৩৬শ বর্ষ] ১৩৬৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত [১ম খণ্ড

সূচীপত্র

হিমালয়

—গোপাল ঘোষ অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৬শ বর্ষ—বৈশাখ, ১৩৬৪] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ১ম সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। "কালীবাড়ীতে কাঙ্গালীরা খেয়ে গেলে তাদের পাতে একটু একটু খেলাম, আর তাদের পাতা মাথায় ঠেকালাম। হলধারী তখন আমায় বললে,—'তুই করছিস কি? কাঙ্গালীদের এঁটো খেলি, তোর ছেলেপিলের বিয়ে হবে কেমন করে?' আমার তখন রাগ হলো। হলধারী আমার দাদা হয়। তা হলে কি হয়? তাকে বললাম, তবে রে শালা, তুমি না গীতা বেদান্ত পড়? তুমি না শেখাও ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা? আমার আবার ছেলেপিলে হবে তুমি ঠাউরেছ? তোর গীতা পাঠের মুখে আগুন। দেখ, শুধু পড়াশুনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বলতে পারে—হাতে আনা বড় শক্ত।"

"ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না হলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। খুব ভালবাসা হলে তবেই চারি দিকে ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হলে তবে চারি দিকে হলদে দেখা যায়। তখন আবার 'তিনিই আমি' এইটি বোধ হয়। মাতালের বেশী নেশা হলে বলে 'আমিই কালী'। গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলতে লাগলো—'আমিই কৃষ্ণ'। তাঁকে রাত-দিন চিন্তা করলে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়, যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিক পরে চারি দিকে শিখাময় দেখা যায়।"

"সে অবস্থার পরে আনন্দও যেমন, আগে যন্ত্রণাও তেমনি। মহাভাব,—ঈশ্বরের ভাব। এই দেহ-মনকে তোলপাড় করে দেয়। যেন একটা বড় হাতী কুঁড়েঘরে ঢুকেছে, ঘর তোলপাড়, হয়তো ভেঙ্গে-চুরে যায়।"

"ঈশ্বরের বিরহ-অগ্নি সামান্য নয়। রূপ সনাতন যে গাছের তলায় বসে থাকতেন, ঐ অবস্থা হলে, এই রকম আছে যে, গাছের পাতা ঝলসা পোড়া হয়ে যেত! আমি এই অবস্থায় তিন দিন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম,—নড়তে-চড়তে পারতাম না, এক জায়গায় পড়েছিলাম। হুঁস হলে, বামনী আমায় ধরে স্নান করতে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত দিয়ে গা ছোঁবার যো ছিল না। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। বামনী সেই চাদরের উপর হাত দিয়ে আমায় ধরে নিয়ে গিছিলো। গায়ে যে সব মাটি লেগেছিল, সে সব মাটি পুড়ে গিছিল!"

"যখন এই অবস্থা আসতো, শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে যেন ফাল চালিয়ে যেত। প্রাণ যায়, প্রাণ যায় করতাম। কিন্তু তার পর খুব আনন্দ।"

"হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম। মাকে বললাম,—আমি মুখ্যু, তুমি আমাকে জানিয়ে দাও, বেদ-বেদান্তে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও। পুরাণতন্ত্রে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও। তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন,—কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।"

"কথা কয়েছে,—শুধু দর্শন নয়, কথা কয়েছে। বটতলায় দেখলাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে তার পর কত হাসি। খেলার ছলে আঙুল মটকান হলো। তার পর কথা!—কথা কয়েছে। তিন দিন করে কেঁদেছি, আর বেদ পুরাণতন্ত্রে—এ সব শাস্ত্রে কি আছে, সব দেখিয়ে দিয়েছেন।"

রবীন্দ্র বংশ

৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও জীবনের নানা খুঁটিনাটি ঘটনা জানেন না এমন লোক বোধ হয় বিরল। তথাপি মহামানব-প্রসঙ্গ যত আলোচিত হয় ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। আত্মীয়তাসূত্রে, সাহিত্যধর্মাশ্রয়ী হওয়ায়, ভারতগৌরব বিশ্ববরেণ্য কবিকে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নিকট হইতে দেখিবার যে সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, সেই দিক হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু আমি আমার লেখার ভিতর দিয়া ধরিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা করিয়াছি, তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে আজ সাহসী হইলাম।

বাস্তুবিদের পক্ষে আবাস-নির্মাণে যেমন প্রথমে ভিত্তিস্থাপন করিতে হয়, মানুষের বেলায়ও জীবনী লিখিতে প্রথম প্রয়োজন হয় বংশের প্রতিষ্ঠাকালের আদিপর্ব। তাই প্রস্তাবনায় দিলাম সব্যাখ্যা কুলপরিচয়-পর্ব, যাহা ঐতিহাসিক প্রয়োজনে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়া পড়ায় সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার নিকটে সবিনয়ে মার্জনা ভিক্ষা করি। শতদল যেমন ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া একদা তাহার সকল দল বিকশিত করে, অসাধারণ প্রতিভাবান আমাদের কবিরও সেদিক হইতে মহৎ বংশের বংশানুক্রমিক দলের ক্রম-পর্যায়ে বিকাশের পূর্ণতা। স্বনামখ্যাত পিতামহ দ্বারকানাথ ও স্বনামধন্য পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে স্বীয় প্রতিভায় ও প্রচেষ্টায় জগৎ-পূজ্য রবীন্দ্রনাথের স্বয়ম্প্রকাশ। রত্নপ্রসূ ঠাকুরবংশে অন্যান্য দিকপালেরও অভাব হয় নাই। রাষ্ট্রজ্ঞানী ও ন্যায়বিদ প্রসন্নকুমার, বাঙলার এক কালে রাষ্ট্রদিকপাল কবি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, তাঁহার অনুজ বিশ্ববন্দিত সংগীতাচার্য রাজা শৌরীন্দ্রমোহন, কবিগুরু-জ্যেষ্ঠাগ্রজ দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ, অন্যতম অগ্রজ সংগীত-বিদ্যাবিশারদ নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কবিগুরু-ভ্রাতুষ্পুত্র শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ কত প্রতিভা দল মেলিয়াছে যাহা একই বংশে কদাচিৎ দেখা যায়।

কুলপরিচয় ও বংশবিবরণ

এদেশের রাঢ়ীশ্রেণী ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে ইতিহাস—গৌড়ের রাজা আদিশূর বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য তাঁহার গৌড়ীয় সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের হস্তে কনৌজের রাজা বীরসিংহের নিকট পত্র দিয়া পাঁচ জন পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া ফিরিয়া যান, কিন্তু সেখানে তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত না করিলে সমাজে চলিতে পারিবেন না বলিয়া সামাজিকেরা আপত্তি উত্থাপন করেন—কারণ তীর্থযাত্রা ভিন্ন তৎকালে কোথাও আসিলে ব্রাহ্মণ পতিত হয় এই বচনের আদর সেই সমাজে ছিল। ব্রাহ্মণেরা প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকৃত হইয়া নিজেদের স্ত্রী-পুত্রদের সহিত গৌড়ে ফিরিয়া আসিলে রাজা আদিশূর তাঁহাদের সমাদর করিয়া বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বাস করিবার জন্য ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে বেদচর্চা প্রচারই আদিশূরের উদ্দেশ্য ছিল। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম লইয়া মতান্তর দৃষ্ট হয়। যে সকল কুলশাস্ত্র এখন পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ, কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ, সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ এবং বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড় এদেশে আসিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ বলিয়া পরিচিত। এড়ুমিশ্র, হরি মিশ্র ও বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্র মতে ইঁহাদের পিতৃগণ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতীশ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় মেধাতিথি, কাশ্যপ গোত্রীয় বীতরাগ, সাবর্ণ গোত্রীয় সৌভরী ও বাৎস্য গোত্রীয় সুধানিধি বঙ্গদেশে আসেন এবং তাঁহাদের উত্তরবংশীয়দের মধ্যে যাঁহারা রাঢ় দেশে (পশ্চিম বঙ্গে) বাস করেন, তাঁহারাই রাঢ়ীশ্রেণীর এবং যাঁহারা বারেন্দ্রভূমিতে (উত্তরবঙ্গে) বাস করেন তাঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর বলিয়া পরিচিত।

আদিশূরের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়ায় রাঢ় ও বারেন্দ্র প্রদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ হয়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে চিরদিনই বেদ হিসাবে প্রথম বিভাগ হয় এবং পরে গোত্র ও প্রবর দ্বারা বিভিন্ন বংশের পরিচয় হয়। আবার এক গোত্রমধ্যে যাঁহারা যজ্ঞাদি বৈদিক অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন তাঁহাদের নামে সেই গোত্রের প্রবরের পরিচয়। গোত্রকার ঋষিদের সহিত এই প্রবরকার ঋষিদের নামোল্লেখ করিয়া যজ্ঞে অগ্নিকে আহ্বান করা হইত। এই সকল ঋষিরা বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা অগ্নির নিকট বিশেষ পরিচিত থাকায় যজ্ঞকর্তাকে সেই পরিচয় অগ্নির নিকট চিনাইয়া দিবে, এইরূপ মনোভাব এই সকল বংশ-পরিচয়ের মূল ছিল বলিয়া মনে হয়। তাহার পরে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের দেশ হিসাবে বিন্ধ্যাচলের উত্তরে পঞ্চ গৌড়ীয় ও বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে পঞ্চদ্রাবিড়ী এই দুই বিভাগে বিভক্ত করা হয়। পঞ্চ-গৌড়ান্তর্গত কান্যকুব্জের বিশেষ প্রসিদ্ধি থাকায় আদিশূর সেইখান হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

কোন্ সময়ে ব্রাহ্মণেরা আসিয়াছিলেন তাহা লইয়াও কুলশাস্ত্রে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন ৬৫৪ শকে (৭৩২ খৃঃ) কেহ কেহ বলেন ৯৫৪ শকে (১০৩২ খৃঃ) 'বেদবাণাঙ্কশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ', আবার কেহ বলেন ৯৯০ সংবতে বা ৮৫৬ শকে (৯৩৪ খৃঃ)। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গড়ে শতবর্ষে চারপুরুষ হিসাব ধরিয়া সময় নির্ণয়ও এক্ষেত্রে দুঃসাধ্য, কারণ বিভিন্ন বংশের বংশলতায় পুরুষের ঐক্য নাই। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ১২০০ বৎসরে ৪৮ পুরুষ কোনো বংশই দেখা যায় না। ইহাতেই মনে হয় যে, বংশলতা ঠিক সমসাময়িক ভাবে

রক্ষিত না হইয়া পরবর্তীকালে নানা বংশের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে সংগৃহীত হইয়াছিল এবং অনেকগুলি নামেরই ছাড় পড়িয়াছে। কাজেই বংশলতাগুলি অভ্রান্ত বলা যায় না। তবে একটা কথা স্মরণযোগ্য। দেখা যায়, অনেক বৈজ্ঞানিক স্বতঃসিদ্ধ মূলসূত্র ভারতে প্রযুক্ত হয় না। ইহার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত ইয়োরোপের অর্থনীতিশাস্ত্রের অনেক মূল সূত্রের এদেশে ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেইরূপ প্রাচীন ভারতের সামাজিক ব্যবস্থার সহিত অন্য দেশের সামাজিক ব্যবস্থায় সাদৃশ্য নাই।

ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায় যে, দ্বিজেরা তিনটি বেদ, অথবা দুইটি অন্তত একটি সমগ্র অধ্যয়ন সমাপনান্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। এই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের সময় ২৫।৩২ বৎসর ছিল। সুতরাং গড়পড়তা শতবর্ষে তিন পুরুষ ধরা অসঙ্গত হইবে না। এ হিসাবে যে সকল বংশে অন্তত ৩৫।৩৬ পুরুষ হইয়াছে তাহা কতকটা নির্ভরযোগ্য। আবার একই সময়ে এক বংশের বিভিন্ন শাখায় কোথাও ১ পুরুষ কোথাও বা ১১ পুরুষ দেখা যায়। এই সকল ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ীশ্রেণীর মূল পুরুষদের ৫৬টি সন্তান হয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর মূলপুরুষদের ১০০টি সন্তান হয়। আদিশূরের পুত্র রাজা ভূশূর এই ১৫৬ জন ব্রাহ্মণকে ১৫৬ খানি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভূস্বামী করিয়া দেন। তাহাতে তাঁহারা সেই সেই গ্রামে গ্রামীন বলিয়া পরিচিত হন। এই গ্রামীন শব্দ অপভ্রংশে গাঁই (গাঞী) হয়। এই গ্রাম অনুসারে নামের সহিত উপাধি ব্যবহৃত হইত। এই কারণেই রাঢ়ীশ্রেণীর ভিতর একটা বাক্য প্রচলিত আছে—আছে—"পঞ্চগোত্র ছাপান্ন গাঁই, ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই।" যদি ৫৬ গাঁইয়ের উল্লেখ আছে কিন্তু বংশলতা ও গাঁইবোধক পদবী দৃষ্টে আমরা বুঝিতে পারি যে অন্তত ৫১ গাঁই ছিল। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের ১৬টি সন্তান ১৬টি বিভিন্ন গ্রাম পাওয়ায় তাঁহাদের ১৬টি গাঁই উপাধি হয়।

আজকাল এ বিষয়ে সেরূপ চর্চা না থাকায় অনেকেরই ধারণা যে রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় হইলেই বন্দ্যোপাধ্যায় হইবে। কিন্তু একমাত্র বন্দ্যঘাটী গ্রামের ভূস্বামী আদি বরাহের বংশধরেরা বন্দ্যঘাটী পরে বন্দ্যোপাধ্যায় বা বাঁড়ুয্যে। ভট্টনারায়ণের অন্যান্য বংশধরেরা নিজ নিজ গ্রাম অনুসারে উপাধি ব্যবহার করিতেন। পরবর্তীকালে রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বরেন্দ্রভূমে গিয়া এবং বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা রাঢ়ে গিয়া বাস করিলেও তাহাদের পরিচয়ে শ্রেণী ও আদিম গাঁইমূলক উপাধির কোনো পরিবর্তন হয় নাই। ঠাকুর বংশীয়েরা ভট্টনারায়ণের কোন্ সন্তানের বংশধর সে সম্বন্ধে ৺প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ও ৺ব্যোমকেশ মুস্তফি প্রণীত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ড, ব্রাহ্মণ বিবরণ, ১ম খণ্ড, ব্রাহ্মণকাণ্ডের ষষ্ঠ অংশ (২৬৮—২৭১ পৃঃ) তে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইহাদের কুশারী গাঁই এবং ইহাদের পূর্বপুরুষ ভট্টনারায়ণের চতুর্দশ পুত্র কোয় বা দীন। ইহারা খুলনার পীঠাভোগ গ্রামের গোষ্ঠীপতি কুশারী বংশীয়ের একটি শাখা। রাঢ়ীশ্রেণীর অধিকাংশ ব্রাহ্মণদের ন্যায় ইহাদেরও সামবেদ, কৌথুমী শাখা। শাণ্ডিল্য গোত্র হওয়ায় ইহাদেরও প্রবর শাণ্ডিল্য, আসিত ও দেবল।

বল্লাল সেন যখন কৌলীন্য মর্যাদা স্থাপন করেন তখন তিনি রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের কুলীন ও শ্রোত্রীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন এবং শ্রোত্রীয়দের মধ্যে সিদ্ধশ্রোত্রীয়, সাধ্যশ্রোত্রীয় ও কষ্টশ্রোত্রীয় এই তিনটি ভাগ হয়। বল্লাল সেন নয়টি লক্ষণের দ্বারা ব্রাহ্মণদের গুণানুসারে কৌলীন্য-মর্যাদা দিয়াছিলেন। যাঁহাদের কোনো একটি গুণের অভাব থাকিত তাঁহাদের এক এক শ্রেণীতে বিভাগ করা হইত, যাহা হইতে শ্রোত্রীয়দের শ্রেণীবিভাগ হয়। সর্বজনপরিচিত নয়টি কুললক্ষণ—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

কুলাচার্যেরা আবৃত্তি শব্দের অর্থ করিতেন সমান ঘরে বৈবাহিক আদান-প্রদান। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই কুলীনের কৌলীন্য ভঙ্গ হইত। আমরা যখন কলেজের ছাত্র তখন তন্ত্রশাস্ত্রে ও তান্ত্রিক আচারে পণ্ডিতপ্রবর জগন্মোহন তর্কালংকার মধ্যে মধ্যে আমাদের খুল্লপিতামহ গোকুলনাথের সহিত দেখা করিতেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম যে, রাজা বল্লাল সেন তান্ত্রিক ধর্ম ও আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তন্ত্রোক্ত কুলাচার ও কৌলশব্দ হইতে এই কুলীন শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণেরা এই ধর্মে আস্থাবান ও ইহার অনুষ্ঠানে যত্নশীল ছিলেন তাঁহাদেরই সমাজে কুলীন আখ্যার মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। কুলীনের এই নয় লক্ষণের একটা গুহ্য অর্থ আছে। আমরা তান্ত্রিকধর্মে দীক্ষিত না থাকায় পণ্ডিত মহাশয় সে গুহ্য অর্থ আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে অসম্মত হইলেন। কাজেই এই শ্লোকের গুহ্য অর্থ জানিবার সৌভাগ্য আমাদের হইল না।

বল্লাল সেন প্রথমে নিম্নলিখিত আটগাঁই ভুক্ত সকল ব্রাহ্মণকেই কুলীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাদের বল্লালপূজিত আটঘর কুলীন বলে। ১। শাণ্ডিল্যগোত্রে বন্দ্যঘাটী গাঁই, ২। ভরদ্বাজগোত্রে মুখুটি গাঁই, ৩। কাশ্যপগোত্রে চাটাতি গাঁই, ৪। সাবর্ণ গোত্রে গাঙ্গুলি গাঁই ও কুন্দ গাঁই, ৫। বাৎস্য গোত্রে ঘোষাল গাঁই, পুতিতুণ্ড গাঁই ও ও কাঞ্জীলাল গাঁই। তাহার পরে তিনি পুনরায় বাছাই করিয়া গুণানুসারে প্রত্যেক গাঁই হইতে কয়েক ব্যক্তিকে কৌলীন্য মর্যাদা দেন। তাঁহারা সংখ্যায় ১১ জন। এই কয়জন ভিন্ন সেই গাঁইভুক্ত অন্যান্য সকলের কৌলীন্য রহিত হইয়া যায়।

পরে রাজা লক্ষ্মণ সেন ব্রাহ্মণদের মর্যাদা নির্ণয়ের সময় সাবর্ণ গোত্রে কুন্দ এবং বাৎস্য গোত্রে পুতিতুণ্ড ও কাঞ্জীলাল গাঁইভুক্ত ব্যক্তিদের কৌলিন্য মর্যাদা রহিত করেন। যাঁহারা কৌলীন্য পাইয়াছিলেন কিন্তু পরে রহিত হয়, তাঁহাদের বংশধরেরা বংশজ নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। লক্ষ্মণসেন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বন্দ্যঘাটী গাঁইভুক্ত ১। জাহ্লন, ২। দেবল, ৩। বামন, ৪। মকরন্দ, ৫। মহেশ্বর, ৬। ঈশান; ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখুটি গাঁইভুক্ত ৭। উৎসাহ, ৮। গরুড়; কাশ্যপ গোত্রীয় চাটাতি গাঁইভুক্ত ৯। বহুরূপ, ১০। হলায়ুধ, ১১। শুচ, ১২। অরবিন্দ, ১৩। বাঙ্গাল; সাবর্ণ গোত্রীয় গাঙ্গুলী গাঁইভুক্ত ১৪। শিশু; বাৎস্য গোত্রীয় ঘোষাল গাঁইভুক্ত ১৫। শিরোমণি শংকর এই পনেরো জনকে কৌলীন্য মর্যাদা দিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণদের গুণানুসারে বাছাই করার পরিবর্তে কৌলীন্য মর্যাদা বংশগত করিয়াছিলেন এবং কুলীন কুলমর্যাদানুসারে কার্য করিতেছেন কি না তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য কয়েক জনকে ঘটক নিযুক্ত করিলেন। ঘটকদের তালিকায়

ইঁহারাই লক্ষ্মণপূজিত কুলীন এবং ইঁহাদের উত্তর পুরুষই বর্তমানে কুলীনশ্রেণী বলিয়া আখ্যাত।

কয়েক শত বৎসর পরে মুসলিম অধিকারে শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় সংকেত বন্দ্যোর বংশধর দেবীবর ঘটক কুলীনদের তৎকালীন অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, সকল বংশেই অল্পবিস্তর দোষ ঘটিয়াছে। ফলে 'দোষ নাই যার, কুল নাই তার' হইয়াছে। তখন এক জাতীয় দোষকে এক একটি গুচ্ছে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে ৩৬ মেলের সৃষ্টি হইল, 'দোষানাং মেলকো মেলঃ।' কোন্ কোন্ মেলের সহিত কোন্ মেলের বৈবাহিক কার্য প্রশস্ত তাহাও নিরূপিত হইল। যাঁহারা দেবীবরের ব্যবস্থা মানিলেন না তাঁহারা দেশ ত্যাগ করিয়া ভিন্ন দেশে চলিয়া গেলেন; এইরূপে মধ্যদেশী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইল। যাঁহারা দেশে রহিলেন তাঁহারা নিষ্কুল অথবা দেবীবরখাঁটা বলিয়া অভিহিত হইলেন। কুলশাস্ত্র মতে মেলবন্ধন ১৪০২ শকে (১৪৮০ খৃঃ) হইয়াছিল। ইহা কেবল কুলীনদের জন্য, শ্রোত্রীয়দের সহিত ইহার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। যে সকল শ্রোত্রীয়বংশ কেবল কুলীনদের কন্যাদান করিতেন এবং বহু কুলীনের পরিপোষক ছিলেন, তাঁহাদের দেবীবরের পূর্ব হইতেই গোষ্ঠীপতি আখ্যা চলিয়া আসিতেছিল।

এই মেলবন্ধন ব্যাপার আমাদের নিকট বিশেষ জটিল রহস্যাবৃত বলিয়া মনে হয়। বংশে কোনোরূপ দোষ থাকিলে লোকে স্বভাবত তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়। কিন্তু দেবীবরের ব্যবস্থায় এই দোষের পরিচয় দিয়া নিজেদের বংশমর্যাদা স্থাপিত করিতে হইত। এখন আমরা এ সকল বিষয়ে অনভ্যস্ত হওয়ায় মেলকে কুলীনদের শ্রেণীবিভাগের একটি নামমাত্র এইরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা লইয়া থাকি। কিন্তু দেবীবরের সময়ে এই মেলের অর্থ সুস্পষ্ট ছিল। কোন্ মেলে কী কী দোষ বুঝায় তাহা মেলের নাম করিলে লোকে বুঝিতে পারিত। বঙ্গদেশের সর্বত্র এইরূপে সকল কুলীনকে দোষযুক্ত পরিচয় দিতে বাধ্য করিল—দেবীবরের পশ্চাতে এমন কী শক্তি ছিল? কিংবদন্তী আছে যে, দেবীবর কামাখ্যায় তপস্যা করিয়া এই বরলাভ করেন যে বাঙলা সমাজে তিনি যে ব্যবস্থা চালাইতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাই চালাইতে পারিবেন ও ৫০০ বৎসর সেই ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সেই সময়েই অনেকে দেবীবরের ব্যবস্থা গ্রহণে অসম্মতি দেখাইয়াছিলেন।

অনুমান হয় যে, কোনো প্রবল রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা না পাইলে এইরূপ ব্যবস্থা সমস্ত দেশব্যাপী করা সম্ভবপর হইত না। যে সকল পাঠান সম্রাটেরা হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতির সম্মত ব্যবস্থা সংকলনের জন্য হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কে বলিতে পারে এ বিষয়ে তাঁহাদের কোনো সম্বন্ধ ছিল কি না? বিশেষত যখন দেখি যে মুসলমান সময়ে জাতিমালা নামে একটা কাছারী ছিল, যেখানে জাতি-ঘটিত সমস্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইত। রাজা নবকৃষ্ণ ইংরাজের প্রথম আমলে এইরূপ জাতিমালার কাছারীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। ইংরাজ এরূপ কাছারীর স্রষ্টা নয়, বঙ্গবিজয়ের পর দেশে এইরূপ কাছারী প্রচলিত আছে দেখিয়া সেই কাছারীর কাজকর্মের ব্যবস্থা করিয়াছিল মাত্র। হয়তো এইরূপ কাছারীতে ব্রাহ্মণদের জাতি-মর্যাদা নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্যে বাদশাহের নিযুক্ত কর্মচারীদের প্রধানস্বরূপ দেবীবর মেলবন্ধন সৃষ্টি করেন ও সেই মেলবন্ধন অনুসারে পরিচয় দিতে রাজাদেশ সকলকে বাধ্য করে; ইহা যদিও অনুমান মাত্র। মনে হয় এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয় নাই, ঐতিহাসিকদের এ বিষয়ে দৃষ্টিপাতের জন্য এখানে এই কথার উল্লেখ করিলাম।

কোয়র বংশীয়েরা সিদ্ধশ্রোত্রীয়। (বিশেষ বিবরণ হরিদাস চট্টো প্রণীত ব্রাহ্মণ ইতিহাস গ্রন্থে ৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) আমরা যশোহর ব্রাহ্মণডাঙা নিবাসী যদুনাথ সার্বভৌমের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে লিখিত কোয়র বংশলতা নামক পুঁথির সাহায্যে এবং সুপ্রিম কোর্টের কয়েকটি মোকর্দমার নথিপত্র দৃষ্টে ইংরাজিতে যে বংশলতা সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহার মুদ্রিত এক একখণ্ড 'ঠাকুর বংশ' নামে কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে, ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। প্রয়োজন হইলে কৌতূহলী পাঠকপাঠিকা তাহা দেখিতে পারেন। ঐ বংশলতা হইতে কিছু কিছু নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কোয়র অধস্তন পুরুষ ভট্টনারায়ণ হইতে ২৩শ বংশধর জগন্নাথ কুশারী ন্যায়পঞ্চানন পিঠাভোগ হইতে যশোহর জেলার ইসফপুর বা চেঙ্গোটিয়া পরগণার শুকদেব রায়চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্বশুর-প্রদত্ত বারপাড়া নরেন্দ্রপুর গ্রামে বসবাস করেন। এই শুকদেব রায়চৌধুরী প্রথম পীরালী দোষগ্রস্ত হওয়ায় সামাজিক ব্যবস্থানুসারে জগন্নাথ ও তৎবংশীয়গণ সিদ্ধশ্রোত্রীয় থাকা সত্ত্বেও পীরালী থাকভুক্ত হইয়া গেলেন। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ঐ খণ্ড দ্রষ্টব্য)। ঘটকগ্রন্থে আছে 'কার্পণ্যদোষাৎ পীরালী'। ঘটকদের যথেষ্ট অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে যে সকল বংশ অসমর্থ ও অসম্মত হয়, তাহাদের পীরালী দোষ স্থায়ী হইয়া যায়। নতুবা কুন্দপুরের রাজবংশ, রায় রায়াঁ গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়ের বংশ এবং হলদা মহেশপুরের অনেক পীরালীদোষদুষ্ট বংশ 'ঘটকেন মার্জিত' হইয়া কুলীনবহুল সমাজেও গোষ্ঠীপতিত্ব করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কাল হইতেই এই পীরালী সমাজের কন্যা দৌহিত্রীদের জন্য কুলীন ও শ্রোত্রীয় সমাজ হইতে পাত্র সংগৃহীত হইয়া এই সমাজের বিস্তৃতি ও পুষ্টিসাধন হইয়াছে। সেই প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি ইহা দেখা যায় যে কুলীন বা শ্রোত্রীয় সমাজ হইতে যিনি আসিয়া এ সমাজে বিবাহ করিতেন তিনি স্বসমাজ পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরাশ্রয়ে গৃহ-জামাতারূপে বাস করেন।

এই জগন্নাথের বিবাহ সম্বন্ধে নীলকান্ত ভট্ট ঘটকের কারিকা বঙ্গীয় জাতীয় ইতিহাস হইতে উদ্ধৃতি দিলাম—

জগন্নাথ ন্যায়পঞ্চানন
বড়ই পণ্ডিত বিচক্ষণ
বড় বজরায় পুরানো কসবায় করতেছেন গমন।
ভীমরব ভৈরবের জলে,
যাচ্ছে বজরা ভাসছে কুতুহলে,
ভট্টনারায়ণ বংশধর
জগন্নাথ, তারপর
এমন সময় ঝোড়ো কোণায় কালো মেঘের দরশন।
জগন্নাথ আজ হবেন ঠুঁটো,
পবন ধুলো উড়োয় মুঠো মুঠো,

তাই গুড় গুড় মেঘেরা ডাকে,
ক্রমে বাড়াবাড়ি চিকুর হাঁকে,
জগন্নাথ পড়িয়া বিষম পাকে,
চেঙ্গটিয়ার কেয়াতলায় করলেন মাকে দরশন।
কেয়াতলায় কালীবাড়ির পাড়া,
রাজবাড়িতে প'ড়ে গেল সাড়া,
বটে বটে বটে ভাটেরা কয়
খট্ খট্ চলে রাজার হয়,
ঘাড়ের মাথায় চললেন রায় আরাধিতে পঞ্চানন।
যত্তনেতে জগন্নাথ বশ,
আতিথ্যের কিবা সুযশ,
জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ,
রাখো মেরা বাৎ, চলো মেরে সাথ,
তোকে সোয়ার এহি ঘোড়ে পর
নজ্‌দিক্ হৈ তো রাজভবন।
পুরুষোত্তম জগন্নাথ,
চললেন শুকদেবের সাথ,—
দেখিয়া সুন্দরী মেয়ে
পুরুষোত্তম করলেন বিয়ে
মুখমিষ্টি গুড় খেয়ে—
এই যে গোষ্ঠী মুখমিষ্টি জানে তা তো সর্বজন।

শুকদেব রায়চৌধুরীরা কান্যকুব্জাগত কাশ্যপগোত্রীয় রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ দক্ষের পুত্র ধীরের বংশধর। রাজা ভূশূর ধীরকে মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত গুড় গ্রামের ভূস্বামী করেন। তিনি ধীরগুড়ী নামে অভিহিত হন ও তৎবংশীয়দের গুড়গাঁই হয়। শুকদেবের এক পূর্বপুরুষ রঘুপতি আচার্য কনকদণ্ডি নামে আখ্যাত হন এবং তাঁহার বংশীয়েরাও কনকদণ্ডি গুড় বলিয়া সমাজে পরিচিত ছিলেন। কিম্বদন্তী এই যে, রঘুপতি দণ্ডিসন্ন্যাসী হইয়াছিলেন এবং কাশীতে তাঁহার বিদ্যাবত্তা ধর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি দেখিয়া দণ্ডিরা তাহাদের নিজেদের প্রধান বলিয়া স্বীকার করেন এবং এই প্রাধান্য স্বীকারের চিহ্নস্বরূপ একটি স্বর্ণ-নির্মিত দণ্ড উপহার দেন এবং সেই হইতে তিনি কনকদণ্ডি আখ্যায় ভূষিত হন। আবার কেহ বলেন, তিনি কনকদাঁড় গ্রামে বাস করায় কনকদণ্ডি আখ্যা প্রাপ্ত হন। সেই কারণে "গুড় গুড় মেঘেরা ডাকে" এবং "মুখ মিষ্টি গুড় খেয়ে" এই যে "গোষ্ঠী মুখ মিষ্টি জানে তা তো সর্বজন" প্রভৃতি বক্রোক্তি দ্বারা গুড় গাঁইয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

"চেঙ্গোটিয়ার কেয়াতলায় করলেন মাকে দরশন"—শুকদেব পীরালী হইবার বহুপূর্বে তাঁহার জনৈক পূর্বপুরুষ দক্ষিণানাথ রায় কেয়াতলায় যে কালী প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল ও এখনো আছে। গুড় চৌধুরী বংশীয়েরা এখনো উক্ত কালীর সেবায়েত। বিদেশাগত পথিকদের আশ্রয় স্থান ও অতিথি-সংকারের এই কালীবাড়িতে ব্যবস্থা ছিল। কারিকায় উক্ত পুরুষোত্তম বিবাহবার্তা জগন্নাথের বিশেষণ। এই চৌধুরী বংশের কন্যাদের মুখশ্রী ও অঙ্গসৌষ্ঠবের সুখ্যাতি থাকায় পরবর্তীকালে কলিকাতার ঠাকুর বংশীয়েরা চিরদিন এই বংশ হইতে কন্যা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। জোড়াসাঁকোর নীলমণি-শাখায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিবাহ এই বংশে হইয়াছিল। পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ-শাখায় দানবীর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ও ৺রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরও এই বংশের কন্যা বিবাহ করেন। এই চেঙ্গোটিয়া পরগণা হইতে কলিকাতা ঠাকুরগোষ্ঠীতে এত বধূর সমাগম হইয়াছে যে যশোহরকে ঠাকুর বাবুদের মাতৃভূমি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই রায়চৌধুরীদের অন্যতম বংশধর লখনৌ শিল্প কলেজের স্বনাম-প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায়-চৌধুরী মূর্ত্তি শিল্পী (Sculptor) বিলাতে প্রস্তর খোদাই ও গঠনাদি শিল্পে শিক্ষা করিয়া ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম বিলাতের A. R. C. A. (Associate of the Royal College of Art) হন এবং ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র রণজিৎ স্বরোদ যন্ত্রবাদন ও কুস্তির জন্য উত্তর-ভারত অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পাঞ্জাবী মল্লদের প্রতিযোগিতায় লাহোরে পরাজিত করিয়া নিখিল ভারতের Wrestling Championship Trophy লাভ করিয়া শরীরচর্চা বিষয়ে বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

বিবাহের পর জগন্নাথ স্বীয় সমাজ ত্যাগ করিয়া যশোহর নরেন্দ্রপুর বারপাড়া গ্রামে শ্বশুর-প্রদত্ত ভূমিতে বাস্তুভিটা পত্তন করেন। সেই খানেই জগন্নাথের চার পুত্র হয় :—(১) প্রিয়ংকর বা সদাশিব, ইঁহার বংশ নাই, (২) পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ, (৩) হৃষীকেশ ও (৪) মনোহর। পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশের পর তাঁহার অধস্তন বংশীয়দের মধ্যে বিদ্যাবত্তার উপাধি না থাকায় তাঁহারা কুশারী ও চক্রবর্তী উপাধি ব্যবহার করিতেন। মুসলমান সরকারে কর্ম করিয়া হৃষীকেশ ও মনোহর মজুমদার ও মুন্সী উপাধি গ্রহণ করেন। হৃষীকেশের অধস্তন বংশীয়েরা যশোহরের শাঁখাবিগাতির মজুমদার বংশ বলিয়া পরিচিত। মনোহরের অধস্তন বংশীয়দের এক শাখার বক্সী ও এক শাখার মজুমদার উপাধি হয়। এই মুন্সীবংশ, বক্সীবংশ এবং মজুমদার বংশ যশোহরের জগন্নাথপুর ও উত্তরপাড়ায় বসবাস করেন এবং বিভিন্ন উপাধিধারী হইলেও ঠাকুরবংশীয়দের গাঁই-গোত্রীয়-জ্ঞাতি। জগন্নাথ-পুত্র পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশের অধস্তন পঞ্চম-পুরুষে মহেশ্বর ও শুকদেবের জন্ম। মহেশ্বর-তনয় পঞ্চানন ও তাঁহার পিতৃব্য শুকদেব নিজেদের ভাগ্যোন্নতির জন্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে গোবিন্দপুরে কালী-ঘাটের নিকটে আসিয়া আদিগঙ্গাতীরে বাস করেন। তখন আদি-গঙ্গার নাম ছিল গোবিন্দপুরের খাঁড়ি (এখনকার দিনে 'টালির নালা')।

[ক্রমশঃ।

প্রাচীন মিশরে হিন্দু-সভ্যতার প্রভাব

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ

বিশ্বের রাজনীতি ক্ষেত্রে আজ মিশর দেশের গুরুত্ব অল্প নহে। আয়তনে অতি ক্ষুদ্র হইলেও শিক্ষায়, সভ্যতায় এবং সামরিক গুরুত্বে এই দেশ বিশ্বের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে সময়ে ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ অজ্ঞানতার তিমিরে সমাচ্ছন্ন, সেই সুদূর অতীতেও এই দেশ জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। হেরোডোটাস্ ডিওডোরাস্ প্রভৃতি গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণের লেখা হইতে প্রাচীন মিশরের বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়। তাহা ছাড়া খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলেও এই দেশের উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী কালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশরীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর এডলফ্ এরমান (Adolf Erman) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর অবিনাশচন্দ্র দাস এই বিষয়ে বেশ কিছু আলোচনা করিয়াছেন।

মিশর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ মনে করেন, সেমিটিক মুসর (Musr) অথবা আরবী মসর (Mosr) শব্দ হইতে মিশর শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। অন্যদের মতে সংস্কৃত 'মিশ্র' শব্দ হইতে এই শব্দটি আসিয়াছে। আমরা শেষোক্ত মতটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

মিশরের উর্ব্বর ভূখণ্ড বিভিন্ন দেশের কৃষকদিগকে এই দেশে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় আর্য্যগণ আসিয়া এই দেশে উপনিবেশ স্থাপনের পর নিজেদের উন্নত সভ্যতা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের নামেরও পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন— এইরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন দেশ হইতে আগত বিভিন্ন জাতীয় লোকের সংমিশ্রণে যে দেশের জনসাধারণের উদ্ভব হইয়াছিল, ভারতীয় আর্য্যগণ তাহাদের সকলের সমান মর্য্যাদা স্বীকার করিবার জন্যই সেই দেশটিকে মিশ্রদেশ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

সেমিটিক বা আরব জাতির সভ্যতা অপেক্ষা মিশরের সভ্যতা বহু পুরাতন। সুতরাং ঐ সকল জাতির প্রভাবে এই দেশের নাম পরিবর্ত্তনের কল্পনা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত যুক্তিই অধিকতর বিচারসহ। সেমিটিক মুসর এবং আরবী মসর শব্দ সংস্কৃত মিশ্র শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে করি।

অতি প্রাচীন কালে মিশরের অধিবাসিগণ তাহাদের দেশকে 'কমিত' (Kamit) নামে অভিহিত করিত। অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র দাসের মতে এই 'কমিত' শব্দটি সংস্কৃত 'কৃষ্ণমৃৎ' শব্দের অপভ্রংশ। মিশরের মৃত্তিকার কৃষ্ণ বর্ণ দেখিয়া ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ উক্ত দেশটিকে এই নামে অভিহিত করিতেন বলিয়া অধ্যাপক দাস মনে করেন। অধ্যাপক দাসের এই অনুমান সত্য হউক আর না হউক, মিশর শব্দের মূল যে সংস্কৃত 'মিশ্র' শব্দ, এই সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

মিশরের ইংরাজী নাম 'ইজিপ্ট' (Egypt)। গ্রীকগণ এই দেশকে বলিতেন 'ঐজিপ্টস্'। এই ঐজিপ্টস শব্দ হইতেই ইংরাজী ইজিপ্ট শব্দটি আসিয়াছে। অধ্যাপক দাসের মতে ইহা সংস্কৃত 'আগুপ্ত' শব্দের অপভ্রংশ।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা ঐতিহাসিক অধ্যাপক হীরেন (Heeren) মিশর এবং ভারতের নরকঙ্কালসমূহ পরীক্ষা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই উভয় দেশের লোকেরা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত (Ibid, vol 1 page 77) অধ্যাপক হীরেন তাঁহার রচিত 'ঐতিহাসিক গবেষণা' (Historical Researches) গ্রন্থমালার এক স্থানে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, মিশরবাসিগণের আদিপুরুষ সম্বন্ধে গবেষণা করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি ভারতবাসিগণের উপর পতিত হইবে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, 'শঙ্কর' নামক একজন নরপতির অধীনে প্রাচীন মিশরের অধিবাসিগণ পূর্ব্বদিকের 'পুন্ত' (Punt) নামক প্রদেশ হইতে এই দেশে আসিয়াছিলেন (Rigvedic India, by A. C. Das, Page—259) আমার মনে হয়, এই পুন্ত শব্দ সংস্কৃত 'প্রান্ত' শব্দের অপভ্রংশ। অর্থাৎ ভারতের এক প্রান্ত হইতে (সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত) উক্ত রাজার অধীনে প্রাচীন ভারতের এক দল লোক এই দেশে আসিয়া সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। যে রাজার অধীনে তাঁহারা এই দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহার নামও খাঁটি ভারতীয়ই বটে।

মিশরের প্রাচীন দেব-দেবীর নাম, বর্ণনা ও অর্চ্চনা-পদ্ধতির সহিত ভারতীয় দেবদেবীগণের নাম, বর্ণনা ও অর্চ্চনা পদ্ধতির বহুলাংশে মিল আছে। (ভারতীয়) ঈশ্বর = (মিশরীয়) ওসিরিস (Osiris) (ভারতীয়) ঈশ্বরী = (মিশরীয়) ঈসিস (Isis)। এইরূপ হর (বা সূর) — হোরাস (Horus)। সূর্য — সিরিয়াস (Sirius) ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের কল্পনায় ও প্রাচীন মিশরীয়গণ বৈদিক চিন্তাধারা হইতে বেশী দূরে যান নাই (Historians' History of the world, vol I, Page—280)

'ওসিরিস' দেবের অর্চ্চনা পদ্ধতি ভারতীয় শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা-পদ্ধতির অনেকটা অনুকরণ বলিয়া বুঝা যায়। শিবলিঙ্গ পূজার অনুকরণেই ওসিরিস দেবকে নির্ম্মিত লিঙ্গমধ্যে অর্চ্চনা করা হইত। এমন কি, উক্ত 'ওসিরিস' দেবের অর্চ্চনার প্রচলন সম্বন্ধে মিশর দেশে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাও ভারতের দক্ষযজ্ঞ বিনাশ উপাখ্যানের অনুকরণই বটে। বিশ্বকোষ অভিধানে এই কিম্বদন্তীটি নিম্নলিখিত ভাবে লিখিত আছে। যথা—

"টাইফন নামক দেবতা মন্ত্রণা পূর্ব্বক ওসীরিসকে নষ্ট করিয়া তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন। এই অশুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভার্য্যা আইসিস দেবী সেই সমস্ত দেহখণ্ড সংগ্রহপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখেন। কিন্তু তিনি লিঙ্গদেশ না পাইয়া প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহার পূজা ও মহোৎসব প্রচলিত করেন।"—বিশ্বকোষ, লিঙ্গশব্দ।

দক্ষযজ্ঞ বিনাশের উপাখ্যানে কথিত আছে যে, পতিনিন্দা শ্রবণে ঈশ্বরী সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দেহ বিষ্ণুর চক্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল, আর এখানে ওসিরিস বা স্বয়ং

ঈশ্বরের দেহ বিনষ্ট ও খণ্ডীকৃত করার কথা বর্ণিত হইয়াছে, এইমাত্র বিশেষ।

যদিও মিশরীয়দের পূর্ব্বপুরুষগণ এই পবিত্র ভারতভূমি হইতেই গিয়াছিলেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, তথাপি পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের বংশধরগণও যে ভারতবর্ষ হইতে নব নব চিন্তাধারাসমূহ স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে। হেরোডোটাস, ডিওডোরাস প্রভৃতি গ্রীক ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, খৃষ্টের জন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে মিশরীয় নৃপতিগণ একাধিক বার ভারতবর্ষে বিজয় অভিযান চালাইয়াছিলেন। হেরোডোটাস বলিয়াছেন—খৃষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরাধিপতি দ্বিতীয় রামশেষ (Ramses) [ইতিহাসে ইঁহাকে the great or মহামতি উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে] দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া সিডিয়া, পারস্য ও বেকট্রিয়ানা বিজয়ের পর ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও বিজয় অভিযান চালাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

দ্বিতীয় রামশেষের ভারত অভিযানের ফলে তদানীন্তন মিশরীয়গণ ভারতীয় চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিয়া এক নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই রামশেষের পৃষ্ঠপোষকতায় মিশরীয় মনীষিগণ বিবিধ কাব্য, অলঙ্কার ও দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন। যাহা পূর্ব্বে 'অসিসন্দিয়াস-এর (অসঙ্কার) মন্দির' নামে পরিচিত ছিল, রামশেষ তাহাকে এই সময় হইতে 'রামেশ্বরম' (Ramesseum) নামে পরিচিত করিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে 'সেতুবন্ধ-রামেশ্বরম' নামক পবিত্র তীর্থে সিংহল বিজেতা ভারতীয় আর্য্য নৃপতি শ্রীরামচন্দ্রকে দেবতার ন্যায় পূজিত হইতে দেখিয়া এই যশোলিপ্সু নরপতি স্বকীয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উল্লিখিত অভিনব নামকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'রামশেষ' এই উপাধিটিও সম্ভবতঃ ভারতীয় নৃপতি শ্রীরামচন্দ্রের নামের অনুকরণ গৃহীত হইয়াছিল। মিশরীয় পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায়, মহামতি দ্বিতীয় রামশেষের প্রকৃত নাম ছিল 'সেযোস্ত্রী' (Sesostris) সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর। তিনি 'রামশেষ' (শেষরাম বা দ্বিতীয় রাম) এই উপাধি ধারণ করেন।

দ্বিতীয় রামশেষের পূর্ব্বেও যে মিশরদেশে ভারতীয় প্রভাব বিদ্যমান ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় রামশেষের পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতি 'সেতি' (Seti) 'অবিদোষ' (Abydos) নামক স্থানে সুপ্রসিদ্ধ দেবতা 'ওসিরিস্' এর অর্চ্চনার জন্য এক মনোরম মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেতির পূর্ব্বে যিনি মিশরের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তিনিও রামশেষ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, অধ্যাপক এরমানের মতে উক্ত প্রথম রামশেষের সিংহাসন আরোহণের কাল খৃঃ পূঃ ১৩৬৫ অব্দ। ভারতীয় সভ্যতা এবং শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তি-কলাপের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে সম্ভবতঃ প্রথম রামশেষের 'রামশেষ' এই উপাধি ধারণ সম্ভব হইত না। এতদ্ব্যতীত 'ওসিরিস' দেবের লিঙ্গপূজা এবং তৎসংক্রান্ত প্রবাদসমূহ যে ভারতীয় সভ্যতারই প্রভাবের ফল, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এতদ্ব্যতীত আরও বহু বিষয়ে প্রাচীন মিশরে হিন্দু সভ্যতার আলোক সম্পাতের প্রমাণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি—

(১) ভারতের সুপবিত্র বেদ ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে যে জন্মান্তর-রহস্যের উল্লেখ আছে, প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যেও তাহাতে সুদৃঢ় বিশ্বাস দেখা যায়।

(২) প্রাচীন ভারতের লেখকগণ কোন লেখাতেই নিজেদের নাম যোগ করিতেন না, ইহার অবিকল অনুকরণ প্রাচীন মিশরের লেখাসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক অধ্যাপক এরমান ইহা লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে লিখিয়াছেন—

'Poetry, we see, flourished at the time of Ramses, and the manuscripts of the works have been preserved, but the names of the authors were not added."

(Historians' History of the World, vol—I, Page—147)

বঙ্গার্থ—আমরা দেখিতে পাই, রামশেষের সময়ে কাব্য-রচনা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঐ সকল কবিতার পাণ্ডুলিপিসমূহও সুরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান আছে, কিন্তু কোথাও লেখকের নাম সংযোজিত হয় নাই।

(৩) গ্রীক ঐতিহাসিকগণের লিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন মিশরে পুরোহিত সম্প্রদায়ের একটি স্বতন্ত্র জাতি ছিল এবং এই জাতিটি জন্মানুযায়ী বিবেচিত হইত। সময়ে সময়ে রাজবংশীয় ব্যক্তিদিগকেও পুরোহিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে দেখা যায়। সমাজের উপর পুরোহিত সম্প্রদায়ের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল, এমন কি নৃপতিগণ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। পুরোহিত সম্প্রদায়ের পরেই সমাজে যোদ্ধ সম্প্রদায়ের স্থান ছিল। ইহাদের জাতিও জন্মানুযায়ী বিবেচিত হইত। পুরোহিত ও যোদ্ধৃগণ প্রভূত পরিমাণ ভূমির অধিকারী হইতেন এবং এইজন্য তাঁহাদিগকে কোনরূপ রাজকর দিতে হইত না। অবশিষ্ট জনসাধারণ কৃষিকার্য্য, পশুপালন, শিল্প ও বাণিজ্যের সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং তাহারাই রাজ্যের প্রকৃত প্রজা হিসাবে বিবেচিত হইত। এই সম্প্রদায়ের কেহই পুরোহিত অথবা সৈনিক হইতে পারিত না।

ভারতীয় জাতিভেদ প্রথার সহিত মিশরের এই জাতিভেদ প্রথার প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান। কেবলমাত্র, ভারতে বৈশ্য নামে একটি স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু মিশরে এই শ্রেণীর লোকদিগকে শূদ্রপর্য্যায়ে গণনা করা হইত। এতদ্ব্যতীত আর সকল বিষয়েই এই জাতিভেদ প্রথাটিকে ভারতীয় জাতিভেদ প্রথার অনুকরণ বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক এরমান এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"The Egyptians are said to have been divided into castes, similar to those of India."

(Historions' History of the World, Vol-1, page 200)।

বঙ্গার্থ—মিশরীয়গণও ভারতীয় জনগণের ন্যায় বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত ছিলেন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

(৪) মিশরীয় নরপতিগণ যেমন ভারতীয় নৃপতি শ্রীরামের নামের অনুকরণ করিতেন, তেমনি তাঁহার অন্যান্য গুণাবলীর অনুকরণেও তাঁহারা কুণ্ঠিত ছিলেন না। স্বদেশের জনসাধারণকে তাঁহারা শ্রীরামের মত এক পত্নীব্রত পালন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

(৫) যে সময়ে মিশরের মনীষিগণ অধ্যাত্ম আলোচনায় বিরত হইয়া বস্তুতান্ত্বিক আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন এবং তাঁহাদের মনীষার ফলে সহস্র সহস্র বৎসরের জন্য মৃতদেহ সমূহকে অবিকৃত রাখার কৌশল আবিষ্কৃত হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বিস্ময়স্থল পিরামিড সমূহ নির্ম্মিত হইতে লাগিল, তখন মিশরের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণ ইহাকে স্বদেশীয় সভ্যতার অবনতি বলিয়া মনে করিতেন। 'প্রিসে পেপিরাস' নামক সুপ্রাচীন মিশরীয় গ্রন্থ হইতে এই বিবরণ জানা যায়।

প্রাচীন ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে সময়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চ্চায় বিরত হইয়া নালীক (বন্দুক ও পিস্তল) মহানালীক (কামান), অগ্নিচূর্ণ (বারুদ) ও অন্যান্য মারাত্মক সমরোপকরণ নির্ম্মাণে ব্রতী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে সনাতনপন্থী মনস্বিগণ তাঁহাদের এই কার্য্যকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করিতেন। শুক্রনীতিসার প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে নালীক, মহানালীক ও অগ্নিচূর্ণের সাহায্যে যুদ্ধ করাকে ঘৃণাভরে 'আসুরিক যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

পরবর্ত্তীকালে যেমন রক্ষণশীল দলের চেষ্টার ফলে বারুদ প্রভৃতি নির্ম্মাণের সূত্র (ফরমূলা) পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, ঠিক তেমনি মৃতদেহ অবিকৃত রাখার বিদ্যাটিও ক্রমশঃ মিশরদেশ হইতে বিলুপ্ত হইল। ইহাকে ভারতীয় ভাবধারার প্রভাবের ফল মনে করা অসঙ্গত হইবে না। ধ্বংসাত্মক কার্য্য হইতে মানুষকে বিরত করিবার জন্য ভারতীয় মনীষিগণ বারুদ নির্ম্মাণ-বিদ্যা বিনষ্ট করিয়াছিলেন, আর মানুষকে অপব্যয়ের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মিশরদেশের মমি-নির্ম্মাণ-বিদ্যা (মৃতদেহ অবিকৃত রাখার বিদ্যা) সেই দেশের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বিলোপিত হইয়াছিল।

(৬) প্রাচীনকালের ভারতীয়গণের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, অশেষ পুণ্যশালী মনুষ্যগণ দেবত্ব বা নক্ষত্রত্ব লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধ্রুব, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী প্রভৃতির নক্ষত্রত্বলাভ এবং নহুষের ইন্দ্রত্বলাভ প্রভৃতির বিবরণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যেও ঠিক অনুরূপ বিশ্বাস ছিল। হেরোডোটাস্ ডিওডোরাস, ডাঃ এরমান প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণে এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

(৭) অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ 'সূর্য্য' দেব ছিলেন বলিয়া ভারতীয়গণ বিশ্বাস করিতেন; আর প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যেও বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহাদের রাজবংশের আদিপুরুষ দেবতা সুর বা সোল (sol)। সংস্কৃত ভাষায় 'সুর' শব্দে সূর্য্যকেই বুঝায়; এবং র ও ল এর উচ্চারণ প্রায় অভিন্ন।

(৮) মিশরীয় বীরগণ যে সময়ে দিগ্‌বিজয় ব্যপদেশে নূতন ভাবে ভারতীয়গণের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহার পর হইতেই ভারতীয় অনুকরণে মিশরের সর্ব্বত্র অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির নির্ম্মিত হইতে থাকে। পেট্রোনিয়াস (Petronius) নামক সুবিখ্যাত পর্য্যটক মিশরের অসংখ্য দেবমন্দির দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লিখিয়াছেন—

"This country is so thickly peopled with divinities, that, it is easier to find a god than a man." (ডাঃ এরমানের প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত)।

বঙ্গার্থ—এই দেশে দেবতাগণের এতই ঘনবসতি যে, একজন মনুষ্যকে খুঁজিয়া বাহির করা অপেক্ষা একজন দেবতাকে খুঁজিয়া বাহির করা অধিকতর সহজ।

অনুকরণকারিগণ যাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হন, অনেক সময়ে কোন বিষয়ে তাহাকেও অতিক্রম করিয়া থাকে। দেবমন্দির নির্ম্মাণ ব্যাপারে মিশরবাসিগণও তাহাই করিয়াছেন।

(৯) ভারতবর্ষে যেমন মিথিলার রাজপুত্র কুশধ্বজ প্রমুখ কোন কোন নৃপতিনন্দন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তপশ্চর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিতেন, মিশর দেশেও তেমনি কোন কোন রাজপুত্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দেবমন্দিরে দেবতার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বিতীয় রামশেষের জ্যেষ্ঠপুত্র 'খামুস' (Khamus) এর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১০) 'পেপিরাস' নামক প্রাচীন মিশরীয় গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সমুদ্রে জাহাজ ডুবিয়া যাওয়ার ফলে জনৈক নাবিক ভাসিতে ভাসিতে মৃত্যুদেবতার দেশে গিয়া উপস্থিত হয়, এবং সেইখানে থাকিয়া কিছুদিন তাঁহার আতিথ্য গ্রহণের পর পুনরায় একখানি স্বদেশীয় জাহাজের সাহায্যে মিশরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই উপাখ্যানটি দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয় যে, ই[illegible]কঠোপনিষদে বর্ণিত নচিকেতার উপাখ্যানের ছায়া অবলম্বনে রচিত।

(১১) প্রাচীন ভারতে হিন্দুগণের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে যেমন অনুলোম বিবাহের প্রচলন ছিল, প্রাচীন মিশরেও তেমনি বিভিন্ন জাতির মধ্যে অনুলোম বিবাহের বিবরণ অবগত হওয়া যায়। কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা পশুপালক সম্প্রদায়ের কন্যাদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

(১২) প্রাচীন ভারতে যেমন ব্রহ্মবাদিনী নারীগণেরও উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি সংস্কারের অধিকার ছিল, প্রাচীন মিশরেও তেমনি নারীদিগকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে অধিকারী হইতে দেখা যায়।

(১৩) প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণ যেমন চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার বিদ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন প্রাচীন মিশরীয়গণও তেমনি এই দুইটি বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কাশীরাজ ধন্বন্তরির মত এত প্রাচীন না হইলেও মিশরের আদিরাজবংশের দ্বিতীয় নৃপতি টেটা (Teta) খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে শরীর ব্যবচ্ছেদবিদ্যা (Anatomy) সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত মিশরের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভাবে সমালোচনা করিলে ইহাদের প্রত্যেকটি স্তরে হিন্দুসভ্যতার প্রগাঢ় ছায়া অবলোকন করা যায়। এই সকল কথা পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, মিশরের জনসাধারণ আমাদেরই দূরবর্ত্তী জ্ঞাতি এবং সভ্যতার বিকাশেও তাঁহারা বহুলাংশে আমাদের সমশ্রেণীভুক্ত।

অক্ষয়কুমার দত্তের পত্রাংশ

অক্ষয়কুমার মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুকে কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সকল পত্রের অংশ-বিশেষ ১৩১১ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি পত্রাংশ উদ্ধৃত হইল :—

মাতৃভক্তি।

আমি শারীরিক এক প্রকার সুস্থ আছি। কিন্তু পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণীর চরমাবস্থা উপস্থিত বোধ হইতেছে। বোধ হয়, তাঁহার স্নেহময় মুখমণ্ডল আর অধিক দিন দেখিতে পাইব না। বোধ হয়, এত দিন পরে আমার একান্ত অকৃত্রিম স্নেহ প্রাপ্তির প্রত্যাশা উন্মূলিত হইল। যদিই তাহাই ঘটে, আপনকার রচিত, মধুময়, শোক-সংহারক প্রস্তাবটি পাঠ করিব।.....

সহৃদয়তা।

আপনি দরিদ্র প্রজাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছেন, তাহাতে অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ব্যাকুল হওয়া ও ক্রন্দন করা এইমাত্র আমাদের ক্ষমতা। এ যাত্রা এইরূপ করিয়াই পরমায়ু ক্ষেপণ করিতে হইল।.....

বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি।

তথাকার বাঙ্গালা পাঠশালায় এক পুস্তকালয় প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে, ইহা অতি শুভসূচক বলিতে হইবে। বিশেষতঃ তদর্থে নূতন নূতন গ্রন্থ অনুবাদিত বা রচিত হইলে বহু উপকার হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। বেলি সাহেব আপনার প্রতি যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার ভারার্পণ করিয়াছেন, তাহা লিখিতে অবশ্য বহু পরিশ্রম হইবে, কিন্তু তদ্দ্বারা লোকের বিস্তর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। এক্ষণে এই সকল কার্য্য দ্বারাই এ দেশের যথার্থ হিত হইতে পারে। (ইং ১৮৫১).....

বিধবা বিবাহ প্রচলন।

আপনি মেদিনীপুর অঞ্চলে বিধবা বিবাহ সম্পাদনার্থ সচেষ্টিত আছেন শুনিয়া সুখী হইয়াছি। আমাকে তদ্বিষয়ের সমাচার লিখিতে আলস্য করিবেন না। বিদ্যাসাগরকে মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেও ত্রুটি করিবেন না। জয়োঽস্তু! জয়োঽস্তু!

সুরসিকতা।

এবার অতিশয় স্নিগ্ধ হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। বৃত্রাসুর পরাস্ত হইয়াছে, দেবরাজ ইন্দ্র জয়ী হইয়াছেন এবং ৫, ৬, ৭ বৈশাখে [১২৫৮] রজনীযোগে অপর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণ দ্বারা মেদিনী সুশীতল হইয়াছে। বৃত্রকে পরাভূত দেখিয়া পবনরাজও দেবরাজের সহকারী হইয়া সকল বায়ু সুস্থ করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্রাসুর এখানে পরাস্ত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে [অর্থাৎ মেদিনীপুরে] গিয়া উদয় হয়, এই আমার শঙ্কা হইতেছে। আপনি তাহার তথ্য সংবাদ লিখিয়া বাধিত করিবেন। কিন্তু আমার নিতান্ত প্রার্থনা, সেখানেও ইন্দ্রদেবের জয়পতাকা উড্ডীয়মানা হয় এবং অবিলম্বে আপনার শরীর সুস্নিগ্ধ হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হই।

* * * *

আপনাকে মহারাণীর ছয়খানি অমূল্য মুখচন্দ্রমা পরিত্যাগ হইবেক।

* * * *

আপনি শারীরিক কিরূপ আছেন লিখিবেন। শুনিলাম, তথায় মাথাঘোরা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; কিছু মন্ত্রতন্ত্র করিবেন, যেন আপনার বাটীর ত্রিসীমায় না আসিতে পারে। ভয় কি? "বিষস্য বিষমৌষধং।" বোধ করি, এই অখণ্ডনীয় নীতির উপর নির্ভর করিয়া বড় বাবু [মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর] আপনাকে অভয়দান দিয়া গিয়াছেন। আপনি প্রাতঃস্নান করিবেন, ফলের জল পান করিবেন, উষা ও সায়ংকালের বায়ু সেবন করিবেন, আর ঘটটিকে একটু একটু চালনা করিবেন। আর নিজে হইতে কোন মতে মাথা ঘোরাইবেন না।

ব্রাহ্মসমাজ।

এখানে [তত্ত্ববোধিনী] সভা ও [ব্রাহ্ম] সমাজের কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। গ্রন্থাধ্যক্ষেরা সকলেই স্ব স্ব ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী বাবু এক জন গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছেন। সমাজে বিলক্ষণ লোকসমাগম হইয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বাঙ্গালা ভাষ্য প্রস্তুত হইতেছে। বড় বাবু তাহার কিঞ্চিৎ আপনার দৃষ্টার্থে পাঠাইয়া দিয়াছেন কি না বলিতে পারিলাম না। এ ভাষ্য বিশিষ্টরূপ উপকার হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।...(জুন ১৮৫২)

তত্ত্ববোধিনী সভায় গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা কোন তারিখে উঠিয়া যায়, যদি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়া বাধিত করিবেন। আপনার একটি বক্তৃতা সংক্রান্ত মোকদ্দমাই উহা উঠিয়া যাইবার কারণ। অতএব আপনি সহজে জানিতে পারিবেন বোধ হয়।

উইলিয়াম কেরীর চিঠি

১৮০১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই চণ্ডীচরণ এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। চণ্ডীচরণের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয় তাঁহার 'তোতা ইতিহাসে'র জন্য। ইহা কাদির বখশ-প্রণীত ফার্সী 'তুতিনামা'র বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদ করিয়া তিনি কলেজ-কাউন্সিলের নিকট হইতে ১০০৲ টাকা পুরস্কার লাভ

করিয়াছিলেন। চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাসে'র পাণ্ডুলিপি কলেজ-কাউন্সিলের ১৬ই জানুয়ারী ১৮০৪ তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়। এ-সম্বন্ধে কেরীর সুপারিশ-পত্র ও কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত এইরূপ :—

Sir...Accompanying this is a translation of the Toteenama from Persian into Bengalee by one of the Pundits of this Class, Chundeechurn. I will thank you to present it to the Council of the College. It is rendered into very plain and good Bengalee, and very fit for a class book. Should the Council order him any reward for his labour, it will be gratefully received by him, and as he is a poor man will be a great help to him. W. Carey.

AGREED that the sum of one hundred Rupees be allowed to the Pundit Chundeechurn for his translation of the Toteenama in Bengalee.—Home Mis. No. 559, p. 304.

'তোতা ইতিহাস' ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২২৪ এবং আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

তোতা ইতিহাস।—বাঙ্গালা ভাষাতে শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্শীতে রচিত।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮০৫।—

ভাষার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম সংস্করণের 'তোতা ইতিহাস' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

১৬ ষোড়শ ইতিহাস।—

চারি জন ধনবান গরিব হইয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্য অস্ত হইল এবং চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা প্রেমানলে দগ্ধা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তোতার অগ্রে যাইয়া কহিলেক, ওহে শ্যামবর্ণ তোতা, তুমি প্রত্যহ জ্ঞানবাক্য কহিয়া আমার গমন বারণ করিতেছ কিন্তু তোমার নীতবাক্যেতে আমার কোন উপকার হইবে না, কেন না যে ব্যক্তি প্রেমাসক্ত হয় তাহার নীতবচনে কি হইতে পারে অতএব আমি প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া যে রূপ দগ্ধচিত্তা হইতেছি তাহা কি কহিব? তোতা কহিলেক, শুন কর্ত্রী বন্ধুলোকের বাক্য শ্রবণ করা উচিত কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া কার্য্য করে, সে দুঃখ পায় এবং লজ্জিত হয়। যে মত চারি জন বন্ধুর মধ্যে এক জন কথা না শুনিয়া ব্যামহ পাইয়াছিল? খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে, সে কিরূপ ইতিহাস তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

'তোতা ইতিহাস' বহুল-প্রচারিত পুস্তক। লণ্ডন হইতেও ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

চণ্ডীচরণ আরও একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া কলেজ-কাউন্সিলের নিকট হইতে ৮০৲ টাকা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন—ইহা ভগবদ্গীতার পয়ার ছন্দে বঙ্গানুবাদ। ইহার পাণ্ডুলিপি কলেজ-কাউন্সিলের ১২ই নবেম্বর ১৮০৪ তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়; এ-সম্বন্ধে কেরীর সুপারিশ-পত্র ও কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত এইরূপ :—

To the Council of the College of Fort William.
Gentlemen,

In consequence of the encouragement given to literary merit by this institution Rajeeb Lochun, a Pundit in the Bengalee Department has lately composed an history of Raja Krishna Chunder Roy (late of Krishnnagur) in the Bengalee Language.

Chundee Churn, another Pundit in the same Department, has, with the help of some learned Brahmuns, translated the Bhagvat Geeta into Bengalee.

I have examined these works and think them to be worthy the patronage of the College, and recommend the writers as deserving some reward for their labours.

Accompanying this I send the manuscripts of these two works, which with the translation of the Tooteh numah, by Chundee Churn I recommend to be printed for the use of the Bengalee Class.

I am, Gentlemen,
Your most obedient humble servant,
W. Carey.

College, 5th Oct. 1804

RESOLVED that 100 copies of the History of Rajah Krishna Chunder Roy in the Bengalee Language, and 100 copies of the Translation of the Toote namah into the Bengalee Language be subscribed for by the College.

ORDERED that a fair copy of each of the foregoing works be made in order to be deposited in the Library of the College.

RESOLVED that a premium of Sicca Rupees 100 be awarded to Rajeeb Lochun Pundit for his History of Rajah Krishna Chunder Roy in the Bengalee Language. That a premium of Sicca Rupees Eighty be awarded to Chundee Churn Pundit for his translation of the Bhagbut Geeta into the Bengalee Language.—Home Mis. No. 559, pp. 384-85.

চণ্ডীচরণ-কৃত ভগবদ্গীতার বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হয় নাই। ইহার পাণ্ডুলিপিটি বর্ত্তমানে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে। ২৬শে নবেম্বর ১৮০৮ তারিখে চণ্ডীচরণ মুন্শীর মৃত্যু হয়। পর-বৎসরের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজ-কাউন্সিল-অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণে প্রকাশ :—Chundee Churn a

Pundit of the fixed Bengalee Establishment having died on the 26th November 1808—Anund Chunder was appointed on the 2nd December 1808 to succeed him." (Home Mis. No. 560, p. 554.)

রামমোহন রায়ের চিঠি

রামমোহন রায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। সেজন্য ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে যখন সংবাদপত্রের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে, এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তিনি উহা নিষ্প্রয়োজন ও অসম্মানসূচক জ্ঞান করিয়া 'মীরাৎ-উল্-আখবার' বন্ধ করিয়া দেন। তিনি এই প্রসঙ্গে যাহা লেখেন, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :—

মীরাৎ-উল্-আখবার

শুক্রবার ৪ এপ্রিল ১৮২৩—(অতিরিক্ত সংখ্যা)

পূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল যে, মহামান্য গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কৌন্সিল দ্বারা একটি আইন ও নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহার ফলে অতঃপর এই নগরে পুলিস আপিসে স্বত্বাধিকারীর দ্বারা হলফ না করাইয়া ও গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারীর নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক পত্র প্রকাশ করা যাইবে না এবং ইহার পরেও পত্রিকা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইলে গবর্ণর-জেনারেল এই লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। এখন জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ৩১এ মার্চ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় সার ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেন এই আইন ও নিয়ম অনুমোদন করিয়াছেন। এই অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্য-সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য হইলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত এই পত্রিকা ('মীরাৎ-উল্-আখবার') প্রকাশ বন্ধ করিলাম। বাধাগুলি এই :—

প্রথমতঃ, প্রধান সেক্রেটারীর সহিত যে-সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হইলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দ্বারবান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ; এবং আমার বিবেচনায় যাহা নিষ্প্রয়োজন, সেই কাজের জন্য নানা জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিস আদালতের দ্বার পার হওয়াও কঠিন। কথা আছে,—

আব্রু কে বা-সদ্ খুন ই জিগর বস্ত দিহদ
বা-উমেদ্-ই করম্-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা-ফরোশ

অর্থাৎ,—যে-সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দরোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, যাহার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করিবার মত বেআইনী ও গর্হিত কাজ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি ও হলফ করিবার অসম্মানভাজন হইবার পরও গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হইতে পারে, এই আশঙ্কার জন্য সেই ব্যক্তিকে লোকসমাজে অপদস্থ হইতে হইবে এবং এই ভয়ে তাহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইবে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃই ভ্রমশীল; সত্য কথা বলিতে গিয়া তাহাকে হয়ত এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহা গবর্ণমেণ্টের নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয়: বিবেচনা করিলাম।

গদা-এ গোশা-নশিনি! হাফিজা! মাখরোশ
রুমুজ-ই-মস্‌লিহৎ-ই খেশ খুসরোয়ান দানন্দ।

—হাফিজ! তুমি কোণঘেঁষা ভিখারী মাত্র, চুপ করিয়া থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন।

পারস্য ও হিন্দুস্থানের যে-সকল মহানুভব ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া 'মীরাৎ-উল্-আখবার'কে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেন উপরোক্ত কারণ সকলের জন্য প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তাঁহাদিগকে ঘটনাবলীর সংবাদ দিব বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন, ইহাই আমার অনুরোধ; এবং ইহাও আমার অনুরোধ যে, আমি যে-স্থানে যে-ভাবেই থাকি না কেন, নিজেদের উদারতায় তাঁহারা যেন আমার মত সামান্য ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই তাঁহাদের সেবায় নিরত বলিয়া জ্ঞান করেন।

কেবলমাত্র পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিয়াই রামমোহন তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। এই আইন রেজেষ্ট্রীকৃত হইবার পূর্ব্বে ইহা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-অপহারক বলিয়া তিনি তাঁহার কয়েক জন কলিকাতাস্থ বন্ধুর সহিত ইহার প্রতিবাদ করেন (৩১ মার্চ ১৮২৩)। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট এক আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন।

রামমোহন আর কোন পত্রিকা পরিচালন করেন নাই বটে, তবে মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইন বিদ্যমান থাকা কালেই মাস-তিনেকের জন্য আর একখানি পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। ইহা ১ই মে ১৮২১ তারিখের প্রকাশিত 'বেঙ্গল হেরাল্ড'।

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

[এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি গ্রাম্য-বালিকার আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। চিত্রটি জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় গৃহীত।]

নীলকণ্ঠ

একুশ

লোকে বিলাত যেত ; এখন স্ত্রীলোকেও যায়। টলিউডের কুমার আর দেবীদের দস্তুর বিলাত যাওয়া নয় ; বোম্বাই যাওয়া। বিলাত-ফেরতের চেয়ে টলিউডে বোম্বাই-ফেরতের কদর আজ অনেক বেশী। বিলাত-যাত্রীর ডায়েরীর চেয়ে টলিউড থেকে বোম্বাই-যাত্রীর ডায়েরিয়া আর ফিল্ম ম্যাগাজিনে অনেক উত্তেজক সম্বাদ। লোকে বিলাত যেত ব্যারিষ্টর হতে ; আই-সি-এস হতে ; ইঞ্জিনিয়র হতে, ডাক্তার হতে ! শুধু বিলাত নয়, ইয়োরোপ। ফিরে আসত একজন শ্রীঅরবিন্দ হয়ে, একজন সুভাষ বোস হয়ে, কেউ মোহনদাস হয়ে গিয়ে ফিরে আসত মহাত্মা গান্ধী হয়ে, কেউ মতিলালের ছেলে হিসেবে যেত, ফিরে আসত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অটোবায়োগ্রাফার হবার জন্য। এরা সংখ্যায় আঙুলের অঙ্ক অতিক্রম করে না। বাকী অসংখ্য নগণ্যরা, অগণ্যরা বাপের পয়সা ওড়াবার জন্য, ব্যারিষ্টরীর নামে বাঁদরামি, প্রগতির নামে মদ্যপান, শিক্ষার নামে বিলাতী বাঁদর নাচ, আর থাকা খাওয়ার খরচার নামে বারবনিতা নয় বড় জোর ওয়েট্রেসের পেছনে খরচা করত। এরাই দেশের ঠাকুরের চেয়ে বিদেশের কুকুরকেও কোল্ দিত অনেক বেশী। সেদিনকার বিলাত-যাত্রী আর আজকের দিনের বিলাত-যাত্রীদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই কিন্তু দৃষ্টিকোণের কোনও পরিবর্তন হয় নি। সেদিন শুধু একদল ছিল যারা বিলাত না গিয়ে সাহেব হত, আজ তারা বিলাত না গিয়ে বিলাতের গল্প লেখে, সেই সব গল্প বাংলা দেশে প্রচুর বিক্রী হয়। ডি, এল, রায় মিথ্যাই লিখেছিলেন বিলাত দেশটা মাটির। বিলাত দেশটা আজও অনেক এদেশীয়র চোখে সোনারূপার !

সেই সোনারূপার দেশ থেকেও আসত লোকে মাটির ভারতবর্ষে। তারা হচ্ছে মিস মেয়ো। মহামানবের এই সাগরতীরে ভারত তীর্থে তারা তীর্থঙ্কর হয়ে আসত না ; তারা আসত এখানে সেখানে যত নর্দমা আছে ; তার খবর বয়ে নিয়ে যেতে খবরের কাগজে। Drain Inspectors' report দিত মিস মেয়োরা। বিদেশিনীর সেই ভারত-বিদ্বেষ, তার অর্থ আবিষ্কার করতে বেশী দূর না গেলেও চলে। কিন্তু একদল এদেশীয় জীব বিলাত ঘুরে এসে আত্ম-জীবনী উপলক্ষ্য করে স্বদেশ এবং স্বজাতি নিন্দায় যে বীভৎস রস সৃষ্টি করে আজও তার রহস্য অনুধাবন করা অসম্ভব। এরা মিস মেয়োর দল নয়, এরা তার চেয়েও সাঙ্ঘাতিক। এরা আসলে মানুষের আকৃতিতে সারমেয়র দল। এই সব সারমেয়রাই চিরকাল দেশের ঠাকুর দেখলে পা কামড়ে দিতে এসেছে বিদেশী কুকুরের সংস্পর্শে আসা মাত্র খাজাত্যপ্রীতিতে গলে গিয়েছে। তাদের দিন হয়ে এল বলে ! এখন আর বিলাত নয়, এখন বিলাতের বদলে বোম্বাই। বোম্বাই,—A land of glamour ; goggles ; gabadine & GOATS.

ভারতবর্ষের টলিউড হচ্ছে টালিগঞ্জে বাংলা দেশের ফিল্ম ষ্টুডিও ; ভারতবর্ষের হলিউড হচ্ছে বোম্বায়ের ফিল্ম ষ্টুডিও। বোম্বাই ফেরৎ না হলে বাংলা দেশ আজ পাত্তা পাওয়া শক্ত। বিলাতযাত্রীদের মধ্যে যেমন কখনও কখনও কেউ কেউ ফিরে আসত শ্রীঅরবিন্দ, সুভাষ হয়ে,—বোম্বাই থেকে কেউ ফিরে আসতে চায় না ; ফিরে আসতে বাধ্য হলে বাংলা দেশে এসে তারা অস্পৃশ্য হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের হলিউড বোম্বাই-হিষ্টিরিয়ায় পঙ্গু হয় তারা চিরকালের মত। বাংলা দেশের ছায়াছবির জগতে সমান পাল্লায় দৌড়তে গিয়ে এরা ছিটকে পড়ে ল্যাংড়া হয়ে যায় ; তারাই বোম্বাইতে গিয়ে ল্যাংড়া আম বনে যায় রাতারাতি ; তারপর তারুণ্য-জল-রশিদের রাত ভোর হবার আগেই আমচুর হয়ে মুখ চুণ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসে। তাদের মধ্যে থেকে যেটুকু রস নেবার সেটুকু শুষে নিয়ে ছিবড়ে করে ফেরত পাঠিয়ে দেয় রেজিষ্ট্রি করে with acknowledgement due ! শাঁসটুকু বার করে নেবার পর ছোবড়ারা যখন আবার টলিউডের আনাচে কানাচে ঢুঁ মারতে বাধ্য হয় তখন বাকী জীবনভোর তাদের বাকী থাকে শুধু দীর্ঘশ্বাস। বোম্বায়ের সঙ্গে নতুন দিল্লীর এই এক জায়গায় ভয়ঙ্কর মিল। বাংলা দেশকে যেখানে নাহলে অচল সেখানে বাঙ্গালীকে নাও। কাজ ফুরিয়ে গেলেই বার করে দাও ! নতুন দিল্লীর মন্ত্রিসভাতেও যা ; বোম্বায়ের ছায়াজীবীদের মন্ত্রণা সভাতেও তাই !

কিন্তু এই সব বাঙালী ছায়াশিল্পীরা যারা বোম্বায়ের চোরাবালিতে পা বাড়ায় তাদের অপমৃত্যুর ইতিহাস, বালারা কি দিয়ে ভাত রাঁধেন, চুল বাঁধেন তার খবর ছাপা ফিল্মের খবর কাগজে বেরোয় না ; বেরোয় না বলেই রকে বসে নরকগুলজার করা ছেলেছোকরার দল ভাবে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস পর্যন্ত টিকিট কেটে অথবা টিকিট না কেটে একবার পৌছতে পারলেই ভিক্টরী অবশ্যম্ভাবী। বাংলা দেশ থেকে যারা বোম্বাই যায় হয় অশোক নয় হেমন্তকুমার হওয়া তাদের সবার বাঁধা, এই মনোভাবই বর্তমানে উড্ডীয়মান বাঙ্গালী ফিল্ম

ষ্টার অথবা টেকনিশিয়ানদের একমাত্র স্বপ্ন। শুনে কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সেদিনকার কণ্ঠে বলতে ইচ্ছে করে স্বপন যদি মধুর এমন···!

বোম্বাইওলা নয়; বোম্বায়ের প্রবাসী বাঙালীই এখান থেকে সস্থ উপস্থিত বাঙালীর সব চেয়ে বড় শত্রু ভারতবর্ষের হলিউড বোম্বায়ের ফিল্ম-ষ্টুডিওর বিপুল সাম্রাজ্যে। হেমন্তকুমারের ইতিহাসই জানি। বোম্বাইতে যাতে তিনি কিছুতেই কাজ না পেয়ে, কাজ কোনও রকমে পেলে কাজ করতে না পেরে চলে যেতে বাধ্য হন তার জন্য বোম্বাইবাসী ফিল্মী-বাঙালী করে নি এমন কোনও অন্যায় নেই! ষড়যন্ত্র থেকে সুরু করে মারণ উচাটন মায়ের পায়ে পূজা পর্যন্ত বাকী তারা রাখে নি কিছুই। একজনকে বলতে শুনেছি হেমন্তর উদ্দেশ্যে: This is your last chance before the final kick! অবশ্য সেই কিক্ হেমন্তকুমারকে শেষ পর্য্যন্ত দিতে পারে নি কেউ! সব ক্লিক; সব কিক্‌কে মিস কিক্ প্রতিপন্ন করে বোম্বায়ের হলিউডে কীর্তিমান হেমন্তকুমার শুধু নিজের নয়, সমস্ত বাঙালীর মুখ রক্ষা করেছেন।

হেমন্তকুমারের কণ্ঠই কেবল বিস্ময়ের বস্তু নয়; মানুষটিও বিস্ময়কর। এখনও; আজও; এই মুহূর্তে হেমন্ত যেমন ছিলেন তেমনি আছেন। সেই সার্টের হাতা কনুই পর্যন্ত গুটানো। ধুতির কোঁচা হাতে ধরা; পায়ে চটি। নমস্কার করবার আগেই গাড়ীর ষ্টিয়ারিংএ বসে যে কোনও পরিচিতকে আগেই অভিবাদন জানানোর সেই পুরানো রীতিতে পরিবর্তন আসে নি এতটুকু। আজ পর্যন্ত কখনও কাউকে আগে নমস্কার করতে দেখলাম না হেমন্তকে। হেমন্তই নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত তুলবেই আগে। স্বর্ণকণ্ঠসমৃদ্ধ হেমন্তকুমার সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ এ কথা বললে অপলাপ হবে; কিন্তু পরিশ্রম যদি প্রতিভার কোনও পরিচয় হয়; দুঃসহ, দুর্বহ দুঃখ বুকে বয়ে বয়ে উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা সিদ্ধভূমিতে যদি কোনও প্রমাণ হয় প্রতিভার তবে হেমন্ত নিঃসংশয়ে প্রতিভাবান। কি বিপুল ধৈর্য; দুরন্ত শ্রম সম্বল করে কি আশ্চর্য আরোহণ সাফল্যের শীর্ষে, হেমন্তর এই সাফল্যের ইতিহাসের সঙ্গে যারা নেই ওতপ্রোত জড়িয়ে তাদের অনুধাবন অসম্ভব সে অভিজ্ঞতা। ধাপে-ধাপে; ধীরে-ধীরে; শশক নয় শম্বুক গতিতে কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছেচে পিছন ফিরে তাকালে অতিক্রান্ত সেই দুস্তর পথ আজ হেমন্তর নিজের কাছেই এক প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবে; কেমন করে অতিক্রম করে এল সেই অন্তহীন পথ সে কি সত্যই নিজেই জানে তার উত্তর।

•

অভয় সরকারের প্রায় অন্ধ গলিতে বন্ধুর বাড়ীতে বসে কয়েক বছর আগেও মনে আছে আমরা সবাই যখন নাওয়া-খাওয়া ভোলা আড্ডায় আত্মনিমজ্জিত তখনও সুড়ুং করে হেমন্ত সরে পড়েছেন নিঃশব্দে কখন টের পাইনি। ফিরে এসেছেন আড্ডায় এক ঘণ্টা বাদে পনের টাকার টুশনি সেরে; টুশনির মারাত্মক প্রয়োজন তার ফুরিয়েছে তখন; কিন্তু আড্ডার চেয়ে যে কাজ বড়ো এবিশ্বাস তখনও তাঁর অফুরন্ত। সেই বিশ্বাসের বলেই তিনি আমাদেরই মত আড্ডা দিয়েও গাড্ডায় পড়েন নি কখনও। এই দেখেছি একদিন; আর আরেক দিন এই সেদিন দেখলাম সারা ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্রসুরকার হেমন্ত এসেছেন কলকাতায় বাংলা ছবির গানে সুর দিতে। সকাল থেকে রাত দুটোর মধ্যে স্বরলিপি করে; সুর তুলিয়ে শিল্পীর কণ্ঠে; মহলার পর গান রেকর্ড করে শেষ রাতে দমদম থেকে উড়োজাহাজে উড়ে গেছেন সান্টা ক্রুজে।

এ হল হেমন্তর বাইরের দিক। ভিতরের মানুষটি আরও আশ্চর্যকর। নিজের মা-বাপ-ভাইয়ের জন্য হেমন্ত যা করেছেন এবং এখনও যা করছেন বাঙালী বড় হলে তা কোনও দিন করে নি; তা কোনও দিন করে না। দুঃস্থ বন্ধুকে বিস্মরণ; মা-বাপ-ভাইকে ত্যাগ; এবং আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করাই ছোট থেকে বড় হওয়া বাঙালীর দস্তুর। দস্তুর মত বড় হওয়া হেমন্তকুমার সেই নিয়মেরই প্রমাণ হিসাবে একমাত্র ব্যতিক্রম। ঘরকে ভালোবাসতে পেরেই দেশকে ভালোবেসেছেন তিনি। তাই বোম্বাই গিয়েও তিনি বাঙালীই আছেন। তাঁর বাড়ীর লোকের কাছেই শুধু জানতে পারা সম্ভব যে ফিল্ম লাইনের ঘর-ছাড়া জীবন ও জীবিকা গ্রহণ করেও ঘরকে তিনি বাইরের থেকে আত্মরক্ষা করেছেন; ছন্দ রেখেছেন বজায়। শুধু লক্ষ্মী নয়; লক্ষ্মীশ্রীও হেমন্তর ঘরে বাঁধা! এমন মানুষই বড়-মানুষই হলে মানায়; কাজে আসে। না হলে মানুষ শুধু বড়লোক হয়; বড়-মানুষ হয় কোথায়?

কিন্তু হেমন্তকুমার হাজার মানুষের সাফল্য একা গলায় পরলেও তিনি একজনই; দ্বিতীয় নেই তাঁর দৃষ্টান্ত বোম্বায়ের বাঙ্গালী-পল্লীতে। আর অশোককুমার? তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তিনি ফ্রিক অভ্ নেচার। Superman যদি বার্ণার্ড শ'র বই ছাড়া কোথাও অস্তিত্ব-অসম্ভব হয় তবুও এর অশোককুমার হিউম্যান হলেও তাঁর কপাল সুপার-হিউম্যান। অসম্ভব জুতের সৃষ্টি অশোককুমারের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী কোন দাবাই লোপে টেঁকে নি! ভাগ্যের তোপের মুখে উড়ে গেছে দুর্ভাগ্যের মিছিল। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক আগে থেকে তৃতীয় মহাযুদ্ধের মুখোমুখী এসেও এসেও ভারতীয় ছায়াচিত্রাকাশের অশোককুমার এখনও Evergreen Hero! জনি ওয়াকারের জীবন্ত বিজ্ঞাপন তিনি, Still going strong! আমরা চাই আর না চাই; ভাগ্য চায়, তাই তাঁর জয় হক; কারণ সব কিছুর পরেও যা অবিস্মরণ-যোগ্য ঘটনা,—তা হল তিনি বাঙালী। বাংলা ভাষা তাঁর মাতৃভাষা; হিন্দি তাঁর বিমাতৃভাষার তুলনায় তা যেমনই বলুন না তিনি বাঙলা!

কিন্তু বোম্বায়ে যেমন করেই হক যে সব বাঙালীরা টিঁকে গেছেন, তাঁরা বাঙালীর যত বড় ঘরের শত্রু বিভীষণ এবং ভীষণ শত্রু কিন্তু বোম্বাইওলাও নয়। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা যেমন ইণ্ডিয়ান শুনলেই নাক সিঁটকোয় সাহেবদের চেয়েও বেশি; বোম্বের এই সব বাঙালীর তেমনই বাঙালী বিদ্বেষে বিদেশের ওপর টেক্কা দেয়। এরা হল বোম্বাই আর বেঙ্গলের সন্ধি নয়; এদের অভিসন্ধি শুধু বাঙালীরা পেছনে বসের হয়ে bamboo দেওয়া। তাই এরা হলো বোম্বাই প্লাস বেঙ্গল ইকোয়্যাল টু ব্যামলোবেঙ্গলী। এরা একেকটি চিজ! বাঙ্গলা ছবি রাষ্ট্রপতি পদক পেলে বোম্বাইওলা মানে; কিন্তু ব্যামলোবেঙ্গলী সম্প্রদায়ের পাণ্ডারা প্রতিবাদ জানায়; মৌখিক প্রতিবাদ নয় শুধু কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঢুকে লিখিত প্রতিবাদ জানালে তবেই বঙ্গদেশে জন্ম বোম্বায়ের মাটিতে সার্থক মনে করে! এই সব বিষধর যাদের ধরে ধরে কোতল করা উচিত বোম্বাইতে পদার্পণ করা মাত্র এদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বঙ্গবাসী। তারা জানে না যে বোম্বাইতে না খেতে পেয়ে বাঙালী মারা গেলে এরাই বঙ্গবাসীর চিতায় দেবে বাঁশ!

বাইশ

ভারতীয় হলিউড, বোম্বায়ের ফিল্ম ষ্টুডিওর তুলনায়, টলিউড,—টালিগঞ্জের ষ্টুডিওগুলি তীর্থক্ষেত্র। বর্ণনা অসম্ভব, বোম্বায়ের ফিল্মরাজ্যের আবহাওয়া এতদূর দূষিত যে সেখানে নিঃশ্বাস নেওয়া শক্ত। এমন কোন অন্যায় যা অনুষ্ঠিত হয় না এই সব ষ্টুডিওতে; এমন কোনও বিবেক বিরুদ্ধ কাজ নেই যা বোম্বায়ের ষ্টুডিওতে করতে বাধে; এমন কোনও পাপ নেই যার পুনরাবৃত্তিতে এখানে কারুর বুক কাঁপে; পা আটকায়! বিড়লাবাড়ীর রহস্য লিখে বাঙালীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়েছেন দেবজ্যোতি বর্মণ; বোম্বের ফিল্ম রাজ্যের রহস্য প্রকাশ করতে পারে যদি কেউ তাকে দিয়েও কম কাজ হবে না কিছু! অতলান্তিক পাপের পঙ্ককুণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছায়ারাজ্যে কখনও যদি দুটি একটি পদ্ম প্রসন্নতার প্রতিমূর্তি হয়ে ফুটে উঠে; যদি দুশ্চর তপস্যায় অন্তহীন অন্ধকার রাতে অপেক্ষা করে অবশ্যম্ভাবী নূতন প্রভাতের,—তবে রাত ভোর হবার অনেক আগেই দুহাতে পদ্মকে টুকরো টুকরো করে; দুপায়ে তাকে দলে পিষে পাঁকের অতলে মিশিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয় এই দূষিত মায়ালোক। প্রয়োজন ও প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি পেয়ে পেয়ে বোম্বায়ের ফিল্মষ্টার আর টেকনিশিয়ানরা ধরাকে শুধু সরা দেখছে না; ধরাকে সত্য সত্য সরাইখানা মনে করে সুরা আর শাকী সহযোগে উড়িয়ে দিয়ে নিজেকে, ফুরিয়ে যাওয়াকেও মনে করছে মনুষ্যত্বের একমাত্র সার্থকতা। বোম্বাই শহরে মদ্য নিষিদ্ধ। তাই বেআইনি মদের সঙ্গে বিকৃত আমোদের বেসাতি বোম্বাইকে চরম মার্কিণী অধঃপতনের প্রান্তদেশে পৌঁছে দিয়েছে আজ। আর এক পা এগুলেই তার অপমৃত্যু অবধারিত। এবং যেখানে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে মনুষ্যত্ব, সেখান থেকে কোনওদিন মুখ তুলে আবার দাঁড়াবার মত জোর আর দুপায়ে সে পাবে না কোনদিন। সেদিন অবশ্য সহস্র সতর্কীকরণের পরেও বেশী দূরে নয়! অতএব মা ভৈঃ।

বোম্বায়ের ছায়ারাজ্যে পা দিয়েই মাথাগুলিয়ে যাবে আপনার। এখানে আসল আর নকলে; খাঁটি আর ভেজালে; মানুষে আর মেয়েমানুষে কোনও তফাৎ নাই। আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই! সাম্যের জয় গাই! সত্যকারের সাম্য কেবলে হয়েছে কে বলে? সত্যকারের সাম্য দেখতে হলে আপনাকে যেতে হবে বোম্বায়ের ফিল্মরাজ্যে। কোন্ প্রোডিউসারের টাকা আছে; কোন্ প্রোডিউসারের এক পয়সা নেই; কাজ আছে আর কে বেকার; কে সত্যই ছবি করতে চায় আর কার শুধু ছবি করার নাম করে শেঠ কাঁসানোই কারবার ঘুণধরা ঝানু লোকেরও তা বোঝা শক্ত; ঠিক করে বলা অসম্ভব। গাড়ী, অফিস, জামাকাপড় দেখে কে বলতে পারে কোনটা গোল্ড আর কে কেমিক্যাল গোল্ড? গোল্ড ফ্লেকের টিন থেকে এরা চারমিনার টানে এমন কায়দায় যেন তলোয়ারের খাপ থেকে দাড়ি কামানোর ক্ষুর বেরুলে যে অবাক হয় আসলে সে-ই বুড়বাক; যে বার করে তার যেন এতে লজ্জার; বিস্ময়ের; অস্বাভাবিকতার কিছুই নেই!

বোম্বায়ের চিত্ররাজ্যে নকল ও আসল চেনা এত শক্ত যে ওখানে [illegible] হিন্দু আর কে মুসলমান নাম থেকে তা মালুম হয় না; ধাম থেকেও না। তাই ভারতবর্ষের কত মুসলিম-টাকা যে পাকিস্থানে চলে যাচ্ছে হিন্দু ছদ্মনামে কে তার খবর রাখে! হিন্দুস্থানে অভিনয় করে পাকিস্থানে ঘর বাড়ী বানিয়ে শ্যাম-কুল দুই বজায় রাখার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। কিন্তু জাল আর অকৃত্রিম প্রকারভেদ করা শক্ত যে বোম্বাই ফিল্মরাজ্যে তার মোদ্দা কারণ হচ্ছে এখানে সব ভাড়া পাওয়া যায়। ফার্ণিচার-ঘর থেকে পোষাক এবং ঘরণী পর্যন্ত ঘণ্টার হিসাবে ভাড়া দেওয়া বোম্বাইয়ে সাভাবাতিক চালু। তাই ফার্ণিসড্ রুমে বসে গ্যাবাড্রিন পোষাক পরতে, বিরাট গাড়ী চড়তে এবং গোল্ড ফ্লেক ফুঁকতে দেখে যাদের মনে হয় যে এদের টাকার অন্ধিগন্ধি নেই তাদের সবটাই যে ফাঁকা; সিগারেট ফুঁকে শেষ হবার আগেই ব্যবসার শিঙ্গা ফুঁকে দিয়ে সরে পড়ার ইতিহাস যে তাদের ডাল ভাত, বাইরে থেকে তা দুদিনে বোঝা সহজ নয়। কারণ ব্যবসার নাম পালটানো এদের কাছে কিছুই নয়; বাপের নাম পাল্টাতেই না আছে পুত্রের লজ্জা; না বাপের অসম্মতি।

টলিউডে প্রতারণা চলে হাজারের অঙ্কে; বোম্বায়ের হলিউডে লাখে। সাত আট লক্ষ টাকা নিয়ে যারা খেলছে আর সত্তর-আশী লক্ষ টাকা নিয়ে খেলাচ্ছে যারা বোম্বাইতে তাদের দু দলের লক্ষ্যই এক। চরৈবেতি! চরৈবেতি! বোম্বায়ের ফিলমী অভিধানে এর অর্থ! এগিয়ে চল; এগিয়ে চল!—নয়; এর অর্থ: সরে পড়ো, সরে পড়ো! অন্য লোককে সারতে সারতে এবং নিজেরা সরতে সরতে সমস্ত ফিল্ম-রাজ্যকে এরা সেইখানে এনে উপস্থিত করেছে যার পরে ডাঙা নেই; শুধু জল! জলে-ডাঙায় তাদের এই খেলা উপভোগ করে সবাই; বিশ্বাস করে না কেউ। তিন চারটি প্রযোজক ছাড়া আর সকলেরই খেলা এখানে খতম হয়ে আসছে। আসবারই কথা। তাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে: খেলা খতম, পয়সা হজম। হজম অবশ্য সকলেই করতে পারে না। বদহজমের ধাক্কায় তখন আশপাশের আকাশ-বাতাস নাকে রুমাল চাপা দিয়েও রেহাই পায় না।

প্রোডিউসাররা এই রকম বলে আর্টিষ্টরা আরও সেয়ানা। বড় অভিনেতা থেকে চুনোপুঁটি পর্যন্ত কন্ট্রাক্টের ধার ধারে না; আইনের করে না তোয়াক্কা। বড় কোনও অভিনেতার বাড়ীতে যে সব চেয়ে আগে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে, সেদিনকার মত তার ছবিতে কাজ হয়। Dateএর ধার ধারে না যেমন Debt-এর ধারও না। তাই বোম্বায়ের ছোট প্রযোজকরা ভাড়া করা ট্যাক্সীতে ধাওয়া করে বেড়ায় আর্টিষ্টের পেছনে; ধরতে পারলে কাজ হলো; না হলে নয়। তারই ফলে স্যুটিং শেষ করতে একটা ছবির কারুর লাগে কয়েক মাস; কারুর কয়েক বছর। শুধু তাই কি? বোম্বায়ের প্রথম শ্রেণীর চিত্রগৃহ পর্যন্ত সারা বছরের জন্য ভাড়া নিয়ে রেখেছে বড় বড় প্রডিউসররা। ছোট প্রযোজকদের ছবি রিলিজ করাই তাই এক সমাধান-দুর্লভ সমস্যা। টাকা চুরি থেকে কাহিনী চুরি; গানের কথা থেকে সুর চুরি; প্রাসাদ থেকে পুকুর চুরির পর্যায়ক্রম ইতিবৃত্তর এক কথায় নাম হলো বোম্বাই ফিল্মের জোচ্চুরী।

একটি ইতিহাস শুনুন।

বোম্বায়ের পয়লা নম্বর অভিনেতা প্রযোজক একজন কলকাতায় চারখানা গল্প কিনলে কল্লোল যুগের একজন লেখকের পরে যিনি

নিজেও চিত্র-পরিচালক হন। চারখানা গল্পের দাম ঠিক হলো বিশ হাজার টাকা। দু'হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে চলে গেলেন বোম্বাই প্রযোজক। চার খানা গল্প বেচবার পর একখানা গল্প নিয়ে আইনগত অসুবিধা দেখা দেওয়ায় বিক্রীর, কলকাতার লেখক সে গল্প ফেরত চাইলেন। বোম্বাই প্রযোজক সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যর্পণ করলেন গল্পের স্বত্ব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানাতে ভুললেন না যে, যে গল্পটির স্বত্ব ছেড়ে দিলেন তিনি তারই দাম ধরেছিলেন আঠারো হাজার টাকা; আর বাকী দু'হাজার মোট তিনটি গল্পের দাম। অতএব যে দু'-হাজার টাকা অগ্রিম দেওয়া ছিলো তাতেই পূর্ণ মূল্য শোধ; এখন Received in full রিসিটটা পাঠিয়ে দিলেই তিনি একটি গল্পের দলিল স্বত্ব ফেরৎ পাঠাতে পারেন বাঙালী লেখককে।

সেই বাঙালী লেখক অনেক চরিত্র ঘেঁটেছেন; সৃষ্টি করেছেন; এখনও করার দাবী রাখেন। কিন্তু এরকম চরিত্র বোধ হয় সৃষ্টি করা দূরের কথা; তাঁর অভিজ্ঞতারও অনেক বাইরে! এ চরিত্র কালে-ভদ্রে একটি দুটি জন্মায়।

হ্যাঁ; আসল কথা বলা হয় নি। যে বাঙালী লেখককে এই ভাবে ফাঁসিয়েছেন বোম্বাই প্রযোজক, তিনি আবার বঙ্গজাতিতে বোম্বাইওলা হলে কি হবে, জাতিতে বাঙ্গালী যে!

[ক্রমশঃ

জুতো পালিশ — শ্রীচুনীলাল ভট্টাচার্য অঙ্কিত

কবিশেখর কালিদাস রায়

স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-চলচল বঙ্গজননীর অনুপম রূপমাধুরী বিভিন্ন কবি প্রত্যক্ষ করেছেন বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে। ধনধান্যে-পুষ্পে ভরা বাঙলার প্রাকৃতিক শোভা তৃপ্ত করেছে কত কবির চাতকি-চিত্তকে তা সংখ্যায় নিরূপিত হয় না। কত কবি জীবনব্যাপী উপলব্ধি করেছেন বাঙলার বিশিষ্টতম রূপকে, অন্তরের সঙ্গে তাকে করে নিয়েছেন গাঢ়ভাবে একীভূত আর সেই যুগপৎ উপলব্ধি ও অন্তরে গাঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার বিকাশ ঘটে তাঁদের কাব্যের মধ্যে দিয়ে। এই কবিরা অহমিকার জালে নিজেদের জড়িয়ে দেন নি। আত্মপ্রচারের বেড়াজাল থেকে থাকেন শত হাত দূরে, বিনয়-গুণ, নম্রতা, শিষ্টাচারের জীবন্ত প্রতিনিধি তাঁরা—এঁদেরই মধ্যে অনায়াসে নাম করা যায় কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অমর হয়ে আছে অজয় নদী। অজয় নদীর তীর একদিন ধন্য হয়েছিল জয়দেবকে বুকে ধারণ করবার সৌভাগ্যে। তার তীরবর্তী কোগ্রামের বক্ষও ধন্য করে গেছেন সাধক কবি লোচনদাস। তাঁরই বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন কবিশেখর কালিদাস রায়। কালিদাস আজ টালিগঞ্জবাসী হলেও কোগ্রাম কবিশূন্য নয়। বর্তমান বাঙলার জীবিত-শ্রেষ্ঠ কবি শ্রদ্ধাস্পদ কুমুদরঞ্জন মল্লিককে আজও দেখা যাবে কোগ্রাম আলো করে এখনও নিত্য-নব অবদানে ভরিয়ে দিচ্ছেন দেশকে।

কালিদাস রায়

কোগ্রামের পর রায়েরা আসেন বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কবিশেখরের জন্ম। পিতৃদেব স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় কাশীমবাজারের মহারাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। প্রথমে গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শুরু, পরে খাগড়া লণ্ডন স্কুল থেকে সরকারী বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি-এ পাশ করলেন ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। এখানকার অধ্যক্ষ হুইলার সাহেবের শিক্ষার গুণে সাহিত্যের প্রতি কবির অনুরক্তি জন্মায়। স্কটিশচার্চ্চ কলেজে দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পড়তে পড়তে চলে যান রঙ্গপুর জেলার উলীপুর স্কুলে প্রধান শিক্ষক হয়ে, সেখানে সাত বছর কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। বড়িশা স্কুলে কিছু দিন শিক্ষকতা করবার পর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশানে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘ বাইশ বছর গৌরবের সঙ্গে অতিবাহিত করে অবসর গ্রহণ করেন।

যুবক কবি কালিদাস রায়কে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অপরিসীম উৎসাহে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ কবিশেখর উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ কবিকে বিশ্ববিদ্যালয় শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন জগত্তারিণী 'পদক'-এ বিভূষিত করে। 'লীলা লেকচারার'এর আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। এই সময়ে বৈষ্ণব পদাবলীতে তিনি একটি সুচিন্তিত ও সারগর্ভ ভাষণ দান করেন।

প্রায় অর্ধশতাব্দী হতে চলল, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছে কবিশেখরের লেখনী। আজও তার ধারা অশ্রান্ত, গতিবেগ আজও প্রখর, অনুভূতি আজও তীব্র। ঐ সময়ে অর্থাৎ তাঁর পঠদ্দশায় 'কুন্দ' নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। কিশলয় পর্ণপুট, (দুই খণ্ড) বল্লরী, ব্রজবেণু, ঋতুমঙ্গল, হৈমন্তী, আহরণ, বৈকালী, আহরণী, (নির্বাচিত কবিতা সংকলন) আহরণ (শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন), গাথাঞ্জলি (গাথা কবিতার সংকলন) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁর কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে। এ ছাড়া তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে গীতার কাব্যানুবাদ, গীতালহরী, চিত্রে গীতগোবিন্দ, কাব্যে শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, ইন্দুমতী (রঘুবংশের কয়েক সর্গ), মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত মেঘদূতের নাম সত্যিই উল্লেখযোগ্য। গদ্যগ্রন্থগুলির মধ্যে দুই খণ্ডে সাহিত্য-প্রসঙ্গ, তিন খণ্ডে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (এইগুলি সবই বি-এ ও এম-এ ছাত্রদের জন্যে অনুমোদিত) শরৎ সাহিত্য, পদাবলী-সাহিত্য দেখা দিয়েছে পাঠক-সাধারণের সামনে। রস-রচনাতেও তাঁর সুদক্ষ লেখনীর পরিচয় পাওয়া গেছে। 'রসকদম্ব' নামে তাঁর একটি হাসির গানের বইও আছে। বর্তমানে তিনি

আত্মস্মৃতি রচনায় মগ্ন। হিন্দী অনুবাদ সহ বাঙলা কবিতার একটি সুবৃহৎ সঙ্কলন সম্পাদনা তিনি বর্তমানে শেষ করেছেন।

কবিশেখরের সাহিত্য-জীবনে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে একটি প্রতিষ্ঠান, তার নাম উল্লেখ না করলে এই রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটি রসচক্র সাহিত্য-সংসদ। শরৎচন্দ্র, শৈলজানন্দ প্রমুখ সাহিত্যিক এবং সতীশ সিংহ, রমেন চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীরা নিয়মিত দেখা দিতেন এই চক্রে।

কবিশেখরের অনুজ সম্প্রতি পরলোকগত রাধেশচন্দ্র রায়ও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন। কবি-পুত্র শ্রীজয়দেব রায়ের নামও মাসিক বসুমতীর সঙ্গীত-পিপাসু পাঠক-পাঠিকার কাছে অজানা নয়। কবি-কন্যা সংযুক্তার পাণিগ্রহণ করেছেন আর একজন বরেণ্য কবি স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের এক পুত্র।

কবিশেখরের ভবিষ্যৎ অবদানগুলির আশায় আমরা অপেক্ষা করে রইলুম।

রেজাউল করীম

রেজাউল করীম। বিগত ৩০ বৎসর বাঙলা দেশের হিন্দু মুসলমান সমাজে নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়ে আসছে, তাঁর উদাত্ত ভাষণ সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের মূলে কুঠারাঘাত হানতো, তাঁর তীব্র তীক্ষ্ণ সতেজ যুক্তিসম্পন্ন প্রবন্ধ সকল জাতীয় জীবনে আনতো মুক্তির আহ্বান; গ্লানিমুক্ত করতো সংস্কারাচ্ছন্ন মন, সমস্ত ভারত জুড়ে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য স্থাপনে যে-কয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি চেষ্টা করেছেন রেজাউল করীম তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

বীরভূম জেলার রামপুরহাট থেকে ৪ মাইল দূরে মারগ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতা হাজী আবদুল হামিদ ছিলেন আরবী ও ফারসীতে সুপণ্ডিত।

গ্রামের মাইনর স্কুলের পড়া শেষ করে কোলকাতায় ক্যালকাটা মাদ্রাসা হাই স্কুলে ভর্তি হন, সেন্ট জেভিয়ার্সে আই, এ, পড়ার সময় দেশের ডাক এলো, সাড়া দিলেন তিনি, সমগ্র দেশ জুড়ে বয়কট আন্দোলন। আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী বাপুজীর নন-কো-অপারেশনের স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি, মুর্শিদাবাদ জেলার সালারে প্রতিষ্ঠা করলেন জাতীয় স্কুল।

কোকনদ কংগ্রেসে বয়কট প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হলে আবার কলেজে প্রবেশ করেন। অতঃপর এম, এ, ল, পাশ করেন তিনি।

দেশ জুড়ে তখন হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য; মুসলীম লীগ তার দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় রত। এই সময় করীম সাহেব (এই নামেই সর্বাধিক খ্যাত) তাঁর শক্তি ও সময় নিয়োজিত করেন এর বিরুদ্ধে। জিন্না এবং লীগের স্বজাতিতত্ত্বের অপযুক্তি খণ্ডন করে ইনি দেখাতে লাগলেন—ভারতবাসী এক এবং অবিভাজ্য, জাতি হিসাবে পৃথক নয়।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলনের সমর্থক, তৎকালীন বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ঢেউ-এর মাঝে ও তাঁর আদর্শের সত্তাকে নির্ভয় নিঃশঙ্কচিত্তে ধারণা করেছেন, এজন্যে আঘাতও কম আসেনি।

ফজলুল হক (অধুনা পূর্ব-পাকিস্থানের গভর্ণর) প্রতিষ্ঠিত নবযুগ পত্রিকায় তিনি সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ কাজ পালন করেছেন। দেশ ও জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর মতামত তখনই সবিশেষ প্রকাশ পেত, জাতির অর্থনীতি শিক্ষা কুসংস্কার ঐক্য সকল দিকেই জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

কিছুকাল আলিপুর ও ব্যাংকশাল কোর্টে তিনি আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন, কিন্তু অনতিবিলম্বেই আইন ব্যবসায় জটিল এবং সত্যমিথ্যার এক বিচিত্র অধ্যায় তাঁর অন্তরকে গভীর ভাবে পীড়িত করে। তিনি উপলব্ধি করেন এ পথ তাঁর জন্যে নয়। অতঃপর বহরমপুর গার্লস কলেজে অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, আজ অবধি সেই কাজেই ব্যাপৃত।

বিপত্নীক নিঃসন্তান করীম সাহেব বহরমপুরের গোরাবাজারে একাকী বাস করেন,—সঙ্গী অসংখ্য পুস্তক আর পরিচিত অপরিচিত অসংখ্য মানুষ। অজাতশত্রু তিনি,—সদাহাস্যময় এই মধুর স্বভাবের মানুষটির দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত,—তা সে যে কোনও মত ও পথের হোক না কেন। চট করে মানুষের মন জয় করে নেবার মন্ত্র যেন তাঁর সরলতায়।

সাংস্কৃতিক সভাসমিতি ও সাহিত্য আলোচনায় করীম সাহেবের উপস্থিতি নিয়মিত,—এবার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তৃপক্ষ বাংলার সুযোগ্য সন্তান বারীন ঘোষের সম্বর্দ্ধনা সভায় রেজাউল করীমকে সভাপতি হিসাবে বরণ করেছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে এখনও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। বর্তমানে 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকার' সম্পাদনার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত।

ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় প্রায় ডজনখানেক বই তিনি লিখেছেন। মোটামুটি রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় লেখা। তন্মধ্যে (১) বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ (২) ফরাসী বিপ্লব (৩) নয়া ভারতের ভিত্তি (৪) Pakistan examined (৫) For India and Islam ইত্যাদি বিখ্যাত। তাঁর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মূল্যবান অসংখ্য প্রবন্ধ সংকলনের অপেক্ষা রাখে।

রেজাউল করীম

দুর্লভ হৃদয়ের অধিকারী এই সহজ মানুষটিকে আমাদের বর্তমান যুগ ও সমাজ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলে তিনি বলেন—"ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শত বাধাবিঘ্ন সত্বেও ভারত তাহার মহৎ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। একদিন ভারতবর্ষই

জগৎকে আলো দান করিবে। আমার বিশ্বাস, ভারতে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। নূতন যুগের নূতন পরিবেশে এমন একটি মহৎ মনোভাব সৃষ্টি হইবে যাহার ফলে ভারতবর্ষ বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারে অনেক কিছু দান করিতে পারিবে।

শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়

[ছায়ারাজ্যের সুপরিচিত কর্ণধার]

গ্রীষ্মের প্রখরতা আর যেন সহ্য হয় না। এই অসহ উষ্ণতা মানুষের মধ্যে তিলে তিলে সঞ্চার করছে অবসাদ, ক্লান্তি, অকর্মণ্যতা। মাঝে মাঝে কোথা থেকে এক এক রাশি ঝলকা বাতাস আসছে আর ছড়িয়ে দিচ্ছে মুঠো মুঠো উত্তাপ। এ হেন পরিবেশে ধর্মতলার কর্মব্যস্ত একটি অট্টালিকার এক কোণে আমরা তিন বামুন জমায়েত হয়েছি—প্রথম জন বাংলার চলচ্চিত্র জগতের কর্ণধার শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় জন ভারতের একজন সুদক্ষ প্রচারবিদ শ্রীপ্রবীরেন্দ্র সান্যাল তৃতীয় জন এই অধম। এক অখ্যাত নগণ্য ব্রাহ্মণ সন্তান।

আলাপ আলোচনা সঙ্গে সঙ্গে চলছে পান-ভোজন। চলচ্চিত্রের গোড়ার আমলের কথা। কেমন করে হ'ল, কার দ্বারা হল, ছায়ারাজ্যের কে কি কেন-করে-কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে মুরলীধরের নিজের কথাও। শেষেরটি অবশ্য তিনি নিজে মোটেই বলতে চান নি। আমাদের জোর করে বার করে নিতে হয়েছে। ছায়াছবির মধ্যেই মুরলীধর নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চান, নিজের পৃথক সত্তা বিলীন করে দিতে চান ছায়াছবির নব নব সৃষ্টির বেদীমূলে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই ঘটুক তাঁর বিকাশ : এই তাঁর কাম্য।

মুরলীধরের আদিনিবাস যশোহর জেলার কালীপুর গ্রামে। ২৮এ ডিসেম্বর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মুরলীধরের জন্ম। পিতৃদেব ছিলেন অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ ৺বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। অগ্রজ ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরবর্তী জীবনে মহারাজা স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের "টেগোর রাজ এষ্টেট" এর চীফ ম্যানেজার স্বর্গীয় দাশরথি চট্টোপাধ্যায় ও অনুজ বর্তমান ছায়াজগতের আর একজন সুপরিচিত পুরুষ শ্রীখগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়। উত্তরপাড়া সরকারী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মুরলীধর। সেণ্ট জেভিয়ার্স থেকে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন মুরলীধর। তারপর পড়তে লাগলেন এম-এ ও আইন। এর পরই এলো এক বিরাট পরিবর্তন, ছন্দে বাঁধা জীবনকে অতিক্রম করে দেখা দিল আগামী দিনের দিবাকরের জাগরণের পূর্বাভাস। পড়া ছেড়ে দিলেন মুরলীধর। মনে বাসনা হল নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, নিজের পথ নিজে করে নিতে হবে, বাইরের জগতে পা দিলেন মুরলীধর। যদি পড়া না ছাড়তেন আইনের সত্য-মিথ্যার বেড়াজালে চিরকালের মত জড়িয়ে যেতেন মুরলীধর, হয় তো বা ভারতের আইন জগতে আজ তিনি হতেন একজন অদ্বিতীয় পুরুষ, সারা ভারতের আইনে হয় তো দাগানো থাকত তাঁর প্রভাব কিন্তু ছায়াছবির রাজ্যের একটি দিকই হয় তো শূন্য থেকে যেত মুরলীধরের অনুপস্থিতিতে। মুরলীধরের বিমুখতা থাকলে বাংলার ছবির রাজ্য কিছুতেই আজকের মত পুষ্ট হতে পারত না। আবির্ভাব হত না এত যুগান্তকারী ছবির, এত কলা-কুশলী ও শিল্পীর আগমন, অসমাপ্ত থেকে যেত শিল্প-বন্দনা।

নানা ব্যবসায়ে নিজেকে ভরিয়ে রেখেছিলেন মুরলীধর। তারপর জে, এন, বসুর সংস্পর্শে এসে তাঁর ব্যবসায়ে যোগ দিলেন মুরলীধর। প্রথম মহাযুদ্ধের পরিণতির ফলে সেই প্রতিষ্ঠান দরজা বন্ধ করে দেয়। এর পরই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মুরলীধর যোগ দিলেন ম্যাডান কোম্পানীতে তাঁর মাসতুতো দাদা সম্প্রতি দেহান্তরিত বাংলার চলচ্চিত্র লোকের প্রষ্টাকুলের অন্যতম বিশেষ পুরুষ স্বর্গীয় প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে। এখানে তিনি ছবি পরিবেশকের ভারপ্রাপ্ত হলেন। বারো বছর সসম্মানে এই দায়িত্ব বহন করে ম্যাডান ত্যাগ করলেন মুরলীধর। তার পর পুত্রের নামানুসারে প্রতিষ্ঠা করলেন রীতেন য্যাণ্ড কোম্পানীর। এঁরা তখন নির্বাক ছবি পরিবেশন করতেন। কর্ণওয়ালিশ ও ক্রাউন (বর্তমানে উত্তরা ও শ্রী) এর নবরূপায়ণের রূপদাতা ও পরিচালকগোষ্ঠীর হলেন অন্যতম, এই সময় পরিচালকগোষ্ঠীতে আর যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে মহারাজা প্রদ্যোতকুমার, দাশরথি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তার পর ক্রমান্বয়ে পুরবী, উজ্জ্বলা, রূপম, নবরূপম ওরিয়েণ্ট প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহগুলির পরিচালক মণ্ডলীতে যোগদান ও একটি বিশেষ স্থান অধিকার। এ কথা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করা যায় যে এতগুলি প্রেক্ষাগৃহের শীর্ষস্থানে একজন বাঙালী এ দেশের বাণিজ্যিক গৌরবই ঘোষণা করছে। মুরলীধরের প্রথম প্রযোজিত নির্বাক চিত্র 'তরুবালা।' তার পর কমলা টকীজ নামক প্রযোজক-প্রতিষ্ঠান গঠন করে রাজকুমারের নির্বাসন ও স্বামি-স্ত্রী ছবি দুটি নির্মাণ করেন। এর পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করল এম, পি, প্রোডাকসানস্ (মায়ের প্রাণ প্রোডাকসানস্)। মায়ের প্রাণই এঁদের প্রথম ছবি। মুরলীধরই ছিলেন এর একমাত্র স্বত্বাধিকারী

শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়

তার পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে এম. পি. একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে সানরাইজের হল প্রতিষ্ঠা। বিখ্যাত পরিবেশক প্রতিষ্ঠান ডি-লুক্সের প্রধান কর্মকর্তা ইনি। বি, এম. পি. এ নামক ছায়ালোকের বিরাট প্রতিষ্ঠানটিরও ইনিই অন্যতম স্রষ্টা (১৯৪৫) ও পাঁচ বার এর সভাপতির আসন করেছেন অলঙ্কৃত, তাঁর এ গৌরবও লক্ষ্যণীয়।

ব্যক্তিগত জীবনে মুরলীধর অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, সরলতার প্রতিমূর্তি তিনি এবং তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ যে, যে কোন আলোচ্য বিষয় যতই তা জটিল হক মুরলীধর মাত্র দু' এক মিনিট সময় নেন তার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে, একটি ব্যাপার নিয়ে দিনের পর দিন তাই নিয়ে ঝুলে থাকা ও অপরকে ঝুলিয়ে রাখা মুরলীধরের স্বভাববহির্ভূত। বর্তমানে ব্যারাকপুর কলেজের পরিচালক-মণ্ডলীর অন্যতম সদস্যরূপে মুরলীধর সেই মহাবিদ্যালয়টির উন্নতিকল্পে সহায়তা করেছেন।

মুরলীধরের একটি বহুদিনের ইচ্ছা শিশুদের জন্যে একটি ছায়াছবি নির্মাণ করা। এ জগতে আসার তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ছবির মাধ্যমে সমাজ গঠন করা, সমাজের সেবা করাই তাঁর আদর্শ। এ জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ দীর্ঘদিনের, সে সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন সত্য বলতে আমি পরাঙ্মুখ নই; কিন্তু সত্যের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিও আমার উপাস্য, সেইজন্যে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় অপ্রিয় সত্য বলতে আমি অনিচ্ছুক। ছবির রাজ্যে আজকে যে গলদ এসেছে তার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর আসে—এ গলদ ঠিক ছবির রাজ্যেই গড়িয়ে এসেছে জাতীয় জীবনধারা থেকেই। আবার কোন কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র পয়সার লোভেই প্রযোজকরূপে দেখা দেন তারপর ছবি না লাগলে বহু লোককে দেয় টাকাও আর দিতে পারেন না ও সরে যান—এই যে অসংখ্য নতুন লোকেরা (যাঁরা এ জগতের স্থায়ী বাসিন্দা নন) যে দুর্নাম নিয়ে গেলেন—এতে করে সেই দুর্নামের অংশ তাঁদের সমভাবেই এই শিল্পের গায়েও লাগল এবং এইভাবেই এই বিরাট জগতের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। আরো একটি কারণ আছে আন্তরিকতা ও সহানুভূতির অভাব। এ দুটি জিনিষ না থাকলে কোন বিরাটত্বই রূপ লাভ করতে পারে না। আমার পরবর্তী প্রশ্ন আজকের দিনে জাতীয় জীবনে সিনেমার ভূমিকা কোথায় এবং কতখানি—মুরলীধর উত্তর দেন ঠিকমত এবং সৎভাব সঙ্গে সারগর্ভ বক্তব্য দিয়ে ভরা ছবি যদি করা যায় সে ছবি জাতিকে চরিত্রগঠনের প্রভূত সহায়ক হতে পারে। আজ অবধি প্রায় পঁয়তাল্লিশটি বিখ্যাত ছবির নির্মাণের মূলে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন মুরলীধর। তাদের মধ্যে শেষ উত্তর, যোগাযোগ, পথ বেঁধে দিল, সাত নম্বর বাড়ী, তুমি আর আমি, স্বপ্ন ও সাধনা, বিদুষী ভার্যা, অভিজাত্য, সঙ্কল্প, ইন্দ্রনাথ, বানপ্রস্থ, বিদ্যাসাগর, সহযাত্রী, প্রত্যাবর্তন, বাবলা, সঞ্জীবনী, বসু পরিবার, আঁধি, কার পাপে, অগ্নিপরীক্ষা, সবার উপরে, বড় ভট্ট, পুত্রবধূ, ত্রিযামা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আবার এদেরই মধ্যে বিদ্যাসাগর, বাবলা, কার পাপে, শেষ উত্তর, যোগাযোগ, বসু পরিবার, সাত নম্বর বাড়ী প্রভৃতি ছবিগুলি এক কথায় মুরলীধরের এক একটি মহার্ঘতম উপহার।

ছায়ামোদীরা দিনে দিনে মুরলীধরের অবদানে নিজেদের আরো পরিতৃপ্ত করুন, এই কামনাই করি।

শ্রীবলাইলাল চন্দ্র

[ট্রপিক্যাল মৎস্য-বিশেষজ্ঞ]

"মাছ—গাছ—পাখী—এসব 'হবি' নিয়েই আমরা আছি, এক পুরুষ নয়—কয়েক পুরুষ ধরেই। মাছের সঙ্গে বিশেষ করে আমার যেন একটা আত্মীয়তাই হয়ে গেছে। গৃহে মাছ পোষা এখন আর আমার কাছে নিছক কোন 'সখ' নয়—তার চেয়েও নিশ্চয়ই অনেক বেশী।"

কথা কয়টি শোনা গেল বাংলার 'ট্রপিক্যাল' মৎস্য-বিশেষজ্ঞ শ্রীবলাইলাল চন্দ্রের মুখে এই সেদিন।

চমৎকার ভদ্রলোক! মুখে হাসি ছাড়া কথা নেই—আপ্যায়নে প্রতিক্ষণ ব্যস্ত। দেখলেই মনে হয় এঁকে—একটি খাঁটি বাঙালী প্রাণ। প্রায় ২৫ বছর ধরে জলজ জীব মাছকে (রঙীন) নিয়ে এঁর চলেছে অব্যাহত গবেষণা। কর্মজীবনে অপরাপর দায়িত্ব পালনের সঙ্গে এইটিও তাঁর না করলেই নয়। দুরন্ত আগ্রহ, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ও অসীম উদ্যম—এ কয়টি গুণাবলীর অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে এই মানুষটির ভেতর এবং অনিবার্য্য ফলস্বরূপ একজন 'ট্রপিক্যাল' মৎস্য-বিজ্ঞানীর মর্য্যাদাই দাবী করতে পারছেন আজ তিনি অনায়াসে।

১৮৯৭ সালের জুলাই মাসে শ্রীবলাইলাল জন্মগ্রহণ করেন কলকাতায় (৫৭নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) এক সম্রান্ত [illegible]
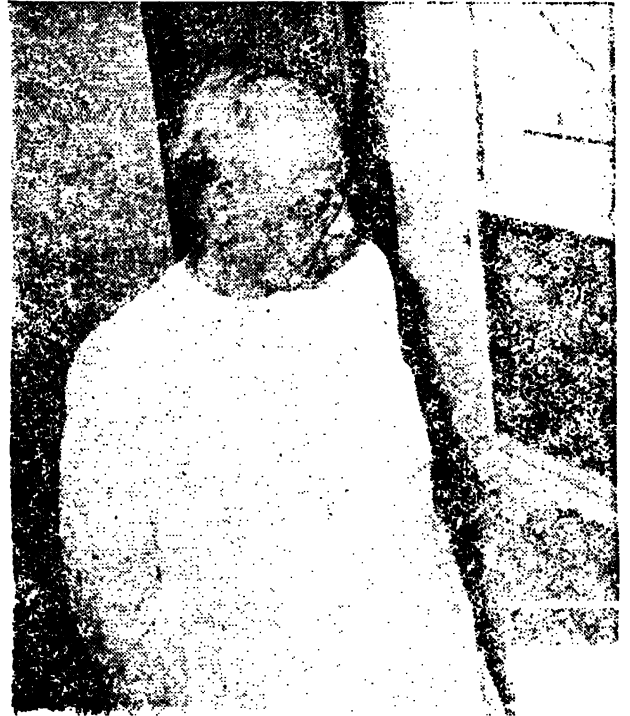
বলাইলাল চন্দ্র

বলরাম দে স্ট্রীটের শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালায় (বর্ত্তমান কমলা হাই স্কুল) তাঁর প্রথম পড়াশুনো। কলেজ-জীবনে তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। ১৯২১ সালে তাঁর কর্ম্মজীবন আরম্ভ হলেও ছাত্রাবস্থাতেই মৎস্য পালনের দিকে তাঁর ঝোঁক যায়। এর একটা কারণও ছিল বটে এবং সেইটি তাঁর নিজেরই ভাষায়—ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাড়ীর সকলেই একটু naturalist-minded অর্থাৎ জীবজন্তু ও উদ্ভিদতত্ত্ব অনুশীলনপ্রিয়। বাবা (৺ভবদেব চন্দ্র) মাছ, গাছ ও পাখী নিয়ে অনেক গবেষণা করে গেছেন। আমাদের ক্ষেত্রে এইটি অনেকটা hereditary (পুরুষানুক্রমিক) বলতে পারা যায়।

এইখানে বলা ভাল—মৎস্য পোষা শ্রীবলাইলালের আবাল্য একটি বড় সখ বা নেশা। বনেদী আমলের কত রঙীন মাছই (gold fish) স্থান পেয়েছে তাঁর সংগ্রহাগারে সেই থেকে। চাকরী জীবনে প্রবেশ তিনি যেখানে গিয়ে ঢুকেন, মাছের সঙ্গে সেই প্রতিষ্ঠানের আদৌ যোগাযোগ কোথায়? অথচ এমনি হ'ল—সেখানে থেকেই মৎস্য পালনের এবং মৎস্য সম্পর্কে গবেষণার প্রচুর সুযোগ ও প্রেরণা তিনি পেয়ে চলেন। ধুনীলাল কমলাপত নামে যে বিরাট কাগজের একটি বিভাগীয় হেড এসিষ্টেন্টের (বড় বাবু) পদে তিনি নিযুক্ত, উঁহারই অন্যতম অংশীদার শ্রীকৈলাসপৎ সিংহানিয়ার 'ট্রপিক্যাল' মাছ পোষার সখ দীর্ঘদিনের। সেই সখই নিরলস কর্ম্মী ও মৎস্যবিলাসী শ্রীচন্দ্রকে আরও উৎসাহিত করে তুলে অনেকখানি।

মাছের জগতে প্রাকৃতিক কী বৈচিত্র্য ও রহস্য সত্যি লুকিয়ে, সন্ধান করবার জন্যে শ্রীবলাইলালের প্রচেষ্টার বিরতি নেই। 'ট্রপিক্যাল ফিশ' বা রঙীন মাছ নিয়েই বলতে গেলে আজও তাঁর সকল খেলাধুলো, আমোদ-আনন্দ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ১৯৩৭ সালেই শ্রীচন্দ্র ট্রপিক্যাল মাছের জন্য নিজগৃহে একটি বিজ্ঞানসম্মত 'একুইরিয়াম' বা জলাধার স্থাপন করেন। আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্র থেকে সংগৃহীত মৎস্য বিষয়ক গ্রন্থাদি এনে সঙ্গে সঙ্গে চললো তাঁর গভীর পর্য্যালোচনা। আর চললো আমেরিকা, বৃটেন, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশের মৎস্য-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পত্রালাপ ও চিন্তা-বিনিময়। ইতঃমধ্যে 'ট্রপিক্যাল' মাছ সম্পর্কে বহু তথ্যপূর্ণ ও গবেষণা মূলক প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন—বিদেশী পত্রপত্রিকাতেও যা সমাদৃত হয়েছে বিশেষ ভাবে।

'একুইরিয়াম' বা বিজ্ঞান অনুমোদিত মৎস্যাধার আজকাল এদেশের অনেক রুচি-সম্পন্ন লোকের বাড়ীতেই দেখতে পাওয়া যায় এবং এইটি শুধু গৃহশোভাই নয়, প্রকৃতির অন্যতম লীলাকেন্দ্র রূপেও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কিন্তু এই জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে এবং দেশবাসীর মনে এর মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে 'একুয়ারিষ্ট' শ্রীবলাইলালের অবদান অনস্বীকার্য্য। 'একুইরিয়াম' রাখার বিশেষ 'হবি' সৃষ্টির তাগিদে ১৯৫০ সাল থেকে তিনি ক্রমাগত কয়েক বছর নিজেদের কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়ীতে 'ট্রপিক্যাল' মৎস্য বা পোষা রঙীন মাছের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। বাংলা কেন, সমগ্র ভারতেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এমন ধরণের সুসংগঠিত প্রদর্শনী আর কখনও হয়নি। এর পর থেকেই 'ট্রপিক্যাল' মৎস্য বিশারদ শ্রীচন্দ্র দেশে-বিদেশে সুধী-সমাজের মনোযোগী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং স্বাতীয় সরকারও তাঁর প্রতিভা ও গুণবত্তার স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে আসেন।

শ্রীবলাইলালের সঙ্গে বিশিষ্ট মৎস্য-বিজ্ঞানী ও জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টার পরলোকগত ডাঃ এস এল হোরার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। 'ট্রপিক্যাল' বা রঙীন মৎস্য বিষয়ে শ্রীচন্দ্র যে আজকের দিনে একজন 'অথরিটি' (authority)—শ্রীহোরা তা বুঝতে পেরেছিলেন সময়ান্তে নিয়ে। তাইতো ওঁকে মৎস্য বিষয়ে গবেষণার সুবিধার্থে কলকাতা মহানগরী বক্ষে একটি সরকারী মৎস্য লালনাগার ('একুইরিয়াম') স্থাপনের যখন কথা উঠল—তখন শ্রীহোরা শ্রীবলাইলালকেই সঙ্গে নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্যোগী হন। সরকারের দিক থেকে এ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপদান এখনও পর্য্যন্ত অবশ্য বাকী আছে কিন্তু এর জন্যে শ্রীচন্দ্রর অন্তরের অকুণ্ঠ দাবী ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, বলা চলে না।

কুশলী সংগঠক হিসাবেও শ্রীবলাইলাল চন্দ্র প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন বহুক্ষেত্রে। তাঁরই সক্রিয় উদ্যোগে ও বলিষ্ঠ অগ্রগণিতায় ১৯৫৫ সালে পশ্চিম বঙ্গের একুয়ারিষ্টদের নিয়ে গড়ে উঠেছে 'একুয়ারিষ্ট এসোসিয়েশন অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটির তিনি আজও অবধি সভাপতি এবং একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। গত দুই বৎসর ধরে উক্ত সংস্থার প্রত্যক্ষ উদ্যোগে দক্ষিণ কলকাতায় রঙীন মাছের যে বিরাট প্রদর্শনী হয়—তাতে প্রদর্শনী সাব কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তিনিই। এ ছাড়া বহু সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। এ বৎসরের সম্মিলিত নেতাজী জন্মোৎসব সমিতির তিনি ছিলেন সহ-সভাপতি। পিপলস্‌ রিলিফ এণ্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সহ-সভাপতি পদেও তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। সাইকেল চড়া, অশ্বারোহণ ও মোটর চালনা প্রভৃতিতেও তিনি সুদক্ষ। এমন কর্ম্মী মানুষ ও উদ্যোগী পুরুষ সহসা খুঁজে পাওয়া বুঝি কঠিন!

[মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে অনিলধন ভট্টাচার্য্য, কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রতন ঘোষ লিখিত।]

আমার কারবার

"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেল না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোন দিন ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে।"—শরৎচন্দ্র

উদয়ভানু

মাটিতে পা পড়লে আগুনের ছোঁয়া লাগে।

ওপরে সাদা আকাশ আর নীচে কালো মাটি। দ্বিপ্রাহরিক সূর্য্যতাপে আসমান-জমি মহাকালের চিতার মত জ্বলছে। আগুনের বর্ণ হলুদ-লাল নয়, রৌপ্য-শুভ্র। খাঁ-খাঁ জ্বালিয়ে দেয় এই প্রখর দাহনে, কোমল মাটির বক্ষ চিরে দেয়। জল শুকিয়ে যায় ইঁদারার। পুকুর আর দীঘির চতুর্দ্দিকের অস্থি-পঞ্জর দেখা দেয়। রাজ-অন্তঃপুরে পুকুরের তীরে, গন্ধরাজ গাছের আড়ালে তবু এক ফালি ছায়া। পাশাপাশি গাছ কয়েকটা, গন্ধরাজ ফুটেছে অজস্র। ঘন সবুজ পাতার মধ্যে থেকে সাদা ফুল উঁকি দেয়। লাল পিঁপড়ের আক্রমণ সহ্য করে, দুপুরের সূর্য্যকে সয়। গন্ধ হারায় না কেন কে জানে! গাছের তলায় মাটিতে ফাট ধরেছে, মালীতে জল দেয় না হয়তো, কাজে ফাঁকি দেয়। গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে চুপিসাড়ে দাঁড়িয়ে আছে শিবানী। গাছকোমর বেঁধেছে পরনের শাড়ীর আঁচলে। শুধু মাত্র লালপাড় পাংলা তাঁতের শাড়ীখানা এঁটেসেঁটে পরা। নজর ফাট-ধরা মাটিতে, পায়ের বুড়ো আঙুলে শুকনো মাটি ভাঙছে। স্নান সেরেছে কখন, ভিজে চুল ছড়িয়ে দিয়েছে পিঠে। কোমর ছাপিয়ে নেমেছে কেশের রাশি। ডান হাতের মুঠোয় গন্ধরাজের একটা শক্ত ডাল। মাটি থেকে চোখ তুললো শিবানী। ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক তুলে চোখ-ইশারায় ডাকলো যেন কা'কে।

নিরালা এখন এ অঞ্চল। কেউ আসে না। জন-মনিষ্যির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। পাখীর কিচির-মিচির ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। পুকুর-তীরে গোলা পায়রার সারি। কাঠ-ফাটা রোদে জল খেতে এসেছে। আকণ্ঠ জল খেয়ে একে একে উড়ে পালাবে ডানা ঝাপটে। অন্দরে চাল-ডালের ভাণ্ডার আছে, তাই পায়রার বাসা ঘরে ঘরে।

শিবানী একবার চমকে উঠলো পায়রা-ওড়ার পাখা-ঝাপটানি শুনে। বাম হাতের মুঠোয় ছিল বাদশাহী মোহর, শিবানীর চমক লাগায় ছড়িয়ে পড়লো মাটিতে। কেমন যেন আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটলো তার মুখে। গর্ব্বভরা চাউনিতে আরেক বার ইশারায় ডাকলো চিবুক নাচিয়ে। ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, ঊর্দ্ধদেহ আনত ক'রলো। এখান সেখান থেকে তুললো মোহর দু'খানি।

চোখে টাটকা কাজল। ঘি-মনসার গভীর কালো কাজলের রেখায় শিবানীর চোখ যেন দীর্ঘতর দেখায়। চোখের সাদা স্পষ্ট হয়। তারা দু'টি চঞ্চল যেন।

নিভৃত-নির্জ্জন। শুধু ক'টা শালিখ ডাকাডাকি করছে করবীর ডালে সভা সাজিয়ে। করবীর-শাখা নুয়ে পড়ছে।

শব্দ নেই চলনের। চোখের ইঙ্গিত না পান-রাঙা ঠোঁটের ইশারা ঠিক ধরা যায় না। শিবানীর লাল অধরও কিছু চঞ্চল। কথা-ফোটার মুখ; টকটকে লাল ওষ্ঠে যেন কত অস্ফুট কথা নাচানাচি করছে। কেমন বিমুগ্ধের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে শশিনাথ।

শিবানীর চোখে যেন সম্মোহন। শশিনাথ থমকে দাঁড়াতেই আবার একবার ডাকলো শিবানী। চিবুক বুকে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে।

—ভয় হয়, কেউ যদি দেখে কোথাও থেকে।

সত্যিই ভয়ে ভয়ে কথা বললে শশিনাথ। দেখলো ইদিক সিদিক। বকফুলের গাছের মগ ডাল পর্য্যন্ত দেখলো।

—খিড়কিতে আমি কুলুপ এঁটে দিয়ে এসেছি ভেতর থেকে।

শশিনাথ এখনও ভয়কে জয় করতে পারে না। কথা বলে সশঙ্কিত সুরে। শিবানীর আপাদমস্তক দেখে নেয় একদৃষ্টিতে। দিনের উজ্জ্বল আলোয় দেখতে পেয়েছে ক্ষণেকের জন্য।

গন্ধরাজের গাছের ছায়ায় ব'সে পড়লো শিবানী। তপ্ত হাওয়ায় ভিজে চুল শুকাতে দুই হাতে চুলের গোছা ধ'রে ছড়িয়ে দিলো পিঠে।

শশিনাথ বললে,—রাজমাতা আজ তো দানসত্র খুলেছেন। যে যা চাইছে তাই দান করছেন। রাজপুরীতে আজ হাসির তুফান বইছে। সকলেই খুশী।

—তুমি? হেসে হেসে বললে শিবানী।

—আমিও খুশী। শশিনাথ কথা বলে আর দেখে ঘাটের দিকে। কেউ যদি আসে হঠাৎ অতর্কিতে!

—রাজমাতা কি দান করলেন? তোমার কিছু লাভ হয়েছে?

শিবানী প্রায় ফিস-ফিস শব্দে বললে। পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকলো মুখে একটু হাসি মাখিয়ে।

শশিনাথ বললে,—আমি কিছু চাই নাই। কে যায় দান ভিক্ষা চাইতে?

খিল খিল শব্দে হেসে উঠলো শিবানী। মুখে দুই হাত চাপলো তৎক্ষণাৎ। হাসি থামিয়ে বললে,—এসো, একটা প্রণাম করি।

শশিনাথ বললে,—কেন?

দেহ হেলিয়ে হাত ছোঁয়ালো শিবানী। মোহর দু'খানি মাটিতে রেখে বললে,—এই নাও বরপণ। আমি তোমাকে দিলাম। কথা বলতে বলতে শশিনাথের পাদমূলের ধূলি তুলে কপালে ঠেকায় শিবানী।

আকবরী মোহর। ফার্সী ভাষায় লেখা হিজরা সাল। দুপুরের সূর্য্য আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে। শিবানী মোহর তুলে শশিনাথের হাতে ধরিয়ে দেয়। শশিনাথ সেই হাত আর ছাড়ে না। শিবানীর নরম হাত, ধ'রে রাখে নিজের হাতে।

—খিড়কিতে কুলুপ, এসেছো কোন্ পথে? চুপি চুপি বললে শশিনাথ। ভয়ে ভয়ে কথা বলছে সে।

—বাঁশের বেড়া ডিঙিয়েছি তোমাকে ফুল তুলতে দেখে। ছাদ থেকে দেখতে পেয়েছি।

হাতের সাজি নামিয়ে রাখলো শশিনাথ। বললে,—তোমাকে একবার দেখতে দাও। উঠে দাঁড়াও। কথার শেষে শিবানীর ধরা-হাত ধ'রে টেনে তুললো তাকে।

হাওয়া চলেছে দক্ষিণের। আগুনের ছোঁয়া যেন হাওয়ায়। শিবানীর এলোচুল উড়ছে।

রাজ-অন্তঃপুর থেকে শঙ্খধ্বনির ভেসে-আসা ক্ষীণ শব্দ শোনা যায় মধ্যে মধ্যে। রাজমাতার মহলে তখনও পর্যন্ত দান খয়রাতি চ'লেছে। সোনা, রূপা আর বস্ত্র দান করছেন বিন্ধ্যবাসিনী। অফুরন্ত ভাণ্ডার না কি তাঁর। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী তিনি।

—আমাকে আবার কি দেখবে! হেসে হেসে বলে শিবানী। কাজল-কালো চোখের দৃষ্টি বাঁকিয়ে বললে,—তেমন যদি রূপ থাকতো তবু!

—তোমার অনেক রূপ, সচরাচর দেখা যায় না এমনটা।

শশিনাথ মুগ্ধচোখে তাকিয়ে আছে। কথা বলছে চুপি চুপি। কথার শেষে শিবানীর চিবুক ধ'রে তুলে ধ'রলো তার লজ্জারাঙা মুখ।

—তোমার পায়ে ঠাঁই হবে তো? না আমার আশায় বজ্রাঘাত হবে?

—হাঁ, তুমি আমার হবে।

এক ঝলক মিষ্টি হাসি হাসলো শিবানী। বললে,—এ তোমার মুখের কথা না মনের কথা?

—আমার অন্তরের কথা। একটুকু মিথ্যা নাই।

—চল এখান থেকে পালাই। শিবানী মিনতির সুরে বলে। বলে,—কেউ যদি দেখতে পায় কোথাও থেকে! চল ঐ দিকে, যেদিকে বাঁশের বেড়া। কারও চোখ পড়বে না।

—অভয় দাও তো যাই। কলঙ্ক রটনার ভয় হয় যে!

শশিনাথ এগিয়ে চলে কথা বলতে বলতে। পায়ে-চলা পথ ধ'রে এগোয়। ইদিক সিদিক দেখে সাবধানী চাউনিতে।

পেছন থেকে শিবানী বললে,—তোমার মা যদি অনুমতি না দেয়, তখন?

শশিনাথ বললে,—না, তা হবে না। মাকে আমি পত্র লিখে জানিয়েছি, পাত্রী আমার পছন্দের।

—তবে আমার সাতজন্মের ভাগ্য বলতে হবে।

—রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী আসছে শুনছি। জানো কিছু?

—হ্যাঁ, আগে উদ্ধার হোক কসাই স্বোয়ামীর কবল থেকে। ছোটকুমার গেছে মান্দারণে। দেখা যাক কি হয়।

—কুমারবাহাদুর কালীশঙ্কর যখন যাত্রা করেছেন তখন আর কোন' চিন্তা নাই।

—এই কথা সকলেই বলে। কাঁটাগাছের বেড়ার আড়ালে ব'সে পড়লো শিবানী। বললে,—যেন ভালয় ভালয় ফিরে আসেন, প্রার্থনা করি।

—তোমার খোঁজ পড়ে যদি অন্দরে? শশিনাথ বললে অল্প হেসে। বললে,—কেউ যদি ডাকাডাকি করে? রাজমাতা যদি ডাক দেন এখন?

হতশ্রদ্ধার মুখভঙ্গীতে শিবানী বললে,—ডাকলে সাড়া পাবে না। জানবে আমি পাড়া ঘুরতে বেরিয়েছি। যে যাই বলুক, তোমাকে এখন ছাড়ছি না। তুমি এখন থাকবে আমার কাছে।

—কেন? চুপি চুপি শুধোয় শশিনাথ।

শিবানী বললে,—আমার সঙ্গে কথা বলবে। তোমাকে যে কাছে পাওয়া যায় না।

শশিনাথ বসলো বেড়ার আড়ালে, পুকুর-তীরে। বললে,—আমারও সাধ হয় তোমার সাথে দু'দণ্ড কথা বলি। মনের আনন্দে তোমাকে দেখি। খানিক থেমে আবার শশিনাথ বললে,—তোমাকে দেখার জন্য আমার মন অস্থির হয়।

অহঙ্কার প্রকাশ করে না শিবানী। পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ঠোঁটের প্রান্তে মৃদু মৃদু হাসি ফোটায়। বলে,—আমারও তাই। আমি জাতে মেয়ে, তাই মুখ ফুটে বলতে পারি না। গুমরে গুমরে মরি।

—মোহর দু'খানা থাক তোমার কাছে। শশিনাথ মোহর ফিরিয়ে দিতে চায়। বলে,—আমার স্বপ্ন, থাকুক তোমার কাছে।

মাটি-ফাটা রোদ। শিবানীর গাল-গলা ঘামতে থাকে। কোমরের আঁচলের পাক খুলে মুখ মুছতে থাকে চেপে চেপে। বলে,—তোমার মনটা বদলে যাবে না তো? পুরুষের মন, বলা যায় না, কখন কেমন থাকে।

সলজ্জ হাসি হাসলো শশিনাথ। বললে,—তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারো।

বুকের আঁচল সামলায় শিবানী। দক্ষিণের হাওয়ায় আঁচল ঠিক থাকে না হয়তো। বলে,—আজ শুক্লতিথির রাতে থাকবো আমি এখানে। তোমার অপেক্ষায় থাকবো। আসবে তুমি তখন?

—সাহস হয় না আমার। ভয়ে ভয়ে বলতে শশিনাথ। বললে,—রাজপুরীতে কত লোক। জোড়া জোড়া চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না যে! কার কখন নজর পড়ে!

—আমি ভয় পাই না। কেমন যেন বেপরোয়ার মত বললে শিবানী। নিজের হাতখানি শশিনাথের হাতে রেখে কথা বলছে। বললে,—রাতের বেলায় এসো, সারা রাত ব'সে ব'সে কথা ক'ইবো। তোমার কাছে গল্প শুনবো। চাঁদের জ্যোৎস্নায় দেখবো তোমাকে।

—দেখা যাক, যদি পারি তো আসবো। ফিসফিসিয়ে বললে শশিনাথ। ইদিক সিদিক নজর ফেলে বললে,—লাল শাড়ীখানা পরবে বল,' তবে আমি আসতে পারি।

মৃদু হাসির সঙ্গে খানিক অবাক চোখে চেয়ে থাকে শিবানী। বলে,—লাল শাড়ীতে কি মানায় আমাকে?

—হাঁ খুব মানায়।

—তবে রাখবো তোমার কথা।

শিবানী কথা বলতে বলতে বাঁধানো ঘাটের দিকে চোখ ফেরায়। কা'কে যেন সহসা দেখতে পেয়ে হাসি চাপে মুখের। বলে,—এখন তবে যাই আমি। পাকশালের জানলা থেকে আমাদের বড়রাণী দেখছেন। আড়ি পেতেছেন।

শশিনাথের মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে ওঠে। তার চোখের সমুখের

পৃথিবী যেন অদৃশ্য হয়ে যায় চকিতের মধ্যে। শিবানী কিন্তু হাসতে থাকে খিলখিল শব্দে। হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়ে যায়।

বড়রাণী! ভাবতেও চমক লাগে শশিনাথের। উমারাণী স্বচক্ষে দেখেছেন! অজানা ভয়ে আশান্বিত হয়ে ওঠে সে। বড়রাণী যদি জানিয়ে দেন রাজবাড়ীতে, যা দেখেছেন তা যদি ব্যক্ত করেন অন্দরে! রাজাবাহাদুরের কানে যদি তুলে দেন!

—পোড়ামুখী মেয়ে, আমি সব দেখতে পেয়েছি।

শিবানী কাছে আসতেই উমারাণী হেসে হেসে বললেন। তামাসার হাসি তাঁর মুখে। সহাস্যে বললেন,—কি বলে শশিনাথ? এতক্ষণ কি কথা কইলি?

মুখে আঁচল চাপলো শিবানী। চোখ ঢাকলো। কিন্তু হাসি তার থামতে চায় না যেন। খিলখিল হাসছে শিবানী।

উমারাণী হাত চেপে ধ'রলেন শিবানীর। সজোরে চেপে ধ'রে বললেন,—চোর ধ'রেছি, চল তোর সাজা হবে আজ। রাজমাতার কাছে নিয়ে যাবো। ফাঁস ক'রে দেবো সব।

—দোহাই বড়রাণী! হাসির জের টেনে শিবানী অনুরোধ জানায়! বলে,—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি।

—আগে বল শশিনাথ কি বললে। উমারাণী জেরা করতে থাকেন নকল গাম্ভীর্যের সুরে। বললেন,—শশিনাথ রাজী আছে তোদের বিয়ের?

মাথা নত ক'রলো শিবানী। খানিক থেমে থেকে মাথা হেলিয়ে বললে,—হাঁ। তার আপত্তি নেই।

—তোকে তার পছন্দ? মুখের হাসি লুকিয়ে উমারাণী বললেন।

—জানি না আমি।

—আমার কাছে লুকাতে নেই শিবানী। সত্যি কথা বলতে হয়।

বড়রাণী কৃত্রিম রাগের সঙ্গে কথা বলছেন। শিবানী এত বিপদেও কেমন যেন অবাক মানে। বড়রাণীর মুখখানি দেখতে দেখতে। নিখুঁত নিটোল মুখ, কোমরের ছাচে ঢালা। কত কাল থেকে দেখছে শিবানী, তবুও দেখার তৃপ্তি হয়নি এতদিনেও। উমারাণীর মুখে অদ্ভুত কমনীয়তা, মোহে যেন পরিপূর্ণ। সদাক্ষণ দেখলেও অতৃপ্তি আসে না।

—চোর আমি না তুমি? শিবানী এতক্ষণে যুক্তিসহ কথা বলার প্রয়াস পায়।

—ওরে পোড়ামুখী, তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! বড়রাণী চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন নকল রাগের সুরে। বলেন,—আমাকে চোর বলিস যে?

—তুমি যে আড়ি পেতে দেখছিলে, তাই।

হেসে ফেললেন উমারাণী। বললেন,—তা বেশ কথা, কি শাস্তি তুই দিতে চাস আমাকে?

ভেবে ভেবে শিবানী বললে,—তোমার মহলে তোমাকে বন্দী ক'রে রাখতে চাই, যাতে আর কোথাও তোমার চোখ না যায়।

আবার হাসলেন বড়রাণী। বললেন,—আমি যাতে আর এই পুকুর ধারে আসতে না পাই, তাই?

—হাঁ ঠিক তাই। জোরালো সুরে বলে শিবানী। বলে,—কোথা থেকে তুমি টের পাও, বলতে পারো?

—আমার অন্তর্দৃষ্টি আছে, তা বুঝি জানিস না? আমি চোখ বন্ধ ক'রলে সব দেখতে পাই।

খানিক চুপ ক'রে থাকে শিবানী। কি যেন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বললে,—আচ্ছা বল' দেখি, রাজাবাহাদুর এখন কোথায়? কি করছেন?

এক-রাশ কালো মেঘ, কোথা থেকে যেন উড়ে এসে চাঁদের রূপকে ম্লান ক'রে দিয়ে যায়। তেমনি লজ্জা, অভিমান না অপমানে উমারাণীর মুখে কালো ছায়া নামে। মুখের হাসি মিলিয়ে যায় ক্ষণিকের মধ্যে। চোখের তারা স্থির হয়ে যায়। অনেক দূরের আকাশে দৃষ্টি রেখে বললেন,—রাজা এখন হয়তো নেশায় মত্ত হয়েছেন। দরবারের গদীতে ব'সে ব'সে সুরাপান করছেন কি না কে জানে! হয়তো মুসলমানীদের সঙ্গে রসালাপে ব্যস্ত আছেন। হয়তো তাদের নানা অলঙ্কার পরিয়ে তাদের রূপসুধা পান করছেন।

—আর তুমি কি ক'রছো? অন্দরে লুকিয়ে থেকে সহ্য করছো বিরহ যন্ত্রণা!

—উপায় কি বল্! হতাশ কণ্ঠে কথা বলেন বড়রাণী। বলেন,—কে কার কথা শোনে!

শিবানী বললে,—চল তোমার মহলে যাই। এ সব কথা থাক এখন। কথা বলতে বলতে সে দালান ধ'রে এগিয়ে চলে। উমারাণীর একটি হাত তার হাতে। শিবানী এগোয় মন্থর গতিতে। বড়রাণীর মুখে থমথমে গাম্ভীর্য। ঠাট্টা-তামাসার স্পৃহা নেই আর। সুপ্ত ক্রোধ প্রকাশ পায় তাঁর চলনে। নিবে যাওয়া তুষের আগুন হঠাৎ যেন জ্বলতে থাকে।

নবাবের মনসবদাররা এসেছে দরবারে। সঙ্গে এসেছে নবাবের আমীল-গুজার।

দরবারের দ্বারে বন্দুকধারী প্রতিহার। দু'জন, দু'দিক থেকে আসা-যাওয়া করছে। রাজা কালীশঙ্কর একমনে আলাপ আলোচনা চালিয়েছেন। তাঁর সম্মুখে তুলট কাগজের স্তূপ। জমির নক্সা, ফার্সী ভাষায় লেখা পরিমাপ।

—সেলামী লক্ষ টাকা; নগদ চাই। তত্‌পর জমির বিষয়ে কথা হবে।

মুখ থেকে মুখনল নামিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন। নিজের ডান হাতের আঙুলগুলিতে চোখ বুলালেন। পঞ্চাশ বাতির ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলছে দরবারের চাঁদোয়ায়। হীরার আংটি ঝকঝক করে সেই আলোয়। কমল হীরার শোভা দেখেন কালীশঙ্কর।

আমীল গুজার আর মনসবদাররা পরস্পরের দিকে একবার দেখাদেখি করে। কেউ কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে পারে না।

রাজাবাহাদুর আবার বললেন,—আমার গঙ্গামহলের প্রজারা মুসলমান নবাবের ফৌজী খাতায় নাম লেখাতে পারে না। নবাবের পক্ষে তারা অস্ত্র ধারণ করবে, তেমন আশা দেখি না।

মনসবদারেরা মনে মনে হতাশ হয়ে পড়ে। একজন বললে,—র, তাই যদি হয় তবে তো আপনার গঙ্গামহলে পর্তুগীজের রাজত্ব হবে। তখন আর নবাবকে ঠকাতে পারবেন না।

—পর্তুগীজ রাজত্ব, মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে তুলনা হয় না। কালীশঙ্কর সাহাস্যে বললেন। বললেন,—পর্তুগীজরা অশিক্ষিত বর্বর নয়। তাদের অর্থলিপ্সা থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মবিদ্বেষ নাই!

মনসবদারদের মধ্যে থেকে আবার কথা আসে। একজন বললে,—হজুরের অনুমান ঠিক নয়। গঙ্গামহলের প্রজারা দেখবেন একদিন বিলকুল খৃষ্টান হয়ে গেছে।

—খৃষ্টানদের তবু সহ্য করতে পারি। নীতি মানে তারা, অন্যায় অধর্ম করে না।

হাসতে হাসতে কথা বলছেন রাজাবাহাদুর। কথার শেষে মুখে মুখনল তুললেন। বাম হাতে গোঁফের প্রান্ত পাকাতে থাকলেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বললেন,—যাই হোক গঙ্গামহলের প্রজাদের আশা পরিত্যাগ করেন।

আমীল গুজার বললে,—হুজুর, জমির কথা কি স্থির করলেন!

রাজাবাহাদুর ভ্রূ কুঁচকে বললেন,—ঐ তো বললাম। সেলামী চাই নগদ এক লক্ষ টাকা। তত:পর কথা হবে।

খানসামা আসে, সোনার থালা হাতে। সুরার পেয়ালা সাজানো সারি সারি। থালা এগিয়ে ধরে খানসামা, একেকজনের সমুখে। যে যার পেয়ালা তুলে নেয়। রাজাবাহাদুরের প্রতি সম্মান দেখিয়ে পেয়ালা কপালে ঠেকায় কেউ কেউ। বিড়বিড়িয়ে কামনা করে রাজার সৌভাগ্য, সুস্থদেহ।

কালীশঙ্করের জন্য পৃথক পাত্র। লাল বেলোয়ারী কাচের সুরাপাত্র। টকটকে লাল রক্ত যেন, টলমল করছে। আলবোলার ফরসি রেখে লাল পাত্র তুললেন রাজাবাহাদুর।

—নবাব এই টাকা দিতে সমর্থ নয়। আমীল-গুজার কথা বলে মুখে পেয়ালা তুলতে তুলতে।

—তবে, এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না আর। এখানেই চাপা থাক। কালীশঙ্কর কণ্ঠ ভিজিয়ে নিয়ে বললেন অনুরোধের সুরে।

—বিবেচনা করুন রাজাবাহাদুর। পঞ্চাশ হাজারের অধিক না ওঠেন।

একজন কাননগো কথা বলে মিনতির সঙ্গে। বলে,—আপনি হজুর একজন রাজার মত রাজা, আপনি যদি দর কষাকষি করেন, আমরা কোথায় যাই!

আর এক চুমুকে পাত্র শূন্য ক'রে কালীশঙ্কর বললেন—আপনার কথায় প্রতিবাদ জানাই আমি। দর কষাকষি আপনারা চালিয়েছেন, আমি এক দর ব'লেছি। সেলামী নগদ এক লক্ষ টাকা। অগ্রিম দেয়।

—নবাবের সামর্থ্যে কুলাবে না হুজুর।

আমীল-গুজার কথা বলে আর পাকা দাড়িতে হাত বুলায়।

হো হো শব্দে হেসে উঠলেন রাজাবাহাদুর। গগনবিদারক হাসি হাসলেন যেন। হাসতে হাসতে বললেন,—আর হাসাবেন না মিঞা সাহেবরা, বাঙলার নবাবের দপ্তরে লাখ টাকা মিলবে না?

—পরিহাস নয় রাজাবাহাদুর, নবাব এই টাকা সেলামী দিতে পারবেন না।

—তবে কত দিতে পারেন? কালীশঙ্কর প্রশ্ন করলেন একচোখ বন্ধ ক'রে।

আমীল গুজার বললে,—বিশ পঁচিশ হাজার তক দিতে পারা যাবে।

আবার হাসলেন রাজা। হো হো শব্দে হাসতে থাকলেন। হাসতে হাসতেই বললেন,—বিশ পঁচিশ নয়, তবে আমি যা বলি তাই শুনেন। মাত্র এক টাকা সেলামী দিন নবাব।

কথা শেষ হ'তে না হ'তে আবার হাসি ধরলেন রাজাবাহাদুর। হাসি যেন কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গমিশ্রিত।

—তাই হবে হুজুর? আপনার খুশী রাজাবাহাদুর। আপনি যেমন বলবেন।

—না না! এপাশে ওপাশে মাথা দুলিয়ে কালীশঙ্কর বললেন,—না না, তাহা হয় না। নবাবের মত একজন গণ্যমান্য আমাকে সেলামী দিবেন কেন? সেলামী আমি চাই না। এখন কতকে জমা হবে তাই বলেন।

—বাৎসরিক ত্রিশ হাজার টাকার কড়ারে।

—ওটাকে চল্লিশ করেন। আর আপত্তি করবেন না।

—তথাস্তু হুজুর। রাজাবাহাদুর, আপনার কথাই থাকবে।

শূন্য পাত্রটা ভর্তি করলেন কালীশঙ্কর। এক চুমুক খেয়ে পাত্র নামিয়ে রেখে ফরসি তুললেন মুখে। বললেন,—জমিটায় নবাব কি কাজ করবেন?

—খাজনাখানা বানাবেন নবাব। আমীল, ফৌজদার-কোতোয়ালের কাছারী বসাবেন। খাজাঞ্চী, সিকদার আর পায়েকের দপ্তর তৈয়ারী হবে।

—বেশ ভাল কথা। বললেন রাজাবাহাদুর। দরবারের শীর্ষে চাঁদোয়ায় চোখ রেখে বললেন,—দু কিস্তী বন্দোবস্তের টাকাটা আগাম চাই কিন্তুক।

—আলবৎ, আলবৎ।

—একসঙ্গে চাই। এক কিস্তীতে।

—আলবৎ। আগামীকাল এই টাকা দেওয়া হবে।

—হাঁ, তত:পর কাগজ-পত্রে সই হবে। কথার শেষে মুখনল তুললেন কালীশঙ্কর। আলবোলায় গর্জ্জন তুললেন। তামাকের সুগন্ধ ভাসালেন।

খানসামা ফলের পাত্র ধরে। রূপার গামলায় আপেল, নাসপাতী, আঙুর, শা-আলু। কেউ একটা আপেল, কেউ নাসপাতী, কেউ ক'টা আঙুর আর কেউ শা-আলু তুলে নেয়।

কালীশঙ্কর আখরোট খেতে ভালবাসেন, সুরার সঙ্গে। তিনি তাঁর নির্দিষ্ট রেকাব থেকে আখরোট তুললেন। রাজার মন থেকে থেকে চঞ্চল হয়ে ওঠে যেন! কেমন যেন আনচান করতে থাকেন। চিন্তামগ্ন দেখায় তাঁকে। তখন মনে মনে' প্রার্থনা জানান,—কালীশঙ্কর যেন নির্বিঘ্নে ফিরে আসে। সুস্থ দেহে।

[ক্রমশ:।

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে
নাম ধাম ঠিকানা লিখতে ভুলবেন না]

চিংড়ীলাভ

—সুজয় ঘোষ

বর্ষার দিনে

—রথীন রায়

খুকু —অনীশকুমার রোজারিও
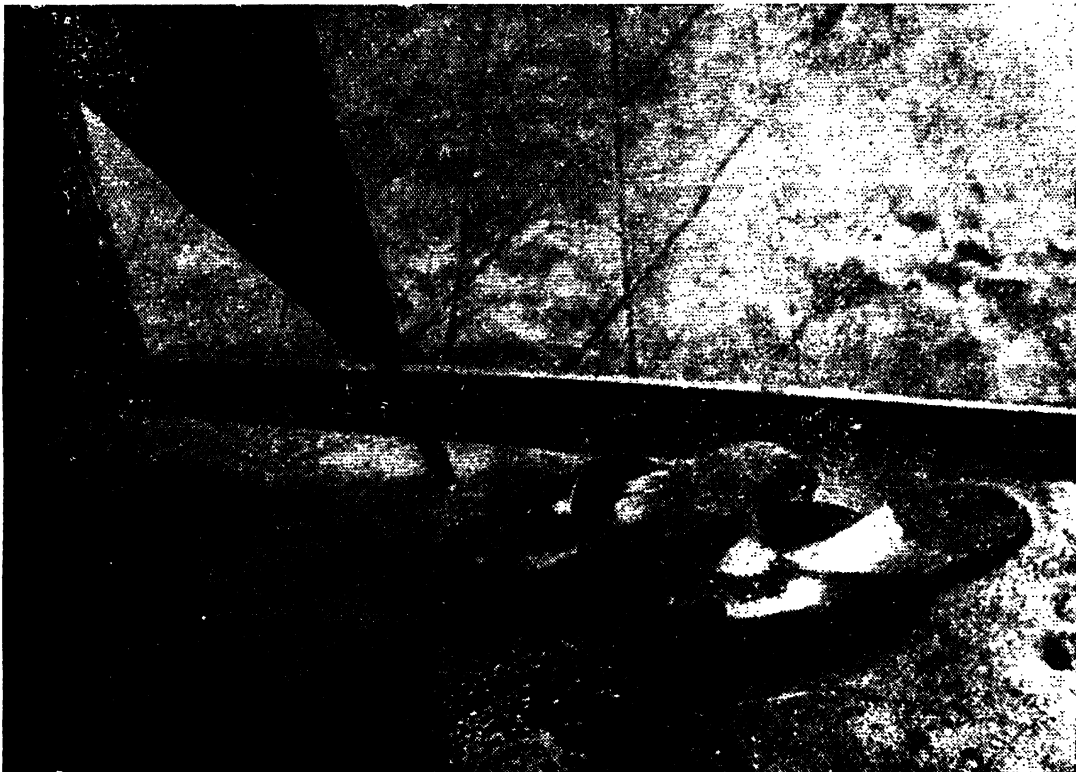
—গোবিন্দলাল দাস

তাই তো!

ফুলের তোড়া

—শিবনাথ পাল

-সলিল গোস্বামী
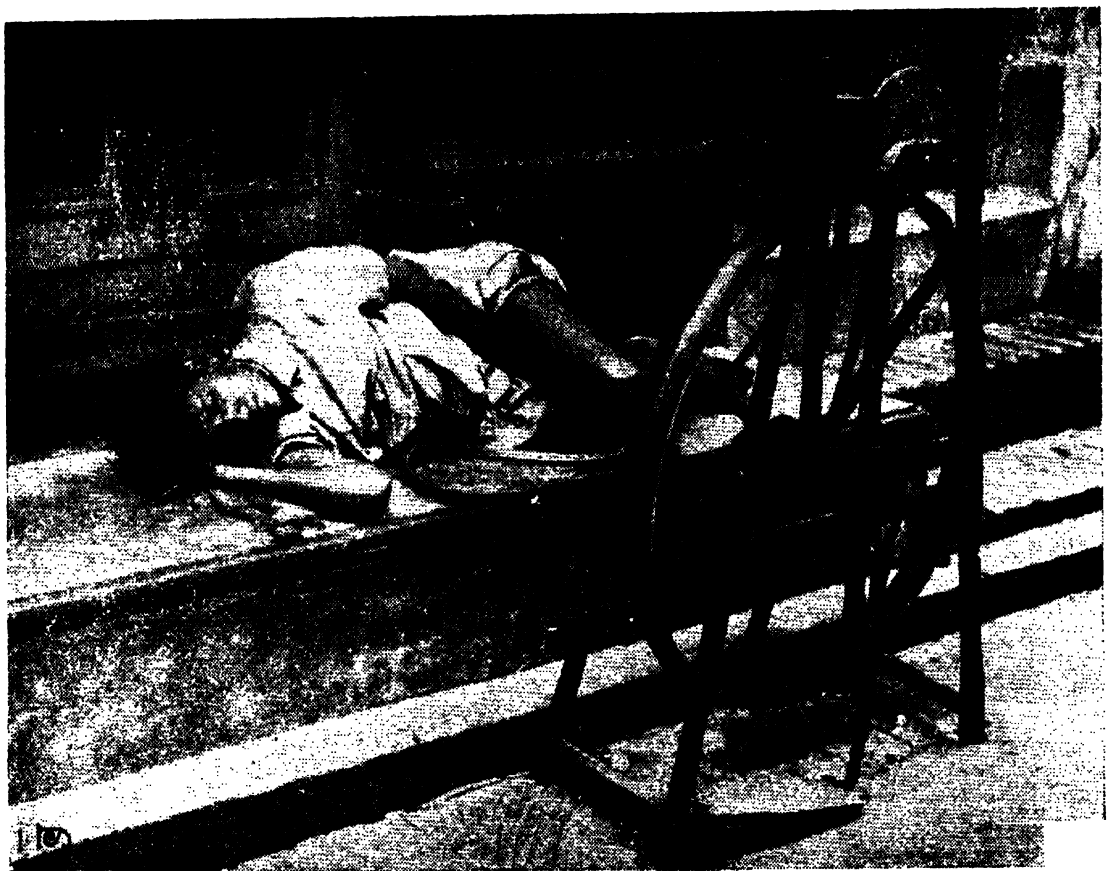
পরিমল গোস্বামী

দ্বিতীয় পর্ব

১

মিষ্টান্নের প্রতি আকর্ষণ ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল। বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে আসতে অনেকগুলো দোকান ডিঙিয়ে আসা সহজ ছিল না। দুই বেলা একই ভাবে বিপন্ন হয়ে শেষকালে একটি সহজ সমাধান আবিষ্কারের চেষ্টা করলাম নতুন পথে। পাবনায় তখন চার পয়সায় এক সের দুধ। আমার সঙ্গে ছিল ষ্টোভ। এই দুয়ের যোগাযোগে বিকেলে এক সের দুধ জ্বালিয়ে ক্ষীর ক'রে খেতে লাগলাম। চা খাওয়া তখন অজ্ঞাত ছিল। পাবনায় কোনো চায়ের দোকান দেখেছি কি না মনে পড়ে না, সম্ভবত দেখিনি। ১৯১৫—১৬ সালের পাবনা শহর!

কিন্তু আমার ব্যবস্থিত জলযোগের সেই নববিধান দিন সাতেকের বেশি টিকিয়ে রাখতে পারলাম না। নিজ হাতে প্রতিদিনের সংসার করা আমার ধাতে নেই। আমার সবই অব্যবস্থিত, এলোমেলো, বেহিসেবী। নিতান্ত দায়ে না পড়া অবধি হিসেবের খাতায় হাত দিইনি। অতএব গৃহস্থালীর দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বেঁচে গেলাম। মেস্ রীতিতে হষ্টেল চলত। পালা ক'রে এক এক জনকে এক এক মাস মেস্ পরিচালনার ভার নিতে হত। এ কাজটি আমার কাছে একটি বিভীষিকা ব'লে বোধ হল, এড়িয়ে গেলাম।

বিকেলে কয়েকজনে মিলে বেড়ানো হত নিয়মিত। পদ্মার দিকেই বেশি, কখনো বাজিতপুর ঘাটে, কখনো সার্কিট হাউসের পথে সোজা, কখনো শহরের উত্তরের শড়কে। ইছামতী নদীর ওপারে রাধানগর গ্রামে তখন এডওয়ার্ড কলেজের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। একদিন সে কলেজ-বাড়ির ভিত্তি স্থাপিত হতে দেখলাম; আমরা শেষ পরীক্ষা দিয়ে চলে আসা পর্যন্ত বাড়ি তৈরির কাজ অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল।

যতদূর মনে পড়ে, টাউন হলের অঙ্গনে, গণপতি চক্রবর্তীর ম্যাজিক দেখানোর আয়োজন হয়। উচ্চাঙ্গের ম্যাজিক সম্পর্কে তৎপূর্বে কোনো ধারণা ছিল না। বেদেনীদের ভোজবাজি দেখেছি শুধু। ম্যাজিকে আমার ভীষণ আকর্ষণ, অতএব গণপতির ম্যাজিকে টিকিট কিনে ঢুকে পড়লাম। ইলিউশন বক্সের খেলা দেখে বেশ ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলাম। অলৌকিকত্বে কোনো বিশ্বাস ছিল না, অথচ নিজের বুদ্ধিতে কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা নেই, এ বড়ই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। যাদুকরের রসসৃষ্টির ক্ষমতায় পুলকিত হয়েছিলাম। পর পর তিন দিন দেখলাম, তবু রহস্য রহস্যই থেকে গেল। শুধু এই ভেবে সান্ত্বনালাভ করলাম যে কৌশল একটা আছেই, শুধু আমার তা জানা নেই। যারা আত্মিক ব্যাপার ব'লে বোঝাতে এসেছিল তাদের সঙ্গে কিছু বিরোধ হয়েছিল মনে আছে।

একটি খেলা খুব উপভোগ্য মনে হয়েছিল। যাদুকর ছোট টেবিলে ছোট একটি কাঠের বাক্স রেখে খুব খানিকটা বক্তৃতা দিয়ে নিলেন। বললেন, "এর মধ্যে মারাত্মক এক সাপ আছে, এ খেলাটা তাই খুব বিপজ্জনক। দর্শকদের মধ্যে সাহসী যদি কেউ থাকেন তবে উঠে আসুন।"

একজন সাহসী উঠে গেলেন। একখানা লাঠি তাঁর হাতে দিয়ে যাদুকর বলতে লাগলেন, "আমি ওয়ান, টু, থ্রী, বলার সঙ্গে সঙ্গে এই বাক্স খুলব, দেখবেন একটি প্রকাণ্ড সাপ মাথা তুলে আছে, আপনি বিদ্যুৎ গতিতে তার মাথায় এই লাঠির বাড়ি মারবেন। একটু দেরি করলে সাপের হাতে মারা পড়তে পারেন—অতএব খুব সাবধান! মনে রাখবেন, সাপকে দেখামাত্র মারতে হবে।"—ব'লে যাদুকর সেই সাহসী লোকটির গায়ের চাদর তাঁর কোমরে জড়িয়ে বেঁধে তাঁকে
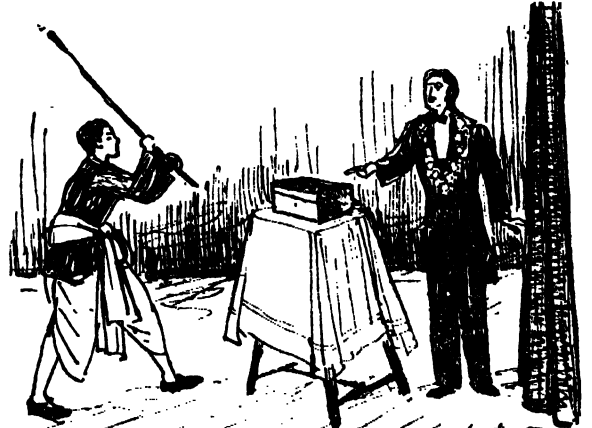
এই বাক্সে সাপ আছে, খুললেই তার মাথায় লাঠি মারতে হবে

লাঠি উঁচু ক'রে ধ'রে কেমন ক'রে দাঁড়াতে হবে, তা দেখিয়ে দিলেন। লোকটি হাজার লোকের সামনে দু'পা ফাঁক ক'রে লাঠি উঁচু ক'রে সেই বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে। সে এক অপরূপ দৃশ্য! সমস্ত দর্শক নীরবে, কি পরিণাম ঘটে দেখার জন্য দম বন্ধ ক'রে ব'সে আছে। যাদুকর আবার সাহসী লোকটিকে বললেন, "মনে রাখবেন, ভয় পেলে চলবে না,"—ব'লে তিনি আবার লোকটির উদ্যত ভঙ্গির দাঁড়ানোকে যথাযথ সংশোধন ক'রে দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থেকে বললেন—"কাঁপবেন না, এইবার প্রস্তুত থাকুন—ওয়ান!"

ব'লে যাদুকর নিজেই কিছু কাঁপতে লাগলেন, এবং ভীত স্বরে বলতে লাগলেন, "কাঁপবেন না—ভয় নেই—টু!"

সাহসী লোকটি ততক্ষণে সত্যিই কাঁপতে আরম্ভ করেছেন। যাদুকরও কাঁপছেন। তিনিই যেন বেশি ভয় পেয়েছেন। এবারে তিনি একটু দূরে সরে ভীষণ কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলেন—"এইবার আমি থ্রী বলব, ভয় পাবেন না, কাঁপবেন না।"

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সাহসী লোকটির মাথার উপর তোলা লাঠিসহ উদ্যত হাত দুখানি ভীষণ কাঁপতে আরম্ভ করেছে। এইবার দর্শকদের দম বন্ধ করা প্রতীক্ষার তীব্রতা চরমে তুলে যাদুকর ভীষণ চিৎকার ক'রে, ভীষণ কেঁপে এবং পালিয়ে যাবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, বাক্সের ডালা এক ধাক্কায় খুলে থ্রী ব'লেই তিন লাফে সরে গেলেন ওখান থেকে, লোকটি লাঠি মারতে মারতে হঠাৎ থেমে গেলেন। বাক্সের মধ্যে সাপ নেই, মারবেন কার মাথায়?

"অ্যাঁ, সাপ নেই? তা হলে আপনি ভয় পাওয়াতে সব গোলমাল হয়ে গেছে"—ব'লে যাদুকর এগিয়ে এসে লাঠিখানা ফিরিয়ে নিয়ে সাহসী লোকটিকে বললেন—"আসনে ফিরে যান।"

এই ব্যাপারটা আগাগোড়াই একটি ধাপ্পা। সাপের ব্যাপারটা একটা ইণ্টারলিউড, বিশুদ্ধ আমোদ সৃষ্টিই ছিল তার উদ্দেশ্য। আসলে ঐ ছোট বাক্স থেকে শেষে এত ফুল বেরোতে লাগল যে তিনখানা টেবিলে তার জায়গা হয় না।

ম্যাজিক নিয়ে এর পর অনেক চিন্তা করেছি এবং নিজেও বাল্যকাল থেকে কিছু কিছু তাদের ম্যাজিক শিখে বন্ধুদের কতবার চমকিয়ে দিয়েছি। অনেক ম্যাজিকই এখন দেখলে তার রহস্যটা বুঝতে পারি, কিন্তু নিশ্চিত বুঝেছি যে রহস্য উদ্ঘাটনে কোনো আনন্দ নেই। সামান্য উপকরণকে সম্বল ক'রে যাদুকর যখন একটা কিছু গড়ে তোলেন, তখন সেই গড়ে তোলাতেই শিল্পীর পরিচয়, ভাঙাতে নয়। শিল্পীর ছবি, কবির কাব্য, সবই তো ভ্রান্তি। রঙ্গমঞ্চে যে নাটক দেখি সেও তো ভ্রান্তি। ছবি দেখে মুগ্ধ হওয়ার বদলে যদি চেঁচিয়ে উঠে প্রচার করি ধ'রে ফেলেছি; কাগজ, তুলি, আর রঙ দিয়ে এটি তৈরি হয়েছে; কাব্য প'ড়ে মুগ্ধ হওয়ার বদলে অনুরূপ ভাবে বলি, হুঁ সব বুঝতে পেরেছি—ঐ শব্দগুলো অভিধান থেকে সংগ্রহ ক'রে সাজানো হয়েছে—ফাঁকি ধ'রে ফেলেছি; তা হলে তাতে শিল্প বা কাব্য-ম্যাজিকের কি কিছুমাত্র ক্ষতি হয়? যে ধ'রে ফেলল, সে নিজে শুধু প্রতারিত হয় না কি? শিশিরকুমার ভাদুড়ি রাম সেজেছেন জেনেও কি সেই রামের দুঃখে আমরা দুঃখ পাইনি নাট্যমন্দিরে? সেই রামের গায়ে সাবান ঘ'ষে শিশিরকুমার ভাদুড়িকে ধ'রে ফেলার চেষ্টা ক'রেছি কি?

কিন্তু এই 'ধ'রে ফেলা'ও সম্মানের জিনিস হয় যদি মাথাটি নিচু ক'রে শিক্ষার্থীর মনোভাব নিয়ে ধরতে আসা যায়। বিজ্ঞানীদের মনোভাব হচ্ছে এটি। তাঁরাও ধ'রে ফেলার দলে, কিন্তু তা নিয়ে তাঁদের দম্ভ নেই, তার মধ্যে 'শো' নষ্ট করার দুষ্প্রবৃত্তি নেই, বিশ্ব-ম্যাজিকের অপরিসীম বিস্ময় খর্ব করার দুরভিসন্ধি নেই। বরং বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য এর বিপরীতই। তাঁরা রহস্য যত ভেদ করছেন রহস্য তত বাড়ছে।

কলেজে কেমিষ্ট্রি পড়তে গিয়েই প্রথমে বিশ্ব-গঠন সম্পর্কে ধারণা কিছু স্পষ্টতর হয়, এবং এটি যে এক বিরাট ম্যাজিকের পর্যায়ে পড়ে এটি সহজেই মনে আসে। অ্যাটম তখনও অবিভাজ্য ছিল আক্ষরিক অর্থে। অ্যাটম ও মোলিকিউল—পরমাণু ও অণু বস্তুসৃষ্টির পথের আদি এই দুটি ধাপ আমাকে সম্পূর্ণ নতুন এক ভাবরাজ্যে উত্তীর্ণ করল। বস্তুর আদিতে মাত্র একটি পরমাণু কণিকা, যাকে আর ভাগ করা যায় না, এই পর্যন্তই তখন আমরা জানি। রাদারফোর্ড তখনো প্রোটনে এসে পৌঁছন নি। রোয়েণ্টগেন-টমসন-বেকেরেল-ক্যুরি-গোল্ডষ্টাইন এবং রাদারফোর্ড-সডির গবেষণা তখনো ফিজিক্সের পাতা ছেড়ে ইণ্টারমীডিয়েট পাঠ্য, সার পি-সি রায় লিখিত, ইনঅরগ্যানিক কেমিষ্ট্রির পাতায় আসেনি। সুতরাং আমাদের কাছে (বইতে এবং অধ্যাপকের বক্তৃতায়) তখন অ্যাটমই চরম। সবার উপরে অ্যাটম সত্য তাহার উপরে নাই।

কেমিষ্ট্রি আমার জীবনে এলো একটি পরম আশীর্বাদরূপে। আমার কল্পনা উধাও হয়ে গেল বস্তুজগতের সীমাহীন রহস্য রাজ্যে। এত বড় ম্যাজিক আর নেই। কেমিষ্ট্রির ফরম্যুলাগুলি আমার চোখে ছবির মতো ভাসতে লাগল। পি-সি রায়ের একখানি মাত্র বই, তারই মধ্যে দিয়ে বিশ্বভ্রমণের পাসপোর্ট পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে এলো লজিকের পথ। সেও আমার কাছে এক নতুন জগৎ। সিলোজিজম-এর ধাপগুলোয় কোথায় ফ্যালাসি, সিদ্ধান্তে কোথায় ফ্যালাসি, লজিকের রীতিতে যাচাই করছি, মাঝে মাঝে বৃত্তের সাহায্য নিচ্ছি। মাঝে মাঝে কল্পনারাজ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। যতটুকু কম চিন্তা করলে পরীক্ষায় ভাল ফল হয়, তা আমার দ্বারা সম্ভব ছিল না, পাঠের যে কোনো অংশ ভাল লাগলে তাকে আশ্রয় ক'রে কল্পনায় উড়ে যেতাম অনেক দূরে।

কলেজের পড়া অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার ছিল এখানে। ভাঙা পুরনো দরিদ্র পরিবেশে আমাদের মধ্যে একটা গভীর আত্মীয়তাবোধ জেগেছিল, যা পরে আর কোথায়ও পেলাম না।

হষ্টেলে আমাদের নানা বিষয়ে তর্ক প্রায় লেগে থাকত। রবীন্দ্র-কাব্য তার মধ্যে একটি প্রধান বিষয়। অতুলানন্দ ও আমি রবীন্দ্রনাথকে রক্ষার ভার নিয়েছিলাম। সে সব বালকোচিত তর্কবিতর্ক, তার রেকর্ড থাকলে আজ নিশ্চিত বোঝা যেত যে রবীন্দ্রনাথ তার অপেক্ষায় ব'সে না থেকে নিজ ক্ষমতাতেই বড় হয়েছিলেন।

যাই হোক, এই উপলক্ষে অতুলানন্দের সঙ্গে একটা বিশেষ অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল এবং আজও সেই ১৯১৫-১৬ সালের কলেজে পাওয়া বন্ধুদের মধ্যে সেই একমাত্র বন্ধু যাকে এখনও দেখতে পাই। তার নিজস্ব প্রতিভায় চলার পথে আমি এককালে বাধা সৃষ্টি ক'রে তাকে গ্রন্থকার হতে প্রলুব্ধ করেছিলাম, এবং সে পথের অনেক মজার

অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর সে সেই দুষ্ট প্রভাব বর্তমান অনেকখানি কাটিয়ে উঠে আত্মস্থ হয়েছে। সে সব কথা পরে বলা যাবে যথাসময়ে।

১৯১৬ সালে অনেক দিক বিবেচনা ক'রে আমাদের রতনদিয়াতে বাস করা স্থির হল। বিঘে দুই জমি নিয়ে তাতে বাড়ি উঠল। বাবা এ বিষয়ে নিস্পৃহ ছিলেন। তাঁর মতে, কোথাও স্থায়ী বাস অর্থহীন। ভবিষ্যতে যার যেখানে খুশি থাকবে, কাউকে কোথায়ও বেঁধে রাখা ঠিক নয়। তখনকার দিনে পাড়াগাঁয়ের লোকের নগদ টাকার অভাব, তাই জমি কিনতে চাইলে যত ইচ্ছে পাওয়া যেত। ধানের জমি খুব শস্তা ছিল। এমন অবস্থায় অল্পায়াসে প্রায় জমিদার হয়ে বসা যেত তখন। বংশ বংশ ধ'রে নিশ্চিন্ত কিন্তু বাবা ঠিক এরই ঘোর বিরোধী ছিলেন। যাযাবরী বৃত্তি সম্ভবত সবারই মজ্জাগত ছিল। এখন ভাবি, তা না হলে আজ কি হত? কোনো জমিতেই মূল প্রবেশ করানো হয়নি ব'লেই আজ হয়তো অস্তিত্বটুকু বজায় আছে।

বাবা পড়াশোনায় ডুবে থাকতেন। নানা ভাষা শিক্ষা তাঁর একটি নেশা ছিল। উচ্চারণ শিক্ষায় একান্ত নিষ্ঠা। ইংরেজী সংস্কৃত ফার্সি—সব বিশুদ্ধ উচ্চারণ হওয়া চাই। ম্যাট্রিক ক্লাসে তিনি আমাদের সংস্কৃত অনেক ছন্দের সূত্র সমেত শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এই সবই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান আনন্দ। ইংরেজী বলতেন খাঁটি ইংরেজের অনুকরণে।

টেষ্ট পরীক্ষা শেষে বাড়ি এসেছিলাম, ফিরে যাবার সময় গেলাম হেঁটে, কুষ্টিয়া থেকে। রাজবাড়ির দুজন ও পাংশার একজন সহপাঠী ছিল সঙ্গে। গড়াই নদী পার হয়ে সাত আট মাইল বা আরও বেশি হাঁটতে হবে। যত এগিয়ে চলেছি তত দেখছি মাঠের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু আগুন আর আগুন।—কুসুম ফুলের আগুন। কুসুম ফুল এক রকম রঞ্জক ফুল, জানতাম না তার চাষ এখানে এমন ব্যাপক ভাবে হয়। দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ শুধু এই কুসুম ফুলে ছাওয়া, কিছু কিছু সরষের হলুদ ফুলের মিশ্রণও আছে। ঘন লালের সঙ্গে হলুদ মেশালে যেমন রং হয় কুসুম ফুলের রং তেমনি। নীল আকাশের পাত্রটা থেকে সোনালি রোদ যেন নিঃশেষে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে সেই রঙের সমুদ্রে। চোখ ঝলসে যায় এমন তার ঔজ্জ্বল্য।—কুসুম ফুলের এমন ব্যাপক চাষ আগে দেখিনি, পরেও না। এরই মধ্যেকার পায়ে চলার পথ ধ'রে এগিয়ে চলেছি। সেদিন ঝড়ের রাতে এরই কাছাকাছি স্থানে এই আকাশেরই নিচে মৃত্যুর ভ্রূকুটি দেখেছিলাম, আজ সেখানে সেই একই প্রকৃতির প্রসন্ন অভ্যর্থনা দেখছি। মন ভরে উঠল।

কুষ্টিয়া থেকে বেলা সাড়ে নটায় রওনা হয়ে বিকেলের দিকে গিয়ে পৌছলাম পাবনা শহরে। পদ্মা পার হয়েছিলাম খেয়া নৌকায়।

এর পর কয়েক সপ্তাহ ধ'রে শুধু পড়ার পালা। আমরা কয়েক-জন মিলে বিকেলে বেড়াতে যেতাম পরীক্ষার পড়া ছেড়েও। পথের দুধারে আমগাছের নিচের জমি ঝরা মুকুলে আচ্ছন্ন। তার মাদকতাপূর্ণ গন্ধে মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যেত। হাজার হাজার মৌমাছির গুঞ্জন অদৃশ্য কোকিলের গান আর অজস্র আমের মুকুলের সেই উগ্র গন্ধ—এই পটভূমিকে ঠেলে "Milton! thou shouldst be living at this hour" পড়ছি চেঁচিয়ে! ওয়ার্ডসওয়ার্থ ১৮০২ সালে মিলটনকে ডেকেছিলেন ইংল্যাণ্ডের বিশেষ প্রয়োজনে। কিন্তু তার শতাধিক বছর পরে সেদিনের সেই ১৯১৭ সালের পাবনা শহরে, এক আই-এ পরীক্ষার্থী বালকের কাছে, সে ডাকের সঙ্গে পরীক্ষা পাস ভিন্ন সুর মেলাবার আর কি দরকার ছিল ভেবে দেখিনি। বসন্ত কালের সেই উন্মাদকরা পরিবেশে মিলটন কেন, অতীত কালের সকল দেশের সকল কবির বেঁচে থাকার দরকার ছিল; আর কোনো কারণে নয়, শুধু পাবনা শহরের বসন্তকালের ঘ্রাণ নিতে আর কোকিলের ডাক শুনতে।

পরীক্ষা শেষে কত বড় মুক্তি! প্রথমে বিশ্বাসই হয় না যে রাত্রে আর পড়তে হবে না। হঠাৎ চমকে উঠি, এখনও ব'সে আছি, এখনও বই খুলিনি? অবশ্য বই আমি সামান্যই খুলেছি। নোট মুখস্থ করিনি কোনো দিন, সে ক্ষমতাও ছিল না। অন্যের ভাবা নিজের ব'লে চালানো ভাল লাগত না। নিজে যেটুকু বুঝেছি মাত্র সেইটুকু লিখতে পারতাম, না বুঝে কিছুই লিখতে পারিনি। কোনো রকমে পাস করার ব্যাপার।

হষ্টেল থেকে চিরবিদায়। দু'দিন ভীষণ হৈ হুল্লোড় চলল। তারপর বিদায়ের আয়োজন। তখনকার দিনে মফঃস্বল শহরে উপভোগের উপায় নিজেদেরই উদ্ভাবন ক'রে নিতে হত। তখন রিল্যাক্সেশন মানে ঘুম, লিবারেশন মানে হৈ হৈ চিৎকার। এখন যেমন সিনেমায় বসলে একই সঙ্গে দুটো প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, তখন তা ছিল না, কারণ তখন সিনেমা ছিল না। ঘোর সেকেলে ব্যাপার।

বিদায়ের আগের দিন তারাপদ সান্যালের মাথায় বায়ুর প্রকোপ দেখা দিল। সে ঘর থেকে খান দুই তক্তাপোষ টেনে বের ক'রে উঠোনে গেটের কাছে রাখল। তারপর প্রত্যেকের পায়ের দুতিন জোড়া ক'রে জুতো এনে জড় করল তার উপর। লম্বা দড়ি টাঙিয়ে তাতে সবার জামাকাপড় ঝোলাল। তারপর একটি টিন বাজাতে বাজাতে 'নিলাম! নিলাম!' ব'লে চেঁচাতে লাগল। খদ্দের জুটে গেল কিছু। তারা সীরিয়াস। নিলামওয়ালার আপত্তি ছিল না বেচে দেওয়ায়।

আমরা চার পাঁচজন যারা ষ্টিমারে গোয়ালন্দের দিকের যাত্রী, ঠিক হ'ল পরদিন সকালে রওনা হব। ঘোড়াগাড়ি এলো দুখানা। তারাপদ আমাদের সঙ্গী, তার বাড়ি বরখাপুর, তাকে নামতে হবে

ফতুয়া গায়ে পাগড়ি মাথায় হুঁকো টানতে টানতে চলস।

খলিলপুর (পাবনা), আমাকে নামতে হবে বেলগাছি (ফরিদপুর)। একটি ষ্টেশনের ব্যবধান। তারাপদ বলল, "আমি শহরের মধ্যে গাড়িতে উঠব না, তোমাদের গাড়ির সঙ্গে হেঁটে যাব এবং শহর ছাড়িয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠব। কি তার উদ্দেশ্য তখন বুঝিনি, একটু পরেই বোঝা গেল। সে ফতুয়া গায়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে মাথায় পাগড়ি বেঁধে চলল হেঁটে তার লম্বা হুঁকোটি টানতে টানতে।

তার পর ষ্টীমার পথ। তারাপদ একাই জমিয়ে রাখল গল্প ক'রে গান গেয়ে। কিন্তু তার আরও একটি প্রধান ভূমিকা তখনও বাকী। এই খানেই তার শেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে সে বিদায় হয়েছে, তারপর এখন সে কোথায়, তা আর জানি না।

যতদূর মনে পড়ে সাতবেড়ে ছেড়ে কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর আমাদের ষ্টীমার গেল চড়ায় আটকে! মার্চ মাসের শেষ তখন, পদ্মার বুকে তখন কত চর জেগে উঠেছে। তাদের এড়িয়ে এড়িয়ে খুব সাবধানে চলছিল ষ্টীমার, কিন্তু এড়ানো গেল না। ঘণ্টা দুই পরে গন্তব্যে পৌঁছে যাব আশা করছিলাম, এমন সময় এই বিপদ! খাওয়ার চিন্তাই তখন বড় হয়ে দেখা দিল। তারাপদ বলল, কোনো চিন্তা নেই।—সে উঠে গেল ব্যবস্থা করতে।

ফিরে এলো মিনিট দশেক পরে। বলল, সব ঠিক আছে। ঠিক আছে, মানে, সারেঙের কাছে গিয়ে সে আমাদের কয়েক জনের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক ক'রে এসেছে। ষ্টীমারে তখন রান্না হচ্ছিল। খালাসীদের জন্য এই রান্নার লোভনীয় গন্ধ ষ্টীমারযাত্রীর পরিচিত। ইতিপূর্বে সে গন্ধই পেয়েছি, এবারে স্বাদ পাওয়া গেল। খিচুড়ী, প্রচুর পেঁয়াজ সংযোগে রান্না। আরও শুনে অবাক হলাম, এ জন্য কোনো পয়সা লাগবে না।

এক বেলা চেষ্টার পর ষ্টীমার চড়ার বন্ধন থেকে মুক্তি পেল। আমি বেলগাছি ঘাটে নামলাম বিকেলে। আমার সঙ্গে একটি বড় ট্রাঙ্ক ছিল, তাতে বই ছিল অনেক, বেশ ভারী সে বাক্স। বেলগাছি ঘাটে মুটে ছিল না একটি। যাত্রীদের সাহায্যে বাক্সটি নিচে নামিয়েছি, কিন্তু তারপর?

একটি স্কুলের ছাত্র, যতদূর মনে পড়ে ঐ ষ্টীমারেই ছিল কিংবা হয় তো বা শূন্য থেকে আবির্ভূত হল আমার প্রয়োজনে। সে কাছে এগিয়ে এসে বলল, চলুন বাক্স আমি নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছি। আমার অসহায় অবস্থা দেখেই সে সব বুঝতে পেরেছিল! মুখখানা শান্ত এবং গম্ভীর। বলল, বাক্স আমার মাথায় তুলে দিন। আমি বললাম "সে কি ক'রে হবে, বাক্স ভারী এবং রেলষ্টেশন মাইলখানেক।" সে শুধু বলল, "আমার কষ্ট হবে না, তুলে দিন।"

না দিয়ে উপায় ছিল না।

ছেলেটি সেই প্রায় আধ মণ ভারী ট্রাঙ্কটি মাথায় বয়ে বেলগাছি ষ্টেশনে এনে নামিয়ে দিল। ধন্যবাদ জানাবার রীতি তখন পল্লীতে প্রচলিত হয়নি। কৃতজ্ঞতা জানাবার আর কোনোই উপায় ছিল না। তার হাতটি ধ'রে চেপে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। হয় তো পেল কিছু, হয় তো পেল না, কিন্তু সে দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে সে চলে গেল। অপরিচিত শত শত অতি সাধারণ স্কুলের ছেলেদের সে এক জন, কিন্তু কি অসাধারণ। কোথায় তার বাড়ি, কি তার নাম, কিছুই মনে নেই এখন। জানবার অবকাশ পেয়েছিলাম কিনা তাও মনে পড়ে না। অথচ কি আশ্চর্য, সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের দূরত্বে থেকেও সে আজ আমার মনের এক কোণে কত বড় একটা স্থান অধিকার ক'রে আছে।

কলেজ জীবনের গোড়াতেই সম্ভবত, সঞ্জীবনী কাগজে কিছু কিছু লিখছি মনে পড়ে। সমাজের অসঙ্গতি বিষয়ে মন খুব আলোড়িত হয়েছিল জাতিভেদ প'ড়ে। লেখার বিষয়-বস্তুতে নতুনত্ব ছিল না, কিন্তু তাতে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস যোগ হয়েছে। "স্থানীয় সংবাদ" এর পর, এই প্রথম আমার নিজস্ব মত, লেখার সঙ্গে যুক্ত হল।

গল্প বা উপন্যাস পাঠে আমার খুব আকর্ষণ ছিল না, আমার শুধু প্রবন্ধ পড়তে ভাল লাগত। ভারতবর্ষে প্রকাশিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর লেখা প্রথম থেকেই পড়ছিলাম। এই প্রবন্ধগুলি আমার কাছে খুব ভাল লাগত। প্রাণময় জগৎ, বাঙময় জগৎ-এর বক্তব্য বুঝতে চেষ্টা করতাম খুব মন দিয়ে। কলেজেও পাঠ্য উপন্যাসখানায় খুব মনোযোগ দিইনি, আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল ষ্টীল অ্যাডিসনের রচনাগুলি। গল্প বা উপন্যাস বিষয়ে আমার এই মনোভাব আমি বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছি। গল্প উপন্যাসে বর্ণিত কোনো বেদনা বা আবেগময় মুহূর্ত আমাকে একটু বেশি পরিমাণে বিচলিত করত, তাই দুঃখ-বেদনার কাহিনী আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতাম। ১৯২১—২২ সালে যখন আমার ছোট বোন মঞ্জুর বয়স প্রায় চার, সেই সময়ের একটি দৃশ্য এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। বাবা তাকে 'পুরাতন ভৃত্য' পড়ে শোনাতেন রোজ। ঐ গল্পটির প্রতি মঞ্জুর ভীষণ লোভ ছিল, অথচ পুরো কাহিনীটি সে সহ্য করতে পারত না, কেঁদে ফেলত। শেষে সে নিজেই আবিষ্কার ক'রে নিয়েছিল, কেঁদে ফেলার জায়গাটায় অর্থাৎ যেখানে আছে—

"লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম, তাহারে ধরিল জ্বরে
নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ-পরে।"

এইখান থেকে শেষ ছত্র—"আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই মোর পুরাতন ভৃত্য।" পর্যন্ত যদি সে না শোনে, তা হলে আর তাকে কাঁদতে হয় না। তাই সে, "যাবে দেশে ফিরে, মা-ঠাকুরানিরে দেখিতে পাইবে পুন" অবধি শুনেই বাবার মুখ চেপে ধরত। দিনে দু'তিনবার এটি শুনতে হবে, এবং প্রত্যেকবার শেষ দৃশ্যে মুখ চেপে ধরা চাই।

আরও একটি কবিতা সম্পর্কে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। বাবা মঞ্জুকে একদিন বধূ কবিতাটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। শুনে সে গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর এক সময় দেখা যায় সে বিছানায় একা শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। অনেক জেরা ক'রে জানা গেল' বধূর দুঃখে সে মর্মাহত। "একটা আলোও দেয় না তাকে!—কেন দেয় না?" ব'লে আবার কাঁদতে লাগল। কবিতাটির শেষ দিকে আছে—

"দেবে না ভালবাসা দেবে না আলো।
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভাল।"

বধূর এ দুঃখ শিশু মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল। আমার নিজের মনের কিছু প্রতিবিম্ব দেখেছিলাম এই দুটি ঘটনার মধ্যে। কিন্তু এ তো অনেক পরের কথা। আমি যথাসময়ে নিজের সম্পর্কে অনেকখানি সতর্ক হবার চেষ্টা করছিলাম খুব মনোযোগের সঙ্গে।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে আদর্শবাদ ঢুকেছিল মনে। বিছানায় তোষক বাদ পড়েছিল, চুল খাটো ক'রে ছাঁটা, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। এ সবই প্রফুল্লর প্রভাব। প্রফুল্লর উপর বিবেকানন্দের প্রভাব। মাস দুই কৃচ্ছ্র সাধন করেছিলাম ঠিকই।

মনোজগতে ভাঙাগড়ার কাজ চলছে অবিরাম।

পাবনা থেকে রতনদিয়া আসবার পর এক মাসের জন্য রতনদিয়া মাইনর স্কুলে হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হলাম। স্থায়ী হেডমাষ্টার হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ছুটি নিয়েছিল, তারই স্থানে। পড়াতে আমার খুব ভাল লাগত এবং কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণ বুঝিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তৃপ্তি হত না।" এই আমার প্রথম চাকরি—বেতন পেলাম ত্রিশ টাকা।

তখনকার দিনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলেই আই-এ বা আই এস্‌সি, সেটি পাস করলে ডিগ্রীর জন্য পড়া, এবং তার পরেও সামর্থ্য থাকলে আইন পড়া অথবা এম-এ বা এম এস্‌সি। এ বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন ছিল না, একেবারে স্বতঃসিদ্ধ, কেন না তখন ছাত্রদের জন্য আর কোনো পথ ছিল না। অতএব ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল তখনকার দিনেব শেষ লক্ষ্য। সাহিত্যে যার কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই, তাকে বিশ্বসাহিত্যের রস পান করতে হচ্ছে অনিচ্ছুক রোগী যেমন ভাবে পাঁচন পান করে তেমনি ভাবে। জীবনে কোনো উদ্দেশ্য নেই, যেমন ক'রে হোক কিছু উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করা। আর এই জন্যই পড়া অনেকের কাছে বিভীষিকা ছিল। একজন ছাত্র ডাক্তারি পড়তে আরম্ভ করল, কিন্তু বছর তিনেক পরে পুলিসের চাকরি পেয়ে চলে গেল! পড়ার সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক ছিল না, শিক্ষার লক্ষ্য সাধারণের পক্ষে ছিল শুধু একখানি ডিপ্লোমা।

নিজের কথাও ঐ একই। কোনো অ্যাম্বিশন নেই, জীবনের লক্ষ্য কিছুই স্থির নেই, পাঠ শেষে সেটি ভাবা যাবে, তার আগে ভাবার কোনো প্রশ্নই নেই কারোই ছিল না। অতএব বি-এ পড়তে এলাম কলকাতায়।—সেটি ১৯১৭ সালের জুলাই মাসের প্রথম। এবং এইখান থেকে আমার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হল ব'লে আমার বিশ্বাস।

ভর্তি হতে এলাম মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে। কিছুদিনের মধ্যেই এর নাম বিদ্যাসাগর কলেজ হয়। এই কলেজটিকেই বেছে নিয়েছিলাম কেন তা এখন আর মনে পড়ে না, এসে কোথায় উঠেছিলাম তাও মনে পড়ে না। এ রকম ছোটখাটো দু একটি ঘটনা মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে। মনে করিয়ে দিলে হয় তো আবার সব জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক একটি ঘটনার কথা বলি, এটি মনোবিজ্ঞানীদের কাজে লাগতে পারে। পাবনা কলেজের দক্ষিণ দিকের অনেকখানি অংশ আমার স্মৃতি থেকে একেবারে মুছে গিয়েছিল। বড় রাস্তাটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, পাবনা ইনষ্টিটিউশনটি ঠিক কোন জায়গায়, পথ বেয়ে কল্পনায় কলেজ পর্যন্ত এসে আর এগোতে পারি না। অথচ দুটি বছর এইখানে ঘোরাফেরা করেছি, এর প্রত্যেকটি ইঞ্চি আমার পরিচিত ছিল। এই এলাকাটা মনে আনতে কিছুদিন ধ'রে কি চেষ্টাই না করেছি, এবং না পেরে ছটফট করেছি। নিজের স্মৃতির কাছে এমন পরাজয় এর কোনো অর্থ হয় না। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মনে হল অতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী ছিল পাবনার স্থায়ী বাসিন্দা, তাকে জিজ্ঞাসা করি না কেন। পাবনা পর্যায় লেখার আগে আমার অনুরোধে অতুলানন্দ পাবনার বড় রাস্তাটির একটি ম্যাপ আঁকতে আরম্ভ করতেই একটি বিদ্যুৎ ঝলকের মতো সবখানি বিস্মৃত এলাকা আমার মনের চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তার মধ্যে পাবনার প্রকাণ্ড খেলার মাঠটি ছিল। এই মাঠে ব'সে ফুটবল খেলার মরশুমে বড় বড় ম্যাচখেলা দেখেছি, পাবনা কলেজের জয়ে উল্লাসে ফেটে পড়েছি। এ মাঠের সঙ্গে অন্তরের যোগ ছিল। অথচ এমন ক'রে ভুলে গিয়েছিলাম সব। শুধু মনে পড়েনি তাই নয়, এ রকম যে একটি প্রিয় স্থান ছিল, যেখানের প্রত্যেকটি গাছ আমার পরিচিত ছিল, তার অস্পষ্ট কোনো আভাসও মনে পড়েনি। সেদিন একটি মুহূর্তে সব ফিরে পেলাম। হয় তো আপনা থেকেই কোনো এক শুভ মুহূর্তে এই বিস্মৃত জায়গাটির অতিপ্রিয় মাঠ, পথ, গাছপালা, ডাকঘর, এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট, পাবনা ইনষ্টিটিউশন, ইছামতী নদী, তার উপরকার ব্রিজ সমস্ত স্মৃতিতে জেগে উঠত, কিংবা হয় তো কোনো দিনই আর এদের ফিরে পেতাম না। স্মৃতির এই শূন্যতা এখন বহু জায়গায় ঘটেছে। সে সব জায়গার আলো নিবে গেছে। কখন কোনটা জ্বলবে ঠিক নেই, কোনোটা জ্বলবে কি না তাও ঠিক নেই। তবে সেদিন একটু ছোঁয়া লেগে যখন সব দপ ক'রে জ্বলে উঠল, তখন আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লাম। মধুর স্মৃতি বিজড়িত একটি হারিয়ে যাওয়া উচ্ছেদ প্রাপ্ত জমিতে আমার পুনর্বাসন ঘটল যেন।

এই যে বিস্মৃতি বিদীর্ণ ক'রে হঠাৎ এক একটি ভুলে যাওয়া মুহূর্তকে ফিরে পাওয়া, এরই কথা ওয়ার্ডসওয়ার্থ বার বার শুনিয়েছেন তাঁর নানা কবিতায়। 'They flash upon that inward eye"—এই কথাটির মধ্যে পাওয়া যায় এর মাধুর্য, ভুলে যাওয়া মুহূর্তগুলিকে ফিরে পাওয়ার মাধুর্য।

কলেজে ভর্তি হওয়ার দিনটি পরিষ্কার মনে আছে। ফর্ম পুরণ করতে গিয়ে দেখি রেজিষ্ট্রেশন নম্বরটি দরকার হয়, এবং আরও শুনলাম খেলাধূলায় ভাল হলে তার আবেদন অগ্রাহ্য করা হয় না।

ফর্মে খেলার জায়গায় লিখলাম বিশেষভাবে জানি ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি। ফুটবল শেষ খেলেছি সম্ভবত ১৯০৮ সালে, সে সময়ে ডান পায়ের হাড়ে (টিবিয়াতে) চোট লেগে ভেঙে যাওয়ার

বাক্সটি তার মাথায় তুলে দিলাম

মতো হয়েছিল। আঘাত লাগা জায়গার হাড় খানিকটা উঁচু হয়ে ছিল। ক্রিকেট খেলেছি ঐ সময়েই গ্রাম্য ব্যাট বল দিয়ে, হকি খেলা তখনও দেখিনি। লিখে তো দিলাম, ভাবলাম যদি কখনো ডাক পড়ে, বলব, জানি কিন্তু খেলব না।

রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি নিয়ে হল মুশকিল, ওটি সঙ্গে আনি নি। দরকার হয় খেয়াল ছিল না, অথচ দেরি হলে ভর্তি অনিশ্চিত। বুদ্ধি খুলে গেল। ভাবলাম, এখন আর তো কেউ চ্যালেঞ্জ করছে না, এখন যে-কোনো একটি নম্বর বসিয়ে দিই, পরে জানালেই হবে ভুল হয়েছিল। একটি কাল্পনিক নম্বর বসিয়ে দিলাম। সে নম্বর আজও বদলের দরকার হয় নি।

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর তলায় ছিল কলেজের মেস। এই মেস্‌-এর দোতলার বড় ঘর যেটি পথের ঠিক উপরে, সেইখানে আরও চার জন ছাত্রের সঙ্গে পেলাম একটি সীট। আমার সীটটি একেবারে পথের ধারে—ছাত্রদের পক্ষে খারাপ, কিন্তু আমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল মনে হল। তার কারণ এত দিন থেকেছি খোলা জায়গায়, এখন হঠাৎ তার সম্পূর্ণ বিপরীতকে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। তাই পথের উপরের বাসস্থানটি আমার কাছে আশীর্বাদস্বরূপ বোধ হল। নদীর ধারে ব'সে বাল্যকাল কেটেছে, আবার এসে বসলাম আর এক নদীর ধারে। এখানে দিনরাত বয়ে চলেছে জীবনের স্রোত। বিছানায় ব'সে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে সময় কেটে যেত স্রোতের মতোই বেগে। আমি জানতাম আমার গৃহবাসীরা তাঁদের পছন্দ মতো সীটগুলো আগেই নিয়ে নিয়েছিলেন, তাঁদের অসুবিধাজনক সীটটি আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরা জানতেন না এই সীটটি না পেলে আমার পক্ষে সে ঘরটি জেলখানা মনে হত।

ব'সে ব'সে চলমান জীবন-স্রোত দেখায় আমার ক্লান্তি ছিল না। দেখতে দেখতে হঠাৎ চেতনা হত, পথের স্রোতের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া মনকে ফিরিয়ে আনতে হত কষ্ট ক'রে। মনের এমন এক একটি অবস্থা আসা সম্ভব, যখন মন প্রফুল্ল থাকে, সব ভাল লাগে। খুব কাছের দৃষ্টিতে স্বার্থের সংঘাতে বা অপ্রয়োজনের উদাসীনতায় যে মানুষটি অত্যন্ত বিরক্তিকর, যার সংস্পর্শ এড়াতে পারলে আরাম, সেই লোকটিকেও তখন অত্যন্ত সুন্দর মনে হয়। 'বিশেষ' থেকে মনকে এ ভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেওয়া অসম্ভব নয়। সমস্ত মানুষের মিলনে যে অখণ্ড একটি মানবতার সত্তা তাকে দেখতে পেলে তখন প্রত্যেকটি বিশেষ মানুষকে তার একটি অপরিহার্য উপাদান ব'লে চেনা যায়।

আমার নিজের সম্পর্কেও এই কথা। সেই সে দিনের আমিকে আজ আমি এই ভাবেই দেখছি। আমি অখ্যাত একটি মানুষ, কিন্তু বিশ্বপরিকল্পনায় আমার স্থান তুচ্ছ নয়। সবার সম্পর্কেই এ কথা সত্য। অতএব আমি যে আমিই, এ জন্য আমি লজ্জিত নই। আমার গর্ব শুধু এই যে, আমার জীবন যে স্থান ও কালের সঙ্গে বাঁধা পড়েছে, সে স্থান ও কালের পনেরো আনা অংশ হয় তো বা আমার মনেরই সৃষ্টি। প্রত্যেকটি মানুষের মনেই এই জগৎ রচনার ক্রিয়া চলেছে।

৩০ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপরে ব'সে আমি প্রত্যেকটি মানুষকে সুন্দর দেখেছি। কখনো এমন কল্পনা ক'রেছি যে আমি অন্য গ্রহ থেকে এসে সম্পূর্ণ নতুন চোখে যদি এই সব বাড়ি ঘর মানুষকে দেখতাম তা হলে এদের কেমন লাগত। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এ কল্পনার পথে অনেক দূর এগিয়ে শেষে ভয়ে ফিরে এসেছি। চেতনা ফিরে এলে নিজেকে ফিরে পেতে দেরি হত। আমি কোথায় আছি তা বুঝতে দশ পনেরো সেকেণ্ড কেটে যেত।

এ রকম চেষ্টা আর করিনি।

তখন মোটর গাড়ি খুব বেশি চলত না, মাঝে মাঝে দু'-একখানা। পথের ভিড়ও আজকের মতো নয়। কিন্তু তখনকার দিনের সেই ভিড়কেই যথেষ্ট মনে করা হত। ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্যের কাছে একটি মজার গল্প শুনেছিলাম। তাঁর সঙ্গে একবার পাড়াগাঁয়ের একটি লোক কলকাতা এসেছিল। সে শিয়ালদহ ষ্টেশনের বাইরে এসে পথের ভিড় দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল 'আজ কলকাতার হাট না কি?' বেচারা হাট ভিন্ন এত লোক এক সঙ্গে কখনো দেখে নি।

লক্ষ্য করলে কত বৈচিত্র্য। নটার পর থেকে তখন যে কেরানি-কুল ডালহৌসি স্কয়ারের দিকে ছুটত, তাদের পোষাক অন্য রকম ছিল। পায়ে চকচকে জুতো, ক'ষে ফিতে বাঁধা। গায়ে শার্টের উপরে ওপনব্রেষ্ট কোট, বোতাম আঁটা নয়। ধুতিতে মালকোঁচা মারা। এই ছিল তাদের সাধারণ সাজ। বেশ একটা স্বকীয়তা। পোষাকের এই চরিত্রের এখন বদল হয়েছে। তখনকার পথের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা ছিল প্রায় নারীবর্জিত, আধুনিকাদের দেখা মিলত না-আদৌ। একেবারে দুর্লভদর্শনা। ট্রামে নয়, দোকানে নয়, কলেজে নয়, ইউনিভার্সিটিতে নয়। দৈনিক একটি দেখলেই যথেষ্ট মনে হত। কলেজের ছাত্রীরা তো শকটগ্রস্তা ছিল, তখনকার মেয়ে স্কুলের নাম 'পর্দা' স্কুল, নইলে ছাত্রী হত না। তখন যুবকদের প্রেম করতে হত বিয়ে করার পর, আপন স্ত্রীর সঙ্গে। তখনকার বাংলা কথাসাহিত্য তাই দুর্বল ছিল, স্বাধীন প্রেমের কথা উঠলে বয়স্ক পাঠকমহলে উত্তেজনার সৃষ্টি হত।

আমাদের মেস্‌-এ কয়েকজন ওড়িয়া ছাত্র ছিলেন। তাঁদের নাম মনে নেই, তাঁদের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ জমেছিল। আমি তাঁদের কাছে ওড়িয়া পড়তে শিখলাম এবং তাঁদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তাঁদের তখনকার মাসিক পত্র 'উৎকল সাহিত্য' নিয়মিত পড়তাম। ওড়িয়া সমসাময়িক সাহিত্যে তখন অগ্রগতি বিশেষ কিছু হয় নি, পত্রিকাখানাও বোধ হয় পঁচিশ ত্রিশ পৃষ্ঠার ছিল। ছেলেদের উপযুক্ত গল্প, সেও আবার অনুবাদ, তাতে ছাপা হতে দেখেছি। তখন যুদ্ধের সময়, অতএব রাজভক্তিমূলক কবিতাও থাকত। নমুনা হিসেবে একটি কবিতা আমি মুখস্থ করেছিলাম, তার কয়েকছত্র এখনও মনে আছে।

> "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা দেখ রক্ত বর্ণে লিখা
> সে ধ্বজার কোলে আজি লভ হে আশ্রয়,
> দেখ বিশ্ব ব্রিটনর কি শক্তি অক্ষয়।"

বাংলা ভাষা ও অক্ষরের সঙ্গে ওড়িয়ার অনেক মিল। আজকের দিনে ওড়িয়া সাহিত্য অনেক এগিয়েছে, উৎকৃষ্ট ছোট গল্প ওড়িয়া ভাষায় লেখা হচ্ছে।

বেশ ভাল লাগল ৩০ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মেস্‌-জীবনের আরম্ভেই এত বড় একটা রাজপথের দখল পাওয়া কম কথা নয়। এ যেন আমারই জীবনের রাজপথ। যতদূর মনে পড়ে এই ১৯১৭ সালেই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনি। বক্তৃতার

বিষয় ছিল 'আমার ধর্ম।' তিনি বলতে চেয়েছিলেন তাঁর যে-জীবন চলছে, যার সম্ভাবনা এখনও শেষ হয়নি, সে জীবনের মর্ম কথা আগেই আবিষ্কার ক'রে, লেবেল মেরে, জাদুঘরে পাঠানো ঠিক নয়। বক্তৃতাটি সমসাময়িক সমালোচনার জবাবে। রবীন্দ্রনাথ আরামের কবি, বিলাসের কবি ইত্যাদি কথা তখন খুব শোনা যেত। এখনও বোধ হয় শোনা যায়।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর কবিতা ও নাটক থেকে পর পর অনেক অংশ আবৃত্তি ক'রে শুনিয়েছিলেন। কবিরূপে কোন্ তত্ত্বটি তাঁর ভিতরে ভিতরে রূপায়িত হচ্ছে তারই চিহ্ন তিনি তাঁর নানা রচনা থেকে উদ্ধৃত ক'রে অনেকটা নিজেরই মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিলেন। সমাজ-মন্দিরে মারাত্মক ভিড় হয়নি। এটি বড়ই আশ্চর্য লাগে।

কবি-কণ্ঠে সে কি তেজোদৃপ্ত আবৃত্তি। শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিলাম। আজও সে ধ্বনি কানে বিঁধে আছে। কি এক অদ্ভুত শক্তির প্রকাশ দেখেছিলাম কবির সমস্ত সত্তায়।

"অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নব-বীর বেশে,
দুরূহ কর্তব্য ভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষত চিহ্ন-অলঙ্কার।"···

কিংবা

"হবে হবে, হবে জয় হে দেবী, করিনে ভয়
হব আমি জয়ী
তোমার আহ্বান বাণী সফল করিব রাণী,
হে মহিমাময়ী।

তারপর বর্ষশেষ থেকে, তারপর মরণমিলন থেকে। এই কবিতাটি আবৃত্তির সময় সমস্ত ঘর যেন কেঁপে উঠল—

"কহ মিলনের একি রীতি এই
ও গো মরণ, হে মোর মরণ।
তার সমারোহ ভার কিছু নেই
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না?
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে পিছে কেহ রবে না?
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরণ?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ও গো মরণ হে মোর মরণ।"

আবৃত্তি শুনতে শুনতে সহসা সম্মুখস্থ সমস্ত দৃশ্য কোথায় মিলিয়ে গেল। ভুল হয়ে গেল হলঘরে ব'সে বক্তৃতা শুনছি। একটা অশরীরী কণ্ঠস্বর যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মতো সমস্ত দেহের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। হৃৎপিণ্ড উত্তেজনায় লাফাচ্ছে; অনুভব করতে পারছি, সেই মুহূর্তে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি—যদি আহ্বান আসে। হল-ঘরে শ্মশানের শূন্যতা। কারো মুখ থেকে একটি শব্দ নেই, শুধু তীব্র কবিকণ্ঠ ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

একই সঙ্গে অনেক বিস্ময়। রবীন্দ্রনাথকে দেখা আমার সেই প্রথম। তাঁর চুলেদাড়িতে তখন কালোর প্রাধান্য। ঠোঁটের চারধারে কিছু বেশি পাকা। দেহ সম্পূর্ণ ঋজু, তার প্রায় চার বছর আগে কবি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। তাঁকে দেখার বিস্ময় কাটতেই তো অনেক সময় লাগার কথা; সে সময় কোথায়? একই সঙ্গে দেখা এবং বক্তৃতা শোনা চলছে। এ যেন মনের উপর অত্যাচার। তাঁর প্রত্যেকটি কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি। এক এক সময় চমকে উঠি, খেয়াল হয়, কথা তো কানে যাচ্ছে না! রবীন্দ্রনাথ-রূপ স্বপ্ন জীবনে এই প্রথম মূর্তি ধ'রে সম্মুখে এসেছে, সেই বিস্ময় কাটিয়ে উঠব কি ক'রে? স্তম্ভিতবৎ শুধু সেই বিরাট ব্যক্তিটির দিকে চেয়ে চেয়ে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছি, এই সেই কবি, এই সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যাঁর ভাষা ও ছন্দ আমার রক্তের সঙ্গে মিশেছে। যাঁর ছবি এঁকেছি পেন্সিলে, তুলিতে। সকল কথা এক সঙ্গে জেগে ওঠে, শুধু সবিস্ময়ে চেয়ে থাকি, কথা কদাচিৎ মর্মে প্রবেশ করে। এই দেখা এবং এই প্রথম তাঁর কণ্ঠস্বর শোনার স্মৃতি আমার জীবনের একটি বড় সঞ্চয় হয়ে আছে। এরই কাছাকাছি সময়ে, কখন ঠিক মনে নেই আবার রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতা শুনি রামমোহন লাইব্রেরিতে। বক্তৃতার বিষয় ছিল সঙ্গীত, নাম ছিল "সঙ্গীতের 'সঙ্গতি।" পরে ছাপার সময় এর নাম হয় সঙ্গীতের মুক্তি। কথার সঙ্গে গান গেয়ে গেয়ে বক্তব্যকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এ বক্তৃতাতেও ভিড় খুব মারাত্মক রকমের হয় নি। এই দুটি জায়গাতেই লিখিত-বক্তৃতা পাঠ করেছিলেন।

বক্তৃতা তখন একটিও বাদ দিতাম না। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা এর আগেই শুনেছিলাম কলেজ স্কয়ারে। এ সময়েও অনেক বার শুনেছি। আশুতোষ চৌধুরী ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা অনেকবার শুনেছি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনেছি আরও পরে। একবার মাত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনেছি ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে।

এই মেস্-এ থাকতে সাহেবগঞ্জ-বাসী প্রবোধ প্রায়ই আমার কাছে আসত এবং তার সঙ্গে আসত বলাইচাঁদের অনুজ ভোলানাথ। সে স্কুলে পড়ত। এই ভোলানাথ কিছুদিন পরেই গল্পলেখক হয়েছিল এবং প্রবাসীর একটি গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিল। আরও কিছু দিন অভ্যাসটি বজায় রেখে তার পর ছেড়ে দিয়েছে। ভাল লিখত।

আমাদের মেস্-এ একটি ছাত্র কলেজের মেয়েদের গাড়ি দেখে এসে এক দিন খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, সে মফঃস্বল থেকে এসেছে, এই প্রথম কলেজের গাড়ি দেখল। এই ঘটনা থেকে তখনকার দিনের পথের অবস্থা অনুমান করা যাবে। প্রবোধের সঙ্গে বেরিয়ে একদিন একটি মজার জিনিস

'আমার ধর্ম' বক্তৃতারত রবীন্দ্রনাথ'

দেখেছিলাম। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে আমাদের মেস্-এর কাছে ছিল ইকনমিক জুয়েলারি, দু'জনে সেখানে গিয়েছিলাম বাইরের কারো অর্ডারি জিনিস কিনতে। খুব কমিক শোনাবে, কিন্তু তবু বলা দরকার যে, সেই ১৯১৭ সালে সেই দোকানে একটি মহিলাকে দেখেছিলাম যিনি স্বাধীন ভাবে একা সেইখানে এসেছিলেন। দ্বিবিধ কারণে এটি মনে আছে। প্রথমতঃ দুর্লভ ব'লে দ্বিতীয়তঃ (এবং প্রধানতঃ) তাঁর অঙ্গে দুটি ঘড়ি ছিল ব'লে। এ রকম কখনো দেখিনি। একটি ঘড়ি হাতে, অন্যটি বুকে, আঁচলের পিনের সঙ্গে ঝোলানো। বুকেরটি আমরা দেখছি, হাতেরটি তিনি নিজে। এর উদ্দেশ্য ভাবতে পারি নি। শুধু অলঙ্করণের জন্য কেউ কি দুটি ঘড়ি ব্যবহার করে?

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন সারদারঞ্জন রায় (এস রায় নামে খ্যাত), সংস্কৃতের নোট লিখতেন এবং ক্রিকেট খেলতেন। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (জে, আর ব্যানার্জি)। অধ্যাপকবৃন্দ সবাই আদ্যাক্ষরে পরিচিত ছিলেন, সেজন্য কোনো কোনো নাম এখন ভুল হয়ে গেছে। এ, ডি—অচ্যুত দত্ত, এস, বি—শিশিরকুমার ভাদুড়ী, এম, এস, (মনি সেন), কে, বি—কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, কে, এন—কুঞ্জলাল নাগ; ইউ, এন—উপেন্দ্র নাগ; আর, কে, ভি (রামকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন?), পি, আর—পূর্ণ রায়; কে, জি—ক্ষীরোদ গুপ্ত; আই, বি, এস—ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত।

আমার কম্বিনেশন ছিল সংস্কৃত ও দর্শন। কয়েকজন অধ্যাপকের শিক্ষণরীতি স্পষ্ট মনে আছে। জ্ঞানরঞ্জন ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিদে মানুষ। তিনি অবিরাম বক্তৃতা দিতে পারতেন। ইংরেজী ক্লাসে বার্ক পড়াতেন ও দর্শনের ক্লাসে সাইকোলজি পড়াতেন। পড়াতে পড়াতে কখনো কোনো উপলক্ষে নিজের কথা বলতেন। কি ভাবে তিনি গ্রীক-ল্যাটীন শিখেছিলেন, বলতেন। প্যারাডাইস লষ্ট প্রায় সব মুখস্থ করেছিলেন। তিনি বলতেন আমি স্বভাবতঃ কবি, কিন্তু দার্শনিক হয়েছে ঘটনাক্রমে। জার্মান ও ফরাসী ভাষা সম্পর্কে বলতেন 'Only a smattering of German and French.' সাইকোলজি পড়াতে পড়াতে একটি গল্প বললেন একদিন। তাঁর বাড়িতে রাত্রে চোর ঢুকেছিল। শব্দে জেগে উঠে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরে পিস্তলটা নিয়ে আয়, চোর এসেছে।—আসলে পিস্তল তাঁর কোনোদিনই ছিল না, কিন্তু চোরকে ভয় দেখানো দরকার, নইলে অনিষ্ট করবে, তাই এই উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়েছিলেন এবং তাতে সফল হয়েছিলেন। চোর পিস্তলের কথা শোনামাত্র পালিয়ে গিয়েছিল। পড়াবার সময় তিনি বার বার বলতেন 'to take recourse to' কখনো লিখো না, ওটি ইংরেজী নয়—ওটা বাঙালী-ইংরেজী।—ইংরেজরা বলে 'to have recourse to'—। আরও একটা বাঙালী-ইংরেজী তোমরা কখনো লিখবে না—অর্থাৎ 'class friend' লিখবে না, বলবে না। ইংরেজরা ঐ কথাটি জানে না, তাদের ভাষায় সহপাঠীকে class-mate বা class-fellow বলে। মগজে হাতুড়ি পিটিয়ে এই কথাগুলি তিনি ছাত্রদের মনে গেঁথে দিতেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ি যেমন ছিলেন চেহারায়, তেমনি ছিলেন পোষাকে। প্রায় প্রতিদিন নতুন সাজে আসতেন। সর্বদা বেশ একটা হাসি-খুশি ভাব। উচ্চারণ এবং বলবার ভঙ্গি ছিল চমৎকার। ভাষাতত্ত্ব পড়াতেন। ক্লাসে এক দিন বক্তৃতা দেবার সময় দেখেন একটি ছেলে ঘুমোচ্ছে। তিনি মাথা উঁচু ক'রে বার বার তার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন আর মৃদু-মৃদু হাসছেন। তখন তার পাশের ছাত্র তাকে জাগিয়ে দিলে শিশিরকুমার হেসে জিজ্ঞাসা করলেন "were you sleeping?" ছেলেটি উত্তর দিল "No sir." শিশিরকুমার আরও হেসে বললেন "Oh, I beg your pardon." কথাটি এমন ভঙ্গিতে বললেন যাতে ক্লাসের সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠল। এই ভাষাতত্ত্বের ক্লাসেই এক দিন এক ছাত্র একটি অপ্রচলিত ইংরেজী শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে শিশিরকুমার তৎক্ষণাৎ "Do I look like a dictionary?" বলেই যেমন পড়াচ্ছিলেন তেমনি পড়িয়ে যেতে লাগলেন গম্ভীরভাবে।

ইংরেজী টিউটোরিয়াল ক্লাসও নিতেন তিনি মাঝে মাঝে, কিন্তু তাঁর ইংরেজী রচনা-লেখা শেখানোর রীতি ছিল তাঁরই নিজস্ব। এক দিন 'শাজাহান' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন আগা-গোড়া। তার পর বললেন যা শুনলে তা সংক্ষেপে ইংরেজীতে লেখ। আরও এক দিন 'মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে রেখেছে সন্ধ্যা-আঁধার পর্ণপুটে' ইত্যাদি সবটাই আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির নাম কলিকা। বললেন 'যা শুনলে তার ভাবার্থ ইংরেজীতে লেখ।' শিশিরকুমারের আবৃত্তি আমার এই প্রথম শোনা। [ক্রমশঃ।

মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিঃ ডাকে ....২৪৲

ষাণ্মাসিক " " ....১২৲

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিঃ ডাকে (ভারতীয় মুদ্রায়) ....২৲

চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাগণ মণিঅর্ডার কুপনে বা পত্রে অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

ভারতবর্ষে

(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক ১৫৲

" ষাণ্মাসিক সডাক ৭৷৷০

প্রতি সংখ্যা ১।০

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে ১৸০

(পাকিস্তানে)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ ....২১৲

ষাণ্মাসিক " " " ১০৷৷০

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " " ১৸০

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

বিশ্বের প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে যিনি আসন পেতে বসে থাকেন তাঁর নাম "মদ।"

তিনি শত্রু। মানুষের শরীরের মধ্যে তিনি একবার আবিষ্ট হলে, মানুষ আর স্তব্ধ হয়ে কিছু শোনে না, কিছু দেখে না। ১

বিজিতাত্মা মানবদের কাছে, সত্যযুগে, যিনি "দম" নামে পরিচিত ছিলেন, তিনিই কলিযুগে···সব উল্টে যায় বলে,···"মদ" নামে স্থান লাভ করেছেন। ২

মৌন হয়ে বসে থাকা, মুখটিকে বিশেষ ভাবে কোঁচকানো, উর্দ্ধে নয়ন তুলে বসা, চক্ষুর্দ্বয়ের অক্ষ-লক্ষ্যতা, অঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার, মাথায় মুকুট পরা,—এইগুলি হচ্ছে 'মদে'র প্রধান রূপ। ৩

শৌর্য-মদ, রূপ-মদ, শৃঙ্গার-মদ ও কুলোন্নতি-মদ,—এইগুলি দেহীদের মদ-বৃক্ষ। এদের মূল হচ্ছে বিভব-মদ, অর্থাৎ দৌলতের দেমাক। ৪

অতি মাত্রায় ভোগের পর এই বিভব-মদকে মনে হয়—শূলে চড়ার মত, বাত-রোগে স্তম্ভিত হওয়ার মত, ভূতে পাওয়ার মত, প্রথম কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসার মত। ৫

যিনি শৌর্য-মদে মাতাল, তিনি ঘড়ি-ঘড়ি নিজের হাতের গুল্ দেখেন; যিনি রূপের গর্ব্বে ফাটছেন তিনি চলতে-ফিরতে নিজের চেহারা দেখেন দর্পণে; যিনি কাম-মদে বিহ্বল, তিনি রাহ রতি স্ত্রীলোকের দিকে নয়ন-বাণ হানেন; কিন্তু যিনি বিভব-মদে মত্ত, তিনি জন্মান্ধ। ৬

জগতে এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁদের আখ্যা দেওয়া হয় "আত্মারাম"। তিনি সুখের রসে মূর্চ্ছা যান, নয়ন মুদ্রিত ক'রে থাকেন; যেন ধ্যানে সমাহিত। তিনিই সর্ব্বশেষ উপমান "ধন-মদে"র। ৭

"মূঢ়-মদে"র কিন্তু বিকারের অন্ত নেই। গুণের লেশমাত্রও তাতে নেই। তিনি কেবল মনুষ্যকে উন্মাদনা জুগিয়ে বেড়ান··· ধরবয়ে। তিনি বিচিত্র। নিঃস্ব হয়েও বিজয়ীর মত দাপিয়ে বেড়ান সংসারে। ৮

আর এক রকমের মদ রয়েছেন, তাঁর নাম "তপস্বি-মদ"। মাটি, খুঁটি, কিছুই তিনি দেখতে পান না চ'নয়নে; কেবল জলজ্যান্ত আকাশে আকাশে দর্শন পান বিদ্যাধরদের।

"ভক্তি-মদ" এক একটি অদ্ভুত কর্ম্ম করে বসেন। দেহের অস্তিত্ব তিনি ভুলে যান। কিন্তু বৎসগণ, জেনে রেখো, প্রকৃতিটি তাঁর নিত্যই থাকে চপল। ৯

"শাস্ত্র-মদ" সর্ব্বদাই যেন ক্রুদ্ধ হয়ে চোখ-রাঙিয়ে রয়েছেন। পরের মুখের তুচ্ছ কথাও তাঁর অসহ্য। তিনি প্রলাপী। মনুষ্য-নেতাদের মধ্যে তিনি মূর্ত্তিধর একটি ধাতু-ক্ষোভ। বৈষম্যের রাজা। ১০

পুরুষদের মধ্যে যে "অধিকার-মদ"-টি বাক্ষমান থাকেন, নিত্য-করাল তাঁর ভ্রূকুটি। নিদারুণ নির্ম্মম তাঁর তর্জ্জন, গর্জ্জন, বচন। কখন যে আঘাত করে বসবেন তার স্থিরতা নেই। তিনি সর্ব্বখাদক, ক্রুর রাক্ষস-বিশেষ। ১১

পুরুষদের মধ্যে যে "কুল-মদ"টি বিরাজ করেন, তিনি কেবল পূর্ব্বপুরুষের প্রতাপের কাহিনীই শতমুখে কপচান, ভুলে যান নিজের ইতিকর্ত্তব্যতা. নিজেকে ভাবেন সুদূরদর্শী ও মহাজ্ঞানী। ১২

"শৌচ-মদ" নামে আর একটি মদ রয়েছেন। নিত্য সঙ্কোচে তিনি পূর্ণ। জনতার স্পর্শ থেকে সর্ব্বদাই নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলেন। সকল সময়েই ভাবেন, তিনি ছাড়া জগতের সব কিছুই অশুচি। আকাশেও তিনি গোবরের ছড়া দিয়ে চলেন। ১৩।

বৎসগণ, এই যে 'মদ'গুলির কথা বলা গেল, এঁদের প্রত্যেকটিই একটি কাল ক'রে নিজের সীমা আছে। নিজের নিজের মূল ক্ষয় হলেই বিনষ্ট হ'য়ে যান। কিন্তু এঁদের চেয়ে প্রসিদ্ধ একটি মদ রয়েছেন। তাঁর নাশ নেই, তিনি কুটিল। ঐ দেখ তিনি বিরাট বিরাট হাই তুলছেন। তিনি অসীম ভোগী। তাঁর নাম "পান-মদ"। পানাসক্তির আবেশে তিনি অন্ধ হয়ে ওঠেন। বিশ্বের তিনি ঘৃণার পাত্র। মূর্ত্তিমান মহিমান্বিত এক মোহ। ক্ষণিক হলেও তিনি দুর্দ্দান্ত আগ্রহে হরণ করে নেন মানুষের হাজার বছরের অর্জিত শীল। মদ্যমদে যিনি মাতাল, তাঁর রাঙা চোখে সবাই সমান। বিদ্বান, ব্রাহ্মণ. গরু, হাতী, কুকুর, চাঁড়াল···সবাই সমান। আত্ম-পর ভেদ তিনি জানেন না।

সৎ-অসৎ-ভেদ তাঁর থাকে না,···লজ্জা যায়। ইট পাথর সোনা ···তাঁর কাছে সবই সমান। যোগীর অবস্থা প্রাপ্ত হলেও, মাতাল নিক্ষেপ পড়েন নরকে।

ইনি কখনও ভেউ ভেউ করে কাঁদেন, কখনও হোঃ হোঃ ক'রে হাসেন, গান গা'ন, বিলাপ করেন, কখনও সম্মোহিত হয়ে পড়েন

মুহূর্তে মুহূর্তে ঘনঘটা ক'রে আকারে প্রকারে অদ্ভুত প্রদর্শনী করেন বিকারের। সংসারের আদর্শ ফণা-ধর এই মাতাল। নিজের প্রেয়সীটি পরের পতিকে চুম্বন করছেন, চোখে দেখেও মাতাল সন্তপ্ত হয়ে ওঠেন না। রক্তের মত গাঢ় লাল মধু পান ক'রেও, বুঝি না, মাতালের কেমন ক'রে আসে বৈরাগ্য!

দূরে বিসর্জন দেন বসন, বরণ করেন দুঃসহ বাসন। অধিক কি ···মাতাল নিজের অঞ্জলি-পাত্রে নিজের মূত্র ধ'রে তাতে চাঁদের ছায়া পড়লে, সেই ছায়াটিকেও পান করে বসেন। ১৪-২০

পুরাকালে, অশ্বিনীকুমার দু'জনের কৃপায় মহর্ষি চ্যবন একদা ফিরে পান তাঁর যৌবন। কৃতজ্ঞ হয়ে মহর্ষি স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, এবং সোমার্হ অশ্বিনীকুমার দুজনকে আবাহন করেন পানোৎসবে।

ক্রুদ্ধ হন ইন্দ্রদেব;—এগিয়ে আসেন। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেন—

"মুনি, আপনি কি জানেন না, যজ্ঞে অশ্বিযুগল সোমার্হ হলেও, বৈদ্য-হিসাবে তাঁরা অপাংক্তেয়?"

সুররাজ বহু নিষেধ করলেন, কিন্তু স্বতেজ-গরিমায় অটল হয়ে রইলেন চ্যবন। তাঁকে যে প্রীত করতেই হবে অশ্বিযুগলকে! আপন কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হলেন না চ্যবন।

ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠলেন জম্ভারি। তাঁর বিশাল ভুজস্তম্ভে উদ্যত হয়ে উঠল বজ্র। কী ঘটে কী ঘটে! সহসা মুনীন্দ্র চ্যবন স্তম্ভিত করে দিলেন ইন্দ্রের ভুজস্তম্ভ। এবং ইন্দ্রকে বধ করবার উদ্দেশ্যে নিমেষে সৃষ্টি করে ফেললেন···দোদুল্যমান কালসর্পের মত এক চতুর্দ্রংষ্ট্র, সহস্র যোজন বিপুল, 'কৃত্যা'-দেবীর মত ভয়াল-দর্শন, ঘোর মহাসুর। অকস্মাৎ দানবের আবির্ভাবে ভীত হয়ে পড়লেন বজ্রী, শরণ নিলেন চ্যবনের। বললেন—"দেববৈদ্য দু'জনকে সোম দেওয়া হোক্"।

ইন্দ্রের তখন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে ধৈর্য্য। করুণা-সিন্ধু মুনিও তৎক্ষণাৎ আশ্বাস দান করলেন ভীত-প্রণত মহেন্দ্রকে। এবং তৎপর ঐ ঘোর 'মদাসুর'কে উৎসর্গ করে দিলেন···

দ্যূতে, রমণীতে, মদিরায় ও মৃগয়ায়। ২১—২৭

বৎসগণ, ক্রুদ্ধ মুনি যে প্রমাথী অসুরটিকে নিমেষে নির্ম্মাণ করেছিলেন নিজের হৃদয়ে, তিনি অধুনা সুক্ষ্মাকারে পাশবদ্ধ অবস্থায়, বসবাস করেন শরীরীদের মধ্যে। তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়:—

শ্রীমন্তদের মৌনতায়,
হঠাৎবড়লোকদের নিস্পন্দ দৃষ্টিতে,
ধনিকদের ভ্রূভঙ্গ আঁকা মুখের বিকারে,
বিটদের ভুরু দু'টিতে।

তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়—

দূত ও বিদ্বানদের জিহ্বায়;
রূপবানদের দশনে, বসনে, কেশে;
বৈদ্যদের ওষ্ঠপুটে;
গুণীদের, নিয়োগীদের, গণকদের গ্রীবায়;
সুবীরদের স্কন্ধতটে;
বণিকদের হৃদয়ে;
শিল্পীদের হাতে;
ছাত্রদের কণ্ঠে, লিখনপত্রে ও অঙ্গুলিভঙ্গে,
তরুণীদের স্তনতটে;
শ্রদ্ধেয়দের উদরে;
পত্রবাহকদের জঙ্ঘায়।

তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়—

কুঞ্জরের গণ্ডে,
ময়ূরের পেখমে,
মরালের গতিতে। ২৮—৩২

এরই নাম "নাম-মদ"। ইনি একটি মহাগ্রহ। অসংখ্য বিকারের মাধ্যমে সুদৃঢ় হয়ে ওঠে এঁর মোহ-বন্ধন এবং ইনি নিজে 'কেঠো' না হয়েও, নিখিল প্রাণীর অঙ্গে কাঠ হয়ে বসে থাকেন সর্ব্বদা। ৩৩

ইতি মদ-বর্ণনং নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

সপ্তম সর্গ

মানুষের অখিল কার্যকলাপের প্রাণ হচ্ছেন "অর্থ।" এই নরলোকে সেই-হেন অর্থকেও, আশ্চর্য, হরণ করেন অতি ধূর্ত্ত গানোপজীবীরা। তাঁদের অস্ত্র···কণ্ঠ। কোমল, মনোহর, পরিবর্ত্তনশীল, চাঁচা-ছোলা কণ্ঠ। ১

পদ্মের ভাঁড়ার নিঃশেষে লুটে-পুটে খেয়েও আশ মেটে না এই গায়ক-ভৃঙ্গদের। তাঁরা ছোটেন কুমুদ ফুলের আস্বাদ নিতে। তাতেও তাঁরা স্থূল হয়ে ওঠেন না, ক্ষীণই থেকে যান। তখন আবার প্রণয় করতে দৌড়ন মাতঙ্গের সঙ্গে। ২

এই গায়কেরা সাক্ষাৎ যোনি-পিশাচ পৃথিবীর। ঘট, পট শকট ইত্যাদি কাঁধে চাপিয়ে ঘোরেন। সঙ্গে ফেরে মূর্খ ছেলের দল। বাব্‌রী চুল উড়তে থাকে বাতাসে। রাজারাজড়ার মাথায় হাত বুলিয়ে খান। ৩

চোর যায় চুরি করতে। কেউ যদি তখন হাহাকার দিয়ে ওঠে, বেচারী চোরকেও তখন ত্রস্তপদে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালাতে হয়। কিন্তু এই গায়ক-চোর প্রকাশ্যে হাহাকার ক'রেই লুঠ করে নেন সকলের সর্ব্বস্ব। ৪

পা পা ধ ধ নি নি গ ম মা, ধা ধা মা মা স মা স গা ধা মা।

এই রকমের স্বরপদশ্রেণী সৃষ্টি ক'রে পৃথিবী মজিয়ে ঘুরে বেড়ান ধূর্ত্ত গায়নেরা। ৫

কুটিল ঘূর্ণীর মত কখনো ঘুরপাক খেতে খেতে গান গেয়ে ওঠেন। কখনও বা গাইতে গাইতে উঠে গিয়ে বেশ বদলে আসেন। সে কত রকমের সাজ! আর গাইতে গাইতে মুখের সে কী বিকৃতি! কখনও আবার বহুক্ষণ ধ'রে মৌনী হয়েই গান গা'ন, মর্দ্দঙ্গ বাজতে থাকে হাতে। ৬

গাইতে গাইতে কখনো বা আমন্ত্রণ করে ওঠেন, কখনো বা জয় দিয়ে ওঠেন। এক এক্‌ কলি গান করেন, আর হুঙ্কার ছাড়েন। গলার সে কী ঘর-ঘরে কারুকাজ···থেকে থেকে নিজেই বাহবা দিয়ে ওঠেন নিজেকে। ৭

ছাতুর কণা জলে ফেলে দিলে মাছে খায়, তাতেও কিছু ধর্ম-লাভ হয়; কিন্তু গায়নদের পায়ে কোটি কোটি ঢাললেও, একটি দানাও লাভ হয় না ফল। ৮

নালার মত বিকট হাঁ করে বসে থাকেন এই গায়নেরা

বিধাতার বিধানে, সেই প্রণাল-পথে বন্যার স্রোতে বেরিয়ে যায় মূর্খদের অন্ধকূপ কোষাগারের রুদ্ধ ধনরাশি। ৯

গায়ন ধূর্ত্তেরা সব সময়েই যে দাঁত হাসিয়ে গান করেন তা নয়, এই ধূর্ত্তেরা গতানুগতিক ভাবে অর্থ গ্রহণ করেও হাসেন। ১০

এঁরা প্রাতঃকালে ধীর থাকেন; গলায় দোলান হার; হাতে বাঁধেন কেয়ুর। মধ্যাহ্ন পার হতে না হতেই এঁরা··নগ্ন, ভগ্ন, নিরাধার, পাশায় সর্ব্বস্বান্ত। ১১

এঁদের গীতগুলি তোষামোদের জাল দিয়ে বোনা; এঁদের গীতের বচনগুলি শরের মত তীক্ষ্ণ; এঁদের বচনগুলির রচনাশৈলী অতি কূট, অতি কপট।

সঙ্গীত-নিষাদেরা গানের ফাঁদ পেতেই মূর্খ হরিণের মত ধনিক বেচারীদের হরণ করেন সর্ব্বস্ব। ১২

স্বরের ঠিক নেই, পদের ঠিক নেই, রেওয়াজ দেখান গায়নেরা। মুহূর্ত্তে হাতান লক্ষ লক্ষ মুদ্রা। হাতিয়েও বলেন···"দাসীর পো কী দিলেন একবার দেখো"; দুঃখিত হয়ে বিদায় নেন। ১৩

যে লক্ষ্মীকে সাধুসন্তেরা, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠেরা, প্রবীণারা বর্জন করে চলেন, যিনি নিখিল শোকের নির্মিতি, সেই লক্ষ্মীর এঁরা অভিশাপ! তাঁকেই ভোগ করেন গায়নেরা। ১৪

পুরাকালে বহু বিলম্ব ক'রে নারদ একদা ফিরে এসেছেন দেবলোকে। ইন্দ্রদেব তাঁকে প্রশ্ন করলেন—

"ভূপালদের খবর কি, মহীতলে?"

নারদ বললেন—"সুরনাথ, মর্ত্ত্যলোকে ভূপালদের জয়জয়কার। অকুরন্ত তাঁদের দান। ধর্মযজ্ঞের ইয়ত্তা নেই। ঘুরতে ঘুরতে নরলোকের শ্রী দেখে অবাক হতে হল। ইন্দ্রের উপযুক্ত শ্রী। ভূপালদের এত বৈভব যে বরুণকে কুবেরকে এমন কি আপনাকেও তাঁরা স্পর্দ্ধা করেন। একবার নয়, এত বার তাঁরা এত বিবিধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন যে, সুরনাথ, আপনার "শত-মখ" নামটি আজ উপহাসাস্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" ১৫—১৭

নারদ মুনির বচন শুনে হিংসায় ফেটে পড়লেন ইন্দ্র। ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। নারদের আবার ইন্দ্রত্ব! তৎক্ষণাৎ তিনি পিশাচদের আহ্বান করলেন। এবং—

"নরেন্দ্রদের ঐশ্বর্য্য হরণ কর।"···এই আদেশ সহ পৃথিবীতে দিলেন পাঠিয়ে।

ইন্দ্রের আদেশে পিশাচসঙ্ঘ নিখিল নৃপতিদের অখিল ঐশ্বর্য্যের লুণ্ঠন ব্যপদেশে উপনীত হলেন ভূতলে। "গীত" হল তাঁদের লুণ্ঠন-মন্ত্র।

অষ্ট পিশাচ আসেন ভূতলে। তাঁদের নাম যথাক্রমে:—মায়াদাস, ডম্বরদাস, বক্রদাস, ক্ষয়দাস, লুণ্ঠদাস, খরহরদাস, প্রসিদ্ধদাস এবং বাড়বদাস।

অতি ভয়াবহ তাঁরা। ওঁ দেখলে ভয় হয়। ভীষণ গলা। পৃথিবীতে এসেই তাঁরা অতিবিকট একদল গায়ক সৃষ্টি ক'রে বসলেন।

গায়কদের কৃপায় দিকে দিকে ক্ষয় হয়ে যেতে লাগল নৃপতিদের বৈভব, সর্ব্বস্বান্ত হতে লাগল মনুষ্য। যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ে শিথিল হয়ে গেল ভূপালদের উদ্যম।

মহাঘোর এই কর্ণ-পিশাচের দল কর্ণরন্ধ্র পথে প্রবেশ করতে লাগল গীতচ্ছলে···ভূপদের হৃদয়ে। আকস্মিক তাঁদের হৃদয়-হরণ! ১৮—২৩

বৎসগণ,

সেই হেতুই বলছি, এই বিকারিদের যে ভূপাল প্রবেশাধিকার দান না করেন তাঁর রাষ্ট্রে, তাঁরই একমাত্র অধীনা থাকেন নিখিলার্থ-সম্পৎ যজ্ঞবতী ভূমি। ২৪

ঐ যাঁরা দেশে বিদেশে প্রচার-নৃত্য দেখিয়ে বেড়ান, কীর্ত্তন ক'রে বেড়ান রাজমহিমা, যাঁরা নাটক করেন, নাচেন, যাদু দেখিয়ে ধাঁধা লাগান, যাঁরা নিজের সর্ব্বস্ব খুইয়ে বারাঙ্গনার অন্ন খেয়ে জীবন ধারণ করেন,···ঐশ্বর্য্যের শালিধান্য-ক্ষেত্রে তাঁরা পঙ্গপাল। তাঁদের হাত থেকে লক্ষ্মীদেবীকে বাঁচিও। ২৫

গায়নসঙ্ঘের ঐক্যতান থেকে উত্থান লাভ করে এক সুমহান্ গীত-নিঃস্বন শুনলে মনে হয়, লক্ষ্মীদেবী যেন অস্থানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, ভয়ের আবেগে বুক ছেড়ে কাঁদছেন। ২৬

ইতি গায়ন-বর্ণনং নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।

[ক্রমশঃ।

রাত্রির রেলগাড়ী

শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত

[Mary Elizabeth Coleridge এর 'The Train' কবিতার অনুবাদ।]

রঙীন-সবুজ চক্ষু-দু'টি জ্বলছে রাতের অন্ধকারে,
উঠছে ধোঁয়া অগ্নিকণা—বাঁশীর ধ্বনি ডাকছে কারে!
হোথায় ছিলো—হেথায় এলো—পালিয়ে গেলো আবার ছুটে—
বলতে পারো কোথায় যাবে রেল-গাড়ীটা বাঁধন টুটে?

রাত্রি ভেদি দানোর মত ছুটছে কেবল ছুটছে সে
চলার সাথে রাতের আঁধার দুই ভাগে ভাগ করছে সে।
নীরবতা দিচ্ছে ভেঙে তার ওই বিরাট চীৎকারে
বিজ্ঞানেরই সাধের ছেলে এই রাতেতে খুঁজছে কারে?

থাকতে পেলে তুষ্ট হতো এমন জনে নি'চ্ছে দূরে
কঠিন ব্যথা-দুঃখ দিয়ে তাদের সারা হৃদয়পুরে।
প্রেমিক এবং বন্ধুজনে আনন্দ সে দেবার তরে
তাদের নিয়ে যাচ্ছে ছুটে বিদেশ হতে নিজের ঘরে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

লাহিড়ী এক দিন আমায় এসে বললে—যোগীন্দার সিং শুরু করলো—ভাই যোগীন্দার, আমাদের কাগজে আমি একটি নতুন ফিচার লিখছি : ইনসাইড ক্যালকাটা। আগের দু'টো সংখ্যায় জোড়াবাগানের উপর লিখেছি, চৌরাঙ্গির উপর লিখেছি। ভাবছি এবার চায়না টাউনের উপর লিখবো। তুমি তো ওদিকটা জানো, আমায় নিয়ে এক দিন দেখাতে পারো ?

নিশ্চয়ই, আমি বললাম, তবে খরচা-পত্তর তোমার। সে রাজী, আমিও খুশি। ফ্রী লাঞ্চ, ফ্রী ডিনার, ফ্রী ড্রিঙ্কস—আর লাহিড়ীর যদি তেমন তেমন শখ হয়, ফ্রী গার্লস্—এমন মওকা কে ছাড়ে বলো ?

তাকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলাম আমার এক চাইনিজ বন্ধু লিয়াং কুয়ো ফান্-এর সঙ্গে। কুয়ো ফান ব্যবসা করে, কিসের ব্যবসা আমরা ঠিক জানি না, কিছু কিছু আঁচ করি বটে, তবে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন মনে করি না। তার সঙ্গে আমি আর লাহিড়ী একটি জুয়ার আড্ডা দেখলাম, একটি চণ্ডুর আড্ডা দেখলাম, একটি মেয়েছেলের আড্ডা দেখলাম। লাহিড়ী খুব খুশি। সে ভাবলো সে চায়না টাউন সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছে। এক দিন সে বললে, এবার একটু সাধারণ লোক দেখবে সে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও কিছু জানবে এবার। একদিন সে সারা দুপুর বসে রইলো চি-শিউ-চিং'এর জুতোর দোকানে। তার পর বললে, একটা দুপুর কাটাবে কোনো একটা সাধারণ চীনে রেস্তরাঁয়, যেখানে সাধারণ চীনেরা খেতে আসে, আড্ডা দিতে আসে। এখন, এ-সব কি আমার ভালো লাগে ? নো ড্রিঙ্কস্, নো গার্লস্, নো ফান্, চুপ-চাপ বসে অন্য লোকের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা আমার কি পোষায় ? যা' হোক, ওখানে তিরেটি বাজারের কাছেই একটি ছোটো গলির ভিতর শু-শিউ-চুয়ান নামে একটি লোকের একটি ছোটো রেস্তরাঁ আছে। তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে শিউ-চুয়ানকে বললাম, আমার এই বন্ধুটি খবরের কাগজের লোক। এখানে বসে একটু লোকজন দেখতে চায়। ওর যা লাগে দেবে। আর দেখো, ওর যেন কোনো অসুবিধে না হয়।

যাক, ওকে সেখানে রেখে তো আমি আমার অফিসে চলে এলাম। আর সেখানেই একটি মজার এ্যাডভেঞ্চার হোলো লাহিড়ীর, মজার বিপদে পড়লো সে। চণ্ডুর আড্ডা, জুয়ার আড্ডা, স্ত্রীলোকের আড্ডা সব নির্বিঘ্নে ঘুরে এসে সেই পুওর লাহিড়ী কি না বিপদে পড়লো ভালো মানুষ শু-শিউ-চুয়ানের অতি সাধারণ একটি রেস্তরাঁয়।

বলে যোগীন্দার সিং আবার হাসতে লাগলো। হাসতে হাসতে বিয়ার শেষ করলো সে। আরেক বোতল বিয়ারের অর্ডার দিলো। তার পর আবার আরম্ভ করলো।

—আমি লাহিড়ীর কাছে যেরকম শুনেছি, সেরকমই বলে যাচ্ছি তোমায়। লাহিড়ী তো সেখানে বসে চা খেতে খেতে দেখলো সাধারণ দু'-চার জন চীনা এসে কাঠের চপ-ষ্টিক দিয়ে সাধারণ ভাত তরকারি খাচ্ছে, চপ-স্যুয়ে নয়, চাও মিয়েন নয়, ফ্রাইড রাইস নয়, শার্কস্ ফিন্ স্যুপ নয়, ওসব কিছু নয়,—প্লেন এ্যাণ্ড সিম্পল্ কারি এ্যাণ্ড রাইস। কয়েক জন বসে শুধু গল্প করছে, দু'একজন ফিরিঙ্গিও আসছে মাঝে মাঝে।

লাহিড়ী বসে বসে ভাবছিলো, এই ক'দিন যা দেখলো তা নিয়ে একটা জমকালো রোমাঞ্চকর ফিচার কি করে লেখা যায়।

হঠাৎ একজনের ডাকে তার চমক ভাঙলো।

মুখ ফিরিয়ে দেখে শার্ট-প্যান্ট পরা একজন ভদ্রলোক পরিষ্কার বাঙলায় তাকে জিজ্ঞেস করছে, "আচ্ছা, আপনার সঙ্গে যে মিষ্টার দত্ত ছিলেন, উনি কোথায় গেলেন ?"

"মিষ্টার দত্ত !" লাহিড়ী অবাক, "আমার সঙ্গে তো ও নামে কেউ ছিলো না ?"

"ছিলো না ? ও, তা' হলে আমারই ভুল হয়ে থাকবে," বলে সেই ভদ্রলোকটি চার দিক তাকিয়ে দেখলো। খালি টেবিল নেই একটিও। তখন লাহিড়ীকে বললো, "আচ্ছা, আমি কি দু'-চার মিনিট এখানে বসতে পারি ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই", উত্তর দিলো লাহিড়ী।

লোকটির হাতে ছিলো একটি এটাচি কেস। সেটি রাখলো টেবিলের উপরে। তার পর একটি সিগার ধরালো। চুপচাপ বসে চুরুট ফুঁকলো কিছুক্ষণ।

তার পর বললো, "আমি অপেক্ষা করছি এক ভদ্রলোকের জন্যে। একটার সময় আসবার কথা, এখন দেড়টা প্রায় বাজে। এখনো দেখা নেই !"

লাহিড়ী উত্তর দিলো, "আজ-কাল সময় ঠিক রাখার বড্ড

অসুবিধে। ট্রামে-বাসে এত ভিড়, ঠিক মতো ওঠা যায় না। তা ছাড়া অনেকে দেড়টায় টাইম দিলে আড়াইটার আগে আসে না।"

এমনি করে গল্প করতে সুরু করে দিলো ওরা দু'জন। লাহিড়ী খুব গল্পের লোক, এক জন কাউকে পেলেই চেনা হোক, অচেনা হোক, আলাপ জমিয়ে ফেলে। আর এ ভদ্রলোকও দেখা গেল, গল্প করতে একটুও গররাজী নয়।

খানিকক্ষণ পর ভদ্রলোক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "আরে! দুটো বাজে যে।—ম্—একটা টেলিফোন করতে পারলে হোতো। এখানে তো টেলিফোন নেই। দাঁড়ান, আসবার সময় ওদিকে একটি ওষুধের দোকান দেখেছি। ওদের নিশ্চয়ই ফোন আছে। আচ্ছা, আমি আসছি এক্ষুণি"—

ভদ্রলোক উঠে বেরিয়ে গেলেন। লাহিড়ী দেখলো যে, এটাচি কেসটি উনি রেখে গেলেন। গা করলো না সে। ভাবলো, ফোন করতে গেছে। এক্ষুণি ফিরে আসবে।

দোকানটা তখন প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। শুধু এক কোণে একটি লোক বসে আছে। কিছুক্ষণ পর আরেক জন লোক এলো। অন্য লোকটির টেবিলে বসলো। দু'-একটা কি যেন কথাবার্তা হোলো ওদের মধ্যে। তার পর চুপচাপ এক কাপ চা খেয়ে লোকটি চলে গেল। আগের লোকটি আরেক কাপ চা নিয়ে বসে রইলো সেই টেবিলে।

লাহিড়ী লক্ষ্য করলো যে, লোকটি মাঝে মাঝে আড়চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাহিড়ী একটু উদ্বিগ্ন হোলো। আড়াইটে বেজে গেছে। সেই ভদ্রলোকের দেখা নেই। এতক্ষণ ফোন করছে সে?

একবার ভাবলো, যাক গে। সে যখন আসবে আসুক। আমার কি? আমি চলে যাই। তার পর ভাবলো, নাঃ, সে ঠিক হবে না। ভদ্রলোক তাঁর ভরসায় এটাচি কেসটি রেখে গেছে। লোকটি ফিরে আসুক, তার পর চলে যাবে।

তিনটে যখন প্রায় বাজে, লাহিড়ী শু-শিউ-চুয়ানকে ডাকলো। সে বসেছিলো দরজার কাছে, তার কাউণ্টারে। সেখান থেকে উঠে লাহিড়ীর কাছে আসতে, লাহিড়ী বললো, "দেখ, একটি লোক এখানে এসে বসেছিলো, সে গেছে ওদিকে একটি ওষুধের দোকানে টেলিফোন করতে—"

"না তো", বললো শিউ-চুয়ান, "ও একটি ট্যাক্সিতে চড়ে এসেছিলো। সঙ্গে আরেক জন লোক ছিলো। সে যতক্ষণ এখানে ছিলো, ট্যাক্সিও ওদিকে অপেক্ষা করেছিলো ততক্ষণ। লোকটি বেরিয়ে গিয়ে সেই ট্যাক্সিতে চড়েই চলে গেছে।"

লাহিড়ী অবাক! বললো, "দেখ, সে এই এটাচি কেসটি এখানে ফেলে গেছে।"

শিউ-চুয়ান একবার এটাচি কেসের দিকে, একবার লাহিড়ীর দিকে তাকালো। তার পর বললো, "আমি দেখি নি।"

"মানে?"

"আমি ওই লোকটিকে এটা নিয়ে ঢুকতে দেখি নি।"

"তা' হলে? এটা কি আমি এনেছি নাকি, না আমি আসবার আগে এখানে ছিলো?" জিজ্ঞেস করলো লাহিড়ী।

"আপনি এনেছেন কি না তাও আমি দেখি নি", শিউ-চুয়ান উত্তর দিলো, "তবে আপনি আসবার আগে এটা আমি এখানে দেখি নি।"

লাহিড়ী বললো, "যাই হোক, এটা রেখে দাও তোমার কাছে, ও নিশ্চয়ই মনে পড়লে ফিরে আসবে। তখন এটা দিয়ে দিও।"

মাথা নাড়লো শিউ-চুয়ান। "জিনিসটা কার না জেনে আমি এখানে ওটা রাখতে পারবো না।"

"তা হলে আমি কি করবো?"

শিউ-চুয়ান চুপ করে রইলো একটুখানি। তার পর বললো, "আমার ধারণা, আপনি ভুলে গেছেন যে, ওটা আপনার। কিংবা হয়তো এখন আপনার মনে হচ্ছে, ওটা আপনার না হলেই ভালো হয়।"

শিউ-চুয়ানের কথার মানে প্রথমটা বুঝতে পারলো না লাহিড়ী। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল একটি ঘটনা। কিছু দিন আগে কাগজে বেরিয়েছে। ট্রেণে এক ভদ্রলোক আরেক জন ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে নিলো। ফার্ষ্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট। যাত্রী শুধু ওরা দু'জন। সারাটা পথ বেশ গল্পগুজব করতে করতে এলো। হাওড়ায় এসে পৌঁছুতে লোকটি বললো, আপনি বসুন, আমার মালগুলো রইলো। আমি কুলি ডেকে আনি। কুলি ডাকতে সেই যে গেল আর দেখা নেই। তার পর বিরক্ত হয়ে যখন কুলি ডেকে নিজের মালগুলো নামাতে যাবে এমন সময় পুলিশ আর আবগারীর লোক এসে উপস্থিত। অন্য লোকটির বাক্স খুলতে আপিং বেরোলো। তখন এ লোকটিকে নিয়ে টানাটানি। সে বললে, ও মাল তার নয়। কিন্তু এরা শুনলো না তার কথা। তাকে ধরে নিয়ে গেল থানায়. অনেক হাঙ্গামার পর প্রমাণিত হোলো যে এ বাক্স তার নয়. গাড়িতে অন্য যে লোকটা উঠেছিলো, তার। সে চোরা আপিং চালান দেয়। হাওড়ায় এসে যেমন সে টের পেলো আবগারী পুলিশ সন্ধান পেয়েছে যে এ গাড়িতে চোরা আপিং আসছে এবং পাহারা রেখেছে চার দিকে, সে আপিঙের মায়া ত্যাগ করে সরে পড়েছে।

মনে পড়তেই ঘেমে উঠলো লাহিড়ী। এটাচি কেসটা তুলতে গিয়ে দেখলো, না, বেশ ভারী।

হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সে।

আর এরকম ভয় পেয়েই সে ভুল করলো। তা নইলে সে দিন তার যা দুর্ভোগ হয়েছিলো, সে রকম হোতো না।

তার যখন সন্দেহ হোলো যে এখানে এরকম সুটকেস ফেলে যাওয়ার মধ্যে কোনো গোলমাল আছে——যোগীন্দার সিং বলে চললো——সোজা পুলিশ ডেকে ব্যাপারটা খুলে বললেই চুকে যেতো। এটা যে তার, এরকম কোনো প্রমাণ তো নেই, মনে করবারও কারণ নেই। সে খবরের কাগজের সাব এডিটার, তার একটা পরিচয় আছে। শিউ-চুয়ানের দোকানে সে আমার সঙ্গে গেছে, কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে ছিলাম। তা ছাড়া আমাদের দেশের পুলিশও অতো কাঁচা নয় যে ঝট করে বিশ্বাস করে নেবে যে ওই এটাচি কেস লাহিড়ীর।

কিন্তু লাহিড়ী হঠাৎ বেদম ভয় পেয়ে গেল। বললো, "না, ওটা আমার নয়। আমি নিয়ে যেতে পারবো না।"

"কি আছে ওর মধ্যে?" শিউ-চুয়ান জিজ্ঞেস করলো।

"আমি জানি না," লাহিড়ী উত্তর দিলো।

"ওটা খুলে দেখা যাক," শিউ-চুয়ান বললো।

কিন্তু লাহিড়ী বেদম নার্ভাস হয়ে বললো "না, না, অন্যের জিনিস তুমি খুলে দেখতে যাবে কেন? আর এটা তো আমি আনিনি।"

"কে এনেছে আমি তো দেখিনি।"

"ওই লোকটাকে তো আমি চিনি না।"

"আমি কি করে জানবো সে কথা। আমি দেখেছি সে লোকটা ট্যাক্সি চেপে এলো, আপনার সঙ্গে বসে গল্প করলো কিছুক্ষণ, তার পর চলে গেল সেই ট্যাক্সিতেই।"

"তুমি ওকে চেনো?"

"না, তবে নানা রকম লোক আসে এখানে। আমি দেখলে একটু একটু টের পাই," শিউ-চুয়ান উত্তর দিলো।

"ও কি রকম লোক?"

"আমি জানি না।"

লাহিড়ী আস্তে আস্তে উঠে পড়লো। এটাচি কেসটা কিছুতেই রেখে যেতে পারলো না। শিউ-চুয়ান মানবে না কিছুতেই। ওকে নিয়ে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করতে সাহস করলো না লাহিড়ী। এটাচি কেসটা নিয়ে বেরিয়ে এলো আস্তে আস্তে।

বাইরে এসে ভাবলো এটা নিয়ে এখন কি করা যায়?

এমন সময় দেখে অন্য যে লোকটি এক কোণের টেবিলে বসেছিলো সেও উঠে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

লাহিড়ী তখন আরো ঘাবড়ে গেল। তার-ধারণা হোলো, এ নিশ্চয়ই আবগারীর লোক। সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলো বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের দিকে, পেছন ফিরে দেখলো সে লোকটিও আসছে তার পেছন পেছন।

আরো জোরে জোরে পা চালালো লাহিড়ী। বড়ো রাস্তায় এসে দেখে, পেছনের লোকটি তখনো গলির ভেতরে রয়েছে। কাছে একটি ট্যাক্সি। লাহিড়ী চট করে উঠে পড়লো ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে দেখে অন্য লোকটিও আরেকটি ট্যাক্সিতে উঠছে।

লাহিড়ীর মুখ তখন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে এতক্ষণে তার ভুল বুঝতে পারলো। শিউ-চুয়ানের দোকানেই ওটা খুলে কি আছে দেখে, পুলিশ টুলিশ ডেকে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করা উচিত ছিলো। কিন্তু এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখন প্রথম কাজ পেছনের লোকটিকে এড়ানো। দ্বিতীয় কাজ এটাচি কেসটাকে দূর করা কোনো রকমে।

এসপ্লানেডের কাছে আসতে দেখে, সবুজ আলো জ্বলছে। লাহিড়ীর ট্যাক্সি রাস্তা পেরোতে লাহিড়ী পেছন ফিরে দেখে, লাল আলো জ্বলে উঠেছে। পেছন দিকে গাড়ির ভিড়ে আর অন্য ট্যাক্সিটাকে দেখা যাচ্ছে না।

লাহিড়ী তখন একটু নিশ্চিন্ত হোলো।

গাধাটা যদি তখন সোজা আমার অফিসে চলে আসতো—বলে গেল যোগীন্দার সিং—সমস্ত ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যেতো তখনই। কিন্তু লাহিড়ী সে কাজ করলো না, সে তখন ভাবছে কি করে এটাচি কেসটা দূর করা যায়।

হঠাৎ তার মাথায় মতলব খেলে গেল। ভাবলো, এ তো খুব সোজা, ইচ্ছে করে ভুল করে ট্যাক্সিতে ফেলে গেলেই হয়।

সে গ্র্যাণ্ডের সামনে ট্যাক্সি থামালো, ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়লো তাড়াতাড়ি, যেন তার ভীষণ তাড়া।

কিন্তু ভুল করে কোনো জিনিস ফেলে যাওয়া কি এতই সহজ? শুনলো, ট্যাক্সি-ড্রাইভার তাকে ডাকছে। তাকে ফিরে তাকাতে হোলো। দেখলো এটাচি কেসটি হাতে নিয়ে লোকটি তার পেছন পেছন আসছে। নিরুপায় হয়ে সেটি নিতে হোলো।

কিছুক্ষণ পর ভাবলো, আবার চেষ্টা করে দেখা যাক। সে আরেকটি ট্যাক্সি নিলো, ট্যাক্সিতে চেপে কিছুক্ষণ পার্ক ষ্ট্রীট, ক্যামাক ষ্ট্রীট, থিয়েটার রোড ঘুরে, অবশেষে গ্লোবের সামনে এসে নামলো। বাক্সটা ইচ্ছে করে সীটের সামনে ফ্লোরের উপর রেখেছিলো যাতে ড্রাইভারের চোখে না পড়ে। গ্লোবের সামনে এসে নামলো এই ভেবে যে ড্রাইভার যদি পরে টের পেয়ে ডাকেও বা, সে আর শুনবে না, সোজা ভেতরে ঢুকে, অন্য দিকে যে আরেকটি পথ আছে পাশের গলিতে বেরিয়ে যাওয়ার, সেদিক দিয়ে সরে পড়বে।

গাড়ি থেকে নামলো, ভাড়া মিটিয়ে দিলো। ড্রাইভারও লক্ষ্য করলো না যে এই ফ্যাকাসে-মুখ যাত্রী তার এটাচি কেস ফেলে গেছে ট্যাক্সিতে। ভাড়া নিয়ে সে চলে গেল ট্যাক্সি হাঁকিয়ে। লাহিড়ী এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

গ্লোবের ভিতরে ঢুকলো সে। মতলব—অন্য পথ দিয়ে পাশের গলিতে বেরিয়ে, হাঁটতে হাঁটতে ওয়েলেসলিতে এসে ট্রাম ধরা।

কিন্তু সে আর হোলো না। অনীতা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে লাহিড়ীর তখন খুব ভাব। আর ভেতরে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল সেই অনীতার সঙ্গে।

"সিনেমা দেখতে এলে বুঝি?" জিজ্ঞেস করলো অনীতা।

"না, এই একটু গুজন নিতে এসেছি," লাহিড়ী উত্তর দিলো আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে।

অনীতা বললো, "আমি এসেছিলাম এ বইটি দেখবো বলে কিন্তু টিকিট পেলাম না। চলো কোথাও বসে চা খাওয়া যাক।"

অনীতাকে দেখলে লাহিড়ী সব কাজ ফেলে তার সঙ্গে লেপটে থাকতে চায়, কিন্তু সেদিন লাহিড়ী অনীতাকে এড়াতে পারলে বাঁচে। কিন্তু সে আর হয়ে উঠলো না। অনীতা তাকে সঙ্গে করে বাইরে বেরিয়ে এলো। আর বেরিয়ে আসতে দেখে, সেই ট্যাক্সি ফিরে আসছে।

অনীতার উপর ভীষণ রাগ হোলো লাহিড়ীর। কিন্তু কিছু করার নেই। রাগ হোলো ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের উপর। ওরা এত সাধুপুরুষ কবে ছিলো, লাহিড়ী ভাবলো। নিরুপায় হয়ে এটাচি কেস ফেরত নিতে হোলো। আট আনা পয়সা বখশিস দিয়ে হারানো মাল ফেরত পাওয়ার জন্যে খুশি হওয়ার ভাণ করতে হোলো।

অনীতা দেখতে চাইলো এটাচি কেসের মধ্যে কি আছে। লাহিড়ী দেখে, আরো বিপদ! বললো, "অনীতা, কিছু মনে কোরো না। চা খাওয়া আর আমার হোলো না। আমার এখন ভীষণ কাজ। কাল তোমায় ফোন করে কোথায় দেখা হবে ঠিক করে নেবো। আমি এখন চলি।"

অনীতা রাগ করে চলে গেল। লাহিড়ী নিউ মার্কেটের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিনার্ভায় এলো।

মিনার্ভার কাছাকাছি আসতে সে ভাবলো, আচ্ছা, এটি সিনেমার ক্লোক রুমে রাখলে কি রকম হয়? ওরা তো ট্যাক্সি-ড্রাইভার নয়। ওরা নিশ্চয়ই আমার পেছন পেছন ছুটে এসে এটা গছিয়ে দেবে না। আর ভিড়ের মধ্যে কখন বেরিয়ে যাবো কেউ খেয়ালও করবে না।

মিনার্ভায় ঢুকে পড়লো সে। প্রথমে একটি ব্যালকনির টিকিট কাটলো। তার পর ভেতরে গিয়ে দেখে, ক্লোকরুম এটেন্‌ডেন্ট নেই। সেদিন লোক বেশী হয়নি। একজন আশার বললে, এই এটাচি কেস আপনি সঙ্গেই রাখতে পারেন।

সেটি হাতে নিয়েই উপরে উঠে ভিতরে ঢুকে সে নিজের সীটে গিয়ে বসলো। প্যাসেজের পাশেই তার সীট, লোকজন বেশী নেই।

তখন তার মাথায় আরেকটি মতলব এলো। এটাচি কেসটি সীটের তলায় রেখে দিয়ে এমনি বেরিয়ে পড়লেই হয়।

একবার ভাবলো এখনই বেরিয়ে পড়ে। তার পর ভাবলো, না। ঢুকবার সময় লোকটি দেখেছে যে একটি এটাচি কেস নিয়ে ঢুকছে। সে যদি লক্ষ্য করে সে এমন খালি হাতে বেরোচ্ছে? ঘণ্টা দু'য়েক পরে বেরুলেই নিরাপদ। ততক্ষণ আর লোকটার মনে না-ও থাকতে পারে।

ঘণ্টা দু'য়েক বসে বইখানি দেখলো অতি কষ্টে। নাচ গান হুল্লোড়ের বই—সাধারণত লাহিড়ীর ভালোই লাগে, কিন্তু এখন একটুও উপভোগ করলো না সে।

বই শেষ হতে যখন সে চুপচাপ খালি হাতে বেরিয়ে পড়ছে, তখন হঠাৎ শুনলো পেছন থেকে কে যেন ডাকছে,—আই সে, মিষ্টার!

তার তিনটে সীট পরে বসেছিল একটি লোক। সে ওই শ্রেণীর পরোপকারী দর্শক যারা বেরোবার সময় সীটগুলো তুলতে তুলতে বেরোয়! লাহিড়ীর সীটটা তুলতেই সে লক্ষ্য করলো লাহিড়ীর এটাচি কেস।

যাই হোক—তাকে অনান্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে এটাচি কেস হাতে লাহিড়ী যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে, তখন দেখে অনীতা আর আরেকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীচে। ওরা ছ'টার শো'এর টিকিট কিনেছে।

লাহিড়ীকে দেখে অনীতা বললো, "ও, এই তোমার ভীষণ কাজ?"

সে কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই অনীতা তার বন্ধুকে নিয়ে সরে গেল সেখান থেকে।

কিন্তু অনীতার অভিমান ভাঙানোর চেষ্টা করার সময় লাহিড়ীর তখন নেই। সে রকম মেজাজও নেই।

সে তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। এটাচি কেসটা দূর করতেই হবে। যে করেই হোক, কলকাতা শহরে, যেখানে এত লোকের এত জিনিস হারাচ্ছে, খোয়া যাচ্ছে, চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে—সেখানে একটা সামান্য এ্যাটাচি কেস কিছুতেই ইচ্ছে করে হারানো যায় না?

সেদিন অনেক চেষ্টা করলো লাহিড়ী। পেরে উঠলো না কিছুতেই।

নিউ মার্কেটের ভিতর একটি নিরিবিলি দেখে চায়ের ষ্টলের কেবিনে বসে চা আর প্যাটিস খেয়ে, টেবিলের নিচে এটাচি কেসটি রেখে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করলো, কিন্তু ওখানকার বয় কী সাধুপুরুষ, তাকে ডেকে এটাচি কেসটি ফিরিয়ে দিলো।

এদিক ওদিক ঘুরে একটা নিরিবিলি ডাষ্টবিন পেলো না কোথাও, সব ডাষ্টবিনের আশে-পাশেই লোকজন গিজগিজ করছে! লাহিড়ী ভাবলো, কলকাতা শহরের জনসাধারণের রুচি কোথায় নেমেছে? ডাষ্টবিনের পাশেও এত ভিড়!

তারপর গেল ময়দানে। তখনো ভালো করে সন্ধ্যা হয়নি। আলো আছে চার দিকে। খুঁজে পেতে একটি নিরিবিলি জায়গা দেখে এটাচি কেসটি রেখে আবার মনের আনন্দে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো সে।

এবার তাকে পেছন থেকে যে ডাকলো, তার গলা খুব কাঁচা!

পেছন ফিরে দেখে, একটি বাচ্চা স্কাউট ছুটতে ছুটতে তাকে ডাকছে।

মনে মনে লর্ড বেডেন পাওয়েলকে গালাগালি দিতে দিতে সে তার হাত থেকে এটাচি কেসটি গ্রহণ করলো। ছেলেটি তাকে তিন-আঙুলের সেলিউট মেরে চলে গেল।

খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে অন্ধকার হয়ে এলো। তখন ময়দানের এদিক ওদিক খুঁজে পেতে দেখে, এতক্ষণ যদিও বা নিরিবিলি ছিলো, এখন তা-ও নেই। সারা কলকাতার অসংখ্য ছেলে-মেয়ের জুড়ি এদিকে ওদিকে বসে ফিস-ফিস করে কথা বলছে।

সে তখন ফিরে এলো চৌরঙ্গিতে। ভাবলো, কী করা যায়!

ভাগ্য তাকে নিয়ে পরিহাসও করলো একটুখানি। কর্পোরেশান প্লেসের ওদিকে একটি ছেলে আচমকা তার এটাচি কেসটি ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় মারলো।

কি যেন ভাবছিলো লাহিড়ী। ওটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিতেই 'চোর চোর পাকড়ো পাকড়ো' বলে চিৎকার করে উঠলো। চিৎকার করে উঠেই থেমে গেল সে। কি করলো সে! বেশ তো ছেলেটা এটাচি কেস চুরি করে পালাচ্ছিলো। কেন সে বোকার মতো চিৎকার করে উঠলো।

কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গেল। কলকাতার পাব্লিক-স্পিরিটেড জনতা ততক্ষণে ছেলেটিকে ধরে ফেলেছে। এটাচি কেস তার হাতে আবার ফিরে এলো। সে আবার পথ চললো সেটি হাতে নিয়ে। তার মনে তখন খুব সমবেদনা ছেলেটির জন্যে—তাকে লোকে ঠ্যাঙাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে যখন সে মিউজিয়াম পেরিয়ে কিড ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে দাঁড়ালো, তখন সে আর ভাবতে পারছে না কি করবে।

এমন সময় লুঙ্গিপরা একটি লোক এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। ফিস-ফিস করে বললো, "ছুকরি চাহিয়ে সাহাব? বহুত আচ্ছা আচ্ছা খাপসুরত এ্যাংলোইণ্ডিয়ান, বেঙ্গলি কলেজ গার্ল, পাঞ্জাবী, নেপালী, চীনা,—।"

শুনে লাহিড়ীর মাথায় আরেকটি মতলব এলো। বললো, "চীনা ছুকরি হ্যায়?"

গলির ভেতর দিকে একটু অন্ধকারে একটি ফিটন গাড়ি

দাঁড়িয়েছিলো। সে লোকটির পেছন পেছন সেই গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

ভেবেছিলো লোকটি যখন চীনা ছুকরির খোঁজ দিচ্ছে, তাকে নিয়েও যাবে চায়না টাউনে।

কিন্তু লোকটি কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে তাকে নিয়ে এলো ওয়েলেসলি অঞ্চলের এক নোংরা গলিতে।

লাহিড়ী ভেবেছিলো, ওখানে কোনো মেয়েছেলের ঘরে এটাচি কেসটি ফেলে আসবে। ওরা নিশ্চয়ই সাধুপুরুষ নয়। সে ভুল করে একটি এটাচি কেস ফেলে যাচ্ছে দেখলে নিশ্চয়ই তাকে ডেকে সেটি ফিরিয়ে দেবে না।

কিন্তু যা ভেবেছিলো তাও হোলো না।

লোকটির সঙ্গে একটি জীর্ণ বাড়ীর দোতলায় উঠে একটি আধো অন্ধকার ঘরে ঢুকে লাহিড়ী পড়লো কয়েক জন গুণ্ডার হাতে।

তার ঘড়ি গেল, ফাউন্টেন পেন গেল, আংটি গেল, টাকাভর্ত্তি মানিব্যাগ গেল। তাতে তার মনে এমন কিছু দুঃখ্ হয়নি যখন সে দেখলো তার এটাচি কেসটিও ওরা নিয়ে নিলো।

কিন্তু ওদের মধ্যে একজন এটাচি কেসটি এককোণে নিয়ে গিয়ে সেটি খুলে দেখলো। দেখে একবার লাহিড়ীর দিকে তাকালো। তার পর সেটি বন্ধ করে লাহিড়ীর হাতে দিয়ে বললো, "এটি আমাদের দরকার নেই। আপনি নিয়ে যান।"

আরেক জন জিজ্ঞেস করলো, "আপনি থাকেন কোথায়?"

"সে জেনে কি হবে?" লাহিড়ী জিজ্ঞেস করলো।

"না। শুধু জানতে চাইছিলাম আপনার বাস ভাড়া কতো লাগবে। হেঁটে গেলে তো তকলিফ হবে—। আচ্ছা, সাহাব, এই এক টাকা নিয়ে যান।"

সর্ব্বস্ব খুইয়ে এটাচি কেস হাতে নিয়ে বাড়ী রওনা হোলো লাহিড়ী। খানিকটা পথ গিয়ে ভাবলো, না, এটা নিয়ে বাড়ী ফেরা ঠিক হবে না, সবাই জানতে চাইবে এর মধ্যে কি আছে। সে আরেক বিপদ।

কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? একটু ভেবে স্থির করলো, না—অফিসে ফিরে যাই। আজ তার রাত্তিরে ডিউটি নেই বটে। কিন্তু ওখানে গিয়ে একটু নিরিবিলি বসে ভাবা যাবে, এটা নিয়ে কি করা যায়।

ওই এক টাকা খরচা করে সে কিছু খেয়ে নিলে একটা ছোটো রেস্তরাঁয়। খুচরো যা বাঁচলো তাতে ট্রামে চেপে অফিসে ফিরে এলো। অফিস থেকে সে তাদের পাড়ায় এক প্রতিবেশীর কাছে ফোন করে দিলো, যেন বাড়ীতে খবর দিয়ে দেয় সে অফিসে আছে।

তার সহকর্মী সাব-এডিটারেরা জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার, আজ তার ডিউটি নেই, সে এখানে কেন!

সে এলোমেলো দু'-চারটি কথা বলে তাদের কৌতূহল এড়িয়ে অন্য গল্প ফাঁদলো।

ঘড়িতে তখন সাড়ে দশটা।

কেটে গেল আরো আধ ঘণ্টা। ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধব সহকর্মীদের মধ্যে বসে আস্তে আস্তে তার সাহস ফিরে এলো। ভাবলো, সত্যিই তো। এত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে। রাত একটু বেশী হলে পথঘাট নির্জন হয়ে আসবে। তখন একটি ডাষ্টবিনে ফেলে দিলেই হোলো।

এগারোটা বাজলো। ভাবলো, এবার ওঠা যাক। তখন এগারোটা দশ।

হঠাৎ একজন ঘরে ঢুকে বললো, "আপনি এখানে? মিষ্টার দত্ত পুলিশকে বলছিলেন আপনি এখানে নেই। কারণ আজ আপনার নাইট ডিউটি নেই। কিন্তু ওরা নাকি আপনার বাড়ীতে খবর নিয়েছে। বাড়ীতে বললে, আপনি নাকি এখানে।"

"পুলিশ!" লাহিড়ীর মুখ শুকিয়ে গেল।

"হ্যাঁ। ওরা মিষ্টার দত্তের ঘরে বসে আছে।"

"ও, আচ্ছা, যাচ্ছি—।" এটাচি কেস হাতে নিয়ে উঠে পড়লো লাহিড়ী। সহকর্মীরা জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার? সে বললে, কি জানি কি ব্যাপার। দেখে আসি একবার।

বেরিয়ে এসে কিন্তু দত্তের ঘরে ঢুকলো না লাহিড়ী। সোজা রাস্তায় নেমে এলো।

গলিটা পেরিয়ে এসে বড়ো রাস্তায় পড়তেই একটি বাস পেয়ে গেল। তাতে উঠে পড়লো সে।

চৌরঙ্গি পেরিয়ে পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে আসতেই সে বাস থেকে নেমে পড়লো। তার পর হাঁটতে লাগলো পার্ক ষ্ট্রীট ধরে। এখন চার দিক নির্জন। কোনো ফাঁকা জায়গায় একটা ডাষ্টবিন পেলেই হয়।

অনেকটা পথ হেঁটে তার পর ডাইনে ক্যামাক ষ্ট্রীটে ঢুকলো। চারদিক নির্জন নিস্তব্ধ। একটু এগুতেই একটি ডাষ্টবিন। কাছাকাছি এসে যেই এটাচি কেসটি ফেলতে যাবে এমন সময় দেখলো ডাইনের গলির ভেতর থেকে একটি পুলিশ-ভ্যান বেরোচ্ছে।

মনে পড়লো, আজকাল একটু বেশী রাত্তিরে ফাঁকা জায়গায় কোনো ভদ্রবেশী কাউকে ডাষ্টবিনে কিছু ফেলতে দেখলে পুলিশেরা খুশি হয় না। কয়েক দিন আগে কোথায় যেন কা'কে হাতে নাতে ধরে ফেলেছে একটি নবজাত শিশুর মৃতদেহ শুদ্ধু।

সে তাড়াতাড়ি হেঁটে চললো। হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়লো,—তাই তো, কেন পাগলের মতো ঘুরে মরছে সে। তার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রশান্ত দাশগুপ্ত, আবগারী বিভাগের বড়ো অফিসার। তাকে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললেই হয়।

সে থাকতো বেকবাগানে। খুঁজতে খুঁজতে তার বাড়ী এসে উপস্থিত হোলো লাহিড়ী। তখন বারোটা প্রায় বাজে। বাড়ীতে থাকতো প্রশান্ত, তার ছোটো ভাই, আর একটি চাকর। ছোটো ভাই দরজা খুলে দিলো। এত রাত্তিরে লাহিড়ীকে দেখে সে অবাক!

বললে, "দাদা তো বাড়ি নেই। কি একটা জরুরী কেসে বেরিয়েছে সেই সন্ধ্যেবেলা।"

"যাই হোক, ফিরবে তো, আমার খুব দরকার," বলে লাহিড়ী বসবার ঘরে গিয়ে বসে পড়লো।

প্রশান্ত যখন বাড়ী ফিরলো তখন রাত প্রায় একটা। লাহিড়ীকে দেখে সে-ও অবাক হোলো, জিজ্ঞেস করলো, "তুমি এত রাত্তিরে?"

"ভাই, খুব জরুরী দরকার আছে তোমার সঙ্গে। কতক্ষণ বসে আছি তোমার জন্তে।"

দেরী হয়ে গেল　বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের ওদিকে চোরাই আপিঙের বেশ একটি বড়ো চালান ধরা পড়লো। সেই ব্যাপারেই বেরিয়েছিলাম," প্রশান্ত উত্তর দিলো।

"বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের ওদিকে?" লাহিড়ীর মুখ শুকিয়ে গেল।

"হ্যাঁ, একটি চীনেম্যানের রেস্তরাঁয়।"—

"এ্যাঁ—,"—চমকে উঠলো লাহিড়ী।

"কেন কি হয়েছে?" প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলো।

লাহিড়ী তখন সব খুলে বললো প্রশান্তকে।

"ও-শিউ-চুয়ান'এর রেস্তরাঁয়?"—প্রশান্ত সব শুনে জিজ্ঞেস করলো।

"হাঁ, কেন?" ঢোক গিলে লাহিড়ী বললো।

"তা হলে তুমিই সেটি?" জিজ্ঞেস করলো প্রশান্ত।

"[illegible]?"

প্রশান্ত হাসতে শুরু করলো। হাসতে হাসতে বললো, "এটাচি কেসটি একবার খুলে দেখে নিতেও পারলে না?"

"ভয়ে খুলিনি,"—উত্তর দিলো লাহিড়ী।

"আচ্ছা, এবার খুলে দেখ তো?"

লাহিড়ী হাতে থাকা এটাচি কেসটি খুললো। তার ভেতরে চারটে কাগজের বাক্স ঠাসাঠাসি করে রাখা। প্রত্যেকটি খুলে দেখলো লাহিড়ী। প্রত্যেকটির ভিতর সন্দেশ।

"বুঝলেন তো, প্রত্যেকটির ভিতর সন্দেশ," বলে যোগীন্দার সিং আবার হাসতে শুরু করলো।

"সন্দেশ?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "লাহিড়ীর সঙ্গে রসিকতা করছিলো নাকি কেউ?"

যোগীন্দার বিয়ার খেলো দু' তিন চুমুক। তার পর উত্তর দিলো, "না। কেউ রসিকতা করেনি। কলকাতার দু'জন নামজাদা স্মাগলারের একটা প্যাঁচ ছিলো এর মধ্যে।"

"কি রকম?"

"বুঝলে না? ও-শিউ-চুয়ানের দোকানে ওই দু'জন লোকের দেখা হওয়ার কথা ছিলো আরেক জনের সঙ্গে, যার হাত দিয়ে কিছু আপিং পাচার করে দেওয়ার কথা। ওই দু'জনের একজন বাঙালী, আরেক জন চীনেম্যান। যার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিলো সেও বাঙালী, কিন্তু এদের কি রকম যেন সন্দেহ হয়েছিলো যে আবগারীর লোকেরা এই খবরটা পেয়েছে এবং নজর রাখছে দোকানটির উপর। তখন আর অন্য লোকটিকে খবর দিয়ে অন্য জায়গায় দেখা হওয়ার ব্যবস্থা করার সময় ছিলো না। তাই এরা ভাবলো, আবগারীর লোকের চোখে ধুলো দিতে হবে। যে রকম এটাচি কেসে ওদের আপিং পাচার করে দেওয়ার কথা, সে রকম এটাচি কেসে সন্দেশ পুরে সেটি সেখানে নিয়ে গেল, তাদেরই দলের একজনকে দেওয়ার জন্যে, যাতে আবগারীর লোক তারই পিছু নিয়ে বেরিয়ে চলে যায় সেখান থেকে, আর যথাসময়ে আসল লোকটি এলে তার হাতে আসল মালটি নিরাপদে দিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু কোনো কারণে প্রথম লোকটি সময় মতো এসে পৌঁছুতে পারলো না। এদেরও আর দেরি করবার সময় ছিলো না। লাহিড়ীকে দেখে ওরা বুঝে নিলো যে সে ভালোমানুষ। এ পাড়ার খবর সে বেশী রাখে না। তাই একটু ঝুঁকি নিয়ে তারই কাছে সন্দেশ-ভর্তি এটাচি কেসটা রেখে সরে পড়লো। দূরে কোথাও যায় নি, কাছেই আরেক জায়গায় বসে লক্ষ্য করেছিলো। যখন দেখলো যে লাহিড়ী বেরিয়ে গেল, আর তার পিছু নিল আরেক জন লোক, লাহিড়ী রাস্তায় গিয়ে ট্যাক্সি নিতে সেও ট্যাক্সিতে চাপলো—তখন পথ পরিষ্কার ভেবে ওরা ফিরে এলো শিউ-চুয়ানের দোকানে। তার পর আসল লোক এসে পৌঁছুতে তার হাতে তুলে দিলো আপিং-ভর্তি এটাচি কেসটি।"

"তুমি কি করে জানলে এত সব কথা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"লাহিড়ীর কাছে শুনেছি।"

"সে কি করে জানলো?"

"সে শুনেছে আবগারী বিভাগের সেই অফিসার বন্ধু প্রশান্ত দাশগুপ্তের কাছে।"

"দাশগুপ্তই বা কি করে জানলো?"

"দেখ বলছি," যোগীন্দার উত্তর দিলো, "আবগারী বিভাগের লোকেরা অতো কাঁচা নয়। সহজ কাজ নয় ওদের চোখে ধুলো দেওয়া। ওই স্মাগলার দু'জন যে ট্যাক্সিতে ঘুরছিলো, সেই ট্যাক্সির ড্রাইভার আসলে পুলিশের লোক। ওদের সন্দেশ কিনে একটি এটাচি কেসে পুরতে দেখে সে ওদের মতলবটা ঠিক ধরে ফেলেছিলো। আপিং-ভর্তি এটাচি কেসটা ওদের সঙ্গে ছিলো বলে ওদের আগেই ধরা যেতো, কিন্তু সেটা করেনি, যার হাত দিয়ে মালটা পাচার করে দেওয়া হবে তাকেও [illegible]। সে সময় মতো খবর দিয়েছিলো আবগারীর লোককে। তাই লাহিড়ী যখন শিউ-চুয়ানের দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লো, একজন লোক তার পিছু নিয়েছিলো এদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে, যাতে এরা নিরাপদ মনে করে পরে ফিরে আসে শিউ-চুয়ানের দোকানে। ওরা যদিও জানতো না পুলিশের লোক আরো কয়েক জন ছিলো, সেই দোকানের আশে-পাশে। সুতরাং আসল তিন জন লোক যখন একত্র হোলো, মাল-শুদ্ধ ধরে ফেলা হোলো ওদের সবাইকে। অফিসার দাশগুপ্ত সেই কেসের ব্যাপারেই অতো রাত অবধি বাইরে ছিলো।"

"আর যে লোকটা লাহিড়ীর পিছু নিয়েছিলো?"

সে তো লোকদেখানো। খানিকটা, এই এসপ্ল্যানেড অবধি, ওর পেছন পেছন গিয়ে সে চলে যায় অন্য দিকে।

"আচ্ছা, তা'হলে লাহিড়ীর অফিসে এসে পুলিশ ওর খোঁজ করছিলো কেন?"

যোগীন্দার হাসলো। বললো, "সে আরেকটা ব্যাপার। সেই যে গুণ্ডাগুলো লাহিড়ীর কাছ থেকে ওর ঘড়ি, পেন, মানিব্যাগ সব কেড়ে নেয়, সেদিন ওদের মধ্যে কি একটা গণ্ডগোল বাধতে একজন ছুরির ঘায়ে জখম হয়। পুলিশ ওর কাছে মানিব্যাগটি পায়; তার মধ্যে লাহিড়ীর নাম লেখা ভিজিটিং কার্ড ছিলো। তাই ওরা গিয়েছিলো লাহিড়ীর খোঁজে।

যোগীন্দার বলতে বলতে হেসে খুন। বললো, "পুলিশের কাছে পরে লাহিড়ীর কি কাকুতি-মিনতি। ওর টাকা ঘড়ি পেনের দরকার নেই, বাড়ীতে বা অপিসে যেন জানতে না পারে যে সে ওরকম একটি জায়গায় গিয়েছিলো। একটি অবাঞ্ছিত এটাচি কেস ফেলে আসবার জন্যে যে একজন সুস্থমস্তিষ্ক লোক ওরকম

পাড়ায় যাবে, এ কথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না। যাই হোক, প্রশান্ত দাশগুপ্তের সাহায্যে সে কোনো রকমে এসব ঝামেলা এড়াতে পেরেছিলো।"

"মিথ্যে ভয়ে একটা দিন তার কি অশান্তিতে কেটেছে," আমি বললাম, "যাই হোক, অনীতা নামে সেই মেয়েটির সঙ্গে লাহিড়ীর মিটমাট হয়ে গিয়েছিলো তো?"

যোগীন্দার একটু হাসলো। কিন্তু অন্য রকম সেই হাসি। বিষণ্ণ, ম্লান।

অনেকক্ষণ কোনো উত্তর না দিয়ে সে বিয়ারের বোতলটি শেষ করলো।

তারপর বললো, "রঞ্জন, আজ দু'বোতল বিয়ার খেয়েই কি আমি একটু মাতাল হলাম না কি?"

"কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তোমায় আরো অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে।" একটু থামলো সে। কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, "না, এ আলোচনা বেশী করে লাভ নেই। লাহিড়ী আমার বন্ধু। ও আর অনীতা এখন বিয়ে করে খুব সুখে সংসার করছে। অনীতার সঙ্গে আমার আগেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো লাহিড়ী। হঠাৎ দেখি, অনীতা আমার সঙ্গে খুব আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে। আমি তো জানতাম না ওদের মধ্যে একটু মন কষাকষি হয়েছে। আমি ভাবলাম, লাহিড়ী যদি অনীতাকে সামলে রাখতে না পারে সে আমার দোষ নয়। দিস ইজ এ ফ্রী কান্ট্রি। অনীতা যদি আমার সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে চায়, কার কি বলার আছে? ইফ উই হ্যাভ সাম ফান টুগেদার, ভালোই তো। আর জানোই তো আমরা এমনিতেই বাঙালী মেয়েদের খুব এডমায়ার করি। ক'দিন বেশ কাটলো। একদিন দেখি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের ওখানে ওরা হাত ধরাধরি করে বসে আছে। অনীতার গলা খুব ভারী, যেন একটু কেঁদেছে খানিক আগে। বলছিলো, তুমি আমায় আগে কেন বলোনি, কেন খুলে বলো নি।—এই এরকম সব মিষ্টি-মিষ্টি কথা। যা ওরা বলে থাকে। আমায় ওরা দেখেনি। আমি সরে গেলাম। হাসি পেলো খুব। কি রকম বোকা, সেন্টিমেন্ট্যাল, ওরা দু'জন। বাড়ী ফিরে এসে দেখি—এই বেয়ারা, আউর একঠো বিয়ার লাও— বাড়ী ফিরে এসে দেখি হাসি আর পাচ্ছে না। খুব মন খারাপ মনে হচ্ছে যেন। চুপ করে বসে ভাবলাম, আগে কেন জানতে পারলাম না নিজের মনকে। তারপর ভাবলাম, যাক, ভালোই হয়েছে। আমি পাঞ্জাবী, অনীতা বাঙালী। ওর মা বাবা তো রাজী হোতো না। তা ছাড়া, সে যখন সত্যি সত্যি লাহিড়ীকেই ভালবাসে, তখন আর এ কথা ভেবে কী লাভ!"

বেয়ারা আরেকটি বিয়ার আনলো। গেলাসে বিয়ার ঢেলে যোগীন্দার আস্তে আস্তে বললো, "লাহিড়ী ওর বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছিলো। ধুতি পাঞ্জাবী পরে বিয়ের বরযাত্রীও গিয়েছিলাম। এখনও প্রায়ই যাই ওদের বাড়ি; খুব ভাব ওদের সঙ্গে। ওরাও বেশ সুখে আছে।"

সেই বোতলও আস্তে আস্তে শেষ করলো যোগীন্দার সিং। বললো, "তবে রঞ্জন, আমার এমন কিছু লোকসান হয়নি। আর কিছু দিন পরেই আলাপ হোলো টিং-লিং-এর সঙ্গে। ওর ভাই ফেং-চোং-শিয়াং-এর সঙ্গে কিছু কিছু ব্যবসার লেন-দেন আছে। একদিন ওদের বাড়ীতে গিয়েই আলাপ হোলো। টিং-লিং অদ্ভুত মেয়ে," জিভ দিয়ে ওপরের ঠোঁট, নিচের ঠোঁট চেটে নিলো যোগীন্দার সিং, বলে গেল, "জানোই তো, আমি খুব সিরিয়াস টাইপ-এর ছেলে নই। আমি চাই টাকা, আমি চাই ভালো ভালো মেয়ে-বন্ধু, আমি চাই ভালো বিয়ার, ভালো স্কচ হুইস্কি—ব্যস, এতেই আমি সুখী। অনীতার জন্যে সব চাইতে ভালো লাহিড়ীরা, যারা ছোটোখাটো চাকরী করবে, ছোটো খাটো ফ্ল্যাটে সুখে ঘর করবে। আমি অন্য রকম। আই ওয়াণ্ট ফান্ ফান্, এ্যাণ্ড নাথিং বাট ফান্।"

যোগীন্দার উঠে দাঁড়ালো।

হাত বাড়িয়ে আমার হাত নিষ্পেষিত করে করমর্দন করলো, বললো, "ওয়েল রঞ্জন। তুমি একটি ফাইন ফেলো। তোমায় আমার বেশ লাগছে। আমি ইতিমধ্যে একদিন টিং-লিং কে নিয়ে বেরোচ্ছি। তুমি আসবে নাকি? যদি আসো তো আরো একটি মেয়েকে বলবো সো দ্যাট শী মে কীপ ইউ কাম্পেনি। গিভ মি এ রিং টু মরো, আমি ডেট ফিক্স আপ করবো। ও-কে, বাই বাই।"

যোগীন্দার সিং যখন চলে গেল, তখন লাইট হাউস বার-এ অনেক মেয়েপুরুষের ভীড়, বাইরের পথে অনেক আলো, আর বন্ধ জানালার ওপারে অনেক দূরে নিথর নীল আকাশে লাল-নীল-সবুজ নিওন সাইনের ঝাপসা আভাস।

যোগীন্দার যে বলেছিলো চীনে-পাড়ায় জুতো পাওয়া যায় খুব সস্তায়, সে কথা মনে ছিলো। ভাবলাম, সৌখিন দোকানে অর্ডার দিয়ে তৈরী করানো জুতো তো অনেক পরেছি, এবার চীনে পাড়ার জুতো চেষ্টা করে দেখা যাক। যোগীন্দারের পায়ে যে জুতো দেখেছি, সে রকম জুতো সস্তা হয় তো নিউ মার্কেট বা কলেজ স্ট্রীট বা ভবানীপুর থেকে জুতো কেনার কোনো মানেই হয় না।

এক দিন জুতোর খোঁজে হাঁটছিলাম বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট ধরে। হঠাৎ দেখি, একটি দোকানে দিলীপ বসে আছে।

আমায় দেখে সে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে। রাস্তায় নেমে এ পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, "সিগারেট আছে?"

"হ্যাঁ।"

"দে একটা, তারপর, এদিন তোর দেখা নেই কেন? এখানে কি করছিস?"

আমার বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট অভিযানের কারণ ব্যক্ত করলাম।

"ও, জুতো কিনবি? বেশ তো," বললো দিলীপ; বলে কি যেন ভাবলো। তার পর জিজ্ঞেস করলো, "কতো টাকার মধ্যে চাস?"

"এই টাকা পনেরোর মধ্যে—।"

"দে আমায় পোনেরো টাকা—।"

"আগে জুতো তো পছন্দ করি—."

"টাকাটা আমায় দে না! আমি তোকে তিরিশ টাকার জুতো পোনেরো টাকায় কিনে দেবো। টাকাটা তোর কাছে থাকলে তোকে এরা পাঁচ টাকার জুতো পোনেরো টাকায় ঠকিয়ে দেবে।"

"যোগীন্দার সিং বলেছিলো:—"

"যোগীন্দারের কথা বিজ্ঞজনেরা ধর্তব্যের বাইরে বলেই মনে করে। ও নিশ্চয়ই তোকে চি-শিউ-চিং'এর দোকান থেকে কিনতে

লছে। ওই সিং-কুল-কলঙ্ক প্রবঞ্চকের কথা বাদ দে। সে শিউ-
ং'এর কাছে কমিশন খায়। ওদের এখনো চিনিস না? কমিশন
াড়া ওরা মানব জীবনের অন্য কোনো জীবন-দর্শন ভাবতেই পারে
া। তুই আয় আমার সঙ্গে। এটি আহ্-তং'এর দোকান। এ
ামার অনেক দিনের বন্ধু।"

"কোন আহ্-তং, দিলীপ দা? সেই যে সেদিন রাত্তিরে ট্যাংরা
গয়েছিলে এর খোঁজে—"

"হ্যাঁ রে। সে-ই। এর ভাই আহ্-কিম্'র সেদিন মাথা
ফেটেছিলো। আয়, ভেতরে আয়। না, না, আগে টাকা পনেরোটা
দে। ওদের সামনে দিলে ওরা কি মনে করবে।"

দোকানের ভেতরে উঠে এলাম আমরা দু'জন।

বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের চীনেম্যানের সাদাসিধে জুতোর দোকান।
কানো রকম সাজসজ্জার বাহার নেই। দিনের বেলা আলো
জ্বলছে। এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়াল পর্যন্ত ঝোলানো
াড়িগুলো থেকে ঝুলছে সারি সারি বুট জুতো, ক্যাম্বিসের
ও, কাবলি আর পামশু। কালো চামড়ার, লাল চামড়ার,
লাল-সাদা কম্বিনেশানের, সাদা সুয়েডের, কালো সুয়েডের,
বাদামী সুয়েডের। দেওয়ালের দু'পাশে দুটো লম্বা বেঞ্চি।
ঘরের ভেতর একটি বাচ্চা ছেলে ট্রাইসাইকেল চালাচ্ছে, আর
হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে আরো বাচ্চা একটি মেয়ে। ভারী ফরসা,
ভারী ফুটফুটে মিষ্টি দেখতে, সোজা সোজা কালো কালো চুল, নাক
তো নেই-ই, চোখ দুটোও প্রায় নেই বললেই হয়।

দরজায় বসে এক এদেশী মুসলমান—দোকানদারের এসিষ্ট্যাণ্ট।
পথের লোকজনকে এক নাগাড়ে ডেকেই চলেছে—এই যে স্যর, কী চাই
বলুন না স্যর, প্রায় মাগনা দিচ্ছি স্যর, না লিবেন তো না লিবেন,
একবার এস দেখে লিন। ক্যা মাংতে হো ভাই সাহাব, আও না
জী। আইয়ে, আইয়ে সর্দারজী, বহুত বঢ়িয়া চপ্পল মিলেঙ্গে।
হোয়াট মিষ্টার, গুড মোকাসিন? কাম ইন এ্যাণ্ড লুক, দেন বাই,
মাগনায় দিচ্ছি স্যর, লিয়ে যান, লিয়ে যান,

যতো সোরগোল, সবই কিন্তু বাইরে। দোকানের ভেতর
নিস্তব্ধ প্রশান্তি, সুদূর প্রাচ্যের বৌদ্ধ মন্দিরের মতো। কাউণ্টারের
ওপাশে একজন জুতোয় রং দিচ্ছে। এক কোণে একটি মেয়ে বসে
মেশিনে চামড়া সেলাই করছে। কাউণ্টারের পেছনে একটি পাতলা
পর্দা ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ। আবছা দেখা যায় তার পেছনে
একটি মেয়ে কাঠের চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

"আহ্-তং! আহ্-তং!" দিলীপ হাঁক ছাড়লো।

পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একজন, তার গায়ে ধবধবে
ফরসা গেঞ্জি, পরনে ফরসা খাকি হাফপ্যাণ্ট, পায়ে কাঠের খড়ম,
কোমরে বাঁধা লংক্লথের আধময়লা এপ্রন? এক হাতে একটি জুতো,
অন্য হাতে জুতার ল্যাস্। পাট করে আঁচড়ানো চুল, ধবধবে ফরসা
রং, মুখে সোনালী-ঝিলিক-মারা হাসি।

"আহ্-তং, এ আমার বন্ধু রঞ্জন, জুতো কিনতে এসেছে'।"

আহ্-তং হাসি মুখে বেঞ্চিটা দেখিয়ে দিলো।

সে অল্প কথার মানুষ। জিজ্ঞেস করলো পরিষ্কার বাংলাতেই,
"কি রকম জুতো চাই"?

"ব্রাউন শু, ডাবাটা সোল হলেই ভালো হয়।"

"হ্যাঁ, হবে।" পায়ের দিকে তাকিয়ে মাপটা স্থির করে নিলো
সে। তার পর চট করে উপর থেকে দু' তিন জোড়া পেড়ে নিলো।
দু-এক জোড়া পরে দেখতে পায়ের সাইজ মতো পাওয়া গেল।

"কতো দাম?"

"আঠারো টাকা।"

"আঠারো টাকা? কী যে বলো আহ্-তং! আঠারো টাকায়
শিউ-চিং তিন জোড়া জুতো দেয়," দিলীপ বললো।

"শিউ-চিং পিচবোর্ডের জুতো দেয়। আহ্-তং দেয় না। তুমি
চায় তো আমি আঠারো টাকায় আঠারো জোড়া পিচবোর্ডের জুতো
দেবে। চামড়ার জুতো হলে আঠারো টাকায় এক জোড়া।"

"আহ্-তং, রঞ্জন আমার বন্ধু।"

"দিলীপ বাবু, বিজনেস ইজ বিজনেস।"

"না, আহ্-তং, এ জুতো পাঁচ টাকা জোড়া।"

"বাবু কী বলছি। হিঃ হিঃ—" হাসলো আহ্-তং, "আচ্ছা,
বাবুর বন্ধু, তাই পনেরো টাকা।"

"না, পাঁচ টাকা।"

আমি দিলীপকে আস্তে আস্তে বললাম, "দিলীপ দা, ফর ফিফটিন,
এটা খুব চীপ।"

"শাট আপ," বললো দিলীপ, "আহ্-তং, তুমি আমার ফ্রেণ্ড।
রঞ্জন আমার ফ্রেণ্ড। তাই এ জুতো ছ'টাকা।"

"না বাবু, তেরো টাকার কমে হবে না।"

"সাত টাকার বেশি এক পয়সাও দেবো না।"

"আচ্ছা, বারো টাকা দিয়ে দিন।"

"আহ্-তং, তোমার জন্য আট টাকা। ব্যস।"

"আমার প্রফিট কোথায় বাবু?"

"কেন, পাঁচ টাকা কষ্ট, তিন টাকা প্রফিট—।"

"আচ্ছা, আট আনা পয়সা বেশি দিন—।"

"ঠিক আছে", আমি বললাম। আট টাকা আট আনায় এ
জুতো, ভাবাই যায় না।

দিলীপ একবার আমার দিকে তাকালো। তারপর পকেট
থেকে বার করলো দশ টাকার নোট। ভাঙতিটা ফেরত নিয়ে
আবার নিজের পকেটেই পুরলো।

তার পর আমার মুখের ভাব দেখে বললো, "তুই তো পোনেরো
টাকা খরচা করবার জন্যে রাজী ছিলি। এ টাকাটা আমার কমিশন
হয় তা'হলে। তবে তুই আমার ভায়ের মতো। তোর কাছ থেকে
মার্জিন মেরে কী হবে। এ টাকা ধার বলেই নিলাম, পরে
ফেরত পাবি।"

আহ্-তং জুতো-জোড়া আরেক জন অল্পবয়েসী চীনের হাতে
দিলো। সে একজোড়া সুকতলি আর আঠার বোতল নিয়ে বসলো।

আহ্-তং বললো "দিলীপ বাবু, তোমার বন্ধু চা খাবে?"

"আলবৎ খাবে। আমিও খাবো।"

আহ্-তং চীনা ভাষায় পর্দার অন্তরালবর্তিনীকে কি যেন বললো।
দেখলাম অন্তরালবর্তিনী এক কোণে একটি ষ্টোভের উপর একটি
কেতলি চাপিয়ে দিলো।

আহ্-তং একবার ভেতরে যেতে আমি দিলীপকে বললাম, "কী
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর! এরা খুব খাটে, না?"

"হাঁ। খুব। সারা দিন খাটে," দিলীপ উত্তর দিলে, "এখন তো দেখছিস গেঞ্জি আর হাফপ্যাণ্ট পরে বসে আছে। সন্ধ্যের পর দেখবি শার্কস্কিনের প্যাণ্ট আর নাইলনের হাওয়াইআন শার্ট পরে মেট্রোতে সিনেমা দেখছে।"

আহ-তং জুতোর কালি আর বুরুশ নিয়ে বেরিয়ে এলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার ভাই এখন কেমন আছে, [illegible]?"

আহ-তং একবার আমার দিকে, একবার দিলীপের দিকে তাকিয়ে বললো, "আমার ভাই ভালোই আছে। ও আসবে [illegible]। তুমি ওখানে [illegible] নাকি?"

"[illegible] হয়েছে [illegible]।"

"[illegible] খুব [illegible] লোক। বুড়ো ওয়াংকে দেখেছো?"

"না, ওঁকে দেখিনি—।"

"একদিন ওকে দেখে এসো। খুব ভালো লোক। অনেক জানে। অনেক দেখেছে। ওরও দিন ছিলো।"

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো আরেক জন তরুণ চীনে। পরনে হাফশার্ট আর প্যাণ্ট। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

দিলীপ আলাপ করিয়ে দিলো। আহ-তং'এর ভাই আহ-কিম।

আমি বাংলায় কথা বলতে সে ইংরেজিতে বললো, "আমি বাংলা বুঝি কিন্তু বলতে পারি না। আমাদের মধ্যে শুধু 'দাই-কো' (বড়দা) বাংলা জানে।"

এমন সময় ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ট্রাউজার আর জ্যাকেট-পরা চীনে মহিলা। অতি সাধারণ চেহারা, গেরস্থঘরের মেয়েদের মতো স্নিগ্ধ।

আহ-কিম বললো, "আমার দাই-সাও।" অর্থাৎ বড়বৌদি।

আহ-তং'এর বৌ আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমরাও একটু হাসলাম। আমাদের চা দিয়ে সে ভেতরে চলে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে দেখি, ঠিক বাঙালী বাড়ির চা,—দুধ, চিনি মেশানো। শুধু একটু বেশী পাতলা।

"দেশের কি খবর," আহ-কিমকে জিজ্ঞেস করলাম।

"বেশ ভালোই," আহ-কিম উত্তর দিলো, "যুদ্ধ চলছে, কিন্তু খবর ভালোই।" উত্তর দিতে গিয়ে আহ-কিমের মুখ জ্বলজ্বল করে উঠলো।

"এঁদের খুব আগ্রহ তোমাদের সম্বন্ধে জানবার জন্যে", দিলীপ বললো।

"জানবার বেশী কিছু নেই," আহ-তং হেসে বললো, "সারা দিন খাটি, আঠারো টাকার জুতো আট টাকায় বেচি, আর যা কামাই তাতেই খুশি হয়ে দিন চালাই। এমনি চলছে, এমনিই চলবে।"

"জানবার অনেক আছে," আহ-কিম বললো, "আমার একটি লণ্ড্রি আছে বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের ওদিকে। ওয়াং'দের মেয়ে মিলি আমার দোকান দেখা-শোনা করে। সে খুব ভালো মেয়ে। তবে আমার দাই-সাওর মতো অতো ভালো এখনো হয়ে উঠতে পারেনি। পরে হবে।"

আহ-কিম আর আহ-তং দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে জোরে হাসলো। আহ-তং তাদের ভাষায় চেঁচিয়ে কি যেন বললো পর্দার ওপারে তার বৌকে। তার বৌয়ের হাসিও শোনা গেল।

আহ-কিম বললো, "আমার দাই-কোর তিনটি ছেলে, দু'টি মেয়ে।"

আহ-তং বললো, "আরো একটি শীগগিরই হবে।"

দু'ভাই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আরো জোরে জোরে হাসলো।

আহ-তং আমার দিকে ফিরে বললো, "এর বেশী জানাবার নেই।"

"আহ-কিম বললো," এমনি করে আমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে একটু একটু করে জানলে আমাদের [illegible] সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবে।"

[illegible] বলছিলাম।"

আহ-কিম উত্তর দিলো, "[illegible] সম্বন্ধে [illegible] কি হবে। [illegible] তাও' এর ছেলে [illegible]' এর কথা [illegible], যাকে ফুকিয়েন প্রদেশের লোক এখনো ভোলেনি। হাঁ, [illegible]। ছেলে-বেলায় তার আত্মীয়রা তাকে [illegible] থেকে নিয়ে গেল [illegible]। সেখানেই বড়ো হোলো সে। তার পর [illegible] কী নাম ডাক। ছিয়াশী খান জাঙ্কের মালিক। দক্ষিণ চীন সমুদ্রের জাহাজের কাপ্তেনরা তার নাম শুনলে থরথর করে কাঁপতো। আময়, ফুকিয়েনের সমুদ্র-তীরের লোকেরা তাকে প্রাদেশিক শাসনকর্তার চাইতেও বেশী মানতো। আর তেমনি ছিলো তার ছেলে [illegible]। বাপে ছেলেতে মিলে বিদেশী শোষকদের কতো জাহাজ লুঠ করেছে ওরা। কিন্তু দেশের লোকের কোনো ক্ষতি কোনো দিন করেনি। আর সম্রাটের লোকেরা বিদেশী শোষকদের প্ররোচনায় বার বার তাদের ধরতে চেয়েছে, বিদেশীদের হাতে ধরিয়ে দিতে চেয়েছে। ১৮৩৮ এ ক্যাণ্টনের দক্ষিণে এক ওলন্দাজ জাহাজের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় ওদের কামানের গোলায় ডুবে যায় চিয়েন-চুং' এর জাঙ্ক। সে সাঁতরে তীরে গিয়ে ওঠে। আর বিদেশীদের কুকুর ক্যাণ্টনের শাসনকর্তার লোকেরা তাকে গ্রেপ্তার করে কোতল করে, কোনো বিচার না করেই।"

বলতে বলতে লাল হয়ে উঠলো আহ-কিমের মুখ। সে বলে গেল না থেমেই, "কিন্তু বছর দুয়েক পর ১৮৪০ এ যখন ওপিয়াম ওয়ার বাধলো, বাপ তার প্রতিহিংসা ভুলে গেল। তখন দেশ বড়ো। সে তার জাঙ্কের বহর নিয়ে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বৃটিশ জাহাজ আক্রমণ করে বেড়াতে লাগলো। তার পর একদিন যুদ্ধের সময় এক বৃটিশ জাহাজের কামানের গোলার ঘায়ে সে মারা যায়। সে খবর যেদিন সমুদ্রতীরের প্রদেশগুলোর লোকেরা শোনে, সবাই চোখের জল ফেলেছিলো তার জন্যে। এই [illegible]' কেই বিদেশী বর্বরেরা নাম দিয়েছিলো the terror of the China seas."

"সে কোনো দিন কলকাতায় আসে নি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি যদ্দূর জানি আসেনি," উত্তর দিলো আহ-কিম। "কিন্তু সে মারা যাওয়ার পর তার ছোটো ছেলে [illegible] চিকাও কলকাতায় চলে এসেছিলো; কারণ তাকে ধরতে পারলে চীন সরকার তাকেও কোতল করতো। তার তখন খুব অল্প বয়েস। বছর বারো এরকম হবে। সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য শহরগুলিও তার পক্ষে নিরাপদ ছিলো না। কারণ সে সব জায়গায় তার বাবার অনেক শত্রু। তাই তার বাবার বন্ধুরা তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। এখানে ওদের কিছু আত্মীয়স্বজন ছিলো।"

"সে-ও কি পরে বাপের মতো হয়েছিলো নাকি ?"

"না." বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়লো আহ-কিম, "সে ছিলো এক বিখ্যাত বারাঙ্গনার রাঁধুনী।"

"কার জানো ?" দিলীপ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "আমেলিয়া বিবির, যার গল্প সেদিন করছিলাম—।"

"যার নামে বিবি আমেলিয়া লেন," বলে গেল আহ্-কিম, "সেই বিবি আমেলিয়ার রাঁধুনী ছিলো ফেং-চি-আও। আমেলিয়া বিবি চীনা খাবার ভীষণ ভালবাসতো। আর খুব ভালো রান্না করতো চি-আও। তাই সে আমেলিয়া বিবির খুব পেয়ারের লোক ছিলো। হাঁ, রান্না করা সে-ও খুব জ্ঞানী লোকের কাজ। কিন্তু ফেং-পাও-তুং'এর ছেলে ফেং-চি-আও কলকাতার এক নামী বিবিজানের পেয়ারের রাঁধুনী, সে ভাবা যায় না।"

"কিন্তু এই চি-আও হোলো ফেং-তুং-মিং'এর বাবা, সে কথা ভুলে যেও না," মনে করিয়ে দিলো আহ-তুং।

"ফেং-তুং-মিং কে ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ফেং-তুং-মিং ?" আহ-কিম'এর মুখ আবার ঝলমল করে উঠলো। ফেং-তুং-মিং ছিলো এই কলকাতার চায়না টাউনের রাজা। সিপাই বিদ্রোহের কিছু পরে জন্মেছিলো সে, মারা গেছে ১৯০১-এ। গত শতাব্দীর শেষ পঁচিশটা বছর সেই ছিলো চায়না টাউনের আইন, সেই ছিলো আদালত, সেই ছিলো সব। ও রকম লোক আর হবে না।"

আহ-তুং বললো, "না হলে ভালো। সবাই হোক শুধু আমার মতো, আমার বৌয়ের মতো, তোমার মতো, এদের মতো। খাটবে, রোজগার করবে, ফূর্তি করবে, বিয়ে করবে, ছেলে-মেয়ে মানুষ করবে, বুড়ো হয়ে সুখে মরবে। ব্যস। এনাফ।"

"হাই-লো। হাই-লো," বললো আহ-কিম। তখন বুঝিনি! পরে দিলীপের মুখে শুনেছিলাম "হাই-লো" মানে "হ্যাঁ, ঠিকই।"

"হাই-লো। হাই-লো," বললো আহ-কিম তার দাই-লো'র কথা শুনে। তার পর চলে গেল আমাদের দিকে ফিরে, "আর মজার কথা কি জানো ? তুং-মিং'এর বাবা চি-আও ছিলো ইহুদী বারাঙ্গনা আমেলিয়া বিবির রাঁধুনী! আর তুং-মিং ছিলো আমেলিয়ার মেয়ে কলকাতার বিখ্যাত সুন্দরী রেবেকা বিবির—কি বলবো ? স্বামী নয়, বিয়ে হয়নি ওদের—রেবেকা বিবির প্রভু। তখনকার দিনে রেবেকা বিবি আর ফেং-তুং-মিংই এই অঞ্চল চালাতো। ইংরেজের আইন, ইংরেজের পুলিশ এখানে ঢুকতো না। আর তাকে কী খাতির করতো ইংরেজরা। সেও ছিলো দক্ষিণ-চীন সমুদ্রের এক দস্যু। তার মাথার উপর পুরস্কার ঘোষণা করেছিলো চীন সরকার। আফ্রিমের কোন একটা যুদ্ধের সময় ইংরেজদের সাহায্য করে সে তাদের খুব প্রিয়পাত্র হয়। এতো বড়ো একজন ক্রিমিন্যাল আর র‍্যাকেটিয়ার কলকাতায় জন্মায় নি। আফিং, কোকেন ইত্যাদির চোরা কারবারে যে রকম অজস্র টাকা রোজগার করে গেছে, তেমনি অজস্র টাকা দানও করে গেছে।"

"এই তুং-মিং আর রেবেকা বিবির মেয়ে হোলো জুলিয়ানা." দিলীপ আমার দিকে ফিরে বললো, "তবে সে নামে তাকে কেউ চেনে না। কলকাতার রসিক সমাজে তার নাম জুলেখাবাঈ।"

জুলেখাবাঈ! পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার কলকাতায় সব চেয়ে নামকরা বাঈজী!

ওরকম ঠুংরি নাকি আজকাল আর কেউ গায় না। বড়ো বড়ো রাজা-মহারাজা নবাবদের বাড়িতে তো বটেই, লাট বড় লাটের প্রাসাদেও নাকি তার মুজরার আমন্ত্রণ আসতো। পুরোনো দিনে তার রেকর্ডের বিক্রি ছিল খুব, আজকাল আর পাওয়া যায় না। নানা রকম কিংবদন্তী ছিলো তার সম্বন্ধে, সাধারণ লোকে জানতো না সে কোন জাতের মেয়ে। কেউ বলতো, সে কাশ্মীরী, কেউ বলতো সে ইহুদী, কেউ বলতো সে আর্মানী। তার পর একদিন হঠাৎ সে চলে গেল কলকাতা ছেড়ে। কোথায় গেল কেউ জানলো না।

সেই জুলেখাবাঈ? দিলীপের দিকে তাকালাম। সে একটু হাসলো।

এতক্ষণ তীব্র বেগে আমার নতুন জুতো-জোড়াটা পালিশ করছিলো আহ-তুং। সেটা শেষ করে বাক্সে মুড়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে-ছেঁদে আমায় এনে দিলো।

দেখলাম তার মুখ হাসিতে ঝলমলো, কপালে ঘামে চিক-চিক করছে। [ক্রমশঃ।

বৈশাখ-বন্দনা

শেফালি সেনগুপ্তা

রুদ্রতেজ-বহ্নি ভালে মধ্যাহ্নের সূর্য্যের মতন
ঋতুচক্র আবর্ত্তিয়া বর্ষে বর্ষে তব আগমন
হে বৈশাখ, এই ধরাতলে। পত্র-ঝরা চৈত্রের শেষে
বসন্তের আমন্ত্রর অন্তিম বাতাসে—
বার্ত্তা বহি নব-বরষের শুনালে তোমার গান
ওগো সুন্দর! বাণীভরা কণ্ঠ তব চির-অম্লান।
ওগো সর্বত্যাগী! নিঃস্ব মহাযোগী,
নিখিল জনতা হিয়া এক কণা আশ্বাসের লাগি,
চেয়ে আছে তব মুখপানে। তাহাদের রিক্ত চিত্ত যত
মুহূর্ত্তে লভুক শক্তি মহাবীর ক্ষত্রিয়ের মতো
তোমার নবীন মন্ত্রে। প্রলয়ের মত্ত কলরোলে
দিগন্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রুক্ষঝরা ঈশানের কোলে
ওঠ তুমি জেগে। বজ্ররবে পূর্ণ করি নিখিল ভুবন,
জাগো জাগো রণবীর ভীষণ নূতন!
এ ধরার যত দুঃখ পুঞ্জ-পুঞ্জ যত অত্যাচার,
কঠোর কঠিন হাতে তুমি তার করো সংহার।
এখানে দেখ না চেয়ে কত দৈন্য কত হতাশ্বাস,
বঞ্চিতের পীড়িতের নিবিড় বেদনাঘন নিষ্ফল প্রয়াস
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে সঞ্চয়। কত প্রাণ ব্যর্থ হাহাকারে
ডুবিতেছে মরণের ঘন অন্ধকারে।
এই জরা-জীর্ণ তার ভয় করি জ্বালো
শূন্যগর্ভ মর্মমূলে জীবনের আলো!
নবীন সৃষ্টির প্রয়োজনে, হের জ্বলে যজ্ঞশিখা
নব-বরষের। স্বর্ণ-বর্ণ পূত সেই জ্যোতির্লেখা
মাঝে, প্রাক্তন যত গ্লানি হয়ে অপগত,
হে বৈশাখ! আসন্ন তোমার উৎসবে ধরাতল হোক মুখরিত।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জরাসন্ধ

স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীকে আবার পেয়ে বসল তার সেই আগের দিনের ছুটো নেশা—আড্ডা আর তামাকপাতা। প্রথমটার জন্যে সাধারণ ওয়ার্ডে যাওয়া দরকার, আর দ্বিতীয়টার জন্যে চাই রাণীবালার অনুগ্রহ। সে দাক্ষিণ্য লাভ করতে হলে কিঞ্চিৎ দক্ষিণার প্রয়োজন। সেটা যোগাবার মত গোপন সঞ্চয় বুড়ীর তখনো শেষ হয়ে যায়নি। ইদানীং হেনার কাছে সে ঘন ঘন ছুটির আব্দার জানাত, এবং মঞ্জুরও করিয়ে নিত। আসল ব্যাপারটা হেনার অজানা ছিল না। মাঝে মাঝে বলত, বুড়ো হয়েছ; এবার ঐ বদ নেশাগুলো ছাড় তো দেখি। ফোকলা দাঁতে এক-গাল হেসে বুড়ী একেবারে আকাশ থেকে পড়ত—কী যে বল দিদিমণি, এই তোমাকে ছুঁয়ে দিব্যি করে বলছি, নেশা টেশা ক'বে ছেড়ে দিয়েছি। ও-সব ছাই আর খাই না। ঐ কালীর মা মানুষটা বড় ভালো। ছু-চারটা সুখ-ছুঃখের কথা ও-ও কয়, আমিও কই। মনটা একটু ভুলে থাকে, এই আর কি!

হেনার সঙ্গে বুড়ীর বিচিত্র সম্পর্ক। রোগশয্যায় মা, সুস্থ অবস্থায় দিদিমণি।

আজ সে ছুপুরের দিকেই বেরিয়ে পড়েছিল। একটা সেলাই হাতে করে নিজের মনের মধ্যে ডুবে ছিল হেনা। সমস্তটা দিন কখন গড়িয়ে গেছে, টের পায় নি। হঠাৎ জলো হাওয়া গায়ে লাগতেই জানালা দিয়ে দেখল, কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। বৃষ্টি আসন্ন। বুড়ীর জন্য চিন্তা হল। বুকের দোষ এখনো কাটেনি। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গেলে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। দেখতে দেখতে বড় বড় জলের ফোঁটা পড়তে সুরু করল। ডেকে আনতে যাবে কি না ভাবছে, এমন সময় দরজায় সাড়া পেয়ে সেদিকে না তাকিয়েই বলল হ্যাঁ, বেশ করে ভেজে এবার পড়লে আমি আর টানতে পারবো না বলে দিচ্ছি।

—না টানলে যাবো কোথায়?

হেনা চমকে উঠল, ও মা, তুই! বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ?

—কী করবো, তুমি তো আর খোঁজ-খবর নেবে না। তাই, আমিই এলাম।

—খোঁজ নিয়ে লাভ? আমার কথা তো আর শুনবি না? ডাক্তার এসে ফিরে গেলেন একবার। দেখা পর্যন্ত করলি না!

—বাঃ, ভালো হয়ে গেছি যে। এই ত্যাখ না, বলে কমলা তার সেদিকে আড় চোখে একবার তাকিয়ে হেনা বলল, ভালো হওয়ার কী একখানা নমুনা!

—যাকগে ও-সব বাজে কথা, হেনার খাটের উপর বসে পড়ে বলল কমলা। তোমার ঐ বই থেকে একটা গল্প-টল্প পড়, শুনি। হেনা সেলাইটা জড়িয়ে রাখতে রাখতে বলল, না; আজ তোর গল্প শুনবো।

—আমার গল্প!

—হ্যাঁ; তোর নিজের গল্প। সেদিন যে শোনাবে বলেছিলি?

—ও—ও হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ। সে-সব কাহিনী ঠিক গল্পেরই মত। গুছিয়ে লিখতে পারলে তোমার ঐ নামজাদা লেখকদের বানানো গল্পের চেয়ে মন্দ হবে না। কিন্তু আমি তো আর একজন লেখিকা নই। শেষ পর্যন্ত তোমার ধৈর্য থাকবে কি না, তাই ভাবছি।

—বেশ তো; পরীক্ষাটা হয়ে যাক।

অশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে। অনেক দিন অনাবৃষ্টির পরে এই বহু-আকাঙ্ক্ষিত বর্ষণ। এরই জন্যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করেছে তৃষিত পৃথিবী। গাছপালার পাতায় পাতায় সদ্য স্নানের আনন্দ। ভিজে মাটির মিষ্টি গন্ধে চারদিক ভরপুর। জানালা দিয়ে একটু একটু ছাট আসছিল। কিন্তু ছু'জনের কারুরই সেদিকে খেয়াল নেই। অনেকক্ষণ নিষ্পলক চোখে বাগানের দিকে চেয়ে রইল কমলা। তারপর মৃদু কণ্ঠে সুরু করল তার কাহিনী:—

বাপ-মায়ের শেষ বয়সের সন্তান আমি। ভাই বোন কেউ নেই। হবার যখন আর আশা নেই, মা তাঁর এক বিধবা জ্ঞাতি-বোনের একটি মেয়েকে কাছে রেখে মানুষ করেছিলেন। আমি জন্মাবার আগেই আমার সেই মাসী মারা গেলেন। দিদি মার কাছেই রয়ে গেল। তার যখন বিয়ে হল, আমার বয়স বোধ হয় বছর ছয়েক হবে। ভালো করে মনেও পড়ে না। তারপরই বাবা অবসর নিলেন। ইস্কুল-মাষ্টার ছিলেন। সামান্য পুঁজিতে সংসার চলে না। তাই ছেলে পড়াতে হত। কারো বাড়ি গিয়ে পড়াতেন না, ছেলেরাই আসত ওঁর কাছে। উনি পড়াতেন; আমি পাশে বসে থাকতাম। একটু বড় হলে সকলের দেখাদেখি আমি সুরু করলাম। ছাত্রেরা চলে গেলে বাবা আমাকে নিয়ে বসতেন। বাবার সঙ্গে খাই, বাবার হাত ধরে বেড়াতে যাই, তাঁর পাশে শুয়ে গল্প শুনি।

বাপের অতখানি সঙ্গ বোধ হয় কোনো মেয়েই পায় না, অতটা আদরগুলা। মাকে বড় একটা কাছে পাইনি। আমার বিয়ের ভাবনার আড়ালেই যেন তার সব স্নেহ, সব আদর চাপা পড়ে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই আমার বাড়ন্ত গড়ন। সেদিকে দেখতেন আর আপন মনে বলতেন, পোড়ারমুখী এলি, ক'টা বছর আগে এলি না কেন? বাবার বয়স বেড়ে যাচ্ছে, শরীর ভেঙে পড়ছে। আমাকে পার করবার আগেই পাছে তিনি চোখ বোজেন, এই ভয়ে মার চোখে ঘুম ছিল না।

দেখতে দেখতে আমি বড় হয়ে উঠলাম। বেশির ভাগ সময় পড়াশুনা নিয়েই থাকি। বাবার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই আমার উপরে পড়ত, কেউ কেউ আমার সঙ্গে। অঙ্কে আমার সঙ্গে প্রায়ই কেউ পেরে উঠত না। আমাকে দিয়ে ওদের হারিয়ে বাবা ভারী আমোদ পেতেন। কাউকে হয়তো একটা শক্ত অঙ্ক দিলেন। খানিকটা চেষ্টা করে যখন পারলো না, তার খাতাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, ছাখ তো কমল, তুমি পার কি না। আমি সহজেই করে দিতাম। আড়চোখে দেখতাম, ছেলেটার মুখ কালো হয়ে গেছে। খাতাটা আমার কাছে আসবে বলে কেউ কেউ আবার ইচ্ছা করে ভুল করতো। বাবা বুঝতেন না; আমি না বোঝবার ভাণ করতাম। যার খাতা, সে বুঝতো ভুলটুকু ঠিক জায়গায় ধরা পড়েছে। রোজ রোজ ভুল বেড়েই চলত, আর সেটা শুধরে দেবার বাড়তি কাজটুকু আমারও নেহাৎ মন্দ লাগত না।

নীরস অঙ্কের সঙ্গে একটু-আধটু সরস কাব্যের আমদানীও যে না হত, তা নয়। একদিন একটি ছেলের অঙ্কের খাতা দেখতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল কোণের দিকে ছোট্ট ছোট্ট করে লেখা—কমল, তোমার জন্যে আমার হৃদয় 'বিদির্ণ' হচ্ছে। আমি ঐ 'বিদির্ণ' শব্দটার নিচে একটা দাগ দিয়ে লিখে দিলাম, 'বানান ভুল'। এ সবই ছিল খেলা। কিন্তু খেলতে খেলতেই একদিন জড়িয়ে পড়লাম। সে যেদিন এল, সেদিনের কথাটা বেশ মনে আছে। বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। গায়ের রংটা চাপা। কিন্তু কী চমৎকার গড়ন! অনেকটা যেন তোমার মত।

হেনা হেসে উঠল, দূর; আমার মত কি রে?

কমলা একটু অপ্রতিভ সুরে বলল, মানে, ধর, তুমি যদি ব্যাটাছেলে হতে—

—ও, সেই জন্যেই বুঝি আমার ওপর এত টান?

—না দিদি, তোমার উপর টান আমার আগের জন্মের। তা না হলে এখানে এসে দুটোতে জুটলাম কী করে?

হেনা এ কথার কোনো উত্তর দিল না। কমলার একটা হাত সস্নেহে তুলে নিয়ে নিজের কোলের উপর রাখল।

কমলা ফিরে গেল তার গল্পে—সব চেয়ে সুন্দর ছিল ওর দু'খানা টানা টানা ভ্রূ। যেন তুলি দিয়ে আঁকা। এদিকে কিন্তু বেজায় গুণী লোক। দু-দু'বার ম্যাট্রিক ফেল করে বার বার তিন বার বলে ঝুলে পড়েছেন। বাপ বড় ব্যবসায়ী। ছেলে পাশ না করলে তাঁর মান থাকে না। টিউটর হিসাবে বাবার নাম ছিল। তাই এসে এক রকম ধর্ণা দিয়ে পড়ল, পাশ করিয়ে দিতেই হবে। তখন কি জানি, তারই হাত দিয়ে আসছে আমার মরণ-বাণ! বাবার এত ছাত্র। কাউকে দেখে কখনো এতটুকু সঙ্কোচ হয় নি। তারাই বরং আমাকে দেখে ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে গেছে। কিন্তু সে যেদিন প্রথম এসে বসল আমাদের বাইরের ঘরে, জানলা দিয়ে একবার চোখাচোখি হতেই পা দুটো আর টেনে তুলতে পারলুম না। বুকের ভেতর সে কী ঝড়! বাবার ডাকাডাকিতে কোনো রকমে আড়ষ্ট হয়ে তাঁর পাশটিতে গিয়ে বসলাম। কিন্তু মাথা তুলে চাইব, সে শক্তি রইল না।

অন্য সব বিষয়ে দু'-চারটা প্রশ্ন করে বাবা তাকে Algebra থেকে একটি অঙ্ক দিলেন। নিতান্ত সহজ অঙ্ক। খাতাটা খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে সে বলল, হল না, মাষ্টার মশাই! বাবা হেসে বললেন, হল না? আচ্ছা। হাত বাড়িয়ে খাতাটা নিলেন এবং এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। আমার হাত কাঁপতে লাগল। চোখের সামনে ঝাপসা হ'য়ে গেল অক্ষরগুলো। একটা ফরমুলাও মনে পড়ল না। এত দিন পরে আমার হার হল। তার কাছে হেরে গেলাম। শুধু হেরে গেলাম নয়, মনে মনে হার মানলাম। সেই প্রথম বুঝলাম, জীবনে হার মেনে কত সুখ।

সেই দিন থেকে বাবার ইস্কুলে পড়া আমার শেষ হল। কেউ ছাড়িয়ে দেয়নি। আমিই ছেড়ে এলাম। তুমি হাসছ, হেনাদি'! কিন্তু সেদিন যদি দেখতে আমার অবস্থা, তোমার দয়া হত। একটু দেখবার জন্যে, সামান্য একটা কথা শোনাবার জন্যে মনের সে কী কাঙালপণা! অথচ সামনে গিয়ে বসতে পারি না। তারও কি সেই দশা? তা না হলে এক ঘণ্টার পড়া হঠাৎ তিন ঘণ্টায় দাঁড়াল কেমন করে? কোত্থেকে এল এত মনোযোগ? লিখছে গ্রামারের প্রশ্ন, চোখ দুটো রয়েছে জানালায়। তার পাশ দিয়ে এ কাজে ও কাজে আমার যাবার-আসবার পথ। বাবা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন। হয়তো খুশীও হয়েছিলেন মনে মনে। প্রায়ই বলতেন, সনৎ ছেলেটি বড় ভালো। এত ছেলে পড়ালাম, এমন একটা প্রাণ আর চোখে পড়েনি। তার পর একদিন আড়ি পেতে শুনলাম খেতে বসে কথা হচ্ছে মার সঙ্গে। কী একটা কথার উত্তরে মা বলে উঠলেন, তুমি ক্ষেপেছ! ওরা হচ্ছে বড়লোক। ছেলে তোমার মেয়ের রূপ দেখে ভুলতে পারে, কিন্তু বাপ তোমার রূপো না পেলে ভুলবে না। সেই হিসেব করে তবে এগিয়ো।

কিন্তু হিসাব শেষ হল না। আমাদের হিসাব-নিকাশ ওলট-পালট করে দিয়ে হঠাৎ একদিন তিনি বিছানা নিলেন। আর উঠলো না। আমাদের সম্বলের মধ্যে রইল গোটা কয়েক ঘটিবাটি বাক্স-প্যাটরা, আমার হাতে দু'গাছা হালকা চুড়ি, গলায় একটা সরু হার, সুটকেসের তলায় লুকিয়ে রাখা তার খানকয়েক চিঠি, যার মধ্যে উচ্ছ্বাস অনেক, ভরসা অতি সামান্য। তবু মাকে বলে কয়ে কিছু দিন অপেক্ষা করলাম, যদি কোনো ডাক আসে। তার পর একদিন জিনিষপত্তরগুলো বিক্রী করে সামান্য ক'টা টাকা হাতে নিয়ে কলকাতায় দিদির বাসায় গিয়ে উঠলাম।

বিয়ের পর সেই গোড়ার দিকে দু'-এক বার ছাড়া দিদি আমাদের বাড়িতে আর আসেনি। জামাইএর সঙ্গে বাবার সদ্ভাব ছিল না। আজ সব হারিয়ে যখন এসে তারই আশ্রয়ে উঠলাম, দিদির মুখ গম্ভীর হল। আমি ছিলাম মার পেছনে। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতেই এমন করে তাকিয়ে রইল, যেন ভূত দেখে ভয় পেয়েছে। পাশের ঘরে চলে গেলাম। শুনলাম, দিদি

বলছে, এখনো ঘরে পুরে রেখেছ! ওর দিকে তাকাও কেমন ক'রে? মা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, না তাকিয়ে কী করি, বল? উনি কি আমার কথা শুনতেন? জানো তো সবই। এবার এলাম তোমাদের আশ্রয়ে। বিনোদকে বলে যত শীগগির পার, যেমন তেমন একটা জুটিয়ে দাও। গলা দিয়ে আমার ভাত নামে না।

—আমি আর কী বলবো? বাড়ি আসুক; তুমিই বলো যা বলবার, বলে দিদি তার কাজে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই জামাই বাবুর গলা পেলাম। তখনই ফিরলেন। শাশুড়ীর একগাদা কথার উত্তরে শুকনো গলায় টেনে টেনে বললেন, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু যা' দিন-কাল পড়েছে…। তার পর এই তো দেখছেন, আড়াইখানা ঘর। আমাদেরই কুলোয় না।

—কী করবো, বাবা, বারান্দার কোণে পড়ে থাকলেও আমাদের থাকতে হবে। ঐ মেয়েটাকে নিয়েই, কমলা কোথায় গেলি? তোর জামাই বাবুকে প্রণাম করলি না?

বেরিয়ে এলাম। আমার ভগিনীপতির ভারী মুখখানা হঠাৎ ঝলমল করে উঠল। একগাল হেসে বললেন, বাঃ বেশ ডাগরটি হয়ে উঠেছে তো কমলা! এসো, এসো, লজ্জা কি! কী বলবো দিদি, মানুষের হাসি যে এত কুৎসিত, এই প্রথম দেখলাম। আর সেই দুটো চোখ যেন গিলে খেতে চাইছে। এক বার চেয়েই আপনা থেকে আমার চোখ নেমে এল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিউরে উঠল; ভয়ে নয়, ঘৃণায়। মনে পড়ল, এ চোখ কোথায় যেন দেখেছি। হাঁ, তখন আমার বয়স সবে সাত আট বছর। আমাদের বাড়ির পেছন দিকের বস্তীতে একটা লোক ছিল। তার নাম গণি মিঞা, অনেকগুলো মুরগী ছিল তার। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে খেলতে খেলতে ও দিকটায় গেলে দেখতাম, মুরগীর খদ্দের এসেছে গণি মিঞার। ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে পাখীগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে ঝুড়ি ভরে। একটা মুরগী ছিল। ভারী সুন্দর দেখতে, আর তেমনি নাদুস নুদুস। টগবগ করে চলত। আমরা বলতাম রাণী। এক দিন জিজ্ঞেস করলাম, ওটা বেচবে না? গণি মাথা নাড়ল। তার পর কান পর্যন্ত হাসি ছড়িয়ে বলল, দেখছ না খুকী, একেবারে তৈরি মাল। ওটা কি আর বেচা যায়? একটা পরব টরব আসুক, দু'চারজন মাতব্বর ডাকি, তার পর… বলে কী এক অদ্ভুত জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল সেই মুরগীটার দিকে। এত দিন পরে আমার জামাই বাবুর কপালের নিচে দেখলাম সেই গণি মিঞার চোখ। বুকের মধ্যে কেমন দুরু দুরু করে উঠল। মার ধমক খেয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে প্রণাম করলাম। উনি আমার কাঁধ দুটো ধরে একটু ঝাঁকানি দিলেন। সমস্ত শরীরটা গিন্-গিন্ করে উঠল।

কী সব ব্যবসা ছিল আমার ভগিনীপতির। সকালে চা-খাবার খেয়ে বেরিয়ে যান। বারোটা-একটায় আসেন। খেয়ে দেয়ে ঘুম। তার পর আবার বিকেলে বেরোন। ফিরতে সেই রাত বারোটা। কোনো কোনো রাতে নাকি একেবারেই ফেরেন না। থাকেন কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই দিদি ঘরে চলে গেল। আমি আসবার পর তাঁর এই রুটিন বদলে গেল। সকালে বেরোতে দেরি হয়। বিকেলে বেরোতেই চান না। সময় নেই, অসময় নেই। কমলা, এটা নিয়ে এসো, সেটা দিয়ে যাও। কাছে গেলে আদরের নাম করে যা আমাকে সইতে হয় মনে হলে আজও আমার গা পাক দিয়ে ওঠে। একলা কাছে যাওয়া এড়িয়ে চলি। কিন্তু সকলের সামনেও রেহাই নেই। এমন ভাব দেখান, যেন কচি খুকী আমি, আমাকে নিয়ে যা খুসী করা চলে। মা দেখেও দেখেন না। দিদি চুপ করে থাকে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ঐ সাপের মত হাত দুটো মুচড়ে ভেঙ্গে দিই। কিন্তু জানি, সেই সঙ্গে আমাদেরও কপাল ভাঙবে। শুধু, আমার হলে ক্ষতি ছিল না সেই সঙ্গে মারও। সে কথা ঐ লোকটার জানা আছে বলেই, আমাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিতে তার দ্বিধা নেই। বাধা দিতে দিতে শেষটায় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ভাবতে সুরু করলাম, আমার এ দেহটা যেন রক্ত-মাংসের নয়, পাথরের। পাথরের তো কোনো বোধশক্তি নেই, মান-অপমান, লজ্জা-সম্ভ্রমের বালাই নেই। আস্তে আস্তে আমিও যেন তেমনি পাথর হয়ে গেলাম।

একটা কথা ভেবে দেখেছ, দিদি? মেয়েমানুষের এই দেহটাই তার জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ; একটু বড় হবার পর থেকেই একে নিয়ে তার ভয়ভাবনার অন্ত নেই, একে নিয়ে তার পদে পদে বিপদ, পদে পদে লাঞ্ছনা। একে সামলে রাখা, আগলে রাখা, বাঁচিয়ে রাখা,—সেইটাই যেন তার সবচেয়ে বড় দায়। এর ওপরে সকলের খরদৃষ্টি, আপন, পর, মেয়ে পুরুষ, কার নয়? পুরুষের দেহটা হল তার সম্পদ, আর মেয়েমানুষের হল বোঝা। তাই পৃথিবীর সেই সুরু থেকে আজ পর্যন্ত বড় কিছুই সে করে উঠতে পারল না। এই বোঝা বয়ে বয়েই জীবন কেটে গেল।

এটা তোর রাগের কথা, মৃদু হেসে প্রতিবাদ করল হেনা। নিজেকে দিয়ে দেখছিস। কিন্তু তোর মত ঐ অবস্থায় ক'জন পড়ে?

—সে কথা ঠিক। আমার মত ভাগ্য আর ক'জনের? কিন্তু তাই বলে আমার আসল কথাটা রয়ে গেল। তুমি যাদের কথা বলছ, আমার দলে যারা পড়ে না, এই শরীরটাকে নিয়ে তাদেরও ঘুম নেই। সেও এক রকমের দায়। দেহকে গুটিয়ে রাখবার দায় নয়, ফুটিয়ে তোলার দায়। তাকে ঘষে মেজে, সাজিয়ে পরিয়ে, সাধুভাষায় যাকে বলে, রমণীয় লোভনীয় করবার কী আপ্রাণ সাধনা! তার জন্যে কত আয়োজন, কত উপকরণ; তার পেছনে কত সময়, কত অর্থ, কত পরিশ্রম। কই, পুরুষের তো সে বালাই নেই! তাই বলছিলাম, মেয়েমানুষ জাতটাই দেহ-সর্বস্ব।

—আচ্ছা, হয়েছে। বক্তৃতা রেখে এবার নিজের কথায় এস দিকিন।

বলে হেনা বালিসে ভর দিয়ে আরাম করে বসল। কমলা উঠে গিয়ে ঘরের কোণে ঢাকা-দেওয়া কলসী থেকে এক বাটি জল গড়িয়ে খেল। তার পর আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বলল, কতখানি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম, সেটা ভাল করে টের পেলাম, যেদিন এল আমার চরম সর্বনাশ। এমনি বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। দিদি হাসপাতালে। সেবারটা বোধ হয় তার পাঁচ বার। আগের চারটি আগেই গেছে। কোনোটা আঁতুরে, কোনোটা ক'দিন পরে। মা তার জামাইএর সঙ্গে মেয়েকে দেখতে গেছেন। সেখান থেকে আর কোথায় যেন যাবার কথা। একটা কী বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ জেগে উঠে দেখলাম, আমার ভগিনীপতি দরজার খিল এঁটে দিচ্ছেন। চেঁচাতে পারতাম বৈ কি? ফল হোক

আর না হোক, চেষ্টা তো করা যেত। কিন্তু চেষ্টা করি নি। যদি বল কেন, ঠিক উত্তর দিতে পারবো না। শুধু এই দেহটা নয়, মনটাও অসাড় হয়ে পড়েছিল। সত্যিই পাথর হয়ে গিয়েছিলাম।

মাকে বা দিদিকে মুখ ফুটে কিছু বলতে হয়নি। মাস দুই পরে সে কাজের ভার নিল আমার এই শরীর। দিদি এবার ফিরে এসেই বিছানা নিয়েছিল। সেখানে বসেই মা'তে মেয়েতে কী সব পরামর্শ চলল কয়েক দিন। তার পর একদিন। রাত বোধ হয় বারোটা একটা হবে। আমি আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ পাশ ফিরতে গিয়ে মার জায়গাটা ফাঁকা ঠেকতেই জেগে উঠলাম। ঠিক তখনই মা-ও ঘরে ঢুকলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন আমার পাশটিতে। তার পর বললেন, বিনোদকে তো অনেক বলে কয়ে রাজী করালাম। তোর দিদিরও মত আছে। তুই যেন আবার বাগড়া দিয়ে বসিস না।

ব্যাপারটা কী জানতে চাইলাম। মা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, শেষ কালে এই ছিল তোর কপালে! কিন্তু উপায় কি? বিয়ে ছাড়া এখন তো আর অন্য পথ নেই, মা!

মনে আছে, মা! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। আর কোনো কথাই বলতে পারিনি। তার পর প্রায় সমস্ত রাত ধরে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কত কী বলেছিলেন মা, তার একটা বর্ণও আমার মাথায় ঢোকে নি।

মা ঠিকই বলেছিলেন। এ ছাড়া আর আমার পথ কোথায়? জামাই বাবু যে রাজী হয়েছেন, সেইটাই তো আমার পরম ভাগ্য, আমিও যে রাজী, এইটুকু শুধু জানিয়ে দেওয়া। তাই হয়তো দিতাম কিন্তু সকালেই এমন একটা ঘটনা ঘটল, যাতে করে আমাদের সব ব্যবস্থা ভেস্তে গেল।

নীচে কাজ করছিলাম। ডাকঘরের পিওন এসে চিঠি দিয়ে চলে গেল। এমনি প্রায় রোজই দেয়। সব জামাই বাবুর চিঠি। মাকে বা আমাকে কেউ চিঠি লেখে না। ওদিকে আমার কোনো কৌতূহলও ছিল না। সে দিন কী মনে হল। একটা পুরানো বিস্কুটের টিন পেরেক দিয়ে দেয়ালে গাঁথা। সেইটাই চিঠির বাক্স। তার ভিতর থেকে চিঠিখানা তুলে দেখলাম। এ কি! এ যে আমার নাম। আর এ লেখা, এ-ও তো আমার ভুলবার নয়! চিঠিটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে ছুটে গেলাম উপরের ঘরে। দরজা বন্ধ করে খুলে ফেললাম খামখানা। বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছিল। কী জানি, যদি সে না হয়। ভাঁজ খুলতেই বুকটা ভরে উঠল।

মস্ত বড় চিঠি। প্রথম দিকে, এক পাতা জুড়ে, কী করে আমাকে খুঁজে পেল, তারই সব মজার কাহিনী। তার পর নতুন করে বলা সেই পুরানো দিনের রঙীন স্বপ্ন। শেষটুকু যেন শেষ হতে চায় না। বার বার করে পড়লাম,—জানো কমল, আজকের মত এমন করে আর কোনো দিন বুঝি নি, তোমাকে না পেলে আমার চলবে না। তোমাকে পাবার পথে সেদিন যে-সব বাধা ছিল, আজ তার কোনোটাই নেই। তুমিও যে বাঁধা পড় নি, সে-খবর আমি পেয়েছি। কিন্তু তোমার মন? সেখানে একটু জায়গা পাবো তো? প্রতি মুহূর্তে দিন গুণছি, কবে তোমার ডাক আসবে।

সেই দিনই জবাব দিলাম। লিখলাম, তোমার ডাক আসবে বলে আমিও যে কত দিন থেকে পা বাড়িয়ে আছি, সনৎদা'! বাঁধা পড়ি নি বটে, তবু ভয় হয়, যেখানে এসে পড়েছি, সেখান থেকে সবার সামনে দিয়ে তোমার কাছে যাবার সরল পথটা আমার খোলা নেই। তুমি এসো। যেমন করে পার, আমাকে বাঁচাও।

সনৎ কী বুঝেছিল, জানি না। ক'দিন পরেই আবার চিঠি এল—অমুক দিন, অমুক সময়ে তৈরি থেকো। তৈরি হয়েই ছিলাম। গভীর রাতে সনৎ এল ট্যাক্সি নিয়ে। হর্ণ শুনেই নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। মার ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ চোখ দুটো জলে ভরে গেল। তাড়াতাড়ি মুছে ফেললাম। আজ তো আমার কাঁদবার দিন নয়। একবার ভেবেছিলাম, মাকে সব জানিয়ে যাবো। সনতের হাতে মেয়ে দিতে হয়তো তার আপত্তি হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভরসা হয়নি। যদি ওঁরা রাজী না হন, যদি সব পথ বন্ধ হয়ে যায়? তাই রাত্রির অন্ধকারে পালিয়ে এলাম। সবাই জানল, কমলা কুলে কালি দিয়ে গেল, কমলা মরল। কিন্তু যে নরকে ছিলাম, তার চেয়ে মরণে ঝাঁপ দিয়েও সুখ। যদি বল, কলঙ্ক? যা পেলাম, তার কাছে সে কত তুচ্ছ!

সনতের পাশে বসে উঠলাম এসে তার কালীঘাটের বাসায়। সেখানে নিয়ে তুলল, বাড়ির মধ্যে সেইটাই সব চেয়ে ভাল ঘর। দামী আসবাব দিয়ে সাজানো। একবার চোখ বুলিয়েই বোঝা যায় তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একজনের হাতের কত যত্ন, তার মনের কত সাধ। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, এই তোমার ঘর। আজ শুধু তোমার। যদ্দিন দু'জনার না হচ্ছে, তদ্দিন এখানে আমার প্রবেশ নিষেধ। তার পর একটু হেসে গলা খাটো করে বলল, সেদিনের আর দেরি নেই।

পরদিন সত্যিই তাকে দেখতে পেলাম না। তার পরের দিনও না। অথচ সাড়া-শব্দ পাই। জানতে পারি বাড়িতেই আছে। ঠাকুর চাকর ঝি-এর হাতে এটা-ওটা পাঠাচ্ছে। শুধু আসল মানুষটির দেখা নেই। তিন দিনের দিন ডেকে পাঠিয়ে বললাম, কী ব্যাপার বলতো? একটি বারও কি আসতে নেই?

ও হেসে বলল, একটি বার কেন, একশ'বার আসবারই তো আয়োজন করছি। তখন আবার বলবে, একটি বারও কি বাইরে যেতে নেই? আমি রাগ করে বললাম, ও সব বাজে কথা। আসলে টান যেটুকু, দূরে ছিলাম বলে। হাতের কাছে পেয়ে সব চলে গেছে। সনৎ একটু কী ভাবল, তার পর বলল, শুধু হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায়, তার বেলায় হয়তো তোমার কথা খাটে। কিন্তু আমি যে আরও অনেকখানি এগিয়ে গেছি। পেয়েছি মনের কাছে। কাজেই হারাবার ভয় নেই, আগলে রাখবারও দরকার নেই। বলে হাসতে হাসতে চলে গেল।

আসল কারণটা বুঝতে পেরেছিলাম। পাছে আমার মনের কোনো সন্দেহ জাগে, তার আশ্রয়ে আছি বলে সে তার অন্যায় সুযোগ নিচ্ছে, তাই নিজেকে একেবারে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। একদিন কথায় কথায় বলেও ফেলেছিল, তোমাদের বাড়িতে যেমন ছিলে, এখানেও তোমাকে ঠিক তেমনি দেখতে চাই। মনে ক'রো মাষ্টার মশাই বেঁচে আছেন। কাছাকাছি কোথায় অপেক্ষা করছেন আমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন বলে।

সে যদি এতখানি ভাল না হত হয়তো ঠকাতে পারতুম।

আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেছে, সে কথা সনৎ বুঝতে পারে নি, কিন্তু যে নতুন ঝিটা আমার জন্তে বহাল করেছিল, তার চোখ এড়ায় নি। আমার মনের মধ্যে যে-ঝড় চলছে, তার কারণটাও মোটামুটি অনুমান করতে তার ভুল হয় নি। সেও আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল, 'চুপ করে থাকো, দিদিমণি। বিয়েটা হয়ে থাক্।' ভরসা দিয়ে বলেছিল, তাতে কোনো পাপ নেই। কিন্তু পারলুম না। বার বার মনে হতে লাগল, প্রতারণা বলে যে একটা পাপ আছে, আর সব জায়গায় হয়তো চলতে পারে, কিন্তু সনতের বেলায় চলে না। বিয়ের আগেই ওকে সব খুলে বলতে হবে। তারপর কপালে যাই হোক। ঐ ঝিকে দিয়েই একদিন সন্ধ্যার পর তাকে ডাকিয়ে এনে কোনো রকমে নিঃশ্বাস চেপে বলে ফেললাম। তার সেই উজ্জ্বল মুখখানা কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ বসে পড়ল। তার পর টলতে টলতে চলে গেল নিজের ঘরে। ছুটে গিয়ে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম, আমার সব কথা তো তোমায় বলা হয় নি, সনৎদা! দয়া করে শোনো; তার পর আমার বিচার ক'রো। কী অবস্থায় পড়ে—

এইটুকু বলতেই সে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, যা শুনেছি, তার বেশি আর কিছু শুনতে চাই না, কমল! তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

পরদিন সকালে উঠেই শুনলাম, সনৎ কোথায় চলে গেছে। একটা চিঠি রেখে গেছে আমার জন্তে। তিন লাইনের চিঠি—"কিছু দিনের জন্তে আমি বাইরে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে দেখা করে যেতে পারলুম না। আমাকে ভুল বুঝো না। তুমি যেমন ছিলে, তেমনি থাকবে। যত দিন বাঁচবো, তোমার সমস্ত ভার আমার। আমাকে না বলে তোমার কোথাও যাওয়া হবে না।

তোমারই সনৎ।"

পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে, "এখানে তোমার সব সব ব্যবস্থাই রইল। তবু যদি কখনো কিছু দরকার হয়, জানাতে সঙ্কোচ করো না। নিচে ঠিকানা রইল।"

ঠিকানা কাশীর। এ চিঠির উত্তরে আমি লিখেছিলাম, "আমি তোমার বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। আমাকে মুক্তি দাও। যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাই।

সনৎ লিখল, "আমার ওপর নিজেকে সঁপে দিয়ে এক দিন গভীর রাত্রে তুমি সর্বস্ব ছেড়ে চলে এসেছিলে। সে বিশ্বাসের মর্যাদা আমাকে রাখতে দাও, কমল! তা'ছাড়া ভুলে যাচ্ছ কেন, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। শেষ ফল তার যাই হোক, তাকে অস্বীকার করবে কেমন করে?"

এ-কথার আর কোনো উত্তর খুঁজে পাইনি।

সনতের বাবা-মা কিছুদিন আগে মারা গেছেন। মাথার উপর অভিভাবক কেউ নেই। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন কেউ কেউ মাঝে মাঝে এসে উঠত ওদের বাসায়। তাদের কাছে আমি বেরোতেও পারি না, লুকিয়ে থাকতেও পারি না। কী করবো ভাবছি, এমন সময় চিঠি এল, আমার জন্তে নবদ্বীপে বাড়ি ঠিক করা হয়েছে। ঝি আমার সঙ্গে যাবে। সরকার মশাই আমাদের পৌঁছে দেবেন। অত দুঃখেও আমার হাসি পেল। ঠিক জায়গায় যাচ্ছি এবার। মহাপ্রভুর দেশ। আমার মত কলঙ্কের কালি মেখে যারা সংসারের বাইরে চলে গেছে, নবদ্বীপই তাদের একমাত্র গতি।

ওখানে গিয়েও দেখলাম, যা তোমাকে আগেই বলেছি। এই দেহটাই হল মেয়েমানুষের চিরকালের অভিশাপ। এক দল লোক পেছনে লাগল। গুণ্ডা নয়; ভদ্র লোক, মানী লোক। কেউ কেউ আবার ঝিটাকে হাত করে ফেলল। কী করে নিজেকে বাঁচাই। এক বার ভাবলাম, সনৎকে লিখি। কিন্তু সে-ই বা কী করবে! হয়তো আর এক জায়গায় নিয়ে যাবে। কিন্তু সেটা তো দুনিয়ার বাইরে নয়। আর কোনো পথ না দেখে ঝিটাকে বিদায় করে দিলাম। সে শাসিয়ে গেল, এর শোধ নেবে।

তার পর একদিন নিতান্ত অকালে পেটের মধ্যে সুরু হল দারুণ যন্ত্রণা। সইতে না পেরে নতুন ঝিকে পাঠালাম ডাক্তার ডাকতে। ডাক্তার আসবার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। আট-দশ ঘণ্টা পরে যখন জ্ঞান হল, চোখ মেলেই দেখি, পুলিশ। শুনলাম, মরা বাচ্চাটাকে ফেলতে গিয়ে আমার নতুন ঝি ধরা পড়েছে, পাড়ার বাবুদের কাছে। সেই অবস্থায় রিকশ করে নিয়ে গেল থানায়। ডাক্তার ছাড়া পেলেন, ঝিএর জামিন হয়ে গেল। আমাকে যেতে হল জেল-হাজতে।

প্রথমটা মনে হল, বাঁচলাম। নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারবো। কিন্তু দু'দিনেই বুঝলাম, ভুল করেছি। কথা বলবার শক্তি নেই: তবু হাজার গণ্ডা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। যা বলি, কেউ বিশ্বাস করে না। কয়েদী-মেয়েরা মুখ টিপে হাসে; জমাদারণী টিটকারি দেয়। জেলর বাবু এক দিন জানতে চাইলেন কী হয়েছিল। বলতে গেলাম, আমি কিছুই জানি না। আমার তখন জ্ঞান ছিল না। মুচকে হেসে চলে গেলেন। অর্থাৎ ওসব আমার জানা আছে। এক জন বুড়ো ডাক্তার আসতেন। তিনি বলেছিলেন, 'হাকিমের কাছে সত্যি কথা বলো। ছাড়া পেয়ে যাবে। তারিখের পর তারিখ পড়তে লাগল। এক দিনও উনি আমাকে কোর্টে যেতে দিলেন না। তখন অনেকটা সেরে উঠেছি। বললাম, এবার যেতে পারবো। ডাক্তার বাবু শুনলেন না। চুপি চুপি বললেন, বোকা মেয়ে! যদি ছেড়ে দেয়? বাইরে গিয়ে এসব ওষুধ-পথ্য কোথায় পাবে?

ডাক্তার বাবু ভরসা দিয়েছিলেন। আমারও বিশ্বাস ছিল, খালাস হয়ে যাবো; বিনা দোষে শাস্তি হবে কেন? যা ঘটেছে খুলে বলবো। কিন্তু হল না। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে চমকে উঠলাম। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল। উকিলদের পেছনে দাঁড়িয়ে আমার জামাই বাবু। একজন উকিল আমার হয়ে আজগুবি কাহিনী সুরু করলেন। বুঝলাম আমাকে ছাড়িয়ে নেবার মতলব। তার বক্তৃতার মাঝখানেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠলাম, ওসব মিথ্যা কথা। যা ঘটেছে, তার সব দায়িত্ব আমার। আমার পেটের ছেলেকে আমি ইচ্ছা করেই অকালে নষ্ট করতে দিয়েছি।

হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

কলঙ্ক থেকে বাঁচবার জন্তে।

হেনা এইখানে প্রশ্ন করল, তোর খোঁজ পেল কী করে লোকটা?

কমলা বলল, সে কথা আমিও অনেক ভেবেছি, দিদি! আজও কোনো হদিস পাইনি।

—সনতের কোনো চিঠি কি ওর বাড়িতে ফেলে এসেছিলি ?

—হতে পারে। তাড়াতাড়িতে সবগুলো হয়তো নেওয়া হয়নি।

—যাক, তার পর ?

—তার পর আর কি ? ছোট হাকিমের কাছ থেকে গেলাম বড় হাকিমের কাছে। সেখানেও ঐ এক কথাই বললাম। বিপক্ষে সাক্ষীও কম ছিল না। আমার সেই পুরানো ঝি বলে গেল, এ ব্যাপারে আমি তার সাহায্য চেয়েছিলাম; রাজী হয়নি বলে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। পাড়ার ক'জন বাবুও হলপ করে বললেন, ঝিএর কাছে এ কথা তারা আগেই শুনতে পেয়েছিলেন এবং আমার ওপর নজর রেখেছিলেন, ইত্যাদি। নতুন ঝি বোধ হয় আমার কথার ওপরেই খালাস হয়ে গেল। আমাকে জেলে পাঠালেন জজ সাহেব। কিছু দিন পরে ছোট জেল থেকে চলে এলাম বড় জেলে। তার পর পেলাম তোমাকে।

অনেকক্ষণ একটানা বসে থেকে থেকে কমলার শিরদাঁড়া টনটন করছিল। ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল অনেকখানি। হেনার বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে চুপ করে পড়ে রইল! হেনা তার মাথার নিচে বালিশটা গুঁজে দিয়ে তার রুক্ষ চুলগুলোর মধ্যে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে যাবার পর কমলা বলল, কী মজা ভাখ, দিদি! সব ছেড়ে এলাম। সবাই আমাকে ছাড়ল। কিন্তু আমার পূজনীয় ভগিনীপতির হাত থেকে রেহাই পেলাম না। তাঁর আদরের শেষ চিহ্ন এই কাল ব্যাধি আমার দেহে অক্ষয় হয়ে রইল।

হেনা দৃঢ় বিশ্বাসের সুরে বলল, না, কমলা; ব্যাধি অক্ষয় নয়। ওটা একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যে জিনিষ তোর জীবনে সত্যিই অক্ষয় হয়ে আছে, তাকে যেন একদিন ফিরে পাস, এইটুকুই আজ কামনা করি।

কমলা আর কোনো কথা বলল না। যে সুডৌল হাতখানা পদ্মকোরকের মত তার কপালের পাশটিতে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছিল, তাকেই আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে বুকের উপর রেখে চোখ বুজে পড়ে রইল।

দেবতোষের মনে হল নিশ্চয়ই ভুল শুনেছেন, কিংবা সুশীলাই হয়তো ভুল বলছে। এ যে একেবারেই অপ্রত্যাশিত! তবু যেটা এক বার শুনেছেন, সেই কথাটাই আরেক বার শুনবার জন্যে প্রশ্ন করলেন, কার কথা বলছ ?

সুশীলার সুরে বিরক্তি ফুটে উঠল, বাঃ শুনতে পাচ্ছেন না ! হেনা। আপনার নার্স। এক বার যেতে বলেছে আপনাকে।

ডাক্তারের মনের মধ্যে বিস্ময় এবং আনন্দ একসঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল। দুটোই চেপে রেখে অনেকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, কেন ? বুড়ীটা আবার পড়ল না কি ?

—বুড়ী ! আপনিও যেমন ! সে তো গোটা জেনানা ফাটক চষে বেড়াচ্ছে।

—তাহলে, ওর নিজের কিছু হয়নি তো ?

—না, অসুখ বিসুখ করলে, আমাকে নিশ্চয়ই বলতো। তা'ছাড়া, চোখ-মুখ তো ভালই দেখে এলাম।

—তবে ?

—তবে-টবে জানি না। আপনি এক বার ঘুরে যাবেন।

দুপুরবেলা খেয়ে উঠে ক্যাম্প-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে কাগজ পড়ছিলেন ডাক্তার। জমাদারণী এই মাত্র যে-খবর দিয়ে গেল, সেটা পাবার পর কাগজের খবরগুলো সব যেন একাকার হয়ে গেল। আমাদের এই চোখ দুটোর কাজ শুধু চাওয়া, শুধু তাকানো। দেখে আর এক জন; তার নাম মন। যে চোখেরপেছনে মন নেই, সে অন্ধ। ডাক্তারের চোখের সামনে খোলা পড়ে রইল একটা বর্ণহীন কাগজের পাতা; মনের সামনে ভেসে উঠল একটি কুয়াশা-ঢাকা শীতের রাত আর তার পরের কতগুলো বর্ণোজ্জ্বল দিন। কিন্তু যাকে আশ্রয় করে তার জীবনে এই বর্ণ-সমাবেশ, সে ধরা দেয়নি। নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে দুর্ভেদ্য কঠিন বর্মের আবরণে। এমন একটা মুহূর্তও মনে পড়ে না, যখন সে নিজের মনে বিনা প্রয়োজনে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, কিংবা মুখ ফুটে বলেছে এমন কোনো কথা যেটা নিছক কাজের কথার এলাকায় পড়ে না। ঐ ছোট্ট হাসপাতালের নিভৃত কোণটিতে দিনের পর দিন সে তাঁর সঙ্গে কাজ করে গেছে, দু'টি নিরলস নিপুণ হাতের কাজ। তার কাছ থেকে তিনি সাহায্য পেয়েছেন, সাহচর্য পেয়েছেন, সান্নিধ্যও পেয়েছেন, কিন্তু মনের দুয়ার খোলা পান নি। এত কাছে থেকেও সে দূরেই রয়ে গেছে। মাঝখানে একটা বেড়া, যার পাশে দাঁড়িয়ে জেল-ডাক্তার দেবতোষ ঘোষ আর ওপাশে ৩১৩ নম্বর মেয়ে-কয়েদী হেনা মিত্র। পরস্পরের কাছে এই টুকুই যেন তাদের পরিচয়। তার বাইরে কিংবা তার বেশী আর কিছু নয়। সম্পর্ক ...টুকু, সব শুধু কাজের: শুধু আইনের। সেই কাজের সূত্র ধরেও তাঁর কাছে কোনো ইচ্ছা, কোনো অনুরোধ সে জানায় নি। কখনো কাছে এসে বলেনি নত মুখে লাজ-নম্র সুরে: কাল এক বার আসবেন; কাজ আছে। আজ যে ডাক এল, এটাও হয়তো তার নিজের তরফ থেকে নয়। এর পেছনে যে প্রয়োজন, তার সঙ্গে তার নিজের কোনো সংশ্রব নেই। তবু যে সে ডেকে পাঠিয়েছে, মুখ ফুটে জানিয়েছে ওঁকে তার প্রয়োজন, এইটুকুই আজ দেবতোষের মনের মধ্যে ছড়িয়ে রইল একরাশ মিষ্টি গন্ধের মত।

ডাক্তারের বৈকালিক ডিউটি সুরু হতে চারটা, সাড়ে চারটা। অন্য দিন সে সময়টা যেন হুড়মুড় করে এসে পড়ে। চায়ের পেয়ালা শেষ করবার সুযোগ দিতে চায় না। আজ ঘড়ি চলল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। সাড়ে তিনটা বাজতেই লেগে গেল সাড়ে তিন দিন। চাকরটাকে তাড়া দিয়ে ডেকে তুললেন দেবতোষ। চা তৈরি হলে কোনো রকমে গোটাকয়েক চুমুক দিয়ে ধড়াচূড়া এঁটে বেরিয়ে পড়লেন। গেট পার হয়ে পা দুটো ধরতে চাইল বাঁ দিকের পথ। কয়েকটা ওয়ার্ড পেরিয়েই ফিমেল ইয়ার্ড। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন ডাক্তার। মনে হল চার পাশের লোকগুলো যেন জেনে ফেলেছে তাঁর মনের খবর। তার পর কী ভেবে আবার সেই পথেই পা বাড়িয়ে দিলেন।

আজও বুড়ী ঘরে নেই। দরজার দিকে পিছন ফিরে পা ছড়িয়ে বসে ছিল হেনা। হাতে ছিল সেলাই। সোয়েটারটা আজ শেষ করতেই হবে। ক্ষিপ্র হাতে একমনে কাঁটা চালিয়ে যাচ্ছিল। ফিমেল ওয়ার্ডারকে বাইরে থেকে ডাকবার জন্যে ফটকের এ-পাশে যে দড়ি-বাঁধা ঘণ্টা ঝুলছে, তার মিষ্টি শব্দটা এক বার

তার কানে এসেছিল। সুশীলার উচ্চকণ্ঠের সাড়াও শুনতে পেয়েছিল। হয়তো রাউণ্ডে আসছে বড় জমাদার, নয়তো খাটনি বুঝে নিতে দেখা দিয়েছে গুদামী সিপাই কিংবা অন্য কোনো কাজে আর কেউ। ভাবতে ভাবতে আবার তন্ময় হয়ে গিয়েছিল নিজের কাজের মধ্যে। পিঠের উপর গড়িয়ে পড়েছে কালো মেঘের মত একরাশ এলো চুল। তারই ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, সুডৌল গ্রীবার অস্পষ্ট আভাস। দু' পাশ দিয়ে নেমে গেছে দু'টি পেলব বাহু; উঠছে-নামছে, কাঁটা চালনার তালে-তালে। বেশবাস শিথিল, হয়তো একটু অসংবৃত। হঠাৎ সিঁড়ির নিচে জুতোর শব্দ শুনতে পেয়ে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল হেনা। বুকে-পিঠে আঁচলখানা জড়িয়ে নেবার ফাঁকে চকিতে এক বার চেয়ে দেখল ডাক্তারের দিকে। তার পর না পারল চোখ তুলে চাইতে, না পারল জানাতে তার প্রয়োজন। কোন এক অননুভূত সলজ্জ সঙ্কোচে জড়িয়ে গেল সকল অঙ্গ।

ডাক্তারই কথা পাড়লেন, ডেকে পাঠিয়েছ, শুনলাম: কী ব্যাপার? তোমার পেশেণ্ট তো দেখছি দিব্যি পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

জড়তা কাটিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করল হেনা। ঘাড়টা তুলে মৃদু হেসে হঠাৎ বলে ফেলল, শুধু ওকে দেখতেই আসেন না কি আপনি?

চমকে উঠলেন দেবতোষ। কী বলতে চায় হেনা! এ কি শুধু সরল পরিহাস, না তাঁরই মনের গহনে অঙ্গুলি-নির্দেশ? ঐ কথা, ঐ হাসি, ঐ চাহনি, সবই যেন একটা নিগূঢ় অর্থ নিয়ে দেখা দিল তাঁর কাছে; সহসা খুলে দিল তাঁর অন্তরের একটি কক্ষের অর্গল। হেনার মুখের উপর গভীর দৃষ্টি মেলে বললেন, কী বলছিলে? ওকেই শুধু দেখতে আসি কি না? তার জবাব কি আজও তুমি জানতে পারনি, হেনা?

হেনার বুকের ভিতরটা শিউরে উঠল। অসতর্ক কর-স্পর্শে যে স্রোতের মুখ সে খুলে দিয়েছে, ভয় হল, তাকে হয়তো আর বন্ধ করা যাবে না। তবু এক বার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে। তাই, যেন বুঝতে পারেনি, এমনি ভাবে তরল কণ্ঠে বলল, বা:! কী যে বলেন আপনি! বুড়ী ছাড়া কি আর কারো অসুখ-বিসুখ করতে নেই? আরো তো কত জন—

কত জন আজ থাক, হেনা, বাধা দিয়ে অধীর কণ্ঠে বললেন দেবতোষ। সেই এক জনের কথা বলতে দাও, যাকে সত্যিই দেখতে আসি। কিন্তু শুধু দেখতে চাই, বললে কিছুই বলা হল না। তার চেয়ে অনেক বেশী আমার লোভ, অনেক বড় আমার আশা। তুমি কি জানো না—

—ডাক্তার বাবু! রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল হেনা। বেদনার্ত কণ্ঠের করুণ আবেদন। সেই করুণ চোখ দু'টির দিকে চেয়ে ডাক্তার হঠাৎ থেমে গেলেন। মুহূর্তকাল বিরতির পর আবার বললেন, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি জানি, যার কথা বলছি, তার উপর আমার কোনো দাবি নেই। তবু আমাকে বলতে হবে। আজ না বললে হয়তো কোনো দিনই বলা হবে না।

—কিন্তু তার কোনো কথাই তো আপনি শোনেন নি? আপনি তো জানেন না কী সে, কী তার পরিচয়, কী তার ইতিহাস।

—জানতে চাই না। তার দরকারও নেই। আমার কাছে সে যা, তাই। এর বেশী আর কিছুই জানবার নেই।

—আর কিছু জানবার নেই?

—না। যে কথা আমার জানবার, সে তো তুমি জানো। নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে ছাখ। তোমার মনকে জিজ্ঞেস কর। তার পর বল, কী তার উত্তর, কোথায় তার বাধা।

দরজার চৌকাঠে ভর দিয়ে হেনা দাঁড়িয়ে রইল স্পন্দনহীন মূর্তির মত। ক্ষণকাল অপেক্ষা করে মৃদু-কোমল কণ্ঠে ডাকলেন দেবতোষ, হেনা—

—বলুন।

—চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও। যদি আজও তোমার মন তৈরি হয়ে না থাকে, আমি অপেক্ষা করবো। যত দিন বলবে, তত দিন অপেক্ষা করবো। আজ শুধু তোমার শেষ-কথাটা জেনে যেতে চাই।

হেনার ঠোঁট দু'খানা কেঁপে উঠল। বেরিয়ে এল কয়েকটি অশ্রু-সিক্ত অস্ফুট শব্দ···না, না; সে হয় না; আমার কোনো উপায় নেই···আমি যে—আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। ব্যথাপ্লুত কণ্ঠে এই ক'টি কথা বলেই সে দু'হাতে মুখ ঢেকে ঘরের ভিতর ছুটে চলে গেল।

সেই দুটি ছোট্ট 'না' ডাক্তারের বুকে এসে বিঁধল সুতীক্ষ্ণ তীরের ফলার মত। বাইরের দিকে তাকালো। মনে হল এই আলোক-উজ্জ্বল অপরাহ্নের বুকের ভিতর থেকে সহসা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে জীবনের চিহ্ন। কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে ফিরে চললেন ফটকের দিকে।

খাটনি-ঘরের কাছাকাছি আসতেই সুশীলা বেরিয়ে এসে নমস্কার করল। ডাক্তার নিঃশব্দে চোখ তুলে চাইলেন। সুশীলা চমকে উঠল, এ কি! আপনার কি অসুখ করেছে, ডাক্তার বাবু?

—না; বলো কী বলবে।

—বলছিলাম, কমলা বলে যে মেয়েটা আছে, তার অসুখ। হেনা বলেছিল তাকে এক বার দেখিয়ে দিতে। আপনাকে বলেনি?

—কী অসুখ?

—কী জানি, কি সব পুরোনো রোগ।

—কাল দেখবো, বলে তেমনি আচ্ছন্নের মত এগিয়ে গেলেন।

[ক্রমশঃ।

পঞ্চতপা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৮

মড়াইয়ের চেহারা বদলে যাচ্ছে একটু একটু করে, সেটা বেশ বোঝা যায় এখন। প্রতিরোধের এক একটা সাদা পাষাণ-অঙ্কুর গজাচ্ছে এখানে-সেখানে। দিনে-দিনে বাড়ছে সেগুলো। শুকনো গৈরিকের মাধুরী বিদীর্ণ করা শ্বেতকায় স্ফীত স্তম্ভগুলো পরস্পরের সঙ্গে এসে মিলবে একদিন, বাতাস চলাচলেরও ফাঁক থাকবে না মাঝে, সেটা এখনো অবশ্য বোঝা যায় না। ওগুলোকে এরা বলে ব্লক। যে যার পৃথক সত্তায় মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে এখন। ওর প্রত্যেকটার পিছনে যে এত জল্পনা-কল্পনা এত কারিগরী, এত অসংখ্য ছোট-বড় প্রয়াস পাষাণ-বন্দী হয়ে আছে, চোখে দেখেও ঠাওর করা শক্ত।

কিন্তু ঋজু-কঠিন এক প্রকাশের তপস্যায় বসেছে মড়াই, তার আভাস সর্বত্র। মড়াইয়ের বুকের এক একটা অতিকায় গহ্বর যেন অমনি করে নিটোল পাষাণ-প্রাচীরে ভরে ওঠার জন্য উন্মুখ তাগিদ দিচ্ছে নিঃশব্দে। কাজ বাড়ছে। কাজের তাগিদ বাড়ছে। মাশুলও দিতে হচ্ছে এক এক সময় বড় কম নয়। ছোটখাট অঘটন ঘটে যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। গোড়ায় গোড়ায় এত হয় নি। কিন্তু এত বড় সৃষ্টির বেদিতে এটুকু অর্ঘ্য না দিলে নয়, এও যেন মেনে নিয়েছে সকলে। দুর্ঘটনা হয়, জীবনেরও অবসান হয় দু'টো-চারটে। কেন হল বা কার দোষে হল সেটা পরের ব্যাপার, নথিপত্রের ব্যাপার। মড়াইয়ে বোবা শঙ্কার ছায়া নামে কিছুক্ষণের জন্য বা কিছুদিনের জন্য। তার পর আবার কাজ, আবার কাজের তাগিদ। তুমি চাও বা না চাও। ওই সৃষ্টির সঙ্গে তোমার সকল গ্রন্থির অমোঘ বাঁধন পড়ে গেছে একটা।

কিন্তু সেদিনের অঘটনটা অন্য রকমের। যেমন ঘটে সচরাচর, তেমন নয়।

ছোট্ট এক দূষিত ক্ষত যেমন পাবে গোটা একটা দেহ বিষিয়ে পঙ্গু করে ফেলতে, চীফ ইঞ্জিনীয়ার বাদল গাঙ্গুলির চোখে তেমনি হঠাৎ এক ধ্বংসকীট বুঝি গোচর হল, এত বড় সৃষ্টি সমারোহের মর্মস্থলে। কিন্তু খুব সহজে নির্মূল করার মত ক্ষীণায়ু নয় সেই ধ্বংসকীট। ফলে অনাগত এক কাল-বোশেখীর শঙ্কা জাগল অনেকের মনে।

ঘুরে ঘুরে মড়াইয়ের কাজ দেখছিল। আরও জনা দুই অফিসার ছিলেন সঙ্গে। কথায় কথায় একজন অফিসার খবর দিলেন, অমুক ব্লক-এ বড় রকমের একটা ফাটল দেখা গেছে, মাটির নিচে যা আছে আছে—ওপরের এক দিক ভেঙ্গে আবার নতুন করে জুড়তে হবে। মাটির ওপর সামান্যই তোলা হয়েছে, কাজেই অসুবিধে হবে না খুব।

শুনে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের মনে খটকা লাগল কেমন। বলল, চলুন দেখে আসি।

দেখে খটকাটা বাড়ল আরো। আড়াআড়ি ফাটল একটা। অনেক কারণে হতে পারে। পঞ্চাশ-ষাট ফুট চওড়া দেয়ালের সেই ফাটলের দিকটা ভেঙ্গে আবার মেরামত করে নেওয়া কঠিন কিছু নয়। কিন্তু ভিতরটা খুঁত খুঁত করতে লাগল বাদল গাঙ্গুলির। ভাবল কিছুক্ষণ। ল্যাবরেটারী অ্যাসিষ্ট্যান্টদের ডেকে পাঠালো।

নির্দেশ মত তারপর সিমেন্ট কনক্রীট তুলে নিয়ে যথাবিধি পরীক্ষা-পর্ব। ফিজিক্যাল টেষ্ট, কেমিক্যাল টেষ্ট, প্রেসার টেষ্ট। পরিস্থিতি জটিল হয়ে দাঁড়ালো আরো। মিকশ্চারে সিমেন্টের অংশ নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে অনেক কম। এক ফাঁক খুঁড়তে তিন ফাঁক বেরুলো। কনক্রীট তৈরী হচ্ছে যেখানে সেখান থেকে সিমেন্টের স্যাম্পল এনে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে একে একে আবার যাবতীয় পরীক্ষা করালে বাদল গাঙ্গুলি। পাথরগুঁড়ো আর জমাট-বাঁধা সিমেন্টও মেশানো তাতে।

মাথাটা ঘুরে উঠল কেমন।

মিকশ্চারে সিমেন্টের পরিমাণ পরীক্ষা করার কথা নিজেদের তরফ থেকেও। মাঝে মাঝে করাও হয়। কিন্তু নিয়ম যাই হোক, এত বড় কাজে হামেশা সম্ভব নয় সেটা। বিশ্বাসের ওপরেই ছেড়ে দিতে হয় বেশির ভাগ। আর এ ধরণের অঘটন হয়ও না বড়। বিশেষ করে ঘোষ ঠিকাদারের মত এতদিনের এতবড় ফার্মকে অবিশ্বাস করারও কারণ নেই কিছু। সরকারের কাছ থেকেই সিমেন্ট কিনে বরাবর সরকারী কাজ চালিয়ে আসছে।

পায়ে পায়ে মড়াইয়ের দিকে চলল আবার বাদল গাঙ্গুলি। সঙ্গে নরেনকে ডেকে নিল।

—কী ব্যাপার? নিষ্প্রভ মূর্তি দেখে নরেন অবাক!

—এসো। ব্লকটার কাছে এসে আঙুল দিয়ে ফাটলটা দেখিয়ে দিল।

—ফেটে গেছে? তেমন না ভেবেই নরেন বলল, তা ভালো করে একটু প্লাষ্টার করে দিলেই তো হয়।

—থামো! নিস্পন্দ-মূর্তি মানুষটা ঝাঁঝিয়ে উঠল হঠাৎ। তারপর সংক্ষেপে বলল ব্যাপারটা।

চুপচাপ অনেকক্ষণ। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে সরে যাচ্ছে বাদল গাঙ্গুলির। অস্বাভাবিক জলজ্বল করছে চোখের তারা দুটো। ওই গ-করা ফাটলটা বড় হয়ে হয়ে যেন সমস্ত মড়াই জুড়ে বসছে, আর, এত বড় ড্যাম কন্স্ট্রাকশন নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে।

সব শুনেও ব্যাপারটা অতবড় করে দেখেনি নরেন চৌধুরী। তবু নীরব সেও। এই অসহিষ্ণু বিক্ষোভের হেতু জানে। নিজের হাতে-গড়া যে সৃষ্টি-সমারোহ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে খান-খান হয়ে গেছে

একদিন, মানুষটার ভিতরের সেই ফাটল মিলায়নি আজও। এখানকার এতবড় এই সৃষ্টির কণায় কণায় একদিনের মর্মচ্ছেদী পরাজয়ের নিখুঁত একটা পাল্টা জবাব লিখে রাখতে চায়। এই অমরত্বার আয়োজন দিয়ে দ্বিগুণ নিটোল করে ভরে তুলতে চায় সেদিনের সেই ব্যর্থতার ফাটলটা। ব্লকের এই ফাটল দেখে সেই পুরানো স্মৃতিই মুখব্যাদান করে আসছে আবার।

—চলো, কি এমন হয়েছে, আপিসে বসে যা হয় ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে'খন। হালকা করে দিতে চাইল নরেন চৌধুরী।

কিন্তু আপিসে ফিরেই যে ব্যবস্থা করল চিফ ইঞ্জিনিয়ার তাতে অন্য সকলেই উতলা হয়ে পড়ল বেশি। অফিসার এবং কর্মচারীদের ডাকিয়ে সোজা হুকুম দিল, ঘোষ-চাকলাদারের সিমেন্ট দিয়ে যেখানে যা কাজ হচ্ছে সব বন্ধ করে দিতে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে তলব করে পাঠালো তারপর।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, অর্থাৎ, ঝরণার বাবা মিঃ চ্যাটার্জী। স্ত্রী টি-পার্টি দিন আর যাই করুন, ভদ্রলোক অনুকূল আশা পোষণ করেন না খুব। ওপর-অলাটিকে মনে মনে বরং সমীহই করেন একটু।

—বসুন। শুনেছেন সব?

মিঃ চ্যাটার্জী মাথা নাড়লেন, শুনেছেন?

—কি করবেন এখন?

চিন্তিত মুখে ভদ্রলোক ভাবলেন একটু। কি আর করা যাবে···গ্রাউণ্ড-ওয়ার্ক-এর কাজে লাগিয়ে দিতে বলি এ লটের মেটিরিয়াল, আর ঘোষ-চাকলাদারকেও নোটিস্ দিই একটা, কেন এরকম হল···।

মুখের দিকে চেয়েই বুঝলেন জবাব মনঃপূত হয়নি।

—কিন্তু না জানতে পারলে ওই দিয়েই আমরা ইরেকশনের কাজ করতাম, তার পরের কথা ভাবুন।

নিরুপায় মিঃ চ্যাটার্জী হাসলেন একটু। বললেন, কিছু কাল বাদে ক্র্যাক হত, রিপেয়ারের হাঙ্গামা লেগে থাকত···এরকম অবশ্য হওয়া উচিত নয়, কিন্তু দেখলাম তো অনেক···

চেয়ার ছেড়ে উঠে স্বল্প পরিসর ঘরের মধ্যেই বারকতক পায়চারী করে নিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল তারপর। —শুনুন, হেড অফিসে ইন্টিমেশন পাঠান, আর ঘোষ-চাকলাদারকে এক্ষুনি নোটিস দিন মাল তুলে নিয়ে যাক। হেড অফিস থেকে ইনস্ট্রাকশন এলেই বলে দেবেন সাত দিনের মধ্যে গো-ডাউনও খালি করে দিতে হবে।

ভদ্রলোক মহা ফাঁপরে পড়লেন যেন। নরেন একটা কথাও বলেনি এতক্ষণ। নির্দেশ শুনে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল সেও! অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার দুর্ভাবনাটা প্রকাশ না করে পারলেন না শেষ পর্যন্ত। একবারে এতটা কি ঠিক হবে···?

—যা বললাম করে পাঠিয়ে দিন, আমি সই করছি।

চেয়ারে বসে অসহিষ্ণু হাতে একটা ফাইল টেনে নিল সে। আর বাক্যব্যয় না করে সোজা প্রস্থান করলেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার।

নরেন তেমনি চুপচাপ বসে রইল আরো কিছুক্ষণ। হালকা শিস দিল একটু। হাসলও।

—বেশ।

সাড়াশব্দ নেই।

—বলব কিছু না সরে পড়ব?

—হু···। ফাইল নিবিষ্ট।

—চিফ ইঞ্জিনিয়ার না বাদল গাঙ্গুলি···কাকে বলি?

খট্ করে বন্ধ হয়ে গেল হাতের ফাইল। সোজা তাকালো মুখের দিকে। খুব স্পষ্ট করে জবাব দিল, চিফ ইঞ্জিনীয়ারকে।

বিরূপ না হয়ে হাসিমুখেই বলল নরেন, তাহলে আর হল না আপাতত, পরে হবে'খন কথা—।

পরদিন গো-ডাউন-এ দ্বিজেন চাকলাদারের হাতে পড়ল নোটিসটা। রণবীর ঘোষ কাছাকাছি গেছে কোথায়। তক্ষুনি লোক পাঠালো তাকে ডেকে নিয়ে আসতে।

এসব ঝামেলা পছন্দ নয় দ্বিজেন চাকলাদারের। লাভ যত বাড়াতে পারবে বাড়াও, সে জন্যে যা করা দরকার করো, কিন্তু গোলযোগে পড়ার সম্ভাবনা আছে এমন কিছু কোরো না। যদিও অর্থে সামর্থ্যে যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে আজ ঘোষ-চাকলাদার ফার্ম, তাতে অল্পবয়সী এক ইঞ্জিনিয়ারের এরকম চোখ রাঙানিকে খুব একটা পরোয়া করে না দ্বিজেন চাকলাদারও। দু'পুরুষের ব্যবসা, সরকারী কাজও কম করল না আজ পর্যন্ত, এখানেও এতবড় কাজ নিয়েছে বাদল গাঙ্গুলির সুপারিশে নয়, হেড অফিসের দাক্ষিণ্যে। তবু এসব ঝামেলা কে চায়। আর কিছু না হোক দুর্নাম তো একটা। কিন্তু দ্বিজেন চাকলাদারের পক্ষে রণবীর ঘোষকে সামলানো শক্ত। এই সাত সকালেই কোথায় কার পিছনে ঘুরছে ঠিক কি···। ব্যবসায় কুশাগ্র বুদ্ধি, কিন্তু যা হচ্ছে দিন কে দিন, ব্যবসা করাবে কাকে দিয়ে!

রণবীর ঘোষ এলো। নোটিস্ পড়ল। ঠোঁটের ফাঁকে বক্ররেখা।—ও বাবা! একেবারে বাতিল! নোটিস্টা ফেরৎ দিয়ে হাঁটুর ওপর পাইপ ঠুকল বারকতক। ছেলে ছোকরার হাতে এতবড় কাজের ভার, ওরা যুধিষ্ঠিরের ভায়রাভাই-ই হয়ে থাকে প্রথম প্রথম। চলো, পিঠ চাপড়ে আসি।

প্রথম যোগাযোগে রণবীর ঘোষের ওপর মনে মনে প্রসন্ন ছিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। তার ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আসেনি কখনো। তবু সুহৃত্তা ছিল কিছুটা।

সেটা কর্মগত।

মডাইয়ের কাজে প্রথম দিকের বিঘ্নোত্তরণের সময় রণবীর ঘোষের সহায়তা ছিল কিছু। গোড়ায় গোড়ায় কুলি আমদানীর ব্যাপারে সাহায্য করেছে। একটা সময় গেছে যখন একসঙ্গে পঞ্চাশজন কুলির আবির্ভাবও শুভ সূচনা বলে ভাবত। রণবীর ঘোষের কাজের অন্তর্গত নয় এটা। নয় বলেই এই সহযোগিতায় তার কর্মক্ষমতা প্রতিপন্ন হয়েছে।

নিজের স্বার্থের দিক থেকে মানুষকে যাচাই করার এবং খুশি করার নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে রণবীর ঘোষের। প্রথম সংযোগে কর্মকর্তাদের সম্বন্ধে তার 'সুপটু বিশ্লেষণ। খুশি হতে সকলেই চায়'। পরিতোষণের ভক্ত নয় কে? শুধু জেনে নাও, খুশি করার যাদু নীতিটি কার বেলায় কি।

মডাইয়ের এই সর্বাধিনায়কটিকে বুঝে নিতে অন্তত সময়

লাগেনি একটুও। এজন্য কোনরকম দুরূহ জটিলতার আবরণও ভেদ করতে হয়নি তাকে। সিমেন্টের সঙ্গে বালু মেশানোর মত কাজের সঙ্গে কাজের আড়ম্বরটুকুও নিপুণ সমতায় বেশ করে মিশিয়ে দিতে পারলে নির্বিঘ্ন আস্থার ভিতটা পাকাপোক্ত হবে, এটুকুই বেশ করে বুঝে নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল রণবীর ঘোষ। কাজের বাইরে এই জন্যেই আর কোনরকম ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টাও করেনি সে। করলে ভুল হবে, জানত। দেখা হয় প্রায়ই, যে যার নড্‌ করে শুধু। আলোচনা উঠলে সপ্রতিভ অথচ সপ্রশংস চোখে কন্সট্রাক্‌শনের কাজের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে, এ চোখ জহুরীর চোখ মিঃ গাঙ্গুলি···এই মড়া জায়গায় প্রাণ আসছে সেটা বোঝা যাচ্ছে বেশ।

সেই গোড়া থেকেই তার জহুরীর চোখ বাদল গাঙ্গুলির সামনে এই মড়া জায়গায় প্রাণ সঞ্চারের সূচনা দেখে আসছে।

ব্যক্তিগত তোষামোদে নয়, এ ধরনের কর্মগত তোষণে চিফ ইঞ্জিনিয়ার তুষ্ট হত বইকি।

পার্টনারের কাছে সবিদ্রূপে এই পিঠ চাপড়ানোর কথাই বলেছে রণবীর ঘোষ।

সকালের রাউণ্ডে বেরিয়ে বাদল গাঙ্গুলি মড়াই থেকে সবে উপরে উঠে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিল জনা দুই কর্মচারীকে। সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আছেন, নরেন আছে। জিপ থেকে নেমে টক টক করে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রণবীর ঘোষ। গুড মর্ণিং স্যার, গুড মর্ণিং, ভালো আছেন?

বাদল গাঙ্গুলি ফিরে তাকালো। চোখে চোখ রেখে সামান্য মাথা নাড়ল শুধু। কর্মচারীদের সঙ্গে কথা শেষ করে বলল, আসুন।

ওপর থেকেই একাগ্র নিবিষ্টতায় নিচের কন্সট্রাকশনের দিকে চোখ রেখে অগ্রসর হল রণবীর ঘোষ। ঘ্রাণে বাতাস খোঁজে। জহুরী আজ মড়া জায়গায় প্রাণ সঞ্চারের বিপুল উচ্ছ্বাস মুখে ব্যক্ত না করে চোখেই ফোটালে।

নীরবে আপিসের দিকে চলেছে বাদল গাঙ্গুলি। পিছনে নরেন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। রাস্তার পাশে দ্বিজেন চাকলাদার জিপে বসে। ইশারায় তাকে অপেক্ষা করতে বলে রণবীর ঘোষ হাসিমুখে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের পাশে পাশে চলল।

আপিসঘরে সকলে বসল। ঘোষ বাদল গাঙ্গুলির সামনে, মুখোমুখি। দু'চার মুহূর্তের নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়।

বলুন—।

ঘোষ হাসল।—আপনার নোটিস পেলাম।···আই অ্যাম সারপ্রাইজড···ব্যাট ইটস ওয়াণ্ডারফুল···আই মাষ্ট সে ইট ইজ ওয়াণ্ডারফুল! এরকম শক্ত হওয়াই দরকার—

বাদল গাঙ্গুলি চেয়ে আছে। প্রতীক্ষা করছে।

রণবীর ঘোষ আবার বলল, আপনি ঠিকই করেছেন, তবু একটা কথা কি জানেন মিঃ গাঙ্গুলি, সিমেন্ট তো আমরা নিজে হাতে তৈরী করিনে, কিনে নিয়ে আসি মাত্র, কি করে জানব বলুন এই কাণ্ড হয়ে আছে!

এবারে জবাব দিল বাদল গাঙ্গুলি। শান্তমুখে বলল, আপনার তো জহুরীর চোখ—জহুরীর চোখ শুধু খাঁটি চেনে না মিঃ ঘোষ, নকলও চেনে!

ঘোষ থমকে গেল। সজোরে হেসে উঠল তারপর।—ওয়াণ্ডারফুল! ঘাট মানছি আপনার কাছে, কিন্তু এ ভুলটা সত্যি ভুল।

—মিকশ্চারে যে প্রোপোরশান সিমেণ্ট মেশাবার কথা, মেশানো হয়নি—

—নিশ্চয় হয়নি! শেষ করতে দিল না ঘোষ।—হলে আর আপনি লিখবেন কেন?···কথা হল, আপনাদের যেমন লোক আছে প্রোপোরশান যাচাই করে নেবার জন্য, অথচ দেখা হয়ে ওঠে না সব সময়, তেমনি আমারও নিজের চোখেই দেখার কথা সব, কিন্তু আসলে নির্ভর করতে হয় দশ জনের ওপর। যাক, সেদিকটা ভালো করেই দেখছি এবার আমি।

কর্তৃপক্ষের গলদের কথাটাও পরোক্ষে স্মরণ করিয়ে আরো ভুল করল।—কিন্তু আপনার সিমেণ্টএ ষ্টোনডাষ্ট পাওয়া গেছে—জমাট-বাঁধা সিমেণ্টও গ্রাইণ্ড করে মেশানো হয়েছে।

—বললাম তো, এ ব্যাপারে আমাদের হাত কোথায়, সরকারের কাছ থেকে যেমন পাই কিনে নিয়ে আসি···

—তাহলে তাদের দায় তারা বুঝবে, আপনার আর কি! আমি ও-দিয়ে কাজ হতে দেব না।

—ব্যাপার কি জানেন, মুখে অমায়িক হাসিটুকু লেগে আছে, এ ভুলের দায় শেষ পর্যন্ত আমাদের কাঁধেই চাপবে, মাল যখন একবার বুঝে নিয়েছি, ঠিক জিনিস পাইনি প্রমাণ করব কি করে! কিন্তু এতদিনের এতবড় ফার্ম আমাদের, তাদের কাছ থেকে খাঁটি নিয়ে আমরা গণ্ডগোল করেছি এ তো আর আপনি বলবেন না···এখন কি করতে পারি তাই বলুন।

ক্রমে ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। তবু ক্ষুদ্র জবাব দিল, মাল তুলে নিয়ে যান, আর গো-ডাউন খালি করে দিন।

এ কথা শোনার জন্যে আসেনি ঘোষ। সুন্দর হতাশার ভঙ্গি করল একটা।—এ তো মশা মারতে একেবারে কামান, থাকগে—। দু'-চার মুহূর্ত ভেবে একটা সমাধান বার করল যেন, বলল, এ মালটা আপনি না হয় ভিতটিতএর কাজে লাগিয়ে দিন, এর পরে আমি দেখছি—।

—কি আর দেখবেন? অনুচ্চ কঠিন কণ্ঠে বলল বাদল গাঙ্গুলি, আমাদের চরিত্রের ভিৎটাও ভেজাল মিশে মিশে এমন হয়েছে যে ওর ওপর আর পাকা কিছু টেঁকে না। যাক, গণ্ডগোল আরো বাড়ার আগে যা বললাম তাই করুন—এদিকে হেড অফিসকে যা ইন্‌ষ্ট্রাকশন দেবার আমি দিয়েছি।

—হেড অফিস···! সপ্রতিভ ভাবটুকু আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল ঘোষের মুখ থেকে। বলল, দেখুন মিঃ গাঙ্গুলি, দু'পুরুষের এতবড় ফার্ম আমাদের, লাখ দু'লাখ গেলেও খুব যায় আসে না, কিন্তু এতে গুড উইলটা যাচ্ছে···সেটা ঠিক···বুঝতেই পারছেন। হেড অফিসের ব্যবস্থা আমি করছি, আপনি শুধু আপনার অর্ডারটা তুলে নিন। একেবারে নিখুঁত আর কোন্‌ জিনিসটা হয় বলুন?

বাদল গাঙ্গুলি বলল, আপনার ওই দু' পুরুষের গুড-উইলেও খুঁত একটু থাকুক তাহলে। আপনি বলতেন, মড়া জায়গায় প্রাণ আসছে—কিন্তু আমি নিখুঁত প্রাণই আনতে চাই, বিকল প্রাণ নয়।

পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল তারা। ঘরের বাকি দু'জন নির্বাক

মূর্তির মত বসে। কণ্ট্রাক্টরের চোখে-মুখে বিদ্বেষ, বিদ্রূপ, কৌতুক। হাতের পাইপ আস্তে আস্তে টেবিলে ঠুকল দু'-চারবার।

—আর তাহলে আপাতত কোন্ কথা নেই?

—আপাতত নেই আর এ সম্বন্ধে পরেও নেই।

—পরের কথা ভবিষ্যতের কথা, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে সহাস্যেই বলল ঘোষ, কে আর জোর করে বলতে পারে বলুন, হতেও পারে আবার কথা, বাট ইউ আর রিয়েলি ওয়াণ্ডারফুল! ভারী খুশি হলাম!

ঝকঝকে চকচকে এক জোড়া চোখ সকলের মুখের ওপর বুলিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ঘর থেকে।

ভেজালকে নিখুঁত করার জন্য ওই সিমেন্টের সঙ্গে একটা অন্তত জ্যান্ত মানুষকে চটকে মিশিয়ে দিতে পারলে দিত।

সন্ধ্যার পর বাদল গাঙ্গুলির কোয়াটার থেকেই ফিরছিল নরেন। ভেবেছিল বলবে কিছু। কিছু বোঝাবে। কিন্তু সে চেষ্টা আর করেনি। মাটির কণায় আকর্ষণ, বালুর কণায় বিচ্ছেদ। মাটির আভাস পেলে চেষ্টা করে দেখত।

অবনী বাবুর বাড়ির বাইরের ঘরে পা দিয়েই নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়ল। এরকম আগুন-গলানো কণ্ঠস্বর আর বড় শোনেনি।

—কেটে কুচি কুচি করে ওকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে না কেন তোমরা? সান্ত্বনা বলছে।

—কি বকচিস রে তুই পাগলি আবোল তাবোল! অবনী বাবু।

সান্ত্বনা বলতে যাচ্ছিল আবার কি। পায়ের শব্দে থেমে গেল। এ ঘরে এসে নরেন বাপ মেয়ে দু'জনকেই দেখল একবার। পরে সান্ত্বনার উদ্দেশে বলল, কি ব্যাপার, ধান ফেললে যে খই ফোটে! অবনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করল, কাকে কেটে কুচি কুচি করছে?

অবনী বাবু হেসে জবাব দিলেন, কন্ট্রাক্টর রণবীর ঘোষকে।

হা-হা শব্দে হেসে উঠল নরেনও। ফলে তার ওপরেই রেগে গিয়ে ভেঙচি কেটে উঠল সান্ত্বনা। হা হা হা—যেন কি একটা মজার কথা হল!

মনে মনে এ সময় এমনি হালকা অবকাশ বিনোদনই চাইছিল বোধ হয় নরেন। জাঁকিয়ে বসল অবনী বাবুর কাছাকাছি। বেশ, মজার কথা না হয় নাই হল, ধরা যাক কেটে কুচি কুচি করা হল লোকটাকে, কিন্তু গঙ্গায় ভাসাবে বলছিলে, এখানে গঙ্গা পাবে কোথায়?

বাবার অলক্ষ্যে আবার বড় রকমের একটা ভেঙচি কাটতে যাচ্ছিল সান্ত্বনা। কিন্তু তার আগেই অবনী বাবু বললেন, তুই এবার তোর কাজে যা দেখি, খবর শুনতে দে এদিকের। নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল, বুঝিয়ে বললে তাঁকে?

—নাঃ। বলে লাভও নেই কিছু।

—কিন্তু এ তো ভালো কথা নয়। এতবড় প্রতিপত্তিশালী লোক···কত কুলি মজুর পর্যন্ত তার মুখের কথায় ওঠে বসে, কি ফ্যাসাদ যে বাঁধায়···তা ছাড়া হেড অফিসেও তো তার জোর কম নয়।

যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল সান্ত্বনা। নরেন কিছু বলার আগে সেই অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল, কি যে তুমি বলো বাবা ঠিক নেই, প্রতিপত্তিশালী বলে যা খুশি তাই করবে! আর পাঁচজন নেই? নাকি হেড আপিসের চোখ কাণা?

নরেন এবারে নিজের মাথার ওপর এক চক্কর আঙুল ঘুরিয়ে টিপ্পনী কাটল, তোমার এই হেড আপিসের সঙ্গে সে হেড আপিসের কিছু তফাৎ আছে।

সান্ত্বনা চটে গেল। —আর আপনার হেড আপিসের সঙ্গে সে হেড আপিসের পরম মিল আছে।

একরকম রাগ করেই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

নরেনের সঙ্গে সঙ্গে অবনীবাবুও হেসে উঠেছিলেন। কিন্তু হাসি থেমে গেল।···ভাবছেন কিছু। ভদ্রলোকের এ ধরনের বিস্মৃতি নরেন আগেও দেখেছে।

সেই পুরানো কথাই ভাবছেন ওভারসিয়ার অবনী রায়। ভাবনাটা প্রকাশ করেই ফেললেন আজ। বললেন, নিজের আগ্রহে বদলী হয়ে এসেছিলাম এখানে···কিন্তু প্রায়ই মনে হয়, কাজটা বোধ হয় ভালো করিনি।

কণ্ট্রাক্টর রণবীর ঘোষের সমস্যা আপাতত সরে গেছে মন থেকে! নরেন চুপচাপ চেয়ে রইল তাঁর দিকে। এই জল নিয়ে বা ড্যাম নিয়ে এত আগ্রহ কেন সান্ত্বনার এতদিনে অনেকটাই জেনেছে। কিন্তু ভদ্রলোক আজ হঠাৎ এ কথা বললেন কেন বুঝে উঠল না।

এতবড় কাজের মধ্য দিয়ে জীবনের এক ব্যর্থ অপমানকে পেরিয়ে চলছিল বাদল গাঙ্গুলি।

অনেকদিন হয়ে গেল কী? কিন্তু মাত্র সেদিন যেন।

অল্প সময়ের মধ্যে এক আটতলা ম্যানসন তুলে দেওয়ার কণ্ট্রাক্ট নিয়েছে নেশন বিল্ডার্স লিমিটেড। এতবড় দায়িত্ব ও কোম্পানীই নিতে পারে অবলীলাক্রমে।

সেই প্রথম নিজের হাতে এতবড় কাজের ভার পেল বাদল গাঙ্গুলি। হোক বিলেত জার্মান ফেরং ইঞ্জিনিয়ার, হোক পদস্থ কর্মচারী, হোক ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ভাবী জামাই—বাসনার ভরা জোয়ারে সেই ওর প্রথম অবগাহন আর প্রথম রোমাঞ্চ।

প্রাথমিক ব্যবস্থাদি সুসম্পূর্ণ। দিনে পাঁচবার করে গিয়ে সাইট দেখে আসছে। কাজ আরম্ভ করলেই হয় এবার। করতেও হবে।

কিন্তু মনে খটকা বাঁধল একটা।

ছোট কাঁটার মত কি যেন একটা খচ খচ করতে লাগল ভিতরে ভিতরে। বিল্ডিং-এর ডিজাইন করেছেন স্বয়ং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। খাতিরের পাটি, খাতিরের তাগিদ। পাকা হাতের পাকা ডিজাইন। বলার নেই কারো কিছু। বাদল গাঙ্গুলিরও না। কিন্তু তার দুশ্চিন্তার হেতু অন্য।

সর্বপ্রথম নরেন চৌধুরীর কাছে সন্দেহটা ব্যক্ত করেছিল।—কেমন যেন লাগছে হে, আগে একবার সয়েলটা টেষ্ট করে নিতে পারলে হত, ও-রকম জমিতে এত বড় কনস্ট্রাকশন যদি না টেঁকে?

সাড়ম্বরে নিজের দুই কান চাপা দিয়েছে নরেন।—সর্বনাশ! তুমি না হয় জামাই হতে চলেছ, আমার চাকরীটা যাবে? আমি বাবা এসবের মধ্যে নেই। পরে পরামর্শ দিয়েছে, উড্-বি ফাদার-ইন-ল'কে বলেই ফেল না চোখ-কান বুজে।

সেটা পেরে উঠছে না বলেই যত অস্বস্তি। আপিসের দু'

চার জন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করল এ নিয়ে। কিন্তু সুরাহা হল না কিছু, একেবারে নিঃসংশয় হওয়া গেল না।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ওকে ঘরে ডেকে পাঠালেন সেদিন। জিজ্ঞাসা করলেন, সব রেডি তো?

—আজ্ঞে হাঁ।

—বেশ। রাইট অ্যাওয়ে স্টার্ট কাজ আরম্ভ করে দাও, পার্টির জোর তাগিদ, দেখতে দেখতে কাজ শেষ করে দিতে হবে। বাট বি ভেরি কেয়ারফুল, কোথাও গলদ না থাকে।

বাদল ঘাড় নাড়ল। একটু ইতস্তত করে বলেই ফেলল তারপর। —সাইট দেখে এসে আমার একটু খটকা লাগছে···ওরকম জমিতে এত বড় ডিজাইন···আগে সয়েলটা অন্তত একবার টেষ্ট করে নিলে হত···।

শুনে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ভুরু কোঁচকালেন প্রথম। ঠোঁটে বাঁকা হাসির মত দেখা গেল একটু। ওর দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন বার দুই।—অনেক দিন কাজ করেছ বলেই সতের ঝামেলার কথা মনে আসে তোমার, নট ব্যাড—।

বক্রোক্তি শুনে দু'কান লাল হয়ে গেল। আবারও বলতে যাচ্ছিল কি। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর থামিয়ে দিলেন। এ সুর ভিন্ন।

—ওয়েট মাই বয়···কথাটা ডিপার্টমেন্টের আরো কাকে যেন তুমি বলেছ শুনেছি। তা কোম্পানীর একটু বিশ্বাস টিশ্বাস আছে আমার ওপর, এই দু'চোখের শাদা অভিজ্ঞতায় তোমাদের ওই সব টেষ্টই ঠিক ঠিক হয়ে আসছে। তোমার কাজের সুনাম খুব, কিন্তু সেটা টেনে বাড়াতে যেও না, ও আপনি আসবে—নাও গো অ্যাহেড উইথ ইয়োর জব।

কিন্তু বিপুল বাড়ুরী সেখানেই থামেন নি। বাড়ি এসে স্ত্রীর কাছেও বলেছেন কথাটা। কিছুদিন হল ভাবী জামাইয়ের ওপর একটু চটেছে আছেন মহিলা। বাদলের মা কিছুদিনের জন্য দেশে গেছেন শুনেই সাগ্রহে তাকে এ বাড়ি এসে থাকার অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি। আশা, ওর মা সেটা শুনলে দেশেই থেকে যেতে পারেন বরাবর। কিন্তু ভাবী জামাই প্রস্তাবটা একবার ভেবে দেখেনি পর্যন্ত। মেয়ে বা মেয়ের বাবার কাছে ক্ষোভ চাপা থাকেনি মিসেস বাড়ুরীর। এভাবে ওকে মাথায় তোলার ফল ভুগতে হবে সে ভবিষ্যদ্বাণী অনেকবারই করেছেন তারপর।

তাঁকে খুশি করার জন্যেই সেদিনের কড়া শাসনের খবরটা ব্যক্ত করলেন বিপুল বাড়ুরী। শুনে একেবারে যেন হাঁ হয়ে গেলেন মিসেস বাড়ুরী। এবং সে হাঁ হওয়া বিস্ময়টুকু পঞ্চপল্লবে সাজিয়ে মেয়ের কাছেও প্রকাশ না করে পারলেন না।

সারাক্ষণই মনটা খারাপ হয়েছিল বাদলের। এরকম কটূক্তি কখনো শুনতে হয়নি। সেদিন পাঁচটার হর্ন বাজতে নবেন এসে পথরোধ করে দাঁড়াল যখন, তাও ভালো লাগেনি। বরং বিরক্ত হয়েছে। অথচ, অন্যান্য দিনের মত পড়িমরি করে যে ছুটেছে তাও নয়।

নীলার প্রথম কথাতেই মেজাজ যেন আরো বিগড়ে গেল। চুপচাপ কিছুক্ষণ গাড়ি চালিয়ে নীলা বলল, এরকম অবস্থা কেন মুখের, বাবার কাছে বকুনি খেয়েছ বলে?

বাদল গাঙ্গুলি দূরে বসল আস্তে আস্তে। চুপচাপ চেয়ে রইল শুধু।

আবার বলল নীলা, বেশ করেছে বকেছে, বকবে না তো কি! বাবাকে পর্যন্ত রাগাতে সাহস করো তুমি, বাবা ডিজাইন করে দিলেও নিঃসন্দেহ হতে পার না এত গুমোর তোমার—ক'দিনের ইঞ্জিনিয়ার হে তুমি?

খানিক চুপ করে থেকে বাদল বলল, এসব আলোচনা আমার ভালো লাগছে না নীলা।

—তা তো লাগবেই না। হাসি আর রাগ মেশানো কটাক্ষ। তেতো কথা কার আর ভালো লাগে, মুখখানা অমন হাঁড়িপনা করে বসে থাকবে না যাবে কোথাও?

সবকিছু মন থেকে ঝেড়ে ফেলেই হাঁড়িমুখে হাসি ফুটিয়ে বাদল গাঙ্গুলি ওর দিকে মন দিতে চেষ্টা করেছিল তারপর।

কিন্তু নেশান বিল্ডার্স-এর ওই আটতলা ম্যানসন আর ওঠেনি।

তার আগেই থামতে হয়েছে।

সমস্ত কোম্পানীর সজাগ দৃষ্টি পড়েছে এদিকে। ছোট বড় সকলের। বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের আবির্ভাব ঘটছে। তাঁরাও মাথা নেড়ে গেছেন। একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠেছে আশপাশময়। আটতলা বাড়ীর সঙ্কল্প ছ'তলায় শেষ, কে কার মুখ চাপা দেবে। কারো মতে কোম্পানীর গুডউইলটি গেল এবার, কারো বিস্ময় বাদল গাঙ্গুলি কাঁচা ছেলে নয়—এরকমটা হল কেন! কারো জবাব, ওই প্ল্যান আর ডিজাইনেই গোলমাল আছে শুনে রাগো, বিশ লাখ টাকার কনস্ট্রাকশনে কম করে দেড়লাখ টাকা পেয়েছে ডিজাইন করে—অভাব নেই, লোভ করতে গেছে, বেশ হয়েছে।

এই খাবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের স্পন্দন থেমে গেছে যেন বাদল গাঙ্গুলির। ধমনীর রক্ত চলাচল থেমে গেছে। দিনের আলোর রং মুছে গেছে চোখ থেকে। রাতের নির্জনতাও যাতনা-মুখর। পরিত্যক্ত বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে।

বাড়ি নয়, বাড়ির কঙ্কাল। মানুষ নয়, নিষ্প্রাণ মূর্তি।

বোঝাপড়ার ডাক এলো।

কৈফিয়ৎ থাকলে এতবড় বিপর্যয়ও কিছু নয়। বিপুল বাড়ুরীর কাছে অন্তত নয়। বড় জোর দু'পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কোম্পানীকে। কিন্তু ঝড় উঠল এই কৈফিয়ৎ দেওয়া এবং কৈফিয়ৎ নেওয়ার ব্যাপারেই।

সাউণ্ডপ্রুফ ঘর তাঁর। বাইরে থেকে কিছু শোনা গেল না, কিছু বোঝা গেল না।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ফেটে পড়লেন, উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে।—ননসেন্স! রিডিকুলাস! প্রিপসটারাস!

বাদল গাঙ্গুলি নীরব, নিশ্চল।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এতবড় ইঙ্গিত বরদাস্ত করে উঠতে পারছিলেন না বিপুল বাড়ুরী। পায়চারী করলেন ঘরের এ মাথা ওমাথা। রাগে সমস্ত মুখ শাদা।—তোমারই ভবিষ্যৎ গড়বার জন্য এতবড় দায়িত্ব দিয়েছিলাম, বদলে মুখে একেবারে চুনকালি দিয়েছ তুমি! কোথায় লজ্জিত হবে তা না···। কোথায় না ভুল হতে পারে? প্লিনথ-এ ভুল হতে পারে, কনস্ট্রাকশনে ভুল হতে পারে···

—জ্ঞানত এসবে কোন ভুল হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

—জ্ঞানত—জ্ঞানত—জ্ঞান! কতটুকু জ্ঞান তোমার? ক'টা ম্যানসন তুলেছ আজ পর্যন্ত? না কি একবার ওই বাইরে ঘুরে এসেছ বলেই জ্ঞানের আর বাকি নেই কিছু?

বাদল উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। কোন মীমাংসা হবার নয় জানাই ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন আবার। সিট ডাউন প্লীজ অ্যাণ্ড লেট মি থিঙ্ক।

নিজেও ঘুরে গিয়ে চেয়ারে বসলেন আবার। খানিকক্ষণ দম নিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্তমুখে বললেন, এতবড় ক্ষতিপূরণ দিয়ে কোম্পানী তো আর চুপচাপ বসে থাকবে না। বোর্ড বসবে, তোমার কৈফিয়ৎ নেবে, রীতিমত বিচার করবে।···বেশ ভেবে চিন্তে আনফোরসিন বিকজ্‌স-এ কিছু একটা গোলযোগ হয়ে গেছে বলে রিপোর্ট দাও।

—তার মানে, খুব শান্ত খুব সংযত কণ্ঠে বাদল গাঙ্গুলি বলল, আমারই কোথাও ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করে নেব?

টেবিল চাপড়ে বিপুল বাড়রী বলে উঠলেন, তা নেবে নেবে—তোমার ওপর ছিল দায়িত্ব আর ভুলটা কি স্বীকার করবে বাইরের লোকে এসে? রিপোর্ট দাও, তারপর দেখা যাক—

নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়। সমস্ত জড়তা কাটিয়ে বাদল গাঙ্গুলি আবার উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। স্পষ্ট জবাব দিল, কিন্তু আমি তাতে রাজি নই। বিল্ডিংয়ের পাশের জমি থেকে এখনো সয়েল টেষ্ট করে নেওয়া যেতে পারে। ওই জমিতে আর ওই ডিজাইনের ফাউণ্ডেশনে এতবড় কনস্ট্রাকশন দাঁড়ায় কি না আমার ষ্টেটমেণ্ট-এ সেটাই আগে আমি পরীক্ষা করে দেখতে বলব। তাতে কোন গলদ না থাকলে বোর্ডের বিচার আমি মাথা পেতে নেব।

শান্ত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

সহসা পাশবদ্ধ দোর্দণ্ডকেশরীর নিরুপায় স্তব্ধতার মত ভদ্রলোক স্থির হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সর্বাঙ্গে গলিত দাহ অনুভূতি একটা। আপিসে বসে থাকা সম্ভব হল না আর। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে বাড়ি ছুটলেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিপুল বাড়রী।

···পরিত্যক্ত বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়েছিল বাদল গাঙ্গুলি। সামনে যেন ওরই হাড় পাঁজরাগুলো দেখছিল চেয়ে চেয়ে। সন্ধ্যার ছোঁয়ায় দিনের আলো ধূসর হয়ে হয়ে মিলিয়ে গেল একসময়। ক্লান্ত, মন্থর গতিতে ফিরে চলল।

নিধু দরজা খুলে দিল। কিছু বলতে চাইল বোধ হয়। কিন্তু বলা হল না। ক'দিন ধরেই মনিবের কবরের মত থমথমে মুখ দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে আছে। বাদল গাঙ্গুলি সোজা নিজের ঘরে চলে গেল। থমকে দাঁড়াল তারপর। নীলা বসে আছে শান্ত মুখে।

ওর ওপর দিয়েও ঝড় গেছে একটা। জানা নেই, কিন্তু অনুমান করা কঠিন হল না। তার আভাসও পেল। নীলাই কথা বলল প্রথম, আশা করোনি দেখছি···।

—না।···তুমি এ সময়ে?

নীলা মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক।—আগে তো যে কোন সময়ে আসতুম, এখন তাহলে সময় ধরে আসার মত কিছু একটা হয়েছে?

জবাব না দিয়ে গায়ের কোটটা খুলে আলনায় রেখে বাদল গাঙ্গুলি। নীলা বিছানার ওপরেই বসে। খানিকটা ব্যবধানে বসল সেও।—বলবে কিছু?

নীলা তেমনি নিরীক্ষণ করছিল তাকে।—বলব কিছু, কিন্তু শুনতে হয়ত তোমার খুব ভালো লাগবে না।

জোর করেই বাদল এবারে হাসতে চেষ্টা করল একটু। শয্যায় শরীর ছেড়ে দিল খানিকটা। হালকা জবাব দিল, তার থেকে শুনতে ভালো লাগে এমন কিছুই না হয় বলো।

যা বলার স্পষ্ট বলতে বলেই এসেছে নীলা। আর জানেও স্পষ্ট বলতে। কিন্তু তবু বলার আগে খুব ভালো করে দেখে নিতে চায় যেন।—বাবার বিরুদ্ধে যাবার দুঃসাহস তোমার হল কি করে? নিজেকে তুমি কি ভেবেছ? আজ পর্যন্ত উনি যা করেছেন তোমার জন্য সব ভুলতে পারলে?

—আমার জন্যে কিছু করেননি, নিরুত্তাপ জবাব, করেছেন তাঁর মেয়ের জন্য···এখন দেখছেন, যা করেছেন সবই ভুল করেছেন।

—শুধু বাবা নয়, সকলেই তাই দেখছে। অদ্ভুত, কণ্ঠে নীলা ঝাঁঝিয়ে উঠল প্রায়, ভুল না হয় হয়েছে, ভুল মানুষেরই হয়, কিন্তু সে দায়টা বাবার ওপর চাপাতে লজ্জা হল না তোমার? সঙ্কোচ হল না?

ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে গেল বাদলের সমস্ত মুখ। সামলে নিয়ে শান্ত মুখেই জবাব দিল আবার, ভুলের দায় আমি কারো ওপর চাপাতে চাইছি না নীলা, সত্যি নিজে ভুল করেছি কি না সেটুকুই বুঝে নিতে চাইছি। ওই জমিও আছে আর তোমার বাবার ডিজাইনও আছে—এ দু'টো একবার তিনি এক্সপার্ট দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিচ্ছেন না কেন? তাতে কোন গলদ না থাকলে, ভুল আমার তো বটেই।···কিন্তু তোমার বাবা তা করবেন না, কারণ, তাঁর মনে সন্দেহ আছে।

কি বলছে, খানিক চুপ করে থেকে বুঝতে চেষ্টা করল নীলা। কিন্তু বোঝা অসম্ভব। বিশেষ করে যেখানে ভালো করে কিছু বোঝাবার জন্যেই এখানে আসা। উল্টে রেগে গেল আরো। শান্ত ধৈর্যটুকুও তিরোহিত হল।—বলিহারি আস্থা তোমার নিজের ওপর! বাবার কাজ ঠিক আছে কি না অন্য এক্সপার্ট ডেকে সেটা যাচাই করতে হবে?

নিরুত্তর

—অতশত আমি বুঝিনে, তোমার আমার ভালোর জন্য বাবা যা বলছেন তাই তোমার করা উচিত, আর তাই তুমি করবে, অন্তত আমার জন্যেও করবে।

—কিন্তু তোমার বাবা যা বলছেন তাই করলে যেখানে আমায় নেমে আসতে হবে তাতে তোমার আমার কারোই ভালো হবে না।

—হবে হবে হবে। নীলার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে এসেছে। আরো সামনে ঝুঁকে এলো। বলে গেল, হয়ত তোমার দুর্নাম হবে কিছু, হয়ত বা উন্নতিও বন্ধ থাকবে কিছুকাল, কিন্তু বাবা ঠিক আবার টেনে তুলবেন তোমায়। তার বদলে তাঁকে অপদস্থ করতে গেলে তাঁর নাগালও পাবে না তুমি, উল্টে সবই যাবে তোমার—তার অর্থটা ভেবে দেখেছ?

স্তব্ধ গুমোট একটা। একটানা। দুঃসহ।

আগে দেখিনি। এখন দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে আরো কেউ যাবে, সব ছেড়ে নিজেকে আর আমার সঙ্গে জুড়ে দিতে পারবে না, এই তো ?

সোজা হয়ে বসল নীলা। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করে উঠল তারপর, ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে কাব্য করলেই তো পারো। তুমি কি ভাবো এ পর্যন্ত তোমায় টেনে তোলা হয়েছে তোমার ভাবের ঘোরে বৈরেগী হবে বলে ? সে রকম লোকের কি খুব অভাব ছিল ?

এর থেকে স্পষ্ট আর বোধ হয় কিছু শোনার ছিল না বাদল গাঙ্গুলির। ওকে টেনে তোলা হয়েছে। ইচ্ছে হল বলে, আভিজাত্যের ফাঁস পরিয়ে টেনে যাকে তুলছ, উঠলে এবারে একটা মরা মানুষই উঠবে। বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে একখানা হাত রাখল শুধু ওর কাঁধে।—নীলা···!

—বলো। হাত সরিয়ে দিয়ে কঠিন মূর্তির মত বসে রইল নীলা।

—তোমার আমার সম্পর্কটা এর বাইরে আর কিছু নয় তা হলে ?

—তোমার এতবড় ঘা খেয়েও সেটা ভাঙবে না এমন কিছু নয়। বাবাকে তুমি অপমান করেছ, তাঁর মানসম্ভ্রম নষ্ট করতে বসেছ। নিজের ভুল স্বীকার করে নাও, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, তাঁর ক্ষমতা তুমি ভালই জানো।

কিছুক্ষণ।···অনেকক্ষণ। একটা আচ্ছন্নতার ঘোর কাটল যেন।—এই তাহলে তোমার শেষ কথা ?

—হাঁ। হাতঘড়ি দেখে নীলা উঠে দাঁড়াল।—আচ্ছা, কালকের মধ্যে তোমার জবাব পাব আশা করি, গুড নাইট্—।

···আর দেখা হয়নি।

কিন্তু জবাব নীলা পরদিনই পেয়েছিল। নীলা ঠিক নয়, বিপুল বাড়রী পেয়েছিলেন।

নীলা চলে যাওয়ার পর সে রাত্রিরও অবসান হয়েছিল বইকি। এতবড় জবাবের দুর্বহ বোঝা বহন করে নিঃশব্দে কেটেছে সে রাত। তিলে তিলে, পলে পলে। আবার সকাল হয়েছে। আবার আপিসের সময় হয়েছে। আবার আপিসে এসেছে···।

শেষবার।

ষ্টেটমেণ্ট লিখেছে। যেমন চেয়েছিলেন বিপুল বাড়রী তেমনি। যে জবাব নীলা আশা করে গেছে তেমনি। ষ্টেটমেণ্ট সই করে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আর সেই সঙ্গে পদত্যাগ পত্রও দাখিল করেছে নিজের।

ওটুকু কাজ শেষ করেই ফিরে এসেছে আবার। একটা বোবা শূন্যতায় ধড়ফড় করে উঠেছে থেকে থেকে। তারপরেই মনে হয়েছে মা নেই এখানে। অনেকদিন নেই।···মায়ের কাছে যাবে।

নরেন এসেছিল তার আগে।

তেমনি হাসি। তেমনি খুশি। আরো বেশি হাসিখুশি যেন। আপিস কামাই করে ষ্টেশানে পৌঁছে দিয়ে গেছে ওকে। অনর্গল কথা বলেছে। কতক কানে গেছে, কতক যায়নি।

···মুক্তিটা যেন ওরই। কেন মা ওকেও ভালবাসত এত, সেটা যেন ভারী সহজে চোখে পড়েছিল সেদিন।

মা অবাক হয়েছিল বইকি। অবাক নয়, ভয়ই পেয়েছিল। একসঙ্গে কত কথা জিজ্ঞাসা করেছিল ঠিক নেই।—এমনি চলে এলি কি রে।···তা বেশ করেছিস···কিন্তু এরকম হঠাৎ···শরীর ভালো আছে তো ? হাঁ রে ? এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?

অত হাসছিল তাও ওই কথা !···তারপর আস্তে ধীরে মা শুনেছে সব। শুনেও মন্তব্য করেনি কিছু। কিন্তু মায়ের ভিতরটা যেন দেখতে পাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে পড়ে গেছে তাঁর দিকে চেয়ে। খুশিতে বলেই ফেলেছিল। আসার দিন নরেন সারাক্ষণ সঙ্গে ছিল মা, গাড়ি ছাড়ার আগে বলল, ওদের অতবড় অবিচার মাথা পেতে নিলে তোমার মুখের মা ডাকও আর ভালো লাগত না তোমার ওই মায়ের—গিয়ে দেখো।

শুনে মা হেসেছিল; আর নরেনের 'পরে মায়ের নীরব আশীর্বাদ ঝরতে দেখেছিল দুই চোখে।—তা তো হল, কিন্তু তোর মুখ-চোখের এ অবস্থা কেন, অতবড় চাকরীটা গেল বলে ?

মিথ্যেই অত হাসছিল। অত হাসতে চেষ্টা করছিল।

একদিন নয়। আরো একদিন ধরা পড়েছে।

খাঁচা ভেঙ্গে এসেছিল। কিন্তু বড় অভ্যস্ত খাঁচা। মুক্তিটা ঠিক মুক্তির মত লাগছিল না। নীলার ফোটো ছিল ট্রাঙ্ক ভরতি। অনেক সপ্রগলভ হাসি-খুশি মুহূর্তকে বন্দী করেছিল একে একে। একা ঘরে সেগুলো বার করে বসেছিল সেদিন। ছিঁড়ছিল একটা একটা করে। ঠাণ্ডা মাথায়। শান্ত মুখে। সমনোযোগে।···মনের আনাচে কানাচে ঘুর ঘুর করে আশার আলেয়ারা। উঁকিঝুঁকি দেয় আকাঙ্ক্ষার নটীরা। কে জানে, সেদিনের সেই একরাতের তিলে তিলে পলে পলে দাহ করা ভস্ম থেকে আবার তারা উঠে আসবে কি না। আবার তারা হাতছানি দেবে কি না। আবার তারা সোনার ফাঁস ওর গলায় পরাবে কি না।

মা কখন এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেনি। মৃদু ভর্ৎসনার চমকে উঠেছিল।—এই করে কি কিছু সুবিধে হবে ?

অপ্রস্তুতের একশেষ। শেষে হেসেই ফেলেছিল। নাঃ তোমাকে লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করারও জো নেই।

খণ্ডছিন্ন ফোটোগুলোর দিকে খানিক চেয়ে থেকে ভারী অদ্ভুত কথা বলেছিল মা তারপর। হ্যাঁরে, এত বুঝিস আর এটুকু বুঝিসনে, জ্বর হলে গায়ে জল ঢেলে গা ঠাণ্ডা করা যায় ? ও যেমন আছে থাকতে দে, আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলের অনেকক্ষণ আর বাকস্ফুরণ হয়নি তার পর। চেয়েই ছিল শুধু। তার পর বলেছিল, এত বুঝি, কিন্তু তোমার মত যদি সব কিছু এত সহজ করে বুঝতাম মা···।

—থাক, খুব হয়েছে। তেমনি সাদাসিধে কথা তাঁর।—কি করবি এবারে ঠিক করে ফ্যাল্। কাজের মানুষ তুই, দিন-রাত এমন শুয়ে-বসে ভালো লাগবে কেন ? কোথায় যাবি চল্, আমিও না হয় যাই তোর সঙ্গে।

মড়াই ঘুমিয়ে পড়েছে। মড়াই ঘেরা পাহাড়গুলো ঘুমিয়েছে। মড়াইয়ের রাত্রিও ঘুমিয়েছে। নিস্তেজ ঘুম সর্বত্র। মাথার ওপর ওই আকাশভরা তারাগুলো জেগে আছে শুধু। খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে মড়াইয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি তাদের দেখছে চেয়ে চেয়ে।···ছেলেবেলায় গল্প শুনত জীবনের শেষে নাকি ওই তারা হয়ে থাকার জীবন।

তাই যদি হয়, কোনটি তার মা ? [ক্রমশঃ।

শরৎ-স্মৃতির টুকিটাকি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

বাংলা ১৩৪৩ সালের ফাল্গুন মাসের এক অপরাহ্ণে আমি আমার বরানগরের বাসার খুব কাছে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটা নির্জন স্থানে একাকী বোসেছিলাম। ঠিক যে গঙ্গার শোভা দেখছিলাম, তা নয়। চোখের সামনে অনেক কিছুই দেখছিলাম বটে, কিন্তু মনের চোখে কিছুই দেখছিলাম না। বোসে-বোসে এলো-পাতাড়ি অনেক কিছুই ভাবছিলুম। ভাবনাগুলো খাপছাড়া; না ছিলো তার শৃঙ্খলা, না ছিলো তার পূর্ণতা। সময় কাটানোর জন্যই হয় ত নিরর্থক বোসেছিলাম। হঠাৎ পিছনে পদশব্দ ও তার সঙ্গে প্রশ্ন—"একলাটি এখানে বসে আছেন যে?" পিছন ফিরে দেখলাম, পরিচিত মুখ; এখানকারই একটি যুবক। এঁর পোষাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব, কথা-বার্তা একটু অনন্য-সাধারণ অর্থাৎ কবি-কবি ভাব। চুলগুলো রুক্ষ-রুক্ষ এবং সযত্নে অযত্ন-বিন্যস্ত; ঢিলা-পাঞ্জাবীটার ওপর নেহাৎ অমনোযোগের সঙ্গে একখানা সুদৃশ্য চাদর বেশ কায়দা-দোরস্ত ভাবে ফেলা; পায়ে তালতলার উল্টো চটি—অর্থাৎ বিদ্যাসাগরী চটি। কথা বলবার ভঙ্গী মধুর ও মোলায়েম; কথাগুলোও বেশ সরস ও মিষ্টি এবং তা সাধারণের থেকে একটু বাইরের। এখানকার যুবক-মহল এঁকে কবি আখ্যা দিয়েচে, যদিও এঁর কোন কবিতা মুদ্রিত বা অ-মুদ্রিত অবস্থায় কখনো কারো নজরে পড়েনি।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না কোরে তিনি মৃদু মৃদু হাসির সহিত দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন—"গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছেন?"

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমিও ঐরূপ হাসতে হাসতে বললাম —"এখন ঋতুরাজ তাঁর দক্ষিণ দুয়ার খুলে দিয়েচেন, এখন কি আর গঙ্গার হাওয়ার দিকে কারুর মন থাকে? মা-গঙ্গা নিজেই এখন ওই লোভে দক্ষিণ দিকে ছুটেচেন, দেখতে পাচ্চেন ত?" বলা বাহুল্য, তখন গঙ্গায় দক্ষিণমুখী ভাঁটার স্রোত বইছিল।

তিনি মিষ্টি হাসির সঙ্গে বললেন—"ঠিক বলেচেন। এখন বসন্তরাণী প্রত্যেকের দুয়ারে এসে ছুটোছুটি করচেন।"

জাঁদরেল কবিটির লিঙ্গ-জ্ঞানে সচকিত হোয়ে পড়লুম; বললুম —"আপনার কবিত্বের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে লিঙ্গালিঙ্গ পুড়ে একাকার হোয়ে বসন্তরাণীর আসবার পথ পরিষ্কার করে দিয়েচে, আমাদের সে সৌভাগ্য হয় নি; তাই আমাদের দোরে এসে দাঁড়ান স্বয়ং ঋতুরাজ তাঁর রাজদণ্ড হাতে নিয়ে।"

জানি না, তিনি আমার কথাগুলোর মানে বুঝতে পারলেন কি না, শুধু হাসতে-হাসতে বললেন—"শুনচি আপনি নাকি বরানগর থেকে আবার লেক রোডের দিকে চলে যাচ্চেন?"

"হ্যাঁ"—বলেই উঠে পড়লুম। ইনিই মাস-দুই আগে, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হবার ইচ্ছায় আমার সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু এখানকার সেই 'S'-য়ের ব্যাপারের পর আমি বিশেষরূপে সতর্ক হোয়ে যাওয়ার ফলে, এঁর অনুরোধটা কোনরকমে তখন কাটিয়ে দিয়েছিলুম।

মনটা ক'দিন ধরেই খারাপ ছিল। বিদেশে সঙ্গিহীন অবস্থা যেমন, ঠিক সেই রকমটা বোধ কচ্ছিলাম। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হবার আগ্রহটা দিন-দিনই মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছিল। এখানে এই একটা বছর থেকে মোটেই আর ভাল লাগছিল না। পরের দিন সকালে চা খেয়েই আমি লেক রোডের ঐ দিকে চলে গেলুম— সুবিধামত একটা বাসার খোঁজে। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর, পেয়েও গেলুম একটা।

সুতরাং দু'-একদিন পরেই আমি বরানগরের বাসা ছেড়ে দিয়ে আবার লেক রোডে শরৎচন্দ্রের বাড়ীর কাছেই চলে এলুম। যেদিন এখানে উঠে এলুম, সেই দিনই রাত্রে সব গোছ-গাছ শেষ করে সারা দিনের খাটাখাটুনির পর আহারান্তে যখন বারান্দায় একখানা মাদুরের ওপর ক্লান্ত হোয়ে শুয়ে পড়লুম, তখন আমার স্ত্রী বললেন— "শুয়ে পড়লে যে? যাও!"

"কোথায়?"

"যাঁর জন্যে তাড়াতাড়ি এখানে চলে এলে;—শরৎ বাবুর কাছে।"

"এত রাত্রে?"

"তা হোলেই বা; নইলে, রাত্রে ঘুমুতে পারবে না হয়তো।"

অর্থাৎ আমার স্ত্রীর বরানগর থেকে আসবার ইচ্ছেটা ছিল না। তাই তাঁর কথায় এই খোঁচাটুকু সহজেই বুঝতে পারলুম। সুতরাং কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করেই শুয়ে থাকলাম এবং আমার ক্লান্ত দেহকে নবাগত দক্ষিণা বাতাস কখন যে সে-রাত্রে ঘুম পাড়িয়ে ফেললে, তা জানতে পারলুম না।

পরদিন সকালেই শরৎচন্দ্রের কাছে গেলাম। ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বললাম—"দাদা, ওখান থেকে বাসা তুলে নিয়ে আবার এইখানেই চলে এলাম।"

"আসবে যে, তা আমি জানি।"

"কি কোরে জানলেন?"

"তা বলতে পারি না; তবে, আমার মন তাই বলছিল; আর চাইছিলোও তাই। তাই জানতুম যে, তুমি আসবেই।"

এই ক'টা কথার মধ্যে কি ছিল জানি না এবং এই নিয়ে একটুখানি কি যে আমি ভাবলুম, তাও জানি না, কিন্তু আমার চোখ দুটো জলে ঝাপসা হোয়ে গেল। শরৎচন্দ্রও ক্ষণিকের জন্য যেন একটু অন্যমনস্ক হোয়ে পড়লেন। জানি না, বহু দিনকার কোনও অকপট, সরল এবং সবল সখ্যতার ভুলে-যাওয়া একটুখানি কথা, একরত্তি ব্যথা, আমার ব্যাপারে তাঁর আজকের পরিণত মনের মধ্যে দীর্ঘ দিন পরে আবার নতুন করে ক্ষণিকের একটা তরঙ্গ তুলেছিল কি না। তখনকার এই ঘটনাটা আজ লিখতে বসে আমার এখনকার এই বৃদ্ধ মনের ওপর এই কথাটাই বড় হোয়ে ফুটে উঠছে যে, মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে যে প্রকৃত সরল, সত্য ও পবিত্র জিনিষটি প্রথমেই সেখানে গেরস্থালী সাজিয়ে বাস করতে থাকে, তার ভবিষ্যৎ জীবনের শত কাজের চাপে, সহস্র ঘাত-প্রতিঘাত ও কোলাহল-কলরবের মধ্যে তা কিছুতেই বিকৃত হয় না; আবশ্যক সময়ে এবং অনুকূল অবস্থায়, সে তার সেই আদিম ঘরখানির

মধ্যে থেকেই তার সেই প্রকৃত রূপ নিয়ে উঁকি দিয়ে বাইরে চাইতে থাকে।

কিছু দিন থেকে শরৎচন্দ্র ঘন ঘন অসুস্থ হোয়ে পড়ছিলেন বোলে আমাদের অনুরোধে তিনি কাশী চলে যান। কিন্তু অল্প-কিছু দিন পরেই আবার কোলকাতায় চলে আসেন। আমি বললাম—"কিছু দিন থেকে এলে ত' ভাল হোত; তাড়াতাড়ি চলে এলেন কেন দাদা?"

বেশ সহজ কণ্ঠে শরৎচন্দ্র বললেন—"শীগ্‌গিরই মরে যাব, তাই অনেক দিনের একটা শেষ সাধ মেটাতে তাড়াতাড়ি চলে এলুম।"

"শীগগিরই মরে যাবেন? কি করে বুঝলেন?"

"হ্যাঁ, আমি বুঝেছি; দেখো।"

মনটা ব্যথায় ভরে উঠ্‌লো। তবুও সেটাকে চেপে রেখে জিজ্ঞাসা করলুম—"ও-সব বাজে কথা আর বলবেন না। যা'ক, শেষ সাধটা কি শুনি?"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভাবলেন; তারপর বললেন—"জীবনে অনেক জায়গা থেকে অনেক 'অভিনন্দন' আমি পেয়েছি; অর্থাৎ আমি খালি নিয়েছি, কারুকে কিছু দিই নি। সেই জন্তে অনেক দিন থেকে আমার ইচ্ছে, আমি একজনকে 'অভিনন্দন' দিয়ে যাব।"

"খুব ভাল কথা। কা'কে দেবেন?"

"দেবো একজনকে।" একটু থেমে আবার বললেন—"উপযুক্ত পাত্রকেই দোবো।"

কা'কে দেবেন, তা যখন তিনি বললেন না, তখন বার বার জিজ্ঞাসা করার অসভ্যতাটা আমি আর করলুম না। মনে মনে ভাবতে লাগলুম, শরৎচন্দ্র নিজ হাতে অভিনন্দন দেবেন যাঁকে, তিনি কে হোতে পারেন? দু'-তিন জনের নাম আমার মনে হোল, যাঁরা খোদ শরৎচন্দ্রের দ্বারা অভিনন্দিত হবার পক্ষে সত্যই উপযুক্ত। তাঁদের মধ্যে অশীতিপর বয়স্ক রায় বাহাদুর জলধর সেন মশা'য়ের নামটাই বেশী কোরে আমার মনে হোতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা না কোরে পারলুম না—"জলধর সেন কি?"

"না।"

তখন আরো দু'জনের নাম করলাম; কিন্তু তিনি তাঁর ঐ নেতি-বাচক প্রথম উত্তরটাকেই বজায় রাখলেন। এর পর আর জিজ্ঞাসা করা চলে না; সুতরাং নীরব রইলাম। কিন্তু মনের মধ্যে ঐ ক'জনের নাম জোয়ার-ভাঁটার মত কেবলি আসতে-যেতে লাগলো। অথচ ঔৎসুক্য ও অভদ্রতার কাছে হার মেনে, মুখ ফুটে এর পর আর জিজ্ঞাসা করাও যায় না।

দু'-একদিন পরে একদিন কবিশেখর কালিদাস রায়ের সঙ্গে দেখা হোল। তিনি বললেন—"শরৎচন্দ্র আপনাকে 'অভিনন্দন' দেবেন।" চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম—"আমাকে?"

"হ্যাঁ।"

বিস্ময়ভরে জিজ্ঞাসা করলুম—"আমাকে কেন?"

"তা বলতে পারি না। যে কারণেই হোক, শরৎচন্দ্র আপনাকে খুবই পছন্দ করেন এবং আপনার লেখাও তাঁর খুব ভাল লাগে; সেই জন্তে তিনি আপনাকে অভিনন্দন দিতে চান।"

সম্প্রতি কয়েক মাস পূর্বে কবিশেখর 'দেশ' পত্রিকায় 'রসচক্র ও শরৎচন্দ্র' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে আমার এই 'অভিনন্দন' সম্বন্ধে তিনি কিছু লিখেছেন, তার মোটামুটি কথা এইরূপ—"অসমঞ্জ বাবু রবীন্দ্রনাথকে তাঁর লিখিত একখানা বই পাঠিয়ে দেন। সেই বই পড়ে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রশংসাপূর্ণ পত্র দেন। তার পর অসমঞ্জ বাবু তাঁর আর একখানা উপন্যাস—'মাটীর স্বর্গ—' পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে এ বইখানার খুব বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। এতে অসমঞ্জ বাবু খুবই ব্যথা পান। এই সূত্রেই শরৎচন্দ্র এক দিন আমাকে বলেন—'ও বড় মন-মরা হোয়ে আছে, ওকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দেওয়া দরকার। তোমার 'রসচক্রে'র একটা বড় অধিবেশনের মাধ্যমে ওকে একটা অভিনন্দন দেবার ব্যবস্থা কর। আমি নিজেই ওকে অভিনন্দিত করবো।·····'

—শরৎচন্দ্র এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, তার কিছু দিন পরেই 'রসচক্রের' এক প্রকাণ্ড অধিবেশন হয় এবং তাতে শরৎচন্দ্র অসমঞ্জ বাবুকে অভিনন্দিত করেন।·····এই ব্যাপারে যা ব্যয় হোয়েছিল, শরৎচন্দ্র তার একটা মোটা অংশ দিয়েছিলেন·····ইত্যাদি।

অনেক দিনের কোন পুরোনো ব্যাপারে একটু-আধটু ভুল-ভ্রান্তি এবং অসামঞ্জস্য হওয়া স্বাভাবিক। তা ছাড়া সেই সামান্য ভুল-ভ্রান্তির সঙ্গে আমার 'অভিনন্দন' ব্যাপারের বিশেষ কোন সম্বন্ধও নেই। তা'হোলেও ব্যাপারটা এই যে, রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে আমি একখানা নয়, আমার সেই সময় পর্যন্ত প্রকাশিত ছয়খানা বই পাঠিয়েছিলাম ও তিনি সব বইগুলি পড়ে, অত্যধিক প্রশংসা করে আমায় পত্র দেন। পরের মাসেই আবার আর একখানা উপন্যাস (মাটীর স্বর্গ) বার হ'লে, আমার প্রকাশক ওখানাও রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে-সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। সে সময় কবির দেহ-মন অত্যন্ত অসুস্থ ছিল। তখন তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্য দার্জিলিংয়ে অবস্থান করছিলেন। ঐ অবস্থায় তিনি 'মাটীর স্বর্গে'র বিরুদ্ধ সমালোচনা করে 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দেন। এটা ১৩৩৮ সালের কথা। এ জন্য যদি সে-সময়ে আমি কিছু মনো-ব্যথা পেয়ে থেকে থাকি, তা নিরশনের জন্য শরৎচন্দ্র ঐ সময়েই আমাকে সান্ত্বনা দিতেন; বা ছ'মাস এক বছর পরেও দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি আমায় 'অভিনন্দন' দেন ১৩৪৪ সালে, অর্থাৎ ছ' বছর পরে। সুতরাং কবিশেখর আমাকে অভিনন্দন দেবার যে-কারণটার কথা লিখেছেন, সেটা, আমার মনে হয় যথার্থ নয়। কবি আমাকে স্নেহ করতেন। আমি তাঁকে চিরকাল যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে এসেছি এবং এখনও করি, এবং যত দিন বাঁচবো, করব। কোন কারণে শ্রদ্ধাস্পদ প্রবাসী-সম্পাদক স্বর্গতঃ রামানন্দ বাবু আমার ওপর একটু ক্ষুণ্ণ হন। ঐ সূত্রে সাময়িক ভাবে রবীন্দ্রনাথও হন। এটা শরৎচন্দ্র জানতেন। কিন্তু কবির এই ক্ষুণ্ণ ভাব অল্প দিন পরেই দূরীভূত হয়, এ সংবাদ সে সময় পরলোকগত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় আমাকে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, আমাকে অভিনন্দন দেবার জন্তে শরৎচন্দ্রের এই প্রবল ইচ্ছার কথা সেদিন কবিশেখরের মুখে শুনে মনটা খারাপ হোয়ে গেল;—সত্যই খারাপ হোয়ে গেল। ব্যাপারটা আমার পক্ষে যে খুবই গৌরবের, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু এর আর একটা দিক ছিল। এই গৌরবলাভের পেছনে কত বড় যে একটা বিপদ আছে, তা ভাল ভাবেই আমি জানি। সুতরাং সেই নিশ্চিত বিপদের জন্য

আমি ভীত হোয়ে পড়লুম। আমাকে শরৎচন্দ্র 'অভিনন্দন' দিলে, কোন কোন লোকের সেটা মোটেই ভাল লাগবে না এবং আমাকে তাঁরা বিষ-নজরে দেখবেন। আমার লেখা রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদের একটু ভাল লাগে এবং তাঁরা তার প্রশংসা করেন,—এটাই অনেকে সহ্য করতে পারেন না এবং এজন্য তাঁদের মন অস্বস্তিকর ও পীড়াগ্রস্ত হোয়ে পড়ে। এর ওপর, শরৎচন্দ্র যদি আমাকে অভিনন্দিত করেন, তা হোলে ত কথাই নেই। এখন এ-বয়সে হলে, ও-সব গ্রাহ্যই করতাম না বা ভয়ও পেতাম না; কিন্তু তখন ও জিনিষটা আমাকে সত্যই আতঙ্কিত কোরে তুললো।

অনেক দিক দিয়ে অনেক কিছু ভেবে-চিন্তেও এর কোন উপায় বার করতে পারলুম না। শরৎচন্দ্রের দ্বারা অভিনন্দিত হওয়ার লোভটাও বড় কম নয়। কিন্তু তাকেও ছাপিয়ে যেতে লাগলো—উপরে লিখিত ওই সবের ভয় ও আতঙ্ক। যাই হোক, শরৎচন্দ্রকে আমি এ সম্বন্ধে অনেক বোঝালুম, অনেক অনুরোধ করলুম, কিন্তু কোনই ফল হল না। তখন দু-পাঁচজন আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবের কাছে পরামর্শ চাইলুম—কি করা যায়। তাঁরা সকলেই বললেন—"এ ত সৌভাগ্য, এতে অমত করবার আছে কি?" আমার ভগিনীপতি, কালীঘাট নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গতঃ গুরুপদ হালদার বি, এল, দর্শনশাস্ত্রী মহাশয় একটা সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়ে বললেন—"উপযাচক হোয়ে মান্য নিতে নেই, কিন্তু তা আপনি এলে, তাকে প্রত্যাখ্যান করতে নেই।" যাক; প্রত্যাখ্যান আর করলুম না। বিশেষতঃ এই সময়টাতে শরৎচন্দ্র ঘন ঘন অসুখে পড়ছিলেন। তাঁর ইচ্ছায় বাধা দিয়ে তাঁর মনে ব্যথা দেওয়া আমি কর্তব্য বলে মনে করলুম না। বরঞ্চ মনে মনে একটা ভয় হোল যে তাঁর মুখের ঐ 'শীগগির মরে যাবা'র কথাটা সত্য হ'য়েই কলে যাবে না কি?

এই সময় একদিন তাঁর শরীরের অবস্থা জানবার জন্যে আমার এক ছেলেকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলুম। ছেলের হাত দিয়ে তিনি একখানা চিঠি পাঠালেন। সেটা এখানে হুবহু তুলে দিলুম।

24, Aswini Dutt Road.
Sarat Chandra Chatterjee Phone—South 84
1—5—'37

প্রিয়বরেষু—

জ্বর এবং অর্শের রক্তপাত সমভাবেই চলচে, বরঞ্চ একটু বেশী বললেও অন্যায় বলা হয় না।

তোমার ছেলে আমার পায়ের ধূলো নিয়েছে, আশীর্বাদ করেছি।

শরৎ দা'

পুঃ—বাড়ীর সকলের অত্যন্ত অমত থাকলেও প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণের আয়োজন করচি। সজ্ঞানে ঐটিই শেষ কাজ।

শ০

মূল চিঠিখানা 'বঙ্গলক্ষ্মী'-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর কাছে আছে। ওর প্রতিলিপি আমার কাছে আছে। চিঠিখানা পোড়ে মনটা আমার খুবই খারাপ হোয়ে গেল।
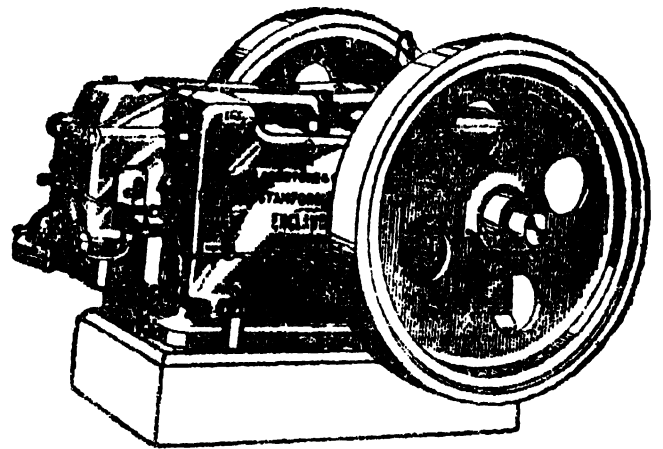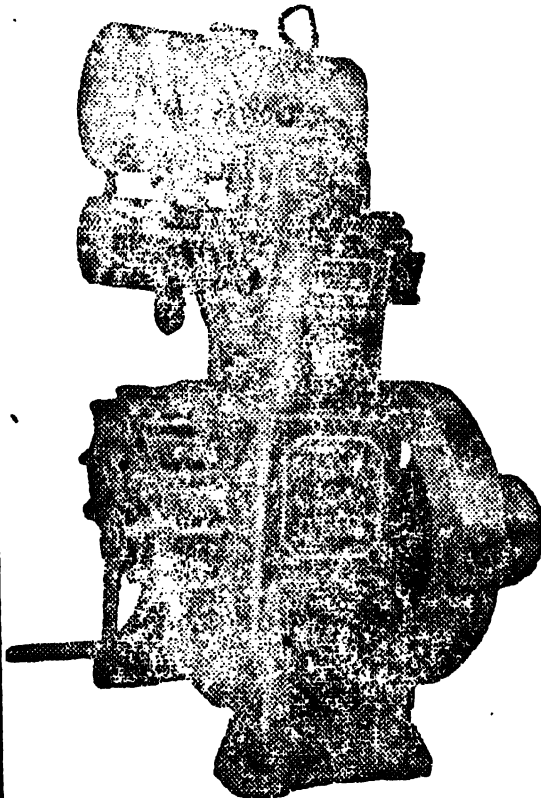
কয়েক দিন পরে 'রসচক্রে'র এক সভ্য-বন্ধু আমার বাসায় এসে জানিয়ে গেলেন—"আর কয়েকটা দিন পরেই, ২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার শরৎচন্দ্র আপনাকে 'অভিনন্দন' দেবেন।" আমি তাঁকে বললাম—"আমাকে না দিয়ে, শরৎচন্দ্র যদি আর কা'কেও দিতেন, ভাল হোত। আমার চেয়ে বহুগুণ উপযুক্ত লোক রয়েছেন, তাঁদের কা'কেও দিলে"···

"না—আপনাকেই তাঁর দিতে ইচ্ছে, এবং ইচ্ছেটা অনেক দিনেরই। শরৎচন্দ্র সমস্ত ব্যবস্থা করার ভার দিয়েছেন, রাধেশ দা'র ওপর।" রাধেশ দা'—অর্থাৎ কবিশেখর কালিদাস রায়ের কনিষ্ঠ সহোদর। রাধেশের সঙ্গে আমারও দেখা হোলো। রাধেশ বললেন, "আপনার জন্যে মুর্শিদাবাদী গরদের 'জোড়', রূপোর চন্দন-বাটি, 'ট্রে' প্রভৃতি সব কিনে ফেলেচি। শরৎদা'র হুকুম, কোনও জিনিষ যেন খারাপ না হয়। যে-টাকা তিনি আমাকে দিয়েছেন, তাতে যদি না কুলায়, আরো যদি টাকা লাগে, তিনি চেয়ে নিতে বলেচেন"—ইত্যাদি।

মনে মনে একটা ক্ষীণ আশা পোষণ করতে লাগলাম, যদি হঠাৎ কোন কারণে কোনও রূপে ব্যাপারটি বন্ধ হোয়ে যায়। সে জন্য একে-তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, কতদূর কি হোচ্ছে। আমার মনোমত উত্তর কারো কাছ থেকেই কিছু পাই না। সকলেই বলেন—"কাজ এগুচ্ছে। রাধেশ বাবুর ওপর শরৎচন্দ্র ভার দিয়েছেন, ও আর দেখতে হবে না।" একজন বললেন—"আজ বোধ হয় অভিনন্দন-পত্র ছাপাতে দেওয়া হোল।"

মনে মনে বুঝলুম, আর কোন আশা-ভরসা নেই, অভিনন্দনটা হবেই। জানতে পারলুম, বেলগাছিয়াতে 'দ্বারকা-কানন' নামে একটি সুন্দর বাড়ীতে অভিনন্দনের আয়োজন হবে।

২রা জ্যৈষ্ঠ অভিনন্দনের দিন। ১লা জ্যৈষ্ঠ শরৎচন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখে আমার এক ছেলের হাত দিয়ে পাঠালাম। লিখলুম—"দাদা, ঠিকই কাল অভিনন্দনের ব্যাপারটা হবে? আমাকে কি তাহোলে যেতেই হবে? আপনার শরীর কেমন আছে?" আমারই চিঠির এক পাশে শরৎচন্দ্র লিখে দিলেন—

১৬।২, লেক রোড
১লা জ্যৈষ্ঠ '৪৪

Injection দিয়ে আজ শয্যাগত। দিন কয়েক পূর্ব্বে রাধেশ এসেছিলেন—সব ঠিক করেছেন বললেন, তার পরে আর কোন সংবাদ জানিনে। শ

দাদা,
একটি মেয়ের অসুখের জন্য আমার সব কাজ প্রায় বন্ধ। আপনার শরীরের অবস্থা যে কেমন তাহারও কোন সংবাদ লইতে পারি নি। আপনি কেমন আছেন দাদা?

'রসচক্রের' ব্যাপারেরও কোন সংবাদ পাই নি। রাধেশ বলিয়াছিল যে, পাতিপুকুরে কোথায় বাগান ঠিক হোয়েছে। কালই ত' রবিবার। আমাকে ত কোন খবর দেয় নাই। আপনি কি খবর পেয়েছেন? কাল যেতে হবে কি না কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কোন খবর জানেন ত জানালে সুখী হ'ব।

আপনার শরীর কেমন আছে তা লিখবেন। ইতি।

আপনারই
শ্রীঅসমঞ্জ

অভিনন্দন সম্পর্কীয় প্রশ্নটার উত্তর, পাশ কাটিয়ে যে এড়িয়ে যাবার মতলব, তা বেশ বুঝতে পারলুম। পাছে, শেষ মুহূর্তে আমি বেঁকে বসি, তাই সংক্ষেপে সেরে জানাতে চাইলেন—'কোন সংবাদ জানিনে।'

পরদিন বেলা আন্দাজ ১টার সময়, আমি বেলগাছিয়ায় যাত্রা করলাম। আমার সঙ্গে আরও দু'-চার জন কে কে গিছলেন, তা ঠিক আমার স্মরণ নেই। সেখানে গিয়ে দেখি, আমাদের যাবার আগেই 'দ্বারকা-কানন' গুলজার; হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। বহু সাহিত্য-রসিক, কবি, শিল্পী প্রভৃতির উপস্থিতিতে বাগান-বাড়ী কোলাহল-মুখর। নীচের রান্নাবাড়ীতে শ্রীমান রাধেশের তত্ত্বাবধানে আহার্য্যাদির প্রস্তুতি ব্যাপার পূর্ণোৎসাহে চলছে। রাধেশ সেখানে একখানা চেয়ার নিয়ে বেশ জুত কোরে বসে আছেন। আয়োজন প্রচুর; সুপ্রচুরও বলা যেতে পারে।

বেলা ১১টা আন্দাজ, শরৎচন্দ্র তাঁর মোটরে কোরে এসে পড়লেন। সেদিন তাঁর শরীর, গত কয়েক দিনের তুলনায় একটু ভাল থাকলেও, মোটের উপর ভাল ছিল না। এইরূপ অসুস্থ দেহে, জ্যৈষ্ঠের প্রখর রোদে এতদূর আসাটা, আমার মনকে লজ্জা এবং পীড়া দুই-ই দিল।

যাই হোক, যথাসময়ে দ্বিতলের বড় একটা হল-ঘরের মধ্যে সকলের উপস্থিতিতে একখানি আসনে আমি বসলাম এবং আমার সামনের আসনে শরৎচন্দ্র বসলেন। শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা, শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে অভিনন্দন-দান হবে; তার কোনরূপ ত্রুটী-বিচ্যুতি হবে না। সুতরাং ধান্য-দূর্ব্বা, ফুল-চন্দন, মালা ইত্যাদি কোন বিষয়েই কোন ত্রুটী রহিল না। আসনে বসবার আগে, আমার পরিহিত কাপড়-জামা ছেড়ে, তাঁর দেওয়া গরদ পরতে হোল এবং গরদের উত্তরীয় গায়ে জড়াতে হোল। তারপর যথারীতি ধান-দূর্ব্বা দিয়ে তিনি আমার অভিষেক করলেন। এই সব আনুষ্ঠানিক ব্যাপার শেষ কোরে তিনি যে বাণী দ্বারা আমাকে অভিনন্দিত করেন, সেই বাণীযুক্ত অভিনন্দন পত্রখানির প্রতিলিপি এখানে দেওয়া গেল:—

"পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ
কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের
শ্রীকরকমলে—

হে রসশিল্পী, তুমি তোমার শান্ত-সংযত অনাড়ম্বর সাহিত্য-সাধনার দ্বারা যে অনাবিল আনন্দ দান করিয়াছ, তাহার প্রতিদান স্বরূপ আজ তোমাকে আমরা শ্রদ্ধাভরে অভিনন্দিত করিতেছি।

উপেক্ষার খর রৌদ্র-দাহে, দৈব-দুর্ব্বিপাকের ঝঞ্ঝা-বজ্রে, দৈন্য-দুঃখের তুষার-বাতে কখনও তোমার চিত্তের বসন্ত-শ্রী ও জীবনের রস-প্রফুল্লতা বিনষ্ট হয় নাই। তোমার জীবনের বহিরঙ্গের সকল রস-মাধুর্য্য নিষ্করুণ কাল ক্রমে শোষণ করিয়া লইতেছে কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে যেখানে তোমার রসপ্রবাহের উৎস, সেখানে কালের প্রবেশাধিকার নাই। সেখানে তোমার জীবনের সকল গরল জ্বালা, সকল রুক্ষতা, সকল অশ্রু, রসধারায় পরিণত হইতেছে।

হে গুণি, আমাদের এই দুর্গতদেশে যাঁহারা সাহিত্য-তীর্থের যাত্রী, তাঁহাদের অনেকেরই পথ ধূলি-কঙ্করময়, কণ্টকাকীর্ণ ও

ছায়াবর্জ্জিত। তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ গণ্য করিয়া, আজ তোমাকে আমরা যে মর্য্যাদা দান করিলাম, তাহা তাপজ্বালাক্লিষ্ট, উপেক্ষা-লাঞ্ছিত, একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনারই উদ্দেশে নিবেদিত। যজ্ঞকুণ্ডে নিবেদিত সকল আহুতি যেমন হুতবহ দেবতাগণের সকাশে বহন করেন, তুমিও তেমনি আমাদের শ্রদ্ধাভিবাদন তোমার দুর্গম-পথের সহযাত্রিগণের হৃদয়দ্বারে বহন কর।

যাঁহাদের পদ-মর্য্যাদা, পাণ্ডিত্য-খ্যাতি ও আভিজাত্য-গৌরব আছে, যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র, যাঁহাদের আনুকূল্যে ও অভিভাবকতায় বহুলোকের স্বার্থ সিদ্ধ হয়, তাঁহাদের স্তাবকের অভাব ঘটে না। যে সকল সাহিত্যসেবীর ধন, মান, পদ-গৌরব, প্রতিষ্ঠা ও কৌলীন্য-বল আছে, তাঁহাদের বন্দনা গাহিয়া বহু লোকই কৃতার্থ হয়। কিন্তু সাহিত্য-মাধুরী ছাড়া যাঁহার অন্য কোন সম্বল নাই, রস-সাধনা ছাড়া যাঁহার অন্য কোন ব্রত নাই, তাঁহাকে কেহই কোন দিন মর্য্যাদা দান করে না। হে সর্ব্বগৌরবহীন অনন্যব্রত রসশিল্পী, আজ তোমাকে অভিনন্দিত করিয়া আমরা অবিমিশ্র সাহিত্যসেবাকেই সম্মানিত করিলাম।

হে রসলক্ষ্মীর মালঞ্চের মালাকর, রসরাজের চরণে আমাদের আকিঞ্চন, তোমার কুটীরাঙ্গনের মালঞ্চখানি সকল দীনতা, সকল রিক্ততা, সকল কণ্টকক্ষত এমনি নব নব পুষ্প সমারোহে সমাচ্ছন্ন করিয়া বহুবর্ষ ধরিয়া যেন মধুমাসকে বন্দী করিয়া রাখে। ইতি—২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ সাল।"

অভিনন্দন-বাণী পাঠ কোরে শরৎচন্দ্র অভিনন্দন-পত্রে সহি করলেন। তারপর কবিশেখরের দিকে চেয়ে বললেন—'রসচক্রে'র সেক্রেটারী হিসেবে তুমিও এতে স্বাক্ষর কর। কবিশেখরও সই করলেন।

অভিনন্দন-পত্রের লেখাটা শরৎচন্দ্রের নিজের লেখা নয় বলেই মনে হয়, কারণ অভিনন্দন-পত্র লেখার মত ভাষা শরৎচন্দ্রের তেমন আয়ত্ত না থাকায় কবিশেখরের ওপরই ওটা লেখার ভার পড়ে, এই রকমই শুনেছিলুম। এ রকম সমৃদ্ধ, সুন্দর ও সালঙ্কার শব্দসম্ভারপূর্ণ রচনা কবিশেখর কালিদাস রায়ের দ্বারাই সম্ভব। মনে মনে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ জানালাম।

শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনপত্র পাঠের পর আরো অনেকেই—আমাকে সম্বর্ধিত কোরে কিছু কিছু বলেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীমনোজ বসুর আন্তরিকতা পূর্ণ শ্রদ্ধার কথাগুলি আজ বার বারই আমার মনে পড়চে। এজন্য সেদিন সকলকে আমি স্বল্প কথায় আমার অন্তরের ধন্যবাদঃ জানিয়েছিলুম; আজ দীর্ঘ উনিশ বছর পরে, সে বিষয়ে লিখতে বসে, আবার আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যাক। অভিনন্দনের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার যখন শেষ হোয়ে গেল, তখন নীচের প্রশস্ত দালানে ভোজনের আয়োজন সুরু হোল। লম্বা দালানে সারি সারি দু' পংক্তিতে শ'খানেক পাতা পড়লো। মহা আনন্দ-কোলাহলের সঙ্গে প্রত্যেকে এক-একখানা পাতা অধিকার করে বসলেন। খাদ্যের আয়োজন সুন্দর, প্রচুর ও ত্রুটীশূন্য। মাছ, মাংস, পোলাও, কালিয়া, লুচি, তরকারী, দই, মিষ্টান্ন—কিছুই বাদ পড়ে নি। রাধেশ ভায়া যেখানে 'ইন-চার্জ্জ', সেখানে কোন দিনই কোন ত্রুটী হবার কথা নয়।

শরৎচন্দ্র অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সেদিন সকলের সঙ্গে আহারে বসলেন এবং পেট ভোরে সব কিছুই খেলেন। পূর্ব্বেই বলেছি, তিনি দৈহিক অসুস্থতাকে গ্রাহ্য করতেন না, গ্রাহ্য করতেন—মনের আনন্দটাকে। সবাই মিলে এক সঙ্গের এই আনন্দ-ভোজনে তাঁর মত লোক কি অংশ না নিয়ে থাকতে পারেন? ভোজনের গুঞ্জনের চেয়ে, আনন্দ-কোলাহলের গুঞ্জনটাই সেদিন ছাপিয়ে উঠেছিল।

অভিনন্দনের ব্যাপারও চুকে গেল। আমার ভয় হোয়েছিল যে ঐ দিনের অনিয়ম অত্যাচারে হয়ত শরৎচন্দ্রের শরীর আরও অসুস্থ হোয়ে পড়বে। কিন্তু তারপর থেকে রোজই আমি তাঁর খবর নিয়ে জানতে পারতুম যে তিনি ভালই আছেন।

আমার অভিনন্দনের খবরটা যাতে কোনও কাগজে না বেরোয় তার জন্যে আমি খুব চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু তা সত্ত্বেও দু'-চারখানা কাগজে খবরটা ছাপা হোয়ে গেল। 'সাহানা'তে যা বেরিয়েছিল।' তা এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হোল।—শৈলজানন্দ ছিলেন তখন 'সাহানা'র সম্পাদক।

"বেলগাছিয়ায় 'দ্বারকা-কাননে' রসচক্রের এক উদ্যান-মিলনের আয়োজন করিয়া গত ২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার, উপন্যাস-সম্রাট শরৎচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দিত করেন। এই আয়োজনঘটিত সর্ব্ব কার্য্যই শরৎচন্দ্রের নির্দ্দেশমত সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রায় সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। অভিনন্দনের পর ভূরি-ভোজনেরও বিশেষরূপ আয়োজন হইয়াছিল।"

('সাহানা'—শনিবার, ২২শে মে, ১৯৩৭)

'মাসিক বসুমতী'র সম্পাদক স্বর্গতঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তাঁর দৈনিক 'বসুমতী'তে সংবাদটা ফলাও কোরে ছাপেন। [ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনস্তবকে যদি সম্ভব করে তুলতেই হয়—প্রেয়সীকে যদি পরিণীতারূপে পেতেই হয় তবে আর দ্বিধা নয়—সঙ্কোচ নয়—বিলম্ব নয়·····আমার একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু, অভিভাবক শুভাকাঙ্ক্ষী ম্ঁ্যসিয়ে দা ব্রাগাদাঁকে অকপটে সমস্ত নিবেদন করে তাঁর সাহায্য চাইলাম। অবশ্য যতদূর অকপটে তাঁর কাছে জানানো চলে—যাই হোক ওঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে সি সি ছাড়া আমার চলবে না—যদি ওর বাবা আমাদের বিবাহে সম্মতি না দেন তবে আমি ওকে নিয়ে পালিয়ে যাবো। তাও ঠিক করেছি বললাম।

তার পর ম্ঁ্যসিয়ে ব্রাগাদাঁ আর তাঁর দু'টি অভিন্নহৃদয় বন্ধুর সঙ্গে দুটি ঘণ্টা ধরে বহু তর্ক, বিতর্ক, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার জন্য বহু শপথ আর প্রশ্নোত্তরের পর তাঁদের কিছুটা সম্মত করতে পারলাম। শেষ অবধি ঠিক হোলো ম্ঁ্যসিয়ে ব্রাগাদাঁই আমার হোয়ে ওর বাবার কাছে বিবাহের প্রস্তাবটা তুলবেন।

এ-সব ঠিক করে সি সি-কে জানাতে গেলাম—গিয়ে দেখি, মা মেয়ে দু'জনাই বিষণ্ণ মুখে বসে—দু'জনারই চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। আমি তো স্তম্ভিত—শেষে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওর দাদাকে পুলিশে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে—হাজতে দিয়েছে। দেনার দায়েই ঘটেছে ব্যাপারটা—আর পি সি আমার জন্যে একটা চিঠিও রেখে গেছে এই মর্মে—যাতে আমি ওকে সাহায্য করি কিন্তু আমার অবস্থাও তখন সুবিধার নয়।

আগামী সুখের রঙীন কল্পনায় যখন দু'জনারই মন ভরপুর সেই সেই সময় পি, সির এই গ্রেপ্তারের ঘটনাটা আমাদের দুজনকেই ভারী জমিয়ে দিলো। তার উপর আবার শুনলাম, সি সির বাবাও সেই রাত্রেই ওদের পল্লীভবন থেকে বাড়ী ফিরছেন। ভারাক্রান্ত মনেই সে রাত্রে বিদায় নিলাম—চলে আসছি, এমন সময় সি সি আমার হাতে একটুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে পালালো। বাইরে এসে দেখি কাগজে-মোড়া একটা চাবি—আর ভিতরে লেখা আছে ওই চাবির সাহায্যে যেন রাত্রে বাড়ীর দরজা খুলে ওর কাছে চলে আসি। দাদার পরিত্যক্ত ঘরে ও আমার জন্যে অপেক্ষা করবে···

সে রাতের অভিসারে কোনো বাধাই আসেনি। কিন্তু আমার মনটা হতাশায় ভরে যেতে লাগলো সি সির কথাগুলি শুনে। আমার বাহুপাশে আবদ্ধ হোয়েও ম্লান হেসে সি সি বললে,—

—"বাবা বেশ সুস্থ শরীরে নিরাপদেই ফিরেছেন···কিন্তু জানো, এসে থেকে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন যেন আমি একটা ছোটো খুকু। আমি যে আর খুকু নই এটা বুঝলে ওঁর মনের কি অবস্থা হবে জানি না···আবার তার উপর যখন শুনবেন, আমার প্রেমিকও আছে ···উঃ ভগবান! তখন যে কি করবেন আমি ভাবতেও পারি না—"

—"কি আর করতে পারবেন? আমার হাতে তোমাকে দিতে না চান তো সোজা তোমায় নিয়ে পালিয়ে যাবো—তার পর আর কি? ধর্মযাজকদের আশীর্ব্বাদ থেকে তো আর বঞ্চিত হবো না···আমাদের মিলনে কোনো দিনও কেউ বাদ সাধতে পারবে না—"

—"আমিও তো তাই তো চাই···কিন্তু বাবা!··উঃ আমার বাবা যে কি ভীষণ, তা তো তুমি জানো না···"

পরদিন সি সির মা বাবার সঙ্গে ম্ঁ্যসিয়ে ব্রাগাদাঁর বহুক্ষণ ধরে তর্ক আর আলোচনা হোলো—কিন্তু সবই নিষ্ফল হোলো শেষ অবধি। এমন কি সি সির মা যতটা আশঙ্কা করেছিলেন আগে থেকে তার চেয়ে আরও খারাপই দাঁড়ালো। ওর বাবা সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন এখনও চার বছর পরে মেয়ের বিয়ের কথা উনি ভাববেন—আর এই চার বছর ওকে কোনো কনভেন্টে রাখবেন। পরে প্রত্যাখ্যানটাকে একটু সহনীয় করার জন্যেই বোধ হয় বললেন—সে সময় আমার পদমর্য্যাদা, সচ্ছলতা সব বিচার করে যদি উপযুক্ত মনে করেন, আর আমাদের ভালোবাসাও যদি তত দিন টিকে থাকে তবে তিনি মত দিতে পারেন।

সে রাত্রে ছোট্টো চাবিটি কোনো কাজেই লাগলো না। ভিতর থেকেই দরজাটা বন্ধ করা ছিলো। একেবারে হতাশার চরম সীমায় পৌছলাম। ওর দাদাও জেলে···কোথা থেকে একটুকু খবর পাবারও উপায় নেই। মরিয়া হোয়ে ভাবলাম, সোজা ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করবো—কিন্তু দরজা থেকেই পরিচারিকার কাছে শুনলাম, কেউই নেই, সবাই পল্লীভবনে চলে গেছেন, কবে ফিরবেন কেউ জানে না।

দুর্ভাগ্য কি একা আসে? কখনও না। চরম হতাশায়, ব্যর্থতায় মনের বিক্ষোভ আর জ্বালা জুড়োতে জুয়ার নেশায় মাতলাম! একটি বারও একটি দানও জিততে পারিনি···ক্রমে ক্রমে সব হারিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হোয়ে মাথার চুল অবধি দেনার দায়ে বিকিয়ে দিলাম। তখনও অবশিষ্ট ছিলো একটু মনুষ্যত্ব···পুরানো শুভার্থীদের দরজায় হাত পেতে দাঁড়ানোর মত চক্ষুলজ্জা। হ্যাঁ একসময় আত্মহত্যা করতেও উদ্যত হোয়েছিলাম···কিন্তু সেই মুহূর্তটি থেকে আমাকে উদ্ধার করলে আর এক জুয়াড়ী আঁতোনির ক্রোসে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

একজন লোক নাম বলেছিলো মানুৎসি, তার পেশা হোলো জহরী—কিছু দামী জহরৎ আমাকে ধারে পাইয়ে দেবে, এই সূত্রে আমার সঙ্গে পরিচয় করেছিলো—আর এই সূত্রেই আমার ঘরে অবাধ প্রবেশের অধিকারটকও জোগাড় করেছিলো—কিন্তু [illegible]

সে ছিলো গুপ্তচর···রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগেরই কর্মচারী। কিন্তু সে পরিচয় তো প্রথমে পাইনি। সে আমার ঘরে এসে আমার বইপত্র নাড়াচাড়া করতো আর আমার সেই যাদুবিদ্যার উপর লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো পড়ে মুগ্ধ ও উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠতো। আমিও নির্বোধের মত তাতেই পুলকিত হোয়ে কিছু কিছু ভৌতিক ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়ে আরও মুগ্ধ করার চেষ্টা করতাম। আসলে তো সবই ফাঁকীর খেলা—শুধু মজা দেখবার জন্যেই···।

কিছু দিন পর গোয়েন্দাটা আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। এবার বললে যে, একজন পুস্তক-সংগ্রাহক আছেন, তিনি তাঁর নাম জানাতে চান না—তিনি হাজার সেকুইন দিয়ে আমার পাঁচখানা পাণ্ডুলিপি কিনে নিতে চান—অবশ্য প্রথমে এক বার দেখতে চান ওগুলো পড়ে। মানুৎসি এও শপথ করলো যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওগুলি আমাকে ফিরিয়ে দেবে। কিছুমাত্র সন্দেহ না করেই রাজী হলাম। পরদিনই মানুৎসি এগুলি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল—ক্রেতা নাকি বলেছেন ও সব জাল। বেশ কয়েক বছর পরে জেনেছিলাম মানুৎসি ওগুলো সোজা নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিলো গোয়েন্দা বিভাগে···প্রমাণ করা হোয়েছিলো আমি একজন উঁচুদরের যাদুকর।

দুর্ভাগ্যের শেষ তখনও হয়নি—আমার বিরুদ্ধে আমার ভাগ্যচক্রের চক্রান্ত তখনো চলছে। এই সময়তেই জনৈকা মাদাম মেমোর মাথায় ঢুকলো যে তাঁর দুই ছেলেকে আমি নাকি পুরোপুরি নাস্তিক করে তুলেছি। আমার বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ আনলেন···অবসরপ্রাপ্ত এক বৃদ্ধ অশ্বারোহী সৈনিক তিনিও জানালেন তাঁর ক্ষোভ যে, আমার গুপ্তবিদ্যার সাহায্যে তাঁর ভাইপো আমি নাকি সর্ব্বনাশ করেছি···সে একেবারে গোল্লায় গেছে। এ সব অভিযোগ গুরুতর হোয়ে উঠলো। পবিত্র চার্চের মধ্যস্থতা মানা হোলো···যখন প্রত্যেকের সাগ্রহ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে গ্রেপ্তার করা গেল না, তখন ওরা সমস্ত ব্যাপারটা সরকারী গোয়েন্দা বিভাগে জানালেন। সেখানে আমার বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ জমছিলো। আমি নাকি ঈশ্বর মানি না, শয়তানের পূজা করি, আমি মাংস খাই প্রতিদিন, অথচ কোনো দিন উপাসনায় যাই না। এই সবের সঙ্গে সকলের চেয়ে বিপদ্জনক অভিযোগ ছিলো যে আমি নাকি বিদেশী দূতাবাসগুলির সঙ্গে অতিমাত্রায় মেলামেশা করি···আর রাজ্যের গুপ্তত্থ্য পরিবেশন করে মোটা টাকা উপার্জ্জন করি।

আশ্চর্য্য! এই সব অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে, অথচ এগুলির কোনোটিরই মূলে এতটুকু সত্য ছিল না। অথচ এই সব অভিযোগ তুলে আমাকে সাধারণের শত্রু, রাজদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতকরূপে অভিযুক্ত করা হোলো···একেই বলে ভাগ্য!

ইতিমধ্যে আমার শুভার্থীরা আমাকে দেশ ছেড়ে যেতে উপদেশ দিলেন। তখনও আমার বিচার শেষ হয়নি আলোচনা চলছে···কিন্তু তাই-ই যথেষ্ট। কারণ সে সময় ভেনিসে শান্তিতে থাকতে পারতো শুধু তারাই যাদের অস্তিত্বটুকুও গোয়েন্দা বিভাগের অজানা—কিন্তু আমারও জেদ কম ছিলো না···সত্যিই কোনো অন্যায় যখন

করিনি তখন কেন পালাবো? তাছাড়া তখন আমি একেবারে নিঃস্ব, যা কিছু মূল্যবান ছিলো সব বাঁধা। তবু বুদ্ধি করে কাগজ পত্র, চিঠি, দলিল ইত্যাদি সব একজন পুরানো বন্ধুর জিম্মায় রেখেছিলাম।

একদিন রাত্রে থিয়েটার দেখে বাড়ী ফিরে দেখি, আমার ঘরের দরজা জোর করে ভেঙ্গে খোলা, আর সমস্ত জিনিষপত্র ছড়ানো, সমস্ত ঘরখানা কে যেন তছনছ করে রেখে গেছে। বাড়ীওয়ালীর কাছে শুনলাম, গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্ত্তা, একদল পুলিশ নিয়ে এসেছিলেন, বলেছেন যে বে-আইনী নুণের বস্তা রাখা আছে ঘরে, তারই খোঁজে এসেছেন। যদিও আমার যথাসর্ব্বস্ব তছনছ করে খুঁজেও শুধু হাতেই ফিরে গেছেন। বুঝলাম আসল উদ্দেশ্য আমার জিনিষপত্র তল্লাসী···নুণের বস্তাটা ছলনা।—

"আমারও তাই বিশ্বাস, নুণের ব্যাপারটা ছলনা ছাড়া কিছু নয়, সরকারী গোয়েন্দা বিভাগে আমিও কয়েক মাস ছিলাম। ওদের চালচলন কিছু জানি" ম'সিয়ে ব্রাগার্দা সব শুনে আমাকে বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে বললেন,—"আমার একটা কথা বিশ্বাস করো। এখনি পালাও তুমি ভেনিস ছেড়ে। ফুসিনাতে যাও, সেখান থেকে ফ্লোরেন্সে—আর যত দিন না আমি জানবো তোমার বিপদ কেটে গেছে তত দিন ফিরো না—"

অন্ধ জেদ আর গোঁয়ারতুমি পেয়ে বসলো আমাকে। কানই দিলাম না বৃদ্ধের উপদেশে,—অনুরোধে। শেষে ম'সিয়ে ব্রাগার্দা আমাকে সকাতর মিনতি জানালেন অন্ততঃ ওঁর বাড়ীতে গিয়ে থাকার জন্য। কারণ ওঁর মত সম্ভ্রান্ত, প্রতিষ্ঠাবান প্রতিপত্তিশালী লোকের বাড়ী আমার পক্ষে অনেক নিরাপদ। কিন্তু জানি না কেন যে তাঁর শেষ অনুরোধটুকুও সেদিন রাখিনি, তাহলে হয়ত আমার জীবনে আবার বিপর্য্যয় ঘটতো না। মনে পড়ে শেষে উনি আমার সামনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। সেই দেখে আমার সমস্ত বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলেও নিজের জেদ থেকে এক পাও টলতে পারলাম না—কেন কে জানে? হতাশ হোয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করে করুণ কণ্ঠে উনি বললেন—"কে জানে হয়ত এই শেষ দেখা।" আমিও তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম, আলিঙ্গন করে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় নিলাম। কে জানতো ওঁর সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হবে···আর দেখা হবে না ওঁর সঙ্গে! ঠিক এগারো বছর পরে উনি মারা গিয়েছিলেন।

ভারাক্রান্ত অথচ দৃঢ় মনেই বাড়ী ফিরলাম। মনে পড়ে, সেদিন ছিলো ২৫শে জুলাই, ১৭৫৫ সাল। ম'সিয়ে ব্রাগার্দার ওখানেই আহারাদির পালা সারা হোয়েছিলো—বাড়ী ফিরে সোজা আশ্রয় নিলাম শয্যার।

* * * *

সবে মাত্র ভোরের আলো ফুটেছে। এমন সময় কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে দেখি সর্ব্বনাশ! পুলিশের বড়কর্ত্তা আমার সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করছেন—'আপনিই কি ক্যাসানোভা?' আমি স্বীকৃতি জানাতেই তিনি সেই মুহূর্ত্তে আমাকে হুকুম করলেন উঠে পড়ে কাপড়-জামা বদলে তৈরী হোয়ে নিতে আর যা কিছু কাগজপত্র ঘরে আছে সমস্ত পুলিশের হাতে দিতে।

—"ট্রাইব্যুনালের আদেশ।"

আমার খোলা ডেস্কের উপর আমার যাবতীয় কাগজপত্র, খাতা ইত্যাদি ছড়ানো। সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে আমি বললাম—যা কিছু কাগজ দেখছেন ও-সব নিতে পারেন। একটা মস্ত থলির ভিতর সমস্ত কাগজপত্র ভরে ফেলা হোলো। তার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার পাণ্ডুলিপিগুলি কোথায়? ওঁরা জানেন আমার কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি কাছেই আছে—এমন কি নামও জানেন দেখলাম···সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে আমার চোখ খুললো। বুঝলাম এ-সবই মানুৎসির কীর্ত্তি। সেই আমাকে মিথ্যা ছলনায় ভুলিয়ে গোয়েন্দা বিভাগে সমস্ত জানিয়েছে। সমস্ত পাণ্ডুলিপিগুলি পুলিশে হস্তগত করলো, এমন কি পেত্রার্ক, হোরেস থেকে সুরু করে সমস্ত বইগুলিও—তার সঙ্গে চিঠিপত্র ইত্যাদি যত কিছু কাগজের টুকরো ছিলো ঘরে···সমস্তই নিয়ে নিলে···আর আমি এই সময়টা ঠিক যন্ত্রচালিতের মত মুখ ধুয়ে পোষাক বদলে, দাড়ি কামিয়ে, চুল আঁচড়ে তৈরী হোয়ে নিচ্ছিলাম, একটি প্রশ্ন, একটি কথাও আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি।

সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হোয়ে আমি যখন পুলিশের বড়কর্ত্তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরোলাম তখন দেখে অবাক যে, পাশের ঘরে প্রায় চল্লিশ জন পাহারওলা আমার জন্যে রয়েছে। আমি ভাবতেও পারিনি আমাকে ধরবার জন্যে এতগুলি পুলিশ-পাহারাদারের প্রয়োজন—জন দুই হোলেই যেখানে যথেষ্ট হোতো।

যাই হোক, চার পাশে চার জন পুলিশ-বেষ্টিত করে বড়কর্ত্তা আমাকে একটা গণ্ডোলাতে তুললেন। তার পর যখন ওঁর বাড়ীতে পৌঁছলাম তখন আমাকে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন এক কাপ কফি খাবার ইচ্ছা আছে কি না। আপত্তি জানালে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা হোলো। আমার মনের তখন এমনি অবস্থা যে, কি করে মুক্তি পাবো, বা কি ভাবে পালাতে পারবো, কিছুই ভাববার ক্ষমতা ছিল না। একটা সোফার উপর তন্দ্রাচ্ছন্নের মত পড়ে রইলাম···মাঝে মাঝে এক একবার চমকে উঠে আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হোয়ে পড়ি। প্রায় তিনটের সময় ইনসপেক্টর এসে জানালেন যে, হুকুম এসেছে আমাকে পিয়োম্বীতে যেতে হবে। অর্থাৎ 'লেডস' এ থাকতে হবে। ঐ জেলখানাটার নাম 'লেডস', কারণ ওর ছাতটা টালির বদলে সীসার পাতে মোড়া। তাই ওর নাম 'দি লেডস্'। নিঃশব্দে অনুসরণ করলাম ইনসপেক্টরকে।

গণ্ডোলাতে চড়ে অনেক অলিগলি, অনেক বাঁক নিয়ে শেষ কালে বন্দিশালার সামনে এসে ভিড়লাম। তার পর অনেক সিঁড়ি আর অনেক উঠা-নামার পর একটা সেতু পার হোলাম, এই সেতুটা 'দোজে'র প্রাসাদের সঙ্গে বন্দিশালার সংযোগ করেছে সেতুটাকে বলে 'রিয়ো দি পালাৎসো'। সেতুটা শেষ হোতেই ম[illegible] লম্বা গ্যালারি। সেটা পার হোয়ে আর একটা ঘরে এলাম সেখানে অফিসারের পোষাকে একজন বসেছিলেন। আমাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখে হুকুম দিলেন—আপাততঃ একটা সে[illegible] ঠিক করে বন্ধ করে রাখো।

আমাকে এবার কারারক্ষকের হাতে দেওয়া হোলো। বিরা[illegible]

দুজন রক্ষীর প্রহরায় নিয়ে সে এগোলো। প্রথমে দুটো সিঁড়ি উঠে একটা গ্যালারি। তার পর চাবি খুলে একটা লম্বা হল, তার পর আর একটা গ্যালারি। আবার চাবি খুলে আর একটা গ্যালারি। সেটার পর আবার চাবি খুলে একটা ছোটো খুপরী। দু'ফুট চওড়া অন্ধকার খাঁচার মত ঘর, মাথার চেয়ে উঁচুতে ছোটো ঘুলঘুলির মত এতটুকু জানলা দিয়ে আলো আসে। প্রথমটা আমি ভেবেছিলাম এই বুঝি আমার কারাকক্ষ! না, ভুল আমার ধারণা, কারণ এবারও একটা মস্ত চাবি বেরোলো, একটা প্রচণ্ড ভারী লোহার শিক-আঁটা দরজা খোলা হোলো। আরও চমৎকার একটি খুপরী, সাড়ে তিন ফুট উঁচু। আর দরজার মাঝখানে আট ইঞ্চি গোল একটা গর্ত্ত।

আমাকে যখন ঢুকতে বলা হোলো, তখন আমি অবাক হোয়ে দেখছিলাম, দেয়ালে একটা ঘোড়ার খুরের আকারের অদ্ভুত লোহার যন্ত্র। কারারক্ষক সেটা লক্ষ্য করে বললে,—'বুঝেছি মশায়, ওটা কি আপনি জানতে চান না? ওটা হোলো যখন ওপরওলারা কারো ফাঁসীর হুকুম দ্যান, তখন তাকে ওর সামনে একটা টুলের উপর বসানো হয়, তার পর তার মাথাটাকে এমন ভাবে পিছনে হেলিয়ে দেওয়া হয় যাতে ঐ যন্ত্রটা ঠিক গলার মাঝামাঝি জায়গায় থাকে, তার পর গলায় একটা সিল্কের দড়ি বেঁধে ঐ গর্ত্ত দুটোর ভিতর দিয়ে দড়িটাকে ঢুকিয়ে পিছনে যে চাকার মত যন্ত্র, তার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। এর পর চাকাটা ধরে ঘোরানো—যতক্ষণ না প্রাণটা বেরোয়'—

—বাঃ বাঃ চমৎকার! আমার মনে হয় ঐ চাকা ঘোরানোর মহৎ কার্য্যটি আপনিই সম্পাদিত করেন—মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো আমার।

কোনো উত্তর না দিয়ে কারারক্ষক তখন সোজা আমাকে সেই খুপরীটার ভিতর ঢুকিয়ে দিলে। তার পর দরজায় চাবি লাগাতে লাগাতে ফুটোটা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে আমি কি খেতে চাই। আমি সজোরে উত্তর দিলাম—এখনো ভেবে ঠিক করিনি। বিনা বাক্যব্যয়ে লোকটা চলে গেল—পিছনে একের পর এক দরজায় সতর্ক ভাবে তালা লাগাতে লাগাতে।

এতক্ষণে আমি নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন প্রচণ্ড বিক্ষোভে আর্ত্তনাদ করে উঠলো···ঐ অন্ধ·[illegible]র অপরিসর গর্ত্তের মধ্যে দুঃখে, হতাশায়, ক্ষোভে পাগলের মত হোয়ে উঠলাম। জানলাটা দুই হাতে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক ইঞ্চি পুরু লোহার জাফরীকাটা জানলা। পাঁচ ইঞ্চি চৌকো কোরে কাটা ষোলোটা গর্ত্ত তাতে। আলো একটু আসতে পারতো কিন্তু সামনের দেওয়ালের জানলার উপরই ছাদের মস্ত বড় বরগাটা এমন ভাবে এসে পড়েছে যে, একটু আলোর

সম্ভাবনাটুকুও ঢেকে গেছে। ঘরের ভিতর চেয়ে দেখলাম বিছানা, টেবিল চেয়ার ইত্যাদি কিছুই নেই, কেবল একটা টাব, আর দেওয়ালে গাঁথা একটা কাঠের তাক ছাড়া। তাকের উপরই আমি আমার সিল্কের জোব্বা, নতুন কোট আর স্পেনের লেশের কাজকরা সাদা টুপীটা রাখলাম।

গরম, কি অসহ্য গরম—একটু বাতাসের আশায় আবার জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটি মাত্র জায়গা যেখানে কনুই দুটোর উপর ভর দিয়ে একটু দাঁড়াতে পারি। কিন্তু সে সুখটুকুও সইলো না। দাঁড়াতেই দেখি সামনের খুপরীটাতে অসংখ্য বড় বড় ইঁদুর ছুটোছুটি করছে। আমার রক্ত যেন জল হোয়ে গেলো—চিরকাল ঐ প্রাণীটাকে ভয় ও ঘৃণা করে এসেছি। তাড়াতাড়ি কাঠের পাল্লাটা টেনে দিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলাম।

পুরো আটটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম জানলায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। নিঃশব্দে, নির্ব্বাক হোয়ে। সে যে কি অনুভূতি তা' প্রকাশের অতীত! আমার একটুও ক্ষুধা ছিল না কিন্তু অসহ্য তৃষ্ণা। মুখের ভিতর কেমন একটা তিক্ত স্বাদ পাচ্ছিলাম। আরও তিনটি ঘণ্টা এই ভাবে কাটতে আমি ক্রোধে, ক্ষোভে, যন্ত্রণায় উন্মত্ত হোয়ে উঠলাম, চীৎকার করতে লাগলাম, আর্ত্তনাদ করতে লাগলাম দেওয়ালে আর দরজায় পাগলের মত লাথি মারতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক ধরে এই ভাবে ক্ষিপ্তের মত পরিশ্রম করে হতাশায়, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে মেঝের উপর সোজা শুয়ে পড়লাম। আমার স্থির বিশ্বাস হোয়েছিলো যে, নিশ্চয়ই ঐ বর্ব্বর অসভ্য গোয়েন্দা অফিসাররা আমাকে না খেতে দিয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মেরে ফেলবে ঠিক করেছে। কিন্তু কি যে আমার অপরাধ তা সত্যিই ভেবে পাচ্ছিলাম না, যার ফলে আমার এই দুর্ভোগ। হোতে পারি লম্পট, জুয়াড়ী, স্পষ্টবাদী, জীবনের নির্দ্দোষ আমোদগুলির একটু বেশী প্রিয় কিন্তু দেশের বিরুদ্ধে কোনো কাজই তো করিনি,—আইনের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধই তো করিনি। ভাবতে ভাবতে আর মনে মনে শাপ শাপান্ত করতে করতে এক সময় ক্ষুধার জ্বালা আর অসহ্য ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন চারি দিকে নিকষ-কালো অন্ধকার! চোখ মেলে কিছুই দেখতে পেলাম না, শুধু কালো কালো, আর কালো ···বাঁ দিক ফিরে শুয়েছিলাম। সেই একই ভাবে থেকে হাত বাড়িয়ে ডান দিকের পকেট থেকে রুমালটা বার করতে গেলাম···

কি সর্ব্বনাশ! আমার আঙুলগুলো গিয়ে ঠেকলো একটা বরফের মত ঠাণ্ডা হাতে—

পা থেকে মাথার চুলগুলো অবধি আতঙ্কে খাড়া হোয়ে উঠলো। জীবনে এত নিদারুণ আতঙ্ক কোনো দিনও অনুভব করিনি। পুরো তিন চার মিনিট বোধ হয় আমার কোনো জ্ঞানই ছিল না। একটু সাড় হোতেই একবার মনে হোলো, আমার কল্পনা নয়তো ওটা? আবার হাত বাড়ালাম, আবার দু'বারই সেই মৃতদেহের হিমশীতল হাতের স্পর্শ!

গলা চিরে বেরোলো তীক্ষ্ণ, তীব্র, প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ!

একটু সামলে নিয়ে ভাবলাম, যখন আমি ঘুমোচ্ছিলাম তখন বোধ হয় একটা মৃতদেহ এনে আমার পাশে ফেলে রেখে গেছে। কারণ, আমি যখন ঘরে প্রথম ঢুকি তখন যে কিছুই ছিল না ঘরে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমার মনে হোলো কাউকে [illegible] দেওয়া হোয়েছে, এটা তারই মৃতদেহ, আর আমার ঘরে ফেলে রাখা অর্থ বোধ হয় জানিয়ে দেওয়া আমার বরাতেও ঐরকম মৃত্যু রয়েছে। একথা মনে হোতেই সমস্ত ভয় প্রচণ্ড রাগে পরিবর্ত্তি[illegible] হোলো। ওদের ঐ বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে যেন সমস্ত দেহ-মন প্রতিবা[illegible] জানালো—রাগের জ্বালায় উঠে বসতে গিয়েই এক মুহূর্ত্তে বুঝলা[illegible] আমার এত আতঙ্ক সবই সৃষ্টি করেছে আমারি বাঁ হাতখানি বাঁ দিক ফিরে বাঁ হাতখানি চেপে শোবার দরুণ রক্ত চলাচল ব[illegible] হোয়ে গিয়েছিলো আর সেই জন্য অসাড় আর ঠাণ্ডাও হো[illegible] উঠেছিলো হাতখানি।

সমস্ত ঘটনাটা শেষ অবধি হাস্যরসের পর্য্যায়ে পড়লেও আ[illegible] কিন্তু এতটুকুও কৌতুক বোধ করিনি। বরং উল্টোটাই ম[illegible] হোয়েছিলো যে এমন ভয়ানক জীবন আমার সুরু হোলো যেখা[illegible] সত্যি ও মিথ্যের রূপে প্রকাশ পেতে পারে, অথচ বিচারশ[illegible] ক্রমেই হারাতে হবে···হয় অসম্ভবের আশা নয় নৈরাশ্যের উন্মত্তত[illegible] এই দু'য়ের মাঝখানে দোল খেতে খেতে বুদ্ধিবৃত্তি সবই হবে ক্ষান্ত···

সমস্ত রাতের পর ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে শব্দ পেলাম দূ[illegible] থেকে একের পর এক তালা খোলার। শেষ অবধি দরজার পা[illegible] থেকে কারারক্ষকের কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল—'কি খেতে চা[illegible] ভাববার সময় পেয়েছিলেন তো?'

বেশ ভদ্রভাবেই আমি চাইলাম একটু, ভাত, স্যুপ, সিদ্ধ মাংস কিছু রুটী, মদ আর জল। লোকটা একটু অবাক হোয়ে[illegible] দেখলাম, আমার কাছ থেকে কোনোরকম নালিশ না শুনে [illegible] সেটাই আশা করেছিলো। আমাকে বললো যে, 'আমি বিছান[illegible] কিম্বা কোনো কিছু আসবাব চাইলাম না দেখে ও অবা[illegible] হোয়ে গেছে। কারণ আমি যদি ভেবে থাকি যে আমাকে[illegible] দু'একদিনের জন্যে আনা হোয়েছে এখানে তাহলে ম[illegible] ভুল করবো।

—যা' দরকার মনে করেন দিতে পারেন—

—আমি আবার কোথায় ছুটবো তার জন্য? এই পেন্সিল আ[illegible] কাগজ নিন—এতে লিখে দিন যা দরকার।

আমি জামাকাপড়, আসবাব ইত্যাদির একটা তালিকা দিলাম আর সেই সঙ্গে আমার যে বইগুলি পুলিশে নিয়ে গিয়েছি[illegible] সেগুলিও লিখে দিলাম।

—আহা অত তাড়া নয়, অত তাড়া নয়। ওসব বই-পত্ত[illegible] কাগজ-কলম আয়না ক্ষুর ওসব কাটুন···ওসব দেওয়া বে-আইনী বরং আপনার খাবারটা কেনার জন্যে কয়েকটা টাকা দিন—

আমি ওই অভদ্র বর্ব্বরটার হাতে একটা সেকুইন দিলাম লোকটা চলে গেল। পরে শুনেছিলাম আরও সাত জন বন্দী [illegible] 'দি লীড্‌স্'এর সেলে রয়েছে। প্রায় দুপুরবেলা লোকটা ফিরে এ[illegible] খাবার আর আসবাবপত্র নিয়ে। একটি মাত্র হাতীর দাঁতের চা[illegible] —কাঁটা-ছুরী দেওয়াও বারণ।

—কালকের যা দরকার সেটাও জানিয়ে দিন। কারণ, দি[illegible] একবারের বেশী আমি আসতে পারি না। আর আপনা[illegible] কতকগুলি শিক্ষণীয় বই পাঠানো হবে। আপনার তালিকায় লে[illegible] বইগুলি দেওয়া বারণ। সেক্রেটারীর হুকুম তাই—

—বেশ কথা, আমাকে একলা থাকতে দেওয়ার জন্ত আমার ধন্তবাদ তাঁকে জানাবেন।

—বলতে বলছেন যখন বলবো। কিন্তু এসব ঠাট্টা-তামাসার ফল কিছু ভালো হবে না—

ঠাট্টা নয়, বদমায়েশ কয়েদীদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার চেয়ে এ তো অনেক ভাল হোয়েছে—

—বদমায়েশ কয়েদী! কি বলছেন মশাই? আশ্চর্য্য! আমাদের এখানে কেবল মহৎ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদেরই রাখা হয়—অবশ্য তাঁদের বন্দী করার কারণ বিখ্যাত বিচারকই বলতে পারবেন, আপনার শাস্তি কঠোরতর করবার জন্তেই আপনাকে এভাবে রাখা হোয়েছে আর আপনি আমায় দিয়ে ধন্তবাদ পাঠাচ্ছেন?

—ওঃ আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—

কারারক্ষক চলে যাবার পর আমি টেবিলটা টেনে এনে দরজার সামনে রাখলাম একটু আলোর আভাস পাবার জন্তে—তার পর খেতে বসলাম। কয়েক চামচ স্যুপ ছাড়া কিছুই গিলতে পারলাম না—দীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টা উপবাসের পর কেমন যেন বমির ভাব আসছিল। সমস্ত দিনটা ইজিচেয়ারে এলিয়ে পড়ে কাটিয়ে দিলাম। নিদারুণ অবসন্নতা আমার দেহ-মন ছেয়ে ফেলেছিলো। এলো রাত্রি। ছ'চোখের পাতা সারা রাতেও এক হোলো না। আলো-বাতাসহীন বদ্ধ খুপরী—প্রতি পনের মিনিট অন্তর সেণ্ট মার্কের গীর্জ্জার প্রচণ্ড ঘণ্টাধ্বনি···আর সারাক্ষণ মস্ত মস্ত ইঁদুরদের ছুটোছুটি আর কিচ্‌কিচিনীর শব্দ···আর সবার উপর হাজার হাজার পোকা আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন ছেঁকে ধরেছিলো, সমস্ত গায়ের রক্ত যেন পাম্প করে শুষে নিচ্ছিল আর ঐ অসংখ্য পোকার মুহুর্মুহু দংশন···আমার সমস্ত পেশীর আক্ষেপ সুরু হোলো—নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হোয়ে আসতে লাগলো···সমস্ত রক্ত যেন বিষাক্ত হোয়ে উঠলো···সে যে কি যন্ত্রণাদায়ক, নিদারুণ তিক্ততম অভিজ্ঞতা, সেটা অনুভব করবার মত শক্তি কারো আছে বলে জানি না।

ভোরবেলা কারারক্ষকটি আবার এলো, সঙ্গে কয়েক জন প্রহরী—কারারক্ষকটির নাম জানলাম লরেঞ্জ। ওই প্রহরীরাই আমার খুপরীটা ধুয়েমুছে বিছানা করে দিলে। এক জন হাত-মুখ ধোবার জন্ত জল এনেছিলো—আমি জিজ্ঞাসা করলাম সামনের ছোটো খুপরীটাতে বেরোতে পারবো কি না···লরেঞ্জ জানালো হুকুম নেই।

দিনের পর দিন কাটলো আশা আর নিরাশায়—হতাশা আর ব্যর্থতায়—ক্ষোভে আর উন্মত্ততায়। প্রতি দিনই আশা করতাম, হয়ত কাল সকালেই দেখবো আমাকে ছেড়ে দেওয়া হোয়েছে। অবশ্য নিরাশও হতাম কারণ যা হওয়া উচিত, যা ন্যায় তা কখনও পিয়োম্বীতে ঘটে না। অগাষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর···দীর্ঘ ভারাক্রান্ত দিনগুলি কেটে গেল। নভেম্বরের প্রথম দিকে নিরাশায় আর ব্যর্থতায় মরিয়া হোয়ে ঠিক করলাম, যেখানে আমাকে জোর করে ধরে রাখা হোয়েছে সেখান থেকে আমি জোর করে বেরিয়ে যাবো।

ঐ একটা খেয়ালই মাথায় ঘুরতে লাগলো···সারাক্ষণ ওই একই চিন্তা করতে লাগলাম।

১৭৫৬ সাল। নববর্ষের দিন লরেঞ্জ এসে ঢুকলো হাতে একটা মস্ত প্যাকেট নিয়ে। তার ভিতর রয়েছে একটা ড্রেসিং গাউন, ভালো চামড়ার লাইনিং দেওয়া, মস্ত ভালুকের চামড়ার ব্যাগ পা ঢুকিয়ে বসার জন্তে আর সিল্কের লেপ। সেই অসহ্য শীতের [illegible] এমন উপহার পেয়ে আনন্দে আমার চোখ ফেটে জল এলো···বিশেষ করে যখন শুনলাম, মাসে ছয়টি সেকুইন আমাকে দেওয়া হবে ইচ্ছামত বই কিনে পড়বার জন্ত। এই উপহার এই অতুলনীয় দান—সবই আমার পিতৃতুল্য, অকৃত্রিম বন্ধু, বৃদ্ধ ব্রাগার্দার কাছ থেকে। লরেঞ্জের কাছে শুনলাম, তিনি তদন্ত কর্মচারীদের কাছে, বিচারকের কাছে নতজানু হোয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে প্রার্থনা করেছেন তাঁর স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ এগুলি আমাকে পাঠাতে। আমার মনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। একখানি কাগজে লিখে দিলাম—'ট্রাইব্যুনালের সদাশয়তার জন্ত আর ম'সিয়ে ব্রাগার্দার স্নেহের অফুরান উৎসের জন্ত ধন্তবাদ জানাই।'

এক দিন ভাগ্যক্রমে অনুমতি পেলাম ঘরের সামনের ছোটো খুপরীটাতে বেড়াবার। অবশ্য অল্প সময়ের জন্ত। যাই হোক, হঠাৎ বেড়াতে বেড়াতে চোখে পড়লো, একটা বিশ ইঞ্চি লম্বা লোহার পুরু শক্ত খিল (অর্গল) পড়ে রয়েছে—চকিতে মনে হোলো, এটা দিয়ে আত্মরক্ষার কাজ চালানো যেতে পারে হয়তো। তখনি সেটা ড্রেসিং গাউনে ঢেকে নিয়ে এলাম। অবশ্য আরও অনেক ভাঙাচোরা জিনিষপত্র ও একটা ভাঙাগোছের সিন্দুক দেখলাম। ওই লোহার লম্বা রডটাকে নিয়ে পড়লাম পুরো আটটি দিন ধরে···এক টুকরো মার্বেল পাথরের উপরে, ক্রমাগত ঘষে ঘষে মুখটা তীক্ষ্ণ ছুঁচালো করে তুললাম। আটটি ধারওলা পিরামিডের আকৃতির মত হোলো—সব কোণগুলি ক্রমেই সূচাগ্র হোয়ে নেমে এসেছে। অবশ্য এত ব্যাপার বড় সহজে হয়নি। অনেক পরিশ্রম করে, তবে। একটুও তেল নেই, থুতুতে ভিজিয়ে নিয়েছি পাথরটা। ডান হাতের পেশীতে এত ব্যথা হোয়েছিলো যে, নাড়তে পারতাম না, হাতের চেটোতে তো দগদগে ঘা···কিন্তু স্বহস্তে প্রস্তুত আমার শাণিত অস্ত্রের দিকে যখন চাইতাম, সব যন্ত্রণা ভুলে যেতাম। অবশ্য তখনি ওটা নিয়ে কি কাজে লাগাবো বুঝতে পারি নি, তবে প্রথম কর্ত্তব্য হোলো যে ওই গোয়েন্দাটা আর প্রহরীদের সন্ধানী দৃষ্টি থেকে ওটা লুকিয়ে রাখা সেটা বুঝেছিলাম।

একটা বেশ ভালো নিরাপদ জায়গা ঠিক করলাম ইজিচেয়ারের পিঠের লাগানো কুশানের ভিতরটা, সেখানে ওটা রেখে যে কী বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলাম সেটা পরে বুঝেছি।

আমি নিশ্চিত জানতাম যে আমার এই ঘরখানার নীচেই সেই জায়গাটা যেখানে সেক্রেটারীর সঙ্গে আমার দেখা করানো হয়েছিলো। ঘরটা রোজ সাফ করা হোতো। আসল কাজ হোলো ঐ অস্ত্রটা দিয়ে মেঝেতে গর্ত্ত করে তার পর বিছানার চাদরটার সাহায্যে নীচের ঘরটায় নেমে পড়া। আর যতক্ষণ না দরজা খোলা হয় টেবিলের নীচে লুকিয়ে থাকা। যেই কেউ আসবে তখন আছে আমার অস্ত্র—মুক্তির পথ খুঁজে দেবে। কিন্তু ভাবলাম, এখন রোজ যে মেঝে খুঁড়বো তাহলে ধুলোর আর মেঝে খোঁড়া গুঁড়োর স্তূপ কোথায় লুকবো? লরেঞ্জ আর প্রহরীরা তো বিছানার নীচটা রোজ পরিষ্কার করে—আমার বিশেষ করে বলা আছে রোজ ভালো করে সাফ করতে।

ভাণ করলাম দারুণ ঠাণ্ডা লাগার, আর ধুলো উড়লেই কাশি বাড়বে। কয়েক দিন এই ছলনাতে বেশ চললো কিন্তু ওই

গোয়েন্দা লরেন্সটা ঠিক সন্দেহ করলো কিন্তু···এক দিন একটা বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে এসে ঘরের প্রত্যেকটি কোণ তন্ন তন্ন করে দেখে সাফ করলো। আমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। পরদিন সকালে আমি করলাম কি, আঙুলে খোঁচা দিয়ে রক্ত বের করে রুমালে লাগালাম। তারপর লরেন্স এলে বললাম যে, কাল ধুলো ওড়ার ফলে কি হোয়েছে দেখুন—আমার অসম্ভব কাশি বেড়েছিলো, সম্ভবত গলার কোনো শিরা ছিঁড়ে গেছে—ডাক্তার ডাকা হোলো, আমি আমার রোগের কারণ জানালাম, তিনি বললেন আমার কথাই ঠিক, ধুলোর মত ফুসফুসের আর শত্রু নেই, এমন কি একটি যুবক কয়েক দিন আগে ঠিক এই রকম কারণে মারা গেছে··· সাবাস, আমি বোধ হয় ঘুষ দিয়েও এত ভালো স্বপক্ষে ওকালতী করাতে পারতাম না।

আমার লাভ হোলো প্রচুর, কারণ প্রহরীদের বারণ হোয়ে গেল যে আমার ঘর ঝাঁট দিয়ে সাফ করে আমাকে যেন আর বিরক্ত না করা হয়। লরেন্স আমার কাছে বার বার ক্ষমা চাইলে, শপথ করে বললে যে আমাকে খুশি করবার জন্তেই ও ঘর পরিষ্কারের দিকে অত নজর দিতো।

দীর্ঘ শীতের রাত্রি···আমাকে প্রায় উনিশটি ঘণ্টা অন্ধকারেই কাটাতে হোতো। রান্নাঘরের মিটমিটে আলোও একটা জুটলে কী ভালোই না হোতো? কিন্তু কোথায় পাবো? এ কথা ঠিক 'অভাবই আবিষ্কারের স্রষ্টা'—আমার একটা মাটির ভাঁড় ছিলো, তাইতে আমি ডিম রান্না করতাম, সেইটাকে স্যালাড তেলে ভর্তি করে লেপ ছিঁড়ে তুলো বের করে সলিতা তৈরী করলাম, কিন্তু আগুন জ্বালি কি করে? লরেন্সকে বললাম যে দাঁতের যন্ত্রণায় অসহ্য কষ্ট পাচ্ছি আমাকে একটু 'পিউমিস ষ্টোন' (আগ্নেয়গিরির প্রচুর ছিদ্রযুক্ত এক প্রকার পাথর) এনে দিতে হবে। স্বভাবতঃই ও বললে জিনিষটা কি তা জানেই না, তখন আমি যেন নেহাৎই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, তাহলে একটা চকমকি পাথর হোলেও চলবে যদি বেশ করে ভিনিগারে ভিজিয়ে রাখা যায়। ওই বোকা শয়তানটা প্রায় আধ ডজন আমাকে দিলে।

আমার পা-জামাতে একটা মস্ত বকলস ছিলো ইস্পাতের···চকমকি, ইস্পাত দুই জুটলো বলে বেশ গর্ব্ব হোলো তখন। কিন্তু আরও বাকী যোগাড়ের ···আগেকার পুরানো দাগ দেখিয়ে ডাক্তারকে চর্ম্মরোগের ভাঁওতা দিয়ে কিছু সালফার পর্য্যন্ত আদায় করলাম নিজেই অষুধ তৈরী করে নেবো বলে। যেন অষুধ তৈরীর জন্তই চাইছে এই ভাবে এমন সোজাসুজি লরেন্সের কাছে দেশলাই চাইলাম যে ওর পকেটে যে কয়টা কাঠি ছিলো ও সব কয়টাই দিয়ে দিলো কিছু না ভেবেই। এবার শেষ দরকার কিছু জিনিসের যা সহজেই জ্বলে উঠবে। হঠাৎ মনে পড়লো আমার দর্জিদের বলা আছে আমার সব পোষাকের বগলের তলার কাপড়ের ভিতরে 'টাকউড' দেওয়া থাকে যেন; কারণ তাতে ঘাম শুষে নেয়। আর ওই বিশেষ ধরণের কাঠটা সহজেই জ্বলে ওঠে জানি, সামনেই কোটটা পড়ে রয়েছে দেখে আশায় আনন্দে বুকটা দুলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাও জাগলো, কি জানি এটাতে হয়তো দেয়নি। মাঝে মাঝে এক একটাতে ভুলে যাওয়াও তো কিছু বিচিত্র নয়। আশা আর নিরাশায় দুলতে দুলতে খুলে ফেললাম ভিতরটা—জয় ভগবান! এই তো রয়েছে! আর কি চাই? সব উপাদানই তো পেলাম। সে যে কী আনন্দ···সেই নিকষ-ঘন অন্ধকারে এই প্রথম আলোর আভাস জানালাতে···যে আলো আমারি হাতের সৃষ্টি। আঃ কি তৃপ্তি আর সেই ভয়াবহ দীর্ঘ ভারাক্রান্ত রাত্রির আক্রমণ হবে না—

মেঝেটা কাঠের ছিলো। প্রায় ছটি ঘণ্টা খোঁড়বার পর প্রায় এক তোয়ালে-ভরা গুঁড়ো জড়ো হোলো। এক পাশে ঢেলে রাখলাম, ভাবলাম সামনের খুপরীটাতে বেড়াবার সময় সিন্দুকের পাশে ঢেলে দিয়ে আসবো। প্রথম তক্তাটা প্রায় ছ ইঞ্চি পুরু, সেটা গর্ত্ত হোলে দেখি, তলায় আবার একটা তক্তা। প্রায় তিনটি সপ্তাহ লাগলো আমার তিনটি তক্তার ভিতর গর্ত্ত করতে। কিন্তু তার তলাটা দেখে হতাশ হোয়ে পড়লাম। এবার দেখি মার্বেল পাথরের মোজেক···আমার যন্ত্রটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে একটু দাগও বসাতে পারলাম না। ভাবতে ভাবতে গল্প মনে পড়ে গেল হানিবল কি করে আল্পস পর্ব্বতের ভিতর পথ করে বেরিয়েছিলো—পাহাড়টাকে ভিনিগারে ভিজিয়ে নরম করে নিয়ে—আমিও দিলাম ঢেলে সমস্ত ভিনিগারটা ওই গর্ত্তটা দিয়ে। পরদিন সকালে দেখি, যে কারণেই হোক মোজেকের গাঁথনির বাঁধুনিটা গলে গিয়ে ওপরটা কুঁকড়ে গিয়েছে। তখন আমার ওই লোহার রড দিয়ে প্রাণপণে ঘষে ঘষে গর্ত্ত করতে পারলাম। দেখি, তলায় আর একটি কাঠের তক্তা দেখা যাচ্ছে—মনে হোলো এটাই নিশ্চয়ই শেষ স্তর।

উঃ, মনে পড়ে তখন মনের কী অবস্থা না গিয়েছিলো—কী একাগ্র কাতর প্রার্থনায় আমার প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাটতো! শক্তিশালী বুদ্ধিমন্তেরা হয়তো তর্ক করবেন প্রার্থনা করে লাভ কি—ও তো ভুয়া ইত্যাদি কিন্তু তাঁরা জানেন না আমার আপন অভিজ্ঞতায় আমি যা জেনেছি একাগ্র গভীর প্রার্থনায় যে কি শক্তি পেয়েছিলাম বলতে পারি না—ঈশ্বরের অনুগ্রহ যদি নাই স্বীকার করি, একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাসের মনের জোর থেকেই এ শক্তি আসে।

তেইশে অগাষ্ট আমার সব কাজ শেষ হোলো। শুধু প্লাষ্টারটুকু খসানো বাকী। ছোটো একটা ফুটো দিয়ে সেক্রেটারীর ঘরখানা এখন আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি আমার মুক্তির দিনটাও আগে থেকে ভেবে রেখেছিলাম। সেণ্ট অগাষ্টিনের ভোজের উৎসব হবে সাতাশ তারিখে···এই প্রাসাদেরই অন্য অংশে সমস্ত কর্মচারী এবং কর্ত্তাব্যক্তিদের একটা সম্মেলন আর উৎসব হবে। এদিকটাতে কেউ থাকবে না, অতএব ঐ তারিখেই পালাবার সবচেয়ে সুবিধা···

কিন্তু কৌতুকময়ী ভাগ্যদেবী আমার! পঁচিশে অগাষ্ট আবার নামলো তাঁর কৌতুক অভিশাপের ছদ্মবেশে। সেদিনের কথা ভাবলে আজও শিউরে উঠি। মনে পড়ে দুপুরের দিকে হঠাৎ তালা আর খিল খোলার শব্দ পেলাম। লাফিয়ে উঠে পড়ে ইজিচেয়ারে বসে পড়লাম—পরমুহূর্ত্তে ঘরে ঢুকলো লরেন্স। রীতিমত উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে বললে—'সুসংবাদ এনেছি মশায়, সত্যিই সুসংবাদ।'

প্রথমটা ভাবলাম বুঝি আমার ক্ষমার আদেশ এসেছে, তাই মুক্তি পেলাম। কিন্তু ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠলো পাছে গর্ত্তটা ধরা পড়ে। সে ভাবটা চেপে বললাম—দাঁড়ান পোষাক বদলে আসছি—না, না তার দরকার নেই। আপনাকে শুধু এই নরককুণ্ডের মত ঘর থেকে অন্য ঘরে নিয়ে যাবার আদেশ এসেছে। সে ঘরখানা বড়, সবে কলি ফেরানো হোয়েছে, তাছাড়া বড় বড় দুটো জানলাও আছে—সেখান থেকে প্রায় অর্দ্ধেক ভেনিসটাই দেখতে পাবেন। ···এমন কি সোজা হোয়ে দাঁড়াতেও পারবেন এমন উঁচু ঘর—

আমার মনে হোলো মূর্চ্ছা যাবো।—একটু ভিনিগার দিন, কোনো মতে আমি বললাম, 'আর সেক্রেটারীকে গিয়ে বলুন আমি তাঁকে আর ট্রাইব্যুনালকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই করুণার জন্য, কিন্তু আমি এই ঘরেই থাকবার অনুমতিটুকু তাঁদের কাছে ভিক্ষা চাই। আমার বেশ অভ্যাস হোয়ে গেছে। আমি বদল করতে চাই না।

—আপনি কি পাগল হোলেন নাকি মশায়? কিসে আপনার ভালো হবে বুঝতে পারেন না? লরেন্সের সেই অতি বিনীত গা-ঘ্যানানো চিবিয়ে কথা যেন কানে গরম সীসে ঢালতে লাগলো—আপনাকে বলে নরক থেকে উদ্ধার করে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হোচ্ছে আর তাইতে আপত্তি? আসুন, আসুন, হুকুম তো মানতেই হবে। আমার হাত ধরে চলুন, বই আর জিনিষপত্র ওরা আনবে—

জানতাম বিদ্রোহ করা মিথ্যা। দুশ্চিন্তায় মৃতপ্রায় অবস্থা তখন, কোনো মতে ওর হাত ধরে টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম। দুটো সরু বারান্দা পেরিয়ে তিন ধাপ ওঠে আবার একটা হল পেরিয়ে আরও একটা সরু বারান্দা পেরিয়ে আমার নতুন জায়গাটাতে পৌঁছলাম। ঘরের ভিতর অবশ্য একটা ভাল দেওয়া জানলা কিন্তু ঢাকা বারান্দাতে দুটো জাল ঢাকা জানলা ছিলো—তা থেকে বহুদূর প্রায় লিডো অবধি দেখা যায়। জানলা দিয়ে নরম মিষ্টি খোলা হাওয়া আসছিলো—খোলা হাওয়া তো আমার কাছে বহু দিন অপরিচিত··· কত দিন বুকভরা নিঃশ্বাস নিইনি! কিন্তু এসব কিছুই সে সময় ভালো লাগছিল না—একমাত্র সান্ত্বনা যে আমার ইজিচেয়ারটা ইতিমধ্যেই এসে গেছে আর তারই পিঠে লুকানো আছে যন্ত্রটা। আমার বিছানাটাও এলো এবার অন্য জিনিষগুলি আনতে গিয়ে প্রহরীরা আর ফিরলো না, দু'টি ঘণ্টা কি অসহ্য দুশ্চিন্তায় কাটলো ···আমার সেলের দরজা অবধি খোলা রয়েছে···এর চেয়ে অস্বাভাবিক এখানে আর কি হবে? কি নিদারুণ যন্ত্রণায় আর দুর্ভাবনায় মুহূর্ত্তগুলি কাটতে লাগলো—এমন সময় মনে হোলো কে যেন দ্রুতপদে এগিয়ে আসছে···পরমুহূর্ত্তে লরেন্স এসে ঢুকলো, রাগে বিবর্ণ হোয়ে গেছে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে আর শাপশাপান্ত করছে। ঢুকেই আমাকে বললে সমস্ত যন্ত্রপাতি যা কিছু আছে সব দিয়ে দিতে আর যে প্রহরী আমাকে এই সব সংগ্রহ করে এনে দিয়েছে তার নাম বলতে। আমি বললাম ওর কথা আমি কিছুই বুঝছি না। তখন সঙ্গের লোকেদের হুকুম করলে আমার দেহ তল্লাসী করতে—আমি লাফিয়ে উঠলাম, সমস্ত জামাকাপড় নিজেই খুলে ফেলে দাঁড়িয়ে বললাম—যা করবার আছে কর···কিন্তু খবরদার আমাকে ছোঁবার সাহস কোরো না—

ওরা আমার বালিস বিছানা সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। ইজিচেয়ারটার কুশন অবধি, কিন্তু পিছনের স্প্রীংএর ভিতর খুঁজে দেখার মত বুদ্ধি ওদের ছিল না! লরেন্স বললে,—মেঝের উপর কি যন্ত্র দিয়ে গর্ত্ত খোঁড়া হোয়েছে!···জানি সহজে বলবেন না। কিন্তু আমরাও কথা বার করবার উপায় জানি—

—"যদি সত্যিই মেঝেতে গর্ত্ত খোঁড়া থাকে···আর এই নিয়ে যদি আমাকেই প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমি সোজা বলবো আপনিই আমাকে নিজের হাতে ঐ-সব যন্ত্রপাতি এনে দিয়েছিলেন···আর সেগুলো আমি আপনাকেই আবার ফিরিয়ে দিয়েছি—"

আমার বলার ভঙ্গীতে আর দৃঢ়তায় ও স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলো—তারপর নিরুপায় ক্ষোভে আর ক্রোধে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় প্রচণ্ড আক্রোশে বারান্দার জানলা দু'টিও সশব্দে বন্ধ করে দিলে। আবার সেই রুদ্ধশ্বাস কারাকক্ষ···

সারা দিনের পর এনে দিলে পূতিগন্ধময় নোংরা খানিকটা মদ, মাংস, রুটি আর জল। সে আমি স্পর্শ করতেও পারলাম না। মাংসটা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পচা। সমস্ত দিন রাত্রি কাটলো অনিদ্রায় অনাহারে তৃষ্ণায় আর অসহ্য গরমে। পরদিন আবার ঐরকম দুর্গন্ধময় খাদ্য নিয়ে ঢুকলো—আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম—আমাকে অনাহারে আর শ্বাসরোধ করে মারবার হুকুম এসেছে কি? কিন্তু আমার কোনো কথায়ই ও কর্ণপাত করলে না। প্রায় আটটি দিন কাটলো এমনি প্রায় অনাহারে আর উত্তপ্ত শ্বাসরোধকারী বদ্ধ ঘরে। এক এক সময় মনে হোতো এবার ওকে খুন

। ফেরলেবো ঘরে ঢুকলেই। সেদিন রাত্রে যে কারণেই হোক সুনিদ্রা হোয়েছিলো। সকালে ঘরে ঢুকতেই প্রহরীদের সামনে ওকে বজ্রগম্ভীর স্বরে বললাম—আমার হিসাবপত্র ঠিক করে এনে দেখাতে। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কি কি খরচ আমার জন্যে করেছে তার পাই পয়সাটার হিসাব অবধি দিতে হবে। এই কথায় লরেঞ্জ স্পষ্টই একটু হতভম্ব হোয়ে গেল। অস্বস্তির সঙ্গে বললে, পরদিন সব হিসাব আমাকে দেখাবে।

পরদিন ভোরেই ও হাজির হোলো এক ঝুড়ি লেবু নিয়ে, ম্যঁসিয়ে ব্রাগার্দার উপহার। তা ছাড়া আমার খাদ্যেরও চমৎকার পরিবর্তন। একটি আস্ত মুরগীর রোষ্ট, এক বোতল ঠাণ্ডা সুস্বাদু জল। আমাকে হিসাবও দিলে। চোখ বুলিয়ে দেখলাম চার সেকুইন অবশিষ্ট। লরেঞ্জকে বললাম তিনটি সেকুইন ওর স্ত্রীকে দিতে, বাকী একটি প্রহরীদের ভাগ করে দিলাম। এইটুকুতেই ওদের প্রসন্নতা লাভ করলাম।—গর্তটা খুঁড়বার জন্যে আমি যন্ত্র এনে দিয়েছি—এটা যা কি করে হোলো তা' না বুঝলেও আপনাকে অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু দয়া করে বলবেন ঐ আলো তৈরীর উপকরণগুলো কে যোগালো?—লরেঞ্জের অনুনয়ের ভঙ্গীতে, বললাম,—সেও আপনি। আপনিই তো আমাকে তেল, চকমকিপাথর দেশলাই সবই দিয়েছেন—আমি সবই আপনাকে বলতে পারি আর সত্যি কথাই বলবো তবে এখানে নয়। সেক্রেটারী আর ট্রাইবুনালের সামনে—

রক্ষা করুন। হায় ভগবান! আপনাকে কিছু বলতে হবে না। গরীব ছাপোষা মানুষ আমি। আমার চাকরী যাবে। ছেলেমেয়ের হাত ধরে পথে বসতে হবে—বলতে বলতে লরেঞ্জ পালালো।

এক দিন আমি বই কিনতে দিলে লরেঞ্জ বললে—এই পয়সা নষ্ট করে কেউ বই কেনে! আপনার যখন এত পড়বার সখ তখন আমাদের আর একজন বন্দীর কাছ থেকে আপনাকে বই ধার করে এনে পড়াতে পারি, তাতে পয়সাগুলো বাঁচবে—

—উপন্যাস? আমার ঘৃণা হয় পড়তে।

—না না, বিজ্ঞানের বই। আপনার কি ধারণা মশাই, যে আপনিই একমাত্র বিদ্বান লোক?

—বেশ তবে বিদ্বানটির কাছ থেকেই বই আনুন। বরং আমার একখানা তাঁকে পড়তে দিয়ে বদলী একটা আনুন—

আমি তাঁকে দিলাম 'রেশানারিয়াম' আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই লরেঞ্জের হাতে এলো 'উলফ' এর প্রথম খণ্ড।

বইখানার ভিতরে একটি পাতার মার্জিনে লেখা দেখলাম 'ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তাই সর্বনাশ আনে।' লেখাটা দেখেই মনে হলো এই বন্দীর সঙ্গে পত্র-বিনিময় করলে ভালো হয়। কিন্তু কালি, কলম, পেন্সিল? কিছুই নেই না থাক, আমার ডান হাতের তর্জনীর নখটিকে বাড়িয়ে সূচালো করে ঠিক কলমের নিবের মত করেছিলাম জামের রসে ডুবিয়ে এখন কালির মত করে লিখতে পারলাম। ওরই বইএর পাতায় লিখে দিলাম একটি আট লাইনের লাতিন কবিতা আর আমার কাছে যে সব বই আছে তার তালিকা। লেখার পরই মনে দারুণ আগ্রহ কি উত্তর আসে জানার—দীর্ঘ দিনের পর মানুষের মনের সঙ্গ। এ কিরকম কথা! লরেঞ্জ ভোরে আসতেই বললাম—এ বইখানা আমার পড়া হয়ে গেছে, আর একটা বদলে আনবেন। দ্বিতীয় খণ্ড এলো ভিতরে ভাঁজ করা ছোট কাগজ—

আমরা দু' জনে একই কারাগারে বন্দী। এখানে আপনার সঙ্গে পত্রালাপের সুযোগে অত্যন্ত আনন্দিত। আমার নাম 'মার্তিন বালবি'। আমি ভেনিসবাসী। মঠের সাধু ছিলাম—এখানে আমার সঙ্গী কাউণ্ট আস্ত্রিয়া। তিনি বলেছেন তাঁর সব বই আপনি খুশী মত পড়তে পারেন। সে সম্বন্ধে এই বইটার মলাটের পিছনে লেখা আছে। কিন্তু একটা কথা, সাবধান হবেন—লরেঞ্জ যেন আমাদের পত্রালাপ সম্বন্ধে কিছু জানতে না পারে—

চললো আমাদের পত্রালাপ। ওদের জানালাম আমার পরিচয়। উত্তরে দীর্ঘ ষোলোটি পাতায় বালবির পরিচয় পেলাম। চার বৎসর ও এইখানে বন্দী। তিনটি তরুণীর সঙ্গে ওর অবৈধ সংসর্গের ফলে যে সব অবৈধ শিশুর জন্ম হোয়েছিলো তাদের 'বালবি' নিজের নামে ব্যাপটাইজ (দীক্ষিত) করে এই তার অপরাধ। অবশ্য বালবি'র বক্তব্য এই যে যেহেতু তারা ওরই সন্তান সেই হেতু তাদের নিজের নামে দীক্ষিত করাই ওর ন্যায়সঙ্গত কর্তব্য।

সে যাই হোক, আমি এদিকে বেশ বুঝেছিলাম যে মুক্তি যদি পেতে হয় নিজের চেষ্টাতেই পেতে হবে যা আপাত দৃষ্টিতে অসাধ্য। কারণ এবারে বেরোতে হলে ছাদ ফুটো করে বেরোতে হবে। অথচ আজ-কাল আমার ঘরের দেয়াল মেঝে রোজ তন্ন তন্ন করে দেখা হয়। ছাদ ফুটো করতে হলে প্রয়োজন পাশের ঘরের ওই সাধুটির সাহায্য। ওই দিক থেকেই করতে হবে। লিখে জানালাম মুক্তি পেতে চায় কি না। উত্তর এলো তার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। আমি লিখলাম তাহলে শপথ করতে হবে আমার সব কথা বিনা প্রতিবাদে শোনার। রাজী হোলে আমার যন্ত্রটির বিবরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম প্রথমে ওর ঘরের ছাদ ফুটো করতে হবে তার পর দুই ঘরের মাঝখানের এই দেয়ালটা—ব্যাস, তাহলেই ওর দায়িত্ব শেষ বাকী সব ভার আমার। ওই সঙ্গে জানিয়ে দিলাম লরেঞ্জকে বলে কিছু সাধু মহাত্মাদের বড় বড় ছবি আনিয়ে ঘরের চার দিকে টাঙাবার ব্যবস্থা করতে। কারণ ছবি দিয়ে দেয়ালের গর্ত সহজেই ঢাকা যাবে।

এখন কথা হোলো লোহার রডটা পাঠানোর ব্যবস্থা নিয়ে। চট্ করে মাথায় একটা মতলব এলো। একটা পরবের দিনে লরেঞ্জকে বললাম যে আমি কিছু ম্যাকারনি রাঁধতে চাই নিজের হাতে নিজের রুচিমত মশলা ইত্যাদি দিয়ে—যাতে খানিকটা সেই সাধুটি, যিনি আমাকে বই পাঠান তাঁকেও পাঠাতে পারি। নির্দিষ্ট দিনে একটা মোটা বড় বাইবেলের পিছনে মলাটের ফাঁকে সেই লোহার রডটা পুরে বইটার উপর মস্ত একটা ডিশে ম্যাকারনি, আর পনীর মাখনে ছাপা-ছাপি করে লরেঞ্জের হাতে দিলাম। গলানো মাখনের ভিতর ম্যাকারনির আর পনীরের গন্ধে লরেঞ্জের চোখ আর মুখের ভাবটি যে কি উপভোগ্য হোয়েছিলো—আর কোনো দিকে মন দেবার মত অবস্থা ওর ছিল না। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এসে বললে যথাস্থানে পৌঁছে গেছে সেটা।

কাজ সুরু হোলো।···কিন্তু এমন বরাত আমার যেদিন 'বালবি' জানালে যে ছাদ ফুটো করা হোয়ে গেছে, একটা ছবি আঠা দিয়ে সেই গর্তটিতে সেঁটে দিয়েছে। আমাদের দেয়ালের ফুটোও প্রায় শেষ শুধু একখানা ইট সরানো বাকী। সেই শুনে আমি ঠিক করলাম

পরদিন রাতেই আমাকে পালাতে হবে—এক বার ছাদ ফুটো করে বেরোলেই বাইরে যাবার পথ ঠিক খুঁজে নেবো। কিন্তু ঠিক দুপুর দুটোর সময় শুনতে পেলাম বাইরের সেলের দরজা খোলার শব্দ। তক্ষুণি তিনটি টোকা দিয়ে ইশারা করলাম বালবিকে কাজ থামাতে, শব্দ না হয়। একটু পরেই লরেন্স ঢুকলো ঘরে সঙ্গে প্রহরী দুই জন আর একজন বিশৃঙ্খল পোষাকের উচ্ছৃঙ্খল চেহারার বন্দী। হাত দুটো খুব কষে বাঁধা। লরেন্স আমার কাছে ক্ষমা চাইলে, এক জন দুশ্চরিত্রকে আমার একই ঘরের সঙ্গী করে দিতে হোচ্ছে বলে। আমি শুধু বললাম—"ট্রাইব্যুনালের আদেশ মানতেই হবে। আপনার কি দোষ—"

লোকটির সম্পত্তি একটি ছেঁড়া মাদুর। আর দিনে দশ পয়সা খোরাকী। কিন্তু আমার সমস্ত মন চরম হতাশায় ভেঙে পড়লো—প্রতি বারই মুক্তির মুহূর্তে এ কী নূতন উপদ্রব! যাই হোক, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করবার চেষ্টা করলাম। লোকটিকে আমার খাদ্যের অংশ গ্রহণ করতে বলায় দেখলাম ও কৃতজ্ঞতায় গলে গেল। পরে লক্ষ্য করলাম আমার সেলের চতুর্দ্দিকে চেয়ে ও কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে—জিজ্ঞাসা করাতে বললে, ভার্জ্জিন মেরীর কোনো ছবি আছে কি না তাহলে ও প্রাণ দিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাবে। আমি ভাবলাম ও হয়তো আমাকে একজন ভক্ত ইহুদী ভেবেছে। সেইটার সুযোগ নিয়ে দেখালাম আমি একজন গোঁড়া ক্রীশ্চান—ওকে পবিত্র ভার্জ্জিনের ছবি দেখালাম বই খুলে—ও ছবির সামনে নতজানু হোয়ে মালা জপ করতে লাগলো। পরে আহারাদি সেরে আমার অবশিষ্ট সুরাটুকু শেষ করে দিলে—তার পরই সুরু হোলো নেশার প্রলাপ আর কান্না। ওর অসংলগ্ন কথা থেকে বুঝলাম—গোয়েন্দা বিভাগে গুপ্তচরের কাজ করতো—অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করায় এই শাস্তি।

বালবিকে আবার খবর দিলাম ঘটনাটা জানিয়ে। আশ্বাস দিলাম ভেঙে পড়ার কারণ নেই, শুধু কাজটা এখন বন্ধ থাক যত দিন না আবার জানাই। লোকটার নাম সোরাদাচি। ওকে দেখলাম দু'বার বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হোলো—দু'বারই ফিরে এলো। বুঝলাম এর হাত থেকে সহজে নিস্তার নেই। অতএব প্রথম পন্থাটিই কাজে লাগালাম। প্রথমতঃ ওকে পরীক্ষা করবার জন্য দু'বারই যখন ওকে ট্রাইব্যুনালের বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় একটা ছলনার উপায় বার করেছিলাম। দু'বারই দেখলাম ও সহজেই বিশ্বাসঘাতকতা করলো। তাই নিয়ে যেন আমার সর্ব্বনাশ হোয়ে গেছে এমন ভাণ করে ওকে নিষ্ঠুর ভাবে শাপান্ত করলাম, তারপর বিছানায় অনড়, অচল নির্ব্বাক হোয়ে শুয়ে রইলাম। ইতিমধ্যে লরেন্সকে দিয়ে একটি পবিত্র ক্রশ, আর দু বোতল পবিত্র জল এনে রেখেছিলাম। আমার ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধে সোরাদাচি যথেষ্ট অভিভূত ছিলো। এখন আমার এই অবস্থা থেকে ওর ভয় হোলো—বহু অনুনয়, বিনয়, কান্নাকাটি করতে লাগলো। আমি কোনো কিছুতেই কান দিলাম না। মনে মনে তখন এক বিচিত্র হাস্যরসের অভিনয়ের মহড়া দিচ্ছি। সেই দিনই বালবিকে জানালাম—ভয় নেই, তবে আমাদের মুক্তি অতি কঠিন সতর্কতার সরু সুতোয় ঝুলছে—খুব সাবধান—আজই রাত্রে···

আমি ততক্ষণে মোটামুটি দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলেছিলাম। জানতাম নভেম্বরের প্রথম তিন দিন বিচারালয় আর তদন্ত বিভাগের সমস্ত কর্ম্মকর্ত্তারা ভেনিসের বাইরে চলে যান। আর এই সুযোগে এই তিন দিন রাত্রে লরেন্স মনের সুখে নেশায় বুঁদ হোয়ে থাকে—

সবচেয়ে সুবিধা হোয়েছিলো, সোরাদাচি আমাকে অসম্ভব ভয় করতে সুরু কোরেছিলো—ওর দৃঢ় বিশ্বাস, আমার মত সাধুর অভিশাপ সহজেই ফলবে। সেদিন সারা দিন না খেয়ে পড়েছিলো—আমি ভাবলাম ওর নির্ব্বোধ দুর্ব্বল মনের মূঢ়তাকে কাজে লাগানোর এই সুযোগ। ডাকলাম ওকে—উঠে এসে আমার পায়ের তলায় পড়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে সুরু করলে। বললে, আমি ক্ষমা না করলে ওর নিশ্চিত মৃত্যু হবে। সুযোগ নিলাম অন্ধবিশ্বাসের—গম্ভীর স্বরে বললাম,—"বসো, কিছু খাও। জানো আজ ভোরে আমাদের পবিত্র দেবী ভার্জ্জিন মেরীর আবির্ভাব হোয়েছিলো—তোমাকে ক্ষমা করতে আদেশ দিয়ে গেছেন—। তোমার বিশ্বাসঘাতকতায় আমার কতবড় সর্ব্বনাশ হোতো সেই ভেবে আমি পাগল হোয়ে গিয়েছিলাম। আমার একমাত্র সান্ত্বনা ছিলো যে, আমার অভিশাপে তিন দিনের মধ্যেই তোমাকে মরতে হবে। হঠাৎ ভোরবেলা দেবীর আবির্ভাব—আহা আমার কত জন্মের পুণ্যফল!—যা হোক দেবী বললেন, সোরাদাচির ভক্তিতে আমি তুষ্ট, ওকে ক্ষমা কর আর ওকে এই [illegible]র জন্য তোমার পুরস্কার হোলো মুক্তি—আমি মানুষের বেশে এক [illegible] দেবদূতকে পাঠাচ্ছি, সে ছাত ফুটো করে তোমার ঘরে আবির্ভূত হোয়ে তোমাকে উদ্ধার করবে। তুমি সোরাদাচিকেও তোমার সঙ্গে মুক্ত করতে পারো, যদি সে প্রতিজ্ঞা করে গুপ্তচর বৃত্তি ছাড়বে জন্মের মতো—" এই বলে দেবী মেরীমাতা অদৃশ্য হোলেন—

মনের আনন্দ চেপে রেখে লক্ষ্য করতে লাগলাম বিশ্বাসঘাতকটার মুখের ভাব। ওর হতভম্ব ভাব দেখে আরও বিশ্বাসটাকে পাকা করবার জন্যে সমস্ত ঘরে পবিত্র জল ছিটিয়ে শুদ্ধ ভাবে বাইবেল খুলে পড়তে লাগলাম—আর ভার্জ্জিনের ছবির সামনে মাঝে মাঝে নতজানু হোয়ে প্রার্থনা জানাতে লাগলাম। সমস্ত দিন জল ছাড়া কিছুই খেলাম না আর সোরাদিচি সমস্ত সুরাটুকুই শেষ করলে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টাখানেক আগে আমি খুব আড়ম্বরের সঙ্গে নতজানু হোয়ে প্রার্থনায় বসলাম। গম্ভীরকণ্ঠে আদেশের সুরে সোরাদাচিকেও বললাম প্রার্থনায় যোগ দিতে। তখনি ও আদেশ পালন করলে, চোখে দেখলাম ভয়, সন্দেহ, সংশয় সব জড়ানো অদ্ভুত দৃষ্টি—মনে মনে হাসলাম দেবদূতের আবির্ভাবে সংশয়ের শেষ রেশটুকুও কেটে যাবে।

যেই শোনা গেল সুপরিচিত শব্দ দেওয়ালের ওধারে তখনি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে সোরাদাচিকেও ঘাড় ধরে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দিলাম। চীৎকার করে বলে উঠলাম—দেবদূত! দেবদূতের আবির্ভাব হবে—স্পষ্ট শুনতে পেলাম শেষ ইটটি সরানো হোলো—বালবিও নেমে গেলো।

—সারা দিন প্রার্থনা করো, চুপ করে শুয়ে থাকো দেওয়ালের দিকে মুখ করে। আর মৌনব্রত নাও, তাহলেই হবে। না, কারো সঙ্গে কোনো বাক্যালাপ করতে পাবে না। আজ সারা দিন এই ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করো। বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলো সোরাদাচি।

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলো লরেন্স।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

ফুলের মত...

আপনার লাবণ্য রেক্সোনা

ব্যবহারে ফুটে উঠবে!

নিয়মিত রেক্সোনা সাবান ব্যবহার করলে আপনার লাবণ্য অনেক বেশি সতেজ, অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! তার কারণ, একমাত্র সুগন্ধ রেক্সোনা সাবানেই আছে **ক্যাডিল** অর্থাৎ ত্বকের সৌন্দর্য্যের জন্যে কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ।

রেক্সোনা সাবানের সরের মত ফেণার রাশি এবং দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ উপভোগ করুন; এই সৌন্দর্য্য সাবানটি প্রতিদিন ব্যবহার করুন। রেক্সোনা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

রেক্সোনা—একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

R.P. 146-X52 BG

(স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী)

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রোগ ও অর্থচিন্তার ভার

১৮৯৩ সালের মাঘোৎসবের পর ৩রা ফেব্রুয়ারী বেহার হইতে রাজগৃহ গমন করিতেছিলে। যাবার সময় পুরুষ মানুষের সহায়তা ত্যাগ করিয়া একাকিনী পরম জননীকে সহায় করিয়া গ্রাম্য পথে সামান্য বেশে প্রার্থনা পূর্ব্বক হরিনাম গান করিলে, ও কোন কোন বাটীতেও গমন করিয়া নাম গান করিলে। বঙ্গনারীর পক্ষে এ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। রাজগৃহে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ৩।০ কি ৪টার সময়ই উঠিয়া প্রাঙ্গণে নাম গান হইত।

৫ই ফেব্রুয়ারী তুমি দৈনিকে লিখিয়াছিলে, "স্বামীনের সহিত একতা ঘন হইতে ঘন হইতেছে। এবার এই ভাবপ্রবণ নারীকে বড় করিয়া জননীর সম্মান রক্ষা করিব। এ বিষয়ে স্বামীন্ সর্ব্বদাই সাহায্য করেন। এবার কেবল জানিতে ও শিখিতে ইচ্ছা প্রবল। প্রসঙ্গ খুব ভাল ভাবে, শুদ্ধ ভাবে চলিতেছে, মন ভাল।"

৯ই রাজগৃহ পরিত্যাগ করিলে। বাজারে মেয়েরা হরিনাম গান করিলেন। সংসার অনিত্য, সেই নাম সত্য, এ বিষয়ে মেয়েদের বলিলে। শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ও সঙ্গে ছিলেন।

এই সময়ে তোমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। পরিশ্রম ও চিন্তা দুই-ই খুব বেশী হইত। অত বড় বিদ্যালয়টি স্কন্ধে পড়িল, তাহার জন্য কত খরচ। যা অভাব হয় তোমাকেই দিতে হয়। টাকার বিষয় আর কেহ ভাবেন না, বড় কেহ দেনও না। নিজের সংসারের খরচ, আত্মীয়দের সাহায্য করা, সমাজের যে ব্যয় হইত নীরবে তাহার অধিকাংশ নিজে বহন করা, ইহা ছাড়া বিদ্যালয়ের গাড়ীর খরচ বহন করা, এ সকলই তোমাকে করিতে হইত। সুতরাং তোমার অর্থভাণ্ডার প্রায় শূন্য থাকিত। তার পর সেই যে লক্ষ্ণৌতে শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সে অসুস্থতা সত্বেও কাজ করিতে বাধ্য হইলে। ঠাণ্ডা লাগিলে বাতের মতন হইয়া শরীর ফুলিয়া উঠিত, তখন শয্যা আশ্রয় করিতে হইত। রাজগৃহের পরিশ্রমের পর নরাটোলার বাটীতে আসিয়া একটু বৃষ্টি লাগিয়া তোমার বিশেষ পীড়া হইল। দাঁতের গোড়া ফুলিয়া গলা ফুলিল, মুখ বন্ধ হইল, কথা বন্ধ হইল। ডাক্তার অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। একদিন এমন হইল যে তোমার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিতে হইল। অবশেষে গালের ভিতরের ফোঁড়া আপনি ফাটিয়া গেল। আমার মন একটু চঞ্চল হইয়াছিল, মনে হয় বিশ্বাস পূর্ণ মাত্রায় করিতে পারি নাই। ক্রমশঃ তুমি সারিয়া উঠিলে। এবারকার পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। অনেক শিখিলাম, তুমিও অনেক শিখিলে। এই পীড়ার কথা তুমি নিজে এইরূপ লিখিয়া রাখিয়াছ,—"শয়ন করিয়াই এবার দুই মাস উপাসনা করিলাম। রোজ নিত্য নূতন ভাবে স্বামীন কখনও পাশে, কখন নিকটে বসিয়া মার নাম করিতেন। চুপ করিয়া থাকিতে ভাল লাগিত, কিন্তু যন্ত্রণা চুপ করিয়া থাকিতে দিত না। সময় সময় ধৈর্য্যচ্যুত করিয়া ফেলিত। অন্য কাহাকেও কিছু বলিতাম না, সময় সময় স্বামীনের উপর সন্তানবৎ আব্দার করিতাম; অভিমানও করিতাম, তিলেকের জন্য; কিন্তু তাঁহার মাতৃসম স্নেহে তখনই ভুলিয়া যাইতাম। এই সময় তাঁহাকে আমি মা বলিয়া সম্বোধন করিতাম, সন্তানের ন্যায় তাঁহার কোলে কখনও কখনও মাথা রাখিয়া জননীর স্নেহ সম্ভোগ করিতাম। স্বামী যে মা হইতে পারেন তাহার প্রমাণ এইখানেই। কিছু খাইতে পারিতাম না বলিয়া রাজকর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় শেষ করিয়া বেলা ১১টার সময় * বাটী আসিয়া নিজে রন্ধন পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া দিতেন।"

তুমি ভাল হইয়া উঠিয়া কিছুকাল শয্যায় শয়ন করিয়াই কাজ করিতে লাগিলে। আমার শরীর যদি ভাল থাকিত, তোমার অনেক সাহায্য করিতে পারিতাম। কিন্তু কলিক ও ডিস্পেপ্সিয়া আমার শরীর চূর্ণ করিয়াছিল। সুতরাং আমার জন্যও তোমাকে চিন্তা করিতে ও পরিশ্রম করিতে হইত। মধ্যে স্কুলের কোনও না কোনও ব্যবস্থা করিয়া নিজের বা আমার বা কোনও সন্তানের স্বাস্থ্যের অনুরোধে মফঃস্বলে কিম্বা গঙ্গার ধারে চলিয়া যাইতে হইত। ইহাতে অনেকে অসন্তুষ্ট হইতেন। মানুষের সহানুভূতি না পাইলে, যে কাজ করে তাহার মনের অবস্থা যে কিরূপ হয়, তাহা তুমি এই সময় খুব বুঝিতে লাগিলে, আর ভগবানের উপর নির্ভর বাড়িতে লাগিল। বড় ক্লেশ হইলে তুমি আমাকে এবং আমি তোমাকে মনের সকল দুঃখ তাপ বলিতাম।

কতরূপ টাকার ব্যবস্থা যে তোমাকে করিতে হইত, নিম্নোদ্ধৃত কয়েকখানি পত্র হইতে কিছু পরিমাণে তাহা জানা যাইতে পারে। তোমার সেই পূর্ব্বপরিচিত খৃষ্টান-পরিবারটির সঙ্গে তোমার কিরূপ আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল, এ পত্রগুলি তাহারও নিদর্শন।

"Chandernagore 25th August 1893.

প্রিয় দিদিমণি!

আপনাকে দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমার স্বামী এই মাসের ১৭ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। এখন আমি অত্যন্ত মনের কষ্টে আছি; আমার নিকট আমার ভগিনী মিসেস্ চক্রবর্ত্তী ও আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ফুলকুমারী আছে। * * * আপনি অনুগ্রহ করিয়া—র জন্যে যে টাকা পাঠান তাহা এখন অনুগ্রহ করিয়া আমার ঠিকানায় পাঠাইবেন। কারণ, দিদি এখন আমার নিকটে আছেন। * * *—আপনার স্নেহের এলিস।"

"Chandernagore 5-9-93.

প্রিয় ভগিনী!

আপনার পত্র ও টাকা পাইয়াছি। আমি এখন এলিসের কাছে আছি ও এখানেই কিছু দিন থাকিব। এলিস ও খোকা এখন ভাল আছে। চারু ও তরুণ স্কুলে আছে। আপনি কেমন

* এই সময় কাছারী সকালবেলা হইত।

আছেন আমায় জানাইবেন। ছেলেরা সকলে কেমন আছে? দাদাকে আমার নমস্কার জানাইবেন ও ছেলেদের ভালবাসা দিবেন।

আপনার ভগিনী বিন্দুবাসিনী চক্রবর্ত্তী।"

"Somerset House, Chandernagore.

প্রিয় দিদিমণি,

অনেক দিবস হইল আপনার অসুখের কথা শুনিয়াছি, এখন আপনি কেমন আছেন লিখিয়া জানাইবেন। আর আপনাকে আমার দুঃখের বিষয় কি লিখিব। এখন চারুর অত্যন্ত অসুখ করাতে আমি তাকে চন্দননগরে আনিয়া এখানে চিকিৎসা করাইতেছি। এ সময়ে যদি টাকা পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে আপনার নিকট চিরকাল বাধিত থাকিব। আপনাকে বিরক্ত করি বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। আমার বড় ইচ্ছা যে চারুকে একবার আপনাদের ওখানে চেঞ্জের জন্য নিয়ে যাই। আপনি কি বড়দিনের সময় ওখানে থাকিবেন? আমাদের ছোট বৌয়ের একটি মেয়ে হয়েছে। সকলে ভাল আছে। আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার সকলকে দিবেন ও আপনি লইবেন।—আপনার অধম ভগিনী B. B. Chukerbutty."

তোমার গুণে সত্য সত্যই চারু তোমার ছেলেদের বড় ভালবাসেন। এখন ইনি একজন graduate এবং কলেজের প্রফেসার। তোমার সন্তানেরা ইঁহার চিরদিনের ভালবাসার অধিকারী হইয়াছেন; তোমার গুণে তাঁহারা একটি খৃষ্টান ভাই লাভ করিয়াছেন। ইহার মূলে তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা।

আর একখানি পত্র এই,—"৮ই জানুয়ারী ১৮৯৩। অদ্য আপনার আশীর্ব্বাদ পত্র সহ পূরা দশ টাকার নোট পাইলাম। আমি বোধ হয় মাঘোৎসবের পরে আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতে একবার যাইব। * * *—বসন্ত।"

আর একখানি পত্র এই:—

"১০ই জানুয়ারী ১৮৯৩। আপনাকে পূর্ব্বে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। বকুর মাহিনা ৪ মাসের বাকী পড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে ২ মাসের বেতন আপনি দিয়াছিলেন, আর ২ মাসের বেতন বাকী আছে, এবং এই মাসের মাহিনা হইল। সুতরাং তিন মাসের বেতন আপনার কাছে পাইব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া দিতেছেন বলিয়া আমি পড়াইতে পারিতেছি।"

অনেক সময় কাহারও বিপদ আসিয়া পড়িলে তাহার সমুদায় ব্যয়ের ভার আপনার মস্তকে তুলিয়া লইতে বাধ্য হইতে। লক্ষ্ণৌ কলেজের একটি কন্যার বিল্ এইরূপে তোমার উপর পড়িয়াছিল। সে সম্বন্ধে মিস্ থোবর্ণ তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ এই:—"লক্ষ্ণৌ, ১০-৩-৯৩। প্রিয় মিসেস্ রায়, তোমার কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলাম; তোমার প্রিয়জনের নিকট হইতে ও তোমার কার্য্যক্ষেত্র হইতে তুমি যে এখনই অপসারিত হইলে না, এজন্য কৃতজ্ঞ হইতেছি। আশা করি, তোমার স্বাস্থ্যের ক্রমিক উন্নতি হইতেছে, এবং শীঘ্রই তুমি তোমার পূর্ব্বের স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইবে। আমি—র বিলের জন্য একটুও ব্যস্ত হই নাই; আমি নিশ্চিন্ত আছি যে সময় মত সে টাকা পাওয়া যাইবে; তুমি সে বিষয়ে চিন্তিত হও, আমি তা ইচ্ছা করি না।—র শরীরটা ভাল ছিল না, বিশেষ গুরুতর কিছু নয়। তার একটা দাঁতের গোড়ায় ঘা হইয়াছিল, কিন্তু তোমার মতন তেমন খারাপ হয় নাই। এখন তো তাকে ভালই মনে হইতেছে। ঈশ্বর তোমাকে তাঁহার সেবা করিবার জন্য সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন দান করুন। আমার সমগ্র প্রাণের এই আকাঙ্ক্ষা, যে আমি তাঁহাকে যেমন যীশুরূপে জানিয়াছি, তুমিও যেন তেমনি জানিতে পার। তাঁহার আশীর্ব্বাদ তুমি প্রাপ্ত হও, যদিও তাঁহাকে তুমি অন্য নামে সম্বোধন করিয়া থাক। ভালবাসা লও। তোমার বন্ধু আই থোবর্ণ।"*

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হীরানন্দ

ব্রাহ্ম সমাজের প্রায় সকলেই ইঁহাকে জানেন। ইনি ১৮৯৩ সালের প্রথম ভাগে নিজের কন্যাদের শিক্ষা কোথায় ভাল হয় তাহা অনুসন্ধান করিতে বাহির হইলেন। অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া তোমার আশ্রমে আসিয়া সেখানেই কন্যাদের রাখিবেন স্থির করিলেন। ইনি সিন্ধী, তুমি বাঙ্গালী, কিন্তু সরল মনে তুমি ইঁহাকে দাদা বলিতে; আমিও ইঁহাকে ছোট ভাইয়ের মত দেখিতাম।

সে সময়ে তোমার পরিবারে দৈনিক জীবনের বিধি ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, এ বিষয়ে আমাদের কাহারও কিছু লেখা নাই। সুখের বিষয়, ভাই হীরানন্দ এ সময়ে তোমার পরিবার সম্বন্ধে কাগজে কিছু লিখিয়াছিলেন। তাহা হইতে তখনকার দৈনিক জীবন অনেকটা বুঝা যাইবে। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ এই:—

"* * * কিন্তু বাঁকিপুরের সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় অনুষ্ঠান একটি সাদাসিদে রকমের বোর্ডিং; একটি ব্রাহ্ম মহিলা ও তাঁহার দুই কন্যা এটিকে চালাইতেছেন। মিসেস্ রায়ের স্বামী গভর্ণমেণ্টের একটি

---

* মূল পত্রখানি এই:—

"Lucknow 10-3-93

My dear Mrs. Ray,

I was very sorry to hear of your severe illness, and thankful that you were not taken now from your family and your work. I hope you have continued to improve and that you will ere long be in your usual health. I am not at all anxious about—'s bill. I am sure it will be settled in the course of time, and I do not wish you to be put out—has not been well but nothing serious. She had an ulcerated tooth but not so bad as yours. She seems well now. May God grant you many years of health in which to serve Him. With all my heart I wish you knew Him in the person of Jesus Christ as I do. May His grace be yours, although called by another name. With love, Your friend—I. Thoburn"

উচ্চ কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁর আর্থিক অবস্থাও ভাল। ৩৫ বৎসর বয়সে ইঁহারা স্বামি-স্ত্রী উভয়ে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেন, এবং আজ পর্য্যন্ত উভয়ে তাহা নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া আসিতেছেন। স্বামীর পূর্ণ অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া মিসেস্ রায় কন্যা দুটিকে লইয়া লক্ষ্ণৌ নগরীতে মিস্ থোবর্ণের কলেজে পড়িতে গিয়াছিলেন।

কন্যাদ্বয়ের মধ্যে একটির বয়স ২৪, অন্যটির অনেক কম। জ্যেষ্ঠা কন্যাটি বিবাহিতা * * * কিন্তু তিনি এখনও পিতামাতার কাছেই থাকেন ও তাঁহাদের সকল মঙ্গল অনুষ্ঠানে সাহায্য করেন। কনিষ্ঠা কন্যাটি একটি মুক্তাবিশেষ। কুমারী হইয়াও তিনি ছোট একটি মায়ের মতন বোর্ডিঙের শিশুগুলিকে যত্ন করেন, আবার বোন হইয়া কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, আত্মবলিদান করিতে হয়, তার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। মিসেস্ রায় দ্রুত ইংরাজী বলিতে পারেন; তিনি বেশ সুশিক্ষিতা।

"প্রত্যূষে পরিবারের কন্যারা সরল ভাবে আপনার আপনার প্রার্থনা করে। বাঁধা প্রার্থনার ব্যবহার নাই; শিশুগুলির কোমল বিবেকের উপর একটুও চাপ দেওয়া হয় না। বড় বড় মেয়েদের প্রত্যেকের উপর ছোট একটি-দুটি মেয়ের ভার দেওয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকের একখানি ছোট ডায়েরী আছে, তাহাতে সে প্রতিদিনের দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি কিছু থাকিলে তাহা লিখে। মেয়েরা মিসেস্ রায়ের পরিদর্শনে পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়টিতেই পড়ে; বাড়ীতে মিসেস্ রায় ও তাঁহার কন্যাদ্বয় মেয়েদের পড়া বলিয়া দেন। পড়ার ও খাওয়া-থাকার খরচ মাসে সাত টাকার কিছু বেশী পড়ে। শিশুগুলিকে দেখিয়া বেশ প্রফুল্ল ও আনন্দপূর্ণ মনে হয়; উপদেশে ও দৃষ্টান্তে উহাদের যে পবিত্রতা, আত্মচেষ্টা ও আত্মত্যাগের শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা উহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিবে বলিয়া বোধ হয়। লাভের জন্য এ বোর্ডিং খোলা হয় নাই। বস্তুতঃ বোর্ডারদের কাছে যা লওয়া হয়, তাতে খরচ কুলায় না। যেটা কম পড়ে তা মিঃ রায় পূর্ণ করিয়া দেন। তাঁর পত্নী ও কন্যাদের কাজে তাঁহার গভীর সহানুভূতি আছে।" *

দেখিলে? ৪ খানা ইংরাজী পুস্তক পড়িয়া কি প্রশংসা পাইলে! দু'-একটা কথা বুঝি একটু তাড়াতাড়ি বলিয়াছিলে, বিদ্বান্ হীরানন্দ তাহাতেই ভুলিয়া গেলেন, ও 'বলিলেন, তুমি দ্রুত ইংরাজী বলিতে পার। কিন্তু কি জানি কোন মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, যে তুমি weel read, অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছ। অথবা, যখন মানুষ মানুষকে ভালবাসে, তখন কোনও অপূর্ণতা দেখিতে পায় না; তাহাই বুঝি হীরানন্দের ঘটিয়াছিল। তোমার ছাত্রী-নিবাসকে তুমি 'পরিবার' বলিতে, কারণ ছাত্রীদের দ্বারা পরিবার নির্ম্মাণ করিবে, এই সাধই ছিল। হীরানন্দ যে ৭৲ টাকার কথা লিখিয়াছেন, তাহাও সকলে দিতেন না। কেহ অর্দ্ধেক, কেহ কেহ কিছুই দিতে পারতেন না। যাহা অপূর্ণ থাকিত তাহা তুমিই পূর্ণ করিতে, আমার কাছেও আবেদন করিতে হইত না। খরচ পত্রের ভার তোমারই মস্তকে ছিল। কখনও দেখিতে, যে সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও কন্যাদের পিতা-মাতা তাহাদের ব্যয়ের জন্য কিছু সাহায্য করিতেছেন না; তুমি কিন্তু

* মূল কথাগুলি এই :—

(The Indian Spectator.—April 2, 1893.)

"By far the most notable institution, however, at Bankipur, is an unpretentious Boarding house, managed by a Brahmo lady and her two daughters. Mrs. Prokash Chandra Rai is the wife of a gentleman who holds a respectable Govt. appointment, and who is in well to do circumstances. At the age of 35 she and her husband took the vow of Brahmacharya, and both have religiously observed it up to date. With her husband's full consent, Mrs. Rai (perhaps I should spell 'Ray') went with her two daughters to Lucknow to study at Miss Thoburn's Institution there. One of the daughters is now 24, the other is much younger. The elder is married, but * * * continues to live with her parents, and to help them in their beneficent works. The younger girl is a pearl. Shs is unmarried, and looks after the children in the Boarding House with a little mother's care, and sets there the example of true sisterly love and self-sacrifice. Mrs. Ray speaks English fluently, and is well read.

Early in the morning the children in her home offer their prayers in their own simple way, for no set prayers are used, and no compulsion is put upon their tender consciences. Each of the elder boarders is in charge of one or two of the younger, and each keeps a small diary in which she notes down every day her failings and backslidings if any. The boarders attend the female school conducted under Mrs. Ray's supervision, and are helped in their studies at home by her and her daughters. The whole cost of education and boarding amounts to Rs. 7 and odd per month. The children look blithe and lively and the lessons of purity, self-help and self-sacrifice, taught to them by example and precept, are likely to have an enduring influence on their after life. The Boarding House is not kept for profit; indeed, the amount charged to the boarders is much less than the actual cost. The deficit is made up by Mr. Ray who takes the deepest interest in the work of his wife and daughters."

কাহারও কাছে চাহিতে না, নীরবে সকল ব্যয়ভার বহন করিতে। কখনও কখনও অচল হইয়া উঠিত, তবু কাহারও নিকট আপনাদের দুরবস্থার কথা জানাইতে না। একদিন আহার করিতে করিতে একজন বন্ধুর কাছে তোমার অর্থাভাবের কথা বলিতেছিলাম। আহারান্তে নির্জ্জন হইলে তুমি আমাকে অনুযোগ করিলে, এবং বলিলে, "কেন বন্ধুর নিকট অভাবের কথা জানাইলে? ইহাতে যে ভগবানের নিন্দা করা হয়।" আপনার সন্তানদের বঞ্চিত করিয়া, নিজে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইয়াও তুমি তোমার ছাত্রীনিবাসকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলে। ইহা দেখিয়াই হীরানন্দ তোমার পরিবারে মুগ্ধ হইলেন, এবং স্বদেশে গিয়া আপনার দুটি কন্যাই তোমার হাতে দিবার সঙ্কল্প করিলেন। যেমন সঙ্কল্প, তেমনি কার্য্য করা তাঁহার স্বভাব ছিল। কন্যা দুটি সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। কোথায় সিন্ধু প্রদেশ, আর কোথায় বেহার, কন্যা দুটিকে এত দূরে পাঠাইতে হইবে বলিয়া সঙ্কুচিত হইলেন না। লক্ষ্ণৌ আসিয়া তাঁহার একটি কন্যা পীড়িতা হইলেন। হীরানন্দ যৎপরোনাস্তি সেবা করিলেন; কন্যা নীরোগ হইলেন, কিন্তু পথে আসিতে আসিতে তিনি নিজে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তোমার গৃহে আসিয়া যখন আশ্রয় লইলেন, আমি তখন বাটীতে উপস্থিত ছিলাম না। তুমি নিজেই চিকিৎসার ও সেবার আয়োজন করিলে এবং যাহাতে হীরানন্দের কষ্ট না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলে। নিজ গৃহের ঘরটি স্বাস্থ্যকর নয় মনে হইবা মাত্র পরেশের স্ত্রীর নিকট হইতে তাঁহার একটি ভাল ঘর চাহিয়া লইলে। হীরানন্দের টাকা ফুরাইয়া গিয়াছিল। পরেশ বাটী ছিলেন না। অন্য একজন ডাক্তারদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলে, "আপনি চিকিৎসার ভার লউন, যত ব্যয় হইবে আমার কাছে পাইবেন।" ডাক্তার বাবু তোমাকে জানিতেন। তোমার উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। হীরানন্দ স্থানান্তরে রহিলেন বটে, কিন্তু তোমার পরিশ্রম বাড়িল। পরিবারের, বিদ্যালয়ের, ও হীরানন্দের সেবার কার্য্য অকাতরে করিতে লাগিলে। যখন রোগ বাড়িতে লাগিল তোমার সেবাও বাড়িতে লাগিল। আহার ঔষধ তোমার হাতে খাইতে ভালবাসিতেন। শেষ মুহূর্ত্ত যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই রোগী ঔষধ সেবনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শেষে দাঁত বন্ধ করিলেন। সকলে ঔষধ দিতে বিরত হইলেন। তুমি কোথায় গিয়েছিলে, গৃহে প্রবেশ মাত্র জিজ্ঞাসা করিলে, ঔষধ খাওয়ান হয় নাই কেন? উত্তরে জানিলে যে রোগী মুখ বন্ধ করিয়াছেন, বিশেষতঃ এখন আর ঔষধ খাওয়াইয়া বিরক্ত করা কেন? তুমি বলিলে, তাও কি হয়? যতক্ষণ শ্বাস আছে, ততক্ষণ আমাদের কর্ত্তব্য করা উচিত। ঔষধের পাত্র লইয়া হীরানন্দের মস্তকের নিকটে গেলে, আর "দাদা, দাদা, ঔষধ," বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলে। শ্রবণমাত্র তিনি মুখ খুলিলেন, এবং ঔষধ পান করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি ১৪ই জুলাই ১৮৯৩ মহাপ্রয়াণ করিলেন। কন্যা দুটির বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ হইল, তাঁহারা সিন্ধুপ্রদেশে ফিরিয়া গেলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আরও ত্যাগ, আরও বিশ্বাস

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন কর্ত্তব্যের অনুরোধে তুমি অনেক সময় বাঁকিপুরে বাসা থাকিতে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে আবার আমাকে অনেক

সময় বাহিরে থাকিতে হইত। ইহাতে তোমার অনেক সময় ক্লেশ হইত। ইহার উপরে ত্যাগের ধর্ম্ম পালন মনের সংগ্রামকে আরও ঘনীভূত করিয়া দিত। এক এক বার তোমার অতিশয় কঠিন বোধ হইত। তোমার দৈনিকে সে সংগ্রামের চিহ্ন অনেক স্থানে আছে, কিন্তু পশ্চাৎপদ কখনও হও নাই। আমি যখন কোনও নূতন নিয়ম বা সাধন তোমার নিকটে ধরিতাম, কখনও কখনও তোমার তাহাতে ক্লেশ পাইতে হইত। কখনও বা তোমার মনে হইত, যে আমি ইচ্ছা করিলে আরও অধিক সময় তোমার কাছে থাকিতে পারি। ইহাতে কোনও সন্দেহ ছিল না; কিন্তু আমার অভিপ্রায় কি? যে শরীর নিশ্চয়ই থাকিবে না, তাহার উপর যদি তোমার ও আমার যোগ স্থাপিত থাকিত, তাহা হইলে আজ কি হইত বল দেখি?

তোমার এই সকল সংগ্রামের ছবি তোমার দৈনিকে ও পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; প্রধানতঃ সে সকল হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি।

"৩০শে জুলাই ১৮৯৩। স্বর্গের সঙ্গি! তোমাকে নমস্কার করিতে বড় ইচ্ছা করিতেছে। তোমার মূল্য এখনও আমি বুঝিতে পারি নাই। তাই এত কষ্ট পাইতেছি। তা বেশ হইতেছে; এখনও দিন আছে। মার কৃপা হয় তো অবশ্যই বুঝিতে পারিব। তবে নমস্কার করি। তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন তোমার মূল্য বুঝিতে পারি। আজ বিদায়। তোমার ঘোরি।"

"আজ ৯ই জুন ১৮৯৩, 'মনের' নামক স্থানে আসিয়াছি। উপাসনা ভাল, মন ভাল। এই স্থানে অনেক মুসলমান পীরের গোর আছে। ১০ই জুন একটি বড় গোরস্থানে সন্ধ্যার সময় স্বামিসহ অনেকক্ষণ বসিয়া পরলোক চিন্তা করিলাম। একবার মন চঞ্চল হইয়াছিল। বাহিরে সিঁড়ির উপর গায়ের চাদর রাখিয়া আসিয়াছিলাম, খুব বাতাস হইতেছিল, মনে হইতেছিল, যদি উড়িয়া যায়! অমনি চেতনা হইল, আর সে চিন্তা রহিল না, নিরাপদে নাম করিয়া, পরলোক চিন্তা করিয়া ফিরিলাম। এই শিক্ষা হইল যে সাধনের পূর্ব্বে সংসারকে এমন করিয়া দূরে রাখিয়া আসিতে হইবে, যেন ঐ সময় আমার মত কাহারও বিপদে পড়িতে না হয়। মনটা কিছু মুসড়ে গেল, পাপবোধে।

"১১ই আর একজন পীরের কথা শোনা গেল। তিনি কাপড় বুনিতেন, তাঁতের দু'ধারে কোরাণ রাখিতেন। যখন যে দিকে আসিতেন, তখন একবার করিয়া কোরাণ পড়িয়া লইতেন। আজ উপাসনায় ঠিক হইল, শরীরের স্পর্শসুখ পরিত্যাগ না করিলে সেই চিন্ময় সুখ, অনন্ত যোগ হইবে না। উপাসনা খুব ভাল হইল, কিন্তু আমার মনের উপর যেন একটা কি ভার পড়িল। এত চেষ্টা করিলাম কিছুতে সে ভার যেন কমে না। বুঝিলাম, স্বামীনের শরীর স্পর্শেতেও আমার আসক্তি আছে, ছাড়িতে হইবে।

"১১ই জুন, উপাসনা ভাল। আজ হইতে আমরা উভয়ে ১বার করিয়া উপাসনার জন্য ব্রতী হইলাম। মন খারাপ। ১৩ই, উপাসনা ভাল। আমার মনে কয় বার নিরাশ ভাব আসিয়াছিল, কিন্তু স্থান পায় নাই। মনের ভার এখনও যায় নাই। ১৪ই, উপাসনা ভাল, মনকে ভাঙ্গ করিবার জন্য উভয়ে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু পারিতেছি না। পাপও দোষ ছাড়িতে এত কষ্ট! ১৫ই উপাসনা ভাল, মন সেইরূপ ভার, একটু ভাল।

"১৬ই উপাসনা ভাল। রাত্রে স্বামীনের শয়নের পূর্ব্বের প্রার্থনা শুনিয়া মনের অন্ধকার দূর হইল। প্রাণে যেন কে আলো জ্বালিয়া দিল। এ কয় দিন যেন একখান খুব বড় কাল মেঘ আমার মনের উপর রাখা ছিল। আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন মন্দ ভাব ছিল না; কিন্তু মন যেন মেঘে-ঢাকা ছিল। যেমন আলো জ্বলিল, অমনি স্বামীনের স্কন্ধে মাথা দিয়া অনেক চক্ষের জল পড়িল, ও কয়দিনের অনেক কথা ছিল, সকল বলিলাম। কেমনে জীবনে পূর্ণতা আসিবে, এ বিষয়ে অনেক কথা কহিয়া উভয়ে শয়ন করিলাম।

"আজ ১৭ই জুন ১৮৯৩, আজ দানাপুর আসিতেছি। পথে উপাসনা খুব ভাল, আমের গাছের তলায় বসিয়া। ঈশ্বর যেন রসস্বরূপ হইয়া আম্রের মধ্যে বাস করিতেছেন। সকল আমেরই এক রস; আমাদের এই পরিবারের সকলেরই যেন এক চরিত্র হয়।

"২১শে জুন, সন্ধ্যায় সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন, তাহার ভিতর ব্রহ্মদর্শন। শয়নের সময় একবার তর্ক করিলাম। একটু পরে বুঝিয়া অনুতাপ হইল, সেই জন্য রাত্রিতে ভাল ঘুম হইল না।

"২৩শে জুন রাত্রি ৩৷টায় শয্যায় উপাসনা, মন ভাল। অঃ প্রকাঃ, যিনি আমার, তাঁহাকে সমস্ত দিন প্রাণের ভিতর দেখিতেছি। এই যোগ যদি খাঁটি হয়, তবেই সত্য মিলন। অভাব বোধ কম। আজ স্বামী বেহারে গিয়াছেন। ১২টার সময় বড় পুত্র সহ তাঁহারই জন্য ছোট উপাসনা আবার করিলাম। এখনও জননীর উপর পূর্ণ নির্ভর হয় নাই, কারণ স্বামীন নাই বলিয়া রাত্রে চোরের ভয় আসিতেছে; কিন্তু কাহাকেও বলিতেছি না। এক একবার বোধ হইতেছে যেন স্বামীন আমার নিকটেই আছেন; ইহা ভ্রম নয় এমনি বোধ হইতেছে। এইরূপে বিশ্বাস বাড়ে। রাত্রে সুনিদ্রা হইল, কোন চিন্তা হইল না। মা কোল পাতিলেন, সেই কোলে সকলকে লইয়া শয়ন করিলাম।"

১লা জুলাই তোমার নয়াটোলার বাটীতে দোতালার নূতন ঘর উৎসর্গ করা হইল। এ গৃহে কোনও অশুদ্ধ আচরণ হইবে না, শারীরিক ভোগ লইয়া এ ঘরে বাস করা হইবে না, এই সঙ্কল্প লওয়া হইল। যত দিন দেহে ছিলে, এ সঙ্কল্প পালন করা হইয়াছিল। তুমি ঐ নূতন গৃহকে অত্যন্ত ভালবাসিতে লাগিলে। আজও ঐ ঘরটি আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

১১ই অক্টোবর, রাত্রি ১।টার সময় বন্ধু খেলাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সুকুমারী পরলোক যাত্রা করিলেন। খেলাতচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী এত যত্ন করিলেন, তুমিও সাধ্যানুসারে সেবা করিলে, কিন্তু প্রিয় কন্যা দেহে থাকিলেন না। মাতাপিতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন। যাঁহার ধন তিনি ফিরাইয়া লইলেন। তুমি সেই রাত্রে শোকাতুরা মাতার সঙ্গে ছিলে। সাধ্যমত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলে। সুকুমারীর যথেষ্ট যত্ন করিতে পার নাই বলিয়া তোমার মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। বিশেষ তাঁহাকে লইয়া প্রথমে বিদ্যালয় আরম্ভ, তাঁহার লেখাপড়া হইতেছে না বলিয়া ঐ সুন্দর লক্ষ্ণৌ নগরীতে কালযাপন। সেই সুকুমারী চলিয়া গেলেন। শোকসন্তপ্ত পিতামাতার কথঞ্চিৎ শান্তি হইবে

বলিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া বিদেশ ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল। হরিদ্বার ও লক্ষ্ণৌ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে।

১৮৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ডায়েরী পাইয়াছি। কয়েক দিনের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "৯ই ডিসেম্বর,—সাধু অঘোরনাথের বার্ষিক শ্রাদ্ধ। প্রার্থনা,—আমি অবস্থার দাস হইয়াছি, তাই তোমার দাসত্ব করিতে পারি না। অবস্থার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তোমার দাসত্ব যাহাতে করিতে পারি, তুমি সেই বল দাও। ১০ই একবার বিধানের প্রতি একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় অনেক গোলমালের ভিতর শান্তভাব রক্ষা হইয়াছিল। প্রার্থনা এই ছিল, যে চরিত্রে তোমাকে পাই, তোমার সন্তান হইতে পারি, সেই চরিত্র দাও। উপাসনা ভাল, কিন্তু মনটা একটু শুষ্ক ছিল। কেন এরূপ হইল তাহা ধরিতে পারি নাই। ঘরে তুলো ছিল, তাহাতে একটি মেয়ে আগুন লাগাইয়াছিল। সংবাদ শুনিয়া একটু দৌড়ে আসিয়াছিলাম। আসিবার সময় যোগ ছিল না। পরে ভগবানকে স্মরণ হইল। সেই মেয়েটিকে একটু মিষ্ট ক'রে বকিয়াছিলাম।

১১ই ডিসেম্বর। আজ মার বাৎসরিক ছিল। প্রার্থনা ছিল, চিন্ময় যোগে আরও বাড়িতে দেও। আজ একটি অনাথ পরিবারের নিকট গিয়াছিলাম। এই স্ত্রীলোকটির সন্তান হইয়াছে, ও এই অবস্থায় জ্বর ও বিকার হইয়াছে। যথাসাধ্য তাঁহার কিছু কাজ করে সুখী হইলাম। কিছু ছিন্ন বস্ত্রাদি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ ক'রে দিলাম। সন্ধ্যায় বাড়ী আসিয়া একটি ধনী পরিবারের নিকট গিয়া ঐ অনাথ পরিবারের গল্প করায় তাঁহারাও কিছু বস্ত্রাদি দিলেন। তাহা লইয়া ফটকে আসিয়া দেখি গাড়ী নাই, সুতরাং হাঁটিয়াই বাড়ী আসিতে হইল। একবার মনে হইল, ধনী পরিবার যদি জানিতে পারেন, কি বলিবেন। কিন্তু অমনি মনে হইল, আমার তো এই কাজ। সেই স্ত্রীলোকটির একখানি লেপের জন্য দুইটি বন্ধুর বাটী গিয়াছিলাম, কিন্তু একজন গ্রাহ্য করিলেন না, অন্য ভগিনী একটি টাকা আনিয়া দিলেন। মনটা বড় গরম হইল। তখনই যেন ভিতর হইতে কে বলিল, ভিক্ষুকের আবার বিচার অভিমান কি? তখনই সে ভাব চলিয়া গেল। টাকাটি লইয়া বাটী আসিলাম; আসিয়া আহারে বসিয়াছি, একটি বন্ধু লেপের আর যাহা লাগিবে ততটুকু সাহায্য নিজেই করিলেন, আশ্চর্য্য হইলাম।"

এইরূপে রোগ, শোক, অর্থচিন্তা, কার্য্যভার ও ত্যাগের ক্লেশ বহন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলে। আপনি যে শুধু উঠিতেছিলে, তা নয়, আমাকেও উঠিবার সাহায্য করিতেছিলে। আমাকে ভালবাসিতে বটে, আসক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইত তাহাও সত্য, তথাপি স্বীকার করি, তোমার ভালবাসা অন্ধ ভালবাসা ছিল না। ৩০শে ডিসেম্বর আহার করিবার সময় আমার অহঙ্কার হইয়াছিল, তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলে। নির্জ্জনে এবং অত্যন্ত প্রিয় ভাষায় তুমি আমার অহঙ্কার দেখাইয়া দিলে। আমি পূর্ব্বে নিজের দোষ বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার ভালবাসার গুণে এ সংশোধন কার্য্যও অত্যন্ত মিষ্ট মনে হইল। ভালবাসা দোষ দেখিলে চুপ করিয়া থাকে না, মিষ্ট ভাষায় উপযুক্ত সময়ে দোষ ধরিয়া দিয়া প্রেমাস্পদের চরিত্র সংশোধন করিয়া উন্নতির সহায়তা করে। দোষকে তুমি কখনই উপেক্ষা করিতে না, এ বিষয়ে আমি সাক্ষী।

এ বৎসর খৃষ্টোৎসবের সময় ভগবান তোমার বিশ্বাস পরীক্ষার জন্য বিশেষ আয়োজন করিলেন। খৃষ্টোৎসবের ব্যয়ভার তুমিই বহন করিতে। কিন্তু এখন পরিবারে এতগুলি কন্যা থাকেন, তাই পূর্ব্বের মতন আর সব সময় হাতে টাকা থাকে না। বরং অনেক সময়, বিশেষতঃ মাস শেষের সময় বিশেষ টানাটানি হয়। এবার খৃষ্টোৎসবে কি হইল, তাহা তোমার দৈনিকে লেখা আছে।

"২৫শে ডিসেম্বর, খৃষ্টমাস, বাগানে উপাসনা। প্রায় ৫৪জন উপাসনায় উপস্থিত। তাহার ভিতর পাঁচ-ছয়টি বালক-বালিকা। এতগুলি লোক আহার করিবেন। আজ আর কিছু নাই আহারের। গত রজনীতে একবার মনে হইল কি হইবে? কিন্তু মার উপর নির্ভর করিয়া নিদ্রা গেলাম। সকালে ৭টা পর্য্যন্ত বিছানায়, শরীর অসুস্থ থাকায় কন্যারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইবে? বলিলাম, সকল মেয়ে-ছেলেদের নিকট ভিক্ষা কর। দু' পয়সা, আড়াই পয়সা, এইরূপে এক টাকা হইল। এই পয়সা দ্বারা চাউল ইত্যাদি খরিদ করিয়া যাত্রা করা গেল। সেখানে গিয়া দেখি, অনেক পরিবার হইতে পুরি, মিঠাই, রুটি, মুড়ি ইত্যাদি আসিয়াছে। লেবু কিছু লইয়াছিলাম, কিছু অন্যেরা আনিয়াছিলেন। এইরূপে খুব ভাল আহারাদি হইল। পায়েসও আসিয়াছিল। ৫৪জন আহার করিয়া কিছু চাউল বাঁচিল এবং ৪ জনের ভাতও বাঁচিল। ঈশার কথা মনে পড়িল, তিনি দুটি মাছ ও দুইখানি রুটিতে কেমন করিয়া এত লোককে খাওয়াইয়াছিলেন, আর বাঁচিয়া ছিল। ফলে বিশ্বাসই মূল। সন্ধ্যায় অবশিষ্ট যাহা ছিল সকলে আহার করিলেন। যিনি ভাণ্ডারী তিনি বলিলেন, কালিকার জন্য জল ও লবণ ভিন্ন কিছু নাই। বলিলাম, আজকের তো হইয়া গেল, কালকার বিষয় আজ আর ভাবিব না। কাল যেমন হয় হইবে, তাঁহারাও তাই বলিয়া বিদায় লইলেন। ঘরে আসিবামাত্র স্বামী মহাশয় বলিলেন, তোমার বিশ্বাসের পুরস্কার লও। এই বলিয়া ৫৲ টাকা দিলেন। পাইয়া অবাক হইলাম; কোথা হইতে আসিল, ভাবিয়া পাইলাম না। পরে বলিলেন, মোকামা হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল এই টাকা পাঠাইয়াছেন, এই ক্ষুদ্র পরিবারের জন্য। মার দয়া দেখিয়া সকলের বিশ্বাস শতগুণ বাড়িল। আজ প্রার্থনা ছিল, বিশ্বাসরূপ শিশুকে যেন যত্নে রক্ষা করিতে পারি।

[ক্রমশঃ।

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

২৩

সকালে বেরুলাম ফিনল্যাণ্ড উপসাগর যে দিকটায়। শহরতলী। জলা-জায়গা মাঝে মাঝে, সবুজ ক্ষেত, ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি। দূর থেকে ঐ যেন পাহাড় বলে মালুম হচ্ছে। উঁহু, পাহাড় নয়—খেলাধুলার ষ্টেডিয়াম, কিরভের নামে বানিয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। চোখ জুড়িয়ে গেল—আহা-হা, সীমাহীন সমুদ্র! ফিনল্যাণ্ড উপসাগর। সবুজ দ্বীপ একটা—দ্বীপটা এদের নয়, ফিনল্যাণ্ডের এলাকায়। বড় রকমের একটা লাফ দিলেই তবে তো ফিনল্যাণ্ডে গিয়ে পড়া যায়। আমার বাঁ-হাতের দিকে অনেকটা দূরে জাহাজ গাদাগাদি হয়ে ভাসছে। বন্দর। খাসা বেড়াবার জায়গা—ঘুরে ঘুরে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করছি। বসবার আসন থরে থরে নেমে গেছে ভিতর দিকে। সমতল কেন্দ্রভূমে খেলার জায়গা।

শহরে ফিরে মোটরগাড়ি ছেড়ে দিলাম। পায়ে না হাঁটলে মজা পাওয়া যায় না। এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ঘুরি, দোকানে ঢুকে এটা-ওটা সওদা করি। যেখানে ঢুকি, সাড়া পড়ে যায়। মুখে না বলুক, চাউনিতে ঠাহর পাই। খাবার কিনে খাচ্ছে বহু লোক পথে দাঁড়িয়ে—আমার দেশে হামেশাই যেমন দেখতে পান তাই দেখে এলাম, মানুষ সকল জায়গায় এক। সেই একদিন মস্কোয় দেখেছিলাম, গাড়িঘোড়া অগ্রাহ্য করে রাস্তা পার হয়ে মানুষ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। ব্যাপার কি—কোন সিনেমা-ষ্টার বেরিয়েছেন নাকি পথে। অতএব তুচ্ছ প্রাণ গাড়ির নিচে যায়ই যদি, কী করা যাবে! শুধু এ-দেশের মানুষকে মিছামিছি দোষেন আপনারা।

কেনাকাটায় কোট-পাণ্টলুনের বিশাল উদরগুলো ভর্তি। এ-রাস্তা ও-গলি ঘুরে ঘুরে হোটেলে ফিরলাম, বেশ দেরি হয়ে গেছে। নাকে মুখে লাঞ্চ গুঁজে তক্ষুণি আবার কেউ কেউ বেরুবেন এদেশের আদালতে কি ধরনের বিচারকর্ম হয় দেখবার জন্য।

কিছুদিন থেকে এক বিদেশি সাহেবকে দেখতে পাচ্ছি। মস্কোয় দেখেছি, তাসখন্দেও দেখেছি একবার। হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যেও নজরে পড়ে যাবে এমন বেঢপ লম্বা। গুল্মরাজ্যে এক তাল-বৃক্ষ। সেই ভদ্রলোক আস্তোরিয়ায় এসে উঠেছেন। আমাদের দেশ এবং বৃটিশ আমল হলে ভাবতাম পুলিশের স্পাই পিছু নিয়েছে। আমাদের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন ভদ্রলোক। তাকাতাকি এখন আর আসলের মধ্যে আনিনে। বিধাতাপুরুষ রূপ দিয়েছেন—কুচকুচে কালো রং, কালোবরণ চুল—অভাগ্য বর্ণহীন সাদা-চামড়ার দল দেখবেই তো তাকিয়ে তাকিয়ে। দেখে হিংসায় ফেটে মরবে।

লাউঞ্জে বসে ভদ্রলোক। হঠাৎ আজ কথা বলে উঠলেন, মাপ করবেন, আপনাকে এর আগে দেখেছি।

দুঃখিত, কিছুই আমি মনে করতে পারছিনে।

থাকেন কোথায় আপনি? কলকাতায়? তবে কলকাতায় দেখে থাকব।

আমি জানি ভাঁওতা এটা। আলাপ জমানোর কায়দা। তর্ক না করে মেনে নিতে হয়। অযাচিতভাবে আত্ম-পরিচয় দিচ্ছে: ওয়াশিংটনে থাকি আমি। ব্যবসায় আছে। কংগ্রেসের মেম্বার। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো নেশা-বিশেষ। আমায় মশায় কেউ নেমন্তন্ন করেনি, গাঁটের পয়সায় এসেছি, পয়সা খরচ করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

থাকবেন কতদিন?

থাকবার জো আছে? ছ'টা মাস এ-রাজ্যে থাকলে ফতুর হয়ে যাব, ব্যবসা লাটে উঠবে। পরের আতিথ্যে আছেন—টের পান না, কী সাংঘাতিক খরচ এদেশে। এক্সচেঞ্জের চড়া হার—এমনি কায়দা করে রেখেছে, বিদেশের কেউ যত টাকাপয়সা নিয়ে আসুক পলকে সব কর্পূর হয়ে উবে যাবে। মানেটা দাঁড়াচ্ছে, বিদেশিরা আসাযাওয়া করুক এরা সেটা চায় না।

আমরাও বুঝছি। অনেকেই আমরা ট্যাভেলারস-চেকে টাকা নিয়ে এসেছি, এটা-ওটা কিনে নিয়ে যাবো। কিন্তু দর শুনে উৎসাহ একেবারে হিম। একজোড়া জুতো দেড় হাজার রুবল—হোন না আপনি রাজা রাজবল্লভ, ও-জুতোর একটা পাটিও তো ট্যাঁকে সইবে না আপনার। অবশ্য রোজগার করলে পুষিয়ে যায়—রোজগারও হাজারের মাপের। একটা ছোটগল্পের হাজার রুবল দক্ষিণা। অত ঘোরাঘুরির মধ্যেও বক্তৃতাদির ব্যাপারে সহস্রাধিক রোজগার হয়েছিল, দরাজ হাতে সেই অর্থ ব্যয় করে এলাম। রূপকথায় সেই যে আছে, তোর বউ তোকে দিয়ে খাওয়ালাম এই আমার কলা!—সেই জিনিষ আর কি!

কার্ল মার্কস ফ্যাক্টরিতে গেলাম বিকাল বেলা। টিপটিপে বৃষ্টি—বছরের এই সময়টা লেনিনগ্রাদ মুখ পুড়িয়ে থাকে। জারের আমলের ফ্যাক্টরি—পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে। অনেকখানি জায়গা, অসংখ্য যন্ত্রপাতি। আগে খালি সুতার কাপড় হত, এখন রেয়ন তৈরির বিরাট ব্যবস্থা করেছে। নতুন কয়েকটা যন্ত্র বানিয়েছে এখানকার মিস্ত্রিরা—তার জন্য বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হয় তাদের!

* * * *

বিদায় লেনিনগ্রাদ! বিপ্লবের শতেক স্মৃতি যার সর্বত্র ছড়ানো। নিপীড়িত জনগণ নতুন আত্মবিশ্বাসে ফেটে পড়ল যেখানে। নতুন সমাজব্যবস্থার সর্বপ্রথম পত্তন। রাত ১১-৪০-এর ট্রেনে চেপে মস্কো ফিরছি। বিশেষ ট্রেন দিয়েছে। ইঞ্জিন জোরে ছোটায় না। স্প্রিঙের দরাজ ব্যবস্থায় ঝাঁকুনিও নেই। ট্রেনে যাচ্ছেন না তো—মনে হবে, কোন নবাব-বাদশার খুশমহলে আরামে গদিয়ান হয়ে আছেন। কাচের আঁটা জানলার বাইরে তাকিয়ে তখনই কেবল

মালুম হবে। আমাদের ইতরসাধারণের জন্যে তো এই—পিতার উপরেও পিতামহ আছেন। দলের নেতা-উপনেতারা যে কামরায় যাচ্ছেন, যেখানে ঢুকে মনে হবে ইন্দ্রলোকের খানিকটা কেটে এনে ইঞ্জিনে জুড়ে দিয়েছে। একটা কথা সবিনয়ে নিবেদন করি। সাম্যবাদের দেশ বটে, কিন্তু নেতা ও সাধারণের মধ্যে এঁরা দস্তুরমতো ফারাক রেখে চলেন। রেলের কামরা, হোটেলের ঘর এমন কি পথে-ঘাটে সাময়িক ব্যবস্থার মধ্যেও তফাৎটা তিলেকের তরে ভুলতে দেন না।

রেডিও শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকাল ঠিক আটটায় আবার রেডিও শুরু। কেমন করে থামানো যায়, রাতে কিছুতে ধরতে পারি নি। দিন মানে আধ-মিনিটের মধ্যে কায়দা পেয়ে গেলাম। ন'টা—দশটা। মস্কোয় পৌঁছতে আর পঞ্চাশ মিনিট কুয়াশায় চারিদিক ভরে আছে। দিনমানে রোদ হয়, এবম্প্রকার ধারণা ভুলে গেছি ইদানীং। জলা জায়গা অনেক দূর ব্যাপ্ত। বড় জঙ্গল—অজস্র ঝাউগাছ। মাঠ আসছে মাঝে মাঝে—চষা খেত। ক্ষেতের ধারে গ্রাম। সাদা ফুল যেন মুঠি মুঠি ছড়িয়ে দিয়েছে ক্ষেতের উপর। বরফ পড়ে আছে বোধ হয়। মুরগির দল খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছে। সবুজ তৃণভূমি আসে হঠাৎ ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে। হুশ-হুশ করে এক একটা ষ্টেশন পার হয়ে যাচ্ছি। প্লাটফরম বেশির ভাগ কাঠের উঁচু পাটাতনের উপর। অত্যন্ত নাবাল অঞ্চল, অতএব মালুম পাওয়া যাচ্ছে।

•

সেই হোটেল মেট্রোপোল। ঘর পালটে গেছে অনেকের, আমরা কপাল ক্রমে পুরানো ঘর পেয়ে গেলাম। নিতান্ত নইলে নয় এমনি দু-চারটে জিনিষ সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, বেশির ভাগ গাঁটরি-বাঁধা ছিল এখানে। গাঁটরি খুলে ছড়িয়ে আবার দিব্যি গৃহস্থালি জমিয়ে বসা গেল। কাল ৭ই নবেম্বর—সারা সোবিয়েত দেশ জুড়ে নবেম্বর-বিপ্লবের বার্ষিক উৎসব। আজকের দিনটুকু অবশ্য বৃথা কাটাচ্ছি না—বিকালবেলা সিনেমা, রাত্রে পুতুল-নাচ। উৎসবের জন্য চতুর্দিকে সাজ সাজ পড়ে গেছে, যাতায়াতের মুখে সমস্ত দেখা যাবে।

সপ্তাহে সপ্তাহে একরকম চটি বই বেরোয়—মস্কো সহরের চুয়াল্লিশটা থিয়েটার ও যাবতীয় সিনেমায় কবে কোন পালা হচ্ছে, ছাপা থাকে সেই বইয়ে। তাই থেকে বুঝে নেবেন; যে পালা দেখবার ইচ্ছা, যথাসময়ে সেখানে হাজিরা দিতে পারবেন। আমাদের নিয়ে হাজির করল, সে-বাড়ির একতলায় দোতলায় দুটো সিনেমা হল। নিচেরটা ছোটদের। পালা সেই মাত্র শেষ হয়েছে, হলের ভিতর দিয়ে চললাম। শিশুরা হাততালি দিয়ে ঘোরতর খাতির জানাচ্ছে।

সিনেমা ছবি চলে বটে রাশিয়ায়, তোড়জোড়ও বেশ, জনপ্রিয়তা কিন্তু থিয়েটারের মতন নয়। ছায়ায় মন ভরে না, জীবন্ত মানুষদল দেখতে চায় মানুষ। আমার অন্তত এই ধারণা। নীচে ক্রাস (creche) আছে বাচ্চাদের জন্য; নানান রকম খেলনা, খেলা-ধুলায় ভুলিয়ে রাখবার জন্য নার্স মোতায়েন আছে। এইখানে বাচ্চা রেখে মায়েরা ছবি দেখতে গিয়ে বসেন। পালা ভেঙেছে, ঘরে যাবেন এইবার—খেলা ছেড়ে ছেলে কিছুতে উঠবে না। কত রকমে মা লোভ দেখাচ্ছেন—বাড়িতে গিয়ে হেনো দেব তেনো দেব—বাচ্চা কানেও নেয় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই মজা দেখলাম ক্ষণকাল।

পুতুল-নাচ। আমেরিকায় সিনেমা-ছবি তোলার ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ। পুতুলের মুখে ভাববিকার নেই, কিন্তু তড়িঘড়ি অঙ্গ-চালনায় হুবহু জীবন্ত বানিয়ে তুলেছে। ছবি তুলবেন ডিরেক্টর; সেই ছবি চালান হয়ে যাবে ইউরোপে। রেডিও শুনে বিষয়টা তাঁর মাথায় এসে গেল। টেলিফোনে তলব দিচ্ছেন সহকারীদের। সেক্রেটারি মেয়েটা ঘুমুচ্ছিল—আলুথালু ভাবে ছুটে এসে টেলিফোন ধরল আধেক-বোজা চোখে। সেক্রেটারি খসখস করে নোট নিচ্ছে ডিরেক্টার যেমন-যেমন বলছেন। মেয়েটার চোখের পাতা ঘন ঘন ওঠে পড়ে—ওটা মুদ্রা দোষ, অথবা ব্যাধি। এর পরে লোক বাছাবাছি। নটনটীদের মাপজোপ হচ্ছে—ফিতে ধরে ডিরেক্টর পেট মাপছেন, বুক মাপছেন। নায়ক-নায়িকা বাছাই হয়ে গেল অবশেষে—নায়িকাকে খুদ মালিক মশায় সঙ্গে নিয়ে এসে সুপারিশ করলেন। আর এক কুৎসিত পুরুষ—ভিলেন সাজবে সে। এদিককার এক রকম হয়ে গেল। তিনটে মেয়ে একসঙ্গে খটাখট টাইপ করে যাচ্ছে—ডিরেক্টর বলে যাচ্ছেন। একজনকে বলছেন গল্প, একজনকে সংলাপ, আর একজনকে শট ডিভিসনের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। এক সঙ্গে সমস্ত। গল্পটার নাম 'কারমেন'—ক্রেমলিনকে চ্যাপটা চৌরস করে নাম দাঁড়াল।

স্যুটিং শুরু এবারে। নায়ক নায়িকাকে চুম্বন করবে কিছু লম্বা সময় নিয়ে। গাছ থেকে টুপ করে একটা ফুল ঝরে পড়বে, সেই সময়টা চুম্বনের ইতি। ফুল কখন পড়ে গেছে, ক্যামেরাম্যান ব্যস্ত হচ্ছে, এরা দুজন কিছুতে মুখ ছাড়বে না। ডিরেক্টরের হুমকিতে শেষটা ছাড়াছাড়ি হল তো নায়িকা আয়নায় দেখে ক্ষেপে আগুন। মুখ ইনসিওর-করা, হাসির বিস্তর দাম, চুম্বন করতে গিয়ে দাঁত বসিয়েছে সেই মহা মূল্যবান মুখের উপর।···নায়িকা গান গাইবে—কি পরিমাণ দূর থেকে হলে কত টাকা, আগেভাগে তারও রেট বেঁধে কন্ট্রাক্ট পাকা করা আছে। গরুর প্রয়োজন সিনের মধ্যে। হন্তদন্ত হয়ে খবর দিল, গরু পাওয়া যাচ্ছে না। তবে লাগাও মহিষ। মালিক এসে পড়ল এমনি সময়ে—ছকের কাগজগুলো পড়ছে। কিচ্ছু হয় নি, কিচ্ছু হয় নি—কম্যুনিষ্টের নিন্দেমন্দ গালিগালাজ আরও বেশী করে ঢোকাতে হবে। কালেকটিভ-ফারমে চাষবাস নয়, আসলে মিলিটারি ব্যাপারে। এমনি সব। মালিক কাগজপত্র দলা পাকিয়ে ছুড়ে দিল। যতদূর ছবি তোলা হয়েছে, সমস্ত বাতিল। গল্প গোড়া থেকে আবার বানাতে হবে।

পুতুল নাচ শেষ হলে যারা সব নাচাচ্ছিল, বাইরে এসে দাঁড়াল। পুতুল আমরা নেড়েচেড়ে দেখছি।

২৪

৭ নবেম্বর। বিপ্লবের স্মৃতি-উৎসব। এই বস্তু দেখবার জন্য আমরা পর্বত-মরু পার হয়ে এত আকাশ উড়ে এসেছি। লাল পতাকা আর কাস্তে-হাতুড়ির ছবিতে চারিদিক ঢেকে দিয়েছে। রাস্তার ধারে ছুটো হাত দেয়ালেও বোধ করি আজকের দিনে খালি পাবেন না।

রেড স্কোয়ারে অনুষ্ঠান। আমাদের হোটেল-মেট্রোপোল থেকে দু-পায়ের পথ। হামেশাই যাই ও দিকটায়, ক্রেমলিনের সামনে

দিয়ে চক্কোর মেরে আসি। আজকে সে পথ বন্ধ। শহরের যাবতীয় মানুষ ঐ জায়গায় জমায়েত হবে, বাইরে থেকেও বিস্তর এসেছেন—যত্র-তত্র হাঁটবার হুকুম নেই। গাড়ি তো চলবেই না।

খানাপিনা তাড়াতাড়ি সারা হল। দোভাষি সবগুলো এসে জমেছে। হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে—কোন পথে কি ভাবে, গিয়ে স্কোয়ারের কোনও অংশে ঠাঁই নেবে, সেই সব ঠিকঠাক করছে নিজেদের মধ্যে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে যাব আমি। নিচে অবশ্য আঁটোসাটো গরম কাপড় থাকবে। চীনের উৎসব-দিনে পিকিনে যেমনধারা পরে ছিলাম। দোভাষিদের মধ্যে মীরা সকলের মাতব্বর। সে আড় হয়ে পড়ল: না, কক্ষণো নয়। মস্কো কী জায়গা, জান না। এই হিমের মধ্যে ফাঁকা রাস্তায় তিন-চার ঘণ্টা দাঁড়ালে নিউমোনিয়া সঙ্গে সঙ্গে। সে দায়িত্ব কে নিতে যাবে?

হাঁটছি মস্ত বড় দল হয়ে। যেদিকে রেড-স্কোয়ার, তার ঠিক উল্টোমুখো নিয়ে চলল। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। রাজপথ ছেড়ে শেষটা গলিতে ঢোকাল। অনেকক্ষণ এমনি এ-গলি সে-গলি করে হঠাৎ এক সময় দেখি বেসিল-ক্যাথিড্রালের পিছন দিকে এসে পড়েছি। উৎসবের যাবতীয় মিছিল রেড-স্কোয়ার পার হয়ে এইখানে এসে ছড়িয়ে পড়বে।

লেনিন-মুসোলিয়ামের ডান দিকে ক্রেমলিনের দেয়াল ঘেঁসে গ্যালারি, সেইখানে আমাদের ঠাঁই। নানান দেশের বিস্তর মানুষ —রকমারি ভাষা ও বেশভূষা। সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে হবে। বসতে বাধা নেই, কিন্তু বসে পড়লে কিছু নজরে আসে না। রেড স্কোয়ারের ওপারে আমাদের ঠিক সামনাসামনি বিরাট অট্টালিকা—গুম, অর্থাৎ সর্ববস্তুর সরকারি দোকান। বেসিল-ক্যাথিড্রালের উপরে মোভি-ক্যামেরা বসিয়েছে—মিছিল ঐমুখো যাবে. ওখান থেকে ছবি উঠবে ভাল। সুপ্রাচীন মৃত্যুবেদী আজ ফুল ও পতাকায় সাজানো—ফুলশয্যার পালঙ্কের মতো ঝলমল করছে। লোকারণ্য। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, শব্দসাড়া নেই।—এই হাজার হাজার মানুষ ঠোঁটে যেন কুলুপ এঁটে দিয়েছে। কয়েক দল সৈন্য গোর্কি রোডের দিক দিয়ে এসে বিপ্লব-মিউজিয়ামের ওদিকটায় মার্চ করে চলে এল। তাদের পদ-দাপ ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে যায় ক্রমশ।

সময় হয়ে আসে। বসেছিলাম, উদগ্র হয়ে সকলে উঠে দাঁড়িয়েছি। ক'টি বাচ্চা ছেলেমেয়ে এদিকে-ওদিকে—আপেল আর চকোলেট আমাদের হাতে গুঁজে গুঁজে দিচ্ছে। ক্লিক-ক্লিক ফোটো নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করে, কোন দেশের মানুষ গো তোমরা? ক্রেমলিনের ঘড়িতে সাড়ে-ন'টা। স্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে বাজনা ওঠে কোন দিকে; আর উল্লাসের কণ্ঠ। ন'টা-পঞ্চান্ন। দূর প্রান্ত থেকে আওয়াজ ভেসে আসে—মানে বুঝি না, গম্ভীর তীব্র তীক্ষ্ণ এক ধ্বনি। সেই আওয়াজ সারবন্দি সৈন্য-পুলিশের মুখে মুখে লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গেল দূর-দূরান্তে।

ঠিক দশটা। কী আশ্চর্য, বাতাস উঠল এই সময়ে এক দমক, উপরে নিচে দূরে নিকটে পতপত করে নিশান উড়ল। লাখ লাখ লাল পাখী পাখনা ঝেড়ে উঠেছে যেন। একটা জিনিষ দেখছি। লেনিন-ষ্ট্যালিনের ছবি যত্রতত্র—মেলেনকভ তো এখানকার কর্তা (মনে রাখবেন, ১৯৫৪ অব্দ এখন), তাঁর ছবি দেখা যায় না কেন? অল্প কয়েক জায়গায় দিয়েছে। একলা নয়। ক্যাবিনেটের তাবৎ মন্ত্রীর ছবি একসঙ্গে। তাই জিজ্ঞাসা করি দোভাষিকে: লেনিন-ষ্ট্যালিন থাকলেন তো জলজ্যান্ত মেলেনকভ মানুষটার কি দোষ হল?

লেনিন-ষ্ট্যালিনের বিপ্লবে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ওঁরা তাই জাতীয় নেতা। ওঁদের পরে আর কেউ কখনো জাতীয় নেতা হবে না।

সাড়ে-দশটা ক্রেমলিনের ঘড়িতে। ব্যাণ্ড বেজে ওঠে। মিছিলের শুরু। সজ্জিত দু-খানা মোটরে কারা দু-জন সকলের আগে—মেলেনকভ নেই ওর মধ্যে। একটি হলেন প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন; অপর জন মুস্কালিয়েঙ্কো, মস্কো বিভাগীয় সৈন্যদলের কম্যাণ্ডার ইন-চীফ। দলের পর দল সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ি ঘুরে ঘুরে যায় তাদের কাছে। গিয়ে অভিনন্দন জানায়। সৈন্যরাও আকাশ ফাটিয়ে পাল্টা জবাব দিচ্ছে।

নেতারা তারপর মুসোলিয়ামের ছাতে দাঁড়ালেন। বক্তৃতা হবে। সামনে দিয়ে মিছিল যাবে, সালাম নেবেন ওখান থেকে। এসে অবধি দেখছি, মুসোলিয়াম ঝাড়পোছ হচ্ছে, দেয়ালে নতুন করে রং ধরাচ্ছে, কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেয় না। আমাদেরও তাই লেনিনকে 'পুষ্পার্ঘ্য দেওয়া হয়নি এত দিনের মধ্যে। সমস্ত আজকের এই দিনটার জন্য। দুই দল ব্যাণ্ড মার্চ করে চলল রেড-স্কোয়ারের দু'পাশ দিয়ে, মচমচ মচমচ জুতো বাজিয়ে বিপ্লব-মিউজিয়ামের ওধারে গিয়ে দাঁড়াল। সারা মাঠ নিস্তব্ধ ছিল, কলরোল ছাপিয়ে পড়ছে এখন।

অক্টোবর-বিপ্লবের সাইত্রিশ বছর পুরল। সাততামামি বক্তৃতা করছেন—কে উনি? মেলেনকভ তো নয়। দেখা যাচ্ছে, প্রধান-মন্ত্রীকে এবার পাত্তা দিচ্ছে না। কৃষিকর্মীদের জয়-জয়কার। বিস্তর পতিত জায়গা উদ্ধার হয়েছে, ধারণাতীত ফসল। কাজাক-গণতন্ত্র সকলের সেরা ফসল ফলিয়েছে এবার। বৈজ্ঞানিকরাও খুব কাজ করেছেন। জল ও স্থল সৈন্য অনেক বাড়ানো হয়েছে। লড়াইয়ের সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি। দেশে দেশে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। গণতন্ত্রের শক্তি অনেক বেড়েছে এই এক বছরে। এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকা থেকে অনেকজন এসেছেন। এদেশ থেকেও অনেক গিয়েছে বাইরে। বিদেশি অতিথিরা জেনেবুঝে গিয়েছেন, সত্যিকার শান্তিকামী আমরা। কিন্তু বাইরের অনেকে লড়াইয়ের পায়তারা ভাঁজছে, তাদের সামালবার জন্য প্রতিরক্ষার কড়া ব্যবস্থা করেছি। দেশব্যাপ্ত এই শান্তির পরিবেশে যে আঘাত হানবে, তার রক্ষা থাকবে না। সেজন্যেও তৈরি আমরা।

বক্তৃতা থামতেই বজ্রনির্ঘোষ। এক সঙ্গে অনেক কামান গর্জে উঠল ক্রেমলিনের ভিতর দিকে। কামান দেগে বক্তার অভিনন্দন। রেড-স্কোয়ারের চতুর্দিকে বড় বড় বাড়ি—কামানের আওয়াজ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার।

প্যারেড এবারে। গুমের ওদিককার জনতা পদাতিক-বাহিনী আড়াল করে ফেলেছে। চলছে তো চলছেই। বিপ্লব-মিউজিয়ামের পিছনে এরা সব জমায়েত হয়ে আছে—মানুষের মহাসমুদ্র, এতদূর আগে ধারণায় আসেনি। খালি-হাতের মিছিল। এদের পরে তলোয়ারধারীরা। তারপরে এক পল্টন এলো, বন্দুক কাঁধে ফেলে তারা চলেছে। পরের দলের বন্দুক আকাশমুখো তুলে ধরা। মেসিনগান উঁচিয়ে আসে এবার। যান্ত্রিক বাহিনী—বিচিত্র চেহারার

LG/P/21 B

সিলোন রেডিয়ো থেকে 'ল্যাক্‌টোজেন' হিন্দী প্রোগ্রামে **বীণা রায়ের** কথা শুনুন।

রবিবার···রাত্রি ৭টা-৪৫ মিঃ থেকে রাত্রি ৮টা এবং বৃহস্পতিবার···রাত্রি ৮টা-৩০ মিঃ থেকে রাত্রি ৮টা-৪৫ মিঃ।

৪১ মিটার ব্যাণ্ডে

21

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন

নেসল্‌স প্রডাক্টস (ইণ্ডিয়া) লিঃ

পোষ্ট বক্স নং ৩৯৬	পোষ্ট বক্স নং ৩১৫	পোষ্ট বক্স নং ১৮০
কলিকাতা	বোম্বে	মাদ্রাজ

রাক্ষুসে গাড়িগুলো গর্জন করে চলেছে, দুনিয়া নখে ছিঁড়বে যেন। বুকের মধ্যে গুরগুর করে, কানে তালা লাগে। প্যারাট্রুপ— প্যারাসুট নিয়ে চলেছে ট্রাকে। বিমানধ্বংসী কামানের বাহিনী— লরী-বোঝাই সৈন্য, সেই লরী পিছনে একটা করে কামান টেনে নিয়ে চলেছে। ভারী কামান; হালকা কামান—রকমারি কামানের মিছিল। মাইন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে লাইনবন্দি ট্রাকের উপর। ট্যাঙ্ক চলেছে—গণতিতে আসে না। ভীষণ আওয়াজ।—পাথরে বাঁধানো রেড-স্কোয়ার গুঁড়ো গুঁড়ো করবে নাকি?

ব্যাণ্ড-পার্টি মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ে বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে যাচ্ছে। কাসিয়া-কোপ্তার মাঝে চাটনিটা ঘুরিয়ে নেবার মতন।

পৌনে এগারো। মিলিটারি প্যারেড চুকল এতক্ষণে। পতাকাবাহী দল আসে নীল পোশাকে। ষোল গণতন্ত্রের ষোলটা আলাদা পতাকা সার দিয়ে আসছে। নীল পোশাকে তরুণ-তরুণীরা— তাদের পতাকায় নেতাদের ছবি। সারা দেশ জুড়ে শত সহস্র উদ্যোগ—সেই সব দলের লোক আসেও ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে। রামধনুর তো সাতটা রং—আজকের উৎসবে ঝলমলে কত রঙের বাহার, তার কোন লেখাজোখা নেই।

জনসাধারণের মিছিল। মাথার উপরে পতাকা। একটু উপর থেকে দেখছি তো—যেদিকে তাকাই, ঝিলমিল পতাকা উড়ছে। আর ফুল। সত্যিকার ফুল নয়—যা দেখেছিলাম পিকিনের উৎসবে, ঠিক দু-বছর আগে। সত্যি ফুল ক'টাই বা ফোটে এই হাড়-কাঁপানো শীতরাজ্যে! দেদার কাগজের ফুল। দলছাড়া কয়েকটা মেয়ে এদিকে এসে বিদেশি আমাদের অভিনন্দন দিয়ে যায়। আকাশ-ফাটানো উল্লাসধ্বনি। ফুল দিয়ে কাস্তে-হাতুড়ি বানিয়েছে, বানিয়েছে ক্রেমলিন-চূড়ার তারা। এ ফুল সত্যিকারের। কাগজের অতিকায় কলসি। মার্কস ও এঙ্গেলসের দু-তিন মানুষ আকারের ছবি। ছবি আর প্লাকার্ডের মিছিল—কত কি লেখা তুলে ধরে চলেছে, মূর্খ মানুষ পড়তে পারিনে। আনন্দ-সমুদ্রে তুফান উঠেছে। কয়েকটা বাচ্চা বাপ-দাদার কাঁধে চেপে মিছিল বয়ে চলেছে। ফুলের মতো চেহারা, মুঠিভরা ফুল—মিষ্টি রিনরিনে গলায় জয়কার দিয়ে যাচ্ছে তারা।

পিছনে চলে যাই, আরও উঁচুতে উঠে সারা মিছিল ভাল করে দেখব। আনন্দোজ্জ্বল জনতরঙ্গ অবিরাম বয়ে যাচ্ছে— শেষ নেই, সীমা নেই। ফাঁকা রাস্তা বয়ে এসেছিলাম, পুলিশে আটকে রেখেছিল, মানুষ দেখে দেখে পথ করে দিচ্ছিল। স্তব্ধ গাম্ভীর্য চারিদিকে। লক্ষ ধারা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বেরিয়ে পড়ল। লাল রঙের বিশাল বাড়ি বিপ্লব-মিউজিয়াম—তারই এদিক-সেদিক থেকে বেরিয়ে আসছে। কুসুমগুল্ম ও সবুজ ঘাসে ভরা একটুকু মাঠ ঐ। সারা সোবিয়েত দেশের সব চেয়ে মূল্যবান ভূমি। কত জনে নিদ্রাচ্ছন্ন ওর নিচে—বিপ্লবের বলি, নাম জানা নেই, গুণতি করেও রাখেনি ক'জন ছিল তারা। আর শুয়ে আছেন মুসোলিয়ামের পাতালকক্ষে কাচের আবরণের নিচে লেনিন ও স্ট্যালিন। শুনতে পাচ্ছেন তাঁরা বাইরের এই কলরোল?

ফিরে আসছি। রেডিও'র একজন পিছু নিয়েছেন: লেখক মানুষ আপনি—এই উৎসবের ব্যাপার রেডিও-য় আজ বলতে হবে। বাংলায় বলবেন, আপনার বাংলাদেশের মানুষ শুনবে।

ভালো রে ভালো! শহর জুড়ে দেওয়ালি, বাজিতে বাজিতে আকাশে আগুন ধরিয়ে দেবে, মস্কোর একটা মানুষ আজ সন্ধ্যায় ঘরে থাকবে না। আমি সেই সময়টা বন্ধ ঘরের মধ্যে মাইকের সামনে ভ্যানর-ভ্যানর করব? ও সব হবে না মশায়! তা ছাড়া লিখে নেবারই বা সময় কোথা?—কাল। ভোরে উঠে লিখে ফেলব; রেকর্ড করে আসব তার পরে এক সময় গিয়ে।

দো-ভাষিণী মীরাও সায় দেয়: কালকের বন্দোবস্ত করুন। সন্ধ্যাবেলা এঁরা দেখে শুনে বেড়াবেন। বলসই থিয়েটারে একটা ভাল পালা আছে—'ঝড়ের আলো'। টিকিট করা হয়েছে।

বেতার-ভাষণ—মস্কো, ৭ নবেম্বর

সাতই নবেম্বর—মানুষের ইতিহাসে পরম স্মরণীয় সোবিয়েত-বিপ্লবের এই দিনটি। কোটি কোটি নিষ্পিষ্ট মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াল। নতুন জগৎ গড়ে তুলবে তারা—সুখের জগৎ, শান্তির জগৎ।

এদেশে পা দিয়ে অবধি দেখতে পাচ্ছি, এই মহা-মহোৎসবের জন্য সকলে দিন গুণছে। সোবিয়েত-রাষ্ট্রের নানান অঞ্চলে চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছি—যেখানে যাই, আগামী উৎসবের তোড়জোড়। মানুষ হেসে নেচে তাদের সর্বোত্তম প্রাপ্তি দেশের সামনে জাহির করবে, তারই সর্বব্যাপ্ত আয়োজন।

নতুন রঙ ধরাচ্ছে বাড়িতে বাড়িতে, আলো আর পতাকা দিয়ে সাজাচ্ছে। ৬ই রাত্রে সারা মস্কো জুড়ে আলোর প্লাবন। ঘুরে ঘুরে এপথ-ওপথ হয়ে বেড়াচ্ছি। আট-শ বছরের সুপ্রাচীন নগরীর বুকের উপর বড় বড় সড়ক, আকাশচুম্বী প্রাসাদ। প্রবীণ সংস্কৃতি আর নবীন জীবনোল্লাস গলাগলি হয়ে আছে এখানে। এই রাত্রে বিচিত্র আলোর মালা পরে ভুবনমোহন রূপ ধরেছে মস্কো।

৭ই সকালবেলা কনকনে শীতের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম আমরা ভারতীয় দল। রেড স্কোয়ার আমাদের হোটেল মেট্রোপোলের অতি নিকটে। পায়চারি করতে করতে সকালবেলা অথবা সন্ধ্যার পর কতদিন লেনিন-স্তালিনের সমাধিভবনের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, আজকে কিন্তু চললাম একেবারে উল্টোদিকে। পথে মানুষজন সামান্য—কর্মব্যস্ত জনাকীর্ণ পথ খা-খা করছে আজ। পুলিশের দল ব্যূহ রচনা করে আছে মাঝে মাঝে। এমনি অনেক ব্যূহ পার হয়ে হাজির হলাম ক্রেমলিনের সামনে সমাধি-ভবনের ডানদিকের গ্যালারিতে। আমাদের জায়গা এখানে, এখান থেকে উৎসব দেখব।

উৎসব দশটায় শুরু। ক্রেমলিনের বড়-ঘড়িতে সাড়ে ন'টা— আধ ঘণ্টা বাকি এখনো। চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। রেড-স্কোয়ারের এক প্রান্তে সুপ্রাচীন বেসিল গির্জা, অন্য প্রান্তে ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের লাল বাড়ি। আর সামনে স্কোয়ারের ওপারে গুম অর্থাৎ সর্বদ্রব্য-বিপণির সুবিশাল প্রাসাদ। বেসিল গির্জার পাশে পুরানো গোলাকার বেদী—সেকালে রাজাজ্ঞায় নৃশংস ভাবে হাত-পা-গলা কেটে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত এর উপরে। সেই বেদী ঘিরে ফুল আর পতাকায় অপরূপ সাজিয়েছে। লাল পতাকা বাতাসে উড়ছে—অগ্নিশিখার মতো দেখাচ্ছে আমাদের এখান থেকে। গুমের গায়েও অমনি শত শত পতাকা। মোভি-ক্যামেরা সাজিয়েছে বেসিল গির্জা গুম আর মিউজিয়ামের উপরে। তিন দিক দিয়ে আক্রমণ—বিপুল এই উৎসব-সমারোহের যতখানি ধরে রাখা যায়।

গুমের লাগোয়া ওপারের ফুটপাথেও অগণ্য দর্শক। তাদের আড়াল করে সৈন্যবাহিনী ছবির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে রেড-স্কোয়ারের প্রান্তে। ব্যাণ্ড-বাহিনীর সোনার বরণ বাজনাগুলো ঝিকমিক করছে। একেবারে সামনের সারিতে দাঁড়িয়েছি, বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা যেখানে। বিষম দানশীল হয়ে পড়েছে ছেলেমেয়েগুলো—বাড়ির লোকে আপেল-টফি-চকোলেট দিয়েছে খাওয়ার জন্যে, সমস্ত নিঃশেষে দিয়ে দিচ্ছে আমাদের। না নিলে শুনবে না—রাগ করে, জবরদস্তি করে। অগত্যা হাত পেতে নিয়ে, আবার ফাঁকমতো তাদের পকেটে ফেলে দিচ্ছি। টের পেয়ে পকেট চেপে সামাল হয়ে গেল। তখন আবার নতুন কায়দা খুঁজি। এই লুকোচুরি খেলা চলছে আমাদের। ক্লিক-ক্লিক ফোটো তুলছে এদিক-ওদিকে। কামানের মতো দুটো বড় মোভিও আক্রমণ করতে ধেয়ে এসেছে এতদূর অবধি।

ন'টা পঞ্চান্ন। ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের দিক থেকে কী-এক শব্দ। সেই শব্দ সরলরেখার গতিতে সারবন্দি পুলিস ও সৈন্যদলের মুখে মুখে ছুটে বেসিল গির্জা ছাড়িয়ে আরো দূর প্রান্তে মিলিয়ে গেল। প্রস্তুত সকলে। দশটা বাজল ক্রেমলিনের ঘড়িতে। নেতারা সমাধি-ভবনের অলিন্দে দাঁড়িয়েছেন। ব্যাণ্ড বেজে উঠল। প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন আর মস্কো-বিভাগের সেনাপতি মুস্কালিয়ানকো দুই মোটরে সৈন্যবাহিনীর সামনে ঝড়ের বেগে অভিনন্দন দিয়ে চলেছেন। তারা প্রতি-অভিনন্দন জানাল। চারিদিক নিঃশব্দ ছিল, আনন্দ উত্তাল হল এক মুহূর্তে। দুই দল ব্যাণ্ড এগিয়ে এল দু-দিক থেকে। বাজাচ্ছে তারা সমাধি-ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে। বিপুল আনন্দ-কলরব—আকাশ ফেটে যায় বুঝি বা!

চুপ! বুলগানিন সম্ভাষণ করছেন সবজনকে। দেশজোড়া বিপুল শিল্প-প্রগতি ও কৃষি-সাফল্য—তার পরিচয় দিলেন। বিস্তর পতিত জমি উদ্ধার হয়েছে। রাশিয়া আর কাজাকিস্তান এই দুই গণতন্ত্র নির্ধারিত সময়ের আগেই লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিকদের বিপুল কর্মিষ্ঠতা। স্থল, জল ও আকাশে সৈন্যদল আধুনিক যন্ত্রপাতিতে শক্তিমান। সোবিয়েত জনগণ অসীম পরিশ্রমে দেশের সর্বত্র ঐশ্বর্য ও আনন্দ বহন করে এনেছে। গণতন্ত্রের শক্তি বেড়েছে পৃথিবীতে। শান্তির প্রচেষ্টা বহু ব্যাপক হচ্ছে। সাংস্কৃতিক যোগাযোগ চলেছে দেশে দেশে। এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার নানা ক্ষেত্রের জ্ঞানী-গুণীরা দলে দলে এসে সোবিয়েত দেশের পরিচয় নিয়ে যাচ্ছেন। এদেশের অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়ে ভিন্ন দেশে যাচ্ছেন। বিদেশের প্রতিনিধিরা নিঃসংশয়ে বুঝে যাচ্ছেন, সোবিয়েতের মানুষ একান্ত শান্তিকামী। কিন্তু লড়াইবাজও আছে দুনিয়ায়। তারা চক্রান্ত করছে; তাই প্রতিরোধ-ব্যবস্থা আমরা দৃঢ়তর করেছি। যাতে শান্তির পরিবেশ কেউ ক্ষুন্ন করতে না পারে···

ভাষণ শেষ হলে ক্রেমলিন থেকে কামান-নির্ঘোষ। তার যেন শেষ নেই, সীমা নেই। প্রতি নির্ঘোষে জনতা প্রবল চিৎকারে উল্লাস জানাচ্ছে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল গির্জার ওদিকটা।

তার পরে সৈন্যবাহিনীর মিছিল—খালি-হাতের সৈন্য, তরোয়ালধারী, বন্দুক কাঁধে ঠেশান দেওয়া, আকাশমুখো বন্দুক, সামনের দিকে উদ্যত বন্দুক—। এমনি চলেছে দলে দলে।

যান্ত্রিকবাহিনী মোটরগাড়িতে। মেশিন-গান দিয়ে সজ্জিত মোটর, বিমান-ধ্বংসী কামান মোটরে টেনে নিয়ে চলেছে। সেল নিয়ে যাচ্ছে, মর্টার নিয়ে যাচ্ছে। ভারী কামান, ভারী বিমান-ধ্বংসী কামান, ক্যাটারপিলার বিমান-ধ্বংসী কামান, প্যারাশুট-বাহিনী—আওয়াজে কাঁপছে চারিদিক। দেখতে আনন্দ লাগে, আতঙ্ক লাগে, বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

রণবাহিনীর মিছিল ক্রমশ বেসিল গির্জা পার হয়ে গেল। একটু স্তব্ধতা। বাতাস প্রবল হয়েছে ইতিমধ্যে। পতপত আওয়াজ করে পতাকা দুলছে গুমের শীর্ষে। বহু সহস্র নবীন প্রত্যাশা কেন্দ্রিত হয়ে যেন মর্মরিত ঊর্ধ্ব আকাশে।

তারপর খেলোয়াড়ের দল। সামনে বড় বড় পতাকায় মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্তালিনের ছবি। তারপরে সোবিয়েত নায়কদের। মাও-সে-তুঙের ছবিও দেখছি। সবুজ, নীল, বেগুনি, খয়েরি—কত রঙের পোশাক। ঝলমল করছে চোখের সামনে, ঝিলিক দিয়ে চলে যাচ্ছে যেন সোবিয়েতের প্রস্ফুট যৌবনশক্তি।

জন-সাধারণের মিছিল তারপরে। সেই জন-সমুদ্রের তুলনা দেব, এমন ভাষা খুঁজে পাই না। পতাকায় সমুদ্র। হাতে ফুল প্রায় সকলের—কাগজের ফুল, নানা রঙের। ফুল নেড়ে আমাদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছে। কত দেশের মানুষ এক হয়ে মিশেছি আমরা। আমি ভারতের, ডানদিকে চীনা এক মেয়ে, পিছনে পোলিশ বৃদ্ধ।··· নিষ্পলক বিমুগ্ধ চোখে অসংখ্য মানবের এই বিচিত্র আনন্দলীলা দেখছি। সমাধি-ভবনের অলিন্দে স্থিরমূর্তি নায়কেরা। আর ভিতরে অনন্ত নিদ্রায় নিযুপ্ত লেনিন ও স্তালিন। ফুল দিয়ে বানিয়েছে প্রকাণ্ড কাস্তে-হাতুড়ি, ফুলের তৈরি ক্রেমলিনের তারা। বাচ্চা কাঁধে তুলে মিছিলে বয়ে চলেছে, বাচ্চাদের হাতেও ফুল। ফুলে ফুলে চারিদিক পরিব্যাপ্ত। এই হাজার হাজার মানুষ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে আর এক দিনের রক্ত-পরিপ্লাবিত আত্মদানের পুণ্যে ভাস্বর এই রেড-স্কোয়ারে।

জন-স্রোতের অন্ত নেই। সীমাহীন উল্লাস। একবার পিছনে গিয়ে উঁচু জায়গার উপর উঠে দেখলাম। অশ্রান্ত সমুদ্র বয়ে চলেছে—তারই মাথায় মাথায় জাহাজের চূড়ার মতো অসংখ্য পতাকা। আর দেখলাম, ব্যবস্থা বটে! একেবারে ফাঁকা রাস্তা দিয়েই তো এসে পৌঁচেছি—দশটা বাজবার আগ পর্যন্ত এতটুকু শব্দ ছিল না কোন দিকে। কোন নিভৃত কন্দরে এত আনন্দ লুকিয়ে রেখেছিল—জীবন-কল্লোল সহসা নিযুপ্তি ভেঙে বিপুল প্রবাহে দশদিক ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

ফিরে চলেছি হোটেলে। এবার ফাঁকা পথ নয়। রাস্তা-গলি ছাপিয়ে শতধারে ছুটেছে আনন্দ। হাতে ফুল গুঁজে দিয়ে যাচ্ছে, সেকহ্যাণ্ড করে যাচ্ছে কত ছেলে-বুড়ো পুরুষ-মেয়ে, কত চীনা কোরীয় আরবী জর্মন মানুষ! উপহার-পাওয়া ফুলে দু-হাত ভরতি। আমরা যাকে পাচ্ছি, সেই ফুল বিলোতে বিলোতে চলেছি। গান গাইতে গাইতে চলেছে দলে দলে, কাছে এসে আলাপ জমানোর চেষ্টা করছে। নতুন নতুন মিছিলের দল এখনও চলেছে বড় রাস্তা দিয়ে। অপরাহ্ণ গড়িয়ে আসে, উল্লাস-প্রবাহ চলেছে তবু অবিরাম।

চব্বিশ বছর আগে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এদেশে এসে বলেছিলেন, 'না এলে এজন্মের তীর্থদর্শন অপূর্ণ থাকত।' বহু মানবের আনন্দের পবিত্র তীর্থ সলিলে অবগাহন করে আজকে বাংলা দেশের সাহিত্যিক আমি পরিতৃপ্ত হলাম।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী আর্ভেরএর দিনপঞ্জী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তরু দত্ত

অফিসারটি বললেন, "মাদমোয়াজেল, ভুল হলে ত বর্তে যেতাম ; কিন্তু অস্বীকার করবার আর পথ নেই, জমিদার তাঁর ভাইকে খুন করেছেন।"

"ভাইকে খুন করেছেন?" আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। জমিদারের দিকে তাকালাম ; ওর বিস্ফারিত চোখ দুটি খাবার ঘরের টেবিলের ওপর নিবদ্ধ। নাক দারুণ ফুলে উঠেছে, ঠোঁটে কঠিন নির্মমতা—কি মর্মান্তিক যন্ত্রণায় ও জ্বলে মরছে আমি স্পষ্ট আঁচ করতে পারলাম। তবু অফিসারকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এর মধ্যে নির্ঘাত কোনও ভুল আছে।

"দয়া করে এদিকে এক বার আসবেন?" খাবার ঘরের দরজা খুলে উনি আমায় ডাকলেন। গেলাম। উনি ভেতরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। এ কী? উঃ যা চোখে পড়ল, জীবনে কখনো ভুলব না। গাস্ত র দেহটা টেবিলের ওপর শোয়ান। ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক করা ; কাচের মত স্বচ্ছ চোখ দু'টি অস্বাভাবিক ভাবে যেন তাকিয়ে আছে। জামা-কাপড় কালো রক্তে ভরা ; আর ডান দিকের বুকটা গুলীতে ছ্যাঁদা হয়ে গেছে!

"এ কি সত্যিই ওর ভাইয়ের কীর্তি?" অস্ফুট স্বরে আমি বললাম।

"আজ্ঞে হ্যাঁ মাদমোয়াজেল!"

—"ঠিক জানেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ মাদমোয়াজেল ; জমিদার নিজে এসে আমাদের হাতে ধরা দেন যখন আমরা টহল দিচ্ছিলাম।" সখেদে উনি জানালেন।

দরজা খুলে দ্যানোয়ার কাছে গেলাম। ওর হাতে হাত রাখলাম : চোখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। হায় রে! কি পরিবর্তনটাই না ঘটে গেছে! ডাগর দু'টি চোখে যেন আগুন ছুটছে। দুই রগের শিরা ফুলে দপ-দপ করছে।

"দ্যানোয়া," আমি নীচু গলায় ডাকলাম, "তোমার শরীর খারাপ, চল, যাবে আমার সঙ্গে?"

অদ্ভুত ফল ফলল আমার কথায়। চট করে ও ফিরে দাঁড়াল ; দৃষ্টি খানিক কোমল হয়ে এল ; এক ঝলক হাসি দেখা দিল। আমার বুক যেন ভেঙে চৌচির হয়ে গেল ; মা গো, এত যন্ত্রণা!

"তোমার সঙ্গে? হাজার বার যাব, এখুনি যাব।" ও জবাব দিল। তার পর ওর নজর পড়ল শেকল-বাঁধা হাতের দিকে। কেমন যেন উদাস অসহায় দৃষ্টিতে ও তাকাতে লাগল। ভয় পেলে শিশুরা যেমন করে, সেই ভাবে ও আর্তনাদ করে উঠল।

"মার্গরিৎ, মার্গরিৎ, এ কী?"

ওকে বুকে করে নিয়ে আমি ওর সঙ্গে পাশের ঘরে গেলাম। নীরবে আমার কথামত ও চলতে লাগল। দরজাটা আমি বন্ধ করে দিলাম। দুই হাতে মাথা চেপে ধরে ও একটা সোফায় শুয়ে পড়ল। ওর পাশে বসে ওর দিকে চেয়ে রইলাম আমি। হায় প্রিয়! কত তোমায় ভালবাসি তুমি জান না। আমার হাতে তুলে নিলাম ওর হাত। সারা গারে যেন জ্বর বয়ে যাচ্ছে। দারুণ গরম। আমি চুপ করে রইলাম।—এমন সময় কঁতেসের মিষ্টি আহ্বান শুনলাম।

"কি হল রে? কই, আমার বাছারা কই?"

হুড়মুড় করে দ্যানোয়া উঠে বসল। দরজার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে ও যেন কান পেতে কি শুনতে লাগল।

"মা মা গো!" ও নিজের মনেই আওড়াতে লাগল।

খাবার ঘরের দরজা খুলল কে ; তার পরই বুকফাটা এক চিৎকার শুনে দ্যানোয়া হকচকিয়ে গেল। আবার শোনা গেল মহা আতঙ্কে ভরা সেই আর্তনাদ, "ওরে গাস্ত, বাবা, বাছা রে আমার!"

খানিকক্ষণ কান্না আর ফিসফাস শব্দের দারুণ রোল উঠল ; তার পর সব থেমে গেল হঠাৎ। উঠে গেলাম ; ওই কান্নার ভয়ে সজোরে চোখ দুটি বন্ধ করে ছিল দ্যানোয়া ; আমি নড়তেই ও শিউরে উঠল। আবার নীরবে বসে রইল। আমি বেরিয়ে গেলাম। কঁতেস আমার দিকে ছুটে এলেন "মার্গরিৎ, মা, এ আমার কি হল মা?" অদম্য কান্নায় উনি ভেঙে পড়লেন।

"চুপ, চুপ!" আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, "পাশের ঘরেই ও রয়েছে ; অবস্থা উদ্বেগজনক! আপনাকে ওর একান্ত প্রয়োজন!"

ঘরে ঢুকে উনি দু'হাতে আঁকড়ে ধরলেন জীবিত পুত্রকে। আমি লোকজন সমেত অফিসারকে চলে যেতে আদেশ দিলাম ; ঘরে গিয়ে দেখি উনি কাঁদছেন ; এত হট্টগোলের কোন অর্থই দ্যানোয়া বুঝতে পারছে না। অবাক-বিস্ময়ে মূঢ়ের মত তাকিয়ে আছে মায়ের দিকে। তিন তলায় কঁতেসের ঘরে মা-ছেলেকে নিয়ে গেলাম। ওখানেই ওঁদের রেখে চলে আসছিলাম ; কঁতেস আমার হাত ছাড়লেন না।

"যাস নে!" উনি বললেন। বসে পড়লাম আমি। "দ্যানোয়া, এ তুই কি করলি বাপ? কেন এমন করলি দ্যানোয়া?" ওর আচ্ছন্ন মুখের দিকে চেয়ে উনি প্রশ্ন করলেন। সবিস্ময়ে ও তাকাল, তার পর বিরক্তির সুরে অনুরোধ করল, "মা-মণি, বড় ঘুম ; খুলে দে না মাথার এই জ্বালা!"

ওর মাথা উনি বুকে টেনে নিলেন। দ্যানোয়া চোখ বুঁজল। কপালে হাত রেখে ও স্বগতোক্তি করল, "উঃ মা, বড় জ্বলছে।"

খুঁটিয়ে সব কথা ওকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন ওর মা।

আমি বাধা দিলাম। ডাক্তার ডাকতে পাঠালাম। মঁসিয়্য শাঁতো অবিলম্বে এসে পড়লেন। ওঁর পেছন পেছন আমি বৈঠকখানায় গেলাম। আমার বর্ণনা উনি খুব মন দিয়ে শুনলেন। জবান শেষ হলে বললেন, "শুনে মনে হচ্ছে উন্মাদ অবস্থায়ই এ-কাজ ও করেছে। দুর্ঘটনার কারণ কিছু জান? পূর্বাভাস?"

"না; নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব কোন দিনই ওদের ছিল না। দু'জনাই দু'জনকে খুব ভালবাসত।"

"ঝগড়া-ঝাঁটি কিছু হয়েছিল?"

"না, তবে গত মাস থেকে জমিদারের হাব-ভাবে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম; কেউ সেদিকে বিশেষ নজর দেয় নি।"

করুণা ও স্নেহমিশ্রিত নয়নে উনি আমার দিকে তাকালেন।

"তোমার বাবার কাছে খবর দিয়েছ?"

"আমি দিই নি, তবে এতক্ষণে ওঁর কানে কথাটা উঠেছে নিশ্চয়।"

অল্পক্ষণ চুপ করে উনি জানতে চাইলেন, "আচ্ছা, জমিদারকে কি একবার দেখতে পারি? ওর অবস্থাটা ঠিক মত জানা দরকার; মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলেই এ-কাজ ও করেছে যদি প্রমাণ করা যায়, বিচারের সময় তবে অনেক সুবিধে হবে।"

ওঁর এ-কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম কি লাঞ্ছনাটা ওর কপালে লেখা আছে; ওকেই যে আমি সঁপেছিলাম আমার হৃদয়, মন! ওকে আমি অন্তরের গভীরতম অনুভূতি দিয়ে ভালবাসি। ভগবান যেন ওর সহায় হন।

দয়াময়, চেয়ে দেখ ওর বিপত্তি, ক্ষমা কর ওর পাপ!

কঁতেসের ঘরে গেলাম। ডাক্তারবাবু খুব সহজ সুরে কথা সুরু করলেন, "এই যে হ্যানোয়া, কেমন আছ হে?"

ও তাঁর দিকে চেয়ে রইল। হাসল।

"মনে হচ্ছে ভালই।"

"নাড়ী দেখি?"

এই অল্প সময়ের মধ্যেই ওকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিলেন তিনি অতি মনোযোগ দিয়ে।

"আচ্ছা কোথায় ব্যথা লাগছে?"

"আজ্ঞে, এইখানে।" বলে ও কপাল দেখাল।

"তাই নাকি? বলতে হয়। এখুনি সারিয়ে দেব।"—এই জাতীয় কথাবার্তার ফাঁকে ভাল ভাবে গুছিয়ে উনি নানা প্রশ্ন করলেন। চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন।

"ওর অসুখ খুবই বাড়াবাড়ি কি?"

মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। সর্বদা ওর দিকে নজর রেখ, আর সম্পূর্ণ বিশ্রাম পায়, সে-ব্যবস্থা কর; আর ভুলেও এ-ঘটনার উল্লেখ ওর কাছে কোর না। আর একটা কথা, ওর মামা কোথায় এখন?"

কর্ণেল দেক্রে এখন স্পেনে। তাঁর ঠিকানা দিলাম।

"এখুনি ওঁকে টেলিগ্রাম করছি। ওঁর আসা নিতান্ত প্রয়োজন। তবে মার্গারিৎ, শরীরটার দিকে যদি নজর না দাও, ভুগতে হবে যে মা!"

উনি চলে গেলেন। রোগীর ঘরে গেলাম আমি। হ্যানোয়াকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওর তন্দ্রা আসছিল। কঁতেসকে ইশারায় ডাকলাম। খুলে বললাম সব কথা। উনি নীরবে কাঁদতে লাগলেন।

হ্যানোয়া ঘুমিয়ে পড়ল। কি অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে লাগছে ওকে! হঠাৎ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে বকতে আরম্ভ করল, "ওই যে, আগুন! আগুন! পাগল করে দেবে! উঃ, পুড়িয়ে দিল সব!"

চট করে একটা ভিজে রুমাল নিয়ে ওর কপালে রাখলাম। ও তা ফেলে দিল। বিকারের ঘোরে সজোরে আমার হাত চেপে ধরল। বাবা আর মা এলেন। বৈঠকখানায় গেলাম। আমায় ওঁরা নিয়ে যেতে এসেছেন। আমি ধরে বসলাম, এখানেই আমায় থাকতে দেওয়া হোক। অতিকষ্টে ওঁদের মত পেলাম। মা-ও থাকবেন বলে জিদ করাতে আমি আপত্তি জানালাম।

১৭ই জানুয়ারী।—ওর অবস্থার পরিবর্তন হয় নি। গায়ে বেশ জ্বর। গত দুই সপ্তাহ অনবরত প্রলাপ বকছে, বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে, রাতে ঘুম নেই। কি নিদারুণ ভোগান্তি! ভগবান, একবার এদিকে ফিরে তাকাও, ভগবান! এতদিন পর ওর মা একটু বিশ্রাম নিতে গেছেন। আমরা এখন পালা করে ওর শুশ্রূষা করছি। গেল মাসের ১১ তারিখ সকালে ওর মামা এসে পৌঁছেচেন! আমায় দেখে উনি অসম্ভব বিচলিত হয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। ওঁকে আদ্যোপান্ত কাহিনী জানালাম।

"হায় ভগবান!" উনি আপন মনে বলতে লাগলেন, "কি

যে করি এই অবস্থায়!"—তার পর হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, "না না, ওর বিচার—কোনও দরকার নেই ; চলে যাব এখান থেকে ওকে নিয়ে!"

ঘটনাটা ওঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছে। আমি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে উনি সামলে নিচ্ছেন বুঝলাম। আমার হাত দুটি ধরে উনি শুধালেন।

"আচ্ছা মা, ওকে তুই এখনো ভালবাসিস?" নিরুত্তর মুখে আমি তাকালাম ওঁর পানে। ওঁর পক্ষে আমার উত্তর পড়ে নিতে দেরী হল না।

"বেচারা মা আমার!" বলতে গিয়ে দু ফোঁটা জল ঝরে পড়ল ওঁর গাল বেয়ে।

১৮ই জানুয়ারী।—কাল রাত্রে হ্যানোয়া বেশ ভাল ছিল। শান্তিতেই ঘুমিয়েছিল। রাত তিনটে নাগাদ বসেছিলাম ওর বিছানার ধারে। আমার কাঁধে ও হাত রাখল। আধশোয়া অবস্থায় ও জানলার দিকে নির্দেশ করে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল,—

"ওই যে দেখছ—যীশু হচ্ছেন উনি যিনি মৃত, যিনি পুনরুজ্জীবিত, যিনি ভগবানের ডান দিকে বসে আছেন, আর আমাদের পক্ষ সমর্থন করে প্রার্থনা করছেন সুবিচার।"

ও টেনে টেনে শেষের কথাগুলো বলল। তৃপ্তির হাসিতে ওর মুখ উজ্জ্বল। আমি কি বলতে গেলে ও থামিয়ে দিল, "চুপ, চুপ! শোন, ওই শোন!"

একদৃষ্টে, অত উৎকর্ণ ভাবে ও কি দেখছিল জানি না! দিগন্তে চাঁদ আর তারার উদ্ভাস। বেশ কিছুক্ষণ পরে ও আবার ধপ করে শুয়ে পড়ল।

"সব শেষ!" করুণ কণ্ঠে ও জানাল।

ও আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ভগবান যেন মুখ তুলে চেয়েছেন মনে হয়। ওর পাপ উনি নিশ্চয় ক্ষমা করবেন। আমরা কে-ই ·· নিজেকে নিষ্পাপ বলতে পারি? অবিরত শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছি ভেড়ার পালের মত ; নিজের নিজের পথে আমাদের চলা ছাড়া উপায় নেই ; তাই ত চিরন্তনের আদেশে যীশু টেনে নিয়েছেন আমাদের সমস্ত পাপ তাঁর নিজের অঙ্কে। ভগবান—আমাদের ঈশ্বর কি সর্বদা বলছেন না, "আমি, আমিই মুছে দিই তোমাদের পাপ-তাপ, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার আমার ভালবাসা,—আমি ভুলে যাব তোমাদের যাবতীয় পাপ।"—ভগবান, ক্ষমা কর ওর পাপ, ওর প্রতি মেলে ধর তোমার বরাভয়-পাণি, তোমার মাঝেই ওর আত্মা যেন খুঁজে পায় পরম শান্তি।

সকালে জমিদারের অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবু ত অবাক! প্রলাপের ঘোর কেটে গেছে, তবে মাথাটা এখনো দুর্বল, সামান্য বিকার আছে।

২০শে জানুয়ারী। ওর বিছানার পাশে আজ সকালে বসেছিলাম। চোখ বুজে ও শুয়ে আছে দেখে ভাবলাম ঘুমুচ্ছে। কিন্তু একবার চোখ তুলে দেখি, স্থির নয়নে আমার দিকেই ও চেয়ে আছে। ইশারায় আমায় কাছে ডাকল ও, "কি দুঃস্বপ্ন যে দেখছিলাম। গাস্ত কই? একবারও কই ও ত' আমায় দেখতে এল না?"

আমি কি বলব ভেবে পেলাম না।

"এখনো ও কি আমার ওপর চটে আছে? ডাক না ওকে, ওর সঙ্গে মিটমাট করে নিই ; যাও লক্ষ্মীটি, ওকে ডেকে আন।"

—আমি বেরিয়ে গেলাম। সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলেন মঁসিয়্য দেক্রে। ওঁকে এ-কথা বলে আমি জানালাম যে সত্যি যা ঘটেছে ওকে এখন খুলে বলা বোধ হয় ভাল।

আমরা ঘরে ঢুকতে হ্যানোয়া সখেদে বলল, "বুঝেছি, ও আসতে চায় না এখনো।"

"ও আসতে পারে না বাপ!" কাঁপা গলায় ওর মামা জবাব দিলেন।

"কেন?"

"ও যে আর বেঁচে নেই!"

"এ্যাঁ, গাস্ত মারা গেছে? আমার স্বপ্নই সত্যি হল?" ও ব্যগ্র ভাবে ওর মামার দিকে ঝুঁকে পড়ল, "আমি যে দেখলাম লেকের ধারে ও মরে পড়ে আছে, আর ওর চোখ উঃ, কি সে চাউনি! দারুণ ভাবে চেয়ে রয়েছে। আমি ওর কাছে যেতেই ওর নিস্পন্দ ঠোঁট দুটোর মধ্যে থেকে কে যেন গর্জে উঠল, 'কায়্যাঁ প্রতারক!' অসম্ভব কর্কশ ওর গলাটা শোনাল। তবে কি এ-সবই সত্যি?"

"হ্যাঁ বাছা!"

"হায় রে!" বলে অমানুষিক চিৎকার করে ও পড়ে গেল বিছানার ওপর, নিথর, অচঞ্চল। মামা তাড়াতাড়ি আঁজলা-ভরতি জল দিতে লাগলেন ওর মুখে-চোখে। খানিক বাদে চোখ মেলেই আবার সভয়ে ও চোখ বুঁজল। আমাকে রোগীর কাছে রেখে উনি ডাক্তার ডাকতে গেলেন। ফের ও তাকাল, শূন্যদৃষ্টিতে ; বহুক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ওর কপালে কালিমা ঘনিয়ে এল ; অব্যক্ত ভীতি ফুটে উঠল দুই চোখে। আমার হাত ধরে নীরস গলায় ও ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল।

"আচ্ছা, সত্যিই আমি···আমি কি···একাজ করেছি? কেন এমন করলাম? কে বলল?"—আমি চুপ করেই রইলাম।

"কই, তুমি উত্তর দিলে না? বল, বল না, এ কথা কি সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি।"

গভীর স্তব্ধতা নেমে এল চারি দিকে। মূক নয়নে পরস্পরের পানে আমরা তাকিয়ে রইলাম, নিষ্প্রাণ মূর্তির মত। মিনিট পনেরো প্রায় এই ভাবেই কাটল। এমন সময় ডাক্তার এলেন।

"বাঃ, তোমায় বেশ ভাবুক, দার্শনিক গোছের দেখতে লাগছে হে", উনি রসিকতা করলেন।

স্বপ্নোত্থিতের মত হ্যানোয়া তাকিয়ে রইল। পরে বলল, "ঠাট্টা না ডাক্তারবাবু ; আর সময় নেই। সবই এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি।"

খানিক দম নিয়ে ও বলে চলল, "উঃ, এমন নিরপরাধ প্রাণ হরণ করবার আগেই কেন আমার মৃত্যু হল না?"

দু'হাতে মুখ ঢেকে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ডাক্তার আর কর্ণেল পাশের ঘরে চলে গেলেন। নিজেরই অজ্ঞাতে ওর পাশে বসে ওর চুলগুলি সযত্নে বিন্যস্ত করতে লাগলাম আমি। এই অসহ্য যন্ত্রণা চোখে দেখা যায় না। ও আমার হাত সরিয়ে দিল।

"জান না আমি কে? আমি যে ভ্রাতৃহন্তা।" বিকৃত গলায়

ঋণং কৃত্বা...

এমন একদিন বোধহয় সত্যিই ছিল যখন লোকে ঘি খাবার জন্যে ধার করতেও পেছপাও হোতনা। মহাজনদের বিধান ছাড়াও তার অন্য কারণ ছিল। দুধ অমৃতের সমান আর সেই দুধ থেকে তৈরী ঘি, মাখন, ছানা, দই, ক্ষীর। সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে এইসব খাবার যে একেবারেই অপরিহার্য্য এ বিষয় কারো কোন দ্বিধা ছিলনা। আর সত্যিই দ্বিধা থাকবার কোন কথাও নয়। তখন সস্তাগণ্ডার দিন ছিল, ভাল টাটকা খাবার অপর্য্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যেত আর সাধারণ লোকে তা কিনতেও পারতো। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার কথা তখন উঠতোই না।

এখন দিনকাল বদলেছে। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ পরিবৃত হয়ে জমিদার মশাই বসে তামাক খেতে খেতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খোসগল্প করছেন আর তাসপাসা খেলছেন—এ এখন গল্পকথায় দাঁড়িয়েছে। তাঁর বংশধরদের এখন সকাল নটায় পড়ি কি মরি করে আপিসে কিম্বা নিজের ধান্দায় ছুটতে হয়।

সত্যিই আজকের এই ডামাডোল আর মাগ্গিগণ্ডার বাজারে সংসার করা, আয়ের মধ্যে চলা অতি দুরুহ কাজ। সবদিক সামলে, নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে চলা যে কত শক্ত কথা তা সকলেই জানেন। বাড়ীভাড়া, কাপড়চোপড়, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে আর বই-খাতার খরচেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, তাই অনেক সময়েই লোকে খাবার দাবারে খরচ কমিয়ে খরচ বাঁচাতে চায়। কিন্তু আজকাল আগেকার তুলনায় ঝামেলা বেড়েছে খাটাখাটুনি ও দুশ্চিন্তাও বেড়েছে। তাই ভেবে দেখুন যে খাবার দাবারে খরচ কমানো মানে কি? তার মানে হয় আধপেটা খেয়ে থাকা নয়'তো নিকৃষ্ট বা ভেজাল জিনিষ খাওয়া। কিন্তু তাতে কি সত্যিই পয়সা বাঁচে? যে পয়সাটা বাঁচে তাতো ডাক্তারের পকেটে বা ওষুধ পত্তরেই খরচ হয়ে যায় অনেক সময়। সুতরাং পুষ্টিকর স্বাস্থ্যদায়ক জিনিষ খাওয়া যে একান্তই দরকার একথা বলে বোঝাবার দরকার নেই, বিশেষ করে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের, বাড়ীর কর্তার, গিন্নীঠাকুরনের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। সুতরাং ঋণং কৃত্বা ছাড়া উপায় নেই এই কথা ভাবছেন তো? না, আছে; উপায় আছে। আর সে উপায় অবলম্বন করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে খুবই সোজা।

একটা সোজা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আপেল। আমরা সবাই জানি আপেল শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইংরেজীতে তো প্রবাদবাক্যই আছে যে রোজ একটা করে আপেল খাওয়া মানে ডাক্তারকে দূরে রাখা। কিন্তু আপেল সাধারণতঃ দুর্মূল্য, তাই কজনেই বা রোজ আপেল খেতে পারে বলুন? কিন্তু আপেলের চেয়ে অনেক কম দামে প্রায় সমান উপকারী ফল বা তরকারী খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়। যেমন ধরুন টোম্যাটো, যাকে আমরা বিলিতী বেগুন বলি, বা কলা—আপেলের চেয়ে অনেক কম দাম কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে ঘি। খাঁটি টাটকা গাওয়া ঘি ভাল জিনিষ, কিন্তু তা পাওয়া গেলেও বেশী দাম। তাই নিত্য ব্যবহারের জন্যে সব সময় গৃহস্থের পক্ষে খাঁটী ঘি কেনা হয়তো সম্ভব হয়না। সেখানে স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। ডালডায় খরচ কম আর ডালডা ঘি এর মতোই উপকারী। একথা জানেন কি যে ডালডা ও খাঁটী গাওয়া ঘিয়ে একই পরিমান ভিটামিন 'এ' আছে। ভিটামিন 'এ' শরীরের বাড়ের জন্যে অত্যন্ত প্রযোজনীয় এবং দাঁত, চোখে ও গায়ের চামড়ার জন্যে অত্যন্ত উপকারী। ভিটামিন 'এ' স্বাস্থ্যের পক্ষে একটি অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। তাই এই স্বাস্থ্যদায়ক ভিটামিন 'এ' যুক্ত ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে এত ভাল। ডালডায় ভিটামিন 'ডি' ও দেওয়া হয়। ভিটামিন 'ডি' ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। ভিটামিন 'ডি' দাঁত ও হাড়কে সবল করে। শুধুমাত্র খাঁটী ভেষজ তেল থেকে ডালডা স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্ব্বদা শীলকরা টিনে খাঁটী ও তাজা পাবেন। এই সব কারনেই ডালডা আজ দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে আজই ডালডা কিনুন—কিনে পয়সা বাঁচান, শরীর ভাল রাখুন। মনে রাখবেন, ডালডা মার্কা বনস্পতি শুধুমাত্র খেজুরগাছ মার্কা টিনেই পাওয়া যায়, এই টিন দেখে কিনবেন।

HVM. 203A-X52 BG

ও চেঁচিয়ে উঠল।—দারুণ ব্যথায় আমি মুষড়ে পড়ছিলাম; কিন্তু না, এ-সময়ে ওকে প্রবোধ দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য। ওকে স্মরণ করাতে চেষ্টা করলাম, "আমরা করুণাময় ঈশ্বরের সন্তান।"

"হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে—তুমি আমায় ভালবাসতে, তাই না? মার মুখে যেন শুনেছি সে-কথা। এখনো ভালবাস?"

"আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমায় ভালবাসি। ভগবান কি আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন না?"

"আমেন!" বলে ও আমার হাতটা তুলে নিল। বলল, "ভগবান আমাদের ক্ষমা করবেন, এ বিশ্বাস আমার অটুট।" ডাক্তার ফিরে এলেন।

"বুঝলে হে খদ্দের, দেহে-মনে এখন যত পার বিশ্রাম নাও!"

ওঁকে ও বাধা দিল, "মঁসিয়ু শাঁতো, আমি একদম সেরে উঠেছি। রীতি-মাফিক বিচার শুরু হোক। আমার বিচারের দিন কবে ধার্য হয়েছে?"

"আগামী বাইশে।"

"আজ···হল···?"

"বিশ তারিখ।"

"পরশু দিন তবে?"

"হুঁ।"

"বেশ। আমি প্রস্তুত।"

ডাক্তার চলে গেলে পাক্কা চার ঘণ্টা ও দিব্যি শান্তিতে ঘুমিয়ে নিল।

২১শে জানুয়ারী।—আজ সন্ধ্যাবেলা ফাদার রোশেল ওকে দেখতে এলেন। সেণ্ট জন্-এর চতুর্দশ অধ্যায়টি পড়ে উনি হাঁটু গেড়ে বসলেন; আমরাও বসলাম ওঁর দেখাদেখি। শুরু হল প্রার্থনা: আমাদের পাপ তিনি যেন হরণ করেন, রোগীকে করেন যেন কৃপা।

"ভগবান, তুমি," উনি ভক্তি-বিনম্র কণ্ঠে বলে চললেন, "তুমি ত চাও না পাপীদের মৃত্যু হয়। তুমি চাও, তারা অনুতপ্ত হোক, পুনরুদ্ধার করুক তাদের আত্মাকে; প্রভু, ক্ষমা কর তোমার দাসানুদাসকে; ওর অন্তস্তলে জেগেছে আকূতি,—প্রেমময়, ক্ষমা কর, কৃপা কর।"

নীরবে আমরা অশ্রু বিসর্জ্জন করছিলাম। পাদরী উঠে দাঁড়ালে হ্যানোয়া তাঁকে অনুরোধ করল নতমুখে, "পিতা, আশীর্বাদ করুন!"

ওর মাথায় হাত রেখে মঁসিয়ু রোশেল বললেন, "বিপদের মুহূর্তে পরম প্রেমিক যেন তোর আহ্বানে সাড়া দেন, আর তাঁর নামের মাঝেই তুই যেন খুঁজে পাস শ্রেষ্ঠ আশ্রয়!"

আজ জমিদার তার মাকে আদ্যোপান্ত ঘটনাটি বলল। ওর কাহিনী শুরু হতে আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম ঘর থেকে,—কঁতেস হাত ধরে আমায় বসালেন; অতি বিষণ্ণ নয়নে জমিদার আমার দিকে তাকাল; তার পর ওর মাকে বলল, "মা, ও চলে যাক; যে কাহিনী তোমায় বলছি, তা দুঃখের, বড় দুঃখের; ওর শোনা উচিত হবে না।"

তবু ওর মা আমায় যেতে দিলেন না।

"না হ্যানোয়া, ও থাক; বেচারা তোকে যে প্রাণাধিক ভালবাসে! ওর কপালে এত দুঃখও ছিল!"

"হুঁ, এ-সব শোনার পর প্রেম-টেম কর্পূরের মত উবে যাবে। তা ছাড়া আমার ওপর ওর ধারণাই বা কেমন হবে?" ম্লানমুখে ও স্বগতোক্তি করল।

তার পর শুরু হল ওর কাহিনী: "অল্প কথায় বলছি, যা ঘটেছিল।—জানেৎ কোরেনকে দেখে আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম আর গাস্তঁও," হ্যানোয়া সসঙ্কোচে বলল, "ওকে ভালবাসত। গাস্তঁকে বহু বার সাবধান করে দিয়েছি, আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বলেছি, আমার খুসীমত চলতে নির্দেশ দিয়েছি। সে-কথা কোন দিন ও কানেও তোলে নি। আর জানেৎ ওকেই বেশী ভালবাসত আমার চেয়ে। আমার ব্যবহার ওর মত মধুর নয়; আমায় কেমন যেন ভয় করেই চলত জানেৎ। আমার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব ওকে বহু বার করেছি; ও আমায় চায় নি! আমি তখন যেন অন্ধ মানুষ,—আমি আর আমাতে ছিলাম না;—এক দিন ফুটফুটে চাঁদিনী রাতে···দেখলাম, ওরা দু'জন বেড়াচ্ছে বাগানের সুরকি-ঢালা পথে।···এই অবধিই আমার মনে আছে। আর কিছু স্মরণে আসছে না। হায় রে কপাল! কেন এর আগেই মরলাম না!"

দু' হাতে মুখ ঢেকে ও প্রাণ-কাড়া কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ওর মা-ও কাঁদছিলেন। আমি উঠে গেলাম, আমার হাতে তুলে নিলাম হ্যানোয়ার হাত। জানি না কেন এ রকম—পোষা কুকুর যেমন মনিবের মন খারাপ হলে তার হাত চেটে দেয়—সেই রকম ব্যবহার আমি করছিলাম। স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলাম ঘটনাবর্ত্তের ধারা, তবু কিছু গ্রাহ্য করবার শক্তি আমার ছিল না। সবই চলছিল যেন স্বপ্নের ঘোরে। আমায় দেখে, আমার বিবর্ণ চেহারা দেখে হ্যানোয়া আঁতকে উঠল; আমার মাথায় হাত রেখে বিড়-বিড় করে বলতে লাগল, "বেচারা! কি কষ্টটাই না দিলাম!"

তার পর আমার দিকে ওর মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, "মা, এই দেখ, শেষ পর্যন্ত একেও কি মেরে ফেলব না কি? কি চেহারা করেছে এই ক'দিনে দেখ ত?"

আমায় ও সস্নেহে অনুরোধ করল, "যাও মার্গারিৎ, লক্ষ্মীটি, ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর!"

শিশুর মত, বিনা বাক্যব্যয়ে আমি ওর আদেশ মেনে নিলাম। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, পথ যেন শেষ হবে না। ঘরে গিয়ে ধপ করে বসে পড়লাম একটি চেয়ারে। কতক্ষণ আচ্ছন্ন ছিলাম জানি না, হঠাৎ দারুণ ভাবে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। চেয়ে দেখি, সামনের জানলাটা খোলা,—বাইরে তুষার পড়ছে। জানলা এঁটে দিলাম। চেয়ারে ফিরে যাবার সময় ক্রুশটার দিকে চোখ পড়ল; নতজানু হয়ে বসলাম আমার দিব্য-সাথীর চরণতলে। মনে নেই কি মিনতি জানালাম, কিন্তু প্রেমের ঈশ্বর, অন্তর্যামী—তিনিই আমায় বল দিলেন। বুক-ভরা সান্ত্বনা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। অন্তরে পেলাম পরম শান্তি। নীচে দেখা হল, মঁসিয়া দেক্লে আর হ্যানোয়ার সাথে। আমার হাত ধরে কর্ণেল অভিবাদন জানালেন। হ্যানোয়া খুবই মুষড়ে পড়েছে। আমার সঙ্গে মুখোমুখি হতেই ওর মুখে প্রসন্ন ভাব দেখা দিল। ও আমার দিকে চেয়ে হাসল।

২৩শে জানুয়ারী।—আজ মামলার রায় বার হবে। ওখানে

আমি যাই নি; যাবার সামর্থ নেই। গাড়ীতে চড়ে হ্যানোয়া আদালতে গেল; সঙ্গে ডাক্তার, কর্ণেল আর আমার বাবা। আশে-পাশে অজস্র পুলিশ-অফিসার। দিব্যি শান্ত ভাবে ও গাড়ীতে বসে ছিল। ভগবান, ওর মঙ্গল কর!

সন্ধ্যা।—বিকেল চারটেয় ওরা ফিরেছে। কর্ণেলের অনুরোধে প্রহরীরা হ্যানোয়াকে নিয়ে এসেছিল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমাদের কাছ থেকে ও বিদায় নেবে বলে। আমি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলাম; হৃৎস্পন্দন স্তব্ধপ্রায়। হ্যানোয়া ধীর পায়ে এগিয়ে এল, হাসবার চেষ্টা করে আমার হাত জড়িয়ে ধরল।

"পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড!" উদাস ভাবে ও জানাল।

আমি কথা খুঁজে পেলাম না। পনেরো বছর! আত্মীয়-বন্ধুহীন অবস্থায় দিন কাটান! এ যে মৃত্যুর সামিল। ঘটনার পর ত ওর স্বাস্থ্য প্রায় ভেঙেই গেছে!

"না গো, হ্যানোয়া, এ-দণ্ড যে বড় নির্মম!"

"ফুঃ! আমার একমাত্র দণ্ড মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়; রক্তের বদলে রক্ত!"—ও উত্তেজিত হয়ে পড়ছে দেখে আমি ওর হাত ধরলাম,

"চল হ্যানোয়া, প্রার্থনা করি গে।"—ওকে নিয়ে গেলাম প্রাসাদের উপাসনালয়ে, যেখানে ধর্ণা দিয়েছিলেন ওর মা। বেদীর ওপর বরাভয়-মুদ্রায় হাতবাড়ান যীশুর ছবিতে লেখা, "এস আমার কাছে, তোমরা, যারা কর্মক্লান্ত, পর্যুদস্ত, এস, আমি লাঘব করব তোমাদের হৃদয়-ভার।"

সত্যিই বুকে আজ আমাদের যে গুরুভার, তা বয়ে বেড়ান অসম্ভব! হাঁটু গেড়ে বসলাম ওর মায়ের পাশে; উনি খপ করে ওর হাত চেপে ধরলেন। মুখে আমাদের ভাষা নেই; প্রার্থনা করছিলাম অন্তরের অতল থেকে। হ্যানোয়া দাঁড়িয়ে পড়লো। নীচু গলায় অনুমতি চাইল, "মা, যাই এবার?"

চট করে উনি টান-টান হয়ে দাঁড়ালেন, চেপে ধরলেন ওকে আকুল আগ্রহে। "না না। আমি দেব না, আমার একমাত্র সন্তানকে এভাবে আমি হত্যা করতে দেব না!" উনি গর্জে উঠলেন। ভীত দৃষ্টিতে উনি কিছু খুঁজতে লাগলেন মনে হল। ওঁর কাঁধে হ্যানোয়া আলতো ভাবে একটা হাত রাখল।

"মাত্র পনেরোটা ত বছর; দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ভগবানকে সর্বদা স্মরণে রেখ মা।"—ধীরে ধীরে মার আশ্লেষ থেকে ও নিজেকে মুক্ত করে নিল, সক্ষোভে উনি বেদীর সামনে বসে পড়লেন।

ও ঝুঁকে পড়ে বলল, "মা-মণি, বিদায় দিবি না?"

ওর গলা জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে উনি কাঁদতে লাগলেন। সহস্র চুম্বনে ওকে অস্থির করে তুললেন।

"ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" উনি প্রার্থনা করলেন। তারপর সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন। জমিদার ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে, "আদিয়্যু মার্গরিৎ, বিদায়!"

ডাগর চোখ দু'টি তুলে ও প্রশ্ন করল, "নিত্য তোমার প্রার্থনার ক্ষণে বিপথগামী এই ভাইয়ের কথা স্মরণ করে করুণা-ভিক্ষা করবে ত?"

"হ্যাঁ," আমি জবাব দিলাম। ওর মার প্রসঙ্গ তুলে জানতে চাইল, "ওঁর নিঃসঙ্গ জীবনে একমাত্র সান্ত্বনা তুমি—ওঁকে মাঝে মাঝে দেখে যাবে ত?"

"হ্যাঁ।"

আবার ও আমার হাত জড়িয়ে ধরল।

"যে-ভালবাসা তোমার কাছে পেয়েছি, তার ঋণ ভগবান শোধ করবেন।"—বলে ও বেরিয়ে গেল। ইচ্ছে হল ছুটে যাই ওর পেছন পেছন কিন্তু দেহে আর তিলমাত্র শক্তি না থাকায় বসে রইলাম শূন্য-হৃদয়ে। চারি দিকে ঘন অন্ধকার জড় হয়ে এল। আজ নিবে গেল আমার জীবনের সব আলো। অন্ধকারে ছোট ছেলেদের ছেড়ে দিলে তারা যেমন করে, আমিও তেমনি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। বসলাম ওর মার অশ্রুসিক্ত সান্নিধ্যে। ভগবান, সাহায্য কর ভগবান! এই দুর্বার আঁধারে পথ দেখাও!

* * *

১০ই এপ্রিল, ১৮৬১।—বহু কাল হল দিনপঞ্জী লেখা হয় নি। কঠিন অসুখ থেকে উঠেছি। অসম্ভব জ্বর আর প্রলাপে ভুগলাম। বাঁচবার আশা ছিল না। ভগবানই রক্ষা করলেন এ যাত্রা। চোখ খুলে যেদিন সূর্য দেখলাম, যেদিন দেখলাম আকাশের নীলিমা আর বাবা-মার আশান্বিত মুখ, ভগবানকে সেদিন ধন্যবাদ জানালাম। "আমায় তুমি সর্বদাই ঘিরে রেখেছ নিবিড় করুণায়!"—আগেকার জীবন আমার কাছে আজ স্বপ্নের মতই অস্পষ্ট, অবাস্তব। সপ্তাহ দুয়েক হল সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছি। তার আগেকার কথা যা স্মরণে আছে, বলছি।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ মনে হল আমার ঘরে এক দল লোক, যেন ফিস-ফিস করে কি আলোচনা করছে। চোখ বুজে ছিলাম; এই আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখি, দুই হাতে মুখ ঢেকে কে যেন আমার বিছানার কাছে বসে কাঁদছে। চোখ আমার বন্ধ হয়ে গেল; বাদামী ঢেউখেলান চুল দেখে চিনতে পারলাম,—কাপ্তেন লফেভ্র। প্রথম দেখা হওয়া অবধি আমায় ও ভালোবেসেছে প্রাণ-মন ঢেলে—প্রতিদানে আমি ওকে কি দিলাম? দিলাম শুধু বুকভরা ব্যথা। ওর প্রতি কেমন যেন সহানুভূতিতে আমার অন্তর ভরে উঠল। আমার মৃত্যুর দেরী নেই, তার আগে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব আমার ভুলের জন্য। এই কথাই বারবার আমার মনে হতে লাগল। আরো কিছু দিন আগে যদি এ-ভাব আসত, যদি রাজী হতাম ওর প্রস্তাবে? ওর মাথায় আমি হাত রাখলাম।

"লুই আমায় ক্ষমা করবে"?

বড় দুর্বল লাগল নিজেকে,—অতি কষ্টে বার হল এই চারটে কথা। উত্তরে ও তুলে নিল আমার হাত, তার ওপর নেমে এল ওর ঠোঁট। চোখ ওর জলে ভরে উঠল।

"লুই, আমি ত যাচ্ছি; তুমি রইলে; বাবা-মার দেখা-শোনা কোর,—ওঁদের নিজের আত্মীয় ভেবে দেখা-শোনা কোর, কেমন?"

মনে কেমন ধারণা এল, মৃত্যু আমার সমীপবর্তী।

"বেচারা বাবা-মা! এই বয়সে ওঁদের যত্ন করার আর কেউ নেই। ওঁরা আমায় এত স্নেহ করেন,—আমার অবর্তমানে না জানি কত কষ্টই না হবে ওঁদের!"

ও নীরবে তাকিয়ে রইল আমার দিকে,—দুই চোখে দারুণ

ব্যথার ছাপ, সজোরে ও ধরে রইল আমার হাত। ক্লান্ত চোখ দুটি বন্ধ করে ফেললাম। কে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরল।

"মা-মণি!"

"বাবা!···"

তার পর আর মনে নেই। তার তিন দিন বাদে জ্ঞান ফিরল। বেশ দুর্বল লাগছিল। আমার ইচ্ছানুযায়ী আমার ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি সেরে উঠছি দেখে মার মুখে হাসি ধরে না; আগের লালিমা ফিরে পেতে এখনও অনেক দেরী। আজ সকালে আমায় জড়িয়ে ধরে তিনি আনন্দে, দুঃখে কেঁদে ফেললেন।

"মার্গো, এ কি চেহারা হল তোর!"

তেরেস ওঁকে ধমক দিতে গিয়ে নিজেও কেঁদে সারা। "মাদাম", ও বলল, "এ-ভাবে ওর ঘরে বসে তুমি কাঁদছ দেখে ও কি নিজেকে সামলাতে পারবে? ডাক্তারবাবু না হাজার বার বলেছেন, ও যাতে উত্তেজিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে?"

মা হাসার চেষ্টা করলেন। তেরেসের মুখ একবার খুললে থামে না সহজে।

"কেন ওর ফ্যাকাসে গাল দুটো কি খারাপ লাগছে নাকি? বরং খাসা লাগছে; এ কথায় অন্তত আর একজন আছে যে সায় দেবে, যখন এখানে আসবে। এমন ভাবে ওকে উত্যক্ত কোর না মাদাম; এতে ওর মন খারাপ হয় না? কাপ্তেন সাহেব আসুক না একবার,—আহ্লাদ করা কাকে বলে দেখিয়ে দেবে একচোট।"

বাবা এসে আমার বিছানায় বসে আমায় আদর করলেন। তেরেস চলে গেল; মার থাকার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমি বাদ সাধলাম; আমি জোর করে ওঁকে বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে দিলাম; বাবাও আমায় সমর্থন করলেন ভাগ্যিস; নয়ত উনি কি যেতেন? বাবা তখন কথা পাড়লেন, "মা-মণি এবার তুই সেরে উঠবি। ভগবান সত্যি আমাদের প্রতি অত্যন্ত সদয়।"

"হ্যাঁ বাবা!"

খানিক বাদে স্বাভাবিক গলায় উনি বললেন, "জানিস মা, লুই তোকে দেখতে এসেছে?"

"হ্যাঁ বাবা; ওকে যখন বিকারের ঘোরে দেখলাম, তখন আমার মনে কেমন যেন ধারণা হয়েছিল আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।"

সবাই তাই ভেবেছিল মা; পারীতে খুড়িমার ওখানে তোর অবস্থার কথা শুনে লুই বেচারা পড়ি-মরি করে ছুটে এসেছে।"

দীর্ঘ নীরবতার পর উনি বললেন, "কি একটা কাজে ও পারী গিয়েছে; দু-এক দিনের মধ্যেই এসে পড়বে।"

"আচ্ছা বাবা, কঁতেসের খবর কি?"

"বিশেষ সুবিধের নয়; মাঝে মাঝে ওঁর মাথার গণ্ডগোল দেখা যাচ্ছে।"

"আর ও?"

"হ্যানোয়া? মারা গিয়েছে; আত্মহত্যা করেছে।"

"হায় ভগবান!" আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। শুনলাম, উন্মত্ত অবস্থায় ও একদিন এই অসহ্য জীবনের পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছে। ভগবান, ওর আত্মা যেন শান্তি পায় তোমার আশ্রয়ে। এখান থেকে বহুদূরে তুর্‌'র কাছাকাছি, কবরখানার বাইরে ওকে গোর দেওয়া হয়েছে। আমি, আমিও ত চেয়েছিলাম ওকে অনুসরণ করতে।

২০শে এপ্রিল। কাল আমার বৈঠকখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; নিজেই নেমে যাচ্ছিলাম; কিন্তু কয়েক ধাপ নেমেই বসে পড়তে হল। বাবা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "দাঁড়া খুকি, আমি তোকে নিয়ে যাবো; এখনো তুই বড় দুর্বল মা!"

আমায় উনি হাত ধরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন বৈঠকখানার সোফার উপর। মা এক গ্লাস সুরা এনে দিলেন। বাবা আমার কাছেই বসলেন; ওঁর কপালে আমি হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম; আমার অসুখের পর থেকে ওঁর কপালে দেখা দিয়েছে অজস্র রেখা।—আমি অনুযোগ করলাম, "বাবা, আমার অসুখের সময় তোমাদের খুব ভুগিয়েছি বুঝি?"

"হ্যাঁ মা, খুবই কষ্টে দিন কেটেছে আমাদের," কাঁপা গলায় উনি জবাব দিলেন দুই হাতে আমায় চেপে ধরে।

"তোমাদের ছেড়ে যেতে পারলাম কই? ভগবান আমায় মনে করিয়ে দিলেন যে তোমাদের প্রতি আমার যে কর্তব্য তা পালিত না হওয়া অবধি আমি নিজেকে তাঁর চরণাশ্রয়ের যোগ্য করতে পারব না।"

বাবা আমায় কোলের কাছে নিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

২১শে এপ্রিল।—কাল বিকেলে লুই এসেছে; বাবা আর আমি বাইরের ঘরে বসেছিলাম, দরজা খুলে গেল, আর আদল্‌ফ্‌ কিছু বলবার আগেই ও এসে ঢুকল।

সাদরে ওর হাত বাবা চেপে ধরলেন নিজের মুঠোয়।

"হঠাৎ বোমার মত কোথা থেকে এসে জুটলি লুই?"

ও আমার কাছে এল; ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমি বললাম, "স্বাগত লুই!"

আমি এত রোগা আর ফ্যাকাসে হয়ে গেছি দেখে ও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। মাকে ডাকতে গেলেন বাবা। লুই আমার হাত নিজের হাতে নিয়ে সরু সরু আঙুলগুলোর ওপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"কি রক্তহীন তোমার চেহারা হয়ে গেছে মার্গরিৎ!" আমার দিকে ঝুঁকে ও অস্ফুট কণ্ঠে বলল, "বনফুল, তোমার ওপর দিয়ে যে বিরাট ঝড় বয়ে গেল!"

ও আমার এত কাছে এগিয়ে এল যে ওর ঠোঁট আমার কপালে অনুভব করতে পারছিলাম; হঠাৎ ও সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল, সরে গেল চিমনীর দিকে। ওকে বেশ বিচলিত লাগল; ওর চোখ কালো হয়ে উঠল। যখনি ও উত্তেজিত হয়, তখনি দেখেছি ওর চোখে ওই রকম কেমন একটা অন্ধকার ভাব ঘনিয়ে আসে। মাকে নিয়ে বাবা এসে ঢুকলেন। মা লুইকে জড়িয়ে ধরলেন; অবিরল জলধারা ওঁর চোখে।

"ওর চেহারা কত বদলে গিয়েছে, না রে লুই?"

"হ্যাঁ, কিন্তু বসন্তকাল এলেই আস্তে আস্তে আগের স্বাস্থ্য ফিরে আসবে।"

"সত্যি না কি রে?

"বাঃ, এ-কথা ত সবাই জানে!" বলে ও আমার দিকে চেয়ে হাসল।

"কি ভাবছ, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই লুই আর আমি ওকে খাড়া করিয়ে দেব, কি বলিস লুই?"—বাবা ঠাট্টা করার চেষ্টা করলেও

দেখলাম ওঁর চোখের কোণ চক্‌চক্ করছে। লুই এবার কিছু দিন থাকবে। সন্ধ্যাটা বেশ লাগছিল। লুই আর বাবা চিমনীর দুই কোণে বসেছিলেন। বাবার হাতে হাত দিয়ে আমি সোফায় শুয়েছিলাম। কাছেই বসে মা সেলাই করছিলেন। রাত দশটা বাজতে বাবা সবাইকে শুতে যেতে বললেন। আমি উঠলাম।

"উঁহু, তুই নিজে সিঁড়ি দিয়ে উঠবি কি করে?"—মা আপত্তি জানালেন।

"দেখ না," আমি হাসলাম, "নামার সময় বাবার হাতে ভর দিয়ে কেমন অনায়াসে এলাম বল ত?"

"না না," বাবা বাধা দিলেন, "অসম্ভব, নামার চেয়ে ওঠা অনেক কঠিন।"

একটু চেষ্টাই করি না কেন?" আমি বেঁকে বসলাম। দশ ধাপ গিয়েই দম নেবার জন্য বসে পড়লাম, বাবা তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন, "কি যে ছেলেমানুষী করছিস, শরীর এতে খারাপ হবে।"

"একদম না।" আমি হাসার চেষ্টা করলাম। কিন্তু খুবই দুর্বল লাগছিল; ইতিমধ্যে লুই এসে পড়ল।

"এই ত লুই! ও-ই তোকে উপরে নিয়ে যাবে মা।"

"না বাবা," আমি আপত্তি জানালাম।

"যা যা," উনি উত্তর দিলেন, "ভয় নেই, ও তোকে ফেলে দেবে না, ওর গায়ে কি জোর জানিস?"

তার আগেই লুই আমায় তুলে ধরেছে। আমায় চুপি চুপি ও বলল, "মাথাটা আমার কাঁধে রাখ দেখি।"

ওর গলাটা যেন অন্য রকম শোনাল; বড় নিস্তেজ লাগছিল, ওর কথাই শুনলাম; কি অবসন্ন যে লাগছে। চোখ খুলে দেখি মা বসে আমার হাতে জল দিচ্ছেন আর তেরেস আমার জামা-কাপড় খুলে দিচ্ছে।

"এই ত জ্ঞান ফিরে এসেছে," ও চেঁচিয়ে উঠল।

উঠতে চেষ্টা করতেই তেরেস বাধা দিল।

"আবার কি করবি রে? যা গোলটা খাওয়ালি এখুনি!"

ওর কথা জানতেই হল। আমায় একটা গরম ড্রেসিং গাউনে ঢেকে দিয়ে ও বলল, "যাই মঁসিয়কে ডেকে আনি:—উনি কোথায় গেলেন মাদাম, জানেন?"

"ওই ত বাগানে কে যেন পায়চারী করছে," বাদাম গাছটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম।

"ও ত কাপ্তেন সাহেব," হেসে উত্তর দিল তেরেস।—খানিক পরেই বাবা এলেন।

"দেখছিস ত মার্গারিৎ, কি দুর্বল হয়ে পড়েছিস?"

"হ্যাঁ বাবা, কিন্তু সকালে কেমন দিব্যি তোমার হাত ধরে নেমে গেলাম; ভেবেছিলাম নিজেই বুঝি উঠতে পারব।"

জানলা দিয়ে চেয়ে উনি বললেন, "ওই ত শাস্ত্রীর মত লুই টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে; তুই অজ্ঞান হয়ে গেছিস দেখে যা ভয়টা পেয়েছিল; বেচারা। ও তোকে কত যে ভালবাসে মা!" বলে উনি আমায় আদর করলেন।

"কিছু চাই না কি মার্গো?"

"না বাবা ঘুমিয়ে পড়গে, মাকেও নিয়ে যাও; দিন-রাত তোমাদের কি যন্ত্রণাই যে দিচ্ছি!"

আবার আমায় আদর করে উনি চলে গেলেন।

২২শে এপ্রিল।—বাগানে মা আর আমি বসেছিলাম। দূরে দেখা যাচ্ছিল বাবা আর লুইকে। ওঁরা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন; বাবা ওঁর নিজের ঘোড়ায়, লুই আমারটায়। বেশ কিছু দিন হল অস্ত্যারলিজের পিঠে চড়িনি বলে ও একটু বুনো হয়ে উঠেছে। তাই লুই ওকে একটু তালিম দিতে নিয়ে গেছে, আমি সেরে উঠলেই যাতে অস্ত্যারলিজকে নিয়ে বেড়াতে যেতে পারি। ওরা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

"লুই এবার বেশ কিছু দিন থাকবে এখানে," মা জানালেন, "চার পাঁচ মাসের ছুটিতে এসেছে। ও বাড়ীতে এলে সব-কিছুর রূপ কেমন বদলে যায়, কেমন যেন একটা স্ফূর্তির আমেজ এসে পড়ে! আর এই সময় তোর স্ফূর্তির একান্ত দরকার।"

"ছেলেটা বড় ভাল।"

মনে এল গত বছর ওর প্রস্তাব আমি যখন প্রত্যাখ্যান করি,—বেচারা আমায় একটা কথা পর্যন্ত বলল না; সরল ব্যবহার দিয়ে, আমুদে মেজাজ দিয়ে ও আমায় একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছে সেই অতীতের অপরাধ; মার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

আমি মুখ ঘুরিয়ে বসলাম, দারুণ কান্না পেতে লাগল। মা-বাবার বাসনা আমি লুইকে বিয়ে করি। আমার ত' মনে হয় ওদের সুখী করাই আমার কর্তব্য। বড়ই দুর্ব্যবহার করেছি ওদের সঙ্গে, ভগবান আমায় বাঁচিয়ে দিলেন এ যাত্রা, যাতে আমি নিজের কামনা

বাসনাগুলো দাবিয়ে রেখে ওঁদের ইচ্ছামত চলতে পারি, আর এই ভাবে তাঁর আশ্রয়ের যোগ্য হয়ে উঠি, যাতে করে আমার একগুঁয়েমির জন্ম পরিতাপ করতে পারি। ওঁরা আমার সেই দুর্ব্যবহারের কোন উল্লেখ মুহূর্তের তরেও করেন না; তবু সে কথা আমার মনে পড়ে যায়। ওঁরা এত ভালবাসেন আমায়, আমার উচিত ওঁদের কোন দাবী অপূর্ণ না রাখা। লুইকে বরাবর আমি একটু বিশেষ চোখেই দেখেছি, আর ওকে যদি বিয়ে করি তবে ভগবান আমায় শিখিয়ে দেবেন কি ভাবে যথার্থই ওকে ভালবাসতে হবে। তিনিই আমার ভরসা।

২৮শে এপ্রিল।—লুই আমাকে আন্তরিক ভালবাসে। ওকে কথা দিয়েছি, ওর জীবনসঙ্গিনী হব আমি। গত কাল সন্ধ্যায় আমি সোফায় শুয়েছিলাম, দরজার দিকে পিছন ফিরে। কার পায়ের শব্দ শুনলাম; লুই! আমার পাশে ও বসল! চিন্তাকুল ওর দৃষ্টি। আমার দিকে যখন ও চাইল, মনে হল আমার গহনতম হৃদয়ে ও যেন কিছু খুঁজছে! দু'জনেই চুপ করে রইলাম। বাইরের জগতের স্তব্ধতা আচ্ছন্ন করে দিল আমাদের অন্তর। ও আমার হাত ধরল; জানি ও কি বলবে। বললও তাই।

"মার্গরিৎ, অহর্নিশি তোমায় আমি স্মরণ করি, আমার জীবন তোমারই হাতে, আমায় আর ফিরিয়ে দিও না মার্গরিৎ, আমার জীবন এ ভাবে ব্যর্থ হতে দিও না; তোমার একটি কথার অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছে আমার সত্তা; তবু তুমি রাজী হবে না?"

ওর গলা কাঁপছে, কাঁপছে ওর হাত দুটো। অসম্ভব বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ওর মুখ,—আকুল আবেগে ও চেয়ে রইল আমার দিকে। সন্তর্পণে আমার হাত রাখলাম ওর পিঠে; ওর স্বচ্ছ চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে অকপট ভালবাসার দীপ্তি।

"হ্যাঁ লুই, তোমায় আমি বরণ করে নেব সাগ্রহে।"—ওর সমস্ত রক্ত যেন ছলকে উঠল সারা মুখে। আমার অতি নিকটে ও সরে এল, তপ্ত দু'টি ওষ্ঠ নেমে এল আমার ওষ্ঠে, বহুক্ষণ নিবিড় প্রেমে আমরা মগ্ন রইলাম।

"মার্গারিৎ, তোমায় আমি সারা সত্তা দিয়ে ভালবাসি।"—বলে আমায় ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে টেনে নিল। ওর প্রশস্ত বুকে আমার মাথা রেখে অপূর্ব এক সুখের মাঝে নিঃস্ব করে দিলাম। মনে পড়ে, এমনি আনন্দ পেয়েছিলাম আর এক দিন। যখন অনেক দিন আগে এক চাষানীর খোকা জলে পড়ে গিয়েছিল, আর আমি ডুবে যাচ্ছিলাম ওকে উদ্ধার করতে গিয়ে—এমন সময় জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বাবা আমায় বুকে টেনে নিয়েছিলেন সবল দু'টি হাতে। ঘরের কোন কিছুই চোখে পড়ছিল না; বাইরে, গাছের লম্বা লম্বা ছায়াগুলো দুলছিল। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে আমরা কাটিয়ে দিলাম ওই ভাবে। তার পর ওর দিকে মুখ তুলতেই চোখে পড়ল উজ্জ্বল দু'টি চোখ; ওকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলাম, ওর কপালে চুম্বন দিয়ে প্রশ্ন করলাম, "লুই, সত্যি কি তুমি আমায় চাও?"

আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল; উত্তরে অনুভব করলাম আরো নিবিড় হয়ে উঠল ওর আশ্লেষ।

"কিন্তু আমি কি তোমায় সুখী করতে পারব? সেদিনের মার্গরিতের কঙ্কাল ক'খানা মাত্র আজ বেঁচে আছে, লুই?"

শীর্ণ আমার হাত দুটো দেখে এক ঝিলিক করুণ হাসি ছড়িয়ে পড়ল আমার মুখে।

"কঙ্কাল থেকেই আবার মার্গরিতকে আমরা গড়ে তুলব; সেই হবে আমাদের সাধনা।"

বাবা এলেন; উনি কিছু বলার আগেই লুই আমার হাত নিজের হাতে রেখে উঠে দাঁড়াল, বলল, "বাবা আমরা দু'জনে বাগ্‌দত্ত; আপনার আশীর্বাদ চাই।"

বাবা এগিয়ে এলেন।

"মা, ভগবান তোদের রক্ষা করুন, তোকে, তোর ঈপ্সিত সঙ্গীকে!" বলে জড়িয়ে ধরলেন আমায়। "আজ সত্যি বড় আনন্দের দিন।"

"সত্যি তুমি সুখী হয়েছ বাবা?"

"হ্যাঁ মা, হ্যাঁ।"

উনি ছুটে গেলেন মাকে ডেকে আনতে। তিনিও এসে আমায় জড়িয়ে ধরলেন, "মার্গো, এ আজ কি শুনলাম মা? সত্যি?"

"হ্যাঁ মা!"

"যাক্, ভগবান এত দিনে আমার প্রার্থনা শুনলেন।"

ওরা বড় সুখী আজ; আমিও সুখী; এত আনন্দ পাব কোন দিন ভাবিনি। ভগবানের ইচ্ছেই আমাদের নিয়ে চলুক পথ দেখিয়ে। লুই জানলা টপকে নেমে গেল বাগানে; সেখানে পায়চারী করতে করতে ও ধরাল একটা সিগার।

"তুই সুখী হয়েছিস মার্গরিৎ?"

"হ্যাঁ বাবা।" আমি হাসলাম।

"বেশ মা, বড় স্বস্তি পেলাম; তুই দিন দিন যা শুকিয়ে যাচ্ছিলি, বড় ভাবনায় পড়েছিলাম; এখন তোর সামনে কত কিছু করবার আছে দেখছিস ত'? সেই সব কর্তব্যের ডাকে, তাদেরই আশায় তুই এবার সেরে উঠবি দেখিস। ও আর তুই—তোদের দু'জনাকে একই রকম ভাবে গড়েছিলেন ভগবান। তুমি কি বল আঁরিয়েৎ?"

"হ্যাঁ গো, সে-কথা আজ আর নতুন করে কি বলি? চল, ওদের আপন মনে কথাবার্তা বলবার সময় দিতে হবে; আমরা উঠি।"

"তাই ত, লুই বোধ হয় এতক্ষণ মনে মনে আমাদের মুণ্ডপাত করছে!" উঠে দাঁড়িয়ে বাবা ঠাট্টা করলেন। "তোদের এখন কত কি বলার আছে, তাই না মা-মণি?"

আমায় আলিঙ্গন করে মা আর বাবা বেরিয়ে গেলেন। সোফায় আমি শুয়ে পড়লাম; চেয়ে দেখতে লাগলাম লুই বাগানে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। খানিক বাদে, ঘরে কারো গলা শোনা যাচ্ছে না দেখে, ও মুখ তুলে তাকাল, তার পর ঘরে কেউ নেই দেখে, সিগারটা ও ফেলে দিয়ে আমার কাছে এসে বসল। পরস্পরের সান্নিধ্যে আমরা স্বপ্নের মধ্যে ভেসে চললাম; ও আমায় এত ভালও বাসে! খানিক চুপ করে থেকে ও জিজ্ঞাসা করল।

"আচ্ছা, কবে তা হলে ঠিক হল?"

"কি?"

"বাঃ, আমাদের—" ও লাল হয়ে উঠল।

"ওহো; তা যেদিন তুমি ঠিক করবে।"

"আমি ত চাই এখনি হোক," ও অধীর গলায় জানাল, "আচ্ছা, আগামী ১৩ই মে করলে কেমন হয়?"

স্নানের

সময়

মার্গো সোপ

ব্যবহার করতে ভুলবেন না

সুরভি-সুন্দর মার্গো সোপের শুভ্র ফেনরাশি প্রতিটি লোমকূপের গভীরে প্রবেশ করে মালিন্য দূর করে এবং দেহে স্বাস্থ্য ও যৌবনের দীপ্তি এনে দেয়। পরিবারের সকলের ব্যবহারের পক্ষে আদর্শ এই সাবান। কোমল ত্বকের পক্ষেও নিরাপদ।

প্রস্তুতকারক

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

কলিকাতা - ২৯

"বেশ!"

"আরো দুই সপ্তাহ বাকী; উঃ, এতগুলো দিন! জান, করে যে তোমায় আমার মত করে পাব,—ভাবতেও ভাল লাগছে!"

"যে লগ্নে তোমায় আমি কথা দিয়েছি তখন থেকেই ত' আমি তোমার, একান্ত তোমার, লুই।" আমি উত্তর দিলাম।

ও বড় খুসী হল এ কথায়।

"জানো মার্গো, আমি ঠিক করেছি তোমায় নিয়ে সোজা দক্ষিণ দেশে চলে যাবো; এখানের এই কনকনে উত্তুরে হাওয়ার আওতা থেকে বহু দূরে উষ্ণ কোন প্রদেশে; সেখানে আমার জীবন-প্রসূন ফিরে পাবে তার পূর্বলাবণ্য!"

ওর মধুর কথা শুনে আমার চোখ সজল হয়ে উঠল। এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে অল্পতেই বিচলিত হই আজ-কাল। ওর শিশুর মত সুন্দর কপালের এলোমেলো চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে চেয়ে রইলাম একদৃষ্টিতে।

"কি ভাবছ বলত?" ও হাসল।

"ভাবছি যে তোমার রূপ, তোমার মহত্ব আমার প্রকৃতির সঙ্গে কি খাপ খাবে?"

দু' ফোঁটা জল পড়ল ওর হাতে। কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে আমার হৃদয় আজ ভরপুর; আমার মাথা ওর বুকে, ওর মুখ আমার কপালে। জীবনের তরী আজ বন্দর খুঁজে পেয়েছে!

এই মে।—গিয়েছিলাম 'ওর' মাকে দেখতে; ওঁর মাথার অবস্থা খুবই খারাপ; এক দিক দিয়ে এ ভালোই হল! তা নয়ত এত যাতনা সহ্য করা ওঁর পক্ষে দায় হত। কর্ণেল ওঁর কাছেই আছেন। আমায় দেখে কঁতেস চিনতে পারলেন; এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করলেন।

"কি তোর চেহারা করেছিস মা!"—এত দিন বাদে ওঁর গলা শুনে বিচলিত হয়ে পড়লাম। বড় কান্না পেল।

"তোর কি অসুখ করেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"জ্যানোয়া তোর এই চেহারা দেখে যে কি কষ্টই পাবে; ও অল্প দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছে; কি একটা কাজে ও গিয়েছে···কোথায় গিয়েছে?······ওহো! মনে পড়েছে···তুর্লতে! কি নাম-যশহীন জায়গায় যে গেল! কে জানে বাপু, নামটা শুনলেই গা রি রি করে; ওই রকমই। জ্যানোয়া বাইরে যাওয়া অবধি এমন ভীতু হয়ে উঠেছি। গান্ত' মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যায়। সারা রাত এমন সব দুঃস্বপ্ন দেখি যে তারস্বরে চেঁচাই ভয় পেয়ে,—তাই শুনে ও ছুটে আসে।"

ওঁর এই ধরণের এলো-মেলো কথা শুনে বড় কষ্ট হল। এমন সময় কর্ণেল ঢেকে এলেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই উনি আমায় অভিবাদন জানালেন। "কি দিদি, এখন শরীর কেমন?" কঁতেসকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তর দিলেন না; বসে বসে কি যেন ভাবতে লাগলেন; হঠাৎ আমায় ধরে বললেন, "কি মা, তোর মুখের হাসি একদম মিলিয়ে গেছে; ব্যাপার কি? তোকে এত গোমড়া দেখছি কেন?"

হাসার ভাণ করে বললাম, "কই কিছু ত হয় নি!"

"কিন্তু তোর সেই প্রাণোচ্ছল ভাব আর নেই; ওহো, আমিই ত তার কারণ···ভাবিস না মা, ওর ফিরে আসার সময় হল; কই আমি ওর মা হয়েও তোর মত মুখ ভার করে বসে নেই দিন-রাত?"

যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম; উনি বিদায়-আলিঙ্গন দিলেন অভ্যাসমত। নীচে কর্ণেলের সঙ্গে করমর্দন করার সময় উনি বলে উঠলেন, "শুনছি মার্গারিৎ, শীগগির তোর বিয়ে? সত্যি না কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"—ওঁর মুখে এ-প্রশ্ন শুনে খুব লজ্জায় পড়লাম; তাই মুখ নামিয়ে ছিলাম; উনি আমার চিবুক তুলে ধরে জানতে চাইলেন, "কাপ্তেন লফেভ্র-এর সাথে, তাই না?"—ফটক অবধি উনি আমায় পৌঁছে দিতে এলেন; বেশ চিন্তামগ্ন লাগল ওঁকে; স্বপ্নোত্থিতের মত বললেন, "তুই কি একা এসেছিস মা?"

"না, বাইরে লুই আমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

আমরা বেরিয়ে আসতেই লুই এগিয়ে এল; করমর্দনের পর ওঁদের কথা শুরু হল। আর পাশে এসে লুই জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়নি?"

"না; কিন্তু এখানে খানিক বসে যাই না কেন?"

লুই ভাবল আমার শক্তি ফুরিয়ে এসেছে; একটা ওক গাছের ছায়ায় বসা গেল। কর্ণেল আমার কাছেই বসলেন; বললেন, "এখনো তুই বড় দুর্বল দেখেছি।"

লুই জানাল যে আমার খুব অসুখ হয়েছিল।

"হ্যাঁ তা ত জানি।"

"এবার দেখবেন আস্তে আস্তে ও কেমন সেরে ওঠে!" বলে লুই হাসল। অদম্য ওর আশা। ও আমায় একান্তই ভালবাসে! আমি যেন ওর প্রেমের যোগ্য হতে পারি, ভগবান!

কর্ণেল বিশেষ কিছু বলছিলেন না; লুই তা লক্ষ্য করে নি। স্মিত হাস্যে ও আমার দিকে চেয়েছিল—আমাদের অদূরেই যে সুখ-পারাবার, তার স্বপ্নে ও একাগ্র। একটু জিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম; যাবার সময় হল। কর্ণেল বেশ আবেগপূর্ণ ভাবে আমায় বিদায় দিলেন।

"মা আমার, তুই আমাদের যে সাহায্য করেছিস, তার জন্য ভগবান তাঁর আশীষে তোকে ধন্য করুন, মা!"

তারপর লুইয়ের সাথে করমর্দনের সময় বললেন, "মঁসিয়্য ওকে সুখী কর; জীবনসঙ্গিনীরূপে যাকে তুমি পেয়েছ সে যে কত দুর্লভ তা যদি জানতে! তুমি ওকে ভালবাস, বেশ বুঝছি; তার থেকেই বুঝছি ছেলে হিসাবে তুমি কি রকম। জীবনে তোমাদের সাথে আর দেখা হবে কি না জানি না; তবু এ কথা জেনে রাখ যে বুড়ো এক সৈনিকের শুভেচ্ছা চিরকাল তোমাদের দু'জনকে আগলে রাখবে।"

বলেই চলে গেলেন। আমরা বাড়ী ফিরলাম। বেশ রাত হয়েছে; বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

"এই ত', এসে গেছে!" উনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

"মা-মণি, ক্লান্ত লাগছে না ত'?"

আদলফ আলো নিয়ে এল।

"তোকে মা বেশ অবসন্ন লাগছে।" বাবা বলে চললেন।

লুই অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। আমি হাসলাম দেখে ওঁরা খানিক নিশ্চিন্ত হলেন।

"তোমাদের চোখে আমি ত আজ-কাল সর্বদাই অবসন্ন হয়ে আছি!" আমি বললাম।

লুই আর বাবা সত্যি আশ্বস্ত হলেন। বাইরের ঘর থেকে আমি নিজের ঘরে চলে এলাম। পেছন পেছন এল লুই।

"শুনছ?" ও ডাকল। আমি থামতেই ও আমায় জড়িয়ে ধরে কপালে এঁকে দিল স্নেহচুম্বন। আমি ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। পোষাক বদলে ফেললাম; খেতে যাব। ক্রুশের সামনে বসে ভগবানকে স্মরণ করলাম। আমি সবে দাঁড়িয়েছি এমন সময় লুই দরজায় টোকা দিল।

"চলে এস না!"

"আসব?"

"বেশ ত? আসবে না কেন?"—দরজা খুলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমায় গোপন করবার মত আমার কি-ই বা আছে?" ও হাসল। ওকে বসিয়ে দিয়ে ওর পাশে আমি বসলাম। বুক আমার টনটন করছে অপূর্ব আনন্দে: প্রার্থনা করছিলাম, লুইয়ের উপযুক্ত সহধর্মিণী যেন হই। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি ওর সারা মুখ তৃপ্তিতে উজ্জ্বল।

"কি ভাবছ গো?"

"কি ভাবছি জান লুই, ভাবছি তোমার ভালবাসার কথা!" বলে ওর হাতে হাত রাখলাম।

"প্রিয়তমা!" ও ডাকল, পকেট থেকে বার করল একটা ছোট বাক্স; তার মধ্যে চমৎকার একটা আংটি; সেটা আমার আঙুলে ও পরিয়ে দিল; মাপে সামান্য বড় ঠেকল যেন।

"তাতে কি পড়বার ভয় নেই!" আমি বললাম।

কালো রেশমের মত সুন্দর এক গাছা চুল দেখিয়ে ও প্রশ্ন করল, "বল'ত কার চুল?"

"তোমার মার?"

"উঁহু, তোমার!" ও হেসে বলল, "কই কবে নিয়েছ, জানি না ত?"

"জানবে কি? তোমার অসুখের সময় নিয়েছি।"

"লুই, আমার সঙ্গে চল না; পুণ্যময়ী মেরীর কাছে প্রার্থনা করা যাক।"

ও উঠে এল; বেদীতে গিয়ে ক্রুশের তলায় দু'জনে বসলাম হাত ধরাধরি করে। নির্বাক শ্রদ্ধায় ভগবানের কাছে মেলে দিলাম আমাদের হৃদয়; আমরা যা চাই, তা তিনি দেবেন। আমরা উঠতেই দীর্ঘ আশ্লেষে ও আমায় ধরে রাখল। জানলার কাছে তন্ময় ভাবে খানিক কাটিয়ে আমরা খাবার ঘরে গেলাম।

১১ই মে। মার আয়োজনের অন্ত নেই। উনি বাবা, কেউই আমায় কুটোটি নাড়তে দেবেন না। গিয়েছিলাম নদীর ধারে, লুইয়ের সঙ্গে। একটা গাছতলায় গিয়ে বসলাম; পাশেই, ঘাসের ওপর লুই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

"কবে যে আমরা এক হব, দিন রাত এই ভাবনাই আমার মাথায় ঘুরছে," বলেই ও সলজ্জ হাসি হাসল।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কেন লুই, কাল বাদে পরশু দিন না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু···"আমার দিকে তাকিয়ে ও বলল, "আচ্ছা, দিনটা পেছিয়ে দিলে হয় না?"

"না গো, দোহাই তোমার; তুমি যা বল আমি সবই করতে রাজী আছি; অমন কথা আর মুখে এন না লক্ষ্মীটি!"

ও আমার হস্ত চুম্বন করল।

এমন সময় পাশের ঝোপটা নড়ে উঠল। দেখি, শ্রীমতী গোসরেল সঙ্গে একজন ভদ্রলোক,—অবাক হয়ে চেয়ে আছেন। লুই এক লাফে উঠে দাঁড়াল। গোসরেল খিলখিল করে হাসতে লাগল।

"বড় খারাপ সময়ে এসে পড়লাম, না কাপ্তেন সাহেব?" তারপর আমায় বলল, "তোর বাড়ী গিয়েছিলাম; তুই শুনলাম বেরিয়ে গেছিস্; অসভ্যের মত হাসতে হাসতে নীচু গলায় ও বলে ফেলল, "জানতাম কি ছাই কার সাথে কোথায় গিয়েছিস্; তা হলে আর তোদের বাগড়া দিতে আসব কেন?

লুই ওর চাবুকটা ঘাসের উপর এলোপাথাড়ি মারতে লাগল অন্যমনস্ক ভাবে; ওর অধৈর্য ভাব দেখে গোসরেল আমার হাত ধরে সহানুভূতি জানাল, "কি বদলে গেছিস তুই? একি চেহারা হয়েছে?"

ওর সঙ্গীর নাম মঁসিয়্য ভালীন—এই বলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ও কানে কানে বলল, "বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; বাপের ব্যবসা আছে; টাকা-কড়িতে পাকা ইহুদী!"

তার পর সাদা গলায় জিজ্ঞাসা করল, "শরীর খারাপ হয়েছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"ওঃ, তাই বল; কিছুই ত জানতাম না। পারী গিয়েছিলাম। তুই কখনো পারী যাসনি, না রে?"

"একবার গিয়েছি।"

"শুনলেন ত মঁসিয়্য ভালীন? বেচারা জীবনে একবারের বেশী পারী যায়নি!"

অমায়িক হাসি হেসে ভদ্রলোক অভিবাদন জানিয়ে আমায় বললেন, "মাদমোয়াজেল আবার যদি কখনো পারী যান, যা কিছু সেখানে দেখার আছে আপনাকে ঘুরিয়ে দেখানোর ভার আমি নিলাম।"

হঠাৎ বহু কণ্ঠের সাড়া পেলাম; আমাদের দিকেই যেন এগিয়ে আসছে।

"ওই ত।" গোসরেল চেঁচিয়ে উঠল, "ওরা আসছে; সিলভী, এই যে আমরা এখানে।"

তিন জন মহিলা আর দুই ভদ্রলোক হাজির হলেন।

"এই দেখ," একটি মহিলাকে ও ডাকল, "এইটি আমার গাঁয়ের বন্ধু।"

তার পর আমায় বলল, "আর এরা আমার পারীসিয়ান বন্ধু: শ্রীমতী বুতেভ, শ্রীমতী মাবির্ত, মাদাম কারসা।"

তারপর ভদ্রলোক দুজনের সাথে আলাপ করিয়ে দিল। এত সোরগোল আমার সইছিল না; দারুণ হাঁপিয়ে উঠলাম।

"কাল আমরা সমুদ্রের ধারে একটি প্লেজার ট্রিপে যাচ্ছি রে মার্গারিৎ; তুই আসবি ত?"

"না," আমি জবাব দিলাম।

"কেন, অমন সরাসরি হঠাৎ 'না' বলছিস কেন রে? চল চল, তোকে যেতেই হবে; রাজী ত?"

লুই আমার হয়ে জবাব দিল এবার, "ও অল্পতেই আজকাল বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় না যাওয়াটাই কাম্য।"

"বেশ আপনি ওর হয়ে চলুন তবে," ওকে ধরে বসল গোসরেল।

"না মাদমোয়াজেল, আমার পক্ষেও যাওয়া সম্ভব হবে না ; মাফ করবেন।"

"বেশ, বেশ, কাপ্তেন সাহেব, আপনার রাগ এখনো পড়ে নি দেখছি! তবুও আপনাকে অনুরোধ করছি, যদি আসেন, বড় সুখী হব ; আসবেন ত? না! ধন্য একরোখা মানুষ বাপু!"

আমাদের সঙ্গে করমর্দনের পর ওরা চলে গেল ; দূর থেকে ও দস্তানা-পরা হাত নেড়ে আমায় বিদায় জানাল।

১২ই মে।—আজ সন্ধ্যাবেলায় জানলার ধারে বসে ছিলাম সোফার ওপর ; লুই এল। আমার পাশে বসে আমায় এক হাতে জড়িয়ে ধরল ; আমি ওর কাঁধে মাথা রাখলাম। ওর পাশে বসে বড় আনন্দ। এই একটি হৃদয় কত যে আন্তরিকতা আর প্রেমে ভরা, আমি জানি। আরো জানি যে জীবনে সব বাধা-বিপত্তির হাত থেকেই ও আমায় আড়াল করে রাখবে। ওর কপোল আমার কপালে, ওর হাত আমার হাতে, আমার মাথা ওর কাঁধের ওপর ; আমরা নীরবে এই মুহূর্তটি উপভোগ করছিলাম। কাল আমাদের দুটি হৃদয় এক হবে। দুই বার ও আমায় চুমু দিল সন্তর্পণে।

লুই যেতেই বাবা এলেন : লুই কোথায় জানতে চাইলেন।

"ওই ত," আমি দেখালাম। লুই পায়চারী করছে। ধূমপানরত। "এইমাত্র ও ত এখানেই ছিল।"

"বল্ মা, তুই সুখী হবি ত?"

ওকে আমি দুই হাতে চেপে ধরে বললাম, "হ্যাঁ বাবা।"

উনি তৃপ্ত হলেন।

"লুই তোকে নীস্-এ নিয়ে যেতে চাইছে।"

"হ্যাঁ, আমাকেও বলেছে।"

"তোকে ছেড়ে থাকা বড় কঠিন হবে মা!"

"বাঃ, তোমরা যেন যাবে না আমাদের সঙ্গে, তুমি আর মা!" আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

আমরা পরে যাব মা! এই ঠাণ্ডা দেশ থেকে তুই যত তাড়াতাড়ি যাস ততই ভাল ; দক্ষিণ দেশের হাওয়া পেলেই দেখবি কেমন সেরে উঠিস। বড় জোর এক মাস কি দুই মাস বাদেই আমরা গিয়ে জুটব। যাবার আগে এখানকার সব কিছু বিলি-ব্যবস্থা করতে হবে ত?"

১৪ই মে।—গত কাল সন্ধ্যার সময় আমাদের পরিণয় সম্পন্ন হয়েছে। পুরুত ঠাকুর যখন ওর হাত আমার হাতে দিলেন, আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। আমি যেন আদর্শ স্ত্রী হতে পারি। গীর্জা থেকে যখন বের হলাম, আমাদের পথে মুঠো মুঠো ফুল ছড়ান হল। হঠাৎ একটা গান আমার মনে পড়ে গেল ; কোথায় যেন পড়েছিলাম :

"নবোঢ়া রূপসী যে-পথে যাবে,
ফুলে ফুলে দাও সে-পথ ছেয়ে ;
পথে পথে ফুল, ফুটনের হাসি,
রূপসী নবোঢ়া এ পথে যাবে!"

গানের শেষটা বড় করুণ :

"পথে পথে ওঠে শোক-ক্রন্দন,
মৃতা রূপসী যে এ-পথে যাবে ;
পথে পথে শোক, অশ্রু-অর্ঘ,
রূপসী মৃতা যে যাবে এ-পথে!"

আমারো কি এই অবস্থা হবে? ভগবান জানেন। আমাদের মঙ্গলের জন্য তিনি সব করেন।

বাবা আর মা বাড়ীর সামনেই আমাদের বরণ করে নিলেন।

চারি দিকে দারুণ ভীড় ; বয়স্করা উচ্চ কণ্ঠে আশীষ জানাচ্ছেন। এঁরা সবাই আমায় অতি ছেলেবেলা থেকে স্নেহ করে আসছেন। লুইয়ের পুরুষালী উদার চেহারা দেখে সবাই বড় সুখী হলেন। বাবা আমায় আলিঙ্গন জানালেন, লুইকেও।

মা দুই হাতে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। ওঁর চোখে জল ; আনন্দাশ্রু। লুই অতি সুখী আজ ; বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মাকে জড়িয়ে ধরল ও।

"বাবা, তোর হাতে আমাদের একমাত্র সন্তানকে সঁপে দিলাম।" উনি বললেন, "জানি তুই ওকে কত ভালবাসিস, আর ও তোর ঘরে গিয়ে আনন্দেই থাকবে। ভগবান তোদের মঙ্গল করুন।"

তেরেস আনন্দের আতিশয্যে আমার গলা আঁকড়ে রইল, "যা দিদি, সুখী হ!"

তারপর বলল, "কিন্তু মাদাম, স্বাস্থ্যটার দিকে একটু নজর দিস, বুঝলি বাছা!"

রাত্তিরে আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন পুরুতঠাকুর, সপরিবারে মেয়র মশাই, সপরিবারে ডাক্তারবাবু, মাদাম গোসরেল ও তাঁর মেয়ে। নব দম্পতীর স্বাস্থ্য-কামনায় পানপর্ব শুরু হল। লুইয়ের মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। শ্রীমতী গোসরেল আমায় উত্যক্ত করে তুলল,—এ কথা ওকে আমি আগে জানাইনি কেন,—এই বলে।

"তুই ভারী দুষ্টু ; এই ত গত পরশু দিন দেখা হল ; কানে কানে একবার বলে দিতে কি আপত্তি ছিল?"

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ছাত্রদের প্রতি বেত্র-ব্যবহার সম্পর্কে বিদ্যাসাগর

আমার মতে অপরাধের প্রকৃতি যাহাই হোক না, নাবালকদের শিক্ষায় দৈহিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা কর্তব্য। বালকদের শিক্ষাদান কার্যে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দৈহিক শাস্তি পরিণামে অশুভজনক ; ইহাতে শাস্তিপ্রাপ্ত বালক না শোধরাইয়া বরং নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে আমি দৃঢ়ভাবে প্রস্তাব করিতেছি, এই নিয়ম যেন অবিলম্বে উঠাইয়া দেওয়া হয়।

(১১ই জানুয়ারী, ১৮৬৫)

এক মুঠো আকাশ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

সিনেমায় তেমন ভীড় ছিল না। কাজের দিন, তিনটের সময় বেশী লোক আশা করা যায় না। তবু ট্রাম-রাস্তার ওপর আর বাজারের কাছে বলে সামনে দিয়ে লোক চলাচলের বিরাম নেই।

ছেলেটা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছবি দেখে, সিনেমা হলের বাইরে আঁকা লাস্যময়ী নায়িকা, তার বিচিত্র ভঙ্গিমা। সিগারেটে জোর টান দিয়ে অনভ্যস্ত হাতের চার আঙুলে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। একমুখ পান, বয়স বেশী নয়, ছাত্র হলে ম্যাট্রিক দিতে এখনও দেরী আছে।

না দেখে পেছু হাঁটতে গিয়ে কার সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ভদ্রলোক তিড়বিড়িয়ে ওঠেন, ভারী ডেঁপো তো, বয়সের মান-সম্মান নেই, বাবা-কাকার গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিচ্ছ?

ছেলেটা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে যায়, আমি ইচ্ছে করে লাগাইনি—

—ছি, ছি, আবার এ নিয়ে কথা, গলা টিপলে দুধ বেরোয়। বাপ-মার পয়সা ধ্বংস করছ? দেখছেন মশাই আজ-কালকার ছোঁড়াগুলোকে? গোল্লায় গেছে। লেখাপড়ার বালাই নেই, বিড়ি-সিগারেট, সিনেমা, শুধু এই হচ্ছে।

দেখতে দেখতে ছোটখাট ভীড় জমে যায়, সকলেই ভদ্রলোকের পক্ষে, আজকালকার ছেলেদের অর্বাচীনতা সম্বন্ধে মুখর হয়ে ওঠেন।

—আপনার বরাত ভালো যে মুখে ধোঁয়া ছেড়ে দেয়নি।

—জিজ্ঞেস করে দেখুন না, শুনবেন হয়তো বাড়ীতে দুবেলা হাঁড়ি চড়ে না।

—কি খোকা, ইস্কুল-টিস্কুল নেই বুঝি? এখানে কি করা হচ্ছে?

ছেলেটা উত্তর খুঁজে পায় না, সিগারেটের ছ্যাঁকা লাগানোর অনিচ্ছাকৃত অপরাধে যে এ ধরণের অসহায় অবস্থায় পড়তে হবে তা সে কল্পনাও করেনি।

—বেশ করছে সিগারেট খাচ্ছে আপনাদের কি? একজন ছেলেটার কাছে এগিয়ে আসে।

এইটুকু দুধের ছেলে—

—এত দরদ তো এক বাটি দুধ খাওয়ান না, সে মুরোদ নেই, শুধু ঝুড়ি ঝুড়ি বুকনি। সিগারেট খেয়ে তো আপনাদের পয়সা ওড়ায়নি। এস তো খোকা আমার সঙ্গে।

ছেলেটা যন্ত্রচালিতের মত এই অপরিচিতের সঙ্গে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে আসে।

—সিনেমা দেখবে?

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকায়, আমার কাছে পয়সা নেই—

—আমি দেখাব, চল।

সামনের দিকে দুটো সিটে পাশাপাশি বসে তারা ছবি দেখে। আধুনিক বাংলা ছবি, ছোটদের জন্যে নয়।

—কি রকম লাগছে?

—ভাল, ছেলেটা আস্তে উত্তর দেয়।

ছবি শেষ হলে তারা বেরিয়ে আসে। গরমকাল, সন্ধ্যে তখনও নামেনি।

—খুব ভাল লাগল, ছবি দেখতে আমি ভীষণ ভালবাসি।

—এই সিনেমায় যে বই ইচ্ছে তুমি দেখতে পার, এখানে আমার পয়সা লাগে না। ছেলেটার চোখ দুটো নেচে ওঠে, তাহলে খুব মজা হয়, আপনার সংগে কোথায় দেখা হবে?

—এখানে কিম্বা ওই গলির মধ্যে চায়ের দোকান আছে, অনন্ত কেবিন, ওইখানে।

—আপনার নাম তো জানি না?

—কেষ্টদা'।

দিন দুই পরের কথা। অনন্ত কেবিনের এক কোণে বসে কেষ্ট চা খাচ্ছে, এ তার আজকের অভ্যেস নয়। চা খায়, কাজ করে, নিজের মনে ভাবে, কখনও গল্প করে। কেবিনের মালিক আশুদা' সদাশিব মানুষ, পয়সা বাকী পড়লে কিছু বলেন না, একসময় চুকিয়ে দিলেই হ'ল। এ কেবিনে সব ধরণের লোক আসে, কলেজের ছাত্র, চাকুরে, বেকার, ব্যবসাদার থেকে সুরু করে জুয়াড়ী, এমন কি সিনেমা থিয়েটারের অভিনেতা পর্য্যন্ত। আসে না শুধু মেয়েরা, বোধ হয় আলাদা ব্যবস্থা নেই বলে।

কেষ্টর নিত্যসঙ্গী প্রভাত। সে সাহিত্যিক, কাগজ-কলম নিয়ে বসে খস-খস করে লিখে যায় ফরমাশ মত গল্প, প্রবন্ধ উপন্যাস। কয়েক কাপ চা আর কয়েক প্যাকেট সিগারেট তার সাহিত্যের প্রেরণা যোগায়। আজও প্রভাত বসে লিখছিল।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কি লিখছিস?

প্রভাত মুখ না তুলে উত্তর দেয়, একটা বড় গল্প, কড়া হয়েছে, তোকে পড়ে শোনাব।

—প্রেমের?

—দূর দূর, ও-সব প্যানপ্যানে জিনিষ আজকাল চলে না, একখানা বিদেশী গল্পের বাংলা রূপ দিলাম, কোন শালাকে ধরতে হবে না যে চুরি করেছি।

প্রভাত বক বক করে একটু বেশী, শুনে শুনে কেষ্টর অভ্যেস হয়ে গেছে, অর্দ্ধেক কথায় মন দেয় না।

কেবিনের বাইরে ভোট নিয়ে কারা ঝগড়া করছিল, দু'দলের মধ্যে বচসা আর কি। কেষ্ট বসে তাই খানিকটা শোনে। আশুদা' বিড় বিড় করেন, ছোঁড়াগুলো আর ঝগড়া করার জায়গা পেলে না, মরতে আমারই দোকানের সামনে এসে জুটল!

হয়তো আরো কিছু বলতেন, যদি না ছেলেটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়াত।

—কি চাই?

—কেষ্টদা' আছেন?

আশুদা' উত্তর দেবার আগেই কেষ্ট হাত নেড়ে ডাকে, এই যে, এদিকে। ছেলেটি কেষ্টর সহাস্য মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে, কাছে গিয়ে বসে পড়ে।

—আমি ভেবেছিলাম কাল তুমি আসবে।

—ইস্কুল ছিল যে।

—তুমি স্কুলে পড়?

—হ্যাঁ, বিদ্যাভবনে।

—বটে, কোন ক্লাশে?

—থার্ড ক্লাশ।

—কি খাবে বল? চপ আনতে বলি?

ছেলেটির উত্তর দেবার আগেই কেষ্ট কেবিনের ছোঁড়া চাকরকে হাঁক দিয়ে বলে, ওরে নিতাই, দুটো চপ দিয়ে যা।

ছোট রেকাবীতে চপ আসে, সংগে খানিকটা কাঁচা পেঁয়াজ। ছেলেটি প্রাণ ভরে খায়, গল্প করে।

—মা নেই, মারা গেছে আমার ছোটবেলায়।

—বাবা?

—বাবা আছেন, মফঃস্বলে কাজ করেন ওষুধ বিক্রীর।

—কোলকাতায় কোথায় থাকো?

—মামার বাড়ীতে।

—স্কুলে যেতে ভাল লাগে না?

—না, ইংরিজী, অঙ্ক মাথায় ঢোকে না যে।

প্রভাত কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে, আমি চলি রে কেষ্ট, যেতে হবে।

কেষ্ট ছেলেটির কাছে সরে আসে, কি করতে ভাল লাগে?

একটু চুপ করে থেকে ছেলেটি হঠাৎ উত্তর দেয়, বেড়াতে। নিজের ইচ্ছেমত যেখানে খুশী।

—চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, এ-সব দেখেছো?

—দেখেছি ছোটবেলায়, খুব বেশী মনে নেই।

—কাল এই সময় এসো, তোমায় ঘুরিয়ে আনব।

—সত্যি, ছেলেটা উৎসাহিত হয়, খুব মজা হবে তাহলে—

কেষ্ট প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে, নাও।

ছেলেটা চার দিক দেখে নেয়, আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, খাবো?

—খাও, এখানে কেউ কিছু বলবে না।

ছেলেটা কেষ্টর সংগে সিগারেট ধরায়।

—তোমার নাম কি?

—মা আমার নাম দিয়েছিলেন শ্যামল।

কেষ্ট শ্যামলকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়ায়। পাখীর খাঁচা, বাঁদরের ঘর, ওরাং ওটাং,—

—ঠিক মানুষের মত, না কেষ্টদা'?

—আমরা তো ওই ছিলাম।

—দেখুন কি রকম সিগারেট খাচ্ছে।

দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে দিয়েছিলো, ওরাং ওটাং দিব্যি মৌজ করে টানতে থাকে।

ঐ দিকে তাকিয়ে থেকেই শ্যামল বলে, আপনার সিগারেটগুলো একটু অন্য রকম না?

—বেশী কড়া।

—একটা খেলেই আরেকটা খেতে ইচ্ছে করে।

কেষ্ট হাসে, সিগারেট চাই তো পরিষ্কার করে বললেই পার।

দু'জনে সিগারেট ধরায়।

নতুন সিংহ এসেছে, হুঙ্কার ছেড়ে পায়চারী করছে, শ্যামল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

—একেই বলে পশুরাজ, কি সুন্দর চেহারা।

—চল বেঞ্চিটায় একটু বসি। শ্যামল কেষ্টর পাশে গিয়ে বসে।

—মাইনের খাতা আনতে বলেছিলাম, এনেছো?

—এই যে, শ্যামল খাতা এগিয়ে দেয়।

কেষ্ট চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, তিন মাসের মাইনে দেওয়া হয়নি।

—না।

—কেন, বাড়ীতে টাকা দেয়নি?

—দিয়েছিলো, খরচা হয়ে গেছে।

কেষ্ট একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, ক্লাশে নাম ডাকে?

—না, কেটে দিয়েছে।

শ্যামলের গলা ভারী হয়ে আসে, তাইতো স্কুলে যাই না।

কেষ্ট ডান হাতটা শ্যামলের কাঁধের ওপর রাখে, তাতে কি হয়েছে, আমি সব ঠিক করে দেবো। একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, যা জিজ্ঞেস করব বলবে আমায়?

—কি?

—কত দিন সিগারেট খাচ্ছো?

—এক বছর।

—কে শেখালো?

—ঝুনো নারকোল।

—সে আবার কে?

—রামচন্দ্র, আমাদের ক্লাশের ছেলে, মাষ্টার মশাইরা ডাকেন ঝুনো নারকোল বলে, তিন বছর একই ক্লাশে আছে কি না।

কেষ্ট কথা চাপা দিয়ে বলে, চল আজ ওঠা যাক।

গল্প করে হাঁটতে হাঁটতে কতখানি পথ চলে এসেছে, শ্যামলের খেয়াল ছিল না, কালীঘাটের কাছে এসে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, আরে, এ যে অনেক দূর এসে গেছি কেষ্টদা', ঐ তো কালীঘাটের মন্দির।

—আর হাঁটতে হবে না। এই বলে কেষ্ট পকেট থেকে চিরুণী বার করে শ্যামলের হাতে দেয়, চুলটা সামনের দিকে পেতি পেড়ে আঁচড়ে নাও, আমি এখুনি আসছি।

নীচু গলায় বলে, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, তুমি আমার ছোট ভাই।

শ্যামলকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কেষ্ট মোড়ের তিন তলা সাদা বাড়ীর ভিতর চলে যায়। প্রথমটা বুঝতে না পারলেও শ্যামল কেষ্টর কথামতই কাজ করে। বাড়ীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকায়, রাস্তায় কত রকম লোক, গ্যাসের আলোর

নীচে আলুকাবলীওয়ালা, মোড়ের চায়ের দোকানে গলা-ভাঙা রেডিওর গান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্তি ধরে যায়।

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে সদর দরজা খুলে কেষ্ট ডাক দেয়, শ্যামল এদিকে আয়। শ্যামল এগিয়ে আসে, তাকে দেখিয়ে কেষ্ট বোঝাতে সুরু করে, এর কথাই এতক্ষণ বলছিলাম। আমার ছোট ভাই শ্যামল, কি কষ্টে যে লেখাপড়া করছে, বই কেনবার পয়সা জোটে না, তার উপরে দু' মাসের মাইনে বাকী, আমার অবস্থা আপনি তো জানেন-ই।

কর্তার হাতে শ্যামলের মাইনের খাতা। নেড়ে-চেড়ে দেখে বলেন, বুঝতেই তো পারছি কিন্তু কি করব বল, সকাল থেকে লোক আসছে, কত জনকে সাহায্য করব।

কেষ্ট ভেঙ্গে পড়ে বলে, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে এসেছি।

—আমি এক মাসের মাইনে সাত টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

—আর তিন টাকা, দুটো বই-এর দাম। আপনাকে আর জ্বালাতন করব না।

—না না, ঐ সাত টাকা। আর আসবে না, মনে রেখো।

কেষ্ট জিভ কেটে কর্তার পায়ের ধুলো নেয়, আজ্ঞে না, আপনি গরীবের মা-বাপ, তাই খুব বিপদে পড়লে ছুটে আসি। সবাই কে, দুঃখীর কথা বোঝে না।

টাকা নিয়ে তারা বেরিয়ে আসে। শ্যামল চলতে চলতে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি আবার আমায় স্কুলে পাঠাতে চান?

উত্তর না পেয়ে বলে, আমি কিন্তু স্কুলে যাবো না।

—ইচ্ছে না করে যেও না।

পানওয়ালার দোকানে দাঁড়িয়ে নোট ভাঙিয়ে কেষ্ট সাড়ে তিন টাকা শ্যামলের হাতে দিয়ে বলে, এটা তোমার।

—টাকা নিয়ে আমি কি করব?

—যা ইচ্ছে তাই করবে, এর জন্যে কাউকে হিসেব দিতে হবে না।

বাড়ীর কাছে এসে শ্যামল কেষ্টর কাছ থেকে বিদায় নেয়, ক্লান্ত-স্বরে বলে, কাল আসব।

দরজা খোলা ছিল। কেষ্ট ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরে উঠে যায়। নীচে কারা এসেছে, আলাপ করার প্রবৃত্তি হয় না। ঘরে ঢুকে জামা খুলে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখে। পা না ধুয়েই বিছানায় বসে পড়ে।

একটু পরে ভাইঝি শ্যামা ওপরে আসে।

—কাকু, তোমার খাবার নিয়ে আসি?

—নিয়ে আয়।

—তুমি নীচে আসবে না?

—নীচে, কেন?

—অনেকে এসেছে মামার বাড়ী থেকে।

—না, আমি যাবো না। পারিস তো খাবার নিয়ে আয়।

শ্যামার বয়স দশ কি বারো হবে, চুলের মত কালো রং, ভীষণ কোঁকড়া চুল, একটুকু শ্রী নেই চেহারায়।

কেষ্টর কথামত সে খাবার ওপরে নিয়ে আসে, আজ পদের বাহুল্য ছিল। কেষ্ট খেতে বসে বায়—নে, তুইও খা।

—আমি খেয়েছি।

—তা কি হয়েছে, নে মাছটা খেয়ে ফেল।

কেষ্ট হঠাৎ বলে, তুই নীচে যা, আমি এঁটো বাসন সব গুছিয়ে রাখবো।

শ্যামা কথা বলে না, চুপ করে বসে থাকে।

—বসে রইলি যে, যা।

—নীচে আমার ভাল লাগে না।

কেষ্ট ভাল করে শ্যামার মুখটা দেখে নিয়ে বলে, কেন কি হয়েছে রে?

শ্যামার চোখে জল ভরে আসে! কেষ্ট খাওয়া ফেলে তাকে কাছে টেনে নেয়, বোকা মেয়ে কাঁদতে আছে কখনও!

শ্যামা ফুঁপিয়ে ওঠে, মামার বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা আমায় কিরকম ঠাট্টা করে, বলে তোর নাম শ্যামা নয়, কালী। জিভ বার করে দাঁড় করিয়ে দিলেই সাক্ষাৎ, মা-কালী।

কান্নায় তার কথা আটকে যায়।

—বড়দের কাউকে বলে দিসনি কেন?

—বাবাকে বলেছিলাম।

—কি বললে?

—বললে, ঠিকই তো বলেছে, এতে রাগের কি আছে, কাক বলেনি এই ঢের।

কথা বলতে বলতে শ্যামা হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলে, তাই শুনে ওরা কি রকম হাসছিলো।

কেষ্ট শ্যামার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, অনেকক্ষণ কেঁদে শ্যামা শান্ত হয়।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে খেয়াল ছিল না। নীচে থেকে ছোটদের দলের গলা শোনা যায়, মা কালী গেল কোথায়, মা কালী?

সিঁড়ি দিয়ে সবাই ওপরে উঠে আসে, শ্যামা কেষ্টকে জড়িয়ে ধরে।

ছেলের দল কেষ্টকে দেখে থমকে দাঁড়ায়, দরজার বাইরে থেকে শান্ত গলায় ডাকে, শ্যামা খেলবি আয়।

কেষ্টর কণ্ঠলগ্ন শ্যামা মাথা নেড়ে জানায় সে যাবে না।

—আয় না, আয় না, বলে এগিয়ে এসে তাদের মধ্যে এক জন শ্যামার হাত ধরে টানে। রাগে কেষ্টর ঠোঁট কাঁপছিল, সজোরে চড় মারে ছেলেটার গালে। জানোয়ার, বেরও এখান থেকে।

মার খেয়ে ছেলেটা মাটিতে পড়ে যায়, গালে হাত রেখে ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ায়। ততক্ষণে অন্যরা কলরব করতে করতে নীচে নেমে গেছে, ও তাদের সংগে যোগ দেয়।

শ্যামা হতভম্ব হয়ে যায়, কেষ্টকে এতখানি রাগতে সে আগে দেখেনি। বিছানার কোণে গিয়ে বসে। কেষ্ট বাঁ হাত দিয়ে চোখ দুটো চেপে ধরে।

নীচে ছেলেটার কান্না শোনা যাচ্ছে, অন্যদের নালিশ, দাদার গর্জ্জন।

একটু বাদে উঠোন থেকে দাদার চিৎকার শোনা যায়, কোথায় গেল মুখপুড়ী, শ্যামা, শ্যামা—ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে কেষ্ট উত্তর দেয়, ও এখন যাবে না।

—আসবে না মানে? আমি ডাকছি আসবে না? আলবাৎ আসবে।

—যাবে না।

—এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার কথা অমান্য করা, এই সব শিখছে তোমার কাছে। কেষ্ট আরও গলা চড়িয়ে বলে, বেশ করছে।

—আমার শ্বশুর বাড়ীর লোকের গায়ে তুমি হাত দিয়েছ কোন সাহসে?

—একশো বার দেব, ছোটলোকমি করলে।

দাদার আর ধৈর্য্য থাকে না। সিঁড়ির উপর কয়েক ধাপ উঠে পড়েন, ছোট লোক? তুমি নিজে ছোট লোক, ক' অক্ষর গোমাংস, ভ্যাগবণ্ড, লোফার।

সাটআপ, কেষ্ট ধমকে ওঠে, বাজে বকো না।

—বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।

—তোমার বাড়ী, নিজের পয়সায় করেছো, কেরাণী আবার বাড়ী করবেন। পৈত্রিক বাড়ীতে তোমার যত ভাগ আছে আমারও তত ভাগ।

—আচ্ছা, দেখা যাবে। শ্যামা চলে আয়।

—ও এখন যাবে না।

—ও নিজের মুখে বলুক।

—আমি বলছি ও যাবে না।

—আচ্ছা দেখছি, পুলিশ ডেকে নামিয়ে আনবো। তোমার ওস্তাদি বার করছি। কেষ্ট আর কথা বলে না, দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। শ্যামা কাঁদছিল, এতক্ষণে কেষ্টর খেয়াল হয়, কাঁদলে গলা টিপে দেব, শুয়ে পড় এখানে।

ভোর রাত্রে বৌদি এসে দরজা ঠেলে, ঠাকুরপো?

কেষ্ট দরজা খুলে দেয়, বৌদি ভয়ে ভয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অনুমতি চায়, শ্যামাকে নিয়ে যাই।

—যাও। কেষ্ট শুকনো গলায় উত্তর দেয়।

একটু থেমে বৌদি কৈফিয়তের সুরে বলে, তোমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে যা মেজাজ, আমি তো ভয়ে মরি। বিশেষ করে তোমার দাদা, মাথার যদি এতটুকু ঠিক থাকে, মার পেটের ভাই, তাকে বলছে কি না—

কেষ্ট বাধা দেয়, আমার এখনও ঘুম কাটেনি বৌদি! তুমি বরং মেয়েটাকে নিয়ে যাও, দেখো, আবার মারধোর কোর না।

কথা শুনে বৌদি তো অবাক, কি যে বল, নিজের মেয়ে—

—থাক্ থাক্, ঢের বক্তৃতা শুনেছি। এখন নীচে যাও।

শ্যামা বিছানা থেকে উঠে চোখ রগড়াচ্ছিল, বৌদি আর কথা না বলে তার হাত ধরে নেমে যায়। কেষ্ট আবার দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে, কিন্তু আর ঘুম আসে না।

পরদিন সকালে কেষ্ট চা খেতে এলো অনন্ত কেবিনে অন্য দিনের চেয়েও দেরীতে। আশুদা' জিজ্ঞেস করলেন—আজ এত দেরীতে যে?

—আর বলবেন না কাল আবার ঝগড়া—

—কি, দাদার সঙ্গে?

কেষ্ট ব্যাজার মুখে উত্তর দেয়—আর কার সঙ্গে, আশুদা' হাসেন—এ আর নতুন কি, রোজই তো লেগে আছে।

—আর ভাল লাগে না। ভাবছি এবার আলাদা হয়ে যাব।

—সে তো তিন বছর থেকে ভাবছো।

—আমার আর কি। ওরাই মরবে। একতলা তো আমি ব্যবহারই করি না। উপরের একখানা ঘরে পড়ে থাকি। বাড়ী ভাগ হ'লে নিচের একখানা ঘর আমায় দিতে হবে। তখন কি করে থাকবে শুনি রাবণের গুষ্ঠি নিয়ে?

আশুদা মাথা নাড়েন, এতই যদি তোমার সুবিধে একটা উকিল আর একটা রাজমিস্ত্রী ডেকে—

কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে—হয় না আশুদা' এত সহজে কিছু হয় না। ঐ যে শ্যামা—দাদার কালো মেয়েটা—ওকে বাড়ীতে কেউ দু'চোখে দেখতে পারে না, বাড়ী ভাগ করলে আমার কাছে যেতে দেবে না। কেঁদে কেঁদেই মরে যাবে।

আশুদা' চুপ করে যান, চেঁচিয়ে বলেন, ওরে কেষ্ট বাবুকে চা রুটি দিয়ে যা।

কেষ্ট খবরের কাগজ নিয়ে ওপর ওপর চোখ বোলায়। বিশেষ কোন খবর নেই—মামুলী কথা।

আশুদা' বললেন—বাই ইলেকসনের তোড়জোড় চলছে যে।

—দেখছি তো! একটু থেমে কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কারা দাঁড়িয়েছে?

—চার জন। তিন জন তিন পার্টির থেকে আর এক জন ইনডিপেণ্ডেণ্ট।

—তিনি কে?

—রাঘব বোয়াল।

—শুনছিলাম বটে রাঘব বোয়াল দাঁড়িয়েছে।

আশুদা' চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন—ওর চর'রা এসেছিল। পাড়ার ছেলেদের চায়, ওর হয়ে খাটবার জন্যে।

—কি রকম দেবে-থোবে?

—পয়সা আছে সাধ্যমত কোরবে নিশ্চয়। আমি তোমার নাম দিয়ে দিয়েছি।

কেষ্ট আড়মোড়া ভাঙে,—যাবো একবার বিকেলের দিকে, দেখি আমার সঙ্গে পটে কি না।

বধূ বাঁড়ুজ্জের বাড়ী পাড়াতেই। মোড়ের মাথায় তিনতলা বিরাট বাড়ী, দু'খানা গাড়ী, তকমা আঁটা দ্বারবান। গেটের দু'পাল্লায় ইংরাজী বড় হরফে লেখা আছে, আর, বি। তাই পাড়ার লোকে নাম দিয়েছে, রাঘব বোয়াল।

আজ আর কেষ্টকে দ্বারবানের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হল না। সেলাম ঠুকতে ঠুকতে নিয়ে গেল বৈঠকখানায়। সেখানেও আপ্যায়নের ত্রুটি নেই। রাঘব বোয়ালের তিন জন ছেলে চা সিগারেট যুগিয়ে যাচ্ছে, আসর জুড়ে বসে আছে পাড়ার মার্কামারা ছেলেরা সুধীর, বীরেন, ভোঁদা আর তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ। এই ঘরে তারা জড়ো হয়েছিল দাঙ্গার সময়—৪৬ সালে। তার পর এই আবার তাদের ডাক পড়েছে।

সিঙ্গাড়া-মিষ্টি-চা পরিবেশনের পর রাঘব বোয়াল তাঁর বক্তব্য জানালেন—আপনারা সকলেই জানেন, আমি নিজের ইচ্ছেয় এই উপনির্ব্বাচনে দাঁড়াইনি। পাড়ার সকলের বিশেষ অনুরোধে নিজের কর্তব্য পালনের জন্য দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু আমার তো কোন বল নেই। বল আপনারা, আপনারা যদি ভরসা দেন তবেই নির্ভয়ে এ কাজে এগুতে পারি।

আধ ঘণ্টা ধরে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন রাঘব বোয়াল। পরের জন্য কতখানি আত্মত্যাগ কারছেন তারই মহিমা প্রচার। অনেকে বাহবা দিল, অনেকে টুকরো মতামত প্রকাশ করলো, কিন্তু সকলেই একবাক্যে সায় দিল, তাঁকে সাহায্য করবে বলে।

জয়ধ্বনি করে সবাই চলে গেলেও কেষ্ট দাঁড়িয়েছিল রাঘব বোয়ালের সঙ্গে একান্তে পরামর্শ করার জন্যে।

—কেষ্ট, তোমার ওপরই আমার সবচেয়ে ভরসা। দাঙ্গার সময় এপাড়া তো তুমিই বাঁচিয়েছিলে, কেষ্টকে আপ্যায়িত করেন রাঘব বোয়াল।

—এত যে লোক জুটিয়েছেন, কাজের বেলা দেখবেন সব ঢু-ঢু।

—তা আর জানিনে, কিন্তু কি করব? এসব ব্যাপারে সকলকেই খুসী রাখতে হয়। মেয়ের বিয়ে দেওয়া এর চেয়ে সোজা।

কেষ্ট মুখে খানিকটা ডালমুট ফেলে বলে, একটা জীপ দরকার হবে।

—তা তো হবেই, আমার কারখানা থেকে আনিয়ে দেবো।

—ড্রাইভার দরকার নেই, আমিই চালাব, শুধু পেট্রোলের একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

—ওই মোড়ের পেট্রোল পাম্পে আমার এ্যাকাউণ্ট আছে, কুপন দিলেই ওরা পেট্রোল দেবে।

—কি ভাবে আমি কাজ করতে চাই ক'দিনের মধ্যেই আপনাকে জানিয়ে দেবো। আপনি আমাদের পাড়া থেকে দাঁড়িয়েছেন, আপনাকে জেতাতে না পারলে আমাদেরই লজ্জা, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন, আজ থেকে সব ভার আমরা নিলাম।

রাঘব বোয়াল বিনয়ে ভেঙ্গে পড়েন, আমি তো আগেই বলেছি ভাই, তোমাদের বলই আমার বল। আমাকে ভালবাসো বলেই তোমরা এসেছ।

—যে ক'জন কাজের লোক এপাড়ায় আছে, সকলেই আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। আজ থেকেই কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি। তবে সাবধান, অনেকে ধাপ্পা দিয়ে টাকা খসাবার চেষ্টা করবে। তাদের কথায় কান দেবেন না।

পরদিন অনন্ত কেবিনে কেষ্ট এসে দেখে, শ্যামল বসে আছে।

—কি রে, এ ক'দিন আসিসনি কেন?

শ্যামলের চোখে-মুখে কেমন যেন লজ্জার ভাব, বলে, এমনি—

কেষ্ট বসে পড়ে কাগজপত্র বার করতে করতে হাঁক দেয়, ওরে দু'কাপ চা আর মামলেট দিয়ে যা। খাবার আসতে দেরী হয়। কেষ্ট একমনে কি যেন লেখে। শ্যামল চুপ করে বসে থাকে, দেখে, অন্য দিকে দু'-একজন ভদ্রলোক রাজনীতি নিয়ে তর্ক করছেন। দোরগোড়ায় আশুদা' ক্যাশ বাক্সের কাছে বসে ঢোলেন। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একটা ভিখিরী মেয়ে পয়সা চাইছে।

কেষ্ট হঠাৎ মুখ তুলে বলে, জানি তুই এতদিন আসিসনি কেন, ভাবছিলি সেদিন টাকাটা নেওয়া উচিত হয়েছে কি না, তাই না?

ধরা পড়ে গিয়ে শ্যামলের মুখ শুকিয়ে যায়।

—টাকা কি করলি?

শ্যামল সসঙ্কোচে বলে, পকেটে আছে।

—দূর গাধা, তুই কোন কর্ম্মের নোস্‌।

এর মধ্যে খাবার দিয়ে গিয়েছিল, শ্যামল কথার কোন উত্তর না দিয়ে খেতে সুরু করে।

আর কোন কথা হয় না। প্রায় আধ ঘণ্টা বসে থাকার পর কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, মাইনের খাতা এনেছিস ?

শ্যামল মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—খাবি ?

শ্যামল ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে তাকায়।

—হাঁ করে কি দেখছিস, খাবি ?

—চলুন।

চৌরঙ্গীর এক বাড়ীতে কেষ্ট শ্যামলকে নিয়ে এল. তারা বনেদী জমিদার। আগের মত বোলবোলা না থাকলেও অবস্থা বেশ ভালই। কিন্তু সরকার মশাই-এর সংগে কিছুতে কেষ্ট কথায় পেরে ওঠে না।

—বলছি তো, আমি একটা পয়সাও দেব না।

কেষ্ট করুণ মুখে বলে, সে আপনার যা ইচ্ছে। তবে আমরা গরীব মানুষ, ভাইটা ম্যাট্রিক পাশ করলেও কোথাও একটা কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারি, দেখুন মাইনের খাতা, ক্লাশের রিপোর্ট, ছ'মাসের মাইনে দিতে পারিনি।

—মিথ্যে চেষ্টা করছ বাপু, এক দিন ছিল যখন এ বাড়ীতে হাজার হাজার কাঙালী বিদায় করা হয়েছে, আজ সে রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই।

—বড় অভাবে পড়ে ছুটে এসেছি, কিছু না হোক এক মাসের মাইনে সাত টাকা—

—সাতটা পয়সা দেবারও আমার ক্ষমতা নেই।

রাস্তায় বেরিয়ে চলতে চলতে শ্যামল হঠাৎ বলে, আমার কি রকম লজ্জা করে।

—কিসের ?

—এ ভাবে পয়সা চাইতে।

—কি এমন মানী লোক যে লজ্জায় মাথা কাটা গেল ?

শ্যামল উত্তর দেয় না, গ্যাসের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে কেষ্ট পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে। ইংরাজী টাইপকরা, নীচে কয়েক জনের সই রয়েছে, শ্যামলের হাতে কাগজটা দিয়ে বলে, ঐ কোণের লাল বাড়ীটায় যা, মাইনের খাতা, এই কাগজ, সব কিছু দেখাবি। দ্যাখ, কিছু দেয় কি না।

শ্যামল আপত্তি করতে পারে না, ভয়ে ভয়ে লাল বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কেষ্টর দেওয়া চিঠিটা পড়ে। সব শব্দের মানে না জানলেও ভাবার্থ বুঝতে অসুবিধে হয় না। তাতে লেখা আছে, এ ছেলেটি আমাদের পরিচিত, অনাথ কিন্তু মেধাবী। আপনারা একে সাহায্য করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। নীচে কয়েক জনের নাম সই করা।

বাবু বাড়ী ছিলেন না, গিন্নী-মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন—কি চাই খোকা ?

কথা বলতে গিয়ে শ্যামলের গলা আটকে যায়, কিছু বলতে পারে না। হাতের কাগজগুলো বাড়িয়ে দেয়,—আহা কি দরকার, মুখেই বল না।

—ইস্কুলে ছ'মাসের মাইনে দেওয়া হয়নি। শ্যামল থেমে যায়, হঠাৎ বলে ফেলে, আমরা বড় গরীব। এ কথা বলার সংগে সংগে ভয়ে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে, কিছুতেই থামাতে পারে না।

গিন্নী-মা চোখের জল দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন, আহা কাঁদছ কেন, লেখা-পড়া শিখে নিশ্চয়ই এক দিন রোজগার করবে, মাস কাবারের সময় হাতে বেশী টাকা নেই, এখন দু'টাকা দিচ্ছি, নিয়ে যাও।

আঁচল থেকে টাকা খুলে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করেন, কোন ক্লাশে পড় ?

থার্ড ক্লাশ।

—পুরোনো বই যদি দরকার থাকলে বোলো। আমার ছেলেরা সব কলেজে পড়ে, ইস্কুলের বই অনেক আছে। এক দিন সকালের দিকে এসে ওদের সংগে আলাপ করে নিয়ে যেও।

শ্যামল তাঁকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসে। দূরে কেষ্ট দাঁড়িয়েছিল, শ্যামলের কাছে এগিয়ে আসে, কি হল ?

শ্যামল দুটো এক টাকার নোট কেষ্টর দিকে এগিয়ে দেয়। কেষ্ট হাসে, শ্যামলের পিঠ চাপড়ে বলে, বাঃ এই তো শিখে গেছিস, তোর এক টাকা, আমার এক টাকা।

শ্যামল ম্লান হাসে, হাতের নোটটার দিকে তাকায়, এই তার প্রথম রোজগার।

শ্যামলের বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হ'ল। কেষ্টর কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে সে সোজা বাড়ীতে ঢোকেনি, পথে পথে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছে, পকেট থেকে টাকা বা'র করে বার বার দেখছে।

বৈঠকখানায় তক্তাপোষের ওপর শশধর বাবু চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি রে ফিরতে এত রাত হ'ল ?

শ্যামল চমকে ওঠে, বাবাকে এমন দিনে সে আশা করেনি। মাসের শেষের দিকে কলকাতায় বড় একটা উনি আসেন না। তাই আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি কখন এলে ?

—বিকেলের গাড়ীতে, শরীরটা ভাল নেই।

—তোর ফিরতে এত রাত হয় কেন ?

—একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দেয়, কোচিং ক্লাশে গিয়েছিলাম।

শশধর বাবু উঠে বসেন, ইস্কুলের পরে যেতে হয় বুঝি ?

—হ্যাঁ, উঁচু ক্লাশে একটু বেশী পড়তে হয়।

—কোচিং ক্লাশে আবার ফী লাগবে তো ?

শ্যামল থতমত খেয়ে বলে, না পয়সা লাগবে না, কেষ্টদা' আমাদের এমনি পড়ান।

কথা শেষ হয় না, শ্যামলের মামা জগৎ বাবু ঘরে ঢুকলেন।

—এইতো শ্যামল এসে গেছে, তুমি মিছামিছি এতক্ষণ ভাবছিলে। জগৎ বাবু তক্তপোষের ওপর বসে পড়েন। ভদ্রলোক বেঁটে, নেয়াপাতি ভুঁড়ি, সওদাগরী অফিসের বড়বাবু। সন্ধ্যেবেলা পান করা তাঁর অনেক দিনের অভ্যেস, আজকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নেশার ঝোঁকেই জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলি, তোর বাবা যে ভেবে ভেবে ম'ল।

শ্যামলের হয়ে শশধর বাবু উত্তর দেন, কোচিং ক্লাশে পড়তে গিয়েছিল।

—ওরে বাবা, ইস্কুলের ক্লাশ, তার ওপর কোচিং ক্লাশ, বিদ্যের জাহাজ হবি নাকি?

শ্যামল উত্তর দেয় না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। জানে সন্ধ্যের পর মামার কথার উত্তর দিয়ে লাভ নেই, উনি অনর্গল বকে যান।

—খবর্দার বেশী লেখাপড়া করিসনি; তাহলে অফিসের ক্লার্ক কি বেয়ারা ছাড়া আর কিছু হতে পারবি না।

কথা তাঁর বেশ জড়িয়ে আসে, আরও জোর দিয়ে বলেন, আমার বাবা ভীষণ লেখাপড়া করেছিল, ফল কি হ'ল, না ইস্কুল মাষ্টার। ষাট টাকার বেশী মাইনে এক পয়সা বাড়লো না। তার পর মনে কর তোর বাবা এই শশধরদা', ডবল গ্র্যাজুয়েট তো, কি হ'ল? না অষুধের ক্যানভাসার।

শ্যামল এ প্রসঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টা করে, মামা, আমি যাই, মুখ হাত পা ধুয়ে নিই—

—দাঁড়া, যা বলছি শোন, আমি আরও কম লেখাপড়া করেছি, কোন রকমে ম্যাট্রিকটা পাশ করে দিলাম, যাহোক তাই বড়বাবু হতে পেরেছি। তুই যদি আরও কম পড়িস তাহলে একদম বড় অফিসার হয়ে যাবি; কেউ আটকাতে পারবে না।

ভেতর থেকে মাসীমা হাঁক দিলেন, এস সবাই, খাবার দেওয়া হয়েছে। শ্যামল এই সুযোগই খুঁজছিল—যাই মাসীমা, বলে সাড়া দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

শ্যামলকে বাড়ী পৌঁছে রাঘব বোয়ালের বাড়ী আসতে কেষ্টর অনেক দেরী হয়ে গেল, তাঁর বড় ছেলে বললে, বাবা আপনার জন্যেই এতক্ষণ বসেছিলেন, এই মাত্র খেতে ওপরে গেছেন।

—আসতে দেরী হয়ে গেল, বড় ঝামেলার কাজ বুঝতেই তো পারছেন, আমি বরং কাল আসব।

—আপনি বসুন, আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করে আসছি।

কেষ্টকে বেশীক্ষণ বসতে হ'ল না, রাঘব বোয়াল নিজেই নেমে এলেন।

—তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।

—না, এই এসেছি। আপনাকেই এত রাত্রে বিরক্ত করলাম।

—মোটেই নয়, মোটেই নয়। রাঘব বোয়াল ঘন ঘন মাথা নাড়েন। তার পর, কি খবর বল?

—আমি দল ঠিক করেছি, আমাদের ভোটার লিষ্ট দেখেন, আমরা নিজেরা গিয়ে আলাপ করে আসব। বিশেষ করে বস্তিগুলোতে, ভোট তো ঐখানেই বেশী পাওয়া যাবে।

—তুমি ঠিক বলেছ, যাঁরা অবস্থাপন্ন, তাঁদের ধরবার আমার লোক আছে। বস্তিগুলো যদি তুমি যোগাড় করতে পার, তাহলে অনেকটা কাজ এগুবে।

কেষ্ট বিজ্ঞের মত হাসে, তাই ত বলছি। এদের হাত করা শক্ত নয়। ভাই ভাই বলে পিঠে হাত দিয়ে বোঝাতে হবে, দু-একদিন ভাল-মন্দ খাওয়াতে হবে, এর বেশী কিছু নয়। তাছাড়া এখন ছোটখাট ক্লাবগুলোকেও হাত করতে হবে, এদের কিছু চাঁদা দিলেই আপনার দিকে চলে আসবে।

—সে তো দিতেই হবে। লাইব্রেরীতে কিছু বই দেওয়া, ফুটবল ক্লাবে জার্সি, ব্যাডমিণ্টন ক্লাবে রাত্রে আলোদেওয়া—

কেষ্ট বাধা দেয়, ব্যস ব্যস। এ করলে আর দেখতে হবে না। দেখি ক'টা ভোট অন্য বাক্সে পড়ে। কয়েকটা জনসভার ব্যবস্থা করতে হবে তো।

—সে তোমরা যা ভাল বোঝ—

—আমি সব পাড়াতেই ব্যবস্থা করে রাখছি, সেই পাড়ার লোক দিয়েই সভা ডাকাব। তারা নিজেরা এসে বক্তৃতা দেবার জন্যে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবে। আপনি গিয়ে দু'চারটে গরম গরম কথা বলবেন—

রাঘব বোয়াল উৎসাহিত হন, এ তোমার খুব ভাল বুদ্ধি হয়েছে, একবার বক্তৃতা দিতে উঠলে আর আমাকে পায় কে, প্রথমেই সরকারের নামে নিন্দে করতে হবে, দেশে কি রকম দুর্নীতি রয়েছে, কালো বাজারীদের অত্যাচার, পুলিশজুলুম। এ সব বিষয়ে খুব শক্ত শক্ত কথা আমার মুখস্ত আছে।

কেষ্ট সায় দিয়ে বলে, আপনার বক্তৃতা কে না শুনেছে, যেমন ভাষা তেমনি বলবার ভঙ্গি, এ ইলেকশানে আপনার জয় নিশ্চিত।

গলাটা একটু নামিয়ে বলে, কিছু টাকার দরকার, ছোঁড়া-গুলোকে হাতে রাখা চাই তো।

—কত দেবো, বেশী টাকা তো নেই, একশ' টাকায় হবে?

—অত কি হবে, টাকা পঞ্চাশ হলেই আপাতত চলে।

রাঘব বোয়াল পকেট থেকে টাকা বার করে দেন, কেষ্ট পাঁচখানা দশ টাকার নোট নিয়ে বেরিয়ে আসে।

জীপ-এ করে কেষ্ট ঘুরে বেড়ায়, সকাল থেকে রাত্রি। গাড়ীতে তেল ফুরিয়ে আসলে পাড়ায় ফেরে, আর সমস্ত রাত্রে বাড়ীতে শোবার জন্যে। ক'দিনের অবিশ্রান্ত কাজ।

রাঘব বোয়াল বলেন, কেষ্ট কাজের লোক বটে, এই ক'দিনে চার দিক গরম করে তুলেছে।

বন্ধু প্রভাত বলে, কেষ্টটা চিরকাল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ালো।

অনন্ত কেবিনের আড্ডা' বলেন, যাক, কেষ্টর দৌলতে পাড়ার ক্লাবগুলো আবার চেগে উঠল। কেষ্ট কোন কথা বলে না, নিজের মনে কাজ করে যায়। রাস্তায় প্রায়ই দেখা যায় জনকয়েক চীৎকার করতে করতে চলেছে,—ভোট ফর রঘু ব্যানার্জ্জী। সেই সংগে কত রকমের শ্লোগান যা কেষ্টই ঠিক করে দিয়েছে অন্য পার্টির নকল করে। যে পাড়া থেকে যে দলই বেরোক, রাঘব বোয়ালের বাড়ীর সামনে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে যায়।

পাড়ায় পাড়ায় পোষ্টার লাগান হয়েছে, নানা ভাষায়, নানা রং-এ। অন্য প্রার্থীদের পোষ্টারের ওপর কেষ্ট ইচ্ছে করে নিজেদের গুলো লাগিয়ে দিয়েছে। সে নিয়ে কত জায়গায় ঝগড়া হয়।

—কে মশাই রঘু বাঁড়ুজ্যে, জীবনে নাম শুনিনি—

—শুনবেন কি করে, অন্ধকূপের মধ্যে বসে আছেন।

—কি করেছেন তিনি?

—কি করেন নি? কেষ্ট নির্ব্বিকার ভাবে ফিরিস্তি দিয়ে যায় রাঘব বোয়ালের গুণের।

—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন থেকে আজ পর্য্যন্ত যত রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে মায় ট্রাম ভাড়া সংগ্রাম অবধি সব ব্যাপারই তিনি নিজে চালিয়েছেন, কিন্তু নাম প্রকাশ করেন নি।

কেষ্টর দল পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয় রাঘব বোয়াল কত বড় একজন নীরব কর্ম্মী।

এরই মধ্যে একদিন দুপুরবেলা চৌরঙ্গীর সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে কেষ্ট ভাবছিল ঢুকবে কি না, এমন সময় একটি মেয়ে এসে কাছে দাঁড়ায়, বলে, আমার একটা কথা শুনবেন?

অন্যমনস্ক হয়ে কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কি?

—আমার ছোট ভাই-এর বড় অসুখ, মর-মর। এই দেখুন ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন্, অষুধ কেনার পয়সা নেই।

কেষ্ট হাসে। মেয়েটি করুণ চোখে তাকায়, টাকা চাই না, এই অষুধ কটা কিনে দিন।

কেষ্ট খুব আস্তে মন্তব্য করে, এখনও কাঁচা।

মেয়েটি তখনও ঘ্যান-ঘ্যান করে, তিন দিন থেকে চেষ্টা করছি, এই এক শিশি অষুধ একজন কিনে দিয়েছিলেন, বড়ী, মিক্সচার, কিছুই দিতে পারিনি। ডাক্তার বলেছে আজ ওষুধ না পড়লে—

কেষ্ট হঠাৎ বলে, বেশ, আমি তোমাদের বাড়ী যাব, যদি দেখি তোমার ভাই-এর সত্যি অসুখ, আমি টাকা দেব।

—অত দূরে কি যেতে পারবেন? টালীগঞ্জে, রেফিউজি বস্তীতে থাকি।

—ঠিক আছে, ঠিকানা দাও।

মেয়েটি ঠিকানা বলে, কেষ্ট নোট-বুকে লিখে নেয়, জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম?

—গৌরী।

সন্ধ্যের আগেই কেষ্ট হাজির হয় টালীগঞ্জের উদ্বাস্তু বস্তিতে। গাড়ী থেকে নামতে দেখে তাকে জমিদার বাড়ীর পাকা দালান পার করিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ভিতরের বস্তিতে। খবর পেয়ে গৌরী এগিয়ে এসে তাকে ঘরে নিয়ে যায়।

—এই নোংরা জায়গায় আপনার কষ্ট হবে জেনেই আসতে বারণ করেছিলাম।

কেষ্ট উত্তর দেয় না, গৌরীর সংগে ছোট কুঠরীর সামনে এসে দাঁড়ায়। মাটির ঘর, ওপরে টিনের চালাঘরের এক কোণে নোংরা বিছানায় একটা ছেলে শুয়ে আছে, প্রায় নির্জীব।

গৌরী ভেতরে ঢুকে গিয়ে বলে, ওই আমার ভাই।

কেষ্ট স্তম্ভিত হয়ে যায়, ক'দিন ভুগছে?

—প্রায় এক মাস।

—দেখি ডাক্তারের প্রেসক্রিপসান?

গৌরী এগিয়ে দেয়, তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে কেষ্ট বলে, আমার সংগে একজনকে দাও, এখুনি ওষুধ কিনে পাঠিয়ে দেব।

—চলুন, আমিই যাব।

—এর কাছে কে থাকবে?

—ভগবান।

—কেষ্ট আর কথা বলে না। গৌরী বলে, গাড়ীতে যাবার দরকার নেই, ডাক্তারখানা পাশেই আছে।

কেষ্ট গৌরীর কথা মত ডাক্তারখানার দিকে যায়, পথে শুধু জিজ্ঞেস করে, তোমার আর কে আছে?

—ওই ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। গৌরীর চোখ ছল-ছল করে ওঠে।

—কেন?

—পাকিস্থান থেকে কলকাতা আসবার পথেই সকলকে হারিয়েছি।

ওষুধ কিনে কেষ্ট গৌরীর হাতে দেয়, বলে, আমার ঠিকানা রেখে দাও, যদি দরকার হয় চিঠি লিখ।

—আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেবো, গৌরী কেষ্টকে প্রণাম করে।
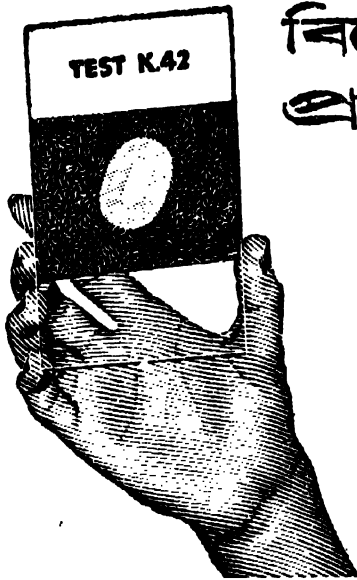
কেষ্ট জিপএ উঠে ষ্টার্ট দেয়।

[ক্রমশঃ।

দন্তক্ষয় নিবারণে
বিশেষ
প্রতিরোধক !*

TEST K.42

• গবেষণাগারে কে৪২ নম্বর পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কলিনস সুপার-হোয়াইট (সাদা অংশ) দন্তক্ষয়ী জীবাণু (কালো অংশ) প্রতিরোধের প্রাচীর (সাদার চারদিকে ধুসর আবরণ) গড়ে তোলে।

পেপারমিণ্ট-গন্ধী সুশীতল আস্বাদ!

Kolynos TOOTHPASTE
SUPER WHITE
Kolynos TOOTHPASTE
Koly

লক্ষ্য করুন, ক্যাপটি
ধরবার কত সুবিধে!

জেফ্রি মানাস এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
রেজিষ্টার্ড ব্যবহারকারী

JK 4778 A

সুমণি মিত্র

৪৪

এবার প্রশ্ন কোরি স্বামিজীর হোয়ে,—
'ঈশ্বর' বোলতে কি বোঝো বলোতো হে ?
ভেবে গ্যাখো কাকে তুমি বলো ভগবান ?
কি কি গুণ তাঁর মাঝে করো সন্ধান ?
তোমার আদর্শের সীমাটা কোথায় ;
কল্পনা পাখা মেলে কতো দূর যায় ?
তোমার আদর্শকে যতোই ছাড়াও,
ঈশ্বর-বোধটাকে যতোই বাড়াও,
দেখবে যে অবতার তাকেও ছাড়ান,
তোমার চেতনা তাঁর পায় না নাগাল।

• • •

কল্পনা সন্ধান পায় না যাঁদের
কেন পুজো কোরবে না বলোতো তাঁদের ?
চাইছো যা' তার চেয়ে বেশি যদি পাও,
কেন তাঁকে মানবে না উত্তর দাও ?
দেবতার গুণ যদি মানুষেই থাকে
কেন তুমি ঈশ্বর বোলবে না তাঁকে ?

• • •

"Take one of these Messengers of Light ;
Compare his character
With the highest ideal of God
You ever formed
And you will find
That your God falls low
And that character rises.
You cannot even form of God
A higher ideal
Than what
The actually embodied
Have practically realized,
And laid before us
As an example.

Is it wrong, therefore
To worship these as God ?
Is it a sin
To fall at the feet of these man-Gods,
And worship them
As the only Divine Beings in the world ?
If they are really...higher
Than all my conception of God,
What harm
That they should be worshipped ?

Not only is there no harm,
But
It is the only possible
And positive way of worship."১

৪৫

তা'বোলে আমাকে কেউ জিগেস্ কোরো না,
শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূর্ণব্রহ্ম কি না।
স্বামিজী যে বোলেছেন তা আমিও জানি,
তবু যেন সায় দিতে সাহস পাইনি।
স্বামিজী তো পৃথিবীকে বোলেছেন ভূয়ো,
সে-কথাটা আমরা কি মেনেছি তবুও ?

১। "জ্যোতির্ময় ঈশ্বরের অগ্রদূত যাঁরা—তাঁদের যে-কোনো একজনের চরিত্রের সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার সর্বোচ্চ ধারণার তুলনা কোরে গ্যাখো। দেখবে—তোমার কল্পিত ঈশ্বর ঐ চরিত্রের তুলনায় অনেকাংশে হীন ; দেখবে—অবতারের, ঈশ্বরাদিষ্ট পুরুষের চরিত্র তোমার ধারণার অনেক ঊর্ধ্বে।

আদর্শের সাকার বিগ্রহস্বরূপ এই সব মানুষ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি কোরে তাঁদের মহৎ জীবনের যে দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে ধোরে গ্যাছেন, আমরা তার চেয়ে ঈশ্বরের উচ্চতর ধারণা কোরতে কখনোই সক্ষম নই।

তাই যদি হয়, তবে জিগ্যেস কোরি, এই সব মানুষকে ভগবানবোধে পুজো করা কি অন্যায় নাকি ? এই সব নর-দেবতাদের শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হোয়ে, পৃথিবীতে এঁদের ভগবানের একমাত্র সাকার বিগ্রহস্বরূপ মনে কোরে পুজো করাটা কি পাপ ? যদি তাঁরা সত্যিই আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে সমস্ত ধারণার চেয়ে আরো বড়ো হন, তবে তাঁদের পুজো কোরতে দোষ কি ?

দোষের তো নয়ই, বরং সাক্ষাৎ ঈশ্বরোপাসনা একমাত্র এই ভাবেই সম্ভব।"—Christ, the Messenger.

স্বামিজীতো বহুকথা বোলেছেন জানি,
আমরা কি স্বামিজীর সবকথা মানি ?
স্বামিজীর কথাগুলো আমাদের তাই
বেবাক্ কোপ্‌চে যাওয়া চলেনাকো ভাই।

ঠাকুর 'ব্রহ্ম' কিনা আমরা কি বুঝি ?
আমরা কি সব ছেড়ে 'ব্রহ্ম'কে খুঁজি ?
'ব্রহ্ম' যে কাকে বলে তাই বা কে জানি ?
নিজে যেটা বুঝিনাকো কি কোরে তা মানি ?

ঠাকুরের দৃষ্টিতে স্বামিজীর ঘর
'সপ্ত-ঋষির লোকে', কিংবা সে 'নর'।২
ঠাকুরের কথা যদি মেনে নিতে যাই
আমাদেরও অন্ততঃ ঋষি হওয়া চাই।
না-বুঝে পরের কথা যেই মেনে নিক্,
স্বামিজীর মতে তারা মহা নাস্তিক।

*　*　*

"A man may believe
In all the churches in the world,
He may carry in his head
All the sacred books ever written,
He may baptise himself
In all the rivers of the earth,
Still,
If he has no perception of God,
I would class him
With the rankest atheist."৩

৪৬

ঠাকুর ও স্বামিজীকে বুঝে নিতে তাই
আমাদের জড়ত্ব আগে যাওয়া চাই।
আমাদের জড়ত্ব কেটে যাবে যেই,
তাঁদের দেবত্বটা বুঝবো তবেই।
ইঁদুর কি দেবে বলো সিংহের মান ?
হাতীই বুঝতে পারে সিংহের দাম।

*　*　*

"It is the strong
That understands strength,
It is the elephant
That understands the lion,
Not the rat.
How can we understand Jesus
Until we are his equals ?
It is all in the dream
To feed five thousand
With two loaves,
Or to feed two with five loaves;
Neither is real
And neither affects the other.
Only grandeur appreciates grandeur,
Only God realizes God."৪

*　*　*

আমরা মানুষ হোলে, জেনো নিশ্চয়
ঠাকুর-স্বামিজী তার বেশি কিছু নয়।

৪৭

বেশকথা, ও না হয় বুঝলাম ভাই,
এবার এ-প্রশ্নের সমাধান চাই,—
ধরো যাঁরা অবতার মর্ত্যে আসেন,
মানুষের মতো যাঁরা কাঁদেন হাসেন,
তাঁদের দেবত্বটা যদিও বিরাট,
তবুও মানুষবোধে ভাখাটা কি পাপ ?
নরের অপূর্ণতা মেনেছেন যিনি
তিনি কি মানুষ নন ? দেব্‌তাই তিনি ?

*　*　*

২। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামিজী প্রসঙ্গে বোলতেন,—
"দেখ, নরেন্দ্র শুদ্ধ সত্ত্বগুণী ; আমি দেখেছি সে 'অখণ্ডের ঘরে'র চারজনের একজন এবং 'সপ্তর্ষির' একজন।"
—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (৫ম ভাগ, পৃঃ ১২১)
আবার এ-ও বোলতেন—"জগৎপালক নারায়ণ নর ও নারায়ণ নামে যে দুই ঋষি মূর্তি পরিগ্রহ কোরে জগতের কল্যাণের জন্যে তপস্যা কোরেছিলেন, নরেন সেই নরঋষির অবতার।"
—স্বামি-শিষ্য-সংবাদ (পূর্বকাণ্ড, পৃঃ ৫৮-৫৯)

৩। "এমন লোক থাকতে পারে যে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মমতেই বিশ্বাসী, দুনিয়ার সমস্ত শাস্ত্র সে মাথায় বোয়ে বেড়াক্, পৃথিবীর সমস্ত নদীর জলে সে নিজেকে অভিষিক্ত কোরুক্, তাসত্ত্বেও যদি তার ঈশ্বর-উপলব্ধি না থাকে, আমি তাকে চূড়ান্ত নাস্তিক বোলে মনে কোরবো।"—Soul, God and Religion.
(complete works, vol I, page 323)

৪। "শক্তিমানই শক্তি কি, তা বুঝতে পারে। হাতীই সিংহকে বোঝে, ইঁদুর নয়। আমরা যতদিন না যীশুর সমকক্ষ হোচ্ছি, ততদিন আমরা যীশুকে কেমন কোরে বুঝবো বলো ? দু'খানা পাউরুটিতে পাঁচ হাজার লোক খাওয়ানো, কিংবা পাঁচখানা পাউরুটিতে দু'জন লোক খাওয়ানো—এ দুই-ই মায়ার রাজ্যে। এদের মধ্যে কোনোটাই সত্যি নয়, সুতরাং এ-দুটোর কোনোটাই অপরটির দ্বারা বাধিত হয় না। মহত্ত্বই কেবল মহত্ত্বের কদর বোঝে, ভগবানই শুধু ভগবানকে উপলব্ধি কোরতে পারেন।"—Inspired Talks (পৃষ্ঠা—১৮৫)

আমরা মানুষ হোলে, অবতারদের
মানুষ ভাবেতে ছাখা নয়কো দোষের।
তবে যদি 'নির্গুণ ব্রহ্মে'তে ভাই
এ জীবনে কোনোদিন প্রতিষ্ঠা পাই,
সেদিন মানুষভাব থাকবেনা আর ;
তার আগে ঐটেই থাকা দরকার।
দরকার বলা ভুল, থাকতে হবেই ;
এ-ব্যাপারে মানুষের দুটো পথ নেই।

* * *

"Whenever we try to think of God
As He is
In His absolute perfection,
We invariably meet
With the most miserable failure ;
Because
As long as we are men,
We cannot conceive Him
As anything higher than man.
The time will come
When we shall transcend our human nature,
And know Him as He is ;
But as long as we are men
We must worship Him
In man and as a man." ৫

* * *

গাধাদের ভগবান, খুব সম্ভব,
আকারেতে আর একটা বড়ো গর্দভ।
তাই বোলে গাধাদের দিচ্ছি না দোষ।
মোষেদের ভগবান প্রকাণ্ড মোষ।
পোনামাছ ঈশ্বর চুনো-পুঁটিদের ;
ঠাকুর ও স্বামিজীরা—এঁরা আমাদের।

* * *

"If, for instance,
The buffaloes want to worship God,
They will,
In keeping with their own nature,
See Him as a huge buffalo ;
If a fish wants to worship God,
It will have to form
An idea of Him
As a big fish ;
And man has to think of Him
As man." ৬

৪৮

ভক্ত এ-কথা শুনে বড়ো ভয় পান,
ঐ বুঝি ভগবান ছোটো হোয়ে যান !
এ-ভয়টা অমূলক, নেই কোনো দাম ;
ভক্তি যে কতো কম—এ তারই প্রমাণ।
দেবতার এতটুকু অপূর্ণতায়
কোটি-কোটি ভক্তই শুধু ঘাবড়ায় !
এই সব ভক্তেরা অবতারদের
দেবতার আবরণে ঢেকেছে তাঁদের।
তাঁদের মানুষ-ভাব, সাধকের সেই
অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস নেই।

গোপীজনবল্লভ কোন্ সাধনায়
পার্থসারথী হন—সে কথা কোথায় ?
আচার্য শঙ্কর—তাঁরও ঠিক তাই,
তিনি যে মানুষ তার কি প্রমাণ পাই ?
দিগ্বিজয়ের ঐ কাহিনীতে তাঁর
লৌকিক চেহারাটা খুঁজে পাওয়া ভার !
সাধক যীশুরও দেখি সাধনায় সেই
লৌকিক চেষ্টার ইতিহাস নেই।
দ্বাদশবছর থেকে তিরিশ বছর
কিভাবে কাটান তার নেইকো খবর ! ৭

* * *

নিকৃষ্ট ভক্তই সদা সাবধান,
ঐ বুঝি অবতার ছোটো হোয়ে যান !
তাই তারা দেবতাকে ভীরু শ্রদ্ধায়
সভয়ে শিকেয় তুলে রেখে দিতে চায়।

৫। "যখনই আমরা ভগবানকে নির্গুণ পূর্ণস্বরূপ বোলে ভাবতে যাই, তখনই আমরা মর্মান্তিক ভাবে ব্যর্থ হই ; কারণ যতদিন আমরা মানুষ, ততদিন তাঁকে মানুষের চেয়ে বড়ো বোলে কিছুতেই ভাব্‌তে পারবো না। অবশ্য এমন দিন আসবে, যখন আমরা মনুষ্য প্রকৃতি অতিক্রম কোরে তাঁর স্বরূপবোধে সমর্থ হবো ; কিন্তু যতদিন মানুষ থাকবো, ততদিন মানুষের ভেতর এবং মানুষবোধেই তাঁকে পুজো কোরতে হবে।"—Bhakti-Yoga. (পৃষ্ঠা—৪৩)

৬। "ধরো, মোষেদের ইচ্ছে হোলো ভগবানকে পুজো কোরতে—তাদের স্বভাব অনুযায়ী তারা ভগবানকে একটা বিরাট মোষ হিসেবেই দেখবে : একটা মাছ ঈশ্বরের আরাধনা কোরতে চাইলে, ঈশ্বরকে তাকে একটা প্রকাণ্ড মাছ বোলেই চিন্তা কোরতে হবে ; আর মানুষকেও ভগবানকে মানুষ বোলেই ভাবতে হবে।"
—Bhakti-Yoga (পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫)

৭। অবতারদের জীবন-ইতিহাস পোড়লে ছাখা যায়, সিদ্ধিলাভ করার পর তাঁদের যে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত হোয়েছিলো—সেইকথাই সবিস্তারে আলোচনা করা হোয়েছে। পূর্বসংস্কারগুলোকে সমূলে

ভক্তিশাস্ত্র মতে এ-শ্রেণীর ভয়
পরিণত ভক্তির পরিচয় নয়।
ভক্তির প্রথমে যে ঐশ্বর্যের
অদ্ভুত মোহ থাকে কাঁচা ভক্তের,
ভক্তিটা পাকা হোলে ত্যাখে সে তখন,
ভক্তিপথের ওটা মহা দুষ্মন।
চতুর্ভুজের মোহ থাকেনাকো আর,
দুটো হাত দুটো পা-ই ভালো লাগে তার।
ভক্তির শেষ কথা ছোটো কোরে ত্যাখা,
অনৈশ্বর্যভাবে কাছে কাছে রাখা।

উৎপাটিত করবার জন্যে সাধনকালে তাঁরা যে অপূর্ব অন্তঃসংগ্রামে নিযুক্ত হোয়েছিলেন—মানুষভাবের সেই দিকটা নিয়ে কেউই বিশেষ আলোচনা করেননি। মনে হয়, মানুষ-ভাবের আলোচনা কোরলে পাছে তাঁরা ছোটো হোয়ে যান, পাছে নিজেদের কিংবা পাঠকের ভক্তির হানি হয়—এই ভয়েই তাঁরা অবতারদের মানুষভাবটি চেপে রেখে কেবল দেবভাবের আলোচনাই কোরে গ্যাছেন। ভক্তির অপরিণত অবস্থাতেই এ-ধরণের দুর্বলতা ত্যাখা যায়। ভক্তির প্রথম অবস্থাতে ভক্ত কখনো তাঁদের ঐশ্বর্য রহিত কোরে চিন্তা কোরতে পারেন না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লোককল্যাণার্থে বিশেষ বিশেষ শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে যে অনেক সময়ে উৎকট তপস্যায় নিযুক্ত হোয়েছিলেন—এ-কথা পুঁথিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সাধনকালে তাঁর অন্তর্যুদ্ধের বিশেষ কোনো বিবরণই পাওয়া যায় না।

ভগবান বুদ্ধের জীবনকাহিনীতে তাঁর সংসার-বৈরাগ্য এবং ধর্মচক্রপ্রবর্তনের যতদূর বিশদ ইতিহাস পাওয়া যায়, তাঁর সাধনার ইতিহাস ততদূর পাই না। তবে অন্যান্য অবতারদের যেমন কিছুই পাওয়া যায়না, সে হিসেবে বুদ্ধের সাধক জীবনের একটা আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু তাও রূপকের সাহায্যে তা' বর্ণিত হোয়েছে বোলে যথাযথভাবে তার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

আচার্য শঙ্করের দিগ্বিজয়কাহিনীই দেখি সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করা হোয়েছে।

বাইবেলে ভগবান যীশুর সাধন-ইতিহাসের প্রায় কোনো কথাই নেই। তাঁর বারো বছর বয়েস পর্য্যন্ত দু'একটা ঘটনা মাত্র লিপিবদ্ধ করা হোয়েছে। তারপর তাঁকে পাই আবার তিরিশ বছর বয়েসে, যখন তিনি 'জনে'র কাছে অভিষেক গ্রহণ কোরে বিজন মরুভূমিতে গিয়ে চল্লিশদিনব্যাপী ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত হন। এইখানে তাঁর অন্তর্যুদ্ধের একটা কথা মাত্র রূপকের সাহায্যে বর্ণিত হোয়েছে। তিনি যখন ঐ মরুভূমিতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তপস্যা কোরছিলেন, তখন এক 'শয়তান' তাঁকে এসে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে, কিন্তু বিফল হয়। তারপর মাত্র তিন বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। অতএব বারোবছর থেকে তিরিশ বছর পর্য্যন্ত তিনি কি ভাবে কাটান, বাইবেলে তার কোনো বিবরণ নেই।

ধর্মের ইতিহাসে বোধ হয় সর্বপ্রথম স্বামী সারদানন্দজীই ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মানুষভাবের আলোচনা কোরে গ্যাছেন এবং যতদূর সম্ভব তাঁর সুদীর্ঘ সাধক-জীবনের বিস্তারিত বিবরণ রেখে গ্যাছেন।

ঈশ্বরে যত বেশি হবে অনুরাগ
ঐশ্বর্যের প্রতি আসবে বিরাগ।
ব্রজের গোপীরা কি হে কৃষ্ণকে কেউ
ভগবান বুদ্ধিতে দেখেছে ভুলেও?
ভক্তির চরমেতে থেমে যায় স্তব,
তখন 'ব্রহ্ম' নয়, 'প্রাণবল্লভ'।
কিংবা যশোদা, যিনি স্বচক্ষে তাঁর
দিব্যবিভূতি সব দেখেছেন যাঁর,
তিনিও কি বিস্ময়-বিমোহিত চোখে
জগৎকারণ বোলে দেখেছেন ওঁকে?
কৃষ্ণ যতই হোন্ জগৎপালক,
যশোদার কাছে তিনি ক্ষুদ্র বালক।
আসলে ও-সব জ্ঞান ভক্তের মনে
বিভীষিকা এনে ত্যায়, ভালোবাসা কমে।
পরিণত ভক্তির লক্ষণই এই,
দেবতাকে কাছে টানে মানুষ-বোধেই।

৪৯

আপাততঃ আমাদেরই প্রয়োজনে ভাই
ঠাকুরকে মানুষের আসনে বসাই।
স্বামিজীকে ধরা যাক্ 'সিমলে'র ছেলে,
তার পর ত্যাখা যাক্ কি বস্তু মেলে।
মনে হয় আমাদের দেবতা হওয়ার
দুর্গম রাস্তাটা তাতে সোজা হয়।

আমাদের মতো যদি না ভাবি ওঁদের,
সত্যলাভের ঐ চেষ্টা তাঁদের
মনে হবে অসত্য, নেই কোনো দাম,
নিত্যপূর্ণ যাঁরা—এ তাঁদের ভাণ।
অনৈশ্বর্যভাবে দেখি যদি তাঁকে,
আত্মজয়ের ঐ সংগ্রামটাকে
'দেবতার লীলা' বোলে ভাববোনা আর,
চেষ্টাটা বৃথা ভেবে ছাড়বো না হাল,
দেবতা হওয়ার ঐ দুর্গম পথে
আমরাও একদিন যাবো পা বাড়াতে।

তাদের মানুষ ভেবে নগদ যে লাভ,
সেটা হোলো আমাদের সচেষ্ট ভাব।
তাই আমি স্বামিজীর সব কিছুতেই
দেবতার আবরণ দিতে রাজী নই।
তাহোলে যে বুঝবো না চেষ্টার দাম,
বুঝবো না কেন তাঁর এত সংগ্রাম।
আমরাও চেষ্টাকে বৃথা ভেবে ঠিক
হাল ছেড়ে দিন দিন হবো তামসিক্।

৫০

তাই বোলে বোলছিনা অবতারদের
আলোচনা করো শুধু মানুষ-ভাবের,
দেবত্ব ভুলে গিয়ে সর্বক্ষণ
ভাববে মানুষ ছাড়া আর কিছু নন।
কিংবা বোলিই যদি ক্ষতি নেই তাতে,
আমাদেরই দেবত্ব বাধা দেবে তাকে।

ভেবেছো কি আমরাও নিতান্ত rat ?
Lion এর ছিটে-কোঁটা আমাদের নেই ?
ঠাকুর-স্বামিজী তাই মানুষ হোলেও
তার চেয়ে বড়ো হোতে কোনো বাধা নেই।

*　　*　　*

"What is the proof
Of Christs and Buddhas of the world ?
That you and I feel like them.
That is how you and I understand
That they were true.
Our prophet-soul
Is the proof of their prophet-soul.
Your God-head
Is the proof of god himself.
If you are not a prophet
There never has been
Anything true of God.
If you are not God
There never was any God,
And never will be." ৮

[ক্রমশঃ

৮ "জগতে খৃষ্ট এবং বুদ্ধদের প্রমাণ কি ? না, তুমি-আমিও সেইরকম অনুভব কোরে থাকি ; তাইতেই তুমি ও আমি তাঁদের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম কোরতে পারি। আমাদের ঐশ্বরিক আত্মাই তাঁদের ঐশ্বরিক আত্মার প্রমাণ। তোমার ঈশ্বরত্বই স্বয়ং ঈশ্বরের প্রমাণ। তুমি যদি নিজে ভগবান না হও তাহোলে কোনো ঈশ্বর নেই, কখনো হবেনও না।"

—Practical Vedanta (পৃষ্ঠা ২১)

নারী ও পুরুষের পরমায়ুর প্রশ্ন

পৃথিবীর সকল দেশে না হোক, অনেক দেশেই দেখা গেছে এ যাবং—পুরুষদের চেয়ে নারীরা বেঁচে থাকে একটু দীর্ঘদিন। বিলেতে নারী ও পুরুষের পরমায়ুর তুলনামূলক বিচারেও এই সত্যটি ধরা পড়েছে বিশেষ ভাবে। কিন্তু প্রশ্ন—এর যথার্থ কারণ কি ? নারীদের আয়ু পুরুষদের অপেক্ষা বেশী হয় কেন ? প্রশ্নটি নিয়ে গবেষণাও বিলেতী চিকিৎসা দেহ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে কম নয়। তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছেন—নারীদের গড়পড়তা আয়ু যেখানে ৭১-৫ বছর, পুরুষদের সে ক্ষেত্রে ৬৫-৮ বছর। তাঁদের নিশ্চিত ধারণা—যৌনগত কারণ এবং দৈহিক কাঠামোর কোথাও কোন ইতর-বিশেষ দরুণই এমনটি হয়ে থাকে বা হওয়া সম্ভব।

নারী ও পুরুষের পরমায়ু পার্থক্যের প্রশ্নটির মীমাংসার জন্মে বিলেতী জীববিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞগণ শুধু মানুষের নয়—আরও প্রায় পঞ্চাশ রকমের প্রাণীকে চোখের উপর রেখে শেষ অবধি পরীক্ষা করেছেন। তাতে তাঁরা এইটিই দেখেছেন—পুরুষজাতীয় প্রাণীগুলোর চেয়ে স্ত্রীজাতীয় প্রাণীগুলো বাঁচে অপেক্ষাকৃত বেশী দিন। মনুষ্য-জগতে নারী এবং পুরুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও চিন্তাধারার তারতম্যে যে পরমায়ুর তারতম্য হয়—উক্ত শ্রেণীর গবেষকমণ্ডলী তা' স্বীকার করেন না। পরন্তু এইটি বার বারই তাঁরা জোর দিয়ে বলেন—দেহের আভ্যন্তরীণ গঠনগত কোন পার্থক্যই পরমায়ুর উল্লিখিত রূপ। পার্থক্যের জন্ম দায়ী অর্থাৎ এই একটি মৌলিক কারণেই সাধারণতঃ পুরুষদের অপেক্ষা নারীরা বাঁচবার সুযোগ পায় কিংবা বেঁচে থাকে অধিক দিন।

সামাজিক পটভূমিকা ও খেলাধূলা

রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে বর্তমান কালের যান্ত্রিক যুগ পর্য্যন্ত খেলাধূলার রীতি প্রচলিত আছে আমাদের দেশে। তবে সামাজিক পটভূমিকা অনুসারে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যেটাকে আমরা এক কথায় যুগোপযোগী বলে থাকি।

মহাভারতের যুগে ধনু ও তূনীর ধারণ। মল্লযুদ্ধ। বালী, হনুমান, সুগ্রীব প্রভৃতি মল্লবীররূপেই খ্যাত হয়েছিলেন।···

ঐতিহাসিক যুগে আমরা সন্ধান পেয়েছি বহু বীরের। বাংলার প্রতাপ শৌর্য্যবীর্য্যে ছিলেন অতুলনীয়।

প্রাচীন কালে বিদ্যাপীঠে ব্যায়াম চর্চ্চার প্রচলন ছিল। গ্রামীন ভারতের আখড়া স্থাপনের কথা নিশ্চয়ই আমরা বিস্মিত হই নি। যার চিহ্ন আজও [illegible] পল্লী অঞ্চলে দেখা যায়। বিজয়া দশমী, নাগপঞ্চমী, বসন্তপঞ্চমী ও অন্যান্য উৎসব-মুখর দিনে পরীক্ষা চলতো। রাজ-রাজড়া কুস্তী করতেন আর পালোয়ান পুষতেন। এই কুস্তীর রেওয়াজ আজও উত্তর বিভাগ প্রদেশে প্রচলিত আছে।

এর পর এলো পরাধীনতার যুগ। সুচতুর বৃটিশ শাসক সম্প্রদায় শক্তি বিনষ্ট করার দিকে লক্ষ্যপাত করে, নানা আইনের বেড়াজালে জাতীয় সংহতিকে ধ্বংস করে ক্লীবত্বে আচ্ছন্ন করে রাখলো।

এর পর এলো দেশাত্মবোধের প্রেরণা।

স্বদেশী যুগে স্মরণীয় বীর শহীদ। শক্তি সঞ্চয়ের জন্য গুপ্ত সমিতি গঠন। লাঠি খেলা, ছুরি খেলা, কুস্তি প্রভৃতির প্রচলন হোল নিজেদের বাঁচার সাধনা।

অসাধারণ মনোবল ও অসীম শক্তির দ্বারা ভারত আবার নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের বাণী—

'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'

জাতি গঠনের মূল মন্ত্র। সমস্ত মালিন্য দৃঢ়হস্তে মোচন করে আজ জাতিকে অগ্রসর হতে হবে।

এবার প্রশ্ন আমাদের সামাজিক পটভূমিকা।

যুগ-সন্ধিক্ষণে দৈনন্দিন জীবন-যাপন যেখানে দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠেছে সেখানে খেলাধূলার কথা চিন্তা করা মানে বিলাস। এ কথাই আজকের দিনে প্রতিটি অভিভাবক বলেন।

আজ থেকে তিরিশ বছর আগে অভিভাবকরা খেলাধূলাকে অন্যায় বলে ভাবতেন। তাঁরা জানতেন, শুধু লেখাপড়া করে ভাল চাকরী পাওয়ার কথা। সুখের বিষয়, বর্তমান অভিভাবকরা ছেলেদের খেলাধূলা করার জন্যে বিশেষ কিছু বলেন না। তাঁরা বুঝেছেন, খেলাধূলার প্রয়োজন আছে। খেলাধূলার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান জাতিগঠনের প্রয়াস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। দেশ-বিদেশে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফলে নানান বিষয়ে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেশে সেই সমস্ত পদ্ধতির যদি প্রচলন করা যায়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে খেলাধূলায় ভারতের স্থান শীর্ষে হবে বলে আশা করা যায়। ভারতের ছেলেমেয়েরা সুঠাম সবল শরীর নিয়ে তাদের কর্ম্মদক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবে।

পাঠশালা থেকে আরম্ভ করে স্কুল-কলেজে ক্রীড়ানুশীলনের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক ভাবে রাখতে হবে। শারীরিক যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন দিকে উৎসাহ দিতে হবে।

বর্ত্তমান স্কুল-কলেজগুলির কথাই আলোচনা করা যাক্। বাধ্যতামূলক ভাবে খেলাধূলার ব্যবস্থা কোন কোন স্কুলে দেখা গেলেও ফলতঃ দেখা যায় যে খেলাধূলা করার মত মাঠের একান্ত অভাব। মিশনারী স্কুল, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্কুলগুলিতে কিছু কিছু সুবিধাজনক ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এগুলি দেশের একমাত্র আশা বা ভরসা স্থল নয়।···

সহরের স্কুলগুলিতে খেলাধূলার কিছু কিছু ব্যবস্থা থাকলেও তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। গ্রামের স্কুলগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। সেখানে খেলাধূলা করার মাঠ আছে কিন্তু স্কুলের তহবিলে খেলাধূলা খাতে খরচ করার মত সঙ্গতি নাই। কোন কোন উৎসাহী তরুণ শিক্ষক এ দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, স্কুলের মাঠে কোনরকমে একটি ফুটবল বা ভলি খেলার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। তা অত্যন্ত মুষ্টিমেয় স্কুলে।

মেয়েদের স্কুলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। মেয়েদের খেলাধূলাকে এখনও আমাদের দেশে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

একটু চিন্তা করলেই আমরা দেখবো যে, মেয়েদের স্থান ছেলেদের অপেক্ষা কোন অংশে কম হতে পারে না। আজকের যে মেয়েটি বালিকা, সেই মেয়েটি কালকের মা। এই ভগ্নস্বাস্থ্য, অশিক্ষিত মায়ের কাছ থেকে সুস্থ, সবল মেধাবী সন্তান আশা করা বৃথা।

প্রাচীন যুগে মেয়েদের শক্তির আধাররূপে কল্পনা করা হোত। তাই আজকের যুগে মেয়েদের স্বাস্থ্যের দিকে দেখা জাতীয় জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করি।

আমাদের দেশের খেলাধূলায় একমাত্র কয়েকটি বে-সরকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠান সম্বল। কিন্তু এগুলির আর্থিক সঙ্গতি অত্যন্ত সঙ্গীন। একমাত্র সভ্যদের চাঁদার উপর সম্বল করে বেঁচে আছে।

পাশ্চাত্য দেশগুলির সংগে আমাদের দেশের তুলনা করলে দেখা যাবে প্রচুর প্রভেদ।

ইউরোপের প্রায় প্রতিটি 'পাবলিক স্কুলে' খোলা মাঠে, আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে।

গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ার কথা সর্ব্বাগ্রে বলতে হয়।

ক্রীড়াবিদদের মূলমন্ত্র অনুশীলন। যে যত অনুশীলন করে তার যোগ্যতা বৃদ্ধি পায় তত বেশী।

খেলাধূলার যে এক সুন্দর ধারা সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রচলিত আছে তা প্রতিটি দেশের পক্ষে অনুসরণীয়।

শিক্ষা এবং শারীরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। সোভিয়েট প্রতিটি মানব-শিশুকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। শিশু গর্ভে আসার সংগে সংগে মাকে সচেতন করে দেওয়া হচ্ছে সুস্থ, সবল সন্তান। জন্মভূমিকে আমরা 'মা' রূপে কল্পনা করি। সোভিয়েট সে কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করেছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এক বছরের শিশু থেকে ব্যায়াম করার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়। নানান অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ বিষয়ে নানান গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতি শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে পাইওনিয়র প্রাসাদ ও পেরেণ্টস কমিটি সংশ্লিষ্ট আছে। মনস্তত্ত্ব বিভাগের বিচক্ষণ অধ্যাপকেরা শিশু পালন বিষয়ে নানান মতামত দিয়ে থাকেন।

রাশিয়ার কিণ্ডারগার্ডেন স্কুল সাধারণ স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় কারখানা এমন কি প্রতি ইউনিয়নে শরীর ভাল রাখার জন্য সব রকম সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। এই সমস্ত শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে সোভিয়েট সরকার। শারীরিক শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা সমান ভাবে এগিয়ে চলেছে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় কাজের চাপে যে সমস্ত ক্রীড়াবিদ অনুশীলন করার সময় পান না দিবা ভাগে, তাঁরা আলো জ্বালিয়ে রাত্রের দিকে অনুশীলন করেন। শুধু অনুশীলন নয়, সেটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সমন্বিত।

কিছুকাল ধরে দেখা দিয়েছে যে ভারতবর্ষের খেলা-ধূলার মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের দিকে নেমে গেছে। বিশেষতঃ কল'কাতার আশে-পাশের অঞ্চলগুলি থেকে তরুণ কুশলী খেলোয়াড়দের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ক'লকাতা মাঠে ফুটবল মরশুম, হকি মরশুমে নানান প্রদেশ থেকে, খেলোয়াড়রা আইনের বেড়াজাল টপকে আসছে। কলকাতার ক্লাবগুলিরও এ দিকে মোটেই দৃষ্টি নেই। তাঁরা মোটেই খেলোয়াড় তৈয়ারী করার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না, ইহা পরিতাপের বিষয়!

ক'লকাতার আশে-পাশের অঞ্চলে খুঁজলে অনেক ভাল খেলোয়াড়-এর সন্ধান পাওয়া যাবে। শুধু সে সমস্ত খেলোয়াড়রা সুযোগ এবং সুবিধার অভাবে তাঁদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ভারতের ক্রীড়ামান অবনতির জন্যে প্রধানতঃ দায়ী করা যায় পরিচালক-মণ্ডলীকে। তাঁরা কোন সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা না নিয়ে ক্রীড়ামানের উন্নয়নের প্রচেষ্টা করেন না। কোন রকমে জোড়া-তালি দিয়ে চালিয়ে যাওয়াটাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শরীর গঠন ও নির্মল আনন্দ ছাড়া আজকের দিনে খেলা-ধূলার আরও একটি উপযোগিতা অধিকতর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। সেটা হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্য। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদরা স্বীকার করে নিয়েছেন খেলা-ধূলার মাধ্যম সৌহার্দ্য বৃদ্ধির পথ।

খেলাধূলার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলি দ্রুত ভাবে এগিয়ে চলেছে। তার প্রধান কারণ সজীব ও সতেজ স্বাস্থ্যের অধিকারী। কিন্তু আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা যে কোন দেশের খেলোয়াড় অপেক্ষা দুর্ব্বল। তাই সর্ব্বপ্রথম নজর দিতে হবে স্বাস্থ্যের দিকে।

আজ ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যে খেলা-ধূলার গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা উপলব্ধি করে কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রসর হয়েছেন। তাই নিখিল-ভারত ক্রীড়া-পরিষদ গঠিত হয়েছে। রাজকুমারী অমৃত কাউরের ক্রীড়া শিক্ষা-পরিকল্পনায় বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রীড়া-শিক্ষক ও কোচ আনার ব্যবস্থা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে স্পোর্টস বোর্ড স্থাপিত হয়েছে। এ সমস্ত প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। উৎকর্ষতা লাভের জন্য বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা দান ছাড়াও চাই রাষ্ট্রের আনুকূল্য, দেশবাসীর সক্রিয় সহযোগিতা ও সদিচ্ছা।

এই বন-শীর্ষ নদী

রবীন চৌধুরী

এই বন-শীর্ষ নদী ঝাউতীর ধরে চলে যায়
অন্ধকার করা কোন হিজল-তলায়।

যেখানে পাথর জল-তটে
সার সার হিজলেরা ওঠে,
সাত তলা জ্যোৎস্নার সমুদ্র-তলে
অসংখ্য গম্বুজ জ্বলে :
স্ফটিক মাঠের সেই মাণিকের বন
পেত যদি মন।

মন যেতে চায়—
মন-পবনের দাঁড়ে
তার তীরে
তারার চুমকি হয়ে জ্বলে যেতে চায়
[illegible] তলায়।
পেল নাক' মন
গম্বুজ বিদীর্ণ সে গজমোতি বন।

মন যদি যেত সেই দেশে
অরণ্যের গন্ধ ধরে সন্ধ্যার মৌমাছি বেশে
নক্ষত্র দ্বীপের তল মধুসিক্ত মৌচাকে তার
অপরাহ্নে আসে যেথা
সোনারঙ পাথরের সার
আর যার মেঘারূঢ় জল-কন্যাগণ
দানব হাওয়ার ডাকে সচকিত অকথ্য কথন,
অতিক্রান্ত সানু হতে অরণ্য অবধি
হয়ে যায় হীরকের নদী।
অরণ্যের গন্ধ ধরে সন্ধ্যার মৌমাছি বেশে
যদি মন—যদি মন যেত সেই দেশে।

সুস্থ ছেলেমেয়েরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবানে দিয়ে চান করে
—এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
L. 257-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত

ছোটদের আসর

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

কলকাতা শহরের এক এক রাস্তা চোখে ধরা পড়ে এক এক রূপ নিয়ে—কোথাও নানা বিচিত্র সাইনবোর্ড একটার পর একটা। নানা ধরণের দোকান—কোনো বাড়ীর সদর দরজাই দেখা যায় না, কোন দিক দিয়ে ওপরে ওঠে লোকে কে জানে! বাইরের ঘর কিংবা বৈঠকখানার পাটই নেই কোনো ট্রামরাস্তার বাড়ীতে। প্রত্যেক বাড়ীর নীচের তলাটা দোকান। মনোহারী, ফাউন্টেন পেনের, ব্লকের, চায়ের, কাপড়ের, মুদীর, বইয়ের, জুতোর, ঘড়ির, সোডা-লেমনেড সরবতের, কিংবা চায়ের।

কোনো রাস্তায় প্রেস আর ডাক্তারখানা আর কবিরাজখানা, আর হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকান। কোথাও লুঙ্গি, টুপি, চুড়ি, মোরাদাবাদ কাশীর জিনিসপত্র ছড়ানো!

কোনো রাস্তায় খালি দাঁত আর চশমা পাশাপাশি। কোথাও সারি সারি গয়নার দোকান। আয়নালাগানো দেওয়ালে হাজার বাতির আলো ঠিকরে প'ড়ে পথচলতি লোকের চোখে ধাঁধা লাগায়।

মাঝে মাঝে পার্কের রেলিং, পুকুরের টলটলে জল।

বড় বড়ো রাস্তাগুলোয় একচেটিয়া মাড়োয়ারী বাড়ী। আকাশ-ছোঁয়া শ্রীহীন, বোমা পড়ার যুগে যেগুলো খালি হয়ে গেছলো মালিকের দম্ভ চূর্ণ ক'রে।

সেদিনের কথা শুনেছে মীরা। ভাবতে পারে না। ভাবতে পারে না এই বিকানীরী জয়পুরিয়া প্রাসাদগুলোর অসংখ্য ঘর কোনোদিন খালি ছিল। ভাবতে পারে না কলকাতার রাস্তা সন্ধ্যে থেকেই অন্ধকার। সেদিন এরোপ্লেন থেকে বোঝবার উপায় ছিল না কোথায় কলকাতা। তবু সেই অন্ধকার কলকাতার বুকের ওপর জাপানী বোমা পড়েছিলো। হাতিবাগানের বাজারের টিনগুলো চৌচির হ'য়ে ফেটে গিয়েছিলো। সমস্ত পাড়াটা থর-থর কেঁপে উঠেছিলো অতি সাধারণ সামান্য বোমায়।

আবার কোনো দিন যুদ্ধ লাগতে পারে। আবার কোনো দিন কলকাতার উজ্জ্বল আকাশ কালো অন্ধকারে ঢেকে যেতে পারে। কিংবা এ পক্ষের ওপক্ষের অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমায় পুরোন পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে নতুন পৃথিবী জন্মাতে পারে। কি পারে আর কি পারে না, সে কথা ভেবে মীরার মাথা খারাপ করার দরকার নেই যদিও।

চায়ের নেমন্তন্ন এসেছে লেডি ব্যানার্জীর বাড়ী থেকে। আজ বিকেলে যেতে হবে। ফোনে জানিয়েছে—চা খেতে এসো। শুধু এক কাপ চা খাওয়ার জন্যে পেট্রোল পুড়িয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয়? অনেকে এ কথা ভাববে। চা খেয়ো এখানে—মানে অনেক গভীর।

মাত্র এক কাপ চা-ই নয়। মীরা দেখেছে তাদের এ বাড়ীতে টি পার্টি ব'লে যে জিনিস হয়, লনের ওপর চার-চারখানা চেয়ারের মাথায় রঙীন ছাতা দিয়ে যে আয়োজন হয়, তা যে কোনো মেয়ের বিয়ের খাওয়ার সমান।

লেডি ব্যানার্জির বাড়ীর ফটক থেকে করিডোর পর্য্যন্ত মোরাম-বিছানো পথে গাড়ী চলে যেন জলের ওপর নৌকো ভেসে যাওয়া।

সকলে ড্রয়িংরুমে বসেছিলো, মীরা ছেলেমানুষ, ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো উঁকি মারতে মারতে।

তখন লেডি ব্যানার্জীর সাজ হচ্ছিলো, মেম-ড্রেসার মুখে রং চুলে কলপ দিয়ে ভ্রূ এঁকে দিচ্ছিলো। লেডি ব্যানার্জীর নাতনী বি-এ পড়ছে, কিন্তু দিদিমার বয়স দেখাচ্ছে পঁয়ত্রিশ।

সত্যি, দেখতে ভালোই লাগে।

লেডি ব্যানার্জী বললে, এসো। মীরা!

ডাকটাও কেমন মিষ্টি।

ত্রিশ বছর ধ'রে কি করে লেডি ব্যানার্জীকে ঠিক এক রকম দেখতে লাগে, সবাই ভেবে অবাক্ হয়।

কথায় যেন মায়া-মাখানো। ধনী হোক, গরীব হোক্—প্রত্যেককে ডেকে ডেকে কুশল-প্রশ্ন করা লেডি ব্যানার্জীর মাধুর্য্য।

গরীব অবশ্য বেশী কেউ এ আসরে আসতে পায়নি। সাহিত্যিক আর শিল্পী কিছু মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে।

এ বাড়ীর ঐশ্বর্য্যের কাছে মীরাদের বাড়ী ম্লান। একেবারে কিছুই নয়। হয়ত কোনো রাজার বাড়ীর সঙ্গে এ বাড়ী মেলে। মার্বল মোজেকের মেঝে। তাও দেখা যায় না, সবই দামী কার্পেটে ঢাকা। দশ জন বাবুর্চি আর দশ জন রাঁধুনী বামুন মিলে আজকের চায়ের নেমন্তন্নর খাবার তৈরী করেছে। খাবারের

াহাড়। তোমার কাছে যেই থালা আসছে, তুলে নাও চামচ দিয়ে যত খুসি।

কোথায় হ্যাংলা আর প্যাংলা? তারা বোধ হয় এখানে লোভ ামলাতে না পেরে খেয়ে মরেই যেত।

রাক্ষসের মতন খাওয়া এখানে চলবে না। দেখাতে হবে তুমি কত কম খেতে পারো।

ওদের অনেক জিনিস ফেলা যাবে। হয়ত কোনো ভিখারীর ছেলে-মেয়েরা তখন কিছু পেতে পারে। ফটকের একেবারে বাইরে। াজা বাবু জয় হোক ব'লে যারা চেঁচাচ্ছে।

অট্টালিকায় প্রচুর খাবার আর বাইরে প্রচুর অভাব—এ প্রাচুর্য্য বাধ হয় এক ভারতবর্ষে। এ কথা ভেবে মীরার দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

এ কথা মনে হ'লে আর খেতে ইচ্ছে করে না। এর পরে ষ্টেজবাঁধা ঘরে গান হল, বাজনা হল, নাচ হল। কিন্তু গরীব হিন্দুস্থানের কথা একবার মনে হ'লে, আর ত কিছুই ভালো লাগে না। ও ভাবতে লাগলো একদিন মাত্র না খাইয়ে এই লেডি ব্যানার্জ্জী যদি কয়েক জন শিল্পী আর সাহিত্যিককে বাঁচার পথে সাহায্য করত!

মন ভার ক'রে মুখ ভার ক'রে মীরা ফিরে এলো। বাড়ীতে এসে দেখে, কত দিন পরে মাসীমা মেসোমশাই এসেছে। মাসীমা মানে মামমির নিজের বোন। মেসোমশাই প্রোফেসর। ব্যারিষ্টার ভায়রাভাইয়ের কাছে নিতান্ত কাজে না পড়লে আসে না।

আজ দরকার। সন্ধ্যে থেকে এসে বসে আছে। কোন ক'রে এলে এ বিভ্রাট ঘটত না।

চেয়ারে বসে কি সব কথাবার্ত্তা হল। কালকে সবাইকে যেতে হবে ওদের নতুন বাড়ীতে। লেক ভিউ বাড়ীতে।

নতুন বাড়ীটি লেকের কাছে। নতুন করা নয়, নতুন কেনা। দূরে লেকের নীল জল, সামনে ফুলের বাগান, তিনখানা ঘরের একতলা ছোট্ট বাড়ীটি কী চমৎকার সকালের আলো হাওয়ায়!

পুরীতে সী-ভিউ, দার্জ্জিলিংএ হিল ভিউ দেখেছে, এবার দেখলে লেক-ভিউ। ডায়মণ্ডহারবারে কি রিভার-ভিউ হবে? কিন্তু রাত্রে এ বাড়ীর অন্য রূপ। সেই গল্পই ও শুনলো। পাশের ঘরে চোর ঢুকে একালের ষ্টীলের আলমারী—যা নাকি আগুনে পোড়ে না, চাবি কেউ খুলতে পারে না, সেই আলমারী এসিডে গলিয়ে গয়নার বাক্স আর যা কিছু ছিল সর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে। এরা শব্দ শুনে জেগে উঠে গিয়ে দেখে, পাজামা-সার্ট বুশকোট পরা ভদ্রলোকের ছেলেরা সব—রিভলবারের আওয়াজ করলো, বোমা ছুঁড়লো—হাওয়া হয়ে গেল।

থানায় রিপোর্ট হল, পুলিশ এলো। কোন কিনারা হল না। সেই চোরদের মতনই দেখতে ভদ্রলোকের ছেলেরা সিগারেট টানতে টানতে এসে প্রোফেসরকে জানিয়ে গেল—যারা চুরি করেছে তাদের মুরুব্বি নাকি বিরাট বিরাট বড়লোকরা। এরা একটু তদ্বির তদারক করতে পারে। কিন্তু এখন গলা শুকিয়ে গেছে মাসীমা, দশ কাপ চা ক'রে দিন।

চা খেতে তারা প্রায়ই আসতে লাগলো। কোনো দিন সরবৎ চায়।

দামী দামী ফুলগাছগুলো কে উপড়ে নিয় যায়। ঢিল ছুঁড়ে সার্শীর কাচ ভাঙে। সারা রাত ধুপধাপ আওয়াজে একতলা বাড়ীতে ঘুম হয় না। তাই প্রোফেসার রাখলো একটা ফক্স-টেরিয়ার।

দিন কতক আওয়াজ বন্ধ হল। উপদ্রব বন্ধ হল।

কিন্তু রক্ষাকালী পুজোর চাঁদা চাইতে এসে কি কায়দায় যে দুর্দ্দান্ত ফক্স টেরিয়ারটাকে মস্ত থলের মধ্যে ওরা পুরে নিয়ে গেল, ওরাই জানে!

বেলায় এলো সেই ছেলের দল। বললে দশটা টাকা পেলে এনে দিতে পারে কুকুরটাকে।

খসলো দশ টাকা। মুখবন্ধ থলেতে ফিরে এলো ফক্স-টেরিয়ার।

ব্যারিষ্টার পরামর্শ দিলে, বাড়ীটা বিক্রি ক'রে পটোলডাঙায় ফিরে যাও। সেখানে পাড়ার লোক সজাগ, এখানে পাড়ার লোক ঝামেলায় যায় না। তা ছাড়া কত দূরে দূরে সব আছে।

আজ মীরা শুনলো, কলকাতায় বাঙালী ছেলেরা, লেখাপড়া জানা ছেলেরা খুব ছোরা চালাতে শিখেছে, মদ খেয়ে মাতলামী করতে শিখেছে, অনেক জায়গায় পথে-ঘাটে মেয়েদের চলা বিপদ, নিজের জাতের ভাইয়েদের সামনে দিয়ে।

মীরার একথা বিশ্বাস হয় না। গুণ্ডা মানেই ত' ছোট লোক, ছোট জাত, মুখ্খু।

ভদ্রলোক কখনো গুণ্ডা হয়? যণ্ডা হ'তে পারে। কয়েক জন ভদ্র পরিবারের ছেলেদের ইয়ার্কিতে একজনকে নতুন বাড়ী বেচে পালিয়ে যেতে হবে?

কিন্তু তাঁর মেসোমশাইকে শেষ পর্য্যন্ত তা-ই করতে হয়। মাঝে থেকে এক উকীল বন্ধু বাড়ী বেচার সময়ে দু' পক্ষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এমন গোলযোগ বাধিয়ে দিলো যে, তার হাত থেকে মুক্তি পেতে বেচারা প্রোফেসারের অনেক ঝঞ্ঝাট হল। কী কাণ্ড সব!

বিচিত্র মহানগরী। এখানে থাকতে গেলে মারতে হবে হয় টাকার জোরে, নয় বুদ্ধির জোরে।

ভালোমানুষ গোবেচারাদের জন্যে কি এ শহর নয়?

তাই ওর প্রাণ শান্ত হল ক'দিন সালানপুর এসে। পৃথিবীর মধ্যে এমন নির্জ্জন দেশও আছে?

ছোট্ট একটা ষ্টেশন। তার পাশে ছোট্ট একটা থানা। বাস-চলার সরু একটা রাস্তা। তার ধারে খান তিন-চার বাড়ী। তার পর মাঠের পর মাঠ, পলাশবন, শালবন, মহুয়াবন।

দূরে দূরে গ্রাম। দিনের বেলাতেই ঘুমন্ত। সাড়া নেই, শব্দ নেই। পথে লোক নেই একটিও।

শুধু শঙ্খচিল ডেকে ওঠে, মুনিয়াপাখী টেলিগ্রাফের তারে তারে লাফিয়ে যায়। আকাশে সাদা মেঘ স্থির হয়ে আছে। দূরে দূরে কলিয়ারীর চিমনি আর কপিকল দেখা যাচ্ছে। কয়লা-বোঝাই ইঞ্জিন শাণ্টিং করছে ষ্টেশানে।

রাস্তাটা প'ড়ে আছে ত প'ড়েই আছে। ক্যাবিনের দোতলার বারান্দার ধারে একটা লোক ব'সে আছে ত' বসেই আছে।

একদিকে আসানসোল, একদিকে কুলটি, একদিকে মাইথন, আর একদিকে চিত্তরঞ্জন। যেখানে লোকচলাচলের আর কাজের নাকি বিরামনেই, অথচ এগুলির এত কাছে, নিঃশব্দ অলস পাণ্ডব-বর্জ্জিত সালানপুর প্রাগৈতিহাসিক যুগের মতন অন্ধকার।

চাষের জমি, ফসলের জমি বিশেষ নেই, এখানে কিছুই পাওয়

যায় না, জল নেই, আলো নেই, শুধু বাতাস আছে নির্মল আর পাহাড়ী—পুরুষরা সব কাজে চ'লে যায় কলিয়ারী আর কারখানায় মেয়েরাও কিছু কিছু বিরাট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়ার কেন্দ্রস্থলটি স্থির হ'য়ে প্রতীক্ষা করে বছরের পর বছর, কবে সেখানে উৎসাহের উত্তমের চঞ্চলতার সাড়া আসবে।

যতই যা হোক, তবু মীরার প্রশ্ন জাগে, এমন গ্রামও ভারতবর্ষে আছে যেখানে উদ্দীপনা ব'লে কিছু নেই। পঞ্চাশ বছর ধরে এ গ্রাম একই ভাবে আছে, একটুও উন্নতি হয় নি। না স্কুল দিয়ে, না দোকান দিয়ে, না ডাকঘর দিয়ে।

এ সব কথা শুনেও মীরার ভালো লাগলো শান্ত ছবিটি দেখে। দিগন্তলীন মাঠের ওপর উদার আকাশ নিঃশব্দ ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয়, শান্তি আসছে, মনে শান্তি আসছে—যে শান্তি পৃথিবীর কম জায়গাতেই আছে।

কলকাতা থেকে জানা খাবার আর তরীতরকারীর ব্যবস্থা হয় ঠাকুরের হাতে রান্নাঘরে—কল্যাণ-কুটীরের টাসিঢাকা ছোট্ট বারান্দা থেকে পঞ্চকোট পাহাড়ের ঢেউ দেখা যায়, ছাদের ওপর উঠলে দশ-পনেরো মাইল মাঠ ঘাট বন গ্রাম চোখের সামনে ধরা পড়ে। ড্রয়িং রুমের ভদ্রতা মেকী সভ্যতার স্থান এখানে নেই, ইচ্ছে হয়, ছোটো মাঠের ওপর দিয়ে—যে মাঠ ক্রমশঃ নীচে নেমে গিয়ে আবার ওপরে উঠে গেছে, যে মাঠ সমতল বাংলার মতন একঘেয়ে নয়।

মাঝে মাঝে নজরে পড়ে রাস্তায় স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের—লেডি ব্যানার্জীদের চেয়ে সৌন্দর্য্য যাদের বেশী। কোনো মেম-ড্রেসার যদি তাদের সাজাত, তাহলে তারা পরীর মতন হ'য়ে উঠত। চুলগুলোকে কি রকম ঘুরিয়ে কানের পাশে খোঁপা করেছে, তাতে গুঁজেছে সাদা-লাল ফুল,—কলকাতার প্লাষ্টিকের শুকনো ফুল নয়—ছুটে চলেছে যেন বনের হরিণের মতন, হাসছে যেন ঝর্ণার কলধ্বনি।

এরাই ত এখানকার শোভা। মোটা খাওয়া-পরায় এত আনন্দ ওরা কোথা থেকে পায়?

রাত হয় সালানপুরে, অজস্র কলিয়ারীতে আলো জ্বলে ওঠে দীপান্বিতার মতন, মাইথন আলোর মালা পরে হাসে।

ঐ মাইথনে যাবার জন্যেই ওদের এখানে আসা। মাম্‌মি স্বপ্ন দেখেছে, ৺কল্যাণেশ্বরীর পূজো দিতে হবে। কালো আকাশে অসংখ্য তারা, যে তারা কলকাতার ধোঁয়াভরা আকাশে দেখা যায় না। সব তারা নিবে যায়। শুকতারা জাগে।

ওদের এয়ার-কণ্ডিশনড্ মোটরকারে ষ্টীয়ারিং হুইলে ফার্ষ্ট গীয়ার, নিউট্রাল, সেকেণ্ড গীয়ার হ'য়ে টপ গীয়ার ঠেলে দেওয়া হয়, গাড়ী ঝড়ের মতন এগিয়ে চলে, অল-ইণ্ডিয়া রেডিয়ো থেকে শানাই বেজে ওঠে ছোট্ট বেতার যন্ত্রে,—গাড়ী ত নয়, যেন বাড়ী চলেছে পীচঢালা রাস্তার ওপর দিয়ে, সাঁওতাল-পল্লীর পাশ দিয়ে, পদ্মদীঘির ধার দিয়ে, দেন্দুয়া হল্ট পার হ'য়ে লাকরাজুড়ি পিছনে ফেলে নেমে যায়, ক্রমশঃ নেমে যায় বরাকর নদীর দিকে গড়গড়িয়ে, আবার ওঠে পাহাড়ের বুক-চেরা রাস্তায় কোয়ার্টার্স দুপাশে ফেলে,—মাইথন বাঁধ নদীর বুক থেকে বিশতলা সমান উঁচু, তার ও-ধারে পাহাড়ের চূড়া বুকে দ্বীপের মতন জাগিয়ে অথৈ অতল জল, ময়দানবের মতন যন্ত্রদানব কি কাজ এখানে করেছে!

ছোট্ট একটুখানি জায়গা জুড়ে ছোট্ট একটি সন্ন্যাসীর আশ্রম চারিধারে দোকান-পসার, লোকালয়।

মীরার মাম্‌মি বলতে লাগলো, সন্ন্যাসী আজ নেই, যেদিন তিনি ছিলেন, আমি এসেছি ঢালনা নদী পার হয়ে কাঁটা-বিছানো পাহাড়ী পথে। সেদিন সন্ন্যাসীর আশ্রমের চারিধারে কত ফল-ফুলের বাগান, কুয়ার জল কি মিষ্টি, আর চারিধারে কি নিবিড় বন!

আশ্রমের জানলার লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাওয়া যেত এক পাহাড়ের উঁচু শিখর, ডিনামাইট দিয়ে যা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই পাহাড়ের জঙ্গল থেকে বাঘ বেরিয়ে আসত রাত্রে। সন্ন্যাসী ছাড়া চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে আর কেউ ছিল না। কোথায় গেল সেই বন, আর কোথায় গেল সেই আশ্রম। ও পথ থেকে ফিরে ওরা মন্দিরের দিকে নেমে এলো।

মাম্‌মি বললে, এই মন্দিরে বিকেল তিনটের পর আর জনমানব থাকত না, পায়ে হেঁটে গরুর গাড়ীতে সব গ্রামের দিকে শহরের দিকে ফিরে যেত। তারপরেই ছিল বাঘের ভয়, নির্জ্জন পথে ছিল ডাকাতের ভয়।

আজ এখানে দেখো, দিনের বেলাতেই ইলেক্‌ট্রিক আলোয় সাজানো দোকান ঘর, মনে হয়, যেন কালীঘাটে এলাম। ধর্মশালায় সারা রাত হৈ হৈ করছে রাঁচী হাজারিবাগ থেকে যারা এসেছে, রাণীগঞ্জের লোকের ফিরে যাবার তাড়া নেই, বাস দাঁড়িয়ে থাকবে।

দেবী আজ সকল ভয় দূর করেছেন, কিন্তু সেদিনের সেই জনহীন নদীকূলের বনপথের মন্দিরের অবাধ গাম্ভীর্য্য কোথায় গেল? এ তো মেলার ঠাকুর দেখতে এলাম!

মীরা বলে, যতই বলো মামমি, সেদিন এলে ভয় করত। গরুর গাড়ীতে ফিরে যেতে হত বেলা তিনটের আগে, থমথম করত চারিদিক, আজ কোনো ভয় নেই, তাড়া নেই, নদীতে স্নান ক'রে খিচুড়ি খেয়ে অনেক রাত ক'রে ফেরা হবে।

নদীর ধারে গাছের তলায় উনুন পেতে ঠাকুর রান্নার ব্যবস্থা করলো। নদীতে পাথরে আছড়ানো ঝর্ণার মুখে ব্যারিষ্টার রায়চৌধুরী মিসেস রায়চৌধুরী মীরাকে নিয়ে প্রাণ ভ'রে স্নান সারলো। উঠতে ইচ্ছে করে না।

দুজনে যখন গরদের কাপড় আর শাড়ী প'রে পূজোর জিনিস নিয়ে তৈরী হল, তখন হাইকোর্টের অ্যাটর্নী উকিল আর মক্কেলরা কেউ কেউ সে দৃশ্য দেখে অবাক্—সাহেব মানুষের এত হিন্দুয়ানী!

অনেক লোক মন্দির-প্রাঙ্গণে, বাইরের অঙ্গনে কালো কালো পাঁঠা সারি-সারি রাখা—একটার বলি দেখে আর একটার আর্তনাদ আর স্পষ্ট চোখের জল মীরাকে চঞ্চল ক'রে তুললো, সে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। নদীর ধারে, যেখানে ঝর্ণার অশ্রান্ত কলকলধ্বনি, আর ব্রীজের ওপারে মাইথনের বাড়ীঘর ঝিকমিক্ করছে।

মীরা ভাবে, খাওয়ার জন্যে পৃথিবীতে অজস্র জীবজন্তু পাখী-পক্ষী হত্যা করা হচ্ছে প্রতিদিনই, সে হয়ত আরো নিষ্ঠুর ভাবে জবাই করা, মানে ত টুঁটিটা আধখানা কেটে ছেড়ে দেওয়া—কিন্তু মায়ের কাছে মার সন্তানদের ঠকাঠক কাঁপুনীর মধ্যে এই বলিদান, কচি কালো পাঁঠাদের এই অকালমৃত্যু এর অর্থ ঠিক বুঝতে পারা যায় না!

অ্যাটম বোমের বাতাসে ভেসে যাওয়া রেণুকণা দিয়ে, বিভিন্ন খাদ্যে ভেজাল দিয়ে, মানুষকে বঞ্চিত করে উপবাসের মুখে ঠেলে

ওদের নিত্য-নতুন পৈশাচিক ষড়যন্ত্র দিয়ে এর চেয়ে অনেক বেশী পাপ কাজ করা হচ্ছে পৃথিবীতে। জননী যেন শক্তি দেন সেই পাপ নিশ্চিহ্ন করবার।

বড়ো মন্দিরের বাইরে যেথানে চরণপদ্ম আছে ছোট মন্দিরে, যেখানে কিশোরী কন্যা একদিন শাঁখারীর কাছে শাঁখা কিনে মদনপুরের দেওঘরিয়া পিতার কাছে দাম নিতে বলেছিলো—ক্ষ্যাপেশ্বরীর সেই পুরানো কাহিনী মায়ের স্থান, মায়ের থান—সেইখানে স্মরণ করতে করতে প্রার্থনা করতে লাগলো মীরা—শক্তিময়ি, শক্তি দাও। [ক্রমশঃ।

আমার দেখা সুনির্ম্মল বসু

শ্রীবিনায়ক সেন

সুনির্ম্মল বসুর সঙ্গে আমার আত্মীয়তাও নেই, বন্ধুত্বও নেই, একদিনের সামান্য কিছুক্ষণের জন্য ছাড়া ওঁর সঙ্গে জীবনে সাক্ষাতের কোন দাবীও করতে পারিনে। তবু যে ওঁর সম্বন্ধে লিখতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ ওঁর সঙ্গে আমার একটি আজন্মের সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ লেখকের ও পাঠকের। তিনিই যখন লেখক, তখন আমিই পাঠক।

সুনির্ম্মল বসুকে আমি আমার নিতান্ত ছেলেবেলা থেকে এবং বলতে কি ওঁর সাহিত্য-জীবনের একেবারে গোড়া থেকেই দেখে আসছি। সেটা হবে ১৯১৯—২০ সাল, আমার বয়েস ন-। নয়-দশ, বাংলার শিশু সাময়িকের রাজ্যে তখন সন্দেশ-এর সাম্রাজ্য চলছে। যদিও শিশু-সাময়িকই তখন এমন কিছু ছিল না, এক ছিল 'সন্দেশ' আর ছিল 'শিশু', 'প্রকৃতি' বোধ হয় তার আগেই বন্ধ হয়েছে। শিশুও গেছে কিম্বা যায় যায়। দু'-একখানা ছুটকো মোটো শিশু এখানে সেখানে বন্ধু-বান্ধবের বাসায় ছাড়া ও কাগজ আমি নিজে কাউকে রাখতে দেখিনি। ছেলেবেলা মানুষ হয়েছি গ্রামে। আমাদের পাড়ার একটি মেয়ে রাখতো সন্দেশ, আর ঐ একটি মাত্র সন্দেশ দিয়েই আমরা পাড়ার সব ছেলে-মেয়ে সাহিত্য উপভোগের জের মেটাতুম। তখনও শিশুচিত্তকে স্বীকার করবার মত বা তাকে সাহিত্যের আনন্দ দেবার মত যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল না।

সেই সময় বড়দের পত্র-পত্রিকা প্রবাসীর কি করে দয়া হলো, ওঁরা ওঁদের কাগজে ছেলেদের পাততাড়ি বলে শিশুদের জন্য কয়েকখানি পাতা জুড়লেন। কাজেই আমরা দু'টো সম্পদ হাতে পেলুম এক সন্দেশ আর এক প্রবাসী। সন্দেশের রায়-পরিবারের প্রায় সবারই দান অনবদ্য গল্প, কবিতা, ছড়া প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণ-কাহিনী, ধাঁধা আমাদের যখন একেবারে মাতিয়ে রেখেছে, তার উপরে প্রবাসীর ছেলেদের পাততাড়ি আমাদের কাছে হলো গুরু ভোজনের উপরেও চাটনী-বিশেষ। সেই প্রবাসীর ছেলেদের পাততাড়ির পৃষ্ঠায় একদিন সুনির্ম্মল বসুর ছড়ার কবিতা পেলুম, "চন্দ্র ভায়ার পদ্মা পার।" চন্দ্র একদিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে যে সে সাঁতরে পদ্মা নদী পার হয়ে যাচ্ছে, বন্ধু-বান্ধব তীরে দাঁড়িয়ে বলছে, "ওরে চন্দ্র, যাসনি যাসনি, ডুবে যাবি, ফিরে আয়।" চন্দ্র কিন্তু কিছুতেই শুনছে না, তখন তার মজা লেগে গেছে—পদ্মা পার সে হবেই। এমন সময় মা এসে হাত ধরেছেন ওর, ওকে ঘুম থেকে তোলবার জন্য—

……ধরল তাহার হাত কে?

"ওরে বাবা কুমীর বলে ওঠেন চন্দ্র আঁতকে—তার পরেই—

……জেগে দেখেন লজ্জায় পার হয়েছেন পদ্মা নদী শুয়ে শুয়ে শয্যায়।

এইটেই সুনির্ম্মল বসুর প্রথম প্রকাশিত লেখা, উনি নিজেই তা' বলেছেন ওঁর সম্প্রতি প্রকাশিত "জীবন-খাতার কয়েক পাতা"য়। ওঁর বয়েস তখন কত ছিল তা' আমরা জানতুম না, আর তা' জানবার প্রয়োজনও তখন কিছুই বোধ করিনি, আমরা ওঁকে পুরোদস্তুর সাহিত্যসেবক বলেই ধরে নিয়েছিলুম। জীবন-খাতার পাতা থেকে জেনেছি, তিনি তখনও ছিলেন স্কুলের ছাত্র। ঐ ছেলেদের পাততাড়িতেই ওঁর আর একটি ছড়ার কবিতা পাই—

—ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং সবে সরে যাও না,
চড়িতেছি সাইকেল দেখিতে কি পাও না?
ঘাড়ে যদি পড়ি তবে প্রাণ হবে অস্ত।
পথ মাঝে পড়ে রবে ছিরকুটে দন্ত।
জান নাকি বলেছিল মহাকবি মাইকেল,
যেও না যেও না সেথা যেথা চলে সাইকেল? ইত্যাদি

সুকুমার রায়ের ছড়া কুমড়ো পটাশ, ভয় পেও না, বোম্বাগড়ের রাজার তখন আমাদের থানা ভরপুর, সুনির্ম্মল বসুকে পেয়ে যেন আরও কিছু পেলুম। সুনির্ম্মল বসুর বেশী কিছু তখনও প্রকাশিত হয়নি। কবি মানসের কবিতা তো প্রকাশিত হয়ই নি। আরও পরে পাই ওঁর কবিত্বপূর্ণ কবিতা সন্দেশের পৃষ্ঠায়। সুনির্ম্মল বসু সম্বন্ধে আমার সেই সময়ের মনোভাব কিছু দিন পূর্ব্বে বাংলার শিশু সাময়িক নামে একটি রচনায় উল্লেখ করেছিলুম (যুগান্তর নভেম্বর ২০,—১৯৫৫) তারই সেই অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করছি।—

"সুনির্ম্মল বসুর সেই সময়েই হাত-খড়ি সাহিত্য জীবন আরম্ভ করেছেন মাত্র। ওর লেখা এবং ওর আঁকা ছবি দেখতে পাই সন্দেশের শেষ দিকে। ১৯২৪-২৫ সালে সুকুমার বাবু মারা যান। তার কিছুদিন পরেই ওদের সব দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে যায়। সেই সময়েই মালিক সুধাবিন্দু বিশ্বাস কিছুদিন সন্দেশ চালিয়েছিলেন বোধ করি বা ২৬, ২৭, ২৮ সন, তার পরেই তা বন্ধ হয়ে যায় একেবারে। সেই সময় সুনির্ম্মল বসুর কবিতা প্রায়ই সন্দেশে বেরোতো আর ওঁর নিজের কবিতার ছবিও প্রায়ই উনি নিজেই আঁকতেন। ওঁর রসের কবিতা, খেয়ালী কবিতা ও ছড়া ছাড়াও উনি প্রায়ই নিছক কবি মনোবৃত্তির কবিতা লিখতেন বিশেষ মাস বা বিশেষ ঋতু নিয়ে। বর্ষার কবিতা ছিল—

—আবার সুরু ঝুরু ঝুরু বাদল ঝরা গান

চৈত্রের কবিতা ছিল—

—চৈতী হাওয়া বইতে সুরু অনেক দিনের পর

শরতের কবিতা ছিল—

—ভোর হলো রে দোর খোল রে ভাই
এমন ভোরে ঘুমুস পড়ে ছাই—ইত্যাদি।

গ্রামের ছেলে ছিলুম আমি, ঋতু পরিবর্ত্তন আর প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য্য উপভোগ আমার রক্তে রক্তে। বেশ মনে পড়ে বর্ষার সময় ঝম ঝম বৃষ্টি পড়তো আর রাস্তার জল একটা নালা বেয়ে হুড় হুড় করে নেবে আসতো আমাদের বাসার সামনের একটা ডোবায়। স্কুল ছুটি থাকলে আমাদের বাইরের ঘরে একাকী বসে পড়তুম সুনির্ম্মল বসুর 'আবার সুরু ঝুরু ঝুরু', আর কাব্যের ছন্দে ছন্দে বুকটা টন টন করে উঠত সেই ছেলেবেলা।

সুনির্ম্মল বসু যদিও ছড়াকার বলেই সমধিক প্রসিদ্ধ কিন্তু আসলে ছিল ওঁর ভিতরে একটি সুন্দর কবি, একটি সত্যিকারের কবি, বার বার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ছোট ছোট কবিতায়। ওঁর সাঁওতালপল্লী, সাঁওতাল পরিবেশ, সাঁওতাল ছেলে-মেয়ে নিয়ে যে সব কবিতা আছে তা যাঁরাই পড়েছেন তাঁরাই জানেন। মাস বা ঋতুর কবিতা তো আগেই উল্লেখ করেছি। 'মাস-পয়লা'র চেহারা তখনও খুব ছোট, সেই ছোট মাস পয়লায় 'অতসী' বলে ওঁর একটি ছোট কবিতা মনে পড়ে। সেই দিন বুঝেছিলুম উনি কত বড় কবি। কবিতাটি ছিল বোধ হয় আটাশ পংক্তি, তার পাঁচটি পংক্তি মাত্র আজ মনে আছে কিন্তু তাঁর কবিচিত্ত বিচারে তাই যথেষ্ট—

—অতসী ফুটেছে বন-কোণায়,
খোঁজ রাখে তার কোন জনায়।
... ...
দু'লে দু'লে যারা নিরালাতে
... ...

তার পর একদিন কবি এসে বললে,—

"ওরে ও অতসী মোছ আঁখি,
আমি কবি তোর খোঁজ রাখি।"

সন্দেশ উঠে যাবার পর সুনির্ম্মল বসুকে আমি দেখি ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য্যের মাস-পয়লার সঙ্গে। ছোট ও বড় মাস পয়লায় উনি অনেক কবিতা, ছড়া ও ছোটদের নাটক লিখেছিলেন। নাটক মনে পড়ে 'কিপটে ঠাকুর্দা', কবিতা 'অতসী' ও সাঁওতালরা, ছড়া 'সামিয়ানা' 'অটল বাবুর পটল তোলা', 'কথক ঠাকুর মশায়ের দাড়ি নাড়া দেখে রাম ছাগলের কথা মনে পড়া', 'কাছায় বাঁধা নেংটে ইঁদুর', 'দুলাল পালের ছেলে ভুলাল সদাই তাহার ভুলটি, কালনা যেতে বললে তারে হাজির হবে কুলটি', 'শেঠজীকে কুকুরে তাড়া করা'—

—প্রবাদ জানে তুমি হামি কুত্তাকো আর তা' জানে না। রাত্রিতে রিক্সা করে' ঠনঠনের কাছে বাড়ী ফিরতে, রিক্সাওয়ালা বাবুকে একেবারে নৈহাটিতে নিয়ে গিয়ে হাজির করা—

ঠনঠনিয়ায় ঠন ঠনিয়ে, রিক্সাওলা আমায় নিয়ে চলতেছিল
হন্ হনিয়ে।

শীতের রাত, গায়ের কাপড়টা একটু ভাল ক'রে জড়িয়ে আরাম করে বসেছি, একটু ঘুমেরও ঢুল এসেছে, তার পর কতক্ষণ কেটে গেছে টের পাইনি হঠাৎ দেখি যে, একি! গঙ্গার ধারে সব বড় বড় চোঙ পূব আকাশে সূর্যি উঁকি মারছে, কি ব্যাপার। হাঁ হাঁ করে' রিক্সাওয়ালাকে থামাতেই সে বললে—কসুর হুয়া ভুল হুয়া কুছ কাল রাতমে আফিং পিয়া। কাজেই—

শীতের রাতে শীঘ্র করে পৌঁছাব ভাই কই বাটীতে,
তা না হয়ে' একেবারে পৌঁছে গেলুম নৈহাটীতে।

মাস পয়লার যুগেই নিজের কৈশোর কাটিয়ে উঠেছি, তার পর ১১৩৩ সালে জীবিকার প্রয়োজনে বিদেশে যেতে হয়েছে, তাই সেই সময়ের পর থেকে সুনির্ম্মল বসুর কার্য্যকলাপের সঙ্গে আর বিশেষ সংযোগের অবকাশ ঘটেনি, তবু সম্বন্ধ যে একেবারে শেষ হয়ে যায়নি বিদেশে থেকেও বার বার তা টের পেয়েছি। অধুনা প্রকাশিত শিশু সাহিত্য পরিষদের 'ছড়ার ছবিও' আমার হাতে এসেছে। জীবন চক্রের ও একটা অতি তুচ্ছ ঘটনা কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এ যেন ভাগ্যের খেলা, সুনির্ম্মল বসু সম্বন্ধে আমাকে একদিন লিখতে হবে বলে সে আমাকে যেন আগে থেকেই প্রস্তুত কচ্ছিল। ঐ ছড়ার ছবিতে ওঁর সে অবদান—

দাদুর মাথায় টাক ছিল
সেই টাকে তেল মাখছিল
বা
হাঁকিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি কাল
আসছিল এক খ্যাক-শিয়াল

এ সব ছড়া তো মনে হয় বাংলায় চিরদিনের ছড়ার ভেতরেই কালে স্থান পাবে।

১১৪০ সালে একবার কলকাতা যাই, তখন একদিন বর্ত্তমান বসুশ্রী বায়োস্কোপ ঘরের কাছাকাছি জায়গায় রসারোডের উপরে ছোট্ট এক রেস্তোরাঁতে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় সুনির্ম্মল বসু এক বন্ধুকে নিয়ে সেখানে এলেন, এবং আর কোন টেবলে জায়গা না থাকাতে ওঁরা দু'জনে আমারই দুপারে বসলেন। বসেই বন্ধু হাত এগিয়ে দিলেন আর সুনির্ম্মল বসু দেখতে লাগলেন তা'। কেউ হাত দেখতে থাকলেই, যদি পয়সা দিতে না হয়, নিজের ভবিষ্যৎটাও একটু হাতড়ে দেখতে চাওয়া মানুষের এক চিরন্তন দুর্ব্বলতা। কাজেই আমিও সেই মুহূর্ত্তে ভিড়ে পড়েছিলুম ওঁদের দলে। কথা হতে পারে যে উনিই যে সুনির্ম্মল বসু আমি তা' জানলুম কি করে' তা' হলে বলব বহু ক্ষেত্রে বহু অবস্থায় ওঁর ছবি আমার দেখা ছিল। অনেক দিন ধরে সম্প্রতি আমার রচনা শিশু সাময়িক প্রকাশিত হবার পর উনি আমার কয়েকটি ভুল শুধরে কাগজে পত্র দেন। সেই ব্যাপারকে অবলম্বন করে, ওঁর সঙ্গে আমার দু'খানি পত্র-বিনিময় হয়। তাতে ঐ কথাটা মনে করিয়ে দেওয়ায় উনি আমাকে লেখেন যে, হাঁ, এক সময় ওঁর হাত দেখা চর্চ্চার ঝোঁক হয়েছিল।

ওঁর সঙ্গে সেই কয়েক মিনিটের মাত্র দেখা, আর কখনো দেখা হয়নি। তবু এই অপরিচয়ের বন্ধক সত্ত্বেও ওঁর নানা লেখা ও নানা বিবৃতির মধ্য দিয়ে ওঁর চরিত্রের একটা বিশেষত্ব বার বার আমাকে অভিভূত করেছে তা' ওঁর মধুর বিনয়। জীবন-খাতার ভূমিকায় উনি বলেছেন—

"আমার আত্মকথা পড়ে কার কি উপকার হবে জানি না। কোন দিনই ভাবি নাই আমার আত্ম-চরিত লিখতে হবে, কোন দিন ইচ্ছাও ছিল না বরং আপত্তিই ছিল বরাবর।"

তারপর তিনি ত অপকর্ম্মের লাভালাভের দায়িত্ব দিয়েছেন প্রকাশককে যিনি তাঁকে তাড়না দিয়ে এ কাজ করিয়েছেন। প্রায় পনেরো বৎসর আগে উনি একটি কবিতা দিয়েছিলেন বাংলার কয়েকটি তরুণ তরুণী সাহিত্যিকদের, ওঁরা বাংলার বর্ত্তমান ও বিগত

কবিদের কবিতার কয়েকটি সঙ্কলন প্রকাশ করতে চেয়েছিল। এই কবিতাটি হয়তো বাংলার যথেষ্ট পাঠকের চোখে এখনও পড়েনি, তাই তা' এখানে সম্পূর্ণ তুলে দিলুম :—

ছোট্ট কবিতা

আমার কাছে চাইলে তুমি ছোট্ট কবিতা,
না যদি দিই, কেমন করে ভুলবে ভবী তা'।
না-ছোড়-বান্দা তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছি,
এই জীবনের চলার পথে নিত্য হেরেছি।
তোমরা যখন দাবী কর লেখার বিষয়ে
তখন ভাবি এমন দাবী থাকব কি সয়ে.
কাব্যলক্ষ্মী এলেন কবে গোপন-চারিণী,
কবে আমি কবি হ'লাম বুঝতে পারিনি'।
তোমরা সবাই ধ'রে কবি করলে আমাকে,
নইলে অনেক ভাল হতো রামা-শ্যামাকে।
যখন কলম ধরেছিলাম খেয়াল খুশীতে,
কে জানতো সকল জনে পারব তুষিতে?
স্বীকার করুক নাহি করুক স্বজন জ্ঞাতিতে,
যে করে' হোক পৌঁছে গেছি খানিক খ্যাতিতে।
একটা বড় লাভ হয়েছে দেখ্‌ছি খতিয়ে,
বাংলার কিশোর প্রসন্ন আজ আমার প্রতি যে।

বাংলার বাইরে থেকেও ওঁর 'জীবন-খাতা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তা' পড়বার আমার সুযোগ ঘটেছে। তা থেকেই টের পাই কেন ওঁর কবিতায় সাঁওতাল-জীবনের এত প্রভাব, যদিও ও সন্দেহ আমার বরাবরই ছিল।

আমার কাছে লেখা পূর্ব্ববর্ণিত ওঁর পত্রে কলকাতা গেলে ওঁর সঙ্গে দেখা করবার উনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। গত নভেম্বর মাসে একবার কলকাতা যাই, সেই সময় একদিন ওঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য বেরিয়ে অনেক রাত্রি হয়ে যাওয়ায় অর্দ্ধেক রাস্তা থেকে ফিরে আসি। সেদিন সংবাদ কাগজের স্তম্ভ থেকে জানলাম উনি পরলোকে। আর কখনো ওঁকে আর আমার দেখা হবে না। এত শীঘ্র যে উনি চলে যাবেন এই কথাটা ভাবতেই পারিনি। আর ভাববই বা কি করে, কী-ই বা এমন বয়েস হয়েছিল ওঁর, মাত্র ছাপ্পান্ন ত'। আমার নিজের কাছে মনে হচ্ছে যেন একজন ছেলেবেলার গুরুস্থানীয় বন্ধু হারালুম। বাংলার অনেক কিশোর-কিশোরীর মতই ছেলেবেলা থেকেই ওঁকে ভালবেসেছি। আজও ওঁর কথা ভাবলে নিজেকে শুধু সেদিনের আমার ভেতরেই দেখতে পাই, আমার কাছে সুনির্ম্মল বসুর এই-ই পরিচয়।

একে পাঁচ পাঁচে এক

[হান্স ক্রিশ্চিয়ান আণ্ডেরসেনের রূপকথা]

এক যে ছিলো মটরশুঁটি।

এক মানে অবশ্য এক জন নয়, কারণ আসলে তারা ছিলো পাঁচ জন। এক হ'লো গিয়ে খোশাটা, আর পাঁচ হ'লো ভিতরের মটরশুঁটি। খোশাটাও সবুজ, তারাও সবুজ, আর তাই তারা ভাবতো সমস্ত পৃথিবীটাই বুঝি সবুজ—ভাবাটা অসম্ভবও ছিলো না। খোশাটা বাড়লো, বাড়লো তারাও—গোলগাল পাঁচ জন একসারে পাশাপাশি ব'সে। বাইরে যখন রোদ থাকে, খোশাটা তখন গরম হয়; বৃষ্টি পড়লে খোশাটা পরিষ্কার পাতলা হ'য়ে আসে। রোদ-মাখানো দিনদুপুরেও ভালো, মিটমিটে শিশুতি রাতেও ভালো; দিনে-দিনে তারা পাঁচ জন বড়ো হয়, আর যতোই বড়ো হয় ততোই তাদের ভাবনা ধরে. কিছু একটা করতে হবে তো, নইলে পৃথিবীতে জন্ম হ'লো কেন?

'এখানেই চিরকাল ব'সে থাকবো নাকি আমরা?' সকলের মনের ভাবনা একদিন মুখ ফুটে প্রকাশ করলে এক জন। ব'সে থাকতে থাকতে শক্ত হ'য়ে গেলেই গেছি। বাইরে না জানি কতো কী হ'চ্ছে, একটু-একটু যেন টেরও পাচ্ছি ভিতরে ব'সে।'

মাস কেটে গেলো। হলদে হ'য়ে এলো তারা, হলদে হ'য়ে এলো তাদের পাতলা আবরণ।

'সমস্ত পৃথিবী হলদে হ'য়ে যাচ্ছে', একে অন্যকে ফিশ-ফিশ ক'রে বললে তারা; আর এমন কথা বলা তাদের পক্ষে অসম্ভবও ছিলো না।

আচমকা খোশায় পড়লো একটান! কে যেন খোশাটা ছিঁড়ে নিলে, কার হাতের ভিতর দিয়ে যেন চ'লে গেলো, টুপ ক'রে পড়লো গিয়ে একটা জামার পকেটে, সেখানে আরো অনেক খোশার ঠেলাঠেলি ভিড়।

'এখন আমাদের খুলবে'—একথা ভাবতেই খুব ফূর্তি হ'লো তাদের মনে—এতো দিন তো এরই জন্য পথ চেয়ে আর কাল গুণে ব'সে ছিলো তারা।

পাঁচ জনের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোটো, সে বললে, 'দেখা যাক আমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে দূরে যায়।'

যে ছিলো সবচেয়ে বড়ো, সে কেবল বললে, 'যা হবার তাই হবে।'

তার পর আচমকা শব্দ ক'রে ফাটলো খোশা, পাঁচ জনে তারা গড়িয়ে বেরিয়ে এলো রোদের ঝলমলানিতে, এসে দেখলো ছোট্ট নরম একটি হাতে তারা শুয়ে—ছোট্টো একটি ছেলে তাদের হাতের মুঠোয় ধ'রে আছে!

'বাঃ, কী মজা!' ছেলেটি ব'লে উঠলো। 'এগুলো দিয়ে আমার গুলতির চমৎকার গুলী হবে।' এই কথা ব'লে এক জনকে সে গুলতির ছিলার উপর রাখলো, তার পর কান পর্যন্ত টেনে দিলে ছুঁড়ে।

'চললুম আমি এই বিরাট পৃথিবীতে উড়ে। ত্যাখো, আমাকে ধরতে পারো কি না!' এই ব'লে সে চ'লে গেলো।

আরেক জন বললে, 'একেবারে ঠিক সূর্যের বুকের মধ্যে গিয়ে লাগবো। ঠিক আমার মনের মতো জায়গা'—ব'লে সে হাওয়া হ'য়ে গেলো।

'যেখানেই গিয়ে পড়িনে কেন, খুব এক চোট ঘুমিয়ে নেবো প্রথমে, তার পর গড়াবো মনের সুখে,'—বললে এর পরেই দু'জন। গড়ালো বটে তারা, খুব ক'রে গড়িয়ে নিলে ছিলেয় লাগাবার আগেই, কিন্তু ছেলেটি তাদের তুলে নিয়ে আবার ছুঁড়ে মারলে। যেতে-যেতে তারা বললে, 'আমরা যাবো সবচেয়ে দূরে।'

'যা হবার তা-ই হবে,'—বললে শেষের জন। গুলতি থেকে

বেরিয়ে সে ছুটলো, ছুটে গিয়ে লাগলো একটা কুঁড়ে-ঘরের জানলার কপাটে।

এদিকে হয়েছে কী, সেই কপাটে ছিলো একটা ফুটো, আর সেই ফুটো নরম কাদা আর ঘাস দিয়ে আটকানো। এতো জোরে ছুটে এসে সে একেবারে আটকে গেলো সেখানটায়—নড়াচড়া একেবারে 'নট্ কিচ্ছু' হ'য়ে গেলো—না পারে নড়তে, না পারে চড়তে। তবু কিন্তু একটুও ঘাবড়ালে না সে, মনে-মনে আবার বললে, 'যা হবার তা-ই হবে।'

ঘরের ভিতরে থাকে এক কাঠকুড়ুনি। ভয়ানক গরিব। বনে ঘুরে-ঘুরে সে কাঠ কুড়োয়, শুকনো পাতা কুড়োয়; লোকের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বাসন মাজে, কুয়ো থেকে জল তোলে। শরীরে তার শক্তি অনেক, কাজও সে সারা দিনই করে, কিন্তু তবু তার দুঃখ দূর হয় না। ঘরে তার আপন বলতে আছে কেবল ছোট্টো, একরত্তি এক মেয়ে; অসুখে ভুগে-ভুগে তার একেবারে মরণদশা। পুরো এক বছর সে মড়ার মতো অসাড়ে বিছানায় শুয়ে আছে—এখন তার এমন অবস্থা যেন সে বাঁচবেও না মরবেও না, কেবলি ভোগাবে মাকে।

কাঠকুড়ুনি মনে-মনে ভাবে,—'ও বুঝি চললো ওর ছোট বোনটিরই কাছে। দুটি মাত্র মেয়ে ছিলো আমার, তাদের খাওয়ানো-পরানো কম কষ্ট নয়। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই একজনের ব্যবস্থা করলেন, টেনে নিলেন তাঁর কোলে। আরেক জনকে আমি তো চাই আমার কাছেই রাখতে, কিন্তু ওরা দু-বোন বুঝি আর আলাদা থাকবে না।

কিন্তু, কই, তবু তো মরলো না মেয়ে,—তেমনি মরো-মরো হ'য়েই শুয়ে থাকলো বিছানায়, নিজেও ভুগতে থাকলো, মাকেও ভোগালো কেবল।

সমস্ত দিন সে চুপ ক'রে নিঃঝুমের মতো বিছানায় শুয়ে থাকে,—আর তার মা ঘোরে বাইরে-বাইরে, কাঠ কুড়োয়, পাতা কুড়োয়, জল তোলে, বাসন মাজে। তখন শীত শেষ হ'য়ে বসন্ত এসেছে; ভোর-বেলায় তার মা যখন কাজে বেরিয়ে যায়, রোদের সোনালি রঙ জানলা দিয়ে চৌকো হ'য়ে মেঝেতে এসে পড়ে: মেয়েটি চুপ ক'রে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'জানলার কপাটে ঐ ছোট্ট, সবুজ ওটা কী, মা? ঐ যে, হাওয়ায় নড়ছে?'

মা জানলার ধারে এগিয়ে এসে দেখলো। 'আরে তাই তো! কী অবাক কাণ্ড! ছোট্টো একটা মটরশুঁটি যে, এখানেই শিকড় গজিয়েছে দেখছি, পাতাও গজিয়েছে দু-একটা। এই ফাটলের মধ্যে কী ক'রে ও এলো? এই তো তোমার ছোট্টো বাগান, মিঠুয়া ব'সে-ব'সে তাকিয়ে ত্যাখো।' ব'লে মা মিঠুয়ার বিছানা জানলার আরো কাছে টেনে আনলো। মা কাজে বেরিয়ে যায় তার পর, আর মিঠুয়া শুয়ে-শুয়ে ত্যাখে, মটরশুঁটিটা কেমন সুন্দর বেড়ে উঠছে আস্তে-আস্তে।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় মিঠুয়া বললে, 'মা-মণি, আমার কেবলি মনে হ'চ্ছে আমি ভালো হ'য়ে উঠবো। আজকের রোদটা বড়ো সুন্দর লাগলো। আর, দেখেছো ঐ মটরশুঁটির কাণ্ড—কী চমৎকার বাড়ছে! আমিও অমনি হবো, মা, আমিও সেরে উঠে বাইরে বেড়াবো এই সোনালি রোদ্দুরে।'

'তা-ই যেন হয়, মিঠু, তা-ই যেন হয়।'

মুখে মা ও-কথা বললো বটে, কিন্তু মনে-মনে সে জানে যে তার মিঠুমণি আর বাঁচবে না। তবু সে কপাটের সঙ্গে একটা কাঠি বেঁধে দিলে; বাড়ন্ত মটরশুঁটি লতানো সবুজ ডগা কাঠিটুকু বেয়ে উঠতে পারবে। ও যেন হাওয়ার দাপটে ছিঁড়ে না পড়ে—ওকে দেখেই তো মিঠুমণি বাঁচবার কথা ভাবতে শিখেছে।

কী আশ্চর্য! মটরশুঁটির সেই ছোট্টো সবুজ লতা সত্যি-সত্যি কাঠি বেয়ে উঠলো, উঠলো উপরে, বাড়লো আস্তে-আস্তে, বাড়লো নতুন প্রাণের আনন্দে; রোজই সে একটু-একটু ক'রে বাড়ছে।

'আরে, ফুলও যে ফুটেছে একটা!' কাঠকুড়ানি হঠাৎ একদিন বলে উঠলো। তখন থেকে তার মনে আশা হ'লো, মিঠুয়া হয়তো সত্যি-সত্যি ভালো হ'য়ে উঠবে। ক'দিন থেকে মিঠুয়া বেশ ভালোই আছে তো! দিব্যি কথাবার্তা বলে, আগের চেয়ে অনেক বেশি হাসিখুশি। কাল একবার উঠেও বসেছিলো, ব'সে-ব'সে তার ছোট্টো বাগানের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, সে বাগানে একটিমাত্র ছোট্টো চারা গাছ, এই সবুজ মটরশুঁটি লতা।

কয়েক দিন পরেই মিঠুয়া দস্তুরমতো এক ঘণ্টা উঠে ব'সে রইলো। বড়ো ভালো লাগলো তার রোদে পিঠ দিয়ে ব'সে থাকতে। জানলায় ফুটেছে মটরশুঁটির ফিকে-বেগুনি ফুল।

মিঠুয়া মুখ বাড়িয়ে কচি-কচি নরম পাতাগুলোকে চুমু খেলো। দিনটা তার মনে হলো যেন উৎসবের রঙে ছোপানো।

মা আর খুশি চাপতে না পেরে ব'লে উঠলো, 'স্বর্গের দেবতাই এই মটরশুঁটিকে পাঠিয়েছেন আমাদের ঘরে, তিনিই ফুটিয়েছেন এই ফুল, যাতে তুই খুশি হোস, আর তোর খুশিতে যাতে আমিও খুশি হই—ব'লে সে হাসলো বেগুনি ফুলের দিয়ে তাকিয়ে, যেন সে-ফুল স্বর্গের পাঠানো দেবদূত।

কিন্তু আর চার জন? তাদের খবর কী?—তবে শোনো। যে বিপুল পৃথিবীতে উড়ে চলে গিয়ে বলেছিলো, 'ত্যাখো আমাকে ধরতে পারো কি-না!' সে গিয়ে পড়লো এক বাড়ির ছাতে, সেখানে পায়রাদের দানা শুকোতে দেওয়া হয়েছিলো, পড়বি তো পড় তারই মধ্যে। তার পর আর কি—পায়রার পেটে। যে দু'জন কুড়েমি ক'রে ঘুমোতে চেয়েছিলো, তাদের কবুতরেই খেয়ে ফেললো—তবু তো যা-হোক একটা কাজে লাগলো। কিন্তু তার পরের জন, যে চেয়েছিলো সূর্যের বুকে গিয়ে লাগতে,···সে পড়লো গিয়ে এক নোংরা নরদমায়। অনেক দিন সে শুয়ে রইলো সেই নোংরা জলে, আর কেবলি ফুলতে থাকলো। আর, মনে মনে বললো, 'কী সুন্দর মোটা হচ্ছি আমি। শেষটায় একদিন ফেটেই যাবো—কিন্তু মটরশুঁটির পক্ষে তো ফেটে যাওয়াটাই সবচেয়ে গৌরবের। পাঁচ জনের মধ্যে আমিই হচ্ছি শ্রেষ্ঠ।' শুনে নরদমা বললে, 'ঠিক কথা।'

এদিকে কুঁড়ে ঘরের জানলায় তখন মিঠুয়া দাঁড়িয়ে, চোখে তার অপরূপ আলো, গালে স্বাস্থ্যের উপচে-পড়া লালিমা। পাতলা দু হাত দিয়ে মটরশুঁটির ফুলকে আদর করছে সে; আর বলছে, 'দেবতার অনেক দয়া যে, তুই ফুটেছিলি।'

'শ্রেষ্ঠ মটরশুঁটি, তুমি যে আমারই!' নরদমা বললে।

অনুবাদক—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের ৬৫০০ লোকের প্রচেষ্টা...

শুধু আপনাদেরই জন্যে

হিন্দুস্থান লিভারে আমরা যে ৬৫০০ লোক কাজ করছি তাদের প্রত্যেকের সামনেই একটি আদর্শ রয়েছে। একথা ঠিকই যে আমরা সাবান, প্রসাধনদ্রব্য, বনস্পতি ইত্যাদি তৈরী করি, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। আমরা সদাসর্ব্বদা সচেতন যেন এই সমস্ত জিনিষের গুণাগুণের কোন তারতম্য কখনও না ঘটে—আমরা যেন ভারতবর্ষের অসংখ্য পরিবারের বিশ্বাস অর্জ্জন করতে পারি। আমরা চাই আপনারা আমাদের জানুন, বিশ্বাস করুন এবং আমাদের তৈরী জিনিষপত্র ব্যবহার করুন। এই আমাদের আদর্শ।

প্রায় আশি বছর ধরে আমরা আপনার প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে এসেছি। উৎপাদন ক্ষেত্রে আমরা করেছি নিত্য নতুন প্রচেষ্টা। আমাদের মার্কেট রিসার্চ বিভাগের কাজই হোল, আপনার পছন্দ অপছন্দ, মতামত ও বিশ্বাস আপনার দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাস চাহিদা ইত্যাদির সঙ্গে যোগ রাখা এবং এই তদন্তের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে আমাদের উৎপাদন বিভাগ অগ্রসর হয়। আমাদের কোয়ালিটি কণ্ট্রোল বিভাগ আমাদের প্রত্যেকটি জিনিষের ওপর (কাঁচা মাল অবস্থা থেকে তৈরী হওয়া পর্য্যন্ত) কঠিন পরীক্ষা চালান এবং নিঃসন্দেহ হওয়া পর্য্যন্ত কোন জিনিষ বাজারে ছাড়া হয় না। আমাদের ডালডা এ্যাডভাইসারি সার্ভিস এবং ওয়াশিং ইনফরমেশন সার্ভিস এই জিনিষগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে আপনাকে মূল্যবান উপদেশ দেন।

এই জিনিষগুলি কি? সানলাইট সাবান...লাইফবয়...লাক্স...রেক্সোনা...গিবস্ এস, আর, টুথপেস্ট...ডালডা বনস্পতি সবই আপনার জানাশুনা নাম—আপনার দৈনন্দিন জীবনের নিত্য সঙ্গী। আপনার প্রত্যেকদিন ঘর গেরস্থালীর কাজে আমাদের জিনিষগুলিই বেছে নিয়েছেন এ আমাদের গর্ব্বের বিষয়। কিন্তু আমরা উপলব্ধি করি যে বিশ্বাস আমরা অর্জ্জন করেছি সে বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করার দায়ীত্ব আমাদের এবং তা আমরা করতে পারি একমাত্র আপনাদের শ্রেষ্ঠ জিনিষ দিয়ে—আপনাদের অর্থাৎ ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষা করে।

দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

HLL. 2-X52 BG

বিজ্ঞানবার্ত্তা
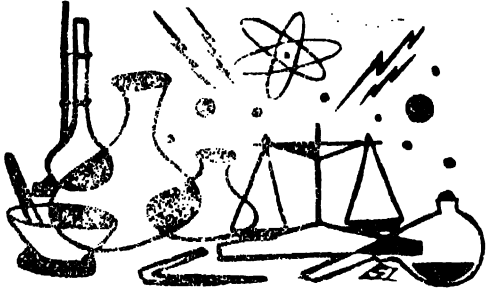
পক্ষধর মিশ্র

নটিলাস একাদিক্রমে প্রায় ৬৬ দিন ভ্রমণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নৌবিভাগের পরমাণু-শক্তি চালিত সাবমেরিণ নটিলাসের কথা পাঠকদের কাছে আমি আগেই পরিবেশন করেছি সে এবার ৬৬ দিন একাদিক্রমে সমুদ্রতলে বিচরণ করে জল, স্থল এবং অন্তরীক্ষের দৌড়ে বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করলো। এর আগে মানুষের সৃষ্ট কোন যন্ত্রযানই একাদিক্রমে ৬৬ দিন চলবার ক্ষমতা সংগ্রহ করতে পারে নি। নটিলাসের সাফল্য, আগামী ভবিষ্যতে পরমাণুশক্তি চালিত যন্ত্রযান-সমূহের অসাধারণ উন্নতির এক মহা সম্ভাবনাপূর্ণ উদাহরণ স্থাপন করলো।

গভীর সমুদ্রে জলের চাপ এবং অন্যান্য বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে একাদিক্রমে প্রায় ১৬০০ ঘণ্টা অবস্থান করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। ইউরেনিয়াম জ্বালানী ভর্ত্তি করা হয়েছিল মাত্র একবার, এবং এই ১৬০০ ঘণ্টায় ঐ জ্বালানীর খুব সামান্য অংশই খরচ হয়েছিল। ১৬০০ ঘণ্টা চলবার জন্য ইউরেনিয়াম জ্বালানীর পরিবর্ত্তে তেল ব্যবহার করা হলে ঐ সাবমেরিণটিতে লাগতো ১৬ লক্ষ গ্যালন তেল—যা রেল-লাইনের উপর দিয়ে বহন করতে প্রায় ১ মাইল লম্বা স্থান জুড়ে তৈলবাহী ট্যাঙ্ক সাজাতে হতো! নটিলাস কিন্তু তার ভ্রমণে খুব কম পরিমাণ জ্বালানী খরচ করেছে, এখনও মজুদ জ্বালানীর সাহায্যে আরও বহু হাজার হাজার মাইল ভ্রমণ করতে পারে। যাত্রা তার সুরু হয়েছিল নিউ লণ্ডনের সাবমেরিণ ঘাঁটী থেকে, তারপর কেপ হর্ণ, প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর পার হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার তলভাগকে পরিভ্রমণ করে নিউ লণ্ডনেই ফিরে এসে আবার ব্যাপকভাবে সে উত্তরমেরু পরিভ্রমণে যাত্রা করে। নটিলাসের পরমাণু-শক্তি-চালিত ইঞ্জিনটি ওয়েষ্টিং হাউস ইলেকট্রিক করপোরেশনের বিজ্ঞানিবৃন্দ পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণ করেছিলেন। সমুদ্রতলেও তাঁরা এর কার্য্যকলাপের উপর নজর রেখে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন।

* * *

স্কুল-কলেজে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং ছোট ছোট শিল্প ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পরীক্ষাগারে সাধারণ কাজকর্ম্মের জন্য 'অ্যাটমিকস্ ইন্টারন্যাশনাল' এক ধরণের ছোট ছোট স্বল্পমূল্যের 'রি-অ্যাকটার' নির্ম্মাণ করেছেন। 'পরীক্ষাগারের রি-অ্যাকটার' নামক এই সরঞ্জামটি মাত্র ৮ ফুট লম্বা এবং এর ব্যাসও ৮ ফুট। অতিরিক্ত কোন সংযোজন না করেও এটি যে কোন স্কুলবাড়ী অথবা পরীক্ষাগারে স্থাপন করা চলে। সম্পূর্ণ নির্ম্মাণ করে কার্য্যকরী অবস্থায় একে বসিয়ে দিতে খরচ পড়ে মাত্র আড়াই লক্ষ টাকা এবং সময় লাগে ৬ মাস।

নির্ম্মাণকর্ত্তারা আশা করেন, এই রি-অ্যাকটারের সহায়তায় ছোট ছোট পরীক্ষাগারে শিল্পবিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত নানাপ্রকার পরীক্ষা সহজে করা যাবে। এই সরল রি-অ্যাকটারটি সাধারণ মানুষেরও পরমাণু শক্তি বিষয়ক নানা প্রকার কৌতূহল মেটাতে সাহায্য করবে। পাঠকেরা হয়তো স্কুলের জন্য এই অ্যাটমিক রি-অ্যাকটারের ব্যবহারের কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। খুবই স্বাভাবিক, আমাদের দেশে স্কুলের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করে অ্যাটমিক রি-অ্যাকটার ক্রয় করার চিন্তা অবাস্তব এবং অস্বাভাবিক মনে হতে পারে কিন্তু অনেক সম্পদশালী এবং ক্ষমতাশালী দেশের কর্ত্তৃপক্ষই পরমাণু শক্তির যুগে প্রতিটি মানুষকে এই শক্তির রহস্যের সঙ্গে হাতে-কলমে পরীক্ষামূলক ভাবে পরিচিত করিয়ে দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। সুতরাং মনে হয়, বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে এবং পরীক্ষাগারে এই সহজলভ্য অ্যাটমিক রি-অ্যাকটারটি যথেষ্ট সমাদর পাবে।

রি-অ্যাকটারটির অন্তর্দেশে তেজস্ক্রিয় রশ্মিবিচ্ছুরণের জন্য একটি গোলাকার ইস্পাতের আধারে প্রায় ৪ গ্যালন জলের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় পরিশোধিত ইউরানিল সালফেট রাখা থাকে। মরিচাবিহীন ইস্পাতের এই গোলাকার আধারটি প্রায় ৬ ইঞ্চি মোটা সীসার পাত দিয়ে আবৃত করে জলে ভরা একটা আট ফুট চৌবাচ্চার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। এই আট ফুট চৌবাচ্চাটাই মোটামুটি বাইরের আবরণ, তাই স্থান খুবই কম লাগে। রি-অ্যাকটারটি মাত্র একজন লোকের পক্ষেই চালান সম্ভব। অ্যাটমিক ইন্টারন্যাশনালের যন্ত্রবিভাগের বিক্রয়-অধিকর্তা ডাঃ মার্টিনের মতে, এই ছোট্ট রি-অ্যাকটারটির আবিষ্কার শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করবে।

* * * *

আপনারা বর্ষাকালে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য রেণ কোট ব্যবহার করেন। সম্প্রতি ভার্জ্জিনিয়ার ফোর্ট বেলভয়ের সৈন্য বিভাগের যন্ত্রবিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে এক রকম নতুন ধরণের রসায়ন দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে, যার সাহায্যে রেণ কোট এবং বৃষ্টিনিরোধ বস্ত্রাদির জীবনী শক্তি বহুগুণ বেড়ে যাবে। সৈন্যবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ আশা করছেন, এই রসায়ন দ্রব্য তাদের তাঁবু, বালির বস্তা, বর্ষাতি, ইত্যাদি নানা প্রকার অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিকে বৃষ্টি, উত্তাপ এবং আর্দ্রতা থেকে বহুকাল রক্ষা করবে। গবেষণাগারে দেখা গিয়েছে, বালির বস্তা সাধারণ ভাবে অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং আর্দ্র স্থানে ব্যবহার করলে মাত্র তিন চার সপ্তাহের মধ্যেই পচে ছিঁড়ে যায়, ছত্রক নিবারক কোন রসায়ন দ্রব্য ব্যবহার করলে প্রায় ১ বছর এগুলি নষ্ট হয় না কিন্তু জলনিরোধ নবাবিষ্কৃত এই রসায়ন দ্রব্য এদের জীবনী শক্তি আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। এই বস্তুটি ব্যবহার করার আরেকটি সুবিধা আছে, ছত্রক নিবারক রসায়ন দ্রব্যাদির পরিমাণ অনেক কম দিলেও কাজ চলে যায়, ফলে খরচ অনেক কম পড়ে। খরচের কথাই কেবল মাত্র চিন্তা করলে চলবে কেন, ছত্রক নিবারক রসায়ন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে তামার যৌগিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। তামা অত্যন্ত মূল্যবান মৌলিক পদার্থ, কোন দিন তামার সরবরাহ কম হওয়ার জন্য জাতীয় স্বার্থরক্ষার্থে এর ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ ঘটতে পারে, তাই এর ব্যয় যতো কম হয় ততই মঙ্গল। যাই হোক, গত মহাযুদ্ধে এবং কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকার সৈন্য বাহিনীতে প্রায় ৫৫ কোটি টাকার বালির বস্তা ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং নবাবিষ্কৃত রাসায়নিক

দ্রব্যটির সাহায্যে কেবলমাত্র বালির বস্তার জীবনকাল কয়েক গুণ বাড়িয়েই সৈন্যবাহিনী কতো টাকার সাশ্রয় ঘটাতে পারবে, তা অনুমান করে দেখুন! এর পর তাঁবু ইত্যাদি অন্যান্য দ্রব্য তো আছেই।

* * *

জলের তলায় অবতরণ করার নৌবিভাগীয় রেকর্ড স্থাপন করেছেন একজন ইংরাজ ডুবুরী। এঁর নাম মিঃ জি, ও, উকে, ইনি উদ্ধারকারী ব্রিটিশ জাহাজ 'রিক্লেম' থেকে নরওয়ের সমুদ্রের একটি খাড়ির মধ্যে ১০৬০ ফুট অবতরণ করে এই রেকর্ড স্থাপন করেছেন। জলের তলাকার দৃশ্য পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্য সাধারণতঃ যে সব পর্য্যবেক্ষণ কক্ষ ব্যবহার করা হয় তারই সাহায্যে মিঃ উকে সমুদ্র-তলদেশে ১০৬০ ফুট অবতরণ করেছিলেন। আরও সাত জন ডুবুরী এই একই ভাবে প্রায় ১৬৫ ফুট তলায় পৌছান।

রিক্লেম জাহাজ থেকে প্রচারিত সংবাদ মারফৎ জানা গিয়েছে. এই অবতরণের সময় পর্য্যবেক্ষণ কক্ষের তলদেশের এবং মধ্যের দুটি আলো ডুবুরীকে পথ দেখাতে সাহায্য করেছিল। মিঃ উকের বিবৃতি অনুসারে জানা যায়, অবতরণের সময় কক্ষমধ্যে তিনি কোন অসুবিধাই অনুভব করেননি। সিলিণ্ডারের সাহায্যে অক্সিজেন সরবরাহও ঠিক থাকায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেরও কোন অসুবিধা হয় নি। সমুদ্রের তলদেশে বড় বড় পাথর ছাড়া আর কিছুই ছিল না, এমন কি কোন মাছের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায় নি। মিঃ উকে জলমধ্যে ১০৬০ ফুট তলায় প্রায় ১ ঘন্টা অবস্থান করেছিলেন। জলের গভীরের আলোক-ঔজ্জ্বল্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

রোনাল্ড রস

ম্যালেরিয়ার জীবাণু কি ভাবে দেহমধ্যে প্রবেশ করে তার আবিষ্কার এবং এই রোগের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করবার ফলপ্রদ গবেষণার জন্য স্যার রোনাল্ড রস চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ১৯০২ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ম্যালেরিয়া রোগের কারণাকারণের গবেষণা ভারতবর্ষে পরিচালিত হয়েছিল, এবং স্যার রোনাল্ডের রক্তের মধ্যেও প্রবাহিত হতো ভারতীয় রক্তের একটি ক্ষীণধারা। তাই এই বিরাট কৃতিত্বের অংশ ভারতবর্ষ দাবী করতে পারে।

ঠিক একশ' বছর আগে ১৮৫৭ সালের ১৩ই মে রোনাল্ড রস কুমায়ুন পাহাড়ে আলমোড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল,—নাম জেনারেল সার কেম্পবেল রস। তাঁর বাবা স্কচ—মা ইংরেজ। শোনা যায়, তাঁরা তিন পুরুষে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান,—কোন সময় ভারতীয় রক্ত বৈবাহিক সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে তাঁদের পরিবারে প্রবেশ করেছিল। বাল্যশিক্ষার জন্য রসকে লণ্ডনে পাঠান হয় এবং পরে তিনি সেন্ট বার্থলোমিউ হাসপাতালে চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৭৪ সালে এম. আর. সি, এস ডিপ্লোমা লাভ করে তিনি কিছুদিন লণ্ডন ও নিউইয়র্কের মধ্যে এক জাহাজে চিকিৎসকের কাজ করেন এবং পরে মাদ্রাজ মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগদান করে বর্ম্মা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৮১ সালে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের পরীক্ষায় সপ্তদশ স্থান অধিকার করে রোনাল্ড রস এর মিলিটারী বিভাগে চাকরী পান এবং কিছুদিন পরে ছুটি নিয়ে লণ্ডনে গিয়ে বিবাহ করেন। এই সময়েই তিনি লণ্ডনে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্লেন-এর নিকট জীবাণু-বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষালাভ করেন এবং ভারতে ফিরেই তাঁর দৃষ্টি পড়ে ম্যালেরিয়া রোগের উপর। ১৮৮০ সালে রোগীর রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট অথবা পরজীবী বীজাণু আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু এই বীজাণু কি ভাবে রোগীর দেহের মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় সে বিষয়ে কোন কিছুই তখন পর্য্যন্ত জানা যায় নি।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্যাট্রিক ম্যানসনই রসের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, মশার কামড়ে হয়তো ম্যালেরিয়া হতে পারে। রস ভারতবর্ষে ফিরে এসে তাই মশা নিয়ে পড়লেন। মশা যদি রোগ ছড়িয়ে বেড়ায় তাহলে মশার মধ্যেও নিশ্চয়ই রোগের প্যারাসাইট পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষে নানা প্রকার মশা ধরে তিনি পরীক্ষা শুরু করলেন। মশা ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড় দিত আর তিনি সরু ছুঁচ দিয়ে সেই মশার পাকস্থলী বার করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করতেন। যাই হোক, এই ভাবে নানাপ্রকার মশার উপর পরীক্ষা চালিয়ে ১৮৯৭ সালের ২০শে আগষ্ট রোনাণ্ড রস সেকেন্দ্রাবাদের হাসপাতালে এনোফিলিস মশার পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট আবিষ্কার করলেন। এর পর এই গবেষণা তিনি সম্পূর্ণ করেন কলকাতায়। সৈন্যবিভাগের চিকিৎসকের চাকরী, বারে বারে বদলীর জন্য যথেষ্ট দুর্ভোগ রসকে ভোগ করতে হয়েছে,—গবেষণায় ঘটেছে যথেষ্ট বিঘ্ন কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত না হয়ে অদম্য উৎসাহে তাঁর পরীক্ষাকার্য্য চালিয়ে গেছেন। ম্যানসন এ বিষয়ে রসকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন,—তাঁরই হস্তক্ষেপে বিলাতের কর্তারা সজাগ হন এবং রস কিছুদিনের জন্য ছুটী নিয়ে কলকাতার একটি গবেষণাগারে গবেষণা করবার সুযোগ পান।

এর পর রসকে পাঠান হয় আসামে কালাজ্বরের কারণ অনুসন্ধানের জন্য। ১৮৯৯ সালে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ করে রস লিভারপুলের স্কুলে ট্রপিকাল মেডিসিনের লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯১২ সালে লিভারপুল পরিত্যাগ করে তিনি কিংস কলেজ-হাসপাতালের নিরক্ষীয় অঞ্চলের রোগের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি সরকারের পরামর্শদাতা ছিলেন এবং ১৯১৮ সাল থেকে লণ্ডনে চিকিৎসা ব্যবসা সুরু করেন। রসকে সম্মানিত করবার জন্য ১৯২১ সালে রস ইনষ্টিটিউট এ্যাণ্ড হসপিট্যাল ট্রপিকাল ডিসিস পুটনেতে স্থাপন করা হয় এবং ঐ স্থানেই ১৯৩২ সালে প্রায় ৭৫ বছর বয়সে সার রোনাণ্ড রস পরলোক গমন করেন।

রোনাণ্ড রস ১৯০২ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯১১ সালে তাঁকে নাইটহুডের সম্মানে ভূষিত করা হয়। এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যালেরিয়ার কারণ এবং এর সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের উপায় নির্দ্ধারণ করেই সন্তুষ্ট হন নি; ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে প্রচারের জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করেছেন। তিনি এক জন সুলেখকও ছিলেন, আত্মজীবনী এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী ছাড়াও তিনি কবিতা ও কাল্পনিক রচনার কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

শ্রীশ্রীসারদা দেবী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমালতী গুহ-রায়

সারদা দেবীর উপদেশ ছিল কেউ যেন হুজুকে পড়ে কিছু না করে। কেন না, হুজুক থেমে গেলে সবই থেমে যায়। যে যা চালাতে পারবে তার সেটুকুই গ্রহণ করা উচিত। জপের সময়ের কোন বিধি-নিষেধ নাই বটে, কিন্তু সকাল-সন্ধ্যাই জপের প্রকৃষ্ট সময়। সব সময়ে আর জপ-ধ্যান ক'টা লোকে করতে পারে? কাজেই ধ্যান-জপ সুরু করলেই যে কাজকর্ম্ম ছাড়তে হবে, তা নয়। মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজে লেগে থাকা ভাল। মনের স্বভাবই হচ্ছে যে, তাকে আলগা রাখলে পাগলা হয়, ও যত রকম গোল বাধায়। এই জন্যই তো নরেন নিষ্কাম কর্ম্মের পত্তন করেছিল। নিষ্কাম কর্ম্মে মন পবিত্র হয়।

জপ-ধ্যানে একটা নিয়মিত অভ্যাসের প্রতি মা খুব জোর দিতেন। তিনি বলতেন, নিয়মিত অভ্যাস, সময়ের স্থিরতা, ও নিষ্ঠা ছাড়া কিছুতে উন্নতি করা যায় না। কাজেই জপ-ধ্যানেও নিয়মানুবর্ত্তিতা আবশ্যক, প্রথম প্রথম একটু মুস্কিল হতে পারে কিন্তু একটা অভ্যাস গড়ে উঠলে সবই সহজ হয়। একদিনও যেন বাদ না পড়ে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। বাদ দেওয়া ভাল নয়। তাতে একটা অভ্যাস গড়ে উঠতে বাধা পায়। সারদা দেবীর এ-সব উপদেশ যে শুধু ভক্তদের জন্য ছিল, তা নয়। তিনি নিজের জীবনেও পরিপূর্ণ ভাবে নিয়ম ও শৃঙ্খলার বশবর্ত্তী ছিলেন।

সাধক-জীবনে আগ্রহকে তিনি প্রাধান্য দিতেন বেশী। বলতেন, আগ্রহ না থাকলে যেমন কিছুই হতে চায় না, তেমনি আগ্রহের জোর থাকলে শত বাধাবিঘ্নও পথ আটকাতে পারে না। একটা উপায় হয়েই যায়। এই জন্যেই তিনি ঐকান্তিক আগ্রহ বা ইচ্ছা দেখলে স্ত্রীলোকের অশুচি কালকে পর্য্যন্ত বাধা বলে মনে করতেন না। [illegible] তিনি বলতেন, মনে দ্বিধা না থাকলে শুচি-অশুচি কিছু করে না। শরীরের কোন অংশ শুচি, আর কোন অংশই বা অশুচি?

সাধনপথে যদি ভক্তের তেমন আকর্ষণ হত, তবে লৌকিক আচার-বিচারকে তিনি কখনোই বাধা বলে মনে করতেন না। আবার ক্ষেত্র-বিশেষে সাধন-ভজন সম্বন্ধে এক একজনের প্রতি তাঁর এক এক উপদেশ ছিল। কারুকে তিনি বেশী জপ-তপ করতে একেবারেই নিষেধ করতেন। বলতেন, "১০৮ বার গুরুমন্ত্র জপ করো, আর খুব আনন্দে থেকো। বাকী যা করবার তা আমিই করে দেবো।" কারুকে বলতেন, বেশী করে পুজো-আর্চ্চা করতে। আর কারুকে বলতেন, খুব বেশী করে জপ করতে আর কারুকে করতে বলতেন ধ্যান।

কোন ভক্ত তাঁর কাছে ব্রহ্মচর্য্য চাইতে এসে ব্যবস্থা পেতো বিয়ে করে সংসারী হবার। আবার কখনো বা বিবাহেচ্ছু ভক্তকে তিনি নিরস্ত করে বলতেন, "সংসারপথ থেকে নিবৃত্ত হওয়াই তোমার প্রয়োজন। সংসারে তোমার কল্যাণ হবে না।" কাজেই সে পেতো ব্রহ্মচর্য্য। তর্ক দিয়ে তাঁকে থামিয়ে দেওয়ার বড় একটা উপায় থাকতো না। কোন একটা যুক্তি নিয়েই তিনি ভক্তদের কল্যাণ-পথে চালনা করতেন। কাজেই অপরের কূট যুক্তি-তর্ক তাঁর কাছে পরাজয় মানতো। মূলতত্ত্বকে যেন কেউ না ভোলে, ভাবপ্রবণতায় কেউ না ঝোঁকে, এ বিষয়ে তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। ভক্তদের অনেকেই বাহ্য অনুষ্ঠান নিয়ে মেতে থাকতে ভালবাসতো কিন্তু সারদা দেবী তার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না।

ঠাকুর প্রায়ই বলতেন, মা তাঁর সন্তানদের পেটের সহ্যশক্তি বুঝেই খেতে দেন। কারুকে ঝাল, কারুকে ঝোল, কারুকে অম্বল আবার ঘোল দেন খেতে। সারদা মায়ের ব্যবস্থাও তাঁর সন্তানদের প্রতি ঠিক তাই ছিল। তাঁর উপদেশ বিভিন্ন ভক্তের প্রতি বিভিন্ন প্রকারের হ'ত ব'লে তাদের কাছে পরস্পর-বিরোধী মনে হত বটে, কিন্তু মা যে আধার বিবেচনা করে উপদেশ দিতেন, তা তারা বুঝতো না বলেই তা তাদের মনে আসতো। তাঁর কাছে কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না।

সর্বসাধারণের প্রতি তাঁর উপদেশ থাকতো—সকলের যেন ধর্ম্মপথে মতি থাকে, ভগবানে স্মরণ-মনন থাকে। ভগবানকে পেতে হ'লে তাঁকে আকুল হয়ে ডাকা চাই। যে ভক্তরা প্রকৃত অধিকারী নয়, তাদের তিনি মাত্র ১০৮ বার গুরুমন্ত্র জপ করার বিধি দিতেন। বলতেন, "বেশ নিষ্ঠা করে ১০৮ বার গুরুমন্ত্র জপ করো আর খেয়ে দেয়ে আনন্দে থেকো, যা করবার আমিই করবো।"

নিরুৎসাহবাণী তাঁর মধ্যে একেবারেই ছিল না। তিনি কি করে বলবেন, তোমরা বললেও করতে পারবে না? কাজেই সত্য সত্যই তিনি নিজে তাদের জন্য জপ করতেন। তিনি জানতেন, ক্রমে ঐ ১০৮ বার থেকেই রুচি এসে তাদের অন্তরে ভক্তিরস জেগে উঠতে পারে! তারা প্রকৃত সাধনের অধিকারী হ'তেও পারে।

সারদা দেবী অত্যন্ত কোমলস্বভাবা পরদুঃখকাতরা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর কোমলতা মধুরতার আশ্রয়ে কারুর সাধনের অঙ্গহানি হতে পারতো না। ভক্তরা জানতেন, মা তাদের জন্য জপ করেন। তারা তাই তাঁকে প্রশ্ন করতো 'মা—তুমিই যদি আমাদের জন্য জপ কর, আমাদের আর কি দরকার?' তিনি বলতেন, 'মাত্র ১০৮ বার গুরুমন্ত্র জপবে, তাও যদি না পার, তবে তোমাদেরই যাবে।'

জপের মূল্য তিনি খুবই দিতেন। কিন্তু হুজুকে পড়ে প্রথম

প্রথম খুব বেশী করে সুরু করে, পরে যাতে না ছেড়ে-ছুড়ে দেয়, তাই তিনি প্রথম দিকে কারুকেই বেশী করে জপ করবার বিধি দিতেন না। নিজে তিনি লক্ষ অবধি জপ করতেন। পনেরো-কুড়ি হাজার জপ না করলে, যে কিছু হয় না। আনন্দ বা শান্তি টের পাওয়া যায় না, এ তিনি অনেক ভক্তকেই বলতেন। মৌখিক জপের কোন ফল নেই, অন্তর দিয়ে মন-প্রাণ ঢেলে জপ দিয়ে ভগবানকে আহ্বান জানাতে হয়, তবেই মনের ময়লা কাটে, আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হয়। কালে প্রেম ভক্তি সব আসে। একথাই তিনি সবাইকে বোঝাতেন।

সারদা দেবীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎকর্ষতা যে কতটা হয়েছিল, তা বোঝা যেতো যখন ঠাকুরের পণ্ডিত-ভক্তদের জটিল অধ্যাত্ম প্রশ্নের তিনি মীমাংসাসূচক জবাব দিতেন। বিদুষী ইংরেজ মহিলা নিবেদিতা বলতেন 'মায়ের নিকট যত কঠিন প্রশ্নই উত্থাপিত করা হউক না কেন, তাঁহাকে কখনই ভীত হইতে বা ইতস্তত: করিতে দেখি নাই।'

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ এ-বিষয়ে বলেন, 'আমি যখন ছোট ছিলুম, মাকে বড্ডই ভালবাসতুম, ভক্তি-শ্রদ্ধা করতুম। তোমরা চোমরা পণ্ডিতেরা যখন এসে মাকে কি সব শক্ত শক্ত প্রশ্ন করতে থাকতেন আমার বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করতো। আর আমার খুব রাগও হতে থাকতো। কেন রে বাপু! স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দজী এঁরা সব বড় বড় পণ্ডিত থাকতে এত সব শক্ত শক্ত প্রশ্ন মা বেচারীকে কেন?'

দেখতুম, মা কিন্তু বেশ নির্ভীক ভাবেই তাদের যেন কি সব জবাব দিয়ে দিতেন; আর প্রশ্নকর্ত্তাদের মুখ বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠতো। বুঝতে পারতুম, তাঁরা তাঁদের মনের মত জবাব পেয়ে বেশ খুসীই হয়েছেন। তখন আমার বুকের ধড়ফড়ানী যেন কমতো, আর আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচতুম। মার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাও দশগুণ বেড়ে যেতো, আনন্দে গর্ব্বে বুকটা যেন ফুলে উঠতো।

ভক্তদের সঙ্গে ব্যবহারে সারদা দেবীর অন্তরদর্শিতারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যেতো। যার ফলে ভক্তরা তাঁকে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হিসেবে পুজো করতো। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাই তাঁকে অনেক ভক্তের হৃদয়ে দেবীর আসন দিয়েছিল। একবার একটি ভক্ত সারদা দেবীকে দর্শন-অন্তে কাঠফাটা রোদের মধ্যে দুপুরবেলা বাড়ী যেতে চাইলে তিনি তাকে দুপুরটা বিশ্রাম করে বিকেলে যেতে বলেন। দুপুরে গেলে কোন কষ্ট হবে না বলে সেই ভক্তটি যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। মা তাকে বললেন, "মানা করছি বাছা, যেও না। বৃষ্টি আসবে আর ভিজে যাবে।" প্রখর সূর্য্যকিরণের দিকে আঙুল দেখিয়ে ভক্তটি হাসতে হাসতে চলে গেল। অর্থাৎ 'মা তুমি আমায় ভুলাচ্ছ এত রোদ্দুরে কখনো বৃষ্টি আসে?'

কিছু দূর যেতে না যেতেই হঠাৎ এমন মেঘ করে বৃষ্টি এল যে ভক্তটি ভিজতে ভিজতে দৌড়িয়ে এক চণ্ডাল-বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ল। তখন সে ইচ্ছাময়ীর লীলা বুঝতে পেরে তাঁর স্নেহ-উপরোধ অগ্রাহ্য করে হঠকারিতা করার জন্য অনুতপ্ত হল।

একবার এক ভক্তকে মা করজপ পদ্ধতি শিখাতে চান। সময়ের অত্যন্ত অল্পতা অথচ সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। বললো, 'মা, তবে কি এবার আমার আর করজপ শেখা হবে না?' মা বললেন, 'তা কেন? তুমি বরং সুরেনের কাছে শিখে নিও।' সে বললো, 'মা, সুরেন থাকে বাঁচীতে আর আমি যাচ্ছি চট্টগ্রামে। তার সঙ্গে দেখাই বা কি করে হবে? আমার এবার আর করজপ শেখা হল না।'

মা বললেন 'হ'বে হ'বে হ'বে। হয়ে যাবে।' মার কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিলেও ভক্তটি নিরাশ হয়েই ভেবেছিল, তার বুঝি আর শেখা হলই না। কিন্তু আশ্চর্য ভাবে চট্টগ্রামের পথে ষ্টীমারেই সুরেনের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল এবং সুরেন তাকে যত্ন করে করজপ শিখিয়ে দিল।

এক ভক্ত মার কাছে দীক্ষা নিতে এল। মা তাকে দীক্ষা দেবার পর সে তাঁকে গুরুদক্ষিণা দিতে উদ্যত হলে মা এই বলে নিরস্ত করলেন যে তিনি সন্ন্যাসীদের কাছে দক্ষিণা নেন না। ভক্তটি বারে বারে তাঁকে বোঝালো, 'মা আমি তো সন্ন্যাসী নই, গৃহী। আমার কাছ থেকে দক্ষিণা নিতে তোমার আপত্তি কেন?' কিন্তু সারদা দেবীর ঐ একই কথা 'বলেছি তো। সন্ন্যাসীর দক্ষিণা নিতে নেই।' ভক্তের বিস্ময় ঘুচলো না। মা কেন বারে বারে এই কথা বলছেন? কিছুদিন পর কিন্তু দেখা গেল সে সন্ন্যাস নিয়েছে।

অনেক সময় সারদা দেবী ভক্তদের মনের কথা টের পেয়ে তাদের অভিলাষ পূর্ণ করতেন। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মায়ের ভক্তরা সুযোগ সুবিধা পেলেই মায়ের সেবা করে। তাই দেখে একটি ভক্তের মনে দুঃখ হল 'আমার জীবনে কিছুই করা হ'ল না। কত ভক্তরা মায়ের সেবা করে ধন্য হয়, আমার অদৃষ্টে তাও ঘটলো না।' মার সম্মুখে দাঁড়িয়েই সে ঐ কথা ভাবছিল। এমন সময় মা তাকে আদেশ করলেন, 'বাবা এসেছ যখন ভাঁড়ার থেকে ঐ ভারী আটার হাঁড়ীটা বের করে আন তো?' তার পর সেই হাঁড়ী থেকে আন্দাজ করে আটা বের করে দিয়ে তাতে পরিমাণ মত জল দিয়ে বললেন, 'এবার বেশ করে এটা একটু মেখে দাও তো?'

এর পর সন্ধ্যার সময় ভক্তটি যখন আবার মার দর্শন নিতে এ'ল, তিনি তাকে বললেন, 'পা'টা বড্ড কন্‌কন্ করছে, একটু টিপে দাও তো বাবা।' ভক্তটি সারা দিনে মাকে সাহায্য ও সেবার এরকম অভাবনীয় সুযোগ পেয়ে যেন নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করলো, আর তার স্পষ্টই মনে হ'ল মা সাক্ষাৎ অন্তর্যামী। তার অন্তরের দুঃখ জানতে পেরেই এভাবে কৃপা করেছেন।

একবার কয়েকটি ভক্ত মার দর্শন নিতে এসে রাত্রি হওয়াতে মার আশ্রমেই রাত্রিতে থাকা স্থির করলো। তারা আশ্রমের সদর ঘরের বারান্দায় রাত্রিবেলা শুয়েছিল। শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙতে তাদের একজনের মনে হ'ল "আহা এই নিশা-উষার সন্ধিক্ষণে মা যদি এসে একবার দর্শন দিতেন!" অপর একজন বলে উঠলো মা তো থাকেন অন্দর মহলে, তা আর কি করে সম্ভব হতে পারে?" ভক্তটি মনের আবেগে গান গেয়ে উঠলো 'ওঠ গো করুণাময়ি, খোল গো কুটীর-দ্বার!'

গানটি শেষ না হতেই দেখা গেল বাইরের দরজাটি খুলে সত্য সত্যই করুণাময়ী মা এসে দাঁড়িয়েছেন! পুলকিত বিস্মিত ভক্তরা কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

একটি ভক্ত সাধু নাগ মশাইর জীবনী পড়েছিল। তাতে সে জানতে পারে, মা নাকি একবার সাধু নাগ মশাইকে নিজ হাতে খাইয়ে দিয়েছিলেন। এটুকু জেনে তার মনেও তীব্র ইচ্ছা হ'ল 'মা যদি আমারো জননী হ'ন, তবে আমাকে কেন তিনি খাইয়ে দেবেন না? মুখ ফুটে সে মাকে কিছুই জানালো না। সত্য সত্যই একদিন মা তাকেও নিজ হাতে খাইয়ে ধন্য করলেন। ভক্তটির আনন্দের আর সীমা রইল না।

কখনো কখনো ভক্তরা মাকে দেবার জন্য ঘী মিষ্টি সন্দেশ নিয়ে আসতো। অথচ মার কাছে এত ভক্তের ভীড় যে, নিজহাতে তাঁকে তা নিবেদন করা হ'ত না। আশ্রমের ভক্তদের হাতে দিয়ে আসতে হ'ত। ফিরবার পথে তাদের মনের মধ্যে একটা খুঁতখুঁতি থাকতো, কষ্ট করে আনা জিনিষ মার সেবায় লাগবে কিনা, তারা যে মার জন্য এনেছিল তা মা আদৌ জানতে পাবেন কি না?

তাদের সঙ্গে পুনরায় যখনই মার দেখা হ'ত তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'হ্যাঁ বাবা, সন্দেশ, ঘী তোমরাই এনেছিলে তো?' কখনো বা তাদের সম্মুখে একটি সন্দেশ হাতে নিয়ে বলতেন, 'এই দেখ গো আমার জন্য যে সন্দেশ এনেছিলে, আমি তা খাচ্ছি।' শিষ্যদের আনন্দের আর অবধি থাকতো না।

একবার কয়েকটি ভক্ত রাস্তায় চলতে চলতে সাদা স্থলপদ্মের গাছ দেখতে পেয়ে স্থির করলো ১০৮টি পদ্ম সংগ্রহ করে মার পায়ে অঞ্জলি দেবে। সেই জন্য তারা ঐ শ্বেতপদ্ম সংগ্রহ করতে থাকে। এমন সময় কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে বললো, 'সাদাপদ্ম ছিঁড়ো না। মা বলে পাঠিয়েছেন দেবীপূজায় শ্বেতপদ্ম লাগে না।' অথচ আশ্রম সেখান থেকে বহুদূর। ভক্তদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। মা কি করে জানলেন?

আরেক বার একটি ভক্ত এসেছিল মায়ের কাছে দীক্ষা নিতে। দীক্ষান্তে সে মায়ের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বললো 'এখান থেকে বেলুড় মঠ দর্শন করে বাড়ী যাবো ভাবছি মা! অনুমতি দিন।'

মা তৎক্ষণাৎ তাকে বললেন, 'এবার না হয় সোজা বাড়ীতে চলে যাও বাছা, অন্য বার বেলুড়-মঠ যেয়ো।

'মা, এতদূরে এসেও যদি বেলুড়-মঠ না দেখে ফিরে যাই, তবে আর হয় তো কখনো এ সুযোগ না-ও পেতে পারি।'

'তাহো'ক বাবা! এবার তুমি বেলুড়মঠ না'ই গেলে। সোজা বাড়ী গিয়ে বাবা মার সেবা কর।'

মায়ের আদেশ অমান্য করতে না পেরে ভক্তটি অগত্যা বাড়ী ফিরেই গেল। কিন্তু বাড়ী এসেই দেখতে পেল, নিজ পিতা মৃত্যুশয্যায়। সে অবাক হয়ে বেলুড় দর্শনে যেতে মার বারংবার নিষেধবাণী স্মরণ করলো। কয়েক দিনের মধ্যেই তার পিতার মৃত্যু হল। মায়ের নিষেধবাণী না শুনলে হয়তো তার পিতার সাথে তার শেষ সাক্ষাৎ আর হত না।

যোগীনমা মায়ের স্ত্রী-ভক্ত। তাকে একদিন মা প্রশ্ন করলেন 'হ্যাঁ গো! তুমি কি শুকনো বেলপাতা দিয়ে পুজো কর?'

যোগীনমা তো প্রশ্ন শুনে অবাক্! বললেন, 'তা করি। কিন্তু তুমি জানলে কি করে?'

শুধু যে অন্তর্দর্শিতা, তাই নয়। মা নিজমুখেই বলতেন, 'কিছুদিন তো এমন হ'ল, মনের মধ্যে যা উঠতো সত্যি সত্যিই তা উপস্থিত হতো। তা এখন ভালই হ'ক, আর মন্দই হোক। ভাবি, এইটি খাবো বা এইটি হোক, ভগবান যেন তখন তখনই তা যুটিয়ে দিতেন।'

রাধুর তখন খুব অসুখ। কোয়ালপাড়া একটা জঙ্গুলে জায়গা। ভাবলুম, যে জঙ্গল, কোন দিন না বাঘ ভাল্লুক বের হয়ে পড়ে। ভক্তরা আশ্বাস দিল, কোয়ালপাড়ার মত জঙ্গলে বাঘ ভাল্লুক কখনো আসেওনি, আসতে পারেও না। আমার ভয় অমূলক। কিন্তু ২।১ দিনের মধ্যেই শোনা গেল একটি গরীব বুড়ীকে নাকি ভাল্লুকে মেরে ফেলেছে।

রাধুর অসুখের সময়ই আরো একবার। অসুখ বাড়াবাড়ি চলছে, সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে আছি। চার দিক থমথমে নিঃশব্দ। একটুও শব্দ সহ্য হয় না রাধুর। বসে ভাবছি এই কিছুদিন ধরে দুটো কাক এসে কতই বিরক্ত করতো 'কা' 'কা' করে শব্দ করে। কিন্তু আর তাদের শব্দ কিন্তু শুনি না। সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে কাক দুটি 'কা' 'কা' করে ডেকে উঠে জানিয়ে দিল 'এই তো মা আমরা রয়েছি এখানেই, কোথাও যাইনি। শুধু তোমার রাধুর ভয়েই চুপ করে রয়েছি। সাড়া দিচ্ছি না। আমি তো অবাক্!

একবার এক পশলা বৃষ্টির পর সবাই দাওয়ায় বসে। মনে হ'ল আহা! শিহড়ের সেই পাগলটা কত কাল আসে না। বদ্ধপাগল বটে, কিন্তু গানগুলি গায় বেশ। বলতেই এক ভক্ত বলে উঠলো 'এত রাত করে আবার তার নাম কেন কর? ধর, সে যদি এখুনি এই রাতে এসে পড়ে?' রাত্রি তখন দশটা। এক ভক্ত বলে উঠলো 'না! না। এই বাদলে এত রাত্তিরে নদী পেরিয়ে পাগলের আসার কোন সম্ভাবনাই নেই।' অথচ কথা শেষ হতে না হতেই পাগল সত্যি এসে হাজির। ব'ললে 'সাঁতরে পার হয়ে এলুম।'

একবার নাকি মার খুব অসুখ করেছিল। বড্ড দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি! চলাচল করতেই কষ্টবোধ হ'ত। একদিন মনে মনে ভাবলেন, 'শরীরের যে অবস্থা একগাছা মোটা দেখে লাঠি পেলে ভর দিয়ে চলতাম। মুখে বলেননি কারুকেই কিছু। সত্যি সত্যি পরদিন তার ঘরের দরজার একটি কোণে ভর করে চলার মত একগাছা মোটা লাঠি দেখা গেল। লাঠিটি যে কে এনে রেখেছে খবর করে জানা গেল না। এতে মা নিজেই বিস্মিত না হয়ে পারেননি। ভাবলেন ঠাকুরেরই লীলা! [ক্রমশঃ।

বেদবতীর উপাখ্যান

অণিমা মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তুলসীর উপাখ্যানে উল্লিখিত শিবভক্ত শ্রীরাজসাবর্ণি সূর্য্যশাপে লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হইলেন। শিব রুষ্ট হইয়া সূর্য্যনিধনে উদ্যত হইলেন। তখন নারায়ণ আসিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় এবং যুক্তি-তর্ক দ্বারা শিবকে নিরস্ত করিলেন। তখন মহাদেব নারায়ণকে প্রশ্ন করিলেন যে, কিরূপে তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত রাজসাবর্ণি পুনরায় লক্ষ্মীলাভ করিবে। উত্তরে নারায়ণ বলিলেন যে, রাজসাবর্ণির বৃষধ্বজ নামে একটি পুত্র হইবে, তাহার পর রথধ্বজ জন্মলাভ করিবে। রথধ্বজের দুই পুত্র হইবে—ধর্ম্মধ্বজ ও কুশধ্বজ। কুশধ্বজের কন্যার লক্ষ্মীর অংশে জন্ম হইবে এবং তখন শাপমুক্ত হইবে।

যথাকালে ধর্ম্মধ্বজ ও কুশধ্বজ জন্মগ্রহণ করিল। লক্ষ্মী দেবীর ইচ্ছায় সেই দুই ভ্রাতা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বহুদিন তপস্যা করিয়াছিল। সেই তপস্যায় তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মী দেবী বরদান করেন। লক্ষ্মী দেবীর বরে তাঁহারা রাজ্যলাভ করিয়া ধনে-পুত্রে সমৃদ্ধিশালী হইয়া ওঠেন। কুশধ্বজের পত্নী মালাবতী অতিশয় পতিব্রতা ও ধর্ম্মশীলা রমণী ছিলেন। মালাবতীর গর্ভে কমলার অংশে বেদবতী নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

পরম আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বেদবতী ভূমিষ্ঠ হইয়াই দ্রুত ব্রহ্মার আরাধনা করিতে বনে চলিয়া গেল। সদ্যোজাত কন্যার এই ভাব দর্শন করিয়া প্রতিবাসী সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহারা কন্যাকে নানাপ্রকারে বাধা দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কন্যা কাহারও কথা না শুনিয়া ত্বরিতে পবিত্র পুষ্করে গিয়া বিধাতার চরণপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিল। এইরূপ তপস্যায় বহুকাল অতিবাহিত হইল। কন্যার তনু ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল, কাঞ্চন বর্ণে কালিমা দেখা দিল এবং ইতিমধ্যে কন্যার যৌবন আসিয়া উপস্থিত হইল। তথাপি কন্যা অবিচল অটুট থাকিয়া উপবাসে কঠোর তপস্যায় নিমগ্না রইলেন। এইরূপ কঠোরতা দেখিয়া ব্রহ্মার আসন টলিল। বিধাতা তুষ্ট হইয়া দৈববাণীর দ্বারা বেদবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে কন্যে তোমার অন্তরের ইচ্ছা প্রকাশ কর। তুমি যাহা চাহ তাহা দিব।' দৈববাণী শুনিয়া বেদবতী কহিলেন—'হে পদ্মাসন, যিনি এই জগতের নাথ, যিনি এই সুমহান বিশ্বের আধার, তিনি যেন আমার পতি হ'ন, ইহাই আমার অন্তরের বাসনা।' বেদবতীর কথা শুনিয়া দৈববাণী কহিল—'হে কন্যা, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও তপস্বী যাঁর পাদপদ্ম নিয়ত অন্তরে ধরিয়া আছে, তাঁহাকে তুমি এজন্মে কী প্রকারে লভিবে? আমি তোমার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বরদান করিতেছি যে, জন্মান্তরে তুমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে লাভ করিবে।

দৈববাণীর কথা শুনিয়া বেদবতী ক্ষুব্ধ চিত্তে দ্রুত গন্ধমাদন পর্ব্বতে চলিলেন। সে স্থানে যাইয়া তিনি অনশনে কৃষ্ণের চরণকমল হৃদয়মাঝে ধারণ করিয়া দিবস রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কন্যা বেদবতী সদা-সর্ব্বদাই এক মনপ্রাণ লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, জগৎজীবন যেন তাহার নারীরূপে তাহাকে গ্রহণ করেন। এইরূপে বেদবতী যখন ধ্যানে নিমগ্না সহসা সেই স্থানে দুরাত্মা রাবণ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাবণকে দেখিয়া বেদবতী তৎক্ষণাৎ অতিথি সংকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অরণ্যের ফলমূল যত্নপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া অতিথিকে পরিতৃপ্ত করিলেন। অতঃপর সেই স্থানে বিশ্রাম লইবার অবকাশে কন্যার মোহনরূপ দর্শন করিয়া পাপমতির অন্তরে কামবহ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। দুরাত্মা মিষ্টভাবে বেদবতীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'হে বিনোদিনি, তুমি কাহার কন্যা? কাহার স্ত্রী? কেনই বা

একাকিনী এই নির্জ্জন পর্ব্বতে বসিয়াছ? হে বিধুমুখি, তুমি কেন গৃহত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ? তোমার দারুণ এই তপস্যা ত্যাগ করিয়া আমার গৃহে চল। আমি ত্রিলোক-বিজয়ী লঙ্কেশ্বর। এই পৃথিবীর মধ্যে তুমিই হবে আমার একমাত্র প্রিয়তমা। আমার অন্যান্য রাণীগণ হবে তোমার সেবিকা মাত্র।' এই বলিয়া রাবণ মোহবশে উন্মত্তের ন্যায় বেদবতীকে আকর্ষণ করিতে যাইল। দুরাত্মার এই মত্ত ভাব দেখিয়া বেদবতী ক্রোধে বেতসপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। রাবণকে সম্বোধন করিয়া দুই চক্ষুতে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—'শোন্ শোন্, নরাধম রাবণ, সরলা নারীর প্রতি তোর এই অত্যাচারের ফল তুই অবিলম্বে পাইবি। ওরে পামর! অতিথিরূপে আসিলি, তোকে যে আদর-অভ্যর্থনা করিলাম, তাহার কি এই ফল? ওরে দুরাচার, সাবধান! আমার নিকটে একটি পদক্ষেপেও আর অগ্রসর হইবি না।' এই বলিয়া বেদবতী সরোষ লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া এক অদ্ভুত তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কন্যার ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাবণ অনঙ্গে অবশ হইয়া রহিল। বেদবতী পুনরায় সরোষে কহিতে লাগিলেন, 'শুন রে পামর, আমি দিবানিশি মন-প্রাণ হরির উপর সমর্পণ করিয়া আছি। তাঁহাকে পতিরূপে লভিবার আশায় অহর্নিশি তাঁহার চিন্তা করিতেছি। তুই যেমন আমায় পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিস্, সেই হেতু তুই সবংশে নিধন হইবি। তোর বংশে আর কেহ রহিবে না এবং মরিয়া তুই যমালয়ে যাইবি।' এই বলিয়া বেদবতী অতি ক্রুদ্ধমনে গঙ্গাবক্ষে জীবন ত্যাগ করিলেন। পাপমতি রাবণ স্বচক্ষে এই সকল দর্শন করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

কমলার অংশে জন্ম কন্যা বেদবতী জাহ্নবী-সলিলে প্রাণত্যাগ করিয়া শাপবশে পুনরায় জন্ম লাভ করিলেন রাবণ নিধনের জন্য; জনকরাজার গৃহে সীতা নাম ধরিয়া বেদবতী আসিলেন। পূর্ব্বকৃত পুণ্যবলে কন্যা ভগবান রঘুপতিকে পতিরূপে লাভ করিলেন। জাতিস্মরা সতী অন্তরে সমস্ত জানিলেন এবং পূর্ব্বকার যত দুঃখ সকলই ভুলিয়া গেলেন। এই ভাবে জন্মান্তরে দৈববাণী প্রদত্ত বরে বেদবতীর কঠোর তপস্যার বলে জগৎপতি, বিশ্বের আধার শান্তশীল, সুচরিত শ্রীরামের পত্নীরূপে পুলকে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

উদ্বোধন

শ্রীঅরুণা ঘোষ

অস্তাচলগামী বর্ষ ডুবে গেল অতীতের অতল গহ্বরে,
বলে গেলো, নবীনের করো আবাহন তোমাদের ঘরে।
সাজাও বরণডালা স্নেহ আর ক্ষমা দিয়ে বাঁধ রাখী হাতে,
মিলনের মন্ত্র আজি গ্রহণ করিবে সবে নূতন প্রভাতে।
চেয়ে দেখি হায়, দিগন্ত রক্তিম করি সে-তো চলে যায়,
স্মৃতির প্রেক্ষাপটে কর্ম্মময় দিন তার লিখে রেখে যায়।
মৌনতায় দিয়ে গেল নীরব সাধনা করে গেল দান,
এ বিরাট বিশ্বে তার যতটুকু ছিল করিবার দান!
নূতন সাধনা দিয়ে নূতন বরষে মোরা উদ্বোধন,
হিংসা, দ্বেষ, গ্লানি ভুলে করি আজ সবে মিলে
মিলনের নূতন বোধন।

জাতিস্মর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

সুমিতা সকালে একবার করে আসে, বাবার পুজোর ঘরে, কয়েক মিনিট নীরবে বসে থাকে তাঁর পাশে।

তারপর সারাদিন আর দেখা পাওয়া যায় না তার। সময় যে তার দিদিমার হাতে তৈরী ছকে বাঁধা। সকালে আসে গীটারের মাষ্টার,—তারপর কলেজ,—ফিরে এসে মুখে-হাতে জল দিতে না দিতে; আসে পিয়ানো অথবা নাচের মাষ্টার। সন্ধ্যায় পড়া তৈরী।

সব শেষ করে রাতে একবার আসে, পিতার লাইব্রেরী-কক্ষে। তিনি তখন হয়তো নিবিষ্ট থাকেন—উপনিষদের মাঝে! একবার মুখ তুলে কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করেন সোমনাথ—প্রশান্ত হাস্যের সঙ্গে দিনান্তের বিদায় জানান।

সুমিতা হয়তো আশা করে থাকে, বাবা, কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করবেন, আর অভিযোগ জানাবেন—

—কৈ, সারা দিন তোমাকে তো একবারও পেলাম না মা! যেমন পূর্ব্বে বলতেন।

কিন্তু সে-সব কিছু হয় না। সোমনাথের ভাবলেশহীন পাথরের মত মুখে কোনো অভিমান বা দুঃখের রেখাপাত পর্য্যন্ত নেই। যেন তাঁর চাইবার আর কিছু নেই, মনে ওঠে না কোনো স্পন্দনের তরঙ্গ। তরঙ্গায়িত তটভূমি ফেলে রেখে, কোন ভাবসাগরের গভীর অতলে যেন বিরাজ করছেন তিনি।

সুমিতা এত বোঝে না! প্রাণে যেন কিসের বেদনা অনুভব করে। সহপাঠিনী দু'-একজনের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে দেখেছে সে ওরা কেমন ভাই-বোনেরা মিলে কত গল্প করে, কত হৈ হুল্লোড়ে মাতামাতি করে। ঝগড়া-মারামারিও আছে। মা-বাবার কাছে কত আদর পায়। আব্দার করে তাঁদের কাছে! ওদের বাড়ীগুলো যেন সজীব প্রাণচাঞ্চল্যে ভর-পুর থাকে!

—কিন্তু তার বেলা কেন এর ব্যতিক্রম ঘটলো? সে যেন দিদিমার হাতের কলের-পুতুল একটা! যে দিকে তিনি চালাচ্ছেন সে দিকে চলতে হচ্ছে তাকে। নিজের মন বলে কোনো দ্রব্য তার থাকতে নেই? কিন্তু সত্যি তো না নয়! মন যে তার চায়, ঐ রমার মত দুরন্তপণা করতে। গীতার মত প্রাণখোলা হাসি হাসতে আর শিখার মত কথায় কথায় ভাই-বোনেদের সঙ্গে ঝগড়া করতে; চেঁচামেচি করে বাড়ীখানা গুলজার করতে!

তা তো হবার নয়! দিদিমা তাঁর অ্যারিষ্টোক্রেট, চলন-বলনকে সর্ব্বদা অনুকরণ করতে বলেন তাকে। কেমন করে সভ্য সমাজে চলতে হবে, দাঁত চেপে মিহি গলায় কথা বলতে হবে, ঠোঁটের কোণে লেগে থাকবে একটু হাসি, শব্দ হবে না একেবারেই; ওটা অসভ্যতা!

দিদিমার শৃঙ্খলাবদ্ধ কারাগারে যেন বন্দিনী সে ! বাইরে যেমন ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য অন্তরে তেমনি যেন কিসের অভাব নিয়ত দংশন করে ওকে ! কিসের বেদনা ওকে যেন সর্ব্বদা সঙ্কুচিতা ম্রিয়মাণা করে রাখে ! মরুভূমির মাঝে ও থাকে ওয়েশিস ! কয়লাখনির নিকষ-কালো আঁধারের মাঝেই যেমন মেলে অত্যুজ্জ্বল হীরকের সন্ধান, রুক্ষ গিরি-গহ্বরে ঝরণার কুলু-কুলু ধ্বনি,—তেমনি সুমিতার জীবনেও আছে সুদাম।

সোমনাথের পরম বন্ধু মহিম হালদার, একজন উঁচু দরের ব্যবসায়ী—তাঁরই একমাত্র পুত্র সুদাম হালদার। জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেছেন তিনি, এখন পরমার্থের সন্ধানে গোপীদাস মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কয়েক বছর হল বৃন্দাবন-বাস করছেন।

বাড়ীতে আছেন তাঁর স্ত্রী। ছোট ভাই অসীম হালদার, আর পুত্র সুদাম হালদার। অসীমের ওপর আর বিশ্বাসী কর্ম্মচারীদের ওপর ব্যবসা পরিচালনার ভার দিয়ে তিনি অস্থায়িভাবে সংসার ত্যাগ করেছেন !

অসীম এখনও অবিবাহিত, তবে খুব চতুর ও হিসেবী। দাদার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হলেও ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে তার বেশী যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

সুদামের তেইশ, চব্বিশ বছর বয়স হলেও মনে হয় এখনও সে নাবালকত্ব কাটিয়ে উঠতে পারে নি। মা ও কাকার অত্যধিক আদর-যত্নে তার শিশুসুলভ ভাব আজও রয়ে গেছে। সুন্দর চেহারায় যেন একটি সুকোমল মেয়েলী ছাপ, ধীর স্থির কিছুটা বা লাজুক প্রকৃতির। মেডিকেল কলেজের ছাত্র সে, ফাইন্যাল পরীক্ষার আর কয়েক মাস মাত্র বাকী।

পিতার ইচ্ছায় ডাক্তারী লাইনে গেলেও সাহিত্যের প্রতি তার অসামান্য অনুরাগ। আধুনিক তরুণ কবিদের মধ্যে যে কয়েক জন বিদগ্ধ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন, সুদাম হালদার তাঁদেরই অন্যতম।

"পূর্ব্বরাগ" নাম নিয়ে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থখানি প্রচুর সমাদরের মাঝে প্রথম সংস্করণের ধাপ পেরিয়ে এখন দ্বিতীয়ে চলছে। ছোট গল্পও তার মাঝে মাঝে দু-চারটি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

লালকুঠিতে যাতায়াত চলেছে তার সেই বারো বছর বয়স থেকে! সুমিতা তখন বছর সাতেকের। এখনও মনে পড়ে সেদিনের কথা।

বাবার সঙ্গে প্রথম যেদিন গিয়েছিলো সে লালকুঠিতে, সুমিতার মা আদর করে কোলে বসিয়েছিলেন, কত কি খেতে দিয়েছিলেন, কি চমৎকার দেখতে ছিলো তাঁকে! ঠিক্ ঐ পটুয়াদের গড়া দুর্গা প্রতিমার মত! গোলাপী ফ্রক পরেছিলো সুমিতা, সোনালী এক-মাথা কোঁকড়ানো চুলে বাঁধা গোলাপী রিবনের বো। ওর হাত ধরে বাগানে নিয়ে গিয়ে কত ফুল দিয়েছিলো! খরগোস আর কত রকমের পাখী দেখিয়েছিলো। আসবার সময় কত চকোলেট বিস্কুট দিয়েছিলো সুমিতা। আর একখানা চমৎকার বিলিতি ছবির বই। সে বইটা আজও যত্ন করে রেখেছে সুদাম।

বছর চারেক পরের কথা। বড্ড মনে কষ্ট হয়েছিলো ওর, যেদিন লালকুঠিতে গিয়ে আর দেখতে পেলো না মিতার মা'কে!

পড়ার ঘরে চেয়ারে চুপ করে বসেছিলো মিতা। সুদামকে দেখে দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো! সুদামও কেঁদে ফেলেছিলো! তারপর সুমিতার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিলো,—কেঁদো না মিতা! মা যে ভগবানের কাছে গেছেন।

—সুমিতা জলভরা চোখ দুটো খুলে বলেছিলো,—মার জন্যে বড্ড যে মন কেমন করছে দামী দা'! কেমন করে আমি একলা থাকবো ?বাবা যে দিনরাত্তির বই নিয়ে থাকেন, আমি কার সঙ্গে কথা কইবো ?

—সুদাম ওর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বলেছিলো, —আমি রোজ তোমার কাছে আসবো মিতা! তোমার সঙ্গে গল্প করবো! তোমার কাছে থাকবো, তাহলে তোমার ভালো লাগবে তো ?

দু'হাতে ওর গলা জড়িয়ে বুকে মাথা রেখে, চোখ বুঁজেছিলো মিতা! চাপা দীর্ঘশ্বাসে ছোট্ট বুকটা ফুলে ফুলে উঠছিলো!

তারপর থেকে রোজ আসতো সুদাম। কলেজ থেকে ফিরে, সোজা চলে আসতো সুমিতাদের বাড়ী। গল্প বলে, কবিতা শুনিয়ে ওকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো।

বেশ ছিলো ওরা দু'জন। বছর দুয়েক পরেই এ বাড়ীতে এলেন সুমিতার দিদিমা, মামা, আর ছোট মাসী! তখন রোজ আসতে কেমন লজ্জা করতো সুদামের। ক্রমে যাওয়া-আসাটা কম হতে হতে এখন সপ্তাহে দু-তিন দিনে দাঁড়িয়েছে।

ঐ দুটো তিনটে দিনই যেন সুমিতার জীবনে নিয়ে আসে অমৃত-প্রবাহ! তার নিয়মের অক্টোপাশে বাঁধা নীরস প্রাণলতিকার মূলে ঐ সঞ্জীবনী সুধাটুকুই একমাত্র সম্বল! হতাশার কুহেলিকার মাঝে উজ্জ্বল আলোকবিন্দু!

এক বছর কেটে গেছে সোমনাথ বাড়ীতে ফেরবার পর। তাঁকে আবার সুদূর পথে যাত্রা করতে হবে। সেদিন সকালে একখানি বিরাট বুইককার এসে দাঁড়ালো লালকুঠির গাড়ী বারান্দার তলায়। গাড়ীর মালিক জানালেন,—তিনি সোমনাথ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান।

বেয়ারা জানালো সোমনাথকে,—তিনি আগন্তুককে লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে আসতে বললেন।

দামী বিলাতী পোষাকে সুসজ্জিত, অতি সুদর্শন একজন যুবক এলেন সোমনাথের ঘরে, সানগ্লাস্ দ্বারা চোখ দুটি তাঁর আবৃত।

যুক্ত করে নমস্কার জানিয়ে বললেন তিনি—আমাকে বোধ হয় চিনতে পারছেন না? আমার নাম অসীম হালদার। মহিম হালদার আমার দাদা।

—সোমনাথ মৃদুস্বরে জবাব দিলেন—বহুদিন পরে তোমাকে দেখছি কি না, সেজন্য প্রথমে চিনতে পারিনি—বোসো—না! না! এখানে নয়, ঐ চেয়ারটাতে বোসো!—হ্যাঁ, বিলেত থেকে ফিরলে কবে? দাদার খবর পেয়েছো তো ?

—চেয়ারে বসলো না অসীম,—পা মুড়ে আড়ষ্ট ভাবে কার্পেটের ওপরই বসে পড়লো। পকেট থেকে একখানি চিটি

বার করে বললো, বিলেত থেকে প্রায় তিন বছর হল ফিরেছি। তার পর থেকেই বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু আমাকেই দেখা-শোনা করতে হচ্ছে কি না। দাদা তো বেশীর ভাগ সময় এখন বৃন্দাবনেই বাস করছেন। এই চিটি দাদা আমার লিখেছেন সেই জন্যই এলাম আপনার কাছে। চিঠিখানি সোমনাথের হাতে দিলো অসীম।

—চিঠিখানি লিখেছেন মহিম হালদার—"সোমনাথ ত্রিবেদীর কাছে গিয়ে প্রস্তাব করো আমদের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুদামের সঙ্গে সুমিতার পরিণয় কার্য্য এবারে সুসম্পন্ন করা হোক, এই আমার অভিপ্রায়। সুদাম ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, সেজন্য বিলম্বে আর কাজ কি? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ব্যাবস্থা করা হোক উভয় পক্ষের।"

সোমনাথ চিঠিখানি প'ড়ে মৃদু হাস্যের সঙ্গে জবাব দেন—আমি তো সন্ন্যাসী মানুষ; ওসব ব্যাপার ঠিক বুঝি না, মহিমকে লিখে দাও, সে এসে যা করবার করে নেবে।

অসীম একটু ভেবে বললো, আমি একবার দেখতে পারি, আপনার মেয়েটিকে?

—অবশ্যই।

বাইরে অপেক্ষমান বেয়ারাকে বললেন, সুমিতাকে ডেকে দেবার জন্য। পিতার আহ্বানে ঘরে এসে, একজন অপরিচিত পুরুষকে দেখে থমকে দাঁড়ালো সুমিতা। সঙ্কুচিত ভাবে জিজ্ঞাসা করে—আমাকে ডেকেছো বাবা?

—হ্যাঁ মা! ইনি সুদামের কাকা অসীম, আর এইটি আমার কন্যা সুমিতা। ওঁকে প্রণাম করো মিতা?

সুমিতা হেঁট হয়ে পায়ের ধূলো নিতে যায়, বাধা দিয়ে অসীম হাত ধরে বসায় ওকে নিজের পাশে।

বিচক্ষণ সমালোচকের দৃষ্টিপাত দ্বারা সুমিতার সর্ব্বাঙ্গ লেহন করে, রায় দিলো অসীম—চমৎকার! সুদামের উপযুক্ত হবে। লেখাপড়া, গান-বাজনা, কিছু কিছু জানা আছে তো?

—হ্যাঁ!-ওর দিদিমার ব্যবস্থায় সবই চলছে। সাউথ ক্যালকাটা গার্ল'স্ কলেজে বি, এ, পড়ছে।

—কন্যাকে আদেশ করলেন সোমনাথ, অসীমের জন্যে চা আনতে।

খানিক বাদেই মায়া দেবী নিজে এলেন, নানাবিধ সুখাদ্যপূর্ণ রূপোর রেকাবী হাতে নিয়ে—পেছনে বেয়ারার হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ। ছোট টিপয়টিতে সব সাজিয়ে দিয়ে, পরমাত্মীয়ার মত বললেন—চেয়ারটাতে উঠে বসো বাবা, একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে। সোমনাথ পরিচয় করিয়ে দিলেন উভয়কে। অসীম হেঁট হয়ে মায়া দেবীর পদধূলি গ্রহণ করলো। যাবার সময় মায়া দেবী অসীমকে বিশেষ অনুরোধ জানালেন,—তুমি মাঝে মাঝে এলে বড়ই সুখী হবো বাবা! সুদাম তো আমাদের ঘরের ছেলে, তার কাকা তুমি, তুমিও আমাদের পরম আপন জন।

আবার নতুন যে সম্বন্ধটা গড়ে তোলবার আয়োজন হচ্ছে, তার জন্যে তো এখন তোমাকেই আনাগোণা করতে হবে।

মনে মনে স্থির করলেন,—এত দিনে বোধ করি মেয়েটার …টা নিজের করতে পারবো।

কয়েক দিন পরে—

একটি নাইট ক্লাবের পৃথক কক্ষে, কয়েক জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে পানপাত্র হাতে বসেছিলো অসীম। মনে তার আলোড়ন জাগিয়েছে, সুমিতার রূপ আর তার পিতার সম্পত্তি। একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রাপ্তি যোগ ঘটলো সুদামের বরাতে। একচুমুকে পাত্রটি নিঃশেষ করে সজোরে টেবিলের ওপর রেখে, আপন মনে জড়িত স্বরে বলে অসীম—না! না! এ হতে পারে না, এ হতে আমি দেব না। বন্ধু নীরেন ওর কথায় হো-হো, করে হেসে ওঠে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে,—

—কি হতে দেবে না বাবা? আবার বুঝি নতুন কিছুর সন্ধান মিলেছে? আর তাকে লুটে নেবার মতলব ভাঁজছো মনে মনে?

অসীম সামলে নেয় নিজেকে—বলে,—না! না! ও একটা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছিলাম।

নীরেন অসীমের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলে—কই হে তোমার উর্ব্বশীটির দর্শন তো এখনও মিললো না? ব্যাপার কি হে?

অসীম হাতঘড়িটি দেখলো, রাত্রি সাড়ে আটটা বেজে গেছে!

মনটা একটু চঞ্চল হল বৈ কি? শুকতারার আসবার কথা ছিলো, ঠিক আটটার সময়! মিনিট পাঁচেক পরেই সকলকার অধৈর্য্য প্রতীক্ষার অবসান ঘটালেন চিত্রতারকা শুকতারা দেবী রঙ্গভূমে আবির্ভূতা হয়ে।

মিষ্টি হাসি ঠোঁটে মাখিয়ে অসীমকে বললো—একটু দেরী করে ফেলেছি না? সেজন্য আমি দুঃখিত, বিশ্বাস করো, বেরুতে যাচ্ছি, এমন সময় এলেন হীরালাল ক্ষেত্রি।

তাঁর বইতে হিরোইনের পার্ট আমি করছি কি-না। সেজন্যে—বুঝতেই পারছো, বিজনেশের ব্যাপারে—বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলে অসীম—

হ্যাঁ! সেটা কিছু অন্যায় হয় নি তোমার পক্ষে! সত্যিই, ধনকুবেরের সান্নিধ্যের চেয়ে এখানকার প্রয়োজন মোটেই লোভনীয় নয় শুকতারা!

তবুও একেবারে ভুলে না গিয়ে মনে করে যে এসেছো, দর্শনার্থী ক'জন যে হত্যে দিচ্ছেন বহুক্ষণ ধরে, তুমি না এলে খেসারতটা আমাকেই দিতে হত? মানে খাদ্যবিল পঞ্চাশ-ষাট চুকিয়ে আবার অন্য কোনো স্ফূর্ত্তির পেছনে দু'-পাঁচশো খসিয়ে তবে ওরা আমাকে রেহাই দিতো। ওরা আজ আমার গেষ্ট কি না। যা হোক তুমি খুব বাঁচালে আমাকে—

—তাই নাকি মিঃ হালদার? তবে তো সে টাকাটা আজ আমারই প্রাপ্য, কি বলো? হেসে লুটিয়ে পড়লো শুকতারা অসীমের বুকের ওপর।

চারিদিকে হো, হো, হি! হি! হাসির তুফান বইলো, বয়রা ছুটোছুটি করলো, ডিসের পর ডিস এলো পর পর, বোতল এলো, খালি হলো।

অসীমের পকেট থেকে ঝরঝরিয়ে টাকার বৃষ্টি পড়লো, বয়রা বার বার সেলাম ঠুকলো।

রাত্রি বারোটায় শুকতারাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার পথে, —মূল্যবান মুক্তোর তিন নর বোম্বে ফ্যাসানে গাঁথা,…বুক

কালীমন্দির (নিউ দিল্লী)
—শ্যামাপদ চক্রবর্তী

সিকান্দ্রা ফটক (আগ্রা)
—অহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
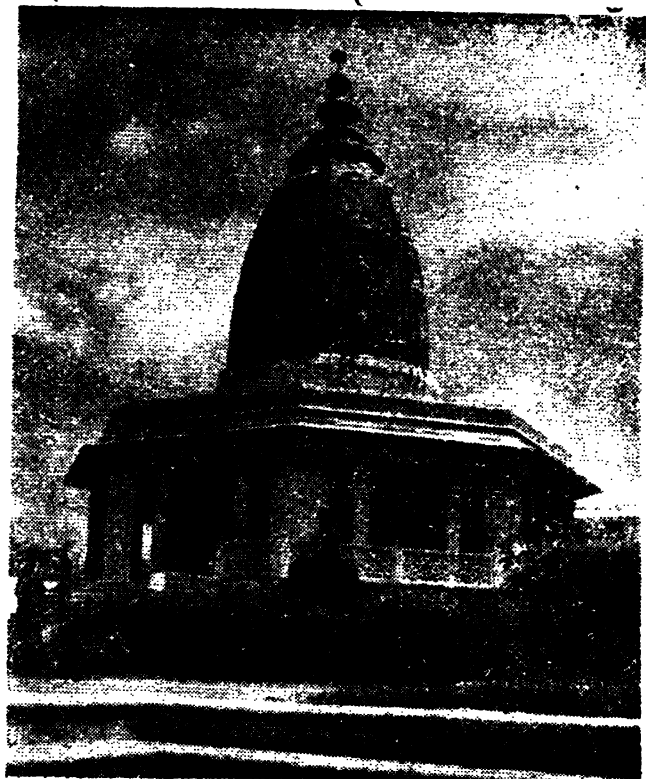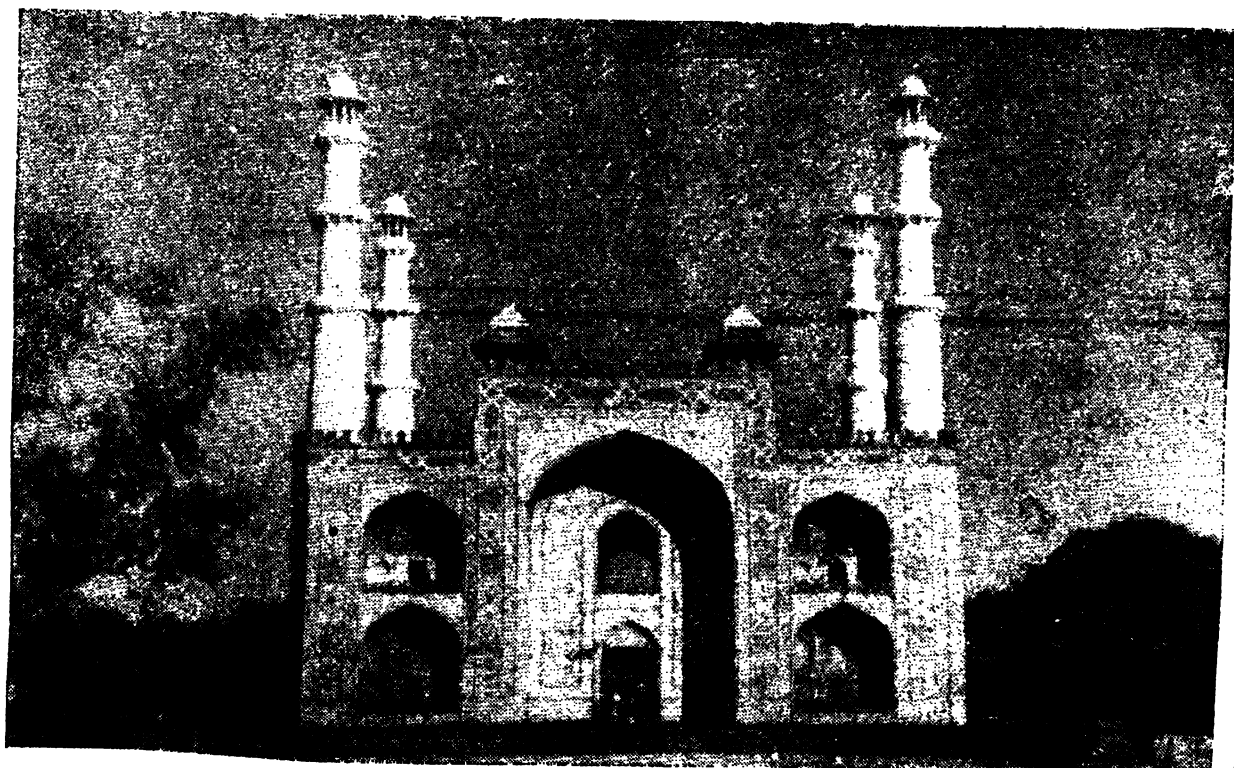
দিদিমণি —মিসেস অদিতি রায়
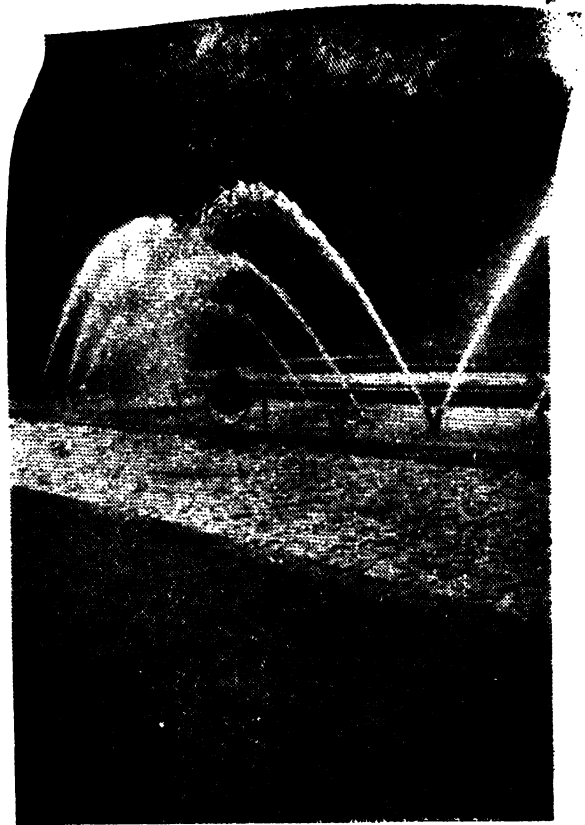
বৃন্দাবন গার্ডেন (মাইসোর) —রমা রায়

মাছধরা —তারা মুখোপাধ্যায়
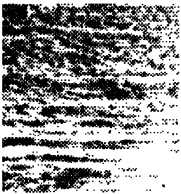
—গীতা সরকার

—সুধীন মিত্র

চাঁদের হাট

।ভার্গব।

—মাধুরী চট্টোপাধ্যায়

—নীহার রায়

পক্ষী-তীর্থ —ত্রিদিব রায়
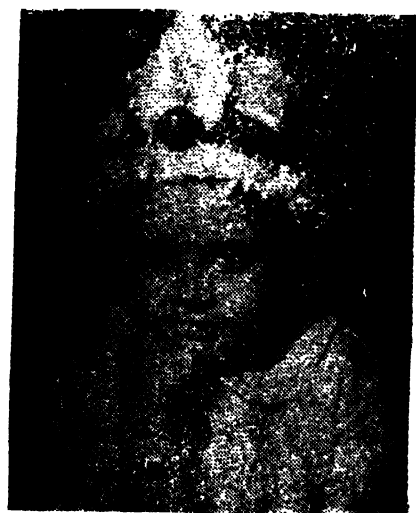
পকেট থেকে বার করে, অসীম পরিয়ে দিলো শুকতারার সুডৌল কণ্ঠে।

তারপর এ-পথে, ও-পথে, ঘুরলো গাড়ী। বারোটার কাঁটা ছুটোর ঘরে পৌঁছোলো, শুকতারাকে তার ফ্ল্যাটে নামিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরলো অসীম।

বিছানায় শোবার পর, একি বিড়ম্বনা! ঘুমের বংশ যেন পালিয়েছে আজ ওর চোখ ছেড়ে। চোখে আর মনে যেন কে লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে, তাই ছুটোই আজ পাল্লা দিয়ে জ্বালিয়ে মারছে।

কি করা যায়? ও রত্ন সুদামের হতে পারে না, ও একমাত্র আমারই জন্ম। কিন্তু কোন্ উপায়ে? ছলে, বলে, কৌশলে, সর্ব্বস্বপণ করে, জীবন দিয়ে। অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রবল উত্তেজনায় অস্থির ভাবে ঘরময় পায়চারী করতে থাকে অসীম। মনে চলতে থাকে ষড়যন্ত্রের জালবোনা, শীকার ধরার অব্যর্থ শর সন্ধান। —কিন্তু কোনটাই মনে ধরে না। ঢং, ঢং, ঢং, ঢং, ঘড়িতে রাত্রি চারটে বাজলো, উত্তেজনার প্রকোপ কমে এসেছে। মাথা ঘুরছে, দেহ-মন অবসন্ন। টলায়মান দেহখানি ধীরে ধীরে শয্যায় এলিয়ে দেয় অসীম, তন্দ্রাভাবে চোখ ছুটো ভারি বোধ হচ্ছে।

—হঠাৎ মস্তিষ্কের বিমূঢ় অন্ধকারে, একটি চমৎকার বুদ্ধির বিজলী খেলে গেলো। ঠিক্! ঠিক্! এ কথা তো এতক্ষণ মনে জাগেনি, সুদাম তো ডাক্তারী পাশ করেছে, দাদার ইচ্ছা ছিলো বিলেতে পাঠিয়ে ওকে কোনো বিষয়ের স্পেশালিষ্ট তৈরী করবার।

তখন সেই বাধা দিয়ে বলেছিলো,—না দাদা! সুদামকে অত দূরে পাঠিয়ে কাজ নেই, এখানে বসে ডাক্তারীও করবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা দেখবে।

—কিন্তু আজ সেই ভুলটা তো সংশোধন করে নেওয়া কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়! কালই দাদাকে চিঠিতে জানাবে, তাঁর কথাই ঠিক্, সুদামের উন্নতির কথা ভাবলে, তার বিদেশে যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

হ্যাঁ। ওকে চোখের আড়াল করতে পারলে সুমিতাকে দখল করা খুব কষ্টসাধ্য হবে না।

সুদাম কি সন্দেহ করবে তাকে? নাঃ! কিছুতেই না! বয়সে সে মাত্র বছর চারেকের ছোট হলেও, বুদ্ধিতে সে এখনও বালক মাত্র! ওর নির্দ্দেশ মাথা পেতে মেনে নিতে সে বাধ্য।

নিজের চমৎকার পরিকল্পনার খুসির আমেজে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে অসীমের! পরম তৃপ্তিভরে পাশ বালিশটাকে টেনে নেয় কাছে।

আঁখি-প্রান্তে নেমে আসে শান্তিপূর্ণ নিদ্রার জড়িমা।

[ক্রমশঃ।

বঙ্গাব্দ-বিদায়ে

শ্রীসুতপাপুরী দেবী

কি যেন অজানা সুরে অন্তরের অন্তঃপুরে
ধ্বনিয়া উঠিছে এক করুণ বেদনা;
নিত্য যার যাওয়া-আসা অন্তরে বেঁধেছে বাসা
বুঝি তার পদধ্বনি আর শুনিব না।
স্তব্ধ হবে ক্ষোণ রবে চিরতরে সে কী তবে
আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক কাজে!
সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা ভরে রব না কী তার তরে
সুখ-দুঃখময় স্মৃতি-বিস্মৃতির মাঝে।
বাংলার নববর্ষ জাতীয় জীবনে হর্ষ
বুঝি আর আনিবে না প্রথম বৈশাখ!
'শকাব্দে'র কলরবে এরে ভুলে যেতে হবে,
ভুলে যেতে হবে রুদ্র—দেবতার ডাক।
মাথায় পিঙ্গল জট অতিবৃদ্ধ মহাবট
মহাতপস্বীর মত শান্ত মৌন-মুখে,
দাঁড়ায়ে গ্রামের প্রান্তে মধ্যাহ্ন-দিনে একান্তে
চির বিদায়ের ছবি এঁকে লবে বুকে।
মোর মাতা মাতামহী তাঁদের প্রপিতামহী
কল্যাণ কামনা লয়ে নব-বর্ষ দিনে,
কত শত যুগ ধরে গভীর ভকতি ভরে
পূজা দিয়ে গেছে হোথা শুচি-শুদ্ধ মনে।

চৈত্র সংক্রান্তির দিনে গাজন-সন্ন্যাসী গানে
মুখরিত হইয়াছে স্তব্ধ দ্বিপ্রহর;
ভুলে যাবে গ্রামবাসী উৎসব দিনের বাঁশী,
সেই মেলা হাসি-খেলা, সেই অবসর।
সেই নব-বৈশাখের কাল-বৈশাখীর জের
আজও সাক্ষ্য হয়ে আছে নদীর ওপারে;
ভেঙেছে বটের গুঁড়ি ত্যজিয়া অসংখ্য ঝুরি
গ্রাম্য উৎসব দিনে নব বৎসরে।
আজি কি হইবে লুপ্ত এই মোর বঙ্গ-অব্দ
এরে ভুলে যেতে হবে নবীনের চাপে?
বৈশাখের সে পুণ্যাহ—নববর্ষ সমারোহ
বিশুষ্ক হইয়া যাবে হৃদয়ের তাপে?
ভাবিতে বেদনা বাজে অন্তর কন্দর-মাঝে
চির-প্রতীক্ষিত মোর পহেলা বৈশাখ—
এক যায় আর আসে প্রকৃতি নিয়ম বশে
তবু নাহি ভোলা যায় পুরাতন ডাক।
হে বিদায়ী বৈশাখ, তোমার মঙ্গল শাঁখ
বাজুক রুদ্রের করে অন্তরীক্ষ তলে;
আমার বঙ্গাব্দখানি সে চির তোমারি জানি
অন্তরের মণিহর্ম্যে তব দীপ জ্বলে!
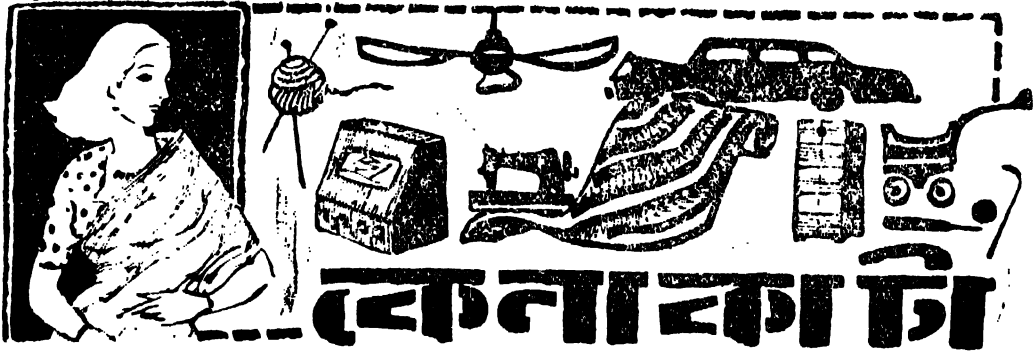
পোশাক পরিকল্পনায় বিজ্ঞান

প্রথমে মানুষ উলঙ্গ ছিল। সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের দেহকে আবৃত করবার আবশ্যকতা অনুভব করলো। প্রথমে গাছের ছালপাতা, পশুর চামড়া প্রভৃতি দিয়েই এ কার্য সম্পন্ন হতো। তারপর বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর উপযোগী পোশাক আবিষ্কৃত হতে লাগলো, যাতে এই সকল পোশাক শীত-গ্রীষ্ম জল-রৌদ্র থেকে শরীরকে রক্ষা ক'রে আরামদায়ক হয়।

মানুষের শরীর একটি তাপ-উৎপাদক যন্ত্রবিশেষ। অবচেতন অবস্থায় স্বয়ংক্রিয় ভাবে শরীর প্রায় একই তাপ বহন করে। দেহের উপরিভাগে ও হাত, পা, নাক, কান প্রভৃতি প্রান্তভাগে উত্তপ্ত রক্তপ্রবাহের পরিমাণ ও বেগ এবং নির্গত ঘাম বাষ্পীভূত হয়ে শরীরের চামড়া ঠাণ্ডা হওয়া—এই সব প্রক্রিয়াতেই প্রধানতঃ দেহের তাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহের তাপ সাধারণ আরাম অবস্থার বেশী কিংবা কম হলে আমরা বলি, গরম কিংবা ঠাণ্ডা লাগছে। অত্যধিক গরম অনুভূত হলে শরীর দুর্বল লাগে। যে কাজ করতে এরূপ অবস্থা হয় সে কাজে অনিচ্ছা হয়। অত্যধিক শীত লাগলে শরীর কাঁপে এবং শক্ত হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় খুব পরিশ্রম ক'রে শরীর গরম করবার ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক।

পরিবেশের সঙ্গে তাপের সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে দেহের আরাম উৎপাদন ব্যতীত ও পোশাক ব্যবহারে আরও অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—যেমন, সামান্য আঘাত থেকে রক্ষা, সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং রীতি পালন, অঙ্গের শোভা-বর্ধন, সৌখীনতা, প্রতারণার ছদ্মবেশ প্রভৃতি। তৈরীর সময় পোশাকের দাম, স্থায়িত্ব, ওজন, নমনীয়তা ধোয়ার সুবিধা এবং উপাদানের সহজ-প্রাপ্তি সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সব দিক বিবেচনা ক'রে বিজ্ঞান-সম্মত হয়েও রুচি-বিরুদ্ধ হলে পোশাক অগ্রাহ্য হয়। কোন পোশাক মনোনয়নের পূর্বে কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করা দরকার—যেমন আবহাওয়ার ঠাণ্ডা কিংবা উত্তপ্ত করবার ক্ষমতা, দেহের স্বাস্থ্য বা তাপ উৎপাদনের সামর্থ্য, নির্দিষ্ট পরিবেশে কতক্ষণ অবস্থান এবং এই সব অবস্থায় পোশাকটির কার্যকারিতা।

শরীর থেকে সব সময়ই তাপ বাইরে নির্গত হওয়া দরকার। কারণ, অত্যধিক তাপ জমা হলে শরীর ক্লান্ত হবে, এমন কি, মারাত্মক ভাবে তাপাহত হওয়াও অসম্ভব নয়। শরীর থেকে তাপ অপসারিত হবার অনেক উপায় আছে। ঠাণ্ডা পরিবেশে শরীরের তাপের বিকিরণ হয়। এমন কি, রৌদ্রোজ্জ্বল গরম দিনেও দেহের তাপ বাইরে নির্গত হতে বাধা পায় না। কিন্তু আবহাওয়া অত্যধিক উত্তপ্ত হলে দেহের তাপের বিকিরণ ব্যাহত হয়। দেহের অত্যধিক তাপ দূরীভূত হবার আর একটি উপায় হলো, ঘাম বাষ্পীভূত হওয়া। যখন অন্যান্য উপায়ে শরীর থেকে যথেষ্ট তাপ নির্গত হয় না, তখন এই প্রথাই সবচেয়ে বেশী ফলপ্রদ।

খানিকটা জল উত্তপ্ত ক'রে উষ্ণতা এক ডিগ্রি ফারেনহিট উঠাতে যতটা তাপের দরকার, তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশী তাপ শরীর থেকে শোষিত হবে একই পরিমাণ ঘাম বাষ্পীকরণে। শরীরে নিকটস্থ বায়ুর চলাচল হলেই বাষ্পীভবনের হার অনেক বেশী হয়। যে পোশাক পরলে বায়ুর চলাচল ব্যাহত হয়, সেরূপ পোশাক শরীরকে সুস্থ রাখবার পক্ষে উপযোগী নয়। চামড়ার উপর বায়ুর জলীয় বাষ্পের চাপের পরিমাণ দিয়েই ঘামের বাষ্পীভবনের হার প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়। বায়ুর চাপ যত কম হবে, বাষ্পীভবন তত দ্রুত হবে। এমন কি, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আর্দ্র বায়ুর চাপেরও দ্বিগুণ জোরে দেহের ঘাম বাষ্পীভূত হতে পারে। আবহাওয়া যথেষ্ট শুকনো হলে কিংবা তাপ কম হলে প্রতিবেশের চাপ এত কম হতে পারে যে, ঘামের বাষ্পীভবনের হার প্রতিবেশের চাপের চেয়ে ৩০।৪০ গুণ বেশী হতে পারে। এই জন্যে শীতকালে স্যাঁতসেঁতে পোশাকে এত ঠাণ্ডা লাগে। আবহাওয়ার তাপ কম হলে আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ এবং দেহের চামড়া খুব শুকনো রাখা দরকার।

শীতের সময় চামড়ার নিকটস্থ বায়ুর চলাচল কম হলেই আরামদায়ক হয়। বায়ু একটি উৎকৃষ্ট অন্তরক। কাজেই যে পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে নিশ্চল বায়ুর স্তর থাকে, সে পোশাকও অন্তরক হয়; অর্থাৎ সেরূপ পোশাক পরলে শীতকালে গরম লাগে। গরম পোশাক মানে এই নয় যে, পোশাক থেকে তাপ শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে। এইরূপ পোশাক পরলে শরীর থেকে তাপ তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে যেতে বাধা পায়। এই কারণে শরীর উত্তপ্ত থাকে। নিশ্চল বায়ুর স্তর যত মোটা হবে পোশাকের অন্তরণতাও তত বেশী হবে। প্রায় সকল শুকনো বস্ত্রের পক্ষেই এগুণ প্রযোজ্য। শুকনো তুলার বস্ত্র পশমী বস্ত্রের ন্যায়ই গরম হয়, যদি উভয় বস্ত্রের বুনানি ও ঘনত্ব এক হয়। কিন্তু তুলার বস্ত্র ধোয়ালে পাতলা হয়ে দৃঢ়তা এবং গরম করবার ক্ষমতা কমে যায়। অপর পক্ষে, পশমের বস্ত্র ধোয়ালে আরও ঘন হয়, কাজেই গরম করবার গুণ বজায় থাকে। তুলা কিংবা সিল্কের চেয়ে পশম অনেক আলগা ভাবে বোনা যায়। আলগা বুনানির জন্যে পশমী বস্ত্রে যে সব রন্ধ্রের উদ্ভব হয় তাতে বায়ু থাকতে পারে। অন্য জাতীয় পোশাকের চেয়ে পশমী পোশাকে ঘাম শোষিত এবং বাষ্পীভূত হয় অনেক আস্তে আস্তে। এই সব

কারণে অন্য জাতীয় বস্ত্রের চেয়ে পশমী বস্ত্র পরলে শীতকালে গরম লাগে। অপর পক্ষে, গ্রীষ্মকালে শরীরের তাপ তাড়াতাড়ি বাইরে বার করে দেওয়া যায়, ততঃ শরীরের পক্ষে আরামদায়ক। যে সব কারণে তুলা কিংবা সিল্কের পোষাক শীতকালে ব্যবহারের অনুপযোগী, সে সব কারণেই এ সব বস্ত্র পশমী কাপড়ের চেয়ে গ্রীষ্মকালে ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী। পশমী পোশাকের চেয়ে এ সব বস্ত্র থেকে শরীরের ঘাম অনেক তাড়াতাড়ি দূরীভূত হয়।

সাধারণতঃ পোশাক শরীরের তাপ বাইরে অপসারিত হতে এবং বাইরের তাপ শরীরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। উজ্জ্বল ও হালকা রঙের আবরণ বাইরের তাপ প্রতিফলিত করে। কালো রঙের দ্রব্য তাপ শোষণ করে। রোদে থাকলে মাথার কালো চুল গরম হয়ে যায় এবং মাথার খুলিকে বাইরের তাপ থেকে অনেকটা রক্ষা করে। শরীরের কালো রং কিংবা কালো পোশাক বাইরের তাপ শোষণ ক'রে নেয় বলেই তাপ শরীরের অভ্যন্তরে বিশেষ প্রবেশ করতে পারে না। তাপ শোষণ করবার ক্ষমতা কালো রঙের সব চেয়ে বেশী; অপর পক্ষে সাদা রঙের সব চেয়ে কম, কালোর প্রায় অর্ধেক। কালো রঙের তাপ শোষণ ক্ষমতা যদি ১০০ ধরা যায়, তাহলে অনুপাতে অন্যান্য রঙের পরিমাণ নিম্নলিখিত সংখ্যায় নির্দেশ করা যেতে পারে।

কালো	১০০
গাঢ় নীল, পাটল, সবুজ	৮৫।১০
ছাই, ধাতব	৮৫।১০
খাকি, লাল, অ্যালুমিনিয়াম,	
অনুজ্জ্বল পাটল ও নীল	৭০।৭৫
খড়, পনীর প্রভৃতির ন্যায় হালকা	৫০।৫৫
সাদা	৪০।৫০

সাদা ও হালকা রঙের পোশাক অধিক তাপ প্রতিফলিত ক'রে গরম কম হয় বলেই গ্রীষ্মকালে পরিধানের উপযোগী। অপর পক্ষে কালো এবং গাঢ় রঙের পোশাক অত্যধিক তাপ শোষণ ক'রে গরম হয়, সেজন্যে শীতকালে ব্যবহারের পক্ষে আরামদায়ক। প্রখর রোদে উত্তপ্ত আবহাওয়ায় ঢিলে সাদা পোষাকই সবচেয়ে উপযোগী। টুপির বাইরে কোন গাঢ় রং না হয়ে সাদা হলে, টুপির নীচে মাথার নিকটস্থ বায়ুর তাপ অনুপাতে প্রায় কুড়ি ডিগ্রি ফারেনহিট কম হতে পারে।

পোশাক এরূপ ভাবে পরিকল্পনা করতে হবে, যেন শীতবস্ত্র পরিধান করলে চামড়ার নিকটস্থ বায়ুর চলাচল কম হয়। কিন্তু তাহলেও নিশ্ছিদ্র পোশাক পরা উচিত নয়, যাতে শরীরের নিকটস্থ বায়ুর চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এরূপ পোশাক পরলে ঘাম হলে শুকাবে না, ভিতরের বস্ত্র ঘামে ভিজে যাবে, বস্ত্রের অন্তরণতাও কমে যাবে এবং শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

যে দেশে সূর্য্যের তেজ প্রখর, বায়ু শুকনো এবং আবহাওয়ার তাপ সাধারণতঃই শরীরের চেয়ে বেশী, সেখানে ঘামের বাষ্পীভবনই শরীর ঠাণ্ডা হবার একমাত্র উপায়। বায়ু শুকনো হওয়াতে জলীয় বাষ্পের চাপ কম থাকে, কাজেই ঘাম বাষ্পীভূত হয়ে শরীর ঠাণ্ডা হবার খুব সুবিধা হয়। মরুভূমিতে বেদুইনেরা নিজেদের দেহকে সূর্য্যের তাপ ও ঝড় থেকে রক্ষা করবার জন্যে হালকা রঙের মোটা আলখাল্লা পরে। শরীরের খুব কম অংশই উন্মুক্ত থাকে। এই পোশাক সমূহে বাষ্প বেরিয়ে যাবার উপযুক্ত ছিদ্র থাকে। এরূপ পোশাকের মৃদু

আন্দোলনেই যথেষ্ট বায়ু চলাচল হয়, কাজেই ঘর্মাক্ত শরীর থেকে দ্রুত বাষ্পীভবনে কোন বাধা থাকে না।

শীতকালে হাত-পা ঠাণ্ডা হওয়া সম্বন্ধে খুবই অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু শরীরের এই সব প্রান্তভাগে অতিরিক্ত গরম পোশাক চাপিয়ে এ সমস্যার সমাধান করা যায় না। অত্যধিক ঠাণ্ডায় দেহের উত্তাপের অপচয় যাতে না হয়, সে কারণে প্রান্তভাগে রক্ত চলাচল অনেক কমে যায়। এ অবস্থায় শরীরের ভিতর থেকে প্রান্তভাগে খুব কম তাপই পরিবাহিত হয়। দেহের ভিতর থেকেই হাত-পা গরম করবার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিশ্রম ক'রে শরীরের উত্তাপ বাড়ালে যথেষ্ট রক্ত চলাচল হয়ে হাত-পা গরম হবে। প্রায় সব অবস্থাতেই মাথা উত্তপ্ত থাকবার মত যথেষ্ট রক্ত সরবরাহ হয়। সাধারণতঃ মানুষ ভ্রম বশতঃ মনে করে যে, মাথা ও মুখ উত্তপ্ত থাকাতে এদের আর কোন আবরণের দরকার নেই। কিন্তু হাত-পা ঠাণ্ডা হওয়ার দরুণ এদেরই ঢাকা দরকার। বস্তুতঃ, শীতকালে ঠাণ্ডা হাত-পার চেয়ে উন্মুক্ত মাথা থেকেই অধিকতর তাপ নির্গত হয়। শিরস্ত্রাণ অপসারিত করলে পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

যুদ্ধের সময় নানা দেশে বিভিন্ন আবহাওয়ায় সৈন্য পাঠাবার সময় পোশাক পরিকল্পনা সম্বন্ধে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হয়, প্রতিবেশ অনুযায়ী বস্ত্র তৈরীর জন্যে। কেবল পরিকল্পনা নয়, বিভিন্ন প্রতিবেশে যাতে বস্ত্র লোকসান না হয় সে সম্বন্ধেও উপায় উদ্ভাবন করা দরকার। পশমী মোজার সঙ্কুচন নিবারণ করবার উপায় আবিষ্কার করতে পারলেও অনেক টাকা বাঁচানো যায়।

আগুন, নানাপ্রকার গ্যাস প্রভৃতি থেকে রক্ষা করবার জন্যেও নানাপ্রকার পোশাক তৈরী হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিবেশ ও অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন পোশাকের পরিকল্পনা যত বৈজ্ঞানিক উপায়ে করা যাবে, মানুষের জীবন-যাত্রা তত আরামদায়ক হবে।

—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন।

চাকরি রদবদলের সমস্যা

বর্ত্তমান সমাজ-কাঠামোতে একটি কোন চাকরি জুটোতেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। বেকার-সমস্যা সর্ব্বত্র দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় নতুন করে আর একটি চাকরি মিলবে, সাধারণ ক্ষেত্রে এই আশা সুদূরপরাহত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—যে চাকরিটি পাওয়া গেল, সর্ব্বাবস্থায় তাতেই কি সুখী থাকতে হবে শেষ অবধি?

চাকরি-জীবীর ক্ষেত্রে এইটি সত্যই একটি জটিল সমস্যা যখন অপর কোন নতুন চাকরি পাওয়ার প্রশ্ন উঠে। কত যুবকের কর্ম্মজীবনেই এক-দুইবার এইরূপ সমস্যার উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়। সহজ কথায় সমস্যাটি হ'ল—যে চাকরিতে রয়েছি, তা আদৌ ছাড়ব কি না এবং একই সঙ্গে যে চাকরির সন্ধান এসেছে সেটি গ্রহণ নিরাপদ ও সঙ্গত হবে কি-না। প্রথম দফা চাকরি খুঁজে পাওয়ার চেয়ে চাকরির এই রদবদলের প্রশ্নটি নিশ্চয়ই কম কঠিন নহে। কেন না, পুরানো কাজ ছেড়ে একটি নতুন কাজ গ্রহণের সিদ্ধান্ত, সমস্ত জীবনব্যাপী এর পরিণাম ভুগতে হবে, ভালই হোক্, আর মন্দই হোক্।

বলা হয় যে, জীবনে দারিদ্র্য যেখানে কম রয়েছে কিংবা বয়স তখনও খুব বেশী হয়ে যায় নি, সেক্ষেত্রে সব রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাই চলতে পারে—একটা চাকরি ছেড়েও নতুন চাকরির ঝুঁকি লওয়া যায় অনেকটা সাহস করেই। আর এ ধরণের ঝুঁকি নেবার প্রবৃত্তি বা আগ্রহ যদি যুবপ্রাণে না দেখা গেল, তবে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা কি করে সম্ভব? অবশ্য জীবনের প্রারম্ভেই সাংসারিক দায় ও দায়িত্বে যদি খুব বেশীরকম জড়িয়ে পড়তে হয়, বর্ত্তমানকে ছেড়ে যখন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরীক্ষার চিন্তাই সম্ভব নহে—সেই অবস্থায় চাকরি রদবদলের প্রশ্ন নেহাৎ অবান্তর। এইরূপ ক্ষেত্রে যিনি যে কাজে আছেন, আঁকড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই, নতুন সে যতই রঙীন হোক্, 'লোভনীয় হোক—দুঃখের হলেও তাঁর কাছে সেইটি বুঝি পরিত্যজ্য।

অনেক ক্ষেত্রেই জীবনে দুইটি সন্ধিক্ষণ এসে দেখা দেয়—যে সময় প্রত্যাশিত উন্নতির খাতিরে নতুন কোন কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দেওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে উঠে। একটি সন্ধিক্ষণ হচ্ছে—বয়স যখন কম থাকে এবং মনে থাকে নিজকে এবং পরিবারবর্গকে উন্নত করার প্রতিশ্রুতি ও দৃঢ়তা। দ্বিতীয় সন্ধিক্ষণ—যখন কর্ম্মজীবন প্রায় শেষ হয়ে আসছে এবং পরিবারেরও নিশ্চিত উন্নতির হয়েছে ব্যবস্থা। এইটি বরং জোর দিয়ে বলা যায়—আর্থিক দায়িত্ব যদি খুব বেশী না রইল এবং বয়সও না পার হয়ে গেল যৌবনের কোঠা, সেই ক্ষেত্রে একটি কাজ ছেড়ে ভাল হবে মনে করলে নতুন কোন কাজের ঝুঁকি নিতে আপত্তি নেই। চাকরির এই রদবদলের মুহূর্ত্তে নিম্নোক্ত তিনটি জরুরী সূত্র মনে রাখা বোধ হয় সমীচীন হবে:

(১) চাকরির লাইন পাল্টান কিংবা নতুন কাজ গ্রহণের প্রশ্ন যখনই আসবে, কাজে যাবার পূর্ব্বেই অবসর সময়ে জেনে নিতে হবে কোন সূত্র ধরে কাজটা আসলে কি এবং কতটা উন্নতির সেখানে সম্ভাবনা। অর্থাৎ একটি কাজে ইস্তফা দিয়ে অপর কাজেই যাবার মুহূর্ত্তে সন্দেহ ও দ্বিধার যেন খুব বেশী অবকাশ না থাকে, সেইটিরই এখানে দাবী।

(২) মনের পূর্ব্বোক্ত প্রস্তুতি ছাড়াও আলোচ্য অবস্থায় আর একটি জিনিসের প্রয়োজন আছে। নতুন যে চাকরির সন্ধান করা হচ্ছে সেইটি পাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে হাতের কাজটি ছেড়ে দেওয়া মোটেই সঙ্গত হবে না।

(৩) এখনকার কাজের ক্ষেত্রে যিনি 'বস্' বা উপরিওয়ালা, সুযোগ খুঁজে তাঁকে নতুন চাকরিতে যাবার বিষয় বলা অনেকক্ষেত্রে ভাল। কারণ সেক্ষেত্রে কর্ম্মপ্রার্থীর উদ্যোগীপণায় তিনি সুখী হবেন এবং তার ভবিষ্যৎ উন্নতির সহায়ক হিসেবে তিনি তাকে স্বেচ্ছায় তুলে দিবেন একটি উপযুক্ত সুপারিশ পত্র।

অবশ্য একটি কথা থেকে যায় এর ভিতর—যে কাজ এখন রয়েছে সেইটি যদি মনোমত হয় এবং উন্নতির সুযোগ ও সম্ভাবনাও থেকে থাকে সেখানে, সেইক্ষেত্রে চাকরি রদবদলের প্রশ্ন উঠে না। যে যে কাজে সক্ষম কিংবা যে কাজের উপযোগী সে-কাজটি জুটে না যাওয়া পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ ঘুরাফেরা করতেই হবে। একবার উপযুক্ত কাজ হাতে এসে গেলেই এবং কাজের অবস্থা-ব্যবস্থা ও মাস মাহিনা যদি অনুকূল হলো, তা হ'লেই আর ততখানি ভাবনা নেই। মোটের উপর, চাকরির রদবদলটাই বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে জীবনে উন্নতির প্রশ্ন এবং মনের মত ও যোগ্যতা অনুরূপ কাজ পাওয়া। অপর দিকে রদবদলের প্রশ্ন যখনই সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন চাই—স্থির চিত্তে চিন্তা ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ এবং ঝুঁকি নেবার মতো শক্ত মনোবল।

বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্য

পিছুকে তীরভূমি ফেলে-আসা নদীর মতো অস্পষ্ট অতীতকে কবে যে মন থেকে প্রায় মুছে ফেলে বসেছিলাম, নিজেই জানি না। দেশ ছেড়ে কোলকাতার মোহানায় এসে আশ্রয় নিয়েছি; স্থায়ী ব্যবস্থা প্রায় শেষ। তবে মনটা নাকি শ্লেট নয় যে সব কিছু সময়ের জল বুলুনিতে ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যাবে, তাই যতোই কেন জীবনের লড়াই, ব্যস্ততার ঝড়ে বিক্ষিপ্ত থাকি না,—মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ানো মুহূর্তে, চোখের সামনে স্মৃতির রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে—দেশ গ্রাম; শৈশব থেকে পনরটা সবুজ সতেজ ভোরের মতো বছর। মনে পড়েছে পটুয়াখালি, আঙ্গারিয়া নদী। ক্ষণিক যদিও। তার পরই জলপ্রপাতের টানের আওতার মধ্যে আসা কুটোর মতো ঝামেলা, ঝঞ্ঝাট, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, রুজি-রোজগার, সংসারের ঘূর্ণি কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে অতীত রোমন্থনের বিলাস। তলিয়ে দিয়েছে অনবসরের অতলে। হয়তো এমন ভাবে আর কখনো সে সব দিনের তার পাত্র-পাত্রী নিয়ে—কাল্পনিক পুনরভিনয় চাক্ষুষ দেখার সময় পেতাম না এ জীবনে। কখনোও না। যদি না পূর্ণর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'য়ে যেতো হাওড়া ষ্টেশনের বাস্তুহারাদের অপরিচ্ছন্ন জটলায়।

কতো দিন হ'য়ে গেলো; আজ থেকে পনরটা বছরের মাইলপোষ্ট গুণে গুণে উজান বেয়ে গেলে দেখতে পাই—আর পাঁচজন পূর্ববঙ্গের ছেলের মতো বরিশালের পটুয়াখালি স্কুল থেকে ম্যাট্রিকের বেড়া ডিঙ্গিয়ে কোলকাতায় এসেছি উচ্চশিক্ষার আশায়। দেশে জমি-জমা—চাষ-বাস, সুপুরি-নারকেলের ব্যবসার ওপর জ্যাঠা মশাইয়ের কবিরাজী। নির্বিঘ্ন-নিশ্চিন্ত। মাসের প্রথম সপ্তাহেই বরাদ্দ টাকা এসে যায়। না এলে কোলকাতায় ব্যবসা-করা দেশের লোকের গদী থেকে ইচ্ছে মতো হাওলাত।

আর সেদিন এলো! দু-একজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে রেস্তোরাঁয় প্রাণভরে আহার-নির্ঘাত কর্মসূচী। এখন মনে করলে চোখে জল টল-টল ক'রে এসে পড়া সে সব সোনালী দিন ভালো লাগে, খারাপও। এ সব দিন যে কখনো আসবেই নয়, এমন অবস্থা যে থাকতে পারে তাই ভাবা যায়নি কখনো। আমার বাবা ছিলেন না জানতেই পারিনি কোনো দিন, এমন জ্যাঠামশাই ছিলেন। অপুত্রক তিনি। বুক দিয়ে শুধু বিষয়-সম্পত্তিই রক্ষে করেন নি। আমাদের ভালোবেসেছেন [illegible]। উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল থেকে সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত নাকি কুগ্রহের দৃষ্টি ছিলো ভারতের ওপর। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বন্যা, মহামারী মড়ক আর দাঙ্গায় ছারখার করেছে সে দৃষ্টি—আমাদের বেলায় কিন্তু তা নয়, বিয়াল্লিশ সাল থেকে চিরকাল,—চিরকাল দুর্দিন। মানুষ তো তা বোঝে না!

যুদ্ধের হিড়িকেই বলতে হবে তেতাল্লিশ সালে আরো শিক্ষার আশা ত্যাগ ক'রে এক সওদাগরী দপ্তরে চাকরি পেয়ে ভেবেছিলাম প্রতিষ্ঠা বুঝি হাতের মুঠোয়! কিন্তু জলে-ডোবা অবস্থায় খড়কুটোর মতো চাকরিকেই আঁকড়ে থাকতে হবে তখন কে জানতো! প্রথম ধাক্কা জ্যাঠা মশাইয়ের হঠাৎ হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়া। দায়িত্বটা কি জিনিস বুঝলাম।

তবু হয়তো চলে যেতো যা হোক ক'রে। হ'লো দেশভাগ, আর তার কিছুদিন পরেই সর্বনাশা পঞ্চাশের বরিশাল হত্যাকাণ্ড।

কয়েক দিনের লোহার পর্দা ভেদ ক'রে কোনো খবর আসে না বরিশালের বাইরে। দৈনিক কাগজে ছিটকে বেরিয়ে আসা খবরে নিজের গ্রামের হত্যাকাণ্ডের দুঃসংবাদ পড়ি। চেনা-শোনা পাড়ার লোকের হত্যার সংবাদে শিউরে শিউরে উঠি। সব বুঝি যায়। গেলোও। অবস্থা দেখে নিজের মৃত্যুকামনাই শ্রেয়ঃ মনে হলো। মা জ্যাঠাইমা, ভাই-বোনেদের এ রকম দেখতে হবে জীবদ্দশায়? লজ্জায় অপমানে পরিত্রাণ উপায় হীনতায় দিশেহারা হ'য়ে গেলাম। তবু শেয়ালদা ষ্টেশনের আশ্রয়প্রার্থীদের দীন জীর্ণ অপরিচ্ছন্ন ভীড় থেকে ওদের চিনে বার করতে হলো একদিন। বুকফাটা কান্না শুনতে হ'লো, আর হতাশ হয়ে দেখতে হ'লো—ক'দিনেই আমরা পথের ভিখিরী ছাড়া কিছু নই। সমস্ত কিছু ত্যাগ ক'রে শুধু মাত্র প্রাণ নিয়ে একবস্ত্রে ওরা পালিয়ে এসেছে।

চাকরিটুকু সম্বল। থাকি মেসে। বুক ফেটে গেলেও প্রথম কয়েক মাস ওদের ধুবুলিয়া ক্যাম্পে রাখতেই হ'লো সরকারী আশ্রয়ে। তার পর থেকে ভাগ্যের সঙ্গে অবিশ্রাম আপোষহীন সংগ্রাম।—আজো চলেছে।

একে দুঃখ-দুর্দশায় মানুষের সংগ্রাম-শক্তি বেড়ে যায়, তার ওপর পূর্ববঙ্গের আমরা প্রাকৃতিক নানান বিরূপতার সঙ্গে শাশ্বত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্যেই বোধ হয় কিছুটা সহজাত সহন আর সংগ্রাম-শক্তির অধিকারী। তাই বাঁচালো। ধীরে ধীরে ভাইয়ের চাকরি হওয়ার পর কোলকাতায় বাসা করতে পারলাম একটা মাথা গোঁজার মতো। ওদিকে বেশ কিছুদিন এণ্ডারসন্ হাউসে ধন্না দিয়ে দিয়ে কোন্নগরের কাছে একটু জমি সাহায্য পেলাম। কিছু ঋণও। প্রাণপণ ক'রে একটা টিনের চালাওলা তিন ঘরের কুঁড়ে খাড়া করেছি আজ।

অফিসে ঋণের পাহাড়। তাতেও শেষ হয় না। এমাসে এটা করি তো ওমাসে ওটা। কোনো মাসে কুয়ো, কোনো মাসে বা দরজা-জানলায় রঙ। সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত কোলকাতার অফিস বজায়। কিন্তু স্বভাব কোথায় যাবে!

এ সবের মধ্যেও সাপের মুখে থাকা ব্যাঙের পোকা ধ'রে খাওয়ার মতো, এই অবস্থাতেও বিয়ে করে বসেছি লক্ষ্মী ছেলের মতো। বিয়ে না, সর্বনাশ ক'রেছি বলাই ভালো বোধ হয়। সর্ব দিক থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ততার নাগপাশের বেড়ে নিজেকে বেঁধেছি আষ্টেপৃষ্ঠে।

আগেকার দিন ভাবার সময় কই? কোথায় মনে পড়ানোর মতো মন?

কেনো দিন কখনো এমন ক'রে মনে পড়ত না, যদি না পূর্ণর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'য়ে যেতো হাওড়া ষ্টেশনের চিড়িয়াখানার জন্তুদের মতো পিঁজরে পিঁজরে ক'রে ভাগ ক'রে রাখা আশ্রয়প্রার্থীদের দীন-জীর্ণ অপরিচ্ছন্ন জটলায়।

আমি ওদিকে চাইতাম না। সে দৃশ্যে বুকে মোচড় দিতো আর চোখ ফেটে জল আসতে চাইতো ব'লে প্রায় চোখ-কান বন্ধ ক'রে হাওড়া শেয়ালদা ষ্টেশনের দলা পাকানো পাকানো নোংরা চরম দুর্দশাগ্রস্ত জটলা পার হ'য়ে যেতাম! কোন দিনও চাইতাম না।

শনিবারের বারবেলায় আর এক চরম ধাক্কা ছিলো কপালে। চাইতেই হ'লো। ঝামেলা কি এক রকম? রেলের মাসিক টিকিটটা ভুলে এসে ফেরার সময় টিকেট কেনার জন্যে থার্ড ক্লাশ টিকেট-জানলার কাছে যদি না দাঁড়াতে হ'তো, তা হ'লে লেখাই হ'তো না এ কাহিনী আর আমার মনেও পড়তো না পুরোন ফেরারী দিন। হয়তো ভবিতব্য। তা না হ'লে এই সমস্ত কার্যকারণ সংঘটিত হবেই বা কেন?

বেশ কিছু গরচা মনে ক'রে মুখে-চোখে যথাসম্ভব বিরক্তির পোঁচ লাগিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম টিকেট কাটতে চাওয়া জনতার আঁকাবাঁকা পাইথন্-লাইনে।

—মেগো নিমাই না?

কী যেন ভাবছিলাম অন্যমনস্ক হ'য়ে। হয়তো কুয়োর পাড় লাগাবার কথা। চমকে উঠলাম! দমকা হাওয়ায় বইয়ের অনেকগুলো পাতা উল্টে গোড়ার দিকে চ'লে যাওয়ার মতো এক ডাকে ফিরে গেলাম যৌবন-প্রত্যূষের সোনালী সবুজ দিনে।

—নিমাই না! তাই ক', ঠিক চিন্‌ছি!

অতি পরিচিত গলা। একটু হকচকানি, বিমূঢ়তা, তারপরই হঠাৎ পরিচয়ের বিদ্যুৎ চমকে উঠতে দেখলাম আমার মুখে, মানসিক দৃষ্টিতে।

—আরে, পূর্ণ?

কী আশ্চর্য! পটুয়াখালির বিখ্যাত ধনী নিতাই সাহার নাতি! প্রায়-রাজা জীবন সাহার আদুরে দুলাল আমার বাল্যবন্ধু প্রিন্স পূর্ণ সাহাকে দেখছি? ঠিক তো? আমার দোষ ছিলো না। চেনা সহজ নয়। গ্রামের সব থেকে সৌখিন—প্রায়-রাজপুত্র—পূর্ণ?

জীর্ণ মলিন বস্ত্রে অপরিচ্ছন্ন জিরজিরে স্বাস্থ্যের—পূর্ণ একটা বাচ্চা ছেলের পেছনে দাঁড়িয়ে টিকেট কাটতে চাওয়াদের কাছে ভিক্ষে করছিলো এক মুহূর্ত আগেও দেখেছি। চিনতে পারিনি। পারার কথাও নয়। নিজেই পরিচয় দিলো আর লজ্জিত হ'লো না পূর্ণ।

—হ রে, সেই পূর্ণ! তোর আর দোষ কি? চেন্‌থে পারার মতো আছে কী কিছু? সত্য! তুইও বদ্‌লাইছো, সহজে ছেন্‌থে পারি নায়!

—এ কি অবস্থা তোর? কী কইরগা এ্যামন্ হইলো রে পূর্ণ? আমরা পূর্ববঙ্গের দেশের লোকের কাছে দেশের ভাষা বলি। না বললে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পাত্র, তিরস্কৃত হই। আমার এ প্রশ্নের প্রয়োজন ছিলো না বুঝলাম।

আমার চোখ-মুখের অবস্থা দেখে পূর্ণ নিজেই নিজের কথা বলার জন্যে তৈরী হ'য়ে গিছলো ওরি মধ্যে। নিচুতে ওড়া-উড়ো জাহাজ থেকে দেখা ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, শহর গ্রামের মতো সমস্ত দেশের জীবনটা এক লহমায় চোখের সামনে দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে তার সমস্ত দৃশ্যপট নিয়ে স'রে স'রে চলে গেলো—।

পাঠশালা থেকে স্কুল।

আড়িয়াল নদীতে ওদের নৌকায় দুপুর-বিকেল করা থেকে, পূর্ণর বিয়ের পর অন্নপূর্ণা বৌদি, আমি আর পূর্ণর দীর্ঘ দুপুর ওদের বাড়ির পেছন দিকের পূর্ণর পড়ার ঘরে কাটানো পর্যন্ত—

সম্পদ আর আনন্দানুভূতি মানুষ চেপে রেখে সুখ পায় না বোধ হয়। অন্তত দেখানো চাই। তার ওপর এখনকার হিসেবে বাল্য-কালেই বিয়ে হওয়ার কি না জানি না, পূর্ণ তার স্ত্রীকে ভালোবাসার প্রদর্শনী, আদর সোহাগের সাক্ষী রাখতো আমাকে। দেখিয়ে দেখিয়ে আদর ক'রে আমাকেই লজ্জায় ফেলতো। প্রথম প্রথম লজ্জায় লাল হ'য়ে আপত্তি করতো অন্নপূর্ণা বৌদি; স'রে স'রে যেতো—। শেষে নিরুপায় হ'য়েই ঘরে বাসা করা চড়ুই পাখির মতো আমাকে লজ্জা অপ্রয়োজনীয় মনে ক'রে পূর্ণর কাঁধে মাথা রেখে আদর খেতো চেখে চেখে, আর সলজ্জ তৃপ্তির হাসিতে উছলে উঠতো।—এক লহমায় সমস্ত ভেসে ভেসে, ফুটে ফুটে উঠলো স্মৃতি থেকে মানসিক চোখে, জলছবির মতো—।

—কী সর্বনাশ হইলো ভাই দ্যাশ্ ভাগ হইয়া! আমাগো দেশ গাঁয়ে আমরা বিদেশী?

চমক ভাঙলো পূর্ণর আত্মকাহিনীর ভূমিকায়।

একটা শাদা কাগজে কলমের আঁচড়ে দেশভাগ স্বীকৃত হ'লো। সেই আঁচড় যে হাজার হাজার মানুষের ফুসফুস দুটোকে দুভাগ করে দেয়ার আঁচড় হ'লো তা কেউ ভেবে দেখেনি বৃহত্তর স্বার্থের মোহ আর মহিমায়।

—নানান বিপদ-আপদ, ক্ষয়-ক্ষতি, অপমান লাঞ্ছনা সহ্য কইর্‌গাও পৈতৃক মুদিখানার দোকানড্ডা আঁকড়াইয়া পইড়্‌গা ছিলাম পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত। বাবারে জানাথ্‌ তো? ঠাকুর্দার অতো সম্পত্ত কর্পূরের মতো উড়াইয়া দিলেন মদ আর মাইয়া মানুষে! তেজারতি কারবার গ্যালো। থ্যাযে দোকান, তাও ছাইড়্‌গা আইথে হইলো। দাঙ্গায় প্রাণগুলাও যাইতো. কোনোক্রমে পলাই বাঁচা—। বাবা কিন্তু আয়েন নাই, তাঁর রক্ষিতার বাড়িতে দাঙ্গায় বলি হইছেন।

কিছু না হইলেও দোকান, বাড়ি, জমি, বাগান, পুথৈর লইয়াও থ্যাষ পর্যন্তও বড়লোকই ছিলাম রে! আর আইজ ত্থাখছো? ভিখারী! পূর্ণর চোখ ছল-ছল ক'রে উঠলো।

সত্যিই! আশ্চর্য! কয়েক বছর আগের দেখা এক প্রায়-রাজপুত্রকে আজ ছেলের হাত ধ'রে প্রকৃতই ভিক্ষে করতে দেখেও যতোটা আঘাত পাবার কথা, যেন পেলাম না। গা সওয়া হ'য়ে গেছে সব। কোনো পরিবর্তনই পরিবর্তন নয়। আশ্চর্য হই না কিছুতেই। সবই সম্ভব—স্বাভাবিক। সমস্ত।

—হ, তোর বাবার নাম নিহত লোকের লিষ্টিতে উঠছিলো, দেখছিলাম। তোগো কতো খোঁজ করছি; হদিশ পাই নাই। কোথায় ছিলি ক' দেখি?

পূর্ণ আমার পথের সকলের জানা—চরম দুর্দশা আর লাঞ্ছনার কথা শোনালো এক নিঃশ্বেসে।

—থ্যাযে নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায় উড়িষ্যায়। সেখানে কী আমরা থাকতে পারি ভাই? কষ্টের অবধি ছিলো না। মা আর তোর বৌঠানের চেহারা দেখবি চল না! কইয়া দিলেও চেন্‌থে পারবি না।

—তার পর?

—তার পর আর কি! ভাবলাম দুর্দশা আর কতো হইতে পারে। বাঙলা দ্যাশে যামুই। এখানে হয়তো একটা ব্যবসা-ট্যাবসা খাড়া করতে পারমু সুযোগ পাইলে। তাই ফিরতি একটা দলে গা ভাসাইয়া দিয়া শিয়ালদার বদলে হাওড়া ষ্টেশনের নরকভোগ করতে লাগছি। এবার তোর খবর ক'; তোগো সকলে—

বললাম সমস্ত।

—বাঃ! তুই তো কাজ গুছাইয়া লইছো। বিয়াও করছো? বাঃ! দে না ভাই একটা জমি, কিছু বাড়ি আর ব্যবসার লোনের ব্যবস্থা কইরগা। তোর তো সব চেনা-জানা। আর তো কিছু হইব না। ল্যাখা-পড়াগও তখন পুরা করলাম না।

পূর্ণ দুঃখ করলো।

—আয়. ওরা সব ঐ ঘেরাটার মধ্যে সংসার পাতছে।

না গেলেই ভালো করতাম। পুরোন সমস্ত ছবি ওলটপালট হ'য়ে গেলো—সমস্ত রঙীন ছবি। অন্নপূর্ণা বৌদি আর পূর্ণর মার চেহারা! সমস্তই চরম দারিদ্র্য বাহুগ্রস্ত। কেন গেলাম?

নোংরা, দুর্গন্ধ আর অস্বাস্থ্যকর জটলার প্রায় ওপর দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালাম। পূর্ণ এগিয়ে গিয়ে ওর মাকে বলছিলো—দূর থেকে দেখলাম। একটি জীর্ণ শতচ্ছিন্ন বস্ত্রাবৃতা রুগ্না মহিলা তাই শুনে এদিকে চেয়েই যেন ভীষণ ভয় পেয়ে, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে বসলেন মাথায় কাপড় টেনে। ফলে তাঁর অনেকখানি ছেঁড়া জামার ফাঁক দিয়ে পিঠটা অনাবৃত হ'লো, আর কাপড়ের ছেঁড়া গর্ত দিয়ে নোংরাজট খোঁপাটা বেরিয়ে পড়ল। বলা ছিলো বলেই চিনতে ভুল হ'লো না।

অন্নপূর্ণা বৌদি! একি দেখছি?

পূর্ণর মা বেড়ার বাইরে এসে আমার সঙ্গে কথা বলে গেলেন। মন্দভাগ্য দুঃখ-দুর্দশার কথা। পুরোন জড়োয়া ঝিকি-ঝিকি দিনের সঙ্গে তুলনা ক'রে ক'রে, কেঁদে কেঁদে ব'লে গেলেন। মাথা নিচু ক'রে শুনলাম। শেষে অনেক আশীর্ব্বাদ ক'রে পূর্ণর মতোই কিছু ব্যবস্থা বন্দোবস্তের কথা বললেন!

দু-তিন বার পেড়াপেড়ি করেও অন্নপূর্ণা বৌদিকে আনতে পারলো না পূর্ণ।

—অর শরীরটা খারাপ কইরেছে! আইচ্ছা, পরে ত্থাখা করিস।

পূর্ণ কৈফিয়ৎ তৈরী ক'রে দিলো। জানতাম উনি সহজে আসবেন না। ব্যাপারটা উপলব্ধি ক'রে, যথাসাধ্য চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরার জন্যে উন্মাদ হ'য়ে উঠলাম যেন। আমরা দৈনিক যাত্রীরা, একটা ট্রেণ ফসকে পনর মিনিট দেরী হওয়াকে রাজত্ব যাওয়ার সামিল মনে ক'রে থাকি।

ট্রেণটা ফসকাতে চাইলাম না। সোমবার সকালে এসে আবার দেখা করব ব'লে—পকেট টিপে ধ'রে দৌড় দিলাম আর পাঁচ জন ডেলিপ্যাসেঞ্জারের মতোই।

ট্রেণ ছাড়লো। আর মুষল ধারে পুরোন দিনের বৃষ্টি এসে গেলো, মনের কথা লোকজন, রেলপথ, বাইরের বিচিত্র প্রকৃতি সমস্তকে ঝাপসা ক'রে দিয়ে। অনেক—অনেক দিন পরে দেশের প্রতিটি দিনের দৃশ্যের পুনরভিনয় হতে থাকলো একের পর এক। স্মৃতি সমস্ত দিনগুলোর ওপর দিয়ে ধীর লঘুপায়ে হেঁটে এলো।

অনেক পুরোন দিন। জ্যাঠামশাই তখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। একদিন ডাক এলো নিতাই সাহার কাছ থেকে। অগাধ সম্পত্তির মালিক—দশটা গাঁয়ের সব সেরা ধনী নিতাই সাহা। মুদিখানা, মদের দোকানের ওপর বন্ধকী তেজারতি করবার একা জ্যোঠামশাই নন। ওঁর পিছু পিছু গিয়ে দেখলাম পঞ্চায়েৎ।

গ্রামের সমস্ত তিন মাথাওলাদের ডাক দিয়েছে মুমূর্ষু নিতাই সাহা।

ছবিটা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আধশোয়া অবস্থায় নিতাই সাহা প্রথমেই পূর্ণ আর একজন কর্মচারীকে মাথার কাছের বিরাট সিন্দুকটা খুলতে বললেন। কে যেন হ্যারিকেনের কল ঘুরিয়ে জোরালো আলোর সৃষ্টি করল। সিন্দুক ভর্ত্তি সোনা রুপো জড়োয়ার গয়না। নিতাই সাহার নির্দেশে কর্মচারীটি কোন গ্রামের কার কী গয়না কতো টাকায় বাঁধা আছে ঘোষণা ক'রে গেলো তালিকা দেখে দেখে। সমস্ত হিসেব দাখিল ক'রে নিতাই সাহা বলল—আপনার গেরামের মাথারা জানেন আমার পোলা উড়নচণ্ডী মাতাল। আমার দিন ফুরাইয়া আইছে। চক্ষু বোজলেই ও সমস্ত খুয়াইয়া উড়াইয়া

সকলকে পথে বসাইবে। সংসারডা ভাইসা যাতে না যায় তার জন্যই আপনাগো হিসাব কইরগা সমস্ত সম্পত্তি আর পূর্ণরে জিম্মা কইরগা দিলাম। দ্যাখফেন ঠাকুরমশায়! দ্যাখফেন আপনারা।

তারপরেও বুড়ো বেঁচেছিলো কিছুদিন। বড় ইচ্ছে পূর্ণর বিয়ে দেখার। নাতবৌয়ের মুখ দেখে মরার শেষ বাসনা। সে সব দিনগুলো ভুলবো না কোনদিন। ঘর আলো করা বৌ নিয়ে পূর্ণ ষ্টীমার ঘাটে নামল আমাদের সঙ্গে। অন্নপূর্ণা বৌদি। সত্যিই অন্নপূর্ণা। চোখ জ্বলজ্বল, পূর্ণ কি খুশি—কী খুশি! সত্যিই পূর্ণ সে সেদিন।

পূর্ণর ভাই ছিলো না। কেমন ক'রে জানি না অন্নপূর্ণা বৌদি দুদিনেই আমাকে নিজের ঠাকুরপো ক'রে নিলেন। ওঁর স্নেহ ভালোবাসা আর আমার ভক্তি ভালোবাসা একাকার। একটা দিনও ওদের বাড়ি না গিয়ে থাকার উপায় নেই। কোন দুপুরেই ওদের পেছনের ঘরে আমার অনুপস্থিতি ক্ষমা করা হতো না। স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্কটা বাদ সব চেয়ে আমার ঘনিষ্ঠ ছিলো অন্নপূর্ণা বৌদি পূর্ণর পর। চলে আসার সময় সে কি বিষাদ-করুণ দৃশ্য! মাঝে মাঝে আসফা তো ঠাকুরপো? চিঠি দেবা? আমাকে আর একবার ভালো করে দেখার জন্যে ঝাপসা চোখ মুছে ফেললো, না লুকিয়েই।

শেষ দেখা সে বার পূজোর সময়। দাঙ্গার আগের বছর। তারপর 'পঞ্চাশের' আগষ্ট মাস থেকে একটা বিরাট ফাঁক। কোনো খবর নেই। আমরা সবাই দুঃখ-দুর্দশার ঘূর্ণিতে পাক খাচ্ছি, ক্রমবর্দ্ধমান গতির নিরবচ্ছিন্ন পাক। কিন্তু আজ এতো দিন পরে কেন ওদের এমন দেখলাম? কেন সুদিনের শেষ দেখাটাই অক্ষয় হ'য়ে থাকলো না? মানসিক ক্লেশ আর কতো চরমে যাবে কে জানে? ফাঁকাটাই ভালো ছিলো। অলীক স্বপ্নের মতো চাই না মনে করতে ফেলে-আসা গ্রামের ভাবলে চোখে জল আসা—দিনগুলো। বাড়িতে এসে সমস্ত বললাম। স্ত্রী উৎসাহ না দেখালেও, মা, জ্যাঠাইমা সবাই বললেন,—যতো কষ্টই হউক, আগো! লইয়া আয়। পূর্ণতো অকর্মণ্য না, একটা কিছুথে লাইজ্ঞা যাইবে। তারপর নিজেগো ব্যবস্থা কইরগা নিবে। আহা! রাজার পোলার এই দুর্দশা? কী কইরগা দেখমু রে? একেবারে ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে না হ'লেও, সোমবার সকাল সকাল যাত্রা করলাম ওদের জন্যে কিছু একটা করার সংকল্প নিয়ে।

অন্নপূর্ণা বৌদির সামনে গিয়ে তাকে আবার অপ্রস্তুত করতে ইচ্ছে করল না। ছেলের হাত ধ'রে ভিক্ষে চাওয়া পূর্ণর খোঁজে টিকেট-জানলার কাছেই গেলাম সোজা। পূর্ণ নেই। অপরাধ জেনেও যেতে হ'লো ওদের লোহার বেড়া ঘেরা জায়গাটার দিকে। সেখানেও নেই। ঠিক ফাঁকা নয়, অন্য একটা নতুন সংসার। এ কী রকম হ'লো?

ভুল—? কখখোনোই নয়!—

একটু ভেবে একজন মাতব্বর গোছের লোককে জিজ্ঞেস করলাম,—পরশু যে পূর্ণ বাবুরা এখানে ছিলো, কোথায় গেলো বলতে পারেন? ঠিক ঐ জায়গাটায় ছিলো ওরা!

—পূর্ণ বাবু তো? জানি। কাইল তো চইলগা গ্যালেন ওরা হঠাৎ। কী জানি দাদা, অর স্ত্রীর হঠাৎ কী হইলো! ক্ষেপিয়া গ্যালেন! কান্নাকাডি ঝগড়া কইরা উনিই যাইতে বাইধ্য করলেন! ওনরা নাকি খুব বড়লোক ছিলেন। এহন্ পরশু নাকি ওনাগো গেরামের কার লগে দেখা হইছে, আর পূর্ণ বাবু সাহায্য চাইছেন! কী কান্না বৌডার—"ওই মুখ ক্যান্ দেখাইলা তুমি? ক্যান্ চাইলা? গলায় দড়ি দিমু—তমো মুখ দেখামু না ওনাগো! বেশ ছিলাম আমরা চেনা লোকের চক্ষুর আড়ালে। নিমাই ঠাকুরপোই কেমন? মেগো হীন অবস্থা লইয়া মজা করতে আইছে নাকি?" কী কান্না, কী কমু মশায়! ছাড়লো না খ্যায পর্যন্ত; সেই উড়িষ্যায়ই ফিরগা যাওয়াইলো ওনাগো। গরমেন্টের একজন অফিসার কাল সকালে আইথেই বৌডি নিজে দেখা কইরগা ফিরগা যাবার কথা কইলেন। বিকালে চইলগা গ্যালেন ওনরা মন ভারি কইরগা! পূর্ণবাবুর অবস্থাটা যদি দেখথেন,—

আমি আর শুনছিলাম না। জল টলটলো লাল চোখ আর তিরস্কার-মুখর অন্নপূর্ণা বৌদির মুখখানা যেন দেখতে পাচ্ছিলাম।

ভালোই করেছে' ঠিকই করেছে অন্নপূর্ণা বৌদি। যতোই পথে বসুক, মনের দিক দিয়ে ভিখিরী হয়নি সে। ধনীর সূক্ষ্ম আত্মসম্মান বোধ, উচ্চমন্যতা আর দম্ভ বজায় রেখে লজ্জা বাঁচিয়েছে সে। পূর্ণ ভেঙ্গে পড়লেও ছোটখাটো মেয়েটা সকলের মাথা ছাড়িয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে।—

একটা নিশ্বাস চেপে, ষ্টেশনে ছড়ানো খাঁচায় আটকে থাকা দুর্গন্ধ, অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের দীন-নোংরা উদ্বাস্তুদের জটলার মধ্যে দিয়ে এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুক্ষণ আগে আসা—সময়টা পায় ক'রে দিতে থাকলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে।

মোটর চুরি এড়াতে হলে

মহানগরীগুলোতে অনেক সময় মোটর গাড়ী চুরির সংবাদ শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু ড্রাইভার বা মোটরচালক যদি আরও একটু সতর্ক থাকেন, তবে গাড়ী চুরি হয়ে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। গাড়ী ছেড়ে যাবার সময় দেখতে হবে ভাল রকম—ষ্টীয়ারিং ও গাড়ীর দরজা যেন চাবি-আঁটা হয় মজবুত ভাবে। মোটর-চোররা নানা রকম ফিকির খুঁজে থাকে, সহজে নিজেদের উদ্দেশ্যটি কি ভাবে হাসিল হয়। কিন্তু গাড়ীর ইঞ্জিনটি যদি কোন অবস্থাতেই দুষ্কৃতকারীরা চালাতে না পারলো, তবে আর ভয় কিসের? গ্যারেজে যখন গাড়ী থাকবে, তখনও দেখতে হবে গাড়ীর প্রবেশ-দ্বারটি যেন শক্ত তালার সাহায্যে বন্ধ থাকে। অপর দিকে দরজা কুলুপাবদ্ধ করা সম্পর্কে জেনে নিতে হবে বিশেষ কতকগুলো কলা-কৌশল।

অপহৃত মোটরের সন্ধান পেতে যাতে সহায়তা হয়, সেইজন্যেও ড্রাইভার বা মোটরচালককে কয়েকটি কাজ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। একটি পকেটবুকে আগে-ভাগে লিখে রাখতে হবে সযত্নে গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন নম্বর, ইঞ্জিনের নম্বর ইত্যাদি। গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন বইটি অবশ্য রাখতে হবে বাড়ীতেই কোন নিরাপদ স্থানে। গাড়ী যখন যেখানেই দাঁড় করিয়ে রাখা হবে, পুলিশের দৃষ্টির ভেতর সেইটি থাকা ভাল। বিশেষ করে, বিদেশ-বিভুঁই-এ যদি যাওয়া হ'ল—গাড়ী কোথায় রাখা চলে, এ ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য বা পরামর্শ গ্রহণের দাবীই আগে উঠে। মোটর চুরি এড়াবার এ সকল নানা উপায়ের কথাই চিন্তা করা যায় কিংবা চিন্তা করা সমীচীন।

বাঁশি
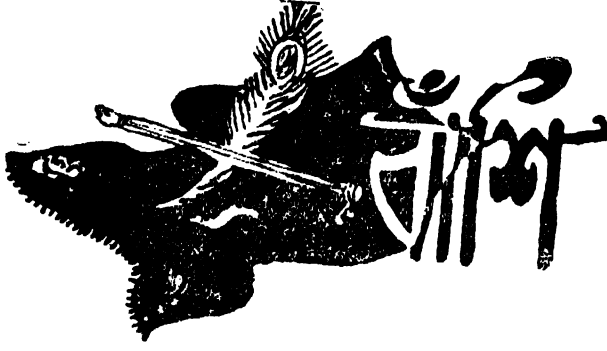
শ্রীঅবিনাশ সাহা

হাইকোর্টে গ্রীষ্মের ছুটি চলেছে। বিচারপতি নিবারণ বাবু সন্ধ্যার পর দক্ষিণ-খোলা ঝুল-বারান্দায় বসে খবরের কাগজের ওপর চোখ বুলাচ্ছিলেন। সহসা নাতনী লীলা কোত্থেকে যেন ছুটতে ছুটতে কাছে এসে বায়না ধরে, একটা গল্প বল না দাদু?

থার্ড ক্লাসে পড়ে লীলা। বছর বারো বয়েস—ফুটফুটে চেহারা। নিবারণ বাবু ওর কোন আব্দারেই না বলতে পারেন না। তবু এ ক্ষেত্রে স্নেহ-মিশ্রিত কণ্ঠেই বলে দেন, এখন অনেক কাজ রয়েছে দিদিভাই, শোবার সময় বলবো'খন।

লীলার প্রাইভেট মাষ্টার আজ পড়াতে আসেন নি। তা ছাড়া ওরও স্কুল ছুটি। কিছুতেই পড়ায় মন দিতে পারে না। দাদুর কাছে গল্প শুনতেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। নিবারণ বাবুর প্রতিবাদে পাল্টা প্রতিবাদ জানায়, না, কাগজ পড়া তোমার এখন হবে না। এক্ষুণি বলতে হবে।

নিবারণ বাবু খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে বিস্ময় প্রকাশ করেন, এক্ষুণি!

হ্যাঁ, এক্ষুণি! পাশের ঘর থেকে সেন্টু ছুটে এসে লীলাকে সমর্থন করে।

চির-আদরের নাতি-নাতনী। নিবারণ বাবু আর না বলতে পারেন না। সহজেই রাজী হয়ে যান, বেশ, ভাল হয়ে তাহলে বস দু'জনে, আরম্ভ করি।

সেন্টু লীলা নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে চুপচাপ দু'খানি চেয়ারের ওপর বসে পড়ে। নিবারণ বাবু আরম্ভ করেন: থার্ড ক্লাসে প্রমোশন পেয়েছি সেবার। নতুন বই-খাতা কেনা হয়ে গেছে। সরস্বতী পূজোর পর পড়াশুনোও নিয়মিত আরম্ভ হয়েছে। জয়দেব আমাদের সঙ্গে এসে ভর্তি হয়। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি। এত দেরীতে ও ভর্তি হচ্ছে দেখে আমরা কিছুটা হতবাকই হই। ভাবি, হয়তো বকাটে ছেলে, পড়াশুনো করতে চায় না, বাপ-মা ধরে-বেঁধে ভর্তি করে দিচ্ছেন। কিন্তু সেই দিনই ফোর্থ পিরিয়ডে আমাদের ভুল ভেঙে যায়। হেড মাষ্টার মশায়, ইংরেজির ক্লাস নিতে এসে আমাদের ক্লাসের ফার্ষ্ট বয় মহেন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলেন, মহেন, আজ থেকে তোমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বাড়লো। শুনেছ বোধ হয়, জয়দেব নামে তোমাদের ক্লাসে খুব একটি ভাল ছেলে ভর্তি হয়েছে। বৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

বেচারা মহেন্দ্র! হেড মাষ্টার মশায়ের নিকট থেকে জয়দেবের গুণপনা শুনে বোধ হয় ঘাবড়ে যায়। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠেই শুধোয়, উনি কবে থেকে ক্লাসে আসছেন স্যার?

হেড মাষ্টার মশায়ের ওষ্ঠে কিঞ্চিৎ হাসি দেখা দিলেও—গাম্ভীর্য সহকারেই উত্তর দেন, যতটা সম্ভব তাড়াতাড়িই আসছে। তবে বড় গরীব বেচারা, সব দিক গুছাতে হয়তো কিছুটা সময় নেবে।

স্কুল সেদিনের মতো যথারীতি ছুটি হয়ে যায়। আমরা সকলেই জয়দেব সম্বন্ধে নানা রকম আলোচনা করতে করতে বাড়ি ফিরি।

শনিবারের হাটবার। ছোট বড় নানা ধরণের নৌকোয় করে ভিন গাঁয়ের মানুষ গঞ্জের হাটে আসে। জয়দেব এরকম একটি হাটুরে নৌকোয় করেই হপ্তা খানেকের মধ্যে এসে বোর্ডিং-এ হাজির হয়। শনিবার বলে আমাদের স্কুল ছুটি হবে ফোর্থ পিরিয়ড হয়ে যাবার পর। কিন্তু সংবাদটা আমরা পাই সেকেণ্ড পিরিয়ডেই। আমাদের ক্লাসের মাখন গোপ একটা বই আনতে বোর্ডিং-এ গিয়েছিল, সে-ই এসে সংবাদটা দেয়। জয়দেবকে দেখবার জন্ম আমরা সকলেই হাঁপিয়ে উঠি।

স্কুল যথাসময়ে ছুটি হয়ে যায়। বোর্ডিং স্কুলের সংলগ্নই। আমরা জন সাতেক তাড়াতাড়ি বোর্ডিং-এ এসে হাজির হই। যদিও আমরা কেউ বোর্ডিং-এ থাকি না, তবু ছুটির পর প্রতি শনিবারেই আমরা মাখনের ঘরে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে থাকি। সেদিনও সকলে মিলে ওর ঘরটিতে এসেই বসি। জানালা দিয়ে লক্ষ্য করি, আমাদের বয়সীই অপরিচিত একটি ছেলে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ঘরের পাশে বেঞ্চের ওপর একাকী বসে আছে। অনুমানে বুঝে নিই, উনিই জয়দেব বিশ্বাস আমাদের নতুন বন্ধু। অবশ্য মাখন আমাদের অনুমানের সঙ্গে সঙ্গে ওকে জয়দেব বলে সনাক্ত করে।

বলিষ্ঠ চেহারা জয়দেবের। দূর থেকে দেখে আমাদের সকলের চেয়ে ওকে কিছুটা ঢেঙাই মনে হয়। গায়ের রং রীতিমত কালো। কদম ফুলের মত ছোট ছোট করে ছাঁটা মাথা ভর্তি রুক্ষ চুল। গায়ে ঢোলা-হাতা আধময়লা গেরুয়া রংয়ের পাঞ্জাবি। যারা বোর্ডিং-এ থাকে তাদের জামা-কাপড় রাখবার জন্ম প্রত্যেকেরই হয় একটি সুটকেশ না হয় একটি ট্রাঙ্ক আছে। এ ছাড়া লেপ, তোষক, মশারি, বালিস সহ পুরোপুরি বিছানা তো আছেই। কিন্তু জয়দেবের সঙ্গে সে রকম কিছু দেখা যায় না। ছোট্ট একটা বোচকা মাত্র বেঞ্চের নীচে রয়েছে। সকলে মিলে জটলা করি, জয়দেব আজকে হয়তো সীট ঠিক করতে এসেছে, সমস্ত জিনিষপত্র সহ আর একদিন আসবে। কিন্তু কেউ ছুটে গিয়ে সঠিক কিছু জিগ্যেস করতে ভরসা পায় না। কেন না সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বড় কড়া লোক। বিনা আহ্বানে তাঁর ঘরের কাছে যাওয়া নিষেধ।

আমাদের জটলা আর বেশী দূর এগোয় না। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কিছুক্ষণের মধ্যেই স্কুল থেকে ফিরে আসেন। জয়দেব বেঞ্চ থেকে উঠে ওঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিতেই উনি ওকে সঙ্গে করে সোজা মাখনের ঘরে এসে ঢোকেন। আমরা থতমত খেয়ে সকলে মিলে উঠে "স্যালুট" করে দাঁড়াই।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এক দিকে কড়া লোক হলেও আর এক দিকে বেশ রসিক ছিলেন। ঘরে ঢুকেই আমাদের কাউকে কিছু না বলে মাখনকে সম্বোধন করেন মাখন, আজ থেকে যদি তোর গতি হয়। জয়দেব তোর ঘরেই থাকবে।

ওঁর ইঙ্গিতটা মাখন চট করে বুঝতে না পারলেও আমরা বুঝে মৃদু মৃদু হাসতে থাকি। কারণ আমাদের চেয়ে দু' ক্লাস ওপরে

পড়ত মাখন। কিন্তু পর পর ফেল করায় আমরা ওকে ধরে ফেলেছি। শুনেছি, ক্লাস ফাইভ থেকে থার্ড ক্লাসে উঠতে ওর নাকি বছর ছয়েক কেটেছে। বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল। থাকেও বেশ ছিমছাম। লেখাপড়ায় যাই হোক মাখনের হৃদয় খুব প্রশস্ত। বাড়ি থেকে প্রতি শনিবারেই নানা রকমের খাবার আসে ওর জন্য। কিন্তু ও তা কখনো একা খায় না। কথায় কথায় বোর্ডিং-এর ঠাকুর-চাকরকে আধ-পুরোনো জামা-কাপড় দিয়ে দেয়। মাসের মধ্যেই দশটা নতুন জামা-কাপড় ওর না হলেই নয়।

মাখন চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। উনি পুনরায় জের টানেন, জয়দেব খুব ভাল ছাত্র, ওর সঙ্গে থাকলে তুই নিশ্চয় পাশ করতে পারবি, বলতে বলতে বাইরের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিলেন আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়দেবের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন, এরা সকলেই তোমার সহপাঠী, আলাপ পরিচয় করে নাও। উপদেশ শেষ করে চটি জুতোয় আওয়াজ তুলে আসা-পথে বেরিয়ে যান উনি। মাখন লজ্জার হাত থেকে বাঁচে। আমরাও হাঁপ ছাড়ি।

জয়দেব যেন কিছুতেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না। মাখনের তক্তপোষটির কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়েই আছে। যেন মাখনই ওর গার্জেন, নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কিছু করতে পারছে না। কিন্তু মাখনও কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। কিছুতেই মুখ খুলতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত মহেনই মুখ খোলে। একটু ঝুঁকে পড়ে সরাসরি জয়দেবকে জিজ্ঞেস করে, আজ চলে যাচ্ছেন বুঝি? বিছানা পত্র কিছুই আনেননি।

সংকোচ কাটিয়ে জয়দেব উত্তর করে, না, আজ থেকেই থাকবো। এই বোঁচকার মধ্যেই সব রয়েছে।

উত্তর শুনে মহেন হতবাক হয়। আমরা সকলেই। ঐ ছোট্ট একটা বোঁচকার মধ্যে লেপ, তোষক, মশারি, বালিশ, জামা, কাপড়, বই, খাতা থাকা কি করে সম্ভবপর! কিন্তু কেউ আর দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করতে ভরসা পাই না।

এবার মুখ খোলে মাখন। আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠেছে। পড়াশুনো ছাড়া বাকী সব বিষয়েই ও উৎসাহী। জয়দেবের মুখ থেকে উত্তর শোনার সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করে, তা হলে আর দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? পাশের সিটটাই আপনার। বোঁচকা খুলে বিছানাপত্র সব গুছিয়ে নিন।

জয়দেব বোধ হয় ফাঁপড়ে পড়ে। মাখনের মতো বিছানা ও কোথায় পাবে? সামান্য দু'খানা আধময়লা কাঁথা আর ছোট্ট একটা মাথার বালিশ মাত্র সম্বল। একখানা কাঁথা বিছোবে আর একখানা গায়ে দেবে। লেপ আর মশারি এ দুইয়ের কাজই চলাতে হবে ও দিয়ে। আর তো আছে ক্ষারে-কাচা দু'খানা সাধারণ ধুতি ও ঢোলা হাতা খদ্দরের পাঞ্জাবী একটা। এ জিনিষ ও কেমন করে ওদের পাঁচ জনের সামনে বার করবে······না না, এতে লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই। ও তো পড়েছে, I am content with what I have, be it little or much তবে আর সংকোচের কি আছে? জয়দেব বোধ হয় মনের বল ফিরে পায়। মাখনের অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে পাশের চৌকিটির ওপর বোঁচকাটা খুলে ফেলে।

মাখন সেদিকে এক নজর দেখে মনে মনে হোঁচট খায়। একজন পড়ুয়া ছাত্র, সামান্য এই পোষাক আসাক নিয়ে কি করে বোর্ডিং-এ থাকবে! ওদের বাড়ির চাকর বাকরেরও যে এর চাইতে ভাল বিছানাপত্র আছে! মাখন আর দ্বিতীয় বার উৎসাহ দেখতে সাহস করে না। আমাদের সকলের অবস্থাই প্রায় তাই। তবু এর ভেতরে মহেন কতকটা আড়ষ্টতা কাটিয়ে ওঠে! একটু সম্ভ্রমের সঙ্গেই দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করে, মশারি আনেননি? এখানে যে বড্ডো মশা!

জয়দেব দাঁড়িয়ে থেকেই উত্তর দেয়, দরকার হবে না, এমনিই চলে যাবে।

বলেন কি! এক রাত্রের মধ্যেই যে গায়ের ছাল-চামড়া তুলে নেবে।

ও কিছু নয়, কাঁথা মুড়ি দিলেই হবে!

এখন না হয় শীত, মুখ চেপে শোবেন, গরমের সময় কি করবেন?

শীত-গ্রীষ্ম বারো মাসই আমাদের কাঁথা গায়ে দেওয়া অভ্যাস আছে।

এর পর আর মহেন এগুতে পারে না। ওরাও গরীব, সংসারে অনেক কিছুরই অভাব আছে। তাই বলে সাধারণ বিছানাপত্র কিংবা দু'-চারটে জামা-কাপড়ের জন্য কখনো ভাবতে হয় না। এত কষ্টও মানুষ করতে পারে!

মা সরস্বতীর সঙ্গে যতোই আড়ি থাক, মাখনের মস্ত বড় গুণ

এক কথায় পরকে আপন করে নেবার ক্ষমতা। তাই জয়দেব যখন নিজের চৌকিটি ঝেড়েপুঁছে কাঁথাখানা বিছাতে যাচ্ছিল তখন ও বাধা দেয়। বন্ধুজনের দরদ দিয়েই বলে, দেশ গাঁয়ে যা করেন—করেন, এখানে ওরকম করলে টিকতে পারবেন না। দেখছেন না নদীর ধারে বোর্ডিং, ঠাণ্ডাতেই মারা যাবেন।

মাখনের কথা শুনে জয়দেবের হাসি পায়। এঁরা বলছেন কি! বোর্ডিং তো নদী থেকে বহু অনেকটা দূরে। পাকা বাড়ি। ওরা যে চালা ঘরে—বলতে গেলে এক রকম নদীর ওপরেই বাস করে! বাড়ি থেকে নেমেই তো, গাং-এর ঘাট। জয়দেব ঈষৎ হেসেই উত্তর করে, আপনাকে ধন্যবাদ; কিন্তু আমার এতটুকু অসুবিধে হবে না।

কিন্তু মাখন থামে না। দৃঢ় থেকেই পুনরায় অনুরোধ করে, না না, আপনাকে আমি কিছুতেই অতো কষ্ট করতে দেবো না। শুনলেন না, মাষ্টার মশায় বলে গেলেন, আপনাকে ধরেই আমায় ক্লাস-বৈতরণী তরতে হবে! আপনার অসুখ-বিসুখ করলে যে আমারই ক্ষতি হবে। আজকের মতো এই 'ব্যাগটা' দিয়ে কাটিয়ে দিন। কালকে আমার আর একটা মশারি ধুয়ে আসছে। কাল থেকে আর কোন অসুবিধেই থাকছে না।

জয়দেব হয়তো এবারও আপত্তি জানাতেই যাচ্ছিল। কিন্তু মহেন বাধা দেয়, সেই ভাল জয়দেব বাবু, বিদেশ বিভুঁইয়ে বাড়াবাড়ি না করাই উচিত। মাখন আমাদের মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড, ওর কাছে লজ্জার কিছু নেই।

সুশান্ত এতক্ষণ পর্যন্ত দম ধরে ছিল। এবার সুযোগ বুঝে মহেনকে সমর্থন করে, জয়দেব বাবু, এ নিয়ে আর আপনি মিছিমিছি কথা বাড়াবেন না। আর মহেন, জয়দেব বাবু যখন মৌন আছেন তখন শাস্ত্রবাক্যই প্রযোজ্য—মৌনং সম্মতিলক্ষণং, এখন আমাদের পেট-সঙ্কটের কি ব্যবস্থা হয়েছে তাই বল্।

সুশান্ত বেশ রসিকতা জানতো। আমরা সকলেই ওর কথায় হো-হো করে হাসতে থাকি। এমন কি নবাগত জয়দেবও না হেসে পারে না।

এবার আমিই ওর কথায় সায় দিই। হেসে হেসেই বলি, ব্যবস্থার যা কিছু তা তো চৌকির নীচেই রয়েছে, টেনে বার কর না।

আর কোন কথা নেই। আমার সমর্থন পেয়ে এক লহমায় সুশান্ত মাখনের চৌকির নীচ থেকে বড় বড় দুটো টিনের কৌটো টেনে বার করে। মুখ খুলতেই একটার ভেতর থেকে ভুর-ভুর করে বেরুতে থাকে—ঘি আর নলেন গুড়ের সুমিষ্ট গন্ধ। আর একটার ভেতরে রয়েছে টাটকা ভাজা কচকচে মুড়ী। আজকের হাটুরে নৌকোয় বাড়ি থেকে এসেছে। সপ্তাহের জলখাবার মাখনের। মুড়ীর টিনটা রেখে সুশান্ত অপরটার ভেতরে হাত গলিয়ে দেয়। কি মজা, আজ শুধু মোয়া মুড়কী নাড়ু-বড়িই আসেনি! এ কৌটোটার ভেতরে যে এ্যালুমিনিয়ামের আরো একটা কৌটো রয়েছে। সুশান্ত সেটাকে টেনে বার করে ঢাকনা খুলে ফেলে। নজর পড়তেই আমরা সকলে উৎফুল্ল হয়ে উঠি। সরভাজা, ক্ষীরের পুলি আর পাটিসাপটা রয়েছে একগাদা। প্রত্যেকের ভাগে নেহাৎ কম পড়বে না। সুশান্ত তো ওরই ভেতরে একটা মুখে পুরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। আমি বাধা দিই, এই রাক্ষস, আর খাসনে বলছি। একটা কম দেওয়া হবে তোকে।

চিবোতে চিবোতে জড়িত-কণ্ঠে সুশান্ত বলে, সে পরের কথা পরে দেখা যাবে। এখন তো চলুক, বলতে বলতে আরো একটা সরভাজা মুখের গহ্বরে ফেলে দেয়।

বেগতিক দেখে মহেন পাশ থেকে কৌটোটা নিজের জিম্মায় টেনে নেয়।

মাখন এতে এতটুকু মন খারাপ করছে না। বরং উৎসাহেই মেতে ওঠে। মহেনকে লক্ষ্য করে বলে, মহেন আজ আর কিছু রাখতে হবে না। আমাদের নতুন বন্ধুর শুভাগমন উপলক্ষে আজ পুরো ভোজই হবে। এই হরি—হরি—মহেনকে নিরস্ত করে বোর্ডিং-এর চাকর হরির উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ে মাখন।

হরি চির-অনুগত মাখনের। ডাক কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে।

মাখন ওকে ডাইনিং রুম থেকে বড় দেখে একটা থালা ও চার পাঁচটা গ্লাস আনতে হুকুম করে।

হরি ছুটে যাচ্ছিল। মহেন বাধা দেয়, একটা নয় দু'টো থালা। কেন না, সুশান্তটা যা পাজি, এক সঙ্গে খেতে হলে জয়দেব বাবু কিছুতেই সুবিধে করতে পারবেন না। ওঁকে আলাদা দেওয়াই ভাল।

প্রস্তাবটা যুক্তিসহ হলেও মাখন রাজী হয় না। বলে, না, প্রথম দিনেই আমি ওঁকে ভিন্ন করে দিতে পারবো না। সুশান্তকে শায়েস্তা করবার ভার আমি তোকেই দিলাম।

হরি যথারীতি চলে যায় এবং থালা গ্লাস নিয়ে ফিরে আসে। মহেন নিজের হাতে পিঠেগুলো সাজাতে থাকে। জয়দেবকে তাড়া দেয় মাখন।

জয়দেব আড়ষ্টতা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে না পারলেও কিছুটা সক্রিয় হয়ে ওঠে। সত্যি, খিদেও প্রচণ্ড পেয়েছে। কখন সেই কাক-পক্ষী না ডাকতে দু'টি ফেনভাত খেয়ে নৌকোয় উঠেছে। লজ্জায় সকলের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে না পারলেও ধীরে ধীরে পেটটা বেশ ভরেই ওঠে। প্রথমে পিঠে; পরে মুড়ী, মোয়া, মুড়কী ও নলেন নারকেলি গুড়। এক সঙ্গে এতগুলো উপাদেয় খাবার জীবনে খুব কমদিনই জুটেছে ওর।

ঘণ্টাখানেক চলে আমাদের খাওয়া দাওয়া হাসি-ঠাট্টা। বিকেল চারটের কাছাকাছি, সকলেই উঠে পড়ি। কেন না, সন্ধ্যা ছটার মধ্যে আমাদের সকলকেই আবার কমনরুমে সান্ধ্য সম্মিলনীতে যেতে হবে। প্রতি শনিবারেই বসে সভা। দুর্গাদাস বাবু হেড মাষ্টার হয়ে আসার পর থেকেই এই রীতি চলেছে। পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের নৈতিক এবং ব্যবহারিক মান উন্নয়ন করাই ওঁর উদ্দেশ্য। সভার প্রারম্ভে পাঠ হবে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। দুর্গাদাস বসু স্বয়ং কিংবা পণ্ডিত মশায় পাঠ করে শোনাবেন প্রত্যহ এক একটি অধ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যাও করে যাবেন। পাঠান্তে আমাদের সকলকে সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে হবে বিশ্বরূপ দর্শনের শ্লোকটি। আমাদের মধ্য হতেই প্রথমে একজন সুর করে আবৃত্তি করবে, পরে আমরা সকলে তাকে ঠিক নামতা পড়ার মতো করে অনুসরণ করবো। গীতা পাঠ শুনতে আমরা তেমন

উৎসাহ বোধ করতাম না। কিন্তু সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে আমাদের খুব ভাল লাগতো। তার চেয়েও আমাদের বেশী আনন্দ হতো নিজেদের লেখা ছড়া, কবিতা, গল্প ও ধাঁধা শুনতে ও শোনাতে। সর্বশেষে কীর্তনের মধ্য দিয়ে আসরের পরিসমাপ্তি হতো।

সেদিনের আসরে জয়দেব ছিল নতুন সভ্য। আমাদের আসতে কিছুটা দেরীই হয়ে যায়। গীতা পাঠ শেষ হয়ে গেছে। আবৃত্তি আরম্ভ হবে, আমরা তিন-চারজন এসে আসরে বসলাম। মনে হলো দুর্গাদাস বসু কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করলেন। কেন না, তিনি কঠোর ভাবে নিয়ম এবং সময় মেনে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। ত্রুটি যা হয়ে গেছে তা নিয়ে তখন আর কিছু করার ছিল না। আমরা আবৃত্তিতে কণ্ঠ মেলাতেই তৎপর হই। হঠাৎ চোখ পড়ে জয়দেবের ওপর। দেখি, ধ্যানী বুদ্ধের মতো চোখ বুজে বসে আছে ও। পরম বিস্ময় বোধ হয় আমাদের। ওর ভাবভঙ্গীতে ক্রমশঃ হাসি চেপে রাখাই দুষ্কর হয়ে ওঠে! অন্যান্য মাষ্টার মশায়দের অবস্থাও বোধ হয় আমাদের মতোই। শুধু দুর্গাদাস বাবুর ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারছেন না।

আবৃত্তি যথারীতি হয়ে যায়। এবার কীর্তনের পালা। আমাদের সভা-গায়ক কেদারনাথ নিয়মিত খোলে চাঁটি মারে। প্রতিদিনের মতো জয়ধ্বনি দিয়ে গানও শুরু করে সে। কিন্তু জয়দেব যেন খুশী হতে পারে না। নিয়তই বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকে ওর তরফ থেকে। দু' চার কলি শোনবার পর শেষটায় আর ধৈর্য রাখতে পারে না। কেদারের নিকট থেকে খোলটি টেনে নিয়ে নিজেই বাজাতে থাকে। সঙ্গে প্রাণখোলা নামগান। একাই যেন একশ'। কীর্তন শেষ হবার পর দুর্গাদাস বাবু ভূয়সী প্রশংসা করেন ওর।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটতে থাকে। আমরা গল্প, কবিতা, ছড়া, খেলায় উৎসাহ পেলেও জয়দেব ওর কাছে ঘেঁষে না। এ সবের চেয়ে কীর্তন আর গীতা শুনতেই ওর অনুরাগ বেশী। দুর্গাদাস বাবুর তাড়ায়—মাঝে মাঝে কিছু কিছু লিখতে বাধ্য হয় বটে, তবে আমরা তার মর্মার্থ কিছুই উপলব্ধি করতে পারি না। গীতার শ্লোককে কেন্দ্র করেই যেন কি সব বড় বড় ন্যায় নীতির কথা।

বোর্ডিং-এর রীতি রাত এগারোটার মধ্যে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়া। পড়া তৈরী হোক আর না-ই হোক মাখন তাই শুয়ে পড়ে। এগারোটা কেন পারলে ও দশটাতেই ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু সুপারিন্টেণ্ডের ভয়ে কোন রকমে দু'চোখের পাতাকে টেনে রাখতে বাধ্য হয়। কিন্তু জয়দেবের ব্যাপার আলাদা। নিয়মমাফিক বাতি নিবিয়ে বিছানা নেয় বটে, কিন্তু ঘুমোয় না। জোড়-আসন হয়ে বিছানার ওপর চোখ বুজে বসে ঘণ্টাখানেকের ওপর বিড় বিড় করে কি সব যেন আওড়াতে থাকে। হয়তো কোন ঠাকুর দেবতার নামই হবে। কেন না, থেকে থেকে হাত তুলে প্রণাম করতেও দেখা যায়। তার পর বালিশের ওপর হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরো কি সব লিখে শুয়ে পড়ে।

মাখন প্রথম দিন কয়েক কিছুই বুঝতে পারে না। কেন না, শোবার সঙ্গে সঙ্গে ও অচৈতন্য। কিন্তু পরে একদিন ঘুম না আসায় হতবাক হয় ও। বেচারা কি দিন দিন পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি! তার পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই জেগে থেকে ওর পাগলামি দেখতে থাকে। অনেক দিন ভাবে, ডেকে জিজ্ঞেস করে, এ সবের মানে কি। কিন্তু বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত আর বলা হয় না। বিকেলে উভয়ে বেড়াতে বার হয়। সুযোগ বুঝে কথায় কথায় খোলাখুলিই প্রশ্ন করে মাখন।

উত্তরে জয়দেব ঈষৎ হেসে বলে, আত্মশুদ্ধি করি।

বিস্মিত মাখন উত্তর শুনে অধিকতর বিস্ময় বোধ করে। বলে কি জয়দেব! ওর কি মাথা খারাপ হলো! নীচু ক্লাসের ছাত্র, মনের আনন্দে খাবে, ঘুমোবে, খেলা করবে, পড়বে। এ সব বুড়োটে-পনা কেন!...

কিন্তু জয়দেব থামে না। উপদেশের সুরেই বলতে থাকে, আমার কাছে ধ্যান করবার মন্ত্র লেখা আছে। অভ্যাস করে দেখবেন, মনের জোর পাবেন—মা সরস্বতীর কৃপা হবে।

মনের জোর আর আত্মশুদ্ধির মানে না বুঝলেও মা সরস্বতীর কৃপা হবে শুনে মাখন উৎসাহ বোধ করে। ভক্তি-বিজড়িত কণ্ঠেই অনুরোধ করে, দেবেন তো তা হলে আমাকে মন্ত্রটা লিখে, চেষ্টা করে দেখবো।

জয়দেবের ওষ্ঠে মৃদু হাসি দেখা দেয়। মাখনকে আশ্বাস দিতে দিতে বেশ উৎফুল্লের সঙ্গেই উভয়ে বোর্ডিং-এ ফিরে আসে।

দিন কয়েক অতিবাহিত হয়, মাখন বোধ হয় সত্যি সত্যি জয়দেবের মন্ত্র-শিষ্য হয়ে পড়ে। কেন না, শোবার আগে সে-ও প্রায় ঘণ্টাখানেক বিছানায় ওপর বসে ধ্যান শুরু করেছে। জয়দেবের মতোই চোখ বুজে বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে থাকে। কিন্তু কই, কৃষ্ণদর্শন তো ওর হয় না! চোখের সামনে যে ভেসে ওঠে কেবল গুচ্ছের খেলা-ধূলোর ছায়াছবি! মন্ত্র না ছাই, যত সব বাজে শুল! মনে মনে বিরক্তি বোধ করে মাখন। ভাবে জয়দেবকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেবে কিন্তু পারে না। মা সরস্বতীর কথা মনে হতেই ভয় হয়। ভক্তিভরেই আবার লেগে থাকে। এবার পাশ করতে না পারলে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে যে একত্রে পড়তে হবে। মাখন উঠে পড়ে লাগে।

ফল বোধ হয় কিছুটা ফলে। ধ্যানে জয়দেবের মতো কৃষ্ণদর্শন না হলেও অবিরত অভ্যাসের ফলে মানসিক চাঞ্চল্য কমে আসে মাখনের। এখন এককালীন ঘণ্টাখানেক বসে পড়তে পারে ও।

বিগত ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় অঙ্ক আর ইংরাজী বাদে আর সব বিষয়েই পাশ করেছে। লেগে থাকলে বাৎসরিক পরীক্ষায় আশা আছে। শিক্ষকগণ মাখনের আশাতীত উন্নতিতে খুশী হয়। মাখন নিজেও।

ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় জয়দেব অঙ্কে একশ'র ভেতরে একশ' পেলেও মহেনকে পরাস্ত করতে পারে না। প্রথম স্থান মহেনই অধিকার করে। জয়দেবের এতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। কৃষ্ণের যেমন ইচ্ছে তাই হোক। কিন্তু মাখন এ পরাজয় সহজে স্বীকার করতে রাজী নয়। জয়দেব যে রকম মেধাবী তাতে ওরই প্রথম স্থান অধিকার করা উচিত। কথাটা স্পষ্টই ও জয়দেবকে জানায়। উত্তরে জয়দেব শুধু হাসে। উদাস ভাবেই মন্তব্য করে, প্রভুর যদি ইচ্ছে হয় হবে। ব্যস্ত হবার কি আছে!

দিন দিন জয়দেবের ওপর শ্রদ্ধা বাড়তে থাকলেও উত্তর শুনে খুশী হয় না মাখন।—একথায় প্রতিবাদ করতেই ইচ্ছে করে ওর। কি সব সময় শুধু প্রভু আর প্রভু! মনের ভক্তি মনে থাক, তাই বলে মানুষ প্রতিযোগিতা করবে না নাকি!···কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাখনের মুখ দিয়ে কিছুই বেরোয় না।

শ্রাবণ মাস। গরমের ছুটির পর মাত্র দিন কয়েক হল স্কুল খুলেছে। এখনো বন্যার জল সম্পূর্ণ নামেনি। ধলেশ্বরীর স্ফীত জল এখনো বোর্ডিং পুকুরের কানায় কানায়। নৌকো ছাড়া কোথাও বার হবার উপায় নেই। খেলা, বেড়ানো সবই এক রকম বন্ধ আমাদের। ঘরে বসে ক্যারম পিটানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। সব সময়েই নিজেদের বন্দী মনে হতে থাকে। কিন্তু করার কিছু নেই। জয়দেব বাড়ি থেকে ফেরে স্কুল খোলারও কয়েক দিন পরে। এবার ওকে আরো গম্ভীর মনে হয়। বোধ হয় মাস ছ' সাত হবে চুল ছাঁটেনি। বাবরি চুল ঘাড় বেয়ে অনেকটা নেমেছে। মাখন বলে, ইদানীং নাকি ও প্রায় অধিকাংশ রাত্রেই ঘুমোয় না। বোর্ডিং নিস্তব্ধ হলে একাকী উঠে চুপচাপ পুকুরের ঘাটলার ওপর গিয়ে বসে থাকে। কৃষ্ণের বাঁশির সুর নাকি ওকে পাগল করে। পুকুর পাড়ের কদম গাছ থেকেই নাকি ভেসে আসে সুমিষ্ট সুরলহরী।

কাহিনী শুনে তো আমরা অবাক। বলে কি মাখন! শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি—তাও কি না পুকুরের ঐ কদম গাছ থেকে! সব বুজরুকি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে জয়দেব তো পাগল হয়েছেই শেষটায় মাখনও না খেপে যায়। টিপ্পনী কেটে আমিই মন্তব্য করি, বাঁশি না ছাই, রাঁচির টিকিট কাটতে হবে।

কিন্তু মাখন তাতেও দমে না। ভাবাবেগেই উত্তর করে, না রে, প্রথম প্রথম আমারও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু শেষটায় আমি ওকে পরীক্ষা করে দেখেছি। আমি নিজের কানে শুনেছি বাঁশির সুর। প্রতি শুক্লপক্ষেই বাজে।

বলিস কি রে! মহেন বিস্ময় প্রকাশ করে।

মাখন বলে, হ্যাঁ, শুধু বাঁশিই নয়। জয়দেব বলে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ওর নাকি প্রত্যক্ষ কথা হয়েছে। ও দেখেছে তাঁর ভুবন ভুলানো রূপ।

ভারি মজা তো, আচ্ছা দেখা যাবে একদিন, মহেন আর আমি সেদিনের মতো আলোচনা রেখে উঠে পড়ি।

সেদিন ঝুলন পূর্ণিমা। সকাল থেকে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। আমাদের স্কুল এক নাগাড়ে তিন দিন ছুটি। বোর্ডিং-এর অধিকাংশ ছাত্রই বাড়ি গেছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবও অনুপস্থিত। তবে জয়দেব নিঃসঙ্গ নয়। মাখন বাড়ি যায়নি। জয়দেবকে আজও ভাল করে বাজিয়ে দেখবে। আজ নাকি শ্রীকৃষ্ণ ওকে পূর্ণ দর্শন দেবেন। ওর হাতের ভোগ খাবেন।

জয়দেবের আজ সারা দিন উপবাস। কিন্তু কোন ক্লান্তি নেই। মনে খুশীর হাওয়া বইছে। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁর দর্শনের জন্য যুগ যুগ আরাধনা করে আসছে আজ ও তাঁর পূর্ণ দর্শন পাবে। ঐ কুসুমিত কদম তরুতলে এসে দাঁড়াবেন নটবর শ্যাম। হাতে থাকবে মোহন বাঁশি গলায় তুলসীর মালা ভালে কনক কিরীট। প্রভু নিজের মুখে খেতে চেয়েছেন। কিন্তু কি আছে ওর যে তাই দিয়ে ভোগ সাজাবে। বিনা সুতোয় মালা গাঁথে জয়দেব বাগান থেকে মালতী ফুল তুলে। বাজার থেকে আনে সাধ্যমতো ফল, মিষ্টি, ছানা, মাখন।

সন্ধ্যায় মেঘের আবরণ চিরে চন্দ্রোদয় হয়। জয়দেব উপকরণ সাজিয়ে রেখে ধ্যানে বসে। প্রভুর দর্শন না হওয়া পর্যন্ত জলটুকুও মুখে দেওয়া চলবে না। কিন্তু সে তো গভীর রাত্রে। বোর্ডিং-এ যদি লোক থাকতো কীর্তন করা চলতো। না না, না থেকেই বরং ভাল হয়েছে। ওরা পেছনে লাগতো। হৃদয় জুড়েই তো প্রভুর নূপুর বাজছে। বাহ্যিক কীর্তনের আর দরকার কি!···জয়দেব ধ্যান-গম্ভীর হয়েই চুপচাপ বসে থাকে। আজ আর বিছানায় ওপরে নয়। মেঝের ওপরে—শুদ্ধাসনে।

রাত্রির মধ্য প্রহর। নিস্তব্ধ বোর্ডিং। চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। জয়দেবের চোখে ঘুম নেই। মাখন খেয়ে-দেয়ে বিছানা নিয়েছে বটে, কিন্তু ঘুমোয় নি! আজ জয়দেবের সঙ্গে ও-ও কৃষ্ণদর্শন করবে। জয়দেবের মতোই সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। সহসা কদম গাছের পাতা নড়ে ওঠে। জয়দেব ধ্যানে ছিল হকচকিয়ে নড়ে ওঠে। নিমেষে ভেসে আসে সুরেলা বাঁশির সুর। জয়দেব আর স্থির থাকতে পারে না। নৈবেদ্য হাতে দোর খুলে ঘাটলার দিকে রওনা হয়। বাহ্যিক হয়তো কোন চেতনাই নেই। মুখে অস্ফুটস্বর প্রভু দেখা দাও—প্রভু দেখা দাও···

জয়দেব বেরিয়ে যায়, মাখনও বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পা টিপে টিপে ওকে অনুসরণ করে। চুপি চুপি গিয়ে ঘাটলার একপাশে বসে। জয়দেবের কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। বোর্ডিং-এরও কেউ জেগে নেই। বাঁশি একটানা বেজে চলেছে।

বাঁশি বাজছে। জয়দেব কান পেতে তা শুনছে। যেন শ্রীমতীই যমুনার কূলে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ জয়দেব যেন আমাদের জয়দেব নয়। ভাব পাগল এক আত্মভোলা।

বেজে বেজে বাঁশি থেমে যায় এক সময়। জয়দেব নৈবেদ্যের থালা হাতে কদম গাছের দিকে ছুটতে থাকে। বর্ষার ভিজে মাটি। বৃষ্টিরও কামাই নেই। পুকুর পাড় রীতিমতো পিচ্ছিল। পা হড়কে যে কোন মুহূর্তে জলে গিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু ভাবপাগল জয়দেবের সেদিকে কোন হুঁস নেই। চলেছে তো চলেছেই। মাখনেরও আত্মপ্রকাশের কোন সুযোগ নেই। যতটা সম্ভব গা বাঁচিয়েই ও লক্ষ্য রাখছে। এমন সময় দৈববাণীর মতো সহসা ভেসে আসে প্রভুর কণ্ঠস্বর, "উতলা হোস নে নৈবেদ্য কদম তলে রেখে চোখ বোজ। যথাসময়ে দর্শন পাবি।"

জয়দেব অনুগত ভক্তের মতো তাই করে। ভয়ে মাখনের গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে। লুকিয়ে এসেছে, ওকি প্রভুর তেজঃ-পুঞ্জ জ্যোতির সামনে চোখ খুলতে পারবে! গীতায় বর্ণিত বিশ্বরূপের সেই ভয়াল মূর্তি অবিরত ভেসে ওঠে। মাখনও জয়দেবের মতোই চোখ বোজে।

ভক্তবাঞ্ছা ভগবান। ভক্তের দেওয়া নৈবেদ্য খুশী মনেই গ্রহণ করবেন। হয়তো কদম গাছ থেকে নেমেই আসছিলেন উনি। সহসা দুম-দাম শব্দ হতে থাকে। মাখন চোখ খুলে দেখে ইষ্টক বর্ষণ শুরু হয়েছে। আর তা আসছে পার্শ্ববর্তী আমগাছ থেকে। জয়দেবও হয়তো চোখ খুলেছিল। প্রভুর প্রতি অনাচার দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ও ভূতলে লুটিয়ে পড়ে। প্রভুর পক্ষেও আর বেশীক্ষণ কদম গাছে টিকে থাকা সম্ভবপর হয় না। ইষ্টকের ঘায়ে লাফিয়ে পড়তেই বাধ্য হন।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের আম গাছ থেকে আরো দু'টি ছায়ামূর্তি লাফিয়ে পড়ে। মাখন সহসা কিছু বুঝে উঠতে পারে না। কদম গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লেন উনি তো স্বয়ং প্রভুই। ঐ তো পীতবাস পরনে, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ দেওয়া চূড়া, হাতে মোহন বাঁশি! কিন্তু ও পাষণ্ড দু'জন কে? তেড়ে এসে প্রভুর হাত চেপে ধরলে! ওরা কি কংশের চর?···

মাখনকে আর বেশীক্ষণ হাবুডুবু খেতে হয় না। ছায়ামূর্তি দু'জন দু'পাশ থেকে প্রভুকে চেপে টানতে টানতে মাখনের কাছে এনে হাজির করে। প্রথমটা একটু ভড়কে গেলেও মাখন স্থির হয়ে দাঁড়ায়। ছায়ামূর্তি দু'টি কাছে আসতেই বিস্ময়ে ফেটে পড়ে। ও মা, এ যে দেখছি মহেন আর সুশান্ত। আর ও তো প্রভু নয়; যাত্রার দলের সেই বয়াটে সন্তোষটা। আগে মনে ছিল না, পাজিটা তো সত্যি খুব ভাল বাঁশি বাজাতে পারে। জয়দেবকে তা হলে এই হতচ্ছাড়াই পাগল করেছে। ক্রোধে এক ঘুঁষি তুলে রুখে ওঠে মাখন। মহেন সুশান্তও জোরসে কয়েক ঘা বসিয়ে দেয়।

সন্তোষ হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করতে থাকে। জীবনে আর কখনো এমুখো হবে না।

ওদিকে জয়দেবকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ওরা সকলেই সন্তোষকে ছেড়ে জয়দেবের কাছে ছুটে আসে। বেচারা, সারা দিনের ক্লান্তিতে মূর্চ্ছায় ঢলে পড়েছে। পুকুর থেকে আঁজলা করে জল এনে তাড়াতাড়ি ওর মাথায় দিতে থাকে। তিন জনে ধরাধরি করে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

ছাড়া পেয়ে সন্তোষ নৈবেদ্যের থালা নিয়ে সরে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জয়দেবের জ্ঞান ফিরে আসে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে অস্ফুট স্বরে আওড়াতে থাকে, কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ দয়াময়।

সেই থেকে জয়দেবের পাগলামি আরো বেড়ে যায়। মাখন অনেক করে বুঝতে চেষ্টা করে। সন্তোষের দুষ্টুমীর কথা আগাগোড়া ওকে বলে। কিন্তু ও কিছুতেই বোঝে না। তার পরেও অনেক রাত্রে পুকুর ঘাটে গিয়েছে। বাঁশি শুনবার জন্য আকুল হয়ে কেঁদেছে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বুক চাপড়িয়েছে। আমরাও ওর জন্য চেষ্টার ত্রুট করিনি। হাসি ঠাট্টা করে, ভয় দেখিয়ে, আমোদ প্রমোদের কথা বলে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি কিন্তু কোন ওষুধেই ওর রোগ উপশম হয়নি। বাৎসরিক পরীক্ষা এসে পড়ে, আমরা আর ধৈর্য্য রাখতে পারি না। যে যার পড়ায় মন দিই। জয়দেব যেন দিন দিন ফ্যাকাশে হয়ে যেতে থাকে। ভাল করে খায় না, ঘুমোয় না, পড়াশুনো করে না। কথাটা হেড মাষ্টার মশায়ের কানে দেওয়াই হয়তো আমাদের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু কি জানি কেন, আমরা কেউ তা দিইনি। বাৎসরিক পরীক্ষা আরম্ভ হবার আগের দিন সহসা দেখা যায় জয়দেবের সীট খালি। চারদিক থেকে খোঁজাখুঁজি চলে চলে কিন্তু কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না।

প্রায় বছর তিনেক কথা। আমরা সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবো। হঠাৎ একদিন হেড মাষ্টার মশায় নবীন এক সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করে আমাদের ক্লাসে ঢোকেন। মহেনকে লক্ষ্য করেই জিজ্ঞেস করেন, মহেন, একে চিনতে পারছো?

মাথায় গেরুয়া পাগড়ি বাঁধা, পরনে আলখাল্লা, প্রতিভাদীপ্ত মুখাবয়ব। মহেন কেন আমরা কেউ ওকে চিনতে পারি না। অবশেষে উনিই হাসতে হাসতে মন্তব্য করেন, ভূতপূর্ব তোমাদের সহপাঠী জয়দেব বিশ্বাস। অধুনা কৃষ্ণানন্দ স্বামী।

স্বামীজির পরিচয় শুনে আমরা সকলেই মৃদু মৃদু হাসতে থাকি। উনিও আমাদের মতোই হাসতে থাকেন।

নিবারণ বাবু এতক্ষণ পর্যন্ত একটানা বলে চলেছেন। সেণ্টু লীলা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনছিল, একটুও বাধা দেয় নি। এবার সেণ্ট ঢোক গিলে প্রশ্ন করে, সকালে যিনি এসেছিলেন তিনিই কি দাদু?

হ্যাঁ দাদুভাই, তিনিই আমাদের ভূতপূর্ব সহপাঠী জয়দেব বিশ্বাস। অধুনা ভারতের এক দিকপাল পণ্ডিত, নিবারণ বাবু উত্তর করেন।

উনি কেন এসেছিলেন দাদু?

উনি এখানে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে চান। যার আদর্শ হবে, অহিংসা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা।

তুমি কি বললে?

বললেম, এ কাজে আমার মত আছে। আমি যথাসাধ্য সহায়তা করবো।

সেণ্টু, লীলা দু'জনেই বোধ হয় খুব খুশী হয়। সারা পৃথিবীর মানুষ যদি হিংসা ভুলে যায়, তা হলে কি সুখেই না মানুষ থাকতে পারে!

সাহিত্য কি?

"সাহিত্যের ধর্ম, রূপ, গঠন, সীমানা, এর তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে অল্পবিস্তর আলোচনা হয়ে গেছে, কিন্তু এর আর একটা দিকের কথা প্রকাশ্যে আজও কেউ বলেন নি। সে এর প্রয়োজনের দিক,—এর কল্যাণ করার শক্তি সম্বন্ধে। এ কথা বোধ করি বহু লোকেই স্বীকার করবেন যে সাহিত্যরসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত! এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্যরসের নূতন সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্যবান হয়ে ওঠে।"—শরৎচন্দ্র

গাজন গান

শ্রীজয়দেব রায়

রাঢ়দেশের ধর্মঠাকুরের পূজা পূর্বে বৌদ্ধদের অনুষ্ঠান ছিল, যুগের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া তাহাই এখন বুড়োশিবের গাজনে পরিণত হইয়াছে। পূর্বে ধর্মঠাকুরের পূজারী ছিল নিম্নশ্রেণীর ডোম বা বাগ্‌দীরা. ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দ্বারা পূত হইয়া হিন্দু দেবতাদের মধ্যে স্থান পাওয়ার পর এখন উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই গাজনের বুড়োশিবের পূজা করে; কিন্তু গাজনে যাহারা মাতিয়া উঠে তাহারা নিম্ন বর্ণেরই লোক।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ধর্মরাজ শিবের পূজার মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে রহিয়া গিয়াছে। গাজনের ভক্তদের ঐ সময়ে বৌদ্ধভিক্ষুদের আচার-ব্যবহার অনুসরণ করিতে হয়। দৈহিক নির্যাতন বা আত্মনিগ্রহ তাহাদের তপস্যারই অঙ্গীভূত। বৌদ্ধধর্মে জাত-বিচার বা অস্পৃশ্যতা নাই, ধর্মপূজার মধ্যেও জাতিভেদ বা স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভেদ নাই। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও নীচজাতের ভক্তদের একত্র মেলামেশার কোন বাধা নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতির গাজন-সন্ন্যাসীদের মধ্যে আহার-বিহারে কোন বাছ-বিচার নাই।

চর্যার যুগে গুরুবাদই প্রাধান্য লাভ করে, তাহার পর হইতে বাঙলা দেশের গানে গুরুবন্দনা চিরাচরিত প্রথায় দাঁড়াইয়া যায়। নদীয়ার গাজন-উৎসবের এই প্রকার একটি গুরুবন্দনা গান উদ্ধৃত করা হইল—

প্রণাম গুরুদেব, অখিল ভুবনে সেব্য
গুরু চতুর্ভুজ সিংহ অপরূপ।
যাঁহার চরণ ধরি, এ ভব সংসার তরি
গুরু হন ব্রহ্মার স্বরূপ।
(আহা) অন্ধের লোচন গুরু, ভক্ত-বাঞ্ছা কল্পতরু
ভক্তজনার প্রতি গুরুর দয়া।
শিবের সেবক নন্দী শিবের চরণ বন্দি
আর বন্দি মা মহামায়া।
গুরু গোসাঁই কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
ও রাঙা চরণ বিনে গতি নাই।
অন্তিম কালে যমদূতে লয়ে যায়,
সেবক বলিয়া প্রভু রেখো রাঙা পায়।

গাজন-গানের বৈচিত্র্যের জন্য নানা আখ্যায়িকার সন্নিবেশ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, লাউসেনের ধর্মপূজা, শিবের নৌকাবিহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পল্লী-কবিরা তাঁহাদের মনোমত নানা নূতন নূতন আখ্যায়িকা গাজন-গানে প্রতি বৎসর সংযোজন করিয়া চলিতেছেন।

ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের গল্প রামায়ণে আছে, গাজন-গানে তাহার ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ পাওয়া যায়—

ব্রহ্মার কৌমণ্ডলে আছেন গঙ্গানারায়ণী রূপ হয়ে।
ধ্যান করিলেন মুনিগণে শিব দিলেন তা কয়ে।
ধ্যান করিয়া দেখিলেন যত মুনিগণে।
সূর্যবংশে জন্মিবে ভগীরথ গঙ্গা আনিবে সেই জনে।

* * *

ব্রহ্মার আদেশে করিয়া গমন আইলেন শিবের পাশ।
শিবের নিকটে করিলেন স্তব বৎসর হাজার দশ।
তুমি হরিহর সকলের আর তোমা বিনা আর কে।
তুমি না সহিলে সকলি মজিবে বাসুকি হইবে শেষ।
আসন করিয়া বসিলেন শিব যোড় করি দুই হাত।
শিবের মস্তকে ঢালিলেন গঙ্গা মূর্চ্ছিত হলেন ভোলানাথ।

শিবের আঁটনে তাঁহার মাথায় জল ঢালিবার সময়ে এই শ্রেণীর গান গাওয়া হয়। ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিলে তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করেন শিব। এসময়ে তাঁহার মস্তকে গঙ্গাজল ঢালিতে ঢালিতে সেই কথাই স্মরণ করা হয়।

গাজনের ব্রত গ্রহণের সময়ে ভক্তরা তামার অঙ্গুরীযুক্ত একটি পৈতা গলায় পরে, তাহার নাম 'উত্তরী'। অনুমান করা হয়, বৌদ্ধযুগে বিস্মৃত ভিক্ষুব্রত গ্রহণের শেষ চিহ্নরূপে এই প্রথা প্রচলিত আছে। এই সময়ে জল-শুদ্ধি, ক্ষীর-শুদ্ধি, উত্তরী-শুদ্ধি, অঙ্গুরী-শুদ্ধি, প্রভৃতি কয়েকটি আনুষ্ঠানিক গান গাওয়া হয়। যেমন—

মন করি ধুতি মোয়া, পবন করি কাছা,
সেই কাছা পরে পূজি সন্ন্যাস দেবতা।
সেই কাছা পরে করি শিবের স্মরণ।
যত কিছু পাপ মোদের হরে ততক্ষণ।
কহেন তো সদ্‌গুরু মহেশের বরে।
উত্তরী শুদ্ধ করেন শ্রীভোলা মহেশ্বরে।

লাউসেন ছিলেন ধর্মমঙ্গলের আদর্শ বীর, ধর্ম ঠাকুরের বরপুত্র। গাজনের পটনির্মাণের গানে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে—

ভারত ভুবনে এলেন দেব পঞ্চানন।
লাউসেনের বাড়ি ঠাকুর দিলেন দরশন।
দরশন দিলেন ঠাকুর লাউসেনের বাড়ি।
বসিতে দিলেন রাজা কুশাসনখানি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে রাজা কহে স্তববাণী।
কি কারণে আগমন আজ্ঞা হোক শুনি।
শিব বলেন স্নান করেন উপোস গেয়াতি।
সিংহাসন আনি দেহ পূজার অনুমতি।

লাউসেন প্রাচীন বাঙ্গলার আদর্শ বীর চরিত্র। ধর্মরাজের ধর্ম রাজ্য স্থাপনের জন্য তাঁহার জন্ম।

রঙপুর জেলায় যোগী সম্প্রদায়ের কৃষকদের মধ্যে শিবের গাজন গান একটি বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নাথ যোগীদের সাধন-ভজনের রীতিনীতির সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের শৈবভক্তদের মিল আছে। অনুমান করা হয়, তাহারা ঐ সম্প্রদায়েরই উত্তর সাধক। এই অঞ্চলের গাজন গান হইতে দুর্গার শাঁখা পরার সাধের একটি গান উদ্ধৃত করা হইল—

আমার জাতের কথা শিব তুই কলু ভাঙ্গিয়া।
তোমার জাতের কথা কইলে লাগিবে ঝগড়া।
ভাসুর আইসে, শশুর আইসে রণ-পরশুম তাকে।
হাতে শাঙ্কা নাই গ্যান গোসাঁই লজ্জা পাছু তাতে।
শাঙ্কা না পাইলে তবে যাব বাপের বাড়ী।
বাপের বাড়ী যাব দুর্গা ভাইয়ের বাড়ী যাব।
কাটনি কাটিয়া তবে তুই ছেইলাক পালিব।

উত্তর বঙ্গের গাজন গান ও পূর্ববঙ্গের নীলের গান সমশ্রেণীর। এই প্রকার শাঁখা পরানোর গান, শিব-দুর্গার বিবাদ, নারদের ঘটকালি প্রভৃতি নীলের গানেরও বিষয়বস্তু।

গাজন উৎসবের ছয়টি অঙ্গ—ভক্তনির্বাচন, ক্ষৌরী ও সংযম, ঘটস্থাপন ও হবিষ্য, মহা হবিষ্য, উপবাস উৎসব ও লীলাবতী পূজা এবং চড়ক।

গাজন উৎসবের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান শুরু হয় ২৭শে চৈত্র। ঐদিন ভক্তরা সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজগোত্র পরিত্যাগপূর্বক শিবগোত্রে প্রবেশ করে। ঐতিহাসিক যুগের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পুনরভিনয় হয় এই ভাবেই। ঐ দিনই তাহারা মহাহবিষ্য পালন করে।

সংক্রান্তির গাজন নৃত্যের আসরও একটি বিরাট অনুষ্ঠান, সারারাত্রি ধরিয়া ঐ দিন ভক্তেরা শিবের আঁটনের চারিপাশে গান গাহিয়া নৃত্য করে। এই নৃত্যোৎসবের সঙ্গে রীতিমত সামরিক উদ্দীপনা বিজড়িত—এ যেন যুদ্ধেরই মহড়া। এককালে এই সকল ভক্তদেরই পূর্বপুরুষগণ রণতাণ্ডবে মাতিয়াছিল, তাহাদের বাহুবলেই বহু ভূস্বামীর বহু ধনসম্পদ সুরক্ষিত হইয়াছে, বহু দরিদ্রের শেষ সম্বল লুণ্ঠিত হইয়াছে; আজ তাহাদের সেই প্রতাপ না থাকিলেও, তাহাদের রক্তে রক্তে রহিয়াছে রণোন্মাদনা।

নৃত্যের পূর্বে 'দ্বারপরিষ্কার' ও 'খাটুনী' নামক দুইটি অনুষ্ঠান আছে। এই অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়—

পূর্বে পূর্ণমণি সুখতারা হায়,
তিন বরুণ রাজা, ভানু ভাস্কর,
তাঁর চরণ সেবি কোন পদ পাই,
নেই যাব যমপুরী ধর্মপুরী ঠাঁই।
ধর্ম অধিকারী, কর্ম অধিকারী;
সাধুজিরে ভাই
পূর্ব দুয়ার খাটুনী হ'ল পুষ্পজল পাই।

চড়ক পূজার সময়ে ভক্তরা নানাপ্রকার দৈহিক নির্যাতন স্বেচ্ছায় পরিগ্রহ করে। কুমীরের পূজা, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর নৃত্য, কাঁটা বা ছুরির উপর ঝাঁপ দেওয়া, বাণ ফোঁড়া, শ্মশানে বারানো ও হাজরা বা ভূতের পূজা, বেত্রাঘাতের নির্যাতন, খেজুরের কাঁটার উপর শয়ন প্রভৃতি এই সূত্রে অনুষ্ঠিত হয়। এইগুলি সবই অনার্য-প্রভাব সম্ভূত।

অনুষ্ঠানের পরিশেষে ভক্তেরা শিবের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভ করে—

ভাঙব চারি দুয়ারের কবাট,
দেখব এবার শিবের পাদচরণ।
দশেতে করিল পূজা দশগিরি রাবণ,
লোহার গুণে সেবা করে সেই পঞ্চানন।
দেবদেবন মহাদেবন গলার উর্দ্ধে পৈতা কাঁধে
চতুঃ দুয়ার মুক্ত হ'ল দেখ পঞ্চানন।

গাজনের সময়ে পল্লীর নিভৃত দেবতাগণও পূজা লাভ করেন।

প্রত্যেক পল্লীগ্রামে নিজস্ব গ্রাম্যদেবতা আছেন। অনার্য আমল হইতে এই ভাবে তাঁহারা গ্রামপ্রান্তের বৃক্ষমূলে কিংবা অন্য কোন নির্দিষ্ট স্থলে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কোথাও তাঁহার নাম বনদুর্গা, কোথাও বা বুড়োশিব।

বটগাছের পূজাও প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। গৌড়বঙ্গের প্রাচীনতম কবি গোবর্ধন আচার্যের একটি শ্লোকে আছে—

স্বস্তি কুগ্রাম বটদ্রুম বৈশ্রবণো বসতু বা লক্ষ্মীঃ।
পামরকুঠারপাতাং কাসরশিংগৈব তে রক্ষ।

এ ছাড়া গাজনের সময়ে নানাপ্রকার ধ্বজা বা কেতন পূজার প্রচলন ছিল এবং এখনও অনেক স্থানে আছে তবে তাহার দ্রুত পরিবর্তন ও রূপান্তর হইতেছে।

রেকর্ড-পরিচয়

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" ও "কলম্বিয়া"র এবার চারখানি রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে :

হিজ মাষ্টাস ভয়েস

N 82741—শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র "মরি লো মরি আমায়" ও "আমি যে আর সইতে পারি নে"—রবীন্দ্র-গীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।

N 82742—"একটুকু ছোঁওয়া লাগে" এবং "আমার অঙ্গে অঙ্গে কে"—গেয়েছেন রবীন্দ্র-গীতি সাধিকা শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলম্বিয়া

GE 24838—কুমারী গায়ত্রী বসুর দরদী কণ্ঠে "সে কোন বনের হরিণ" ও "গোপন কথাটি রবে না গোপনে" ভাব ব্যঞ্জনায় অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

GE 24839—শ্রীমতী গীতা ঘটক রেকর্ড-জগতে নবাগতা হলেও সংগীত-প্রিয়দের পরিচিতা। বিশ্বকবির "দু'জনে দেখা হল মধুযামিনীতে" ও "সখী বহে গেল বেলা"—গান দু'খানির ডালি নিয়ে শিল্পী রেকর্ড জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন—ভাব ও সুর মূর্ত হয়ে উঠেছে শিল্পীর কণ্ঠে।

আমার কথা (২৮)

গৌরীকেদার ভট্টাচার্য

আধুনিক এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, বাংলা এবং হিন্দী কি উর্দু, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, পল্লীগীতি কিম্বা জাতীয় সঙ্গীত আবার কাওয়ালি, গীত, নাত, গজল, ভজন, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি—সব রকম গানে সমান পারদর্শী, গীতি-রসিকদের প্রিয় গায়ক গৌরীকেদার ভট্টাচার্য ১৯১৬ সালে চট্টগ্রামের পরাইকোড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কবিরাজ ৺অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য। মাত্র দশ মাস বয়সেই গৌরীকেদারকে কাশীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বালক বয়স হতে বারাণসীর পবিত্র আবহাওয়ায় তাঁর সঙ্গীত-সাধনা সুরু হয়। কাশীর বিখ্যাত ধ্রুপদ গাইয়ে হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষায় প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে তিনি কলকাতায় আসেন এবং রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে গান শিখতে থাকেন।

কাশীর সেন্ট্রাল কাশী ইনষ্টিটিউশন এবং কলকাতার ধর্মদাস মণ্ডেল স্কুল এবং রামরিক ইনষ্টিটিউশনে তিনি লেখাপড়া করেন। যখন তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন মাত্র সতের বছর বয়সে রেডিওতে গান করবার সুযোগ পান এবং ১৯৩৬ সালে কুড়ি বছর বয়সে কলকাতা রেডিওতে নিয়মিত শিল্পী হিসাবে কাজ সুরু করেন।

রেডিওতে গাওয়া গান ক্লাসে বসে ছাত্রবন্ধুদের অনুরোধে গাইবার সময় ধরা পড়ে তিনি বিদ্যালয়ে হতে বহিষ্কৃত হন, তদবধি অনন্যচিত্তে সঙ্গীতের সাধনায় নিযুক্ত থাকেন। ১৯৩৬ সালে তিনি প্রথম গান রেকর্ড করান,—১৯৩৭ সালে তা 'হিন্দুস্থান' রেকর্ডে প্রকাশিত হয় এবং অচিরে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তার পর রিগাল, কলম্বিয়া এবং "হিজমাষ্টার ভয়েস" রেকর্ডেও তিনি বাংলা হিন্দি এবং উর্দু বহু প্রকারের গান দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন।

রেডিও এবং রেকর্ড ব্যতীত চলচ্চিত্রে তিনি বহু গান নেপথ্য থেকে গেয়েছেন, নিজে পর্দায় আবির্ভূত হয়েও গেয়েছেন, বহু গানের সুর দিয়েছেন, সুরপরিচালকের কাজও করেছেন—'হ্যাপি ক্লাব' নামক চিত্রে তিনি প্রথম নেপথ্য সঙ্গীত করেন। পরে 'চন্দ্রশেখর' 'মরণের পরে' 'আবর্তন,' 'নিমাই সন্ন্যাস' প্রভৃতি ছবিতেও গান করেন। 'এই ত জীবন' 'শাখা সিঁদুর' 'মৌচাকে ঢিল', 'মহাসম্পদ' 'নন্দরাণীর সংসার' 'এক আউরৎ' প্রভৃতি চিত্রে সহকারী সঙ্গীত পরিচালকের কাজ এবং নেপথ্য সঙ্গীত দুই কাজই তিনি করেন। পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্ম-সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে তিনি 'পরশ পাথর' চিত্রে কাজ করেন।

বর্তমানে রেকর্ড এবং চলচ্চিত্রের সংস্পর্শ একরকম ছেড়ে দিয়ে সংগীতকে তিনি সাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এখনও রেডিও এবং বড় বড় জলসায় গান করেন বটে, তবে আধুনিক গানের সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতই বেশি গেয়ে থাকেন। তিনি একজন দক্ষ সঙ্গীত শিক্ষক। বাণী বিদ্যাবীথি, সুর বিদ্যাবীথি প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানে তিনি সঙ্গীত শিক্ষকের কাজ করেছেন। তার ছাত্রদের মধ্যে বহু গুণী গায়ক বেরিয়েছেন।

নিরভিমান অনলস কর্মী গৌরীকেদার সামরিক বিভাগে ইলেকট্রিকাল এবং মেকানিকাল বিভাগে ভালো চাকুরীতে কয়েক বছর কাজ করেছিলেন। বিদ্যুৎ ও যন্ত্রপাতির কাজে তাঁর দক্ষতা থাকলেও মন বসত না, ফলে তিন বছর কাজ করবার পর ফের তিনি পালিয়ে এলেন সঙ্গীতের আসরে এবং যা তাঁর নিজের মনের মতো কাজ সেই গীত সাধনাতেই ডুবে গেলেন। আজও চলছে তাঁর অতন্দ্র সাধনা। তিনি কখনও আত্মপ্রচার চাননি, চেয়েছেন গান, প্রাণ ঢেলে গান গাইতে, আর তাতেই পরকেও দিয়েছেন, নিজেও পেয়েছেন পরম তৃপ্তি—যা প্রকৃত গুণী শিল্পীর ধর্ম।

LUX
TOILET SOAP
LUX
TOILET SOAP
প্রণতি ঘোষ লাক্স টয়লেট
সাবান পছন্দ করেন তিনি বলেন
"এর শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতা
প্রমাণ করে!"

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

জর্ডানে আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিন—

জর্ডানের রাজা হোসেন গত ২৫শে এপ্রিল (১৯৫৭) সমগ্র জর্ডানে সামরিক আইন, আম্মানের রাজপথ হইতে বিক্ষোভকারীদিগকে অপসারিত করিবার জন্য দিন-রাত্রি-ব্যাপী কারফিউ জারী করিয়াছেন, সমস্ত রাজনৈতিক দল ভাঙ্গিয়া দিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খালিদির পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া ইব্রাহিম হাসেনকে নূতন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করিয়াছেন। গত এপ্রিল মাসের (১৯৫৭) তিন সপ্তাহব্যাপী যে সকল ঘটনার ক্রম পরিণতিতে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, উহা জর্ডানে আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিন প্রয়োগের প্রথম ফল। ২৫শে এপ্রিল জর্ডান বেতারে রাজা হোসেনের রেকর্ড-করা যে বিবৃতি প্রচার করা হয় তাহাতে বলা হইয়াছে যে, "আমি আমার সৈন্যবাহিনী ও জনগণের সমর্থন লাভ করিয়াছি।" তিনি যে জনগণের কিরূপ সমর্থন লাভ করিয়াছেন, তাহা আম্মানে দিন-রাত্রি-ব্যাপী কারফিউ জারী হইতেই বুঝিতে পারা যায়। জর্ডানের রাজা যদি সত্যই জনগণের সমর্থন লাভ করিতেন তাহা হইলে কারফিউ জারীর কোন প্রয়োজন হইত না। সৈন্যবাহিনীর সমর্থন যে তিনি পাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই এই সমর্থন পাওয়ার পূর্ব্বে জর্ডান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল আবু নুওয়ারকে তিনি পদচ্যুত করেন এবং ১৭ জন সামরিক অফিসার এবং প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী নবুলসির ১১ জন সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়। জেনারেল নুওয়ারকে পদচ্যুত করার পর মেজর জেনারেল আলি হিয়ারীকে জর্ডান বাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ নিযুক্ত করা হয়। রাজা হোসেন ৬০ জন সামরিক অফিসারকে স্বৈরতান্ত্রিক ভাবে পদচ্যুত করায়, উহার প্রতিবাদে মেজর জেনারেল আলি হিয়ারীও পদত্যাগ করেন। সামরিক অফিসারদের মধ্যে যে-সকল আরব ফিলিস্তানী ছিল এই ভাবে তাহাদিগকে অপসারিত করিয়া রাজা হোসেন তাহাদের স্থানে অনুগত বেদুইন অফিসার নিযুক্ত করায় সৈন্য বাহিনীর সমর্থন পাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে

আম্মানের রাজপথগুলিতে গত ২৪শে এপ্রিল যে মার্কিণ বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়, রাজা হোসেনের বিবৃতিতে তাহার জন্য আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজমকে দায়ী করা হইয়াছে. আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজমের অজুহাতে যাহা খুশী তাহাই যে করিতে পারা যায় জর্ডানের ঘটনাবলী তাহার আর এক দফা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিবৃতিতে তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, কয়েক জন অফিসারের দেশত্যাগই উহার প্রমাণ। জর্ডানের সঙ্কটকে রাজা হোসেন সম্পূর্ণ রূপে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, জর্ডানের ব্যাপারে বাহিরের কাহারও হস্তক্ষেপ সহ্য করা হইবে না। কিন্তু জর্ডানবাসীদের অদৃষ্টের ইহা এক পরিহাস যে, আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিনের স্বার্থেই রাজা হোসেন জর্ডানে এই সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিনকে নিয়োগ করিয়াছেন নিজের সিংহাসন রক্ষার প্রয়োজনে। বিবৃতিতে তিনি রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে জর্ডানের বাহির হইতে নির্দ্দেশ গ্রহণের অভিযোগও উপস্থিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই অভিযোগ জর্ডানের জনগণের বিরুদ্ধেই করা হইয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। গত অক্টোবর মাসের (১৯৫৬) সাধারণ নির্ব্বাচনে জনগণ যাঁহাদের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে তাঁহারা বিদেশ হইতে নির্দ্দেশ গ্রহণ করিতেছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বাহিরের নির্দ্দেশ বলিতে রাজা হোসেন বৃটেন বা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নির্দ্দেশকে বুঝান নাই, বুঝাইয়াছেন রাশিয়ার নির্দ্দেশকে। রাশিয়া আরব রাষ্ট্রগুলিতে অনুপ্রবেশ করিতে চেষ্টার ত্রুটি অবশ্যই করিতেছে না। কিন্তু কার্য্যতঃ রাশিয়া কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। রাশিয়া কর্ত্তৃক প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা নিরোধের জন্যই আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিন। জর্ডানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী নবুলসী আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিন ও সামরিক চুক্তির নিন্দা করিয়াছেন। ইহার উপর তিনি এবং তাঁহার মন্ত্রিসভা রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। রাজা হোসেন উহাকেই জর্ডানের জনগণের বিরুদ্ধে তাঁহার অভ্যুত্থানের সুযোগে পরিণত করিয়াছেন।

জর্ডানে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছিল তাহা আসলে রাজা হোসেনের সিংহাসন সঙ্কট। তাঁহার সিংহাসন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। জর্ডানের রাজসিংহাসনের রক্ষক বৃটেনের অর্থ সাহায্য, বৃটিশ জেনারেল গ্লাব পাশা কর্ত্তৃক গঠিত সৈন্য বাহিনী অর্থাৎ আরব লিজিয়ন এবং বেদুইনদের আনুগত্য। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে অঞ্চল লইয়া ট্রান্স জর্ডান রাজ্য গঠিত হয় তাহা ছিল ৪ লক্ষ বেদুইন অধ্যুষিত। বৃটেন আমীর আবদুল্লাকে এই ট্রান্স জর্ডান অঞ্চলের অধিপতি করেন এবং বেদুইনরাও তাঁহার আধিপত্য মানিয়া লয়। সম্পূর্ণরূপে বৃটেনের অর্থে আরব লিজিয়ন গঠিত হয় এবং বৃটিশ জেনারেল গ্লাব

পাশার হাতেই ছিল প্রকৃত পক্ষে এই নূতন রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা। বৃটিশ অর্থের উপরেই এই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব একান্ত ভাবে নির্ভরশীল। বেদুইনদের রাজনৈতিক চেতনা বলিয়া কিছু নাই, গণতন্ত্রের ধার তাহারা ধারে না। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ভাবধারার মধ্যে বর্দ্ধিত বলিয়া আমীর আবদুল্লার প্রতি তাহাদের আনুগত্য একটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই ভাবে রাজা আবদুল্লার রাজ্য শাসন বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছিল। অতঃপর ১৯৪৮ সালে আরম্ভ হইল আরব-ইসরাইল যুদ্ধ। এই যুদ্ধে একমাত্র ট্রান্স জর্ডানের আরব লিজিয়নই বিজয় গৌরব অর্জন করিতে এবং জর্ডান নদীর অপর পারস্থ নয় লক্ষ আরব ফেলিস্তানী অধ্যুষিত অঞ্চল দখল করিতে সমর্থ হয়। এই অঞ্চল ট্রান্স জর্ডানের অঙ্গীভূত হওয়ায় উহার নূতন নামকরণ হইল জর্ডান। এই যে নয় লক্ষ ফেলিস্তানী আরব জর্ডানের নাগরিক হইল ইহারা সকলেই রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন এবং গণতন্ত্রের সমর্থক। জর্ডান রাজ সিংহাসনের সঙ্কটের সূচনা এই সময় হইতেই, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

রাজা আবদুল্লা একজন ফেলিস্তানী আরবের হাতেই ১৯৫১ সালে নিহত হন। আবদুল্লার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তালাল সিংহাসনের আরোহণ করেন। কিন্তু জেনারেল গ্লাব পাশার সহিত ছিল তাঁহার মনোমালিন্য। কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই পুত্র হোসেনের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হইল। এই তরুণ যুবক রাজা হোসেনই গ্লাব পাশাকে ১৯৫৬ সালে বরখাস্ত করেন। তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৯৫৪ সালে তাঁহাকে বরখাস্ত করিবার কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছিল। তরুণ রাজা হোসেন প্রথমে বৃটেনের একান্ত অনুগত মিত্রই ছিলেন। কিন্তু ১৯৫৪ সালে তিনি যখন প্যারীতে গিয়াছিলেন সেই সময় প্যারীস্থিত তাঁহার সামরিক এ্যাটাচি আবুনুওয়ারের প্রভাবে পতিত হন। আবুনুওয়ার গোঁড়া জাতীয়তাবাদী, জর্ডান হইতে বৃটিশ প্রভাব নিশ্চিহ্ন করিতে তিনি বদ্ধপরিকর; প্যারীর হোটেল বৃষ্টলে তাঁহার সহিত আলোচনার ফলে রাজা হোসেন জেনারেল গ্লাব পাশাকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত করেন। আরব লিজিয়নের সেনাপতি মণ্ডলীর অধ্যক্ষের পদ হইতে তাঁহাকে অপসারণের কাহিনী এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বাগদাদ চুক্তির বিরুদ্ধে জর্ডানে প্রবল বিক্ষোভ ও হাঙ্গামা এবং আরব লিজিয়নের উপর হইতে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ অপসারণের দাবীকে উপলক্ষ করিয়া ১৯৫৬ সালের ২রা মার্চ্চ রাজা হোসেন বৃটিশ জেনারেল জন গ্লাব ওরফে গ্লাব পাশাকে পদচ্যুত করেন এবং জেনারেল আলি আবুনুওয়ার তাঁহার স্থানে সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

জেনারেল আবুনুওয়ার মিশর ও সিরিয়ার সহিত ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পক্ষপাতী। বৃটিশের সাহায্য বর্জ্জন করিলে ইহা ছাড়া জর্ডানের স্থায়িত্বের আর কোন পথ নাই। রাজা হোসেনের কাছে ইহা খুব ভাল লাগে নাই। তাঁহার ভাগ্যে মিশরের রাজার অবস্থা ঘটিবার আশঙ্কা তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার ভ্রাতৃব্য ইরাকের রাজার সহিত ঐক্যবদ্ধ হওয়াই পছন্দ করেন। কিন্তু ঘটনার গতি তাঁহার সিংহাসন বিপন্নহওয়ার দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। গত ২১শে অক্টোবর (১৯৫৬) জর্ডানে যে-সাধারণ নির্ব্বাচন হয় তাহাতে ইঙ্গ-জর্ডান সন্ধি বাতিলের পক্ষপাতীরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে। এই নির্ব্বাচনের পর মিশর, সিরিয়া ও জর্ডানের সৈন্য বাহিনীর জন্য যৌথ কমাণ্ড গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। রাজা হোসেন একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে ইঙ্গ-জর্ডান সন্ধি বাতিল করিতে বাধ্য হন। গত নবেম্বর মাসে (১৯৫৬) একদল সিরিয় সৈন্য জর্ডানের মাফরাক সহরে মোতায়েন হয়। তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ নবুলসী জর্ডান বাহিনীর এক অংশের সমর্থন লাভ করেন। এই অবস্থায় রাজা হোসেন যে তাঁহার সিংহাসন সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবেন ইহা খুব স্বাভাবিক।

সিংহাসনের নিরাপত্তার জন্য রাজা হোসেন কি কি পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন সে-সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় নাই। লণ্ডন হইতে প্রেরিত ৩রা এপ্রিলের (১৯৫৬) এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, রাজা হোসেন মিশরের প্রেসিডেণ্ট নাসের এবং সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট কোয়াটলীর নিকট যে গোপন পত্র দেন তাহা হইতেই সঙ্কটের উদ্ভব হয়। ঐ পত্রে তিনি মিঃ সুলেমান নবুলসীর প্রধান মন্ত্রিত্বে গঠিত জর্ডান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শাসনতন্ত্রের গুরুতর অপব্যবহার করার অভিযোগ করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রের কি গুরুতর অপব্যবহার করা হইয়াছে তাহা কিছুই ঐ সংবাদে প্রকাশ নাই। কিন্তু সংবাদে ইহাও বলা হয় যে, যে কোন মুহূর্ত্তে নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইবার জন্য রাজা হোসেন নিজের প্রাইভেট বিমান প্রস্তুত রাখিয়াছেন। তিনি নাকি তাঁহার নয় বৎসরবয়স্ক ভ্রাতার অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিতেও রাজী ছিলেন। কিন্তু বামপন্থীরা প্রজাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট দাবী করেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ২রা এপ্রিল নবুলসী মন্ত্রিসভা সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যিনি এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কেই নিশ্চিত ছিলেন না সেই রাজা হোসেন জর্ডানের জনগণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলেন কিরূপে তাহা রহস্যাবৃতই রহিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে সৌদী আরবের রাজা সৌদ ওয়াশিংটন হইতে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, মে মাসের প্রথম ভাগে তাঁহার আম্মান পরিদর্শনের কথাও ছিল। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ রিচার্ডস আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের বেসাতী ফেরি করিবার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে বাহির হইয়াছেন। এইগুলি যে রাজা হোসেনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইরাকের নিকট তিনি তিনি কোন সাহায্য চাহিয়াছিলেন কি না তাহা অবশ্য কিছুই জানা যায় না। আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজম জাতীয়তাবাদের ছদ্মবেশে আরব রাষ্ট্রগুলিতে প্রবেশ করিয়াছে, রাজা হোসেন কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই এই বুলি কপচাইতে ছিলেন। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে মার্কিণ বিমানবাহী জাহাজ ফরেষ্টল (Forrestal) লেবাননের বেইরুটে আসিয়া নোঙ্গর ফেলে। এই জাহাজটি পৃথিবীর বিমানবাহী জাহাজগুলির মধ্যে বৃহত্তম। জর্ডানের সঙ্কট এবং মার্কিণ বিমানবাহী জাহাজ 'ফরেষ্টলে'র বেইরুটে উপস্থিতি একেবারেই কাকতালীয় ন্যায়ের মত, এ কথা স্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত বিমানবাহী জাহাজের উপস্থিতির ফলে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন গ্রহণ সম্পর্কে লেবানন গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত লেবানন পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়।

অনুকূল পরিবেশের সুযোগেই রাজা হোসেন প্রথম আঘাত হানেন নবুলসী মন্ত্রিসভার উপর। আম্মান হইতে প্রেরিত ১৪ই এপ্রিলের (১৯৫৭) সংবাদে অবশ্য বলা হইয়াছে যে, চারি দিন পূর্ব্বে রাজার অনুরোধে প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুলেমান নবুলসী পদত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজাই যে মিঃ নবুলসীকে পদচ্যুত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া রাজা হোসেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ আবদুল হালিম নিমরকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে নির্দ্দেশ দেন। তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করিতে অসমর্থ হওয়ায়, ডাঃ হোসেন ফখরি খালিদি-কে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দেওয়া হয়। তিনি ১৫ই এপ্রিল নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সমর্থ হন। রাজার সহিত আপোষের ভিত্তিতে এই নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ নবুলসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী রূপে উহাতে স্থান প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইহাতেও সমস্যার সত্যিকার কোন সমাধান হয় নাই এবং রাজা হোসেন তাঁহার সিংহাসন সঙ্কটমুক্ত হইয়াছে, ইহাও মনে করিতে পারেন নাই। গত ২১শে এপ্রিল মিঃ নবুলসী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, তিনি একজন কম্যুনিষ্ট-বিরোধী। তিনি বলেন, "আমি আমার নিজের মত করিয়া কম্যুনিষ্টদের সহিত সংগ্রাম করিতে চাই, আইসেনহাওয়ারের পন্থায় নহে।"

আম্মানে সোভিয়েট দূতাবাস থাকিলে তিনি কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবেন কিরূপে, এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ নবুলসী বলেন "আমি শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, অন্যান্য কূটনৈতিক মিশন আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে;" ইতিপূর্ব্বে রাজাকে হত্যা করার এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার এবং অতঃপর আরব লিজিয়নের মধ্যে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হওয়ার এবং রাজা হোসেন কর্ত্তৃক তাহা দমন করার এক সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই বিদ্রোহকে উপলক্ষ করিয়াই সেনাপতি-মণ্ডলীর অধ্যক্ষ আবুনুওয়ারকে এবং আরও কয়েকজন সামরিক অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়। মেজর জেনারেল আলি হিয়ারীকে সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পরে তিনিও পদত্যাগ করেন। ঐ সময় ইরাকী সেনাবাহিনীর জর্ডানে প্রবেশের সংবাদ প্রকাশিত হয়। বাগদাদের সরকারী মহল হইতে ইরাকী ফৌজের জর্ডনে প্রবেশের সংবাদ অস্বীকার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনাবলী হইতে উহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

মেঃ জেঃ আলি হিয়ারী পদত্যাগ করিয়া দামাস্কাসে চলিয়া যান এবং সেখানে এক বিবৃতিতে বলেন, "জর্ডান ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে কয়েকজন বিদেশী কূটনীতিবিদের হাত রহিয়াছে। তাঁহাদের অভিসন্ধি হইতেছে, রাজার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, ইহাই তাহারা প্রমাণ করিতে চান।" বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, "সাম্রাজ্যবাদীদের রথচক্রে জর্ডনকে বাঁধিয়া দিতে চায় এইরূপ গবর্ণমেণ্ট গঠনের চেষ্টা করা হইলে জনগণ যদি তাহার বিরোধিতা করে, তাহা হইলে সৈন্যবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল।" তাঁহার এই বিবৃতি ও বহু সংখ্যক সামরিক অফিসারকে অপসারিত করা হইতে ইহা অনুমান করা যায় যে, সৈন্যবাহিনীতে রাজার একান্ত অনুগত অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং ইহার পর রাজা হোসেন ২৫শে এপ্রিল জর্ডানে সামরিক আইন ও আম্মানে দিনরাতব্যাপী কারফিউ জারী করেন এবং রাজনৈতিক দলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দ্দেশ দেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ঐ দিনেই ভূমধ্যসাগরস্থ মার্কিণ ষষ্ঠ নৌবহর পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে মহড়া দিতে আরম্ভ করে। ইহাকে কাকতালীয় ন্যায় বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। জর্ডানের এই সঙ্কটে রাজা হোসেন সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য চাহেন কি না, তাহা জানিবার জন্য মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট জর্ডানস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূতকে নির্দ্দেশ প্রদান করেন। রাজা হোসেন দলনিরপেক্ষ রাজনীতিক ইব্রাহিম হাসেনকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে রাজার নির্দ্দেশ অনুসারেই চলিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ নবুলসীকেও গ্রেফতার করা হইয়াছে। জর্ডানের জনগণের বিরুদ্ধে রাজা হোসেনের জয়লাভ যে একরূপ সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করিতে পারা যায়। এই জয়লাভের মধ্যে জর্ডানে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের জয়লাভও সূচিত হইতেছে।

মিশরের সুয়েজ-পরিকল্পনা—

সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হইয়াছে এবং সুয়েজ খাল দিয়া জাহাজ চলাচলও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সুয়েজ খাল সমস্যার কোন সমাধান এখনও হয় নাই। সম্প্রতি মিশর সুয়েজ খাল পরিচালন সম্পর্কে এক স্মারক-লিপি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারশিল্ডের নিকট পেশ করা করিয়াছে। গত ২৪শে এপ্রিল (১৯৫৭) কায়রো রেডিও হইতেও এই স্মারক-লিপির বিবরণ ঘোষণা করা হইয়াছে। এই স্মারক-লিপিতে বলা হইয়াছে যে, ১৮৮৮ সালের কনষ্টাণ্টিনোপল চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করাই মিশরের নীতি এবং মিশর গবর্ণমেণ্ট উহা অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদও মিশর মানিয়া চলিতেছে। এই সাধারণ প্রতিশ্রুতি ব্যতীত সুয়েজ খাল পরিচালন সম্পর্কে মিশর যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছে তাহাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন।

মিশর এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, আলাপ-আলোচনা কিম্বা সালিশী ব্যতীত ১২ মাসের মধ্যে মিশর খালের মাশুল শতকরা এক ভাগের বেশী বৃদ্ধি করিবে না। কিন্তু এই ১২ মাস প্রথম বার মাস, না যে কোন বার মাস তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলা হয় নাই। এই অস্পষ্টতা যে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ তাহা বলাই বাহুল্য। উন্নয়ন তহবিলের জন্য খালের রাজস্বের শতকরা ৫ ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিবার প্রতিশ্রুতিও মিশর দিয়াছে এবং ইহাও জানাইয়াছে যে, ১৯৪৯ সালের চুক্তি অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনাও মিশর কার্য্যকরী করিবে। খালের মাশুল হইতে মোট যে রাজস্ব পাওয়া যাইবে তাহার শতকরা ৫ ভাগ মিশর তাহার রয়্যালটি বাবদ রাখিবে। ইতিপূর্ব্বে ব্যবস্থা ছিল যে, খরচ খরচা বাদ দিবার পূর্ব্বে খালের মাশুল হইতে মোট যে আয় হইত তাহার শতকরা ৭ ভাগ মিশর রয়্যালটি বাবদ পাইবে। সে তুলনায় মোট রাজস্বের শতকরা ৫ ভাগ যে অপেক্ষাকৃত বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই। খাল পরিচালন ব্যাপারে কোন রাষ্ট্রের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইতেছে কি না, তাহাও একটি বড় প্রশ্ন। ক্ষতিপূরণের প্রশ্নও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই দুই ব্যাপারে অভিযোগ উপস্থিত হইলে যে ভাবে উহার

মীমাংসা করা হইবে সে-সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করিয়াছে। প্রথমতঃ সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইবে। সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষের মীমাংসা যদি সন্তোষজনক না হয়, তবে উহার মীমাংসার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইবে। এই কমিটিতে অভিযোগকারী দেশের এবং খাল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি তো থাকিবেনই, তাছাড়া উভয় পক্ষ কর্তৃক মনোনীত আরও দুইজন সালিশীও থাকিবেন। এই দুইজন সালিশী মনোনয়ন সম্পর্কে যদি কোন মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে এই বিষয়টি আন্তর্জ্জাতিক আদালতে পেশ করা হইবে। এ সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক আদালতের নির্দ্দেশ মানিতে মিশর বাধ্য থাকিবে। পদ্ধতিটি এমন যে মীমাংসা হওয়া বহু সময় সাপেক্ষ হইবে। ইহাতেও উভয় পক্ষের সন্তোষজনক কোন মীমাংসা হইবে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে।

মিশরের এই স্মারকলিপিকে আন্তর্জ্জাতিক দলিল হিসাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে রেজেষ্ট্রি করা হইবে। ইতিপূর্ব্বে বহু আন্তর্জ্জাতিক দলিলের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে সুয়েজ সম্পর্কে মিশরের পরিকল্পনাকে আন্তর্জ্জাতিক দলিলরূপে গণ্য করার বিশেষ কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই প্রশ্ন বাদ দিলেও ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গত অক্টোবর মাসে সুয়েজ খাল সম্পর্কে যে ছয়টি নীতি নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হইয়াছে মিশরের উক্ত পরিকল্পনা তদনুযায়ী হয় নাই। মিশরও ইহা স্বীকার করিয়াছে যে, উক্ত ছয়টি নীতি আক্ষরিক ভাবে স্বীকৃত হয় নাই, তবে উহার মূলনীতি স্বীকৃত হইয়াছে। সুয়েজ খাল-কে কোনও দেশের রাজনীতির সহিত জড়িত করা চলিবে না, এই নীতি মিশরের পরিকল্পনায় নাই। ইসরাইলী জাহাজ সম্পর্কে মিশর যে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করিবে, একথা মিশর গোপন রাখে নাই। তবে মিশর এই পর্য্যন্ত করিতে পারে যে, ইসরাইলের জন্য পণ্য লইয়া অন্য দেশের যে সকল জাহাজ যাইবে মিশর সেগুলিকে আটক করিবে না। মিশর সুয়েজ সম্পর্কে যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে তাহা পাশ্চমী শক্তিবর্গের পছন্দ হইবে বলিয়াও মনে হয় না।

জারিং মিশনের ব্যর্থতার গুঁতো—

নিরাপত্তা পরিষদের ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) প্রস্তাব অনুযায়ী মিঃ গানার জারিং ভারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা শেষ করিয়া গত ৩০শে এপ্রিল তাঁহার রিপোর্ট পেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, কাশ্মীর প্রশ্ন মীমাংসার কোন পন্থা বাহির করিতে তিনি সমর্থ হন নাই। মিঃ জারিং ব্যর্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতকে ব্যর্থতার এক প্রচণ্ড গুঁতো দিতেও তিনি ছাড়েন নাই। তিনি তাঁহার রিপোর্টে কাশ্মীর কমিশনের ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্টের প্রস্তাব ১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারীর প্রস্তাব সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই উক্ত দুইটি প্রস্তাব বাধ্যকর বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। প্রথম প্রস্তাবে যুদ্ধবিরতি এবং কাশ্মীরের জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য করিবার কথা আছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গণভোট পরিচালক সম্পর্কে। মিঃ জারিং তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, তাঁহারা সরল বিশ্বাসে উক্ত প্রস্তাবের সর্ত্ত কার্য্যকরী করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত যাহা বলিয়াছে তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের কথা এই যে, ১৯৪৮ সালের প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তানী ফৌজ কাশ্মীর হইতে অপসারণ করা হয় নাই এবং আজাদ কাশ্মীর বাহিনীও ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় নাই। কাজেই প্রস্তাবের অন্যান্য অংশ কার্য্যকরী করার প্রশ্ন উঠে না। ১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারীর প্রস্তাবও কার্য্যকরী করার প্রশ্ন উঠে না। দ্বিতীয়তঃ ভারতের কথা এই যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী আক্রমণের যে অভিযোগ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আনয়ন করিয়াছেন নিরাপত্তা পরিষদ সে সম্পর্কে নীরব। মিঃ জারিং তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, কাশ্মীর কমিশনের প্রথম প্রস্তাবের প্রথম অংশ কার্য্যকরী করা হইয়াছে কি না তাহা নির্দ্ধারণের জন্য তিনি সালিশ নিযুক্তের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত রিপোর্টে দেখা যায়, পাকিস্তান অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর নীতিগত ভাবে সালিশের প্রস্তাব গ্রহণ করে, কিন্তু ভারত প্রশ্নগুলি সালিশীর যোগ্য বলিয়া মনে করে না।

মিঃ জারিং সালিশের প্রস্তাব কোন্ সময় উপস্থিত করিয়াছিলেন রিপোর্ট তাহা কিছুই জানা যায় না। উক্ত প্রস্তাব ভারত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর পাকিস্তান নীতিগত ভাবে গ্রহণ করিয়াছে কি না সে সম্পর্কেও রিপোর্ট নীরব। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মিঃ জারিং পাক গবর্ণমেণ্টের সহিতই সর্ব্বশেষ আলোচনা করেন। কতগুলি তথ্য নির্দ্ধারণের জন্য সালিশের প্রস্তাব করিয়া তিনি আক্রান্ত ভারত এবং আক্রমণকারী পাকিস্তান উভয়কে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। নিরাপত্তা পরিষদে পশ্চিমী শক্তিবর্গ কাশ্মীর সম্পর্কে যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন ইহা যে তদনুযায়ীই হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই! দ্বিতীয়তঃ মিঃ জারিং কৌশলপূর্ণ উপায়ে তাঁহার ব্যর্থতার দায়িত্ব ভারতের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সালিশ নিয়োগ সম্পর্কে তাঁহার প্রস্তাব পাকিস্তান গ্রহণ করায় এবং ভারত গ্রহণ না করাতেই যে তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন তাঁহার রিপোর্ট হইতে বিশ্ববাসীর মনে এই ধারণাই জন্মিবে। ইহা দ্বারা তিনি পাকিস্তানের হাতে ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য নূতন অস্ত্র তুলিয়া দিয়াছেন। পাকিস্তান এইবার বলিবে যে, ভারত শুধু গণভোট গ্রহণেরই বিরোধী নয়, সালিশীরও বিরোধী। পাকিস্তান যে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করিবে না তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করিতে পারা যায়। মিঃ জারিং তাঁহার রিপোর্টে আরও বলিয়াছেন যে, সমস্যাগুলির মোটামুটি মীমাংসার জন্য তিনি কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় পক্ষই তাহা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রস্তাবগুলি কি তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই, ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। গণভোট সম্পর্কে এবং উহার ফলে যে-সকল সমস্যা দেখা দিবে তাহার সমাধানের জন্যও নাকি তিনি কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রিপোর্টে প্রস্তাবগুলির কোন উল্লেখ করা হয় নাই।

মিঃ জারিং তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, সমগ্র কাশ্মীর প্রশ্নের সহিত পরিবর্ত্তনশীল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রণনৈতিক প্রশ্ন সমূহ এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়ায় রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সম্পর্কের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তিনি উদ্বেগ অনুভব করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন

নাই। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নয়। গত ১০ বৎসর ধরিয়া কাশ্মীরের কতক অংশ পাকিস্তান বে-আইনী ভাবে দখল করিয়া রহিয়াছে, ঐ অংশে সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছে এবং তাহার শাসনতন্ত্রে সমগ্র কাশ্মীরকেই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সামরিক দিক হইতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলের আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। পাকিস্তান মার্কিণ সামরিক সাহায্য পাওয়ার এই গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাকিস্তান সিয়াটো ও বাগদাদ চুক্তির সদস্য। পাকিস্তান সামরিক সাহায্য পাইতেছে। এইগুলিই যে পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ জারিং নিরাপত্তা পরিষদের নিকট তাঁহার ব্যর্থতার রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর নিরাপত্তা পরিষদ কি করে তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনেকে মনে করেন কমনওয়েলথ সম্মেলনের পূর্বে জারিং রিপোর্ট সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা হইবে না।

বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে বৈঠকের আশা :—

আন্তর্জ্জাতিক আকাশ যে আবার ঠাণ্ডা যুদ্ধের কাল মেঘে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাশিয়া যে নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং নাটোর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে তাহা গত চৈত্র মাসের (১৩৬৩) মাসিক বসুমতীতে আমরা আলোচনা করিয়াছি। বস্তুতঃ বারমুডা সম্মেলনের পর হইতে ঠাণ্ডাযুদ্ধের তীব্রতা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের এই তীব্রতা সত্ত্বেও কূটনীতিবিদগণ বৃহৎ রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের প্রধানদের আর একটি সম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিতেছেন না। ঠাণ্ডাযুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস করিতে হইলে যে বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধানের একত্র মিলিত হওয়া প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্প্রতি এমন কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে সম্ভাব্য কালের মধ্যে আবার বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আশা পোষণ করা যাইতে পারে তাহা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। নিউ ইয়র্ক হইতে ২১শে এপ্রিলের (১৯৫৭) সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ববর্ত্তী সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার সংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছিলেন যে, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছে তাহা ১৯৪৫ সালের পর সর্ব্বাপেক্ষা আশাপ্রদ। মস্কোর রাজনৈতিক আবহাওয়া কিরূপ সে-সম্বন্ধে বিস্তৃত রিপোর্ট প্রদানের জন্যই প্রেঃ আইসেনহাওয়ার মস্কোস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূতকে লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। অনেকে মনে করেন যে, এই রিপোর্ট পাওয়ার পর চতুঃশক্তি সম্মেলন সম্বন্ধে মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের মতের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। তাছাড়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের মর্য্যাদা লইয়া বাড়াবাড়ি না করিয়া সুয়েজ সমস্যা সম্পর্কে বৃহৎ শক্তিবর্গ আলোচনা করিতে প্রস্তুত বলিয়াই মনে হয়। গত ২৩শে এপ্রিল (১৯৫৭) মিঃ ডালেস বলিয়াছেন যে, নিরস্ত্রীকরণ, তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির প্রতি ব্যবহার এবং জার্ম্মাণীকে ঐক্যবদ্ধ করণ সম্পর্কে রাশিয়া কি করিতে প্রস্তুত তাহারই উপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মধ্যে নূতন সম্মেলন আহ্বান করা নির্ভর করিতেছে। যদিও মিঃ ডালেস এইরূপ সম্মেলন আহ্বান সম্পর্কে সর্ত্ত আরোপ করিয়াছেন, যদিও এই ধরণের সর্ত্তে রাশিয়া রাজী হইবে না, তথাপি ইহা বুঝা যাইতেছে যে, বৃহৎ শক্তি-চতুষ্টয়ের প্রধানদের মধ্যে আলোচনার সম্ভাবনা একেবারে অলীক কল্পনা নয়।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলনের নিকট রুশ প্রধান মন্ত্রী বুলগানিনের ব্যক্তিগত পত্রও বৃহৎ শক্তিচতুষ্টয়ের প্রধানদের মধ্যে সম্মেলন সম্পর্কে আশার সঞ্চার করিয়াছে। এই পত্রে রুশ প্রধান মন্ত্রী বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে মস্কোতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা না করিয়া মিঃ ম্যাকমিলন এই পত্রের উত্তর অবশ্য দিবেন না। মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট এবং ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সমর্থন করিলেই তিনি রাশিয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয় তাহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যেমন চাহে না, তেমনি বৃটেনও চায় না যে, রাশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার একমাত্র বিকল্প বৃহৎ চতুঃশক্তির মধ্যে আলোচনা। কি রাশিয়া কি পশ্চিমী শক্তিবর্গ সকলেই ইহা বুঝিতে পারিতেছে যে, এই পরমাণু অস্ত্রের যুগে হয় এক সঙ্গে বাস করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে, না হয় একসঙ্গে মৃত্যু বরণ করিতে হইবে।

লণ্ডনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ কমিটির আলোচনা চলিতেছে। সম্প্রতি পশ্চিম জার্ম্মাণীর বনে উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের প্রথম সম্মেলন হইয়া গেল। শক্তিশালী হইয়া রাশিয়ার সহিত আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যেই উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি করা হইয়াছে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য এপর্য্যন্ত ব্যর্থই হইয়াছে। রাশিয়াও পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার অধিকারী হইয়াছে। উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তির উত্তরে রাশিয়া ওয়ারশ চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। পশ্চিম জার্ম্মাণী নাটোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের আশা সুদূর পরাহত হইয়া উঠিয়াছে। উভয় পক্ষে চলিতেছে অস্ত্রসজ্জার প্রবল প্রতিযোগিতা। চলিতেছে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ। এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের পরিণামও যে ভয়াবহ সে-বিষয়ে সকলেই একমত। সম্প্রতি বৃটেনেও হাইড্রোজেন বোমা নির্ম্মাণে উদ্যোগী হইয়াছে। ক্রিষ্টমাস দ্বীপে বৃটেন সর্ব্বপ্রথম তাহার হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। সম্প্রতি রাশিয়াও অনেকগুলি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। নাটোর বৈঠকের শেষে গত ৩রা মে (১৯৫৭) যে-চূড়ান্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে যে, তাহাতে বলা হইয়াছে আটলাণ্টিক মৈত্রীর বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ হইলে তাহার সম্মুখীন হওয়ার জন্য যাহাতে সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারা যায় তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক অস্ত্র পাইবার ব্যবস্থা। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক অস্ত্র যে পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমা তাহাতে সন্দেহ নাই। উভয় পক্ষেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত হইলেই যে পরমাণু যুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী হইবে, ইহা অবশ্য মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু এই আশঙ্কা যেমন উপেক্ষার বিষয় নহে, তেমনি উহার পরিণামে ব্যাপক ধ্বংস অনিবার্য্য।

—১০ই মে, ১৯৫৭।

সবাই জানেন –
সীল করা প্যাকেটে পাওয়া যায় ব'লে ব্রুক বণ্ড চা নির্ভেজাল ও একেবারে খাঁটি থাকে
বাজারে ব্রুক বণ্ড চায়েরই কাটতি সব চেয়ে বেশী
প্রতি প্যাকেট ব্রুক বণ্ড চায়ে অনেক বেশী কাপ ভালো চা তৈরী করা যায়
এই জন্যেই অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে
ব্রুক বণ্ড চা
বেশী লোকে খান !

১৩৬৩-৬৪ সালের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

* কবিতা *

কাব্যবিতান ১০৲	প্রমথনাথ বিশী ও তারাপদ মুখো: সম্পাদিত	বেঙ্গল পাবলিশার্স
দশমী ১৲	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	সিগনেট
দ্বাস্তিক ২৲	সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত	এম, সি, সরকার
দুঃখের দর্পণে ১৲	রাম বসু	গ্রন্থজগৎ
মনোগঙ্গা ২৲	নটকৃষ্ণ দে	ক্যাল: পাবলিশার্স
সাগর থেকে ফেরা ৩৲	প্রেমেন্দ্র মিত্র	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
স্বনির্বাচিত কবিতা ৪।০	মোহিতলাল মজুমদার	" "
হেমন্তের দিন ১।০	রাজলক্ষ্মী দেবী	অভ্যুদয়

* উপন্যাস *

অতিক্রান্ত ৩।০	আশাপূর্ণা দেবী	শ্রীগুরু লাইব্রেরী
অনুরাগিণী ২৲	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	বেঙ্গল পাবলিশার্স
অন্তরঙ্গ ২।০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	সিগনেট
ইস্পাতের স্বাক্ষর ১০৲	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	ওরিয়েন্ট বুক কোং
খেলাঘর ৪৲	প্রাণতোষ ঘটক	সাহিত্য ভবন
গড় শ্রীখণ্ড ৮৲	অমিয়ভূষণ মজুমদার	নাভানা
জংলা মাঠের ফসল ৩।০	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	নিরীক্ষা
জন্মেছি এই দেশে ৪৲	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	মিত্র ও ঘোষ
তিতাস একটি নদীর নাম ৬৲	অদ্বৈত মল্লবর্মণ	পুঁথিঘর
তিন তরঙ্গ ৪৲	প্রতিভা বসু	নাভানা
দম্পতি ৩।০	প্রভাত দেবসরকার	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
দেওয়াল ৪।০	বিমল কর	ডি, এম, লাইব্রেরী
ধুলোমাটি ৬৲	ননী ভৌমিক	বেঙ্গল পাবলিশার্স
নয়ান বৌ ৫৲	বিভূতিভূষণ মুখো:	মিত্র ও ঘোষ
নাগমতী ৪।০	প্রফুল্ল রায়	" "
নীলাঞ্জন ৪৲	সরোজ রায়চৌধুরী	বেঙ্গল পাবলিশার্স
পুতুলের খেলা ২।০	সমরেশ বসু	ডি, এম, লাইব্রেরী
প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান ২৲	মানিক বন্দ্যো:	বেঙ্গল পাবলিশার্স
বহ্নি-পতঙ্গ ৩।০	শরদিন্দু বন্দ্যো:	গুরুদাস
বালির প্রাসাদ ৪৲	পুলকেশ দে-সরকার	নবভারতী
বিচারক ২।০	তারাশঙ্কর বন্দ্যো:	বেঙ্গল পাবলিশার্স
বেগমবাহার লেন ৮৲	বারীন্দ্রনাথ দাশ	বেঙ্গল পাবলিশার্স
বৃষ্টি, বৃষ্টি ! ৫।০	মনোজ বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স
ব্যালেরিনা ৩৲	সুধীরঞ্জন মুখো:	ডি, এম, লাইব্রেরী
ভুবন সোম ২।০	বনফুল	" "
ভৃগুজাতক ৫৲	তারেশচন্দ্র শর্মাচার্য	মিত্র ও ঘোষ
মধুমাধবী ৩৲	সুশীল রায়	সত্যব্রত লাইব্রেরী
মণিমালা ২৲	লীলা মজুমদার	এশিয়া পাবলিশিং
যন্ত্র ও শ্রীমতী ৩৲	অন্নদাশঙ্কর রায়	ডি, এম, লাইব্রেরী
লালবাঈ ৫৲	রমাপদ চৌধুরী	" "
শেষ পাণ্ডুলিপি ৩।০	বুদ্ধদেব বসু	এম, সি, সরকার
সুজাতা ২।০	সুবোধ ঘোষ	ক্যাল: পাবলিশার্স

* গল্পগ্রন্থ *

আপন প্রিয় ৩৲	রমাপদ চৌধুরী	ত্রিবেণী প্রকাশন
কড়ির ঝাঁপি ৩৲	সন্তোষকুমার ঘোষ	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
গল্প পঞ্চাশৎ ৮৲	বিভূতিভূষণ বন্দ্যো:	মিত্র ও ঘোষ
গল্প-সংগ্রহ ৩।০	নারায়ণ গঙ্গো:	" "
" " ৪৲	প্রবোধকুমার সান্যাল	" "
চকাচকী ২৲	সতীনাথ ভাদুড়ী	বেঙ্গল পাবলিশার্স
জীবন-যৌবন ২৲	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যো:	সাহিত্য ভবন
তাল বেতাল ২।০	বিভূতিভূষণ মুখো:	নবভারত
নীরস গল্প-সঞ্চয়ন ৩।০	প্রমথনাথ বিশী	ওরিয়েন্ট বুক কোং
নীলতারা ইত্যাদি গল্প ৩৲	পরশুরাম	এম, সি, সরকার
পলাশের নেশা ৩৲	সুবোধ ঘোষ	ত্রিবেণী প্রকাশন
প্রেমের গল্প ৭।০	বিশু মুখো: সম্পাদিত	রীডার্স কর্নার
বাসক-সজ্জিকা ৪৲	প্রাণতোষ ঘটক	মিত্র এণ্ড ঘোষ
ময়ূরী ২৲	বিমল কর	বাসন্তী বুক ষ্টল
রুপালী রেখা ৬।০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	আভেনির
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫।০	ত্রৈলোক্যনাথ মুখো:	মিত্র ও ঘোষ
" " ৪৲	পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য	গুরুদাস
" " ৪।০	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	বিহার সাহিত্য ভবন
ষষ্ঠ ঋতু ২৲	সমরেশ বসু	নিওলিট
সপ্তপদী ১৸০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
সরস গল্প ৪৲	আশাপূর্ণা দেবী	কথামৃত ভবন
স্বনির্বাচিত গল্প ৪৲	মানিক বন্দ্যো:	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
" ৪৲	শিবরাম চক্রবর্তী	"

*** রম্যরচনা ***

আড্ডা ২৲ গোপাল হালদার বেঙ্গল পাবলিশার্স
প্রিয়াঙ্গী ২৸০ মৌলানা খাফী খান সত্যব্রত লাইব্রেরি
বসন্ত কেবিন ২।০ নীলকণ্ঠ ষ্ট্যাণ্ডার্ড
মনে এল ৪৲ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখো: নিউ এজ
সপ্তপক্ষ ৩।০ পরিমল গোস্বামী মিত্র ও ঘোষ

*** নাটক ***

আরোগ্য নিকেতন ১।০ তারাশঙ্কর বন্দ্যো: বেঙ্গল পাবলিশার্স
একটি নায়ক ১।০ দিলীপ রায় প্রতীতি প্রকাশনী
এরাও মানুষ ২৲ সন্তোষ সেন ডি এম
ধৃতরাষ্ট্র ২৲ ধনঞ্জয় বৈরাগী আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স
পরিণীতা ১।০ দেবনারায়ণ গুপ্ত এম সি সরকার
শেষলগ্ন ২৲ মনোজ বসু বেঙ্গল পাবলিশার্স

*** ভ্রমণ-কাহিনী ***

এলেম নতুন দেশে ৩৲ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ সিগনেট
কামাল পরদেশী ৪।০ বিমল ঘোষ মিত্রালয়
জলে ডাঙায় ৩।০ সৈয়দ মুজতবা আলী বেঙ্গল পাবলিশার্স
দুনিয়া দেখছি ৫৲ কল্যাণী প্রামাণিক ওরিয়েণ্ট বুক কোং
দেবতাত্মা হিমালয় (২য় খণ্ড) ১।০ প্রবোধকুমার সান্যাল বেঙ্গল পাবলিশার্স
পথ চলি ৩৲ মনোজ বসু "
মহা সোভিয়েট ৩।০ মৈত্রেয়ী দেবী বিচিত্রা
লাক্ষা যাত্রা ২।০ মোহনলাল গঙ্গো: বেঙ্গল পাবলিশার্স
সাহেব বিবির দেশে ৬৲ নরেন্দ্র দেব ডি, এম

*** সাহিত্য ও সংস্কৃতি ***

অ্যারিষ্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব ৬।০ সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য বেঙ্গল পাবলিশার্স
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ৬৲ অসিত বন্দ্যো: ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
কণ্ঠস্বর ৩৲ অন্নদাশঙ্কর রায় ডি এম
কাব্য-কৌতুক ৫৲ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য প্রগেসিভ পাবলিশার্স
কি লিখি ৩।০ যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি ওরিয়েণ্ট বুক কোং
বাংলা ছন্দ ৩৲ সুধীভূষণ ভট্টাচার্য এম সি সরকার
বাংলার জাগরণ ৩৲ কাজী আবদুল ওদুদ বিশ্বভারতী
বাংলার পত্রসাহিত্য ৪৲ সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ক্যালকাটা বুক ক্লাব
বাংলার স্ত্রী-আচার ১।০ শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বিশ্বভারতী
বাংলা সাহিত্য ও মানব-স্বীকৃতি ৩।০ গোপাল হালদার ডি এম
বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা ১০।০ ভোলানাথ ঘোষ এস ব্যানার্জি
বাংলা সাহিত্য পরিচয় ২।০ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থ জগৎ
রবীন্দ্র-নাটক-প্রসঙ্গ ২৲ জীবনকৃষ্ণ শেঠ সাহিত্য ভবন
রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-দর্শন ২।০ প্রবাসজীবন চৌধুরী এ মুখার্জি
রবীন্দ্র-মানস ৩।০ ডা: অরবিন্দ পোদ্দার ইণ্ডিয়ানা
শাক্ত পদাবলী ও শক্তি-সাধনা ৫৲ জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ডি এম
সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা ৫৲ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য এ মুখার্জি
সাহিত্য ও সাহিত্যিক ২৲ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ডি এম
সাহিত্য বিচিত্র ৪৲ রথীন্দ্রনাথ রায় ক্যালকাটা বুক ক্লাব
স্বদেশ ও সংস্কৃতি ২।০ বুদ্ধদেব বসু বেঙ্গল পাবলিশার্স

*** জীবনী ***

কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে ২৲ নির্মলকুমারী মহলানবিশ ডি এম
ঝাঁসির রাণী ৫৲ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য নিউ এজ
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (৪র্থ খণ্ড) ৫৲ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সিগনেট
প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ ৬৲ গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ কলি: পুস্তকালয়
বুদ্ধদেব ১।০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী
বুদ্ধ-প্রসঙ্গ ।০ মহেশচন্দ্র ঘোষ "
ভক্ত কবীর ৫৲ উপেন্দ্রকুমার দাস ওরিয়েণ্ট বুক কোং
ভারতের সাধক ৫৲ শঙ্করনাথ রায় রাইটার্স সিণ্ডিকেট
মীরাবাঈ ৪।০ ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য প্রবর্তক
মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন সেন ৩৲ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দাশগুপ্ত প্রকাশন
রবীন্দ্র-জীবনী (৪র্থ খণ্ড) ১০৲ প্রভাতকুমার মুখো: বিশ্বভারতী
রূপকার নন্দলাল ২।০ শান্তিদেব ঘোষ গ্রন্থ জগৎ
শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ ১২।০ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী নবভারত
স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ৪।০ সরলাবালা সরকার বেঙ্গল পাবলিশার্স

*** স্মৃতিকথা ***

আত্মস্মৃতি (২য় ভাগ) ৫৲ সজনীকান্ত দাস ডি এম লাইব্রেরী
আন্দামান-বন্দী ১।০ অনন্ত ভট্টাচার্য মিত্রালয়
কৈশোর-স্মৃতি ৪৲ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মিত্র ও ঘোষ
তখন আমি জেলে ৬৲ দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি ১২৲ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় "
যখন নায়ক ছিলাম ৫৲ ধীরাজ ভট্টাচার্য "

*** শিকার-কাহিনী ***

আমার শিকার-স্মৃতি ২৲ বিশ্বকান্ত সেন বিহার সাহিত্য ভবন
ঠাকুরাণীর বাঘ ২৲ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী দিগন্ত পাবলিশার্স
বনের খবর ৩৲ প্রমদারঞ্জন রায় সিগনেট

*** ইতিহাস ***

ইতিহাসের ধারা ২৲ অমিত সেন ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
পৃথিবীর ইতিহাস ৮৲ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও রমাকৃষ্ণ মৈত্র বেঙ্গল পাবলিশার্স
প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা ।০ ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার বিশ্বভারতী
বিদেশীর চোখে প্রাচীন ভারত ৮০ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিদ্যোদয় লাইব্রেরি
ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকা ৩৲ প্রিয়তোষ মৈত্রেয় গ্রন্থ জগৎ

* সঙ্গীত *

াস্তবের গান ২৲	সলিল চৌধুরী	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
ংলা গানের গতিপথ ২৲	চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়	ডি এম লাইব্রেরী
ংলার গীতকার ৩।০	রাজ্যেশ্বর মিত্র	মিত্রালয়
ঙ্গীত ও সংস্কৃতি (২য় খণ্ড) ৭।০	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
ঙ্গীত শিক্ষার প্রথম সোপান ১৲	নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়	হস্তিকা
রেসাগর ৩।০	হিমাংশু রায় ও সন্তোষ সেনগুপ্ত	ডি এম লাইব্রেরি
রবিতান (খণ্ড ৪৭ —৩৲; ৪৮ —৪৲; ৪৯ — ৩।০; ৫০ —৩৲; ৫১ — ২।০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী

* ধর্ম ও দর্শন *

অমৃতের সন্ধান ২।০	হরেন্দ্রকুমার দে-চৌধুরী	প্রবর্তক পাবলিশার্স
প্রবন্ধাবলী (৬ষ্ঠ খণ্ড) ২৲	স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি	শ্রীগুরু লাইব্রেরি
লোকায়ত দর্শন ১৫৲	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	নিউ এজ

* শিল্প-কথা *

আধুনিক আলোকচিত্রণ ৬৲	পরিমল গোস্বামী	বিহার সাহিত্য ভবন
ধারা থেকে মাণ্ডু ২।০	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	সারস্বত লাইব্রেরি
বাংলার লোকশিল্প ১।০	রবীন্দ্র মজুমদার	গ্রন্থ জগৎ
ভারতের চিত্রকলা ১৫৲	অশোক মিত্র	বেঙ্গল পাবলিশার্স
য়ুরোপে আধুনিক চিত্রকলার প্রগতি ৩৲	অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গো:	গ্রন্থ জগৎ
রূপধানী ৪৲	রমাপদ চৌধুরী	সরস্বতী গ্রন্থালয়
শিল্পচর্চা ৫৲	নন্দলাল বসু	বিশ্বভারতী

* গদ্য-সাহিত্য *

আধুনিক শিক্ষণ সহায়িকা ৬৲	নারায়ণচন্দ্র চন্দ	কলি: পুস্তকালয়
কলকাতার পথঘাট ৩৲	প্রাণতোষ ঘটক	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
করে দেখ (২ খণ্ড) ১।০	গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
কাচ ও কাচশিল্প ১৲	হীরেন্দ্রনাথ বসু	"
নেহরু ও পররাষ্ট্রনীতি ৫৲	অনাদিনাথ পাল	ওরিয়েন্ট বুক কো:
বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ ২।০	সুকুমার রায়	সিগনেট
বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ৮৲	কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য	গ্রন্থ জগৎ
বাংলার ভূমিব্যবস্থা ।০	নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য	বিশ্বভারতী
বিবাহতত্ত্ব ও জন্মনিয়ন্ত্রণ ২৲	ভক্তি সেন	দিগন্ত পাবলিশার্স
মনোবিজ্ঞান ৮৲	ইন্দুভূষণ মজুমদার	আশুতোষ বুক ষ্টল
মল্লজগতে ভারতের স্থান ৪।০	সমর বসু	ডি এম
রসায়ন ও সভ্যতা ।০	প্রিয়দারঞ্জন রায়	বিশ্বভারতী
রাশিবিজ্ঞানের কথা ।০	ডা: পূর্ণেন্দুকুমার বসু	"
রাষ্ট্রনীতি ২৲	বিপিনচন্দ্র পাল	যুগযাত্রী প্রকাশক
সমীক্ষা ৫৲	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য	মিত্র ও ঘোষ

* শিশু-সাহিত্য *

ঘনাদার গল্প ২৸০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
ছবিছড়ার দেশে ৩৲	বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত	এশিয়া পাবলিশিং
ছুটির আকাশ ১৸০	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	ইষ্টলাইট
ছোটদের ছোটগল্প ১।০	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	ভারতী লাইব্রেরি
ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প ২৲	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	অভ্যুদয়
" ২৲	মোহনলাল গঙ্গো:	"
" ২৲	রবীন্দ্রলাল রায়	"
" ২৲	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	"
" ২৲	শিবরাম চক্রবর্তী	"
" ২৲	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	"
" ২৲	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	"
তারা তিনজন ২৲	নীলকণ্ঠ	এশিয়া পাবলিশিং
দুষ্টু ও লক্ষ্মীদের গল্প ১।০	বিভূতিভূষণ মুখো:	নবভারত
বাছা বাছা ১।০	মৌমাছি	ঘোষ ব্রাদার্স
ভোঁদড় বাহাদুর ১।০	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	সিগনেট
মাইকেল মধুসূদন ১৲	সুনির্মল বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স
মারুতির পুঁথি ৩।০	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
মিঠুয়া ১৲	সমর চট্টোপাধ্যায়	নাভানা
মেরুপথের যাত্রিদল ১।০	পরিমল গোস্বামী	রাইটার্স সিণ্ডিকেট
রূপকুমারী গল্প ১।০	স্বপনবুড়ো	অভ্যুদয়
রঙ্গনা ১।০	বনফুল	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
রান্না থেকে কান্না ১।০	বুদ্ধদেব বসু	" "
সুন্দরবনের চিঠি ১০	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	বিদ্যোদয় লাইব্রেরী

* অনুবাদ *

অয়েক ১ম পর্ব (আপটন সিনক্লেয়ার) ৪।০	জ্যোতিষ বেদজ্ঞ	মিত্রালয়
এ পেয়ার অব ব্লু আইজ (টমাস হার্ডি) ৫।০	চারুপমা বসু	মিত্র ও ঘোষ
ক্রিকেট খেলার অ-আ-ক-খ (ডনব্র্যাডম্যান) ৪৲	পরীক্ষিত	আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স
নীল পাখি (মেটারলিঙ্ক) ১৲	পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	বিদ্যোদয় লাইব্রেরী
বিবাহিত প্রেম (মারি ষ্টোপস) ৪৲	কল্পনা রায়	আর্ট এণ্ড লেটার্স
মহানপুরুষদের সান্নিধ্যে (শিবনাথ শাস্ত্রী) ৩।০	মায়া রায়	রাইটার্স সিণ্ডিকেট
মা ও ছেলে (রমাঁ রোলাঁ) ৫৲		র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
রোমান হলিডে ২।০	ভবানী মুখোপাধ্যায়	এস. রায় এণ্ড কো:
স্পার্টাকাস (হাওয়ার্ড ফাষ্ট) ৫৲	সুনীল চট্টোপাধ্যায়	ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
হিরোসিমার মেয়ে (আর কাম) ৪।০	ইলা মিত্র	র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
হে বিদেশী ফুল ৫৲	বিষ্ণু দে	বাক

কোলে
বিস্কুট

রঙ্গপট

বাঙলা ছবি ও ১৩৬৩

১৩৬৩ সালে মোট বাঙলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে উনপঞ্চাশখানি। সেইগুলির উপর চোখ বোলালে যা দেখা বা পাওয়া যায় তারই একটি সার মর্ম উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি।

(১) চিরকুমার সভা (১ সপ্তাহ) কাহিনী ও গান রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গীত সন্তোষ সেনগুপ্ত, আলোকচিত্র বিশু চক্রবর্তী, সম্পাদনা গোবর্দ্ধন অধিকারী, শিল্প সৌরেন সেনের তত্ত্বাবধানে পুলিন ঘোষ ও গোপী সেন, শব্দ শ্যামসুন্দর ঘোষ, পরিচালনা দেবকীকুমার। রূপায়ণে অহীন্দ্র, জহর, নীতীশ, উত্তম, প্রশান্ত, জীবেন, তুলসী চক্র, জহর, অজিত, পঞ্চানন, ভারতী, শোভা, তপতী, যমুনা, অনিতা, অপর্ণা। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত, সন্ধ্যা, পূরবী। (২) পরাধীন (৫ সপ্তাহ) কাহিনী ৺নারায়ণ ভট্টাচার্য, সংলাপ নারায়ণ গঙ্গো, সঙ্গীত গোপেন মল্লিক, আলোকচিত্র অনিল গুপ্ত, সম্পাদনা শিব ভট্টা, শিল্প অনিল পাল, গান প্রণব রায়, শব্দ বাণী দত্ত, পরিচালনা মধু বসু। রূপায়ণে অহীন্দ্র, ছবি, জহর, নির্মল, বীরেন, আদিত্য, বেচু, প্রীতি, শৈলেন, বাণী বাবু, হেম গুপ্ত, শ্যামল, অলক, সজল, মলিনা, চন্দ্রা, শোভা, সন্ধ্যারাণী, কাবেরী, সাবিত্রী, রেখা মল্লিক, সন্ধ্যা, আশা, মনোরমা, শান্তা, রিক্তা, গীতা, বুলবুল। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, আল্পনা, ছবি। (৩) একটি রাত (মূল নাম ভীমপলশ্রী) (৮ সপ্তাহ) কাহিনী বনফুল, চিত্রনাট্য নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, সঙ্গীত অনুপম ঘটক, আলোকচিত্র বিজয় ঘোষ, সম্পাদনা বৈদ্যনাথ চট্টো, শিল্প সুধীর খাঁ, শব্দ জগন্নাথ চট্টো, গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা চিত্ত বসু। রূপায়ণে পাহাড়ী, কমল, উত্তম, জীবেন, গুরুদাস, অনুপ, শুভেন, ভানু, জহর, তুলসী চক্র, হরিধন, তুলসী, শিবকালী, পঞ্চানন, ছবি, মলিনা, চন্দ্রা, মেনকা, সুচিত্রা, সবিতা, করালী। নেপথ্য কণ্ঠে—সন্ধ্যা। (৪) মহাকবি গিরিশচন্দ্র (১ সপ্তাহ) কাহিনী—মধু বসু ও দেবনারায়ণ গুপ্ত সংলাপ দেবনারায়ণ, অতিঃ সংলাপ বিধায়ক ভট্টা, সঙ্গীত অনিল বাগচী, আলোকচিত্র অনিল গুপ্ত, সম্পাদনা কমল গাঙ্গুলী, শিল্প কার্ত্তিক বসু, গান মহাকবি গিরিশচন্দ্র ও শ্যামল গুপ্ত, শব্দ বাণী দত্ত, পরিচালনা মধু বসু, নামভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল। রূপায়ণে অহীন্দ্র, নীতীশ, অসিত, মোহন, গুরুদাস, উৎপল, মিহির, সন্তোষ, জহ অজিতপ্রকাশ, অনুপ, সবিতাব্রত, গঙ্গাপদ, দেবেন, ভূপেন, বলী অবিনাশ, আদিত্য, বিপিন, সৌরীন, শ্রীপতি, পঞ্চানন, চন্দ্রশেখ শিবকালী, শুভেন্দু, হেম গুপ্ত, প্রীতি, সজল, মলিনা, পদ্ম সন্ধ্যারাণী, ভারতী, শোভা, তপতী, মেনকা, পূর্ণিমা, সন্ধ্যা ছন্দা। নেপথ্য কণ্ঠে—ধনঞ্জয়, মৃণাল, উৎপলা, গীতা, ছবি অঞ্জুশ্রী। (৫) অসমাপ্ত (৭ সপ্তাহ) কাহিনী বিধায়ক ভট্টা সঙ্গীত অনুপম, অনিল, নচিকেতা, দুর্গা, ডাঃ ভূপেন, আলোকচি অনিল গুপ্ত, নৃত্য শ্রীমতী প্রিয়ম হাজারিকা। নৃত্য নেতৃত্ব উদয়শঙ্কর, সম্পাদনা রবীন দাস, শিল্প কার্ত্তিক বসু, শব্দ গৌ দাস ও বাণী দত্ত, গান গৌরীপ্রসন্ন, শ্যামল, হীরেন বসু, পুলক বিধায়ক ও হরিচরণ, পরিচালনা রতন চট্টো। রূপায়ণে ছবি, জহর ধীরাজ, পাহাড়ী, কমল, নীতীশ, অসিত, দীপক, গুরুদাস প্রবীর, ভানু, জহর, অনুপ, তুলসী চক্র, সন্তোষ, তুলসী, বেচু, শান্তি প্রীতি, নৃপতি, অমর বসু ও বিশ্বাস, ধীরাজ, বিভু, মলিনা সন্ধ্যারাণী, মঞ্জু, কাবেরী, রেণুকা, বাণী গাঙ্গুলী, জয়শ্রী, প্রীতিধারা ছন্দা, অনুশীলা। নেপথ্য যন্ত্রে আল্লারাখা, শান্তাপ্রসাদ, কেরামতুল্লা রাধাকান্ত, নিখিল, সাগিরুদ্দীন, রাসবিহারী। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত, ধনঞ্জয়, সতীনাথ, বিনয় অধিকারী, মৃণাল অপরেশ, মণ্টু, ডাঃ ভূপেন, লতা, সন্ধ্যা, প্রতিমা, আলপনা কৃষ্ণা, বাঁশরী, বাসন্তী। (৬) শঙ্করনারায়ণ ব্যাঙ্ক (৬ সপ্তাহ) কাহিনী নিতাই ভট্টা, সঙ্গীত অনুপম ঘটক, আলোকচিত্র বিজয় ঘোষ, সম্পাদনা সন্তোষ গাঙ্গুলী, শিল্প সৌরেন সেন, শব্দ জগন্নাথ চট্টো, গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা নীরেন লাহিড়ী। রূপায়ণে ছবি, উত্তম, বসন্ত, মিহির, সবিতাব্রত, অনুপ, আশীষ মুখো ডাঃ হরেন, দেবেন, ছায়া, কাবেরী, অনুভা, নীলিমা। নেপথ্য কণ্ঠে সন্ধ্যা। (৭) শ্যামলী (১০ সপ্তাহ) কাহিনী নিরুপমা দেবী সঙ্গীত কালিপদ সেন, সম্পাদনা অর্দ্ধেন্দু চট্টো, শিল্প সুনীল সরকার, শব্দ ইরাণী ও সত্যেন চট্টো, গান গৌরীপ্রসন্ন ও ভূষণ, আলোকচিত্র ও পরিচালনা অজয় কর। রূপায়ণে অহীন্দ্র, উত্তম, আশীষ মুখো অনুপ, সন্তোষ, হরিধন, তুলসী চক্র, শিবকালী, ডাঃ হরেন, অমর বিশ্বাস, খগেন, শ্যামল চক্র ও মলিনা, কাবেরী, অনুভা, মণিকা অপর্ণা, রাণীবালা, রাজলক্ষ্মী, আশা, করালী, বেলারাণী, সন্ধ্যা আরতি ও কালিপদ সেন। (৮) ত্রিযামা (৮ সপ্তাহ) কাহিনী সুবোধ ঘোষ, সঙ্গীত নচিকেতা ঘোষ, আলোকচিত্র বিভূতি লাহা ও বিজয় ঘোষ, সম্পাদনা সন্তোষ গাঙ্গুলী, শিল্প সত্যেন রায়চৌধুরী, শব্দ যতীন দত্ত, গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালক অগ্রদূত। রূপায়ণে ছবি জহর, কমল, নীতীশ, উত্তম, দীপক, মিহির, জীবেন, শুভেন হরিধন, ডাঃ হরেন, চন্দ্রশেখর, গৌর সী, চন্দ্রা, ছায়া, শোভা, সুচিত্রা অনুভা, কেতকী, নেপথ্য যন্ত্রে আলী আকবর। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত সন্ধ্যা, ছবি। (৯) আশা (৭ সপ্তাহ) কাহিনী রাখালচন্দ্র, সংলাপ সজনীকান্ত, আলোকচিত্র জি, কে, মেহতা, সঙ্গীত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সম্পাদনা দুলাল দত্ত, শিল্প সত্যেন রায়চৌধুরী, গান জ্ঞানপ্রকাশ ও শ্যামল গুপ্ত, শব্দ সত্যেন চট্টো, পরিচালনা হরিদাস ভট্টাচার্য। রূপায়ণে জহর, কমল, আশীষ, প্রশান্ত, পূর্ণেন্দু, শিশির বটব্যাল, গঙ্গাপদ, তুলসী চক্র, তুলসী, আশু, শীতল, পঞ্চানন, বেচু, নৃপতি, ডাঃ হরেন, শৈলেন, খগেন, কানন, পদ্মা, মণিকা, তৃপ্তি, সুমনা

ীরা। নেপথ্য কণ্ঠে প্রসূন, কানন, আলপনা। (১০) মামলার ফল (৪ সপ্তাহ) কাহিনী শরৎচন্দ্র, চিত্রনাট্য শৈলজানন্দ, সঙ্গীত বীন চট্টো, আলোকচিত্র বিশু চক্রবর্তী, সম্পাদনা রবীন দাস, শিল্প ার্তিক বসু, শব্দ নৃপেন পাল, দেবেশ ঘোষ, ভূপেন ঘোষ, গান ্রণব রায়, পরিচালনা পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। রূপায়ণে ছবি, জহর, ্সিত, প্রেমাংশু, ভানু, তুলসী, পঞ্চানন, শিবকালী, ধীরাজ, শৈলেন, ্মথ, সুখেন, বিভু, অসিতকুমার, দেবাশীষ, মলিনা, সাবিত্রী, রেণুকা, াণী গাঙ্গুলী, সুদীপ্তা, চিত্রা, মীরা। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, শ্যামল, ন্ধ্যা, আলপনা। (১১) চলাচল (৩ সপ্তাহ কিন্তু ২য় দফে দীর্ঘদিন চলেছিল) কাহিনী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত নির্মল ভট্টাচার্য, আলোকচিত্র অনিল বন্দ্যো ও অজয় মিত্র, সম্পাদনা দুলাল দত্ত, শিল্প বটু সেন, গান অনিল ভট্টা ও শিবদাস বন্দ্যো, শব্দ গৌর দাস ও সত্যেন চট্টো। পরিচালনা অসিত সেন। রূপায়ণে পাহাড়ী, অসিত, নির্মল, প্রভাত, জহর, সমরকুমার, অনিল, খগেন রায়, চন্দ্রা, অরুন্ধতী, তপতী, শুক্লা ও যাদু সম্রাট পি, সি, সরকার। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, শ্যামল, তরুণ, মৃণাল। (১২) পাপ ও পাপী (৫ সপ্তাহ) কাহিনী মুরারি সেন, সঙ্গীত গোপেন মল্লিক ও সুধাংশু দাসগুপ্ত, আলোকচিত্র বিমল মুখো, সম্পাদনা গোবর্ধন অধিকারী, শিল্প গৌর পোদ্দার, শব্দ দুর্গাদাস মিত্র, গান প্রণব রায়, পরিচালনা বিজন সেন। রূপায়ণে পাহাড়ী, নীতীশ, বিকাশ, অসিত, অজিত, আশীষ, নির্মল বসাক, শিশির মিত্র, মুরারি, হরিধন, পঞ্চানন, নৃপতি, ডাঃ হরেন, বেচু, ধীরাজ, মঞ্জু, অনুভা, সবিতা, শ্যামলী, মণিকা ঘোষ, জয়শ্রী। নেপথ্য কণ্ঠে অসিত, সুপ্রীতি, গায়ত্রী, ইরা। (১৩) মানরক্ষা (৪ সপ্তাহ) কাহিনী ৺নারায়ণ ভট্টাচার্য, সঙ্গীত কমল দাশগুপ্ত, আলোকচিত্র বিজয় দে, সম্পাদনা রমেশ যোশী, শিল্প বিজয় বসু, শব্দ বাণী দত্ত, চিত্রনাট্য সংলাপ ও গান প্রণব রায়, পরিচালনা সতীশ দাশগুপ্ত। রূপায়ণে ছবি, ধীরাজ, পাহাড়ী, কমল, নির্মল, ভানু, তুলসী চক্র, হরিধন, নৃপতি, বেচু, প্রীতি, খগেন, ছবি, সবিতা, যমুনা, অপর্ণা, রাজলক্ষ্মী, কেতকী। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, সন্ধ্যা, প্রতিমা। (১৪) একদিন রাত্রে (১১ সপ্তাহ) কাহিনী ও পরিচালনা শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র, সঙ্গীত সলিল চৌধুরী, আলোকচিত্র রাধু কর্মকার, সম্পাদনা মায়েকার ও বসন্ত সুলে, শিল্প আচরেকার, শব্দ আলাউদ্দীন, গান সলিল চৌধুরী ও শৈলেন্দ্র, প্রযোজক ও প্রধানাংশে রাজকাপুর। রূপায়ণে ছবি, পাহাড়ী, প্রদীপ, গঙ্গাপদ, কালী সরকার, তুলসী লাহিড়ী, নেমো, নন্দবাবু, ইফতিকার, বিক্রম কাপুর, মণি চট্টো, কুমার রায় সুমিত্রা, স্মৃতি, সুলোচনা, ডেইজি এবং শ্রীমতী নার্গিস। নেপথ্য কণ্ঠে মান্না, লতা, সন্ধ্যা। (১৫) রাজপথ (৪ সপ্তাহ) কাহিনী-উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সংলাপ উপেন্দ্রনাথ, মন্মথনাথ ঘোষ, সঙ্গীত—শৈলেশ দত্তগুপ্ত ও রায়, আলোকচিত্র বিভূতি দাস, সম্পাদনা সুধীন্দ্র পাল, শব্দ ক্ষেত্র ভট্টাচার্য্য, শিল্প ঈশ্বরপ্রসাদ, গান শৈলেশ রায়, পরিচালনা গুণময় বন্দ্যো। রূপায়ণে অহীন্দ্র, ছবি, জহর, ধীরাজ, নীতীশ, বসন্ত, অসিত, বীরেন, নবগোপাল, শিশির, গুরুদাস, অমর মল্লিক, সন্তোষ, তুলসী, জহর, অজিত, নবদ্বীপ, নৃপতি, হুয়া, কৃষ্ণধন, ধীরাজ, প্রীতি, বিজয়কার্ত্তিক, ডাঃ হরেন, সুখেন, মনোগোপাল, অলোক, মিণ্টু, সত্যব্রত, সুপ্রিয়, মলিনা, চন্দ্রা, সুপ্রভা, পদ্মা, মেনকা, অনুভা, শোভা, ভারতী, শিপ্রা, যমুনা, প্রমীলা, স্বাগতা, সুদীপ্তা, মণিকা ঘোষ, নিভাননী, চিত্রা, শান্তা, মীরা, মনোরমা। নেপথ্য কণ্ঠে অসিত, ধনঞ্জয়, শ্যামল, তরুণ সন্ধ্যা, আলপনা, প্রতিমা, রমা। (১৬) সূর্য্যমুখী (মূল নাম প্রভাতসূর্য) (৮ সপ্তাহ) কাহিনী গজেন মিত্র, অতি: সংলাপ পাঁচুগোপাল মুখো, আলোকচিত্র দেওজীভাই, সঙ্গীত হেমন্ত মুখো, সম্পাদনা কমল গাঙ্গুলী, শব্দ সত্যেন চট্টো, শিল্প গৌর পোদ্দার, গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা বিকাশ রায়। রূপায়ণে ছবি, পাহাড়ী, বিকাশ, অভি, জীবেন, মিহির, ভানু, তুলসী চক্র, হুয়া, পঞ্চানন, খগেন, দেবেন, সৌরীন মৃত্যুঞ্জয়, সমরকুমার, চন্দ্রা, সন্ধ্যারাণী মঞ্জু, ভারতী, অপর্ণা, বাণী গাঙ্গুলী, ছন্দা, রেবা, আশা, সন্ধ্যা, রিক্তা। (১৭) ছায়া সঙ্গিনী (৩ সপ্তাহ) কাহিনী ও গান গৌরীপ্রসন্ন, সঙ্গীত কালিপদ সেন ও বীরেন রায়, সম্পাদনা প্রণব মুখো, শিল্প (নাম নেই), শব্দ নৃপেন পাল, আলোকচিত্র ও পরিচালনা—বিদ্যাপতি ঘোষ। রূপায়ণে ছবি, জহর, বসন্ত, ধীরাজ, শান্তি, বাবুয়া, মলিনা, চন্দ্রা, মঞ্জু, শোভা, অনুভা, অপর্ণা, নিভাননী, আশা, তারা, শান্তা। নেপথ্য কণ্ঠে আলপনা, উৎপলা। (১৮) সাধক রামপ্রসাদ (৮ সপ্তাহ) কাহিনী গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু, সঙ্গীত সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, আলোকচিত্র দিব্যেন্দু ঘোষ, সম্পাদনা নানা বসু, শিল্প ব্রতীন ঠাকুর, শব্দ পরিতোষ বসু, গান রামপ্রসাদ, পরিচালনা বংশী আশ, নাম ভূমিকায় গুরুদাস। রূপায়ণে ছবি জহর, ধীরাজ, মহেন্দ্র, নীতীশ, ...র, অজিত, রবীন, অভি, প্রশান্ত, শিশির মিত্র (প্রযোজক), সমীর, তুলসী, জহর, নবদ্বীপ, নৃপতি, পশুপতি, বাবুয়া, মলিনা, সুনন্দা, পদ্মা, শিখা, অপর্ণা, ...রাণী, কল্পনা, গৌরী। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়। (১৯) গোবিন্দ দাস (৪ সপ্তাহ) কাহিনী নিতাই ভট্টাচার্য, আলোকচিত্র জি, কে, মেহতা, সঙ্গীত কমল দাশগুপ্ত, সম্পাদনা বৈদ্যনাথ চট্টো, শিল্প বিজয় বসু, শব্দ বাণী দত্ত, রঞ্জিত দত্ত, ঋষি বন্দ্যো, গান গোবিন্দ দাস, পরিচালনা—প্রফুল্ল চক্রবর্তী। রূপায়ণে ছবি, পাহাড়ী, কানু, নীতীশ, বসন্ত, সত্য, ভানু, জহর, অজিত, গৌর সী, নৃপতি, বেচু, প্রীতি, মন্মথ, সমীর লাহিড়ী, মঞ্জু, সাবিত্রী, সবিতা, অপর্ণা, করাজী, মীরা, পুরবী। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, প্রতিমা। (২০) মদনমোহন (৬ সপ্তাহ) কাহিনী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, সঙ্গীত প্রফুল্ল ভট্টা ও পরেশ ধর, আলোকচিত্র রমেন পাল, (বিশেষ দৃশ্য প্রবোধ দাস) সম্পাদনা অর্দ্ধেন্দু চট্টো, শব্দ পরিতোষ বসু, শিল্প ৺তারক বসু, গান সুবল দত্ত, সন্তোষ সেন, ফণী নন্দী, পরিচালনা অমল বসু। রূপায়ণে ছবি, পাহাড়ী, নীতীশ, অজিত, শুভেন, মিহির, গঙ্গাপদ, অনুপ, বেচু, পঞ্চানন, ধীরাজ, মনোগোপাল, মলিনা, সবিতা, নমিতা, শ্যামলী। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, শ্যামল, পান্নালাল, বিনয় অধিকারী, মৃণাল, প্রতিমা, গায়ত্রী, বাসন্তী, ডলি। (২১) পুত্রবধূ (৮ সপ্তাহ) কাহিনী সলিল সেনগুপ্ত, আলোকচিত্র বিজয় ঘোষ, সঙ্গীত রাজেন সরকার, সম্পাদনা সন্তোষ গাঙ্গুলী, শিল্প সুধীর খাঁ, শব্দজগন্নাথ চট্টো, নৃত্য বিনয় ঘোষ, গান গৌরীপ্রসন্ন। পরিচালনা—চিত্ত বসু। রূপায়ণে ছবি, উত্তম, আশীষ মুখো, শুভেন, জীবেন, অনুপ, পঞ্চানন, শান্তি, মৃণাল, উৎপল, ছবি, বিভু, চন্দ্রা, মালা, সবিতা, মীরা। নেপথ্য কণ্ঠে মান্না ও সন্ধ্যা। (২২) অপরাজিত (৬ সপ্তাহ) কাহিনী বিভূতিভূষণ,

সঙ্গীত রবিশঙ্কর, আলোকচিত্র সুব্রত মিত্র, সম্পাদনা দুলাল দত্ত, শিল্প বংশী চন্দ্রগুপ্ত, শব্দ দুর্গাদাস মিত্র, পরিচালনা সত্যজিৎ রায়। রূপায়ণে কানু, স্মরণ, পিনাকী, কালী, রমণীরঞ্জন, চারুপ্রকাশ, সুবোধ গাঙ্গুলী, হেমন্ত, কালীচরণ, মণি, লালচাঁদ, পঞ্চানন, অনিল মুখো, হরেন্দ্রকুমার, অজয়, ভাগামু পাণ্ডে, করুণা, রাণীবালা, শান্তি গুপ্তা, সুদীপ্তা, মীনাক্ষী, রেবা। (২৩) যন্ত্র (২ সপ্তাহ) কাহিনী ও প্রযোজনা—অমিতা দেবী, সঙ্গীত রবীন চট্টো, আলোকচিত্র যতীন দাস, সম্পাদনা রমেশ যোশী, শিল্প বটু সেন, শব্দ শচীন চক্রবর্তী, গান প্রণব রায়, পরিচালনা সতীশ দাশগুপ্ত। রূপায়ণে ছবি, রবীন, অসিত, সন্তোষ, শিশির বটব্যাল, নরেশ, ধীরাজ, যতীন, মলিনা, চন্দ্রা, অমিতা, শিখা, মনোরমা, শান্তা, সন্ধ্যা, অঞ্জলি। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, সতীনাথ, তরুণ, দ্বিজেন চৌধুরী, প্রসূন ও সন্ধ্যা। (২৪) দানের মর্যাদা (১ সপ্তাহ) কাহিনী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, পরিবর্ধন ও সংলাপ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আলোকচিত্র সুরেশ দাস, সঙ্গীত গোপেন মল্লিক, রবীন্দ্র সঙ্গীত দ্বিজেন চৌধুরী, সম্পাদনা বৈদ্যনাথ বন্দ্যো, শব্দ পরিতোষ বসু, শিল্প অনিল পাল, গান প্রণব রায়, চারু মুখো ও অরুণ ভট্টা, পরিচালনা সুশীল মজুমদার। রূপায়ণে ছবি, কানু, রবীন, অসিত, বীরেন, মিহির, জীবেন, বীরেশ্বর, অমর মল্লিক, ভানু, নৃপতি, ডাঃ হরেন, তারাকুমার, প্রীতি, ছায়া, সাবিত্রী, আরতি, নমিতা, শুক্লা, নিভাননী, রেখা মল্লিক, শান্তা, করালী। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত, অপরেশ, উৎপলা, আলপনা, সুনন্দা মজুমদার। (২৫) মা (৫ সপ্তাহ) কাহিনী অলকা মুখোপাধ্যায়, আলোকচিত্র জি, কে, মেহতা, সঙ্গীত নির্মল ভট্টা (সহায়তায় বালসারা) সম্পাদনা হরিদাস মহলানবীশ, শিল্প সুনীতি মিত্র, শব্দ মণি বসু, গান অনিল ভট্টা যুগ্ম-পরিচালক প্রভাত মিত্র, পরিচালনা প্রভাত মুখোপাধ্যায়। রূপায়ণে অসিত, শিশির বটব্যাল, পার্থ, চন্দ্রা, অরুন্ধতী, সাবিত্রী, বিনতা, আশা, রেবা, ললিতা। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত, সুপ্রভা, উৎপলা, অরুন্ধতী। (২৬) নাগর দোলা (২ সপ্তাহ) কাহিনী সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত অনুপম ঘটক, আলোকচিত্র সন্তোষ গুহরায়, সম্পাদক বৈদ্যনাথ চট্টো, শিল্প রবীন চট্টো, শব্দ শ্যামসুন্দর ও সুশীল সরকার, গান শান্তি ও পরিমল ভট্ট, সংলাপ ও পরিচালনা অমলেন্দু বসু। রূপায়ণে নীতীশ, রবীন, সত্য, অনুপ, জহর, তুলসী চক্র, নবদ্বীপ, ছায়া, শীতল, পঞ্চানন, রাধারমণ, নারায়ণ, ছবি, পদ্মা, প্রণতি, সবিতা, বিনতা, মেনকা, করালী। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, মিন্টু, সন্ধ্যা, আলপনা। (২৭) শুভলগ্ন (৩ সপ্তাহ) কাহিনী লিলি দেবী, সংলাপ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গীত বীরেন্দ্রকিশোর (গৌরীপুর) আলোকচিত্র জি, কে, মেহতা, সম্পাদনা শ্যাম দাস ও শিব ভট্টা, শিল্প বিজয় বসু, শব্দ বাণী দত্ত, গান প্রণব রায় ও শ্যামল গুপ্ত, পরিচালনা মধু বসু। রূপায়ণে নীতীশ, নির্মল, বীরেন, নবকুমার, গুরুদাস, উৎপল, অজিতপ্রকাশ, অমর মল্লিক, তুলসী লাহিড়ী ডাঃ হরেন, নৃপতি, প্রীতি, নরেশ, ধীরাজ, ছবি ঘোষাল, নরেন, মলিনা, ছায়া, শোভা, প্রণতি, তপতী, শুক্লা বুলবুল, বিভা। (২৮) টাকা-আনা-পাই (৮ সপ্তাহ) কাহিন ও পরিচালনা জ্যোতির্ময় রায়, সঙ্গীত সত্যজিৎ মজুমদার আলোক চিত্র সুহৃদ ঘোষ, সম্পাদনা অর্ধেন্দু চট্টো, শিল্প বটু সেন, শব্দ শচীন চক্রবর্তী, গান জ্যোতির্ময় রায় ও কল্যাণ দাশগুপ্ত। রূপায়ণে ছবি, রবীন, বিকাশ, উৎপল, জীবেন, ভানু, জহর, অনিল, শৈলেন প্রেমতোষ, বাবুয়া, অরুন্ধতী, তপতী, বিনতা, বাণী গাঙ্গুলী, অলকা, গীতা, নেপথ্য কণ্ঠে সতীনাথ, সন্ধ্যা, বিনতা (২৯) শিল্পী (৭ সপ্তাহ) কাহিনী নিতাই ভট্টাচার্য, আলোকচিত্র রামানন্দ সেনগুপ্ত, সঙ্গীত রবীন চট্টো, নৃত্য অনাদিপ্রসাদ, সম্পাদনা কালী রাহা, শিল্প সত্যেন রায়চৌধুরী, শব্দ সত্যেন চট্টো, গান প্রণব রায় পরিচালনা অগ্রগামী। রূপায়ণে পাহাড়ী, কমল, উত্তম, অসিত, কালী, ভূপেন, ডাঃ হরেন, পঞ্চানন, গোকুল, সমরকুমার, মলিনা, সুচিত্রা, শোভা, শিখা, গীতা ও শিল্পী রথীন মৈত্র। (৩০) ধূলার ধরণী (২ সপ্তাহ) কাহিনী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সংলাপ বিধায়ক ভট্টা, সঙ্গীত মানবেন্দ্র মুখো, আলোকচিত্র—সন্তোষ গুহরায়, সম্পাদনা শিব ভট্টা, শিল্প গৌর পোদ্দার, শব্দ গৌর দাস, গান গৌরীপ্রসন্ন ও শ্যামল গুপ্ত, পরিচালনা অর্ধেন্দু সেন। রূপায়ণে ধীরাজ, পাহাড়ী, বিকাশ, অসিত, অজিত, প্রেমাংশু, তরুণ, জহর, তুলসী চক্র, নৃপতি, শীতল, হরিমোহন, ধীরাজ, প্রীতি, অমূল্য, সন্ধ্যারাণী, শোভা, সবিতা, রাজলক্ষ্মী, নিভাননী, রত্না, নমিতা দত্ত। নেপথ্য কণ্ঠে অসিত, মানবেন্দ্র ও সন্ধ্যা। (৩১) সিঁথির সিঁদুর (৪ সপ্তাহ) কাহিনী বিজয় গুপ্ত, আলোকচিত্র সন্তোষ গুহরায়, সঙ্গীত কালিপদ সেন, সম্পাদনা সন্তোষ গাঙ্গুলী, শিল্প সুনীল সরকার, শব্দ গৌর দাস, গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা অর্ধেন্দু সেন। রূপায়ণে ছবি, পাহাড়ী, কমল, অসিত, বীরেন, অনুপ, রাজা, বীরেশ্বর, সন্তোষ, জহর, তুলসী চক্র, নৃপতি, হরিধন, বেচু, ধীরাজ, কবি দাশগুপ্ত, মলয়, অমূল্য, সন্ধ্যারাণী, সাবিত্রী, তপতী, দীপ্তি, রেণুকা, অপর্ণা, রাজলক্ষ্মী, অনুশীলা ও রবার্ট কানিংহাম (হলিউড)। নেপথ্য কণ্ঠে সতীনাথ শ্যামল, সন্ধ্যা, প্রতিমা। (৩২) চোর (৭ সপ্তাহ) কাহিনী মণি সিংহ, পরিবর্ধন প্রবোধ সান্যাল, আলোকচিত্র অমূল্য মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত রবীন চট্টো, সম্পাদনা হরিদাস মহলানবীশ, শিল্প সৌরেন সেন, শব্দ শ্যামসুন্দর ও সুশীল সরকার, নৃত্য বালকৃষ্ণ, গান প্রণব রায়, পরিচালনা কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। রূপায়ণে বিকাশ, জীবেন, প্রেমাংশু, দিলীপ, সত্য, শিশির বটব্যাল, তুলসী, জহর, রঞ্জিৎ, প্রীতি, বেচু, মণি, ছবি, সুখেন, গুম, সন্ধ্যারাণী, ছন্দা, ইরা, গীতা, চিত্রা, আশা, মনোরমা। (৩৩) আমার বৌ (৫ সপ্তাহ) কাহিনী ও পরিচালনা খগেন রায়, আলোকচিত্র দিব্যেন্দু ঘোষ, সঙ্গীত অনুপ সরকার ও বিনয় চট্টো, সম্পাদনা সুকুমার মুখো, শব্দ পরিতোষ বসু, শিল্প নিশীথ সেন, গান গৌরীপ্রসন্ন ও সন্তোষ সেন। রূপায়ণে ধীরাজ, কমল, বিকাশ, ভানু, জহর, তুলসী চক্র, তুয়া, হরিধন, পশুপতি, মৃত্যুঞ্জয়, সুচিত্রা, রেণুকা, সুমনা, মিত্রা, আরতি দাস, রাজলক্ষ্মী, সন্ধ্যা, অমলা, শান্তা, কলিন অলিভার। (৩৪) নবজন্ম (৭ সপ্তাহ) কাহিনী আশাপূর্ণা দেবী, সঙ্গীত নচিকেতা ঘোষ, আলোকচিত্র বিশু চক্রবর্তী, অতিঃ চিত্রায়ণে জি, কে, মেহতা, বিদ্যাপতি ঘোষ ও বিমল মুখোঃ সম্পাদনা গোবর্ধন অধিকারী, শিল্প সৌরেন সেনের তত্ত্বাবধানে পুলিন ঘোষ ও গোপী সেন, শব্দ শ্যামসুন্দর ঘোষ, অতিঃ গান গৌরী প্রসন্ন, পরিচালনা দেবকীকুমার। রূপায়ণে জহর, উত্তম, অজিত, ভূপেন, শিশির বটব্যাল, তুলসী লাহিড়ী, গোকুল, বিভু, বাবুয়া,

তিলক, অরুন্ধতী, সাবিত্রী, সবিতা, মিতা, বাণী গাঙ্গুলী, নিভাননী, আশা, মনোরমা। নেপথ্য যন্ত্রে আলী আকবর। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, উত্তম, মানবেন্দ্র, সন্ধ্যা, ছবি। (৩৫) কাবলিওয়ালা (১৩ সপ্তাহ) কাহিনী রবীন্দ্রনাথ, অতিঃ সংলাপ প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঙ্গীত রবিশঙ্কর, রবীন্দ্র সঙ্গীত দ্বিজেন চৌধুরী, নৃত্য মাধবী চট্টোপাধ্যায়, আলোকচিত্র অনিল বন্দ্যোঃ, সম্পাদনা সুবোধ রায়, শিল্প সুনীতি মিত্র, শব্দ মণি বসু ও অতুল চট্টোঃ, গান রবীন্দ্রনাথ, পরিচালনা তপন সিংহ। প্রধানাংশে ছবি বিশ্বাস ও টিঙ্কু ঠাকুর। রূপায়ণে রাধামোহন, কালী, জীবেন, অতনু, কৃষ্ণধন, জহর, ধীরাজ, পারিজাত, নৃপতি, প্রীতি, মঞ্জু, শ্রাবণী, করালী, আশা, নেপথ্য কণ্ঠে দেবযানী বনশ্রী, মালবিকা ও শুক্লা। (৩৬) হারজিৎ (৫ সপ্তাহ) কাহিনী প্রেমেন্দ্র মিত্র, চিত্রনাট্য ও সংলাপ পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও প্রণব রায়, সঙ্গীত রবীন চট্টোঃ, আলোকচিত্র বিভূতি চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক দুলাল দত্ত, শিল্প সুনীল সরকার, শব্দ ইরাণী, গান প্রণব রায়, পরিচালনা মানু সেন। রূপায়ণে পাহাড়ী, কমল, উত্তম, বসন্ত, বীরেন, জীবেন, সন্তোষ, জয়নারায়ণ, অনুপ, তুলসী চক্র, নৃপতি, ছয়া, ধীরাজ, বাবুয়া, মলিনা, অনিতা, স্বাগতা, সুজাতা। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, শ্যামল, এ, কানন, প্রসূন, সন্ধ্যা গায়ত্রী। (৩৭) মধুমালতী (৪ সপ্তাহ) কাহিনী প্রমথেশ বড়ুয়া, প্রযোজনা যমুনা বড়ুয়া, পরিবর্ত্তন ও সংলাপ নিতাই ভট্টাঃ, সঙ্গীত কমল দাশগুপ্ত, আলোকচিত্র সুহৃদ ঘোষ, সম্পাদনা রাসবিহারী সিংহ, শিল্প বিজয় বসু, শব্দ ইরাণী ও শিশির চট্টো, গান প্রণব রায়, পরিচালনা নী[illegible] লাহিড়ী। রূপায়ণে জহর, নীতীশ, অভি, বসন্ত, অমর মল্লিক, শিশির মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র, ভানু, নৃপতি, প্রীতি, ধীরাজ, ইরাণী, কাবেরী, নমিতা। নেপথ্য কণ্ঠে এ কানন, প্রসূন ও সন্ধ্যা। (৩৮) শেষ পরিচয় (৬ সপ্তাহ) কাহিনী ও গান কবি বিমল ঘোষ, আলোকচিত্র দেওজীভাই, সঙ্গীত হেমন্ত মুখোঃ, সম্পাদনা দুলাল দত্ত, শিল্প সুনীল সরকার, শব্দ শিশির চট্টোঃ, পরিচালনা সুশীল মজুমদার। রূপায়ণে ছবি, পাহাড়ী, কানু, কমল, বিকাশ, বসন্ত, প্রেমাংশু, জীবেন, ভানু, জহর, নৃপতি, তুলসী, প্রীতি, কৃষ্ণধন, বেচু, চন্দ্রশেখর, শৈলেন, তারাকুমার, ছায়া, সাবিত্রী, তপতী, মিত্রা, অপর্ণা, নমিতা, নিভাননী, স্বরূপ, শান্তা ও বিপিন গুপ্ত। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত ও লতা। (৩৯) বড়দিদি (৭ সপ্তাহ) কাহিনী শরৎচন্দ্র, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ও বিধায়ক, সঙ্গীত অনিল বাগচী, সম্পাদনা কমল গাঙ্গুলী, শিল্প কার্তিক বসু, শব্দ বাণী দত্ত, গান শ্যামল গুপ্ত, আলোকচিত্র ও পরিচালনা অজয় কর। রূপায়ণে ছবি, ধীরাজ, পাহাড়ী, উত্তম প্রশান্ত, অনুপ, জীবেন, তুলসী, নৃপতি, শিবকালী, প্রীতি, শীতল, খগেন, অসিত, শ্যামল, সজল, ছায়া, সন্ধ্যারাণী, মঞ্জু, তপতী, দীপ্তি, মেনকা, মণিকা ঘোষ, সন্ধ্যা, শান্তা, রূপা। (৪০) ঘুম (৫ সপ্তাহ) কাহিনী মণি বর্মা, সঙ্গীত শচীন গুপ্ত, আলোকচিত্র বিভূতি চক্রবর্ত্তী, সম্পাদনা দুলাল দত্ত, শিল্প সুনীল সরকার, শব্দ শ্যামসুন্দর ঘোষ, গান পুলক বন্দ্যোঃ, পরিচালনা শ্রীতারাশঙ্করের উপদেশনায় অগ্রণী। রূপায়ণে ছবি, জহর, অসিত, প্রবীর, দীপক, ভানু, সন্তোষ, অমর বিশ্বাস, জ্যোতির্ময়, ম্যালকম, ধীরাজ, বাবুয়া, সন্ধ্যারাণী, মঞ্জু, শোভা, সবিতা, রেণুকা, রাজলক্ষ্মী, আশা। নেপথ্য কণ্ঠে সন্ধ্যা, আলপনা। (৪১) বড়মা (৪ সপ্তাহ) কাহিনী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, আলোকচিত্র বিশু চক্রবর্ত্তী, সঙ্গীত পবিত্র চট্টোঃ, সম্পাদনা অর্দ্ধেন্দু চট্টোঃ, শিল্প কার্তিক বসু, শব্দ রঞ্জিত দত্ত, গান প্রণব রায়, পরিচালনা নীরেন লাহিড়ী। রূপায়ণে ছবি, জহর, নীতীশ, বিকাশ, ভানু, তুলসী, কৃষ্ণধন, প্রীতি, ধীরাজ, গোকুল, দ্বিজু, তিলক, সরযু, সন্ধ্যারাণী, দীপ্তি, জ্ঞানদা, রমা, শান্তা, করালী। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত, ধনঞ্জয়, হীরাবাঈ, ও লতা। (৪২) সিঁদুর (৫ সপ্তাহ) কাহিনী রুবেন রায়, চিত্রনাট্য নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, সঙ্গীত রবীন চট্টোঃ, আলোকচিত্র দেওজীভাই, সম্পাদনা বৈদ্যনাথ চট্টোঃ, শিল্প সত্যেন রায়চৌধুরী, শব্দ সত্যেন চট্টোঃ, গান কবি বিমল ঘোষ, পরিচালনা সুধীর মুখোঃ! রূপায়ণে পাহাড়ী, কমল, বিকাশ, রবীন, প্রেমাংশু, জীবেন, অমর মল্লিক, তুলসী চক্র, নৃপতি, বাণীবাবু শীতল, শৈলেন, সন্ধ্যারাণী, মঞ্জু, মানসী, রেবা, রাজলক্ষ্মী, আশা, চিত্রা, অমলা। নেপথ্য কণ্ঠে—শ্যামল, সন্ধ্যা, প্রতিমা। (৪৩) উল্কা, কাহিনী—নীহার গুপ্ত, আলোকচিত্র—জি, কে, মেহতা, সঙ্গীত—সুধীন দাশগুপ্ত, সম্পাদনা—অর্দ্ধেন্দু চট্টো, শিল্প—বটু সেন ও শিব ভৌমিক, শব্দ—সুশীল সরকার, গান—গৌরীপ্রসন্ন ও কানু ঘোষ, পরিচালনা—নরেশচন্দ্র। প্রধানাংশে—সত্য বন্দ্যো। রূপায়ণে—কমল, বীরেশ্বর, বীরেন, জীবেন, অনিল, অনুপ, তুলসী লাহিড়ী, জহর, ডাঃ হরেন, দেবেন, রাধারমণ, শৈলেন, সুনন্দা, সবিতা, যমুনা, জয়শ্রী, সন্ধ্যা নৃত্যে লীনা-লীজ। নেপথ্য যন্ত্রে ইমারত হোসেন ও বিলায়েৎ হোসেন। নেপথ্য কণ্ঠে সন্ধ্যা, আলপনা, গায়ত্রী। (৪৪) রাত্রি শেষে (৩ সপ্তাহ) কাহিনী মাণিক গুহরায়, সঙ্গীত আলি আকবর, সম্পাদনা শিব ভট্টা, শব্দ ইরাণী, শিল্প গৌর পোদ্দার, নৃত্য বিনয় ঘোষ, গান শ্যামল গুপ্ত ও বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, আলোকচিত্র ও পরিচালনা সন্তোষ গুহরায়। রূপায়ণে পাহাড়ী, [illegible] অসিত, কালী, সত্য, অনুপ, জহর, শীতল, ছবি, দেবাশীষ, পদ্মা, সন্ধ্যারাণী, বাণী গাঙ্গুলী, রেণুকা, শ্যামলী, রাজলক্ষ্মী, রমা, কমলা, চিত্রা। নৃত্যে মায়া ও সীমা। নেপথ্য যন্ত্রে নিখিল, সাগিরুদ্দীন, আশীষ, বালসারা, শিশিরকণা। নেপথ্য কণ্ঠে সতীনাথ, মানবেন্দ্র, আলপনা। (৪৫) একতারা কাহিনী প্রতিভা বসু, সঙ্গীত অনুপম ঘটক, আলোকচিত্র দীনেন গুপ্ত, সম্পাদনা অর্দ্ধেন্দু চট্টো, শিল্প কার্তিক বসু, শব্দ সত্যেন চট্টো ও দুর্গাদাস মিত্র, গান ও পরিচালনা হীরেন বসু। রূপায়ণে ছবি, কানু, প্রবীর, সন্তোষ, কৃষ্ণচন্দ্র, ভানু, তুলসী চক্র, হরিধন, নৃপতি, রঞ্জিৎ, বেচু, শ্যামল, মলিনা, পদ্মা, সাবিত্রী, সবিতা, মেনকা, রাজলক্ষ্মী, আশা, সীমা, বুলবুল। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, শ্যামল, পান্নালাল, মানবেন্দ্র, সন্ধ্যা, প্রতিমা, গায়ত্রী, ছবি, আলপনা, নীলিমা, কৃষ্ণা, রাধারাণী। (৪৬) অমর সায়গল (১ সপ্তাহ) কাহিনী বিনয় চট্টো, আলোকচিত্র নির্মল দে, সংলাপ নটবর, সঙ্গীত পঙ্কজ, তিমির, রাইচাঁদ, অপরেশ, সম্পাদনা হরিদাস মহলানবীশ, শিল্প সুনীতি মিত্র, শব্দ (নাম নেই) পরিচালনা নীতীন বসু। নাম ভূমিকায় মুখেরী। রূপায়ণে পাহাড়ী, হাফেসজী ট্যাণ্ডন, কাপুর, পদ্মা, আখতার জাহান, অনুশীলা, রমা। (৪৭) তাপসী কাহিনী মণি বর্মা, সঙ্গীত নচিকেতা ঘোষ, আলোকচিত্র রামানন্দ সেনগুপ্ত, সম্পাদনা বৈদ্যনাথ চট্টো, শিল্প সুবোধ দাস ও মদন গুপ্ত, শব্দ নৃপেন পাল ও দেবেশ ঘোষ, গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা চিত্ত বসু। রূপায়ণে অহীন্দ্র, ছবি, জহর, পাহাড়ী, কমল,

অসিত, অজিত, দীপক, বীরেন, শিশির বটব্যাল, শুভেন, অনুপ, পরিমল, পঞ্চানন, নৃপতি, প্রীতি, বেচু, শান্তি, বিদু, মলিনা, চন্দ্রা, সন্ধ্যারাণী, সবিতা, বনানী, রেণুকা, রেবা, আশা, করালী, রূপা, গীতা। নেপথ্য কণ্ঠে শচীন, আলপনা, গায়ত্রী, প্রতিমা। (৪৮) পঞ্চতপা কাহিনী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত নির্মল ভট্টাচার্য ও বালসারা, আলোকচিত্র অজয় মিত্র, সম্পাদনা তরুণ দত্ত, শিল্প এস, রামচন্দ্র, শব্দ বাণী দত্ত, গান শ্যামল গুপ্ত, পরিচালনা অসিত সেন। রূপায়ণে পাহাড়ী, কমল, অসিত, প্রশান্ত, পারিজাত, অমৃত, মৃণাল, চন্দ্রা, পদ্মা, অরুন্ধতী, শুক্লা, সীতা ও বিভাস সোম। নেপথ্য কণ্ঠে সন্ধ্যা। (৪৯) আঁধারে আলো কাহিনী শরৎচন্দ্র, অতি সংলাপ সজনীকান্ত, সঙ্গীত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, আলোকচিত্র জি-কে মেহতা, সম্পাদনা দুলাল দত্ত, শব্দ দেবেশ ঘোষ, শিল্প সত্যেন রায়চৌধুরী, গান শ্যামল গুপ্ত, পরিচালনা হরিদাস ভট্টাচার্য। রূপায়ণে বিকাশ, বসন্ত, জীবেন, অমর মল্লিক, ভানু, তুলসী চক্র, অজিত ছয়া, পদ্মা, সুমিত্রা, যমুনা, নীলিমা। নেপথ্য কণ্ঠে মানবেন্দ্র ও সন্ধ্যা।

এ বছর যে সব নতুন মুখের সন্ধান পাওয়া গেল তাঁদের মধ্যে—আশীষ মুখোপাধ্যায়, অমৃত দাশগুপ্ত, পরিমল সেন, দ্বিজু ভাওয়াল, স্মরণ ঘোষাল, পিনাকী সেনগুপ্ত, শ্রীমান্ তিলক, শ্রীমান্ শুম, চারুপ্রকাশ ঘোষ, রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত, অজয় মিত্র, সুবোধ গাঙ্গুলী, শ্রীমান্ পার্থ, স্বরূপ মুখোপাধ্যায়, শম্ভু চট্টোপাধ্যায়, নির্মল বসাক, মলয় বিশ্বাস, উজ্জ্বলকুমার, টিঙ্কু ঠাকুর, শুক্লা সেন, অলকা সেন, গীতা দে, মানসী চট্টোপাধ্যায়, সুজাতা দেবী, শ্রাবণী চৌধুরী, সীতা সেনগুপ্ত, কুমারী ললিতা, জ্ঞানদা কাকোতি, মীরা রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

যে সকল কৃতী শিল্পীদের বেশ কিছুদিন বাদে বাঙলা ছবিতে অভিনয় করতে দেখা গেল তাঁদের মধ্যে মহেন্দ্র গুপ্ত, রাধামোহন ভট্টাচার্য, অভি ভট্টাচার্য, বিপিন গুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র দে, বিপিন মুখোপাধ্যায়, ভূপেন চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বর সেন, দিলীপ চৌধুরী, সবিতাব্রত দত্ত, অবিনাশ দাস, সমরকুমার, মনোগোপাল, তারাকুমার ভাদুড়ি, রাজা মুখোপাধ্যায়, ম্যালকম, জ্যোতির্ময়কুমার, প্রেমতোষ রায়, নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, মালা সিন্‌হা, বনানী চৌধুরী, স্মৃতিরেখা বিশ্বাস, মণিকা গাঙ্গুলী, অনিতা গুহ, বিনতা রায়, আরতি মজুমদার, শিখারাণী বাগ, পূর্ণিমা দেবী, অমিতা দেবী, ছন্দা দেবী, মণিকা ঘোষ, রমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

এ বছর যাঁরা নতুন পরিচালকরূপে এ জগতে প্রবেশ করলেন তাঁদের নাম—শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র, অমিত সেন, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাপতি ঘোষ, অগ্রণী, সন্তোষ গুহরায় ও অমলেন্দু বসু।

অভিনয়শিল্পী সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, সিধু গাঙ্গুলী, আশু বসু, সঙ্গীত পরিচালক অনুপম ঘটক এবং পরিচালক জ্ঞান মুখোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্তী প্রভৃতি এ বছর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সাপ্তাহিক স্থায়িত্বের দিক দিয়ে এ বছর প্রথম স্থান লাভ করেছে কাবলিওয়ালা ১৩ সপ্তাহ, দ্বিতীয়—একদিন রাত্রে ১১ সপ্তাহ এবং তৃতীয়—শ্যামলী ১০ সপ্তাহ।

পরিচালকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছবি উপহার দিয়েছেন মধু বসু, চিত্ত বসু ও নীরেন লাহিড়ী (প্রত্যেকে তিনখানি করে)।

মোট ছবিগুলির মধ্যে সব চেয়ে বেশী ছবিতে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথম তিন জন হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস (২৫) খানি, পাহাড়ী সান্যাল, (২১ খানি) ও তুলসী চক্রবর্তী (১৯ খানি) এবং অভিনেত্রীদের মধ্যে মলিনা দেবী (১৬ খানি) সন্ধ্যারাণী ও সবিতা চট্টো (১৩ খানি) এবং চন্দ্রাবতী, পদ্মা দেবী ও আশা দেবী (১১ খানি)।

এ বছর পর্দার বুকে বারেকের তরে দেখা দিলেন যাদুসম্রাট পি-সি সরকার, বিখ্যাত শিল্পী রথীন মৈত্র, হলিউডের রবার্ট ক্যানিং হাম ও আলোকচিত্রী বিভাস সোমকে!

এইবার আমরা এ বছরের ছবিগুলির নামোল্লেখ করে চিহ্ন দ্বারা তাদের শ্রেণী নির্ণয় করার চেষ্টা করে এই আলোচনা শেষ করি।

১। চিরকুমার সভা * * *
২। পরাধীন * * *
৩। একটি রাত * * *
৪। মহাকবি গিরিশচন্দ্র * * *
৫। অসমাপ্ত * *
৬। শঙ্করনারায়ণ ব্যাঙ্ক * * *
৭। শ্যামলী *
৮। ত্রিযামা * *
৯। আশা * *
১০। মামলার ফল * *
১১। চলাচল *
১২। পাপ ও পাপী * * *
১৩। মানবক্ষা * * *
১৪। রাজপথ * *
১৫ একদিন রাত্রে *
১৬। সূর্যমুখী * *
১৭। ছায়া সঙ্গিনী * * *
১৮। সাধক রামপ্রসাদ * *
১৯। গোবিন্দদাস * * *
২০। মদনমোহন * * *
২১। পুত্রবধু * *
২২। অপরাজিত * *
২৩। ফল্গু * * *
২৪। দানের মর্যাদা * *
২৫। মা * *
২৬। নাগরদোলা * * *
২৭। শুভলগ্ন * * *
২৮। টাকা-আনা-পাই *
২৯। শিল্পী * *
৩০। দুলার ধরণী * * *
৩১। সিঁথির সিঁদুর * * *
৩২। চোর *
৩৩। আমার বৌ * * *
৩৪। নবজন্ম * *
৩৫। কাবলিওয়ালা *
৩৬। হারজিৎ * * *
৩৭। মধুমালতী * * *
৩৮। শেষ পরিচয় *
৩৯। বড়দিদি * *
৪০। ঘুম * * *
৪১। বড় মা * * *
৪২। সিঁদুর * *
৪৩। উল্কা * *
৪৪। রাত্রি শেষে * * *
৪৫। একতারা * * *
৪৬। অমর সায়গল * * *
৪৭। তাপসী * *
৪৮। আঁধারে আলো *
৪৯। পঞ্চতপা *

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

নৃত্যপটীয়সী অভিনেত্রী শ্রীমতী জয়শ্রী সেন

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী সপ্তাহ চলছে। এ সপ্তাহে শিল্পীদের যোগাযোগ করা একটা দুরূহ ব্যাপার! কিন্তু এদিকে মাসিক বসুমতীর চলচ্চিত্র সম্পর্কে মতামত লিখবার জন্ম তাগিদ পাচ্ছি, কপি না দিলেই নয়। তাই এবারে ঠিক করলুম দক্ষিণ-কলকাতার কোন শিল্পীর কাছে না গিয়ে মধ্য কলকাতায় যে ক'জন শিল্পী থাকেন, তাঁদের সন্ধান করবো!

বর্ত্তমান কালে অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের যে কয়জন নৃত্যপটীয়সী অভিনেত্রী রূপালী পর্দায় দেখা যায় তাদের মধ্যে শ্রীমতী জয়শ্রী সেন অন্যতমা। সম্প্রতিক কালে মঞ্চ ও পর্দায় যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছেন। নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' ছবিতে 'মাফিনের' ভূমিকায় অভিনয় করে ইনি সুনাম তো অর্জ্জন করেছেনই, প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী বলেও সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করেছেন। এরই ভেতর একদিন সকালে শ্রীমতী জয়শ্রীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করলুম। আগে থেকেই খবর দেওয়া ছিল। শ্রীমতী সেনের বাড়ী খুঁজে পেতে একটু দেরী হয়ে গেল। ছুটীর দিন ভেবেছিলুম হয় তো শ্রীমতী সেনকে বাড়ীতে পাবো না। যাক, সরাসরি শ্রীমতী জয়শ্রীর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলুম, উপরে উঠতেই সামনে দেখি শ্রীমতী জয়শ্রী সাদাসিধে পোষাকে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার উদ্দেশ্যের কথা বলতেই একটু হেসে তাঁদের ড্রয়িং রুমে নিয়ে আমাকে বসালেন। তাঁর বসবার ঘরটিতে ঢুকেই মনে হ'লো সত্যিকারের শিল্পীর ঘর। চার দিকেই দেখতে পেলুম সাজান, সব কিছু সুরুচির পরিচায়ক।

প্রাথমিক পরিচয় আদান-প্রদানের পরেই সুরু হলো আমাদের আলাপ আলোচনা। শ্রীমতী জয়শ্রী বলতে থাকেন, ১৯৫৩ সালের 'আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ' ছবিতে আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ। শ্রীবিজন সেন এ ছবিখানি পরিচালনা করেন। তারপর অনেক ছবিতে ও বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে আসছি। যখন যে-ভূমিকায় অভিনয় করেছি সে-ভূমিকাতেই আনন্দ পেয়েছি। তবে বিশেষ ভাবে যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলবো, নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত 'কাজরী' ছবিতে ডালিয়ার ভূমিকায় এবং নরেশ মি: পরিচালিত 'উল্কা' ছবিতে মাফিনের অংশে অভিনয় করে তৃপ্তি পেয়েছি প্রচুর।

চলচ্চিত্র জগতে আপনার যোগদানের কারণ কি এবং এ লাইনে আসতে প্রথম প্রেরণা আপনি কি ভাবে পান, জিজ্ঞেস করলুম আমি। শ্রীমতী জয়শ্রী সেন স্পষ্ট ভাষায় উত্তর করলেন, ছোটবেলা থেকেই অভিনয় ও নৃত্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। শুধু তাই নয়, শিশুকাল থেকে আমার স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে অভিনয় করবো, বড় হ'বো। ছোটবেলা গ্রামোফোনে গান হলে সঙ্গে সঙ্গে আমি নাচতুম। আমার এই আগ্রহ দেখে আমার মা আমাকে একটি গ্রামোফোন কিনে দিয়েছিলেন। চলচ্চিত্রে ও মঞ্চে যোগদান করতে আমার মা আমাকে উৎসাহিত করেন। তিনি নাচ, গান ও অভিনয় ভালবাসেন। মায়ের উৎসাহ ও আগ্রহেই আমি এ-লাইনে এসেছি, এ কথাটি বলতে আমার কোনই দ্বিধা নেই। ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর আমার সামাজিক কি পারিবারিক জীবনে কোনই পরিবর্ত্তন আসেনি, এটুকু স্পষ্ট ভাবেই আমি বলতে পারি।

দৈনন্দিন কর্ম্মসূচীর কথা জিজ্ঞেস করলে শ্রীমতী জয়শ্রী বললেন, মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের মেয়েদের জীবন যে ভাবে কাটে আমার বেলাতেও তার ব্যতিক্রম নাই। সকালে ঘুম থেকে উঠে শিক্ষণীয় যে সকল পুঁথিপুস্তক আছে তা পাঠ করি, তার পর নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করি। ব্যায়ামের শেষে চা করে আমি সকলকে পরিবেশন করি ও বাবা, মা, ভাই, বোন সকলের সঙ্গে একত্র বসে চা-খাবার খাই। চায়ের পর্ব্ব শেষ হলে যেদিন স্যুটিং থাকে না সেদিন রান্নাবান্নায় সাহায্য করি। দুপুর বেলা বই পড়ি। বিকেলে নাচ শিখতে যাই। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে সংসারের কাজে সাহায্য করে থাকি। রাত্রিতে আবার পড়াশুনো করি। বাড়ীর মেয়েরা যে সকল কাজ করে আমিও সেগুলো করে থাকি প্রায় প্রত্যহই। পুঁথি-পুস্তক পড়া সম্পর্কে ঐতিহাসিক গল্পের বই পড়তেই আমার ভাল লাগে। খেলাধূলোর মধ্যে ব্যাডমিণ্টন খেলাকে আমি ভালবাসি, তবে ফুটবল খেলা দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। পত্র-পত্রিকার মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্র সিনেমা সংক্রান্ত পত্রিকাগুলি আমি নিয়মিত পাঠ করে থাকি। কবিতা লেখা আমার অভ্যাস আছে এবং মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকাগুলিতে উহা কিছু প্রকাশিতও হ'য়েছে।

পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলবো সাদাসিদে ধরণের পোষাকই আমার পছন্দ। আমি নিজে সাদা পোষাকই পছন্দ করি।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন, প্রশ্ন করলুম আমি।

শ্রীমতী জয়শ্রী সেন স্পষ্ট গলায় বললেন, চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে সুচেহারা, সুকণ্ঠ, অভিনয়-দক্ষতা, নাচগান ইত্যাদি জানা একান্ত প্রয়োজন। এর সাথে চাই উত্তম বাচনভঙ্গী। আর ভাল ছবি করতে হ'লে চাই ভাল গল্প বা কাহিনী, সুদক্ষ পরিচালক এবং তার সঙ্গে টিম ওয়ার্কটিও ভাল হওয়া চাই। আমার মতে শিক্ষামূলক ছবি তৈরী করতে হবে, যাতে সত্যিকারের সমাজের উন্নতি সাধিত হয়।

শিল্পীদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা ও শরীরের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক কি?

শ্রীমতী জয়শ্রী সেন

শ্রীমতী জয়শ্রী দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করলেন নিশ্চয়ই। বোধ হয় এর চাইতে বড় প্রয়োজন শিল্পীদের আর থাকতে পারে না। চলচ্চিত্রে বাঙ্গালী বিশেষ করে অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েদের আরও অধিক সংখ্যায় যোগদান করা উচিত। ভদ্র ও শিক্ষিত ঘরের ছেলেমেয়েরা এ লাইনে এলে এ শিল্পের আরও উন্নতি হবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। এ সম্পর্কে আরও একটি কথা বলতে চাই বর্তমান যুগে চলচ্চিত্রের ক্ষমতা অপরিসীম। এর চাইতে শিক্ষার মাধ্যম ও প্রভাব আজকালের দিনে আর কিছুতে তেমন দেখা যায় না। সরকার এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন বা দিচ্ছেন। পুরোপুরি ভাবে সরকারী সাহায্য পেলে এ শিল্পের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হবে। অবশ্য এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, আজকাল যে সকল ছবি তৈরী হচ্ছে সে ছবিগুলো সবই ভাল। দিন দিন আরও ভাল ছবি তৈরী হবে।

এ ভাবে আমার আলোচনা প্রায় শেষ পর্য্যায়ে এসে পৌঁছুলো। দেখলুম শ্রীমতী জয়শ্রীর এ শিল্পের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ও শেখবার আগ্রহ প্রচুর। সত্যিকারের শিল্পীর যে সাধনা সেই সাধনাই করে চলেছেন ইনি। বয়সে নবীনা হলেও এঁর চেষ্টা, উদ্যম ও নিষ্ঠা সত্যই প্রশংসনীয়। আমাদের আলোচনার মাধ্যমে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলুম তাঁর আগ্রহ ও নিষ্ঠা এ শিল্পের প্রতি।

এ বারে আমি আমার শেষ প্রশ্নটি শ্রীমতী জয়শ্রীর কাছে তুলে ধরলুম—আপনার প্রথম জীবন কি ভাবে কাটে এবং ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে কাটাতে চান?

শ্রীমতী জয়শ্রী বলে চললেন, পূর্ব্ব-বাঙ্গালার ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জে আমাদের পৈত্রিক বাড়ী কিন্তু ঢাকা সহরেই আমরা বাস করতুম। আমার বাবা ছিলেন ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক। ঢাকা কমরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ে আমি পড়তুম এবং সেখান থেকেই আমি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিই। তার পর ১৯৫০ সালে দাঙ্গার সময় আমরা কলকাতায় চলে আসি এক রকম রিক্ত হস্তে বলতে পারেন। ১৯৫২ সালে আমি রেডিওতে যোগ দিই এবং অভিনয় করি। ঢাকায় থাকতেই আমি নাচ শিখি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিই। ঢাকাতে বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে যোগদান করে সুনামও অর্জ্জন করেছিলুম প্রচুর। ১৯৫৩ সালে চলচ্চিত্রে যোগ দিই এবং মঞ্চে যোগ দিই ১৯৫৪ সালে। ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না, তবে শিল্পী আমি, শিল্পের ভিতরে আত্মনিয়োগ করে সকলকে আনন্দ দিতে চাই। সত্যিকারের শিল্পী-জীবন যাপনই আমার একমাত্র কাম্য।

কোনো এক বর্ষার রাত্রে

অরুণাচল বসু

এখন হয়তো মেতেছে কোথাও অরণ্য :
এই বর্ষার ধারা ঝর্ঝরে
কোনো পাহাড়ের বাঁকা নির্ঝরে
নেমেছে বন্যা, কলরোলে তার
রাত্রির কানে সঙ্গীত বোনে ছল্‌ছল্ সুর ;
বনের চরণে দিগন্তময় বেজেছে নূপুর।
ভেজা-পাখি জাগে কঠিন রাত্রি,
চকিত হরিণী হয়রাণ হ'লো ; শিকারী বাঘের
চোখে ঠিকরায় কোথাও আগুন ;
মৌচাকে চুপ ভীরু গুন্‌-গুন্,
সাপের খোপরে বেদে ; জলধারা তাড়া করে যায়,
কোথাও ময়ূরী পেখম তুলেছে ঝড়ের হাওয়ায়,
অরণ্য দোলে, দোলে শ্যাম দেশ
স্বপ্নের কেশ এলানো দু'চোখে বন-কন্যার—
ভিজে-হাওয়া বেয়ে হৃদয় আমার
উড়ন্ত তাই,
বুকে বর্ষার আরণ্য স্বর :

পৃথিবীতে আজ আর কিছু নাই, আর কিছু নাই

আপনার বাড়ীর জন্যে সুন্দর একটি ন্যাশনাল-একো রেডিও কিনুন

আজই ন্যাশনাল-একো বিক্রেতাকে বিনা খরচায় বাজিয়ে শোনাতে বলুন। এখানে সব নীট দাম দেওয়া হলো—এর ওপর স্থানীয় কর লাগবে।

দেশের ঘরে ঘরে **ন্যাশনাল-একো** রেডিও গান-বাজনা ও আনন্দের ঢেউ এনে দিচ্ছে—আপনিও একটি **ন্যাশনাল-একো** রেডিও রেখে এই আনন্দের আসরে যোগ দিন। ১৯৫৲ টাকা থেকে ১২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পছন্দসই বারো রকমের মডেল আছে।

ন্যাশনাল-একো রেডিও
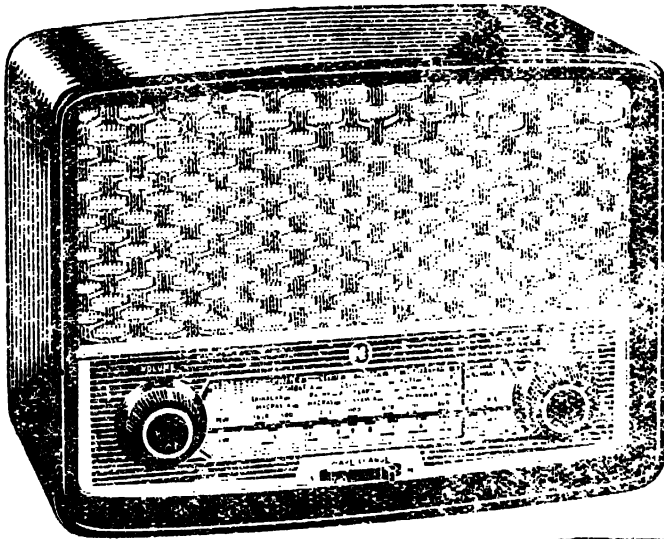
মডেল ২৪১ : ৫ ভাল্ব, এসি/ডিসি সেট। ৪ ভাল্বের ড্রাই ব্যাটারী সেট। মধ্য ওয়েভ ধরা যায়। দাম ১৯৫৲ টাকা

মডেল ২৭০/১ :—'নিউ কুমার' ৫ ভাল্ব, ৩ ব্যাণ্ড··· পরিবর্তনযোগ্য টোন-কণ্ট্রোল, বড় টিউনিং স্কেল, বড় ক্যাবিনেট। মডেল এ-২৭০/১ এসি; মডেল ইউ-২৭০/১ এসি বা ডিসি। দাম ৩০০৲ টাকা।
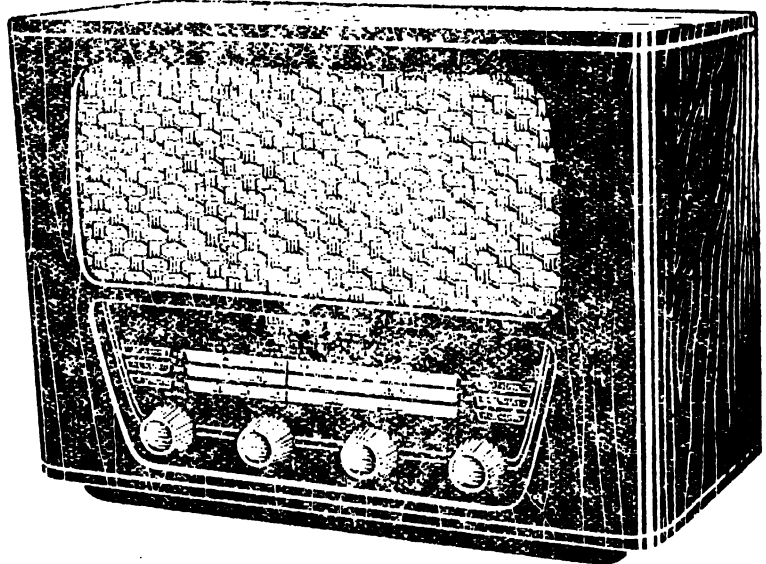
(R.A.) জেনারেল রেডিও এণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা - বোম্বাই - মাদ্রাজ - বাঙ্গালোর - দিল্লী

হিন্দী—চলবে না

"সরকারী ভাবে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা না হইলেও বে-সরকারী সূত্রে রিপোর্টের সুপারিশের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছুটা আভাস ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, কমিশন ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হিন্দীকে ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারী ভাষারূপে চালু করার সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু কমিশনের দুই জন সদস্য—ডাঃ পি সুব্বারায়ণ এবং ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সুপারিশের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংরাজীকে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের পরও ভারতের সরকারী ভাষারূপে চালু রাখা উচিত। ভারতীয় সংবিধানে অবশ্য ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে চালু করার নির্দেশ ছিল—কিন্তু ডাঃ সুব্বারায়ণ এবং ডাঃ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, প্রয়োজন হইলে সংবিধানের সংশোধন করিয়াও ইংরাজীকে সরকারী ভাষারূপে রাখা আবশ্যক। জোর করিয়া হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে চালু করার বিরুদ্ধে শুধু দাক্ষিণ-ভারতেই নহে, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি স্থানেও প্রবল বিক্ষোভ করিয়াছে। এই বিক্ষোভকে উপেক্ষা করিয়া কমিশনের সুপারিশ চালু করিবার চেষ্টা করিলে তিক্ততা ও বিভেদই বাড়িবে—এ সত্য ভারত সরকারের এখনো সময় থাকিতে উপলব্ধি করা উচিত।" —দৈনিক বসুমতী।

সীমান্ত-সমস্যা

"সীমান্তবর্তী ভারতীয় এলাকায় পাকিস্থানী দুর্বৃত্তদলের হামলা একরূপ হামেসা-সংঘটিত ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। এমন দিন খুব কমই যায়—যে দিন খবরের কাগজ খুলিলে কোথাও না কোথাও দুই-একটা দস্যুতার সংবাদ চোখে না পড়ে। ১৩ই মে তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় ষ্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত পাকিস্থানী হামলার যে বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই ধরণের হইলেও নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য বহন করে। রাজসাহী হইতে আগত একদল পাকিস্থানী ডাকাত মালদহ জেলার পরাণগড় গ্রামে প্রবেশ করিয়া ঐ গ্রামেরই জনৈক মুসলমান গৃহস্থের বাড়ীতে হানা দেয়। উক্ত গৃহস্থটি ডাকাতদলকে লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইলে ডাকাতদল পলায়ন করে এবং পরদিন সকালে অপর আর এক গ্রামের গাছতলায় দস্যুদলের দুইজন লোক ধরা পড়ে, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন গুলীর আঘাতে আহত এবং অন্যজন তাহার শুশ্রূষারত। তাহাদের স্বীকারোক্তি হইতে জানা যায়, গ্রামের লোকদের সহিত ডাকাতদলের যোগাযোগ ছিল এবং কৌতুকপ্রদ আরও যে কথাটি জানা যায় তাহা হইল এই যে, আহত ডাকাতটি নাকি একজন এল এম এফ ডাক্তার। অবাক কাণ্ড! একপাল লোকের মধ্যে গুলী লাগবি তো লাগ তাক করিয়া ডাক্তারের পায়ে! সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে শালাকে ধর—উপকথায় এই প্রবাদবাক্য এ ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইল। এ কথা বলিতেই হইবে যে, পুলিশ দল এক্ষেত্রে বেঁড়ে এক আসামী পাকড়াইয়াছে। সামাজিক পদমর্যাদার বলে ডাকাত নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে গণ্য হইবার জন্য দাবী জানাইবে।" —আনন্দবাজার পত্রিকা

মিথ্যা জেহাদ

"আল্লামা মাশরিকিকে লইয়া আবার গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত 'কাশ্মীর অভিযানের' তারিখ ক্রমাগত বদলাইয়া উহা স্থগিত রাখিতেছেন দেখিয়া তাঁহারই দলের লোকেরা তাঁহাকে দল হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। কিন্তু আল্লামার অধ্যবসায় অসাধারণ। তিনি নূতন স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া নূতন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারত-পাকিস্থান সীমান্তে শিয়ালকোটের নিকটে তিনি সম্প্রতি তাঁহার "শিবির" স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করিয়া "সদৈন্যে" কাশ্মীরে প্রবেশ করিবেন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশবাসী এবং স্বধর্মাবলম্বীরা তাঁহার এই পবিত্র জেহাদের মূল্য বুঝিল না। তাঁহার "শিবিরের" পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের লোকেরা একদিন একযোগে আসিয়া আল্লামার "শিবির" ভাঙ্গিয়া তছনছ করিয়া দিয়াছে। অবশ্য আল্লামার ভক্তেরা নাকি আবার "শিবির" রচনা করিয়াছে এবং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিচার প্রার্থনা করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও বিচার করিবেন কি না সে প্রশ্ন পৃথক। কিন্তু প্রধান প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কাশ্মীর অভিযানের মত পবিত্র কার্য্যে আল্লামার দেশবাসীরা ও সমধর্মীরা সাহায্য না করিয়া বাধা দিতেছে কেন? পাকিস্থানের অনেক নেতাই তো কাশ্মীর দখলের জন্য মাঝে মাঝে "জেহাদ" ঘোষণা করেন। কেবল আল্লামার বেলায় ইহাতে দোষ কেন? স্বয়ং আল্লামা এ বিষয়ে কি বলেন?" —যুগান্তর

সতর্কতার প্রয়োজন

"গত সপ্তাহে বেলডাঙ্গায় রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। বোমা তৈরীর যন্ত্রপাতি, ঢাকা মুসলীম লীগের রসিদ বই, দীর্ঘায়তন পাকিস্তানী পতাকা, উত্তেজনামূলক প্রচারপত্র, কাশ্মীর এবং মুর্শিদাবাদ এক সঙ্গে আক্রমণ করবার সিদ্ধান্তমূলক পত্র বেলডাঙ্গা পুলিশ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এসম্পর্কে সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে যে, পুলিশ সন্দেহভাজন যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছিলেন তারা সবাই জামিনে মুক্ত আছেন। জামিনদারদের মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিধানসভার সদস্যও আছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, পশ্চিমবাঙ্গালার বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এই সংবাদটি যেভাবে পরিবেশিত হওয়া উচিত ছিল তা মোটেই হয়নি, ফলে স্বভাবতঃই এই ঘটনাটির গুরুত্ব অনেক পরিমাণে লঘু হয়ে গেছে। বিগত নির্ব্বাচনকে উপলক্ষ্য করে এই রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীন ভাবে গোষ্ঠী গঠন করার অধিকার আছে বলেই নির্ব্বাচনের আগে আর সাময়িক কালে পুলিশের কড়া নজর থাকা সত্ত্বেও এই সব রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপ কোথাও বাধা পায় নি। এই অবকাশেই নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় ধীরে ধীরে একটি চক্রান্ত গড়ে উঠেছিল, আর এই চক্রান্ত বিরাট আর ব্যাপক আকার নিতে বেশী দেরী হয়নি। আমরা এ ঘটনার বহু আগেই সীমান্তবর্ত্তী এ জেলায় রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপের নানা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলাম। সৌভাগ্যের কথা, নির্ব্বাচনের কয়েক মাস বাদেই আমাদের বক্তব্য যে মোটেই ভিত্তিহীন আর অমূলক ছিল না তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে আরো জানতে পেরেছি যে, বেলডাঙ্গায় আবিষ্কৃত রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপের পেছনে আরো এমন অনেকের পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে যারা এই জেলার সীমান্ত অঞ্চলে বসবাস করছেন। "চাঁদা দেবেন কেন, মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য" এই প্রচার-পুস্তিকা ছড়িয়ে জেলার এক বিশেষ সম্প্রদায়ের জনসাধারণের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা চাঁদা তোলা হয়েছে। যে সমস্ত রসিদ বই পুলিশের হাতে পৌঁছেছে, সেই রসিদ বইয়ের সূত্র ধরে আরো অনেক অপপ্রচারকারী আর ষড়যন্ত্রকারীকে গেপ্তার করা যায়, অথচ স্থানীয় পুলিশ বিভাগ এ সম্পর্কে এখনও সম্পূর্ণ নীরব আছেন!" —জনমত (বহরমর)

তাঁত সপ্তাহ উপলক্ষে

"গত ৫ই মে হইতে ভারতব্যাপী তাঁত সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে। এই সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য হইতেছে তাঁত-জাত বস্ত্রের বিক্রয় তথা অধিক পরিমাণ ব্যবহারের প্রতি জন-সাধারণের মনকে আকৃষ্ট করা। তাঁত বস্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সরকারী প্রচেষ্টা আছে সত্য, কিন্তু জন-সাধারণের সহযোগিতা ব্যতিরেকে ইহার প্রসার লাভ সম্ভব নহে। জন-সাধারণ অধিক পরিমাণে তাঁত-জাত বস্ত্র ব্যবহার করিলে বহু বেকার এই শিল্পকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিবে, অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হইবে এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক হইবে। বর্দ্ধমান জেলার তাঁত, তাত বস্ত্রের খ্যাতি আছে, জেলার বাহিরে বাজার আছে, চাহিদাও যথেষ্ট আছে। বর্ত্তমানে যে ভাবে ইহা পরিচালিত হইতেছে তাহা এই শিল্পকে জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া মনে করি। একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে, বাজার সৃষ্টি করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে শিল্পচাতুর্য্য সমন্বিত বস্ত্রবয়ন দ্বারা ক্রেতা আকর্ষণ করিতে হইবে। অবশ্য ইহা সমবায়ের ভিত্তিতেই করিতে হইবে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এই সমবায় পদ্ধতি যেন তাঁত-শিল্পীদের ঋণ দান সমিতিতে পরিণত না হয়।" —বর্দ্ধমান বাণী।

লুণ্ঠন কেন?

"অন্নের কাঙাল, বস্ত্রের কাঙাল, শিক্ষার কাঙাল, স্বাস্থ্যের কাঙাল ভারতকে আজ যে হৃদয় বিদারক অবস্থায় দিন কাটাইতে হইতেছে, তা রাজ্য সরকার হইতে মোটা মোটা তনখা, যান বাহন, প্রাসাদোপম বাসগৃহ ইত্যাদি যাঁহারা উপভোগের সুবিধা পাইয়াছেন, তাঁহারা তাহা অনুভব করিতে পারিবেন না। এই ভারতকে হঠাৎ আমেরিকার মত সর্ব্ব সম্পদ সম্পন্ন করিবার খেয়ালে এক পঞ্চবার্ষিক লুণ্ঠন ক্রিয়ার সহায়তা যাঁহারা করেন, তাঁহারা যে কোন্ জাতীয় অতিমানব তাহা এ দেশের কেহ চেনে না। আজ ইংরাজ রাজত্বের পরাধীনতাকে এই স্বাধীনতা অপেক্ষা আরামদায়ক বলিয়া মনে করিতেছে। আজ দেশে যুদ্ধ নাই তবুও এই ধনরত্ন সংগ্রহের প্রবৃত্তি কেন? গোমতী-তীরে পতিত নরকপালের মত ভারতের তথা ভারতবাসীর "অপরস্থা কিং ভবিষ্যতি" ভাবিয়া দিশেহারা হইতে হয়।" —জঙ্গীপুর সংবাদ।

প্রাথমিক শিক্ষক

"পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের প্রাথমিক শিক্ষকগণ দারুণ দুর্দশার সম্মুখীন হইয়াছেন। বহু স্থানে বহু শিক্ষক নাকি নিয়মিত ভাবে বেতন পাইতেছেন না—বেতন পাইতে অযথা বহু বিলম্ব হইতেছে। ইহার সঠিক কারণ যে কি তাহা বুঝা যায় না। দুর্মূল্য ভাতা বাবদ যে টাকা শিক্ষকগণ পাইয়া থাকেন, অনেক স্থানে তাহার কিছু অংশ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পাইয়াছেন বাকী অংশ এখনো তাঁহারা পান নাই। ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃই উর্দ্ধমুখী হইতেছে। একেই তো প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষকগণ স্বল্প বেতন পান—তাহার দ্বারা সংসারের সমস্ত প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হয় না। তাহার উপর আবার যদি তাহা পাইতে অযথা বিলম্ব ঘটে তাহা হইলে তাঁহারা যে কিরূপ অসুবিধায় পড়েন, তাহা সহজেই অনুমেয়।" —ভাগীরথী (কালনা)।

কংগ্রেস

"আজ কোথায় কংগ্রেস আর কোথায় দেশের মানুষ! মানুষ হইতে বহু দূরে সরিয়া যাওয়ায় কংগ্রেস আজ কেবল অর্থের উপর বনিয়াদ গড়িতেছে এবং ধনীদের কৃপা ও করুণার উপর নির্ভর করিয়া চালিত হইতেছে। কংগ্রেস-নেতার সহিত জনগণের পরিচয় নাই এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা ও শোষণের কোন খবরাখবর তাঁহারা রাখেন না বা রাখিবার প্রয়োজন করে না। কারণ হয়ত এই যে তাহা রাখিয়া কোন লাভ নাই, এইজন্য তাহাদের করিবার কিছু নাই। দুর্নীতি, ঘুষ, অন্যায় অবিচার, মিথ্যাচার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াও তাঁহারা কি করিতে পারেন ইহাই আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয়। দরিদ্র দেশ ও নানা অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে দেশে দারিদ্র্য অতি দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। এই অবস্থায় সরকারী জাঁক জমক ও আড়ম্বর আরও বাড়িতেছে। শ্রীনেহরু তাঁহার পত্রে সরকারী জাঁকজমক আড়ম্বর, মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের লাল উর্দ্দীপরা চাপরাশী প্রভৃতির বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কংগ্রেসের জন সংযোগের অভাব এবং জনগণের সহিত অন্নের মাধ্যমে ছাড়া সম্বন্ধ না থাকায় দেশে ধনী কংগ্রেস ও দরিদ্র জনসাধারণ এই দুইটি দল দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। বর্ত্তমান কংগ্রেস পরিচালকগণ এই মহৎ কার্য্যটি নিষ্ঠার সহিত করিতেছেন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল তাহার সুযোগ লইয়া মানুষের হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে। ইহা কংগ্রেসের পক্ষে অতি অশুভ এবং দেশের পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। শ্রীনেহরু তাঁহার সরকারী সহকর্ম্মীদের সংযত হইবার যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু বর্ত্তমান কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইহার প্রধানদের ক্ষমতা করায়ত্তের মোহ দূর না হইলে সুফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীনেহরু প্রত্যেককেই সাবধান করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাতেও যদি মিথ্যা বাহ্য আড়ম্বর ও জাঁক জমক বন্ধ না হয় তবে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। টাকা একটা বিরাট শক্তি, ইহা আমরা স্বীকার করি কিন্তু কেবল টাকার উপর ভরসা করিয়া ও তাহার দৃষ্টি দিয়া চলিলে ভরাডুবি

হইতে দেরী হয় না। তাহার কারণ এই যে, অযাচিত ও নিঃস্বার্থ ভাবে অর্থ দান অতি অল্প লোকই করিয়া থাকে। স্বার্থ-প্রণোদিত দানের মর্য্যাদা দিতে প্রতিষ্ঠান যে দিন কুণ্ঠিত হইয়া যাইবে সেদিন আফশোষের আর সীমা থাকিবে না। শ্রীনেহেরু যাহা বলিয়াছেন তাহা মানিয়া চলিতে বাধা করিতে তিনি পারেন কি না তাহা আমরা জানি না কিন্তু কর্তাগণ ইহা যদি মানিয়া চলিতেন তবে ভাল ছাড়া মন্দ হইত না। আজ নেতারা আত্মবিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারিতেন যে দেশ অপেক্ষা নেতারা উর্দ্ধে উঠিয়াছেন এবং দেশকে তাঁহারা নীচে টানিয়া নামাইতেছেন।" —ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)

মিথ্যার বাঁধ

"বাঁধের পরিকল্পনা করিয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকারের বন্যা নিরোধ বিভাগ, বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন ত্রিপুরা সরকারের পূর্ত্ত বিভাগ। ইহাদের কাহারও যেন বাঁধের ব্যাপারে দায়িত্ব নাই। "বাঁধের পরিকল্পনা আমাদের নয়" এই কথা বলিয়া পূর্ত্ত বিভাগ পাশ কাটাইয়া যান, আর যাঁরা বাঁধের পরিকল্পনা করিয়াছে, "বাঁধ আমরা করি নাই" বলিয়া তাঁহারাও পাশ কাটাইয়া যাইতে চান। স্মরণ করা যাইতে পারে যে, গত জুন মাসের বন্যার পর এই দুই ডিপার্টমেণ্ট পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমরা এখন দেখিতেছি, জলের ধাক্কায় বাঁধ না টিকিলে গ্রামবাসীসহ আগরতলার লোকের কপালে অনেক দুর্দ্দশা রহিয়াছে। বালু মাটি দিয়া বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া বন্যা প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টাকে মোটেই সমর্থন করা যায় না। যে রাজ্যে পাথর পাওয়া যায় না সেখানে কয়েক মাইল লম্বা একটা বিরাট বাঁধ নির্ম্মাণের সাহস কি ভাবে করা হয়, তাহাই ভাবিয়া পাওয়া যায় না! বাঁধ নির্ম্মাণ যদি প্রকৃতই জরুরী হইয়া পড়িয়াছিল তবে আরও অধিক পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়াই ভাল ভাবে বাঁধ নির্ম্মাণ করা বিধেয় ছিল। তাহা হইলে সতের লক্ষ টাকাও একটা সৎকার্য্যে ব্যয় হইয়াছে বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া যাইত। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই মনে হয় যে, ভগ্ন বাঁধের জলস্রোত অপেক্ষা কয়েক ঘণ্টার জন্য সহরের উপর এক হাঁটু পরিমাণ জল অনেক ভাল ছিল। বাঁধটি যদি প্রকৃতই জনসাধারণের ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে তবে ইহাকে সময় থাকিতে ভাঙ্গিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। ইহাতে অবশ্য অর্থক্ষতির আশঙ্কা আছে। খয়রাতী সাহায্যের তুলনায় এই অর্থক্ষতি নিশ্চয়ই অনেক অল্প হইবে। সাধু সাবধান!" —সেবক (আগরতলা)।

জেলা-পাঠাগার

"জেলা-পাঠাগার সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছি। দুইটি জেলা-পাঠাগারের অন্যতম মেদিনীপুর সহরের পাঠাগারের জন্য চেষ্টা বহু পূর্ব্ব হইতেই হইতেছে, সরকারী অর্থও বহুদিন রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া আছে কিন্তু ঘোড়ার পূর্ব্বে চাবুক আসিয়াছে মাত্র—একজন গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হইয়াছেন, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের জন্য একখানি বড় মোটরভ্যানও ক্রয় করা হইয়াছে। তমলুকে অন্যতম জেলা-পাঠাগারটির জন্য যখন ত্রিতল গৃহের উদ্বোধন উৎসব হইতে যাইতেছে, এখানে তখন রাজনারায়ণ স্মৃতি-পাঠাগার বনাম জেলা-পাঠাগার কর্তৃপক্ষ বাদানুবাদে বৃথা সময় ব্যয় করিতেছেন। কাহার দাবী ন্যায়সঙ্গত সে প্রসঙ্গ হইয়া আমরা এখন আলোচনা করিতেছি না—আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, জনস্বার্থের দিক হইতে বিচার করিয়া পাঠাগার-ভবনটি সত্বর নির্ম্মিত হওয়া প্রয়োজন।" —মেদিনীপুর হিতৈষী।

আর কত দেরী

"সহরে এবং গ্রামাঞ্চল সমূহে ধান-চাউল ও শাকসব্জীর মূল্য প্রতিনিয়তই বর্দ্ধিত হইতেছে। আশা করা গিয়াছিল ধান-চালের মূল্য কিছু হ্রাস পাইবে—কিন্তু হইল না। শুধু মাত্র সহরেই নহে। গ্রামাঞ্চল সমূহ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে বহু স্থানেই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধিহেতু অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে এবং অবস্থা আরও বেশী শোচনীয় হইয়া উঠিলে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং অল্প মূল্যে চাউল সরবরাহের দোকানের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলিয়াছিলাম। সম্প্রতি ফালাকাটা অঞ্চলে নিদারুণ খাদ্যসমস্যা দেখা দিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অবিলম্বে যদি সরকারী কর্তৃপক্ষের তৎপরতা প্রকাশ না ঘটে তাহা হইলে বাস্তবিকই অবস্থা আরও বেশী নিদারুণ হইয়া উঠিবে। অবিলম্বে প্রয়োজনীয় চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। টেষ্ট রিলিফেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে।" —বার্ত্তা (জলপাইগুড়ি)।

শোক-সংবাদ

জগদীশ গুপ্ত

সুসাহিত্যিক কবি জগদীশ গুপ্ত গত ২রা বৈশাখ কিছু কাল রোগভোগান্তে ৭১ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। জীবনের একটি সুদীর্ঘ অংশ সাহিত্যসেবায় ইনি অতিবাহিত করে বাংলা সাহিত্যকে নানা ভাবে গৌরবান্বিত করে গেছেন। সারল্য ও আন্তরিকতা ছিল তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য। তাঁর লেখা বহু উপন্যাস গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে রতি ও বিরতি, শ্রীমতী, অসাধু, সিদ্ধার্থ দুলালী, মেঘাবৃত অশনি, মল্লিক ও মল্লিকা, লঘুগুরু, দয়ানন্দ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মাসিক বসুমতীর সঙ্গেও এঁর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ ছিল।

ডাঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সংস্কৃতির প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী গত ২১এ বৈশাখ ৬৬ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ছাত্রজীবন এঁর চিরকাল গৌরবে ভাস্বর ছিল। ইনি ১৯৫০ খৃঃ নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ইতিহাস-কংগ্রেসের অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজেও অধ্যাপনা করেছিলেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগেরও প্রধান অধ্যাপকের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
১৬৬ "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

তরু দত্তর প্রতিভা

পৌষ সংখ্যার পত্রিকায় তরু দত্ত সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যে আপনার লেখা মন্তব্যটি উপন্যাসের প্রথমে সত্যি বড় সুন্দর লাগল। বুঝলাম, কোথাও থেকে বই জোগাড় করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বিখ্যাত মনীষী শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত বলছিলেন যে, বইটি নিশ্চয়ই অতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অন্যতম। শ্রীঅরবিন্দ ১৮৯৩ সাল নাগাদ যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন সেই সময় বোম্বাইয়ের একটি পত্রিকায় 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক ধারাবাহিক একটি প্রবন্ধ লেখেন। পুস্তকাকারে সেটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক থেকে তরু দত্ত সম্বন্ধে একটি মন্তব্য আপনাকে পাঠালাম: এত বড় কথা শ্রীঅরবিন্দ তরু দত্ত সম্বন্ধে লিখেছিলেন,—ভাল যদি বোঝেন, এটির সদ্ব্যবহার করতে পারেন :···"অসাধারণ এক তারুণ্যের প্রতিভা নিয়ে জন্মালেন তরু দত্ত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিদেশী ভাষার উপর দিয়েই সে প্রতিভার অযথা অপব্যয় ক'রে অকালে তিনি অল্প বয়সেই মারা গেলেন। তিনিও শিখেছিলেন গ্রীক ভাষা। ইংরেজী ভাষাতে তিনি খুবই চমৎকার লিখতেন, কিন্তু ফরাসীতেও তাঁর কম দক্ষতা ছিল না। তাঁর লেখা ফরাসী নভেল ওই দেশের লোকেরা খুব আদরের সঙ্গে পড়ত, আর তাঁর লেখা অপূর্ব ফরাসী সঙ্গীত তখন জার্মাণীর বিরুদ্ধে ফরাসী জাতির মনে উদ্দীপনা জোগাত। এঁদের প্রত্যেকেরই প্রচুর পড়া-শোনার বিষয়ে যেমন একটা অসাধারণত্ব ছিল, এঁদের জীবন ব্যাপার সম্বন্ধেও ছিল তাই। যাকে বলে মস্ত বহরের মানুষ, এঁরা ছিলেন ঠিক তাই,—যা কিছু করতেন সবই বেশি বেশি মাত্রায়। এঁরা শিখেছেনও যত বেশি, লিখেছেনও তত বেশি···"[শ্রীঅরবিন্দের 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তক থেকে]—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীঅরবিন্দ

চার জন প্রসঙ্গে

আমি আপনাদের পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। গত ফাল্গুন (১৩৬৩) সংখ্যার পত্রিকায় "চার জন" পর্য্যায়ে মনোবিজ্ঞানী ডাঃ তরুণ সিংহ সম্পর্কে কয়েকটি ভুল তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে লক্ষ্য করলাম। প্রথমত, লুম্বিনী মানসিক হাসপাতাল সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলা হয়েছে: "ডাঃ সিংহের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো লুম্বিনী মানসিক হাসপাতাল।" আপনাদের অবগতির জন্যে জানাই, লুম্বিনী মানসিক হাসপাতাল ১৯৫০ সালের বহুপূর্বেই ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু-র প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী হিসাবে ১৯৪৭-৪৯ সালে লুম্বিনী হাসপাতালে নিয়মিত যাওয়ার আমার সুযোগ হয়েছিলো। দ্বিতীয়ত, তিনি ঐ হাসপাতালের 'অধিকর্তা' বলে বর্ণিত হয়েছেন। 'অধিকর্তা' কথাটি বিশেষ পরিষ্কার নয়, উনি ওখানকার সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ওখানকার প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র। পরবর্তী সংখ্যায় এই ভুলগুলি সংশোধিত হলে সুখী হ'বো। এ জাতীয় প্রমাদ সাধারণ পাঠকদের বিভ্রান্ত করে।—মায়া দেব। ৪ সুরাবর্দী এভিন্যু, কলিকাতা-১৭।

পত্রিকা সমালোচনা

সুদীর্ঘ কাল ধরে আমি মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা। তবে কি জানি কেন, গত কয়েক বছর ধরে বসুমতী যেন আমার কাছে অতুলনীয় বলে প্রতিভাত হচ্ছে। আরও তো অসংখ্য পত্র-পত্রিকা আছে কিন্তু বসুমতীর নাগাল ধরতেও তাদের অনেক দেরী। আপনারা ঠিকই বলেছেন—রাঁচী থেকে করাচী, রাণী থেকে কেরাণী সকল দরবারেই বসুমতীর সমান গতিবিধি, এক এক সংখ্যায় সাত আটখানি উপন্যাস বসুমতী উপহার দিয়েছেন। কত অজানা অচেনা ব্যক্তিকে অন্ধকার থেকে তুলে এনে তাঁদের প্রত্যেককে স্ব স্ব প্রতিভা প্রকাশ করার সুযোগ দিয়ে তাঁদের করেছেন আলোর রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। বসুমতীই ধরতে গেলে প্রতি মাসে পাঁচটি ছ'টি করে নতুন নতুন লেখক উপহার দিয়ে আসছে। আপনাদের খালি একটি অনুরোধ করি, সেই দিকে কৃপা করে দৃষ্টিদান করলে বাধিতা হই। তার কারণ, যে কাগজে বর্ত্তমানে বসুমতী ছাপা হচ্ছে তা মোটেই লাভ করে না স্থায়িত্ব। কিছুকাল গত হলেই তা বিবর্ণ হয়ে যায়।

শ্রীমতী শান্তা বসুর রচনা আমার বেশ লাগছে, বেশ একটা আকর্ষণীয় পরিবেশ তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর রচনার মাধ্যমে। আশুতোষের পঞ্চতপা ও বারীন্দ্রনাথের চায়না-টাউনও আনন্দ দিচ্ছে।

আপনার সম্পাদনা বাঙলার তথা ভারতের সম্পাদক মহলের একটি বিস্ময়কর উদাহরণ বলে গণ্য হবে। ইতি সুপ্রিয়া ঘোষাল, জামসেদপুর।

অনেক দিন ধরে আমি মাসিক বসুমতী পড়ে আসছি, লক্ষ্য করছি যে, এখন পাঠক-সাধারণও পত্রিকা সম্পর্কে মত প্রকাশ করছেন। সেই দেখে আপনাকে পত্রিকা সম্পর্কে আমার মত জানাবার সাহস সংগ্রহ করছি।

বসুমতীর প্রত্যেকটি বিভাগ যথেষ্ট পরিমাণ কৃতিত্বের সঙ্গেই সম্পাদিত হচ্ছে, এ কথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। অচিন্ত্যকুমারের পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘকাল ধরে পাঠকচিত্তে জুগিয়ে গেছে অধ্যাত্ম ভাবের প্রাবল্য। একটি নিবেদন শৈলজানন্দ সম্বন্ধে: যখন ইচ্ছে তিনি লেখেন, যখন ইচ্ছে তিনি বন্ধ করেন (অন্ততঃ সাধারণ পাঠক হিসাবে যা দেখতে পাচ্ছি) এর অর্থ কি? তাঁর লেখা

মাদের যথার্থই আরো ভালো লাগে, কিন্তু আমাদের সেই স্তবিক "ভাল-লাগা"কে নিয়ে শৈলজানন্দ আজ যে ছেলেখেলা সছেন, এর কোন যুক্তিসঙ্গত অর্থই আমার জানা নেই।

মনোজ বসু মহাশয়ের রচনায় অনেকেই তৃপ্তিলাভ করবেন। শ ঝরঝরে লেখা হচ্ছে শান্তা বসুর ও পৃথ্বীশ মুখোপাধ্যায়ের।

দয়া করে জানাবেন কি উদয়ভানুর ও নীলকণ্ঠের প্রকৃত নামটি ?

বসুমতীর একটি বিশেষত্ব বড়ই আনন্দ দেয় সেটি হচ্ছে যে, সুমতীতে যত রকম বিভাগ আছে এত রকম বিভাগ বোধ হয় অন্য ান পত্রিকাতেই নেই। সমাজের সকল স্তরেই আপনারা লাভ রেছেন অকুণ্ঠ সমাদর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকেই সুমতীর মধ্যে খুঁজে পাবেন তাঁদের নিজেদের মনের খোরাক।

চারজন, রঙ্গপট, সাহিত্য-পরিচয় নাচ-গান-বাজনা, কেনাকাটা, খাধূলা, ইত্যাদি ইত্যাদি আরও যে সকল বিভাগ আছে, প্রত্যেকটিই থষ্ট পরিমাণে হৃদয়গ্রাহী এবং তাৎপর্যপূর্ণ।—শোভনলাল য়চৌধুরী ও বিনতা রায়, এলাহাবাদ।

সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টির পরিবেশনে আপনি সত্যিই অতুলনীয়! রাগিণী তামসী খুব ভালো লাগছে ধন্যবাদ আপনাকে। অশোক য়। ৯১, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬।

কালের গতি অতিক্রম করে যাচ্ছে, সমুদ্রের উচ্ছলিত ঢেউ এর কে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যাই তার অপরূপ সৌন্দর্য্যে, সৃষ্টিকর্তার র কারুকার্য্য অতীব সুন্দর, তেমনই "মাসিক বসুমতী" দিনের পর মাদের সামনে ধরা দিচ্ছে এক যৌবন-সৌন্দর্য্যময়ীর কল্যাণ রূপে। তায় পাতায় ভরে যাচ্ছে সুলেখকদের প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ত্যাদি। শ্রদ্ধায় মাথা নত করি ও দূর হতে জানাই প্রণাম সকল লেখকগোষ্ঠীকে, আর সম্পাদককে জানাই আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম।

"তামসী" উপন্যাস খুব ভালো লাগছে। বারীন্দ্রনাথ দাশের গয়না টাকা" এক অভিনব ধরণের লেখা, "পঞ্চতপা" ও "অশ্রু ও তাহ" এর লেখককে আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাবেন, "অশ্রু ও তাহ" পড়তে পড়তে মুগ্ধ হ'য়ে যাই। মনে হয় লেখক যেন সব মম ষ্টুডিওর চার পাশে ঘোরাঘুরি করেন। বিদেশী সাহিত্য অনুবাদ আরও বেশী করে প্রকাশ করলে ভালো হয়। মাসিক বসুমতীর দীর্ঘজীবন কামনা করি। ইতি—শ্রীমদন সরকার। শশিভূষণ ঘোষ লেন। মাহেশ, শ্রীরামপুর।

গ্রহণ করুন আপনি আমাদের "শুভ নববর্ষের" আন্তরিক নমস্কার ও অভিনন্দন এবং আপনার মধ্য দিয়ে সকল পাঠক-পাঠিকাদের জানাই আমাদের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা। আমরা আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকা "মাসিক বসুমতীর" নিয়মিত পাঠিকা, এর প্রতিটি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, পত্রগুচ্ছ, আমাদের খুব ভাল লাগে, এর অন্যতম আকর্ষণ "চার জন"। এই চার জনের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পাই দেশের কত জ্ঞানী-গুণীদের জীবনী-চিত্র। আমরা এই চার জনে দেশের কোন বিদুষী মহিলারও জীবনী দেখতে চাই। অনেক দিন "মাসিক বসুমতীর" পাতায় আপনার কোন লেখা দেখতে পাচ্ছি না কেন? আমরা এর দীর্ঘজীবন কামনা করি ও দিনে দিনে আরও সুন্দর ও উজ্জ্বলতর হোয়ে উঠুক মাসিক বসুমতী। রঞ্জনা ঘোষ ও গায়ত্রী দত্ত। শশিভূষণ ঘোষ লেন, মাহেশ।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Kindly receive Rs 15/- as sulscription of "Masik Basumati." Pritikona Sengupta C/o Santilal Sengupta, Manager, Surma valley Sand Mills. Cachar.

১৩৬৪ সালের মাসিক বসুমতীর চাদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠালাম। বসুমতী পত্রিকার উন্নতি কামনা করি, মহাশ্বেতা দাশগুপ্ত P. O. Titabar. Assam.

১৩৬৪ সালের মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পনেরো টাকা পাঠাইলাম। Madhuri Mookherjee, 41/19 Hauzkhar Enclove, New Deihi-16.

১৩৬৪ সালের চাঁদা পাঠালাম। Renu Dasgupta 3/17/331 H. Mal Dahia Varanasi Cantt.

Sending Rs 7'50 for the subscription from Baisakh to Aswin. Parbati Sen, 111A/304 Ashoknagar. U. P.

মাসিক বসুমতীর জন্য ষাণ্মাসিক মূল্য পাঠাইলাম। শ্রীমতী প্রভাবতী মুখোপাধ্যায় C/o Professor N. N. Mookherjee 6220 Rakalgunj Road. Agra, U. P.

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের (বৈশাখ-চৈত্র ১৩৬৪) চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠালাম। বৈশাখ সংখ্যা অবিলম্বে পাঠাবেন। শ্রীমতী মমতা বক্সী। C/o Dr. B. K. Bakshi Forest Research Institute Dehra Dun,

আমি ৪০৫১১ (M) নং গ্রাহিকা। আজ আমার বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। শ্রীমতী ইরা ঘোষ। পোঃ সাহেবগঞ্জ, (এস, পি) দুমকা।

১৩৬৪ সালের গ্রাহকমূল্য স্বরূপ ১৫৲টাকা পাঠালাম। নিয়মিত বসুমতী পাঠাবেন। কৃষ্ণা সান্যাল। গ্রাঃ নং M 41229 C/o, Sri R. K. Sannyal, Executive Engineer Hydro Electric Dvn. Gorakhpur.

সামনের বছরের চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। শান্তি বসু। 36 Havelock Rd. Lucknow U. P.

ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠাইলাম। ফাল্গুন ১৩৬৩ হইতে শ্রাবণ ১৩৬৪ পর্য্যন্ত। মঞ্জরী সেনগুপ্ত। C/o. Sree B. Sen Gupta, A. C. Station. Jodhpur, Rajasthan

Sending herewith my Annual subscription for Monthly Basumati Magazine. Sm. Hiran Kumari Mittra, 49, Leader Road, Allahabad.

A sum of Rs. 15/- only is remitted herewith on a/c full payment of Annual subscription of Masik Basumati. Please acknowledge receipt and send the M. Basumati regularly.—Bela Paul. C/o G. G. Paul. Accountant in B. N. Assam Rifles, Imphal, Manipur State.

Remitted herewith Rupees Seven and annas eight only as halt yearly subscription of Masik Basumati. Please enlist my name.—Manashi Sinha, Mor Hospital, Nawalgarh, Rajasthan,

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৬শ বর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা

কথামৃত

গুরু কি ?

"যিনি তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু। দেখ না, আমার গুরু আমার ভূত-ভবিষ্যৎ বলিয়া দিয়াছিলেন।

যিনি এই সংসার-মায়ার পারে লইয়া যান, যিনি কৃপা করিয়া সমস্ত মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ গুরু। আগে শিষ্যেরা 'সমিৎপাণি' হইয়া গুরুর আশ্রমে গমন করিত। গুরু অধিকারী বলিয়া বুঝিলে তাহাকে দীক্ষিত করিয়া বেদপাঠ করাইতেন।

শাস্ত্রে বলে, যাঁহারা অধীতবেদবেদান্ত, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁহারা অপরকে অভয়ের পারে লইয়া যাইতে সমর্থ, তাঁহারাই যথার্থ গুরু; তাঁহাদের পাইলেই দীক্ষিত হইবে—"নাত্র কার্যবিচারণা।" এখন উহা কেমন দাঁড়াইয়াছে জান?—"অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।"

আত্মা কেবল অপর আত্মা হইতেই শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে, আর কিছু হইতেই নহে। সারা জীবন পুস্তক পাঠ করিতে পারি, খুব একজন বুদ্ধিজীবী হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু শেষে দেখিব, আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় নাই। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিও খুব হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই আধ্যাত্মিক বাক্যবিন্যাসে অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকিলেও কার্যের সময়—প্রকৃত ধর্মভাবে জীবনযাপন করিবার সময়—কেন এত ন্যূনতা লক্ষিত হয়, তাহার কারণ গ্রন্থরাশি আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। জীবাত্মার শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে, অপর এক আত্মার শক্তিসঞ্চার আবশ্যক।

যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে গুরু বলে; এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাকে শিষ্য বলে। এইরূপ শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন, তাঁহার এই সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যক। আর যাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক, ভূমিও সুকৃষ্ট থাকা আবশ্যক। যেখানে এই উভয়টিই বিদ্যমান, সেইখানেই প্রকৃত ধর্মের অপূর্ব বিকাশ দৃষ্ট হয়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ
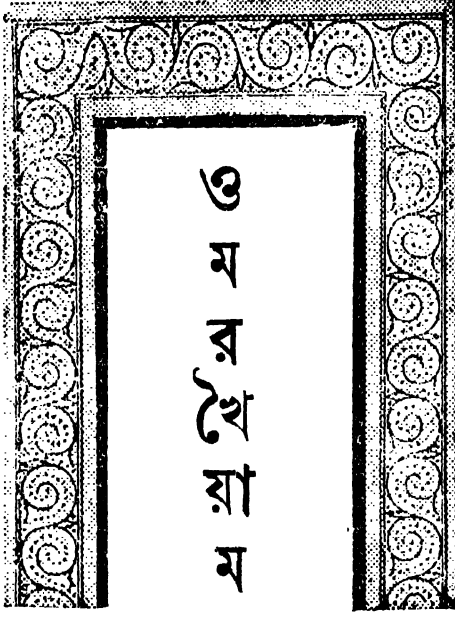
(অপ্রকাশিত)

কাজী নজরুল ইসলাম

দু'জনাতেই সইছি সাকী নিয়তির ভ্রূভঙ্গি ঢের
এই ধরাতে তোমার আমার নাই অবসর আনন্দের।
তবুও মোদের মাঝে আছে মদ-পিয়ালা যতক্ষণ
সেই ত ধ্রুব সত্য, সখি, পথ দেখাবে সেই মোদের!

শরাব আনো! বক্ষে আমার খুনীর তুফান দেয় যে দোল্।
স্বপ্ন-চপল ভাগ্যলক্ষ্মী জাগল জাগো ঘুম বিভোল!
মোদের শুভদিন চলে যায় পারদসম ব্যস্ত পায়,
যৌবনের এই বহ্নি নিবে খোঁজে নদীর শীতল কোল!

মদ পিও আর ফূর্তি কর আমার সত্য আইন এই!
পাপ পুণ্যের খোঁজ রাখি না স্বতন্ত্র মোর ধর্ম সেই।
ভাগ্য সাথে বিয়ের দিনে কইনু, 'দিব কি যৌতুক?'
কইল বধূ, 'খুশী থাকো, তার বড় যৌতুক সে নেই।'

মসজিদের অযোগ্য আমি, গির্জার আমি শত্রু প্রায়
ওগো প্রভু, কোন মাটিতে করলে সৃজন এই আমায়?
সংশয়াত্মা সাধু কিংবা ঘৃণ্য নগর-নারীর তুল
নাই স্বর্গের আশা আমার, শান্তি নাহি এই ধরায়।

নৃত্য-পরা ঝর্ণাতীরে সবুজ ঘাসের ঐ ঝালর
উন্মুখ কার চুমো যেন দেব-কুমারের ঠোঁটের প'র—
হেথায় পায়ে দ'লো না কেউ—এই যে সবুজ তৃণের ভিড়
হয়ত কোনো গুল্-বদনীর কবর-ঢাকা নীল চাদর।

হৃদয় যাদের অমন প্রেমের জ্যোতির্ধারায় দীপ্তিমান,
মসজিদ মন্দির গির্জা, যথা করুক অর্ঘ্য দান—
প্রেমের খাতায় থাকে লেখা অমর হ'য়ে তাদের নাম,
স্বর্গের লোভ ও নরক ভীতির উর্দ্ধে তারা মুক্তপ্রাণ।

কায়কোবাদের সিংহাসন আর কায়কাউসের রাজমুকুট,
তূসের রাজ্য, একছিটে এই মদের কাছে সব যে ঝুট!
ধর্ম-গোঁড়ার উপাসনার কর্কশ যে প্রভাত-স্তব
তাহার চেয়ে অনেক মধুর প্রেমিক জনে শ্বাস অফুট।

দোষ দেয় আর ভর্ৎসে সবাই আমার পাপের নাম নিয়া
আমার দেবী-প্রতিমারে পূজি তবু প্রাণ দিয়া
মরতে যদি হয় গো আমায় শরাব-পানের মজলিশে
স্বর্গ-নরক সমান, পাশে থাকবে শরাব আর প্রিয়া।

'রজব শাবান পবিত্র মাস' বলে গোঁড়া মুসলমান,
'সাবধান, এই দু'মাস ভাই কেউ করো না শরাব পান'
খোদা এবং তাঁর রসুলের 'রজব' 'শাবান' এই দু'মাস
পান পিয়াসীর তরে তবে সৃষ্ট বুঝি এ 'রমজান'?

মুসাফিরের এক রাত্রির পান্থবাস এ পৃথ্বীতল—
রাত্রি দিবার চিত্রলেখা চন্দ্রাতপ আঁধার-উজল।
বসল হাজার জাম্‌শেদ ঐ উৎসবেরই আঙ্গিনায়
লাল বাহ্‌রাম এই আসনে ব'সে হ'ল বেদখল।

আজকে তোমার গোলাপ-বাগে ফুটল যখন রঙীন গুল্,
রেখো না পান-পাত্র বেকার, উপচে পড়ুক সুখ ফজুল।
পান ক'রে নে, সময় ভীষণ অবিশ্বাসী, শত্রু ঘোর,
হয়ত এমন ফুল-মাখানো দিন পাবি না আজের তুল।

এই সে প্রমোদ-ভবন যথায় জল্‌সা ছিল বাহ্‌রামের,
হরিণ সেথায় বিহার করে, আরাম ক'রে ঘুমায় শের!
চির-জীবন করল শিকার রাজ-শিকারী যে বাহ্‌রাম,
মৃত্যুশিকারীর হাতে সে শিকার হ'ল হায় আখের।

নীল আকাশের নয়ন ছেপে বাদল অশ্রুজল ঝরে
না পেলে আজ এই পানীয় ফুটত না ফুল বন ভ'রে।
চোখ জুড়াল আমার যেমন আজ এ ফোটা ফুলগুলি,
মোর কবরে ফুটবে যে ফুল—কে জানে হায় কার তরে

শুক্রবার আজ, বলে সবাই পবিত্র নাম জুম্মা যার
হাত যেন ভাই খালি না যায়, শরাব চলুক আজ দেদার
এক পেয়ালি শরাব যদি পান কর ভাই অন্য দিন,
দু' পেয়ালি পান কর আজ বারের বাদসা জুম্মা বার।

এই মদিরা হাজার রূপে অরূপে এর হয় প্রকাশ,
কভু এ হয় প্রাণী, কভু তরু তা, ফুল-সুবাস।
ভেবো না কেউ সুরার সাথে সুরার সারও যায় উবে,
রূপ লোপ এর হয় অরূপে, অস্তি ইহার হয় না নাশ।

যার পরে তোর আস্থা গভীর, এই যে বুকের বন্ধু তোর,
মার্জিত জ্ঞান চক্ষু নিয়ে দেখ এই তোর শত্রু ঘোর।
বন্ধু বেছে নিস নে রে তোর অমার্জিতের ভিড় থেকে,
ভেজিয়ে দে ভাই অন্তরহীন অন্তরঙ্গতার এ দোর।

রে নির্বোধ! এ ছাঁচে-ঢালা মাটির ধরা শূন্য সব,
রং-বেরংএর খিলান করা এই যে আকাশ-অবাস্তব।
এই যে মোদের আসা-যাওয়া জীবন-মৃত্যু-পথ দিয়ে,
একটি নিশ্বাস ইহার আয়ু, আকাশ-কুসুমের এ টব।

হুরী বলে থাকলে কিছু—একটি হুরী, মদ খানিক,
ঘাস-বিছানো ঝর্ণাতীরে, অল্পবয়েস বৈতালিক—
এই যদি পাস স্বর্গ নামক পুরানো সেই নরকটায়,
চাসনে যেতে স্বর্গ ইহাই স্বর্গ যদি থাকেই ঠিক।

হাতে নিয়ে পান-পিয়ালা নামাজ পড়ার মাদুর খান—
দেখতে পেলাম ভাঁটিখানার পথ ধরে শেখসাহেব যান
কইনু দেখে, 'ব্যাপার কি এ, এ পথে যে শেখ সাহেব।'
কইলেন পীর, 'ফক্কিকার এ দুনিয়া, কর শরাব পান।'

বুলবুলি এক হালকা পাখায় উড়ে যেতে গুলিস্তান,
দেখল হাসিখুশী ভরা গোলাপ লিলির ফুল-বাথান।
আনন্দে সে উঠল গাহি, 'মিটিয়ে নে সাধ এই বেলা,
ভোগ করতে এমন দিন আর পাবিনে তুই ফিরিয়ে প্রাণ!'

খৈয়াম! তোর দিন দু'য়েকের এই যে দেহের শামিয়ানা—
আত্মা নামক শাহনশাহের হেথায় ক্ষণিক আস্তানা।
তাম্বুওয়ালা মৃত্যু আসে আত্মা যখন লন বিদায়,
উঠিয়ে তাঁবু অগ্রে চলে; কোথায় সে যায় অজানা।

খৈয়াম—যে জ্ঞানের তাঁবু করল সেলাই আজীবন,
অগ্নিকুণ্ডে প'ড়ে সে আজ সইছে দহন অসহন।
তার জীবনের সূত্রগুলি মৃত্যু-কাঁচি কাটল হায়,
ঘৃণার সাথে বিকায় তারে তাই নিয়তির দালালগণ।

ডাইনে বাঁয়ে দোষদর্শী সমালোচক ভয় দেখান—
'শরাব ভীষণ খারাপ জিনিস, মদ্যপায়ীর নেইকো ত্রাণ।'
সত্য কথাই! যে আঙুরে নষ্ট করে ধর্মমত,
সবার উচিত—নিঙড়ে ওরে করে উহার রক্তপান!

রহস্য শোন্ সেই সে লোকের আত্মা যথায় বিরাজে,
ওরে মানব! নিখিল সৃষ্টি লুকিয়ে আছে তোর মাঝে।
তুই-ই মানুষ, তুই-ই পশু, দেবতা, দানব, স্বর্গদূত,
যখন হতে চাইবি রে যা হতে পারিস তুই তা যে।

স্রষ্টা যদি মত নিত মোর—আসতাম না প্রাণান্তেও,
এই ধরাতে এসে আবার যাবার ইচ্ছা নেই মোটেও।
সংক্ষেপে কই, চিরতরে নাশ করতাম সমূলে
যাওয়া-আসা জন্ম আমার; সেও শূন্য, শূন্য এও!

এক সে উপায় আছে যদি বিশ্বে খুশী করতে চাও—
মুসলিম খ্রীষ্টান ইহুদী সবার যশো-গাথা গাও।
এন্তার সব শ্রদ্ধা পাবে বড় ছোট সকলকার
তোমার নিন্দা করতে সাহস করবে না আর কেউ কোথাও।

কুগ্রহ মোর! বলতে পারিস্, করেছি তোর ক্ষতি কোন্?
সত্যি বলিস্, মোর পরে তুই বিরূপ এত কি কারণ।
একটু মদের তরে এত উঞ্ছবৃত্তি তোষামোদ,
একটুক্‌রো রুটীর তরে, ভিক্ষা করাস অনুক্ষণ।

খামখা কথার বিষ খাস্‌নে, মুসড়ে যাসনে নিরাশায়,
ফেরেব-বাজিব এই দুনিয়ায় তুই ধরে থাক সত্য ন্যায়।
আখেরে ত দেখলি রে তুই, বিশ্ব ফাঁকা ফক্কিকার,
তুইও মায়ার পুতুল যখন—ভয় ভাবনা যাক চুলায়।

ভাগ্যদেবি! তোমার যত লীলা খেলায় সুপ্রকাশ
অত্যাচারী উৎপীড়কের দাসী তুমি বারো মাস।
মন্দকে দাও লাখ নিয়ামত ভালোকে দাও দুঃখ শোক,
বাহাত্তুরে ধরল শেষে? না এ বুদ্ধিভ্রম বিলাস?

[ক্রমশঃ।

"রাষ্ট্রভাষা হিন্দী—অচল"—উইলিয়াম কেরী

[বাঙলা দেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের স্কন্ধে হিন্দী ভাষা জোর-জুলুমের মাধ্যমে যাঁরা চাপাতে চান, তাঁরা যে ভুল পথে অগ্রসর হয়েছেন, সেই কথা বিভিন্ন প্রদেশবাসীরা বিভিন্ন আন্দোলন এবং প্রতিবাদের দ্বারা জানিয়ে দিয়েছে। তথাপি হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করতে যাঁরা উদ্যোগী, তাঁদের জন্য এক বিখ্যাত বিদেশী মনীষীর উক্তি আমরা উদ্ধৃত করছি—যাঁর নাম উইলিয়াম কেরী (১৭৬১—১৭৯৩)। মনীষী কেরী ভারতবর্ষে এসেছিলেন প্রধানতঃ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের এবং শিক্ষাদানের কাজ চালাতে। উইলিয়াম কেরী তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে ব'লে গেছেন বহু পূর্ব্বে—হিন্দী সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষা হিসাবে ধার্য্য হ'তে পারে না।
—সম্পাদক]

"Bengal, as the seat of the British Government in India, and the centre of a great part of the commerce of the East, must be treated as a country of very great importance. Its soil is fertile, its population great and the necessary intercourse subsisting between its inhabitants and those of other countries who visit the ports, is rapidly increasing. A knowledge of the language of this country must therefore be a very desirable object.

The pleasure which a person feels in being able to converse upon any subject with those who have occasion to visit him, is very great. Many of the natives of this country, who are conversant with the Europeans, are men of great respectability, well informed upon a variety of subjects both commercial and literary, and able to mix in conversation with pleasure and advantage. Indeed, husbandmen, labourers and people in the lowest stations are often able to give that information on local affairs which every friend of science would be proud to obtain." * * *

"Bengalee, a language which is spoken from the Bay of Bengal in the South, to the mountains of Bootan in the north, and from the borders of Ramgor to Arakan.

It has been supposed by some, that a knowledge of the Hindoosthanee language is sufficient for every purpose of business in any part of India. **This idea is very far from correct**; for though it is admitted that persons may be found in every part of India who speak that language yet Hindoosthanee is almost as much a foreign language, in all the countries of India, except those to the north west of Bengal which may be called Hindoosthan proper, as the French in the other countries of Europe. In all the courts of justice in Bengal, and most probably in every other part of India, the poor usually give their evidence in the dialect of that particular country, and seldom understand any other,...

The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita that any of the other languages of India;······four-fifths of the words in the language are pure Sungskrita, **words may be compounded with such facility, and to so great an extent in Bengalee, as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to the copiousness.** On these, and many other accounts, it may be esteemed one of the **most expressive and elegant language of the east.**"

(বঙ্গানুবাদ)

বাঙালী জাতির পরিচয়

"বাঙ্গালায় ভারতস্থিত বৃটিশ সরকারের শাসন-কেন্দ্র রাজধানী অবস্থিত; বাঙ্গালা প্রাচ্যের সহিত অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্যেরও কেন্দ্র। এজন্য বাঙ্গালা দেশকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। উহার ভূমি উর্ব্বর, লোকসংখ্যা যথেষ্ট। যে-সকল দেশের অধিবাসীরা বাঙ্গালার বন্দরে যান, তাঁহাদের সহিত বাঙ্গালার অধিবাসীদের যোগাযোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ বিশেষ বাঞ্ছনীয়। যে কোন বিষয়ে লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মহান আনন্দ লাভ করা যায়। বাঙ্গালা দেশের যে-সকল অধিবাসী ইউরোপীয়দের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন, তাঁহাদের অনেকেই বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সাহিত্যিক ও বাণিজ্যিক-বিবিধ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং পরস্পরের সুবিধাজনক ভাবে ও সন্তোষের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পটু। বাঙ্গালা দেশের কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নস্তরের লোকরাও প্রায়ই স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে এমন সব সংবাদ সরবরাহ করিতে পারে, যাহা বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন লোকদের নিকট আদরণীয়।"

বাংলা ভাষার গুরুত্ব

"শুধু ভারত কেন, সমগ্র বিশ্বেই বাংলা আজ একটি অত্যন্ত মর্য্যাদাসম্পন্ন ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। সমৃদ্ধির দিক হইতে প্রাচ্যভূমিতে এই ভাষার সঙ্গে অপর কোন ভাষার বোধ করি তুলনাই হয় না। বঙ্গোপসাগর হইতে পার্ব্বত্য ভূটান পর্য্যন্ত, রামগড় সীমান্ত হইতে আরাকান-সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের কোটি কোটি অধিবাসীর মাতৃভাষা হইতেছে বাংলা।

কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা—হিন্দুস্থানী কিছু জানা থাকিলেই ভারতের যে কোন এলাকায় যাইয়া কাজ সারিয়া আসা যায়। এইটি কিন্তু মোটেই ঠিক নহে। অবশ্য ইহা স্বীকৃত যে, ভারতের সকল অঞ্চলেই কিছু না কিছু হিন্দুস্থানী জানা লোক পাওয়া যায়। আবার, হিন্দুস্থানী আদৌ বুঝে না,—এমন বহু অঞ্চল এবং বহু অধিবাসী ভারতেই রহিয়াছে। সোজা কথায়, সাধারণ লোক সাধারণতঃ আঞ্চলিক ও স্থানীয় ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকে—অপর কোন ভাষার জ্ঞান তাহাদের ভিতর কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা ভাষা বরং ভারতের অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে সংস্কৃতের কাছাকাছি। বাংলা শব্দসমষ্টির পাঁচ ভাগের চার ভাগই সংস্কৃত বলা যাইতে পারে। এই ভাষায় এত সহজে ও এত সুন্দরভাবে মনোগত ভাব প্রকাশ করা সম্ভবপর, প্রাচ্যের আর কোন ভাষায় বুঝি এমনটি হয় না।"

পরিমল গোস্বামী

দ্বিতীয় পর্ব্ব

২

ইংরেজী টিউটোরিয়াল ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি, এবং তারপর বলা—এর ভাবার্থ ইংরেজীতে লেখা, শিশিরকুমার ভাদুড়ির এ শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব এবং মনোহর। যাঁরা ইংরেজী কবিতা পড়াতেন তাঁরাও যদি ক্লাসে এসে বার বার শুধু কবিতা এই ভাবে আবৃত্তি করতেন, কবিতার ছন্দ এবং শব্দঝংকার আমাদের কানে বার বার ধ্বনিত করতেন, তা হলে ইংরেজী কাব্য গোড়া থেকেই হয়তো সবার কাছে প্রিয় হয়ে উঠত। কিন্তু পড়াবার রীতি তা নয়। রীতি হচ্ছে ক্লাসে এসেই কবিতার প্রথম লাইন প'ড়ে তার ব্যাখ্যা শোনানো। ৪৫ মিনিটে হয় তো ৬ লাইন পড়া হল। অংশ জুড়ে জুড়ে বহুদিন ধ'রে নোট চেহারার পরিচয়, সামগ্রিক রূপ তাতে ধরা পড়ে না, সে সামগ্রিক রূপ অনেকগুলি অংশের যোগফলে তৈরি হয় না।

শিশিরকুমার ইংরেজী পাঠ্যের নোট লিখতেন, যতদূর মনে পড়ে নোট বইতে তাঁর নাম ছাপা হত না। সেন-রায় ছিলেন তার প্রকাশক। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে পাশাপাশি কয়েকটি প্রকাশক ছিলেন। এঁদের মধ্যে স্বভাবতই প্রতিযোগিতা ছিল। একদিন এক ইংরেজী প্যাম্ফলেট নিয়ে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র মহলে খুব হৈ চৈ শুরু হ'ল। এই প্যাম্ফলেটের লেখক ছিলেন জে-এল ব্যানার্জি। তিনিও ছিলেন অন্য প্রকাশকের নোট লেখক। তিনি সেন-রায়ের প্রকাশিত ইংরেজী নোটের ভুল দেখিয়ে সেই ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন। শিশিরকুমারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়াতে আমরা ম্রিয়মাণ। কিন্তু বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না। পাল্টা প্যাম্ফলেট বেরোল। শিশিরকুমার দেখালেন (ইংরেজী-পণ্ডিতদের প্রচুর প্রমাণ সহ) যে তাঁর শব্দ প্রয়োগে কোথায়ও ভুল হয়নি, জে-এল ব্যানার্জিই ভুল করেছেন। তখন আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, যেন একটা বড় যুদ্ধে আমরা জিতে গেলাম। একটি মাত্র 'ভুল' প্রয়োগের কথা মনে আছে। জে-এল ব্যানার্জি বলেছিলেন sweet-scented flower ভুল প্রয়োগ, হবে sweet-smelling flower. শিশিরকুমার প্রমাণ সহ দেখিয়েছিলেন sweet-scented flower অতি নির্ভুল ইংরেজী, ইংরেজ সমর্থিত ইংরেজী।

পি-রায় চেহারায় ছিলেন প্রায় ইউরোপীয়। শাদা চুল, গৌর কান্তি, গালে গোলাপী আভা। শাদা সুট প'রে এলে বেশ দেখাত। পড়াতেন ঠিক সাহেবী ধরনেই। ল্যানডরের 'ইমেজিনারি কনভারসেশনস' পড়াতেন তিনি। কুঞ্জলাল নাগ পড়াতেন শেক্সপীয়ারের নাটক। চেহারায় কিছু শীর্ণ ছিলেন, চোখা নাক, হ্রস্ব দেহ। তিনি ছিলেন গোঁড়া শেক্সপীয়ার ভক্ত। অঙ্গভঙ্গিসহ অভিনয় করতেন মাঝে মাঝে। একদিন চাদরে মাথা ঢেকে ম্যাকবেথের উইচ সেজে চেষ্টনাট চিবোলেন শব্দ ক'রে (অর্থাৎ যেন উইচ চিবাচ্ছে)। টীকাকার ভেরিটির উপর তিনি মহা খাপ্পা ছিলেন। ভেরিটির নোটসহ মুদ্রিত এডিশনগুলিই আমরা পড়তাম। তিনি মাঝে মাঝে ভেরিটির ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁর মতভেদ জানিয়ে বিদ্রূপপূর্ণ সুরে বলতেন, "ভেরিটি নয় যেন বেড়িটি!—শেক্সপীয়ারের পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে।"

ডাক্তার বিমলাচরণ ঘোষ (বি, সি, ঘোষ নামে প্রসিদ্ধ) পড়াতেন ইংরেজী 'ডিস্কাভারি' নামক একখানি বই। এই বইখানার কথা আমি প্রথম কিস্তিতে উল্লেখ করেছি পিঁপড়ে-দর্শন সম্পর্কে। এর লেখক আর, এ, গ্রেগরি। এ রকম রোমাঞ্চকর বই আমি আর পড়িনি। যুগে যুগে বিজ্ঞানীরা কি ভাবে নির্লোভ এবং নিরহঙ্কারের মনোভাব নিয়ে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সেবা ক'রে গেছেন তার কাহিনী। এমন চমৎকার ভাষায় লেখা, বিজ্ঞানীদের জীবনের রোমাঞ্চকর আত্মত্যাগের ঘটনাগুলি এমন অদ্ভুতভাবে সংকলিত এবং বিন্যস্ত যে পড়তে বসলে মন আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে। অধ্যাপক বি, সি, ঘোষ এক একটি কাহিনী পড়াতে পড়াতে নিজেই অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতেন। তিনি ছিলেন খুব সংযতবাক মধুর ভাষী এবং নিরহঙ্কার, আর বইতে ছিল মানুষের শ্রেষ্ঠ জীবন-দর্শনের কথা। তাই তাঁর ক্লাসে ব'সে কখনো মনে হ'ত যেন কোনো দার্শনিকের বক্তৃতা শুনছি, কখনো মনে হ'ত বিজ্ঞানের ক্লাসে বিজ্ঞান পড়ছি।

আর-কে-ভি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ। সংস্কৃত ও বাংলা পড়াতেন।

তাঁর মতো রসিক ব্যক্তি অধ্যাপকদের মধ্যে আর দেখিনি। বিদ্যাসাগরের আমলের লোক। তাঁর কাছে ছাত্ররা একেবারে স্বাধীন। তিনি নিজেই সবাইকে খুব প্রশ্রয় দিতেন, নিজে খুব গম্ভীর থেকেও আর সবাইকে হাসাতেন। একদিন ক্লাসে ঢুকে দেখি রোল-কল আরম্ভ হয়ে গেছে এবং আমার নম্বরটি পার হয়ে গেছে। আমি এসে আর-কে-ভি'র সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম ডেস্কের সামনে ঝুঁকে। উদ্দেশ্য—সবার রোল নম্বর ডাকা শেষ হয়ে গেলে আমারটিতে 'প্রেজেন্ট' লিখিয়ে নেব। ডাকা শেষ হল, আর-কে-ভিকে আমার নম্বরটি বললাম। তিনি আমার মুখের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে মাথাটি আমার প্রায় মুখের কাছে এগিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়ির পাশে বাড়ি না এক গলিতে বাড়ি?" এ প্রশ্নের ইঙ্গিত এই যে আমি নিশ্চয় অন্যের প্রক্সি দিচ্ছি, কিন্তু যার জন্য আমি এতটা কষ্ট স্বীকার করছি, তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি ভাবে গ'ড়ে উঠেছে, পাশাপাশি বাড়ি থাকার দরুন, না এক গলিতে বাড়ি হওয়ার দরুন।—অর্থাৎ বন্ধুত্বটা খুব গভীর না শুধু মুখের আলাপ। আমি বললাম, "না সার, ওটা আমার নিজেরই নম্বর।"

একদিন ক্লাসের মধ্যে থেকে কে একজন খুব গম্ভীর ভাবে ব'লে উঠল, "সার, এই বুড়ো বয়সে আর পারি না।" এর উত্তরে আর-কে-ভি অম্লান বদনে বললেন, "বিয়েটা হয়ে যাক আর কি, তারপর সব ছেড়ে দিও।" আর এক দিন একজন জিজ্ঞাসা করল, "লিখতে এত ভুল হয়, কি করি বলুন তো, সার?" আর-কে-ভি বললেন, "তবে একটি গল্প শোন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একটি ছাত্র জিজ্ঞাসা করেছিল, 'নির্ভুল লেখা শেখা যায় কি ক'রে? তার উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছিলেন, খুব সহজ একটি উপায় আছে, সেটি অনুসরণ করলে কখনো ভুল হবে না।' ছেলেটি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল 'বলুন সে কি উপায়, আমি পরীক্ষা ক'রে দেখব।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বললেন, 'কখনো লিখো না'।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই গভীর অর্থপূর্ণ উপদেশটি আর কোথায়ও প্রকাশিত হয়েছে কি না জানি না, তবে আর-কে-ভি বলেছিলেন কথাটি তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছ থেকে শুনেছিলেন।

কলেজের নতুন হস্টেলে এলাম ১৯১৮তে। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপর চার তলা বাড়ি, বাড়ির নম্বর ১৭। টাটকা নতুন বাড়িতে বেশ একটা তৃপ্তি। এখানে আসার কিছু দিনের মধ্যেই ডেঙ্গু জ্বর সংক্রামক ভাবে আরম্ভ হল পৃথিবী জুড়ে, তার নাম হল war-fever বা যুদ্ধ-জ্বর। সেই জ্বরে আক্রান্ত হলাম আমি। অত্যন্ত কষ্টদায়ক জ্বর, সমস্ত গায়ে হাত পায়ে তীব্র যন্ত্রণা, পাশ ফিরতে লোকের সাহায্য দরকার হয় এমনি অবস্থা। আমি অসহায় ভাবে প'ড়ে ছটফট করছি চারতলার ঘরে শুয়ে।

এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটল, যা একই সঙ্গে ট্র্যাজিক এবং কমিক। আমার সেই অত্যন্ত অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিকেলের দিকে প্রবল ভূমিকম্প আরম্ভ হ'ল, অন্তত চার তলার ঘরে তার ঝাঁকানি খুব জোরেই চলছিল। এমন অবস্থায় কি ভাবে যে কি ঘটে গেল, আমি তার জন্য মোটেই দায়ী নই, কিন্তু যখন কিঞ্চিৎ সম্বিৎ ফিরে এলো তখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম, হস্টেলের বাইরে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ফুটপাথের উপর, অত্যন্ত অসহায় অবস্থায়। আত্মরক্ষার সহজাত প্রেরণা থেকে এ কার্য করেছি এবং চারতলা থেকে আর সবার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে ছুটে এসেছি, বুঝতেই পারি নি যে আমি অসুস্থ, আমি যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর, পাশ ফিরতে পারি না, বিছানায় উঠে বসতে পারি না। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। নিচে নামতে এক মিনিটের বেশি লাগেনি, অথচ উঠতে হল সমস্ত শক্তি ব্যয় ক'রে প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে এবং অন্যের সাহায্যে।

দেহ আর মনের সম্পর্ক বিষয়ে অল্প জানা ছিল, কিন্তু মন বিশেষ সময়ে দেহের সর্বময় কর্তৃত্ব নিতে পারে এবং আপন গরজে একটি অসমর্থ দেহকে সুস্থ দেহের মতো চালনা করতে পারে, এ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নতুন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পড়েছি, তিনি একবার বিছের কামড়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, এমন সময় তিনি মনকে বোঝালেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক এক ব্যক্তিকে বিছে কামড়িয়েছে, তাতে তাঁর কষ্ট হবে কেন? এই ভাবে সত্যিই তিনি দংশন বেদনাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পেরেছিলেন। সতীদাহ সম্পর্কে পড়েছি, অনেক সতীই দাহযন্ত্রণাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পেরেছিলেন ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে। সবই চিত্ত-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার। কিন্তু আমার ঘটনাটিতে সজ্ঞান নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন নেই। আমার মন আপন গরজে এবং আপন বিচারবুদ্ধির অপেক্ষা না ক'রে, বেতাল যেমন মৃতদেহকে আশ্রয় ক'রে তাকে জীবিত ক'রে তোলে, তেমনি ভাবে একটি অপটু দেহকে সাময়িক ভাবে পটু ক'রে নিয়েছিল। তার যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়ে কার্যোদ্ধার ক'রে নিয়েছিল এবং প্রয়োজন শেষ হতেই যথাপূর্বং। তবু মনকে ধন্যবাদ জানিয়েছি এজন্য।

নতুন হস্টেলে কয়েকটি চরিত্র স্মরণীয় হয়ে আছে। হরিপদ সান্যালের কথা আগেই বলেছি। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য চরিত্র সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন ছিমছামবাবু। তাঁর বইয়ের শেলফ পরিচ্ছন্ন, একখানি বই নেই। টেবিলের ড্রয়ারে একখানা মাত্র খাতা, উপরে আয়না, চিরুনি এবং একটি ক্লারিওনেটের বাক্স। দেখে খুবই অভিনব মনে হয়েছিল। খুব একটু জোরালো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চেহারা। কলেজের এক নাটকে খুব ভাল অভিনয় করেছিলেন, কোচ করেছিলেন শিশিরকুমার। একদিন বিকেলে হৈ হৈ কাণ্ড। দোতলার কয়েকজন ছাত্র সুধাংশুর বিরুদ্ধে প্রিন্সিপ্যালের কাছে অভিযোগ করলেন, "সুধাংশু বাবু ক্লারিওনেট বাজাচ্ছেন, এতে আমাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে, আমরা পড়তে পারছি না।'

বেলা তখন সাড়ে চারটে। অপরাধীর ডাক পড়ল। দেখলাম তিনি অত্যন্ত নিরুদ্বেগ ভাবে এগিয়ে আসছেন, অপরাধীর চেহারা আদৌ
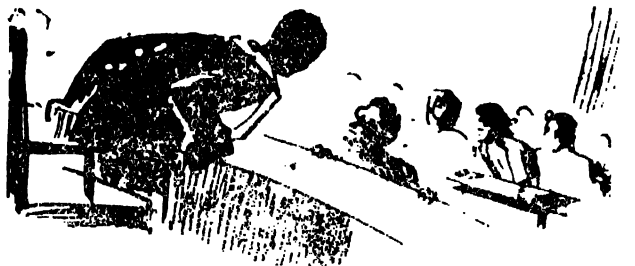
"বাড়ির পাশে বাড়ি, না এক গলিতে বাড়ি?"

নয়। তাঁকে ছাত্রদের অসুবিধের কথা বলা হয়। তিনি সব শুনে প্রিফেক্টের দিকে খুব একটা দৃপ্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, "এঁরা বললেন অসুবিধে হচ্ছে, আর আপনি সে কথা শুনলেন? এখন বেলা সাড়ে চারটে, এটা পড়বার সময় নয়, খেলার সময়। এখন যদি এঁরা বলেন 'আমরা পড়ছি' আর আপনি এঁদের প্রশ্রয় দেন, তা হলে অপরাধ হবে আপনার। এ সময়ে প'ড়ে এঁরা স্বাস্থ্য নষ্ট করছেন, এই পাপ কাজে আপনি এঁদের প্রশ্রয় দেবেন না, দিলে এঁদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে, এবং তার জন্য দায়ী হবেন আপনি। এঁদের ব'লে দিন, ঘরে ব'সে থাকার সময় এটি নয়, এখন কেউ পড়ে না।"

খুব জোরের সঙ্গে কথাগুলো ব'লে অপরাধী অভিজ্ঞাত ভঙ্গিতে ঘরে ফিরে গেলেন। বিচারক স্তম্ভিত। তাঁর বলবার কিছুই ছিল না। সুধাংশুর প্রত্যেকটি কথা সত্যি। ছেলেরা স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে পড়ছে এটি সত্যিই অন্যায়। খেলার সময় পড়বে কেন? বিকেলে ঘরে বদ্ধ থাকবে কেন?

অল্পক্ষণের মধ্যেই সুধাংশুর ঘরে ক্লারিওনেট বেজে উঠল।

সুধাংশুর সব কথাই যুক্তিসঙ্গত, শুধু তাঁর লজিকে একটি ত্রুটি ছিল। তিনি নিজেই সাড়ে চারটের সময় ঘরে ব'সে স্বাস্থ্য নষ্ট করছিলেন।

এঁর সঙ্গে পরে আলাপ হয়েছিল, বেশ মধুর চরিত্র এবং একটি যোগাযোগও আবিষ্কার হয়েছিল—ইনি বনফুলের ভগিনীপতি।

ক্ষিতীশচন্দ্র সর্বাধিকারী আর এক চিত্তাকর্ষক চরিত্র। মেদিনীপুরের ডাক্তার শচীন্দ্র সর্বাধিকারীর পুত্র, আই-এস-সির ছাত্র। ক্ষিতীশ অল্প দিনের মধ্যেই অতুলানন্দ ও আমাকে একেবারে প্রিয়তম বন্ধু বানিয়ে ফেলল। এ রকম দুর্দান্ত প্রাণোচ্ছল ছেলে হস্টেলে আর ছিল কিনা জানি না, কিন্তু তার বিরামহীন হুল্লোড় প্রবৃত্তি, পাঠে অমনোযোগিতা-প্রসূত অস্বস্তিকে ভেঙে চুরে একাকার ক'রে দিত। এর মধ্যে সব চেয়ে ভাল লাগত তার রুচির পরিচ্ছন্নতা। তার বক্তৃতা কাব্য না হলেও তার প্রত্যেকটি বাক্য ছিল রসাত্মক। একদিন থিয়েটার থেকে ফিরতে তার একটু রাত হয়েছিল, সে আগে হস্টেলে জানিয়ে যেতে পারেনি, সেজন্য গেট বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। অগত্যা ক্ষিতীশকে গেট টপকিয়ে ভিতরে আসতে হল, কিন্তু ধরা প'ড়ে গেল। গুরুতর কিছু নয়, কিন্তু ক্ষিতীশ পরদিন এই উপলক্ষে একটি গল্প ফেঁদে বসল। বক্তৃতার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে—"ব্রজধামে হস্টেল ছিল, সেই হস্টেলের গেট টপকিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভিতরে লাফিয়ে পড়লেন। হস্টেলে আয়ান ঘোষ বাস করতেন সপরিবারে, কৃষ্ণকে ধ'রে ফেলে বললেন, 'হোয়াট ডু ইউ মীন'?" ইত্যাদি ক'রে দীর্ঘ এক কাহিনী, খুবই উপভোগ্য হয়েছিল এটি।

খাবার ঘরেও ক্ষিতীশ নিষ্ক্রিয় থাকত না। হস্টেলের চেহারা যেমন ঝকঝকে তকতকে, তেমনি তার খাবার ঘরের বাসনপত্র। ভারী কাঁসার থালা বাটি গেলাস, সব নতুন। সব মিলিয়ে বেশ তৃপ্তিকর। একসঙ্গে অনেকে খেতে বসতাম। সংখ্যা মনে নেই। পঞ্চাশ ষাট কিংবা বেশি। ক্ষিতীশ আমি প্রায় একসঙ্গে পাশাপাশি বসতাম। মণি মুখুজ্জে ক্ষিতীশের সহপাঠী, সেও বসত আমাদের সঙ্গে। সপ্তাহে একদিন মাংস হত। সকালের ও বিকেলের খাবার ঘরে ঘরে দিয়ে যেত। থাকা ও খাওয়া মিলিয়ে ১৮ টাকা মাসে বাঁধা রেট।

মাংস হত দুরকম, পেঁয়াজযুক্ত ও পেঁয়াজহীন—নাম যথাক্রমে আমিষ ও নিরামিষ মাংস। মাছ বা মাংস, অথবা ডাল, পৃথক বাটিতে পরিবেশন করা হ'ত। একদিন মাংস পরিবেশন করা হচ্ছিল। ঠাকুর প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা ক'রে নিচ্ছিল—আমিষ চাই কি নিরামিষ চাই। ক্ষিতীশের কাছে এলে সে এমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল যে সে যেন আর এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভাবছেই না কিছু, যা হোক একটা দিলেই হল—এই রকম ভাবটা। অথচ সবই সে লক্ষ্য করেছে, জানে তাকে পেঁয়াজযুক্ত মাংস দেওয়া হয়েছে। দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে বাটিসুদ্ধ থালায় ঢেলে একটু মুখে দিয়েই ঠাকুরকে ডেকে বলল "আমিষ মাংস দিয়েছ আমাকে—ছি! ছি! এ আমি খাই না," ব'লে সে সবটা মাংস ও ঝোল ঠেলে ঠেলে থালার একপাশে সরিয়ে দিল। ঠাকুর মহা অপরাধীর মতো নিরামিষ মাংস একবাটি রেখে গেল থালার পাশে। ক্ষিতীশ তখন সে মাংসও থালাতে ঢেলে নিয়ে দুটিতে মিশিয়ে ভোজন সমাধা করল।

আরও এক দিনের ঘটনা। পরিপুষ্ট চিংড়িমাছ রান্না হয়েছিল। ক্ষিতীশ মাছটি মুখে দিয়েই মাটিতে ফেলে দিয়ে চেঁচাতে লাগল, "ঠাকুর, পচা চিংড়িটাই আমাকে দিলে?" ঠাকুর দেখল কথাটি মিথ্যা নয়, মাছ মাটিতে প'ড়ে আছে। সে তখন আর এক বাটি থেকে নতুন একটা মাছ ও ঝোল ক্ষিতীশের পাতে ঢেলে দিল। ক্ষিতীশ তখন ফেলে দেওয়া মাছটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে খেতে লাগল। দুষ্টুমি বুদ্ধির অন্ত নেই। একদিন মাছ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিতীশ দূরে দরজার দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে ব'লে উঠল "আরে! জে, আর ব্যানার্জি খাবার ঘরে!" পাশে মণি মুখুজ্জে বসেছিল, সবাই দরজার দিকে তাকাতেই ক্ষিতীশ মণির বাটি থেকে তার মাছের খণ্ডটি তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করেছে। পরে একদিন ক্ষিতীশেরই কৌশলে ক্ষিতীশকে জব্দ করতে চেয়েছিল মণি, কিন্তু পারেনি। "আরে, শিশির ভাদুড়ি এসেছেন খাবার ঘরে!" বলতেই ক্ষিতীশ নিজের মাছের বাটিটি ডান হাতে ঢেকে বলল, "কোথায়?" ক্ষিতীশই কি কেপমারী কৌশলের প্রথম উদ্ভাবক?

আরও কয়েক বছর পরের একটি ঘটনা বলি। বলাইচাঁদ (বনফুল) তখন সম্ভবত মেডিক্যাল কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়ে। ক্ষিতীশও মেডিক্যাল কলেজে পড়ত একই সঙ্গে, কিন্তু ওদের বিশেষ পরিচয় ছিল না। আমার কাছে বলাই সম্পর্কে অনেক কথা শুনে ক্ষিতীশের প্রবল আগ্রহ হয় তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে। সেটি অত্যন্ত সাধারণ এবং স্বাভাবিক ভাবেই হতে পারত, কিন্তু ক্ষিতীশের পথ আলাদা। সে তখনই আমাকে বলল, ভাই, বনফুলের কোনো একটা কবিতা জোগাড় ক'রে দিতে পার? সেটি সম্ভবত ১৯২৩ সাল। সে সময়ে তার অনেক কবিতা নানা কাগজে বেরিয়েছে, একটি জোগাড় ক'রে দেওয়া গেল। ক্ষিতীশ সেই দিনই বলাইয়ের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলল। সে ঐ কবিতায় যে-কোনো একটি সুর লাগিয়ে বলাইয়ের পিছনের একটি আসনে ব'সে আপন মনে গাইতে লাগল। এইটিই আলাপের প্রথম সূত্রপাত।

ক্ষিতীশ বর্তমানে মেদিনীপুরের খ্যাতনামা ডাক্তার এবং বহু

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আরম্ভের সঙ্গে শেষ দিকের অবশ্যই একটি যোগসূত্র আছে, দীর্ঘকালের দূরত্বে ব'সে সেটি অনুসরণ করা আমার সাধ্য নয়।

এই হষ্টেলে দেখা হল রাজেন সেনের সঙ্গে। ১৯১১ সালের বিজয়ী মোহনবাগান দলের যে ফোটোগ্রাফ ক্লাস সেভেনে পড়তে নানা কাগজে দেখেছিলাম, তার মধ্যেকার প্রত্যেকের চেহারা মনে গাঁথা ছিল। তারপর কোন্ সালে মনে নেই বিজয় ভাদুড়ীর খেলা আমি দেখেছিলাম। আমার ১৯১১ সালের সেই রোমাঞ্চকর বিজয়-স্মৃতিতে শ্রদ্ধার, গর্ব্বের এবং বিস্ময়ের আসনে এঁরা সবাই ছিলেন উজ্জ্বল। সেই ফোটোগ্রাফ থেকে যেন রাজেন সেন জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন সামনে। আর তারই সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ছি, এক হষ্টেলে বাস করছি! এ ঘটনা আমার কাছে খুবই আশ্চর্য্য মনে হয়েছিল।

রাজেন সেনের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হল। আমি সেই বেঁটে লোকটির লোহার মত শক্ত পেশী দেখে অবাক হতাম, এবং তিনি আমার হাড়ের উপরকার চামড়ার আবরণ দেখে অবাক হতেন। খুব মিষ্টভাষী ছিলেন এবং খুব মর্য্যাদাশ্লিষ্ট ছিলেন। এক দিন আরও অবাক হলাম দেখে, শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি তাঁকে রাজেনদা ব'লে ডাকছেন। পড়াবার সময় অবশ্য শিশিরকুমারই দাদা হতেন ক্লাসের মধ্যে। বিদ্যাসাগর কলেজের আর এক বিখ্যাত খেলোয়াড় শ্রীগোষ্ঠ পাল তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন। তিনি হষ্টেলে থাকতেন না। তাঁর সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়েছিল। কলেজের কোনো খেলাই কখনো দেখতে যাইনি, শুধু খেলোয়াড় দেখেই খুশি।

বিকেলের দিকে বেড়াতে যাওয়া প্রায় নিয়মিত ছিল। অতুলানন্দের সঙ্গে একত্র যাওয়া হত বেশি। অবশ্য এই সময় আমার আবার ম্যালেরিয়ার বড়ই কষ্ট দিতে থাকে, সেজন্য মাঝে মাঝে শুয়ে থাকতে হত। আমাদের ভ্রমণ-সীমা এ সময় গোলদীঘির বেশি বিস্তৃত ছিল না। এখানে এলে নানা চিত্তাকর্ষক জিনিসে মানসিক হাওয়া পরিবর্তন ঘটত সহজে। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে সভা প্রায় লেগেই থাকত। সেখানে স্যর আশুতোষ চৌধুরী অথবা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক বার সভাপতির পদে দেখেছি। চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর অনেক কৌতুককর প্রোগ্রাম এখানে দেখেছি। কলেজ স্কোয়ারে খোলা জায়গায় সভা প্রায় লেগেই থাকত। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা খুব আকর্ষক ছিল। তিনি তাঁর বক্তব্য শ্রোতার মর্মে গেঁথে দিতে পারতেন। তখন মাইক্রোফোন লাউড-স্পীকার ছিল না, কিন্তু তখনকার বক্তার এসব দরকার হত না। শ্রোতার সংখ্যাও সীমাবদ্ধ ছিল সব সময়। ইনষ্টিটিউটে যত চিত্তাকর্ষক বক্তৃতাই হোক, সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু ভিড়ে হট্টগোল হতে দেখি নি।

বিপিন পালের গলা ছিল খুব জোরালো। তিনি কোনো কথাই দ্রুত বলতেন না, প্রত্যেকটি কথা প্রয়োজন বোধে একবারের বেশি বলতেন। সব দিকে ঘুরে ঘুরে সব দিকের শ্রোতার প্রতি লক্ষ্য ক'রে বলতেন একই কথা। এ রকম বক্তৃতা আর কাউকে দিতে দেখিনি।

সন্ধ্যাবেলা কলেজ স্কয়ারে উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতেন। হিন্দুর শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করতেন যুক্তি দিয়ে। কিন্তু সে ব্যাখ্যা সাধারণ শ্রোতার মনঃপূত হত না, সভায় ভীষণ প্রতিবাদ উঠত। অতুলানন্দ ও আমি তাঁর ব্যাখ্যার নূতনত্বে খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁকে কলেজ স্কয়ারে দেখলেই শ্রোতার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেতাম। রামায়ণ মহাভারত বেদ উপনিষদ তিনি এমন মুখস্থ করেছিলেন যে তাঁর সংগৃহীত সংস্করণগুলির যে-কোনো পাতা থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারতেন পৃষ্ঠার নম্বর এবং শ্লোকের নম্বর সমেত। লম্বা দাড়ি চুল, প্রায় সবটাই পাকা, বেঁটে মানুষ, গায়ে গেরুয়া রঙের ঢিলে লম্বা জামা, গেরুয়া রঙের ধুতি।

এক দিন সন্ধ্যায় তাঁর বক্তৃতা শুনছি, তিনি কোনো একটি শ্লোকের লৌকিক ব্যাখ্যা করছিলেন, শ্লোকটি এখন আর মনে নেই। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে হিংস্র প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেল, এবং তাঁর গায়ে কে যেন ঢিল ছুড়তে লাগল। বিপজ্জনক অবস্থা, কেউ কেউ মারবে ব'লে এগিয়ে এলো। অতুলানন্দ ও আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে, এবং তাঁকে উদ্ধার ক'রে বাইরে নিয়ে এলাম জনতার মাঝখান থেকে।

উমেশচন্দ্র আমাদের ছাড়লেন না, নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে, এবং কত গল্প করলেন। গল্প করতে করতে বই খুলছিলেন মাঝে মাঝে আমাদের দেখাবার জন্য। কয়েকটি আলমারি বোঝাই বই। আলমারিরও অদ্ভুত সব নাম ছিল। একটির নাম মনে পড়ে—'নৈমিষারণ্য'। নামগুলি আলমারির গায়ে লেখা। তাঁর কোনো পুত্র তখন অ্যামেরিকার ছিলেন, তাঁর ফোটো দেখালেন—এই রকম মনে পড়ে।

পাবনা হষ্টেলে থাকতে আক্রমণের হাত থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাঁচাবার চেষ্টা করলাম, কলকাতার হষ্টেলে এসে উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে বাঁচাবার চেষ্টা করলাম। উভয়ত্রই 'হীরো' সেই একই আমরা দুজন—অতুলানন্দ ও আমি। সৌভাগ্যের বিষয়, এর পর থেকে আর এক দিনও অন্য কাউকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিতে হয় নি, কেন না পরবর্তী ত্রিশ চল্লিশ বছর ধ'রে আমরা শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা ক'রে আসছি।

কাছাকাছি সময়ে (১৯১৮ কি ১৯১৯ মনে পড়ছে না) বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতা শুনলাম টিকিট কিনে। জগদীশচন্দ্র তাঁর ক্রেস্কোগ্রাফের ক্রিয়া দেখালেন অন্ধকার দেয়ালে একটি আলোর

ক্ষিতীশ হষ্টেলের গেট টপকাচ্ছে।

গোলক প্রতিফলিত ক'রে। গাছ উত্তেজক খাদ্যে কি ভাবে সাড়া দেয় এবং বিষ দিলে কি রকম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তাঁর ছবি দেখা গেল এর সাহায্যে। সোজাসুজি দেখবার উপায় নেই, গাছের উত্তেজনা বা নিষ্ক্রিয়তা এক লাখ গুণ বর্ধিত ক'রে একটি বলের মতো আলোর প্রতিফলনের সাহায্যে দেখানো। এই উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র নিজের বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাস সংক্ষেপে বলেছিলেন সেদিন। পদার্থবিদ্যায় এবং বিশেষ ক'রে বেতার বিজ্ঞানে তাঁর দানের কথা উল্লেখ করেছিলেন মনে আছে। 'my galena receiver' কথাটি বার বার বলেছিলেন, এখনও কানে বাজছে। জগদীশচন্দ্রকে দেখে সেদিন ধন্য হয়েছিলাম। বক্তৃতা শেষে তাঁর সঙ্গে সামান্য আলাপও করেছিলাম। এই সময় রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, পকেট সংস্করণ তার নাম। একই সঙ্গে পুরনো সংস্করণের কাব্য গ্রন্থসমূহ—(যৌবনস্বপ্ন, প্রেম, কল্পনা, যাত্রা প্রভৃতি নামে বিভক্ত) ও ক্ষণিকা (পকেট এডিশন) ও গদ্য গ্রন্থ—চারিত্র পূজা, লোক সাহিত্য প্রভৃতি পথে দু আনা ক'রে বিক্রি হত—আমি অনেক কিনেছিলাম, এখনও কিছু আছে।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় বসতে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। দেখলাম সবাই প্রকাশ্যে বই খুলে নকল করছে। এই ব্যাপারটি আমার মফঃস্বলীয় দৃষ্টিতে খুব চমকপ্রদ বোধ হয়েছিল। পরীক্ষায় নকল এতকাল ছিল একটি বিভীষিকা। কল্পনার বাইরে ছিল। পাবনা শহরে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছি নিস্তব্ধ ঘরে। কোথাও কারো মুখে একটি শব্দ নেই। পরীক্ষা একটি পবিত্র এবং নিষ্ঠার ব্যাপার ব'লে মনে হয়েছে এ জন্য। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাও পাবনা শহরে দিয়েছি, সেও শ্রদ্ধাপূর্ণ মনে। তাই এ পরীক্ষায় প্রথমত মনে আঘাত লাগল, এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই সে আঘাত কাটিয়ে উঠতে বেশি দেরি হল না। পরদিন থেকে আমিও পাশের খোলা বইয়ের দিকে চাইলাম।

শুনলাম পরীক্ষার খাতা দেখা হয় না, অতএব টোকা না টোকা সমান। পরীক্ষাটা লোক দেখানো। উদ্দেশ্য গোড়ায় ভাল ছিল সন্দেহ নেই, কারণ পরীক্ষার নামে কিছু পড়া পড়বে ছেলেরা, এবং উত্তর লেখা অভ্যাস করবে। কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা এত যে এই উদ্দেশ্যে তাদের নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। আজকের দিনে এর পরিবর্তন হয়েছে সম্ভবত, কিন্তু তখন শুনেছি বিদ্যাসাগর কলেজের এটি একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পরীক্ষায় টোকা এখানে 'বার্থ-রাইট' বিবেচিত হত। অধ্যাপকেরা বাধা দিতেন না।

ক্ষীরোদ গুপ্ত দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন; অতি সদাশয় ব্যক্তি, শিশুর মতো সরল, ছেলেদের খুব ভালবাসতেন। মেটাফিজিক্সের ক্লাস হচ্ছিল, এমন সময় পাশের মেট্রোপলিটান স্কুলের টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রায় হাজার খানেক ছাত্র এক সঙ্গে চিৎকার ক'রে ক্লাস থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। রোজ হয় এ রকম। তখন সে চিৎকার সহ্য করা কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখি ক্ষীরোদ গুপ্ত আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে হেসে বলছেন আহা, এতক্ষণের রুদ্ধ শক্তি এক সঙ্গে মুক্তি পেল। তিনি পড়ানো ভুলে এই চিৎকার উপভোগ করতে লাগলেন চোখ বুজে—মুখে মৃদু হাসি। একটা পরীক্ষার দিন তিনি গার্ড হিসেবে এলেন এবং এসে চেয়ারখানা উল্টো ক'রে ঘুরিয়ে দরজার দিকে মুখ ক'রে বসলেন। যতক্ষণ পরীক্ষা হ'ল, ততক্ষণ তিনি একখানা খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন। নকলে বাধা দেবেন না জেনেই তিনি বিপরীতমুখী হয়েছিলেন গোড়া থেকে। বুঝলাম টোকা এখানে একটি বনেদি অভ্যাস।

ম্যালেরিয়ার জন্য নিয়মিত ক্লাসে যাওয়া হয়নি, নিয়মিত পড়ার উৎসাহও পাইনি, ধারাবাহিকতার মধ্যে বার বার ছেদ পড়েছে। শেষে এমন হল যে টেষ্ট পরীক্ষাই দেওয়া হল না। পরীক্ষা দিলেই পাস, অথচ বসাই হল না। আশা ছিল ফাইনাল পরীক্ষার আগে যদি ভাল থাকি তবে এরই মধ্যে বেশি প'ড়ে এতদিনের ক্ষতিপূরণ করে নেব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হল না। হষ্টেলের একজন ডাক্তার ছিলেন, তিনি কুইনিন ও অন্যান্য দু একটি সহযোগী ওষুধের বড়ি ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু যে কারণেই হোক, তাতে জ্বর বন্ধ হল না। অবশেষে গেলাম হ্যারিসন রোডে চারুচন্দ্র সান্যালের কাছে। তিনি অতুলানন্দের পরিচিত ছিলেন। তিনি কুইনিন দিলেন, কিন্তু বড়ি নয়, মিকশ্চার। এই মিকশ্চারে দ্রুত ফল হল, কিন্তু নিয়মিত চালানো সম্ভব হল না। বাল্যকাল থেকে ডি গুপ্তের ওষুধ, এডওয়ার্ডস টনিক খেয়ে খেয়ে তিতো ওষুধ অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই এক শিশির আটটি মাত্রাও শেষ করলাম না। জ্বর আবার দেখা দিল এবং মাঝে মাঝে বাড়তে লাগল। তখন হয়তো আবার দু তিন মাত্রা খেয়ে তাকে দমিয়ে রাখতাম।

অতুলানন্দ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কবিরাজ গণনাথ সেনকে আশ্রয় করল, নানা মগজপুষ্টিকর ওষুধ খেতে লাগল, মাথায় তেল মালিশ করতে লাগল, আর পড়তে লাগল! সেন্টসবেরির প্রকাণ্ড 'লিটারেচর' খানা প্রায় মুখস্থ ক'রে ফেলল। তার এক হাত মাথায় কবিরাজী তেল মালিশে ব্যস্ত, অন্য হাতে বই। আমার দুখানা হাতই পীলের উপর। কোনো বইই পরীক্ষার আগে প'ড়ে শেষ করা গেল না। অতুলানন্দ সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেল। অর্থাৎ যতটুকু কম পড়লে সে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেতে পারত, তার চেয়ে অনেক বেশি প'ড়ে সে ঠকে গেল, আর আমার মাত্রা প্রয়োজনীয় কম পড়ার ধাপ পর্যন্তও উঠল না ব'লে আমার পাস করাই হল না।

পর বছর ইংরেজী ছটি পেপার ছেড়ে দিয়ে তিনটি পেপার নিলাম। এবারেও স্বাস্থ্য প্রতিকূল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বোঝা হাল্কা হওয়াতে পার হয়ে যাওয়ায় কোনো অসুবিধে হয়নি। পরীক্ষা হয়েছিল সায়েন্স কলেজে। ১৯১৯-এর দ্বারভাঙ্গার বাড়ির অভিজ্ঞতার সঙ্গে ১৯২০-র অভিজ্ঞতা মিলল না। এবারের কাণ্ডকারখানা দেখে একেবারে স্তম্ভিত! পরীক্ষার হল, না বাজার! যার যেমন খুশি স্বাধীন ভাবে আলাপ আলোচনা ক'রে লিখছে। ইনভিজিলেটররা পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব নিলেন। বিদ্যাসাগর কলেজের কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে এই কাণ্ড দেখে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেত।

আমার খুব তাড়াতাড়ি লেখা অভ্যাস। ম্যাট্রিকুলেশনে কিংবা ইণ্টারমিডিয়েটে প্রত্যেকটি পেপার—কোনোটি আধ ঘণ্টা কোনোটি পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শেষ। এক ঘণ্টার আগে হল্ থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় না—সেজন্য বড়ই অসুবিধে হত। আমি

যেটুকু বুঝি, শুধু সেইটুকুই লিখি এবং তার পরিমাণ সব সময়েই কম।

বি-এ পরীক্ষাতেও আমাকে লেখা শেষ ক'রে থাকতে দেখে শুধু পাশের বন্ধুরা নয়, পাঁচ ছ জনের দূরত্বেরও অনেকে জোড় হাত ক'রে "দাদা দু-নম্বরটা একটু"—কিংবা "চার নম্বরের পয়েন্টগুলো যদি একটু সংক্ষেপে লিখে জানান"—। সাইকোলজি পরীক্ষার দিন এটি সব চেয়ে বেশি হয়েছিল। দূরের বন্ধুদের লিখে জানাতে হল, ইনভিজিলেটর তা বয়ে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে এলেন। কখনো বললেন নিচে ফেলে দিন। নিচে ফেলে দিলে পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে এগিয়ে দিলেন।

পরীক্ষার এই কমিক দিকটি কলকাতার অভিজ্ঞতাতেই আমার কাছে প্রকট হয়। এ নিয়ে অনেক ভেবে দেখেছি। পরীক্ষার যে রীতি তাতে এই টোকার ব্যাপারটাও অনিবার্য। এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি আমি, এবং ব্যঙ্গ গল্পও লিখেছি একটি। গল্পটির নাম 'বাতিল পরীক্ষার কাহিনী'—প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল বছর দশেক আগে। গল্পটি "মারকে লেঙ্গে" বইতে স্থান পেয়েছে।

১৯১১ সালে আমার সঙ্গে পাংশা-কালিকাপুরের যতীন্দ্রনাথ বাগচীর কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নার বিয়ে হয়। অভিভাবক-নির্দিষ্ট বিবাহ। বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এতে পণ বা কোনো রকম দান গ্রহণ করা হয় নি—বিবাহের যাবতীয় খরচ বাবা বহন ক'রেছিলেন।

এই বছরে আমি প্রথম ক্যামেরা কিনি। ক্যামেরা সম্পর্কে আমার মনে একটা অতি প্রবল আকর্ষণ ছিল বাল্যকাল থেকে। প্রথম ফোটোগ্রাফ দেখি বাবার। তাঁর অনেক ফোটোগ্রাফ। আমিও ক্লাস-টুতে পড়তে প্রথম ফোটো তোলাই। সেটি ক্লাসের ছেলে ও এক জন টীচারের সঙ্গে গ্রুপ ফোটো। কত দিন ধ'রে চেয়ে চেয়ে দেখেছি—জলছবির পরেই এমন বিস্ময় আর কিছুতে অনুভব করিনি। ফোটোগ্রাফের রহস্যের কথা ভেবে ভেবে কূলকিনারা পাইনি। যখনই সুযোগ পেয়েছি ফোটো তুলিয়েছি, কিন্তু কি ক'রে ছবি ওঠে তার রহস্য ভেদ করার উপায় কি? হাই স্কুলে পড়তে, ১৯১২তেই সম্ভবত, একখানা ছোট ক্যাটালগ আনাই কলকাতার হাউটন বুচারের কাছ থেকে। বইখানি ৫ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি হবে, মোটা কাগজে বাঁধানো। তাতে ছোট ক্যামেরার বিজ্ঞাপন ছিল। নানা আকারের ছবির জন্য নানা আকারের মিনিয়েচার ক্যামেরা। ক্যামেরার ছবির পাশে পাশে সেই ক্যামেরার তোলা ছবিও একটি ক'রে ছাপা ছিল—কি আকারের ছবি ওঠে তার ধারণা জন্মানোর জন্য। তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট যে ক্যামেরা—তার নাম Ticca Watch Camera (টিকা পকেটঘড়ি ক্যামেরা) দেখতে পকেটঘড়ির মতো, তার ছবির আকার ডাকটিকিটের আকার।

এই বইখানা ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। অনেক বছর ধ'রে তাকে রক্ষা করেছিলাম। তার এক একটি পৃষ্ঠা চোখের সামনে ধ'রে মনে মনে ক্যামেরা বাছাই করেছি, কোন্‌টি আমার কেনা উচিত মনে মনে হিসেব করেছি, কিন্তু ফোটো তোলা শিখিয়ে দেবার মতো তখন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বড় একটি ফিল্ড ক্যামেরা প্রথম স্পর্শ করি দার্জিলিঙে, ১৯১৩ সালে। আমার সেই প্রথম দার্জিলিঙ দেখার চোখেই বড় ক্যামেরায় কি করে ফোকাস করা হয় তা দেখার সুযোগ পেলাম। যেখানে উঠেছিলাম, সেখানে কোনো এক ভদ্রলোকের একটি ক্যামেরা ছিল, তিনি সেটিকে বাইরে ট্রাইপডে দাঁড় করিয়ে কালো কাপড়ে মাথা ঢেকে নিকটবর্তী একটি অতিকায় গোলাপ ফুলকে ফোকাস ক'রে দেখছিলেন। তাঁকে আমার অন্তরের বাসনার কথা জানাতেই তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে আমাকে ফোকাস করার কৌশল দেখালেন। দার্জিলিঙের প্রকাণ্ড একটি গোলাপ ফুলের ছবি দেখলাম ফোকাসিং স্ক্রীনের উপর। উল্টো ছবি, ফুলের উঁচু মাথা নিচু দিকে। ঘষা কাচের উপর সবুজ পাতার সঙ্গে গোলাপফুলের রং কি অদ্ভুত সুন্দর যে দেখাচ্ছিল! একটি অনাবিষ্কৃত রহস্য-রাজ্যের এই প্রথম স্বাদ। জীবন ধন্য হল।

১৯১৭ সালে যখন ৩০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের কলেজ মেসে থাকি, সে সময় জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন আমার সহপাঠী। জ্ঞানেন্দ্রনাথ পরে ছোটদের জন্য কবিতা গল্প ইত্যাদি লিখে খ্যাত হয়েছিলেন। এঁর ফোটো তোলানোর শখ ছিল বেশ। তিনি একদিন আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন কাছাকাছি কোনো গলির মধ্যে এম দত্ত ফোটোগ্রাফারের দোকানে। এম দত্তের কোনো ষ্টুডিও ছিল না, বাইরের আলোতে তুলতেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের চুল ছিল ঝাঁকড়া এবং ঢেউ খেলানো। তাঁর শখ হয়েছিল সাহেবী পোষাকে ছবি তোলাবেন। সেজন্য তিনি কলার নেকটাই এ একটি কোট কোথা থেকে সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন। দোকানে গিয়ে সেজে নিলেন এবং ঘাড় পর্যন্ত ফোটো তোলালেন। পুরো ছবি হল না, ধুতির সঙ্গে কোট কলার নেকটাই আর চলবে কি করে। (মাদ্রাজে চলে, ছবিতে দেখেছি)।

তাঁর তোলা হলে বললেন, আপনিও কলার টাই প'রে নিন। প্রস্তাবটি মনোহর। সাহেব সাজা গেল ধার করা পোষাকে। ফোটো তোলার পর এম দত্ত (মনোমোহন দত্ত) কে বললাম প্লেটে কি ক'রে ছবি ওঠে দেখিয়ে দিন। মনোমোহন বাবু খুব অমায়িক লোক ছিলেন, আমাকে ডার্করুমে নিয়ে গেলেন এবং ডেভেলপ করা দেখালেন। তখন প্যানক্রোমেটিজম-এর জন্ম হয় নি, তখন সাধারণ প্লেটে ছবি তোলা হত, এবং সব প্লেটই কড়া লাল আলোতে নিরাপদে ডেভেলপ করা চলত।

জীবনে এই প্রথম প্লেট ডেভেলপ করা দেখলাম। প্রত্যেকটি

নকলে বাধা দেবেন না জেনেই তিনি বিপরীতমুখী হয়েছিলেন গোড়া থেকে।

ধাপ খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখলাম। ডেভেলপিং, ফিক্সিং ও তার পরে জলে অনেকক্ষণ ধোয়া। ডার্করুমের কাজ দেখা যাবে এই আশায় মনোমোহন দত্তের কাছে আমি নিজে অনেক বার ছবি তুলিয়েছি এবং বন্ধুদের নিয়ে গিয়েছি ছবি তোলাতে। এই উপলক্ষে অনেক বার ঢোকা হল ডার্করুমে। তখন পাইরো-সোডা ডেভেলপিং খুব চলত। এতে প্লেট ডেভেলপ করলে কারো চেহারার যে ছাপ উঠত, তার বাইরের লাইন অর্থাৎ চোখ কান নাক ও মুখের লাইন প্লেটে গভীর দাগ কেটে যেত। তখন পি-ও-পি (প্রিন্টিং আউট পেপার) ও ডেভেলপিং আউট পেপার বা ব্রোমাইড পেপার—দুই-ই চলত, ক্রেতার পছন্দ যেটি। অনেকের ধারণা ছিল ব্রোমাইড কাগজে ছবি বেশি দিন স্থায়ী হয়। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। পি-ও-পি প্রিন্টই দীর্ঘস্থায়ী হয়। অবশ্য ব্রোমাইড প্রিন্ট পরে সেপিয়া করলে তা প্রায় চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

যাই হোক, মনোমোহন দত্তের সংস্পর্শে এসে আমার ক্যামেরার আকর্ষণ ক্রমে বেড়ে গেল, এবং তাঁরই সাহায্যে ১৯১১ সালে হসপিট্যাল স্ট্রীটের গোপীনাথ দত্তের দোকান থেকে একটি কোয়ার্টার প্লেট ক্যামেরা কিনলাম। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ক্যামেরা ট্রাইপড সহ, দাম দিলাম ৪৫৲ টাকা। ফিল্ম ও প্লেট ক্যামেরা, তিন খানা স্লাইড ছিল। ক্যামেরায় ছিল অলডিস র‍্যাপিড রেক্টিলীনিয়ার (সংক্ষেপে আর-আর) ৭·৭ লেন্স্ ও ধাতুনির্মিত শাটার। এ ক্যামেরায় রোল ফিল্ম ও প্লেট দুই-ই চলত।

ডার্করুমের কাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটলেও ক্যামেরায় আলোর তারতম্য হিসেব ক'রে এক্সপোজার দেওয়া দু-এক দিন মাত্র শিখলেই হয় না। কিন্তু উৎসাহ এমনই অদম্য ছিল যে অবিরাম ভুলের পথে গিয়েও দমিনি কখনো। ক্যামেরা কিনে নিয়েই দেশে গিয়েছিলাম, তাই দেখিয়ে দেওয়ার কেউ ছিল না। 'ট্রায়াল অ্যাণ্ড এরর' নীতিতে চলা ভিন্ন আর কোনো উপায় ছিল না। বাথগেট থেকে প্লেট কেমিক্যাল ইত্যাদি রেল-পার্সেলে আনিয়ে নিতাম। তখন অধৈর্য ছিল বেশি, তাই অর্ডার দেবার তৃতীয় দিনেই সব পাওয়া যেত ব'লে ঐখানে অর্ডার দিতাম, যদিও দাম অনেক বেশি পড়ত।

নিজ হাতে ছবি তুলছি এবং এত সহজে ছবি উঠছে এই ব্যাপারটি আমাকে অতি মাত্রায় উৎসাহিত ক'রে তুলল। দিন রাত প্রায় ফোটো তোলাতেই মেতে রইলাম। কয়েকটি বিশেষ বাঁধা আলোয় অতি চমৎকার ফোটো উঠত। সেই বিশেষ আলোয় এক্সপোজার আবিষ্কার ক'রে নিয়েছিলাম। ফোটো সব সময়েই রোদে ভাল হত, ছায়াতে তোলার এক্সপোজার তখনও সঠিক খুঁজে পাইনি। ছায়াতে বেশি বা কম হত। প্লেট ছিল তখন কম দ্রুত। সবই ইলফোর্ড প্লেট। দু রকম পাওয়া যেত, অর্ডিনারি ও স্পেশ্যাল র‍্যাপিড। এই স্পেশাল র‍্যাপিডেই তুলতাম, সংক্ষেপে এর নাম ছিল এস-আর। কোডাক রোল ফিল্মেও তুলতাম। বারোজ ওয়েলকামের 'ট্যাবলয়েড' মার্কা কেমিক্যাল বেশি ব্যবহার করতাম। প্লেট ও কাগজ দুইয়েতেই 'অ্যামিডল' ব্যবহার করতাম।

পি-ও-পি কাগজও অনেক ব্যবহার করেছি। দিনের আলোয় ছাপা, একটু একটু খুলে দেখা যেত কতদূর এগোচ্ছে। তার পর গোল্ড ক্লোরাইড সলিউশনে 'টোন' করে হাইপোতে দিতে হত। ছাপার পরেই হাইপোতে দেওয়া চলত সেলফ-টোনিং পেপারে। সব চেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে প্রিয় ছিল আমার এই কাগজটি। দুঃখের বিষয় এ কাগজ এখন আর পাওয়া যায় না।

বিদ্যাসাগর হস্টেলে থাকতে এ ক্যামেরায় বন্ধুদের ছবি তুলে দিয়েছি। ঘরেই অনেক সময় ডেভেলপ করতাম; কখনো দিনের বেলায় দরজা জানালা বন্ধ ক'রে লেপের ভিতর বসে, কখনো একটা হাঁড়ির মুখে লাল কাগজ জড়িয়ে, উপরে একটি ফুটো ক'রে, ভিতরে মোমবাতি জ্বেলে সেই আলোয়। যে কোনো ঘরকে ফোটোগ্রাফিক ডার্করুমে পরিণত করতাম প্রায় জোর ক'রে।

একদিন ইচ্ছে হল হস্টেলের একখানা ছবি তুলব। তখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির থেকে হস্টেলের ভাল ছবি তোলা সম্ভব ছিল। দু'-তিনজনে গিয়ে অনুমতি চাইলাম। বললাম এখান থেকে আমাদের হস্টেলের একখানি ছবি তুলতে চাই। কিন্তু যাঁদের কাছে চাইলাম তাঁরা হয় তো অনুমতি দেবার অধিকারী নন, তাই তাঁদের মনে সন্দেহ ঢুকল, ভাবলেন সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে, বললেন, না সে কি ক'রে হয় ইত্যাদি। অবস্থা সুবিধে জনক নয় দেখে আমি তর্করত বন্ধুদের দিকে পিছন ফিরে একখানা ফোটো তুলে নিলাম, কাউকে জানতে দিলাম না।

ছবিখানা অতি সুন্দর হয়েছিল। তার অনেক কপি করতে হয়েছিল তখন। আমার কাছে নেই সে ছবি, যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের কারো কাছে থাকতেও পারে।

দুটি নতুন আকর্ষণের মাঝখানের সংকীর্ণ খাতের ভিতর দিয়ে চলা, সেজন্যই পাঠ্যের বোঝা কিছু কমিয়ে নিতে হয়েছিল—যাকে বলে jettison করা, তাই। ১৯২০ সালে পরীক্ষা দিয়ে চলে গেলাম সাহেবগঞ্জে, বন্ধু প্রবোধচন্দ্রের কাছে। আগে থাকতেই আমাদের আয়োজন পাকা ছিল, আমরা ওখান থেকে সক্রিগলি মনিহারীঘাট কাটিহার পার্বতীপুরের পথে দার্জিলিঙ রওনা হয়ে গেলাম।

সাত বছর পরে আবার দার্জিলিঙ!

সঙ্গে ছিল সাহেবগঞ্জের গৌর মজুমদার আর সম্ভবত ইন্দু মুখুজ্জে, মনে করতে পারছি না ঠিক। গ্রীষ্মকালে বাংলা বা বিহারে ব'সে দার্জিলিঙের শীত কল্পনা করা দুঃসাধ্য। প্রবোধকে এক রকম জোর ক'রেই শীতের পোষাক সঙ্গে নিতে রাজি করিয়েছিলাম। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙের গাড়িতে উপরে উঠতে উত্তাপের তারতম্য গাড়ির মধ্যে ব'সে অনেক সময় বোঝা যায় না, বিশেষ ক'রে আগে যদি এক বা একাধিক দিন ট্রেনে কাটিয়ে আসা যায়। ক্লান্ত অবস্থায় শীত কিছু কম লাগে। তাই কার্সিয়ং ছেড়ে যত উপরে উঠছি, তত প্রবোধ জিজ্ঞাসা করছে শীত কোথায়!

আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল ঘুম। দার্জিলিঙের আগের ষ্টেশন এটি, এবং দার্জিলিঙ থেকে এক হাজার ফুট বেশি উঁচু। তাই সব সময়েই এখানে দার্জিলিঙ থেকে শীত একটু বেশি বোধ হয়। প্রবোধচন্দ্র অনুতাপ করছিল আমার কথায় এত সব ভারী জামা ব'য়ে আনার জন্য। ঘুম ষ্টেশনে নেমেও মনে হচ্ছিল শীত কিছুই নেই। কিন্তু দু'-চার পা হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি ঠাণ্ডা প্রবাহ বয়ে গেল যাতে আমাদের হাড়সুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলল। সে এক অতি বিশ্রী রকমের কড়া ঠাণ্ডা। আমি প্রবোধকে

প্রশ্ন করলাম, কেমন বোধ হচ্ছে? প্রবোধ ঠকঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বলল আঃ কি আরাম!

এখানে উঠলাম গৌরের ভগ্নীপতির বাড়ীতে। খুব ফাঁকা জায়গায় বাড়িটি—সর্বদা জোর ঠাণ্ডা হাওয়া, বাইরে এলেই। আমার এবারের আসার অতিরিক্ত আকর্ষণ হচ্ছে নতুন কেনা ক্যামেরাটি। দার্জিলিঙের স্বপ্নের মতো কোমল এবং স্পর্শাতীত সুন্দর রূপটি ক্যামেরায় ধরব। এ রূপটিকে কোমল বলছি অন্য অর্থে। দার্জিলিঙ আমার কাছে একটি বিশেষ শহর নয়। যেখান থেকে তরাইয়ের জঙ্গল শুরু হল সেইখান থেকে আরম্ভ ক'রে আলোছায়ার সঙ্গে, অরণ্য ও খোলা পাহাড়ের সঙ্গে, লুকোচুরি খেলতে খেলতে রেলগাড়ি যতদূর এসে শেষ হয়েছে ততখানি পথ ও তার সঙ্গে তুষার-ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা মিলিয়ে যতটা হয় ততটা। তা আমার কাছে কখনো স্পর্শযোগ্য বোধ হয় নি, একটা অদ্ভুত অ্যাবষ্ট্রাক্ট ধ্যানরূপেই তা আমার চেতনার মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। নীহারিকা-পুঞ্জের মতো একটি অধরা রূপ, তাই কোমল।

আমার ধারণা ছিল, এ রূপের কিছু অন্তত ক্যামেরায় ধরা পড়বে। কিন্তু পড়ল না। প্রথমত সে আমার প্রথম চেষ্টা, দ্বিতীয়ত ক্যামেরার শক্তিসীমা তখন আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এক্সপোজার দিয়েছি, উৎকৃষ্ট ছবি হয়েছে, কিন্তু সে শুধুই পাথর, শুধুই আউটলাইন। সমস্ত আলোছায়া, কুয়াসা ও মেঘে গড়া অভিনবত্বের আবেগময় অনুভূতি ক্যামেরার ছবিতে ওঠেনি।

১৯২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশ। সম্ভবত সেটি জুলাই মাস। অ্যামহার্ষ্ট স্ট্রীটে যেখানে কুন্তলীনের এইচ বোসের বাড়ি, তার পাশ দিয়ে ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীট। সেইখানে একটি মেস্ ছিল, তার পরিচালক ছিলেন কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। যত দূর মনে পড়ে তিনিও তখন পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন। এই মেসের সন্ধান আমাকে কে দিয়েছিল তা আর এখন মনে পড়ে না, তবে এ মেসের পরিবেশটি বেশ ভালই লেগেছিল, যদিও বেশি দিন এখানে আমি থাকিনি। থাকিনি তার কারণ কিছুদিনের মধ্যেই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল এবং এই আন্দোলনে আমার স্বাস্থ্যও যোগ দিল।

একদিন ষ্টার থিয়েটারে সভা। চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতি এবং গান্ধীজী বক্তা। বিজ্ঞপ্তি প'ড়ে ষ্টার থিয়েটারে গিয়ে আসন দখল করেছিলাম। চিত্তরঞ্জন দাশ আসতে দেরি করছেন, গান্ধীজির তো কোনো খবরই নেই, আমরা অধীর হয়ে উঠছি, এমন সময় সভার উদ্যোক্তারা একটি নতুন জিনিস করলেন। তাঁরা ছাত্রসমাজ থেকে একজনকে সভাপতি ক'রে দিলেন। এই ছাত্র শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

সাবিত্রীপ্রসন্ন তখন ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীটের মেসে 'ভাবের অভিব্যক্তি' অনুশীলনে বিশেষ মনোযোগী, আমি তাঁর নানা মুখভঙ্গির ফোটোগ্রাফ তুলে দিচ্ছি। থিয়েটার করায় তাঁর পটুত্ব আছে শুনেছি, অতএব মঞ্চভীতি বা ষ্টেজফ্রাইট তাঁর স্বভাবতই ছিল না। তিনি ষ্টার মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের উদ্দেশে বীররসে আহ্বান জানালেন—তোমরা সব বেরিয়ে এসো স্কুল কলেজ ছেড়ে। তাঁর বক্তৃতা চলার অবস্থায় চিত্তরঞ্জন দাশ এসে পৌঁছলেন সভায়। গান্ধীজির তখনও কোনো খবর নেই। দর্শকদের প্রধান উদ্দেশ্য গান্ধীজিকে দেখা। অবশেষে 'ঐ এসেছেন—ঐ এসেছেন' রূপ উত্তেজক ধ্বনিটি স্রোতের মতো প্রবাহিত হয়ে গেল প্রেক্ষাগৃহের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

গান্ধীজির পিঠে এক ভারী চটের থলে, তার ভারে তিনি নুয়ে পড়েছেন। তিনি এসেই ঘোষণা করলেন, তাঁর থলেয় রয়েছে বাঙালী মহিলাদের অলঙ্কারের দান। মহিলাদের এক সভায় তিনি এতক্ষণ বক্তৃতা করছিলেন, তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য কামনায় সবাই নিজ নিজ অলঙ্কার খুলে দিয়েছেন গান্ধীজির হাতে। গান্ধীজি মঞ্চে প্রবেশমাত্র তাঁর মুখে স্পটলাইট নিক্ষেপ করা হ'ল নাটকীয় ভঙ্গিতে। সব মিলে বেশ একটা রোমাঞ্চকর দৃশ্য। হাততালি আর হর্ষধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ছে। যেন সত্যি সত্যি একটি নাটকের দৃশ্য।

আমি পাশের বন্ধুকে চুপে চুপে বলছি—'আসলে গান্ধীজী বাংলাদেশে এসে ডাকাতি ক'রে গেলেন।' অবশ্য এই জাতীয় ডাকাতিতে গান্ধীজি ছিলেন ওস্তাদ। পরে শুনেছি গয়না প'রে গান্ধীজির সভায় মেয়েদের অনেকেই যেতে দিতেন না।

ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীটের মেসে সাহিত্যিকদের আনাগোনা ছিল। 'উপাসনা' সম্পাদনা করতেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। উপাসনার কাজ এই মেসেই অনেকটা চলত। এখানকার বাসিন্দা আর দু'জন, প্রবোধ মজুমদার ও চারুচন্দ্র সরকার বর্তমানে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। প্রবোধ মজুমদার শুভযাত্রা নাটকের লেখক, ও চারু বাবু ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক।

এই মেস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরত্ব কম নয়। আমি অধিকাংশ সময় নরসিং লেন নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার হয়ে যেতাম। ইংরেজী "এ গ্রুপ"-এ ভর্তি হয়েছিলাম। তখনকার দিনের একখানা খাতা আবিষ্কার করেছি কিছুদিন হল, তা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি। (আমার রোল নম্বর ছিল ১০৪, সেকশন-টু, ১৯২০)

প্রোফেসর এন, চ্যাটার্জি—ল্যাঙ্গুয়েজ
" এম, ঘোষ —অ্যারিষ্টোফেনিস (দি ক্লাউড্স)
" এইচ, মৈত্র —ওয়ার্ডসওয়ার্থ
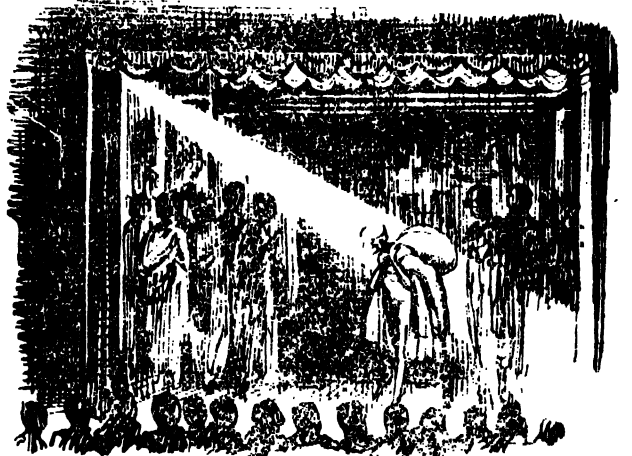
গান্ধীজির পিঠে এক ভারী চটের থলে।

প্রফেসর এন, চ্যাটার্জি—ল্যাম্বুয়েজ
" পি, সি, ঘোষ —চসার
" ষ্ক্রিমজ্যার —শেক্সপীয়ার
" জে, জি ব্যানার্জি—স্পেশাল পীরিয়ড অফ পোয়েট্রি
" এস, রায় —লিটারেচর অ্যাংলো-স্যাক্সন পীরিয়ড
" ষ্টিফেন —সিলেকটেড পীরিয়ড অফ প্রোস (এসেজ অ্যাণ্ড ক্রিটিসিজম)
" কে বি রায় —গিবন
" এস, সেন —প্রোস পীরিয়ড (ফিকশন)
" জে, ঘোষ —লিটারেচর—রেষ্টোরেশন পীরিয়ড
" আর, পি মুখার্জী—মিলটন

এম ঘোষ—মনোমোহন ঘোষ (অরবিন্দ ঘোষের জ্যেষ্ঠ), তখন বেশ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, মাথায় খুব হাল্কা শাদা চুল, হাওয়ায় সর্বদা উড়ছে, কণ্ঠস্বর নিস্তেজ, খুব কাছে না বসলে সব কথা ভাল শোনা যেত না। ষ্ক্রিমজ্যার ছিলেন ক্ষীণদেহ, দেখে রুগ্ন ব'লে বোধ হত। ষ্টিফেন ছিলেন খুব স্বাস্থ্যবান, এবং দীর্ঘ। তিনি যত্ন ক'রে নোট লিখিয়ে দিতেন। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ খুব উৎসাহী শিক্ষক ছিলেন, শুধু বক্তৃতা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন না, প্রত্যেককে পড়া জিজ্ঞাসা করতেন ঠিক স্কুলের শিক্ষকের মতো। কারো ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না। তখনকার দিনের এই অধ্যাপকদের প্রায় সবার চেহারা আজও স্পষ্ট মনে আছে। মনে আছে সুহাস রায় সুদর্শন যুবক ছিলেন, শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও সম্ভবত তখন পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক এবং গৌরাঙ্গ। রুটিনে দুটি নাম একসঙ্গে আছে, জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুহাস রায়।—গত ডিসেম্বর ১৯৫৬, এঁরা দু'জন একদিনের ব্যবধানে পরলোক গমন করেছেন।

[ক্রমশঃ।

রাজধানীর পথে-পথে

উমা দেবী

ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটের সরু আকাশের
চাপা বাতাসের
ঢিলে ফাঁকায় ঢুকে পড়েছে চপলমতি
—এক প্রজাপতি!
তার হলুদ পাখাতে এখনো হয়তো কোনো
নীলপদ্মের মধু মাখানো!
কাশ্মীরের সুনীল হ্রদের তরঙ্গে-তরঙ্গে
স্বর্ণাভ রৌদ্রের লীলায়িত রঙ্গে
সে-ও হয়তো কাঁপিয়েছে পাখা—অগাধ সুখে
হয়তো বা ডাল হ্রদের তীরে কোনো পুঞ্জিত শাখার বুকে!
তার পর ভেসে এসেছে নিশীথের অসহ্য অন্ধকারের তুলনা
ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটের গলিতে
—অতর্কিতে
একটি সুরভি স্বপ্নের মত!
কিংবা হয়তো
শহরের দুঃস্বপ্ন-আতুর কোনো শহরতলীতে
অকস্মাৎ বেজে ওঠা ঈথর-সঙ্গীতে
মধুর কণ্ঠের মত!
সে কেমন ক'রে এল এই সরু একমুখো রাস্তার মাঝ দিয়ে?
স্বল্প পরিসরের এক বন্ধপ্রায় জানলার ফাঁক দিয়ে—
অনেক লোকচক্ষুর পাহারা এড়িয়ে
অনেক মাঠ-ঘাট পেরিয়ে!
ভাবছিলাম মনে মনে কেমন ক'রে একে পথ বুঝিয়ে দিই
জানিয়ে দিই সেই উজ্জ্বল নীলাকাশের স্মৃতি!—
হায়—হায় রে চপলমতি!
হঠাৎ সে বসল এসে মামলার নথি-ভরা টেবিলের উপরে
যেন রহস্য ভরে
অল্প অল্প পাখা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে
বলতে লাগল হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে—
এত দিনে পেলাম খুঁজে পথ—
পূর্ণ মনোরথ—
সেই কাশ্মীরের ডাল হ্রদের সুরভি বাতাসে
ভর দিয়ে ভেসে এলাম কলকাতার মুক্তাকাশে
এই এটর্ণী আপিসের পরীরাজ্যের দেশে
অবশেষে
সেখানে রৌপ্যমুদ্রার চাকে
নির্বিপাকে
ক্ষরিত হচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে স্বর্ণের বিন্দু
প্রথম উদয় আভা অঙ্গে নিয়ে গলে যাচ্ছে তরলায়িত ইন্দু
হৃদয়ের ধমনীরাজ্যের পদ্মরাগ—আরক্ত তরল
আর নয়ন উদ্যানের শুভ্র মুক্তাফল
এর ধুলায় অদৃষ্টের অপার রহস্যে স্পন্দিত
অনিশ্চয়ের আকস্মিকতায় অভিনন্দিত
আর ফিরে যেতে চাই না সেই পুরানো ঐশ্বর্যে
মিইয়ে-যাওয়া ফাটল-ধরা পুরানো ধরণের সৌন্দর্যে
চুকিয়ে দিয়ে এলাম সকল দেনা—
তাকিয়ে দেখি প্রজাপতির ভঙ্গিটা কিছু চেনা-চেনা!

রবীন্দ্রায়ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চানন ও তদীয় পিতৃব্য শুকদেব জাহাজে সরবরাহকারের ব্যবসায়ে অর্থসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। গোবিন্দপুরে বাস করিবার সময় প্রতিবেশী ধীবরাদি শ্রেণীর দ্বারা যে ব্রাহ্মণ বলিয়া 'ঠাকুর' আখ্যায় তাঁহারা পরিচিত হইয়াছিলেন, সেই 'ঠাকুর' আখ্যাতেই ইংরাজ বণিক ও কাপ্তেনদিগের নিকটও পরিচিত হইলেন। তাঁহারাও ইহাদিগকে 'ঠাকুর' বলিয়াই ডাকিতেন। অর্ডার দেওয়া, বিল করা, সমস্তই 'ঠাকুর' নামেই হইত। এইরূপে পঞ্চানন ও শুকদেব উভয়েরই 'ঠাকুর' উপাধিই প্রচলিত হইয়া গেল। তৎপূর্বে তাঁহাদের শাখায় 'চক্রবর্তী' উপাধি প্রচলিত ছিল। সরকারী কাগজপত্রে এবং সুপ্রিম বিচারালয়ের মকদ্দমার নথিতে এই 'ঠাকুর'-এর নানাবিধ রূপ দেখা যায়। যাঁহারা ইংরাজিতে ঠাকুর স্বাক্ষর করিতেন তাঁহারা তখন লিখিতেন Thakoor. শুকদেব-তনয় কৃষ্ণচরণ ও কৃষ্ণচরণের পৌত্র রামরতনের স্বাক্ষরে এবং জয়রাম-সুত দর্পনারায়ণের স্বাক্ষরে এবং রামসন্তোষ বা সন্তোষরামের পুত্র বাঞ্ছারামের স্বাক্ষরে Tagoor দেখিতে পাওয়া যায়। দর্পনারায়ণের পৌত্র ও হরিমোহনের পুত্র উমানন্দনের স্বাক্ষরে Thaquore দেখা যায়। দর্পনারায়ণ ও তাঁহার অগ্রজ নীলমণির পুত্রদের ও রামরতনের পুত্রদের সময়ে Tagore স্বাক্ষর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার পর সকল শাখাতেই ইংরাজী স্বাক্ষরে Tagore রূপ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। দ্বারিকানাথ চিরদিন Tagore লিখিতেন এবং তাঁহার সমকালবর্তী সকল শাখার সকলেই তাঁহাদের উপাধির এইরূপ ইংরাজি বানান করিতেন। মাননীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর লিখিয়াছেন যে "ঠাকুরের ইহা বিশুদ্ধ ইংরাজি রূপ না হইলেও এই বানানই লিখিতে হইবে নতুবা অনেক দলিলপত্রে গোল হইবে।" এই সময় হইতেই যে সকল ব্রাহ্মণ-পরিবারের ঠাকুর উপাধি ছিল যেমন পাথুরিয়াঘাটা দর্মাহাটা ষ্ট্রীটের (অধুনা মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড) ঠাকুর বংশ অথচ পীরালী নন ইহাই জানাইবার জন্ত তাঁহাদের নিজেদের উপাধি লিখিতেন Thakur এই বংশীয় দেবেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকায় মহর্ষি তাঁহাকে সখা বলিতেন এবং মহর্ষি-পরিবারে তিনি 'সখাবাবু' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই দেবেন্দ্রনাথের পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি অক্ষয়কুমার, এম, এ ; বি, এল চিরদিন Thakur স্বাক্ষর করিতেন, তাই প্রেসিডেন্সি কলেজ রেজিষ্টার ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেণ্ডারে তাঁহাদের নামের এইরূপ উপাধির বানান ইংরাজিতে ছাপা হইয়াছে।

আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদে শুকদেব বংশীয় চোরবাগানের রামরতন ঠাকুরের একখণ্ড ভূমি সম্পত্তি ক্রয়ের কোবালায় রামরতন ঠাকুর চক্রবর্তী নাম দেখিতে পাই এবং তাহা হইতে অনুমান করা অসংগত হইবে না যে, পিতৃব্য শুকদেবের উপাধি ভ্রাতুষ্পুত্র পঞ্চাননেরও উপাধি ছিল। পঞ্চানন ও শুকদেব তাঁহাদের ব্যবসায়ে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদি গঙ্গাতীরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহাদের আবাস নির্মাণ করিলেন। পঞ্চানন তাঁহার পুত্র জয়রাম ও সন্তোষরাম বা রামসন্তোষ এবং শুকদেব তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচরণকে কোম্পানীর অফিসে কর্ম করিবার উপযোগী কিছু কিছু ইংরাজি শিক্ষা দিলেন। তাহার ফলে জয়রাম ও রামসন্তোষ কলিকাতার আমীন নিযুক্ত হন এবং তাঁহারা সুতানুটি ও গোবিন্দপুর জরিপ করেন। পলাশীযুদ্ধের পরে যখন শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ মুন্সীকে (পরে রাজা) কোম্পানী জায়গীর দিয়াছিল তখন এই আমীন ঠাকুরদের জরীপের নির্দিষ্ট সীমানুসারে উহা প্রদত্ত হয়। শুকদেব ও পঞ্চাননের মৃত্যুর পর জয়রাম ও রামসন্তোষ কৃষ্ণচরণের সহিত পৃথক হইয়া জানবাজারে ও তালতলায় নিজেদের আবাস নির্মাণ করেন। বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর তাঁহাদের এই বাড়ি আমীন ঠাকুরদের ভিটা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। যশোহর বারপাড়ায় তাঁহাদের যে বাস্তু ছিল তাহাকে লোকে তখন আমিন ঠাকুরদের ভিটা বলিত। জয়রাম পরে ধনসায়রে (অধুনা ধর্মতলা) আবাস ও বাগানবাড়ি নির্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করেন এবং এইখানেই শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ, শিবমন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তখন সমারোহে দোল-দুর্গোৎসব করিতে আরম্ভ করেন। জানবাজারে, তালতলায় তাঁহার যে সকল ভূসম্পত্তি ছিল তাহার অধিকাংশ পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকো উভয় বংশীয় ঠাকুরদের অধিকারে এখনো আছে। তালতলার বাজার ও হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার তাহাদের অন্যতম। জয়রামের বাড়ী ও বাগান এক্ষণে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের অন্তর্গত। যখন সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করেন তখন জয়রাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় নবাব ক্ষতিপূরণের টাকা দেন, যাহার কিয়দংশ জয়রামের মৃত্যুর পরে তাঁহার বংশীয়েরা পাইয়াছিলেন দেখা যায়।

জয়রামের আনন্দিরাম, নীলমণিরাম, দর্পনারায়ণ ওরফে মুকুন্দরাম ও গোবিন্দরাম নামে চার পুত্র ও সিদ্ধেশ্বরী নামে এক কন্যা হয়। জয়রাম সিদ্ধেশ্বরীর সহিত যশোহরের গোলোকচন্দ্র মজুমদারের বিবাহ দিয়া জানবাজারের ভূমিখণ্ডে একাংশে তাঁহাদের জন্ত একটি বাড়ী নির্মাণ করাইয়া ও তৎসংলগ্ন কিছু জমি দিয়া তাঁহাদের কলিকাতায় বসবাস করাইয়াছিলেন। আনন্দিরাম কয়েকটি কদাচারের জন্ত পিতা কর্তৃক ত্যাজ্যপুত্র হওয়ায় পিতৃগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুতানুটির পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে বাস করেন। এখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীটের যে অংশে প্রসিদ্ধ

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন বৈদ্যরত্নের বাড়ি, পূর্বে তাহাকে আনন্দিরাম ঠাকুরের রাস্তা বলিত। জয়রামের জীবদ্দশায় আনন্দিরামের মৃত্যু হয়। আনন্দিরামের পরিবারবর্গ কিন্তু ধনসায়রের বাড়িতে থাকিয়া যান। জয়রামের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দরাম এবং শুকদেবের পুত্র কৃষ্ণচরণ উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের কন্‌ট্রাক্ট পাইয়াছিলেন। যখন বর্তমান উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের জন্ম গোবিন্দপুরের অনেক ভূমি গৃহীত হয় তখন আদিগঙ্গাতীরস্থ বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণচরণ চোরবাগানে অনেক ভূমি সংগ্রহ করিয়া আবাসবাটী নির্মাণ করেন। ইহার কতকাংশ (৩৪, ৩৪।১, ৩৫নং মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট) এখনো এই বংশীয় শ্রীমান সুনীতকুমার ঠাকুর, এম-এ; এল-এল, বি; এডভোকেট ও তাঁহার ভ্রাতাদের অধিকারে আছে। ধর্মতলা হইতে গড়ের মাঠের অনেক অংশ ফোর্ট উইলিয়াম পর্যন্ত ধনসায়র বলিয়া পরিচিত ছিল। তখন কোম্পানীর কেল্লা ছিল বর্তমান বড় ডাকঘরের স্থানে। ধনসায়রের বাড়ি গৃহীত হইবার পর নীলমণি এবং ভ্রাতা দর্পনারায়ণ সপরিবারে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটায় আসিয়া বাস করেন। তখন আনন্দিরামের পরিবারবর্গ ও গোবিন্দরামের বিধবা স্ত্রী রামপ্রিয়া দেবী ইহাদের পরিবারভুক্ত ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটায় আবাস-বাড়ি এবং শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহের জন্ম ঠাকুরবাড়ি নির্মিত হয় এবং গঙ্গাতীরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট যেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডের সহিত মিশিয়াছে, সেইখানে শিবমন্দির এখনো বর্তমান। নীলমণি ও দর্পনারায়ণের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ, ইহা লইয়া মতভেদ দেখা যায় কিন্তু ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আনন্দিরামের বংশীয় রাধাবল্লভ জয়রাম বংশীয়দের বিরুদ্ধে সম্পত্তি পাইবার জন্ম যে মোকর্দমা করেন, তাহাতে তাঁহাদের পুরোহিত রতিবল্লভ ভট্টাচার্য বলেন যে, নীলমণি ও দর্পনারায়ণকে তিনি দেখিয়াছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে নীলমণি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ভূমিক্রয়ের দলিলও ইহার পরিপোষক। দেখা যায় ১৭৬১ হইতে ১৭৮৩ খৃ: পর্যন্ত যে সকল সম্পত্তি ক্রীত হইয়াছে তাহা নীলমণির নামেই হইয়াছে। তাহার পরে ১৭৮৪ হইতে ১৭৯৩ পর্যন্ত দর্পনারায়ণের নামে এবং ১৭৯৩ হইতে ১৮১৬ পর্যন্ত গোপীমোহন ও লাডলিমোহন উভয় নামে ক্রীত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে যিনি যখন পরিবারের কর্তা, তখন তাঁহার নামেই সম্পত্তি খরিদ হইয়াছে। ১৭৮৪ সালে নীলমণি ভ্রাতার সহিত পৃথক হইয়া সম্পত্তিতে তাঁহার অংশের মূল্য নগদ লক্ষ টাকা এবং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দনশিলা লইয়া জোড়াসাঁকোয় আসিয়া বাস করেন ও জোড়াসাঁকোর বাড়ি নির্মিত হয়। ১৭৯৩ খৃ: দর্পনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর পুত্রদের জ্যেষ্ঠ গোপীমোহন ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর পুত্রদের জ্যেষ্ঠ লাডলিমোহন এই উভয় নামে সকল যৌথ সম্পত্তি খরিদ হইয়াছিল। গোপীমোহনের অগ্রজ রাধামোহন ও অনুজ কৃষ্ণমোহন বৈষ্ণবমন্ত্র ত্যাগ করায় বৈষ্ণব দর্পনারায়ণ তাঁহাদের ত্যাজ্যপুত্র করেন। তাঁহার পঞ্চম পুত্র প্যারীমোহন মূক ও বধির থাকায় তাঁহার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার অবশিষ্ট চার পুত্রকে দিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে গোপীমোহন ও হরিমোহন তাঁহার প্রথমা স্ত্রী তারিণী দেবীর গর্ভজাত ও লাডলিমোহন ও মোহিনীমোহন তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী বদনমণি দেবীর গর্ভজাত। গোপীমোহনের বংশে তৎপ্রপৌত্র ৺মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার, হরিমোহনের বংশে সুরশিল্পী শ্রীমান্ দক্ষিণামোহন, লাডলিমোহনের বংশে রথীন্দ্রনাথ, এম, বি এবং মোহিনীমোহনের বংশে ৺রাজা প্রফুল্লনাথ সাধারণের নিকট সমধিক পরিচিত।

নীলমণি জোড়াসাঁকোয় আসিয়া বাস করিবার পর ১৭৯১ খৃ: পরলোক গমন করেন। তিনি উড়িষ্যায় কিছুদিন আদালতের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, যে সময় তিনি তমলুকে দেবী বর্গভীমা মন্দিরের সংস্কার করাইয়া দেন। সে সময় তাঁহার স্বতন্ত্র ব্যবসায়ও ছিল। পরে ২৪ পরগণা আদালতের সেরেস্তাদার হইয়াছিলেন। তিনি চেঙ্গোটীয়ার ঘোষাল বংশের কন্যা ললিতা দেবীকে বিবাহ করেন। ইহার পিতৃনাম ও বাসগ্রামের নাম সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। নীলমণির তিন পুত্র রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ ও এক কন্যা কমলমণি। কমলমণির সহিত কালীঘাটের হরিশচন্দ্র হালদারের বিবাহ দিয়া স্বগৃহে গৃহজামাতা রাখিয়াছিলেন। নীলমণির পুত্রদের সকলেরই স্বতন্ত্র ব্যবসায় ছিল। তাহার উপর রামমণি কলিকাতা পুলিস অফিসে প্রধান বাঙালী কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার জন্ম ১৭৫৯ খৃ:। রামবল্লভ কটক আদালতের একজন কর্মচারী ছিলেন ও পরে কটকের জমিদারী ক্রয় করিয়া জমিদার হন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু। ইনি যশোহরের স্বসমাজে মজুমদার বংশে বিবাহ করেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র যদুনাথের শৈশবে মৃত্যু হয়। ইঁহার দুই কন্যা জ্যেষ্ঠা হরসুন্দরী বা বিনোদিনী ও কনিষ্ঠা গৌরী। গৌরীর স্বামী সনাতন মুখোপাধ্যায় ও তাঁহাদের কোনো সন্তান হয় নাই। জ্যেষ্ঠা হরসুন্দরীর সহিত বীরনগরের পেলারাম বা হলধর মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। হরসুন্দরীর তিন পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও কালাচাঁদ ও একমাত্র কন্যা আনন্দময়ী। দ্বারকানাথ তাঁহার বাড়ির দক্ষিণে একটি বাড়ি খরিদ করিয়া বসবাসার্থ হরসুন্দরীকে তাহা প্রদান করেন। দ্বারকানাথের দ্বিতীয়বার ইয়োরোপ যাত্রায় ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র সঙ্গী হন।

নীলমণির দ্বিতীয় পুত্র রামমণির পত্নী দক্ষিণডিহি শুকদেব রায়-চৌধুরী বংশীয় রামকান্ত রায়চৌধুরীর কন্যা মেনকা দেবী। ইঁহারই গর্ভে কন্যা জাহ্নবী, পুত্র রাধানাথ, কন্যা রাসবিলাসী ও পুত্র দ্বারকানাথের জন্ম। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ৮মাস বয়:ক্রমকালে দ্বারকানাথের মাতৃবিয়োগ হয়। রামমণি দ্বিতীয়পক্ষে যশোহর জগন্নাথপুরে শুকদেব রায়চৌধুরী-বংশীয়া দুর্গামণিকে বিবাহ করেন। দুর্গামণির গর্ভে রামমণির রমানাথ নামে (পরে মহারাজা) এক পুত্র এবং দ্রবময়ী নামে এক কন্যা হয়। রামমণি তাঁহার সর্বজ্যেষ্ঠা সন্তান জাহ্নবী দেবীর সহিত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়া গৃহে রাখেন। দ্বারকানাথ ইঁহার বাসের জন্ম সিমুলিয়ায় একটি বাড়ি করিয়া দেন। এখন ইঁহাদের বংশাভাব। রামমণির তৃতীয় সন্তান রাসবিলাসী দেবী। ইঁহার সহিত চন্দননগর বিবিরহাট নিবাসী তদানীন্তন ফরাসী সরকারের দেওয়ান রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ভোলানাথের বিবাহ হয়। ভোলানাথ গৃহজামাতা থাকেন ও পরে দণ্ডাশ্রম গ্রহণ করেন। ইঁহার দুই পুত্র মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন। চন্দ্রমোহন চিরকুমার ছিলেন ও বাঙলার প্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতার প্রথম ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার অফ য়্যাসিওরেন্সেস্।

যখন কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন প্রথা পরীক্ষার জন্ত Justice of the Peace পদের সৃষ্টি হয়, তখন প্রথম উক্ত পদে নিযুক্ত হন মাতুল দ্বারকানাথ ও ভাগিনেয়দ্বয় মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন। মদনমোহন মাতুলপ্রদত্ত এক খণ্ড ভূমি মাতুলালয়ের দক্ষিণে পাইয়া স্বোপার্জনে আরো কয়েকখণ্ড ভূমি সংগ্রহ করিয়া তদুপরি নিজের আবাস ভবন নির্মাণ করেন। যে রাস্তায় তাঁহার বাড়ি নির্মিত হয় তাহা তাঁহার নামে মদন চট্টোপাধ্যায় লেন আখ্যা পাইয়াছে। Justice of the Peace রূপে তখন মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন বেতন পাইতেন। মদনমোহনের বর্তমান বংশধরেরা দক্ষিণ কলিকাতা ও চন্দননগর নিবাসী।

রামমণি তাঁহার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা দ্রবময়ীর কোন্নগরে এক জমিদারের ভাগিনেয় নবকুমার (নবকান্ত) চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ দিয়া যথারীতি তাঁহাকে গৃহজামাতা করিয়া লন। তাঁহার তিন পুত্র ও ছয় কন্যা ও তাঁহাদের বংশ বর্তমান।

রামমণির জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধানাথ ১৭৯০ খৃঃ জন্ম। তিনি কটকে পিতৃব্য রামবল্লভের সহকারিরূপে কার্য করিয়াছিলেন এবং যখন দর্পনারায়ণের পুত্র গোপীমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্যকুমার কলিকাতায় Commercial Bank প্রতিষ্ঠা করেন তখন রাধানাথ হিসাব বিভাগের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন। তৎকালে ইংরাজিতে কৃতবিদ্য বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ১৮৩০ খৃঃ তিনি পিতার জীবদ্দশায় পরলোক গমন করেন। রাধানাথ দক্ষিণডিহি শুকদেব বংশীয় রূপরাম রায়চৌধুরীর কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন। তাঁহার কন্যা উমাসুন্দরী ও দুই পুত্র মথুরানাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ। উমা ও ব্রজেন্দ্রের বংশাভাব। মথুরানাথের দুই পুত্র শ্রীনাথ ও শৈলেন্দ্রের মধ্যে দ্বিতীয়ের বংশে একটি মাত্র বালক বর্তমান। দ্বারকানাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রামলোচন কর্তৃক পাঁচ বৎসর বয়সে দত্তকপুত্র গৃহীত হন। এই রামলোচনও ব্যবসায় দ্বারা স্বোপার্জনে অনেক সম্পত্তি করিয়াছিলেন। সংগীত-চর্চায় তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি রামকান্ত রায়চৌধুরীর কন্যা অলকাকে বিবাহ করেন। অলকা দেবীর একটি কন্যা হয় কিন্তু শৈশবেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাহার পর দ্বারকানাথকে রামলোচন দত্তক গ্রহণ করেন। এই অলকা রামমণি-পত্নী মেনকার অগ্রজা এবং মহর্ষিদেবের আত্মচরিতে যে পিতামহীর উল্লেখ আছে ইনিই তিনি। ১৮০৭ খৃঃ রামলোচনের যখন মৃত্যু হয় তখন দ্বারিকানাথের বয়স ১২/১৩ বৎসর।

দ্বারকানাথের জনক রামমণির দ্বিতীয়া পত্নীর পুত্র অর্থাৎ দ্বারকানাথের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহারাজা রমানাথ দ্বারকানাথ অপেক্ষা ছয় বৎসরের কনিষ্ঠ ও তাঁহার ১৮০০ খৃঃ জন্ম। রমানাথ আলিপুর কালেক্টরেটে কর্মচারীরূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। পরে ইউনিয়ান ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হইলে তাহার কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত Reformer সংবাদপত্রের এবং "অনুবাদিকা" নামক বাংলা সংবাদপত্রের ইনি সহঃ সম্পাদক ছিলেন। কাউন্সিলের সভ্য হইয়া কাউন্সিলে ও সংবাদপত্রে জনগণের হিতার্থে বক্তৃতা করায় ও লেখায় লোকে তাঁহাকে রায়ত-বন্ধু বলিত। রমানাথের স্ত্রী দক্ষিণডিহি নিবাসী শুকদেব বংশীয় তারাচাঁদ রায়চৌধুরীর কন্যা জগদম্বা। রমানাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও সেনেটের সভ্যরূপে সেবা করিয়াছেন ও রামমোহন রায় বিলাত যাইবার পর হিন্দু রমানাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজেরও একজন অছিরূপে বহু বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎকালীন কলিকাতার যে-কোনো সভা সমিতিতে বক্তা বা সভাপতিরূপে তাঁহার সংশ্রব থাকিত। একজন Justice of the Peace রূপেও তিনি যথেষ্ট মিউনিসিপাল কার্য করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃঃ অগ্রজ দ্বারকানাথকে পৈতৃক ভবনের স্বীয় অংশ বিক্রয় করিয়া তৎলব্ধ অর্থ ও স্বোপার্জিত অর্থে কয়লাহাটায় রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটে (অধুনা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট) একটি সুবৃহৎ আবাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সহোদরা দ্রবময়ীর সহিত সপরিবারে বাস করেন। রমানাথের তিন পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্র, মনীন্দ্র ও দুই কন্যা ব্রজসুন্দরী ও শ্যামাসুন্দরী। মহেন্দ্র ও মনীন্দ্রের শৈশবে মৃত্যু। ব্রজসুন্দরীর সহিত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। শ্যামাসুন্দরীর বংশাভাব, ব্রজসুন্দরীর বংশ এখনো বর্তমান, লেখক মাতৃকুল হইতে সেই বংশ সম্ভূত। নৃপেন্দ্রনাথের ১৮২৩ খৃঃ জন্ম। তিনি রামমোহনের বিদ্যালয়ে ও পরে হিন্দু কলেজে মহর্ষির সহপাঠী ছিলেন ও জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পাইয়া ইউনিয়ান ব্যাংকে মহর্ষির সহিত পিতার সহকারীরূপে কর্ম করেন। মহর্ষি তাঁহাকে চিরদিন স্নেহ করিতেন ও তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠাকালে নৃপেন্দ্র তাহার অবৈতনিক সম্পাদক ১৮৩৯ খৃঃ নিযুক্ত হন ও মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেইপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৫৪খৃঃ মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার মৃত্যু। ১৮৭৭খৃঃ রমানাথের* মৃত্যুর পরে কলিকাতা টাউন হলে তাঁহার মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসী তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিয়াছে।

রামলোচন মৃত্যুকালে যে চরমপত্র করিয়াছিলেন তাহা 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' ৩২২-৩৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে যাহাতে তাঁহার মৃত্যুকালে দ্বারকানাথ কী কী পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত চরমপত্র বা উইল এইরূপ :—

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং
লক্ষ্মীজনার্দন শরণং

প্রাণাধিক শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর চিরজীবেষু,

লিখিতং শ্রীরামলোচন ঠাকুর উইলপত্রমিদং কার্যঞ্চ আগে আমি শারীরিক পীড়িত ভদ্রাভদ্রসম্বেই তুমি আমার পুত্র একারণ আপন জ্ঞানপূর্বক ও স্বেচ্ছাধীন এই উইল করিতেছি। আমার পৈতৃক দৌলত নাই। শ্রীশ্রী৺ঠাকুর ও জায়গা ও বাড়ী ও এসবাব পোষাক তামা পিতল কাঁসা রূপা ও সোনার বাসনদিগর সেওয়ায় গহনা পৈতৃক যে কিছু আছে ইহার তিন অংশের এক অংশ আমি পাইব দুই অংশ ভায়ারা পাইবেন পৈতৃক ও আমার দত্ত সোনা রূপার গহনার অংশ হইবেক না, যাহার যে চিহ্নিত আছে সে তাহারই থাকিবেক। আর সংসারের খরচ ও ধর্ম্মতলার বাটীদিগর বানানোতে মবলগত্রায় আমার নিজটাকা বিংখাতা রোকড় ভায়াদিগের স্থানে আমার পাওনা আছে এবং অন্য অন্য লোকের স্থানেও যে পাওনা আছে আমার দেনা নাই এই সকল পাওনা ও পৈতৃক হিস্যা ও আমার সোপার্জিত দৌলত অসানা রূপার বাসন ও এসবাব পোষাক ও জেলা যশোহরের মোতালক পরগণে বিরাহিমপুর

* এক্ষণে রমানাথের বংশধরেরা বালিগঞ্জ নিবাসী।

জমিদারিও শহর কলিকাতার মধ্যের খরিদা জায়গা ও গায়রহ সেওয়ায় রতন বিধবার দরুণ বাড়ি আমার স্বোপার্জিত ও পৈতৃক হিস্যা যে কিছু সব তোমাকে দিলাম রতন বিধবার দরুণ বাড়ি খরিদ করিয়া তৎকালীন তোমার মাতাকে দিয়াছি এবং সন ১২১৩ সালে তোমার মাতার পুণ্যক্রিয়া অর্থে আমি তুষ্ট হইয়া সিক্কা ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা দিয়াছি, এ টাকা এবং রতন বিধবার দরুণ বাড়ি ইহার সহিত তোমার এলাকা নাই, ইহার দান বিতরণ এক্তার তোমার মাতার। এখনো তুমি নাবালক, এ কারণ এই জমিদারি ও গায়রহ যে কিছু বিষয় তোমাকে দিলাম, ইহার কর্ম্মকার্য্য যাবত আমি বর্ত্তমান থাকিব তাবত আমিই করিব আমার অবর্ত্তমানে যাবত তুমি বয়সপ্রাপ্ত না হও তাবত পরগণাদিগের এ সকল বিষয়ের কর্ম্মকার্য্য ও সহী দস্তখত ও বন্দোবস্ত ও হুকুম-হাকাম সকলই তোমার মাতা করিবেন তুমি প্রাপ্ত বয়স হইলে জমিদারিদিগের আপন নামে হুজুর লেখাইয়া এবং আপন এক্তারে আনিয়া জমিদারির ও সংসারের কর্ম্মকার্য্য ও জমিদারির বন্দবস্ত ও খরচপত্র ও গায়রহ তোমার মাতার অনুমতি ও পরামর্শে তুমি করিবে এবং যাবত তোমার মাতা বর্ত্তমান থাকিবেন তাবত পরগণার মুনাফা ও গায়রহ যেকিছু আমদানির তহবিল তোমার মাতার নিকট যেমন আমি রাখিতাম, তুমিও সেই মতো রাখিবা। আমি ও তোমার মাতা যাবত বর্ত্তমান ও বর্ত্তমানা থাকিব ও থাকিবেন তাবত আমাদিগের পুণ্যক্রিয়া আদি যে কিছু খরচপত্র এই দৌলাত হইতে পাইব। আমার স্বোপার্জ্জিত জায়গার কবালা ও বয়নামা ও গায়রহ আমার স্থানে ছিল নিস্তামতো তোমাকে দিলাম পৈতৃক জায়গা ও বাটীদিগরের কবালা ও পাট্টা ও গায়রহ কগিজ রামমণি বাবুর স্থানে আছে জায়গা হিস্যা চিহ্নিত মতো বুঝিয়া লইবা এতদর্থে উইলপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২১৪ সাল বারো শ চৌদ্দ সাল তারিখ ২২শে অগ্রহায়ণ—ইশাদি

শ্রীরামসুন্দর শর্ম্মণঃ
সাং—

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ শর্ম্মণঃ
সাং পালপাড়া
জেলা নদীয়া

শ্রীজগন্নাথ শর্ম্মণঃ
সাং চেঙ্গোটিয়া
জেলা যশোহর

জায় জায়গা স্বোপার্জ্জিত		পৈতৃক	
জমিদারি পরগণে বিরাহিমপুর মোতালকে জেলা যশোহর	১	নিজবাটী	১
		ধর্ম্মতলা বাটী	১
শহর কলিকাতার মধ্য ডোম পিদ্রো সাহেবের দঃ জায়গা	১—১/৪	বড়বাজারের বটতলার বাটী	.
বামনদেব বাইতির দঃ জায়গা	১—৩	জানবাজারের হাড়িটোলার জায়গা	১
কৃষ্ণচন্দ্র রায় কবিরাজের দঃ জায়গা	১—।০	ডোমটোলার জায়গা	১
তিলক বসাকের দঃ জায়গা	১—॥০	মাহুত্তের দঃ জায়গা	১
শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের দঃ বাটী	১—।১	কলিঙ্গা ব্রহ্মচারীর দঃ জায়গা	১
রামকিশোর মিস্ত্রীর দঃ জায়গা	১—/২	পরগণে মাগুরা মৌজে ফতেপুর	
রামনিধি সাহার দঃ বাটী	১—,০	ব্রহ্মোত্তর জমি	১
রতন বিধবার দঃ বাটী—এটি তোমার মাতাকে দিয়াছি	১—/৪	মৌজে কপিলেশ্বর ব্রহ্মোত্তর জমি	১
	৩/৪/।।		৯

উক্ত গ্রন্থে লিখিত যে জনক রামমণি ও পিতৃব্য রামবল্লভ বর্ত্তমান থাকিলেও মাত্র ৪ বৎসরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ সহোদর রাধানাথ তাঁহার অভিভাবক হইয়াছিলেন। জনক ও পিতৃব্য উভয়েই রামলোচনের নিকট ঋণী থাকায় সম্পত্তির মালিক দ্বারকানাথের সহিত বৈষয়িক বিষয়ে তাঁহাদের অভিভাবক মনোনয়নে আইনগত বাধা ছিল।

[ক্রমশঃ।

দেশের কাজের মূল সূত্র

দেশের সমস্ত কার্য্যই যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে আমি তাহার মূলতত্ত্ব কয়টি নির্দ্দেশ করিয়াছি মাত্র। সে কয়টি এই :—

প্রথম, বর্ত্তমানকালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতেই হইবে। বর্ত্তমানের সেই প্রকৃতিটি—জোট বাধা, ব্যূহবদ্ধতা, Organization। সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও ব্যূহের নিকট কেবলমাত্র সমূহ আজ কিছুতেই টিকিতে পারিবে না। অতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে বিশ্লিষ্টতা, যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে গ্রামগুলিকে সত্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।

দ্বিতীয়, আমাদের চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্ব্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতই আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।

তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহারসামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্ত্তিত কর; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর। এ কর্ম্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না; এমন কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো ঘোষণা নাই কেবল ধৈর্য্য এবং প্রেম এবং নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।

* * * *

—রবীন্দ্রনাথ।

(পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতা—বঙ্গদর্শন, ১৩১৪ ফাল্গুন)

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

"সৎ সঙ্গ শরণম্"

শ্রীশ্রীশ্রী ১০৮ অর্ণবস্বামী গুরুজী মহারাজ সমীপেষু—

শত শত সেলাম পূর্বক নিবেদন,

পরমারাধ্য বাবাজী, আপনার আকস্মিক অধঃপতনে আমি বড়ই মর্মাহত হইলাম। ইতোমধ্যে শ্রবণ করিয়াছিলাম আপনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, তখন মানস পটে এই চিন্তাই সমুপস্থিত হইয়াছিল যে ইহা সাময়িক মত্ততা মাত্র কিন্তু অধুনা উপলব্ধি করিতেছি, আমার ভ্রম হইয়াছিল। এমতাবস্থায় ইহাই অনুমিত হইতেছে যে কাহারও সুমন্ত্রণায় আপনি এই পথবর্তী হইয়াছেন। অতএব আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃদ্ধ পিতা এবং অসুস্থ মাতার প্রতি ঐহিক কর্তব্য সকল পদাঘাতে দূরীভূত করিয়া কোন নীতিশাস্ত্রানুযায়ী পারলৌকিক চরমোন্নতি সাধনের নিমিত্ত আপনি এক মোহ-মার্গ সাধনা করিতেছেন? এ ক্ষেত্রে আমার নিবেদন এই যে, অচিরে এই সৎ সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক, আপনার এই অস্বাভাবিকতা বর্জন করিয়া স্বীয় কর্তব্য করণে প্রবৃত্ত হউন; আপনার পিতাঠাকুরের নির্দেশ মত আপনার কলিকাতায় আসিয়া থাকাই আমার অভিপ্রেয়। এ স্থানেও সৎ সঙ্গের অনটন হইবে না উপরন্তু আমার মত অসতের সহিত দুই চারিটা কথোপকথনের সুবিধাও মিলিবে, অবশ্য ইহা আমারই সৌভাগ্যজনক হইবে। যদিচ এ আশা নিতান্তই অকল্পেয়, তথাপি চিন্তা করিতে দোষ কী? আমার দুইখানি পত্রে যে-সকল আবেগময় গোপন কথা লিখিলাম তাহার উত্তরের আশা বিসর্জন দিয়াছি, কিন্তু এ পত্রের বিস্তৃত উত্তর না পাইলে ইহাই আমার শেষ চিঠি জানিবেন। ইতি দাসানুদাস, সেবক—শ্রীসুকান্ত।

[ঐ সময়ে গ্রামে ফিরে 'ত্রিদিব' নামে একটি হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করে সুকান্তকে একটি দার্শনিক (!) অর্থাৎ রাজনীতিবর্জিত কবিতা লিখে পাঠাতে ফরমায়েস দিই। তারপর এই চিঠি: অ ব]

20 Narkeldanga Main Road,
3. 3. 43.

প্রিয়বরেষু,

অরুণ! তোর কাছ থেকে এতো বৈচিত্র্যপূর্ণ চিঠি ইতিপূর্বে আর কখনো পাইনি। তার কারণ বিবৃত করছি। প্রথমতঃ চিঠিটা নৈহাটি, দৌলোৎপুর, ডোঙ্গাঘাটা, পাঁজিয়া এই চার জায়গায় fountain Pen, Pencil এবং কলমে লেখা ব'লে এতো বিচিত্র! দ্বিতীয়তঃ সমস্ত চিঠিটায় একজন কেজো লোকের ব্যস্ততার সাড়া পাওয়া গেলো। তৃতীয় কারণ, চিঠিটার অপ্রত্যাশিততা।

চিঠির উত্তর দিতে তোকে নিষেধ করেছিলাম, তবুও তোর চিঠি পেয়ে আশান্বিত হয়ে, প'ড়ে দেখলাম চিঠিটা নেহাৎ নৈর্ব্যক্তিক অর্থাৎ official। যদিও সংশিক্ষা সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ আছে, তবুও সেটা গৌণ মুখ্য হচ্ছে 'ত্রিদিব'। এজন্যে আমি দুঃখিত হইনি, বরং কৌতুক অনুভব করেছি। অবিশ্যি খামখানাই এজন্য দায়ী।

'ত্রিদিবে'র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার আশা গভীর হ'লো যশোহরের সংকীর্ণতা থেকে সারা বাংলা দেশেই এর পরিব্যাপ্তি ও সম্প্রসারণ দেখে। পত্রিকাটি নতুন লেখক ও শিল্পীদের প্রাণরসে পরিপুষ্ট ও পরিপক্ব হ'য়ে একদিন সারা বাংলার ক্ষুধা মেটানোর জন্যে পরিবেশিত হবে—সূচনা দেখে এ অনুমান করা সম্ভবত আমার অদূরদর্শিতায় পর্যবসিত হবে না।

তুই যে আমার আন্তরিকতায় দিন-দিন সন্দিহান হচ্ছিস, ক্রমশঃ তার পরিচয় পাচ্ছি। কারণ ও প্রমাণ মুখোমুখি সাক্ষাৎ হ'লে দেখাবো। তুই কবে আসছিস এইটা জানবার জন্যে উৎসুক আছি। আর এইটাই আমার কাছে সব চেয়ে জরুরী। তুই বোধ হয় কোনো কার্য-ব্যপদেশে এখানে আসছিস, তার কারণ তুই অধুনা কাজের লোক হ'য়ে পড়েছিস, কিন্তু আমি চাই বেশ কিছু সময় হাতে নিয়ে তুই আসবি।

তোর সত্যলব্ধ দিদি আর কাকীমার সম্বন্ধে রীতিমত কৌতূহল দেখা দিয়েছে। আর কিছু পরিচয় পেলাম তোর সূক্ষ্ম বর্ণনায়, তাঁরা যে সাহিত্য-রসিক তার নমুনা পাওয়া গেলো পঠনস্পৃহা থেকে।

তোদের (খুড়ি) আমাদের 'ত্রিদিব' সম্বন্ধে একটা বড় সত্য অনুভব করছি যে, আমরা এই পাপ দুঃখ কষ্ট আকীর্ণ ধরণীর নগণ্য লোক কর্মদোষে ত্রিদিবের দর্শন পাচ্ছি না। আশা করি তোর সংগ লাভের পুণ্যে হয়তো পাপ ক্ষালন হবে, এবং তখন এক সংখ্যার দর্শনলাভও হবে।

তুই লিখেছিস, "অভাবে স্বভাব নষ্ট" (স্বভাব নষ্ট হাওয়া সত্ত্বেও নিজের সম্বন্ধে একটা সত্যি কথা বলেছিস দেখে তৃপ্ত হলুম।) সত্যিই তোর স্বভাবের এতদূর অধঃপতন হয়েছে যে, দুটো বাজে লেখা* তুলে দিয়ে, স্বচ্ছন্দে নিজের স্বীকারোক্তি ক'রে নিশ্চিন্ত হলি? ভালো!

আর একটা গুরুতর কথা, তুই নিজে না সম্পাদক হ'য়ে কোন এক সুনীল বন্ধুকে সম্পাদক করেছিস কেনো? তোর চেয়ে যোগ্য লোক ডোঙ্গাঘাটা তথা সারা যশোরে আছে না কী? এটা একটা আশা ভংগের কথা।

কবিতা পাঠাচ্ছি। 'আহ্নিক' বলে যে কবিতাটা লিখেছিলাম সেটা দিতে পারলেই ভালো হ'তো। কিন্তু সেটা এখন পাচ্ছি না,

[* অর্থাৎ ওর দু'টি কবিতা।—অ, ব,]

পেলে পরে পাঠাবো, এখন অন্য একটা লেখা (দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক) পাঠালুম। বইয়ের লিষ্টও পাঠালুম, তবে সংক্ষিপ্ত, বিস্তৃত পরে পাঠাবো। চিঠির উত্তরের পরিবর্তে তোকে পেতে চাই। তোদের সকলের কুশল কামনা করি। ইতি—সুকান্ত।

আরো একটু—চিঠিখানা ৩রা মার্চ্চ লেখা হ'লেও পোষ্ট অফিসে পয়সা নিয়ে গিয়েও নানা কারণে বিতাড়িত হ'য়েছিলাম দিনকয়েক। তা ছাড়া শুনলাম, তুই নাকি আবার সফরে বেরিয়েছিস, তাই মনে হ'চ্ছে পত্রপাঠ চিঠিটা পাঠাতে না পারলেও, বিশেষ ক্ষতি হবে না। আর কবিতা যেটা পাঠালুম, সেটা প্রধানত অতিরিক্ত সহজবোধ্য ব'লেই আমার মতে (বোধ হয় তোর মতেও) অত্যন্ত খারাপ, সেজন্য দুঃখ করিসনি, সবুরে মেওয়া ফলবে। তুই আজকাল ছবি-টবি আঁকছিস আশা করি, কবিতা বোধ হয় খুব ভালো লিখছিস।—সুকান্ত।

Swadhinata
8E Dacres Lane, Calcutta
২৪, ৫, ৪৬

প্রিয় বয়স্য,

তোর আবেগের কারণটা ঠিক বুঝলাম না, কেমন যেন হেঁয়ালী। হেঁয়ালীকে ব্যঙ্গ ক'রবো না সহানুভূতি জানাবো তাও বুঝছি না। আমি খুলনা যাওয়ার সুযোগ হারিয়েছি এক মুহূর্তের লজ্জায়। কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব ক'রেছিলেন, আমি হঠাৎ 'না' বলে ফেলেছিলাম। যাই হোক, তুই তাড়াতাড়ি ফিরিস। তোর চিঠির থলি এখুনি ঘাড়ে ক'রে বেরুবো। কার্টুন ভালো হ'লে পাঠাস। ভূপেনের লেখা মন্দ হয়নি। 'কবিতা' পত্রিকায় এবারও তোর আর আমার লেখা প্রকাশিত হয়নি। যেতে পারলুম না ব'লে দুঃখ করিস নি। —সুকান্ত

স্বামী অরুণাচল মহারাজ সমীপেষু—

বাবাজী!

আপনি গাঁজার ঘোরে ভুল দেখিয়াছেন! আপনার "নাম-চিহ্ন" নকল করা হয় নাই। ছবিটি বিখ্যাত শিল্পী অহিনকুল মুখোপাধ্যায়ের আঁকা; নাম-চিহ্ন অনেকটা আপনার ন্যায় হইলেও, স্বাতন্ত্র্য আছে। সুতরাং ডায়ালেকটিক্যাল আদালতের কি ভয় দেখাইতেছেন? ব্যাপারটি মেটাফিসিক্স্ কি না তাই বুঝিতে পারেন নাই।

দুর্বিনীত: সুকান্ত শর্মা

অহি-নকুল তথ্য

স্বাধীনতা 'কিশোর-সভা'র সম্পাদক তখন সুকান্ত। মাঝে মাঝে আমি তাতে গল্প-কবিতা চিত্রণ করতাম। প্রতি ছবির একটি কোণায় রীতি মাফিক আমার নামের আদ্যক্ষরটি (অ) স্বাক্ষরিত থাকতো। কিন্তু একবার সপ্তাহ দুই বাইরে গিয়ে থাকতে হওয়ায় ওর দপ্তরে আর আমার ছবি অবশিষ্ট ছিলো না। কিন্তু সেখানে বসেই অবাক হয়ে দেখলাম অবিকল আমার ঐ 'অ' নাম-চিহ্নিত একটি ছবি পরের রবিবারে বেশ যথা নিয়মেই বেরিয়ে এলো। বুঝতে বাকি রইলো না ব্যাপারটা সুকান্ত এবং আমাদের অন্যতম এক শিল্পী অন্তরঙ্গের যুগ্ম ষড়যন্ত্রেই সংঘটিত হ'য়েছে!—সুবিখ্যাত শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের নামে প্রথম অক্ষরের সঙ্গে আমার নাম মেলে না; কিন্তু ঐ 'অহিনকুল' কথাটির মধ্য দিয়েই একাধারে উভয়ের নামের সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে এই ঘটনার ফলে আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়াটুকু নিয়ে সরস কৌতুক করা গেছে। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের একটি আর্ট-প্লেট 'বসুমতী'র গত সংখ্যাতেই প্রকাশিত হ'য়েছে।

ডায়ালেকটিক্যাল আদালত

সুকান্তর জীবনে ভালোবাসার একটি চমৎকার ইতিবৃত্ত আছে। অবশ্য সে প্রণয় ছিলো নিতান্তই কিশোরসুলভ—প্রায় একক হৃদয়াবেগের বলা চলে। ইংরেজীতে 'ডায়ালেকটিক্' শব্দের অর্থে দ্বন্দ্ব'র সঙ্গে 'বিকাশ' জড়িত। কিন্তু বাংলায় দ্বন্দ্ব অর্থে কলহও বোঝায়।—ও এবং ওর সেই পাত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কটি ছিলো বিরোধ-সংকুল ওর ছড়ায়-ভাষায় বেশ একটু 'মিঠে-কড়া'। আমি তাই তাকে নাম দিয়েছিলাম 'ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশন'—এবং ও-তে আমাতে কিছু নিয়ে কিঞ্চিৎ মতান্তর হ'লেই ব্যাপারটি ওই 'ডায়ালেকটিক্যাল আদালতে' উপস্থিত করবার ভয় দেখাতুম! উপস্থিত ক্ষেত্রেও তা করা হয়েছিলো বলা বাহুল্য।

মেটাফিজিক্স তত্ত্ব

আমাদের এলাকায় প্রায়ই রাস্তায় বেরুলে এক বুড়ো মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তো। তিনি চুলদাড়ি ছাঁটতেন না। নাকের ডগায় ভাঙা চশমা। গলাবন্ধ পুরানো কোট। ময়লা কাপড় হাঁটুর ওপর তোলা। পায়ে অতি পুরোনো কেড্‌স। কিন্তু বড়ো ভাল মানুষ তিনি। যৌবনের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে আর বিবাহও করা হ'য়ে ওঠেনি। প্রায় শিশুর মতো সরল আর পণ্ডিত মানুষ, একটু দার্শনিক প্রকৃতিরই লোকও বলা চলে। আমাদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন তিনি। আর দেখা হ'লেই তাঁর ভাষায় 'মেটাফিজিক্স এ্যাণ্ড মিষ্টিসিজম'-এ তাঁর গবেষণার সর্বাধুনিক তথ্যটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুঝিয়ে যেতেন। আমরা তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধাই করতাম। অবশ্য পিছনে যে একটু হাসাহাসিও করতুম না তাও নয়। সুকান্ত তাঁর প্রসঙ্গই উল্লেখ করেছে এখানে। (অ, ব)।

20 Narkeldanga Main Road
Calcutta, 15. 2. 43.

প্রীতিভাজনেষু—

আমি কিছুদিন আগে একটা বিপুল বপু চিঠিতে অজস্র বাজে কথা লিখে পাঠিয়েছিলাম—নেহাৎ চিঠি লেখার জন্যই। সেখানা হস্তগত হ'য়েছে শুনে নির্ভয় হ'লাম। ও চিঠির উত্তর না-পাওয়া আমাকে বিচলিত করেনি, যেহেতু ঐ চিঠিটার উত্তর দেবার মতো মূল্য ছিলো না। আমার খবর আমি এক কথায় জানাচ্ছি—পরিবর্তনহীন ভাবে রাজনীতি নিয়ে কালক্ষয় ক'রছি। তোরা একটা "পত্রিকা" বার করেছিস। ভালো কথা। কিন্তু প্রশ্ন এই, হাতের লেখা পত্রিকা বার করার মতো মনের অপরিপক্কতা তোর আজো আছে? কথাটা নীরস হ'লেও এ-কথা আমি বলবোই যে, এই ধরণের "খইভাজায়" এই দুর্দিনে কাগজ ও সময় নষ্ট করা

ছাড়া আর কিছুই হবে না। নিজের সম্বন্ধে তোর সব চেয়ে বড়ো দায়িত্ব হ'চ্ছে, নিজেকে নানা ভাবে সৎশিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলা এবং সেই জন্তে পত্রপাঠ ক'লকাতায় এসে বাবার সাহায্য নেওয়া। কথাটা গুরুমশাইয়ের উপদেশ অথবা বাবার নিবেদনের মত তিক্ত ও অনাবশ্যক ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু কথাটা সত্যি। কথাটার তাৎপর্য আমি মর্মে মর্মে অনুভব ক'রছি—এবং যথাসাধ্য সে সম্বন্ধে চেষ্টা ও আয়োজন ক'রছি। অতএব আমার কথাটা ভালো ক'রে ভেবে দেখবার জন্তে অনুরোধ জানাচ্ছি। আশা করি, মা এবং ভাই-বোন-সহ তুই ভালো আছিস, তোর প্রীতি-প্রাপ্তরা ভালো আছে, চিঠির উত্তর চাই না।

—সুকান্ত ভট্টাচার্য*

[* অর্থাৎ ভালোভাবে স্কুলের পড়াশুনো না করার ফলে একবার ম্যাট্রিকে ফেল করবার পর আবার তারই জন্তে প্রাণপণ চেষ্টায় রত আছে। এ-চিঠিটিও উপরোক্ত হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ প্রসঙ্গেই লেখা।]—অ, ব]

10 Rowdon Street
Calcutta

বন্ধু-বৎসলেষু,

....
....

সুকান্ত
২৭।৬।৪৬

[সুকান্ত তখন অসুস্থ হ'য়ে উপরোক্ত ঠিকানায় কমিউনিষ্ট পার্টির 'রেড-এড' কিওর হোমে' আছে। নানা কাজের তাড়ায় দীর্ঘদিন ওকে দেখতে যেতে পারিনি। তার পর হঠাৎ উপরের কার্ডের চিঠিটি আমার হাতে পৌঁছোলো। বলা বাহুল্য, ওই 'বন্ধু-বৎসলেষু' কথাটি এবং বাকি চিঠিটায় শুধু ড্যাশের আড়ালেই—বন্ধুর প্রতি আমার এই অকর্তব্যের প্রতি সুনিপুণ এবং চূড়ান্ত এক কটাক্ষ নিহিত আছে। অ, ব]

কলকাতা
১০।১।৪৫

অরুণ,

তোর খবর কি? এক মাস তোর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। অবিশ্যি দেখা-সাক্ষাৎ করাটা তোর কাছে অধুনা অবান্তর। আমি কিন্তু এই এক মাসের মধ্যে বার দুই তিন বেলেঘাটায় গেছি তোর খোঁজে। যাই হোক, তোর খবরের জন্তে আমি কি রকম উৎসুক তা রিপ্লাই কার্ড দেখেই আশা করি আন্দাজ করতে পারবি, এর পর যেন আর উত্তর দিতে দেরি করিসনি। অসুখ বিসুখ করেনি তো? কেন না, আমি ইতিমধ্যে আর একবার অসুখে প'ড়েছিলাম। এ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্ম আমার দুশ্চিন্তা ও অবহেলার সীমা নেই, যদিচ তোড়জোড় ক'রছি খুব। তাই উত্তর দিতে অবহেলা ক'রে আর দুশ্চিন্তা বাড়াস নি। ক'লকাতায় কবে ফিরবি? বাড়ির অন্ত সব কে কেমন আছে জানাস।* —সুকান্ত

* শ্রীঅরুণাচল বসুর সৌজন্তে।

বাংলা ভাষা ও ভারতের ঐক্য

বাল্যকালে এমন আলোচনাও আমি শুনেছি যে, বাঙালী যে বঙ্গভাষার চর্চায় মন দিয়েছে এতে করে ভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ, ভাষার শক্তি বাড়তে থাকলে তার দৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করা কঠিন হয়। তখনকার দিনে বঙ্গ-সাহিত্য যদি উৎকর্ষ লাভ না করত, তবে আজকে হয়ত তার প্রতি মমতা ছেড়ে দিয়ে আমরা নির্বিকার চিত্তে কোনো একটি সাধারণ ভাষা গ্রহণ করে বসতাম। কিন্তু, ভাষা জিনিষের জীবনধর্ম আছে, তাকে ছাঁচে ঢেলে কলে ফেলে ফরমাশে গড়া যায় না। তার নিয়মকে স্বীকার করে নিয়ে তবেই তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়। তার বিরুদ্ধগামী হ'লে সে বন্ধ্যা হয়।......

আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা যেমন মাতৃক্রোড়ে জন্মেছি তেমনি মাতৃ-ভাষার ক্রোড়ে আমাদের জন্ম, এই উভয় জননীই আমাদের পক্ষে সজীব ও অপরিহার্য।......

সুতরাং প্রত্যেক দেশ যখন তার স্বকীয় ভাষাতে পূর্ণতা লাভ করবে, তখনই অন্ত দেশের ভাষার সঙ্গে তার সত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে। ভাষার এই সহযোগিতায় প্রত্যেক জাতির সাহিত্য উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশমান হবার সুযোগ পায়।

(সভাপতির অভিভাষণ, ১৩৩০)—রবীন্দ্রনাথ

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

২৫

এখন আর লেখা হচ্ছে না নিয়ম মতো। বিরক্তি লাগে। লেখক মানুষ—সাধ ছিল, এখানে যাঁরা লেখেন, তাঁদের সঙ্গে কয়েকটা দিন মিলেমিশে হৈ-হৈ করব। কিন্তু এত দিনের মধ্যে যোগাযোগ হল না। হতাশ হয়ে পড়ছি। যে দলের মধ্যে এসেছি, জন দুই-তিন ছাড়া সাহিত্যের কোন তোয়াক্কা রাখেন না কেউ। বাংলা সাহিত্যের তো নয়-ই। পিকিনে স্পানিসিমভের সঙ্গে খাতির জমেছিল—এখানে এসে শুনি, ভদ্রলোক গর্কি ইনস্টিট্যুট অব ওয়ার্ল্ড লিটারেচার নামক মস্ত বড় প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর, রীতিমত ওজনদার মানুষ। মস্কোয় এত ঘোরাফেরা করছি, একই জায়গায় থেকে তবু কিন্তু দেখা হল না একটিবার। কত জনকে বললাম, বটেই তো, বটেই তো বলে প্রবল ঘাড় নাড়ে, দু-কদম যেতে না যেতে ভুলে মেরে দেয়।

দেশে ফিরবার সময় হয়ে এলো। খুব বেশি তো আর এক হপ্তা। সত্যি তো ঘর-বাড়ি বিকিয়ে দিয়ে আসি নি। ক'জনের দস্তুরমতো গৃহপীড়া দেখা দিয়েছে—শয়নে, স্বপনে, বিচরণে বাড়ির কথা। চিঠি লেখা বিষম বেড়েছে, ভোকসের লোক নাজেহাল হচ্ছে খাম-টিকিটের জোগান দিতে দিতে।

ঘোরাঘুরি চলছে ঠিক নিয়ম মতো। আজ সকালে নিয়ে চলল মিলিটারি একজিবিসনে—যার আসল নাম সোবিয়েত মিউজিয়াম অব আর্মস্। ১৯১৯ অব্দে স্থাপনা।

লেনিন ও ষ্টালিনের প্রতিমূর্তি—যেমন সর্বত্র দেখে আসছি। ১৯১৭ অব্দে বিপ্লব হ'ল—সেই বিপ্লব-সৈনিকদের টুপি, ব্যাজ ও পিস্তল। ভাবি সম্মানের বস্তু এগুলো। আর দেখুন পতাকা। কাচের আড়ালে সাঁটা রয়েছে বিবর্ণ নিশ্চল, এক দিন এই পতাকা উড়িয়ে তারা জারের শীত-প্রাসাদ আক্রমণ করেছিল। সেই আক্রমণের ছবি—ফোটো তুলে রাখেনি কেউ, শিল্পী রঙ তুলি আর কল্পনায় এঁকেছে। দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন সর্বহারার গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করলেন, তখনকার ফোটো ও কাগজপত্রে। অর্ডার অব দি রেড ব্যানার—লাল পতাকার নামে সৈনিকের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান—তার নমুনা রেখে দিয়েছে এখানে।

১৯১৮ অব্দে চারিদিক দিয়ে শত্রু রাষ্ট্র ঘিরে ফেলেছিল—তখনকার নানা পোষ্টার ও ছবি। বৃটিশ, আমেরিকা জর্মনি সীমান্তে সেনা মোতায়েত করল, বিষম অত্যাচার, দেশের ভিতরেও গণ্ডগোল কাঁপিয়ে তুলেছে শত্রুরা, ঘরে-বাইরে লড়াই। তার হরেক ছবি ও কাগজপত্র। বৃটিশ আমেরিকা জর্মনি জাপান ও ফ্রান্সের বন্দুক মেশিনগান টুপি হেলমেট ইত্যাদি কেড়েকুড়ে নিয়েছিল সেই সময়, তার কিছু কিছু আছে। আবার এই তরফের কামান, মাইন গেরিলাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র, বোমা ফেলার যন্ত্র, হাতে তৈরি পেটাই মেশিনগান। সেকালের হাতলওয়ালা বর্শা। জাপানি টুপি কেড়ে নিয়ে তাই মাথায় চাপিয়ে জাপানি সেজে পড়েছে গেরিলারা; বিদেশির হামলা রুখেছে। সেই সব টুপি দেখতে পাচ্ছি।

এক লাল সৈন্যের হাতের চামড়া তুলে নিল যেহেতু সে দলের কথা ফাঁস করে না। সেই সৈন্যের নামধাম যাবতীয় কাহিনী। কশাক টুপি, হাতবোমা, তলোয়ার, তলোয়ারের খাপ। শহীদজনের মূর্তি অনেকগুলি। একটা বৃটিশ সাবমেরিন এরা ডুবিয়ে দিয়েছিল, তার মডেল রেখে দিয়েছে। জলতল থেকে পরে ঐ সাবমেরিন তুলে তার মধ্যে ষড়যন্ত্রের দলিলপত্র পাওয়া যায়।

১৯১৯ অব্দের তোলা সোবিয়েত বীর সেনাদের ছবি। তাদের বিভিন্ন অস্ত্রসজ্জা। প্রোপাগাণ্ডার ট্রেন ও জাহাজ বেরুল দেশের আনাচে কানাচে সর্বত্র। গণমানুষদের রাজনীতির পাঠ দিতে হবে। গণ্যমান্য নেতারা বেরিয়ে পড়েছেন গাঁয়ে গাঁয়ে। সেই সব ট্রেন ও জাহাজের মডেল।

লড়াই ছেড়ে সংগঠন এবারে। পর পর তিনটে পঞ্চবার্ষিকী কল্পনার রূপদান হল। কত খাল কেটেছে, বাঁধ বেঁধেছে, জলধারা, বইয়ে দিয়েছে উষর মরুতে, তেল-ইস্পাতের গোপন ভাণ্ডার পাতাল খুঁড়ে বের করে ফেলেছে। ছবিতে ছবিতে তাকিয়ে দেখুন কী কাণ্ড করেছে তামাম দেশটা জুড়ে। লড়াইয়ের সরঞ্জামও বানাচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে। দুটো পঞ্চবার্ষিকীর মধ্যে বানাল চারশ রণতরী, নানান রকমের বন্দুক মেশিনগান হাউইটজার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। নাজি ফ্যাসি ও জাপান হামলা দিয়েছে রাশিয়ার উপর। আমেরিকা ও ফ্রান্সের অস্ত্র পাওয়া গেল তাদের হাতে। নিউইয়র্ক টাইমসে ট্রুম্যানের বিবৃতি; যারা জিতবে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করব আমরা।...অসংখ্য পোষ্টার সে আমলের। এক দুর্গে সৈন্যেরা আটকা পড়েছে, আঁকাবাঁকা অক্ষরে কে-একজন লিখে গেছে দেয়ালের উপর: আত্মদান করলাম, কিন্তু দুর্গ ছাড়িনি; তারিখ—২০ জুলাই, ১৯৪১। একটুকরো টিন রেখেছে এক পাশে—গুলিতে গুলিতে শতছিদ্র।

দেড় মাসে রাশিয়া খতম—এই ওদের হিসাব। হিসাব উল্টে গেল—জর্মনিই হটছে। ষ্টালিন কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ।

গাইড বলে যাচ্ছে ইংরেজি। ছবি ও জিনিষপত্রে ঘটনার পর ঘটনা দেখিয়ে যাচ্ছে। রোমাঞ্চক রূপকথার মতো শুনে যাচ্ছি। জর্মনদের হাতিয়ার পত্র কেড়ে নিয়ে তাড়া করেছে তাদের। নীপার নদী পার হচ্ছে সৈন্যদল—তার এক বিরাট মডেল। নিরীহ লাঠির মধ্যে বন্দুক-রিভলভার। ছুরির মধ্যে মাইক। পিস্তল পেন্সিলের মধ্যে। গুপ্তচরেরা এই সমস্ত নিয়ে দেশের মধ্যে ঘুরত।

১৯৪৫ অব্দে পুরোপুরি জয়। জর্মনির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙেচুরে পালাচ্ছে বার্লিন মুখে—তার সুবৃহৎ মডেল।

রাইখষ্টাগের চূড়ায় যে পতাকা এরা উড়িয়ে গিয়েছিল, সেটা পরম যত্নে এনে রেখেছে। সমস্ত শহর জ্বলছে, তার ছবি। রাইখষ্টাগের মডেল। নানা অঞ্চলের সৈন্তেরা রাইখের এখানে ওখানে যা খুশি লিখেছিল, তার ছাপ রেখে দিয়েছে। জাপানেরও হার হল, গাদা গাদা অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছে।

সোবিয়েত দুনিয়া শান্তি চায়। দেয়াল জোড়া ম্যাপের উপর আলো বসানো—বিশাল দেশের যাবতীয় সম্পদের পরিচয় এই ম্যাপে। দেশের মানুষ সকলে মিলে সুখে শান্তিতে এই বিপুল সম্পদ ভোগ করতে চায়। রণজয়ের পর দেশ থেকে কত উপহারের পাহাড় জমেছে! স্তুপীকৃত পতাকা—যা সমস্ত জয় করে এসেছে, আর নিজেদের যা ছিল।

কত লোক মিউজিয়াম দেখতে এসেছে—মেয়েপুরুষ বাচ্চাবুড়ো আর ইউনিফর্ম আঁটা সৈন্ত। দেখে দেখে এলাম—গাইডেরা বকবক করে বুঝিয়ে চলেছে—এদের এই মহা ইতিহাস আপনার চোখের উপর ভাসবে। কত সংগ্রাম, কত বীরত্ব, কত আত্মত্যাগ! বেদনার উদ্বেল সমুদ্র পার হয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল কূল পেয়েছে।

বিজয়োৎসব। পরাজিত পতাকাগুলো এদেশ সে দেশ থেকে বয়ে এনে প্রথমটা মুশোলিয়ামের সামনে রেখে দিল। লেনিন যার ভিতর শান্ত ভাবে ঘুমিয়ে আছেন। দেশের সমস্ত উল্লাস ঐ স্মৃতি-মন্দিরের পাদপীঠে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তার পরে এই মিউজিয়ামের সংগ্রহে রেখেছে। সমস্ত সাজানো গোছানো সর্বশেষ হঠাৎ দেখি, খুদ হিটলারের বিশাল পতাকা আর ব্যাজ মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। তাকের উপর কিম্বা দেয়ালের গায়ে জায়গা হয়নি। গাইডের কণ্ঠ সহসা গম্ভীর হয়ে উঠল, কথায় আগুনের জ্বালা। আমরা শান্তি চাই; কেউ যদি পিছনে লাগতে আসে, তার মাথা এমনি করে ধূলায় লুটবে।

চেকোভস্কি সুরকার। জ্ঞানীগুণীরা খুব জানেন, সাধারণের কথা বলতে পারব না। রাশিয়ায় কিন্তু এই নামে সির্শি পড়ে। মস্কো শহরের বুকে মস্ত বড় মূর্তি, ঐ নামে পার্ক। মনোরম এক হল বানিয়েছে—চেকোভস্কি কনসার্ট হল। সন্ধ্যার পর সেখানে গিয়ে বসলাম। নাচের আসর; অত বড় হল মানুষে গমগম করছে।

রাশিয়ার রকমারি লোকনৃত্য। চোখে না দেখে নাচের কি মজা পাবেন? আহা-ওহো করেও লাভ নেই। আর কি হবে—নাম কটা নিয়ে নিন শুধু।

বার্চ নাচ—গ্রাম্য পোষাকে একগাদা মেয়ে নাচছে। ডান হাতে নীল রুমাল, বাঁ হাতে বার্চ-শাখা। লাল গাউনে দুটো পা ঢেকে গেছে, ঢেকে অনেকখানি ষ্টেজের উপর ছড়িয়ে আছে। হলদে রুমাল মাথায়। ধীরে ধীরে চলন। ঘুরছে, পা দেখা যায় তো—মনে হল ষ্টেজই পাক দিচ্ছে মেয়েগুলোকে ঘিরে। নাচ নয়—কাঠের ঐ ষ্টেজের উপর ভেসে ভেসে বেড়ানো। যত সব ধুন্দুমার নাচ দেখায় পশ্চিমে—আজকের নাচ ভারি মোলায়েম। গানের সুরগুলোও বড় স্নিগ্ধ।

নাচের পর নাচ চলছে। ক্ষিতে নাচ। তিন ঘোড়ার নাচ—ঘোড়ার ভঙ্গিতে নাচে তিনটে করে ছেলে। উত্তর-রাশিয়ার অতি প্রাচীন এক লোকনৃত্য। চৌকো নৃত্য—চারটে করে মেয়ে একসঙ্গে নাচে। মস্কো অঞ্চলের এক পুরানো নাচের সুর। ভল্গা গাঙের উপর মাঝির নাচ। এক মেয়ের প্রণয়গাথা ও নাচ। কসাক মেয়েদের নাচ—নাচের তাবৎ দর্শকদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছে, বাজনদারদের অবধি। নাগর দোলার নাচ। হাসিহল্লার নাচ। এক পালা নাচ, নাম হল 'আমরা রাজহংসী'—কালো পাথরের বড় আংটি আঙুলে পরে হাত বাঁকিয়ে মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেন রাজহংসী, কালো পাথর হল হাঁসের চোখ; আহা, সরোবরে ভেসে বেড়ায় হংসীর দল। রঙের খেলা—নাচে আর সাজ-পোশাকে রঙের ঢেউ খেলে যাচ্ছে; বারম্বার হাততালি পড়ে, ঘুরে ফিরে নাচতে হয়। রাশিয়ার পুরানো বাজনা—কত রকম তারের যন্ত্র, লেখাজোখা নেই। লোকনৃত্যের বাজনা। সোবিয়েত যুৎনৃত্য ও গান—একবার দু'বার দেখে লোকের তৃপ্তি হয় না, বারম্বার করতে হয়।

পরদিন—১ নভেম্বর। রেড স্কোয়ার দিয়ে যত বার যাই, লোলুপ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি মুসোলিয়ামের দিকে। ভিতরে গিয়ে দেখব, লেনিন—ষ্টালিনের কাছে গিয়ে দাঁড়াব। এত দিন যেতে দিত না, উৎসব ব্যাপারে ভিতরে রঙচঙ করা হচ্ছে, এমনি যেন শুনেছিলাম। উৎসব অন্তে আজ দোর খুলে দিয়েছে। চলেছি সেখানে। পায়ে হেঁটে যাচ্ছি। প্রকাণ্ড আয়তনের শ্বেত কুসুমস্তবক নিয়ে চলেছি।

রেড-স্কোয়ার আর রেভল্যুসান স্কোয়ারের মাঝখানটায় ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের লাল বাড়ি। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে অগুন্তি মানুষ। মুসোলিয়ামের সামনে থেকে লাইনের শুরু—রেড-স্কোয়ার শেষ হয়ে ঐতিহাসিক মিউজিয়াম ছাড়িয়ে রেভল্যুসান স্কোয়ারের বহুদূর অবধি চলে গেছে। বাচ্চা-বুড়ো মেয়েপুরুষ সব রকম তার মধ্যে। বারো মাস তিরিশ দিন এই ব্যাপার বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ঢুকতে দেয়, কিউয়ের লেজ একটুকু খাটো হয় না তার ভিতর। মাথার দিক দিয়ে লাইনবন্দি ঢুকে যাচ্ছে, পিছন দিকে নতুন নতুন মানুষ জুটছে এসে। আমরাও আসছি রেভল্যুশান-স্কোয়ার হয়ে ঐ পিছন দিকে। আরে সর্বনাশ! আগে যারা দাঁড়িয়ে গেছে তাদেরই শেষ হতে আজকের পাঁচটায় তো কুলাবে না।

না, বিশেষ অতিথি বলে আলাদা বন্দোবস্ত আমাদের জন্ত। উর্দি পরা কয়েকটা সৈন্ত আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলল কিউয়ের পাশ দিয়ে মুশোলিয়ামের দরজার দিকে। কুসুমস্তবক জন আষ্টেক মিলে কাঁধে বয়ে চলেছেন। লি'ও আগে আগে ছুটেছে ফোটো তুলতে তুলতে।

দুয়ারে অদূরে এসে থমকে দাঁড়াতে হল। ঠিক বারোটা—পাহারা বদল হচ্ছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাহারা বদল। দু'জন করে সৈন্ত বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। দিন-রাত্রি শীত-গ্রীষ্ম-বরফ সর্বক্ষণ আছে তারা। এতটুকু নড়াচড়া নেই—অবিচল, পাথর-খোদা মূর্তির মতো। তিনজন বন্দুকধারী ক্রেমলিনের ভিতর দিক থেকে আসছে খটখট জুতোর আওয়াজ তুলে পাথরে-বাঁধানো রেড—স্কোয়ারের উপর। তারা এসে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। দু-জন উঠল গিয়ে

দরজার উপর ; আগের দু-জন নেমে এসে আবার তিন জন হল। মার্চ করে তিন জনে আবার ক্রেমলিনে ঢুকে পড়ল।

ফুল ভিতরে নিতে দেয় না, দরজার কাছে রাখে। ভিতরে চললাম। লাল মার্বেলে গড়া চৌকো ধরনের বাড়ি—বাইরে থেকে ছোট মনে হয়। পয়লা দিনটা খুব খারাপ লাগছিল, এমনি সামান্য এক জায়গায় লেনিন-ষ্ট্যালিনকে রেখেছে! আজকে ভিতরে এসে দেখছি, ছোট ব্যাপার নয়। বিরাট ক্রেমলিনের পাশে বলেই আরও ছোট দেখায়। চমৎকার পালিশ করা, হাত ঠেকালে পিছলে যায়। মাটির অনেক তলেও ঘর। সিঁড়ি দিয়ে নেমে নেমে ক্রমশ গর্ভগৃহে ঢুকে পড়লাম। সৈন্যের পাহারা ভিতরেও। সন্তর্পণে সবাই পা ফেলে ফেলে যাচ্ছি। নিস্তব্ধ জুতোর শব্দ হচ্ছে না এতটুকু। শান্ত ধ্যান-সমাহিত পরিবেশ। অবশেষে এসে পৌঁছলাম সমাধিগৃহে।

লেনিন ও ষ্ট্যালিন ঘুমুচ্ছেন পাশাপাশি। কাচে ঘেরা জায়গাটুকু। কে বলবে মৃত্যু, কঠিন সংঘর্ষ ও কর্মের ক্লান্তিতে বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। লেনিনের বাম দিকে ষ্ট্যালিন। লেনিনের গায়ে কালো রঙের কোট। ষ্ট্যালিনের পুরোদস্তুর মিলিটারি পোশাক। ছবিতে যা দেখেন, অবিকল সেই চেহারা। অদৃশ্য কোথা থেকে সহসা একটু আলো পড়েছে মুখের উপর—যেমন ধারা জ্যোতি ঘেরা থাকে মহাপুরুষের মুখমণ্ডলে। ছোট খাট মানুষটি লেনিন—হাত একটু যেন বিবর্ণ হয়েছে এই তিরিশ বছরে। ষ্ট্যালিনের কাঁচায় পাকায় মেশানো গোঁফ-চুল। বারম্বার মুখে তাকাচ্ছি—ঘুমন্ত মানুষ ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। দুই দেহের তিন দিক প্রদক্ষিণ করে আবার উঁচুতে উঠে একটু বাঁক ঘুরে চলেছি। পা টিপে টিপে চলা—ঘুম ভেঙে যায় যদি দৈবাৎ! গভীর শান্তিতে ঘুমোতে লাগলেন এঁরা—নিঃশব্দে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভিন্ন দরজায় বেরিয়ে এলাম।

শেষ নয়। আরও আছে, আর একটু এগিয়ে যাব। খানিকটা গিয়ে বাঁয়ে ঘুরলাম। উপরে উঠে যাচ্ছি, ক্রেমলিনের দেয়ালের দিকে। একটু বাগান। তার পরে শহীদের কবরভূমি। বিপ্লবের বলি। রীডের লেখা 'টেন ডেজ দ্যাট শুক দ ওয়ার্লড' (Ten Days that Shook The World) বইয়ে জ্বলন্ত বর্ণনা আছে। সারা রাত্রি ধরে মাটি খুঁড়ে গর্ত বানান। শহরের নানা জায়গা থেকে নিঃশব্দ অন্ধকারে শব এনে জমা করেছে। তার পর শব সাজান খালি মাটির উপর। এক বার সাজানো হয়ে গেল তো দেহগুলোর উপর দিয়ে আর এক দফা সাজাচ্ছে। তার উপরে আবার। পাইকারি কবর—নাম ধাম জানা নেই। শুধু এই পুণ্যদেহ, মহৎ ব্রতে প্রাণ দিয়েছেন। কবর এমনি দুটো—লম্বালম্বি অনেকটা জায়গা নিয়ে—মাঝে একটুখানি ফাঁক। মস্কো শহরের সব চেয়ে পবিত্র জায়গা—মরবার পর এই জায়গায় একটুকু ঠাঁই পাবার জন্য সকলের ভারি লোভ। মার্কিণ লেখক রীডেরও কবর এখানে। আরও পাঁচ জন বড় বড় নেতার—তাঁদের আবক্ষ মূর্তি কবরের উপর।

জায়গা নেই, একটু জায়গা নেই আর ওখানে। অনেকে বলে গেলেন, মৃত্যুর পরে দেহ যেন দাহ করা হয় ; সেই ছাই খানিকটা ঐখানে ক্রেমলিনের দেয়ালের ভিতর ঢুকিয়ে রাখা হবে। অনেক আছে এমন—দেয়ালের উপর পাথরের ফলকে নাম লেখা। মাক্সিম গর্কিরও ছাই এখানে।

মস্কোর ভারতীয় অ্যাম্বাসি দাওয়াত পাঠিয়েছেন আমাদের সকলকে। দেশে তো ফিরছেন, তার আগে ফূর্তি করে খাওয়া যাক এক সঙ্গে। বর্ধমান, রায়নার সুধীন্দ্রনাথ বোসকে জানেন আপনারা—সেই যে ছেলেটি অ্যাম্বাসিতে চাকরি করে। বয়সে তরুণ, ভারি সুন্দর ছেলে। বেলাবেলি আসতে বলে দিয়েছি তাকে। দু-জনে বেরুব। ওদের গাড়িতে নয়—পায়ে হাঁটব যত্র-তত্র, ট্রামে চড়ে বেড়াব, মেট্রোয় চড়ব। মস্কো শহর চষে বেড়াব'। তার পর যথা সময়ে অ্যাম্বাসিতে জুটে খানাপিনা করে করে সকলের সঙ্গে বাসায় ফিরব। বোস অনেক দিন আছে মস্কোয় তার সঙ্গে পথ হারাবার ভয় নেই। আমাদেরই পুরোপুরি আপন লোক সে।

এই যে শুনি ইস্পাতের পর্দায় ঘেরা চতুর্দিক। দুটো চারটে জায়গা দেখিয়ে দেয় নিজেদের খুশি মতো। বিদেশির দিকে কড়া নজর। চলাচলের ব্যাপারে একটু হেরফের হলে ক্যাঁক করে টুঁটি টিপে কনসেন্টেন-ক্যাম্পে নিয়ে তুলবে।

বোস একগাল হেসে বলে, তাই দেখুন। সারা বিকেল তো চক্কোর দিচ্ছি। নজর তুলে দেখল না একটিবার কেউ।

ঘণ্টা তিন-চার ঘোরা-ঘুরি হয়েছে। ট্রামে চেপে যাচ্ছি—কোন তল্লাট দিয়ে কোথায় চলেছি, বোস বোধ হয় কিছু কিছু বলতে পারে। এবারে মালুম হল, নজর আছে বই কি! সবগুলো নজরই বোধ হয় আমাদের দিকে। যাদের মুখোমুখি বসেছি, তারা সোজা তাকাচ্ছে। চোখে চোখ পড়লে নজর নামিয়ে নেয়, ক্ষণপরে আবার তাকায়। উল্টো দিকে যাদের মুখ, ঘাড় বাঁকিয়ে লুকিয়ে চুকিয়ে দেখে তারা। এ তো বড় মুশকিল! সামনে তো এই ব্যাপার—পিঠের উপরটাও দৃষ্টির শূলে খোঁচাখুঁচি করছে, অনুমানে বুঝতে পারি।

বোস বলে, রূপ দেখছে আমাদের। কালো দেখতে পায় না বড় একটা—দেখছে, আর হিংসেয় জ্বলছে মনে মনে।

[ক্রমশঃ।

জনসাধারণের সাহিত্য

ভারতবর্ষে এক সময়ে জনসাধারণের মধ্যে একটা ঢেউ উঠিয়াছিল। ঈশ্বরের অধিকার যে কেবল জ্ঞানীদিগেরই নহে এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে যে তন্ত্রমন্ত্র ও বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না, কেবল সরল ভক্তির দ্বারাই আপামর চণ্ডাল সকলেই ভগবানকে লাভ করিতে পারে, এই কথাটা হঠাৎ যেন একটা নূতন আবিষ্কারের মত আসিয়া ভারতের জনসাধারণের দুঃসহ হীনতাভার মোচন করিয়া দিয়াছিল। সেই বৃহৎ আনন্দ দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যখন ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তখন যে সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা জনসাধারণের এই নূতন গৌরবলাভের সাহিত্য। (সাহিত্য-সৃষ্টি—বঙ্গদর্শন, ১৩১৪ আষাঢ়)

—রবীন্দ্রনাথ

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে নাম ধাম ঠিকানা লিখতে ভুলবেন না]

বিড়লা মন্দির (দিল্লী)

—সুশীল হালদার

যাত্রা হ'ল শুরু

—রখান রায়

বন্দিনী —পরিতোষ মিত্র

মুক্তির বন্ধন —রামকিঙ্কর সিংহ
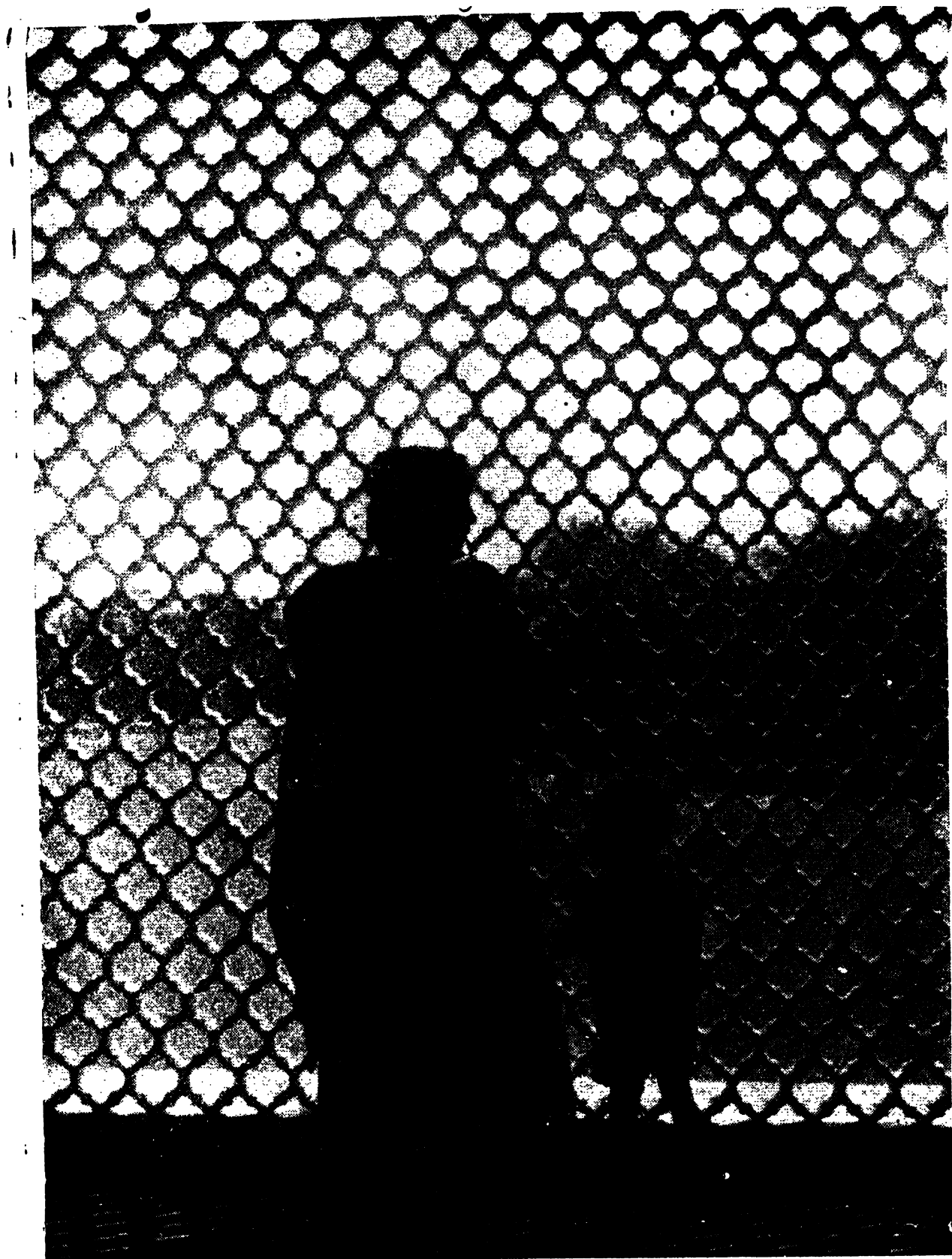
চাষী —সুকুমার দাস

তনয়-তনয়া

—সুনীল বসু

—অমরেশ দাস

ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

[পরিচালক, নব নালন্দা মহাবিহার, নালন্দা]

১৩০০ সালের ২রা চৈত্র বৃহস্পতিবার বীরভূম জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবড়া গ্রামে (পোঃ—দক্ষিণগ্রাম) মাতুলালয়ে সাতকড়িবাবু জন্মগ্রহণ করেন। সাতকড়িবাবুর মাতামহ ছিলেন বীরভূমের প্রধান পণ্ডিত অধ্যাপক নিমাইচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ। সাতকড়িবাবুর পিতা ৺হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বীরভূমের রাতমা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষকতা করিতেন। পরে রামপুরহাট ফৌজদারী আদালতে মোক্তারি করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সাতকড়িবাবুর মাতার নাম বিশ্বেশ্বরী দেবী। সাতকড়িবাবুর পিতৃকুলে বৈরাগ্যের প্রবল প্রভাব দেখা যায়। তাঁহার পিতামহ ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুত্র হরিপ্রসন্নের চতুর্দশ বৎসর বয়সের সময় সংসার পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাণিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (স্বামী মোক্ষদানন্দ) কাশীতে দণ্ডী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হন এবং রামপুরহাটের সন্নিকটস্থ তারাপীঠে তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তারাপীঠের ভৈরব বামা ক্ষ্যাপা তাঁহার শিষ্য ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে রামপুরহাট হাই স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সাতকড়িবাবু প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সেই সময় হইতেই ইংরাজী ও সংস্কৃত এই উভয় ভাষায়ই সাতকড়িবাবুর সমান ব্যুৎপত্তি দেখা যায়। স্কুলে থার্ড ক্লাসে (বর্ত্তমানের Class VIII) পড়িবার সময় পিতার নির্দেশে সাতকড়িবাবু সমগ্র গীতা এবং অমরকোষের একের তিন অংশ কণ্ঠস্থ করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত 'অনার্সে' প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া সাতকড়িবাবু সংস্কৃত কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সাতকড়িবাবু যখন সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত অনার্স পড়েন তখন ইংরাজীতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া ইংরাজীর অধ্যাপক ৺শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে ইংরাজীতে অনার্স লইবার জন্য বার বার বলেন। সাতকড়িবাবুর পিতার ইচ্ছা ছিল, পুত্র সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হউক। পিতার ইচ্ছার প্রতি সম্মান দিবার জন্যই সাতকড়িবাবু সংস্কৃতই পড়িতে থাকেন। অনার্স পড়িবার সময় সাতকড়িবাবু পাণিনি ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি ৺সীতানাথ কাব্যরত্নের নিকট পাণিনি ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া [সাত]কড়িবাবু এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্যার আশুতোষ সাতকড়িবাবুকে [ক]লিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। সেই সময় হইতেই ছাত্রেরা তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া পাণিনি ব্যাকরণ ও অলঙ্কার অধ্যয়ন করিয়া যাইত। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় চার বৎসর সাতকড়িবাবু তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সহিত সাতকড়িবাবুর পরিচয় হয়। তাঁহারই নির্দেশে সাতকড়িবাবু নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শনের উপর তিব্বতী ও সংস্কৃত এই উভয় ভাষার সাহায্যে গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন। ডক্টর দাশগুপ্তের নিকট সাতকড়িবাবু পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা করেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থের নিকট সাতকড়িবাবু ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করেন। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে সাতকড়িবাবু ছয়টি আস্তিক্য দর্শন এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন আলোচনা করেন। পরে বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গবাদ ও বৌদ্ধ ন্যায়ের উপর নিবন্ধ রচনা করিয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ইহার পূর্বে সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় 'সংস্কৃত সাহিত্য পত্রিকা' 'আর্য্যদর্পণ' Calcutta Review প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তিনি বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবনে সাতকড়িবাবুর ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়। তিনি সংস্কৃত বিভাগের রীডার, প্রধান অধ্যাপক ও আশুতোষ অধ্যাপক হন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় বিহার গভর্ণমেণ্ট তাহাদের বৌদ্ধশাস্ত্র ও পালিভাষার
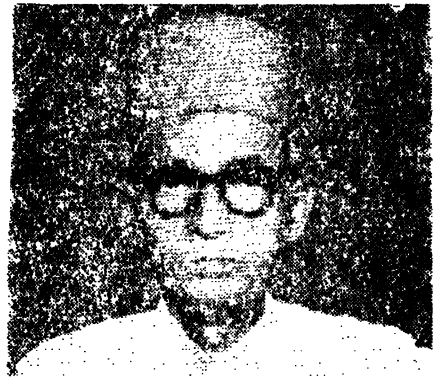
সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দা রিসার্চ ইন্সটিটিউটকে (বর্তমান নাম,—নব নালন্দা মহাবিহার) গড়িয়া তুলিবার জন্য সাতকড়িবাবুকে অনুরোধ করেন। সাতকড়িবাবুর স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না, তাহা হইলেও বিহার গভর্ণমেন্টের অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন না। ঐ প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর রূপে তিনি নূতন ভাবে কার্য্যে যোগদান করিলেন। সেই পদেই তিনি বর্তমানে অধিষ্ঠিত আছেন।

সাতকড়িবাবু বহু প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ভাগবতকুমার শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু খ্যাতিমান্ পণ্ডিতের পদপ্রান্তে বসিয়া সাতকড়িবাবু অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং ইঁহাদের স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছেন।

সাতকড়ি বাবু কয়েকখানি বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। The Buddhist Philosophy of Universal Flux' (1935 C. U.), The Jain Philosophy of Non-Absolutism (ভারতী মহাবিদ্যালয়ের শান্তিপ্রসাদ জৈন লেকচার সিরিজ, 1946), প্রমাণমীমাংসা (হেমচন্দ্র)—A critic of Organ of knowledge (in collaboration with Dr. Tatia এবং The Absolutists position in Logic—এই কয়খানি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারত সরকারের History of Philosophy, Eastern and Western গ্রন্থের 'Philosophy of Sankhyayoga' নামক প্রবন্ধও সাতকড়িবাবুর রচিত।

সাতকড়িবাবু সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল ভাষণ দিতে পারেন এবং সংস্কৃত কবিতা রচনায় ও তাঁহার নৈপুণ্য আছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীদরবারের উৎসব উপলক্ষে রামপুরহাটে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি স্বরচিত অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। 'কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গীতার উপর সংস্কৃত ভাষায় তিনি বক্তৃতা দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি বহুবার সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করেন।

সাতকড়িবাবুর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁহার খ্যাতিমান্ ছাত্রবৃন্দ। গবেষণায় সাফল্যের পথের নির্দেশ দানে সাতকড়িবাবুর তুলনা ভারতবর্ষে নাই।

শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায়

[প্রতিষ্ঠাবান বাঙ্গালী চা ব্যবসায়ী]

সততা, অধ্যবসায় ও কর্ম্মনিষ্ঠা থাকলে লোক সাধারণ অবস্থা থেকে কি করে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন বিখ্যাত চা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুধীর চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায়। বাঙ্গালী চা ব্যবসায়ীদের মধ্যে আজ ইনি একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে আছেন। চাকুরীজীবী বাঙ্গালীদের কাছে সুধীরবাবু আদর্শস্থল এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে এঁর সততা, কর্ম্মনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় অনুপ্রেরণার বস্তু হয়ে থাকবে। লক্ষীর কৃপা লাভ করলেও সুধীর বাবু অতীতের দিনগুলি বিস্মৃত হন নাই। তাই তাঁর চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য। অতীত দিনের কথাগুলো বলতে বলতে সুধীরবাবুর চোখ সজল হয়ে উঠলো দেখলুম। অমায়িক, নিরহঙ্কার, সদালাপী এ মানুষটিকে দেখে সত্যিই ভাল লাগলো। পৃথিবীতে ধনবান হলে লোকে সাধারণতই একটু গর্ব্ব অনুভব করে এবং অতীত দিনের কথা সহজেই বিস্মৃত হয়, সুধীরবাবুকে দেখলুম এদিকে সম্পূর্ণ পৃথক। দেব, দ্বিজ ও নারায়ণে ভক্তি তাঁর চরিত্রের মধ্যে অপর কয়েকটি গুণ দেখতে পেলুম, আর দেখতে পেলুম তাঁর ভেতর অপূর্ব্ব কর্ম্মনিষ্ঠা।

কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন করভারে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী আজ নিষ্পেষিত। এই অন্যায় করভারের প্রতিবাদে বামপন্থী নেতৃবৃন্দ হরতাল আহ্বান করেছেন ৩০শে মে বৃহস্পতিবার। তাই এ দিনটিই আমি বেছে নিলুম কৃতী ব্যবসায়ী সুধীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের। কাঁটায় কাঁটায় সকাল ৯ ঘটিকার সুধীরবাবুর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। গিয়ে সুধীরবাবুর অনুসন্ধান করতেই তিনি নীচে নেমে এলেন। আমি তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করলুম। সুধীরবাবু বলতে থাকেন। "অন্যান্য ৫জন বাঙ্গালীর মত আমি ও চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রবেশ করি পারিবারিক বিপর্য্যয়ে। কিন্তু যেদিন চাকুরী ত্যাগ করতে বাধ্য হই সেদিন আমার সম্বল ছিল মাত্র কয়েকটি টাকা। সেদিন আমি কোথাও কোন আলোকের সন্ধান পাইনি।"

১৯১১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ব্যবসায়ী শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয় এই কলিকাতা মহানগরীতেই। তাঁদের আদিনিবাস ২৪ পরগনা জেলার হালিসহরে। পিতা ডাঃ বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়। সুধীরবাবুর লেখাপড়া আরম্ভ হয় সর্বপ্রথম গৃহশিক্ষকের কাছে, বাড়ীতে কিছুকাল লেখাপড়ার পর তিনি কলকাতা টাউন স্কুলে ভর্ত্তি হন। স্কুলের পড়া শেষ করেই তাঁকে কর্ম্মক্ষেত্রে যোগদান করতে হয়। ১৯২৮ সালে কলকাতার বামার লরী এণ্ড কোম্পানীতে চা বিভাগে unpaid apprentice হিসেবে যোগদান করেন এবং এখান থেকেই হয় তাঁর কর্ম্মজীবনের সুরু এবং কিছুকালের মধ্যেই তিনি এই বিভাগের ভার প্রাপ্ত হন। এই বিভাগটি বামার লরী এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত 'ইণ্ডিয়ান টি কোম্পানী' বলে সে সময় পরিচিত ছিল। উহার অস্তিত্ব আজ লুপ্ত।

১৯৩৬ সালে উক্ত কোম্পানী থেকে সুধীরবাবুকে বিদায় নিতে হয়। কোন লোকের প্রভাবে পড়ে বামার লরীর কর্ত্তৃপক্ষ সুধীর বাবুকে কর্ম্মত্যাগ করতে বাধ্য করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, উক্ত লোকটি ছিলেন সুধীরবাবুর আত্মীয়। চাকুরী যাবার পর সুধীর বাবুকে কিছুদিন অসুবিধের মধ্যে কাটাতে হয়। তারপর বামার লরীর এক সাহেবের চেষ্টাতেই শ্রীচট্টোপাধ্যায় ক্যারেট মোর এণ্ড কোম্পানীর under Broker নিযুক্ত হন। আণ্ডার ব্রোকার নিযুক্ত হওয়ার পরেই উক্ত কোম্পানী তাঁকে কমিশন প্রদান আরম্ভ করেন। এর পর থেকেই সুধীরবাবু ধাপে ধাপে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে থাকেন।

এর পর লাগলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এ সময় ক্যারেটমোর 'এণ্ড কোম্পানীর সব সাহেবই বিলেত চলে যায়। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সম্মুখে চায়ের ব্যবসার সমস্তদিক শেখবার সুযোগ এসে গেল এ সময়। শ্রীচট্টোপাধ্যায় এ সুযোগ গ্রহণ করতে এতটুকু বিলম্ব করলেন না।

তিনি কর্ম্মী মানুষ। কাজ যখন তাঁর দ্বারে এসে উপস্থিত হলো, তিনি তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে Tea marketএর সব গূঢ়তত্ত্ব আয়ত্ত করে নিলেন নিজের কর্ম্মদক্ষতায়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের জীবনে আবার নতুন সমস্যা দেখা দিল। এ সময় কোম্পানীর বড় সাহেব অবসর গ্রহণ করলেন। যিনি নতুন বড় সাহেব হ'য়ে এলেন তিনি শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের কমিশনের হার কমিয়ে দিলেন। এই কমিশন হ্রাস করার প্রতিবাদে সুধীর বাবু Resign করলেন। এ সময় থেকেই শ্রীচট্টোপাধ্যায় সুরু করলেন স্বাধীন ভাবে চা ব্যবসা অর্থাৎ চা'য়ের দালালী এবং বামার লরীর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। ক্রমে তিনি নিজ কর্ম্মদক্ষতায়, সততা ও অধ্যবসায়ের গুণে এবং তদানীন্তন ইণ্ডিয়ান টি মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মিঃ জি, এ, রেনীর প্রচেষ্টায় ক্যালকাটা টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশনের রেজিষ্টার্ড ব্রোকার হিসেবে প্রবেশ করেন। রেজিষ্টার্ড ব্রোকার হলেন বটে কিন্তু সুধীরবাবুর পথ সুগম হ'লো না। এখানেও নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হ'তে হলো। সে সময় চায়ের বাজারে কোন বাঙ্গালী ব্রোকারকে সাহায্য ক'রবার জন্য কেউ প্রস্তুত হ'লো না। কেন না, তখন পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী 'Registered Broker' হিসেবে সুপরিচিত ছিল না। ইউরোপীয়ান ব্যবসায়ীদের চায়ের বাজার একচেটিয়া ছিল। তাই সুধীর বাবুকে সংগ্রাম করতে হ'য়েছে এদিক দিয়েও। এ সময়ে পি, সি, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোম্পানীর শ্রীপরেশ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের বাগানের চা দিয়ে সুধীর বাবুকে সাহায্য করেন এবং এ বাগানের চা সম্বল করেই তিনি প্রথম 'ক্যাটালগ' প্রকাশ করেন। এর পর থেকেই ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকটি বাগান সুধীর বাবুকে তাঁদের ব্রোকার নিযুক্ত করলেন শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় পেয়ে। ২০ বৎসর কাল চায়ের বাজারে সুধীর বাবু অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর চা Testing সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তার প্রধান কারণ, সাহেবরা কেবল তাদের ভেতরেই টেষ্টিং Monopoly করে রেখেছিল। শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে উহা শেখবার সুযোগ প্রদান করে নাই। এ সম্পর্কে সুধীরবাবু নিজেই বলছেন, "চায়ের Testing সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকলে কোন চা ব্যবসায়ীই সফলতা লাভ করতে পারেন না। এজন্য ১১৪৭ সালের ৫ই মে আমাকে লণ্ডন যেতে হলো এবং লণ্ডন থেকে একজন Tea Testing সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোক নিয়ে আসতে হলো। এ ভদ্রলোকের নাম মিঃ ভি, এন, সিনক্লেয়ার। সুধীর চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী মিঃ সিন ক্লেয়ারকে প্রথম ডিরেক্টার করে নিয়ে আসেন। এবং সুধীরবাবুও চা Testing-এ একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে সততা, অধ্যবসায় ও কর্ম্মদক্ষতার গুণে আজ চা ব্যবসায় ক্ষেত্রে এস, চ্যাটার্জী এণ্ড কোম্পানী অন্যতম শ্রেষ্ঠ চা ব্যবসায়ী বলে সুপরিচিত। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর এ প্রতিষ্ঠানটি আজ গর্ব্বের বস্তু। ১৯৫২ সালে কোম্পানীর সুনাম ও কর্ম্মদক্ষতায় আকৃষ্ট হয়ে বামার লরী এণ্ড কোম্পানী তাঁদের দু'খানা চা বাগানের চা বিক্রয়ের ভার সুধীর চ্যাটার্জী এণ্ড কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করেন। তারপর সুধীরবাবু ১৯৫৫ সালে পুনরায় বিলেত যান এবং ফিরে আসেন কয়েকটি ইউরোপীয়ান কোম্পানীর চা বাগানের চা বিক্রয় করবার ভার নিয়ে। বর্ত্তমানে সুধীর বাবু ইউরোপীয়ান ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত এবং চা ব্যবসার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সুধীর চট্টোপাধ্যায়

সুধীরবাবু জীবনে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও জীবনে তাঁকে বহু সংগ্রাম করতে হ'য়েছে; তাঁর বাবা-মা ছেলে বেলাতেই মারা যান। বড় হ'বার একটা উদগ্র কামনা ছেলেবেলা থেকেই ছিল এবং সেই ইঙ্গিত লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যে তিনি নিরলস ভাবে কর্ম্ম করে গেছেন। জীবনের চলার পথে কোন বাধা বিঘ্নই তাঁকে কর্ম্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তাই এ কর্ম্মযোগী আজ উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হ'য়েছেন। বহু বাঙ্গালী তাঁর প্রতিষ্ঠানে কার্য্য করে তাদের পরিবার পালন করছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য—তিনি বাঙ্গালীকে সাহায্য করবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ!

বহুবার বিলেত গেলেও ব্যক্তিগত জীবনে সুধীর বাবু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাঁর কলকাতার বাড়ীতে প্রত্যহ নারায়ণ সেবা হয় এবং প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার তিনি নিয়মিত ভাবে কালীঘাটে কালীমায়ের দর্শন করে দানধ্যান করেন.

শ্রীচট্টোপাধ্যায় বহু সাংস্কৃতিক ও ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন এবং নিয়মিত ভাবে অর্থ সাহায্য করেন!

আজও তিনি নিরলস ভাবে কর্ম্ম করে চলেছেন। বিভিন্ন চা বাগানের মালিকদের কি ভাবে বাগানের চা উন্নততর করা সম্ভব তৎসম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে আসছেন। তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ইউরোপীয়ান কোম্পানীর মালিকেরাও চা বাগানের মালিকদের চায়ের উন্নতি সম্পর্কে পরামর্শ দিতে আরম্ভ করেছেন।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় দীর্ঘজীবন লাভ করে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা দেশের মুখোজ্জ্বল করুন, এই প্রার্থনাই আমরা ভগবানকে জানাই।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ

[উড়িষ্যা-নিবাসী বিশিষ্ট আইনজীবী]

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে যে স্বল্প-সংখ্যক বাঙ্গালী তদানীন্তন বৃহত্তর বঙ্গের অন্যতম অংশ উড়িষ্যায় নিজ কর্ম্মক্ষেত্র গঠন ও উহার ভবিষ্যৎ রূপায়ণে সাহায্য করেন,

এ্যাডভোকেট শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ তন্মধ্যে অন্যতম। তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রথমভাগেই (১৯১১ সালে) বৃহত্তর-বঙ্গ হইতে বিছিন্ন হইয়া "বিহার-উড়িষ্যা" পৃথক প্রদেশরূপে গঠিত হইলে— উড়িয়াভাষাভাষীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি প্রভৃতি পরিবর্দ্ধনের জন্য একটি পৃথক প্রদেশ গঠিত হওয়া এবং উহার নবগঠনে উড়িয়া ও বাঙ্গালী বাসিন্দাদের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা ও মিলনাত্মক সৌহার্দ্দ্য দৃঢ়তর হওয়া উচিত ইহা তিনি খুবই অনুভব করিতেন। তাই যখন ১৯৩৭ সালে পৃথক "উড়িষ্যা-প্রদেশ" সৃষ্ট হয়, তখন উপেন্দ্রনাথ সানন্দে উহা গ্রহণ করেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার শিকড়া-কুলীন গ্রামে ৺জানকীনাথ ঘোষের তৃতীয় পুত্র উপেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন। ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত স্বগ্রাম হইতে ছয় বৎসর বয়সে তিনি আঁড়িয়াদহে আসেন এবং স্থানীয় উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে ১৮৯৪ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৮ সালে ইংরাজীতে অনার্স সহ হুগলী কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া রিপণ 'ল' কলেজে ভর্ত্তি হন। সেই সময় তিনি Executive Service পরীক্ষা দিবার মানসে জনৈক ইংরাজ-শাসকের নিকট অশ্বারোহণের সার্টিফিকেট প্রার্থী হন। নানারূপ অছিলায় প্রত্যাখান হইলে তিনি কটকের শাসক স্যার কে, জি, গুপ্তের জামাতা সিভিলিয়ান বি, সি, সেনের নিকট হইতে উক্ত সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। তথাপি বাংলা সরকারের তৎকালীন আণ্ডার-সেক্রেটারী (হোম) মিঃ ষ্টিফেনসন (পরে বিহারের লাটসাহেব) তাঁহাকে পরীক্ষার লিখিত অনুমতি দেন নাই। পরে অনুসন্ধানে জানা যায় যে, দেশীয় সিভিলিয়ান প্রদত্ত সার্টিফিকেট উপেন্দ্রনাথের পক্ষে 'অপরাধ' স্বরূপ হইয়াছে। সরকারী চাকুরীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি তখন আইনের শেষ-পরীক্ষা দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন এবং পরবৎসর সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল পরে ভাগ্যান্বেষণে তিনি কটক সহরে আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। সেস্থানে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় তাঁহার শ্বশুর বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীহেমচন্দ্র দে সরকারের 'জুনিয়ার' হিসাবে বালেশ্বরে উপস্থিত হন এবং স্থায়িভাবে সেখানে বসবাস করিতে থাকেন।

উপেন্দ্রনাথ ঘোষ

এইস্থানে তিনি বহু মামলা পরিচালনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমজীবনে দুইটি বিখ্যাত মামলায় তিনি আসামী পক্ষ সমর্থন করেন এবং তজ্জন্য ইংরাজ শাসকদের বিরাগভাজন হন।

প্রথমটিতে, চিত্তপ্রিয় ও 'বাঘ যতীনের' অন্যতম সঙ্গীদ্বয় বুড়াবালঙ নদীর নিকট চাষখণ্ড গ্রামে ধৃত নীরেন (১৯) ও মনোরঞ্জনের (১৮) মামলায় সরকারী ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া ট্রাইবুন্যালে জাতীয়তাবাদী উপেন্দ্রনাথ আসামীপক্ষ সমর্থন করেন। উহার চেয়ারম্যান ম্যাকফারসন্ ও কাউন্সেল মানফ সাহেবদ্বয় তাঁহার উপস্থাপিত বক্তব্যের উচ্চ-প্রশংসা করেন কিন্তু বিপ্লবীদলের সদস্য বলিয়া দুইটি বালকের ফাঁসীর দণ্ড রোধ না হওয়ার ব্যথা আজও উপেন্দ্রনাথ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন। উক্ত মামলায় কলিকাতার ব্যারিষ্টার (কলিকাতা পৌরসভার ভূতপূর্ব্ব মেয়র) স্বর্গীয় নিশীথ সেন (শ্রদ্ধেয়া কবি কামিনী রায় মহোদয়ার অনুজ) পরে যোগদান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়টিতে, উপেন্দ্রনাথ কনিকার রাজা এবং ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকর্ম্মী (বর্ত্তমানে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী) ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাবের পক্ষাবলম্বন করেন এবং তাঁহাকে সসম্মানে মুক্ত করিতে সক্ষম হন।

পাটনা হাইকোর্টে বিচারপতি থাকাকালীন ফজল আলী সাহেব (বর্ত্তমানে আসামের গভর্ণর) নিম্ন-আদালতের কয়েকটি মামলায় উপেন্দ্রনাথের উপস্থাপিত বক্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কর্ম্মদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ উপেন্দ্রনাথকে নিখিল-উড়িষ্যা আইনজীবী সম্মেলনে সভাপতি পদে বৃত করা হয় এবং উহাতে তাঁহার প্রদত্ত ভাষণ সরকারী ও বে-সরকারী মহলে উচ্চ-প্রশংসিত হয়। গত ১৯৫৩ সালে তাঁহার আইন ব্যবসায়ের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ত্তি হিসাবে উড়িষ্যার আইনজীবিরা সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব পালন করেন।

আইনব্যবসায়ে প্রভূত বিত্ত অর্জ্জন করা সত্ত্বেও সরলপ্রাণ উপেন্দ্রনাথ সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত রহিয়াছেন। তাঁহার গোপনদানে বহু গরীব ছাত্র আজও বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে। দৃঢ়চেতা, সঙ্কল্পনিষ্ঠ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ উপেন্দ্রনাথ মনে করেন যে অগাধ ভগবৎবিশ্বাস ও একাগ্র-সাধনা মানবজীবনে উন্নতির মূল সোপান। তাঁহার অমায়িক ও সুমধুর ব্যবহারে সাধারণ লোক মুগ্ধ। নানাকর্ম্মে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও স্বগ্রামের কথা তাঁহার মনে সদাজাগরূক রহিয়াছে এবং বৎসরে কয়েক বার সেখানে আসিয়া থাকেন।

শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ

[জনপ্রিয় সংবাদপত্রসেবী]
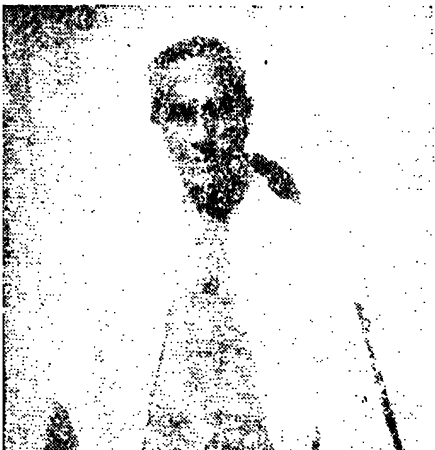
কার যশ হরণ করে জেলাটার নাম যশোহর হয়েছিল জানি না, তবে যশোহরের রক্ত বুকে নিয়ে বাঙলার অসংখ্য সন্তান নিজেদের করে তুলেছিলেন যশস্বী; তার সাক্ষী দেবে ইতিহাস। যশোহরের কোন এক গ্রামের সম্ভ্রান্ত ঘোষ পরিবারের এক বধূ ছিলেন, নাম ছিল যাঁর অমৃতময়ী। এই অমৃতময়ীর নামানুসারে গ্রামটির নাম বদলে রাখা হ'ল অমৃতবাজার। অমৃতবাজারের ঘোষবংশে দেখা

দিলেন বসন্তকুমার, হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার, মতিলাল, গোলাপ, প্রমুখ ভ্রাতৃবর্গ। এখান থেকেই প্রকাশিত হল অমৃতবাজার পত্রিকা। স্বনামধন্য সংবাদপত্র। সে আজ অনেক দিন আগের কথা।

হেমন্তকুমারের পৌত্র সুকমলকান্তি। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তাঁর জন্ম। বছর দশ বারো যখন বয়েস ঠিক এই সময়ে ইনি এঁর বাবা পরিমলকান্তি ঘোষকে হারালেন চিরদিনের জন্যে। টাউন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তে থাকেন সুকমল। এখান থেকে পাশ করেন বি, এ। এর পর আইন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলেন সুকমল। ছেড়েও দিলেন। সংবাদপত্রের পরিবেশে ছেলেবেলা থেকে গড়ে উঠেছেন সুকমল। তাই ছেলেবেলা থেকেই অনুভব করেছেন এরই হাতছানি প্রতিটি মুহূর্তে। ছেড়ে দিলেন আইন পড়া। অর্থনীতিতে এম-এ পড়তে পড়তে সেখানেও মধ্যপথে হ'ল ইতি। কর্মজীবনে প্রবেশ করে প্রথমে অমৃতবাজারের ক্যানভাসারের কর্মভার গ্রহণ করলেন সুকমল। সেখানে তিনি ক্যানভাসার, অমৃতবাজারের স্বত্বাধিকারী গোষ্ঠীর কেউ নন ঠিক এই মনোভাবটি নিয়েই কাজে মন দিয়েছিলেন সুকমল। সেই জন্যেই নিখুঁতভাবে সমস্ত কার্যটি আয়ত্তে আনতে পেরেছিলেন। যেদিন প্রথম কর্মজগতে পা বাড়ালেন সেদিন অবর্ণনীয় আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তাঁর জ্যাঠামশাই স্বর্গীয় মৃণালকান্তি ঘোষ ও তাঁর ছোটকাকা শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের কাছ থেকে। সুকমলের জীবনের যাত্রাপথে এঁদের অনুপ্রেরণা এক অতি মূল্যবান পাথেয়। দেখতে দেখতে হল যুগান্তরের প্রতিষ্ঠা, প্রথম দিন থেকে আজ অবধি যুগান্তরকে সর্বতোভাবে ইনি করে চলেছেন সেবা। আজ দীর্ঘ দশ বছর ধরে ইনি পত্রিকা সিণ্ডিকেট নামক প্রতিষ্ঠানটির সেবায় মগ্ন। সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক আকাদামির নৃত্যনাট্য শাখার কর্মপরিষদের ইনি একজন সভ্য। কোপেনহাগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র সংহতির সাধারণ অধিবেশনে সুকমল ছিলেন প্রথম ভারতীয় প্রতিনিধি (১৯৫৫)। সেখানে এঁর আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল—'ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ডিপ্লোমা পরীক্ষায় 'সংবাদপত্র পরিচালনা' প্রসঙ্গে ইনি প্রশ্নপত্র রোটারি ক্লাবের সঙ্গেও ইনি রচনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। যুগান্তরের প্রথম দিনটি সম্বন্ধে বলেন কেন অমৃতবাজারের ছেলে হয়ে আমি যুগান্তরে এত গভীরভাবে প্রবেশ করলুম জানো বলে যে ঘটনা তিনি বিবৃত করলেন তা এই প্রথম যখন যুগান্তর জন্ম নিল তখন তাকে লালন-পালন করতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সেদিন প্রত্যেকেই ছিলেন তরুণ। নতুন নতুন স্বপ্ন সেদিন তাঁদের চোখে, আশা ও আনন্দে ভরপুর তাঁদের হৃদয়, উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ তাঁদের অন্তর, তারুণ্যের এই অভাবনীয় সমাবেশ থেকে দূরে সরে থাকতে পারলেন না সুকমল। নিজেকে
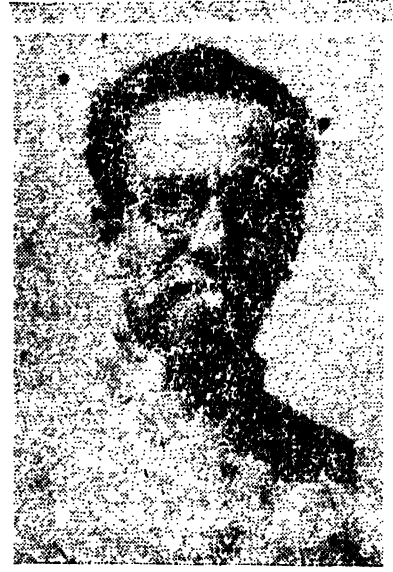
সুকমলকান্তি ঘোষ

মিশিয়ে দিলেন এর স্রোতে। সর্বান্তঃকরণে অগ্রগমনের প্রেরণা জাগালেন তুষারকান্তি ঘোষ। শ্রীঘোষের মতে আজকে ভারতে যে পরিমাণে জনবৃদ্ধি হচ্ছে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারটুকু করতে পারছেন না আজকের ব্যবসাজগত।

সমগ্র ইয়োরোপ পরিভ্রমণ করেও সুকমলকান্তির মন ভরপুর জাপানের স্মৃতিতে। এশীয় সৌন্দর্যবোধের উদাহরণ জাপান, বঙ্গভূমির সঙ্গে জাপভূমির মিল নানা জায়গায়। তাদের জুতো খোলায়, মাদুর বিছিয়ে শোয়ায়, মন্দিরে অর্ঘস্বরূপ 'রৌপ্যমুদ্রা ছোঁড়ায় ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে বাঙালীর সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য বিদ্যমান। জাপানে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিখতে হয় সংবাদপত্র মুদ্রণ ও পরিচালনা কি করে হয়? সেখানে দীপশলাকা কখনও পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না, যে কোন জায়গায় তা পাওয়া যায় বিনামূল্যে। ছোট্ট বস্তু, অথচ কি অপূর্ব শিল্পকার্য তার গায়ে, রঙ ও রেখার অভিনব রূপায়ণ সুদূর দেশে ঘোষণা করে চলেছে ও কাকুমার দেশে সেই নাম-না-জানা শিল্পীদের কৃতিত্ব। জাপানের বুকে যত রঙ্গমঞ্চ, চিত্রগৃহ, পান্থশালা, নাইট ক্লাব শোভা পাচ্ছে—সংখ্যার দিক দিয়ে তার কাছে পৃথিবীর সেরা রূপপুরী প্যারীও পরাজিতা।

জাপানকে কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়েছিলেন দুজন বিরাট বাঙালী। সেই মহান্ সন্তানদের মধ্যে আজ একজন মৃত্যুর আনন্দময় বক্ষে নিদ্রামগ্ন আর একজন কোথায় সব আজ সারা বিশ্বেরই জিজ্ঞাস্য। আজও জাপান তাঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করে চলেছে। তাঁদের প্রতি তাদের গভীর অনুরাগ পরিলক্ষণীয়! সেই দু'জন আর কেউই নন—তাঁরা হচ্ছেন বন্দিত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও বিসর্গিত জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসু।

উদয়ভানু

রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘদিন এখন শেষের দিকে।

তবুও এখনও ডুবন্ত সূর্য্যরশ্মির তর্জ্জনী এসে স্পর্শ করছে মুক্তদ্বার পাল্কীর ভেতরে, রাজকুমারীর ঠিক কপালটিতে। যেন এক মৃত মানুষের শান্ত কপাল। বিন্ধ্যবাসিনী মেঘ-মুলুকে চোখ মেলে বসে আছেন নির্জীব পাষাণের মত। দীর্ঘ আঁখি, কালো তারা দুটি যেন কৃষ্ণবর্ণ হীরার মত জ্বল-জ্বল করছে সূর্য্য-আলোয়। মিহি আর সূক্ষ্ম ভুরুর আশে-পাশে চাকা-চাকা কেশগুচ্ছ কাঁপছে। চৌধুরীগৃহ থেকে ফেরার পথে দু'জনের একজনও কথা বলেন না একটিও। পরিচারিকাও কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে আছে, জমিদারণীর মুখে আশাভঙ্গের ব্যর্থতা দেখে। পাল্কী এগিয়ে চলেছে মন্থর গতিতে। দু'পাশের মাট-ঘাট পিছিয়ে পড়ছে। দিন-শেষের সোনালী রোদ্দুর গাছের শাখাজাল ভেদ ক'রে রাজকুমারীর চোখে এসে পড়ছে বার বার, রাজকন্যা তাই চোখ বন্ধ করলেন। যেন ঘুমিয়ে পড়লেন ক্লান্ত চোখে।

গড়-মান্দারণের পথ-প্রান্তর বড়ই দুর্গম। খটখটে দিবালোকেই পথিকজন দল বেঁধে পথ চলে। একা কা'কেও দেখা যায় না। উপলখণ্ডে আকীর্ণ আঁকাবাঁকা পথের দুই ধারে শান্তিশঙ্কাহীন চৌর্য্যবৃত্তি উঁকি দেয় বনাঞ্চল থেকে। শুধু তাই নয়, হিংস্র জানোয়ারের উৎপাত কে এড়ায়? মারণ-উচাটন মন্ত্রের গুঞ্জন শোনা যায়; সিদ্ধাই উপাসনা করছে স্ত্রীশবের বুকে। হোমের আগুন জ্বলছে কোথায়, যেন আলেয়ার মত। পথপ্রান্তে তৃণশয্যায় তাড়ির আড্ডা বসেছে। নেশার আনন্দে উৎফুল্ল ঝর্ণার মত অট্টহাসি হাসছে এখন থেকেই। পাল্কীবাহকদের পদশব্দে ভয়-পাওয়া শিয়াল লেজ উঁচিয়ে ছোটাছুটি করছে। আবছায়ায় দেখা যায়, ওদের নীলাভ চোখের কুটিলতা। স্পষ্ট হাসি যেন দস্যুরের তীক্ষ্ণদন্তে।

এক দমকা হাওয়ায় চোখ চাইলেন যেন বিন্ধ্যবাসিনী। খানিক দেখে দেখে বললেন,—ব্রাহ্মণি, পাল্কীর দুয়ারটা বন্ধ কর। সম্মুখে রাত্রি, ভুলে যাও কেন?

পরিচারিকা ভয়ার্ত্ত চোখ ফিরিয়ে বললে,—রাত্তির নয় রাজকুমারি, যেন কালরাত্তির!

একটা সজোর শ্বাস ফেলে বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—তা যাই হোক। জ্যোতিঃশাস্ত্র ঠিক আমার জানা নাই, ভবিষ্যৎ বলতে পারি না।

—আমি কিছু কিছু জানি।

পরিচারিকা বললে ভয়হীন কণ্ঠে। বললে,—চৌধুরী-গিন্নী সহজে রেহাই দেওয়ার পাত্রী নয় বৌ, তা তুমি দেখে নিও।

বক্ষটা যেন ধ্বক-ধ্বক করতে থাকে রাজকন্যার। পাল্কীর দেওয়ালগায়ে গা এলিয়ে বসেছিলেন বিন্ধ্যবাসিনী, ধীরে ধীরে উঠালেন উর্দ্ধদেহ। পরিচারিকার একটি হাত ধ'রলেন নিজের হাতে। আবার এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মৃদুকণ্ঠে,—এখন কি উপায় ব্রাহ্মণি? কি করি, কোথায় যাই?

যশোদা ফিসফিসিয়ে বললে,—দেখে নিও বৌ, চৌধুরী-গিন্নী ঠিক নবাবের কোতোয়ালে জানিয়ে দেবে। মাগীর চোখে আমি পতিহিংসার (প্রতিহিংসা) চাউনি দেখেছি।

পাল্কীর মধ্যে এখন প্রায় অন্ধকার। দ্বার রুদ্ধ। বাহকরা এগিয়ে চলেছে হনহনিয়ে। সঙ্গে ক'জন পাইক আছে। একজন মশালচি আছে। আঁধার আরও ঘনীভূত হওয়ার পর মশাল জ্বলবে তখন।

তস্করের দল ছড়িয়ে আছে এখানে-সেখানে। কচুবনের আড়ালে আড়ালে ব'সে আছে উবু হয়ে। মুখে আর দেহে কালো ভুশো মেখেছে। ওৎ পেতে ব'সে আছে, যদি মিলে যায় এক-আধ জন সঙ্গিহীন মানুষ।

এক চলমান জনপিণ্ড আসছে, তাই দেখে আর দেখা দেয় না কেউ। দলে ভারী, সেই ভয়ে। পাল্কীর বাহকরা, পাইক, মশালচি, জোড়া জোড়া অদৃশ্য চোখের লোভার্ত্ত দৃষ্টি আছড়ে আছড়ে পড়ে পাল্কীতে। কে যায়? কোথায় যায় এমন অবেলায়? নক্সাকাটা পর্দ্দায় ঢাকা পাল্কীর অভ্যন্তরে অবশ্যই নারী আছেন কেউ। কোন একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা! কুমারী কিম্বা সধবা যদি হন, নানা অলঙ্কারে নিশ্চয়ই তিনি সুসজ্জিতা। ফসকে-যাওয়া শিকার হাতের নাগাল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, চোর আর ঠেঙ্গাড়ের দল মুখ লুকালো কচুবনের আড়ালে।

—আমি তো কোন' উপায় দেখি না বৌ!

পরিচারিকা অনেকক্ষণ পরে কথা বললে যেন আপনার মনে। বললে,—আমি তো দশ দিক অন্ধকার দেখছি।

—আমিও তাই যশোদা! বিন্ধ্যবাসিনী ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন—রক্ষা পাওয়া কঠিন।

চৌধুরীগৃহিণী প্রথমে কেঁদেছিলেন, ককিয়েছিলেন। মেয়ের দুঃখে অধীর হয়ে বুক-কপাল চাপড়েছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনীর পায়ে মাথাও খুঁড়েছিলেন। আনন্দকুমারীর নিরুদ্দেশের সঠিক কারণ শেষ পর্য্যন্ত জানতে না পাওয়ার পর শাসানির সুরে কথা বলেছিলেন। দশমহাবিদ্যার মত একেক বার এক এক মূর্ত্তি ধ'রেছিলেন যেন। শেষে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন,—আনন্দকে না পাওয়া যায় ক্ষতি নেই, জমিদার কেষ্টরামের স্ত্রী গুমখুন হবে! আমার লোক-লস্করের অভাব নেই, অর্থবলও সামান্য নয়। আমি নবাবের এজলাসে নালিশ পেশ করবো!

বিন্ধ্যবাসিনী প্রায় কম্পিতদেহে চৌধুরীগৃহ ত্যাগ ক'রে উঠে এসেছেন। কাঁপতে কাঁপতে পাল্কীতে উঠে সংজ্ঞাহীনের মত ব'সে পড়েছেন। চৌধুরাণীর ক্রোধের সুর কানে বাজে যখন-তখন। বাঘিনীর মত তাঁর রূপ যেন, মনে পড়লেও ভয় হয়।

—চল' বৌ, সাতগাঁয়ে ফিরে যাই আমরা।

পরিচারিকা খানিক ভাবনার পর বললে অনুরোধের সুরে।

মাথা দোলালেন রাজকুমারী। আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বললেন,—না তা হয় না যশোদা! আমি আর সাতগাঁয়ে ফিরবো না কোন দিন। জমিদারের সুখের বাধা হই কেন আর!

—এখানেই থাকবে তবে? মান্দারণে থাকতে সাহস হয় না আমার। পরিচারিকার ভয়ার্ত কণ্ঠ ফিস-ফিস করে পাল্কীর অন্দরে। বলে,—চৌধুরীগিন্নী সহজে নিস্তার দেবে না জেনো।

—মান্দারণ ত্যাগ করলেই কি পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, আমার তা মনে হয় না। বিন্ধ্যবাসিনী বললেন সন্দিগ্ধকণ্ঠে। কয়েক মুহূর্ত থেমে আবার বললেন,—এক চন্দ্রকান্ত ইচ্ছা করলে আমাদের রক্ষা করতে পারেন। তিনি এখন কোথায় কে জানে!

এক ঝলক তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটালো মুখে। হেসে হেসে যশোদা বললে,—চন্দ্রকান্ত আমাদের রক্ষে করবে! তেমন আশা আমি করি না। আনন্দকে হারিয়ে আর কি তিনি ফিরে তাকাবেন?

কথা বলতে বলতে পরিচারিকা পাল্কীর দুয়ার ঈষৎ সরিয়ে বাইরে চোখ মেললো। দিনের শুভ্রতা ঘুচে গেছে কখন। কালো আকাশে ক'টা তারা জ্বল-জ্বল করছে। ঝির-ঝির বাতাস বইছে। নারকেল গাছের পাতার আড়াল থেকে চাঁদের সোনালী উঁকি দেয়। উজানের নৌকার মত পাল্কী এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে।

হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজকুমারী। ভয়ের পথটুকু পেরিয়ে যেতে পারলে, ভগ্নদেউলে পৌঁছতে পারলে যেন স্বস্তি পাওয়া যায়। বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—ব্রাহ্মণি, আর কত দূর?

ইতি-উতি দেখলো যশোদা। ঘনান্ধকারে দৃষ্টি চালিয়ে দিয়ে বললে,—যেদিক তাকাই সেদিকেই আঁধার। পথ কি চেনা যায় বৌ!

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—আকাশে কি মেঘ জ'মেছে?

পরিচারিকা ঊর্দ্ধাকাশে চোখ তুললো। দেখে দেখে বললে,—উঁহু, আকাশে মেঘ কোথায়! জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে।

চোখের তারা স্থির হয়ে থাকে রাজকুমারীর। সাগ্রহে তিনি কি লক্ষ্য করছেন কে জানে। বললেন,—পথের ধারে এত আলো কেন নাচানাচি করছে? ভূত-প্রেত নয় তো?

যশোদা বললে,—তুমি আর হাসিও না বৌ! আলো নয়, শিয়ালের চোখ জ্বলছে অন্ধকারে। পাল্কী চলার শব্দ পেয়ে হয়তো ভয় পেয়েছে!

একেক জোড়া হলুদ-রঙ চোখ, আলোকবিন্দুর মত সত্যিই যেন নেচে নেচে উঠছে। জ্বলন্ত ক্ষুধার তাড়নায় শিকারের সন্ধান করছে। গেরস্থের মোরগ যদি মিলে যায় একটা। কিম্বা একটি ঘুমন্ত শিশু!

—চন্দ্রকান্তকে চাই, নচেৎ রক্ষা নাই আর। কেমন যেন আতঙ্কের সঙ্গে বললেন রাজকুমারী। এক-বুক শ্বাস টেনে নিয়ে বললেন,—তাঁকে আমাদের পক্ষে রাখতে হবে। সাক্ষী মানতে হবে। তাঁকে এখনই আমাদের চাই।

—এই রাতের বেলায় ব্রাহ্মণকে কোথায় পাবে তুমি? পরিচারিকার কথায় বিস্ময়। চোখে জিজ্ঞাসার চাউনি।

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—তুমি দয়া করলেই তাঁকে পাওয়া যায়।

বৈশাখ-রাত্রির ঝিরঝিরে হাওয়া চলেছে। গাছের পাতায় মর্মর ভেসে আসছে। শুষ্কপত্র উড়ছে বাতাসের সঙ্গে। পাল্কীর মুক্ত দ্বার, রাজকুমারীর ঘর্মাক্ত কপালে হাওয়ার স্পর্শ লাগে। তিনি আবার কথা বললেন,—মিথ্যা দোষারোপ কে মেনে নেয়! চুরি করলে একজন আর তার শাস্তিভোগ করবো আমরা?

—আমি কি করতে পারি বৌ? আমার দয়ার প্রত্যাশা কেন তাই শুনি? পরিচারিকার ভীতি-কাতর কণ্ঠ কেঁপে কেঁপে কথা বলে। বললে,—আমরা গরীব-গরবা, আমাদের আবার দয়া কোথা থেকে আসবে!

অল্প হাসলেন রাজকুমারী। শুষ্ক হাসি হেসে বললেন,—তুমি যদি কষ্ট কর', তবেই তাঁকে পাওয়া যায়।

—কি করতে হবে তাই বল'?

—আমাকে জমিদার-বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে তুই যা এই পাল্কীতে। বিন্ধ্যবাসিনী ফিস ফিস কথা বললেন, পরিচারিকার কানের কাছে মুখ এগিয়ে বললেন,—পাল্কীবেহারাদের পাঁচ দশ কড়ি বকশিস দিলেই—

কথা শেষ হয় না। যশোদা বললে,—তিনি যদি আমার কথায় না আসে?

হঠাৎ এক রাশ জোরালো বাতাস দাপাদাপি করতে করতে মাটির বুক থেকে আকাশের দিকে ছুটলো। সামুদ্রিক তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের মত হাওয়ার ঢেউ উঠলো। গাছের শাখা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুললো। নির্জ্জন প্রান্তর ধ'রে পাল্কীও ছুটেছে অনুকূল বাতাসের ধাক্কায়। মশালচির হাতের নতমুখী অগ্নিশিখা কাদের যেন প্রণাম করতে থাকে। মশালের আলো চ'লেছে সর্ব্বাগ্রে। বাঁশের লাঠি ঠুকতে ঠুকতে পাইক-পেয়াদা চলেছে মশালচির পেছনে। তারপর পাল্কী চলেছে। পাল্কীর শেষে আরও ক'জন পাইক।

বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ ছিলেন রাজকন্যা। কত শত চিন্তায় ডুবে ছিলেন যেন। নিজের কোমল বক্ষে হাত রাখলেন ক্ষণেক, স্পর্শে অনুভব করলেন হৃদয়ধ্বনি। ঘন ঘন বেজে চলেছে। শ্বাসের কষ্ট হয় বিন্ধ্যবাসিনীর। কি এক অস্বস্তির জ্বালায় থেকে থেকে অস্থৈর্য্য প্রকাশ পায়। কেমন যেন কষ্টের সঙ্গে কথা বললেন রাজকুমারী। অস্ফুট সুরে বললেন,—আমার নাম ল'য়ে বললে অমান্য করবেন না।

—সোনা-দানা আছে কিছু কাছে?

পরিচারিকা প্রশ্ন করলে যেন ডাকাতনীর মত। চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকলো। জ্যোৎস্নার আলোয় তার চোখের কালো তারা যেন উজ্জ্বল হয়ে আছে।

—আছে, অনামিকায় একটা অঙ্গুরী আছে। মুক্তাবসানো।

—হাত-ছাড়া করতে পারবে খুশী মনে?

—কেন? কি প্রয়োজনে?

—পাইক আর বেহারাদের দিতে হবে। নগদানগদি কিছু দিলেই কাজ হবে। কানা-কড়িতে ওদের মন উঠবে না।

—তা বটে। তোমার কথাই ঠিক।

কথা বলতে বলতে রাজকুমারী অনামিকার আঙটি খুললেন। যশোদার হাতে দিয়ে তার মুঠি বন্ধ ক'রে দিলেন। বললেন—আমাদের দেউলে পাল্কী পৌঁছেছে, তুমি যা বলার ওদের বল'। আমি ঘরে যাই।

—একা থাকতে তোমার ভয় হবে না বৌ? তুমিও চল না?

—পাল্কীতে একেই স্থানাভাব। আমি ঘরে ফিরি, একা থাকায় ভয় পাই না আমি। একাই তো আছি। খানিক থেমে আবার বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—দেখো, বিফল যাত্রা না হয়।

জমিদারগৃহের তোরণ-ফটক পেরিয়ে পাল্কী ততক্ষণে প্রবেশ-দ্বারের কাছে। পাল্কী নামাতেই বিদ্যুতের শিখার মত এক পলকের মধ্যে রাজকুমারী প্রায় ছুট দিয়ে চ'লে গেলেন যেন। যশোদা শুধু নামলো না। ব'সে থাকলো যেমনকার তেমনি! বললে,—চৌধুরী-গিন্নীর একটা হুকুম আছে। তামিল করতে হবে আমাকে।

পাইকরা শুধালো,—কি হুকুম?

যশোদা গম্ভীর স্বরে কথা বলে। কেমন যেন মান্যগণ্যের ঢঙে। বললে,—আসমান দীঘির ঐ তীরে পাল্কী নিয়ে যেতে হবে, চৌধুরী-গিন্নীর দু'টো গোপন কথা জানিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

—আমাদের গিন্নীমার হুকুম?

—হাঁ গো হাঁ। আনন্দকুমারীর সন্ধানে যাবো।

আর কিছু বলতে হয় না। আবার পাল্কী উঠলো আর চললো নতুন উদ্যমে। গায়ের ঘাম মোছার ফুরসৎ পায় না বাহকরা।

অন্দরের এক চোরা ঘুলঘুলি থেকে রাজকন্যা এক চোখে দেখলেন, পাল্কীখানা আবার চললো। আর দেখলেন প্রাঙ্গণে-প্রান্তরে জ্যোৎস্না থৈ-থৈ করছে। গাছের শীর্ষে শীর্ষে সোনার প্রলেপ। আকাশ থেকে যেন মুঠো মুঠো জ্যোৎস্না ঝরছে। চাঁদের ভস্ম পড়ছে সোনালী চিকণ তুলে।

রুদ্ধশ্বাসে সোপান-শ্রেণীতে উঠলেন বিন্ধ্যবাসিনী। ঘনকালো অন্ধকার, শুধুমাত্র পরিচয়ের ভরসায় নির্ভয়ে চললেন যেন। নিজের কক্ষে কোন রকমে পৌঁছানো, ততঃপর আর কোন ভয় নাই। ঘরের ভেতর থেকে অর্গল তুলে দিয়ে থাকলেই যথেষ্ট। রাজকুমারীও তাই ক'রলেন। উর্দ্ধ দেহের বস্ত্র আলগা করলেন। কক্ষলগ্ন দালান থেকে আমোদরকে দেখা যায়। নদীতে চোখ রেখে দাঁড়ালেন বিন্ধ্যবাসিনী। মুক্ত বাতাস আসছে নদীর বুক থেকে। ত্বালাহর ঠাণ্ডা বাতাস।

সোনার চাদর বিছানো নদীতে। চাঁদের আকর্ষণে কিছু যেন উচ্ছ্বসিত। লক্ষ লক্ষ বাহু মেলছে আকাশের দিকে। যৌবনের জোয়ার এসেছে যেন আমোদরের। তাই ডাকাডাকি করছে আকাশের চাঁদকে। জোয়ারের মত নদীর জল কেঁপে উঠেছে আজ। পূর্ণিমা যত নিকটে আসবে, ততই না কি উচ্ছ্বাস উদ্দাম হ'তে থাকবে। কুলকুল শব্দ গর্জ্জনের মত শোনাবে দূর থেকে। কাল-বোশেখীর ঝড়-জলে স্ফীতকায় হয়েছে যেন আমোদর। দূরে কাছে কোথায় হয়তো অশ্রান্ত বর্ষণ হয়েছে আজকাল।

যুঁই ফুলের গন্ধ আনে হাওয়া। আসমান দীঘির তীরে অজস্র যুঁই ফুটেছে সান্ধ্য বাতাসের চুম্বন স্পর্শে। কতকাল আগের এক মধুরাত মনের কোণে স্মৃতির রেখা তুললো। অচেনা অজানা অনাগত সেই রাত্রিটায় ভীষণ ভয় পেয়ে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন নাবালিকা কিশোরী বিন্ধ্যবাসিনী। বাসর-রাতের হাসি-ঠাট্টা সমঝাতে পারেননি তখন। কুলনারীদের পরিহাস বুঝবেন তেমন দক্ষতা নেই। অন্যের হাতের খেলার পুতুলের মত রাজকন্যা নিজেকে যেন বিকিয়ে দিয়েছিলেন। বেশ মনে পড়ে, বাসরশয্যায় যুঁই আর বেলফুলের ছড়াছড়ি। ঘরের কোণের জ্বলন্ত দীপশিখাটির মত সারা রাত জাগতে পারলেন না রাজকুমারী। ভোর-রাতে ঘুমে ডুবে গেলেন। যুঁইয়ের গন্ধ রাজকন্যার অঙ্গ থেকে যেতে কত কাল সময় লাগে।

কলসী থেকে এক ঘটি জল গড়ালেন বিন্ধ্যবাসিনী। মুখে-পায়ে জল দিলেন। আর এক পাত্র গড়ালেন। পান করলেন আকণ্ঠ। তারপর চকমকি ঘ'ষে দীপ ধরালেন। আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সকল কিছু চোখে পড়লো। প্রথমে দেখলেন, তুলট কাগজের রাশি, মসীপাত্র, লেখনীদণ্ড। চন্দ্রকান্তর দেওয়া সেই জরাজীর্ণ কীটদষ্ট পুঁথিখানি। মহাকাব্যের মূল লেখা আছে ঐ পুঁথিতে। একান্তই দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য।

পায়ের তলায় ভূমি কাঁপছে থেকে থেকে। ভয়ে আর ভাবনায় বুক কাঁপছে। অস্বস্তির কাঁটা বিঁধছে যেন বুকে। পালঙে বসলেন বিন্ধ্যবাসিনী! অবসন্নতায় শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হয় দেহ এলিয়ে দিয়ে। চিন্তা-জ্বরের জ্বালায় তাও যেন পারলেন না।

চৌধুরীকন্যা কোথায় এখন কে জানে! রাজকন্যার চোখে ভয়াবহ দৃশ্য ভাসতে থাকে। অত্যাচার আর উৎপীড়নের ছবি। আনন্দকুমারী এখন বিদেশীর কবলে। তার খেয়াল-খুশী চরিতার্থের সামগ্রী। চোরাই আর লুঠের মাল।

গঙ্গানদীর এক কিনারায়, এক ভাঙ্গা ঘাটে ম্যালেটের তরী নোঙর বেঁধেছে। তীরের একেবারে কাছাকাছি নয়, কিছু দূরে। হিংস্র জানোয়ারের ভয়। বিশেষতঃ বাঘের ভয়। ক্ষুধার জ্বালায় কত গহিনরাতে তীরলগ্ন নৌকার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ। ঘুমন্ত যাত্রী আর মাঝিদের দু'-একজনের ঘাড় কামড়ে ধ'রে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অন্ধকারে। ভোরের আলো ফুটলে দেখা যায়, রক্তধারা পথ সৃষ্টি ক'রেছে।

তাই আগেভাগেই সাবধান হয় ম্যালেট। বজরা আর তীরে ভিড়ায় না। তীরের জঙ্গল থেকে গর্জ্জন শোনা যায় বাঘের। ফেউয়ের আর্তনাদ ভাসে গঙ্গার ওপরে। ম্যালেটের তেলেঙ্গী সিপাইরা বন্দুক ধ'রে বসে আছে বজরার ছাদে। বাঘ আবার সাঁতরাতে পারে না কি! গভীর জল সাঁতরে নৌকা আক্রমণ করে অতর্কিতে। শিকার ধ'রে নিয়ে সাঁতরে পালায়। জল থেকে ডাঙ্গায় ওঠে, মুখে থাকে আধমরা মানুষ।

বাঘের গর্জ্জনে ভীতা আনন্দকুমারী। ম্যালেটকে জড়িয়ে ধ'রে আছে সজোরে। ম্যালেট তো হেসেই খুন কৃষ্ণকন্যার ভয় পাওয়া দেখে। নদীর এক প্রান্তে হাসির প্রতিধ্বনি ভাসিয়ে অট্টহাসি হাসছে ম্যালেট। তার হাসির চাঞ্চল্যে বজরা দুলে দুলে উঠছে।

[৩৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বিচিত্র-ভ্রমণ

জ্ঞানাঞ্জন পাল

লোকমান্য তিলকের সঙ্গে বম্বের এক হোটেলে এক সকালে জেগে উঠি। সেটা মনে হয়েছে এক সৌভাগ্যের সকাল, সত্যিকারের সুপ্রভাত! হোটেলটা অবশ্য কারণ নয়, সাধারণ মাঝারি হোটেল; বম্বে শহরের জন্যও সৌভাগ্য নয়। শেঠ নই, বম্বে শহর অর্থপূর্ণ আকর্ষণে কখনো টানেনি। ঐ অঞ্চলে পুণাই মনকে বেশী নাড়া দিয়েছে। এই যুগের মারাঠিদের কর্ম্মের সাধনা পুণাকেই ঘিরে ঘন হয়ে গড়ে উঠেছে। রাণাডে, গোখলে, তিলক পুণারই লোক। আর লোকমান্য তিলকের অতিথি হয়ে বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে আমরা এই হোটেলে এসে উঠেছি। আমরা বম্বে পৌঁছি আগের দিন দুপুরে। তিলক আসেন রাত্রে। পরের দিন সকালে তিলক বাবা ও মাকে (এবার মা-ও সঙ্গে ছিলেন) অভিবাদন জানাতে আমাদের ঘরে আসেন। আমি তিলককে প্রণাম করি। সুপ্রভাত নয় কি?

হোটেলটি বিশেষ করে মারাঠিদের নাম 'সর্দ্দার-গৃহ'। মারাঠি অবস্থাপন্ন যাঁরা—অর্থাৎ জমিজমা যাঁদের আছে তাঁদের বোধ হয় গৌরবে সর্দ্দার বলে। এই রকম অভিজাতদের জন্যই যে প্রধানতঃ এই হোটেল, নামেই বোধ হয় তা বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। বম্বে শহরের সম্পদে মারাঠিদের ভাগ খুব বেশী দেখিনি। সেটা ভোগ করেন পার্শীরা, খোজা সম্প্রদায় ও গুজরাটীরা। ধর্ম্মে হলেও বৃত্তিতে এঁরা সব বণিক। মারাঠিরা মনোবৃত্তিতেও বণিক নন। কাজে-কর্ম্মে বম্বে শহরে মারাঠিরা যাঁরা থাকেন, সাধারণ ভাবেই তাঁরা প্রায় থাকেন। এমন কি, দেশপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী এম. আর জয়কারের বম্বের বাড়ীতেও বিভবের আতিশয্য দেখিনি। যাঁদের বম্বে শহরে আসতে হয় মাঝে মাঝে তাঁরা অনেকে সস্ত্রীক 'সর্দ্দার গৃহে'ই ওঠেন। এটা অনেকটা পারিবারিক হোষ্টেলের মত। কিন্তু এর আসল আভিজাত্য তিলক এখানে ওঠেন ব'লে।

তিলক বাবাকে নিয়ে সকালেই এক আলোচনায় বসলেন। তিলকের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মী নরসিংহ চিন্তামণি কেলকার আছেন—আরও অনেকে। আলোচনার জরুরী প্রয়োজন ছিল। সময়টা ১৯১৮ সালের প্রথম দিকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখনো থামেনি, তবে থামবার মুখে। তিলক সদলে ভয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও এই সময়েই বিলাত যাবেন স্থির করেছেন। সেই দলে আছেন—নরসিংহ চিন্তামণি কেলকার, দাদাসাহেব গণেশ, শ্রীকৃষ্ণ খাপার্দে, বলবন্ত গঙ্গাধর তিলক নিজে ও বিপিনচন্দ্র পাল। বাহিরের দিক থেকে প্রয়োজন—ভ্যালেনটাইন চিরল তাঁর "Indian Unrest" বইয়ে তিলকের রাষ্ট্র-জীবনকে যে হেয় করতে চেষ্টা করেছেন তার বিরুদ্ধে চিরলের নামে বিলাতে মানহানির মামলা রুজু করা। এটা নিতান্তই বাহিরের প্রয়োজন। আমার মত যুবকের মনে হয়েছিল, তুচ্ছও বটে। বিদেশী শত্রুপক্ষের নিন্দা সব সময়েই দেশসেবকের অঙ্গের ভূষণ। তার জন্য দেশের এতগুলি মাথার মণিকে নিয়ে লড়াইয়ের বিপদের মাঝে সমুদ্রপাড়ি দেবার কি এমন প্রয়োজন? কিন্তু এসময়েই বিলাত যাওয়ার আসল প্রয়োজন দেশের জন্য—তিলকের নিজের জন্য বা তাঁর দলের জন্যও নয়।

প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা; একটু খুলে বললে বোধ হয় ভাল বোঝা যাবে। ১৯১৪ সালের দুনিয়া-জোড় লড়াইয়ে ইংরেজের অবস্থা এক সময় বেশ সঙ্গিন হয়ে উঠে। তখন তাঁরা ভারতের সম্পূর্ণ আত্মশাসনের আকাঙ্ক্ষা যে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত থেকেও সফল হ'তে পারে, আর আস্তে আস্তে এই লক্ষ্যে পৌছিতে যে তাঁরা সহায়ও হ'তে পারেন—এমন কথা এক রকম স্পষ্ট করেই বলেন। মার্কিণপতি উডরো উইলসনের চোদ্দ দফার বিখ্যাত বাণী প্রায় এই সময়েই প্রচারিত হয়। তাতেও আমাদের মত পরাধীন জাতিদের অনেক আশার কথা শোনান হয়। যুদ্ধটা পুরোপুরি থামার আগেই ভারতের আত্মশাসন সম্বন্ধে পাকাপাকি প্রতিশ্রুতি যদি ইংরেজের কাছ থেকে আদায় করা যায়, তারই জন্য তিলক সহকর্মীদের নিয়ে বিপদের মাঝেও বিলাত যাওয়ার সংকল্প করেছেন।

তিলককে ইংরেজ বোঝেনি—তিলকের চরিতচিত্র আঁকবার সময় বিপিনচন্দ্র একথা বলেছেন। কথাটা হয়ত ঠিকই। আমাদের সময়ে দেখেছি—ইংরেজ এদেশের লোককে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। এক ভাগ, যাদের দ্বারা তাদের কোনো স্বার্থসিদ্ধি হয় বা হ'তে পারে; আর এক ভাগ, যারা তাদের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইংরেজের স্বার্থের সহায় তিলক কখনো হ'তে পারেননি। তাই তিলককে এত অপবাদে তাঁরা ভূষিত করেছে। তিলককে ইংরেজ বুঝতে না পারলেও তিলক কিন্তু ইংরেজের প্রকৃতি ভালই বুঝেছিলেন। তিনি জানতেন, যুদ্ধের চাপে ইংরেজের মুখে যে সদিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে, যুদ্ধ থেমে গেলে—আর ইংরেজ যদি তখন জয়ীর কোঠাতে থাকে—তা আর বাস্তবে পরিণত হবে না। সেজন্য যুদ্ধ থামবার আগেই একটা ফয়সালার চেষ্টা করা দরকার।

কিন্তু কেবল বিলাতে গেলেও হবে না। ইংলণ্ড ও আমেরিকা তখন, কতকটা এখানেরই মত প্রায় একজোটে বাঁধা। আমেরিকায় কাউকে পাঠান যায় না? সে আলোচনাই তিলক, বিপিনচন্দ্র ও কেলকার করছিলেন, একসঙ্গে হয়েই সকালবেলা "সর্দার-গৃহে"র এক ঘরে বসে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে। একটু পরে বেরিয়ে এলেন বিপিনচন্দ্র তাঁর ঘরের দিকে; ডাকলেন আমাকে। আমাদের প্রায় পিছন পিছন দেখি একটা নতুন টাইপরাইটার যন্ত্রও এলো আমাদের ঘরে; সঙ্গে যাবে ব'লে সবে কেনা হয়েছে। আমায় বললেন—মেসিনে বসো, একটা চিঠি লিখতে হবে। চিন্তায় গম্ভীর মুখ। চিঠিটা যাবে তিলকের নামে—রবীন্দ্রনাথের কাছে। যে চিঠিটা বিপিনচন্দ্র বলে গেলেন ও আমায় টাইপ করতে হলো, তার মর্ম্মটা এই—"রবীন্দ্রনাথ যদি আমেরিকায় এখন যান, রাজনীতিক কোন দলের পক্ষে নয়, রাজনীতিক কোনো কাজেও প্রত্যক্ষ ভাবে নয়। ভারতের সাধনা তাঁর বাণীতেই এ যুগে সব চেয়ে বেশী মূর্ত হয়েছে। সেই সাধনার কথা যদি মার্কিণের সমাজের কাছে তিনি নতুন করে বলেন ও সারা দুনিয়ায় যদি সেটা প্রচারিত হয়, ত ভারতের আত্মশাসনের সম্ভাবনা বা যুদ্ধের গতিতে জেগে উঠেছে তা অনেকটা শক্তি পেতে পারে। নেবেন কি তিনি এ ভার?" তাঁর পাথেয় ও খরচের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠাবার ব্যবস্থাও তিলক করলেন। বম্বের একজন ধনী পার্শী তিলকের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। নাম তাঁর এস. আর. বোমানজি। এই চিঠি ও এই টাকা নগদ রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেবার ভার তিলক দিলেন তাঁর উপর। তিলকের নির্দ্দেশ এই চিঠি ও টাকা নিয়ে বোমানজি যেন সেই রাত্রেই কলিকাতা রওনা হন। রবীন্দ্রনাথ তিলককে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু রাজনৈতিক

উদ্দেশ্য পেছনে রেখে রাজনীতিক কাজের জন্য সাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থে তিনি আমেরিকা যেতে রাজী হলেন না।

ভারতের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসাবে এ সময় রবীন্দ্রনাথ মার্কিণে গেলে ভাল হয়, এ কল্পনা আমার মনে হয়েছে, বিপিনচন্দ্রের তিলকের নয়। একটু ভাবলে মনে হবে এটা কল্পনাই। আর কল্পনা বাঙ্গালীর সহজাত, মারাঠির নয়। স্বদেশীর নতুন প্রবাহ যাঁরা বাংলায় ও ভারতে এনেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। স্বদেশপ্রেমের বান আমাদের জীবনের মরা গাঙে এসেছিল ১৯০৫-৬ সালে, সত্য; কিন্তু সে বান ১৯১৬-১৭ সালে অনেকখানি নেমে গেছে। ইংরেজের নির্মম নিষ্পেষণে ও আমাদের অদক্ষতায় সে স্রোত তখন প্রায় রুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিলক প্রমুখের নতুন রাজনীতির সম্বন্ধও অনেকটা ছিন্ন হয়ে গেছে। এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষ ভাবেও যে এরকম কোন কাজের সঙ্গে যুক্ত হ'তে চাইবেন না, এটা স্বাভাবিক।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তিলকের এই চিঠি ও এত টাকা অবলীলাক্রমে রবীন্দ্রনাথকে পাঠানোর মধ্যে যে মহত্ত্ব দেখা যায় তা স্মরণীয়। তখনকার দিনে রাজনীতিতে বড় অঙ্কের টাকা এখনকার মত সহজে আসত না। রবীন্দ্রনাথ এই টাকা গ্রহণ করলেও তা দিয়ে ভারতের সাধনা বাহিরে নতুন করে প্রতিষ্ঠা পেলেও তিলকের নাম তার সঙ্গে যুক্ত হত না। তিলকের এই চিঠি ও টাকার কথা সম্পূর্ণ অজানা থাকবে সাধারণের এই ছিল নির্দেশ। ভারতের এই সর্বজনমান্য লোকনায়ক পদ, প্রতিষ্ঠা, অর্থ সম্বন্ধে এমনই নিস্পৃহ ছিলেন। মনে হয়, এ যেন কোন অনাসক্ত সাধুর জীবনের এক কাহিনী। অথচ তিলক সাধুসন্তদের মত কৃচ্ছ্রসাধন করে এ অনাসক্তি অর্জন করেছিলেন, শুনিনি। দেশসেবা কেবল তিলককে নয়, তাঁর সহকর্মী অনেককেও এভাবে সহজ ত্যাগী হতে শিক্ষা দিয়েছিল। সত্য দেশসেবায় নাকি এরকমই হয়। কিন্তু তাই যদি হয় ত দেশের সেবায় আমরা এখন এত লোভাতুর ও প্রতিষ্ঠাপ্রিয় হয়ে উঠছি কি করে?

তিলক ও তাঁর সহকর্মীদের বোম্বাইয়ের মহিলা-সমাজ এক অভিনন্দন দেন। গুজরাটী এক বাণিজ্যপতির বাড়ীর সংলগ্ন উদ্যানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এই সভায় সব মহিলা তিলক, কেলকার, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ তার জন ও আমি ছাড়া। এরকম মহিলাদের সভা আগে দেখিনি। সভায় বেশী বক্তৃতাদি হয়েছিল বলে মনে নেই। পার্শী, গুজরাটী, মারাঠি মহিলাদের শ্রদ্ধার দান হিসাবে একটা বড় টাকার থলে লোকমান্য তিলকের হাতে দেবার জন্যই এই সভার আয়োজন। সভায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা গরীবের ঘরের মেয়ে বা বৌ একথা বলব না—ধনীগৃহেরই প্রায় সব গৃহিণী বা কন্যা, শিক্ষিতা ত বটেই, সুন্দরীও। কাউকে নতুন ভালবাসলে মেয়েদের সৌন্দর্য্য নাকি বেড়ে যায়। গোবিন্দদাস তাঁর এক বিখ্যাত কবিতায় রাধার রূপের গৌরব বর্ণনা করতে গিয়ে রাধা নবঅনুরাগিণী এ কথা বলেছেন। আমারও মনে হয়েছিল দেশের প্রতি নব অনুরাগে এই সব মহিলাদের রূপ এক নতুন শোভাতে খুলে গিয়েছিল। নহিলে এত সুন্দর তাঁদের লেগেছিল কি করে? সভা অল্প পরে ভাঙল। তিলক ও তাঁর সহকর্মীরা উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সব মেয়ে পরম আত্মীয়কে বিদায়ের মুখে স্বজনেরা যেমন ঘেরে, সে-রকম ঘিরে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলেন বেরুবার রাস্তার দিকে। মুস্কিল হ'ল আমার। যুবক বটে, কিন্তু এমন পৌরুষ সংগ্রহ করতে পারলাম না নিজের মনে, যাতে এই মহিলা-ব্যূহ ভেদ করে তিলক-বিপিনচন্দ্রের কাছে এগিয়ে যাই। বাহিরে গিয়ে তাঁরা আমার জন্য অপেক্ষা করবেন বা কোন তরুণীকে পাঠাবেন আমার সন্ধানে ভাবতে লজ্জা হ'ল। কিন্তু এগুই কি করে? বাবার সঙ্গে থেকে তাঁর কাজ করি; চোখে-মুখে পুত্রত্বের ছাপ বোধ হয় তখন কিছু ফুটে উঠেছিল। একটু পরে মাতৃসমা এক মহিলা ইঙ্গিতে ডেকে সঙ্গে করে দ্রুত বাহিরে নিয়ে এলেন আমাকে। তাঁর মুখে স্নেহ ও কৌতুক-মেশানো চাপা হাসি, এত দিন পরেও চোখের উপর ভেসে উঠছে।

বম্বেতে তিলক থাকতে আসেন নি, বিপিনচন্দ্রও নন। বম্বে থেকে যাবেন তাঁরা মান্দ্রাজে, মান্দ্রাজ থেকে কলম্বো, সেখানে উঠবেন বিলাতের জাহাজে এই ব্যবস্থা। সবাই একসঙ্গে বম্বে ছাড়লুম। মাঝে বেলগাঁওতে এক অপরাহ্নে আসতে হ'ল। একটা ভাঙা মন্দিরের সামনে বড় ময়দানে সভার আয়োজন হয়েছে। আমরা যাদের অশিক্ষিত বলি তাদেরই বিরাট জনতা। শিক্ষিত স্থানীয় যাঁরা নিশ্চয় তাঁরা সভাতে ছিলেন, কিন্তু অশিক্ষিত সাধারণ দেশবাসীর মধ্যে তাঁরা কেবল মিশে নয় যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন। সংখ্যার পার্থক্যে এটা হয়নি, হয়েছিল সভার যে চেহারাটা ফুটে উঠেছিল তাতে। বক্তা তিলক একা; আর তিলকের দৃষ্টি, ভাষা, ভঙ্গী সব নিবদ্ধ ছিল এই তথাকথিত অশিক্ষিত জনতার উপর। আমি মারাঠি বুঝি না, কিন্তু তিলকের দেশপ্রেমের ব্যাখ্যানের সম্মোহন শক্তি জনতার মুখচ্ছবিতে দেখতে পেলাম। জনতার মুখের দিকে তাকিয়ে বার বার মনে হচ্ছিল, দেশপ্রীতিতে বক্তা ও শ্রোতা যেন এক হয়ে গেছেন।

সবাই তিলকের সঙ্গে বিলাত যাইবেন না, কিন্তু বম্বে ছেড়ে মান্দ্রাজগামী রেলে যখন উঠি তখন মস্ত এক দল। যেন অনেক বরযাত্রী একটা বড় বিয়েতে যাচ্ছি। দ্রুতগামী মেল ট্রেণে উঠেছিলাম কি না মনে নেই, কিন্তু সারা রাত অনেক ষ্টেশনে গাড়ী থেমেছিল। এক একটা ষ্টেশনে ট্রেণ থামে, আর জনতার জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে প্লাটফরমটা। তিলকের বিলাত যাওয়ার সঙ্কল্পটা যেন জনপ্রিয় কোন রাষ্ট্রনায়কের বিজয় অভিযান। সম্বর্দ্ধনার উৎসাহে সেরকমই মনে হয়। এই উচ্ছ্বাসী জনতার মধ্যেও যে একটা বড় সংগঠন ছিল বুঝলাম যখন দেখলাম, প্রতি জনতার মুখ্যের হাতে একটা করে টাকার থলি—গ্রামবাসীর সংগৃহীত দান তিলককে দেবার জন্য। তিলকের কামরায় তাঁরা টাকার থলি, ফল, ফুল, মিষ্টি রেখে যাচ্ছেন। যে কামরায় রাখছেন সে কামরায় তিলক কিন্তু নেই। একটা বেঞ্চিতে ওপাশ ফিরে একজন বর্ষীয়ান মারাঠি শুয়ে আছেন—সামনে তাঁর ফুলের পাহাড়। রাত্রের জন্য তিনি তিলকের পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। জনতা তিলকের এই শায়িত প্রতিনিধিকে তিলক জেনে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য রেখে যাচ্ছে। এ না হলে সারা রাত তিলককে একরকম জেগে যেতে হয়; তিলকের ভগ্নস্বাস্থ্যে তাঁর অনুরক্তরা এ হতে দিতে পারেন না।

মান্দ্রাজে পৌঁছিলাম। তিলক ও তাঁর দলের আমরা সকলে শ্রীমতী বেশান্তের অতিথি। ভুবন-বিখ্যাত এই মহিলার জীবনগতি

সোজা বা সহজপথে চলেনি। খরস্রোতা নদী যেমন নিজে পথ কেটে ঋজুকুটিল ভাবে সাগরে গিয়ে মেশে, প্রতিভাশালিনী এই নারীর জীবনও তেমন নানা বাধা-বিঘ্ন ঝড়-ঝঞ্চার ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছিল। আমরা এবার মাদ্রাজে যখন, তখন তাঁকে দেখি এখন বর্ষীয়সী—বোধ হয় সত্তরের কাছে। কিন্তু অদম্য উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের অধিনেত্রীর পদে তিনি বৃতা হ'ন। তার আগেই বোধ হয়, ১৯১৪ সালে ভারতীয় হোমরুল লীগ সংগঠন করেন। তাঁর তত্ত্ববিদ্যা সমিতি বা Theosophical Society'র মত হোমরুল লীগের শাখাও ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাতেও হয়, কিন্তু মনে হয় বাংলাতে তেমন প্রাণ পায়নি। বম্বে অঞ্চলেও হয়; আর তার সমস্ত ভার তিলক ও তাঁর দলের উপর দেওয়া হয়। শ্রীমতী বেশান্তের কোনো কর্ত্তৃত্ব থাকে না। শ্রীমতী বেশান্তের সাংসারিক জ্ঞানও যে প্রখর ছিল, এ থেকে বুঝতে পারি। তিলকের নেতৃত্বে বিশেষ করে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে যা সম্ভব, অন্য কারো দ্বারা তা সম্ভব ছিল না।

রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা ১৯১৪ সালে কি রকম ছিল মনের সামনে তার ছবিটা তুলে ধরা যাক। ১৯১৪-র আগেই বাহিরের প্রকাশে স্বাধীনতার আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে গেছে। বাংলায়, মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে, মাদ্রাজে—নির্ব্বাসন বা দীর্ঘ কারাবাসের পর ফিরে এসে নেতারা দেখলেন তাঁদের কাজের ক্ষেত্র সব বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছে। যুবকেরা অনেকে প্রাণ দিয়েছে। পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ নিয়ে বাহিরে কাজ করার অবস্থাটা যেন আর নেই। ১৯১৪-র বিশ্বযুদ্ধে সাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা বা অধীনতার বন্ধনের বেদনা কিছু বেশী জেগেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও নতুন জোরে মাথা চাপা দিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। অন্ধকার রাতে ঘন মেঘের আকাশে বিদ্যুতের ঝলকের মত বাংলায় মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে ও মাদ্রাজে দেশপ্রেমিক যুবকদের আত্মবলিদানে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে নিবে যায়নি, তলায় চলে গিয়েছে মাত্র, তা জানিয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থাতেই শ্রীমতী বেশান্ত তাঁর হোমরুল আন্দোলন প্রবর্তন করেন। কিন্তু তখন উচ্ছ্বাসে যাই মনে হোক না কেন, এখন বলতে পারি, এ আন্দোলন এ দেশে তেমন শিকড় গজায়নি। দু'টো কারণ তার মনে হয়েছে। এক, এর পিছনে সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ মুক্তি বা স্বাধীনতার আদর্শ ছিল না, যা বাংলায় ও মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতার আন্দোলনের পিছনে ছিল। দ্বিতীয়, এ আন্দোলন ইংরেজের সঙ্গে থেকে, ইংরেজের কোন ক্ষতি না করে, আইনের মধ্যে চলে, নিজেকে বাঁচিয়ে এদেশে প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিল। বাংলা এবং মহারাষ্ট্রও নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার জন্য বেদী রচনা করতে গিয়েছিল।

তিলক ত নেই, বিপিনচন্দ্রও নিছক ভাববিলাসী ছিলেন না। গভীর মননশীলতায় তাঁদের মন সদা-জাগ্রত ছিল। যে বিপিনচন্দ্র ১৯০২—৭ সালে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য, এই বাণী প্রচার করেন, ও সব নদী যেমন সাগরে মেশে, দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম্ম ও সমাজ ব্যবস্থা তেমন এই সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বাদেশিকতার মধ্যেই তাদের সত্য সার্থকতা খুঁজে পাবে, এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। তিনিই ১৯১১-১২ সালে নিরঙ্কুশ সংকীর্ণ জাতীয়তা অপেক্ষা ভারতের পক্ষে ইংলণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির সঙ্গে সমান পদ ও প্রতিষ্ঠায় এক বৃহত্তর রাষ্ট্র-সম্বন্ধ গঠনের চেষ্টা যে শ্রেয়স্কর—এ কথা বলতে আরম্ভ করেন। স্বপ্রতিষ্ঠ ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের এরূপ নতুন সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারলেই আমাদের ও ইংরেজের মধ্যে যে মর্ম্মান্তিক বিরোধ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছিল, তারও একটা মীমাংসা হ'তে পারে—একথাও তিনি বলেন। যেমন স্বদেশীর প্রথম যুগে তেমন এখানেও লোকমান্য তিলকের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের মনের একটা গভীর মিল দেখতে পাওয়া যায়। আর এই উদারতর রাজনৈতিক চিন্তার প্রসারে শ্রীমতী বেশান্তের হোমরুল আন্দোলন সহায় হ'তে পারে। এ ভাবেই মনে হয়েছে, শ্রীমতী বেশান্তের সঙ্গে তাঁদের এক নতুন হৃদ্যতা ও সহযোগিতা গড়ে উঠে।

মাদ্রাজে শ্রীমতী বেশান্তের থিয়সফিক্যাল সোসাইটির আশ্রমে—আডিয়ারে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়। সমুদ্রের ধারে বিস্তীর্ণ জমি নিয়ে বহু প্রতিষ্ঠান ও বহুতর অট্টালিকায় সমৃদ্ধ এই আশ্রম। হোমরুল আন্দোলনের কেন্দ্ররূপে এর কর্ম্মব্যস্ততা অনেক বেড়ে গিয়েছে। একটা বাড়ীর দোতলায় মা ও আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। সারাদিন ও রাত্রের বড় অংশ যায় বাবার নানা সভা, অনুষ্ঠান ও অভিনন্দনাদির ব্যস্ততায়। বোধ হয় যে দিন সকালে মাদ্রাজ পৌঁছি সেদিনই রাত্রে আডিয়ারের প্রাঙ্গণে তাঁদের প্রকাণ্ড বট-গাছের তলায় উন্মুক্ত আকাশের নীচে এক সাধারণ ভোজের ব্যবস্থা হয়। গাছের অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় ঝোলান হয়েছে অগণিত ছোট ছোট আলো, নানা রংয়ের। আর প্রায় দু'হাজার লোক আমরা গাছ তলায় খেতে বসেছি। পরিবেশন হচ্ছে নিঃশব্দে, কলের চাইতেও বেশী শৃঙ্খলায়। এ-হেন এক মায়াপুরী তৈরী হয়েছে। এমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে পরিবেশে এত বড় ভোজসভার আয়োজন এর আগে বা পরে দেখিনি।

কংগ্রেসের নেত্রী হিসাবে (শ্রীমতী বেশান্ত ১৯১৭ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনে নেতৃত্ব করেন,) হোমরুল আন্দোলনের কর্ত্রী হিসাবে মাদ্রাজের বিশিষ্ট নাগরিক সকলকেই শ্রীমতী বেশান্ত এই ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। এত বড় নেতৃ-সম্মেলন দেখার সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে, এক সঙ্গে খাওয়া সাধারণের ভাগ্যে প্রায় কখনো ঘটে না।

মারাঠি মেয়েরা বাহিরের কাজেও কত ক্ষিপ্র ও দক্ষ, তার এক পরিচয় আডিয়ারে পাই। মার দেখাশুনার ভার ছিল একটি মারাঠি বধূর উপর। লোকমান্য তিলকের একজন অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মীর তিনি পুত্রবধূ। তিনি ও তাঁর স্বামী দু'জনেই এখানকার কোন শিক্ষায়তনের কর্ম্মী, দু'জনেই উচ্চশিক্ষিত। মার ইচ্ছা, মাদ্রাজে যা দেখার আছে সব দেখেন। এই বৌটি মার জন্য পরদিন সকালে এক মোটরের ব্যবস্থা করেছেন। গাড়ী সকালেই আসার কথা; দেরী হচ্ছে অল্প। মা হয়ত একটু ব্যস্তও হয়েছেন। তাই না দেখে বৌটি তরতরিয়ে নেমে গিয়ে গেটের কাছে যে সাইকেল ছিল পাকা চড়িয়ের মত তাতে চড়ে আশ্রমের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ পেরিয়ে মোটর নিয়ে এলেন তখনি সঙ্গে করে। উপরের বারান্দা থেকে মা দেখে ত অবাক! প্রৌঢ়া বাঙ্গালী গৃহিণীর যে ধরণের ধীর লজ্জায় নতমুখী বৌ দেখে অভ্যাস, এ তার একেবারে উল্টো। তবে মার এরকম বৌও ভাল লেগেছিল নিশ্চয়। কলিকাতায় অনেক বার এ গল্প

করেছিলেন। বৌটি কাজের, মাকে নিয়ে সারাদিন শহর ঘুরতে পারেন, এত সময় নেই। মোটরের চালক সব চেনেন, তাঁরই উপর ভার দেওয়া হ'ল মাকে সব দেখাতে। আমি মার সঙ্গে।

মাকে শহর দেখিয়ে দুপুরে বাবার এক বিশেষ মান্দ্রাজী বন্ধুর বাড়ীতে আমরা খাব। সকালেই শহরের বিভিন্ন অংশে একাধিক সভাতে তিলক ও বাবাকে যেতে হবে শ্রীমতী বেশান্তের সঙ্গে—বিদায় অভিনন্দন নাগরিকেরা দেবেন তিলক ও তাঁর সহকর্মীদের। সময়ের যে হিসাব শ্রীমতী বেশান্ত করেছিলেন তা আর রাখা সম্ভব হয় নি, সাধারণের উৎসাহের আতিশয্যে। এদিকে দুপুর ত প্রায় হয়। তাঁদের এক সভায় আমরা গিয়ে পৌছলাম। সভা সবে ভেঙেছে। শ্রীমতী বেশান্ত তাঁর প্রকাণ্ড রোলসরয়েস গাড়ীতে তিলক ও বিপিনচন্দ্রকে নিয়ে উঠলেন। এই দামী গাড়ী শ্রদ্ধার অর্ঘ্য হিসাবে বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী যমুনাদাস দ্বারকাদাস তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। আরও ২।৩টি সভায় তখনো তাঁদের যেতে বাকী। আমরা কি তাঁদের সঙ্গেই ঘুরবো? বাবাকে জিজ্ঞাসা করি কি করে? ভিড় ঠেলে ত এগুলাম তাঁদের গাড়ীর সামনে। গাড়ী ইতিমধ্যে অল্প অল্প চলতে আরম্ভ করেছে। পাদানিতে উঠে বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম—কি করব মা ও আমরা। শ্রীমতী বেশান্তের চোখ তখন পড়েছে আমার উপর। তাঁর গাড়ীতে তাঁর অতিথিদের বিরক্ত করছে এক যুবক! অমনি তাঁর মুখ থেকে বেরুলো নেমে যাও, নেমে যাও এখুনি। ইংরেজীতে অবশ্য তিনি বলেন, আর তাঁর স্বাভাবিক জোরের ভঙ্গীতে। আমার অভিমানে তাতে যেন আরও বেশী লেগেছিল। নেমে আমি গেলাম তখুনি। বাবা বললেন, 'আমাদের সঙ্গে চলো।' শ্রীমতী বেশান্ত অবশ্য বোঝেননি আমি বিপিনচন্দ্রের পুত্র। তাঁতের জরিপাড় মান্দ্রাজী চাদর কিনেছি ইতিমধ্যে; তাঁদের মত ঝুলিয়ে দিয়েছি গায়ে; পায়ে মান্দ্রাজী চটি; রংও তাঁদের মত। সুতরাং শ্রীমতী বেশান্তের চোখে আমি মান্দ্রাজী এক যুবক। কিন্তু হই না কেন তা? কোন যুবকের প্রাণে কি এমন করে আঘাত দিতে হয়—মনের ব্যথায় ভাবলাম। আর ভাবলাম, তিলক কি বাংলার কোন নেতা কি কোন যুবককে এভাবে বলতে পারতেন?

সেদিন বিকালে এক সভা ছিল। যতটা মনে আছে এক মন্দিরের প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে। মান্দ্রাজের জনতা বিপিনচন্দ্রের পরিচিত। তিলক ও বিপিনচন্দ্র এসভায় বক্তৃতা করেন। সভার পরে সে রাত্রেই আমরা কলম্বোর দিকে রওয়ানা হ'ব, কথা। আমি ভেবেছিলাম সোজা বোধ হয় ষ্টেশনেই যেতে হবে। এরকম বড় সভায় বাবা আমার সম্বন্ধে একটু ব্যস্ত হ'তেন মধ্যে মধ্যে দেখেছি—হারিয়ে যাবো ব'লে নয়, হয়ত পিছিয়ে থাকব এই ভয়ে। সেজন্য ডাঃ আরুণ্ডেলের উপর ভার দেন, তিনি যেন আমাকে তাঁর সঙ্গে রাখেন। ডাঃ আরুণ্ডেল শ্রীমতী বেশান্তের শিষ্য ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। দক্ষিণগামী ট্রেণের তখনো কিছু দেরী ছিল। তিলক প্রমুখের গাড়ীর সঙ্গে দেখি যে গাড়ীতে ডাঃ আরুণ্ডেল আমায় নিয়ে উঠলেন, সে গাড়ীও ঢুকল ফের আডিয়ারে, থামলো শ্রীমতী বেশান্তের বাড়ীর নীচে। দোতলায় উঠলাম—বসবার বড় ঘর—আলমারী, টেবিল আর বই কাগজপত্রে ভরা, কিন্তু অগোছালো নয়। শ্রীমতী বেশান্ত এসেই ক'খানা চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন—বিলাতে তাঁর অনুরাগী ও পরিচিত বন্ধুদের; তাঁরা যেন তিলককে সাহায্য করেন যতটা সম্ভব। এই সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। তিলকের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি য়ুরোপে অনেক আগেই পৌঁছিয়েছে। কিন্তু নবজাগ্রত ভারতের তিনিই যে অবিসম্বাদী নেতা, শিক্ষিত ইংরেজ সমাজের কাছে এটা ভাল করে জানান দরকার। চিরলের 'Indian Unrest' বইয়ের অপপ্রচারে বিলাতে তিলকের নেতৃত্বের যে ক্ষতি হয়েছে তার প্রতীকার করা একারণেই প্রয়োজন। শ্রীমতী বেশান্ত দ্রুত চিঠিগুলি লিখে চললেন—নিজের হাতেই। আর শ্রীমতী জিনরাজদাস অতিথিদের চা পরিবেশন করতে লাগলেন। তিলককে চা দিলেন শ্রীমতী বেশান্তের নিজের সোনার পেয়ালায়; অন্যেরা ও আমিও চা পেলাম রূপোর পেয়ালায়। কপালের লিখন ছিল, সকালে যাঁর কটু ভাষণ শোনা, সন্ধ্যায় তাঁরই ঘরে তাঁর দেওয়া চায়ে অভ্যর্থিত হওয়া। দু'টার কোনোটারই আমি অবশ্য প্রকৃত হেতু নই।

তিলকের এই সমাদর সাধারণ প্রীতি বা আতিথ্যের অঙ্গ বলে মনে করলে বোধ হয় ভুল বোঝা হবে। এঁদের মধ্যে দীর্ঘদিনের স্বাভাবিক কোন প্রীতি ছিল বলে জানি না। তিলক প্রমুখের ১৯০৫-৬ সালের রাজনীতি শ্রীমতী বেশান্তের কোনো সমর্থন পায়নি। বিপিনচন্দ্রের ঐ সময়ের রাজনৈতিক চিন্তাকে তিনি 'প্রতিভার বিকৃতি' বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু ১৯১৩-১৪ সালে শ্রীমতী বেশান্ত দেখলেন, দেশে এক নতুন শক্তি জেগেছে। এটা যে কত বড় শক্তি, তা তিলক প্রভৃতিও বোধ হয় বোঝেন নি, এমনই আত্ম-ভোলা ছিলেন তাঁরা। বাংলায় এ শক্তি সংহত পর্যন্ত হয়নি, দিকে দিকে এর প্রকাশ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল মাত্র। মহারাষ্ট্রের যে সংহতি তিলকের নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছিল, তা বিদেশীর শক্তিকে কেবল আঘাত করার জন্যই। বাংলায়, মহারাষ্ট্রে বা পাঞ্জাবে স্বদেশীযুগের সাধনায় মৃতপ্রায় জাতির প্রাণে যে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল, আমাদের দেশের ইতিহাস এখনো তার হিসাব করেনি। এর সম্ভাবনা যে কত বড় শ্রীমতী বেশান্তের চোখেই বোধ হয় তা প্রথম ধরা পড়ে।

হোমরুল আন্দোলন তিনি আরম্ভ করেন ১৯১৪ সালে কংগ্রেসের মধ্যে তিলক প্রভৃতিকে ফের টেনে আনেন ১৯১[illegible] সালে। মুসলমান নেতৃত্বের সঙ্গেও একটা রফার চেষ্টা হ[illegible] এসময়। এভাবে কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে শ্রীমতী বেশা[illegible] এমন একটা সংহতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন, যা[illegible] রাজনৈতিক সকল শক্তি এই নতুন নেতৃত্বের হাতে আসে। শ্রীমতী বেশান্তই আমাদের রাজনৈতিক জীবনে বোধ হয় প্রথ[illegible] যিনি নেত্রীত্ব কামনা করেন, শুধু তাই নয়, একনায়কত্বও চান কিন্তু তিলকের নেতৃত্ব স্বতঃ গড়ে উঠেছে সাধারণের মধ্যে গত চল্লি[illegible] বছরের উপর একনিষ্ঠ দেশ-সেবায়। সেই নেতৃত্বের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বি[illegible] নয়, প্রীতির বন্ধনে যুক্ত হ'তে চান শ্রীমতী বেশান্ত প্রথম থেকেই তারই প্রকাশ আমরা দেখি এবারে তিলকের সমাদরে। ১৯১৭-১[illegible] সালে লড়াইয়ের গতিতে ভারতের আত্মশাসন লাভের সম্ভাবনা জে[illegible] উঠে, আগেই বলেছি। ইংরেজের সঙ্গে তার জন্য যে রফা প্রয়োজ[illegible] তার ভার একমাত্র লোকমান্য তিলকের উপরেই দেওয়া যায়; শ্রীম[illegible] বেশান্ত এটা জানতেন। তিলকের সঙ্গে সহযোগিতায় তাঁর ত[illegible] এত ঔৎসুক্য। শ্রীমতী বেশান্তের জীবনীতে আছে, তাঁর দৃঢ় আ[illegible] ছিল তিনি ভারতে আত্ম-শাসন প্রতিষ্ঠা দেখে যাবেন। আর [illegible]

যদি এবারে সম্ভব হয় ত তিলকের সঙ্গে তাঁর নামও আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে অক্ষয় মর্য্যাদা লাভ করবে।

শ্রীমতী বেশান্তের গৃহ থেকে সোজা যাই আমরা এগমোর ষ্টেশনে; সেতুবন্ধ রামেশ্বরের গাড়ী এখান থেকেই ছাড়ে। এদিকের অনেক ট্রেণে করিডর আছে, বাংলা অঞ্চলে তা দেখিনি। ধনুষ্কোটি ভারতের ও ট্রেণের শেষ সীমা। এখান থেকে এক ফেরী জাহাজে সমুদ্রের জল পেরিয়ে সিংহলের ভূমিতে পা দিলাম। এদিকের রেললাইন একটু ছোট। কিন্তু সুন্দর ট্রেণ, করিডরও। রাত্রে গেলাম সংলগ্ন খাবার ঘরে। অবশ্য পুরো বিলাতী খানা—সাধারণ হিন্দুর নিষিদ্ধ ভোজ্য-সম্ভারই বেশী। বাবা ত একেবারে এ সব তখন খান না,—মা কখনো খান না। আমাদেরও সংস্কারে আটকাচ্ছিল এ খানার সব রকম খেতে। কিন্তু আটকালো না দেখলাম শ্রদ্ধেয় খাপার্দে'র। বয়সে, বিদ্যায়, ব্যবহারে তিনি আমাদের নমস্য ত ছিলেনই, বর্ণে বা ব্রাহ্মণ্যেও ছিলেন উপরে। তাঁকে দেখে বুঝলাম আমাদের খাদ্যাখাদ্যের সংস্কার কত বাহিরের। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ভবভূতির উত্তরচরিতে আছে, রামচন্দ্রের সময়ে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অতিথির সম্মান-ভোজের আয়োজন হয়েছিল আশ্রমের হৃষ্টপুষ্ট গো-বৎসের বলিদানে।

কলম্বো পৌঁছলাম পরদিন ভোরে। তিলক প্রভৃতি উঠলেন তিলকের এক অনুরক্ত ভক্তের বৃহৎ 'বাংলো' বাড়ীতে। বাবার সঙ্গে আমরা উঠলাম বাবার এক সিংহলী বন্ধুর বাড়ীতে। বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে বিলাতে তাঁর পরিচয়। নাম তাঁর ডবলিউ এ ডি সিলভা, খুব বড় ধনী, একটা প্রকাণ্ড রবারের ক্ষেত বা প্লানটেশনের মালিক। মস্ত বাড়ী, নতুন করেছেন, চার দিকে খুব বড় বাগান। আর সবই খুব সুন্দর করে সাজান। বাড়ীর ঘরের পর্দা প্রভৃতিও দামী সিল্কের। একটা বাড়ীর মধ্যে এত ঐশ্বর্য্য এর আগে দেখিনি। খাপার্দে এ বাড়ীতে এক সকালে বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এসে এক মজার মন্তব্য করেন; বলেন—"এ বাড়ী দেখতে ভাল, থাকতে ভাল নয়; এত সাজান গোছান ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কি মানুষ আরাম পায়?" আরাম কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম, বিভবের প্রাচুর্য্যের জন্য অবশ্য নয়, বাড়ীর যিনি মালিক তাঁর ব্যবহারে। তাঁর নিজের ছেলেপুলে নেই, স্বামী স্ত্রী দু'জনে। এক আত্মীয়ের ছেলেকে পালন করেন। তাঁর নামকরণ করেছেন আমাদের দেশীয় নাম—বোধ হয় সুশান্ত। বাড়ীরও নাম রেখেছেন "শ্রাবস্তী।" সিংহল পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের অধীনে অনেক দিন ছিল। তারা খালি দেশই দখল করেনি, সাধারণের পোষাক, পরিচ্ছদ, নাম, ধর্ম সব বদলে দিয়েছিল। নাম সব দি'ফনসেকা, দি'সিলভা, ফার্ণানদেজ প্রভৃতি। সাধারণ মেয়েদের পোষাকও কতকটা আমাদের দেশের দো-আঁশলা গরীব মেয়েদের মত ঘাগরা ও জ্যাকেট বা ব্লাউস। আমরা যাবার আগেই সিংহলে নতুন জাতীয়তার আন্দোলনের প্রভাব এসে পড়েছিল। দেখলুম, শিক্ষিত সিংহলীরা তাঁদের পূর্ব্বতন বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ স্থাপনে উৎসুক হয়েছেন। নিজেদের ছেলেমেয়েদের নাম আর বিদেশীর অনুকরণে রাখছেন না, বড় ঘরের মেয়েরা শাড়ী পরতে আরম্ভ করেছেন। পরাধীনতার যে নির্ম্মম চেহারা সিংহলে দেখেছিলাম আমাদের দেশেও তা দেখিনি। আমাদের দেশ বিদেশী নিয়েছে, সম্পদ সব তাদেরই করায়ত্ত করেছে, মর্য্যাদায় আমাদের খাটো করতেও চেষ্টার ত্রুটি করে না। কিন্তু এত দুর্ভাগ্যও আমাদের মনকে কখনো তাদের দাসত্বের শিকলে বাঁধতে পারেনি। যাঁদের জন্য এটা সম্ভব হয় নি, তাঁরা আমাদের চিরকালের প্রণম্য—সিংহলে ১৯১৮ সালে বার বার এ কথা মনে হয়েছে।

কলম্বো থেকে তিলক-বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি বিলাতের জাহাজে উঠবেন। কিন্তু লড়াইয়ের সময় ছাড়পত্র চাই। ছাড়পত্র দেওয়া না দেওয়া সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ছাড়পত্র আর পাওয়া যাচ্ছে না। চেষ্টা আগে থেকে নিশ্চয় হচ্ছিল; এখানে এসেও বিলাতে অনেক তার গেল, এল। সকলে এখানে বসে রইলেন আশায় আশায় বোধ হয় দশ-এগার দিন। শেষ পর্য্যন্ত ছাড়পত্র আর এল না। ইংরেজ সরকার নিরীহ ক'জন ভারতবাসীকে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে তাঁদের দেশেও যেতে অনুমতি দিতে পারলেন না। তিলক প্রভৃতির এত চেষ্টা, এত শ্রম, সাধারণের সংগৃহীত অর্থের এই খরচ আপাততঃ সব বৃথা গেল। এর পরে যুদ্ধ থেমে গেলে এঁরা বিলাত গেলেন বটে। কিন্তু যে সম্ভাবনা ও যে পরিস্থিতি যুদ্ধের গতিতে জেগে উঠেছিল, যুদ্ধ প্রায় হঠাৎ থামায় আর ইংরেজ ও তার মিত্রবর্গ জয়ী হওয়ায় সে সম্ভাবনা একেবারে মিলিয়ে গেল। ভারতের আত্মশাসনের আশা, মনে হলো, আপাততঃ বোধ হয় নিবে গেল। এটা বলছি ১৯১৮ সালের কথা। আর একটা বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা পেল। কিন্তু ভাবি, এটা যদি প্রায় ত্রিশ বছর আরও আগে হ'ত, তা'হলে কি আমরা স্বাধীনতার এই রূপই পেতাম? তখনও কি দেশ ভাগ হ'ত, ঐক্যের নামে এক-নায়কত্বকেই আশ্রয় করতাম, দেশের কৃষি ও শিল্প সম্পদ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের দারিদ্র্যও কি বাড়িয়ে তুলতাম? কি জানি!

স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ

শ্রীহরিহর শেঠ

দীর্ঘ দিনের পর আজ এই বিদ্যামন্দিরের একটি আনন্দ অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভাবে একটু যোগদানের সুযোগ পেয়ে সুখ ও দুঃখের কত স্মৃতিই না মনে উদয় হচ্ছে। যাঁরা আমাকে আজকের এই সম্মানের আসনে স্থান দিয়াছেন, এই সুযোগে তাঁদের আমি আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের এই ব্যবস্থা সাধু-ইচ্ছা-প্রণোদিত, তাতে সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও, মনে হয় আমাকে এই কার্য্যের জন্য নির্বাচনটা হয়ত তাঁদের একটু হিসাবের বাহিরে হইয়াছে।

কালের বিবর্ত্তনে, হয়ত শিক্ষা-সংস্কৃতির একজন দীন সেবক হিসাবেই আমি আজ এই পদ গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রিত, আর এই শিক্ষামন্দিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও স্রষ্টা আমার প্রধান সহায় বন্ধুবর নারায়ণ বাবু, প্রবাস বঙ্গে বিশেষিত হলেও আজ এখানে একজন অতিথি। আর শুধু তাহাই বা বলি কেন, পৌরপ্রধান-রূপে তাঁরই কর্তৃত্বাধীনে এই যে প্রতিষ্ঠান, এবং হয়ত বা যিনি ইহার নিয়ন্ত্রণের মালিক, আজ সেখানে তিনি অতিথি।

কয় দিন পূর্বে শ্রদ্ধেয়া প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মহোদয়া যেদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন, ২৩শে মার্চ অনুষ্ঠানের দিন ধার্য্য হয়েছে শুনেই তাঁকে সেদিন যা বলেছিলাম—স্বাধীন ভারতের পুণ্যভূমে আজ এই একটি চিহ্নিত স্থানে দাঁড়িয়ে যে কথা প্রথমেই মনে হয়, অপ্রাসঙ্গিক হলেও তা এখানে উল্লেখ না করে পারাচ না। ঠিক দুই শত বৎসর পূর্বে ১৭৫৭ সালের ২৩শে মার্চ পরাধীন চন্দননগরের ঠিক এই স্থানেই বৃটিশ-ভাগ্যলক্ষ্মীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ এবং ফরাসী ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল। তারপর দীর্ঘ দুই শত বৎসরে কতই না পারিবর্তন ঘটেছে! আজ এখানে ইংরাজ নাই ফরাসী নাই। উভয় অদ্বিতীয় রাজশক্তির অঙ্ক ভারতে বিলোপ ঘটেছে। আমাদের মধ্যেও কত দিকে কত পরিবর্তন না ঘটেছে। মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা প্রসঙ্গেই বলি, একটা দিন ছিল যখন মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা সমাজে নিন্দার বিষয় ছিল। তখন লেখাপড়া শিক্ষা নর্ত্তকী ও পতিতাদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। আজ আমাদের মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রেও যেমন দ্রুত অগ্রগমনের পথে অগ্রসর হতে চলেছে, কি রাষ্ট্রক্ষেত্রে কি সমাজের বিবিধ স্তরেও তাঁহাদের আসন ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতেছে। মনে হয় বুঝি বা অন্য সকল বিষয়ের তুলনায় সমাজে নারী-প্রগতি বা নারী জাগরণই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

একত্রিংশ বৎসর পূর্বে যখন এই শিক্ষামন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, সে দিন কত সাবধানে কত সংশয়ে না আমাদের অগ্রসর হতে হয়েছিল। আরম্ভ হয়েছিল এই উদ্দেশ্য নিয়ে, অক্ষর পরিচয়ের পর দুই-একখানা বই পড়া শেষ করেছে এরূপ মেয়েদের নিয়ে তার বিবাহযোগ্য বয়সের মধ্যে এমন শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হবে যাতে সে উত্তর জীবনে সুমাতা, সুগৃহিণী, সুভগিনী হয়ে কাটাতে পারে। পাঠ্যবিষয়, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণী বিভাগ প্রভৃতি সকলের মধ্যেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল, অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে তাহা করা হয় নাই। তখনও বালিকাদের বিবাহের বয়স অনেকটা কৈশোর সীমার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। সুতরাং স্থলবিশেষে বিবাহিতা বালিকা, বালবিধবা প্রভৃতির শিক্ষার ব্যবস্থাও তাহার মধ্যে ছিল। বিশেষ সাফল্য লাভ না হইলেও, পরে পুরস্ত্রীগণের শিক্ষার আয়োজনও করা হইয়াছিল। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহার সমস্ত থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়া মেয়েরা ম্যাট্রিক্ পাশ করে এ উদ্দেশ্যও ছিল না। কালক্রমে প্রথমকার মেয়েরা যখন শিক্ষা-মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর পড়া শেষ করিল, তাহাদের আগ্রহ ও সহরবাসীর অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। মনে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তখন শ্রীযুক্তা পি. কে. রায় ও ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যালয় পরিদর্শনে আইসেন। তাঁহারা আবশ্যকীয় সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলে, তখনকার ম্যাট্রিক শ্রেণীর ছাত্রীরা তাঁহাদের নিকট আব্দার ধরিল, যাহাতে আগামী পরীক্ষাতেই তাহারা উপস্থিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য। সে তারিখটি ২০ কি ২১শে ডিসেম্বর। তাঁহারা মেয়েদের অনুরোধ শুনিয়াছিলেন, বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা অনুমতি দিয়াছিলেন। সে বার পরীক্ষা দিয়াছিল তিনটি ছাত্রী, তন্মধ্যে শ্রীমতী ইন্দু ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী মায়া চট্টোপাধ্যায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তির পর যাহাতে ছাত্রীরা কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, সে বিষয় চেষ্টার কোন ত্রুটি করা না হইলেও, যত দিন পর্য্যন্ত বেসরকারী কর্তৃত্বাধীনে ছিল, ইহার সকল বৈশিষ্ট্যই রক্ষিত হইয়াছিল। তৎপরে সরকারের হস্তে অর্পণের পর কয়েক বৎসর কতকটা পূর্ব্বের ব্যবস্থাদি অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা হইলেও, পরে ঠিক কি ভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহার কোন সংবাদ জানি না। প্রথম হইতে এখানে ছাত্রীদের দক্ষিণার হার ১৲ ১৷৷০ ও ২৲ টাকা মাত্র ছিল এবং অবৈতনিক বা অর্দ্ধবৈতনিকের কোন সংখ্যা নির্দ্ধারিত ছিল না। সরকারের হস্তে অর্পণের সময় তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুসারে বেতনের হার দশ বৎসরের মধ্যে কোন পরিবর্তন হইবে না স্থির হয়। কিন্তু নয় বৎসর না যাইতেই তাহা দ্বিগুণ বা ততোধিক বর্দ্ধিত করিয়া অন্য সকল সরকারী বিদ্যালয়ের সহিত সমান করা হয়। পাঠ্যাদি বিষয়ও এক্ষণে সাধারণ শিক্ষালয়ের সহিত সমান হওয়াই সম্ভব। যদি ইহা হইয়া থাকে তাহাই স্বাভাবিক। এজন্য শিক্ষামন্দিরের বর্ত্তমান পরিচালনার দোষারোপ করিবার বা বলিবার কিছু নাই।

অন্য সকল দিক বিবেচনা করিলে উন্নতিও কিছু যে না হইয়াছে তাহা নহে। প্রথম প্রথম উপযুক্তা শিক্ষয়িত্রী পাইতে সময় সময় বিশেষ অসুবিধা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিতা একজন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ও তাঁহার অধীনে কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্তা এম-এ, বি-এ শিক্ষিকা নিয়োজিতা আছেন। আর একটি আমাদের আনন্দের কথা, শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শিক্ষা ব্যতিরেকেও সঙ্গীত, রন্ধন, কাট-ছাঁট, হাতের কাজ প্রভৃতি যে সব শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, কিছু দিন যাবৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার মধ্যে অধিকাংশই প্রবর্ত্তন করায় এখানকার বৈশিষ্ট্যের অনুকূলেই হইয়াছে। আরও একটি আনন্দের কথা, সরকারী প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটিকে multipurpose স্কুলে পরিণত করা হইতেছে। বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম

প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের এই উচ্চ ইংরাজী স্কুলটিকেই বোধ হয় এই বিভাগে সর্ব্বপ্রথম Higher Secondary School-এ পরিণত করে সরকার ইহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এখানে বিবিধ বিষয় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ছাত্রীরা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্যই এখানকার সাধারণের নিকট ধন্যবাদার্হ। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে হওয়া স্বাভাবিক—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৪৮ সালের পর ১৯৫৬ সালে ১৩ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থলে ২২ হাজার হইয়াছে এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যাও ৮৫৮র স্থলে ১৫৫৬ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলে আজ প্রায় সর্ব্বত্র কি স্কুল কি কলেজে ছেলে-মেয়েদের স্থানাভাবে শিক্ষা বিষয়ে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে সে দিকে কর্তৃপক্ষের যে উপযুক্ত দৃষ্টি আছে তাহার পরিচয়ও এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না। এই চন্দননগরেই যখন প্রথম এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় তখন সাধারণের নিকট কি ভাবে ইহা গৃহীত হইবে, আশানুরূপ ছাত্রী পাওয়া যাইবে কি না, এই সব মনে হইয়াছিল, আর আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও এই নগরেই চারিটি এবং হুগলী চুঁচুড়ায় তিনটি মেয়েদের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্ব্বত্রেই সকল শ্রেণী ছাত্রীতে পূর্ণ। বলা বাহুল্য, এই সব কয়টি বিদ্যালয়ই স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই অসুবিধার কথা স্বতঃই বর্ত্তমানে এখানে প্রায় একটি সাধারণ প্রসঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা মনে আসে। সরকারী ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত নবগঠিত কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে যাওয়ার ফলে স্থানীয় দরদীদের হস্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকতর উন্নতি দেখিবার আশা অনেকে করিয়াছিলেন। আপাততঃ তাঁহাদের নিরাশ হইতে হইয়াছে। এতাবৎ তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। শুনা যায় এখন পর্য্যন্ত সরকারের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি মত সুযোগ সুবিধা এবং আর্থিক সাহায্য না পাওয়াই তাহার কারণ। ইহা যদি সত্য হয় তবে খুবই দুঃখের কথা। অন্যান্য কোন কোন বিদ্যালয়েও এই শিক্ষা-মন্দিরে বহুদিন হইতে যে কতিপয় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর স্থান শূন্য রহিয়াছে তাহার কারণও তাহাই। সম্প্রতি এই অভাব পূরণের চেষ্টা হইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

আজ এই যে ছাত্রীদের কৃত সূচীশিল্পাদির প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইল, এই সব বিষয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতেই যথেষ্ট উৎসাহ ছিল এবং বিবিধ প্রদর্শনী হ'তে বহু পদকাদি লাভ হয়েছিল। সে সময় পাঠ্যের সঙ্গে ছাত্রীদের হাতের কাজ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি দেখিয়া সমাগত মনীষীদের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, কবি কামিনী রায়, স্যর যদুনাথ প্রভৃতি কতই না আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। সেসব কথা মনে হ'লে আজও আনন্দে হৃদয়টা ভরে উঠে। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে তাঁদের, যাঁদের চেষ্টা ও পরিশ্রমে এই শিক্ষামন্দিরটি গড়ে উঠেছিল, বিশেষ ভাবে তদানীন্তন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী স্বর্গতা নীহারিকা মল্লিক ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সম্পাদক স্বর্গত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে। তাঁদের উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

কালের নিয়মে আর এই পরিবর্তনের যুগে কতই না পরিবর্তন হয়েছে। আমরা সে যুগের মানুষ, ঠিক যুগের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারি না। আর সেই জন্যই বহু ব্যয়ে আদব-কায়দা ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ছেলেমেয়েদের সংসার-বিচ্যুত করে কনভেন্ট প্রভৃতিতে দেওয়ার সার্থকতা ঠিক মত উপলব্ধি করতে পারি না। আমাদের মেয়েদের আমাদের সমাজ সংসারের উপযোগী করে শিক্ষা দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তখন ক্লাশে পড়াশুনা আরম্ভের পূর্ব্বে এবং পরে নিত্য নিয়মিত দেবীর বন্দনা করান হইত। মেয়েদের মনে দীন দরিদ্রদের সেবাবৃত্তি স্ফুরিত করিবার জন্য শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজার দিন মেয়েদের স্বহস্তে রন্ধন ও পরিবেশন দ্বারা দরিদ্র নারায়ণদের ভোজন করান হইত। বাৎসরিক খেলা-ধূলা প্রতিযোগিতার সময় খেলার সঙ্গে গৃহস্থালী কোন কোন কাজকর্ম্মের প্রতিযোগিতাও হইত।

সময়ের গতিকে আজ আমি শিক্ষামন্দির হ'তে কিছু দূরে গিয়ে পড়েচি। বয়সের ধর্ম্মে আজ বিস্মৃতি আমার উপর তার যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলেও, সময় সময় কত কথাই না মনে পড়ে। এই শিক্ষামন্দিরের কল্যাণেই আজও স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী বহু পরিবারে আমার জন্য দ্বার উন্মুক্ত। মেয়েদের সঙ্গে দেখা হলে আজও তাদের শ্রদ্ধা আমাকে অভিভূত করে। শৈশব ও কৈশোরে মানুষ যে আদর্শের মধ্যে থাকে পরবর্ত্তী জীবনে তার প্রভাব থাকিয়াই যায়। আমার বেশ মনে আছে, শিক্ষামন্দির গভর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণের যখন কথা উঠে, তখন তদানীন্তন ফরাসী-ভারতের গভর্ণর এবং হুগলীর স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর মহোদয় ইহার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার কিছুটা ঘটিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আমাদেরও যে সে সংশয় ছিল না তাহা নহে। তবে সেই সঙ্গে সরকারী কর্তৃত্বে পরিচালনাদি অধিকতর দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভবিষ্যৎ অধিকতর উজ্জ্বল হইবে এ বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তির সহিত পাঠ্যাদি বিষয় নাবস্থামত অনুসরণ করিতেই হইবে। সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই, সেখানে আদর্শ বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু আছে কি না জানি না। বালিকাদের শিক্ষাক্ষেত্রে একটা আদর্শ থাকা একান্ত আবশ্যক বলিয়াই মনে করি। এসকল বিষয় নির্ভর করে যাঁহারা শিক্ষা দিবেন তাঁহাদের উপর। আমার বিশ্বাস, এখানকার শিক্ষয়িত্রীদের সে বিষয়ে জ্ঞানের অভাব নাই।

বহু অবান্তর কথায় আপনাদের মূল্যবান সময় অনেকটা নষ্ট করিলাম। আমি প্রথমেই বলেছি, আমাকে এই আসন দেওয়াটা হয়ত একটু হিসাবের বাহিরে হয়েছে। একজন বিশেষজ্ঞের উপর এই কার্য্যভার অর্পিত হলে অনেক সময়োপযোগী প্রয়োজনোপযোগী উপদেশাবলী শুনবার আপনাদের সুযোগ হ'ত। আমার এই ভাষণে কি সুধীবৃন্দ, কি শিক্ষয়িত্রী কি ছাত্রীবৃন্দ কেহই তৃপ্তি পেয়েছেন, তা মনে করি না। সভা পরিচালকের কাছ থেকে এই সব পুরাতন কথা বা ইতিহাস শুনবার জন্য কেহ আগ্রহান্বিত থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু আমার পক্ষে আমার এই সব ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা

এমন একটি অনুষ্ঠানে মনে না এসে পারে না। পরিশেষে শ্রীভগবান সমীপে, বড় আদরের বড় যত্নে সৃষ্ট এই শিক্ষা-মন্দিরটির ও আমার পরম স্নেহের ছাত্রীবৃন্দের সর্ব্ববিধ কল্যাণ কামনা করি। আর শিক্ষিকা-মণ্ডলী এখানে সকল সুবিধার মধ্যে একটি সুন্দর সৌষ্ঠবসম্পন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করে যাতে প্রফুল্ল মনে তাঁদের কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হন, সেই কামনা করে আমার কথা শেষ করি। আর মেয়েরা, সংসারে তোমাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব অনেক। মাত্র একটি কথা মনে রাখতে বলি—ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোলাদি অধ্যয়নের দ্বারা সেই সেই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ হইলেও শিক্ষার প্রাথমিক বা মূল উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব লাভ করা, মানুষ হওয়া। মহাজ্ঞানী স্বামী বিবেকানন্দ মাতৃসমীপে মাত্র এই প্রার্থনাই জানাইয়াছিলেন—"মা, আমাকে মানুষ কর।" মনুষ্যত্বই মানুষের শ্রেষ্ঠ কাম্য। তোমাদের সাধনাও তাহাই হওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রার্থনীয়। আমি মনে করি, মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের মধ্যে ব্যবধান বিশেষ নাই। *

* ২৩শে মার্চ ১৯৫৭ কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষামন্দিরের বাৎসরিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

পলাতকা

শ্রীবিভূতিভূষণ বাগচী

রূপে রঙে রসে বর্ণোজ্জ্বল তোমার নিখিল,
বাঙলা ত প্লাবনে ভাসা অবিচ্ছিন্ন দুঃখের মিছিল।
বর্ষণ ঘনঘটা ঝড়-ঝঞ্ঝায়—
নাই বা এবারে তুমি গেলে বাঙলায়?

ভাসে পূর্ব্বস্থলী জামগ্রাম ডাঙী জঙ্গীপুর,
কালনা কাটোয়া কান্দী বনগ্রাম ভরপুর।
ক্রুদ্ধ বক্রেশ্বর, ধেয়ে এলো দামোদর,
জলঙ্গী কোপাই কংশবতী খরতর;
রূপনারায়ণ-কূলে গর্জ্জে লক্ষ ফণা—
বৃংহিত বন্যার শত শুণ্ডের তাড়না।

নবদ্বীপ 'সমুদ্দুর' পানিত্রাসে ত্রাস,
নলহাটী তমলুক বেহালার আশ-পাশ
জল খেয়ে হাঁসফাঁস।
এ সময়ে কোলকাতায় বাস,
হে লাবণ্য, শোনায় যে রিক্ত উপহাস।

বন্যা বাজায়েছে তার দুন্দুভি নাকাড়া,
রাঙা মাটির পথ, রাঙা জলে গ্রামছাড়া।
হায় রে ধানের শীষ! সবুজ ইসারা,
সোনালী কামনা আর রূপালী তুষারা।

গ্রামছাড়া, ঘরছাড়া!
রায়মঙ্গল মাথাভাঙা মাতলা বেদিশ,
নীলু ময়ূরাক্ষী মধুমতীর হদিশ?
আশ্বিনের ভরা গাঙে মথিত বেদন,
বাঙলায় যাবে কি সেথা ঢেউ তোলে অনন্ত রোদন

মত্ত প্রবাহধারা ভাগীরথী, চূর্ণি—
মাতে দুর্জ্জয় অজয় জলধারা ঘূর্ণি।
তাতাথৈ অথৈ জলে জগঝম্প,
বিষ্ণুপুরে বীরভূমে হৃদিকম্প।
ন'দে শান্তিপুর ভাসে ভাসিছে খাগড়া,
বাক্সেই থেকে যাবে জরির নাগরা!

* * * *

তার চেয়ে যাও আজমীর,
ময়ূর-মধুর পুষ্করের তীর—
চন্দনার খঞ্জনার নৃত্যে ভরপুর।
যমুনালহরী র'বে থেমে বহুদূর।
দিগন্তে দিগন্তরাঙা, রাঙা থির নীর;
তারাগড়ে, সাবিত্রী পাহাড়ে নামে নিশীথ তিমির।
নীলনয়না "আবু"র যৌবন-চঞ্চল, সবুজের ঝলমল;
নয়নাভিরাম সে শৈলধাম,—সেথা যাবে তুমি?
বনহরিণীর ডাকে উচ্চকিত যে অরণ্য-ভূমি।
সে কোন হারানো পথ "থর" মরু প্রসারিত কোলে,
নিঝ্‌ঝুম নিশুতি রাত্রে মহাশূন্যে সপ্তর্ষিরা দোলে।
সে নিঃসঙ্গ নীরবতা দস্তুর ভয়াল;
আদিগন্ত বালুর আসনে ধ্যানমগ্ন মহাকাল।

* * * *

তাই যাও, পড়ে থাক নিরন্তর দুঃখের মিছিল;
নদী নালা খন্দখানা খাল বিল ঝিল।

বিষ্ণুপুর, কোলকাতা ন'দে শান্তিপুর, সে ত বহুদূর!
শাল সেগুন জারুল,
কুল পলাশ বকুল,
সব প'রে জলের ঘাগরা।
বাঙলায় গিয়ে কি হ'বে—
ভিজে যাবে জরির নাগরা।

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

অষ্টম সর্গ

গায়নদের চেয়ে হেমকারেরা আরো বড় চোর; চৌর্য্য-কলায় তাঁরা যোগীবিশেষ। বিস্তীর্ণ তাঁদের ধ্যান। প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী হয়েও তাঁরা জগতে খেলা দেখিয়ে বেড়ান ন্যতার। ১

সোনা,··ধন-রাজ্যের যেটি সার-পদার্থ, যেটি সম্পদে ভূষণ, বিপদে রক্ষা, যেটিকে বলা যেতে পারে পরম তেজঃ,—সেই সোনাকেও নিত্য চুরি করেন এই পাপেরা। ২

নিত্য-অশুচি চণ্ডালেরা যেমন হঠাৎ স্পর্শ ক'রেই নষ্টশ্রী করে দেন ব্রাহ্মণকে, তেমনি হেমকারেরাও স্পর্শমাত্রেই ক্ষয়িত করে ফেলেন সুবর্ণ-কে। ৩

মসৃণ কষ্টিপাথরে ধীরে ধীরে সোনা কষতে কষতে সোনার বর্ণিটিকে কমিয়ে দেখানো যাঁদের একটি কলাবিদ্যা, বিক্রয়কালে খরে কষ্টিপাথরে সেই সোনার উগ্রতা দেখিয়ে লাভের কড়ি বাড়ানোও তাঁদেরি আর একটি কলাবিদ্যা। ৪

লোক-ব্যবহার ভেদে তৌলের পাষাণ এঁদের পাঁচ প্রকারের।

কোনো পাষাণ জল টানে,
কোনো পাষাণকে ওষুধ দিয়ে থামানো হয়,
কোনো পাষাণ মোম দিয়ে জমানো,
কোনো পাষাণ বালুকা-প্রায়,
কোনো পাষাণ গরম। ৫

এঁদের "মূষা" অর্থাৎ "মুচি" ছয় প্রকারের। যে দ্বি-ভাঁজ মুচিটিতে রৌপ্যাদি ও ঔষধের পাক হয়, তাকে বলে "দ্বিপুট।" যেটিতে সোনা ফাটিয়ে গালানো হয়, তাকে বলে "স্ফোট-বিপাক।" একটির নাম "সুবর্ণ-রস-পায়িনী।"

যেটিতে সোনার রঙ বাদামী করা হয় সেটির নাম "সুতাম্র কলা।" এবং আর এক রকমের মুচি আছে যেটি কেবল সীসে, কর্পূর ও কাচের চূর্ণ গ্রহণ-বিষয়েই মজবুৎ। ৬

সোনা-তৌলীর বাটখারা এঁদের ষোলো রকমের।

(১) কোনোটি "বক্র-মুখী,"
(২) কোনোটি বিষম-পুট;
(৩) কোনোটি "সুষিরতল" অর্থাৎ তলা ছেঁদা;
(৪) কোনোটিতে পারদ রাখা থাকে;
(৫) কোনোটি পলপলে;
(৬) কোনোটির পাখনা দুটি কাঠের;
(৭) কোনোটি গ্রন্থিমতী:
(৮) কোনোটিতে লাগানো থাকে মোম;
(৯) কোনোটিতে তাগা জড়ানো;
(১০) কোনোটির মুখ ঝোঁকা;
(১১) কোনোটি বাতাসে ঘোরে;
(১২) কোনোটি সরু;
(১৩) কোনোটি ভারী;
(১৪) জোরে বাতাস করলেও কোনোটি আবার আঁকড়ে থাকে সোনার গুঁড়ো;
(১৫) কোনোটির ভিতর কীট পোরা থাকে; ৭
(১৬) কোনোটিতে আবার কীট থাকে না। ৮

এই হেমকারদের "ফুৎকার"-ও আবার ছ' রকমের।

(১) ধীর;
(২) সাবেগ;
(৩) মধ্যছিন্ন;
(৪) স-শব্দ;
(৫) পাতী;
(৬) শীকর-কারী। ৯

এঁদের "বহ্নি" ছ' রকমের।

(১) জ্বালা-বলয়ী;
(২) ধূমল;
(৩) বিস্ফোটী;
(৪) ঢিমে আঁচের;
(৫) স্ফুলিঙ্গী;
(৬) পূর্ব্বধৃত তাম্রচূর্ণের আগুন। ১০

এঁদের প্রচেষ্টা দ্বাদশ প্রকারের।

(১) এঁরা প্রশ্ন করবেনই;
(২) কথার বৈচিত্র্যের এঁদের অন্ত নেই;
(৩) কণ্ডূয়ন রোগ থাকতেই হবে;
(৪) কাপড় ধরে টানাটানি করবেনই;
(৫) দিনের বেলায় অর্ক-নিরীক্ষণ করবেনই;

(৬) হোঃ হোঃ করে হাসা চাই;
(৭) বোলতার মত ধাওয়া করবেনই;
(৮) তামাসা দেখতে ছুটবেনই;
(৯) বার বার স্বজনদের সঙ্গে বিবাদ করবেন;
(১০) জলের ঘড়া ভাঙবেন;
(১১) থেকে থেকে বাইরে দৌড়বেন।
(১২) কাঁচা ঘুঁটের আলে বসিয়ে, লবণ ও ক্ষারের অনুলেপ দিতে দিতে হাতের কাজটির উপর নকল গিল্‌টি ধরাবেনই। ১১-১৩

এঁদের চুম্বকটিকে যদি মাটিতে ফেলে রাখা হয়, তাহলেও দেখবে, সাধারণ লোহার পাত্র থেকেও এঁদের বাটখারাগুলো সেদিকে যেন মুখিয়ে দৌড়চ্ছে, কিন্তু হয়েও মুহুর্মুহু সুপূর্ণ হয়ে উঠছে তারা। বাটখারাগুলো মোমে সেঁটে যায়। সরিয়ে দেয় নিগূঢ় সোনার কণা। তারপরে পুরণের সময় আনন্দে ফিরে আসে সোনা চুরি করতে…সম্ভব। ১৪-১৫

বৎসগণ,—অত্যন্ত জলন্ত অবস্থাতেও পারার "পাতন" এঁরা জানেন। পাষাণ করা…এঁদের কাছে এক নিতান্ত সহজ ব্যাপার। সদৃশ ও বিচিত্র অলঙ্কার গড়বার সময় কেমন ক'রে সেটিকে বদলাতে হয়, হাল্কা করতে হয়, তার প্রসার দেখাতে হয়, সে বিদ্যায় এঁরা পারদর্শী। সোনাটি হাতিয়ে নিয়ে অদৃশ্য হওয়ায় এঁরা পটু। তারপরে এক মায়া ক'রে ফিরৎ দেবার কড়ার করেন। পান চড়াতে এঁরা দক্ষ। সময় নিয়ে নিয়ে সময় নষ্ট করতে এঁরা সিদ্ধ। ক্ষতিপূরণ, পাল্‌টাদাবী…বিলক্ষণ জানেন। অনেক রকমের সংযোগ, অনেক রকমের দাগ এঁদের আয়ত্তাধীনে। এই একাদশটি কলাবিদ্যাকে ছোট্ট করে বলা হয় "যুক্তি"।

এবং এঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ কলা হচ্ছে—

সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে নিশিতে অন্তর্ধান। ১৬-১৯

বিচারের ফলে হদিশ পাওয়া যায় এই চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার। এ ছাড়া হেমকারদের অঙ্গ যে সব গূঢ় কলানৈপুণ্য রয়েছে, হাজারচক্ষু ইন্দ্রদেবও সেগুলির হদিশ জানেন না। ২০

বৎসগণ, মেরু-পাহাড়ের নাম শুনেছ নিশ্চয়? তিনি এখন অতিদূরে সরে রয়েছেন! মনুষ্য-ভূমি পরিত্যাগ ক'রে, এই ঘোর চোর হেমকারদের ভয়ে দূরে চলে গেছেন। কোনো ভুল নেই। ২১

পুরাকালে একদল মূষিক,…স্বর্ণ-শৈলের শত শত সন্ধিস্থলে কোটি কোটি গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে সম্পূর্ণভাবে ঝাঁঝরা করে ফেলেছিল তাঁর শিখরগুলোকে। বিরাট মূষিকবাহিনী। এমন ভাবে তারা নখ দিয়ে কুরতে থাকে মেরুকে যে, সহসা শিথিল হয়ে যায় তাঁর মূল। তিনি অচল হয়ে পড়েন।

এত তাল-তাল সোনার মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে উপরে তুলতে থাকে মূষিক-নখর, যে ক্রমশঃ বেজায় উঁচু হয়ে ওঠেন সুমেরু। উদ্ধত স্বর্ণ-ধূলায় হলুদ হয়ে যায় দিগন্ত।

অমরের দল স্বর্গ থেকে আর্তনয়নে দেখতে পান,…শিখরগুলি জর্জরিত হয়ে গেছে! সোনার পাহাড়ের তটদেশে হাঁ করে রয়েছে বিরাট বিরাট গর্ত! কল্পান্ত উপস্থিত হচ্ছে না তো!! তাঁরা বিশেষ ভয় পেয়ে ওঠেন।

অগস্ত্য ঋষি দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন দেবতাদের। তিনি তাঁদের কাছে সমস্ত কথা নিবেদন করে শেষে বললেন—

"দেবাসুরের সংগ্রামে যে ব্রহ্মঘ্ন নিশাচরদের আপনারা নিহত করেছিলেন, তাঁরাই অধুনা ঐ মূষিক-রূপ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আরম্ভ করে দিয়েছেন মেরু-নিপাত। তারা আপনাদের পুনর্বধ্য। মুনিদের আশ্রমভঙ্গও তাঁরা করেছেন।"

অগস্ত্যমুনির নিবেদন শুনে দেবতারা আর কালবিলম্ব করলেন না, ধূম দিয়ে পরিপূর্ণ ক'রে দিলেন গর্তগুলিকে। পূর্বেই অভিশাপে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল মহা-মূষিকের দল। এবার তারা ছাই হয়ে গেল। ২২-২৮

সেই মূষিকবাহিনীই এই সুবর্ণকারেরা; পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন ধরাধামে। জন্মাভ্যাস তাঁরা ভুলতে পারেন নি। তাই রাত্রিদিন কেবল কুরে কুরে বার করেই চলেছেন…কাঞ্চনচূর্ণ। ২৯

সেই হেতুই বলছি, যখন পৃথ্বীপতিদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে রাজ্য চালনা, তখন যেন তাঁরা বিষ-মারক ও চোর-ডাকাতদের মধ্যে একমাত্র সুবর্ণকারকেই নিগ্রহ করেন,…সর্বথা ও নিত্য। ৩০

ইতি সুবর্ণকারোৎপত্তির্নাম অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গ

এই সমুদ্রমেখলা পৃথিবীতে, বৎসগণ, প্রতারকেরা…যে মায়াজাল বিস্তার করে রেখেছেন, সেটি বিশাল। ধীবরেরা এই ভাবেই জাল ফেলে ডাঙায় তোলেন নষ্টবুদ্ধি মৎস্যদের। ১।

যে প্রাণ মানুষের পরম ধন, সর্বস্ব; যেটির জন্যে মানুষের এত আয়াস, এত প্রচেষ্টা; সেই প্রাণ নিত্য যাঁদের হাতের মুঠোর মধ্যে থাকে, তাঁরা বৈদ্য। তাঁদের চিনে রাখা উচিত সকলের।

বিরহের মত তাঁরা দুঃসহ।

যতক্ষণ না দেহ ভস্ম হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ধূর্ত বৈদ্যগণ ঔষধ প্রদান করবেনই।

গ্রীষ্মের তপ্তদিনের মত তাঁরা উগ্র।

তৃষ্ণার অন্ত নেই তাঁদের।

শোষণ করে সর্বস্ব।

ঔষধের নিত্য পরিবর্তন-মূলে, এবং স্ব-বিদ্যার গবেষণা মূলে প্রথমে তাঁরা সহস্র সহস্র নরহত্যা করেন, পশ্চাতে সিদ্ধ হন বৈদ্য-রূপে। ২-৪।

গণৎকারদেরও বৎসগণ চিনে রেখো। কেউ যদি কিছু প্রশ্ন নিয়ে এল, দেখবে, গণকঠাকুর তখনি ধীরে ধীরে রাশি-চক্রের বিন্যাস নিয়ে বসবেন, হরেক রকমের মুখের বিকৃতি দেখাবেন, নাটক করবেন গ্রহ-চিন্তার এবং তারপরে বহু পরে যদি কিছু বলতে চান, তাহলে তাঁর সেই ভাষণ হবে যৎকিঞ্চিৎ।

চন্দ্রের সঙ্গে বিশাখার মিলন হচ্ছে গগনে, গণছেন বসে গণৎকার। কিন্তু লম্পট সর্পদের নিয়ে ঘরে যে চমৎকার খেলায় মেতেছেন ঘরণী, সে গণনা তাঁর আসে না। ৫-৬।

এক দল জোচ্চোর আছেন, যাঁরা প্রথম জীবনে হন উড়ন-চণ্ডী, ওড়ান পোড়ান সর্বস্ব। তার পরে তিনি হয়ে ওঠেন সোনার কাঙাল। বিনাশ করতে থাকেন সেই সব রসিক-প্রবরদের, যাঁদের ঘড়া ভর্তি-ভর্তি ধন। তাঁরা চিত্রকর। তুলিবাজীতে তাঁরা ওস্তাদ। ৭

এক দল আছেন, যাঁরা ধাতুবাদী। তাঁরা বলে বেড়ান—

"হেঃ হেঃ, আমার এই শতবেধীটি, এই সহস্রবেধীটি, সিদ্ধ। রসও বেরিয়েছে।" তাঁরা ঠক্। কী চেহারা তাঁদের! নগ্ন, মলিন, রুক্ষ, কৃশ। ৮

আর এক প্রকার ধূর্ত্ত আছেন। তিনি রাসায়নিক। জরাজীর্ণ। তামার ঘটের সঙ্গে উপমা দেওয়া চলে তাঁর মুণ্ডের। এক-মাথা-টাক-বাবুদের ট্যাঁক সমান কেশোৎপাদনের কথা শুনিয়ে। অতিকামী তাঁরা। সব সময়েই তাঁদের দুরাশা বন্ধক দেওয়া থাকে শম্বর-রমণীদের নয়নতারার আহ্লাদী শুচিতায়। বেলপাতা পুড়িয়ে হোম করতে করতে ধূমান্ধ হন অবশেষে। ৯-১০

বৎসগণ, জগতে দলে দলে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বহু ধূর্ত্ত-রত্ন। সংসারী মানুষ তাঁদের কাছে দৌড়য়, সিদ্ধির লোভে। আর সেই রত্নের···মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষাগুলোকে জাগিয়ে রেখে খেলা দেখান, বলেন—"যত্ন করলে যদি আকাশ কুসুম পাওয়া যায়, তাহলে খেচরী বিদ্যা বলে বিদ্যাধরত্ব তো অনায়াসেই লাভ করা যেতে পারে।"

"আহা বশীকরণ যাঁরা জানেন, তাঁরা তো বলেই থাকেন···মশায় হাড়গুলোর মধ্যেও নানান সিদ্ধি রয়েছে।" "আরে আরে এত ভাবনা কিসের মহাশয়,—কালো ঘোড়ার লেদি জ্বালিয়ে অঞ্জন করে নিন, সেই অঞ্জন চোখে লাগান···ইন্দ্রের ভবন দেখবেন গগনে।" তাহলে কথাটি কান পেতে না হয় শুনলেন; ব্যাঙের চর্বি ব্যবহার করুন।

মানুষের পক্ষে অপ্সরাবল্লভ হওয়া কী কথা। ইত্যাদি ভাষণে উত্তেজিত ক'রে নিরীহ মানুষদের তাঁরা পাঠান নরকে। ১১-১৩

এমন এক দল প্রতারক আছেন, যাঁরা কুলবধূদের ভুলিয়ে ভালিয়ে গৃহত্যাগিনী করাতে পারেন। পথে পথে নারীদের রক্ষা-দান করা তাঁদের অভ্যাস। অথচ রতিতন্ত্র ও কামতন্ত্র-মূলক মূল মন্ত্র তাঁদের অজ্ঞাত। ১৪

এই সব ফেরিওয়ালা গুরুরা প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত নন। ক্ষণিক মিলনের মোহ ছড়িয়ে আত্মসাৎ করেন সরল মূঢ়দের অর্থসম্পদ, এমন কি পত্নীও। তাঁরা ব্যাধের মত। ১৫

"আহা, আপনার হাতের ধনরেখাটি! শুধু বিপুলা নয়, বিপুলতরা! কিন্তু আপনার স্বামীটির···হৃদয় বড় চঞ্চল; এই হেন বচন ছাড়েন ধূর্ত্ত-শ্রেষ্ঠ, আর ধীরে ধীরে টিপতে থাকেন কুলবধূদের কমল-কোমল পাণি। ১৬

বুড়ো আঙুলটিকে জলের মধ্যে ডোবান কল্পা, আর দেখতে থাকেন···জনভ্রম! কিন্তু আসল চোরটিকে তিনি দেখতে পান না। ইন্দ্রজালের এমনই মোহ। ১৭

মন্তর নেই, তন্তর নেই, ছোট্ট একটি ধূপ জ্বালিয়েই চাকরদের বশ করে ফেলেন ধূর্ত্তেরা, আবোলতাবোল বকেন, মনিবদের মাথায় চাঁটি মেরে মজায় চালান পান-ভোজন। ১৮

"নাগার্জ্জুনের লেখা এই যুক্তিটি ধূপে জড়িয়ে কৌপীনের মধ্যে রাখুন। চুরি করতে এলেই মূর্চ্ছা যাবে চোর।" ইতি আশ্বাস দেন ধূর্ত্ত, আর আগুনে পড়ে পরের ধন। ১৯

এই কূট ধূপ-কর্ত্তাদের, বৎসগণ, চিনে রেখো। তোমরা গল্প শুনেছ তো যক্ষীপুত্র আর চোরের?···যাতে প্রত্যক্ষ ফল হয়েছিল··· দারিদ্র্য এবং রাজভঙ্গ? ২০

"বণিকটি মহাধনী। পুত্রীটিকে তিনি আবার পুত্রবৎ দত্তক নিয়েছেন। বুঝেছ হে, পুত্রীটি আবার আমার অধীনা।"··· ইত্যাদি কথার খই ফোটে ধূর্ত্তের মুখে, আর ধীরে ভোগে আসে কন্যার অর্থ। ২১

বৎসগণ, এই যে সব প্রতারক ধূর্ত্তদের কথা বলা হল তাঁদের নিয়োগ করেন শত্রুরা।

সাঙ্কেতিক তাঁদের ভাষা;
তাঁরা মর্ম-জ্ঞ,
তাঁরা হৃদয়-চোর।
মিথ্যা-বধির বা বোবা সাজা তাঁদের কাছে,···খেলা। ২২

[ক্রমশঃ।

নালন্দা

আহমদ নওয়াজ

পুরাকালের শিক্ষাগারের এই নালন্দা পীঠস্থান,
এই নালন্দায় গীত হলো বিশ্বজোড়া সাম্যগান।
ছাত্র এলেন নানান দেশের যথা, কাশ্মীর পেশাবার,
চীন, জাপান, কোরিয়া, জাভা, তিব্বত এবং সুমাত্রার।
তাহার সাথে ছাত্র এলেন মঙ্গোলিয়ার বোথারার
সাদা, কালো, পীত ও হলুদ মিশিয়ে হলো একাকার।
ব্রাহ্মণ্য আর বুদ্ধযুগের কৃষ্টি এবং শিক্ষাসার,
এইখানে হয় প্রচারিত প্রচেষ্টাতে পাল রাজার।
জ্ঞানের খনি এই নালন্দা শিক্ষার্থীর পুণ্য মঠ,
উদারতার আবাস-ভূমি মুক্ত এবং অকপট।

সাংখ্য বৈশেষিক ও ন্যায়ের দর্শন আর তত্ত্ব পাঠ,
এই নালন্দায় বসিয়েছিল স্বর্ণযুগের স্বর্ণ-হাট।
তাহার সাথে নিত্য ছিল বেদ ও উপনিষদ-বাণী,
যাহার মাঝে লুক্কায়িত সত্য আছে চিরন্তনী।
যোগ দর্শন শিক্ষার আশায় এলেন হুয়েন সাং চিনের,
শিলাভদ্রের কাছে পেলেন শিক্ষা গূঢ়-তত্ত্ব ঢের।
তখন ছিলেন শিলাভদ্র নালন্দাতে চান্ সেলার,
মহাজ্ঞানী সাধক পুরুষ, বঙ্গদেশের রত্নসার।
এই নালন্দায় দেশ-বিদেশের জ্ঞানপিপাসু পাঠক দল,
জ্ঞান সাধনায় লাভ করেছেন, মহাজ্ঞানের মহাফল।

অদ্বিতীয় এই নালন্দার জ্ঞানমার্গের ভ্রাতৃভাব,
আজও বাজে কর্ণ মাঝে, স্বর্ণযুগের সেই সারাব।

(স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী)

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আর্ত্তবন্ধু

১৮৯৪ সালের মাঘোৎসবের পর রাজগৃহ যাত্রা করা হইল। এবারও পথে পথে গান ও মার কথা বলা হইল।

বিদ্যালয়ের জন্য ও পরিবারের জন্য শ্রম নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল। মার্চ্চ মাসে শ্রদ্ধেয় দীননাথ মজুমদার মহাশয়ের কন্যা নির্ম্মলার সহিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বিনয়ভূষণের বিবাহ হয়। এ বিবাহে তোমাকে অনেক খাটিতে হইয়াছিল। গোপাল বাবুরা তোমার বাটীতেই ছিলেন। তার পর লক্ষ্ণৌ নগরীতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষের কন্যা সরলার সহিত শ্রদ্ধেয় দীন বাবু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। সেখানেও তুমি গমন করিয়াছিলে। তুমি সেখানে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী উভয়ই হইয়াছিলে। সেখানকার একটি ঘটনা মনে আছে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন হিন্দু ভদ্রলোক একটু মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। কারণ, সকল ব্রাহ্মের সঙ্গে তিনি আহার করিতে পারিবেন না। তুমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিলে, এবং আশ্বাস দিয়া তাঁহার ভিন্নস্থানে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলে। তিনি একথা এখনও ভুলেন নাই।

ইহার পর তোমার দ্বিতীয়া কন্যা সরোজিনীর বিবাহ উপস্থিত হইল। বিবাহের জন্য আমরা চেষ্টা করি নাই, কারণ চেষ্টা করা তোমার ও আমার উভয়েরই বিশ্বাস-বিরুদ্ধ ছিল। বিধাতা আপনি এ সম্বন্ধ মিলাইয়া দিলেন। কন্যা সরোজিনীকে তুমি বৈরাগিণী করিয়া গঠন করিয়াছিলে। বেশভূষা সাজসজ্জা তাঁহার কিছুই ছিল না। তিনি ধর্ম্মকেই নিজের অলঙ্কার বলিয়া জানিতেন। বরপক্ষের অভিভাবকগণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইবার সময় শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু মহাশয়ের পত্নী কন্যার ছবি পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। একা তাঁহার ছবি তুলাইলে পাছে তাঁহার মনে কিছু আশঙ্কা হয়, তাই সে সময়ে তোমার, আমার, সুবোধের ও সরোজিনীর ছবি তোলা হইল। ভাগ্যে সেদিন তোমার ছবি তোলা হইল, নতুবা তোমার একখানি ছবিও আমার কাছে থাকিত না। দেহে থাকিতে দায়ে পড়িয়া সেই একবার মাত্র কালীর ছবি লইতে দিয়াছিলে। ছবি তো তোলা হইবে, কিন্তু উপযুক্ত সাজসজ্জা করিয়া যাওয়া হয় নাই। ফটোগ্রাফার বলিলেন, সাদা কাপড়ে ছবি ভাল উঠিবে না, তাই আমার গেরুয়া গায়ে দিয়া সকলে ছবি তুলিলে। এইরূপে অপ্রস্তুত অবস্থায় ছবি তুলিয়াছিলে বলিয়া, বিশেষতঃ কন্যাকে সাজাও নাই বলিয়া, তুমি বন্ধুজনের কাছে অনেক কথা শুনিয়াছিলে।

বরকন্যা পরস্পরকে পছন্দ করিলেন, তার পর বিবাহের আয়োজন হইল। একই বেদীতে বসিয়া শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু ও ভাই শিবনাথ বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর কন্যার শ্বশুর-শাশুড়ীর নিকট হইতে সংবাদ পাইতে লাগিলাম যে তাঁহারা পুত্রবধূ পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছেন। ইহাতে আমাদের সুখের সীমা রহিল না।

কন্যার বিবাহের পর তুমি তোমার সেবার কার্য্যে আরও প্রাণমন ঢালিয়া দিলে। বিদ্যালয়ের ও পরিবারের নিয়মিত কাজ ব্যতীত দরিদ্র ও বিপন্নের সেবা করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে। দুঃখ-দারিদ্র্য রোগ-শোক দেখিলে তুমি আর স্থির থাকিতে পারিতে না। এক এক সময়ে আহার নিদ্রার অবসর থাকিত না, তবু নিজে খাটিতে ও সকলকে উৎসাহিত করিতে অবহেলা কর নাই। যতই শরীর ভাঙ্গিতে লাগিল, ততই যেন তোমার নিষ্কাম সেবা ও নির্লিপ্ত ভাব বাড়িতে লাগিল। একটা কোন বস্তুতে প্রেম আবদ্ধ না থাকিলে যা হয়, তাই তোমারই হইতে লাগিল। এদেশে নারীজীবনে যে সেবা নাই তা নয়। কিন্তু তাহা প্রায়ই স্বামী ও পরিবারের সীমার মধ্যেই বদ্ধ থাকে। তুমি যতই আসক্তির প্রাচীর ভাঙ্গিতে লাগিলে, ততই পরের জন্য ভাবিবার ও খাটিবার শক্তি বাড়িতে লাগিল। তোমার কাছে এ সময় যেমন বড় মানুষের বাটী, তেমনি দুঃখিনী বিধবার পর্ণকুটীর। সংবাদ পাইলেই দুঃখ দূর করিবার জন্য দৌড়িতে। শেষে যখন এই সেবার কাজ অনেক বাড়িয়া চলিল, আমার কাছে সব সময় জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর পাইতে না। কত দিন আমার অজ্ঞাতসারে কত রোগীর সেবা করিতে চলিয়া গিয়াছ।

একদিন রাত্রি দুইটার সময় আমার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলে, "আমি যাই।" চক্ষু খুলিয়া দেখি, তুমি আপনার মোটা সজ্জায় সজ্জিত। আমি বলিলাম, "এই শীতকালের রাত্রিতে কোথায় যাইবে?" তুমি—"বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্র বড়ই পীড়িত, দেখিতে যাইব।" ব্রাহ্মণীর আর কেহই নাই, একমাত্র পুত্র এফ এ পাশ করিয়াছিল; সেই পুত্র জ্বর রোগে এখন তখন, যায় যায়। সন্ধ্যার সময় তুমি সেবা করিতে গিয়াছিলে। চিকিৎসার্থে পরেশ বাবুকে ডাকাইয়াছিলে। আমি এ সব কিছুই জানিতাম না। আমি নিদ্রিত হওয়ার পর, রাত্রি দশটার সময় বাটী আসিয়া আহার এবং শয়ন করিয়াছিলে। তার পর এই আমাকে প্রথম জাগাইলে। আমি—"এত রাত্রে কেন যাইবে? প্রাতঃকালে যাইও।" তুমি—"বলিয়া আসিয়াছি, ডাকিলেই যাইব। অবস্থা মন্দ না হইলে ডাকিতে আসিত না।" আমি—"ঘরের গাড়ী আছে, প্রস্তুত করাইয়া, তাহাতেই যাও।" তুমি—"ঘোড়া পরিশ্রম করিয়াছে, কোচোয়ান নিদ্রা যাইতেছে, গাড়ী প্রস্তুত করিতে অনেক বিলম্ব হইবে। ততক্ষণে হাঁটিয়া রোগীর পার্শ্বে উপস্থিত হইতে পারিব।" আমি—"তবে যাও।" অনুমতি পাইবামাত্র তুমি অক্লেশে সেই ঘোর নিশাকালে পদব্রজে রোগীর সেবায় চলিয়া গেলে। সঙ্গে রোগীর বাটীর চাকর, তার হাতে লণ্ঠন। শেষ রাত্রি ৪টার সময় রোগীর দেহান্ত হয়। শব গঙ্গাতীরে পাঠান, বহনের জন্য ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করা, এসব তোমাকেই করিতে হইল। বিধুরা মাতার শোকে সন্তপ্ত হইয়া তুমি তাঁহাকে স্নান করাইলে, শয্যা প্রস্তুত করাইয়া দিলে, একটু

সরবত পান করাইয়া বাটী আসিলে। তখন বেলা ১টা, বিদ্যালয়ে যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী। উপাসনা করিয়া, একটু দুধ খাইয়া বিদ্যালয়ে চলিয়া গেলে। আহারের সময় পাইলে না।

একদিন বিদ্যালয়ে কাজ করিতেছ, এমন সময় তোমার পুত্রসম স্নেহভাজন ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া সংবাদ দিলেন, নিকটেই একজন অসহায়া নারী প্রসবের পর রুগ্না হইয়া কষ্ট পাইতেছেন, সাহায্য প্রয়োজন। কামাখ্যানাথের সঙ্গে তোমার বন্দোবস্ত ছিল যে, এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে তিনি তোমায় সংবাদ দিবেন ও সেবার জন্য লইয়া যাইবেন। প্রিয় কামাখ্যানাথ নিজেই লিখিতেছেন, "একদিন একটি ছাত্র মেডিকেল স্কুলে আমায় বলিল যে এখানকার একজন সম্ভ্রান্ত ধনীর কোন আত্মীয়া রোগে ভয়ানক কষ্ট পাইতেছেন। স্ত্রীলোকটির এক মাস কি দেড় মাসের একটি শিশু কন্যা আছে, তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিবার কোনও লোক নাই, এবং পথ্যাদি কিনিবারও কোন সম্বল নাই। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন কেহ তাঁহার সংবাদ লন নাই। ছাত্রটির মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল। দুঃখনিবারণের কি উপায় হইতে পারে, এই ভাবিয়া আমি গিয়া মাতাঠাকুরাণীকে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি আমার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ চাকরকে গাড়ী ডাকিতে বলিলেন, এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই অনাথিনী নারীর ভগ্ন কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে আসিয়াই মলমূত্র-বিশিষ্ট কতকগুলি নেকড়া, যাহা গৃহের এক ধারে জড় করা ছিল, তাহা লইয়া কাচিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তো অবাক হইয়া গেলাম। তিনি যতক্ষণ নেকড়াগুলি কাচিতে লাগিলেন, আমি গৃহ পরিষ্কারের জন্য ঝাঁটা লইয়া ঝাঁট দিতে লাগিলাম। তিনি চকিতের মধ্যে নেকড়াগুলি কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া আমার হাত হইতে ঝাঁটা লইয়া গৃহের সমস্ত আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।" গৃহটি অপরিষ্কার, এক দিকে কয়লার গুঁড়া, অন্য দিকে আবর্জ্জনা। বাবুটি কয়লার ব্যবসা করিতেন, তখন নিঃস্ব। প্রসূতি সন্তান লইয়া কয়লার মধ্যে পড়িয়া আছেন। দেখিবা মাত্র আপন গৃহে সংবাদ পাঠাইয়া দিলে। সেখান হইতে পরিষ্কার বস্ত্র, শয্যা, উপাধান চাহিয়া পাঠাইলে। যখন তুমি সম্মার্জ্জনী হস্তে লইয়া গৃহ পরিষ্কারে নিযুক্ত হইলে, বাবুটি আসিয়া আপত্তি করিলেন। তুমি বলিলে, "এ হাত থাকিয়া কি হইবে?" সত্য সত্যই দেবি, তোমার হস্ত সেবার জন্যই আসিয়াছিল। তুমিও তাহা বুঝিয়াছিলে। অল্পক্ষণ মধ্যে গৃহ পরিষ্কার হইল, শয্যা প্রস্তুত হইল, মাতা ও শিশুর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা হইল। একখানি খাটে শায়িতা হইয়া সেই নারী বলিলেন, "মা তুমি প্রাণ দান করিলে।" গৃহে গিয়া দুধ সাগু প্রস্তুত করিয়া প্রেরণ করিতে লাগিলে, ও কামাখ্যানাথকে প্রতিদিন আসিয়া চিকিৎসা করিবার ভার দিলে। সুপরিষ্কৃত সন্তানটি যখন মাতার কোলে দিলে, তখন মাতা যে হাসি হাসিলেন, তাহাই তোমার পুরস্কার। যত দিন ইনি অসুস্থ ছিলেন, প্রতিদিন দেখিতে যাইতে।

একটি বালিকা পূর্ব্বে তোমার বিদ্যালয়ে পড়িতেন। তিনি এখন বিবাহিতা। সম্প্রতি একটি সন্তান প্রসব করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের ঝি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিল। সে প্রত্যাগত হইয়া নিবেদন করিল যে, ঐ কন্যার পিতামাতা তীর্থে গিয়াছেন। বাটীতে কেবল কন্যার স্বামী আছেন। এদিকে কন্যাটির সূতিকাজ্বর হইয়াছে। গৃহে দ্বিতীয়া নারী নাই যে সেবা করেন। শুনিবা মাত্র তুমি সেবা করিতে গমন করিলে। সূতিকাগৃহের দুর্দ্দশা দেখিয়া তোমার বড় কষ্ট হইল। তুমি সেই দুর্গন্ধময় স্থান পরিষ্কৃত করিলে, প্রসূতি ও সন্তান যাহাতে আরামে থাকেন, তাহার আয়োজন করিতে লাগিলে। কন্যার স্বামী দেখিয়া অবাক হইলেন। গৃহ পরিষ্কার করা, সন্তান পরিষ্কার করা, শয্যা প্রস্তুত করা এ সকল কার্য্য যেন মুহূর্ত্তমধ্যে হইয়া গেল। ডাক্তার ডাকাইলে। যত্নের সহিত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। সেদিন তুমি অনেক রাত্রে গৃহে ফিরিয়াছিলে। তুমি অনেক যত্ন করিতে লাগিলে, কিন্তু রোগ অতি কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। প্রতিদিন তোমায় কত বার যাইতে হইত, ঠিক নাই। এত সেবা করিলে, তবু কন্যা তিন চারি দিনের বেশী জীবিত রহিলেন না। শেষ সময়ে আমিও উপস্থিত ছিলাম। রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কন্যা বলিলেন, "মা, আমাকে বাঁচাইতে পারিলেন না।"

তুমি বলিলে, "এখন ভগবানকে স্মরণ কর।" আহাহা! বালিকা তিনি, ভগবানের বিষয় কি জানেন! জিজ্ঞাসিলেন, "কাহাকে ডাকিব? কি বলিব?" তুমি বলিলে, "দয়াময় হরি, দয়াময় হরি, এই নাম কর।" সেই নাম করিতে করিতে কন্যা সন্ধ্যার পর দেহত্যাগ করিলেন। তখন তুমি স্বামীকে ডাকিয়া বলিলে, এখন ইঁহার সদগতির জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা করা হউক। তার পর গঙ্গাতীরের সুব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া গৃহে ফিরিলে।

—বাবু মুনসেফ। তিনি কাহারও সহিত আলাপ করিতে চাহিতেন না। তাঁহার একমাত্র পুত্রসন্তানের ডবল নিউমোনিয়া হইল। পুত্রের জননী তখন পূর্ণগর্ভা ছিলেন, তিনি সেবা করিতে অক্ষম। বন্ধুরা তোমাকে সংবাদ দিলেন। আমি তখন বাহিরে কাজ করিতে গিয়াছি। কিন্তু আমার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করা তখন সম্ভব নয়, তাই আমাকে না বলিয়াই যাইতে প্রস্তুত হইলে। ইত্যবসরে আমি ফিরিয়া আসিলাম। আমি তোমার সঙ্গে মুনসেফ বাবুর বাটীতে গেলাম। সন্তান একটি ছোট ঘরে রহিয়াছে, দেখিবামাত্র তুমি বলিলে, ইহাকে বড় দালানে লইয়া যাইতে হইবে। তাহাই হইল। বাজার হইতে ফ্লানেল আনাইলে, আপন বাটী হইতে ভাজা তিষি চূর্ণ করাইয়া আনাইলে। পুলটিশ দিতে লাগিলে। বেলা নয়টা কি দশটার সময় বসিলে, বেলা দুইটা বাজিয়া গেল তবুও তুমি একাসনে সন্তান কোলে লইয়া সেবা করিতে লাগিলে। তারপর কন্যা সুসার এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ফিরিয়া আসিলে তোমার আধ ঘণ্টার জন্য ছুটি হইল। বাটী আসিয়া আহার করিয়া আবার পূর্ব্বের মত সেবায় নিযুক্ত হইলে। সন্তানের মাতা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অবাক হইয়া তোমার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। বাবুদের সঙ্গে আমিও অনেক বার দেখিতে গিয়াছিলাম। মনে হইল যেন তুমি আপনার সন্তান কোলে লইয়া বসিয়া আছ। তোমার পরিশ্রম দেখিয়া তোমার স্বাস্থ্যের জন্য আমি একটু চিন্তিত হইতেছিলাম। কিন্তু হায়, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তোমার কোল শূন্য করিয়া এবং পিতামাতাকে কাঁদাইয়া সন্তান পলায়ন করিলেন। জননী যখন ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, তুমি সান্ত্বনা দিয়া বলিলে, "অধিক কাঁদিলে গর্ভস্থ শিশুর অকল্যাণ হইবে, এখন ভগবানের শরণাপন্ন হও।" ইহার পর হইতে সেই জননী গাড়ী করিয়া তোমার নিকট উপদেশ ও সান্ত্বনার জন্য বাস্ত হইয়া আসিতেন।

তিনি যেন ঐ দিন হইতে তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীর মত হইয়া গেলেন।

এদিকে এইরূপ সেবা করিতে, আবার মাসিক আয়ের টাকা পরার্থে এত ব্যয় করিতে যে অনেক সময় নিজের বস্ত্র ক্রয় করিবার সঙ্গতি থাকিত না। অতি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া লোকের বাড়ী সেবা করিতেই বা কিরূপে যাইবে, এই সঙ্কটে অনেক বার পড়িতে হইয়াছে। তোমার দৈনিকে একদিন লেখা আছে, "আজ রাত্রিতে ——র ভাইর পেটের খুব পীড়া থাকায় ১২টা রাত্রিতে ডাকিতে আইসে। তখন গেলাম না। ১টায় আবার ডাকিতে আইসে। তখন আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। খুব ছেঁড়া একখানি বস্ত্র পরিয়াছিলাম। সেইখানি পরিয়াই তাহাদের চাকরের সহিত তাহাদের বাটীতে গেলাম। খুব ভাল ঈশ্বরদর্শন হইল। মুমূর্ষু সন্তানকে একাকী লইয়া বসিয়া রহিলাম। ৫টার সময় চক্ষের সামনে আস্তে আস্তে শিশু চিরনিদ্রিত হইল। পরদিন বেলা ১টার সময় বাটী আসিয়া একাকী উপাসনা করিলাম। বড় মিষ্ট উপাসনা হইল। প্রার্থনা,—মা, সর্ব্বদা নিত্যতা অনুভব করিতে শিখাও।

কখনও কখনও কেহ কেহ মনে করিতেন, দেখাইবার জন্য তুমি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান কর। কিন্তু তাহা নয়। সেই যে প্রথম ত্যাগের মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলে, সেই হইতে কখনও ভাল বস্ত্র ভাল অলঙ্কার পরিধান কর নাই। আর তা ছাড়া, কাহারও অভাব জানিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ নিজের যা কিছু থাকিত এমন কি আমার ও সন্তানদের যা কিছু থাকিত, সবই অকাতরে দান করিতে। কাজেই কিছু থাকিত না। আমি তোমায় কিছু অলঙ্কার করিয়া দিই নাই। পিত্রালয়ের যে ক'খানি গহনা ছিল, তাও সব বিক্রয় করিয়া দান করিয়াছিলে। একবার একজন লোক বেনারসী সাড়ী বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী বসন্ত বলিলেন, "কাকীমা, একখানি সাড়ী কেন না? নিজে না পর, সরোজিনীকে একখানা ক্রয় করিয়া দেও।" তুমি সকল বস্ত্রগুলি দেখিলে, কিন্তু সকলগুলিই ফিরাইয়া দিলে। বসন্ত জিদ করিতে লাগিলেন, উত্তরে তুমি বলিলে, "একখানা কিনিলে তো হবে না, আমার দশটি মেয়ে, দশখানা কিনিতে হয়।" সত্য সত্যই পরিবারের সব মেয়েদের তোমার আপনার কন্যা মনে করিতে, তাই অসঙ্গতি নিবন্ধন আপনার কন্যাদেরও বসন ভূষণ করিয়া দিতে পার নাই। পূর্ব্বে যখন পরের কন্যাদের আপনার করিতে শিক্ষা কর নাই, তখন উৎসবের সময় নূতন বস্ত্র আনিতে, এবং আপনার সন্তানদিগকে পরাইয়া সুখী হইতে। কিন্তু যখন আপনাকে ভুলিয়া পরের মঙ্গলে নিযুক্ত হইলে, তখন উৎসবের সময় সকলের বস্ত্র ক্রয় করিতে পারিতে না বলিয়া নিজের সন্তানগুলিকেও বঞ্চিত করিতে বাধ্য হইতে। মেয়েদেরই ভাল বস্ত্র নাই, তখন তোমার আর কোথা হইতে হইবে? তুমি তাই বেহারের দুঃখিনীদের মত "মুটিয়া" বস্ত্র যত্ন করিয়া পরিধান করিতে, এবং বড় মানুষের মেয়েদের সঙ্গেও তাহাই পরিয়া দেখা করিতে যাইতে। সেই মোটা, রং করা, মাঝখানে সেলাই করা দীর্ঘ বস্ত্র পরিয়া একদিন একজন শিক্ষিতা রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে। তিনি বিলাতফেরতদের ঘরের মেয়ে। বস্ত্র দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন "এ বস্ত্র কোথায় পাইলেন?" তুমি দমিবার মেয়ে নও, অমনি বলিয়া উঠিলে, "কেন? পরিবে? বল তো ক্রয় করিয়া দিতে পারি। অমুক জায়গায় পাওয়া যায়।"

এই বৎসরের আর একটি ঘটনা মনে পড়িল। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন। এখান হইতে ডাকগাড়ীতে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিবেন। ডাকগাড়ী সকাল ৭ টায় আইসে। তুমি স্বীকার করিলে, সকালে ৬টার সময় আহার প্রস্তুত করিয়া দিবে। তিনি আনন্দিত হইলেন। আহার হইবে, উপাসনা হইবে না, ইহা তোমার প্রাণে সহিল না। লজ্জা ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসিলে, "৬টার আহার, তবে উপাসনা কখন হইবে?" শ্রদ্ধেয় মহাশয় বলিলেন, "অত সকালে কেহ কি আসিতে পারিবেন?" তুমি বলিলে, "আপনি বলিলেই সকলেই আসিবেন," যেন তুমিই সকলের কর্ত্রী। হইলও তাহাই। প্রায় সকল বাটীর স্ত্রী-পুরুষেরা ৫টার সময় তোমার দেবালয়ে উপস্থিত। গরম জল প্রস্তুত হইল; শ্রদ্ধেয় মহাশয় ৫টার পূর্ব্বে স্নান করিলেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উপাসনাগৃহ পূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন, ঊষা উপাসনা কখনই করেন নাই; তোমার চেষ্টায় তাহাও হইল। ৬টার সময় আহার করিলেন, ও ৭টার সময় যাত্রা করিলেন।

এই বৎসর গাজীপুরে গিয়া খৃষ্টোৎসব করা হইবে এই স্থির হইয়াছিল। গাজীপুরের উকীল ভাই নিত্যগোপাল রায় সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তোমরা প্রস্তুত হইলে। ছোট বড় সব যাত্রীই নারী। আমি ও ব্রজগোপাল তোমাদের সেবার্থে চলিলাম। সন্ধ্যার সময় আমরা আরা উপস্থিত হইলাম। সেখানকার ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া গেল না। তুমি অদম্য উৎসাহে সব মেয়েদের সঙ্গে লইয়া হাটিয়াই চলিতে লাগিলে। পথ অন্ধকারে আবৃত হওয়ায় একটু সাবধানে চলিতে হইল। অল্প রাত্রি হইতে না হইতে সকলে গঙ্গাগোবিন্দ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী অনেক আদর ও যত্ন করিলেন। সেই রাত্রেই তোমরা শ্রীমান্ জ্ঞানচন্দ্রের বাটীতে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকেও সঙ্গিনী করিলে। পরদিন অতি প্রত্যূষে উপাসনা ও আহার করিয়া আরা হইতে গাজীপুর যাত্রা হইল। তাড়ীঘাট হইতে দুখানি নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইয়া গাজীপুর পৌঁছিলাম। ভাই নিত্যগোপালের কতই যত্ন। খুব বড় বাড়ী, খুব বড় মন, তোমাদের আদরের সীমা রহিল না। ২৩শে রবিবার সন্ধ্যার উপাসনা ব্রজগোপাল করিলেন। সোমবারে পওহারি বাবার দর্শনার্থে গমন। তিনি পূর্ব্বদিন বাহির হইয়াছিলেন। তোমরা তাঁহার কুটীরের সম্মুখে বৃক্ষতলে বসিয়া অনেক কথা কহিলে। তাহার পর গৃহে ফিরিলে। ২৫শে তাঁবুর মধ্যে ভাই নিত্যগোপাল উপাসনা করিলেন। বড়ই ভাল লাগিল। পরদিন কর্ণওয়ালিস সাহেবের সমাধি দর্শন করিয়া তার পর নিত্য বাবুর পত্নীর পিত্রালয়ে বেড়াইতে গেলে। সেদিন তুমি থান ধুতি পরিয়াছিলে। ভগিনীর ইচ্ছা যে সধবার মত পাড়ওয়ালা কাপড় পরিধান করিয়া যাও। তুমি বলিলে যে তাহা হইলে যাওয়াই হইবে না। অবশেষে তোমার কথাই রহিল। বিধবার বেশে গেলে, কিন্তু ভগিনীর বাটীর সকলেই তোমাকে আদর করিলেন। তুমি বলিলে, বস্ত্রে কি সধবা বিধবা হয়? তোমায় থানের ধুতি পরিলে বেশ দেখাইত।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চিন্ময় যোগ বৃদ্ধি

১৮৯৪ সালে তোমার বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা আরো বাড়িল; কাযেই খাটুনিও বাড়িল; তার উপর বিপন্নের সেবার জন্ম কত আহ্বান আসিতে লাগিল, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ সকলের মধ্যে ব্যস্ত থাকিয়াও সেই চিরবাঞ্ছিত ধন চিন্ময় যোগের জন্ম মন পড়িয়া থাকিত। মায়াশূন্য আসক্তিশূন্ত হইয়া কিরূপে মার কাজ করিবে, তারই জন্ম সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিতে। মার কাজের খাতিরে তোমাকে অনেক সময় আমা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে হইত; আমি মফঃস্বলে গেলে আর তো সঙ্গে যাইতে পারিতে না। তাই আসক্তির সহিত সংগ্রাম আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল, চিন্ময় যোগের পিপাসা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে এক একদিন বলিতে, "আমার ভালবাসা শেখা এখনও হয় নাই।" আপনার প্রতি নির্ভর কখনই করিতে না; আপনার গুণ কখনই দেখিতে না, তাই তোমার দৈনিক তোমার নিত্য নব নব কাতর প্রার্থনায় পরিপূর্ণ। একদিন লিখিয়াছ, "এখনও ভালবাসা শিখি নাই। দয়াময়ী মা, তোমার ভালবাসা শিখাও। আমার ভাল রক্ত, ভাল মাংস, হাড়ের শক্তি, সকলই দিয়া সংসারের সেবা করিলাম, ভালবাসিলাম। কিন্তু তাহার ফল এখনও দেখি শূন্য। এখন কাল রক্ত, পচা মাংস, দুর্ব্বল হাড় কয়খানা দিয়া শেষ কয়টা দিন যাহা করিব, তাহা যেন তুমি গ্রাহ্য কর, ও তোমার ছেলেমেয়েরা গ্রাহ্য করেন, এই ভিক্ষা। আজি রাগ হয় নাই।" তোমার এই লেখা হইতে মনে হয়, তুমি যেন আভাস পাইতেছিলে, যে শরীর দিয়া মায়ের সেবা করিবার দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। আর তাই চিন্ময় যোগের জন্ম এত লালায়িত হইতেছিলে।

এই বৎসর একবার আমি পাটনা জেলার অন্তর্গত মিরচাইগঞ্জ নামক স্থানে গিয়াছিলাম। তখন তুমি পত্রে লিখিয়াছিলে, "কাযের স্রোত খুব বাড়িয়া চলিতেছে, এই সঙ্গে ক্রমও বাড়িতেছে, ভয় পাইও না। মা আমাদের প্রাণ আরও প্রশস্ত করুন। শরীর তফাৎ হইলেও যে যোগ কমে না, বরং পরলোকচিন্তা সহজ হয়, তবু আমার পাগল মন কেন শরীর ভালবাসে, কি জানি? অবশ্যই কোন অভিপ্রায় আছে, বুঝি! তা না হ'লে কেন ক্ষণিকের জন্ম আমাকে এত ফেলে দেয়। পরে আর তো সে ভাব থাকে না; মন খুব ভাল হয়, যোগ নিকট হয়। আজ ৪টার সময় এই কথাই মনকে ব্যাকুল করিতেছিল। কে যেন বলিল, এক সময় এইরূপ শরীর আর থাকিবে না। সেই চিন্তায় মনকে কি করিল, আত্মার যোগের জন্ম প্রাণ যেন পাগল হইল। সে যোগ এখনও হয় নাই, যাহাতে শরীর দেখিলে যেমন সুখ হয় শরীর না দেখিলেও তেমনি হইবে। আজকাল সেই যোগের জন্ম খুব চেষ্টা করিতেছি। তোমাকে নিকটে উপস্থিত দেখিলে সকল বিষয় বলিব। এখন মায়ের কৃপাকে শুভক্ষণে ধরিতে পারিলেই হয়। কত কথা আর লিখিব, শেষ তো নাই। যোগ বাড়ুক, মা তাই করুন; কারণ এ লেখাও তো আর থাকিবে না। মন চ'লে যাউক, সকল কথা বলে আসুক, এই ভাল। তুমি আর এখন মিরচাইগঞ্জে নও, এই যে আমার পাশে সত্যই আমি অনুভব করিতেছি। মা, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর, সেই যোগ দাও।"

এই সময় কোনও শ্রদ্ধেয়া ভগিনীকে লিখিয়াছিলে, "কয় দিন নেওরায় খগোলের ভাই-বোন সহ খুব ভাল কাটাইলাম। কাল এখানে আসিয়াছি। আর শেষ কটা দিন নিস্তব্ধ থাকিবেন না। একবার আগুনটা খুব ভাল ক'রে জ্বেলে দিন। আর যে বিলম্ব সয় না; কবে কি হইবে? খুব ধূমধাম লাগান না। দিন যে গেল। মা এবার চরিত্র ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছেন। কে তাহার সেই সাধ পূর্ণ করিবে? মাতা ও পৃথিবী ও ভক্তগণ আমাদের উপর বড় বেশী আশা করিয়াছেন। এবার শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু মহাশয় একই কথা বলিলেন যে, এইখানেই সেই দল হইবে, যে দলের ছায়ায় লোকে শান্তি পাইবে। দিদি, এ কথা শুনিলে ভয় হয়, কিন্তু মাও ছাড়িতেছেন না। আর এক কথা শুনিলাম যে নারীর ধর্ম্ম না হইলে ধর্ম্ম থাকিবে না। তবে উঠুন, আর বিলম্ব করিবেন না। আমরাই যদি প্রতিবন্ধক তবে আর দেরী করা উচিত নয়।"

আর একবার আমি মফঃস্বলে গেলে আমাকে লিখিয়াছিলে, "পিকু! তুমি এবার আশ্চর্য্যরূপে নিকটে বাস করিতেছ। এইরূপ নিকটে দেখিতে পাইলে আমার আর কিছু বলিবার নাই। মন খুব ভাল। কাজ বেশ করিতে পারিতেছি। লিখে আর এখন কথা শেষ হয় না। চিন্ময় কথাই ভাল। এখন তুমি জলে আমি স্থলে। —র মা ভক্তিকে বলিয়াছেন, সুবোধের বাবা, মা যখন একত্র যান, কেমন বেশ দেখায়, যেন ভাই-বোনের মত। যাকে যে ভালবাসে, তার সকলই তার ভাল লাগে।" যোগেই এ প্রফুল্লতা হয়। দুঃখের বিষয় এ চিন্ময় যোগ সর্ব্বক্ষণ থাকে না। দুর্ব্বল মানুষ, জড় শরীর না পাইলে তাহার মন ওঠে না। জড়েই ভুলিয়া থাকিতে চায়। তুমিও তো মানুষ ছিলে, তোমারও ঐ দশা হইত। যোগে বঞ্চিত হইলে তোমার কি কষ্ট হইত, নিয়োদ্ধৃত পত্র পড়িলে বুঝা যায়। এখন ৪টা বাজিয়া ১৫ মিনিট, এই স্কুল হইতে আসিলাম। সভার জন্ম প্রস্তুত হইতেছি। আজ একটি গুরুভার মাথায় লইতে যাইতেছি। কি হইবে জানি না। ফল মায়ের হাতে। তুমি এ সময় প্রার্থনা করিও; মা আশীর্ব্বাদ করুন। কা'ল গাড়ী যখন বাড়ী মুখে ফিরিল, অমনি চক্ষু দিয়া অনেকখানি জল পড়িল। আর বাধা দিলাম না। ফাটকের বাহিরে আসিতে আসিতে পরলোকের ছবিখানি মা হাতে লইয়া দেখা দিলেন, আর সেই ছবি দেখিতে দেখিতে সমস্ত পথ বেশ এলাম। কাল সমস্ত সময় আর আজ এ পর্য্যন্ত সেই ছবিখানি আমার সামনে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বেশ দিন কাটিল। আশা করি তোমারও তাই। আর আমার শরীরের জন্ম ব্যাকুলতা নাই। এখন দর্শনে পৌঁছিয়াছি। এখন প্রাণ দর্শনের জন্ম ব্যাকুল হয়, এইতো এবার বুঝিতেছি।

একবার আমি গঙ্গাতীরে সুন্দর শোভাময় স্থানে একটি বাঙ্গালাতে ছিলাম। ইচ্ছা হইল, তুমিও আসিয়া সে শোভা দর্শন কর। তোমাকে লিখিলাম। উত্তরে তুমি লিখিলে, "চিরমুক্ত! এবার বেশ আছি। কোনও রূপে মন উদাস নয়। এ কাজ আমার পবিত্রাণের জন্ম। এই কয় দিনে শরীরের আসক্তি বিষয়ে অনেক উপকার দেখিতেছি। মার কৃপায় আশা করি মুক্ত হইব। এমন মন আর কখনও ছিল কি না মনে নাই। যে নির্ভর করে, তার এইরূপই হয়। আমি গেলে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যাইতে হয়।

তাই ভাবিতেছি, দেখি কি হয়। যদি যাই সন্ধ্যার সময়। আহারাদির কোন যোগাড় করিও না। যাওয়ার ঠিক নাই। যদি যাই, আহার করিয়া যাইব। আশা করি, মার কোলে তুমি ভাল আছ। এবার তুমি বড় নিকট। তবে বিদায়।" পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে যদি একটা বিস্তৃত সমতল ভূমি পাওয়া যায়, তাহা হইলে মনে হয়, বুঝি এই শেষ, বুঝি আর উঠিতে হইবে না। যোগ-রাজ্যের সেইরূপ এক ভূমিতে তুমি এই সময় উঠিয়াছিলে; সুতরাং তোমার দুঃখ নাই। তখন তুমি প্রিয়জনকে নিকটেই দেখিতেছিলে, আর কাঁদিবে কেন? কিন্তু অনন্তের রাজ্যে তো কাহারও কখনও নিস্তার নাই। "হইল না" একথা বলিতেই হইবে, নইলে অনন্ত উন্নতি একটা কথার কথা মাত্র, যখন ঈশ্বর যোগভূমিতে লইয়া যাইতেছেন, তখনও কত তর্ক, কত আশঙ্কা! মন কখনও কত তোলপাড় হইত তাহা এই পত্রে বুঝা যায়। "কাল গাড়ীতে আসিতে আসিতে ভাবিতেছিলাম, অসুস্থ পিকুর সেবা করিতে কে দিতেছে না? আমার হাত পা কে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন? উত্তর আসিল, 'মালিক এই হুকুম দিয়াছেন।' কোথাও কেহ নাই, অথচ এই শব্দ আসিল, অমনি মাথা হেঁট করিয়া 'বস' বলিলাম। স্কুলে আসিয়া অনেক বার স্মরণ হইল। স্মরণের বেড়ার ভিতর তুমি খুব উজ্জ্বল ভাবে ছিলে। সন্ধ্যার সময় উপাসনা করিয়া একবার চুপ করিয়া একাকী থাকিতে ইচ্ছা করিল। নিজের বিছানায় চুপ করিয়া শয়ন করিলাম, এবং তোমাকে খুব নিকটে দেখিয়া দূরত্ব যেন ভুলিয়া গেলাম। অনেক আলাপ করিলাম। ঐ যাহা গাড়ীতে হইয়াছিল তাহা তোমার কাছে বলিলাম, ও আরো বলিলাম, আমার যে তোমার সেবা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। এইরূপে অনেক আলাপে খুব আরাম পেলাম। কিন্তু তোমার নূতন স্থানে হয় তো কষ্ট হইতেছে ইত্যাদি ভাবিয়া মনটা আবার একটু কেমন করিল; কিন্তু আমার ইচ্ছা তো কিছু নয় এই বলিয়া প্রার্থনা করিলাম। পিকু! এইরূপে আমার যে তপস্যা হইতেছে, মনে হয় তাহা কিছু কম নয়। এতেই আমার জীবনকে লইয়া যাইতেছে।"

আর একবারের পত্র এই, "কাল যেরূপ দেখিলাম তাহাতে আশা বাড়িল। যেমন কাপড় পরিলাম, অমনি যেন কর্ত্তব্যের ভিতর পড়িলাম আর আসক্তি মায়া কোথায় চলিয়া গেল। বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিলে। যেমন করিয়া তুমি আমার মায়া পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হও, তেমনি করিয়া তোমার মায়া ভুলিয়া আমি অগ্রসর হইতে কাল পারিয়াছিলাম। আশা হইতেছে যে আমিও মায়ামুক্ত হইতে পারিব। আর কি বলিব। আমার মন সুখী। আমার আর কি সুখ। মার এবং তোমার ইচ্ছা পালনই আমার সুখ। তবে এখন বিদায়।"

২০শে অক্টোবর তোমাকে আমার সঙ্গে মফঃস্বলে চলিতে বলিলাম। কর্ত্তব্যের জন্য এবারও তুমি যাইতে পারিলে না। আমার মনে হইল, তবে একাকীই যাইতে হইবে। ওদিকে তুমি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছ, "আমাকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করায় আমি ইচ্ছা সত্ত্বেও যাইব না বলিলাম। কারণ, আমার সুখের জন্য অনেক কর্ত্তব্য নষ্ট হয়, অতএব কি করিয়া যাইব? গেলাম না বটে, কিন্তু মন আমার তাঁহারই সহিত চলিয়া গেল। আমি বেশ বুঝিলাম আমার মনও গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী চলিয়া গেলে উপরে আসিয়া আজকার ডায়েরী লিখিলাম। প্রায় ১১ ঘণ্টা আমি জাগিয়া থাকি। এ সময়ের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বশুদ্ধ দুই কি তিন ঘণ্টা অঃ প্রঃ আমার মনে থাকেন না। আজ বড়ই মনটা কেমন করিতেছে, কি জানি! মা, তুমি তাঁহাকে কোলে কর।"

১ই নভেম্বর লিখিয়াছ, "কাল সন্ধ্যার সময় উপাসনার ঘরে একাকী বসিয়া পরলোকের কথা ভাবিতেছিলাম। তুমি অবশ্যই ছিলে। মনে হইল যেন তুমি অনেক দূর দেশে গিয়া পড়িয়াছ। তাহাই সত্য। কারণ নিকটে থাকিলে সংবাদ পেতাম। নিজ দেশে গেলে আর তো কাগজে সংবাদ আসিবে না। তখন তার ভিন্ন আর সংবাদের উপায় থাকিবে না। তারটা পরিষ্কার চাই। ব্রহ্মরূপ তার সাফ না করিলে সংবাদ দেওয়া বড় কঠিন। সেই তার কিসে পরিষ্কার রাখি এই কথাই আজ উঠিল। এই ভাবেই উপাসনা হইল। ইচ্ছা করিতেছে, জিজ্ঞাসা করি কবে আসিবে। কিন্তু করিব না, কেন না সে দেশে গেলে তো আর ঐরূপ কথা ব্যবহার হইবে না। যাক্ আর না, বিদায়। তোমার অঘোর।"

১২ই ডিসেম্বর লিখিয়াছ, "আজ স্বামী মহাশয় বাহিরে গেলেন। ৪টার সময় আমি আবার শয়ন করিয়া ঘরের দিকে চেয়ে দেখি সব খালি। সহজেই মনে হইল, মানুষ নাই। একে তো মৃত বলি না, বলি অনুপস্থিত। মৃতকে তবে আর মৃত বলিব না, অনুপস্থিত বলিব। উপাসনায় গেলাম। যোগ যে বাড়িতেছে বেশ বুঝিতে পারিলাম। প্রার্থনা ছিল, আত্মা দূরে গেলে যেন অনুপস্থিত বলি, আত্মা মার নিকট গেলেও যেন অনুপস্থিত বলিতে পারি। মা তাই আজ ভিক্ষা যে, অদর্শনে যেন বলিতে পারি, অনুপস্থিতের দর্শন দাও।"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পতাকা বহনের শক্তি

অনেক দিন পরে সঙ্গীতে শুনিলাম, "তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।" ১৮১৫ সালে তোমাকে নারীজাতির সম্মানের পতাকা অনেক বিরোধ ও বিসম্বাদের মধ্যে বহন করিতে হইয়াছিল, এবং দেখিলাম সত্য সত্যই তুমি সে পতাকা বহনের জন্য বলও লাভ করিয়াছিলে। শুধু এই পতাকাই নয়, এই বৎসরের মধ্যে তোমাকে শোকের ক্রসও বহন করিতে হইয়াছিল।

১৮১৪ সাল হইতেই তুমি মাঝে মাঝে পরলোকগত গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বাটীতে যাইতে। এইরূপে তাঁহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপিত হইতেছিল। তুমি তাঁহার বৃহৎ প্রাসাদে যখন তোমার সেই বেহারের সাড়ী পরিয়া যাইতে, তোমায় বেশ দেখিতে লাগিত। প্রথম প্রথম উঁহারা কেহ তোমার সঙ্গে দেখা করিতে তোমার বাড়ী আসিতেন না। কিন্তু তুমি তাহাতে কিছুই দুঃখিত হইতে না। কারণ তুমি সাংসারিক ভদ্রতায় চলিতে না, বা অহঙ্কারমূলক আত্মসম্মানবোধেরও ধার ধারিতে না। পরে যখন উঁহাদের বাড়ীর মহিলারা তোমার পরিবারকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন, ও যখন তোমার বিদ্যালয়ের সংস্রবে মাঘোৎসবের সময় tableau vivent (ট্যাবলো অভিনয়) করিবার কথা হইল, তখন উঁহারাও ঘন ঘন তোমার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এইরূপে উঁহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়িয়া গেল।

এত বড় একটি ব্যাপার সম্পন্ন করিতে সঙ্কল্প করিলে, কিন্তু তোমার নিজের তো সব জানা ছিল না যে, কি করিয়া কাকে সাজাইতে হইবে ও শিখাইতে হইবে। পরলোকগত গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ তোমার প্রধান সহায় হইলেন। শেখান, সাজান, সব সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। ক্রমে তোমাদের উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। যাহারা শিখিতে লাগিল তাহাদেরও খুব উৎসাহ হইল। দেখা গেল, সাজসজ্জা, গান ও আবৃত্তি অতি সুন্দর হইবে। অবশেষে অভিনয় দেখাইবার দিন আসিল। সে দিন তোমাদের কি ব্যস্ততা, কতই উৎসাহ, কতই আনন্দ! শুধু আনন্দ নয়, ইহার সঙ্গে কিছু কিছু মানসিক উত্তেজনাও ছিল, কারণ এক শ্রেণীর লোকে ইহা পছন্দ করিতেছিলেন না। তাঁহারা তোমার উচ্চ উদ্দেশ্য বুঝিলেন না; এ সব করা বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়া সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

প্রথমে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত গান করা হইল। তারপর স্বর্ণমুকুটভূষিতা, রক্তবস্ত্রপরিহিতা পদ্মাসনা লক্ষ্মী পদ্মবনে দেখা দিলেন। নেপথ্যে লক্ষ্মীর স্তব গান হইতে লাগিল। ইহার পর আবৃত্তি; তারপর আবার শ্বেতপদ্মবনে শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা বীণা-পুস্তকহস্তে সরস্বতী দেখা দিলেন, ওদিকে নেপথ্যে সরস্বতীর স্তুতিগান হইতে লাগিল। তারপর আবৃত্তি; তারপর ব্যাঘ্র ও সর্পময় বনে লুণ্ঠিত অঞ্চলে ঊর্দ্ধনেত্রে যোড়করে ধ্রুব দেখা দিলেন। নেপথ্যে সঙ্গীত হইতে লাগিল, "বিজন কাননে সুনীতি তনয় কাঁদে কোথা হরি ব'লে, দু নয়নে ধারা বয়।" তারপর ফুলের বাগানে আসিয়া দুটি বোন, প্রকৃতির রচয়িতা কে? এই প্রশ্ন বিস্ময়ের সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিল। তারপর বৃক্ষমূলে পাশবদ্ধ রাজকুমার প্রহ্লাদ ঊর্দ্ধমুখে নতজানু হইয়া দেখা দিলেন। নেপথ্যে প্রহ্লাদের উক্তিসূচক সঙ্গীত হইতে লাগিল। তারপর সঙ্গীত, "There is a happy land, far far away." তারপর কমণ্ডলু রুদ্রাক্ষমালা গৈরিক ও জটা চিহ্নিত "ধর্ম্ম", ঊর্দ্ধনয়না কৃতাঞ্জলি পুষ্পমুকুটধারিণী "ভক্তি", ও ক্রোড়ে পুস্তকধারিণী বাম হস্তে ন্যস্তশীর্ষা চিন্তানিমগ্না "বিদ্যা" দর্শন দিলেন। তার পর ক্রমশঃ অভিমানিনী বালিকার আবৃত্তি, বিচিত্র দেশে ছয় ঋতুর আবির্ভাব ও এক বালিকার অপর বালিকাকে সান্ত্বনা প্রদান, এ সকল হইয়া গেল। সর্ব্বশেষে সঙ্গীত হইল, "না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

এই দিন সকালে ব্রাহ্মিকা সমাজ ছিল। সেখানে তোমাকে উপাসনা করিতে হইয়াছিল। তার পর সারাদিন তোমরা ট্যাবলোর জন্ত খাটলে। বাহিরের অনেকে তো তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেনই, অবশেষে তোমার স্বমণ্ডলীভুক্ত এক ভাই বলিলেন, তোমার সকল কাজেই বাড়াবাড়ি ও তোমার আচরণ বাজারের স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুলনীয়। সেদিন তুমি রাত্রিতে আসিয়া আমার বক্ষে মাথা রাখিয়া অনেক ক্রন্দন করিলে। আমরা উভয়ে প্রার্থনা করিলাম, তার পর মনের ভাব চলিয়া গেল।

শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সে বার বিদেশ হইতে প্রচার করিয়া কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন। উৎসবের দিনই তাঁর বাঁকিপুর ষ্টেশন দিয়া মেল ট্রেণে চলিয়া যাইবার কথা। তুমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলে। বিকাল ৪ টার ট্রেণে সদলবলে দানাপুরে উপস্থিত হইলে। সেখান হইতে একখানি গাড়ী মেল ট্রেণের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইবে, তাহাতে তোমরা সকলে বাঁকিপুর পর্য্যন্ত আসিবে, এই বন্দোবস্ত করা গেল। মেল ট্রেণ দানাপুর ষ্টেশনে আসিবামাত্র সকলে মিলিয়া শ্রদ্ধেয় মহাশয়কে সেই গাড়ীখানিতে লইয়া আসিলেন। তাঁহার গলায় পুষ্পমাল্য দেওয়া হইল, পুষ্প ও সুগন্ধ বৃষ্টি করা হইল, অভ্যর্থনাসূচক একটি কবিতা আবৃত্তি করা হইল। পরে প্রার্থনা হইল। বাঁকিপুর ষ্টেশনে গাড়ীখানি কাটিয়া দেওয়া হইল। শ্রদ্ধেয় মহাশয়কে লইয়া মেল ট্রেণ চলিয়া গেল, আমরাও ষ্টেশন হইতে উপাসনা-মন্দিরে আসিলাম।

এই যে আমরা শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিতে গেলাম, ইহাতে অনেকে মন্দ বলিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, উৎসবের দিনে মানুষকে বড় করা কেন? মানুষকে, বিশেষতঃ যে ব্রহ্মসন্তান বিদেশ হইতে ব্রহ্মনাম প্রচার করিয়া ফিরিতেছেন তাঁহাকে, আদর করিলে যে উৎসব করা হয়, একথা ভক্তিহীন ব্রাহ্মসমাজ অনেক বিলম্বে বুঝিবেন। যাহা হউক, এবার বেশ ধুমধামের সহিত উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। ট্যাবলো অভিনয়ের পরের দিন (২৭শে জানুয়ারী) আমাদের দুজনের আধ্যাত্মিক বিবাহোৎসবও হইয়া গেল।

এ বৎসর তোমার জন্ত নিন্দা ও সমালোচনা প্রচুর পরিমাণে অপেক্ষা করিতেছিল। এই সকল ব্যাপারের পরই রাজগৃহ যাত্রা করিলে। পথে একখানি গাড়ী উল্টিয়া গিয়া কয়েক জন আঘাত প্রাপ্ত হন, তাই প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলাম, বুঝি আর যাওয়া হইবে না। কিন্তু যাওয়া তো হইলই, অন্তান্ত বারের মত এবারেও মেয়েরা পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গেলেন। ইহার জন্ত চিরপ্রচলিত যা নিন্দা তা হইল। তার পর বাঁকিপুরে ফিরিয়া আসিয়া স্কুলের প্রাইজ দিবার সময়, মেয়েরা কোথায় বসিবে, কি ভাবে প্রাইজ আনিতে যাইবে, ও পর্দ্দা হইবে কি না, এ সব বিষয় লইয়া অনেক আলোচনা ও সমালোচনা হইল। মাঝে মাঝে তোমাকে একটু উত্তেজিতও দেখিতেছিলাম।

যাহা হউক, এ সব ব্যাপার শেষ হইয়া গেল, তার পর তোমার বিদ্যালয়ের কায, পরিবারের কায, ও পরসেবার কায আবার নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল। কিন্তু এ বৎসর তোমার শরীর বড়ই ভাঙ্গিতে লাগিল। তুমি বলিতে, "ভাঙ্গা শরীর আর বসাইয়া রাখিয়া কি হইবে?" একদিনও বসাইয়া রাখিতে চাহিতে না, একদিনও নিয়মিত কাযগুলি ছাড়িতে চাহিতে না। এই ভাবে কায করিতেছ, এমন সময় মার্চ্চ মাসে আর একটি ঘটনা ঘটিল। সন্ন্যাসীচরণ রায় নামক একটি যুবক আসামে চা-বাগানে কায করিতেন। তাঁর নামে মিথ্যা চুরির মোকদ্দমা লাগান হওয়াতে তিনি হঠাৎ ভীত হইয়া চা-বাগান হইতে পালাইয়া দানাপুরে চলিয়া আসেন। এখানে তাঁহার নামে ওয়ারাণ্ট আসে, ধৃত হইয়া তিনি এখানকার জেলে প্রেরিত হন। তুমি জেলে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলে। তাঁহার মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া তোমার বিশ্বাস হইল যে তিনি নির্দ্দোষ। তখন হইতেই তুমি তাঁর মুক্তির জন্ত উদ্যোগী হইয়া পড়িলে। তুমি তাঁর জন্ত এত ব্যস্ত হইলে যে মানুষ আপন সন্তানের জন্তও এত হয়

কি না সন্দেহ। তাঁর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলে। যখন তাঁহাকে কয়েদ' অবস্থায় আসাম লইয়া যাওয়া হইল, তখন ব্রজগোপালকে তাঁহার সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দিলে। ব্রজগোপাল নওগাঁতে গিয়া উকীল শ্রীযুক্ত রামদুর্লভ মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে উঠিলেন। তিনি অনেক যত্ন ও সাহায্য করিলেন। অবশেষে সন্ন্যাসীচরণ দণ্ডমুক্ত হইলেন। যতদিন না তাঁহার মুক্তি হইল, তুমি প্রতিদিন তাঁর জন্য কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতে। প্রথমে নিম্নতর বিচারালয়ে তাঁর দেড় বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। যখন এ সংবাদ তারযোগে এখানে পৌঁছিল তখন বাগানে উপাসনা হইতেছিল। তুমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া যে প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা কখনই ভুলিব না! পরে যখন আবার তারযোগে মুক্তি সংবাদ আসিল, তখন তোমার আনন্দ আর ধরে না। সন্ন্যাসীচরণ এই সূত্রে তোমার চিরদিনের আপনার হইয়া গেলেন। সুবোধের ন্যায় তিনিও যেন তোমার এক পুত্র হইয়াছেন।

এদিকে তোমার পরিবার বাড়িতে লাগিল। আয় কিন্তু বাড়িল না। যাঁহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা সে মাসের মধ্যেই দিতে, বাজারে ঋণ করিতে না। এ অবস্থায় সংসার চলে কিরূপে? একবার অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়া মেয়েদের কাছ হইতে তাহাদের হাত খরচের টাকা হইতে ধার লইয়াছিলে। সে টাকাও তুমি নিজেই তাঁহাদের দিয়াছিলে, কিন্তু সেই নিজের প্রদত্ত টাকা ধার লইয়াও তোমার মনে পরে অত্যন্ত অনুতাপের যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল। একবার মাত্র এরূপ করিয়াছিলে, আর কখনই কর নাই। এ বৎসর তোমার বিশ্বাস আরও উজ্জ্বল হইয়াছিল। একদিন তুমি লিখিয়াছ, "আমি যেন এই পরিবারের জন্য ভাবি না। আমার সকল ভার তুমি লও। আমার ভাই বোন আমার এই পরিবারের জন্য ভাবিতেছেন। আজ আমার পরিবারে একটা পয়সাও ছিল না। সকালে একটি ভগিনী পুরান কাগজ বিক্রয় করিয়া ১।/০ আনা দিলেন। বৈকালে আবার একটি কন্যার বাবা ১১৲ টাকা নিজে আনিয়া দিলেন। তিন জোড়া বস্ত্রের ও অন্যান্য খরচের বড় দরকার হইয়াছিল। এ ১২।/০ দান পাইয়া ধন্যবাদ করিলাম মাকে। এইরূপে এই বৎসর মা নিজে আমার সকল অভাব পূর্ণ করিতেছেন।" এ তো নূতন কথা নয়। মানুষের বুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায় না, বিশ্বাসী তাহা সরল বিশ্বাসে বুঝেন। যখন পরিবার বাড়িতে লাগিল, আমি একটু আপত্তি করিয়াছিলাম। তুমি বলিলে, "তাহাও কি হয়? মেয়ে আসিলে ফিরাইয়া দিব কিরূপে?" আমি আর কিছু বলিতাম না। তোমার বিশ্বাসকে অতিশয় মান্য করিতাম। কিন্তু তোমার সহকারিণীগণ অনেক সময় পারিয়া উঠিতেন না। একদিন তুমি লিখিয়াছ, "আজকাল অত্যন্ত সাংসারিক অভাব। কর্ম্মকারিণীরা অনেকে বকেন। সব হাসিয়া উড়াই, কখনও চুপ করিয়া থাকি। আশ্চর্য্য, একদিন কিছুই ছিল না। ঐরূপ বকুনি ও হাসির পর একজন কর্ম্মকারিণী নীচে হইতে হাসিতে হাসিতে ৫টা দানের টাকা পাইয়া লইয়া আসিলেন। ঐ টাকা পাইবার সে দিন কোন কথা ছিল না। ঐ টাকা দেখিয়া মাকে ধন্যবাদ দিলাম। পরিবারে বিশ্বাস বাড়িল।"

২৩শে আগষ্ট রাত্রিতে তোমার কন্যা সরোজিনীর একটি পুত্র সন্তান হইল। এই প্রথম দৌহিত্র; তাহার সুন্দর মুখখানি তোমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কন্যার সেবা করিতে গিয়া তুমি নিজে অসুস্থ হইয়া পড়িলে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তোমার শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

এই বৎসর আসানসোলে একজন নারীর প্রতি অত্যাচার হয়। তুমি সংবাদ পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলে না। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কে এ বিষয়ে পত্র লিখিয়াছিলে। অবশেষে ছোটলাট-পত্নীকেও পত্র লিখিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলে। লেডী ইলিয়ট মনোযোগী হওয়ায় অত্যাচারীর ৫ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল।

এই বৎসর হইতে তোমার বাটীতে একটি অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিলে। তোমার অবর্ত্তমানে তোমার পরিবারের কন্যারা এখনও ইহা পালন করিয়া থাকেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন সব ভাইদের ডাকিলে। ভাইদের নামের প্রথম অক্ষর এক এক খানি রুমালের কোণে লেখা হইল। একদিকে ভাইয়েরা সমাদর লাভ করিবার জন্য বসিলেন, অপর দিকে ভগিনীরা সমাদর করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ভগিনীদের পক্ষ হইতে একটি ছোট মেয়ে সকলকে ফোঁটা দিলেন। সঙ্গীত হইল, তুমি প্রার্থনা করিলে। তার পর সকলকে জলযোগ করান ও নামাঙ্কিত রুমাল উপহার দেওয়া হইল। এ অনুষ্ঠানটি আমার অতি সুন্দর লাগিয়াছিল। এখনও বাঁকিপুরস্থ মণ্ডলীর এটি একটি বিশেষ প্রিয় অনুষ্ঠান।

নবেম্বর মাসে তোমার স্বাস্থ্য আবার ভগ্ন হইয়া পড়িল, কিন্তু কায কিছুই কমাইলে না। এই সংগ্রামের মধ্যে তোমার জন্য ভগবান আর একটি গুরু ভার ক্রস্ পাঠাইলেন। তাহা বহন করিতে গিয়া তুমি তোমার বিশ্বাসের শক্তির পরিচয় আশ্চর্য্যরূপে দান করিলে। ডিসেম্বর মাসে তোমার আদরের দৌহিত্র পীড়িত হইল। কন্যা সরোজিনী কখনও এত শক্ত সেবা করেন নাই, কাযেই তোমার পরিশ্রম বাড়িতে লাগিল। বন্ধুরা ব্যস্ত হইলেন, ও সাহায্য করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে উমাচরণ বাবু জাগিতে আসিতেন। তাঁহার পত্নীও আসিতেন, ও শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ দান করিতেন। রোগ বাড়িয়া চলিল, ইহার মধ্যে মাস শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, অর্থের গুরুতর টানাটানি পড়িয়া গেল। রোজ ৪।৫ টাকা ব্যয় হইতেছিল, আয়ের জন্য কোনও পথ ছিল না। ২৩শে ডিসেম্বর আমার অত্যন্ত চিন্তা হইল। তুমি প্রায়ই খোকার কাছে উপরের ঘরে থাকিতে। সেদিন সকাল বেলা একটু অবকাশ পাইয়া ভাঁড়ার দেখিতে গেলাম। সেখানে তোমাতে আমাতে যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

আমি—এত খরচ হইতেছে, এখন তোমার অর্থের সম্বল কিরূপ?

তুমি—আছে। (পাছে চিন্তিত হই, তাই অভাব থাকিলেও আমাকে জানাইতে না।)

আমি—ও আমি বুঝি না। আজ তোমার হাতে কত আছে?

তুমি (একটু হাসিয়া)—এক টাকা।

আমি—কি বলিলে? ৪।৫ টাকা নিত্য ব্যয়, আর আজ সকালে তোমার হাতে এক টাকা মাত্র?

তুমি আবার বিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলে—ভাবিও না, হইয়া যাবে।

আমি—আমি বুঝিতে পারি না, তুমি কিরূপে স্থির আছ।

এই বলিতে বলিতে ঘরের বাহির হইলাম, ও চিন্তাকুল হইয়া বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় বড় রাস্তায় কেহ ডাকিল "বাবুজী, বাবুজী।" বাহিরে গিয়া দেখি একজন পোষ্ট-পিয়ন মণিঅর্ডার লইয়া আসিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, পরিবারের তিনটি মেয়ের জন্য কোন অপরিচিত বন্ধু খরচ পাঠাইয়াছেন। তাহাদের জন্য আর কখনই খরচ আসে নাই, পূর্ব্বেও নহে, পরেও নহে। যেদিন বিশেষ অভাব সেই দিনই ৩০টি টাকা আসিয়া উপস্থিত। টাকা লইয়া তোমার হাতে দিলাম। তুমি যেন বিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কি বলিলে তাহা কি তোমার মনে আছে? তোমার না থাকিতে পারে, কিন্তু আমি কেমনে ভুলিব? তুমি এইমাত্র বলিলে, "দেখলে?" বিশ্বাসের জয় হইল, আমি হার মানিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে আমারও অবিশ্বাস ও সঙ্কোচ দূর হইল।

২৪শে ও ২৫শে খোকার রোগ খুব বাড়িল। ঘরেই খৃষ্টোৎসব হইতে লাগিল। ২৫শে খোকাকে ফেলিয়া উপাসনার গৃহে আসিতে পারিলে না। ২৬শে উপাসনা উপরের ঘরেই হইল। তুমি খোকাকে কোলে করিয়া উপাসনা করিলে। ২৭শে এই প্রার্থনা করিলে, আমরা যেন শিশুর রোগের মধ্যে সকলেই ক্রুশ বহন করিতে পারি। তুমিও এখন বুঝিলে, খোকা থাকিতে আসে নাই। বেশ প্রস্তুতি হইতে লাগিল। জামাতা জ্ঞান আসিলেন, খুব চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিছুতেই কিছু হইল না। ৪ঠা জানুয়ারী (১৮১৬) অমর যাত্রী অমর ধামে চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে ১লা জানুয়ারী পরেশের বাটীতে নববর্ষের উপাসনা হইয়াছিল। সেদিন বন্দোবস্ত করিয়া তুমিও গিয়াছিলে।

৫ই জানুয়ারী অনেক বড় বড় গোলাপ ফুলে খোকাকে সাজাইয়া লইয়া যাওয়া হইল। গোলাপ ফুলের মধ্যে খোকার মুখখানিও একটি গোলাপের মত দেখাইতেছিল। অনেক দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, তোমাকে শ্মশান দেখাইব। তোমার খোকা আগুনে পুড়িবে, তুমি তাই দেখিতে চাহিলে। গাড়ী করিয়া তুমি ঘাটে গেলে। যখন দাহকার্য্য হইতেছিল, তাহার মধ্যে তুমি একবার বলিয়াছিলে, "সুবোধ, অত নিষ্ঠুর কেন হও?"

এইরূপে ১৮১৫ সাল চলিয়া গেল। তোমার জন্য এ বৎসরটা অর্পিত ক্রস্ ক্রমশঃ ভারী হইতেছিল। তুমি তাহা নিরাপত্তিতে বহনও করিতেছিলে। বাহিরের জীবনে এই ক্রস্, অন্তরের জীবনেও দেহের সঙ্গে সংগ্রাম, ও আমার সঙ্গে মিলনের জন্য আপনাকে বলিদান, এ সকল অন্তরকে শ্রান্ত করিতেছিল। তুমি সে সকলকে কেমন করিয়া "মায়ের হাতের বেদনার দান" বলিয়া গ্রহণ করিতেছিলে, কেমন করিয়া "জীবনে মৃত্যু বহন" করিয়া মৃত্যুকে জীবন বলিয়া আদর করিতে পারিয়াছিলে, তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি।

[ক্রমশঃ।

এক্সপ্রেস

ষ্টীফেন স্পেণ্ডার

চারটে বাজার পরে ষ্টেশনের কাছে সিগন্যালটার
পাখা নামে, বাঁশি বাজে, কানে তালা লেগে যায়;
বিকট আওয়াজ ক'রে কালো তেল-চুক্‌চুকে পিষ্টন
নড়ে ওঠে, ওঠে নামে, তালে তালে ঘোরে চাকা ঝম্‌-ঝম্;

ষ্টেশন ছাড়িয়ে ধীরে এঁকে-বেঁকে এক্সপ্রেস ধায়
ধোঁয়া তার শূন্যের তরলিত মেঘ হয়ে আকাশ ছাপায়।
কত সব বাড়ি-ঘর দুই পাশে ছুট-ছুট দৌড়ায়
কারখানা, বাতিঘর, কবরখানার ভিৎ নড়ে যায়।

অনেক দূরের দেশে দিগন্ত মাঠ আর দীঘিজল,
পাহাড়ের হাতছানি, নীলাকাশ, আর ঘন বনতল;
উধাও গতির স্রোতে তার-টানা খুঁটিগুলো পর পর
উড়ে চলে—সীমাহীন যাত্রার নেই কোনো অবসর।

রাত এলে দীপ জ্বেলে ছুটে চলে দূর দূর বন্দর-নগর,
বুকে তার কুঠুরীতে সুরক্ষিত চিঠির খবর,
ফস্‌ফরাসের আলো ঐ দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের চূড়ায়।
পৃথিবী ছাড়িয়ে যেন ধূমকেতু হবার নেশায়

পাড়ি দেয় নৈশ রাতে, লৌহবর্ম্মে গুম্‌-গুম্ ধ্বনি,
এমন সঙ্গীত, আহা, মৌমাছি কি পাখিদের কাছেও শুনিনি।

অনুবাদক—দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়।
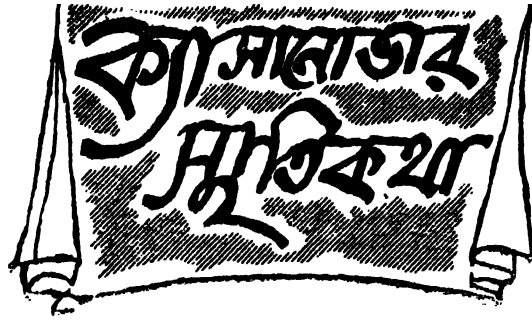
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জানি না, ভীতিতে কি বিশ্বাসেতে সোরাদাচি আমার হুকুম বর্ণে বর্ণে তামিল করেছিলো। যতক্ষণ লরেঞ্জ ঘরে ছিলো ততক্ষণ দেয়ালের দিকে ফিরে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে পড়েছিলো। সৌভাগ্য ওরও, শুধু আমার নয়—কারণ একটু এদিক-ওদিক হলে ওকে যে কী করতাম তা আমিই জানি! লরেঞ্জ চলে গেলে ওকে বললাম, "আজ দুপুরেই দেবদূতের আবার আবির্ভাব হবে—তাঁর সঙ্গে কাঁচি থাকবে, তাই দিয়ে তুমি আমাদের দু'জনের দাড়ি ভালো করে কামিয়ে দেবে।" আমি আগেই জেনে নিয়েছিলাম সোরাদাচি জাতে নাপিত।

—"দেবদূতেরও দাড়ি থাকে নাকি?"

—"নিশ্চয়ই। তুমি আমাদের কামিয়ে দিলে আমরা এই প্রাসাদের ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবো। সোজা গিয়ে নামবো সেন্টমার্ক স্কোয়ারে—সেখান থেকে জার্ম্মাণী চলে যাবো—"

সোরাদাচি চুপচাপ শুনলো—কোনো কথাই কইলে না। খেতে বসেও নিঃশব্দে খেয়ে নিলে। আমার মন তখন এত উত্তেজিত, সন্তমুক্তির আশায় এত বিভোর যে, খাওয়া তো দূরে, দুটি রাত দুই চোখের পাতা অবধি এক করিনি।

ঠিক সময়টিতে দেবদূতের আবির্ভাব হলো। দেওয়ালের গর্তটির মুখে যেই ফাদার বালবিকে দেখা গেল সেই মুহূর্ত্তেই সোরাদাচি তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানালো। বালবি নেমে পড়ে দুই হাতে আমায় জড়িয়ে ধরলেন।

—"আপনার কাজ এবার শেষ হোলো ফাদার বালবি! এখন সুরু হবে আমার কাজ—"

বালবি আমাকে একজোড়া কাঁচি আর আমার সেই বিখ্যাত হাতিয়ার লোহার রডটি ফিরিয়ে দিলেন। আমার কথা মত সোরাদাচি আমাদের দু'জনকেই বেশ সুন্দর ভাবে চেঁছে-ছুলে দিলে। আমি বালবিকে বললাম, সোরাদাচির কাছে অপেক্ষা করতে ইতিমধ্যে আমি একবার সমস্ত জায়গাটা পরীক্ষা করে আসবো। দেওয়ালের গর্ত্তটা একটু ছোটো হোলেও কোনো মতে দেহটাকে গলিয়ে নিয়ে সোজা নামলাম বালবির ঘরে। সেখানে ওঁর সহবন্দী কাউণ্ট এ্যাসকুইনি শুয়ে আছেন দেখলাম। সুপুরুষ, বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এর পর আমার মতলবটা কি? আমি বুঝিয়ে বললাম, কিন্তু বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হলেন না ওঁর মতে আমি শুধু উত্তেজনার বশে খামখেয়ালে এত বড় বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছি। উনি রাজী নন আমার সঙ্গে পালাতে। তবে আমার মঙ্গলের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন ঠিকই। ওঁর ধারণা, ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে দু'খানা ডানা না গজালে মাটিতে নামা সম্ভব হতে পারে না—আমার ব্যাখ্যা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়।

ফিরে এলাম আমার সেলে। তারপর পুরো চারটি ঘণ্টা ধরে যত কম্বল, চাদর, ওয়াড়, বিছানাঢাকা, টেবলক্লথ ছিলো সব সরু সরু লম্বা ফালির মত করে কাটলাম—সেইগুলো জুড়ে একশো গজ লম্বা দড়ির মত করলাম। তারপর কোট, সার্ট, মোজা এগুলো একটা ছোটো প্যাকেটের মত করে বেঁধে নিলাম। এসব কাজ হোলে সেই গর্ত্তটা দিয়ে তিন জনে আবার এসে কাউণ্ট এ্যাসকুইনির সেলে নামলাম। সেখানে ঘণ্টা দুই ধরে ছাদেতে আর একটা বড় গর্ত্ত করলাম—কিন্তু সেই গর্ত্তের ভিতর দিয়ে দেখি, বাইরে জ্যোৎস্নায় আলোর বান ডাকছে—এমন রাতে সেণ্ট মার্কস স্কোয়ারে দলে দলে সবাই বেড়ায়—অতএব এই সময় 'লেডস্'-এর ছাতে দুটো ছায়ামূর্ত্তি সবার মনেই সন্দেহ জাগাবে। অপেক্ষা করতে হোলো।

কাউণ্ট এ্যাসকুইনির কাছে ত্রিশ সেকুইন (ইতালীয় মুদ্রা) ধার চাইলাম—জার্ম্মাণীতে নিরাপদে পৌঁছবামাত্রই ফেরৎ পাঠাবো, এমন প্রতিশ্রুতিও দিলাম। কিন্তু কৃপণ বৃদ্ধ কিছুতেই রাজী নয়—আমিও ছাড়বার পাত্র নই। শেষে অনেক চোখের জলে মাত্র দুটি সেকুইন দিতে রাজী হলেন—তাই-ই সই।

ফাদার বালবির চরিত্রটির পরিচয় এইবার পেতে সুরু করলাম। ইতিমধ্যে প্রায় বার দশেক আমাকে শোনালেন যে, আমার কথার ঠিক নেই। আমি যে সব প্ল্যান ঠিক করে রেখেছি বলেছিলাম সেকথা সম্পূর্ণ মিথ্যা—আমি শুধু ভাঁওতা দিয়েছি। আগে জানলে উনি আমার সঙ্গে যোগ দিতে রাজী হতেন না। ওঁর সঙ্গে কাউণ্ট যোগ দিলেন—অযাচিত উপদেশ আমার এই অদূরদর্শিতায়—ব্যাপার দেখে সোরাদাচি এতক্ষণে মুখ খোলবার সাহস পেল। হাউ হাউ করে কেঁদে আমার পায়ে ধরে ভিক্ষা চাইলে ওকে মুক্তি দেবার জন্যে! ছাদের কার্ণিশ বেয়ে ঐ পিছল পথে ওর যাওয়া একেবারেই অসম্ভব—নীচের খালের জলে পড়ে ওর মৃত্যুও নাকি অবধারিত—আমি যেন দয়া করে ওকে সঙ্গে না নিই। নির্ব্বোধটা বুঝতেও পারল না ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমিও কত নিশ্চিন্ত কত খুসী হোয়েছি। কাউণ্টের কাছ থেকে কালি কলম আর কাগজ নিয়ে একটা চিঠি লিখে সোরাদাচিকে দিলাম সেক্রেটারীকে দেবার জন্যে—চিঠিটা অনেকটা এই রকম ছিলো—

আমাদের মালিক রাজ্যের বিচার বিভাগীয় অধিকর্ত্তারা একজন দোষীকে কারারুদ্ধ করবার জন্য তাঁদের সমস্ত ক্ষমতাই নিয়োগ করেন। কিন্তু সেই বন্দীকে যদি সাময়িক মুক্তিও না দেওয়া হয়, সেও তার সমস্ত ক্ষমতাই নিয়োগ করে মুক্ত হতে। তাঁদের অধিকার নীতিতে—তার অধিকার প্রকৃতিতে। তাঁরা বন্দী করার সময় তার সম্মতি চাননি—তারও মুক্তি নেবার সময় তাঁদের সম্মতির প্রয়োজন নেই।

জ্যাক্‌স্ ক্যাসানোভা, যে এই চিঠিটা লিখছে, হৃদয়ের সমস্ত তিক্ততা দিয়ে, সে জানে তার আবার হয়ত বন্দী হবার সম্ভাবনা আছে—সে ক্ষেত্রে সে বিচারকদের মনুষ্যত্বের কাছে এই আবেদন জানাচ্ছে যে, তখন যেন তার ভাগ্যে এর চেয়ে বেশী দুরবস্থা না ঘটানো হয়। তার সেলের ভিতরে যাবতীয় জিনিষপত্র সোজাসুজি দিয়ে যাচ্ছে—শুধু বইগুলি কাউণ্ট এ্যাসকুইনিকে।

মধ্যরাত্রির এক ঘণ্টা আগে বিনা প্রদীপে, কাউণ্ট এ্যাসকুইনির সেলে লিখিত—৩১শে অক্টোবর ১৭৫৬।

চাঁদ ঢলে পড়েছে—আর সেই বানডাকা জ্যোৎস্নার রাশি নেই। যাত্রার সময় হোলো। অর্দ্ধেকটা দড়ি বালবির একটা কাঁধে আর ওঁর প্যাকেটটাতে বাঁধা হোলো। আমার নিজেরও তাই। তারপর মাথায় টুপী এঁটে দু'জনাই সেই ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে বেরিয়ে পড়লাম।

* * * *

আমি প্রথম, আমার পিছনে বালবি। আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলাম, হাতের বল্লটা দিয়ে সীসের পাতের খাঁজে খাঁজে ভর দিয়ে বালবিকে টানতে টানতে। তিনি ডান হাতে আমার কোমর-বন্ধনীটা সজোরে চেপে ছিলেন। আমার নিজের বোঝা, তার উপর লাগাম-পরানো ঘোড়ার মত ওঁকে টানছি ঘন কুয়াশায় পিচ্ছিল সীসের পাতের কার্নিশ দিয়ে—সে যা অবস্থা! হঠাৎ বালবি আমাকে থামতে বললেন হ্যাঁচকা টান মেরে। ওঁর প্যাকেট থেকে কি একটা পড়ে গেছে খোঁজবার জন্যে। ইচ্ছা হোলো এক লাথিতে খালের জলে ফেলে দিই লোকটাকে—কোনো মতে নিজেকে সামলে নিলাম। বললাম, দড়িগুলো ঠিক থাকলেই হোলো, এখন হারানোর জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই—থামলেই মৃত্যু। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বালবি আবার এগোতে সুরু করলেন। খানিকটা গিয়ে ছাদের চূড়ায় উঁচু ঢিপির মত দেখে দু'জনে পাশাপাশি বসলাম—মাত্র দু'শো ফিট দূরে দেখা যাচ্ছে 'দোজ'-এর প্রাসাদচূড়া। পৃথিবীর কোনো সম্রাটই বোধ হয় এর চেয়ে সুন্দরতর প্রাসাদের কল্পনা করতে পারে না। এখানে আবার বালবি বেচারার টুপীটা গেল হাওয়ায় উড়ে। বেচারা আরও মুষড়ে পড়লো। ছাদের ঐ জায়গাটাতেই বালবিকে বসিয়ে রেখে আমি খুঁজতে গেলাম, যদি নামবার কোন পথ পাওয়া যায়। সিঁড়ির দরজা, জানলা কিম্বা স্কাইলাইট যাতে আমি দড়ির এক প্রান্ত বেঁধে অপর প্রান্ত ধরে নামবার চেষ্টা করতে পারি। চার্চ পেরিয়ে নামবার জন্য চার্চের ছাদের দিকে নজরে পড়লো···কিন্তু সেটা এত খাড়াই যে ওখানে নামতে হ'লে সলিলসমাধি অবশ্যম্ভাবী। জায়গাটা দেখে বুঝলাম, আমরা বন্দিশালা থেকে অনেকটা এগিয়ে এসেছি ছাদ বেয়ে বেয়ে—এটা সম্ভবতঃ 'দোজে'র প্রাসাদেরই অংশ। হয়ত ভোরের আলোয় কোনো দরজা চোখে পড়তে পারে। কারণ, আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, যদি প্রাসাদের কোনো ভৃত্যের নজরেও পড়ি সে তৎক্ষণাৎ আমাকে পালিয়ে যাবার সুযোগই করে দেবে—যত বড় দাগী আসামীই হই না কেন। বিচারকের হাতে তুলে দেবে না—বিচার-বিভাগ সবার কাছেই এমন উৎকট ভীতিপ্রদ আর ঘৃণ্য ছিলো। প্রাসাদের সবচেয়ে উঁচু ছাদের নীচেই একটা জানলা হঠাৎ চোখে পড়লো। মরিয়া হয়ে ছাদের উপর থেকে বুকে হেঁটে ঘষে ঘষে ধীরে ধীরে নামতে চেষ্টা করলাম। শেষে কাছাকাছি পৌঁছে ঝুঁকে পড়ে দেখলাম, ছোটো ছোটো কাচ দিয়ে তৈরী জাফরীকাটা জানলা—তার ওধারে ঘরের মত মনে হোলো। কাচগুলো সহজেই সরানো যেত কিন্তু আমার তখনকার মনের অবস্থা এমন যে, মনে হোলো এটাই সবচেয়ে বড় বাধা। নিরাশায় মন ভরে গেল—দীর্ঘ সময়ের উত্তেজনা, পরিশ্রম, ক্লান্তি, অনাহার আর তীব্র মানসিক উদ্বেগ আমার মনের সহজ ভাবটুকু সম্পূর্ণ গ্রাস করছিলো। অতি সামান্য সহজ-সাধ্য কাজও আমাকে ভয়-নিরাশায় ভরে তুললো। এমন সময় সেণ্ট মার্কের ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা বাজলো—মধ্যরাত্রির সূচনা। ঐ ঘড়ির শব্দ হঠাৎ কেন জানি না আমার মনে আশা, আর নির্ভর আশ্বাসের চেতনা জাগিয়ে দিলো। কি এক শক্তিতে ফিরে পেলাম বিশ্বাস, আর দৃঢ়তা। নতুন উদ্যমে হাতের বল্লটা দিয়ে একটা কাচ ভেঙে ফেললাম। তার পর পনেরো মিনিট ধরে কঠিন পরিশ্রমের সঙ্গে একে একে জাফরীর সব কয়টা কাচই ভেঙে ফেললাম—উত্তেজনায় খেয়ালই ছিল না যে বাঁ হাতটা কখন কেটে গিয়ে রক্তে ভেসে যাচ্ছে!

ফিরে এলাম আমার সঙ্গী ফাদার বালবির কাছে। হায় রে কপাল! 'যার জন্যে করে মরি সেই বলে চোর'—আমাকে দেখিয়ে বালবি কুৎসিততম ভাষায় আমাকে গালাগাল দিতে সুরু করলেন, এতক্ষণ একলা বসিয়ে রাখার জন্যে। ঠিক করেছিলেন যে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আবার কারাগৃহে ফিরে যাবেন। আর ভেবেছিলেন যে আমি খালের জলেই ডুবে মরেছি।

"তাই বুঝি আমাকে নিরাপদে ফিরতে দেখে ঐ ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করলেন? এখন চলুন এতক্ষণ কি করেছি দেখাবো।"

দু'জনে মিলে ফিরে এলাম সেই ছাদের উপর জাফরীকাটা জানলার ধারে। পরামর্শ করতে লাগলাম কি করে ভিতরে নামা যায়। একজনের পক্ষে খুবই সহজ, অন্য জন দড়িটা না হয় ধরবে—কিন্তু সে নামবে কি করে? এটা কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলাম না। বালবি বলে উঠলেন,—"আমাকে আগে নামিয়ে দিন তো। তারপর আপনি কেমন করে নামবেন সে কথা চিন্তা করবার যথেষ্ট সময় পাবেন।"

স্বার্থপর ঘৃণ্য পশুটার কথায় মনে হোলো, দিই লোহার বল্লটা ওর বুকে বিঁধে। কিন্তু সামলে নিলাম নিজেকে, তার বদলে ওরই কাঁধে বেঁধে ওকে নামিয়ে দিলাম। দড়িটা টেনে তুলে মেপে দেখলাম প্রায় পঞ্চাশ ফিট নীচে ঘরের মেঝে। এখন আমি কি করে নামবো? জাফরীর পাতলা ফ্রেমে দড়ি বাঁধলেও অত ভর সইবে না, ভেঙে পড়বে। ছাদের সীমার টালির উপর ইতস্ততঃ ঘুরতে লাগলাম, মনে মনে একটা উপায় খুঁজতে খুঁজতে। ঘুরতে ঘুরতে অপর প্রান্তে গিয়ে দেখি, এক কোণে একটা বড় টবভর্ত্তি চূণ, বালি, জল গোলা রয়েছে, পাশে খুরপি আর একটা মস্ত লম্বা মই পড়ে রয়েছে। মইটা দেখেই উল্লসিত! দড়ি দিয়ে একদিকের প্রথম ধাপটা বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এলাম সেটা জানলার কাছে। জানলা দিয়ে গলাবার চেষ্টা করতে লাগলাম প্রাণপণে কিন্তু একটু গিয়েই সেটা আটকে গেল। তখন আমি বেশ করে দড়িটা দিয়ে মইটা জোর করে বাঁধলাম, তারপর সেটা জল বেরোবার নালীর পাইপের উপর ঝুলতে লাগলো। কারণ মাত্র একটুখানি জানলার ভিতর ঢুকেছে, বেশীর ভাগ অংশটা বাইরের দিকে—কোনোরকমে

উপুড় হোয়ে শুয়ে বুক ঘষে ঘষে জলের মার্বেল পাথরের পাইপটা ধরলাম, তারপর সেটা ধরে পিছলে পিছলে খানিকটা নেমে এসে মইটার শেষ দিকটা ধরতে পারলাম। শেষটা ধরে ঠেললে খানিকটা জোর হয়। প্রাণপণে ঠেলে আরও একটু ঢুকে গেল মইটা। তখন আর বাইরে ঝুলতে লাগলো না। বেশীর ভাগ ভারটাই ভিতরের দিকে ঝুঁকে গেল। কিন্তু ঐ জোরে ঠেলার দরুণ আমি পিছলে গেলাম—ঢালু সীসের পাতের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে···ছুটো হাঁটু আর হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলাম···নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি জেনেও মনের উপস্থিত বুদ্ধি হারাইনি। সমস্ত শক্তি দিয়ে মরিয়ার মত চেষ্টা করতে করতে সামলে নিলাম নিজেকে। উঠে এসে জলের পাইপটার পাশাপাশি চিৎ হোয়ে শুয়ে হাপরের মত নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম অমানুষিক পরিশ্রমের ক্লান্তিতে। সমস্ত হাত-পায়ে খিল ধরে আসছিলো। শরীরটাকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে রইলাম। উপায় নেই··কি নিদারুণ দুঃসহ মুহূর্ত! ক্রমে ক্রমে হাত-পায়ের সাড় ফিরে এলো। সহজ হোলো নিঃশ্বাস। উঠে পড়ে মইটার বাকীটুকুও ঠেলে দিলাম—তারপর রডটার সাহায্যে সীসার পাতের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে জানলাটার কাছে গেলাম। মইটা ভিতরে লম্বালম্বি হোয়ে আটকে ছিলো—এবার সহজেই সেটাকে নীচে নামাতে পারলাম—নীচে বালবি সেটা ধরে ফেললেন। আমি ওপর থেকে জামা-কাপড়ের প্যাকেট, দড়ির বাণ্ডিল সব নীচে ছুঁড়ে দিয়ে নিজে নেমে পড়লাম। তার পর মইটাও নীচে নামিয়ে নিলাম। কারণ, উপরে আমাদের পালানোর কোনো চিহ্নই লরেঞ্জোর সন্ধানী দৃষ্টির সামনে রাখতে চাইনি। নীচে অন্ধকার ঘরটায় আমরা দু'জন হাত ধরাধরি করে ঘরের অবস্থানটা ঠিক করে নিতে লাগলাম। দরজার কাছে গিয়ে দেখি, লোহার খিল লাগানো কিন্তু তালাবদ্ধ নয়। খুলে বেরিয়ে পড়লাম। দেখি, আর একটা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছি, মাঝখানে মস্ত টেবিল চার ধারে চেয়ার সাজানো। ঘরের একটা জানলা খুলে বাইরেটা দেখলাম—নিকষ কালো অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। অগত্যা নূতন কোনো প্রচেষ্টার আশা ছেড়ে দড়ির বাণ্ডিলটা মাথায় দিয়ে ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়লাম লম্বা হোয়ে—সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম এলো দুটি চোখে, তখন আর কোনো চিন্তার ক্ষমতাটুকুও ছিল না। পরে মুক্তি জুটবে না মরতে হবে সব চিন্তাই তখন সমান।

বোধ হয় পুরো সাড়ে তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম। ফাদার বালবি চেঁচিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে আমার ঘুম ভাঙালেন। পাঁচটা বাজে—এখন এই অবস্থায় আমার চোখে ঘুম আসে কি করে? উনি তো ভাবতেও পারছেন না। কিন্তু আমার প্রয়োজন ছিলো—এই বিশ্রামের পর আবার আমার স্নায়ুগুলো সচল হোলো।

—"এটা তো জেলখানা নয়। এখানে নিশ্চয়ই কোনো বেরুবার পথ পাবো।"

দু'জনে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম। একটা গ্যালারি পেরিয়ে ছোটো পাথরের সিঁড়ি। নেমে এসে আর একটা গ্যালারি, আরও একটা সিঁড়ি পেরিয়ে মস্ত একটা হলে এসে পৌঁছলাম। কিন্তু এর দরজা কিছুতেই খোলা সম্ভব হোলো না। মুক্তির মুখে এসে তখন আমার মরিয়া অবস্থা। ঠিক করলাম লোহার রডটা দিয়ে ওপরের খোপটাতে একটা গর্ত্ত করবো। তার ভিতর দিয়ে গলে বেরোবো। তখনি সুরু করলাম গর্ত্ত করা। আধ ঘণ্টার চেষ্টায় বেশ বড় গর্ত্ত করা গেল। কিন্তু এমন বিশ্রী রকম গর্ত্ত হোলো যে গলে যাওয়া বিপদজনক। চারিদিকে বর্শার মত খোঁচা-খোঁচা অসমান ভাঙ্গা গর্ত্ত। তার উপর মেঝে থেকে পাঁচ ফুট উঁচুতে। বালবিকে প্রথমে উরুতে ধরে পরে গোড়ালী ধরে কোনমতে পার করলাম। কিন্তু আমার ভরসা তো আমিই। কোনো মতে মাথা আর কাঁধটা গলিয়ে বালবিকে বললাম টানতে—যদি খোঁচা লেগে দেহটা টুকরো টুকরো হোয়ে যায় তাহলেও যেন থামে না। এই ভাবে অবশেষে নামলাম—সর্ব্বাঙ্গে যন্ত্রণা নিয়ে আর পিছন থেকে উরু থেকে দর-দর ধারায় রক্তের স্রোত বইয়ে।

এবার দৌড়ে গিয়ে আর একটা সিঁড়ি নেমে একেবারে প্রাসাদের প্রধান সোপানের দরজার সামনে উপস্থিত হলাম। কিন্তু সেই বিরাট দরজা ভেদ করা আমার লোহার রডটির সাধ্য ছিল না। কিন্তু তার জন্য অস্থির বা চঞ্চল না হোয়ে শান্ত ভাবে বসে পড়লাম দরজার সামনে। বালবিকে বললাম আমার যতদূর সাধ্য করেছি, এখন বিধাতার ইচ্ছা। আজ প্রাসাদের ঝাড়ুদারও আসবে কি না সন্দেহ! কারণ আজ তো ছুটির দিন। যদিই কেউ এসে দরজা খোলে তখনি ছুটে পালাবার চেষ্টা করবো, অন্যথায় মরে গেলেও এখান থেকে নড়ছি না।

বালবি তো রেগেই আগুন! আমাকে উন্মাদ, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি যথেচ্ছ গালাগাল দিতে সুরু করলেন। বালবিকে চাষার মত দেখতে হলে কি হবে—বেশভূষা ওঁর ঠিকই ছিলো, কোনো পরিশ্রম তো করতে হয়নি। আর আমার অবস্থা তো দেখলে লোকের ভয় হবে—সর্ব্বাঙ্গে রক্তমাখা, সারাগায়ের চামড়া ছড়ে ছাল উঠে গেছে। সমস্ত জামাকাপড় টুক্‌রো টুক্‌রো হোয়ে ফালির মত ঝুলছে, মোজাটা, ওয়েষ্টকোট, শার্টগুলো শতছিন্ন অবস্থায়, আর বোঝবার মতও নেই। উরুর গভীর ক্ষত থেকে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে!

আমি রুমাল দিয়ে যতদূর সম্ভব ভদ্রভাবে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধলাম, উপরি উপরি গোটা দুয়েক শার্ট প্যাকেট থেকে বের করে পরে ফেলে সবার উপরে লেশ দেওয়া শার্টটা পরলাম। নতুন একজোড়া মোজা পরে যতগুলো রুমাল ইত্যাদি পকেটে ভরা সম্ভব ভরে নিয়ে বাকীগুলো এক কোণে ফেলে দিলাম। হাত দিয়ে চুলগুলোকে যথাসম্ভব বিন্যস্ত করার চেষ্টা করতে করতে একটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে পাল্লা দুটো খুলে দিলাম। খুলতেই নীচের উঠানে যারা ছিলো তাদের দু'-একজনের চোখ পড়লো আমার দিকে···পড়াটা অবশ্য বিচিত্র নয়। সে তখনি প্রাসাদ-রক্ষককে খবর দিতে ছুটলো। ভালমানুষ বৃদ্ধটি হয়ত ভাবলেন, ভুল করে আগের রাত্রে কাউকে চাবিবন্ধ করে ফেলেছেন—তাড়াতাড়ি চাবির গোছা নিয়ে হাজির হোলেন। আমি ওদের ঝনঝনানি শুনতে পাচ্ছিলাম—সিঁড়ির ধাপে ধাপে এগিয়ে আসছে। আমি বালবিকে আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াতে বললাম—লোহার রড হাতে নিয়ে দরজার পাশে অপেক্ষা করতে লাগলাম—ওরা দরজা খুললেই পালাবো আর যদি বাধা দেয় তবে এই লোহার রড···

বৃদ্ধ বেচারা আমার চেহারা দেখে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে
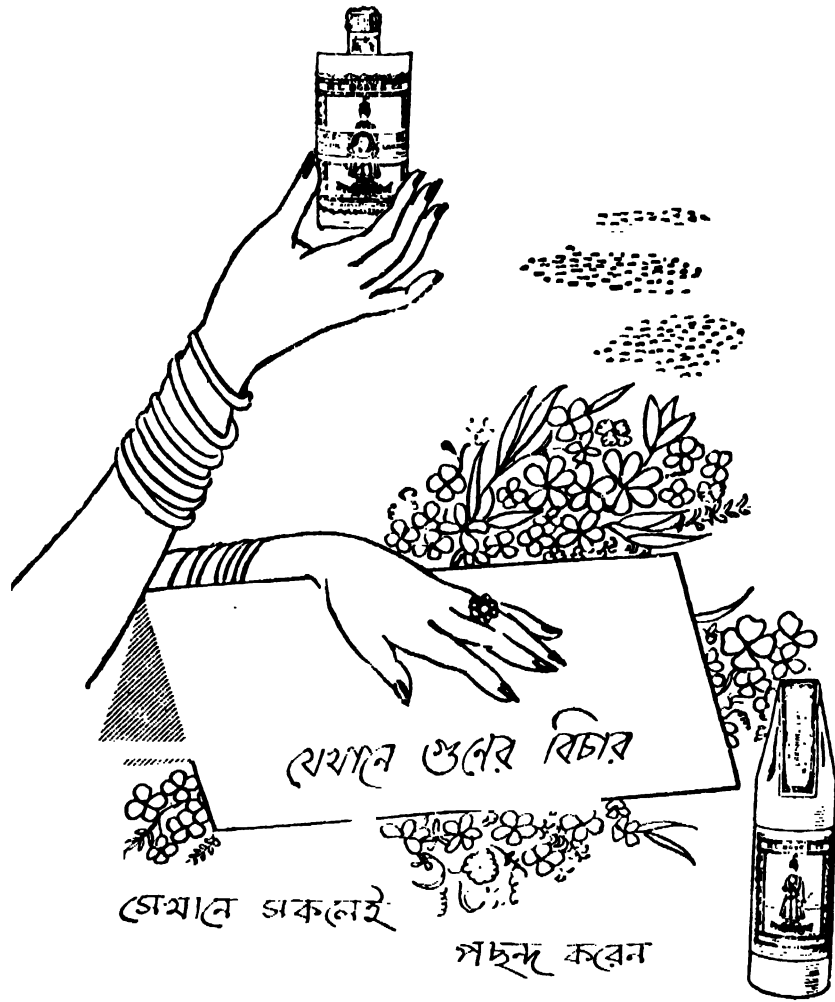
রইলো···আমি দৃক্‌পাতও না করে অসম্ভব দ্রুতগতিতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম—ঠিক পিছনে বাসবি। কিন্তু গতি দ্রুত করলেও পালাচ্ছি যে সে রকম ভাব ফুটতে দিইনি চলার ভঙ্গীতে। সোজা প্রাসাদের প্রধান ফটক পেরিয়ে সামনের ছোটো পার্ক পেরিয়ে জলের কিনারায় রাস্তার উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনেই যে গণ্ডোলাটা পেলাম তাইতেই চড়ে বসে বললাম "আমি খুব শীগগির ফুসিনা পৌঁছাতে চাই আর একজন মাঝি বরং ডেকে নাও"—

বলা বাহুল্য, আমার সঙ্গে সেই মুহূর্তে বলবিও উঠে পড়েছিলো গণ্ডোলাতে। গণ্ডোলাটা একটু এগোলে আমি মাঝিকে ডেকে বললাম যে—"আমি মত বদলেছি, আমি মেস্‌ত্রায় যেতে চাই"—

—"ভাড়া ঠিকমত পেলে আপনাদের ইংলণ্ডেও পৌঁছে দিতে পারি হুজুর!" মাঝিটা হেসে বললে।

খালটাকে এত অপরূপ সুন্দর আগে কখনও মনে হয়নি—বিশেষ করে এত নির্জন যে আর একটা নৌকাও দেখা যাচ্ছে না··· কি নিশ্চিন্ত তৃপ্তি! ভোরের নরম আলোয় আর মিষ্টি বাতাসে দেহ মন জুড়িয়ে গেল। মাঝি দুটিও খুব দ্রুত বাইছিলো। সেই অন্ধকারময় কারাগৃহের নরককুণ্ড থেকে আবার উদার আকাশের তলায় মুক্তি পেয়ে আনন্দে, ঈশ্বরের করুণায় মুগ্ধ হোয়ে আমার দুই চোখ জলে ভরে এলো···আবেগে উত্তেজনায় আমি সত্যিই কেঁদে ফেললাম। এতক্ষণে আমার সঙ্গীর, আমার কর্তব্যপরায়ণ বন্ধুর কর্তব্যবোধ ফিরে এলো—তিনি এসে আমি কাঁদছি ভেবে কর্তব্যবোধে সান্ত্বনা দিতে সুরু করলেন। এই মূঢ়তায় হাসা ছাড়া আর উপায় রইলো না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দীর্ঘ পথের যাত্রায় বিচিত্র, তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর অবশেষে ১৭৫৭ সালের ৫ই জানুয়ারী প্যারিসে পৌঁছলাম। পুরানো বন্ধুরা সাদরে আমাকে কাছে টেনে নিলে। প্যারিস—গৌরবময়ী প্যারিস যেন আমার পালিকা মা—অপরিচয়ের সঙ্কোচ আর আতঙ্ক কিছুই নেই এখানে। আর আমার জন্মভূমি ভেনিস? সেখানে যাবার পথ তো এখনকার মত নিজের হাতেই বন্ধ করে এসেছি।

মনে মনে ঠিক করলাম—আচার-ব্যবহারে সংযম আর দৃঢ়তা ফিরিয়ে আনবো—আবার আমাকে ফিরে পেতে হবে যশ, মান, সম্ভ্রম আর প্রতিপত্তি·····পিতৃতম বন্ধু, অভিভাবক ম্যঁসিয়ে ব্রাগাদা মাসিক হাজার ক্রাউন বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন আমার জন্য—তাই স্বচ্ছলতার মধ্যেই দিন কাটছিলো এখন শুধু ধৈর্য্য ধরে আরও উন্নতির চেষ্টা করতে হবে·····

আমার প্রথম কর্তব্য ঠিক করেছিলাম ভেনিসের রাজদূতের সঙ্গে দেখা করা। কারণ, এখানে রাজসভায় তাঁর অসীম প্রতিপত্তির কথা আমি জানতাম। আর তাঁকে যতদূর চিনি, তাইতে তাঁর অনুগ্রহ পাবো বলেই ভরসা করি।

আমার পালিয়ে আসার গল্প আমি প্রতিটি সালোঁতে করতাম। একদিন একটা চিঠি লিখে নিজেই সেটা সঙ্গে করে প্যালেস বুরবঁতে গিয়ে দিয়ে এলাম। পরদিন বেলা আটটার সময় একটা চিঠি পেলাম—সেই দিনই আমাকে ওখানে উপস্থিত হতে বলা হোয়েছে তাইতে।

ম্যঁসিয়ে দ্য বার্ণীস আমাকে অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন—আমার পালানোর বিবরণও শুনেছেন বলে জানালেন। আমি ওঁকে কথা দিলাম যে আমার পালানোর সমস্ত ইতিহাসটাই আমি ওঁকে লিখে দেবো। উঠে আসার সময় উনি আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে হাতে একটা একশো লুই-এর নোট গুঁজে দিলেন। সেটা অবশ্য পোসাকের আলমারীটা ভদ্রভাবে ভর্ত্তি করতেই খরচ হোয়ে গেল। যাই হোক, এক সপ্তাহের মধ্যেই ওঁকে আমি পুরো বিবরণটা লিখে পাঠিয়ে দিলাম—সেই সঙ্গে জানালাম, ওটায় যতগুলি ইচ্ছে সংখ্যায় উনি ছাপাতে পারেন আর বিলি করতে পারেন। আর অনুরোধও জানালাম, এমন সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছেও দিতে যাঁদের দ্বারা আমার কিছু উপকার হোতে পারে।

সপ্তাহ তিনেক পর উনি আমাকে বললেন যে, আমার সম্বন্ধে উনি ভেনিসের রাজদূত ম্যঁসিয়ে এরিৎসো'র সঙ্গে কথা বলেছেন। রাজদূত জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত ভাবে আমার উপর তাঁর কিছুমাত্র ক্রোধ বা বিরক্তি নেই···তবে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী নন। কারণ, কোনো রকম গোলমালের ভিতর উনি নিজেকে জড়াতে চান না। আর রাজ্যের শাসন-পরিষদের কাছে পাছে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হয় সে সব হাঙ্গামাও উনি পছন্দ করেন না। ম্যঁসিয়ে বার্ণীস আরও জানালেন যে, আমার গল্প তিনি মার্ক্যুিস দ্য পম্পাড্যুর, ম্যঁসিয়ে দ্য ব্যুলোন্ ইত্যাদি প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের কাছে করেছেন। ওঁর পরিচয়-পত্র নিয়ে গেলে তাঁরা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন সন্দেহ নাই। এখন তাঁদের সঙ্গে থেকে নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা সম্পূর্ণ আমার হাতে। আরও বললেন যে, রাজকোষে যাতে কিছু অর্থ আসে সে বিষয়ে কিছু নতুন ব্যবস্থা বা উপায়ের উদ্ভাবনা যদি করতে পারি, তবে আমার ভবিষ্যৎ স্বর্ণোজ্জ্বল। তবে যেন কোনো রকম জটিলতার মধ্যেই না যাই।

ম্যঁসিয়ে দ্য ব্যুলোন-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বৃদ্ধ, বুদ্ধিদীপ্ত সৌম্যমূর্ত্তি—প্রথম দর্শনেই মনে শ্রদ্ধা জাগে। অনেক বিষয়ে আলোচনার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"একটা ব্যাপার আছে—সে বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য বলতে পারেন—অবশ্য পরে লিখেও জানাতে পারেন। ব্যাপারটা হোলো ম্যঁসিয়ে প্যারিস দ্যুভার্ণি তাঁর সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রের জন্যে বিশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা চান। এই টাকাটা আমাদের তুলে দিতে হবে রাজকোষে হস্তক্ষেপ না করেই।"

—"আমার কিন্তু একটা প্ল্যান আছে, যাতে করে রাজাকে—"

—"কত খরচ হবে তাতে?"

—"কিছুমাত্র নয়—কেবল টাকাগুলি সংগ্রহ করার যা খরচ—"

—"আপনি কি ঠিক করেছেন আমি জানি—"

—"আশ্চর্য্য! কি করে জানলেন আপনি? আমি তো কাউকেই বলিনি—"

—"বেশ তো। কাল এসে আমাদের সঙ্গে রাত্রে খাবেন, ম্যঁসিয়ে দ্যুভার্ণির সঙ্গেও এ বিষয়ে আমরা কথা বলবো।"

ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম। চলতে চলতে আপন মনেই চিন্তা করতে লাগলাম, ভাগ্যের কি অদ্ভুত খেলা! রাজকোষে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন আছে জেনেই বলে

বসলাম এত টাকা আমি জোগাড় করে দেবো—বিন্দুমাত্রও চিন্তা না করে যে কোথা থেকে বা কেমন করে দিতে পারবো। অথচ ওই পাকা ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন দেখাবার জন্তে যে আমার কথা উনি আগেই ধরতে পেরেছেন। এখন উপায়? আমি ভাবলাম, প্রথমেই আমাকে যে করেই হোক আঁচ করে নিতে হবে দ্যুভার্ণি আর উনি কি ভেবে রেখেছেন, যদি নেহাৎই না পারি তবে এমন রহস্যপূর্ণ হাসি মুখে টেনে নিঃশব্দে বসে থাকবো যাতে মনে হবে এ সবই তো আমার জানা ব্যাপার।

যথাসময়ে ম্যঁসিয়ে দ্যুভার্ণির বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রাখতে গেলাম। আরও অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন—আর কথাবার্তা যতদূর সম্ভব একঘেয়ে ক্লান্তিকর হোয়ে উঠেছিলো। খাওয়ার পর ম্যঁসিয়ে দ্যুভার্ণি অন্যান্য অভ্যাগতের কাছ থেকে কিছুক্ষণের অবসর প্রার্থনা করে আমাকে আর ম্যঁসিয়ে ব্যুলোনকে অন্য একটা ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানে আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করালেন। তারপর উঠে গিয়ে একটা বই হাতে করে নিয়ে এসে প্রথম পাতাটি খুলে একটু হেসে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—"ম্যঁসিয়ে ক্যাসানোভা, এই দেখুন আপনার প্ল্যানটি"

প্রথম পাতাটিতে দেখলাম লেখা আছে—নব্বইটি টিকিটের লটারী মাসে একবার করে টিকিট বিক্রী হবে—আর প্রত্যেকটি বারে পাঁচখানার বেশী টিকিট উঠবে না।—"স্বীকার করছি মহাশয়, আমি ঠিক এই জিনিষই ভেবেছিলাম"—

সেদিন বাকী রাতটা কাটলো, কি ভাবে লটারীর সব ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে। আর নেহাৎ অহঙ্কার করে বলছি না আমি যে সব সংশোধনী অথবা নতুন কোনো পদ্ধতির প্রস্তাব আনলাম প্রত্যেকটিই সকলের মতে রীতিমত মূল্যবান বলে গৃহীত হোলো—সবার মনেই আমার সম্বন্ধে অন্ততঃ আমার কার্য্যকরী ক্ষমতা সম্বন্ধে বেশ একটা উঁচু ধারণাই গড়ে উঠেছিলো। তার বিশদ বিবরণ না দিলেও শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, হিসাব পত্র আর গণনার যথার্থ নির্ভুল ভাবে বিচার করার জন্য এক জন নামকরা বিশেষজ্ঞ ডাকা হোলো। আর তিনি এসে আমার প্রত্যেকটি প্রস্তাব এবং হিসাব নির্ভুল বলে স্বীকার করলেন।

ম্যঁসিয়ে দ্য বার্গস আমার সঙ্গে মাদাম দ্য পম্পাদুর-এর পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাদাম ঠিক চিনতে পারলেন, আমাকে পাঁচ বছর আগে দেখেছিলেন—তবে তফাৎ এই যে, আমার মুখে ফরাসী ভাষা শুনে তখন তাঁর ভারী মজা লাগতো, কিন্তু এখন আমার নির্ভুল পরিষ্কার উচ্চারণে উনি আশ্চর্য্য। যাই হোক, লটারীতে মাদাম পম্পাদুর প্রবল উৎসাহ দেখালেন। লটারীর প্ল্যানটা হোলো—প্রতি মাসে পাঁচটি করে জিতবার সংখ্যা থাকবে অর্থাৎ পাঁচখানা টিকিট জিতবে—আর যদি ছয়টা হয় তাহলে আরও ভালো—ছয়ের সংখ্যাটা রাষ্ট্রের হোয়ে যাবে। অতএব রাজা প্রতি মাসে একশো হাজার ক্রাউন লাভ করতে পারবেন।

লটারীর ছয়টি অফিসের ভার আমার উপর দেওয়া হোলো। আর লটারীর লাভ থেকে বছরে চার হাজার ফ্রাঙ্ক আমার আয় নির্দ্দিষ্ট করা হোলো। প্রধান অফিস রুম্ তসার্তার এ খোলা হোয়েছিলো, তার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর আমার চেয়ে অনেক বেশী আয় নির্দ্দিষ্ট করা হোলো। কিন্তু তার জন্য আমি একটুও হিংসা করিনি। কারণ, ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গেই দ্যুভার্ণি তাঁর বাড়ীতে আমার পরিচয় করিয়ে দেন আর আমি জানতাম, আসলে এই সমস্ত লটারীর প্ল্যানটা তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত।

এইবার আমার বুদ্ধির খেলা সুরু হোলো। আমি আমার পাঁচটা অফিসই বছরে দু'হাজার ফ্রাঙ্কে ভাড়া দিয়ে দিলাম। আর রু সেণ্ট দেনিসে এই অফিসটি যথাসম্ভব সৌখীন মূল্যবান আর সুন্দর জিনিষে সাজালাম। এক জন কর্ম্মচারীও রাখলাম—সুন্দর প্রাণবন্ত, বুদ্ধিদীপ্ত একটি ইতালীয় যুবক।

জনসাধারণকে আমার অফিসের দিকেই আকর্ষণ করবার জন্তে আমি ছাপানো কাগজ বিলি করতে লাগলাম। তাতে লেখা ছিলো, আমার সই-করা টিকিট যদি জেতে তাহলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই জেতার টাকা পাওয়া যাবে। সহজেই আমার অফিসের ভীড় বাড়তেই লাগলো। প্রথম বারেই আমার অফিস থেকে চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্কএর টিকিট বিক্রী হোলো তার থেকে—জিতবার পুরস্কার-স্বরূপ দিতে হোলো আঠারো হাজার ফ্রাঙ্ক। ক্রমে ক্রমে আমার অফিসটা রীতিমত জনপ্রিয় হোয়ে উঠলো। আমার ইতালীয় কর্ম্মচারীটিও ভাগ্য ফিরিয়ে নেবার সন্ধান পেলো।

এই সময় ভেনিসের একটি অভিজাত-বংশীয় যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হোয়েছিলো। ওর নাম কাউণ্ট দ্য তিরেত্তা।

এক দিন তিরেত্তা আমাকে জানালে যে, পোপের এক জন বিধবা ভ্রাতৃপুত্রবধূ মাদাম লাম্বার্ত্তিনীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে। নামটা শুনে কৌতূহল জাগলো, রাজী হোয়ে গেলাম। তিরেত্তার সঙ্গে গেলাম—কিন্তু কোথায়ই বা পোপ আর কোথায়ই বা তার আত্মীয়া! পরিচয় হোলো উগ্র বিলাসিনী উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির একটি মহিলার সঙ্গে আর তার বান্ধবীর সঙ্গে। আর সেই বান্ধবীটি অপরূপ সুন্দরী কিশোরী বোনঝির সঙ্গে। কিশোরীটির নাম মাদামোয়াসেল থেরেসা দ্য লা মিউর।

কিছুক্ষণ অর্থহীন আলাপের পর মাদাম লাম্বার্ত্তিনী এক রকম তাসের জুয়া-খেলার প্রস্তাব করলেন। আমি রাজী হলাম না কিছুতেই—একটু এগিয়ে এসে মাদামের কিশোরী বোনঝিটিকে আগুনের ধারে একটি বসবার জায়গায় বসতে অনুরোধ জানিয়ে তার পাশে বসে পড়লাম। ওঁদের জানালাম, তাস খেলার চেয়ে গল্প করে কাটানোই আমার ভালো লাগবে। মাদাম লাম্বার্তিনী হাসতে হাসতে বললেন,—"গল্প তো করবেন—কিন্তু কোন বিষয়ে কথা বলবেন? ও তো মোটে এক মাস হোলো কনভেণ্ট থেকে বেরিয়েছে?"

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম এই বলে যে, এমন মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে একটুও খারাপ লাগবে না। ওঁরা তাস খেলতে লাগলেন—আর আমি মেয়েটির সঙ্গে নানা চমকপ্রদ বিষয়ে আলাপ জমালাম। বলতে দ্বিধা নেই—ওর মনোরঞ্জনে একটুও বিলম্ব ঘটেনি আমার। সদ্য গণ্ডীর বাইরে মুক্তি পাওয়া কাঁচা মন—নানারকম সরস আলোচনায় ওর কৌতূহল আর আগ্রহ স্বাভাবিক;

যে সব প্রসঙ্গের আলোচনা ওর অপরিণত বয়সের কাছে অপরাধ বলে গণ্য করা হোতো, সেই সব প্রসঙ্গের আলোচনায় ওর কিশোর মনের লজ্জা আর আগ্রহের ছাপ ওর মুখে অপরূপ হোয়ে ফুটে উঠতে

লাগলো। এক সময় ও উঠে গিয়ে ওর মাসীর চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই ওর মাসী হাতের তাসটায় হারলেন। বোনঝিকেই অপয়া, ভেবে বললেন,—"দুষ্টু মেয়ে পালা এখান থেকে—তুই-ই নিশ্চয়ই অপয়া, তাই এবার হারলাম। আর তাছাড়া ঐ ভদ্রলোককে একা বসিয়ে রেখে চলে এলি যে! লোকে কি বলবে? একটুও শিক্ষা সভ্যতা জানে না?"

মেয়েটি হাসতে হাসতে ফিরে এলো আমার পাশে। তার পর ফিশ-ফিশ করে বললে,—"যদি আমার মাসী জানতেন যে আপনি আমার সঙ্গে কি সব বিষয়ে গল্প করছেন—তাহলে কিন্তু চলে যাবার জন্মে দোষ দিতেন না—"

—"সত্যিই ভারী অন্যায় হয়েছে। এর জন্যে আমার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। আচ্ছা তাহলে আমি বরং চলে যাই—কিছু মনে করবে না তো?"

—"আপনি যদি চলে যান তাহলে মাসী ভাববেন আমি একটা আস্ত বোকা, তাই আপনি বিরক্ত হোয়ে চলে গেলেন—"

—"তাহলে তোমার ইচ্ছা যে আমি থাকি।"

—"আপনি যেতে পাবেন না—"

ফিরে এলাম। তবে সে রাত্রে বিদায় নেবার আগে জেনে গেলাম ওই লাবণ্যময়ী কিশোরীর হৃদয়ে গভীর প্রেমের রেখা এঁকে দিয়েছি—আর আমার অনুরাগের চিহ্ন রেখে গেলাম ওর দুটি প্রসারিত কর-পল্লবে অজস্র উষ্ণ চুম্বনে···

তিন চার দিন পর মাদামোয়াসেল দ্য লা মিউর-এর কাছ থেকে আমার অফিসে একটি চিঠি এলো। চিঠিতে ও জানিয়েছে—"মোটামুটি এই কথা—" আমার মাসী ধনী কিন্তু অত্যন্ত খেয়ালী, বিলাসিনী আর দুর্নীতি-পরায়ণা। আমাকে পর্দ্দানসীন করতে না পেরে শুধু ঘটকের মুখের প্রশংসায় মুগ্ধ হোয়ে ডানকার্কের এক ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার বিবাহের ঠিক করেছেন। তাকে আমিও যত চিনি মাসীও ততই চেনেন। আপনাকে আজ আমি বলতে চাই যে যদি সেদিন রাত্রের আলাপ-আলোচনায় আমাকে ঘৃণা না করে থাকেন তবে আমি আপনার ধর্মপত্নী হোতে চাই। হ্যাঁ, আমার দেহ-মন আমি আপনার হাতেই সমর্পণ করতে চাই—পঁচাত্তর হাজার ফ্রাঙ্ক সমেত—আমার মৃতা মায়ের যৌতুক। তাছাড়া মাসীর মৃত্যুর পরও অত টাকা আমিই পাবো।

চিঠিতে উত্তর দেবেন না। কার হাতে পড়বে জানি না। পাঁচ দিন পর মাদাম লাম্বার্ত্তিনীর বাড়ীতে এসে মুখেই জানাবেন। পাঁচটি দিন সময় রইলো আপনার ভাববার। যদি আমাকে আপনার উপযুক্ত না মনে করেন তবে একটি অনুরোধ রাখবেন—আমার কাছে আর আসবেন না···আমার সঙ্গে কোথাও দেখা হবার সম্ভাবনা থাকলে এড়িয়ে যাবেন···তাইতে আমারও ভোলা সহজ হবে। আমার জীবনে একমাত্র সুখ শুধু আপনার পাশে···"

চিঠিখানি পড়ে ব্যথিত হলাম। চিঠির প্রতিটি লাইনে সততা, সম্মান আর সরল মনের সহজ সত্য ফুটে উঠেছে···সত্যিই শ্রদ্ধা হোলো মেয়েটির উপর। কিন্তু ওই বিবাহের কথাতেই আমি পিছিয়ে এলাম। আমার মনে বিবাহের বা বিবাহিত জীবনের প্রতি কোনো রকম আসক্তি ছিল না আমি স্পষ্টই দেখতে পেতাম যে বিবাহিত জীবনের মসৃণ স্বাচ্ছন্দ্য আমার জন্যে নয়। তাকে আমি শুধু দুঃখই দেবো—যে আমার কাছে করবে আত্ম নিবেদন।

চার দিন পর মাদাম লাম্বার্ত্তিনীর বাড়ীতে ওর সঙ্গে দেখা হোলো—সুন্দর সাজে অপরূপ সুন্দরী দেখাচ্ছিল ওকে। ওর মাসীর সামনেই আমি প্রস্তাব করলাম, ২৮শে মার্চ সকলকে দামিএন-এর ফাঁসী দেখবার জন্যে আমি নিয়ে যাবো। সমস্ত প্যারিস দেখবার জন্য উন্মুখ সেই নিষ্ঠুর মৃত্যুদণ্ড। আমি একটা খুব ভালো জানলা ভাড়া করে এলাম। যেখান থেকে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার দেখা যাবে। ফিরে এসে দ্য লা মিউর এর সঙ্গে নিভৃতে বসে গল্প করতে লাগলাম··· আর আলাপের মধ্যে এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ভাসা-ভাসা ভাবে বিবাহে সম্মতিও জানিয়ে দিলাম।

ফাঁসীর দিন সবাইকে নিয়ে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় গেলাম। জানলাটা বিশেষ বড় ছিলো না—তাই প্রথম সারিতে মহিলারা আর তাঁদের পিছনে আমি তিরেন্তো দাঁড়িয়ে। কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, সেই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড আমি দেখতে পারিনি—সারাক্ষণ মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলাম। দুই কান প্রাণপণে চেপে রাখা সত্ত্বেও সেই হতভাগ্যের মর্ম্মস্পর্শী তীব্র করুণ আর্ত্তনাদ শুনতে পাচ্ছিলাম। ডেমিএন সম্বন্ধে সকলেই জানতো—লোকটা অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির আর ধর্ম্মে অন্ধবিশ্বাসী ছিলো। রাজাকে হত্যা করে স্বর্গলাভের আশা করতে গিয়েই বেচারার এই ফল হোলো। অবশ্য রাজার গায়ে সামান্য একটু আঁচড় কাটা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি···কিন্তু শাস্তিটা হোলো হত্যা করার শাস্তিরই সামিল। সীন নদীর ঢালু পাড়ের উপর দিয়ে গড়ানো চাকায় বেঁধে দেওয়া হোলো হতভাগার দেহটা। চাকায় সমস্ত শরীরটা পিষে গেল আর চারটে ঘোড়ার পায়ের আঘাতে সমস্ত দেহটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হোয়ে টুকরো টুকরো করে ছিটকে পড়তে লাগলো। আশ্চর্য্য প্যারিসের মহিলারা! এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য তাঁদের এতটুকুও বিচলিত করলো না!

এই ঘটনার পরই মাদামোয়াসেল দ্য লা মিউর তার মাসীর সঙ্গে লা ভিলেৎ এ বেড়াতে গেল আমাকেও একবার যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে। দিন তিনেক পর আমি দু'-একদিন কাটাবো বলে গেলাম। ডানকার্কের সেই ধনী ব্যবসায়ীটিরও আসার কথা ছিলো। কিন্তু আমি থাকা অবধি তিনি এসে পৌছলেন না। আমি তাঁকে দেখবার জন্য আর একবার গেলাম লা ভিলেৎ এ। মাদামোয়াসেল দ্য লা মিউরকে ধনী অতিথির সম্মানে মূল্যবান উজ্জ্বল পোষাকে সুন্দর করে সাজতে দেখলাম—ডানকার্কের ব্যবসায়ীটিও দেখতে সুন্দর আকর্ষণীয়। তাঁকে আরও একদিন বেশী থাকবার জন্য অনুরোধ জানালেন মেয়েটির মাসী। দ্য লা মিউরও তাঁর সঙ্গে যোগ দিলে।

পরে যখন মাসী বোনঝিকে একান্ত ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হবু স্বামীর সম্বন্ধে কি ঠিক করলি বল?" বোনঝি তখন উত্তর দিলে,—"লক্ষ্মীটি মাসী, এখনকার মত আমাকে রেহাই দাও। কাল ঐ ভদ্রলোকের পাশে আমাকে বসিও আর কথা বলিও, তাহলেই দেখতে পাবে আমার রূপ ওঁর সহ্য হোলেও আমার কথাবার্ত্তা ওঁর অসহ্য হোয়ে উঠবে। যখন দেখবেন আমি একেবারে একটা নিরেট বোকা তখন হয়ত আমাকে বিয়ে করতে চাইবেন না"—

সে রাত্রে খাওয়ার পর কিছুক্ষণ তাস খেলে আমরা সবাই যে যার

ঘরে শুতে গেলাম। মিনিট পনেরো পরেই আমার দরজা খুলে গেল—ঢুকলো এসে আমার কিশোরী প্রিয়া—কিন্তু প্রতিদিনকার মত শিথিল রাত্রিবাস ওর পরনে নেই, সান্ধ্য পোষাকে সুসজ্জিতা।

—"বলো তুমি···এই বিয়েতে কি আমাকে রাজী হতে হবে?"

—"ঐ ভদ্রলোকটিকে পছন্দ হয় তোমার?"

—"অপছন্দ হয় না"

—"তবে রাজী হও"।

—"বেশ—তবে বিদায়। এই মুহূর্ত থেকে প্রেমের মৃত্যু হোক, জেগে থাক শুধু বন্ধুত্বের প্রীতি"—

—"আজই রাত্রি থেকে কেন? বন্ধুত্বের সুরু হোক কাল থেকে। আজ রাতে তুমি আমার প্রেয়সীই থাকো।"

—"না, তা' হয় না, মরে গেলেও তা' হোতে দেবো না। আমি যদি অন্যের স্ত্রী হই আমাকে তারই যোগ্য হোতে হবে। কে জানে ভবিষ্যতে হয়ত তার পাশে থেকেই সুখ পাবো। আমাকে ছেড়ে দাও—আমাকে আর ধরে রেখো না—যেতে দাও—তুমি তো জানো আমি তোমাকে ভালবাসি"—

—"তবে যাবার আগে একটি চুম্বন দিয়ে যাও"

—"না।"

—"কিন্তু তোমার চোখে জল! তুমি কাঁদছো?"

—"না-না-না, ভগবানের দোহাই এবার আমায় যেতে দাও"।

—"না, তুমি ঘরে ফিরে গিয়ে সারা রাত কেঁদে কাটাবে! কি করবো ভাবতে পারছি না—শোনো, কেঁদো না তুমি, থাকো আমার কাছে, আমিই তোমাকে বিয়ে করবো"—

—"না—আর এখন তাইতে আমি রাজী হতে পারি না।"—

এই বলে প্রবল চেষ্টায় আমার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নিয়ে ও ছুটে চলে গেল।

পরদিন রাত্রে আহারের সময় অবধি আমি রইলাম। গত রাত্রে অনুশোচনায়, লজ্জায়, ক্ষোভে এক মুহূর্তের জন্য ঘুমাতে পারিনি। সারা দিন অসুখের ভাণ করে নির্জনে চুপচাপ কাটিয়ে দিলাম। সারাক্ষণের মধ্যে দ্য লা মিউর এর সঙ্গে একটি বার দেখাও হোলো না, একটি কথাও বলতে পেলাম না। রাত্রে খাবার টেবিলে মাদামরাসল ওর বিয়ের কথা প্রকাশ করলে···দিন আষ্টেকের মধ্যেই বিয়ে হবে, তারপরই ও ডানকার্ক চলে যাবে। আজ বুঝতে পারি সেদিন আর দেখা না করে ও ঠিকই করেছিলো।

কিন্তু সে সময় আমি যেন ওকে হারিয়ে পাগলের মত হোয়ে উঠেছিলাম···অনুশোচনায় আমার বুক জ্বলে যাচ্ছিল। প্যারিসে ফিরে এসে ওকে এক দীর্ঘ উচ্ছ্বাস আর আবেগ ভরা চিঠি লিখলাম। উত্তর এলো অনুরোধ জানিয়ে, আর কখনো যেন ওকে চিঠি না লিখি। মনে হোলো তবে ও নিশ্চয়ই ডানকার্কের ওই ব্যবসায়ীর প্রেমেই পড়েছে—মনে হতেই ইচ্ছা হোলো ঐ ব্যবসায়ীটাকে খুন করতে ও যেন দস্যুর মত লুঠে নিতে এসেছে আমার এক পরম সম্পদ।

ঠিক করলাম ওর বাড়ীতে যাবো···ওকে গিয়ে জানাবো ওর ভাবী পত্নীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা। তারপরও যদি ও নিরস্ত না হয় তাহলে ওকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাবো। মনে মনে ঠিক করে দুটি পিস্তল হাতে নিয়ে সত্যিই ওর বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। কিন্তু তখন ও ঘুমাচ্ছে। অপেক্ষা করতে লাগলাম—আধ ঘণ্টা পর ও ঘরে এসে ঢুকলো একটা ড্রেসিং-গাউন গায়ে জড়িয়ে ঢুকে আমাকে দেখেই দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে উচ্ছ্বসিত আহ্বান জানালো। ওর এই আন্তরিকতায় আমার ভিতরের উন্মত্ত পশুটা অভিভূত হোয়ে পড়লো। সব ক্ষোভ, জ্বালা শান্ত হোয়ে জুড়িয়ে গেলো। আমি বাঁচলাম।···

এর কিছু দিন পর আমি জেনেভাতে চলে এলাম। সেখানে এসে যে হোটেলটাতে উঠলাম তার নাম হোটেল দা বার্গাস। মনে আছে সেদিন তারিখটা ছিলো ২০শে অগাষ্ট ১৭৬০। ঘরের মধ্যে এক সময় অলস ভাবে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ চোখে পড়লো জানলার কাচের উপর কি যেন লেখা রয়েছে···উৎসুক হোয়ে কাছে যেতেই দেখি, হীরার অগ্রভাগ কেটে কেটে লেখা—

"তুমিও ভুলে যাবে হেনরিয়েটাকে"

আমার মাথার চুলগুলো অবধি খাড়া হোয়ে হোয়ে উঠলো একটা অসহ্য শিহরণে—এক ঝাপটায় সরে গেল বিস্মৃতির যবনিকা—হেনরিয়েটার স্মৃতি আমার সমস্ত মনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মনে পড়লো সুদীর্ঘ তেরটি বছর আগেকার সেই দিনটি যেদিন হেনরিয়েটা ঐ কথাগুলি লিখে রেখে গিয়েছিলো। এই ঘরেই আমরা দুজনে কাটিয়েছিলাম উজ্জ্বল মধুর ক'টি দিন। হেনরিয়েটার লক্ষ লক্ষ স্মৃতি আমার সমস্ত অনুভূতি সমস্ত হৃদয় জুড়ে ফুটে উঠলো···মানস নয়নে জেগে উঠলো হেনরিয়েটার তেজোময়ী; দীপ্তিময়ী মধুর মুখখানি—মনের সবটুকু মাধুরী দিয়ে যাকে একদিন ভালোবেসেছিলাম আজ সে কোথায়? তারপর থেকে আর দেখিনি তাকে। কোথাও শুনিনি তার কথা। আজও তাকে আমি ভালবাসি—মনের অবচেতনে এত আবেগ এত নিবিড় অনুভূতি আজও ওর জন্যে লুকিয়েছিলো। কিন্তু কি যেন হারিয়েছি আজকের আমি সেদিনের আমির কাছ থেকে। হয়তো সেই গভীর আদর্শবাদ। কিন্তু মনে হয় আজও ওর স্মৃতি আমাকে যেন অনেক দিনের হারানো কি ফিরিয়ে দিলে। যদি একটুও জানতাম কোথায় গেলে ওর সন্ধান পাবো, তবে সেই মুহূর্তেই সেখানে চলে যেতাম ওর খোঁজে। মানতাম না কোনো বাধা—শুনতাম না ওর সেই কাতর মিনতি ভরা নিষেধ।

সেই দিন রাত্রে ম'সিয়ে ভিলার্স-শ্যাঁত্রর সঙ্গে গেলাম ভলটেয়ারের কাছে। আমার জীবনে এও এক স্মরণীয় দিন। আমরা যখন পৌছলাম তখন তিনি সবে টেবিল ছেড়ে উঠছেন—তাঁর চার পাশে ঘিরে আছেন বিখ্যাত লর্ড আর লেডীরা।

আমাকে যথারীতি ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোলো।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু।

শ্রীমতী আর্ভেরএর দিনপঞ্জী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তরু দত্ত

"কারণ জানতাম যে তোমাদের ওখানে নিমন্ত্রণ-পত্র পৌঁছে গেছে।"

"আর তাতেই তোর কর্তব্য শেষ হয়ে গেল?"

রাত দুটার সময় শুতে গেলাম সবার অনুমতি নিয়ে। বড় ক্লান্ত লাগছিল। আমাদের জন্য আমার ঘরটা সাজান হয়েছিল; পাশের ঘরের দোরটাও খুলে দেওয়া হয়েছে, ওখানে হবে আমার বুদোয়ার। আমার কত দিনের সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে ভরা অতি-পরিচিত ঘরটার চেহারা আজ বদলে গেছে; ক্রুশটা শুধু যথাস্থানে আছে। বহুক্ষণ তার সামনে বসে রইলাম।

আজ সকালে উঠতে বেশ দেরী হল। লুই এসে ঘরে ঢুকলো, "কি, ঘুম ভাঙল?" বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে চেয়ে আছি দেখে ও হেসে বলল, "ওগো বঁধু, তুমি ভুলে গেলে নাকি গত রজনীর কথা?"

'ওগো বঁধু' কথাটার কি আলো ছিল জানি না, চকিতে চেয়ে দেখি সামনেই 'আমার স্বামী'। বড় অপরূপ ওর চেহারা; আমার দুই কাঁধে হাত রেখে ও স্মিতমুখে চেয়ে ছিল। অসীম প্রেমে ভরা ওর চোখ আজ স্নেহনম্র; ধবধবে সাদা দাঁতগুলো উঁকি দিচ্ছে সরল হাসিতে উজ্জ্বল ওর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে; ওর ঢেউ-খেলানো চুলে সোনা আর পান্নার চমক। ওর গলা জড়িয়ে ধরে আমি ওর ঠোঁটের ওপর রাখলাম আমার ঠোঁট। ও বসে পড়ল আমার পাশে, আমি ওর বুকে মুখ লুকালাম, আমার কপাল থেকে ও চুলগুলো আস্তে আস্তে সরিয়ে দিল; ওর কাছাকাছি আরও নিবিড় হয়ে বসলাম, তাকালাম ওর দিকে সহাস্য, সানন্দ, নির্ভরশীল দৃষ্টিতে। ও আমার স্বামী, বন্ধু! ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম আমায় এত সহৃদয়, প্রেমাতুর, অনুগত স্বামীর হাতে অর্পণ করার দরুণ। এক সঙ্গে গিয়ে ক্রুশের সামনে আমরা প্রার্থনা করলাম। ও নীচে গেল; আমি খানিক বাদে যখন নামছি সিঁড়ি দিয়ে, ও দেখি আবার ওপরে আসছে।

'কি হল?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'কিছু না, আমার ঘড়িটা ভুলে এসেছি,' বলে টুক করে আমায় জড়িয়ে ধরল।

ঘরে গিয়ে ও দরজাটা একটু ফাঁক করে রাখল। চার-তলার ঘর থেকে তেরেস্ নামছিল।

"এই যে দিদি, ঘুম ভেঙেছে?" ও আহ্লাদে ডগমগ করে উঠল, "এই ত! কেমন সুন্দর চড়ুয়ের মত স্ফূর্তিভরা চেহারা হয়েছে তোর। এখনো অল্প ফ্যাকাশে ভাব যদিও আছে। কেমন দিদি, আগেই বলিনি এবার শীগগির তুই সেরে উঠবি?"

আমি হাসলাম। লুই ঘর থেকে বেরিয়ে এল, "কি বলছ, ও তেরেস?"

"কাপ্তেন সাহেব, বলছিলাম যে মাদমোয়াজেল আপনার রাজত্বে যেতে না যেতেই ওর গালের গোলাপগুলো আবার ফুটেছে।"

লুই হেসে বাধা দিল, "না তেরেস ও আর এখন মাদমোয়াজেল নয়।"

"তাই ত! আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে!" বলে ও কপাল চাপড়াতে লাগল, "এবার থেকে ত ওকে মাদাম ডাকতে হবে। খুকীদির বে হয়ে গেছে, ভাবতেও কেমন লাগে। না, আমার ভীমরতি ধরেছে।"

লুই হাসল। আমরা খাবার ঘরে গেলাম। বাবা 'কেমন আছিস?' বলে আমায় চুমা দিলেন। মা মৃদু মৃদু হাসছিলেন; টেবিলের ওপর একটা চিঠি আর বাক্সের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

"আমার জন্য?"

"হ্যাঁ মার্গো, তোর ঠাকুমা পাঠিয়েছেন," মা জানালেন।

নানা রকম দামী পাথরের কাজ-করা সুন্দর দুটি সোনার ব্রেসলেট ছিল বাক্সের মধ্যে।

"আমাকে কি এত সুন্দর গয়নায় মানাবে?"

"দেখাই যাক না, পরে ত," বলল লুই।

"উঁহু, আগে ওঁর চিঠিটা পড়া যাক্।"

চিঠিটা আন্তরিক স্নেহে উচ্ছল। আমাদের বিয়ের যৌতুক-স্বরূপ গয়না পাঠিয়েছেন ঠাকুমা, আর লিখেছেন প্যারী গিয়ে ওঁকে আমরা যেন দেখে আসি একবার।

ও আর আমি বেড়াতে গেলাম। একটা চেরিগাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর বসা গেল। আমার কোলে মাথা রেখে লুই শুয়ে পড়ল।

একটু সঙ্কোচের সুরে ওকে বললাম, "লুই, তোমার মায়ের কথা বল না?"

ও চুপ করে আছে দেখে ভাবলাম বুঝি এ প্রশ্ন ওর মনঃপূত হয়নি।

"লুই রাগ করলে?"

আমায় আদর করে ও বলল, "কি যে বলছ, রাগ করব, তোমার ওপর? কেন বল ত? ভাবছিলাম মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তবে আমার প্রাণাধিকাকে দেখে কি তৃপ্তিই না পেতেন! হয়ত উনি অদৃশ্য লোক থেকে আমাদের দেখছেন, আমাদের ওপর ঝরে পড়ছে ওঁর আশীষধারা।"

"ওঁর ছবি তোমার কাছে আছে?"

"এখানে নেই; বাড়ী গিয়ে তোমায় দেখাব। আমার সঙ্গে আছে কয়েক গুছি চুল।" বলে ওর ঘড়ির চেনে লাগান একটা পকেট খুলে দুই গুছি চুল দেখাল।

"তুষার-শুভ্র গুছিটি আমার মায়ের; কটা চুলগুলো আমার বাবার।"

"তোমার মার গায়ের রং বুঝি এত সুন্দর ছিল?"

"হ্যাঁ, ওঁকে অতি অপূর্ব দেখতে ছিল; আমায় দেখলে অবশ্য উল্টো ধারণাই হবে, ও হেসে বলল।"

আমি ওর মুখ চেপে ধরলাম।

"বাবার সঙ্গে ওঁর মিলন হয় অতি অল্প বয়সে, তবে তোমার মত এত কম বয়সে নয়।"

১৭ই মে। কাল আমরা চলে যাব। আজ সবই তাই থমথম করছে। লুই আর বাবা দেখাতে চাইছিলেন ওঁদের ফূর্তিতে ভাটা পড়েনি, কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল বাবা খামকা এই অপচেষ্টা করছেন। মা আর আমি সেলাই করছিলাম। থেকে থেকে আমার দিকে চেয়ে উনি গোপনে চোখ মুছছিলেন। মার কত যে কষ্ট হচ্ছে! তা সত্ত্বেও উনি জোর করে আমাদের পাঠাচ্ছেন—আমার শরীরের কথা ভেবে।

"তোর যা স্বাস্থ্যের অবস্থা; অবিলম্বে চেঞ্জে যাওয়া দরকার। সঙ্গে তোর স্বামী থাকবে, আমার ভাবনার কি-ই বা কারণ আছে?"—আমায় উনি উৎসাহ দিচ্ছিলেন এই বলে।

বাবাও বললেন যে, অল্পদিন বাদেই মা আর উনি আমাদের সঙ্গে নীসে মিলিত হবেন। আমার চোখের জল দেখলে পাছে ওঁরা দুর্বল হয়ে পড়েন, তাই আমি প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলাচ্ছিলাম। আমরা বিকেল ছটার এক্সপ্রেসে রওনা হব।

আমার ঘরে গিয়ে একা বসে কাঁদছিলাম; এই বাড়ী ছেড়ে, বাবা-মাকে ছেড়ে এক মাসও আমার পক্ষে কোথাও থাকা অসম্ভব। তেরেস এল।

"সে কি খুকুদি, কাঁদছিস কেন? কাপ্তেন সাহেব দেখলে কি ভাববে বল্ ত? তোর এই অবস্থা দেখলে ওর কত কষ্ট হবে বল্ দেখি? ও বউ! স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যাবি, এতে কাঁদবার কি পেলি!"

জল এনে ও আমার চোখ-মুখ ভাল করে ধুয়ে দিল। ও ঠিকই বলেছে। লুই বেচারা আমায় এত বিচলিত দেখলে কোন প্রাণে যাবার ব্যবস্থা করবে? মা এসে আমায় দেখে কেঁদে ফেললেন। তারপর আমার স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। দশটা অবধি আমার কাছে উনি রইলেন। লুই এলে হাত ধরে ওকে পাশে বসালেন।

"বাবা," ওকে মা বললেন, "তোর হাতে এই দুধের বাছাকে সঁপে দিয়েছি,—জানি যে তুই ওকে সুখে রাখবি; লুই, ওকে সর্বদা চোখে চোখে রাখবি ত? দেখছিস ত এখনও ও নাবালিকা, তা ছাড়া কত দুর্বল!"

"হ্যাঁ মা," ও প্রতিশ্রুতি দিল। মিনিট পনেরো আলোচনার পর মা উঠলেন।

১১শে মে। পারী।—কাল বিকেলে বৃটানী ছেড়ে এসেছি; রাত দুপুরে এখানে পৌঁছেছি। মা আর বাবাকে বিদায় জানাতে গিয়ে নিজেকে সামলাতে পারিনি; ওঁরা ষ্টেশন অবধি এসেছিলেন।

আমায় সজোরে বুকে ধরে শত চুমায় বাবা অভিষিক্ত করলেন। বাবার কণ্ঠলগ্ন হয়ে আমি অঝোরে কাঁদলাম।

কাঁপা গলায় উনি বললেন, "যা মা, আর কাঁদিস না,—বড় কষ্ট লাগছে আমার।" তারপর হাসার চেষ্টা করে বললেন—

"তা ছাড়া তরুণ-তরুণীর সংসারে আমাদের মত বুড়ো হাবড়ার কি-ই বা দরকার বল্ ত?"—মা লুইকে আশীর্বাদ করলেন।

"ওকে দেখিস কিন্তু বাবা," মার অনুরোধ ভেসে এল। বাবার হাত ধরে আমাদের কামরা অবধি ও এল। আবার আলিঙ্গন-আশীর্বাদের পালা শুরু হতেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

যতক্ষণ পারলাম চোখ ভরে চেয়ে রইলাম মা-বাবার দিকে; আমাদের গ্রামের দিকে চোখ পড়ল। মিলিয়ে যাবার পূর্বক্ষণ অবধি আমি সমস্ত অনুভূতি দিয়ে উপভোগ করতে লাগলাম আমাদের গ্রামের শোভা। বুকের কাছটা খালি খালি লাগল। আমার স্বামীর দিকে তাকালাম! ওর জন্য আজ সব কিছু ছেড়ে এলাম, বাবা, মা, দেশ, অতীত। ওর স্বচ্ছ স্নেহ-কোমল চোখের দিকে চেয়ে আমার মধ্যে জেগে উঠল ক্ষীণ এক আশার শিখা, সুখময় এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন! ওর কাঁধে ভর দিয়ে, হাতে হাত রেখে নীরবে কাঁদতে লাগলাম। ও আমায় ওর স্নেহচ্ছায়ায় ঘিরে ধরল। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এলাম; মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে।

"তোমায় বড় বিরক্ত করছি, না গো?" ওকে প্রশ্ন করলাম।

"আমায়? বিরক্ত করছ?" ও হেসে জিজ্ঞাসা করল, "আমি কিছুতে বিরক্ত হই? বল মার্গারিৎ?"

গাড়ীর আলো জ্বলে উঠল। আমাদের কামরায় দেখি আরো এক জন বয়স্ক ভদ্রলোক আছেন; বেশ মন দিয়ে উনি আমাদের লক্ষ্য করছিলেন। বড় অস্বস্তি লাগল; উনি নিশ্চয় আমায় কাঁদতে দেখেছেন; লুইকে চোখের ইশারায় প্রশ্ন করলাম ভদ্রলোককে ও প্রথমেই দেখেছিল কি না। ও সম্মতিসূচক হাসি হাসল, আর আমায় আগের মত ভাবেই বসতে বাধ্য করল। তার পর আস্তে আস্তে আমরা গল্প-গুজবে মেতে উঠলাম। একটু নীরবতার সুযোগ নিয়ে ভদ্রলোক কথা পাড়লেন।

"মশাইয়ের কি পারী যাওয়া হচ্ছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দু-এক দিনের জন্য; কয়েক মাস আমরা গিয়ে দক্ষিণদেশে কাটাব ইচ্ছে আছে।"

"আমিও পারী যাচ্ছি; ডাক্তারী করি: নাম আমার ডাঃ লাফের্ম; আপনাদের কোন উপকার করতে পারলে কৃতার্থ হব; আপনার ত দেখছি সামরিক বিভাগের চাকরি।"

"আজ্ঞে, আমি হচ্ছি দ্বাবিংশ অশ্বারোহী বাহিনীর কাপ্তেন লফেভ্র।"—লুই নিজের পরিচয় দিল।

"মাদামের কি শরীর খারাপ লাগছে?" সৌজন্যের সঙ্গে ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

"সম্প্রতি উনি অসুখ থেকে উঠেছেন।" লুই উত্তর দিল।

উদ্বিগ্ন নয়নে লুই আমার দিকে তাকাল; ভদ্রলোকের প্রশ্নে ও ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমায় জিজ্ঞাসা করল, শরীর খারাপ লাগছে কি না।

"না গো না, আমি আজ খাসা আছি।"

ও আশ্বস্ত হল।

আমরা লুভ্র হোটেলে উঠেছি। এখন ভোর ছটা। বাড়ীতে আমি বরাবরই সকাল সকাল উঠতাম। সে অভ্যাস এখনো ছাড়িনি। গ্রামের কথা, বাবার কথা, মার কথা মনে পড়তেই চোখ আমার জলে ভরে ওঠে। তবু আমি সুখী, বড়ই সুখী। লুই এখনো ঘুমুচ্ছে। আমি চাই না ও দেখুক আমি কাঁদছি। মনে হচ্ছে কত দিন হল আমি চলে এসেছি; এই ত সবে গতকাল আমরা বাড়ী থেকে রওনা হলাম। আজ ঠাকুমার ওখানে যাব। উনি বোধ হয় জানেন না আমাদের আসার কথা, আমাদের পেলে কি খুসীটাই হবেন উনি! বড় জোর দু দিন কি তিন দিন আমরা এখানে থাকবো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লুই দক্ষিণ দেশে পৌঁছুতে চায়। আজ আমি ভগিনী ভেরোনিকের দেওয়া ক্রুশটার সামনে প্রার্থনা করলাম। ওটি সর্বদাই আমার গলায় থাকে। বেচারি! কত অল্প বয়সেই না মারা গেলেন। ওঁর জীবনের ছাব্বিশটা বছর খতিয়ে দেখলে দুঃখের পুঁজিই বেশী দেখা যাবে। আজ উনি শান্তিলোকের অধিবাসী Requiescat in pace! লুইয়ের ঘুম ভাঙল!

"কি গো, বড় দেরী হয়ে গেল না?" বলে ও আমায় জড়িয়ে ধরল। এবার লেখা থামাই। সারা দিনের জল্পনা-কল্পনা ও এখন সেরে রাখতে চায়।

আমরা ঠাকুমার ওখানে গিয়েছিলাম। আমরা এসেছি, চাকরের মুখে শুনে উনি সোজা বাইরের দরজায় গিয়ে হাজির।

"আয় রে আয় বাছারা!" আনন্দে ওঁর গলা ভারী হয়ে উঠল। আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলাম, উনি আমাদের হাত ধরে বলে চললেন—

"কি দাদা-দিদি, তোরা সুখী হয়েছিস ত? হ্যাঁ: আমাকে যেমন প্রশ্ন! কিন্তু তোর এমন রক্তহীন চেহারা কেন রে দিদি? খুব ভুগলি বুঝি? বাছা আমার! বাবা-মার সব খবর কি? ভাল ত?"

লুইকে বসিয়ে আমায় নিয়ে গেলেন সোফার কাছে, "নে দিদি, একটু জিরিয়ে নে: খুব কাহিল হয়ে পড়েছিস, তাই না?"

"না ঠাকুমা, এইটুকুতেই কাহিল হব? এখন আমার বল ফিরে এসেছে, শরীরের অবসাদ কেটে গেছে।"

লুইয়ের দিকে ফিরে উনি প্রশ্ন করলেন, "তাই নাকি রে লুই? বেশ, তা হলে আজ আমার এখানে খেয়ে দেখাতে হবে কেমন শরীর সেরেছে। কোনও ওজর শুনছি নে বাপু! আমার কথা শুনতেই হবে।

ওর পাঠান উপহারের জন্য ধন্যবাদ জানাতে গেলাম; উনি থামিয়ে দিলেন আমায়।—"ও-সব কিছু আমি শুনতে নারাজ। দুই জনে আজ এখানে খেয়ে যাও, তবেই ব্রেসলেটের দাম উঠে যাবে।"—ওঁর কথায় রাজী হতেই হল। আমাদের ছেলেবেলার কত গল্পই যে করলেন।

"জানতাম, তোরা একদিন না একদিন মিলিত হবিই! বুঝলি দিদি, প্রথম দর্শনেই তোদের প্রেম হয়, সে কথা আমার এখনও মনে আছে। ওর জন্মদিনে সে বার ওর সাত বছর পূর্ণ হল। তোর তখন বছর দুয়েক বয়েস। ছোটদের জন্য একটা 'বল' নাচের ব্যবস্থা হয়েছিল। দুই থেকে বারো বছর বয়েসের নানা ছেলে-পিলেতে

ঘর ভরতি। লুইয়ের হাতে ছোট একটা মালা,—ওর হৃদয়-রাণীর গলায় পরিয়ে দেবে। কত রূপের, কত বর্ণের খুকিই যে ওর সামনে দিয়ে আনাগোনা করল : কিন্তু মহারাজের মন কিছুতেই ভরল না। সেই সময় তোকে কোলে নিয়ে তোর মা ঘরে ঢুকলেন। সেই তোদের প্রথম দেখা। সাদা-পোষাকে আবলুসের মত চুলে আর কুচ্‌কুচে কালো বড় বড় চোখে কি রূপই সেদিন খুলেছিল তোর! ওর আর তর সইল না; সটান গিয়ে তোর মাথায় মালাটা দিয়েই এক চুমু। কি হাসির রোল যে উঠল দিদি! ছোঁড়ার মা ত কাঁদবে কি হাসবে ভেবে সারা। তার পর তোকে কোলে তুলে নিয়ে জানতে চাইল ওর মা,—তুই তার ছেলের বউ হবি কিনা। খুব গম্ভীর গলায় দৃঢ়তার সঙ্গে তুই জবাব দিয়েছিলি—"হুঁ।"—ওর মা অতি মহানুভব প্রাণোচ্ছল মেয়ে ছিল; বেচারী আজ তোদের দেখে কি তৃপ্তিটাই না পেত।"—বলে ঠাকুমা চোখ মুছলেন। লুই আমার হাতে চাপ দিল; আমাদের চোখাচোখি হল।

২৩শে অক্টোবর, ১৮৬১। ছয় মাস হয়ে গেল আমরা নীসে সংসার পেতেছি। সমুদ্রের ধারে ছোট্ট এই শহরটি বড় ভাল লাগে। কত দিন যে আমার খাতায় কিছু লেখা হয় নি; সময় পাই না একদম। ওর হুকুম, যতক্ষণ সম্ভব খোলা হাওয়ায় থাকতে হবে; আর সন্ধ্যাবেলা ত প্রায়ই আটটার আগে ঘুমুতে হয়। এত তাড়াতাড়ি যে ঘুমিয়ে পড়ি, এর থেকেই বুঝছি যে সেরে উঠছি। ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমিতে দু'জনে যখন তখন ঘুরতে যাই। সূর্যের আলোয় নীল সাগরের বুকে অজস্র রঙের বাহার দেখে চোখ ঝলসে ওঠে। রাতের খাওয়া প্রায়ই ছাতের ওপর হয়। সেখান থেকে জ্যোৎস্না রাতের সমুদ্র যে কী অপূর্ব লাগে! দুজনে দুজনকে নতুন করে পাই এই অসীম রূপের পাথারে। কখনো কখনো এ-ভাবেই ঘুমিয়ে পড়ি; সবল দু'টি হাতে ও অবলীলাক্রমে আমায় বুকে তুলে নেয়, শুইয়ে দেয় গিয়ে বিছানায়; এত যে চেষ্টা করি জেগে থাকতে, তবু পারি না। ও বলে, এতে ওর বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না; আমার ওজন নাকি ওর কাঁধের পেশীটার চেয়েও কম! আমার লুই যে কত ভাল তা কি করে বলি? ওকে ভালবেসে, ওর জীবনসাথী হয়ে নিজেকে আমি ধন্য মেনেছি।

মা কিংবা বাবার পাত্তা নেই এ অবধি, ওঁরা চিঠি অবশ্য রোজই লেখেন। এবার লিখেছেন আসছে মাসের আগে আসতে পারবেন না; এত আশা করেছিলাম যে আগষ্ট মাসের আগেই ওঁদের সঙ্গে দেখা হবে।

লুইকে মাঝে মাঝে পারী যেতে হয়; ওখানেই ওর রেজিমেণ্ট আছে এখন। বড় জোর দুই দিনের বেশী ও বাইরে কাটায় না। গতকাল সকালে ও পারী গিয়েছে; আজ বিকেলে এসে পৌঁছবে লিখেছে। বারণ করেছে গতবারের মত ষ্টেশনে যেন না যাই ওকে আনতে। ওর ধারণা, এত অল্পেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়বো। তবে, বাগানের দরজা অবধি গিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করতে পারি, এ অনুমতি ও দিয়েছে! ওকে একটা কথা বলতে হবে,—এমন কথা যে ভাবতেই প্রতিবার আমি আশায়, আনন্দে শিউরে উঠছি! ভগবান, অসীম তোমার করুণা!

ছটা বাজল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই লুই এসে পড়বে! এবার খাতা বন্ধ করি, বাগানে গিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করব।

২৪শে অক্টোবর।—কাল লুইকে কথাটা বলেছি। রাতে খাবার পর আমরা ছাতেই ছিলাম। পারীতে কি দেখল, কি করল—সবকিছু সবিস্তারে বলছিল ও। খানিক চুপ করে থাকার পর ওর বুকে মুখ রেখে বললাম—

"লুই, আমার মনে হয়···"রাজ্যের লজ্জা এসে জড় হল আমার সর্বাঙ্গে, "মনে হয় যে শীগগির আমাদের ঘরে নতুন এক অতিথি আসছে।"

উল্লসিত ওর ওষ্ঠের সঙ্গে আমার ওষ্ঠ এক হয়ে গেল। কাল থেকে আমার চোখে জগতের রূপ পালটে গেছে, আমার সুখে মনে হল বিশ্বপ্রকৃতি আজ সুখী। আমার জানলার পাশে গোলাপ গাছের ওপর থেকে পাখীরা মধুর কি এক বাণী নিয়ে আসে আমার জন্য; ওদের চঞ্চল চোখ যেন আমারই সুখের প্রতিচ্ছবি। ফুল ফুটে উঠেছে অপূর্ব প্রাচুর্য নিয়ে; সমুদ্রের ধারে যখন বসি আর ঢেউগুলো এসে লুটিয়ে পড়ে আমার পায়ের তলায়, মনে হয় ওরা বন্দনা গাইছে নবাগতের। ভগবান, তোমাকে আমার প্রণতি জানাই। আজ সকালে ঘুম ভাঙতেই বসে রইলাম লুইয়ের পাশে, চেয়ে রইলাম ওর ঘুমন্ত মুখের পানে; ওকে আমি বড় ভালবাসি; আমার স্বামী, আমার সন্তানের পিতা! দশ মাসও হয়নি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম তোমার প্রস্তাব। তা সত্ত্বেও তুমি আমায় ভালবেসেছ বন্ধু, বড়ই অকৃতজ্ঞ, বড়ই নিষ্ঠুর আমি। কিন্তু না, আজ, লুই, প্রিয়, তোমায় আমি প্রাণাধিক ভালবাসি; মনে পড়ে তোমার মুখে প্রথম যখন এ-কথা শুনি চেরি-বাগানে! ওর কপালে আলতো ভাবে চুমু দিয়ে আমি জানলা খুলে দিলাম। প্রাণোচ্ছল আলোর স্রোতে ঘর ভরে গেল। সূর্যের প্রোজ্জ্বল মুখখানি হেসে যেন আমায় বলছে, "সুপ্রভাত।" পাখীদের মুখেও সেই কথার প্রতিধ্বনি, "সুপ্রভাত।" আনন্দের আবেগে আমার ইচ্ছে হল গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠি। গোলাপ তুলতে গিয়ে মৃদুস্বরে তাদের জানালাম এ-সুখবর। শিশিরভেজা ফুলগুলো নিয়ে গিয়ে রাখলাম মেরী-মায়ের বেদীমূলে; আমাদের আশার অকপট অঞ্জলি ওঁর চরণে কি পৌঁছবে না? কতক্ষণ জানি না, চেয়ে রইলাম ওঁর অঙ্কশায়ী নবজাত যীশুর দিকে; এই দেবশিশুর মত সুন্দর হোক আমার সন্তান। আকুল প্রাণে প্রার্থনা করলাম যীশুর কাছে। তার পর মেরীকে স্মরণ করে বললাম, "হে জননি! আমাদের ঈশ্বরের জননি, আমায় বল দাও, আমার সন্তানকে পরম প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী আমি যেন গড়ে তুলতে পারি আদর্শ মানুষ-রূপে!"

২৫শে অক্টোবর। কাল আমরা ছাতের পাশে হলঘরটায় বসে ছিলাম। একটা কৌচের ওপরে বসে লুই আর আমি আমাদের সন্তান সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করছিলাম। আমি বললাম, "লুই, তোমার মত ও সৈন্য বিভাগে কাজ করবে, না?"

"যদি ওর মায়ের আপত্তি না থাকে," ও হেসে বলল।

"আমার ত একান্ত ইচ্ছে যে ও হুবহু তোমার মত হোক; লোকে দ্বিতীয় লুই লফেভ্র বলে ওকে অভিহিত করুক। তোমারি রেজিমেণ্টে ও যোগ দেবে,—বাপের অধীনে কাজ করবে। আর আমি দ্বাবিংশ অশ্বারোহী বিভাগের আমার স্বামী ও পুত্র সম্বন্ধে সেদিন গর্ব করে

বেড়াব। তার পর ও যখন একুশ বছরে পা দেবে, তোমার বদলে ও হবে কাপ্তেন, আর তুমি, তুমি হবে মার্শাল।"

"সমস্ত ফরাসী সৈন্যবিভাগের মার্শাল, না?"

"নিশ্চয়ই! তোমার কি সাহসের অভাব?—তখন তুমিই ওকে অস্ত্রশিক্ষা দেবে। ওর প্রথম বিজয় যেদিন ঘোষিত হবে, সেদিন সবাই অবাক হয়ে তাকাবে ওর দিকে, "কে এই তরুণ যোদ্ধা!" লোকে তখন বুক ফুলিয়ে উত্তর দেবে, "মার্শাল লফেভ্র-এর ছেলে?" আর আমি মনে মনে বলব, 'আমাদের সন্তান'!

২৬শে অক্টোবর। কাল লুই আর আমি বনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। খানিক এদিক ওদিক ঘোরবার পর আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় গেলাম; অলিভ গাছের ছায়ায় গজিয়েছে অজস্র নরম 'মস্'। বুনো গোলাপের বেড়া দেওয়া ছোট্ট এই কুটিরখানি প্রকৃতি যেন আমাদের জন্য তৈরী করেছিলেন। তার গোপনতম কোণে গিয়ে আমি বসলাম, আর চিরদিনের অভ্যাসমত লুই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল আমার কোলে মাথা রেখে। আমার দিকে নীরবে চেয়ে ও নাড়াচাড়া করছিল আমার গলার লকেটটা; এই লকেটের মধ্যে আমি ওর ছবি রেখে দিয়েছি।

"শুনছ? বড় ঘুম পাচ্ছে।"

ওর দিকে তাকালাম; কি অপরূপ দেখতে! আমার সাদা মসলিনের পোষাকের ওপর ওর কটা রঙের চুলগুলো চমৎকার লাগছে। ওর বাঁ হাতে লকেটটা রয়েছে, ডান হাতটা আলতো ভাবে নামানো মাটির ওপর।

ও হঠাৎ চোখ খুলে আমায় জিজ্ঞাসা করল, "কি এত ভাবছ গো?"

"আমাদের সন্তান যেন তার বাপের রূপ পায়, লুই।"

"আমায় যদি অতই সুন্দর দেখতে তবে তার দাম চাই, একটা—" ও হেসে বলা মাত্র আমি নীচু হলাম; ও সাগ্রহে আমার গলা জড়িয়ে ধরল।

"মার্গারিৎ, মার্গো, তোমায় বড় ভালবাসি!"

হঠাৎ মনে হল কে যেন ঝোপের ওদিকে রয়েছে, লুই ঘাড় ফিরিয়েই দেখল, একটি লোক এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে। লুই উঠে দাঁড়াল চট করে।

"ভিয়ার! তুই এখানে কি করে এলি রে?" সানন্দে ও চেঁচিয়ে উঠল।

"আমার ভ্রমণের নেশার কথা জানিস্ ত? আর এখানেই দিন কাটাচ্ছি কেন জানিস? তোকে আর তোর বউকে দেখব বলে।" আগন্তুক উত্তর দিয়ে আমায় অভিবাদন জানাল।

"এখানে দিন কাটাচ্ছিস কি রে? এত দিন এখানে আছি, তোর সঙ্গে দেখা হয়নি ত?"

"সে কথা থাক, তোদের ছুটিতে এত চমৎকার 'তাবলো'র সৃষ্টি করেছিলি রে! চুপি চুপি ক্যানভাসের বুকে এঁকে নিলাম। আমার ওপর সেজন্য রাগ করলি না ত, লুই?"

"চটব কেন রে? তোর হাজার খুন মাফ করলাম; ক্যানভাসের ওপর ছবি হয়ে টিঁকে থাকার বদলে পুরুষালি একটা কাজ দিলি বটে!"

আমার দিকে ঘুরে ও বলল, "মাদাম, আমায় মাফ করবেন ত?"

"বিলক্ষণ মঁসিয়্য, অবশ্য এতে মাফ করার কিছুই দেখি না!" আমি জবাব দিলাম।

"ধন্যবাদ মাদাম, আপনি দেখছি সাক্ষাৎ করুণাময়ী!"

"কিন্তু তোর ছবিটা লুকোলি কোথায় ভিয়ার?" লুই প্রশ্ন করল।

"উঁহু, এখন দেখাচ্ছি না; শেষ আঁচড় দেওয়ার পর দেখাব; এখন খালি কাঠামোটা দাঁড় করিয়েছি।"

"তবে চল্, আমাদের ওখানেই এ-বেলার পাট চুকিয়ে নিবি।"

"আমি ত এক্ষুণি রাজী, কিন্তু মাদাম কি আমার মত ভবঘুরেকে বাড়ী ঢুকতে দেবেন?"

"নে নে, ও-সব পারিসিয়ান নকুতো এখানে অচল," লুই ধমক দিল হেসে। আমিও যোগ দিলাম, "বুঝলেন মঁসিয়্য, লুইয়ের যত বন্ধু আছেন, প্রত্যেকেই আমারো বন্ধু,—তাঁরা প্রত্যেকেই যে-কোন মুহূর্তে আমাদের বাড়ী আসতে পারেন; কাজেই কোন ওজর খাটবে না মশাই!"

বাড়ীর পথ ধরলাম আমরা।

"তুই বিয়ে করলি লফেভ্র, আমাকে জানাস নি ত?"

"হুঁ, বহুকাল তোর সঙ্গে দেখাও হয় নি, তোকে লেখাও হয় নি, গেল মে মাসে আমাদের বিয়ে হল।"

"আর আমায় একটা লাইন পর্য্যন্ত লিখে পাঠালি না হতভাগা! দেখলেন ত মাদাম, কেমন বন্ধু?" আমায় ও সাক্ষী মানল। তার পর কিছু গম্ভীর কিছু পরিহাসের সুরে ও বলে চলল, "থাক বাপু, তোকে আর বেশী উত্যক্ত করব না। কারণ বিয়ের পর, বিশেষতঃ মাদামের মত রূপে গুণে তিলোত্তমার হাতে পড়লে, লোকে আর সবই ভুলে যায়।"

লুই ওর বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল।

"সত্যি ভিয়ার, তুই বড় একটা সত্যি কথা বলে ফেললি; জীবনে আমি এত সুখ আশা করিনি!"—কাঁপা গলায় লুই বলল। ওর চোখ ঝাপসা হয়ে এল; ওর বন্ধু সহানুভূতির সুরে জানাল।

"জানি লফেভ্র, জানি; তোর এই সুখের যে আমি কত বড় সমভোগী, তা, তা তুই জানিস না।" লুইয়ের হাত ও ধরল।

খাবার পর লুই মঁসিয়্য ভিয়ারকে গান গাইতে বলল। "জান মার্গারিৎ, খোদ সারিও-র মত ওর গলা।" আমিও অনুরোধ করাতে মঁসিয়্য ভিয়ার গিয়ে পিয়ানোয় বসল। জানলার কাছে একটা কেদারায় গিয়ে বসল লুই। ওর পাশেই একটা গদীতে বসলাম আমি, ওর কোলে মাথা রেখে। ভিয়ারের প্রথম কয়েকটি সঙ্গৎ শুনেই কেমন একটা অস্পষ্ট স্মৃতি চকিতে জেগে উঠল। জানা একটা সুর, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারলাম না কি! ও হো, এইবার মনে পড়েছে।

"নবোঢ়া রূপসী যে পথে যাবে,
ফুলে ফুলে দাও সে-পথ ছেয়ে;
পথে পথে ফুল, ফুটনের হাসি,
রূপসী নবোঢ়া এ-পথে যাবে!"

এ যে জাস্‌ম্যাঁর সেই করুণ গান। আমাদের বিয়ের দিন হঠাৎ যে গানটা আমার মনে পড়েছিল। দু'ই দু'বার একই গান এ-ভাবে

আমার কানে ধ্বনিত হল,—এ কি কিছুর ইঙ্গিত? ওই ত! শেষটুকু ও গাইছে, সুন্দরী এয়োস্ত্রীকে কবরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে :—

"পথে পথে ওঠে শোক-ক্রন্দন
মৃতা রূপসী যে এ পথে যাবে;
পথে পথে শোক, অশ্রু-অর্ঘ,
রূপসী মৃতা যে যাবে এ পথে!"

আমার বুক ব্যথায় টনটন্ করতে লাগল। সজোরে লুইয়ের হাত চেপে ধরলাম। ও সুখী, ভগবান; আমি, আমিও সুখী! আর কোল জুড়ে যে আসছে! ওকে বুকের দুধ খাইয়ে কি জীবনের পথে দীক্ষিত করে যেতে পারবো না আমি? দয়াময়, এমন যেন কখনো না হয়; না দয়াময়, তোমার ইচ্ছাই যেন পূর্ণ হয়—আমাদের বাসনা যেন তোমার কাজের অন্তরায় না হয়!

মঁসিয়্য ভিন্নার উঠল।

"ধন্যবাদ," লুই বলল, "তোর গলাটা খাসা চাঁছা-ছোলা রেখেছিস দেখছি; কিন্তু অন্য কিছু এবার শোনা: সুন্দরী সেই গেঁয়ো মেয়ের কাহিনীটা?"

"যাঃ! ওটা ভুলে গেছি, জাস্‌মাঁার এই গানটাই মনে ছিল এখন যেটা গাইলাম।" ও এগিয়ে এল, অস্ফুটস্বরে আমি ওকে ধন্যবাদ দিয়েই একটু খোলা হাওয়া খাবার অজুহাতে গিয়ে হাজির হলাম ছাতে। না, না, লুইয়ের সামনে কিছুতেই এ-ব্যথার মুখ খুলব না। একটু পায়চারী করে বেশ শান্তি পেলাম। জানলা-গুলো বন্ধ করে দেওয়া হল, আলো এল। রাত আটটার সময় মঁসিয়্য ভিন্নার উঠল। রোজ আসবে,—কথা দিয়ে গেল।

২৭শে অক্টোবর।—কাল রাতে এগারটার সময় ডায়েরী লিখছিলাম, ভয় হচ্ছিল লুই বুঝি বকুনি দেয় এখনো জেগে আছি বলে। ও নীচে গিয়ে আফিসের কি হিসেব মেলাচ্ছে। আজ বহুক্ষণ ভগবানকে ডাকলাম, যেন আমাদের প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করেন। কয়েক মিনিট বাদেই লুই এল।

"এ কি এখনো লিখছ! না গো, এ ভাবে শরীর খারাপ কোর না লক্ষ্মীটি!"—তারপর আমায় আদর করতে করতে বলল, "কি সুন্দর যে লাগছে তোমায়!"

আমি হাসলাম।

"কি গো, হল?" ও অধীর হয়ে উঠল।

"এই হয়ে এল।" আমি জানালাম। তারপর খাতা বন্ধ করে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা লুই, তুমি আমায় সত্যি ভালবাস?"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ," ও বলল।

"আমিও তোমায় বড় ভালবাসি লুই, এ কথা তুমি বিশ্বাস কর?" আমার দুই চোখ জলে ভরে উঠল, শত চেষ্টায়ও তা ঢাকতে পারলাম না।

"কেন তুমি এ-কথা বলে আমায় কষ্ট দিচ্ছ?"

"আচ্ছা, অতীতের জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করেছ?"

"ক্ষমা? কিসের জন্য?" বলেই ও আমায় বুকে চেপে ধরল। তারপর আমরা ক্রুশের সামনে প্রার্থনা করলাম অভ্যাস মত।

২রা নভেম্বর।—মা-বাবার চিঠি পেয়েছি, ওঁরা ১ তারিখে আসছেন। এতদিন বাদে ওঁদের দেখব,—দিন যেন কাটছে না। ওঁদের জন্য ঘর গোছাতেই সারা দিন কাটিয়ে দিলাম, দু'জনের ২টি ঘর।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ :—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ফড়িং ও ঝিঁঝি

(কীট্‌স্ থেকে)

এই জগতের কাব্য কভু ধ্বংস হবার নয় :
সকল পাখী মুষড়ে যখন থাকে তপন-তাপে,
গাছের ছায়ায় লুকোয় যবে একটা গুমোট্ ভাপে,
লতার বেড়ায় ঘাস-ছাটানো মাঠে ফড়িং-চয়
গ্রীষ্মকালের বাতাস শোভা গেয়ে সুনিশ্চয়।
আমোদ কভু মিটবে না তার, শ্রান্ত হ'লে বাপে
খুব আরামে জঙ্গলীগাছের সুন্দর ঝোপ-ঝাপে;
(এম্‌নি ক'রে জগৎ সে যে করছে মধুময়।)
এই জগতের কাব্য কভু ক্ষান্ত হবে না রে!
শীতের বিজন সন্ধ্যেবেলা শান্ত নীরব ধরা,
ঝিঁঝি তখন গরম চাঁইয়ের আওতাতে গান গায়।
আত্মভোলা মানুষ তখন ঘুমের অন্ধকারে,
ভাববে, ফড়িং গাইছে বুঝি এমন আকুল-করা!
গাইছে বুঝি অদূরে কোন্ উচ্চ পাহাড়-চূড়ায়!

অনুবাদ : শ্রী.যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

কলকাতায় তখন সবে বর্ষা নেমেছে।

বাড়িতে বসে আছি চুপ-চাপ. কোনো কাজ নেই, রাস্তার মোড়ে একটু জল। পথে লোক-চলাচল নেই। দু'একটি ট্যাক্সি কি রিক্স চলে যাচ্ছে কখনো-সখনো। দেখছি রাস্তাকে পাশের বাড়িতে। আর শোনা যাচ্ছে মেয়েদের আড্ডার কলকোলাহল।

তেমনি এক বৃষ্টির দিন দুপুরবেলা হঠাৎ দেখি, একটি ট্যাক্সি এসে থামলো বাড়ির সামনে।

মিনিট দুই পরে চোখের সামনে আবির্ভূত হোলো দিলীপদা'। বললে, "ক'টা টাকা আছে তোর কাছে? ট্যাক্সির ভাড়াটা মিটিয়ে দে তো।"

আমি অবাক হয়ে তাকালাম দিলীপের দিকে। সে নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলো, "মনে ছিলো না যে পকেটে পয়সা নেই। ট্যাক্সিতে উঠে খেয়াল হোলো। ভাবলাম কোথায় যাই। তোর বাড়িটা পথে পড়লো বলে এখানেই এসে নামলাম।"

চাকরের হাত দিয়ে ভাড়াটা নিচে পাঠিয়ে দিলাম। ট্যাক্সি চলে গেল।

"আজ বেরোস নি?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"এই বৃষ্টিতে কোথায় বেরুবো?"

"আমি কিন্তু এমন বৃষ্টিতে বাড়িতে বসে থাকতে পারি না." দিলীপ জবাব দিলো.

আমি চুপ করে রইলাম। দিলীপ একটু অপেক্ষা করলো আমার কিছু বলার, চুপ করে আছি দেখে একটু পরে জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় গিয়েছিলাম জানিস?"

আমি চোখ তুলে তাকালাম।

"রেবা চৌধুরির হস্টেলে।"

"ওরা দেখা করতে দিলো রেবার সঙ্গে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ভিজিটার্স লিস্টে নাম না থাকলে তো দেখা করতে দেয় না।"

"সে প্রশ্ন ওঠেনি, কারণ, সে হস্টেলে ছিল না!"

"ও"—বলে আমি মনে মনে একটু সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

দিলীপ বোধ হয় বুঝলো। হাসলো একটুখানি। বললো, "রেবাকে হস্টেলে না পেয়ে আমি গেলাম সুবিমল ভটচাযের বাড়ি। সেখানেই রেবার সঙ্গে দেখা হোলো। এতক্ষণ ওদের ওখানেই আড্ডা দিচ্ছিলাম. খেলামও সেখানেই। মল্লিকা খাসা রান্না করে।"

আমার মুখে কি ভাব ফুটে উঠেছিলো না জানি! দিলীপ হেসে তাকালো আমার দিকে। তার পর আস্তে আস্তে বললো, "তোর অতো ভাবনা কিসের? তোর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে এসেছি সেখানে। সুবিমল, রেবা মল্লিক, সবাইকেই বুঝিয়ে এসেছি তোর মতো ছেলে আর হয় না।"

আমি তবু কোনো উত্তর দিলাম না। দিলীপই বোধ হয় এবার একটু অসোয়াস্তি বোধ করলো। আস্তে আস্তে বললো, "তুই বোধ হয় জানিস না, কেন আমি ওদের ওখানে গিয়েছিলাম?"

আমি চোখ তুলে তাকালাম।

দিলীপ বলে গেল, "আজ দু'তিন দিন ধরে শুধু ভাবছি কি করে একজনকে ভোলা যায়। চেনা মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে হৈ-চৈ করে কিছুই হোলো না। তার কথা বার বার আরো বেশী করে মনে পড়লো। অচেনা মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাতে গিয়ে দেখি, তাদের তো অসহ্য মনে হচ্ছেই, আর মনে হচ্ছে যেন এ ভাবে সব চেয়ে বেশী অপমান করছি তাকে, যাকে চেষ্টা করছি ভুলে যাওয়ার। সুতরাং এখন মনে হচ্ছে, এমন একজন সামান্য চেনা কারো সঙ্গে একটু বেশী চেনা করে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক, যাকে অনেক চেষ্টা করেও আমার কাছে অসামান্য করে তোলা যাবে না। কারণ, সে আরেক জনের কাছে এরই মধ্যে অসামান্য হয়ে আছে,—একটু ভাবতেই তোর কথা মনে পড়লো, রেবার কথা মনে পড়লো, সুতরাং রেবাকে খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।"

কী আবোল-তাবোল বকছে দিলীপদা'! জিজ্ঞেস করলাম, "কি লাভ হবে এতে?"

"বিশেষ কিছুই না, দিলীপদা' উত্তর দিলো, "শুধু একটি সিনেমা দেখার আমন্ত্রণ।"

"মানে?"

"রেবা কাল আমায় একটি সিনেমা দেখাচ্ছে।"

"ও, তা'হলে," আমি বললাম, "তুমি, সুবিমল, মল্লিকা, রেবা সবাই মিলে কাল সিনেমায় যাচ্ছো?"

ফুলের মত…
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে
Rexona
BLENDED WITH CADYL

"সুবিমল আর মল্লিকা যাচ্ছে না," দিলীপ ম্লান হাসি হাসলো, "শুধু আমি আর রেবা যাচ্ছি।"

বাইরে ঝমঝম করে আরেক পশলা বৃষ্টি নামলো। দমকা হাওয়া জানলা-দরজায় ঘা দিয়ে গেল, তোলপাড় করে তুললো জানলার পর্দা, সামনের টেবিলে একটি বইয়ের পাতাগুলো বিপর্যস্ত হয়ে উঠলো, আর এলোমেলো হয়ে গেল দিলীপদা'র মাথার চুলগুলো। সামনের বাড়ির ছাতের ওপারে কালো কালো মেঘ হুড়মুড় করে উঠলো।

"বেশ তো, দেখে এসো," আমি হেসে বললাম, "রেবাকে তো চেনো না, ওর পাশে বসে সিনেমা দেখার মতো যন্ত্রণা আর নেই। প্রত্যেকটি কথা ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে, প্রত্যেকটি ঘটনা কেন হোলো, কি ভাবে হোলো, তার বিশদ ব্যাখ্যা করতে হবে, ও হেসে উঠলে কানে আঙুল চাপা দিতে হবে, ও চোখের জল ফেলতে সুরু করলে নিজের রুমাল এগিয়ে দিতে হবে। একদিন ঘুরে এসো ওর সঙ্গে। আর যেতে চাইবে না।"

দিলীপ একটু ম্লান হেসে চুপ করে রইলো। তারপর বললে, "সে-ও ভালো। একদিন যাবো, দু'দিন যাবো, তিন দিনের দিন আর যেতে চাইবো না, মনেও কোনো আক্ষেপ থাকবে না। অনেক দিন আগে একবার একজনের সঙ্গে যে রকম হয়েছিলো সে রকমটি না হলেই হোলো।"

হঠাৎ যেন মনে হোলো দিলীপদা'র উপর অন্যায় করছি এত রুক্ষ হয়ে। খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "কার কথা বলছো? জেনী ওয়াঙ?"

দিলীপ চুপ করে রইলো।

মন্থর হয়ে এলো বাইরের বৃষ্টি। নিস্তেজ হয়ে এলো বাদলা হাওয়া। বারান্দার অর্কিডের পাতা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে টুপ-টুপ করে।

"আচ্ছা, দিলীপদা', তুমি আমার কাছে ওদের অনেকের গল্পই করেছো, কিন্তু জেনীর গল্প করো নি কোনো দিন," আমি বললাম।

তখনো চুপ করে রইলো দিলীপদা'।

তারপর আবার যখন ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি সুরু হোলো আরেক পশলা আর গুরু-গুরু মেঘ ডেকে উঠলো আবার, দিলীপ বললো আস্তে আস্তে, "আজ জেনীর গল্প করার মতোই দিন। শোন তা হলে। কিন্তু তার আগে চা চাই। হুইস্কি হলে আরো ভালো হোতো, কিন্তু তোদের সব মধ্যবিত্ত ব্যাপার, ওসব তালে থাকিস না। এই বাঙালী জাতটার যে কবে উন্নতি হবে কে জানে! যাক, চা-ই সই। দু' কাপ চা দিতে বলে দে'। আর কাউকে ডেকে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে দে। খুচরো নেই তোর কাছে? কেন, ওই, ট্যাক্সির ভাড়া দিতে পাঁচটা টাকা দিলি তোর চাকরকে? ডাক তাকে, ডেকে তিন চার প্যাকেট গোল্ডফ্লেক এনে দিতে বলে দে। তোদের এ-সব মধ্যবিত্ত পাড়ার পানওয়ালাদের কাছে তো টিন পাওয়া যাবে না।"

দু' কাপ চা এলো। তার পর তিন প্যাকেট গোল্ডফ্লেকও এলো।

বাইরে ঝির-ঝির বৃষ্টি—কিন্তু বাদলা হাওয়ার সে রকম দাপট আর নেই। এ বাড়ি ও বাড়ির জানলায় জানলায় কি রকম যেন একটু করুণ তার সাড়া।

রিকশ ঠুং-ঠুং করে গেল রাস্তা দিয়ে। স্তিমিত হয়ে এলো পাশের বাড়ির রেডিও। ও-বাড়ির মেয়েদের হাসির সাড়াও আর পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই আড্ডা সেরে এবার হেঁসেলে গিয়ে ঢুকেছে বোধ হয় চায়ের ব্যবস্থা করতে।

দিলীপ একটি সিগারেট ধরালো। জিজ্ঞেস করলো, "শুনবি?"

আমি চুপচাপ একটি সিগারেট ধরালাম।

"রেবার সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়েছিলাম বলে কিছু মনে করিস নি তো?" দিলীপ ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করলো।

উত্তরে একটু হেসে আমিও একমুখ ধোঁয়া ছাড়লাম।

দিলীপ চুপচাপ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। তারপর বললো, "আচ্ছা, শোন তা'হলে। আজ না বললে হয় তো আর কোনো দিন বলা হয়ে উঠবে না।"

আহ-কিম্'এর লণ্ড্রি বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের এক পাশে। ছোটো সাজানো-গুছোনো দোকান, কাউণ্টারের পেছনে কাচের আলমারিতে নানারকম সুটগাউন টাঙানো। কাউণ্টারের পেছনে একটি চীনে মেয়ে বসে।

একটি ময়লা গরম সুট বগলে নিয়ে একদিন সেখানে উঠে এলো দিলীপ। সুট ড্রাই ক্লীন করতে দিলো, দর নিয়ে নিষ্ফল তর্ক করলো, রসিদে নিজের নাম-ঠিকানা সই করলো, তারপর রসিদ নিয়ে চলে গেল।

কিছু দিন পর গিয়ে সেই সুট ফেরত নিয়ে এলো। তারপর একদিন একটি সিল্কের হাওয়াইআন শার্ট ধুতে দিলো। পরের বার নিয়ে গেল একটি রেয়নের সুট।

সেটি দিয়ে, রসিদ নিয়ে, ঘণ্টাখানেক এখানে সেখানে কাটিয়ে হঠাৎ খেয়াল হোলো যে তার সিগারেট-লাইটারটি ভুলে সেই সুটের পকেটে রয়ে গেছে। দামী লাইটার। একজনের কাছে উপহার পাওয়া।

তাই তক্ষুণি ছুটলো সেই লণ্ড্রিতে, যদি সুটটা এখনো কারখানায় চলে গিয়ে না থাকে, তা' হলে লাইটারটি ফেরত পাবে, এই প্রত্যাশায়।

ঢুকতেই সেই চীনে মেয়েটি তাকে দেখে একটু হাসলো। সেইটুকু হাসিতেই বুঁজে এলো তার চোখ দু'টো।

দিলীপ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই সে লাইটারটি বার করে দিলো।

সে মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে পথে বেরিয়ে এলো। প্যাকেট বার করে একটি সিগারেট ঠোঁটের কোণে সন্নিবিষ্ট করলো। তারপর লাইটারটি ধরালো।

চকমকি থেকে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে সলতেটি ধরে উঠতেই দিলীপ একটু অবাক হয়ে আগুনের শিখার দিকে তাকালো। কী যেন ভাবলো। তারপর চলে গেল।

দিন পাঁচ-ছয় পরে দিলীপ লণ্ড্রিতে ফিরে এলো তার রেয়নের সুট ডেলিভারি নিতে কিন্তু রসিদ ফিরিয়ে সুট ডেলিভারি নিয়েই সে চলে গেল না। দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করলো।

"ইয়েস, এনিথিং এল্‌স্‌," জিজ্ঞেস করলো সেই মেয়েটি।

"হ্যাঁ, বলছি," দিলীপ বললো, "আমি যখন লাইটারটি কোটের পকেটে রেখেছিলাম তখন তা'তে তেল ছিলো না। যখন আমি লাইটারটি তোমার কাছ থেকে পেলাম তখন দেখি, ওটাতে তেল ভরে দেওয়া হয়েছে।"

মেয়েটি একটু হাসলো। হেসে বললো, "তা'তে কি হয়েছে?"

"বিশেষ কিছু না," দিলীপ উত্তর দিলো, "শুধু জানতে চেয়েছিলাম যে জিনিসটা জ্বলে না, তোমার কাজ কি সেটি জ্বলবার ব্যবস্থা করে দেওয়া?"

মেয়েটি হেসে ফেললো। আনমনেই কি রকম যেন নিচু হয়ে গেল তার মাথা। আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "কি আমার কাজ সেটা আজো ঠিক জানি না। তবে কি আমার কাজ নয় সেটা বলতে পারি।"

"বেশ, তাই বলো, শুনি," দিলীপ বললো।

"লণ্ড্রিতে কাজ করা আমার পেশা নয়", মেয়েটি উত্তর দিলো, "আমি চৌরঙ্গির একটি দোকানে সেলস্‌-এসিষ্ট্যাণ্ট ছিলাম। এই দোকানে কাজ করে আমার বোন। ওর এখন অসুখ। আর আমারও হাতে কাজ নেই। তাই যে ক'দিন সে আসতে না পারে সেই কদিন আমি এখানে বসছি।"

"দোকানের মালিককে যে দেখিনি একদিনও?"

"এ সময়টা সে থাকে না।"

একটু চুপ করে থেকে দিলীপ জিজ্ঞেস করলো, "তোমার বন্ধুরা তোমায় কি বলে ডাকে?"

"জেনী," মেয়েটি হাসলো, "আমার নাম জেনী ওয়াড।"

"তোমার বোন সেরে উঠতে আর ক'দিন বাকী?"

জেনী তার নরম চোখ দুটো রাখলো দিলীপের চোখের উপর। আস্তে আস্তে বললো, "আমার মালিকের আসবার সময় হয়েছে।"

"তাই নাকি? আচ্ছা, বাই বাই," বলে দিলীপ কেটে পড়লো।

দিন কয়েক পর দিলীপ আবার গিয়ে উপস্থিত হোলো—এবার তার নিজের স্যুট নিয়ে নয়। কারণ, অতো স্যুট তার ছিলো না। এবার সে নিয়ে গেল তার এক বন্ধুর স্যুট।

জেনী রসিদ লিখতে লিখতে হেসে ফেললো। বললো, "এভাবে নিজের পয়সায় পরের স্যুট কাচিয়ে দিতে সুরু করলে দু' দিনে দেউলে হয়ে যাবে। পয়সা যদি ওড়াতেই চাও তো অনেক রাস্তা আছে।"

দিলীপ জিজ্ঞেস করলো, "ওটা যে আমার স্যুট নয় তুমি কি করে জানলে?"

"আমার এক জোড়া চোখ আছে মিষ্টার," উত্তর দিলো মেয়েটি।

"আমার বন্ধুরা আমায় দিলীপ বলে ডাকে," দিলীপ বললো।

লণ্ড্রি গার্ল্‌স তাদের কাষ্টমারদের দিলীপ বলে ডাকে না।"

দিলীপ জিজ্ঞেস করলো, "তোমার বোন এখানে বসতে আরম্ভ করবে কবে থেকে?"

"কাল থেকে," হেসে উত্তর দিলো মেয়েটি, "আজ এখানে আমার শেষ দিন।"

"দ্যাট্‌স্‌ ফাইন, তুমি অফ-ডিউটি কখন থেকে?"

"চারটে থেকে। তখন মালিক নিজে এসে বসবে।"

"ফাইন। শোনো," দিলীপ বললো, "দেখ, আজকে ছ'টার শোতে আমি লাইট হাউসের দুটো টিকিট করেছি। একটি আমার কাছে আছে। আরেকটি আমি ভুল করে ওই কোটের পকেটে রেখেছি।"

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি আশা করো? পরের হপ্তায় যখন স্যুটটা নিতে আসবে তখন টিকিটখানি ফিরিয়ে দেবো?"

"না," দিলীপ উত্তর দিলো, "আমি আশা করি লণ্ড্রি গার্ল তার অস্থায়ী চাকরির শেষ দিন কাষ্টমারের জিনিষ ফিরিয়ে না দিয়ে নিজেই ব্যবহার করবে।" বলে দিলীপ আর উত্তরের জন্যে দাঁড়ালো না।

গট গট করে হেঁটে বেরিয়ে এলো লণ্ড্রি থেকে। একবারও পেছন ফিরে তাকালো না। সোজা চলে গেল তার নিজের কাজে।

সন্ধ্যার পর লাইট হাউসে ঢুকে দিলীপ দেখে, ঠিক পাশের সীটে বসে আছে জেনী ওয়াড।

সে দিন সিনেমায় দিলীপের পাশে বসে এটা-কি ওটা-কি জিজ্ঞেস করলো না, ঘটনা ও সংলাপ বুঝিয়ে দিতে বললো না, হল ফাটিয়ে হাসলো না বা নায়ক-নায়িকার দুঃখ দেখে চোখে রুমাল চাপা দিলো না রেবা চৌধুরির মতো। শুধু চুপচাপ বসে সিনেমা দেখলো।

সিনেমা শেষ হতে জেনীদের পেলে দিলীপেরা যা বলে, দিলীপ তাই বললো। বললো, "চলো কোথাও বসে খেয়ে নিই।"

জেনী সেদিন রাজী হোলো না। বললো, "আজ নয় আরেক দিন।"

"এর পর দেখা হবে কোথায়?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

জেনী বললো, "পরশু তিনটের সময় এখানেই। সেদিন সিনেমা আমি দেখাবো।

জেনীকে ট্রামে তুলে দেওয়ার আগে শুধু একবার দিলীপ বললো, "জেনী, এখন তুমি লণ্ড্রিগার্ল নও, আমিও কাষ্টমার নই, সুতরাং এখন থেকে আমায় দিলীপ বলে ডাকতে পারো।"

"আচ্ছা," বলে হেসে জেনী ট্রামে উঠে পড়লো।

দিন দুয়েক পর আবার জেনীর সঙ্গে সিনেমায় দেখা হোলো। জেনী সে দিন কিছু বললে না।

তিন চার দিন পর দিলীপ আবার গেল সেই লণ্ড্রিতে। বোধ হয় ভেবেছিলো এবার জেনীর বোনকে একবার দেখবে। কিন্তু গিয়ে দেখলো, কাউণ্টারের পেছনে জেনীই বসে আছে।

কি ব্যাপার?

না, লণ্ড্রির মালিক আহ্‌-কিম জেনীর বোন মিনিকে বলেছে,—তোমার শরীর এখনো ঠিক সেরে ওঠেনি, তুমি এক মাস বিশ্রাম নাও। মাইনেও পুরোই পাবে। আর জেনীর হাতেও তো চাকরি নেই। এই এক মাস সে-ও কাজ করুক এখানে। তারপর দেখা যাবে।

"খুব উদার মালিক দেখছি," দিলীপ বললো।

"হ্যাঁ, ও আমায় খুব ভালোবাসে।" জেনী হাসতে হাসতে উত্তর দিলো।

"তাই নাকি," বলে দিলীপ চোখ তুলে জেনীর দিকে তাকালো। বোধ হয় ফ্যাকাশে পাংশু হয়ে গিয়েছিলো দিলীপের মুখ, তাই জেনী মুখ ফিরিয়ে মুখ টিপে একটু হাসলো।

দিলীপ একটু তাকিয়ে দেখলো জেনীকে, তারপর কোনো কথা না বলে পেছন ফিরে দরজার দিকে হেঁটে চললো।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা পড়তেই জেনীর ডাক শুনলো পেছন থেকে," যেও না দিলীপ, শোনো।"

"কি," দিলীপ মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করলো।

"এখানে এসো।"

দিলীপ ফিরে গেল কাউন্টারের কাছে।

"আহ্‌-কিম আমায় কেন ভালোবাসে সেটা শুনে যাও," জেনী বললো।

"শুনে কি হবে?" শুকনো গলায় দিলীপ বললো।

"শোনোই না। আহ্‌-কিমের সঙ্গে আমার বোন মিনির বিয়ে হবে। আমি মিনির দিদি! তাই আহ্‌-কিম আমাকেও ভালোবাসে। কেমন ভালো আহ্‌-কিম—তাই না," বলে জেনী মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

হঠাৎ জেনী লক্ষ্য করলো যে, দিলীপ তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। এতক্ষণে খেয়াল হোলো যে তার চোখ দু'টি ঝাপসা।

জেনী মুখ নিচু করলো তাড়াতাড়ি।

দিলীপ আস্তে আস্তে বললো, "জেনী, তোমায় একটা কথা বলবো ভাবছি।"

"আজ নয় দিলীপ! অন্য কোনো একদিন—।"

"না, এক্ষুণি।"

"এখানে নয় দিলীপ! এটা দোকান। অন্য কোথাও—"

"না, এখানেই।"

"মালিক এখনই এসে পড়বে দিলীপ!"

"মালিক তো আহ্‌-কিম? সে যে মেয়েকে বিয়ে করবে, সেই মেয়ের দিদিকে তার দোকানের কাষ্টমার কি বলবে না বলবে ইজ নান্ অফ হিজ বিজনেস্।"

"ওর কাষ্টমারেরা যদি দোকানের ভিতর এরকম পাগলামি করতে সুরু করে তাহলে দু'দিনেই ব্যবসা উঠে যাবে।"

"ও যাকে বিয়ে করছে তার যদি ততগুলো দিদি থাকে যতোগুলো কাষ্টমার আছে—তার দোকানের তাহলে দুদিনে হু-হু করে ব্যবসা কেঁপে যাবে।"

"তুমি ব্যবসার কি বোঝো দিলীপ! এখন পর্যন্ত নিজের ব্যবসা দাঁড় করাতে পারলে না।"

"এবার আমায় চার মাস সময় দাও জেনী! দেখবে, কি রকম দাঁড়িয়ে গেছে আমার ব্যবসা।"

"চার মাস কেন?"

"চার-টা আমার লাকি নাম্বার।"

"আমার লাকি নাম্বার কিন্তু পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চান্ন।"

"দেখ, জেনী, এসব আজে-বাজে কথা বলে আমার আসল বক্তব্য থেকে তুমি আমায় বিচ্যুত করছো।"

"বেশ তো, কি বলছিলে বলো।"

তখন দিলীপ একটু ভাবলো। ভেবে মুখ লাল করে একটি ব্যক্তিগত খবর জানালো। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করলো জেনীকে। জেনীও একটু কান লাল করে উত্তর দিলো—হ্যাঁ! তারপর দিলীপ একটি সঙ্কল্প ঘোষণা করলো।

জেনী আস্তে আস্তে বললো, "সেটা এখন নয়। আরো কিছুদিন যাক। তোমার রোজগার বাড়ুক। আমিও একটি চাকরি খুঁজে-পেতে নিই।"

"তখন হবে তো," খুব উৎফুল্ল হয়ে দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

জেনী ঘাড় নাড়লো হাসিমুখে। দিলীপ খুব খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

কেটে গেল আরো কিছুদিন। সন্ধ্যাগুলো জেনীর সঙ্গে কাটাতে কাটাতে কলকাতাকে স্বর্গ মনে হোলো দিলীপের।

দিলীপ একদিন জেনীকে বলেছিলো, "জানো, আমার মা ইংরেজ।"

"উনি কি মারা গেছেন?" জেনী জিজ্ঞেস করেছিলো।

"কেন বলো তো?" দিলীপ অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো জেনীর দিকে।

"তোমায় দেখে মনে হয়," জেনী উত্তর দিয়েছিলো, "তোমার মা নেই। তবে আমার ভুলও হতে পারে।"

দিলীপ একটু চুপ করে থেকে বলেছিলো, "না, তুমি ঠিকই বলেছো। আমার মা নেই।"

"উনি যখন মারা যান তুমি খুব ছোটো ছিলে বুঝি?" দিলীপের পিঠে হাত রেখে জেনী জিজ্ঞেস করেছিলো।

"উনি মারা যান নি। বেঁচেই আছেন।"

"তা'হলে?" অবাক হয়েছিলো জেনী।

"আমি যখন বেশ ছোটো, তখন উনি বাবাকে ছেড়ে চলে যান। বাবা আর বিয়ে করেন নি। আমি আয়ার হাতে মানুষ হয়েছি।"

জেনী সেদিন আর কিছু বলতে পারেনি, শুধু চোখ ছলছলিয়ে দিলীপের হাতখানি চেপে রেখেছিলো নিজের নরম মুঠোর মধ্যে। আর সে দিনই যতোটুকু দ্বিধা ছিলো জেনী ওয়াঙের মনে, সবটুকুই কেটে গেল। হোক না ওরা দু'জনে দুটো আলাদা জাত—দিলীপের তো জেনীকে দরকার তার জীবনে। সুতরাং কী আসে-যায়!

জেনী খবরটা প্রথম ভাঙলো তার বোন মিনির কাছে। মিনি অনেকক্ষণ জেনীর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, "দেখ, সে বিদেশী। যা করবে খুব ভেবে-চিন্তে করবে।"

"আমি যা স্থির করেছি, অনেক ভেবে-চিন্তেই স্থির করেছি." জেনী উত্তর দিলো।

ওরা কথা বলে কম, তর্ক করে না, যা বলবার দু'-চার কথায় বলে, যা বুঝবার দু'-চার কথায় বুঝে নেয়।

মিনি বুঝে নিলো, জেনী দিলীপকে ভালোবাসে, এবং তাকেই বিয়ে করবে। এর আর এদিক-ওদিক হবার নয়।

তখন মিনি তার দিদিকে জড়িয়ে ধরে বললো, "তুমি যদি সুখী হও, আমিও খুব সুখী হবো।"

তারপর বললো, "জানো, আহ্‌-কিমকে যখন বিয়ে করবো স্থির করলাম, তখন তোমার কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল। এর মধ্যে আমারও বিয়ের ঠিক হয়ে গেল, অথচ তোমার চোখে লাগলো না কোনো ছেলেকে। আমি আহ্‌-কিমদের বাড়ি চলে গেলে তুমি একা থাকবে কি করে? অনেক রাত্তিরে তোমার কথা ভেবে কেঁদেছি, তবে লজ্জায় তোমায় বলিনি। আজ যে আমার কী ভালো লাগছে, সে বলে বোঝাতে পারবো না।"

শুনে জেনী একটু হাসলো।

তারপর মিনি জিজ্ঞেস করলো, "বুড়ো কর্তা শুনলেও কিছু মনে করবে না। সুং চাংও না হয় মাথা ঘামাবে না, কিন্তু চিয়েন-চাং?"

চিয়েন-চাংকে নিয়ে একটু অসুবিধে ছিলো।

বুড়ো ওয়াঙ জীবনে অনেকে দেখেছে, অনেক জেনেছে, যে কোনো কিছুই অত্যন্ত সহজ ভাবে নেওয়াই তার অভ্যেস।

শুনে বললে, "এ আর নতুন কথা কি? আমাদের দেশে কতো জাত এসেছে, আমাদের মেয়ে বিয়ে করে আমাদের মধ্যে মিশে গেছে। এমন কি ওই ইহুদীরা, যারা অন্যান্য দেশে নিজেদের পৃথক সাম্প্রদায়িক অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছে কয়েক শতাব্দী ধরে, আমাদের দেশে তাদেরও আমরা হজম করে ফেলেছি। এখানেও তাই হয়েছে, কতো কিনটাস মিশে গেছে আমাদের মধ্যে, আমাদের মেয়েরা চলে গেছে ফিরিঙ্গীদের মধ্যে। আস্তে আস্তে বাঙালীদের মধ্যেও যাবে। যে দেশে যা, তাই হয়ে থাকতে হবে বই কি। বাঙালীর যদি তেমন মুরোদ থাকে হজম করে ফেলুক আমাদের, যদি নিজেদের উপর বিশ্বাস না থাকে, আলাদা সম্প্রদায় হয়ে থাকুক। আমাদের কোনো ক্ষতি নেই।"

জেনী সেদিন খুশি হয়ে বাপকে একটি নতুন রান্না রেঁধে খাওয়ালে।

জেনীর ভাই সুং-চাং'ও এমন কিছু বিরূপতা প্রকাশ করলো না। যদিও তার মনের প্রসার বুড়ো ওয়াঙের মতো নয়, তবু ঠিক সেই সময় সে প্রেম করছিলো এক ফিরিঙ্গী ললনার সঙ্গে। সুতরাং বিয়ের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার সে বিরোধী। অন্তত নীতিগত ভাবে। —কারণ জেনী ওয়াঙের পছন্দ করা ছেলেটি বাঙালী শুনে তার ভালো লাগেনি। বললে,—কী এসব বাঙালীরা, বড্ড বেশী কথা বলে, সরষের তেলে রান্না করে, তরকারীতে মিষ্টি দেয়, ইত্যাদি।

কিন্তু যখন শুনলে দিলীপের মা ইংরেজ, তখন সে আর আপত্তি করার কোনো কারণ খুঁজে পেলো না। যাই হোক, দিলীপ হাফ-ইংরেজ তো—যেমনি হাফ-ইংরেজ সুং-চাংএর প্রণয়িনী রোজী।

রোজীর রং ময়লা, তবু তার পূর্বপুরুষ ইংরেজ, সে নাচতে জানে, ভালো ইংরেজি বলতে জানে। কোথায় লাগে তার কাছে চায়না টাউনের মধ্যবিত্ত চীনে মেয়েরা, যারা শুধু কাঠের খড়ম পরে খুট খুট করে চলতে জানে, গালাগাল দিয়ে ঝগড়া করতে জানে, যাদের গায়ে রান্নাঘরের গন্ধ। হ্যাঁ, দু-চারজন যায় বটে কনভেন্টে, এবং ওরা অন্যান্য চীনে মেয়েদের চাইতে একটু বেশী স্মার্ট, কিন্তু এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের কাছে লাগে না। ইদানীং কেউ তো কনভেন্টেও মেয়ে পাঠাতে চাইছে না। চীনেদের নিজেদের স্কুল হয়েছে। ছেলেরা মেয়েরা সবাই আজ-কাল সেখানে যায়। সবই শেখে, শুধু যেটুকু থাকলে ফিরিঙ্গী মেয়েদের মতো আকর্ষণময় হয়ে ওঠা যায়, সেটুকু শেখে না।

সুতরাং বুড়ো ওয়াঙ তার বিয়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেও পারে নি। সে ফিরেই তাকায়নি নিজেদের সমাজের মেয়েদের দিকে। তার বন্ধুবান্ধব বান্ধবী সবই ফিরিঙ্গী, নয় ইহুদী নয় আর্মানী আর কিছু ফিরিঙ্গী বনে যাওয়া ভারতীয়। সুং-চাং-এর পোষাকের ছাট সাম্প্রতিকতম আমেরিকান—প্যান্ট কোমরের অনেক নিচে, সরু মুখটা গোড়ালি থেকে আট ইঞ্চি উপরে। কোটে একটি মোটে বোতাম, কাঁধ অতিকায় রকম চওড়া, কোমর অত্যন্ত ঢোলা। চুলের সামনেটা এ্যালবার্ট। পায়ে রংদার মোজা, গলায় জমকালো টাই, মুখে কাও-বয় ইংরেজি।

সুতরাং দিলীপের ধমনীতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ইংরেজ-রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে জেনে সে চট করে দিলীপকে পছন্দ করে বসলো। বললো, "একদিন এনে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও। সে আমাদের ডিনার ষ্ট্যাণ্ড করুক, হুইস্কি ষ্ট্যাণ্ড করুক, তার পর দেখা যাবে তাকে আমরা পছন্দ করি কি করি না।"

এত সহজে সে মিনি ওয়াঙের ভাবী স্বামী আহ-কিমকেও অনুমোদন করেনি। কারণ আহ-কিমের ইংরেজি খুব পরিষ্কার নয়, সে জামা-কাপড়ে খুব কেতাদুরস্ত নয়, তার চেহারা খুব স্মার্ট নয়, সে একজন সাধারণ দোকানদার—আর তার দাদা বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের একজন সাধারণ জুতোওয়ালা, সে নিজের হাতে কাষ্টমারদের পায়ে জুতো পরিয়ে দেয়, যে দোকানের ভিতর হাফপ্যাণ্ট আর গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বসে থাকে। তার বৌদিকে তো দেখা গেছে, বছর বছর পুত্র সন্তান প্রসব করতে আর রান্নাঘরে বসে শুয়োরের চর্বিতে তরকারি রাঁধতে।

বুড়োরা বোঝে না। বললে চটে গিয়ে বলে, এদের কথা শোনো, পুত্র সন্তান মেয়েরা প্রসব করবে না তো কে করবে? বছর বছর না করবে তো শতাব্দীতে একটি করে করবে? আমাদের মায়েরা করেনি? আমাদের ঠাকুরমায়েরা করেনি? ওরা কি আমাদের চাইতে কোনো অংশে খারাপ ছিলো?

সুতরাং মিনির বর হিসেবে আহ-কিমকে বুড়ো ওয়াঙ আর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা পছন্দ করে ফেললেও সুং-চাং কোনো দিন তাকে অনুমোদন করতে পারেনি।

বরং এবার যখন দেখলো, জেনী ওয়াঙ এমন একজনকে পছন্দ করেছে যার শরীরে আছে ইংরেজ-রক্ত, তখন জেনীকে অনেক বেশী বুদ্ধিমান মনে হোলো মিনির চাইতে।

সুং-চাং সোজাসুজি বললে, "হুইস্কি জল মিশিয়েই খাও, আর সোডা মিশিয়েই খাও, হুইস্কি সে হুইস্কি।"

কিন্তু বড়ো ভাই চিয়েন-চাং চুপ করে রইলো।

"তুমি কিছু বলছো না যে দাই-কো," মিনি জিজ্ঞেস করলো।

জানলার আলসেতে পাইপ খুট-খুট করে ছাইটা ঝেড়ে ফেলে তন্দ্রালস উত্তর দিলো চিয়েন চাং, "ইণ্ডিয়ান, এঃ? তা মন্দ নয়, তবে ইণ্ডিয়ানদের চেনো না। তার রক্তে ইংরেজ-রক্তই থাক আর জাপানী রক্তই থাক ইণ্ডিয়ানরা চিরকালই ইণ্ডিয়ান।—তবে শুধু ইণ্ডিয়ান বলেই আমি আপত্তি করার কোনো কারণ দেখি না, যেহেতু, ওরা প্রায় আমাদের মতো সভ্যজাত, শুধু আমাদের মতো রান্না জানে না।—আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের মধ্যেই যখন ভালো ছেলে আছে, তখন আর এই অচেনা ইণ্ডিয়ানকে কেন?"

"আমাদের মধ্যেই ভালো ছেলে? তুমি কার কথা বলছো?" জিজ্ঞেস করলো বুড়ো ওয়াঙ।

"কেন? ফেং চেং-শিয়াং? সে কি যোগ্য নয়?" বললো চিয়েন-চাং।

[ক্রমশঃ।

পা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৯

মড়াইয়ের কাজে এখন পর্যন্ত বিঘ্ন ঘটেনি কোথাও। যেমন চলছিল তেমনি চলেছে। ঘোষ-চাকলাদারই এখানকার একমাত্র কনট্রাক্টর নয়। ছোটবড় আরো আছে, ছোটবড় কাজ নিয়ে আছে। একজনের বিপর্যয়ে আর একজনের সুদিনের সম্ভাবনা। তবু প্রতিকূল আবর্তের ছায়া পড়ে একটা। অনাগত উৎকণ্ঠার মত কিছু একটা দুর্যোগ যেন থিতিয়ে আছে। শুরু থেকেই ঘোষ-চাকলাদারকে সকলে স্বতন্ত্র চোখে দেখে এসেছে বলেই হয়ত এরকম লাগছে।

বাবা বা নরেন বাবুর দুশ্চিন্তা দেখে সান্ত্বনা মুখে যাই বলুক, মেজাজ ঠাণ্ডা হতে ভিতরে ভিতরে একটু দমে গেল সেও। যাই হোক না কেন সূচনা শুভ নয় তো বটেই।

অনধিত এক জীবনের অধ্যায়ও তার পর শুনল একদিন। নরেনই বলেছে। যেভাবে বলে সচরাচর সেভাবে নয়। একজনের শোনার দরদ তারও ভেতরটাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল বোধ হয় সেদিন। সান্ত্বনা তন্ময় হয়ে শুনেছে।

শেষ হতে নরেন নিজেই যেন থমকে গেল একটু। সারাক্ষণ সান্ত্বনা ওরই দিকে চেয়েছিল বটে, ওরই কথা শুনছিল। কিন্তু তার কথার বুনটে দেখছিল যাকে সে অন্য মানুষ। দেখছিল, চিফ ইঞ্জিনিয়ারের খোলস থেকে যাকে উদ্‌ঘাটন করে দেখাল, তাকে। হাল্কা হেসে নরেন বলল, কি হল, কেঁদে টেদে ফেলবে না কি?

নিজের স্তব্ধতায় নিজেই একটু লজ্জা পেল সান্ত্বনা। বলল, না, বড় দুঃখের জীবন তো ভদ্রলোকের।

—দুঃখের বলেই তো এমন একটা নিখুঁত জিনিস গড়ে উঠছে, নরেন ঠাট্টা করল আবারও, ওর ভেতরটা যত জ্বলবে, লোকে ততো বেশি আলোর আশ্বাস পাবে, মন্দ কি?

—যান্, আপনি ভারী নিষ্ঠুর।

অন্যমনস্কের মত নরেন ভাবল কি। পরে বলল, নিষ্ঠুর নয়, ওর জীবন থেকে নীলা গেছে ভালই হয়েছে কিন্তু একেবারে গেছে কি না ভেবেই ভয় হয় মাঝে মাঝে।

সান্ত্বনার জিজ্ঞাসু চোখে চোখ রেখে বাকিটুকুও না বলে পারল না।—মানুষটাকে যত শক্ত দেখো ততো শক্ত নয়, আমার বিশ্বাস ওই মেয়ে সামনাসামনি এলে আবারও পারে ওর জীবনের সব কিছু ওলটপালট করে দিতে, ওর এই কাজ এই নিষ্ঠা সব কিছু তচনচ করে ফেলতে।

শোনা মাত্র মুখভাব বদলাতে লাগল, সান্ত্বনার। একজন গেলেও সরকারী কাজ বন্ধ থাকবে না সে কথা মনে হল না। ওলটপালট হয়ে যাওয়া এবং নিষ্ঠায় ছেদ পড়ার সঙ্গে ড্যামের কাজে ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনাটা এক করে দেখল কি না সেই জানে। মেয়েটার আবার সামনাসামনি আসার প্রসঙ্গ কল্পনা করে সমস্ত মুখে কঠিন ছায়া পড়ল একটা।

রণবীর ঘোষের ব্যাপারটা স্থগিত আছে এখনও। কতকাল থাকবে তারও ঠিক নেই। হেড অফিস থেকে নির্দেশ আসেনি এখনো কিছু। কেন আসেনি তাও অনুমান করতে পারে বাদল গাঙ্গুলি। ঘোষ-চাকলাদার নিশ্চেষ্ট বসে নেই।

এ ব্যাপারের ফলে কাজের ধারা একটু বদলেছে বাদল গাঙ্গুলির। দিনের মধ্যে দু'তিন বার মড়াইয়ে নামে। সন্ধানী চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সব। ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করে। বিশ্বাসের শান্তিভঙ্গ হয়েছে একবার। ঘোষ-চাকলাদারকে সমূলে কুক আর যাই করুক, ভিতরে চিড় খেয়ে গেছে একটা।

ফলে সান্ত্বনার সঙ্গেও আজকাল দেখা হয়ে যায় মাঝে মাঝে।

সান্ত্বনার ইচ্ছেও হয় সামনে গিয়ে দুটো কথা বলে। গাছতলায় সেই লাঞ্চের পর্ব মনে পড়তে রাঙিয়ে ওঠে নিজেই। রাগের মাথায় কি যাচ্ছেতাই না বলেছিল। বড়সাহেবের প্রতি পাগল সর্দারের সেই অভিযোগ মুছে গেছে মন থেকে, ভুতুবাবুর কথাগুলোও। একটা মেয়ের কাছ থেকে অতবড় ঘা খেয়েও মেয়েদের ওপর ভদ্রলোক বীতস্পৃহ হবেন না তো কি! সব শুনে ওর নিজেরই রাগ ধরে গিয়েছিল মেয়ে জাতটার ওপর।

সামনাসামনি পড়ে গেলে নমস্কার বিনিময় হয় বড় জোর। ইচ্ছে থাকলেও কাছে ঘেঁষে না সান্ত্বনা। পারেও না।

কারণ সান্ত্বনাও বদলেছে।

মাসির বাড়িতে বাবার সঙ্গে ঝকাঝকি করে যে মেয়ে মড়াইয়ে এসেছিল, সে বদলেছে। একটু একটু করে বদলেছে। দশ জনের চোখে নিজেকে দেখে বদলেছে। সেই হাসি খুশি আছে, সেই কৌতূহল প্রাচুর্যও আছে, কিন্তু ভরা জোয়ারের মধ্যে চেতনার রাশটাও তেমনি সজাগ আজকাল। ওভারসিয়ারের মেয়ে সেটাই একমাত্র পরিচয় নয় এখন। স্ব-মহিমায় স্বতন্ত্র, স্বয়ংবিকশিত। নিজের পরিপূর্ণতার রহস্য নিজে জানে। ওই যে একবড় চিফ ইঞ্জিনিয়ার মড়াইয়ের, ঘা খাওয়া পোড় খাওয়া মানুষ—দেখলেও যে না দেখার ভান করে কত সময়, কাজের ফাঁকে ফাঁকে তারও বিমনা দৃষ্টি উধাও হয়ে আসতে দেখেছে ওর কাছ পর্যন্ত।

অন্য রকমের যোগাযোগ ঘটল একটা সেদিন।

বিকেলে মেন কোয়ারটার্স-এর দিকে ছিল সান্ত্বনা। বড় বড় ফোঁটায় জল পড়তে লাগল হঠাৎ। অসময়ের জল। অন্যমনস্ক ছিল, থমকে দাঁড়াল। তারপর আকাশের দিকে চেয়ে দিল ছুট।

অদূরের সব ক'টা কোয়ার্টারই চেনা। একটার খুব কাছে নয় আর একটা। চকিতে ভেবে নিয়ে যে দিকে এগলো, একা

সীলকরা প্যাকেটে
পাওয়া যায় বলে
ব্রুক বণ্ড চা
নির্ভেজাল ও একেবারে
খাঁটি থাকে

রোজ
২৪,৯০,৪৯৬ প্যাকেট
ব্রুক বণ্ড চা
লোকে কেনেন

Darjeeling Tea
Brooke Bond Tea
Blend
Brooke
Bond
Tea

এই জন্যেই
অন্য যে কোন
মার্কা চায়ের চেয়ে

ব্রুক বণ্ড চা

বেশী লোকে খান!

৪৪।৪০০
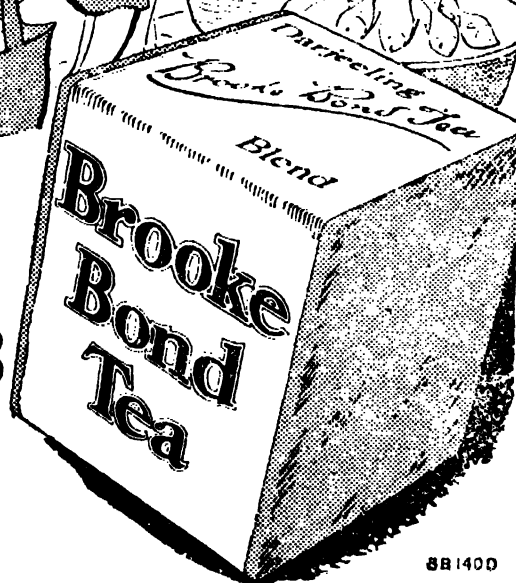
কোনদিন যাবে সেখানে ভাবে নি। ভদ্রলোক তো আর বাড়ি নেই এখন, শুধু নিধু আছে···।

কিন্তু জলটা চেপে এলো যেন। যতটা ভিজবে ভেবেছিল তার থেকে বেশিই ভিজে গেল। একেবারে বাড়ির গায়ে এসে সেই চেতনার রাশে টান পড়ল আবার। না, যাবে না। আগে হলে ভাবত না, সরাসরি ঢুকে পড়ত। এখন মন চাইছে বলেই যাবে না। তাছাড়া ভিজেছে একেবারে কম নয় হলই বা নিধু···।

বাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছাতের আলসেয় মাথা বাঁচাতে চেষ্টা করল। কি যাচ্ছেতাই জল রে বাবা। কতক্ষণে ছাড়বে ঠিক কি! ভদ্রলোক যদি এসেই পড়েন এর মধ্যে! অস্বস্তিতে আকাশ নিরীক্ষণ করতে লাগল সান্ত্বনা।

ওদিকে মাথার ওপর জানালা খুলে যে লোকটা গলা বাড়িয়েছে সে স্বয়ং নিধুরাম।

—দিদিমণি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ভিজছ। এসো এসো ভিতরে এসো!

চমকে উঠেছিল সান্ত্বনা। পরে নিষ্পলক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, এটা তোমাদের বাড়ি না কি নিধু?

বহুবচনে প্রীত হল নিধুরাম। হৃষ্ট কণ্ঠে জবাব দিলে, হাঁ দিদিমণি, আমাদের বাড়ি, আমার আর বাবুর। কিন্তু তুমি ভিজে যাচ্ছ যে, ছুটটে ভিতরে চলে এসো না।

এভাবে গা বাঁচানো সম্ভব নয়। কিন্তু পা যেন আটকে আছে এখন মাটির সঙ্গে। বলল, ভিতরে যাব···তোমার বাবু রাগ করবে না তো?

নিধু অবাক।—বিষ্টিতে ভিজছ রাগ কেন করবে? আর বাবুতো এখন আপিস ঠ্যাঙাচ্ছে—

ভিতরে প্রবেশ করে সান্ত্বনা শাড়ির আঁচলে হাতমুখ মুছে ফেলল। কটাক্ষে নিধুকে দেখে নিল একবার। দিদিমণি আসার আনন্দই তার চোখে মুখে। যে দিদিমণিকে সকলে চেনে, সকলে জানে আর সকলে ভালোবাসে।

—দাঁড়াও, একটা তোয়ালে এনে দিই তোমাকে।

—না না, তোয়ালে কিছু দরকার নেই, সান্ত্বনা শশব্যস্তে থামালো তাকে, এই তো একটুখানি ভিজেছি মোটে।

কতটা ভিজেছে নিধু তাই দেখে নিল একবার। শাড়ির আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে সান্ত্বনা সকৌতুকে ভিতরের দিকে উঁকি দিল। নিধু বলল, সব ঘুরে ঘুরে দেখো না দিদিমণি, আমি তো আছি, ভয় কি।

সান্ত্বনা মাথা নাড়ল। আশ্বস্ত হল যেন। কিন্তু এগোবার আগেই সাগ্রহে আর একটা প্রস্তাব করে বসল নিধুরাম। নিজের যা কিছু অন্যের চোখ দিয়ে আস্বাদন করে নেওয়ার বৃত্তিটা শাশ্বত। দিদিমণির মত এমন সমজদার আর পাবে কোথায়। সবিনয়ে বলল, আগে আমার ঘরখানা দেখে যাও, হ্যাঁ? বাবুর ঘর থেকে আমার ঘর ঢের ভালো, দেখবে এসো, কাউকে দেখাইনে।

সানন্দে আগে তারই ঘর দেখতে চলল সান্ত্বনা। সত্যিই দেখার মত ঘর। নিধুর নিজস্বতা আছে একটা। যেখানে যা কিছু পছন্দসই সবই ঘরে এনে পুরেছে। চৌকি, হাতলভাঙা চেয়ার, খবরের কাগজঢাকা কেরোসিনকাঠের টেবিল। টেবিলে রাজ্যের জিনিস। রঙওঠা টাইমপীস্, ফাটা আয়না, রোঁয়া ওঠা বুরুশে দামী চিরুণী, শস্তা ফাউন্টেন পেন, কালি, চকচকে অ্যাশ পট একটা, দামী তেলের শিশি, ছুটো একটা শূন্য ফাইল পর্যন্ত। আলনায় আধময়লা কাপড় জামা আর ছেঁড়া টার্কিশ তোয়ালে, নিচে ছ'তিন জোড়া পুরানো জুতো। সামনেই দেয়ালে মহাদেবের ছবি আর তার পাশেই স্বল্পবসনা নারীমূর্তির বিলিতি ক্যালেণ্ডার।

—বাঃ সুন্দর। সান্ত্বনা হেসেই ফেলল, এত সব তুমি কোথায় পেলে?

একটু যেন বিব্রত হয়ে পড়ল নিধুরাম। জবাব দিল, পাবে আবার কোথায়, এ সব তো তারই। কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারল না তবু। একটু সতর্ক করে রাখা ভালো। বলল, আমার ঘরে এত সব আছে তুমি যেন বাবুকে কক্ষণো বোলো না দিদিমণি।

সান্ত্বনা মাথা নেড়ে আশ্বস্ত করল তাকে, কখনোই বলবে না। খুশি হয়ে নিধুরাম নিচু গলায় বলল আবার, তোমাকে তাহলে বলি দিদিমণি, বাবুর তো কিছু মনে থাকে না, যখন যা ভালো কিছু নিয়ে আসে কিছুদিন গেলেই সেটা আমার হয়ে যায়। যদি কখনো খোঁজ পড়ে বলি খুঁজে দোব'খন—ব্যস্, তারপর আর মনে থাকে না, কি করে থাকবে, সারাক্ষণ তো মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করে ড্যাম্ ঘুরছে!

দিদিমণিকে হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে কিছু বোধ হয় খেয়াল হল নিধুরামের। অতঃপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে মনোভাবটুকু জ্ঞাপন করল, তার সার কথা, দিদিমণি ভাবছে চুরি, চুরি নয়, চুরি কেন হতে যাবে! এমনিই নেয় সে, তেমন বেশি খোঁজ পড়লে চুপি চুপি তো আবার ফিরিয়েই দেয়। আর তাছাড়া সে তো আর বিয়ে-থাওয়া কিছু করেনি, ঘর-সংসারও নেই—এ সব তো এখানেই থাকবে বরাবর, কোথায় আর যাবে।

কোনরকমে হাসি দমন করে তার কথায় সায় দিতে দিতে বাইরে এলো সান্ত্বনা। নিধু বলল, বাবুর আসার সময় হয়ে গেল, আমি চট্ করে চায়ের জল চাপিয়ে আসি।

নিধুর পাল্লায় পড়ে এভাবে এখানে এসে পড়ার অস্বস্তি অনেকটা কেটেছিল। গৃহস্বামীর প্রত্যাবর্তন সম্ভাবনায় সঙ্কোচ বাড়তে লাগল আবার। বাইরে অঝোরে জল পড়ছে তেমনি। ওর সঙ্গে আড়ি করে নেমেছে যেন। এত জলে কেউ বেরোয় না এই যা ভরসা। একটু ধরে এলে ও নিজেই আগে পালাবে এখান থেকে।

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে নিধুর মনিবের ঘরে উঁকি দিল সান্ত্বনা। অবিন্যস্ত আগোছালো ঘরের ছিরি দেখে ওর হাসি পেয়ে গেল। যেটার যেখানে খুশি পড়ে আছে। সব ছাড়িয়ে চোখ গেল ঘরের কোণে টেবিলটার দিকে। টেবিলের দামী ফোটোস্ট্যাণ্ডের ওপর।

এরই কথা শুনেছিল নরেন বাবুর মুখে। ফোটোখানার কথাও শুনেছিল। পায়ে পায়ে এগলো সান্ত্বনা। কাছে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল। ঝকঝকে চকচকে চেহারা। সুশ্রী। শৌখীন বেশবাস। সুপরিস্ফুট আভিজাত্য।

এই তাহলে নীলা। সামনাসামনি এলে যে এখনো পাড়ে সব ওলটপালট করে দিতে, এই কাজ এই নিষ্ঠা সব তচনচ করে ফেলতে।

চেয়ে চেয়ে দেখছে সান্ত্বনা।

—পারে বোধ হয়। নইলে এ ছবি এখনো এখানে কেন। হাতে তুলে নিল ছবিখানা। কাছে দূরে এপাশে ওপাশে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল আবার। আয়নায় চোখ পড়েনি, নইলে দেখত ওর এই দেখাটার মধ্যে প্রীতি ছিল না খুব।

নিধুর সাড়া পেয়ে ফোটো যথাস্থানে রেখে দিল আবার। নিধু চুপি চুপি পরিচয় করিয়ে দিল, উটি নীলা দিদিমণি, বাবুর সঙ্গে খুব ইয়ে ছিল একসময়, কি রকম সব গণ্ডগোল হয়ে গেল, নইলে বাবুর তখন ফুর্তি ছিল কত!

সান্ত্বনা জানে সবই। কিন্তু জানুক বা না জানুক নিধুর মুখে কিছু শুনতে যাওয়া বিড়ম্বনা। বেরিয়ে এসে বাইরের ঘরে বসল সে। নিধুর ভদ্রলোক হওয়ার সরঞ্জাম-সংগ্রহে বিশেষ একটা অভিলাষ অপূর্ণ থেকে গেছে বলেই নীলা দিদিমণির প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। গোপনে বাসনাটা ব্যক্ত করে ফেলল সান্ত্বনার কাছে। কাউকে যদি না বলো তো একটা কথা বলি দিদিমণি, হ্যাঁ?

কোনরকম প্রতিশ্রুতি না দিয়ে সান্ত্বনা আবার কিছু শোনবার সম্ভাবনায় শঙ্কিত নেত্রে তাকালো ওর দিকে।

—আমাকে অমনি রুপোর খাপে বাঁধানো ছবি দেবে একটা দিদিমণি? টেবিলে রাখতুম—

নিবেদন শুনে দুই চক্ষু প্রথম বিস্ফারিত হয়ে উঠল সান্ত্বনার। উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগে স্থির বসে থাকা দায় হল তার পর। এই নিয়ে ওর সামনে বসে হাসাটাও বিসদৃশ। আবেদন পেশ করে ফেলেই নিধুও লজ্জায় অধোবদন। দিদিমণি অত হাসবে জানলে বলত না।

সান্ত্বনা বলল, আমার কাছে তো নেই, পেলে দেব'খন। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যই জিজ্ঞাসা করল, তোমার চা হয়ে গেল?

—না, সবে জল গরম হল, এবারে খাবারটা আগে তৈরী করব, তুমি বোসো।

মনে মনে নিধুও একটু আড়াল হবার ফিকির খুঁজছিল হয়ত। ব্যস্ত হয়ে তার রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

কিন্তু দিদিমণির মত একজনকে চুপচাপ বসিয়ে রেখে কতক্ষণ আর ভালো লাগবে। তার ওপর একটা প্ল্যানও এসে গেছে মাথায়। এবারের প্রস্তাবে নিশ্চয় খুশি হবে। সেই টিফিন ক্যারিয়ার বদলানোর ব্যাপারটা নিধু জীবনে ভুলবে না। বাবু অবাক হয়ে কেমন চেটেপুটে খেয়েছিল এবং পরে জেনে ফেলে আরো কত অবাক হয়েছিল সে সব ফিরিস্তি দিদিমণির কাছে অনেক দিন আগেই বলা হয়ে গেছে।

গামছায় হাত মুছতে মুছতে কাছে এসে দাঁড়াল আবার। —দিদিমণি, নতুন খাবার কিছু তৈরী করে দেবে? দাদাবাবু খেয়ে ভারি খুশি হবে সেবারের মত—

ঝোঁকের মাথায় এখানে এভাবে এসে আটকে পড়ার অস্বস্তিটা ক্রমেই বাড়ছিল সান্ত্বনার। ভুরু কুঁচকে জলের বহর দেখছিল। ওকে জব্দ করার জন্যেই যেন সব কিছু। যার কথা ভেবে এত সঙ্কোচ, এর ওপর তাকে খুশি করার এই প্রস্তাব শুনে প্রায় রেগেই গেল। বলল, রোজ কচ্ছ তুমিই করোগে যাও, আমি এখন পারব না—তোমাদের ছাতাটাতা আছে কিছু?

হঠাৎ এই বিরাগের সুরটা কানে বাজতে থতমত খেয়ে গেল নিধু। মাথা নাড়ল, নেই—। ফিরে গেল।

ছাতা থাকলেই বা এ জলে যেত কি করে! শাদা মনে এসেছিল লোকটা, এভাবে না বললেই হত। ভাবল সান্ত্বনা। নেমন্তন্ন করে তো আর ডেকে আনেনি, বরং এসেছে বলে খুশিতে আটখানা হয়েছে। উসখুস করতে লাগল ···নীলার মত মোটর হাঁকাধনি কখনো, ঝরনার মত এম, এ পড়েনি—কিন্তু এই একটি জায়গায় তার হাত পড়লে তেমন কিছু করে তুলতে পারে, সে আস্থা পুরোপুরি আছে। আর এটুকু পাবার আকর্ষণও কম নয় ওর কাছে।

উঠল। পায়ে পায়ে নিধুর রন্ধনশালার দরজায় এসে দাঁড়াল। কাগজে জড়ানো বড় একটা পাউরুটি আর গোটাকতক ডিম সামনে রেখে গম্ভীর মুখে নিধু পেঁয়াজ কুঁচোতে বসেছে।

—কি খাবার কচ্ছ নিধু?

জবাব না দিয়ে নিধু ডিম-পাউরুটির দিকে একবার তাকালো শুধু। বড় সাহেবের আপনার লোক প্রায়, তারও একটা মানমর্যাদা আছে। নেহাত দিদিমণি বলেই ভুলেছিল আর অমন অনুরোধ করেছিল।

সান্ত্বনা আবার জিজ্ঞাসা করল, আপিস থেকে এসে এই শুকনো ডিমরুটি খাবে তোমার বাবু?

নিধু সাফ জবাব দিল, খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করে তখন খাবে না তো কি।

জবাব শুনে বিমর্ষ হল সান্ত্বনা। কিন্তু ওর দিকে চেয়ে বেশ একটু কৌতুকও অনুভব করল।—জল ছাড়ার তো কোন লক্ষণ নেই, তোমার বাবু আসবে কি করে?

—আঁটা-পুরুফ আছে, বিষ্টির জল ভেতরে সেঁধোয় না, ঠিক আসবে।

দুচার মুহূর্ত ঘরের ভেতরটা দেখে নিল চুপচাপ। তেমনি হাল্কা করেই বলল আবার, তোমার আছে তো দেখছি শুধু ডিম আর রুটি এ দিয়ে আবার নতুন কি করতে চাইছিলে তুমি?

জবাব না দিয়ে নিধু ঘরের কোণে তরকারির ঝুড়িটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

সান্ত্বনা হাসল একটু।—আচ্ছা সবো, দেখি কি করতে পারি।

এতক্ষণে নিধুর ফুর্তি যেন ফিরে এলো আবার। একগাল হেসে, তরকারির ঝুড়িটা টেনে আনলো। অন্যান্য সরঞ্জাম হাতের কাছে গুছিয়ে দিতে লাগল। চৌকাঠের ওপর বসে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল তারপর।

নিধু অরসিক নয়। তার মনে হল, দু'খানি যোগ্য হাতের তৎপর ছোঁয়া পেয়ে ঝিমন্ত রান্নাঘরটাই যেন নড়েচড়ে জেগে উঠেছে। তরকারি শেষ, আদা-পেঁয়াজের রস সহযোগে সেদ্ধ আলুর কাটলেট শেষ, এবারে ডিম আর রুটি একসঙ্গে করে ভেজে নামাচ্ছে। কথাবার্তা থেমে গেছে নিধুবামের, সব কটিরই সুঘ্রাণে রসনা সিক্ত।

বাইরে খটাখট কড়া নাড়ার শব্দ।

নিধু ছুটল। হাত থেমে গেল সান্ত্বনারও।

গৃহস্বামীর পদার্পণ ঘটেছে। জলঝরা ওয়াটার প্রুফ খুলে নিধুর

হাতে দিল। ভিজে জুতো বদলে ঘরে ঢুকল। তোয়ালে দিয়ে আধভেজা হাতমুখ মুছে ফেলে ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে রইল খানিক্ষণ। নিধু দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

খানিকবাদে আপিসের বেশভূষা বদলে এবং হাতমুখ ধোয়া শেষ করে আবার ইজিচেয়ারে এসে বসল। বলল, খুব ভালো করে চা কর—।

এরই প্রতীক্ষায় ছিল নিধুরাম। নির্দেশ শোনার আগেই রান্নাঘরে এসে হাজির। সান্ত্বনা গুছিয়ে রেখেছে সব। একটি কথাও না বলে তার হাতে তুলে দিল। খেয়াল করে ওর মুখের দিকে তাকালে নিধুরামও ভড়কে যেত হয়ত। কিন্তু তার চোখ অন্যদিকে। নিজেদের জন্য কতটা আছে না আছে দেখে নিয়ে খাবার হাতে দ্রুত প্রস্থান করল আবার।

রোজকার মতই খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে মনিব। খাবারের ডিশে হাত বাড়াল। তার পরেই তফাৎটা বুঝতে পারল যেন। কাগজ কোলে নামিয়ে ভালো করে দেখল চেয়ে। তার পর অবাক হয়ে তাকালো নিধুর দিকে কিছু স্মরণ হল বোধ হয়।

নিধু প্রশ্নোন্মুখ।

ডাকল, এই শোন্ তো—

প্রত্যাবর্তন।

—এ খাবার তুই তৈরী করেছিস না কেউ পাঠিয়েছে?

নিধু জবাব দিল, এ বিষ্টিতে আবার পাঠাবে কেমন করে, ঘরে বসেই তৈরী করছে দিদিমণি।

—দিদিমণি!

স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করল নিধু, সেই ওভারসিয়ার দিদিমণি—সেই সেবারে রাস্তায় যার সঙ্গে পোলাও-কালিয়া বদল হয়ে গেছল। বাইরে দাঁড়িয়ে জলে ভিজছিল, আমি ধরে নিয়ে এলাম—আসতে কি চায়, বলে তোমার বাবু রাগ করবে না তো?

চায়ের সরঞ্জাম হাতে সান্ত্বনা সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়ল। তেপায়ার ওপর রাখল ঠিক করে। বলল, অত জেরার কি আছে, খেতে ভালো না লাগে সরিয়ে রেখে দিন। নিধু মামলেট আর পাউরুটি নিয়ে আসুক, চিবোন বসে বসে।

বাক্য শুনে নিধু হতভম্ব। বাইরে জলের দরুন ঘরে আলো কম মনে হচ্ছিল। আলোটা জ্বেলে দিল। মনিবের মুখে রাগের চিহ্নমাত্র না দেখে আশ্বস্ত। উল্টে হাসির মতই দেখল যেন। তক্ষুনি রান্না ঘরের কথাটা মনে পড়ে গেল তারও। তাড়াতাড়ি সেদিকেই চলল সে।

—বসুন। বন্ধ দরজা জানালার কোনো এক ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা যদি এসেই পড়ে, সেটা উপলব্ধি না করে উপায় নেই। চাক বা না চাক ভালো লাগার আভাস লাগল মুখে।

এ রকম পরিবেশে সান্ত্বনার একমাত্র সোজা রাস্তা সহজ হওয়া। এই সহজ হওয়ার দায়েই সরাসরি ঘরে এসে ঢোকা। বলল, হ্যাঁ, বসবে, বাড়িতে ওদিকে বাবা কত ভাবছে।

জানালা দিয়ে বাইরের জলঝরা আকাশ নিরীক্ষণ করে বাদল গাঙ্গুলি হাল্কা জবাব দিল, তাহলে বাড়ি যান।

বিস্মিত নেত্রে তাকালো সান্ত্বনা, এই বৃষ্টিতে যাব কি করে?

—তাহলে বসুন।

সান্ত্বনা সকৌতুকে দেখল আবারও। পরে বলল আমার নাম সান্ত্বনা। আমাকে আপনি বসুন বলতে হবে না।

খেতে খেতে বাদল গাঙ্গুলি মুখ তুলে হাসল একটু।—নাম জানি।

—সকলেই জানে।

অর্থাৎ সকলেই যখন জানে, তার জানাটাও এমন কিছু নয়। এই নিস্পৃহ অভিব্যক্তির পিছনে আয়াস কতটুকু বুঝতে দিতে রাজি নয় সান্ত্বনা। বলল, কতক্ষণে যে ধরবে এ ছাইয়ের জল কে জানে, সেই কখন থেকে আটকে আছি।

নরেনবাবু হলে এই অকালবর্ষণের সুবিবেচনার কথা বলে খাবারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠত। আহাররত মানুষটা সে দিক দিয়েও গেল না। ক্ষুদ্র প্রশ্ন করল, আজ এদিকে রাউণ্ড ছিল বুঝি?

আবারও সেই একই কথার টোপ ফেলল সান্ত্বনা।—ছিলই তো, আপনার ভিম-রুটি চিবুনো বরাতে নেই বলেই ছিল বোধ হয়। ওই নিধুর জন্যে, নইলে কবে এতক্ষণে ভিজেই বাড়ি চলে যেতাম।

এবারেও সুতোটা ছেড়ে দিয়ে গেল বাদল গাঙ্গুলি। মৃদু হেসে পেয়ালায় চা ঢেলে নিয়ে আবার আহারে মনঃসংযোগ করল।

জানালার কাছে গিয়ে একবার আকাশটা দেখে এলো সান্ত্বনা। তারপর দাঁড়িয়ে রইল তেমনি। ভ্রুযুগলে কুঞ্চন-রেখা মিলিয়ে গেল। এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি, আগের থেকে শুকনো দেখাচ্ছে ভদ্রলোককে। মড়াইয়ের বিগত গোলযোগের দরুন বোধ হয়। কিন্তু শুকনো হলেও সঙ্কল্পের কাঠিন্য আছে তাতে। আর আছে প্রায় রূঢ় স্বাতন্ত্র্যবোধ। ভেবেছিল এই নিয়ে কথাবার্তা হবে, মড়াইয়ের ভালোমন্দ মিশে আছে তারও মনের সঙ্গে জানিয়ে দেবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভয়ানক গায়েপড়া শোনাবে। এরকম নিঃকার অভ্যর্থনায় সান্ত্বনাও অভ্যস্ত নয় আজকাল।

—কি হল, বসতে আপত্তি আছে না কি? চায়ের পেয়ালা রেখে বাদল গাঙ্গুলি মুখ তুলল আবার। আপনি বা তুমি দুই-ই এড়িয়ে গেল।

সান্ত্বনাও লক্ষ্য করল সেটুকু। ঘরের মধ্যে বসবার দ্বিতীয় জায়গা শয্যা বিছানো খাটখানা। খাটের পাশেই টেবিল। টেবিলের ওপর নীলার ফোটো। ফোটোর মধ্যে মেয়েটা যেন একেবারে মুখোমুখি হাসছে তার দিকে চেয়ে চেয়ে। পাল্টা জবাবেই যেন সান্ত্বনা ঈষৎ ভ্রূভঙ্গি সহকারে দেখতে লাগল তাকে। তার এই দেখাটা অনুসরণ করে অন্য লোকটির নীরব চাঞ্চল্য না তাকিয়েও যেন উপলব্ধি করতে পারল সে।

বাদল গাঙ্গুলির দুচোখ ওর দিকেই সংবদ্ধ। ভিতরে একটা নাড়াচাড়া পড়ল হঠাৎ। গুরুগম্ভীর পদমর্যাদার আবরণ সরিয়ে অনেকদিনের আহত মানুষটাই জেগে উঠল যেন। নিছক কৌতূহলে ভিতরের একটা দুর্বল ক্ষত কেউ উল্টে পাল্টে দেখতে থাকলে যেমন লাগে তেমনি লাগছে। অস্বস্তিকর যন্ত্রণাদায়ক।

হঠাৎ বেদম হাসি পেয়ে গেল সান্ত্বনার। হাসতে হাসতে খাটের কোণ ঘেঁষে বসে পড়ল এবার। মানুষটার চোখের দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠছে দেখেও হাসি থামে না। কিংবা হয়ত ইচ্ছে করেই থামতে দিল না সেটা।

—এত হাসির কি হল? নীরস, ঠাণ্ডা প্রশ্ন।

সান্ত্বনার সামলে নিতে সময় লাগল তবু। শাড়ির আঁচলে চোখ মুখ মুছে নিয়ে বলল, শুনলে আপনি রেগে না যান। আপনার নিধুরও ভারি সখ এরকম একখানা ঝকঝকে ফোটো ওর টেবিলে রাখে, আমাকে বলছিল যদি একটা যোগাড় টোগাড় করে দিতে পারি।

হাসির কারণ শুনে অন্তঃস্তলের একটা ছায়াভয় মুহূর্তে অপসৃত হয়ে গেল যেন। আপসের নিঃশ্বাস। ইচ্ছে না থাকলেও যেখানে সহজ হওয়া যায়, সহজ হতে হয়, তেমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে মেয়েটার জুড়ি নেই বোধ হয়। মৃদু মৃদু হাসতে লাগল বাদল গাঙ্গুলি। বলল, তা তুমি ইচ্ছে করলে এর থেকে অনেক ভালো ফোটোই তো নিধু পেতে পারে, বলছিল যখন দিয়েই দাও একখানা।

বুঝল সান্ত্বনা। বুঝেও দুর্বোধ্যতার ভান করতে হল তাকে।

—আমি কোত্থেকে দেব?

—তোমার নিজের ফোটোই একখানা দিয়ে দিতে পারো···।

চকিত কটাক্ষে সান্ত্বনা তাকালো একবার তার দিকে। অপরিণত অজ্ঞতায় ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, আমার ফোটোই নেই—। কি মনে পড়তে আর এক ঝলক হাসল আবার। মুখোমুখি জাঁকিয়ে বসল।—জানেন, মাসিমা একবার তো আমায় সাজিয়ে গুছিয়ে ফোটো তোলানোর সব ঠিকঠাক করলে। ফোটোগ্রাফারের সামনে যেই গিয়ে দাঁড়ানো, অমনি ভদ্রলোক সেই কালো ঘোমটা মাথায় দিয়ে যা শুরু করে দিলে—সোজা হোন, বেঁকে দাঁড়ান, মুখ তুলুন, মুখ নাবান, গম্ভীর হোন, ওয়ান—টু—হাসুন—। আমার আগেই হাসি পেয়ে যাচ্ছিল, তার ওপর যেই না বলা হাসুন, আমি হেসে একাকার—কালো ঘোমটা সরিয়ে ভদ্রলোক এমন চেয়ে রইল—আমার হাসি আর থামলই না, একেবারে দে ছুট!

নিজের অজ্ঞাতেই ভালো লাগছে বাদল গাঙ্গুলির। কল খুলে দিলে যেমন ঝরঝরিয়ে জল পড়ে, এ মেয়ের হাসির উৎসে নাড়া পড়লে তেমনি ঝরঝরিয়ে হাসি ঝরে।

—তোমার সুন্দরী কেমন আছে?

আর একদিন আর এক জায়গায় এই একই প্রশ্ন করে যে জবাব পেয়েছিল বিলক্ষণ মনে আছে। আছে বলেই আজ আবারও জিজ্ঞাসা করল।

সান্ত্বনা যথার্থই লজ্জা পেল এবার। তবু বলল, ওর ওপর আপনার খুব টান দেখছি।

—যে টানা টানিয়েছিলে, টান হবে না?

আরক্ত হয়ে উঠল সান্ত্বনা।— আমি কি জানতুম আপনি চিফ ইঞ্জিনিয়ার এখানকার?

—জানলে কি করতে ?

—স্যালুট ট্যালুট করতুম বোধ হয়।

গোরু ছুটে যেতে যেভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল বাদল গাঙ্গুলির। সে কথা বলে লজ্জা না দিয়ে বলল, কিন্তু তার পরেও তো অনেক বার দেখা হয়েছে, পরোয়া কর নি তো ?

অম্লান বদনে উল্টো জবাব দিল এবার। আমি পরোয়া করতে যাব কেন, আমি আপনার চাকরি করি ?

বাদল গাঙ্গুলি হাসছে।

ঘরের আলোয় বাইরের দিকটা এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি কেউ। অধ্যবসায়ী ছাত্রের দুরূহ কোন আঁকের ফল মিলে গেলে যেমন হয় তেমনি একটা তৃপ্তির আস্বাদন নিয়ে সান্ত্বনা উঠে জানালার ধারে গিয়ে জল থেমেছে কি না দেখল। জিব কামড়ে বলল, এই যা জল কখন ছেড়ে গেছে, বাবা দেবে'খন, আমি চলি—।

ঘাড় ফিরিয়ে বাদল গাঙ্গুলিও তাকালো বাইরের দিকে। সন্ধ্যার ঘন ছায়া নেমেছে। বলল, নিধুকে ডেকে দিই, সে সঙ্গে যাক।

অস্ফুট হেসে উঠল সান্ত্বনা, ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার—নিধুকে ডাকতে হবে না, আমি একাই যেতে পারব।

লঘু চরণে ঘর থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।···বাদল গাঙ্গুলি চুপচাপ বসে। রাত্রিচেরা বিদ্যুৎ ঝলকে বিবরাশ্রয়ীদের সাড়া পেয়ে হঠাৎ সচেতন হল যেন। এ বিস্মৃতি চায় নি, চায়ও না। চোখ দুটো আবার শুকনো খরখরে হয়ে উঠতে লাগল আগের মতই।

কিন্তু তবু ঘরের আলোটা এখন নিষ্প্রভ লাগছে কেমন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কোয়ার্টার থেকে সান্ত্বনা বেরিয়ে এল বিজয়িনীর মতই। অন্তর্তুষ্টিতে ভরপুর। কাউকে বলা যাবে না, নরেন বাবুকেও না।···বলতে পারলে কিন্তু বেশ হত। কলের মানুষ না কি। কলের মানুষের কলকব্জাগুলো একটু নাড়াচাড়া করে দেখে আসতে পারে বোধ হয় ইচ্ছে করলে।

কিন্তু মেন কোয়ার্টারস-এর বাধানো রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই সমস্ত নারীবিক্রম ঠাণ্ডা। কোয়ার্টার থেকে পঁচিশ-তিরিশ গজ দূরে রাস্তার আলোর নিচে দাঁড়িয়ে রণবীর ঘোষ কথা বলছে নিধুর সঙ্গে। মড়াইয়ের সোসাইটি বলতে মেন কোয়ার্টারস্। দেখা এখানে সকলের সঙ্গেই হতে পারে। কিন্তু জলঝরা রাস্তায় লোকজন নেই আজ, এখানে এ সময়ে নিধুর সঙ্গে কথা বলাটা শুধুই যোগাযোগ নয় নিশ্চয়। সেই বাদনা উৎসবের পর এই ক'মাসের মধ্যে লোকটাকে আর সামনাসামনি দেখে নি সান্ত্বনা।

মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে নিল। সোজা নিধুর সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে অনুশাসনের সুরে বলল, তুমি এখানে আর ও-দিকে ডেকে সারা এতক্ষণ। আমাকে পৌঁছে দেবে চলো।

কিন্তু নিধুর মনে রয়েছে অন্য চিন্তা। বলে উঠল, এই যাঃ, তুমি চলে এলে দিদিমণি, তোমার খাবার যে রান্নাঘরে ঢাকা পড়ে থাকল! আমি অপিক্ষে করে করে ভাবছিলাম···

—তুমি আসবে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকবক করবে? যথার্থ রেগে উঠল সান্ত্বনা।

নিধু হকচকিয়ে গেল। সান্ত্বনা ভ্রূক্ষেপ করুক বা না করুক, রণবীর ঘোষ নিজে থেকেই অমায়িক হেসে বলল, আপনার যাবার তাড়ায় বেচারীর দরদটুকু মাঠে মারা গেল, খবর সব ভালো তো ?

জবাব না দিয়ে সান্ত্বনা পলকের জন্য শুধু মুখ তুলে তাকালো একবার। সেই হাসি ভিজানো ঝকঝকে মুখ আর চকচকে চোখ। বিগত গোলযোগের আঁচ লেগেছে কোথাও মনে হয় না, একটুও বদলায়নি।

পা বাড়াবার আগেই দ্বিতীয় দফা বাক-নিঃসরণ হল রণবীর ঘোষের।—সেই দু'মাস আগে আমার গো-ডাউন দেখতে যাবেন বলেছিলেন, এতদিনের মধ্যে কই একবারও গেলেন না তো ?

—আপনার গো-ডাউন এখনো আছে না কি ?

বলবে ভাবে নি, বলতে চায়ও নি। মুখ দিয়ে আপনিই যেন বেরিয়ে গেল হঠাৎ। সচকিত হয়ে ডাকল, নিধু এসো—।

—সায়েবকে বলে আসি দিদিমণি···।

—বলতে হবে না এসো তুমি! ঝাঁঝিয়ে উঠে সান্ত্বনা হনহন করে এগিয়ে গেল।

রমণী বিরাগে অনভ্যস্ত নিধুরাম শশব্যস্তে অনুসরণ করল তাকে। মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। দিদিমণি এ রকম বলল বলে নয়, নিজের হাতে সব করে না খেয়ে চলল বলে। বেচারীর দোষ নেই। জিজ্ঞাসা করতে এসেও মনিবের ঘরের আবহাওয়া দেখে রসভঙ্গ করতে মন সরেনি। বাবুর অমন হাসিমুখ দেখেনি অনেককাল।

সামনের বাঁক না পেরুনো পর্যন্ত সান্ত্বনা আর এদিক ওদিক চাইতেও পারছে না। না তাকিয়েও পিছনে রণবীর ঘোষের দুই চোখ উপলব্ধি করতে পারছিল। নিধু পাশে আসতে জিজ্ঞাসা করল, লোকটা দাঁড়িয়ে আছে না তোমার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল ?

নিধু ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একবার। বলল, দাঁড়িয়ে এদিকপানে চেয়ে আছে। বাবুর সঙ্গে আজ আর দেখা করবেন না তো উনি।

সান্ত্বনা বলল, দেখা করবেন না তো তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে এত কি কথা হচ্ছিল ?

যেন সেই মনিব নিধুর। জবাবদিহি শুনে আরো রেগে গেল। নিধুর বক্তব্য, দেখা করার জন্য লোকটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে ঠিক করেছে অত রাতে আজ আর দেখা করবে না, আর একদিন আসবে।

—অপেক্ষা করছিল তো তুমি তোমার বাবুকে এসে খবর দাওনি কেন ?

তাই বা কি করে দেবে নিধু। লোকটা যে নিষেধ করল, সাহেব দিদিমণির সঙ্গে গল্প করছে যখন আজ আর বিরক্ত করে কাজ নেই, বাড়িতে কখন কি রকম ফুরসৎ থাকে সাহেবের, তাই জেনে নিচ্ছিল।

নিধুর আত্মসমর্থনে কিছুমাত্র খুশি না হয়ে নিজের মনে গজ-গজ করতে করতে এগলো সান্ত্বনা।

নিধু মিথ্যে বলে নি খুব। তা বলে নির্জলা সত্যিও বলে নি একেবারে। দিদিমণির মেজাজ দেখে চেপে গেল। নইলে কথা উঠতে আরো অনেক কথাই বলে ফেলেছে সে। দিদিমণির কথা। যত বড় সাহেবই হও, দিদিমণির সামনে সব জল। প্রকারান্তরে

এ কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছে রণবীর ঘোষকে। তার পর দিদিমণির রান্নার প্রশংসাও করেছে বইকি। আর তাই যখন করল, সেবারের সেই 'টিপিনকার' বদলে দেওয়ার মজার খবরটাই বা না বলে পারে কি করে!

কিন্তু সান্ত্বনার মন থেকে রণবীর লোপ মুছে গেল একটু বাদেই। তার আগের অধ্যায়টুকুই জুড়ে বসল আবার।···নরেন বাবু মিথ্যে বলেনি বোধ হয়। আসলে ওই মেয়েটাকে ভুলতে পারেনি বলেই একটা শোকের অহঙ্কার চোখের সামনে সর্বদা জিইয়ে রাখতে চায় মানুষটা। নইলে ও ছবিটা ওভাবে ওখানে থাকত না। থাকুক, সান্ত্বনার আপত্তি নেই। কিন্তু ঠুনকো এক নারী-বিয়ে জ্বলছে বলে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে একজন তার গ্লানি ছড়িয়ে সমস্ত মেয়ে জাতটাকে কালো করে দেখবে, সেখানেই যত আপত্তি! ওতে যেন তাদের সকলের অপমান। থেকে থেকে কেবলি মনে হতে লাগল, একটা কাজের মত কাজ হয়েছে আজ। ওপর ওপর দেখতে গেলে কিছুই নয়, কি আর এমন বলে এসেছে? কিন্তু মনের কারিগরী অন্য রাস্তায়। ও যেন জানে, বলাটাই সব নয়। বলে হোক, না বলে হোক, লোকটার ওই কালোর শোক কিছুক্ষণের জন্য অন্তত ঘুচিয়ে এসেছে।

নিধুকে আগেই বিদায় দিয়েছে। বাড়ি ঢুকে দেখে, বাবা চিন্তিত মুখে ঘর বার করছেন। দেখেই বলে উঠলেন, ঝড় জল দেখে বেরোস না, না কি—?

অপ্রস্তুত হয়েও জবাব দিল, জল এসে গেল তার আমি কি করব?

বিরস বদনে অবনী বাবু কাছে এসে হাত দিয়ে তার গা মাথা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন, ভিজেছে কি না।

—কেমন, ভিজেছি?

অবনী বাবু হেসে বললেন, না, খুব বাহাদুরী—সেই থেকে ভাবছি আমি, ছিলি কোথায় তুই?

—তোমার তো কাজ না থাকলেই ভাবা, রোসো, এদিকের ব্যবস্থা দেখে আসি আগে।

সরে এলো সান্ত্বনা। ব্যবস্থার জন্য নয়, ছিল কোথায় এতক্ষণ সেটাই এড়াতে চায়। কিন্তু কেন?

এই কেনটাই ভালো লাগছে না কেন জানি। নিজের পরিবর্তন জানে, উপলব্ধি করে। আগে হলে বাবার সামনে জাঁকিয়ে বসত, বলত সব। আজ বলতে পারল না। পারল না, কারণ, জলটা হঠাৎ এসেছে বটে, কিন্তু বাদল গাঙ্গুলির বাড়িতে ওর যাওয়াটা আকস্মিক কিছু নয়। জলের সুযোগে ভিতরের একটা আগ্রহ ওকে ঠেলে পাঠিয়েছে।

তিন চার দিন পরে বাড়ি ঢুকেই নরেন হৈ চৈ করে উঠল প্রায়, তোমার ব্যাপারখানা কি বল তো! অমন একটা অ্যাডভেঞ্চার করে এলে অথচ আমাকে বলই নি কিছু?

শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখে যেন এক ঝলক রক্ত নেমে এলো সান্ত্বনার। কাজের অছিলায় উঠে গিয়ে একটু বাদে ফিরে এলো আবার।—কি হয়েছে বুঝলাম না।

—বুঝলে না? সেদিনের জলে কোথায় আটকে পড়েছিলে?

—ও, এই কথা। সে আবার বলার মত কি?

বলার মত কি! জবাব শুনে নরেন আরো অবাক। যেন নির্ঝরিণী বলছে, ঝরার মত কি।

যথাসম্ভব নিস্পৃহতা বজায় রেখে সান্ত্বনা সাদাসিধে ভাবেই জিজ্ঞাসা করল, কার কাছে শুনলেন?

—নিধুরাম দি গ্রেট।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওর কথা ভুলেই গিয়েছিল। এবারে রাগও হল বেশ। ঠেস দিয়ে বলল, নিধুরামের সঙ্গে খুব ভাব বুঝি আপনার?

—খুব। নিধু হল আমার দশ বছরের সাগরেদ।

—কান কুড়কুড় শেখে? হেসে উঠল। ঠাট্টা করতে পেরে নয়, প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য।

অ্যাডভেঞ্চারের কথাটা চাপা পড়ে গেল ঠিকই। এর পরেও ও কিছু বলল না দেখেই নরেন তুলল না কথা। মনে একটা জিজ্ঞাসার আঁচড় পড়ল কি পড়ল না। ব্যতিক্রমটুকুই উপলব্ধি করল শুধু। কিছুদিন ধরেই করছে! কথার ফাঁকে ফাঁকে ওকে লক্ষ্য করল অনেকবার।···উচ্ছলতা নয়, সম্প্রতি খুশির জোয়ারটা ওর ভিতরে এসে থেমে আছে যেন।

ডামের সকলেই ব্যস্ত ইদানীং। আর একটা বছর ঘুরে আসছে। কাজের গতি লক্ষ্যের নিশানায় পৌঁছয়নি। নতুন বছরের ছক কাটা হচ্ছে। সন্ধ্যায় মিটিং বসছে রোজই। আরো লোকজন, আরো সাজসরঞ্জাম, আরো তৎপরতা বাড়ানোর জল্পনা-কল্পনা।

অবনী বাবুর বাড়ি ফিরতে রাত হয় প্রায়ই। নরেনেরও ক'দিনের মধ্যে দেখা নেই। আগে এ ধরনের বাড়তি অবকাশে সান্ত্বনা নিজেকে আরো বেশি করে বাইরে ছড়িয়ে দিত। কিন্তু পরপর কটা দিন বাড়ি বসেই কাটছে একরকম। বাইরের সঙ্গে নিজেকে মেলানোর অশান্ত তাগিদে ছেদ পড়েছে। বেশ লাগছে এই ভরা ভরা অলস মুহূর্তগুলো।

—দিদিয়া!

হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন কাঁটা দিয়ে উঠল সান্ত্বনার। ভিতরের দাওয়ায় বসে বাইরের আলোর রংবদল দেখছিল চুপচাপ। উঠবে, আলো জ্বালবে, সন্ধ্যে দেখাবে। আঁধার ঘনিয়ে আসছিল, কিন্তু উঠি উঠি করেও ওঠা হচ্ছিল না। এরই মধ্যে অনতিদূরে কোথায় চাপা গলায় অতিপরিচিত ফিস ফিস ডাক শুনে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। সহসা প্রেতের ডাক শুনল যেন।

—ই দিদিয়া!

সান্ত্বনার সারা অঙ্গে হিম স্রোত বইছে একটা। নড়া চড়ার ক্ষমতা নেই। আকুল হয়ে বলতে চাইল, কোথায় রে, কোথায় তুই? ব্যাকুল নেত্রে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল শুধু।

—দি-দি-য়া!

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল এবার। সুন্দরীর ঘরের দিক থেকে আসছে অস্ফুট কণ্ঠস্বর। এগিয়ে গেল। আড়ষ্ট কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল তারপর। গোয়াল ঘরের দেয়াল ঘেঁসে অন্ধকারে আবছা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

চাঁদমণি!

অস্ফুট হাস্যধ্বনি।—আমাকে চেনতে পারিস লাই দিদিয়া?

সান্ত্বনা সামলে নিয়েছে খানিকটা, মৃদু গলায় ডাকল, আয়।

—উবাসীর বাবু কুথা?

—নেই, আয়। হাত ধরে তাকে ভিতরের দাওয়ায় নিয়ে এসে আলো জ্বেলে দিল। তারপর আর মুখে কথা সরল না একটাও।

চাঁদমণি কিন্তু হাসছে! যেমন হাসতো আগে তেমন নয়, তবু হাসছে। সান্ত্বনার আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, তুকে একটোবার দেখতে আলাম, আরো অনেক সোন্দরপানা দেখতে লাগছে তুকে।

সোজাসুজি সান্ত্বনা তাকাতেও পারছে না। মড়াইয়ে চাঁদমণি বলে মেয়ে ছিল একটা পাগল সর্দারের। অনেকদিন পর্যন্ত তার মূর্তি আর তার কথা সকলেরই মনে হয়েছে। অন্তত সান্ত্বনার তো হয়েছে। কিন্তু সব সত্ত্বেও প্রেতের প্রত্যাবর্তন যেমন কাম্য নয় তেমনি বিসম এক অস্বস্তিতে স্তব্ধ হয়ে রইল যেন।···কালোর ওপর আলগা কালো ছাপ পড়েছে আর একটা, ঢলঢলে প্রাচুর্যে শুকনো টান ধরেছে, যে কালো চোখ কারণে অকারণে জ্বলতে দেখেছে কতবার তার নিচে যেন কালো দীঘির ছায়া। চকচকে মুখে পরুষ-নির্যাতনের রুক্ষতা, আর···আর···মেয়েটা একলা নয় এখন, ওর দিকে তাকালেই সেই অনাগত সম্ভাবনাটা চোখে পড়ে।

চাঁদমণি দাওয়ার ওপরে বসল।

সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে তেমনি। কি করবে, কি বলবে বুঝে উঠছে না। কেন এলো মেয়েটা। এলো যদি, এমন লুকিয়ে তার কাছেই এলো কেন! অস্ফুট প্রশ্ন করল, এতদিন ছিলি কোথায় তুই?

—ছেলাম? হাসিতে দাঁতগুলি আগের মত ঝকঝকিয়ে উঠল না আর।···ছেলাম···কত লয়া জায়গায় ছেলাম।

—তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে? সান্ত্বনাও বলল আস্তে আস্তে।

সভয়ে চাঁদমণি ফিরে তাকালো তার দিকে। বলল, উ দেখলে তো ভুঁয়ে পুঁতে ফেলাবে।

—বেশ করবে, হঠাৎ রাগে দপ করে উঠল সান্ত্বনা, আঁশ বঁটি দিয়ে কুটবে তোকে, আমি খবর পাঠাচ্ছি তাকে।

চাঁদমণি অনেকক্ষণ শুধু চুপচাপ চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর হাসল আবার। সেই হাসি দেখে গা আবারও জ্বলে গেল সান্ত্বনার, মরার হাসি যোগ যায়নি এখনো। কিন্তু পর মুহূর্তে হকচকিয়ে কাঠ হয়ে গেল একেবারে। সহসা উবুড় হয়ে তার দু'পা আঁকড়ে ধরে মাথা গুঁজে পড়ে রইল চাঁদমণি। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, সর্বাঙ্গ অবশ সান্ত্বনার। আর এক পাহাড় প্রমাণ জমাট বেদনা যেন কেঁদে কেঁদে তার পায়ের ওপর গলিয়ে দিচ্ছে মেয়েটা।

নীরব, নিস্পন্দ পুতুলের মত বসে আছে সান্ত্বনা। কিন্তু ওই কান্নার স্পর্শে চোখ দুটো তারও ভিজে উঠছে বারবার।

নিজেই উঠল চাঁদমণি। শান্ত হয়ে আঁচলে করে চোখ মুখ মুছে নিল অনেকক্ষণ ধরে। আবারও হাসল তার পর। বলল, দিদিয়ার সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গেই দেখা করতে সাহস করেনি। দিদিয়ার ও ক্ষতি করতে চেয়েছে কতবার, তবু। ও চলে যাচ্ছে, এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে, আর কোন দিন দেখা হবে না কারও সঙ্গে, কিন্তু সকলকে একবারটি দেখতে ইচ্ছে করে খুব—সকলকে আর কি করে দেখবে, লুকিয়ে লুকিয়ে শুধু বাবাকে দেখবে একবার, দেখে চলে যাবে।

—কোথায় যাবি? কার সঙ্গে যাবে, সে প্রশ্ন আর মুখে এলো না।

কে জানে কোথায় যাবে। কে জানে কতদূর নিয়ে যাবে তাকে। বাবাকে একবার দেখা হলেই যেখানে হোক যাবে, আজ ক'দিন ধরে চেষ্টা করছে তাকে লুকিয়ে দেখতে, কিন্তু মড়াইয়ে তো আর যেতে পারে না, গাঁয়ের দিকে গেলেও সকলে চিনে ফেলবে। দিদিয়া কি তার বাবাকে দেখেছে? ক'দিন দেখেছে? কোথায় দেখেছে?

আবার উষ্ণ হয়ে উঠছে সান্ত্বনা। সেই নির্মম বিচারের মহড়া চোখে ভাসতে উঠল। কি না হতে পারত। নিজের জীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে যে লোকটা এতবড় বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করল তার বাবাকে, তার প্রসঙ্গ আভাসেও জিজ্ঞাসা করল না একবার। সান্ত্বনা নীরস কণ্ঠে বলে উঠল, নিজের দেশ ছেড়ে সকলকে ছেড়ে ওই জমাদার লোকটাই বেশি হল যখন, তখন আবার দরদ কিসের এত?

—কোন জমাদার? বাহাদুর? হঠাৎ চাঁদমণির দুই চোখ জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল। যেমন মড়াইয়ে জ্বলত আগে। চেয়ে রইল সান্ত্বনার দিকে। শুধু ওকে নয়, ওর ভিতর দিয়ে সকলের ধারণাটাই উপলব্ধি করে নিতে চাইল বোধহয়। তার পর আস্তে আস্তে নিবে গেল আবার। শান্ত হল। ঠাণ্ডা জবাব দিল, বাহাদুর লয়।

সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎপৃষ্টের মত একটা ঝাঁকুনি খেল সান্ত্বনা। বাহাদুর নয়! বাহাদুর না হলে আর যে কে সেটা বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হল না তার।

চাঁদমণি জানাল, সেই থেকে কলকাতায় ঘোষ বাবুর আড়তে কাজ করছে বাহাদুর। ঘোষ বাবু অনেক টাকা দিয়েছে তাকে, আরো দেবে। টাকার লোভে বাহাদুর ওকে দেশে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে, বলেছে বিয়ে করবে। কিন্তু বিয়ে করবে না চাঁদমণি জানে, কেউ করে না···কিন্তু যেতেই যখন হবে কোথাও, ভয়-ডর নেই আর, ওর সঙ্গেই যাবে।

মুখ তুলে সান্ত্বনা চাইতেও পারছে না আর। নির্বাক, বিমূঢ়, অধোবদন। প্রলোভনের এ আগুন চাঁদমণির কাছে কত অমোঘ সেটা মর্মে মর্মে বুঝেছে বলেই।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে চাঁদমণি উঠে দাঁড়াল একসময়। বলল, যাবার আগে পারলে দিদিয়ার সঙ্গে আর একবার দেখা করে যাবে।

তবু একটি কথাও বলতে পারল না সান্ত্বনা। মুখ ফুটে একবার জিজ্ঞাসাও করতে পারল না, কোথায় যাচ্ছে এখন ও, কোথায় থাকবে।

—দিদিয়া—

ডাক শুনে এবারে চমকে তাকালো ওর দিকে। কিছু একটা বলবে চাঁদমণি, স্থির নেত্রে দেখেছে তাকে, চোখ দুটো চকচক করছে প্রায় আগের মতই।

হঠাৎ অস্ফুট কণ্ঠে একটু হেসে উঠল চাঁদমণি। বলল, দিদিয়া, আখুন তুকে আরো ঢের ঢের সোন্দর দেখতে লাগছে। তু টুকচি সামলে চলিস, বোঝলি?

পিছনের গোরু-ঢোকা সরু পথ দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সান্ত্বনা স্থাণুর মত বসে আছে তেমনি। কতক্ষণ ঠিক নেই। আজ বুঝতে পারছে, অনেক কিছুই বুঝতে পারছে। কেন মড়াইয়ে রণবীর ঘোষের সঙ্গে প্রথম দিন ওকে দেখে অগ্নিদৃষ্টিতে ভস্ম করে ফেলতে চাইছিল চাঁদমণি, বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে, কেন আদিম ঈর্ষায় বাদন উৎসবে ওই মেয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছিল ওকে। আর বুঝতে পারছে, শাল মহুয়ার ধারে কোন প্রতীক্ষায় ক্লিপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত রণবীর ঘোষ।

কিন্তু আজ ওর কাছেই এলো কেন চাঁদমণি? এলো কোন্ বিশ্বাসে? সহানুভূতির জন্যে নয়, নালিশ জানাতেও নয়। শুধু ওর বাবাকে দেখার ইচ্ছেয় এসে থাকলে তাকে দেখেই ফিরে যেত। এতবড় মর্মঘাতী বেদনা নিয়ে ওর কাছে আসত না। এসেছে শুধু এই জন্য, এসেছে শুধু এই শেষের কথাটি বলে যেতে। এসেছে, নারীমাংসলোলুপ এক পুরুষ দানবের সম্বন্ধে ওকে সচেতন করে দিয়ে যেতে।

মড়াইয়ের বাতাস পর্যন্ত দুঃসহ, বিষাক্ত হয়ে উঠল যেন। কিছু ভালো লাগছে না, কিচ্ছু না। কাউকে বলবে কিছু? কি বলবে?

এক এক করে তিন চার দিন কেটে গেল।

অধীর আগ্রহ। দুরু দুরু প্রতীক্ষা, চাঁদমণি আবার একদিন আসবে বলে গেছে। সন্ধ্যায় বাড়ি ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্য বেরুতে পারে না। নরেন বা তার বাবা সেই সময় বাড়ি থাকলেও অধীর হয়ে ওঠে।

অস্থিরতা বাড়ে। দুপুর হতে সোজা মড়াইয়ে নেমে এলো সেদিন। পাগল সর্দারের দেখা পেল না। প্রায়ই কামাই করে আজকাল। কিন্তু সেদিন আরো একটা লোককে দেখল না সান্ত্বনা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাছে দূরে সর্বত্র খুঁজল। হোপুন। অক্লান্ত নির্মম যান্ত্রিক আঘাতে শক্ত কঠিন পাথুরে মাটির বুকে শুধু ক্ষতচিহ্ন আঁকে যে।

ফিরে চলল আবার। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি পাগল সর্দারের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু অষ্টপ্রহরের যাতনার সঙ্গে একটা ভীতিও মিশে আছে কেমন।

বাড়িতেই পাওয়া গেল সর্দারকে। মাটির ঘরের মেঝেয় বসে পাতার নলে তামাক খাচ্ছে। অদূরে হোপুনও চুপচাপ বসে।

—আই রে দিদিয়া, আয় আয়! মহা খুশি হয়ে পাগল সর্দার তামাক খাওয়া বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে একটা মোড়া টেনে বসতে দিল তাকে।—বস্ দিদিয়া, আজ সোমকাল হতে তুকে ভাবতে ছেলাম, অনেকদিন দেখি লাই।

দ্বিতীয় লোকটার উপস্থিতি বরাবরই অস্বস্তির কারণ সান্ত্বনার। ও যে এসেছে সেটা যেন টেরই পায় নি লোকটা। তবু পাগল সর্দারের খুশির আপ্যায়নে ভিতরের একটা দুর্ভর বোঝা যেন হালকা হয়ে গেল অনেক। মোড়াটা তার কাছে টেনে বসে অন্তরঙ্গ ভ্রূকুটি করে বলল, বাড়ি বসে থাকলে দেখবে কি করে, কাজে যাওনি কেন আজ?

—শরীলটা আরাম দেল না, জ্বর আসল ভাবলাম—।

—তোমার তো রোজই জ্বর আসছে আজকাল। জ্বর এলে কেউ খালি গায়ে বসে থাকে? কপালে পিঠে হাত দিয়ে তার গা পরীক্ষা করল সান্ত্বনা।—কোথায় জ্বর, গা তো ঠাণ্ডা পাথর! তুমি বড় শুধু শুধু কামাই কর আজকাল।

ওর হাতের এই স্পর্শ আর অনুশাসন সমস্ত বুক দিয়ে অনুভব করে নিল সর্দার। তারপর হেসে তাকালো হোপুনের দিকে, বলল, উকেও জ্বর লেগেছে, আমো সঙতে দু'দিন কামাই দেল—জ্বরপানা মুক্তিটো দেখে লে দিদিয়া।

সত্যিই এবার না তাকিয়ে পারল না সান্ত্বনা, আর হেসেও ফেলল। ওর ভিতরকার ঠাণ্ডার আঁচ দশ হাত দূর থেকেও উপলব্ধি করা যায়। মুখ তুলে হোপুন দু'জনের দিকেই তাকালো। তারপর উঠে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। প্রায় আগের মতই, কোন তারতম্য নেই।...একদিন শুধু অন্যরকম দেখেছিল। চাঁদমণির সঙ্গে সেই পাহাড়ের নির্জনে...।

পাগল সর্দার কি বলে চলেছে ঠিক যেন কানে যাচ্ছে না, তার মুখের দিকেই চেয়ে আছে সান্ত্বনা। ক'টা মাসে সর্দারের বয়েস যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। কালো মুখে নিষ্প্রভ জরা নেমেছে একটা।...পাগল সর্দার বুড়িয়ে গেছে।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, চাঁদমণির খবর কিছু পেলে সর্দার?

এক মুহূর্ত। সর্বাঙ্গের স্থবিরতা মুহূর্তে বিলীন হয়ে গেল বুঝি। ক্ষীণদ্যুতি চোখের কোটরে লক্ষ্যভ্রষ্ট ব্যাধের ক্রুর পরিতাপ চিকচিকিয়ে উঠল। সময় লাগল সামলে নিতে। অবসাদাচ্ছন্ন, মৃদু জবাব দিল তারপর, উ আকুসীর নাম তু আর এখেনে লিস না দিদিয়া—।

নাম আর নেয়নি সান্ত্বনা। যা বোঝবার ওটুকুতেই বুঝে নিয়েছে। বাইরের দিকে চোখ পড়তে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বিকেলের আলো কমে আসছে। চাঁদমণি যদি আসে...। এসে যদি ফিরে যায়!

আর বসতে পারল না এক মুহূর্তও। ভিতর থেকে কিছু যেন ওকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

কিন্তু দিন যায়, চাঁদমণি এলো না।

হোপুন আর পাগল সর্দারের ক্ষতি কিছুতে আর বড় করে দেখতে পারছে না সান্ত্বনা। রাগ হয় ওর বাবার ওপর, কেন এতদিন বিয়ে দেয় নি। রাগ হয় হোপুনের ওপর, কেন জোর করেই বিয়ে করেনি এতদিন। নিদারুণ ভয়ে নিজের বাবার কাছে গিয়েও দাঁড়াতে পারেনি মেয়েটা। শুধু ওকে বিশ্বাস করেছে, ওর কাছে এসেছে। আশ্চর্য। কিন্তু আবার এলে বলে দেবে, তোর বাবাকে দেখে কাজ নেই চাঁদমণি, তুই পালা শিগগীর, যেখানে হোক পালা। কিন্তু পালাবেই বা কোথায়, এতবড় পৃথিবীতে কোথাও আর আশ্রয় নেই... বীভৎস শকুনির ছায়া নেমেছে ওর জীবনে।

ধরফর করে ওঠে সান্ত্বনার বুকের ভিতরটা। কাঁপুনি ধরে সর্বাঙ্গে। দিনে অস্বস্তি। রাতে ঘুম নেই। সেই পা-ভেজানো কান্নার স্পর্শ ভুলতে পারছে না কিছুতে, চোখের কোণে এসে জমছে। মন বলছে চাঁদমণি আর আসবে না। যে জন্যে এসেছিল বলে গেছে। তবু সন্ধ্যার ছায়া নামার সঙ্গে সঙ্গে উতলা হয়ে ওঠে। অন্ধকার গাঢ়তর হতে নিজের অজ্ঞাতে আনাচে কানাচে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এক একবার। কোথায় বুঝি কালো মেয়ের কালো ছায়া পড়ে একটা। উৎকর্ণ। কখন বুঝি ভীতত্রস্ত ফিস ফিস ডাক কানে আসে চাঁদমণির, দিদিয়া! ই-দিদিয়া—!

[ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

অনন্ত কেবিনে কেষ্টর জন্যে সকলে বসেছিল। ওকে ফিরতে দেখেই চীৎকার করে ওঠে—কেষ্টদা', সারা দিন কোথায় ছিলে, এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেছে!

—কি হয়েছে?

—আজকের মিটিং-এ একেবারে লোক হয়নি, রাঘব বোয়াল রেগে অস্থির। আজই তোমাকে দেখা করতে বলেছে।

কেষ্ট বিরক্ত হয়, কেন, লোক হ'ল না কেন?

—আহা, ওর কাছেই যে 'হনুমান মার্কা'দের মিটিং ছিল, শালারা এমন বজ্জাত, মিটিং-এর পর চা খাওয়াবে বলে সবাইকে টেনে নিয়ে গেল।

আরও বিরক্ত হয়ে কেষ্ট বলে, তোরা কোন কম্মের নোস, ওদের মাইকের তারটাও তো কেটে দিতে পারতিস?

—তুমি নেই, সাহস হল না।

—যা, এখন জ্বালাতন করিস না, রাঘব বোয়ালকে বলে দে আমার শরীর খারাপ, কাল দেখা করব।

সবাই চলে গেলে এক কোণে কেষ্ট চুপ করে বসে থাকে। আশুদা' এক বার জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, আজ এত চুপচাপ কেন?

—শরীরটা ভাল নেই আশুদা'।

অনেকক্ষণ বাদে প্রভাত এল, একটা পত্রিকা কেষ্টর সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, দেখ, এবারের ইস্যুটা কেমন হয়েছে!

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেষ্ট নেড়ে-চেড়ে দেখে বলে, ভাল।

—কভারের ছবিটা দেখ, এরকম টাটকা মেয়ের ছবি দেখেছিস? এ বই-স্টল-এ পড়তে পাবে না, একেবারে হট কেক।

কেষ্ট উত্তর দেয় না, জানে প্রভাত এখনও বক-বক করবে।

—সূচীপত্র বার কর, সব কটা লেখা আমার। গোপেশ রায়, বীণা চ্যাটার্জী, 'ক খ গ,' সৌমেন তালুকদার সব আমি। কিন্তু পড়ে দেখ, এক বারও বুঝতে পারবি না যে একজনই সব লিখেছে।

—বাহাদুর বটে!

—লেখকদের একটি পয়সা দিতে হবে না, এ না হলে আজকালকার দিনে কাগজ চলে?

প্রভাত একটু চুপ করে থেকে কেষ্টর দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলে, কি হয়েছে রে, এত গম্ভীর কেন?

কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, দুনিয়াটা বড় গোলমেলে।

পরদিন সকালে কেষ্ট এল রাঘব বোয়ালের বাড়ী। আগে থেকেই সেখানে মিটিং চলছিল। কেষ্টকে দেখে তিনি বেশ জোরের সংগেই বললেন, ছি, ছি, আর বোল না। লজ্জার এক শেষ! বক্তৃতা দিতে গিয়ে মাঠে একটা লোক নেই! আর নাকের ডগায় হনুমান মার্কাদের কি ভীড়, ঘন ঘন জয়ধ্বনি, এত অপমান আর আমার জীবনে হয়নি।

কেষ্ট কথা চাপা দেয়, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তাই যা গোলমাল। সামনের মিটিং-এ নিশ্চয় এর শোধ তুলব। পরশু তেকোণ পার্কে আমাদের মিটিং-এ দেখবেন কি কাণ্ড হয়।

রাঘব বোয়ালকে আশ্বস্ত করে কেষ্ট তার দলবল নিয়ে বসল পরামর্শ করতে। পুলিন বললে, কেষ্টদা', বলে তো এলে পরশু দিন তেকোণ পার্কে মিটিং করবে, কিন্তু সেদিন হনুমান মার্কাদেরও যে ঐখানে মিটিং আছে।

—জানি, ওরা সময় দিয়েছে পাঁচটা, আমরা চারটে থেকে মাঠের অন্য দিকটা দখল করে বসব। যত লোক আসবে, দেখবি সুড়-সুড় করে আমাদের দিকে চলে আসবে। ওদের মিটিং কিছুতেই জমবে না।

যে কথা সেই কাজ। রাতারাতি কেষ্টর দল তেকোণ পার্ক রাঘব বোয়ালের পোষ্টারে ছেয়ে দিল। দুপুর থেকে মাইকে সিনেমার গান বাজতে লাগল, দেখতে দেখতে ছোটখাট ভীড় জমে ওঠে।

কেষ্ট বলে, দেখতে হবে না, মাঠ ভরে যাবে। বেকার, ভ্যাগাবণ্ড আর স্কুল-কলেজ-পালান ছাত্রের সংখ্যা কি কম নাকি? এমন তেকোণ পার্ক তিনখানা ভরে যাবে।

পুলিন বলে, কিন্তু সাবধান, ওদের দলও ছেড়ে কথা কইবে না, শেষ পর্যন্ত মারামারি হতে পারে।

—আমি তো তাই চাই, আমরা তৈরী হয়ে এসেছি। ওরা তো আঁটঘাট বেঁধে আসবে না, খুব একচোট হয়ে যাবে।

রাঘব বোয়াল বক্তৃতা দিতে এসে অবাক হয়ে গেলেন। এত লোকের সামনে তিনি আগে কখনও বলেন নি। কেষ্টর দলের লোক মাইকে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল, সংগে সংগে ঘন ঘন করতালি, শাঁখ, কাঁসর-ঘণ্টা বেজে ওঠে। রাঘব বোয়াল জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা সুরু করলেন। চললও কিছুক্ষণ, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। হনুমান মার্কাদের অনেকে এসে পড়ে চীৎকার চেঁচামেচি করে বক্তৃতা থামিয়ে দিতে চায়। কেষ্টর দলও তৎপর হয়ে ওঠে। বচসা সুরু হয়ে গেল, দাঙ্গা হবার উপক্রম, কয়েক মিনিটের মধ্যে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কেষ্টর দল সোডার বোতল ছুঁড়তে থাকে, বেশ কয়েক জন জখম হল। রাঘব বোয়াল এক সুযোগে বক্তৃতা থামিয়ে গাড়ী চড়ে পালিয়ে গেলেন। দাঙ্গার জের চলল অনেকক্ষণ। হনুমান মার্কাদের দল প্রথমটায় মার খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু আরও লোকজন নিয়ে ফিরে এসেছিল। ঠিক সময় পুলিশ এসে না পড়লে রক্তারক্তি কম হত না। হাতের কাছে যাদের পেল, পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। মাত্র

LUX
TOILET SOAP
LUX
TOILET SOAP
প্রণতি ঘোষ লাক্স টয়লেট
সাবান পছন্দ করেন তিনি বলেন
"এর শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতা
প্রমাণ করে!"

দু'জন ছাড়া কেষ্টর দলের সকলেই পুলিশ আসার আগেই পালিয়েছিল।

কেষ্টরা ফিরলে উৎকণ্ঠিত রাঘব বোয়াল জিজ্ঞেস করলেন, কি হল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না! মারামারি কেন?

কেষ্ট জবাব দিলে, হিংসে, হিংসে, তা ছাড়া আর কি! ওদের মিটিং-এ লোক হয় নি, তাই ইচ্ছে করে গোলমাল বাধাল।

—সোডার বোতল ছুঁড়ছিল কারা?

—ওরাই তৈরী হয়ে এসেছিল, ভাগ্যিস আমাদের বিশেষ কিছু লাগেনি। নিরীহ জনতার উপর অত্যাচার!

রাঘব বোয়াল বল্লেন, যাই বল, এত ভীড় হবে আমি আশা করি নি।

—বলেছি তো নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন, আপনার জয় অনিবার্য্য।

ক'দিনই শ্যামল এসে ফিরে গেছে, কেষ্টর সংগে দেখা হয় নি। অবশ্য আজ-কাল অনন্ত কেবিনে একলা বসে থাকতে তার খারাপ লাগে না। আশুদা', প্রভাত, পুলিন অনেকের সংগেই আলাপ হয়ে গেছে। আশুদা' বল্লেন, অত 'কেষ্টদা' কেষ্টদা' করে ছটফট কর কেন? বসে চা খাও না। একবার যে এখানে চা খেয়েছে, সে ঘুরে-ফিরে ঠিক এখানে আসবেই।

প্রভাত খেই ধরে, তা আর বলতে, আশুদা'র চা না খেলে আমি তো লেখার ইন্সপিরেশনই পাই না।

শ্যামল জিজ্ঞেস করে, এখানে এত গোলমালের মধ্যে কি করে লেখেন?

প্রভাত হাসে, আমার এখানে-সেখানের বাছ-বিচার নেই, যেখানে বসিয়ে দেবে, লিখে যাব। এই দেখ না, একটা উপন্যাস লিখছি। মাত্র তিন দিনে এতখানি লেখা হয়ে গেছে আর খুব হলে সাত দিন, তিনশ' পাতার মোটা বই।

—বই-এর কি নাম?

—মধুবালা।

—সিনেমার মধুবালা?

প্রভাত হাসে, বিজ্ঞের হাসি, তার সংগে কোন সম্বন্ধ নেই, শুধু ঐ নামটা দিয়েছি। এখন থেকে বই-এর অর্ডার আসছে।

একটু চুপ করে থেকে শ্যামল জিজ্ঞেস করে, আপনি ডিটেক্টিভ বই লেখেন নি?

—অনেক, তবে নিজের নামে নয়। নাম খারাপ হয়ে যায় কিনা, তাই 'অবধূত' ছদ্মনামে লিখি।

শ্যামল বিস্মিত হয়, আপনিই অবধূত?

প্রভাতের উত্তর দেবার আগেই কেষ্ট এসে পড়ে, এই যে শ্যামল, ক'দিনই তোর সংগে দেখা হচ্ছে না, কি খবর?

প্রভাত বলে, তোরা গিয়ে ওদিকটায় বোস কেষ্ট, আমি ততক্ষণ আরও দু'চ্যাপটার লিখে নিই।

শ্যামল উঠে এসে কেষ্টর পাশে বসে পড়ে, কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, চেহারায় বেশ চটক এসেছে দেখছি, ভালো মানুষ ভাবটা কেটে গেছে, ভাল।

শ্যামল আগের মত লজ্জা না পেয়ে বলে, আজ আমি আপনাকে খাওয়াব কেষ্টদা'।

—খুব বড়লোক হয়েছিস বুঝি?

—এক দিনে প্রায় দশ টাকা পেয়েছি।

—বাঃ বাঃ, বাহাদুর তো!

শ্যামল উৎসাহিত হয়, প্রথম দিন যে লাল বাড়ীতে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে পুরোন বই নিয়ে এসেছি। বিক্রী করে চার কি সাড়ে চার টাকা পাব।

—বাড়ীতে কেউ কিছু জানতে পেরেছে?

—না।

কেষ্ট ব্যাগ থেকে একটা চাঁদার খাতা বার করে শ্যামলের দিকে এগিয়ে দেয়।

—সরস্বতী-পুজো আসছে, খাতা নিয়ে চাঁদা তুলে বেড়াবার চেষ্টা করলে দিনে চার পাঁচ টাকা ঠিক উঠবে। দুপুরের দিকে যাবি, যে সময় মেয়েরা থাকে।

শ্যামল ঘাড় নেড়ে কেষ্টর হাত থেকে খাতা নেয়, এ যে অনাথ-বান্ধব সমিতির চাঁদার খাতা।

—তাই তো দিলাম, এদের পুজো খুব নামকরা, চাঁদা চাইবার অসুবিধে হবে না। কিন্তু সাবধান! ওদেরই দলের কারো কাছে গিয়ে হাজির হোস না।

শ্যামল হেসে উত্তর দেয়, সে আমি ম্যানেজ করে নেব।

আজ কেষ্টর ঘুম ভেঙে যায় অন্য দিনের চাইতে অনেক আগে। রাস্তায় ধরানো উনুনের ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে। বিরক্ত হয়ে কেষ্ট নীচে নেমে এসে কলতলায় মুখ ধুয়ে নেয়, ডাকে, শ্যামা চা দিয়ে যা। কেষ্টকে এত আগে উঠতে দেখে বিস্মিতা শ্যামা জিজ্ঞেস করে, এত সকালে উঠে পড়েছ, কোথাও যাবে বুঝি? কেষ্ট তাকে ভেঙিয়ে বলে, কোথাও যাবে বুঝি? ঘরময় যে ধোঁয়া, সকাল বেলা জানলাগুলো বন্ধ করে দেওয়ারও সময় হয় না?

—ও মা, তাইতো! আমি একেবারে ভুলে গেছি কাকু, ছি ছি!

কেষ্ট থামিয়ে দিয়ে বলে, যা, চট করে এক কাপ চা নিয়ে আয়, আমায় বেরুতে হবে।

কেষ্ট ওপরে উঠে গিয়ে জামা-কাপড় পরে। জুতো-জোড়া বড় ময়লা হয়েছিল, বসে পালিশ করে নেয়। একটু পরে শ্যামা চা নিয়ে আসে, সংগে গরম তেলেভাজা। কেষ্ট খেতে খেতে বলে, বাঃ বেশ গরম তো, নে দুটো খেয়ে ত্থাখ।

তার কথামত শ্যামা একটা বেগুনি নিয়ে মুখে দেয়, উঃ, ভীষণ গরম!

শ্যামা মুখ থেকে বার করে উঃ-আঃ করতে থাকে। কেষ্ট হেসে ফেলে।

হঠাৎ শ্যামা জিজ্ঞেস করে, কাকু, তুমি বিয়ে করবে না?

কেষ্ট বিস্মিত হয়, এধরণের প্রশ্ন সে আগে শ্যামার কাছে শোনেনি, জিজ্ঞেস করে, বিয়ে কেন?

—বাঃ, সবাই তো বিয়ে করে।

কেষ্ট হাসে, এ নিয়ে কথা হচ্ছিল বুঝি?

—হ্যাঁ, কালকে।

—কে বলছিল?

—বিভূতি বাবুরা এসেছিলেন যে—

—কোন বিভূতি বাবু, ঐ হলদে বাড়ীর ভাড়াটেরা?

—হ্যাঁ, শীলাদি'র সংগে তোমার বিয়ের জন্তে।

—কি কথা হ'ল ?

—বাবা বললেন তোমার সংগে কথা বলতে।

কেষ্ট সিগারেট ধরায়, যাক, তোর বাবার তাহলে এত দিনে বুদ্ধি হয়েছে।

ব্যাগ হাতে নিয়ে কেষ্ট সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়, শ্যামা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কাকু, তোমার একটা চিঠি এসেছিল পেয়েছ ?

—কই না !

—আমি যে তোমার কোটের পকেটে রেখেছিলাম।

—দিয়ে যা :

শ্যামা ছুটে গিয়ে কেষ্টর হাতে চিঠি দিয়ে আসে। চিঠিটা খুলতে খুলতে কেষ্ট রাস্তায় বেরয়, গৌরীর চিঠি।

"শ্রীচরণেষু,

আপনি সেদিন আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। আমার ভাই একটু ভাল আছে। আরও পাঁচ টাকার ওষুধ কিনিতে হইবে, আপনি যদি দয়া করিয়া ঐ কয়টি টাকা দেন তো বড় উপকার হয়। আমি সকাল নয়টা হইতে প্রায় দু'-তিন ঘণ্টা ধর্ম্মতলার মোড়ে থাকি। দয়া করিয়া একবার আসিবেন। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। ইতি

প্রণতা গৌরী।"

চিঠি পড়ে কেষ্ট পকেট থেকে টাকা বার করে দেখে কত আছে।

কেষ্ট যখন এসপ্লানেডে এসে জীপ থামালো তখন প্রায় এগারোটা বাজে। অফিস যাবার ভীড় চলে গেছে তবু গাড়ী চলার বিরাম নেই। কেষ্ট গাড়ী পার্ক করে চার দিকে তাকায়, কিন্তু গৌরীকে দেখতে পায় না। অন্যমনস্ক হয়ে দেখছিল বইএর ষ্টলে কত লোকের ভীড় হয়েছে, ফিরিওয়ালাদের দোকানে জিনিষ বিক্রী হচ্ছে। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল ছিল না। গৌরীর ডাকে চমক ভাঙ্গে।

—আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন ?

—না, বেশীক্ষণ না। ভাই কেমন আছে ?

—আগের চেয়ে একটু ভাল, ওষুধে কাজ দিয়েছে, কিন্তু রোগীর পথ্যি দিতে পাচ্ছি কই !

—ডাক্তার কি খেতে বলেছে ?

—সব দামী দামী খাবার, ফল, দুধ, ছানা।

কেষ্ট কি বলবে ভেবে পায় না।

—এখুনি আসছি, বলে গৌরী হঠাৎ এগিয়ে যায় রাস্তার মধ্যে। কেষ্ট দেখে পুলিশের হাত দেখানোর জন্তে অনেকগুলো গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। গৌরী সেখানে গিয়ে ভিক্ষে চায়। কেষ্ট সেই দিকেই তাকিয়ে থাকে। ময়লা শাড়ী, তেলের অভাবে চুলে জট পড়েছে, কি বলছে শোনা যায় না, চোখে করুণ প্রার্থনা। ব্যগ্র হাতে গাড়ীর দরজা আঁকড়ে ধরছে, ড্রাইভারের ধমকে আবার হাতটা সরিয়ে নেয়। হয়ত কোন গাড়ীর কাছ কিছু পাবার আশায় আগ্রহ ভরে ছুটে যায়, পয়সা পেলে দাতার উদ্দেশ্যে শুভ কামনা জানায়, না পেলে নিরাশ হয়।

পুলিশের বাঁশীতে গাড়ীগুলো আবার চলতে আরম্ভ করে, গৌরী কেষ্টর কাছে ফিরে আসে।

—কত পেলে ?

গৌরী ক্লান্ত স্বরে বলে, ছ' আনা। একটু থেমে বলে, একটা টাকাও পুরো হল না। কেউ যে শুনতে চায় না। কেষ্ট ম্লান হাসে, শুনলেও এরা দেয় না।

কেষ্ট সে কথার উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে এগিয়ে দেয়,—এই নাও, তোমার ভাইকে ভাল পথ্যি দিও।

টাকা নিতে গিয়ে গৌরীর চোখে জল আসে, বলে আপনি দেবতা !

কেষ্ট শব্দ করে হেসে ওঠে, দেবতাই বটে, ওই যে আবার থেমেছে, দেখ যদি আর কোন দেবতা পাও।

গৌরীর উত্তরের অপেক্ষা না করেই কেষ্ট গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যায়।

কেষ্ট বরাবরই গাড়ী জোরে চালায়, আজও ভীড়ের মধ্যে দিয়ে হর্ণ বাজিয়ে বেশ জোরেই গাড়ী চালাচ্ছিল কিন্তু মন তার গাড়ীর দিকে ছিল না। ভাবছিল গৌরীর কথা কতখানি সরল, মানুষের ওপর কি গভীর বিশ্বাস, আর ভুলতে পারছিল না একটা কথা, 'আপনি দেবতা।'

এক জায়গায় ভীড় দেখে গাড়ী থামাতে বাধ্য হল। সকলে ধর ধর করে চেঁচাচ্ছে। কেষ্টর আসার মিনিটখানেক আগে কোন ফোর্ড গাড়ী একটি দশ বার বছরের পাড়ার ছেলেকে চাপা দিয়ে

চলে গেছে। কেষ্টকে তারা অনুরোধ করে, আপনার গাড়ী করে ছেলেটাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দিন।

কেষ্ট বলে, ওকে বরং ট্যাক্সী করে নিয়ে যান, আমি ততক্ষণ ফোর্ড গাড়ীটা ধরতে পারি কি না দেখি।

কেষ্ট জোরে গাড়ী চালিয়ে দেয়, শুনতে পায় পেছু থেকে বলছে সবাই, নীল রং, বড় ফোর্ড, মেয়ে চালাচ্ছে।

রাস্তা বেশ চওড়া, জোরে চালাবার অসুবিধে হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দূরে ফোর্ড গাড়ীটা দেখা যায়, কেষ্ট এ্যাকসিলেটারে আরও চাপা দেয়। ফোর্ড গাড়ীটাও বেশ জোরে চলেছে। অনেক বেঁকে চুরে, প্রায় বালীগঞ্জের কাছে এসে গাড়ীটা বড় দোতলা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যায়। কেষ্ট তার পেছনে গাড়ী থামিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ে। গাড়ীর সামনের সিটে চালকের পাশে একটি মেয়ে বসেছিল, ভয়ে তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। পিছনে দু'তিনটি ছোট ছেলে-মেয়ে আর এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। কেষ্ট কাছে এসে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করে, আপনারা কি মানুষ, একটা ছেলেকে চাপা দিয়ে পালিয়ে এলেন?

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি গাড়ী থেকে নেমে ভয়ে ভয়ে উত্তর দেন, ঠিক পালিয়ে আসিনি।

—নয় ত কি, শরীরে এতটুকু দয়ামায়া নেই?

ভদ্রলোক আমতা-আমতা করেন, নতুন ড্রাইভার বুঝলেন কি না—

কেষ্ট রেগে বলে, ড্রাইভার তো গাড়ী চালাচ্ছিল না, ওর ওপর দোষ দিচ্ছেন কেন? গাড়ী তো উনি চালাচ্ছিলেন।

কেষ্ট ইঙ্গিতে মেয়েটিকে দেখিয়ে দেয়।

মেয়েটি এবার কথা বলে, যে ছেলেটি চাপা পড়েছে সে কে?

—আমার শালা।

—খুব বেশী লেগেছে?

—মরল কি বাঁচল, তা দেখবার আপনাদের সময় কোথায়?

—মিথ্যে এ কথা বলছেন, আমরা তো দাঁড়াতে চেয়েছিলাম, সবাই ক্ষেপে মারতে এল দেখেই তো—

—ক্ষেপবে না, বিধবার সবে ধন নীলমণি ছেলে। যাক্ গে, হাসপাতালে নিয়ে গেছে, এখন দেখা যাক্।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাকে থামিয়ে কথা বলেন, ছেলেটির চিকিৎসার জন্যে যত টাকা লাগে, আমরা দেবো। এ নিয়ে আর থানা-পুলিশ করবেন না। এত বড় বাড়ীর বৌ, বুঝলেন কি না—

কেষ্ট শান্ত গলায় বলে, সে তো বুঝতেই পারছি। দেখি, আমার শাশুড়ীকে যদি রাজী করাতে পারি। এখন আমায় টাকা পঞ্চাশ দিন, আবার হাসপাতালেই যাই, কখন কি লাগে বলা তো যায় না।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। মেয়েটির কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভদ্রলোক কেষ্টর হাতে গুঁজে দেন। বুঝতেই পারছি আপনার মনের অবস্থা কিন্তু বিশ্বাস করুন, ছেলেটি অমন করে ছুটে এসে না পড়লে গাড়ীতে ধাক্কা লাগতো না।

কেষ্ট টাকাটা পকেটে রাখতে রাখতে বলে, যদি বেঁচে যায়, আপনার চিকিৎসার টাকাটা দিলেই হবে, কিন্তু মরে গেলে জানি না আমার শাশুড়ী আপনাদের ছেড়ে দেবেন কি না।

আর কোন কথা না বলে কেষ্ট গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে আসে। চিন্তিত মুখে ভদ্রলোক সবাইকে নিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে যান। ফটকে দরোয়ান বসেছিল, তার সামনে গাড়ী থামিয়ে কেষ্ট এক টাকা বখশিস দেয়, দরোয়ান সেলাম করে।

—ঐ বুড়ো বাবু কে?

—বাড়ীর মালিক।

—ঐ মেয়েটি?

—মাইজী।

—অত ছোট?

—নয়া মাইজী।

—ও, দ্বিতীয় পক্ষ? কেষ্ট ব্যাঁকা হাসে।

ফেরবার পথে কেষ্ট আবার ঘটনাস্থলে আসে। খবর নিয়ে জানতে পারে, ঐ ছেলেটি মোড়ের মিষ্টিওয়ালার দোকানে কাজ করে।

—ধরতে পারলেন নাকি?

কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কই, পেছু-পেছু কত দূর দৌড়লাম, কোথায় যে বেঁকে গেল!

পাড়ার ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে বলে, ধরতে পারলে গাড়ীর রফা রফা করতাম।

কেষ্ট সায় দেয়, আমিও কি ছাড়তাম নাকি? পরে মিষ্টিওয়ালাকে বলে, আমি এসে খবর নিয়ে যাব, ছেলেটি কেমন থাকে।

নতুন বাংলা মাস পড়ে গেছে, এরই মধ্যে পত্রিকা বার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রেসের গোলমালে হয়ে ওঠেনি। তাই সকাল থেকেই প্রভাত সম্পাদকের সংগে উঠে-পড়ে লেগেছে, পত্রিকা কাগজে মুড়ে তার ওপর নাম-ঠিকানা লিখছে। গ্রাহকদের সংখ্যা বেশী না হলেও, সময় মত বই না পেলে চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে। সম্পাদক বলে, গ্রাহক তো নয় সব, খাদক। পত্রিকার দেরী হলেই শালাদের মেজাজ গরম। কড়া কড়া চিঠি পাঠাবে।

প্রভাত কাজ করতে করতে উত্তর দেয়, পয়সা দিয়েছে, করবে না? আমরা যখন টাকা দিয়ে লেখা নিই, তখন কি আর ছেড়ে কথা কই? লেখককে বেঁধে ফেলে গল্প লেখাই না?

—এবারের গেট আপ কেমন লাগছে?

—ওপরের ছবিটা তেমন জোর হয় নি।

সম্পাদক মুখ ব্যাঁকায় হতভাগা জীবনটার জন্যে। কেউ তার ছবি ছাপিয়েছে কখনও! আমি তার নাম করিয়ে দিলাম আর শালা এখন আমার কাছেই টাকা চায়।

প্রভাত বিস্মিত হয়, বল কি, জীবনও টাকা চায়?

—নয় তো আমি কুমারেশের ছবি নিই! ও ত বক্স ক্যামেরায় ছবি তোলে।

—যাকগে পত্রিকার মুখ তো এঁটে দেওয়া হয়েছে, ষ্টলে দাঁড়িয়ে বাবুদের আর পাতা ওলটাবার উপায় নেই। ও ঠিক কেটে যাবে।

এ-হেন নামকরা পত্রিকার আফিস। উত্তর-কলকাতার অনেক গলি-ঘুঁজির মধ্যে একটি ছোট কামরায়, যার সন্ধান শুধু ডাকযোগেই পাওয়া সম্ভব। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটা কালিপড়া কাঠের টেবিল, আর দু'খানা নড়বড়ে চেয়ার। তাই সম্পাদক আর সহ-সম্পাদক মাটিতে মাদুর বিছিয়ে কাজে ব্যস্ত।

প্রভাত আড়মোড়া ভেঙ্গে বলে, এবারের গল্পটা তেমন সুবিধের হয় নি।

—সুরুটা ভালই ছিল, শেষের দিকটা গুলিয়ে গেছে।

—কি করব, একেবারে সময় পাই না। চিঠি পত্তরের জবাব দেব, প্রবন্ধ লিখব তার পর অনুবাদ করব। এদিকে গল্প উপন্যাস সব খিচুড়ী পাকিয়ে যায়। সম্পাদক উৎসাহ দেয়, তুমি তো সব্যসাচী হে, তুমি ছাড়া কি এ কাগজ চলতো ?

কাজ শেষ হতে প্রায় বারোটা বেজে গেল, প্রভাত কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসছিল, সম্পাদক বলে, বেলারাণীর সংগে ইণ্টারভিউটা ভুলে যেও না।

—সে তো সোমবার দিন।

—একটা ভাল ছবি ওঁকে দিয়ে সই করিয়ে নিও, আমাদের জন্মে বিশেষ ভাবে তোলাটা লিখে দিতে হবে।

প্রভাত সায় দিয়ে বলে, সে সব আমি ঠিক করে নেব। প্রশ্ন উত্তরও আমার সব লেখা হয়ে গেছে, ওঁকে শুধু একবার শোনাতে হবে। একটু থেমে বলে, বালীগঞ্জে বাড়ী, ট্যাক্সী করে যাব, ভাড়াটা দিয়ে দিও।

—বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে ট্যাক্সী চেপো, এখান থেকে নয়।

—সে আর বলে দিতে হবে না।

হাসতে হাসতে প্রভাত বেরিয়ে আসে।

রাঘব বোয়ালের বড় গাড়ী এসে দাঁড়াল অনন্ত কেবিনের দরজায়। আশু বাবু হন্তদন্ত হয়ে নেমে এলেন, কাউকে খুঁজছেন স্যার ?

রাঘব বোয়ালের ছেলে পেছনের সিট থেকে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, কেষ্ট বাবু কোথায় জানেন ?

—দিন-দুই এ-দিকে আসেনি।

—তাকেই যে দরকার—

আশু বাবু টাকে হাত বোলান, এলে বরং পাঠিয়ে দেবো।

আপনাকে বলে যাচ্ছি, ছেলেরা যারা আসবে সব আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবেন, বাবা সকলের সংগে কথা বলতে চান।

—নিশ্চয়, এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আশু বাবু মুখ বাড়িয়ে হাঁক দেন, ভোঁদা, নরেশ, যা শীগগিরি যা, বাঁড়ুজ্জে মশাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

রাঘব বোয়ালের ছেলে চলে যায়। আশু বাবু দোকানে উঠে এসে বিড়-বিড় করেন, কেষ্টকে নিয়ে এই জ্বালা, মাথার যদি এতটুকু ঠিক থাকে!

ভোঁদা বলে, এ আর নতুন কি, তবু তো কেষ্টদা' এবার একটু বেশী মন দিয়েছে।

—তোমরা আর দেরী কোর না বাপু, যাও।

—আর তো সাত দিন, রাঘব বোয়ালের পয়সায় ক'দিন নবাবী করে নিই। তার পর আর কে পুঁছছে, আপনিই কি আর দোকানে ঢুকতে দেবেন ?

আশুদা' সে-কথায় কান দেন না। কোণের টেবিলে শ্যামল বসে ছিল, সে দিকে এগিয়ে যান। তোমার কেষ্টদা'র কোন খবর জান নাকি শ্যামল ?

—না, ক'দিনই ধরতে পারছি না, তাই তো এখানে বসে আছি।

—কিছু খাবে নাকি ?

—খেয়েছি। একটু থেমে বলে, আশুদা,' আপনাকে কিন্তু চাঁদা দিতে হবে।

—কিসের চাঁদা ?

—সরস্বতী-পুজোর।

—ওরে বাবা! তোমাকে নিয়ে এ পর্য্যন্ত কুড়ি জন হ'ল। মা সরস্বতী আমায় ইস্কুল থেকে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়েছিলেন, তবু তাঁর পুজোর সময় চাঁদা দিতে হবে, কি আব্দার দেখ!

—সে আমি শুনব না আশুদা', আপনার নামে এক টাকার রসিদ কেটে রেখেছি, এই দেখুন—বলে সত্যিই রসিদ বার করে আশুদা'র হাতে দেয়।

—তবে আর চাইছ কেন ? এক টাকার খেয়ে দাম দিও না। তাহলেই আমার চাঁদা দেওয়া হয়ে যাবে, কি বল ?

—তাতে আমি রাজী আছি। নিতাই, পাঁউরুটি আর ডিম দিয়ে যা।

ঘর প্রায় ফাঁকা ছিল, তাই আশুদা' বসে বসে শ্যামলের সংগে গল্প করেন। বিশেষ করে নিজের জীবনের কথা, কত কষ্ট করে দোকান করেছেন, কত রকমের কাজ করেছেন, তারই বিবরণ। কথা হয়তো অনেকক্ষণ চলতো, যদি না কেষ্ট এসে পড়ে হাঁক দিত।

—কি খবর আশুদা', দু'দিন আপনার পাত্তা পাই নি যে ?

—তাই বটে, চোর এসে বুড়ীকে বলছে, তুমি তো আমায় ছুঁতে পারলে না!

—কেন, কি হল ?

—কি আবার হোল, রাঘব বোয়াল যে লোক পাঠিয়ে পাগল করে মারছে।

কেষ্ট বিরক্ত হয়, ও জ্বালাতন করে মারলে, রাঘব বোয়াল আর রাঘব বোয়াল। আমায় যেন মাইনে দিয়ে চাকর রেখেছে। সব সময় হাজিরা দিতে হবে, যত সব—

—আহা, মাথা গরম করছ কেন ?

শ্যামল এতক্ষণে কথা বলে, কেষ্টদা,' আপনার সংগে যে কথাই হচ্ছে না!

—কি করবো বল, কত দিক সামলাবো ?

—আমায় চাঁদা দিতে হবে কেষ্টদা'—

—চাঁদা, কিসের ?

আশুদা' টিপ্পনী কাটেন, সরস্বতী-পুজোর বিস্তের দৌড় তো তোমার আমারই মত কিন্তু চাঁদা দিতে হবে।

শ্যামল আবদারের সুরে বলে, বাঃ সবাই চাঁদা না দিলে ভাল করে পুজো হবে কি করে ?

কেষ্টর বেশ মজা লাগে, জিজ্ঞেস করে, কাদের পুজো ?

—অনাথ-বান্ধব সমিতির। এই দেখুন আশুদা', প্রভাতদা', সবাইএর কাছে চাঁদা নিয়েছি, আপনাকে এক টাকা দিতেই হবে।

কেষ্ট পকেট থেকে এক টাকা বার করে ওর হাতে দেয়, ঐ নে, থাক থাক, রসিদ পরে দিয়ে দিস, আমি চলি—

শ্যামল বাধা দেয়, না কেষ্টদা', আমাদের সমিতিতে সে হবার জো নেই। টাকা নিলেই রসিদ দিতে হবে।

—তবে দাও।

শ্যামল খস-খস করে রসিদ লিখে দেয়। কেষ্ট একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করে ওঠে।

কেষ্ট চলে যাবার পর শ্যামল অনন্ত কেবিন থেকে বেরিয়ে সোজা পার্কে এসে হাজির হল। ওদের বিদ্যাভবনের কাছেই এই পার্ক, দু'মিনিটের রাস্তা। স্কুলপালানো ছেলেদের ছোটখাট আড্ডা এখানে রোজই বসে। আজ অবশ্য এখনও কেউ আসেনি। বারটা বেজে গেছে, ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। পার্কের এক কোণে ঘরের বাইরে গাছতলায় খাটিয়া পেতে মালী শুয়ে আছে। অন্য দিকে সাধারণের বিশ্রামের জন্য যে শাণবাঁধান, মাথা ঢাকা, ছোট ঘরটি রয়েছে সেখানে দু'জন ফিরিওয়ালা পাশে মাল রেখে ঝিমুচ্ছে। শ্যামল রোজকার মত পুবদিকের পেয়ারা গাছটার তলায় গিয়ে বসে। খুব আস্তে হাওয়া বইছে, ছায়ায় বসলে বেশ আরাম লাগে। শ্যামল চিৎ হয়ে শুয়ে দেখছিল গাছের উঁচু ডালে ছোট ছোট পেয়ারা হয়েছে, দু-তিনটে পাখী কিচমিচ করে ঝগড়া লাগিয়েছে।

—এই বাঁদর, ঘুমুচ্ছিস? রেলিঙ টপকে মদন পার্কের ভেতর এসে শ্যামলকে ঠেলা দেয়।

শ্যামল ঠিক ঘুময়নি, তন্দ্রার ভাব এসেছিল, উঠে বসে বলে, দূর গাধা, বেশ আরাম লাগছিল, তুই নষ্ট করে দিলি।

—দিব্যি মৌজ করে শুয়ে আছিস, তোর আর কি? আমাদের শালা এক মিনিটের ফাঁক নেই। একবার বাইরে যেতে চাইলে মাষ্টাররা কটমট করে তাকায়। তেমনি সব ভালো মানুষ ছেলে জুটেছে, বলে, কি রে সিগারেট খেতে যাবি?

শ্যামল হাসে, বেশ হয়েছে, তুই তো আর ক্লাশ রোজ ফাঁকি দিতে পারবি না, যা রাগী দাদা, বেত মারবে।

মদন মুখটা গম্ভীর করে বলে, সেই তো জ্বালা! একটা সিগারেট দাও, এখুনি ক্লাশে ফিরতে হবে।

শ্যামল সিগারেট বার করে মদনের হাতে দেয়, নিজেও ধরায়।

—এ সময় এলি যে, টিফিনের তো দেরী আছে।

—এক পিরিয়ড আগেই ছেলেদের উঠোনে জড় করেছে, হেড মাষ্টার কি বক্তৃতা দেবে।

আমি সেই সুযোগে এই দুটো নিয়ে পালিয়ে এলাম।

মদন পকেট থেকে দুটো 'ইনস্ট্রুমেণ্ট বক্স' বার করে শ্যামলের সামনে রাখে।

—একেবারে নতুন যে—

—নিলে কেউ পুরোন নেয়?

—কার?

—কে জানে, আমাদেরই ক্লাশের।

শ্যামল বাক্স দুটো নেড়ে-চেড়ে বলে, আজই ঝেড়ে দেবো।

—দু'-একটা দোকান যাচিয়ে নিস—।

—তুই আর আমায় শেখাস না।

মদন একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, তোর ছোটদার সংগে আমার আলাপ করিয়ে দিবি না?

—দেবো তো বলেছি। কেষ্টদা' এখন খুব ব্যস্ত, রোববার ভোট হয়ে যাক, তার পর একদিন—

সিগারেট শেষ হয়ে আসে, মদন জোরে টান দেয়, পালাই, দেরী হলে ধরা পড়ে যাব।

—তাহলে কখন দেখা হবে?

মদন কি যেন ভেবে নেয়, একটা ছবি দেখবি?

—কোথায়?

—বীথিকায়, 'চিচিং ফাঁক' খুব ভাল হয়েছে।

—আলিবাবার গল্প?

—না, না, এ শুধু খিস্তি ভরা।

—কে আছে?

—বেলারাণী।

—মাইরী! আমি তাহলে গেটের কাছে থাকব। ছ'টার সময়।

—ঠিক আছে। সম্মতি জানিয়ে মদন আবার রেলিঙ টপকে পার্কের বাইরে চলে যায়। একদিন কেষ্ট একেবারেই ফুরসৎ পায়নি। সামনের রবিবার ভোট দেবার দিন, এরই মধ্যে সব কিছু ব্যবস্থা তাকে করতে হয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত চতুর্দিকে লোক পাঠিয়েছে, প্রত্যেক সেণ্টারের কাছে নিজেদের অফিস খোলার ব্যবস্থা করেছে, রাঘব বোয়ালকে বলে তার বন্ধুদের কাছ থেকে অনেকগুলো গাড়ী আনিয়েছে, প্রয়োজন মত খুঁজে খুঁজে ছেলে যোগাড় করে এনেছে, যারা বিভিন্ন সেণ্টারের ভার নিয়ে সেই দিন কাজ চালাতে পারবে। এর মধ্যে কথা-কাটাকাটি, ঝগড়া হয়েছে অনেকর সংগে। বিশেষ করে পুলিন, সে তো বলেই গেল, চললাম আমি, হনুমান মার্কাদের দলে। দেখব কোন শালা রাঘব বোয়ালকে জেতায়।

কেষ্ট চেঁচিয়ে উত্তর দিয়েছিল, কাজ করবার জন্যে সবাইকে এখানে আনানো হয়েছে। গুলতানী করবার জন্যে নয়।

পুলিন কেষ্টকে ভয় করে। তাই মুখের ওপর জবাব না দিয়ে বেরিয়ে এসে অন্যদের কাছে বলেছিল, কেষ্টদা'র ফুটানী দেখলি? রাঘব বোয়ালের পয়সায় নবাবী করছে আর আমরা দুটো পয়সা চাইলেই খিঁচিয়ে ওঠে। চেনে না আমায়, পুলিন মণ্ডল যে-সে ছোকরা নয়, এর শোধ আমি ঠিক তুলব।

এ নিয়ে দলের মধ্যে অনেক কথা উঠেছিল। এমন কি, রাঘব বোয়াল বলেছিলেন, কেষ্ট, এ সময় ঝগড়াঝাটি করা ভাল নয়, পুলিনকে ফিরিয়ে আন, নয় ত বল আমি নিজেই ডেকে আনছি।

কেষ্ট এতে সায় দেয়নি, কোন দরকার নেই ওকে ডাকবার। ও সব ছেলেকে শায়েস্তা করতে আমি জানি। [ক্রমশঃ।

কালীমূর্তির ব্যাখ্যা

জগজ্জননী—কাঁকে প্রকৃতি বা কালীও বলা হয়। একটি নারী-মূর্তি একটি পুরুষ-মূর্তির উপর দাঁড়িয়ে আছেন—তার অর্থ, মায়ার আবরণ উন্মোচিত না হলে আমরা জ্ঞানলাভ করতে পারি না। ব্রহ্ম স্বয়ং স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই নন, তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তিনি যখন নিজেকে অভিব্যক্ত করেন তখন নিজেকে মায়ার আবরণে আবৃত করে জগজ্জননীরূপ ধারণ করেন ও সৃষ্টি-প্রপঞ্চের বিস্তার করেন। যে পুরুষ-মূর্তিটি শয়ানভাবে রয়েছেন তিনি শিব বা ব্রহ্ম, মায়াবৃত হয়ে শবরূপ।—স্বামী বিবেকানন্দ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জরাসন্ধ

ডাক্তার বাবু বলছিলেন, নিজের মনকে জিজ্ঞেস কর, কী তার উত্তর। এত দুঃখেও হাসি পায় হেনার। নিজের মনকে কি আজও তার জানতে বাকী আছে? সে যে কত লোভী, কত অবুঝ, তার আকাঙ্ক্ষার যে শেষ নেই! তাই আপনার অন্তরকে শুধু চোখ রাঙিয়ে এসেছে এত দিন। তার অসঙ্গত আব্দারকে এতটুকু প্রশ্রয় দেয়নি। আজ মনে হচ্ছে, সে লোভ যেন তার নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর বোধ হয় নিজেকে সে ধরে রাখতে পারবে না।

জেল-গেটের পেটা ঘণ্টায় দুটো বেজে গেল। পাশের বিছানায় মোনার মা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সে-ও তো দীর্ঘ রাত্রির সেই প্রথম প্রহর থেকে একটুখানি ঘুমের জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেনি? কিন্তু ঘুম আসেনি। নিমীলিত চোখের উপর কেবলই ভেসে উঠছে একখানা মুখ আর তার দু'টি ক্ষমাসুন্দর চক্ষু—স্নেহে করুণায় ভাস্বর, আগ্রহে, অনুরাগে প্রদীপ্ত। ঐ মানুষটা কি রক্ত-মাংস দিয়ে তৈরি নয়? কারাবন্দী অপরাধীর উপর মানুষের যে সহজাত ঘৃণা, স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা, সে সব কি বিধাতা তাকে একেবারেই দেননি? তিনি তো জানেন, প্রকাশ্য আদালতের বিচারে সে জঘন্য অভিযোগে দণ্ডিতা, জীবনের যে পথ ধরে এইখানে এসে সে দাঁড়াল, সে পথ পঙ্কিল, কলুষময়। তার সর্বাঙ্গে জড়ানো সেই মসী-চিহ্ন কি ওঁর ঐ উদার আয়ত চোখ দু'টিতে একবারও ধরা পড়ল না? সভ্য সমাজ যাকে আবর্জনার মত আস্তাকুঁড়ে টেনে ফেলে দিল, তিনি তাকে দু' হাত ধরে তুলে নিলেন, জড়াতে চাইলেন একান্ত করে, নিবিড় করে নিজের শুভ্র পবিত্র জীবনের সঙ্গে। প্রসন্ন-সরল হাস্যে সব দ্বিধা, সন্দেহ উড়িয়ে দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, তুমি যা আছ, সে-ই তোমার পরিচয়; তার বেশী আর কিছু জানতে চাই না।

কিন্তু তিনি জানতে না চাইলেও সে তো না জানিয়ে পারে না? তিনি ভুলতে চাইলেও সে তো ভোলাতে পারে না! নিজেকে তার প্রকাশ না করে উপায় নেই। হেনার ইচ্ছা হল এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে নিজেকে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে দেয়, সেই পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে বলে, হে আমার দেবতা, তুমি যাকে ভালবেসেছ, সে আমি নই, সে আমার এক কল্পনা-রঙীন মিথ্যা রূপ। তোমার ঐ করুণাময় অন্তরের মাধুরী মিশিয়ে তার জন্ম। সে তোমার সৃষ্টি, আমার বিধাতার সৃষ্টি নয়। হে আমার প্রিয়, তোমার কাছে যা পেলাম, সে যে কত বড় পাওয়া, তা কেবল আমিই জানি। কিন্তু এ কথা কেমন করে ভুলি, তার একটা কণাও আমার পাওনা নয়? সে শুধু ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে নেওয়া। আমাকে তুমি জেনে নাও। আমার অতীত, আমার বর্তমান, আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে যে পরিপূর্ণ আমি, তাকে তোমার সামনে তুলে ধরতে দাও। তাকে যখন দেখবে হয়তো মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে, ঘৃণায় ভরে উঠবে তোমার ঐ দেবচক্ষু। বুক ভেঙ্গে গেলেও সে দুঃখ আমি সইতে পারবো। কিন্তু মিথ্যা আমি, নকল আমি দিয়ে একটা দিনের তরেও তোমাকে ঠকিয়েছি, সে যন্ত্রণা আমার সইবে না।

প্রবল উত্তেজনায় হেনা বিছানার উপর উঠে বসল। বার বার মাথা নেড়ে বলতে লাগল, একথা তাঁকে জানাতেই হবে। তিনি শুনতে না চাইলেও অকপটে অসঙ্কোচে মেলে ধরতে হবে তার গ্লানিময় রূপ, খুলে দিতে হবে জীবনের যেটা অন্ধকার কক্ষ, যার মধ্যে স্তূপাকার হয়ে আছে পাপ অপরাধ আর কলঙ্কের বোঝা।

গভীর ক্লান্তিতে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে এল। ধীরে ধীরে আবার শয্যাপ্রান্তে এলিয়ে পড়ল হেনা। পশ্চিম আকাশের কোন প্রান্ত থেকে এক টুকরা চাঁদ তার একটুখানি ক্ষীণ জ্যোৎস্না পাঠিয়ে দিয়েছিল খোলা জানালার পথে। সেই অপরিস্ফুট আলোয় চেয়ে দেখল আপনাকে। কেমন যেন মায়া হল নিজের উপর। বঞ্চিত জীবনের উপর এক রহস্যময় মমতা। মুহূর্ত পূর্বে যে কঠোর সংকল্প দিয়ে নিজের মনকে সে দৃঢ় বন্ধনে বেঁধেছিল, তার গ্রন্থি যেন শিথিল হয়ে এল। মনে হল, থাক না ঢাকা। জীবনের যে দিনগুলো চোখের আড়ালে পড়ে আছে, থাক না তার উপরে বিস্মৃতির আবরণ। কী কাজ তাকে খুলে দিয়ে? কুয়াশার স্নিগ্ধ মায়া যদি মোহ রচনা করে থাকে কারো মনে, সূর্যের রূঢ় আলোয় তার স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে কী লাভ? সে তো ইচ্ছা করে, ছল করে কাউকে ভোলায়নি? তবু যদি কেউ ভুলে থাকে, সে ভুল নাই বা ভাঙল? তার অনাগত জীবনের সম্পদ হয়ে থাক সেই ভুলের ফসল।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল, পুবদিকের জানালা দিয়ে খানিকটা রোদ এসে পড়েছে ঘরের মাঝখানে। ধড়মড় করে উঠে পড়তেই চোখে পড়ল পাশের খাটে বসে মোনার মা তার দিকে চেয়ে হাসছে। হাসতে হাসতে বলল, আজ তুমি হেরে গেছ, দিদিমণি! আমি তোমার আগে উঠেছি।

হেনা লজ্জিত হয়ে বলল, আমাকে ডাকনি কেন?

—আহা ; বড্ড ঘুমুচ্ছিলে, তাই আর ডাকাডাকি করলাম না। শরীর ভালো আছে তো ?

—হ্যাঁ গো ·হ্যাঁ। কথায় কথায় অমন শরীর খারাপ করে না আমার।

বিছানা থেকে নেমে চার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, সব তো বুঝলাম। আমাকেও ডাকনি, নিজেও বসে আছ গণেশ ঠাকুরের মত। এদিকে গোছগাছ সব পড়ে আছে। আজ আবার বাইরের হাসপাতালে যেতে হবে, মনে আছে তো ?

—আর পারি না মা ! এখানেই তো বেশ চিকিচ্ছে হচ্ছে। এতেই যা হয়, হবে। এই বুড়ো হাড়ে আর টানাটানি সয় না।

—সয় না বললে হবে কেন ?

—খুব হবে। তুমি ডাক্তার বাবুকে একটু বুঝিয়ে বল। তাহলেই শুনবেন। একটু থেমে উদাস সুরে বলল, তোমাদের দু'জনের হাতে যদি না সারে, এ রোগ স্বর্গে গিয়েও সারবে না।

তোমাদের দু'জনের হাতে ! হেনার বুকের মধ্যে একটা অত্যন্ত কোমল জায়গায় যেন হাত পড়ল। ব্যথায় টনটন করে উঠল সমস্ত বুকখানা। আর কোনো কথা না বলে কাপড়-জামা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কলতলার দিকে।

দৃশ্যত: সুস্থ হয়ে উঠলেও যক্ষ্মারোগীর সম্বন্ধে চিকিৎসকের ভাবনা সহজে ঘোচে না। উপসর্গ সব বন্ধ হয়ে গেছে। ওজন লাফিয়ে উঠছে ধাপে ধাপে। তবু ডাক্তারের হাত থেকে তার ছুটি নেই। তখনো মাঝে মাঝে গিয়ে দাঁড়াতে হবে রঞ্জনরশ্মির কবলে। আবার তোলা হবে আলোকচিত্র। সেই হাড়পাঁজরাগুলো আলোর সামনে তুলে ধরে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে দেখবেন বিশেষজ্ঞ কোথায়, কোন কোণে লুকিয়ে আছে সেই সর্বনাশা সূক্ষ্মদেহ যমদূতগুলো। আস্তে আস্তে তাঁর মুখের উপর ঘনিয়ে উঠবে গাম্ভীর্যের ছায়া। তীব্র উৎকণ্ঠায় অপেক্ষমান রোগীর আত্মীয়ের দিকে মুখ তুলে বলবেন,—'নাঃ, আর একটা কোর্স নিতে হবে।' তার পর প্যাড টেনে নিয়ে লিখবেন প্রেসক্রিপশন আর তার সঙ্গে আর এক দফা রাজসিক খাদ্যতালিকার পুনরুক্তি।

বুড়ীর এখন সেই পর্যায়। বিশেষজ্ঞের নির্দেশে অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে আজও তাই ছুটতে হল বাইরের হাসপাতালে। তাকে রওনা করে দিয়ে হেনার হাতে কোনো কাজ ছিল না। শরীর কাল থেকেই ক্লান্ত। তার উপরে মন ভরে আছে গভীর অবসাদে। চুপ করে পড়েছিল বিছানায়।

ডাক্তার দেখা ; ডাক্তার দেখা ; এবার হল তো ? বলতে বলতে ঘরে ঢুকল কমলা, ও মা, এমন অসময়ে শুয়ে !

হেনা একটু পাশের দিকে সরে গিয়ে বলল, কী করবো, কাজকর্ম নেই ; তাই শুয়ে পড়লাম। বোস্ না। কী বললেন ডাক্তার বাবু ?

কমলা তার কোলের কাছটিতে বসে পড়ে বলল, কী ভীষণ ভয় হয়েছিল, জানো দিদি ? কত কী হয়তো জিজ্ঞেস করবেন। কেমন করে কী উত্তর দেবো ! সে সব কিছু না। খালি বললেন, কী কষ্ট হয়, বলো। আমি বললাম, গাঁটগুলোয় ব্যথা। ব্যস্। তার পর হাতটা দেখলেন, চোখের কোণটা একটু টেনে দেখলেন। বললেন, এত দিন বল নি কেন ? রোগ কখনো পুষে রাখতে আছে ? সুশীলা মাসীমাকে বললেন, কম্পাউণ্ডার বাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। রক্ত নিতে হবে। যাবার সময় আর একবার ফিরলেন আমার দিকে, কিছু ভয় নেই ; গোটা কয়েক ইঞ্জেকশন দিলেই সেরে যাবে।··· এমন মিষ্টি করে বললেন কথাগুলো ! মনে হচ্ছে, অসুখ আমার আদ্ধেক ভালো হয়ে গেছে।

হেনা হঠাৎ প্রশ্ন করল, মাসীমা কি করছে রে ?

—কেন ?

—কাজ আছে।

—ওর কাছে এখন আবার কী কাজ ?

—বিকালের দিকে একবার আফিসে নিয়ে যেতে বলবো।

—আফিসে ! খিল-খিল করে হেসে উঠল কমলা ; চাকরি টাকরি পেলে নাকি কিছু ? সেই যে কী নাম বাবুটির ? ক'দিন সেজেগুজে ঘোরাঘুরি করলেন। তার দপ্তরে বুঝি ?

এবার হেনাও হেসে ফেলল। তার পর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, না, ঠাট্টা নয় ; জেলর সাহেবের কাছে যেতে হবে এক বার।

কমলা বিস্মিত হল, জেলর সাহেবের কাছে !

—হ্যাঁ। এবার বোধ হয় সত্যিই তোকে ছেড়ে চললাম, কমলা ! বলে ওর একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতের মধ্যে।

কমলা চমকে উঠল, ছেড়ে চললে ? কোথায় ?

—কোথায় আবার ? আর কোনো জেলে। অবিশ্যি ওঁরা যদি রাজী হন।

কমলা নিঃশ্বাস চেপে যেন আপন মনে বলল, বুঝেছি। আশ্চর্য ! ঐ মানুষের কাছ থেকেও পালাতে হয় ?

—না রে ; পালাচ্ছি নিজের কাছ থেকে। নিজের ওপরে আর বিশ্বাস রাখতে পারছি না।

কমলা ক্ষণকাল তার শুষ্ক গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, সেদিনও বলেছিলাম, আজও সেই কথাই বলবো। তুমি ভুল করছ দিদি !

—কী করবো, বল, অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল হেনা, বিধাতা ওঁকে অত বড় দুটো চোখ দিয়েও যখন দেননি, আমাকে তার সুযোগ নিতে বলিস !

—না। ওঁর চোখ ফোটাবার জন্যে নিজেকেই শুধু ছোট করে হেয় করে দাঁড় করাতে বলি তার সামনে !

—তোরই ভুল হল, কমলা। নিজেকে আমি ছোটও করিনি, হেয়ও করিনি, শুধু দেখাতে চেয়েছি নিজের যেটা সত্যিকারের রূপ।

—হ্যাঁ ; অত্যন্ত খাঁটি দোকানদার যেমন তার খদ্দেরকে সাবধান করে দেয়, জিনিষটা দেখে-শুনে নেবেন, স্যর। ঠকবেন না যেন।

কমলার এই শ্লেষ-তিক্ত স্বর এবার তীব্র হয়ে উঠল, এক বার ভেবে দেখেছ, এমনি করে কোথায় টেনে নামাচ্ছ নিজেকে, আর সেই সঙ্গে ঐ উদার সবল মানুষটাকে ; যার চোখের দিকে এক বার তাকালে নিজেকে শুধু নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

—ইচ্ছে করে তো তাই দে না ? কে মানা করছে ? মুখ টিপে হাসল হেনা।

—সে কথা তো আগেই বলেছি। আমি যদি তুমি হোতাম, তোমার কাছে পরামর্শ চাইতে যেতাম না। না, ঠাট্টার কথা নয়, দিদি ! তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়। বিদ্যায় বুদ্ধিতে মানে আরো অনেক বড়। তবু মুখ্যু ছোট বোনের একটা কথা হেসে উড়িয়ে

দিও না। এটা তোমার কেনা-বেচার হাট নয়। এখানে যে চোখ বুজে নিতে পারে, সেই পায়; আর যে হিসাবের খাতা খুলে বসে, সে ঠকে। কেন, নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারছ না? তুমি তো ওঁর কিছুই জানতে চাওনি, খুঁজতে চাওনি কোথায় লুকিয়ে আছে ওর ঠিকুজি-কুষ্টীর ফর্দ। চোখ বুজেই তো নিয়েছ। তাই সমস্ত বুক ভরে আছে। ওঁর বেলাতেও তাই···

বলি, খুব তো লেকচার ঝাড়া হচ্ছে, এদিকে যে কম্পাউণ্ডার বাবু সেই কখোন এসে বসে আছে সূঁচ হাতে করে, বলতে বলতে সুশীলা জমাদারণী একেবারে 'মার'-মূর্ত্তিতে দোরগোড়ায় এসে হানা দিল। কমলা দাঁতে জিভ কেটে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই যে, যাই মাসীমা! বলেই বেরিয়ে গেল।

কমলার এই শেষের কথাগুলোয় হেনার মনটা প্রথমে আবিষ্ট হয়ে এল। কিন্তু সে আবেশ কাটিয়ে উঠতেও বেশীক্ষণ লাগল না। কথার মোহ বড় মারাত্মক জিনিষ। মানুষের সঙ্গে এত বড় প্রতারণা বোধ হয় আর কেউ করে না। সত্যকে ভুলিয়ে দিতে, প্রকৃত বস্তুর উপর থেকে দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করতে তার জোড়া নেই। হয়তো এই সব বড় বড় কথার ফাঁদে পড়ে কমলাও আজ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। ভুলে গেছে, একদিন সে-ও পারেনি। ওর সেই প্রথম ঝি-এর পরামর্শ যদি সেদিন শুনত, সমরের কাছে লুকিয়ে রাখত জীবনের সেই চরমতম অভিশাপ, আজ তাহলে স্বামি-পুত্র নিয়ে পরম সুখে ঘর সংসার করত। আপনার কাছে যে পরিচয়ই থাক, লোকে বলত সতী-সাধ্বী স্বামি-সোহাগিনী। সভ্য সমাজের পুণ্যবতীরা ওর পতিভাগ্যকে ঈর্ষা করত। ভবিষ্যৎ জীবনের সে উজ্জ্বল আকর্ষণ তবু ওকে নীরব থাকতে দিল না। তার কারণটা হয়তো ভেবে দেখেনি কমলা। কিন্তু কারণ অতি সহজ—ওরা যে ভালবেসেছিল বড় বিচিত্র বস্তু এই ভালবাসা! সে অনেক দুঃখ সইতে পারে, অনেক আঘাত বইতে পারে। শুধু মিথ্যার সঙ্গে তার বিরোধ, প্রবঞ্চনার সঙ্গে তার আপোষ চলে না।

ফটকের কাছে দড়ি-বাঁধা ঘণ্টাটা জোরে জোরে বাজতে লাগল। নিশ্চয়ই হোমরা-চোমরা কেউ। হয় জেলর, কিংবা কোনো ভিজিটর, নয়তো স্বয়ং বড় সাহেব। কিন্তু আজ তো বড় সাহেবের ফাইল নয়। অদিনে অক্ষণে ফিমেল ওয়ার্ডে সুপারের আবির্ভাব বড় রকম অঘটন না হলে ঘটে না। হঠাৎ জমাদারণীর সুতীক্ষ্ণ হুঙ্কারে সমস্ত ওয়ার্ড কেঁপে উঠল—এস্কাট্ আটেন্‌শন্। সুশীলার সেই পেটেন্ট মিলিটারী কমাণ্ড। এই কমাণ্ড দিতে গিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে জমাদারণী তিনটা স্বরগ্রাম ব্যবহার করে থাকে। জেলর সাহেব এলে উদারা, কোনো ভিজিটর যখন আসেন, মুদারা, আর বড় সাহেবের বেলায় তারা। হেনার সন্দেহ হল, এটা সেই সর্ব্বোচ্চ পরদা। ওয়ার্ডে, ওয়ার্কশপে বা কাছে-ধারে কোথাও থাকলে এখন তাকে অন্য সকলের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করতে হত। আবার বসে পড়তে হত, সুশীলা যখন হাঁক দিত, আজ্ঞবর। প্রথম জেলে আসবার পর জমাদার এবং জমাদারণীর মুখে এই বিচিত্র বুলি প্রত্যেক দিন শুনেও হেনা ধরতে পারেনি কথাগুলো কী এবং ভাষাটা কোন্ দেশের। তার পর একবার পিকেটিং না প্রসেশন, কী একটা ব্যাপারে জন কতক স্বদেশী মেয়ের জেল হয়ে গেল। তাদেরই একজন ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, কথাটা হচ্ছে, স্কোয়াড্ অ্যাটেন্‌শান্ (Squad, Attention!) আরও বলেছিল, এটা নাকি হালে আমদানী। আগেকার দিনের বুলি ছিল—সরকার, সেলাম! ঐ মেয়েটির কাছেই প্রথম শুনতে পায় হেনা, 'বন্দে মাতরম্'-এর মত এই কুখ্যাত শব্দের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে বহু দিনের বহু লাঞ্ছনার নির্লজ্জ ইতিহাস। সে এক দিন গেছে, যখন এই 'সরকার সেলাম' আদায় করতে গিয়ে সরকারের কত বেটন দু' খণ্ড হয়ে গেছে, কত লাঠির সঙ্গে উঠে এসেছে তাজা মাংস, বুটের ঠোক্কর খেয়ে ভেঙ্গেছে কত পাঁজরার হাড়। তবু বেয়াড়া 'স্বদেশী'কে শায়েস্তা করা যায় নি। তার পর হঠাৎ এক দিন সরকার হাল ছেড়ে দিলেন এবং রাতারাতি 'সরকার সেলাম'এর জায়গায় দেখা দিল এই স্কোয়াড্ অ্যাটেন্‌শন্। সব দিক রক্ষা হল। শুধু মুস্কিলে পড়ল, জেলের যত জমাদার আর জমাদারণীর দল। কটমট বিদেশী ভাষার ঐ বিদ্‌ঘুটে কথাগুলো নানা মুখে নানা বিচিত্র আকার নিয়ে কয়েদীদের কৌতুক যোগাতে লাগল।

হেনার কানে গেল, অনেকগুলো জুতোর শব্দ নেবু গাছের ঝোপ পার হয়ে তার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই সুপার সাহেব সদলবলে সামনে এসে পড়লেন। তাকে দেখিয়ে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, এটি কে? কী করছে এখানে?

জেলর সাহেব বললেন, ওই এখানকার টি-বি কেসটা দেখাশুনা করে।

—I see; পা ফাঁক করে, মধ্যাঙ্গ সামনের দিকে বাড়িয়ে ছোট্ট সরু লাঠিখানা জুতোর উপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন সুপার। বাই দ বাই, That old woman is not coming back. সিভিল সার্জেনকে বলে আমি ওখানেই ওর একটা বেড-এর ব্যবস্থা করেছি। Let this Hospital be closed down. এখানে কাউকে রাখবার দরকার নেই। জেলরের দিকে ফিরে ইঙ্গিতে হেনাকে উদ্দেশ করে বললেন, Give her some hard work to do.

দলবল নিয়ে ফিরে চললেন বড় সাহেব। যাবার পথে নেব গাছগুলোর দিকে লাঠি উঁচিয়ে বললেন, Looks more like a bower than a lime orchard. এ-সব কুঞ্জ-টুঞ্জ এখানে না থাকাই ভালো। বলে বাঁকা দৃষ্টিতে একবার তাকালেন দেবতোষের মুখের দিকে।

দু-এক জায়গায় রাউণ্ড সেরে আপিসে যাবার পর এই প্রসঙ্গেই আবার ফিরে এলেন সুপার সাহেব। বললেন, লুক হিয়ার, জেলর, ফিমেল ওয়ার্ড সম্বন্ধে আমাদের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। ওখানে যারা থাকে তারা কেউ সতী-সাধ্বী নয়। সেইজন্যে ওদের দৈহিক স্বাস্থ্যের চাইতে নৈতিক স্বাস্থ্যটাই বেশী লক্ষ্য করা দরকার। ওরা নিজেরা ভালো হোক না হোক বয়ে গেল, কিন্তু আমাদের যে-সব ষ্টাফ ওদের সংস্রবে আসে, তারা না বিগড়ে যায়, সেদিকে কড়া নজর দিতে হবে, আপনার কী মনে হয়?

তালুকদার অস্পষ্ট ভাবে মাথা নাড়লেন। কিন্তু তার পরেও মনিবকে উত্তরের অপেক্ষা করতে দেখে বললেন, নজর সব দিকেই রাখতে হয়। ওদের ভালো-মন্দটাও বাদ দেওয়া চলে না।

—You are right তবে আমার ষ্টাফের স্বার্থটাই আমি বেশী দেখি। আমার মনে হয়, সম্প্রতি সে বিষয়ে চিন্তিত হবার

কারণ ঘটেছে। Don't you think so? তালুকদার বললেন, আমি তো সে রকম কিছু জানি না। সুপার বিস্ময় প্রকাশ করলেন, বলেন কি! কাষ্ট এস, এ, এস, আর ঐ মেয়েটাকে জড়িয়ে কোনো কথাই কি আপনার কানে আসেনি?

—তা কিছু কিছু এসেছে। ঐ সব ব্যাপার নিয়ে যারা মাথা ঘামায়, কান ভারী করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। দেখতে পাচ্ছি, সেদিকে তাদের ত্রুটি হয়নি।

—Oh, no, no, আপনি ভুল করছেন। বিশেষ ভাবে কারো কাছ থেকে আমি কিছু শুনিনি। তবে ওদের মধ্যে যে বেশ খানিকটা undesirable ঘনিষ্ঠতা দেখা দিয়েছে, যাকে বলে romantic relations সে কথা বোধ হয় মিথ্যা নয়। The Doctor must be a fool. ও হয়তো ঐ মেয়েটাকে একটা হিরোয়িন টিরোয়িন ঠাউরে বসে আছে। I admit she has charms and she appears to be respectable; but after all she is a criminal!

জেলর সাহেব আর কোনো উত্তর করলেন না। মনে পড়ল, উদারপন্থী এবং অতি আধুনিক বলে তাঁর এই মনিবটির প্রসিদ্ধি আছে। সামাজিক জীবনে বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের স্বাধীন মেলামেশার তিনি পক্ষপাতী, এবং সে বিষয়ে জাতি, বর্ণ বা অন্য সব কৃত্রিম বাধা স্বীকার করেন না। তাঁর নিজের মেয়ে সম্বন্ধেও নানা রকম অপ্রীতিকর জনশ্রুতি আছে। তিনি সে সব গ্রাহ্য করেন না, বরং মেয়ে এবং তার পুরুষ-বন্ধুদের খানিকটা প্রশ্রয়ই দিয়ে থাকেন। এ-হেন ব্যক্তিও যে আজকার এই ব্যাপারে বিচলিত হয়ে উঠেছেন সেটা হঠাৎ বিসদৃশ মনে হলেও কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। তার কারণ, After all she is a criminal.

এই পাঁচিলঘেরা জায়গাটুকু দুনিয়া থেকে শুধু বিচ্ছিন্ন নয়, সর্বপ্রকারে বিভিন্ন। এখানকার যারা বাসিন্দা, তাদের সঙ্গে বাইরের মানুষের মিল শুধু আকৃতির, শুধু দেহের কাঠামোয়। তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় কোন ইস্কুলপাঠ্য কেতাবে একদিন মুখস্থ করেছিলেন ইংরেজ কবির লেখা কটা লাইন Stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage... যিনি উচ্ছ্বাস ভরে এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, তিনি কোনোদিন জেল-ফেরৎ কয়েদীর সাক্ষাৎ পাননি। যদি পেতেন, তাহলে বুঝতেন, অত বড় মিথ্যা কথা আর নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের দুর্লঙ্ঘ্য প্রভেদ যদি কেউ ঘটাতে পারে, সে হচ্ছে ঐ stone walls আর Iron bars এ দুটো বস্তু ভেদ করবার মত দৃষ্টি আজ পর্যন্ত কারোর চোখে দেখা দেয়নি, হয়তো কোনো কালেই দেবে না।

জেলরকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বড়-সাহেব মনে মনে আশ্বস্ত হলেন। অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, আপনি ভেবে দেখুন, এসব scandal আমাদের বন্ধ করতেই হবে। আপাততঃ ওখানকার হাসপাতালটা বন্ধ করে দেওয়া গেল। যদি আরো কিছু, এমন কি drastic কিছু করবার দরকার হয়, তাও করতে হবে। আচ্ছা ঐ ঘোষটাকে—

টেবিলের উপর টেলিফোন বেজে উঠল। সাহেব রিসিভার তুলে নিলেন। সেই সুযোগে জেলরও বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে।

নিজের ঘরে এসে দেখলেন, বিশাল টেবিল জুড়ে জমে উঠেছে খাতা-পত্তরের পাহাড়। পাশের একটা চেয়ারে বসে আছেন দেবতোষ। অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন না হলে এ সময়ে ডাক্তারের আসবার কথা নয়। তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে এক বার মাত্র দৃষ্টিপাত করে বললেন তালুকদার, কী হে, তোমার আবার কি দরকার পড়ল? সেই কলেরা রুগীটা বুঝি পটল তুলবার আয়োজন করছে; সদর হাসপাতালে পাঠাতে চাও? হবে না, গার্ড একেবারে নেই, মরতে হয় তো তোমার হাতেই মরুক।

—না, না। পটল তুলবে কোন দুঃখে? সে তো দিব্যি চাঙ্গা হয়ে উঠছে।

—তবে কী? আবার একটা কুষ্ঠ কিংবা চিকেন পক্‌স্‌ জুটিয়েছ? ওসব তোমার ঐ হাসপাতালের এক কোণে রেখে দাও। cell দিতে পারবো না। সব পাগোলভর্তি।

—এসব ব্যাপার নিয়ে আসিনি, দাদা! এসেছি নিজের কাজে। বলে, একখানা টাইপ-করা কাগজ এগিয়ে দিলেন ডাক্তার। তালুকদার হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিয়ে বললেন, কী এটা?

—পড়লেই বুঝতে পারবেন।

খানিকটা চোখ বুলিয়ে নিয়ে ম্লান হেসে বললেন জেলর সাহেব, বুঝেছি। কলেরা নয়, কুষ্ঠও নয়। তার চেয়েও মারাত্মক কিছু।

ডাক্তার কোনো জবাব দিলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এবার আমি চলি। আপনার মক্কেলরা সব সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আমারও অনেক কাজ বাকী।

জেলর সাহেব হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। ডাক্তার চলতে শুরু করতেই প্রশ্ন করলেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। তোমার এই ছুটির দরখাস্তের সঙ্গে কি আজকের ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক আছে?

—না, দাদা! ছুটির কথা ক'দিন থেকেই ভাবছিলাম। কাল রাত্তিরে মন স্থির করে ফেললাম। আজ সকাল থেকেই ওটা পকেটে করে ঘুরছি।

একটু দাঁড়িয়ে চেয়ারের পিঠের উপর হাত রেখে বললেন, অ্যাপ্লিকেশন তো দিলাম। এখন কত দিন ঝুলিয়ে রাখবেন, কে জানে? এটা পাঠানো হবে, মঞ্জুর হবে, লোক পাওয়া যাবে কি না, পেলেও সে কবে আসবে—অন্ততঃ মাসখানেকের ধাক্কা। তবে আপনি যদি একবার কর্তাকে বুঝিয়ে বলেন, অর্ডারের অপেক্ষা না করেই হয়তো ছেড়ে দিতে পারেন। ডাক্তার সেন তো রইলেন। দরকার হলে 'পুলিশ হাসপাতালের মল্লিক এসে ক'দিন ঠ্যাকা দিয়ে যেতে রাজী আছে। এক বার বলে দেখুন না?

তালুকদার খানিকক্ষণ ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমাকে আমরা কয়েক দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবো।

ডাক্তার ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশবুকের বোঝা নিয়ে ব্যস্ত ভাবে ঢুকে পড়লেন হেড ক্লার্ক।

[ক্রমশঃ।

তীর্থ সেরে আবার পরিচিত পরিবেশে ফিরে আসবার পর তীর্থাচরণগুলোর কথা স্মরণ করলে কেমন যেন বিস্ময় লাগে। হাসি পায়, বিশ্বাস করতেও সঙ্কোচ হয়, কবুল করা তো দূরের কথা। সত্যি কি অমন অকারণে ভাববিভোর হয়েছিলাম?—অমন নির্বোধের মতো কি সত্যি অবিশ্বসিত ঈশ্বরের কাছে পূজা নিবেদন করেছিলাম? অশিক্ষিত অমার্জিত এক পাণ্ডাই বা কেমন করে অত সহজে অতগুলো টাকা ঠকিয়ে নিতে পারল? ঐ সব যুক্তিহীন অবাস্তব কিম্বদন্তীগুলোই বা বিনা প্রতিবাদে ধৈর্য্য ধরে শুনে কি করে? তীর্থে তো এই আমিই গিয়েছিলাম, কিন্তু সেই আমি কি এই আমিই?

যাত্রীরা কিন্তু বিশ্বাস করে যে তীর্থে গেলে যাত্রীর জন্মান্তর হয়। আজকের এই বস্তুবাদী যুগে জন্মান্তর শব্দটায় চট করে বিশ্বাস করা সহজ নয়, কিন্তু তীর্থে গেলে সংশয়প্রবণ সংস্কারমুক্ত যাত্রীর মধ্যেও যে একটা ভাবান্তর আসে তা অনস্বীকার্য। আর মৌলিক অবস্থার সঙ্গে এই ভাবান্তরের প্রকৃতিগত প্রভেদ অকস্মাৎ এমনই প্রবলরূপে প্রকট হয়ে ওঠে যে, আলঙ্কারিক অর্থে অন্তত জন্মান্তর শব্দটা ব্যবহার করলে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। এ যেন পরিচিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগৎ ছেড়ে অপর এক চেতনা-সর্বস্ব সত্তাগ্রাহ্য অন্তর্জগতে প্রবেশ করা। পূর্বের যুক্তি এখানে অযৌক্তিক, পূর্বের সংশয় হাস্যকর, পূর্বের বিশ্বাস ছেলেখেলা। এখানে সর্বদা দু'য়ে দু'য়ে চার হয় না। ধোঁয়া দেখেই পর্বত বহ্নিমান অনুমান করলে অনেক সময় ভুল হয়। অথচ এই জগতেরও নিজস্ব যুক্তি আছে, বিশ্বাস তো আছেই আর তাছাড়া আছে যোগ-বিয়োগ ন্যায়-অন্যায় সব কিছু। এই জগতের পরিপ্রেক্ষিতে যে এই সব কিছুই আবার সমান যুক্তিসঙ্গত, অপর জগৎ থেকে ক্ষণকালের জন্য নিছক ভ্রমণ-মানসে এসেও তা অস্বীকার করা অসম্ভব।

এখন এই দুই জগতের মধ্যে কোন্‌টা অধিকতর সত্য এবং কোন্‌টা অপেক্ষাকৃত মিথ্যা, তা নিয়ে দলীয় দার্শনিকদের কখনো যুক্তি-প্রতিযুক্তির অভাব হয় নি। বিপদ শুধু আমাদের মতো অদার্শনিক ইতরজনদের—কেবল তর্কে যাদের জিজ্ঞাসা মেটে না—যারা জীবনটুকু কাটাবার জন্যে একটা সাদামিঠা সহজ জবাব চায়। দেহ আমাদের একটিই, সামাজিক চৌহদ্দিতে জীবন সেও একবচন, মনও সর্বত্রগামী নয়,—একোদর পৃথক-গ্রীবা হয়ে যুগপৎ দুই জীবনেরই স্বাদ গ্রহণ করবার ক্ষমতাও আমাদের নেই। বিপদ হয় যখন এই আমাদেরই একজন ইন্দ্রিয়সর্বস্ব বাহ্য-জগতে লালিত-পালিত বর্ধিত হয়ে, এই পরিচিত জগৎটিকেই একমাত্র জগৎ বলে বিশ্বাস করবার পরমুহূর্তের অনবধানে অকস্মাৎ অপর অন্তর্জগতের অস্তিত্ব অনুভব করে, তার কেবল বিপরীত নয় বিরোধী যুক্তি, বিশ্বাস, ন্যায় ইত্যাদিকে আর কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না তখন। একক জীবনটাই যেন তখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একার্দ্ধ অপরার্দ্ধের সঙ্গে মরণ-সংগ্রামে লিপ্ত হয়। চেতনসত্তা অপেক্ষা ইন্দ্রিয় আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত, অতএব যতক্ষণ সজ্ঞান থাকি, ততক্ষণ আমরা ইন্দ্রিয়পক্ষই সমর্থন করি। কিন্তু সর্বক্ষণ সজ্ঞান থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয় একটু ক্লান্ত হলেই চেতনসত্তা তখন তার অধিকার বিস্তার করতে থাকে—মুহূর্তমধ্যে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলে। এই আত্মকলহে নিরপেক্ষতার অবকাশ নেই এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে একবার মুহূর্তের জন্য পক্ষ-নির্বাচনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেই অচিরকালের মধ্যে এই কলহের প্রতিক্রিয়া নিগৃহীতের বাহজীবনে পরিস্ফুট হতে সুরু করে, ব্যক্তির জীবন তখন একটা বিলম্বিত যন্ত্রণা; অজস্র কোষের সমন্বয় নয় সংগ্রাম-ক্ষেত্র। তখন কখনো মনে হয়, পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো? নচেৎ এই আবছায়া কতকগুলো ধারণাকে এমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি যেন? আবার কখনো ঘৃণা হয় যে ইন্দ্রিয় কি চিরকালই এমন মাঝে মাঝে অধঃপতনে টেনে নেবে?—নিজের উপর কি কখনোই একটু অধিকার জন্মাবে না? জীবনের তখন কোন দিশা নেই, গতি নেই, সিদ্ধান্ত নেই, উদ্দেশ্য নেই,—একটা অচলায়তন মৃত কাঠের গুঁড়ি নদীর পাকে পাকে ভেসে চলেছে, কখনো মন্দিরের ঘাটে ঠেকে, কখনো শ্মশানের ঘাটে।

আমি চতুরতর যাত্রী, অনেক বড়ো শঠ। উপরোক্ত গতিপথের শেষ প্রান্তে পৌঁছবার অনেক আগেই আমি অনেক মিছা কথা বলে অনেক অছিলা করে আবার নিজেকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি পরিচিত পুরানো জগতে। এই প্রত্যাবর্তন হয়তো চিরস্থায়ী হবে না কিন্তু ইতিমধ্যে দুই জগতের অভিজ্ঞতার বাহাদুরী দেখিয়ে কিছু বাহবা লোটা যায়।

আমি হয়তো নিজেকে যতটা মনে করি আসলে ততটা চতুর নই। সেই ভাবান্তরিত জগতের ন্যায় ও যুক্তির ধারা এই জগতের পাঠকের কাছে বিবৃত করার পিছনে আমার বাহবা লোটার অভিসন্ধিটা হয়তো একান্তই আপাত। সেই জগতের কথা আমি ভুলতে পারিনি, ভুলতে পারবো না। সেই জগতের যুক্তি আমি পুরোপুরি বুঝতে পারি নি হয়তো বুঝতে পারবোও না। আমার সত্তা তবু একবার তার উৎসের সন্ধান পেয়েছে এবং ক্রমাগতই সেই দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। সেই ভাবান্তরের কথা বার বার নিজের কাছে বলে, লিখে বার বার চোখের সামনে ধরে নিজেরই অজ্ঞাতসারে আমি হয়তো যাচাই করে দেখছি সেই ভাবান্তরিত অস্তিত্বের ভিত্তি;—সেই ভিত্তি সত্য কি কাল্পনিক, পরিহারযোগ্য কি অপরিহার্য, ত্যাজ্য কিম্বা কাম্য। চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের পূর্বে এ হয়তো একটু আত্ম-সান্ত্বনা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মতো ইন্দ্রিয়াতীত জগতের কার্য-কারণ সূত্রেও অনেক জটিল জট। অপরিচয়ের দরুণ এই জট মুক্ত করা অধিকতর দুঃসাধ্য।

প্রসঙ্গ-কথায় আমরা অনেক দূর বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছি। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল ঐ যাত্রীরা যাকে বলে জন্মান্তর,—নামান্তরে যাকে ভাবান্তর বলে আমরা রফা করেছি। এই ভাবান্তরের প্রকৃতিটা এইবার বোঝা দরকার। কিন্তু এইটে বোঝানো বড় শক্ত। কেন না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিগুলো প্রকাশ করবার জন্যেই যে ভাষার সৃষ্টি

সে ভাষায় অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও যুক্তির কথা ব্যক্ত করা সহজ নয়। তবু পাঠকের সহানুভূতির উপর নির্ভর করে দু'টো-চারটে উদাহরণে এই ভাবান্তরিত অবস্থার পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যায়।

কামাখ্যাবাসের দ্বিতীয় দিন দু' টাকার একটা লালচে নোট হাতে ডালির দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। দু' টাকার ডালিতে পুজো দেব, দোকানদারকে দু' টাকার ডালি দেবার কথা বলে অপেক্ষা করছি। অন্ত দু'-চার জন খরিদ্দার বিদায়ের পর আমার পালা আসবে। হঠাৎ সন্দেহ হল, হাতের নোটটা দু' টাকারই তো? এক টাকার নোট বা এমনি এক টুকরো কাগজ নয়! নোটের লালচে রঙটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম,—কিন্তু নিজের চোখকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দু'টাকার ডালি নিয়ে এই নোটটা এগিয়ে ধরলে দোকানদার যদি হেসে ওঠে হঠাৎ? হাসিটার রেশ যেন ইতিমধ্যেই বুকের ভিতরে দুর-দুর করে কাঁপছিল। ভয়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল, গলা শুকিয়ে কাঠ। এমন সময় আমার পালা আসতে নিজেকে ভ্রূকুটি করে বললাম, দূর আজগুবি এ-সব কি ভেবে মরছি! তারপরে সেই নোট দিয়ে দু'টাকার ডালি নিয়ে মন্দিরের দিকে চলে এলাম।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে পারলাম না। ওই অহেতুক ভয়টার কথা ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। খুব সবলচিত্ত বলতে যা বোঝায় তা আমি কোন দিনই নই, কিন্তু চোখের সামনে জলজ্যান্ত কোন একটা বিষয় সম্পর্কে এর আগে কখনো তো এমন সংশয়কাতর হইনি! এর পর মন্দিরে যাবার পথে আস্তে আস্তে নতুন জগতের নতুন যুক্তিধারা আমার দৃষ্টিগোচর হল। স্পষ্ট যেন বুঝতে পারলাম যে, ভয়টা আসলে অমূলক বা অহেতুক ছিল না। এর আগে কখনই পয়সা দিয়ে কোন প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনেছি তখনই সেই পয়সার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লোভ যুক্ত হয়ে পয়সা পূর্ণমূল্য পেয়েছে। বয়স্যাকে কফিতে আপ্যায়িত করে যখন তার দাম দিয়েছি তখনও সেই দামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাম। কিন্তু আজকের এই ডালির দু'টাকার সঙ্গে তো আমার শ্রদ্ধা যুক্ত হয়নি, বিশ্বাসও অভ্যস্ত সংশয়ের তলায় তলিয়ে গেছে। অতএব আজকের এই দু'টাকাকে যদি এক টাকা বলে প্রতীতি হয়ে থাকে, এমনি এক টুকরো কাগজ বলে আশঙ্কা হয়ে থাকে, তার প্রতীতি সেই আশঙ্কা তো অহেতুক নয়, অমূলকও নয়। আর এই যুক্তিকেই সেদিন আমার খুব যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়েছিল।

অভ্যস্ত পরিচিত জগতের সীমা ছাড়িয়ে চেতনাময় অন্তর্জগতে পদার্পণ করলে এমনি মানসিক বিপর্যয় ঘটে এবং এই বিপর্যয় কেবল মানসিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, চিরাচরিত ঐহিক অভ্যাসগুলোও নিমেষমধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। যেমন, আমার চিরকালের নাগরিক অভ্যাস হচ্ছে বেলা আটটায় নিদ্রাভঙ্গ; তার পরে পর পর দু' পেয়ালা চা পানের পর সাড়ে আটটায় শয্যাত্যাগ। অথচ কামাখ্যায় আসবার প্রথম দিন যদিও ঘুমোতে ঘুমোতে রাত্রি প্রায় আড়াইটে বেজে গিয়েছিল, তবুও দ্বিতীয় দিন আমার ঘুম ভাঙলো প্রত্যূষে ঠিক চারটেয়। মাত্র দেড় ঘণ্টার বিশ্রাম, তবুও দেহ সম্পূর্ণ ক্লান্তিহীন, মন অবসাদমুক্ত। তার পরেও নিদ্রাভঙ্গে প্রথমেই চায়ের কথা মনে পড়ল না, মনে হোল আজ পুজো দিতে হবে, স্নান করা প্রয়োজন। এমন ব্যতিক্রম অথচ বিনা বিস্ময়ে সব করে গেলাম, যেন এই করেই অভ্যস্ত।

তা ছাড়া কেবলই কি দৈহিক এবং মানসিক বিপর্যয়?—এত কালের যে শিক্ষা-সংস্কার, রীতি-নীতি সে-সবই বা চোখের নিমেষে কোথায় ভেসে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায়? নগরের রাস্তায় যেই আমি নিজেকে জগতের কেন্দ্র অনুমান করে ভুলেও কখনো গ্রীবা সোজা করি না—সহজ ওষ্ঠে সিগারেট ধারণ করি না—সেই আমিই কি না চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে অবিশ্বসিত ঈশ্বরের কাছে নির্বোধ মূঢ় গ্রাম্য পুণ্যকামীর মতো এক কোঁটা কর্দমাক্ত দূষিত জল কপালে ঠেকিয়ে ডালি হাতে পংক্তি বেঁধে পুজো দিতে গেলাম?

কামাখ্যা-মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগটা অত্যন্ত অন্ধকার। মন্দিরে প্রবেশ করে সোজা দু'পা গিয়েই বাঁ দিকের অন্ধকারে সিঁড়ি নেমে গেছে। এ-কোণ ও-কোণে দেয়ালের গর্তে দু'টো-একটা প্রদীপ স্থিরভাবে জ্বলছে। কিন্তু সে-আলোয় মন্দিরের আকৃতি তো দূরের কথা পার্শ্ববর্তী যাত্রীর মুখও দেখা যায় না। সমাচ্ছন্ন অন্ধকারে ডালি হাতে নিম্নগামী সিঁড়ির ধাপে পংক্তি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছি,—পালা আসলে পুজো দেব। অন্ধকারটার বিস্তার যে কতদূর পর্যন্ত তা বুঝবার উপায় নেই। যাত্রীদের উষ্ণশ্বাসে সে যেন সজীব হয়ে উঠেছে। বার বার এ-পাশ ও-পাশ ফিরছে মাথা কুটছে যেন নিজের অন্ধকার থেকে মুক্তি চায়! দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে আস্তে আস্তে অপ্রতিরোধ্যরূপে ঐ অন্ধকারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছি। এত কাল ধরে অন্তিম সুখের মুহূর্তে সেই অনির্দেশ্য শক্তি প্রতিবার বাদ সেধেছে, জয়ের পুরস্কার হিসাবে দিয়েছে পরাভয়ের গ্লানি, সাফল্যের পর এনেছে ব্যর্থতার অবসাদ—সেই শক্তিই যেন কামাখ্যা-মন্দিরের অন্ধকারের রূপ পরিগ্রহ করে আজ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে. আলিঙ্গন করতে উদ্যত হয়েছে। অনেক কাল পরে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবোধ্য বিষয় যেন প্রায় বুঝতে পারছিলাম; এত কাল যা বুঝে এসেছি তার সব যেন নিঃশেষে তলিয়ে যাচ্ছিল।

নিজের উপর আর নির্ভর ছিল না। অচঞ্চল সজীব অন্ধকারের হাতে আত্মসমর্পণ করে ধীরে ধীরে নীচে নেমে যাচ্ছিলাম। যেন চেতনা থেকে অবচেতনের স্তরে, সান্ত থেকে অনন্তে, প্রবাহ থেকে সাগরে। খানিকটা নেমেই স্বল্প-পরিসর একটু জায়গা। একটা ঘৃত-প্রদীপ জ্বলছে, পূজারীরা বসে আছে, যাত্রীরা একের পর এক পুজো নিবেদন করে নির্গমনের অন্ধকার পথে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে। পুজো গ্রহণের জন্য কোন বিগ্রহ নেই, শুধু সিন্দুর-চর্চিত দুটি টোপরাকৃতি ধাতব আবরণ শক্তির প্রতিভূ স্বরূপ দাঁড় করান। সতীর দেহের যোনিদেশ পড়েছিল বলে কামাখ্যাপীঠের যুগজয়ী খ্যাতি। পুজো নিবেদনের পর পাণ্ডা যখন সেই আবরণের দেহ থেকে সিন্দুর নিয়ে কপালে টিপ পরিয়ে দিল তখন মুহূর্তের জন্য একবার দুর্জয় বাসনা হল আবরণ সরিয়ে অভ্যন্তরের সত্তা প্রত্যক্ষ করবার। কিন্তু সেইটে নিয়ম-বিরুদ্ধ। তাছাড়া হয়তো শ্বাসরুদ্ধকারী অন্ধকারের দরুণ, হয়তো অন্য কোন কারণে ঐ ধৃষ্ট অনুসন্ধিৎসা মনে জাগবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত দেহ-মন যেন কেমন অবশ হয়ে এল। অকস্মাৎ যেন একটা দুর্দমনীয় আভ্যন্তরীণ আকর্ষণে সাধের বাহ্যিক বন্ধনগুলো শিথিল হয়ে এল। হঠাৎ

মনে হল, একটা অতল গভীর কূপের অন্ধকারে অপ্রতিরোধ্যরূপে তলিয়ে যাচ্ছি। পূজা সাঙ্গ হলেও সেই ধাতব আবরণ দু'টির দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রদীপের আলোয় আবরণ দু'টি চকচক করছিল। একটু দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই অকস্মাৎ আবার মনে হল, আবরণ দু'টি বুঝি স্বতঃই উন্মোচিত হয়ে যাবে।

হয়তো হ'ত, হয়তো হ'ত না। কিন্তু আর অপেক্ষা করতে না দিয়ে পাণ্ডা আমাকে হাতে ধরে টেনে মন্দির-প্রকোষ্ঠ থেকে বের করে আনল তাড়াতাড়ি। বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল যে আমার 'ঘোর' লেগেছে কি না, আমি প্রশ্নটাকে এড়িয়ে নির্বোধের মতো একবার হাসলাম, যার মানে হাঁ-ও হতে পারে না-ও হতে পারে। আমার ধারণা, আমি সে দিন সত্য জবাবই দিয়েছিলাম।
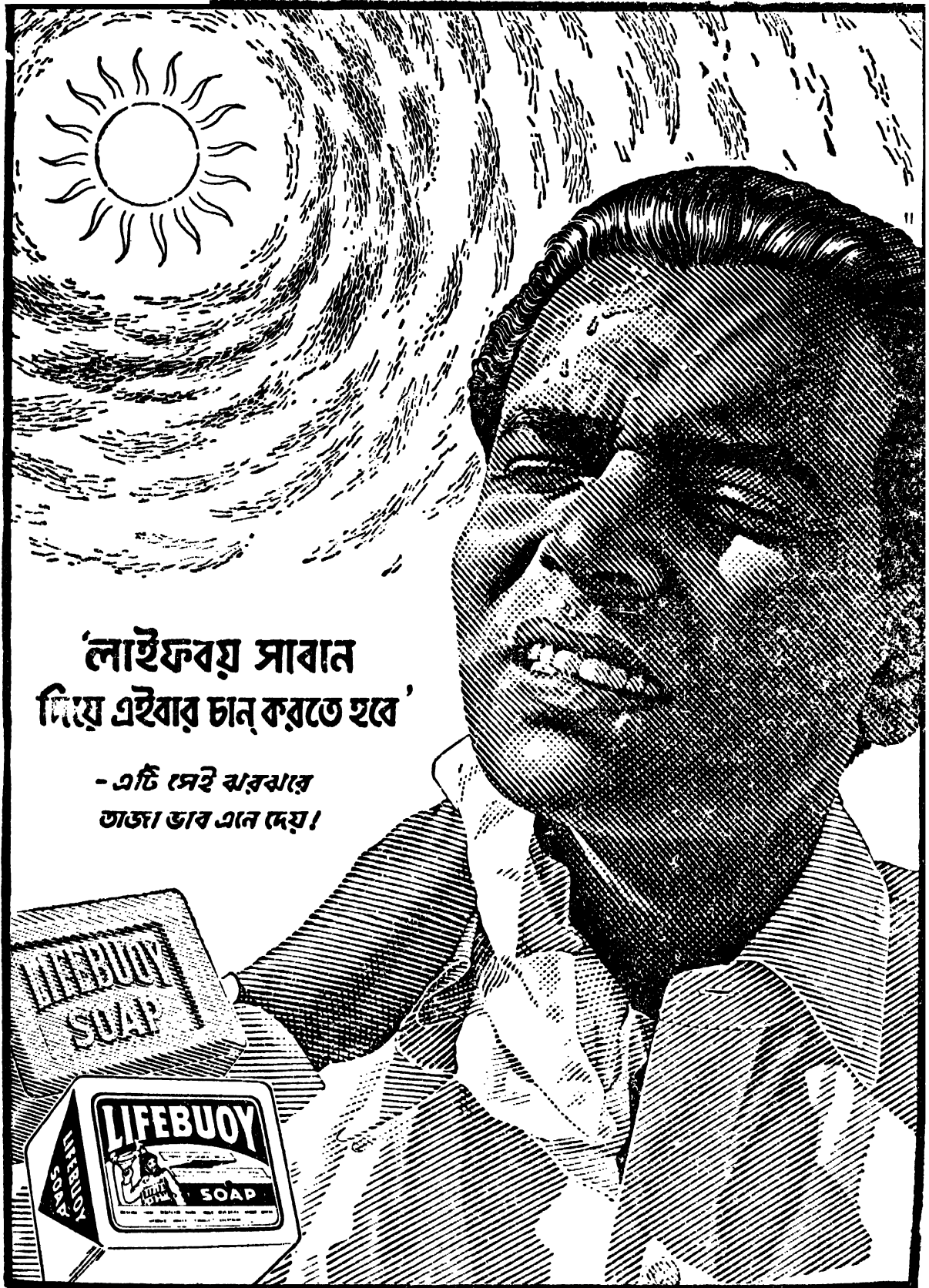
ভাবান্তরিত অবস্থায় নিজের মধ্যে, নিজের সত্তায় নিজেকে হারিয়ে ফেলবার এই শেষোক্ত লক্ষণটি কিন্তু একমাত্র কামাখ্যারই বৈশিষ্ট্য। ভারত-তীর্থের খুব সামান্য অংশই আমার পরিক্রমণের সুযোগ হয়েছে কিন্তু এর আগে কখনই কোথায়ও গিয়ে তীর্থ-চেতনায় পরিপ্লুত হয়েছি তখনই অনুভব করেছি, যেন ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতার কূল ছাপিয়ে এই ব্যক্তি-মণ্ডূক আমিই অসীম ভূমায় পরিব্যাপ্ত। পুরীতে কাশীতে হরিদ্বারে তুঙ্গনাথে সর্বত্রই এক দীক্ষা পেয়েছি যে, নিজের থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে না দিলে, বা বিকল্পে এই যে ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক আমি—এই আমির মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত মুক্তি নেই, শান্তি নেই। কিন্তু কামাখ্যার কথা এর ব্যতিক্রম, কামাখ্যার অভিজ্ঞতা ভিন্নতর, প্রায় বিপরীত। ভক্তকে কামাখ্যা বহির্জগতের ভূমায় ছড়িয়ে দেয় না, অন্তর্জগতের গভীরতায় নিরুদ্ধ করে। ব্যক্তির ব্যভিচারী ইন্দ্রিয় বা রিপুর সঙ্গে কামাখ্যার কোন বিরোধ নেই। কামাখ্যার বিচারে ব্যক্তি-চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য ইন্দ্রিয় এবং রিপুই মুক্তির সোপানস্বরূপ। ব্যক্তির সামাজিক সত্তা, সাংস্কৃতিক সত্তা, ভৌগোলিক সত্তা, ঐতিহাসিক সত্তা, এমন কি ধার্মিক সত্তারও অন্তরালে যে নিগূঢ় সত্তা—ইন্দ্রিয়ও রিপু উপেক্ষা বা উচ্ছেদ করে নয়, সে সব অতিক্রম করে সেই সত্তার আস্বাদ গ্রহণেই ব্যক্তির মুক্তি, সেই সত্তায় নিমজ্জিত ব্যক্তির সিদ্ধি।

প্রাচীনতম কাল থেকে ভারতবর্ষের উপাসক-সম্প্রদায় মুখ্যত দুই সাধন পদ্ধতিতে সাধনা করে আসছেন—শৈব এবং শাক্ত। এই দুই সাধন পদ্ধতির রীতি-নীতি আচার-উপচার সব কিছু শুধু বিভিন্ন নয়, প্রায় পরস্পর-বিরোধী। অথচ হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ জৈন ইসলাম বা খৃষ্টধর্মের যেমন যুগে যুগে সংঘর্ষ বেধেছে তেমন কোন বৈরিভাব এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কালেই দেখা যায়নি। দু'টো যেন সমান্তরাল রেখা,—দূরত্ব বজায় রেখে যে যার পথে চলেছে ; হয়তো অনন্তে গিয়ে মিশবে বলেই। কিন্তু অন্য কোন গূঢ়তর যুক্তির অনুপস্থিতিতে এমন অবস্থা ইতিহাসের যুক্তি-বিরুদ্ধ যে, দুটো পরস্পর-বিরোধী সাধন-ধারা একই দেশে একই সঙ্গে একে অপরের উপর সামান্যতম প্রভাব বিস্তার না করে সমান জনপ্রিয় থাকবে। এমন অবস্থার সত্যতা অনস্বীকার্য, এমন অবস্থার যুক্তি কি? যুগাতিযুগ ধরে যে-সব যাত্রী কাশী গেছে বা কামাখ্যায় এসেছে, তাঁ'রা কিন্তু এই যুক্তি খুঁজে বিভ্রান্ত হয়নি কোন দিন—হয়তো সে যুক্তি তাঁ'রা আপন আপন সত্তায় কান পেতে শুনে থাকবে। কিন্তু এই যুক্তির আভাস আজ-কাল পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদেরও নজরে পড়ছে, এই বোধি-গ্রাহ্য যুক্তি অস্বীকার করা তাদের পক্ষেও প্রতিদিনই অধিকতর শক্ত হয়ে উঠছে। স্বাধীন ভাবে কিন্তু সর্বাংশে প্রাচ্যের অনুরূপ ব্যক্তি-চরিত্রের যে-সংজ্ঞা জর্মাণ মনস্তত্ত্ববিদ সি, জি, য়ুঙ গ্রথিত করেছেন তার গ্রহণযোগ্য কোন প্রতিবাদ আজ পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। পাশ্চাত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় গুণী ব্যক্তিরা সবাই আজ নিঃসংশয়ে এ-কথা স্বীকার করেন যে, জীবনকে দেখবার মূলতঃ দু'টি দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের আছে। একটির নাম ওঁরা স্থির করেছেন 'এক্সট্রোভার্ট,' অর্থাৎ বহির্মুখী, —আমরা আমাদের গ্রাম্য ভাষায় যাকে বলি শৈব। অপরটির পশ্চিমী নাম 'ইনট্রোভার্ট,' অর্থাৎ অন্তর্মুখী,—ভারতীয়রা যাকে এত কাল শাক্ত বলে এসেছে। দু'টো সমান্তরাল রেখা—যেন গঙ্গা আর যমুনা—যে যার পথে বয়ে চলেছে ; অন্তে সেই অসীম অপার সমুদ্র—সেখানে সবাই এক।

দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত অল্প বলে এবং প্রত্যাবর্তনের পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ নয়—তদুপরি যুগের অনুকূলতায়—শৈব সাধন পদ্ধতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক অজ্ঞতা সত্ত্বেও সেই ধারার সঙ্গে একটা ব্যবহারিক পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে। মাঝে মাঝে শাক্ত আকর্ষণও আমরা সবাই আমাদের সত্তায় অনুভব করে থাকি ; কিন্তু সেই শক্তির আভাসই এত ভয়ঙ্কর যে তাকে একটা শক্তি বলে স্বীকার করে জয় করবার সাহস এবং বিশ্বাস দুই চার জন ক্ষণজন্মা পুরুষ ভিন্ন বড় রাখে না। সেই আকর্ষণ যখন আমাদের দ্বারে এসে পৌঁছায় আমরা তখন আর্থিক অনটন, কর্মক্লান্তি, যৌন-অতৃপ্তি, রাজনৈতিক অসন্তোষ ইত্যাদি স্থূল এবং সমাধানযোগ্য কতকগুলো সমস্যার বালুতে উটপাখীর মতো মাথা লুকিয়ে সেই শক্তিকে অস্বীকার করি, তার আকর্ষণ বিপথগামী করি। কিন্তু কামাখ্যার মন্দিরে শক্তিমাতার প্রকোষ্ঠে যখন সেই আকর্ষণ টেনে ধরে তখন আর পালাবার কোন পথ থাকে না। তখন আমাদের 'ঘোর' লাগে। সেদিন সেই ভূতল গর্ভের অন্ধকার কুঠরীতে আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে পরিণাম কী হত তা অনুমান করাও অসম্ভব! পাণ্ডা ঠাকুরের সম্ভবতঃ তা জানা ছিল,—হাত ধরে টেনে তিনি আমাকে সেই সজীব অন্ধকারের সুদৃঢ় আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে বাইরে নিয়ে এলেন।

মূল-মন্দির থেকে উঠে নাট-মন্দিরে যাবার পথে একই ছাদের তলায় ছোট একটি ঘর আছে। ঘরটি পাণ্ডাদের বিশ্রাম স্থানস্বরূপ। ঘরের চতুর্দিককার দেয়ালে হেলানো, শোয়ানো দাঁড় করানো অবস্থায় রুচিসৌন্দর্য কমনীয়তা এবং বাস্তবতা বর্জিত অশুভ্র কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। পাণ্ডাকথিত অযৌক্তিক কিম্বদন্তীর সূত্রে প্রত্যেকটি মূর্তিই পৌরাণিক যুগের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কিত। একটা মূর্তি কেবল অর্বাচীন,—যদিচ এরও যথার্থ বয়স নিরূপণ করবার কোন বিজ্ঞানসম্মত উপায় নেই,—মূর্তিটি কোচবিহারের রাজা শুক্লধ্বজের। শ্বেত পাথরে খোদিত ভাবলেশহীন মূর্তিটি ঘরের এক কোণে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। এমন ব্যক্তিত্বহীন নিরপেক্ষ মূর্তি যে প্রথম নজরে চোখেই পড়ে না ; অথচ সেই নিরপেক্ষতা এমনই তীক্ষ্ণ অলক্ষ্যে মনে একটা অনপনেয় দাগ কেটে যায়। চিহ্নটা ক্রমে ক্ষতের মতো বাড়তে থাকে, অনুক্ষণ কুটতে থাকে কাঁটার মতো।

'লাইফবয় সাবান
দিয়ে এইবার চান্ করতে হবে'
-এটি সেই ঝরঝরে
তাজা ভাব এনে দেয়!
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP

ঘরের মেঝেতে নানান আকৃতির ঢোলকজাতীয় একরাশ বাদ্যযন্ত্র ছড়ানো। আমাকে টেনে এনে শ্বাস ফেলবার সময় না দিয়েই পাণ্ডাঠাকুর চর্বিত চর্বণের মতো বলতে শুরু করলেন যে, এই সব বাদ্যযন্ত্র প্রতি অমাবস্যার রাত্রিতে বাজানো হয়,—মা তখন এই বাদ্যের তালে তালে আপন প্রকোষ্ঠে নগ্ন-নৃত্য করেন। প্রতি অমাবস্যার রাত্রিতেই এই নৃত্যানুষ্ঠান হয়।

"আপনি কখনো দেখেছেন মা'র নৃত্যানুষ্ঠান? মা কি দেহ ধারণ করেই নৃত্য করেন?"

"ছি, মা'র নগ্ননৃত্য কি সন্তানের দেখতে আছে? সে পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নেই!" রক্তবর্ণ নিমীলিত চক্ষু প্রসারিত করে ভর্ৎসনা করতে গিয়েই পাণ্ডাঠাকুর মৃদু হেসে এই ঔদ্ধত্য মার্জনা করলেন। "তাছাড়া সেই নৃত্য দেখবার ক্ষমতাই বা মানুষের কোথায়? ছলে বলে নানান কৌশল করে নানান মুখোস পরে সইয়ে সইয়ে মা মাঝে মাঝে সামান্য একটু আভাসে সাক্ষাৎ দেন, তাতেই আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাই। স্বরূপে তাঁকে দেখবার চেষ্টা করলে যে পাথর হয়ে যাব, মহারাজ শুক্লধ্বজের মতো। সেই বীভৎস সৌন্দর্য দেখবার ক্ষমতা রক্তমাংসের মানুষের নেই।"

প্রতিভূ সমীপে অবিশ্বাস ভয়ে প্রশ্নটুকু নিবেদন করতেই যে 'ঘোর' লেগেছিল তার রেশ তখনো পুরোপুরি কাটেনি, অতএব অক্ষমতার ভয়ে ভীত হবার দায় আমার ছিল না। আমি ভাবছিলাম, মা স্বয়ং যদি নগ্ননৃত্যে সঙ্কুচিত না হন তবে আমার পক্ষে তা দেখা কেন অবৈধ হবে? কিন্তু প্রশ্নটা মনে মনে শত বার নাড়াচাড়া করেও, একবার উচ্চারণ করতে আমারই কেমন সঙ্কোচ লাগছিল, চেতনার উপরিস্তরের বিক্ষোভ সত্ত্বেও, অন্তরালে যেন অস্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম এই আলঙ্কারিক নগ্ননৃত্যের আক্ষরিক নিগূঢ় অর্থ।

ইতিমধ্যে পাণ্ডাঠাকুর একটির পর একটি মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে রীতি-অনুযায়ী সেই সেই মূর্তির সংগে সংযুক্ত কিম্বদন্তীগুলো এই পাপীর পাপমোচনার্থে বিবৃত করে যাচ্ছিলেন। ভারতের প্রতি তীর্থই কিম্বদন্তী দিয়ে গড়া না হলেও কিম্বদন্তী দিয়ে ঘেরা, কামাখ্যা-তীর্থও এর ব্যতিক্রম নয়। এই গল্পকথাগুলো এক অতি অদ্ভুত জিনিষ! এগুলোর কাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক নয়, বাস্তবতা শ্রোতার সমবেদনা আকর্ষণ করে না, রুচির বালাই নেই, সৌন্দর্যের লেশশূন্য, সম্ভাব্য অসাম্ভাব্যতারও দায়মুক্ত—অথচ এগুলোই যুগের পর যুগ ধরে প্রতিদিন শত সহস্র বার একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন কণ্ঠে বিবৃত হচ্ছে; বিশ্বাস করে বা না করে লক্ষ লক্ষ যাত্রী এই সব গাঁজাখুরি গল্পই শুনেছে সশ্রদ্ধচিত্তে। এই গল্পগুলোর উৎসের কথা ভাববার চেষ্টা করলে বিস্ময় লাগে। সুস্থ বা বিকৃতমস্তিষ্ক কোন মানুষের পক্ষেই এমন গল্প উদ্ভাবন করা সম্ভব বলে বিশ্বাস হয় না; অথচ উদ্ভাবিত না হলে এগুলো এল কোথা থেকে?

আগেই বলেছি যে, তীর্থস্থানে—বিশেষতঃ কামাখ্যা-পীঠের মতো নিবিষ্ট তীর্থে পদার্পণ করলে আমাদের মতো পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতের চেতনা কতকগুলো সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আমারও একটা চেতনা ব্যস্ত ছিল পারিপার্শ্বের আলো শব্দদৃশ্য থেকে কতটা জ্ঞান আবার ফিরে এসেছে ও আসছে তার হিসেব করতে। অপর চেতনা কিছুক্ষণ আগেকার সেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় বারবার সন্তর্পণে ডুব দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিল যে, সেই অভিজ্ঞতা সত্য কি সংস্কার? তৃতীয় চেতনা আবার এই অভিনব জগতের সঙ্গে আমার পুরাতন নাগরিক জগতের তুলনামূলক বিচারে ব্যস্ত ছিল। এই সব এবং আরও অজস্র স্ফুট-অস্ফুট চেতনার টানাপোড়েনে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিলাম না। তা ছাড়া পাণ্ডাকথিত এই ধরণের কিম্বদন্তী কাহিনী আমার অনেক শোনা আছে—সেদিকে কর্ণপাত নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু হঠাৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা চেতনা অত্যন্ত ক্ষীণ অনুভূতিতে যেন স্পষ্ট আর্তনাদ করতে সুরু করল। অকস্মাৎ আর কোন সন্দেহ রইল না যে, এই সব গাঁজাখুরি গল্পকথার মধ্যেই আমরা অজস্র পরম সত্য চিরতরে হারিয়ে ফেলেছি। কবে কোন বিস্মৃত যুগে এক অসীম শক্তিধারী ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মজন্মান্তরের সাধনার ফলস্বরূপ, এক পরম সত্য উচ্চারণ করেছিলেন। সাধারণের সেই সত্য বুঝবার সাহস নেই, সাধনা নেই,—সেই সত্য উপেক্ষা করতে গেলে শ্রদ্ধা এসে বাধা দেয়;—তখন যুগের পর যুগ ধরে চলল সেই নিষ্ঠুর সত্যের চতুর্দিকে শর্করার মতো গল্পকথার প্রলেপ-মার্জনা। ক্ষণজন্মার সাধনার ফল আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিতরণযোগ্য করবার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। ক্রমে ঐতিহ্যের আবরণে সত্যের নিষ্ঠুরতা ঢাকা পড়ল। আজও যে সব সমর্পিত যাত্রী এই ঐতিহ্যধারা অনুসরণ করে তীর্থে আসে, তারা হয়তো আপন আপন অজ্ঞতা সত্ত্বেও সেই সাধনার ফলে অমর হয়ে যায়। আমরা যারা যাচাই না করে কোন জিনিষে বিশ্বাস করি না, আমাদের কাছে সেই সত্য চিরতরে হারিয়ে গেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনির্দেশ্য এক সূত্র ধরে কেন প্রতিশ্রুতি আসছিল যে, ঠিক সাধনা নয়, একটু চেষ্টা করলেই সে সত্য নিজে থেকেই বুঝতে পারব। অথচ তখনই আবার মনে পড়ছিল, তিন দিনের মধ্যেই সেরেস্তার কাজে টান পড়বে। যদিও মনে-প্রাণে সর্বক্ষণই বুঝতে পারছিলাম যে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে বসে আছি। অমন বিক্ষুব্ধ অসহায়তা আজ সত্য বা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে নিজের কাছেও কেমন যেন বাধ-বাধ লাগে।

বিনা বিরতিতে কিম্বদন্তী কথা বলতে বলতে পাণ্ডাঠাকুর একটির পর একটি মূর্তি অতিক্রম করে অবশেষে পূর্বোল্লিখিত মহারাজা শুক্লধ্বজের মূর্তির সামনে এসে দাঁড়ালেন। মূর্তিটা তখনও তেমনি বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে,—তার নিরপেক্ষতার সংক্রামক ব্যঞ্জনা তখনো আমার সজ্ঞান-চেতনা স্পর্শ করে নি। কিন্তু তবু মূর্তিটার সামনে এসে দাঁড়াতেই আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিক্ষোভ যেন মুহূর্তের জন্য নীথর হয়ে গেল।—প্রথমটায় কিছুই বুঝতে পারলাম না, কান পেতে শ্বাস রুদ্ধ করে শুধু শুনলাম, মহারাজার করুণার্দ্র বীভৎস কাহিনী।

শুক্লধ্বজ ছিলেন কোচবিহারের মহারাজা। কেবল পদাধিকারেই নন, শৌর্যে-বীর্যে চেহারায়-চরিত্রে চলনে-বলনে অমন যোল আনা মহারাজা ইতিপূর্বে কখনো কোচবিহার রাজ্যের রাজাসন অলঙ্কৃত করেন নি। মহারাজা ছিলেন একক এবং অনন্য।

কিন্তু ওই পর্যন্ত; মহারাজা শুক্লধ্বজ বা তাঁর রাজত্ব সম্পর্কে পাণ্ডাঠাকুর আর কিছু বলেন না, হয়তো আর বিশেষ জানেনও না। এই আংশিক পরিচয়ে শ্রোতার ঐতিহাসিক তৃষ্ণা সম্ভবত অনেকাংশে

অতৃপ্ত থাকে, কিন্তু ঐতিহাসিক তৃষ্ণা অপেক্ষাও হয়তো মহত্তর তৃষ্ণা আছে, যার পক্ষে ঐ আংশিক পরিচয়টুকুই যথেষ্ট। শুনতে শুনতে আমার তো অন্তত মনে হ'ল যে, ঐ রাজা শুক্লধ্বজের সঙ্গে নিজের যেন কোথায় একটা অঙ্গাঙ্গী আত্মীয়তা আছে। ঠিক আমারই মতো, প্রত্যেকের মতো, শুক্লধ্বজও একক এবং অনন্ত!

সিংহাসনে আরোহণ করেই মহারাজা শুক্লধ্বজ মনঃসন্নিবেশ করলেন রাজ্যজয়ের দিকে। একে একে আশে-পাশের ছোট-বড়ো সব রাজ্য শুক্লধ্বজের বশ্যতা স্বীকার করলো। সিংহাসন অধিকারের অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যে এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর প্রদেশও মহারাজার বশীভূত হল। কিন্তু রাজ্যজয়ের এই উন্মাদনা বেশি দিন স্থায়ী হল না; তার প্রধান কারণ, নিজ জন্মভূমি থেকে কখনো অধিক দিন দূরে প্রবাসী থাকা সইত না মহারাজা শুক্লধ্বজের। কারণে-অকারণে তিনি রাজধানীতে ফিরে আসতেন; কখনো কোন রাজ্য সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করবার আগেই, আবার কখনো শত্রুকে পুরোপুরি দমন না করেই। অবশেষে একবার যে এলেন, তার পরে আর নতুন কোন অভিযানে যাবার নাম করলেন না।

অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় আমার আবারও যেন মনে হ'ল, অনেকটা ঠিক আমারই মতো। শুক্লধ্বজের সুযোগ আমার ছিল না সত্য, কিন্তু প্রথম যৌবনের নব উন্মাদনায় প্রেম, স্বাদেশিকতা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবাদ, সাম্যবাদ লোকহিতৈষণা কত শত রাজ্য-জয়ের সে কি অদম্য উৎসাহ! এক এক বার এক এক পথে যাই, কিছুদূর গিয়েই আবার ফিরে আসি; সাফল্য অসাফল্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবারও কৌতূহলটুকু আর অবশিষ্ট থাকে না। যেন কোন একটা অনির্দেশ্য নোঙরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে বাঁধা আছি; দূরে ভেসে যাবার আগেই যা আবার কূলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতি বারই যেন রাজা বা যোদ্ধা বা পুরোহিতের ভূমিকায় অভিনয়ের পর সাজসজ্জা খুলে আবার যেই আমি ঠিক সেই আমি। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তখন আবার আপন আবাসে আর্তনাদ করতে করতে প্রত্যাগমন।

রাজ্যজয় পর্ব সমাধা হতেই মহারাজা শুক্লধ্বজের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটল। এখন তিনি সুবিশাল কোচবিহার রাজ্যের মহারাজা,—পূর্বের সংযম গেল বিলাসের স্রোতে ভেসে, ব্যভিচারের সংঘাতে চারিত্রিক দৃঢ়তা হল চূর্ণ-বিচূর্ণ। নর্তকীর নূপুর নিক্কণে অস্ত্রের ঝনঝনা স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রজাদের সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখবার আর সময় হয় না; রাজ্য থেকে শান্তি নির্বাসিত হল, শৃঙ্খলা বিদায় নিল। যে অপরিমিত বেগে রাজা শুক্লধ্বজ এককালে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতেন এখন তার চাইতেও দ্বিগুণ বেগে ভেসে চললেন ব্যভিচারের পঙ্কিল স্রোতে।

অর্থাৎ ঠিক যেমনটি ঘটবার। জীবনের সহজাত ব্যর্থতার আর্তনাদ চাপতে হবে, ব্যভিচারের পাশবিক কোলাহলে। পরাজয়ের ক্ষত ঢাকতে হবে কতকগুলো আপাত স্বয়ংসৃষ্ট ক্ষত সর্বদা নিজের চোখের সামনে ধরে রেখে নিজেকে শিউরে দিয়ে। এক কালের সে কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা কত কল্পনা কত উচ্চাভিলাষ,—হঠাৎ একদিন রাত প্রভাতে দেখা গেল সব ভিত্তিহীন, রাত্রির শেষে রঙিন অলীক স্বপ্নও সব শেষ। জানা গেল যে আসলে কোন দিনই কোথায়ও যাচ্ছিলাম না, কোন দিন কোথায়ও যাবার কোন উপায়ই নেই। যেই 'আমি'কে কেন্দ্র করে এত সব, সেই আমিও নিকষ কালো শূন্যতার মধ্যে একটি নিছক শূন্য। কোন পরিচয় নেই, কোন স্বাক্ষর নেই, কোন নাম পর্যন্ত নেই! ভরাডুবির পর অকূল পাথার সমুদ্রের মধ্যে একটা বুদ্বুদের মতো ভাসছি,—ফেটে গেলেই সব শেষ! এমন শূন্যতা স্বীকার করবার সাহস নেই, উপেক্ষা করবার ঔদ্ধত্য ভেঙে গেছে, অতিক্রম করবার সামর্থ্যের অভাব, সাধনা নেই বলে। অতএব অগত্যা পলায়ন,—যে দিকে চোখ যায় না সে দিকে চোখ না চায়! অতএব অগত্যা রসনা লাঞ্ছিত করে জীবনের তিক্ততা বিস্মরণ।

কিন্তু রাজত্ব করা তো জল থেকে ডাঙায় উঠে দাঁড়ান নয়, যে জল আর স্পর্শ না করে আপন পথে বয়ে যাবে! রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগে পার্শ্ববর্তী জনৈক পরাক্রমী রাজা কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করলেন। একটি বিন্দু রক্তপাতও হল না, প্রজা সৈন্যসামন্ত সবাই প্রস্তুত ছিল, প্রথম সুযোগেই সবাই আত্মসমর্পণ করল। শুধু নিজের প্রাণটুকু নিয়ে মহারাজা শুক্লধ্বজ আপন রাজ্য থেকে পালিয়ে এলেন। পালিয়ে এলেন এই কামাখ্যারই পার্বত্য অরণ্যে।

যেমন আমি আজ এসেছি, কিম্বা উন্মত্তের মতো অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে বারে বারে গেছি ভারতের বিভিন্ন তীর্থে। ঘৃণ্য ক্ষুদ্র পাশবিক জীবনের পাশ থেকে মুক্তি পাবার মূঢ় ব্যর্থ প্রয়াসে, কিন্তু মহারাজা শুক্লধ্বজকে যিনি রাজ্যত্যাগে বাধ্য করলেন সেই পরাক্রমীর নামই বা কী, রাজ্যই বা তার ছিল কোথায়, সে সম্পর্কে পাণ্ডাঠাকুর সম্পূর্ণ

নীরব—যেন সম্পূর্ণ উদাসীন। অনুরোধের অবকাশে আগন্তুকের পক্ষে আগ্রাসীকে চেনা সহজতর হয়। অন্তত আমি তো স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে এই আগ্রাসী আমার অপরিচিত নয়; আমারই সত্তার অংশ সহজাত বিরোধী,—পরাজয়ের ক্লেদে যে জয়তিলক তাঁকে সাফল্যের উপর আনে ব্যর্থতার কালো ছায়া, মানুষকে যে ক্লান্ত করে রাখে চিরকাল ক্রমেই চির-চঞ্চল চির-অস্থির বিদ্রোহী, যোগীকে কে ভোগী করে—ভোগীকে যোগী। এর দয়া নেই, ক্ষমা নেই, নীতি নেই, ভালোমন্দ বোধটুকুও নেই। কোন দিন কারো কাছে এ শক্তি ধরা দেয়নি, তাহার একে ধরতে যাওয়া বাতুলতা।

সেই অরণ্যের স্বরূপ আমরা আজ কল্পনাও করতে পারি না। জনবসতিশূন্য শ্বাপদসঙ্কুল সেই ঘনারণ্যে রাজ্যহারা মহারাজা গুরুধ্বজ নিঃসঙ্গ পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। জীবন ধারণের সামান্যতম অনুবিধাটুকু যার নষ্ট না, তিনিই এখন মানুষের নজর এড়িয়ে গভীরের ধকল কাটিয়ে যদি একটা ধরগোশ খাবতে পারেন তো স্ফূর্তিবৃত্তি করেন; নচেৎ দিনের পর দিন চলে উপবাস। কোন দিন বা বাঘের ভুক্তাবশিষ্ট গোগ্রাসে পিত্তরক্ষা হয়। এমন সময় একদিন অনাহারে কৃশ অনিদ্রায় ক্লান্ত ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ মহারাজা গুরুধ্বজ হতচেতন হয়ে একটা গাছের তলায় শুয়ে পড়লেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, ঝোপে ঝাড়ে অন্ধকার দানা বেঁধে উঠছে—রাত্রির আশ্রয় খুঁজবার সময় অতিক্রান্ত-প্রায়। দিনের নিরীহ জীব সব মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে; একটু পরেই হিংস্র শ্বাপদের ক্ষুধার্ত চোখ অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে উঠবে, আকাশ কাঁদবে শকুন শাবকের নির্দয় আর্তনাদে। কিন্তু মহারাজা গুরুধ্বজের আর ভয় পাবার মতো শক্তিটুকুও অবশিষ্ট ছিল না। ঘুরে বা পাশ কাটিয়ে বা মধ্য দিয়ে পলায়নের সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে; গুরুধ্বজ দীর্ঘ শ্বাসটুকুও না ছেড়ে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন নিয়তির হাতে। মুহূর্তমধ্যে ক্লান্ত মহারাজার সমস্ত বাইরের চেতনা লুপ্ত হ'ল। অবশেষে রাত্রি দ্বিপ্রহর হলে দিব্য জ্যোতিতে মা আবির্ভূতা হলেন মহারাজার সামনে। ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে তিনি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন মা'য়ের মুখের দিকে। আস্তে আস্তে দেহে শক্তি সঞ্চার হতে থাকল; রাত্রির শেষ প্রহরে একটা মন্দির গড়ে দেবেন বলে প্রণাম করবার পর শক্তিমাতা অন্তর্হিতা হলেন। মহারাজ গুরুধ্বজের দেহে তখন আর ক্লান্তির কণাটুকুও অবশিষ্ট নেই,—তন্মুহূর্তে তিনি রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হলেন। তিন দিন তিন রাত্রি একাদিক্রমে হেঁটে আপন রাজ্যে এসে পৌঁছলেন—মায়ের কৃপায় সাত দিনের মধ্যে আবার সিংহাসনে আরোহণের পরেই প্রতিজ্ঞানুযায়ী মায়ের মন্দির নির্মাণের আদেশ দিলেন।

সেদিনের সেই কামাখ্যা-তীর্থের অভিজ্ঞতা লিখতে শুরু করবার সময়েই সংশয়ের অন্ত ছিল না, সংকোচে এখন কলম স্তব্ধ হয়ে আসছে। কলমের ভাষা নিতান্তই বিজ্ঞানের ভাষা। ইন্দ্রিয়ের সব কথাও সর্বদা তার মুখে জোগায় না। আর চেতনায় একেবারে প্রান্তদেশে পৌঁছে ব্যক্তির মানসিক আবেগ যখন বিক্ষোভের প্রাবল্যে সম্পূর্ণ নীথর হয়ে যায়—যুক্তি-অযুক্তি সাদা-কালো সরল-জটিল সব যখন একাকার, যখন জগতের সমস্ত পরস্পর-বিরোধী ভাব একটি এক তানে আকাশ-বাতাস নৈঃশব্দে মুখরিত করে তুলেছে তখনকার সেই আনন্দ সেই আবিষ্কার কথা কলমের একতন্ত্রে উচ্চারণ করা যায় না। জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি মুহূর্তে এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। এত কাল ধরে, এবং এত কালেরও আগে অনন্তকাল ধরে যা কিছু দেখেছি শুনেছি ভেবেছি, কত কিছু আশা-আদর্শ হতাশা-শোক প্রাপ্তি-বঞ্চনা সব এসে জড়ো হয়েছে এই একটি অনন্ত মুহূর্তে। একটি একটি করে সুতো খুলে বয়নশিল্পের কারিগরী দিকটা হয়তো বোঝানো যায় কিন্তু তাতে লজ্জা নিবারিত হয় না। সুতো যেভে এগুলে অনন্ত কাল পরেও অনন্ত মুহূর্তে সমান দূরে থাকবে। মানুষের ভাষা মানুষের চাইতেও দুর্বল। ঐক্যতানের প্রতিটি তান বিচ্ছিন্ন করে তবেই ভাষায় গ্রথিত করা যায় কিন্তু সেই বিবরণ শত বার পাঠ করলেও ঐক্যতানের স্বরূপ তা থেকে হৃদয়ঙ্গম হয় কি?

কিন্তু এ-রচনার সম্ভাব্য পাঠকমাত্রকেই যদি আস্তিক বলে ধরে নেবার কোন অসুবিধে না থাকতো তবে উপরোক্ত বিলাপোক্তির কোন প্রয়োজনই ঘটত না। শক্তিমাতা আবির্ভূতা হলেন, বর দিলেন এবং প্রণামী নিলেন,—বিশ্বাসীর কাছে এ-সব কথার কোন অবিশ্বাস্য অতিরঞ্জন নেই। কেন না, মা যে দুর্গতি-নাশিনী সে-কথা তাদের কাছে স্বতঃপ্রমাণ,—এই সহজ কথার নিগূঢ় গুরুত্ব উপলব্ধিতে তাদের ঐতিহ্যলব্ধ ক্ষমতা। ঐতিহ্যচ্যুত হয়ে সে-ক্ষমতা আমি হারিয়েছি অনেক দিন, তবুও সেদিনের সেই সাময়িক অপ্রকৃতিস্থতায় পাণ্ডার কথা শুনতে এবং হয়তো বুঝতে আমার কণামাত্রও অসুবিধে হয়নি। দিব্যজ্যোতিতে মা আবির্ভূতা হলেন এবং ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে মহারাজা একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন মায়ের মুখের দিকে—এ-কথার নিগূঢ় ব্যঞ্জনা আমি সেদিন এমন নিঃসংশয়ে বুঝেছিলাম যে, সমতলে নেমে এসেও অযৌক্তিক বলে তা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই, কিন্তু যে সত্যের যুক্তি কেবল অনুভূতিগ্রাহ্য তা অনস্বীকার্য হলেও ভাষায় তাকে কি করে গাঁথব? অপরকে সে-সত্য বোঝাবো কেমন করে?

কিন্তু কেমন হয়, কোন একটা বিষয় নিয়ে অনবরত ভাবনা চলতে থাকলে তখন সজীব নির্জীব সব কিছুর সঙ্গেই সেই বিষয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আবিষ্কৃত হতে থাকে, তখন সব সঙ্গীতেরই ঐ এক সুর, সব সাহিত্যেরই ঐ এক ব্যঞ্জনা। কিম্বা হয়তো ঐ ব্যঞ্জনার সাহিত্যই তখন চোখে পড়ে, ঐ সুরই কেবল কানে বাজে। কামাখ্যা থেকে প্রত্যাগমনের পরেও ঐ অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার বাস্তব ভিত্তি যে কী হতে পারে মুহূর্তের জন্য সে-চিন্তা থেকে রেহাই ছিল না। আর যেন অনেকটা দৈবযোগেই ঠিক এই সময়ে পি, ডব্ল, মার্টিন রচিত এক্সপেরিমেণ্ট ইন ডেপ্‌ট গ্রন্থখানা হাতে এসে গেল—যদিও কোন কালেই আমি মনস্তত্বের ছাত্র ছিলাম না। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরবর্তী অধ্যয়নের যোগ-সাধন করে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেবার অক্ষমতা স্বীকার না করলেও বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবে সেই পরিসরের অভাব। তবে গ্রন্থখানা একবার উল্টে দেখলেই উৎসাহী পাঠকের বুঝতে বিলম্ব হবে না যে, অশিক্ষিত অমার্জিত সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুরা যুগাতিযুগ ধরে শক্তিমাতা বলে যাঁর পায়ে পূজো নিবেদন করে এসেছে আজকের পশ্চিমী বিদগ্ধজনেরা অনেক দ্বারে মাথা ঠুকে অবশেষে পথ হাতড়ে হাতড়ে সেই চরণেরই কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। যদিও তার স্বরূপ এখনো বোঝেনি, তবুও তার গুরুত্ব উপলব্ধি করছে পূর্ণমাত্রায়। কেউ তাকে 'আনকনশাস' বলে ডাকেন, কেউ বলেন ব্ল্যাক ম্যাডোনা, কেউ বা গ্রেট লিভিং মাথ।

সবাই স্বীকার করেন যে, এই শক্তি বীভৎস এবং এই শক্তি সুন্দর—মানুষ যে-কোন মানুষ সব মানুষ এই শক্তিরই দাস মাত্র। প্রত্যেক মানুষের এ-শক্তি চার দিকে একবার নয়ন মেলে চায়, তার সামাজিক বন্ধন—সামাজিক রীতি-নীতি বোধ সমেত—স্খলিত হয়ে যায় সেই মুহূর্তে। এই শক্তি ফকিরকে যেমন ক্ষণকাল মধ্যে রাজা করে দেয় তেমনি রাজাকে করে দেয় ফকির; দুর্বলকে এ বলশালী করে বলবানকে করে পঙ্গু। এই শক্তির এক ভ্রূকুটিতে মানুষ পশুর স্তরে নেমে আসে: এই শক্তি বাস্তবিকে মানুষ মাত্রেই পশু। ওঁরা আরও আবিষ্কার করেছেন যে সাহস না থাকলে বা ক্ষমতার অভাব ঘটলে, অর্থাৎ আমরা যাকে সাধনার অপ্রতুলতা বলে এসেছি এত কাল তা নিয়ে এই শক্তির সম্মুখীন হবার দুর্ভাগ্য যদি কোন দুর্বল মন মানুষের হয়, তবে সে পাগল হয়ে যেতে বাধ্য,—সামাজিক রীতি অনুযায়ী আলঙ্কারিক অর্থে মৃত্যু তার হবেই। পেলফ্রেস, পলি, পিকউইক তথন যে, ম্যালসর্ট, ট্রাউডেকে স্থান ছেড়ে দিয়ে বিদায় নেবে। অপর পক্ষে যদি তার সাহস থাকে সাধনা থাকে তবে এই শক্তিকে অধিগত করে সে অসীম শক্তির অধিকারী হবে।—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কেমন একদিন হয়েছিলেন সদর স্ট্রীটের এক অতি পুণ্য প্রভাতে। কিন্তু কামাখ্যায় সেদিন এ-সব কোন যুক্তিই আমার জানা ছিল না: সেদিন আমার পুঁজি ছিল শুধু সহজাত অবিশ্বাস আর সদ্য সংক্রামিত অপ্রকৃতিস্থতা। সেই সাময়িক অপ্রকৃতিস্থতারই সুযোগে আমি সেদিন নিঃসংশয় চিত্তে উপলব্ধি করেছিলাম যে, মহারাজা শুক্লধ্বজ আপন অনাহারক্লিষ্টতায় যার কাছ থেকে যে শক্তি লাভ করেছিলেন বলে পাণ্ডা ঠাকুর বললেন—যে শক্তির বলে হৃত রাজ্য আবার মহারাজার করতলগত হল—সেই শক্তির অস্তিত্ব যুক্তি-প্রতিষ্ঠ না হলেও স্বতঃসিদ্ধ।

এখন সিংহাসন তো করতলগত হল, মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিও না হয় রক্ষিত হল কিন্তু যেই শক্তির আশীর্বাদে সব হল তাঁর পূর্ণ পরিচয় তো জানা হল না! সেই রাজত্ব সেই ঐশ্বর্য সেই পরিজন সেই পারিষদ,—কিন্তু তবু কোন কিছুই যেন আর পূর্বকার মতো সজীব নয়, সত্য নয়, সুবিন্যস্ত নয়, সুসম্বদ্ধ নয়। বাইরে যেই মহারাজা ঠিক সেই মহারাজা, একটু তারতম্য ঘটেনি; কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজেকে কেমন প্রেতাত্মা বলে মনে হয় মহারাজা শুক্লধ্বজের,—যেন কোন কিছুর সঙ্গেই আর আত্মিক কোন যোগাযোগ নেই; সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, সব কিছু দূরে আয়ত্তের বাইরে আগ্রহের বাইরে চলে গেছে। মহারাজা শুক্লধ্বজের মনে হয় যে নিজ রাজত্বেই তিনি নির্বাসিত। এমন নিঃসঙ্গতা যে সম্ভব তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি কোন দিন। এক এক সময় ভয় হয় বুঝি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যাচ্ছেন, এক এক সময় বড়ো অসহায়, বড়ো দুর্বল, একেবারে অর্থহীন যুক্তিহীন বলে মনে হয় নিজেকে; কিন্তু তবু সত্তার অন্তস্তলে নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখাটির মতো একটা উদ্ধত দম্ভবোধ সদা-জাগ্রত!—ইতিমধ্যে কামাখ্যা পাহাড়ের নব-প্রতিষ্ঠিত মন্দির থেকে মায়ের নানান মহিমা-কথা রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হচ্ছিল। মা বাঞ্ছিতের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, দুর্গতের গতি করেন,—কামাখ্যা-মন্দিরে মা সদা-জাগ্রত, এ কথাও রাজার কানে পৌঁছল। মহারাজা একবার ভাবলেন যে মায়ের কাছ থেকে শান্তি মেগে নেবেন কিন্তু রাজকীয় দম্ভ বাদ সাধল। করায়ত্ত সহজ সমাধানের পথটি রুদ্ধ থাকায় নিষ্ফল নিরুদ্দিষ্ট রোষে মহারাজা দ্বিগুণ ফুঁসতে থাকলেন। জীবন যে গীতিকাব্যের একটা পঠিত পুস্তক নয় শুক্লধ্বজ তা জানতেন; তাই অরণ্য থেকে অরণ্যান্তরে যখন অনাহারক্লিষ্ট দেহে দিনের পর দিন অভিশপ্তের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন তখন তাতে কষ্ট হয়েছে কিন্তু এমন শ্বাসরুদ্ধ হয়নি, আজ আর কোন ভোগ্যবস্তুরই অস্বাচ্ছন্দ্য নেই—স্পৃহাও আছে—আজ শুধু মহারাজা অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পান, স্পৃহা অতিক্রম করে অনেক অনেক গভীরের অন্ধকারে আজ তার দৃষ্টি হারিয়ে গেছে। বাইরের কেউ কিছু জানতে পারে না, বুঝতে পারে না; কিন্তু ভিতরে ভিতরে মহারাজা একেক বার পাগল হয়ে যাবেন ভেবে আতঙ্কে শিউরে ওঠেন। আতঙ্কের আর অন্য কোন কারণ নেই, শুধু মা দেখেই পাগল হয়ে যাবেন, না জেনেই বিদায় নেবেন।

শক্তি এবার স্পষ্টতই নিয়তির বেশে আকর্ষণ করছেন এবং প্রজাকল্যাণে স্ত্রী-সম্ভোগে বা গার্হস্থ্যধর্মে মনোনিবেশ করে মহারাজার পক্ষে আর সে-আকর্ষণ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সম্ভব হবেই বা কী করে?—জন্মজন্মান্তর ধরে মূলদেশে জলসিঞ্চন করে যেই বৃক্ষ-শিশুকে মহীরুহে পরিণত করেছি সেই নিয়তি আমাদের সৃষ্ট বলেই তো আমাদের দাস নয়। যত কাল অন্ধ ছিলাম, নাবালক ছিলাম, তত কাল কোন দায়িত্ব ছিল না, শক্তির কথায় উঠেছি বসেছি—শক্তিকে ফাঁকি দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট নিজেকেও ভুলেছি মাঝে মাঝে। কিন্তু জীবনের রূঢ় নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতায় আজ চোখ খুলে গেছে—আর সেই পূর্বেকার বাধ্য-বাধকতা নেই কিন্তু নিয়তির নির্মম পথ আজ চোখের সামনে প্রসারিত। নির্জীব নিরীহ নীতি-বেষ্টিত ক্ষুদ্র সামাজিক জীবনে আর প্রত্যাগমনের পথ নেই—এখন হয় মৃত্যু, নয় মুক্তি।

এমন সময় রাজার কানে সংবাদ পৌঁছল যে, মা প্রতি অমাবস্যার রাত্রে কামাখ্যার ভূগর্ভস্থ মন্দির-প্রকোষ্ঠে নৃত্য করেন। সংবাদ শুনে মহারাজা মরীয়া হয়ে উঠলেন, কামাখ্যা পাহাড়ে যাত্রার তোড়জোড় তৎক্ষণাৎ সুরু হয়ে গেল। রাজ-পরিবারের পাণ্ডা অনেক বার স্থির করেও রাজার সামনে কোন ক্রমেই নিরস্ত হবার অনুরোধটুকু উচ্চারণ করতে পারলেন না। সবাই যেন জানতো কী ঘটবে, সবাই যেন জানতো যে, যা ঘটবে তা অপ্রতিরোধ্য। অবশেষে অমাবস্যা রাত্রির পূর্বেই মন্দির-প্রকোষ্ঠের দরজায় ছোট্ট একটি ছিদ্র করে রাখা হল এবং রাত্রির প্রথম প্রহরে মহারাজা শুক্লধ্বজ সেই ছিদ্রে চোখ রেখে দাঁড়ালেন। রাত্রি ক্রমে গভীরতর হতে লাগল—কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠল মন্দিরের বাইরে—কামাখ্যা পাহাড় থরথর কাঁপতে থাকল। ছিদ্রপথে রাজার চোখের আর পাতা পড়ে না। অকস্মাৎ বাদ্য থেমে গেল, কামাখ্যা পাহাড় স্থির হয়ে দাঁড়াল, ব্রহ্মপুত্র স্তব্ধ। ছুটে গিয়ে সবাই দেখল, মহারাজা শুক্লধ্বজ তখনো ছিদ্রপথে চক্ষু নিবদ্ধ রেখে নীথর দাঁড়িয়ে আছেন। মহারাজা পাষাণ-মূর্তি হয়ে গেছেন। এই সেই মহারাজা ঠিক সেই অবস্থায়। এঁকেও প্রণাম করতে হয়।

মহারাজার নিরপেক্ষ মূর্তি নিনিমেষ তাকিয়ে রইল। নতজানু হয়ে পাণ্ডাঠাকুর সেই মূর্তিকে প্রণাম করলেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। কেন না, অন্তত এ কথায় বিশ্বাস করতে আমার আর সঙ্কোচ নেই যে, তীর্থে এলে যাত্রীর জন্মান্তর হয়। সাময়িক হলেও কামাখ্যা তীর্থে আমারও হয়তো জন্মান্তর হয়েছিল।

শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায়

পায়রা ওড়ান বঙ্কিমের নেশা। অনেকে অনেক কিছু করে; মদ খায়, মেয়েমানুষ পোষে, গাঁজা, গুলি, আফিং অনেক রকম বিষ তিলে তিলে গলাধঃকরণ করে নীলকণ্ঠ হয়ে ওঠার প্রয়াস পায়। ও-সব দিক থেকে বঙ্কিম একেবারে নির্ভেজাল, সাদা আর খাঁটি। শুধু বেলা ন'টার পর সকালের চা শেষ করে ছাদে উঠে আসে বঙ্কিম। ছাদের এক দিকে কাঠের তৈরী সার সার ছোট ছোট খোপ, সেই সব খোপের ছোট ছোট দরজা তখনও বন্ধ। আগের দিন সন্ধ্যায় বঙ্কিম প্রত্যেকটা খোপের প্রত্যেকটা দরজা নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়ে যায়। দোরবন্ধ খোপগুলোর ভেতর থেকে সমস্বরে ধ্বনি ওঠে,—"বক্‌-বকুম্, বক্‌-বকুম, বক্‌-বক্‌-বকুম্।" কান পাতে বঙ্কিম, কান পেতে থাকে, দুই কান দিয়ে যেন পান করে পায়রাদের কোরাস্ সঙ্গীত। অদ্ভুত ডাক এই পায়রাদের, চোখ বুজে খানিকক্ষণ শুনলে যেন ঝিমুনি আসে, ঢুল আসে, ঘুম পায়। এত দিন ধরে ত শুনছে বঙ্কিম এই ডাক, সেই ছোটবেলা থেকে, বাবার হাত ধরে যখন সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এসে কৌতূহলী মন নিয়ে এই ডাক শুনত, তখন থেকেই ত এই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। মদ কোনো দিন খায়নি বঙ্কিম, পরনারী, বারনারীর অঙ্গ স্পর্শ করেনি সে, গাঁজা-বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া মস্তিষ্কে কোনো দিন আলোড়ন তোলেনি তার, সুতরাং ও সমস্তর মর্ম বোঝে না সে; তবু আন্দাজ করে বঙ্কিম—এই যে 'বক্‌-বকুম্' 'বক্‌-বকুম্' শুনতে শুনতে আবেশে দুই চোখ সহজে বুজে আসা—এ বোধ হয় সেই সমস্ত ধোঁয়াটে তরল আর মাংসল নেশার আমেজের মতই। নিশ্চিত জানে না সে, কিন্তু একদিন এই ডাক না শুনলেই যেন মনে হয় কি যেন হারিয়েছি, কি যেন পেলাম না, কিসের থেকে যেন বঞ্চিত হলাম।

এক এক করে খোপের দরজাগুলো খুলে দেয় বঙ্কিম। এক একটা দোর খোলে আর ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্ করে একজোড়া পায়রা ছাদজোড়া সোনারঙা সকালের রদ্দুরে বেরিয়ে আসে। উড়ে উড়ে বঙ্কিমের ঘাড়ে মাথায় বসে পায়রাগুলো—ভারী ভাল লাগে বঙ্কিমের, একটুও অস্বস্তি বোধ হয় না। একে একে সব খোপের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হলে বঙ্কিম হাতে করে না, পোষ মানা পায়রাগুলোর পাখনার বাঁধনগুলো পরীক্ষা করে, পাখনা উল্টে দুটি আলগা আঙুলে বাঁধনগুলো পায়রার মেজাজ মাফিক ঢিলে বা কড়া করে দেয়। ইতিমধ্যে পোষমানা, পুরোনো পায়রাগুলোর কেউ কেউ আলসের উঠে বা কার্নিসে নেমে যৌবন-গর্বিতা ষোড়শীর মত সামনে বুক ঠেসে ঈষৎ দুলে দুলে চলে আর বঙ্কিমের বাপ-দাদার আমলের নোনায় ধরা পুরোনো বাড়ির ঝরেপড়া পলস্তারা বালি-সুরকি খুঁটে খুঁটে খায়। কেউ কেউ উঠে যায় একটা বাঁশের মাথার দিকে চৌকালা করে চার খুঁটির ওপর জালবেছান 'ব্যোমে'।

অনেক রকম পায়রা আছে বঙ্কিমের। দেশী-বিদেশী সুন্দর-কুৎসিত। গোলা, কেলে গোলা, গলা ফোলা, মুখ্‌খী থেকে সুরু করে লক্কা, সিরাজু, তোমা, গিরবাজ, টারবিন, ম্যাকরিণ পর্যন্ত। একজোড়া পায়রার দাম যে দেড়শ-দু'শ টাকা পর্যন্ত দিতে হয় বঙ্কিমকে, তা কি জানে রাণু? না সে জানে যে ঝুঁটিদার লক্কার সঙ্গে পায়রা-জগতে অপাংক্তেয় কেলে গোলার মিশ্রণের ফলে এমন এক নতুন জাতের সৃষ্টি হয়, যা অনায়াসে বঙ্কিম বুক ফুলিয়ে সবাইকে ডেকে দেখাতে পারে। কিছুই জানে না রাণু। তার ধারণা, বছর বছর আপনি আপনি বেড়ে যায় বঙ্কিমের পায়রাদের সংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে, যে নিয়মে খেতে না পাওয়া মানুষের ঘরে বছর বছর ডিম ছাড়ান কই মাছের মত হাড় জিরজিরে, বুক ডিগডিগে বাচ্চার সংখ্যা বেড়ে যায়। এই পায়রাদের পেছনে বঙ্কিমের যে কত পরিশ্রম, কত অধ্যবসায়, কত খরচ—তার কিছুই ধারণা নেই রাণুর। কত সাধনার পর, কত শিক্ষকতার পর যে একটা পায়রা শীষের প্রকার-ভেদ ধরতে পারে, বুঝতে পারে আর সেই অনুযায়ী নিজেকে ফুলের মালার মত কিংবা যোগ চিহ্নের মত অথবা আরো নানান কারুকার্যের মত আকাশে উড়ন্ত পায়রার দলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শেখে, খাপ খাইয়ে নিয়ে সেই নয়ন মনোহর দৃশ্যের অন্তর্গত হয়ে যেতে শেখে, তা কল্পনাও করতে পারে না রাণু। তাই সে ঠাট্টা করে বঙ্কিমকে, বিদ্রূপ করে, ঠেস দিয়ে দিয়ে বঙ্কিমের আচরণের নিন্দা করে।

হাসি পায় বঙ্কিমের, করুণাও হয়। কি দেখেছে রাণু? কতটুকু দেখেছে? গরীব ঘরের মেয়ে রাণু, রূপের দৌলতে এই আদি কলকাতার অভিজাত পরিবারে ঠাঁই হয়েছে তার। আজ না হয় পয়সা নেই বঙ্কিমের, না হয় তিন বিঘের ওপর জায়গাজোড়া নানান মহল বাড়িখানা আজ ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে, খসে গেছে পলস্তারা, কঙ্কালের দাঁত ছিরকুটি হাসির মত না হয় বাড়িখানাও ইটের দাঁত বের করে হাসছে, না হয় আজ বাড়ির ভেতরের বড় বড় মাঠগুলো আর উঠোনগুলো ধোবাদের আর গোয়ালাদের ভাড়া দিয়ে দিয়েছে বঙ্কিম কাপড় শুকোনোর আর গরু-মোষের খাটাল করবার জন্য। তাই বলে বংশমর্য্যাদা যাবে কোথায় বঙ্কিমের? বাপ-দাদার আমলের 'রাজা' উপাধিটা কি এতই সস্তা আর সহজলভ্য যে, আজ দু'টিখানি ভাতের অভাব হয়েছে বলেই বঙ্কিম তার 'রাজা' উপাধি, এত দিনকার বংশমর্য্যাদা তার পায়রা ওড়ানোর নেশা, সব কিছু ছেলেমানুষের খেলনার মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাল আমলের ডাক্তার-মোক্তার মধ্যবিত্তদের মত চাকরী খুঁজতে বেরুবে? আর চাকরী করবে কি করে বঙ্কিম? সে কি পড়েছে, না পাস করেছে?

তবু ত আর কোনো নেশা নেই বঙ্কিমের, ছোটবেলাতেও ত

সে দেখেছে তার বাবার বড়মানুষী চাল! শুনেছে ডিকাণ্টারে-ডিকাণ্টারে ঠোকাঠুকির মিষ্টি-মধুর শব্দ। সেই গ্যাসের উজ্জ্বল আলোয় রঙীন পানীয়ের ঝলক, চিৎপুর থেকে আনা মুনিয়া বাঈয়ের চুমকী-বসানো ঘাগরা ওড়ান নাচ, পিলুর ওপর ঠুংরীর মধুর সুর-বিস্তার,—"আয়ে না সাজন বা···" সে সব ত কিছুই দেখল না, জানল না, শুনল না রাণু! আজ শুধু সামান্য ক'টা পায়রা দেখেই রাণুর এত রাগ! না হয় সে একটা না দুটো পাসই করেছে, না হয় রূপ আছে তার—রূপ ত এ বাড়ির বউ হয়ে আসার ব্যাপারে এক অতি আবশ্যকীয় যোগ্যতা—তাই বলে সে বঙ্কিমের পিতা-পিতামহর আমল থেকে চলে আসা পায়রা ওড়ান নেশাকে, এক কথায় তার বংশের ঐতিহ্যকে উড়িয়ে দিতে চাইবে তার প্রজাপতির পাখনার মত ঠোঁটের সামান্য হাসির হাওয়ায়?

আর পায়রা ওড়ানোর নেশাই বা বঙ্কিমের কি এমন বেশী? তার ঠাকুরদাদার গল্প শুনেছে সে ছোটবেলা তার বাবার মুখে। সে কথা ভাবলে মনে হয় তার নিজের নেশা—শুধু আজ-কালকার লোকের মত মদের বদলে চায়ের নেশার সমান। সেই পুরোনো আমলে পাঁচশ-সাতশ-হাজার টাকায় একজোড়া পায়রা কিনতেন ঠাকুরদা'। ভাবলে শরীরে শিহরণ লাগে বঙ্কিমের। আর সেই পায়রার লড়াই আর রেস! একশ একশ পায়রা উঠত দু'দিক থেকে দু' দলের, লড়াই চলত দু'ঘণ্টা তিন ঘণ্টা ধরে। কোন দিকের কত পায়রা দলছাড়া হয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল, তার হিসেব নিকেশ করে নিষ্পত্তি হত জয়-পরাজয়ের। আর রেস যোগদানকারী সকলের পায়রা একসঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হত গয়া, কাশী, মথুরা বা বৃন্দাবন থেকে, যাঁর পায়রা আগে কলকাতায় এসে পৌঁছুত তিনি জিততেন রেসে। অনেক বার বিজয় মুকুট লাভ করেছেন বঙ্কিমের ঠাকুরদা' এমনি ধারা লড়াইএ আর দৌড়বাজীতে। কিন্তু সে সব দিন আজ কোথায়? আজ আর লোকে পায়রার সম্মান দেয় না, মর্য্যাদা বোঝে না। রোজ সকালে যখন সে হাতের ছোট লাঠিটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আর জিভের তলায় মধ্যমা আর তর্জ্জনী দিয়ে বিচিত্র শব্দে শীষ দেয় আর সেই শীষের শব্দ অনুসরণ করে ব্যোম থেকে ডানা মেলে দিয়ে পায়রার ঝাঁক মেয়েদের সূচের কাজের মত আকাশের এক অংশে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়ে তোলে, তখন দূরের দূরের বাড়ির ছাদের সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। কিন্তু বঙ্কিম জানে, ওরা যতই অবাক হোক না কেন, আসলে মনে মনে ওরা সবাই বঙ্কিমকে অবহেলা করে, বঙ্কিমের কথা উঠলেই নাক সিঁটকে বলে—ঐ পায়রা-ওড়ান লোকটা! ওদের ওপর রাগ হয় বঙ্কিমের, কিন্তু আবার সামলে নেয় রাগ। ওদের দোষ কি? নিজের বউ যেখানে ঠোঁট বাঁকায়, নাক সিঁটকোয় কথায় কথায়, সেখানে অন্য লোক যে দুয়ো দেবে, ধুলো ছুঁড়বে, হাততালি বাজাবে পেছনে, তা আর বিচিত্র কি?

বিদ্রূপ করুক রাণু, কিছু এসে-যায় না বঙ্কিমের। পাস-করা মেয়ে রাণু, এঘরে ওকে আনাই ভুল হয়েছে। আসল কথা, শেষ বয়সে আজকালকার কড়া আলোর চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল বঙ্কিমের বাবার, ভেবেছিলেন কোনো আধুনিকাকে ঘরে তুলে আজকালকার সঙ্গে পাল্লা দেবেন। ছেলে বঙ্কিমকে বিয়ে দিলেন তিনি গরীবের মেয়ে রাণুর সঙ্গে, যে আসলে আজকালকার এই ঠুনকো যুগেরই প্রতিনিধি। দিয়ে ত মরলেন তিনি, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তলায় তলায় খেয়ে-যাওয়া বড়মানুষী ভেঙ্গে পড়ল সশব্দে। পাওনাদাররা একযোগে সবকিছু গ্রাস করল, রইল শুধু এই সাবেক বাপ-দাদার আমলের দৈত্যাকার বাড়িখানা। আর এই এত বড় বাড়িখানা আগলে যক্ষের মত জেগে রইল বঙ্কিম। এদিকে, এবাড়িতে মন বসল না রাণুর। সে ঘরের মধ্যে থেকেও পর হয়ে রইল, দূর হয়ে রইল।

কিন্তু মন কি করে বসাতে হয় জানে বঙ্কিম। এ পরিবারের পূর্বপুরুষের হাত অনেক নারীরক্তে রঞ্জিত। সেই রক্ত বংশ-পরম্পরায় বঙ্কিমের দেহেও প্রবাহিত। রাণু তার কাছে একটা বড় পায়রা ছাড়া আর কিছু নয়। পায়রা কি করে পোষ মানাতে হয়, তা জানে বঙ্কিম।

বিয়ের পরের প্রথম দিককার কথা মনে পড়ে বঙ্কিমের। সকালের পায়রা ওড়ানর অনুষ্ঠান তখনো শেষ হয়নি, সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এসেছিল রাণু, সূর্য্যের আলোয় অবগাহন স্নান করে উজ্জ্বল একঝাঁক উড়ন্ত পায়রা দেখে বুঝি তারও ভাল লেগেছিল। একটুখানি প্রশংসমান দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সে, তারপর শুধিয়েছিল,—"কি, চান-খাওয়া করবে না আজ?"

চোখ নামিয়েছিল বঙ্কিম, রাণুকে দেখে বিস্মিত হয়েছিল একটু, তারপর আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে জিভের নীচে তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে দীর্ঘ বিলম্বিত করে একবার শীষ দিল সে। বৃত্তাকারে উড়ন্ত পায়রাগুলো হঠাৎ বৃত্ত ভেঙ্গে ঝুপ ঝুপ করে নেমে পড়ল ব্যোমের ওপর। রাণুর দিকে ফিরেছিল বঙ্কিম,—"ছাদে উঠেছ যে?"

রাণুর মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখা দিয়েছিল,—উঠেছি ত কি হয়েছে? নিজের বাড়ির ছাদেও উঠতে পারব না?"

—"না। পারবে না!" চমকে উঠেছিল বঙ্কিম,—"আমাদের বংশের বউদের অত বেলেল্লাপণা চলবে না! বুঝেছ? যাও।" সিঁড়ির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করল বঙ্কিম।

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল রাণু, সিঁড়িতে পা দিয়ে এদিকে ফিরে বলেছিল,—"বেলা বারটা যে বেজে গেল! খাওয়া দাওয়া করবে না?"

—"খাবার কথা!" গর্জন করে উঠেছিল বঙ্কিম,—"যা—ও!"

হুড়মুড় করে নেমে গিয়েছিল রাণু।

সেদিনের কথা মনে আছে বঙ্কিমের। রাণুরও। তারপর আর কোনো দিন ছাদে ওঠেনি সে।

সারাদিন ত ছাদেই থাকে বঙ্কিম। নীচে নামে খুব কম—শুধু খাওয়া আর শোয়ার সময়। বাড়ির বাইরে যায়ই না বলতে গেলে। শুধু মাসের শেষে ধোপা আর গোয়ালাদের কাছ থেকে ভাড়ার টাকা আদায় করতে বাইরে যায় সে। নীচেকার অন্ধকার ঘরে সারাদিন প্রায় একাই কাটাতে হয় রাণুকে। প্রথম প্রথম কি ভয়ই না করত রাণুর! বাবা ম্যাট্রিক পাস করিয়েও বিয়ে দিলেন রাজবংশের এই মূর্খ রাজপুত্রটির সঙ্গে। যদিও অবস্থা তখন দৃষ্টিকটু রকমের পড়ন্ত এদের, তবুও বাবা বলেছিলেন,—"মরাহাতীর দাম লাখ টাকা!" সে গরব না থাকলেও এখনও ওরা সাতটা উকিলকে এক হাটে কিনে আর হাটে বেচতে পারে! বাবার হিসাবে গোলমাল হয়েছিল, তিনি তার যৌবনের চোখ

দিয়ে এ[illegible] যে রমারম্ ঝমাঝম্ দেখেছিলেন, আসলে বুড়ো বয়সেও তার রেশ কাটেনি।

বিয়ে হল আর গোটা পৃথিবীটা যেন চোখের সামনে কপাট বন্ধ করে দিয়ে নিজেকে আড়াল করে নিল। বই পড়া বারণ এ বাড়ির বউ-এর, বারণ বাইরে বেরুনো, দিনের বেলা ছাদে ওঠাও। শ্বশুর বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত দু'-চারজন পরগাছা বাল-বিধবা আত্মীয়াও যা ছিলেন, শ্বশুর চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে তারা চলে গেল সারাল বৃক্ষের সন্ধানে। কিংবা বঙ্কিমই তাদের তাড়াল। তারপর একা, একেবারে একা! ভূতের মত বাড়িটা তার সমস্ত অন্ধকার, নিস্তব্ধতা আর ক্ষীণতম শব্দের বীভৎসতম প্রতিধ্বনি নিয়ে যেন বুকের উপর চেপে বসল রাণুর, যেন দু'হাতে গলা টিপে ধরে তার দম বন্ধ করে দিতে চাইল।

এই নিঃশব্দতা নিঃসঙ্গতা আর নিষ্পন্দতাকে এড়ানোর জন্যই রাণু ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতে সুরু করেছিল। ছোট ছোট খুপরী খুপরী ঘর, ঘরের মধ্যে চাপ চাপ আদিম অন্ধকারের বাস। ঘরের মধ্যে ঢুকলেই যেন আড়মোড়া ভেঙে দৌড়ে গিলে খেতে আসে, পায়ের সামান্যতম শব্দ বিরাটতম রবে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। এমনি এক ঘর থেকে আর এক ঘরে ঘুরতে ঘুরতেই একদিন বিকাশ দা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই কে যেন হাত ধরেছিল তার। আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েছিল সে, তখনই বিকাশ কথা বলল,—"চুপ! আমি আমি, রাণু!"

অবাক হয়ে গিয়েছিল রাণু,—"তুমি···তুমি কি করে এলে বিকাশ দা'?"

—"এলাম।" আবছা অন্ধকারেও বিকাশের মুখের হাসিটি দেখা গিয়েছিল,—"জানতাম ত এ বাড়িতে বিয়ে হয়েছে তোমার! চুপি চুপি এসেছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করব বলে, লুকিয়ে ছিলাম এই ঘরের মধ্যে।"

ভীষণ ভয় পেয়েছিল রাণু, হাত দিয়ে ওর বুকে ছোট্ট একটা ঠেলা দিয়ে বলেছিল,—"তুমি চলে যাও বিকাশ দা'! চলে যাও এখান থেকে।"

রাণুর দু' কাঁধের ওপর দু' হাত রেখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল বিকাশ রাণুকে, তারপর শুধিয়েছিল,—"তাড়িয়ে দিচ্ছ রাণু?"

—"না, না বিকাশ দা'! তাড়িয়ে দিচ্ছি না তোমাকে আমি"—রাণু বলল,—"তবু যাও তুমি।"

—"আচ্ছা। যাই—" বিকাশ এগিয়ে গিয়েছিল দু'পা, তারপর ফিরে বলেছিল,—"আবার কিন্তু আসব রাণু!"

বিকাশ চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বুকের ঢিপঢিপানি থামেনি রাণুর। কিছুটা পুলক, কিছুটা আতঙ্ক দুইয়ের সংমিশ্রণে এক অনাস্বাদিতপূর্ব শিহরণ বার বার পা থেকে মাথা, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। বিকাশকে ভালবাসত রাণু, হ্যাঁ, এখনও বাসে। কারণ, বিয়ের পরে যে-কারণে মেয়েরা এক কালের
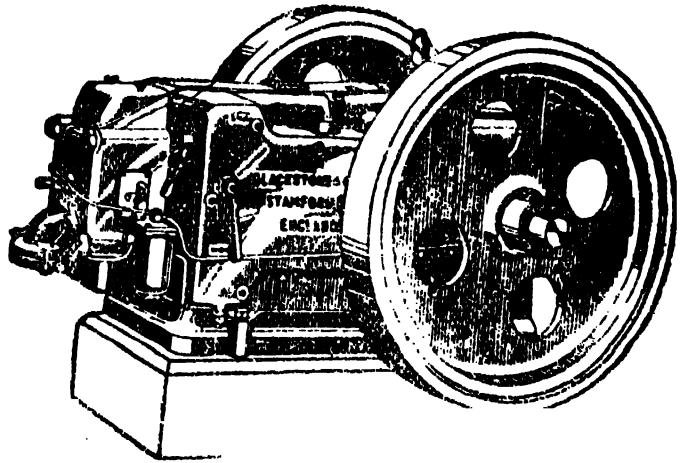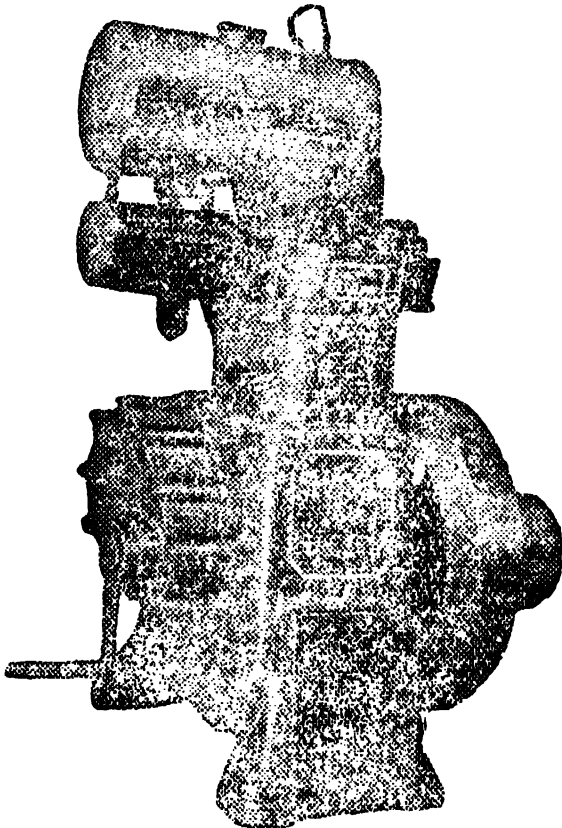
প্রিয়জনকে ভুলে গিয়ে চোখের জলের দাগের সঙ্গে সঙ্গে মনের দাগকেও মুছে ফেলে নতুন সংসার, নতুন মানুষের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, ভবত মিলে যেতে পারে—তার কিছুই ত পায়নি রাণু! তার সংসার বলতে ত এই ভাঙ্গা, অন্ধকার, ঘরে ঘরে চামচিকে আর মাকড়সার বাসা, মান্ধাতার আমলের জনশূন্য, মনশূন্য বাড়ি আর স্বামী বলতে ত ঐ বোকা, মূর্খ, এককালীন সম্ভ্রান্ততার অহংকারে ডগমগ বঙ্কিম, যে আজো ছাদে বসে শীষ দিয়ে পায়রা ওড়ায় আর বউকে অন্ধকার ঘরের অন্ধকারতম কোণায় আটকে রেখে বংশের ঐতিহ্য বহন করে চলে! কি করে সে ভুলবে বিকাশ দা'কে, মুছে ফেলবে মন থেকে নিশ্চিহ্নে—যে বিকাশ দা' এক দিন তার শিক্ষায়, বুদ্ধিতে, কথায়, চিন্তায় উজ্জ্বল একটা নক্ষত্রের মত অহরহ চোখের সামনে, মনের আকাশে জেগে থাকত?

তবু এমনি ভাবে বিকাশ দেখা না দিলেও পারত। বিয়ের সময় দেখা হয়নি বিকাশের সঙ্গে। কারণ, সে তখন গভর্ণমেন্ট ষ্টাইপেণ্ড নিয়ে পড়তে গিয়েছিল বিদেশে। দেখা যখন হয় নি—না হয় দেখা না-ই হত কোনো দিন। অনুপস্থিত বিকাশ দা'র উজ্জ্বল ভাস্বর মূর্ত্তি মনের বেদীতে বসিয়ে ভক্তির চন্দনে, শ্রদ্ধার পুষ্পে সাজিয়ে চিরকাল পুজো করে এক দিন নিঃশব্দে এই ভূতুড়ে বাড়িতে নিস্পন্দে মরে যেতে পারত সে! কেন এল বিকাশদা' আবার? আর যদি বা এল, কেন এমনি ভাবে এক দিন বলে বসল হাতের মধ্যে হাত নিয়ে,—"তুমি আমার সঙ্গে চল রাণু! নতুন চাকরী হচ্ছে আমার, পাঞ্জাবে পোষ্টিং হচ্ছে, কেউ জানবে না! কেন এমনি ভাবে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে? আমি তোমাকে ভালবাসি—তুমি আমাকে ভালবাস, এই কি সব চেয়ে বড় কথা নয়?"

সেদিনও রাণু কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল,—"তুমি যাও বিকাশ দা'! তুমি যাও!"

একটু হেসে বিকাশ বলে গিয়েছিল,—"যাচ্ছি! কিন্তু আবার আসব।"

এ কি লোভ দেখিয়ে গেল বিকাশ? আলো, বাতাস, ফুল, পাখী, গান, হাসি, প্রেম, ভালবাসা—যার কিছু পেল না রাণু, অথচ যা কিছু পাওয়ার জন্তে তার তন্বী মনটা আঁকুপাঁকু করছে, যা কিছুর অভাবে তার জীবনে মৃত্যু নেমে আসছে তড়িৎগতি, সব কিছুর প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিকাশ এসে দাঁড়িয়েছে সামনে! পৃথিবীটা আবার কড়া নেড়ে যাচ্ছে বন্ধ দোরের বাইরে থেকে—দোর খোলো, দোর খোলো! কি করে এখন রাণু?

আজকে এই সময় বিকাশ এল কেন? বেলা যখন প্রায় একটা বাজে, পায়রা ওড়ান শেষ করে বঙ্কিমের নীচে নামার সময় হয়ে গেছে যখন, তখন বিকাশ না এলেই বুঝি ছিল ভাল! আর এল যদি, এমন জুতো মচমচিয়ে একেবারে শোবার ঘরে এসে না ঢুকলেও ত পারত সে? বিকাশ ত জানে, বঙ্কিম নেমে এসে যদি দেখে বিকাশকে, মাথায় খুন চেপে যাবে তার!

আর তাই ত ঘটল। বিকাশকে যখন ঠেলে দিচ্ছে রাণু দোরের বাইরে, বলছে—"তুমি চলে যাও বিকাশ দা'! এখুনি! ওর নামার সময় হয়ে গেছে ছাদ থেকে!" ঠিক তখনই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বঙ্কিম আর দোরে দাঁড়ান বিকাশকে দেখেই দপ করে জ্বলে উঠল তার চোখ দুটো!

বিকাশও দেখেছে বঙ্কিমকে। একটুখানি কাষ্ঠহাসি হেসে বিকাশ বলল,—"এই যে বঙ্কিম বাবু, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আজ, নামই শোনা ছিল শুধু! আমি রাণুর পিসতুতো ভাই, আপনাদের বিয়ের সময় ফরেনে ছিলাম। আচ্ছা, চলি আজ। বেলা হয়ে গেল। আবার দেখা হবে। চলি রাণু, কেমন?" জুতো বাজিয়ে বেরিয়ে গেল বিকাশ। কপাটের ওপাশে দাঁড়ান রাণু জমে যেন হিম হয়ে গেল!

ঘরে ঢুকল বঙ্কিম। সংকুচিত দুই ভ্রূতে সন্দেহের ঘোর কুটিল ছায়া। একটুখানি দেখল রাণুকে বঙ্কিম, তার পর প্রশ্ন করল,—"ও কে?"

ভাষার পথে যেন হোঁচট খেল রাণু,—"আমার······আমার পিসতুতো ভাই।"

—"দেখাচ্ছি, আজ তোর কোন্ গোকুলের পিসতুতো ভাই!" দাঁতে দাঁত ঘষে কথা ক'টা উচ্চারণ করল বঙ্কিম, তার পর হাত বাড়িয়ে তাকের ওপর থেকে লম্বা আর সরু একটা লোহার রড টেনে নিল সে।

—"তুমি···তুমি···মারবে আমাকে?" শীৎকারধ্বনির মত কথা ক'টা বেরিয়ে এল রাণুর মুখ থেকে।

—"না না!" ব্যঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠল বঙ্কিমের স্বর,—"পুজো করব।"

তার পর সুরু হল মার। লোহার রড দিয়ে এলোপাথাড়ী পিটোতে সুরু করল বঙ্কিম—পিঠে, ঘাড়ে, কপালে, বাহুতে, মাথায়। দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বঙ্কিমের হাতের লম্বা সরু আর শক্ত লোহার রড রাণুর দেহে তাণ্ডব নৃত্য করে চলল। কপাল কেটে গেল রাণুর, রক্ত গড়িয়ে নেমে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা করে দিল তার, মাথা ফেটে রক্তে চুল আঠা হয়ে গেল।

শেষে এক সময় ক্লান্ত আর পরিশ্রান্ত হয়েই যেন থামল বঙ্কিম, রেহাই দিল রাণুকে। প্রচণ্ড বেগে ঘরের পালঙ্কের ওপর ঠেলে দিল তাকে। বলল,—"আবার যদি দেখি কোনো দিন ঘরের মধ্যে নাগর নিয়ে কেলি করতে, দু'খানা করে ফেলব একেবারে!" বেরিয়ে গেল বঙ্কিম, মনে তার আত্মপ্রসাদ; পোষ কি করে মানাতে হয় জানে সে!

পালঙ্কের ওপর শুয়ে শুয়ে কাঁদল রাণু, কাঁদল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, ফুলে ফুলে। জোরে কেঁদে কি করবে রাণু? যত জোরেই কাঁদুক সে, সে কান্না এই কবর-ভূমির বাইরে যে আলো বাতাস, জীবন, আনন্দ, প্রেম-ভালবাসা ভরা পৃথিবী, সে পৃথিবীতে ত কোনো দিন পৌঁছুবে না!

কতক্ষণ যে কেঁদেছিল রাণু, তা জানা নেই তার। চমকে উঠল চুলে এক স্নিগ্ধ কোমল-স্পর্শ পেয়ে। চমকে তাকিয়ে দেখল বিকাশ এসে দাঁড়িয়েছে কখন মাথার কাছে, বলছে,—"আমি জানতাম রাণু, এমনি হবে, তাই আবার এলাম।"

দুরন্ত অশ্রুভার লুকোবার জন্তই মুখ লুকোলো রাণু। এমনি সময় না এলেই কি চলত না বিকাশের? হাতে পায়ে পিঠে যখন প্রহার জনিত কালো কালো দাগ, রক্তে যখন সে প্রায় নেয়ে উঠেছে,

সর্বাঙ্গে যখন তার বিপ্রলব্ধা জীবনের গভীর বঞ্চনার সুস্পষ্ট চিহ্ন, তখন সব কিছুর অবসাদ নিয়ে, আশা নিয়ে, প্রতিশ্রুতি নিয়ে, এমনি ভাবে মাথার কাছে এসে না দাঁড়ালেই কি পারত না বিকাশ ?

পরের দিনে সকালে ছাদে বসে পায়রা ওড়াচ্ছিল বঙ্কিম। গোলা, কেলে গোলা, গলাফোলা, মুখ্‌খী, হোমা, সিরাজু, গিরবাজ, টারবিন, জ্যাকরিণ, গ্রাবার নানান ধরণের পায়রার বিচিত্র পক্ষ-বিলাস আকাশের বুকে! কিন্তু আজ পায়রা ওড়াতে মন নেই বঙ্কিমের। সব···সব পায়রা থেকেও যেন কোন একটা হারিয়ে গেছে চিরতরে; সব চেয়ে ভাল আর দামী আর সুন্দর পায়রাটাই যেন উড়ে গেছে বঙ্কিমের, উড়ে গেছে চিরকালের জন্য, ডানা মেলে দিয়েছে অবাধে, কোনো দিনও ফিরে আসার আশা নেই তার।

পুরোনো দিন হলে হয়ত গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে খুঁজে বার করত ওদেরকে বঙ্কিম, তারপর বাড়িতে নিয়ে এসে একেবারে শেষ করে দিয়ে নিঃশব্দে পুঁতে ফেলত এই অন্ধকার বাড়ির মেঝেয় গভীর গর্ত করে। কিন্তু আজ আর তা করার শক্তি নেই তার, ক্ষমতা নেই, সাধ্যও নেই। আজ শুধু তাকে এই সব চেয়ে বড় পায়রা হারানোর দুঃখটাকে বুকে পুষে রেখে চুপ করে পায়রা পোষ মানাতে হবে; সকালের রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীষ দিয়ে দিয়ে আর ছোট লাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পায়রা ওড়ান ছাড়া আর কিছুই করার নেই বঙ্কিমের।

বৃষ্টি ঝরে

রেখা দত্ত

বৃষ্টি ঝরে বৃষ্টি ঝরে
ঝিম ঝিম ঝিম সারাক্ষণ। রুদ্ধঘরে
একা একা বসে আমি। গাঢ় অন্ধকার
আপন আঁচলে ঢেকে নিল ত্রিসংসার।

নিঃশ্বাস স্পন্দন শূন্য স্তব্ধ দশ দিশি,
নিষ্কম্প-প্রদীপ মনে জেগে সারা নিশি
ভাবি বসে বসে—
ভেঙে-চুরে টুক্‌রো-হয়ে যারা গেছে খসে
এ জীবন হ'তে
যদি পারি কোনো মতে
তাদের স্মৃতির ম্লান রেশ
এই রাতে করে সমাবেশ
জোড়া দেব।
শত চেষ্টা শেষে
তন্দ্রাবিজড়িত চোখে ব্যর্থ ভাবাবেশে
একটু জোড়ানো হলে পিছে চেয়ে দেখি
পুনঃ সব গেছে ভেঙে!
মুচ্‌মেকি সে কি
লক্ষ চিন্তা আসে-যায় তারি ফাঁক দিয়ে
হঠাৎ তুমিও এসে উঁকি মারো প্রিয়ে।
মনে ভাবি, বলে ফেলি এই শুভক্ষণে, রাশি রাশি
নির্জন প্রহরে, 'ভালবাসি, তোমাকেও ভালবাসি!'

'ভালবাসি' বলবার সব চেষ্টা বৃথা—
আগে জানি নি তা!
কা'রা এসে
কণ্ঠ চেপে ধরে অট্টহেসে!
সে কি লাজ ?
সে কি ওই মার্জ্জিত সমাজ
আর পিছে ফেলে-আসা যত নর-নারী ?
না না শুধু তারা নয় প্রেমের ভিখারী,
তা ছাড়া অনেকে
আরো, চেনা-জানা নেই তাই থেকে থেকে
বলা না-বলার দ্বন্দ্বে
থামা ও চলার ছন্দে
চোখ খুলতেই
দেখি তুমি নেই!
বৃষ্টি-ধোয়া কর্দমাক্ত পথে
বিদ্যুৎ-চকিত রথে
চলে গেছ যেন কত দূরে!
শ্রান্ত আমি ক্লান্ত পায়ে মিথ্যে ঘুরে ঘুরে
ব্যর্থ মনে এই শূন্য ঘরে ফিরে আসি।

'ভালবাসি'—
ভালবাসি বলা শক্ত বড়!
লজ্জা ভয়ে দেহ-মন অতি জড়সড়,
বুক ফাটে তবু ভালবাসি বলা দায়।

নব নব রাত্রি-দিন আসে চলে যায়
বৃষ্টি ঝরে
অনাদি অনন্ত কাল ধরে
তার মাঝে অন্ধকারে হু হু করে নেমে আসে ঝড়,
হিয়া কাঁপে থরোথর
অশ্রু ঝরে, ঝিকিমিকি সিক্ত গণ্ড জলে তপ্ত আঁখি;
মৃত্যুম্লান অন্ধকার ভেদ করে তবু চেয়ে থাকি
প্রিয়ে,

হয়তো আসবে তুমি প্রভাতের রাঙা আভা নিয়ে।

বৃষ্টি ঝরে বৃষ্টি ঝরে
ঝিম ঝিম ঝিম সারাক্ষণ। রুদ্ধঘরে
একা একা বসে আমি। গাঢ় অন্ধকার
আপন আঁচলে ঢেকে নিল ত্রিসংসার।
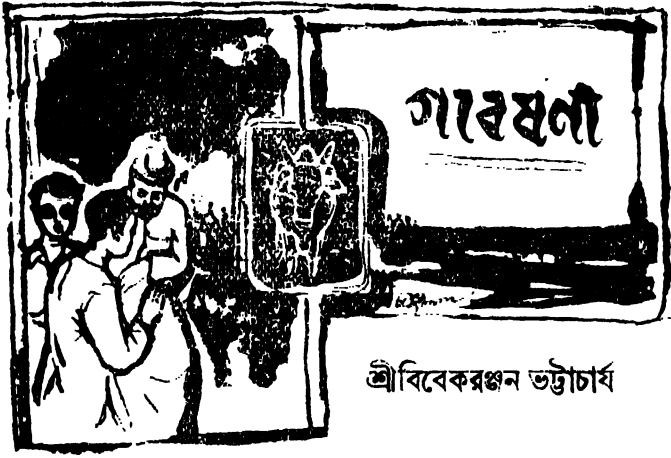
গবেষণা

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

একখানা বই থেকে নকল করার নাম চুরি। অনেকগুলো বই থেকে নকল করার নাম গবেষণা। বছর পাঁচেক আগের কথা বলছি। অনেক বই ঘেঁটে, অনেক মেহনত করে, ঘামের গঙ্গা-যমুনা বইয়েও যখন দু' লাইন লিখতে পারলাম না, গুরু তখন ডেকে বললেন "বৎস, ও-সব তোমার দ্বারা হবে না, এ লাইন থেকে কেটে পড়।"

কিন্তু গবেষণা করতেই হবে আমাকে। ডিগ্রীটা না পাই নেহাৎ একটা ডিপ্লোমা ত চাই-ই।

শ' পাঁচেক প্রশ্ন সঞ্চয় করে, দিল্লী থেকে কুরুক্ষেত্র অভিমুখে রওনা দিলুম। এবার আর বই থেকে নকল নয়। মুখোমুখি প্রশ্ন করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা নিয়ে প্র্যাক্‌টিক্যাল গবেষণা।

জায়গাটার নাম নিলোখেরি। দিল্লী থেকে আশী মাইল দূরে। কুরুক্ষেত্রের কাছেই। বাসনা ছিল ধর্মক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারার।

নিলোখেরিতে বহু দিন ছিলাম। বহু নবজীবনের সাথে পরিচয়ও ঘটেছিল। কিন্তু একটি দিনের ছবি আমার মনে যে রেখাপাত করেছে, আমার মনে হয়, জীবনের শেষ মুহূর্তেও সে চিত্র মুছবে না।

প্রশ্নের তাড়া নিয়ে প্রতিদিন ঘরে ঘরে ঘুরতাম। সাথে থাকতেন স্থানীয় কবি বন্ধু—আমার দোভাষী।

নিলোখেরির প্রায় সবাই মুলতান প্রত্যাগত শরণার্থী। মুলতানের গ্রামের চাষী-সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত পরিবার।

সেদিন গরমটা একটু বেশীই পড়েছিল। সমস্ত দিন কাজে মনোযোগ দিতে পারি নি। দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য দিগন্তে আবীর ছড়িয়ে পাটে বসছিলেন। আমার কবি বন্ধু নানকের মহিমা আবৃত্তি করতে করতে এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার বেশী দেরী ছিল না। সাথে সাথী প্রদীপ নিয়ে চলল। চারিদিকে বাতি নেই। বড় রাস্তাগুলোতে তখনও সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলে নি।

রাস্তার বাঁকে বাঁকে দুরন্ত ছেলেরা খেলাধুলোয় মত্ত ছিল। হস্পিট্যাল এরিয়া ছাড়িয়ে ষ্টেশনের দিকে পড়লাম। গ্রামের বধূরা ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালছিল। আমার মনে ভেসে উঠল বাংলার নিভৃত পল্লীর বিস্মৃতপ্রায় দৃশ্য। তুলসীমঞ্চে প্রদীপ-শিখারত গলবস্ত্র বঙ্গ পল্লীবালার সে চিত্র সহস্র মাইল দূরে কে শিখিয়ে দিল?

ভারতের গ্রামকে তখনও আমার চেনা ছিল বাকী। আমার কবি বন্ধু যশোবন্ত বলল, "এই যে এসে পড়েছি।" কুটীরের সামনে একটা গরু বাঁধা। মাটীর কলসী ভরা জল। পাশে ঝক্‌ঝকে গেলাস।

যশোবন্ত ভিতরে গিয়ে গৃহকর্তাকে ডেকে আনল। এখানকার সব ঘরেই ওর সমান যাতায়াত। সবাই ওকে 'গুরুপ্রিয়' বলেই ডাকে। যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁর নাম গোবিন্দরাম।

গোবিন্দ মুলতানের অধিবাসী। পাঞ্জাবী ভাষায় মুলতানী দেহাতীর টান আছে। লম্বা-চওড়া চেহারা। মুখখানা রক্তাভ। মাথায় পাগড়ী। পরনে ছিন্ন শালওয়ার। আমাদের সহস্র কুর্নিস করে দাঁড়াল। খাটিয়াতে বসলাম।

আমার সহস্র প্রশ্নে আমি নিজেই দ্বিধাবোধ করছিলাম। হঠাৎ লোকটা আমাদের ফেলে লাফ দিয়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল। আমার উদ্বেগ দেখে যশোবন্ত অভয় দিলেন, "ঘাবড়াবেন না, ও এখুনি আসছে।"

ঝক্‌ঝকে গ্লাস ভর্তি ফেনিল দুধ নিয়ে গোবিন্দরাম হাসিমুখে এসে দাঁড়ালো।

যশোবন্ত আমার কানে কানে বলল, "দুধটুকু চোখ-কান বুজে খেয়ে ফেলুন।" এই ওর আতিথেয়তা। না খেলে ওকে শক্ত বে-ইজ্জতি করা হবে।

যশোবন্তের আদেশ শিরোধার্য করলাম। কাঁচা ফেনিল দুধে চুমুক দিলাম। তা ছাড়া লোকটার আন্তরিকতাও আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

প্রশ্নরাশি শেষ করে উঠছি, এমন সময়ে মিনতির সুরে গোবিন্দ বলল, "তুমি দিল্লী থেকে আসছো? তাই না?"

বললাম, "হাঁ"—

"তাহলে রাজার সাথে রোজই দেখা হয়?"

বললাম, "কোন্ রাজা?"

"কেন? আমাদের মুখিয়া যে বলত রাজা দিল্লীতেই থাকে। তাকে দেখোনি কোনো দিন?"

বললাম, "ও হরি! তুমি জানো না গোবিন্দ, সে রাজা ত কবে এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে! এখন ত তোমার আমার, আমাদের সবার রাজ। যাকে খুশী গদীতে বসাও।"

যশোবন্ত দাড়ির ফাঁকে হেসে বলল, "বল ত চাচা তোমার জন্যও একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। সবাই পঞ্চায়েতে রায় দিলে দিল্লীর গদীতে তুমিও বসতে পারো।"

বৃদ্ধ বলল, "তামাসা করিস নি। তুই থাম, জ্যাঠা কোথাকার। জানিসটা কি শুনি? ইংরেজ রাজা ত চলে গেছে। তার গদীটা ত আর খালি নেই। বলি, নতুন রাজাও ত দিল্লীতেই থাকে?"

"ঠিক কথা। ঠিক কথা। তাকে কি কিছু বলতে হবে? বল ত গোবিন্দ—"

আমার দু'খানি হাত ধরে মিনতির সুরে সজল চোখে বৃদ্ধ বলল, "তুমি বলবে বাবুজী? বল তুমি বাদশাকে বলবে?"

আমি বললাম, "তোমার সমস্যাটা তো বল আগে।"

—"আমার বিজয়া।" বলেই বৃদ্ধ অশ্রু সংবরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

—কর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে আমি যশোবন্তের মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম ওর অবস্থাও সুবিধের নয়। চোখ দুটো বাষ্প-সজল।

আমি বললাম, "কি হয়েছে গোবিন্দ? বল, তোমার বিজয়ার কি হয়েছে। আমি নিশ্চয়ই দিল্লীতে খবর দেব। গোবিন্দ!"

—"জী!"

"—কোথায় তোমার বিজয়া?"

—"বাবুজী, পেটের দায়ে তাকে বিক্রী করে দিয়েছি। ভগবান আমাকে কেন তার আগে খতম করে দিলেন না? আমার বিজয়া—"

বলেই বৃদ্ধ হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করল। তার অশ্রু সংবরণের কোন পথই আমার জানা ছিল না।

বসে বসে না দেখা বিজয়ার চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করলাম। তরুণী যুবতী, তন্বী, সরলা বহু বিজয়ার চিত্র আমার চোখে ভেসে উঠল।

কিন্তু কে বিজয়া? মাতা? কন্যা? বধূসুন্দরী? কেমন করে জিজ্ঞাসা করি?

বৃদ্ধ বলল, "মাত্র একশ টাকার জন্ত পাষণ্ড হরিরাম আমার বিজয়াকে কিনে নিয়েছে। বিশ্বাস কর বাবুজী, ছ' মাস ধরে রোজ একবেলা খেয়ে পাঁচ কুড়ি টাকা জমিয়ে যখন হরির কাছে গেলুম বিজয়াকে ফিরিয়ে আনতে বেটা পাজী বলে কি না একশো কি হে? কমসে কম পাঁচশো টাকা ফেলে বিজয়াকে ফেরত নেবার কথা পাড়ো। বেইমান। কাম্বাক্‌ত্‌ বেটার পায়ে ধরে বললাম, আমার বিজয়া কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। ওকে ছেড়ে দাও হরি: বিধাতা তোমার মঙ্গল করবেন। মূলোর মতন লম্বা দাঁতগুলো বার করে বেটা বললে, "নিজের খাবার বন্দোবস্ত আগে কর চাচা! বিজয়ার চিন্তায় তোমার কাজ নেই।"

বাবুজী, বিজয়াকে আমি মুখ দেখাতে পারি না। সে দিন কাছে গেলাম আদর করতে। মুখ ফিরিয়ে নিল। দেখলাম বড় বড় চোখ দুটো তার জলে ভরে গেছে। চলে আসার পথে পিছনে ফিরে দেখি, একাগ্র নয়নে বিজয়া আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনে মনে বললাম, দু'টো দিন সবুর কর বিজয়া। তোকে আমি ফিরিয়ে নেবই।

চারি দিক ঘুরে ঘুরে দিন-রাত মজুরী খেটে আরও দু'কুড়ি টাকা জোগাড় করে হরির কাছে গেলাম। হরির পায়ে টাকা কটা দিয়ে বললাম, "হরি ভাই, তুই বড়লোক। দু' কুড়ি টাকা বেশী দিচ্ছি। বিজয়াকে ছেড়ে দে।" হরি তাকে ছেড়ে দিল না।

আমি তখন বললাম, "হরি, তোর ক্ষেতে কত লোক খাটে। আমি তোর জমিতে পুরো ছ' মাস গতর খেটে দেব। তুই আমার বিজয়াকে ছেড়ে দে। এখানে থাকলে ও আর বাঁচবে না। বাবুজী, বেটা শয়তান শুধু মুচকি হাসলো।"

বিজয়াকে অনেক খুঁজেও দেখতে পেলাম না। সত্যি বলছি, বাবুজী, বিজয়াকে ছেড়ে আমি বাঁচব না।

আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, "তাই যদি হবে, তবে ওকে বিক্রী করতে গেলে কেন? তখন এ সব কথা খেয়াল হয় নি?"

গোবিন্দরাম বলল, "বিশ্বাস কর বাবুজী, একটা কানাকড়ি পকেটে ছিল না। তাতে কোন দুঃখ ছিল না। যে বিধাতা এ পেট দিয়েছেন, দুঃখ সইবার শক্তিও তিনি কম দেন নি। আমার চিন্তা ছিল জয়া বিজয়াকে বাঁচানো। ওদের আমি খাবার জোগাতে পারছিলাম না। এই একশ টাকার এক পাই আমি নিজের জন্ত খরচ করিনি। জয়াকে খাইয়ে বাঁচিয়েছি। বাবুজী, তুমি রাজা হবে। দিল্লীতে খবরটা দিয়ে তুমি আমার বিজয়াকে ছাড়িয়ে দাও।"

আমার পা দু'টো জড়িয়ে বৃদ্ধ হাপুস নয়নে অশ্রুর গঙ্গা-যমুনা বইয়ে দিল।

অত্যন্ত দ্বিধার সাথে বললাম, "তোমার জয়া তো তোমার সাথে আছে। তাকে যত্ন করছ তো?"

"জয়ার কি হয়েছে জানি না। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। কেবল বোধ হয় বিজয়ার কথাই ভাবে। তুমি চল না বাবুজী! ভিতরে একবার চলো। দেখবে তাকে।"

কত কষ্ট করে মুলতান থেকে পায়ে হেঁটে ওদের নিয়ে বেঁচে এসেছি, সে দুঃখের কথা বিধাতা ছাড়া কেউ জানেন না। ঘর বাড়ী সম্পত্তি কিছুই তো আনতে পারিনি সাথে। আমার দরিদ্র জীবনে জয়া বিজয়া ছাড়া আর কেউ নেই। চলো না, দেখবে জয়াকে।

অনেকক্ষণ থেকেই মনটা আনচান করছিল। বৃদ্ধের সাথে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলাম। দু-একটা লাঙ্গল ছাড়া ঘরে বিশেষ কিছুই দেখলাম না। আমাকে টানতে টানতে একটা বলদের সামনে নিয়ে খাড়া করল। এক হাতে বলদটার গলায় হাত বুলিয়ে অন্ত হাতে তার মুখে খড় দিয়ে আদর করে বৃদ্ধ বলল, "বাবুজী, এই হল জয়া। বিজয়াকে যদি দেখতে। সে আরও লম্বা। আরও ফর্সা। তার শিং দুটো সোনালী রঙের। জয়া বিজয়া দুজনে মিলে পাথর থেকে সোনা ফলায়।" বলদটার গলা জড়িয়ে বৃদ্ধ বলল, "দিল্লীতে গিয়েই বাবুজী বিজয়াকে ছাড়িয়ে দেবেন। শুনছিস জয়া? জয়া কেমন করে তোমার দিকে তাকাচ্ছে দেখো বাবুজী, দেখো।"

গবেষণার ডিগ্রী আজও পাইনি। দুঃখ নেই তাতে। আমার ভারতবর্ষকে আমি চিনতে শিখেছি। আমি তাতেই খুশী।

সুমণি মিত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

(যুগ প্রয়োজন ও ঊনবিংশ শতাব্দী)

১

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন !
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" ১

* * *

"নরস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষো হরিনারায়ণো হ্যহম্।
কালে লোকমিমং প্রাপ্তৌ নরনারায়ণাবৃষী ॥" ২

* * *

এখানে প্রশ্ন তোলে মন,—
নিত্যমুক্ত আত্মা ঐ 'নর-নারায়ণ'
আবার এলেন কেন
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে,
যখন এ-দেশে
প্রচণ্ড প্রতিভারা তুলেছিলো ঝড়।
মহর্ষি, কেশব সেন, বিদ্যাসাগর
যখন কর্ণধার বাংলাদেশের,
তবু কেন সেই যুগে ফের
এলেন দুর্দ্ধর্ষ নর, ঋষি নারায়ণ ?
ঠাকুর-স্বামিজী এই যুগ্ম আত্মা
কি জন্যে এলেন ?

২

আমরা সেদিন
মদ ও মাংসের ঝাঁজে
একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন !
দুর্মদ ইংরিজী-আনা অচেতন সমাজের বুকে
ঝাঁকে-ঝাঁকে বোসেছিলো
শকুনির মতো ঝুঁকে ঝুঁকে !
বিশেষতঃ বাঙ্গালীর শিক্ষিত সমাজ
পরানুকরণ মোহে সব চেয়ে আগে,
সবচেয়ে অম্লানবদনে,
সবচেয়ে অসংযতভাবে
ঘাড় গুঁজে পোড়েছিলো ঐ
বহির্মুখী বিদেশীর জান্তব জীবনের পাঁকে !

বহুকাল ধোরে
খাঁটি ইংরিজী বুলি বোলে
মাতলামি কোরেছিলো প্রচণ্ড প্রলাপে !
সেদিনের সাহিত্যে সে দুঃস্বপ্নের কথা লেখা আছে,—
"I read English, write English
Talk English, speechify in English,
Think in English, Dream in English." ৩

* * *

"পুরাকালে ভূতে পেতো
মদ-মাংসে পেয়েছে এ-কালে"···,
মাতলামি কোরে কিন্তু
'নিমেচাঁদ' ঠিক কথা বলে। ৪

১। "শ্রীভগবান বোল্লেন—'হে পরন্তপ অর্জুন, আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হোয়েছে। আমি সেসব জানি ; কিন্তু তুমি তা' জানো না (ভুলে গিয়েছো) আমার সেই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকে আশ্রয় কোরে স্বীয় মায়ার দ্বারা আমি দেহধারণ কোরি।

হে ভারত, যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃজন কোরি। সাধুদের রক্ষা, পাপীদের দুষ্কৃতিনাশ এবং ধর্মস্থাপনের জন্যে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।'—"

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (৪র্থ অধ্যায়)।

২। "হে অর্জুন, তুমি দুর্দ্ধর্ষ নর, আমি নারায়ণ হরি। আমরা সেই 'নর-নারায়ণ' ঋষি, কালক্রমে এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হোয়েছি।"

—মহাভারত (উদ্যোগ পর্ব)

৩। "আমি ইংরিজী পোড়ি, ইংরিজী লিখি, ইংরিজীতে কথা বোলি, ইংরিজীতে বক্তৃতা দি', ইংরিজীতে চিন্তা কোরি এবং ইংরিজীতে স্বপ্ন দেখি।"—সধবার একাদশী।

৪। সে-যুগে মদ না খেলে সমাজে কেউ শিক্ষিত বোলে স্বীকৃত হোতোনা। স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষের ভাগ্নে গ্র্যাজুয়েট হোয়েছিলো কিন্তু মদ খেতোনা। ঘোষমশাই অত্যন্ত দুঃখিত হোয়ে বোলেছিলেন,—"তুই মদ খেতে শিখলি না, তোকে আমি সমাজে বার কোরি কি কোরে ?"

৩

আর ও-দিকে মিশনারীগণ
তাগ বুঝে 'হিদেন্'কে অন্ধকার থেকে
টেনে-হিঁচড়ে আনেন আলোকে।
বানুকরণে আর আত্মবিস্মরণে
ন্ধ বাঙ্গালী যতো গাধাদের মতো
ান দুটো খাড়া কোরে মন দিয়ে শোনে,—
"তোমাদের দেব-দেবী, আচার-বিচার
পৈশাচিক, অনন্ত নরক ;
Crystallized immorality
And Hinduism
Are samething.৫

যীশু আছে ভয় নেই,
পাপীদের পরিত্রাতা তিনি,
তাঁর পায়ে পড়ো,
আর
'বাইবেল' বুকে চেপে
প্রাণপণে অনুতাপ করো।"

* * *

বিজয়ী জাতির গুণে অভিভূত বিজিত জাতের
তরল মনের খাসা উর্বর জমিতে
এইভাবে শ্বেতচাষাগণ
ধর্ম-বিদ্বেষের বিষ মুঠো মুঠো ছড়াতে থাকেন !
সেদিনের শিক্ষিত সমাজ
পাদ্রীদের কথাতেই ওঠে-বসে-নাচে,
'পৈশাচিক হিন্দুধর্ম' ফেলে পত্রপাঠ
খৃষ্টান্ হোয়ে তবে বাঁচে !

৪

আরও একটা দল ছিলো
'ডিরোজিও' জাতে, ৬
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নামে
অসম্ভব মদ খেয়ে মাতে !

নিজেদের ধর্মবাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
লজ্জা ঢাকেনা এরা আর কোনোটাতে !
ফরাসীবিপ্লব-বিষ পেট ভোরে খেয়ে
যে-ডালেতে থাকে এরা সেই ডাল কাটে
সন্দেহের ভীষণ আকার
কুমীর আনবে বোলে
একমনে কোযে খাল কাটে !

৫। "স্ফটিকাকারে ঘনীভূত অপবিত্রতা আর হিন্দুধর্ম একই জিনিষ।"

৬। সেকালে হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা কোলকাতা সহরে যে সমাজ-বিপ্লব সুরু কোরেছিলো, তার জনক হোলেন আধা-ইউরোপী ও আধা-ভারতীয় এই তরুণ প্রতিভাশালী শিক্ষক 'ডিরোজিও'। 'ডিরোজিও' যথার্থই ভারতবর্ষকে ভালোবেসেছিলেন এবং ফরাসী-বিপ্লব-সাগর মন্থন কোরে ভারতের জন্ম শুধু অমৃতই আনেননি, গরলও এনেছিলেন। 'The Fakir of Janghira' নামক কাব্যগ্রন্থটি তাঁর ভারত-প্রেমের একটা চূড়ান্ত নিদর্শন। 'ডিরোজিও' মাত্র ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। ১৭ বছর বয়েসেই এই দৃঢ়হৃদয় প্রতিভাবান অধ্যাপক হিন্দুকলেজের ছাত্রদের নিয়ে এই নতুন সমাজ-বিপ্লব সুরু করেন। তাঁর মূলমন্ত্র ছিলো—'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সর্বতোভাবে উপভোগ কোরতে হবে।' এতে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহায়ে সত্যানুসন্ধানের একটা স্পৃহা জেগেছিলো, সংস্কারমুক্ত বুদ্ধি দিয়ে সবকিছুকে যাচাই কোরে নেবার একটা প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছিলো। তাঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং ভারতের Demosthenis স্বনামধন্য শ্রীরামগোপাল ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কালক্রমে পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দীক্ষায় স্বেচ্ছাচারী ছাত্রেরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা সুরু কোরে দিলে : নিষিদ্ধ মাংস খাওয়া, প্রকাশ্যে সুরাপান করা—এইসব দুঃসাহসের কাজ বোলে বিবেচিত হোতে লাগলো। হিন্দুধর্মের সবকিছুকেই কুসংস্কার বোলে ধোরে নিয়ে মদ্যপানকেই কুসংস্কারভঞ্জনের একমাত্র উপায় মনে কোরে এরা মদিরা-স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলো : শুধু হিন্দুধর্মকেই নয়, সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা উপভোগ কোরতে গিয়ে শেষপর্যন্ত এরা কোনো ধর্মকেই গ্রহণ কোরতে পারেনি। এদের হঠকারিতা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা সে-যুগের সমাজের সমস্ত শ্রেণীর কাছেই অসহ্য হোয়ে উঠেছিলো। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের এই পৈশাচিক আচার-ব্যবহার দেখে রাজা রামমোহন অত্যন্ত বিচলিত হোয়েছিলেন। আজীবন 'অন্ধবিশ্বাসে'র বিরুদ্ধে যিনি যুক্তির খড়্গ ধোরেছিলেন, সেই বুদ্ধিবাদী রামমোহন শেষজীবনে হিন্দুকলেজের এই যুক্তিবাদী ছাত্রদের স্বেচ্ছাচার আর 'অল্পবিশ্বাস' দেখে রীতিমতো শিউরে উঠেছিলেন। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন,—

"In his younger years, his mind had been deeply struck with the evils of believing too much, and against that he directed all his energies ; but in his latter days, he began to feel, that there was as much, if not greater danger in the tendency to believe too little. He often deplored the existence of a party which had sprung up in Calcutta, composed principally of imprudent youngmen, some of them possesing talent, who had avowed themselves scepties in the widest sense of the term. He described it as partly composed of East Indians, partly of the Hindu youths who, from education had learnt to reject their own faith without substituting any other, these he thought more debased than the most bigoted Hindu, and their principles the bane of all morality."

—Biography of Raja Ram Mohan Roy, London.

৫

আর,
ওদের কি দোষ ?
শতাব্দী-সঞ্চিত ঐ কুসংস্কারে কানা
সেদিনের মর্‌চে-পড়া হিন্দুধর্ম তার
দুর্বহ ওজন নিয়ে বেদ-বেদান্ত থেকে
পিছলে এসে পোড়েছিলো
রান্নাঘরে 'ভাতের হাড়িতে' !

ধর্মের রক্ষক যারা, হিন্দুধর্মটাকে
স্ত্রী-আচার-দেশাচারে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে,
'জ্ঞান-মার্গ', 'ভক্তি-মার্গ,' 'যোগ-মার্গ' থেকে
'ছুঁৎ-মার্গে' পোড়ে স্রেফ খাবি খাচ্ছিলো !
এই ঘোর 'বামাতন্ত্রে' মূলমন্ত্র হোলো—
'আমায় ছুঁয়োনা কেউ, ছুঁলে জাত যায় !'
পাগলাগারদটাকে 'ব্রহ্মলোক' ভেবে,
দুই কিংবা ততোধিক উপপত্নী রেখে
অপবিত্র দুনিয়াকে দুচোখ রাঙায় !৭

৬

এমন সময়
উন্নত বলিষ্ঠ ঋজু রামমোহনের
'বেদান্তে'র বেত্রাঘাতে
সেদিনের তন্দ্রাতুর জাত
প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে চোখ তুলে চায় ।
দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হোয়ে
'মার্স্‌ম্যান্,' 'কেরী'-ফেরি যতো ৮
প্রবল বেদান্ত-যুদ্ধে
একে একে হোলেন আহত ।
ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে ঐ
জড়পিণ্ডবৎ স্থাণু হিন্দু জাতটাকে,
একাই একশো হোয়ে রাজা একটানে
পঙ্কশয্যা থেকে তাকে
ঝুঁটি ধোরে বার কোরে আনে !

৭

যুগের সারথি তুমি 'ভারত-পথিক',
আধুনিক ভারতের স্রষ্টা তুমিই ।
অসীম দৃঢ়তা নিয়ে বুকে
হৃদয় ও বুদ্ধিকে জাগ্রত রেখে
যুগের মূঢ়তা আর অন্ধতা যতো
বিদূরিত কোরে গ্যাছো তুমি ।
'সতীদাহ' প্রথাটাকে দাহ কোরে তুমি ৯

৭। সেকালের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বামিজীর মতামত প্রণিধান-যোগ্য—"আমাদের কি আর ধর্ম ? আমাদের 'ছুঁৎমার্গ,' খালি 'আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা ।' যে-দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু'হাজার বছর খালি বিচার কোরছে, ডান হাতে খাবো, কি বাঁহাতে, ডান দিক থেকে জল নেবো, কি বাঁদিক থেকে—তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে ?...ক্রোর টাকা খরচ কোরে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলচে আর পড়চে । এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি কোরছেন—এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্চে । ভোগের সময় ব্রাহ্মণেতর জাতের স্পর্শে দোষ নেই—ভোগ সাঙ্গ হোলেই স্নান,...সাধু সন্ন্যাসী, আর ব্রাহ্মণ বদ্‌মাস দেশটা উৎসন্নে দিয়েছে । দেহি দেহি চুরি বদ্‌মাসি—এরা আবার ধর্মের প্রচারক ! পয়সা নেবে, সর্বনাশ কোরবে আবার বলে—ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা—আর কাষ তো ভারি—'আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তাহোলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে ?' '১৪ বার হাতে মাটি না কোরলে ১৪ পুরুষ নরকে যায়, কি ২৪ পুরুষ'—এই সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কোরেছেন আজ ২ হাজার বছর ধোরে । এদিকে ¼ of the people are starving" পত্রাবলী (১ম ভাগ, পৃ: ১৫৬ ও ৪৫৬) ।

৮। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং লুপ্তপ্রায় উপনিষদ প্রচার এবং পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন । কেবল হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই নয়, মিশনারী প্রচারিত অসার মতবাদের বিরুদ্ধেও তিনি লেখনী ধারণ করেন । ফলে প্রাচীন-পন্থী হিন্দুসমাজ এবং খৃষ্টান মিশনারী—দু'পক্ষই বিশেষ ভাবে বিচলিত হন । ১৮২১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম আডাম নামে একজন খৃষ্টান মিশনারী খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ কোরে রামমোহনের একেশ্বরবাদ গ্রহণ করেন । এই ব্যাপার নিয়ে মিশনারী মহলে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হোয়েছিলো । দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হোয়ে ম্যার্স‌ম্যান, কেরী প্রভৃতি শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বেদান্তদর্শনকে আক্রমণ কোরলেন । রামমোহন দৃঢ়চিত্তে তাঁদের অযৌক্তিক মতামতগুলো একে একে খণ্ডন কোরতে লাগলেন । এই বিখ্যাত বেদান্ত-যুদ্ধ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা । একদিকে হিন্দুদের শতাব্দীসঞ্চিত কুসংস্কার, আর একদিকে মিশনারীদের আক্রমণ,—দু'য়েরই বিরুদ্ধে রামমোহনকে একাই দৃঢ়চিত্তে এবং ধীরভাবে সংগ্রাম কোরতে হোয়েছে ।

৯। 'সতীদাহ' প্রথা বৃটিশ সরকার রদ করেনি । এ ব্যাপারে স্বামিজীর মতামত প্রণিধানযোগ্য ।

"The great Hindu reformer, Raja Rammohan Roy, was a wonderful example of unselfish work. He devoted his whole life to helping India. It was he who stopped the burnning of widows. It is usually believed that this reform was due entirely to the English; but it was Raja Ram Mohan Roy who started the agitation against the custom and succeeded in obtaining the support of the Government in suppressing

'জাতিভেদ', 'শ্রেণীভেদ' ভেঙ্গে
অমিতবিক্রমে
নোংরা সমাজটাকে
একা হাতে সাফ কোরে গ্যাছো।
বিধি আর নিষেধের দড়া-দড়ি ছিঁড়ে
'কালাপানি' পার হোয়ে
টাকে সচল কোরেছো।

স্বামিজী তো ঠিকই বোলেছেন,—

"One of the great causes
Of India's misery and downfall
Has been
That she narrowed herself,
Went into her shell
As the Oyster does,
And refused to give her Jewels
And her treasures
To the other races of mankind,
Refused to give life-giving truths
To thirsting nations
Outside the Aryanfold

That has been the one great cause,
That we did not go out,
That we did not compare notes with other nations,—
That has been the one great cause
Of our downfall,
And every one of you knows
That that little stir,
The little life that you see in India
Begins from the day
When Raja Ram Mohan Roy
Broke through the walls of that exclusiveness.

it. Until he began the movement, the English had done nothing."—Inspired Talks (Comp. works. Vol VII 84) সুরেন ব্যানার্জীও এতে সায় দিয়েছেন, "Without him the law could never have been passed."

Since that day,
History in India
Has taken another turn,
And now
It is growing with accelerated motion." ১০

* * *

তুমি যা' কোরেছো রাজা,
তার তুলনায়
যা' করোনি—সেটা কিছু নয়।
গণিত, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি এনে,
জাতীয় শিক্ষাটাকে বিজ্ঞানে টেনে,
আমাদের ক্ষীণ স্নায়ুটাতে
সাঙ্ঘাতিক রোমাঞ্চ তুলেছো!

হিন্দু ও মুস্লিম—দু'য়েরই যখন
ঐক্যের শিথিলতা ঘ'টেছে চরম,
তোমার ঐক্যবোধে তার
মধুর মিলন-সেতু গ'ড়েছো তুমিই,
সমন্বয় ধর্মের সত্যতা কোরেছো প্রচার।

জঙ্গ-ধরা হিঁদুত্বটাকে
বেদান্তে চুবিয়ে তুমি
ঘ'ষে-মেজে তার
লুপ্ত শোভা কোরেছো উদ্ধার।১১

সাহচর্য দূরে থাক,
সেদিনের হিন্দুর দল
তেড়ে কামড়াতে এসে
অবিশ্রান্ত কোরেছে চিৎকার!১২

৮

তুমি নির্ঘাত
John the Baptist,
"...The voice of one
Crying in the wilderness,
Make straight
The way of the Lord..."

ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে
কেন বোললে না খুলে তুমি,—
"...There standeth one among you,
Whom Ye know not;
He it is,
Who coming after me
Is preferred before me,...?" ১৩

* * *

তা-সে-যাই-হোক্,
শতাব্দীর ব্যবধানে
আমাদের জাত
একথাটা ঢুকেছে মাথায়—
অবতার আসার আগেই
দারুণ দীপ্তি নিয়ে
ঝাঁটা হাতে আসে অগ্রদূত!

[ক্রমশঃ।

১০। "ভারতের পতন এবং দুঃখ দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ,—ভারত নিজের কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত কোরেছিলো, শামুকের মতো দরজায় খিল দিয়ে বোসেছিলো, আর্য ছাড়া অন্যান্য সত্যপিপাসু জাতের কাছে নিজের রত্নভাণ্ডার—জীবনপ্রদ সত্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেনি। আমাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ, আমরা বিদেশে গিয়ে অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমাদের তুলনা কোরে দেখিনি, আর আপনারা সবাই জানেন, যেদিন থেকে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙ্গলেন, সেই দিন থেকেই—আজ ভারতের সর্বত্র যে একটু প্রাণ-স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হোচ্ছে—তার সুরু।"

—Lectures From Colombo to Almora (Page—244)

১১। রামমোহন প্রসঙ্গে স্বামিজী সিস্টার নিবেদিতাকে বোলেছিলেন—তাঁর বাণীর প্রধান সুর হোচ্ছে তিনটে,—

"...his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussalman equally with the Hindu.

In all these things, he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Ram Mohan Roy had mapped out."

—Notes of some wanderings
with the Swami Vivekananda
by
Sister Nivedita

১২। প্রাচীন হিন্দুসমাজ সত্যবিধবাকে পুড়িয়ে মারবার সুযোগ হারিয়ে রামমোহনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। স্যার রাধাকান্তের দল এইবার তাঁর মূর্তিপূজো অস্বীকার এবং বেদান্ত আন্দোলনকে প্রতিবাদ কোরতে লাগলেন। এই বাদানুবাদের মধ্যে দেশপ্রেম কতোখানি ছিলো জানি না, তবে কুরুচি এবং ঈর্ষার পরিমাণ নিতান্ত কম ছিলো না।

১৩। বাইবেলে 'St. John'এ খৃষ্টের অগ্রদূত 'John the Baptist' এর কথা লেখা আছে। জুয়েরা তাঁকে তাদের শাস্ত্রোক্ত অবতার ভেবে যখন প্রশ্ন কোরেছিলো,—"Who art thou?" তখন John উত্তর দিয়েছিলেন,—"I am not the Christ." —"What then?...what sayest thou of thyself?"

তার উত্তরে John বোলেছিলেন—"I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord...But there standeth one among you, whom Ye know not; He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose."

হে উদ্দাম পশ্চিম বাতাস

(পি. বি. শেলীর '*Ode to the West Wind*' কবিতার অনুবাদ)

(১)

হে উদ্দাম পশ্চিম বাতাস, তুমি মূর্তিমান শরতের শ্বাস,
তোমারই অদৃশ্য উপস্থিতি থেকে মৃত পত্রদল
বিতাড়িত ঐন্দ্রজালিকের থেকে যেমন ভূতেরা উর্দ্ধশ্বাস।

পীতাভ ... কৃষ্ণ, মলিন, এবং জ্বরতপ্ত ও পাটল,
মহামারী-... বলিত সংখ্যাহীন তারা; আর তুমি,
তাদের সা... থ্য করো অন্ধকার শীতের শয্যায় মহাবল!

সপক্ষ বীজেরা, শুয়ে আঁকড়িয়ে ঠাণ্ডা নিম্নভূমি,
প্রতিটি শবের মত কবরে আবদ্ধ হয়ে থাকে, যতক্ষণ
তোমার বাসন্তী নীল ভগ্নী না বাজায় নিজে চুমি'

সিঙা তার স্বপ্নময় পৃথিবীতে, করে সম্পূরণ
(মধুর কোরকগুলি মেষের মতন নিয়ে চরিয়ে হাওয়ায়)
জীবন্ত রঙে ও গন্ধে সমতল, পর্বত গহন:

হে উদ্দাম-সত্তা, সর্বদেশে তুমি ধাও;
ধ্বংসকারী এবং রক্ষক তুমি, শোনো, শুনে যাও!

(২)

তোমারই প্রবাহে ঢালু, শক্ত আকাশের সঞ্চালনে,
খণ্ড-ছিন্ন মেঘপুঞ্জ, পৃথিবীর বিশীর্ণ পাতার মত ঝরে,
আকাশ ও সমুদ্রের থেকে, যেন গ্রন্থিল শাখার আন্দোলনে।

বৃষ্টি ও বজ্রের ওরা দেবদূত; প্রসারিত থাকে থরে-থরে
যে তোমার বায়বীয় তরঙ্গ, সুনীল বুকে তার,
যেমন উজ্জ্বল কেশ উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত মাথার উপরে।

ভয়াবহ প্রচণ্ডার, এমন কি দিগন্ত-রেখার
অস্পষ্ট প্রান্তের থেকে মধ্য-আকাশের উচ্চমান
আসন্ন ঝড়ের কেশরাশ। তুমি শোকগীতি তার।

যে-বর্ষ মুমূর্ষু, তার এই রাত্রি প্রত্যাসন্ন যার লগ্নমান
বিশাল সমাধি-শীর্ষে গড়বে গম্বুজ তার, তাও
করবে খিলান সব তোমার বাষ্পীয়শক্তি হয়ে একতান,

তারই নীরন্ধ্র শূন্য থেকে কৃষ্ণবৃষ্টি, বহ্নি আর করকাও
ঝরে যাবে; ওগো তুমি শোনো, শুনে যাও!

(৩)

তুমিই জাগালে গ্রীষ্ম-স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা
নীল ভূমধ্যসাগর, সে যেখানে থাকতো শায়িত,
তাকে ঘুমপাড়াতো কুণ্ডলীকৃত স্ফটিক স্রোতেরা,

'বেয়ী' উপসাগরে আগ্নেয়শিলা-নির্মিত দ্বীপের সন্নিহিত,
এবং দেখতো ঘুমে প্রাচীন প্রাসাদ হর্ম্যাবলী
তরঙ্গের তীব্রতার দিনে আন্দোলিত,

সুনীল শৈবালে, ফুলে আচ্ছন্ন সকলই
কী সুন্দর, অনুভূতি মূর্চ্ছাহত সে চিত্র চিত্রণে!
তোমার পথের জন্যে আটলান্টিক সমতার বলী,

জলেরাও নিজেদের দীর্ণ করে, আবর্তের গর্ভে, বহু নিচে
সমুদ্র-শৈবাল আর কর্দমাক্ত বন, ভরে তাও
সাগরের নীরস পাতায়, তারা জানে কী যে

তোমার গর্জন, আর সহসাই ভয়ে পাংশু গা-ও,
কাঁপে, আর নিজেদের নষ্ট করে: ওগো শুনে যাও!

(৪)

আমি হলে মৃত পত্র, তুমি টেনে নিতে;
দ্রুতগামী মেঘ হয়ে তোমার সাথেই যদি হতাম উড্ডীন;
অথবা একক ঢেউ, কেঁপে উঠে তোমার শক্তিতে,

পেতাম কিছুটা অংশ ক্ষমতার প্রভাবের, অল্পই স্বাধীন
তোমার অপেক্ষা, হে দুর্দমনীয়! এমন কি যদি
হতাম শৈশবকালে আমি যা ছিলাম, আর আমি অর্বাচীন,

হতাম তোমার সঙ্গী ভ্রমণের—আকাশ পরিধি;
এবং তখন যদি তোমার আকাশগতি অতিক্রমণ
করার কচিৎ স্বপ্ন মনে হতো, বিরত হতাম সে অবধি

এ-প্রচেষ্টা থেকে যা তোমার সঙ্গে প্রার্থনার তীব্র প্রয়োজন।
ওগো তুলে নাও আমাকে তরঙ্গ, পাতা, অথবা মেঘের মত!
জীবনের কাঁটাবনে পড়ি আমি! দেহে হয় শোণিত ক্ষরণ!

সময়ের গুরুভারে শৃঙ্খলিত এবং আনত
তোমারই মতন একজন: দুর্দম এবং দ্রুত, এবং উদ্ধত।

(৫)

আমাকে তোমার বীণা করে নাও, এমন কি বনের মতন;
কী বা হবে তারই মত ঝরে যদি আমার পাতারা ঝুর-ঝুর!
উচ্চকিত তোমার বিপুল তান-লয়-সম্মেলন

উভয়ের থেকে নেবে, গভীর শারদ কোনো সুর,
যা দুঃখেও মধুস্রাবী। হও তুমি হে সত্তা ভীষণ,
আমার জীবন! আর তুমি হও উত্তেজক আমার স্নায়ুর!

আমার নিষ্প্রাণ চিন্তাগুলি বিশ্বে করো বিসর্জন
বিশীর্ণ পাতার মত নূতন জন্মকে দিতে গতি!
আর এই কবিতার এ-মন্ত্রেই করো সমর্পণ

জ্বলন্ত চুল্লীর থেকে যেন ভস্ম, স্ফুলিঙ্গ-সংহতি,
আমার বাক্যের রাশি, মানুষের মাঝে, গুচ্ছময়!
আমার ওষ্ঠের থেকে অজাগ্রত পৃথিবীর প্রতি

ভবিষ্যদ্বাণীর শঙ্খ বাজাও! হে বায়ু বরাভয়,
শীত যদি আসে তবে বসন্ত কি বহু দূরে রয়?

অনুবাদ: গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানবার্তা
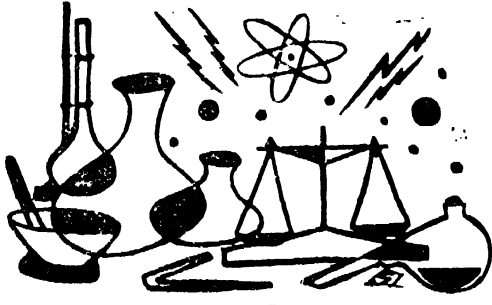
পক্ষধর মিশ্র

বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং,—কথাটা আপনাদের কাছে নতুন মনে হতে পারে। বিজ্ঞানের এই নতুন শাখার সাহায্যে আশা করা যায়, মানুষ অদূর ভবিষ্যতে তার খাদ্যসমস্যার সমাধান ঘটাতে পারবে। পৃথিবীতে জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার দেখে চিন্তাবিদরা শঙ্কিত হয়ে উঠছেন,—এর সঙ্গে খাদ্যের উৎপাদনের একটা সমতা রক্ষা না করতে পারলে পৃথিবীতে নেবে আসবে এক অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়।

বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কি ভাবে মানুষকে সাহায্য করবে? উদ্ভিদ-জগতই আমাদের খাদ্যের অপর্য্যাপ্ত উৎস, আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম খাদ্যসম্ভারই সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে। বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে আমরা উদ্ভিদ-জগত থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য উদ্ধার করে নিতে সক্ষম হবো। সব রকম উদ্ভিদ আমরা গ্রহণ করতে পারি না, কারণ তাদের মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিন ইত্যাদির সঙ্গে আরও বহুপ্রকার বস্তু একাত্ম ভাবে মিশে রয়েছে—যা মানবদেহের পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়। যে বস্তুটি আমাদের পরিপাক শক্তির সঙ্গে শত্রুতা করছে আলাদা ভাবে হয়তো তা মানুষের অন্য কোন কাজে লাগতে পারে। কিন্তু মজাটা দেখুন,—এক সঙ্গে মিশে থাকার জন্য দুটি বস্তুকেই আমাদের পরিত্যাগ করতে হচ্ছে। আশা করা যায়, বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে এদের পৃথক করে কাজে লাগান যাবে। ধান অথবা তুলোর এতো আদর কেন? তার কারণ অতি সহজেই এদের উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক করে কাজে লাগান যায়। ঘাসের মধ্যে প্রচুর খাদ্যগুণ থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য পদার্থের উপস্থিতির জন্য এর খাদ্যমূল্য খুবই কম, গম বা তুলোর মতো এর প্রয়োজনীয় অংশটিকে পৃথক করে নেওয়া যায় না; তাই এর পরিমাণ অপর্য্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ একে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছে না। ঘাসের থেকে খাদ্যশক্তি মানুষ অন্য ভাবে সংগ্রহ করে। গরু ঘোড়া ইত্যাদি প্রাণী ঘাস খায়, ঘাসের খাদ্যাংশ তাদের দেহে পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে জমা হয় প্রোটিনরূপে, সেই প্রোটিন মানুষ খাদ্য হিসাবে কাজে লাগায়। প্রাণীর দুধের এবং মাংসের মধ্যে দিয়ে মানুষ আস্বাদ পায় ঐ খাদ্যশক্তির। অনেক বিজ্ঞানীর মতেই উদ্ভিদ-দেহের খাদ্যমূল্যের এই রূপান্তর অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। উদ্ভিদের যে অংশ পৃথক করা সম্ভব হলে মানুষ ব্যবহার করতে পারতো তার মাত্র শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ প্রাণিদেহের মধ্যে দিয়ে ফেরত পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা তাই বলছেন, কোন ক্রমে উদ্ভিদ থেকে এই প্রোটিনকে সোজা বার করে নেওয়া সম্ভব হলে পৃথিবীতে অবস্থিত অপর্য্যাপ্ত উদ্ভিদের কল্যাণে মানুষ তার খাদ্য-সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে পারবে। পৃথিবীর তৃণভূমি ও নিরক্ষীয় অঞ্চলে যে পরিমাণ ঘাস ও অন্যান্য গুল্মাদি জন্মায়, গবাদি পশুর খাওয়ার পরও তার এক বৃহৎ অংশ হয় নষ্ট। বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে আশা করা যায়, এই উদ্ভিদ সমূহ থেকে মানুষ তার ভবিষ্যতের খাদ্য খুঁজে বার করবে।

* * * *

বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির প্রয়োগ ও প্রসারের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা হলেন রথামষ্টেড এক্সপেরিমেণ্টাল ষ্টেশনে বিজ্ঞানী পিরী সাহেব। তাঁর মতে বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানের কোন একটা নতুন শাখা নয়। জীবরসায়ন, জৈবরসায়নের প্রচলিত জ্ঞান ও ধারণার সঙ্গে উৎপাদন-শিল্পবিজ্ঞানের যান্ত্রিক কলাকৌশলের মিশ্রণ ঘটিয়েই এর উৎপত্তি হয়েছে। তেল, রবার এবং ষ্টার্চ প্রস্তুত প্রণালীকেও মোটামুটি এই শ্রেণীর মধ্যেই ফেলা যায়। গাছের পাতা থেকে প্রোটিন পৃথক করার চেষ্টা গত কয়েক বছর ধরেই রথামষ্টেড গবেষণাগারে চলছে, ফলাফলও মোটের উপর শুভ। সেখানে তাঁরা যে যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করেছেন তার সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় ৩০ অশ্বশক্তি খরচ করে ২ টন প্রোটিন মিশ্রিত রস গাছের পাতা থেকে নিষ্কাশণ করা সম্ভব। প্রথমে প্রোটিন সমন্বিত রস নিষ্কাশণ করা হয়। মোটামুটিভাবে পাতার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ প্রোটিন রসের সঙ্গে বার হয়ে আসে। তারপর ঐ ঠাণ্ডা তরল পদার্থটিকে কোঅ্যাগুলেসন যন্ত্রে প্রবেশ করান হয়। উপর দিয়ে নিচের দিকে নামে ঐ তরল পদার্থ এবং নিচের থেকে উপরের দিকে পাঠান হয় গরম বাষ্প। গরমে ঐ তরল পদার্থের মধ্যের প্রোটিন যায় জমে ঘন হয়ে। এখন কেবল ছেঁকে নিলেই জমাট প্রোটিনকে পরিত্যাগ করে তরল পদার্থের সঙ্গে অন্যান্য বস্তু বার হয়ে যাবে। এই হোল উদ্ভিদ-জগতের প্রোটিন পৃথক করার মূল বক্তব্য,—এ ছাড়া অন্যান্য যান্ত্রিক বা বৈজ্ঞানিক জটিলতার কথা এখানে আর আলোচনা করা হোল না। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার ফলে প্রোটিন ছাড়াও আর একটি বস্তু আমরা পাব,—রস নিষ্কাশণ করার পরে পাতার যে শুষ্ক অংশ পড়ে থাকবে, জ্বালানী হিসাবে তার মূল্য যথেষ্ট বেশী। বিশেষ করে আমাদের দেশে জ্বালানী হিসাবে এই বস্তুটি যথেষ্ট সমাদৃত হবে।

বিজ্ঞানী পুটনামের, 'ভবিষ্যৎ কালের শক্তি' নামক পুস্তকে আমরা কয়েকটি চমৎকার তথ্যের সন্ধান পাই। সেই বইটিতে তিনি ১৮৬০ সালে সারা জগতে জ্বালানী ব্যবহারের বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। তখন জ্বালানী ব্যবহারে ভারতবর্ষ যথেষ্ট অগ্রগামী ছিল এবং ব্যবহৃত জ্বালানীর প্রধান অংশ অধিকার করে থাকতো বনের কাঠকুটো আর শুকনো গাছপালা। আজকের দিনেও সম্ভব হলে ঠিক এই ভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই শুকনো গাছপালা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের পক্ষে পুটনাম দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেছেন, এর দ্বারা কয়লার অপচয় হয় রোধ, জ্বালানী পরিবহনের সমস্যা মেটে এবং কৃষিক্ষেত্রের শুকনো জঞ্জালের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষকদের কিছু আর্থিক লাভ হয়। সারা জগতেই

যখন ... অবস্থা, তখন ভারতবর্ষের কথাটা একবার চিন্তা করে দেখুন ...পাতা আর ঘাস থেকে তৈরী হবে প্রোটিন, সেই প্রোটিন ভারতবাসীকে খাদ্য জোগাবে। এই শিল্পে আবর্জ্জনারূপে উদ্ভিদের যে শুকনো অংশ থাকবে পড়ে তা দেবে জ্বালানী। কেবল সাশ্রয়ের কথাই নয়, জ্বালানী হিসাবে এই শুকনো উদ্ভিদ-দেহের মূল্য খুবই বেশী।

* * * *

উইলিয়াম হেনরী ব্র্যাগ্

১৮৬২ সালের ২রা জুলাই ইংল্যাণ্ডে, কাম্বারল্যাণ্ডের ওয়েষ্টওয়ার্ডে, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী উইলিয়াম হেনরী ব্র্যাগ-এর জন্ম হয়। মাত্র সাত বছর বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয় এবং তাকে লিচেষ্টার-সায়ারের একটি গ্রামার স্কুলে লেখাপড়া শেখার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর পর তিনি কিংস উইলিয়াম কলেজে ভর্ত্তি হন এবং এখানেই গণিত-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ জন্মায়। ১৮৮১ সালে, ১৯ বছর বয়সে ব্র্যাগ কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্ত্তি হন এবং গণিত-বিজ্ঞানে ট্রাইপস্ লাভ করেন। ট্রিনিটি কলেজে তিনি তৃতীয় র‍্যাংলারের সম্মান পেয়েছিলেন, এবং এখানেই পদার্থবিদ্যায় বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী জে, জে, টমসনের বক্তৃতা শুনবার সৌভাগ্য তাঁর হয়।

১৮৮৫ সালে সুদূর অষ্ট্রেলিয়া থেকে ব্র্যাগের ডাক এলো। বয়স তখন তাঁর মাত্র তেইশ বছর, তিনি অ্যাডিলেড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ ও গণিত বিদ্যার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করবার জন্য আহ্বান পেলেন ১৮৮৬ সালে ব্র্যাগ ঐ পদে যোগদান করেন, এবং তাঁর প্রথম জীবনের গবেষণা আরম্ভ হয় ঐ অষ্ট্রেলিয়াতেই। জীবনের প্রায় তেইশ বছর সময় তিনি এই দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়াতেই অতিবাহিত করেন; এখানে তিনি তেজস্ক্রিয়তার উপর গবেষণা করেছিলেন। গবেষণার ফলাফল অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিল। ১৯০৬ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্ব্বাচিত হলেন।

আবার ইংল্যাণ্ড। ১৯০৮ সালে তিনি লিড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেণ্ডিস অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করার জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আহ্বান এলো। এই পদ গ্রহণ তিনি করলেন বটে, কিন্তু সমর-বিজ্ঞানের নানাপ্রকার সমস্যা সমাধানের জন্য নৌবিভাগের কাজে ১৯১৯ সালের আগে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে পারেন নি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি সরকারকে আবিষ্কার এবং গবেষণা বোর্ডের একজন সদস্য হিসাবে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করেছিলেন। ১৯২৩ সালে বিজ্ঞানী ব্র্যাগ রয়েল ইনসটিটিউসন অফ গ্রেট ব্রিটেনের ডিরেক্টার নিযুক্ত হন। পৃথিবী-বিখ্যাত ডেভীফ্যারাডে গবেষণাগারের দায়িত্ব এবার তাঁর হাতে আসে এবং তাঁরই পরিচালনায় পদার্থের খৃষ্টাল অথবা স্ফটিকের বিষয়ের গবেষণায় এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম নতুন করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

আপন প্রতিভাবলে এই বিজ্ঞানী সারা জীবনে অজস্র সম্মান লাভ করে গেছেন। এক্স-রে, বা রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পদার্থের স্ফটিকের কাঠামোর পরিচয় এবং তার মধ্যে পরমাণু সমূহের অবস্থিতি নির্ণয়ের গবেষণায় বিরাট অবদানের জন্য ১৯১৫ সালে বিজ্ঞানী উইলিয়াম হেনরী ব্র্যাগ, তার পুত্র উইলিয়াম লরেন্স ব্র্যাগের সঙ্গে একযোগে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিজ্ঞানী ব্র্যাগ ১৯২০ সালে স্যার উপাধিতে ভূষিত হন। প্রায় ১৬টি ব্রিটিশ এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিখ্যাত এই বিজ্ঞানীকে ডক্টরেট উপাধি দিয়ে নিজেদের সম্মানিত করেন। স্যার উইলিয়াম হেনরী ব্র্যাগ ১৯৩৫ সালে রয়েল সোসাইটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত এই পদ তিনি অলঙ্কৃত করেন। ১৯২৮-১৯২৯ সালে তিনি ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েসন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অফ সায়ান্সের সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন।

বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম হেনরী ব্র্যাগের বিজ্ঞান নিবন্ধ রচনার প্রতিও যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। বিজ্ঞান গবেষণা-পরিষদ, বিদ্যোৎ সমিতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতাগুলির বিজ্ঞান সাহিত্য হিসাবে মূল্য খুবই বেশী। স্যার হেনরী ব্র্যাগের রচিত কয়েকটি পুস্তক এবং তাদের প্রকাশের বছর দেওয়া হলো। The world of sound (1920), the Universe of light (1933), Concerning the nature of Thing (1925).

"যে পথ কঠিন, সে পথ কণ্টক-সঙ্কুল, সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আজ যাত্রারম্ভে এখনো মেঘের গর্জ্জন শোনা যায় নাই বলিয়া সমস্তটাকে যেন খেলা বলিয়া মনে না করি। যদি বিদ্যুৎ চকিত হইতে থাকে, বজ্রধ্বনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা ফিরিয়ো না, দুর্যোগের রক্তচক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎ-সমক্ষে অপমানিত করিয়ো না। বাধার সম্ভাবনা জানিয়াই চলিতে হইবে, দুঃখকে স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। অতি বিবেচকদের ভীত পরামর্শে নিজেকে দুর্ব্বল করিয়ো না। যখন বিধাতার ঝড় আসে, তখন সংযত বেশে আসে না, কিন্তু প্রয়োজন বলিয়াই আসে, তাহা ভাল-মন্দ লাভক্ষতি দুই-ই লইয়া আসে।"

—রবীন্দ্রনাথ

শরৎ-স্মৃতির টুকিটাকি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

বর্ষাকাল। শেষ শ্রাবণের এক মেঘ-মেদুর দিন। পূর্বরাত্রিতে প্রায় সারাক্ষণই বৃষ্টি হোয়ে গেছে, কখনো ঝম-ঝম, কখনো বা ঝির-ঝির। আজ সকাল থেকে বর্ষণ থেমে গেছে বটে, কিন্তু কোদালে-মেঘ ভরা সারা আকাশটা গম্ভীরভাব ধারণ কোরে আছে। তা সরিয়ে সূর্যঠাকুর একটিবারের জন্যেও উঁকি দিতে পারেন নি। সারাদিনটাই অন্ধকারে আচ্ছন্ন। স্নানাহার সেরে, বেশ জুত কোরেই শুয়ে পড়লুম। মনে করলুম, আজকের এই বাদলা দিনে ভাল কোরে এক চোট ঘুম দোবো। সকলকে বলে রাখলুম—"বেলা তিনটের আগে আমাকে কেউ তুলো না। জীবনে অনেক বর্ষাকাল আসবে, কিন্তু আজকের দিনের মত জুত কোরে ঘুমোবার মত দিন হয় ত কখনো না-ও আসতে পারে।"

ঘুম কিন্তু এলো না। মনের মধ্যে আমার গ্রামের এইরূপ কতদিনের বর্ষার ছবি ফুটে উঠে, মনকে কেবলি সেইদিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। ইট কাঠ পাথরের তৈরী সহরের আবদ্ধ গুদাম-ঘরের মধ্যে বস্তার মত পোড়ে থেকে, গ্রামের সেই অপরূপ বর্ষা-সৌন্দর্য কেমন কোরে বোঝা যাবে! সে মাধুর্য ও সৌন্দর্যের তুলনা নেই। ভাষায় তা ব্যক্ত করতে যাওয়া বাতুলতা। মাঠের ধারে বাড়ী। চিল কোঠার জানালায় বোসে, এই রকম শ্রাবণ বর্ষার রূপ দেখা! জীবনে সে দৃশ্য ভোলবার নয়। সমস্ত পৃথিবী ছায়াঘন আঁধারে ছেয়ে আসচে, মাঠ-ঘাট-বাড়ী-ঘর-দুয়ার, কানন-প্রান্তর—সবের ওপর যেন মহাপ্রলয় নেবে আসচে। সারা আকাশব্যাপী নিশ্চল কালো মেঘের সঞ্চার, যেন কোন এক নির্দিষ্ট ক্ষণের প্রতীক্ষায় থম্‌-থমে ভাব ধোরে আছে। সেই সব দৃশ্য, সেই সব ছবিই মনের ওপর ফুটে উঠে, মনকে চঞ্চল কোরে তুলতে লাগলো, ঘুম কিছুতেই হোল না। সুতরাং উঠে পড়লুম।

কোন একটা কাগজের লেখার জন্যে জোর তাগিদ ছিল; ভাবলুম ওইটে লিখলে হয়, কিন্তু লেখার দিকে কিছুতেই মন বসাতে পারলুম না। অনেকের মত, আমি যখন তখন লিখতে পারতুম না। লেখার ভাবে মন যখন কানায়-কানায় ভরে উঠতো, তা তখন ভোর বেলাই হোক, দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যাই হোক, রাত্রিই হোক বা গভীর রাত্রিই হোক, সেই সময়টিতেই আমি লিখতে পারতুম ও লিখতে বসতুম। সুতরাং ধারা-শ্রাবণের সেই বর্ষণহীন আঁধার মধ্যাহ্নে লেখার দিকে মন গেল না। কি করা যায়! কোথায়ই বা যাওয়া যায়? এমন দিনটা ঘরের মধ্যে নিষ্কর্মার মত কাটাতেও মন সরচে না। সুতরাং ছাতাটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু যাই কোথায়? 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত'। চললুম শরৎচন্দ্রের ওখানে। আমিও যেমন নিষ্কর্মা, তিনিও তদ্রূপ, তাই দু'জনে মেলে ভাল।

শরৎচন্দ্র ওপর থেকে বোধ হয় আমাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গেই নেবে এলেন। জিজ্ঞাসা করলুম—"আমায় দেখতে পেয়ে বোধ হয় নেবে এলেন, দাদা?" শরৎচন্দ্র বললেন—"না। তোমায় ত দেখতে পাই নি, এমনই নেমে এলাম। আজকের weather কি রকম বদ্‌খত দেখছো।"

"Weather বদ্‌খত নয় দাদা, মনটাই আমাদের এই শহরে ইঞ্জিন-কারখানায় থেকে বদ্‌খত হোয়ে দাঁড়িয়েছে। বয়সকালে আর স্থান-বিশেষে এই weatherই মনের মধ্যে কোন এক সুন্দর স্বপ্নলোকের অন্ধকারময়ী মায়া বুলিয়ে দিয়ে যেত; নয় কি, বলুন।"

শরৎচন্দ্র কিছু বললেন না, তার বদলে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি '—'য় কবে যাচ্ছ?"

"সেখানে এখন আর যাব না।"

"যেয়ো না। অত বড়লোকের বাড়ী যাওয়া ভাল নয়। যাও কেন?"

"বড়লোক বলে যাই না। যাই—আন্তরিক ভালবাসার টানে। তাঁদের ধনদৌলত, টাকা পয়সা আমাকে তাঁদের ওখানে নিয়ে যায় না; আমার প্রতি তাঁদের ঐকান্তিক প্রীতি-ভালবাসা আর শ্রদ্ধাই তাঁদের ওখানে আমাকে আকর্ষণ করে। হৃদয়ের বদলে হৃদয় না দিলে যে পাপ হবে, দাদা! বলুন হ্যাঁ কি না।"

কিন্তু শরৎচন্দ্র কিছু বললেন না, চুপ কোরে রইলেন। তাঁর এই নীরবতা আমার কথার সমর্থনই জানিয়ে দিল।

শরৎচন্দ্র ইদানীং ধনীদের সংশ্রব এড়িয়ে যেতে চাইতেন, তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা তিনি পছন্দ করতেন না, বিশেষত যেখানে ধনের অহমিকা থাকতো, সেখানে ত নয়ই। কা'রো ধনদৌলত বা টাকা-কড়ি কখনই তাঁর ওপর মোহ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অবশ্য কৈশোর যৌবনের অপরিণত বয়সে তিনি অনেক ধনীর সঙ্গে মিশতেন, অনেক ধনীগৃহে তাঁর যাতায়াত ছিল। ভাগলপুরের মজুমদার বাড়ী ও স্বর্গত নফর ভট্ট মশাইয়ের বাড়ীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁরা ধনবান গৃহস্থ ছিলেন। ওখানকার বড় জমিদার 'লাল' পরিবার ও মজঃফরপুরের মহাদেব সাহু প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁর খুব ভাব-সাব ছিলো ও তাঁদের গৃহে তাঁর যাতায়াত ছিল। মিষ্টার এস, লাল, মিষ্টার টি, লাল প্রভৃতি তখনকার নাম-করা ধনী। মিঃ টি, লালের (তিলকধারী লাল) সম্পত্তি কোলকাতা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। মিস্ গিবনস্ নাম্নী এক ইউরোপীয় মহিলার মাধ্যমে মিঃ টি, লালের সঙ্গে এককালে আমার আলাপ ও ভাব-সাব হোয়েছিল। মিস্ গিবনস্ মিষ্টার টি, লালের কোলকাতায় গৃহ-সম্পত্তি দেখা-শোনা করতেন। তিনি কখনো কোলকাতায় কখনো ভাগলপুরে থাকতেন। মিস্ গিবনস্ মাঝে-মাঝেই ভাগলপুরের 'দই' এনে আমাকে উপহারস্বরূপ দিতেন। তাঁর কাছ থেকেই 'লাল'-পরিবারের ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্যের কথা শুনতাম। পরবর্তীকালে শুনেছি, এঁদের বাড়ীতে শরৎচন্দ্রেরও যাতায়াত ছিল। মহাদেব সাহুও অর্থশালী লোক ছিলেন। খুব সম্ভব এঁদেরই কারুকে নিয়ে 'শ্রীকান্তে'র 'কুমার সাহেব' চরিত্র অঙ্কিত। আমার কিশোর বয়সে এক সময় আমি ভাগলপুরের

স্বগত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের গৃহে কিছুদিনের জন্য ছিলাম। মুকুন্দদেব বাবু ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ও সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা অনুরূপা দেবীর পিতা। তিনি সে সময় তখনকার সিনিয়র ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ওখানকার নফর ভট্ট মশায়ও ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সবজজ। এই দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট ভাব-ভালবাসা ছিল। সেজন্য ওখানে থাকা কালে আমিও কয়েকবার নফর ভট্ট মশায়ের গৃহে গিয়েছি। বোধ হয়, আমার বয়স তখন ষোল-সতেরো, সে সময় শরৎচন্দ্রের বয়স ঐ হিসাবে হবে—কুড়ি-একুশ। ভাগলপুরে তাঁদের যে সাহিত্য আসর ছিল তার সঙ্গে নফর ভট্ট মশায়ের পুত্র শ্রীবিভূতি ভট্ট মশায়ের ভালরকম যোগ ছিল। ঐ সূত্রেই ভট্ট পরিবারের গৃহে তাঁর খুবই যাতায়াত ছিল।

এই সাহিত্য আসরের আমলেই শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গল্প 'মন্দির' কুন্তলীন পুরস্কারের প্রথম স্থানের অধিকারী হোয়ে সে বছর সাহিত্য-রসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে সময় আমি কাশীতে ছিলাম। তখন সাহিত্যের 'সা'-ও জানতাম না। কিন্তু, গল্পটা পড়ে মুগ্ধ হোয়ে যাই। আমার কাশীর অন্যতম বন্ধু, বর্ত্তমানে 'শান্তিনিকেতনে'র শ্রীক্ষিতিমোহন সেনকে গল্পটার কথা বলি ও তাঁকে পড়তে দিই। তিনিও পড়ে চমৎকৃত হন। গল্প লেখককে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। গল্পের শেষে লেখকের নাম ছিল—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙ্গালী টোলা, ভাগলপুর, কিম্বা T. N. Jubilee College, ভাগলপুর; আমার ঠিক স্মরণ হয় না। প্রায় ৬০ বছর আগেকার কথা, সুতরাং সামান্য ভুল-ভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নয়। এই সূত্রে আরও একটা কথা বলে রাখি। 'শরৎস্মৃতির টুকিটাকী—' প্রায় সমাপ্তির পথে এল। এতে আমার লিখিত কোন বিষয়ের বা বিষয়াংশের কেউ যদি কোন প্রতিবাদ করেন, আমার দিক থেকে সে প্রতিবাদের কোন উত্তরের আশা যেন তিনি না করেন। আমার সে নীরবতার কারণ হবে—প্রতিবাদকে তাচ্ছল্য বা অবহেলা নয়, আমার অক্ষমতা।

যাই হোক, পরে যখন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার মেলা-মেশা ভাব-সাব হয়, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, 'মন্দির' গল্পটা তিনি বে-নামীতে দিয়েছিলেন কেন? তার উত্তরে বলেছিলেন—"নিজের লেখার ওপর তখন মোটেই বিশ্বাস ছিল না। তাই আশা করতে পারি নি যে ওটা অন্ততঃ লাষ্ট প্রাইজেরও যোগ্য বিবেচিত হবে কি না। আর সেই না-হওয়ার ব্যথাটা সরাসরি সোজা বুকে এসে যাতে না লাগে, সুরেনকে হোয়ে যাতে আঘাতে আসে, তাই সুরেনের নামেই দিয়েছিলাম।"

কাশীতে 'মন্দির' গল্পটা দেখবার ও পড়বার পরই আমি ওখান থেকে ভাগলপুর যাই বা যেতে বাধ্য হই। সে-ও শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তে উল্লেখিত সাধু-সন্ন্যাসীর ব্যাপারের মত। তবে শ্রীকান্তের সাধু ছিল নকল, গিল্টি করা টিন, আর আমার তোল খাঁটা চোনে-পাত সোনা, পবিত্র ও স্বর্গীয় দীপ্তিতে দীপ্তিমান। জগদ্বিখ্যাত কাশীর শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামিজী কিছুদিন আগে 'দেহ রক্ষা' করেচেন তাঁর সেই পবিত্র ও মহান আসনে অধিষ্ঠিত তখন তাঁরই প্রধান চেলা—শ্রীমৎ মৈথিলানন্দ স্বামিজী। এক পুণ্যপ্রভাতে তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম।

সেই প্রথম দর্শনের দিনে, কি হোল জানি না। জানি না—আমার মত অতি সাধারণ এক কিশোরের মনের সঙ্গে আর এক সর্বলোক-পূজিত, পুণ্য-জ্যোতির্ময় মহান পুরুষের মনের সঙ্গে সেদিন কিসের একটা অদৃশ্য আকর্ষণের সৃষ্টি হয়ে গেল। এবং যার ফলে তাঁর কাছে আমি প্রায় প্রত্যহই একটি বারের জন্য না গিয়ে পারতুম না এবং তিনিও আমাকে একটি দিনও না যাইয়ে ছাড়তেন না। পরলোকগত ভাস্করানন্দ স্বামিজীর উলঙ্গ মর্মর মূর্তি ও তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির স্থান দেখবার জন্যে অনেক সাহেব-মেম আসতেন। ইংরাজীতে স্বামিজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাণী, ও তাঁর বহু অনুরাগী ইউরোপীয় ভক্তের নাম-ঠিকানা সম্বলিত মুদ্রিত পুস্তক থাকতো, আমি তা সকলকে এক একখানা দিতাম ও তাঁদের কথা প্রশ্ন আন্দাজী বুঝে নিয়ে, আমার যোগ্য বছুরী বিদ্যার জোরে কোনও রকমে সে সবের উত্তর দিতুম।

স্বামিজীর অনেক বড় বড় বাঙ্গালী শিষ্য ছিলেন। কচিৎ কখনো তাঁদের চিঠি লেখবার দরকার হোলে, আমাকে দিয়েই তা লেখাতেন। মৈথিলানন্দজীর মৈথিল ভাষা ছাড়া, বাংলা ত দূরের কথা, ভাল হিন্দীও জানতেন না; আর আমি বাংলা ছাড়া আর কিছু তেমন জানতুম না! আমাদের দু'জনের মধ্যে যখন কথা হোত, তখন তিনি যদি যেতেন পূবে, ত আমি যেতুম—পশ্চিমে। কিন্তু—দু'জনেরই গতি ঘুরে এসে এক জায়গায় যেত মিলে; অর্থাৎ বুঝতে কারুরই কিছু আটকাতো না।

ভাগলপুরে মুকুন্দদেব বাবুর এক কন্যার মারাত্মক অসুখ করেছিল। স্বামিজী আমাকে ভাগলপুরে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন; বলে দিলেন—কোন চিন্তা নেই, মেয়ে সেরে যাবে। ঠিক তাই হোল। আমি যাবার কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর কন্যা আরোগ্য হোলেন। ভাগলপুরে থাকাকালীন, শ্রীযুক্ত নফর ভট্ট মশায়ের বাড়ীতেও আমি যেতুম। শরৎচন্দ্রও ঐ সময়ে আসতেন। ভট্ট-পরিবার ওখানকার মধ্যে সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। কিন্তু তখনকার ধনীদের মনোভাবের অনেক প্রভেদ দেখা যায়। প্রভেদ যে কি এই এবং কোথায়, তা না বললেও বুঝতে আটকায় না। বর্ত্তমান কালের প্রভেদটুকুর জন্যেই শরৎচন্দ্র ইদানীং ধনীদের সংস্রব এড়িয়ে যেতে চাইতেন এবং আমাকেও সেই উপদেশ দিতেন।

উপদেশ ছলে দুটো কথা তিনি আমাকে শুনিয়ে প্রায়ই বলতেন। একটি হচ্ছে, 'শতং বদ, মা লিখ।' আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে—'তর্ক কোরো না।' একশ্রেণীর লোকদের তর্ক করবার স্পৃহা এত উদ্দাম যে, সহস্র যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ সত্ত্বেও, তাঁরা পেছু হটতে চান না। ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকে I. C. S.রা —বিশেষতঃ এ দেশীয় I. C. S.রা একবার যদি ভ্রমক্রমে বলে ফেলতেন যে 'সূর্য পশ্চিমে উদয় হয়', সে কথা আর তিনি কিছুতেই ওল্টাতেন না। সূর্যোদয়ের কালে যদি তাঁকে 'হাতে-নাতে' দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, সূর্য পূবেই উঠে, তবু তিনি তা স্বীকার করবেন না, বলবেন—'আজ হয়ত পূবে উঠে, কিন্তু সূর্য পশ্চিমেই ওঠে রোজ।' সুতরাং এ ত তর্ক নয়, এ হোল গোঁ। অতএব তর্ক কিছুতেই করবে না। উল্টে অনাবশ্যক একটা মনোব্যথা নিয়ে তোমায় ফিরে আসতে হবে।" শরৎচন্দ্রের এই কথাটা যে খুবই সত্যি তা আমার বহু বিষয়ে বহু অভিজ্ঞতাপূর্ণ সুদীর্ঘ সামাজিক ও

সাংসারিক জীবনে বরাবরই লক্ষ্য করে এসেছি। কতকটা এই জন্যেই লিখতে বাধ্য হোয়েছি যে—'আমার লিখিত শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এই টুকিটাকির অংশবিশেষের ভবিষ্যতে কোন প্রতিবাদের উত্তর দিতে আমি একান্তই অক্ষম, আমার কাছ থেকে কেউ তা আশা করবেন না।'

আমাকে 'অভিনন্দন' দেবার প্রায় চার মাস পরে আবার '৩১শে ভাদ্র'—অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের জন্মদিন এসে পড়লো। এবার 'অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো'র কোলকাতা শাখার কর্মকর্তারা, তাঁদের ১নং গার্স্টিন্ প্লেসের বাড়ীতে 'শরৎ-শর্বরী' নামে তাঁর জন্ম-বার্ষিকীর উৎসব আয়োজন করেন। তখন কে জানতো যে এই উৎসবই তাঁর শেষ জন্মদিন উৎসব! এ দিনের কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখানে সবিস্তারে লিখলাম।

পূর্বেই আমি বলেছি যে, এ দিনের উৎসবে, বেতার কর্তৃপক্ষ আমাকেও আমন্ত্রণ করেছিলেন এবং ৩১শে ভাদ্রের সকালে, শরৎচন্দ্র আমাকে খবর পাঠালেন যে, আমি যেন সন্ধ্যার পূর্বে তাঁর ওখানে যাই; সেখান থেকে একসঙ্গে রেডিও অফিসে যাব। তাই হোল। সন্ধ্যার কিছু আগেই আমি শরৎচন্দ্রের বাড়ী গেলাম ও সেখান থেকে তাঁর গাড়ীতে ১নং গার্স্টিন্ প্লেসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমাদের সঙ্গে কবিশেখর কালিদাস রায়ও ছিলেন। পথে, চৌরঙ্গী থেকে গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শিল্পী শ্রীমুকুল দে'কেও আমাদের গাড়ীতে তুলে নিয়ে, গণ্ডা ভর্তি করা হোল,—একথা পূর্বে লিখেছি।

'কোলকাতা বেতার' সৃষ্টির সুরু থেকেই, তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দিনের পর দিন ঐখানে আমাদের আনন্দের বান বয়েছে। বেতার যমুনার কূলে-কূলে নেপেনের (নৃপেন্দ্র নাথ মজুমদার) মধুর বাঁশীর সুর সর্বদাই ভেসে বেড়াতো। রাইচাঁদ বড়াল, রঞ্জিত রায়, প্রফুল্লবালা—এঁরা প্রথম যুগের রেডিওর অবিচ্ছেদ্য অংশ। 'রেডিয়ো'র এই সময়কার ষ্টেশন-ডিরেক্টার ছিলেন—মিষ্টার ষ্টেপলটান। সম্ভবতঃ তিনি জাতিতে Scotch ছিলেন। শরৎচন্দ্র Irish ও Scotchদের খুব পছন্দ করতেন। বেতার অফিসে শরৎচন্দ্রের জন্মদিন, উপলক্ষে তাঁর সম্বর্দ্ধনা ব্যাপারে Mr. Steppleton-য়ের আগ্রহপূর্ণ সমর্থন, সম্মতি ব্যবস্থাপনা ছিল।

এই Steppleton সাহেবই একদিন বলেন যে, মহারাজ-কুমার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর 'রেডিয়ো'তে আমার 'জমা-খরচে'র অভিনয় শুনে, একবার আমাকে দেখবার জন্য খুব উদ্‌গ্রীব হোয়েছেন। আমি মহারাজকুমারের বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য, তাঁর বি. টি. রোডস্থ 'Emerald Bower'য়ে একদিন যাব বলে স্থির কোরেছিলুম; কিন্তু শরৎচন্দ্র আমাকে ধমক দিয়ে যেতে নিষেধ করেন। সুতরাং যাই নি।

'জমা-খরচ' প্রশংসার সহিত বেতারে উপর্যুপরি কয়েক রাত ধরেই অভিনীত হোয়েছিল। বোম্বে থেকে প্রকাশিত 'Indian Radio Times' নামক পাক্ষিক পত্রে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় এর প্রশংসা প্রকাশিত হোয়েছিল। শরৎচন্দ্রের ইচ্ছায় ও আদেশে, তার 'কাটিংশ' গুলি আমি সযত্নে রেখে দিতাম।

বছর তিন-চার আগে 'বেতার-জগৎ'য়ের জুবিলী সংখ্যায় বেতারের প্রথম অভিনীত নাটক সম্বন্ধে ৺নৃপেন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন— 'অসমঞ্জ বাবুর 'জমা-খরচ' সর্বপ্রথম বেতারে অভিনীত হয় এবং আমিই ছিলাম—তার 'অধিকারী'...ইত্যাদি'। কিন্তু ঐ সংখ্যাতেই আর একজন...যা'ক, এ সমস্ত দিকে আমার ব্যক্তিগত কথা এ ক্ষেত্রে না লেখাই ভাল। বলছিলাম, তাই বলি—

সন্ধ্যার পরই আমরা রেডিও অফিসে গিয়ে পৌছলাম। কোলকাতার বহু গণ্য-মান্য লোক। বহু সাহিত্যিক ও কবি সেদিনকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেদিনের উৎসব সম্বন্ধে, ১৫ই আশ্বিন, ১৩৪৪—তারিখের 'বেতার জগৎ'এ যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হোয়েছিলো। তা'এখানে উদ্ধৃত কোরে দেওয়া হোল।

আমাদের কথা

শরৎ-শর্বরী—

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর। শুক্রবারের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে "শরৎ-শর্বরী"র অধিবেশন অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন হোয়ে গেছে। এই অধিবেশনে নাটোরের মহারাজা কাশিমবাজারের মহারাজ', রায়বাহাদুর জলধর সেন, রায়বাহাদুর এন, কে, সেন, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, কাজি নজরুল ইসলাম, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত মুকুন্দচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত হোয়ে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলেছিলেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্য বলেছিলেন অতি সংক্ষেপে ও অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী ভাষায়। স্বয়ং শরৎচন্দ্র ও সমাগত সুধী ব্যক্তিরা খুবই খুসী হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র রচিত 'সতী' গল্পের নাট্যরূপ ও অভিনয়-দর্শনে। ছোটদের বৈঠকের পক্ষ থেকে কুমারী গীতিকা সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গীত হয়েছিল।

গান

মন্দিরেতে আসন পেতে
রেখেছি মোরা তব পূজার লাগি।
সুধা পরশে এই নব বরষে
ধন্য মানি তব করুণা মাগি।
বাণীর দেউলে তুমি আনিলে যে সুর।
মধু-মূরছনে সারা দেশ ভরপুর,
পেয়েছে ভাষা প্রাণে জেগেছে আশা
পূতাশ চিত আজি উঠিছে জাগি।
অনেক দিয়েছ তবু তোমার কাছে,
কাঙাল পরাণ আরো আরো হে যাচে,
সবার সনে আছ সবার মনে
সবার সাথে সুখ-দুখ ভাগী।

[ক্রমশঃ।

এ দুটির তুলনা নেই

নিম টুথ পেষ্ট দিয়ে দাঁত মাজা আর স্নানে **মার্গো সোপ** ব্যবহার নিত্য প্রয়োজনীয়। নিম টুথ পেষ্ট আর মার্গো সোপ দুটি জিনিসেই নিমের বিষাপহারক, জীবাণুনাশক ও নির্মলকর গুণ আছে। এ দুটি জিনিসই উপকারী ও প্রীতিপদ।

নিমের গুণসমন্বিত জিনিস ব্যবহার করা মানেই স্বাস্থ্যকর অভ্যাস।
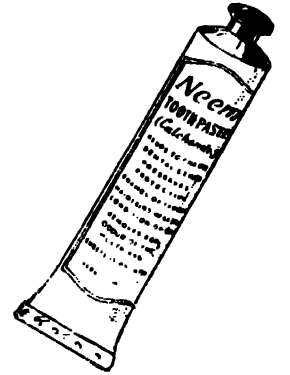
চিঠি লিখলে বিনামূল্যে "প্রসাধনী" পুস্তিকা পাঠান হয়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

ছোটদের আসর

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু
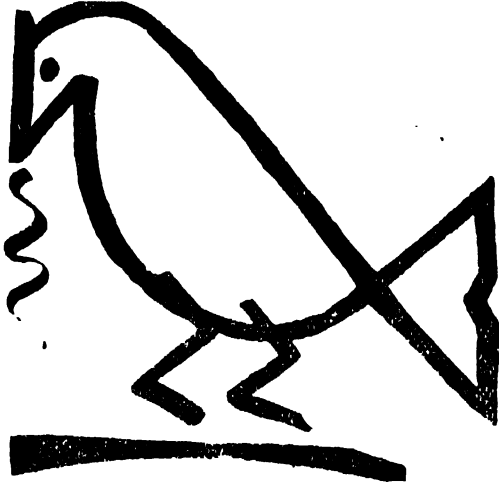
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রামটির নাম পাহাড়তলী। ছোট্ট পাহাড়, সবুজ ঘাসে ঢাকা, একছুটে একেবারে ওপরে উঠে যাওয়া যায়, চূড়ার ওপর বটগাছের তলায়—সেখানে উঠে অনেক দূর পর্য্যন্ত—দশ মাইল ত হবেই—মাঠ ঘাট বন নজরে পড়ে—নজরে পড়ে জেমারি, দেন্দুয়া আর সালানপুরের সাদা সাদা বাড়ীগুলো পর্য্যন্ত—সেই পাহাড়ের নীচে শাল পলাশ শিমুল গাছের ছায়ায় পাহাড়তলী গ্রাম—সামডি পোষ্ট অফিস। বনবিডিড, বনজেমারি, আসকুশা কলিয়ারী ওপরের বটগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখা যায়। একটা পাহাড়ী নদী গেছে, বাঁকা-বাঁকা পথে সাঁকো সৃষ্টি ক'রে। এই ছোট্ট ঝিরঝিরে নদীর জন্যে রেল লাইনের ব্রীজ দিতে হয়েছে। হঠাৎ বর্ষায় এ যে ফুলে-ফেঁপে ওঠে, নিয়ে আসে দূরের পাহাড় থেকে গঙ্গার মতন লাল জল। দু'ধারে মাঠ ছাপিয়ে নদী ব'য়ে যায়।

পাহাড়ের ধারে ধারে গরু চরছে। রাখাল ছেলে বেণু বাজায়, যাদের নিয়ে কত কবিতা, কত গান তৈরী হয়েছে। এখন প্রায় দুপুর—রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়ে—

মধ্য দিনে যবে গান
বন্ধ করে পাখী,
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী কী মিষ্টি সুর!

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে মীরা শুনেছিলো।

রবীন্দ্র জয়ন্তী। কলকাতা শহর তোলপাড় হয়ে যায় সরস্বতী পুজোর মতন। ছেলে বুড়ো মেয়েরা—আবালবৃদ্ধবনিতা যেন পাগল হ'য়ে ওঠে, মাতাল হয়ে ওঠে—রবীন্দ্র জয়ন্তীর উৎসবে। কয়েকটি জায়গায় সে গেছে, আরো কত জায়গার কথা শুনেছে—দূর দূর গ্রামে গ্রামে, কত নদীর এপারে ওপারে কত ষ্টেশনের ধারে, কত গঞ্জের ঘাটে—রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তীর উৎসব রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি প্রতিযোগিতার কত বিচার—রবীন্দ্রনাট্য অভিনয়ে নৃত্য-সংগীতে কত শিল্পীর প্রয়োজন—কত সভাপতি, কত প্রধান অতিথি. কত সুন্দর সুন্দর নিমন্ত্রণ পত্রে কাব্যময় ভাষা—সেই পৌরোহিত্যটা কিন্তু সকলেই পৌরোহিত্য করবে—অসামান্য কবির জন্যে কী অসাধারণ উন্মাদনা—পুরীতে থাকলেও কিছুই টের পায়নি। সেখানে সমুদ্র শুধু গর্জ্জন করে, সমস্ত দিন সমস্ত রাত অশ্রান্ত। সমুদ্রকে বাদ দিয়ে কোনো চিন্তা কোনো কল্পনা মনে আসতে পায় না।

আরে, মীরার মন কোথায় চলে গেছলো! পাহাড়তলী গ্রামের দিকে চেয়ে বটগাছের গুঁড়ির ওপর ব'সে সে ভাবছে—রবীন্দ্র জয়ন্তীর কথা দেশে, দেশে, ভাবছে পুরীর সমুদ্রের কথা, তার শৈশবের নিত্যসঙ্গী যে ছিল! এদিকে ড্যাডিকে না বলে যে সে পাইলট ইঞ্জিনে চড়ে এত দূর চলে এসেছে, ড্যাডির ভাবনা হওয়া আশ্চর্য্য নয়। যদিও বাসনা তাকে দেখেছে, সে কি মনে ক'রে বলবে? শান্টিং ইঞ্জিনের পাশে দাঁড়িয়ে ও যখন ড্রাইভারকে বললে—এ ইঞ্জিন কোথায় যাবে? ড্রাইভার বললে—কয়লা আনতে,—ও বললে কখন ফিরবে? সে বললে দু'ঘণ্টার মধ্যে। তখনি ত' ও ইঞ্জিনে উঠে পড়লো।

বাঙালী যুবক, সাদা পোষাক তার কালীতে কালো হয়ে গেছে, এত সুন্দর স্কার্টপরা মেয়েকে ইঞ্জিনের তেল-ময়লার মধ্যে দাঁড়াতে দেখে ব্যস্ত হ'য়ে গেল—বললে, কোথায় বসতে দিই আপনাকে? সবই যে কালীমাখা! তখন মীরা হেসে বললে, আমি দাঁড়িয়েই যাব। আপনি কি করে গাড়ী চালান দেখি।

এত সহজ ইঞ্জিন চালানো? একটা চাকা মতন জিনিস ঘুরিয়ে দিলেই গাড়ী চলবে? একটা তারের মতন জিনিস টানলেই এমন সিটি দেবে যে কানে তালা লেগে যায়? এ তো মীরাও পারে। কিন্তু সিমেন্টের চুল্লী থেকে গণগণে কয়লার আঁচ, এ কতোক্ষণ সহ্য করা যায়? আর ডানদিকের ছোট্ট ফোকরে চোখ রেখে গাড়ী চালানো সেই পথে, যে পথে গরু ভেড়া ছাগলের সঙ্গে মানুষের দল চলেছে, লাইনটাই যেন রাস্তা!—এ কি সহজ নাকি? আর এই তো লাইন, কেউ কোনো যত্নই নেয় না। এর ওপর দিয়ে কি ক'রে এত কয়লা নিয়ে এতগুলো মালগাড়ী চলে? কোনোদিন তো উল্টে পড়ে না! ইঞ্জিন থামে, যেখানে লাইনের ধারে কয়লা সাজানো আছে সাইডিংএ। মাঠের মধ্যে ম্যানেজারের কোয়ার্টার, জানলায় ম্যানেজারের বৌ মেয়ে হয়তো দাঁড়িয়ে আছে। কী নির্জ্জন চারি ধার। কুলী আর কামিনরা যখন তাদের ধাওড়ায়

ফিরে যাবে, তখন এখানে কে আছে? রাত্রে যখন চার দিক অন্ধকার, তখন এখানে কে আছে? ডাকাত পড়ে তো কে বাঁচাবে? এ যেন নির্বাসন! এ যেন বনবাস! তাই তো ও পাহাড়তলী সাইডিং এ নেমে প'ড়ে পাহাড়ে গিয়ে উঠেছিলো, রূপনারায়ণপুরের কেব্‌ল্ ফ্যাক্টরী, চিত্তরঞ্জন কারখানার আলো যেখান থেকে সন্ধ্যেবেলা প্রদীপমালার মতন দেখা যায়। যেমন দেখা যায় সালামপুর থেকে কুলটির আলোর হার, মাইথনের আলোর সাতনরী।

কলকাতার বড় ঘরের এই ছোট্ট মেয়েটিকে সামলাতে গিয়ে বাঙালী ছোকরা ড্রাইভার থতমত খেয়ে গেছলো, অনেক উঁচু থেকে নীচে নামিয়ে দেবার সময়ে বলেছিলো, দেখবেন, পাশের রডটা ধরবেন। 'হাতটা ধরবেন' বলতে পারেনি, কারণ ওর হাতময় কালী, সীতারামপুরে বাড়ীতে গিয়ে সাবান মেখে স্নান করতে হবে। বাড়ীর সামনেই ইঞ্জিন থেমেছিলো, মালগাড়ীগুলো রাস্তা পার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে! মীরা ছুটে গিয়ে বাড়ী থেকে একটা ঝকঝকে ছবি-আঁকা টফির বাক্স নিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে ওর হাতে দিলো, বললে, আপনার ছেলে-মেয়েকে দেবেন।

সে ম্লান হেসে বললে—আমার ছেলে-মেয়ে নেই।

স্ত্রী তো আছেন?

তা-ও নেই।

তাহ'লে আপনি খাবেন। আপনি কি টফি ভালোবাসেন না? ইঞ্জিন চালাতে চালাতে কি আপনার দু-একটা টফি মুখে দিতে ইচ্ছে করে না?

কিন্তু এর তো অনেক দাম! কেন মিছে নষ্ট করছেন?

অনেক দাম? আমারও অনেক আছে—এ কথা মীরা বলতে পারলো না, বললে, আপনার হাতে যে ঘড়িটা আছে, ওটারও তো অনেক দাম বলেই আমি জানি।

এ কথাটা বললে এইটি বোঝাতো যে, তোমাকেও আমি তুচ্ছ মনে করি না, যে তুমি খুব দামী ঘড়িই কিনে পরতে পারো।

কী চওড়া নতুন রাস্তা আসছে, লক্ষ লক্ষ একর ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে আসানসোল থেকে চিত্তরঞ্জন জুড়ে দেবার জন্যে। নির্জন নিস্তব্ধ গ্রাম সালামপুরের বুকের ওপর দিয়ে রাজপথ তৈরী হচ্ছে দেশ বিদেশের পণ্যবাহী আর যাত্রিবাহী গাড়ীর কোলাহল সমস্ত আলস্য চূর্ণ করতে, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে যে অচলায়তন, তার মাটির পাঁচিল ভেঙে আসছে ইস্পাতের জয়যাত্রা। তবু কবি বলেছেন—রক্তকরবী শ্বেতকরবী ফুটবে মাঠের প্রান্তে, সিদ্ধির ইলেক্‌ট্রিকের তার যেখান দিয়ে কলকাতা গেছে।

কলকাতা—!

বালিগঞ্জের এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা—

দাদখানি চাল
মুসুরির ডাল
চিনিপাতা দৈ।
দুটো পাকা বেল
সরিষার তেল
ডিম-ভরা কৈ।

বাজারে এই আনতে গিয়ে মুখস্থ করতে করতে ছেলেটি পথে ঘুড়ি ওড়ানো ইত্যাদি দেখে সব ভুলে যাবে—দোকানে গিয়ে বলবে—

দাদখানি বেল,
মুসুরির তেল
সরিষার কৈ।
চিনিপাতা চাল
দুটো পাকা ডাল
ডিম-ভরা দৈ।

মীরা এখানে নাম দিলো—

যোলোর নীচে যার বয়স, সেই যোগ দিতে পারে। ও বললে—ড্যাডি, ভারী মজার কবিতাটা! বাংলা কবিতায় এত মজাও ছিল—তোমরা যখন ছোট ছিলে!

ড্যাডি বললে—ওটা ইংরেজী কবিতা থেকে বেমালুম নেওয়া—স্বীকার করা হয় নি। ইংরেজী কবিতাটার নাম হচ্ছে Going on an errand.

ড্যাডির কাছে এত খবরও থাকে! মীরা বলে, ড্যাডি, আমাদের রবীন্দ্রনাথ আশী বছর বেঁচে ছিলেন—আর ওদের লেখকরা?

ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর টেনিসন যা দীর্ঘজীবী! নইলে কীট্‌স ত্রিশ বছর, শেলি ত্রিশ বছর, বায়রণ ছত্রিশ বছর, লুই ষ্টিভেনসন চুয়াল্লিশ বছর, শেক্সপীয়ার বাহান্ন বছর। আমাদের দেশে পরমহংসদেব, মাইকেল মধুসূদন, কেশবচন্দ্র সেন সাতচল্লিশ, দেশবন্ধু, আশুতোষ চুয়ান্ন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিয়াল্লিশ, স্বামী বিবেকানন্দ উনচল্লিশ, নটা ভাষায় এম-এ হরিনাথ দে বত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য বত্রিশ আর আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট আটাশ বছরে মারা যান। কত অল্প বয়সে তাঁরা কত কাজ ক'রে গেছেন! আর মাত্র উনিশ বছরের বালক সিরাজদ্দৌলা ইংরেজের হাতে মারা গেল, ঐ বয়সেই কত কুকীর্ত্তি, কত সাহসের পরিচয় সে দিয়ে গেছে!

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম হল মীরা। পদক নিয়ে বাড়ী এলো। বড়োলোকের ক্লাব নয়, সস্তার পাতলা মেডেল দিয়েছে তারা—নেহাৎই তারা মারা!

মীরার মন খারাপ।

মীরার মাম্মি বললে সম্মানটাই বড়ো। জিনিসটা নয়। তুমি কি জানো ভিক্টোরিয়া ক্রশ সোনার নয়, রূপোর নয়, নিতান্তই ব্রোঞ্জের, তবু তার সম্মান সোনার চেয়ে বেশী।

কি ক'রে হল?

১৮৫৪ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ানরা পালায় অনেক কামান ফেলে। ইংরেজ সেগুলি নিয়ে আসে। জাঁদরেল জেনারালরা কত কি পুরস্কার পেলে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া বললে সেই সব অখ্যাত সৈনিকরা কি পাবে, যারা কত সাহসের পরিচয় দিয়েছে যারা না থাকলে যুদ্ধ জয়ই হত না? তখন স্থির হল ঐ ব্রোঞ্জের কামানগুলো ভেঙে ক্রুশচিহ্ন তৈরী করা হবে, রাণীর নামে নাম হবে ভিক্টোরিয়া ক্রশ—তারাই পাবে যাদের ত্যাগের আর সাহসের তুলনা নেই। ১৯১৪ সালের যুদ্ধে পাঞ্জাবের খোদাদ খাঁ ভি-সি পেয়েছিলো! ভি-সি পেয়ে রাণীর সঙ্গে সে ডিনার খেতে বসতে পেয়েছিলো। সে ত ব্রোঞ্জের। তবু তো তোমার পদকে খানিকটা রূপো আছে।

কার্মাটার থেকে মাম্মির দাদা এসেছে, তাকে মামাবাবু নয়, আঙ্কল বলতে হবে। সাহেব মানুষ। সাঁওতালদের মধ্যে থাকেন,

সব সময়ে পাজামা পরে। ধুতি পরতে পারেন না। লুঙ্গি পরাটা কিন্তু পছন্দ করেন না।

আঙ্কল এনেছে গোলাপ কার্মাটারের বাগান থেকে—মাস্ক রোজ, ড্যামাস্ক রোজ, উড রোজ—যাকে কাঠগোলাপ বলে, আর ওয়াইল্ড রোজ, বুনো গোলাপ।

গোলাপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেল আঙ্কলের কাছে। পুষ্পরেণুকে pollen বলে। এমন যে সুন্দর গোলাপ ফুল তাতে নাকি মধু মোটে নেই। কত বনের ফুলে মধু থাকে, আর দুনিয়ার সেরা ফুলে মধু নেই! মৌমাছিরা পুষ্পরেণু খেয়েই খুসি হয়!

কার্মাটার মীরা দেখেনি, চোখের সামনে ভেসে ওঠে, রাঙামাটির দেশে গোলাপের বাগান, কত রং-বেরঙের গোলাপ সারে সারে ফুটে আছে, গোলাপ বাগান আলো ক'রে নার্সারি চ'লে গেছে বিঘার পর বিঘা, কয়েক একর দূরে পাহাড়ের চূড়া, খাটছে কালো পাথরের চেহারা সাঁওতাল তার সাঁওতালী মেয়েরা—কার্মাটার।

যেমন টাইবার নদীর তীরে রোম ভাবতে ভালো লাগে, তেমনি, সাঁওতাল পরগণায় কার্মাটার ভাবতে ভালো লাগে বালিগঞ্জের রেনি পার্ক থেকে।

আঙ্কলের একটা ফিল্‌ম ক্যামেরা আছে,, তাতে নড়া-ছবি তোলা যায়। একদিন সেই ছবি তোলার ব্যবস্থা হল।

বটানিক্যাল গার্ডেনে ঝিলের ধারে রান্না হল, খাওয়া হল, পরিবেশন হল, বিরাট বটগাছের মাঝখানে যেখানে আসল গুঁড়িটা ম'রে গেছে, বংশের গাছগুলো একদিন যারা ঝুরি হ'য়ে নেমেছিলো, আজ বাইরেটা পাহাড়ের মতন ক'রে সাজিয়ে রেখেছে, সেই খোলা ফাঁকা জায়গায় ওরা গিয়ে দাঁড়ালো, দাঁড়ালো গঙ্গার ধারে যেখানে ষ্টীমার চ'লে যাচ্ছে ঢেউ তুলে, গঙ্গা ব'য়ে যাচ্ছে গঙ্গাসাগরের দিকে, আর সমস্ত ফিল্মটা ডেভালাপ হ'য়ে প্রিণ্ট হ'য়ে যখন এলো, তখন সাদা পর্দার গায়ে ফুটে উঠলো সেই একটি দিনের কাণ্ড কারখানা চলচ্চিত্রে। আশ্চর্য্য মনে হয়!

ড্যাডি অন্য লোককেও আশ্চর্য্য করবার ব্যবস্থা ক'রে দিলে আদুরে মেয়ের খাতিরে। এলো নতুন ক্যামেরা, এলো প্রোজেক্টর, এলো স্ক্রীন। শিখে নিতেও দেরী হল না।

কিন্তু দেখবে কারা? কোথায় সেই উৎসুক ছেলে-মেয়ের দল? এ বাড়ীতে যে সব ছোটরা আসে, তারা তো বড়োদের মতন নাক সিঁটকেই আছে। কোনো কিছুতে অবাক্ হওয়া তাদের বারণ। তাদের বলতেই হবে, এ আর এমন কী! ও তো ভারী! কিন্তু এই বাংলাদেশেই—এই কলকাতা সহরেই এমন অনেক ছেলেমেয়ে আছে, ছেলেমেয়েদের মা-বাপ-পিসিমা-দিদিমারাও আছে, যারা অবাক হয়ে যাবে নিজেদের চলা-ফেরার ছবি পর্দার বুকে ফুটে উঠছে দেখে। তারা তো ধন্য হ'য়ে যাবে।

তাদের পাবে কোথায় মীরা? সেই সরল প্রাণের উচ্ছ্বাস এখানে কি ক'রে দেখা যাবে এই সাহেবী কায়দার বাড়ীতে?

বাগবাজারের বাড়ীতে সে দেখেছে, একদিন একটা ঝি ঝগড়া করছে, তাকে ঝি ব'লে ডাকা হয়েছে ব'লে, আর তাকে তুই বলা হয়েছে।

সে কি না কমলার মা, তাকে সবাই তুমি বলে, আর এ বাড়ীতে—ঝি, তুই?

কাজ করবুনি, এখনি আমার মাইনে চুকিয়ে দাও, তুমি যে, আমিও সে। বাসন মাজি ব'লে কি ছোটনোক হয়ে গেনু?

কোমরে হাত দিয়ে ছোটলোকের এত চোখরাঙানী?

আর তাকেই শেষটা সাধ্যসাধনা ক'রে রাখা হল, পৌষমাস, এ মাসে যেতে নেই, রাগ কোরো না।

কুড়িটাকা মাইনে দুবেলা হাতীর খোরাক্, তবু এ খোসামোদ করতে হবে?

ওদের রাঁধুনী বলেছিলো—কাম ছেড়ে দিমু।

অগত্যা অন্য লোক আনা হয়েছিলো। তখন সে বলে যামু না।

মেয়েছেলের কী কাণ্ড!

ঝিও তো তাই করলো, মাঘ মাস পড়তে যেই নতুন চাকর এলো, তাকে বললে, তুমি আমার চাকরীটি খেতে এলে? এক ছেলে নিয়ে ঘর করো, তোমার কি প্রাণে ভয় নেই?

তখন একজন গিন্নী বললে ঝাঁটা মেরে বিদেয় কর মুখপুড়িকে। লোক দেখলেই যেন কেঁচো, অন্য সময়ে কালকেউটে। দূর হ, ঢের ঝি মিলবে তোর মতন। ঝি তখন কান্না জুড়ে দিলো নেচে-কুঁদে। আমাকে মেরেছে—ঝাঁটা মেরেছে! ধেই ধেই নাচ।

এ বাড়ীতে ও সব কুরুক্ষেত্র দক্ষযজ্ঞ চলবে না।

রামরতন ব'লে লোকটা একদিন মীরাকে বলেছিলো—চা যদি জুড়িয়ে গিয়ে থাকে, হিটারে গরম ক'রে নাও, আমি আবার চা করতে পারব না—ড্যাডি শুনতে পেয়ে তক্ষণি হিসাব ক'রে টাকা দিয়ে বললে—এই দণ্ডে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। মনিবের সঙ্গে কথা বলতে শেখোনি?

সে বলেছিলো—হুজুর, কসুর হয়ে গেছে

একটি কথা নয়। বাইরে সোজা চলে যাও।

ড্যাডি বলে—পা আর মাথা এক হয় না। জুতো সোনার হ'লেও পায়ে থাকে। অশিক্ষিত ছোট জাত কি ক'রে সম্মান পাবে শিক্ষিত বড়ো জাতের সঙ্গে? কোনো বর্ণশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কখনো বলেননি যে এমন হ'তে পারে।

আবার ঢাকুরিয়া লেক। যতই গরম পড়ুক কলকাতায় সন্ধ্যের পর দক্ষিণ থেকে যে হাওয়া আসে লেকের জলের ওপর দিয়ে—হু হু হু, প্রাণ তা জুড়িয়ে দেবে। ওদিকে থাক না—১১০—১১১—১১২ ডিগ্রী।

মাম্‌মি জর্জেট শাড়ী নিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো। মীরার শিক্ষক নরম দুর্ব্বাদলের ছোঁয়া পেলে। মাম্‌মি বললে—এইজন্যেই পশ্চিমের গরম দেশের লোক সন্ধ্যে হলে কোথায় জল খুঁজে বেড়ায়। একটা ডোবার ধারে গেলেও মাঠের গরম হাওয়া ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে।

ওদিকে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে গল্প শুনছে। কার কাছে? সেই লেখক—ছড়াতে-পড়াতে যার লেখা।

আচ্ছা, আপনার বয়স কত? একজন ভারিক্কি গোছের লোক প্রশ্ন করে—যার মাথার চুল সাদা, খোঁচাখোঁচা দাড়ি-গোঁফ সাদা, কানের ওপর গোছা-গোছা চুল সাদা।

কেন বলুন ত?—লেখকের প্রশ্ন।

আমার বয়স পঞ্চাশও নয়, জরার সাদা চিহ্ন আমার সারা গায়ে। আপনার বয়সও নিশ্চয় এর চেয়ে কম নয়—লেখাই ত পড়ছি আজ

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর—অথচ চুল দিব্যি কাঁচা, মুখখানাও কচি, গলার স্বরও ছেলেমানুষের মতন কোমল। কি ক'রে এমন হয়?

হয় মনের জন্যে। মনে কোনো প্যাঁচ ঢুকতে না দিলেই চেহারার কোমলতা থাকে। মনটাকে রাখতে হয় কৈশোরের দিনে। পৃথিবী দেখে অবাক্ হ'তে হবে।

তাই বুঝি এখনো হয়? তা কি ক'রে সম্ভব হবে? আর আপনি ঘুরিয়ে বলতে চান, আমার মনে প্যাঁচ আছে তাই চেহারা পাকিয়ে গেছে?

—তা নইলে এরকম চোয়াড়ে হ'য়ে যাবেন কেন? আর গায়ে প'ড়ে ঝগড়াই বা করতে যাবেন কেন? বসুন তো এই ছেলেদের নিয়ে। করুন ত গল্প।

হ্যাঃ, আমার যেন আর কাজ নেই! আমি তো আপনার মতন নিকামাই নই?

এ-ও তো একটা কাজ—ছেলেমেয়েদের আনন্দ দেওয়া। বসুন এদের নিয়ে।

ছেলেরা মেয়েরা তখন আপত্তি জুড়েছে, না না, আপনি বলুন—কি হল সেই টুনটুনি পাখীর? রাজাও তাকে পেটের মধ্যে পুরে ফেলেছে। তারপর কি হল?

রাজা একটা ঢেঁকুর তুলেছে—হেউ, আর টুনটুনি পাখী পেট থেকে বেরিয়ে ফুড়ুক ক'রে উড়ে গেল!

যারা শুনছিলো, তারা হৈ-হৈ ক'রে উঠলো—বললে তারপর? তারপর?

শিশুমন যে হারিয়ে ফেলেছে, সে আর দাঁড়ালো না, ব'লে গেল যত সব গাঁজা. পেটের মধ্যে পাখী গেলে কখনো ঢেঁকুরের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারে? পারে উড়ে যেতে? এ কি সার্কাসের লাল মাছ যে জলের সঙ্গে গিলে ফেলে আবার কুলকুচো ক'রে একটি একটি জ্যান্ত বার ক'রে দেবে? এ হল টুনটুনি পাখী, যাকে আস্ত গেলা যায় না!

হ্রদের সবুজ জল হাওয়ায় কাঁপছে, কাঁপছে বিজলী বাতির রেখা হাজার ঢেউএর সঙ্গে। আসছে ঝড়, যাচ্ছে ট্রেন। চানাচুর ভাজা চা—না বাদাম—ঘুম আসে। মনে পড়ে যায়—পুরীতে ফেলে এসেছে 'রাজার ছেলে' কি জানি কার লেখা, প্রথম পাতাটা ছিঁড়ে গেছে, রাজার ছেলে প্রাশন্ত, তার বন্ধু অধীর—দুজনে দেশে দেশে ঘুরে কত কী কাণ্ড! কিছুতে ভুলতে পারা যায় না গল্পটা!

তাদের বাড়ীতে আসে কোথাকার কুমার বাহাদুর, সে-ও ছোট বেলায় পড়েছে রাজার ছেলে বলে, আমার জীবন একেবারে বদলে গেছে রাজার ছেলে প'ড়ে। ষ্টেট যখন গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নিলে তখন তাই আমার একটুও কষ্ট হল না। আগে থেকেই আমি প্রাসাদ ছেড়ে আমার দোতলা বাড়ীতে চ'লে এসেছি, আর কাপড়ের কল দু-দুটো ক'রে ফেলেছি।

সবুজ ঘাসের বিছানায় দক্ষিণে হাওয়ায় রাজার ছেলের পালঙ্কের মসলনের বিছানার কথা মনে হয়। নটার সময়ে ড্যাডি গাড়ী নিয়ে এসে ডাকাডাকি করে, এ কি অসভ্যের মতন ঘাসের ওপর শোয়া? চার ধারে লোকজন ঘোরা-ফেরা করছে। তোমাদের কি সবই অদ্ভুত?

বড্ডো ক্লান্ত লাগছিলো, মাম্মি বললো।

চিরদিন কখনো সমান যায় না বলে একটা কথা আছে। বিনামেঘে বজ্রাঘাত হলেও একটা কথা আছে। আকাশে মেঘ নেই, অথচ বাজ পড়লো।

মীরা সেই রকম একটা কথা শুনলো।

মাম্মির ছেলে হবে।

মানে মীরার একটি ভাই আসছে।

ভাই হওয়া তো আনন্দেরই। কোন বোনের না আনন্দ হয় ভাই হ'লে?

কিন্তু এখানে আর একটা জিনিস ভাবতে হবে। এদের ছেলে হয়নি ব'লেই না মীরাকে এনেছে? ছেলে হয়নি ব'লেই না এখানকার সমস্ত ঐশ্বর্য্য মীরার? ধন-দৌলত, বাড়ীঘর সব?

সত্যি যদি নিজের ভাই হত, না হয় তার সঙ্গে সমান-সমান ভাগ হ'ত, তাতে দুঃখ ছিল না। কিন্তু মীরা তো সত্যি এ বাড়ীর কেউ-ই নয়?

এদের নিজের ছেলে কিংবা মেয়ে এলে মীরার কোনো দরকারই হবে না।

তাকে হয়তো ফিরে যেতে হবে তার গরীব বাপের দুঃখের সংসারে, নয়ত রাস্তার ফুটপাথে হাত-পাতা ভিখারীদের দলে।

যে ভবিষ্যৎ তার স্থির হ'য়ে গেছলো—সেই ভবিষ্যৎ হ'য়ে গেল অনিশ্চিত।

ড্যাডির মুখ গম্ভীর।

মাম্মির মুখ আরো গম্ভীর।

নবদ্বীপ থেকে কাঁথিন পিসিমা এসে বললেন—নাৎনি কি ভয় পেয়ে গেলি?

মীরার চোখে এবার জল এসে গেল—যে জল বাধা মানল না, ঝরে পড়ল ঝর-ঝর-ঝর। অসহায় মেয়েটিকে চিবিয়ে খাওয়ার জন্যে যেন নিষ্ঠুর পৃথিবী অপেক্ষা করছে রূপকথার রাক্ষসীর মতন। সমস্ত জগৎ জুড়ে যেন ঝন্‌ঝন্-ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ! ঘরে ঘরে ছেলেমেয়ে ভয়ে আঁৎকে ওঠে। আকাশে হাজার হাজার শকুনি!

আজ মীরার বাড়ীতে গেলে হয়ত আশ্রয় হবে না। সংসার সংসার অভাবের তাড়নায় আরো হয়ত ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠেছে। স্থাংলা প্যাংলারই হয়ত দুবেলা পেট ভ'রে ভাত জুটছে না।

বড়ে হ'য়ে গেছে মীরা মাথায়। এবার তার বিয়ের ভাবনা। যে সমুদ্র তার ভালোবাসার জিনিস ছিল—তাও আজ ভালো লাগছে না। মাথার ওপরের ছাদ উড়ে গেছে। পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে গেছে।

মীরার নিজেরই মনে হল, আসলে মীরা বিধাতার খেলার পুতুল! যেন ঘুম ভেঙে গেল দুঃস্বপ্ন দেখে।

ফুলের বন মিলিয়ে গিয়ে মরুভূমির বালি উড়ছে—সাহারা মরুভূমি—সারা ইয়োরোপের চেয়ে বড়ো। ওয়েসিস—মরুদ্যানের ধারে ধারে ডাকাত দল থাকে, লুঠ করে পথিকের সর্ব্বস্ব, যে মরীচিকা দেখে দেখে ছুটে ছুটে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হ'য়ে শেষ পর্য্যন্ত গণগণে বালির ওপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে প্রাণ হারালো। ঘরে তার খবর গেল না, সাহারা মরুভূমির বালি তাকে চাপা দিলো।

মেরুদণ্ডের ভেতর পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে। সে কি চলেছে কুমেরু পাহাড়ের দিকে মাইলের পর মাইল, বরফ পার হ'য়ে মেরুর দেশের হরিণ পর্য্যন্ত যেখানে যায় না, সাদা ভালুক আসে না। গাছ নেই, ঘাস নেই, ফুল নেই, ফল নেই, পথ নেই, ঘাট নেই, গ্রাম নেই, ঘর নেই, আকাশে পাখী নেই, মাটিতে মানুষ নেই—শুধু দুর্ভেদ্য কুয়াসা, সাদা বরফ আর কনকনে ঠাণ্ডা। খাদ্য নেই, পানীয় নেই, বল নেই, ভরসা নেই, আশা নেই, সান্ত্বনা নেই, শুধু আছে ভয় আর ক্লান্তি। দিগন্তবিহীন দক্ষিণ মেরু, আড়ষ্ট পা যেখানে চলে না, ভারী বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না।

এদের বাড়ীতে উৎসব। আত্মীয়-স্বজনের নিত্য আনাগোণা। কত কামনার কত ভরসার ছেলে আসছে নিঃসন্তান রায়চৌধুরী পরিবারে—লক্ষ লক্ষ টাকা যাদের ব্যাঙ্কে—ভোগ করবার লোক খুঁজছিলো যারা!

হাঘরের মেয়ে মীরার উড়ে এসে জুড়ে বসা কেউই পছন্দ করছিলো না। সবাই আজ সমান খুসি বাচ্চা মেয়ের সর্ব্বনাশের সম্ভাবনায়!

সালামপুরের সাঁওতাল মেয়ের মতন খোঁপায় ফুল গুঁজে, ক'সে কোমর বেঁধে ও যদি চলে যেতে পারত কয়লা-খনির কাজে প্রজাপতির মতন নাচতে নাচতে, আর ফিরে আসতে পারত গান গেয়ে গেয়ে—তেমনি নিটোল স্বাস্থ্য নিয়ে, তেমনি প্রাণের উচ্ছলতায়! ভাবনা-বিহীন সাঁওতাল মেয়ে!

শান্তাকে দেখেছে-শুনেছে যশোরে, সে কত আদরে ছিল, কলকাতার মেয়ে। আজ সব হারিয়ে দশটা-পাঁচটা চাকরী করছে লক্ষ পুরুষের ভিড়ে, ট্রামে-বাসে দাঁড়িয়ে গিয়ে। মীরার অবশ্য অত বিদ্যে নেই। [ক্রমশঃ।

স্বর্গজয়ের বিড়ম্বনা

(একটি দিনেমার রূপকথা)

হান্স ক্রিশ্চিয়ান এ্যাণ্ডারসন

অনেক, অনেক দিন আগে ছিলো এক দেশ। সে-দেশের রাজার ছিলো দানোর মতো লোভ। তাঁর রাজ্য ছিলো বেশ বড়ো, কিন্তু তাতে তাঁর মন উঠতো না। তিনি চাইতেন যে, তিনিই সারা পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট হবেন। আর, সেই উদ্দেশ্যেই, রাজামশাই সৈন্যসামন্ত লোক-লস্কর তীর-ধনুক বর্শা ইত্যাদি নিয়ে প্রতিবছরই দেশ জয় করতে বেরোতেন। তাঁর শিবির পড়তো যেখানে, সেখানেই তাঁর ফৌজ সব-কিছু ধ্বংস করতো, তাদের নিষ্ঠুর, লোভে-বাঁকানো, শিরা-আঁকা থাবা থেকে কিছুই রেহাই পেতো না। যে দেশ জয় করতে যেতেন, সেই দেশের শস্যশ্যামল মাঠের উপর দিয়ে সেই রাজা তাঁর পল্টন চালিয়ে নিয়ে যেতেন, আর তাদের পায়ের চাপে সব ফসল, সোনালি ফসল, নষ্ট হ'য়ে যেতো। তার দরুণ দেশের লোকদের অনেক কাল ধরে না খেয়ে থাকতে হ'তো। রাজামশাই যে দেশ জয় করতেন, সে-দেশের কেবল যে ফসলই নষ্ট করতেন, তা নয় দেশের উপর দিয়ে যাবার সময় সব গরিব লোকদের কুঁড়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখতেন। এই সব ঘরবাড়ির আগুন হু-হু ক'রে আকাশ পর্য্যন্ত উঠতো, আর আশে-পাশের সব গাছপালা আগুনের আঁচে ঝলসে যেতো, পুড়ে যেতো। খিদে পেলে কেউ যে ফলমূল খেয়ে থাকবে, তারও কোনো উপায় থাকতো না। সবাই যাতে না খেয়ে মরে সেই জন্যই এই ছিলো [illegible] নির্দয় ফন্দি! ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ে কোলে ক'রে [illegible]গুন-লাগা বাড়ি থেকে সব মেয়েপুরুষ এসে আশ্রয় নিতো সেই [illegible] ঝলসানো গাছতলায়। বর্ষার দিনে প্রবল বৃষ্টির জলে, আর শীতকালের ঠাণ্ডা, কনকনে, পাঁজরায়-ছুরি-চালানো হাওয়ায়, অনাহারে, অনিদ্রায়, ভয়ে তাদের যে কী অবস্থা হ'তো, তা কল্পনা করতে গেলেই শরীর শিউরে উঠতে চায়। লড়াইয়ের গল্প প'ড়ে আমরা মোটেই বুঝতে পারিনে, যে-দেশ হারলো, সে-দেশের উপর দিয়ে দুর্দশার রথের চাকা কী ভাবে গড়িয়ে যায়!

রাজামশাই তাঁর ফৌজ নিয়ে যাবার সময় অনেক বার ঐ সব করুণ, বুক-ফাটা দুঃখে মলিন দৃশ্য দেখেছেন, কিন্তু অন্য সবাই সে-সব দৃশ্য দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠলেও তাঁর খুবই ভালো লাগতো ও সব দেখতে। রাজামশাই দেখতেন, তাঁর চোখের সুমুখে দেশের সব লোক ঘরছাড়া হয়ে শীতে বা বর্ষায় না-খেতে পেয়ে কষ্ট পাচ্ছে ও মারা যাচ্ছে, তবু তিনি মনে করতেন যে, তিনি ঠিকই করছেন, অন্যায় কিছু করছেন না। রাজার পরাক্রম আর সৈন্যবল ছিলো অনেক, কিন্তু তাঁর যুদ্ধ-জয়ের ফল কেবল হ'তো এই রকম ধ্বংস আর দারুণ দুর্ভিক্ষ।

দিনের পর দিন যায়, রাজামশাইয়ের ক্ষমতা কেবল বেড়েই চলে। একের পর এক সকল দেশ আসতে থাকলো তাঁর দখলে। তাঁর নাম শুনলে আশে-পাশের দেশের লোকেরা ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপতো, ছেলেরা দুষ্টুমি করলে মায়েরা তাদের ভয় দেখাতেন তাঁর কথা ব'লে। এমন কি, যে-সব ডানপিটে ছেলেরা তাদের মা-বাবার কথা শুনতো না, তারা পর্য্যন্ত ভয়ে শিরশিরিয়ে কাঁপতো তাঁর নাম শুনলে।

যে সব দেশ রাজামশাই দখল করতেন, সে সব দেশ থেকে অঢেল ধনসম্পত্তি তিনি লুঠতরাজ ক'রে নিয়ে আসতেন। এর দরুণ তাঁর রাজধানীর সম্পদ ক্রমশই বেড়ে চললো। পৃথিবীতে অতো সমৃদ্ধ নগরী তখন আর কোনোখানে ছিলো না। রাজামশাই যতোই তাঁর অধীন সব দেশ থেকে অজস্র টাকাকড়ি পেতে লাগলেন, ততোই সে-সব দিয়ে রাজধানীতে অনেক ভালো-ভালো মন্দির, রাস্তা, বাগান, প্রাসাদ প্রভৃতি তৈরি করাতে লাগলেন। রাজধানীর লোকেরা দেখতো, তাদের দেশের সম্পদ আর ঐশ্বর্য দিন-দিন কেবলি বেড়ে যাচ্ছে, আর তাই দেখে তারা সবাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো: 'ও! খুব শক্তিশালী রাজা তো!' তারা যখন অমন ভাবে ঐ দুর্দান্ত রাজার ক্ষমতার প্রশংসা করতো, তখন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো না যে, অন্য সব অধীন দেশের লোকদের কী রকম দুর্দশার বিনিময়ে তাদের দেশ ঐ-রকম সুন্দর ক'রে সাজানো হ'চ্ছে।

আর রাজামশাইও তাঁর অঢেল সোনা রূপো হীরে-জহরৎ চুণি-পান্না দেখে ভাবতেন, 'সত্যিই তো, আমার তো তবে সাংঘাতিক ক্ষমতা! কিন্তু আমার আরো চাই, আরো বাড়াতে হবে আমার ঐশ্বর্য, পৃথিবীর সকলের চেয়ে অনেকগুণ বেশি ধনী আমায় হ'তে হবে।' এই ভেবে আস্তে-আস্তে পৃথিবীর সকল রাজাকে তিনি হারিয়ে দিলেন, আর তাদের সমস্ত ধনরত্ন নিজের রাজ্যে ব'য়ে আনালেন। অধীন দেশের রাজারা হ'লো তাঁর সামন্তের মতো;

প্রতি ব[illegible]ই তারা তাঁর জন্য ধনদৌলত নিয়ে আসতো। রাজামশাই উঁচু সোনার সিংহাসনে ব'সে থাকতেন, তাঁর গর্বিত মাথায় ঝলমল করতো চুনি-পান্না-বসানো সোনার মুকুট, আর সেই সব পরাজিত রাজা[illegible] হাঁটু গেড়ে তাঁকে অভিবাদন করতো।

একদিন রাজামশাইয়ের খুব শখ হ'লো যে, দেশে-দেশে, ঘরে-ঘরে তাঁর [illegible] পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। যেই তিনি হুকুম দিলেন, অমনি অজস্র শিল্পী তাঁর মূর্তি গড়তে শুরু ক'রে দিলে। এক মাসের মধ্যেই হাজার-হাজার শ্বেতপাথরের মূর্তি তৈরি হ'য়ে গেলো। রাস্তার ধারে, বাগানের মধ্যে, বড়ো-বড়ো প্রাসাদের ভিতরে তাঁর মূর্তি বসানো হ'তে লাগলো। তারপর একদিন রাজামশাই তাঁর কয়েকটি পাথরের মূর্তি একটি বড়ো গাড়িতে বোঝাই ক'রে নিয়ে বেরোলেন। উদ্দেশ্য, ঐ মূর্তিগুলো দেশের সব বড়ো-বড়ো দেউলের মধ্যে বসাবেন। দেউলে গিয়ে রাজামশাই পুরুতদের বললেন: 'আমি চাই যে, সব মন্দিরেই আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়। আর এ-ও আমি চাই যে, দেবতার পুজোর সঙ্গে সঙ্গে আমারও যেন পুজো হয়।'

পুরুতরা সকলে করজোড়ে বললেন: 'সম্রাট! আমরা স্বীকার করি যে, আপনার ক্ষমতার কোনো সীমা নেই, সাধ্য আপনার সীমাহীন! কিন্তু একথা তো ঠিক যে, স্বর্গের দেবতারা আপনার চেয়ে ঢের বেশি শক্তি ধরেন। আমরা আপনার আদেশ পালন করতে ভয় পাচ্ছি, কারণ, তা-হ'লে দেবতারা আমাদের শাস্তি দেবেন। সুতরাং সম্রাট! আমাদের কোনো ত্রুটি না নিয়ে এই দুরূহ ইচ্ছের হাত থেকে আমাদের রেহাই দিন।'

পুরুতদের সেই উত্তর শুনে রাজামশাই বললেন: 'বেশ, আমি স্বর্গের দেবতাদেরও পরাস্ত করবো। দেবতাদের জয় করবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে আপনারা খুব ভালো কাজ করেছেন।'

স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, তাই রাজামশাইয়ের নির্দেশ অনুসারে খুব তোড়জোড় শুরু হ'য়ে গেলো চার দিকে। উদ্ধত রাজার অহঙ্কার প্রস্তুত হ'তে লাগলো তুমুল যুদ্ধের জন্য। তখনো উড়োজাহাজ বেরোয়নি, তাই তাঁর হুকুম-মতো অজস্র টাকা খরচ ক'রে একটা প্রকাণ্ড জাহাজ তৈরি হ'লো; সেই জাহাজের উপর সাজানো হ'লো হাজার-হাজার তীর-ধনুক ঢাল-তলোয়ার বর্শা-বল্লম; আর ঠিক হ'লো, রাজামশাই তাঁর পল্টন নিয়ে সেই জাহাজের মধ্যেই থাকবেন। তারপর প্রায় দশ হাজার ঈগল বেঁধে দেয়া হ'লো সেই জাহাজের সঙ্গে, কারণ, জাহাজটার তো ওড়া চাই!

নির্দিষ্ট দিনে সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, ঈগল-পাখীরা সেই জাহাজটা নিয়ে আকাশে উড়লো! ক্রমশ পৃথিবী থেকে দূরে স'রে যেতে লাগলো জাহাজটা; খানিক পরেই পৃথিবীর সব জিনিশ দেখাতে লাগলো পুতুলের দেশের মতো ছোটো-ছোটো; তারপর উড়তে-উড়তে জাহাজটা এতো উপরে উঠলো যে; সেখান থেকে পৃথিবীর কিছুই আর দেখা গেলো না।

জাহাজটা যখন নীল আকাশে অনেক উঁচুতে উঠলো, রাজামশাই চার পাশে দেবদূতদের চলাফেরা করতে দেখলেন। তাদের দেখেই রাজামশাই হুকুম দিলেন তীর ছুঁড়তে। হাজার হাজার ধনুক থেকে অনর্গল রাশি-রাশি তীর ছোঁড়া হ'তে লাগলো, কিন্তু রাজা অবাক হ'য়ে দেখলেন যে, একটাও দেবদূতদের গায়ে লাগছে না, বরং সেই সব তীর কেমন ক'রে যেন ফিরে এসে তাঁরই সৈন্যদের গায়ে লাগছে, আর তারা এক-এক ক'রে মরছে। বেগতিক দেখে নিজেই একটা ধনুক তুলে নিলেন হাতে, খুব ভালো ক'রে লক্ষ্য স্থির করলেন, তারপর ছুঁড়লেন এক দেবদূতের দিকে। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, তীরটা দেবদূতের গায়ে লাগলো, কিন্তু তবু সে মরলো না। কেবল তার গা থেকে দু-ফোঁটা রক্ত পড়লো জাহাজের উপর, আর সেই দু-ফোঁটা রক্ত পড়তেই মনে হ'লো, কেউ যেন সেই জাহাজটার উপর হাজার মণ বোঝা চাপিয়ে দিলো। তার দরুণ ঈগলেরা আর জাহাজের ভার বইতে পারলো না। ভারের চোটে তাদের ডানা ভেঙে গেলো, আর হুহু ক'রে জাহাজটা শূন্য থেকে মাটিতে পড়তে লাগলো।

অতো উঁচু থেকে পড়তেও তো সময় লাগে। সেই সময়টুকুর মধ্যে রাজামশাইয়ের দুর্দশা কিন্তু কিছু কম হ'লো না। হাওয়া উথাল-পাথাল হ'য়ে উঠলো যেন হঠাৎ, নাগরদোলার মতো পাক খেতে লাগলো জাহাজটা, টলতে লাগলো চরকিবাজির মতো, রাজার মাথার উপরে হাওয়ার বোঁ-বোঁ ক'রে আওয়াজ হ'তে থাকলো, তাঁর অনেক সৈন্যকে ঝড়ে যে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেলো, তা কেউ বুঝতেও পারলে না; আর কতকগুলো বড়ো-বড়ো সমুদ্রের কাঁকড়ার মতো কী সব জানোয়ার হুশ-হুশ ক'রে উড়ে এসে রাজামশাইকে আর তাঁর সৈন্যদের কামড়ে একেবারে রক্তাক্ত ক'রে দিল।

তারপর,—রাজামশাইয়ের বরাত জোরে, কি দেবতাদের কাছে তাঁর আরো শাস্তি তোলা ছিলো ব'লেই কি না জানিনে,—জাহাজটা এসে পড়লো জলে। যদি মাটিতে বা পাহাড়ের উপরে পড়তো, তবে জাহাজটা তো চুরমার হ'য়ে যেতোই, রাজামশাইও তা-হ'লে গুঁড়ো হ'য়ে যেতেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর স্বর্গের রাজা হওয়া বেরিয়ে যেতো। এতো শাস্তি পেয়েও রাজামশাই দমলেন না; ক্ষতবিক্ষত শরীরে বাড়ি ফিরে এলেন: ঠিক করলেন, যে-কষ্টেই হোক, স্বর্গ জয় করা তাঁর চাই-ই। বৈদ্যদের চিকিৎসায় যখন তাঁর আহত শরীর সেরে গেলো, তখন তিনি ফের দেবতাদের সঙ্গে লড়াইয়ের উদ্যোগ করতে লাগলেন।

এবারে একটা উড়োজাহাজের জায়গায় তৈরি হ'লো একশো উড়োজাহাজ। আর সেই সব উড়োজাহাজ আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য কতো যে ঈগল পোষা হ'লো, তার আর কোনো লেখাজোখা নেই। লড়াইয়ের জন্য অস্ত্রশস্ত্রও তৈরি হ'লো প্রচুর। পৃথিবীর সব দেশ থেকে তাঁর জন্য সৈন্যসামন্ত এলো। যুদ্ধের জন্য রাজামশাই এতো বিরাট আয়োজন করেছিলেন যে, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে অতো সৈন্য ও অতো রসদ জোগাড় করা সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি।

সৈন্যেরা সব জাহাজে উঠছে,—তখনো জাহাজ ছাড়তে কিছুক্ষণ দেরি আছে, চার দিকে ভয়ানক শোরগোল আর ব্যস্ততা। যুদ্ধের বাজনা বাজছে তুমুল আওয়াজে,—এমন সময়ে স্বর্গের দেবতারা একঝাঁক বড়ো-বড়ো মশা রাজামশাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। সেই মশাগুলির এমনি বিষ যে, তাদের কামড়ে সাপের ছোবলের মতো যন্ত্রণা হয়, আর মানুষ পাগলের মতো অস্থির হ'য়ে চার দিকে ছুটাছুটি করতে থাকে। রাজামশাই

কেবল জাহাজে উঠতে যাবেন, এমন সময় সেই মশার ঝাঁক এসে তাঁকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করলো।

রাজা খাপ থেকে রূপোলি তলোয়ার বার ক'রে মশাদের মারবার জন্ম এদিক-ওদিক চালাতে লাগলেন, কিন্তু একটি মশাও মরলো না। ওদিকে রাজা মশাইয়ের সারা শরীর মশার কামড়ে ভীষণ জ্বালা করতে লাগলো! পাগলের মতো নাচতে থাকলেন রাজা, কিন্তু তবু মশারা তাঁকে রেহাই দিলো না। তখন রাজা হুকুম দিলেন: 'তাড়াতাড়ি আমাকে একটা মশারি দিয়ে ঢেকে দাও, আর মশাদের উপর তীর ছোঁড়ো।'

তাঁর হুকুম শুনে সৈন্তরা সব হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। তারা ভাবলে, 'মশা মারতে আবার তীর ছুঁড়বো কি! রাজামশাই নিশ্চয়ই পাগল হ'য়ে গেছেন।' কয়েক জন অবশ্য তক্ষুণি ছুটে গিয়ে কোত্থেকে একটা মশারি নিয়ে এসে রাজামশাইকে ঢেকে দিলে, কিন্তু তবু কোনখান দিয়ে একটা মশা মশারির ভিতরে তাঁকে এমনি ভাবে কামড়ালো যে, জ্বলুনির চোটে মশারি ছেড়ে তিনি পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলেন।

তাঁর সৈন্তসামন্তরা এই কাণ্ড দেখে ভাবতে লাগলো, ও রকম দু-চার ঝাঁক মশা যদি দেবতারা তাদের দিকে পাঠিয়ে দেয় তো মহা মুশকিল হবে: সেইজন্ত তারা সবাই বেঁকে বসলো, তারা যুদ্ধে যাবে না। তবু যদি রাজামশাই বেশি পীড়াপীড়ি করেন তো তারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। রাজাও তাঁর সব সৈন্ত ও দেশের লোকের সামনে সামান্ত কয়েকটি মশার কাছে লাঞ্ছনায় এমনি লজ্জিত আর অপ্রতিভ হ'লেন যে, ভুলেও ভবিষ্যতে তিনি আর কোনো দিন স্বর্গজয়ের দুর্বাসনা প্রকাশ করেন নি।

অনুবাদক: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাশিয়ার রূপকথা

(বয়স তার সাত)

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

তারা দুই ভাই। একজন ধনী, আরেক জন গরীব। ধনীর আছে তাজী ঘোড়া, গরীবের আছে মাদী ঘোড়া। এক দিন তারা বেড়াতে বেরুল। নিজ নিজ বাহনে চড়ে দুই ভাই পাশাপাশি চলল। চলতে চলতে রাত হল। একটা গাছের তলায় তারা রাত কাটাল।

ধনী লোকটির ঘোড়া ছাড়া গাড়িও ছিল সঙ্গে। গাড়িতে করে তার খাবার-দাবার আর বিছানাপত্র গিয়েছিল।

রাত্রিবেলা গরীব লোকটির মাদী ঘোড়ার একটি বাচ্চা হল। বাচ্চাটি গড়িয়ে গড়িয়ে ধনীর গাড়ির তলায় এসে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালবেলা ধনী গরীবকে ডেকে বলল, দেখেছো হে, আমার গাড়িটা কি সুন্দর বাচ্চা দিয়েছে!

গরীব ধনীর কথায় অবাক হয়ে বলল, "সে কি কথা, গাড়ি আবার বাচ্চা দেবে কি করে? বাচ্চা দিয়েছে আমার মাদী ঘোড়া।"

ধনী এ-কথায় আপত্তি জানিয়ে বলল, "বাচ্চা যদি তোমার মাদীর হবে, তাহলে সে আমার গাড়ির নীচে আসবে কেন?"

এমনি করে কথা-কাটাকাটি করতে করতে তারা [illegible]ষ পর্যন্ত আদালতের আশ্রয় নিল।

ধনী ঘুস দিয়ে উকিল হাকিমের মুখ বন্ধ করল। গরীবের সম্বল রইল শুধু সত্যি কথা। ব্যাপারটা আদালত থেকে রাজা[র] কাছে গেল।

রাজা তাদের দু'জনকে ডেকে চারটি প্রশ্ন দিলেন।

এক—সব চাইতে শক্তিশালী কে, আর [illegible] সব চাইতে তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে?

দুই—সবার চাইতে স্নেহ কার বেশি?

তিন—সব চেয়ে নরম জিনিস কি?

চার—সবার চাইতে মানুষের প্রিয় কি?

প্রশ্নগুলি বলে রাজা তাদের তিন দিনের সময় দিলেন। চতুর্থ দিন সকাল বেলাই তারা যেন উত্তর মুখে নিয়ে রাজদরবারে হাজির থাকে।

ধনী লোকটি চতুর। তার মনে পড়ল একজন চেনাশোনা লোককে। সে তখনই তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন চারটির উত্তর জানতে চাইল। যার কাছে গেল, সে-ও খুব চালাক লোক। চটপট সে উত্তর বলে যেতে লাগল।

এক—সবচেয়ে শক্তিশালী আমার পাটকিলে রঙের ঘোড়া। তার গায়ে চাবুক ছুঁইয়েছে কি সে বাতাসের আগে ছুটতে শুরু করবে।

দুই—স্নেহ মানে স্নেহপদার্থ, মানে চর্বি। ঐ ত্যাখো না আমার দু' বছরের শুওরের বাচ্চাটার গায়ে কত চর্বি। ওটা এমনি মোটা যে, চার পায়ের উপর শরীরের ভর রেখে দাঁড়াতেই পারে না।

তিন—পালকের বিছানার চাইতে নরম আর কিছু আছে বলে ত জানিনে।

চার—আমার নাতি ইভানুস্কার চাইতে প্রিয় আর কি থাকতে পারে? ত্যাখোই না, কি সুন্দর সে দেখতে—যেন দেবদূত নেমে এসেছেন।

ধনী প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়ে আনন্দে লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে রাজার কাছে হাজির হবার আয়োজন করতে লাগল।

এদিকে গরীব লোকটি ঘরের এক কোণায় বসে কাঁদতে লাগল। রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে তার যে প্রাণ নেবেন রাজামশাই। সে যদি বেঁচে না থাকে, তাহলে কোথায় দাঁড়াবে তার সাত বছরের মা-হারা মেয়ে!

মেয়ে তাকে দেখে ফেলল হঠাৎ। বলল সে বাবাকে, "এমন কাঁদছ কেন বাবা?"

গরীব বাবা বলল, "মা, রাজা আমাকে চারটি প্রশ্ন দিয়েছেন। সেগুলির উত্তর আমি খুঁজে পাচ্ছি নে।"

মেয়ে বলল, "বলো না আমাকে, রাজা কি প্রশ্ন দিয়েছে?"

বাবা বলল, একে একে চারটি প্রশ্নের কথা, তার সাত বছরের মেয়েকে।

মেয়ে প্রশ্ন শুনে বলল, "এ তো খুব সহজ প্রশ্ন বাবা! আমিই এ-গুলির উত্তর তোমাকে বলে দিচ্ছি, শোনো—"

এক—সবচেয়ে বলশালী হচ্ছে বাতাস, বাতাসের চাইতে তাড়াতাড়ি আর কেউ ছুটতে পারে না।

দুই—সব চেয়ে স্নেহ বেশি হচ্ছে পৃথিবীর। যত জীবজন্তু, গাছপালা—প্রাণী সবাইকেই পৃথিবী অপার স্নেহে পালন করছে, খাইয়ে পরিয়ে বাড়িয়ে তুলছে।

—সব চেয়ে নরম হচ্ছে মানুষের বাহু। মানুষ শত নরম শয্যায় [illegible]ও মাথার নীচে বাহুখানি বিছিয়ে দিলে আরাম বোধ করে।

চা[illegible]—সবার চাইতে প্রিয় মানুষের ঘুম। দুঃখ-যাতনা রোগ-শোক সব কিছুরই শান্তি হয় ঘুম যখন দু'চোখ ভরে আসে। এমন দরদী বন্ধু মানুষের আর কিছু নেই।

চতুর্থ দি[illegible] আবার দুই ভাই একসঙ্গে হয়ে এসে হাজির হল রাজ-দরবারে। [illegible] প্রথম ধনীকে প্রশ্নের উত্তর শুধালেন। ধনীর উত্তর শুনে রা[illegible] কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর গরীবকে শুধালেন। [illegible]রীব একে একে প্রশ্ন চারটির উত্তর দিলে পর রাজা বললেন, "এই উত্তরগুলি কি তুমি নিজে নিজেই তৈরি করেছ—না, আর কারও সাহায্য নিয়েছ?"

গরীব লোক কখনও মিথ্যে কথা বলেনি। এবারও সে সত্যি কথাই বলল। বলল—"আমার সাত বছরের মেয়ের কাছ থেকে প্রশ্নগুলির উত্তর জেনে নিয়েছি।"

রাজা শুনে অবাক হয়ে বললেন, "তোমার এত ছোটো মেয়ের এত যদি বুদ্ধি তাহলে এক কাজ করো তো, এই নিয়ে যাও আমার কিছু রেশমের সুতো, এ দিয়ে তোমার মেয়ে যেন আমাকে একটি সুন্দর তোয়ালে তৈরি করে দেয়।"

গরীব লোকটি রাজার দেওয়া রেশমের সুতো নিয়ে বাড়ি এসে এক কোণায় বসে রইল বিষণ্ণ মনে।

মেয়ে এসে বাবাকে বলল, "কেন এমন মুখ কালো করে বসে আছ বাবা? বাবা তখন খুলে সব কথা বলল।

মেয়ে বাবার কথা শুনে বলল, "এর জন্যে তুমি অত আবার ভাবছ? এই বলে সে তখনই ঝাঁটার ভিতর থেকে কাঠের টুকরোটা খুলে নিয়ে বাবার হাতে দিয়ে বলল, "যাও, এক্ষুনি রাজার কাছে, গিয়ে তাকে বলো যে এই কাঠের টুকরোটা দিয়ে উনি যেন একটা তাঁতের মাকু তৈরী করিয়ে দেন আমাকে। ওঁর ভালো কাঠমিস্ত্রি আছে।"

গরীব লোকটির হাতে রাজা কাঠের টুকরো পেয়ে ভাবতে লাগলেন সেই ছোট্ট মেয়ের কথা, যার বয়স মোটে সাত।

পরক্ষণেই দেখলো দেড়শো হাঁসের ডিম নিয়ে এসে লোকটির হাতে দিয়েরাজা বললেন, "এগুলো নিয়ে তোমার মেয়েকে দাও আর বলো—কালকের মধ্যে আমাকে যেন দেড়শো হাঁসের বাচ্চা পাঠিয়ে দেয়।"

গরীব লোকটি রাজার দেওয়া দেড়শো ডিম নিয়ে এসে বাড়িতে এক কোণায় বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। আজ তাকে অন্যান্য দিনের চাইতেও চিন্তাকুল দেখাচ্ছিল।

তার মেয়ে এসে তাকে 'বাবা' বলে ডাকতেই সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলল—"হায় রে আমার পোড়াকপালী মেয়ে, এবার রাজা যে বিপদে ফেলেছে তার থেকে আর বাঁচতে পারবি নে।"

মেয়ে বাবার মুখে রাজার হুকুম শুনল আর রাজার দেওয়া ডিমগুলি নিল। ডিমগুলি দিয়ে সে তখনই নানারকমের খাবার তৈরি করতে লাগল।

তার পর বাবাকে বলল, "যাও বাবা রাজার কাছে, গিয়ে বলো, হাঁসের বাচ্চাগুলির জন্য আজকেই যেন জমিতে চাষ দিয়ে নীবার বোনেন, কালকের মধ্যেই সেই নীবারগুলির কচি ডগা তুলতে হবে—আর সেগুলি খেয়ে বাচ্চাগুলি বাঁচবে। যাও, এখনই গিয়ে রাজাকে বলো।"

রাজা গরীব লোকটির কথা শুনে বলল, "তোমার মেয়ের যদি এত বুদ্ধি, তাহলে তাকে গিয়ে পাঠিয়ে দাও কাল খুব সকালবেলা আমার কাছে। কিন্তু একটা কথা—সে যেন পায়ে হেঁটে না আসে, সে যেন ঘোড়ায়ও না চড়ে আর তার পরনে যেন কিছু না থাকে, তাই বলে সে যেন ন্যাংটো হয়ে না আসে। আর মনে রেখো—সে যেন আমার জন্য কোনো উপহার না আনে—তাই বলে একেবারে খালি হাত যেন তার না থাকে।"

রাজার এই অদ্ভুত সব ইচ্ছে শুনে গরীব লোকটি হতাশ হয়ে পড়ল। বাড়িতে গিয়ে পা দিতেই মেয়ে এসে তার মুখ থেকে সকল কথা কেড়ে নিয়ে বাবাকে সাহস দিয়ে বলল, কিছু ভয় নেই বাবা। শিকারীদের কাছে যাও, আর আমার জন্ত একটা জ্যান্ত খরগোস আর একটা তিতির কিনে নিয়ে এসো।

পরের দিন মেয়ে ঘুম থেকে উঠেই পরনের পোষাক খুলে ফেলল। একটা মাছ-ধরার জাল দিয়ে শরীরটা ঢাকল। তিতিরটাকে হাতে নিল আর খরগোসটার পিঠে চড়ে বসল। খরগোসটা ছুটে চলল রাজবাড়ির দিকে।

রাজবাড়ির ফটকেই রাজার সঙ্গে দেখা হল। সেই গরীব লোকের সাত বছরের মেয়ে। মেয়ে মাথা নুয়িয়ে রাজাকে অভিবাদন করল। তার পর বলল, "এই নিন আপনার উপহার", বলে তিতিরটাকে ছেড়ে দিল।

রাজা পাখিটার দিকে হাত বাড়ালেন কিন্তু ধরতে পারলেন না। পাখিটা শাঁ করে আকাশে উড়ে গেল।

রাজা এতে বিরক্ত না হয়ে বললেন, "সাবাস মেয়ে! ঠিক ঠিক যেমনটি বলেছিলাম, তেমনটি তুমি করলে, সাবাস!

রাজা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার বললেন, "আচ্ছা, তোমার বাবা-তো বড় গরীব, তুমি আমায় বলতে পারো, তোমাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা কি করে হয়?"

সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে রাজার প্রশ্ন শুনে এতটুকু বিচলিত হল না। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল। "আমার বাবার আবার ভাবনা কিসের। শুকনো ডাঙায় তিনি মাছ ধরতে পারেন। মাছ ধরবার জন্য কখনও তাঁকে নদীতে যেতে হয় না, জালও বাইতে হয় না। ডাঙা থেকেই বাবা এত বেশি মাছ ধরেন যে আমি সে সব মাছ আমার জামার আস্তিনে পুরে বাড়ি নিয়ে আসি। সেই মাছ দিয়ে আমি খুব মুখরোচক সুপ তৈরী করি। আমি খাই। বাবা খান। আপনি যদি একবার খান, তাহলে তার কথা জীবনে ভুলবেন না।"

রাজা হো হো করে হেসে উঠে বললেন, "ওরে অবোধ, বোকা মেয়ে, কী সব তুই বলছিস? মাছ কি কখনও ডাঙায় থাকে? মাছ যে জলের জীব, সে কথা কে না জানে?"

সাত বছরের মেয়ে তখন গলার জোরে চেঁচিয়ে বলল, "ওগো বুদ্ধিমান্ রাজা, কাঠের গাড়ির পেটে আবার কোথায় রক্তমাংসের ঘোড়ার বাচ্চা জন্মায়? মাদী ঘোড়ার পেটেই যে বাচ্চা থাকতে পারে, সে কথা কে না জানে?

রাজা এবার সাত বছরের মেয়ের কাছে জব্দ হলেন। গরীব লোকটিকে ডেকে তিনি তার ঘোড়ার বাচ্চাটা ফিরিয়ে দিলেন।

নীলকণ্ঠ

বাইশ

মেয়ে-পুরুষ। মেল আর ফিমেল বলে বোম্বায়ের ফিল্মরাজ্যে আলাদা আলাদা শ্রেণী নেই। কে যে মেল্ আর কে ফিমেল ; জামা-কাপড়, হাবভাব, বৃত্তি অথবা প্রবৃত্তি কিছু দিয়েই তা ঠাহর করায় হিম্মতের দরকার। মেল আর ফিমেল নেই ; তার বদলে আছে ব্ল্যাক মেল। যেমন নাকি হগসাহেবের বাজার ; বহু বাবুর বাজার ; চীৎপুরের নূতন বাজার ; বৈঠকখানার বাজার,—এ সব সনাতন কলকাতাতেই আজও টিঁকে আছে। বোম্বায়ের ফিল্ম রাজ্যে এরা প্রাগৈতিহাসিক হয়েছে বহুদিন। তার পরিবর্তে একমাত্র যে বাজার আলো করে আছে দশ দিক,—তার নাম কালো বাজার। ব্ল্যাক মেল আর ব্ল্যাক মার্কেটিং। প্রথমটা চালু আছে বহুদিন, দ্বিতীয়টির গোড়াপত্তন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে। ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইটে বোম্বায়ের ফিল্মরাজ্যের ব্লু-প্রিন্টের নকল লিপিবদ্ধ করা সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে অসম্ভব। কারণ বোম্বাই ছবিওলাদের মুখ কেবলমাত্র ব্ল্যাক নয়। তার আসল রং ব্লু-ব্ল্যাক। সোসাইটি ব্লুদের তীর্থস্থান ভারতবর্ষের হলিউড বোম্বায়ের ফিল্মরাজ্যে তাই শুধু ভারতে আর কি হয়, বোম্বায়ের ছায়া ভারতে যাকে বলে ফিলিমী ইণ্ডিয়ার বেআইনী মদ এবং তার সঙ্গে নিষিদ্ধ আমোদ, কোনটারই অভাব নেই ; ব্ল্যাক মার্কেটের কৃপায়, ব্ল্যাকমেলের কৃতিত্বে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উপলক্ষে ভারতবর্ষের মাটিতে বিষবৃক্ষের যে মার্কিণী চারা পুঁতে গেল কোটি কোটি এ্যামেরিকান ডলার তা ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় এখনও চারার আকারে থাকলে কি হবে? বেচারা বোম্বাই! বিষের চারা বোম্বায়ের ফিলিমী দুনিয়ার ফুলে ফলে লতায় পল্লবে এখন চার শ' বিষে সুপরিপক্ক। এই ফিলিমী ইণ্ডিয়ার সব চেয়ে বড় ফিল্ম ম্যাগাজিনে ...নের শিখণ্ডির আড়াল থেকে ব্ল্যাক মেলের তীর ছুঁড়ে স... জীবন, বাড়ী করে, গাড়ী করে তারপর সেই কাগজেই ঘোষণা করা যে, যে প্রমাণ করতে পারবে যে সম্পাদক ব্ল্যাকমেলার তাকে হাজার হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে!—এমন বুকের পাটা বোম্বায়ের ফিল্মরাজ্যেই সম্ভব। শোনা যায় আমাদের এখানে বহুকাল আগে এক প্রবীণ সাংবাদিক দৈনিক পত্রের ...দকীয়র কলমে প্রত্যহ গালাগাল করতেন একটি ছোট প্রতি...কে। তারপর সেই প্রতিষ্ঠানটি এই প্রবীণ সাংবাদিকের কলম ...করার উদ্দেশ্যে কিছু টাকা দিয়ে যায় গোপনে! তারপর আবার ...রের দিন প্রচণ্ড গালাগালি কাগজে প্রকাশিত হতে দৌড়ে আসে প্রতিষ্ঠানের লোক। কি ব্যাপার? কিছু না! সাংবাদিক বলেন: টাকা নিতে পারি অভাবে; কিন্তু তার জন্য সাংবাদিক আদর্শ বিসর্জন দিতে পারি না ত! বুঝুন একবার! এটা আদর্শ না দুরারোগ্য অর্শ?—কে বলবে!

বোম্বায়ের ফিল্মরাজ্যে যারা পদার্পণ করেছে একবার তাদের নরক-দর্শন হয়ে গেছে জীবদ্দশাতেই। যুধিষ্ঠির যেমন সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন, তেমনি সশরীরে নরকে যেতে হলে বোম্বের ফিল্ম ষ্টুডিওতে যেতে হবে আপনাকে। ইংরেজ যেমন আমাদের ক্রীশ্চান করেছে, মাতৃভাষা ভুলিয়েছে, স্বদেশ ও সংস্কৃতি করিয়েছে বিস্মৃত, তেমনই বোম্বাই ফিল্ম ভারতের জমিতে পয়দা করছে জারজ মার্কিণ সংস্কৃতি। চটুল পায়ে তালি পড়ান সুরকে সঙ্গীত বলে। হাওয়াইয়ান অথবা বুশ সার্ট। তার সঙ্গে ট্রাউজার আর পায়ে স্লিপার। না জন্তু না মানুষের এই পোষাককে একমাত্র পরিধেয় বলে। রাস্তায়, পার্কে, প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে, ট্যাক্সীতে পুরুষে এবং নারীতে মিলে জড়াজড়ি করাকে প্রণয় বলে। না শুদ্ধ হিন্দি, না বিশুদ্ধ রাষ্ট্রভাষা; দুয়ের অভাবে এ্যামেরিকান শ্ল্যাংকেই একমাত্র হিউম্যান ল্যাঙ্গোয়েজ বলে চালাবার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বোম্বাই ছবির। আর সেই বোম্বেটে ছবি যে রেটে গ্রাস করছে কালচারের কলকাতাকে তাতে স্বাধীন ভারত রসাতলে যেতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করবার থাকবে না প্রয়োজন। কলকাতাও আজ সংস্কৃতি বলতে বুঝছে সিনেমা। পাঠ্য বলতে সিনেমার কাগজ। এ্যাটম আর হাইড্রোজেন। ন্যুক্লিয়ার অস্ত্রের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহের অনেক আগে নির্মূল করা দরকার এই জাতীয় ছবি। এবং এই বজ্জাতীয় ফিল্ম পত্রিকাগুলিকে। এখানেই সার্বজনীন দুষ্কৃতির ন্যুক্লিয়াসের সব চেয়ে জোরালো অবস্থিতি। সেবাসদনে সন্তান ঠিক সময়ে প্রসব না হলে ডাক্তারেরা পর্যন্ত আজকাল সন্দেহ করে যে সেই দীর্ঘসূত্রিতা কোনও প্রাকৃতিক কারণে নয়। হয়ত নবজাতক ভূমিষ্ঠ হবার আগেই মাতৃগর্ভে থাকতে থাকতে হাতে পেয়েছে কোনও সিনেমার কাগজ; হয়ত সেই কাগজে ছাপা জনপ্রিয়তম লেখকের সার্থকতম সাহিত্য সৃষ্টি, 'কথা-সংবাদ' পড়তে পড়তে বিস্মৃত হয়েছে সময়ে জন্ম নিতে! সিনেমা ভুলিয়েছে বাপ-মায়ের নাম; আর সিনেমার কাগজ ভোলাচ্ছে মনুষ্য-জন্ম!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই এই বোম্বাই হাওয়া ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে বইতে সুরু করেছে। বেলেল্লাপনা; বেআক্কেলপনা; বেআব্রুপনার অভিশাপই ফণা তুলেছে বোম্বাই মার্কা ছবিতেই প্রথম।

সেই 'অ'-এ অজগর আসছে তেড়ে! 'খিড়কি'-দরজা দিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে যার সন্তর্পণ প্রবেশ সতর্ক হবার কোনও সুযোগই দেয় নি তাকে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর মানসিক বিকৃতির দুধ কলা দিয়ে পুষেছি আমরা; তাই উদ্যতফণা এই অজগরের স্রষ্টা আমরাই। আস্তে আস্তে এই ফিলমের দূষিত হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের সমস্ত স্তরে; এর নাগালের বাইরে আছে আজও যারা তারা সংখ্যায় নগণ্য। সত্যকারের মাইনরিটি মুসলমান-ক্রীশ্চান অথবা পার্সিরা নয় হিন্দুস্থানে। স্বাধীন ভারতবর্ষে তারাই সত্যকারের একমাত্র মাইনরিটি যারা স্বাধীন চিন্তা করবার এখনও রেখেছে স্পর্দ্ধা। কলকাতার রাজপথে হোলির দিনে unholy উৎসব প্রত্যক্ষ করবার অভিজ্ঞতা এখনও আমাদের মন থেকে মুছে যায়নি। খবরের কাগজে এখনও পর্যন্ত প্রত্যহ আমাদের পড়তে হচ্ছে: 'প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ায় ছাত্রদের একযোগে পরীক্ষাকেন্দ্র ত্যাগ!' আমরা এ খবরও সেই সঙ্গে রাখি যে বেলা তিনটের স্কুলে থাকে যত ছেলে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় থাকে কোনও নূতন ছবির ম্যাটিনি শো-তে! এবং একথাও ত মিথ্যা নয় যে পাড়ায় পাড়ায় পূজা উপলক্ষে জলসার নামে আমরা লাউডস্পীকার যোগে যার জয়ধ্বনি দিতে বাধ্য হই তার সঙ্গে আর যারই যত ক্ষীণসূত্র যোগ থাক পূজার সঙ্গে বা কোনও শুভ, সুস্থ অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সংযোগ থাকতেই পারে না; আর? আর বাড়ীতে পারিবারিক সম্বন্ধ বাবা-মায়ের সঙ্গে ছেলেমেয়ের কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সে কথার উল্লেখ না থাকাই বোধ করি বাঞ্ছনীয়! কিন্তু একদিনে হয়নি এসব; একটু-একটু করে হয়েছে। এবং শিথিল হয়ে আসা; ঘুণধরা সমাজের সেই আগাপাশতলায় সজোরে শেষ ধাক্কা দিচ্ছে এই সব বোম্বায়ের আসল এবং অন্যত্র বোম্বায়ের নকল বোম্বাই মার্কা ছবি!

বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কথঞ্চিৎ নাম হলেই বোম্বাই পাড়ি দিচ্ছে। বদনাম হলে বাধ্য হচ্ছে। নিউ থিয়েটার্স-যুগের যারা এবং যারা পরবর্তী হুজুগের কৃপায় বড় পরিচালক, কি সুরকার, অথবা আলোক চিত্রকর; অভিনেতা-নেত্রী ত বটেই বম্বে যাবার জন্য ব্যস্ত। না। ব্যস্ত নয়; জলের জন্য চাতক যেমন; তৃষ্ণার্ত। বাংলা ছবিতে নাম হয়; হিন্দী ছবিতে বদনাম। কিন্তু বাংলা ছবিতে টাকা হয় না; হিন্দী ছবিতে টাকা হয়। এই যুক্তিতে কেউ কেউ বলতে চান, বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রী যদি টাকার জন্য বোম্বাই যান তাতে আপত্তির কি থাকতে পারে? পারে। ইঁদুরেরাই ডুবন্ত জাহাজ পরিত্যাগ করে প্রথম; মানুষেরা নয়। কিন্তু এরা সেই মূষিকের চেয়েও অধম; কারণ মূষিকেরা ডুবন্ত জাহাজ পরিত্যাগ করে মাত্র; আর বাংলা ছবির কুশীলব এবং কলাকুশলীরা শুধু বাংলা দেশ ত্যাগ করেই রেহাই দেয় না। ভাগ করে থাকে; আবার বাংলা ছবির হাল ফিরে গেলেই; অথবা বোম্বাইতে যথেষ্টরও অতিরিক্ত নাজেহাল হলে এই পোড়া বঙ্গেই প্রত্যাবর্ত্তন করতে না হয় লজ্জিত; না করে দ্বিধা। শুধু সে-কারণেও নয়। টাকা,—মস্ত বড় প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেও নয়। একটা তুলনা দিলেই সহজ হবে বক্তব্য। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এবারের বেটন কাপ বিজয়ী; তাতে বাঙালীর গৌরব কোথায়? একজন-আধজন মাত্র বাঙালী ইষ্টবেঙ্গ[illegible]বর হয়ে খেলেছেন। ফুটবলেও তাই। দেশ বিদেশের [illegible]দার খেলোয়াড় নিয়ে এসে শুধু ইষ্টবেঙ্গল নয়; ইষ্টবেঙ্গল, মোহ[illegible]বাগান, এবং ঠক বাছতে গাঁ উজাড়!—কে নয়? এতে বাঙালী [illegible]খেলোয়াড় তৈরী হচ্ছে কোথায়? আমরা একসময়ে ক্রিকেটে [illegible]রঞ্জি ট্রফি জিততাম সাতজন সাহেব খেলোয়াড় সম্বল করে এগার[illegible]নের মধ্যে। তাতে রঞ্জি ট্রফি জিততাম বটে কিন্তু যাঁর পুণ্য নামে [illegible] ট্রফি সেই অবিস্মরণীয় রঞ্জি হাসতেন নিশ্চয়ই; যে হাসি [illegible]লে কান্নারই আরেক রূপ।

বাংলা দেশের ছবি আজ যেখানে এসে পৌঁছেচে তার জন্য যাদের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব সর্বাধিক সেই সব ব্যক্তিত্ব যদি কেবলমাত্র টাকার জন্য সবাই বোম্বাই চলে যান তাতে স্বদেশ ও সংস্কৃতি তাদের অকৃতজ্ঞ বলে সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা দায়ী করতে পারে বৈ কি! টাকার প্রয়োজন সককলের আছে। ছায়াছবি-কর্মীর যে থাকবে তাতে আর যাই থাক দোষের কিছু নেই। কিন্তু টাকার জন্য লোকে চুরি করবে, এতে যেমন না আছে আইনের, না বিবেকের সম্মতি, তেমনি শুধু মাত্র-টাকার জন্য নিজের দেশের প্রগতি ব্যাহত হবে জেনেও প্রবাসে পাড়ি দেওয়ায় আইনের না থাক মনুষ্যত্ববোধের বিশেষ আপত্তি থাকতে বাধ্য। এ ছাড়াও আপত্তির আরও কারণ আছে। আরও অকাট্য যুক্তি আছে আমাদের বক্তব্যর সমর্থনে। বোম্বাইতে ছবির পৃথিবী টাকার; কেবলমাত্র টাকারই। টাকা ছাড়া আর কোনও রকম আদর্শের এতটুকু বালাই থাকলেও আমরা বাঙালীর বোম্বাই ফিল্মে যোগদান করায় আপত্তির পরিবর্তে জানাতাম অভিনন্দন। কিন্তু বোম্বাইকে জানি; অনেক বেশি জানি বোম্বাই ছবির প্রযোজকদের। শুধু তা-ও নয়। বোম্বাই প্রযোজকদের; কুশীলবদের; কলাকুশলীদের মনোবৃত্তির চেহারাটা দেখতে পাই খোলাচোখেই চিকিৎসকদের এক্স-রে চোখের চেয়ে অনেক অন্তঃপুর পর্যন্ত। সে মনোবৃত্তি বাঙালী বিদ্বেষে বিকৃত। বোম্বাই বলে নয়; সমস্ত অবাঙালীরই জাতক্রোধ বাঙালীর বিরুদ্ধে; পুঞ্জীভূত আকারে বোম্বায়ের ফিল্ম ষ্টুডিওতেও সঞ্জাত। বাঙালীকে দিয়ে ছাড়া সেকাজ আর কাউকে দিয়ে অসম্ভব, সেই কাজেই কেবলমাত্র বাঙালীকে ডাকো। কাজ ফুরোলেই বিদায় দাও। বোম্বায়ের ফিল্মরাজ্যে যে ক'জন বাঙালী ধোপে টিকেছেন, অনেক আছড়েও তাঁদের দফা দফারফা করা যায় নি বলেই তাঁরা বোম্বায়ে যতখানি বাঙালী তার চেয়ে অনেক বেশি অবাঙালী হতে বাধ্য হয়ে তবে টিকেছেন। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা বলছি না। উজ্জ্বল ব্যতিক্রম আছে এবং থাকবে। কিন্তু ব্যতিক্রম ত' নিয়মেরই প্রমাণ সূচিত করে মাত্র।

বোম্বাই ছবিওলার বঙ্গবিদ্বেষের পেছনে যা কাজ করে তা-ও ওই টাকা। টাকা অনেক বেশি রোজগারের মহিমায় বোম্বাই শিল্পী এবং কুশলীরা বাঙালীর চেয়ে নিজেদের অনেক বড় মনে করে। না মনে করে উপায় কি! গুণের চেয়ে ভাগ্যের; বিদ্যার চেয়ে অর্থের; ব্রাহ্মণের চেয়ে বণিকের প্রতিপত্তি বিশ্বসমাজ জুড়েই যেখানে বেশি সেখানে অশিক্ষিত ছবিওলারা যে টাকার উত্তাপে যৎকিঞ্চিৎ গরম হবে এতে অবাক হবার এমন কি আছে? আজকের পৃথিবীতে যারা সভ্যতার অঙ্গে শিল্পের বিজ্ঞানের চিন্তার অলঙ্কার পরাবার স্পর্দ্ধা

তারা নয়। বড় জাত বলে গণ্য আজ তারাই, চরম সভ্যতার যারা মূর্ত প্রতীক; যাদের হাতে আছে হাইড্রোজেন বা এ্যাটম বোমা। এই যেখানে শতাব্দীর সভ্যকারের রূপ, সেই শতাব্দীতে সভ্যতার অভিশাপ যারা, চলচ্চিত্রকর্মী—পেটে বোমা মারলে যাদের 'ক' বেরোয় না, তারা যে গুণীকে ট্রেসপাসার জ্ঞান করবে, তাতে আমরা যতই বিচলিত বোধ করি শূদ্রপ্রধান পৃথিবীতে অর্থে ও কল্যাণে সমর্থ সেই সব শয়তানরা নিজেদের দুষ্কার্যে ততই অবিচলিত থাকবে। তাদের অচলায়তনে তাই ঘা দিতে হবে। সুস্থ, শুভ, প্রগতির ঘা; অন্ত ও প্রত্যহ; প্রতিমুহূর্তে দিয়ে যেতে হবে সজোর আঘাত।

মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত অন্ত ও প্রত্যহ'র কোন্ একটি কিস্তিতে আমার মনে নেই, আমার একটি মন্তব্যে বিচলিত হয়ে বসুমতীর কোনও অনুরাগী পাঠিকা এক পত্রাঘাত করেন সম্পাদককে। সেই পত্রটি আমি দেখেছি। আমার যে মন্তব্য তিনি আপত্তিকর বলে জানিয়েছেন সেটি প্রত্যাহার করেও তার পুনরুক্তি করার থেকে বিরত রইলাম। বিরত রইলাম কারণ পুনরুক্তিতে পুনর্বার তিনি আঘাত পেতে পারেন। কাউকে ব্যক্তিগত আঘাত করা আমার 'অন্ত ও প্রত্যহ' রচনার উদ্দেশ্য নয়, তার পরিবর্তে সকলকে ঘুম থেকে জাগানোই আমার লক্ষ্য; আমার একমাত্র করণীয়।

আমার মন্তব্যটির টীকাটিপ্পনি সংযোগে সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা যদি করা যায় তাহলে মোদ্দা মানে দাঁড়াবে তার এই যে, আমি বলতে চেয়েছিলাম মাত্র এইটুকু: অন্ত ও প্রত্যহে যাদের কথা আমি বলছি তারা ত' এতে কর্ণপাত করবে না কোনও দিন, কারণ চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী; কিন্তু তাদের বাদ দিলাম যারা অন্ত ও প্রত্যহ রূপালী পর্দায় এদের লজ্জাকরজনক অবদান প্রত্যক্ষ করছেন, সেই দর্শকদের কানেও কিছু তুলে লাভ নেই বোধ হয়। কারণ দর্শকদেরও; বাংলা হিন্দি ছবির দর্শকদেরও আপাততঃ মূকবধির বলে মনে করা; মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। মূক এবং বধির না হলে বাংলা ছবি বা হিন্দি ছবি শুধু নয়, যত দুষ্কৃতি আজ পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তা হতে পারত না।

নিন্দনীয় বিকৃত মনোবৃত্তির রসদ যারা দিনের পর দিন উপস্থিত করছে রূপালী পর্দার তিনটে-ছটা ন-টায় বুক ফুলিয়ে, তারা কাদের ভরসায় একাজ করছে? দর্শকরা এক আধজন নয়, লক্ষ লক্ষ দর্শক লক্ষ্যভ্রষ্ট বলেই আজ বোম্বাই মার্কা বাংলা ও হিন্দি ছবির জয়-জয়কার। জানি। পৃথিবীতে বিকৃত বই এবং ছবি বহু বিক্রীত, তার কারণ একদল লোক সব যুগে থাকবেই যারা এর বাঁধা খদ্দের। কিন্তু তাদের কণ্ঠ যদি এত সোচ্চার হয় যে সেই ভয়ায় সুন্দর কণ্ঠস্বর থেকে যায় চিরকালের মত অশ্রুত, তাহলে তার দায়িত্ব কেবল মাত্র ছবিওলাদের ওপর বর্তায় না; যারা ছবি দেখে নিয়মিত তারাও এর জন্য কিছুটা দায়ী হতে বাধ্য। মাসিক বসুমতীর অনুরাগী সেই নিয়মিত পাঠিকা এর জবাব দিন।

এবং প্রতিবাদের অভাবেই যে পথের পাঁচালীর পরেও এখনও বোম্বাই মার্কা বাংলা-হিন্দি ছবির জয়যাত্রা অব্যাহত, একথা অস্বীকার করে লাভ কার? অন্ধ হলে কি সত্যই প্রলয় বন্ধ থাকে? অনেকে মনে করেন প্রতিবাদ করে লাভ কি? কে শুনবে? লাভ আছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা আরেক গুরুতর অন্যায়। অন্যায়ের ক্ষমা আছে; কিন্তু প্রতিবাদ না করার যে অন্যায়—সে হল ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। দু'চারজনও যদি এর প্রতিবাদ করে; যদি প্রতিজ্ঞা করে এ জাতীয় ছবি তারা দেখবে না; বা অন্যদের দেখায় বাধা দেবে তাতেও টনক নড়বে। তাতেও চৈতন্যের সঞ্চার হবে অহল্যার পাষাণে।

খবরকাগজের কথা তুলে লাভ নেই। সম্বাদপত্র আজ বিজ্ঞাপনের পায়ে বিক্রীত। সেই কারণে স্বাধীন মতামত সম্বাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রায়শঃই বিকৃত। সেখানে রুচিহীন ছবির বিরুদ্ধে মুখ খোলবার আগেই বিজ্ঞাপনের রজ্জুতে কাগজগুলোর মুখবন্ধ। তাই সমালোচনার অপেক্ষায় না থেকে মুষ্টিমেয় দর্শক যাঁরা যথার্থই ভালো ছবি দেখতে চান। তাঁরাই প্রথম প্রতিবাদের পথিকৃৎ হন! তাঁদের সেই প্রতিবাদের ধ্বনি হওই ক্ষীণ হক আজ, এই ক্ষীণ প্রতিবাদের ধ্বনি যেদিন কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করে ফিরবে, সেদিন ঘুরবে বাংলা ছবির মোড়। তার আগে নয়। সেই আগামী কালকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্যই অন্ত ও প্রত্যহর অন্য কোনও সার্থকতায় লেখকের আত্মতৃপ্তি নেই।

প্রতিবাদের অভাব নাহলে ছবির প্রযোজক একথা বলতে কিছুতেই সাহস করত না যে যে ছবিই পয়সা দেবে সেই ছবিই শুধু ছবি। এবং নোংরা, অসার, অপদার্থ ছবিতে যখন পয়সা বেশি, তখন বেশি করে সেই ছবিই আমরা তৈরী করব। বাংলা ছবির দর্শকদের পক্ষে প্রযোজকদের এ মন্তব্য অপমান, অসম্মানজনক। কিন্তু এর পুরোটা না হক, খানিকটা যে সত্য, কোনও দর্শকই কি তা অস্বীকার করতে পারবেন? আমার মন্তব্যে বিরূপ, মাসিক বসুমতীর অনুরাগী সেই পাঠিকাই কি পারবেন! না। পারবেন না। পারবেন না বলেই, তাঁকেও আহ্বান জানাচ্ছি যে খারাপ ছবি, খারাপ বইএর বহু বিক্রয়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ সংগ্রামে অবতীর্ণ। তিনি একা না দেখলে, একা না পড়লেই শুধু কাজ হবে, এমন নয়, আরও পাঁচজনকে নিয়ে দাঁড়াতে হবে এর বিরুদ্ধে। আর পাঁচজনকে দিয়েও বলাতে হবে: বাজে ছবি দেখানো বন্ধ কর। শুধু কালেভদ্রে; পার্কে, হলে, বক্তৃতা মঞ্চে বললেই হবে না। অন্ত ও প্রত্যহ রোজই বলতে হবে: বাজে ছবি দেখানো বন্ধ কর। বাজে ছবি দেখা দর্শকরা সেদিন বন্ধ করবে, বাজে ছবি দেখানো মাত্র সেদিনই বন্ধ হবে। সেদিন আমার মত, বসুমতীর সেই অনুরাগী পাঠিকারও নিশ্চয় এবিশ্বাস আছে, সেদিন আর দূরে নয়। পথের পাঁচালী এখনও একটি। সেদিন একটির পর একটি, একটি মশালের আগুন থেকে জ্বলে উঠবে আরেকটি মশাল। পথের পাঁচালীর অনেক আগে বাঁশের কেল্লা; পথের পাঁচালীর পর অপরাজিত; চলাচল, পঙ্কতপা, কাবুলিওয়ালা এবং টাকা-আনা-পাই কি তারই প্রমাণ নয়?

[ক্রমশঃ।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

শ্রীশ্রীসারদা দেবী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমালতী গুহ-রায়

ছোটবেলা থেকে মা'র কতকগুলি অলৌকিক দর্শনের কথাও জানা যায়। তাঁর কোন কষ্টকর কাজ বা অসুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হলেই অলৌকিক ভাবে তিনি সাহায্য পেতেন। কিন্তু সে সাহায্য কি করে হ'ত, কে যে করতো, তার কোন নিরূপণ হ'ত না। রহস্যাবৃত থাকতো।

ছোট অবস্থা থেকেই মা সাংসারিক কাজে নিজের মাকে সাহায্য করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এ আমরা শুনেছি। গরুর জন্য দল-ঘাস কাটতে তাঁকে পুকুরে গলাজলে ডুবতে হত। ঘাস কেটে তুলে আনতে ঐ বয়সে তাঁর যথেষ্টই পরিশ্রম ও কষ্ট হত। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন তাঁরই বয়সী ছোট একটি মেয়ে ঘাসগুলি কেটে কেটে তাঁর হাতে তুলে দিতো আর তিনি বেশ সহজেই সেগুলি ঘাটে তুলে রাখতেন। তাঁর কাজ যেন অর্দ্ধেক হাল্কা হয়ে যেতো। কে যে মেয়েটি তাঁকে এমনি অভাবনীয় ভাবে সাহায্য করতো, তার আর কোন খবর পাওয়া যেতো না!

মা যখন প্রথম জীবনে কামারপুকুরে থাকতেন, ভোর রাতের দিকেই তাঁকে খিড়কীর দরজা দিয়ে স্নান করে আসতে হত। একা-একা এভাবে পুকুরে গিয়ে স্নান করতে তাঁর রীতিমতো ভয়-ভয় করতো। পরদিন থেকেই দেখতে পেলেন কোথা থেকে আটটি স্ত্রীলোক তাঁর স্নানের ঠিক সময়টাতেই তাঁদের খিড়কীর সুমুখ দিয়ে তাঁরই সাথে সাথে চলতো। আগে চার জন পিছে চার জন এ ভাবে তারা মাকে মধ্যে রেখেই পুকুর পর্য্যন্ত যেতো। আবার স্নানান্তে কলসী কাঁখে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরতো। এরকম আশ্চর্য্য ভাবে সঙ্গী পেয়ে মার আর স্নানে যাওয়া-আসার কোন ভয় থাকতো না। অথচ এই সঙ্গিনীরা যে কে, তার কোন পরিচয় আর পাওয়া যায় নি।

দক্ষিণেশ্বর যাবার পথে জ্বরে বেহুঁস হয়ে যখন মা রাস্তায় এক চটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখনো কালো মত একটি সুশ্রী মে[illegible] এসে তাঁর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁকে আরাম করে দি[illegible]ছিল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল 'আমি তোমার বো[illegible] হই।' পরদিন ঘুম থেকে উঠে সত্যই মা দেখেন সেই মেয়েটিও নেই, তাঁর অসুখও আর নেই।

আবার চলা সুরু করলেন ক্লান্ত দেহে—পা চলে না, তবুও ঐ পথে কোন যানবাহনের চিহ্নমাত্র নেই। কাজেই চ[illegible]তে লাগলেন ধীরে ধীরে হেঁটেই। হঠাৎ দেখা গেল তাঁরই দি[illegible] একটি পাল্কী আসছে। এমন অভাবনীয় ব্যাপার বড় একটা হয় না, মা ভাবলেন, কালকের রাতে দেখা সেই কালো মেয়েটিই নিশ্চয় এ পাল্কীর ব্যবস্থা করেছে, নইলে এখানে আর পাল্কী আসবে কোত্থেকে! এমনি ধরণের ঘটনা মা'র জীবনে অনেক বারই ঘটেছে। কিন্তু এ নিয়ে তিনি কোন দিন বিশেষ কোন আলোচনা করেন নি।

সারদা দেবী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কাজে ও ব্যবহারে সেবাপরায়ণতা ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেতো। অন্তরটিও তাঁর অতি শৈশব হ'তে কোমল ও দুঃখকাতর ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় একবার তাঁদের বাড়ীতে গরীব দুঃখীদের খিচুড়ী খাওয়ানো হয়েছিলো। মাত্র বছর ছয়েক তখন তাঁর বয়স। তিনি সকলের খাওয়া দেখতেন। গরম গরম খিচুড়ী পাতে নিয়ে ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্ররা যখন খেতে বসতো তিনি দৌড়ে গিয়ে পাখা নিয়ে তাদের গরম খিচুড়ী ঠাণ্ডা করে দিতেন। ভাবতেন আহা! কত ক্ষিদে পেয়েছে! গরম খিচুড়ী ঠাণ্ডা না করে দিলে খাবে কি করে? ছয় বৎসর বয়সের এই ছোট ঘটনা থেকে তাঁর কোমল ও পরদুঃখকাতর অন্তরের পরিচয় পাওয়া যেতো।

সারদা দেবীর বিচার-বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা ঠাকুর নিজেও করতেন। তিনি বলতেন, ও যদি এমন না হ'ত, তবে আমার সিদ্ধির পথে অন্তরায় হ'ত। একবার নাকি পাণিহাটির উৎসবে ঠাকুরকে ভক্তদের সাথে যেতে হয়েছিল। সেই কালে ধর্মোৎসব ছাড়া সামাজিক জীবনে বড় একটা বৈচিত্র্য ছিল না। কাজেই ঠাকুর মাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন তিনিও যেতে চান কি না?

প্রশ্নের রকম দেখে সারদা দেবী বুঝতে পারলেন তাঁর যাওয়া সঙ্গত নয়। কেন না, ঠাকুর তো তাঁকে সঙ্গে যাবার জন্য তৈরী হ'তে বলেননি, তিনি যেতে চান কি না এ প্রশ্নমাত্র করেছেন। ঠাকুরের যদি ইচ্ছা হত, সারদা দেবীকে সঙ্গে নেবেন তবে ঐ ধরণের প্রশ্ন কখনোই আসতো না। সাথে যাবার আদেশ বা আহ্বান জানাতেন। অল্পবয়সে সখও যে না ছিল তাও নয়। কিন্তু বুদ্ধি করে নিজেকে দমন করলেন তিনি। গেলেন না।

ঠাকুর কিন্তু পরে বলেছিলেন 'সারদা না গিয়ে খুব বুদ্ধিমতীর পরিচয় দিয়েছে নইলে লোকে বলতো হংস-হংসী এসেছে।'

আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ে যখন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিরাও ওষুধ নিতে আসতেন, ভক্তরা বিব্রত বোধ করত। একদিন একটি ভক্ত এসে মা'র উপদেশ চাইলেন দাতব্য ঔষধালয় তো গরীবদের জন্য, ধনীরা ও যে ওষুধ নিতে আসে কি করবো?

মা বললেন, গরীবদের জন্যই দাতব্য চিকিৎসালয়, তা জেনেও যে ধনীরা ওষুধ চাইতে পারে, যে পর্য্যন্ত অনটন না ঘটবে দিয়েই যেও। কেন না, জেনেও যাঁরা ভিক্ষা চান তাঁরা যে দীন ও কৃপারই পাত্র।

মাড়োয়ারী ভক্তটি যখন ঠাকুরকে দশ হাজার টাকা দিতে এসে

প্রত্যা[illegible]ত হয়ে মা'র কাছে ঐ অর্থ গচ্ছিত রাখার প্রস্তাব করেছি[illegible], তখন টাকাটা যুক্তি ও দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তাতেও ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও নির্লোভতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয়ে।

সারদা দেবীর তীক্ষ্ণবুদ্ধিই তাঁকে শিখিয়েছিল সংস্কারমুক্ত হ'তে। আর ঐ সংস্কারের দেওয়ালগুলিকে তিনি ভাঙ্গতে পেরেছিলেন বলেই মুক্তির আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন। সংস্কারের দেয়ালগুলিই তো মানুষকে বদ্ধ করে, কোন আলোর সন্ধান পেতে দেয় না।

ভক্তেরা তীর্থযাত্রার সুযোগ পেয়ে কাল-অকালের বাছ-বাছাই করলে তিনি বলতেন 'কালের কাছে (মৃত্যু) যখন কাল বা অকাল নেই, তখন পুণ্য কাজে কেন কাল অকালকে টানবে? সৎকাজের সুযোগ কখনো বারে বারে আসে না।' ভক্তদের কত জটিল সংস্কার-জনক সমস্যা যে তিনি বুদ্ধি দিয়ে সরল সহজ মীমাংসা করে দিতেন তার ঠিক নেই। তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের সংস্পর্শে যে কেউ আসতো তারই সংস্কারের দেয়াল ভেঙ্গে পড়তো। সকলকে তিনি নির্ভীক হতে উপদেশ দিতেন। সত্যধর্ম আশ্রয় করে নির্লোভী হতে পারলেই ভয় জয় করা যায়, এই ছিল তাঁর মত।

কত দেশ-দেশান্তর থেকে বিদেশী ভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা তাঁর কাছে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে আসতেন। সারদা দেবীকে কখনোই ভয় পেতে দেখা যায়নি। দিব্যি হাসিমুখে তাঁদের তিনি অভ্যর্থনা করতেন। ভাষার জন্যও কোন দিন তাঁর আটকায় নি, নিজের অন্তর দিয়েই তাদের অন্তরের ভাষা তিনি বুঝে নিতেন।

নিন্দা-স্তুতিও তাঁর কাছে সমান ছিল। কোনটা বরণ করতেও তিনি যেমন এগিয়ে যেতেন না আবার অন্যটা জেনে করতেও তেমনি পিছিয়ে যেতেন না। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা নিগৃহীত হয়েও তিনি যেমন অচঞ্চল থাকতেন, স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য জ্ঞানী ভক্তদের দ্বারা দেবীজ্ঞানে পুজিত হয়েও ঠিক তেমনিই অবিচলিত থাকতেন। সবই ছিল তাঁর চোখে ঠাকুরের লীলা। নিজের প্রাপ্য বলে কিছুই তিনি গ্রহণ করতেন না।

তাঁর মধ্যে ভগবৎশক্তির প্রকাশ অনুভব করেই তাঁর সম্মুখে যেতে স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট ঠাকুরের সন্তানদের শরীর ভক্তি-শ্রদ্ধার আবেগে থরথর করে কাঁপতো। দুর্গাপুজার সময় ঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে দেবীভাবে অর্চনা করতেন। অন্যান্য বহু স্ত্রী-পুরুষ ভক্তেরা মাকে চণ্ডীজ্ঞানে পূজা করতেন। ১০৮টি রক্তপদ্ম দিয়ে তাঁকে অর্চনা করে তাঁকে দেবীরূপে সম্মুখে রেখেই চণ্ডীপাঠ করতেন।

কত যে অগণিত ভক্ত সারদা দেবীর চরণ-পূজা করতো তার কোন সীমাসংখ্যা ছিল না। নারায়ণী কাত্যায়নী জ্ঞানে কেহ বা সর্ব্ব সম্মুখেই তাঁকে পূজা করতো। আর শুধু কি তাই? ভক্তরা যে তাঁর প্রতি তাদের অসীম শ্রদ্ধা কি ক'রে তাঁকে নিবেদন করবে, তা প্রকাশের যেন উপায় খুঁজে পেতো না। তাঁর গাড়ীর ঘোড়া খুলে নিজেরাই ঘোড়ার বদলে গাড়ী টেনে নিয়ে যেতো। কেউ বা তাঁর চলার পথটি ফুলে ফুলে ঢেকে দিত। এরকম দেবদুর্লভ সম্মান শ্রদ্ধা পেয়েও কিন্তু সারদা দেবীকে এক দিনের তরে বিচলিত হতে দেখা যায়নি। এমন ভাবে তিনি এসব শ্রদ্ধা নিবেদন গ্রহণ করতেন যেন শ্রীশ্রীঠাকুরকেই ভক্তরা সম্মান দেখাচ্ছে, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। কোন চিত্তবৈকল্য এ জন্যই তাঁকে স্পর্শ করতে পারতো না।

দূর-দূরান্তর থেকে যে ভাবে মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আনুগত্য স্বীকার করেছে, তা দেখে মনে হয় যেন পাহাড়, পর্ব্বত ও পথের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে নানা নদ নদী বুঝি এসে সমুদ্রের বুকে আশ্রয় খুঁজেছে।

'সু' ও 'কু' বলে তাঁর কাছে কিছু ছিল না। বিপথগামীদের প্রতিও তাঁর অনন্ত করুণা ছিল। কিন্তু তাই বলে কারুর কোন অন্যায়কে কোন দিনই প্রশ্রয় দেননি তিনি। তাঁর সৎ ও পুণ্য আদর্শে এসে অসংরা সৎ হয়েছে, ডাকাতরা পর্য্যন্ত সাধু হয়েছে। তিনি ছিলেন পরশমণি। তাঁর সংস্পর্শে সব যেন সোনা হয়ে যেতো। অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মাতো, পুণ্যবানের পুণ্যার্জ্জনাকাঙ্ক্ষা শতগুণে বৃদ্ধি পেতো। এ সারদা দেবীর কথা বর্ণনা করা সাধারণ মনুষ্যসাধ্য নয়।

স্বর্গীয় গিরিশ ঘোষ রামকৃষ্ণভক্ত ছিলেন। সারদা দেবীকে তিনি শুধু ঠাকুরের বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী ছাড়া অন্য কোন স্বতন্ত্র প্রাধান্য দিতে রাজী ছিলেন না। কয়েক জন ভক্তের সঙ্গে একবার তিনি জয়রামবাটী যান। সেখানে তিনি মাকে প্রথম দর্শন করেন। মাকে দেখে তিনি চমকে ওঠেন। তাঁর এরকম ভাবান্তর দেখে ভক্তরা তাঁকে প্রশ্ন করে। তিনি বলেন 'মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখ তো, স্বপ্নে তিনিই আমায় দর্শন দিয়েছেন কি না?'

সারদা দেবীকে প্রশ্ন করে ভক্তরা জানতে পারে যে, তিনি স্বপ্নে গিরিশ ঘোষকে সত্যই দর্শন দিয়েছেন। গিরিশ বাবু একথা শুনে ভক্তদের কাছে তাঁর দীর্ঘকাল আগে দেখা স্বপ্নবৃত্তান্তটি বর্ণনা করেন।

উনিশ বৎসর বয়সে না কি তাঁর এক বার কঠিন অসুখ করে। প্রাণের কোন আশা ছিল না। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতেন। সে সময় এক দিন তিনি স্বপ্নে এক অপরূপ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি দর্শন করেন। তিনি তাঁকে সস্নেহে বলেন, 'গিরিশ, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তা ভেবো না তুমি সেরে যাবে।' এই ব'লে পুরীর জগন্নাথের প্রসাদের মত তাঁকে কিছু খেতে দেন। সেই খেয়ে পরদিন থেকেই তিনি সেরে উঠতে থাকেন। সেই সময় তিনি সারদা দেবীকে দেখা দূরে থাকুক তাঁর কোন ছবিও দেখেন নি, তাই চিনতে পারেন নি। ভেবেছিলেন অতি শৈশবে তাঁর মা মারা গিয়েছেন, তিনিই বুঝি সন্তানের কষ্ট লাঘব করার জন্য স্বপ্নে ঐ ব্যবস্থা দিয়েছেন। এত দিন পর আজ সারদা দেবীকে চাক্ষুষ দর্শন করে স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তির সঙ্গে তাঁর অপূর্ব্ব সাদৃশ্য লক্ষ্য করে স্তম্ভিত হয়েছেন। ইনিই যে তিনি এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। সেই থেকে গিরিশচন্দ্র মায়ের পদাশ্রিত ভক্ত; ঠাকুর ও সারদা দেবীতে অভিন্ন জ্ঞানসম্পন্ন।

সারদা দেবীর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি যেমন ফুলের মত নরম ছিলেন, তেমনি প্রয়োজনে বজ্রের মত কঠিনও হতে পারতেন। লজ্জাশীলতায় নম্রতায় ও স্নিগ্ধতায় তিনি ছিলেন পল্লীবধূ। আবার তেজস্বিতায় দৃঢ়তায় ও সৎসাহসে ছিলেন রাজপুত রমণী। একাধারে এই কুসুমবৎ মৃদু ও বজ্রদৃঢ় ভাব খুব কম নারীতেই দেখা যায়।

জয়রামবাটীতে প্রায়ই বাঘের উৎপাত শোনা যেতো। ঠাকুর যখন সেখানে যেতেন প্রয়োজনেও রাত্রিতে একা বে'র হ'তে সাহস পেতেন না। কিন্তু সারদা দেবী লণ্ঠন হাতে দরজা খুলে বাইরে এসে ঠাকুরকে ডাকতেন 'কৈ গো? আমি দাঁড়িয়েছি, তুমি এসো। তোমার ভয় নাই। তোমার কিছুই হবে না। বাঘে খায় তো আমাকেই খাবে।' এসব কথা শুনে কি মনে হয়, মা আমাদের পল্লীর মেয়ে! অবলা সরলা ভয়চকিতা গ্রাম্যবধূ?

প্রথম যখন ঠাকুরের মাথা খারাপ হওয়ার সংবাদ পেয়ে মা দক্ষিণেশ্বরে আসেন, দলচ্যুত হয়ে পিছিয়ে পড়ায় ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। কিন্তু কী অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তা ও অসীম সাহসে তিনি পিতৃসম্বোধন করে দস্যুর আশ্রয় ভিক্ষা করেছিলেন, সে এক বিস্ময়! ডাকাতের মন ভিজে গিয়েছিল। দস্যুরা তো ভীত আর্ত্তনাদ শুনতেই চির অভ্যস্ত। তাতে তাদের মন ভেজে না বরং সে আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করেই তারা তাদের লুণ্ঠন ও হত্যাবৃত্তি চরিতার্থ করে। তাই-ই তাদের পেশা। কিন্তু সারদা দেবীর মধুর কণ্ঠে পিতৃসম্বোধন দস্যুকে তার বৃত্তি ভুলিয়ে দিল। তার অন্তর যেন আমূল সঞ্চালিত হ'লো বাৎসল্যরসে। সারদা দেবীকে সন্তান জ্ঞানে মাতৃজ্ঞানে নিরাপদে রক্ষা করে স্বামীর কাছে পৌঁছে দেওয়াকেই পরম কর্ত্তব্য মনে করলো সে।

কামারপুকুর থাকা কালে এক উন্মাদ ভক্ত একবার মাকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছিল। আত্মরক্ষার্থে তিনি প্রথমে পালাতে গিয়ে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকেন। কিন্তু যখন পাগলের সঙ্গে দৌড়ে পেরে উঠলেন না, তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে হাঁটু দিয়ে তার বুকে চেপে ধরে তাকে ক্রমাগত চড় মারতে মারতে নিজের হাত লাল করে ফেলেন। আর পাগল হাঁফাতে থাকে। আধুনিক যুগের প্রগতিসম্পন্না মেয়েদের দ্বারা এ রকম অপূর্ব্ব সাহসে আত্মরক্ষা সম্ভব কি?

সারদা দেবীর মধ্যে অনন্যসাধারণ এতগুলি মহৎ গুণের সম্মিশ্রণ ছিল, যা মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিস্ময় না জাগিয়ে পারে না। তাঁকে বুঝতে হ'লে শুধু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে চলে না। সেই একশ বছর আগের সামাজিক জীবন যাপন, সমাজে নারীর স্থান, বিচার করে দেখতে হয়।

জাতিভেদের বজ্রদৃঢ় দেয়াল ডিঙিয়ে সেদিনে কারুর চলাচলের কোন রাস্তা ছিল না। সামান্য চ্যুতি-বিচ্যুতিতেই জাতিচ্যুত সমাজচ্যুত একঘরে হয়ে থাকতে হ'ত মানুষকে। সারদা দেবী কিন্তু সমাজের এই সব দাবী অপেক্ষা মানুষে মানুষে যে অন্তরের দাবী, তাকেই প্রাধান্য দিতেন বেশী। নির্ভয়ে তিনি তাঁর সংস্কারমুক্ত

মন নিয়ে সমাজ চলাচল করেছেন সমাজের ভ্রূকুটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। ভগিনী নিবেদিতা, ভগিনী ক্রিষ্টিন, ভগিনী দেবমাতা, সারা ওলি বুল প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় লোকের সঙ্গে তিনি যেরূপ অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতেন, একত্র খেতেন, একত্র শুতেন, তাঁদের একেবারে নিতান্ত আপন ভাবে গ্রহণ করতেন, তাঁতে তাঁর বলিষ্ঠ মনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যেতে।

সারদা দেবী ছিলেন অত্যন্ত উদারচেতা ও গুণগ্রাহিনী। এই ভিনদেশীয়া, বিজাতীয়া, সমাজচোখে অস্পৃশ্যা নারীদের সাথে তাঁর এই অন্তরঙ্গতা থেকে বোঝা যায় তিনি কি রকম নারী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। নারীর স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীন রূপটিকেই তিনি যেন শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন এই বিদেশিনীদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ প্রেম ও প্রীতি প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

সারদা দেবী প্রাচীন যুগের ভারতীয়া নারী। নারীর লজ্জাশীলতা ও আব্রুর তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সে শুধু নারীর স্নিগ্ধতা ও কোমলতা বজায় রাখার জন্য। কোন কল্যাণকর জাগরণে তিনি নারীর এই লজ্জাশীলতা বা আব্রুকে প্রতিবন্ধক হ'তে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। দেশ-কালের প্রয়োজন বিচারে তিনি বিশেষ উদারমতাবলম্বিনী ছিলেন। তাঁর সংস্কারমুক্ত উন্নত হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে ভগিনী নিবেদিতা অনেক সময় বলতেন 'মা যে পুরাতন যুগের শেষ কিংবা নূতন যুগের সুরু, তা বুঝবার কোন উপায় নেই।'

স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও প্রচারে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহের অন্ত ছিল না। তিনি বলতেন, 'বিদ্যায় অবিদ্যা দূর হয়। একটি মেয়ে লেখাপড়া শিখলে দশজনের উপকার হবে, এ কি কম কথা?' নিবেদিতা বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যাপারে সে জন্যই তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ। গোঁড়াযুগের মানুষেরা ইস্কুলে মেয়ে পাঠাতে রাজী হ'ত না। মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা করা যে কত প্রয়োজন মা তাদের তা বুঝাতেন। অথচ সেই সময়টায় মেয়েরাই মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইংরেজী লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা ও ভাগ্যহীনা হয়, এই ছিল তাঁদের ধারণা। অথচ সারদা দেবীকে দেখি নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রীবৃদ্ধির জন্য কি ব্যস্ততা!

গৃহশিক্ষয়িত্রী হয়ে মেয়েরা উপার্জ্জন করবে, এ তখনকার দিনে বড়ই লজ্জার বিষয় ছিল। মেয়েরা বিদ্যাদান করে আত্মসংস্থানের পথ করবে, সারদা দেবীর চোখে তা একেবারেই দোষের বলে মনে হ'ত না। হাসপাতালে নার্স হবার শিক্ষা নিতেও তিনি মেয়েদের উৎসাহ দিতেন। 'সেবাব্রতই যে সেরা ব্রত আর ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ কাজ। একজন শিখে নিলে কত লোকের উপকার হবে।' ঘোর অবরোধ-প্রথার যুগে মানুষ হয়েও নারী জাগরণে যে তিনি কিরূপ উৎসাহী ছিলেন, তা তাঁর ঐ ধরণের মন্তব্য শুনলেই বোঝা যায়। নারীজন্ম যে শুধু বিবাহ, গৃহকর্ম্ম ও সন্তানোৎপাদনেরই জন্য, এটা তাঁর অন্তর মানতো না। দেবসেবা বা জীবসেবার জন্য যদি মেয়েরা বিবাহে অনিচ্ছুক হ'ত, তাদের তিনি খুশী-মনে আশীর্ব্বাদ করতেন। সংযম শিক্ষা, নৈতিক চরিত্র গঠন ও ভাবে সেবার আকাঙ্ক্ষা সকলের প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত, এই ছিল তাঁর মত।

লেখাপড়া শিখবার সারদা দেবীর নিজেরও খুব আগ্রহ ছিল কিন্তু সুযোগ-সুবিধা করে উঠতে পারেন নি বিশেষ। কাজেই মেয়েরা যাতে সেই সুযোগ-সুবিধা পায়, তার জন্য তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি বই পড়তে চেষ্টা করতেন, ঠাকুরের ভাগে হৃদয় তাঁর বই কেড়ে নিয়ে বাধা দিত। ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী যেতো পাঠশালায় পড়তে। তার কাছেই তিনি চুপি চুপি একটু একটু পড়া জেনে নিতেন।

কামারপুকুর শ্বশুরবাড়ী। সেখানে শত কাজে ও শত চক্ষুর সম্মুখে সুবিধা করে উঠতে পারেন নি কিছু বিশেষ শিখবার, কিন্তু সেজন্য উৎসাহ হারান নি। দক্ষিণেশ্বরে এসে মুখুজ্যে-বাড়ীর একটি মেয়ের কাছে তিনি মাঝে মাঝে পড়া জেনে নিতেন। সে মেয়েটি প্রায়ই স্নান করতে এসে মাকে সাহায্য করতো। এমনি করেই তিনি রামায়ণ, মহাভারত দিব্যি পড়তে শিখেছিলেন; লেখার সরঞ্জাম সংগ্রহ করা কষ্টকর ছিল বলে লিখতে বিশেষ শেখেন নি।

ঐ সময়টায় বিশেষ অবস্থাপন্ন ঘরেও লেখাপড়ায় বিশেষ আগ্রহ দেখা যেতো না। মা'র সেই দিনে এরকম জ্ঞানস্পৃহা দেখে অবাকই লাগে। উত্তর-জীবনে নিবেদিতা স্কুলের মেয়েদের কাছে মাঝে মাঝে দু'চারটি ইংরাজী কথাও জানতে চাইতেন তিনি।

'আমরা এখন বাড়ী যাবো'—এর ইংরাজী কি? 'বাড়ী গিয়ে কি খাবে'? ইংরাজীতে কি বলবে? এসবের উত্তর শুনে বড় খুসী হতেন তিনি। ব্রহ্মচারী ভক্তদের তিনি বলতেন, 'ও-দেশ থেকে সাহেব-সুবো কত আসবে, ভাল করে কথা বলতে হবে। কাজেই তোমরা একটু ভাল করে ইংরিজী-টিংরিজী শিখে নিও বাপু।' এর থেকে মনে হয় না কি যে, তাঁর দূরদর্শিতা অসাধারণ ছিল?

সারদা দেবীকে পুঁথিগত বিদ্যায় তথাকথিত শিক্ষিতা বলা না চললেও, ধর্ম্মজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশ্ন ও জটিল সমস্যার কি সরল, সহজ ও সুন্দর মীমাংসাই না তিনি দিতে পারতেন! যা নাকি জিজ্ঞাসুর মস্তিষ্কে কোন রকম আলোড়ন আন্দোলন না ঘটিয়ে সরাসরি তাদের অন্তর স্পর্শ করতো। ধর্ম্মরাজ্যে বিচরণ করেও রাজনৈতিক, সামাজিক ও দেশের আভ্যন্তরিক সর্ব্ববিধ উন্নতি-অবনতি, সুখ-দুঃখ ও উত্থান-পতন সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট অবহিত থাকতেন।

আবার ধর্ম্মরাজ্যে গুরু হলেও সেবাব্রতই তাঁর মহান ব্রত ছিল। জনকল্যাণ কাজে ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ ও প্রেরণা। আশ্রমবাসী ভক্তরা তাঁকে প্রশ্ন করতেন, 'মা, সব ছেড়ে ছুড়ে যার জন্ম এখানে এলুম, তাতেই যে বড় বিঘ্ন হচ্ছে! এত সব কাজ-কর্ম্ম নিয়ে লিপ্ত থাকলে সাধন-ভজন যে হতে চায় না।'

তিনি বলতেন, 'রাতদিন কি আর কেউ বসে সাধন-ভজন করতে পারে বাবা! না মন বসাতেই পারে? নিঃস্বার্থ সেবাই ভগবান লাভে সহায়তা করতে পারে। নিষ্কাম কর্ম্মই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মক্ষয়ের একমাত্র পথ। কাজ সম্মুখে এলে সেবাজ্ঞানে করে যেও। সেবাকে ধর্ম্মপথে বিঘ্ন মনে করা বড় ভুল।'

সাধারণ সংসারীর মত জীবন-যাপন করেও কি ভাবে ভগবৎমুখী হওয়া যায়, সারদা দেবী নিজের জীবনাদর্শ দিয়ে তা দেখিয়ে গেছেন। সাধারণ সংসারী জীবনের ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়েও তাঁর অন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত ভগবৎ-ভক্তির একটা ধারা যেন সর্ব্বদাই নীরবে বয়ে যেতো। তার থেকে তিনি যে অন্তরে শান্তি পেতেন তা তাঁর সংসারের শত তাপ দুঃখেও নষ্ট করতে পারতো না। তিনি তাই সর্ব্বসাধারণকে তাঁর পরীক্ষিত শান্তির পথে চালাতে চাইতেন। অন্তরের ভক্তিস্রোত সর্ব্বদা বইলে কোন পাপ বা ময়লা তিষ্ঠাতে পারে না। আবার ভক্তি-শ্রদ্ধাহীন অন্তরে দিবা-রাত্র জপতপ করলেও বৃথাই যায়। [ক্রমশঃ।

বৌদ্ধ ত্রিশরণ

আশা রায়

"বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি। ধম্মং সরণং গচ্ছামি। সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি!" বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ ইহাদের অতুলনীয় পূত পবিত্রতার জন্ম ত্রিরত্ন বলিয়া বিদিত এবং যেহেতু বৌদ্ধদিগের নিকট জগতের মধ্যে ইহা মহত্তম বৈভব। এই ত্রিরত্নই ত্রিশরণ। কোনও বৌদ্ধ যখন এই ত্রিশরণ গ্রহণ করেন তখন ইহাদের প্রতি তাহার জীবনধারা ও চিন্তাবৃত্তির প্রেরণারূপে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও দৃঢ় আস্থার সহিত আত্মসমর্পণ করেন। এই সরল ভাব-ব্যঞ্জনা যিনিই আবৃত্তি করেন তিনিই বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দেশের প্রত্যেকেই একরূপ প্রথম বাক্যস্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গেই ইহা উচ্চারণ করিতে শেখে এবং ইহা তিন বার আবৃত্তি করিয়া শরণ গ্রহণ করে। এতদ্ব্যতীত যে কোনও অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ইহাদের শরণ গ্রহণ করিয়া তবে সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এই ত্রিশরণ শুনিতে মন্ত্র উচ্চারণের ন্যায় হইলেও বাস্তবিক ইহা মন্ত্র নহে এবং পুণ্যার্থে আবৃত্তিও নহে।

বুদ্ধ বলিতে সেই পরমোত্তম পথ নির্দ্দেশককেই বুঝায়, তাঁহার মহান আদর্শকেই বুঝায়। যিনি জীবের দুঃখে জীবকে দুঃখ, জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার পথের সন্ধানে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই মুক্তিপথের সন্ধান ও পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান লাভের প্রতীকই বুদ্ধ।

রাজার কুমার রাজপ্রাসাদের নিশ্চিত সুখ ও বিলাস হইতে পরিপূর্ণ যৌবনে মাত্র ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে একদিন যখন রাজপুরীর সকলে সুষুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন, সে সময় গভীর রাত্রে প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পশ্চাতে পড়িয়া রহিল তাহার অসীম স্নেহশীল পিতা, আর অপার মমতাময়ী বিমাতা, অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যযুক্তা প্রেমময়ী পত্নী, সদ্যোজাত সুকুমার পুত্র—বিদায়ের ক্ষণে কুমারের চক্ষু ক্ষণিকের জন্য সজল হইয়া উঠিল, কিন্তু তাঁর দৃঢ় সংকল্প দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিল না। নগরী পার হইয়া বিশ্বস্ত সারথি অশ্রুমুখী ছন্নকে বিদায় দিলেন।

যিনি নিয়ত অনুচর, ভৃত্যবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন তিনি চলিলেন একা সহায়হীন সম্বলহীন কপর্দ্দকহীন! রাজকীয় আড়ম্বরের মহার্ঘ রাজছত্র নাই আতপ নিবৃত্ত করিতে। যানারোহণ বিনা যিনি পথ চলা কি জানিতেন না, তিনি চলিলেন পদব্রজে, বিচিত্র সুখকর পাদুকা যে পদ যুগলকে কণ্টক ও কঙ্কর হইতে রক্ষা করিত সে পদ নগ্ন ও বিক্ষত। মণিরত্নাভরণ ও স্বর্ণসূত্রের বস্ত্র যে অঙ্গের কান্তি বর্দ্ধন করিত সে অনিন্দ্যসুন্দর অঙ্গে ধারণ করিলেন শ্মশান পরিত্যক্ত ভিখারীর চীবর। মসৃণ কেশগুচ্ছ যাহা একদিন সযত্নে নানা গন্ধতৈলে, গন্ধবারিতে সিঞ্চিত ও সজ্জিত হইত তাহা ছেদন করিলেন। স্বর্ণথালায় পরিবেষ্টিত রাজভোগে যিনি অভ্যস্ত, মৃত্তিকার ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষার কদন্ন হইল আহার। দুগ্ধফেননিভ কোমল পালঙ্ক শয্যার পরিবর্ত্তে কণ্টকাকীর্ণ কঠিন বৃক্ষতল হইল বিশ্রামের স্থল।

নিজের তাঁহার কোনও দুঃখ ছিল না, অপার স্নেহময় পিতার সদা সতর্ক দৃষ্টিতে তিনি আজন্ম সুখলালিত, পৃথিবীতে যাহা কিছু সুখ বলিয়া কাম্য সকলই তাঁহার ছিল, কোনও কিছুর অভাব বা অভাবের সম্ভাবনাও ছিল না। মানুষের দুঃখে এই মহান আত্মত্যাগের তুলনা ও আদর্শ বুঝি ধরাতলে আর নাই।

তিনি বিশাল বিশ্বের বিস্ময়। জীবের দুঃখমুক্তির জন্ম রাজার দুলাল গৌতমী-নয়ন-পুত্তলি ভিখারী জীবনের ব্রত ধারণ করিয়া অসীম ক্লেশ অসাধারণ অধ্যবসায় ও অপরিসীম চেষ্টায় এই জীবন-বিজ্ঞানী জীবের মুক্তির পথ আবিষ্কার করিলেন।

সেই মহত্তম পারত্রিক শিক্ষকের আদর্শের শরণই বুদ্ধ বন্দনার অর্থ। বুদ্ধ ব্যক্তিবিশেষের পূজা নহে। কারণ তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে পূজা করা বা তাঁর নিকট প্রার্থনার কোনই অর্থ হয় না। এই শরণ গ্রহণের অর্থ সেই সম্যা-সম্বোধির মহান আদর্শকে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং এই শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে আছে তাঁর মহান আদর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী চলিবার জন্ম আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার সঙ্কল্প।

যখন তাঁর করুণা বিগলিত প্রশান্ত মূর্ত্তির সম্মুখে নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মুদিত নেত্রে প্রণাম জানাই, তখন তাঁর ধ্যান-নিমীলিত স্মিত মূর্ত্তি অন্তরের অন্তস্তলে স্বতঃই মুদ্রিত হইয়া যায়। এ

জগতের সকল ক্ষেত্রে, সকল দিনের সকল কর্ম্মে, জীবনের সুখে সমৃদ্ধিতে দুঃখে—দৌর্মনস্যে দ্বন্দ্বে দ্বিধায় এই মহান আদর্শের প্রতীক আমাদের যথার্থ পথে চালিত করিবার প্রেরণা যোগায়—তাই বার বার আবৃত্তি করি—"বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।"

ধর্ম্ম, দ্বিতীয় শরণ হইল মুক্তির পথ। যে পথের সন্ধানে তিনি তৎকালীন পণ্ডিতদিগের নিকট গভীর মনোনিবেশের সহিত অধ্যয়ন করিলেন, তত্ত্ব সন্ধান করিলেন নানা শাস্ত্র লইয়া, এজন্য বরণ করিলেন বিভিন্ন গুরু, আলোচনা করিলেন তাঁহাদের সঙ্গে কিন্তু কেহই তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে বা পথের সন্ধান দিতে পারিলেন না। দীর্ঘ ছয় বৎসর অতীত হইতে চলিল।

তারপর তাঁর চলিল অদ্ভুত কৃচ্ছ্রসাধন, লোকালয়ের বাহিরে হিংস্র শ্বাপদ-বহুল গভীর অরণ্যে তিনি তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। আহার পর্য্যায়ক্রমে হ্রাস পাইয়া হইল দিনান্তে একটি মাত্র শস্যকণা, শরীর হইল অস্থিচর্ম্মসার। তারপর স্নানান্তে এক দিন নদীতীরে ভূপতিত হইলেন, উত্থানশক্তি রহিত হইয়া কৃচ্ছ্র সাধনের অসারতা উপলব্ধি করিলেন। তিনি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া শরীরের হৃত বল ও পুষ্টির আশায় পরিমিত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে তাঁর পঞ্চশিষ্য হতাশ ও বিরক্ত হইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা যে সময় তাঁহার সাহায্যের ছিল প্রয়োজন সেই সময়ই তাঁহারা তাঁহাকে করিলেন বর্জ্জন। কিন্তু অসাধারণ তাঁর মনোবল, তিনি বিচলিত হইলেন না। নৈরঞ্জনা নদীর তীরে একটি বোধিবৃক্ষ মূলে তিনি সাধনের উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিলেন এবং এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সেই বৃক্ষতলে স্বায়ত্ত সাধনার দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছিবার দৃঢ় সঙ্কল্পে উপবেশন করিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন—দেখিতে দেখিতে তাঁহার দেহ নিশ্চল স্থির হইল, মুখ অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল, সেই জ্যোতি পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নাধারার সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত জগৎ প্লাবিত করিল, তিনি বোধিজ্ঞান লাভ করিলেন সম্বুদ্ধ হইলেন। জন্ম, জরা, মরণ রহস্যের ঘন যবনিকা ভেদ করিলেন। আবিষ্কার করিলেন মানবের দুঃখমুক্তির উপায়, আবিষ্কার করিলেন দুঃখের কারণ। তিনি বলিলেন, তৃষ্ণাই সকল দুঃখের মূল কারণ। বাসনা দ্বারা চালিত হইয়া সুখ-মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবনই দুঃখের অন্তর্নিহিত সত্য। পতঙ্গ যেরূপ অগ্নিতে ধাবিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয় মানুষও বাসনারূপ অগ্নিতে তদ্রূপই ধাবিত হয়; মূঢ় মানব বুঝিতে পারে না বাসনাই মোহ এবং এই মোহই অবিদ্যা; ইহাতে আবদ্ধ হইয়া মানুষ একের পর এক নানাবিধ তৃষ্ণার আবর্ত্তনে পতিত হইয়া বাসনা হেতু ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া জনিত পরিণামে নদী স্রোতের অবিরাম গতির মত জন্ম-মৃত্যুর কাল-চক্রে আবর্ত্তিত হইয়া দুঃখ ভোগ করে। তিনি দুঃখের হেতু ও তাঁহার প্রভাব নিরোধের উপায় 'চতুরার্য্যসত্য' আবিষ্কার করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন—মানবের মনই তৃষ্ণার উৎস, সকল রকম দুঃখের হেতু তৃষ্ণা মন হইতেই উদ্ভূত। তাই ধম্মপদের প্রথম বাক্যই হইল—"মনো পুব্বং গমা ধম্মা মনো সেট্ঠা মনোময়া।" মনকে জানাই প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য, মনকে বাসনাহীন পবিত্র না করিতে পারিলে মানবের মুক্তি নাই এবং প্রত্যেক মানুষের স্বীয়

অন্তরের মধ্যেই মনকে নির্ম্মল পবিত্র করার শক্তি আছে ; মনের অন্তর্নিহিত সে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করিতে পারিলেই মানবের সে ক্ষমতা সুপ্তোত্থিত হয় এবং মোহ বা অবিদ্যা ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া বাসনাহীন হয় এবং অনাবিল আনন্দের পথে লইয়া যায়।

এই মনকে পবিত্র ও মুক্ত করিবার জন্ত যে উপদেশ যে বাণী তিনি দিয়া গিয়াছেন তাহাই ধর্ম্ম। যে পথ যে উপায় সেই চিন্তাশীল মন-বিজ্ঞানী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহারই স্মৃতি লইয়া অনুশীলনের উদ্দেশ্যে আবৃত্তি করি—"ধম্মং সরণং গচ্ছামি"

সঙ্ঘ, তৃতীয় শরণ, আজ আমাদের চতুষ্পার্শ্বে নানা সঙ্ঘের নাম শুনিয়া থাকি এবং কথাটি শুনিতে এত অভ্যস্ত যে মনে হয় ইহা অত্যন্ত মামুলী ; কিন্তু সঙ্ঘ সৃষ্টি ভগবান বুদ্ধেরই পরিকল্পনা। তিনিই ভিক্ষুসঙ্ঘ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সমদৃষ্টি ভঙ্গীতে সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ঐকান্তিক অভিনিবেশ, পৃথক ও ক্ষুদ্রকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া বৃহত্তর শক্তির সৃজন ও প্রয়োগ। তিনি তাঁর নির্দ্দেশিত পথের অনুগামীদের জাতিধর্ম্মের বিভেদ ভাঙ্গিয়া ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একত্রিত করিলেন, এবং মহান ধর্ম্মের ধারার ঐতিহ্য ও পরম্পরা ধারাবাহিক ভাবে সঞ্জীবিত রাখার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘগুলির প্রতিষ্ঠা করিলেন। সঙ্ঘ সৃষ্টির মূলে তাঁর অলোকসামান্য দূরদৃষ্টি আজিও আমাদের চমৎকৃত করিয়া দেয়।

মানবের জন্মলব্ধ জাতিগত উচ্চনীচ ভেদগ্রস্ত সমাজের আত্মঘাতী রীতির বিরুদ্ধে যে নির্ভীক মতবাদ তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, সমাজের এ ঘোর অন্যায়ের প্রতিবাদে যাহা বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া যে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন আজিও তাহার প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে, সমাজের এ গর্হিত গ্লানির উচ্ছেদকল্পে যে প্রগতিশীল চিন্তাধারা সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে চিন্তা করিয়াছিলেন সেই সর্ব্ব-অকুশল দমন-কুশলী মনীষীর অভূতপূর্ব্ব তীক্ষ্ণ—ধী ও প্রতিভায় অভিভূত হইতে হয়, বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতে হয়।

বিশ্বপ্রেমিক মহামানব কেবল ব্রাহ্মণ শূদ্র ধনী দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ না করিয়া ক্ষান্ত হন নাই ; তাঁর দরদী মন নারীকেও বিশিষ্ট স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, মুক্তি পথের দুয়ার তিনি মানুষ মাত্র সকলেরই জন্য সমভাবে সর্ব্বদা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন ; তাই তাঁর স্নেহময়ী বিমাতা গৌতমী তাঁর নিকট হইতে ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার অনুমতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কোনও ভেদ-বৈষম্যের স্থান ছিল না। রাজমহিষী হইতে দীনা দাসী সতী সাধ্বী রমণী হইতে বারবনিতা পর্য্যন্ত ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রবেশের সমান অধিকার তিনি দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ভিক্ষুণী জীবন যাপনের ও নির্ব্বাণ প্রাপ্তির অধিকার সকলেরই সমান।

সংসার-তাপে তাপিত নানা দুঃখে জর্জ্জরিত ভিক্ষুণীগণ ভগবান বুদ্ধের নির্দ্দেশিত পথ অনুসরণ করিয়া সংসারের অসারতা ও দুঃখ বেষ্টনী অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং যে শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহারা যে গাথাগুলির ভাব উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি করিয়াছিলেন তাহাই 'থেরীগাথা'। ইহা পাঠে আধ্যাত্মিকতায় তাঁহারা কত উন্নত হইয়াছিলেন উপলব্ধি করিতে পারা যায়। থেরী গাথার স্থান পালি বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, জগতের আদি কাব্য-গ্রন্থ সমূহের মধ্যে ইহা বৈরাগ্য, আত্মচেতনা ও প্রজ্ঞার জন্ত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ও নানা ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নানা বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে, ধর্ম্ম দর্শন সাধনা ও শাস্ত্রচর্চ্চায় পুরুষ ও স্ত্রীর সমান অধিকার ছিল। ভিক্ষুণীগণের মধ্যে অনেকেই সুপণ্ডিতা ছিলেন এবং ধর্ম্ম দেসনা করিতে ও তর্কবিচারে পারদর্শিনী ও নিপুণা ছিলেন। নারীর অধিকার ও উচ্চ মর্য্যাদা দানের এইরূপ দৃষ্টান্ত আর নাই। তাঁর করুণা বিগলিত মনের বিশ্বব্যাপী সকলের জন্ত অপার করুণা স্মরণ করিয়া মুগ্ধ হই, সেই মহাকারুণিকের প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে হৃদয় আপ্লুত হইয়া যায়, শির স্বতঃই নত হইয়া আসে।

সঙ্ঘ বন্দনার অর্থ—ভগবান বুদ্ধের উন্নতমনা সত্যদর্শী অতি মানবীয় অনুগমনকারীরা যাঁহারা তাঁর বাণী অনুসরণ করিয়া পরমোত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন বা তাঁর অনুবর্ত্তী যাহারা তাঁর নির্দ্দেশিত পথে চলিতেছেন, তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার সংকল্প। বাস্তবিক তাঁহাদের জীবন্ত দৃষ্টান্ত উপদেশ ও উৎসাহ যতখানি সহায়তা যতখানি প্রেরণা যোগায়, এমন চাক্ষুস ভাবে সহজ ও সুন্দর ভাবে অন্যত্র লাভের সম্ভাবনা হয় না।

সমাজ-বিজ্ঞানী সমাজের কঠিন নিগড় ভঙ্গ করিয়া আধ্যাত্মিকতার ভ্রাতৃত্ববন্ধনে যে সাম্যবাদের সঙ্ঘ-সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব, সুশৃঙ্খলতা, আমাদের জীবনে সদাই নূতন আশা নূতন আলোক নূতন চেতনা আনয়ন করে। তাই আবৃত্তি করি—"সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।"

"সমগ্র বিশ্বচরাচর সুখী হউক।"

জাতিস্মর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

সাহিত্যিকের ডায়েরীর মাঝে ওদের পারিবারিক বিশেষ ঘটনাগুলো ঠিক মত পাওয়া যায় না।

—মানে যে রকমটি পেলে আমার উপন্যাসখানির মাল-মশলা যোগাড় হবে, ঠিক সেই রকমটির যখন অভাব ঘটে, তখন, কলম থামিয়ে মাঝে মাঝে, আমাকে ছুটে যেতে হয়, আলিপুর বেলভেরিয়া রোডে—বাসু ভবনে।

এমনি একদিন সন্ধ্যায় তাঁর ড্রয়িংরুমে বসে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিলো আমাদের। আমি জানতে চেয়েছিলাম,—

সোমনাথ বাবুর মাত্র বত্রিশ-বছর বয়সে সন্ন্যাস নেবার কারণটা কি? শুধু কি স্ত্রীবিয়োগই এর মূলকারণ? না আর কিছু?

জবাব দিলেন মিঃ বাসু। এ ব্যাপারটা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে গেলে,—পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনাগুলো শুনতে হবে আপনাকে। আমারও প্রথম প্রথম ভীষণ গোলমেলে লাগতো এদের ফ্যামিলিটাকে! যখন ঐ লালকুঠিতে সুমিতা নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করছিলো। তিন বছর সে কোথাও বেরোয়নি, ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীতে উপর

দেখুন! মাত্র অর্দ্ধেক সানলাইট সাবানেই

এত সব জামাকাপড় কাচা যায়!

সানলাইটের ফেণার আধিক্যই এর কারণ!

ভারতে প্রস্তুত
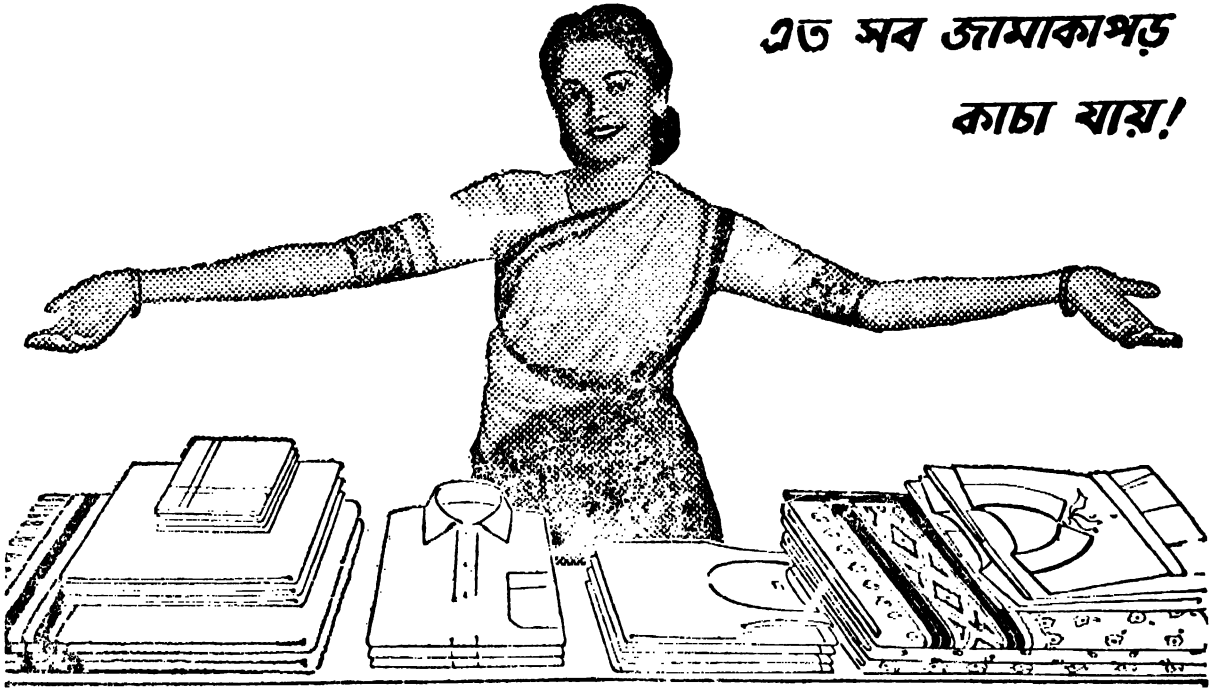
ফেণার আধিক্যের দরুণই সানলাইট সাবান এত ক্রিয়াশীল। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে মাত্র **অর্দ্ধেকটা সানলাইটে** কতগুলি জামাকাপড় কাচা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেণার দরুণই প্রতিটী ময়লার কণা দূর হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে আশ্চর্য্যরকম সাদা এবং উজ্জ্বল!

সানলাইটের ফেণার আধিক্যের দরুণই জামাকাপড় বিনা আছাড়ে পরিষ্কার হয়। তার মানে আপনার জামাকাপড় টেঁকে আরও অনেক বেশী দিন।
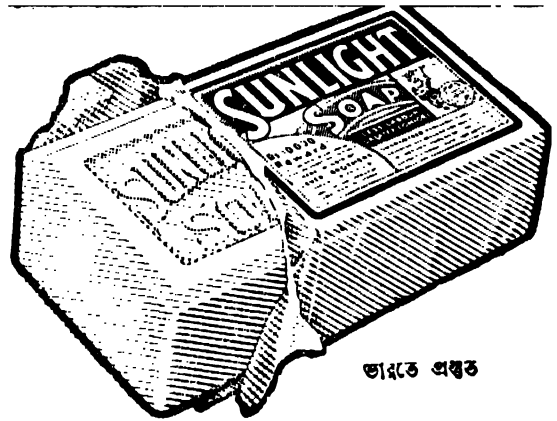
সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

S. 243-X52 BG

তলায় একলাই থাকতো। অনিল অবশ্য নিচের তলায় ছিলো, তার স্ত্রীও ছিলো, তবে তাদের জীবনধারা ছিলো অন্য রকমের— তারাও তখন, নিজেদের ভুলের মাশুল দিয়ে যাচ্ছে। এই সময় তার একমাত্র সঙ্গী ছিলাম আমি। মাঝে মাঝে বাগানে ওদের অর্কিড হাউসের ভেতরে সুমিতা ডেকে নিয়ে যেতো আমাকে। কথা বেশী বলতো না, চুপ করে বসে যেন কি ভাবতো।

একদিন সে আমাকে বলেছিলো—জানো দাদা, বংশের পূর্বপুরুষদের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত না কি পরবর্তীদের করতে হয়।

আমি হেসে বলেছিলাম,—তা কখনও হয়? একজনের পাপের দণ্ড অনেক জন ভোগ করবে কেন?—

—হায়! এই দেখ না আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি। চমকে উঠেছিলাম,—

তুমি কি বলছো মিতা?

—ঠিকই বলছি ভাই! এই যে অর্কিড হাউসটা দেখছো এ ভারি অদ্ভুত!

মাঝে মাঝে গুড়-গুড় শব্দ হয় এর তলায়, ঘরটা কেঁপে ওঠে! গাছপালাগুলো যেন শিরশির ফিসফিস করে কথা কয়, আর মনে হয় মাটির অনেক তলায় কার চাপা কান্না যেন গুমরে ওঠে!

আমি একদিন ভারি ভয় পেয়ে ছুটে বেরুচ্ছি অর্কিড হাউস থেকে, আমাদের বুড়ো মালী রামভজন সিং বললো,—খুকি দিদি, কি হয়েছে, ভয় লেগেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ রাম সিং! ঘরটা যেন কাঁপছে, যেন কি রকম আওয়াজ!

রামভজন সিং ফোকলা মাড়ি বার করে হাসে—। আমার হাত ধরে বাগানে পাথরের বেদিটার ওপর বসিয়ে বললো, ও-সব অনেক কাল ধরে ঘটছে দিদিমণি, ওতে ভয় পেয়ো না! আমি যখন এ বাড়ীতে এসেছি, তখন তোমার বাবা জন্মায়নি!

তোমার ঠাকুরদাদার সঙ্গে কত খেলা করেছি, কি দিন্ ছিলো ছোটো বাবুর,—আহা,—কেন যে অমন বেফাঁস কাজটা করতে গেলেন? জীবনটাই চলে গেলো!

—কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে সে বলে গেলো কত কথা! তুমি শুনবে দাদা? তাহলে ডাকি ওকে!

সুমিতার ডাকে, অর্কিড হাউসের ভেতর খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে দাঁড়ায় রামভজন সিং।

লতাপাতার ছাউনির ফাঁকে ফাঁকে ম্লান চাঁদের আলো এসে পড়ছিলো, ওর ধপধপে শাদা চুল-দাড়ির ওপর। ওর সামনে ঝুঁকে পড়া জরাভারাক্রান্ত দেহখানি কালো আলোয়ানে ঢেকে সে বসলো আমাদের সামনে, ফোয়ারার জলের পাশে!

খুক খুক করে কাশতে কাশতে বললো,—কি খুকু দিদি, বুড়োটাকে ডাকলে কেন বলো?

সুমিতা বললো,—সেই সেদিন, এই অর্কিড হাউসটার কথা, আমাদের পূর্ব পুরুষদের ব্যাপার যা বলেছিলে তুমি আমাকে, সেই কথাগুলো আজ আবার বলো না, ভজন দাদা!

—সব কথা কি মনে আছে দিদিমণি? বয়স কি কম হলো? ছোটবাবু আর আমি এক বয়িসী ছিলাম কি না—এ বাড়ীতে এসেছি সে কি আজকের কথা? তখন তোমার দাদু বছর বারো-তেরো বয়সের আর আমারও ঐ রকমই হবে!

আমার বাবা ছিলেন এখানকার দরোয়ানদের সর্দার, মস্তবড় পালোয়ান ছিলেন আমার বাপ্-কাকা! ঐ যে দেখ্‌ছো লতা-পাতার কুঞ্জবন, আগে ওখানে ছিলো পালোয়ানদের আখড়া!

কত কুস্তিগীর আসতো,—তোমার বাবার ঠাকুরদাদা রামনাথ ত্রিবেদী ছিলেন তখনকার দিনের একজন দেশমান্য লোক!

বাঙালী ব্যবসায়ী তখন এদেশে খুবই কম। এঁর ছিলো, চিনি, লোহা, সিমেন্ট, নানা রকমের ব্যবসা! লক্ষ্মীর বরপুত্তুর ছিলেন তিনি! ধনে, জনে, এ বাড়ী তখন গমগম্ করতো।

নিকট আর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়, দাস, দাসী, সরকার, আমলা, অতিথি, অভ্যাগতে লালকুঠি সর্বদা পরিপূর্ণ। তার ওপর বারো মাসে, তের পার্বণ। অতিথ-ফকির কখনও বিমুখ হতো না। সবাই বলতো, সাক্ষাৎ মহেশ্বর আর অন্নপূর্ণা এ বাড়ীর কর্তাবাবু আর গিন্নীমা!

রামজীর কৃপায় কর্তাবাবু তখন মহালের পর মহাল খরিদ করছেন। কোম্পানীর সঙ্গেও খুব খাতির ছিলো, কত সায়েব সুবো, লাট, বিবিরা আসতো এ বাড়ীতে। কত ঝাড়লণ্ঠন জ্বলতো! আতসবাজি পুড়তো! দিল্লি, লাহোর, বোম্বাই থেকে আসতো নাচওয়ালী।

—তারপর গভর্ণমেণ্ট যখন কর্তাবাবুকে রাজাবাহাদুর খেতাব দিলেন, তখন এ বাড়ীতে এক মাস ধরে পরব চলেছিলো।

গরীব দুঃখীর জন্যে ভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন রাণীমা, মেঠাই মোণ্ডায় আমাদের অরুচি ধরে গিয়েছিলো। বাড়ীর সব লোকজন গিনি, মোহর, পুরোনো কর্মচারী দরোয়ান সব মোহরমালা বখশিষ পেয়েছিলো। সে এক দিন গেছে!

কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়েছিলো রামভজন সিং। চোখ বুজে খানিকটা চুপ করে থাকে, বুঝি বা তার মনের পর্দায় ফুটে ওঠে হারানো অতীতের জমকালো দিনের ছবিগুলো।

দু'হাতে চোখ মুছে আবার আরম্ভ করে রামভজন সিং! তোমার ঠাকুরদাদা কুমার সাহেব ইন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর বাপ-মা'র মত হলেন না।

তখনকার দিনে বড়লোকের ছেলেদের সর্বনাশ করবার জন্যে চারিদিকে মোসাহেবের দল ঘুরঘুর করতো; এমনি একটি খারাপ দল সর্বনাশ করলো আমার কুমার সাহেবের!

ছেলেকে শোধরাবার জন্যে রাজাবাবু—লক্ষ্মী প্রতিমার মত বৌ ঘরে নিয়ে এলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, ঐ দুষ্টগ্রহদের হাত থেকে ছোট বাবু রেহাই পেলেন না!

তোমার ঠাকুমা বৌরাণী কমলা দেবী আহা কি সতীলক্ষ্মী ছিলেন গো! বলছি সে কথা পরে! তোমার বাবা যখন জন্মালেন—এই তো সেদিনের কথা, রাজবংশের কুলপ্রদীপ যেদিন জ্বলে উঠলো আঁতুড় ঘরে আবার রাজবাড়ীতে আমোদ আহ্লাদের পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো।

সকলে ভেবেছিলো এবারে কুমার সাহেব ঘরমুখো হবেন, কিন্তু হায়, হল তার বিপরীত!

খোকাবাবু যখন বছরখানেকের তখন রাজা বাবু একদিন হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে একদিন বেহুঁস হয়ে পড়লেন! কত

ডাক্তার ওষুধ, জীবনটা ফিরলো বটে, কিন্তু পক্ষাঘাতে একেবারে পঙ্গু হয়ে বিছানায় রইলেন।

এইবারে এলো ত্রিবেদী বাড়ীর চরম সর্বনাশের দিন!

কুমার সাহেব, বাড়ীতেই তাঁর কুসঙ্গীদের নিয়ে জাঁকিয়ে বসলেন! দিনরাত গান-বাজনা! মদের ঢেউ খেলতে লাগলো ঐ হলঘরে!

নিত্যি নতুন মেয়েমানুষ যোগাড় করে আনতো মোসাহেবের দল! কত ভদ্দর ঘরের মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করেছে ওরা, পাপের স্রোত বইতে লাগলো লাল কুঠিতে!

আহা বিছানায় শুয়ে, চোখের জল মুছতেন আমার দেবতা! রাণীমা, বাড়ীঘর ছেড়ে দিয়ে দিনরাত থাকতেন রাজা বাবুর বিছানার পাশে, আর ঐ ঠাকুর ঘরটিতে।

সোনারচাঁদ খোকা বাবুকে কোলে নিয়ে চোখের জল ফেলে অন্দরে একা দিন কাটাতেন বৌরাণী! দু'তিন বছরের মধ্যে দেনার দায়ে, লাটের কিস্তি না দিতে পারায়, পর পর অনেকগুলি মহাল নিলামে বিক্রি হয়ে গেলো।

কুমার সায়েবের তখনও হুঁস হলো না,—হুঁস হল আরো, আরো কয়েক মাস পরে—

স্তব্ধহয়ে শুনছিলাম আমরা, সেই রাজ-পরিবারের ধ্বংসের ইতিহাস।

চাঁদের আলো পাতার ফাঁকি দিয়ে সরু সরু রূপোর জালির মত ছড়িয়ে পড়েছিলো, রামভজন সিং-এর সর্বাঙ্গে সাদা চুল-দাড়িগুলো চক্ চক্ করে উঠছিলো। কোঁচকানো কালো মুখখানা যেন মনে হচ্ছিলো, মহেঞ্জদারোর ভগ্নস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত একখানি প্রাগৈতিহাসিক মুখ। পাশে ফোয়ারার জলের ঝির-ঝির শব্দ মাঝে মাঝে দু-একটা পাখীর ডানা ঝাপ্টানোর আওয়াজ অর্কিড হাউসের নীরবতাকে যেন কেমন অলৌকিক রহস্যপূর্ণ করে তুলেছিলো।

বুড়ো বসে বসে বোধ হয় ঝিমোচ্ছিলো।

সুমিতা ডাকলো, ভজনদা'! ও ভজনদা'! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

চমকে ওঠে ভজন সিং। কে? ছোট বাবু?

না, না, ঐ দেখ, বয়সটা কি কম হল দিদি? সেই কবে এসেছিলাম এ বাড়ীতে।

হাঁ, কি বলছিলাম যেন?···সেই নেপালী মেয়েটার কথা না?

—ফতুয়ার ভেতর থেকে দোক্তাপাতা বার করে হাতে দলে খৈনি প্রস্তুত করে মুখে ফেলে দিলো ভজন সিং। তার পর আবার বলতে আরম্ভ করলো—

এক দিন একটা ভারি খুপসুরৎ নেপালী মেয়েকে চুরি করে এনে ইয়ারের দল ঐ এক তলার কোণের ঘরটায় তালাবন্ধ করে রেখেছিলো।

রাত্রে যখন মেয়েটাকে বার করবার জন্যে তালা খুললেন কুমার সাহেব,—তাকে দেখে আঁতকে উঠে চিৎকার করে পিছিয়ে এলেন—

মেয়েটা টানাপাখার সঙ্গে পরনের কাপড় বেঁধে তাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে।

চুপ! চুপ! বাড়ীশুদ্ধ সকলকার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। রাতারাতি এই গাছঘরের তলায় গর্ত্ত খুঁজে লাশ পুঁতে ফেলে দূর্ব্বোঘাস বুনে দেওয়া হল। বাইরের হাঙ্গামা কিছু হল না বটে, তবে কুমার সায়েবের মনটা যেন গেলো একেবারে বদলে। মদ মেয়েমানুষ সব বন্ধ হল, ইয়ারবক্সিদের বিদায় দিলেন। বারবাড়ি ফেলে অন্দরে বাস করতে লাগলেন।

সর্ব্বক্ষণ যেন কেমন ভয়ে ভয়ে থাকতেন তিনি। ল্যাণ্ডো গাড়ী করে সন্ধ্যে-সকাল গঙ্গার ধারে যদি একটু হাওয়া খেতে বেরুতেন, মনে হত ছোট ছোট জলজ্বলে চোখওয়ালা দু-চার জন নেপালী যেন ওঁর আশে-পাশে ঘোরাফেরা করছে। ওঁর দিকে চেয়ে যেন কি সব বলাবলি করছে। ছোট কাগজের টুকরো এক দিন দলা পাকিয়ে ওঁর গাড়ীতে কে ছুঁড়ে মারলো।—তাতে লেখা ছিলো, ইজ্জতের বদলে ইজ্জত—জানের বদলে জান দিতে হবে।

এর পর ছোট বাবু আর বেরুতেন না বাড়ী থেকে, একটা বিষম ত্রাস যেন ওঁকে গ্রাস করতে লাগলো। ঘুমের ঘোরে কি সব বিড় বিড় করে বকেন

চিৎকার করে ওঠেন,—ঐ এলো,—ঐ খুন করলে, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

বৌরাণী ভয় পেয়ে, রাণীমাকে বললেন সব কথা। রাণীমা ভাবলেন বোধ হয় ছেলের মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে।

বড় বড় ডাক্তার এলো!—তাঁরা পরীক্ষা করে কোনো ব্যাধির লক্ষণ খুঁজে পেলেন না!

স্নায়ুর গোলমাল! ফুর্ত্তি আমোদের দরকার, এ ঘরটা বদল করে অন্য ঘরে শোবার ব্যবস্থা করা উচিত! মানে পরিবেশটা কিছু অদল-বদল করলে মনটার পরিবর্ত্তন হতে পারে!

অনেক দিন পরে আবার ইয়ার বক্সীরা এলো, বাগানের দিকে একতলার ঐ কোণের ঘরে তাঁর শোবার ব্যবস্থা হল।

সুরার পাত্রে চুমুক দিয়ে মনের ত্রাসভাব যেন অনেকটা কমে এসেছে।

মন প্রাণ খুলে স্ফূর্ত্তি করলেন ছোটবাবু!

অনেক দিন বাদে শান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন!

পরদিন সকালে ছোটবাবুর খানসামার চিৎকার শুনে বাড়ীর সকলে ছুটে গেলো ছোটবাবুর ঘরে।

বন্ধুদের নেশার ঘোর ছুটে যায়, সকলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে, একসাথে সকলে চেঁচিয়ে ওঠে—

—গালচের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছেন কুমার সাহেব! লাল রেশমী রুমাল দিয়ে শক্ত করে মুখ তার ফাঁস দিয়ে বাঁধা! বুকে বসানো একটা চক্চকে ভোজালী।

—গালচের ওপর গড়িয়ে পড়া রক্তগুলো চাপ বেঁধে কালো হয়ে গেছে। বিস্ফারিত চোখ থেকে আতঙ্ক যেন ঠিকরে পড়ছে।

—হত্যাকারীর সন্ধান মিললো না। সম্মানিত ঘরের ছেলের লাশ, কাটা ছেঁড়া হলো না।

রাশি রাশি ফুলে ঢেকে দেওয়া হল কুমার বাহাদুরের দেহটাকে।

মা অন্নপূর্ণা একমাত্র নয়নের মণির মাথাটি নিজের কোলে তুলে নিয়ে বসেছিলেন। দুচোখে গড়িয়ে পড়ছিলো গঙ্গা-যমুনার ধারা। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে অস্ফুট স্বরে কি আশীর্ব্বাদ করছিলেন, পরমেশ্বরের কাছে স্নেহের দুলালের আত্মার শান্তি ভিক্ষা চাইছিলেন!

—রাজাবাহাদুরের অক্ষম দেহটা বহন করে নিয়ে এলো দু'জন ভৃত্য। তাঁর শীর্ণ হাতখানি পুত্রের মাথায় রেখে ডাকলেন, আমার মা কমলা কই? তাকে আর আমার দাদুভাইকে ডেকে আনো তো। তোমার বাবাকে কোলে করে নিয়ে এলাম আমি।

—কিন্তু বৌরাণীর দেখা কোথাও পাওয়া গেলো না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ঠাকুরঘরে পাওয়া গেলো তাঁকে। কিন্তু তখন দেহে তাঁর প্রাণ ছিলো না। বিষ খেয়ে সকল জ্বালা জুড়িয়েছেন সতীলক্ষ্মী মা আমার।

মহাসমারোহে জাঁকজমকের সঙ্গে বিদায় নিলেন বাড়ীর লক্ষ্মীনারায়ণ। কুলরমণীরা মায়ের পায়ে সিঁদূর ঢেলে দিয়ে সেই সিঁদূর মুঠো মুঠো তুলে নিতে লাগলেন নিজেদের কৌটায়। খৈ, বাতাসা, টাকা, সিকি, গিনি, মোহর ওঁদের যাত্রাপথের দু'ধারে ছড়ানো হলো রাশি রাশি। লালকুঠির আলো নিবে গেলো।

নীরব হল রামভজন সিং।

তার কোটরগত চোখ দুটো দিয়ে অনর্গল ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছিলো, কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলতে লাগলো।

রাজাবাবু এ ধাক্কা সামলাতে পারলেন না, দু'মাসের মাথায় তিনিও স্বর্গে চলে গেলেন। এই বিশাল পুরীতে রইলেন একা রাণীমা, ঐ পাঁচবছরের শিশু তোমার বাবাকে বুকে করে।

—আত্মীয়-স্বজন সকলে চলে গেলো বাড়ী ছেড়ে। দু'-একটি পরগণা তখনও যা ছিলো, রাণীমা বিক্রি করে দিলেন।

সরকার আমলা সকলকে বিদায় দিলেন! খালি পুরোনো বিশ্বাসী লোক আমরা কয়েক জন রইলাম।

খোকা বাবু ক্রমে বড় হতে লাগলো। তাঁকে তিনি বাড়ী থেকে একেবারেই বেরুতে দিতেন না; বাড়ীতেই লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

খোকা বাবুর মামা ছিলেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁকে রাণীমা বাড়ীতে রাখলেন, যাতে ছোটবেলা থেকে খোকা বাবুর সৎশিক্ষা হয়।

নিজে তিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করতেন, তার সঙ্গে খোকা বাবুকেও পালন করাতেন।

মাছ মাংস এ বাড়ীতে তখন নিষিদ্ধ ছিলো। খোকা বাবুর যখন আগারো বছর বয়স তখন তাঁর বিয়ে দিলেন রাণীমা। কারণ তাঁর শরীর খুব খারাপ হচ্ছিলো,—সে-জন্যে তাড়াতাড়ি নাতির বিয়ে দিলেন।

তার পরের দিন সন্ধ্যায় চাঁদে গ্রহণ লেগেছে, রাণীমা সারা দিন উপোস থেকে সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ঘাটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। গঙ্গায় জোয়ার এসেছে তখন, কোমর পর্য্যন্ত ছিলো তাঁর জলে ডোবানো, সেই অবস্থায় সিঁড়িতে পড়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গে পুরোনো ঝি ছিলো, তার চিৎকারে সকলে ছুটে এসে ওঁকে ধরাধরি করে তুলে এনে ঘাটের ওপর শোয়ালো, কিন্তু জীবন তাঁর তখন দেহ ছেড়ে চলে গেছে। 'পুণ্যবতী জননীকে আমার, মা গঙ্গা স্বয়ং কোলে তুলে নিয়েছেন।'

মিঃ বাসুর কথার মাঝে ছেদ টানতে হলো। কারণ জরুরী প্রয়োজনে বাইরে এক ভদ্রলোক এসেছেন তাঁর কাছে—তাঁকে সেজন্য উঠে যেতে হল।

মিসেস বাসু সেখানে বসে উল বুনছিলেন। আমার দিকে চেয়ে হাস্যমুখে বললেন,—এখনও যে একটু বাকি আছে ভাই, সেটুকু আমিও বলতে পারি আপনাকে। তবে ওঁর মত সুন্দর ভাষায় হয়তো পারবো না।

—আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসে বললাম—তা হলে বাকিটুকু আপনার কাছেই শুনি ভাই,—যেমন ভাবেই বলুন না কেন, ভালো আমার লাগবেই—একথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

—আমি তখন খুব ছোট, সেজন্য সব ঘটনা ঠিক মনে নেই—তবে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটেনি বছর দশেকের মধ্যে।

সোমনাথ বাবুর ঠাকুমা মারা যাওয়াতে তিনি মনে যেন বড় বেশী আঘাত পেয়েছিলেন। কারণ ছোটবেলা থেকে সঙ্গী সাথী কেউ ছিলো না তাঁর। ঐ ঠাকুমা আর মামাই ছিলেন তাঁর মা, বাপ, ভাই বন্ধু সবই।—তিনি বড় একটা কারুর সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। প্রফেসারি করতেন আর বাকী সময়টা লাইব্রেরীতে পড়া-শোনায় কাটাতেন। তাঁর মামা চলে গেলেন কাশীতে। মাঝে মাঝে, দু'চার জন সাধু সন্ন্যাসী দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আনাগোণা করতেন তাঁর কাছে। গোপীদাস মহারাজ তাঁদের অন্যতম। সুদামের বাবা মহিম হালদার ছিলেন তাঁরই শিষ্য।

সুমিতার যখন বছর এগারো বয়স সেই সময় তাঁর মা দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করে মারা গেলেন। ছেলেটিও রইলো না।

এইবারে সোমনাথ বাবুর মনে দেখা দিলো পূর্ণ বৈরাগ্য।

এই প্রহেলিকাময় জীবনের অর্থ অনুসন্ধান করবার জন্য তিনি ছাড়লেন প্রফেসারি।

দিন-রাত ঐ লাইব্রেরি ঘরের কপাট বন্ধ করে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন।

দু'বছর পরে এলেন গোপীদাস মহারাজ। কয়েক দিন তিনি বাস করলেন ঐ রুদ্ধকক্ষে। তাঁর কাছেই বোধ হয় সোমনাথ বাবু জীবনের কিছু মানে খুঁজে পেলেন।

ব্যস্ত ভাবে একদিন তাঁর শ্বশুরালয়ে গিয়ে হাজির হলেন।

শত চেষ্টাতেও যাঁকে ঘরের বার করা সম্ভব হয়নি, তাঁকে হঠাৎ আসতে দেখে সকলে অবাক বনে গিয়েছিলেন।

—তিনি, দুচার কথায় শ্বশ্রূমাতাকে বললেন।

—তীর্থ ভ্রমণে যাবেন, বাড়ীতে সুমিতাকে দেখবার শোনবার তো কেউ নেই, যদি ওঁরা গিয়ে তাঁর লালকুঠিতে বাস করেন এবং সমস্ত ভার গ্রহণ করেন—তবে তিনি তীর্থে গমন করবেন আগামী কল্যই।

তাঁর নির্দ্দেশ মতই কাজ করলেন তাঁর শ্বশ্রূমাতা। আর তাঁর তীর্থে গমন, পরে সন্ন্যাস গ্রহণের এই মোটামুটি ইতিহাস আমার জানা আছে। [ক্রমশঃ।
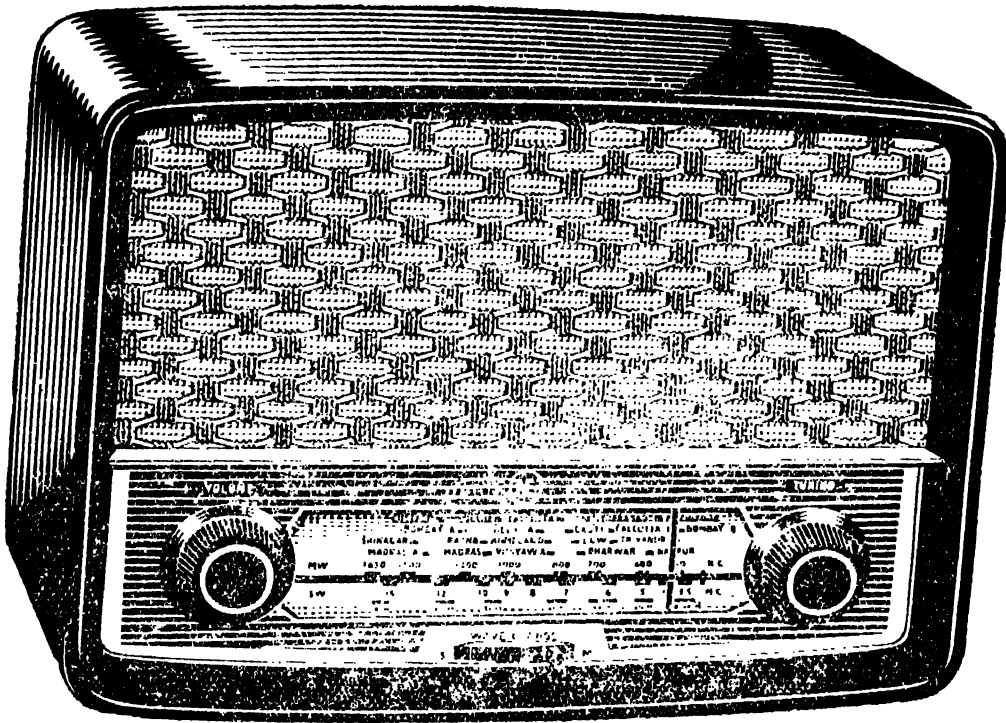
বিজ্ঞাপন

আজ-কাল কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কত রকমেরই যে বিজ্ঞাপন বাহির হয়, কত প্রকার দেশহিতৈষিতা তাহাতে যে প্রকটিত থাকে, কত প্রকার মনোমোহিনী ভাষা তাহাতে প্রয়োগ করা হয়, তাহার অন্ত নাই। ক্রেতারূপ মৎস্য ধরিবার জন্য, সংবাদপত্ররূপ সরোবরে কত বিজ্ঞাপনদাতা, কত রকম চার ফেলিয়া ছিপ পাতিয়া বসিয়া আছে। এই পুকুরে মাছ ধরিবার জন্য পুকুরের মালিককে কিছু কিছু টাকা দিতে হয়। যে যতগুলি ছত্রস্বরূপ ছিপ ফেলিবে তাহাকে তত অধিক জমা দিতে হয়। অধিক ছিপ ফেলিলে যে মাছ অধিক ধরা যায় তাহা নহে। বিজ্ঞাপনের ভাষারূপ মালমসলা দিয়া চার ও টোপ তৈয়ার করিতে হয়। কোন কোন ব্যক্তির ভাষা-চারের এমনি খোসবু যে, তাহারা চার ফেলিতে ফেলিতে ভ্রান্ত মৎস্যগণ সুগন্ধে আমোদিত হইয়া পালে পালে আসিয়া টোপ গিলিয়া ফেলে এবং শেষে বড়ই পস্তাইতে থাকে।

সংসারে বিজ্ঞাপনটা যে কেবল সংবাদপত্রেই দেওয়া হয় তাহা নহে। আমার সময় সময় বোধ হয়, সংসারে যেন কোন না কোন আকারে সর্ব্বত্রই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে, সংসারে যেন কেহই একটা না একটা বিজ্ঞাপন খাড়া না করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহে না। যেন চতুর্দ্দিকে "আমায় দেখ, দেখ গো" ; "আমায় দেখ গো" এইরূপ বলিয়া সকলেই চীৎকার করিতেছে। যেন আমাকে অন্য লোকে না দেখিলে, অন্য লোকে আমার নাম না শুনিলে, আমার জীবন বৃথা যাইল—যেন সংসারে জীবনের একমাত্র এবং কেবলমাত্র উদ্দেশ্য আপনাকে প্রচার করা, আপনার নাম অন্যের কণ্ঠে নিনাদিত করা, আপনার কীর্ত্তিকলাপ অন্যের কণ্ঠে খোদিত করা। এইরূপ আত্ম-ঘোষণাতে যে নীচতা আছে, তাহার প্রতি লোকে দৃষ্টি করিতে চাহে না।

প্রায় সকল মানুষই যেন বিজ্ঞাপন দিবার জন্য, আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য ব্যাকুল। কেহ বহি লিখিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন আমি কবি, কেহ বক্তৃতা করিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন, আমি স্বদেশপ্রেমী, কেহ কথোপকথনে বা নিজের রচনাতে নানা প্রকার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দিতেছেন, আমি পণ্ডিত, কেহ বা গাড়ি-ঘোড়া হাঁকাইয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন আমি ধনী, কেহ বা প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশি দ্বারা বিজ্ঞাপন দিতেছেন আমি লক্ষপতি। কেহ বা বিচিত্র বেশে সাজিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন, —"আমি সাজিয়া আছি, তোমাদিগের পায়ে পড়ি, আমাকে একবার দেখ গো।" কেহ বা সৌন্দর্য্যের বিজ্ঞাপন দিতেছে। যেন প্রতি পদবিক্ষেপে প্রতি কটাক্ষে বলিতেছে, "ওগো আমাকে দেখো গো, আমি দেখিতে বড় সুন্দর। তোমরা আমায় ভাল করিয়া না দেখিলে আমি প্রাণে বাঁচি না।"

সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলি অনেকে এক একটা ভেঁপুস্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেখানে যাহা করেন সংবাদপত্রের স্তম্ভে একবার জয়ধ্বনি করিয়া তাহার বিজ্ঞাপন না দিয়া তাঁহারা শান্তি লাভ করিতে পারেন না। সভ্যতার সহিত সকল প্রকার বিজ্ঞাপনে আড়ম্বর, চটক ও নির্লজ্জতা দিন দিন বাড়িতেছে।

আমি যে একটা মস্ত লোক, আমার রচিত বা প্রকাশিত গ্রন্থ যে একটা অপূর্ব্ব পদার্থ, আমার দোকানের জিনিস যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, দেখুন এই কথা, সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া লজ্জার মাথা খাইয়া, বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন দিয়া, কত লোকে অম্লানবদনে ফুকারিয়া বলিতেছে। সভ্য ইংলণ্ড ও সভ্য আমেরিকাতে এই জুয়াচুরি অধিক পরিমাণে বিকশিত হইতেছে। ভারত অন্য বিলাতের নিকট সভ্যতা শিখিতেছে, সুতরাং বিলাতের সভ্যতার জুয়াচুরিটুকুও বেশ শিখিতেছে।

লণ্ডনের পথ দিয়া চলিয়া যান, বিবিধ বর্ণে, বিবিধ বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইবেন। একটি ছাতাওয়ালার দোকানের বাহিরে লোহিত কাষ্ঠে লেখা রহিয়াছে, দেখিবেন—"যদি ছাতা কিনিয়া না ঠকিতে চান তাহা হইলে এই দোকানে ছাতা ক্রয় করুন।" ঐ দোকানের পাশেই আর একটি ছাতার দোকান রহিয়াছে, তাহার বাহিরে নীল কাষ্ঠফলকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—"যদি আপনি যথার্থ ভাল ছাতা চান, তাহা হইলে সতর্ক হইবেন, তাহা কেবল আমার দোকানে পাইবেন।" প্রায় সকল মুদিরই দোকানে এই বিজ্ঞাপন দেখিবেন— "একবার আমার দোকানের চা খাইলে আর কোনও দোকানের চা রুচিবে না।" কি নির্লজ্জ মিথ্যাবাদিতা! একটা অতি প্রকাণ্ড চা'র দোকানে লজ্জা ও সত্য জলাঞ্জলি দিয়া, বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন— "আমরা ডিউক, মার্কুইস বড় ওমরাও লোককে যে চা দিয়া থাকি, সেই চা ১।০ টাকা পাউণ্ড হিসাবে বিক্রয় করিয়া থাকি।" কি ভয়ানক প্রতারণা! বিলাতে বিজ্ঞাপনে অদ্ভুত টাকা খরচ করা হয়। বিলাতের প্রধান দৈনিকপত্র 'টাইমসে'র ষাট স্তম্ভ বিজ্ঞাপনে পূর্ণ। এমন অনেক দোকানদার আছে যাহারা ইংলণ্ডের প্রত্যেক সংবাদপত্রে, প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে, প্রত্যেক পুস্তকের মলাটে, প্রত্যেক সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে।* এই বিজ্ঞাপন-সমু

---

* John Bull and his Island PP 58—59

কত জুয়াচোর হাঙ্গর ডুব দিয়া রহিয়াছে তাহা বলা যায় না। অসতর্ক পাঠক পাইলেই তাহারা তাহাদিগকে টপ করিয়া গিলিয়া ফেলে।

এইরূপ জুয়াচোর হাঙ্গর এ দেশের বিজ্ঞাপকদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়,—ক্রমেই অধিক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কোন ব্যক্তি-বিশেষকে আঘাত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কাহারও নাম করিতে চাহি না। অনেক বিজ্ঞাপক আক্ষেপ করিয়া বলেন যে "কোন কাগজেই এখন বিজ্ঞাপনে আর বড় কাজ হয় না।" কেমন করিয়া হইবে? এত লোক মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিতেছে যে, ক্রেতাগণের বিজ্ঞাপন মাত্রেরই উপর একটা ঘোর অবিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে। কেহ বিজ্ঞাপন দেখিয়া পয়সা পাঠাইয়া বহি পায় না, কেহ বহি পাইয়া দেখে, তাহা ছাই পাঁশ, অস্পৃশ্য ঘৃণিত শুক্কারবৎ, কেহ ঔষধ কিনিয়া দেখে তাহা—ডোবার রং-করা পাঁক। যারা কোন জন্মে ডাক্তারি শিখে নাই, তারাও নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিতেছে এবং তাহা সর্ব্ববিধ রোগের অব্যর্থ অমোঘ ঔষধ বলিয়া, অসঙ্কুচিত চিত্তে বিজ্ঞাপন-ভেরী দ্বারা ঘোষণা করিতেছে। কাজে কাজেই যাঁহারা সত্য বিজ্ঞাপন দিতেছেন, জুয়াচোরদিগের জন্ম, তাঁহাদিগের বিজ্ঞাপনে আর তত কাজ হইতেছে না। এই সকল জুয়াচোরদিগের যাহাতে দমন হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সংসারে অনেক রকমের বিজ্ঞাপন দিয়া লোক অর্থ উপার্জ্জন করে। মহানগরীর রাজত্বে বারাঙ্গনারা নিজের দেহরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া তাহা দ্বারা পথিকগণকে নরকে আকর্ষণ করিবার জন্ম কতই চেষ্টা করে। ইংরাজি-সাহিত্য শিক্ষিত পাঠকগণের মিলটনের Areopagiticaতে কে বারাঙ্গনার কতকটা এবম্বিধ বর্ণনা স্মরণ হইবে। ইহারা বিজ্ঞাপনে কি বলিতেছে? "এস পথিক, তুমি আমাকে পয়সা দাও, আমি তোমার নিকট আমার সৌন্দর্য্য ও ধর্ম্ম বিক্রয় করিতেছি।" ঘৃণিততম—নীচতম এই সকল বিজ্ঞাপন। কত ঘৃণিততম, নীচতম এই সকল বিজ্ঞাপন। কত ঘৃণিততম, নীচতম এই সকল পাপীয়সীদিগের জীবন! কিন্তু সংবাদপত্রে যাহারা বারাঙ্গনাদিগের কটাক্ষবৎ মিথ্যাপূর্ণ চটুকে ভাষায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাদিগের জীবন কি বারাঙ্গনাদিগের জীবনের ন্যায় ঘৃণিত নহে? প্রলোভন, প্রতারণা, ঘৃণিত বিজ্ঞাপন, উভয়েরই অস্ত্র—অন্যের অর্থ অবৈধরূপে গ্রহণ করা, উভয়েরই উদ্দেশ্য—নরকে উভয়েরই বাসস্থান।

আমরা আর অসৎ বিজ্ঞাপনের আলোচনা করিতে পারিতেছি না। এখন সাধু বিজ্ঞাপনের আলোচনা করা যাউক। সংসারে যে যাহা করিতেছে, যে যাহা বলিতেছে, যে যাহা লিখিতেছে, তাহাতেই কোনও না কোন প্রকারে সত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিতেছে। বিজ্ঞানের বড় বড় পুস্তক, আবিষ্কৃত সত্যের বিজ্ঞাপন মাত্র। ভাল ভাল কবিতা, এক প্রকার সঙ্গীতময় সত্যের বিজ্ঞাপন। আর মধুর পবিত্র সঙ্গীত—স্বর্গরাজ্যের বিজ্ঞাপন। আর ধর্ম্মকার্য্য, পরোপকার, দয়া প্রেম—পবিত্র আত্মার অস্তিত্বের বিজ্ঞাপন। অজ্ঞান আঁধারে লোকে দিশাহারা হইয়া পৃথিবীতে ফিরিতেছে। জ্ঞানী মহাজন যাঁহারা, তাঁহারা উন্নতির ঠিক পথ কোন্ দিকে তাহা দেখাইবার জন্ম, সময়ের রাজবর্ত্মে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া বিজ্ঞাপন মারিয়া দিতেছেন, পুস্তকের খুঁটিতে "সাইন বোর্ড"

টাঙ্গাইয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচারক যাঁহারা, স্বর্গ বা স্বর্গরাজ্যের পথ কোন দিকে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্ত দেশে দেশে বিজ্ঞাপন দিতেছেন।

আর দেখুন, মানুষকে শিক্ষা দিবার জন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং কত স্থানে, কত রকমে, কত বিজ্ঞাপন দিয়া রাখিয়াছেন। আকাশে নীল কাগজের উপর, হীরকের অক্ষরে, প্রতি রাত্রিতে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহা কি দেখিতে পান না? আপনারা স্বর্ণাক্ষরে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথাই শুনিয়াছেন। কিন্তু দেখুন, সমুদায় আকাশে, হীরক অক্ষরে কে বিজ্ঞাপন দিয়া রাখিয়াছেন? ঐ বিজ্ঞাপন কি প্রকাশ করিতেছে? অযুত-বৃন্দ জগৎ—অনন্ত ব্যাপ্তি, জ্যোতির্ম্ময়তা, সুনিয়ম—মধুর মহীয়ান্ বিশ্বব্যাপী অভীর সঙ্গীত। বলিহারি এই বিজ্ঞাপনের! আকাশে কেন, জগতে যে দিকে চান, সে দিকেই বিজ্ঞাপন—সমুদায় সৃষ্টি বিজ্ঞাপন—জ্বলদক্ষরে অসংখ্য অসীম, অনন্ত, অবিনশ্বর, সত্য দিবানিশি প্রচার করিতেছে!

—জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়

জনপ্রিয়তার যাচাই

সুনাম বা জনপ্রিয়তা এমনি জিনিস—যা ঘরের মনোহারী আয়নায় ধরা পড়ে না, এর পরিচয় বা পরিমাপের জন্তে তাকাতে হয় সমাজ-দর্পণের দিকে। প্রতিবেশীরা আমার সম্পর্কে কি ভাবছেন, যাঁদের সঙ্গে দৈনন্দিন কাজ-কারবার বা চলাফেরা, তাঁরা সত্যি আমায় পছন্দ করেন কি না এবং করলেও কতখানি—এইখানেই তো জনপ্রিয়তার যাচাই।

সাধারণতঃ আমরা নিজেকে কেহই ছোট করে দেখতে চাইনে—নিজের কোন ত্রুটি বা অক্ষমতা নিজে থেকে সহসা মেনে নেওয়া আমাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রায় নয়। পরন্তু এইটুকু ভাবতে আমরা তেমন দ্বিধা করি না—প্রত্যেকেই আমরা মোটামুটি নিখুঁত, আমাদের মান ও মর্য্যাদা সামান্ত কোথায়? আমাদের বেশীর ভাগেরই ক্ষেত্রে এইটি আত্ম-প্রবঞ্চনা না হলেও, আত্মসন্তুষ্টি ছাড়া কিছুই নয়। সুনাম বা জনপ্রিয়তা যাচাই করতে চাইলে এই মাপকাঠি ধরে নিয়ে থাকলে নিতান্ত ভুল করা হবে।

মানুষ মানুষকে কখন ভালোবাসে, কেন ভালোবাসে? অথবা স্থায়ী সুনাম বা জনপ্রিয়তা নির্ভর করে কিসের উপর? প্রথম কথাই যতদূর সম্ভব ভালো মানুষ হতে হবে; আশাবাদী, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, সাহসী, কর্ত্তব্যপর ও দরদী মানুষ না হলে নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা—অহংকার বা মাদকতা, আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব বা সঙ্কীর্ণতা এই শ্রেণীর বদভ্যাসে পেয়ে বসলে কখনই চলবে না। বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা ও অধিকারে যতই কেন না বড় হওয়া গেল, ভাবতে হবে নিজেকে সাধারণেরই এক জন—নিতান্ত আলাদা কিছু নয়। বৈষয়িক আচরণে সততা ও সারল্য, বিশ্বাস ও নিষ্ঠার ভাব যেন অটুট থাকে—এইদিকেও নজর রাখতে হবে সব সময় কড়া।

এ তো গেল একদিকের ব্যাপার—অপর দিকে, নিজেকে নিজে বড় না ভাবলেও মনে প্রতিশ্রুতি রাখতে হবে—আমি কখনই পেছনে পড়ে থাকবো না, নিজেকে হেয় বা হীন প্রতিপন্ন করবো না কোন অবস্থাতেই। অহংকারের প্রশ্ন না তুললেও ব্যক্তিত্ব ও অগ্রগামিতা চাই সকল ভালো কাজে—সকল প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে। এইভাবে একটি স্বচ্ছ, সুন্দর ও বলিষ্ঠ জীবনযাত্রার পথ বেছে নিলে সুনাম বা জনপ্রিয়তা এসে জুটবে আপনি—এর যাচাইএর জন্তে এতটুকু আর ভাবতে হবে না।

ভারতে ম্যাংগানিজ উৎপাদন

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ম্যাংগানিজ একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় প্রথম শ্রেণীর ধাতু হিসাবে গণ্য। লৌহ ও ইস্পাত মজবুদ করতে, এনামেল ব্লক ও ব্লিচিং পাউডার তৈয়ারী ব্যাপারে, রসায়ন-শিল্প ও কাচ-শিল্পের ক্ষেত্রে এই খনিজ পদার্থের ব্যবহার আজ খুবই ব্যাপক।

লৌহ, কয়লা, ক্রোমিয়াম, অভ্র ও থোরিয়ামের ন্তায় ম্যাংগানিজেরও সত্যি প্রচুর যোগান রয়েছে ভারতে। বলতে কি, সেদিন পর্য্যন্তও ম্যাংগানিজ উৎপাদনে এই দেশ শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। এক্ষণে উৎপাদনের দিক হ'তে ভারত তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও ভারতের উৎপাদনের পরিমাণ বিশ্বের মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ। ভারতের মধ্যে আবার মধ্যপ্রদেশেই এই খনিজ পদার্থ বা ধাতুর উৎপাদন সবচেয়ে বেশী। তার পরই নাম করতে হয় মাদ্রাজ রাজ্যের। বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে ম্যাংগানিজ পাওয়া যায়। অন্য দিকে বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের মধ্যে ভারতের ম্যাংগানিজ উৎপাদনের স্থান দ্বিতীয়।

ভারতের খনিসংস্থার সাম্প্রতিক একটি হিসাব—ভারতে ম্যাংগানিজ পিণ্ড আছে প্রায় ১১ কোটি ২০ লক্ষ টন। তন্মধ্যে একমাত্র মধ্যপ্রদেশেই রয়েছে প্রায় ১০ কোটি টন ম্যাংগানিজ পিণ্ড। ভারতে যে ম্যাংগানিজ পাওয়া যায়, তা' সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। এখান থেকে বিপুল পরিমাণ ম্যাংগানিজ বিদেশে রপ্তানী হয়ে যায়। ১৯৫৫ সালে ভারতের খনিসমূহ হ'তে ১৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫৩৮ টন ম্যাংগানিজ পিণ্ড উত্তোলন করা হয়। ১৯৫৪ সালে উত্তোলন করা হয় ১৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৮ টন ম্যাংগানিজ পিণ্ড। ভারত থেকে ১৯৫৫ সালে যে ম্যাংগানিজ পিণ্ড রপ্তানী হয়, উহার পরিমাণ ছিল প্রায় ৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতের ২০ লক্ষ টন ম্যাংগানিজ পিণ্ড উত্তোলন নির্দ্ধারিত আছে। এই পরিকল্পনায় রপ্তানীর যে বরাদ্দ স্থিরীকৃত হয়েছে, উহার পরিমাণ ১৫ লক্ষ টন। এই রপ্তানী খাতে ভারত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করে আসছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

গিনিগোল্ড জুয়েলারি স্পেশালিষ্ট

'নতুন ব্রাঞ্চ শোরুম—জামসেদপুর· ফোন: জামসেদপুর-৮'

কলকাতা মাঠে খেলাধুলা একটু মন্থর গতিতে চলেছে। কারণ, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা জ্বরে কবলে পড়েছেন অনেকে। এ অধীনও তার হাত থেকে রেহাই পায়নি।

দীর্ঘ দিন সংবাদের উপর কোন আলোচনা হয়নি, তাই এবারে যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

এবারে রণজি প্রতিযোগিতায় ফ্যাইনাল খেলায় বোম্বাইদল বিজয়ী হয়েছে। বোম্বাই ইতিপূর্ব্বে আট বার এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। ফ্যাইনালে এবার বোম্বাই দল সার্ভিসেস দলকে এক ইনিংস ও ৩৮ রাণে পরাজিত করেছে। খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর নিয়ে দেওয়া হইল।

সার্ভিসেস—১ম ইনিংস ১৭১ (গাদকারী ৫৩, কঞ্জুরু ৫০, এস, ওয়াই রেগে ২১, উম্রিগড় ৬৫ রাণে ৪, বিলে ২৩ রাণে ৩ ও গার্ড ২৩ রাণে ২ উইকেট)

বোম্বাই—১ম ইনিংস—৩৫৯ (৭উইঃ ডিক্লেয়ার্ড) ওয়াইকে বিলে ১৬২, তামানে ৬৬, মন্ত্রী ৬২, কামাথ ৩৮, জগদীশন ৫১ রাণে ৩ উইঃ সুরেন্দ্রনাথ ৫০ রাণে ২ ও দানী ৪৭ রাণে ২ উইকেট লাভ করেন।

সার্ভিসেস—২য় ইনিংস—১৫০ (গাদকারী ৪০, দানী ৩৬ গণেশন ২৭, পাঞ্জরী ৫৭ রাণে ৫, উম্রিগড় ৫৭ রাণে ৫ ও হারদিকার ১ রাণে ১ উইকেট)

(বোম্বাই এক ইনিংস ও ৩৮ রাণে বিজয়ী)

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা বোম্বাইএ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এবারে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে রেল দল। রেল দল সমেত ভারতের প্রায় সকল রাজ্য দ্বাবিংশতিতম অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। দুঃখের বিষয়, বিশ্ববিজয়ী হকি খেলার মান আজ নিম্নমুখী।

ভারতীয় রেল দল ও বোম্বাইএর মধ্যে যে ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় তাতে কিছুটা উন্নত ধরণের খেলা দেখার সৌভাগ্য দর্শককুলের হয়েছিল বলা যায়। তীব্র উত্তেজনা এবং আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের মধ্য দিয়ে খেলাটি নিষ্পত্তি হয় ২—১ গোলে। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় রেল দলের ইহাই দ্বিতীয় সাফল্য। ১৯৩০ সালে রেল দল প্রথম বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

* * *

মোহনবাগান দল অপরাজিতের জয়তিলক পরে এবারও হকি লীগের চ্যাম্পিয়ান সিপ লাভ করেছে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, মোহনবাগান দল উপর্য্যুপরি তিন বার অপরাজিত থেকে হকি লীগের চ্যাম্পিয়ান অর্জন সত্যি মোহনবাগানের খেলাধূলার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আর এবার রাণার্স হয়েছে ইষ্টবেঙ্গল দল।

এবার নিয়ে মোহনবাগান দল ৬বার লীগ বিজয়ীর সম্মান অর্জন ক।

* * *

এবারে বাইটন কাপ লাভ করেছে ইষ্টবেঙ্গল দল। ফাইন্যালে মহামেডান স্পোর্টিং দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। দীর্ঘদিন পরে কলকাতার দুইটি দল বাইটন কাপের ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় খেলার মাঠে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। শক্তিশালী ফুটবল দল হিসাবে এত দিন ইষ্টবেঙ্গল দলের পরিচয় ছিল। ক্রমে ক্রমে সে সীমারেখা অতিক্রম করে ইষ্টবেঙ্গল দল এ্যাথেলেটিক্স স্পোর্টসে শীর্ষস্থানীয়, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ বছরই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব সর্ব্বপ্রথম বাইটন কাপ লাভ করলো। এ বছর বাইটন কাপের খেলায় মোট ৩০টি দল অংশ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে বাংলার বাইরের দল ছিল আটটি। শক্তিশালী দল হিসাবে একমাত্র উত্তর প্রদেশ ছাড়া, টাটা স্পোর্টস, পাঞ্জাব, সার্ভিসেস প্রমুখ শক্তিশালী দলগুলি এবারের বাইটন কাপের খেলায় যোগদান করেনি। বাইটন কাপের প্রতিযোগিতায় উপর্য্যুপরি তিনবার হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল ১—০ গোলে পরাজিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, মোহনবাগান দল লীগের খেলায় মহামেডান দলকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে। যাই হোক, বাইটন কাপের সংগে সংগে হকি খেলার উপর যবনিকা পড়ল।

* * *

কলকাতায় ফুটবল লীগের খেলা শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছু দিন। লীগ পাল্লার দৌড়ে রাজস্থান দল ১৪টি দলের মধ্যে এখন অপরাজিতের সম্মান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মরশুমের প্রথম চারিটি খেলায় মহামেডান স্পোর্টিং-এর কাছে ইষ্টবেঙ্গল দলের পরাজয় যেমন মহামেডান দলকে লীগ বিজয়ের পথ কিছুটা প্রশস্ত করে দিয়েছে, অপর পক্ষে ইষ্টবেঙ্গল দল বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়ল। এই খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দল প্রথমার্ধে কোণঠাসা করে রাখলেও শেষ পর্য্যন্ত মহামেডান দলের কাছে ১-০ গোলে পরাজয় বরণ ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই দিন মহামেডান দলের অধিনায়ক সালাম ও ইষ্টবেঙ্গল দলের নবাগত খেলোয়াড় রাম-বাহাদুরের ক্রীড়ানৈপুণ্য চোখে পড়ে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, আই, এফ, কর্ত্তৃপক্ষ ইনফ্লুয়েঞ্জার দোহাই দিয়ে খেলা বন্ধ রাখেন। ঠিক এই প্রকার অজুহাতে খেলাধূলা বন্ধ রাখা ইতিপূর্ব্বে কখনও হয়নি। এর পিছনে নাকি কোন দুরভিসন্ধি আছে বলে শোনা যাচ্ছে। জানি না, এর কতটুকু সত্য এবং মিথ্যা।

এবারের প্রথম ডিভিসনে উন্নীত হাওড়া ইউনিয়ন দল মোটামুটি খেলছেন। সূচনা ভাল হলেও হাওড়া ইউনিয়ন দলের খেলায় তেমন ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখা যায়নি। অতীতের খ্যাতিমান দল তার পূর্ব্ব-সুনাম অনুযায়ী খেলুক, এটাই ক্রীড়ামোদীরা আশা করেন।

গ্রন্থকার ও পাঠক

গ্রন্থকার ও পাঠকে সম্বন্ধ কি? এতদুভয়ের সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই গ্রন্থকার ও পাঠক শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। গ্রন্থকার শব্দের অর্থ 'যিনি গ্রন্থন করেন'। গ্রন্থকার কি গ্রন্থন করেন? এতদুত্তরে বলা যায় যে, তিনি শব্দসমূহ গ্রন্থন করেন। মালী যেরূপ মালা গ্রন্থন করে, গ্রন্থকারও সেইরূপ শব্দসমূহ গ্রন্থন করেন। শব্দসমূহ চিন্তার প্রতীক বা বাহন। যে শব্দে মনের কোন চিন্তা প্রকাশ করে না, সেই শব্দ অর্থহীন। গ্রন্থকার শব্দসমূহ গ্রথিত করিয়া বস্তুতঃ চিন্তাসমূহই গ্রথিত করিয়া থাকেন। আর পাঠক শব্দের অর্থ 'যিনি পাঠ করেন.' পাঠ করার অর্থ কি? ইহার অর্থ শুধু কতকগুলি অক্ষর দর্শন বা উচ্চারণ করা নয়। পাঠ করার প্রকৃতার্থ অর্থবোধ সহ অক্ষর সমূহের দর্শন কিংবা উচ্চারণ, বা অর্থবোধসহ অক্ষর সমূহের যুগপৎ দর্শন ও উচ্চারণ। অর্থবোধই পাঠক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য। যে পাঠে অর্থবোধ নাই, সে পাঠ পাঠই নয়, উহা কেবল কতকগুলি শব্দের উচ্চারণ বা কতকগুলি অক্ষরের দর্শন মাত্র। অর্থবোধের অর্থ—পাঠক কর্তৃক গ্রন্থকার-লিখিত ভাষা হৃদয়ঙ্গম করা, গ্রন্থকারের মনোগত ভাবে ভাবান্বিত হওয়া বা তাঁহার চিন্তারাশি চিন্তা করা। এইরূপে গ্রন্থকার ও পাঠকের সম্বন্ধ দুইটি সঙ্গীর পরস্পর সম্বন্ধরূপে প্রতিপন্ন হয়, গ্রন্থকার যেন কিছু বলিতেছেন, আর পাঠক যেন তাহা শ্রবণ করিতেছেন। তখন তাহাদের সম্বন্ধ বক্তা ও শ্রোতার সম্বন্ধরূপে বর্ণিত হইতে পারে। আর গ্রন্থকার যখন কোন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন, তখন গ্রন্থকার হন উপদেষ্টা, আর পাঠক হন উপদিষ্ট, সেইজন্য আমরা তাঁহাদের তৎকালীন সম্বন্ধ গুরুশিষ্য-সম্বন্ধরূপে অভিহিত করিতে পারি। পাঠক যদি কোন গ্রন্থ বুঝিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে গ্রন্থকারের ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। তাহা হইলেই তিনি গ্রন্থকারের উক্তি সম্যক বুঝিতে পারিবেন। নতুবা তিনি গ্রন্থকারের লেখার ভিন্নার্থ করিয়া ফেলিবেন। সেইজন্য কোন গ্রন্থের সমালোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিতে হইবে, পশ্চাৎ উহার উৎকর্ষাপকর্ষের সমালোচনা করা যাইতে পারে, নতুবা পাঠক ঐ গ্রন্থের অপব্যাখ্যা করিয়া ফেলিবেন, তাহাতে তিনিই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবেন।

আমরা ইতিপূর্বে গ্রন্থকার ও পাঠকের সম্বন্ধ দুইটি সঙ্গীর সম্বন্ধরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে সকলে চিত্তাকর্ষকরূপে তাঁহাদের বক্তব্য বলিতে পারেন না। কেহ হয়ত সরস ভাষায় তাঁহার বক্তব্য বলিতে পারেন, আবার কেহ হয়ত নীরস কিংবা জটিল ভাষায় তাঁহার বক্তব্য বলিতে পারেন। সেইরূপ কোন গ্রন্থকারের ভাষা হয়ত সরস, সরল ও সতেজ হয়, আবার কোন গ্রন্থকারের ভাষা হয়ত নীরস ও জটিল হয়, ইহা গ্রন্থকারের স্বীয় ভাব প্রকাশের ভঙ্গির উপর নির্ভর করে; ভাষার সরসতা কিম্বা নীরসতা আবার বিষয়ের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। কোন গভীর তত্ত্বের বিষয়ে লিখিতে হইলে ভাষা সাধারণতঃ গম্ভীর ও জটিল হইয়া পড়ে, আবার নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি তরল ভাবের গ্রন্থ লিখিতে ভাষা সাধারণতঃ সরস হইয়া পড়ে। তাই বলিয়া গভীর তত্ত্বপূর্ণ লেখার ভাষা যে সরস হইতে পারে না, এমন কোন নিয়ম নাই। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপে শঙ্করাচার্য-বিরচিত চর্পটিকা-স্তোত্রের উল্লেখ করিতে পারি। এই স্তোত্র গভীর তত্ত্ব-প্রকাশক, অথচ ইহার ভাষা বেশ সরল ও সরস। এ সম্পর্কে আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মোটের উপর, এ কথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, তত্ত্বজ্ঞান সম্বলিত লেখার ভাষা গম্ভীর ও জটিল হয়। ইহার প্রমাণ আমরা দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে পাইয়া থাকি। ঐ গ্রন্থ সমূহ নানা যুক্তিজালে বিস্তীর্ণ, আর ঐ যুক্তিজাল দুরূহ শব্দে গঠিত। সাধারণ লোক ঐ সকল যুক্তিজাল ভেদ করিয়া সার গ্রহণে সমর্থ হয় না। সাধারণ লোক যেরূপ তরল মস্তিষ্ক, সে ঐরূপ তরল ভাবাপন্ন নাটক কিম্বা উপন্যাস পড়িয়াই আমোদ পাইয়া থাকে। এই হেতুতে দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্ম ও গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রের গ্রন্থকারদের পাঠকের সংখ্যা খুব কম থাকে। পক্ষান্তরে, কাব্য, ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদি বিষয়ের গ্রন্থকারদের পাঠকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়া থাকে। যে যাহা হোক, পাঠকবর্গের সংখ্যাধিক্য দ্বারা গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের উৎকর্ষাপকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরেজীতে একটি কথা আছে যে, Like will draw like. (সমান সমানেই মিলন হয়)। এই নিয়মানুসারে পাঠক যে প্রকৃতির, সে সেই প্রকৃতির গ্রন্থকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আর গ্রন্থকার যে প্রকৃতির, সে সেই প্রকৃতির পাঠকবর্গকে আকর্ষণ করে।

গ্রন্থকার ও পাঠকের সম্বন্ধ সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া আ[illegible] হয়, গ্রন্থকার যেন দাতা, আর পাঠক যেন গ্রহী[illegible] পাঠককে চিন্তারাশি দান করেন, আর পাঠক [illegible] করেন, কিন্তু সকল গ্রন্থকার মুখে চিন্তারাশি দ[illegible]

পারেন না। কোন গ্রন্থকার হয়ত ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে শায়িত থাকেন, আবার কোন গ্রন্থকার হয়ত দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে লাঞ্ছিত হয়েন। কোন গ্রন্থকার হয়ত জীবদ্দশাতেই প্রভূত যশঃ, প্রতিপত্তি ও অর্থ লাভ করেন, আবার কাহারও ভাগ্যে হয়ত মৃত্যুর পর ঐ সকল বা উহাদের একতম জুটে বা জুটে না! যাঁহারা ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা জানেন 'কবিজীবনী' ("Lives of Poets") লেখক ডাক্তার জনসন (Dr. Johnson) ও অমর কবি মিল্টন (Milton) জীবদ্দশায় কিরূপ অর্থকষ্ট পাইয়াছিলেন। যশঃ ও প্রতিপত্তি এই উভয় গ্রন্থকারই জীবদ্দশায় যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে অর্থাভাবে বড় কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। আমাদের বাঙ্গালা ভাষার অমর কবি মাইকেলের জীবনও গ্রন্থকারদের দুঃখ-দারিদ্র্য ভোগের দৃষ্টান্তস্থল নহে কি? কবিবর মাইকেল জীবনে যে কত কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া সুবিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার (মাইকেলের) মৃত্যুপলক্ষে রচিত স্ব স্ব কবিতায় খেদ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"হায়, মা ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যে জন সেবিবে ও পদযুগল
সেই সে দরিদ্র হবে।" (হেমচন্দ্র)

"কিংবা কণ্টকিত হায়! যে বিধি করিল
গোলাপ কমল;
সে বিধি পাষাণ মনে দহিতে সুকবিগণে
কবিত্ব-অমৃতে দিল দারিদ্র্য-অনল।"
(নবীন সেন)

ইংরেজীতে এই ভাবে একটি গাথা আছে, তাহা এই,—Most wretched men are craddled into poetry wrong, what they learn by suffering they teach in song. অর্থাৎ ভাগ্যহীন লোকেরাই ভুল বশতঃ কবিতার চর্চা করিয়া থাকে আর তাহারা দুঃখ-কষ্টে যাহা শিখে, তাহাই তাহারা সঙ্গীতাকারে শিক্ষা দিয়া যায়। এই উক্তি কেবল কবিদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। মোটের উপর, যাঁহারা ভারতীর সেবা করেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন, তাঁহাদিগকেই অনেক দুঃখ-কষ্ট, নানা বাধা-বিপত্তি ভোগ করিতে হয়। গ্রন্থকারগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্যের উপাসক, তাই তাঁহাদিগকেও অনেক সময় দুঃখ-দৈন্য ভোগ করিতে হয়; কিন্তু ইহা নিয়ম নয় যে, গ্রন্থকার মাত্রই দুঃখ-কষ্ট পাইবে। গ্রন্থ প্রণয়ন ও দুঃখপ্রাপ্তির সঙ্গে এমন কোন নিত্যসম্বন্ধ নাই যে, একটির বিদ্যমানতা অপরটিকে সূচিত করে। গ্রন্থকার যে জীবদ্দশায়ই প্রভূত ধনসম্পত্তি ও যশের অধিকারী হইতে পারেন, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রভূত যশঃ, সম্মান ও অর্থলাভ করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রভূত যশঃ, [illegible]ন ও অর্থলাভ করিয়া গিয়াছেন। এরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া [illegible] পারে। সংসারে সুখ-দুঃখ ভাগ্যায়ত্ত। ইহাতে গ্রন্থকার [illegible] কোন কথা নাই। তবে যাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা পার্থিব সুখস্বচ্ছন্দ্যের প্রতি যেন একটু উদাসীন থাকেন। এই হেতু ঐ সকল জিনিষ তাঁহাদের ভাগ্যে যেন একটু কমই জুটে। তবে অদৃষ্টে সুখ থাকিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াও সুখ হইতে পারে,—গ্রন্থকারও সুখী হইতে পারেন। এখানে প্রশ্ন এই যে, গ্রন্থকার যদি নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াও পাঠককে তাঁহার চিন্তারাশি উপহার দিয়া যাইতে পারেন, তবে পাঠকের গ্রন্থকারের প্রতি কোন কর্ত্তব্য আছে কি? ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, গ্রন্থকার যেমন পাঠককে চিন্তারাশি দান করেন, পাঠকও তেমন গ্রন্থকারকে গ্রন্থের মূল্যস্বরূপে অর্থদান করেন, সকল পাঠকই মূল্য দিয়া গ্রন্থ ক্রয় করিলে বহু লোকে বিনামূল্যে ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া থাকে। গ্রন্থাগারে কোন একখানা গ্রন্থ থাকিলে বহু পাঠক সেই গ্রন্থাধ্যয়নে উপকৃত হইতে পারে। কোন কোন গ্রন্থাগারে পাঠকগণকে কিছু কিছু চাঁদা দিতে হয়, তাহা গ্রন্থকারের চিন্তারাশির তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কারণ চিন্তা বা ভাব দানের সঙ্গে অর্থদানের তুলনাই হইতে পারে না, তদোধিক ঐ সামান্য অর্থদানের। এতদ্ব্যতীত কোন কোন গ্রন্থাগারে পাঠকগণ বিনা খরচেই গ্রন্থাধ্যয়ন করিতে পারেন, যেমন কলিকাতার ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীতে ও অন্যান্য গ্রন্থাগারে। সেরূপ ক্ষেত্রে পাঠক গ্রন্থকারকে তাঁহার চিন্তারাশির বিনিময়ে কি দিতে পারেন? তিনি দিতে পারেন তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা। পাঠক যদি গ্রন্থকারের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া কিছুমাত্র উপকৃত হন, তবেই গ্রন্থকার নিজকে কৃতার্থ মনে করেন। মোটের উপর, গ্রন্থকারের দান সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, তাই পাঠক গ্রন্থকারের নিকট চিরদিন গ্রহীতা বা ঋণী থাকেন, আর গ্রন্থকার পাঠকের নিকট চিরদিন দাতাই থাকেন।

সকল গ্রন্থই পাঠকবর্গের সমাদর লাভ করিতে পারে না, আবার সকল গ্রন্থ সমান সমাদরও লাভ করে না। কোন কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থ কেবল সাময়িক ভাবে সমাদর লাভ করে, পরে হয়ত উহা অনাদৃত হইয়া বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, কোন কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থ চিরদিনই সমাদরপ্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের গ্রন্থ স্বদেশে সমাদরপ্রাপ্ত হয়ই, এমন কি বিদেশেও সমাদর লাভ করে। এ সকল গ্রন্থকার বাস্তবিকই ভাগ্যবান। বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জিল, কালিদাস, দান্তে, নিউটন, শেক্সপীয়র ও মিল্টন প্রভৃতি বাস্তবিকই ভাগ্যবান গ্রন্থকার। এ সকল গ্রন্থকার দেশ-কালের অতীত,—তাঁহারা সর্বদেশে সর্বকালেই পূজিত হইবেন।

পাঠকের উপর গ্রন্থকারের একটি স্থায়ী প্রভাব আছে। কেহ যেন মনে না করেন যে, গ্রন্থপাঠের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থকার ও পাঠকের সম্বন্ধ ফুরাইয়া যায়। এরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। কারণ গ্রন্থকার একটিমাত্র কথা দ্বারা পাঠকের মনে এরূপ গভীর ভাবের সঞ্চার করিতে পারেন, যাহা যাবজ্জীবন স্থায়ী হইতে পারে। গ্রন্থকার ও পাঠকের সম্বন্ধ যদি গ্রন্থপাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ফুরাইয়া যায়, তবে গ্রন্থাধ্যয়ন করিয়া লাভ কি? আমরা গ্রন্থাধ্যয়ন করি, উহা হইতে কোন স্থায়ী ফল লাভ করিবার জন্য,—যেমন আমাদের চরিত্র গঠনের জন্য, অথবা এমন কোন জ্ঞানলাভের জন্য, যাহা চিরতরে জীবনপথে আমাদিগকে সাহায্য করিবে। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থই যে আমাদের মনের উপর স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যাইতে পারে, এমন কথা নয়, তবে এ কথাও অস্বীকার করা যাইতে

গান্ধী-হত্যাস্থল (দিল্লী) —কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

. . . এ মাসের প্রচ্ছদপট . . .

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি গ্রাম্যমেয়ের আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। চিত্রটি শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ গৃহীত।]
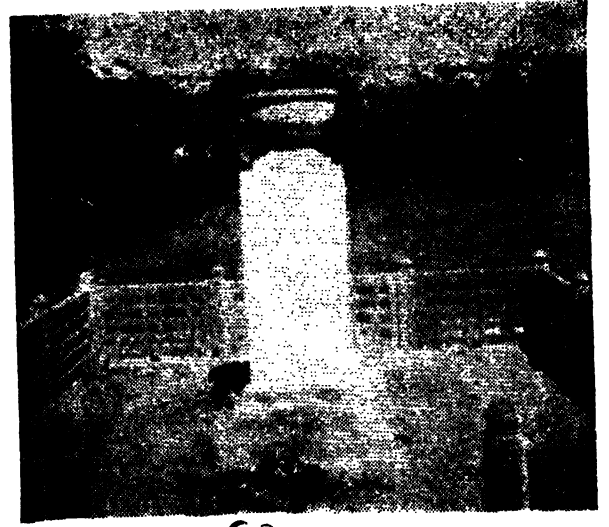
বুদ্ধগয়া (বিড়লা মন্দির) দিল্লী

—এস. এন. সরকার
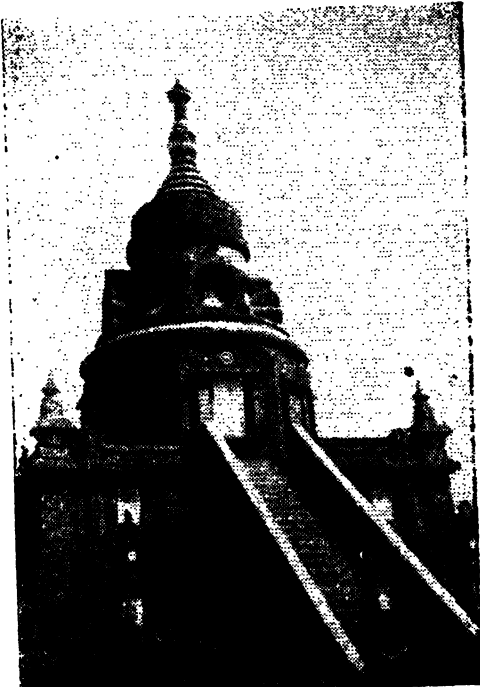
জগদীশ মন্দিরগাত্র (উদয়পুর)

—যতীন্দ্রনাথ পাল

কোণারক

—মদন বসু

সাজঘর

—মীরেন অধিকারী

ঘরকন্না
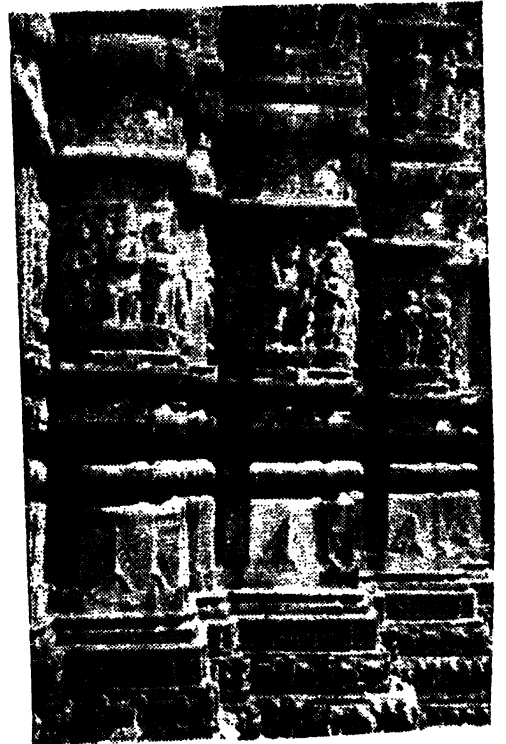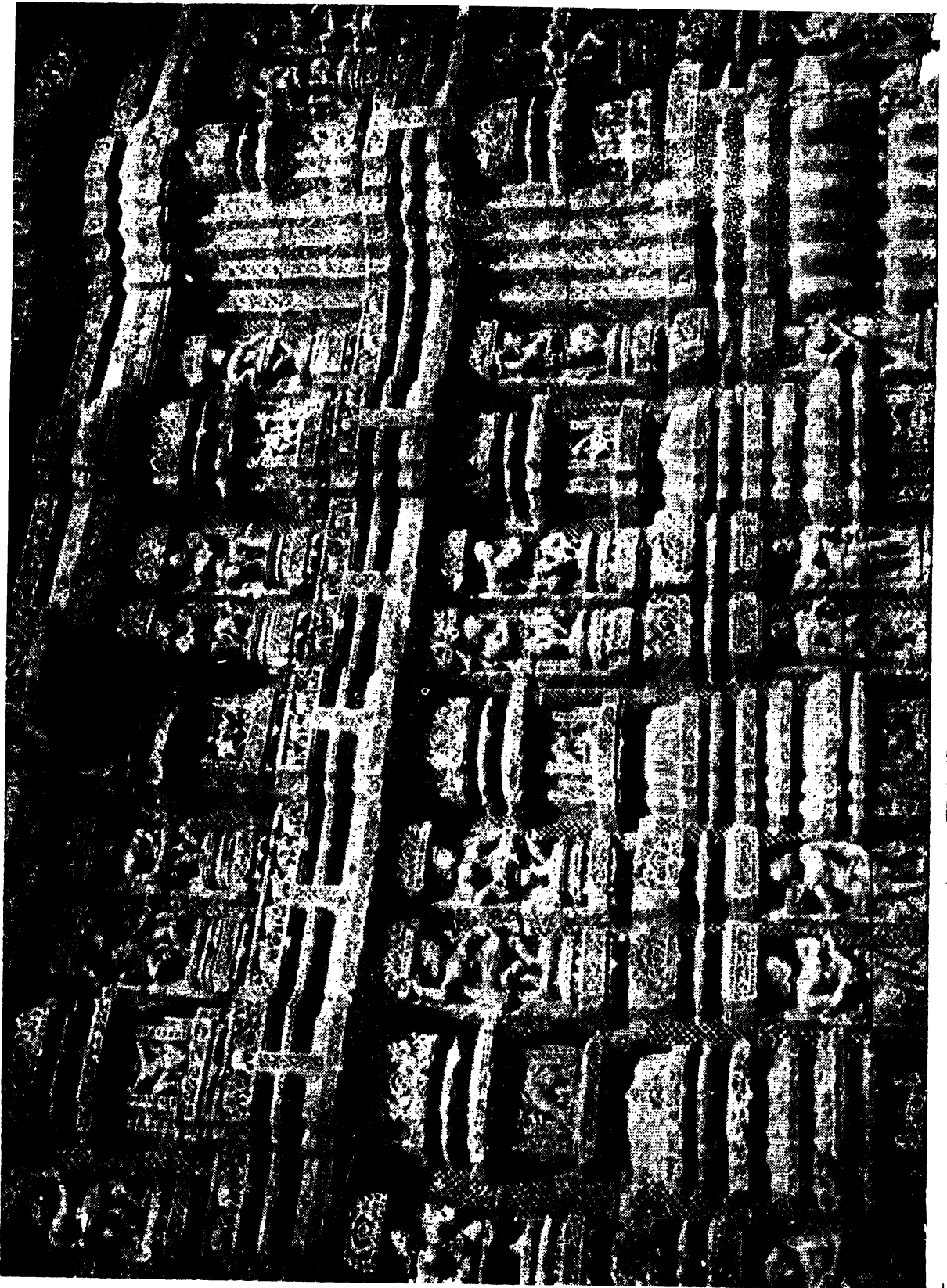
–রণজিৎ সোম

তাঞ্জোর মন্দির

—রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
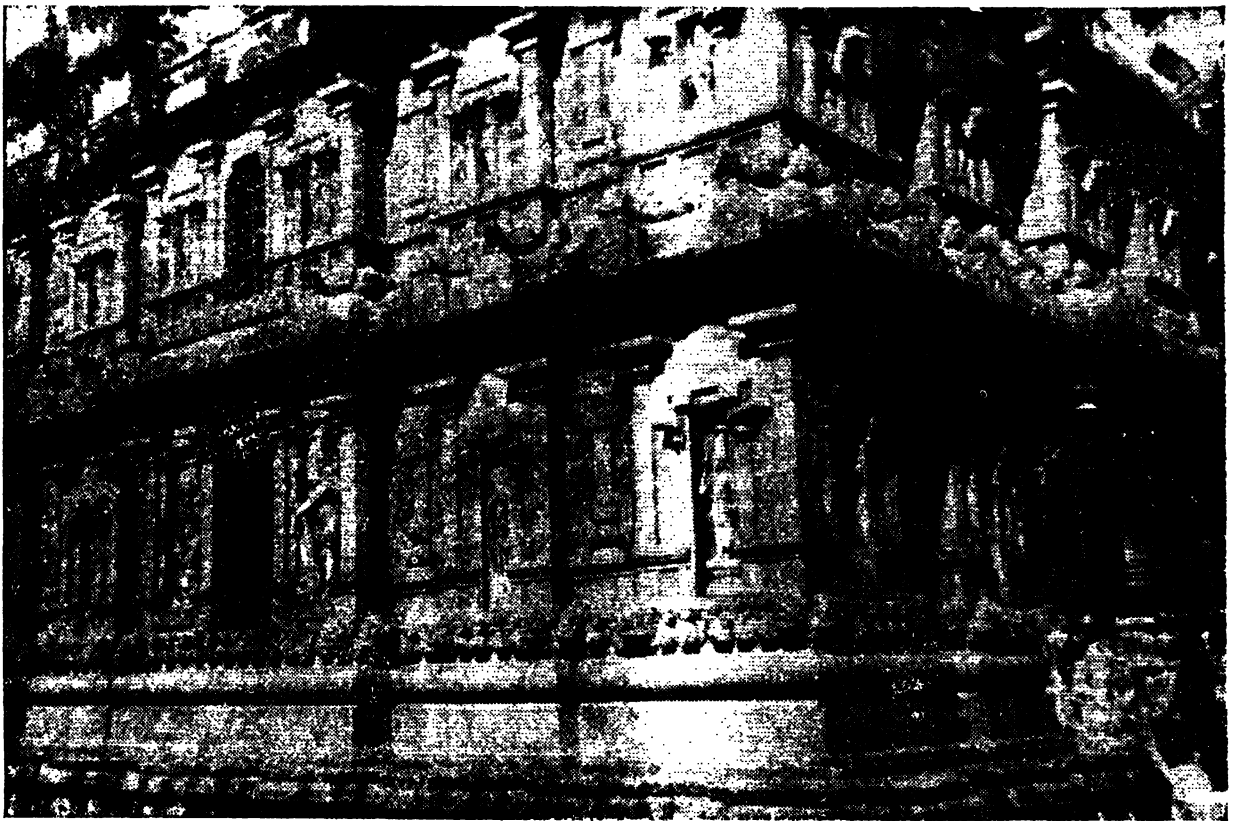
পারা যায় না যে, প্রত্যেক গ্রন্থকারই পাঠকের মনের উপর একটি অল্পবিস্তর স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যান। যাহা পাঠকের জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এমন কি, যখন আমরা সময়াতিপাত করিবার জন্য কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করি, তখনও গ্রন্থকার আমাদের মনের উপর অলক্ষ্যে একটি প্রভাব বিস্তার করিয়া যান।

পক্ষান্তরে, কেবল গ্রন্থকারেরই যে পাঠকের উপর প্রভাব থাকে এমন নয়, পাঠকেরও গ্রন্থকারের উপর অল্প বিস্তর প্রভাব আছে। গ্রন্থকার যদি পাঠককে সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন, তবে পাঠক সর্বত্র গ্রন্থকারের গুণকীর্তন করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, পাঠক যদি গ্রন্থকারের গ্রন্থে তেমন উপাদেয় কিছু না পান, অথবা গ্রন্থকারের গ্রন্থ যদি কুভাবে কিংবা কুচরিত্রে কলুষিত হয়, অথবা তাঁহার গ্রন্থ যদি নানা দোষে দুষ্ট হয়, তাহা হইলে সুধী পাঠক ঐরূপ গ্রন্থকারের যশঃ না গাহিয়া দুর্নামই করিয়া থাকে। লোকেরই বা দোষ কি? সাধু লোকের প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকে, আর কুলোকের নিন্দা সকলেই করিয়া থাকে। প্রশংসা ও নিন্দা সকলেরই আয়ত্তাধীন। সৎপথে চলিলে লোকে প্রশংসা করে, আর অসৎপথে চলিলে লোকে নিন্দা করে। সেইরূপ যে গ্রন্থকার তাহার গ্রন্থমধ্যে সৌন্দর্য্য, চরিত্র ও ধর্ম্মের ছবি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন তিনিই জনসমাজে যশঃ লাভ করেন; আর যে গ্রন্থকার গ্রন্থের মধ্যে পাপের ছবি চিত্রিত করিয়া লোকের মন কলুষিত করেন, তিনি সুধী সমাজের নিন্দাভাজন হন। ঐরূপ গ্রন্থকার দেশের কণ্টকস্বরূপ, কারণ তিনি গ্রন্থ প্রণয়নের উচ্চাদর্শ (সমাজের মঙ্গল) বিস্মৃত হইয়া জনসমাজকে কুপথে চালিত করেন।

এরূপ গ্রন্থকার অনেক সময় কেবল সমাজের রুচি অনুসারে গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন। সমাজের রুচি অনুযায়ী গ্রন্থ প্রণয়ন করাতে তিনি হয়ত খুব লাভবান্ হন,—বাজারে তাহার পুস্তকের হয়ত খুব কাটতি হয় কিন্তু কাটতি হইলে কি হইবে? ঐরূপ গ্রন্থের আদর বেশী দিন থাকে না। কারণ এবম্প্রকারের গ্রন্থ সমাজের সাময়িক রুচি অনুযায়ী ভাবে লিখিত হয় বলিয়া সমাজের রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহারও আদর কমিয়া যায়। যথা, পাঁচকড়ি দের ডিটেকটিভ উপন্যাস সকল। পক্ষান্তরে, যে সকল গ্রন্থকার সমাজের কুরুচির সংশোধন করিয়া সমাজকে সৎপথে চালিত করিতে পারে, তাহারা বাস্তবিকই দেশহিতৈষী। এরূপ গ্রন্থকার সমাজের উপর একটা স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যান। ইতিহাসে তাঁহাদের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত থাকে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, পাঠকের সমালোচনা দ্বারা তৎকর্তৃক গ্রন্থকারের গুণকীর্তন বা নিন্দাবাদ দ্বারা গ্রন্থকারের বা লেখার কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না; কিন্তু পাঠক কর্তৃক গ্রন্থকারের গুণস্তুতি বা নিন্দাবাদ যে গ্রন্থকারের সুনাম বা দুর্নাম অনেকটা বর্দ্ধিত করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা এই হিসাবেই বলিতেছি যে, গ্রন্থকারের যেরূপ পাঠকের উপর একটা স্থায়ী প্রভাব আছে, পাঠকেরও গ্রন্থকারের উপর সেইরূপ অল্পবিস্তর প্রভাব আছে।—শ্রীবরদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

হরপ্রসাদ রচনাবলী

বাঙলা দেশের শিক্ষিত সমাজের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন সুলেখক, চিন্তাশীল মনীষী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। আলোচ্য গ্রন্থটি শাস্ত্রী মহাশয়ের সমগ্র রচনার সংগ্রহের প্রথম খণ্ড। ইংরাজী এবং বাঙলায় তিনি অসংখ্য সাহিত্যসৃষ্টি করেন, যেগুলি এত কাল ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিল নানা পত্র-পত্রিকায়। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত থাকায় এই সব মূল্যবান রচনাপাঠের সৌভাগ্য হয় নি আমাদের পাঠক-সমাজের। হরপ্রসাদের সাহিত্য অনন্যসাধারণ বিভিন্ন কারণে। কারণ, তিনি যেমন পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও কুসংস্কারে নিজেকে আচ্ছন্ন করেন নি, তেমনি তাঁর রচনামালাও নানা গুণের অধিকারী হলেও সেই সনাতনী ধাঁচে রচিত হয় নি। হরপ্রসাদ একদা তাঁর সাহিত্য-সেবার মাধ্যমে এই কথাই প্রমাণ করেছিলেন, ইংরাজী-শিক্ষার প্রসার যেন দেশকে উচ্ছন্নয় না ভাসাতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহিত্য-প্রতিভা বহুমুখী। তাঁর ভাবের আর ভাষার তত্ত্ব অফুরন্ত। প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ আয়তনের বিপুল এই গ্রন্থ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রথম সম্ভারের আদ্যোপান্ত সম্পাদকের কৃতিত্ব বহন করছে। এই মহাগ্রন্থের যত প্রচার হয় ততই মঙ্গল। প্রতি খণ্ড মূল্য এগারো এবং পনেরো টাকা। ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী। ৬৪এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে

সে যুগের বাঙালী লেখকদের অধিকাংশই বাঙলা ও ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে সমান দক্ষ ছিলেন। ঠিক এই ধরণের জ্ঞানী ও গুণীদের প্রথম সারির মধ্যে স্থান দেওয়া যায় আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীকে। তখন বাঙালীর গৌরবময় যুগ, বাঙলা দেশের নামে সমগ্র ভারতবর্ষ শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াতো। এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জন শিবনাথ শাস্ত্রীর বিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থ "মেন আই হাভ সীন" এত কাল বাদে প্রথম বাঙলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয় এদেশের ও বিদেশের বহু বিখ্যাত মহাপুরুষদের সান্নিধ্য লাভ করেন স্বীয় প্রতিভার বলে। তিনি এমনই একজন বিশেষ মানুষ ছিলেন যে তাঁর প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছেন তদানীন্তন মহাপুরুষরা। আজকের যুগ নকলের যুগ। আসলের যুগ অতীত হয়েছে এখন। আজকের বিভ্রান্ত তরুণ-তরুণী ও চপলমতি কিশোর-কিশোরীদের কাছে এই বইখানি এক অমূল্য সম্পদ হওয়া উচিত। বাঙলার গৌরবময় যুগের সাত জন অমর বাঙালীর এই জীবন-আলেখ্য থেকে বর্তমানের মানুষ অনেক কিছু শিক্ষালাভ করবে। আলোচ্য জীবনীর মধ্যে বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, আনন্দমোহন, পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, ডাঃ মহেন্দ্রলাল এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কাহিনী স্থান পেয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের সুযোগ্যা কন্যা মায়া রায় এই গ্রন্থের যোগ্য অনুবাদ করেছেন। বইটির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট যথাযোগ্য হয়েছে।

রাইটার্স সিণ্ডিকেট। ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১৩। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

গ্রন্থবার্তা

বিদেশের সেরা সেরা গ্রন্থগুলির সারাংশ সংকলিত করে 'গ্রন্থবার্তা' নাম দেওয়া হয়েছে। আজকের দিনে পৃথিবীর সাহিত্য কোন পথে তার গতি পরিচালিত করছে, সে সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা এর থেকে জন্মাতে পারে। বিভিন্ন লেখক-লেখিকা সম্বন্ধেও যথাযোগ্য আলোচনা এখানে পরিবেশিত হয়েছে। সংকলকের চয়নশক্তি প্রশংসার যোগ্য। তাঁর সংকলক এককেন্দ্রিক নয়। বহুমুখীন। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতন্ত্র, মনস্তত্ত্ব আত্মজীবনী সকল বিষয়ক রচনাই সংকলক শীলভদ্র এখানে সমান কৃতিত্বের সঙ্গে পরিবেশন করে গেছেন। রচনার উৎকর্ষতা স্থানে স্থানে পাঠকচিত্তকে গভীর ভাবে নাড়া দেয়। এ ধরণের গ্রন্থ নিশ্চয়ই পাঠকমহলে সাড়া জাগাবে, এ আশা আমরা রাখি, এই প্রসঙ্গে সংকলকের প্রকৃত নাম প্রকাশের কৌতূহল আমরা চেপে রাখতে পারছি না। তাঁর নাম শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১০ বি কলেজ রো-স্থ শান্তি লাইব্রেরী থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম চার টাকা মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য

বাঙালী জাতি ও তার সাহিত্য উভয়েরই একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল আজ থেকে দেড়শ বছর আগে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে। যে শতাব্দী বাঙলার শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি নব জাগরণ জীবনবোধ নতুন ভাবে গড়ে দিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দী যখন সবে চোখ মেলে প্রত্যক্ষ করছে পৃথিবীর আলো ঠিক সেই সময়ই বাঙালীর জীবনবোধ এক নতুন চেতনায় রূপ নিচ্ছে, তার স্মরণ সব থেকে বেশী রূপ নিয়েছিল তৎকালীন সাহিত্যে। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন যেমন পরিশ্রম সাপেক্ষ তেমনই প্রশংসার যোগ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে সেই সংকার্য্যটি সম্পাদন করেছেন। বাঙালীর মানসিক শ্রীবৃদ্ধির এই ইতিকথার যত প্রসার হয় ততই ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গল। কারণ অতীতের প্রতি বিস্মরণ আজকের দিনে এক বৈশিষ্ট্যের আকার ধারণ করেছে। এই গ্রন্থটির আমরা বহুল প্রচার কামনা করি। ১৩ হ্যারিসন রোডস্থ ইণ্ডিয়ান য্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ থেকে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম তিন টাকা মাত্র।

মেরুপথের যাত্রী দল

বাঙলার কিশোরদের জগতে আজ রোমাঞ্চ বা শিহরণ সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি খুব সাড়া তুলেছে। কিন্তু সেগুলি নিতান্তই অসারতায় ভরা। শ্রীপবিত্র গোস্বামীর এই গ্রন্থখানি তারই ব্যতিক্রম সানন্দে ঘোষণা করছে। ভবিষ্যতের নাগরিকদের জীবন ভরা যে তৃষ্ণার প্রয়োজন লেখক তা সম্যক্ উপলব্ধি করেছেন, কৈশোরে মানুষের অনুসন্ধানের স্পৃহার হয় প্রথম উন্মেষ, ভবিষ্যতে তাই তাকে টেনে নিয়ে যায় সমৃদ্ধির সিংহদ্বারে। কিশোর মনে অন্বেষণের বীজ বপন করেছেন লেখক এই গ্রন্থখানির মাধ্যমে। সত্যিকারের শিহরণ মানুষের মনকে গঠন পথে সহায়তা করে প্রভূত। লেখক এখানে তাঁর বক্তব্য পরিবেশনে সম্পূর্ণরূপে সার্থক হতে পেরেছেন বলে ধরে নেওয়া যায়। ৮৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীটস্থ রাইটার্স সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ থেকে শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম—দেড় টাকা মাত্র।

নেহরু ও পররাষ্ট্র নীতি

একথা আজ অস্বীকার করার উপায় কোন মতেই নেই যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী আচার্য জওহরলাল নেহরুর মত ব্যক্তিত্ববান পুরুষ সারা পৃথিবীর মধ্যে আর দ্বিতীয় জন নেই। আজকের সমস্যা-সঙ্কুল পৃথিবীতে, যেখানে সর্বত্র হতাশা, লোভ আর বিনষ্টির সুস্পষ্ট হাতছানি সেই রোরুদ্যমানা বিশ্বের বুকে নেহরুজীর একটি মন্তব্য যথেষ্ট মূল্য বহন করে। সারা বিশ্বের রাজনৈতিক পটভূমিকায় নেহরুজীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ নেতৃত্ব আজ একটি সম্পদ-বিশেষ। ভারতবর্ষ আজ লাভ করেছে স্বাধীনতা, প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর স্বয়ং তার পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সহ অস্তিত্ব, সহযোগিতা ও সহানুভূতি সম্বল করে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির প্রভাব আজ বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন শান্তির মূর্তমম উপাসক শ্রীনেহরু। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়। লেখক—শ্রীঅনাদিনাথ পাল, ১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীটস্থ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীপ্রহ্লাদ-কুমার প্রামাণিক। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

মাটিঘেঁষা মানুষ

বাঙলার কথাশিল্প-জগতে একটি আলোকোজ্জ্বল আসনের অধিকারী স্বর্গীয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অসমাপ্ত একটি কাহিনীর সম্পূর্ণতার পূর্ণচ্ছেদ টেনেছেন কৃতী সাহিত্যিক সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকারা এই গ্রন্থের কিয়দংশের সঙ্গে পরিচিত। নিপীড়িত মানবাত্মার জন্যে ক্রন্দনে, জীবনের নবতর চেতনার সন্ধানে, অন্তরের মূল সত্যের যথোচিত উদ্ঘাটিত গ্রন্থটি আকর্ষণীয়। নারী-জীবনের বিচিত্র স্পন্দন ও অনুভূতি সার্থক রূপায়ণ লেখনী দ্বারা এই মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে। ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ ডি, এম, লাইব্রেরী থেকে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। দাম আড়াই টাকা মাত্র।

নাজান্তা ও তার বন্ধুদের অভিযান

রুশ দেশের সাহিত্য এত কাল বলতে গেলে বাঙলা দেশের শিশুদের কাছে অজ্ঞাতই ছিল, কিন্তু এবারে সে বাঙালী ছোট-ছোট পাঠক-পাঠিকার সাথেও পাতাতে চাইছে মিতালি, দুটি দেশের সাহিত্য পরস্পর পরস্পরকে ভরিয়ে তুলতে চাইছে আন্তরিক শুভ আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে। শিশুদের জন্যে এই গ্রন্থটি মূল রচনা করেছেন নিকোলাই নসোব। রাশিয়ার সাহিত্য ক্ষেত্রে এই উনপঞ্চাশ বছরের সাহিত্যিকের প্রবল প্রভাব বহুল অভিনন্দন লাভ করতে সমর্থ হয়েছে তাঁর রচনা। সহজ, প্রাঞ্জল ও ছন্দোময় ভাষায় যাদের জন্যে লেখা তাদের অন্তরের কেন্দ্রস্থলে অধিকার করবে এর বক্তব্য। মনোরম ভঙ্গীতে লেখা এর কাহিনী সকলকেই দেবে

পরিতৃপ্তি। অনুবাদক শ্রীজয়ন্তকুমার (মূল রুশ থেকে) ও কৃতিত্বের সঙ্গে সফল হয়েছেন বলা যায়। ৬৪-এ ধর্মতলা ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী থেকে শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম তিন টাকা মাত্র।

রক্তরাগ

সুসাহিত্যিক শ্রীদেবেশ দাশের 'রক্তরাগ' গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। দেবেশ দাশ ইতঃপূর্বে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়ে বাঙলার সাহিত্যকে ক্রমান্বয়ে পুষ্ট করে এসেছেন। তাঁর এই গ্রন্থটিও যথেষ্ট মূল্য বহন করে। সামরিক পটভূমিকায় এর কাহিনীর সারমর্ম হয়েছে রচিত। সামরিক জীবন সম্বন্ধে বর্তমান দিনে আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আলোকপাত করার সবিশেষ প্রয়োজন। সামরিক জীবনেও যে সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার জোয়ার চলে, লেখনী দ্বারা তার প্রকাশ দেবেশ বাবুর সুনিপুণ কৃতিত্বেরই ঘোষণা করে। একদা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র বর্তমানে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি আচার্য রাজেন্দ্র-প্রসাদের স্বাক্ষরসহ বাঙলায় লেখা ভূমিকাটি গ্রন্থটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। ১৩ হ্যারিসন রোডস্থ ইণ্ডিয়ান ম্যাসোসিয়েটেড পাবলিসিং কোং লিঃ থেকে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম চার টাকা মাত্র।

ননীগোপালের বিয়ে

নীলকণ্ঠ বিরচিত "ননীগোপালের বিয়ে" দীর্ঘদিন বাদে বাংলা সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ হাসির উপন্যাসের অভাব দূর করবে। মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের প্রিয় লেখক নীলকণ্ঠের প্রথম আকস্মিক আত্মপ্রকাশ মাসিক বসুমতীর পাতাতেই "চিত্র ও বিচিত্র" মারফৎ। বর্তমানে তাঁর আরেকটি ধারাবাহিক রচনা মাসিক বসুমতীতেই চলছে: অদ্য ও প্রত্যহ। ননীগোপালের বিয়ে শেষ বা ব্যঙ্গমুখী ব্যাণ্টারের বই নয়। নির্মল হাসির, পরিচ্ছন্ন কৌতুকের, কথার চেয়ে বেশী সিচুয়েশাক্সাল; ওডহাউস-টাইপের হাসির উপন্যাস। হাসার এবং ভালোবাসার যুগপৎ আদি ও অনাদি রসের যুগল গঙ্গা-যমুনায় হাবুডুবু খেতে কারুরই আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রকাশক: সাহিত্য ভবন। দাম: দু টাকা বারো আনা।

মধ্যবিত্ত

দেশের মধ্যে বিরাট অংশ জুড়ে আছেন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। দেশ ও দশ বলতে তারাই। কিন্তু তারাই আজ সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক। অভাব আর অনটন তাদের নিত্যসঙ্গী, অস্বাচ্ছল্যই যেন তাদের যাত্রাপথ-প্রদর্শক। এদের হাসি-কান্না, আবেগ-অনুভূতির কোন মূল্যই তথাকথিতদের কাছে পাওয়া যায় না। সে সব জায়গার দেওয়াল এত মোটা যে এদের আবেদনে ব্যর্থতা বরণ করেই ফিরে আসে। অন্তর দিয়ে তা উপলব্ধি করে সেই সত্যই এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন বনফুল। যমুনা, কুঙ্কুম, ললিতা, নকুল, সহদেব, শিবাজী, পরিতোষ প্রতিটি চরিত্র যথেষ্ট মূল্য বহন করে। ১৩ হ্যারিসন রোডস্থ ইণ্ডিয়ান ম্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ থেকে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম দু'টাকা মাত্র।

অঘটন আজো ঘটে

তথাকথিত বিজ্ঞান আজ যত প্রসারই লাভ করুক, যত অসম্ভবই সম্ভব হোক, তার কৃপায় ভারতের সনাতন যুগ থেকে যে অলৌকিকত্ব কালে কালে বহমান হয়ে এসেছে, তার মহিমার কাছে বিজ্ঞানের গরিমার কোন স্থানই নেই। লোকচক্ষুর অন্তরালে যে-বিরাট শক্তি জগতকে তার প্রতিমুহূর্তের যাত্রাপথে পরিচালিত করছে সে রহস্য বিজ্ঞান ধরতে পারে না বলেই তার উপর নিজের মহিমাকে সে তুলে ধরতে চায় কিন্তু সেখানেও সে পরাজিত। লোকচিত্তে কখন অগোচরে যে অলৌকিকতার মহিমা প্রভাব বিস্তার করে ফেলে তা বোধ হয় বুঝেও বোঝা যায় না। এই সত্যকে কেন্দ্র করে 'অঘটন আজো ঘটে'র কাহিনী রচিত। কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে সেই ঐশ্বরিক অলৌকিকতার অস্তিত্ব স্বীকার করে সেই উদ্দেশে প্রণাম জানিয়েছেন লেখক। বর্ণনার অপূর্ব ভঙ্গী, লেখনীর সজীবতা পাঠকচিত্তে প্রভূত আনন্দ দেবে। কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে দিলীপকুমার যে যুক্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতে করে তাঁর নৈয়ায়িক প্রতিভার পরিচয় আরও গভীর ভাবে ফুটে ওঠে। ১৩ হ্যারিসন রোডস্থ ইণ্ডিয়ান ম্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ থেকে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম সাড়ে চার টাকা।

প্রাণ-গঙ্গা

বাস্তব ও কাব্যধর্মের সমন্বয় প্রাণ-গঙ্গা সুলেখক অবিনাশ সাহার একখানি সার্থক উপন্যাস বলা চলে। বৃহৎ উপন্যাসের যে সকল গুণ থাকা উচিত এই বইটিতে তা সবই আছে। পটভূমিকা পূর্ববাঙলার গ্রাম নদী বন। নিশির পাগলকরা বাঁশের বাঁশী ঘরে থাকতে দেয় না ময়নাকে। মুখোমুখি বসে দু'জনে, চুরি-করা খাবার খায় আর মনের আনন্দে গান গায়, দৌড়ঝাঁপ দেয় মাঠময়। একজন অন্যজনকে পাতার মুকুট পরিয়ে দেয়। ময়নার খোঁপায় ওঠে কাশফুল। ছোটবেলার খেলার সাথী জীবনসাথী হয়ে পাশে এসে দাঁড়ায় একদিন। লেখকের ভাষা, বর্ণনা এবং চরিত্রসৃষ্টি বেশ হৃদয়গ্রাহী। বইখানি সকল পাঠকের কাছেই সমাদৃত হবে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট উচ্চাঙ্গের। প্রকাশ মহল। ৬ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট। কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

চীন থেকে ভারত

পৃথিবীর বহু দেশ থেকে পর্যটক এসেছেন এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। হিউয়েন চোয়াং এসেছিলেন চীন থেকে ভারতে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সুপণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য হিউয়েন চোয়াংএর লিখিত বিবরণীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করায় তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাই। এই অতিখ্যাত চৈনিক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় ইতিপূর্বেই অনূদিত হয়েছে। ভারতীয় ভাষার মধ্যে এই প্রথম ভাষান্তর হয়েছে বাঙলায়। হিউয়েন চোয়াং ধর্মসন্ধানী ছিলেন, ভারতে বৌদ্ধযুগের কীর্তিকলাপ দেখে তিনি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়েছেন বারে বারে। চীনা পর্যটকের সেই কষ্টকর তীর্থ পরিক্রমায় বৌদ্ধতত্ত্ব সংগ্রহের প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। হিউয়েন চোয়াং ইতিহাসের তত্ত্ব জানাতে কোথাও কোথাও ভুল করলেও, তাঁর বিবরণে পর্যটকের সহিষ্ণুতা আর অধ্যবসায় পরিস্ফুট। এই বিবরণ আমাদের কাছে সত্যি এক মূল্যবান দলিলস্বরূপ। গ্রন্থখানির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ প্রথম শ্রেণীর। শিল্পী হৈমন্তী সেনের আঁকা প্রচ্ছদচিত্র অভিনবত্বের দাবী করতে পারে। কলিকাতা পুস্তকালয়। ৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

ছোট্ট রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীঅজয়েন্দুনারায়ণ রায়

আমার দিদিমা অর্থাৎ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মাকে আমরা ডাকতাম পদ্মমা নামে। একদিন গল্পচ্ছলে জিজ্ঞেস করলাম—পদ্মমা! আমার বড় মামার ছেলেবেলা থেকে কী খুব বুদ্ধি ছিল? তখন থেকে কী মামার পড়ায় খুব মন ছিল?

—যখন পাঁচ বছর বয়স রামের, হাতে খড়ি দিলায়। তখন তার কথা ভাল করে মুখ থেকে বার হয়নি। কাগজ ভাল করে ধরতে শেখেনি। তখন তার বাবারা বললেন—আর এক বছর যাক, তার পর পড়া ধরাবো। ছ' বছর বয়সে তার বাবা তাকে পড়াতে আরম্ভ করলেন। ঠিক দু দিনেই প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ শেষ করলে। আশ্চর্য্য হয়ে রামের বাবা বললেন—এ ছেলে জাতিস্মর! আগে এগুলো সব শেষ করে এসেছে। তখন খুশী দেখে কে আমাদের!

বাড়ীতে তখন ঐ একটা ছেলে রাম। তার তখন খুব আদর। বাবা ছেলেকে পড়িয়ে এসে বলছেন—ও ছেলেকে ত আর আমরা পড়াতে পারি না। ও ছেলে জিজ্ঞেস করছে—"ম" কে "মো" বলছেন। মরণ এর উচ্চারণ মোরণ। মরণ বলবো কেন বুঝিয়ে বলুন!! কী উত্তর দেবো ভেবে পাই না। অন্নদা পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞেস করেও কোন উত্তর পেলো না ছেলে।

তখন তার বাবারা ভর্ত্তি ক'রে দিলেন রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ইস্কুলে। অন্নদা পণ্ডিতের হাত দিয়ে বলে দিলেন এর উপর নজর রাখবেন।

সাত-আট বছর যখন রামের, তখন ইতিহাস পড়াতে লাগলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য যে সব বীর প্রাণ দিয়েছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁদের কথা বলতেন। রাম তখন যেন গিলে খেতো। রাম তার বাবা উঠতে চাইলে উঠতে দিতো না। বলতো—আরও বলুন! তার বাবা কখন কখন জিজ্ঞেস ক'রে বুঝে নিতেন ছেলের মনে আছে কিনা। খুশী হতেন ছেলের বলা শুনে।

আমরা কোন কোন দিন গিয়ে দেখতাম, রামের বাবার ছেলে পড়ান। সে যেন একটা কী ভঙ্গী! হাত নড়ছে বাবার জোরে জোরে। সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে। ছেলের চোখে জল। আমরাও শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে উঠতাম। ছেলে জ্বর-গায়ে ইস্কুল এসে কাঁপছে। অন্নদা পণ্ডিত জিজ্ঞেস করলেন—তুমি জ্বর-গায়ে কেন রাম? উত্তর এলো ও এখুনি ছেড়ে যাবে পণ্ডিত মশায়। তখনই ধরে এনে আমাকে দিয়ে গেলেন। আমি বললাম—রাম জ্বর-গায়ে ইস্কুল যায়? তখন রাম যা বললে শুনে হেসে বাঁচিনে। ঠিক যেন বুড়ো—আমি নতুন বাটির ঘাস কাটবো না কি? একটু জ্বরে শুয়ে থাকবো কেন? হাজার বাবারা বললেও শোনে না, ইস্কুল যাবেই।

খুব অল্প বয়সে রাম আঁক কষতো খুব ভাল। পদ্মমা জিজ্ঞেস ক'রলেন—হা রে। আঁকের সঙ্গে আর একটা কী পড়া হয়? ব'ললো জ্যামিতি। ঐ জ্যামিতিতে পণ্ডিত দিকেও হারিয়ে দিতো। পণ্ডিতরা এসে বাবুদের কাছে গল্প করতেন। রাম জানতে পারলে পণ্ডিতদের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে ব'লতো—আমার বিদ্যা ত আপনাদের কাছেই। এই রকম শুদ্ধ কথা শুনে তার বাবারা হেসে খুন।

রামের বাবা জ্যোতিষী বিদ্যায় বড় পণ্ডিত ছিলেন. তিনি ঠিক সন্ধ্যে লাগলেই মানুষের উপর ব'সে বুঝাতে লাগতেন। আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে—ঐ দেখ ছায়াপথ। ঐ উত্তর দিকে আছে ধ্রুব নক্ষত্র। ঐ এখানে সন্ধ্যে তারা উঠে। আর সব মনে পড়ছে না ভাই! যা দেখিয়ে দিতেন একটা যদি ভুল হ'তো রামের! সেই দেখে তার বাবার খুশী কত্তো।

কখন কখন ছেলের বাবা শিক্ষা দিতেন—কখন চুরি ক'রে ভাল হবে, পাশ করবার চেষ্টা করবে না। মন দিয়ে পড়বে। পড়ার সময় কখন ফাঁকি দেবে না, তাহলে নিজেই ফাঁকি পড়বে! এ সব কথা রাম মনোযোগ দিয়ে শুনতো।

একদিন রামের বাবা ছেলেকে সকালের দিকে খেলা করতে দেখে ভাবলেন—এবার ছেলের সব শেষ। এতো মনে করলাম কতো ভাল হবে!! দুঃখ ক'রে ছেলেকে বললেন—এই সময় কী খেলার রাম? আমি তোমার উপর অনেক ভরসা ক'রেছিলাম! রাম দাঁড়িয়ে থাকলো চুপটি ক'রে! মুখে কোন কথা নাই। তখনই রাম বাবার পায়ের উপর পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলো, বাবা! আপনি পরীক্ষা নিয়ে দেখুন পড়া শেষ ক'রে গিয়েছি কি না। তখনই বাবা পরীক্ষা নিয়ে জানলেন, ছেলে সত্যই পড়া ক'রে খেলে বেড়াচ্ছে। তখন তার বাবা খুসী হ'য়ে ন বছরের ছেলের কাছে নিজে ক্ষমা চাইলেন। আর যাবে কোথা! রাম বাবার পায়ের উপর প'ড়ে ক্ষমা চাইতে লাগলো—আর ব'লে চ'ললো বাবা! আপনি ক্ষমা কথা তুলিয়ে নেন। কী করেন, বাবাকে তখন রামকে কোলে তুলে নিয়ে ব'লতে হলো—তুলিয়ে নিলাম বাবা! সেই কথা এসে বলেন রামের বাবা আর হাসেন। এতো কম বয়সে ছেলেদের এমন বুড়োমি কথা কখনো শুনেছো!

আর কিছুদিন পরে মেকেঞ্জি সাহেব এলেন জেমো ইস্কুলে পরীক্ষা নিতে। তিনি এসে ক্লাসে জিজ্ঞেস ক'রলেন, কোন উত্তর পান না। তখন রামকে প্রশ্ন করলেন—গঞ্জাম কোথা বল ত খোকা? রাম উত্তর দিলো—মান্দ্রাজ প্রদেশের একটা জেলা। তার প্রধান সহরের নাম কী?—বহরমপুর। তখন প্রশ্ন ক'রলেন সাহেব তোমাদের এই বহরমপুর আর ঐ বহরমপুর তফাৎ কী? তখন রাম বললে—আমাদের বহরমপুর মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান সহর আর ওটা মান্দ্রাজে। সাহেব খুসী হ'য়ে রামের পিঠে হাত বুলুতে লাগলেন। বার বার প্রশংসা করে বলেন—তোমার মত একটা ছেলেও আমার চোখে পড়েনি। তুমি খুব মন দিয়ে পড়বে খোকা! সারা ভারতের মধ্যে একজন হবে।

রামকে দেখে মনে হ'তো আলা-ভুলো। তার কাছার ঠিক নাই। কিন্তু তার বই-দপ্তর ঠিক স্থানে থাকতো, একটু যদি নড়চড় থাকে।

কেউ হাত দিয়ে এধার ওধারে রাখলে রক্ষে নাই। কেঁদে আকুল। কেউ যদি দুটো চারটে পয়সা দিতো রামকে, আমার কাছে রেখে দিতো। হিসাব তার ঠিক ঠিক রাখতো। দু পয়সা তা থেকে খরচ ক'রলে অনেক বলে ছেলেকে বুঝাতে হ'তো।

মামার খেলার কোন সখ ছিল কি না পদ্ম-মা? জিজ্ঞেস করতেই বললেন—ছেলেদের মত দৌড়াদৌড়ি ক'রতে কখন পারতো না। ব'সে ব'সে মাটিতে দাগ কেটে—বাঘবন্দী না হয় ছক্কা পঞ্জা খেলতো। বাবারা বলতেন—ও সব খেলা ভাল নয় ছেলের। আমাকে দিয়ে বলাবার চেষ্টা ক'রতেন। বললে শুনতো না রাম। এই শুনে তার বা নিজে একদিন ব'ললেন। সেই থেকে বাঘবন্দী খেলা করতে আমি জীবনে দেখিনি। তোমরা বড় হয়ে ত দেখেছো তাস খেলতে তোমাদের মায়েদের সাথে, জিতলে কী খুশী! যেন ছেলেমানুষ! এ তো তোমাদের নিজের চোখে দেখা।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় রাম প্রথম হয়ে পাশ ক'রলো। সে কী ধুম তখন বাড়ীতে। ছেলের বাবা ও ছোট-বাবা অনেক ভদ্রলোক ও রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে নূতন বাড়ীতে এনে খাওয়ালেন। রাজা এসেই ছেলেকে ভাল করে দেখে বললেন—বাবুসাহেব! তোমার এই ছেলেটি আমার জন্য রাখিবে। এর বিয়ে দেবো ইন্দুর সঙ্গে। রাজার ছোট কন্যার নাম ইন্দুপ্রভা। ছেলের বাবা বললেন—এ তো আমার ভাগ্যের কথা। এতো বড় মুরুব্বি আর কোথায় পাবে?

আমাদের বাড়ীর সামনে যে ফুলবাগান আছে, এটা ক'রেছে আমার ছেলে রাম আর তার ছোট-বাবা উপেন্দ্র বাবু। দু'জনে বসে কত পরামর্শ। তার ছোট-বাবা ত বলতো রামের পরামর্শ নিয়েই ত বাগান তুলেছি। কেও জল দেবার না থাকলে ছোট বালতি করে সে নিজেই ছোট হাতে জল তুলেছে! কখন বলেছে ছোট-বাবা, এবার কামিনী গাছ ছাঁটতে হবে। তখন দেখেছি সত্যই এত দিন কাটা উচিত ছিল।

পদ্ম-মা! মামা সাত-দিনই পড়তেন? না জীবজন্তু নিয়ে কখন কখন থাকতেন? হেসে পদ্ম-মা তখন আরম্ভ করলেন—রাম বাড়ীতে ঢুকলে, দুটো রাজহাঁস বাড়ীতে ছিল ডাকতে লাগলো। যেন তারা কতো রামের বন্ধু। সকলকে পায়ে কামড়ে ধরতো। কেবল তার সঙ্গে খেলা করতো। দুটো ভাত হাতে করে কেবল দিতো। আমরা নবান্নের সময় শিবা ভোগ দিতে গেলে রাম পিছু পিছু সঙ্গে যেতো, হাঁ করে চেয়ে দেখতো কখন শিবা-মা এসে খাবে। তখন জিজ্ঞেস করতো বুড়োর মত—শেয়ালকে তোমরা শিবা-মা বল কেন? কী উত্তর দেবো ভেবে পেতাম না। হাসির কথা বলি শোন—একটা কুকুরের নাম দিয়েছিল রাম কালটা। নিজে দুধ না খেয়ে সেই কালটাকে খাওয়াতো। তার মুখে চুমো খেতো রাম। দেখে তার বাবারা দুঃখ ক'রে বলতেন—হাঁ রাম! তোমার ঐ কুকুরটা কী ভাই? নিত্য গিয়ে রামকে রেখে আসতো ইস্কুলে আবার নিয়ে আসবার সময়ও কালটার ঠিক জানা ছিল। কী আশ্চর্য্য! রাম শিক্ষা দিয়ে বলতো—কালটা কখন ভাত খাবি না হেঁসেলে ঢুকে। নিত্য স্নান করে এসে ভাত খাবে, বেশ! শুনতো ও রামের কথা। একদিনও হেঁসেল মারেনি। নিত্যি স্নান ক'রে এসে ভাত খেতো। সেই কালটা মলে কী রামের দুঃখ! দুদিন ছেলে ভাত ছুঁলো না, ইস্কুলে গেল না। তার পর রাম ব'ললে—আমি আর জীবনে কুকুর পুষবো না। সেই থেকে কিন্তু কুকুর আর পোষেনি রাম।

বাড়ীতে ইংরাজী কয়েক দিন পড়িয়ে কান্দীর ইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন রামকে। তার বাবারা হেড মাষ্টারের হাতে দিয়ে বললেন—ছেলেকে দিয়ে গেলাম একটু দেখবেন। সে বার রাম ভাল ইংরাজি জানতো না বলে দ্বিতীয় হলো, তখন আমাদের নতুন বাড়ীতে মরা কান্না—ছেলে বলল, এবার দেখবেন, আমি কখন আর সেকেণ্ড হবো না।

তার পর থেকেই পড়া কেমন জিনিষ দেখিয়ে দিলো রাম। দিন নাই রাত নাই পড়া। ভালুকের বাজি হচ্ছে, কতো ছেলে হাজির সদর আঙনেতে। তখন রাম পাঠে নিরত। বাবারা থিয়েটারের রিহার্সাল দিচ্ছেন। ঘর-বাড়ী গুম-গুম করছে বাজনার আওয়াজে, ছেলের খেয়াল নাই, ঘরে ব'সে কেবল পড়া। সেদিন বাবাদের থিয়েটার, ছোট-বাবা ছেলেকে নিমন্ত্রণ করলো রামকে, তবে রাম সেখানে উপস্থিত হলো। একদিন তার বাবা গিয়ে দেখেন কী বই পড়ছে ছেলে। দেখে অবাক! যত সব কঠিন বই সাহেবদের। তখন থেকে রাম আর দ্বিতীয় হয় নি। সে বরাবর প্রথম হয়ে উঠেচে।

রাজা আর থাকতে না পেরে নিজের ছোট মেয়ে ইন্দুপ্রভার সঙ্গে বিয়ে দিলেন রামের। বৌমা এসেই দেখলো আর এক রাজকন্তে মারা গেল। তিনি মরবার সময় ব'লে গেলেন—আমি একজনকে দিয়ে গেলাম। তখন রামের বয়স চোদ্দ বছর। হেডমাষ্টার বলেছিলেন—এবার ছেলের মাথা খাওয়া গেল আর পড়া হবে, না ছাই হবে। প্রথম শ্রেণীতে উঠে রামের চক্ষু স্থির! তার বাবা মারা গেলেন। তিনি শুধু বাবা নন তার, বন্ধু তার; খুব আপনার জন তার, খেলার সাথী! রাম একেবারে ভেঙে পড়লো। পড়া ছেড়ে দিয়ে ঝিম হয়ে ব'সলো। তখন কতো বোঝায় তার ছোট-বাবা উপেন্দ্র বাবু ছেলে কি বোঝে! তখন উপেন্দ্র বাবু ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে ব'লতে আরম্ভ করলেন—দেখ বাবা! তোমার বাবা ব'লে গেছে তুমি ভাল হয়ে পাশ করবে, মানুষ হবে। সে কথা মনে আছে ত আজ স্বর্গ থেকে তিনি সব দেখছেন। তুমি না পড়লে তিনি কাঁদবেন। তুমি তাঁর ছেলে হয়ে তাঁকে কষ্ট দেবে!! তখন রাম যেন ঘুম থেকে উঠলো। সব জড়তা ঝেড়ে আবার পড়তে আরম্ভ করলো সেই আগেকার দিনের মত। সে বার পরীক্ষা দিয়ে সবার চেয়ে ভাল হলো। বৃত্তি পেলো সকলের চেয়ে বেশী।

রামের চোখে জল। সেই দেখে বাড়ী শুদ্ধ সকলে কেঁদে উঠলো। হয় তো মনে পড়েছে বাবার কথা! [ক্রমশঃ
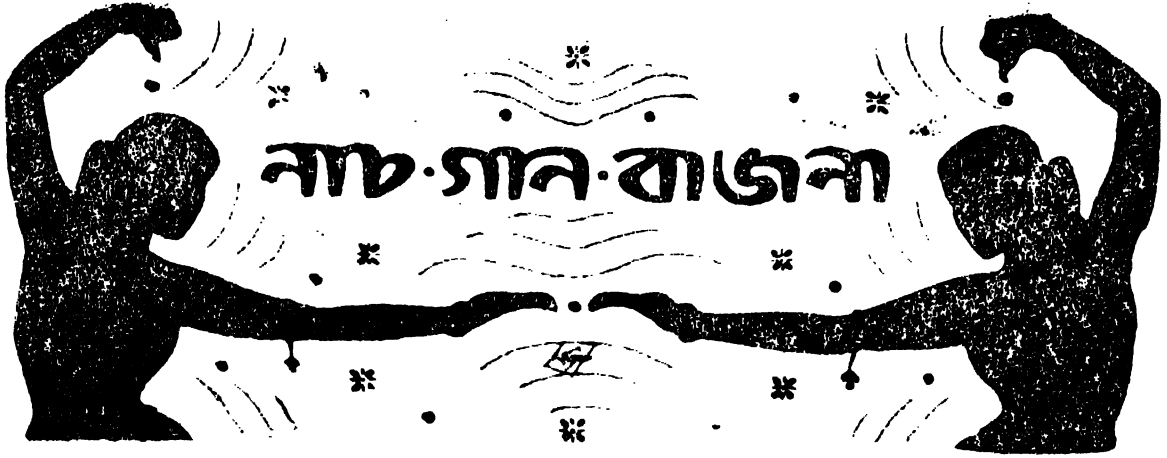
রাগসঙ্গীতে সময়

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীতের সঙ্গে সময়ের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শিল্পিগণ সচেতন। তাহা সঙ্গীত-শাস্ত্র গ্রন্থগুলি দেখিলেই বুঝা যায়। 'সঙ্গীত' শব্দে এস্থলে আমরা কণ্ঠ ও যন্ত্র ‍সঙ্গীতই উল্লেখ করিব। শিল্পীর উপলব্ধিই শাস্ত্রকার শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কাজেই এই উপলব্ধির মূলে কোন বাস্তব তত্ত্ব নিহিত আছে কি না তাহা আমাদের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। কোন ওস্তাদ গায়ক অথবা বাদককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "প্রাতঃকালে কেন বেহাগ রাগ গাওয়া হয় না বা যায় না—অথবা সায়ংকালেই বা কেন ভৈরোঁ গাওয়া হয় না?" তাহার উত্তরে তিনি হয়তো বলিবেন—(১) "শাস্ত্রের বিধান নাই," অথবা (২) "শাস্ত্রের বিধান তাই আমরা মানিয়া চলি, কারণ বলিতে পারি না"—অথবা (৩) অত্যধিক পীড়াপীড়ি করিলে হয়তো বলিবেন (৪) "ও সব শাস্ত্রের মর্ম আপনারা বুঝবেন না।" কোন কোন ওস্তাদকে আমি বলিতে শুনিয়াছি—"কেন গাওয়া যাইবে না, নিশ্চয়ই যায়। আমি ওসব শাস্ত্রের বিধান মানি না।" কলিকাতার কোন বিশিষ্ট (রাগ) সঙ্গীতজ্ঞ আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "কেন গাওয়া যাইবে না? যায়। প্রাচীন কালে শাস্ত্রকারগণ অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ ছিলেন, তাই ওই সকল কাল্পনিক নিয়মে সঙ্গীতকে শৃঙ্খলিত করিয়া গিয়াছেন। সায়ংকালে কেন ভৈরোঁ গাওয়া যাইবে না, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।"

বুঝিলাম যে শ্রদ্ধেয় ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতই তাঁহার মত। খাঁটি ভাবিয়া দেখিবার মত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, একই ব্যক্তি প্রভাতকালে 'ভৈরোঁ' রাগে তাঁহার যে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন, সায়ংকালে তাহা কেন যে পারিবেন না; অথবা রাগ আশানুরূপ অথবা অধিক মনোরঞ্জক হইবে না—তাহারই বা কি কারণ থাকিতে পারে? অথচ শাস্ত্রকারগণের মতও উপেক্ষণীয় নহে। যাহা হউক, শ্রোতৃমনোরঞ্জই যদি রাগের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে আমরা বলিব যে সে উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হওয়া সম্ভব। শাস্ত্রেও নিয়মের ব্যতিক্রম উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়। নারদ-সংহিতায় আছে—"রঙ্গভূমৌ নৃপাজ্ঞয়া কালদোষো ন বিদ্যতে।" নাঃ সঃ অর্থাৎ রঙ্গভূমিতে এবং রাজার আজ্ঞায় কালদোষ থাকে না।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে কোন সময়েই যে কোন রাগ গাওয়া অথবা বাজানো যাইবে। এই জন্যই বোধ হয় নিয়মানুবর্ত্তী গায়ক বাদক অসময়ে কোন রাগ গাহিতে বা বাজাইতে হইলে শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সেই রাগ গাহিবার বা বাজাইবার অনুরোধ করিতে বলেন। তাহাতে দোষ খণ্ডিত হয়, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। সঙ্গীত-মকরন্দে নারদ অসময়ে কোন রাগ গাওয়াকে ক্ষতিকর (পাপ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"এবং কালবিধিং জ্ঞাত্বা গায়েৎ যঃ স সুখী ভবেৎ।
রাগা বেলা প্রগানেন রাগাণাং হিংসকো ভবেৎ।
যঃ শৃণোতি স দরিদ্রী আয়ুর্নশ্যতি সর্বদা॥ সঃ মঃ

এইরূপ কালবিধি জানিয়া যিনি গান করেন তিনি সুখী হন। নির্দেশিত ব্যতীত অন্য সময়ে কোন রাগ গাহিলে রাগগুলি হিংসাপ্রবণ হয়, এবং যাঁহারা শ্রোতা তাঁহাদের আয়ু নাশ হয়। এরূপ একটা অভিশাপের ভয় নারদ কেন দেখাইলেন তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

সঙ্গীতনির্ণয় রচয়িতার মতে দেশভেদে কালনিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইতে পারে।

"এবং বহুবিধাচার্য্যৈর্গান-কাল সমীরিতঃ।
যস্মিন্ দেশে যথা শিষ্টৈর্গীতং বিজ্ঞস্তথাচরেৎ। সঃ নিঃ

পণ্ডিতগণের দ্বারা এইরূপ বহুবিধ গানের সময় বর্ণিত হইয়াছে। বিজ্ঞব্যক্তির যে দেশে গীতের যে রীতি তাহাই পালন করা উচিত।

রাগতরঙ্গিণীকার লোচন ঝা (দ্বারভাঙ্গা) এ বিষয়ে তাঁহার উপলব্ধি—যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মূল তথ্য আমরা পরে আলোচনা করিব। গায়ন-বাদনের কালনিয়মের ব্যতিক্রমের উল্লেখে তিনি বলিয়াছেন:—

দশদণ্ডাৎ পরং রাত্রৌ সর্বেষাং গানমীরিতম্।
রঙ্গভূমৌ নৃপাজ্ঞয়া কালদোষো ন বিদ্যতে॥ রাঃ তঃ

দ্বিতীয় চরণটি নারদসংহিতার—ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। লোচনের মতে দশ দণ্ড রাত্রি অতীত হইলে যে কোন রাগ অথবা গান গাওয়া যাইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য খুব সম্ভব ইহাই হইবে যে, জ্যোতিষ শাস্ত্র মতানুসারে শুক্রই সঙ্গীতকারী গ্রহ এবং রাত্রি দশ দণ্ড হইতে শুক্রের অধিকৃত সময় অর্থাৎ তৎকালে শুক্রের প্রভাব বলবতী হয় এবং যে কোন রাগই গাওয়া অথবা বাজানো গায়ক-বাদকের পক্ষে সহজসাধ্য হয় এবং আশানুরূপ মনোরঞ্জকও হয়।

অথবা ইহাও সম্ভব যে, এই সময়ে নৈশ-নিস্তব্ধতা সঙ্গীতচর্চার বিশেষ সহায়ক।

কতকগুলি শব্দের (নাদ) সাহায্যে বিশেষ বিশেষ স্বর রচনার দ্বারা শ্রোতৃমনের একটি বিশেষ ভাবকে জাগাইয়া তোলাই শিল্পীর কাম্য। নানাবিধ ও অভিনব শব্দব্যঞ্জনার সাহায্যে শ্রোতৃচিত্তকে অভিভূত করাই সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে সময়ের সাহায্য প্রয়োজন—এ কথাই বা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? কারণ, প্রভাত কালের মনোভাব ও সায়ংকালের মনোভাব একরূপ হয় না—হইতেও পারে না। সারারাত্রিব্যাপী বিশ্রামের শেষে প্রভাতে মনে যে শান্ত, উদার গম্ভীর ভাব বিরাজ করে, কর্মক্লান্ত দিবাবসানে ঠিক সেইরূপ মনোভাব থাকা সম্ভব নহে।

সকলেই হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, রাগসঙ্গীতের শব্দরচনায় রাগ যেন কিছু বলিতে চায়। এইরূপ একটি গূঢ়ভাব স্বর-রচনায় নিহিত থাকে। সৃষ্টির আদিকাল হইতেই মানবে মানবে, মানবে মানবীতে, মানবে প্রকৃতিতে—একটি চিরন্তন যোগাযোগ চলিয়া আসিতেছে। সঙ্গীতের উদ্দেশ্য শব্দের সাহায্যে তাহারই আভাস মানবমনে জাগাইয়া তোলা। এইরূপ দেখা যায় যে মাত্র কয়েকটি স্বরের মীড়েই কোন্ এক অজ্ঞাত জনমের স্মৃতি যেন মনকে আলোড়িত করিয়া দেয় তাহাকে স্থান ও কালে (Time and Space) সীমার বাহিরে কোন্ এক অজ্ঞাত স্বপ্নময় জগতের আভাস দেয়।

রাগসঙ্গীত ব্যবহারের সময়, ঋতু ইত্যাদির নিয়ম যে নিতান্তই ভিত্তিহীন তাহা আমরা স্বীকার করি না। বসন্তকালে 'দেশ' অথবা মল্লার গাহিলে কি ভাল লাগে না? লাগে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু বর্ষা ঋতুতে গাহিলে মন যেরূপ বিবশ, বিহ্বল হয়, তেমনটি বোধ হয় অন্য ঋতুতে হয় না। কারণ শিল্পীর নিজেরই আসল ভাবটি ফুটাইয়া তুলিতে বিলম্ব হয়। শাস্ত্রকারগণ শিল্পীর অভিজ্ঞ উপলব্ধি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, পরবর্তী কালের শিল্পিগণের কলাকৌশল সহজেই সিদ্ধিলাভ করতে পারে এবং রাগাভিব্যক্তি উত্তরোত্তর সহজসাধ্য হয়। সায়ংকালে ভৈরোঁ গাহিলে যে ভাল লাগে না তাহা নহে, কিন্তু রাগ যে মনোভাবটি জাগাইয়া তুলিতে চাহে সেই প্রচেষ্টা বোধ হয় সম্যক সফল হয় না। সুমার্জিত সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের সাহায্যে গাহিলে অথবা দীর্ঘ অভ্যাসের অভিজ্ঞতায় বাজাইলে যে কোন রাগই যে কোন সময়ে মনোরঞ্জক করা সম্ভব। কিন্তু রাগের, 'আত্মকাহিনী'টি খুব সম্ভবতঃ রাগের বলা হয় না। ভাল লাগাই যদি মাত্র কাম্য হয়—তাহা হইলে সময়ের দিকে দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন সুগায়ক-বাদকের পক্ষে অতি অল্পই থাকে। কিন্তু রাগ যে নিজের আত্মকথা শুনাইয়া মনোরঞ্জন করিতে চাহে—তাহাতে সুসময়ের প্রয়োজন—একথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? অর্থাৎ যে কোন সময়েই যে কোন রাগ কুশল শিল্পীর পরিচালনায় মনোরঞ্জক হইতে পারে কিন্তু পূর্ণভাবটি প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

৺পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বলিয়াছেন, "ইস শাস্ত্র নিয়মকা আশয় ইতনা হী সমঝনা চাহিয়ে কি নিয়মিত রাগ নিয়মিত সময় পর আপনা আপনা প্রভাব অধিক সন্তোষপ্রদ রীতি সে ব্যক্ত করতে হৈ।" এই শাস্ত্র-নিয়মের তাৎপর্য্য এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে, নিয়মিত সময়ে গাহিলে অথবা বাজাইলে রাগ আপনা হইতেই সন্তোষজনক ভাবে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। অন্য সময়ে রাগের সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য শিল্পিগণকে কিঞ্চিৎ প্রচেষ্টার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

পক্ষান্তরে, রাগ গাহিবার যে সময় নির্দেশিত হইয়াছে তাহা মানিয়া চলিতে গেলেও নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, রাত্রিকালেই অধিকাংশ সঙ্গীতচর্চ্চার ব্যবস্থা হয়, সময়ের নিয়ম মানিয়া চলিলে অন্য সময়ের রাগগুলির আলোচনা ও চর্চ্চা সম্ভব হয় না। যাঁহারা আসরে গান গাহিয়া রোজগার করেন, তাঁহাদেরও অনুরুদ্ধ হইয়া রাগ গাহিতে হয় বলিয়া রাগের সময়-নিয়ম পালন করা সম্ভব হয় না। হয়তো অপরাহ্নে আসর বসিলে 'মালকোষ' যাহা তৃতীয় প্রহর রাত্রে গাহিবার সময় নির্দেশিত হইয়াছে, গাহিতে অনুরোধ করা হইল। শিল্পীর পক্ষে সে অনুরোধ উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। কারণ জনপ্রিয়তা তাঁহার ব্যবসায়ের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য শাস্ত্রকর্ত্তাগণ বিশেষ চিন্তা করিয়া রাজাজ্ঞায় নিয়ম লঙ্ঘন করা যাইবে বলিয়া নিয়ম কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়াছেন। রাজাজ্ঞায় কালাকাল বিচারের প্রয়োজন নাই—অর্থাৎ তাহা না করিলে না খাইয়া মরিতে হইবে।

রাগসঙ্গীতে সময়ের যে বিধি-নিয়ম বদ্ধ করা হইয়াছে তাহার ভিত্তি কিসের উপরে রচিত, সে বিষয়ে রাগতরঙ্গিণীর রচয়িতা লোচন পণ্ডিত এমন একটি তথ্য আমাদের দিয়াছেন যাহার জন্য সঙ্গীত-জগৎ চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তাহা এই—

"যথাকালে সমারব্ধং গীতং ভবতি রঞ্জকম্
অতঃ স্বরস্বনিয়মাৎ রাগেঽপি নিয়মঃ কৃতঃ। রাঃ তঃ

যথাসময়ে—অর্থাৎ শাস্ত্র নির্দেশিত সময়ে আরম্ভ করিলে গীত অধিক মনোরঞ্জক হয়—কারণ স্বরের ব্যবহারের নিয়মানুসারেই রাগ গাহিবার সময় নির্দেশিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন রাগে যে স্বরগুলি (বাদী, সম্বাদী, বিবাদী, অনুবাদী) ব্যবহৃত হয় তাহাদের অল্পত্ব অর্থাৎ অল্প ব্যবহার এবং বহুত্বের অর্থাৎ বহুল ব্যবহারের উপর ভিত্তি করিয়া সেই রাগ গাহিবার সময় স্থির করা হইয়াছে। পণ্ডিতের (লোচন) বলিবার উদ্দেশ্য খুব সম্ভবতঃ এই যে, সব সময়েই সব স্বরের বহুল ব্যবহার ভাল লাগে না ও আশানুরূপ মনোরঞ্জকও হয় না। দিন ও রাত্রির বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ স্বরের ব্যবহার অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয় এবং সেই স্বরগুলির ব্যবহারে তখন সেই রাগ আশানুরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। রসানুভব হইতেই সঙ্গীতের উৎপত্তি। বিশেষ বিশেষ ভাব ও রসের অভিব্যক্তির জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই শব্দগুলি কোন নির্দিষ্ট নিয়মে রচনা করিয়া রাগরূপ সৃষ্টি করা হইয়াছে দেখা যায় এবং সেই জন্য রাগ প্রকাশের সময়ে একটি ভাবের অথবা রসের অনুভূতি শিল্পী এবং শ্রোতা উভয়েরই মনকে আচ্ছন্ন করে। কাজেই এই রস বা ভাবানুভূতির শাব্দিক স্ফুরণ উপযুক্ত সময়ের উপরে নির্ভরশীল মনে করা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

এখন সে কথা থাক, স্বরের ব্যবহারের অল্পত্ব ও বহুত্ব অবলম্বনে কি প্রকারে রাগ গাহিবার সময় ধার্য্য করা হইয়াছে। মধ্যষড়্জ (সা) দেশী সঙ্গীতে সর্বাবস্থাতেই প্রবল থাকে—এই জন্য সময়ের সহিত

তাহার বিশেষ কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না। স্বরসপ্তককে দুই সমান অংশে ভাগ করিলে পূর্বাঙ্গ সা, রে, গা মা ও উত্তরাঙ্গ পা, ধা, নি, সা এইরূপ দুইটি সমান চতুঃস্বারিক অবয়ব হয়। ইহাতে পঞ্চমের কার্য্যও সাধারণতঃ ষড়জের মতই দেখা যায়। তথাপি অন্যান্য স্বরের যোগে পঞ্চম ও নানাপ্রকার বৈচিত্র্য উৎপাদক হয়। সাধারণ নিয়মে কোন রাগের বাদীস্বরকেই বহুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে—অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অধিক বার গাওয়া হয়। কিন্তু কুশল ও অভিজ্ঞ শিল্পী রাগের প্রত্যেক স্বরকেই সমভাবে মণ্ডন (বাড়াইয়া) করিয়া থাকেন—তাহাতে রাগরূপের কোনরূপ অসঙ্গতি দেখা যায় না—উপরন্তু আবির্ভাব তিরোভাবাদি নানাবিধ বৈচিত্র্যদায়ক নিয়মের সুষ্ঠু ব্যবহার হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা মালকোশ রাগ লইতেছি। এই রাগে সর্বসম্মত 'মধ্যম' বাদী ও ষড়জ সম্বাদী। কিন্তু গুণী শিল্পী সা, গা, মা, ধা, নি প্রত্যেক স্বরের উপরেই ন্যাস করিয়া অভিনব কৌশলে রাগরূপ ফুটাইয়া তোলেন, এবং মধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। তবে ইহা সম্ভব যে, রাগের মুখ্য অঙ্গ বাদীস্বরকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইয়া থাকে। এই জন্য বাদীস্বরের সহিত সময়ের অথবা সময়ের প্রভাব অনুসারে বাদীস্বরের নির্ব্বাচন নিতান্ত অসঙ্গত না হইতেও পারে। শাস্ত্রের নির্দেশে বাদীস্বর ব্যতীত রাগের অন্যান্য মুখ্য স্বরগুলিকেও ক্ষণকালের জন্য বাদীত্ব দেওয়া হয় তাহাকে 'পর্য্যায়াংশ' বলে অর্থাৎ পর্য্যায়ক্রমে অংশত্ব বা বাদীত্ব দেওয়া হয়।

ষড়জ শুদ্ধ মধ্যম ও পঞ্চম (পৃথিবীর) সর্বসঙ্গীতেই সমব্যবধানে অবস্থিত এই স্বরগুলি নিজেরা খুব বেশী বৈচিত্র্যদায়ক না হইলেও সপ্তকান্ত অন্যান্য স্বরের সঙ্গতিতে বিবিধ অনুপম, রক্তিদায়ক রচনায় সহায়তা করে অবশিষ্ট স্বরগুলি অর্থাৎ রে, গা, ধা, নি, উচ্চ-নীচতায় (pitch)এ পরিবর্তনশীল বলিয়া মার্গদর্শক স্বর নামে অভিহিত হয়। এই মার্গদর্শক স্বরগুলির উচ্চ-নীচতার পরিবর্তন সময়ের উপর নির্ভরশীল বলিয়া মনে হয়। প্রচলিত রাগগুলির স্বর রচনা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন স্বর একটি বিশেষ সময়ে অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়। যেমন প্রাতঃকালে, যখন মন-ভাব শান্ত গম্ভীর, ধীর থাকে তখন ঋষভ ও ধৈবতের ব্যবহার সেই ভাবস্ফুরণে বিশেষ সহায়তা করে এবং যে সকল রাগে এই দুইটি স্বর প্রবল থাকে তাহাই প্রাতঃকালে গাওয়া হয়। অথবা দিবসের প্রথম ভাগের রাগগুলিতে ঋষভ ধৈবত প্রবল এবং গান্ধার নিষাদ অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাখা হয়। ঠিক তদ্রূপ রাত্রির প্রথম প্রহরের রাগে গান্ধার নিষাদ প্রবল ও ঋষভ, ধৈবত অপেক্ষাকৃত দুর্বল লক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত যেস্থলে ধৈবত প্রবল, কিয়ৎপরিমাণে নিষাদের বাহুল্য এবং যেস্থলে ঋষভ প্রবল সেস্থলে কিঞ্চিৎ গান্ধারের বাহুল্য স্বতঃ হইতেই আসিয়া পড়ে। প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের জন্য ঋষভের প্রয়োজন হয় বলিয়া শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির রাগগুলিতে গান্ধার ও নিষাদ বহুল থাকিলেও ঋষভের বিশিষ্ট ব্যবহার প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ শুদ্ধ মধ্যম দিবসের প্রথম ভাগে ও তীব্র মধ্যম সায়ংকালে অধিক ব্যবহৃত হয় দেখা যায়। দিবসের দ্বিতীয় ভাগ আসন্ন হইতেই কিছু তীব্র মধ্যমের ব্যবহার ও রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইতেই শুদ্ধ মধ্যমের ব্যবহার রক্তিদায়ক হয়।

রাগসঙ্গীতে রে, গা, ধা, নি এই স্বর চতুষ্টয়ের উচ্চ-নীচতার পরিবর্তন—সময়ের পরিবর্তনের সহিত একটি রহস্যজনক সম্বন্ধে আবদ্ধ। যেমন ঠিক দ্বিপ্রহরে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত বৃন্দাবনী সারং গাওয়া হয়। সূর্য্যদেব পশ্চিমে হেলিতে আরম্ভ করিলে খুব নীচু কোমল গান্ধারে পীলু আরম্ভ হয়। দ্বিপ্রহরে গান্ধার পরিত্যক্ত ছিল। পীলুর পরেই আরও একটু উচ্চকোমল গান্ধারে ভীমপলশ্রী, ধানেশ্রী পটদীপ ইত্যাদি গাওয়া হয়। ইহার ঠিক পরেই আরও একটু উচ্চকোমল গান্ধারে মুলতানী—তখন সূর্য্যদেবের ডগমগ লাল মূর্ত্তি। সূর্য্যদেব থাকিতে থাকিতেই শুদ্ধগান্ধার লইয়া পুরবী আসিয়া অস্তাস্ত উদাস ভাবে কর্মক্লান্ত দিবসের অবসান ঘোষণা করিল। ধীরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল—কোমল ঋষভের উচ্চতা আর একটু বাড়াইয়া এবং তীব্রমধ্যমকে প্রবল করিয়া একটি গম্ভীর মধুর অথচ যেন বেদনাযুক্ত মনোভাব লইয়া পুরিয়া কিছুক্ষণের জন্য আসন গ্রহণ করিল। ক্রমে সন্ধ্যার আভাস রাত্রির নিস্তব্ধতায় বিলীন হইতে লাগিল ও শুদ্ধ ঋষভ ও গান্ধার লইয়া ইমন অথবা কল্যাণের আবির্ভাব হইল।

এই রূপেই রাগ গাহিবার নিয়ম স্বরের ব্যবহারের নিয়মের উপরে নির্ভর করে দেখা যায়। দিবারাত্রির যে কোন সময়েই গাওয়া হউক না কেন—ভীমপলশ্রী অথবা ধানেশ্রীতে কোমল গান্ধার ঠিক উপযুক্ত উচ্চতায় লাগাইতে পারিলে নিশ্চয়ই অপরাহ্ণের আভাস দিবে। "দাদুর্বা বুলাই রে বদরিয়া" যে কোন ঋতুতেই গাওয়া হউক না কেন, যদি গান্ধার ঠিক লাগানো হয় তাহা হইলে নিঃসংশয়ে বর্ষাঋতুর আভাসে ও আমেজে মনকে আচ্ছন্ন করিবে।

সুতরাং স্বরগুলি (রে, গা, ধা, নি) নিজেরাই সময় জ্ঞাপক। শাস্ত্রকারগণ মাত্র শিল্পীর উপলব্ধির অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কল্পদ্রুমাঙ্কুর প্রণেতা (আপ্পা তুলসী) ৺পণ্ডিত ভাতখণ্ডের পরামর্শে তাঁহার পুস্তকে 'রাগতরঙ্গিণীর' রাগ গাহিবার সময় তালিকা সমন্বিত শ্লোকগুলি সঙ্কলন করিয়াছেন। উহার কিঞ্চিৎ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম:—

"প্রাতসমে মে গাইয়ে ভৈরব প্রথম সুরাগ।
ললিত ভৈরবী রামকলি গুণকলি অনুরাগ।
* * * *
সোলেসহস্র অরু অটসৌ রাগ-রাগিণী জান
বৃন্দাবন হরি-রাসমে গোপিন কিয়ে হৈ গান।
দেশ দেশকে ভেদ মে ভিন্ন ভিন্ন হৈ নাম
মারগ ব্রহ্মাদি ক কহে দেশী দশগু" ধাম। রা, তঃ

রেকর্ড-পরিচয়

এবার "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" ও "কলম্বিয়া" রেকর্ডে যে গানগুলি বেরিয়েছে, তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয়:—

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82745—শ্রীমতী উৎপলা সেনের কণ্ঠে দু'খানি আধুনিক গান "রয়েছে ছড়ায়ে" ও "কথা দিয়েছিলে হায়"—প্রতিভাময়ী শিল্পীর সার্থক রূপায়ণ সকলকে তৃপ্তি দেবে।

N 82746—সতীনাথ মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন "রাতের আকাশ তারায়" ও "পথ চেয়ে শুধু মোর" দু'খানি আধুনিক গান—গান দু'খানি ভাব, ভাষা ও অনবদ্য পরিবেশনা গুণে সকলের মনে স্থায়ী আসন পাবে।

N 82747—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠতম রেকর্ড এবারের বাংলা গান দু'টি। "একটি কথা শোন" ও "নতুন কিছু বলো শুনি" —ভাষা, সুর ও তার পরিবেশনায় নতুনত্বের দাবী রাখে।

N 82748—মৃণাল চক্রবর্তী গেয়েছেন "খোলা জানালার ধারে" ও "মৃণাল বাহুলতা বেরিয়া"—গান দু'খানিতে সুরও দিয়েছেন তিনি—এক কথায় চমৎকার।

কলম্বিয়া

GE 24842—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের মধু কণ্ঠে বিশেষত্বে পূর্ণ দু'খানি গান "এই ঝির ঝির ঝির বাতাসে" এবং "গান গেয়ে ফিরে গেছি"—অপূর্ব রসসৃষ্টি করেছে।

GE 24843—শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ছন্দপ্রধান দু'খানি গান গেয়েছেন "নামটি যে তার কেউ জানে না" এবং "এই রাত নিঃঝুম"—নতুন রসধারায় ডুবিয়ে রাখে।

GE 24841—শ্রীমতী সুচিত্রা সেন গেয়েছেন "বাঁশী কি গুণ জানে গো" ও "তোরা বলিস্ নে আর শ্যামের কথা।" পল্লীগীতি দু'খানি নবাগতা শিল্পীর কণ্ঠে দীপ্ত মাধুর্যে ভ'রে উঠেছে।

আমার কথা (২৯)

শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ

আজ থেকে বছর ত্রিশেক আগে কলকাতার আকাশবাণী যখন প্রথম আলো দর্শন করে, সেই সময় তাকে স্নেহময়ী ধাত্রীর মত বুকে তুলে নিয়েছিলেন স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। গভীর স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে তিলে তিলে তার কপালে পরিয়ে দিয়েছিলেন পূর্ণতার জয়তিলক। নৃপেন্দ্রনাথের অনুজ ডাক্তার শ্রীরবীন্দ্রনাথ মজুমদার। তাঁর এক ছেলে ও চার মেয়ের মধ্যে স্বনামধন্যা গায়িকা ভারতী বসু ও সুপ্রীতি ঘোষের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজকের দিনে উল্লেখযোগ্যা শক্তিময়ী কণ্ঠশিল্পীদের দরবারে সুপ্রীতি ঘোষের যে একটি বিশেষ আসন সংরক্ষিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিয়ালদহ অঞ্চলে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২০শে অগাষ্ট সুপ্রীতির জন্ম। ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন। সেখানে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী অবধি পড়ে শিক্ষা-জগৎ থেকে গ্রহণ করেন বিদায়, পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করেন সঙ্গীতের আলোময় রাজ্যের উন্নতিসাধনে।

বাড়ীতে সঙ্গীতের প্রভাব বরাবরই ছিল, নৃপেন্দ্রনাথের কাছে সমাগম হত অনেক স্বনামধন্য গুণী গায়কের, বসত গানের বৈঠক, নাদগম্ভীর কণ্ঠে গমগম করত বাড়ী। বাড়ীর সর্ব অঙ্গ মিশে যেত সুরে-তানে-লয়ে। এই সময় গানের ক্ষেত্রে নিজের সুপ্রসিদ্ধা অগ্রজার কাছেও অনেক সাহায্য পান সুপ্রীতি। সুপ্রীতির গান শুনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাসন্তী বিদ্যাবীথি এঁকে গ্রহণ করে নেন ছাত্রীহিসাবে। কীর্তন, ভাটিয়ালি, আধুনিক, পল্লীগীতি, ভজন, খেয়াল, ঠুংরি প্রভৃতি সম্বন্ধে পাঠ নিতে থাকেন সুপ্রীতি। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মাত্র আট বছর বয়সে বেতার কেন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন

সুপ্রীতি ঘোষ

সুপ্রীতি। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে অজয় ভট্টাচার্যের 'আবার আমি আসব গো এই পথে' ও 'আজও কি যমুনা তীরে' গান দুটি শৈলেশ দত্তগুপ্তের শিক্ষাধীনে সেনোলায় রেকর্ড করেন সুপ্রীতি। এই তাঁর প্রথম রেকর্ড। ১৯৩৫ থেকে ৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত-সম্মিলনী ও নাগর সঙ্গীত সম্মিলনীতে প্রত্যেক বার প্রতিযোগিতায় প্রথম থেকে তৃতীয় পর্যন্ত যে কোন একটি আসন সুপ্রীতির জন্যে থাকতই, এর কখনও ব্যতিক্রম হত না। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীতি প্রথম রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করেন (চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে এবং কে বলে যাও যাও আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া), কবিগুরু তখনও জীবিত, স্রষ্টার সস্নেহ আশীর্বাদে সেদিন কানায় কানায় পরিপূর্ণা হয়েছিলেন শিল্পী। রবীন্দ্র সঙ্গীতে শিক্ষালাভ করেছেন অনাদি দস্তিদার ও নীহারবিন্দু সেনের কাছে, তা ছাড়া শান্তিদেব ঘোষ ও শৈলজা মজুমদারের অনুপ্রেরণা ও শিক্ষারও গ্রহণ করেছেন আস্বাদ। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দেই চলচ্চিত্রে আগমন সূচিত হল সুপ্রীতির জীবনে। অভয়ের বিয়ে ছবিতে প্রথম কণ্ঠদান করেন সুপ্রীতি। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন শচীন দেববর্মণ, এ ছবিতে শচীন বাবুর সহকারী ছিলেন আজকের দিনের আর একজন প্রখ্যাত সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। আজ অবধি প্রায় আশীখানি ছবিতে গান গেয়েছেন শ্রীমতী ঘোষ। ছায়াছবি-বহির্ভূত অন্যান্য গানের রেকর্ড-সংখ্যাও এঁর প্রায় ষাটখানি, সর্বসাকুল্যে এঁর গাওয়া আনুমানিক দুশোখানি গান রেকর্ডে ধরে রাখা হয়েছে। বেঙ্গল মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশান এঁকে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠ মহিলা নেপথ্য-শিল্পীর সম্মানে বিভূষিতা করেন। ভারতের বিভিন্ন বেতার কেন্দ্রে এবং দক্ষিণ-ভারত ব্যতীত ভারতের নানা স্থান (শ্রীনগর জম্মু পর্যন্ত) থেকে গান গাইবার জন্যে আহ্বান এসেছে সুপ্রীতির দুয়ারে, একবার নয়, দু'বার নয় বহু বার। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা প্রাপ্তি উপলক্ষে বেতারে বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সুপ্রীতি, সেদিনকার অনুষ্ঠানে সুপ্রীতির সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছিলেন পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও জগন্ময় মিত্র। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রতি বৎসর বেতারে মহালয়ার বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে আসছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল থাকাকালীন রাজাজী রাজভবনে সুপ্রীতির গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে সম্মানিতা করতে কুণ্ঠিত হন নি।

বাহুল্য বর্জিত ও সরল জীবন যাপনই সুপ্রীতির বাঞ্ছনীয়। ফুলের প্রতি এঁর অসম্ভব আকর্ষণ। ভ্রমণেও পেয়ে থাকেন অপার আনন্দ।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হন সুপ্রীতি। শ্রীঘোষ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন গেজেটেড অফিসার। সুপ্রীতি একটি কন্যা (চৈতী)র জননী।

জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি। পথে পথে শুধু গ্রীষ্মের প্রখরতার বাণী। বাতাসে বাতাসে হলাহলের তপ্ত নিঃশ্বাস, প্রতি মুহূর্তেই উত্তাপ লাভ করছে ব্যাপকতা। আর বসা চলে না, আসর হয় গুটোতে, পা বাড়াতে হয় গৃহের উদ্দেশে।

রাজায়-রাজায়

[২০৮ পৃষ্ঠার পর]

জানলা থেকে জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়েছে বজরার মধ্যে। গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি এসে নৌকার আশ-পাশে আছড়ে পড়ছে। কলকলিয়ে হাসছে যেন রাতের গঙ্গা। যেদিকে দু'চোখ যায় শুধু জল আর জল। অন্ধকারে নদীর অন্য তীর যেন অস্তিত্ব হারিয়েছে।

মরণপথের যাত্রীর মত চৌধুরাণীর মুখখানি রুক্ষ আর বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পায় ম্যালেট। ভয় পেয়েছে, তাই হয়তো থেকে থেকে কেঁপে উঠছে দেহলতা। ম্যালেটের বাহুবন্ধনে বাঁধা তবু।

—সাহেব, আমার বড় ভয় করছে!

ক্ষীণ কণ্ঠে কথা বললে আনন্দকুমারী। সেতারে যেন এক অতি করুণ সুর বাজলো।

চিবুক তুলে ধ'রলো ম্যালেট। চৌধুরাণীর ভীরু মুখ দেখতে দেখতে আবার হেসে ফেললো। বললে—ভয় নাই।

আনন্দকুমারী বললে,—বজরা এখানে থাকবে না। আমার ভয় করবে।

—ভয় নাই। ম্যালেট আবার বললে হাসতে হাসতে। বজরার ভেতরে এক কোণে কি দেখিয়ে বললে,—ভয় কেন? বন্দুক আছে হামাদের।

কে কার কথা শোনে! আবার বাঘের গর্জ্জন শোনা যায়। ফেউ ডাকছে অবিরাম। বন্য জন্তুদের বুকে কম্পন লেগে গেছে। শিয়ালের পাল ছুটছে বাঘের ভয়ে। দূরে কোথায় ঢাক পিটছে কারা। বাঘ বেরিয়েছে, তাই জানিয়ে দেওয়া হয়। গেরস্থকে সাবধান করা হয়।

—বজরার দড়ি খুলতে বল' সাহেব! দোহাই।

আসন্ন মৃত্যুকে এড়ানোর জন্যই যেন কথাগুলি বললে আনন্দকুমারী। ভয়ে তার কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। ঠকঠকিয়ে কেঁপে উঠছে। হাত দু'টি যেন বরফ-ঠাণ্ডা।

বজরার এক প্রান্তে তোলা-উনুন জ্বলছে রাঙা আগুনের আভা ছড়িয়ে। সাহেবের রান্না চেপেছে। সিপাইরা রান্নার কাজে লেগেছে। দুধের পাত্রে দুধ ফুটছে টগবগিয়ে। খাঁটি গোদুগ্ধের সুগন্ধ বইছে হাওয়ায়। দুধ নামলেই সব্জী সিদ্ধ হবে। তারপর মাছ ভাজার পালা। একটা ভেটকী মাছ কিনেছে ম্যালেট, হাট-বাজার থেকে। এক কুড়ি আম কিনেছে।

গঙ্গার বুকে ঠাণ্ডা বাতাস চলেছে। চৌধুরাণীর আলুলায়িত রুক্ষ কেশের রাশি উড়ছে। চুলে চিরুণী পড়ে না কত দিন। এক কোঁটা তেলও নয়। আনন্দকুমারীর এলোচুল তাই যেন কালো রঙ হারিয়ে সোনালী হয়ে উঠেছে। তার মাথায় পর পর কয়েকটা চুমা খায় ম্যালেট। আরও কাছে টেনে নেয় তাকে। বলে,—কোথায় যাবে বজরা?

ম্যালেট মাঝে মাঝে দেশী ভাষায় কথা বলে। স্পষ্ট বাঙলা ভাষা বলে। ম্যালেট ল্যাটিন, ইংরাজী, ফরাসী আর স্পেনের ভাষা জানে! কথ্য বাঙলা ভাষাও দিনে দিনে রপ্ত করছে। শুনে শুনে শিখছে! যেটা জানে সেটা আওড়ায় যখন তখন। ল্যাটিন আর ইংরাজীর সঙ্গে বাঙলা ভাষার যোগসূত্র খোঁজে মনে মনে।

আনন্দকুমারী বললে,—এখানে থাকবো না আমি। কিছুতেই নয়। আরও এগিয়ে চল'।

ম্যালেট মিষ্টি হেসে বললে,—পর্টুগীজ পাইরেটদের ভয় আছে। ক্যানেলে লুকিয়ে আছে ওরা। বজরা দেখলেই হামাদের এ্যাটাক্ করবে। তখন আমরা মারা যাবো। বাঘ একা এ্যাটাক করে, পাইরেট আসবে দল বেঁধে।

শিউরে শিউরে উঠলো চৌধুরাণীর স্তব্ধ চোখের তারা। মুখে তার কথা ফুটলো না। ম্যালেটের মুখপানে তাকিয়ে থাকলো ভীরু পাখীর মত।

ম্যালেট আবার হেসে হেসে ব'ললে,—পর্টুগীজরা হামাদেব মারবে না ধরবে না। আনন্দকুমারীকে ওরা ছাড়বে না। কিড্‌ন্যাপ্ করবে।

চৌধুরাণীর ভয়ার্ত চোখ বন্ধ হয়ে যায় সহসা। নিজের মুখখানি সে ম্যালেটের বুকে চেপে ধরে। সাদা মলমলের পাতলা সার্ট ম্যালেটের গায়ে। জিনের সাদা পায়জামা। সার্টের বোতাম খোলা। ম্যালেটের বুকে রূপার চেনে বাঁধা ছোট্ট লকেট। সোনার ক্রুশ, যীশুর কাঠামো। চাঁদের আলোয় সেই স্মৃতিচিহ্ন চিকমিক করছে।

মুখ লুকিয়ে চুপি চুপি কথা বলে চৌধুরাণী। বললে,—সাহেব, তুমিও তাই ক'রেছো। ইংরাজের সঙ্গে পর্তুগীজের তফাৎ কোথায়?

এক ঝলক লজ্জা নামলো ম্যালেটের শুভ্রলাল মুখে। সলজ্জায় বললে,—বাট্ আই লাভ ইউ। আমি টোমাকে ভালবাসি। আই ওয়াণ্ট ইউ। আমি টোমাকে চাই।

নিশ্চুপ থেমে থাকলো আনন্দকুমারী। কতক্ষণ কে জানে! ম্যালেটের বুকে কান পেতে শুনলো যেন তার অন্তরের' কথা। ভালবাসার কথা শুনে মনে মনে কি যেন ভাবতে থাকলো। যা যতটুকু পেয়েছে, তার হিসাব কষতে থাকলো যেন। কত কি দিয়েছে ম্যালেট। ক'দিন আহার জুগিয়েছে। পরনের বস্ত্র দিয়েছে ক'খানা। কত ভাল ভাল কথা শুনিয়েছে। বাজনা শুনিয়েছে। কাব্য আওড়েছে। চৌধুরাণী একেক সময়ে বুঝেছে, শুধু ভোগ-দখলের সুখে নয়, ম্যালেট যেন তাকে পেয়ে এক স্বর্গসুখ হাতে পেয়েছে—যাতে দেওয়া আর নেওয়ার পার্থিব আনন্দের লেশমাত্র নেই। দেশে থাকতে অনেক কুঁড়ি আর ফুল দেখেছে ম্যালেট, সাজানো কাননে বীথিতে ফুটে উঠতে দেখেছে। কিন্তু কোথায় এক বিদেশ-বিভুঁইয়ে একটি বনফুল দেখতে পেয়ে অবহেলা করতে পারলো না যেন। তাই তুলে নিয়ে রেখেছে বুকের 'পরে।

—আমার শেষ পর্য্যন্ত কি'গতি হবে সাহেব?

চৌধুরাণী কথা বললে হঠাৎ। হিসাব কষে কি বুঝলো কে জানে, পরিণাম জানতে চাইলো কেমন ভাঙা মনে। চোখ তুলে তাকালো। চোখে যেন নেশার ঘোর। বললে,—ঘরে-বাইরে কোথাও যে আর আমার ঠাঁই মিলবে না। মরণ ছাড়া আর গতি কি! কথার শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ম্যালেটের লোমশ বুকে। তারপর আবার বললে,—আমাকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবে তো?

—নো, নো। নেভার।

কথায় আন্তরিকতা মাখিয়ে বললে ম্যালেট। শিথিল বাহু-বাঁধন কঠিন ক'রলো। চোখে কাতর দৃষ্টি ফুটিয়ে বললে,—আমি টোমাকে ছাড়বো না। নেভার ইন মাই লাইফ।

—সত্যি কথা? পুরুষকে বিশ্বাস নাই। চন্দ্রকান্ত আমাকে বিপদে ফেলে পালিয়ে যায়।

—হাঁ, সত্য কথা। মেরীর নামে বলছি। কালীর নামে বলছি! মাদার গডেশ, কালী।

—তোমার কে আছে?

—কেউ নাই হামার। ফাদার ছিলেন, সেও মারা গেল।

—বৌ নেই? স্ত্রী নেই?

—না। টুমি হামার স্ত্রী।

—দেশ কোথায়?

—ইংল্যাণ্ডে।

সব কিছু যেন জানা হয়ে গেছে চৌধুরাণীর। আবার স্তব্ধ নীরব হয়। চুপচাপ থাকে। মন্থর শ্বাস ফেলে একেকটা। বজরার আনাচে-কানাচে জলের ঢেউ আছড়ানোর শব্দ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চৌধুরাণীর উড়ন্ত কেশরাশিতে হাতের কোমল পরশ বুলায় ম্যালেট।

—আমার মা আছে। বাবা আছেন।

অনেকক্ষণ থেমে থাকার পর আবার কথা বললে আনন্দকুমারী।

ম্যালেট সহানুভূতির সঙ্গে বলে,—হামি জানি।

চাঁদের ছায়া খেলছে নদীর জলে, সোনারঙ্গি। ছায়াপথ সৃষ্টি হয়েছে যেন। জলের স্রোতে ধিকিধিকি কাঁপছে। ঐ সোনালী ঝিলিমিলিতে চোখ রেখে কথা বলছে ম্যালেট।

—মাকে দেখতে ইচ্ছা হয়। কেমন আছে কে জানে?

চৌধুরাণী কেমন যেন কষ্টকাতর সুরে কথা বলছে। বৈরাগী ভঙ্গীতে। বললে,—বাবা হেথায় নাই, সুতানুটি গোবিন্দপুরে গেছেন।

এবার নীরব হয় ম্যালেট। সে কেবল শুনে যায় চৌধুরাণীর কথা। তার যেন কোন কিছু বক্তব্য নেই।

—আমার বজরায় গয়না ছিল আমার গায়ের। তোমার সিপাই আর মাঝিরা, সাহেব সে-সব লুটেপুটে নিয়েছে। খানিক থেমে আবার বললে চৌধুরাণী,—যা গেছে তা যাক। আমি আর ফেরৎ চাই না। মায়ের সিন্দুকে আমার আরও অনেক গয়না-অলঙ্কার আছে।

ম্যালেটের মুখে কথা নেই। সার্টের আস্তিনে কপালের ঘাম মুছলো একবার। চাঁদের ঝিলিমিলি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজের বুকে চোখ নামালো। চৌধুরাণী মুখ উঁচিয়ে বললে,—কোথায় নিয়ে চললে আমাকে?

—টুওয়ার্ডস সুতনুটি-গোবিন্দপুর। ম্যালেট বললে কেমন যেন গম্ভীর সুরে। বললে,—আই উইল গো টু মাই ওয়ার্কিং সেণ্টার।

হঠাৎ যেন দুলে উঠলো বজরাখানা। জলের ঢেউয়ে টলমলিয়ে উঠলো। ম্যালেট দেখলো আরও একখানি বজরা কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। আসছে এই দিকেই, তীরের কাছে। হয়তো নোঙর বাঁধবে।

ম্যালেটের চোখে সভয় চাউনি। চোর, চুরি ক'রেছে, তাই তার ভয় পাওয়া। হয়তো বামাল সমেত গ্রেপ্তার করতে আসছে কারা। ম্যালেট দেখে নেয় বন্দুকটা কোথায়!

মাঝি-সর্দার মুখে হুঁকো ধ'রে কথা বলে পরিহাসের সুরে। বললে,—সাহেব, বজরাখানা দেখো একবার। চক্ষু জুড়িয়ে যাবে।

ম্যালেটের লক্ষ্য চলন্ত বজরার সঙ্গে সঙ্গে চলে। সাগ্রহে দেখে বজরার গতিবিধি; অনেক মাঝি-মাল্লা বজরার দুই মুখে। বজরার ঘরে সারি সারি গবাক্ষ। ছাদে ধৌতশুভ্র বিছানা-তাকিয়া। মশাল জ্বলছে ছাদের মাথায়, সুউচ্চ বাঁশের শীর্ষে। সেই আলোয় দেখা যায় নৌকাগাত্রে নানা রঙের চিত্র-বিচিত্র। বজরাখানি ব্যাঘ্রমুখী।

আর যেন স্থির থাকতে পারে না ম্যালেট। বাহুপাশ আলগা হয়ে যায় ধীরে ধীরে।

বজরা এখনও দোদুল্যমান। জলের স্বাভাবিক ধারা যেন হঠাৎ ব্যাহত হয়েছে। চৌধুরাণীও মাঝি-সর্দারের কথা শুনে চোখ ফিরিয়ে দেখছে। উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আনন্দকুমারীর হাত ধরে তাকে বসিয়ে ম্যালেট ঘরের বাইরে যায় মাথা নামিয়ে। চুরি করেছে ম্যালেট, তাই হয়তো ভয় হয়েছে।

চোখের যেন পলক পড়ে না। চৌধুরাণীর লক্ষ্যে ধরা পড়ে ঐ

বজরার যাত্রীরা সকলেই দেশীয়। দেখে যেন আশ্বাস পায় মনে। পর্টুগীজ কিম্বা ইংরাজদের কোন' জাতীয়-চিহ্ন দেখা যায় না, তাই নিশ্চিন্ত হয়। চৌধুরাণীর সম্যক অভিজ্ঞতায় বিদেশীদের রূপ বিশ্রী আকৃতি ধ'রেছে। চোর-ডাকাত ছাড়া আর কোন মানুষ নেই যেন বিদেশীদের মধ্যে! মনুষ্যত্ব বলতে কিছু নেই—আছে শুধু লোভ আর লালসা! অপহরণের প্রবল তৃষ্ণার কাতরতা।

—সুতানুটি-গোবিন্দপুরের বজরা। ঐ তল্লাট থেকে আসছে।

মাঝি-সর্দার দেখে দেখে চিনতে পারে। বজরার গঠন, আকৃতি আর যাত্রীদের দেখতে দেখতে কথা বললে অটুট আত্মবিশ্বাসের সুরে।

—ফ্রেণ্ড অর্ ফো! নিজেকে যেন প্রশ্ন করলে ম্যালেট। বললে, —শত্রু না মিত্র?

মাঝি-সর্দার বললে,—জানি না সায়েব, তবে মনে হয় আমাদেরই মত রাতটুকু কাবার করতে নোঙর ফেলছে।

কথা কানে যায় আর বুকের মধ্যে যেন গুমরে গুমরে ওঠে। আনন্দকুমারী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। 'সুতানুটি-গোবিন্দপুরের বজরা' এই কথাটি শোনামাত্র তার শোণিতধারায় কেমন এক উত্তেজনা নাচানাচি করতে থাকে। ম্যালেটের পেছনে দাঁড়িয়ে অবাক-চোখে তাকিয়ে আছে। নিস্পলক চোখে দেখছে সুচিত্রিত বজরাখানি আর তার যাত্রীদের। বজরার ছাদে মশাল জ্বলছে কম্পমান শিখায়। গঙ্গাবক্ষের মুক্ত হাওয়ায় মশালের আলো থর-থর কাঁপছে। বজরার ছাদে শুভ্রশয্যায় কে যেন ব'সে আছেন তাকিয়ায় হেলান দিয়ে। বন্দুকধারী সিপাইরা চলাফেরা করছে মাঝে মাঝে। চাঁদের অকৃপণ আলোয় বন্দুক স্পষ্ট দেখা যায়।

—ডার্লিং, ভয় পাইও না।

ডান হাতে চৌধুরাণীর কোমর জড়িয়ে ধরলো ম্যালেট। বুকের কাছে টেনে নিলো তাকে।

—ওরা কারা? ভয়ে ভয়ে শুধালো আনন্দকুমারী।

ম্যালেট বললে,—ওরা বাঙ্গালী।

কথা শুনে কোথায় খুশী হবে তা নয়, চৌধুরাণী আরও যেন আশঙ্কিত হয়ে উঠলো। কেন কে জানে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আসার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেটের বুকে মুখ লুকালো।

মাঝি-সর্দার আবার কথা বললে,—সায়েব, ওরা জানে না বাঘ বেরিয়েছে। তীরে নামছে সব দলে দলে। জানিয়ে দিয়ে আসি, যদি অনুমতি দাও।

আনন্দকুমারী তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে বললে,—হাঁ যাও মাঝি-সর্দার! বাঘের খপ্পরে প'ড়ে মানুষ মরবে জানিয়ে দিয়ে এসো। এক মুহূর্ত থেমে আবার বললে,—আর খোঁজ নাও, বজরার মালিক কে? কোন্ দিকের যাত্রী?

ম্যালেটের কথা থেমে যায় চৌধুরাণীর দৃপ্ত কণ্ঠ শুনে। বাহুপাশে যেন এক বাঘিনী, ফুঁসে উঠলো।

চোখ ফিরিয়ে নেয় ম্যালেট। চাঁদের জল-ছায়া দেখে আবার। জলে সোনালী ঝিলিমিলি খেলছে। গঙ্গার অন্য তীর নজরে পড়ে না, যেন দিগন্তে গিয়ে মিশেছে।

মাঝি-সর্দার জলে নামলো। এক-হাঁটু জল। ম্যালেট মনে মনে তাকে বাধা দিতে চাইলেও মুখ ফুটে বলতে পারলো না কিছু। চাঁদের আলোয় দেখলো, সর্দার-মাঝি ঊর্দ্ধশ্বাসে এগিয়ে চলেছে। তীরে উঠছে না বাঘের ভয়ে, হাঁটুভর্ত্তি জলের পথে চলেছে।

বাঘ গর্জ্জে উঠলো আবার, অনেক দূরে কোথায়। হুঙ্কারের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ফেউয়ের ডাক শুরু হয় সঙ্গে সঙ্গে।

ম্যালেট যেন কেমন নিরাশ হয়ে ফিরে আসে। চৌধুরাণীকে ছেড়ে চলে আসে; ব'সে পড়ে নিজের জায়গায় ফিরে। ডিকেণ্টারটা টেনে নেয় নিজের কাছে। নেশা যেন তৃষায় কাতর হয়েছে। কণ্ঠ প্রায় শুকিয়ে গেছে।

এত আদর যত্নেও মন উঠছে না আনন্দকুমারীর! বজরার ঘরে তার মন বসছে না, বাইরে ছুটে চলেছে বারে বারে। কে কোথায় এলো গেল নজর সেই দিকে যেন। খাঁচার বন্দী পাখী যেমন দেখে আকাশ-বিস্তার।

যতই হোক, ম্যালেট একা। সিপাই আর মাঝি-মাল্লারা তার তাঁবের লোক, তবুও যেন নিজেকে তার বড় বেশী একা মনে হয়। কাছে রয়েছে চৌধুরাণী, তবুও। কত কি মনে হয় ম্যালেটের। দুশ্চিন্তার ছায়া ফোটে তার টিকালো মুখে। পানপাত্র মুখে তুললো ম্যালেট। স্কচ হুইস্কি এক পাত্রে—যা কখনও না কি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। বরং অনুরাগিণী প্রেয়সীর মত আনন্দ দান করে।

—চৌধুরাণী! হঠাৎ কি মনে হ'তে ম্যালেট ডাক পাড়লো সিক্তকণ্ঠে।

আনন্দকুমারী সাড়া দেয় না। যেদিকে তার চোখ সেদিকেই চেয়ে থাকে। ডাক যেন কানে যায় না তার। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

আবার ডাকলো ম্যালেট,—ডিয়ারেষ্ট ডার্লিং!

তবুও সাড়া দিলো না আনন্দকুমারী। পৃথিবীর অন্য এক আশ্চর্য্য দেখছে যেন সে। কর্ণেন্দ্রিয় নেই। চৌধুরাণী যেন মূক আর বধির।

ম্যালেটের মনের আশার আলো যেন নিবু নিবু হয়। অবজ্ঞার আঘাত লাগে তার। পানপাত্র মুখে তোলে আবার। এক চুমুকে শেষ হয়ে যায় পাত্র। গঙ্গার বুকে চাঁদের ঝিলিমিলি দেখতে থাকে ম্যালেট। তার কপাল আর ভুরুতে কুঞ্চন দেখা দেয় কেন কে জানে! শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আছে হয়তো। ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে চৌধুরাণী। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে বহু বিচিত্র বজরাখানা আর তার যাত্রীদের। সুতানুটি-গোবিন্দপুরের নাম দু'টি তার পরিচিত। চৌধুরী মশাই বছরে বেশ কয়েক বার মান্দারণ থেকে যাত্রা করেন সুতানুটির উদ্দেশে ব্যবসার প্রয়োজনে। গোবিন্দপুরের কোলে গঙ্গার তীরে আছে বুড়োশিবের বাজার-হাট। সেই হাটে মাল বিকাতে যান চৌধুরী, সওদাও করেন। নাম দু'টি শুনে জমিদার-নন্দিনী বিন্ধ্যবাসিনীর মুখখানি মনের পটে ভেসে ওঠে। তাঁর পিত্রালয় ঐ দেশে। আনন্দকুমারী ভাবলো, এখন রাজকুমারীর সঙ্গে আর কোন পার্থক্য নেই তার। তিনি গৃহে বন্দিনী, চৌধুরাণীও বজরায় বন্দিনী।

চাঁদের আলোয় দেখা যায় মাঝি-সর্দার জলপথে এগিয়ে চলেছে। আনন্দকুমারীর দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে।

ম্যালেট প্রেমিক মানুষ, কিন্তু তার চোখে যেন এখন কুটিল চাউনি ফুটে আছে। চাঁদের ঝিলিমিলি থেকে চোখ ফিরিয়ে দেখছে চৌধুরাণীর আপাদমস্তক। কেমন যেন নিরাশ হওয়ার পর চাপা আক্রোশে জ্বলছে ম্যালেট। এক পাত্র নিঃশেষ হওয়ার পর আরেক পাত্র হাতে তুলেছে।

বাঘ ডাকছে ঘন ঘন। ফেউ ডাকছে। কিন্তু চৌধুরাণীর যেন কান নেই! ভয় নেই। বজরা আর দেশী যাত্রী দেখে মনে মনে কি আঁচতে থাকে কে জানে! লাল অধর দংশন করে দাঁতে। চোখের পাতা পড়ে না। পাষাণ-মূর্তির মত অবিচল দাঁড়িয়ে থাকে।

তোলা-উনুন জ্বলছে। সাহেব আর বিবির রান্না চেপেছে রাতের। মাছ ভাজার গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। খাঁটি সরষের তেলের উগ্র গন্ধ।

—চোখ দেখবে না কি মিষ্টার? দু'-চারখানা দিই খাও। মদের মুখে মন্দ লাগবে না।

একজন সিপাই কথা বললে ম্যালেটের সামনে এসে। একখানা রেকাবী নামিয়ে দিয়ে গেল।

ম্যালেট হাঁ না কিছুই বললে না। একবার শুধু উদাস চোখে দেখলো সিপাইকে। সম্মতি বা অসম্মতির জন্য আর দাঁড়ালো না সিপাই, উনুনধারে চলে গেল।

—চৌধুরাণী, কাম হিয়ার। হামার নিকটে আইস।

ম্যালেট কথা বললে খানিক বাদে। রেকাবী তুলে ধরলো আনন্দকুমারীর দিকে।

মূক আর বধির যেন সে। কানে তোলে না কথা। মুখে অবজ্ঞা ফুটিয়ে থাকলো।

—চৌধুরাণী।

বাঘের মতই সহসা গর্জ্জন করলো ম্যালেট। বজরার মাঝি আর সিপাইরা পর্য্যন্ত চমকে উঠলো ম্যালেটের গলা শুনে।

আনন্দকুমারী মুখ ফিরালো এতক্ষণে। অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে বললে—কি? আবার?

—কাম হিয়ার। ম্যালেট ঝাঁঝালো সুরে বললে। ধমক দেওয়ার সুরে।

—কি চাই আবার? চৌধুরাণী কথা বলতে বলতে বজরা দুলিয়ে ম্যালেটের কাছে আসে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

রেকাবী আবার উঁচিয়ে ধ'রলো ম্যালেট। বললে,—টুমি খাও।

এ পাশে ও পাশে মাথা দুলিয়ে অসম্মতি জানালো আনন্দকুমারী। মুখে বিরাগ আর বিতৃষ্ণা ফুটালো। সঙ্গে সঙ্গে রেকাবীখানা জানলা থেকে ছুঁড়ে নদীর জলে ফেলে দেয় ম্যালেট।

চৌধুরাণী ভীতা হয়ে ওঠে ম্যালেটের মুখভাব দেখে আর উচ্চকণ্ঠ শুনে। হঠাৎ যেন কেঁপে ওঠে ঠকঠকিয়ে।

—হুজুরাণী, কেউ কোন কথা ফাঁস করলে না। মাঝি সর্দার দরজার বাইরে থেকে কথা বললে। বললে,—বজরার মালিকের নাম বললে না।

—কোথা থেকে আসছে তাও বললে না?

চৌধুরাণী প্রশ্ন করলে গম্ভীর সুরে। চোখ বাঁকিয়ে দেখলো বাঁকা চোখে।

—হাঁ তা ব'লেছে। আমাদের অনুমান মিথ্যা নয়, সুতানুটি-গোবিন্দপুর থেকে আসছে।
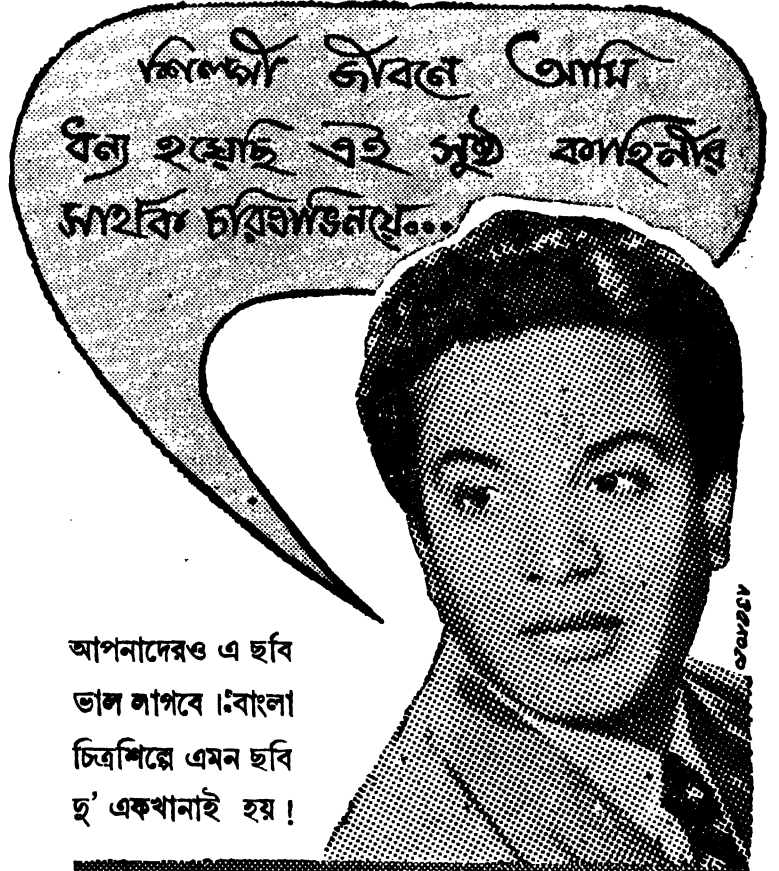
—কোথায় যাবে ?

—যাবে হুজুরণী গড়-মান্দারণে।

মাঝির কথা শুনে একটা কেমন যেন স্বস্তির শ্বাস ফেললো চৌধুরাণী। মুখে হঠাৎ এক ঝলক হাসি ফুটিয়ে ব'সে পড়লো ম্যালেটের কাছাকাছি। গা ঘেঁষে ব'সলো। হেসে হেসে বললে,—সায়েবের রাগ তো দেখছি খুব! আমার যে ভয় করে রাগ দেখলে।

ম্যালেট জলের বুকে লম্ববান ঝিলিমিলি দেখছে তো দেখছেই। চৌধুরাণীর দিকে আর যেন কখনও ফিরে তাকাবে না। রাগ না অভিমানের গাম্ভীর্য্য তার চোখে-মুখে। দ্বিতীয় পাত্র মুখে তুলেছে ম্যালেট। পান করেছে কয়েক চুমুক। হুইস্কির সজোর লাথি খেয়েও যেন কেমন স্থির হয়ে আছে।

গড়-মান্দারণ! চৌধুরাণীর মুখের হাসি কৃত্রিম। মনে মনে কি যেন আঁচতে থাকে সে। নকল হাসি হেসে আর একটু ঘেঁষে বসে। তার কোমলদেহ অনুভব করে উষ্ণতা। ম্যালেটের রাগের গরম হয়তো। চোখে-মুখে হাসি মাখিয়ে ম্যালেটের হাত থেকে পাত্র কেড়ে নেয় আনন্দকুমারী। টলমল করছে সোনা-রঙের হুইস্কি! নিজের হাতে ম্যালেটের মুখের কাছে এগিয়ে ধরে চৌধুরাণী। কি কারণে কে যেন হঠাৎ যেন অদ্ভুত লাস্যময়ীর ভাব দেখায়। নিজের মুখ তুলে ধরে ম্যালেটের মুখের কাছে।

বাইরে জ্যোৎস্না আর অন্ধকারে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। কে কাঁকে হারাতে পারে। সিপাই আর মাঝিরা কি এক দৃশ্য দেখতে পায় বজরার ভেতরে। কি লজ্জাহীনা ঐ বেনের মেয়ে! তারা চোখ ফিরিয়ে নেয় অন্য দিকে।

সুধাপানের লোভে ম্যালেট আবার হাসলো মুখের গাম্ভীর্য্য ঘুচিয়ে। নেশার প্রথম উগ্রতায় কেমন যেন আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

কতক্ষণ অতীত হয়ে যায়, কথা বলার অবকাশ পায় না চৌধুরাণী। যখন মুক্তি পায় তখন বলে,—খুশী হয়েছো সায়েব?

মাথা দুলিয়ে ম্যালেট বলে নেতিবাচক ইঙ্গিত করে। মিষ্টি হাসি ম্যালেটের মুখে।

আবার মুখ তুলে ধ'রলো আনন্দকুমারী। কি এক আবেশে চোখ দু'টি বন্ধ করলো। ম্যালেটের হাতের বলিষ্ঠ আঙুল ক'টা চৌধুরাণীর পিঠে যেন কামড়ে ধরে। কত কোমলদেহ, তবুও এতটুকু আপত্তি জানায় না আনন্দকুমারী।

বাঘের গর্জ্জন ভেসে আসে অনেক দূর থেকে। খেয়াল নেই কারও। হুইস্কির নেশায় যেন বিভোর হয়ে আছে ম্যালেট।

নিজেকে মুক্ত করে আনন্দকুমারী। বলে,—ছেড়ে দাও এখন। সিপাইরা সব ঘোরাফেরা করছে যে!

ফিস-ফিস কথা, তবু অমান্য করতে পারে না ম্যালেট। চৌধুরাণীকে ছেড়ে পানের পাত্র মুখে তুললো খুশী মনে।

এক রাশ হেসে আনন্দকুমারী বললে,—দেখি, আকাশের চাঁদ এখন কোথায়। কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো সে। লম্বা পা ফেলে ফেলে তিন কদমে ঘরের বাইরে চলে গেল। আকাশের এদিক সেদিক দেখতে থাকলো।

মাঝি আর সিপাইরা সারাদিনের ক্লান্তিতে এখন শান্ত হয়ে আছে। এখানে সেখানে ব'সে আছে দলে দলে। খোসগল্প করছে।

হঠাৎ কি এক শব্দে চমকে উঠলো সকলে। এমন কি ম্যালেট পর্য্যন্ত: তার হাত থেকে পানপাত্র খ'সে পড়লো। মাঝিদের দলে হৈ হৈ পড়লো। সিপাইরা ছোটাছুটি করতে থাকে।

ঘরের বাইরে এসে এধার ওধার তাকিয়ে ম্যালেট দেখলো, আনন্দকুমারী নেই। অতর্কিতে জলে ঝাঁপ দিয়েছে সে। দু'জন মাঝিও ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। কোথায় গেল সায়েবের বিবি! ম্যালেটও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

জল আর জল। সাঁতরে চলেছে দু'জন মাঝি, যদি একবার ভেসে ওঠে। দেখা যায় দেহের কোন অংশ। আনন্দকুমারীর শাড়ীর আঁচল কিম্বা তার মাথার কালো কেশ!

চৌধুরাণী ডুব-সাঁতারে এগিয়ে যায় ছুটন্ত সাপের মত; যেদিকে বজরাখানা দাঁড়িয়ে আছে সেই দিকে সাঁতরায়। সুতানুটি-গোবিন্দপুর থেকে গড়-মান্দারণের দিকে যাবে-বজরা, তবে আর দ্বিধা কেন?

ম্যালেটের রুষ্ট চাউনি আহত হয় নদীর জলে। চৌধুরাণীর চিহ্ন দেখা যায় না কোথাও। ম্যালেটের তর্জ্জন-গর্জ্জনে সিপাই আর মাঝিরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

চৌধুরাণীর ডুব-সাঁতার কারও চোখে পড়ে না। চাঁদের আলোয় একবার শুধু তার একখানি শুভ্র হাত ভেসে উঠতে দেখা যায়। জলের আবর্ত্তে আবার কোথায় হারিয়ে যায় চৌধুরাণী। চাঁদের ছায়া খেলছে জলে। সোনালী ঝিলিমিলি নয়, জলের হাসি যেন!

[ক্রমশঃ।

ভিটামিন যুক্ত

যাঁরা গুণের বিচার করেন

তাঁরা সকলেই পছন্দ করেন

সবসময়ে

কোলে বিস্কুট কোম্পানী
প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১

পুষ্টিকর খাদ্য সম্ভার

থিন-এরারুট
মেরী
পেটিটবুারো
নাইস
কলেজ
টেষ্টা
ডেল্টা
ক্রীমক্র্যাকার
কয়েন
স্পোর্ট
জিঞ্জারনাট
হাউসহোল্ড
সল্‌টী
মার্ভেলক্রীম
কাফেনয়ের
চকোলেটক্রীম
বেবীক্রীম
সল্ট ক্র্যাকার
প্রভৃতি
আরও অনেক রকম।

র ঙ্গ প ট

খেলা ভাঙার খেলা

শরৎচন্দ্রের অমর রচনার অক্ষয় ভাণ্ডার থেকে বহুমূল্য রত্নরাজি দিয়ে পরবর্তী কালে কত যে কাহিনী গড়ে উঠেছে তার ইয়ত্তা নেই। খেলা ভাঙার খেলা তারই একটি সংযোজন মাত্র। সামাজিক ছবি। একটি নারীকে কেন্দ্র করে আর একটি নারী ও একটি পুরুষের গল্প। জমিদার-নন্দন বিনয় বাল্যকালে খেলার ছলে একদিন সঙ্গিনী শুকতারার সঙ্গে করে ফেলেছিল মালা বদল। যাত্রাদলের গীত-শিক্ষকের মেয়ে শুকতারা। বহুকাল পরে শহরবাসী বিনয়ের সঙ্গে যখন অর্পিতার বিয়ের ঠিক, সেই সময়ে ঘটনাচক্রে শুকতারার কথা তার কানে ওঠে। সে জানতে পারে, শুকতারার সঙ্গে এক বৃদ্ধ দোজবরের বিবাহের ঠিক হওয়ায় সে ভয়ে নিরুদ্দিষ্টা এবং অনেকের ধারণা, সে বর্তমানে বিনয়েরই আশ্রিতা। এর পরেই ঘটনাপ্রবাহে অভিনেত্রী মেঘনা দেবীর সঙ্গে হয় বিনয়ের পরিচয়। জানা যায় মেঘনাই শুকতারা। বিনয়ের জীবনের স্রোত যায় ঘুরে। শুকতারাকে নতুন করে পাবার জন্যে সে পাগল হয়ে ওঠে। শুকতারা···বাধা দেয়। সে বিনয়ের বংশমর্যাদার দিকে দৃষ্টি রেখে বিবাহবন্ধন থেকে নিজে সরে যায় এবং নিজে থেকে অর্পিতার সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে দিয়ে নিজের যথাসর্বস্ব অর্পিতার নামে লিখে দিয়ে সে গ্রহণ করে বিদায়।

এই হল কাহিনীর সংক্ষেপিত রূপ। প্রত্যেক ছবিতেই দর্শকদের সাময়িক আনন্দ দেবার জন্যে কিছু হাস্যরসের অবতারণা করতে হয়। কাহিনীটির মধ্যে থেকেই অংশবিশেষ বেছে নেওয়া হয় হাস্যরসের জন্যে। এ ছবিতে সাময়িক পত্রের কার্যালয়কে বেছে নেওয়া হয়েছে হাস্যরসের কেন্দ্ররূপে এবং কেন্দ্রবিন্দুরূপে দেখানো হয়েছে বিভাগীয় সম্পাদক-বৃন্দকে। এই মনোবৃত্তি যেমনই জঘন্য তেমনই লজ্জাকর। জনগণের অন্তরের বাণী একত্রীভূত করে যাঁরা হাজারের মধ্যে ছড়িয়ে দেন, মানুষে মানুষে যোগসূত্রের মিলন-সেতু যাঁরা, সেই সাময়িক-পত্রসেবীদের প্রতি এই রুচিবিগর্হিত ব্যঙ্গ শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও। সাময়িকপত্র-সেবীদের বাঙলার এই সব পরিচালকের দল যে চোখে ইচ্ছে দেখুন, তাদের কাছে নিজেদের আকণ্ঠ ঋণ অস্বীকার করতে চান করুন, তবে এই সত্য চিরদিনই বেঁচে থাকবে যে মুড়ি ও মিছরির দর কখনও এক হয় না। যে যা সে তা। শত ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপেও সে আসন টলানো যায় না। ছবির প্রথম থেকেই পরিচালনা ক্রটিপূর্ণ। নৌকো থেকে শুকতারা নামল যে ছেলেটিকে নিয়ে, সেই ছেলেটি কোথায় গেল? বিভুর সঙ্গে মেয়েটিকে দেখতে মানায় কি? পরিচালকের চোখ তো আছে! বিনয়ের প্রভাব যখন শুকতারার অন্তর স্পর্শ করেছে তখনও তার পরিধানে পিঠ-কাটা জামার মত আপত্তিজনক বেশভূষা কেন? ষ্টেশনে শুকতারাকে পৌঁছোতে বিনয় এল আর যে অর্পিতাকে নিজের যথাসর্বস্ব সে দিয়ে এলো, তাকে ষ্টেশনে দেখা গেল না কেন? অর্পিতার মা হৃদয়হীনা হতে পারেন তবে তার বাবা তো স্নেহশীল বলেই দেখে এসেছি। তিনিই বা নিরুদ্দিষ্টা মেয়ের খোঁজ করলেন না কেন? চিত্র গ্রহণের কাজে সুধীর বসু প্রশংসার্হ। অভিনয়ে একটি ছোট ভূমিকায় সকলকে অতিক্রম করে গেছেন অসাধারণ অভিনেতা ছবি বিশ্বাস। সুমিত্রা দেবী মনে ছাপ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন। বসন্ত চৌধুরীর অভিনয় খুব একটা রেখাপাত করে না। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার ও চন্দ্রা দেবীর অভিনয় প্রাণ স্পর্শ করে। নবাগতা সুমালা চট্টোপাধ্যায়কে ভালো লাগবে, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ। এ ছাড়া কমল মিত্র, মোহন ঘোষাল, (ছবির প্রচার বিভাগ বড় চমৎকার ব্যবহার করেছেন এই শিল্পীটির সঙ্গে) পদ্মা দেবী, অপর্ণা দেবী, বিভু ও গীতা সু-অভিনয়ই করেছেন। এঁরা ছাড়াও ভূমিকালিপিতে আছেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় শ্যাম লাহা, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, বেচু সিংহ, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, বাণী গঙ্গোপাধ্যায় ও রাজলক্ষ্মী। সবচেয়ে দুর্বিষহ ও বিরক্তিকর অভিনয় করেছেন সবিতা চট্টোপাধ্যায়।

নতুন প্রভাত

বিকাশ রায়ের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবার তাঁর লেখনীর সঙ্গেও পরিচিত হলেন দর্শক-সাধারণ। এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিকাশ রায় রচনা করেছেন এর কাহিনী। কতকগুলি রোগীকে কেন্দ্র করে এক ডাক্তার ও তার চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের গল্প। আছে জনসেবার সুমহান প্রচার, তারই সাথে জুড়ে আছে প্রেম, সংঘাত, মিলন, বিয়োগ। রোগীর অন্তরের অনুভূতি, ভাব ও তার বহিঃপ্রকাশ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন বিকাশ রায়। রোগীর অসহায়তার প্রতি তার সমবেদনা এখানে সুপরিস্ফুট। বাঙলা ছবির কাহিনীর মধ্যে গতানুগতিকতা ভেদ করে নতুন নতুন পথের যে নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে, সেই নব বার্তাবাহীদের মধ্যে নতুন প্রভাতেরও স্থান হবে নিরূপিত। ডাক্তার অনিল ঘোষের চিকিৎসাশ্রমে দেখা যাচ্ছে হরেন মাষ্টারকে, দারিদ্র্যের নিষ্পেষনে শুধুমাত্র আশার আলোয় যে ক্রসওয়ার্ড নিয়ে পাগল, অরুণকে, বৌ-পাগলা লোক অথচ স্ত্রীর সাধারণ ঠাট্টাকে যে গভীর ভাবে গ্রহণ করে, রমাকে, সীতাকে, ডাক্তারের অন্তরে যে মেলাতে চায় অন্তর, আনন্দকে, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা একটি কিশোর বালক সব কিছুর উপর যে বলতে চায় যে দুনিয়ায় টাকার উপরেও আছে, অনেক কিছু আছে স্নেহ-মায়া-মমতা-হাসি-গান-কবিতা। পার্থিব শোক দুঃখ জয়ের মূর্ততম প্রতিমূর্তি তার জনক-জননীকে। সোমেশ্বর কে, সবদিক দিয়ে একটি কৃতী ছেলে একটি অসম্ভব ঘা খেয়ে যে ভাবে

তিলে তিলে এগিয়ে যায় ক্ষয়ের দিকে, তারই যেন ব্যক্তিরূপ। ডাক্তার ব্যানার্জীকে, হাস্যরসিক ও হৃদয়বান এক চিকিৎসককে, সীতাকে, ডাক্তারশিষ্য রমেশের প্রেয়সী অথচ সীতা চায় ডাক্তারকে, পরে ডাক্তারই তাকে আত্মহত্যার হাত থেকে উদ্ধার করে তার ভুল ভেঙে দেয়, ডাক্তার চায় রমাকে, রমা চায় সোমেশ্বরকে, পায়ও। ডাক্তার নিমগ্ন থেকে যায় জীবসেবার মহান তপস্যায়। ছবিতে ডাঃ ব্যানার্জীকে দিয়ে ঐ রকম হাস্যরসের অবতারণা করে চরিত্রটির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে বলে মনে হয়। প্রিয়তমের গুরুকে প্রেম নিবেদন কি রকম যেন বিসদৃশ লাগে। অরুণ ও আশার মধ্যে কি ভুল বোঝাবুঝিই লাভ করল চিরস্থায়িত্ব? ছবির আরম্ভ ও শেষ অপূর্ব ভাবগম্ভীর পরিবেশে সূচিত হয়েছে। অনিল গুপ্তের চিত্র গ্রহণ চমৎকার অভিনয়ে ছোট একটি চরিত্রে অপূর্ব সংবেদনশীল ও সংযত অভিনয় করে গেছেন ছবি বিশ্বাস ও অপর্ণা দেবী। পুত্রবিয়োগের বেদনা মর্মে মর্মে বাজছে অথচ সমস্ত দুঃখ তাঁর পায়ে নিবেদন করার সেই দৃঢ়তা, অপূর্ব ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এঁরা। অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়। অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসি ও কান্না তিনি একাধারে গেলেন পরিবেশন করে। ক্লাসওয়ার্ডের সমস্যায় হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছেন, আবার দরিদ্র শিক্ষকের ততোধিক দরিদ্র পরিবারবর্গের অসহায় কাতর অবস্থার উল্লেখে সকলের চক্ষু সজল করে তুলেছেন। অনেক দিন বাদে দেখা দিয়ে প্রাণমাতানো অভিনয় করে গেছেন নীরেন ভট্টাচার্য। ছবির নায়ক না হলেও ছবির প্রাণ তিনি। নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নিজের চরিত্রটি। অল্প সুযোগে যথেষ্ট পরিমাণে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বাঙলার অসামান্যা অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, সন্ধ্যারাণী, তপতী ঘোষের অভিনয়ও অন্তর স্পর্শ করে। এঁরা ছাড়া রূপায়ণে আছেন কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাগতা চক্রবর্তী, শুক্লা দাস, সীতা সেনগুপ্তা, সন্ধ্যা দেবী ও মায়া ভট্টাচার্য।

ক্ষুধা

বিশ্বরূপার নবতম নাট্যার্ঘ 'ক্ষুধা'। সমস্যাসঙ্কুল বাষ্পাচ্ছন্ন আজকের পৃথিবীতে জীবনের একটি বিশাল অংশ জুড়ে আজ প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে এক বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, ক্ষুদ্র আয়তন থেকে আজ তা বিশালত্বের দিকে এগিয়ে চলছে। পেটের ক্ষুধা থেকে যে প্রশ্নের উদ্ভব, তার পরিণতি গিয়ে দাঁড়াচ্ছে বাঁচার ক্ষুধায়। বিধায়ক ভট্টাচার্য এই নাটকে একটি সুন্দর ও জোরালো বক্তব্য পেশ করেছেন। বর্তমান যুগের সময়োপযোগী নাটক হিসাবে ক্ষুধার নাট্যমূল্য যথেষ্ট। নাটকটি অপূর্বত্ব লাভ করেছে শ্রদ্ধেয় নটশেখর নরেশচন্দ্রের সুপরিচালনায়। নরেশচন্দ্রের সুনিপুণ স্পর্শ প্রভাবে এক বিশিষ্টতা লাভে সমর্থ হয়েছে এই নাটকখানি! মানুষের সঙ্গে মানুষের যে রক্তের টান অর্থের মাপদণ্ডেরও উপরে, সেই বক্তব্যই প্রচার করা হয়েছে। অধ্যাপক চরিত্রটি অপূর্ব। সন্দেশ দিয়ে মোড়া চাবুক

ব্যবহার করা হয়েছে এই চরিত্রে। আজ ঠুনকো আভিজাত্যের তাসের ঘর আঁকড়ে থাকার চেয়ে বেঁচে থাকার যে বিরাট আহ্বান ঘরে ঘরে শোনা যাচ্ছে সেই পটভূমিকায় রচিত এই নাটকটির আবেদন সকলকে আকর্ষণ করুক, এই কামনা করি। অভিনয়ে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া বসন্ত চৌধুরী, তরুণকুমার, বিমান বন্দ্যোঃ, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজু ভাওয়াল, সন্তোষ সিংহ, নবদ্বীপ হালদার, মণি শ্রীমানী, জয়শ্রী সেন, সুব্রতা সেন প্রভৃতিও সুঅভিনয় করেছেন। শান্তি গুপ্তা ও তপতী ঘোষ দরদ দিয়ে নিজেদের চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলতে সমর্থা হয়েছেন।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

চিত্রামোদীদের কাছে অশোককুমারের সুযোগ্য অনুজ কিশোরকুমারের নাম আর অজানা নেই। বোম্বাইয়ে আজ যাঁরা বাঙলার মুখ উজ্জ্বল করছেন, নিঃসংশয়ে তাঁদের মধ্যে কিশোরের নাম উল্লেখ করা যায়। প্রতিভাবান অভিনেতা কিশোরকুমার এবারে বাঙলায় একটি ছবি প্রযোজনা করবেন। পরিচালনা করবেন কাহিনীকার কমল মজুমদার। ছবিটির নাম লুকোচুরি। সঙ্গীতের ভার পেয়েছেন হেমন্তকুমার। রূপায়ণে থাকছেন কিশোর নিজে এবং অনুপকুমার, বিপিন গুপ্ত, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মালা সিনহা, কমলা মুখোপাধ্যায়, সতী, সীতা, পুরবী ও রাজলক্ষ্মী (বড়)।···
প্রখ্যাত সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় রায়ের আগামী অবদান কাঁচামিঠে। সুহৃদ ঘোষ ঘোরাচ্ছেন ক্যামেরার হাতল। অভিনয় করছেন ছবি বিশ্বাস, রবীন মজুমদার, অনুপকুমার, জীবেন বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, বিনতা রায়, নীলিমা দাস, শুক্লা দাস প্রভৃতি।···
'পথে হল দেরী' ছবিটি সম্পূর্ণ রঙীন প্রথম বাঙলা ছবি। রূপায়ণে উত্তম-সুচিত্রা সহযোগে থাকছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, অনুপকুমার, মিহির ভট্টাচার্য, জহর রায়, শ্যাম লাহা, চন্দ্রাবতী, শোভা সেন, ভারতী দেবী, চিত্রিতা মণ্ডল প্রমুখ কৃতী শিল্পিগণ। কাহিনীটি রচনা করেছেন প্রখ্যাতা লেখিকা প্রতিভা বসু।···
বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বন করে মা লক্ষ্মী ছবিটি পরিচালনা করছেন হরি ভঞ্জ। রূপ দিচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, গঙ্গাপদ বসু, মলিনা দেবী, সন্ধ্যারাণী, জয়শ্রী সেন ও শিখা বাগ প্রভৃতি।

মানবদেহের অভ্যন্তরে

বাইরে থেকে মানুষের দেহ কাঠামোটি নিশ্চয়ই যথেষ্ট সুঠাম সুন্দর। কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে যে যন্ত্রাদি ও উপাদান রয়েছে সে সকলের খবর আমাদের ক'জনারই বা জানা? শুনলে আশ্চর্য্য ঠেকবে—মানবশরীরে যে জলীয় অংশ রয়েছে, তার গড়পড়তা পরিমাণ প্রায় ১০ গ্যালন। 'ফ্যাট' বা চর্ব্বিজাতীয় উপাদান যা রয়েছে, ওতে সাবানের প্রায় সাতটি 'বার' তৈরী সম্ভবপর। 'কার্বন' গড়পড়তা যা আছে, কমপক্ষে ৯ হাজার লেড পেন্সিল তৈরী করা চলতে পারে তা' দিয়ে। দেহের অভ্যন্তস্থ 'ফসফরাস' এর পরিমাণও এত বেশী যে, ওতে দুই সহস্রাধিক দে'শলাই তৈরী সম্ভব।

এইটি হ'ল উপাদানের পরিমাণের দিক থেকে একটি বুঝবার মতো হিসেব। সংখ্যার দিক থেকে হিসেব শুনলে আরও অবাক হয়ে যাওয়া ভিন্ন উপায় নেই। মনুষ্য-শরীরের একটি অপরিহার্য্য উপাদান রক্ত—একথা সকলেরই জানা। কিন্তু ক'জনার জানা আছে—নরদেহে অক্সিজেন আহরণ উপযোগী যে লাল রক্তকণিকা রয়েছে, উহার সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ কোটি? এগুলোকে যদি কোন সমতলক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে ওরা প্রায় ৩৩ শত বর্গগজ স্থান জুড়ে ফেলবে। মেরুদণ্ড ও হাড়ের কাঠামোর উপরই মানবদেহ দাঁড়িয়ে—কিন্তু ছোট-বড় হাড়ের সংখ্যা কি একটি দুটি? শৈশবাবস্থায় এক একটি দেহ-কাঠামোতে হাড় থাকে অন্ততঃ ২৭০টি। তার পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো হাড় আপনি জুড়ে যায় এবং এর ফলে সংখ্যা স্বভাবতঃই কিছুটা কমে আসে। তথাপি অবশ্য প্রায় ২০৬টি হাড় খুঁজে পাওয়া যাবে প্রতিটি মনুষ্য-শরীরে। হাড়গুলো একে অন্য থেকে ঠিক আলাদা আলাদা নয়—দড়ির মত একটি জিনিস, যাকে বলা হয় সংযোজক তন্তু এই দিয়ে এদের একটির সঙ্গে আর একটি যুক্ত।

এখন মানুষের হৃদ্‌স্পন্দনের সংখ্যাটা একবার তলিয়ে দেখা যাক্। সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে স্পন্দন হয় ৭০।৭২ বার এবং এই হিসেবে একটি মানুষ যদি ৭২ বছর বেঁচে থাকতে পারলো, তবে কম পক্ষে তার হৃদ্‌স্পন্দন হবে ২৬০ কোটি বার। অপর দিকে এই স্পন্দনের ফাঁকে মানুষের শিরা-উপশিরায় যে রক্ত সঞ্চালিত হবে, তার পরিমাণ প্রায় ২৭ কোটি পাইণ্ট। মানুষের মাথায় কত সংখ্যক চুল আছে, এর সঠিক হিসেব কখনই প্রায় হয় না। একটি হিসেবে অবশ্য দাবী করা হয়েছে—মাথার চুল এক লক্ষ ২০ হাজার থেকে এক লক্ষ ৪০ হাজারের মধ্যে। মানুষের নখ কতটা করে বাড়ে, খতিয়ে দেখা হয়েছে সেইটিও। আঙুলের নখ বৃদ্ধি পায় বছরে দেড় ইঞ্চি করে এবং এর অর্থই হচ্ছে একজন মানুষের জীবনে হাতের নখ যদি কখনই কর্ত্তিত না হ'ল, তবে সেই নখ বেড়ে হবে ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি। এমনি করে আরও কত হিসেব বা গবেষণাই চলতে পারে মানব দেহের যন্ত্রপাতি নিয়ে, যা' অবহিত হয়ে বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতা কেন ?

"এই বৎসর আই-এ পরীক্ষায় শতকরা ৪৬'২ এবং আই-এস্‌সি পরীক্ষায় শতকরা ৪১'৩ জন পাশ করিয়াছে। অর্থাৎ পাশের অপেক্ষা ফেলের সংখ্যা অধিক। এরূপ হবার কারণ কি? এতগুলি ছাত্র-ছাত্রীর একটি বৎসর নষ্ট হইল, তাহাদের অভিভাবকদের এত অর্থদণ্ড গেল কেন? এই বৎসর প্রশ্নপত্র যে কঠিন হইয়াছে, এরূপ অভিযোগ ছাত্রেরাও করে নাই। শোনা যাইতেছে যে, ইংরেজীর জন্য এত অধিক সংখ্যক ছাত্র ফেল করিয়াছে। অধিকাংশ পরীক্ষকের মত এই যে, ছাত্রেরা ইংরেজী ভাল করিয়া বোঝে না এবং ইংরেজী ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু কলেজে প্রায় সব বিষয়ই ইংরেজীতে পড়ান হয় এবং অধিকাংশ ছাত্র ইংরেজীতে উত্তর লেখে। ফলে ক্লাসে কি পড়ান হয়, তাহাও তাহারা বোঝে না এবং কি উত্তর লিখিতেছে তাহাও তাহারা জানে না। এই ভাবে বৎসরের পর বৎসর ছাত্রেরা ফেল করিয়া চলিয়াছে। এ সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার মান উন্নত না করিলে কলেজের শিক্ষার মান উন্নত হইতে পারে না এবং পাশের হারও বাড়িতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, স্কুলে ছাত্রেরা মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়াশুনা করিয়াছে, হঠাৎ কলেজে আসিয়া ইংরেজীতে পড়া তাহাদের পক্ষে অসুবিধা সৃষ্টি করে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে অনেকটা সুফল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।"

—দৈনিক বসুমতী।

আবহ সংবাদ

"কিন্তু একটি বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ আছে। ভারতের আবহাওয়া অফিসগুলির কর্মপদ্ধতি এবং যন্ত্রোপকরণের মধ্যে আধুনিকতম সৌষ্ঠবের অভাব নাই তো? উন্নত দেশগুলিতে আবহ বিভাগ দেশের কৃষির প্রতি বিশেষ দায়িত্বশীলতা বহন করে আবহ বিভাগের প্রচারিত তথ্যের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়া সেই সব দেশের কৃষিকার্য পরিচালিত হইয়া থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, আবহ বিভাগের সহযোগিতায় কৃষিকার্য সুষ্ঠুতর ভাবে পরিচালিত হইবার সুযোগ পায়। তাহা ছাড়া, বাণিজ্য এবং শিল্পগত উদ্যোগের সহিত আবহ বিভাগের সংগৃহীত, অনুমিত ও প্রচারিত তথ্যের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আছে। আবহবিদ বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতিগত যেসব তথ্য প্রচার করেন, তাহাই স্মরণে রাখিয়া দেশের নৌ-চলাচল, বিমান চলাচল এবং জাহাজের সমুদ্রযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। শুনিয়াছি, ১১৪২ সালের অক্টোবরে সমুদ্রের যে জলোচ্ছ্বাসে মেদিনীপুর ভয়াবহ ভাবে প্লাবিত হইয়াছিল, সেই জলোচ্ছ্বাসের আসন্নতার ইঙ্গিত এবং সতর্কতার নোটিশ যথাসময়ে প্রচারিত হইবার সুযোগ পায় নাই। যথাসময়ে সেই 'পূর্বাভাস' প্রচারিত হইলে অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচিত। আবহ বৈজ্ঞানিকদিগের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ভারতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং এই অভিযোগ করা যায় না যে, আবহ বিজ্ঞানের গুরুত্ব এবং আবহ পর্যবেক্ষণাগারগুলির উন্নতি সাধনের গুরুত্ব সম্বন্ধে দেশের সরকার সচেতন নহেন। কিন্তু সচেতনতা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে বিশেষ কোন উন্নয়নের উদ্যোগ হইয়াছে কি না জানি না। আবহাওয়া অফিসগুলির কাজ সেই পুরাতন গতানুগতিক পদ্ধতিতেই চলিতেছে কি? আবহ বিজ্ঞানের আধুনিকতম রীতিনীতি ও পদ্ধতি-সমূহ ভারতের আবহ বিভাগের কর্মক্ষেত্রে প্রচলিত হইয়াছে কি? প্রশ্নটি এই কারণে উত্থাপন করিতে হইতেছে যে, পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়নে অগ্রসর ভারতের কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে যথোচিত সুষ্ঠু আবহ তথ্যের প্রয়োজন বিশেষ গুরুত্ব লইয়া দেখা দিয়াছে"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

বাস্তুহারা সমস্যা

"অদ্য শনিবার অপরাহ্নে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া উদ্বাস্তু পুনর্বসতির প্রশ্নটি আর একবার আদ্যন্ত যাচাইয়া দেখিবেন এবং কেন্দ্রীয় পুনর্বসতি মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না তথায় উপস্থিত থাকিবেন, এ সংবাদে সবাই প্রীত হইবেন। সাধারণ নির্বাচনের পর এই প্রথম কংগ্রেসের সরকারী ও বেসরকারী মহল একত্র মিলিত হইতেছেন, সুতরাং সবাই এই আশাই করিবেন যে, আলোচ্য সম্মেলনে যে সব সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তাহা একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করিবে। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বসতি সমস্যাটির সার্থক ও সন্তোষজনক সমাধান আজ পর্যন্ত হইতে পারে নাই, ইহা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে বাস্তবিকই বিশেষ উদ্বেগজনক। বলাই বাহুল্য, আজ পর্যন্ত এই খাতে অর্থও ব্যয় হইয়াছে প্রচুর, প্রয়াস প্রচেষ্টাও কম হয় নাই, কিন্তু উদ্বাস্তুদের বৃহত্তর অংশকেই এখনো স্থিতিশীল গৃহস্থে পরিণত করা যায় নাই বা সমাজজীবনের পক্ষে উপযোগী করিয়াও তোলা যায় নাই। এই কাজ কি ভাবে ত্বরান্বিত ও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করা যাইতে পারে, আলোচ্য সম্মেলনে আশা করি সে সম্বন্ধে বাস্তবতাসম্মত উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিবেন। আসলে নির্দিষ্ট বাসস্থান, অনুকূল আবেষ্টনী ও স্বাবলম্বী হওয়ার মতো জীবিকা, এই তিন দিকের সমীকরণের উপরই পূর্ণাঙ্গ পুনর্বসতির সফলতা নির্ভর করে। ক্যাম্পে রাখিয়া খয়রাতি সাহায্যের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখা, অথবা পরিকল্পনাহীন ভাবে বাংলার বাহিরে পাঠানোর দ্বারা যে জটিলতাই বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা সকলেরই অভিজ্ঞতা। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সার্থক ও বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের পথ বাহির করুন, ইহাই আমরা আন্তরিক ভাবে কামনা করি।"

—যুগান্তর।

ডাকঘরের দুরবস্থা

"ইদানীং পোষ্ট অফিসগুলিতে ডাকের চিঠিপত্রও টেলিগ্রামাদি বিলির কার্য্যে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। এই তমলুক সহরেই দেখি, আজের টেলিগ্রাম কাল পৌছিতেছে, চিঠিপত্র বেলা ১২টার পূর্ব্বে পাওয়া ভাগ্যের কথা, সময়ে সময়ে তাহা পাইতে বিকাল ৪টা ৫টাও হইয়া যায়। তাহাতেও আবার রামের চিঠি শ্যামের কাছে এবং শ্যামের চিঠি যদুর নিকট যাওয়াও বিচিত্র নহে। সহরেই যদি এই অনিয়ম চলে তবে মফঃস্বলের দুরবস্থা সহজেই অনুমেয়। স্পষ্টতঃই বুঝা যায় ডাক বিভাগে আর সে আগের নিয়মানুবর্ত্তিতা বা কর্ম্মনিষ্ঠা নাই। সেদিন যুগান্তরেও দেখা গেল যে কলিকাতার বিখ্যাত জেনারেল পোষ্টঅফিসেও কর্ম্মশৈথিল্য ঢুকিয়াছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে স্থানীয় পোষ্ট অফিসে খোঁজ লইলে জানা যায় তাঁহাদের যথেষ্ট সংখ্যক কর্ম্মী নাই। নূতন নূতন যাহাদের কাজে লাগানো হইয়াছে তাহাদেরও যথোপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা বা কর্ম্মনিষ্ঠার অভাব রহিয়াছে। ফলে চিঠি বাছাই ইত্যাদিতে বিলম্ব হয়। তারপর কাহারও অসুখ-বিসুখ হইলে ত আর কথাই নাই; দুই জনের কাজ এক জনকে করিতে হয়, তখন অসুবিধা চরমে উঠে, এবং জনসাধারণও তাহার জন্য ফলভোগ করে। সরকার দিন দিন পোষ্ট অফিসের সংখ্যা বাড়াইয়া বাহাদুরী লইতে চান। কিন্তু কাজের মান বাড়ানো দূরে থাক অন্ততঃ পূর্ব্বমান বজায় রাখার দিকে দৃষ্টি কোথায়? এই সব বিশৃঙ্খলার জন্য কর্তৃপক্ষও কম দায়ী নহেন। সরকার খাম, টিকিট, রেজেষ্ট্রী প্রভৃতি সব বিষয়েই দর বাড়াইয়া চলিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত কাজ না দেওয়ার জন্য মানুষের যে অসুবিধা ও ক্ষতি হয় তাহার কৈফিয়ৎ কি?"

—প্রদীপ (তমলুক)।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

"কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ১৯৫৭-৫৮র বাজেট রাজ্যের পরিকল্পনা বাবদে ১৫ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা পাইবার কথা কিন্তু বাস্তবে ১২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে, ইহার ফলে আরও ৪ কোটির ঘাটতি পড়িবে। পশ্চিম-বাংলাবাসীর উপর মোট ৮।• কোটি টাকার মত নূতন কর চাপিবে। কারণ ডাঃ রায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যথাযোগ্য গুরুত্ব ও দৃঢ়তার সাথে রাজ্যের দাবী পেশ করেন নাই। বরং জনগণকে অধিকতর কৃচ্ছ সাধনের মামুলী উপদেশ দিয়া নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষকে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে ও সারা দেশের খাতিরে পশ্চিম বাংলার স্বার্থত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান করিয়া ডাঃ রায় কেন্দ্রের নিকট বাংলার দাবীকে দুর্ব্বল করিয়াছেন। সারা পশ্চিম বাংলাকে যিনি এই সে দিনও বিহারভুক্ত করার অপচেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। জনগণকে আজ পশ্চিম বাংলার চরম খাদ্যসঙ্কটের দ্বারে বসিয়া দেশী ধনিক শ্রেণীর শ্রেণীদল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে বিশ্লেষণ করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যে কোন প্রকারে আপাত মধুর ব্যবস্থার আড়ালে জনগণকে অধিকতর নিপীড়নের পথ পাইলে ইহারা তাহা গ্রহণে কুণ্ঠিত হইবে না।"

—বীরভূম।

অদ্ভুত মনোবৃত্তি

"রঘুনাথগঞ্জ ট্রেড কমিটির গচ্ছিত প্রায় দুই হাজার টাকা প্রস্তাবিত জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতাল ফণ্ডে দান করা সম্পর্কে স্থানীয় মহকুমা শাসকের এক প্রস্তাব বিবেচনার জন্য গত ২রা জুন উক্ত ট্রেড কমিটির এক সভা ম্যাকেঞ্জি পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে, ট্রেড কমিটির কতিপয় সদস্যের আপত্তির জন্য মহকুমা শাসক মহাশয় শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হন। মহকুমা শাসক উক্ত কমিটির প্রেসিডেণ্ট এবং সভাপতির আসন হইতে যথারীতি কোন প্রস্তাব পেশ করা হইলে ইহা সেই কমিটি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার নজির ইহাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, যাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন তন্মধ্যে উক্ত ট্রেড কমিটির সম্পাদক মহাশয় অন্যতম এবং তিনি এই শহরের একজন বিশিষ্ট ডাক্তার। এ সম্বন্ধে অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এই ট্রেড কমিটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কিছু বলা প্রয়োজন। প্রায় ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন মহকুমা শাসক শ্রীআজিজুর রহমানের উদ্যোগে এই ট্রেড কমিটি গঠিত হয় এবং তাঁহারই উদ্যোগে প্রায় ৩০০০৲ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়। এই টাকার অধিকাংশই জোগান দেন এই মহকুমার পল্লীবাসিগণ। এই টাকা প্রথমে স্থানীয় ডাকঘরে জমা না রাখিয়া জমা রাখা হয় তপশীলভুক্ত নহে এমন একটি স্থানীয় ব্যাঙ্কে। পরে এই ব্যাঙ্কটি ফেল হইলে কমিটির প্রায় ছয় শত টাকা খোয়া যায়। যাহা হউক, ইহার মধ্যে কিছু পরে খরচ করিয়া কয়েক কাঠা জমি খরিদ করা হয় এবং বাকী টাকা দীর্ঘদিন ধরিয়া স্থানীয় ডাকঘরে আমানত পড়িয়া থাকে। কমিটি আজ পর্য্যন্ত গচ্ছিত টাকা সদ্ব্যবহারের কোন চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই বা ইহাদের কোন কর্ম্মোদ্যমের লক্ষণও দেখা যায় নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ট্রেড কমিটির যে টাকা দীর্ঘদিনের মধ্যে কোন কাজে লাগান সম্ভব হয় নাই বা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নাই সে টাকাটা যদি আপাততঃ হাসপাতাল ফণ্ডে দেওয়া হইত তাহা হইলে এই শহর তথা এই মহকুমার একটি বড় অভাব দূর হইত। জনগণের অর্থ জনকল্যাণে ব্যয়িত হইলেই তাহার সার্থকতা, অনন্ত কাল ব্যাঙ্কে আমানত রাখায় ইহার কোন সার্থকতা নাই।"

—ভারতী (রঘুনাথগঞ্জ)

দুর্গাপুরের দুর্গতি

"দুর্গাপুরের লোহার কারখানার পত্তনের জন্য বহুব্যক্তির জমি ও ভিটা হারাইতে হইয়াছে। এখনও তাহাদের জন্য সরকার বিশেষ কিছুই ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমাদের অনুরোধ, সরকার ঐ সমস্ত লোকের মধ্য হইতে কারখানার জন্য উপযুক্ত লোককে, অন্য বাইরের লোক লইবার পূর্ব্বে; যেন কাজ পাইবার, প্রথম সুযোগ দেন। তাহা হইলে ঐ সমস্ত দরিদ্র ব্যক্তির গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে এবং স্থানীয় বেকার সমস্যারও কিছু সমাধান হইবে।"

—আসানসোল হিতৈষী।

কৃষ্ণমাচারীর বদান্যতা

"দুর্দান্ত জমিদার যেমন প্রজার রক্ত-নিঙড়ানো টাকায় থলি ভর্ত্তি করিয়া দুই-এক টাকা বখশিস ছুড়িয়া প্রজাবাৎসল্য দেখায় কৃষ্ণমাচারীর ট্যাক্স প্রস্তাবের পরিবর্ত্তন সেই রকমের। মধ্যবিত্ত ও গরীবের কাঁধের বোঝা ঠিকই রহিল। আমরা আগেই বলিয়াছিলাম, ট্যাক্স প্রস্তাবের নড়চড় বিশেষ হইবে না, পোষ্টকার্ডের দাম ঠিক রাখিলে এনভেলাপের দাম বাড়িবে। হইয়াছেও তাহাই। ইন্‌ল্যাণ্ড এনভেলাপের মূল্য ১৫ নয়া পইসা হইয়াছে—পুরানো ৮ পয়সারও বেশী। রেলে যাত্রীভাড়া প্রথম ১৫ মাইল পর্য্যন্ত বাড়িবে না, অর্থাৎ জেলা বা মহকুমা সহরে যাহাদের কাজেকর্ম্মে ট্রেনে যাতায়াত করিতে হয় তাহাদের বেশীর ভাগই এই সুবিধা পাইবে না। ইনকাম-ট্যাক্স তিন হাজার টাকায়ই ঠিক রহিল, তবে ছেলেমেয়ে থাকিলে ৩০০ টাকা হইতে ৬০০ টাকা পর্য্যন্ত আয়কর হইতে বাদ যাইবে। কৃষ্ণমাচারী চা ও কফির উপর বর্দ্ধিত শুল্ক প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং নূতন কোম্পানীওয়ালাদের পাঁচ বৎসরের জন্য সম্পত্তিকর হইতে রেহাই দিয়াছেন—ইহাতে উপরতলার লোকদের লাভ হইবে। মোটমাট ৭৮ কোটি টাকা ট্যাক্স হইতে মাত্র ৫ কোটি টাকা ট্যাক্স কমাইতে কৃষ্ণমাচারী রাজী হইয়াছেন। কংগ্রেসী এম-পিদের হৈচৈও বন্ধ হইয়াছে, জহরলাল এক ধমকে তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, প্ল্যান বাঁচাইবার জন্য ট্যাক্সের ষ্টীম-রোলার চালানো বন্ধ ত হইবেই না, বরং যাহাতে বেশী ট্যাক্স দিয়া দেশের লোক হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারে যে, প্ল্যান চলিতেছে তাহারই ব্যবস্থা করা হইবে। অপচয় ও দুর্নীতি বন্ধ করিয়া, নবাবী চাল একটু কমাইয়া যে অনেক টাকা বাঁচানো যায়, দু'এক টাকা ট্যাক্স কমিলেও যে গরীবেরা একটু সোয়াস্তি পায় তাহা বুঝিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত তাঁহার নাই।"

—যুগবাণী।

শুধু অবহেলা

"স্থানীয় সহরের অব্যবহৃত রাস্তাগুলি সংস্কার করিবার অভিপ্রায়ে স্থানীয় পৌরসভার পরিচালক-মণ্ডলী বিভিন্ন স্থানে খোয়া ফেলিয়া রাখিয়াছেন। সহরের জন-সাধারণ ভাবিয়াছিল যে তাঁহারা বুঝি শীঘ্রই রাস্তা সংস্কারের কার্য্য আরম্ভ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের নিষ্ক্রিয়তা জনগণকে হতাশ করিয়াছে। রাস্তার ধারে ধারে যে খোয়াগুলি পড়িয়া আছে সেগুলি লইয়া সহরের অপরিণতবুদ্ধি বালকেরা বালক-সুলভ চাপল্যে ইষ্টক নিক্ষেপ ক্রীড়ায় আনন্দ অনুভব করিতেছে। এই ভাবে খোয়াগুলির অপব্যয় ঘটাইবার যে কি কারণ তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর! আশা করি, পৌরসভার কর্তৃপক্ষ আশু রাস্তাগুলি সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়া অযথা অপচয় নিবারণ করিতে মনোযোগী হইবেন।

—ভাগীরথী, (কালনা)।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

মুলাঁ রুজ

চৈত্রের বসুমতীতে শ্রীযুত সুবীরকান্ত গুপ্ত শ্রীযুত অশোক সিংহের 'সংশোধনের' 'সংশোধন' করেছেন।

অশোক বাবু 'মুলাঁ' লিখেছেন, আর সুবীর বাবু বলছেন লেখা উচিৎ 'মুল্যাঁ' ('মু'তে উকার দু'জনাই দীর্ঘ দিয়েছেন কিন্তু সেটা ছাপার ভুলও হতে পারে। কারণ pour-এর ou-এর মত moulin-র ou দীর্ঘ নয়, হ্রস্ব—এটা অবশ্য এস্থলে অবান্তর)। সুবীর বাবু ফরাসী ভাষার অধ্যাপক, তাই একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারতেন অশোক বাবু মুলাঁ লিখেছেন কেন? তাঁর মনে মনে ভয় ছিল (এবং সেটা কিছু অসঙ্গত নয়) মুল্যাঁ লিখলে বাঙলা ভাষার রীতি অনুযায়ী লোকে পড়বে, 'মুলল্যাঁ' যে রকম আমরা 'কন্যা,' 'বন্যার' স্থলে 'ক-ন্‌না' 'ব-ন্‌না' পড়ি অর্থাৎ য ফলা থাকার দরুণ তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব করি। এই কারণেই অনেকে রমাঁ (Romain) লেখেন 'রম্যাঁ' না লিখে; যদি ও ফরাসীতে Romain (রোমবাসী, কিম্বা সাহিত্যিক Romain) এবং Roman (উপন্যাস) দুইই আছে, এবং প্রকৃত পক্ষে একটা হবে রম্যাঁ এবং অন্যটা রমাঁ। কিন্তু ঐ দ্বিত্ব উচ্চারণের ভয়ে বহু গুণী রমাঁ (রলাঁ) লিখছেন—রম্যাঁ রলাঁ না লিখে। Moulin-কে বরঞ্চ মুলাঁ উচ্চারণ করা ভালো, কিন্তু (মুল্যাঁ থেকে) মুলল্যাঁ উচ্চারণ করলে আসল উচ্চারণ থেকে আমরা অনেক দূরে চলে যাই।

Henri-এর বেলাও অশোক বাবুর ভয় ছিল আঁরি লিখলে বাঙালী 'আঁ'টাকে তার ভাষার উচ্চারণের পদ্ধতি অনুযায়ী বড্ড বেশী দীর্ঘ করে ফেলবে এবং ফরাসীতে ঐ জায়গাটার 'en'-টি অতিশয় হ্রস্ব, প্রায় 'le'-এর 'e'-র মত (ফরাসীতে যে 'a' হরফের দু রকম উচ্চারণ—হ্রস্ব দীর্ঘ নয়, সে তো আছেই—একটা মুখ-গহ্বরের সামনের দ্বিতীয়টা পিছনের এবং Henri শব্দের enটা পিছনের অনুনাসিক a)। অবশ্য অশোক বাবু চিন্তা করলে ভালো করতেন যে 'অঁরি' লিখলে বাঙালী তার ভাষার প্রথা অনুযায়ী উচ্চারণ করে বসবে ওঁরি (যেমন 'কলি' হয় 'কোলি,' 'বলি' হয় 'বোলি') এবং সেটা ফরাসীর আসল উচ্চারণ থেকে এত দূরে চলে যাবে যে তার চেয়ে 'আঁরি' ভালো।

কাজেই এসব (সুবীর বাবুর অভিমত অনুযায়ী) 'ভুল' নয়, উনিশ-বিশের তফাৎ। কারণ, তিনি নিজেই চরম সত্যটি বলে দিয়েছেন—'সব ফরাসী শব্দের যথার্থ উচ্চারণ বাঙলায় লেখা সম্ভব নয়।' 'ত্যাঁবুর্যাঁ' বেলাও তাই হয়েছে। 'tam'-এর am এত হ্রস্ব, একেবারে Henri-র 'en'-এর মত যে অশোক বাবু এস্থলে ত্যাঁ (য ফলা ও আকার) দিয়েছেন। আবার সুবীর বাবুর 'তাঁবুর্যাঁ' বাঙলায় উচ্চারিত হয়ে যাবে 'তাঁবুর্‌রাঁ'!—খামখা একটা ফালতো 'র' এসে যাবে। (উভয়েই 'বু' দিয়েছেন হ্রস্ব; ওটা কি 'বূ' দীর্ঘ হবে না?)

কিন্তু R-এর উচ্চারণ সম্বন্ধে সুবীর বাবু যা বলেছেন সে বিষয়ে আমার মনে কিঞ্চিৎ ধোঁকা আছে। 'ওরা R উচ্চারণ করে গলার ভেতর থেকে, জিভ থেকে নয়'—তা হলে প্রশ্ন—জিভ কেটে ফেললে কি ফরাসী R তখনো বলা যাবে? আর বাঙালীর গলা বন্ধ করে দিলে কি সে শুদ্ধ জিভে জোরে বাঙলা R বলতে পারবে। কিন্তু, 'আ' এবং 'রা' দুটোই তো 'গলা থেকে' বেরয়—তফাৎ তবে কোথায়?

অপরঞ্চ, দক্ষিণ ফ্রান্সের লোক আমাদের 'র'-র মতই R উচ্চারণ করে—তবে আমাদের মত অতখানি 'ট্রিল' করে না। প্যারিসের লোক কি ভাবে করে? 'জিভ থেকে নয়' 'গলার ভিতর থেকে' বললেই যদি মুশকিল আসান হয়ে যেত তবে তো কোনো কথাই ছিল না।

সর্বশেষে বক্তব্য, 'লো'-তে 'একার' ও 'য' ফলার সমন্বয়ে বাঙালী কি উচ্চারণ করতে কি যে করবে, তার ঠিক নেই; কারণ বাঙলাতে এ সমন্বয় থাকলেও আমাদের চোখে পড়ে নি।

—সৈয়দ মুজতবা আলী

স্বামী বিবেকানন্দ ও দিব্যভারত

গত মাঘ সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে "স্বামী বিবেকানন্দ ও দিব্যভারত" প্রবন্ধটিতে শ্রীনিত্যগোপাল রায় মহাশয় যে মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন—তন্মধ্যে এক স্থানে বলেছেন—"বুদ্ধ হইতে শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত সকলেই অনেকাংশে শ্রীকৃষ্ণের বিপরীতধর্মী অর্থাৎ antithesis, স্বামীজী এই বিপরীত ভাব বিদূরিত করিয়া একটা সমন্বয় (Synthesis) আনিলেন।"—কথাটা সমর্থনযোগ্য নয়। বরং শ্রীকৃষ্ণ-পরবর্তী বুদ্ধ শংকর চৈতন্য প্রভৃতি অবতার প্রতিম মহাপুরুষগণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন ভাব—বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ বলা যায়।

শ্রীবুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ত্যাগ-বৈরাগ্য, শংকরে জ্ঞান ও শ্রীচৈতন্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম যেন পূর্ণ মহিমায় প্রকট হোয়েছিল বস্তুতঃ, এঁরা সবাই ছিলেন সমন্বয়-ধর্মী। প্রকৃত ধর্মের আদর্শই এই সমন্বয়। ধর্মই সকল যুগে সকল ভাব-সংঘাত বা বৈপরীত্যকে (antithesis) একাদর্শে সমন্বিত করে। শ্রীবুদ্ধ-শংকর-শ্রীচৈতন্য

এই সমন্বয়ের আদর্শ রূপায়িত। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে এই সমন্বয়ই মহাসমন্বয়ে পরিপূর্ণ। তাই স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে "অবতার-বরিষ্ঠায়" বলে ঘোষণা করেছেন। লেখক অন্যত্র শ্রীবুদ্ধ শংকর ও শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে যে নেতিবাদের (negativism) কথা বলেছেন এটাও ঠিক বলা চলে না। এঁরা কেউই নেতিবাদের প্রচারক ছিলেন না। বরং এঁরা সবাই ছিলেন ইতি-বাদেরই প্রচারক। শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ-বাদ, শংকরের ব্রহ্মবাদ, শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদ মূলত: একই প্রচারণা—একই মহা হওয়ার বাণী।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে "ব্রহ্মনির্ব্বাণে"র কথা বলেছেন—উহাই শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ, শংকরের ব্রহ্ম, ও শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদ দর্শন। শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ বস্তুত: নাস্তিবাচক (anhilation) নয়। শংকরের মায়াবাদও নিছক ভ্রান্তি (illusion) বা অধ্যাস (projection) নয়। উহা ব্রহ্মবাদেরই অভিনব রূপে সংস্থাপন মাত্র। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মও নেতিবাদমূলক নয় বরং ইতিবাদ-মূলক। কারণ বৈষ্ণবের বৈরাগ্যের আদর্শই কৃষ্ণপ্রেম। কৃষ্ণপ্রেম কখনও নেতিবাদের সমর্থক নয়। বৈরাগ্যের তাৎপর্য রাগ-বিহীনতা। প্রবৃত্তির রাগরঞ্জনে রঞ্জিত না হওয়াই প্রকৃত বৈরাগ্য। উহা কখনই (negativism) নয়।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, শ্রীবুদ্ধ শংকর ও শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণের লীলাবসানের পরে তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের দ্বারাই এই নেতিবাদ প্রচারিত হয়। যার ফলে বুদ্ধের নির্ব্বাণ, শংকরের মায়া, শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি একটা বিরাট বিকৃতি এনে দিল জনসাধারণের মনে ও মগজে। ধর্মের নামে, প্রেমভক্তির নামে ক্লীবতা, জড়তায় ডুবে গেল সারা দেশ। ইতিবাদের পরিবর্ত্তে নেতিবাদই হোয়ে উঠল প্রবল। এ জন্য দায়ী শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য-অনুগামী অগণিত শিষ্য বা ভক্তের দল। এ সম্বন্ধে লেখক রায় মহাশয় নূতন কিছু জানালে সুখী হবো। শ্রীহিরণ্ময় মুন্সী, পোঃ জগতাই।

কিনতে চাই

১৩৬২ সালের বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত মাসিক বসুমতী।—দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩ নং লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জ্জী রোড। কলিকাতা ৬।

১৩৬৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা চাই।—সমীর দে। ২৭ সি বিডন রো। কলিকাতা ৬।

১৩৬২ সালের বৈশাখ ও ১৩৬৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যা চাই।—অনিমা সেন। ৭৭, নতুন চটি। বাঁকুড়া।

১৩৬৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা চাই।—আশরাফ সিদ্দিকী। ৩৭, দেওয়ান বাজার রোড। ঢাকা। পাকিস্থান।

১৩৫৫ সালের বৈশাখ থেকে শ্রাবণ, পৌষ, এবং চৈত্র। ১৩৫৬র ফাল্গুন, ১৩৫৮র ফাল্গুন, এবং ১৩৫১এর আষাঢ় এবং ফাল্গুন।—সন্তোষ পাল। Chengmari Tea Estate. Dalcheng P. O.

বেচতে চাই

১৩৫৭ সাল থেকে ১৩৬২ সাল পর্য্যন্ত পত্রিকার পুরা সেট। মূল্য যথাক্রমে ছয়, নয় এবং বারো টাকা। এক সঙ্গে লইলে ছয় টাকা দাম কম হইবে। ননীলাল দত্ত। ৬০, কৈবর্ত্ত পাড়া লেন। শালিখা। হাওড়া।

১৩৬০ সালের আষাঢ় ও ভাদ্র ছাড়া সবগুলি সংখ্যা। মূল্য প্রতি সংখ্যা এক টাকা। ভিঃ পিঃতে পাঠানো যাবে। গোপালচন্দ্র পাল। গাজিপুর। হাওড়া।

১৩৪৭ হইতে১৩৬১ সাল পর্য্যন্ত পত্রিকা বেচতে চাই। পুষ্পলতা ব্যানার্জী। ৪৬ চিন্তামণি দে রোড। হাওড়া।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

আমার প্রিয় পত্রিকার জন্য এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক বৈশাখ সংখ্যা সত্বর পাঠাইবেন। ইতি—মায়া দেবী। Garganda Tea Estate. Ramjhora (Dooars).

Remitting Rs 15/- only being the amount of yearly subscription for the year 1364 B. S. please send the paper regularly and oblige.—Nilima Bose. C/o, B. M. Bose. Asst. Manager, Halmari T. E.

১৩৬৪ সালের গ্রাহকমূল্য পাঠাইলাম। নিয়মিত ভাবে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি—Sm. Rajlakshmi Kar. 8, Goode Road. Darjeeling.

১৩৬৪ সালের মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া বৈশাখ মাস হইতে উপরিউক্ত ঠিকানায় বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—বাণী রায়। 35/B, Nizamuddin West, New Delhi—13.

Rs 15/- being the subscription of M. Basumati for the current year is remitted herewith. I shall be glad if you would enlist my name for this year also and arrange to send the subsequent copy of the 'Basumati' at an early date.—Lila Lahiri. Coal Survey Station. Bilaspur P. O. M. P.

মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হওয়ার জন্য ছয় মাসের চাঁদা ডাকে পাঠাইলাম। পত্রিকা সত্বর পাঠাইবেন।—রাজলক্ষ্মী মুখোপাধ্যায়। C/o, Ramranjan Mukherjee. Dept of Ins. Govt of India. Simla Hills.

আমি আপনাদের মাসিক বসুমতীর একজন গ্রাহিকা হিসাবে ছয় মাসের বসুমতীর জন্য অগ্রিম সাড়ে সাত টাকা পাঠাইলাম। —শ্রীশকুন্তলাকুমারী দেবী। Po. Jiaganj, Murshidabad.

১৫৲ টাকা পাঠালাম। ১৩৬৪ সালের মাসিক বসুমতীর জন্য। অবিলম্বে পত্রিকা পাঠাবেন।—Devrani Choudhuri, 26. Wakdewadi Poona 5.

Being subscription for the year commencing 1st Baisakh to 31st Chaitra. Please start issuing the magazine regularly.—Mrs. Gita Banerjee, 15/95, Civil Lines. Kanpur.

বসুমতীর জন্য ৭।০ টাকা পাঠাইলাম। নানা কারণে দেরী হইয়া গেল। আশা করি বই সত্বর পাইব।—সুমিত্রা দাশগুপ্তা। Quinton Road, Shillong (Assam).

হাট-বাজার

রবিন্দ দত্ত অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৬শ বর্ষ—আষাঢ়, ১৩৬৪] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

সকল উপাসনার সার এই—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ-সাধন। যিনি দরিদ্র, দুর্বল, রোগী সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্ত্তকমাত্র। যে ব্যক্তি জাতিধর্মনির্বিশেষে একটি দরিদ্র ব্যক্তিকেও সেবা করে, তাহার প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন।

যিনি পিতাকে সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের সেবা অগ্রে করিতে হইবে। যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের সেবা সর্বাগ্রে করিতে হইবে—অগ্রে জগতের জীবগণের সেবা করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা ভগবানের দাসগণের সেবা করেন, তাঁহারাই ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ দাস; অতএব এইটি সর্বদা স্মরণ রাখিবে।

আমি তোমাদিগকে আবার বলিতেছি, তোমাদিগকে শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে এবং যে কেহ তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, যথাসাধ্য তাহার সেবা করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে পরের সেবা শুভ কর্ম। এই সৎকর্মবলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব রহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন। তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। যদি দর্পণের উপর ধূলি ও ময়লা থাকে, তবে তাহাতে আমরা আমাদের মূর্তি দেখতে পাই না। আমাদের হৃদয়-দর্পণেও এইরূপ অজ্ঞান ও পাপের ময়লা রহিয়াছে।

গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান—কায়মনোবাক্যে 'জগদ্ধিতায়' দিতে হইবে। পড়িয়াছ, "মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব", আমি বলি, "দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব",—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।

আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, আমি মানুষকে বিশ্বাস করি; দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত হওয়া আমি খুব বড় কাজ বলিয়া বিশ্বাস করি।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সংস্কৃতি ও বাঙ্গালী

শ্রীদেবব্রত সেন

আমাদের ব্যবহারিক সত্তায় একটা দ্বিমুখী প্রবৃত্তি ধরা পড়ে। এক দিকে মহত্তের আকর্ষণ—আর, অন্য দিকে ক্ষুদ্রতার নিকট আত্মসমর্পণ। এত আলোচনা অন্তে বিদগ্ধসমাজ একথা মেনে নিয়েছেন যে, আমাদের স্বভাবের মধ্যে নিরন্তর এই দু'ধারার দ্বন্দ্ব চলেছে। প্রতীচীর কোন এক মনীষীর ভাষায় The world is the vale of soul-making,—অর্থাৎ, নানা বিরোধের মধ্য দিয়ে মানুষের সকল প্রয়াসের আসল লক্ষ্য নিজের পূর্ণতম বিকাশের দিকে সে বিকাশের ভাবী স্বরূপ নিয়ে অনিশ্চিত মন্তব্যে কোন লাভ নেই। সময়ের ধারা ব'য়ে চলেছে; তারই বুকে চলেছে বিবর্তনের খেলা; এই বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, নিজেকে বৃহত্তর জীবনের রূপে রূপায়িত করবার জন্য নানা কর্ম ও চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছে মানুষ। সে নিজের ভেতরকার অ-প্রয়োজনীয়ের সংস্কার করে চলেছে,—যা একান্ত প্রয়োজনীয় তাকে প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে। এমনি করে স্বভাবের সংস্কার করতে গিয়ে যা কিছু গ'ড়ে উঠেছে, তারই নাম 'সংস্কৃতি'। প্রকৃতির খেলা লক্ষ্য করলে এটা বেশ বোঝা যায় যে, পরিবর্তন ছাড়া সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্ভব নয়। বাইরের জগৎ বহু ভাবে একথা আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে যে সেখানে একটা বিপুল চলমান শক্তির প্রকাশ চলছে চিরকাল। প্রকৃতি তার আকারহীন বিপুল বাষ্পসংঘাত থেকে চলতে চলতে আজ মানুষে এসে পৌছেচে। এই চলা এখানেই শেষ হবার নয়। কিন্তু এই অবিরাম চলার লক্ষ্য একটা সার্থক অভিব্যক্তির দিকে।

মানুষের মন প্রকৃতিরই অংশস্বরূপ—তাই তাকে বলি অন্তঃপ্রকৃতি (Internal Nature)। সেই ভেতরের রাজ্যও বিবর্তনের খেলা থেকে অব্যাহতি পায়নি। নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সেই মনোরাজ্যেও গ'ড়ে উঠেছে নানা সভ্যতা রুচি ও সংস্কৃতিবোধ। রূপান্তরের মূল অর্থ হ'ল ভাঙা-গড়ার লীলা। এই লীলার আনন্দে মানুষ যোগ দিয়েছে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে। যাকে সে গড়েছে, তাকেই আবার ভেঙে চুরমার করেছে। কিন্তু, কেন এই খেলা? উত্তরে বলব,—একটা সার্থক বিকাশের প্রয়োজনে। তাই, প্রকৃত সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে প্রগতির কোন বিরোধ ত' নেই-ই,—বরঞ্চ, তারা অতি নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ।

বহুমুখী ঘটনার আবর্তে পড়েও যে স্ব-রূপটি গ'ড়ে ওঠে তারই নাম স্বাতন্ত্র্য। নানা ভেদের মধ্যেও একটি অভেদ রূপ গ'ড়ে ওঠে সেখানে। ব্যক্তিগত জীবনে তার নাম 'চরিত্র',—আর সমষ্টিগত জীবনে তাই-ই 'সংস্কৃতি' নামে অভিহিত হয়।

এছাড়া, আরও একটা দিক্‌ আছে। রাষ্ট্রনীতি পড়ে আমরা জেনেছি যে, কি অপরিণত অবস্থা থেকে এবং কত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানবসমাজ বর্তমান জীবনের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে! এই চলমান ধারাবাহিক জীবন-রংগের মূল নায়ক মানুষ নিজেই। যে শক্তি প্রকৃতির মধ্যে নিছক যান্ত্রিক (Mechanical) হ'য়ে ছিল, —মানুষের জীবনে তাই একান্ত ভাবে আত্মিক স্বাধীনতা লাভ করল। সভ্যতা চলল এগিয়ে; সংগে সংগে বিভিন্ন দেশ ও সমাজ-জীবন গ'ড়ে উঠল। এমনি করেই দেখা দিল নানা রাষ্ট্র ও জাতির একটা প্রবহমান ধারা। তারা বিভিন্ন,—কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। ভূগোলের চতুঃসীমায় তারা ধীরে ধীরে বাঁধা পড়ল। বাতাস আর মাটি বদলের সংগে সংগে ভেতরের বৈচিত্র্যও ফুটে উঠল। কারণ, মাটির রসেই মনের রস প্রবর্দ্ধিত হয়। যাই হোক, ক্রমশঃ এই বিভিন্নতা উৎকট প্রাধান্য লাভ করল। ফলে, মানুষ তার মূল ঐক্যের (Common Heritage) কথাও বিস্মৃত হয়ে গেল। প্রসংগতঃ, একথা বলে রাখি যে, এ ভুলের মাশুল আদায় সুরু হ'য়ে গিয়েছে;—তারই প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি সারা বিশ্ব জুড়ে সংঘটিত, মানুষের স্বকৃত আত্মঘাতী সংগ্রাম ও সংঘর্ষের মধ্যে।

বস্তুতঃ, অবিমিশ্র ভাল বা মন্দ—কোনটাই সম্ভব নয়। কালের বিবর্তনের সংগে সংগে সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। ফলে দেখা গেল, যে রসধারা বহু জনমানসে ছড়িয়েছিল—তা নানা প্রদেশের সীমায় আবদ্ধ হ'য়ে স্বতন্ত্র ও বিশেষ হ'য়ে উঠল। ছোট ছোট জায়গায় সীমাবদ্ধ হবার ফলে প্রত্যেক জাতি তাদের নিজেদের সংস্কৃতিকে আপন খুসীমত গ'ড়ে তোলবার দিকে মনোনিবেশ করতে সমর্থ হোল। নানা সংস্কৃতির এই মহাতীর্থযাত্রায় 'বঙ্গসংস্কৃতি' নামে একটা বিশিষ্ট ভাবধারা গ'ড়ে উঠল। এই বাঙ্গালী জাতি ও তার সংস্কৃতির আদি পরিচয়টি কি? ঐতিহাসিকের ভাষায়—"গংগা-করতোয়া-লৌহিত্য-বিধৌত, সাগর-পর্বতধৃত রাঢ়-পুণ্ড্র-বংগ-সমতট এই চতুর্জনপদসম্বদ্ধ বাংলা দেশে প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া তুর্কী অভ্যুদয় পর্য্যন্ত কত বিভিন্ন জন, কত বিচিত্র রক্ত ও সাংস্কৃতিক ধারা বহন করিয়া আনিয়াছে—এবং একে একে ধীরে ধীরে কোথায় কে কি ভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস তাহার সঠিক হিসাব মনে রাখে নাই। সজাগ চিত্তের ও ক্রিয়াশীল মননের রচিত কোনও ইতিহাসে তাহার হিসাব নাই একথা সত্য, কিন্তু মানুষ তাহার রক্ত ও দেহ গঠনে, ভাষায় ও সভ্যতার বাস্তব উপাদানে এবং মানসিক সংস্কৃতিতে তাহা গোপন করিতে পারে নাই।" (বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব,—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়)। কালের প্রবহমানতার মধ্য দিয়ে এ মাটিতে একটা স্বতন্ত্র জনসমাজ তার স্বকীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। সেই সমষ্টিপ্রাণের গতি আজও সামনের দিকে নিয়ত-প্রসারিত। ইতিহাসের পাতায় একথা বহু বার লেখা হয়ে গেয়েছে যে, অন্য যে কোন জাতির ন্যায় বাঙালীর সংস্কৃতির মানস-দুর্গে বহু বার আঘাত লেগেছে। তাতে সামাজিক, জীবনের বন্ধনগুলো চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। অনেক কিছু পুরানো নিশ্চিহ্ন হয়েছে,—আর তারই ভগ্নস্তূপের উপর নতুনতর জীবনের সৌধ গ'ড়ে উঠেছে। দুঃখ ও বিরূপতাকে বাঙালী এড়িয়ে যেতে চায়নি। তার জীবনধর্মে এমন একটা দুর্দমনীয় বীর্য্য আছে, যার প্রেরণায় সে দুঃসহকে করেছে সহনীয়, প্রতিকূলকে করেছে অনুকূল। নানা দুঃখ ও সংগ্রামের প্রচণ্ড আঘাত বাঙালীকে সত্যের প্রবেশ-দ্বারে পৌছে দিয়েছে।

আমার মনে হয় যে, বাঙালীর মানস গঠনটি একটু স্বতন্ত্র ও অপূর্ব। তার মনোধর্ম একান্ত ভাবে নমনীয়, এ কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে এই নমনীয়তার মধ্যেই বাঙ্গালীচিত্তের এমন একটি দৃঢ়তা গ'ড়ে উঠেছিল, যা আপন বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল। এখন এই নমনীয়তার কথাই বলি। ইতিহাসের আবর্তচক্রে এই "গংগা-করতোয়া-লৌহিত্য-বিধৌত-রাঢ়-পুণ্ড্র বংগ-সমতট" প্রদেশে বার বার নতুন জন, ধর্ম ও সংস্কৃতির আঘাত লেগেছে,—আজও লাগছে। কিন্তু সেই দুর্দিনে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনচর্য্যা তার অন্তরের স্বাতন্ত্র্যগুণে কালের আবর্তন-প্রবাহে মগ্ন হ'য়ে গিয়েছে। তখন মনে হয়েছে, বুঝি বা বাঙ্গালী গেল—তার চর্য্যা ও সংস্কৃতির বিলোপ ঘটলো। কিন্তু তা হবার নয়। এ জাতি তার অন্তরস্থিত দুর্জয় শক্তি ও অনমনীয় সাহসের বলে কিছু কালের মধ্যে নবতর উৎসাহে সবার মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এটি একটি বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য যে, চরিত্রের এই দৃঢ়তা ও সংগ্রামী মনোবৃত্তির প্রবলতর প্রকাশ ঘটেছে এক এক জন মহামানবের আবির্ভাবে, সমাজ ও ব্যক্তির জীবন পরস্পর-নির্ভরশীল, এটি আধুনিক সমাজ দর্শনের একটি বহু ঘোষিত সত্য। এ সত্যটি বাঙ্গালীর জীবনেও বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এমনি নবজাগরণের যুগে অসংখ্য মহাপ্রাণ আবির্ভূত হয়েছেন জাতির জীবনে; তারা এই দুর্দশাগ্রস্ত, বিপর্যস্ত, মৃতপ্রায় সমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন নতুনতর জীবন-চর্য্যার পুনরুদ্বোধন উৎসবে, তখন জাতির মগ্নচৈতন্য (Subliminal Consciousness) থেকে তার জন্ম-জন্মান্তরের ঐতিহ্য, তার সুদীর্ঘ অতীত, একই সংগে, একই প্রেরণায় তড়িৎ-শিখার মত প্রস্ফুরিত হ'য়ে উঠেছে। বহু বার এই নবজাগরণের শঙ্খধ্বনি শুনেছি বাঙ্গলা দেশে। জাতির চিত্তাকাশে এসে দাঁড়িয়েছেন কত মহামানব; তাঁদের কর্মে-জীবনে, স্বপ্নে-মননে, একটা লুপ্তপ্রায় জনমানসের আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বাণী ঘোষিত হয়েছে। সে ঘটনাবলীর তারিখ সমন্বিত বিচারের ভার রইলো ঐতিহাসিকের উপর। এ ধরণের যুগের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Human Cycle নামক পুস্তকে বলেছেন.—

"Then there arrives a period when the gulf between the convention and the truth becomes intolerable and the men of intellectual power arise...who rejecting robustly or fiercely or with the calm light of reason symbol and type and convention strike at the walls of the prison-house and seek by the individual reason, moral sense or emotional desire the truth that society has lost or buried in its whited sepulchres. It is then that the individualistic age of religion and thought and society is created; the Age of Revolt, Age of Reason, Progress, Freedom has begun." (P. 13).

ব্যক্তিজীবনের চরম প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙ্গালীর আত্মজীবন জাতীয়তার মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো; তারই সঙ্গে বাঙ্গালী বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মন্ত্রে দীক্ষালাভ করল। এই সমন্বয়ের প্রতিফলন দেখতে পাই উনিশ শতকের বাঙ্গালী মহাপুরুষদের জীবনে ও বাণীতে। এই সব মহামানবের আবির্ভাবও নিতান্ত আকস্মিক নয়। এর পেছনে রয়েছে কার্য্য-কারণ নিয়মের অলঙ্ঘনীয় শাসন। জাতির বহুকালের সাধনা ও কর্মের মধ্য দিয়ে জাতির অসংখ্যপ্রাণ যে সাধনা করে, তারই বলিষ্ঠ একীভূত রূপায়ণ ঘটে এক একটা বিশেষ মানুষের মধ্যে। জাতির বহুকালের অপ্রকাশিত বেদনা প্রকাশিত হয় নানা মহামানবের জীবনে। একথা অন্য যে কোন জাতির ন্যায় বাঙ্গালীর সম্বন্ধেও সত্য। বৃহৎ জন্মলাভের জন্য বৃহত্তম বেদনার প্রয়োজন। আজ-কাল অনেকে আক্ষেপ করে বলে থাকেন যে, কই,—বাঙ্গালা দেশে এত দলের মধ্যেও এমন কোন নেতা আছেন কি, যিনি এই বিপর্যস্ত জাতিকে একটি সুনির্দিষ্ট কল্যাণময় ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে পারেন? তার উত্তরে আমি বলব যে, এই দুর্দশা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কারণ জাতির মনে আজ কোনও বেদনাবোধ নেই। ইংরেজ-শাসিত ভারতে এবং আরও একটু পেছিয়ে বলা যায়, মুসলমান-শাসিত দেশে মানুষের মনে যে সুতীব্র বেদনা ও স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল, তারই ফলে অগণ্য মহামানবের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। জাতি যখন অচেতন হয়ে থাকে, তখন তার আত্মতৃপ্তির মানস-দুর্গে আঘাত লাগে; সে আঘাত যত প্রচণ্ড হয়, আবির্ভাবের বিরাটত্বও তত সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। এটি ঐতিহাসিক সত্য, আজ নানা দলীয় চাপে পড়ে বাঙ্গালী খুঁজে পাচ্ছে না কোন সুযোগ্য নেতাকে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে এ কথাও মনে হয় যে, এ জাতির অনুসন্ধান করবার তাগিদও বুঝি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থায় আমাদের সকলকেই সেই নবজাগরণের কাজে অগ্রসর হতে হবে; কেন না, এ হ'ল জাতীয় দায়িত্ব। এই বেদনাবোধ জাগ্রত করবার একমাত্র উপায় হ'ল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতিকে তার স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

"একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের 'সঙ্গীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে, অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন! এ সুরগুলিকে কোনো রাগ-কৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে, তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না—স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলাতী সুর নয়।"

"য়ুরোপের প্রত্যেক গান একটি বিশেষ ব্যক্তি সে আপনার মধ্যে প্রধানতঃ আত্মমর্য্যাদাই প্রকাশ করে। ভারতে প্রত্যেক গান একটি বিশেষ জাতীয়, সে আপনার মধ্যে জাতিমর্য্যাদাই প্রকাশ করে।"

—রবীন্দ্রনাথ

তীর্থগোষ্ঠীর ভাষা-সমন্বয়

শ্রীআদিত্যপ্রভনন্দ কাব্যতীর্থ

বহু ঐতিহাসিকের মতে আর্যগণের আদি বাসভূমি ছিল মধ্য-এশিয়া, সেখানে বংশবৃদ্ধি ও স্বল্প-পরিশ্রমে জীবনোপায়ের অসুবিধার জন্য তাহারা পশ্চিম ও দক্ষিণে সুজলা ভল্‌গা, ডন্, দানিয়ুব, টাইগ্রিস্, ইউফ্রেটিস্, সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী-বিধৌত শস্য-শ্যামল ইউরোপীয় দেশসমূহ ও তুরস্ক, ইরাণ ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি এশিয়ার দেশসমূহে গিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সেই স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

পৈতৃক বাসভূমিতে তাহাদের যে মাতৃভাষা ছিল, বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ায়, ধীরে ধীরে তাহার পরিবর্তন হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাহা বিভিন্ন রূপ ধারণ করিল। তাহাদের নব নব রূপে যদিও তাহাদিগকে পরস্পরের জ্ঞাতি বলিয়াও চিনিতে পারা গেল না—তবুও সূক্ষ্ম, গভীর ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ভাষাবিদগণের দৃষ্টিকে তাহারা বঞ্চিত করিতে পারিল না। তাই আজ ভাষাবিদ্‌গণ তাহাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষের একত্ব আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা বর্তমান ইংরাজী ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষার জনক ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতির সহিত ভারতবর্ষীয় প্রধান ভাষাগুলির উৎপত্তির উৎস সংস্কৃতের, আবার আরবি, পার্শী প্রভৃতিরও কি কি সাদৃশ্য আছে—তাহার কিছু কিছু নির্ধারণ করিয়াছেন।

নিম্নে ইংরাজীর কতকগুলি বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের সহিত সংস্কৃতের কতকগুলি শব্দ ও ধাতুর কি কি সাদৃশ্য আছে—তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

Webster এর অভিধানে ইহার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও বিশেষ্য ও ক্রিয়া, সেই প্রাচীন যুগে একরূপই ছিল—কালক্রমে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ল্যাটিন, গ্রীক্, হিব্রু, আরবি প্রভৃতি ভাষার মূল ধাতু ও শব্দের সহিত সংস্কৃতের এই সাদৃশ্য বহুভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনুসন্ধানে ক্রমে নির্ণীত হইবার আশা করা যাইতে পারে।

গম্ ও কৃ ধাতুর ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষাগুলির মূলের ২।৪টি দৃষ্টান্ত ওয়েবষ্টার হইতে প্রদর্শিত হইল।

ক্রিয়া		বিশেষ্য প্রভৃতি	
সংস্কৃত	ইংরাজী	সংস্কৃত ও বাংলা	ইংরাজী
গম্, গাড	Go	পিতর, পিতৃ	Father
	Saxon-gan	মাতর, মাতৃ	Mother
	German-gehen	ভ্রাতর, ভ্রাতৃ	Brother
	Dun-gaaer	ত্রি (তিন)	Three
	Swedish-ga	ষষ্ (ছয়)	Six
	Dutch-gaan	অষ্টন্ (আট)	Eight
	Busqwe-gan	নবম্ (নয়)	Nine
ভু (কুঙ) কৃ	Do	তে (তাহারা)	They
কৃ (করা)	Saxon-Don		
	Dutch-Doen	পূর্ব	Prior
	German-Thun	অগ্র, আগে	Ago
	Russian-Deya (Dayw)	ফল	Fruit

ক্রিয়া	
সংস্কৃত	ইংরাজী
অর্চ, অর্হ	Worship
অর্জ	Earn
অট্	Wonder
জট্, ঝট্	Clot
রুট্	Rob
মদ্, মদি	Mad, Become Mad
অড্	Endevour
ষ্টুভু	Stop
পনচ্	Praise
ঊর্ণ্ণ	Weave
পুরী, পূঙ্	Purify
সেব্	Serve
জীব	Live
শল্	Fall
বম্	Vomit
ক্রুশ্, ক্রন্দ্	Cry
মেথৃ	Meet
চীবৃ	Wear
মাস্থ, মা, মাঙ্	Measure
বধ্	Bind
কিৎ	Cure
শান্, শিঙ্	Sharpen

ক্রিয়া	
সংস্কৃত	ইংরাজী
অদ্, অশ	Eat
লিহ	Lick
নিস্	Kiss
শীঙ, ষস্	Sleep
পা, পৃ, পল্	Protect
ভু, বিদ্	Be
জন্	Born
ষিবু	Sew
প্রীঙ্	Please
ষ্বিদা	Sweat
শম্	Calm
দম্	Tame
তৃষ্	(become) Thirsty
ক্লথ্, কুঙ্	Kill
দনভ	Deceive
ইষ	Wish
মৃগ্	Seek
ভাজ্	Devide
ক্রট্, চুট্, কৃৎ, কুট	Cut
মুদ্, মিশ্র	Mix

EXTEMPORARY SONG.

I

I sigh for Albion's distant shore,
Its valleys green,—its mountains high ;—
Tho' friends, relations I have none
In that far clime,—yet oh ! I sigh
To cross the vast Atlantic wave
For glory or a nameless grave !

II

My father, mother, sister all
Do love me and I love them too,
Yet oft the tear-drops rush and fall
From my sad eyes like winter's dew.
And oh ! I sigh for Albion's strand
As if she were my native land !

KIDDERPORE, 1841. —Madhusudan Dutt.

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

১

২৬ মে ১৮৯৯

ওঁ

প্রিয়বরেষু, কলিকাতা

বলেন্দ্রনাথ ও আমার পুত্র রথীর রোগপরিচর্য্যার জন্য আমাকে হঠাৎ কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে—প্রায় পনেরো দিন এইখানেই কাটিয়াছে, আরও দিন পাঁচ সাত কাটিতে পারে। নিজেও সুস্থ নহি।

এদিকে অকালবর্ষা নামিয়াছে—ঠিক শ্রাবণ মাসের মত। ইহাতে আমার কোন আপত্তি ছিল না, শঙ্কা হয় পাছে প্রকৃতি শ্রাবণ মাসে ফাঁকি দিয়া বসেন। দার্জ্জিলিঙেও যদি এখানকার অনুরূপ বর্ষার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে তবে আপনার সৌভাগ্য আমি ঈর্ষা করি না। পাহাড়ের বর্ষা আমাদের বাঙ্গালীর কান্নার মত একঘেয়ে এবং অবিশ্রাম। তবু একবার আপনাদের শৈলনীড়ের মধ্যে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু অবকাশ এবং পাখা না থাকায় সে দুরাশা মনে স্থান দিই না। রোগতাপের মধ্যে লেখাপড়া বন্ধ আছে—সুযোগের অপেক্ষা করিতেছি—এক একবার ভাবি সুযোগও হয়ত আমার অপেক্ষা করিতেছে—জোর করিয়া মনটাকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একবার লিখিতে বসিলেই হয়—কিন্তু সেই জোরটুকু সম্প্রতি পাইতেছি না।

কতকগুলি পৌরাণিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে—যেমন করিয়া হৌক্ তাহাদের একটা গতি করিতে হইবে—তাহারা আমার কন্যাদায়ের মত—পাব্লিকের সহিত তাহাদের পরিণয় সাধন করিতে না পারিলে তাহারা অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিবে—কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধেও বাল্যবিবাহটা ভাল নয়—উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত ইহাদের কলরব ও উপদ্রব আমাকে সহ্য করিতেই হইবে। শরীর আজ পীড়িত আছে—এইখানেই বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ। ১৩০৬ আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

১৮ জুন ১৮৯৯

ওঁ

শিলাইদহ,

কুমারখালি

প্রিয়বরেষু, E. B. S. Ry.

দার্জ্জিলিঙের ঠিকানায় আমি আপনার পত্রের উত্তর দিয়াছিলাম, পাইয়াছেন কি না জানি না। আপনার পত্রে দার্জ্জিলিঙ ছাড়া আর কোন প্রকার বিশেষ ঠিকানা লিখিত ছিল না। এ পত্র কলিকাতার ঠিকানায় লিখিলাম।

যেরূপ প্রবল বর্ষা পড়িয়াছে, এখন বোধ করি নদীনির্ঝর ও সঙ্গে সঙ্গে বহুতর ভূখণ্ড শিলাখণ্ড পাহাড় ছাড়িয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে—আপনারা কি শিখরদেশেই অটল হইয়া থাকিবেন? যদি নামেন ত এই পদ্মা নদীর পথটা কি অনুসরণ করিতে পারেন না? এখন আকাশ মেঘে নদী জলে এবং পৃথিবী শস্যে পরিপূর্ণ। ঘরের বাহির হওয়া শক্ত কিন্তু জানালা আছে কি করিতে? আপনাদের বাইসিক্‌ল্ চলিবার মত একটা পথ গড়িয়া লওয়া গেছে।

আত্মীয়দের পীড়া লইয়া প্রায় এক মাস কলিকাতায় ছিলাম—সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়া আপনাদের সেই অর্দ্ধশ্রুত গল্পটিতে হাত দিয়াছি। মাসিক পত্রিকার তাড়া নাই—আপন মনে আস্তে আস্তে লিখি। কোন একদিন সায়াহ্নে আপনাদের সেই কোণের ঘরে বসিয়া বোধ করি পড়িয়া শুনাইবার অবকাশ পাইব। ইতি ৪ঠা আষাঢ়। ১৩০৬

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

২৪ জুন ১৮৯৯

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

১০ই আষাঢ় ১৩০৬

প্রিয়বরেষু—

আপনার পত্রখানি পড়িয়া আমি বিশেষ সান্ত্বনা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। স্তুতিনিন্দার প্রতি উদাসীন থাকিতে বিশেষ চেষ্টা করি, কৃতকার্য্য হইতে পারি না বলিয়া যথাসম্ভব দূরে থাকি; কিন্তু সংসারকে ফাঁকি দেওয়া চলে না; প্রেমদাসের একটা গানে আছে:—

বৃথা শোচ কুছ কাম ন আওয়ে—
ভোগ বিনা নাহি মিট্‌না।

বৃথা শোক করিয়া কোন ফল হয় না—যাহা ভোগ করিবার তাহা না করিয়া এড়াইবার যো নাই। কিন্তু দুঃখের মধ্যে পরম সুখ এই যে, বন্ধুদের সস্নেহ হৃদয় নিজের বেদনার নিকট অগ্রসর হইতে দেখি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কুক্ষণে ২০টি রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্রি আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি—দশ বারো জন লোক অহর্নিশি তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পাতা আনার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে—লরেন্স স্নান-আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীট-সেবায় নিযুক্ত। আমাকে সে দিনের মধ্যে দশ বার করিয়া টানাটানি করে—প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। ইংরেজ জাতি কেন যে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হয় তাহার প্রত্যক্ষ কারণ দেখিতেছি। উহাদের শক্তি চালনা করিবার জন্য বিধাতা উনপঞ্চাশ বায়ু নিযুক্ত করিয়াছেন, অথচ উহাদের মধ্যে বোঝাই এত আছে যে কাৎ করিতে পারে না। এখন যদি আমাদের কীটশালায় একবার আসিতে পারিতেন তবে একটা দৃশ্য দেখিতে পাইতেন। বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। কোন এক সময় ছুটি পাইলে এদিককার কথা স্মরণ করিবেন।

আমার চাস-বাসের কাজও মন্দ চলিতেছে না। আমেরিকান ভুট্টার বীজ আনাইয়াছিলাম—তাহার গাছগুলা দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিতেছে। মান্দ্রাজি সরু ধান রোপণ করাইয়াছি, তাহাতেও কোন অংশে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু সোমবারে সস্ত্রীক আমার শস্যক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিবেন।

আপনারা উভয়ে আমাদের আন্তরিক প্রীতি-অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

১৭ সেপ্টেম্বর [১৯০০]

ঔ

শিলাইদহ
কুমারখালি
নদীয়া

প্রিয় বন্ধু,

চুপচাপ বসে একখানা ফরাসী ব্যাকরণ নিয়ে ওল্‌টাচ্ছিলুম এমন সময় চিঠিখানি পেয়ে মৃত ভেকের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের সঞ্চার হ'য়ে খুব ধড়্ফড় ক'রে উঠেছি। লোকেনকে, সুরেনকে আপনার চিঠিখানা দেখাবার জন্যে ছটফট করচি, কিন্তু তারা দূরে, আজই তাদের লিখে পাঠাতে হবে। যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিন। কাউকে রেয়াৎ করবেন না—যে হতভাগ্য surrender না করবে, লর্ড রবার্টসের মত নির্মম চিত্তে তাদের পুরাতন ঘর দুয়ার তর্কানলে জ্বালিয়ে দেবেন—আপনি এক সৈন্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সৈন্য-সম্প্রদায় গেঁথে যেরকম ব্যূহ রচনা করেচেন তাতে প্রিটোরিয়ায় ক্রিষ্টমাস করতে পারবেন ব'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তারপরে আপনি জয় ক'রে এলে আপনার সেই বিজয়গৌরব আমরা বাঙ্গালীরা মিলে ভাগ ক'রে নেব—আপনি কি করলেন তা বোঝবার কিছু দরকার হবে না, না বুদ্ধি, না অর্থ, না সময় কিছুই খরচ করতে হবে না, কেবল টাইমস পত্রে ইংরেজের মুখ থেকে বাহবা শোনবামাত্র সেই বাহবা আমরা লুফে নেব। তখন আমাদের দেশীয় কোন বিখ্যাত কাগজে বলবে, আমরা বড় কম লোক নই; অন্য কাগজে বলবে, আমরা বিজ্ঞানে নব নব তথ্য আবিষ্কার করচি;—এদিকে আপনার জন্যে কারো সিকি পয়সার মাথাব্যথা নেই, কিন্তু যখন জগৎ থেকে যশের ফসল ঘরে আনবেন তখন আপনি আমাদের;—চাষের বেলা আপনি একা, লাভের বেলা আমরা সবাই; অতএব আপনি জয়ী হ'লে আপনার চেয়ে আমাদেরই জিৎ।

আপনি 'ক' বিন্দুতে কম্পমান, আমি 'খ' বিন্দুতে দিব্য নিশ্চেষ্ট নিরুদ্বিগ্ন হ'য়ে ব'সে আছি—আমার চারিদিকে আমন ধান এবং আখের ক্ষেত আসন্ন শরতের শিশিরাক্ত বাতাসে দোদুল্যমান। শুনে আশ্চর্য্য হবেন, একখানা Sketch book নিয়ে ব'সে ব'সে ছবি আঁকচি। বলা বাহুল্য, সে ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্যে তৈরী করচিনে, এবং কোন দেশের ন্যাশন্যাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। কিন্তু কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব্ব স্নেহ জন্মে তেমনি যে বিদ্যাটা ভাল আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা করলুম, এবারে ষোল আনা কুঁড়েমিতে মন দেবো তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এই সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করবার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেন্সিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশী রবার চালাতে হচ্ছে, সুতরাং ঐ রবার চালানটাই অধিক অভ্যাস হ'য়ে যাচ্চে—অতএব মৃত র্যাফেল্‌ তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ম'রে থাকতে পারেন—আমার দ্বারা তাঁর যশের কোন লাঘব হবে না।

লোকেন আসন্ন পূজার ছুটিতে আমাকে তার ভ্রমণের সহচর ক'রে সিমলা-শিখরে টানবার জন্যে চেষ্টা করচে—কিন্তু আমি নড়চিনে। ঋষিরা যখন পর্ব্বত-শিখরে তপস্যা করতে যেতেন তখন সে এক সময় ছিল—কিন্তু এখন যে গিরিশৃঙ্গে শান্তি নেই সে কথা আপনার অগোচর নেই। আশা করি, দার্জ্জিলিঙের সেই পথে-পাওয়া বন্ধুটিকে ভোলেননি। আমি আমার পদ্মা-তীরের কলহংস-মুখর বালুতটে শারদশ্রীর শুভ শুভ্র সমাগম প্রতীক্ষা করচি। বোধ করি, মনে আছে, আপনি আমাকে একটি ভ্রমণ-সঙ্গ-দানে প্রতিশ্রুত আছেন, কাশ্মীরে হোক্, উড়িষ্যায় হোক্, ত্রিবাঙ্কুরে হোক্, আপনার সঙ্গে ভ্রমণ ক'রে আপনার জীবনচরিতের একটা অধ্যায়ের মধ্যে ফাঁকি দিয়ে স্থান পেতে ইচ্ছে করি। আশা করি, বঞ্চিত করবেন না—সেই ভবিষ্যৎ কোন একটা ছুটির জন্যে পাথেয় সঞ্চয় ক'রে রাখচি। গৃহিণী আমার অনতিদূরে একটা কেদারায় ব'সে আমাকে স্নানাহারের জন্যে অত্যন্ত তাগিদ করচেন—বেলাও হয়েচে। অতএব ক্ষণকালের জন্যে মার্জ্জনা করবেন—আমার অধিক দেরী হবে না।

লোকেন আমার যে কাব্য-চয়ন প্রকাশে প্রবৃত্ত ছিল মাঝখানে বিলাতে গিয়ে তার উদ্যম কিছু যেন ক'মে এসেছে। সে যদি কিছু না মনে করে তা'হলে আমি নিজেই এ কাজে হাত দিতে পারি আমি ছবি আঁকচি শুনে যদি আশ্চর্য্য হন ত লোকেন কবিতা লিখতে ব'সে গেছে শুনে বোধ হয় কম আশ্চর্য্য হবে না। তার এতই দুরবস্থা হয়েচে! বেচারাকে শেষ কালে কবিতা লেখালে! ওমার খায়েমের বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ করচে। দুই-একটা নমুনা দেখলে তার মনের অবস্থা কতকটা বুঝতে পারবেন:—

মূঢ় তোরা, ত্যজি' সুখ স্বর্গসুখ-আশে
থাকিস্ মুক্তির তরে অন্ধ কারাবাসে।
সুদ পাবি ব'লে ফেলে রাখিস্ পাওনা,
ছাড়ি না নগদ আমি যাহা হাতে আসে!

এই সমস্ত কবিতায় লোকেন মুকুন্দ ফুঁকে দিয়ে ব্যবসা চালাবার প্রস্পেক্টস্ জারি করেচে—সুদ চায় না, লাভ চায় না, যা কিছু জমা আছে সব উড়িয়ে দিতে চায়—আমি এ ব্যবসায়ে শেয়ার কিনতে প্রস্তুত নই।

আপনার শ্যালকজায়া আর্য্যা সরলা, বিদ্যার্ণবের কাছে সম্প্রতি সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করেচেন। শিক্ষা-প্রণালীটি আমার রচিত। খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করচেন—পণ্ডিতমশায় এমন বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেয়ে ভারী খুসীতে আছেন। আমি তাঁকে পূর্ব্বেই আশ্বাস দিয়েছি, আমার পদ্ধতি মতে যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন তাহ'লে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মাবে। তাঁর সংস্কৃত-চর্চ্চায় আমি ভারি আনন্দিত হয়েছি। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত মেয়েদের অতিমাত্রায় ইংরেজী চর্চ্চার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যে সংস্কৃত শেখাটা একান্ত দরকার হয়েছে।

মশায়, আপনার জন্যে পুরীর জমিটি ঠেকিয়ে রাখতে পারব ব'লে আশা হচ্ছে না, তার প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি পড়েচে। কর্ত্তা আমাকে লিখেচেন, পুরী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের আমার ঐ ভূখণ্ডটুকুতে ভারি প্রয়োজন হয়েচে। জোর যার মুল্লুক তার যদি সত্য হয় তা'হলে ও জমিটুকু রক্ষা হবে না। আপনি যদি এখানে থাকতে থাকতেই বাড়ী আরম্ভ ক'রে দিতে পারতেন তাহ'লে ও লোকটা দাবী করতে পারত না।

আজকের দিনটা ঝোড়ো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—মাঝে মাঝে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হ'য়ে যাচ্চে—মাঝে মাঝে বাতাসের দমকা এসে জানলা-দরজাগুলো দুদ্দাড় ক'রে দিয়ে যাচ্চে। এই ঝড়-বৃষ্টি-বাদলে বেশ একটি ছুটির ভাব এনেছে—সেই কর্ম্মপরায়ণ পশ্চিম দেশে এই ভাবটা ঠিক অনুভব করতে পারবেন না। একে ত সপ্তাহের মধ্যে সাত দিন কাজ করিনে—তার পরে আবার যেদিন একটু বাদলা হয়, বা শরতের রৌদ্র ওঠে, বা দক্ষিণের হাওয়া বয়, সেদিন আরও বেশী ছুটি নিতে ইচ্ছে হয়। আমি ঘরের দরজা খুলে শার্সিগুলো বন্ধ ক'রে ব'সে আছি—ঝরঝর শব্দে প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়চে।

পত্রোত্তর দানের বিশ্বাস হ'তে যদি নিষ্কৃতি পেতে ইচ্ছা করেন তাহ'লে আর্য্যার শরণাপন্ন হবেন—তিনি যদি আপনার হ'য়ে উত্তর দেন তাহ'লে আমার কোন নালিশ থাকবে না। তাঁকে আমার সাদর অভিবাদন জানাবেন। আপনি যে কাজে গেছেন তার প্রত্যেক টুকরো খবরটুকু পর্য্যন্ত আমার কাছে পরম উপাদেয়, এটুকু মনে রাখবেন। কে কি বলচে, কি লিখচে, কি হচ্ছে সমস্ত আদ্যোপান্ত জানবার জন্যে সতৃষ্ণ হ'য়ে আছি। ইতি ১লা আশ্বিন [১৩০৭]

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

[অক্টোবর বা নভেম্বর ১৯০০]

বন্ধু,

সীজার যে নৌকায় চড়েন সে নৌকা কি কখনও ডুবিতে পারে? মহৎ কর্ম্ম আপনাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আপনাকে অতি শীঘ্র সারিয়া উঠিতে হইবে।

আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত বলিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়াছি—প্রায় আট রাত্রি ঘুমাইতে অবসর পাই নাই। তাই আজ মাথার ঠিক নাই—শরীর অবসন্ন। কাল হইতে তাহার বিপদ কাটিয়াছে বলিয়া আশ্বাস পাইয়াছি; এখন নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে। মনে করিয়াছি, দুই-চারি দিন বোলপুর শান্তিনিকেতনে যাইব।

আমার সমস্ত ছোট গল্প একত্র ছাপিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে। প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় আপনাকে পাঠাইতে পারি নাই। এক্ষণে, আপনার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে প্রথম খণ্ডই পাঠাইতেছি। দ্বিতীয় খণ্ডেই অধিকাংশ ভাল গল্প বাহির হইবে। প্রথম খণ্ডে তর্জ্জমার যোগ্য গল্প বোধ হয় নিম্ন কয়েকটি হইতে পারে:—পোষ্টমাষ্টার, কঙ্কাল, নিশীথে, কাবুলিওয়ালা এবং প্রতিবেশিনী। কিন্তু Mrs. Knight-এর রচনানৈপুণ্যের প্রতি আমার বড় একটা আস্থা নাই।

ত্রিপুরার মহারাজকে আপনার সমস্ত খবরই আমি পাঠাইয়া থাকি। আপনার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন আপনার কার্য্যের সহায়তার জন্য তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত দানের অপেক্ষা আরো অনেকটা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বিলাতে কাজ লওয়া সম্বন্ধে কি স্থির করিলেন? এ সম্বন্ধে আমার মত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আপনি দ্বিধামাত্র করিবেন না। আপনার সফলতার পথে যদি আপনার স্বদেশও অন্তরায় হয় তবে তাহাকেও ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় দিতে হইবে।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। একান্ত মনে প্রার্থনা করি, সুস্থ হইয়া উঠুন।

আপনার চিরন্তন
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

২০ নভেম্বর ১৯০০

ওঁ

কলিকাতা

বন্ধু,

কিছুকাল থেকে সাংসারিক নানা কাজে আমাকে কলকাতায় বদ্ধ থাকতে হয়েচে। কিন্তু কলকাতায় আমার সুখ নেই। পূর্ব্বে এখানে যখন আসতুম তোমাদের ওখানেই সর্ব্ব প্রথমে ছুটে যেতুম, এবারে সে-রকম আগ্রহের সঙ্গে কোনখানে যাবার নেই। আজ প্রভাতেই তোমার চিঠিখানি পেয়ে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হল—তোমার সেই ছোট ঘরটি থেকে তোমার আলাপগুঞ্জন যেমন আমি হৃদয়ে পূর্ণ করে নিয়ে আসতুম নিজেকে আজও সেই রকম পূর্ণ বোধ করচি। এক এক সময় সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে হৃদয় অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, কাজ করবার শক্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তোমার সঙ্গে আলাপ করে এলে কর্ত্তব্যের গৌরব পুনর্ব্বার নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে পারি—সংসারের সমস্ত জটিল বাধা তুচ্ছ করবার মত বল মনের মধ্যে সঞ্চয় করি। তোমার চিঠিতেও আজ অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও আমার সংসার-বন্ধন লঘু হল।

ত্রিপুরার মহারাজ এখন কলকাতায়। তোমার সফলতায় তিনি যে কি রকম আন্তরিক আনন্দ অনুভব করেন তা তোমাকে আর কি বলব! বাস্তবিক তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে তোমাকে শ্রদ্ধা করেন

এতেই তিনি বিশেষরূপে আমার হৃদয় আকর্ষণ করেচেন। আজ তোমার চিঠি নিয়ে তাঁর ওখানে যাব—তিনি খুব খুসি হবেন। তুমি তাঁকে অল্পদিন হল যে চিঠি লিখেছিলে সেখানি পেয়ে তিনি যেন বিশেষ সম্মানিত হয়ে উঠেছিলেন এমনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। কোনরূপে তোমাকে সহায়তা করবার জন্যে তিনি যেন ব্যগ্র হয়ে আছেন।

লোকেনকে আমার গল্প তর্জ্জমার জন্যে ধরেছি—কিন্তু সে নিতান্ত কুঁড়ে এবং নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাসহীন। সেই জন্যে তাকে কোন কাজে প্রবৃত্ত করাতে পারিনে। সে এখন আমার কাব্যনির্ব্বাচনে ব্যস্ত আছে। তার সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে তাকে পরাস্ত করেছি—তার অনেকগুলি সখের কবিতা এই Selection থেকে নির্ব্বাসিত করে বইটাকে সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তোলা গেছে—এখনো দুই এক জায়গায় একটু আধটু কণ্টক লুকিয়ে আছে—সে আর পারা গেল না।

আমি আজকাল নানা গোলমালের মধ্যে "নৈবেদ্য" বলে এক একটি কবিতা প্রত্যহ আমার কোন এক অবসরে লিখে ফেলে আমার অন্তর্য্যামীকে নিবেদন করে দিই। আমার জীবনের সমস্ত কৃত কর্ম্মের সমস্ত চিন্তিত সংকল্পের সমস্ত দুঃখ-সুখের কেন্দ্রস্থলে যিনি ধ্রুব নিশ্চল ভাবে বিরাজ করচেন এবং সেই সঙ্গে সমস্ত অণুপরমাণু সমস্ত বিরাট জগৎমণ্ডলের যিনি একটিমাত্র ঐক্যস্থল—তাঁর কাছে নির্জ্জনে গোপনে প্রত্যহ জীবনের একটি একটি দিন সমর্পণ করে দিচ্চি। সে দিনগুলিকে যদি কর্ম্মের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিতে পারতুম তাহলেই ভাল হত কিন্তু অন্তত তাতে পত্রপুটে ফুলের মত একটি করে গান সাজিয়ে আমার জীবনের নদীর ঘাটে সেই সমুদ্রের উদ্দেশে ভাসিয়ে দিয়েও সুখ আছে। শীঘ্রই এগুলো ছাপতে দেব—বোধ হয় তুমি ইংলণ্ডে থাকতে থাকতেই পাবে। কিন্তু সেখানকার কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষের নির্জ্জন দেবালয়ের এই গানগুলি ঠিক সুরে বাজবে কি না জানি নে—এর আনন্দ এবং বিষাদ এবং শান্তি সেখানে কি রকম শোনাবে?

মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এলুম—তাঁকে তোমার চিঠি শোনালুম—তিনি ভারি খুসি হলেন। আচ্ছা, তুমি এদেশে থেকেই যদি কাজ করতে চাও তোমাকে কি আমরা সকলে মিলে স্বাধীন করে দিতে পারি নে? কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও সেটা যদি আমরা পূরিয়ে দিতে না পারি তা হলে আমাদের ধিক্। কিন্তু তুমি সাহস করে এ প্রস্তাব কি গ্রহণ করবে? পায়ে বন্ধন জড়িয়ে পদে পদে লাঞ্ছনা সহ্য করে তুমি কাজ করতে পারবে কেন? আমরা তোমাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করি—সেটা সাধন করা আমাদের পক্ষে যে দুরূহ হবে তা আমি মনে করি নে। তুমি কি বল?

অনেক দিন বিরহী আছি—শিলাইদহের নীড়টির জন্যে প্রাণ কাঁদচে। ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩০৭

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

১২ ডিসেম্বর [১৯০০]

ওঁ

বন্ধু,

পীড়িত ছিলাম বলিয়া কিছুদিন পত্র বন্ধ ছিল। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইতেছি। বিসর্জ্জন নাটকের অভিনয় হইবে; আমি রঘুপতি সাজিব, সেইজন্য সঙ্গীতসমাজের অনুরোধে পড়িয়া শিলাইদহের বিরহ স্বীকার করিয়া এই পাষাণপুরীর বন্ধনে ধরা দিয়াছি। যত পার তোমার খবর আমাকে পাঠাইবে—তন্ন তন্ন বিবরণের জন্য আমি ক্ষুধাতুর—কোন কথা সামান্য জ্ঞান করিয়া বাদ দিয়ো না। তোমার কীর্ত্তিকাহিনীর মহাভোজের কণাটুকু হইতেও আমি বঞ্চিত হইতে চাই না। ত্রিবেদী তোমার নবপ্রকাশিত পুস্তিকা হইতে একটা প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন—এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তাঁহার সহিত একবার দেখা করিব।

আমার গল্পের দ্বিতীয় খণ্ড আর দিন দশেকের মধ্যেই বাহির হইয়া যাইবে। দুই খণ্ড তোমার হস্তগত হইলে নির্ব্বাচন করিবার সুবিধা হইবে। আমার রচনা-লক্ষ্মীকে তুমি জগৎ-সমক্ষে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছ—কিন্তু তাহার বাঙ্গলা-ভাষা-বস্ত্রখানি টানিয়া লইলে দ্রৌপদীর মত সভাসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সাহিত্যের ঐ বড় মুস্কিল—ভাষার অন্তঃপুরে আত্মীয়-পরিজনের কাছে সে যে ভাবে প্রকাশমান বাহিরে টানিয়া আনিতে গেলেই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ঐখানে তোমাদের জিৎ—জ্ঞান ভাষার অপেক্ষা তেমন করিয়া রাখে না, ভাব ভাষার কাছে আপাদমস্তক বিকাইয়া আছে।

গভর্ণমেণ্ট যদি তোমাকে ছুটি দিতে সম্মত না হয়, তুমি কি বিনা বেতনে ছুটি লইতে অধিকারী নও? যদি সে সম্ভাবনা থাকে তবে তোমার সেই ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতে পারি। যেমন করিয়া হোক, তোমার কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়া আসিও না। তুমি তোমার কর্ম্মের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভার আমি লইব।

আমার গল্পের অনুবাদ ছাপাইয়া কিছু যে লাভ হইবে, ইহা আমি আশা করি না—যদি লাভ হয় আমি তাহাতে কোন দাবী রাখিতে চাহি না—তুমি যাহাকে খুসি দিয়ো।

বিসর্জ্জন নাটকের রিহার্সাল আমাকে তাগিদ করিতেছে—অতএব বিদায়। ইতি ১২ই ডিঃ [ডিসেম্বর ১৯০০]

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

৮

[ডিসেম্বরের শেষ ১৯০০
বা জানুয়ারীর প্রথম ১৯০১]

ওঁ

বন্ধু,

আমাকে তুমি কি এক দিগ্‌গজ পুরাতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ? প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের কি পর্য্যন্ত আলোচনা হইয়াছে তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানি না। ত্রিবেদী সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞান (astronomy) সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ তাঁহার "প্রকৃতি" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন—সেই গ্রন্থ তোমাকে পাঠাইয়া দিব। অন্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোথাও কিছু দেখিয়াছি বলিয়া মনেই পড়ে না। কিছু দিন রোগভোগে কাটাইয়া দিয়াছি। তাহার পর শান্তিনিকেতনের উৎসবের জন্য এক বক্তৃতা লিখিতে হইল—তাহার পরে ভারতীর জন্য "চিরকুমার সভা" লিখিতে হইল—তাহার পরে

সঙ্গীত-সমাজে বিসর্জ্জন নাটকের অভিনয়ের রিহার্সাল দেওয়া গেল—আমাকে রঘুপতি সাজিতে হইয়াছিল—সমস্ত ঝঞ্ঝাটে বিব্রত ছিলাম।

বিসর্জ্জনের অভিনয় যখন হইতেছিল তুমি তখন সাত সমুদ্র পারে কি করিতেছিলে? উপস্থিত থাকিলে তুমি খুসী হইতে—আমিও হইতাম, বলা বাহুল্য।

বড় দাদা তাঁহার পাণ্ডুলিপি তোমাকে পাঠাইবার জন্য আমার হস্তে দিয়াছেন। কোন গণিতওয়ালাকে দিয়া একবার যাচাই করিয়া লইতে চান—নিরুৎসাহ জনক কথা হইলে বলিতে কুণ্ঠিত হইও না। তাঁহার মতে ইহা কিছু জটিল ও বাহুল্যময় হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে নূতন পদার্থ মেলা অসম্ভব নহে। যদি কেহ ইহাকে [সহজ] করিবার জন্য কোন [ইচ্ছা জ্ঞাপন] করেন তাহা তিনি শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন। অথবা কেহ যদি ইহার মর্ম্মটা রাখিয়া কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ছাপাইতে ইচ্ছুক হন, তিনি তাহাতে সম্মত।

এবার শিলাইদহে ফিরিয়া পদ্মার চরে বোটে আশ্রয় লইব বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি। এখন শীতের দিনে পদ্মা তাহার তীরে আমার অভ্যর্থনার জন্য শুভ্র ফরাস বিছাইয়া অপেক্ষা করিতেছে—ফস্ করিয়া তুমি একবার বেড়াইয়া যাইতে পারিলে বেশ হইত।

তোমার রবি

পুঃ—বড়দাদার এই খাতার কোন নকল নাই।

৯

জানুয়ারি ১৯০১

ওঁ

বন্ধু,

অসময়ে ভারতবর্ষে ফিরিলে পাছে তোমার কর্ম্ম-সমাধা সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে এ আশঙ্কা আমি দূর করিতে পারিতেছি না। সকল প্রকারেই ত্যাগ স্বীকার করিয়া তোমাকে তোমার কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। যে বৈজ্ঞানিক রশ্মি তোমার মাথার মধ্যে স্পন্দিত হইতেছে তাহাকে বিশ্বসংসারের গোচর করিতে হইবে। তোমার কাজে আমাদের স্বার্থ—সুতরাং সেই কার্য্য সমাধার ব্যয় আমাদেরই বহনীয়। তুমি অসময়ে তোমার কর্ম্ম অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়ো না—আমার ত এই পরামর্শ।

এখনো বোধ হয় ডাক্তারের হাতে রহিয়াছ—আমার এই চিঠি যখন পৌঁছিবে, আশা করি, ততদিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিয়াছ। আমার একান্ত মনের প্রার্থনা এই যে, তোমার প্রদত্ত নূতন জ্ঞানালোকের দ্বারা নব শতাব্দীর আরম্ভ ভাগ অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা লাভ করুক।

তোমার রবি

১০

মে ১৯০১

ওঁ

বন্ধু,

অনেক দিন তোমার পত্র পাই নাই, আমিও লিখি নাই। তুমি লেখ নাই তাহার ভাল জবাবদিহি আছে—আমি যে লিখি নাই তাহার কারণ অতি ক্ষুদ্র অথচ বিপুল। নানা সাংসারিক সঙ্কটে বিজড়িত হইয়া আমি অত্যন্ত পীড়িত চিত্তে আছি—কোন রকমে মনের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া লেখা-পড়ায় মন দিতে চাই—কিন্তু কম্‌লি নেই ছোড়্‌তা।

শরীরটা কিছু ক্লিষ্ট হওয়ায় সম্প্রতি মহারাজের সঙ্গে দার্জ্জিলিঙে আসিয়াছি। তাঁহার আতিথ্যে ও প্রকৃতির শুশ্রূষায় শরীর ও মনের স্বাস্থ্য লাভ করিব প্রত্যাশা করিতেছি। কিন্তু অধিক দিন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কেন নাই, সে খবরটা তোমাকে দেওয়া যাক।

বেলার বিবাহ এই মাসেই স্থির হইয়াছে। আর তিন সপ্তাহ মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি এমনি হতভাগ্য, আমার কোন বন্ধুই বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন না; তুমি বিলাতে, লোকেন তথৈবচ, মহারাজ সে-সময় বোধ করি আগরতলায়, নাটোর নীলগিরিতে। আমার গৃহে এই প্রথম বড় কাজ—কিন্তু তোমাদের অভাবে আমার উৎসব নিরানন্দ হইবে।

কিন্তু তুমি এমন কোনও তারহীন বিদ্যুদ্‌-যান এখনো কি প্রস্তুত কর নাই যাহা অবলম্বন করিয়া বন্ধুর আনন্দ-উৎসবে প্রসন্ন মঙ্গলহাস্য বিকীর্ণ করতে পার? নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়ো।

তোমাকে একটি কাজের ভার দিতে চাই। যুবরাজের জন্য বিলাত হইতে একটি ভাল শিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে হইবে। যুবরাজ ত্রিপুরা হইতে দূরে থাকিয়া সম্পূর্ণ তাঁহার শাসনাধীনে শিক্ষালাভ করিবেন। শিক্ষকটি বিজ্ঞানবিৎ হইলেই ভাল হয়। এরূপ গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে লইতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করিবে, আমি জানি; কিন্তু তবু তোমাকে লইতে হইবে। অবশ্য, তুমি যাহাকে ভাল মনে করিয়া বাছিয়া দিবে ভারতবর্ষের জলহাওয়ার গুণে দুই দিনেই সে মন্দ হইয়া দাঁড়াইতে পারে—মহারাজা সেজন্য তোমাকে দোষী করিবেন না। বর্ত্তমানে তুমি যাঁহাকে যোগ্য এবং ভাল মনে করিবে, যিনি যুবরাজকে যথোচিত সংযমে রাখিতে পারিবেন, অথচ অনাবশ্যক উদ্ধত হইবেন না এমন একটি লোক দেখিয়া, তাহার বেতন প্রভৃতি কিরূপ হইতে পারে জানিয়া লিখিবে।

বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জীবিত হইতেছে। আমাকে তাহার সম্পাদক করিয়াছে। মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয় দান করিয়াছেন। কন্যাকে বিদায় দিয়া এই পত্রের প্রতি মন দিতে হইবে।

তোমাকে বেলার হাতে কপি-করা একখানি কবিতার খাতা পাঠাইয়াছি, নিশ্চয় পাইয়াছ।

বন্ধুজায়াকে আমার নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানাইবে। শুনিলাম, তিনি অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে প্রবাসী বাঙ্গালীকে মাছের ঝোল ভাত খাওয়াইয়া পুণ্য লাভ করিতেছেন—তাঁহার মাছের ঝোল এখনও ভুলি নাই।

তোমার রবি

পুনশ্চ—মহারাজ আবার তোমাকে বলিবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন—তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন—তোমাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিতে চাহেন। শিক্ষকটির বাসস্থান ও আহারাদির খরচ নিজে হইতে লাগিবে না। কুচবিহার বলেন, বেতন পাঁচ শত হইতে আরম্ভ করিয়া আট শত পর্য্যন্ত হওয়াই নিয়ম। যদি তার চেয়ে অধিক দিতে হয় ও নির্দ্দিষ্ট সময় বাঁধিয়া দিতে হয়, তাহাও চলিতে পারিবে।

১১ ওঁ
২১ মে ১৯০১

শিলাইদহ
২১শে মে
১৯০১

বন্ধু,

অনেক দিন থেকে তোমার চিঠির জন্যে প্রত্যাশিত হয়ে ছিলুম। আজ পেয়ে খুব খুসি হলুম। পাছে তোমার কাজের লেশমাত্র ক্ষতি হয় সেই জন্যে আমি তোমাকে কখন তাগিদ করিনে।

পৃথিবীকে সর্ব্বত্র চিম্‌টি কাটবার যে উপায় তুমি বের করেছ সেইটে পড়ে গর্ব্ব অনুভব করা গেল। এতদিন জড় পদার্থ আমাদের বিধিমতে পীড়ন করে আসছিলেন এবারে তোমার কল্যাণে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারব। তাদের দেদার চিম্‌টি কাট আর বিষ খাওয়াও—ওগুলোকে কোনমতে ছেড়োনা। এখন থেকে আদালতে যদি অপরাধী জড় পদার্থের বিচার হয় তাহলে বিচারক তাদের চিম্‌টি দণ্ড বিধান কর্ত্তে পারবে।

যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাকতে হয় তুমি তারই জন্যে প্রস্তুত হোয়ো। অনর্থক ভারতবর্ষের বঞ্ঝাটের মধ্যে এসে কাজ নষ্ট কোরোনা। তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫.৬ বৎসর সেখানে থকেতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য তোমার দরকার হবে। আমার কাছে লেশমাত্র সঙ্কোচ কোরো না। বৎসরে তোমাকে কত পরিমাণে দিলে তুমি বিনা বেতনে দীর্ঘ ছুটি নিতে পার আমাকে লিখো। যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে সেখানে থেকে তোমার কাজ করতে পার আমি বোধ হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব। তুমি আমাকে খোলসা করে লিখো।

লোকেন যাত্রা করে বেরিয়ে পড়েছে। এতদিনে সে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করেছে। তার প্রতি আমার ঈর্ষা হচ্ছে। আমার ভারি ইচ্ছা করছে আমরা জন দুইতিনে মিলে তোমার ওখানে মাছের ঝোল খেয়ে আগুনের কাছে ঘরের কোণে ঘণ্টা দুই তিনের জন্যে জমিয়ে বসি। আর একবার আমি লোকেনের সঙ্গে লণ্ডনে গিয়েছিলুম—তখন তোমরা কেউ সেখানে ছিলেনা—আমি দুদিন থেকেই নিতান্ত ধিক্কার সহকারে সেখান থেকে দৌড় দিয়েছিলুম। কিন্তু তোমার যদি বিলাতে পাঁচ ছয় বৎসর থাকা হয় তাহলে কি একবার সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে না? আশা করছি দেখা হবে। হয়ত কোন দিন তোমার দরজায় ঠক্‌ঠক্‌ শব্দে ঘা পড়বে।

বঙ্গদর্শন প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। নানা হাঙ্গামে আমি মন দিতে পারি নি—অনেক ভুলচুক থেকে গেছে। আমার একটা কবিতা এমন বিকৃত হয়ে গেছে তার মানেই বোঝা যায় না। তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলে দেব।

তোমার রবি

৪ জুন [১৯০১]

১২

বন্ধু,

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং! তোমাদের চিঠি পাইয়া আমি প্রাতঃকাল হইতে নূতন লোকে বিচরণ করিতেছি। যে ঈশ্বর তোমার দ্বারা ভারতের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন আমি তাঁহার চরণে আমার হৃদয়কে অবনত করিয়া রাখিয়াছি। কোন্ দিক্ দিয়া তিনি আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন অদ্য আমি তাহার অরুণাভামণ্ডিত পথ দেখিতেছি। তোমার নিকট পূজা প্রেরণ করিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া আছে—বন্ধু, আমার পূজা গ্রহণ কর! তোমার জয় হউক্। তোমাতে আমাদের দেশ জয়ী হউক্! নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোকশিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্বলিত কর।

তোমাকে বারম্বার মিনতি করিতেছি—অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর—দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতার্জ্জন করিব।

বেলার বিবাহের আর ১০।১১ দিন বাকি আছে। তোমার জয়সংবাদে আমার সেই উৎসব দ্বিগুণতর উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে। আমার সভার মধ্যে তুমি তোমার অদৃশ্য কিরণের আলোক জ্বালিয়া দিয়াছ। অনেক বঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িয়াছিলাম—আমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি। আমার একান্ত দুঃখ রহিল তোমার জয়ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকিতে এবং তোমার জয়লাভের পরে তোমার হস্তস্পর্শ করিতে পারিলাম না।

তোমার ক্ষুদ্র বন্ধু মীরাকে তোমার জয়সংবাদ দিলাম, সে কিছুই বুঝিল না। যখন বুঝিবার বয়স হইবে তখন স্মরণ করিয়া খুসী হইবে।

এইবার বিবাহের আয়োজনে মন দেইগে। ইতি—২১শে জ্যৈষ্ঠ। [১৩০৮] *

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

* বিশ্বভারতীর সৌজন্যে।

আষাঢ়ের মেঘকে

শ্রীপ্রজেশকুমার রায়

স্বাগত হে সুন্দর আষাঢ়ের মেঘ!
স্বাগত হে মন্থর আষাঢ়ের মেঘ!
দগ্ধ চোখে মোহাঞ্জন দাও, এঁকে দাও—
অসকার পথে নাও, সঙ্গে করে নাও।

স্বাগত হে ঘননীল আষাঢ়ের মেঘ!
দাও আশা, দাও ভাষা, দাও প্রাণবেগ।
দূর করো নিদাঘের দাহ দুঃসহ,—
দাও অশ্রু, দাও গীতি, ওগো বারিবহ!

বক্ষ ভরে দাও কেয়া-কদম্বের ঘ্রাণ—
কল্পনারে দাও পাখা, মৃতে দাও প্রাণ।

পরিমল গোস্বামী

দ্বিতীয় পর্ব

৩

ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীটের মেসেই প্রথম কাজি নজরুল ইসলামকে দেখলাম। যুবক নজরুল, প্রাণোচ্ছলতায় ভেঙে পড়ছেন, তাঁর কল্পনার হাউই তখন আকাশচুম্বী। কবিতা আবৃত্তি করলেন। বল বীর, বল উন্নত মম শির! উদ্দীপনা জাগায় ভীরু মনে। গালভানির মতো তিনি যেন, যে যুবশক্তি মৃত ব্যাঙের মতো পড়ে আছে, তার মধ্যে বিদ্যুত্তরঙ্গ চালনা করতে এসেছেন তাঁর বিদ্যুজ্জনন যন্ত্র নিয়ে।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। আবৃত্তির পর তিনি কীর্তন গান গাইলেন একখানা। তাঁর কণ্ঠের উচ্চগ্রাম মেস-ঘর অতিক্রম ক'রে আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের বাড়িঘরগুলোকে ধাক্কা মারতে লাগল। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম দুজনের দিকে।

কবিশেখর কালিদাস রায় আসতেন লেখার ফাইল নিয়ে, বাইরে থেকে। তিনি উপাসনা কাগজে মাসিকপত্র সমালোচনা করতেন, তাঁর জন্য ঐ কাগজে একটি পৃথক বিভাগ ছিল। সাবিত্রীপ্রসন্ন ছিলেন সহকারী সম্পাদক। আরও একজন সহকারী—কিরণকুমার রায়। ১৯২০ সালে কিরণ থার্ড ইয়ারে পড়ত ইংরেজীতে অনার্স সহ।

কিরণের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়েছিল তখন থেকেই, আজও তা অক্ষুণ্ন আছে। কিরণচরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অধিকাংশ বিষয়েই নিজস্ব মত প্রকাশ করা, এবং সে মতটি একটি মাত্র ইংরেজী শব্দ—trash! অনেক কিছুই কিরণের কাছে ট্র্যাশ। মনে মনে জানতাম ঠিকই বলছে, কিন্তু অত অল্প বয়সে এ রকম মত প্রকাশ করবে কেন সে, এর পরিণাম কি, ভেবে ভয় হত। শেষ পর্যন্ত আশঙ্কিত পরিণামই ঘটেছে, সে সব পরে বলা যাবে।

একটি কবিতা লিখেছিলাম, সসঙ্কোচে সেটি কবিশেখরের হাতে দিলাম। তিনি সেটি উপাসনাতে ছেপেছিলেন। কবিতা যে কেন লিখেছিলাম জানি না, ওটি হয়তো বাঙালীত্বের বৈশিষ্ট্য। কবিত্ব ছিল মনে মনে, নীরব এবং অদৃশ্য। নীরব কবিকে সংসারে কবি বলে স্বীকার করা হয় না। অবশ্য কবিরূপে তারা স্বীকৃতি না পেলেও মুখর কবিদের প্রধান অনুরাগী তারাই। পৃথিবীতে কবিদের কাব্যে এ যাবৎ যারা মুগ্ধ হয়েছে এবং কাব্যকে জনপ্রিয় করেছে তারা সবাই নীরব কবি।

"একাকী গায়কের নহে তো গান
গাহিতে হবে দুইজনে
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা
আর একজন গাবে মনে।"

এর ব্যতিক্রম একমাত্র সমবেত সঙ্গীতে, যেখানে, 'গাহিবে দশজনে খুলিয়া গলা, কেহই গাহিবে না মনে।'

উপাসনায় এ সময় আমার একটি প্রবন্ধও ছাপা হয়, (মাঘ ১৩২৭)। প্রবন্ধের নাম 'আমাদের চিত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা।'—প্রবন্ধটি আজ থেকে ৩৭ বছর আগের লেখা। তবু হয় তো আজকের আমির কিছু চিহ্ন ওর মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। ঐ প্রবন্ধে লিখছি—

"কোনো একটি বস্তুর রূপ বর্ণনা করিতে গেলে আমরা ভাষার আশ্রয় লই, কিংবা রেখায় ও বর্ণে তাহা ফুটাইয়া তুলি। চোখে যেটুকু দেখি শুধু সেইটুকুই যদি প্রকাশ করি তাহা হইলে সে প্রকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে পিকেটিং
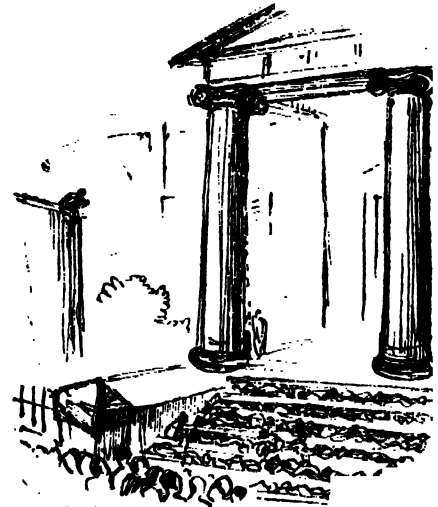
অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যে রূপটুকু চোখের নিকট অব্যক্ত অথচ হৃদয়ের মধ্যে ব্যক্ত সেটুকুর প্রকাশ না করা পর্যন্ত আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। এখন কথা উঠিয়াছে চিত্রশিল্পে আমরা প্রকৃতিপন্থী হইব কি কল্পনাপন্থী হইব; যাহা চোখে দেখিতে পাই কেবল তাহাই আঁকিব না কল্পনার রং ফলাইয়া তাহাকে ভিন্ন পথে চালাইব। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়—সমস্যাটি মোটেই জটিল নহে। চিত্রশিল্পে প্রকৃতিকে অনুসরণ করার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে আমাদের অঙ্কিত চিত্র একটি বাস্তব চিত্র তো হইবেই তাহা ছাড়াও কিছু বেশি হইবে। বস্তু বিশুদ্ধ অবস্থায় শুধু দেহের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা যখন মনের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে চাই তখন আমরা তাহার বিশুদ্ধতা বজায় রাখিতে পারি না; সঙ্গে কিছু বাহুল্য কিছু অবাস্তর এবং কিছু অলঙ্কার যোগ করিয়াই থাকি।···চোখে দেখা রূপের বর্ণনা বেশি করিতে হয় না, কারণ চোখে আমরা সামান্য অংশই দেখিতে পাই; কিন্তু অন্তরের চোখে যাহা দেখি তাহা অতি বৃহৎ। তাই শব্দচিত্রেই হউক, বর্ণ বা রেখাচিত্রেই হউক, কল্পনার রূপ যত বেশি দিতে পারিব ততই সেগুলি বেশি সুন্দর হইবে।"

চিত্রশিল্প নিয়ে এখনও মাঝে মাঝে লিখি। আজ বুঝতে পারি যে অর্থে একথা লিখেছিলাম আমার মনের মধ্যে সে অর্থের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের মূলে আছেন রবীন্দ্রনাথ। সে কথা পরে বলছি।

বিভূতিভূষণ ভট্ট আসতেন এই মেসে। তাঁর একখানা ফোটোগ্রাফ তুলে দিয়েছিলাম, আজও মনে আছে সে ছবিখানার কথা। আরও একখানি ছবি তুলেছিলাম যার কপি থাকলে আজ তার বড়ই আদর হত। সিনেট হাউসের সিঁড়িতে ছাত্ররা শুয়ে আছে, ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে না কাউকে। প্রবেশ করতে হলে তাদের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। আমি আমার কোয়ার্টার প্লেট ক্যামেরাটি নিয়ে পাশের একটি ফটকের উপরে উঠে ছবি তুলেছিলাম। আশুতোষ বিলডিং তখন ছিল না। ফোটোগ্রাফখানা নির্ভুল এক্সপোজারে চমৎকার হয়েছিল।

এই মেসে থাকতে আর একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটে। আমি একদিন একখানা ছবি আঁকি। ছবিটি রবীন্দ্রনাথের মূর্তিকে আশ্রয় ক'রে আঁকা। একখানা প্রোফিল ফোটোগ্রাফ থেকে কপাল ও নাকমুখের রেখাটি নিয়ে সেই রেখাটি শাদা রেখে বাকী অংশ সব কালো ক'রে দেওয়া। মনে হচ্ছিল যেন অন্ধকারে মুখের ঐ অংশে শুধু আলো পড়েছে। যেন অন্ধকার ভেদ ক'রে কবি জ্যোতির্ময়ের দিকে মাথা তুলেছেন। ভাবটি তাঁর কবিতা থেকেই নেওয়া।

কবি জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় তখন প্রভাতী নামক ছোট্ট একখানা মাসিকপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে পত্রিকায় আমার একটি রচনাও ছাপা হয়েছিল, কি এখন আর মনে নেই। এই পত্রিকায় জ্ঞানেন্দ্রনাথের ব্রিজ অফ সাইস্ কবিতার অনুবাদ ছাপা হয়। তিনি এই মেসে আসতেন। যে দিন ছবিখানা আঁকি তার পরদিন তিনি এসেছিলেন। তিনি ছবিখানা দেখে বললেন ওখানা প্রভাতীতে ছাপবেন! মোটা কাগজে আঁকা ছবি, জড়িয়ে মোটা বোর্ডের সিলিণ্ডারে ঢুকিয়ে তাঁকে দিয়ে দিলাম। তখন বেলা নটা কি দশটা। আধঘণ্টা পরে জ্ঞানবাবু হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন আমার কাছে এবং এসে প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি। তিনি সোজাসুজি কিছুতেই বলতে চান না, শেষে লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত ভাবে বললেন ঘরে গিয়ে দেখি, প্যাকিংএর চোঙাটা হাতে আছে, ভিতরে ছবি নেই, চোঙা থেকে পথে কোথায় পড়ে গেছে। শেষে আমিই তাঁকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করলাম।

বেলা বারোটা আন্দাজ সময়ে খাবার ঘরে কয়েকজন 'সহোদর'-এর কাছে ঘটনাটা বর্ণনা করছিলাম। শক্তিপদ নামক এক বন্ধু বললেন মেসের চাকর এক ওড়িয়ার দোকান থেকে তাঁর জন্য পান কিনে এনেছে, সেই পান জড়ানো আছে রবি ঠাকুরের একখানা ছবি দিয়ে। খাওয়া শেষে দেখি—ঘটনা সত্য। পানের রং মাখা সেই কাগজখানায় আমারই ছবি। তবে পান উল্টো পিঠে জড়ানো ছিল, তাই সম্পূর্ণ নষ্ট হয়নি। ছবিখানা দুমড়ে গিয়েছিল, কিন্তু অনেক কৌশলে তাকে চেপে চেপে ঠিক করে তার উপর আবার তুলি বুলিয়ে ঠিক ক'রে ফেললাম।

কথাটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল, এবং সে ছবি অবশেষে সবাই দেখলেন। যেন জীবন্ত কবি একটি বড় দুর্ঘটনা থেকে সম্প্রতি কোনোরকমে বেঁচে ফিরে এসেছেন। কিরণকুমার বলল, ও ছবি উপাসনায় ছাপা হবে। নানা কারণে ছবির দাম বেড়ে গিয়েছিল। উপাসনাতেই অবশেষে সে ছবি ছাপা হল পৃথক প্লেটে, ছবির নিচে ক্যাপশন রইল 'সমস্ত তিমির ভেদ করি দেখিতে হইবে ঊর্ধ্ব শির—এক পূর্ণ জ্যোতির্ময়ে অনন্ত ভুবনে।'

জ্ঞানবাবু একদিন বিস্মিত হয়ে দেখে গেলেন সে ছবি এবং পুনরায় অনুতাপ ক'রে চলে গেলেন।

কিন্তু এ ছবির কাহিনী এখানেই শেষ নয়। এ ছবির যে কি দাম তা রবীন্দ্রনাথই একদিন ফাঁস ক'রে দিয়েছিলেন।

এই মেসে থাকতে এক বিশিষ্ট বন্ধুর জন্য কনে দেখার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম। বাইরে থেকে হঠাৎ গিয়ে কোনো মেয়েকে দেখে পছন্দ হল বা পছন্দ হল না বলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার মতে গৌণভাবে জেনে শুনে শুধু বিয়ের কথা পাকা করলেই যাওয়া ভাল। এ বিষয়ে আমার এমন একটি মনোভাব আছে যাকে দুর্বলতা নাম দেওয়া যেতে পারে হয় তো, কিন্তু আজও এ দুর্বলতা আমার কাটেনি। বিয়ের ব্যাপারে পছন্দ অপছন্দ দুটি কথা প্রায় কেনা-বেচার ভাষায় পরিণত হয়েছে, ওতে মেয়েদের অপমান করা হয় এই আমার ধারণা। যাই হোক, তবু আমাকে যেতে হল নানা কারণে। যেতে হল সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত। সঙ্গে কিরণকুমার, সাবিত্রীপ্রসন্ন এবং আরও একজন কে ছিলেন মনে নেই। দুটি বোন একত্র সেজে এসে বসল, সম্ভাবিত খদ্দেরদের কাছে। দুজনে একসঙ্গে ব'সে সেতারে একই গৎ বাজাল। কত খাতির পেলাম। কলকাতা ফিরে এসে অভিযানের নেতা বললেন বড় মেয়েটির সম্পর্কে মত দিতে হবে। ফুলমার্ক ১০০। দশটি ভাগে ভাগ করা হল মেয়েটিকে। চুল ১০, মুখ ১০, চোখ ১০, দেহ-সৌষ্ঠব ১০, কণ্ঠস্বর ১০, ইত্যাদি। আমরা যারা যারা দেখেছি সবারই পৃথকভাবে নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে হবে মার্ক দিয়ে। আমার হাতে মোট মার্ক উঠেছিল ৮০। কিন্তু অন্যেরা মার্ক কম দিলেন, ভোটের জোর হল তাঁদের। তাঁরা যে কেন কম দিলেন তা আমার বুদ্ধির অগম্য ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেস ছেড়ে গেলাম দেশে। স্বাস্থ্য ক্রমশ খারাপের দিকে। এর উপর দেশে ব্যাপক ভাবে মহামারী দেখা দিল। আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই চলে গেলাম ভাগলপুরে ১৯২১ সালে। প্রবোধ ছিল সেখানে, তার সাহায্যে আগেই বাড়ি ভাড়া ক'রে রাখা হয়েছিল।

গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ তখন সর্বত্র ভেঙে পড়ছে। খুব একটা উত্তেজনার ভাব। আমার স্বাস্থ্য কোনো দিনই কোনো আন্দোলনের উপযুক্ত ছিল না, সেজন্য আমি এ বিষয়ে ছিলাম অনেকখানি উদাসীন। ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির 'চরকায় স্বরাজ' প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে ভিন্ন মত প্রচার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত আমার যুক্তিবাদী মনে খুব সাড়া দিয়েছিল।

আমার বোন সরলা তখন ছিল চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী ঊর্মিলা দেবী প্রতিষ্ঠিত নারীকর্মমন্দির নামক শিক্ষায়তনে। বাড়িটি ছিল রূপচাঁদ মুখুজ্জে ষ্ট্রীটে। এখানে ইংরেজী, হিন্দি, অঙ্ক ও চরকায় সুতো কাটা শেখানো হত। সুপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে মুখার্জী) ও চারুলতা বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে রায়চৌধুরী) এখানে ছাত্রী ছিলেন। ভাগলপুর থেকে দেশে ফেরার পথে আমরা সবাই মিলে একবেলার জন্য এখানে এসে উঠলাম। আসবার সময় সরলা কর্মমন্দিরের এক চরকা আমাদের কাছে বিক্রি করল। এই সম্পূর্ণ স্বদেশী জিনিসটি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছেছিল ঠিকই, কিন্তু সঙ্গের একটি বিদেশী জিনিস গাড়ির ভিতর থেকে চুরি হয়ে গেল।

চুরি হল আমার ক্যামেরাটি। একটি অ্যাটাশে কেস্-এ ক্যামেরা ও অনেকগুলো চিঠি ছিল, সবশুদ্ধ গেল। বিদ্যাসাগর হষ্টেলে থাকতে রবীন্দ্রনাথকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম। অকারণ চিঠি। শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তখন কিছু ভেবেছিলাম এবং রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম। কি লিখেছিলাম ঠিক মনে পড়ে না এবং সে-চিঠির কোনো উত্তর আমি আদৌ আশা করি নি এবং উত্তর পাওয়া যে আদৌ সম্ভব তাও কল্পনা করি নি, অথচ লেখার কয়েকদিনের মধ্যেই তার এক উত্তর এলো, খামে-লেখা মাত্র তিন লাইন। চিঠিখানা মুখস্থ আছে।

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দ লাভ করেছি। আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে, বাংলা দেশ থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোনো সাহায্য বা সহানুভূতি পাই নি। ইতি—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯১৮ সালে লেখা, কিন্তু তারিখটি আমার মনে নেই। এই চিঠিখানাও ক্যামেরার সঙ্গে চুরি হয়ে গেল। চিঠিখানিতে একটি বেদনার সুর আছে। চিঠি লেখার মুহূর্তে মনে হয় তো কোনো প্রচ্ছন্ন বেদনা ছিল। কবি মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়তেন সাময়িক ভাবে। তারই কিছু ছায়া পড়েছে এ চিঠিতে। কিন্তু কি আশ্চর্য, আমার সামান্য একখানা চিঠির উত্তরে তিনি আমার প্রতি অনেকখানি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন, এ আমার কাছে একেবারে কল্পনাতীত ছিল। এতে কবির মানসিক ঔদার্যের একটি পরিচয় আমার কাছে উদ্ঘাটিত হল, যা আমি ভুলতে পারি নি কখনো।

এ চিঠিখানা হারিয়ে যাওয়াতে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল। মূল্যবান জিনিসগুলো হারিয়ে শুধু চরকা নিয়ে বাড়িতে ফিরলাম। চরকা আমিও কেটেছিলাম, শুধু মেয়েদের দেখাতে যে ও-কাজটা ছেলেরাই ভাল পারে। আধ সের পরিমাণ সুতো আমার হাতে বেরিয়েছিল। সে সুতো কোনো তাঁত পর্যন্ত পৌঁছয় নি। পৌঁছতে হলে সম্ভবত আমাকে কলকাতা আসতে হত ফিরে। ১৯২১ সালের ঘটনা। এর ২৬ বছর পরে যে স্বাধীনতা এলো, তারই কি সেটি প্রথম সূত্রপাত ?

আক্ষরিক অর্থে চরকা কেটেছিলাম কয়েক বছর পরে, উনুনে পাঠাবার আগে। যাই হোক, বাড়িতে চুপচাপ ব'সে থাকতে থাকতে মানসিক অধৈর্য বাড়তে লাগল। পড়াশোনা হোক বা অন্য কোনো বিদ্যা হোক, তার সাহায্যে উপার্জন করতে হবে, এ চিন্তা মনে এলেও ভাল লাগত না। অন্তত এ সময়ে বা এর পরেও অনেক দিন এদিক দিয়ে কিছু ভাবি নি। একটা দায়িত্বহীন অলসপরিস্থিতা, যার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ক্রমে নবগঠিত বিশ্বভারতীর দিকে আকর্ষণটা বেশি বোধ করতে লাগলাম। সেখানে থেকে, চিত্রাঙ্কন শিখব, এই ভাবে চিঠি লিখে সব আয়োজন পাকা ক'রে ফেললাম, সম্ভবত টাকাও আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। রওনা হবার আগে একখানা চিঠি পেলাম নৈহাটি রেল পুলিসের কাছ থেকে। আমার ব্যাগটি সেখানে জমা আছে, পুলিসে সেটি কুড়িয়ে পেয়েছে রেলের ধারে। শান্তিনিকেতনে যাবার পথে সেটি উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেলাম নৈহাটি রেল পুলিসের ঘর থেকে। তার ভিতরে কিছুই ছিল না। পরে হঠাৎ খেয়াল হল পুলিস জানল কি ক'রে যে ওটি আমার ব্যাগ! নিশ্চয় ওর ভিতরের চিঠি থেকে। কিন্তু আমি যখন ব্যাগ পেয়েছি তখন তাতে একখানিও চিঠি ছিল না। অপ্রয়োজনীয় বোধে চিঠিগুলো সব ফেলে দিয়ে থাকবে, কিন্তু কেন? শুধু একটি ভাঙা কেস্ সংগ্রহের জন্য আমার ডাক পড়ল, অথচ যা আমার কাছে যথার্থরূপে মূল্যবান তা ফেলে দেওয়া হল। পরে এ সব উল্লেখ ক'রে রেল পুলিসকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম শান্তিনিকেতন থেকে, কিন্তু তার কোনো জবাবই পাইনি।

শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছলাম সন্ধ্যাবেলা। আশ্রয় পেলাম লাইব্রেরি ঘরের দোতলায় আরও অনেকের সঙ্গে। এখানকার খোলা আবহাওয়ায় এবং নতুন পরিবেশে স্বাস্থ্যলাভ করব এই রকম একটা আশা জাগল মনে। কিন্তু ঘটল বিপরীত। ভোরবেলা

সাহেবগঞ্জে কনে দেখা

ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে সর্দিকাসি আরম্ভ হয়ে গেল এবং শুধু আলুর তরকারি আর ডাল খেয়ে পাকস্থলীর দুর্দশা ঘটল। চেহারা দাঁড়াল যক্ষ্মারোগীর মতো, এবং সপ্তাহে দু-তিন দিন অন্তত হাসপাতালের বিশেষ পথ্য খেতে লাগলাম ডাক্তারের ব্যবস্থায়। মাঝে-মাঝে কাসি এত বেশি হতে লাগল যে নিজেরই সংকোচ হ'ত কারো সঙ্গে মন খুলে আলাপ করতে।

আমি যে ঘরে ছিলাম সেখানে আজকের স্মরণীয়দের মধ্যে আমার নিকটতম শয্যায় রাত কাটাতেন সৈয়দ মুজতবা আলী ও শ্রীঅনিল চন্দ। দু'জনেই আজ কথাশিল্পীরূপে প্রসিদ্ধ। তখনও তাই ছিলেন। ক্রমাগত কথা ব'লে আসর জমিয়ে রাখতেন। কথাশিল্পী আজ অবশ্য বিশেষ অর্থে। একজনের প্রকাশ কাগজে কলমে, আর একজনের প্রকাশ রাষ্ট্রীয় আসরে। আর ছিলেন অনাদি দস্তিদার ও শিল্পী হরিপদ রায়।

শান্তিনিকেতনে যাবার কয়েক দিনের মধ্যেই দেখলাম গণপতি চক্রবর্তীর ম্যাজিক। দেখলাম তাঁর সেই প্রসিদ্ধ বাক্সের খেলা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ছোটখাটো সব খেলা। এই আসরে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন কিছুক্ষণ। এক যাদুকর আর এক যাদুকরের সামনে ব'সে আছেন! সমস্ত পরিবেশটি বেশ উপভোগ্য মনে হয়েছিল! ইলিউশন বক্সের খেলা আরম্ভ হবার আগে বাক্সটি সন্তোষ মজুমদার, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরও অনেকে বেশ ভালভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন।

এই খেলাটির একটু বর্ণনা আবশ্যক। এটি বড় একটি কাঠের বাক্স। গণপতি চক্রবর্তীর দুখানা হাত পিছমোড়া ক'রে বাঁধা হ'ল। দুখানা পাও কষে বাঁধা হ'ল। তার পর তাঁকে একটি থলেতে পুরে, থলের মুখ বেঁধে সেই বাক্সে পোরা হল। তার পর সেই বাক্সটি দড়ি দিয়ে চারদিক থেকে বাঁধা হল এবং তালা বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। তার পর সামনে একটি কালো পর্দা ঝুলিয়ে দিতে না দিতে যাদুকরের দুখানা হাত পর্দা ভেদ ক'রে বেরিয়ে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। হাত দুখানা স'রে গেল, পর্দাও সরিয়ে দেওয়া হল, দেখা গেল বাক্স আগের মতোই বন্ধ আছে। তার পর বাক্সের উপরে তবলা রাখা হল এবং পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। ব'লে দেওয়া হল যাঁর যে তাল শুনতে ইচ্ছে, আদেশ করুন। কেউ বললেন চৌতাল, কেউ বললেন ধামার। পর পর দুটি তালই তবলায় বাজল। পর্দা স'রে গেল, বাক্স পূর্ববৎ। আবার পর্দায় ঢেকে দেওয়া হল, এবারে যাদুকর নিজে বেরিয়ে এলেন পর্দার আড়াল থেকে। বলা হল আপনারা কেউ কোনো চিহ্ন লাগিয়ে দিন এঁর গায়ে। কেউ আংটি পরিয়ে দিল, কেউ চশমা পরিয়ে দিল। যাদুকর পর্দার আড়ালে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে দেওয়া হল এবং দর্শকদের মধ্যে থেকে উৎসাহীরা গিয়ে দড়ি খুলে, তালা খুলে, বাক্সের ঢাকনা তুলে মুখ বাঁধা থলেটি বাইরে তুলে আনলেন। সেটি খুলে দেখা গেল যাদুকর দর্শকদের দেওয়া চশমা ও আংটি পরা অবস্থায় এবং পূর্ববৎ পিছমোড়া ও পা-বাঁধা অবস্থায় থলের মধ্যে রয়েছেন।

তখনকার দিনে এই খেলাটির খুব প্রসিদ্ধি ছিল। এর পর স্টেজে আমি অদ্যাবধি কারো ম্যাজিকই দেখিনি। অতএব এ দেখার উপভোগ্য স্মৃতিটি আজও আছে।

প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে তখন কিছু দূরত্ব ছিল, কাছাকাছি ছিলেন তাঁর ভাই, শ্রীপ্রফুল্লনাথ বিশী, বর্তমানে রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলরের পি, এ, তিনি খুব সহৃদয়তার সঙ্গে আমাকে ওখানকার ভূগোলের সঙ্গে যথাসাধ্য পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রমথনাথের সঙ্গে দূরত্ব ছিল অথচ পরে তাঁর খুব কাছে এলাম, এগারো বারো বছর পরে। এ রকম ঘটনা আরও একজনের সম্পর্কে ঘটেছে। বিদ্যাসাগর কলেজে একই সঙ্গে একই সেকশনে দুটি বছর পড়েছি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, কিন্তু পরে যখন পনেরো বছর অন্তে তার সঙ্গে দেখা হল, তখন নতুন ক'রে পরিচয় হল এবং বন্ধুত্ব গাঢ় হল। আমরা পূর্বে পরস্পর কাউকে দেখেছি মনে পড়ল না।

শান্তিনিকেতনে কিঞ্চিৎ দূরত্ব প্রায় সবার সঙ্গেই ছিল এবং প্রধানত তা স্বাস্থ্যের জন্য। সৈয়দ মুজতবা আলী (তখন ছিলেন মুজতাবা) ও অনিলকুমার চন্দ অবিরাম কথা বলতে পারতেন ব'লে, এবং তাঁদের সঙ্গে প্রায় পাশাপাশি রাত কাটাতে হত ব'লে, আক্ষরিক অর্থে তাঁদের সঙ্গে দূরত্ব ঘুচে গিয়েছিল। আলী হিন্দি এবং উর্দু দ্রুত লিখতে পারতেন। সোজা দিক থেকে এবং বিপরীত দিক থেকে। আমার একখানা খাতায় তাঁর হাতে আমার নাম ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি এবং উর্দুতে সোজা এবং উল্টো ক'রে লেখা, এখনও রয়ে গেছে।

কলাভবনে ভর্তি হয়েছিলাম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ক্লাসগুলো নিতেন তার কোনোটিই বাদ দিইনি। ওখানে গিয়ে একদিন বিকেলের দিকে তাঁর কাছে গেলাম; তিনি একা ছিলেন সেই মুহূর্তে। আমার পরিচয় দিলাম। তিনি খুব খুশি হলেন যে আমি এখানে কলা-ভবনে ভর্তি হয়েছি। তাঁর সঙ্গে আলাপে সকল সংকোচ কেটে গেল। এই আমার প্রথম কথা বলা তাঁর সঙ্গে। তিনি এমন আশ্চর্য সহানুভূতি এবং স্নেহের সঙ্গে কথা বললেন যাতে শুধু সংকোচ কাটা নয়, কিঞ্চিৎ সাহসীও হয়ে উঠলাম এবং আমার আঁকা উপাসনায় প্রকাশিত সেই ছবিখানি, (যা আমি চাদরের নিচে লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম) তাঁকে দেখালাম।

মনে হল ছবিখানা দেখে তাঁর যেন কিঞ্চিৎ ভ্রূকুঞ্চন ঘটল। তিনি তার উপরে চোখ বুলিয়েই সেখানা আমাকে ফেরৎ দিলেন এবং কয়েক সেকেণ্ড চুপ ক'রে থেকে বলতে লাগলেন, তুমি যে ছবি এঁকেছ তার প্রধান লক্ষ্য আমার চেহারা, অর্থাৎ ছবিতে কতখানি আমার চেহারার সঙ্গে মেলাতে পার, এবং তার পর নিচে একটি নাম বসিয়ে দিয়েছ। একে আমি ছবি বলব না। কবিতার যে কথা দিয়ে ছবির ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছ সেই ভাবটা যদি তোমাকে প্রেরণা দিত তা হলে চেহারার সঙ্গে ছবি মেলাবার ইচ্ছেটা অবান্তর হত। তোমার উচিত ছিল কল্পনার আশ্রয় নেওয়া, ফোটোগ্রাফের আশ্রয় নয়। ছবির যেটি মূল প্রেরণা সেটি হচ্ছে একটি ইমোশন। সেই ইমোশনের সঙ্গে যদি আমাকেই এক ক'রে দেখার কথা মনে হয়ে থাকে তা হলে তোমার ছবির চেহারা অন্য রকম হত। তোমার সকল চেষ্টা এ ছবিতে শেষ হয়েছে চেহারা মেলাবার কাজে। তাই এটি তুমি যা দেখাতে চেয়েছ তা হয় নি। হয়েছে স্পটলাইট ফেলা একখানি ফোটোগ্রাফ। তার অর্থ এই যে, ক্যামেরায় ঠিক এই রকম একখানা ছবি তৈরি করা কঠিন হত না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে আপনার চেহারার সঙ্গে মেলাবার কোনো দরকারই ছিল না?

না।—যদি দৈবাৎ মিলত, ক্ষতি হত না, কিন্তু এ রকম ক্ষেত্রে মেলাবার জন্ম আঁকলে তা ক্রিয়েশন হয় না।

কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলাম। আমি উপাসনা কাগজের প্রবন্ধে আর্টের যে অর্থ বোঝাতে চেয়েছি—তা কি আমার মনে সবখানি ধরা পড়েনি? স্পষ্টই বোঝা গেল পড়েনি। যা লিখেছি, বাস্তবকে আশ্রয় ক'রে কল্পনার বিস্তারের কথা, আমার মনে তার একটি সীমাবদ্ধ অর্থমাত্র প্রকাশিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার আত্মগৌরব ধূলিসাৎ হল। তিনি আমার মনে আর্টের এমন একটি ব্যাখ্যা স্পষ্ট ক'রে তুললেন যা আমার রচনায় কল্পিত হয়নি। তিনি প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে আর্ট সম্পর্কে বলেছিলেন এবং আমার কাছে তখন তা সম্পূর্ণ নতুন মনে হয়েছিল। কথাগুলো আমাকে অনেক চিন্তা ক'রে আত্মস্থ করতে হয়েছিল, কারণ আর্ট সম্পর্কে এ রকম বৈপ্লবিক ধারণা আমার ছিল না। আর্ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাছে পেলাম প্রথম দীক্ষা, এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। এর পর বিচিত্রা মাসিকে (চৈত্র ১৩৩৮, ১১৩১) 'আর্টের অর্থ' নামক যে প্রবন্ধটি লিখি তা সে দিন রবীন্দ্রনাথ আমার কানে যে মন্ত্র দিয়েছিলেন তারই উপর ভিত্তি ক'রে লেখা। এই প্রবন্ধে আর্টের অর্থের (অর্থাৎ আমার পাওয়া নতুন অর্থের) পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পকেই বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম। কারণ ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজে চিত্রশিল্পী হয়েছেন। অতএব আমার এই কার্যটিকে সম্ভবত গুরু-মারা বিদ্যা বলা চলে।

নবাগত আমাকে রবীন্দ্রনাথ এমন অদ্ভুত সহানুভূতির সঙ্গে এত কথা বললেন, এ আমার কাছে তখন আশাতীত বোধ হয়েছিল, এবং শুধু তাই নয়, মনে হয়েছিল এতটা যেন আমার প্রাপ্য নয়, যেন তাঁর মূল্যবান সময়ের ও সহৃদয়তার উপর আমি মূঢ়তা বশতঃ অত্যাচার করলাম। রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছের দৃষ্টিতে দেখায় অভ্যস্ত না হলে এ রকম হওয়া স্বাভাবিক। তিনি যে বহু বিচিত্র দায়িত্ব এক সঙ্গে পালন ক'রে যেতে পারেন একথা আমার পক্ষে বাইরে থেকে বিশ্বাস করা শক্ত ছিল, বিশেষ ক'রে যখন তিনি ক্লাসে ব'সে পড়াচ্ছেন বা কারো সঙ্গে কৌতুক করছেন, তখন একথা কখনো মনে আসেনি যে তিনি হয় তো তার পাঁচমিনিট আগে কোনো বৃহৎ রাষ্ট্রনৈতিক বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান চিন্তা করছিলেন।

মন্ত্রদানের শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন নন্দলাল এখানে আছেন এটি আমাদের সৌভাগ্য। বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হও, তা হলেই বুঝতে পারবে তিনি কত বড় আর্টিষ্ট, ক্লাইভ বেলের আর্ট বইখানা পড়, তা হলে তোমার উপকার হবে।

একদিন শেলীর 'হিম্ টু ইনটেলেকচুয়াল বিউটি' নামক কবিতাটি পড়ালেন। ইংরেজী কবিতা তিনি বাংলায় ব্যাখ্যা করতেন। ব্যাখ্যা তাকে বলা যায় না, এক কাব্যের সমান্তরাল যেন আর এক কাব্য রচনা। পড়াতে পড়াতে ইউরোপের ফুলের কথা উঠল। বললেন অনেকের ধারণা আমাদের দেশেই ফুলের শোভা বেশি, কিন্তু তা ঠিক নয়। ইউরোপে তিনি ফুলের যে শোভা দেখেছেন—বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে তা অপূর্ব সুন্দর, সে শোভা আমরা এদেশে ব'সে কল্পনা করতে পারি না।

বাংলা ভাষায় ইংরেজী কাব্যের স্বাদ অনুভব করা এবং তা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে, এ অভিজ্ঞতা নতুন, তাই খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। লক্ষ্য করতাম, নবাগত বিদেশী ছাত্ররা অস্বস্তি বোধ করছেন বাংলা বুঝতে না পেরে, কিন্তু কবির সে দিকে খেয়াল নেই। কিংবা খেয়াল ছিল বলেই বাংলায় বোঝাতেন। কারণ তাঁরা কবির কাছে পড়বেন ব'লেই এসেছেন, অতএব বাংলা শেখার জন্ম উঠে পড়ে লাগতেন, এবং শিখেও ফেলতেন খুব দ্রুত। আমি তো একজনকে বাঙালী মনে ক'রে আলাপ করছিলাম, তার পর শুনলাম ছাত্রটি সিংহলী। একজন সিংহলী ছাত্র আমার কাছেও আসতেন বাংলা শিখতে।

জাপানী এক যুবক পণ্ডিত এসেছিলেন, নামটি মনে নেই। তাঁর কাছে শুনেছিলাম তিনি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে থেকে ইউরোপে যাবেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কথা বলতেন। দুচার দিনের মধ্যেই বাঙালী রীতি কিছু শিখে নেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সব কথা মনে রাখতে পারতেন না। খাবার ঘরে আমরা পাশাপাশি খাচ্ছিলাম। এমন সময় তাঁর নতুন পরিচিত একজন সেখানে আসতেই ভাতের থালা থেকে হাত তুলে দু হাত জোড় ক'রে তাঁকে নমস্কার জানালেন। আমি খুব সহজ ভাষায় একটি একটি কথা পৃথক ভাবে উচ্চারণ ক'রে বুঝিয়ে দিলাম, ঠিক যেমন একটি ছোট ছেলেকে বোঝায় তেমনি ক'রে; বললাম খাবার সময় এ কাজ করতে নেই, ওটা আমাদের রীতি নয়, আমারা সবাই এখানকার বাসিন্দা, তাই সকালে হোক বা যখন হোক আমাদের যখন প্রথম দেখা হবে তখন নমস্কার জানাব, কিন্তু সেটি কখনো খেতে খেতে নয়। তিনি আমার কথা বুঝলেন এবং বললেন ইয়েস ইয়েস। কিন্তু কি পরিমাণ বুঝলেন, সেটি আমি বুঝলাম কয়েক মুহূর্ত পরেই। তাঁর আর একজন নব পরিচিত ছাত্র খাবার ঘরে আসতেই নিষিদ্ধ সকল প্রক্রিয়াগুলিই পুনরনুষ্ঠিত হল। অর্থাৎ মুখ থেকে ডান হাত বেরিয়ে বাঁ হাতের সঙ্গে যুক্ত হল তবু 'নমস্কার' ব'লে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

পাতে ডাল ও আলুর তরকারী ছিল। প্রথমত তিনি শুধু

রবীন্দ্রনাথের 'নাইট স্কুল'

ভাত খাচ্ছিলেন, একটু একটু ডালও খাচ্ছিলেন, কিন্তু পরে একটুকরো আলু মুখে দিয়ে ভেরি হট ভেরি হট (ভেলি হৎ ভেলি হৎ) বলতে বলতে উঠে পড়লেন। চেয়ে দেখি নাক ও চোখ দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলেছে। সেদিন আর তাঁর খাওয়া হল না। আমিও কম ঝাল খাই, এবং আমার মতেও সেটি কম ঝালই ছিল।

খাবার ঘণ্টা বাজলে থালা-বাটি নিয়ে ছোটার একটি কমিক দিক আছে। ব্যাপারটি আমার কাছে খুব মজার মনে হত। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে খাবার জন্য ছুটে আসার অভ্যাস তৈরি ক'রে দেওয়ার পরীক্ষা কুকুরকে নিয়েই বেশি হয়েছে। মানুষের জন্যও এটি দরকার কাজের সুবিধার জন্য।

সেপ্টেম্বর (১৯২১) মাসের রাত্রিবেলা রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ক্লাস নিয়েছিলেন জাপানী কবিতা পড়াবার জন্য। ডিট্‌স লণ্ঠনের আলোয় ব'সে পড়াতেন ছাতের খোলা হাওয়ায়। আমরা মোট দশ বারো জনের বেশি নয় তাঁকে ঘিরে ব'সে যেতাম। জাপানী 'হাইকাই' নামক 'লিরিক এপিগ্রাম' কবিকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছিল। কবিতাগুলি এক লাইন, দু' লাইন, তিন লাইন বা চার লাইনের। তিনি এই জাতীয় কবিতা প'ড়ে এমনই বিস্মিত হয়েছিলেন যে তাঁর সে বিস্ময় তিনি আমাদের মনে যতক্ষণ না সঞ্চারিত করতে পারছেন, ততক্ষণ তাঁর তৃপ্তি নেই। এ রকম উচ্ছ্বসিত অনাবিল প্রশংসার হেতু হাইকাই কবিতাগুলির গঠন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পাওয়া যাবে। অল্প কথা, অনাড়ম্বর প্রকাশ, কিন্তু এক একটি কবিতার ইঙ্গিত হঠাৎ এমন গভীরতা এবং ব্যাপ্তির দিকে ছড়িয়ে পড়েছে যে মনকে প্রবল ভাবে ধাক্কা মেরে যায়। রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে বীজমন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন মনে আছে। তিনি বলেছিলেন এই কবিতার জন্ম নিতান্তই কৌতূহল থেকে, হঠাৎ-কৌতূহল, উদ্দেশ্যমূলক নয়, একটি benevolent curiosity কিন্তু তারপর তুলির ছোঁয়া (কবিতা তুলিতেই লেখা) লাগা মাত্র তা profundity of sympathy-তে অর্থাৎ সেই কৌতূহল একটি অতি গভীর সংবেদনে রূপান্তরিত।

যেমন, একটি এক লাইনের হাইকাই—'শ্রান্ত বাহক চেরি ফুল দেখতে পায় না।'

কবি বললেন, দেখ মানুষের দুঃখ বেদনার মূলে না পৌছলে এমন ক'রে এ কথাটি বলা যেত না। এ দৃষ্টান্তটি হচ্ছে vital comprehension of human suffering-এর।

আর একটি কবিতা—'দ্বারের কাছে একটি পাইন'—ইটারনিটির পথের মাইলষ্টোনের মতো। প্রাণের অনুভূতির vision আছে এতে। আর একটি কবিতা—

> They spread their beauty
> and we watch them—
> and the flowers turn and
> fade—and—

এইটুকু মাত্র। কত বড় সঙ্কেত রেখে গেল, ইঙ্গিতের শেষ হ'লনা কোথায়ও। মন চিরদিন নিজেকে জিজ্ঞাসা করবে 'এবং'এর পরে কি। আশ্চর্য সংহত শক্তি!

আর একটি অদ্ভুত সুন্দর কবিতা, এটি one of the most beautiful—

> The world of dew is
> alas ; a world of dew
> and none-the-less—

এখানেও ইঙ্গিত চিরদিনের। খানিকটা পেসিমিষ্টিক, এবং এপিকিউরিয়ানিস্‌মের ভাব। এই world of dew এর মানে হচ্ছে অনিত্য জগৎ।

চমকপ্রদ সুন্দর এই সব কাব্য-বীজমন্ত্র। কবি একটি কথা খুব জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। কথাটি জাপানী জনসাধারণের সৌন্দর্য ও রসবোধের সম্পর্কে। তিনি বললেন এই হাইকাই কবিতা এমন রিফাইনড এবং এর রস এত ঘনীভূত যে হঠাৎ মনে হবে অল্প সংখ্যক লোকই এর মর্মগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় বিস্ময় যে জাপানী জনসাধারণ এর ভোক্তা! তুলির এক টানে যে সব ছবি আঁকা হয় সে সম্পর্কেও তাই। একটা জাতি যে এমন রুচিসম্পন্ন হতে পারে তা তিনি আগে ভাবতে পারেননি।

কথায় কথায় জাপানী মেয়েদের কথা উঠল একদিন। তিনি গাঢ়স্বরে স্মরণ করলেন তাঁর বিদায় মুহূর্তের কথা। সে সময় মেয়েরা এমন কেঁদেছিল যে তা মনকে স্পর্শ না ক'রে পারেনি। একজন বিদেশী অতিথির প্রতি তাদের এই মমত্ব বোধ কবির কাছে সুন্দর লেগেছিল।

এই নাইট স্কুলে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকপ্রিয়তারও দেখা মিলত। একদিনের একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে আছে। ছাতে ক্লাস বসত একটিমাত্র ডিট্‌স লণ্ঠনের আলোয়। আমি বসতাম কবির ডান হাতের কাছে, একখানি খাতা নিয়ে, কিছু নোট নিতাম। হাইকাই সম্পর্কে এতক্ষণ যে কথাগুলি লিখলাম তা সেদিনের একখানি মাত্র পাতায় লেখা নোট থেকে। অন্যান্য অনেক কথা যা আর একখাতায় লেখা ছিল, তা হারিয়ে গেছে।

লণ্ঠনের আলো বেশি দূরে যেত না, কবির কণ্ঠও একদিন কিছু ক্ষীণ ছিল। তাঁর ইচ্ছে আমরা সবাই তাঁর খুব কাছে বসি। লণ্ঠনটা থাকত ছোট একটা টুলের উপর। কাছেই বসেছিলাম সবাই, কিন্তু আমাদের মধ্যেকার একজন ছাত্র কবির লক্ষ্য এড়াতে পারলেন না। তিনি বেশ একটু দূরে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। পড়াতে পড়াতে কবি একবার মাত্র চোখ তুলে বললেন, "অসিত, ঘুমোনোর তো আরও ভাল জায়গা ছিল!"

এই শ্লেষের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছেন শিল্পশিক্ষক অসিতকুমার হালদার। এর পর তাঁকে এগিয়ে আসতেই হ'ল।

অরবিন্দমোহন বসু একদিন তাঁর জারমানির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। বছর দশেক বিদেশে থেকে তাঁর বাংলা উচ্চারণে টান ধ'রেছিল। অ্যানড্রুজ সাহেব একদিন আমাদের সবাইকে ডেকে গান্ধীজির অসহযোগ নীতি সম্পর্কে কিছু বললেন। তিনি তখন সদ্য তাঁর কাছ থেকে ফিরেছেন।

সন্তোষ মজুমদার একদিন রাত্রে আমাদের ঘরে ব'সে তাঁর জীবনের পূর্বকথা কিছু শোনালেন। তাঁর সঙ্গে অল্পদিনের আলাপেই তাঁর বেশ একটা সরল মনের পরিচয় পেয়েছিলাম। এমন নিরহঙ্কার

মনখোলা লোক স্মরণীয়। তিনি বললেন সন্ত্রাসবাদ তাঁকে ভীষণ আকর্ষণ করছিল। তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেবেন মনে মনে ঠিক ক'রে ফেলেছিলেন, এমন সময় গুরুদেবের আদেশ এলো আমেরিকায় যেতে হবে। সেখানে না গেলে এতদিন তাঁকে আন্দামানে থাকতে হত।

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী আর এক মধুর চরিত্র। দূর কালের ব্যবধানেও সেই অল্পকালের পরিচয়, অস্পষ্ট, তবু মনের একটি কোণে চিহ্ন এঁকে গেছে। ভাল লেগেছিল, শুধু এই স্মৃতিটুকু রয়ে গেছে। তাঁর মোচার অগ্রের মতো একটুখানি শ্মশ্রুশীর্ষ যেন অনেকদিনের অব্যবহৃত স্মরণ রেকর্ডখানার উপর আজ নীডলএর কাজ করছে।

আশ্রমের এক প্রান্তে এক প্রাচীন ঋষি বাস করতেন। আত্মভোলা, ঋষিসুলভ শুষ্ক এবং ক্ষীণ। পাখী ও কাঠবিড়ালিদের সঙ্গে তাঁর ভাব। দর্শনশাস্ত্র অনুশীলনে বিরাম নেই। অনুশীলনে ক্লান্তি বোধ হল, কিছু রিক্রিয়েশন দরকার, কিছু খেলা দরকার। দর্শন অনুশীলন ছেড়ে খেলায় মাতলেন। কি সাংঘাতিক খেলা! শুনলে চমকে উঠতে হয়। সেটি উচ্চ গণিতের খেলা। পড়াশোনার ক্লান্তি কাটাতে অঙ্ক কষা! এ শুধু দ্বিজেন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। শুধু তাই নয়, শাস্ত্র অনুশীলনে কোথায়ও এসে ব্যাখ্যা আটকে গেল, ব্যাখ্যা দরকার। তখনই আপন রিকশ'খানায় চেপে হাল্কা কয়েকগাছা রেশমী দাড়ি ওড়াতে ওড়াতে ছুটলেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে। এমন মানুষ আর দ্বিতীয় দেখলাম না। দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে দেশে যথেষ্ট আলোচনা হয়নি কেন ভাবতে আশ্চর্য লাগে। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা হয়নি আজও। তাঁর পরিচয় বাংলাদেশে প্রচার হওয়ার প্রয়োজন আছে।

জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেন এঁদের পরিচয় পেলাম ঋণশোধ নাটকে। সে নাটকের কথা ভোলবার নয়। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ নিজে কয়েকটি গান গেয়েছিলেন। 'সারা নিশি ছিলেম শুয়ে,' 'কেন যে মন ভোলে' 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই, যে রয় মনে,' 'আজি শরৎ তপনে প্রভাত স্বপনে' ইত্যাদি।

আচার্য নন্দলাল বসুর শিক্ষাপদ্ধতি খুব সহজ ও সরল ছিল, তিনি নিজে সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার এবং অক্লান্তকর্মা। কি ভাবে আঁকলে আরও ভাল হবে, তা আঁকা ছবির উপর বা পাশে দ্বিতীয়বার এঁকে দেখিয়ে দিতেন। তাঁর হাতের পেন্সিলে আঁকা ছবি আমার কাছে দু'-একখানা এখনও আছে। আমার আঁকার পাশে তাঁর আঁকা।

শান্তিনিকেতনে আসার পর থেকেই বর্ষার দু'-একটি গান খুব শুনতে পেতাম যেখানে-সেখানে। কণ্ঠে বা এসরাজে বাজছে। একটি—'আমার দিন ফুরালো, ব্যাকুল বাদল সাঁঝে,' অথবা 'বাদল মেঘে মাদল বাজে'। 'ও গো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়া তরীর মাঝি' গানটিও তখন খুব গাওয়া হচ্ছিল। এই সব গানের সুরে এমন একটি বেদনার গভীরতা ছিল যা আমার মনকে অত্যন্ত উতলা ক'রে তুলত। মনে সব সময় ঐ সব কথা ও সুর গুঞ্জরণ ক'রে ফিরত। কিছু ভাল লাগত না। এক এক সময় মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠত। বিকেলের দিকে একা বেরিয়ে যেতাম বহু দূরে, নির্জন কোনো স্থানে। কখনো রেলের ধারে গিয়ে বসতাম। রেলের দু'ধারে ফিকে গৈরিক মাটির পাহাড় যেন। দু'ধারের উঁচু দেয়ালের মাঝখান দিয়ে রেল চলে গেছে। ১৯১৩ সালে এই পথে সাহেবগঞ্জ যেতে যে আনন্দশিহরণ অনুভব করেছিলাম তাই যেন আবার ফিরে আসত মনে। কখনো চলে যেতাম কোপাই নদীর ধারে—বহু দূরে। দিগন্তব্যাপী সেই বিস্তীর্ণ বালু জমিতে আমার কোথায়ও আর আড়াল নেই, সমস্ত উন্মুক্ত পরিমণ্ডল যেন আমার নিশ্বাসের সঙ্গে এসে রক্তে মিশছে। শান্তিনিকেতনের আবেষ্টনেই কেমন যেন একটা বেদনার সুর। উৎসব চলছে, প্রাণোচ্ছলতার শেষ নেই, কিন্তু তবু আমি তার মাঝখানে একা। বাইরে বেরিয়ে এসে উদ্দেশ্যহীন ভাবে দু' চার মাইল হাঁটার পর মন শান্ত হত অনেক সময়।

বীরভূমের নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যে বেশ একটা অভিনবত্ব আছে, আমার খুব ভাল লাগত। আশৈশব যে প্রকৃতির কোলে মানুষ, বীরভূমের প্রকৃতি তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই আমার চোখে তা ছবির মতো লাগত। এ দৃশ্য প্রকৃতই চিত্রধর্মী। সবুজ এখানে অনেক কম। এক একটা উঁচু জমিতে তাল গাছের ভিড়—অজস্র তাল গাছ। এর বেশ একটা চরিত্র আছে। পূর্ববাংলার নদী বাদ দিলে বাকী দৃশ্য চরিত্রহীন। ঝোপঝাড়ে ঢাকা সমতল মাঠের পুনরাবৃত্তি, বড্ড একঘেয়ে। যেন গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট। অনেক সময় দম বন্ধ হয়ে আসে। শুধু নদী পূর্ব বাংলার দৃশ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যে কিছু বলিষ্ঠতা থাকা নিতান্ত দরকার। বীরভূমের নামে ও দৃশ্যে সেই বলিষ্ঠতার পরিচয় আছে; তদুপরি কিছু রুক্ষতাও আছে। সব মিলিয়ে চিত্তাকর্ষক। এই সব গানের আনন্দ-বেদনার সুরের সঙ্গে একান্ত নিষ্ঠাবান রবীন্দ্র-সুরভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধুর স্মৃতিটি মনের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

শান্তিনিকেতনে বর্ষা কেটে গিয়ে এলো শরৎ। 'ঋণশোধ' নাটকের রিহার্সালে সমবেত কণ্ঠে 'আজ আমাদের ছুটি' অথবা 'ওগো শেফালি বনের মনের কামনা' ধ্বনিত হয়ে উঠল। আমার মনের উপরকার বোঝাটাও নেমে গেল। শরৎকালের সঙ্গে পল্লী-বাংলার পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ এবং সে এক মধুর ঘনিষ্ঠতা। এই কালের সঙ্গে, একই সঙ্গে বাংলা দেশের বহু আনন্দময় স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তার উপর আবার শরতের সমস্ত অন্তরাত্মাটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে গানে আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। বর্ষার বেদনাভরা ভাবটি মুহূর্তে কেটে গেল, এলো ঋণশোধের পালা। সামনে ছুটির আনন্দ। ঋণশোধ নাটকের প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

অভিনয়ের আগের দিন। সর্বত্র বেশ একটা চাঞ্চল্য। বিকেলের দিকে আমি একটি খুব কৌতুককর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। লাইব্রেরি ঘরের সামনের দিকে শালবীথির পারে কোনো একটা স্থানে

বীরভূমের প্রকৃতি

ষ্টেজ সম্পর্কে কি আলোচনা করতে করতে কবি এগিয়ে চলেছেন। চোখে-মুখে বেশ একটা উদ্বেগের ছায়া। আমিও ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম বাইরে থেকে আসা দু-তিন জন ভদ্রলোক দ্রুত সে দিকে আসছেন। কবির সে দিকে লক্ষ্য ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ভাবে তাঁদের সম্মুখীন হলেন। তাঁরা পর পর কবিকে প্রণাম ক'রে তাঁর মুখের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। বলা বাহুল্য, কবি খুবই বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন। এক জন আগন্তুক ব'লে উঠলেন, আমরা আপনাকে দেখতে এলাম।

কবি ইতিমধ্যেই আত্মোদ্ধারের পথ খুঁজতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি মুখে আরও ব্যস্ততা ফুটিয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন এবং ভদ্রলোকদের বলতে লাগলেন বেশ, আপনারা দেখুন সব ঘুরে—

তার পর হঠাৎ বাঁ-পাশে মুখ ঘুরিয়ে রথী, রথী ব'লে ডাকতে ডাকতে দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। রথীন্দ্রনাথকে দেখা গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে এত দূরে যে কবির কণ্ঠ তত দূরে পৌঁছবার কথা নয় এবং তিনি যত দ্রুতই পা চালান রথীন্দ্রনাথকে ধ'রে ফেলাও তখন সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ ভিন্ন তখন আর কোনো উপায়ও ছিল না। রথীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ভাবে হয় তো তাঁর পিতাকে অনেক সংকটের হাত থেকে বাঁচিয়ে থাকবেন, কিন্তু সে দিন নিজ চোখে দেখলাম রথীন্দ্রত্ব নামক একটি অ্যাবষ্ট্রাক্ট পুত্রসত্তা কবি পিতাকে আশ্চর্যরকমে বাঁচিয়ে দিল। [ক্রমশঃ।

এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং

শ্রীদেবব্রত ঘোষ

"মার্কিণ মুলুকের সব কিছুই অদ্ভুত"—পৃথিবীর সর্বোচ্চ অট্টালিকা নিউইয়র্কের এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং দেখে বিদেশী দর্শক মাত্রেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে এই কথাটি বলে থাকেন।

মানুষের হাতে-গড়া এই বিস্ময়কর আকাশছোঁয়া বাড়ীটি ১৪৯০ ফিট উঁচু ও ১০২ তলা। নিউইয়র্কের অভিজাত পল্লী ফিফথ্ এভিনিউ ও থার্টিফোর্থ ষ্ট্রীটের মধ্যে প্রায় দুই একর জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীটি গড়ে তুলতে যে পরিমাণ মাল-মশলা ও অর্থব্যয় হয়েছে তার অঙ্ক শুনলে অনেকেরই হয়ত মাথা ঘুরে যাবে। কিন্তু মার্কিণ মুলুকে সব কিছুই সম্ভব।

নিউইয়র্কের বিখ্যাত স্থপতি উইলিয়াম এফ ল্যাম্ব সর্বপ্রথম এই আকাশছোঁয়া বাড়ীটির পরিকল্পনা করেন এবং তিনিই দীর্ঘদিন ধরে পরিশ্রম করে বাড়ীটির নক্সা তৈরী করে দেন। তারপর মুখ্যবাস্তুকার মিঃ শ্রীভ ও মিঃ হারমান্ নক্সাটিকে পনেরো বার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে তবে বাড়ীটি তৈরী করতে অনুমতি দেন।

১৯৩০ সালের অক্টোবর মাস থেকে এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং-এর কাজ শুরু হয়। বাড়ীটি গড়ে তুলতে ৬০,০০০ টন ইস্পাত, ১০,০০০০০০ ইট ও ৩০১৪৩৬০০০ টাকা খরচ হয়েছিল। এ ছাড়া চুণ, সুরকী, পাথর, সিমেণ্ট খরচ হয়েছিল হাজার টন। কে তার হিসেব রাখে! ১৯৩১ সালের মে মাসে বাড়ীটি তৈরী শেষ হয়।

এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং-এ ৬৪০০ জানলা, ৩২০০ মাইল টেলিফোন-টেলিগ্রাফের তার, ৫০ মাইল প্লাম্বিং পাইপ ও ২১৫৮০০০ বর্গ ফিট মেঝে আছে। তিনশো পরিচারিকা সর্বদা বাড়ীটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে এবং নীচে থেকে উপর-তলা পর্যন্ত সিঁড়ির সংখ্যা ১৮৬০টি। বাড়ীটির বিভিন্ন দোকান ও অফিসে নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ১৮০০০। এদের ওঠা-নামার জন্য ৭৪টি লিফট আছে। তাছাড়া কয়েকটি এক্সপ্রেস লিফটও আছে। এগুলির সাহায্যে দেড় মিনিটেরও কম সময়ে একেবারে উপর-তলায় পৌঁছে যাওয়া যায়।

উপর থেকে সহরের দৃশ্য দেখার জন্য ৮৬ তলায় একটি অবজারভেশন প্লাটফরম আছে। এখান থেকে চারিদিকে প্রায় পঞ্চাশ-মাইল দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত দেখা যায়। দক্ষিণা দিলে জনসাধারণ এখানে দাঁড়িয়ে নিউইয়র্ক সহরের দৃশ্য দেখতে পারেন। টিকিটের হার মাথা-পিছু ভারতীয় মুদ্রায় সাড়ে ছয় টাকার মত। প্রতি বছর ৫০০,০০০ দর্শক এই অবজারভেশন প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে নিউইয়র্কের দৃশ্য দেখার জন্য এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং-এ বেড়াতে আসেন। এদের কাছ থেকে দর্শনী বাবদ কর্তৃপক্ষের বছরে ৩২৫০০০০ টাকা আয় হয়। স্যার উইনষ্টন চার্চিল কার্ডিনাল ইউজিনিও প্যাসিলি (ভ্যাটিকানের পোপ), ডিউক অব উইণ্ডসর ও ডাক্তার আলবার্ট আইনষ্টাইন প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত মনীষীরাও এখানে দাঁড়িয়ে নিউইয়র্ক সহরের দৃশ্য দেখে গেছেন।

আমেরিকার বিশিষ্ট বাস্তু-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বলেছেন—ভবিষ্যতে আণবিক অথবা হাইড্রোজেন বোমার আঘাতে বাড়ীখানি ধ্বংসপ্রাপ্ত না হলে এর আয়ুষ্কাল এক হাজার বছরেরও বেশী। মার্কিণ ধনকুবের মিঃ হেনরী ক্রাউন এই বিস্ময়কর আকাশ-ছোঁয়া বাড়ীটির মালিক।
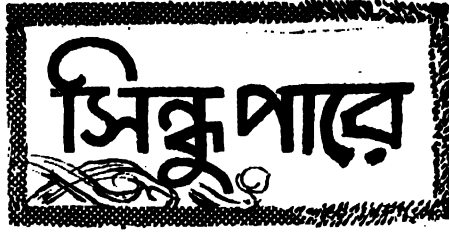
শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

['সুশান্ত সা' প্রকাশিত হবার পর বন্ধুবান্ধব অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তার পর কি হল? বলেছিলাম—সে খবর এখনও পাইনি। এক দিন আমার স্বনামধন্য বন্ধু ৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—'সুশান্ত সা'র পরের খবরটা দশ জনকে জানিয়ে দিলে ভালই হয়। সন্ধান করবার অনুপ্রেরণা পেলাম। যতটুকু যা জেনেছি 'নীলশাড়ী' উপন্যাসে লেখা হয়েছে। 'নীলশাড়ী' উপন্যাসে দেখা যায়—'সুশান্ত সা'র পৌত্র বিকাশ এখান থেকে ডাক্তারী পাশ করে অতিরিক্ত পড়াশুনা করার জন্য স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে এদেশে রেখে বিলেত রওনা হয়ে গেল, আর ফিরল না। বিলেতে তার জীবনটা কোথা দিয়ে কি ভাবে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কোথায় দাঁড়িয়েছিল' সেইটিই 'সিন্ধুপারে' উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু। বিকাশই সুদীর্ঘ চিঠি লিখে তার আদরের ছোটবোন 'নীলশাড়ী'র বুলাকে অকপটে সব দিচ্ছে জানিয়ে। —লেখক]

বিকাশের চিঠি

প্রথম পর্ব্ব

এক

সেণ্ট জন হোটেল।
সলিহল : ইংলণ্ড।

কল্যাণীয়াসু আমার স্নেহের বোন বুলা—

তোমার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছি সে কথা বলাই বাহুল্য। তুমি যে এত দিন পরে মনে করে আমাকে চিঠি লিখেছ সেইটেই আমার মনের দিক দিয়ে তোমার চিঠির সব চেয়ে বড় কথা। দাদার চিঠি কচিৎ কখনও পাই। তোমার চিঠি বহুদিনের মধ্যে পেয়েছি বলে মনে হয় না।

চিঠিতে যা জানতে চেয়েছো তার জবাব আমি দেবো। কিন্তু এক কথায় জবাবটি সর্ব্বাঙ্গীন হবে না। তাই তোমার চিঠি পেয়ে অনেক দিন ভেবেছি। শেষ পর্য্যন্ত আমার কাজ থেকে কিছু দিনের ছুটি নিয়ে আমার বাড়ী এবং সার্জ্জারী ছেড়ে নিরিবিলি উপরোক্ত হোটেলটিতে এসে বাস করছি তোমাকে চিঠি লেখার জন্য। এই দূর বিদেশে ডাক্তারি করি—বিশেষ কর্ম্মব্যস্ত আমার জীবন। তাই সব ছেড়ে এরকম পালিয়ে না এলে তোমাকে এ চিঠি লেখা হত না।

অথচ এ চিঠি লেখার বিশেষ প্রয়োজনও হয়েছে। আমার একমাত্র পুত্র বরুণকুমার বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, খুলনার কাছাকাছি এক গ্রাম্য কলেজে অধ্যাপকের কাজ করে—এ খবরটা অবশ্য আমি আগেই শুনেছিলাম। এখন তুমি লিখেছ, সে এদেশে এসে অক্সফোর্ড বা ক্যামব্রিজে অতিরিক্ত পড়াশুনা করার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে, তার আসা উচিত কি না সেই বিষয় তুমি আমার মতামত চেয়ে পাঠিয়েছ। লিখেছ "প্রায় চার বছর হতে চলল সে এম, এ, পাশ করেছে, কিন্তু এত দিন কিছুতেই বিবাহ করতে রাজী হয়নি। আমিও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ প্রস্তাবে কোনও দিনই জোর দিই নি। কেন না, বরুণের চরিত্রে এমনই একটা স্বাভাবিক মাধুর্য্য আছে যে আমার কোনও ইচ্ছা বা অনিচ্ছা স্বভাবতঃ মেনে নিয়েই সে যেন তৃপ্তি পায়, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বস্তি পায় না মনে। তাই জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার ইচ্ছা চালিয়ে তার চরিত্রের এই স্বাভাবিক মাধুর্য্যটুকু আমি ক্ষুণ্ণ করতে চাই নি। আজ যখন সে স্পষ্ট ভাবে বিলেত যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা জানিয়েছে তখনই আমি বুঝতে পেরেছি কেন সে এত দিন বিবাহ করতে রাজী হয় নি। বিবাহিত স্ত্রীকে রেখে বিলেত যেতে তার মন সায় দেয়নি কখনও এবং বিলেত যাওয়ার ইচ্ছাটি বরাবরই সে মনে পোষণ করে এসেছে। আজ এখন আমি কি বলি—মহা সমস্যায় পড়েছি। এ ক্ষেত্রে আমার কি করা উচিত জানিয়ো।" কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসা করার দায়িত্বও এখন আমার নয়। সে দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্যতা আমি অনেক দিন হারিয়েছি। সে বিষয় মীমাংসা করার দায়িত্ব ত' এখন সম্পূর্ণ তোমারই। বুদ্ধির দিক দিয়ে, জীবনের অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে সে দায়িত্ব নেওয়ার শক্তি তুমি পেয়েছ আমি জানি। জীবনের নানা রকম ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তুমি উত্তীর্ণ হয়ে এগিয়ে গিয়েছ। আজ তুমি মাধবপুরের রাণীর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত—নিজেরই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং চরিত্রের মহিমায়। বরুণকুমারের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার পথ তুমিই ত দেখিয়ে দেবে।

বরুণকুমার অবশ্য আমার পুত্র কিন্তু সেইটেই তার সব চেয়ে বড় পরিচয় নয়। ছেলেবেলায়ই সে বাপকে হারিয়েছে, মাকেও হারিয়েছে। তোমাকে আশ্রয় করেই সে বড় হয়ে উঠেছে—তোমারই আদর্শে সঞ্জীবিত হয়ে। তার মনের গতির সঠিক খবর তোমার চাইতে কেউ ত বেশী জানে না। শুধু তাই নয়, আমাদের বংশের একমাত্র পুত্র বরুণকুমার, মাধবপুরের অত বড় জমিদারীর উত্তরাধিকারী সে। এ সব খবরের তাৎপর্য্য তোমার চাইতে বেশী কে বোঝে? বিশেষতঃ আমাদের সকলের মাথার উপর দাদা এখনও বেঁচে আছেন। তাঁর মতন লোক জগতে খুব বেশী পাওয়া যায় না। তাঁকেও সব দিক বিবেচনা করে দেখতে বলো।

এক কথায় তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এইখানেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তবুও সব কথা বলা হল না। আমার মনে হয়,

যে প্রশ্ন তুমি তুলেছ সেই দিক দিয়ে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, বরুণকুমারের জীবনের ভবিষ্যৎ পথ নির্দ্দেশ করবার দায়িত্ব নেওয়ার পূর্ব্বে আমার জীবনটাও সর্ব্বদিক দিয়ে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে তোমার দেখে নেওয়া উচিত। তা হলেই তোমার এ দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্যতার আর কোনও ত্রুটি থাকবে না। তুমি লিখেছ, "বরুণের বিলেত যাওয়ায় দাদার বিশেষ মত নেই, দাদার ইচ্ছে বরুণকে আইন পাশ করিয়ে হাইকোর্টের উকিল করেন। কিন্তু বরুণের তা মোটেই ইচ্ছে নয়। বরুণের বিলেত যাওয়ার ইচ্ছার মধ্যে তার হারিয়ে-যাওয়া বাপকে আবার খুঁজে পাওয়ার প্রবল বাসনা যে মর্ম্মে মর্ম্মে লুকিয়ে আছে—সেটুকু আমার দৃষ্টি এড়ায় নি।" সে দিক দিয়েও আমার এ চিঠি লেখার বিশেষ প্রয়োজন। যদি তাকে বিলেত পাঠাও, এ চিঠি পড়ে বাপকে খুঁজে বার করার পথ তার সহজই হবে। রঙ্গিন চশমা আড়াল দিয়ে সে আমাকে দেখবে—আমি তা একেবারেই চাই না। তা ছাড়া এদিক দিয়ে আরও একটা বড় কথা আছে। পিতার জীবনের অভিজ্ঞতায় স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী ত পুত্র। সে অভিজ্ঞতাকে অন্ধকারে ঢেকে রেখে তার থেকে পুত্রকে বঞ্চিত করা, আমার মতে শুধু অন্যায় নয়—পাপ। বাপের অভিজ্ঞতার আলোতে পুত্র জীবনের পথ খুঁজে পাবে সেইটেই জীবনযাত্রার ধর্ম্ম। পুত্রের প্রতি, আমার জীবনে আমি অন্ততঃ সেইটুকু কর্ত্তব্য করে যেতে চাই। তাই পালিয়ে এলাম কর্ম্মব্যস্ত জীবনের আবহাওয়া ছেড়ে ঘনতরু-ঘেরা নিরিবিলি এই হোটেলটিতে।

দাদার অমতের কারণ বোঝা ত মোটেই কঠিন নয়। অমত ত হবেই। ভাইকে হারিয়েছেন। বংশের একমাত্র দুলালকে হারাতে আর রাজী নন। শুধু দাদার দিক দিয়ে কেন, তোমারও মনের দিক দিয়ে সে ভয় যে নেই—এমন কথা জোর করে বলতে পারি কৈ? আমি জানি, আমি তোমাদের সকলেরই নিন্দাভাজন এবং তার যথেষ্ট কারণও আছে। আশৈশব নিজের সংসার ও সমাজ সমস্ত ভুলে সাধ্বী প্রেমদা স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে বিনা অপরাধে অনায়াসে বর্জ্জন করে যে লোক দূর বিদেশে গিয়ে নতুন জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তার স্বপক্ষে যুক্তির দিক দিয়ে কোনও কথা খুঁজে পাওয়া যায় না—সেটা আমি বুঝি। বিশেষতঃ যখন সেই সাধ্বী স্ত্রী অযথা মানসিক উৎপীড়ন ও নির্লজ্জ অপমানে ধীরে ধীরে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দেয় তখন তাকে কেউই ক্ষমা করে না, পাষণ্ড বলেই অভিহিত করে—সেটুকুও আমি জানি। অথচ এই দিক দিয়ে সারাজীবন আমি আমার প্রাণের কোণে একটা বেদনা বহন করে নিয়ে চলেছি—সে কথাটা ত কেউ জানে না। এই দূর বিদেশে জীবনের পথে চলতে চলতে হঠাৎ মাঝে মাঝে সোনালী সূর্য্যের অরুণ আলোর দিকে চেয়ে কিংবা গভীর রাত্রে দুরন্ত বাতাসে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে সেই বেদনায় চমকে উঠে গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে একটু স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছি—সে কথাও কেবল আমারই জানা। অনেক খুঁজেছি। কিন্তু এ বেদনার প্রলেপ আমি আজও খুঁজে পাইনি। কখনও বা ইচ্ছে হয়েছে তোমাকে একখানা চিঠি লিখি। মনে হয়েছে শুধু তোমারই মনে হয়ত বা এই ব্যথাটুকুর সাড়া একটু পেতেও পারি। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই মিলিয়ে গেছে, লেখার অনুপ্রেরণা পাইনি।

এমন সময় তোমার পাঠানো 'সুশান্ত সা'র আত্মজীবনী হাতে এলো। প্রাণ-মন দিয়ে দিন-রাত বসে বইখানি পড়লাম। শেষ করে বারে বারে পূজনীয় পিতামহের চরণে প্রণাম করে বলেছি "হে পিতামহ! তোমার জীবনে রুদ্রের তীব্র লীলায় তুমি পুণ্যশ্লোক। তোমাকে প্রণাম করে ধন্য হই।" একটু যেন সান্ত্বনাও পেলাম অন্তরের নিভৃত বেদনায়।

কেন জানি না, 'সুশান্ত সা' পড়ে আবার তোমাকে বিস্তারিত একখানা চিঠিতে আমার জীবনের কাহিনী জানিয়ে দেবার বাসনা মনে জেগেছিল! সৃষ্টির আদি লীলার অনুপ্রেরণা সুশান্তর ভাঙ্গা বুকে এসে লেগেছিল—তাই তিনি অতবড় গ্রন্থ লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু আমি পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে অনুপ্রেরণা পেলাম না। মনের বাসনা মনেই গেল রয়ে। কিংবা হয় ত তখনও আমার জীবনের কাহিনী সম্পূর্ণ হয় নি—তাই বোধ হয় অনুপ্রেরণা জাগে নি মনে। অথবা চিঠি লেখার প্রয়োজনের দিক দিয়ে তখনও বিশেষ কোনও তাগিদ পাইনি মনে। কিন্তু আজ আমার জীবনের কাহিনী শেষ হয়েছে, তাই বোধ হয় তোমার চিঠি পেয়ে চিঠিরই প্রয়োজনে মনে প্রবল অনুপ্রেরণা জেগেছে। আজ সময় হয়েছে—আমার জীবনের সমস্ত কাহিনী তোমাকে জানাবার।

ভুল বুঝো না। আমি বিচারপ্রার্থী নই। বিচারে নিরপরাধী প্রমাণিত হওয়ার বাসনায় এ চিঠি লিখছি না। পূজনীয় পিতামহ 'সুশান্ত সা' মনুষ্য-সমাজের আদালতে অবিচার পেয়ে তাঁরই বড় আদরের গঙ্গার কাছে সুবিচার চেয়েছিলেন। আমার বিচারের ভার রইল ভবিষ্যতের গর্ভে তোলা।

দুই

প্রথম যেদিন ইংলণ্ডে এলাম—তখন আমার তরুণ যৌবন। আজ মনে হচ্ছে, সে যেন কতকাল আগেকার আর এক জন্মের কথা। আজ ত আমি প্রৌঢ়ত্বেরও সীমা ছাড়িয়ে বার্দ্ধক্যের সীমানায় পা দিয়েছি। শুনে বিস্মিত হবে না নিশ্চয় যে, আজ আমার মাথায় আর একটিও কাঁচা চুল নেই। তবে একমাথা চুল আজও—টাক পড়েনি। সেই ছেলেবেলায় যেমন দেখেছিলে—সেই রকমই মাথার একপাশে সিঁথি কেটে চুলগুলোকে পিছন দিকে টেনে আঁচড়ে দি। ছেলেবেলায় তোমরা সকলেই আমাকে সুপুরুষ বলতে—আমার স্পষ্ট মনে আছে। আজ এদেশে এ বয়সেও সবাই আমাকে সুপুরুষই বলে—এ কথা শুনলে তুমি নিশ্চয়ই খুশী হবে। তবে ছেলে বয়সে চোখে চশমা ছিল না—এখন সব সময়ই চোখে চশমা—বিনা চশমায় দেখতে পাই না বললেও চলে। গায়ের রং তোমাদের দেশের মাপকাঠিতে আজও ফর্সা বরং এ দেশের জল-হাওয়ায় একটা লালচে আভায় আরও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবে এ দেশের লোকের পাশে আমি কালো। কিন্তু শুনলে আশ্চর্য্য হবে যে, আমার এই রং এরা ত ঘৃণা করেই না, বরং কেউ কেউ হিংসাও করে—আমার গায়ের রং পেলে তারা যেন বেঁচে যায়। ইচ্ছে করে রোদে পুড়িয়ে গায়ের রংকে ঘন লাল করে তোলার জন্য এদের তরুণ-তরুণীর মধ্যে কারো কারো কি সাধনা! অথচ তোমাদের দেশে রোদ বাঁচিয়ে, নানারকম ক্রীম মেখে কালো রংকে একটু উজ্জ্বল করে তোলার দিকে তরুণদের অনেকেরই চেষ্টার ত্রুটি নেই।

যা পায়, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না—এইটেই যৌবনের একটি বিশেষত্ব। তা কি এদেশে কি ওদেশে। বোধ হয় জীবনে প্রগতির দরজা খোলা রাখার ভগবানের এ এক কৌশল। বার্দ্ধক্যের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। বার্দ্ধক্যে মন অবশ হয়ে আসে। তখন নিজের মনের মধ্যে নিজেই একটা ঠাঁই তৈরী করে নেয়—নিশ্চল বিশ্রামের আশায়।

* * * *

যাই হোক, নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যাবেলা লণ্ডন সহরে এসে প্রথম পদার্পণ করেছিলাম—ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে। এসে পৌঁছবার কথা ছিল রাত ৮টায়, কিন্তু এসে পৌঁছলাম সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। তার একটু কারণও ছিল। ফ্রান্স থেকে ইংলিশ উপসাগর জাহাজে পাড়ি দিয়ে ফোকষ্টোনে এসে দেখলাম যে, লণ্ডন নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সঙ্গে আমার আশৈশব বন্ধু চন্দ্রনাথও ছিল। প্ল্যাটফর্ম্মে রেল-কর্ম্মচারী আমাদের দু'জনকে দু'টি কামরায় দিল তুলে।

কিন্তু তখন আমাদের দু'জনারই যা মনের অবস্থা, কেউ কাউকে ছাড়তে রাজী নয়; চন্দ্রনাথের কামরায় জায়গা ছিল, তাই আমি রেল-কর্ম্মচারীর আদেশ অমান্য করে চন্দ্রনাথের কামরায় গিয়ে উঠে বসলাম।

চন্দ্রনাথকে তোমার নিশ্চয় মনে আছে? ছেলেবেলায় সে অনেক সময় আমাদের বাড়ীতে গিয়েছে আমার সঙ্গে গল্প করার জন্য— দেখেছ তাকে নিশ্চয়ই। দোহারা গড়ন, সুদর্শন চেহারা—গায়ের বর্ণ গৌর। মাথায় কালো চুল— মাঝখান দিয়ে পরিপাটি করে আঁচড়ানো। পোষাক-পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্নতার ভিতর দিয়ে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কথায়-বার্ত্তায় ব্যবহারে ধরণে-ধারণে একটা মার্জ্জিত বিশিষ্টতার আভাস সেই বয়সেই পেয়েছিলাম—সেটাই আমাকে বিশেষ ভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার— কথা বলে অত আনন্দ আমার অন্য বন্ধু-বান্ধবদের আর কারো কাছে পাই নি। কোনও কথা বলতে না বলতে তার নিগূঢ় মর্ম্মটি ঠিক বুঝে নেয় এবং উত্তরে ঠিক সাড়া দেয় মনে। এই দূর বিদেশে ক্রমে তার মনের সঙ্গে আমার পরিচয় আরও নিবিড় হয়েছিল—সে কথা ক্রমে বলব। চন্দ্রনাথ এখন কোথায়, কেমন আছে জানি না। অনেক দিন তার সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়েছি এবং সেটা আমার জীবনের ক্ষতির পর্য্যায়েই তোলা আছে। শুনেছিলাম, পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যে সে বিশিষ্ট নামজাদা অধ্যাপক হয়েছিল—সেই পর্য্যন্ত।

ফোকষ্টোন ষ্টেশনে কেন যে আমরা দু'জন দু'জনকে ছাড়তে পারি নি—তারও একটু ইতিহাস আছে। সেইটুকু বলি। বম্বে থেকে জাহাজ ছাড়ল বেলা ৩টে আন্দাজ। জাহাজ ছাড়ার পর অনেকক্ষণ আমি ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে ছিলাম। জাহাজ চলায় গাঢ় নীল জলের ঢেউগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে সাদা ফেনায়—একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে তাই দেখছিলাম। আজকেও স্পষ্ট মনে আছে—ঢেউগুলির ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে সে-সময়টা আমি আমার মনের যা হোক একটা অবলম্বন যেন খুঁজে নিতে চেয়েছিলাম— ক্রমে মনটা এতই আকুল হয়ে উঠেছিল। জাহাজ ক্রমে দূরে চলেছে, আরও দূরে আরও—আমার দেশ, আমার যা কিছু মনের আশ্রয় সমস্ত থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে—আমি যেন আর সইতে পারছিলাম না। ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল। দূর দিগন্তে মাঝে মাঝে তোমাদের সকলের মুখমণ্ডল আমার চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছিল—সেই তোমাদের কাছে শেষ বিদায়ের সময় যেমন দেখেছিলাম—সেই তোমার ব্যথাভরা সজল দুটো চোখ, সেই সুধার ছল ছল চোখ দু'টির সলজ্জ কাতর চাহনি। কিন্তু হায় রে, তার মধ্যে মনের কোনও অবলম্বন পাওয়া ত দূরের কথা, মনটা আরও যেন পাগল হয়ে দিশাহারা হয়ে উঠল। বিরাট সমুদ্রের বিশাল ঢেউগুলি ক্রমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল—শুধু কানে বাজতে লাগল সমুদ্রের একটা প্রবল গর্জ্জন, যেন আমারই মনের আর্ত্তনাদের তীব্র প্রতিধ্বনি! আমি যে হারিয়ে গেলাম, আমি যে হারিয়ে গেলাম—এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমার দেশের মাটির সঙ্গে আমার যোগসূত্রটি গেল ছিঁড়ে। কোনও রকমে টলতে টলতে নিজের কেবিনে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম—সে রাত্রে আর কিছু খাই নি।

১৭।১৮ দিন জাহাজে ছিলাম—এই হারিয়ে যাওয়া মনোভাবটা আমার ত যায়ইনি বরং উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। তার উপর সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত খালি জল জল আর জল—জল দেখে দেখে আমার ক্রমে যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আমার দেশের মাটির কথা ছেড়েই দিচ্ছি—এই পৃথিবীর বুকের একটু মাটি কোথায়ও দেখতে পেলে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। সে যে কি মনের অবস্থা বুলা, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। ধরণীর মাটির সঙ্গে আমাদের গহন মনের যে কি নিগূঢ় যোগ—সেটা মাটির উপর সব সময় দাঁড়িয়ে তোমরা টের পাও না।

যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের মার্শেলস-এ নেমে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম—কিন্তু হারিয়ে যাওয়া দিশাহারা মনোভাবটি তখনও গেল না আমার। মাটিতে পা দিয়েছি, কিন্তু এ মাটি ত আমার মাটি নয়। এর সঙ্গে আমার প্রাণের কোথাও কোনও যোগ নেই। এ মাটির রস টেনে নিয়ে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠার শক্তি পেলাম না। তাই নীরস মনের নিদারুণ অবসাদে চন্দ্রনাথকে অমন করে আঁকড়ে ধরেছিলাম—একদণ্ডও তাকে ছাড়তে রাজী নই—কতকটা যেন মুমূর্ষু রোগীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অক্সিজেনের মত। তাই ফোকষ্টোনের রেল-কর্ম্মচারীর কথা মানিনি।

নভেম্বর মাসের যে সন্ধ্যায় লণ্ডন সহরে এসে প্রথম পদার্পণ করেছিলাম—সে সন্ধ্যাটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে আমার জীবনে। কেন, ক্রমে সেটা বুঝতে পারবে। আমরা দুজন ট্রেণের কামরায় উঠে বসার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেণ দিল ছেড়ে। একটু অবাক হলাম। আমার হিসেব মত ট্রেণ ছাড়তে তখনও প্রায় দু'ঘণ্টা বাকী। চন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে শুধোলাম, "একি হল! এরই মধ্যে ট্রেণ ছেড়ে দিল যে?"

চন্দ্রনাথ বললে, "কি জানি, তোমার হিসেবে ভুল ছিল বোধ হয়।" কিন্তু মন সে কথায় সায় দিল না। কেন না, আমার যাত্রাপথের প্রত্যেক পদক্ষেপটি জাহাজ এবং ট্রেণের বই দেখে আমার—ইংরেজীতে যাকে বলে Travelling Agents—তারা লিখে ঠিক করে দিয়েছিল। পকেট থেকে সেই কাগজখানি বার করে দেখলাম—আমার ত ভুল হয়নি!

ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথ ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখছিল। হঠাৎ শুধাল, "তোমাকে প্রথম অনেক পিছনের একটা কামরায় বসিয়েছিল না ?"

বললাম, "হ্যাঁ"।

বললে, "ঠিক হয়েছে। ট্রেনটা দুই ভাগে ছিল। প্রথম অংশটি ছেড়ে দিয়েছে, শেষের অংশটি তোমার হিসেব মত প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরেই ছাড়বে। তাই তোমাকে সেই দিকে উঠিয়েছিল।"

কাচ আঁটা জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলাম—কথাটা ঠিক। আমাদের কামরার পিছনে মাত্র আর একখানি গাড়ী রয়েছে। আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। তারও কারণ বলি।

সুরেশ ঘোষ বলে আমার এক বন্ধু ছিল—নাম শুনেছ, তাকে দেখনি কখনও। নাম শুনেছ তার কারণ, এটা নিশ্চয়ই শুনেছিলে যে বিলেত যাত্রা করার আগে তাকেই আমি টেলিগ্রাম করেছিলাম—ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা করতে এবং আমার থাকার জন্য একটা ঘর ঠিক করে রাখতে। সে আমি রওয়ানা হবার বছরখানেক আগে থেকে, বিলেতে এসে ব্যারিষ্টারী পড়ছিল। তাকে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌছবার সময় দিয়েছিলাম রাত ৮॥টা। কিন্তু আগের ট্রেণে উঠে বসেছি—হিসেব মত লণ্ডনে পৌছতে ৬॥টার বেশী হয় না।

চন্দ্রনাথকে সব কথা খুলে বলে শুধোলাম "কি হবে ?"

চন্দ্রনাথ বলল "কি আর হবে ? যা হয় একটা করে নেওয়া যাবে। নেহাৎ নিরুপায় হই ত ষ্টেশনেই বসে থাকব, যতক্ষণ না সুরেশ আসে।"

চুপ করে রইলাম। আসল মনের কথাটি চন্দ্রনাথকে বলতে লজ্জা হ'ল। এই দূর অচেনা বিদেশে, যেখানে কোনও দিক দিয়েই মনের একটুকু অবলম্বন খুঁজে পাচ্ছি না, সুরেশই যেন আমার মনের একমাত্র আশ্রয়। আমি যে ইতিমধ্যে কতবার সুরেশ ঘোষের মুখখানি মনে করে, পরমাত্মীয় ভাবে তাকেই মনে মনে আঁকড়ে ধরেছিলাম, চন্দ্রনাথ ত তা জানে না। যদিও তোমাকে জানাতে এখন আর কোনও বাধা নাই যে দেশে থাকতে সুরেশকে কোনও দিনই আমি বিশেষ পছন্দ করিনি—তার সঙ্গে মনের মিল আমার হয়নি কখনও। সব সময়ই মনে হয়েছে—মনটা তার অন্ধকারে গলিপথে চলতেই ভালবাসে—আলোর সোজা রাস্তা সে যেন চলে এড়িয়ে।

যাই হোক, চন্দ্রনাথের কথা শুনে ষ্টেশনেই সুরেশের জন্য অপেক্ষা করব—এই রকম একটা সিদ্ধান্ত মনে মনে করে নিয়ে খানিকটা স্বস্তি পেলাম। ক্রমে ট্রেণ এসে দাঁড়াল ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে। প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে মনে হল—এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুধু আমরা দু'জনেই যেন খালি বাস্তব, আর সবই যেন স্বপ্ন।

চন্দ্রনাথ শুধাল "কি করবে ?"

বললাম "সুরেশের জন্য অপেক্ষা করা যাক। কোথাও গিয়ে বসা যায় না ?"

চন্দ্রনাথ বলল "কিন্তু এই ঠাণ্ডায় দু' ঘণ্টার ওপর বসে থাকলে ত মরে যাবো।"

সত্যই অসম্ভব শীত। এ রকম শীত জীবনে কখনও দেখিনি। গায়ে গরম স্যুট, তার উপর ওভারকোট, মাথায় টুপি—তবুও যেন হাড়ের ভিতর থেকে শীত কেঁপে কেঁপে উঠছে। দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব।

চন্দ্রনাথ বলল "তোমার জন্য সুরেশ ২২নং ক্রমওয়েল রোডে ইণ্ডিয়া হাউসে জায়গা ঠিক করে রেখেছে না ?"

বললাম "ঠিক করেছে বলে ত লেখে নি। প্রথমটা এসে সেইখানেই দু'-একদিন থাকবার ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করবে—এই রকম একটা কি চিঠিতে লিখেছিল। সে চিঠি ত আমার টেলিগ্রাম করবার আগেই পেয়েছিলাম।"

চন্দ্রনাথ একটু ভেবে বলল, "চল, এক কাজ করা যাক। ট্যাক্সি করে চল যাই ইণ্ডিয়া হাউসে। সেটা ত আমাদেরই মতন ভারতবর্ষের ছেলেদের প্রথম এসে ওঠার জন্যই তৈরী হয়েছে। জায়গা পেয়ে যাবো।"

বললাম "কিন্তু সুরেশের সঙ্গে দেখা হবে কি করে ?"

চন্দ্রনাথ বলল "এসে তোমাকে না পেলে ইণ্ডিয়া হাউসে কাল সকালে সে নিশ্চয়ই খবর নেবে।"

সত্যই ঐ শীতে ষ্টেশনে আর দাঁড়ান সম্ভব হচ্ছে না। অথচ কোথায় যে গিয়ে একটু গরমে অপেক্ষা করব—তাও জানি না। নিজের ইচ্ছাশক্তির জোর তখন আমার একেবারেই নেই। চন্দ্রনাথের কথায় সায় দিয়ে বললাম "তাই চল।" মনে মনে ভেবে নিলাম ইণ্ডিয়া হাউসে গিয়ে, একটা আস্তানা ঠিক করে—ট্যাক্সি করে না হয় ফিরে আবার ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে আসব, সুরেশের সঙ্গে দেখা করতে।

জিনিষ-পত্তর নিয়ে চললাম ট্যাক্সি করে দু'জনে—ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বলে দিলাম—২২ নং ক্রমওয়েল রোড। লণ্ডন সহরের বুকের উপর দিয়ে চলল আমাদের ট্যাক্সি—সেই লণ্ডন সহর, যার কত কথা ছেলেবেলা থেকে শুনেছি। কাচ আঁটা জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলাম—রাতের অন্ধকার কুয়াশাচ্ছন্ন অথচ সেই অন্ধকারের বুকে হাজার আলো জ্বলছে চারিদিকে। মনে হল—এ যেন একটা সহস্রচক্ষু বিরাট দৈত্য, হাঁ করে ক্রমেই আমাদের গ্রাস করে নিচ্ছে তার বিশাল উদরে।

চন্দ্রনাথকে শুধোলাম "তোমার থাকার জায়গা তুমি কিছু ঠিক করে আসনি কেন ?"

বলল "জান ত আমার আসা হঠাৎ ঠিক হল। আমারও তেমন জানাশোনা কেউ এদেশে নেই। মেজদা তার এক বন্ধুকে চিঠি লিখেছেন—ঐ ইণ্ডিয়া হাউসেই আমার জন্য ঘর ঠিক করে রাখতে। তিনি কিছু করেছেন কিনা জানি না।"

বললাম "চল, ইণ্ডিয়া হাউসে গেলেই যা হয় বোঝা যাবে।"

কিন্তু রাস্তা যেন আর ফুরোয় না। ট্যাক্সি চলেছে ত চলেইছে। মন তখন কোনও রকম একটা আশ্রয় পাওয়ার জন্য পাগলের মতন ছুটেছে। ট্যাক্সি তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারবে কেন ?

যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল—২২নং ক্রমওয়েল রোডের সামনে। ফুটপাথের উপরেই বাড়ী—কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গিয়েছে ফুটপাথ থেকে—দুধারে রেলিং দেওয়া। দুজনে উঠে গিয়ে সদর দরজায় ধাক্কা দিলাম। একটি মহিলা দরজাটি ঈষৎ খুলে মুখ বার করে জিজ্ঞাসা করলে "কা'কে চাই ?"

বললাম "আমরা সোজা ভারতবর্ষ থেকে আসছি।—এখানে থাকার জায়গা হবে কি না"—

দরজা খুলে মহিলাটি বললে—"ভিতরে আসুন।"

ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালাম একটি অপ্রশস্ত বারান্দা মতন জায়গায়—দু'পাশে ঘর, সামনে একটু দূরে সোজা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলায়। মহিলাটি সেখানে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি নাম?"

আমাদের নাম বললাম। বললে, "একটু অপেক্ষা করুন—আমি খবর নিচ্ছি।" এই বলে পাশের একটি ঘরে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বললে, "মিঃ চৌধুরী কার নাম?" আমি বললাম "আমার।" বললে "আপনার জন্য ঘর আছে কিন্তু (চন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে) "আপনার জন্য কোনও স্থান ত নেই! কোনও খবর ত আপনার পাইনি আমরা।" তাড়াতাড়ি বললাম—"ঐ একটা ঘরেই দু'জনে কোনও রকমে ব্যবস্থা করে নেব। আজ রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে যা হয় করব।"

মহিলাটি একটু হেসে বললে, "তা হয় না। একজনারই খালি বিছানা—দু'জনের ব্যবস্থা হবে না।"

চন্দ্রনাথের দিকে তাকালাম। সে তখন আমার কোটের হাতটা জোর করে চেপে ধরেছে। চুপি চুপি বললে, "আমাকে ছেড়োনা কিন্তু।" বুঝলাম তারও মনের অবস্থা আসলে আমার চাইতে বিশেষ কিছু ভাল নয়।

বললাম "আমরা দুজনে যে একসঙ্গে থাকতে চাই। বললে, "তাহলে অন্যত্র চেষ্টা করুন।"

তখন চন্দ্রনাথ বলল "অন্য কোথায় দুজনে অন্ততঃ আজ রাতটার মতন জায়গা পেতে পারি বলে দিতে পারেন?"

বললে "হ্যাঁ। তিন জায়গার নাম ও ঠিকানা আপনাদের লিখে দিচ্ছি। কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন—নিশ্চয়ই।"

এই বলে আবার পাশের ঘরে গেল চলে। একটু পরেই একটি কাগজে তিনটি ঠিকানা লিখে বাইরে এলো। চন্দ্রনাথ হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল। আমাকে বললে "চল।" আমি যন্ত্র-চালিত পুতুলের মত চন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে চললাম। দু'পা এগিয়ে চন্দ্রনাথ হঠাৎ ফিরে মহিলাটিকে বললে, "অনেক ধন্যবাদ।"

মহিলাটি হেসে একটু মাথা দোলাল, মুখেও কি যেন একটা বলল—ঠিক বুঝতে পারলাম না। যদিও বিশেষ করে শিখে এসেছিলাম যে এদেশে কথায় কথায় ধন্যবাদ দিতে হয়। তবুও আমি ধন্যবাদ দিতে ভুলেই গেলাম।

* * * *

আবার চলল আমাদের ট্যাক্সি লণ্ডন সহরের বুকের উপর এদিক ওদিক নানা রাস্তা দিয়ে। কখনও অতিরিক্ত আলোতে উজ্জ্বল প্রশস্ত রাস্তা—দু'দিকে বড় বড় অট্টালিকা। কখনও বা অপ্রশস্ত রাস্তা—দু'দিকে ঠিক একই ধরণের ছোট ছোট বাড়ী। সেই কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারে রাস্তার পাশে দাঁড়ান ক্ষীণ আলোতে যেটুকু দেখা যাচ্ছে সবই যেন অবাস্তব, অস্পষ্ট। অনেক ঘুরে ঘুরে ক্রমে আমাদের ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল—গাওয়ার স্ট্রীটে, সেক্সপীয়ার হাটে। এইটেই মহিলাটির দেওয়া প্রথম ঠিকানা।

গাওয়ার স্ট্রীটে সেক্সপীয়ার হাট লণ্ডন-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের বিশেষ পরিচিত স্থান, কিন্তু আমরা দু'জনে এর বিষয়ে কিছুই জানতাম না। লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের মেলামেশার এটি একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল—এক কথায় যাকে বলে ক্লাব। কিছু কিছু ভারতীয় ছাত্রদের থাকবারও ব্যবস্থা ছিল এখানে। ভারতীয় খাদ্য অর্থাৎ ডাল ভাত রুটী চাপাটী মাংসের কারী ইত্যাদি এখানে বেশ সস্তায় খেতে পাওয়া যেত এবং অনেক দূর দূর থেকে ভারতীয় ছাত্ররা মাঝে মাঝে এখানে ভারতীয় খাদ্য খেতে এসে জুটত এবং পরে আমিও হয়েছিলাম তাদের মধ্যে একজন। স্থানটিকে আমি যে কোনও দিনই বিশেষ পছন্দ করেছি, এমন কথা বলতে পারব না। কিন্তু কখনও কখনও ভারতীয় খাদ্যের লোভ আমাকে টেনে নিয়ে যেত সেখানে।

সেক্সপীয়ার হাটের বাড়ীখানি লণ্ডনের অন্য অন্য সাধারণ বাড়ীগুলির চেয়ে একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। একতলা বাংলো ধরণের বাড়ী—ছাদটি টালির না কাঠের ঠিক মনে নেই। সামনেই বেশ বড় ছড়ান কাচ আঁটা বসবার ঘর—রাস্তা থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। আমি ট্যাক্সি থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। রাস্তার দিকে বড় সদর দরজাটি সম্পূর্ণ খোলা।

আমার মনের উত্তাপ তখন খুব কম মাত্রায়ই ছিল। কিন্তু যা দেখছিলাম তাতে আমার মনের মাত্রা প্রায় শূন্যতে গিয়ে নামল। এক ঘর ছড়ান বিদেশী পোষাক পরা ভারতীয় ছাত্র—কেউ বা বসে গল্প করছে, কেউ বা একটু বেঁকিয়ে দাঁড়ানো, চেয়ারের উপর তুলে দিয়েছে পা। চুলগুলি প্রায় সকলেরই পিছন দিকে টেনে আঁচড়ানো—কারও মুখে পাইপ, কারও ঠোঁটে সিগারেট একটু বেঁকিয়ে লাগানো। হো-হো হাসি ও তাদের মুখের বাঁকা-বাঁকা বিদেশী কথাবার্তা—ঘর ভরা তামাকের ধোঁয়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বাইরে যেটুকু কানে এলো—কেমন যেন বিকৃত মনে হল।

চন্দ্রনাথকে বললাম "আমি আর নামব না। তুমি নেমে খবর নাও।"

চন্দ্রনাথ "আচ্ছা" বলে নেমে গেল। খানিকক্ষণ চুপচাপ গাড়ীতে বসে রইলাম—কিছু দূরে ঘরের মধ্যে ভারতীয়দের গতি-বিধি ধরণ ধারণ চোখের সামনে সিনেমার ছবির মত ভাসতে লাগল—সেই দিকেই রইলাম চেয়ে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ বাইরে থেকে এসে আমাদের গাড়ীর পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে; কেউ কেউ বা বেরিয়ে যাচ্ছে ঘরের ভেতর থেকে। কিন্তু বেশীর ভাগই একা নয়—বগলে জড়ান পাশে চলেছে মেম সাহেব।

চন্দ্রনাথ ফিরে এল। এসে বাইরে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে কাগজ বার করে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে কি একটা বলে দিল—কাচ আঁটা ভিতর থেকে ঠিক শুনতে পেলাম না। বুঝলাম—পরের ঠিকানা।

ভিতরে উঠে এসে বলল "বাবা! বাঁচা গেল।" শুধোলাম "কি হল?"

বললে "আরে কেউ ভাল করে কথাই বলতে চায় না। এ বলে—ও দিকে যান। ও বলে—ঐ দিকে খবর নাও। সকলের চোখেই কেমন যেন তাচ্ছিল্য ভরা বাঁকা চাহনি।"

শুধোলাম "শেষ পর্য্যন্ত জায়গা আছে কি না খবরই পেলে না?"

বললে—"যে মেমসাহেবের হাতে সব ব্যবস্থা করার ভার—

তিনি এখন নেই। তবে শুনলাম নাকি জায়গা নেই। থাকলেও থাকতাম না ওখানে।"

ট্যাক্সি চলেছে। শুধোলাম "কোথায় যাচ্ছি এখন?" বললে "বেডফোর্ড ষ্ট্রীটে। লিঙ্কলন হল হোটেলে।"

জায়গা ওখানে না পাওয়াতে মনে মনে আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

* * * *

ক্রমে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল—লিঙ্কলন হল হোটেলের সামনে। খানিকটা ২২নং ক্রমওয়েল রোডের মতনই বাড়ীখানি—ফুটপাথ থেকে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে, দু'পাশে রেলিং দেওয়া। বাইরের দিকে জানালা দরজা সবই বন্ধ—ভিতরে যে মানুষ আছে বোঝা যায় না। দু'জনে নেমে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে সদর দরজায় ধাক্কা দিলাম। সদর দরজার পাশেই পিতলের উপর কালো হরফে বড় বড় করে লেখা—লিঙ্কলন হল হোটেল। বাড়ীর নম্বরটাও চোখে পড়ল—২৭।

একটি ক্ষীণাঙ্গী দীর্ঘ মহিলা এসে দরজা খুলে আমাদের দিকে চাইলেন।

চন্দ্রনাথ বলল, "এখানে কি আমাদের থাকবার স্থান হবে? আমরা দু'জনে একসঙ্গে থাকতে চাই।"

বললে "ভিতরে আসুন।" ভিতরে ঢুকলাম—সেই ক্রমওয়েল রোডের ধাঁচেই বাড়ীটা তৈরী—অর্থাৎ লম্বা অপ্রশস্ত বারান্দা মতন একটা জায়গা, দু'পাশে ঘর এবং কিছু দূরে সামনে দোতলায় উঠার সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। পরে অবশ্য দেখেছিলাম—বেশীর ভাগ লণ্ডনের সাধারণ বসবাসের বাড়ীগুলিই ঐ রকম।

মহিলাটি বললেন "হ্যাঁ—দোতলায় দুজনের থাকবার মতন একটা ঘর আছে। চলুন দেখবেন।"

কথাটা শুনেই একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার বুক ছাপিয়ে বেরুল, আমি নিজে টের পাওয়ার আগেই। চন্দ্রনাথ একটু যেন হেসে আমার মুখের দিকে চাইল। [ক্রমশঃ।

বিলেতে ধূমপানের বহর

ধূমপান অর্থাৎ সিগার-সিগারেট খাওয়ার বহর বৃটেনে বেড়েই চলেছে দিন দিন। সেখানকার অনেক ধূমপায়ী ফুসফুসের ক্যানসারে ভুগছে এবং গবেষণায় প্রমাণিতও হয়েছে যে, ধূমপানের সঙ্গে ফুসফুসের ক্যানসারজনিত ক্ষতের সম্পর্ক খুব নিবিড়। কিন্তু তাই বলে ধূমপানের মাত্রা বা হার কমে যায়নি সেখানে এতটুকু, পরন্তু সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে দেখা গেছে—এইটি ক্রমেই বাড়তির দিকে।

১৯৫৪-৫৫ সাল অর্থাৎ বছর তিন আগেকার একটি সরকারী হিসেব। বিলেতের শুল্ক ও আবগারী বিভাগীয় কমিশনারের রিপোর্টেই জানা গেছে, টুব্যাকো (তামাক) থেকে আলোচ্য বর্ষের জানুয়ারী মাসে যে রাজস্ব সংগৃহীত হয়, তার পরিমাণ ৬৫ কোটি পাউণ্ড। এর পূর্ব্ববর্ত্তী বছরটিতে অর্থাৎ ১৯৫৩-৫৪ সালে এই খাতেই সংগৃহীত রাজস্ব অপেক্ষা উক্ত রাজস্ব ২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী। বৃটেনে ধূমপানের বহর বাড়ছে বই যে কমছে না, এই থেকে এর একটি সহজ অনুমান চলে।

শুধু বৃটেনেই কেন, পৃথিবীর মোটামুটি প্রায় সকল দেশেই ধূমপানের মাত্রা তথা ধূমপায়ীর সংখ্যা আগে থেকে বেড়েছে, অন্ততঃ কমেনি কোথাও। তবে বৃটেনে নারীদের ভেতরও এই অভ্যাসের প্রচলন অনেক দেশের তুলনায় অত্যন্ত বেশী। অবশ্য রাষ্ট্রীয় সরকারের দিক থেকে এতে প্রত্যক্ষ কিছু ক্ষতি বা লোকসান নেই। পক্ষান্তরে বরং বলা চলে—এইটি তাঁদের আয়ের একটি মস্ত বড় সূত্র এবং সম্ভবতঃ সর্ব্বাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র। ধূমপানের বহর বা মাত্রা যতই বাড়বে, রাজস্ব বৃদ্ধিও হবে সেই অনুপাতেই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন

[শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ এবং বর্ত্তমানে ঐ কলেজের ইমারিটাস্ প্রফেসর]

অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান পূর্ব্ব-পাকিস্তানের যশোহর জেলার অন্তর্গত ঝিনাইদহ মহকুমার রায়গ্রাম নামক এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বগৃহ হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানীয় বদান্য জমিদারের প্রতিষ্ঠিত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত নলডাঙ্গা ভূষণ উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিনি তাঁহার মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেন। পরে তিনি যশোহর জেলা স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভবিষ্যৎ জীবনে শ্রীসেন রসায়নশাস্ত্র ও ধাতুবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিলেও প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি সংস্কৃত বিষয়ক পত্রে যশোহর জেলার ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাইয়া শীতলাসুন্দরী বসু সুবর্ণপদক লাভ করেন। ইহার পর শ্রীসেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৯১৪ সালে তথা হইতে রসায়নশাস্ত্রে অনার্স সহ বি, এস, সি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে রায়বাহাদুর শ্রীনাথ পাল সুবর্ণপদক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উড় স্কলারসিপ এবং রায়বাহাদুর অমৃতনাথ মিত্র পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পর তিনি ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এস্-সি ডিগ্রী লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রী লাভের পর তিনি স্যার রাসবিহারী ঘোষ স্নাতকোত্তর বৃত্তি পাইয়া বিজ্ঞান কলেজে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পরিচালনায় ১৯১৭ সাল হইতে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত দুই বৎসরকাল গবেষণা কার্য্য করেন।

১৯১৯এর শেষভাগেই তাঁহার কর্ম্মজীবন সুরু হয়। এই সময় শ্রীসেন মেসার্স আর, জি, হচিসন কোম্পানীতে তাঁহাদের প্রধান রাসায়নিকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি তিন বৎসর এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুনামের সহিত কার্য্য করিবার পর তৎকালীন দেশপ্রেমিক বিদ্যোৎসাহী শিল্পপতিগোষ্ঠী টাটা কর্তৃপক্ষের গুণগ্রাহী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি জে, এন, টাটা স্কলারশিপ প্রাপ্ত হইয়া উচ্চতর বিদ্যা এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণের উদ্দেশে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে শ্রীসেন ধাতুবিদ্যায় উচ্চতর জ্ঞানলাভের জন্য ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজীর অধীন রয়্যাল স্কুল অব মাইন্সএ যোগদান করেন। দুই বৎসর পর তিনি এ, আর, এস, এম ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯২৪ সাল হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত এক বৎসর শ্রীসেন মিডলসবরো সহরে অবস্থিত ডরম্যান লঙ এণ্ড কোম্পানীর ওকলাম ব্রিটানীয়া আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কসএ কাজ করেন এবং ১৯২৫ সালের শেষভাগে ভারত সরকারের ষ্টোরস্ বিভাগের ইনস্পেকটরের অধীনে একজন ক্লাশ ওয়ান অফিসাররূপে যোগদান করেন। এই পদে তিনি অল্প দিন অধিষ্ঠিত থাকিলেও সেই অল্পকালের মধ্যেই তিনি ষ্টোরস্ বিভাগের মেটালোগ্রাফি ল্যাবরেটারীতে একটি নূতন ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপন করেন এবং রেলওয়ে সংক্রান্ত ধাতুদ্রব্যাদির অকাল ভগ্নপ্রবণতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান পরিচালনা করেন। ইহার পর ১৯২৭ সালে শ্রীসেন শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ধাতু এবং রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই কলেজের খনিবিদ্যা বিভাগের ভারও কিছুকালের জন্য ইঁহার উপর ন্যস্ত হয়। পরে অবশ্য ধানবাদে ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ মাইনস্ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিবপুর কলেজের ঐ বিভাগটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

১৯৩৬ সালে শ্রীসেন ধাতুবিদ্যা শিক্ষাদান এবং ধাতব শিল্প (**Metallurgical Industries**) প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করিবার জন্য গ্রেট বৃটেন এবং জার্ম্মাণী প্রেরিত হন এবং আট মাস ঐ দুই দেশে অবস্থান করিয়া জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন

রিয়া শ্রীসেন গ্রেটবৃটেন এবং জার্মাণীতে অর্জিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধাতুবিদ্যা শিক্ষণ ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং ধাতুবিদ্যায় একটি ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া শিবপুরের তৎকালীন অধ্যক্ষ মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের নিকট পেশ করেন। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড মনে-প্রাণে কলেজের শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি কামনা করিতেন। তিনি অতিশয় উৎসাহিত হইয়া শ্রীসেনকে সেই পরিকল্পনাটি লইয়া সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দরবারে উপস্থিত হইবার উপদেশ দেন।

সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার পরিকল্পনা অনুমোদন করায় ১৯৩১ সালে ধাতুবিদ্যায় ৩ বৎসরের বি, মেট, ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তিত হয়। পরে ১৯৪৫ সালে অবশ্য এই কোর্স ৪ বৎসরের কোর্সে পরিণত হয় এবং ইহাতে উত্তীর্ণ তরুণেরা মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ বি, ই, ডিগ্রী লাভ করিয়া থাকেন। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে শ্রীসেন ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই বৎসরই বাংলা সরকার উচ্চতর ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা সম্পর্কে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির রিপোর্টে অনতিবিলম্বে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের শিক্ষাদান ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং উন্নতিসাধন করিবার সুপারিশ করা হয়। সরকার সেই সকল সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং শ্রীসেনের উপর সেই সকল সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, ভর্তি হইবার যোগ্যতার পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ম-কানুনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনার্থ পেশ করিবার নির্দেশ দেন। সেই সকল নিয়ম-কানুন ১৯৪৬ সালের ২১শে জুন সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হয়, কিন্তু সিণ্ডিকেট প্রথম এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে এই সকল নিয়ম-কানুনগুলিকে পশ্চাদ্বর্ত্তী ১৯৪৫ সালের ২২শে অক্টোবর (with retrospective effect) হইতেই চালু করিবার নির্দেশ দেন। শ্রীসেনের নির্মল বুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টি ঐ সকল নিয়ম-কানুনের মধ্যে সম্যকরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

শিবপুরের অধ্যক্ষতার সংগে সংগে তিনি ডাইরেক্টর জেনারেল অফ এয়ার ক্রাফটের অধীনস্থ টেক্‌নিক্যাল ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষ হিসাবেও কাজ করেন। ভারতীয় এয়ারফোর্সের ফ্লাইট মেকানিকদিগের ট্রেনিংএর ব্যাপারেও শ্রীসেনের উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, তিনি বাংলা ও বিহারের খনিবিদ্যা বিষয়ক অ্যাডভাইসারী বোর্ড, প্লীডার্স সার্ভে এগজামিনেশন বোর্ড এবং স্কুল ফাইন্যাল এগজামিনেশন (বিজ্ঞান বিভাগ) বোর্ডের কর্মসচিব (Secretary) হিসাবে প্রশংসনীয় কার্য করিয়াছেন। শ্রীসেন স্বদেশ ও বিদেশে যে সকল বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সংগে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন এবং অবসর গ্রহণের পর এখনও আছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠকদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে পারে। আমরা তাঁহার কর্মজীবনের ব্যাপকতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি মাত্র। ১৯২৪ সালে শ্রীসেন গ্রেটবৃটেন এবং আয়ার্লণ্ডের "ইনষ্টিটিউট অব কেমিষ্ট্রির" অ্যাসোসিয়েট এবং ১৯৩৭ সালে ঐ প্রতিষ্ঠানের ফেলোশিপের সম্মান অর্জন করেন। ইহা ছাড়া তিনি ভারতীয় 'Chemical Society'র ফেলো লণ্ডনের ইনষ্টিটিউসন অব মাইনিং এণ্ড মেটালর্জির অ্যাসোসিয়েটেড সভ্য ছিলেন (১৯৩৪—৪১)। তিনি ১৯৪১ হইতে ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত ভারতের জিওলজিক্যাল মাইনিং এণ্ড মেটালর্জিকাল ইনষ্টিটিউশনের সভ্য ছিলেন। ১৯৪৫ সাল হইতে ইনি ভারতের "ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ার্স" নাম প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদে বৃত আছেন। ইনি "ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স" নামক সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য। তিনি সর্বভারতীয় কাউন্সিল ফর টেকনিকাল এডুকেশন ও সর্বভারতীয় বোর্ড অব টেকনিকাল ষ্টাডীজ ইন ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড মেটালার্জী প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন এবং ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্সের পরীক্ষা গ্রহণ কমিটি এবং ক্যালকাটা টেকনিকাল স্কুলের গভর্ণিং বডির সদস্য ছিলেন। ১৯৪৫ হইতে ১৯৫১ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। তিনি কয়েকবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির ডীন মনোনীত হন এবং সিণ্ডিকেটের সভ্য হিসাবে কাজ করেন। সিণ্ডিকেটের সভ্য থাকা কালে তিনি ইহার ওয়ার্কস কমিটি, স্কুল কমিটি এবং ফাইনান্স কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি এক বৎসরের জন্য ভূবিদ্যা শিক্ষা বোর্ডের এবং কয়েক বৎসরের জন্য ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি মনোনীত হন। তিনি বেঙ্গল ট্যানিং (Tanning) ইনষ্টিটিউট ও ইনষ্টিটিউট অব জুট টেকনলজির গভর্ণিং বডির মেম্বর এবং কাউন্সিল অব পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট টিচিং ইন সায়েন্সএর সদস্য ছিলেন।

শ্রীসেনের মৌলিক গবেষণামূলক কাজ খুব বেশী নাই। তবে তাঁহার যে দুইটি মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লণ্ডনের কেমিকাল সোসাইটির বার্ষিক রিপোর্টে স্থান লাভ করিয়াছিল। ১৯৪২ সালে কাশীধামে বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে সম্মেলন হয় তাহাতে তিনি "Struntum of Metals" এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং বিজ্ঞান-কংগ্রেসের উদ্যোক্তাদের নিকট ধাতুবিদ্যাকে বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা হিসাবে গণ্য করিবার আবেদন জানান। ইহার ফলে ধাতু এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাকে যুক্তভাবে একটি "সেকসনাল সাবজেক্ট" রূপে গণ্য করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৪৯ সালে তিনি বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি যে প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন তাহার স্বীকৃতিস্বরূপ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এমারিটাস্ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। ইনি শিবপুর কলেজের দ্বিতীয় ভারতীয় এবং প্রথম বাঙ্গালী অধ্যক্ষ।

অধ্যক্ষ শ্রীচিন্তামণি কর

[সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও বিখ্যাত চিত্র ও প্রস্তরশিল্পী]

রত্নগর্ভা ভারতের সুমহান ঐতিহ্যের রশ্মিধারা আলোকিত করেছে বিশ্বের আকাশ তার দিকপাল সন্তানগণের কল্যাণে। দীর্ঘ দিন বিদেশে কালাতিপাত করেও নিজের দেশীয় স্বাতন্ত্র্য যাঁরা পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন উপরন্তু নিজেদের ভাবধারায় অপরকে করেছেন অনুপ্রাণিত, সেই বরণীয় সন্তানগণের সঙ্গে অনায়াসে উল্লেখ

করা যেতে পারে সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের বর্তমান অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ চিত্র ও প্রস্তরশিল্পী বাঙলার গৌরব শ্রীচিন্তামণি করের নাম।

শিল্পের দিকে অনুরাগ তাঁর জীবনের উষালগ্ন থেকে। পড়াশুনায় মন না বসলেই পিতৃদেব শিল্পী শ্রীভূপতিনাথ কর অঙ্কনের দিকে অনুপ্রাণিত করতেন। বাবার কাছে পেয়েছেন অপরিসীম উৎসাহ। তা ছাড়া মৃৎশিল্পীদের কার্যেও সহায়তা করতেন সেই সময় থেকেই। এমনই করেই শিল্প-লক্ষ্মীর অমোঘ আহ্বান বরণ করে নেন চিন্তামণি। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র-স্মৃতি বিজড়িত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ অরিয়েণ্টাল আর্টস-এ যোগদান করেন। নিজের কৃতিত্বে ও মেধায় সেখানে উঁচু ক্লাসেই স্থান পান। এখানে মোট তেরো মাস ছাত্র হিসাবে ছিলেন। ভারতীয় ধারায় চিত্রাঙ্কনে এঁকে সেদিন শিক্ষা দিতেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার। কাষ্ঠ ও প্রস্তর খোদাই করা সম্বন্ধে পাঠ নিলেন উড়িষ্যার শ্রদ্ধেয় মৃৎশিল্পী গিরিধারী মহাপাত্রের কাছ থেকে। এদিকে প্রবেশিকা পরীক্ষায়ও হয়েছেন উত্তীর্ণ। রিপণ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) মহাবিদ্যালয় থেকে পাশ করেছেন আই-এ। আত্মনিয়োগ করলেন বাণিজ্যিক শিল্প সাধনায়। তারপর টাকীতে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ, সেখান থেকে তিনি বদলী হলেন সিউড়ীর বীরভূম জেলা বিদ্যালয়ে ও নিজের মনোমত বিভাগটি পেলেন। অঙ্কন শিক্ষক হলেন চিন্তামণি কর। ইতিমধ্যে চিন্তামণির শিল্পীখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। রঙ ও রেখার আঁচড়ে ফোটাতে থাকেন অন্তরের ভাব ও ভাষা, নীরস পাথরের মধ্যে আনেন লালিত্য, লাবণ্য, দীপ্তি। শিল্পপ্রাণ মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত য়্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস্-এর প্রদর্শনী থেকে সাড়ে চার শ' টাকায় এঁর একখানি ছবি কিনে নিয়ে গেলেন ত্রিপুরার পরলোকগত বিদ্যোৎসাহী মহারাজা বাহাদুর। তারপর লণ্ডন যাত্রা। সেখানেও প্রভূত সমাদর পেল এঁর অঙ্কিত ছবিগুলি। সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টা পেলেন সম্মান। লণ্ডন থেকে এলেন প্যারীতে, এখানে তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে শ্রম ও সাধনার মধ্যে দিয়ে, অপরিসীম নিষ্ঠায় তিনি দিনের পর দিন যে পরিমাণ পরিশ্রম করে গেছেন তারই সমষ্টি দেখা দিয়েছে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্যরূপে, সেখানে সকালে নটা থেকে বারোটা য়্যাকাদেমী স্ত লা' গ্রাঁদ শুমিয়েরে মাটির কাজ শিখেছেন, দুটো থেকে পাঁচটা প্রস্তর খোদাই শিখেছেন বরণীয় শিল্পী ভিক্টর জোভানেল্লীর ষ্টুডিওতে, ছটা থেকে সাতটা অধ্যয়ন করেছেন ইনষ্টিটিউট অফ আর্ট য়্যাণ্ড আরকোলজিতে, ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেছেন রাত আটটা থেকে দশটা অবধি। এই ছিল তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী। যুদ্ধের মরণ-দামামা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। ১৯৪২ খৃঃ এ দিল্লীতে গিয়ে একটি ষ্টুডিও খুললেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দিল্লী পলিটেকনিক আর্টস সেকসানে ভাস্কর্য শেখাবার ভার পেলেন (১৯৪৩)। ১৯৪৪-৪৫ খৃঃ অঙ্কনে ও ভাস্কর্যে ওয়ানম্যান শো'য় অর্জন করলেন প্রভূত প্রসিদ্ধি। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে আবার লণ্ডন যাত্রা। সেখানেও নির্মাণ করলেন একটি ষ্টুডিও। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল ব্রিটিশ স্কালপচারাল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হলেন। সমগ্র এশিয়ার মধ্যে ইনিই এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ও আজ পর্যন্ত একমাত্র সভ্য। ১৯৪৮এর অলিম্পিকে স্পোর্ট-ইন-আর্ট'এর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভাস্কর্য বিভাগ জন্ম গ্রেট বৃটেনের পক্ষ থেকে রৌপ্যপদক ও ডিপ্লোমা পান। রয়্যাল য়্যাকাডেমির প্রদর্শনীগুলিতে ইনি একজন নিয়মিত প্রদর্শক ছিলেন (১৯৪৯-৫৬)। লণ্ডনের একটি শিল্প সংরক্ষণ শালার পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় শিল্পী চিন্তামণি কর (১৯৫০-৫৩)। লণ্ডনে চার বার ও প্যারীতে দু'বার ইনি 'ওয়ান-ম্যান-শো' করে এসেছেন। লণ্ডন ও প্যারী ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে বহু ব্যক্তিগত ও সাধারণ সংগ্রহশালায় শোভা পাচ্ছে এঁর শিল্প সৃষ্টিগুলি। ক্লাসিকাল ইণ্ডিয়ান স্কালপচার' ও 'ইণ্ডিয়ান মেটাল স্কালপচার' নামক দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেও সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৫৩ ও ৫৪ খৃষ্টাব্দে তিন মাসের জন্যে দুবার ভারতে ফিরে আসেন। এই সময়ে শ্রীজি, ডি, বিড়লার ইচ্ছাক্রমে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের একটি এগারো ফুট ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি নির্মাণের ভার নেন। ১৯৫৫ খৃঃ সেটিকে আট মাসে সম্পূর্ণ করেন। ভারতের প্রধান হিসাব পরীক্ষকের আবাসের সামনে দেওয়ালে ন'টি "৬-৪" বাস রিলিফ স্কালপচার প্যানেলের নির্মাণ ভার গ্রহণ করলেন ভারত সরকারের কাছ থেকে। এই উপলক্ষে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে একেবারে প্রত্যাবর্তন করলেন ও সেই বছরই আগষ্ট মাসে সরকারী ও চারুকারু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন চিন্তামণি কর।

দীর্ঘদিন বিদেশে কাটিয়েছেন, ভারতীয় ভাবধারায় শিল্প সৃষ্টি করে সেখানে অর্জন করেছেন প্রভূত যশ, ইনি বলেন যে আমাদের প্রাচীন শিল্প সেখানে অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের প্রাচীন শিল্প সম্বন্ধে তারা রীতিমত চর্চা করে। স্বদেশে শিল্পের যতটা অগ্রগমন হওয়া দরকার অধ্যক্ষ করের মতে ভারতে তা মোটেই হচ্ছে

শ্রীচিন্তামণি কর

না। ভবিষ্যৎ শিল্পীদের প্রতি আপনার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ উপদেশ কি, জিজ্ঞাসা করায় অধ্যক্ষ করের কাছ থেকে উত্তর আসে যে নতুন শিল্পীদের নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত থাকতে হবে অবশ্য তাই বলে পুরাকালকে আমি নকল করতে বলি না—তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে নতুন যুগেরই ছবি থাকবে তবে তা দেখেই যেন বোঝা যায় যে শিল্পী কোন দেশান্তর্গত। এইভাবে ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রত্যেক শিল্পীর অবশ্য কর্তব্য। জীবনে বহু শিল্প-সাধকের সংস্পর্শে নিবিড়ভাবে এসেছেন অধ্যক্ষ কর যাদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ব্রেবিক, জুভেনেল্লি প্রমুখ এঁর শিক্ষকবর্গের ও তৎসহ ব্রাঙ্কুসী, ডেসপিউ, এপষ্টাইন প্রমুখ স্বনামধন্য শিল্প সাধকদের নাম।

ভারতের বিশেষ করে বাঙলার গৌরব অধ্যক্ষ চিন্তামণি করের দ্বারা সারা বিশ্বে আরও পরিব্যাপ্ত হোক, বিশ্ববাসীকে ভারতীয় শিল্প বোধে উদ্বুদ্ধ করুক, বিশ্বজন মানসে ভারতের শিল্প নতুন চেতনার সঞ্চার করুক, এই কামনাই করি।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

[প্রখ্যাত কবি ও 'যুগান্তর'-সম্পাদক]

শ্যামল শোভন বাঙলার পরম কোমল মৃত্তিকায় পুষ্ট হয়েছেন বাঙলার অসংখ্য কবি সন্তান, সেই পুষ্টিকে বিকাশের পথে সহায়তা করেছে বাঙলার অন্দরমহলের রূপ রস মাধুরীর অবর্ণনীয় বৈচিত্র্য। এই রূপসাগরে অবগাহন করে কবিকুল তাই থেকে আহরণ করেন অমৃত, সেই অমৃত তাঁরা পরিবেশন করেন ঘরে ঘরে কাব্যের মাধ্যমে। বাঙলার ঠিক এই রকমই এক শোভা সুষমায় ভরা

গ্রামে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করলেন স্বনামধন্য সাংবাদিক ও সুকবি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। ফরিদপুর জেলায় মাদারীপুর মহকুমান্তর্গত ছয়গাঁও গ্রামে। নদীতীরে মাতুলালয়ে। পিতৃদেব স্বর্গীয় কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়। ইংরাজী কাব্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত, পরম বিদ্যোৎসাহী। মায়ের কাছে প্রথম পাঠগ্রহণ। তারপর পাঠশালায় প্রবেশ। এদিকে গ্রাম্য প্রকৃতি বিশেষ করে গৃহ সন্নিকটস্থ নদী ছেলেবেলা থেকে হাতছানি দেয় বিবেকানন্দকে। নদীর গতিবেগ অভিভূত করে তোলে বালককে, তার উত্তাল উদ্দামতার মধ্যে মনে মনে বালক নিজেকে দেয় মিশিয়ে, ভবিষ্যৎ-জীবনের কবি বিবেকানন্দের কবিতার মধ্যে বা তাঁর নিজের জীবনেও যে অশ্রান্ত গতিবেগ ধরা পড়ে তার উৎসই হচ্ছে এই নদী-তট। গ্রামের মহিলাদের রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে শোনান বিবেকানন্দ। পাঠশালার পর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় তারপর রুদ্রগড় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। লেখা আরম্ভ হয়েছে তার আগেই। বিদ্যালয় থেকে হাতে লেখা পত্রিকা বের হ'লে তাতে গল্প-প্রবন্ধ কবিতা এই তিন বিভাগেই দেখা দিলেন বিবেকানন্দ। নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধের অনুকরণে একদিন রচনা করলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ কাব্য। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ এল। বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি স্মরণীয় বৎসর। পরাধীন দেশের নেতারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠেছেন, দেশের মুক্তি আন্দোলনে উদ্বোধিত করছেন সকলকে ঝাঁপিয়ে পড়তে, সুদূর পল্লীগ্রামেও সে ডাক পৌঁছোল, ফলে বিবেকানন্দের অধ্যয়ন ব্যাহত হ'ল কিছুকালের জন্যে। এরপর একবার কলকাতায় ঘুরে যান বিবেকানন্দ। এখানে এসে দৈনিক বসুমতী ও অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতি আকৃষ্ট হন ও গ্রাহক হয়ে যান। কবিতা রচনা তখন পুরোদমে চলছে। প্রথম কবিতা বেরোল 'উদ্বোধন'এ দ্বিতীয় 'মাসিক বসুমতী'তে। মাসিক বসুমতী তখন সবে চোখ মেলে চেয়েছে। পূজনীয় স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে মাসিক বসুমতী ধীরে ধীরে বৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলবার রাস্তা খুঁজছে। মাসিক বসুমতীর সঙ্গে এই যে সংযোগ স্থাপিত হ'ল বিবেকানন্দের তা আজও অক্ষুণ্ণ। শুধু তাই নয়, বিবেকানন্দের জীবনের অনেক স্মরণীয় ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে লেখা কবিতাগুলি এখানেই প্রকাশিত হয়েছে, তা ছাড়া তখন একরকম নিয়মিত ভাবেই এখানে কবিতা পরিবেশন করতেন বিবেকানন্দ। এদিকে বাঙলা ও সংস্কৃতে 'লেটার' নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিবেকানন্দ। ছাত্রজীবন বরাবরই গৌরবমণ্ডিত ছিল। কলেজে পড়ার ইচ্ছা থাকাটা স্বাভাবিকই। কিন্তু কোন কারণে কলেজে পড়া আর হয়ে উঠল না, কর্মজীবনের অমোঘ আহ্বান সরিয়ে রাখতে পারলেন না—কিন্তু অধ্যয়ন তাঁর শেষ হ'ল না, তার বিরাম নেই, পৃথিবীর বিখ্যাত সাহিত্যগ্রন্থগুলি বিখ্যাত সন্তানদের জীবনকাহিনীগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে তলিয়ে গেলেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। কলেজে পাঠগ্রহণের উদ্দেশে ইনি যখন চুঁচুড়ায় পদার্পণ করেন, সেই সময়ে নজরুল ইসলামের সঙ্গে এঁর হয় পরিচয়। নজরুলের সঙ্গে এঁর পরবর্তী জীবনের গভীর সৌহার্দ্য অনেকেরই সুবিদিত। উদীয়মান কবিকে নজরুল আখ্যা দিলেন 'মর্ণিং ষ্টার'।

বিবেকানন্দের কর্মজীবনের সূত্রপাত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়।

আনন্দবাজারও তখন শিশুমাত্র। নির্ভীক সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের চেষ্টায় ও মাখনলাল সেনের সমর্থনে একজন অবৈতনিক শিক্ষানবীশরূপে প্রবেশ করলেন বিবেকানন্দ (১৯২৫ খৃঃ)। অনেক দিন পরে প্রথম পারিশ্রমিক লাভ করলেন পঁচিশ টাকা। তার পর মেধায় ও নিষ্ঠায় এবং সততায় বারো বছরের মধ্যে তিনি সহ-সম্পাদকের পদে সমাসীন হলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি ও বিপ্লবের গ্রন্থগুলি ব্যাপক ভাবে সংগ্রহ করতে লাগলেন। সম্পাদকীয় রচনায় আন্তর্জাতিক বিষয়ক রচনাদির প্রথম প্রবর্তন ইনিই করলেন। দীর্ঘাকার প্রবন্ধগুলিই ধীরে ধীরে আজ রবিবাসরীয় বিভাগরূপে পরিণত হয়েছে। আনন্দবাজারের দোল সংখ্যা ও পূজা সংখ্যার সম্পাদনভার ইনি একাধিক বার গ্রহণ করেছেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে 'যুগান্তর'এর প্রতিষ্ঠা হ'ল। বিবেকানন্দ যোগদান করলেন যুগান্তরে। সমস্ত পরিকল্পনাটি তাঁর সৃষ্টি। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিক থেকে ইনি সম্পাদনভার গ্রহণ করলেন, আজও তিনি গৌরবের সঙ্গে এই পদে সমাসীন। প্রথম জীবনে বিদ্রোহমূলক কবিতা লেখার জন্যে গোয়েন্দা বিভাগের কুনজরেও থাকতে হয়েছিল প্রায় পনেরো-ষোলো বছর। শতাব্দীর সঙ্গীত, বিপ্লবী নায়িকা ও জীবনমৃত্যু গ্রন্থত্রয় তাঁর কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর বহনকারী। তা ছাড়া জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী, রুশ-জার্মাণ সংগ্রাম, সোভিয়েট মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতি শীর্ষক গ্রন্থগুলিতে তাঁর বিশ্ব রাজনীতি তথা সমরনীতি সম্বন্ধে দক্ষতা ধরা পড়েছে।

বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে ইনি ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত এবং ১৯৫৫ থেকে ইনি পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংস্থার সভাপতি। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম চীন ভ্রমণের আমন্ত্রণ পান কিন্তু তা রক্ষা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে হেলসিঙ্কি যাত্রা করেন ও সেই সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়া ভ্রমণ করেন। ঐ বছরেই এপ্রিল মাসে বার্মায় অনুষ্ঠিত নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ঐ বছরের শেষার্ধে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সমাজ সংস্কৃতি শাখার সভাপতিরূপে দেখা যায় এঁকে। ৎসুরিখের আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র সংস্থা বর্তমানে বিশ্বের সংবাদ জগৎ নিয়ে গবেষণায় মত্ত। এঁদের বাৎসরিক সম্মেলনে আমষ্টার্ডামে যুগান্তরের প্রতিনিধিত্ব করলেন বিবেকানন্দ (১৯৫৭ খৃঃ)।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশ্বের দরবারে ভারতীয় সাংবাদিকতার স্থান কোথায়? আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় বিবেকানন্দ উত্তর দেন—কলাকৌশলের দিকে তারা অনেক উন্নত মনীষার ক্ষেত্রে ভারত বিশেষতঃ বাঙ্গালার কাছে তাদের স্থান অনেক নীচে। সাহিত্য ও সাংবাদিকতা এই দ্বিবিধ জীবন বহকাল একযোগে যাপন করে এসেছেন কবি সাংবাদিক বিবেকানন্দ। আমার প্রশ্ন এই যে দুয়ের মধ্যে সংযোগ কতখানি? উত্তর আসে অচ্ছেদ্য। সাহিত্যে রীতিমত দক্ষতা না থাকলে সাংবাদিকতায় সাফল্যলাভ করা যায় না। ইতিহাসে দেখুন যাঁরা সার্থকনামা সম্পাদক তাঁরাই কৃতী সাহিত্যসেবী। তাই সাংবাদিকতার মধ্যেও তাঁদের সেই পরম মোহনীয় শিল্পীমনই বার বার ধরা দেয় এবং যেখানে তা দেয় না সেইখানেই তাঁদের ব্যর্থতা।

ডক্টর শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ]

জীবনের প্রতিষ্ঠাশিখরে যাঁরা আরোহণ করেছেন ইতিহাসের সোপানমালাকে আশ্রয় করে, ইতিহাসের মাধুর্যময় আলোকের ঝরণাধারায় যাঁরা নিজেদের স্নাত করেছেন সর্বতোভাবে, ইতিহাসের বহুমূল্য কোষাগার থেকে মহার্ঘ রত্ন আহরণ করে সেইগুলি দিয়ে যাঁরা ভরিয়ে দিয়েছেন শিক্ষার্থী ছাত্রদের ও শিক্ষার্থিনী ছাত্রীদের, সেই বরণীয় ঐতিহাসিককুলে ডক্টর অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েরও যে একটি বিশেষ আসন আছে সংরক্ষিত, এ অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসচর্চা, সাংবাদিকতা ও শিক্ষাদান এই তিন বিরাট ব্রতের মধ্যে অনিলচন্দ্রের জীবন ও জীবনীর পরিপূর্ণ বিকাশ।

নোয়াখালীর একটি স্কুলের শিক্ষক ৺সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র অনিলচন্দ্র নোয়াখালীতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৮ই অগাষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বালিগাঁও গ্রামে ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়দের আদিনিবাস। আরিয়ল গ্রামের (ঢাকা জেলা) স্বর্ণময়ী হাই স্কুলে অধ্যয়ন করেন অনিলচন্দ্র। নোয়াখালীর অরুণচন্দ্র হাই স্কুল থেকে সরকারী বৃত্তি নিয়ে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। ছাত্রজীবন অনিলচন্দ্রের ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর, কেবলমাত্র সর্বাঙ্গীন সার্থকতা, সাফল্য, বিজয়ের আস্বাদ।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ফেণী কলেজ থেকে আই-এ পাশ করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, বাঙ্গালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে হলেন প্রথম জন। সরকারী বৃত্তি সহ পেলেন বঙ্কিমচন্দ্র পদক ও দ্বিজেন্দ্রলাল বৃত্তি। প্রেসিডেন্সী

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন অনিলচন্দ্র (১৯৩০)। এবারেও সরকারী বৃত্তিলাভ। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর প্রথমজন হয়ে স্বর্ণপদক ও পুরস্কার নিয়ে এম, এ, পরীক্ষাতেও হলেন উত্তীর্ণ। মারাঠার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে মৌয়াট মেডেল ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ লাভ (১৯৪০-৪২)। আসাম ও ব্রহ্মদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ইনি দর্শনশাস্ত্রে 'ডক্টরেট' লাভ করেন। এ ছাড়াও যথা মারাঠার ইতিহাস, রাজপুত ইতিহাস, আসাম ও ব্রহ্মের ইতিহাস, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও আফগান সমস্যার ইতিহাস, ভারতের শাসনতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়সমূহ অবলম্বন করে গবেষণার মধ্যে অনিলচন্দ্র অতিবাহিত করেছেন জীবনের অনেকগুলি দিন।

সিটি কলেজ ও জয়পুরিয়া কলেজে কয়েক বৎসর ইতিহাসের পাঠ দিয়েছেন। ত্রিপুরা জেলার শ্রীকাইল কলেজের অধ্যক্ষও ছিলেন এক বছর। বর্তমানে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষরূপে ইনি সমাসীন (১৯৫৩ থেকে)। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ইতিহাসের অধ্যাপকের আসনও এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকও ছিলেন বছর তিনেক।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত অমৃতবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের আসন অলঙ্কৃত হয়েছে এঁর দ্বারা। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, ফ্যাকাল্টি ও বহু কমিটির ও কয়েকটি স্কুল-কলেজের পরিচালক সমিতির ইনি সভ্য। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সঙ্গে এঁর সম্পর্ক সুনিবিড়। আজীবন সভ্যরূপে কোষাধ্যক্ষরূপে, শাখা সভাপতিরূপে, ঐ কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৯৫৫) অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকরূপে নানা ভাবে ঐ কংগ্রেসকে সেবা করেছেন অনিলচন্দ্র। বর্তমানে ইনি কার্যকরী সমিতির সভ্য ও ঐ কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট ভারত ইতিহাস প্রকাশনী সমিতির সম্পাদক। ভারতীয় সরকারের ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিকাল রেকর্ডস্ কমিশনের ইনি একজন সভ্য। প্রায় পঁচিশখানি গ্রন্থ অনিলচন্দ্র রচনা করেছেন তাদের মধ্যে পেশোয়া প্রথম মাধব রাও, রাজপুত ষ্টাডিস, রাজপুত ষ্টেট্স্ য্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার অফ বৃটীশ ইণ্ডিয়া, য্যানেক্সেসান অফ বর্মা, ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশনাল ডকুমেণ্টস (৩ খণ্ড) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ডক্টর নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের সঙ্গে সহযোগিতায় এঁর লেখা ভারতীয় ইতিহাস রুশ ভাষায় রূপলাভ করেছে। এ ছাড়াও ইতিহাস বিষয়ক বাঙলা ভাষায় ইনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অনিলচন্দ্রের ইতিহাসে অনুরক্তি একারই নয়। এঁর তিন ভাইও ইতিহাসে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এঁর তরুণ পুত্র অমলেন্দুর নামও অনেকের কাছে অজানা নয়। অমলেন্দুর ছাত্রজীবনও যশঃ-সৌরভে ভরপুর। প্রবেশিকায় দ্বিতীয়, আই-এতে প্রথম, অনার্স সহ বি, এতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে তিনিও যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। বর্তমানে ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যালিয়ল কলেজের ছাত্র।

অনেক কৃতী শিক্ষাদাতার সংস্পর্শে এসেছেন অনিলচন্দ্র। তাঁদের মধ্যে কে, জ্যাকেরিয়া, হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর স্মৃতি আজও অনিলচন্দ্রের হৃদয়ে অমলিন। ইংরাজী ভাষাতেও প্রফুল্ল ঘোষ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের (দমদম মতিঝিল কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) শিক্ষাদান পদ্ধতিও অনিলচন্দ্রের অন্তরে স্পর্শ করে। জিজ্ঞেস করেছিলুম যে দীর্ঘ দিন শিক্ষাজগতে অতিবাহিত করে কি অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন—এক কথায় উত্তর দিয়েছিলেন যে পনেরো বছর আগেও যে একাগ্রতা, নিষ্ঠা, সহযোগিতা এ জগতে ছিল আজ তা যেন লোপ পেতে বসেছে। অধ্যক্ষ অনিলচন্দ্রকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব কি জিজ্ঞাসা করি—উত্তর এল—অধ্যক্ষকে ছাত্রদের মনের মধ্যে সর্বাগ্রে ধারণা আনতে হবে যে তিনিও একজন শিক্ষক তবেই তাদের সঙ্গে অন্তরের সংযোগ গড়ে উঠবে, শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা আসবে তাদের তরফ থেকে। অধ্যক্ষ যদি শুধুমাত্র অফিসাররূপেই তাদের সামনে প্রতিভাত হন তবে কিছুতেই তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না। তবে এও ঠিক, অধ্যক্ষকে শুধুমাত্র শিক্ষক হয়ে থাকলেই চলে না, কলেজের নানাবিভাগ নিয়ে তাঁকে মাথা ঘামাতে হয়। এই বিষয়ে পশ্চিম বাঙলার শিক্ষা-জগতের আজকের দিনের একজন বিরাট পুরুষ উক্তি করেছেন "দি প্রিন্সিপালস্ আর সিটিং অন ভলক্যানোস্।" অধ্যক্ষের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীর সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত জিজ্ঞাসা করায় অনিলচন্দ্র বলেন যে—এক প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, তাদের সঙ্গে আলোচনার দ্বারা পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়—কিন্তু সংখ্যাধিক্যের জন্যে সকলের সঙ্গে তা হওয়া অসম্ভব। সেই জন্যে স্বল্পসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী যেখানে সেখানেই অধ্যক্ষের সঙ্গে তাদের নিবিড় সংযোগের পরিপূর্ণ সুযোগ। ঐতিহাসিক অনিলচন্দ্রকে প্রশ্ন করি—আজকের দিনে সারা ভারতবর্ষে ইতিহাস-জগতের স্তম্ভরূপে আপনি কোন্ কোন্ ঐতিহাসিকের নাম করতে চান? অনিলচন্দ্রের অভিমতে আজকের দিনের ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রথম তিনজন হলেন ডাঃ স্যার যদুনাথ সরকার, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ও ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। এ বিষয়ে সবিশেষ লক্ষণীয় যে যে তিনজনের নাম ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকরূপে অনিলচন্দ্র উল্লেখ করলেন, তাঁরা তিনজনেই বাঙালী, বাঙলাদেশের ছেলে। রত্নপ্রসূ বঙ্গজননীর কীর্তিমান সন্তান।

"যে পথেই হ'ক, আর যে ভাবেই হ'ক, দেশ বিভাগ রহিত হতেই হবে; ঐক্যসাধন করতেই হবে এবং ঐক্যলাভ হবেই।"

—শ্রীঅরবিন্দ

উদয়ভানু

মৎস্যকন্যার মত এঁকেবেঁকে সাঁতরে চলেছে অদৃশ্য আনন্দকুমারী।

অফুরন্ত জ্যোৎস্নার আলোয় কখনও দেখা যায় তার শুভ্র দু'খানি হাত, কখনও মাথার কৃষ্ণকেশ, কখনও শাড়ীর আঁচল বা তার বস্ত্রপ্রান্ত। স্বচ্ছ চন্দ্রালোকে ম্যালেট দেখতে পায় ঝাপসা চোখে, তার প্রিয়সঙ্গিনী জলে ভেসে চলেছে। ক্রোধের আতিশয্যে বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়েছে কখন, কিন্তু হাত আর উঠলো না যেন। একটা বুক-জ্বলা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ম্যালেট। সার্টের বোতাম খুলে তপ্ত বুকখানা উন্মুক্ত করলো। চোখের দৃষ্টির দোষ না ভুল দেখছে নিজেই সে বোঝে না। চোখে হাত কচলায়। মাঝির দল চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে। হুকুম পাওয়া মাত্র তারা জলে ঝাঁপ দেবে কিন্তু ম্যালেটের মুখে কোন কথা নেই, স্তব্ধবাক যেন। খাঁচা থেকে পাখী পালিয়েছে, চ'লে গেছে হাতের নাগালের বাইরে। শূন্য বজরাকক্ষের দিকে একবার ব্যর্থ দৃষ্টিতে দেখলো ম্যালেট। তারপর ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে ব'সে পড়লো নিজের জায়গায়। ডিকেন্টারটা হাতে তুলে নিয়ে নিশ্চুপ ব'সে থাকলো কতক্ষণ।

ঘরের খাটো দরজায় দেখা দেয় মাঝি-সর্দার। নিম্নকণ্ঠে বললে,—হুজুর, গোলা-বারুদ আর এতগুলো বন্দুক থাকতে শিকার পালিয়ে যাবে চোখে ধুলো দিয়ে?

ম্যালেট নিরুত্তর। অভিমানে যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। চোখের পলক পড়ছে না। মুখে নিরাশার কালোছায়া ফুটেছে। তবুও অস্ফুট ক্ষীণ হাসলো ম্যালেট। ডিকেন্টার মুখে তুলে ঢকঢকিয়ে পান করলো খানিকটা, তৃষ্ণা মিটাতে। ক্রোধ আর উত্তেজনায় তার কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। মাঝির কথা যেন কানে ওঠে না। ম্যালেট হয়তো জানে, ভালবাসার তত্ত্বে জোর-জুলুম অচল। শক্তির প্রয়োগে দেহ যদিও কারও পাওয়া যায়, ভালবাসার খনি মনটা পাওয়া যায় না। সাহেবের আশার আলো যেন চিরদিনের মত নিবে গেছে। প্রেমের কণ্ঠহার ছিঁড়ে গেল অতর্কিতে।

মাঝি-সর্দার দেখতে পায় তার মনিব পান করছে অতি-মাত্রায়। এই অসংযমের পরিণাম তার অজানা নয়। দেখতে দেখতে এখনই জ্ঞান হারাবে, আর বসতে বা দাঁড়াতে পারবে না! জ্ঞান ফিরতে ফিরতে হয়তো আকাশ ফর্সা হয়ে যাবে।

—হুজুর এত খাবেন না উপরি-উপরি।

মাঝি-সর্দার যেন আর থাকতে পারে না, দেখতে পারে না চোখে। কথাগুলি বলে একান্ত আপন জনের মত।

কি এক আক্রোশে ডিকেন্টার নামিয়ে রেখে উঠে পড়লো ম্যালেট। টলটল পদক্ষেপে ঘরের ইদিক সিদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ হেসে উঠলো সশব্দে। কি যেন খুঁজতে থাকে হাসতে হাসতে। আনন্দকুমারীর পরনের বস্ত্র আর সাজসজ্জার উপকরণ জলে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে। মাঝির দল এই দৃশ্য দেখতে দেখতে অবাক মানে।

—সাহেবের মাথাটা বিগড়ে গেছে না কি? মন্তব্য কাটলো একজন মাঝি।

আরেকজন বললে,—মনে দাগা পেয়েছে, হবেও বা তাই।

কিছুই রাখলো না ম্যালেট। স্মৃতির চিহ্নগুলি একে একে জলে ভাসিয়ে দিয়ে আবার বসলো নিজের জায়গায়। বাদ্যযন্ত্রটা পদাঘাতে একপাশে সরিয়ে দিয়েছে। যন্ত্রটা একবার ঝঙ্কার তুলে ককিয়ে উঠেছে রাত্রির নৈঃশব্দ ভেঙে।

—এক গেছে আর এক আসবে। মাঝি-সর্দার সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে কথা বললে সাহেবকে শুনিয়ে। বললে,—রাঢ়ের দেশে মেয়েমানুষের অভাব হবে না। অমন সুন্দরী ঢের ঢের মিলবে।

নদীর জলে, লম্বমান চন্দ্রালোকছায়ায় দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। ডিকেন্টারটা আবার তুলে নিয়েছে কখন। নদীর জলকল্লোলে বজরা দুলে দুলে উঠছে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে ম্যালেট। রাগের আবেগে তার উন্নতবক্ষ আরও যেন স্ফীত হয়ে উঠছে থেকে থেকে। সর্দার-মাঝির সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই চোখের ইশারায় ডাকলো!

বজরার কক্ষে তৈলদীপ জ্বলছে এককোণে। সাহেবের নীলাভ-চোখের আহ্বান দেখতে পেয়ে কক্ষমধ্যে ঢুকলো মাঝি।

ম্যালেট মৃদু হাসির সঙ্গে বললে,—বজরা চালাও।

—কোথায় যাবে সাহেব এই মাঝরাতে? মাঝি যেন কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সঙ্গে কথা বললো। বললে,—পর্তুগীজদের হাতে পড়লে কেউ বাঁচতে পারবে না। খালের ধারে লুকিয়ে থাকে তারা।

—ভয় নাই কিছু! কেমন যেন অস্বস্তির সঙ্গে বললে ম্যালেট। বললে,—হামাদের বন্দুক আছে। ভয় কেন? নোঙর খুলটে বল'।

অগত্যা মাঝি-সর্দার ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ক্ষুব্ধমনে। এত সাধের বিশ্রাম আর কপালে সহ্য হয় না। সারাদিন হাল টেনে টেনে মাঝির দল ক্লান্ত হয়ে আছে। তোলা-উনুন জ্বেলে ভাত তরকারী চাপিয়েছে। সাহেবের জন্য রান্না চেপেছে।

হাওয়া যেন বিষ ছড়িয়ে দেয় শরীরে। তাই আর এখানে থাকতে চায় না ম্যালেট। যেন শ্বাস রোধ হ'তে থাকে অপমানে আর অভিমানে। রাত্রি কত স্নিগ্ধশান্ত, তবুও উত্তেজনায় কপাল ঘেমে উঠছে। পরাজয় মানতে আপত্তি নেই, কিন্তু ঠকতে রাজী নয় ম্যালেট।

সাঁতারে পাকাপোক্ত চৌধুরাণী। কতদিন পাড়ার সঙ্গিনীদের

সঙ্গে নিয়ে সায়রদীঘি পারাপার করেছে। চৌধুরীমশাইয়ের গৃহলগ্ন সায়রদীঘি যেমন গভীর তেমন বিশাল। একপাল হাঁসের মত আনন্দকুমারীর দল দীঘি তোলপাড় ক'রেছে সকাল সন্ধ্যায়।

বজরা আবার জলে ভাসলো আচমকা ঠেলা খেয়ে। মাঝির দল বিরক্ত হয় মনে মনে, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করে না। যে যার হাল ধরে। মাঝ-গঙ্গার দিকে খানিক এগিয়ে তারপর যেদিকে যেতে হয় যাবে। ম্যালেট চুপচাপ বসে আছে ঘরের এক কোণে। তৈলদীপের আলোয় তার চোখের তারা দু'টি যেন জ্বল-জ্বল করছে। কেউ দেখতে পায় না, তার চোখের প্রান্তে জল টলমল করছে। দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু পড়লো ম্যালেটের বুকে। হারানো বন্ধুর রূপগুণ মনে মনে হয়তো খতিয়ে নেয় সে। চৌধুরাণীর স্মৃতি হয়তো ভুলতে পারছে না। তার রূপের প্রতি লোভ মিটতে না মিটতেই চোখের আড়ালে চ'লে গেছে সে। আর কি দেখতে পাওয়া যাবে তাকে! আনন্দকুমারীর কুসুম কোমল দেহের স্পর্শ এখনও যেন অনুভব করা যায়। ম্যালেট ভাবছে, কুসুমের মত যে এতই মৃদু, সে কেন এমন বজ্রের মত কঠিন হবে!

—কোন দিকে যাবো হুজুর? উত্তরে না দক্ষিণে?

মাঝি-সর্দার নৌকার একমুখ থেকে সজোরে কণ্ঠ ছাড়লো। শন-শন বাতাস চলেছে মধ্য-গঙ্গায়, কথা শোনা যায় কি না যায় তাই কথার সুর জোরালো।

ইষ্টওয়ার্ড হো! ওয়েষ্টওয়ার্ড হো!

ম্যালেটের নিজের দেশের মাঝিদের কথা মনে পড়ে। মনটা যেন ফাঁকা হয়ে আছে তার। টেমস নদীর বাঁধাঘাট ভেসে উঠছে তার নেশাচ্ছন্ন চোখে। সার্টের বোতাম ক'টা একে একে আঁটতে থাকে। ঠাণ্ডা বাতাস চলেছে সবেগে, এলোমেলো দিকভোলা হাওয়া। আকাশে চোখ তুললো ম্যালেট, দেখলো পূর্ণাবয়ব চাঁদ। নিরেট সোনার থালা যেন একটি, প্রায় পরিপূর্ণ গোলাকার। আকাশের চাঁদ যেন বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে বজরার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ মুখে। অধিকক্ষণ যেন দেখতে পারে না ঐ চলমান চাঁদকে। তার ব্যঙ্গ হাসি যেন চোখে দেখা যায় না, চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়। ডিকেণ্টার আবার মুখে তুলতে যাবে, হঠাৎ যেন ঘরের ফরাসে চোখ পড়তেই একটু খুশীর হাসি ফুটলো লাল ঠোঁটের ফাঁকে। নজর পড়তেই নিজের হাতে তুলে নিলো ম্যালেট, কয়েকটা শজারু-কাঁটা। আনন্দকুমারীর কবরীবন্ধনের কাঁটা।

সামান্য মাথার কাঁটা ক'টায় বার বার চুমা খায় ম্যালেট। আলোয় ধ'রে দেখে। শেষে অতি যত্নে কাঁটাগুলি জামার বুক-পকেটে রেখে দেয়। মুখের হাসি মিলিয়ে যায় আবার। কাঠিন্য ফোটে মুখে, ঈষৎ জলসিক্ত চোখের নীলাভ তারায়।

নৌকার এক শেষে মাঝি-সর্দারের হাতে জ্বলন্ত হুঁকা। বজরা মধ্যগাঙে ভাসিয়ে দিয়ে তামাক খেতে ব'সেছে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না থৈ থৈ করছে নদীর জলে। সবই যেন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, এমন কি গঙ্গার দুই তীর—ঘন জঙ্গল। কোথাও কোথাও বাঁধানো ঘাট, চণ্ডীমণ্ডপ, শিবমন্দির। দেবদেউলে দীপ জ্বলছে আকাশের একলা তারার মত। মাঝি-সর্দার ঘাড় ফিরিয়ে বসেছে, হুঁকা টানছে আর দেখছে পেছনে-ফেলে-আসা তীরে বাঁধা চিত্রবিচিত্রিত বজরাখানি। বিরাট বজরার ছাদে মশাল জ্বলছে। মশালের আকাশমুখী লেলিহান শিখাটিতে যেন নর্ত্তকীর দেহভঙ্গিমা। বাতাস চলেছে, তাই নেচে চলেছে মশালের আগুন। বজরার পাটাতনে বন্দুকধারী সিপাই পায়চারী করছে।

সার্টের আস্তিনে চোখ মুছে নেয় ম্যালেট। লক্ষ্যহীন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে! নিজের মনে বিড় বিড় ব'কে চলেছে জানলায় মাথা হেলিয়ে। কবিতা বলছে ম্যালেট। একটি বিদেশী গান আওড়ে চলেছে! গানটি খুবই করুণ, বিচ্ছেদের সুর ছত্রে ছত্রে! ফল্‌কুয়েট এর লেখা গানটি:

"But if you wish me to turn elsewhere
Part from you the beauty and the sweet
laughter,
And the grey pleasure, that had sent mad
my wit;
Since, as I ween, I must part me from you,
Every day are you more fair and pleasant
to me,
Wherefore I wish ill to the eyes that behold
you
Because they can never see you to my good,
But to my ill they see you subtly
(or speedily)".

জ্যোৎস্না রজনীর গভীর গাম্ভীর্য্য নেই! অফুরন্ত যৌবন-সম্ভার, যার কালাকাল নিরূপণ হয় না। পূর্ণযৌবনার মত সময়ের হিসাব ভুলিয়ে দেয়। আনন্দকুমারী তীরের নিকটে এসে চারিদিকে চক্ষু ঘুরিয়ে দেখলো অস্পষ্ট দৃষ্টিতে। জ্যোৎস্নার জোয়ার তার চোখে। বোঝে না রাত্রি এখন গম্ভীর। অবিরাম সন্তরণের ক্লান্তিতে হাঁফ ধরেছে, তদুপরি বুকে পলাতকার ভয়-শিহর। এক বসনে সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে চৌধুরাণী। এখন কে বলবে, পথ কোথায়? মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করবে কে? কে দেখাবে জীবনের আলো?

গঙ্গার তীরে জঙ্গলের অন্ধকারময় কায়া। দেখলে ভয় হয়। অসংখ্য খদ্যোত জ্বলছে গাছের শাখায় শাখায়। পিশাচ আর পিশাচীরা যেন হাসাহাসি করছে। তীরে উঠে দেহের সিক্ত বাস ঠিকঠাক করে আনন্দকুমারী। শ্বাসকষ্ট হয় হয়তো, বক্ষ ঘন ঘন ওঠানামা করে।

মশালের আলো ছড়িয়েছে তীরে। আনন্দকুমারীর সিক্তবসনে। মৎস্যকন্যাকে দেখতে পেয়েছে বজরার মাঝিরা। সত্যি না মিথ্যা দেখছে, ঠাওরাতে পারছে না।

আনন্দকুমারী ছুটলো বুকের আঁচল সামলে। মৃত্যুভয়ে ভীতা যেন সে। এত ক্লান্ত, তবুও উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো বজরার দিকে। জানে না, এক খাঁচা থেকে আর এক খাঁচায় বন্দী হবে কি না।

[৫৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ছবি পাঠানোর সময় ছবির পেছনে নাম, ধাম ও
বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না]

প্রতীক্ষা
—রথীন রায়

নর্ত্তকী
—রতন দাশগুপ্ত

রিক্সাওয়ালা —বিবেকজ্যোতি মিত্র

সাথীহারা —এন. কে. মিত্র

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা —সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য

জলসা —মাধুরী চট্টোপাধ্যায়

স্ফূর্ত্তি
—গোপাল ঘোষ

বিবিসাহেবা —ষ্টুডিও সাংরিলা
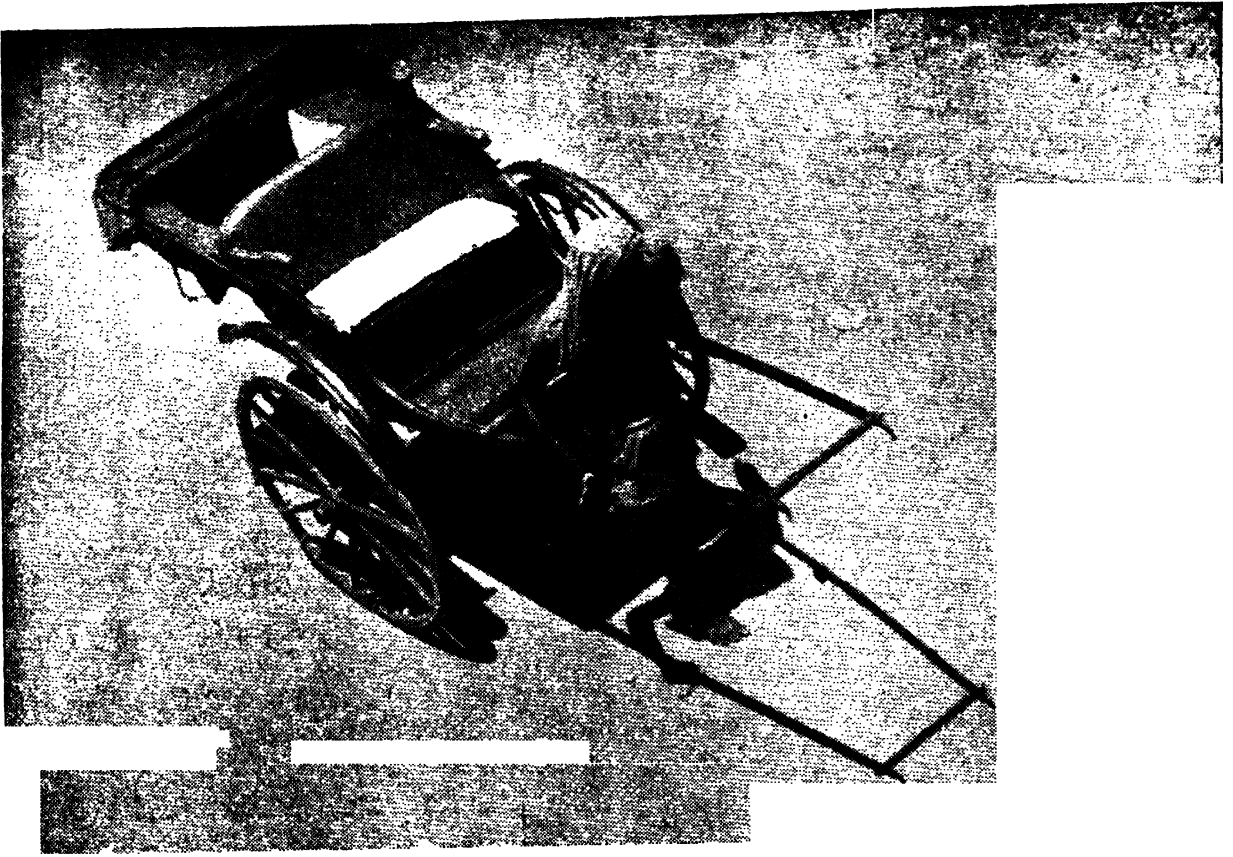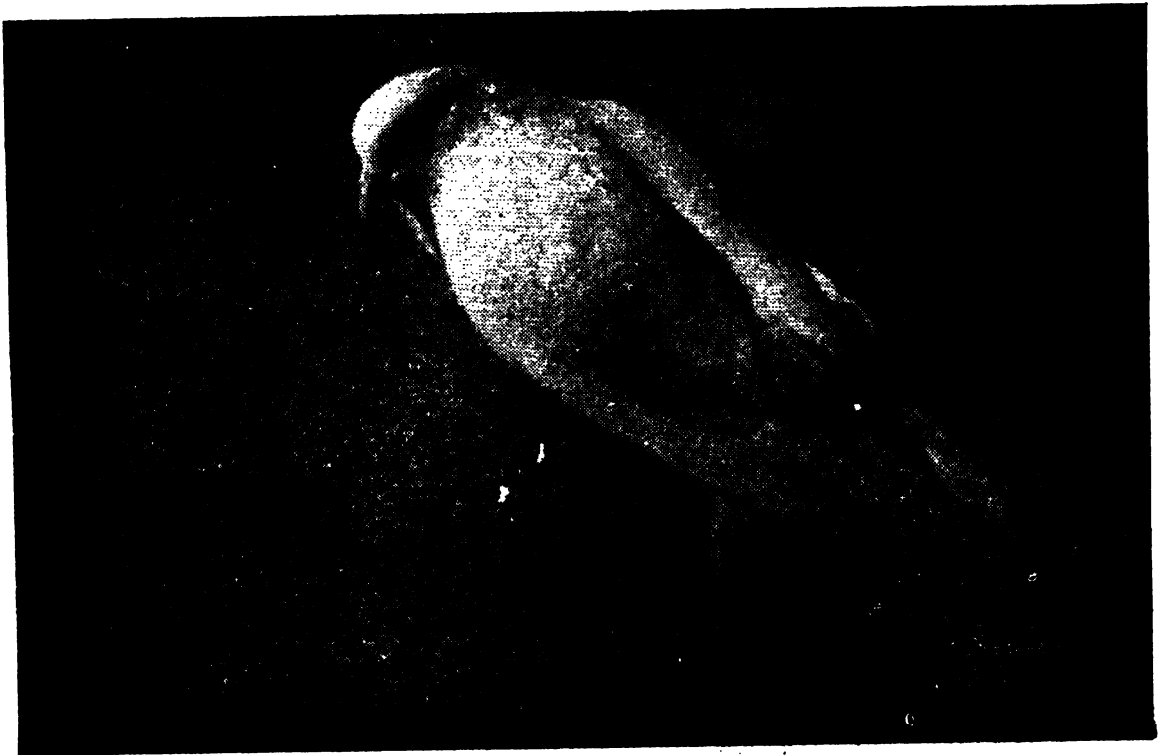
হঠাৎ সেদিন দেখলাম, এক কর্মরত কুম্ভকার
করছে চূর্ণ মাটির ঢেলা ঘট তৈরীর থাল দেদার।
দিব্য দৃষ্টি দিয়ে এ সব যেই দেখলাম, কইল মন,
নূতন ঘট এ করছে সৃজন মাটিতে মোর বাপদাদার।

আমার সাথী সাকী জানে মানুষ আমি কোন জাতের,
চাবি আছে তার আঁচলে আমার বুকের সুখ দুখের।
যেমনি মেজাজ মিইয়ে আসে গেলাস ভ'রে দেয় সে মদ
এক লহমায় বদলে গিয়ে দূত হয়ে যাই দেবলোকের।

মউজ চলুক! লেখার যা তা লিখল ভাগ্যে কাল্‌কে তোর
ভুলেও কেহ পুছল না কি থাকতে পারে তোর ওজর!
ভদ্রতারও অনুমতি কেউ নিল না, অমনি ব্যস
ঠিকঠাক সব হয়ে গেল ভুগবি কেমন জীবন-ভোর!

সুরার সোরাহি এই মানুষ, আত্মা শরাব তার ভিতর,
দেহ তাহার বাঁশরী আর তেজ যেন সেই বাঁশীর স্বর।
খৈয়াম! তুই জানিস কি এই মাটির মানুষ
কোন জিনিস?
খেয়াল-খুশীর ফানুস এ ভাই, ভিতরে তার প্রদীপ কর।

আমি চাহি—স্রষ্টা আবার সৃজন করুন শ্রেষ্ঠতর
আকাশ ভুবন এই এখনই, এই সে আমার আঁখির পর।
সেই সাথে চাই সৃষ্টিখাতায় দিক কেটে সে আমার নাম,
কিংবা আমার যা প্রয়োজন তা মিটাবার দিক সে বর।

তোমার দয়ার পিয়ালা প্রভু উপচে পড়ুক আমার পর,
নিত্য ক্ষুধার অন্ন পেতে না যেন হয় পাততে কর।
তোমার মদে মস্ত্‌ কর, আমার 'আমি'র পাই সীমা,
দুঃখে যেন শির না দুখায়, হে দুখ-হরণ অতঃপর।

ওমর রে, তোর জ্বলছে হৃদয় হয়ত নরকেই জ্বলি,'
তাহার বহ্নি-মহোৎসবে হয়ত হবি অঞ্জলি!
খোদায় দয়া শিখাতে যাস সেই সে তুই, কি দুঃসাহস!
তুই শিখাবার কে, তাঁহারে শিখাতে যাস কি বলি?

দোহাই! ঘৃণায় ফিরিয়ো না মুখ
দেখে শরাব-খোর গোঁয়ার,
যদিও সাধু সজ্জনেরই সঙ্গে কাটে কাল তোমার।
শরাব পিও, কারণ শরাব পান কর আর না-ই কর,
ভাগ্যে ধার্য থাকলে নরক যায় না পাওয়া স্বর্গ আর।
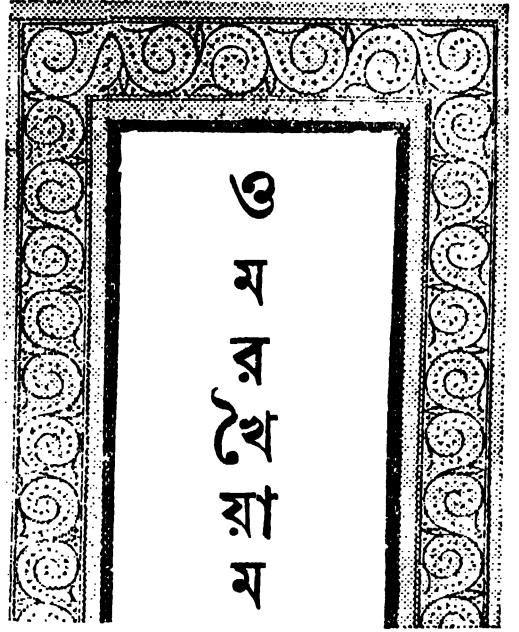
(অপ্রকাশিত)

কাজী নজরুল ইসলাম

খ্যাতির মুকুট পরলে হেথায় নিন্দা-গ্লানির পাঁক হানে,
বলবে ষড়যন্ত্রকারী রোস যদি গোরস্থানে।
'খিজির' হও আর 'ইলিয়াস' হও;
সব-সে-আচ্ছা এই ধরায়
জানতে চাস নে কারেও তুই আর তোরেও
কেহ না জানে।

শরাব এবং প্রিয়ায় নিয়ে, সাকী, হেথায় এলাম ফের।
তৌবা ক'রেও পাইনে রেহাই হাত হ'তে
ভাই এই পাপের।
'নূহ' আর তাঁর প্লাবন-কথা শুনিয়ো নাকো আর, সাকী,
তার চেয়ে মদ-প্লাবন এনে ডুবাও ব্যথা মোর বুকের।

যেমনি পাবি মণ দুই মদ—যেখানে হোক যদিই পা'স
অমনি পানোন্মত্ত ওরে, সে মদস্রোতে ডুবে যাস!
যেমনি খাওয়া অমনি হ'বি আমার মত মুক্ত প্রাণ,
ভেসে যাবে রাশ-ভারি তোর ঋষির মত দাড়ি রাশ।

যতক্ষণ এ হাতের কাছে আছে অঢেল লাল শরাব
গেহুঁর রুটি, গরম গরম মটন চপ ও এই কাবাব,
আর লালারুখ্‌ প্রিয়া আমার কুটীর-শয়ন-সঙ্গিনী,
কোথায় লাগে শাহান শাহের দৌলত ঐ বে-হিসাব।

এই নেহারি-নিবিড় মেঘে মগ্ন আছে মুখ তোমার,
একটু পরেই ঠিকরে পড়ে ভুবন-মোহন দীপ্তি তার।
মহলা দাও নিজ মহিমার নিজের কাছেই, হে বিরাট,
স্রষ্টা তুমি, দৃশ্য তুমি তোমার অভিনয় লীলার।

মরুর বুকে বসাও মেলা, উপনিবেশ আনন্দের,
একটি হৃদয় খুশী করা তাহার চেয়ে মহৎ ঢের।
প্রেমের শিকল পরিয়ে যদি বাঁধতে পার একটি প্রাণ
হাজার বন্দী মুক্ত করার চেয়েও অধিক পুণ্য এর।

পানোন্মত্ত বারাঙ্গনায় দেখে সে এক শেখজী কন—
'দুরাচার আর সুরার কর দাসীপণা সর্বখন।'
'আমায় দেখে যা মনে হয়, তাই আমি', কয় বারনারী,
'কিন্তু শেখজী, তুমি কি তাই,
তোমায় দেখে কয় যা মন'?

চূর্ণ ক'রে তোমায় আমায় গড়বে কুঁজো কুম্ভকার,
ওগো প্রিয়া! পার হবার সে আগেই মৃত্যু-
খিড়কি-দ্বার—
পাত্রে ব্যথার শান্তি ঢালো—এই সোরাহির লাল সুরা,
এক পেয়ালা তুমি পিও, আমায় দিও পেয়ালা আর।

রূপ-মাধুরীর মাথায় তোমার য'দিন পারলো প্রিয়া,
তোমার প্রেমিক বঁধুর ব্যথা হরণ কর প্রেম দিয়া!

রূপ-লাবণীর সম্ভার এই রইবে না সে চিরকাল,
ফিরবে না আর তোমার কাছে যায় যদি বিদায় নিয়া।

মৃত্তিকা-লীন হবার আগে নিয়তির নিঠুর করে
বেঁচে নে তুই, মৃত্যু-পাত্র আসছে রে ঐ তোর তরে।
হেথায় কিছু যোগাড় ক'রে নে রে,
হোথায় কেউ সে নাই,
তাদের তরে—শূন্য হাতে যায় যাহারা সেই ঘরে।

আঁধার অন্তরীক্ষে বুনে যখন রূপার পা'ড় প্রভাত
পাখীর বিলাপ ধ্বনি কেন শুনি তখন অকস্মাৎ?
তারা যেন দেখতে বলে উজল প্রাতের আর্শিতে—
ছন্নছাড়া তোর জীবনের কাটল কেমন একটি রাত!

আমার কাছে শোন উপদেশ—কাউকে কভু বলিস নে
মিথ্যা ধরায় কাউকে প্রাণের বন্ধু মেনে চলিস নে।
দুঃখ-ব্যথায় টলিস নে তুই, খুঁজিস নে তার প্রতিষেধ,
চাসনে ব্যথার সমব্যথী, শির উঁচু রাখ, ঢলিস নে!

নাস্তিক আর কাফের বলি তোমরা লয়ে আমার নাম
কুৎসা গ্লানির পঙ্কিল স্রোত বহাও হেথা অবিশ্রাম।
অস্বীকার তা করব না যা ভুল ক'রে যাই, কিন্তু ভাই,
কুৎসিত এই গালি দিয়েই তোমরা যাবে স্বর্গধাম?

মুক্তির সাধনা

.........."বন্দীদশা শুধু তো কারাপ্রাচীরের মধ্যে নয়। মানুষের অধিকার সংক্ষেপ করাই তো বন্ধন। সম্মানের খর্বতার মতো কারাগার তো নেই। ভারতবর্ষের সেই সামাজিক কারাগারকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেছি। এই বন্দীর দেশে আমরা মুক্তি পাবো কি করে? যারা মুক্তি দেয়, তারাই তো মুক্ত হয়।

ভারতবর্ষ আজ মুক্তির সাধনায় জেগে উঠল। পণ করলাম, চিরদিন বিদেশী শাসনে মনুষ্যকে পঙ্গু করে রাখার এ ব্যবস্থা আর স্বীকার করব না। বিধাতা ঠিক সেই সময়ে দেখিয়ে দিলেন, কোথায় আমাদের পরাভবের অন্ধকার গহ্বরগুলো। আজ ভারতে যাঁরা মুক্তিসাধনার তাপস, তাঁদের সাধনা বাধা পেল তাদেরই কাছ থেকে, যাদের আমরা অকিঞ্চিৎকর করে রেখেছি। যারা ছোট হয়ে ছিল, তারাই আজ বড়োকে করেচে অকৃতার্থ। তুচ্ছ বলে যাদের আমরা মেরেচি, তারাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মার মারচে।"

—রবীন্দ্রনাথ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পিতামহ দ্বারকানাথ

১২০১ সালে ১৭৯৪ খৃঃ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম। নরেন্দ্রপুর যশোহর নিবাসী রামতনু রায়চৌধুরীর কন্যা দিগম্বরী দেবীর সহিত দ্বারকানাথের বিবাহ হয়। দ্বারকানাথের পাঁচ পুত্র: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্র (৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু), গিরীন্দ্রনাথ (৩৫ বৎসরে মৃত্যু), ভূপেন্দ্র (১৩ বৎসরে মৃত্যু) ও নগেন্দ্রনাথ (নিঃসন্তান, ২১ বৎসরে মৃত্যু)। ১৭৮৪ খৃঃ নীলমণি তদীয় অনুজ দর্পনারায়ণের সহিত পাথুরেঘাটা দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটের প্রাচীন বাস্তু হইতে পৃথক হইয়া জোড়াসাঁকোয় (পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন) বাস্তু পত্তন করিয়াছিলেন এবং বাড়ীতে সমারোহে দুর্গোৎসব, শ্যামা, জগদ্ধাত্রী ও সরস্বতীপূজার প্রবর্তন করেন এবং গৃহদেবতা শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীজনার্দন জিউর প্রতিষ্ঠা করেন। যে শালগ্রাম শিলা আজও অবনীন্দ্রনাথের গৃহে পূজিত হইতেছেন। জোড়াসাঁকোর (পরে ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন) এই বাড়ীকে পারিবারিক চলতি কথায় 'বড়বাড়ী' বলা হয় এবং পার্শ্বস্থ যে বাড়ীতে দ্বারকানাথের তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে বাস করিতেন ও যাহা ৫ সংখ্যক ভবন, সম্প্রতি বিক্রীত হইয়া গিয়াছে, যাহা দ্বারকানাথ নির্মাণ করান ও যাহা তাঁহার বৈঠকখানা বাড়ী ছিল, তাহাকে চলতি ব্যবহারে আত্মীয়রা 'বৈঠকখানা বাড়ী' বলিয়া অভিহিত করিতেন। মহর্ষি ও তাঁহার ভ্রাতা গিরীন্দ্র-পরিবারে এরূপ একাত্মতা ছিল যে স্বপ্নপ্রয়াণে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

ভাতে যথা সত্য হেম মাতে যথা বীর
গুণজ্যোতি হরে যথা মনের তিমির
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি
সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি।

ইহার দার্শনিক ব্যাখ্যা ছাড়াও অপর ব্যাখ্যাটিতে পাই সহোদর সত্যেন্দ্র, হেমেন্দ্র, বীরেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র, সোমেন্দ্র ও রবীন্দ্রের নামের সহিত ও পিতা দেবেন্দ্রনাথের নিকেতনের উল্লেখের সহিত পিতৃব্য পুত্র গুণেন্দ্রেরও নামোল্লেখ। •

দ্বারকানাথ স্বীয় বুদ্ধিবলে কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া, ব্যাংক পরিচালনায় ও বহুবিধ ব্যবসায়ে প্রভূত ধনশালী হন ও তৎকালীন কলিকাতার একজন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাবান নাগরিক ছিলেন। মাতৃভাষা বাঙলা ও জনৈক মুন্সির নিকট তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন এবং চিৎপুর রোডে শেরবোর্ণের স্কুলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি তাঁহার পিতৃব্য রামলোচন কর্তৃক দত্তক গৃহীত হইয়াছিলেন এবং অল্পবয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। যুগপুরুষ রাজা রামমোহন রায় তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। দ্বারকানাথ লবণ-এজেন্টের দেওয়ান ও পরে কাষ্টমসের ঐ পদে নিযুক্ত হন! সতীদাহ প্রথা রহিত করিবার আন্দোলনে তিনি রামমোহনকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। ১৮৩৪ সালে তিনি উপরোক্ত সরকারী দেওয়ানের পদ ত্যাগ করেন ও Carr Tagore & Co প্রতিষ্ঠা করিয়া রাণীগঞ্জে কয়লার খনি, রামনগরে চিনির কল ও শিলাইদহে ও বঙ্গদেশের অপর কয়েক স্থানে অপর কয়েকটি ফ্যাকটারি পরিচালনা করেন। তন্মধ্যে কয়েকটিতে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁহার বৈমাত্রেয় অনুজ রমানাথ ঠাকুর (পরে মহারাজা)। দ্বারকানাথ ইউনিয়ান ব্যাংকেরও অন্যতম ডিরেক্টার ছিলেন ও উক্ত পদে ইস্তফা দিয়া পরবর্তী দশ বৎসর জন-আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে, ব্লাক য়্যাক্টের বিরোধিতায় দ্বারকানাথের অবদান সামান্য নহে। তাঁহার বেলগাছিয়ার উদ্যানে তৎকালীন জ্ঞানীগুণীদের তিনি প্রায়ই সম্বর্ধনা করিতেন। এই উদ্যান পরে মহর্ষি Carr Tagore Co. উঠিয়া যাওয়াতে বিক্রয় করিয়া দেন পাইকপাড়ার রাজাকে, যাহা এখনো তাঁহাদের বংশধরদের অধিকারে আছে। দ্বারকানাথ প্রথম ভারতীয় Justice of the Peace ও পরে এই পদ তাঁহার দুই ভাগিনেয় মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই প্রাপ্ত হন। দ্বারকানাথ দুই বার বিলাত গিয়াছিলেন ও তথায় নানা প্রতিষ্ঠানাদিতে মুক্তহস্তে দান করায় ও দেশে অবস্থানকালে যেরূপ নানা উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিতেন সেরূপ তথায়ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান করায় তাঁহাকে সে দেশের অভিজাত সমাজ "প্রিন্স" বা যুবরাজ বলিতেন। তিনি মহিমান্বিত মর্যাদায় সে দেশে অবস্থান করিতেন ও তত্রস্থ রাজা রাণী, ডিউকগণ ও তাঁহাদের পরিবারবৃন্দ প্রভৃতির সহিত এবং ইতালি, স্পেন প্রভৃতি দেশে অবস্থানকালে তথাকারও রাজা, রাণীদের সহিত একত্রে আহারাদিতে প্রায়ই মিলিত হইতেন। তাঁহার দুইবার ইয়োরোপ যাত্রায় একবার তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও একবার তাঁহার কনিষ্ঠ ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। দ্বারকানাথ প্রথম বার বিলাত যান ১৮৪২এর জানুয়ারিতে ও দ্বিতীয়বার বা শেষবার ১৮৪৫এর মার্চে এবং তথায় বৎসরাধিক কাল অবস্থান করিবার পর ১৮৪৬এর ১লা অগাষ্ট ইংল্যাণ্ডেই দেহরক্ষা করেন।

পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১২৪০ সালের ফাল্গুন মাসে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে যশোহরের (পরে খুলনা জেলার) অন্তর্গত দক্ষিণডিহি গ্রামের রামনারায়ণ রায়-চৌধুরীর কন্যা শাকম্ভরী বা সারদা দেবীকে দেবেন্দ্রনাথ বিবাহ করেন। সারদা দেবীর ১২৩২ সালে জন্ম ও ১২৮১ সালে লোকান্তর ঘটে। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ৺অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রণীত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ১১৩ পৃষ্ঠায় আছে যে মহর্ষি তাঁহার পত্নীবিয়োগ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন তাঁহার বিবাহকালে নববধূর বয়স ছয় বৎসর ছিল। অল্প বয়সে পরিণয় হইলেও বয়স সম্বন্ধে কিছু ভুল আছে। আমরা মহর্ষিদেবের পিসতুতো ভগিনী কাদীদাসী দেবীর মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহার ভ্রাতৃজায়া তাঁহার সমবয়সী ছিলেন এবং তাঁহার নিজের বিবাহ মহর্ষির বিবাহের এক বৎসর পরে হয়, তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর। বিবাহ পর্যন্ত তিনি তাঁহার মাতামহ রামমণি ঠাকুরের পরিবারভুক্ত হইয়া মহর্ষির সহিত এক বাড়িতে বাস করিতেন। সুতরাং কবি-জননীর বিবাহকালীন বয়স ছিল আট, মহর্ষির তখন সতের।

আমাদের প্রপিতামহ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের খরচের খাতাও ইহাও পোষকতা করে। তাঁহার সম্বন্ধে উল্লেখ 'মহর্ষির আত্মজীবনীতে' আছে। মদনমোহন তাঁহার মেজ পিসীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তাঁহার অপেক্ষা বারো বৎসরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন। মদনমোহন নিজের উপার্জনের যে স্বতন্ত্র হিসাব রাখিতেন তাহাতে দেখা যায় লৌকিকতা হিসাবে মাতাঠাকুরাণী দেবেন্দ্রের বধূকে আশীর্বাদের যৌতুক দেন ২৪এ ফাল্গুন ১২৪০ ইং ১৮৩৪ ও পরে ৫ই আশ্বিন ১২৪৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ দেবেন্দ্রের বধূর সাধের জন্য মিঠাই প্রস্তুত হয়।

মহর্ষির প্রথম সন্তান কন্যার জন্ম ১৮৩৮ খৃঃ (অকালে মৃত), প্রথম পুত্র দার্শনিক ও কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ জন্ম বুধবার ২৭এ চৈত্র ১২৪৬ ইং ৮ই এপ্রিল ১৮৪০, দ্বিতীয় পুত্র প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান লেখক সত্যেন্দ্রনাথ জন্ম ১৮৪২, তৃতীয় পুত্র ব্যায়ামবীর হেমেন্দ্রনাথ, তৎপরে জন্মগ্রহণ করেন অন্যান্য পুত্রকন্যাগণ বীরেন্দ্র, সৌদামিনী, সংগীত ও সাহিত্যশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সুকুমারী, পুণ্যেন্দ্র (অকালে মৃত), শরৎকুমারী, সাহিত্যসম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী, বর্ণকুমারী, সোমেন্দ্রনাথ (চিরকুমার), অষ্টমপুত্র রবীন্দ্রনাথ ও বুধেন্দ্রনাথ (অকালে মৃত)।

উপরোক্ত সুকুমারী দেবীর সহিত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহের অনুষ্ঠানের একটি ইংরাজি অনুবাদ চার্লস্ ডিকেনস্ সম্পাদিত "All The Year Round" পত্রিকায় ৫ই এপ্রিল ১৮৬২ তারিখে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক জগদ্দলনিবাসী ঠাকুর বংশের আত্মীয় ও শিল্পী অসিতকুমার হালদারের পিতামহ রাখালদাস হালদার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহাই এই পরিবারে প্রথম ব্রাহ্মমতে বিবাহ। মহর্ষি ইতিপূর্বেই আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রমুখ চারিজন ব্রাহ্মণকে কাশীতে পাঠাইয়া [illegible] তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে বৃত হন। মহর্ষি উপাসনায় বেদগান অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। সমাজে দেশীয় সংগীত-যন্ত্রের সহিত উপাসনাকালে বিষ্ণু চক্রবর্তীর গান হইত। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণান্তে মহর্ষি প্রত্যূষে সপরিবারে শয্যা ত্যাগ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পট্টবস্ত্রপরিহিত হইয়া দালানে একত্র হইতেন। মহর্ষি সস্ত্রীক বেদীতে বসিতেন এবং পুরুষেরা এক পার্শ্বে ও মহিলারা অপর পার্শ্বে বসিয়া উপসনায় যোগ দিতেন। দৈনিক উপাসনায় মহর্ষির বৈদিকমন্ত্র প্রধান অবলম্বন ছিল। তৎপরে ব্রহ্মসংগীত গীত হইত। ব্রহ্ম সংগীত রচনা তিনি নিজে তো করিতেনই, দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথও রচনা করিতেন। পূর্বে প্রাচীনপন্থী ভারতীয় সংগীতবিদেরা হারমোনিয়ামকে সুনজরে দেখিতেন না। মহর্ষির নির্দেশে দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম সংগীতে হারমোনিয়ামের সঙ্গত প্রচলন করিবার চেষ্টা করিয়া কথঞ্চিৎ সফলকাম হন। পরে প্রথম ভারতীয় ডক্টর অফ মিউজিক সংগীতনায়ক রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রমোদকুমারের ঐকান্তিক চেষ্টায় বাঙলা গানে হারমোনিয়াম (তখন হারমণি ফ্লুট বলা হইত) যন্ত্রের ব্যবহার বহুল প্রচার লাভ করে ও সাধারণে প্রচলিত হয়।

ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষায় গায়ত্রী মন্ত্র একমনে জপ ও ধ্যান-ধারণার সাহায্যে সাধনা করিতে মহর্ষি উপদেশ দিতেন। তাঁহার গায়ত্রীতে দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা আজীবন ছিল। পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম ধর্মের বীজ চতুষ্টয়ও আবিষ্কৃত হয় ও তদ্দারা দীক্ষাপ্রথা চলিল। 'রুদ্রং যত্তে দক্ষিণং মুখং, তেন মাং পাহি নিত্যং' মন্ত্র লইয়া প্রার্থনাস্বরূপ পঠিত হইতে লাগিল ও সব শেষে 'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ' বলিয়া উপাসনা সমাপ্ত হইত।

উপাসকের মমত্ববোধই তাহার রক্ষাকবচ। বিশ্বজননী জগৎ-মঙ্গলকার্যে যতই ব্যাপৃত থাকুন না কেন, আমার তিনি ভিন্ন কেহ নাই!

> দদাসি দুঃখম্ যদি কালী নিত্যম্,
> ত্যজামি নাহং তব পাদপদ্মম্।
> সন্তাড়িতাশ্চেচ্ছিশবো জনন্যা,
> অঙ্কং জনন্যা হি সমাশ্রয়ন্তি।
>
> —মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

ভগবৎবিশ্বাস ছাড়াও মহর্ষির চারিত্রিক অসংখ্য গুণের মধ্যে একটির উল্লেখ এখানে করিতেছি—যাহাতে তাঁহার বিরাট হৃদয়ের ও মানসিক শক্তির পরিচয় মিলিবে। যদিও এ-ঘটনা অনেকেরই বিদিত তথাপি লিখিলাম। প্রভূত ধনশালী পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর জানা যায় যে তাঁহার শেষ জীবনে বিদেশে অবস্থান করায় দেশে ব্যবসায়িক আয়-আদায়ের চেষ্টা না হওয়ায় বহু টাকা ঋণ হয় ও তাহা শোধের পরিবর্তে অনেকে মহর্ষিকে সম্পত্তি বেনামী করিতে বলেন কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতো মহর্ষি তাহা না করিয়া পাওনাদারদের বলেন যে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহারা পরিচালনাধীনে লইয়া বিক্রয় করা প্রয়োজন হইলে তাহা করিয়া মহর্ষিকে যেন পিতৃঋণমুক্ত করেন। তাঁহার এই মহানুভবতায় পাওনাদারেরা মুগ্ধ হইয়া তাহা না করিয়া কিয়দংশ বিক্রয়ের প্রস্তাব করিয়া ও কিস্তিবন্দীতে ঋণ শোধ করিতে বলেন ও ধীরে ধীরে ঋণ শোধ হইয়া যায়।

১৮৫৬ হইতে ১৮৬৫ পর্যন্ত একটা যুগসন্ধি। বাঙলাদেশে সমাজে এবং সাহিত্যে নানা পরিবর্তন দেখা যায়। ১৮৫৪ সালে লর্ড ড্যালহাউসির প্রস্তাবে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্তা (Lieutanant Governor) নিযুক্ত হইলেন। ইঁহাকে ছোটলাট এবং গভর্ণার জেনারেলকে সেই সময় হইতে বড়লাট বলা হইত। সার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বাঙলার প্রথম ছোটলাট। ইহার পূর্বে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা সংক্রান্ত সমস্ত রাষ্ট্রীয় কার্য গভর্ণর-জেনারেলের তত্ত্বাবধানে নিজস্ব বিভাগে সম্পাদিত হইত, একজন ডেপুটি গভর্ণর তাঁহার উপদেশ মতো তাঁহার কার্যে সহায়তা করিতেন। ড্যালহাউসি দেখিলেন সর্তবিধ কার্য সুসম্পন্ন হইতেছে না। একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা যেভাবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া এই প্রদেশের শৃঙ্খলা ও সর্ববিধ উন্নতির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন তাহা অল্প-অবসর বড়লাটের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তিনি বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে এ বিষয়ে সমস্ত অবস্থা বিশদভাবে জানাইলেন। ফলে ১৮৫৩ সালে চার্টার রিনিউএর সময় তাঁহার প্রস্তাবিত ছোটলাট নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইল ও স্থির হইল যে তিনি স্বতন্ত্র ভাবে নিজের দায়িত্বে কার্য করিতে পারিবেন, কেবল কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় বড়লাটের অনুমোদন-সাপেক্ষ রহিল।

সদ্য-বিধবার মৃত্যু নিবারণের জন্য রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের আপ্রাণ চেষ্টায় ১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক আইন করিয়া সতীদাহ প্রথা রহিত করেন। ইহার প্রায় ২০।২২ বর্ষ পরে বিধবার দুঃখময় জীবন দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বিশেষ ব্যথিত করে। তিনি বিধবা বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ করিলেন ও ইহার সিদ্ধতা শাস্ত্রীয় বচনে প্রমাণ করিলেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ কয়েকজন দেশের নেতৃবৃন্দ তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। গোঁড়া সমাজের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও সরকার বিধবা বিবাহ আইন প্রচারে ঘোষণা করিলেন যে হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ করিলে সে বিবাহ বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে কিন্তু তাহার পূর্ব স্বামীর সম্পত্তিতে কোনোরূপ দাবীদাওয়া থাকিবে না। ১৮৫৬ সালে Hindu Widow Remarriage Act আইন প্রচারিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত দ্বিতীয় সমাজ সংস্কারের আন্দোলন বহুবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে কোনোরূপ আইন করা সরকার আবশ্যক বোধ করিলেন না। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হওয়ায় তাহা আপনা হইতে রহিত হইয়া গিয়াছে।

এই সময়ে কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন প্রস্তুত হয় এবং মিউনিসিপ্যাল কমিশানারদের (পরে কাউনসিলার), যাহাদের তখন নাম ছিল Justice of the Peace, শহরের সীমান্তর্গত ভূসম্পত্তির উপরে অতিরিক্ত ট্যাক্স্ বসাইবার ও সেই অর্থ স্বাধীন ভাবে ব্যয় করিয়া কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি, ড্রেনেজ, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও আলোক প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিবার অধিকার দেওয়া হইল। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির কার্য ছোটলাটের কর্তৃত্বাধীনে রহিল এবং ১৮৫৬ সালে কতিপয় আইনের দ্বারা তিন জন বৈতনিক কমিশানার ও একজন চেয়ারম্যান লইয়া একটি মিউনিসিপ্যাল বোর্ড গঠিত হয়। তাঁহাদের কর্পোরেশান আখ্যা দিয়া তাঁহাদের হস্তে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সকল টাকা ও নগর সংক্রান্ত সর্ববিধ কার্যের ভার সরকার হস্তান্তরিত করেন। ১৮৫৯ সালে কলিকাতায় খোলা নর্দমার পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ পাইপের দ্বারা ড্রেন প্রস্তুত আরম্ভ হয় ও তাহা সম্পূর্ণ করিতে ১৬ বৎসর লাগে। বহুবর্ষ পরে নিরাপদে লোক চলাচলের জন্য পাদ-পথ বা ফুটপাথ নির্মিত হয় এবং ইহারও ব্যবস্থার সূত্রপাত এই সময়েই।

১৮৬০ সালে বাঙলাদেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহ ঘটায় নীল সম্বন্ধে সর্ববিষয়ে অনুসন্ধান ও রিপোর্ট করিবার জন্য এক কমিশন বসে ও ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী আইনের দ্বারা নীলকরদের সংযত করিবার চেষ্টা হয়। চাষীপ্রজার অবস্থার উন্নতির জন্য উপদেশ ও বিধি-ব্যবস্থা সম্বলিত চাষীপ্রজার অধিকারপত্র বা Charter ঘোষিত হয় ও তদনুযায়ী কার্য শুরু হইল। এই প্রজাস্বত্ববিধি জমিদারের অনেক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া দিল। এই বৎসরেই দেশের জনসাধারণের জন্য নিম্নশিক্ষার বিস্তারের ভার সরকার হাতে লইলেন। এই সম্বন্ধের ডেসপ্যাচকে শিক্ষা বিষয়ে অধিকারপত্র বা চার্টার বলা হইত। এই ডেসপ্যাচ অনুসারে সরকারের তত্ত্বাবধানে দেশে নিম্ন প্রাইমারি শিক্ষার জন্য নরম্যাল স্কুল স্থাপিত হইল এবং বঙ্গভাষা শিক্ষার্থীর জন্য ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষা ও পরীক্ষান্তে অভিজ্ঞানপত্র বা সার্টিফিকেট দিবার ব্যবস্থা হইল। ইহার অল্পদিন পরেই উচ্চ প্রাইমারি বা মাইনার পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। এই সময়েই ডাক ব্যবস্থার সুশৃঙ্খলার জন্য সুলভ মূল্যে ডাকটিকিটের ও পোষ্টকার্ডের প্রচলন আরম্ভ। ইহার পূর্বে বিভিন্ন প্রদেশের দূরত্ব অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ডাকখরচা সরকারে জমা দিলে চিঠিপত্র সরকারী ডাকে প্রেরিত হইত। এখন নিয়ম হইল যে বিলাতের ন্যায় একই মূল্যের ডাকটিকিটে ভারতে সর্বত্র পত্রাদি প্রেরিত হইবে। প্রেরিত দ্রব্যের ওজনের উপরে ডাকটিকিটের মূল্যের তারতম্যের ব্যবস্থা হইল। দূরত্ব তখন আর গণ্যের মধ্যে থাকিল না। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য জমিদারদের উপর ডাক-খাজনা (Cess) বসান হইল।

১৮৬০ সালে সকল ভারতীয় প্রজাকে একই দণ্ডবিধির অধীন করিবার জন্য অপরাধের শ্রেণীবিভাগ ও দণ্ডের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি-আইন (Indian Penal Code) বিধিবদ্ধ হইল। একদিকে দণ্ডবিধির দ্বারা যেমন প্রজার শান্তিবিধান হইল, অন্যদিকে তেমন ভারতীয় প্রজাকে সম্মানের দ্বারা পুরস্কৃত করিবার জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অনুমত্যনুসারে ১৮৬১ সালে ভারত-নক্ষত্র (Star of India) অর্ডারের উপাধির সৃষ্টি হইল। মহারাণী রাজ্যভার গ্রহণের পর এই ভাবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের ব্যবস্থা করিলেন এবং পরে ভারতীয়রা উপরোক্ত অর্ডারের ও অন্যান্য পুরাতন ব্রিটিশ অর্ডারের উপাধিতে ও আরো পরে পুরাতন নাইট ব্যাচিলার উপাধি-ভূষণে বিভূষিত হইতে লাগিলেন। আর বংশানুক্রমিক নাইট বা ব্যারোনেট উপাধি প্রথম লাভ করিলেন বোম্বাইয়ের এক দানবীর কোটিপতি ব্যবসায়ী যাহা অনেক পরে আরো একজন বোম্বাইয়েরই কোটিপতি ব্যবসায়ী লাভ করেন।

প্রাদেশিক স্থানীয় কার্য সুনির্বাহের জন্য ও প্রতি প্রদেশের উপযোগী স্বতন্ত্র আইন-পরিষদ গঠন করিবার ব্যবস্থার ফলে প্রথম

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৮ই জানুয়ারি ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রমাপ্রসাদ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজনকে উক্ত সভার সভ্য মনোনীত করা হয়। উপরোক্ত ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া অর্ডারের Companion শ্রেণীর উপাধিতে যাঁহারা প্রথম ভূষিত হইয়াছিলেন প্রসন্নকুমার ও রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। রাধাকান্ত পরে উক্ত অর্ডারের নাইট কমাণ্ডার শ্রেণীতে প্রথম ভারতবাসী উন্নীত হন।

কলিকাতায় লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত পানীয় জলের অভাব দিন দিন বাড়িতেছিল। পুষ্করিণী ও খারাপ কূপের অস্বাস্থ্যকর জল সাধারণ লোকে পানাদি সকল কার্যেই ব্যবহার করিত; বিত্তশালী সম্প্রদায় প্রতি বৎসর মাঘ মাসে গঙ্গাজল সংগ্রহ করিয়া নির্মাল্যাদির দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া এক বৎসরের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। দ্বারকানাথের সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে এই ব্যবস্থাই ছিল। কলিকাতা সহরে শোধিত জল (Filtered water) যাহাতে সহজপ্রাপ্য হয় তাহার জন্য ১৮৬১ সালে আন্দোলন আরম্ভ হয়। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ ১৮৬৩ সালে ঐ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তাঁহাদের ইঞ্জিনিয়ার কাশীপুরের সম্মুখস্থ গঙ্গা হইতে নলদ্বারা কলিকাতায় জল আনাইবার প্রস্তাব করিলেন। গভর্ণমেন্টের স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে ইহাতে আপত্তি হইল। তাঁহারা বলেন যে কলিকাতার সন্নিকটস্থ প্রদেশের জল পরীক্ষায় অত্যন্ত দোষণীয় দেখা গিয়াছে। তাঁহাদের মতে ব্যারাকপুরের দক্ষিণে গঙ্গাতীরস্থ কোনো স্থান হইতে জল লওয়া উচিত হইবে না। তখন ব্যারাকপুরের এক ক্রোশ উত্তরে পলতায় গঙ্গাজল সঞ্চয় করিয়া শোধন করিবার জন্য কয়েকটি শোধন পুষ্করিণী (Filters and Reservoirs) প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেইখান হইতে পাইপের দ্বারা কলিকাতায় জল সরবরাহের প্রস্তাব হয়। এই পলতার অপর পারে গঙ্গার পশ্চিমকূলে পলতা ঘাট, গোরুটি গ্রামের অন্তর্গত। শ্রীচৈতন্যদেবের ভ্রমণকালীন এইস্থানে অবস্থান জন্য এই স্থানটি গৌরহাটি প্রাচীন আখ্যা পায়, অপভ্রংশে গোরুটি বলিয়া পরিচিত। ইহার সন্নিকটে চাঁপদানীতে (এক্ষণে বৈদ্যবাটী রেল ষ্টেশান ও মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায়) ভাগীরথীতীরে একটি স্নানের ঘাট আছে। তাহা তারকেশ্বর তীর্থযাত্রীদের নিকট নিমাইতীর্থের ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ ও তথায় স্নানার্থ বৈষ্ণব তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। এই ঘাটের উত্তরে কিয়দ্দূরে আম্রকানন ঘেরা একটি সুন্দর বাগান-বাড়ী ১১০২ সাল অবধি ছিল। ইহাকে পলতার বাগান বলিত, এক্ষণে ড্যালহাউসি ও য়্যাঙ্গাস্ জুট মিলে রূপান্তরিত। ইহা পূর্বে ঠাকুর-বাবুদের গোরুটি বা পলতার বাগান বলিয়া তাঁহাদের পরিবারে উল্লিখিত হইত। 'মহর্ষির আত্মজীবনীতে' এখানে ২।৩ বার নবগঠিত ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের উদ্যান-মিলনের প্রসঙ্গে বাগানবাড়ীটি উল্লিখিত। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতিতে' যে তাঁহার খুড়তুতোভাই খোলাপ্রাণ হাস্যোজ্জ্বল সৌখীন 'গুণদাদার' (অবনীন্দ্র-জনক গুণেন্দ্রনাথ) উল্লেখ আছে, তাঁহার অকাল মৃত্যু (১৮৮১) তাঁহার এই সাধের বাগানে হইয়াছিল। ১৮৬৫ সালে ছোটলাট পলতা হইতে পানীয় জল সরবরাহের প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। ১৮৬৬ সালে কলিকাতার অন্যান্য বাড়ীর ন্যায় দেবেন্দ্র-পরিবারবর্গ তাঁহাদের বাড়ীর দোতলায় ও তেতলায় কলের জলের ব্যবহারে আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। তাই গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার কলের জলে ধৌত নাগরিক কবি। পল্লীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করিয়াছেন তাহা পরবর্তীকালের ও তাহা তাঁহার স্বোপার্জিত। এই নদী-মাতৃক দেশে নৌকাভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সহিত অন্তরঙ্গতা স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। পরবর্তীকালে উত্থিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নব্য সাহিত্যিকদের পক্ষে গ্রাম্যজীবন হইতে ঘনিষ্ঠভাবে অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যরচনার উপাদান আহরণ করা গ্রামের লোক বলিয়া সহজ হইয়াছে।

১৮৪৩ সাল হইতে যে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল, ১৮৫৭ সালে তাহা কার্যে পরিণত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও যদুনাথ বসু এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট হন, যাহা সর্বজনবিদিত। পরে কবি হেমচন্দ্র ও কৃষ্ণকমল আইন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া একজন উকিল ও অপর জন অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ভারতীয়দের জ্ঞানচর্চার সুযোগ ও রাষ্ট্রীয় কর্মনিয়োগের প্রসারবৃদ্ধিকল্পে নানারূপ ব্যবস্থা তৎকালীন বিলাতী পার্লামেন্ট হইতেও কিছু কিছু করা হইত। ভারতকে কেবল অর্থশোষণের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে তখনকার কয়েক জন ইংরাজপ্রধানের অভিপ্রায়ে বাধিত। তাঁহারা বলিতেন, ভারতীয়দের জ্ঞান ও জাগতিক ব্যবহারের সুশৃঙ্খলা যদি সম্পাদিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে তাহা ঘোরতর লজ্জার কথা। এই কারণে ১৮৫৩ সালের চার্টার রিনিউএর সময় স্থির হইয়াছিল যে, ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত আবশ্যক। এই চার্টারেই ব্যবস্থা হয় যে, ভারতীয়েরা বিলাতে গিয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহারা ভারতের বিচার বিভাগে ও প্রাদেশিক শাসন বিভাগে ইংরাজ কর্মচারীদের সহিত সমভাবে নিযুক্ত হইবেন। এই সময়েই Innগুলি অর্থাৎ আইনের কর্তৃমণ্ডলী ভারতীয়দের বিলাতে আইন অধ্যয়ন করিয়া ব্যারিষ্টার হইবার অধিকার ঘোষণা করেন। ফলে প্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার হইলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন। তিনি হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়ার পরীক্ষায় ১৮৪১ সালে বৃত্তি পাইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া বিলাত যান ও ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া রেভাঃ ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলা দেবীকে দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়া পুনরায় বিলাত যান। তথায় তিনি আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন ও পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু আইনের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। বিলাতে 'বৈঠকখানা' নামীয় নিজের বাড়ীতে তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাস করেন। তাঁহার প্রথম পক্ষে হিন্দু মতে বিবাহিতা পত্নী বালাসুন্দরী দেবী ও জ্ঞানেন্দ্রমোহনের একমাত্র পুত্র প্রসূনকুমার অকালে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য প্রথম ভারতীয়দ্বয় রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণনগরের দেওয়ান রামলোচন ঘোষের পুত্র ব্যারিষ্টার মনোমোহন ১৮৬০ সালে বিলাত যাত্রা করেন ও

তথায় জ্ঞানেন্দ্রমোহনের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সত্যেন্দ্র ১৮৫৭ সালে বৃত্তি পাইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষান্তে দুই বৎসর ইয়োরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ১৮৬৪ সালে প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ানরূপে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মাইকেল মধুসূদন তখন বিলাতে। তিনি নিম্নলিখিত চতুর্দশপদী কবিতায় সত্যেন্দ্রকে অভিনন্দিত করিলেন। বাঙলা কবিতায় সনেটের প্রবর্তন এবং সনেটের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে অভিনন্দন উভয়ই মধুসূদনের অবিনশ্বর কীর্তি।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরপুরে সশরীরে শূরকুলপতি
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্যবলে
ফিরিলা কাননবাসে; তুমি হে তেমতি
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশালতা তব ফলবতী!—
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভবতলে!—
শুভক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিলা যে সতী,
তিতিবেন যিনি, বৎস নয়নের জলে
(স্নেহাসার!) যবে রঙ্গে বায়ুরূপ ধরি
জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে
এ তোমার কীর্ত্তিবার্ত্তা। যাও দ্রুতে, তরি,
নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে!
অদৃশ্য রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গলক্ষ্মী! যাও, কবি আশীর্ব্বাদ করে।—

মনোমোহন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াও নির্দিষ্ট বয়স উত্তীর্ণ হওয়ায় ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিলেন।

[ক্রমশঃ।

জ্বর

কৃষ্ণ ধর

কালি সারা রাত ভীষণ জ্বরে আমার শরীর পুড়েছে,
উত্তাপে আমার দেহ অবশ, হৃদয় মৌমাছির মতো
নেশায় বুঁদ। সারা রাত ধরে জ্বরের মৌচাকের
কোষে কোষে কারা যেন বেদনার মধু রেখে গেছে,
আর আমি সে ব্যথায় বার বার শিউরে উঠেছি!
জানালার ধারে বাতাবী লেবুর গাছে যৌবনবতী
নারীর স্তনের মতো দুটো লেবু সারারাত
জ্যোৎস্নায় খেলেছে। আমি যতোবার তাকিয়েছি
হাওয়া এসে পাতার আড়াল দিয়ে তার লজ্জা
দিয়েছে ঢেকে। দূরে কৃষ্ণচূড়ার ডালে
থলো থলো আগুনের ফুলকি। আমি আর
তাকাতে পারি না। আমার কেমন জানি ভয় করে।
এই ডাক-বাংলোয় একা একা ভীষণ জ্বরে
ধুঁকে ধুঁকে কেমন জানি ভীত চকিত হ'য়ে গেছি,
শর-বেঁধা হরিণের মতো।

ভোর তখনও হয়নি। ঝির ঝির হাওয়া
শিরীষ গাছে ঝুমুর বাজিয়ে চলে গেল।
বরফ-গলা পাহাড়ী নদীর স্রোতের মতো ঠাণ্ডা
এক ঝলক হাওয়া এসে আমার জানালায় দাঁড়াল।
আমার উত্তাপ গেল কমে। আমি চোখ বুজলাম।
সারারাত্রি জ্বরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে এবার
যেন আমার হৃদয় মৌমাছির মতো ঘুমিয়ে পড়ল।
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমার মনে হল:
নিচে ঢালু জমি পেরিয়ে সেই সবুজ উপত্যকার
মতো জায়গাটায় উষ্ণার জলে পা ডুবিয়ে যেন
আমি গিয়ে বসেছি। আমার পাশে এসে
বসল কমলালেবুর মতো মুখ সেই খাসিয়া
মেয়েটি যাকে আমি কোথায় দেখেছি
এখন আর মনে পড়ছে না।

আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না,
কমলালেবুর মতো মুখ এই মেয়েটাকে।
ভুট্টার দানার মতো তার ছোট্ট গোল গোল
দাঁতের পাটি; কী আশ্চর্য ভঙ্গিতে ও হাসছিল
আর আমার সারা গায়ে দিচ্ছিল উষ্ণার জল।
আমি ওর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন
বিহ্বল হয়ে গেলাম।
ও এতো কাছে, তবু ছুঁতে পারি না।
মনে হয় ও হেসে একটা খুশির ঝর্ণার মতো
ঢলে পড়ল আমার গায়। দমকা হাওয়া
আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।
আমি সম্বরের মতো ওর দিকে তাকাই,
ও ব্যাধিনীর মতো চোখের শায়কে আমাকে
বিঁধে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।
উষ্ণার জলে কতোক্ষণ এমনি স্নান করেছি
মনে নেই। জলের ফোঁটা গায়ে পড়তেই
আমার ঘুম ভাঙ্গল।
ভোরের দিকে জোর এক পশলা বৃষ্টি।
তার ফোঁটাগুলো গোল মুক্তোর মতো দানা
বেঁধে আছে বাতাবী লেবু দুটোর গায়।
এখুনি নাহারকাটিয়ার আকাশে সূর্য উঠবে।
আর শিরীষগাছের পাতায় আটকানো ভোর
বেলাকার বৃষ্টির ফোঁটায় এই নিঃসঙ্গ নৈঃশব্দের
জগৎ প্রতিবিম্বিত হবে।
আর আমি দক্ষিণ নায়কের মতো,
আমার তাপদগ্ধ হৃদয় নিয়ে,
এই শব্দ গন্ধ আর চেতনার জগৎকে
ভালবাসবো নতুন করে, নারীর প্রেমে, যৌবনের আহ্বানে
আর কৃষ্ণচূড়ার লাল নিমন্ত্রণে।

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

২৬

শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে—কেষ্ট বিষ্টু কেউ নই—কিঞ্চিৎ যোগাযোগ আছে আমার। পিকিনের শান্তি-সম্মেলনে খানিকটা তড়পে এসেছিলাম। মস্কোর শান্তি-অফিসে এই সুবাদে ঢুঁ মেরে এলে কেমন হয়? ইচ্ছা মাত্রেই গাড়িতে পুরে পলকের মধ্যে তথায় হাজির করে দিল। সঙ্গে কৃষ্ণস্বামী—আমার পিকিনের সহযাত্রী, সিনেমার মানুষ। খাতির করে বসালেন ওঁরা। প্রশ্ন: শান্তির কাজ কর্ম কেমন ধারা চলছে ভারতে? এবং উত্তর নিজেরাই দিচ্ছে: নেহরুর দেশ, বিশ্ব শান্তির আদর্শ তোমাদের—আন্দোলন খুব জোরদার নিশ্চয় ওখানে। আমরা জোরে জোরে ঘাড় নাড়ি: হাঁ হাঁ—অত্র সন্দেহ নাস্তি।

পলিতকেশা এক বৃদ্ধা ঠাহর করে করে দেখছেন। ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে লোকে যেমন পুঁথি পড়ে। হঠাৎ উঠে গিয়ে তাকের উপর থেকে লম্বা-চওড়া এক বই নামিয়ে ফসফস করে অনেকগুলো পাতা উল্টালেন। তার পরে মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বোস—

ব্যাপার জানি। বইটার চেহারায় মালুম হয়েছে—পিকিন শান্তি সম্মেলনের বুলেটিন। চার ভাষায় আছে—ওটা হল রুশ। আমার কাছে আছে ইংরেজি। আর বানিয়েছে চীনা স্পানিশে। অধমকেও তুলে দিয়েছিল সেই আসরে। ছবি নিয়েছিল বক্তৃতার সময়—ঐ কেতাবে ছবি সহ বক্তৃতা ছাপা হয়ে আছে। ছবি তো সব বক্তারই রয়েছে—দুঁশ দেখুন তা হলে বুড়োমানুষের আহা-মরি প্রাণকান্ত চেহারা নয় যে এক নজরে ছবি দেখে অমনি হিয়ায় দাগ কেটে রয়েছে। অথচ বই খুঁজে খুঁজে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নাম বাতলে তবে ছাড়লেন।

শরীর বেজুত লাগছে, দুপুর থেকে শুয়ে পড়ে আছি। হীরেন মুখুজ্জে মশায় বললেন, সে হয় না, সাহিত্য নিয়ে যাদের নাড়াচাড়া তারা তো যাবেই। হিন্দির ব্যাপার যখন, যে ক'জন বাঙালি আছি সকলেরই যাওয়া উচিত।

হিন্দি সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রকাশ গুপ্ত বলছেন—ভোক্‌সের ডাকে এসেছি, ভোক্‌স্ হল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ভারত সোবিয়েতের জানাশোনা ও ভালবাসা আরও ঘনিষ্ঠ হবে এই আশায় ডেকে এনে এত খাতির যত্ন ও খরচপত্র করছেন, এসেছি যখন যার যেটুকু বিদ্যে, জাহির করে যেতে হবে। আমাদের আছে কাল বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধ—আমার ও হীরেন মুখুজ্জে মশায়ের। এবং শ্রীমতী মদন বলবেন পাঞ্জাবি রূপকথা সম্বন্ধে। প্রকাশ গুপ্ত হলেন এলাহবাদ য়্যুনিভার্সিটির অধ্যাপক। মাষ্টার মানুষ, বলার অভ্যাসতো থাকবেই—কিন্তু পরমাশ্চর্য ব্যাপার, ডিগ্রি এবং চাকরি প্রাপ্তির পরেও পড়াশুনা ভদ্রলোক রীতিমতো বজায় রেখেছেন।

তা নিয়ে লাভ হল অনেক, সত্যি বলছি। আনাড়ি মানুষ অনেক কিছু শিখে নিলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। রুশ শ্রোতারাও শতকণ্ঠে তারিপ করলেন। আমাদের নিয়ে প্রথম এই গুণী-জ্ঞানীর আসর। শ্রীগুপ্ত দলের ষোল আনা মান রেখেছেন।

পরের সকালে রেডিও অফিসে আমাদের ক'জনকে ডেকেছে। সোবিয়েতে এত দিন ঘোরাঘুরি হল, কেমন লাগল বলে যান এইবার। মুখের কথা রেকর্ড করে নিচ্ছে, সময় মতো পরে শোনাবে। প্রশ্ন করছেন বিনয়, আমরা জবাব দিচ্ছি। তার পরে কিছু আলোচনা সকলে মিলে। আমার আবার আলাদা একটু কাজ—গল্প রেকর্ড করা। বিনয় চারটে গল্প পছন্দ করে দিয়েছেন, সেগুলো পড়তে হবে। আজকে যদ্দূর হয় হোক, যা বাকি থাকে কাল-পরশু দেখা যাবে।

বাইশ-চব্বিশ বছরের এক তরুণীকে দেখছি, কাজে নিমগ্ন। আড়চোখে চায় এক একবার, মিটিমিটি হাসে। বিনয় পরিচয় করিয়ে দেন: ভাল্যা ইসোরবোভা—রেডিও বাংলা বিভাগের মেয়ে, খাসা বাংলা শিখেছে।

ভাল্যা রাঙা হয়ে ওঠে লজ্জায়: না না, বাংলা আমি কিছু জানি না।

লাজুক ভাব খাসা লাগে ওদেশের মেয়ের মুখে। খুনসুটি করি, নানা কথা জিজ্ঞাসা করি বাংলায়—কেমন জবাব দেয় দেখি। ঘাড় নিচু করে দুটো একটা কথা বলে, আর হাসে। আর বলে, বাংলা আমি একেবারে জানি না।

বরিস কাপুস্কিন—সুশ্রী এক যুবা রেডিওর ঐ বাংলা বিভাগে অনুবাদের কাজ করে। ভাল্যা বাংলা হরফে নাম লিখল আমার খাতায়, বরিসও লিখল। গল্পে গল্পে আমাদের থিয়েটার-জগতের মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথা উঠল। সে আমলে ভারতীয় গণনাট্যের এক প্রধান গুণী বিনয়; আর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ছিলেন দলের সভাপতি। মস্কোয় বেড়ানোর সময় এক সাহেব ছেলে হঠাৎ এসে তাঁকে বলল। আপনাকে দাদু ডাকিতে ইচ্ছা করি। মহর্ষি হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। বিনয়কে শুধাই, কে ছেলেটি খবর রাখেন কিছু? আছে সে এখন মস্কোয়?

বরিস বলে, আমি তো সেই।

আবিষ্কার রীতিমতো। দেশে গিয়ে বলা যাবে, মহর্ষির নাতিকে দেখেছি।

ভাল্যাকে বললাম, আমার বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে লাজুক মেয়ে দেখে থাকি। অবিকল তোমারই মতো।

ভাল্যা চুপি চুপি বলে, আপনি দাদা, আমি বোন আপনার।

ভাই পেয়েছি গ্রাত্যুককে, বোনও এই পেয়ে গেলাম। দেশে

ফেরবার ২'টা দিন আগে। আমার শিষ্ট শান্ত লক্ষ্মী বোনই বটে। ঐ এক সকাল বেলা দেখে এলাম, আলাপ পরিচয় হল। মস্কোয় তাকে আর পাই নি। আর কোনদিন দেখব না জীবনে। কিন্তু সুবাসিনী তার অজানন্ত হাসিভরা মুখ নিয়ে চিরকাল আমার আপনজন হয়ে রইল।

ভারত এসে উপস্থিত। হু হু করে গাড়ি ছুটিয়ে এসেছে মস্কোর রাজপথে। দেটা চোখে দেখিনি বটে, কিন্তু ছুটো-তিনটে সিঁড়ি ধুপধাপ একসঙ্গে টপকানো দেখে বকম বোঝা যায়। এসে অবধি চেষ্টা করছি, নিজ গোষ্ঠীর ভিতর বসে ছুটো সুখ-দুঃখের কথা কইব, সেই সুদিন যত্র সমাগত। য়ুনিয়ান অব রাইটার্স নামে জোরালো সমিতি— মস্কোর লেখককুল ঐখানে মোলাকাতের জন্য বসে আছেন। চলুন, চলুন—

কী মুশকিল, আগে একটু খবরাখবর দেয়! ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, এ কেমন কথা?

আগে থেকেই নাকি ব্যবস্থা, কালকেই খবর দেবার কথা। কিন্তু যার উপরে ভার ইত্যাদি ইত্যাদি।

একতলা বাড়ি, মস্ত বড় কম্পাউণ্ড। লেখক মশায়রা গাড়ি চেপে আসছেন, গাড়িতে বেরুচ্ছেন। পঁচিশ-ত্রিশটা গাড়ি সর্বক্ষণ উঠানে। সমিতির কতগুলো ঘর আর কত রকমের বিভাগ, গণে পারবেন না।

এক ঘরে নিয়ে গেল। লম্বা টেবিল ঘিরে বসেছি—আমাদের তরফের এবং ঐ তরফের। অনেক লেখক পলিতকেশ অশীতিপর একজন রবীন্দ্রনাথের কথা তুললেন। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গেলেন, বিপ্লবের ধকল তখনো কাটেনি। নানান অভাব-অসুবিধা, খাবার দাবার পাওয়া যায় না। কিন্তু মুশকিল কাটিয়ে উঠবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলছে। রবীন্দ্রনাথকে রাখা হয়েছে শহরতলীর এক বাড়ি। লোকজনের ঝামেলা কম, নিরিবিলি আছেন।

সেই লেখক বলতে লাগলেন, বিপ্লবের আগেও তাঁর কবিতায় অনুবাদ হয়েছিল এদেশে, আমরা তাঁর নাম জানতাম, লেখাও পড়েছি। একদিনের কথা মনে পড়ে। পনেরজন লেখক মোটমাট বসেছি একসঙ্গে। টেগোর প্রান্তদেশে। বারম্বার দেখছি তাঁকে, দেখে দেখে আশ মেটে না। মনে হল প্রফেট। তাঁর মুখ দাড়ি পোশাক সব মিলিয়ে অপরূপ মনে হচ্ছিল। মৃদুস্বরে কথা বলছেন। সব চেয়ে আশ্চর্য সঙ্গীতের মতো সেই কণ্ঠ। দু ঘণ্টা ধরে চলল। আমাদের ভয় হচ্ছে, ক্লান্ত হয়ে পড়বেন তিনি। কিছু না। মস্কো তখন বড় একটা গ্রামের মতো। এই বৃহৎ দেশের এইটুকু রাজধানী —তিনি কিন্তু হতাশ হননি। মস্কোর লোকের খুব প্রশংসা করতেন। লেনিনগ্রাডে যাবার কথা, কিন্তু শরীরের জন্য ঘটে উঠল না।

ভারি এক মজা হল সেই সময়। বৃদ্ধ বলতে বলতে হেসে উঠলেন। কেমন করে রটে গেছে, গির্জার পাদরিকে লুকিয়ে রেখেছি ঐ বাড়িতে। টেগোরের দাড়ি ও লম্বা পোষাক দেখে ভেবেছে ঐ রকম। বিপ্লবের রেশ আছে তখনো, পাদরি-পুরুতের উপর লোকের রাগ। বড়লোকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুরানো ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ছিল তারা। একদিন হামলা দিয়ে এসে পড়ল। আমরা বোঝাই, মস্ত বড় কবি—ভারত থেকে এসেছেন, মহামান্য অতিথি। তখন বলে, দেখতে দাও আমাদের ভাল করে। টেগোর উপরের বারাণ্ডায় এলেন। সকাল বেলা, রোদে চারিদিক ভরে গেছে, তারি মধ্যে ঐ সুঠাম সৌম্য দীর্ঘ দেহ এসে দাঁড়ালেন। মুগ্ধ জনতার জয়ধ্বনি উঠল। তখন আবার ঐ এক উপসর্গ—রোজ এসে ভিড় করে: টেগোরকে দেখব। কবি বারাণ্ডায় বেরিয়ে আসেন, দেখে পরিতৃপ্ত হয়ে মানুষ ফিরে যায়।

'রাশিয়ার চিঠি' কথা তুললাম আমি। সেই আশা সার্থক হয়েছিল। কী আশ্চর্য সুন্দর ভাবে এই দেশ ও আপনাদের কথা লিখে গেছেন! বইটার ইংরেজি অনুবাদ হয়েছিল, কিন্তু শুনতে পাই বিলাতে প্রচার বন্ধ। আপনাদের রাশিয়ান অনুবাদ নেই?

তাঁরা প্রায় আকাশ থেকে পড়েন: না—নেই তো সে বইয়ের অনুবাদ। পড়ি নি আমরা।

আমার কাছে আছে এক কপি। আমার নিজের কয়েকটা বই আপনাদের জন্য এনেছি, সেই সঙ্গে ওটাও দিয়ে যাব।

নিশ্চয় দেবেন। আমরা অনুবাদ করে নেবো।

কাগজে দেখছি, 'রাশিয়ার চিঠি' রুশ অনুবাদ হয়েছে। আমার সেই কপি থেকে হয়েছে কি না জানিনে।

এইবারে সেই লোকের নিজের কথা: ১৯২০ অব্দে কাবুল গিয়েছিলাম কূটনৈতিক কাজে। ভারতীয় কাগজ পড়তাম। বৃটিশের সঙ্গে খুব লড়ছ তখন তোমরা। সেই সময় পেশোয়ার যাবার খুব চেষ্টা করেছিলাম। আমি ফরাসি বলতাম। আমায় বলেছিল, ভাইসরয়ের অফিস যতদিন সিমলায় আছে, তোমাদের যেতে দেবে না। আমি বলেছিলাম, আর কদ্দিন থাকতে পারে, তাই দেখ। চলে গেলে তার পরে যাব। হয়েছেও তাই— তারা চলে গেছে। কিন্তু আমি ৮৬ বুড়ো হয়ে পড়েছি, আর কোথাও যাবার ক্ষমতা নেই। মনে মনে ভারত ঘুরি এখন। ভারতকে খুঁজে বেড়াই নানা বইয়ের মধ্যে। ভাষার অসুবিধা। ভারতের অনেক—অনেক বইয়ের তর্জমা হওয়া দরকার।

সদ্য একটা বই বেরিয়েছে—'ভারত ও পাকিস্তানের ছোট গল্প'। বইটা নেড়েচেড়ে দেখি। একজনকে বলি, সূচীটা পড় তো, কার কার গল্প নিয়েছে শুনি। যশপালের আছে গোটা চার-পাঁচ, কৃষণচাঁদ, মুলুকরাজ ওঁদের সব আছে। অজানা নামও অনেক। আমাদের বাংলাদেশের শুধু একজন—ভবানী ভট্টাচার্য। তিনি বাংলায় লেখেন না, থাকেনও না বাংলা দেশে।

কী মশায়রা, বাংলার উপরে বিতৃষ্ণা কেন? বাংলা ছোট গল্প ভুবনের যে কোন দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। তার একটারও ঠাঁই হল না?

আমাদের আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও হাঁ-হাঁ করে সায় দিয়ে ওঠেন।

ওঁরা লজ্জিত হয়েছেন। বলেন, জানতে পারিনে, খবর-বাদ পাইনে তেমন কিছু। আপনাদের তরফ থেকেও সাহায্য পাইনি এ তাবৎ। বরঞ্চ এমনও মনে হয়েছে, টেগোরের অত বড় সাহিত্যের ধারা কি একেবারে শুকিয়ে গেল?

বাঙালি লেখকদের কিঞ্চিৎ উদ্যোগী হতে বলি। আমাদের প্রচার নেই। দুনিয়া ছোট হয়ে গেছে। আপনার সাধনার ধন শুধু স্বদেশের ক'টা মানুষের মধ্যে আটক থাকবে কেন? বাইরে ছড়িয়ে দিন। বম্বে ও দিল্লির দিকে নজর তুলে দেখুন না একটু। সামান্য সম্বল নিয়ে কত জনে কী ঢাকই না বাজাচ্ছেন! [ক্রমশঃ।

বিমলকুমার দত্ত

বুদ্ধের পাদপূজা : অমরাবতী

ভারতীয় ভাস্কর্য্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ভারতেতিহাসের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি। ভাস্কর্য্য ইতিহাসের মাধ্যমে ক্রমানুসারে ভারতের রাজনৈতিক উত্থান-পতন কাহিনী, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মবিবর্ত্তনের গতি ও প্রকৃতি এবং জনচৈতন্যের ক্রম বিবর্ত্তন ও আশা-নিরাশার চিত্রাবলী সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত।

ভাস্কর্য্য শিল্প জাতীয় চিত্ত-বিকাশের প্রকাশ। ভারতীয় ভাস্কর্য্য-ধারার সহিত পরিচিত হইতে হইলে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও আদর্শের সহিত সম্পূর্ণ পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। সাধারণ শিল্প-বিচারের মাপকাঠিতে ভারতশিল্পকে বিচার না করিয়া বহির্দেহের মাধ্যমে চিত্তবৃত্তি, সত্যভাব ও আধ্যাত্মিক সত্তা প্রকাশে সার্থক হইয়াছে কি না তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বহির্দেহের মাধ্যমে অন্তর্দেহের সত্য ও সার্থক রূপ প্রকাশই ভারতশিল্পের আদর্শ।

পাঞ্জাবে হারাপ্পা, সিন্ধুপ্রদেশে মহেঞ্জোদড়ো ও উত্তর-ভারতের অন্যান্য স্থানে ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন ভাস্কর্য্য শিল্পের নিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাদের বয়স আনুমানিক পাঁচ হাজার বৎসর। প্রাপ্ত নিদর্শনাদির মধ্যে মহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত ধাতুনির্ম্মিত নৃত্যরতা নারী ও শ্মশ্রুবিশিষ্ট নাসাগ্রদৃষ্টি যুক্ত আবক্ষ পুরুষ-মূর্তি এবং হারাপ্পার মুণ্ডবিহীন প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তিদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাক-আর্য্য শিল্পের এই সকল নিদর্শন হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে যুগে ভাস্কর্য্য শিল্পের স্তর ও মান বিশেষ উন্নত ধরণের ছিল এবং বহুদিনের চেষ্টা ও সাধনার ফলে ধীরে ধীরে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল নিদর্শন ব্যতীত উপরোক্ত স্থান সমূহে যে অসংখ্য বিভিন্ন আকারের ফলক (শীল) ও পোড়ামাটির স্ত্রীমূর্ত্তি সকল পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা তদানীন্তন সামাজিক ও ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধীয় আচার-ব্যবহারের সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়।

আর্য্যগণ ভারতে বৈদিক সভ্যতার পত্তন করেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহারা ১৫০০ খৃঃ-পূর্ব্বাব্দে মধ্য-এশিয়া হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। যাযাবর আর্য্যদিগের আক্রমণ ও সিন্ধুনদীর গতি পরিবর্ত্তনের ফলে ভারতের সুসভ্য অনার্য্য সভ্যতার কেন্দ্র সকল ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া পড়ে। দুর্দ্ধর্ষ, সংঘবদ্ধ ও ক্ষিপ্রগতি বিশিষ্ট হওয়ার জন্য (অশ্ব ব্যবহার করার দরুণ) আর্য্যগণ সুসভ্য ও শান্ত দ্রাবিড়গণকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হন।

সমন্বয় সাধনই ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। মূলতঃ, চতুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি আর্য্যদিগের দান কিন্তু পরবর্ত্তী হিন্দুসভ্যতা বাস্তব জীবনে ও ভাবজগতে আর্য্য-অনার্য্য চিন্তাধারার মিশ্রণের ফল। পুনর্জ্জন্মবাদ, প্রতিমাপূজা, ভক্তিবাদ, যোগসাধনা প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যাদি পুরাপুরি অনার্য্য সভ্যতার দান।

ক্রমশঃ আর্য্য-অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতে যোলটি পৃথক পৃথক রাজ্য গড়িয়া ওঠে এবং ৩২০ খৃঃ-পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত এই সকল রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আত্মকলহ চলিতে থাকে। মৌর্য্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে (৩২০ খৃঃ-পূঃ) প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ এক ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম্ম মৌর্য্যরাজ অশোকের কাল হইতে রাজধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়া বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে।

মৌর্য্য এবং ইহার পরবর্ত্তী সুঙ্গ ও কাণ্বযুগে (১৮৫-২১ খৃঃ পূঃ) যে সকল ভাস্কর্য্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, বুদ্ধমূর্ত্তির অনুপস্থিতি তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলকথা হইতেছে যে, তৃণহা বা তৃষ্ণাকে এবং উহার পরিবর্দ্ধক ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্য্যবিলাস ও

পার্থিব ভোগলালসাকে নিবারণ করা। ইহার ফলে দেহকান্তিময় শিল্পকলা সাধনা ও বর্জ্জিত হয়।

ভারতে আর্য্যাধিকার কাল হইতে মৌর্য্যশক্তির বিকাশকাল পর্য্যন্ত যে সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা পরবর্ত্তী ভারতীয় ইতিহাসে বিশেষ ভাবে রেখাপাত করে, তন্মধ্যে ৫১৬ খৃঃপূর্ব্বাব্দে পারস্য-সম্রাট দরায়ুসের এবং ৩২৬ খৃঃপূঃ গ্রীক-সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের বিকাশ ও বিবর্ত্তনধারা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও ধর্ম্মবিকাশের প্রভাব ভারতীয় ভাস্কর্য্য-শিল্পের ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করিয়া নূতন নূতন রূপে রূপায়িত হইতে সাহায্য করে।

মৌর্য্যযুগের ভাস্কর্য্যধারায় যে সকল নিদর্শন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বৃহদাকার যক্ষ-যক্ষী এবং পশুমূর্তিগুলি প্রধান। দিদারগঞ্জে প্রাপ্ত যক্ষীমূর্তিটির সহজ দৈহিক লীলায়িত ভঙ্গি, সুললিত ছন্দ এবং সরস সজীবতা ও সারনাথের সিংহমূর্তির নিখুঁত গঠন, স্ফীত শিরা-উপশিরা ও পেশীসমূহ, কেশর বিন্যাসের আলংকারিক বাস্তবানুগত ভাব প্রকাশে পরিস্ফুট। এই সকল মূর্তির সজীবতা, বাস্তবতা ও সুচিক্কণ মসৃণতা মৌর্য্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য কিন্তু অন্যান্য যক্ষ-যক্ষী ও পশুমূর্তি (যেমন বেশনগরের যক্ষী, পাটনার যক্ষ, লৌরীয়নন্দন গড়ের সিংহমূর্তি ইত্যাদি) আকারে বিরাট হইলেও স্থূল, গতি ও প্রাণহীন। মৌর্য্য-শৈলীশিল্প প্রকাশ মধ্যে এই দুইটি ধারা সহজেই অনুসরণ করা যায়।

পারস্য ও গ্রীস দেশীয় শিল্পধারার প্রভাব মৌর্য্যশিল্পকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করে একথা সত্য, কিন্তু তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতীয় ভাস্কর্য্যধারার অব্যাহত গতি ও ছন্দের উপরেই মৌর্য্যশিল্পের মূল ভিত্তি।

মৌর্য্য-পরবর্ত্তী যুগে সুঙ্গ ও কাণ্ব সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটে। সুঙ্গ ও কাণ্ব রাজগণের উদারতার জন্য বৌদ্ধ-শিল্পস্রোত অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত থাকে। সাঁচী, ভারুত, বুদ্ধগয়া, উদয়গিরি খণ্ডগিরি ও দক্ষিণ-ভারতে ভেঙ্গী নামক স্থানে এই যুগের শিল্প নিদর্শনাদি দেখিতে পাওয়া যায়। এ যুগের শিল্পধারা মৌর্য্যযুগের ধারার গতি ও প্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণ পৃথক। মৌর্য্যযুগের ন্যায় এ যুগের শিল্পে সে সজীবতা ও সরস ছন্দের আর সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত অধিকাংশ শিল্প নিদর্শন পরিপ্রেক্ষিত রচনার অভাবে গভীরত্বহীনতা, কাল ও স্থানের অসঙ্গতি, ভাবলেশহীন মুখাকৃতি ও ছন্দহীনতার দোষে দুষ্ট কিন্তু জীবজন্তু, বৃক্ষলতা ফল-ফুল প্রভৃতির শিল্পরূপ আদিম সৌন্দর্য্য, সজীবতা ও সারল্যের জন্য খ্যাত। ভারুত ও সাঁচীর বেদিকাগাত্রে ক্ষোদিত জাতক-কাহিনীগুলির মধ্যে ছদন্ত, অলম্বুষা, মহাকপি, শ্যামা, জেতবন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এ যুগে বুদ্ধমূর্তি প্রতীক চিহ্ন দ্বারা (যেমন ছত্র, ত্রিরত্ন, সিংহাসন, পাদুকা, ধর্ম্মচক্র ইত্যাদি) রূপায়িত। দোহদ ও মিথুনমূর্তির প্রচলন সুঙ্গ-কাণ্ব শিল্পে বিবিধ ভাবে প্রকাশিত।

খৃষ্টাব্দের সুরু হইতে ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখা যায়। মগধের প্রভাব-প্রতিপত্তি ম্লান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতে কুষাণ ও দক্ষিণে অন্ধ্র বা সাতবাহন সাম্রাজ্য প্রভাব বিস্তার করিতে সুরু করে।
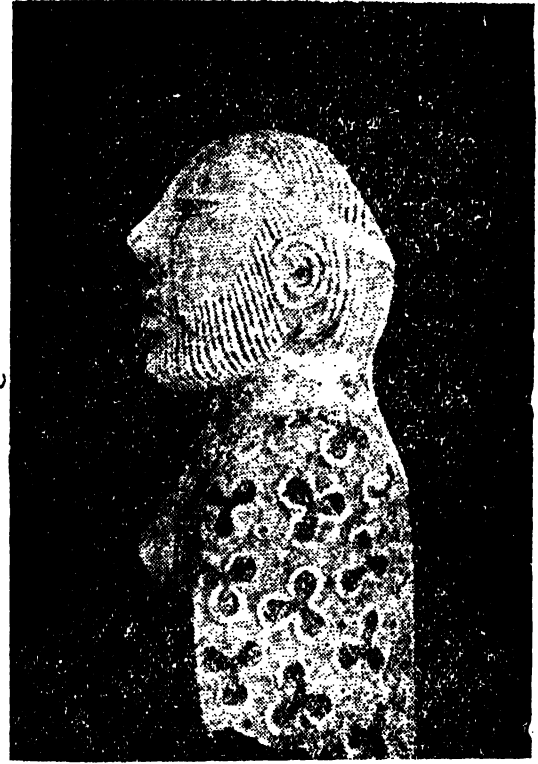
শ্মশ্রুযুক্ত মূর্তির ভগ্নাবশেষ : মহেঞ্জোদড়ো

কুষাণগণ মূলতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের এক দুর্দ্ধর্ষ যাযাবর সম্প্রদায়। ভাগ্য পরিবর্ত্তনের আশায় তাঁহারা ভারতে প্রবেশ করেন এবং ধীরে ধীরে মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধীশ্বর হইয়া বসেন। কুষাণরাজদিগের মধ্যে সম্রাট কণিষ্কের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অশোকস্তম্ভশীর্ষ বৃষমূর্তি : রামপুরোয়া
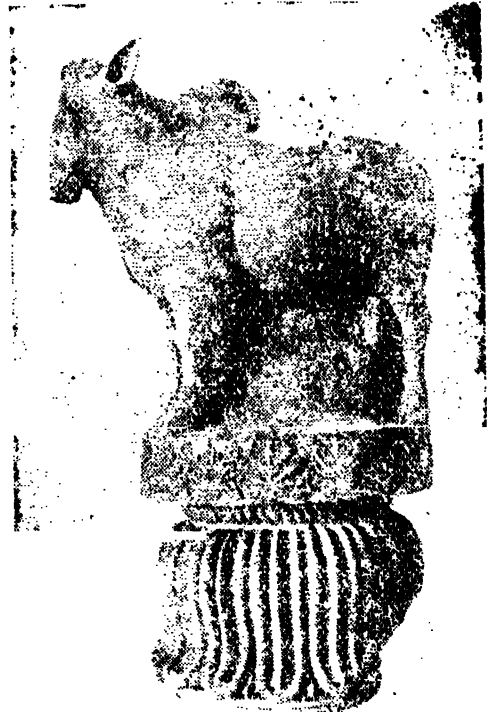
সম্রাট কণিষ্কের সময় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এক নূতন রূপ পরিগ্রহণ করে। হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায় বিভক্ত হইয়া পড়ার দরুণ বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক সম্রাট কণিষ্ক জালালাবাদে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের এক সভা আহ্বান করেন এবং উক্ত সভায় মহাযান মতবাদ স্বীকৃত হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরায় নবশক্তি ও প্রেরণা লাভ করে। শিল্পের দিক দিয়া মহাযান মতবাদ প্রবর্ত্তন এক নবযুগের সূচক। কারণ, হীনযান মতে বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মহাযানীদের মধ্যে বিভিন্নরূপে বুদ্ধের মূর্ত্তির নানা ভাবে প্রকাশ করিবার এক গভীর উৎসাহ দেখা যায় এবং সেই কারণে সাক্ষাৎ ভাবে এ যুগে বুদ্ধের মূর্ত্তির ব্যাপক প্রকাশ ঘটিয়া থাকে।

এ যুগের শিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে পশ্চিমে গান্ধার, মধ্যভারতে মথুরা এবং দক্ষিণে অমরাবতী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগের কারখানায় তৈয়ারী করার মত কুষাণ যুগে উপরোক্ত শিল্পকেন্দ্রসমূহে অসংখ্য বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের দেব-দেবীর ও অন্যান্য মূর্ত্তি তৈয়ারী হয়।

প্রাচীন কালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পেশোয়ার জিলা গান্ধার অঞ্চল নামে খ্যাত ছিল। সুদূর অতীত কাল হইতে এই অঞ্চলটি ভারত, পারস্য ও গ্রীক সভ্যতার মিলন ক্ষেত্র। ইহার ফলে এই অঞ্চলে যে ফিরিঙ্গী শিল্প গড়িয়া ওঠে তাহা গান্ধার শিল্প নামে খ্যাত। গান্ধার শিল্প সম্ভবতঃ ২য় খৃঃ-পূঃ কাল হইতে আরম্ভ হয় এবং প্রায় ৫০০ বৎসর ধরিয়া গ্রীক ও রোমান শৈলী শিল্পের আদর্শে ও ভারতীয় ভাবধারায় অসংখ্য বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির মূর্ত্তি এই অঞ্চলে তৈয়ারী হয়। বহির্দেশের নিখুঁত প্রকাশ চেষ্টার আধিক্য বশতঃ ভারতের ধ্যানমগ্ন অন্তর্মুখী ব্যঞ্জনা গান্ধার শিল্পে আদৌ বিকশিত হয় নাই। কাহারও কাহারও মতে গান্ধারেই প্রথম বুদ্ধমূর্ত্তির সূচনা হয়, কিন্তু এ কথা সত্য নহে। মথুরা ও গান্ধারে একই সময় বুদ্ধমূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করে।

গৌতমবুদ্ধ : গান্ধার

গান্ধারের ন্যায় মথুরাকে কেন্দ্র করিয়া এ যুগে যে শিল্পবেদ্ম গড়িয়া ওঠে তাহা মথুরা শিল্প নামে খ্যাত। মথুরা কেন্দ্রের তৈয়ারী অসংখ্য লাল পাথরের বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন দেব-দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া যায়। দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি গান্ধারের মূর্ত্তির মত নাটকীয় ভাবের আধিক্যে অপূর্ব না হইলেও ভারতীয় ভাবধারার সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি বহে। দেব-দেবীর মূর্ত্তি ব্যতীত সাময়িক চিত্র সকল জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য গতি ও লাস্যময় ভাবের প্রকাশে সার্থক ও সম্পূর্ণ। শক কুষাণ রাজাদিগের প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সকল এ যুগের বিশেষ দান।

দক্ষিণ-ভারতের কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত অমরাবতীর শিল্প সত্যই ভারত-শিল্পের অমরাবতী। সাদা মার্ব্বেল পাথরের তৈয়ারী অমরাবতী ও নাগার্জ্জুনী কোণ্ডার স্তূপের গাত্রে ক্ষোদিত যে সকল মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা শৈলীশিল্পের মান অনুযায়ী মথুরা ও গান্ধার শিল্প হইতে উন্নত ধরণের এবং মোহিনী শক্তি ও রাগাত্মক ভাবের প্রভাবে অনুপম। অমরাবতী ও নাগার্জ্জুনী কোণ্ডার স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি অপূর্ব্ব সরস মোহিনী শক্তির লাস্যময় প্রকাশ। এই অঞ্চলের প্রথম যুগের শিল্প ভেঙ্গী শিল্প নামে পরিচিত এবং ইহা সাঁচী ও ভারতের সমসাময়িক।

চতুর্থ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে (৩২০ খৃষ্টাব্দ) মগধে গুপ্তরাজবংশের অভ্যুদয় এক স্মরণীয় ঘটনা। গুপ্তযুগে ধর্ম্ম, সাহিত্য, চারুকলা, বিজ্ঞান ও সমাজ-জীবনের যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও বিকাশ ঘটে তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীন, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, মালয় ও পূর্ব্ব-উপদ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ সকল স্থাপিত হয় এবং ধর্ম্ম, শিল্পকলা, সাহিত্য ইত্যাদির আদান-প্রদান দ্বারা এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা গড়িয়া ওঠে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ গুপ্তযুগে এশিয়ার সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র পরিগণিত হয়।

গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা শুরু হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল স্রোত তখনও অব্যাহত। সে কারণ এই যুগে বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-শিল্পের প্রসার ঘটে।

যখন প্রাচীন জ্ঞানমার্গ ও বৌদ্ধ নীতিমার্গ প্রবল ছিল, তখন সাধকগণের মধ্যে যাহারা নিম্নঅধিকারী, তাহারাই কেবল রসতৃষ্ণার তৃপ্তিসাধনের জন্য শিল্পের আশ্রয় লইত। কুষাণ ও গুপ্তযুগে ভক্তির প্রচার শিক্ষা-দীক্ষা সমন্বয়ের বিশেষ সহায়তা করে এবং এই ভক্তিস্রোত সাকার ধ্যান ও পূজাকে সারা সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাইয়া উচ্চাঙ্গ শিল্পের অভ্যুদয় সাধন করে। এ যুগের শিল্পই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিভিন্ন যুগে শিল্পে যে সকল অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহা গুপ্তযুগের ভক্তিস্রোতের প্রাবল্যে, ধ্যানের গম্ভীর রসে ও বীর্য্যবত্তায় এবং সংযমের সুস্থির বন্ধন-ডোরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুন্দর ও সম্পূর্ণ মানব-দেহের মধ্য দিয়া দেহাতিরিক্ত ভাব প্রকাশ চেষ্টায় এই যুগের শিল্পীরা সার্থক হন।

অঘোর প্রকাশ

(স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী)

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"তোমার হাতের বেদনার দান"

তোমাকে নিজে মীমাংসা করিয়া অনেক সময় কায করিতে হইত। কায করিতে হইলেই তো ভুলও হইয়া থাকে। ভুলও হইতে লাগিল। জ্ঞানের তারতম্য ছিল বলিয়া তোমাতে আমাতে একটু অমিলও হইতে লাগিল। তখন মনে হইত, দু'জনার মধ্যে এক জনার আমিত্ব একেবারে চলিয়া গেলে তবে সামঞ্জস্য হইবে। তোমার ২১শে মে ১৮৯৫ তারিখের দৈনিক ইহার প্রমাণ। "আজ সকাল হইতে মনটা বড় চিন্তাযুক্ত। এই প্রশ্ন হইতেছিল, আমি কি খারাপ হইয়া গিয়াছি? আজ কয় সপ্তাহ হইতে মনে বড় ঝড় চলিতেছে। আজ তাই এই কথা মনে হইল। দয়াময়ী মা উপাসনায় বলিয়া দিলেন, 'তোমাকে ১০ বৎসর বয়সের সময় যে ধন দিয়াছিলাম, সেই ধন হারাইয়াছ। আমিত্ব হারাইয়া চির অধীন থাকিবে বলিয়াছিলে,— এখন তুমি স্বাধীন হইয়া সকল কায কর। মত হইয়াছে তোমার, বিচার কর তুমি, এই জন্য এত ঝড় বহিতেছে।' বুঝিলাম কারণ! প্রার্থনা আজ এই হইল, 'আমিত্বের ধূঁয়ায় আমাকে ঘিরিয়াছে। মা আমাকে আমিত্ব হ'তে বাঁচাও, আবার আমাকে অধীন কর। মনে বড় বিচার উঠিতেছে। সদাই যেন সকল বিষয়ে বিচার আসে, আর মন অশান্ত হয়।" ৩০শে মে লিখিয়াছ, "আমার মনে বড়ই ঝড় চলিতেছে; কিছুই পরিষ্কার হইতেছে না। আমি কি কাহারও ধর্ম্মের বাধা হইতেছি? কেন আমার মন এমন ব্যাকুল? চিন্তা এত প্রবল যে শরীর সুস্থ হইতে পারিতেছে না। কি করি মা, বল।"

তোমারও যে অবস্থা আমারও তাই হইয়াছিল। আমার ডায়েরী দেখ। "ঘোরীর সঙ্গে এত অমিল হয় কেন? আমিত্ব যায় নাই বলিয়া। মনে কেন এত অশান্তি হয়? ইহার কারণ কি বুঝিতে পারি না। সেই বুঝিবার ক্ষমতা দাও। ঘোরীর সঙ্গে বৈরাগ্য বিষয়ে অনেক কথা হইল। একেবারে সমুদয় অর্পণ করিতে না পারিলে নির্ব্বাণ হয় না। নির্ব্বাণ না হইলে মিলন কিরূপে হইবে? যেন সর্ব্বস্ব দিতে পারি। সন্ধ্যার সময় মিলনের বিষয় অনেক কথা হইল। শরীরের মিলন তো আমি চাই না। তাহা সহজ। আত্মার মিলন দাও।" দু'জনার একই মত, একই সুর, একই অভাব। ভালবাসা ছিল, মিলন ছিল, কিন্তু কি যেন একটা অভাব যেন এক বাজনা বাজিতেছে না, একটু একটু বেসুর হইতেছে, বেতাল বাজিতেছে। লোকে বলিত, খুব মিলন ইহাদের মধ্যে। আমি যখন বিহটা রাজকার্য্যে চলিলাম, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে আসিলে। এত নিকটে, কিন্তু মাঝখানে যেন এক একটা পাহাড় রহিয়া গেল।

তোমরা ১লা জুনের দৈনিকে লেখা আছে, "কাল সন্ধ্যার সময় উভয়ে মিলন বিষয়ে অনেক কথা হইল। আজ সকালে ৬।০ টার সময় উপাসনা হইল। খুব ভাল উপাসনা, প্রার্থনা মিলন বিষয়ে। আত্মার মিলন যাহাতে হয় সেই পথ দেখাইয়া দেও।" আমার ডায়েরীও তাই বলিতেছে, "অতি মিষ্ট উপাসনা। রিপু বর্ত্তমান অথচ এমন ভাল উপাসনা। আমার প্রার্থনা, ঘোরীর সঙ্গে মিল অত্যাবশ্যক। ইহাতে যদি জ্ঞান ভুলিয়া যাইতে হয়, প্রেম লুকাইতে যদি হয়, তাহাও করা আবশ্যক। মা! তুমি আমার সকল কাড়িয়া লও।"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে দু'জনে মতভেদ হওয়াতেই বড় কষ্ট পাইতাম। তখন তুমি স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছ; স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে গেলে মতভেদ অনিবার্য্য। কিন্তু তখন এরূপ হইলে দুই জনেরই মনে বড় তীব্র যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। সত্য সত্যই মনে হয়, এই সময়ে আমাদের যতটা আমিত্ববিহীন হওয়া উচিত ছিল, তাহা আমরা হইতে পারি নাই। পরস্পরকে স্বাধীনতা দিতে হইলে আমিত্ববিনাশ ভিন্ন আর পথ নাই।

জুলাই মাসে মসৌঢ়ি গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া দু'জন বেশ ভাল ছিলাম। দু'জনে একত্র মিলিয়া সামান্য কোনও কায করিতে পারিলেও কেমন পবিত্র আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা সেখানে গিয়া দেখিলাম। মসৌঢ়ির আমবাগানে দু'জনে একত্রে গেলাম। একত্রে আম পাড়িলাম। আমি বলিলাম, "তুমি গাছে চড়িতে পার?" তুমি বলিলে, "হাঁ পারি। কিন্তু কিছু মন্দ নয় তো?" আমি বলিলাম, "না; চড়।" তার পর তুমি গাছে চড়িলে। আমার বড় আমোদ হইল।

এইরূপে কখনও মতভেদের জন্য কষ্ট, কখনও বা একত্র কায করিয়া আনন্দ, এই ভাবে এই বৎসর চলিতে লাগিল। দু'জনের মধ্যে কষ্টের কয়েকটা স্থায়ী কারণও ছিল। তোমার জ্ঞানের অল্পতাবশতঃ তুমি সব সময় মনের ক্লেশে থাকিতে। যদি আমি কখনও কোনও বন্ধুর সঙ্গে ইংরাজিতে আলাপ করিয়া সুখী হইতাম, অমনি তুমি সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে ও বলিতে, "দু'জনের বিদ্যা সমান না হইলে বিবাহ হওয়া উচিত নয়।" আমি যদি কাহারও সহিত আলাপে বা প্রসঙ্গে অনেক সময় কাটাইতাম, ও যদি তোমার মনে হইত যে, তোমার প্রাপ্য সময় বা মনোযোগ আমি অপরকে দিতেছি, তাহাতে তোমার মনে বড় কষ্ট উপস্থিত হইত। একবার পঞ্জাব হইতে আগত একটি ধর্ম্মপ্রাণ ভাইকে (মঙ্গল দেওজীকে) পাইয়া আমি তাঁহার সঙ্গে কয়েক দিন অনেক সময় কাটাইয়াছিলাম। ইহাতে তুমি অসুখী হইয়াছিলে। শরীরের সম্বন্ধ ত্যাগের সংগ্রামও তোমার পক্ষে অতিশয় কঠিন হইতেছিল। আমার ইচ্ছা হইত যে, আমার শরীরের প্রতি তোমার কিছুই টান না থাকে; তাই প্রস্তাব করিলাম যে, একেবারে পরস্পরের শরীর স্পর্শ করিব না। তুমি ইহাতে অসুখী হইয়াছিলে। যখনই মনে করিতে যে, আমার শরীরের জন্য তোমার যতটা টান আছে, তোমার শরীরের জন্য আমার ততটা নাই, তখন তোমার মনে অতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হইত।

এ সকল সংগ্রাম অন্তরেই থাকিত; এ সকলের জন্য বাহিরের কোনও কাজে বাধা উপস্থিত হইত না। কিন্তু এ সকলের জন্য তোমার ভগ্ন শরীর আরও ভগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল। লোকে আমাকে কত মন্দ বলিতে লাগিল যে আমি তোমাকে অতিরিক্ত খাটাইয়া তোমার শরীর নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি, কিন্তু তুমি কোনও কাজ ছাড়িতে চাহিতে না। কারণ, যতক্ষণ মায়ের সেবার জন্য উৎসাহ প্রজ্বলিত থাকিত ততক্ষণ এ সকল সংগ্রাম মনকে অধিকার করিতে পারিত না। যখনই বাড়ীতে কোনও অতিথি আসিতেন, কিংবা তোমাকে পরসেবার জন্য অন্যের বাড়ীতে যাইতে হইত, তখনই তোমার মুখ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইত।

এ বৎসর তোমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যন্ত্রণার দিন গিয়াছে ৪ঠা আগষ্ট। এই দিনের দৈনিকে লিখিয়াছ, "মা, আমি জানিতাম, আমায় কখনও পরীক্ষায় ধরিবে না, সুখ ভিন্ন দুঃখ কখনও আমাকে ছুঁইবে না, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব। আমাকে পরীক্ষায় ঘিরেছে। আমি ভয় পাইব না। চিরদিন এ পরীক্ষা থাকিবে না। আশীর্বাদ কর, তোমার হাতের পরীক্ষা যাহা আমার মঙ্গলের জন্য এসেছে, আমি যেন আদর করিতে পারি। আমাকে ধৈর্য্য দাও, আশীর্বাদ কর। আজ রবিবার, সকালের উপাসনা দাদুর বাটীতে ছিল। বিকালবেলা প্রায় ৩টার সময় স্বামীনের সঙ্গে বাটী ফিরিয়া আসিলাম। একটু বিশ্রামের পর ভাল কথা বলিতে বলিলাম। আজ কয়দিন কয়মাস, বিশেষ আজ সকাল হইতে মনটা যেন কেমন করিতেছিল। আজ ৩।৪ বার তাহা স্বামীনকে জানাইয়াছি। এবারও তাই জানাইয়া ভাল কথা বলিতে বলায় তিনি বলিলেন, 'পরের বিচার করা উচিত নয়।' আমি অন্যের বিচার না করিয়া এই পরিবার কেমন করিয়া চালাইতে পারি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেক কথা হইল। পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার উপাসনা, জীবন, কি নীচ হইয়াছে?" উত্তর—"বুঝিতে পারি না; কিন্তু দৌড়ে যাইতে চাহিতেছি, কিন্তু বাধা পাইতেছি। আমার আর তোমার সহিত চলে না দেখিতেছি।" এই কথা শুনিয়া আমার যে কি অবস্থা হইল ঈশ্বর ভিন্ন নিশ্চয় কেহ তাহা বুঝিতে পারিবে না। একটু পরে ক্ষমা চাহিলাম। স্বামী হাসিয়া বলিলেন, "কোনও দোষ তো মনে হয় না।" বড়ই যাতনা হইতে লাগিল। একটু পরে আবার বলিলাম, "আমি কি তোমার প্রেমের পথের বাধা হইতেছি?" উত্তর—"একটু বই কি!" তখন মাথাটা যেন ঘুরিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। উভয়ে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে বলিলাম, "তুমি সমাজে যাও।" তিনি গেলেন, আমি গেলাম না। আজ যে কথাটা স্বামীনের মুখে শুনিলাম, এই ভাবটি আজ কয়মাস হইতে একটু বুঝিতেছিলাম। যাহাই হউক, আজ আমার কি ভয়ানক ঘন পরীক্ষা! আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর একত্র বাস। যাঁহার সঙ্গে চলিব বলিয়া মা, বাপ, ভাই, বোন, দেশ, আহার, পরিচ্ছদ, পৃথিবীর সকল বিষয় হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছি, আজ সেই মুখে আমার এই অবনতির কথা শুনিয়া মনে হয় সেই সময় একটু জ্ঞানহারা হইয়াছিলাম। আর তো কোনও উপায় নাই। সকল দুঃখের কথা যাঁহার নিকট বলিয়া শান্তি পাইতাম, তাঁহার মুখে যখন এই কথা শুনিলাম, তখন সেই অগতির গতির নিকট গিয়া এক ঘণ্টা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিলাম। বুঝিলাম, তিনি বলেন নাই; মা আমায় শাসন করিলেন। এখন রাত্রি ১১টা, আজ ঘুম নাই। মন ব্রহ্মে বাস করিতেছে। তবে বিছানায় যাই।"

৬ই আগষ্ট তারিখে "মুঙ্গের" নামক গ্রাম হইতে তোমাকে লিখিয়াছিলাম, "মাতৃকন্যা, মায়ের ভালবাসা লইয়া ভবের হাটে, মেলার গোলমালে স্বর্গীয় প্রেম দ্বারা সামান্য মোটা জিনিষ ক্রয় করিয়া আসিতেছ। তাহার মধ্যে অধিকাংশ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, আর আসিবে না। স্বর্গের প্রেম দ্বারা আমার শরীরও মন ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছ, কিন্তু আত্মা কিনিতে পার নাই। আত্মা তবে কিরূপে ক্রয় করা যাইবে? তাহার একমাত্র উপায়,—ব্রহ্মকে লাভ কর, আমার চিরস্থায়ী আত্মাকে লাভ করিবে। এতদিন যে আত্মা ক্রয় করা হয় নাই সে দোষ তোমার নয়, আমারই দোষ। পূর্ব্বেই যদি তোমাকে বলিতাম, তাহা হইলে এ বয়সে তোমার এত ক্লেশ হইত না। যাহা হউক, এখনও অনেক প্রেম অবশিষ্ট আছে, তাহা দ্বারা সূক্ষ্ম পরব্রহ্মকে লাভ করা আশ্চর্য্য নয়। এস, তাহারই চেষ্টায় নিযুক্ত থাকি। অনেক সময় যাহাতে তাঁহাকে স্মরণ হয় এমন কথা বলিব। তাঁহারই কথায়, তাঁহারই সেবায়, দিবানিশি ভুলে থাকি। "মুঙ্গের" এ বিষয়ে খুব সহায়। নির্জ্জন মন্দির মসজিদ্ সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কবে বাড়ী গেলে এইরূপ ভাব মনে উদয় হইবে! এখানকার মনের অবস্থা খুব ভাল। ভগবান তোমাকে এই সুখ শীঘ্রই দান করুন, এই আমার দুই প্রহরের ও সন্ধ্যার প্রার্থনা। তোমার উপর অনেক নির্ভর করিতেছে।" তুমি উত্তরে লিখিলে, "ব্রহ্মপুত্র, তোমার আশীর্ব্বাদপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলাম। কারণ আমি অনুপযুক্ত। তোমার আশীর্ব্বাদ পূর্ণ হউক, মাকে আমি পাই, তোমার আত্মাকে ক্রয় করি, মা শীঘ্র এই করুন। কারণ, আমার যে আর কোন কাজ হবে না যদি তোমার আত্মাকে ক্রয় করিতে না পারি। আমার জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করিও। আশা করি তুমি মার কোলে ভালই আছ। তোমার মন ভাল আছে শুনিয়া সুখী হইলাম। দুঃখ হয়, আমি অনেক সময় তোমার এই সুখের ব্যাঘাত হই, নিজের স্বার্থের জন্য। মা আশীর্ব্বাদ করুন, আমার এই রোগ যেন না থাকে। কেমন করিয়া গৃহে ব্রহ্মকে রাখি, তুমি বাহির হইতে আসিয়া গৃহে ব্রহ্মদর্শন করিয়া শান্তি লাভ করিতে পার, এ বিষয়েও কিছু বলিও। আমার শরীর মন ভাল; আর সব ভাল। এখন আমি জীবব্রহ্মে বেষ্টিত হইয়া এই দু'কলম লিখিলাম। আমার চারিদিকে ৪খান বেঞ্চ। তাহাতে আমার মায়ের আদরের ২৫টি ছোট জীবন-ধন, মধ্যে আমি। যাহা করি প্রতিদিন তাহা সত্য হউক; ব্রহ্মে নিয়োজিত হউক।

ইহার পর তোমার শরীর খারাপ হইতে লাগিল। তখন পত্রে লিখিয়াছিলে, "তোমার সুখ হইলেই আমার সুখ। মা চিন্ময় যোগে যুক্ত করুন, আর কিছু চাই না। আমার জন্য ভাবিও না। যতদিন থাকিবার ও কাষ করিবার দরকার ততদিন আমি নিশ্চয় এদেশে থাকিব। আর সকলে ভাল। মন বেশ আছে। সর্ব্বদাই তোমার নিকট থাকি। অনেক আলাপ করি, সুখী হই। কষ্ট নাই। মা অতি নিকটে সর্ব্বদা থাকেন।"

আর একদিন লিখিলে, "যখন কাষ আসে তখন যেন কোথা

হইতে বলও আসে। আমি আশ্চর্য্য হই যে আমি কেমন করিয়া এত পারি। আমার জন্য প্রার্থনা করিও, আরও তোমার উপযুক্ত হইয়া যেন মরিতে পারি। তোমার সহিত এমন একটা যোগ হইয়াছে, সে যোগে এমন একটা স্মরণ আছে, যাহা কোন সময় মনকে পরিত্যাগ করে না। অশীর্ব্বাদ কর, ব্রহ্মের সহিত সেইরূপ যোগ হউক। ভক্তিপূর্ণ ভালবাসা লও। তোমার সুন্দর পত্রখানি পাইয়া ভাবিলাম, একদিন আর আমার জন্য এ পত্রও আসিবে না। বেশ মন প্রস্তুত।" আর একদিন লিখিয়াছ, "এখন শয়ান অবস্থাতেই তোমার কথা ভাবিতেছিলাম, শরীর না থাকায় মনের কি অবস্থা হয়, যখন শরীর আর আমার নিকট আসিবে না তখন কি অবস্থা হইবে। শরীরে বা কত মিষ্টতা, আত্মাতেই বা কত মিষ্টতা তাই অনুভব করিতেছিলাম। আত্মাকে শরীরের মত স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম; সেই সুখ অনুভব করিতেছিলাম। একটা না থাকিলে আর একটার জন্য মনটা বড় টানে, তাই ভাবছিলাম। তারপর তুমি এখন কি করিতেছ তাই ভাবিলাম।" ২২শে আগষ্ট লিখিয়াছ, "বেশ হইয়াছে। শরীরটা অসুস্থ বলিয়া তোমার সহিত এত বেশী থাকিতে পারিতেছি; শরীর ভাল থাকিলে এ সুখটা আর হইত না। শয়ন করিয়া তোমার বিষয় কতই ভাবি। মা খুব ভালবাসেন বলিয়া চারটি দেওয়ালযুক্ত স্থানেও এ অবসর দিয়াছেন। তুমি গঙ্গার কূলে বসিয়া কত সুখী হইতেছ, আমি পাছে বঞ্চিত হই, তাই আমাকেও শয়ান অবস্থায় রাখিয়া খুব সুখী করিতেছেন। চিন্তা ফেলে উঠিতে ভাল লাগে না। আজ ৮টার সময় তোমার পত্র পাইলাম। একবার মন পত্র চাহিতেছিল, অমনি ধমক দিতেই চুপ করিল। তুমি সুখে দিন কাটাইতেছ, এতে আমার মন কত সুখী ও কত নিশ্চিন্ত, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। ক্ষ [illegible] জান। তোমার ধন হইলেই আমার ঐশ্বর্য্য বাড়িবে। সত্য না? আমার মন ভাল। অনেক সহিয়া আসিয়াছে। এবার কি আমি যাইবার সময় সুখ ভার করিয়াছি? বোধ হয় না। এইরূপে তো হইবে? আমার ভালবাসাপূর্ণ ভক্তি লও।" আর একদিন লিখিয়াছ, "পিকু, আমার জন্য ভাবিও না। আমি ভাল আছি। এই দেশে থাকিয়াই পরলোক যে কিরূপ হইবে তাহার পূর্ব্বাভাস পাইতেছি। মার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। তবে আজ বিদায়।" ২১শে আগষ্ট লিখিয়াছিলে, "স্কুলে আসিবার সময় তোমার মিষ্ট সত্যমাখা পত্রখানি পাইয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর ও মন ভাল। শ্রবণের বেড়া পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ঘন হইয়া আসিয়াছে। আমার দুর্ব্বলতার জন্য তুমি প্রার্থনা করিও। শেষ নিঃশ্বাস যেন মার নামে ফেলিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর।" আর একদিন লিখিয়াছ, "আশীর্ব্বাদ কর, চিরকাল যেন তোমার মুখাপেক্ষা করিয়া সঙ্গে চলিতে পারি। তোমার সহিত চলিতে চলিতে যদি এই লোক ছাড়িতে হয়, আমার স্বর্গ হইবে। ১০ বৎসর বয়সে যে ব্রত মা জননী অজানিতরূপে আমাকে দিয়াছিলেন, সে ব্রত যেন আমার উদ্‌যাপন হয়। পিকু, তুমি অবশ্যই জান, আমি আর কোন আশা রাখি না। একটি লোক আপনাকে হারাইয়া কেমন করিয়া অন্যের সহিত মার নামে মিশিতে পারে, এই আমার কাজ। মা কবে সেদিন দেবেন! তাহারই জন্য এত বহন করা। যখন উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই, তখন শরীর মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। মনে হয় যেন আর চলে না। আবার যিনি চিরদিন আশা দেন তাঁহার দ্বারা চালিত হইয়া আমি বল পাই। যাক্, তুমি যে এত সুখে দিন কাটাইতেছ, শুনে বড়ই সুখ হইতেছে। তোমার সুখে আমার সুখ। মা বুঝি চান না যে তোমার শারীরিক সুখ হয়, তোমার সঙ্গে আমার শারীরিক সম্বন্ধ থাকে, তাই হয়তো এইরূপ ঘটনা করিতেছেন। এক ঘণ্টার পথে থাকিয়াও তুমি আমার শারীরিক কোন অবস্থা বুঝিতেছ না। মন বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে, চিন্ময় যোগের জন্য। একটা কিছু না হইলে মন শান্ত হইতেছে না। কাল ৫টা হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত তোমাকে দেখিবার জন্য বড়ই প্রাণ কেমন করিতেছিল, কেন তা জানি না। পত্র পাইলে বুঝিলাম, ঐ সময় তুমিও আমাকে স্মরণ করিতেছিলে। অজানিত রূপে দু'টি আত্মা দু'টি আত্মাকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাই ওরূপ হইতেছিল বুঝি।"

দেবি, আমার জন্য তোমার মুখাপেক্ষা চিরকালই ছিল, এখনও আছে। আমার সঙ্গে চলিবার আকাঙ্ক্ষা বড়ই প্রবল ছিল। সত্য সত্যই আমার সঙ্গে চলিবার জন্য দৌড়তে। প্রথম জীবনে অনেক কাল বৃথা গিয়াছে বলিয়া শেষ জীবনে এত দৌড়িতে হইত। ১০ বৎসরের সময় হইতে এই মিলন ব্রত লইয়াছিলে, একদিনও সে ব্রত ভঙ্গ কর নাই। আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। ক্ষণেকের জন্য উদ্দেশ্য ভুলিলে মিলন ভাঙ্গিত, আবার স্বর্গের সুধাপান করিয়া আপনার ব্রত রক্ষা করিতে। শরীরের রোগ পূর্ব্বেই কমিয়াছিল, এখন শান্ত মনে তাহার স্থানে আত্মার যোগ স্থাপন করিতে লাগিল।

২৪শে অক্টোবর লিখিয়াছ, "কাল তুমি গাড়ীতে কি বিষয় ভাবিলে, এবং ওখানে গিয়াই বা কি বিষয় ভাবিলে, শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি সমস্ত গাড়ী তোমার অনাসক্তির কথাই ভাবিলাম। বাটী আসিয়া শয়ন করিয়া ঐ কথা ভাবিলাম। যদি তোমার শরীর ছাড়িয়া এ দেশে থাকিতে হয়, কি ভাবে কিরূপে থাকিব তাই ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা গেলাম।"

৬ই নভেম্বর তোমার শরীর বড়ই ভাঙ্গিয়া পড়িল। তোমাকে লইয়া দানাপুরে আসিলাম। তার পর দিন মধুসূদনপুরের গঙ্গাতীরের বাটীর বাগানে দুই জনা উপাসনা করিলাম। অবশ্যই তোমার মনে আছে। কেমন বিভূতি শূন্য উপাসনা, চক্ষের জলের সঙ্গে কেবলমাত্র স্বরূপগুলি উচ্চারণ করা; এ উপাসনা তোমারও খুব ভাল লাগিল। এমন উপাসনা কখনও শুন নাই। সন্ধ্যার সময় আবার তোমার সঙ্গে সদালাপ। ৮ই নভেম্বর জ্বর লইয়া আবার উপাসনায় গেলে। বিভূতিশূন্য উপাসনা হইয়াছিল, তুমিও খুব সুখী হইয়াছিলে।

সরোজিনীর খোকা তোমার কাছে পরলোক আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়া গেলেন। তোমার দৈনিকে লেখা আছে, "আজ প্রিয় খোকার শেষ উপাসনা হইল। প্রার্থনা হইল, শিশু আমার গুরু হইয়াছেন। পরলোকের নিকট করিয়া দিয়া গেলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে স্থায়ী সম্বন্ধ হয় নাই তাহাও বুঝাইয়া দিয়া গেলেন। আমি তাঁহার নিকট ঋণী হইলাম।" আর একদিন প্রার্থনা করিয়াছিলে, "খোকা যেমন সূর্য্য দেখিয়া একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন, আমার তো সেরূপ তোমাকে দেখে হয় না।

সেইরূপ যাহাতে হয়, তাই কর।" সরোজিনীকে কলিকাতায় পাঠাইবার সময় প্রার্থনা করিলে, "মা তুমি সরোর ছেলে হ'য়ে কোলে উঠে যাও। চিন্ময় খোকাকে যেন আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই।"

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আপন আলয় মুখে

১৮১৬ সালের মাঘোৎসবের জন্য কিরূপে প্রস্তুত হইতেছিলে, তাহা তোমার ২২শে জানুয়ারীর দৈনিক পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। তুমি লিখিয়াছ, "ভাই বোনের নিকট পাপ স্বীকার না করিলে, তাঁহারা এক বৎসরের অপরাধ ক্ষমা না করিলে, উৎসবে মা দেখা দিবেন না। কিন্তু ছোট বড় সকলের নিকট পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা বড় কঠিন, তাই বল ভিক্ষা করিলাম। উপাসনা হইতে উঠিয়া সকলকে পায় ধরিয়া ক্ষমা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা হইল।" উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতেছ, এমন সময় সংবাদ পাইলে যে কোনও প্রতিবন্ধক বশতঃ গগোলের ভাইবোনেরা উৎসবে আসিতে পারিবেন না তুমি লিখিলে, "গগোল ছাড়িয়া উৎসব করিতে কি ক্লেশ, তুমি জান। যাহারা প্রতিবন্ধক তাহাদের অনুতাপ দেও।" ২৬শে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব? স্থান—সমাজ মন্দিরের প্রাঙ্গণ। এবার হাতে পয়সা ছিল না, তাই সকালের উপাসনার পর তুমি ভিক্ষা করিলে। দু'টি ছোট ছোট মেয়ে আর নিজে তুমি গৈরিক বস্ত্রে আবৃত হইয়া উৎসব-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া একটি প্রার্থনা করিলে। হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা। অমন প্রার্থনা আর তোমার মুখে শুনিয়াছি কি না সন্দেহ। অমন রূপ ২ ৩ বার দেখিয়াছি মাত্র। ভিক্ষুণী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, সুতরাং তোমার সেই বেশ অতি সুন্দর মনে হইতে লাগিল। শরীরের রূপ তো বিশেষ কিছু ছিল না, স্বর্গের ভাব তোমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়াছিল। সেই ভাব তখন ফুটিয়া পড়িতেছিল, সুন্দর ব্রহ্মরূপে তুমি নিমগ্ন হইয়াছিলে। নারী যদি এই রূপ লইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, পৃথিবীতে আর পাপ তিষ্ঠিতে পারে না। হাতে ভিক্ষার ঝুলিও সেইরূপ সুন্দর দেখাইতেছিল। কেহ বা সিধা, কেহ বা পয়সা দান করিলেন। উপাসনার পর প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে আমাকে ডাকিয়া হাতে সোনার বালা দেখাইলে। যখন তুমি অলঙ্কার ও কেশত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হও, তার পর একদিন আমি বলিয়াছিলাম, "সকলই তো হইল, এখন আবার কেশ রাখ।" তুমি বলিয়াছিলে, "আর কেশ বড় করিতে পারিব না, বড় ভার বোধ হয়।" আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, "তবে অলঙ্কার পর।" তুমি তখন বলিয়াছিলে, "আচ্ছা, একদিন পরিব।" আজ উপযুক্ত সময়ে, ভিখারিণী বেশধারণের অব্যবহিত পরে তোমার সে অঙ্গীকার পূর্ণ করিলে। ভিক্ষান্ন প্রস্তুত হইল, আনন্দে সকলে আহার করিলেন। তারপর তোমার শেষ আনন্দবাজার করিলে। দোকানগুলি বেশ চলিল। নিয়ম করিয়াছিলে যে প্রত্যেক বস্তুর মূল্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে; পরস্পর কেনা-বেচা করিবে কিন্তু মূল্য চাহিতে পারিবে না। পান ও সরবৎ বেচিয়া অনেক লাভ হইয়াছিল, তাহা হইতে সব খরচ কুলাইয়া যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছিল তারও শোধ হইল। ২৭শে জানুয়ারী আত্মিক বিবাহের উৎসব। এই দিনে রাজগৃহে তোমার আর আমার আত্মার বিবাহ হইয়াছিল। বাৎসরিক ব্যাপার মনের মানুষদের সঙ্গে একত্রে করিবে, তাই গগোল গেলে। সমস্ত রাত্রি ভাল কথাবার্ত্তায় কাটিয়া গেল।

ইহার পর রাজগৃহ যাত্রা হইল। তুমি বলিলে "যাত্রীর সুখের জন্য প্রাণ, মন, অর্থ সব যেন দিতে পারি; পশ্চাতে থাকিয়া। রাজগৃহে গিয়া দুই প্রহরে বেড়াইতে যাইতে। রাত্রিতে একাকী ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান তোমার বড়ই ভাল লাগিল। পরে আমিও গিয়া স্নান করিলাম। যেন এই শেষ স্নান; সেই নির্ম্মল জল, পূর্ণিমার পর চতুর্থীর চন্দ্রের কিরণ বিশুদ্ধ জলে পড়িয়াছে; পাহাড় নীরব; এমন স্থানে মানুষের বাদ-বিসম্বাদ হইতে বিদায় লইয়া ঈশ্বরের ভাবে পূর্ণ হইয়া শীতকালের রাত্রে স্নান,—ইহা সম্ভোগের বিষয়। তাই তুমি লিখিয়াছিলে, "উপযুক্ত ভালবাসায় নির্জ্জন সম্ভোগ।" সেই জন্যেই তুমি প্রার্থনা করিলে, "যাঁহা দ্বারা তোমাকে পাইয়াছি, কিছু কিছু শিখিয়াছি, তাঁকে যেন ভক্তি করিতে পারি।" ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু মহাশয় সকালের উপাসনা তোমাকেই করিতে বলিলেন। তুমি অপ্রস্তুত, তবুও হাসিমুখে মাথা পাতিয়া লইলে। তুমি অধিকার পাইয়া আবার আমাদের সকলকে এক এক স্বরূপে আরাধনা করিতে বলিলে। আমরা তিন জন তিন স্বরূপে আরাধনা করিলাম, বাকি সকল স্বরূপ তুমিই করিলে। খুব ভাল হইল।

রাজগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ফেব্রুয়ারী মাসে আমার সঙ্গে একবার বিহটায় গিয়াছিলে। বিহটা হইতে শরীর ও মন ভাল করিয়া ফিরিলে। তোমার দৈনিকে লিখিয়াছ, "আজ বিহটা হইতে আসিলাম। দুইবার উপাসনা আজও হইয়াছে। খুব ভাল হইল। শাশুড়ী পুত্রের কাছে অনেক দুঃখ করিলেন,—আমি তাঁর কিছু করিতে পারি না। তাঁহার ধর্ম্মও এক প্রতিবন্ধক। আমি পারি না বলিয়া স্বামীর একটু ক্লেশ হয়।" তবু তুমি তাঁহার সকল আবদার সহ্য করিতে। অন্যত্র যাইতে চাহিলে তুমি বাধা দিতে ও বলিতে, "হাজার হউক, আমাদের মত মায়ের আর বেহ করিতে পারিবে না।" তোমার অন্তর্ধানের পর তিনি এই কথাগুলি উল্লেখ করিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ৩ ৪ বার উপাসনা হইল। আমার শরীরটা ভাল ছিল না, তুমি সামাজিক-উপাসনা গৃহেই করিলে। ২০ জন ছোট-বড় মেয়ে যোগ দিলেন। খুব ভাল উপাসনা। রোগীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া উপাসনা করিলে রোগীর বিশেষ সেবা করা হয়। এ সেবায় যেন কেহ বঞ্চিত না হয়।

এই সময়ে তোমাকে যেমন নিয়মিত গুরুতর শ্রম করিতে হইতেছিল, তেমনি মানসিক অনেক সংগ্রামও বহন করিতে হইতেছিল। সে কথা আগামী পরিচ্ছেদে বলিব। আমার মনে হয়, তোমার শরীর এ সময়ে এত অপটু হইয়া গিয়াছিল যে, এত শ্রম ও এত সংগ্রাম বহন তার পক্ষে অনুপযুক্ত। অন্তরের সংগ্রাম সহিবার জন্যও স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। বাহিরের কার্য্যভার বহনের জন্যও স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। তোমার স্বাস্থ্য ইহার পূর্ব্বেই ভিতরে ভিতরে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

মার্চ্চ মাসে বোল্টন সাহেব চীফ সেক্রেটারী হইয়া কলিকাতায় যাইতেছিলেন। যাইবার পূর্ব্বে তোমার প্রিয় মেয়েদের বিদ্যালয় দেখিতে আসিলেন। এক ঘণ্টা ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী পরীক্ষা

করিলেন। মিঃ ডি. এন্ মল্লিক ছিলেন, আমিও ছিলাম, এক কোণে তুমিও তোমার অপূর্ব্ব গোয়ালিনীর সাড়ী পরিয়া দাঁড়াইয়াছিলে। সাহেব আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিলেন না; তোমার কাছে গিয়া বলিলেন, "বিদ্যালয় দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। বিলাতে এবং ভারতবর্ষে এ সকল কায কুমারী কিংবা বিধবারাই করিয়া থাকেন। স্বামী পুত্র লইয়া এত কায হাতে লইয়াছেন, এমন আর দেখিতে পাই না।" তুমি বলিলে, মহারাণীর প্রতিনিধি হইয়া আপনি যে আমাদের এই সামান্য বিদ্যালয় পরীক্ষার জন্য এত সময় দিলেন ও সন্তুষ্ট হইলেন, ইহাতেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।" এই কথা বলিয়াই এক প্রণাম করিলে। সেই পাদরী সাহেবের শেকহ্যাণ্ড করার পর হইতে সাবধান হইয়াছিলে বলিয়া দূর হইতেই প্রণাম করিলে; সাহেবও নমস্কার করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

৮ই মার্চ্চ মেয়েদের স্কুলের প্রাইজ হইল। সকলের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। যাঁহাদের চরিত্র খুব ভাল নয়, তাঁহারাও আসিয়াছিলেন, এই জন্য অনেকে চটিলেন। একটি বালিকা আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতেও অনেকের আপত্তি। তুমি কিন্তু ইহাতে দমিলে না। তুমি লিখিলে, "যতই বকুন কাজ কিন্তু ছাড়িব না, এই প্রতিজ্ঞা।" এই দুই ব্যাপারে তোমাকে যে পরিশ্রম করিতে হইল, তাহাতে শরীর আরও ভাঙ্গিয়া গেল।

৩১শে মার্চ্চের দৈনিকে লিখিয়াছ, "আজ স্কুল কমিটিতে কথা হইল, গবর্ণমেণ্টকে বলা হইবে স্কুল হাতে লইতে। আজ গাড়ীর খরচের জন্য গবর্ণমেণ্ট (special grant) ১৬৮৲ টাকা দিলেন। স্কুল যখন আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন শিষ্টে ৫টি মেয়ে। কেবল প্রার্থনা ভরসা ছিল। আজ সেই প্রার্থনার ফলে স্কুলে প্রায় ৪০টি মেয়ে। অপরিচিত বাবুরা আসিয়া কার্য্যভার লইয়াছেন; আমাদের অবসর দিতে চান; টাকা অনেক; এখন স্কুল ধনী। এ সকলই প্রার্থনার ফল। তাই বলি, মা আমায় আরও প্রার্থনাশীল কর, আরও বিশ্বাসী কর। এই ভিক্ষা চাই, পরিবারকেও বিশ্বাসী কর।"

৫ই এপ্রিল ১৮৯৬ আমাদের প্রিয় ব্রজগোপাল সংসার ত্যাগ ও প্রচারক ব্রত গ্রহণ করিলেন। তোমার উপাসনা-গৃহে আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। তুমি ও আমি আশীর্ব্বাদ করিলাম।

২০শে এপ্রিল কথায় কথায় শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্রের বিবাহের কথা উঠিল। তুমি বলিলে, বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে যদি সুবোধ বিবাহ করিতে চাহেন, তাহা হইলে বারণ করিবে। কি আশ্চর্য্য! কোথাও কিছু নাই, টাকার সঙ্গতি নাই, অথচ মনে মনে তুমি ঠিক করিয়াছ, সুবোধ বিলাত যাইবে। বিশ্বাসী লোক আসমানেতে বানায় ঘর! দেখি, তোমার সে সাধও পূর্ণ হইয়াছে।

২৭শে এপ্রিল শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেনের কন্যার কলেরা হইল। সকলে সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। তুমিও সেবা করিতে লাগিলে। একদিকে উমাচরণ বাবুর কন্যার পীড়া, অন্যদিকে ভাই বিহারীলাল ঘোষের কন্যা হেমের সহিত মিঃ ডি. এন মল্লিকের বিবাহ স্থির হইল। এ কন্যার বিবাহের ভার তুমিই গ্রহণ করিয়াছিলে। ১৫ই মে কন্যার আইবুড়াভাত ও বর ও কন্যার দীক্ষা সম্পন্ন হইল। তা'র পরদিন বিবাহ। সেদিন সন্ধ্যার সময় ময়রা আসিয়া বলিল, তাহার পীড়া হইয়াছে, সে লুচি প্রস্তুত করিতে পারিবে না। তখন অন্য বন্দোবস্ত করার আর সময় নাই। আমার চিরদিনের মন্ত্রীর কাছে মন্ত্রণা চাহিলাম। মন্ত্রী বলিলেন, "ভাবিও না, আমরাই করিব।" উপস্থিত মেয়েদের সাধ্য-সাধনা করিলে; কিন্তু বিবাহ-সভা ত্যাগ করিয়া কে লুচি ভাজিতে আগুনের নিকট দুই ঘণ্টা বসিয়া থাকে? অবশেষে কি করিবে, ভৃত্যকে উনুন প্রস্তুত করিতে বলিলে, এবং নিজেই ভাজিতে আরম্ভ করিলে। দুই শত লোকের জন্য লুচি প্রস্তুত করা সহজ নয়, কিন্তু তোমার উৎসাহ অদম্য। বিবাহ শেষ হইতে না হইতে লুচি প্রস্তুত হইল, কেহ জানিতেও পারিল না কেমনে, কোথা হইতে অথবা কে প্রস্তুত করিল।

রেজিষ্ট্রেশন শেষ হইতে না হইতে একটু কষ্টের ব্যাপার ঘটিল। সে বিষয় তোমার দৈনিক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "ডাক্তার বাবুর বাটীতে আজ (১৬ই মে) হেমের বিবাহ। মেয়েদের আমোদের জন্য সাহেব জামাতার হাতে সিন্দুর দিয়া কন্যাকে পরাতে যাওয়া হয়। শ্রদ্ধেয়—বাবু—বাবুর উত্তেজনায় অধীর হইয়া নারীদের অপমানসূচক ধমক দিয়া জামাতাকে বাহিরে লইয়া যান। বলেন, সিন্দুর পরান কুসংস্কার। আমার শান্তিভঙ্গ হইল। আমি রাগ করিলাম, কারণ আমার জীবনে নারীকে নিজস্থানে স্থান দিবার জন্য প্রাণপণ। বলিলাম, আপনারা আমার সিন্দুরের মত অনেক কুসংস্কার করিলেন। এই ঘটনায় বুঝিলাম, এখনও নারীর স্থানের অনেক দেরী। এই বিষয়—বাবুকে বলিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু মন গরম ছিল বলিয়া স্বামীন বারণ করিলেন; আর বলা হইল না।" সেদিনকার কথা আজিও আমার মনে জাগিতেছে। যখন সভায় সকল কথা বলিবে বলিয়া আমার অনুমতি চাহিলে, তখন তোমার মুখ লাল এবং উত্তেজিত। যদি তুমি সভায় কিছু বলিতে, তাহা হইলে তার ফল ভাল হইত না। তাই আমি বলিলাম, 'গোলা খা ডালো', আর তুমি সেই তপ্তগোলা হজম করিয়া ফেলিলে। তখনি কথা উঠিল বৌ-ভাত কবে হইবে। বিবাহের পরদিনই বৌ-ভাত হইলে উপর্য্যুপরি পরিশ্রমে তোমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে, আমি তাই আপত্তি করিলাম। তুমি বলিলে, বিলম্ব করিলে মল্লিক সাহেবের অনেক খরচ বাড়িবে। পরদিনেই করা উচিত। আপনাকে হারাইয়া পরের মঙ্গলে জীবন দেওয়া তোমার পক্ষে সহজ হইয়া গিয়াছিল। তোমারই জয় হইল, স্থির হইল পরদিন বৌ-ভাত হইবে।

বিবাহ-রাত্রির সকল ব্যাপারের বর্ণনা এখনও ফুরায় নাই। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আহারের পর তুমি জানিতে পারিলে যে, উমাচরণ বাবু কিংবা তাঁহার স্ত্রী বিবাহে আসেন নাই। তৎক্ষণাৎ থালায় খাবার সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলে। কিন্তু গাড়ী পাঠান হয় নাই বলিয়া তিনি আপনাকে অপমানিত মনে করিয়াছিলেন, সুতরাং খাদ্যাদি ফেরত পাঠাইলেন ও পত্র লিখিলেন, যতক্ষণ এ অপমানের পূর্ণ কৈফিয়ৎ না পান, বিবাহের সামগ্রী লইবেন না! কোন বাটীতে গাড়ী পাঠান হয় নাই, সুতরাং এ বিষয়ে তোমার কোন অপরাধ ছিল না। যাহা হউক, রাত্রি ১১টার সময় তোমাকে লইয়া হাঁটিয়া নিজ বাটীতে চলিলাম। পথিমধ্যে উমাচরণ বাবুর বাটী; তখনও তাঁহারা শয়ন করেন নাই। দেখিবামাত্র তুমি বলিয়া উঠিলে, "দাঁড়াও, আমি একটা মজা করিয়া

আসি।" এই বলিয়াই আর অপেক্ষা না করিয়া উমাচরণ বাবুর গৃহে প্রবেশ করিলে; অপমানের কোনও কথা উল্লেখ করিলে না। পীড়িত কন্যার জন্য রাত্রি জাগরণের কি ব্যবস্থা হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে। তিনি বলিলেন, "আজ তো আর কোনও বন্দোবস্ত নাই, খোকার মাতা ও আমি রাত্রি জাগরণ করিব। যাঁরা অন্য দিন রাত্রি জাগরণের জন্য আসিতেন, তাঁরা আজ সকলেই বিবাহে গিয়াছেন। যদি দু' ঘণ্টার জন্য কেহ থাকিতেন, তাহা হইলে সহজ হইত।" তুমি—"আমাকে বিশ্বাস করিয়া দু' ঘণ্টা সেবা করিতে দিন।" তিনি—"আপনাকে পাইলে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।" তুমি বলিলে, "খোকার মাকে শয়ন করিতে বলুন, কন্যার নিকট আমি জাগিতেছি।" বাহিরে আসিয়া আমাকে গৃহে যাইতে বলিলে। তুমি দুপা পাইয়াই রোগীর শয্যাপার্শ্বে সেবা করিতে বসিলে। সারা দিনের এত পরিশ্রমের পরও সে রাত্রিতে দুইটার পূর্ব্বে বাটী গিয়া শয়ন করিতে পারিলে না।

১৭ই মে বৌ-ভাত হইল। তোমার দৈনিকে লেখা আছে, "আজ হেমের বাটীতে সকলের নিমন্ত্রণ। আমি, হেম, জামাতা, প্রকাশ এক গাড়ীতে যাইতেছিলাম। জামাতা গত রজনীর কথা তুলিয়া অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আমার ভুল হইয়াছে। আগে সকল তত্ত্ব জানিলে আমি সিন্দূর দিতাম। আজ দিব।" আমি বলিলাম, "আর দিতে হইবে না; কারণ কাল মেয়েদের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য বলিয়াছিলাম। আমি নিজে প্রায় ৩০ বৎসর সিন্দূর ছাড়িয়া দিয়াছি, বিধবা সাজিয়া থাকি। এ অবস্থায় যখন আমাকে কুসংস্কারাপন্ন মনে করা হইল, তখন আমি আর সে বিষয়ে আলোচনা করিব না। কিন্তু নারীর অপমানের জন্য এখনও আমার মন অপমানিত। যদি একজন ইউরোপীয়ান নারী হইতেন, তবে কখনও এ ব্যবহার হইত না। যাক্।" এই সকল কথা বলিতে বলিতে মল্লিক সাহেবের বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলে। মেয়েরা পূর্ব্বেই গিয়াছিলেন। কথা ছিল, ৯টায় উপাসনা আরম্ভ হইবে ও ১১টায় আহার হইবে। বাবুরা সন্দেহ করিতেছিলেন যে, ইহা হইয়া উঠিবে কি না! তুমি কিন্তু নির্ভয়। ৮টা উনুন জ্বালিলে, একেবারে ৮ স্থানে রান্না আরম্ভ হইল। সকাল ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে সমুদয় রান্না প্রস্তুত করিয়া উপাসনা বসিবামাত্র তুমি যোগ দিলে। ১১টার কিঞ্চিৎ পরেই গরম পোলাও সকলের পাতে পড়িল। ধরাধামে তোমার এই শেষ রন্ধন, এই শেষ বৌ-ভাত খাওয়ান হইয়া গেল।

এই পরিশ্রমের পর তোমার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তোমাকে লইয়া খগোল যাত্রা করিলাম। সেখানে কেবল উপাসনা ও ভাল কথা হইবে, বিশুদ্ধ বায়ুতে তোমার শরীর সুস্থ হইবে, এই আশা। Canalএর ধারে একটি বাঙ্গালায় অবস্থিতি করিতে লাগিলে। সকালে সন্ধ্যায় বেড়ান হইত, যখন অবকাশ হইত ভাল কথা বলিতে। ২১শে ও ২২শে মে বক্সী বাবুর ও খেলাত বাবুর বাটীতে উপাসনা করিয়া ২৩শে বাঁকিপুর ফিরিলে। ২৪শে মে বাঁকিপুরে ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক হইল। ২৫শে মে মোকামার ভাই-বোনেদের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলে। আর দেহে খগোল ও মোকামায় যাওয়া হইল না। এবারকার সাক্ষাৎ কিছু বাস্তভাবের পরিচয় দিয়াছিল। যখন কেহ অনেক দূরদেশে যাত্রার উদ্যোগ করে, তখনকার দেখা-সাক্ষাৎ ব্যস্ততারই পরিচয় দেয়।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মৃত্যুচ্ছায়াময় উপত্যকা

খোকা যেন তোমার জীবনের উপর পরলোকের ছায়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিল। ১৮৯৬ সালের যে কয়েক মাস তুমি দেহে ছিলে, দেহের সহিত সংগ্রাম কিরূপে করিয়াছিলে, তাহা এই পরিচ্ছেদে বলিতেছি। শরীর তোমাকে মুক্তি দিবার পূর্ব্বে আর একবার যেন শেষ দেখা দিয়া গেল; আর একবার তোমার দৃষ্টির সম্মুখে নিবিড় অন্ধকার রচনা করিল!

১৫ই জানুয়ারী আমার সঙ্গে তুমি নাসরীগঞ্জে গিয়াছিলে। সে সময়ে দেখিয়াছিলাম, একত্র অবস্থান সত্ত্বেও শরীরের অধিকার ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। আমার দৈনিকে লিখিয়াছিলাম, "আজি বাগানে-উপাসনা খুব ভাল হইল। নির্ব্বাণ এখনও লাভ হয় নাই। শরীরের প্রভাব এখনও আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। শরীরের ভোগের জন্য এখনও মন ব্যাকুল হয়। কেন তাহা হইবে? "রী" নামে অঘোরকে ডাকিলাম, বড় মিষ্ট লাগিল। পবিত্র ভাব রক্ষা বিষয়ে "রী" সাহায্য করিলেন।" ২১শে ফেব্রুয়ারী তুমি আমার সঙ্গে ফতুহা গেলে। সেদিনকার দৈনিকে এইরূপ লিখিয়াছিলে— "আজও ২ বার উপাসনা চলিতেছে। প্রার্থনা আরও দর্শন উজ্জ্বল কর। তোমার সন্তানকে দেখি, তোমাকে আরও ভাল করিয়া দেখি, এই সংসারেই তুমি দেখা দেও।" ঐ দিন সন্ধ্যার সময় তোমাকে লইয়া বেড়াইতে গেলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক কথা হইল। অনেক সময় নির্জ্জন পাইলে এইরূপ বেড়াইতে ভালবাসিতে ও অনেক কথা বলিতে ও শুনিতে। তোমার কোন দোষ থাকিলে তাহাও তখন বলিতাম। তাই দৈনিকে লিখিয়াছ, "শরীরে এখনও [illegible] আছে। এ দোষ গেলে স্বামীন্ সুখী হন।"

ইহার পর [illegible]শে ফেব্রুয়ারী আমি এই ব্রত লইয়াছিলাম, যে কোনও কারণেই তোমার শরীর স্পর্শ করিব না। তাহাতেও যদি ভালবাসা থাকে তবেই বুঝিব যে স্থায়ী ভালবাসা হইয়াছে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে তোমার শরীর এমন ভগ্ন হইয়াছে যে এখন এ ব্রত রক্ষা করা কঠিন হইবে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী তোমার পেটে একটা ব্যথা হইল। সে দিনের বিষয় তোমার দৈনিকে লিখিয়াছ, "আজ পেটে বড় বেদনা উঠিয়াছিল। স্বামীন্ সন্তানদের ডাকিয়া সাহায্য করিতে বলিলেন, তাহা নিলাম না। কারণ সংসারে সুখে দুঃখে একজনের সাহায্যই নেব বলেছিলাম। তাই যদি ভগবান মানা করিলেন তবে তিনি ছাড়া আর কাহারও সাহায্য নেব না। ১১টা পর্য্যন্ত যন্ত্রণার পর নিদ্রা আসিল। মায়ার পড়িবার ভয়ে স্বামীন্ জিজ্ঞাসা করিলেন না।" কেহ যদি আমার দৈনিক পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন, সচেতন হইয়াও সে রাত্রিতে আমি অচেতন পাথরের মত পড়িয়াছিলাম। যে ব্রত লইয়াছিলাম, যদি তোমার সেবা ও আদর করিতাম, তাহা হইলে সে ব্রত ভাঙ্গিয়া যাইত। স্পর্শ করিব না অথচ নিকটে থাকিব, আমার কপালে সেই সাধন পড়িয়াছিল। তুমিও ক্ষুণ্ণ হইলে, আমিও নিরাশ্রয়ের মত চারিদিকে

আশ্রয় অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। সন্তানদের সাহায্য ভিন্ন সে-দিন অন্য উপায় ছিল না। তোমার মুখ মলিন হইতে লাগিল, তাই ২১শে এই ব্রত ত্যাগ করিতে হইল। তোমার নিজের কথাও নিজে লিখিয়া গিয়াছ:—"২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৮১৬। মা, আরও ভাল করিয়া আপনার দোষগুলি দেখাও। দোষ না গেলে তো আমি কাহারও পুণ্যের জন্য সহায় হইতে পারিব না। অন্তের পুণ্যের জন্য বিশেষ স্বামীনের পুণ্যের জন্য আমাকে শুদ্ধ কর। সমস্তদিন মন উদাস। আজও মন উদাস। স্বামীনের সহিত এক হইতে পারিতেছি না, কেন এমন হইল? কোন খারাপ ভাব নাই কিন্তু মন যেন ভারাক্রান্ত। নির্জ্জন ভাল লাগিতেছে। প্রার্থনা ছিল, যাঁহার জন্য আমি সব ছাড়িলাম, ৩০ বৎসর পরে তাঁহার আত্মার জন্য অবশিষ্ট কিছু আরাম ছাড়িতে পারিব না? আমার জীবন কি করিতে? তুমি আশীর্ব্বাদ কর, শেষ কয়েকটা দিন যেন স্বামীনের আত্মার সেবা করিতে পারি।"

এইরূপে কিছুকাল হইতে তোমার জীর্ণ ভগ্ন দেহ আত্মাকে ক্লেশ দিতেছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দীর্ঘ চারি বৎসরের গুরুতর শ্রমে ও মানসিক সংগ্রামে তোমার স্বাস্থ্য চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিবাহের পরিশ্রমের পর শরীর আরও অপটু হইয়া পড়িল। আর যেন আত্মার সহিত চলিতে সমর্থ হইত না। অবশেষে সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বাপেক্ষা ঘন অন্ধকারের দিন আসিল।

২১ শে মে ১৮১৬ প্রত্যূষে তুমি, আমি, সুবোধ একত্রে উপাসনা করিয়া আমি বিহার যাত্রা করিলাম। আমার মনে হইল যেন তোমার উপাসনা ভাল হইল না। কিন্তু আর কিছু বুঝিতে পারি নাই। তুমি বিধানের একখানা পুরাতন খাতায় তোমার মনের ভাব লিখিয়াছিলে; কোনও তারিখ নাই কিন্তু মনে হয় ২৭ মে তারিখেরই লেখা। "আজ সকালে স্বামীনের সহিত প্রসঙ্গ হইতে হইতে বুঝিলাম, তিনি পূর্ণমাত্রায় শরীর অতিক্রম করিয়াছেন কিন্তু আমার এখনও বার আনা শরীরে আসক্তি আছে। আমি এতদিন ভাবিতাম উভয়েরই শরীরে অল্পাধিক আসক্তি আছে। সে ভ্রম আজ ঘুচিল। একটু পরে তিনি অন্য স্থানে গমন করিলেন; তাহাতেও তাঁহার অনাসক্তি ও আমার আসক্তির পরিচয় পাইলাম। শয়ন করিয়া প্রার্থনা করিলাম। কি জানি মনের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। যত মনে হইতে লাগিল, আমার শরীরে আর পৃথিবীতে কাহারও কাজ নাই, একে আর কেহ চাহে না, মনে মনে যেন ঝড় বহিতে লাগিল, তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। যাঁহাকে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটের জানিতাম তিনিও এ যুদ্ধ দেখিতে পান না। মা মনকে যে কি দিয়ে গঠন করিয়াছেন কি জানি? অবশ্যই নিজ শক্তি দিয়া, নইলে মন এত সয় কিরূপে? মন কত সয় তাহা বলিতে পারি না। পৃথিবীর কোন বস্তু দিয়া যদি গড়ান হইত তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যাইত। আজ আমার জীবনের একটা বিশেষ প্রাতঃকাল, আজ অনেক দিনের পাপ পূর্ণরূপে বুঝিলাম।"

দেখি, চিরজীবন আমার পার্শ্বে থাকিয়া বীর নারীর মত মায়ের আহ্বান শুনিয়া চলিয়াছিলে। এ সংগ্রামে কত ক্ষত বিক্ষত হইয়াছ, কেমনে দেহের শোণিত শুষ্ক করিয়া, সুখ ও আরাম বলিদান দিয়া, বিশ্বাসের সেবায় ও চিন্ময় যোগের পতাকা ধরিয়া রহিয়াছ, চিরজীবন পাশে পাশে থাকিয়া আমি তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু দেহের সহিত এই শেষ সংগ্রাম তোমাকে একাকী করিতে হইল! এ ঘন আঁধারে আমাকেও নিকটে দেখিতে পাইলে না। সকল বিশ্বাসীর জীবনেই মায়ের লীলা এইরূপ। এই ঘোর যাতনা, এই ঘন অন্ধকার, ইহাই বুঝি মৃত্যুর ছায়াময় উপত্যকা (Valley of the Shadow of Death), যার কথা শাস্ত্রে লেখা আছে। এ অন্ধকার অতিক্রম করিয়া তবে আনন্দধামে বিশ্রামনগরীতে প্রবেশ করিতে হয়। দেবনন্দন শ্রীঈশাকেও শেষ সময়ে একাকী এ আঁধারে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। তখন কেহই সঙ্গে ছিল না; একাকী পিতার চরণে মৃত্যুযাতনার অশ্রু ফেলিতে হইতেছিল।

তুমি দৈনিকে আরও লিখিয়াছ, "মনে হইতেছে, আমার এখানকার কাজ শেষ হইয়াছে। আজকার প্রার্থনা ছিল, আর এদেশের কিছু ভাল লাগিতেছে না। ঐ দেশে যাইতে হইবে, ঐখানকার জন্য মন ব্যস্ত হইয়াছে, ঐ দেশের আচার-ব্যবহার, ঐ দেশের সকল আজ হইতে আমাকে শেখাও। এ দেশের মায়া কাট, ঐ দেশের মায়া বাড়াও, এই ভিক্ষা পূর্ণ কর।"

২১শে মে আমি বিহার হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি, তোমার জ্বর হইয়াছে। ৩০শে জ্বর বেশ ফুটিল, সেদিন হইতেই শয্যাগত হইলে। ঐ তারিখে তোমার শেষ লেখা তুমি লিখিলে, "আজ বাটীতে উপাসনা, খাঁটি বিশ্বাসী কর। কাল রাত্রিতে জ্বর হইয়াছে। আমার মন শুষ্ক কেন? এ প্রশ্ন সদাই আসিতেছে।"

এ শুষ্কতাও ঐ অন্ধকারের শেষ অংশ। প্রতিদিন আলোকের জন্য, বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলে। প্রতিদিন উপাসনায় যোগ দিতে। যতই বুঝিতে লাগিলে, মার কাছে যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী, ততই মা'র কোলে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিলে। মা-ও কোল পাতিয়া হাসিমুখে তোমাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আনন্দধাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ২৭শে মে আমি বিহারে যাই, ও ২১শে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তোমার একটু জ্বর হইয়াছে। আসিবার পরেই ছোট উপাসনা হইল। ছোট হইল বটে, কিন্তু তোমার মিষ্ট লাগিল। দিনের বেলায় বিশ্রাম করিলে, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর স্থির থাকিতে পারিলে না। সেবাই তোমার নিকট বিশ্রাম বোধ হইত। সন্ধ্যার পর করুণার মাতার সঙ্গে দেখা করিলে। শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্রের মেয়ে পীড়িত, তাহাকে দেখিয়া আসিলে। অসুস্থ শরীরেও আপনার নিত্যকর্ম্ম করিয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলে। রাত্রে বেশ জ্বর ফুটিল। ৩০শে মে প্রাতঃকালে জ্বর গায়ে নীচের ঘরে উপাসনা করিতে গেলে। খাঁটি বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করিলে। সেই দিন বুঝিলাম তোমার মহাপ্রয়াণ অত্যন্ত নিকটে। আমি প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। তুমি আমি বোম্বাই বেড়াইতে যাইব, স্থির ছিল; পাথেয় সংগ্রহ হইয়াছিল; বোম্বাই সহরে একটি ছোট বাড়ীও ঠিক হইয়াছিল, ছুটিও পাইয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতার বিধান ভিন্ন প্রকার।

১লা জুন তোমার বড় ঘোড়া বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। ঐ ঘোড়া বিদ্যালয়ের জন্য ক্রয় করিয়াছিলে। নিজের অর্থে ঘোড়া কিনিয়া তিন বৎসর ধরিয়া স্কুলের গাড়ী চালাইলে। তোমার রোগ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আমার বাহিরে কাযে যাওয়া হইল না। ২রা জুন রাত্রিতে একাকী সেবা করিলাম। আমারও শরীর অপটু; দুই বার পড়িয়া গেলাম। মোকামা হইতে কন্যা সুসারকে আনান হইল।

৩রা জুন দুই প্রহরে তোমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। প্রথমে পায়ের আঙ্গুলে বাতের ব্যথার মত ব্যথা হইয়াছিল। তারপর ঐ ব্যথা বুক পর্য্যন্ত আসিয়া শ্বাস বন্ধ হইতে আরম্ভ হইল। সকলে বলিতে লাগিল Endocarditis হইয়াছে। হৃৎপিণ্ডের নিম্নাংশ নাকি ফুলিয়াছিল। নিঃশ্বাস ফেলিতে মাঝে মাঝে এত কষ্ট বোধ হইতেছিল যে প্রত্যেক আক্রমণে আমাদের মনে হইতেছিল বুঝি এইবার প্রাণ যায়। দুই প্রহরের পর একবার প্রবল প্রকোপ হওয়াতে তুমিও মনে করিলে, এই শেষ। দেহত্যাগে পাছে কাহারও ক্ষতি হয়, এই ভয়ে সেই কষ্টের সময়ও আমার পানে তাকাইয়া বলিলে, "নসরুর হিসাবে গোল, আর কোথাও গোল নাই,—বস্।" সংসারের হিসাবপত্রের বিষয়ে এই শেষ কথা বলিলে। পরে যখন উঁহাদের বিল আসিল হিসাব পরিষ্কার করিতে গিয়া বুঝিলাম, তোমার কথাই ঠিক। বিলের হিসাব কাটিতে হইল। "বস্" কথাটির কত অর্থ! পৃথিবীর দেনা-পাওনা ফুরাইল। আর টাকা-কড়ির হিসাব রাখিতে হইবে না, এই শেষ হইল।

প্রথম হইতেই বন্ধুরা সাহায্য করিতে লাগিলেন, রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন মহাশয় প্রধান ভার লইলেন। সেই বিবাহের রাত্রিতে তোমার ব্যবহার তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। দুজনা পুরুষ ও একজনা নারী দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর ধনীরাও এত যত্ন পান কি না সন্দেহ। পীড়ার সময় কত লীলা হইল, তাহা বিশেষ করিয়া লেখা হইয়াছিল। উমাচরণ বাবুর সঙ্গে তোমার বিশেষ সম্বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার লেখাগুলি পীড়ার ইতিহাসের একটি বিশেষ অঙ্গ। নিঃশ্বাস বন্ধ হইলে তোমাকে ধরিয়া উঠাইতে হইতেছিল। পরিচারিকাগণ একবার কার্য্যান্তরে অন্য ঘরে গিয়াছেন, এমন সময় নিঃশ্বাস বন্ধের ফিট উপস্থিত। তুমি "উঠাও, উঠাও" বলিতে লাগিলে। তুমি নারী, উমাচরণ বাবু একমাত্র পুরুষ গৃহে। কিরূপে ধরিয়া উঠাইবেন, ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তুমি তখনই তাঁহার সঙ্কট বুঝিতে পারিলে, এবং বলিলে, "এইরূপে কি সেবা করিবেন? আপনি যে আমার বাবা!" যেমন বলা, অমনি তিনি ধরিয়া উঠাইলেন। কি আশ্চর্য্য! এমন যন্ত্রণার সময়ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গেল না। যা বলিলে কার্য্যোদ্ধার হয়, তাহাই বলিলে।

৫ই জুন রোগ পরীক্ষার জন্য ডাক্তার সূর্য্য বাবুকে ডাকা হইল। তিনি বলিলেন, "রিউম্যাটিজম ও ব দি হার্ট।" কাহার চিকিৎসা হইবে এ কথা উঠিলে তুমি পরেশের উপর ভার দিলে; আমিও তোমার মতে মত দিলাম। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ আপত্তি করিতে লাগিলেন। তুমি দৃঢ়ভাবে বলিলে, "যদি বাঁচিতে হয় দাদার হাতে বাঁচিব, যদি মরিতে হয় দাদার হাতে মরিব।" চিকিৎসকের হাতে কিরূপে আত্মসমর্পণ করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক স্থির করিয়াছিলে। যখন একবার স্থির হইল, যখন একবার "ডাক্তার ভাই" বলিয়া স্বীকার করিলে, বিশ্বাসীর মত শেষ পর্য্যন্ত অটল রহিলে। একবারও চিকিৎসার প্রণালী কিংবা ঔষধ অস্বীকার কর নাই। ধর্ম্মনিষ্ঠ চিকিৎসক যখন ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন তখন তাহার অপূর্ব্ব শ্রী হয়। তুমি পরেশের মধ্যে এই ধর্ম্মভাবের অবতারণা বুঝিতে পারিতে, তাই তাঁহার প্রতি এত অচলা ভক্তি। সুতরাং তাঁহারই চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

জুন মাসের গরম, তার উপর আমাদের বাড়ীর উপরের একহারা ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ দিকে তোমার হৃদ্‌রোগ, কাযেই তোমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইতে লাগিল। পরেশ তোমাকে তাঁহার বাঙ্গলায় লইয়া যাইতে চাহিলেন। এই প্রস্তাবে তোমার সম্মতি হইল না। আপনার বাটীর স্মৃতি তোমার ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে জড়িত, সহসা সে স্থান ছাড়িতে চাহিলে না। যদি মরিতে হয় তাহা হইলে আপনার গৃহে দেহত্যাগ করাই ভাল, এই তোমার মনের ভাব।

তোমার আসন্ন তিরোভাব তুমি বুঝিতে পারিতেছিলে, নহিলে ৭ই জুন রাত্রি দুই প্রহরে কেন বলিলে, "সব গোপন কচ্চেন, আমি কিন্তু ভাল নাই।" সহরের লোকেরা তোমার পীড়ার কথা জানিলেন। ৯ই জুন গুরুপ্রসাদ বাবু ও লোকনাথ বাবু তোমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ১০ই জুন রোগ খুব বাড়িল। পরেশ সমস্ত রাত্রি জাগিলেন। রোগের লক্ষণ দেখিয়া তিনি গৃহান্তরে বসিয়া বলিতেছিলেন, "যদি এবার উদ্ধার হন, অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিতে হইবে।" তোমার কানে একটু আওয়াজ গিয়াছিল; তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, "দাদা কি বলিতেছেন?" অগত্যা আমি বলিলাম; শুনিয়া তুমি বলিলে, "তবে বাঁচিয়া থাকার আবশ্যক কি?" তোমার চক্ষে জীবন ও সেবা এক হইয়াছিল। পঙ্গু হইয়া পড়িয়া থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব মনে হইত।

১১ই জুনের ভোরবেলা পরেশ তোমার কষ্ট দেখিয়া আবার তাঁহার গৃহে লইয়া যাইবার অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরাগে এইবার তুমি পরাস্ত হইলে। যখন যাইতেই হইবে তখন অসার গৃহানুরাগ রাখিয়া ফল কি? তুমি স্বীকার করিলে। তোমার সম্মতি পাইবামাত্র আমি গৃহান্তরে পরেশকে বলিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় তুমি আমাকে ডাকিয়া বলিলে, "রোস, রোস, তোমার মত কি?" এমন যন্ত্রণার সময়ও আমার মত জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিলে না। অতি প্রত্যূষে পালকী করিয়া তোমাকে পরেশের বাটীতে লইয়া গেলাম সঙ্গে সঙ্গে মিঃ মল্লিক ছিলেন, অন্যান্য বন্ধুরাও ছিলেন। গুরুপ্রসাদ বাবু তাঁহার বাটীও দিতে চাহিয়াছিলেন। পরেশের বাটীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পশ্চিমের ঘরে তোমার স্থান হইল। নূতন নূতন সেবক উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তোমার ইচ্ছানুসারে তোমার নিজ বাটীতে সেবকদিগের আহার হইত, আর তাঁহারা পালা করিয়া দিবানিশি তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন।

১১ই সমস্ত দিন ভালই গেল। রোগের কষ্ট ছিল না ছটফটানি, বুকের ব্যথা, পিটের ব্যথা কিছুই ছিল না। এত নিদ্রা হইল যে সেবকদিগের অধিক ক্লেশ হইল না। আমিও নিদ্রা যাইতে পারিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে হাতমুখ ধুইয়া তোমার শয্যাপা

বসিয়া উপাসনা করিলাম। অল্পক্ষণস্থায়ী উপাসনা ; যাহাতে তোমার কষ্ট না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি ছিল, তুমিও শান্ত ছিলে। ১২ই জুনও তুমি বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলে। রাত্রে নিদ্রা হইয়াছিল, জ্বর ১০২ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, শেষ রাত্রে ছটফট করিয়াছিলে। অপরাহ্নে বন্ধু ডাক্তার নৃত্যগোপাল বাবু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, রোগীর অবস্থা মন্দ নয়।

১৩ই জুন প্রাতে তোমার শয্যার পার্শ্বে উপাসনা করিলাম, তুমি আবার বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করিলে। সন্ধ্যার সময় শ্রীমান্ সুন্দর সিং সেবার্থী হইয়া তোমার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন ; তুমি আমাকে ডাকিলে ও বলিলে, "যদি তাঁহাকে সেবা করিতে না দেও, তাঁহার ক্লেশ হইবে। একটা কিছু কর।" তোমার রোগের ক্লেশ ভুলিয়া গেলে ; সুন্দর সিংহের ক্লেশ না হয় এই চিন্তা প্রবল হইল। শুশ্রূষার জন্য আর অধিক লোকের প্রয়োজন ছিল না, তাই তাঁহাকে বেদানা আনিতে মিঠাপুর পাঠাইলাম। শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্রের সন্তানের জ্বর ছাড়িতেছে না ; আমাকে ডাকিয়া বলিলে, "আমাদের উপরের ঘর তাহাকে ছাড়িয়া দাও।" ইহার পূর্ব্বেই তাঁহারা আমাদের উপরের ঘরে আসিয়াছেন, শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলে। যেন হৃদয় হইতে একটা মহা বোঝা নামিয়া গেল। শেষরাত্রে তোমার রোগ বৃদ্ধি পাইল। আমার পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইতে লাগিল। কত চক্ষের জল পড়িল।

১৩ই জুন রাত্রি ১১টা ৫৫ মিনিটের সময় তুমি বলিলে, "মায়ের কাছে যাব, আর দেরী করতে পারছি না। সুবোধ, অসত্য পথে যেও না। তোমাদের জন্য কিছু রেখে গেলাম না ; এই সত্য নিও। আমার জন্য কেঁদ না। দেখ আমি কাঁদছি না। সেদিন চোখে জল এসেছিল বলে এ কয় দিন দেরী হ'ল।"

১৪ই রবিবার আবার উপাসনায় যোগ দিলে, কিন্তু আজ যন্ত্রণা তোমায় শান্ত থাকিতে দিল না। প্রার্থনা যেমন তেমনই করিলে। যতই তোমার কষ্ট বাড়িতে লাগিল, ততই যেন আমার কাঁটার মুকুট বড় বড় কাঁটাযুক্ত হইয়া বিদ্ধ হইতে লাগিল ; যেন আর সহ্য করা যায় না। রবিবার সমাজের উপাসনা করিতে যাইতে হইবে ; তোমার নিকট অনুমতি চাহিলাম, তুমি বিদায় দিলে, আর বলিলে, "অবশ্যই যাইবে" শুধু আমাকে নয়, মোকামার দিদিকেও সমাজে যাইতে বলিলে। বলিলে, "যদি আপনি সমাজে না যান তাহা হইলে আপনার হাতে ঔষধ খাইব না।"

১৫ই জুন তোমার যাত্রার দিন। ঐ দিনের প্রভাত হইবার পূর্ব্বে (রাত্রি ৩টা ১৫ মিনিটের সময়) তুমি বলিলে, ষষ্ঠী বাবু! কে তুমি, সুবোধ? জিজ্ঞাসা কর ষষ্ঠী বাবুকে, ৪টার গাড়ী চলে গেছে? আমার অসুখ আর সারবে না। আমি তো কোথাও যাব না। কোথায় যাব? সংসার আমার যত্নের জিনিস। ও মেনীর বাবা (ষষ্ঠী বাবু) ও সুকুমারীর বাবা (খেলাত বাবু), তোমরা নহি শুনতে হো কি চাব বজেকে গাড়িতে যাব। কে তুমি? মণি?" ১৫ই প্রত্যূষে যখন ভাই খেলাতচন্দ্র আসিলেন, তাঁহার আগমনের কথা বলিবামাত্র তুমি বলিলে, "কেন? আমি তো এই মাত্র খগোলে গিয়াছিলাম। এই তো দেখা করিয়া আসিলাম।"

বেলা ৭টার সময় উপাসনা করিতে তোমার শয্যার পার্শ্বে সকলে একত্রিত হইলেন। তুমি তোমাকে ঘুরাইয়া দিতে বলিলে, যাহাতে সকলকে দেখিতে পাও। তোমার ইচ্ছামত তোমাকে শোয়ান হইল। তুমি পৃথিবীতে শেষ প্রার্থনা করিলে, "যেন বিশ্বাসের শেষ পরিচয় দিয়া যাইতে পারি।" প্রার্থনা ছোট, কিন্তু বেশ স্পষ্টস্বরে বলিলে। সকালেই নাড়ী ক্ষীণ দেখিয়া মনে সন্দেহ হইতেছিল। তখন সকালে আফিস হইত। আফিসে যাইবার পূর্ব্বে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম, তুমি বলিলে আচ্ছা।" আমার চক্ষে জল দেখিয়া তুমি বলিলে, "কাঁদছ?" এই এক কথায় অনেক কথা বলা হইল। বিয়োগ তো কিছু নয় ; তুমি আমার কাছে কাছেই থাকিবে ; ইচ্ছা হইলেই দেখিতে পাইব, তবে কাঁদিব কেন? আমিও তোমার কথা শুনিলাম ; চক্ষের জল পুঁছিয়া ফেলিলাম, ও রাজকার্য্য করিতে গেলাম।

দুই প্রহরের পূর্ব্বেই তুমি সকলকে আহার করিয়া আসিতে বলিলে। লতু ও পাঁড়েয়াইন ও আর সকলকে ডাকাইয়া আনিলে। সুসারকে ডাকিয়া তাঁহার ক্রোড়ে নিজ মস্তক রাখিলে, যেন আপনার সকল ভার তাঁহাকে অর্পণ করিলে। সুসারও তোমার অর্পিত ভার আজীবন বহন করিয়া গেলেন। ভাই পরেশ বাহিরে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন ; প্রায় একটার সময় বাড়ী আসিয়াই প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন আছেন?" তখন বোধ হয় তোমার শেষ যাতনা উপস্থিত হইয়াছে ; তবু তুমি বলিলে, "এখন বলিব না, আহার করিয়া আসুন, তারপর বলিব।" কি অপরের দিকে দৃষ্টি! ১৷০টার সময় আমি ঔষধ দিলাম, তুমি পান করিলে। তারপরেই ডাক্তার সূর্য্য বাবু আসিলেন এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "ঔষধ দেওয়া বৃথা।" কেহ নাম করে না দেখিয়া আমিই মাতৃস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলাম ; আর সকলে যোগ দিলেন। মনে হইল তুমিও যোগ দিতেছিলে। যেন ওষ্ঠ নড়িতেছিল। ২-১২ মিনিটে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলে।

উত্তর-পশ্চিমের কুঠরীতে তোমার দেহ রাখা হইল। চতুর্দ্দিকে আমরা বসিয়া উপাসনা করিলাম। সুবোধ ও সুসারও প্রার্থনা করিলেন। তারপর তোমার দেহের ফটো লওয়া হইল। তোমার দেহ নয়াটোলার বাড়ীতে আনয়ন করা গেল। পল্লীর যত দরিদ্র লোক (অধিকাংশই স্ত্রীলোক) তোমার দেহকে ঘিরিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। উপাসনার ঘরের কাছে নামাইয়া আবার প্রার্থনা করা হইল। তারপর ৪টার সময় দেহ তীরস্থ করা হইল। সঙ্গে অনেক ভদ্রলোক গিয়াছিলেন। সুসার ও লতুও গিয়াছিলেন। তোমার শেষশয্যা প্রস্তুত হইল। তোমার এই পুরাতন বন্ধু ও সেবক তোমার দেহের শেষকার্য্য করিল। তোমার জন্য প্রার্থনা করিয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়া অগ্নিদান করিলাম। রাত্রি ১টার সময় আমরা গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

পৃথিবীর জীবন এইরূপে শেষ হইল। কিন্তু তোমার অমর আত্মা নিশ্চয়ই নিষ্ক্রিয় নহে। এখান হইতে যে প্রেম, নিঃস্বার্থ ভাব ও পরহিতকামনা অর্জ্জন করিয়াছিলে, অমরধামে তাহার বড়ই প্রয়োজন, তাই তুমি সে সকলে সুসজ্জিত হইয়া চলিয়া গেলে।

সমাপ্ত
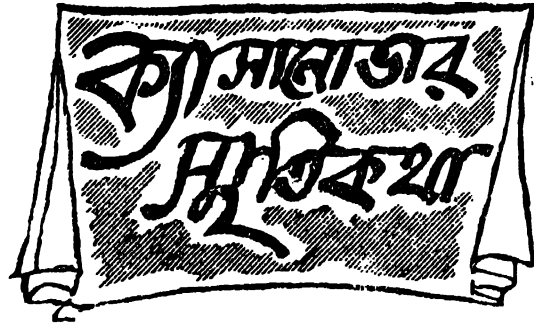
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—"ম্যঁসিয়ে দ্য ভলতেয়ার আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবের দিন—গত বিশ বছর ধরে আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি। আজ গুরুর চাক্ষুষ দর্শনে, তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে পেরে আমি ধন্য"—

—"এই শিষ্যত্বের পরমায়ু আরও বিশ বছর স্থায়ী হোক—আশা করি, তারপর আমার গুরুদক্ষিণাটা থেকে বঞ্চিত হবো না—"

—"সর্বান্তঃকরণে সম্মত—অবশ্য যদি তত দিন আমার জন্যে অপেক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন"—

আমাদের এই ভলতেয়ারীয় বাকচাতুরীতে সকলেই হেসে উঠলেন। আমি কিন্তু একটুও অপ্রস্তুত ছিলাম না। কারণ ভলতেয়ারের সঙ্গে এই ধরণের আলাপই আমি আশা করছিলাম। ভলতেয়ার আমাকে এবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যখন ভেনিসের লোক তখন কাউন্ট আলগারোত্তিকে চিনি কি না?

—"সাত বছর আগে যখন পাদুয়াতে ছিলাম চিনতাম। আর ওঁর মধ্যে একটি জিনিস আমাকে মুগ্ধ করেছিলো—সেটি হোলো আপনার প্রতি ওঁর অসীম শ্রদ্ধা"—

—"আমাকে বড্ড বাড়াচ্ছেন—উনি যে সকলের শ্রদ্ধেয় সেটা নিশ্চয়ই বিশেষ একজনের প্রতি ওঁর শ্রদ্ধা আর প্রশংসার জন্য নয়।"

—"ঠিক ওই কারণেই উনি নাম করেছেন। নিউটনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রদর্শন আর প্রশংসা করেই উনি প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।"

—"আচ্ছা ইতালীয়রা ওঁর রচনাশৈলী পছন্দ করে?"

—"না, কারণ বিভিন্ন ভাষার রচনাশৈলীর প্রভাব আর আধিক্য ওঁর রচনায় পূর্ণ।"

—"কিন্তু ইতালীয় সাহিত্যে ফরাসী সাহিত্যের ভাব আর প্রকাশভঙ্গীর তো অভাব দেখি না—"

—"হ্যাঁ আমাদের সাহিত্যকে ওইতেই নষ্ট করেছে। যেমন ফরাসী ভাষার মধ্যেও ইতালী আর জার্মাণ সাহিত্যের প্রভাব আর তাদের রচনাশৈলীর অনুকরণ খুব বেশী দেখি, এমন কি ম্যঁসিয়ে দ্য ভলতেয়ারও যদি অমন ভাবে লেখেন তাহলেও সেটা উপভোগ্য হবে না একটুও—"

—"ঠিকই বলেছেন। সাহিত্যের সব চেয়ে বড় জিনিষ হোলো ভাষার পবিত্রতা। আচ্ছা জানতে পারি কি, কোন ধরণের সাহিত্যে আপনি আত্মনিয়োগ করেছেন?"

—"বিশেষ কোনটিতেই নয়। কিন্তু আমি প্রচুর পড়ি আর ভ্রমণ করি মানুষের চরিত্রের স্বরূপ জানতে আর বুঝতে।

—"হ্যাঁ এ ভাবেও শেখা যায়—তবে বইএর প্রয়োজন সবার বেশী। অবশ্য সবচেয়ে সহজ উপায় হোলো ইতিহাসের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয়।"

—"ঠিক, যদি অবশ্য ইতিহাস মিথ্যা না বলে, তাছাড়া ইতিহাসে থাকে বিরক্তিকর একঘেয়েমি, রসপিপাসু চিত্তকে তৃপ্তি দেবার ক্ষমতা তার নেই—অথচ যাযাবরের মত দেশ থেকে বিদেশে···পথ থেকে বিপথে চলতে চলতেই তো দেখা যায় বিচিত্র এ বিশ্বমাঝে বৈচিত্রের লীলা বয়ে যায়···"

—"আপনি বুঝি কবিতার অনুরাগী?···"

—"শুধু অনুরাগ? কবিতায় আমার সত্তার বিলোপ···"

—"আপনি কি অনেক সনেট লিখেছেন?"

—"গোটা বারো সনেট প্রকৃত রসোত্তীর্ণ বলে স্বীকার করি, আর হাজার দুই তিন শুধু লিখেছি আর পরমুহূর্তে ভুলেছি—"

—"আপনাদের অর্থাৎ ইতালীয়দের সনেটের উপর একটা দারুণ ঝোঁক দেখা যায়···তবুও সনেটের ঐ নির্দিষ্ট লাইনের অনুশাসনের বন্ধনেও কবিতাগুলি যেন অযথা বিলম্বিত লয়ে চলতে থাকে। আমাদের ভাষার দোষেই বোধ হয় একটাও ভালো সনেট আমাদের ভাষায় নেই—"

—"ভাষার দোষ ছাড়াও ফরাসী সাহিত্যিক প্রতিভারাও বেশ কিছুটা দায়ী। কারণ তাঁদের ধারণা, ভাবধারার বিস্তৃতিই কাব্যের গতি ব্যাহত করে তাকে নিষ্প্রভ করে তোলে···"

—"আপনি কি তা মনে করেন না?"

—"মাফ করবেন, আমার মতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হোলো ভাবধারার নির্বাচন। কবিতার রস-সৌন্দর্য্য নির্ভর করে কোন ভাব বা কোন চিন্তার আধারে তার প্রকাশ তারই ভিতর···"

—"আপনার সবচেয়ে প্রিয় ইতালীয় কবি কে?"

—"আরিয়োস্ত। আমি যে তাঁকে আর সকলের চেয়ে বেশী ভালোবাসি, একথা বলতে পারি না—কারণ একমাত্র উনিই আমার প্রিয় কবি···ওঁর সামনে আর সব কবিই ম্লান, নিষ্প্রভ। বছর পনেরো আগে ওঁর সম্বন্ধে আপনার লেখা পড়ে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে আপনি যখন ওঁর সমস্ত লেখা পড়বেন তখন আপনি বাধ্য হবেন আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভাবে বদলাতে···"

—"হ্যাঁ, আমি তখন অল্পবয়সী ছিলাম, আপনাদের ভাষা সম্বন্ধে আমার জ্ঞানও ছিলো ভাসা-ভাসা। তখন অন্যদের যথেষ্ট প্রভাব আমার উপর পড়ে। আর তাইতেই অনুপ্রাণিত হয়ে

আমি যে সমালোচনা লিখি···সেটা সে সময় আমার লেখা বলে মনে করলেও আসলে সেটা ছিলো তাদেরই কথার আর মতের প্রতিধ্বনি। এখন কিন্তু আপনার আরিয়োস্ত আমারও প্রিয় কবি—"

—"আঃ, মঁ্যসিয়ে ভলতেয়ার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আপনার কথায়! কিন্তু এবার কৃপা করে আপনার ঐ সব রচনাগুলি বাতিল করে দিন না—যাতে অতবড় একটা প্রতিভাকে শুধু উপহাস আর বিদ্রূপ করে গেছেন—"

—"কোনো চিন্তা নেই, তারা সব একঘরে হোয়েছে। এবার আমার একটা আবৃত্তি শুনুন, তাহলেই বুঝবেন···"

এই বলে ভলতেয়ার চতুর্বিংশ আর পঞ্চবিংশ সর্গ থেকে দুটি সুদীর্ঘ অংশ আবৃত্তি করে গেলেন, একটি অক্ষরও বাদ না দিয়ে··· শেষ হোতে না হোতে আমি উচ্ছ্বসিত হোয়ে চীৎকার করে উঠলাম এই বলে যে, সারা ইতালীর এই অনবদ্য আবৃত্তি শোনা উচিত ছিলো। প্রশংসাপ্রিয় ভলতেয়ার খুসী হোয়ে ওঁর রচিত কয়েকটি অংশের অনুবাদ আমাকে উপহার পাঠিয়েছিলেন পরদিন।

ভলতেয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্রী মাদাম দেনিস উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁর কাকা কবির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পঙ্‌ক্তি কটি আবৃত্তি করেছেন কি না।

—"হ্যাঁ, শ্রেষ্ঠ বলা যায়, শ্রেষ্ঠতম বলা যায় না···"

—"আপনার মতে কোন পঙ্‌ক্তিগুলি শ্রেষ্ঠতম?"···ভলতেয়ারের প্রশ্ন।

—"ত্রয়োবিংশ সর্গের শেষ পঙ্‌ক্তিগুলি। যেখানে তিনি বর্ণনা করছেন কেমন করে রোলাঁ পাগল হোয়ে গেল···সৃষ্টির আদিযুগ থেকে আজও এই অনবদ্য পঙ্‌ক্তিগুলির তুলনীয় কিছু রচিত হয়নি।"

—"মঁ্যসিয়ে ক্যাসানোভা, এটি আমাদের আবৃত্তি করে শোনাবেন কি?" মাদাম দেনিসের অনুনয়।

করলাম আবৃত্তি। যখন শেষ হোলো দেখি, সবার চোখেই জল টলমল করছে···অবরুদ্ধ ক্রন্দনের বেগ সকলকেই সামলাতে হোচ্ছে··· ভলতেয়ার ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন উচ্ছ্বসিত আবেগে।

—"আশ্চর্য! রোলাঁর এই সঙ্গীতকে রোম তার প্রাপ্য স্থান দেয় না!" মাদামের বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর।

—"রোম কখনও একে তাচ্ছিল্য করেনি"···ভলতেয়ার বললেন. "দশম লিও গোড়াতেই তাদের বাতিল করে দিতেন যারাই এই রচনার বিপক্ষ সমালোচনা করতে যেত। তাছাড়া রীতিমত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী দুজন সম্মানিত ব্যক্তি আরিয়োস্ত সর্বদা আগলে রাখতেন। তাঁদের সাহায্য আর আশ্রয় না পেলে ওঁকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করতে হোতো···"

এইবার উপস্থিত কোনো ভদ্রলোকের প্রস্তাবে ওঁর বাড়ীতে একটা আবৃত্তি অনুষ্ঠানের কথা উঠলো। ভলতেয়ার আমাকে তাইতে অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন, জানালেন, তাহলে তিনি নিজেও অংশ গ্রহণ করবেন। আমি সবিনয়ে আমার অক্ষমতা জানালাম, কারণ পরদিনই আমি চলে যাচ্ছি। ভলতেয়ার আমার পরদিন চলে যাবার কথায় কানই দিলেন না—

—"আপনি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন না আমার কথা শুনতে এসেছিলেন?"

—"বলতে নিশ্চয়ই, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হোলো আমার সঙ্গে আপনাকে কথা বলাতে···"

—"তাহলে অন্ততঃ আরও তিন দিন থাকুন। প্রতিদিন আমার কাছে আপনার নিমন্ত্রণ রইলো···আহারপর্বের সঙ্গে সঙ্গে চলবে আমাদের আলাপ-আলোচনা···"

অস্বীকার করতে পারলাম না, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে রাত্রের মত বিদায় নিলাম।

পরদিন সকালে ভলতেয়ারের সঙ্গে আহারপর্বের সময়, ভলতেয়ার ভেনিসের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বার বার কৌতূহল প্রকাশ করতে লাগলেন কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপনে আমার একান্ত অনিচ্ছা দেখে আর প্রশ্ন করলেন না। আমার হাত ধরে বাগানে বেড়াবার জন্যে উঠে এলেন। বাগানের এক প্রান্ত দিয়ে রোন নদী বয়ে চলেছে। নানা ধরণের আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আমরা শেষে বাড়ীতে এলাম। ওঁর সঙ্গে ওঁর শোবার ঘর অবধি আমি গেলাম। ভলতেয়ার মাথার পরচুলাটা খুলে টুপী মাথায় দিলেন। সহজেই ঠাণ্ডা লাগতো বলে উনি কখনও মাথা খালি রাখতেন না। একটা দেরাজ খুলে ফেললেন—দেখলাম, তার ভিতর প্রায় শ'খানেক মোটা মোটা কাগজপত্রের দিস্তা।

—"ও-সবগুলো কি জানেন? প্রায় হাজার পঞ্চাশেক চিঠি। ওগুলোর প্রত্যেকটার উত্তর কিন্তু আমি দিয়েছি"—

—"আপনার উত্তরগুলোর প্রতিলিপি রেখেছেন তো?"

—"আমার কর্মচারীর উপরই ও-সব রাখার ভার দেওয়া আছে।"

—"আমি যথেষ্ট প্রকাশক আর পুস্তক-বিক্রেতাকে জানি, যারা ওই অমূল্য সম্পদ পেলে যোগ্য দক্ষিণা দিতে এখনই প্রস্তুত—"

—"হাঁ, কিন্তু ওদের থেকে সাবধান! যদি আপনি কোনো বই বা রচনা প্রকাশ করতে চান—আর বিশেষ করে আপনি যদি অখ্যাতনামা হন, তাহলেই সর্বনাশ! দেখবেন, তখন সব প্রকাশকেরাই ডাকাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর।"

—"যত দিন না বার্দ্ধক্যে পা দিচ্ছি তত দিন ওই সব ভদ্রমহোদয়দের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই।"

—"তাহলে ওরাই হবে আপনার বার্দ্ধক্যের চাবুক!"

তারপর আমরা আবার সালোতে ফিরে এলাম। সেখানে প্রায় দুটি ঘণ্টা ধরে ভলতেয়ারের আশ্চর্য নিপুণ বাগবৈদগ্ধ আর উন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয় সমস্ত শ্রোতাদেরই মুগ্ধ করে রাখলে···যদিও তার সঙ্গে ছিলো তাঁর স্বভাবজাত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি যা কাউকেই পরোয়া করতো না। কিন্তু ওর মিষ্টি হাসির আড়ালে সব শ্লেষ, আর বিদ্রূপ ঢাকা পড়ে যেতো।

ভলতেয়ারের বাড়ীতে ছিলো সবার অবারিত দ্বার। তেমন আহার্যের পরিবেশনেও ছিলো উদার মুক্তহস্তের পরিচয়। তখন ওঁর বয়স হবে ছেষট্টি বছর আর বাৎসরিক আয় একশো বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক। জনরব ছিলো, ভলতেয়ার ওর প্রকাশকদের ঠকিয়ে নিজে ধনী হোয়েছেন—কিন্তু আসলে তার সম্পূর্ণ বিপরীতই ঘটতো। প্রকাশকরাই তাঁকে ঠকাতো। অবশ্য তার জন্য দায়ী ওর খ্যাতির মোহ। খ্যাতির প্রতি দুর্বলতা ওকে এমন পেয়ে বসেছিলো যে,

উনি অনেক সময় প্রকাশকদের শুধু এই সর্ত্তেই বই দিতেন যে, সেগুলি ছাপা হবে আর ভালোভাবে চালু করা হবে। মাত্র তিন দিন ওঁর সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম, তার মধ্যেও ওঁর এই উদারতার পরিচয় আমি পেয়েছি। 'প্রিন্সেস অ ব্যাবিলন' বলে একটি অপূর্ব্ব উপন্যাস উনি ওই ভাবে প্রকাশককে দিয়ে দেন। বইখানি মাত্র তিন দিনের মধ্যে শেষ করেছিলেন।

রাত্রে আহারের সময় মাদাম দেনিস ছিলেন। ভলতেয়ার অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির সব ত্রুটি উনি একাই হরণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরও মার্জ্জিত রুচি, সাধারণ জ্ঞান আর সৌন্দর্য্যবোধের কিছু অভাব ছিল না। ম'সিয়ে অ ভলতেয়ার বেশ দেরীতে ফিরলেন, হাতে একখানা চিঠি। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি মার্ক্ুইস আলবার্গাতিকে চিনি কি না। আমি বললাম, পরিচয় না থাকলেও নামে চিনি।"

—"তিনি আমাকে 'গলদোণি'র কয়েকটি নাটক, কিছু সসেজ আর একটি রচনার অনুবাদ উপহার পাঠিয়েছেন, আর বলে পাঠিয়েছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন—"

—"নিশ্চিন্ত থাকুন, তিনি আসবেন না, অত বোকা তিনি নন।"

—"মানে? আমার সঙ্গে দেখা করাটা বোকামির লক্ষণ? আপনি এই বলতে চান?"

—"না, আমি শুধু বলতে চাই যে, এতে করে কত বড় ঝুঁকি যে তাঁকে নিতে হবে, সেটুকু বোঝবার মত জ্ঞান তাঁর আছে। কারণ যদিই আসেন, তবে সেই মুহূর্ত্তেই আপনি টের পেয়ে যাবেন তাঁর বুদ্ধির দৌড় কতখানি—আর আপনারও ধারণা ভেঙে যাবে"

—"আচ্ছা, গলদোনি 'ডিউক অফ পারমা'র কবি বলে জাহির করেন কেন?"

—"বোধ হয় প্রমাণ করতে যে আর পাঁচজনের মত তাঁরও চরিত্রে একটা দুর্ব্বল দিক আছে।"

"উনি তো নিজেকে একজন ব্যারিষ্টারও বলেন—আসলে কোনোটাই নন। কয়েকটি বেশ ভালো মিলনান্তক নাটক অবশ্য তিনি লিখেছেন, আর কিছু না। সমাজেও বিশেষ নাম করতে পারেন নি···"

—"আমি শুনেছি ওঁর অবস্থা ভালো নয়, উনি নাকি ভেনিস ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু ভয় পাচ্ছেন থিয়েটারের ম্যানেজারদের চটাতে। সেখানে ওঁর নাটকগুলি অভিনীত হয় কিনা···"

—"একবার ওঁকে একটা বৃত্তি দেবার কথা ওঠে। কিন্তু আবার সেটা চাপা পড়ে যায়। কারণ, সবাই আশঙ্কা করেন যে, একটা সুনির্দিষ্ট আয় হোলে হয়ত আর উনি লিখতে চাইবেন না···"

—"হুম্! হোমারকেও একবার বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা নাকচ করে দেওয়া হয়। পাছে অন্ধমাত্রেই বৃত্তি চেয়ে বসে বলে···"

সেদিনটা ওঁর সান্নিধ্যে উজ্জ্বল আর স্মরণীয় হোয়েই রইলো। পরদিনও অমনি উজ্জ্বল একটি দিনের প্রত্যাশায় গেলাম ভলতেয়ারের কাছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, সেদিন সেই বিরাট প্রতিভাকে দেখলাম তাঁর নিকৃষ্টতম মানসিক অবস্থায়। জানি না, কোন অজ্ঞাত কারণে সেদিন ওঁর মেজাজ যেমন খিটখিটে, কলহপ্রিয়, কথাবার্ত্তা ত তেমনি তিক্ত আর শ্লেষ-বিদ্রূপে ভরা। যদিও জানতেন সেদিন আমার বিদায়ের দিন, তা সত্ত্বেও আমাকে দেখে তিক্ত হাসি হেসে বললেন—"মার্লিনের বইটা উপহারের জন্যে দিয়েছেন হয়তো ভালো মনেই। কিন্তু তার জন্যে ধন্যবাদ দিতে আমি অক্ষম। কারণ পুরো চারটি ঘণ্টা আমার ওর পিছনে নষ্ট হোয়েছে।"

আমি প্রাণপণে নিজেকে সংযত রেখে উত্তর দিলাম, হয়ত আজ ভালো না লাগলেও একদিন আমার মতের সঙ্গে মিল হোতে পারে। সামান্য কথায় উঠলো তর্কের ঝড়। কথায় কথায় আমি ক্রেবিলঁকে আমার শিক্ষক বলে অভিহিত করাতে ভলতেয়ার জিজ্ঞাসা করলেন, —"ক্রেবিলঁ! জানতে পারি কি, কোন্ সুবাদে তাঁকে শিক্ষক বলছেন আপনার?"

—"তিনি আমাকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন দু'টি বছর ধরে—আর তারই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি তাঁর একটি রচনা ইতালীয় 'আলেকজান্দ্রাইন' ছন্দে অনুবাদ করেছিলাম—আর আমিই প্রথম ইতালীয় যার ঐ ছন্দে রচনার সাহস ছিলো···"

—"প্রথম! মাফ করবেন, প্রথম হবার সম্মান জুটেছিলো আমার বন্ধু পিয়ের মার্ত্তেলীরই বরাতে···"

—"দুঃখিত, আপনার কথার প্রতিবাদ করতে হোলো বলে···"

—"কিন্তু তাঁর রচনা আমার কাছে আছে। বোলোনাতে ছাপা হোয়েছিলো···"

—"হ্যাঁ, কিন্তু 'আলেকজান্দ্রাইন' ছন্দে লেখা নয়। তাঁর কবিতাগুলির চোদ্দটি করে চরণ, আর একটি পুংলিঙ্গে একটি স্ত্রীলিঙ্গ, এই ভাবে পর পর চরণগুলির রচনাও তিনি করেন নি। অবশ্য, তিনি নিজে ভেবেছিলেন যে, তিনি ওই ছন্দেই লিখছেন, তাই ওঁর ভূমিকা পড়ে আমি হাসি চাপতে পারি নি। সম্ভবতঃ আপনি সেটা পড়েন নি···"

—"পড়ি নি! কি বলছেন আপনি? ভূমিকা পড়াটাই আমার নেশা। তাতে তো তিনি জোর করেই লিখেছেন···"

—"হ্যাঁ, সেটাই তো মজার ব্যাপার···আপনাদের কাব্যগুলিতে কখনও বারোটি চরণ আর কখনও তেরটি চরণ ব্যবহার হয়। অথচ মার্ত্তেলী সবই চোদ্দ চরণের। অতএব হয় তিনি কানা, নয় তাঁর ছন্দজ্ঞান খুবই কম।"

—"আপনি বুঝি আমাদের কবিতার ছন্দের প্রত্যেকটি নিয়ম-কানুন কঠোর ভাবে অনুসরণ করেন?"

—"হ্যাঁ, যত কঠিনই হোক না কেন?"

—"আচ্ছা ক্রেবিলঁর রচনার যে অনুবাদ করেছেন তার কোনো অংশ কি আবৃত্তি করে শোনাতে পারেন? অবশ্য যদি আপনার অসুবিধা না হয়। কারণ আমার খুব ইচ্ছা আপনার অনুবাদ আর ছন্দ শুনতে···"

আমি দশ বছর আগে ক্রেবিলঁর কাছে যে অংশটি আবৃত্তি করেছিলাম সেই অংশটিরই পুনরাবৃত্তি করলাম। এতক্ষণে ভলতেয়ারের মুখে খুশীর আলোর আভাস দেখা দিল। শেষ হতে নিজেও ওঁর স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন—সেটি তখনও ছাপা হয়নি···কিন্তু অপূর্ব্ব, অনবদ্য সেই রচনা। যদি সেই খুশীর রেশটুকু রেখেই সেদিন বিদায় নিতাম তবে সব দিক থেকেই ভালো হোতো। কিন্তু কেন যে আবার 'হোরেস'এর লেখার সমালোচনার মধ্যে নিজেকে জড়ালাম জানি না! সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ আর তর্কের ঝড়ে খুশীর সেই মৃদু আলোটুকুও নিবে গেলো। দুটি

প্রতিপক্ষের মধ্যে শুধু যুক্তি-তর্কের আর বিতর্কের ঝড় বইতে লাগলো। এলো নিতান্ত অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গ সব···দেশ, শাসনতন্ত্র স্বাধীনতা সব কিছুই···

—"আপনি কি ভাবেন ভেনিসে আপনারা স্বাধীন জীবন যাপন করেন?"—ভলতেয়ারের কূট প্রশ্ন।

—"একটি অভিজাত শাসনতন্ত্রের অধীনে যতটা স্বাধীনতা ভোগ করা যায় ততটা করি বৈ কি। বলছি না যে আমরা ইংরেজদের মত স্বাধীন—তবুও বলবো আমরা তৃপ্ত, আমরা খুসী···"

—"এমন কি যখন 'লেড্‌স্'এ বন্দী ছিলেন তখনও···" ঝিক্‌মিকিয়ে উঠলো শাণিত বিদ্রূপ।

—"আমার কারাবাস একটা ষড়যন্ত্রের ফল আমি জানি···কিন্তু এটাও ঠিক যে আমি আমার স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছিলাম। মাঝে মাঝে আমার এ কথাও মনে হয়, কোনো রকম বিচারের ব্যবস্থা না করেই শাসনকর্ত্তারা আমাকে বন্দী করে উচিত কাজই করেছিলেন···"

—"কিন্তু আপনি তো পালিয়েছিলেন?"

—"শাসনতন্ত্রও যেমন তার অধিকার নিয়ে আছে, আমিও তেমনি আমার অধিকার খাটিয়েছি···"

—"সাবাস! কিন্তু তাতে তো ভেনিসে কেউই স্বাধীন হোতে পারে না?"

—"হয়ত নয়। কিন্তু নিজেকে স্বাধীন ভাবলেই তো স্বাধীন হওয়া যায়···"

—"আপনার এ-কথায় আমার কোনো আস্থা নেই। অভিজাত সম্প্রদায়, এমন কি শাসন বিভাগের অধিকর্ত্তারাও তো আপনাদের দেশে স্বাধীন নন। কারণ তাঁরাও তো অনুমতিপত্র ছাড়া কোথাও ভ্রমণ করতে অবধি পারেন না—"

—"ঠিক, কিন্তু এটাও তো তাঁদেরই গড়া আইনের অনুশাসনে তাঁরা স্বেচ্ছাবন্দী···"

—"ভালো কথা, দুনিয়ার সব জায়গাতেই জনসাধারণকে নিজেদের আইন গড়বার সুবিধা দেওয়া হোক···"

সাহিত্য প্রসঙ্গ বহুক্ষণ চাপা পড়ে গেছে। এই কূট তর্কের জালে ক্লান্ত হোয়ে দুজনেই চুপ করে রইলাম। তারপর ভলতেয়ার বিশ্রাম নেবার জন্যে উঠে গেলে আমি চলে এলাম অশান্ত, বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে। নিজের উপরই বিরক্ত হোয়ে উঠলাম কেন এই বিখ্যাত সাহিত্যিক, অসাধারণ, বুদ্ধিজীবী, বিরাট প্রতিভাকে যুক্তিতর্কের যুদ্ধক্ষেত্রে নামালাম! অবশ্য সারা মন জুড়ে একটা তীব্র বিদ্বেষের দাহ অনির্ব্বাণ ভাবে জ্বলছিলো, তাই পুরো দশটি বছর ধরে ভলতেয়ারের প্রতিটি লেখার নির্ম্মম সমালোচনা করেছি। অবশ্য আজ তার জন্য আমি অনুতপ্ত। কিন্তু পরে সেই সব লেখা বাতিল করতে গিয়ে বার বার পড়ে দেখেছি—অনেক জায়গায় অনেক বিষয়ে আমার সমালোচনার কোনো ত্রুটিই দেখতে পাইনি। তবুও বলবো, আমার আরও সংযত হওয়া উচিত ছিলো।

সারা রাত বসে লিখে রাখলাম আমাদের কথোপকথন—যা সব জড়ো করলে একটা বিরাট গ্রন্থ হোতে পারতো। কিন্তু আত্মস্মৃতির পাতায় তার দু'-একটি টুকরোই রেখে দিলাম। পর দিনই যাত্রা করলাম দক্ষিণের পথে···।

নবম পরিচ্ছেদ

ঘুরতে ঘুরতে নীস জেনোয়া হোয়ে এলাম ফ্লোরেন্সে। এখানে এসে ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করলাম। জায়গাটি বড় সুন্দর বেছে নিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে একটা গাড়ী কিনে কোচম্যান আর সহিসও রাখলাম দু'জন। তার পর আরও কিছু খুঁটিনাটি ব্যবস্থাও সেরে নিতে দেরী হোলো না। এক দিন অপেরা দেখতে গেলাম। এমন জায়গায় আমার আসন নিয়েছিলাম যেখান থেকে প্রত্যেকটি অভিনেত্রীকে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কে জানতো সেখানে আমার জন্যে এমন বিস্ময় অপেক্ষা করে রয়েছে।

শ্রেষ্ঠ গায়িকাটি যেই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ, অমনি আমারও সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চের শিহরণ···এ তো টেরেসা···সেই টেরেসা যাকে কতো···কতো দিন আগে পেয়েছিলাম। আর পেয়েই হারিয়েছিলাম। সে কী আজ? ১৭৪৪ সালে ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয়···আর কি অভিনব সেই পরিচয়! কিশোরীর আত্মপরিচয় কিশোরের বেশে। সঙ্গীদেরও ছদ্মপরিচয় মা আর সহোদরের রূপে। কিন্তু বেলিনোর ছদ্মবেশের আড়ালে কিশোরীর কমনীয়তা আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। আর ওর সত্য পরিচয়ের রহস্যভরা অবগুণ্ঠনখানি তুলে ধরতে গিয়ে আমাদের হৃদয় বিনিময়েও কোনো ফাঁক ছিল না। আর যৌবনের সেই প্রথম সন্ধিক্ষণে আমাদের অভিনব প্রণয় পরিণয়েই সমাপ্তি লাভ করতো···সেই শপথই তো আমরা নিয়েছিলাম নির্জন বিহ্বল মুহূর্ত্তগুলিতে···কিন্তু কৌতুকময়ী ভাগ্যদেবীর পরিহাসে আমি হলাম পিসারোতে বন্দী আর প্রতীক্ষারতা টেরেসা পেলো ডিউক অফ কাস্ত্রোপিনানোর আশ্রয় তাঁর রঙ্গমঞ্চের গায়িকা হোয়ে···

তার পর দু'জনের মাঝখানে সুদীর্ঘ সতেরোটি বছরের ব্যবধান। স্মৃতির কোন মণিকোঠায় রুদ্ধঘরে বন্দিনী দিনগুলি ছাড়া পেয়ে ছুটে এলো বুঝি···মনে পড়লো টেরেসার শেষ চিঠিখানির উত্তর আজও দেওয়া হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য্য, এই সুদীর্ঘ সতেরোটি বছর ওকে কি কোথাও স্পর্শ করেনি? তেমনি সতেজ, তেমনি কমনীয় তেমনি লাবণ্যে ঢলঢল অপরূপ দেহকান্তি···আর তেমনি মাধুর্য্যে পূর্ণ বিকশিত।

গানের শেষের দিকে হঠাৎ চোখ পড়লো টেরেসার আমার দিকে। স্পষ্ট দেখলাম, দু'টি আঁখিতারায় জ্বলে উঠলো পরিচয়ের দ্যুতি। গানটি শেষ হওয়া অবধি অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো আমার দিকে। এক বারও দৃষ্টি ফেরালো না···মঞ্চ ছেড়ে যাবার সময় হাতের পাখাখানি দিয়ে চকিত ইশারায় জানিয়ে গেল আহ্বান।

আসন ছেড়ে উঠে পড়লাম···বক্ষস্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর। রঙ্গমঞ্চের পিছনে গিয়ে দেখি, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আমার টেরেসা। এগিয়ে গেলাম। মুখোমুখি দাঁড়ালাম দু'জনে···নিঃশব্দে সম্মোহিতের মতো। জানি না ক'টি মুহূর্ত্ত কাটলো। শেষে আস্তে আস্তে ওর হাতখানি ধরে আমি বুকের উপর চেপে ধরলাম।

—"কিছু শুনতে পাচ্ছো? বুকের ভিতরটায় কি হচ্ছে, পাচ্ছো তার আভাস?"

—"প্রথম যেই তোমাকে দেখলাম, মনে হোলো এখনি বুঝি মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়বো। দুর্ভাগ্য আজই রাত্রে আমার আবার অন্য জায়গায় নিমন্ত্রণ···কিন্তু আজ তো সারা রাত দু'টি চোখের পাতায় ঘুম নামবে না···তাদের জায়গা তুমি যে আগেই অধিকার করে বসে আছো। কাল ভোরবেলা এসো আমার কাছে, বলো আসবে? কোথায় থাকো তুমি? এখানে কি নাম তোমার? কত দিন এসেছো? কত দিন থাকবে আর? বিয়ে কোরেছো? ওঃ ওঃ, সময় হোয়ে আসছে···ডাই-এর নিমন্ত্রণ···ঈশ্, ওরা ডাকতে আসছে বুঝি? বিদায়···বিদায়···কাল কিন্তু মনে···

মিলিয়ে গেল কণ্ঠস্বর···স্তব্ধ হোয়ে গেল অজস্র প্রশ্নের ঝড়। প্রকৃতিস্থ হোতে কিছু সময় লাগলো বৈ কি। ফিরে এলাম নিজের আসনে। এতক্ষণে খেয়াল হোলো ওর নাম-ধাম কোনো পরিচয়ই তো নেওয়া হয়নি। আমন্ত্রণ যে জানালে কিন্তু ঠিকানা কোথায়?

আমার পাশেই বসেছিলেন একটি সুবেশ তরুণ···আমি মৃদুস্বরে তাকেই প্রশ্ন করলাম ঐ গায়িকা-অভিনেত্রীটির পরিচয় যদি বলতে পারেন?

—"আপনি বুঝি ফ্লোরেন্সে নবাগত?" তিনি প্রশ্ন করলেন।

—"সবেমাত্র এসেছি বলতে পারেন—"

—"ওঃ, তবে আপনার অজ্ঞতা ক্ষমা করা যেতে পারে। তাহলে শুনুন ওই ভদ্রমহিলার আর আমার নাম একই; কারণ উনি আমার স্ত্রী। আর এই অধমের নাম হোলো সিরিল্লো পালেসি"—

আমি অভিবাদন জানালাম, কিন্তু কোথায় থাকেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস হোলো না—আমার ভব্যতা সম্বন্ধে তাহলে সন্দেহ জাগতে পারে, টেরেসা তাহলে এই সুন্দর তরুণটিকে বিয়ে করেছে? আর আশ্চর্য্য, সবাইকে ছেড়ে আমিও ঠিক এঁকেই প্রশ্ন করলাম!

অপেরা দেখে ফিরে আসবার সময় ওখানকারই একটি পরিচারককে ডেকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, মাত্র দশ মাস হোলো টেরেসার বিয়ে হয়েছে। আর ওর স্বামী বেচারা বেকার শুধু নয় বিত্তহীনও বটে; তবে টেরেসার অর্থসম্পদ দু'জনার পক্ষে যথেষ্ট। শুধু অর্থসম্পদ নয়, মানমর্য্যাদাও কিছু কম নেই টেরেসার।

উষার আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হোলাম আমার যৌবনের উষালোকে, যে প্রথম মাধুর্য্যের রঙের পরশ বুলিয়েছিল আমার মনে; তারই দরজায়! এক জন বৃদ্ধা পরিচারিকা এসে দরজা খুলে অভিবাদন জানিয়ে বললে, আমিই ম্যাসিয়ে ক্যাসানোভা কি না, কারণ তাঁরই অপেক্ষায় কর্ত্রী রয়েছেন।

বাড়ীর ভিতর ঢুকতেই টেরেসার তরুণ স্বামীটি বেরিয়ে এলেন, পরনে ড্রেসিং গাউন, মাথায় রাত্রির টুপী। আমাকে স্বাগত জানিয়ে বিনয়ের সঙ্গে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। জানালেন ওঁর স্ত্রী এখনি আসবেন, তার পর আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে বললেন,—"কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, আপনিই নিশ্চয়ই কাল আমার স্ত্রীর নাম জানতে চেয়েছিলেন।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি বহুদিন ওকে দেখিনি, আর ওর বিয়ে হোয়ে গেছে তাও জানতাম না। আমার সৌভাগ্য যে, ওর স্বামীর কাছেই আমি কাল প্রশ্ন করেছিলাম। আমাদের দু'জনার বন্ধুত্বের বন্ধনে আপনাকেও জড়াতে পারলে ধন্য হবো···অবশ্য আপনার সম্মতি থাকলে···"

টেরেসা এসে ঢুকলো। দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানে দু'টি প্রণয়ীর মতই আমরা উচ্ছ্বসিত আলিঙ্গনে পরস্পরকে বন্দী করলাম। কয়েক মুহূর্ত মাত্র···টেরেসা ওর স্বামীকে বসতে বলে দুই হাতে আমাকে টানতে টানতে সোফার উপর ওর পাশে নিয়ে বসালে···তার পর উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লো···আমারও চোখ অশ্রুসজল—

প্রথম উচ্ছ্বাসের বেগ একটু কমে এলে দু'জনারই চোখ গিয়ে পড়লো বেচারী স্বামীটির উপর···আমাদের খেয়ালই ছিল না ওর উপস্থিতি···আর বেচারার হতভম্ব, মূর্ত্তি দেখে দু'জনাই হেসে উঠলাম এক সঙ্গে। কিন্তু টেরেসা জানতো, ওই পোষমানা বেচারী জীবটিকে কেমন করে মানিয়ে নিতে হয়—

—"ও হোঃ পালেসি! ভুলেই গিয়েছিলাম তোমাকে বলতে, এই যে ভদ্রলোকটিকে সামনে দেখছো ইনি আমার বাবার মতো,···বরং বাবার চেয়েও বেশী বলতে পারি। অভিভাবকের মত, বন্ধুর মত, রক্ষাকর্ত্তার মত ইনি যে আমার কত উপকার করেছেন তুমি জানো না···আমি সবকিছুরই জন্যেই এঁর কাছে ঋণী, উঃ কি আনন্দের দিন আজ···দীর্ঘ দশটি বছর এই মুহূর্ত্তটির প্রতীক্ষায় ছিলাম।"

বাবার সঙ্গে তুলনা দেওয়ায় সে বেচারার চোখ দু'টি গোল গোল হয়ে উঠলো···কারণ টেরেসা যদিও আজ নিখুঁত সৌন্দর্য্য আর অটুট যৌবনকে এতটুকু ম্লান হোতে দেয়নি তাহলেও মাত্র দু'বছরের ছোটো আমার চেয়ে। তবু হাল ধরেই চললাম—

—"ঠিকই বলেছে, আপনার টেরেসা শুধু আমার মেয়েই নয়, সহোদরার প্রীতি বন্ধুর ভালোবাসা সবই ওর কাছে পেয়েছি। ও সাধারণ মেয়ে নয়, ও একটি অমূল্য সম্পদ'তার উপর আপনার স্ত্রী" ···এইটুকু এক নিঃশ্বাসে বলেই আমি টেরেসার দিকে ফিরে বললাম— 'প্রিয় তোমার শেষ চিঠিটার উত্তর আমি আজও দিইনি কারণ···"

—"আমি জানি তুমি 'লেড্‌স' এ বন্দী ছিলে। ভিয়েনায় থাকতে তোমার পালিয়ে আসার আশ্চর্য্য গল্প শুনেছিলাম। তার পর প্যারিসে আর হলাণ্ডেও তোমার খবর পেয়েছি। মাত্র সম্প্রতি আমি তোমার কোনো খোঁজ পাইনি কোনো সূত্রও পাইনি, যেখান থেকে খোঁজ পাবো। গত দশটি বছর কেমন করে কেটেছে সেই সব গল্প তোমার কাছে করবো··· তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। যাই বলো এখন কিন্তু আমি সুখী। আমার প্রিয়তম পালেসি, ওকে আমি ভালোবাসি, পালেসিও আমাকে ভালোবাসে। মাত্র কয়েক মাস আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমার আশা আছে তুমি যেমন আমার বন্ধু তেমনি এক দিন পালেসিরও বন্ধু হোয়ে উঠবে···"

এই কথায় আমি উঠে গিয়ে পালেসিকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করলাম। আর বেচারা পালেসি—স্ত্রীর পিতৃসম, ভ্রাতৃসম বন্ধুসম সম্ভবতঃ প্রণয়ীসম এই নবপরিচিতকে কি ভাবে গ্রহণ করবে সেটা বুঝে ওঠা বাস্তবিকই ওর পক্ষে দুরূহ ছিলো। ওর দুর্দ্দশা দেখে আমারই হাসি চেপে রাখা দায় হোয়েছিলো। কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে অতি কষ্টে স্বাভাবিক হবার
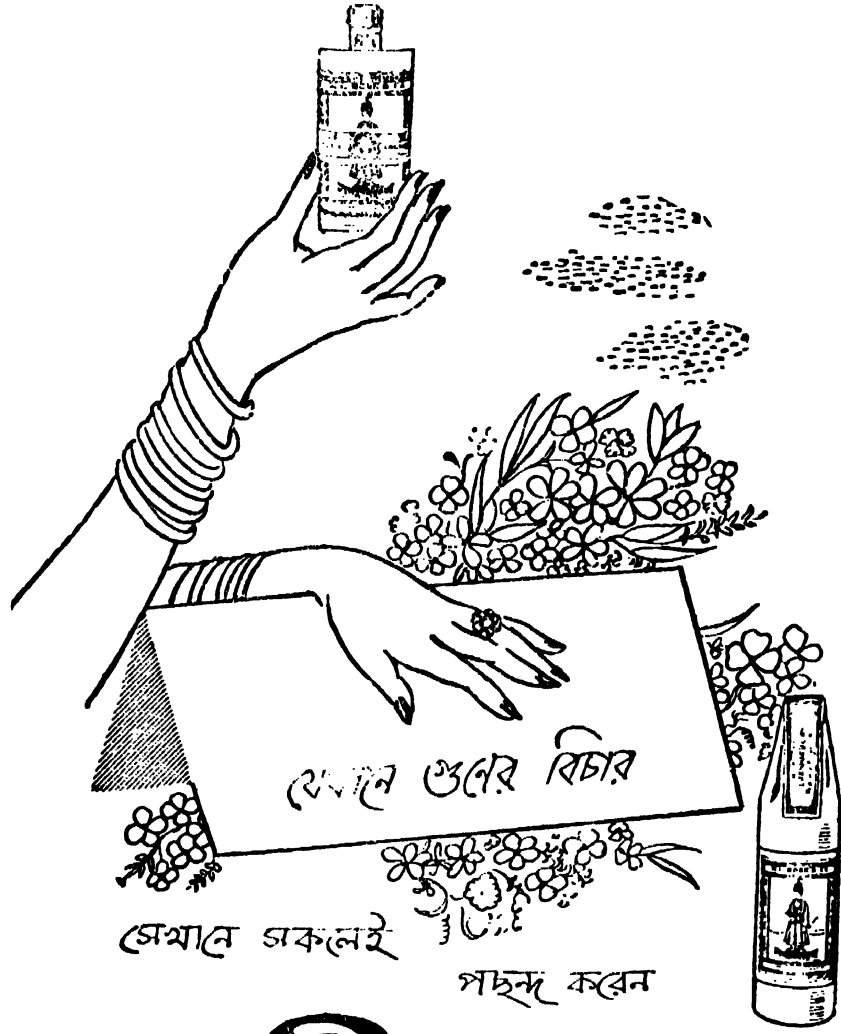
চেষ্টা করে আমাকে ওদের সঙ্গে এক পিয়ালা চকোলেট খাবার জন্ম অনুরোধ জানালে—আর পরক্ষণেই ভিতরের চলে গেল তার ব্যবস্থা করতে···যদিও আমার বিশ্বাস, নিজেকে একটু সামলে নিতেই গেল।

আমরা একা হোতেই টেরেসা হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দুই হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে মনের উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলো—

—"প্রিয় আমার, প্রিয়তম আমার···জীবনের প্রথম প্রেমের স্বপ্ন আমার···আমাকে বুকে টেনে নাও···আরও আরও নিবিড় করে এতটুকু যেন ফাঁক না থাকে। আমি কি ভুলতে পারি? হৃদয়ে প্রথম প্রেমের স্পন্দন তো তুমি জাগিয়েছিলে···কৈশোরের স্বপ্নভরা রঙীন মায়াকে তো তুমিই রূপ দিয়েছিলে···আজ একটি মুহূর্তের জন্মে ফিরে পেতে দাও সেই ফেলে-আসা মধুর ক্ষণগুলির একটি কণা। কাল থেকে সহোদরার প্রীতি নিয়ে সবার সামনে তোমার স্নেহের দাবীই করবো···কিন্তু সে কাল, আজ নয়। আজ শুধু তুমি থাকো আমার সেই চিরকিশোর প্রিয়তম···

না, না বঞ্চনা আমি করিনি···আমি ভালোবাসি আমার স্বামীকে, সত্যিই ভালোবাসি। তাকে আমি বঞ্চনা করিনি··· করবো না। কিন্তু তোমার ঋণ যে শুধু শুধতেই হবে···আমার প্রথম প্রেমের ঋণ। তারপর···তারপর ভুলে যাবো সব—শুধু মনে রাখবো আমি বিবাহিতা···আর তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের অক্ষয় বন্ধন। ও কি?···তোমার মুখ অত ম্লান কেন?"

—"সেদিন আমি বন্দী ছিলাম···সেই সতেরো বছর আগে··· তাই মুক্ত বিহঙ্গীকে ধরে রাখিনি। আর আজ আমি যখন মুক্ত তখন দেখি বন-বিহঙ্গী হোয়েছে স্বেচ্ছাবন্দিনী···অনেক দেরী হোয়েছে আমার। কিন্তু আজ তোমার ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ···বলো আমাকে তোমার কি ইচ্ছা? তোমার স্বামীর কাছে পূর্ব্বকথার কোনো উল্লেখই যেন না করি তাই না?"

—"তাই-ই। পালেসি আমার পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সকলেই যা জানে তা' ছাড়া যে নেপলসেই আমি মাত্র দশ বছরে এসে অর্থ, সম্পদ, খ্যাতি অর্জ্জন করি। এ বঞ্চনা নির্দোষ নয় কি? বলো, কার কতটুকু ক্ষতি হবে এটুকু ছলনায়? অথচ এক জনের জীবনে এ-যে অনেকখানি। সবাই জানে আমার বয়স চব্বিশ—আমি তাই-ই বলেছি। বলো তো আমাকে কি অনেক বেশী বয়স দেখায় তার চেয়ে?"

—"একটুও না—যদিও আমি জানি তোমার বত্রিশ বছর বয়স।"

—"একথা আমাদের মধ্যেই থাক্। কিন্তু ঠিক করে বলো আমাকে চব্বিশের মত দেখায় কি?"

—"তার চেয়ে আরও অনেক কম দেখায়।"

—"আচ্ছা, ক্যাসানোভা এবার বলো তোমার কথা। তোমার টাকার দরকার আছে? এক দিন তুমি যা দিয়েছিলে আজ তা ফিরিয়ে দেবার মতো ক্ষমতা আমার হোয়েছে···হাঁ সুদশুদ্ধ। আমার হাজার পঞ্চাশেক টাকা আছে আর প্রায় সমান দামের হীরে আছে···একটুও সঙ্কোচ করো না—শীগগির বলো, চকোলেট আসার সময় হোয়ে এলো যে···"

আমি উত্তরে শুধু আর এক বার ওকে আমার বাহুডোরে বন্দী করতে যাচ্ছিলাম এমন সময় চকোলেট এসে পড়লো। ওর স্বামী প্রথমে, আর পিছনে পরিচারিকার হাতে রূপার ট্রেতে তিনটি পেয়ালা। খেতে খেতে আমরা তিন জনেই নানা রকম গল্প করতে লাগলাম। পালেসি এবার অনেকটা স্বচ্ছন্দ আর সপ্রতিভ। কৌতুকভরা স্বরে পালেসি বললে, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই যে আগন্তুকটির সঙ্গে দেখা সেই কাল রাত্রে থিয়েটারে ওরই কাছে ওর স্ত্রীর পরিচয় চেয়েছিলো। তাই ও আশ্চর্য্য হোয়ে গিয়েছিলো খুবই। কিন্তু ওর ভদ্র মন আর সংযত ব্যবহার ইঙ্গিতেও প্রশ্ন তুললে না, কবে, কখন, কোথায় কেমন করে ওর স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে।

পালেসির বয়স তেইশ বছর মাত্র···কিন্তু অপরূপ ওর লালিত্য আর অতি শোভন ওর কেশবিন্যাস···হাঁ পুরুষের পক্ষে সৌন্দর্য্যটা একটু মাত্রাছাড়াই বলতে হবে। আর ওর স্বচ্ছন্দ ব্যবহার আর চঞ্চল আমোদপ্রিয় স্বভাবের জন্ম অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওকে ভালো লাগলো ···ভারী ভালো লাগলো।

প্রায় দশটা নাগাদ একে একে অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের আগমন সুরু হোলো রিহার্শালের জন্যে। আমি লক্ষ্য করলাম টেরেসার সহজ সুন্দর ব্যবহার প্রত্যেকের সঙ্গে···অথচ সবার মধ্যে।

দু'জন অভিনেত্রী শেষ অবধি থেকে গেলেন। টেরেসার কাছে তাঁদের আহারের নিমন্ত্রণ। তার মধ্যে লা কর্ত্তিসেলি নামে অভিনেত্রীটি আশ্চর্য্য সুন্দরী···কিন্তু তখন আমার সমস্ত মন টেরেসাতে আচ্ছন্ন। আর কারো দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার মত অবস্থাই ছিল না আমার।

আহারের শেষে এক জন মঠবাসী এসে উপস্থিত হোলেন আমাদের আসরে। ওঁর নাম আবে গামা। ওঁকে আমি চিনতাম রোমে থাকতে। উনিও আমাকে দেখেই চিনতে পেরে এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করলেন। ওঁর কাছ থেকে পুরানো বন্ধুদের সব খবর শুনতে লাগলাম···কিন্তু হঠাৎ আমার সমস্ত মনটা চমকে উঠলো একটি ছেলেকে দেখে। বছর পনেরো বয়সের একটি ছেলে ঘরে ঢুকে সকলকে অভিবাদন জানিয়ে এগিয়ে এসে টেরেসাকে চুম্বন করলো। একমাত্র আমিই ছেলেটির কাছে অপরিচিত। কিন্তু আশ্চর্য্য আমি একাই হইনি। টেরেসা তখনি ওকে আমার সামনে এনে বললে।

—"এটি আমার ভাই।"

টেরেসার ভাই! অথচ আমার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি···এতটুকু পার্থক্য নেই···কৈশোরের কমনীয়তাটুকু ছাড়া। তখনি বুঝলাম, তখনি জানলাম ওকে···প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার এর চেয়ে চরম আর কি হতে পারে?

আমার মনে হোলো আমাদের দু'জনার প্রথম পরিচয়ের এতগুলি সাক্ষী টেরেসা না রাখলেই ভালো করতো। আমি যত বার ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলাম তত বারই ও আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। আর সেই কিশোরটি এমন একাগ্র তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো যে টেরেসা ওকে কি বলছে তা ওর কানেও গেল না। আর ঘরশুদ্ধ সবাই এক বার আমার মুখে আর এক বার ঐ কিশোরটির মুখের দিকে তাকাতে লাগলো! যে কোনো লোক মাথায় এক ফোঁটা বুদ্ধি থাকলেই ধরে ফেলতে পারবে কিশোরটির বাপ মায়ের পরিচয়।

কথাবার্ত্তা ওর অতি মার্জ্জিত আর সব চেয়ে বড় কথা হোলো ও কথা কইতে জানে। তাছাড়া কি শোভন ভদ্র ব্যবহার! ওর মা বললে সঙ্গীত ওর একমাত্র সঙ্গী।

—"তুমি ওর 'হার্পসিকর্ড' বাজনা শুনো···সত্যিই শোনবার মত। যদিও ও আমার চেয়ে আট বছরের ছোটো তবুও অনেক ভালো বাজায় আমার চেয়ে।"

সত্যি কঠিন সমস্যার হাত এড়িয়ে যেতে মেয়েরা যত সহজে পারে পুরুষরা কিছুতেই পারে না।

সবাই বিদায় নেবার পর ঘরে টেরেসাকে একলা দেখে অভিনন্দন জানালাম, অমন সুকুমার দর্শন সহোদরের জন্তে।

—"ও তো তোমারই···আর আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ। মনে আছে ডিউক অফ কাত্রোপিনানোর কথা? তিনিই ওকে মানুষ করেছেন। মনে পড়ছে তোমার 'রিমিনি' থেকে যিনি আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর আশ্রয়ে? ছেলে জন্মাবার পরই ওকে সোরেন্টোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নয়টি বছর ও সেখানে ছিলো। ডিউক ওকে সিজার ফিলিপ লার্টি এই নামে দীক্ষিত করেন। ও বরাবরই আমাকে বড় বোনের মতই জানে। কিন্তু আমার হৃদয়ে একটি আশার ক্ষীণ আলো আমি নিবতে দিইনি···আমাদের আবার দেখা হবে আবার মিলবো তুমি আর আমি···আর তখন তুমি তোমার সন্তানকে স্বীকার করে তার জননীকে দেবে সহধর্ম্মিণীর সম্মান।"

—"কিন্তু এখন তো তুমিই সে পক্ষ বন্ধ করেছো টেরেসা?"

—"হায় রে, আমারি দুর্ভাগ্য ছাড়া কি বলি? ডিউকের মৃত্যুর পর যখন আমি নেপল্‌সে আসি তখনও আমি বিত্তবান। আর তোমার ছেলেও বিশ হাজার টাকার মালিক। আমার আর পালেন্দির যদি কোনো সন্তান না হয় তবে আমার যা কিছু সবই ওর—"

আমাকে টেরেসা ওর শোবার ঘরে নিয়ে গেল। আলমারী খুলে দেখালে হীরা মুক্তা আরও নানা মূল্যবান রত্ন, তাছাড়া প্রচুর রূপার বাসন।

—"সিজারিনোকে আমায় দাও টেরেসা—ওকে আমি দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।"

—"না, না, না, অন্য কিছু বলো, আর কিছু চাও, আমার ছেলেকে নিয়ে নিও না। জানো, ভয়ে আমি কোনো দিন ওকে ভালো করে চুমা খাইনি। আচ্ছা বলো তো ভেনিসের লোক কি মনে করবে যদি তাখে ক্যাসানোভা আবার কিশোর হোয়ে ফিরে এসেছে···"

—"তুমি কি ভেনিসে যাবে ঠিক করেছো?"

—"হ্যাঁ, আর তুমি?"

—"রোম তার পরে নেপল্‌স।"

আমার জীবনে এক চরম সুখের দিন। আমার সিজারিনো··· হৃদয়ের অনেকখানি জায়গা জুড়ে নিলো সে আপন স্বভাবে···শুধু সন্তানস্নেহে নয়। ওর দুষ্টুমীভরা স্বভাবে, ওর সরল কৌতুকের উচ্চ মধুর হাসিতে—ওর এক ঝলক দখিণ-হাওয়ার মত উচ্ছল প্রাণের খুশীতে···ও যে কী মায়া জড়ালো জানি না।

ওর 'হার্পসিকর্ড' বাজিয়ে মজার গান শোনানো কখনও ভুলবো না—ঘরশুদ্ধ লোকের হাসতে হাসতে দমবন্ধ হবার যোগাড়। আর টেরেসার দৃষ্টি শুধু আমার দিকে এক বার আর সিজারের দিকে এক বার···কি ভাবাভরা তন্ময় দৃষ্টি! অথচ ওরই মধ্যে দেখছি ঘনিষ্ঠ হোয়ে বসে পালেন্দিকে মিষ্টি করে আদর করে বলছে—"যাদের সবচেয়ে ভালোবাসি তাদের সান্নিধ্যের চেয়ে স্বর্গসুখও বড় নয়···"

বিচিত্ররূপিণী! কিন্তু ওর ছলনার ব্যথা আমি বুঝি।

[ক্রমশঃ।

—অনুবাদিকা শান্তা বসু।

গতকাল ঃ আজ

অর্ণব সেন

গতকাল ভোরে ছিল বৃষ্টির আকাশ
রূপালী বন্যার মতো বৃষ্টিঝরা দিন
প্রাত্যহিক মন ছিল নেশায় রঙিন
আহা, জল লেগে কাল কি সবুজ হয়েছিল ঘাস!
কাল বুঝি জলে ভিজে তুমি ছিলে কিছুটা রক্তিম
ভিজে চুল, ভিজে মন, গ্রীবাটি বঙ্কিম,
কি কথা কালকে ছিল এখন বলো না
কাল তো বললে না।
আজকে সকাল এলো অন্ধকার চোখের মতন
আকাশে পাখিরা নেই চুপচাপ যেন ঝাউবন,
ঘুম নেই, ঘুম নেই, সাগরিকা মনে
কি পাবে এখানে এই—এই ঝাউবনে?
তোমার অবুঝ চোখে যা ছিল গহনে
বলো তা আমায় আজ চুপি চুপি এই ঝাউবনে;
কি কথা বলবে বলো এইখানে চোখ মেলে ঘাসে
বিগত ভোরের স্বপ্ন এখনি কি ম্লান হয়ে আসে?

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

যে-সব বারাঙ্গনাদের মুচ্‌কি হাসিতে ছাই ঝরে, যে সব গণিকারা পুজোপাঠে মন দিয়েছেন, এবং যে-সব শ্রমণারা বৃদ্ধা, তাঁরা কুলস্ত্রীদের ধন ও শীল হরণ করেই…চলেন। ২৩

এক দল ধূর্ত্ত রয়েছেন, যাঁদের কাজ জড়ভরত নায়ক ধরে বেড়ানো। তাঁদের বাণী,—

"বিধবাটি তরুণী হে; সম্পত্তিও বিস্তর। আপনার মতই একটি দিব্য প্রেমিক তাঁর প্রাণের কামনা।"

তত:পর ধূর্ত্ত ভক্ষণ করেন তাঁর সর্ব্বস্ব। ২৪

এক দল ধূর্ত্ত রয়েছেন তাঁরা কারুশিল্পী। প্রত্যহ বেতন নিয়ে কাজ করেন। কর্মে বিঘ্ন-ঘটানোই তাঁদের বিলাস। তাঁদের বলে… "কাল-চোর।" ২৫

এক দল ডাকসাইটে জোচ্চোর আছেন, যাঁদের ব্যবসায় ক্ষেত্র হচ্ছে বিদেশ। তাঁরা পাশা পাতেন, নানান রকমের গণনা করেন, তার পরেই দেখান সুনিপুণ হাত সাফাই। ২৬

এক দল ধূর্ত্ত আছেন, তাঁদের প্রাদুর্ভাব হয় ভোজনের সঙ্গেই। মদ, পাশা, বেশ্যা…এই পথেই বহু ব্যয় ঘটিয়েছেন। তাঁদের বলা হয় "গৃহচোর।" সাধারণত: তাঁর বন্ধুজন গৃহদাস। ২৭

আর বৎসগণ, জেনে রেখো—যিনি বলে বেড়ান—

"শাস্ত্রগুলো কৃত্রিম, অসত্য; কেউ কি কখনো সাক্ষাৎ পরলোক দেখেছে?"

তিনি একটি শঙ্কাশূন্য নিরঙ্কুশ মত্ত-মাতঙ্গ। ২৮

আর এক দল মানুষ আছেন, তাঁদের নাম "লাভ-চোর।" এঁরা মহাপণ্ডিত। সন্ধানে ফেরেন সেই সব মানুষদের, যাঁদের বেশী লাভের লোভটি অত্যধিক। অসহ্য লাভের লোভ দেখিয়ে, তাঁদের দিয়ে ঋণ করান; আর তার পরেই চুরি করেন ঋণ-ধন। ২৯

"ন্যায়-চোর" নামীয় আর এক দল ধূর্ত্ত আছেন। তাঁদের আখ্যা হচ্ছে 'ভট্ট।' তাঁরা জন-ধন-ঘন-মন। সর্ব্বদাই সর্ব্ব-ভুক্‌। বিচার-গৃহ-সমুদ্রের মাঝখানে বাড়বাগ্নির মত জ্বলেন। ৩০

"সুখ-চোর" নামীয় আর এক দল ধূর্ত্ত আছেন। তাঁরা সুহৃৎ। ঐশ্বর্য-পদ্মের তাঁরা ভ্রমর; বিপদের দু:সহ বাতাস বইলেই তাঁরা মুখ উলটিয়ে বসে থাকেন। লক্ষ্মীর লতাই কেবল তাঁদের আহ্বান জানান। ৩১

"কর্ণ-চোর"—নামীয় আর এক দল ধূর্ত্ত আছেন। এক লাখ হাসির কথা আওড়ে কর্ণ-সুখ বিধান করেন তাঁরা। এমন সব কাজের কথা ফলিয়ে বলেন, যার সবটুকুই অপূর্ব্ব, কল্পনাতেও যার ধারণা করা অসম্ভব। ৩২

"স্তিতি-চোর"—নামীয় আর এক দল ধূর্ত্ত আছেন। চতুর তাঁদের বচন। দোষগুলোরও গুণ গেয়ে তাঁরা শ্রদ্ধা উৎপাদন করে ফেলেন দোষগুলোর প্রতি। সে এক অভিনব সৃষ্টি! আচারের বালাই তাঁদের নেই। ৩৩

"গুণ-চোর" নামীয় আর এক দল পরম ধূর্ত্ত আছেন। বিপুল যত্ন-সহকারে তাঁরা পরের গুণগুলিকে ঢেকে ফেলে, নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রচার করেন নিজের গুণ, সম্মোহিত করে ফেলেন মূঢ়দের সরল হৃদয়। ৩৪

আর এক দল ধূর্ত্ত আছেন। তাঁদের বলা হয় "বৃত্তি-চোর"। প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে তাঁদের বেশী সময় লাগে না। কিন্তু অন্য কেউ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠছে দেখলেই হিংসেয় তাঁরা ফেটে পড়েন। পরের ভালো তাঁদের সয় না। খলতার বৈচিত্র্য দেখিয়ে তাঁরা অদ্ভুত উপায়ে তাঁদের নাশ করেন। ৩৫

আর এক দল ধূর্ত্ত আছেন, শম দম বা ভক্তির বালাই তাঁদের নেই; অথচ তাঁরা দেখান, যেন কতই না তাঁরা পালন করছেন তীব্র ব্রত। প্রতিপত্তির জোরেই তাঁরা হঠিয়ে দেন সাধু-সজ্জনদের। তাঁদের বলা হয় "কীর্ত্তি-চোর"। ৩৬

"দেশ-চোর" নামীয় আর এক দল ধূর্ত্ত আছেন। তাঁদের মুখে অহরহ: শুনতে পাওয়া যায় দেশ-দেশান্তরের রম্যাতিরম্য বর্ণনা;—

"ও:, সেখানে মশায়, কী ভোগ-বিলাস!
উ:, কী না ঘটছে সেখানে!"

কথায় ভুলিয়ে তাঁরা পশুর মতন বিদেশে চালান করেন দেশের মানুষদের। ৩৭

এমন ধূর্ত্তও আছেন, যাঁরা হাসি-খুশীর ভিতর দিয়ে অথবা অনেক রকমের সৌখীন পাণ্ডিত্য দেখিয়ে অথবা নর্ম-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে, পরের ঘাড়ে দিন কাটিয়ে দেন আনন্দে। তাঁরা "প্রকৃতিব্যাপার চোর"। ৩৮

আর আছেন "বিটে"র দল। নিজেদের বহু বৈভব তাঁরা খেয়ে ওড়ান। তারপর পরের বৈভব কী করে কমাতে হয়, ওড়াতে হয়, ক্ষয় করতে হয়, সেই ব্যবসায়ে তাঁরা দীক্ষালাভ করেন। হরদম তাঁদের মুখে লেগে থাকে বেশ্যাগৃহের স্তুতি। তাঁরা চিন্তনীয় পদার্থ। ৩৯

আর এক দল ধূর্ত্ত আছেন, তাঁরা নিঃস্পৃহ-নিয়োগী। অতি-শুচিতার আড়ম্বর দেখিয়ে তাঁরা বিত্ত গ্রহণ করেন না ; আগে ভাগেই অধিকার কেঁদে বসেন। এঁরা নিয়ম-সলিলের মাছ। সর্বথা পরিহার্য। ৪০

ফিরিওয়ালারা পাপ। ঘরে ঘরে তাঁরা পণ্য নিয়ে বেড়ান। হাতে ক'রে যা দেন, তা কেবল ঠুনকো কাচ। ৪১

যাঁরা ছন্দানুবর্ত্তী, খানায় ফেলে দিলেও যাঁরা সাধুবাদ করতে ছাড়েন না, বৎসগণ, জেনে রেখো, তাঁরা মধুর বিষবৎ ; অন্তরে প্রবেশ করে হরণ করেন সর্ব্বস্ব। ৪২

আর রাজদাসেরা ধূর্ত্ত। তাঁরা বিজনে সেবকদের ডেকে নিয়ে বলেন—

"রাজা আপনাদের উপর প্রসন্ন, আপনাদের গুণগান করছিলেন।" তারপরেই লোঠেন। ৪৩

"মহাশয়, স্বপ্নে আমাকে দর্শন দিয়েছেন লক্ষ্মী দেবী। পদ্ম ফুল তাঁর হাতে। দেখলেম, দেবী প্রবেশ করলেন আপনার গৃহে।"

"মহাশয়, মাসাবধি আমি উপবাস করেছি। তুষ্টা হয়ে লক্ষ্মী দেবী আদর করে আমায় বললেন—'যা রে আমার ভক্তের কাছে যা, সেই তোকে সব দেবে।" ইত্যাদি স্বপ্নতত্ত্বে ভুলিয়ে সরল মানুষদের গৃহে গৃহে, কত ধূর্ত্তই না নেচে বেড়ান! ৪৪

রাজধানীতে বিপ্লব বেধেছে বা নগরোদয় যজ্ঞ হচ্ছে বা বিবাহোৎসবে ভিড়ে ভিড় ;…শক্ত হলেও সেখানে উপস্থিত হয়ে যান বন্ধুবেশী ধূর্ত্তের দল। একটিই মাত্র তাঁদের উদ্দেশ্য ;…লুঠ করে হাওয়া-হওয়া। ৪৫

কতকগুলি বিশেষ প্রকারের মানুষ আছেন। বৎসগণ, তাঁদের …সাবধান!—

(১) বন্ধু-বান্ধবদের মদের আসর বসেছে, অথচ দেখবে, তাঁরা মদ স্পর্শ করছেন না।

(২) রাত জাগার দল।

(৩) ভাবে বিভোর হবার দল।

(৪) সেবার লোভে যেন তাঁরা মুখ বাড়িয়েই আছেন ; কিছু-না-কিছু করবার জন্যে যেন সদাপ্রস্তুত।

(৫) তাঁরা কথা বললে উত্তর দেন না ; যদিই বা দিলেন অস্পষ্ট শোনায় তাঁদের গদগদ গুঞ্জন :

(৬) চক্ষুলজ্জাহীনের দল।

(৭) তাঁরা উচ্ছ্বাসে ক্ষণে ক্ষণে ঘন ঘন কাঁপেন এঁরা সকলেই চোর। ৪৬-৪৭

আর সাবধান তাঁদের, যাঁরা—

(১) প্রার্থনা করেন পবিত্তশুদ্ধির প্রাচুর্য ;

(২) ঘন ঘন তোলেন সগর্ব্ব গর্জন ; এবং—

(৩) যাঁরা ঘোর অপলাপকারী। এঁরা পাপ। শঙ্কার এঁরা মন্দির। ৪৮

চোখের সামনে থেকেও চোখের আড়ালের কাজগুলি যিনি করেন ;

যাঁর কাছে করা-না-করা, সত্যি-মিথ্যা সব সমান ;

ব'লেও যিনি বলেন, 'না এমন কিছু তো আমি বলি নাই' ;

ব্যবহার যাঁর নির্বিকার ;

পুরুষদের মধ্যে তিনি পরম ভয়-স্থান। ৪৯

মিনমিনে নকল মুগ্ধ-মুগ্ধ ভাব নিয়ে, মেয়েলি ঢঙে কথা কইতে কইতে, মেয়েদের চরিত্র নিয়ে আলাপ করতে করতে, স্ত্রী-রত্নদের মধ্যে যাঁরা ষণ্ডের মত ঘুরে বেড়ান, তাঁরা সাক্ষাৎ কামদেব,…কিন্তু গৃহে ধূর্ত্ত। ৫০

এমন মনুষ্যও দেখতে পাবে,…সর্ব্বদাই যাঁর মাথাটি নীচু, দৃষ্টিটি নীচু ; বৈভব থাকলেও দাঁত ময়লা, কাপড় ময়লা ; বসে বসে ভাঁড়ারঘরের হিসাবপত্র লিখছেনই তো লিখছেন। ভেবে দ্যাখ তো বৎসগণ, এমন মনুষ্য ভাঁড়ারঘরের ইঁদুর কি না? ৫১

যে মানুষ প্রীতি-বেশ্যার ভবনে গৃহদাস হয়ে সারাটি দিন কাটান, অথচ নিজের ঘরের কথায় পঙ্কমুখ,…সে হেন মনুষ্যটিকে চিনে রেখো। তিনি চর। সমস্ত আত্মা দিয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। ৫২

নিন্দনীয় কাজ, বড় দণ্ডার্হ কাজ…তাতেও যিনি বেবাক্ ঠকান ;

জীবিকা-নাশের ভয় দেখিয়ে যিনি ব্যবস্থা করেন নিজের ভোজনের ;

তাঁর কথা আর বোলো না। তাঁর দয়ায় রাশিচক্রও স্থির হয়ে যায়। ৫৩

যা কিছু গোপনীয় সমস্তই ভালো ক'রে দেখে নিয়ে এবং অতি সহজে তার সমস্ত রহস্য জেনে নিয়ে, সেই মূঢ়কেই ধূর্ত্ত আবার গিলে কোটেন। ৫৪

রাজবিরুদ্ধ কোনো দ্রব্য, বা জালমুদ্রা, বা কূট দলিলাদি বা অন্য কিছু ঘরে ফেলে দিয়ে ধূর্ত্ত সরে পড়েন অন্যত্র অলক্ষ্যে। তার ফল ফলে। ধনীরা নিপাত যায়। ৫৫

মানুষ ক্ষুদ্রই হোক বা ক্ষীণই হোক…যদি একবার সে ধনের আস্বাদ পায়, বা পরে যদি তার অর্থাগম হয়, তাহলে দেখবে, তার হাতে যেন আপনা হতেই উদয় হয়েছে অস্ত্র বিষ বা পাশ। তিনি যম হয়ে ওঠেন। ৫৬

লজ্জা যে নায়কের ধন, অথবা যিনি কুলীন, অথবা যাঁর শুদ্ধতা শীল ও মর্য্যাদা, বড় সম্মানিত প্রায়ই দেখা যায়, সগর্ভ নারীদের সহায়তায় তাঁকে মেয়েমানুষ বানিয়ে ফেলেছেন ধূর্ত্তেরা। ৫৭

আকছার দেখা যায়,… স্বামীরা প্রবাসে গেছেন,—আর ধূর্ত্তেরা লুঠছেন মুগ্ধা বধূদের,…মেকী প্রণয়-রঙ্গের নির্মম মুদ্রা দেখিয়ে, অথবা না দেখিয়ে। ৫৮

জনবহুল স্থানে ধূর্ত্তেরা অঙ্গে আভরণ চড়িয়ে, ভদ্রবেশে, হেলাভরে ঘুরে বেড়ান, এবং অচঞ্চল-হস্তে হরণ করেন সকলের ধন। কেউ যদি দেখে ফেলেন, অমনি হাস্য, অন্তর্ধান…লাভ। ৫৯

ধূর্ত্ত দেশান্তরে যান, সাড়ম্বরে ঘর জাঁকিয়ে বসেন। বিশ্বাস ক'রে লোকে তাঁর হাতে গচ্ছিত রেখে যায় লক্ষ লক্ষ টাকা। স্ফীত হয়ে ওঠেন ধূর্ত্ত, পূর্ণ হয় তাঁর গৃহ, পূর্ণ হয় কুম্ভ। তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই, ধূর্ত্ত দেন পিট্টান। ৬০

আবার কোথাও দেখবে, এই ধূর্ত্তগণ শত্রুধ্বস্ত রাজপুত্তুর সেজে বসে গেছেন। কী তাঁদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মিহিন ধুতি! স্বর্ণালঙ্কারের কী ঘনঘটা অঙ্গে! সম্ভ্রমভরে লোকজন এসে দাঁড়াচ্ছে, আর তিনি পুজো কুড়োচ্ছেন ঘরে ঘরে। ৬১

ধর, কোথাও উৎসর্গ-করা দেশবৃষভ বা পুণ্যছাগল ছাড়া রয়েছে। ধূর্ত্তেরা কি করবেন জানো? সেগুলোকে বিক্রী করে দেবেন।

আর এমনও মূর্খ আছেন যাঁরা সেগুলোকে কিনবেন, দুঃখে পচবেন, আনন্দে লাফাবেন। অর্থ লাভ হয়েছে তো! ৬২

মহাশয়-ব্যক্তিদের ঐশ্বর্য যে ধূর্ত্ত ক্রুদ্ধ ঘৃণায় পরিত্যাগ করে চলে যান, কিন্তু তলেও সেই ধূর্ত্তকেই,···মানুষে দিয়ে যায় বিত্ত, সভয়ে সযত্নে। ৬৩

নিঃসার ভূর্জ্জপত্রে লেখাপড়া ক'রে দিয়ে ধূর্ত্ত গুছিয়ে ফেলেন রাশি রাশি পণ্য। তারপরে তিনিও বেরলেন দেশে-বিদেশে, আর ধনিকরাও ভুলিয়ে গেলেন হাজারে হাজারে। ৬৪

বিদেশে যখন বাস করেন, তখন প্রচার করে দেন, গয়া-গঙ্গা ইত্যাদি তীর্থযাত্রায় তিনি চলেছেন। মৃতবন্ধুদের নামে পূজো দিতে তৈজসপত্র, অর্ঘ ইত্যাদি হাতে নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে যান মূঢ়েরা। এবং ধূর্ত্ত সেগুলিকে গ্রহণ করেন। ৬৫

কোথাও দেখবে পণ্য-রমণী সুখের ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন মুগ্ধদের, আর চুরি করছেন তাঁদের গায়ের মহামূল্য পোষাক। তাঁরই হাতে আবার দেখবে, অচল রূপেয়া গুঁজে দিয়ে ঠকিয়ে নিশিপালন করে গেলেন ধূর্ত্ত। ৬৬

কোথাও দেখবে, বোবা বা কালা কোনো বণিককে মালখানায় পুরে রেখে, ধূর্ত্ত লহমায় সরিয়ে ফেললেন তাঁর বহুমূল্য আদর্শ মাল। ৬৭।

কিঞ্চিৎ পরিচয়,
কিঞ্চিৎ প্রগলভতা,
কিঞ্চিৎ কল্পনা,
কিঞ্চিৎ কলহ,
কিঞ্চিৎ মামলা—

এইগুলিকেই সাক্ষী ক'রে বিশ্বজয় করেন সর্বজ্ঞ ধাপ্পাবাজ। ৬৮।

মেকী বড়লোক তিনি সাজেন;
পেটে পুঁথির বিদ্যে, অথচ বচনে ঝরান জ্ঞান;
বানানোয় তিনি বীর;
চপল একটি চতুর্মুখ।
এই হোলো ধূর্ত্তের প্রকাশ। ৬৯

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে কাঁপাতে কাঁপাতে সঙ্কেতে তিনি সকলকে জানিয়ে দেন···এখন যে যার ঘরে বিদায় হও। তার পরেই মহাধূর্ত্তটি হয়ে ওঠেন স্বেচ্ছাচারী, দিগন্তরে অন্তর্ধান হন···মজা লুঠতে। ৭০

গুরুজনদের সামনেও অবাধে ধূর্ত্ত বলে যান "একশ বছরের পুরোনো একটি মাত্র আমলকী খেয়ে শ্রীপর্ব্বত থেকে আমি এসেছি। আমার স্মরণ হচ্ছে শুভ-সূচনা।" ৭১

বৎসগণ, তোমাদের কাছে সংক্ষেপে আজ আমি বর্ণনা করলুম চৌষট্টিটি মায়া। কে জানে, লাখ লাখ কত রয়েছে ধাপ্পা-মহারাজদের মায়া। ৭২

ইতি কলাবিলাসে নানা-ধূর্ত্ত-বর্ণনং নাম নবমঃ সর্গঃ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

পালতে মাদার

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য

কণ্টকময় লতাগুল্মের চূড়ে
কে তুমি উঠেছ ফুটে?
প্রভাত-অরুণ বর্ণ তোমার স্ফুরে,
ধূলার ধরণী রূপবৈভব লুটে;
তোমারে চিনেছি পালতে মাদার অয়ি!
দিব্যাঙ্গনা, রূপসী-মহিমময়ী!

তুমি স্বরগের পারিজাত মন্দার,
ধূলার ধরায় কেন আভসার তব?
নন্দনরাণী শচীর কণ্ঠহার,
কা'র অভিশাপে কণ্টকযোনি লভ?
মম মালঞ্চ ধন্য করেছ তুমি,
ধন্য ধরার সমীর তোমারে চুমি'।

শাখার শিখরে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটি'
রক্তাম্বরা, রক্তাঙ্গিনী বালা,
কোকনদরুচি দল দিয়ে ভরি মুঠি
ফাল্গুনে আজি রিক্ত করিছ ডালা
সারাদিন কেন তরুতলে যাও ঝরি!
উতলা হ'য়েছ কা'র কথা স্মরি' স্মরি'!

অজের বিলাপে ভরি গেছে ত্রিভুবন,
অমৃত করেছে বিষের বৃষ্টি হায়!
রাজাধিরাজের হরিয়া বুকের ধন,
কোন্ বেদনায় অন্তর তব ছায়?
যে ভূমে পড়েছে লুটায়ে ইন্দুমতী,
এসেছ কি তা'র জুড়াতে হৃদয় সতি?

কণ্টকময় আছিল শয়নতল,
মরমী অমরী ছাড়ি এলে অমরায়,
দুখের বহ্নিদহনে দীপ্ত দল
আজও হেরি রাঙা স্মরি সেই বেদনায়!
অয়ি পারিজাত, অয়ি মন্দার মোর,
ইন্দু-মরণে অপরাধ কিবা তোর?

কুটিল নিয়তি করেছে কুটিল লীলা,
তুমি দরদীয়া স্বরগ তেয়াগি এলে;
কণ্টক পরে কৃচ্ছ্রসাধনশীলা,
কুঙ্কুমরাঙা দলগুলি দিলে মেলে।
দুখের এ ভূমি, কঠিন ধরণীতল,
এ নহে তোমার যোগ্য আবাস স্থল।

অয়ি পারিজাত, অয়ি মন্দারবালা!
মম কণ্ঠের লহ সঙ্গীতমালা।
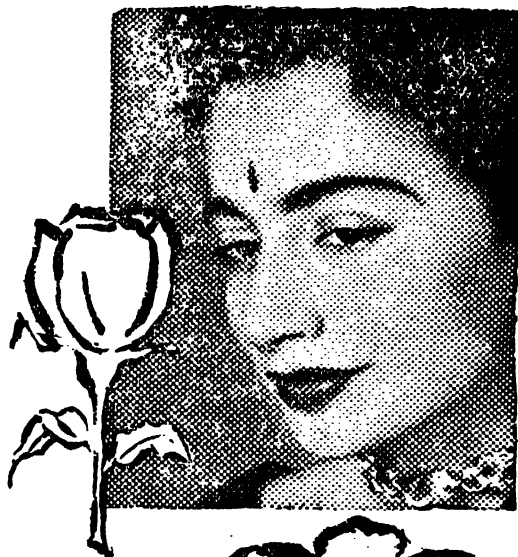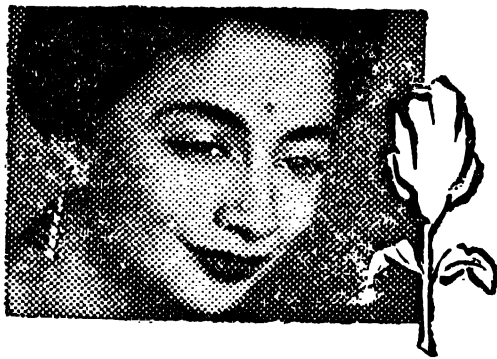
ফুলের মত…
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে

রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্যে তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান
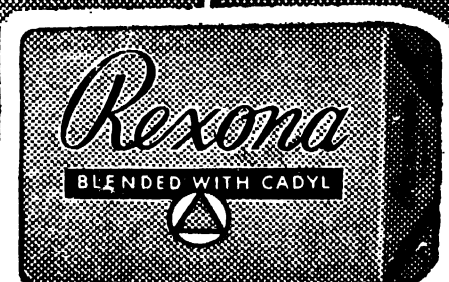
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

R.P. 148-X52-BG

পঞ্চতপা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১০

কন্ট্রাক্টর ঘোষ-চাকলাদার যেমনটি আশা করেছিল, তেমনটি হল না।

ক্রমশ ভিতরে ভিতরে একটু উতলা হতে থাকল তারা। রণবীর ঘোষ না হোক দ্বিজেন চাকলাদার বটেই। সপ্তাহে দু'-তিনবার পালা করে হেড আপিসে আনাগোনা করছে। আশ্বাস পাচ্ছে না এমন নয়। কিন্তু সেটা খুব জোরালো লাগছে না এখন। চড়া মাশুলে এমন নিষ্প্রভ আশ্বাস সর্বত্র মেলে। হেড আপিস থেকে লেখালেখি চলছে। এখান থেকেও জবাব যাচ্ছে। এই মামুলি আপিসি-চালের রীতি জানে।

নিরুপায় বিক্ষোভ আর অসহিষ্ণু প্রতীক্ষা। এ ছাড়া পথও নেই আর। ইচ্ছে করলেই একটা সোরগোল ফেলতে পারে তারা, হেস্তনেস্ত করতে পারে। কিন্তু তাতে করে যে জালে জড়িয়েছে, সেটা আরো জটিল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। ঘা খেতে অভ্যস্ত নয় বলেই প্রথমে গর্জে উঠেছিল। কিন্তু তলিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেল একটু। অনবধানে ওই ঘা সুদূরঘাতী হতে পারে। কারণ সন্দেহের দায়ে কন্ট্রাক্টরি বাতিল করাটাই শেষ অস্ত্র নয় চীফ ইঞ্জিনিয়ারের হাতে। অপটু চালে তাকে ঘাঁটাতে গেলে যে ব্যবস্থায় এগোতে পারে সে, তার রাস্তা সোজাসুজি গারদের দিকে।

অবশ্য এ ধরনের ভাবনা শুধু দ্বিজেন চাকলাদারেরই। রণবীর ঘোষ অত ভাবে না। ভেজালের দায় তারও জানা আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে টাকার যাদুও জানা আছে। তা ছাড়া গো-ডাউনে এখনো আর ভেজাল নিয়ে বসে নেই সে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী চৌকস হলে গো-ডাউনে পাহারা বসাতো সর্বাগ্রে। তবু চুপ করে আছে সে-ও। কারণ, ব্লকের সেই ফাটলটাতো এখনো হাঁ করেই আছে তেমনি। চালে ভুল হলে ওটা যা গ্রাস করেছে, তার থেকে অনেক বেশি উগরে দিতে পারে।

গো-ডাউনে বালুর পাহাড়, পাথর-কুঁচির পাহাড় আর সিমেন্ট বস্তার পাহাড়গুলো যেন নিঃশব্দ অনাদরের বোঝা বইছে একটা। বিরাট অপচয়ের সম্ভাবনায় স্তব্ধ। বোবা নিঃশ্বাস ছাড়ছে যেন। সর্বত্র পরিত্যক্ত শূন্য অনুভূতি একটা। কর্মতৎপর সাড়াশব্দ নেই কোথাও। রণবীর ঘোষ সেখানে এসে দাঁড়ায় একসময়। দুর্জয় ক্রোধে দেহের প্রতি রক্ত ভরাট হতে থাকে।

চিঠি পড়ছে। কলকাতার আড়ত থেকে চিঠি। নতুন বারতা কিছু নেই। হেড আপিসের প্রীতিবদ্ধ শুভানুধ্যায়ীদের নির্দেশ. চিফ ইঞ্জিনিয়ার নরম না হলে তদবীর তদারক করে বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না। অতএব, ইত্যাদি।

অস্ফুট কটূক্তি করে বসে বসে পাইপ টানতে লাগল। তেলতেলে মুখে লালচে আভা। দ্বিজেন চাকলাদারও চিঠি পড়ে ভুরু কোঁচকালো। চিঠিখানা আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল তার সামনে।

পাইপ মুখে রণবীর ঘোষ অনেকটা যেন নিজের মনেই বলল, চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে নরম করার পরামর্শ দিয়েছে।

বিরক্ত মুখে দ্বিজেন চাকলাদার জবাব দিল, তা তো দিয়েছে, কিন্তু লোকটা যে নিরেট পাথর একখানা, তাকে নরম করবেন কি করে?

ঠিক কানে গেল না বোধ হয়। অথবা শুনেও শুনল না। ঘোষ ভাবছে কিছু। আর পাইপ টানছে। অনেকক্ষণ বাদে বলল, কিন্তু সেরকম চেষ্টাও তো করিনি।

লোকটার এ ধরনের ভাব-ব্যতিক্রম চেনে দ্বিজেন চাকলাদার। মগজে নতুন কিছু মতলব এসেছে বা আসছে। ও মগজের প্রতি আস্থাও প্রচুর। অবশ্য যদি সেটা নারী-বিবর্জিত পথে চলে। মুশকিল আসানের ঘ্রাণ পেল যেন।

নিজের অজ্ঞাতে চিঠিটা দুই হাতের চেটোয় তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে রণবীর ঘোষ। তালগোল পাকিয়ে চলেছে আরো। অন্তঃক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ। সামনে দেয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি আটকে আছে স্থাণুর মত। চোখ পড়ল। নিশানা করল। ছুঁড়ে মারল ঠিক করে। ঢ্যাপ করে শব্দ হল একটা। টিকটিকিটা মাটিতে পড়ল। গায়ে লাগেনি, আচমকা আক্রান্ত হয়ে থাবা ফসকেছে। সেই এক কথাই বলল আবার রণবীর ঘোষ, সেরকম চেষ্টাও তো করিনি আমরা তাকে নরম করার, করেছি?

জবাবের প্রত্যাশায় নয়। নিজের মনেই পর্যালোচনা করেছে কিছু। ভুল হয়েছে বই কি। সুপারিশ করতে গিয়েও উপেক্ষা দেখিয়ে এসেছিল। নত হয়নি বরং একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে এসেছে। গোড়ায় গোড়ায় হত না এমন ভুল। ভিতরের দম্ভ বিনয়ের আঁচে তরল করে নিতে পারত যখন তখন। মর্যাদার শিখরে বসে ড্যামের ওই অল্পবয়সী ওপরঅলাটিকে প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মান না দিয়ে ভুল করেছে। নইলে ফন্দিফিকির জানে বই কি। পাথর নরম করারও ফন্দিফিকির জানে।

এবারে মনভিজানো আবেদন নয় আর। নিরভিমান সমর্পণ। সেও লক্ষ্যস্থলে নয় সরাসরি। মাটি চুঁইয়ে শিকড়ে পৌছানোর মত এই সমর্পণের ধারাও চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দরবারে পেশ করে নরেন চৌধুরীর মারফৎ। বলল, ফাঁসির আসামীও নিজের হয়ে দু'টো কথা বলতে পায়, আমরা কি তাও পাব না?

বিব্রত বোধ করল নরেন চৌধুরী। মাসের পর মাস এরকম নিরুপদ্রবে কেটে যাবে ভাবেনি। উতলা ভাবটা একেবারে যায়নি তবু। স্বচ্ছ জলের নিচে খানিকটা পঙ্কিলতা জমে থাকার মত এই অনাবিল কর্মস্রোতের তলায় তলায় একটা গোলযোগের আশঙ্কা থিতিয়ে আছে সেই থেকে। কখন বুঝি ঘুলিয়ে ওঠে। কিন্তু তার বদলে ক'মাসের এই শান্ত প্রতীক্ষা আর তারপর এই নতি স্বীকার।

এতটা আশা করেনি নরেন চৌধুরী। আশা করেনি বলে আবেদনও যথাস্থানে পৌছুল।

সময় অনেক ভোলায়। কোন রকম বাধা না পেয়ে চি

ইঞ্জিনিয়ারের সেই রূঢ়তা গেছে। তা'ছাড়া মেজাজও অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আজকাল। জবাব দিল, কিন্তু আমি আর কি করতে পারি বলো?

নরেন বলল, কি বলতে চায় শুনতে বাধা কি। গোড়ার দিকে লোকটা উপকারই করেছিল। এ ব্যাপারে শাস্তিও যথেষ্ট হয়েছে—এরপর কিছু করা সম্ভব হলে করবে, নয় তো সেটাই বুঝিয়ে বলে দেবে।…কার ভিতরে কি আছে বাইরে থেকে বোঝা শক্ত, দেখই না কি বলে।

বাদল গাঙ্গুলি আপত্তি করেনি আর। দিনস্থির করে নরেন রণবীর ঘোষকে জানিয়ে দিল।

শুনে মনে মনে আর একদফা কটূক্তি বর্ষণ করল রণবীর ঘোষ নিজের উদ্দেশে। স্থূল দম্ভের বশে মিথ্যেই এই ক'টা মাস এভাবে নষ্ট। যেখানে মাটি তেতে আছে সেখানে জল না ঢেলে ছুটল কি না ঠাণ্ডা হেড আপিসকে আরো ঠাণ্ডা করতে!

দিনে দিনে খুশির মাত্রা বাড়ছে নরেন চৌধুরীর। নিজেরই ভিতরে কোথায় যেন অনেকদিন ধরে একটা খুশির আলো জেলে বসে আছে সে। মনের আনাচে কানাচে সর্বত্র খুশির ঝলক। বাদে শুধু সেই খুশি প্রদীপের নিচটুকু। সেখানে কি যেন এক আলো-আঁধারি সংশয়।

কিন্তু মানুষটাই ভিন্ন ধাতুতে গড়া। ভাবনশূন্য উচ্ছলতায় ভরপুর। যেদিকে তাকালে সংশয় সেদিকে তাকিও না। ঠিক সময়ে ঠিক লগ্নটির প্রতীক্ষা করো শুধু।

গোড়ায় গোড়ায় কি মড়াই ভালো লেগেছিল এত? কাদের হাওয়ায় প্রজাপতির মত এমন পাখা মেলেছে মন? কি জানি। কিন্তু এখন ভালো লাগার মাত্রাটা প্রায় দুর্বহ হয়ে ওঠে এক একদিন। মড়াইয়ের ওধারে ধূসর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যখন সূর্য ওঠে তখন থেকে শুরু হয় ভালো লাগা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মড়াইয়ে জল বাঁধার কর্মস্রোতে মিশে থাকে সেই ভর-ভরতি ভালো লাগার উদ্দীপনা। বিকেলে যখন গলানো সূর্যের রঙ আটকে থাকে পাহাড়ী মেঘের ফাটলে ফাটলে, ওর ভালো লাগার সঙ্গে তখনকার সেই রঙটাও ভারী মেলে যেন। তারপরে ভালো লাগে মড়াইয়ের আকাশ আর মড়াইয়ের বাতাস আর মড়াইয়ের সমাহিত পাহাড় আর মড়াইয়ের তমস্বিনী রাত্রি।

যে লগ্নের প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা, তার আভাস এখন মনোগোচর খানিকটা। অন্তত সেই রকমই ধারণা। চোখের সামনে একজনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে একটুখানি। করছেও। প্রথম উপলব্ধি করেছে পাগল সর্দারের বাদনা উৎসবের নেমন্তন্ন রাখতে গিয়ে। তারপর ফেরার পথে পাহাড়ের ওপর সেই পাথরটায় বসে। তারপর অনেকদিন। চেতনার আলোয় হঠাৎ থমকে যাওয়ার মত সেই পরিবর্তন। তারপর থেকে একটু যেন ব্যবধান বাড়ছে, একটু যেন আড়ালে রাখছে, একটু যেন আগলে রাখছে। নরেন বোঝে। বুঝেও না বোঝার ভান করে। নিজেকে দেখছে দেখুক। ওই দেখাটাই লগ্নের সূচনা।

—কি ব্যাপার! দিক-বিদিক ভুলে অমন হন্ হন্ করে চলেছেন কোথায়?

সামনের বড় পাথরটার আড়ালে ঝরণা একটা শুকনো গাছের ডাল দিয়ে পাহাড়ের দেয়াল থেকে পাহাড়ী ফুল-চয়নের চেষ্টা করছিল। পাথরটার পাশ কাটিয়ে নরেন আর তাকায়নি বলেই দেখতে পায়নি।

ঝরণা হেসে উঠল খিলখিল করে। হাতের শুকনো ডাল ফেলে এগিয়ে এলো। সোনালি ফ্রেমের পুরু লেন্সের ওধারে দুই শাদাটে চোখে কৌতুক উপচে তুলে বলল, দিলাম তো বাধা? চলেছেন কোথায় এভাবে?

ঝরণার হাসি আর সপ্রগলভ কৌতুক নরেন চৌধুরীর ভালো লাগেনি প্রথম থেকেই। অনেক দিন দেখা হয়েছে, অনেক দিন হাল্কা আলাপ করেছে। ঝরণা কথা বলেছে অনর্গল আর হেসেছে অজস্র। কিন্তু নরেনের মনে হয়েছে মেয়েটা কোথায় যেন ঠিক সুস্থ নয় খুব। সেই অসুস্থতা ক্ষয় করার চেষ্টা তার এই হাসি-খুশিতে আর চলনে-বলনে। সেটা স্বতোৎসারিত নয় বলেই খানিক বাদে উজাড় করা শূন্যপাত্রের মতই রিক্ত দেখায় ওকে।

জবাব এড়িয়ে নরেন ঠাট্টা করল, পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ফুল চুরি করছেন, দেখব কি করে?

—হায় রে কপাল! ঝরণা বড়-সড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল একটা, যান কোথায় যাচ্ছেন, এর পরে এত বড় রাস্তাটাই হয় ত গা-ঢাকা দিয়েছে মনে হবে।

যা বললে খুশি হবে জানে, এর পর তাই বলল নরেন:—আপনি আছেন, এটা না-ও মনে হতে পারে।

ঝরঝরিয়ে হেসে উঠল ঝরণা। নরেন জানতো হাসবে। এমনি হাসতে-হাসতে হঠাৎ এক সময় সব হাসি যেন ফুরিয়ে যাবে মেয়েটার। পুরু লেন্সের ভিতর দিয়ে দেউলে হাসির আভায় তবু চিক-চিক করবে চোখের কোণ দুটো। সচকিত হয়ে সোজা প্রস্থান করবে তার পর।

হাসির মধ্যেই ঝরণা ভেবে নিল বোধ হয় কিছু। জিজ্ঞাসা করল, সত্যিই যাচ্ছেন কোথায়?

—অবনীবাবুর কাছে। নরেন গম্ভীর মুখেই জবাব দিল।

ঝরণা বলল, তাহলে অ্যাবাউট-টার্ন করুন, মেন-কোয়ার্টারস্-এর রাস্তা ধরে আবার নাক বরাবর হেঁটে যান সোজা—আমি গেষ্ট-হাউসের দিকে দেখে এসেছি তাঁকে।

নরেন বেকায়দায় পড়ে গেল। উৎফুল্ল মুখে ঝরণা বলল, সাধে বলে কেষ্টঠাকুর ছাড়া সবাই মেয়ে, যাচ্ছেন তো মড়াইকন্যা দর্শনে—বেচারী অবনীবাবুকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন? যান, আর আটকাবো না আপনাকে।

জবাবে নরেনও গোটাকতক টিপ্পনী কাটতে পারত। কিন্তু পাল্টা রসিকতার আঁচ পেলেই চকচকিয়ে উঠবে আবার। তা ছাড়া অবনীবাবুর বাড়ি না থাকার প্রসঙ্গেও গোপন দুর্বলতায় একটু ঘা পড়েছে। জেনারেল কোয়ার্টারের দিকে ওর পা বাড়ানোর সময়ের সঙ্গে অবনীবাবুর বাড়ি থাকার সময়টা প্রায়ই মিলছে না আজকাল। মিলছে কি মিলছে না আগে একবারও মনে হত না। এখন হয়।

শাদাসিধে আমন্ত্রণ জানালো, আপনারই বা এমন কি কাজ, চলুন না একসঙ্গে যাই গল্প করতে করতে।

খুব আগ্রহ ঝরণার।—কিছু কাজ নেই আমার, কিন্তু সত্যি

বলছেন? আসব সঙ্গে? চলুন তাহলে, সান্ত্বনাকে একদিন বলেওছিলাম, যাব। সানন্দে কয়েক পা এগিয়েই থেমে গেল আবার। বলল, থাক গে, মিছিমিছি, আপনি যান—

যেভাবে বলল, শাদা অর্থ যাবার ইচ্ছে ষোল আনা, কিন্তু উপর পড়া হয়ে গিয়ে কারো আনন্দবিনোদনে আবার ব্যাঘাত ঘটাই কেন। নরেন বিব্রত এবং বিরক্ত হল মনে মনে। আচ্ছা ছেলেমানুষ তো আপনি! যাবেন তো চলুন—

উচ্ছল হেসে ঝরণা বলে উঠল, আমায় কেউ ছেলেমানুষ বললেই মা তাকে সন্দেশ না খাইয়ে ছাড়ে না। উৎফুল্ল নিঃশ্বাস ফেলল একটা, বলছেন যখন, যাই চলুন।

জেনারেল কোয়ার্টারসএর রাস্তা ধরে পাশাপাশি চলল তারা। ছোট মহল্লায় নিতান্ত ঘরবন্দী হয়ে না থাকলে সকলেই সকলের হাঁড়ির খবর রাখে। অন্তত এই মা মেয়েকে চিনতে বাকি নেই কারো। ভিতরে ভিতরে অবিরাম একটা টাগ অব ওয়ার চলছে যেন মা-মেয়েতে। মা চান টেনে রাখতে, মেয়ে চায় ছিটকে বেরিয়ে আসতে। মায়ের টেনে রাখাটাও যেমন বিসদৃশ, বিপরীত ঝোঁকে মেয়ের বেরিয়ে আসার সপ্রগলভ আতিশয্যও তেমনি অশোভন মনে হয় অনেকের চোখেই। চলতে চলতে নরেন জিজ্ঞাসা করল, আপনি তাহলে এ বছরটা ড্রপ করছেন?

—ড্রপ করছি মানে?

—এ বছর এম-এ পরীক্ষা দিচ্ছেন না?

—ও, তাই বলুন। কি করে দেব, শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন দেখছেন না? শরীর আগে না পরীক্ষা আগে? হাসতে লাগল, মায়ের কাছে শোনেননি এ সব কথা?

বেগতিক দেখে নরেন চুপ। শুধু পরিহাস নয়, পুঞ্জীভূত খানিকটা ক্ষোভের মুক্তি। সব জেনেও বিস্মিত হল মনে মনে। ব্যাধি মায়ের না মেয়ের!

অবনীবাবুর বাড়িতে পা দিয়েই আরো যেন বোবা হয়ে গেল সে। বাইরের ঘরে বসে অবনীবাবু পড়ছেন কি। নীরব বিস্ময়ে নরেন তাকালো ঝরণার দিকে। চশমার ওধারে থেকে চাপা হাসি উপচে পড়ছে।

অবনীবাবু তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। ঝরণা বলল, আমাকে আপনি চেনেন না বোধ হয়, তবু আপনার বাড়ি চড়াও করেচি, আপনার মেয়ে চেনে অবশ্য—

—আমিও চিনি, অবনীবাবু ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, ওরে সান্ত্বনা, দেখে যা কে এসেছেন—

একটু আগে ছোকরা চাকর সুন্দরীকে নিয়ে ফিরেছে। সান্ত্বনা তার তত্ত্বাবধান করছিল। ডাক শুনে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে যেমন ছিল তেমনি বেরিয়ে এলো।

অতি অন্তরঙ্গ জনের মত ঝরণা একেবারে জড়িয়ে ধরল তাকে। —কেমন? ভাবো নি তো? বলেছিলাম না আসব—এসে গেলাম। এখন খুশি হয়েচ কি হওনি তুমিই জানো।

বাবার সামনে নরেনবাবুর সামনে এই আচমকা উচ্ছ্বাসে সান্ত্বনা হকচকিয়ে গেল প্রায়। যে ভাবে জড়িয়ে ধরেছে, ছাড়ানো শক্ত। ভিতরে এনে দাওয়ায় মাদুর পেতে বসালো তাকে। নিজেও বসল। ভাবেনি তো বটেই। খুশি হয়েছে কি হয়নি তাও জানে না।

ঝরণা দু'চার মুহূর্ত নীরবে নিরীক্ষণ করল তাকে। কি ক'চ্ছি এসময় বাড়ি বসে?

তার চোখে চোখ রেখেই হাল্কা হেসে সান্ত্বনা জবাব দিল, গোয়ালঘরে ছিলাম।

—গোয়ালঘর! চশমার ওধারে দুই চোখ বড় বড় দেখালো ঝরণার। যেখানে গোরু থাকে? তোমার আছে? সাগ্রহে একেবারে উঠে দাঁড়াল সে, চলো তো দেখি।

এবারে বিস্ময়ের পালা সান্ত্বনার। হাত ধরেই টেনে আবার বসালো তাকে। আচ্ছা দেখবেন'খন পরে, বসুন। আমার সঙ্গে সঙ্গে ওখানে আপনাকে নিয়ে ঢোকালে বাবার কাছে বকুনি খেয়ে মরতে হবে।

আগ্রহটুকু এভাবে অগ্রাহ্য হতে ঝরণা বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা। বাবাকে বুঝি ভয় করো খুব?

সান্ত্বনা হেসে মাথা নাড়ল, খু-উ-ব। পাশের ঘরের দিকে তাকালো একবার। কানে গেলে দু'জনেই হেসে উঠবে।

চশমার ওধারে ঝরণার চোখে হাসির ছটা কমে আসছে। দেখছে চেয়ে চেয়ে।—সেই কবে দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে, আর আজ। সেই যে সাঁওতালদের কি উৎসব দেখতে গিয়েছিলে তোমরা—বনের ধারে নদীর পারে দেখা হল মনে নেই?

সান্ত্বনা জবাব দিল না। মনে আছে। আর তার পরেও ঝরণা ওকে না দেখুক, ও দেখেছে। রণবীর ঘোষের জিপে চড়ে হাওয়া খেতে দেখেছে আরো অনেকবার, ভুতুবাবুর দোকানের কোণে তেমনি ঘেঁষাঘেঁষি বসে গল্পগুজব করতে দেখেছে কলকাতার সেই প্রাইভেট কলেজের মাষ্টারের সঙ্গে—ওর মা যাকে বোকা ভাবে, অথচ বোকা নয়। ঝরণার মতে আসলে ভালো বলেই বোকা দেখায় যাকে।

থেকে থেকে ঝরণা তেমনি নিরীক্ষণ করছে তাকে। কিছু একটা বিশ্লেষণ করার মতই।—সেই তখন যা দেখেছিলাম তার থেকে আরো যেন ঢের সুন্দর লাগছে এখন তোমাকে। অস্ফুট হাস্যে ঝরণা একেবারে গায়ের কাছে ঘেঁষে বসল তার।

হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না সান্ত্বনা। দিন কতক আগে চাঁদমণিও এই কথাই বলেছিল। কিন্তু সেদিন অন্তত তার চোখের নারীসুলভ প্রশংসাই সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু এ যেন ঠিক তা নয়। খানিকটা যেন পুরুষ চোখে যাচাইয়ের দৃষ্টি। বিশ্লেষণ করে দেখা। সরে বসতে পারলে একটু সরে বসত সান্ত্বনা।

ঝরণা কথা শুরু করল আবার। নানান কথা। অবান্তর কথা। কতদিন ভেবেছে আসবে, কি রকম বিচ্ছিরি লাগে এক এক সময়, কি করে সময় কাটায় সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির—মায়ের কত ঝক্কি তার জন্য, ইত্যাদি।

একবর্ণও শুনছে না সান্ত্বনা। এই ফাঁকে দেখে নিচ্ছে সেও। সঙ্গোপনে যা দেখতে চাইছে। চাঁদমণির মুখে যা দেখেছিল যে পুরুষ-নির্যাতন দেখেছিল। এরকম কৌতূহল নিজের কাছেই বিড়ম্বনা। লজ্জাকর। তবু কৌতূহল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। চাঁদমণি হতচ্ছাড়াটা প্রসাধন-পটু নয় এমন।

—হাঁ করে দেখছ কি?

নড়ে চড়ে বসে সান্ত্বনা তেমনি জবাব দিল, দেখছি কোথায়, শুনছি তো—আপনি এ সময় এলেন কোত্থেকে ?

জবাব না দিয়ে ঝরণা হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁক দিল, নরেন বাবু, ও নরেন বাবু !

নরেন এসে দাঁড়াতে বলল, ওখানে ক'চ্ছেন কি এখানে বসুন। সরে বসে মাদুরে জায়গা করে দিল। সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করছে এসময় কোত্থেকে এলাম, অর্থাৎ আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটল কি করে। বলব নাকি ?

সান্ত্বনা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল তার দিকে। মাদুরে যোগাসন হয়ে নরেন হাল্কা জবাব দিতে যাচ্ছিল কি। কিন্তু তার আগেই আবার এক ঝলক হেসে ঝরণা বলল, জানো, নিয়ে আসতে কি চায় আমাকে, নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে পড়ে তবে এসেছি।

আবার সেই শাদাটে উচ্ছলতা ঝরণার চোখে মুখে। নরেন বলল, এ রকম সত্যবাদিনীর দেখা পেলে যুধিষ্ঠির মহারাজ হয়ত একেবারে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে তুলতেন।

মুখে বিরস ছায়া ফেলে ঝরণা তাকালো তার দিকে। বলল, কলকাতায় দাদার বাড়ির চাকরটার নাম যে যুধিষ্ঠির !

সান্ত্বনা সুদ্ধ এবারে হাসল অনেকক্ষণ ধরে। সেই প্রথম দিন তার মায়ের সঙ্গে দেখে ভালো লেগেছিল। আর এই এখন লাগল। মাঝখানের যতকিছু সব মুছে গেলে আরো ভালো লাগত।

আতিথেয়তার কথাও স্মরণ হল এতক্ষণে। ওঠার উপক্রম করতে ঝরণা বাধা দিল, ও কি, যাচ্ছ কোথায় ?

—আপনাকে চা করে দিই একটু।

—বোসো ! ধমকে উঠল প্রায়। তারপরেই মনে পড়ল বোধ হয় কিছু। বলল, চা খেতে যাব কেন, তোমার রাঁধা প্রশংসা শুনি, ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হব একদিন, দেখো।

ঈষৎ বিস্ময়ে সান্ত্বনা নরেনের দিকে তাকালো একবার। কিন্তু নরেনও যথার্থই কোন দিন একে বলেনি কিছু। সেই জিজ্ঞাসা করল, প্রশংসাটা কার কাছে শুনলেন ?

—লোকের অভাব ! এই মড়াইসুদ্ধ লোক তো ওর ভক্ত, মেয়েটা যাদু জানে—। যাদু জানে কি না সেটাই যেন নিরীক্ষণ করে দেখল একটু। পরে বলল, এর মধ্যে সেরা ভক্ত দু'জন।

নরেন জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইল। সান্ত্বনা আশঙ্কায় দুরু দুরু।

ঝরণা বলল, একজন ভুতুবাবু আর একজন নিধুরাম।

নরেন হেসে উঠল। সান্ত্বনাও হালকা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। ঝরণা বলে গেল ভুতুবাবু মা-লক্ষ্মী বলতে অজ্ঞান, নতুন কোন মেয়ে চা খেতে গেলে আগে মা-লক্ষ্মীর পাঁচালি শুনতে হবে তবে চা পাবে। আর ওদিকে নিধু বলে, এমন রান্নার রান্না, খেয়ে তার গুরুগম্ভীর বাবু সুদ্ধ কাবু।

হাসিভরা দুই চোখ আলতো করে নরেনের মুখের ওপর বুলিয়ে নিল একপ্রস্থ। কিন্তু নরেন খেয়াল করেনি। নিজের অগোচরে সান্ত্বনার সঙ্গেই দৃষ্টি বিনিময় ঘটল তার। চকিতে অন্তদিকে মুখ ফেরালো সান্ত্বনা। বিরক্ত এবং আরক্ত।

ওদিক থেকে অবনীবাবু এসে দাঁড়ালেন সামনে। ঝরণা বলল, কেমন হাট বসিয়ে দিয়েছি আমরা দেখুন। তার পরেই সোজা উঠে দাঁড়াল একেবারে।—আপনার সঙ্গে আলাপই হল না, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন চলুন—গল্প করতে করতে যাব।

—বেশ তো, বেশ তো।

—বেশ তো না, এখুনি যাব, রাত হয়ে গেল।

তাড়া খেয়ে অবনীবাবু জামা বদলাবার জন্য ঘরে গেলেন আবার। ঝরণার দু'চোখ যেন খলখলিয়ে হেসে উঠল নরেনের মুখের ওপর। তার অর্থ শুধু প্রাঞ্জল নয়, অস্বস্তিকরও।

সান্ত্বনাও লক্ষ্য করল সেটুকু। না করলে অস্বাভাবিক লাগত না কিছু। করল বলেই বাবাকে এভাবে টেনে নিয়ে যাওয়ার পিছনে স্থূল রসিকতার আভাস পেল। এতক্ষণের ভালো লাগাটুকুর ওপর যেন কালির ছিটে পড়ল একপ্রস্থ। বিরক্তিতে মুখ লাল হয়ে উঠল সান্ত্বনার।

অবনীবাবুকে নিয়ে ঝরণা চলে গেল। আর যাবার আগে ওদের দুজনার মাঝে বেশ খানিকটা অস্বস্তি ছড়িয়ে দিয়ে গেল। সহজতার তাগিদে নরেনের পকেট থেকে সিগারেট বেরুলো, দিয়াশলাই বেরুলো, হাতীর দাঁতের কানকাঠি বেরুলো, নাকমুখ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া বেরুলো আর সবশেষে কর্ণ-পটহ তোয়াজ-সুলভ গলা দিয়ে সেই পেটেন্ট শব্দ বার হল গোটাকতক।

সান্ত্বনা চেয়েছিল দরজার দিকে। যে দরজা দিয়ে তার বাবা আর ঝরণা বেরিয়ে গেল। মুখ না ফিরিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বলল, অদ্ভুত !

—আমি ? না ওই যে গেল ? নরেনের মুখে উৎকণ্ঠার কারুকার্য।

সান্ত্বনা হেসে ফেলে তাকালো তার দিকে। দুজনেই, নইলে ও আপনার সঙ্গে এসে জুটল কি করে ?

—বরাত। দীর্ঘনিঃশ্বাস।

—মেয়েটার মাথায় ছিট আছে।

—তা আছে। নরেন সায় দিল, ও এক ধরনের রোগ, বিষম রোগ।

শোনামাত্র আবার অন্যদিকে চোখ ফেরালো সান্ত্বনা। লাল হয়ে উঠছে, নিজেই বুঝছে।

নরেন অবাক। ঠিক তামাসা করে বলেনি। যেটুকু বলেছে তাও সুস্পষ্ট নয় খুব। কিন্তু ঝরণার রোগের স্বরূপ সান্ত্বনাও যে যথার্থই উপলব্ধি করে বসে আছে, একবারও ভাবেনি।

মনে মনে কি জানি কেন আবার সেই অকারণ খুশির স্পর্শ লাগল মনে। কিন্তু আর মনস্তত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘুঁটির দিকে এগুলো না। ঝরণা প্রসঙ্গ সরাসরি ধামাচাপা দিল।—যেতে দাও ওসব—সুখবর ছিল, মেয়েটার পাল্লায় পড়ে তোমার বাবাকে বলা হল না।

জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালো সান্ত্বনা।

—চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে ঘোষ-চাকলাদারের এবারে একটা ফয়সলা হতে পারে বোধ হয়, ব্যবস্থা করে এলাম।

—কি ব্যবস্থা ? ঠাণ্ডা প্রশ্ন।

রণবীর ঘোষের আবেদন এবং বাদল গাঙ্গুলির কাছে সুপারিশের বৃত্তান্ত জানালো।

অকস্মাৎ দপ করে জ্বলে উঠল যেন একমুঠো নিরুত্তাপ ছাই।—কেন, কেন আপনি সর্দারি করে এ ব্যবস্থা করতে গেলেন ? কে

আপনাকে করতে বলেছিল? ডেকে দুটো মিষ্টি কথা বলল, আর গলে জল হয়ে অমনি ছুটলেন সুপারিশ করতে?

নরেন হতভম্ব। এমন আর দেখেনি। কি হল?

উত্তেজনায় অধর দংশন করে রইল সান্ত্বনা। নরেনের বিস্ময়ের শেষ নেই। কি ব্যাপার? পাছে কিছু গোলমাল হয়, সেই জন্যেই তো—

মেজাজ চড়লো আরো।—ওঃ, একটা লোক এতবড় কাজের মধ্যে গোলমাল করে তো একেবারে উল্টে দেবে সব—সেই ভয়েই গেলেন আপনারা! আর ওদিকে বুক ফুলিয়ে যা খুশি করে বেড়াবে সে। কতবড় পাজি ও লোকটা জানেন? পাগল সর্দারের ওই মেয়েটাকে পর্যন্ত একেবারে—

রাগে ক্ষোভে লজ্জায় শেষ করতে পারল না। অন্যদিকে ঘাড় গোঁজ করে বসে রইল।

বিহ্বল বিস্ময়ে নরেনের মুখে কথা নেই আর। মড়াইয়ের বুক থেকে এক ভরাপ্রাণ কালো মেয়ের অন্তর্ধান হঠাৎ একটা স্থূল রহস্যের পরদা ঠেলে একেবারে চোখের সামনে তীব্র তীক্ষ্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

শুধু তাই নয়। সান্ত্বনা জানল কি করে? সর্দার বলেছে? মন বলছে, না। ওদের বলার রীতি এরকম নয়। বললে সরাসরি রণবীর ঘোষকেই বলত। আর সেই বলার মড়াইয়ের পাঁজরে ত্রাসের কাঁপুনি জাগত।

রাগ কমে আসছে সান্ত্বনার। অস্বস্তি বাড়ছে। এ নীরবতা শুধু বিস্ময়াহত নয়। জিজ্ঞাসা-মুখরও। কিন্তু মানুষটার বিবেচনার প্রশংসা না করে পারল না। আভাসেও কোন প্রশ্নের দ্বারা বিব্রত করল না ওকে। বিড়ম্বনাটুকু উপলব্ধি করেই যেন উঠে চলে গেল এক সময়।

রাগ গেছে। উত্তেজনা কমেছে। পুরুষ সন্নিধানজনিত সঙ্কোচও নেই। চুপচাপ খানিক বসে থেকে বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সান্ত্বনা। কিন্তু খুব আরামের নয় যেন। তলায় তলায় একটা অন্যায় বোধ জাগছে। অকারণে এত কথা বলল, এত কথা শোনালো। ভদ্রলোক যা করছে বা করতে গেছে সবটাই ভালোর জন্যে। তা ছাড়া ভিতরের এ সব ব্যাপার জানতও না। কিন্তু রাগের মাথায় কি বলতে কি না বলে বসল!

শুধু অনুতাপ নয়। একটুখানি আশঙ্কাও। ওর কথা শুনে সব আবার নাকচ করে দেবে না তো! জানাজানি হবে না তো কিছু? ড্যামের কাজে নতুন কিছু বিভ্রাট বাধবে না তো আবার? ছেলে-মানুষির জন্য নিজের উপরেই মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হল সান্ত্বনা। তবে গোলযোগের আশঙ্কাটা থাকল না বেশিক্ষণ। নরেনবাবু না হয়ে আর কেউ হলে ভাবত।···বাদল গাঙ্গুলি হলেও নিশ্চিন্ত হতে পারত না।

স্বয়ং চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কোয়ার্টারে এক নাটকীয় প্রহসন ঘটে গেল সেদিন।

যেদিন রণবীর ঘোষ এলো নিজের হয়ে সওয়াল করতে। ভেজালের ফাটল জুড়তে।

নরেনকে সঙ্গে থাকতে বলেছিল বাদল গাঙ্গুলি। সময় মত আসেনি সে। স্মরণও করিয়ে দেয়নি কিছু। তাই প্রতিদিনের মত সকালের রাউণ্ডের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আর অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের প্রতীক্ষা করছিল। কি একটা কাজে তাঁরই আসার কথা।

নরেন চৌধুরী ভোলেনি। কিন্তু তার আগ্রহ স্তিমিত। ড্যামের স্বার্থে আপসের প্রয়াস। সে প্রয়োজনই আছেই। তবু···। রণবীর ঘোষকে ভালই জানত। ভালই জানে। তবু··· এক জনের ক্ষোভ আর বেদনা আর কখনো এমন করে স্পর্শ করেনি তাকে। তাই নিরুৎসাহ। আবার এরপর ও লোকটার সংশ্রবে আসতেও বিতৃষ্ণা। যা করেছে ভালোর জন্য করেছে। ভালো ভেবে করেছে। এর পর যার দায়িত্ব সে বুঝুক।

কিন্তু মন বলছে তারও উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। বাদল গাঙ্গুলির রাগ জানে। কি থেকে কি হয় আবার ঠিক কি। তা' ছাড়া নিজে মুখে থাকতে বলেছিল ওকে। ঘড়ি দেখল। বেশ দেরি হয়ে গেছে! তবু বেরিয়ে পড়ল।

ওদিকে রণবীর ঘোষ এসেছে ঘড়ির কাঁটা ধরে। হাতে অবিকল বইয়ের আকারের বোতাম-আঁটা চকচকে কালো লেদারকেস একটা। চামড়া মোড়ানো সৌখীন বড় ডায়েরির মত। দ্বিজেন চাকলাদারকে অদূরে জিপে বসিয়ে রেখে সহাস্যে সাড়া দিল, গুড মর্নিং স্যর, ভিতরে আসব?

আপিস সংক্রান্ত কাগজপত্র উল্টে দেখছিল বাদল গাঙ্গুলি। মুখ তুলে তাকালো। মনে পড়ল। আজই আসার কথা বটে। ঘড়ি দেখল। সম্ভবত নরেনের আসার কথা ভেবেই।

—আসুন।

—নমস্কার, ভালো আছেন বেশ?

—হ্যাঁ, বসুন।

রণবীর ঘোষ বসল। তেমনি হাসিখুশি, তেমনি সপ্রতিভ।—আপনি বেরুচ্ছিলেন নাকি?

—হ্যাঁ, আজই আপনি আসবেন খেয়াল ছিল না, নরেন বাবুরও আসার কথা ছিল, আসেন নি···।

দুর্ভাগ্যজনিত একটা বিরস ছায়া নামল ঘোষের মুখে। পরে হাসল অল্প একটু।—বরাত। যাক, আপনার শরণার্থী বটেই, তবু আজ আমি কিন্তু কোন ব্যবসার তাগিদে আসিনি আপনার কাছে।

বাদল গাঙ্গুলি নীরব, জিজ্ঞাসু।

কি ভাবে ব্যক্ত করবে মনের কথাটা রণবীর ঘোষ ঠিক করে উঠতে পারছে না যেন। স্বীকৃতির বাসনার সঙ্গে অনভ্যাসজনিত সঙ্কোচ মিশলে যেমন হয়। সলাজ হাসি। বলল, এসেছি এক রকম প্রাণের তাগিদে···বড়র আকর্ষণ ভারী বিচিত্র ব্যাপার!

বলতে না পারলে কটু শোনাতো। বিরক্তির কারণ হত। কিন্তু রণবীর ঘোষ নিপুণ কথক।

অন্য দিকে গাম্ভীর্যের ব্যতিক্রম ঘটল না খুব। শুধু বিস্ময়ের আভাস একটু।—আপনি কি বলবেন বলুন।

—কত কি বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু কি যে বলি, ইট্‌ ইজ্‌ অল্‌ সো ওয়াণ্ডারফুল! মুখের ভাব নয় শুধু, গলার স্বর পর্যন্ত বদলে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে কাচের শার্সির ভিতর দিয়ে দূরে মড়াইয়ের দিকে চেয়ে রইল ক্ষণকাল। ফিরে এলো আবার।

বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা। বসল চেয়ারে। হাসল একটু।

—আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ গাঙ্গুলি, কি যে হল সেদিন থেকে নিজেই বুঝতে পারছি না। এতবড় এক লোকসান, তার থেকেও বড় জিনিস, এতবড় একটা দুর্নাম কাঁধে চাপলে অনেক কিছুই করার কথা আমাদের—আর কিছু না হোক, বড়দরের একটা গোলমাল অন্তত পাকিয়ে তুলতে স্বচ্ছন্দে পারি। হেসে চোখে চোখ রাখল, আরো মৃদু, আরো সাদাসিদে নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, কিন্তু মন বলছে, তার থেকে অনেক বড় পাওয়া হবে সোজাসুজি আপনার কাছে এসে প্রাণ খুলে হার স্বীকার করা। এ লাভটুকুর কাছে এই লোকসান কিছুই নয়।

দম্ভ নয়, প্রার্থীর দৈন্যও নয়, আহত মর্যাদার অভিব্যক্তি। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের ঋজু গাম্ভীর্য তরল হয়ে এলো। এ রকম সমর্পণে বিব্রত বোধ করতে লাগল প্রায়।

ঘরে নরেন চৌধুরীর পদার্পণ। বাদল গাঙ্গুলি ঘড়ির দিকে তাকালো একবার। ঘোষ দু'হাত তুলে নমস্কার জানালো। হেসে বলল, আপনি কিন্তু অনেক লেট।

ঠাণ্ডা চোখে নরেন একবার শুধু তাকালো। প্রতি-নমস্কার না, কিছু না। একটা চেয়ার টেনে শরীর ছেড়ে দিয়ে বসল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে চেয়ারের কাঁধে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে ধীরে সুস্থে সিগারেট ধরালো একটা। বন্ধুর দিকে না চেয়েই সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করল, বেরোতে দেরি আছে না কি তোমার?

—না। তার অমন নিস্পৃহ হাবভাব দেখে বাদল গাঙ্গুলি অবাকই হল একটু। আর তেমনি বিস্মিত রণবীর ঘোষ। প্রয়োজনে এর শরণাপন্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু তাবলে এ লোকটাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি কখনো। বক্র কটাক্ষে দেখল দুই একবার। চেয়ারের কাঁধে মাথা রেখে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে, যেন ঘরে দ্বিতীয় মানুষ নেই কেউ।

আগের কথা প্রসঙ্গে এবারে বাদল গাঙ্গুলি সদয় কণ্ঠে বলল, আপনার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই মিঃ ঘোষ, সিমেন্টের ব্যাপারে যা করেছি বাধ্য হয়েই করেছি—কিন্তু সত্যি এরকম করে যদি ভাবতে পারেন তাহলে তো আনন্দের কথা।

উৎফুল্ল মুখে ঘোষ জবাব দিল, ভাবতে পারতুম না কখনো, এখন শিখেছি। আপনি শিখিয়েছেন। পরিবেশ যেন তারই আয়ত্তাধীন। —ওই ভেজালের অপকাণ্ডটি যেই করে থাক, দায়িত্ব যখন সব আমার, দায়ীও আমিই বই কি।···আমি···আমার মত আরো পাঁচজন···। এতকাল সবাই পার পেয়ে আসছে তেমন শক্ত কৈফিয়তের তলব পড়েনি বলে—পড়লে ব্যাঙের ছাতার মতই সব—

শেষ না করে অস্ফুট কণ্ঠে হেসে উঠল। চকিতে নরেনকে দেখে নিল আবার। তেমনি নির্বিকার মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে হালকা বিনয়ে বলল আবার, যাক কাজের সময় আর আপনাদের বিরক্ত করব না···

হাতের লেদার কেসটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল, এটা দয়া করে রেখে দিন, অবসর মত খুলে দেখবেন একটু—

নিপুণ স্তুতিতে দুর্বাসাও ঘায়েল হন। আরো অনেকটাই নরম হয়ে এসেছিল বাদল গাঙ্গুলি। এবারে বিস্মিত হল। কেসটা উল্টে পাল্টে দেখে জিজ্ঞাসা করল, এতে কি আছে?

ও বোষ্টুমি-বিস্ময় খুব চেনে ঘোষ। সঙ্কোচ বিনম্র হাসি। যেমনটি দরকার। বলল, ও কিছু নয়, আমার জবানবন্দি···।

—কিন্তু এ দেখে আমি কি করব?

—কিছু না, কিছু না—আপনাদের মনে দাগ ফেলতে পারে এমন কিছু নয়। শুধু আমার নিজের মনের সান্ত্বনা একটু···নইলে আপনাদের কাছে ওর আর কি দাম···এতবড় এক অভিজ্ঞতার মূল্য স্বীকার না করলে, যাক, সময় মত শুধু দেখে রাখবেন একটু—।

তৃতীয় লোকটির বেখাপ্পা নীরবতা প্রায় অসাচ্ছন্দ্যের কারণ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার উদ্যোগ করল ঘোষ।

বাদল গাঙ্গুলি বলল, কিন্তু এখন আর এসব দেখে আমি কি করব?

অবিমিশ্র প্রশংসাভরা দুই চোখে ঘোষ যেন সিক্ত করল তাকে দু'চার মুহূর্ত।—উই আর রিয়েলি ওয়াণ্ডারফুল! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কিচ্ছু আপনাকে করতে হবে না। ওই সিমেন্টের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর পর যেদিন আপনি বলবেন সেদিনই আপনার সামনে ওই গুদোম ভরা সিমেন্ট আমি মড়াইয়ের জলে ঢালব। আগেই ঢালতুম, পাছে আপনার অবিশ্বাস হয় সেই জন্য অপেক্ষা করছি। হাসল। যদিও ওতে আর ভেজাল নেই এক কণাও, তবু যে শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেব।

বাদল গাঙ্গুলি বিব্রত আবারও। নরেনের দিকে চোখ ফেরাল। চোখাচোখি হল বটে। কিন্তু তেমনি নিরুৎসুক। কোন আভাস নেই। একটু থেমে বলল, ও সিমেন্ট এখন যেমন আছে থাক, ভেবে দেখি

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেহের অণুতে অণুতে আচমকা এক বিদ্যুৎ শিহরণ। সবেগে চেয়ার ছেড়ে একেবারে দাঁড়িয়ে উঠল বাদল গাঙ্গুলি। দুই চোখে ভয়ার্ত বিভীষিকা।

কথা বলতে বলতে বইয়ের আকারের লেদার কেসএর বোতাম টেনে খুলেছে। তার ভিতরে রণবীর ঘোষের জবানবন্দি। খাতাপত্র নয় কিছু।

তিন তাড়া নোট। সব একশ' টাকার। তিরিশ হাজার···

দেহের সব রক্ত মুখে এসে জমাট বাঁধতে লাগল। নরেন চৌধুরীও বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতই উঠে বসেছে। বিস্ময়ে তারও দু'চোখ বিস্ফারিত।

এত বিস্ময় খুব যেন অনুকূল মনে হচ্ছে না রণবীর ঘোষের। আনাড়ীদের রকম সকম অস্বস্তিকর।

নির্বাক বিমূঢ় বিস্ময়ের ঘোর কাটল বাদল গাঙ্গুলির। লেদার কেস হাতে তাকালো নরেনের দিকে। নরেনের দু' চোখও তার মুখের ওপরেই সংবদ্ধ। বাদল গাঙ্গুলি ওর দিকে চেয়েই আছে। দেখছে। অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে যেন। সহসা তার এই দেখাটুকু উপলব্ধি করল নরেন চৌধুরী। আপসের সুপারিশ সেই করেছিল। আর এতক্ষণ তার বসে থাকাটাও ও চোখে বিকৃত সন্দেহ জাগিয়েছে। এবারে এক ঝাঁকুনি খেয়ে সচেতন হল সেও।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল! ঘোষের মুখোমুখি।

সে দাঁড়ানোর মধ্যে ছিল বোধ হয় কিছু। কারণ নিজের অজ্ঞাতে ঘোষও উঠে দাঁড়াল।

হাত বাড়িয়ে নরেন বাদল গাঙ্গুলির হাত থেকে চামড়ার কেসটা নিল। নোটের তাড়া ক'টা দেখল। চামড়ার কেস থেকে খুলে নিল সেগুলি। খুব মোলায়েম গলায় বলল, আপনার অভিজ্ঞতার মূল্য—যে অভিজ্ঞতায় টাকার ভেজালে ভেজাল সিমেন্ট খাঁটি হয়ে যায়, কেমন?

এমন পরিস্থিতি কল্পনা করেনি রণবীর ঘোষ। এ সাক্ষাত ব্যবস্থার পিছনে একটা অর্থই জানে। একটা অর্থই জেনে অভ্যস্ত। কিন্তু খদ্দের যে এদিকে এত কাঁচা বোঝেনি। রণবীর ঘোষও না, দ্বিজেন চাকলাদারও না।

আরো মৃদু আরো মোলায়েম ব্যঙ্গের মত শোনালো নরেনের কণ্ঠস্বর। এতকাল সবাই আপনারা পার পেয়ে আসছেন তেমন শক্ত কৈফিয়তের তলব পড়েনি বলে, হুঁ—?

বাদল গাঙ্গুলি নির্বাক দ্রষ্টা।

ঘোষ সামলে নিয়েছে কিছুটা। পরিস্থিতি উপলব্ধির ফলে বিনয়ের মুখোস খসেছে। নগ্ন রূঢ়তার ছাপ সেখানে।

নির্মম বিদ্রূপ-ছটায় নরেন যেন হাসছে।—কিন্তু কৈফিয়ৎ যারা তলব করে তাদের জাত আলাদা। আপনার এ জবানবন্দী তারা নেবে না—মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে এমনি করে—আর এমনি করে—আর এমনি করে!

তিনবার তিন তাড়া নোট এবং চতুর্থবার চামড়ার কেস। দু'হাতে মুখ বাঁচিয়ে ঘোষ একেবারে ঘরের বাইরে এসে পড়ল। জিপ থেকে ছুটে এলো দ্বিজেন চাকলাদার। নিধু আড়ালে ছিল। আর আড়ালে থাকা সম্ভব হল না! ওদিকে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন কখন।

চিত্রার্পিত সকলে।

ঘোষ-চাকলাদারের জিপ চলে গেছে অনেকক্ষণ। অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। নিধু আড়াল নিয়েছে আবার। ঘরের মধ্যে গুম হয়ে বসে আছে নরেন চৌধুরী।

আর বাদল গাঙ্গুলি? তার বাড়িতে, তার ঘরে, তার সামনে এরকমটা হবার কথা নয়! কিন্তু তারও সন্দেহ করার কথা নয় নরেন চৌধুরীকে। টাকা দেখে তাইতো করেছিল। আড়ে আড়ে দেখছে বাদল গাঙ্গুলি। ছেলেবেলা থেকে বিপরীতই দেখে এসেছে। এরকম আর দেখেনি কখনো। দেখবে ভাবেওনি।···রাগ চণ্ডাল! কিন্তু মনে হচ্ছিল জায়গা বিশেষে সুন্দরও।

হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে নরেনের সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল। সিগারেট ধরাল। কিন্তু ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলো না তবু। জানালার ভিতর দিয়ে দূরে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে নিস্পন্দ মূর্তির মত। দু'চার পলক দেখল। প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বার করল। পরে নিজের সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে অন্যটা হাতে নিয়ে মৃদু একটা খোঁচা দিল তার কাঁধে।

এবারে নরেন চৌধুরী ফিরে তাকালো। বাদল গাঙ্গুলি নীরবে অন্য সিগারেটটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে। চোখে চোখ রেখে হাসতে লাগল মৃদু মৃদু।

নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়। হাত বাড়িয়ে নরেন চৌধুরী তার হাত থেকে সিগারেট নিল। স্বচ্ছ, নির্মেঘ।

ছোট মড়াইয়ে ঘটনাটা চাপা থাকল না।

অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার তাঁর স্ত্রী এবং অন্তরঙ্গ দু'চারজন সহকর্মীকে বললেন। মিসেস চ্যাটার্জী ফিস ফিস করলেন সমমর্যাদার গিন্নিদের কাছে। বেশ খোলাখুলি ভাবেই কানাকানি শুরু হল একটা। বিস্ময়-কণ্টকিত নিশ্বাসে সেদিনই দুপুরে সবিস্তারে পল্লবিত করতে বসল দিদিমণির কাছে।···নরেন বাবুর কাণ্ড সর্বাগ্রে এখানে বলবে না তো কোথায় বলবে! এই বলে বেড়ানো স্বভাবের জন্য ইদানীং সান্ত্বনা মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না ওর ওপর। কিন্তু শুনল যা, দুই চক্ষু বিস্ফারিত।

অধীর প্রতীক্ষা তারপর। কিন্তু লোকটার আর পাত্তা নেই পর পর ক'দিন। বাবার মুখেও শাদামাটা ঘটনাটাই শুনেছে শুধু। রণবীর ঘোষ ঘুষ দিতে এসেছিল আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি নরেন চৌধুরী, ইত্যাদি। এই মেজাজ ঠিক রাখতে না পারার পিছনে আরো যে কারণ, সে শুধু সান্ত্বনাই জানে। ভদ্রলোককে সেদিন ওভাবে বলার জন্য মনে মনে অনেক অনুতাপ করেছে। কিন্তু এই কাণ্ড ঘটবে কে জানত। ভাবল, বাবাকেই জিজ্ঞাসা করবে ভদ্রলোকের দেখা নেই কেন ক'দিন ধরে। কিন্তু বলি বলি করেও হল না বলা। ছোকরা চাকরটাকে পাঠিয়ে খবর দেবে ভেবেছিল। তাও পেরে উঠল না।

ওর এই আগ্রহটুকুই অদৃশ্য বাধার মত।

প্রথম দেখে নিজের চোখ দুটোকেই সহসা যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না সান্ত্বনা।

রণবীর ঘোষের জিপ উপরে উঠে গেল হুস করে। একটা বড় পাথরের চাতায় পা ছড়িয়ে বসেছিল সান্ত্বনা।

ওকে কি দেখেছে? বোধ হয় না। দেখলে নীল চশমা ঘাড় ফেরাতই। তার পাশে বসে আর একজন। বিচিত্র একজন!

হোপুন···।

চড়াই-উৎরাইয়ের পথে এ এমন কিছু অভাবনীয় ব্যাপার নয়। জিপে হোক, ট্রাকে হোক হরদম নামতে-উঠতে দেখা যায় ওদেরও। বিশেষ করে উপরে ওঠার সময়। জায়গা থাকলে সরাসরি চেপে বসে তারা। সঙ্কোচের বালাই নেই কোনো, মাঝপথেও ডেকে থামায়, বাবু টুকচি তুলে লে না কেনে—

কিন্তু সান্ত্বনার চোখে রণবীর ঘোষের পাশে হোপুন···প্রায় ঝাঁকুনি লাগার মতই অপ্রত্যাশিত।

হোপুনের স্বভাব বদলানো একটা কালো পাথরের রং বদলানোর মতই। ভাবা যায় না। লোকটার সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞাতে সান্ত্বনার তেমনি একটা ছাপ পড়েছিল মনে। কিন্তু দিন কতক আগেও কেমন একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছিল। লক্ষ্য করা ঠিক নয়, উপলব্ধি করা। পর পর দু' দিন।

প্রথম মড়াইয়ে। সেদিনও মাটি কাটছিল হোপুন। সহস্রের সঙ্গে, সহস্রের মতই। এরই মধ্যে তফাৎ কোথায়, সে শুধু সান্ত্বনাই দূরে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছে অনেক দিন। সেদিনও করছিল। এদিক-ওদিক চেয়ে পাগল সর্দারকে না দেখে ওর কাছেই খোঁজ

করতে এসেছিল তার পর।—সর্দারকে দেখচি নে, সে কাজে আসে নি?

কোদাল থেমে গিয়েছিল। মাটি কাটার ঝোঁকে আনত দেহ আস্তে আস্তে টান হয়েছিল। শ্রান্ত দেহপঞ্জর ভরাট করে বাতাস টেনেছিল হাপরের মত। তার পর জবাব না দিয়ে নিষ্পলক চেয়েছিল তার দিকে। থতমত খেয়ে সান্ত্বনা আবার জিজ্ঞাসা করেছে, সর্দার ভালো আছে তো?

এবারও মুখে জবাব দেয়নি কিছু, একটা হাত তুলে আঙুল দিয়ে দূরের এক দিকে দেখিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ, ওই দিকে আছে সর্দার। কিন্তু চোখের পাতা পড়ে নি একবারও, আত্মবিস্মৃতের মত হাতটা আপনি উঠেছিল যেন।

তাড়াতাড়ি ওর কাছ থেকে দু' দশ পা সরে বেঁচেছিল সান্ত্বনা। সর্দারকে দরকার নেই কিছু। দেখেনি বলেই খোঁজ করেছিল। যেখানে আছে জানল, সেও কাছাকাছি নয়। হোপুন কাজ শুরু করেছিল আবার। কিন্তু একটু বাদেই মাটি কাটার সেই হিংস্র তন্ময়তায় ছেদ পড়তে দেখেছিল সান্ত্বনা। একাধিকবার। তার পর সম্পূর্ণ। কোদাল-হাতে হোপুন চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিল ওকে। সেই প্রথম ব্যতিক্রম। সান্ত্বনা অবাক। আর কখনো এমন হয় নি। ওর নির্বিকার নিস্পৃহতায় এতটুকু ফাটল দেখে নি কখনো। প্রথম ভেবেছিল কিছু বলতে চায় বুঝি।…কিন্তু তা নয়। ওকে দেখার মধ্য দিয়ে দুই নিষ্পলক কালো চোখ যেন কোন দূরে সমাহিত।

ইচ্ছে হচ্ছিল সামনে এসে দাঁড়ায় আবার। জিজ্ঞাসা করে কিছু বলবে কি না। ভরসা পায় নি। এই এক কালো মানুষের প্রতি সম্ভ্রমের শেষ নেই। দিনে দিনে সেটা বেড়েছে। পাগল সর্দারকে আপন জন মনে করে। চাঁদমণির আকর্ষণও সেই প্রথম থেকেই। সেই সুবাদে এই লোকটার সঙ্গেও একটা সহজ সংযোগ অবাঞ্ছিত ছিল না। কিন্তু ওর সান্নিধ্যে সহজ হতে পারল না কোন দিন। সেদিনও পায়ে পায়ে প্রস্থানই করেছিল।

কিন্তু ওর সেই নীরব আচরণ ভোলেনি।

দ্বিতীয়বারের ব্যতিক্রম এর কিছুদিন পরে। সুন্দরীর, অর্থাৎ সান্ত্বনার গোরুর অপরাহ্ণ রোমন্থনের সেই নিরিবিলি পরিবেশে। ছোকরা চাকর সবে গরু ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। সান্ত্বনাও উঠবে উঠবে করছিল। মড়াইয়ের ওধারে পাহাড়ের উপর ঠিক তেমনি একটা ধূসর মেঘের দিকে চোখ আটকে গিয়েছিল। পড়ন্ত সূর্যের গলানো সোনায় ঠাসা জমাট কালোর বর্ণছটা।

বিষম চমক তারপর। বিশ তিরিশ হাত দূরে হোপুন। কাজের শেষে ঘরে চলেছিল সম্ভবত। ওকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছে। কখন এসেছে, কখন দাঁড়িয়েছে সান্ত্বনা লক্ষ্য করেনি। এ পথেও পাহাড় পেরিয়ে গাঁয়ে যাওয়া চলে। তবু এ সাক্ষাৎ শুধুই যোগাযোগ মনে হয় না সান্ত্বনার। তাহলে আর কোনদিন অন্তত চোখে পড়ত।

…তেমনি নিশ্চল, নিষ্পলক চাউনি…তেমনি দূর বিস্মৃতির পথে উধাও।

চুপচাপ থাকা বিড়ম্বনা। অসচ্ছন্দ্যের বোঝা ঠেলে সান্ত্বনা উঠে এসে জিজ্ঞাসা করল, আমায় কিছু বলবে হোপুন?

হঠাৎ যেন আত্মস্থ হল মানুষটা। চোখ থেকে দূরের ঘোর কেটে গেল। পাষাণ মুখে চেতনার সাড়া জাগল। সঙ্গে সঙ্গে রূঢ় কঠোর ছাপ পড়ল একটা। সেই চিরাচরিত নিস্পৃহতা নয়।

তারপর চলে গেল।

বিমূঢ় বিস্ময় কাটতে সময় লেগেছিল সেদিনও। পরে মনে হয়েছে, এ বিরূপতা হয়ত চাঁদমণির স্মৃতি বিজড়িত। চাঁদমণির রাগ ছিল সান্ত্বনার ওপর, ওটুকুই জানে। পরের খবর তো জানে না। জানানো সম্ভব নয়। হলে বলে দিত।

বিগত ওই দুদিনের ঘটনা মন থেকে মোছে নি। সর্দারের কথা ভাবতে গেলে একটা বোবা শূন্যতার নিপীড়ন। চাঁদমণির কথা ভাবতে গেলে বুকের ভিতরে এক অব্যক্ত টনটনানি। কিন্তু হোপুনের কথা ভাবতে গেলে এক নিটোল রুক্ষতা, সে রুক্ষতার পিছনে নারীর অপরাধ…। তাই সঙ্কোচ, তাই ভয়ও একটু।

তবু এমন নয়, যা কোন অনাগত সংশয়ের ছায়া ফেলে মনে। অথবা, বিভ্রমের মুগুরে অতর্কিত ঘা বসিয়ে দেয় একটা। কিন্তু আজ দিনে দুপুরে জিপে রণবীর ঘোষের পাশে ওই জমাট বাঁধা কালো মূর্তি দেখে তাই হল যেন। সহসা স্থান কাল ভুল হয়ে গেল। বিভ্রান্তি আর কেমন যেন অস্বস্তি। নীল-চশমার পাশে ওই কালো মূর্তি, নিষ্ঠুরতার পাশে কালো ত্রাসের মতই।

অতিকায় গহ্বরের পাশ থেকে ডাম্পার মাটির স্তূপ বয়ে নিয়ে ঢেলে দিয়ে আসছে যেখানে দরকার। বুলডোজার ঠেলে ঠেলে সমান করে দিচ্ছে সে মাটি। আর মাটি কাটছে আর্থ-কাটার। সান্ত্বনা শুনেছিল, নতুন মডেলের বিশাল বিশাল দু'তিনটে মাটিকাটা যন্ত্র এসেছে আরো। সে নাকি এক ভয়ানক ব্যাপার!

শোনামাত্র সবুর সয়নি আর।

অনেক দূরে একদিকে চলেছে সেই মাটিকাটা যন্ত্র। ভয়ানক ব্যাপারই বটে। হিংস্র গর্জনে সেই যন্ত্র-দানবের অস্ত্র বিভীষিকা স্তরে স্তরে শুকনো কঠিন মাটি চেছে নিয়ে আসছে, খুলে নিয়ে আসছে অবলীলাক্রমে। মাটির বুক কুরে নিমেষের মধ্যে এক একটা গাড়ি বোঝাই করে ফেলছে। নিঃশব্দ আর্তনাদে মাটির বাঁধন আলগা হয়ে খুলে আসছে। ট্রাকের গহ্বরে মাটি পড়ছে না যেন ধরণী আপনাকে উজাড় করে অঞ্জলি দিচ্ছে অজস্রধারে।

অদূরে এক জায়গায় বসে তন্ময় হয়ে দেখছে সান্ত্বনা। যন্ত্রমুখর, সৃষ্টিমুখর। দেখছে আর নিজের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে কোথায়। ধূ ধূ অতীতের ওপারে। এর পাশাপাশি আর এক যুগের আর এক মানুষদের সেই চেষ্টার ছবি। বুড়ী ঠাকুমার চোখের জলে সূর্য-ভেজানো, টোটকা পণ্ডিতদের মন্ত্রবাণে মেঘ জমানো, চাসী প্রতিবেশীদের যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ। সান্ত্বনা ঝাপসা দেখছে সব কিছু। চোখের কোল টলমল।

তন্ময়তায় ছেদ পড়ে গেল। অপ্রস্তুতের একশেষ। পাঁচ-সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

—কি ব্যাপার, এ ভাবে বসে?

মুখ ঘুরিয়ে নিতে হল চট করে। বাহুতে চোখ রগড়ে নিল তাড়াতাড়ি। হেসে উঠে দাঁড়াল তারপর। হালকা জবাব দিল, আপনার ওই যন্ত্রগুলির কেরামতি দেখছিলাম, বাবারে বাবা, এক একটা যেন মাটিগেলা রাক্ষস!

এদিকটায় এই যন্ত্রেরই কাজ দেখতে এসেছিল বাদল গাঙ্গুলিও। কিন্তু সেখানে এমন এক দৃশ্যও দেখবে ভাবেনি। তদারক সেরে ফিরে যাবে যাবে করেও না দাঁড়িয়ে পারেনি। এমন বিস্মৃতি-বন্দিনী মূর্তি আর দেখেনি। এখন আর তার চিহ্নমাত্র নেই। বরং বিপরীত এবং সচেতন মুখরতায় ভরপুর। ক্ষণপূর্বের দৃশ্যটা মনের কোথাও জমা হয়ে থাকল তবু।

পাশাপাশি আসছে। এভাবে এই লোকের সামনে ধরা পড়বে সান্ত্বনা স্বপ্নেও ভাবেনি।

কিছু একটা রোমাঞ্চকর সঙ্কোচ এড়ানোর তাগিদ। আর কেমন এক অকারণ খুশির বিড়ম্বনা। নিরুপায়, তাই বেপরোয়া। প্রায় প্রগল্‌ভা।

—ডাম্পারগুলোকে দেখাচ্ছে যেন শুকনো ডাঙায় মস্ত এক একটা কচ্ছপ। নতুন আর্থকাটারের মাথায় হাতি হাতে মূর্তির মত বসে আছে ওই যে টুপীমাথায় লোকটা—মুখখানা দেখলে মনে হয় জন্ম জন্ম ধরে কলের মত শুধু এই করে আসছে। কাঁকা মড়াইয়ে শাদা ব্লকগুলোকে উঁচু থেকে বেদেদের তাঁবুর মত মনে হয় অনেক সময়। আর ড্যামের ওই ওদিকটায় কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে বসা হাতীর পিঠের মত লাগে দেখতে। অনর্গল উপমা আর অনর্গল হাসি সান্ত্বনার।

সেদিন যেমন আজও তেমনি। মড়াইয়ের সর্বাধিনায়ক তো ওর কি! ও পরোয়া করে না। অন্তত দেখাতে চায় যে পরোয়া করে না। অস্বস্তিতে ঘেমে উঠছে ভিতরে ভিতরে। উঠলেই বা। বাইরে অটুট সহজ। দ্বিগুণ সহজ।

বাদল গাঙ্গুলি দেখছে। হালকা লাগছে। ভালো লাগছে। জিজ্ঞাসা করল, সেদিন আমার বাড়ি থেকে ওভাবে চলে এলে যে?

ঠিক বুঝে উঠল না। কি ভাবে চলে এলাম?

—খাবার টাবার তৈরী করে খাওয়ালে, তারপর নিজে না খেয়ে চলে এলে—নিধু দুঃখ করছিল।

হেসে উঠল সান্ত্বনা।—আর নিধুর মনিব?

—নিধুর মনিবও।

আবার সেই খুশির বিড়ম্বনা। ফলে আবার সেই খুশির উচ্ছলতা। সান্ত্বনা বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা। আ-হা, মরে যাই মরে যাই, নিধুর দুঃখ তার ওপর আবার নিধুর মনিবের দুঃখ —একেবারে জোড়া-কুমীর কান্না। আর একদিন গিয়ে বেঁধে দিয়ে আসব?

হাসছে বাদল গাঙ্গুলিও। নিজের অজ্ঞাতে হাসছে। বলল, দিলে তো ভালই, নিধুর রান্নার কথা মনে হলেই গায়ে জ্বর আসে। তুমি এত ভালো রাঁধতে শিখলে কি করে?

গম্ভীর মুখে সান্ত্বনা জবাব দিল, ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে প্ল্যান করিয়ে, ড্রাফটস্‌ম্যান দিয়ে ছক আঁকিয়ে, ওভারসিয়ার দিয়ে সারভে করিয়ে, কন্ট্রাক্টর দিয়ে—। নিজের মুখরতায় নিজেই লজ্জা পেল একটু।

দিনে বার দুই অন্তত: মড়াইয়ে টহল দিতে দেখা যায় চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে। নিঃশব্দে আসে কখন, নীরবে পর্যবেক্ষণ করে, সকলের মধ্য দিয়েই সকলের পাশ কাটিয়ে যায় আবার। কিন্তু আজ যারা দেখল বা দেখছে তারা তফাৎ কিছু উপলব্ধি করছে। গুমোট ছায়া পড়েনি কোন! বিশ্লেষণী গাম্ভীর্যের দূরত্ব নেই।

মড়াইয়ের উপর থেকে দেখছে আর একজন। রণবীর ঘোষ। দিনের মধ্যে ক'বার তূর্যগতিতে তার জিপ ওঠানামা করছে ঠিক নেই। অকারণে। ক্ষোভে আর আক্রোশে। লাঞ্ছনার ক্ষত মুছে ফেলার তাড়নায়। দ্রুতগতির মাথায় ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল জিপটা। এত উঁচু থেকেও মড়াইয়ের গহ্বরে চোখে পড়েছে কিছু। দুই মূর্তি। একজনের শাড়ীর আভাষ।

ঝুঁকে পিছনের আসন থেকে বায়নাকুলার হাতে নিল। কি কাজে লাগে এটা এখানে? এখন না হোক, আগে লাগত। মড়াইয়ে নিজের এলাকায় বসে দৃষ্টিসান্নিধ্য পেত। যখন খুশি, যার খুশি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখে উঠত ওটা। বেছে বেছে নজরবন্দী করত কাউকে।

চোখ থেকে নীল চশমা নামল। বায়নাকুলার উঠল। ব্যবধান ঘুচল। দৃষ্টি-বন্দী দুই মূর্তি। চিফ ইঞ্জিনিয়ার আর সান্ত্বনা। নারী আর পুরুষ আর প্রসন্নতা।

কঠিন চোখে পলক পড়ে না। যতক্ষণ দেখা যায়। তারপর বিচ্ছিন্ন হল ওরা। বায়নাকুলারের আওতা থেকে একজনকে ছাড়তে হল এবার। অস্ফুট কটূক্তির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকে জাহান্নমে পাঠালে। নারী প্রাচুর্য সামনে এগিয়ে আসছে ক্রমশ।

উঠে আসছে। কাছে আসছে। প্রায় হাতের কাছে যেন। তবু রণবীর ঘোষ জানে খুব কাছে নয়। চোখ থেকে যন্ত্রটা সরালে কাছের মোহ ভেঙে যাবে।

…থমকে দাঁড়াল। জিপটা দেখেছে এবং চিনেছে। নিরীক্ষণ করছে। চোখ টান করে। চোখাচোখি হল বায়নাকুলারের ভিতর দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত। যন্ত্রটা সরালো রণবীর ঘোষ। বেশ দূর এখনো।

এর পরে কি হবে জানা আছে। ওই বাঁক পেরোলে আবার দেখা যাবে উঠে আসছে। উঠে আসবে। তারপর সরাসরি ঢুকে পড়বে ওই দোকানে। ভুতুবাবুর দোকানে।

পাথুরে মত জিপে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগল। মড়াইয়ের মিয়াদ ফুরিয়েছে তার। বোঝাপড়া হয়ে গেছে দ্বিজেন চাকলাদারের সঙ্গে। এখানে তার এ চালচলন আর বরদাস্ত করতে রাজি নয় পার্টনার। স্পষ্ট জানিয়েছে। কলকাতার আড়ত নিয়ে থাকতে হবে তাকে। আর হেড অফিস থেকে এন্‌কোয়ারির ব্যবস্থা করতে হবে। মড়াইয়ে শুধু দ্বিজেন চাকলাদার থাকবে।

ঘাড় ফেরাল। দেখা যাচ্ছে। যা ভেবেছিল তাই। বিচলিত দৃষ্টি। ক্ষণিক দ্বিধা। তারপর ভুতুবাবুর দোকান।

রণবীর ঘোষের চকচকে মুখে হাসির আভাস। ভুতুবাবুর মা-লক্ষ্মী!

সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিল ভুতুবাবুকে। সেই জলের দিনে সন্ধ্যায় চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার সামনাসামনি পড়েছিল যখন। তারপর গোডাউন দেখতে আসার আমন্ত্রণের জবাবে মেয়েটা যা বলেছিল ভোলেনি। তবু সেদিন অবাক যত হয়েছিল অপ্রসন্ন হয়নি তত। পরে হালকা আভাসে জিজ্ঞাসা করেছিল ভুতুবাবুকে। কার বরাতে ঝুলছে? বাদল গাঙ্গুলি? নরেন চৌধুরী?

ভুতুবাবু এত জানে আর এটুকু জানে না। আধ হাত জিব কেটে সারা। কিন্তু সেদিনের সে মেজাজ গেছে রণবীর ঘোষের।

জিপ থেকে নামল। চলল ধীরে-সুস্থে।

দোকান জমে উঠছে ভুতুবাবুর। পর্দা দিয়ে ক্যাবিন করেছে মেয়েদের জন্ম। নিটোল পর্দা নয় মোটেই, দৃষ্টি চলে অনায়াসে। তাও আবার অর্ধেক গোটানো। ভুতুবাবুর গোল মাথার বুদ্ধি গোল নয়।

মেন কোয়ার্টার্স'এর আর একটি মেয়ের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিল ঝরণা চ্যাটার্জী আর হাসি ছড়াচ্ছিল। আসলে হাফ-গোটানো পর্দার ওদিকে ছেলে ক'টার মুখের কারুকার্য উপভোগ করছিল। তারা চলে যেতে মুখে একটা বিষণ্ণ ক্লান্তির ছায়া পড়ছিল সবে। সান্ত্বনাকে দেখামাত্র কলকলিয়ে উঠল একেবারে। ভুতুবাবুর ফোলা গাল হাসি টসটসে হ'য়ে উঠল চিরাচরিত অভ্যর্থনায়।—আসুন মা-লক্ষ্মী আসুন, আমি ভাবছিলাম ভুতুর দোকান ভুলেই গেলেন!

ঝরণা হেসে উঠল আবার।—এ দিকে, সোজা এ দিকে চলে এসো মা-লক্ষ্মী!

এক বিপদ এড়াতে গিয়ে আর এক ফ্যাসাদ। কিন্তু ঝরণার অভ্যর্থনায় সাড়া দেবে কি ভুতুবাবুর কাছেই দাঁড়াবে ঠিক করার আগে আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন ঘটল আবার। নীল-চশমা হাতে দোলাতে দোলাতে রণবীর ঘোষ ভিতরে এসে দাঁড়াল।

সান্ত্বনা ঘাড় ফেরাল। দৃষ্টি-বিনিময়। নিস্পন্দ কাঠ তারপরে। চিত্রার্পিত নিশ্চল কয়েক মুহূর্ত। তার পরেই চকিত সাড়া জাগল। সবিনয়ে ভুতুবাবু তার আসন ছেড়ে মাটিতে অবতরণ করল। কলহাস্যে ঝরণাও এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি। কৌতুকছটা তার পার্শ্ববর্তিনী তৃতীয় মেয়েটির মুখেও। ঝরণা বলল, ভুতুবাবুরই ভাগ্য আজ, মা-লক্ষ্মীর পা পড়তে না পড়তে একেবারে কুবেরের আবির্ভাব!

ভুতুবাবু বিনয় বিগলিত। পলকের জন্ম ঝরণা থমকে গেল। সান্ত্বনাকে দেখল। রণবীর ঘোষকে দেখল। অজগরের অমোঘ আকর্ষণী আওতায় অসহায় পশুর অব্যক্ত ধড়ফড়ানি দেখল। নির্মম উচ্ছলতায় সমস্ত ভিতরটা খল-খলিয়ে উঠল যেন। কিছু দেখার আনন্দে শুকনো এক নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির আস্বাদন। সান্ত্বনার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল একটা, কি গো মড়াইকন্তা একেবারে বোবা হয়ে গেলে যে। অনেকদিন আগে এই ভদ্রলোক দুঃখ করছিলেন তুমি নাকি সুনজরে দেখো না—এসো আজ বোঝাপড়া করে ছাড়ব তোমার সঙ্গে। ভুতুবাবু, আমাদের চা দিন, আসুন মিঃ ঘোষ, ভুতুবাবুর লেডিজ ক্যাবিনেই চলে আসুন।

আহ্বান কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনার বিভ্রান্ত আচ্ছন্নতা কেটে গেল যেন। সবলে এক লোলুপ গ্রাস থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। বলল, না আমাকে এক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে। ভুতুবাবুর দিকে এগিয়ে এলো একটু।—সর্দারের সঙ্গে দেখা হলে একবার আমাদের বাড়ি যেতে বলবেন তো, দরকার আছে—।

কোনদিকে না চেয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল। ভুতুবাবুর গোলচোখে গোলমেলে বিস্ময়। রণবীর ঘোষ নিজের অজ্ঞাতে ঘাড় ফিরিয়েছে বাইরের দিকে। চাপা হাসিতে ঝলমলিয়ে উঠেছে ঝরণার সমস্ত মুখ। মানুষটাকে দেখছে না, তার ইচ্ছাটাকে দেখছে। দেখছে আর কৌতুকে উপচে উঠছে।—আসুন তাহলে, আমরাই আর একটু চা খাই, কি আর করা যাবে!

রণবীর ঘোষ সচকিত। ভুতুবাবুও। ছোকরা চাকরকে হাঁকডাক করে চায়ের অর্ডার দিল তাড়াতাড়ি।

হনহনিয়ে উপরে উঠছে সান্ত্বনা। বিকেলের মিষ্টি বাতাসে আরো বহুলোক উঠছে নামছে। কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। অসহিষ্ণু ক্ষোভে ভিতরে ভিতরে জ্বলছে। যেন মেন কোয়ার্টারস ছাড়িয়ে জেনারাল কোয়ার্টারস-এর দিকে পা বাড়িয়ে কিছুটা সুস্থ হল। বেজায় হাঁপিয়ে গেছে। বসলে হত একটু। কিন্তু বাড়ি পৌঁছানোর অকারণ তাগিদে বসা হল না।

পাগল সর্দারকে আসার জন্ম বলে এলো ভুতুবাবুকে। কেন বলল? কে জানে কেন, শুধু কিছু একটা বলার জন্যেই বলা। সঙ্গে সঙ্গে হোপুনের কথাও মনে পড়ে। জিপে রণবীর ঘোষ আর তার পাশে সেই কালো পাথর মূর্তি। ভিতরে ভিতরে আবার জ্বলে উঠল সান্ত্বনা। খুব তো জিপে করে পাশে বসে ঘুরিস, তোর চাঁদমণির খবর রাখিস? পাগল সর্দার এলে বলে দেবে, ওই লোকটার সঙ্গে যেন কক্ষনো না মেশে হোপুন। সেদিন জিপে ওদের দু'জনকে পাশাপাশি দেখার বিস্ময় এবং অস্বস্তি ভুলতে পারেনি সান্ত্বনা।

বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মন খুশি। বাবা আর নরেন-বাবুতে বসে গল্প করছে। সেই কটূক্তি শুনে গিয়েছিল ভদ্রলোক, আর এই এলো। অবনীবাবু ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, কোথায় থাকিস সমস্ত দিন? নরেন সেই কখন এসেছে আপিস থেকে, ওর বোধ হয় খিদে পেয়ে গেছে, দেখ কি আছে।

কি আছে দেখার বদলে সান্ত্বনা নরেনকে দেখতে লাগল। খুব চেনা মানুষের মধ্যে অচেনা কিছু দেখলে যেমন করে দেখে। চোখে মুখে কৌতুকাভাস।

নরেন অল্প অল্প পা দোলাচ্ছে আর হাসছে। খিদে পেয়েছে কি না দেখছ নাকি?

জবাব না দিয়ে হাসিমুখে ভিতরে চলে এলো সান্ত্বনা। গুমোট কেটেছে। হাল্কা লাগছে।

কিছুদিন হল হাল্কা লাগছে অবনীবাবুরও।

নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়েছেন তিনি। সান্ত্বনা জানে না। নরেনও কিছু আভাস পায়নি। সকলের অলক্ষ্যে সকলের অগোচরেই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন অবনীবাবু। একলার জীবনে এক ধরনের দার্শনিক নির্লিপ্ততা এসেছে তাঁর মধ্যে। সংস্কারের বাঁধন শিথিল হয়েছে অনেক। সামাজিক ভ্রুকুটির অর্থ গেছে কমে। মেয়ে সুখে থাকবে। ভালো থাকবে। এইটেই বড় কথা। আর সার কথা। নরেনই কথা পাড়বে হয়ত। সঙ্কোচে যদি না পারে, তিনিই বলবেন। এ ঘর থেকেই হাঁক দিলেন, আমি বেরুলাম, বুঝলি?

বিকেলে লম্বা একপ্রস্থ হাঁটা অভ্যেস তাঁর।

সান্ত্বনা হাতমুখ ধুয়ে দাওয়ায় এসে সবে ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবার কথা কানে এলো। তিনি বেরিয়ে গেলেন টের পেল। ভাল লাগল না। খারাপও লাগল না। মনে মনে উদগ্রীব হয়েছিল একদিন। নিধুর মুখে আর বাবার মুখে রণবীর ঘোষের নাকাল হওয়ার ব্যাপারটা শোনার পর থেকেই। নিধু বলেছিল

তাড়া তাড়া নোট দিয়ে অমন পিটুনি জম্মেতক দেখেনি। বাবা চিন্তিত হয়েছেন, কি ভাবে শোধ নিতে চেষ্টা করবে ওই কন্‌ট্রাক্টর ঠিক কি। সে চিন্তা সান্ত্বনাকেও স্পর্শ করেনি এমন নয়। কেমন মনে হয়েছে, তার জন্তেই এতটা হয়েছে। হঠাৎ আবার জিপে রণবীর ঘোষের পাশে হোপুনের মূর্তি স্মরণ হতেই ভয়ের ছায়া নামল মুখে।

নরেন এসে দাঁড়াল। মোড়া টেনে দাওয়ায় বসল, যেমন বসে। সহজাত হালকাভাবেই বলল, আমার খাবার তাড়া নেই কিছু, খেয়ে এসেছি।

সান্ত্বনা সকৌতুকে তাকালো তার দিকে। বলল, নতুন নতুন লাগচে শুনতে।

—যে ভাবে তাকাচ্ছ, মনে হচ্ছে নতুন নতুন লাগছে দেখতেও।

—লাগচেই তো। আপনার আবার এত রাগ জানতুম না।

কোন প্রসঙ্গে বলছে বুঝেই নরেন হাসতে লাগল তার দিকে চেয়ে। এ ছাড়া আমার আর যা কিছু সব জেনে ফেলেছ বোধ হয়?

নিরুপায় হয়ে হেসে ফেলল সান্ত্বনা, খুব ফট ফট করে কথা শোনাচ্ছেন যে—এ কদিন আসেন নি কেন?

অনেকবার স্থির করেছিল, দেখা হলে বলবে, সেদিন ওরকম বলাটা তার অন্যায় হয়েছে খুব। বলে উঠতে পারল না। কিন্তু যা বলল, নরেনের কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছুলো বোধ হয়। নিস্পৃহ মুখে জবাব দিল, না এসে দেখছিলাম পেয়াদা পাঠাও কি না, আশা নেই দেখে শেষে চলে এলাম।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সান্ত্বনা। সেখানেই বসল। চেষ্টা করেও হালকা কথা কিছু মুখে জোগালো না। বাইরের দিকে মুখ ফেরাতে হল। ভদ্রলোকের কথাবার্তার ধরণ-ধারণ সুবিধের ঠেকছে না।

প্রসঙ্গ বদলে নরেনই জিজ্ঞাসা করে বসল আবার, মড়াইয়ে বাদল গাঙ্গুলির সঙ্গে খুব গল্প করছিলে দেখলাম—

প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ একেবারে থতমত খেয়ে গেল সান্ত্বনা। সচকিত বর্ণান্তর। নরেনের চোখ এড়োলো না কিছুই। চেয়েই আছে। হাসছে একটু একটু।

হালকা বিস্ময়ে সান্ত্বনা পাল্টা প্রশ্ন করল, ও মা, আপনি আবার কোত্থেকে দেখলেন?

—গা-ঢাকা দিয়ে তো আর ঘুরছিলে না, সব জায়গা থেকেই দেখা গেছে···তা কি কথা হল?

আবার লাল হয়ে উঠছিল সান্ত্বনা, শেষের প্রশ্নটার আশ্রয় নিয়ে বাঁচল। ছদ্ম-গাম্ভীর্যে বলল, কথা হল আমি খুব ভালো রাঁধি, আর নিধুর রান্নার কথা মনে হলে গায়ে একেবারে জ্বর আসে। আচ্ছা কেপ্পন আপনাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার—এত টাকা মাইনে পায়, দেখে শুনে একজন রাঁধুনী রাখলেই হয়।

শুধু টিপ্পনী নয়। নিজে এ বিদ্যেয় পটু বলে করুণাও। নিধুর রান্নার বহর স্বচক্ষে দেখেছে।

সঙ্গে সঙ্গে নরেন ঠাট্টা করল, তা পছন্দ মত রাঁধুনীর খোঁজে যদি এ বাড়ির দিকেই চোখ দেয়, তাহলে?

—ধ্যেৎ, আপনি যাচ্ছেতাই লোক। ভ্রূকুটি সত্ত্বেও আরক্ত হয়ে উঠল। এ কথার জবাবে এই ভদ্রলোক এরকম ঠাট্টাই করবে জেনেও বলা। তবু বিকেলে মড়াইয়ের অনুভূতিটুকু নিজের অজ্ঞাতে মিষ্টি আনন্দের মত যেন ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে আছে। সেই খুশিটুকুই প্রকাশ পেল আবারও। হাসি-খুশি মুখেই জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রলোককে সবাই এত ভয় করে কেন বলুন তো? ক'দিন তো কথা বলে দেখলাম, মেজাজপত্র দিব্যি ঠাণ্ডা।

নরেন চুপচাপ চেয়েছিল। মুচকি হেসে বলল, তোমাকে সে মেজাজ দেখাতে যাবে কেন?

—অন্য লোককে? হালকা আগ্রহ।

—অন্য লোককেও মেজাজ ঠিক দেখায় না, তবে কাজের বাইরে নিজের মনে একা থাকতে থাকতে এমন হয়েছে যে ভরসা করে কেউ বড় ঘেঁষে না কাছে।

বলার মধ্যে আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল কোথায়! নারীসুলভ একটুখানি বেদনার ছায়া পড়ল মুখে। কিছু না ভেবেই জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, ভদ্রলোকের আপন বলতে আর কেউ কোথাও নেই, না?

আবার হাসতে লাগল নরেন চৌধুরী। নিঃশব্দ হাসি আর সকৌতুক নিরীক্ষণ। সান্ত্বনা বিব্রত বোধ করতে লাগল কেমন। বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে নরেন সাদাসিদে জবাব দিল, আছে, তেমন কেউই আছে, তবে ভদ্রলোক সেটা এখনো ঠিক জানে না বোধ হয়।

এক ঝলক রক্ত উঠে আসছে সান্ত্বনার মুখে। সেটা টের পেয়েই জিজ্ঞাসু বিস্ময়ের ভান করতে হল যথাসম্ভব। কিন্তু সেও আর কতক্ষণ। ভদ্রলোকের চোখে-মুখে গা-জ্বালানো হাসি।

উঠে চট্ করে রান্নাঘরে চলে গেল। সেদিকে চোখ রেখে নরেন তেমনি হাসছে মৃদু-মৃদু।

সান্ত্বনার সামলে নিতে সময় লাগল বেশ একটু। ওই ভাবে না তাকালে আর ওই ভাবে না হাসলে সেও রাগ দেখাতে পারত বা যাহোক কিছু বলতে পারত। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে করতেও হবে সে রকম কিছু বা বলতে হবে। কিন্তু আয়না ছাড়াও নিজের মুখের অবস্থা অনুমান করতে পারছে।

চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সুন্দরীর ছোকরা চাকর উনুন ধরিয়ে রেখে গেছে। বেশ শব্দ করে কেটলি ধুয়ে চায়ের জল চড়ালো। শাড়ীর আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এলো তারপর। বিমূঢ় পরক্ষণে।

নরেন চৌধুরী চলে গেছে।

শ্লথ পায়ে যেন কোয়ার্টারস-এর দিকে চলেছে নরেন চৌধুরী। অনেকটা নিরুদ্দিষ্টের মত। অল্প-অল্প হাসিটুকু মুখে লেগে আছে তেমনি।···হাসি ঠিক নয়। তবু হাসি বই কি।

মূর্তির মত দাওয়ায় বসে আছে সান্ত্বনা। রান্নাঘরে কেটলির জল ফুটে উনুন নিবছে, খেয়াল নেই। [ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জরাসন্ধ

যে তাকিয়াটাকে আশ্রয় করে এতক্ষণ কাত হয়ে ছিলেন, এবার তারই উপর সটান শুয়ে পড়ে তালুকদার বললেন, তার পর? কী বলতেন তোমার মাষ্টার মশাই?

দেবতোষ বসে ছিলেন পাশেই একটা ক্যাম্পচেয়ারে। উঠে পড়ে বললেন, দাঁড়ান, আপনার সিগারেট নিয়ে আসি।

—আর তোমার ঐ বনমালীকে বল আর এক কাপ চা দিতে। সত্যি, ও যে একজন ওস্তাদ চাকর, সেটা ওর চামচে নাড়া দেখলেই বোঝা যায়। এ্যালুসনটা বুঝলে না তো? ডাক্তার জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। তালুকদার বললেন, যখন হিন্দু হষ্টেলে ছিলাম, আমাদের Ward Servant ছিল বংশী। একটি নতুন ফার্ষ্ট ইয়ারের ছেলে বন্ধুর কাছে তাকে চাকর বলে উল্লেখ করেছিল। বংশী তো ভীষণ খাপ্পা। সরকারী চাকরি করে; চাকর বললে বরদাস্ত করবে কেন? তাকে ঠাণ্ডা করলেন আমাদের মন্টতোষ দা। ডেকে এনে বললেন, ওরে মুখ্যু, চাকর মানে চাকর নয়। ওটা সংস্কৃত কথা। চাং করোতি, ইতি চাকরঃ। তোর মত চা করে কে?

দেবতোষ হাসতে হাসতে বললেন, গল্পটা বনমালীকে শোনাতে হবে, দেখছি।

—সে কাজও করো না। এখন ঘাড়ে চড়ে আছে। এর পরে মাথায় উঠবে। মাইনে দাও কত?

—যখন যা পারি। কোনো হিসেব-পত্তর নেই।

—ওকে আমি Kidnap করবো ঠিক করেছি।

—রক্ষে করুন, দাদা! তাহলে আমার চলবে কেমন করে?

—ঐ লক্ষ্মীছাড়াটাই কি চিরকাল চালাবে নাকি? লক্ষ্মী একটি জোটাতে হবে না?

—কোনো দরকার নেই। এই বেশ আছি। বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

আজ সকালেই দেবতোষের ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেছে। সন্ধ্যা থেকে তার এই শোবার ঘরেই আস্তানা নিয়েছেন তালুকদার। ঘণ্টা দুই কোথা দিয়ে কেটে গেছে কেউ টের পাননি। আজকার বক্তা দেবতোষ। উনি শুধু মাঝে মাঝে দু-একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের ডুবুরি নামিয়ে তার অন্তরের গহন থেকে সংগ্রহ করছিলেন যা কোনো দিন কেউ পায়নি। ডাক্তার সিগারেট নিয়ে ফিরে এলে তালুকদারও তাঁর পুরানো প্রশ্নে ফিরে গেলেন, এবার বল তোমার সেই পাগলা মাষ্টারের কাহিনী।

ডাক্তার তাঁর সেই ক্যাম্প-চেয়ারটা আবার দখল করে বললেন, আমার ওপরে ওঁর একটু বিশেষ টান দিল, যদিও আমিই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী জ্বালাতন করতাম। মাঝে মাঝে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতেন, আমাদের সেই মহকুমা সহর থেকে অনেকখানি দূরে কোনো ফাঁকা মাঠে, কিংবা নদীর ধারে। কত কী বলতেন। একটা কথা প্রায়ই শুনতাম তাঁর মুখে—এই যে দেখছিস মাঠ ঘাট গাছপালা নদীনালা, যাদের আমরা বলি বিশ্ব প্রকৃতি, মানুষও এর একটা অংশ। এদের মত সে-ও নতুন করে জন্ম নিচ্ছে প্রতিদিন, ঐ আকাশের রং যেমন বদলায়, কেন বদলায় কেউ জানে না, কেউ প্রশ্ন করে না, তেমনি মানুষেরও রং বদলায়, তার মন বদলায়। কিন্তু আমরা সে কথা মানতে চাই না। তর্কের বেলায় মানলেও কাজের বেলায় মানি না। জোর করে বলি, অমুকে এ রকম হতে পারে না তমুকে একথা বলতে পারে না। অথচ দুটোই এক, একই বিধাতার সৃষ্টি। দুয়ের মধ্যে একই লীলা একই বৈচিত্র্যের খেলা। কাল রাতে ঝড় উঠেছিল বলে, আজকের উষার হাসি তো বন্ধ থাকে না? তেমনি যে মানুষ কাল একজনের বুকে ছুরি বসিয়েছিল, আজ সে আর একজনকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারে। কালকার 'আমি'র সঙ্গে আজকার 'আমি'র অনেক তফাৎ। কালকের বীভৎস রূপ যদি সত্যি হয়, আজকের এই মোহন রূপও মিথ্যা নয়…গভীর আবেগের সঙ্গে এই সব কথা যখন বলতেন মাষ্টার মশাই, মনে হত, এ সব শুধু কথা নয়, তাঁর মনের কোনো প্রত্যক্ষ সত্য বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তাকে যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি। তারপর আবার ভুলে যেতাম। অন্য সকলের মত আমিও বলতাম, পাগলা মাষ্টার! কিন্তু তার পাগলামির ভূত যে বরাবর আমার ঘাড়ে চেপে ছিল, বহুকাল পরে সেটা টের পেলাম, যখন এলাম আপনার এই জেলখানায়। দেখলাম খুনী, ডাকাত, পকেটমার, জোচ্চোর, গুণ্ডা বলে যাদের চিরদিন ভয় করে এসেছি, ঘৃণা করেছি সমস্ত অন্তর দিয়ে, তাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ কোথায়? তারাও তো খুসী হলে হাসে, দুঃখ পেলে কাঁদে, উপকার করলে কৃতজ্ঞ হয়, ভালবাসলে সাড়া দেয়, অপমানে ক্ষুব্ধ হয়। আমার হাসপাতালের কালতু ফটিক বাগদী একটা বাচ্চা

মেয়ের গলা টিপে মেরেছিল, এক ভরি একটা সোনার হারের জন্যে। সেদিন জমাদারের ছোট মেয়েটার ফোড়া অপারেশন দেখে কেঁদেই অস্থির। ছুটে গিয়ে কার কাছ থেকে একটা কমলা লেবু এনে গুঁজে দিল মেয়েটার হাতে। সেই মুহূর্তে যে চোখ দুটো তার দেখলাম, সে তো খুনীর চোখ নয়?

দেবতোষের কণ্ঠ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। তালুকদার কোনো সাড়া দিলেন না। কয়েক মিনিট বিরতির পর আবার বললেন, ডাক্তার, আমার সে পাগলা মাষ্টার আজ আর নেই। কিন্তু তার সেই চোখ দুটো আমার চোখের ওপর ভাসছে। সেই চোখ দিয়ে মাঝে মাঝে আমি এই কয়েদীগুলোকে দেখতে চেষ্টা করি। হঠাৎ মনে পড়ে, কাল রাতে ঝড় উঠেছিল বলে, আজকার উষার হাসি তো বন্ধ হয় না!

এবার তালুকদারের সাড়া পাওয়া গেল। চোখ বুজে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, But after all they are criminals. ডাক্তারের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল, criminal বৈ কি? জেলে যখন এসেছে।

—Exactly বিছানার উপর উঠে বসলেন তালুকদার, তার পর বললেন, জেলের বাইরে যে বিশাল দুনিয়া, যেখানে ঐটুকুই ওদের একমাত্র পরিচয়। জেল থেকে বেরিয়ে যখন যাবে, তখনও তারা কেবল মাত্র ex-convicts। কিন্তু সে কথা আজ তোমার মাথায় ঢুকবে না। তোমার কাঁধে ভর করে আছে পাগলা মাষ্টারের ভূত। চোখের দৃষ্টিই বদলে গেছে। তুমি দেখছ, হেনা মিত্র বলে যে সর্বনাশী এক দিন এক জনকে বিষ খাইয়েছিল, আজ আর এক জনের জন্যে সে বয়ে এনেছে অমৃত। কিন্তু ঐ বিষকন্যা যেদিন এই পাঁচিলের বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে, আর সারা সংসারের কাছে বিষদৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই পাবে না, তখন যদি ওকে দেখতে পাও, ওর হাতের এই সুধার ভাণ্ডটা তোমার নজরে পড়বে তো, ভায়া?

—আজ আর এ-সব কথা কেন, দাদা? মৃদু করুণ সুরে বললেন দেবতোষ। যে অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে, পাতা উলটে আবার সেখানে ফিরে গিয়ে কী লাভ?

—ভুল করলে দেবতোষ। দার্শনিকরা বলেন, জীবনটা হচ্ছে বার বার পড়া উপন্যাস। তার কোনো অধ্যায়ই কোনো কালে শেষ হয় না। তা ছাড়া আমি তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেটা 'যদি'র কথা। যে-তুমি আমার সামনে বসে বক্ বক্ করছ, তার কথা নয়।

—ও 'যদির' কথা? তাহলে বলবো, আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই দিয়েছেন। যে-মানুষ এক বার অমৃতের স্বাদ পেয়েছে, সে অমর। বিষ তাকে কোনো দিন স্পর্শ করবে না।

—আচ্ছা, ও-সব রূপক ছেড়ে সাদা কথায় এসো। যখন দেখবে, ঐ একটা মানুষের জন্যে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন তোমার আত্মীয়-পরিজন, আর আমাদের ভদ্র সমাজ তার দরজাটা বেশ করে এঁটে বন্ধ করে দিলেন তোমার মুখের উপর, তখন?

দেবতোষ হেসে ফেললেন, জানতে চাইছেন, তখন কী করতাম? আর যা-ই করি, যাঁরা মুখ ফেরালেন, তাঁদের মুখ দেখবার জন্যে ছটফট করতাম না, আর, যে-দরজা বন্ধ হল তাও খোলবার জন্যে টানাটানি করতাম না। কিন্তু ও-সব যদি-টদি আজ একেবারেই অবান্তর। ওগুলো আজ থাক্।

বেশ রাত হয়েছিল। তালুকদার বিছানা থেকে নেমে লাঠিখানা হাতে নিয়ে বললেন, তুমি তাহলে সত্যিই চললে ডাক্তার?

দেবতোষ মাথা নত করলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

—কোথায় যাবে ঠিক করলে?

ডাক্তার মাথা তুলে বললেন, ঠিক কিছুই করিনি। ভাবছি, কিছু দিন ঘুরবো।

দু'পা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন তালুকদার। প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, ওর সম্বন্ধে কিছুই কোনো দিন জানতে চাওনি?

—জেনেছিলাম, যেটুকু আমার প্রয়োজন।

—কী সেটুকু?

—কোনোখানে ওর কোনো বাঁধন নেই।

—আমার মনে হয়, বাঁধন না থাকলেও হয়তো কোনো বাধা আছে, যা আমরা জানি না।

—জেনেও কিছু লাভ নেই দাদা! তার শেষ উত্তর পেয়ে গেছি।

—এই দ্যাখ; আবার আমাকে দর্শনশাস্ত্র আওড়াতে হল। সংসারে শেষ বলে কিছু আছে কি?

ডাক্তারের কাছ থেকে এ প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

বড় বড় জেলের বড় জমাদারের একাধিক 'রাইটার' থাকে। অনেকটা প্রাইভেট সেক্রেটারীর মত। কয়েদী হলেও তারা লেখাপড়া জানা মাতব্বর কয়েদী। কোন্ নম্বরে কত আসামী বন্ধ হবে; কত গেল, কত এল; কোন কোন খাটনিতে লোক চাই, কোথায় ছাঁটাই দরকার; নতুন যারা আসছে, তাদের 'কাম পাল' বা কাজ বণ্টন, এই সব এবং এ ছাড়া দৈনন্দিন কারা-পরিচালনার আরো অসংখ্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে হিসাব পত্র রাখা এবং জমাদারকে সাহায্য করাই হচ্ছে তার রাইটারদের কাজ। তাদের হাতে ক্ষমতাও প্রচুর। যারা খাটনি-বদল চায়, গম-পেষা থেকে ফুলবাগান, 'চৌকা' থেকে 'ঝাড়ু-দফা,' কিংবা 'রাস্তাচালি' (Road-repairing) থেকে 'বাতি কমান' (Lamp-lighting) রাইটার বাবুর সুপারিশ ছাড়া তাদের গতি নেই। সাধারণ কয়েদী থেকে 'পাহারা', কিংবা 'পাহারা' থেকে 'মেট' পদে যার প্রমোশন দরকার, তাকেও প্রথমটা গিয়ে দাঁড়াতে হবে ঐ রাইটারের কাছে। কারা-শাসন-তন্ত্রে বড় জমাদারের যে প্রতিষ্ঠা, তার অনেকখানি নির্ভর করে উপযুক্ত রাইটারের উপর।

সুশীলা বড় জমাদার নয়, জেনানা ফাটকের জমাদারণী। তার রাজ্যটা নেহাৎ ক্ষুদ্র, কাজকর্মও ক্ষুদ্রতর, তবু রাইটারের আকাঙ্ক্ষা তার অনেক দিনের। মহাবল সিং-এর মত দু'-তিনটা না হোক, অন্ততঃ একটি লেখাপড়া জানা অনুগত মেয়ে তার পায়ের কাছটিতে কম্বল বিছিয়ে বসবে, আর তার নির্দেশমত লিখে থাকে অমুককে 'ফাটা-দরজি' (ছেঁড়া জামাকাপড় মেরামতের কাজ) থেকে ডালচাকি, তমুককে ঘাস-ছেঁড়া থেকে চালঝাড়া— এটুকু না হলে তার মর্যাদা রক্ষা হয় না। কিন্তু এমনি কপাল, লেখাপড়া জানে, এরকম কটা মেয়েই বা জেলে আসে? কালে-ভদ্রে যদি বা এসে পড়ে তার মনের কথাটা কেউ বোঝে না। হেনা যেদিন এল,

তাকে দেখে, তার চাল-চলন কথাবার্তা লক্ষ্য করে সুশীলার সেই লুপ্ত আশা আবার জেগে উঠল। মনে মনে স্থির করে ফেলল, একে আর কোনো কাজ করতে দেবে না; এর একমাত্র পদ হবে জমাদারণীর রাইটার। কিন্তু হেনাও তার অন্তরের কথাটা ধরতে পারল না। প্রস্তাবটা একরকম হেসেই উড়িয়ে দিল, আপনার ঐটুকু কাজ করতে আর কতক্ষণ লাগবে, মাসীমা? খাটনি বুঝিয়ে দিয়ে এসে ওটা আমি দু'মিনিটে করে দেবো। সুশীলা ক্ষুণ্ন হল। কাজ তার চলে গেল ঠিকই। কিন্তু রাইটার তো হল না। যে ডাল ভাঙে, যতই লিখুক, তাকে কেউ রাইটার বলবে না।

কিছু দিন পরে ডাল-খাটনি থেকে হেনা চলে গেল টি-বি ওয়ার্ডে। তার পর বড় সাহেবের হুকুমে, সে কাজ যখন তার বন্ধ হয়ে গেল, ওকে এবার কোথায় দেওয়া যায়, ভাবতে গিয়ে সুশীলার মনের কোণে হঠাৎ নতুন করে দেখা দিল সেই রাইটারের স্বপ্ন। হেনাকে ডেকে নিয়ে বলল, তোর আর খাটানি-ঘরে যেতে হবে না। ক'টা দিন জিরিয়ে নে। তার পর আমার এই কাজটাজগুলো একটু আধটু দেখা-শুনা করবি। আমি জেলর বাবুকে বলে সব ঠিকঠাক করে নেবো। হেনা এবার বুঝল সবই, কিন্তু সায় দিতে পারল না। মনের কোণে ছুঁয়ে গেল একটুখানি ব্যথার স্পর্শ। বলল, সে হয় না মাসীমা! আগে যা করতাম, তাই করবো। জেলর বাবুকে এ নিয়ে আপনি আর কিছু বলতে যাবেন না। সুশীলারও শেষ পর্যন্ত মনে হল, ওর কথাই ঠিক। এই সামান্য ব্যাপারে বড় সাহেব পর্যন্ত যখন মাথা ঘামাচ্ছেন, তখন তার মত লোকের নাক গলানো উচিত হবে না। কর্তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

অনেক দিন পরে আবার যখন গীতার পাশে গিয়ে বসল হেনা, তখন রাণীবালার ডিউটি। দু'-তিনটি মেয়ের সঙ্গে তার একটুখানি নীরব হাসির আদান-প্রদান অনেকের অলক্ষ্যে হলেও হেনার চোখ এড়াল না। অনভ্যাসের ফলে ওকে একটু ঘন ঘন হাত বদলাতে হচ্ছিল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, কণ্ঠে বেশ খানিকটা দরদ ঢেলে বলল রাণীবালা, তোমার যদি কষ্ট হয়, রেখে দাও না। বাকীটা ওরা কেউ করে দেবে।

হেনা সহজ সুরেই বলল না, না। কষ্ট হবে কেন?

—তুমি 'না' বললে কি হয়, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি। তাই ভাবছিলাম, ডাক্তার বাবুকে বলে তোমার খাটনিটা মাপ করিয়ে দেবো।

কয়েকটি মেয়ে খিল-খিল করে হেসে উঠল। কমলার কাজ ছিল না। সে বসেছিল দরজায় ঠেসান দিয়ে। হঠাৎ বলে উঠল, দরকার হলে সেটা ও নিজেই বলতে পারবে। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

—তোমাকে তো আমি কিছু বলিনি বাছা, ঝঙ্কার দিয়ে উঠল রাণীবালা, তোমার এত জ্বলুনি কিসের?

কমলা কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। তার আগেই হেনার কণ্ঠে শোনা গেল চাপা ভর্ৎসনার সুর—কমলা! আর কোনো কথা না বলে সে উঠে চলে গেল। ঘরের আবহাওয়াটা কেমন থমথম করতে লাগল।

বেলা গড়িয়ে গেছে। সবারই লক্ষ্য তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে কাজটুকু সেরে ফেলা। এমন সময়ে দরজার বাইরে শোনা গেল রাণীবালার গলা, এই যে নিস্তারিণী, কী খবর? নিস্তারিণীকে মেয়েরাও চেনে। ওর নাম ফালতু জমাদারণী। হাজতী-মেয়েদের যেদিন মামলার তারিখ থাকে, সেদিন ওর ডাক পড়ে তাদের কোর্টে নিয়ে যাওয়া এবং সন্ধ্যাবেলা আবার পৌঁছে দেবার জন্যে। তাছাড়া কোনো মেয়ে যখন সদর হাসপাতালে যায় কিংবা চালান হয়ে যায় অন্য জেলে, তখনও সঙ্গে যায় নিস্তারিণী।

রাণীবালার প্রশ্নের জবাবে বলল, এই তো, এলাম। একটা চিঠি আছে।

—চিঠি! কার চিঠি?

—হেনা কার নাম?

—ঐ তো হেনা। কোত্থেকে এল চিঠি?

—হাসপাতাল থেকে।

হেনার হাত দুটো হঠাৎ অচল হয়ে গেল। মাথা না তুলেও বুঝতে পারল, চার দিকে সবগুলো না হোক, অন্তত: কয়েকটা মুখ চাপা হাসিতে ফেটে পড়ছে। রাণীবালা তাড়া দিয়ে উঠল, নাও না চিঠিখানা। ডাক্তার বাবু দিয়েছে বুঝি?

—না, না। ডাক্তার বাবু নয়, বলল নিস্তারিণী। দিয়েছে ঐ বুড়ী, কি নাম যেন!

—সোনার মা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ সোনার মা।

—ও, তুমি বুঝি ঐটাকে নিয়ে আছ?

—আর বল কেন, দিদি! এরকম একটা ঘ্যান-ঘ্যানে বুড়ী জন্মে কখনো দেখিনি।

হেনার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। উঠে এসে চিঠিটা নিল নিস্তারিণীর হাত থেকে। চিঠি মানে ছেঁড়া এক টুকরা কাগজ। আঁকাবাঁকা অক্ষরে পেন্সিল দিয়ে লেখা। কোনো রুগীকে দিয়ে লিখিয়েছে বোধ হয়। দু'টি মাত্র লাইন—'দিদিমণি, ডাক্তার বাবুকে বলে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এখানে থাকলে আমি মরে যাবো।' হেনার চোখ দুটো ছল-ছল করে উঠল। এই যক্ষ্মাব্যাধিগ্রস্ত বুড়ীটাকে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তার মনটা যে কখন জড়িয়ে পড়েছিল, এত দিন টের পায়নি। কিন্তু বুড়ী যে ওকে কতখানি ভালবাসে, শুধু ভালবাসে নয়, কতখানি ভরসা করে, নির্ভর করে ওর উপর, তার পরিচয় অনেক বার পেয়েছে: তাই জেলের বাইরে গিয়েও সেই জেলেই আবার ফিরে আসবার জন্যে ছটফট করছে। সেখানকার নিয়মিত চিকিৎসা, সুদক্ষ নার্সদের সেবা-যত্ন সব ফেলে ডাক্তার বাবু আর দিদিমণির কাছেই তার প্রাণটা পড়ে আছে। ওখান থেকে উদ্ধার পাবার আর কোনো পথ চোখে পড়েনি। এক টুকরা কাগজ পাঠিয়ে শরণ নিয়েছে সেই দিদিমণির, যে তারই মত কিংবা তার চেয়েও অসহায়।

—ও মেয়ে, গিয়ে কী বলবো বুড়ীটাকে? নিস্তারিণীর ডাক শুনে হঠাৎ যেন ধ্যান ভেঙে জেগে উঠল হেনা। নিস্তার বলে চলল, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। খালি এক কথা—আমাকে দিদিমণির কাছে নিয়ে চল।

হেনা বলল, আমি তো ওকে চিঠি দিতে পারি না। আপনি বুঝিয়ে বলবেন, ওখানে থাকলেই শীগগির শীগগির ভাল হয়ে যাবে।

ভালো হলেই ওরা এখানে পাঠিয়ে দেবেন। আর বলবেন, খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিলে আমি ভীষণ রাগ করবো।

পরদিন বিকালবেলা। সুশীলার আসবার কথা চারটা সাড়ে চারটায়। এল প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি। বৈকালিক খাওয়া দাওয়া সেরে হেনা একা-একা গেটের কাছটায় বেড়াচ্ছিল। সুশীলাকে দেখে বলল, আজ এত দেরি যে মাসীমা?

—মিটিং-এ গিয়েছিলাম। সুশীলার চোখে-মুখে উত্তেজনার চিহ্ন।

—মিটিং-এ! কোথায় মিটিং?

—জেলখানার বড় মাঠে।

—জেলখানায় আবার মিটিং হয় নাকি?

—আমিও তো তাই জানতাম। জেলখানায় এ সব কাণ্ড আমার তিন কুলে কেউ শোনে নি, দেখা তো দূরের কথা। আজ দেখে এলাম নিজের চোখে।

হেনারও কৌতূহল বেড়ে গেল। কাছে এগিয়ে এসে বলল, কিসের মিটিং মাসীমা?

সুশীলা যেন মনে মনে সেই দৃশ্যটা স্মরণ করে বলল, আমাদের ডাক্তার বাবু চলে যাচ্ছেন, কয়েদীরা তাকে বিদায় দিয়ে গেল। একটু থেমে আবার বলল, মাঠভর্তি লোক। উনি বসে আছেন ঠিক সামনে। পাশে রয়েছেন জেলর বাবু। আর সব বাবুরাও রয়েছে। একে একে এসে মালা দিয়ে যাচ্ছে ওঁর গলায়, সেলাম করছে, কেউ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। সব দেখে এলাম। বাইশ বছর জেলখানায় আছি। কত বাবু দেখলাম। কত জেলর, ডাক্তার বদলি হয়েছে, ছুটি নিয়ে গেছে। বাবুরা মিলে অফিসে বসে চা-টা খাইয়েছে কাউকে কাউকে। কিন্তু এ রকম কয়েদীর মেলা কোনো দিন হয়নি।

হেনা আর কোনো প্রশ্ন করল না। শুধু চেয়ে রইল দূরে ঐ আমগাছটার দিকে।

সুশীলা আবার সুরু করল, কী সুন্দর বক্তৃতা দিলেন, এক বার যদি শুনতিস?

হেনা হাসল মৃদু হাসি, হ্যাঁ, আমার আর কাজ কী! জেলের মাঠে বক্তৃতা শুনতে যাই। কী বললেন?

—সে সব কি আমি ছাই বুঝি? কিন্তু ভারী ভালো লাগছিল। কয়েদীগুলোর কী কান্না! সকলের মুখে এক কথা, এ রকম বাবু আর হবে না।

দড়ি-বাঁধা ঘণ্টা বেজে উঠল। জমাদার আসছে লক্-আপ-এর উদ্যোগ করতে। সুশীলা তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বহুদর্শী জমাদারণী ঠিকই বলেছে। জেলের কোনো অফিসার চলে যাচ্ছেন বদলি হয়ে, কিংবা ছুটি নিয়ে, আর কয়েদীরা দিচ্ছে তাকে বিদায় অভিনন্দন, এ রকম ঘটনা ছিল নিতান্তই অভাবনীয়। শাসক এবং শাসিতের যে সম্বন্ধ, তার মধ্যে হৃদয়বৃত্তির স্থান নেই। এক পক্ষ হুকুম করবে, আর এক পক্ষ তামিল করবে, তার বেশী আর কিছু নয়। কারো বেলায় কোনো ব্যতিক্রম যদি ঘটত, হুকুমের বর্ম ভেদ করে দেখা দিত অন্তরের যোগসূত্র, কর্তৃপক্ষ বিচলিত হতেন। কয়েদীরা যাকে প্রীতির চক্ষে দেখে, তার উপরে পড়ত সরকারের সন্দেহ-চক্ষু। এক পক্ষের অনুরাগ মানেই অন্য পক্ষের বিরাগ। কয়েদী-মহলে জনপ্রিয় হওয়াটা কৃতী এবং জবরদস্ত অফিসারের কাম্য নয়, চাকরির দিক দিয়েও নিরাপদ ছিল না। বন্দীরা সে কথা জানত। তাই প্রিয় ব্যক্তির প্রতি তাদের যে শ্রদ্ধাপ্রীতি সেটা নীরবে জানিয়েই ক্ষান্ত হত। আনুষ্ঠানিক প্রকাশের সাহস করত না। দেবতোষকে নিয়ে হঠাৎ এক দারুণ দুঃসাহসের কাজ করে বসল এ জেলের কয়েদীরা। তাদের তরফ থেকে জনকয়েক প্রতিনিধি জেলের সাহেবের কাছে গিয়ে জানাল, তারা সবাই একত্র হয়ে ডাক্তার বাবুকে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে চায়। দেবতোষের উপর সাধারণ বন্দীদের মনোভাব তালুকদারের অজানা ছিল না। এই ব্যাপারটাকে সাময়িক হুজুক বলে লঘু করে দেখলে ভুল করা হবে, এ বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই যথাযথ গুরুত্ব দিয়েই তিনি কয়েদীদের আবেদন সুপারের কাছে হাজির করেছিলেন।

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর এই ডাক্তারটিকে উপলক্ষ করে জেলের ডিসিপ্লিনে যে ভাঙন ধরেছে, এটা তারই শোচনীয় পরিণতি। হঠাৎ মনে হল, এ প্রস্তাব একটা সোজাসুজি চ্যালেঞ্জ। তিনি এবং তাঁর শাসন নীতি যাকে অবাঞ্ছিত মনে করে প্রকারান্তরে সরিয়ে দিচ্ছেন, তাকেই তারা ঘটা করে দেবে ফেয়ারওয়েল! মেজর সাহেবের ঠোঁটের কোণে একটু ক্রুর হাসি ফুটে উঠল। জেলরের দিকে ফিরে বললেন, ঐ লীডারদের জানিয়ে দিন, ওদের চ্যালেঞ্জ আমি accept করলাম। ফেয়ারওয়েল হতে দেবো না। তার পর দেখি ওদের দৌড় কতদূর। তালুকদার মনিবের মনের কথাটা বুঝতে পেরে শান্ত কণ্ঠে বললেন, তাতে জিৎ হবে ওদেরই।

—মানে? রুক্ষ কণ্ঠে জানতে চাইলেন মেজর।

—আপনি যাকে মনে করছেন চ্যালেঞ্জ, সেইটাই তখন সব আব্রু খুলে গিয়ে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াবে। ওদের মিটিং বন্ধ হবে বটে, কিন্তু আমাদের মুখ রক্ষা হবে না।

সাহেব কিঞ্চিৎ নরম হলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, তাহলে ওদের ঐ ছেলেখেলাটা হতে দেওয়া, মানে ignore করাই আপনার ইচ্ছা? বেশ তাই করুন।

সুতরাং মিটিং হল। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে কয়েদীরা এসে সার বেঁধে বসে পড়ল ঘাসের উপর। তাদের সামনে এক লাইন চেয়ার দখল করলেন বাবুরা। মাঝখানটিতে বসলেন দেবতোষ, তার পাশেই সভাপতির আসনে রইলেন জেলর সাহেব। সময়োপযোগী ভাষণও একটা দিতে হল। বন্দীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ উঠে দু-চার কথা বলতে চেষ্টা করল তাদের অনভ্যস্ত কাঁচা ভাষায়। যা বলা হল, তার চেয়ে অনেক বেশী রইল না-বলা। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন দেবতোষ। বললেন, আমার বন্ধুদের মত আমি ঠিক জেলখানার লোক নই। হঠাৎ এসে পড়েছিলাম; হঠাৎই আবার চলে যাচ্ছি। এই ক'টা দিন আমার চিরদিন মনে থাকবে।

জেলখানায় চাকরি পাবার কাহিনী উল্লেখ করে বললেন, কত ভয় হয়েছিল মনে মনে। যত না ভয় তার চেয়ে অনেক বেশী লজ্জা। লোকে বলবে জেলের ডাক্তার। ছিঃ ছিঃ! আজ বুঝতে পারছি, এখানে না এলে জীবনের একটা বড় দিক আমার কাছে অন্ধকার থেকে যেত। বাইরের হাসপাতালে ডাক্তারি করতে গিয়ে দেখেছি, ব্যাধিগ্রস্ত দেহ। এখানে এসে দেখলাম ব্যাধিগ্রস্ত

মন। কিন্তু এদের ভালো করবার মত ওষুধ আমার জানা নেই। মানুষের হাত-পায়ে যখন আঘাত লাগে, সে ব্যথা আমরা সারিয়ে দিই, কিন্তু তার মনে যখন আঘাত লাগে, সেখানে যখন ক্ষত দেখা দেয়, আমাদের কিছুই করবার নেই। অথচ, কে না জানে, সেই আঘাত বা ক্ষত থেকেই জন্ম নেয় অপরাধের অঙ্কুর, যাকে আমরা বলি crime আমাদের শরীরের উত্তাপ যদি বেড়ে যায়, আমরা তাকে বলি জ্বর। সে হল দেহের একটা সাময়িক বিকার। তার চিকিৎসা আছে, প্রতিকার আছে, যার ফলে সে বিকার চলে যায়। রুগী আবার সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কিন্তু কোনো কারণে মানুষের অন্তরের উত্তাপ যখন বেড়ে যায়, তার কর্মে আচরণে দেখা দেয় বিকৃতির লক্ষণ, আমরা তার নাম দিই অপরাধ। সেই অপরাধী অর্থাৎ বিকারগ্রস্ত মানুষটাকে ধরে এনে আটকে রাখি জেলখানায়। তাকে সুস্থ করবার, নিরাময় করবার, স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নেবার কোনো বিধান তো আমাদের শাস্ত্রে নেই। সে ডাক্তারি আমি শিখিনি। শিখবার কোনো ব্যবস্থা আছে বলেও জানি না। যদি থাকত, আমাদের এই থার্মোমিটার বা ষ্টেথিস্কোপ দিয়ে যেমন জ্বর মাপি, হৃদযন্ত্রের স্পন্দন কিংবা ফুসফুসের শক্তি পরখ করি, তেমনি একটা কিছু যদি থাকত যা দিয়ে মাপা যায় অপরাধীর মনের দাহ, তার হৃদয় বা মস্তিষ্কের কুটিল গতি, তাহলে বোধ হয় এত বড় পাঁচিল, এত সব সিপাই-শান্ত্রী, গুলী-বন্দুকের দরকার হত না। জেলের বদলে গড়ে উঠত আর এক রকমের নতুন হাসপাতাল। খুলে যেত মানব-সেবার আর একটা নতুন দ্বার।

বাবুদের লাইনে কেউ কেউ উসখুস সুরু করলেন। কারো কারো মুখে দেখা দিল চাপা হাসি। দেবতোষ সেটা লক্ষ্য করলেন। তারপর বললেন, আমার পক্ষে এ-সব হয়তো অনধিকার চর্চা। জেলের আইন-কানুন আমি পুরোপুরি জানি না। সমালোচনা করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু জানিয়ে যাচ্ছি আমার অক্ষমতা। তোমাদের জন্যে আমি কিছুই করতে পারিনি। তোমরা যারা আমাকে ভালোবেসেছিলে, তাদের কাছে স্বীকার করছি, সে ভালোবাসা পাবার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই।

সুশীলা অত্যুক্তি করেনি। ডাক্তারের বেশীর ভাগ কথা সেও যেমন বোঝেনি, কয়েদীরাও তেমনি বুঝতে পারেনি। তবু, এই দুর্বোধ্য কথাগুলো শুনতে শুনতেই তাদের চোখের জল সেদিন বাধা মানেনি। কথা বুঝতে বুদ্ধি লাগে, শিক্ষা লাগে। সেটা ওদের অনেকেরই নেই। কিন্তু তার পেছনে যে সুর সেটা বুঝতে লাগে হৃদয়। সেখানটায় বোধ হয় কোনো অভাব ছিল না।

কারণ নেই, যুক্তি নেই, তবু একটা অর্থহীন ক্ষীণ আশা হেনার মনের কোণে জড়িয়ে ছিল, যাবার আগে একবার তিনি আসবেন। সেই সঙ্গে একটা আশঙ্কাও ছিল, যদি আসেন আর সেই উদাস চোখ দুটি তুলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, হেনা আমি যাচ্ছি, কী বলবে সে? হয়তো সেই দৃষ্টির সামনে মাথাটা তার আপনিই নুইয়ে পড়বে। একটি বার চেয়ে দেখা হবে না, একটি কথাও বলা হবে না। বলবার বা শোনবার আর আছেই বা কী? তাই হয় তো আসেন নি। কিন্তু তার জন্যে না আসুন, আরো তো কত মেয়ে আছে এই জেনানা-ফাটকে, যারা তাঁর কাছে কতরকমে ঋণী। কমলা আছে, বীণা আছে, যাদের চিকিৎসা সবে সুরু করেছিলেন, শেষ করে যেতে পারেননি। তাদের ব্যবস্থা অবশ্য তিনি করে গেছেন। নতুন ডাক্তার তাঁরই নির্দেশ মত ওষুধ ইনজেকশন চালিয়ে যাচ্ছেন। তবু কি এক বার আসতে নেই? কী ক্ষতি হত যদি মিনিট কয়েকের জন্যে একটি বার এসে দাঁড়াতেন এই ওয়ার্ডের সামনে? আর মেয়েরা এসে একে একে জানিয়ে যেত তাদের শ্রদ্ধানত অন্তরের নিঃশব্দ প্রণাম। ক্ষতি হোক আর না হোক, তিনি আসেন নি। সুশীলার কাছেই খবর পেয়েছিল হেনা তিনি চলে গেছেন। কোথায়, তা সে জানে না। এটাই তো স্বাভাবিক, এটাই তো প্রত্যাশিত। এতে অভিযোগ করবার, নালিশ জানাবার কী আছে? তবু তার মনে হল, বুকের একটা দিক কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। তার মধ্যে কিসের একটা যন্ত্রণা, খানিকটা ক্ষোভ, খানিকটা অভিমান, খানিকটা বঞ্চনা! অর্থহীন বেদনায় চোখের কোণ দুটো ভিজে ওঠে। মনে হয় এক দিন কোথাও একটা আশ্রয় ছিল। আজ আর নেই। আজ সে নিতান্ত একা, একান্ত অসহায়।

এক সপ্তাহের উপর হল দেবতোষ চলে গেছেন। বুড়ী ফিরে আসেনি। নেবুতলার হাসপাতাল বন্ধ। জমাদারকে বলে-কয়ে ক'দিন হল একটা সেল-এ থাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে হেনা। নির্দিষ্ট খাটনি করে আর সুশীলার ফাই-ফরমাজ খেটে যে-টুকু সময় বাঁচে, ঐ নির্জন ছোট ঘরটাতেই সে কাটিয়ে দেয়। সেল'এ আলোর ব্যবস্থা নেই। নিশি আসবার আগেই সেখানে নৈশ ভোজনের পাট সেরে নিতে হয়, এবং সূর্যঠাকুর পাটে বসতে না বসতেই বন্ধ হয়ে যায় গরাদে-দেওয়া লৌহকপাট। সেখানে আলো একটা অনাবশ্যক বিলাস মাত্র। দুটো কম্বল বিছিয়ে নিতে ক' মিনিট সময় লাগে? দু'মিনিট? তার পর আলোর কী প্রয়োজন? লেখাপড়া? তৃতীয় কয়েদির সে অধিকার নেই। যদি বলেন, তবে লাইব্রেরী আছে কিসের জন্যে? ওটা শুধু রবিবারের রিক্রিয়েশান। রবিবার ছাড়াও সে সুবিধা ওদের দেওয়া হয়, বছরে ন'দিন, যাকে বল জেলহলিডে। সব কটাই কোনো না কোনো পর্বের দিন—তিনটি হিন্দু, তিনটি মুসলমান, তিনটি খৃষ্টান। সর্বধর্মে সমদৃষ্টি। অভিযোগের অবকাশ নেই কোনো তরফেই। ঐ ন'টা দিন খাটানির বদলে বই পড়ো কিংবা দশ-পঁচিশি খেলো। কিন্তু সব দিনের বেলায়। জেলের রাতগুলো শুধু ঘুমের জন্যে। কথা বলতে চাও, নিজের সঙ্গে বল। গান করতে চাও, তাও নীরবে। "Strict silence should be maintained at all times."—লেখা আছে জেল কোড-এ।

আইনে যার বিধান নেই, কিংবা তার মত অন্য সকলের জন্যে যে ব্যবস্থা হয়নি, এমন কিছুই হেনা কোনো দিন চায়নি, দিলেও প্রত্যাখ্যান করেছে। আজ এত দিন পরে তার সে কঠোর নিয়ম শিথিল করতে হল। অনেক ভেবে, অনেক ইতস্তত: করে এক দিন সুশীলার দরবারে পেশ করল তার আরজি, আপনার কাছে দুটো জিনিষ চাইতে এলাম, মাসীমা।

সুশীলা খোস মেজাজে ছিল। বলল, কী জিনিষ, একটা দড়ি আর একটা কলসী?

—তা আপনি দিতে পারবেন না। দিলেও লাভ নেই। একটা পুকুর চাই, তা না হলে ওগুলো কাজে লাগবে না।

—তবে কী তোমার কাজে লাগবে শুনি ?

—একটা আলো আর একটা খাতা।

সুশীলার মুখ গম্ভীর হল। হ্যারিকেনের সংখ্যা নির্দিষ্ট। প্রতিটি লণ্ঠনের জন্য যে তেলের বরাদ্দ আছে, শীতকালে দু'ছটাক আর গরমকালে দেড় ছটাক, তার বেলাতেও হিসাবের কড়াকড়ি। একটা ফালতু আলো চাইতে হলে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে গুদামী-বাবুর সেরেস্তায়, এবং প্রচুর তৈলমর্দন করেও এক ছটাক তৈল সংগ্রহ অসম্ভব ব্যাপার। অথচ এই সামান্য বিষয়ে হার স্বীকার করলে এত বড় জেলের জমাদারণীর মান থাকে না। বিশেষ করে, যে কোনো দিন কিছু চায় না, সেধে দিতে গেলেও হাত গুটিয়ে নেয়, তার এই আব্দারটুকু না রাখতে পারলে মনই বা বুঝ মানে কেমন করে ? আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে এক ঝলক বিদ্যুৎ-শিখার মত হাসপাতালের লণ্ঠনটা সুশীলার চোখের উপর ভেসে উঠল, এবং তারি আলোয় মুখের গাম্ভীর্যটাও এক নিমেষে কেটে গেল। তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠল, আলোর জন্যে ভাবনা কি ? জমাদার এলে মনে করাস, হাসপাতালে যে বাতিটা পড়ে আছে, বের করে দেবো।

হেনা আশ্বস্ত হতে পারলো না। বলল, কিন্তু, ওটা যদি ওঁরা ফেরত চান ? হাসপাতাল তো বন্ধ হয়ে গেছে।

—আরে না, না। ফেরত অমনি চাইলেই হল ?

মুখে ভরসা দিল বটে। কিন্তু সে বিষয়ে উদ্বেগ সুশীলার মনেও কম ছিল না। তবু, আপাততঃ সমাধান একটা হয়ে গেল। গোল বাধল ঐ দু'নম্বরে। জেলসুপার কয়েদী বিশেষে খাতা কিনবার অনুমতি দিতে পারেন। সরকারী খরচে নয়, কয়েদীর নিজের পয়সায়। হেনার তো কোনো টাকা-পয়সা জমা নেই। বাইরে থেকে একটা খাতা যদি তার কোনো আপনার জন জেল-গেটে দিয়ে যায়, তাতেও বাধা ছিল না। কিন্তু তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। আইন বাঁচিয়ে প্রকাশ্য ভাবে আফিস-মারফৎ এই সামান্য জিনিষটাও সুশীলার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, যদিও শুধু খাতা কেন, আরো অনেক কিছু তার এই একান্ত স্নেহের পাত্রীটির হাতে দেবার জন্যে সে ব্যাকুল। হেনা তার 'আপনার জন' নয়, তার হেফাজতে রাখা একজন কয়েদী মাত্র। তার সঙ্গে এই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখবেন না। বিশেষ করে বড় সাহেব এবং আরো ক'জন বাবু যে এই মেয়েটির উপর প্রসন্ন নন, সে কথা আজ আর কারো অজানা নেই। নিজের এই অসহায় অক্ষমতা অনুভব করে সুশীলার মুখখানা করুণ হয়ে উঠল। হেনার দিকে ফিরে অনেকটা যেন সান্ত্বনার সুরে বলল, খাতা দিয়ে কী করবি ? বই-টই আছে, তাই পড়।

এই সান্ত্বনার আড়ালে আসল অবস্থাটা বুঝতে পেরে হেনারও সঙ্কোচের অবধি ছিল না। তাই সুশীলার উত্তরে বেশ খানিকটা উৎসাহ দেখিয়ে বলে উঠল, তাই ভালো। বই-টই বরং এনে দেবেন মাঝে মাঝে। খাতা এখন থাক। আলোটাই আমার বেশী দরকার ছিল।

খাতা উপলক্ষ করে এই ছলনাটুকু দু'জনের কারো কাছেই গোপন রইল না এবং হেনার অতিরিক্ত খুসির সুর আর এক জনের বুকে গিয়ে বিঁধল। দুটো দিন সমস্ত কাজ-কর্ম চলা-ফেরার মধ্যে তার মনের একটা কোণ জুড়ে রইল একখানা কালো মেঘ। সে মেঘ নেমে গেল তৃতীয় দিন ভোর বেলা, যখন তার দু'হাত লম্বা চাদরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা মোটা বাঁধানো খাতা এবং যেদিকে তাকিয়ে হেনার মুখে ভেসে উঠল সত্যিকার খুসির আলো। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বলল, এটা ভালো করেননি মাসীমা। ওরা যদি জানতে পারে ?

—হ্যাঁ, জানতে পেরে তো আমার সব করবে !

—তা ছাড়া, এতে জেলের ছাপ নেই, বড় সাহেবের সই নেই। তালাসি করতে এলেই তো কেড়ে নিয়ে যাবে। আমার শাস্তি হবে, সেজন্যে ভয় করি না, কিন্তু আপনাকেও পড়তে হবে কত কী কৈফিয়তের দায়ে। সে ভাবনা সুশীলার মনেও কম ছিল না। একটু কি ভেবে নিয়ে বলল, এক সময়ে দিস খাতাখানা। লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে কেরাণীবাবুকে বলে কয়ে যদি একটা সীল দিয়ে আনতে পারি, দেখবো।

ইস্, এ খাতা আমি দিলাম আর কি ! ছেলেমানুষের মত মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল হেনা। যদি আর ফিরিয়ে না দেয়। আসুক না তালাসি। বলে আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলল খাতাখানা।

[ক্রমশঃ।

এক মুঠো আকাশ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

আজ সেই বহু-আকাঙ্খিত রবিবার। ভোর থেকে উঠে কেষ্টর দল কাজ সুরু করেছে। আগের দিনের নির্দেশ মত ছেলেরা এক এক সেণ্টারে জমা হয়। কেষ্ট জীপে করে ঘুরে বেড়ায়, কাজ ঠিক এগুচ্ছে কি না দেখে।

—তোমাদের এখানে পঁচিশ জন ছেলে এসেছে ?

এদের মোড়ল নিতাই উত্তর দেয়, দু'জন ছাড়া আর সবাই এসেছে। ভোটার-লিষ্টের 'ইনচার্জ' করেছি অতীনকে, ও দু'জনকে নিয়ে এখানে বসবে।

—ভোটারদের স্লিপ দেবে কারা ?

—সত্যেন আর বিশু, ভোটার 'স্লিপ' ওরাই হাতে ধরিয়ে দেবে।

—গাড়ী বিশ্বাসী লোকের হাতে দিও, ভোটার আনতে গিয়ে না লেংকে বেড়িয়ে আসে। দরকারী কথার মধ্যেই সত্যেন এক কোণ থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কেষ্ট দা', খাবার আসবে কখন, চা-সিগারেটে তো আর পেট ভরবে না ?

—এরই মধ্যে ক্ষিদে পেয়ে গেল ? এখনও তো কোন কাজই করিস্ নি।

—টিফিনের আগেই কিন্তু খাবার আসা চাই, মাংস থাকবে তো ?

—তুই কি বিয়ে-বাড়ী পেয়েছিস নাকি ? তবে লুচি আলুর দমের ভাল ব্যবস্থাই আছে।

ভোট দেবার জন্যে যারা মুখিয়ে ছিলেন, সেণ্টার খুলতে না খুলতে হুড়মুড় করে ভেতরে চলে যান। সে কিন্তু বেশীক্ষণের জন্যে নয়, আস্তে আস্তে ভীড় পাতলা হয়ে আসে।

কেষ্ট বলে—প্রথম চোটে শেখানো-পড়ানো লোকরা চলে গেছে। এখন আর নিজের গরজে কেউ আসবে না, সাধাসাধি করে আনতে হবে।

কেষ্টর কথাই ঠিক। বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটদাতার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। সব সেণ্টারেই প্রার্থীদের আফিসে ভোটদাতারা জমায়েৎ হয়ে চা, সিগারেট পান করেন। ভলেণ্টিয়াররা খাতির করে বলে, মনে রাখবেন স্যার, অমুক মার্কা বাক্স— ভদ্রলোক হেঁ হেঁ করে হাসেন, তা না হলে এই রোদ্দুরে কষ্ট করে আসি ? দেখি এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ—

তিনটি গ্লাস এক সঙ্গে এগিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে পান, সিগারেট। ভদ্রলোক সব ক'টির সদ্ব্যবহার করে উঠে দাঁড়ান। তাঁকে অনুপ্রাণিত করবার জন্যে ভলেণ্টিয়াররা সমবেত কণ্ঠে কানে তালা লাগিয়ে চীৎকার করে, ভোট ফর রঘু ব্যানার্জ্জী—

ভদ্রলোক দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন, ডান হাত বাড়িয়ে নির্ব্বিকার কণ্ঠে বলেন, ফেরার ভাড়াটা, দেড় টাকা।

—ভোট দিয়ে আসুন, আমাদের লোক গিয়ে ছেড়ে আসবে।

—ফিরে এলে তখন তো আর চিনতে পারবেন না। ভাড়াটা আগে থেকে নিয়ে নেওয়াই ভাল। অগত্যা নগদ বিদায় করতে হয়। আরেক খিলি পান মুখে দিয়ে ভদ্রলোক ভোট দেবার জন্যে এগিয়ে যান।

বেশ কয়েকটি সেণ্টারে হনুমান মার্কাদের সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেল রাঘব বোয়ালের দলের। জনৈক ভোটদাতা রাঘব বোয়ালের আফিস থেকে চা সিগারেট খেয়ে আবার বুঝি হনুমান মার্কাদের ক্যাম্পে লুচি-সন্দেশ উড়িয়েছে। ব্যস্, আর যায় কোথা, তাকে কেন্দ্র করেই গোলমালের সূত্রপাত। ফলে অনেক নিরীহ ভোটদাতার জামা ছিঁড়ল, মেয়েদের মধ্যে অনেকে ভোট না দিয়ে বাড়ী চলে গেল, দু'দলের অসম্মান জনক চীৎকারে পাড়ার লোক দরজা-জানলা বন্ধ করতে বাধ্য হল।

কেষ্টর হেড আফিসে খবর আসে, ওদের এক সেণ্টার থেকে ভোটার-লিষ্ট চুরি হয়ে গেছে। সংগে সংগে কেষ্ট সেখানে ছুটে যায়।

—কি করে চুরি হ'ল ?

বিশু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে, আমরা কি করে জানব কেষ্টদা', খানিক আগে পুলিন এসেছিল—

কেষ্ট রাগে ফেটে পড়ে, পুলিন, ডাম্ রাস্কেল। তাকে কে ঢুকতে দিলে ?

—তার যে এ মতলব, কি করে বুঝব ? এসে বলল বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, এক গ্লাস জল খাওয়া। জিজ্ঞেস করলাম, কেন, হনুমান মার্কারা জল দিচ্ছেন না বুঝি ? জিভ কেটে বললে, ছি, ছি, কেষ্টদার সংগে ঝগড়া হয়েছে বলে ঐ হনুমানদের দলে যাব ?

—সরালে কি করে ?

—ট্যাক্সী থেকে ক'জন লোক নামলেন, আমি বেরিয়ে নামিয়ে আনতে গেছি, ইতিমধ্যে পুলিন কখন বেরিয়ে গেল। আমি ফিরে এসে আর ভোটার-লিষ্ট খুঁজে পাই না।

কেষ্ট ঠোঁট কামড়ায়, তোমরা যেমনি গাধা, পুলিনটা তেমনি শয়তান !

সে সেণ্টারে রাঘব বোয়ালের দল ভোটার-লিষ্টের অভাবে আর বিশেষ কাজ করতে পারে না। রাঘব বোয়াল মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন, তখনই বলেছিলাম কেষ্ট, পুলিনের সংগে ঝগড়া করা উচিত হয়নি।

রাঘব বোয়ালের কথা যে কতখানি সত্যি তা আরও বেশী করে প্রমাণ হল এক 'মিল এরিয়ায়'। কেষ্ট সেখানে নিশ্চিন্ত হয়েছিল অন্ততঃ শতকরা আশীটা ভোট রাঘব বোয়াল পাবেই। সেই জন্যেই সেদিকে আজ কেষ্ট বিশেষ নজর দেয়নি। কিন্তু পরিদর্শনে এসে সে অবাক হয়ে গেল !

বিপিন বলল, সর্ব্বনাশ হয়েছে কেষ্টদা'।

—কি ব্যাপার ?

—এখানে কেউ ভোটই দিতে পারছে না।

—মানে ?

—কোথা থেকে এক দল লোক এসে দাঁড়িয়ে গেছে ! পালোয়ান চেহারা, ভীড় করে আছে। ভোট দিতে যাচ্ছেও না, কাউকে যেতেও দিচ্ছে না।

—এ আবার কি রসিকতা, পুলিশ কি করছে ?

—পুলিশ তো রয়েছে, ওরা বলছে, আমরা এদিককার লোক, সবাই হনুমানজীকে ভোট দেবো, নেতার জন্তে অপেক্ষা করছি।

বিরক্ত হয়ে কেষ্ট সেণ্টারের দিকে এগিয়ে যায়, কথা মিথ্যে নয়। এক দল লম্বা-চওড়া লোক গেটের সামনে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের অশ্লীল মন্তব্যে ও অভদ্র ব্যবহারে কেউ ত্রিসীমানায় যাচ্ছে না।

এক সময় বিপিন চুপি-চুপি বলে, খবর পেলাম কেষ্ট-দা', এ-ও না কি পুলিনের কাজ।

কেষ্ট চোখ তুলে তাকায়।

—ও জানত এখানে আমরা সব চেয়ে বেশী ভোট পাব। তাই হনুমান মার্কাদের দলে গিয়ে এই কাণ্ডটি করিয়েছে।

এর পর আর কেষ্টকে দেখা যায় নি। শুধু সেই দিন নয়, তার পরদিনও। এর মধ্যে কত জন অনন্তকেবিনে এসে কেষ্টর খোঁজ করেছে, নিকিকার আশু দা' বলেছেন, তার খবর জানি না ভাই !

কিন্তু পুলিশের লোক এসে যখন তার সন্ধান করলে, তিনি চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি বলুন তো ?

—গুণ্ডামীর চার্জ।

—কোথায় ?

—পুলিন মণ্ডল নামে একটি ছেলে থাকে এই পাড়ায়, চেনেন বোধ হয় ?

—চিনি বই কি।

তাকে ইলেকশানের দিন রাত্রিবেলা কারা রাস্তায় মেরে হাত-পা ভেঙ্গে দিয়েছে।

—কি সর্ব্বনাশ !

আশু দা' যদিও বিস্ময় প্রকাশ করলেন, কিন্তু তার মুখ দেখেই বোঝা গেল এ খবরটি তাঁর অজানা ছিল না।

—যাঁদের সন্দেহ হয় বলে পুলিন বাবু নাম দিয়েছেন, কেষ্ট দাস তাঁদের মধ্যে এক জন। পুলিশ ইন্সপেক্টর বলে যেতেই আশু বাবু দোকান থেকে বেরিয়ে কেষ্টর বাড়ীর দিকে গেলেন।

যথাসময়ে ট্যাকসী থেকে নেমে প্রভাত দরজার বেল টিপতেই, বেলারাণীর চাকর বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি ছায়ামঞ্চ থেকে আসছেন ?

—হ্যাঁ।

—ভেতরে আসুন। দরজা বন্ধ করে প্রভাতকে ভেতরের বৈঠকখানায় বসিয়ে দেয়। এ ঘর প্রভাতের অপরিচিত নয়, আগেও বেলারাণীর সংগে এইখানে এসে আলাপ করে গেছে। আসবাবপত্রের বাহুল্য না থাকলেও ঘরটি পরিষ্কার করে সাজান। প্রভাত কাগজপত্র বার করে নেড়ে চেড়ে দেখে। জানে, বেলারাণীর নামতে যথারীতি আধ ঘণ্টা দেরী হবে। ইতিমধ্যে চাকরটি চা দিয়ে গেল।

অন্য দিনের চেয়ে আজ বেলারাণী একটু আগেই নামে। একমুখ হেসে হাত তুলে নমস্কার করে বলে, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, সেজন্যে মাপ করবেন।

প্রভাত উঠে দাঁড়িয়েছিল, বললে না না, আজ আপনি মোটেই বেশী সময় নেন নি। তার ওপর আপনার ভৃত্যটি অতিথি সৎকারে বেশ পটু।

—সে আমার ভাগ্য।

কিছুক্ষণ টুকরো আলোচনার পর প্রভাত আসল কথা পাড়ে, আপনি আমাদের আগের সংখ্যা দুটো পেয়েছেন নিশ্চয় ?

—হ্যাঁ পেয়েছি।

—বিশিষ্ট তারকারা প্রশ্নোত্তর দিয়েছেন, দেখেছেন বোধ হয় ?

—বেশ সুন্দর হয়েছে, ওঁরা কি নিজেরাই—

—পাগল হয়েছেন, সব আমার লেখা। এবার আপনার নামে প্রশ্নোত্তরগুলো যাবে।

—লিখে এনেছেন, দেখি ?

প্রভাত কয়েকটি কাগজ এগিয়ে দেয়, বেলারাণী ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে বলে, প্রশ্নগুলি তো বেশ ইণ্টারেষ্টিং, আপনার কাগজের পাঠকরা দেখছি—প্রভাত হেসে বাধা দেয়, এ প্রশ্ন সবই আমার, পাঠকরা কি আর এত বুদ্ধিমান ?

—তার মানে, ওরা কি কোন প্রশ্নই করে না ?

—করে, তবে আমরা তার কোন উত্তর দিই না। উপরে লেখা থাকে দেখবেন, আমাদের কাছে এত চিঠি এসেছে যে, সব ক'টির উত্তর দেওয়া সম্ভব হল না।

—এতগুলো নাম-ঠিকানা দিয়েছেন—

—এ কি কম মেহনতের কাজ, এমন ঠিকানা দিতে হবে যাতে না কেউ পরে গোলমাল করে।

বেলারাণী হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়ে, এটি বড় সুন্দর লিখেছেন, প্রশ্ন···আপনি মাথায় কি তেল মাখেন ? উত্তর···জবাকুসুম, মহাভৃঙ্গরাজ, ক্যাষ্টর অয়েল মিশিয়ে তাতে তিন ফোঁটা ইভনিং ইন প্যারিস দিই।

—কোন পাঠিকা এটি পরীক্ষা করে দেখলে কি হবে জানি না !

বেলারাণী হেসে বলে, আমার যে বব্ চুল তা কি তারা খবর রাখে না ভাবেন ? প্রভাত কথার মোড় ফেরায়, নীচের দিকে মিষ্টি খাওয়ার প্রশ্নটি দেখুন, বেলারাণী পড়ে, প্রশ্ন···রসগোল্লা না সন্দেশ, কি খেতে ভালবাসেন ? উত্তর···পরীক্ষার খাতায় সন্দেশ, তবে কেউ পাঠালে রসগোল্লা পছন্দ করি। সত্যি কিন্তু প্রভাত বাবু আমি রসগোল্লা খেতে ভালবাসি।

এ ধরণের প্রশ্নোত্তর নিয়ে হাসাহাসি চলে। প্রভাত একসময় জিজ্ঞেস করে, আপনার যে প্রডিউসার হবার কথা ছিল, কদ্দূর এগুলো ?

—এখনও পাকাপাকি হয়নি।

—হলে আমায় মনে রাখবেন কিন্তু।

—সে আর বলতে হবে না, বইটি তুললেই আপনাকে দিয়ে সিনেরিও লেখাবো। নতুন কিছু লিখেছেন নাকি ?

—একটা বড় উপন্যাস।

—কি নাম ?

—মধুবালা।

বেলারাণী কপট রাগের ভাণ করে বলে, মধুবালার জীবনী বেশী ইণ্টারেষ্টিং হল বুঝি ?

—কি মুস্কিল, জীবনী কেন হবে! নায়িকার নাম মধুবালা। বুঝছেন না, যাতে বই বিক্রী হয়।

—বেলারাণী নাম দিলে তো বই বিক্রী হত না !

প্রভাত অপ্রতিভ হবার ছেলে মোটেই নয়, বলে আপনার কি শুধু নামটাই দেব, পুরো জীবনী দিয়ে বই লিখব।

—আমাকে খুসী করার চেষ্টা করছেন বুঝি ?

—বাঃ, ইংরাজীতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনীর উপর কত সুন্দর সুন্দর বই আছে, আমাদের দেশেই বা তা হবে না কেন ?

—পরে এক দিন আপনার সংগে এ নিয়ে আলোচনা করব।

—কবে বলুন ?

—বললাম তো, এক দিন।

প্রভাত আর এ প্রসঙ্গের জের টানে না। বলে, এক কপি ছবি দিন, এ মাসের কভারে দেব।

—সে আবার কি, দুটো ছবি তো পোষ্টে পাঠিয়েছি।

—পুরোন ছবি না, আপনার বিশেষ ভঙ্গিমায় তোলা।

প্রভাতের দিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে বেলারাণী হেসে বলে, আপনি ভারী দুষ্টু, শেষ পর্যন্ত না নিয়ে ছাড়বেন না দেখছি।

বেলারাণী উঠে গিয়ে দেরাজ থেকে ছবি বার করে প্রভাতের হাতে দেয়। ইংরাজী নায়িকার অনুকরণে লোল কটাক্ষ ভরা, শ্লথ ভঙ্গিমার ছবি।

প্রভাত তারিফ করে বলে, বাঃ, বেশ সুন্দর উঠেছে তো ! কে তুলেছে ?

—কেন, পিনাকী। ওই তো আমার সব ছবি তোলে।

প্রভাত উঠতে উঠতে বলে, না এবারের পত্রিকা পাঁচশো কপি ছাপাতে হবে দেখছি। নমস্কার-বিনিময়ের পর প্রভাত যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন প্রায় এগারোটা বেজে গেছে।

আশু বাবু কেষ্টদের বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়তে ভেতর থেকে চীৎকার করে তার দাদা জিজ্ঞেস করেন, কে কড়া নাড়ে ?

—আমি আশু, অনন্ত কেবিন থেকে আসছি।

—কা'কে চাই ?

—কেষ্ট বাড়ী আছে ?

—নেই।

একটু চুপ করে থেকে আশু বাবু বলেন, বিশেষ দরকার আছে, দরজাটা একবার খুলুন না।

কেষ্টর দাদা একপাটি দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে উত্তর দেয়, আমি সব জানি। পুলিশে হুলিয়া দিয়েছে, কোথায় কা'কে খুন করে এসেছে।

—আহা খুন করবে কেন, সব পুলিন মণ্ডলের বদমাইশি।

—আপনারাই কেষ্টর মাথাটা খেয়েছেন, একটা খুনেকে নিয়ে বাড়ীতে বাস করা !

—তার দিকটা এক বার ভাবুন, বেচারী বিপদে পড়েছে। এ সময় আমাদের সকলের উচিত—

—উচিত ঘণ্টা, ও সব বাঁদরদের জেলে যাওয়াই ভাল। আমি পুলিশের লোকদের সাফ সাফ বলে দিয়েছি, দু'দিন ওর পাত্তা নেই—

আশু বাবু বিড়বিড় করে বলেন, জানি না ভাল করলেন কি না—

—ভাল-মন্দ আমাকে শেখাতে হবে না। বলে কেষ্টর দাদা দড়াম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়।

আশু বাবু ফিরে আসছিলেন, মোড়ের মাথায় কেষ্টর সংগে দেখা। দিব্যি টেরী কেটে হাসতে হাসতে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসে, কি আশুদা', এদিকে হঠাৎ ?

—তোমার বাড়ীতে গিয়েছিলাম।

—দাদা খুব ক্ষেপে আছে নিশ্চয় ?

—ক্ষেপে মানে, পারলে আমাকেই বোধ হয় জেলে পাঠিয়ে দিতেন।

কেষ্ট তাচ্ছিল্য ভরে বলে, ও একটা পাগল ! আপনার দোকানে যাওয়া যাক, বড্ড খিদে পেয়েছে, চলতে চলতে আশুদা' বলেন, থানা থেকে লোক এসেছিল।

—জানি।

—কি হবে ?

—কি আবার হবে ? একদিন ধরে নিয়ে যাবে, আপনারা গিয়ে জামিনে খালাস করে আনবেন।

—তার পর ?

—কিছুই নয়, প্রমাণ অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

—কিন্তু পুলিন ?

—ও আর কারো সংগে শয়তানী করতে পারবে না, জন্মের মত শিক্ষা হয়ে গেল।

দোকানের কাছে এসে কেষ্ট মত বদলায়, চলুন অন্য কোথাও যাই।

—কেন ?

—আপনার দোকানে অনেক লোক, সবাই-এর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে আর ভাল লাগছে না।

কেষ্ট আশু বাবুকে নিয়ে অন্য রাস্তা ধরে। বড় রাস্তা পেরুতেই আশু বাবু বললেন, অন্য কোন দোকানে যাবে ! বরং আমার বাড়ী চল।

আশু বাবুর বাড়ী কাছেই, সেখানে পৌছতে দেরী হয় না। বাইরের বৈঠকখানায় কেষ্টকে বসিয়ে আশু বাবু ভিতরে চলে যান। কেষ্ট ডেকচেয়ারে বসে সিগারেট ধরায়, আপনা হতেই চোখ বুজে আসে। আশু বাবু ফিরে এসে কেষ্টর দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলেন, তোমায় বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কাল কোথায় ছিলে ?

—এক বন্ধুর বাড়ী।

—সারা দিন তোমায় দেখিনি ?

—রুগীর সেবা করতে গিয়েছিলাম।

—কোথায় ?

—টালীগঞ্জ।

—কার অসুখ ?

—গৌরীর ভাইএর।

—গৌরী কে ?

—আপনি চেনেন না। একটু হেসে বলে, ছেলেটা বাঁচবে না।

—কি হয়েছে ?

—বোধ হয় যক্ষ্মা।

—আহা! একটু পরে বলেন, খাবার আনতে বড় দেরী করছে, তুমি বস, আমি নিয়ে আসি।

কেষ্ট সতৃষ্ণ নয়নে বলে, আশুদা', গরম চা।

খাবার আনতে বেশী দেরী হয় না, চা করতে আর নিমকি ভাজতে যেটুকু সময় লাগে, আশু বাবু ফিরে এসে দেখেন কেষ্ট ঘুমিয়ে পড়েছে। জাগাতে মায়া হ'ল, ছেলেকে ফিস্ ফিস্ করে বলে গেলেন, আমি দোকানে যাচ্ছি, কেষ্ট উঠলে ভাল করে চা খাবার খাইয়ে দিস্।

ঘুম থেকে উঠেই শ্যামল শোনে মামা চেঁচামেচি করছেন, তাঁর জামার পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট চুরি গেছে। শ্যামল চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে ঘরে ঢোকে, কি হয়েছে মামা ?

জগৎ বাবু ঝাঁঝের সংগে বললে, ভূতের রাজত্ব, কাল রাত্রে আমার পকেটে পাঁচ টাকা ছিল, আজ একটা পয়সা নেই। পাখা গজিয়ে উড়ে গেল নাকি ?

—এত আশ্চর্য্য কথা মাসীমা, সব জায়গা দেখা হয়েছে ?

মাসীমা বললেন, সব জায়গা তো খোঁজা হ'ল। ছোটদা' কাল অন্য কোথাও ফেলে আসনি তো ?

জগৎ বাবু আরও রেগে যান, তোমাদের ওই এক কথা, কিছু হারালে আমিই নিশ্চয় কোথাও ফেলে এসেছি। কেন, আমার কি মাথার ঠিক থাকে না, মাতাল হয়ে—?

শ্যামল জগৎ বাবুর পক্ষ নিয়ে বলেন, এ কথা ঠিক মাসীমা, বাড়ীতে প্রায়ই এটা-ওটা চুরি যাচ্ছে। এই তো ক'দিন আগে বাবা স্কুলের মাইনে দিয়ে গেলেন, তার মধ্যে দু' টাকা পেলাম না। নিশ্চয় কেউ আমার পকেট থেকে তুলে নিয়েছে।

—আগে বলিস নি তো ?

—বলে কি হবে ? মিছিমিছি গোলমালের সৃষ্টি, যে নিয়েছে সে তো ফেরৎ দেবে না ?

জগৎ বাবু জোর দিয়ে বলেন, আমি নিশ্চয় করে বলছি, এ-সব ওই হতভাগা নটবরটার কাজ।

মাসীমা আস্তে আস্তে বলেন, নতুন লোক তো নয়, বেশ কিছু দিন কাজ করছে—

—ওরা সব পারে, আজ-কাল একটা বিশ্বাসী লোক পাবে না।

শ্যামলকে ডেকে বললেন, আমি দরকারী কাজে বেরুচ্ছি, তুই ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ, সন্দেহ হলেই দিবি বেটাকে তাড়িয়ে।

জগৎ বাবু চলে গেলে মাসীমা বললেন, শ্যামল, কাজটা কি ঠিক হবে ? মিছিমিছি একটা লোককে সন্দেহ করা—

—মামা যখন বলে গেলেন, একবার ওর বাক্স-প্যাটরাগুলো দেখা উচিত, নয়ত ফিরে এসে আমাদের ওপর চটে যাবেন।

শ্যামল যখন নীচে গিয়ে নটবরকে বাক্স-বিছানা খুলে দেখাতে বলে, সে প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়ে যায়, বাবু এই কথা বলে গেলেন!

—আমি কি তবে মিথ্যে বলছি! সাধু সাজতে হবে না, বাক্স খোল।

কথামত নটবর বাক্স খুলে দেয়। শ্যামল জিনিসপত্তর নেড়েচেড়ে দেখে, এ নতুন কাপড় কোথায় পেলে ?

—পুজোর সময় মাসীমা দিয়েছিলেন।

—মাথার তেল, সাবান, এসব কেন ?

—দেশে পাঠাব, গাঁয়ের লোক কাল যাবে।

—কেনবার টাকা পেলি কোথায় ?

নটবর বিরক্ত হয়ে বলে, আপনারা কি মাইনে দেন না ?

—এঃ, খুব যে মুখের উপর কথা বলতে শিখেছিস, দাঁড়া, বাবু আসুক বাড়ীতে।

জগৎ বাবু ফিরে আসার জন্তে আর অপেক্ষা করতে হয় না। নটবর সোজা মাসীমার কাছে গিয়ে বলে, আমার মাইনে চুকিয়ে ছুটি দিন মা!

মাসীমা ঠাণ্ডা গলায় বলেন, বাবু আসুন।

আমি এ-বাড়ীতে কাজ করব না। এত দিন রয়েছি একটা জিনিষের এদিক-ওদিক হয়নি, আর আজ আমাকে এক কথায় চোর বললেন।

আর কিছু না বলে নটবর সেখান থেকে হন্ হন্ করে চলে যায়। মাসীমার কাছে সব শুনে শ্যামল বললে, তবে ও-ব্যাটা নিশ্চয় চোর, এক কথায় যখন কাজ ছেড়ে পালাল—

—কি জানি বাবা, লোকটা তো কখনও খারাপ ছিল না?

—বুদ্ধি দেবার লোক জুটেছে বোধ হয়।

শ্যামল আর কথা না বাড়িয়ে জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। মদনদের পাড়ায় আসতে তার বেশী সময় লাগে না, ট্রাম থেকে নেমে দু' মিনিটের হাঁটা পথ। গলির মোড়ে ফুটপাথের ওপর বসে মদনরা আড্ডা মারছিল, শ্যামলকে দেখে হাঁক দেয়,—এই শ্যামল, এ দিকে—

শ্যামল ওদের মধ্যে গিয়ে বসে, সকলেই প্রায় তার পরিচিত। এখানে এসে কত দিন সে আড্ডা মেরে গেছে, মদন এর নাম দিয়েছে আড্ড-সঙ্ঘ। নামকরণ যে খুবই সঙ্গত হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিন তলা বাড়ীর নীচে বড় ফুটপাথ, তারই একাংশ আড্ডাসঙ্ঘের আসর বসে। এক তলায় রেশন আফিসের গুদাম বলে সারাক্ষণই ফুটপাথে দু'-তিনটে ঠেলা গাড়ী থাকে। প্রয়োজন মত ছেলেরা ঠেলাগাড়ীর মাটি ছোঁয়া অংশটায় বসে, কেউ বা তার পাশের পাথরটায়, কখনও ফুটপাথেই কাগজ পেতে। সামনেই পানের দোকান। বড় বাড়ীর নীচে বলে অনেকক্ষণ ছায়া থাকে। প্রথম দিন এসে শ্যামল তারিফ করে বলেছিল, বাঃ বেশ খাসা জায়গা! কারুর বাড়ী নয়, দোকান নয়, সরকারী ফুটপাথ, যে কেউ এসে আড্ডা দিতে পারে, কারো কিছু বলার নেই।

মদন হেসে বলেছিল, শুধু এই, সামনের বাড়ীটা দেখেছিস? ছোট বারান্দা, ওখানে যা আছে—

—কি রে, কি? শ্যামল চারি দিকে তাকায়।

—চিড়িয়া।

—মাইরি?

—এক উকিল থাকে, তাঁর পাঁচ মেয়ে। বড় দু'জনের বিয়ে হয়ে গেছে। সেজ মেয়েটির সংগে আমাদের মন্টুদা—

মন্টুদা শ্যামলের অচেনা নয়। মদনের সংগে অনেক বার দেখেছে, সুন্দর চেহারা। ফর্সা রং, টানা ভুরু, গানও বেশ ভাল করে, বিশেষ করে সিনেমার গান।

প্রথম দিন মদনের কথা শুনে শ্যামল খুব অবাক হয়েছিল। এ বিষয়ে আরও শোনার জন্মে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে গা-সওয়া হয়ে গেছে। কত দিন দেখেছে মন্টুদা এই আড্ডা-সঙ্ঘে বসে গান গায় আর মেয়েটি বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। শ্যামলের প্রথম প্রথম চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা করত। পরে দেখেছিলো, মেয়েটি ডানাকাটা পরী কিছু নয়, সাধারণ মেয়েই। বয়স ছাড়া আর কিছু আকর্ষণীয় আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মন্টুদা যে মেয়েটির জন্মে পাগল এ বিষয়ে কারুর সন্দেহ নেই। আজও সবাইকে বলছিল, আমার মনের কথা তোমরা বুঝবে না ভাই!

ভোঁদা উৎসাহ দিয়ে বলে, যা হোক হেস্ত-নেস্ত কিছু করে ফেলুন, মন্টুদা, আমরা আপনার পেছনে ঠিক আছি।

—এ সব ব্যাপারে গায়ের জোর চলে না যে ভাই!

—নন্দিতার বাবাকে একটা চিঠি লিখেই দেখুন না।

মন্টুদা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, কোন লাভ নেই, হেমন্ত বাবু আমাকে দু চোখে দেখতে পারেন না। ওনাকেই বা দোষ দেব কি, পাত্র হিসেবে আমি সত্যিই তাঁর মেয়ের যোগ্য নই।

—কেন, অযোগ্য কিসের? ক'টা ছেলে আপনার মত গান করতে পারে,?

মদন যেই ধরে, আর এমন রোমিও মার্কা চেহারাই বা কোথায় পাবে? ওঁর বড় জামাইটি তো একটি হোঁদল কুৎকুৎ।

—আপনি তো অন্যদের মত ভ্যাগাবণ্ড নন, রীতিমত দশটা পাঁচটা অফিস করেন।

মন্টুদা উঠে পড়ে, কেরাণীর আবার আফিস, চলি ভাই।

ভোঁদা চট্ করে হাত বাড়িয়ে দেয় সিগারেটের প্যাকেটটা দিয়ে যান মন্টুদা।

মন্টুদা সিগারেট, দেশলাই দুটোই ওর হাতে দিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ীর দিকে চলে যায়।

শ্যামল প্রথম কথা বলে, পাগলা!

ভোঁদা সিগারেট ধরিয়ে বলে, যাই বল খাঁটি প্রেমিক, ভেজাল নেই।

মদন হাই তোলে, আজ কিন্তু তেমন জমলো না। এমন ছুটির দিনে না মন্টুদার দু'-একটা কড়া গান, না সামনের বাড়ীর নীল শাড়ী।

শ্যামল জিজ্ঞেস করে, মদন, বেরুবি নাকি?

—চল।

দু'জনে উঠে পড়ে। চলতে চলতে কেষ্টর বিষয়ে আলোচনা হয়। মদন জিজ্ঞেস করে,—কেষ্টদা'কে থানায় ধরে নিয়ে গেল?

—সে তো, চব্বিশ ঘণ্টার জন্মে, আশুদা' গিয়ে জামিনে খালাস করে এনেছে।

—কোর্টে কেস হবে তো?

—হবে, কিন্তু প্রমাণ পাবে না। সেদিন যাদের সংগে ছিল রাতে, তারা সাক্ষী দেবে।

—আমার সংগে কবে আলাপ করিয়ে দিবি?

—সেই কথাই বলতে এলাম, তোকে নিয়ে টালীগঞ্জের বস্তীতে যেতে বলেছে।

—কেন, সেখানে কি হবে?

—কেষ্টদার' ব্যাপার কি বোঝা যায়, বলল কে এক জন মর-মর, হয়তো শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে। নিশ্চয় কোন দাঁও মারবে।

মদন হঠাৎ বলে, সে দোকানদারটা আবার এসেছিল। ওকে টাকা না দিলে চলবে না, বলছে বাড়ীতে বলে দেবে।

শ্যামল পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট বার করে মদনের হাতে দেয়।

—কোথায় পেলি?

—মামার পকেট থেকে।

—সাবাস, আজ না পেলে মুস্কিলে হত। চল, বুড়োকে আগে টাকাটা দিয়ে আসি।

[ক্রমশঃ।

ব্যক্তিত্বে রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীঅজয়েন্দুনারায়ণ রায়

২

এবার কলকাতায় পড়বার পালা। উপেন্দ্র বাবু—রামের ছোট বাবা বললেন—ঐ ছেলেকে ছেড়ে একা আমি থাকতে পারবো না। আমরা সপরিবারে গিয়ে রামকে পাশ করিয়ে তবে আনবো। শুনতে পেয়ে রামের শ্বশুর রাজা ডেকে বললেন উপেন্দ্র বাবুকে, তোমাদের বিষয় দেখবে কে? তোমাদের ধার আছে শোধ দেবে কে? তোমার যাওয়া হবে না। ছেলেকে ভর্তি ক'রে দিয়ে এসো—রাজার কথা বাবুদের কাছে বেদবাক্য।

তখন রাজা দু'খানা পাল্কী ক'রে দিয়ে সাঁইথিয়া পাঠিয়ে দিলেন। তখন কলকাতা যাওয়া সোজা ছিল না। যেতে হলে সাঁইথিয়া ছাড়া ট্রেণ নাই। রামেন্দ্র বাবু উঠলেন গিয়ে কলকাতায়। যে ছেলে অজ পাড়াগাঁ থেকে প্রথম হয়ে আসচে কলকাতায়, তাঁকে দেখবার জন্য ভীড় ক'রে এলো ভাল ভাল ছাত্র। অবিনাশ বাবু বললেন—হা রে! তুই মফঃস্বলের ছেলে হয়ে আমাদের মুখে চুণ-কালি দিলি! জানকী বাবুও ঐ ধরণের ঠাট্টা করেন। উপেন্দ্র বাবুর এই সব কথা শুনে আনন্দ ধরে না। রাম ঝোঁক ধরলো আমি বিদ্যাসাগরের আশীর্ব্বাদ না নিয়ে কলেজে ভর্তি হবো না। তখন উপেন্দ্র বাবু বললেন—এ কথার উত্তর দিতে পারবো না। এ আমাদের বংশের ছেলেরই কথা। আমার সাথে একটু পরিচয় ছিল বটে, তবে হয় তো চিনতেই পারবেন না।

এক দিন বেলা আটটার সময় বিদ্যাসাগরের কাছে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি নানা কাজে ব্যস্ত। ছেলে আর তার কাকাকে দেখেই চিনতে পারলেন। আমাকে কী চিনতে পেরেছেন? বলতেই উত্তর দিলেন—আমি ত আপনাদের মত জমিদার নই; এক বার দেখলে আমাদের ভুল হয় না। রামেন্দ্রের পরিচয় শুনে খুশী ধরে না বিদ্যাসাগরের। তিনি বললেন—আমার নিজেরই একরকম প্রতিষ্ঠা করা কান্দীর ইস্কুল। জানো রাম? তোমার বাবা কাকার পরীক্ষা নিয়েছি আমি নিজে। তোমার দাদুর সাথে আমার পরিচয় ছিল। তোমাদের বাড়ী গিয়েছি, খেয়ে এসেছি। তোমার বাবা কাকারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে জানেন। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি রাম, তুমি মানুষ হও।

রাম তখন বিদ্যাসাগরের পায়ের ধুলো নিয়ে ভাব-গদগদ ভাবে আশীর্ব্বাদ চাইলে তখন বিদ্যাসাগর মাথায় হাত দিয়ে বললেন—তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, মনে রাখবে কখনও শাসকের অধীনে কোন কাজ নেবে না। শুনে রামের মন ভরে উঠলো। যেন কে রামের আত্মায় সাড়া দিলো। মনে হলো রামের, হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ দেখে এলাম। খুব খুশী হয়ে বাড়ী এলো।

প্রথম কলেজে যেয়ে খুব ইংরাজি দর্শন পড়তে লাগলেন রাম বাবু। এতো পড়া তার কথা নাই। রাত দুটো বেজে গেছে খেয়াল নাই। তার বন্ধুরা এসে বলতেন—রাম, তুই নিজের পরীক্ষার পড়া পড়বি কখন? রাম উত্তর দিতেন—তা দিন কতক দেখে নিলেই হবে। তখন সহপাঠীর দল মনে করতেন—হবেও বা তাই। রাম ত অসাধারণ বুদ্ধিমান। কিন্তু সে বার রাম দ্বিতীয় হয়ে গেল। অনেক দিন পর রামের মনে পড়লো বাবার কথা। তাঁর কাছে কী কথা বলেছিলেন তাও মনে পড়লো। তখন থেকে আরম্ভ করলেন বিজ্ঞান পড়তে। তখন দর্শনশাস্ত্র আর খুলেও দেখেন না। প্রথম হয়ে সে বার পাশ করলেন। তাঁর কাগজ দেখে তাঁদের পরীক্ষক পেডলার সাহেব এতো খুশী হলেন বলার না। তিনি বলেছিলেন, আমি এ পর্য্যন্ত যত রসায়নের কাগজ দেখেছি তার মধ্যে এইখানি out of the way the best." কিছুক্ষণ পরে আবার দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছিলেন out of the way the best. তিনিই বললেন রামকে—তুমি এম এ, ও প্রেমচাঁদ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও।

এম-এ পরীক্ষায়ও প্রথম হয়ে পাশ করলেন। তার পর প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দেবার সময় রাম বাবুর পড়া দেখে সকল ছেলেই হতবুদ্ধি। সমস্ত রাত কেটে যাচ্ছে, ঘুম নাই। সহপাঠীরা বলে—এতো পড়লে মাথা খারাপ হ'য়ে যাবে যে রাম। কে শোনে সে কথা—রাম বলে আমাকে অবিনাশের মত ছেলেদের সাথে পরীক্ষা দিতে হবে মনে রেখো। কিছুদিন পর দেখা গেল ছেলেদের কথাই ঠিক হলো। রাম বাবুর মাথার দোষ হলো। একটু পড়তে গেলেই অজ্ঞান হ'য়ে যান। ডাক্তাররা এসে বললেন তোমাকে এখন বিশ্রাম নিতে হ'বে। চার মাস শুয়ে থাকতে হলো রাম বাবুকে ঠিক পরীক্ষা দেবার আগেই। তখন তিনি বাড়ীতে লিখলেন—আমি এবার পরীক্ষা দিতে পারবো না। শুনে শ্বশুর লিখে পাঠালেন—তুমি পাশ না করতে পারলেও পরীক্ষা দাও।

কী করেন? অগত্যা পরীক্ষা দিতে গেলেন। দুটো প্রশ্ন মাত্র লিখে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন পরীক্ষা-গৃহেই। ব'লতে লাগলেন—আমি পাশ ক'রতে পারবো না। কেন শ্বশুরমশায় আমাকে জেদ ক'রে পাঠালেন। দুঃখে রাম বাবু বিছানায় গা ঢালা দিলেন। প্রফেসার এসে জানিয়ে যান—অভরসা পাবার মত তুমি লেখনি। তুমি ওঠো কথা কও। ভাল লাগছে না সে-কথা তাঁর; মনে করেন—আমাকে স্তোক দেবার জন্য বলচেন। পরে পেডলার সাহেব এসে যখন প্রকৃত সংবাদ দিলেন তখন রাম উঠে বসলেন। সাহেব বললেন—তোমার মত লেখা কখনও কোন ছেলের আজ পর্য্যন্ত চোখে পড়েনি আমার। তুমি যেটার উত্তর না দিয়েছি মনে করে লিখেছো সেটার উত্তর আরও চমৎকার হয়েছে। তুমি বাড়ীতে খবর দাও, আট হাজার টাকার পুরস্কার পেয়েচো প্রেমচাঁদে প্রথম হ'য়ে পাশ করেচো।

তৎক্ষণাৎ রামেন্দ্র বাবু তার করলেন বাড়ীতে—আমি ও অবিনাশ পাশ করেচি প্রথম হয়েই। দুজনেই বৃত্তি পেয়েচি আট হাজার ক'রে।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ইংরাজী জানতেন না। তাঁর কাছারিতে সামান্য রকম ইংরাজী-জানা কর্ম্মচারী একজন ছিলেন। তিনি প'ড়ে

বললেন—রাম ফেল ক'রেচে। অবিনাশ পাশ করেচে। শুনেই রাজা মর্ম্মাহত হ'লেন। কী ভুলই করেচি জামাইকে পরীক্ষা দেবার অনুমতি দিয়ে!

এমন সময় বসন্ত বাবু—রাম বাবুর পিসেমশায় কান্দী ইংরাজী ইস্কুল থেকে এসে উপস্থিত। তিনি তার না দেখেই বললেন—গাধাটাকে ডাকো ত', টেলিগ্রাম ক'রে কেও ফেলের খবর দেয়! তার পর বললেন—রাম অবিনাশ দু'জনেই পাশ করেচে। দু'জনেই আট হাজার টাকা ক'রে বৃত্তি পেয়েচে।

তখন রাজবাড়ীতে ধূম দেখে কে। জেমো-কান্দীতে এমন লোক ছিলেন না যিনি ঠাকুরদের প্রসাদ না পেয়েচেন।

প্রেমচাঁদ পরীক্ষার পর লিখেচেন আলেকজাণ্ডার পেডলার—চার জন ছেলে প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে দু'জন বৃত্তি পেয়ে প্রথম হয়েচে। তার মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর এমন সুন্দর রসায়ন শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়েচে, এমন খাতা আর কোন ছাত্রের এ যাবৎ আমার চোখে পড়েনি।

পাশ করেই দু' বছর বেতন না নিয়েই প্রেসিডেন্সি কলেজের যন্ত্রাগারের কাজ করেছিলেন।

বি-এ পড়বার সময় রামেন্দ্রসুন্দরের পুত্রসন্তান হয়। বহু আত্মীয়-স্বজনে সর্ব্বদা কোলে নিয়ে থাকতো ব'লে লজ্জায় তিনি ছেলেকে নিতে পারতেন না। রাত্রে থাকতো পদ্মমার কাছে ছেলে, তখনও নেওয়া সম্ভব হত না রামেন্দ্রসুন্দরের। কিছু দিন পরেই ছেলে মারা গেল। তখন দুঃখ করতে দেখেছেন অনেকে। ছেলে হাত বাড়িয়ে কত সময় আসতে চেয়েচে আমার কাছে। আমি নিইনি কেবল লজ্জায়! আজ আমার সেই ছেলে হারালাম। আর হয়তো আমার পুত্র সন্তান হবেও না। আশ্চর্য্য কথা ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের। যে কথা বের হ'তো তাঁর মুখ থেকে তা' ঠিকই হ'তো। আর পুত্র সন্তান হয়নি তাঁর।

পাশ ও অবৈতনিক কাজ করার পরই দু'বছর গৃহকর্ম্ম দেখতে ব্যস্ত ছিলেন। প্রথম দেখলেন কর্ত্তাবাবার একটা উইল প্রবেট নেওয়া হয়নি। সম্পত্তির অনেক টাকা ধার। আরও অনেক কাজ পড়ে রয়েচে। নিজের ও খুড়তুতো ভাইরা নাবালক সব একত্রে আছে। কয়েক জন রামেন্দ্রের বন্ধু বললেন—তোমার নিজের পাওনা টাকা একত্রমালি ধরে শুধচো কেন? তখন তিনি তাঁদের দিকে চেয়ে বললেন—চিনে রাখলাম আপনাদেরকে।

১২৯৮ সাল, রামেন্দ্রের শ্বশুর মারা গেলেন। শোকে মুহ্যমান হয়ে বাড়ীতে কিছু দিন থাকলেন। অনেকে এসে বলতে লাগলেন—সব বোঝ তুমি জ্ঞানী। তোমার মত ছেলে কখনও কাঁদে? তখনিই উত্তর দিয়েচেন—আমার বোধ আছে ব'লেই ত কাঁদচি। কোন পশু-পক্ষীকে কাঁদতে দেখেচো? আমি ত ছার রাম! ত্রেতা: কালের অবতারকে কাঁদতে শোনোনি। উইল মত কতক সম্পত্তি তিনকড়ি দেবীকে দিয়ে ব্রজসুন্দরের নির্দেশ মত দেবোত্তর ক'রে দিলেন বিষয়। ঋণপত্র শোধ দিলেন নিজের পরীক্ষার পাওয়া টাকা হ'তেই।

ডাক প'ড়লো রামেন্দ্রসুন্দরের ভগিনীপতিদের তরফ হ'তে। চার ভগিনী আছে জেমো রাজবাড়ীতে। ভগিনীপতিরাও প্রায় তাঁর সমবয়স্ক। পিতৃহীন হয়ে বিভাগ করতে চান রামেন্দ্র বাবুকে সামনে রেখে।
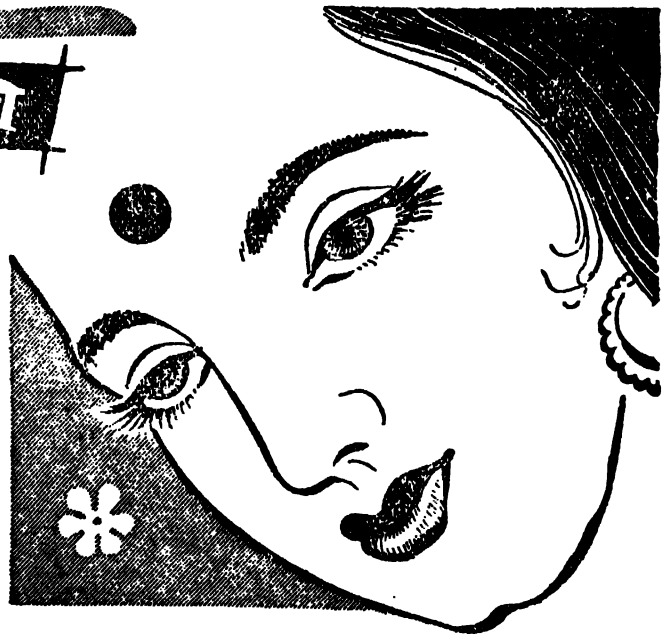
রাজা রামেন্দ্রসুন্দরের কতো উপকারী ছিলেন ভেবে তিনি ভার গ্রহণ করলেন। দিন নাই রাত্রি নাই সর্ব্বদা রামেন্দ্রসুন্দর তৎপর বিষয় কাজে। তাঁর কোমরে বড় বড় চাবি আয়রণ সেফের ও সিন্দুকের। রামেন্দ্র বাবু তখন বলতেন প্রায়ই, তোমাদেরই জন্যে আমাকে এই বোঝা টানতে হচ্ছে। বিভাগের বিষয়ে ডাক পড়তেই রামেন্দ্রবাবু হাজির। খুব লক্ষ্য রাখেন যেন কোন বিষয়ে কারও একটু অন্যায় না হয়।

হঠাৎ একদিন সেফ খুলে দেখেন, একটা ড্রয়ারে সোনার চাঁদির জিনিষে বোঝাই। তখন ভগিনীপতিরা বললেন—রাম বাবু! দেখছো না আজ টুপি ভাগ হচ্ছে, এটা শেষ হ'তে দাও। ওটা আর এক দিন হলেই হ'বে। সেদিন সোনা-চাঁদি ভাগ করা হ'লো না।

কী করেন আবার আর এক দিন আসতে হ'লো রামেন্দ্র বাবুকে সোনা-চাঁদির ভাগের জন্য। এসে দেখেন, সোনা-চাঁদির জিনিষ নামমাত্র পড়ে রয়েছে। তখন দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ফুল ভগিনীপতি বললেন—ব্যাপার কী রাম বাবু? রামেন্দ্রসুন্দর উত্তরে বললেন—তাই ত দেখছি ফুল হুজুর। তখন অন্য ভগিনীপতিরা বললেন—রাম বাবুর কাছে চাবি আছে, আমরা কী চুরি করতে গিয়েছি? হাজার মানা করলেও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বললেন হাস্য করে।—আমি কি বুঝি না রাম বাবু! আমার সাথে একটা তোমার ভগিনীর বিয়ে দিলেও আমার শরিকদের বাড়ীতে আর তিন বোনের বিয়ে দিয়েছো।

হাজার ঠাট্টা করে বললেও রামেন্দ্র বাবুর চৈতন্য হলো। এতো ব'লে-কয়েও আর রামেন্দ্র বাবুকে চাবি নেওয়া করাতে পারেন নি। তাঁর সেই এক কথা—আমি নিজেকে কখন ফাঁকি দিতে পারি না। রহস্যচ্ছলে ফুল হুজুর যা ব'লেছেন, মিথ্যা না। আমিই দেখতে গেলে চুরি ক'রেছি।

তার পর দরখাস্ত ক'রলেন গভর্ণমেণ্ট এডুকেশনাল বিভাগে একটা চাকরী করবার জন্য। মাহিনাও বেশী সংবাদ পেয়েছেন। ডিরেক্টারের নিকট দরখাস্ত দিয়ে আহ্বান পেয়েছেন ইণ্টারভিউ-এর জন্য। এমন সময় পিয়ন এসে হাত পেতে বকশিস চাইলো। অবাক হয়ে রামেন্দ্র বাবু প্রশ্ন করলেন—কেন? উত্তরে দারোয়ান বললো—গভর্ণমেণ্টের ঘরে যেতে হ'লে দিতে হয়।

তখনই মনে পড়ে গেল বিদ্যাসাগরের কথা। উঠে বললেন—সাহেবের ডাক পড়লে বলবে, তিনি আপনাদের দেওয়া কাজ নেবেন না। দারোয়ান তাকিয়ে দেখলো লোকটিকে। পাঁচ-ছয় শত টাকার চাকরী ছেড়ে যায় সেই মানুষটিকে।

রামেন্দ্র বাবু প্রায়ই ব'লতেন—আমাদের শিক্ষা সেই দিনই সম্পূর্ণ হ'বে, যেদিন পরের জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদবে। আত্মচিন্তা ছেড়ে পরের জন্য ভাবতে শিখবো।

এই ভাব দেখে হীরেন্দ্র বাবু ব'লেছিলেন—জাতির জীবনে আমরা সেই দিনই জয়ী হইব, যখন চরিত্র বলে রামেন্দ্রসুন্দরের মত হইতে আরম্ভ করিব।

রামেন্দ্র বাবু বিজ্ঞানের উন্নতি দেখাতে চান নি, দর্শনশাস্ত্রের কিছু দেখিয়ে নাম নিতে চান নি, কেবল বেছে নিয়েছিলেন স্বদেশের উন্নতির কাজ। সেই জন্য অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখে গেছেন—হাজারখানা বই লিখে যা নাম হয় রামেন্দ্র বাবু সেই কীর্ত্তিই রেখে গেছেন। রামেন্দ্র বাবুর কথার দোছোট ছিল—নিজে ভাল না বুঝে কখনও অপরকে বোঝাতে যাবে না। সেই জন্য অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত লিখে গেছেন—রামেন্দ্র বাবুকে আমরা পেলাম ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে। যখন তিনি বলতে আরম্ভ করলেন তখন রোগশয্যায়। যত দিন ভাল ছিলেন আয়ত্ত করেই গেলেন। তিনি কোন শাস্ত্র হজম না করে বলতেন না। কখন রামেন্দ্র বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এলে বুঝিয়ে দিতেন বাংলা ভাষায়। এমন কি, যখন পড়াতেন কলেজে তখন জ্ঞান থাকতো না। ক্লাসের ঘণ্টা বেজে গেছে কে দেখে কে শোনে সে সব কথা। তখন পড়িয়েই চ'লছেন। ছেলেরাও শুনছে আগ্রহ করে।

তিনি প্রায়ই বলতেন—যদি পারি আমার মাতৃভাষাকেই তোলাবো। ঐ ভাষায় প্রথম আমি মা বলে ডেকেছি। দেখি যদি পারি আমার মাতৃভাষাকে বাহন করবো সব কিছু শিক্ষার।

একদিন হেসে বলছেন বিশ্বকবিকে—আমার দৌহিত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলাম—জয়গোপাল, মণি! তোরা ভারতের চৌহদ্দি কি বল্ তো। তারা দাঁড়িয়ে রইলো নির্বাক। তখন জিজ্ঞেস করলাম ভারতের চতুঃসীমা বলতে পারো? তখনও নিরুত্তর। যখন বললাম—ভারতের বাউনডারি। তখন জলের মত মুখস্থ বলে গেল। আঁশ-বঁটি দিয়ে কাটতে হয় না পণ্ডিত মশায়দিকে। যাঁরা বুঝিয়ে না দিয়ে মুখস্থ করান।

বিশ্বকবি গম্ভীর গলায় বললেন—তা হলে রামেন্দ্রসুন্দর হাজারে হাজারে জন্মাতে হয়।

তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হলে মূক দর্শক রামেন্দ্রসুন্দর। যেন কিছুই বোঝেন না ত্রিবেদী মশায়। হাজার জিজ্ঞাসা করলেও তাঁর কাছে উত্তর পাওয়া যায় না।

কান্দী মহকুমার ভার নিয়ে আছেন তখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। পূজো'র ছুটিতে রামেন্দ্র বাবু বাড়ী গিয়েই জানতে পারলেন, রায় মহাশয় এখানে আছেন। ভগিনীপতি পূর্ণেন্দুনারায়ণ-এর সঙ্গে রামেন্দ্র বাবু গেলেন ডি, এল, রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। অল্প বয়স হলেও তখন রামেন্দ্র বাবুর সব চুল পেকে গেছে। স্থবিরের ভাব এসেছে শরীরে। পরিচয় দিতেই চমকে উঠে বললেন—হবে না কেন ভিতরের জ্ঞানও যে পরিস্ফুট হয়েছে। রামেন্দ্র বাবুকে পেয়ে ভাবাবেশে অনেক প্রশ্ন করলেন। রামেন্দ্র বাবুর উত্তর শুধু হাসি দিয়ে। কতো কথা জিজ্ঞেস করেন ডি, এল, রায়। সেই হাসি। ডি, এল, রায় তাঁর বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখেছেন তাই লিখলাম—এখন কান্দিতে থাকার মধ্যে আছেন স্থবির-প্রায় বৃদ্ধ সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়। সেদিন অনুগ্রহ করিয়া আমার এখানে আসিয়াছিলেন। আলাপ হইল। বহুদিন পর এক জন নামজাদা বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গ পাইয়া নানা প্রসঙ্গ তুলিয়া তাঁর সহিত তর্ক করিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সে জ্ঞানগর্ভ গম্ভীর মুখ হইতে বাক্যের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ সময়ে মৃদু হাস্য অর্থাৎ—দশনকৌমুদীর স্ফুরণ মাত্র হইতে থাকিল। সুতরাং আমারও না মিটিল আশা না পুরিল সাধ; তর্ক হইল না। অহো দগ্ধ অদৃষ্ট! বড় ধীর মানুষটি। কতকটা নির্বোধ-এর মত কাণ্ডজ্ঞানহীন হইলেও বিদ্যার একটা জাহাজ, তর্ক যখন করেন না বুঝিলাম বেরসিক। আমাকে যখন বাড়ী নিয়া গিয়া খাওয়াইলেন, অতএব বুঝিলাম উদারমনা মহাজন।

সে বার পুজোর ছুটিতে তাঁর বন্ধুরা দেখেন তাদের রাম বাবুকে বড় খুশী। অনেকে প্রশ্ন করলেন—আপনাকে বড় খুশী দেখাচ্ছে কেন? তখন রাম বাবু সুরু করলেন—আমার আকাঙ্ক্ষা এতো দিনে ফলবতী হতে চলেছে। কী আকাঙ্ক্ষা আপনার? জিজ্ঞসা করতেই প্রসন্ন স্বরে আরম্ভ করলেন বলতে—আমার বরাবরকার আকাঙ্ক্ষা ছিল সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাংলাকে গড়া। আমাদের বাঙ্গালীর চেতনা ফিরিয়ে আনতে গেলে চাই এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে গেলে আবার ফিরে আসবে ভাবধারা। সেই স্বর্ণমন্দিরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। এর নাম দিয়েছে সাহিত্য পরিষৎ। যেখানে সমবেত হবেন ভারতের মনীষিগণ। তাঁরা জাগিয়ে তুলবেন শুধু বাংলাকে নয়, ভারতকেও।

তখন ভাবগম্ভীর রামেন্দ্রসুন্দর ব'লে চলেছেন শুদ্ধ ভাষায়। জিজ্ঞেস করলেন উপেন্দ্র বাবু—কুচবিহার কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল—তোমার দান কী আছে এতে?

হেসে বললেন রামেন্দ্র বাবু—আমার এই জন্তে গর্ব যে এটা একটা মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠান বললেও চলে। মুর্শিদাবাদের স্বনামধন্য মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জমির উপর সাহিত্য পরিষদ মন্দির স্থাপিত। মুর্শিদাবাদের আর এক স্বনামধন্য মহারাজা যোগীন্দ্র-নারায়ণের টাকাতে মন্দিরটির দ্বিতল গঠিত। আরও একটা কথা বলি মুর্শিদাবাদের শ্রীনাথ পাল মহাশয়ের টাকাতে এই মন্দিরটি মর্ম্মর-মণ্ডিত হয়েছে। সবচেয়ে আনন্দের কথা, আপনাদের এই অধম একজন মুর্শিদাবাদেরই অধিবাসী এর সম্পাদক। তখন হাসির রোল উঠলো! আচ্ছা অধম লোক আপনি মুর্শিদাবাদের!

লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ যখন তাঁর নাতি ধীরেন্দ্র-নারায়ণকে সমর্পণ করে গেলেন রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে, ব'লে গেলেন মানুষ করবার জন্ত আপনার মত পণ্ডিতের হাতে দিয়ে গেলাম।

রামেন্দ্রসুন্দর সানন্দচিত্তে সে ভার নিলেন। বললেন আমারও যে নাতি খোকা। মহারাজ বললেন—বাসাটা একটু বড় করতে হবে, আমার লোকজনও আসতে পারে। রামেন্দ্র বাবু বললেন—আমি একজন গরীব শিক্ষক আমার এইটুকুই প্রয়োজন ছিল। এখন আপনাদের মত বড় পাখী আসতে গেলে বড় খাঁচারও প্রয়োজন।

ইতস্ততঃ করে মহারাজা জানবার চেষ্টা করলেন—এর জন্ত কিছু কী দিতে হবে আপনাকে? তখন উচ্চ হাস্য শুনতে পেলেন রামেন্দ্র বাবুর। বললেন—আমাকে! আমার নাতির ভার নেওয়ার জন্ত! তখন লজ্জিত হয়ে মহারাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। মহারাজাকে লজ্জা-নিবারণ জন্ত বললেন ত্রিবেদী মশায়—আমার কতকগুলো অভ্যাস খারাপ আছে। কখন কখন ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দাঁড়াবো আপনার কাছে। অবশ্য নিজের জন্ত নয়। শুনে মহারাজা গম্ভীর ভাবে বললেন—বুঝেছি, দেশের কাজের জন্ত ভিক্ষের ঝুলি হাতে আপনাদের মত লোক পাওয়া ত ভাগ্যের কথা মশায়! রামেন্দ্র বাবুর তখন খুশী ধরে না।

যখনিই জানতে পেরেছেন মহারাজ, রামেন্দ্র বাবু চিন্তিত আছেন সাহিত্য পরিষদের ঘর তৈয়ারী নিয়ে, তখনিই মুক্তহস্তে রামেন্দ্র বাবুর অভাব মোচন করেছেন। যখন শুনেছেন স্থায়ী ভাণ্ডারের জন্ত রামেন্দ্র বাবু চিন্তা করছেন তখনই পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেছেন স্থায়ী ভাণ্ডারে। যখন শুনেছেন রামেন্দ্র বাবু চিন্তা করছেন বিদ্যাসাগর লাইব্রেরীর জন্ম। তখন মুক্তহস্তে সেই লাইব্রেরী দান করেছেন যত টাকাই লাগুক মহারাজের। এই ভাবে রামেন্দ্রসুন্দরের ঋণ শোধ করবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন মহারাজা।

মহারাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার একটা ইতিহাস আছে। রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য পরিষদের অনুরাগী সাহিত্যিকদেরকে বললেন—আপনারা সকলে একত্রিত হয়ে বলুন মহারাজাকে, আমাদের সাহিত্য পরিষৎ অভাবী দরিদ্র, আপনি কিছু সাহায্য করুন। দেখা যাক কী তিনি দেন।

তখনিই সকলে একটা মিটিং করার স্থির করলেন। সহরের ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের বহু সুধী একত্রিত হয়ে কলকাতায় একটা বিরাট মিটিং-এ মহারাজা বাহাদুরকে অভিনন্দিত করলেন। এমন কী সেদিনের সুধীজনের চাপে সভামণ্ডপ ভেঙে যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছিল। এমন সুধী সমাগম তখনকার কালে কেউ দেখতে পায় নি। তাঁরা মহারাজকে মালা-চন্দন দিয়ে বরণ করে নিলেন। দূর্বা দিয়ে দশের পক্ষ হতে আশীর্ব্বাদ করা হলো।

মহারাজা তখন বললেন রামেন্দ্র বাবুকে দিয়ে—আমি স্থায়ী ভাণ্ডারে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চাই। অতর্কিতে এই কথা কানে যাওয়াতে সমস্ত ভদ্রমণ্ডলীর খুশী দেখে কে! খুশীর ধূমে সভামণ্ডপ ভেঙে পড়ে আর কী! বহুকষ্টে উত্তেজনা কমলে সুধী সজ্জনে প্রস্তাব করলেন, মহারাজকে বহন করে নিয়ে যাবার খোলা গাড়ীতে। মহারাজা কিন্তু সম্মত হলেন না—আপনাদের মত বিদ্বান লোকেরা গাড়ী টেনে নিয়ে যাবেন আমাকে গাড়ীতে বসিয়ে, এমন সঙ আমি সাজতে পারবো না। মহারাজকে প্রায় বলতে শোনা যেতো টাকা থাকলে ত' হয় না মশায়। দান করিয়ে দেবার মত মন করে দেবার পাত্রও দরকার।

নিজের বন্ধুদের মধ্যে কেউ যদি বলতেন—রামেন্দ্র বাবু আপনাকে অনেক খরচ করিয়ে দেন। তখন বলতেন মহারাজা—আমার কলিজা যে দিয়ে রেখেছি রামেন্দ্র বাবুর কাছে। ধীরেন্দ্রনারায়ণ একমাত্র নাতি যে মহারাজের, তেমন পাশ না করতে পারলেও বাঙলার মধ্যে একজন নামকরা সাহিত্যিক। রামেন্দ্রসুন্দরের সান্নিধ্য লাভেই তাঁর সাহিত্য সাধনায় আগ্রহ জন্মেছিল।

[ক্রমশঃ।

শরৎ স্মৃতির টুকিটাকি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

কোলকাতা বেতারের সেদিনকার 'শরৎ-শর্ব্বরী' সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই শরৎচন্দ্রের দীর্ঘজীবন কামনা কোরে কিছু কিছু বক্তৃতা দান করেন। সকলেরই ভাষণ খুব আন্তরিকতাপূর্ণ হোয়েছিল। সকলের বলা শেষ হলে, শরৎচন্দ্র তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে, অল্প কথায় কিছু বলেন। তাঁর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন তার মোটামুটি কথা এই যে, দীর্ঘজীবন বাইরে থেকে সাধারণতঃ দেখতে ভাল হ'লেও, সব সময়ে ও সব ক্ষেত্রে উহা কাম্য নয়। যদি স্বাস্থ্য, শান্তি ও কর্মশক্তি অটুট থাকে; দেশ, সমাজ ও লোকসেবা করবার ক্ষমতা থাকে, কোনও দিকে কোনরূপ অশান্তি না থাকে, তবেই দীর্ঘজীবন কাম্য। কিন্তু মানসিক অশান্তি ও দৈহিক অসুস্থতার মধ্য দিয়ে যে দীর্ঘজীবন—তেমন দীর্ঘজীবনকে তিনি ভাগ্যের অভিসম্পাত বলেই মনে করেন। ব্যাধিপীড়িত হ'য়ে কর্মশক্তি হারিয়ে তিনি একদিনও বাঁচতে চান না···ইত্যাদি।

তারপর বেতার কর্তৃপক্ষ থেকে ফটো তোলবার আয়োজন হয়। ফটো তোলা হয়, একখানা শরৎচন্দ্রের আর একখানা সমবেত অভ্যাগতদের। এই দু'খানা ফটো থেকে ব্লক করে, 'বেতার জগৎ'এ ছাপা হোয়েছিল। শরৎচন্দ্রের ফটোখানা বেশ ভাল হয় নি। গ্রুপ ফটোখানাতে সামনের ক'জনেরই ভাল উঠেছিল। একেবারে সামনে বসেছিলাম আমি এবং নাটোরের মহারাজা, কাশিমবাজারের মহারাজা, জলধর সেন প্রভৃতি দু'চার জন। 'বেতার জগৎ'এর ছবিতে এই ক'জনেরই ভাল উঠেছিল। 'বেতার জগৎ'এ ছাপা এই ছবি দু'টি 'টুকিটাকি'র গত সংখ্যায় ছেপে দেবার জন্য আমি পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ঐ প্রেরিত ছবি থেকে ভাল ব্লক হবে না বলে আমায় ছবি দু'খানা ফেরৎ পাঠানো হয়। 'টুকিটাকি' সম্ভবতঃ স্বতন্ত্র বইয়ের আকারে প্রকাশিত হবে। তাইতে ঐ ছবি দু'খানা যদি কোন রকমে দিতে পারা যায়, তার জন্য চেষ্টা করবো।

পরদিন সকালে যখন শরৎচন্দ্রের কাছে গেলাম তখন তাঁর প্রথম কথা হোল—"আমার সব প্ল্যান উল্টে গেল হে!" একখানা চেয়ারে বসে আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। চেয়ে দেখবার উদ্দেশ্য, মুখভাব দেখে, তিনি কেমন আছেন সেইটে বোঝবার চেষ্টা। শরৎচন্দ্র বললেন—"কই, কিছু জিজ্ঞাসা করছ না যে?"

"কি জিজ্ঞাসা করবো?"

"ঐ যে বললুম, 'সব প্ল্যান উল্টে গেল'—ওই বিষয়ে?"

"কোন্ প্ল্যানটা উল্টে গেল, দাদা? আপনার 'প্ল্যান্'এর ত' সীমা নেই? কিসের প্ল্যান?"

"আহা-হা! আসল জিনিসটা, যা এত দিন মনে-মনে ছোকে এসেছি,—দেবানন্দপুরে বাড়ী কোরে তোমাতে আমাতে দু'জনে থাকবার ব্যবস্থাটা। ওটা আর হোয়ে উঠলো না! বড় জোরে জোরে যাবার তাগিদ আসছে। কালকের জন্মদিন উৎসবই আমার এ জীবনের শেষ জন্মদিন উৎসব হোয়ে গেল।"

আমি অপ্রসন্ন মনে একটু ধমকের সুরে বললাম—"চুপ করুন ত', বাজে কথা বলবেন না।"

শরৎচন্দ্র গম্ভীর হোয়ে বললেন—"বাজে কথা মোটেই নয়; দেখে নিয়ো।"

এর পর থেকেই ঘন-ঘন তাঁর শরীর খারাপ হোতে লাগলো। মনে মনে আমার একটু ভয় হোল, তাঁর মুখের কথাটাই সত্য হোয়ে দেখা দেবে না কি?

হঠাৎ জানা গেল, তিনি অতিমাত্রায় অসুস্থ হোয়ে পড়েছেন এবং শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে তাঁর কাছে আনিয়ে রেখেছেন। খুব আবশ্যকের সময় সুরেন বাবুকেই তিনি নিজের পাশে রাখেন। সুরেন বাবু শরৎচন্দ্রের শুধুই যে মাতুল সম্পর্কীয় ছিলেন, তা ত' নয়। তিনি ছিলেন তাঁর আবাল্যের সহচর, তাঁর প্রিয়তম শিষ্য, তাঁর পরম বন্ধু। শরৎচন্দ্র সব কাজেই তাঁকে ডাকতেন, তাঁকে চাইতেন, তাঁর পরামর্শ ও সাহায্য নিতেন।

তাঁর 'নারসিং হোম'এ যাবার কয়েক দিন আগে আমি তাঁকে দেখতে গেলুম। তখন তিনি নীচে একেবারেই নামেন না। সুরেন বাবু সর্বদাই তাঁর কাছে থাকেন। তখন শরৎচন্দ্র কারো সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ করেন না। ডাক্তারদের সেইরূপই নির্দেশ ছিল। তবে খুব দরকারী কাজের জন্যে কেউ যদি আসতেন ত' সুরেন বাবুর মারফতে ওপর থেকে শরৎচন্দ্র সব বলে পাঠাতেন।

এরকম অবস্থায় আমিও যেতাম না। না গেলেও খবরটা আমি পেতাম। আমার যে ছেলেকে তিনি খুব ভালবাসতেন, তাকে রোজ পাঠিয়ে খবরটা আনতুম। সেদিন সেই ছেলেটি বাড়ী না থাকায় ভাবলুম, আমিই গিয়ে সুরেন বাবুর কাছ থেকে খবরটা জেনে আসি। গেলাম। বরাবর যে গিয়েছি, একটা মধুর স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আনন্দময় আলোর মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, বসেছি, গল্প-গাছা করেছি। সেদিন যেন গিয়ে দাঁড়ালাম—একটা অন্ধকারভরা, আনন্দশূন্য, স্থানে। সেই ঘর, সেই দোর, সেই দালান, সেই সামনেকার ছোট্ট বাগান—কয়েক দিন আগে পর্য্যন্ত যে সবের মধ্যে ছিল একটা প্রাণপূর্ণ উৎসাহ ও মাধুর্য্যের স্পর্শ, একটা সাড়া, একটা সুর,—আজ সেখানকার সেই সবের ভেতর যেন প্রাণহীনতার একটা নিষ্করুণ হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

মনটা যেন কি রকম হোয়ে গেল!

রোয়াকের পৈঠায় উঠতে গিয়ে, দাঁড়ালুম। সেখানকার স্তব্ধ বাতাস আমাকে যেন পেছনে ঠেলে ফিরিয়ে দিতে চাইলে।

ফিরে যাই।

তাও পারলুম না! রোয়াকের ওপর উঠে কলিং-বেলটা টিপে ধরলুম। শব্দ শুনেই সুরেন বাবু নীচে নেমে এলেন ও সংবাদ যা দিলেন তা মোটেই ভাল বলে মনে হোল না। সুরেন বাবু আমাকে নীচের ঘরে বসিয়ে আবার ওপরে শরৎচন্দ্রকে খবর দিতে গেলেন। একটু পরেই নেমে এসে বললেন—"শরৎ আসছে।"

আমি চমকে উঠলুম। বললুম—"আসছেন কি রকম? নীচে

নামতে বারণ করুন। খবরদার, যেন নীচে না নামেন; যান আপনি।"

"না, সে শুনবে না। আপনি এসেছেন শুনে, ও কিছুতেই না এসে পারবে না।"

"কিছুতেই তা হবে না; আমি চলে যাচ্ছি।" বলেই আমি উঠে দাঁড়ালুম। সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়িতে চটি জুতোর শব্দ হতে লাগলো।

সুরেন বাবু বললেন—"দেখলেন ত?"

কিছু আর বলবার পেলুম না।

অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় শরৎচন্দ্র যেন নির্জীবের মত ঘরের মধ্যে এসে তাঁর সেই নিত্য ব্যবহার্য্য আরাম কেদারাটার ওপর ঢলে পড়লেন। আমি তাঁকে খুব খানিকটা বকলুম। তিনি একটু চুপ কোরে থেকে বললেন—"তোমার ছেলেকে দিয়ে বলে দিয়েছিলুম, তোমাকে আসবার জন্যে। তাই, তুমি এসেছ শুনেই এলুম।"

"কেন এলেন? আসাটা মোটেই ভাল হয়নি।"

"আসি না ত। মোটেই আমি নীচে নামি না; সুরেনকে জিজ্ঞেস করে দেখ।"

কি আর বলবো তাঁকে! যাঁর মনে অগাধ বন্ধুপ্রীতি, তাঁকে শারীরিক অসুস্থতার বাঁধনে কখনো বেঁধে রাখা যায়? যাঁর মুখের কথাই হোল—'মরতে ত এক দিন হবেই, তার জন্যে আর দুঃখ কি?' তাকে সাবধানতার বেড়া দিয়ে কখনো আটকে রাখা যায় না।

মনে রাখতে হবে,—এ আর কেউ নয়—'শ্রীকান্ত'।

ইন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য—'শ্রীকান্ত'।

সুরেন বাবু এখনো জীবিত আছেন, তাই এই দিনের কথাগুলো স্বচ্ছন্দে লিখলাম; নতুবা লিখতুম না। *

জীবিত অবস্থায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এই দিনের দেখাই আমার শেষ দেখা। অবশ্য কল্পনার ছায়ামূর্তিতে আমি তাঁকে প্রায় প্রতিদিনই দেখি। জীবনে অনেক আত্মীয়, অনেক হিতার্থী, অনেক বন্ধুকে হারিয়েছি, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত এমন পরমাত্মীয়, এমন পরম বন্ধু, এমন পরম শুভার্থীকে যে অত্যন্ত অসময়ে এমন ভাবে হঠাৎ হারাতে হোল, এটা আমার চরম দুর্ভাগ্য!

দাদা গো! এম্নি হঠাৎই যে তুমি পালিয়ে যাবে, তা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিনি। বলেছিলে বটে যে, তোমার ছুটির বাঁশী শীগগিরই বেজে উঠবে, তাই কাশী থেকে তাড়াতাড়ি চলে এলে। তখন বুঝতে পারিনি যে তোমার মুখের সেই কথা এমনি মর্মান্তিক ভাবেই সত্য হয়ে যাবে! কি কোরে যে তুমি সেটা জানতে পেরেছিলে, তা জানি না। এখন বুঝতে পারছি, তুমি যেমন কোরেই হোক ত জানতে পেরেছিলে। যাই হোক, ভবিতব্যতা যা, তা হবেই। ভগবানের কাছে এখন এই প্রার্থনা করি, তুমি যেখানে গেছ, শীগগিরই যেন সেখানে গিয়ে আবার তোমার সঙ্গে মিলিত হতে পারি।

---

* 'টুকিটাকি'র এই সংখ্যাটা পূর্বেই লেখা হয়েছিল। সে সময় সুরেন বাবু জীবিত ছিলেন ও কোলকাতার দক্ষিণাংশ 'বেহালায়' বাস করছিলেন। দুঃখের বিষয় যে, কয়েক মাস পূর্বে তাঁর ভাগ্য-বিধাতা তাঁকেও শরৎচন্দ্রের পথে টেনে নিয়েছেন।

—লেখক।

'শরৎ-স্মৃতির টুকিটাকি' পড়ে, কেউ কেউ 'রসচক্র' উপন্যাসখানার বিষয়ে আরো-একটু বিশদ ভাবে জানতে চেয়েছেন। তাঁদের অনুরোধ মত লিখছি যে, স্বর্গতঃ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাশী থেকে ক্ষুদ্র-কলেবর একখানা মাসিক পত্রিকা বার করতেন অথবা তার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাখানির নাম ছিল—'প্রবাস-জ্যোতি'। শরৎচন্দ্র এক বার কাশী গেলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁকে ধরে বসেন, 'প্রবাস-জ্যোতির' জন্য একটা উপন্যাস তাঁকে লিখে দিতেই হবে। শরৎচন্দ্র কেদার বাবুর বার-বার অনুরোধ এড়াতে না পেরে, 'বাড়ীর কর্ত্তা' নাম দিয়ে একটি উপন্যাস ফাঁদেন ও তার প্রথম পরিচ্ছেদ লিখে কেদার বাবুকে দেন। 'প্রবাস-জ্যোতিতে ঐ প্রথম পরিচ্ছেদটা ছাপা হয়। তার'পর শরৎচন্দ্র কাশী থেকে কোলকাতায় চলে আসেন এবং 'প্রবাসজ্যোতি'তে 'বাড়ীর কর্ত্তা'ও বন্ধ হোয়ে যায়। এর বছরখানেক পরে, কাশীর অন্যতম মাসিক 'উত্তরা'র সম্পাদক, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমাদের 'রসচক্রে'র কাছে প্রস্তাব করেন যে, রসচক্রের সদস্যগণের দ্বারা ঐ অসম্পূর্ণ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করা হোক এবং সেটা ধারাবাহিক ভাবে তাঁর 'উত্তরা'তে প্রকাশিত হোক'। সুরেশচন্দ্র এজন্যে আমাদের সকলকে খুবই ধরে বসলেন। আমরা শরৎচন্দ্রকে এবিষয়ে বলাতে তিনি সুরেশচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তখন স্থির হোল, বারোয়ারী উপন্যাসের মত, আমরা আট-দশ জন মিলে লিখে গল্পটার শেষ করবো। গল্পের প্লট কি হবে তা সকলে একসঙ্গে মিলে ঠিক করতে পারবেন না, বা সে বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে কেউ কোন আলোচনা বা পরামর্শ করতে পারবেন না। শরৎচন্দ্র লিখিত প্রথম পরিচ্ছেদের পর, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে লেখবার ভার পড়ে আমার ওপর। কিন্তু আমার হাতে তখন মাসিক বসুমতীর জন্য খুব জরুরী একটা লেখার কাজ থাকায়, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটা লিখিয়ে নেবার প্রস্তাব করি। তাতে আমাকে বলা হয় যে, সে ভার আপনাকেই নিতে হবে। সে সময় শৈলজানন্দ কালীঘাট হালদারপাড়া রোডে, বটকৃষ্ণ পালের একখানা বাড়ীতে থাকতেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে এবিষয়ে বলাতে তিনি সম্মত হলেন ও দিন-দুইয়ের ভেতরই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটা লিখে দিলেন। কিন্তু তখনো আমার হাতের সেই কাজ শেষ না হওয়াতে, কবিশেখর কালিদাস রায়ের ব্যবস্থাপনায়, স্বর্গতঃ জগদীশ গুপ্ত ওর তৃতীয় পরিচ্ছেদটা লেখেন। তার পর আমি লিখি, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। আমার পর শ্রীনরেন দেব লেখেন সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদ ও শ্রীরাধারাণী দেবী লেখেন—নবম পরিচ্ছেদ। দশ হইতে চৌদ্দ পরিচ্ছেদ লিখিত হয়—সরোজকুমার রায়চৌধুরীর দ্বারা। পনর থেকে উনিশ পরিচ্ছেদ শ্রীমনোজ বসুর লেখা। তার পর বিশ্বপতি চৌধুরী লেখেন—বিশ থেকে বাইশ পরিচ্ছেদ। তারাশঙ্কর লেখেন—তেইশ, চব্বিশ ও পঁচিশ পরিচ্ছেদ। ছাব্বিশ থেকে আঠাশ পরিচ্ছেদ লেখেন—রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। সব শেষে ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত শেষ তিনটি পরিচ্ছেদ লিখে—উপন্যাসখানি সমাপ্ত করেন। মোট একত্রিশটি পরিচ্ছেদে বইখানি শেষ হয়।

"রসচক্র" উপন্যাস সম্পর্কে আর এক জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি আমাদের 'রসচক্র সাহিত্য সভার' একজন বিশিষ্ট সদস্য—কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী। বইখানায় তিনি কিছু না

লিখলেও, ওর প্রকাশ ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ, উদ্যম ও সাহায্য খুব বেশী ছিল। তিনি আশুতোষ কলেজের একজন পুরাতন ও প্রবীণ অধ্যাপক ও এক সময়কার 'বঙ্গবাণী' মাসিকের (যা স্বর্গতঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে, তাঁদের বাড়ী থেকেই বার হোত) কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যরসিক ও সমালোচক। শরৎচন্দ্রের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। 'বঙ্গবাণী' কে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত পছন্দ করতেন ও তাতে তিনি নিয়মিত ভাবে লিখতেন। তাঁর 'মহেশ' ও 'পথের দাবী' এই 'বঙ্গবাণী'তেই প্রকাশিত হ'য়েছিল। শরৎচন্দ্র যখন সামতাবেড়ে থাকতেন, তখন 'বঙ্গবাণী'র জন্ম তাঁর লেখার কাপি আনতে কুমুদ বসু প্রতি মাসেই অন্ততঃ পক্ষে একবার করেও সামতাবেড় যেতেন। শরৎচন্দ্র যেমন আমাকে 'আফিং' ধরিয়ে গেছেন, তেমনি কুমুদ বাবুকেও ধরাবার জন্যে খুব চেষ্টা করেছিলেন। আফিং ধরার বিরুদ্ধে কুমুদ বাবু যতরকম আপত্তি তুলেছিলেন, শরৎচন্দ্র তা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। শেষকালে যখন কুমুদ বাবু বলেছিলেন যে, আফিং খেলে প্রচুর দুধ খেতে হয়, দুধের পয়সা তাঁর নেই, তাতে শরৎচন্দ্র কুমুদ বাবুকেও বলেছিলেন যে, তাঁর একখানা বইয়ের কাপি-রাইট তিনি কুমুদ বাবুর নামেও লিখে দেবেন, সেই পয়সায় তিনি দুধ খাবেন। কিন্তু এততেও শরৎচন্দ্র কুমুদ বাবুকে রাজী করাতে পারেন নি। নৈসর্গিক জগতে উভয়ের মধ্যে সর্বজনবিদিত প্রণয় ও বন্ধুত্বের বাঁধন থাকলেও এবং শরৎচন্দ্র শক্তিতে ও শোভায় অতুলনীয় হ'লেও, এক্ষেত্রে কুমুদের নিকট তাঁর এই অনুরোধ কিছুতেই রক্ষিত হোল না। কুমুদ বাবুকে আমার মত তিনি আফিং ধরাতে পারলেন না। পরে শরৎচন্দ্র আমাকে এ বিষয়ে বলেছিলেন—"কুমুদ আফিং ধরলে ভাল করতো; ওর ঐ মারাত্মক রকমের ডিস্পেপসিয়ার হাত থেকে ও বাঁচতো। ও রোগটার পক্ষে আফিং একটা মস্ত ওষুধ। পশ্চিমী চিকিৎসা-শাস্ত্রে আফিংকে সূক্ষ্মভাবে বুঝতে ও ধরতে পারে নি, আফিংয়ের ওপর ওপর মোটামুটি গুণাগুণ তারা বুঝেছে। ঋষিদের আয়ুর্বেদে এর সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে।" পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের এই কথাগুলোর যাথার্থ্য আমি জানতে পারি। স্থলবিশেষে এই জিনিষটি বিষের কাজ করে, আবার স্থলবিশেষে এ অমৃতের মত উপকার দান করে। আমাদের এদেশে ৬০.৬৫ বছর বয়সের সময় দৈনিক অল্প মাত্রায় খেলে, বৃদ্ধ বয়সের অনেকগুলো রোগের হাত থেকে এড়ানো যায় ও দীর্ঘজীবী হওয়া যায়।

স্বর্গতঃ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁর মৃত্যুর পূর্বে যখন তাঁর জন্মভূমি দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তখন আমিও দক্ষিণেশ্বরে বাস করতাম। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার বহু কথা হয়। আফিং সম্বন্ধেও অনেক কথা হয়। তিনি নিজেও আফিং ব্যবহার করতেন। সে সময় তাঁর বয়স প্রায় ৮০। তিনি বললেন—"আমি যে এ বয়সেও নীরোগ ও কর্মক্ষম আছি, সেটা আফিংয়ের দৌলতে। এই জন্যেই আমাদের দেশে বৃদ্ধ বয়সে এই জিনিষটা প্রায় ঘরে ঘরেই প্রচলিত ছিল এবং সেই সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা নীরোগ ও কর্মঠ দেহে ৮০।৯০।১০০ বছর পর্যন্ত বাঁচতেন। কিন্তু ইংরেজদের ডাক্তারীতে কিছুতেই আফিংয়ের স্বপক্ষে এই গুণের কথা স্বীকৃত হবে না।" আমি ইচ্ছা কোরেই আফিংয়ের বিরুদ্ধে অনেক পথ দিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করি। এরূপ শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও করতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে হোল। তবে, শরৎচন্দ্র যেমন বলতেন, কেদার বাবুও তাই বললেন যে, ৬০-এর আগে আফিং খাওয়া কর্তব্য নয় কিংবা খুব বেশী মাত্রায় ব্যবহার করাও ঠিক নয়। মোটের ওপর আয়ুর্বেদে বর্ণিত নিয়মে ও জিনিষ ব্যবহার করলে, অমৃতের ন্যায় ফল দিয়ে থাকে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই, ডাক্তারেরা যাই বলুন না কেন। শরৎচন্দ্র নিত্য আফিং ব্যবহার করতেন, তবুও অসময়ে মারা গেলেন। এর মস্ত একটা কারণ ছিল। তিনি শরীরের ওপর যেরূপ অনিয়ম অত্যাচার চিরকাল কোরে এসেছেন, তাতে তাঁর অকালমৃত্যু মোটেই আশ্চর্য্যের নয়। বেঁচে থাকার ওপর তাঁর বিন্দুমাত্র ঝোঁক ছিল না। তিনি অনেক দিন আমার কাছে বলেছেন—"দেখ, এখন বেঁচে থাকাটা লোকসানের সামিল। কি কোরে মরা যায় বল দেখি?"

আমি বলতাম—"কেন দাদা, মরে লাভটা কি?"

"লাভই ত ষোল আনা। আবার নতুন জন্ম, আবার সেই মধুর ছেলেবেলা, ছেলেখেলা, আবার জীবনের সব চেয়ে মাধুর্যময় সময়—কিশোর বয়স, সেই কিশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণ···আহা-হা! কী সুন্দর! কী চমৎকার!"—বলতে বলতে শরৎচন্দ্র যেন আত্মহারা হোয়ে যেতেন। তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে হঠাৎ যেন শ্রীকান্ত রূপ নিয়ে ফুটে উঠতো, আর সেই সঙ্গে বায়োস্কোপের ছবির মত পর্দায় পর্দায় হয়ত বা ফুটে উঠতো—ভাগলপুরের সেই গঙ্গা, গঙ্গার প্রবল স্রোতোবেগ ইন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথের ডিঙ্গি, বুনোঝাউয়ের বন, মাছচুরি; তার সঙ্গে ফুটে উঠতো—তার অন্নদা দিদি, আর অন্নদা দিদির সেই নির্মম সাপুড়ে স্বামী। আরো কত কি! যাক, যা বলছিলুম—বলি।

'রসচক্র' উপন্যাস সম্বন্ধে এর আগে আমি বলেছি যে সমস্ত বইখানা পড়ে আমার নিজের তেমন ভালো লাগেনি। এ কথার মানে এই নয় যে, যাঁরা যাঁরা আমরা এতে লিখেছি, সবার লেখা খারাপ হোয়েছে। লেখা সকলেরই খুব ভালো হোয়েছে, কিন্তু প্লট সম্বন্ধে পূর্বে সকলে মিলে যুক্তি-পরামর্শ না কোরে, অনির্দিষ্ট ভাবে অগ্রসর হওয়ার ফলে যেমন হয়, তাই হোয়েছে। আলাদা আলাদা ভাবে, প্রত্যেকের লেখা অতি সুন্দর হোয়েছে—এ কথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে এবং হোয়েছেও তাই। শরৎচন্দ্রও 'রসচক্র' সম্বন্ধে আমাকে বলেন—"বই ত বেশ ভালই হোয়েছে, তোমাদের সবাইকে আমি এ জন্যে ধন্যবাদ দিচ্ছি; সবাইকে জানিয়ো।"

'ফিল্ম' হবার পক্ষে 'রসচক্র' ভাল বই। যে বই শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র, তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ প্রভৃতির লেখনীস্পর্শে জন্মগ্রহণ করেছে, সে বইয়ের ছবি যে সকলেরই খুব প্রিয় ও আকর্ষণীয় হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বইখানার ছবি করবার জন্যে কোন কোন ফিল্ম কোম্পানী থেকে প্রস্তাবও এসেছিল, কিন্তু আমাদের সকলের ইচ্ছা, কোন ভাল এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান যদি 'রসচক্রে'র ছবি করেন, তাঁদের আমরা আনন্দের সহিত উহা দিব। বইখানি বাজারে নিঃশেষপ্রায় হোলেও, এক-আধ কাপি আমাদের কাছে আছে; কোন প্রতিষ্ঠান ফিল্ম কোম্পানী আমাদের কাছে এ জন্ম এলে আমরা তাঁদের বই দিতে পারব। 'রসচক্রে'র বহু পাঠক-পাঠিকা এর চিত্রাভিনয়ের ব্যবস্থার জন্ম আমাদের অনুরোধ জানিয়ে

আসছেন ; এবং এটাও ঠিক যে 'রসচক্র' ফিল্ম হোলে, ফিল্ম প্রস্তুতকারীদের পক্ষে তা নিশ্চয়ই লাভজনক হবে।

ফিল্মের কথায় আর একটা কথা মনে পড়ছে। একদিন সকালে শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছি, কথায়-কথায় তিনি বললেন—"তোমার গল্পের ভেতর অনেকগুলোর বেশ ভাল ফিল্ম হোতে পারে, যদি প্লট একটু-আধটু বাড়িয়ে দিতে পার।" আমি বললাম—"আমার বই ফিল্ম করবার জন্মে আমি কারো কাছে যাই নি, যাবও না। কোন প্রতিষ্ঠান যদি আমার কাছে এসে প্রস্তাব করেন, তা হলে আমি আনন্দের সঙ্গেই সে প্রস্তাবে রাজি হ'ব।" একটু চুপ কোরে থেকে আমি বললুম—"প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর 'মুক্তি'র ছবি শেষ কোরে একদিন আমার কাছে এসে, আমার একখানা বই খুব আগ্রহ কোরে চেয়েছিলেন। আমি খুব আনন্দের সঙ্গে তাতে রাজি হোয়েছিলুম। কথা হোয়েছিল, তিনি 'মুক্তি'র ছবি কোরে খুবই ক্লান্ত হোয়ে পড়েছেন। সেজন্য কিছুদিন জাহাজে ইয়োরোপ ঘুরে আসবেন ; ফিরে এসেই আমার একখানা বই ফিল্ম তোলবার ব্যবস্থা করবেন।"

"হোল না কেন ?"

"তিনি বম্বে থেকে জাহাজে ওঠবার দু'চার দিন পরেই, এখানে তাঁর স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যু হোল। পথে এই খবর পেয়েই তিনি ফিরে এলেন। তারপর সব ওলোট-পালোট হোয়ে গেল; আমিও আর ও-সম্বন্ধে কোন চেষ্টা করি নি।"

"আচ্ছা, তুমি রবীন্দ্রনাথকে তোমার কি কি বই পাঠিয়েছিলে ?"

"'পথের স্মৃতি,' 'বরদা ডাক্তার,' 'স্ত্রী,' 'মুক্তোঝারি,' 'জমা-খরচ' আর বোধ হয় 'ধাঁধার উত্তর'।"

"কবির চিঠিখানা যত্ন কোরে রেখে দিয়ো ; ওর দাম অনেক হে।"

রবীন্দ্রনাথ আমাকে যে চিঠি দিয়াছিলেন, তার মোটামুটি কথা এইরূপ ছিল :—'মনে করেছিলুম, আপনার বইগুলোতে একটু-একটু উঁকি দিয়েই ছুটি নেব, কিন্তু পড়া আরম্ভ কোরে, সব শেষ না কোরে পারি নি, তাতে আমার কাজের বিশেষ ক্ষতি হোয়েছে। লেখায় আপনি ওস্তাদ। আপনার লেখা প্রত্যক্ষর পথেই চলে ; চলে খুব সহজেই। * * * করুণকে অতি করুণ করবার ইচ্ছায়, কোন কোন জায়গায় রং চড়িয়েছেন একটু বেশী ; তা হোলেও তা ত্যাড়া-বাঁকা অষ্টাবক্র হয়নি যে, তাতে আরাম পেলাম। * * ইত্যাদি। আমার বইগুলোর ওপর রবীন্দ্রনাথের এই প্রশংসাসূচক অভিমত দানের জন্মে সব-চেয়ে বেশী খুশী হোয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। প্রকৃত বন্ধুর এইরূপই হয়। আমার সব বই পড়ে স্বর্গতঃ ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস দু'খানা দীর্ঘ পত্র লিখে আমায় যে অভিনন্দিত করেছিলেন এবং শ্যামাপ্রসাদ, এন, সি, চ্যাটার্জি,

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি যে উচ্চ প্রশংসা করতেন, তাতে আমার অন্যান্য অধিকাংশ বন্ধুরা ভেতর ভেতর একটা অস্বস্তির ভাব যে পোষণ করতেন সেটা আমি বুঝতে পারতুম। কিন্তু শরৎচন্দ্র এতে খুবই আনন্দিত হ'তেন। তিনি ছিলেন আমার প্রকৃত বন্ধু।

আজ তাঁকে হারিয়ে আমি যেন নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছি। তাই তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই আমি একরকম সাহিত্য-আসর থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। তবে প্রবল নেশার মত যে জিনিষ হৃদয়ের আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িত হোয়ে গেছলো, তার থেকে একেবারে মুক্ত হোতে পারিনি। সেই জন্যেই মাঝে মাঝে একটু-আধটু না লিখে পারিনি এবং সেই জন্যেই কতক সুধীব্যক্তির বিশেষ অনুরোধে—'শরৎ-স্মৃতির টুকি-টাকি' লিখতে বসেছিলাম। বসলেও আর আগের মত হয় না; মুক্তবেণী আর যুক্ত হয় না। তাই এখনকার লেখার মধ্যে থেকে যায়—শতেক ভুল, সহস্র ত্রুটি, অসংখ্য অসতর্কতার ছাপ। এর জন্য তাই গোড়াতেই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে রেখেছি। আজ আমার সৃষ্টিকর্তা যে পথে আমায় ঠেলে দিয়েছেন, শরৎচন্দ্র জীবিত থাকলে আজ দু'জনে একসাথে বুক ফুলিয়ে, নির্ভয়ে, বিনা বাধায় সেই চির-মহান, চির-উজ্জ্বল পথে অগ্রসর হোতে পারতাম। বন্ধু অনেকেই ছিলেন, অনেকেই আছেন, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই আজ নিজেদের সংসার-স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত; আমার মত লোকের বন্ধুত্বে তাঁদের কোন দিক দিয়ে কোনরূপ লাভ হবার আশা নেই। তাই আজ ঐ শ্রেণীর কোন বন্ধুর বাড়ী যদি যাই, তা তিনি মনে মনে অসন্তুষ্টই হ'ন। বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও হয়ত, কারুকে দিয়ে বলে পাঠান যে তিনি বাড়ী নেই; কিংবা দু'মিনিটের জন্যে একবার এসে, জরুরী কাজের অছিলা দেখিয়ে, অতি ভদ্রতার সহিত চলে যান। সুতরাং কারো কাছে আর যাইও না, যাওয়া উচিতও না।

সাহিত্যক্ষেত্র হোতে নিজেকে একরকম বিচ্ছিন্ন করেই একান্তে পড়ে আছি; বর্তমান সাহিত্যের কোন খবরই বড় একটা রাখি না। শুনতে পাই, কেউ কেউ বলেন যে বর্তমানে কথাসাহিত্য উন্নতির চরম সীমায় উঠেছে; আবার কেউ কেউ খুব অশ্রদ্ধার সঙ্গে ও-কথার বিপরীত বলে থাকেন। কিছুই বুঝি না। তবে এটা বুঝি যে, সাহিত্যক্ষেত্র আজ বিভিন্ন দলে ভাগাভাগী। দল অবশ্য চিরকালই ছিল, কিন্তু ঠিক এ ভাবের গোঁড়া দলীয় ভাব ছিল না। একজনের উৎকৃষ্ট রচনা, অন্য দল কিছুতেই গ্রহণ করবে না, আবার খুব নিকৃষ্ট রচনাও সেই দলে আদরের সহিত গৃহীত হোয়ে তার প্রশংসা-প্রচারে তাঁরা আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলবেন···এই ধরণের নানা কথা শুনতে পাই। কি ঠিক, কি বে-ঠিক তা বুঝতে পারি না, বোঝবার আবশ্যক নেই বোলে, সে চেষ্টাও করি না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, বাংলা-সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি হোক; তাই দেখতে দেখতে, যে পথে পা বাড়িয়েছি সেই পথে যেন তাড়াতাড়ি যেতে পারি। পথের শেষে সেখানে শরৎচন্দ্র আমার অপেক্ষায় বসে আছেন।

দাদা গো! যেখানে তুমি গেছ, সেখানে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছি। শীগ্‌গিরই সেখানে গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হব। সেখানে আবার আমরা এমন সাহিত্যিক জোট বাঁধবো, যাতে পরস্পরের মধ্যে হিংসা থাকবে না, দ্বেষ থাকবে না, পরশ্রীকাতরতা থাকবে না, যেখানে মিথ্যা অভিমান-অহঙ্কার থাকবে না, মুখে মধু মনে বিষ থাকবে না, অর্থের অহমিকা থাকবে না। সেখানে থাকবে সত্য, প্রীতি, সরলতা, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রকৃত বিনিময়, স্বর্গীয় প্রেমের আদান-প্রদান। সেখানে আমরা সত্যকার পবিত্র ও অনাবিল সাহিত্য-সাধনা কোরে, সেই মহা-সাহিত্যিকের প্রীতি ও করুণা যেন আমরা লাভ করতে সমর্থ হই, যা অনন্তকাল পর্যন্ত সেখানকার আকাশে-আকাশে, বাতাসে-বাতাসে, ফলে-ফুলে, তরু-লতায়, পল্লবে-পাতায়, বনে-উপবনে, প্রান্তরে-কান্তারে চির-সঞ্চারিত হোয়ে সঞ্চিত থাকবে। তাই আজ তোমার স্মৃতি-নৈবেদ্যের মধ্যে, তোমাকে স্মরণ করবার সঙ্গে-সঙ্গে, সেই দুনিয়ার মালীকে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রাজাধিরাজ, মহা-সাহিত্যিক ও কবিশ্রেষ্ঠের চরণে কোটি-কোটি প্রণাম জানিয়ে, তোমার স্মৃতির এই 'টুকি-টাকি'তে সমাপ্তির রেখা টেনে দিলাম।

শেষ

তুমি এসেছিলে

শ্রীমাধবী সেনগুপ্ত

আমার ঘরের কপাটে কে যেন টোকা দিয়ে গেল মৃদু
ধূপছায়া রাত যখন কেটেছে, উদাস হাওয়ায় যখন মিশেছে
ঝিরি ঝিরি আর ঝুরু ঝুরু বন-বিটপীর ঘ্রাণ,
কে যেন তখন টোকা দিয়ে গেল আমার দুয়ারে শুধু।
আকাশ যখন অরুণ-চুমায় হয়নিকো মোটে লাল—
সাগর-বলাকা ওড়েনি যখন যুক্ত-পক্ষ হয়ে,
তটিনী যখন সাগরের কানে কয়েছিলো কিছু কথা,
তখন কে যেন দুয়ার-বাহিরে রেখে গেল নীরবতা।

তন্দ্রার মতো যখন জ্যোৎস্না বাইরে ছড়িয়ে ছিল,
একটি জোনাকি যখন সেখানে ঝিল্লীর রবে মিশে,
নির্জন-সাথ যখন আঁধারে পালক গুটায়ে নিল,
আমার দুয়ারে তখনই মধুর আওয়াজ তুলিল কিসে?
শ্রাবণ যখন অশ্রুত ছিল কামনার রাগিণীতে
অনেক ইচ্ছা তোমাকে পাওয়ার না পাওয়ার সঙ্গীতে
পূর্ণ যখন। তখন কে যেন মৃদু গুন্ গুন্ গানে
টোকা দিয়ে গেল আমার দুয়ারে, ডাক দিয়ে গেল শুধু।

এই শিশুটির জন্য
এক মুহূর্তও
ভাবতে হয় না

কারন সে

ল্যাক্‌টোজেন

খেয়ে পুষ্ট

LACTOGEN
NESTLE'S
MODIFIED POWDERED MILK

LG/P/21 B

সিলোন রেডিয়ো থেকে 'ল্যাক্‌টোজেন' হিন্দী প্রোগ্রামে **বীণা রায়ের** কথা শুনুন।

রবিবার···রাত্রি ৭টা-৪৫ মিঃ থেকে রাত্রি ৮টা এবং বৃহস্পতিবার···রাত্রি ৮টা-৩০ মিঃ থেকে রাত্রি ৮টা-৪৫ মিঃ।

৪১ মিটার ব্যাণ্ডে

21

'F'

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন

নেসল্‌স প্রডাক্টস (ইণ্ডিয়া) লিঃ

পোষ্ট বক্স নং ৩৯৬	পোষ্ট বক্স নং ৩১৫	পোষ্ট বক্স নং ১৮০
কলিকাতা	বোম্বে	মাদ্রাজ

বিজ্ঞানবার্ত্তা

পঙ্কধর মিশ্র
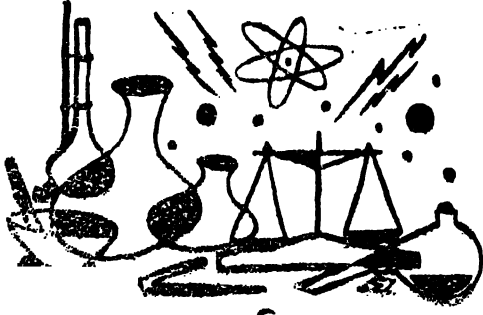
যন্ত্র দিয়েই কেবল শিল্প প্রতিষ্ঠান চলে না, শিল্পের উন্নতির জন্ত উপযুক্ত মানুষেরও প্রয়োজন। শিল্পের উৎকর্ষতার, উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করবে মানুষ :—যন্ত্র চালাবে মানুষ, তাই উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন শিল্পক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী। ছেলে ছবি আঁকতে ভালবাসে; আপন মনে সে পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, খুশী মতো স্কেচ করে। বাবা তাকে এক দিন জোর করে যন্ত্রপাতির কারখানায় চাকরীতে ঢুকিয়ে দিলেন। ছবি আঁকলে তো পেট ভরবে না—অতএব হাতুড়ী নাও। শিল্পী হিসাবে ছেলেটি হয়তো খুবই উন্নতি করতে পারতো—কারখানার মেহনতী কর্ম্মী হিসাবে সে একেবারেই অচল। তবু তাকে দিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে, ফলে লোকটির এবং তার সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠান এই উভয়েরই ক্ষতি হচ্ছে। এক কথায় বৃহৎ অর্থে ক্ষতি হচ্ছে সমগ্র দেশের। কেবলমাত্র কর্ম্মী নয়, উচ্চপদস্থ অফিসার এবং পরিচালকমণ্ডলী নির্ব্বাচিত করার সময়ও এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মানসিক পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়ার সঙ্গে যিনি দায়িত্ব গ্রহণ করতে আসছেন, তাঁর মনের মিল আছে কি না।

দেশ-বিদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্ত্তমান কালে সাধারণ কর্ম্মীদের এবং দায়িত্বপূর্ণ অফিসারদের মানসিক পরীক্ষার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র মানসিক পরীক্ষা নয়, যাঁরা অফিসারের দায়িত্ব নিতে যাবেন তাঁদের পৃথক ভাবে ব্যবসা ও শিল্প পরিচালনা বিষয়ে শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করা উচিত। ঠিক কি ভাবে শিল্পের জন্ত প্রয়োজনীয় মানুস সংগ্রহ এবং তৈরী করে নেওয়া যায়,—ইংলণ্ডের বিজ্ঞান ও শিল্প-গবেষণা পরিষদ তা নির্ণয় করতে উদ্যোগী হয়েছেন। শিল্পক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্ম্মীর সঙ্গে উৎপাদনের হার একসূত্রে বাঁধা; তাই অন্যান্য শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা করতেও পরিষদ এসেছেন এগিয়ে। গবেষণার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে 'ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ ইনডাষ্ট্রিয়াল সাইকোলজি' নামক প্রতিষ্ঠানের উপর। গবেষণার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্ত শিল্প ও বিজ্ঞান-গবেষণা পরিষদের কাছে তাঁরা আগামী তিন বছরের জন্ত, বছরে লক্ষাধিক টাকা সাহায্য পাবেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন আবহাওয়ার মানুষ নিজেকে কাজের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে এবং নতুন পদ্ধতি ও চিন্তাধারা গ্রহণ করতে পারে, তা নির্ণয়কল্পেই প্রধানতঃ এই গবেষণা পরিচালিত করা হবে।

* * * *

ফিজার কোম্পানী আবিষ্কার করেছেন 'সিগমামাইসিন'; ওয়াশিংটনে সম্প্রতি অ্যাণ্টিবায়োটিকের উপর যে আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র বসেছিল, তাতে এই ঔষধটি অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়েছে। টেট্রাসাইক্লিন এবং ওলিয়ানডোমাইসিন নামক দু'টি অ্যাণ্টিবায়োটিকের সমন্বয়ে প্রস্তুত সিগমামাইসিন চিকিৎসা-জগতে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে। আপনারা জানেন, বেশী অ্যাণ্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হলে মানবদেহে অ্যাণ্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতার উদ্ভব হয়। ফলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও এই ঔষধে সুফল পাওয়া যায় না। আবার কোন কোন প্রাণিদেহ অ্যাণ্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ সহ্য করতে পারে না,—একে এক রকম অ্যালার্জ্জি বলা যেতে পারে। সিগমামাইসিন দেহের অ্যাণ্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং অ্যাণ্টিবায়োটিক ভীতি নিরাময় করতে সক্ষম, তাই চিকিৎসা-জগতে এই ঔষধের আবিষ্কারের গুরুত্ব খুবই বেশী।

* * * *

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, কোন রোগে, বিশেষ কোন ঔষধ একা নিরাময় ঘটাতে না পারলেও অনেক সময়েই অপর অন্ত কোন ঔষধের সহিত একযোগে ব্যবহার করায় খুবই সুফল দেয়। অ্যাণ্টিবায়োটিক ঔষধের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডাঃ সিগমুণ্ড উইনটন, নবাবিষ্কৃত সিগমামাইসিনের কার্য্যকারিতার প্রশংসা করে বলেন যে, চিকিৎসাক্ষেত্রে শতকরা ১৬ ভাগ রোগীই অ্যাণ্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতার হাত থেকে এই ঔষধ ব্যবহার করে আরোগ্য লাভ করতে পারে। তিনি আরও জানান যে, কয়েকটি সাংঘাতিক যৌন রোগ এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলের রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সিগমামাইসিন অত্যন্ত সুফল দেয়। ফ্লোরিডার চিকিৎসাবিজ্ঞানী ১৮১ জন রোগীর উপর এই ঔষধ প্রয়োগ করেছিলেন; তাঁর মতে এই ঔষধের ব্যবহার অত্যন্ত নিরাপদ, সকলেই এই ঔষধ প্রয়োগ সহ্য করতে পারে এবং অনেক ষ্টেফাইলোককাস জাতীয় জীবাণুর আক্রমণে যেখানে অন্যান্য ঔষধ কার্য্যকরী হয় না, সেখানেও এর ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রদ। অন্যান্য চিকিৎসকদের বিবৃতি থেকে জানা যায়, দেহমধ্যস্থ বহুপ্রকার রোগ, ক্ষত প্রভৃতিতে এই মিশ্র ঔষধ বিশেষ সুফলদায়ক।

আবিষ্কর্ত্তা হলেন ফিজার কোম্পানীর বিজ্ঞানীরা, তাঁরা কি দাবী করছেন শুনুন। তাঁদের মতে 'সিগমামাইসিন' এর জীবাণুনাশক এবং রোগনিরাময়কারী ক্ষমতার পরিধি সবচেয়ে বেশী। যে সব ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা নানা প্রকার অ্যাণ্টিবায়োটিকস ব্যবহার করেন, সেখানে নিরাপদে এই ঔষধ ব্যবহার করা চলবে। যে-সব ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ পেনিসিলিন ব্যবহার করেন, সেই সব রোগীর উপরেও সিগমামাইসিন ব্যবহার করা যাবে।

* * * *

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ওয়াশিংটনের অ্যাণ্টিবায়োটিক বিষয়ের আলোচনাচক্রে সিগমামাইসিনের পরে আর একটি ঔষধ বিষয়েও চিকিৎসকেরা যথেষ্ট মনোযোগ দেন। এই অ্যাণ্টিবায়োটিকটির নাম রিসটোসিটিন,—এই ঔষধটি বিভিন্ন জীবাণুর বৃদ্ধি মন্দীভূত করে দিতে পারে। জর্জ্জ ওয়াশিংটন ইউনিভারসিটি স্কুলের বিজ্ঞানী ডাঃ রোমানস্কি এবং কলম্বিয়া জেনারেল হাসপাতালের ডাঃ লিমসন এই নতুন ঔষধটি ১৬ জন নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ ইত্যাদি রোগীর উপর পরীক্ষা করেছেন। আলোচনাচক্রে উপস্থিত বিজ্ঞানীরা এই

বিজ্ঞানীদ্বয়ের পরীক্ষামূলক চিকিৎসার ফলাফল বিচার বিশ্লেষণ করেন।

পি এ ১৩২ নামক আর একটি নবাবিষ্কৃত অ্যান্টিবায়োটিকের বিষয়েও বিজ্ঞানীরা আলোচনা করেন। অনেকের মতেই উদ্ভিদের প্যাথোজিনিক ফাঙ্গাল রোগ সমূহে পি এ ১৩২ খুবই কার্য্যকরী বলে বিবেচিত হবে। মানবদেহের পক্ষে উত্তেজক হওয়ার জন্য মনে হয় মানুষের রোগচিকিৎসায় এই বস্তুটি ব্যবহার করা যাবে না। আমেরিকান সায়নামাইড কোম্পানীর ১২ জন বিজ্ঞানী এক সঙ্গে ভারতবর্ষের মাটী থেকে প্রাপ্ত আর একটি নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের কথা ঘোষণা করেন। এই নতুন অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধটির নাম 'নিউক্লিয়োসিডিন'। বিজ্ঞানীরা জানান যে, এই ঔষধটি গ্রাম পজেটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ এই উভয় প্রকার জীবাণুর বিরুদ্ধেই কার্য্যকরী। তাঁরা মনে করেন, যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় নতুন অ্যান্টিবায়োটিক নিউক্লিয়োসিডিন বিশেষ কার্য্যকরী হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, রিসটোসিটিনেরও গ্রাম পজেটিভ জীবাণু এবং যক্ষ্মার জীবাণু বিনাশের অসাধারণ ক্ষমতা পর্য্যবেক্ষণ করা গেছে।

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন

বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীর জীবনকাহিনী আজ আলোচনা করবো, মাত্র ২ বছর আগে ১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ্চ জার্ম্মাণীতে ব্যাভেরিয়ার উলম অঞ্চলে একটি ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলজীবনে প্রথম দিকে শিক্ষক মহাশয়দের কাছে বোকা বলে পরিচিত হলেও অল্প বয়সেই তিনি কঠিন ক্যালকুলাস ও অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি শেষ করে ফেলেছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনের শিক্ষা সুইজারল্যাণ্ডে পাবার পর অবশেষে তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অফ ফিলজফি উপাধি লাভ করেন। প্রথম কর্ম্মজীবন তাঁর আরম্ভ হয় পেটেণ্ট পরীক্ষকরূপে। এই সময়েই তিনি তাঁর জগদ্‌বিখ্যাত আপেক্ষিক-তত্ত্বের উপর গবেষণা সুরু করেন এবং চাকরী করতে ঢোকা মাত্র তিন বছর পরেই ১৯০৫ সালে এই তত্ত্বের উপর তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই একটি মাত্র গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানী হিসাবে আইনষ্টাইনের নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যায়। তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার, আপেক্ষিক-তত্ত্বের সাধারণ মতবাদের উপর বিজ্ঞানী মহলে আলোচনা ও সমালোচনার অন্ত থাকে না। এই সময় আইনষ্টাইন নিজেই বলেছিলেন,—"আমার এই মতবাদ যদি সঠিক প্রমাণিত হয়, তাহলে জার্ম্মাণীরা আমাকে জার্ম্মাণীর এক মহামানব বলবে এবং ফরাসীরা বলবে আমি সমগ্র বিশ্বের নাগরিক, কিন্তু যদি ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে জার্ম্মাণরা বলবে আমি ইহুদী এবং ফরাসীরা বলবে আমি জার্ম্মাণ।"

যাই হোক, অবিলম্বেই বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে বিজ্ঞানাচার্য্য অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন তাঁর গবেষণার স্বীকৃতি পেলেন, বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখায় মারফৎ তাঁর গবেষণা চললো এগিয়ে। পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য ১৯২১ সালে পদার্থবিদ্যায় তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান তাঁর আপেক্ষিক-তত্ত্ব। এর মাধ্যমে তিনি পদার্থের পরিমাণ, আকর্ষণ, স্থান এবং কালের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই বিশ্বজগতের সর্ব্বক্ষেত্রেই যে স্থান ও কালের বিরাট প্রভাব আছে, একথা তিনিই ঘোষণা করেন। আইনষ্টাইনই জানান যে, পদার্থের সঙ্গে শক্তির কোন প্রভেদ নেই,—পদার্থ হলো জমাটবাঁধা শক্তি। মাত্র আধ পাউণ্ড পদার্থকে যদি শক্তিতে যুক্ত করা যায়, তাহলে তার পরিমাণ ১০ লক্ষ টন টি, এন, টি-এর বিস্ফোরণের সমান হবে। বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন জানান, আলোর যে রেখা তারও পদার্থগত পরিমাণ আছে এবং আলোকও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আকর্ষণ করে। শেষ বয়সে বিজ্ঞানাচার্য্য আর একটি যুগান্তকারী মতবাদ প্রচারে মনোনিবেশ করেছিলেন,—এর নাম "দি ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরী।" এই মতবাদের মাধ্যমে বিজ্ঞানী দেখতে চাইছিলেন তারা, গ্রহ, বিদ্যুৎ, আলো ইত্যাদি বিশ্বজগতের সবকিছুই একটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলে। তাঁর এই সমস্ত গবেষণাই পরিচালিত হয়েছিল মস্তিষ্করূপ গবেষণাগারে—সম্বল ছিল মাত্র কাগজ আর পেন্সিল। কাগজ-পেন্সিলের মাধ্যমে যে সব তথ্য বিজ্ঞানাচার্য্য বহুদিন আগে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন,—আজকের দিনে গবেষণাগারে তা পরীক্ষিত সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সর্ব্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে পরিগণিত হলেও ১৯৩৩ সালে ইহুদী বিতাড়নের সময় বিজ্ঞানাচার্য্য আইনষ্টাইনকে জার্ম্মাণী পরিত্যাগ করতে হয়। সামান্য অর্থ সম্বল করে তিনি ফ্রান্স ও বেলজিয়ম হয়ে ইংলণ্ডে আসেন এবং এখান থেকেই আমেরিকাতে স্থায়িভাবে বসবাস করবার আহ্বান পান। ১৯৩৩ সালে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন এবং প্রিন্সটনস্থিত, "ইন্‌ষ্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড ষ্টাডীর" আজীবন অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে বিজ্ঞানাচার্য্য আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি আমেরিকার প্রিন্সটনেই বসবাস করেছিলেন।

বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন ছিলেন আপনভোলা ঋষিকল্প মানুষ। কোন কিছুতেই খেয়াল নেই,—স্নানের সাবান দিয়ে দাড়ি কামাতেন আর বেল্টের অভাবে কোমরে বাঁধা থাকতো একটা ছেঁড়া টাই। অত্যন্ত সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন তিনি যাপন করতেন। ১৯০১ সালে তিনি মিলভা মরিক নামক এক জন বিজ্ঞান-কর্ম্মীকে বিবাহ করেন, ১৯১৬ সালে তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। ১৯১৭ সালেই তিনি তাঁর সম্পর্কে বোন এলসা আইনষ্টাইনকে বিবাহ করেন। এলসা মারা যান ১৯৩৬ সালে। বিজ্ঞানাচার্য্যের দু'টি পুত্র, একজন অ্যালবার্ট জুনিয়ার এবং অপর জন এডওয়ার্ড। উভয়েই তাঁর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান।

বিজ্ঞানাচার্য্য আইনষ্টাইন যুগাতীত মহামানব। বর্ত্তমান বিজ্ঞানকালকে তিনিই পরিচালিত করতেন; তাই একে বলা হয় আইনষ্টাইনের যুগ। সর্ব্বকালের বিজ্ঞানীদের মধ্যে নিউটন আর আইনষ্টাইনকে শ্রেষ্ঠতম বলা হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে পৃথিবী সর্ব্বকালের এক শ্রেষ্ঠতম অসাধারণ সন্তানকে হারিয়েছে।

শ্রীমতী আর্ভেরএর দিনপঞ্জী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তরু দত্ত

লুই পই-পই করে বারণ করল নিজে নিজে এ-সব যেন না করি; কিন্তু আমায় নিরস্ত করা সম্ভব নয় দেখে নিজেই ও লেগে গেল আমার সঙ্গে। বাবা-মা আসছেন বলে ওকেও বড় উৎফুল্ল লাগল।

মঁসিয়া ভিয়ার এসেছিল; ওকে জানালাম যে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই মা-বাবা আসছেন।

"এমন মেয়ের মাকে দেখে ধন্য হব মাদাম! না জানি কত মহৎ ওঁর চরিত্র!" ও বলল।

"বাঃ ভিয়ার, নারী মহলে তুই কথার খই ফোটাতে ওস্তাদ দেখছি।" লুই ঠাট্টা করল।

"উঁহু! কথার কথা নয় লুই, আমার মনের কথাই বলছি ভাই, এতটুকু মিথ্যা নয়।"

সকলে খাওয়ার পর নিয়ম মত বেড়াতে গেলাম জাকো-গিন্নির ওখানে। আশী বছর ভদ্রমহিলার বয়স; দেখা-শোনার কেউ নেই। আমায় উনি বড় স্নেহ করেন আর আমি যেতেই অভ্যর্থনা জানান।

"পুণ্যবতী, ভগবান তোর মঙ্গল করুন।" নানা কথাবার্তা হয় ওঁর সঙ্গে। প্রায়ই ওঁর জন্যে ভাল ফল, কিংবা ভাল মদ, নয়ত পেয়ালা খানেক সুপ নিয়ে যাই। উনি একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েছেন।

আজ ওঁর ওখানে যখন যাচ্ছি, লুই আর ভিয়ারের সঙ্গে দেখা। লুই হেসে প্রশ্ন করল।

"কাদের বাড়ীর বউ গো? একা সাত সকালে যাও কোথায়?"

"আমি জাকো-গিন্নির ওখানে যাচ্ছি লুই।"

"আমিও যাব, চল ভিয়ার।" বুড়ীর বাড়ীতে তিন জনেই গিয়ে হাজির হলাম। দু' জন ভদ্রলোককে বাড়ীতে আসতে দেখে ভদ্রমহিলা দারুণ বিব্রত হয়ে পড়লেন। আমি তখন জানালাম যে আমার স্বামী ও তাঁর বন্ধু এসেছেন, উনি লুইয়ের হাত ধরলেন।

"তাই বলি বাছা! তুমিই আমার বউমার সোয়ামী? অসহায় এই বিধবাকে ও যে-ভাবে সেবা করছে, ভগবান সেজন্য ওকে পুরস্কৃত করবেন, এই বিশ্বাস আমার অন্তরে বদ্ধমূল।" সস্নেহে উনি লুইকে বললেন, "সৈন্য বিভাগে কাজ কর? বেশ। আমার জোসেফও ওখানেই কাজ করত; বেচারা! আমার একমাত্র ছেলে! ক্রিমিয়া থেকে আর ফিরল না। এই ওর একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন আমার ঘর আলো করে আছে।" উনি ইশারায় দেখালেন দেওয়ালে ঝলনো একটা মিলিটারী পোষাক।

"ওর সাহস ছিল অসাধারণ।—ওর দেহ থেকে কি পাওয়া গিয়েছিল জান? মারী বোলনএর দেওয়া একটা লকেট আর আমার একটা চিঠি।" বুড়ী চোখ মুছলেন।

"ও এখন মাদাম তুস্যাঁ বুঝলে।—মারীর কথা বলছি। ক্যামাসেনা'র ধনী হোটেলওয়ালাকে ও বিয়ে করল। জোসেফ যে কি ভালই বাসত ওকে! যুদ্ধের শেষেই ওদের বিয়ে হবে ঠিক ছিল। মারী মেয়ে বড় ভাল; মাঝে মাঝে এখনো আমার দেখা-শোনা করে। ওর স্বামীকে ধরে ও আমায় এই বাড়ীটা কিনে দিয়েছে। ঘরে ওর দুটি সন্তান: আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ জননী। বেচারা জোসেফ!" বহুক্ষণ এ জাতীয় গল্প চললো। আমরা চলে যখন আসছি, উনি লুইয়ের হাত ধরে বললেন, "আচ্ছা বাবা, ভগবান নাকি বিধবাদের প্রার্থনা শুনতে পান? তা যদি সত্যি হয়, যে ক'টা দিন বেঁচে আছি আমি তোমার আর আমার বউমার মঙ্গল কামনায় রোজ তাঁকে স্মরণ করব।"

১ই নভেম্বর।—মা আর বাবা এসেছেন। লুই আর আমি দরজায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। পাঁচটা নাগাদ একটা ফিটন এসে থামল; আমরা দৌড়ে গেলাম। বাবাই প্রথমে আমাদের দেখতে পেলেন।

"এই যে মার্গরিৎ", উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "বেশ দেখতে লাগছে ত তোকে!"

মা তাড়াতাড়ি নেমে এসে আমাকে আর লুইকে বুকে চেপে ধরলেন। আনন্দে দুই চোখে তাঁর অবিরল ধারাতে জল ঝরতে লাগল। বাবা যে কত বার আমায় চুমা খেলেন!

"বাবা, কত কাল বাদে যে তোমাদের দেখছি!"

"এখানে ভাল লাগছে ত মার্গরিৎ?"

"হ্যাঁ বাবা, খুব ভাল জায়গা।"

এই সব আলোচনার মধ্যে লুই এসে জুটল; "কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে শুনি?" হেসে ও প্রশ্ন করল।

"বাবাকে বলছিলাম যে জায়গাটা বড় চমৎকার!"

ও চুপ করে থাকলেও ওর মুখর চোখ দু'টি জল-জল করছিল।

"চল, ভেতরে যাওয়া যাক," ও ডাকল, বেশ ঠাণ্ডা লাগছে, মার্গরিৎ, আর বাইরে থাকা উচিত হবে না।"

মাকে ওঁর ঘরে নিয়ে গেলাম; সোফায় বসে আমার মুখ উনি দুই হাতে চেপে ধরলেন। মনে পড়ল, এভাবে একদিন আদর করতেন প্রুয়ার ভেনের কঁতেস। দু'ফোঁটা জল নেমে এল আমার চোখ দিয়ে; অনুশোচনা? না, মোটেই না, কারণ মুখে আমার হাসি ছিল। মা আমার শিরশ্চুম্বন করলেন।

"মার্গো, ওকে তুই এখন ভালবাসিস ত?"

"হ্যাঁ মা!"

"জগতে সবার চেয়ে বেশী?"

"হ্যাঁ মা!"

মা হাসলেন ; চেয়ে রইলেন আমার দিকে। "চল মার্গো, ভগবানকে আজ ধন্যবাদ জানাই তাঁর অসীম করুণার জন্য।"

"হ্যাঁ মা, চল।"

বিশ্বতারকের চরণতলে নতজানু হয়ে বসলাম আমরা।—তারপর যখন বৈঠকখানায় গেলাম, দেখলাম লুই একা বসে আছে আগুনের ধারে (আজকাল বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে); পেছন থেকে গিয়ে ওর পিঠে হাত রাখতেই ও চমকে উঠল; আমার দিকে তাকাল; ওর কটা চুল আর প্রশস্ত কপাল আগুনের সামনে চক্চক্ করছিল; দুই চোখে ওর সুখের আমেজ। ওকে বুকে ধরে জানতে চাইলাম, "একা বসে যে? বাবা কই?"

"ওপরে, ওঁর ঘরে আছেন।"

উঠে দাঁড়িয়ে ও আমায় ওর শূন্য স্থানে বসিয়ে দিয়ে বলল, "আগুনের ধারে একটু জিরিয়ে নাও গো; বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছ!" আমার পাশেই ও বসল। আমরা কতক্ষণ যে ও-ভাবে কাটালাম জানি না, হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল; মঁসিয়্য ভিয়ার ঢুকল। ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল।

"আয় রে!" লুই হেসে ডাকল ওকে; তার পর যেমন ভাবে বসেছিল, সেই ভাবেই ও ভিয়ারকে হাত ধরে বসাল আমাদের কাছে।

ভিয়ার বলল যে, বাবা এসেছেন শুনে ও এসেছে তাঁর সাথে আলাপ করতে।

"কিন্তু লযেন্দ্র, তোর কি শরীর খারাপ নাকি?"

"আমার? কোন্ দুঃখে? একটু আরাম করছি রে। জানলি, যখন ওর কোলে মাথা রেখে তুই আর ওর হাত দুটো ভেসে চলে আমার ওপর দিয়ে, তখন আমি বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলি যেন।"

এমন সময় বাবা এলেন। লুই চটপট উঠে ওঁকে একটা কেদারা এগিয়ে দিল। ওঁর সঙ্গে ভিয়ারের আলাপ করিয়ে দিলাম; মা না আসা অবধি বহু গল্পই হল। তার পর আমরা খেতে গেলাম।

১০ই নভেম্বর। আগামী পয়লা ডিসেম্বর আমরা নীস থেকে চলে যাব। কিছু দিন প্যারীতে কাটিয়ে আমরা ফিরে যাব আমার জীবনের বহু স্মৃতি-বিজড়িত বৃটানিতে। আমার ইচ্ছে, আমাদের সন্তান ওখানেই ভূমিষ্ঠ হোক, লুইও তাই চায়। বৈঠকখানার চিমনীর পাশে মা আর আমি এক দিন সন্ধ্যেবেলা বসেছিলাম। লুই আর বাবা বেরিয়েছেন। বৃটানির গল্প হচ্ছিল। কঁতেস কেমন আছেন, আমি জানতে চাইলাম।

"মাথার অবস্থা খুবই খারাপ।" মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"ওর ভাই ওখানেই আছেন?"

"হ্যাঁ মিলিটারীর কাজ ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বোনের দেখাশোনা করছেন তিনি।"

নানা স্মৃতি একের পর এক ফিরে আসছিল। হঠাৎ মা আমায় প্রশ্ন করলেন, "মার্গরিৎ, তুই এবার মা হচ্ছিস, তাই না?"—আমিও
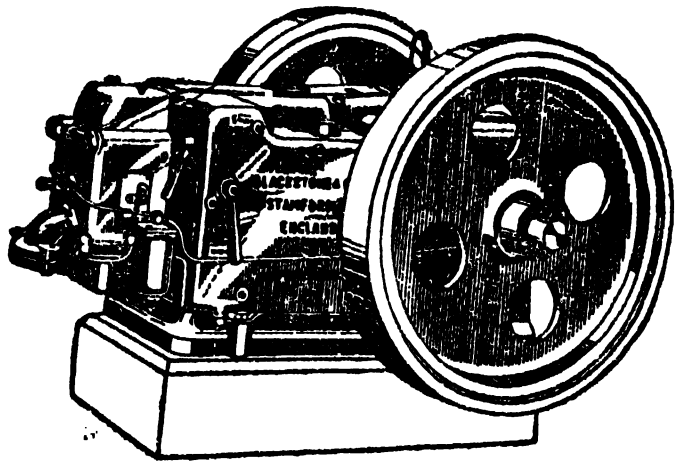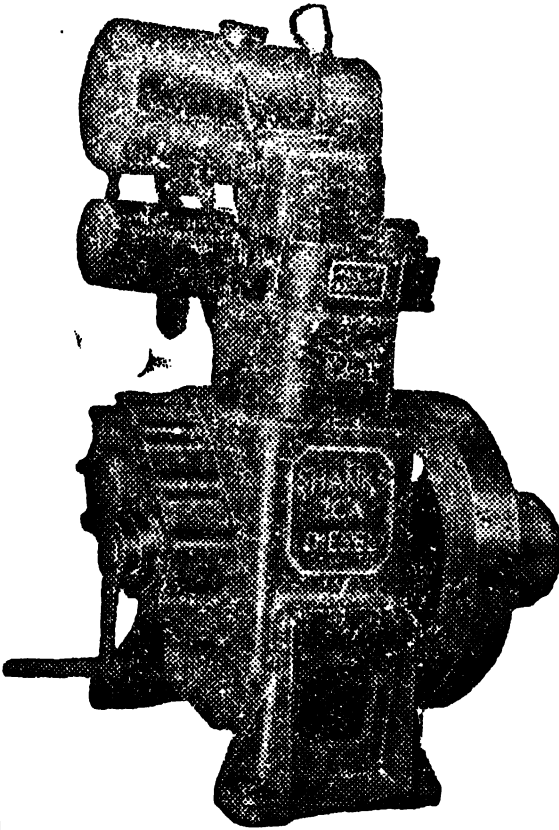
ওর মত আড়ষ্ট গলায় উত্তর দিলাম, "হাঁ মা!"—নীরব আশীর্বাদে উনি আমায় বুকে টেনে নিয়ে জানতে চাইলেন, "কত মাস হল রে?"

"জানি না ত!"—শুনে মা হাসলেন।

"ওর প্রয়োজনীয় যা কিছু সব তৈরী রেখেছিস?"

আমি মাকে নিয়ে গেলাম আমাদের ঘরে। একে একে দেখলাম লুই আর আমি যা যা কিনেছিলাম ভাবী পুত্রের জন্ম। মা ড্রয়ার খুলে বলে উঠলেন, "এই ছোট বুট-জোড়া কি কাজে লাগবে রে? এই ভেলভেটের খুদে মিলিটারী টুপি, মিলিটারী পোষাক? এসব কি করেছিস মার্গারিৎ? হুঁ, এটা বরং দরকার লাগবে," বলে এক প্যাকেট লিনেন বার করলেন, "কিন্তু এত অল্পে কি হবে? বেশ আমিই ওর কাঁথা-কোলটের বন্দোবস্ত করব, তুই ভাবিস না।"

"হ্যাঁ মা," আমি হাসলাম, "সেই ভাল, আমি ত এ সবের কিছুই জানি না।"—এমন সময় নীচে বাবার আর লুইয়ের গলা শোনা গেল। সিঁড়িতে লুইয়ের সঙ্গে দেখা। মা ওর সঙ্গে করমর্দন করে নেমে গেলেন। লুই আমার দিকে ফিরে জানতে চাইল, "কি ব্যাপার গো?"

"উনি জানতে পেরেছেন যে আমাদের ঘরে নতুন অতিথি আসছে। কি করে জানলেন বল ত?"

"এতে আর অবাক হবার কি আছে?" ও হাসল।

"ওগো তুমিই বুঝি বলেছ?

"না গো!" বলে ও আমায় নিয়ে গেল আমাদের ঘরের মধ্যে।

"লুই, মা বলছিলেন ফেব্রুয়ারী নাগাদ ও জন্মাবে, সত্যি?"

"হ্যাঁ গো, সবই ভগবানের মর্জি।"

"কিন্তু লুই—" একটু থেমে আমি বললাম।

"ও-সময় কিন্তু আমি বৃটানিতে থাকতে চাই।"

জানি না আমার গলা কেঁপে উঠল কি না, কারণ জাসম্যাঁর সেই করুণ গানটা হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল। চট করে লুই মুখ তুলেই আমায় জড়িয়ে ধরল।

"এতে আর বলার কি আছে গো? তোমার মার চেয়ে ত এ সময়ে আর কেউ ভাল ভাবে তোমার শুশ্রূষা করতে পারবে না!"

বাবার কানেও মা কথাটা তুলেছেন বুঝলাম; খাবার সময় তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, "ভগবান তোদের রক্ষা করুন মা, তোকে, লুইকে, তোদের ভাবী সন্তানকে।"

খানিক বাদে লুই এল। বড় আনন্দে কেটে গেল সন্ধ্যাটা।

২০শে নভেম্বর।—আজ আমরা সবাই মঁসিয়্য ভিয়ারের ষ্টুডিও দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের সেই ছবিটা ও দেখাল; এখনো শেষ হয়নি; তবু অতি অপূর্ব লাগল। আমি এক কোণে বসে আছি লুইয়ের দিকে মুখ নামিয়ে, আর ও শুয়ে আছে ঘাসের ওপর, আমার কোলে মাথা রেখে। এক হাতে ও ধরে আছে আমার বুকের লকেটটা; ওর মুখে মৃদু হাসি; আমার মুখ যেন একটু গম্ভীর, তবু আশার মাধুর্যে মগ্ন। ছবিটার নাম দিয়েছে 'প্রেমের স্বপ্ন'।—বাবার অত্যন্ত ভাল লাগল, মার ত কথাই নেই। লুইয়ের বড় পছন্দ হয়েছে ছবিটা, আমারো। কাল সকালে মঁসিয়্য ভিয়ার পারী চলে যাচ্ছে। আজ আমাদের এখানেই ও খেল; বিদায় নিয়ে গেল।

২৩শে নভেম্বর।—লুই আর আমি জাকো-গিন্নিকে বিদায় জানিয়ে এলাম। আমরা দেশে যাচ্ছি শুনে বড়ই দুঃখিত হলেন উনি। ওঁর ঘরে ঢুকে দেখি, একহারা চেহারায় এক ভদ্রমহিলা বসে; আমাদের অভিবাদন জানিয়ে উনি দুটো চেয়ার এগিয়ে দিলেন। ইনিই মাদাম তুস্ত্যাঁ, বনাম মারী বোলেন।

"মা, তুই কাল চলে যাবি?" অতি কাতর স্বরে বললেন জাকো-গিন্নি।" "তোরা সুখী হ, এই প্রার্থনাই ম্যার জাকো তোদের জন্তে দিন-রাত করবে রে!"

ওঁর কাছ থেকে আসার সময় চুপি চুপি দুটো গিনি দিয়ে এলাম ওঁর হাতে। মারী বোলেন আমাদের পৌঁছে দিলেন দরজা অবধি।

১০ই ডিসেম্বর, ১৮৬১। এখনো আমরা পারীতেই আছি, তবে পরশু দিন দেশে যাব। এক নাগাড়ে বেশী রাস্তা যাই, লুই তা চায় না, পাছে আমার কষ্ট হয়। সর্বদা ওর সতর্ক দৃষ্টি—কিসে আমার ভাল হয়। কাল ঠাকুমা আমাদের এখানে এসেছিলেন। প্রতিদিন বিকেলেই উনি আসেন, গাড়ীতে চড়ে বেড়াতে যান আমাদের সঙ্গে; রোজ সকালে আমি যাই ওঁর ওখানে। আমায় উনি বড় ভালবাসেন। কাল আমাদের সঙ্গে মা যেতে না পারায় উনি, লুই, আমি তিন জনই শুধু বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাবা গিয়েছিলেন ওঁর বন্ধুর বাড়ী। বুলোঞি বাগানে ঠাকুমা আমাদের দু'জনকে গাড়ী থেকে নামতে বললেন। ঘণ্টাখানেক ওখানে হাঁটার পর লুই আমায় গাড়ীতে উঠতে ইঙ্গিত করল।

"কি গো, ক্লান্ত লাগছে না ত?" উৎকণ্ঠিত ভাবে ও জিজ্ঞাসা করল।

"কি যে বলিস," ঠাকুমা ঠাট্টা করলেন, "আমি থুথুরে বুড়ী, দিব্যি তাজা আছি, আর ও কি না ক্লান্ত হয়ে পড়বে?"

"কিন্তু এ অবস্থায় ওর বেশী হাঁটাহাঁটি করা ভাল নয়," ওর পেছন পেছন গাড়ীতে ঢুকে লুই বলল। ঠাকুমা কয়েক মিনিট কি ভাবলেন, তার পর আমার দিকে তাকালেন, "ওহো, এতক্ষণে আঁচ করেছি। তাই নাকি রে?"

আমি লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইলাম।

"এই ত তোর গাল দুটো কেমন টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছে বাছা, আমার বাহাত্তুরে না পেলে কি এত দেরী লাগত বুঝতে!" বলে উনি আদর করলেন।

"ভাবতেও কেমন লাগে যে তুই আজ মা হতে চললি, আর আমি, আমি এখনো আইবুড় রয়ে গেলাম! বলি খুদে শয়তানটা আসছে কবে?"

"বোধ হয় ফেব্রুয়ারী মাসে, ঠাকুমা!"

"আর ত মোটে ক'দিন!" উনি উল্লাসে অধীর হয়ে উঠলেন "তাই বলি তোর এমন চেহারা হয়েছে কেন; ষোল বছরে বিয়ে হওয়ার এই এক ঝামেলা বাপু; সতেরোতে পা দিতে না দিতে কোলে একটি ট্যাঁ ট্যাঁ করবে। কিন্তু তুই আমায় প্রণাম করলি না ত?"

ওঁর বাসনা পূর্ণ করলাম।

"অগাধ সম্পত্তির মালিক হবে রে তোর ছেলেটা; দেখিস, আদরে মাথাটা খাস না যেন!"

বাড়ী না যাওয়া অবধি এই কথাই হচ্ছিল।

৩০শে ডিসেম্বর। বৃটানি। দেশে ফিরে যে কী ভাল লাগছে! যেদিন পৌছলাম, বরফ পড়ছিল। একটা প্রকাণ্ড সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে প্রকৃতি উপভোগ করছিলেন জ্যোৎস্নার রজত-আশীষ; চার দিক ঝলমল করছিল। ভাল পশমী কাপড়ে লুই আমার সারা গা সযত্নে ঢেকে দিল; বাবা বললেন টুপিটা মুখ অবধি টেনে আনতে। আমাদের গাড়ী অপেক্ষা করছিল; উঠে বসতেই ঘোড়া ছুটো টকাটক্ টকাটক্ করে দৌড় দিল। তেরেস বাড়ী পাহারা দিচ্ছিল। আমাদের প্রতীক্ষায় ছিল। আমায় দেখে কি ওর আদরের ঘটা, "এই ত দিদি, ফিরে এলি ঘরের মেয়ে ঘরে!"

লুই ওকে অভিবাদন জানাল; আমরা খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম; ওখানে শুকনো আঙুর-লতার গনগনে আগুন সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। তেরেস আমার গরম জামা, জুতো খুলে নিল; ওগুলো তুষারে ভরে গিয়েছিল। মা ওঁর ঘরে গেলেন। এত দিন বাদে সবাই বাড়ীতে জড় হয়েছি, ওঁর মুখে হাসি ধরে না! লুই আর বাবা গেলেন পোষাক বদলাতে। আমায় শুকনো জামা-কাপড় এনে দিয়ে তেরেস আমার পা চিমনির ধারে তুলে দিল। ওকে ধন্যবাদ দিতে গেলাম; ও বাধা দিল।

"তুই এসেছিস খুকুদি, আজ আমার বড় আনন্দের দিন, দেখছিস না, তোর জন্যে ভেবে ভেবে আমি কত বুড়ো হয়ে গেছি? কিন্তু তোকে দেখে এখন মনে হচ্ছে দশ বছর আমার কমে গেছে একদিনে; খুদে মঁসিয়্য যে আসছেন, তাঁর উপযুক্ত দাই হবার মত শক্তি এখনো রাখি। তোবও আমি দাই ছিলাম না? তোর মায়ের? আর এবার তোর ছেলের দাই হব!"

ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল ভাবের অনুভূতিতে। আমাদের ছেলে! আমার সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চিন্তা আজ ওকে ঘিরে; লুইয়েরও সেই দশা। মা ওর জন্যে কাঁথা-কোলট তৈরী করছেন। লুই নীস্ গিয়েছে; সপ্তাহ খানেক ওখানে থাকতে হবে। অন্ততঃ দুই মাসের ছুটি নিয়ে ফিরবে। বড় সুন্দর ভাবে খ্রীষ্টমাস কাটল। সকাল আটটায় গীর্জাতে গিয়েছিলাম। সারা গ্রাম ওখানে ভেঙ্গে পড়েছিল। সবাই আমার সঙ্গে করমর্দন করলে, সবাই গায়ে পড়ে দু-দশটা ভাল কথা শোনাল। কৃতজ্ঞতায় নত হৃদয়ে আমি বসলাম গিয়ে বেদীর সামনে। দোলনায় শোয়ান নবজাত যীশুকে প্রণাম করলাম। ভাবতে লাগলাম, আমার সন্তানের কথা। মা, মেরী, আমায় পথ দেখাও, আমায় বল দাও, প্রাণে আমার শক্তি দাও, আমি যেন আদর্শ জননী হতে পারি। লুই ছিল আমার পাশে; ওর ভাবনা আর আমার ভাবনা একই খাতে বয়ে চলেছিল।

মঁসিয়্য ভাল্পোয়ান্ আর তাঁর স্ত্রী ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। রুদ্র পুরুষসুলভ গাম্ভীর্যে আমার সঙ্গে করমর্দন করল। হেলেন আমায় দেখে লজ্জায় কথাই বলছিল না; ওর মায়ের আড়ালে আড়ালে ঘুরছিল; শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওর আগের

বাচালতা বেরুতে দেরী হল না। ছোট পিয়েরের দিকে হাত বাড়াতেই ঘুম করে ও চলে এল।

কাল গিয়েছিলাম কঁতেসকে দেখতে; সঙ্গে ছিল লুই। ও আমায় বারণ করে দিল, যেন অনর্থক নিজেকে দুর্বল না করে ফেলি। একা গিয়ে ওঁর ঘরে ঢুকলাম। ত্যানোয়ার পুরনো চাকর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

"মামজেল্ আর্ন্ডের।"—ও আমায় বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। কঁতেস একটা সোফায় শুয়েছিলেন। চিমনীর ধারে বসেছিলেন কর্ণেল। উনি কাগজ পড়ছিলেন; আমায় প্রথমে দেখতেই পান নি। কিন্তু আমায় দেখে কঁতেস ধড়মড় করে ওঠাতে উনি ফিরে তাকালেন।

"ত্যানোয়া যেখানে আছে, সেই দেশ থেকে ও ফিরেছে; বল মা, ত্যানোয়ার খবর কি?" কঁতেস ধরে বসলেন: হেসে আমার হাত দুটো ধরলেন। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে না।—আচ্ছা, ওকি ওর ভাইকে খুন করেনি?" ফিস্ ফিস্ করে আমায় উনি প্রশ্ন করলেন। কর্ণেল ওঁকে সোফায় শুইয়ে দিলেন। উনি হাসলেন। ওর কথামত শুয়ে রইলেন। চুপি চুপি কর্ণেল আমায় জানালেন যে দিন দিন অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছে।

"এই ক'দিন আগে ত দেখে গিয়েছিস ওকে; আর এখন দেখ, কি রোগা আর বুড়ী হয়ে গেছে এর মধ্যে।" কর্ণেল বললেন।

"হ্যাঁ, তাই ত দেখছি।" ওঁকে দেখে আমার চোখে জল এল।

"তুই আনন্দে আছিস ত মা?" কর্ণেল জিজ্ঞাসা করলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" ওঁর দিকে চোখ তুলে উত্তর দিলাম।

খানিক কথা-বার্তার পর উঠলাম, কঁতেস অভ্যাস মত আলিঙ্গন জানালেন। কর্ণেল গাড়ী অবধি এলেন, লুইয়ের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

"ম'সিয়্য, ও তোমায় পেয়ে সুখী হয়েছে; ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই সর্বান্তঃকরণে। ওরই সুখী হওয়া সাজে।"

মাদমোয়াজেল গোসরেল আমাদের এখানে সেদিন এসেছিল। সঙ্গে ছিলেন আর একটি ভদ্রলোক। ছুটে এসে ও আমায় জড়িয়ে ধরল; তার পর সঙ্গীর পরিচয় দিল, "ইনি হচ্ছেন ম'সিয়্য লাকোস্ত, মার্গরিৎ, আমার ভবিষ্যৎ স্বামী; দেখলি ত, তোর মত ঢাকাঢুকি আমার স্বভাব নয়!" বলে সে কি হাসি।

"বুঝলি, ব্যাঙ্কার। টাকার কুমীর!"

সহাস্য ম'সিয়্য লাকোস্তের দিকে আমি তাকাতে গোসরেল বলে চলল, "উনি আমায় হাড়ে হাড়ে চিনেছেন; জানেন, ওঁকে আমি কত ভালবাসি আর সোনা-দানার প্রতি আমার টান কত। তাই না বিশার?"

হেসে উনি উত্তর দিলেন; "ধন্য ওরস্তাস, বলিহারি তোমার প্রখর বুদ্ধির।"

গোসরেল একটু গম্ভীর ভাবে জানতে চাইল, "আচ্ছা মার্গরিৎ, তোর শরীর কি এখনও সারে নি? এসে দেখলাম তুই সোফায় শুয়ে আছিস।"

একটু মুস্কিলে পড়লাম, "নাঃ, ভালই ত আছি।"

"ম'সিয়্য লফেভ্র কই? ওর নাম দিয়েছি ক্রুদ্ধ সৈনিক।"

—নীস্-এ গিয়েছেন।"

"ওহো, ওর রেজিমেন্ট বুঝি এখন ওখানে?"

"হ্যাঁ।"

"মিলিটারীকে বিয়ে করার অসুবিধে কত দেখেছিস ত'? বাড়ীতে অতি অল্প সময়ই ওরা কাটাতে পারে; তা ছাড়া যুদ্ধের সময় ত'..."

"এখন ত' আর যুদ্ধ নেই কোথাও, আর কোথাও লাগার সম্ভাবনাও ত' দেখি না।" আমি উত্তেজিত হয়ে বাধা দিলাম। তার পর গর্বের সুরে বললাম, "সৈনিকের কর্তব্যই ত হল দেশের বিপদে এগিয়ে যাওয়া; সব ধর্মের ওপর তার ধর্ম হচ্ছে স্বদেশ-প্রেম!"

"দেখলে ত বিশার, কি ভাবে স্বামীকে পাখার আড়ালে ঢেকে রেখেছে! কবে ফিরছে ম'সিয়্য লফেভ্র?"

"সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই। আন্দাজ দুই-তিন মাস ছুটি নিচ্ছে।"

"ওঃ, সুন্দরীর পাশে বসে কাটাবার জন্য? আশা করি বেচারার ছুটি মঞ্জুর হোক।"

যাবার আগে গোসরেল ওর বিয়েতে যাবার জন্য নেমন্তন্ন করে গেল, "আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী, বুঝলি মার্গরিৎ? আসা চাই-ই।"

"হ্যাঁ, যদি যেতে পারি।"

"তার মানে: যদি স্বামী যেতে দেয়? বেশ, তোর স্বামীর নামেও চিঠি পাঠাব; একটু চেপে ধরলেই রাজী হয়ে যাবে, বুঝলি? তোর ঐ গোলাপী ওষ্ঠের একটা স্পর্শই ওকে কাত করতে যথেষ্ট।"

৮ই জানুয়ারী, ১৮৬২। নতুন বছর শুরু হয়েছে। লুই ফিরেছে আজ। পকেটে তিন মাসের ছুটির অনুমতি। কত দি[ন] বাদে যেন ওকে দেখলাম। বাবা আমায় নড়াচড়া করতে দেন নি, তাই আপন মনে দাঁড়িয়েছিলাম বাইরের ঘরের দরজায়। বহু দূ[র] থেকে লুইকে দেখতে পেলাম,—ঘোড়ায় চড়ে আসছে। তর-ত[র] করে ও সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল; আমি মুখ ঢাকলাম ওর বুকে। বহুক্ষণ ওই ভাবে ছিলাম, এমন সময় বাবা এসে গেলেন।

"বাইশ বছরেই কি কেউ এমন প্রেমে পড়ে?" হেসে উ[নি] বলাতে লুই ওঁর দিকে তাকিয়েই বড় অপ্রস্তুত হল। ওর স[ঙ্গে] করমর্দন করল; বাবা ওর কপালে এঁকে দিলেন স্নেহচুম্বন।

"যা বাবা, তোর ওপর ভারি সন্তুষ্ট হয়েছি; ছুটি মঞ্জুর হল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তিন মাসের ছুটি।"

বাবা বাইরে গেলেন; লুই ঢুকল আমাদের ঘরে, ময়[লা] জামা-কাপড় বদলাতে; আমি ওকে অনুসরণ করলাম।

"বুঝলে গো, আমাদের ওপরওয়ালা কর্ণেল লোকটি বড় ভা[ল]" আমার দিকে সরে এসে ও বলল, "ওঁর কাছে ছুটি চাইতেই উ[নি] কারণ জানতে চাইলেন। পারিবারিক ব্যাপারে ছুটির প্রয়ো[জন] শোনামাত্র উনি তক্ষুণি ব্যবস্থা করে দিলেন।"

ওকে মাদমোয়াজেল গোসরেলের নিমন্ত্রণের কথা জানাতে হাসল।

"তোমার পক্ষে ত' তখন যাওয়া অসম্ভব: আমারো সেই অব[স্থা] কারণ তখন যে আমাদের ঘরে বাতি জ্বলবার সময়, না গো" বলে আমার আকুল চুমায় ভরে দিল।

১১ই জানুয়ারী, ১৮৬২। পরশু রাতে বড় খারাপ [স্বপ্ন] দেখেছি। ধড়মড় করে উঠে তাকিয়ে রইলাম আমার স্বা[মীর]

দিকে। চিমনীর অস্পষ্ট আলো এসে ওর মুখে পড়েছে। কি প্রশান্তিতেই ও ঘুমিয়ে আছে! আমার চোখ থেকে দুই ফোঁটা জল ঝরে পড়ল; হায় ভগবান! সত্যি কি তবে আমায় চলে যেতে হবে এই পৃথিবী থেকে? আমার সুখের প্রভাত সবে হয়েছে শুরু, আর এরই মধ্যে তলব আসবে? সন্তর্পণে স্পর্শ করলাম ওর কপাল, "কি গো, কি বলছ?" বলে ঘুমের ঘোরেই ও আমায় বন্দী করল স্নেহাতুর বাহুপাশে। ওর বুকে বুক দিয়ে বহুক্ষণ জেগে রইলাম। উঃ, এ কি দুঃস্বপ্ন!

কাল রাতে লুইকে স্বপ্নটা বললাম। রাত তখন দশটা হবে; কাপড়-জামা বদলে জানলার কাছে অপেক্ষা করছিলাম লুইয়ের জন্য। বাইরে সব কিছু সাদা ধবধব করছে ম্লান জ্যোৎস্নায়। খানিক পরেই লুই এল। আমি উঠে দাঁড়ালাম; পরস্পরের সান্নিধ্যে আমরা চেয়ে রইলাম বাইরের দিকে। গাছ থেকে এক এক করে ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা, টুপ টুপ করে টোকা দিয়ে যাচ্ছে আমাদের জানালার কাচে, প্রজাপতির মত হাল্কা পাখায় কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছে! হঠাৎ আমি বলে উঠলাম, "লুই, আবার যখন আসবে গাছে গাছে সবুজের জোয়ার, আমায় তখন আর তোমার পাশে পাবে না; আমি তখন শীতল ঘাসের তলায় চিরবিশ্রামে থাকবো মগ্ন!"

"ভগবান, এ ব্যথা যেন সইতে না হয়, প্রভু!" ওর মুখ দিয়ে কথা ক'টি বেরিয়ে এল। দারুণ আবেগে ও আমায় ঘিরে ধরল সমস্ত অঙ্গ দিয়ে। তার পর আমায় শুনিয়ে একটু ঠাট্টার সুরেই বলল, "কি যে সব আজেবাজে চিন্তা তোমার! তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ছেলের মা হতে চলেছ—এই সব কথা বুঝি রাত-দিন ভাবছ? গেল সপ্তাহে আমি এখানে ছিলাম না, সেই অনুপস্থিতির ফাঁকে ছোট্ট মাথাটি একেবারে দুশ্চিন্তার আঁতুড়-ঘর করে তুলেছ!"

"তুমি হয়ত ঠিকই বলেছ লুই, কিন্তু কাল রাতে যা স্বপ্ন দেখেছি,—ভয়ে আমি আকুল হয়ে উঠেছি!"

"আচ্ছা বিপদ, আমাকে ডেকে তুললে না কেন? এই অবস্থায় কখনও মনে ভয় পুষে রাখতে হয়?"

"তুমি এমন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছিলে, ডাকতে মায়া হল। আমি তোমার গা ঘেঁসে শুলাম, তুমি আমায় টেনে নিলে তোমার বুকে, আদর করে কি যেন বললে; তাতেই আমি অনেকটা স্বস্তি পেলাম।"

"আচ্ছা, তোমার স্বপ্নটা শোনাই যাক", চপল কণ্ঠে ও বলল, "তোমার মত সাহসী মেয়ের মনে ভয় যখন ঢুকেছে, মনে হয় অতি ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছ স্বপ্নের ঘোরে?"

"স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি একা শুয়ে আছি, এমন সময় কে যেন টোকা দিল পাশের জানলায়; ঘুম ভেঙে আমি উঠতে পারছি না, এত অবসন্ন লাগল, এমন সময় যেন বাবার গলা শুনলাম, দরজা খুললাম, দেখি কেউ নেই। বাইরের ঘরে গেলাম, তোমায় দেখতে পাবো ভেবে। দরজা খুলে ঢুকে দেখি তুমি দাঁড়িয়ে আছ জানলার ধারে, বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে। আমি গেলাম, জড়িয়ে ধরলাম তোমায়, তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না ভেবে যেমন চোখ তুলেছি, দেখি, কই তোমার মুখ! মৃত্যু নিজে দাঁড়িয়ে আছে!—তখুনি আমার ঘুম ভেঙে গেল।"

লুই আগা-গোড়া মন দিয়ে শুনল। শেষ হওয়ামাত্র হেসে বলে উঠল, "দেখ গো, ভাল করে চেয়ে দেখ এখন আমায়, যমের মত লাগছে না কি!"

"ধেৎ!" আমি জবাব দিলাম। ওর অপূর্ব চেহারা, আশা আর স্নেহে ভরা চোখ, অসীম ভালবাসা ভরা হাসি আর আনন্দোচ্ছল মুখ দেখে আমার ভয় সব উবে গেল। আমি ওর মুখে মুখ রেখে আপন মনে বলে উঠলাম,—

"তোমার নয়ন উদিবে হেথায়
তারকা-সম,
তাহারি রশ্মি উজলিবে প্রিয়
স্বপ্ন মম।"

ও হাসল, "মার্গারিৎ, আমার উদ্দেশ্যেই বলছ না কি?" বলে আমায় ওর বুকে টেনে নিল। তার পর একটু গভীর গলায় বলল, "আচ্ছা, মার্গারিৎ, কোন প্রাণে তুমি ভাবতে পার যে আমাদের এই সত্ত সাজানো সংসার থেকে ভগবান তোমায় সরিয়ে নেবেন? না মার্গারিৎ, এ কথা মনে রেখ যে ভগবান এত নিষ্ঠুর হতে পারেন না!"

আমি চুপ করে রইলাম। কে জানে? ভগবান যা করেন তা আমাদের মঙ্গলেরই জন্য, বাইরে থেকে সব সময় তা সহনীয় না হতেও পারে! [ক্রমশঃ।

অনুবাদ:—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

শ্রীশ্রীসারদা দেবী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমালতী গুহ-রায়

ত্যাগের অভাবই সংসারে সকল অশান্তির মূল। সংসারীরা তা বোঝেনা। ভোগের পিছনে তৃষ্ণার্ত্ত হয়েই শুধু ছোটে। তাই পৃথিবীতে এত সংঘাত। ত্যাগের পথই যে শান্তির পথ, তা সারদা দেবী নিজ জীবনে আচরণ করেই দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর জীবনকে আমরা উদাহরণ হিসাবে পেতে পারি। সব কিছু বিলিয়ে দিয়েই তিনি সব কিছু পেয়ে দেব-মানবী হতে পেরেছিলেন। সাংসারিক দৃষ্টিতে লোকে যা-ই ভাবুক না কেন, তাঁকে হারাতে কিছুই হয়নি।

শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, বিশ্রাম, খাওয়া, চলা, বলা কিছুই যেন সারদা দেবীর নিজের জন্ত ছিল না। এমন কি, অবসর সময়ের চিন্তা-ভাবনাটুকুও অপরকে ঘিরে হ'ত। জগতের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল সর্ব্বদা নিঃস্বার্থ হয়ে কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকতে। কর্ম্ম দিয়েই পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলের ক্ষয় হয়। তিনি বলতেন, 'সর্ব্বদা আত্মদোষানুদর্শী হও, তবেই প্রকৃত শান্তির পথ খুঁজে পাবে। মানবজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। মানব-দেহকে ঈশ্বরের মন্দির ভেবে পবিত্র রাখতে চেষ্টা করা মানুষের পরম ধর্ম্ম। অন্তরেই ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তবে সে অন্তর অশুদ্ধ বা কলুষিত হলে চলে না। শুদ্ধ পবিত্র হওয়া চাই।'

এই নিঃস্বার্থ প্রেম ও সেবাব্রত গ্রহণ করতে গিয়ে সারদা দেবীকে যে কতখানি নিঃস্বার্থ হতে হয়েছিল, তার সম্যক ধারণা করাও আমাদের সাধারণ মানুষদের সম্ভব নয়। পরের সেবা আর পরোপকার দিয়েই সারদা দেবীর জীবন সুরু আর তাতেই তার জীবনের অবসান। আত্ম-পরের কোন গণ্ডী আমরা সারদা দেবীর মধ্যে দেখতে পাই না। তাঁর সংস্পর্শে যেই এসেছে, তাকেই তিনি অতি আপন ভাবে গ্রহণ করেছেন।

সারদা দেবীর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল অনলস কর্ম্ম ও অসাধারণ ত্যাগে। ঠাকুরের অগণিত ভক্ত-সন্তানদের জন্ত এবং পরবর্ত্তী জীবনে তাঁর নিজেরও ভক্ত-সন্তানদের জন্ত দিবারাত্রি কত যে পরিশ্রম তাঁকে করতে হ'ত, তা সারদা দেবীর জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পরিচয়ও যাঁর আছে, তাঁর অজানা নেই। আর তাঁর ত্যাগের কাহিনীর বর্ণনা যদিও মনুষ্যসাধ্য নয়, তবু অত্যন্ত ছোট একটি ঘটনা থেকেই তাঁর সমস্ত জীবনের ত্যাগমাধুর্য্য ধরা পড়ে।

দক্ষিণেশ্বরে যখন সারদা দেবী ঠাকুরের কাছে আসেন, ঠাকুরই তাঁর ইষ্টদেব, জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন। তাঁকে সেবা করা, যত্ন করা, আপন হাতে রান্না করে কাছে বসিয়ে তাঁকে খাওয়ানোই তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ ও তৃপ্তিকর কাজ ছিল। খেতে বসে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হ'লে খেতে পারতেন না। তাঁকে অভুক্ত থাকতে হ'ত। সারদা দেবী তাই কাছে বসে পাখা দিয়ে হাওয়া করে নানা কথায় ঠাকুরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়াতেন। এইটিই ছিল তাঁর এক মাত্র সময়, যখন তিনি স্বামীর একান্ত সান্নিধ্য পেতেন। অপর সময় ভক্তরা তাঁকে এমন ঘিরে থাকতো যে, সারদা দেবী তাঁর দর্শনও পেতেন না।

এক দিন একটি স্ত্রী-ভক্ত এসে সারদা দেবীকে বললেন, 'মা, আপনি ভাতের থালা দিন, ঠাকুরকে আমি খাওয়াবো।' এরকম ক্ষেত্রে একান্ত পতিব্রতা স্ত্রীর অন্তরে কি ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক, তা আমরা সহজে অনুমান করতে পারি। সারদা দেবীর এই একটি মাত্র তৃপ্তি একটি মাত্র পরম আনন্দকর কাজ। কিন্তু স্ত্রী-ভক্তটির আন্তরিক ইচ্ছাকে উপেক্ষা করতে তিনি পারলেন না। তুলে দিলেন ভাতের থালা তার হাতে।

সে সময় নারীরা কোন কাজের অছিলা ভিন্ন স্বামীর কাছে যেতে সঙ্কোচ বোধ করতো। আর তাছাড়া সারদা দেবী ছিলেন অত্যন্ত লজ্জাশীলা। স্ত্রী-ভক্তটি ভাত নিয়ে চলে গেল ঠাকুরকে খাওয়াতে। তিনি বসেই রইলেন। কাছে বসে স্বামীর খাওয়াটুকু দেখতে পারলেন না। এর পর থেকে প্রতি দিনই ঐ স্ত্রী-ভক্তটি ঠাকুরকে খাওয়াতে লাগলেন। মুখ ফুটে সারদা দেবী নিজের দাবী বা আকাঙ্খাটুকু জানাতে পারলেন না। অথচ কত কষ্টই না তাঁর হয়েছিল!

ক্রমে তো এমন হ'ল, যে পঞ্চাশ-ষাট গজের ব্যবধানে থেকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস স্বামিদর্শনটুকু থেকেও তাঁকে বঞ্চিত থাকতে হ'ত। ঠাকুরের সমস্ত কাজই ভক্তরা করে দেয়, কাজেই তাঁর আর ঠাকুরের কাছে যাবার সময় কোথায়? এ একটি অনুরক্তা স্ত্রী, ভক্তিমতী ভক্তের পক্ষে কত বড় ত্যাগ, তা আমরা ধারণা করতেও পারি না।

দক্ষিণেশ্বরে কত নাচ-গান হয়, ঠাকুরের কত ভাবসমাধি হয়, দূর-দূরান্তর থেকে লোকেরা দেখতে আসে। সারদা দেবী সে দক্ষিণেশ্বরে থেকেও দেখতে পান না। তিনি তাই নহবৎখানার বেড়ার মধ্যে একটা ফুটো করে তার মধ্য দিয়েই চেষ্টা করেন দেখতে, সাথে সাথে ভাবেন আহা! ভক্তরা কত ভাগ্য করে এসেছে। সব সময় তাঁর কাছে কাছে থাকে, তাঁর দর্শন ও স্পর্শ পায়। আমি যদি এমনি ভক্ত হয়ে জন্মাতুম এ ভাগ্য আমারও হতে পারতো!

আবার নিজের মনেই ভাবতেন, 'আমি কি আর তেমন পুণ্য করে জন্মেছি যে, অমন দেবদুর্ল্লভ স্বামীর নিত্যদর্শন, নিত্যসান্নিধ্য পাবো আর তাঁকে নিত্য সেবা করে ধন্য হবো?'

সারদা দেবী যদি স্বামীর প্রতি নিজ পত্নীত্বের অধিকার

বিন্দুমাত্রও দাবী জানাতেন, তবে কি সর্ব্বাগ্রে তাঁর দাবী বিবেচিত হ'ত না? কিন্তু এক দিনের জন্যও তাঁর কথাবার্ত্তা বা ব্যবহারে তিনি তা প্রকাশ করেন নি। নিজেকে বিলিয়ে দিতে যিনি এসেছেন, কুড়িয়ে নেবেন কেন?

সকলের মতে মত মিলিয়ে সকলের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে থাকতে তিনি অভ্যস্ত হয়েছিলেন। ত্যাগই তাঁর জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল। কাজেই ব্যক্তিগত কোন দুঃখই কোন দিন তাঁকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। সর্ব্ব অবস্থাকে মেনে নিয়ে তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার এমন এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর!

সাংসারিক আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হলে তিনি বলতেন, হয়তো শিবপূজো করতে গিয়ে কাঁটাশুদ্ধ বেলপাতা দিয়েই মহাদেবের পুজো করেছিলুম, তার জন্য এ জন্মে এ কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। যার জন্য তিনি কষ্ট পেতেন তার প্রতি কোন অভিমান ছিল না তাঁর। অপরের দোষই দেখতে পেতেন না তিনি।

ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় অসংখ্য ভক্ত-পরিবৃত হয়ে থাকায়, সারদা দেবী ঠাকুরকে একান্ত ভাবে কখনই পাননি বটে, কিন্তু ঠাকুরের দেহাবসানের পর তিনি তাঁকে সর্ব্বসময়ের জন্য পেতেন। ঠাকুর যেন সত্যি সত্যি ঘর বদলে তাঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন! যেখানে সারদা দেবী সর্ব্বদাই তাঁর দর্শন, স্পর্শন, সান্নিধ্য, আদেশ, উপদেশ, ঠিক যেন দেহধারী স্বামীর মতই পেতেন। এমন কি, শোনা যায় ঠাকুর নাকি তাঁর কাছ থেকে আব্দার করে, কখনো কখনো খিচুড়ী পর্য্যন্ত চেয়ে খেতেন।

ঠাকুরের দেহাবসানের পর মা তাঁর প্রথম জীবন্ত দর্শন পান নিজ বৈধব্যবেশ ধারণকালে। ঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে বলেন, 'আমি আর কোথায় গেছি গো! এ-ঘর থেকে তো শুধু ও-ঘর!' বাস্তবিকই সারদা দেবীর এ অনুভূতি তাঁর দেহাবসান কাল পর্য্যন্ত ছিল। সেজন্যই তিনি সরু লাল পাড়ের শাড়ী ও হাতে দু'গাছা বালা পরতেন। শোনা যায়, সধবার লক্ষণ হিসাবে মাথার পিছন দিকে সিঁদুরও ধারণ করতেন। শুধু তাই নয়, সেই থেকে স্বামীকে তিনি নিত্য ভোগ রান্না করে খাওয়াতেন! নিজ হাতে তাঁর ছবি সাজাতেন, ঘুম পাড়াতেন, জাগাতেন। সব কিছুতেই তিনি যেন ঠাকুরের জীবন্ত সান্নিধ্য পেতেন।

ঠাকুরকে যখন তিনি ভোগ নিবেদন করতেন, তার মধ্য দিয়েই দেখা যেতো তিনি ঠাকুরের উপস্থিতি বা সান্নিধ্য কতটা অনুভব করতেন। 'কৈ গো! এসো, তোমার খাবার দিয়েছি।' কখনো
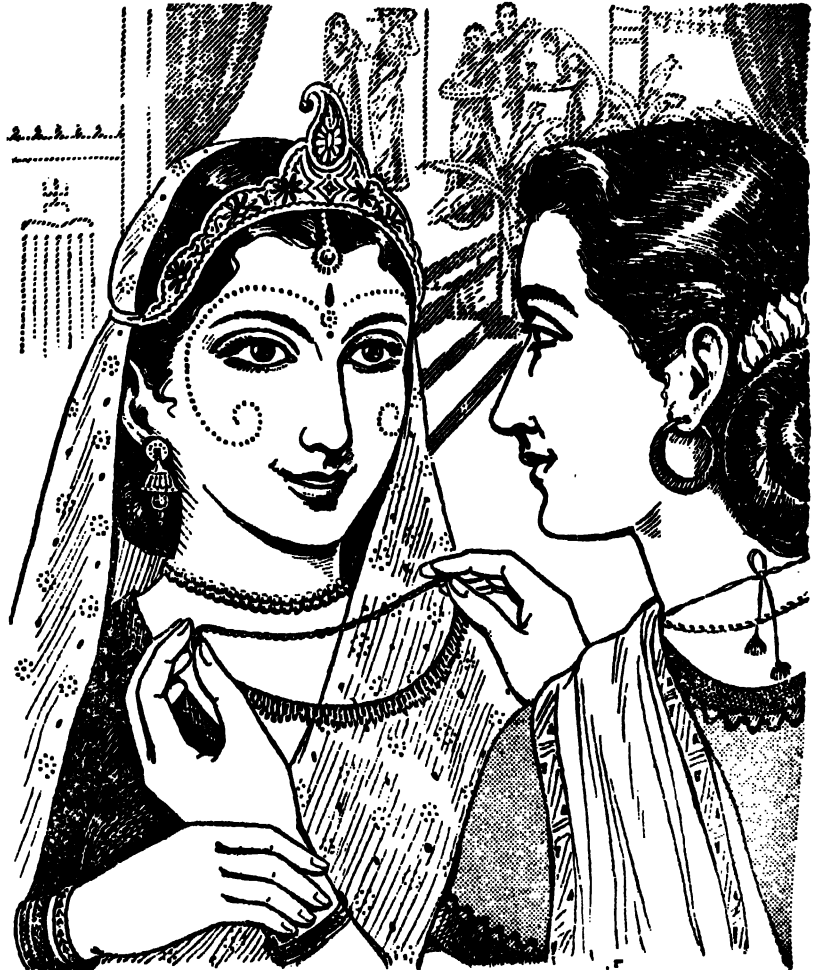
বলতেন, 'আজ কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি করে খেতে হবে, আমি কিন্তু জগদ্ধাত্রী-পূজা দেখতে যাবো।'

এরকম সহজ ভাবে আহ্বানে তিনি যে কোন পটের ঠাকুরকে ডাকতেন, তা মনে হ'ত না। জীবিতকালে স্বামীকে যে ভাবে আহ্বান করতেন, তাই-ই যেন স্মরণ করিয়ে দিত।

পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে কাপড়ের নীচে লুকিয়ে নেওয়া ঠাকুরের ছবিকে তিনি জগন্নাথ দর্শন করিয়েছিলেন। জীবিতকালে ঠাকুরের জগন্নাথ দর্শন হয়নি। নিজে সেই জগন্নাথদেবকে একা কি করে দর্শন করবেন?

এক দিন দুপুরবেলা সারদা দেবী দেখতে পান ঠাকুর সারা ঘরময় পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। তা দেখে সারদা দেবী চমকে ওঠেন, 'এ কি! বিশ্রামের সময় যে! তুমি এখনো শোওনি?' ঠাকুরের ছবির কাছে এগিয়ে দেখেন, ছবি-ভর্তি লাল ডেঁয়ো পিপড়ের সারি। কারণ বুঝতে তাঁর দেরী হয় না। একটি ভক্ত সেদিন ঠাকুরের আসন ফুল দিয়ে সাজিয়েছিল। হয়তো ফুল না বেছেই দিয়ে থাকবে!

সারদা দেবী ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করেই বুঝতে পারতেন ঠাকুর তা গ্রহণ করেছেন কি না। গ্রহণ না করলে তাঁর কি ব্যস্ততা! ঠাকুরের কাছে বসে কত অনুনয় বিনয়। তিনি জানতে পারতেন অপবিত্র বাড়ীতে ঠাকুরের ভোগ নিবেদন হয়েছে। গৃহস্থবাড়ীতে ঠাকুর অভুক্ত থাকলে তাদের পাছে অকল্যাণ হয়, বুঝে তিনি অনুরোধ করে ঠাকুরকে একটু পায়েস খাওয়াতেন। নিজেও পায়েস ছাড়া আর কিছু মুখে দিতেন না। স্বামীর জন্য ভোগ রান্না হয়েছে। তিনিই খেলেন না, সারদা দেবী কি করে খাবেন? কখনো যদি ঠাকুর না খেতেন তিনিও অভুক্ত থাকতেন।

ঠাকুর তখনো জীবিত। কাশীপুর বাগানে উত্থানশক্তি-রহিত অসুস্থ। সারদা দেবী ছিলেন অন্য ঘরে। সেখান থেকে তিনি দেখতে পান, ঠাকুর নিজ ঘর থেকে বের হয়ে দৌড়ে কোথায় যেন গেলেন। বিস্মিত সারদা দেবী ঠাকুরের ঘরে এসে দেখতে পান সত্যি সত্যিই ঠাকুর বিছানায় নেই। তাই দেখে তিনি চমৎকৃত হন। ঠাকুরকে পাশ ফিরিয়ে না দিলে নড়তে পারেন না। তিনি কোন মন্ত্রবলে সুস্থ মানুষের মত দৌড়ে বাগানের দিকে গেলেন? এ কি করে বিশ্বাস করা যায়?

ঠাকুরকে পরে একথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানতে পারেন, নরেন প্রভৃতি কয়েকটি ভক্ত বাগানে খেজুরের রস খেতে গিয়েছে, সেই খেজুর গাছের নীচে মস্ত একটা গোখরো সাপ দেখতে পেয়ে তিনি তাদের বাঁচাবার জন্য এক দৌড়ে সাপটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এলেন। সারদা দেবী ঠাকুরের জীবদ্দশায়ই তাঁর সূক্ষ্মশরীরের ক্রিয়ার দর্শন করতেন, যা সাধারণ চক্ষুতে কেউ দেখতে পেত না। কাজেই দেহাবসানের পর তাঁর জীবন্ত সান্নিধ্য বা দর্শন পাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

ঠাকুরের দেহাবসানের পর যখন সারদা দেবী কামারপুকুরে ছিলেন, এত দিনের অভ্যাস্ত গঙ্গাস্নানের অভাবে তাঁর বড় কষ্ট হত। এক দিন তাঁর গঙ্গাস্নানের খুব ইচ্ছা হয়। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন ঠাকুর যেন পায়ে হেঁটে আসছেন, এবং তাঁর পিছনে পিছনে আসছে সব ভক্তরা। ঠাকুরের পায়ের কাছে জলের মস্ত মস্ত ঢেউ। সারদা দেবী ছুটে গিয়ে ঠাকুরঘরের পাশের একটা গাছ থেকে মুঠো মুঠো ফুল তুলে সেই জলে অর্ঘ্য দিতে লাগলেন। ভুলে গেলেন, এখানে গঙ্গা থাকার কথা নয়। সব যখন মিলিয়ে গেল তখন বুঝতে পারলেন ঠাকুর এভাবে তাঁকে অলৌকিক দর্শন দিয়ে জানিয়ে গেলেন যে তাঁর জন্মস্থান গঙ্গার মতই পবিত্র। এখানে থেকে গঙ্গাস্নান করতে না পারলে দুঃখের কোন কারণ নাই।

নীলাম্বর মুখার্জ্জীর বাড়ীতে থাকা কালে আরো একবার মার এরকম দর্শন হয়। তিনি দেখতে পান, ঠাকুর যেন গঙ্গায় নামলেন আর তাঁর দেহ যেন গ'লে গঙ্গার জলে মিশে গেল। সেই জল স্বামী বিবেকানন্দ নিজে হাতে ক'রে কোটি কোটি লোকের মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে 'জয় রামকৃষ্ণের জয়' বলতে লাগলেন। সেই থেকে অনেক দিন পর্য্যন্ত গঙ্গাকে আরো পবিত্র মনে করে সারদা দেবী গঙ্গায় নেমে স্নান করতে পারতেন না। উত্তরকালে তাঁর এই দর্শন যে বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছিল, তা আমরা সবাই জানি। সাধনলভ্য সূক্ষ্মদৃষ্টি সারদা দেবীর ছিল বলেই তিনি এ-ধরণের ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্ব্বাভাস পেতেন।

পরমহংসদেবের অলৌকিক ক্ষমতার কথা আমরা অনেক কিছুই শুনেছি। যখন তখন একটু স্পর্শ করেই তিনি অনেক ভক্তদের মনের ইচ্ছার মোড় ঘুরিয়ে দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত শক্তিশালী মানুষের জীবনে আমরা এ প্রয়োগ দেখেছি। সারদা দেবীরও শোনা যায় এ ধরণের বিভূতি প্রকাশের ক্ষমতা ছিল। যদিও শারীরিক ও আধ্যাত্মিক দুই শক্তিরই এতে অপচয় হয় জেনে বিশেষ কারণ ব্যতীত তিনি তা প্রয়োগ করতেন না। তবে প্রয়োজন বোধে তিনি তাঁর ভক্তদের মধ্যে কয়েক জনকে নিজ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তা আমরা জানি।

ঠাকুরের শেষ জীবনে যে দুরারোগ্য কষ্টকর ব্যাধি তাঁর দেহে আশ্রয় করেছিল, সেই সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা যে, যখন তখন অগণিত ভক্তদের পাপের ভোগ ক্ষয় করতে গিয়ে নিজের মধ্যে তা টেনে নিয়েছিলেন বলেই তাঁর পবিত্র দেহে ঐ ব্যাধি আসা সম্ভব হয়েছিল। কর্ম্মের একটা ফল থাকেই। কর্ম্মকারীকে যদি কেহ নিজ শক্তিবলে ফলভোগ করতে না দেয়, তবে সে কর্ম্মফল কর্ম্মকারীকে আশ্রয় না করে নাশকারীতে বর্ত্তায়। ঠাকুরের আয়ুষ্কাল কমাও ঐ রোগভোগেরই একমাত্র কারণই। নিজ শক্তি ক্ষয় করে ভক্তদের দুর্ভোগের অবসান করা।

একটিমাত্র ঘটনাকে আমরা এ বিশ্বাসের সমর্থনে দেখাতে পারি। কত ঘটনা যে আরো আছে তার তো যেন অন্তই নেই। মথুর বাবুর স্ত্রী যখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যুশয্যায়, তখন তিনি এক দিন এসে ঠাকুরের পায়ে কেঁদে পড়লেন। স্ত্রী না বাঁচলে তাঁর জমিদারী যায়। ঠাকুর একটু স্থির হয়ে ভাবলেন, তার পর বললেন, 'যাও, দেখ গিয়ে ভাল হয়ে গেছে।'

মথুর বাবু বাড়ী ফিরে সত্যি দেখেন, স্ত্রীর রোগের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! তিনি ছুটে এলেন ঠাকুরের পায়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে ঠাকুর তাঁকে বললেন, 'রোগ আর কোথায় গেছে? (নিজেকে দেখিয়ে) এই দেহে টেনে এনেছি।'

মায়ের মুখেও এক বার স্বামী বিবেকানন্দের প্রশ্নের উত্তরে ঠিক এই ধরণের কথা শোনা গিয়েছিল। বিবেকানন্দ সারদা দেবীকে এসে

প্রশ্ন করেছিলেন, 'মা, আমরা ঠাকুরের সন্তান হয়েও কাশ্মীরের একটা ফকিরের অভিশাপ আমার উপর এমনি করে ফলে গেল, আর ঠাকুর আমাদের রক্ষা করতে পারলেন না?"

উত্তরে তিনি বলছিলেন, 'সে তো বাবা একই কথা! তোমার দেহেও যা, তাঁর দেহেও তাই-ই। ভক্তের প্রতি অবিচার নিজে গ্রহণ করলেই ভগবান ভক্তকে মুক্তি দিতে পারেন, নতুবা প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল বা সাধুবাক্য না ফলে যাবে কোথায়? ঠাকুর তো কিছু নষ্ট করতে আসেন নি? সব রক্ষা করতেই এসেছিলেন।'

অনেকে আবার খোলাখুলি সারদা দেবীকে প্রশ্নও করতো, 'মা, ঠাকুরের পবিত্র দেহে এত কষ্টকর ব্যাধি কেন?'

মা তাদের উত্তরে বলতেন, 'সকলের পাপ যে তিনি নিজের দেহে টেনে নিতেন। নইলে কি ও-সব দেহে ব্যাধি হয়?'

ভক্তদের কর্ম্মফল নিজে গ্রহণ করে ঠাকুর তাঁদের মুক্ত করতেন, একথা মেনে নিলেও তাঁর দীর্ঘ রোগভোগের মধ্যে পৃথিবীর যে একটা মহাকল্যাণ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল, একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

জীবিতকালে আপন জীবনাদর্শ দিয়ে নরদেহে কি করে ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব, তার তিনি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। আপন সাধন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন যে, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ই হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ। তার মধ্যে কিছু ত্যাজ্য গ্রাহ্য নাই।

তা ছাড়া দীর্ঘ রোগভোগকালে তাঁর শয্যাপার্শ্বে উন্মুখ-হৃদয় ভক্তদের তিনি একত্র হবার সুযোগ দিয়েছিলেন অপূর্ব্ব ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের সুদৃঢ় বনিয়াদ গড়তে। আর শুধু তাই-ই নয়, অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রী সারদা অবগুণ্ঠন ঘুচিয়ে এক দিনের চাওয়া একটি সন্তানের জায়গায় এতগুলি সন্তানের জননী করে ও সেই সন্তানদের সম্মুখে তাঁর স্নেহময়ী কল্যাণময়ী জননীরূপটি উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। [ক্রমশঃ।

ভালো লাগা মুহূর্ত

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

ভালো লাগা মুহূর্ত আমার
আনন্দ-ঘন মুহূর্ত
স্বতঃস্ফূর্ত
না হ'তে, গুঞ্জন না উঠ্‌তে,
সুরের জাল বিস্তার না করতে,
ছিঁড়ে যায়, টুকরো হ'য়ে সেতারের তার।
স্বপ্নিল মুহূর্ত আমার।
পাইনে কারও নিবিড় আলিঙ্গন
ক্ষণিক আলিম্পন
বিদায়ী সূর্যের রঙিন আলোর মত
শুধু ছুঁয়ে যায় মন।
কী মধুর, কী পরম ক্ষণ
ওরা চলে যায়
এঁকে রেখে যায়
রেখে দিয়ে যায়
ভালোবাসার স্মরণ সম্ভার।
ভালো লাগা মুহূর্ত আমার।
ওরা হাঁটে—,
চিত্তরঞ্জন এভেনিউর ফুটপ্যাথে
কেউ যায় বাসে, কেউ ঘরের মোটরে
ক্রমশঃ ওরা অপস্রিয়মান,
লাল সূর্য অস্তমান
বড় বড় সৌধগুলির মাথার ওপরে।
গোধূলি-অন্ধকার ঘনিয়ে আসে
চিত্তরঞ্জন এভেনিউর আকাশে
ঘন ছায়া ফেলে
মনের অতলে
আমি মূক, নিথর, অভিভূত—
জমাট বাঁধা বরফের মত
দাঁড়িয়ে থাকি আমার কেবিনের জানালার পাশে।
কতটুকু সময়ের সাক্ষাৎকার,
কী মধুর মুহূর্ত আমার।
জমাট বাঁধা বরফ কখন যেন গলতে সুরু করে,
চম্‌কে উঠি আমি রজনীগন্ধার সুবাসে
অন্তরঙ্গ পরশে
যে রজনীগন্ধা রয়েছে আমার টেবিলের পুষ্পাধারে।
প্রীতি ছোঁয়ানো উপহার
রজনীগন্ধার ঝাড়
সন্ধ্যা বাতাসে, মদির হয়ে আসে
মাধুর্যের উপচার
ভালো লাগা মুহূর্ত আমার।

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বাণি দেবী

বিলাতি পামগাছ-ঘেরা জালির ওপর পুষ্পিত লতার ছাউনি ঢাকা, ছোট্ট অর্কিড হাউসটির ভেতর শ্বেত পাথরের বেদিটার ওপর বসেছিলো সুমিতা আর সুদাম। সামনেই শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত হংস-মিথুনের ঠোঁট বেয়ে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে ক্ষীণ জলধারা। পাশের ঝোপে খেলা করছিলো একপাল খরগোস।

শরতের মেঘমুক্ত সোনালী প্রভাত। ঘন-নীল আকাশে পেঁজা তুলোর বস্তার মত হাল্কা মেঘের দল আপন খুশিতে ছুটোছুটি করছিলো, ঐ খরগোসগুলোর মত।

সুদাম অপলক দৃষ্টি মেলে চেয়েছিলো সেই দিকে। ওর হাতখানা ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলে সুমিতা, অত অবাক চোখে কি দেখছো দামীদা'?

মুগ্ধ দৃষ্টি তার ফিরে আসে সুমিতার মুখের ওপর।

—কি দেখছিলাম?—দেখছিলাম কি অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ছড়ানো রয়েছে জগৎ জুড়ে। কোন অসীম সৌন্দর্য্যশালী শিল্পী যেন অলক্ষ্যে

বলে মুঠো মুঠো বিচিত্র সৌন্দর্য্যধারা ছড়িয়ে দিচ্ছেন ধরণীর বুকে, দিনের পর দিন! এ দেওয়ার বিরাম নেই, শেষও নেই।

বিস্ময় ভরে চোখ দু'টি বিস্ফারিত করে বলে সুমিতা,—আচ্ছা দামীদা'! তোমার মত সুন্দর করে এই পৃথিবীটাকে আমি কেন দেখতে পাই না? এ সৌন্দর্য্য বুঝি সবার জন্যে নয়?

—হ্যাঁ মিতা! এ সবারই জন্য।—তবে একে আহরণ করে নিতে হয়। ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া সবার উর্দ্ধে এমন একটা সাম্য সৌন্দর্য্য বিরাজ করছে, যাকে হৃদয়ে বরণ করে নিলে আর কোনো ক্ষোভ থাকে না।

স্বপ্নালু দুটি চোখ মেলে চাইলো সুদাম সুমিতার পানে। সে চোখে ছিলো না কোনো কামনার বহ্নি। ছিলো প্রেম-অনুরাগের স্নিগ্ধ ছায়া। একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে বললো সুমিতা—তোমার মত যদি মন আমিও পেতাম দামীদা'। অমনি খুশির আলোয় মনটাকে ভরিয়ে নিতে পারতাম তাহলে···

—তাহলে কি হত মিতু'? কিসের অভাব তোমার মনে? কেন আনন্দ-সায়রে অবগাহন করতে সঙ্কোচ তোমার মিতু?

—জানি না দামীদা'! কেন আমার এমন হয়! বেদনার্ত্ত কণ্ঠে বলে সুমিতা।

—ওর একখানি হাত নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নেয় সুদাম, অপর হাতে দেয় একখানি নীলরং-এর কাগজ—বলে, পড়ো এটা—

—খুশির আলো বুঝি এবারে লাগলো ওর চোখে-মুখে। হরিণীর মত চঞ্চল কাজল-কালো চোখ দু'টি নাচিয়ে বললো—নতুন কবিতা? কবে লিখলে?

—পড়েই দেখো না,—হাতখানিতে মৃদু চাপ দিয়ে বলে সুদাম।

—তুমি পড়ো দামীদা'। তোমার মুখে কবিতা শুনতে যে আমার বড্ড ভালো লাগে। নিজে পড়লে অতটা ভালো লাগে না।

—তাই না কি? আমার গলায় যে এত মধু আছে তা তো আমার জানা ছিলো না, ভাগ্যিস্ তুমি বললে মিতা!

কৃত্রিম কোপের সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে নেয় মিতা। মুখ ফিরিয়ে বসে, অভিমানভরে বলে—থাক্ পড়তে তোমায় হবে না।

নিজেকে ভারি অপরাধী বোধ করে সুদাম। ওর সামনে গিয়ে মাটিতে বিছানো কাঁকরের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। সুমিতার হাত দুটি ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—

—আমায় ক্ষমা করো মিতা। পরিহাস করতে গিয়ে আঘাত করেছি তোমার মনে। দাও কবিতাটা আমি পড়ে শোনাই তোমাকে। কত'দূর চলে যাবো—কত দিন শোনাতে পারবো না তোমায় কবিতা। আমার সমস্ত কাব্যকুসুমগুলো সেখানে হয়তো কুঁড়িতেই ঝরে যাবে। তুমি তো কাছে থাকবে না, কে ফোটাবে তাদের।

—হায়! সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নারীচরিত্র-অনভিজ্ঞ পুরুষ তার প্রিয়তমার আসন্ন প্রিয়-বিচ্ছেদ বেদনা—ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবার নিদারুণ বাক্যবাণ বিদ্ধ করে বসলো!

দু'হাতে মুখ ঢেকে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো সুমিতা। ক্ষীণ তনুলতাখানি তার কান্নার জোয়ারে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো।

—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় করুণ চোখে তার পানে খানিক চেয়ে রইলো সুদাম,—তার পরে দু'হাতে টেনে নিলো তাকে নিজের বুকের ওপর।

সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে—তুমি যদি অমন করে কাঁদো, তবে আমি সেই সুদূর পথে কেমন করে যাবো মিতা? সত্যিই যে তোমাকে ফেলে যেতে মন আমার একেবারেই চাইছে না—কেবল বাবা, আর কাকার আদেশেই যেতে হচ্ছে। তুমি যদি এত কাতর হয়ে পড়ো, তবে থাক্ আমার যাওয়া।

সুমিতা সামলে নেয় নিজেকে। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলে—না। না। দামীদা'। তোমার উন্নতির পথে আমি কখনই বাধা হবো না। তুমি যাও।

—তার পর জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বলে, মাত্র তিনটে বছর তো,—ও দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তুমিও ফিরে এসে দেখবে আমি কত কি শিখেছি,—তোমার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হবে তো? বাবার সঙ্গে দেখা করবে বলছিলে না? যাও তুমি বাবার লাইব্রেরী-ঘরে,—আমি এখানেই রইলাম। দেখা করে আবার এখানে এসো।

সুদাম বিমর্ষ চিত্তে অর্কিড-হাউস থেকে বেরিয়ে যায়। সুমিতা উচ্চকণ্ঠে ডাক্ দেয়—ভজনদা', ও-ভজনদা'।

—বুড়ো মালী তার ঘর থেকে কালো-শাদায় চেক-কাটা চাদরখানি মুড়ি দিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে—কি গো খুকুদিদি। বুড়োটাকে আবার কি দরকার পড়লো?

—বড্ড দরকার ভজনদা'। তোমার সাজিটা আর ছুঁচ সুতোটা এক বার দাও না?

একমুখ ফোকলা হাসি হেসে বলে রামভজন সিং—ও, এই কথা? আনছি গো দিদি!

থপ-থপ করে দ্রুত গমনে যায় ভজন সিং। এনে দেয় সুমিতার ফরমায়েসী দ্রব্য।

—সাজিতে রাশি রাশি ফুল তোলে সুমিতা। একা পারে না, মালীদাও ওর সঙ্গে ছুটোছুটি করে ফুল তোলে।

গোলাপ, যুঁই, গন্ধরাজ, করবী, আর তার সঙ্গে বিচিত্র বর্ণের মরশুমী ফুলে সাজিটা ভরিয়ে নিয়ে গিয়ে বসে অর্কিড-হাউসের ভেতর।

আধ ঘণ্টা পরে সেখানে ফিরে এলো সুদাম। সুমিতাকে বসে থাকতে দেখে ব্যথিত কণ্ঠে বললো,—সেই কখন থেকে একলা বসে আছ মিতু? ওঠো, এবারে ভেতরে যাও।

—বাঃ! কবিতাটা শোনাবে না?

—সত্যিই তো! দাও কাগজখানা।

—কাগজটা ওর হাতে দেয় সুমিতা।

—গভীর ভাবাবেগপূর্ণ কণ্ঠে কবিতাটা পাঠ করে সুদাম।

—"তোমার তরে রইলো আমার সকল আয়োজন,
আমার সকল চাওয়া
হৃদয় ভরে পাওয়া।
রাত্রি-দিনের কাব্য আমার—প্রেমে উজল মন!
তোমার তরে রইলো মিতা, সকল আয়োজন।
দূরের পথে, নিলেম সাথে তোমার মালাখানি,
বন্ধু তোমার গানের সুরে,
হৃদয় আমার নিলেম ভরে,
পাথেয় মোর রইলো সাথে তোমার প্রেমমণি।"

কবিতা পড়ার শেষে উঠে দাঁড়ালো মিতা! সাজির ওপরে চাপা-দেওয়া কলার পাতাটি সরিয়ে সদ্য-সমাপ্ত ফুলের মালা ছড়াটি বার করে পরিয়ে দেয় সুদামের গলায়। মিষ্টি হাসির সঙ্গে বলে—কবিতার পুরস্কার।

সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে মালাটি দেখে সুদাম। তার পর নিবিড় অনুরাগভরে বাহুপাশে আবদ্ধ করে, সুমিতাকে বুকের কাছে টেনে নেয়। কম্পিত রক্তিম ওষ্ঠে এঁকে দেয় প্রথম চুম্বনরেখা। গভীর ভাবসাগরের অতলতলে, তলিয়ে যায় দু'টি প্রেমবিমুগ্ধ তরুণ আত্মা। কেটে যায় কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত।

প্রাত্যহিক নিয়মরক্ষা করবার জন্য সেদিনও রাত্রে এসেছিলো সুমিতা পিতার কক্ষে। ধূপ, ধুনো, অগুরুর পবিত্র গন্ধে ঘরের বাতাস সুরভিত! সুমিতার বড় ভালো লাগে এ গন্ধটা! এ ঘরে এলে মনের গুমোট ভাবটা যেন অনেকটা হাল্কা হয়ে যায়।

—তবুও বাবার কাছে সে বসে না। সঙ্কোচ ভরে, তফাতে বসে।—পিতার শুচিশুদ্ধ সান্নিধ্য থেকে নিজেকে পৃথক রাখে। অন্য দিন সোমনাথ বিশেষ কথা বলেন না। কিন্তু সেদিন সুমিতাকে নিজের পাশে বসতে আদেশ করলেন।

একটু বিস্ময় লাগে বৈ কি?

কত দিন যে মনটা তার লালায়িত হয়ে উঠেছে পিতার একটু স্নেহ-পরশ পাবার জন্যে! ভাগ্যে তা মেলেনি এক দিনও। আনন্দের উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা কেমন টিপ-টিপ করতে থাকে।

সোমনাথ কন্যার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—মিতু মা! আমি স্থির করেছি কালই হরিদ্বার রওনা হবো।—বাসনা ছিলো, তোমাদের পরিণয়-কার্যটা সমাধা করে যাবো, কিন্তু সর্বনিয়ন্তার ইচ্ছা অন্যরূপ।

সুদামের ফিরতে বছর তিনেক বিলম্ব হবে, আমারও কিছুকাল নির্জ্জনবাসের প্রয়োজন হয়েছে।

—তুমিও চলে যাবে বাবা?

মৃদুস্বরে কথা ক'টি বলে পিতার মুখপানে বিহ্বল ভাবে চেয়ে থাকে সুমিতা। ভাবলেশহীন পাথরে গড়া সে মুখে কোনো ভাবান্তরের রেখাপাত পর্যান্ত দেখা গেলো না। সোমনাথের দৃষ্টি সুমিতার ওপর ছিলো না।

যদি তা থাকতো, তবে তাঁর নির্ব্বিকার চিত্তসায়রে স্নেহের আলোড়ন হয়তো দেখা দিতো, অথবা সেই আশঙ্কাতেই তাঁর দৃষ্টি রইলো অসীমের পানে নিবদ্ধ।
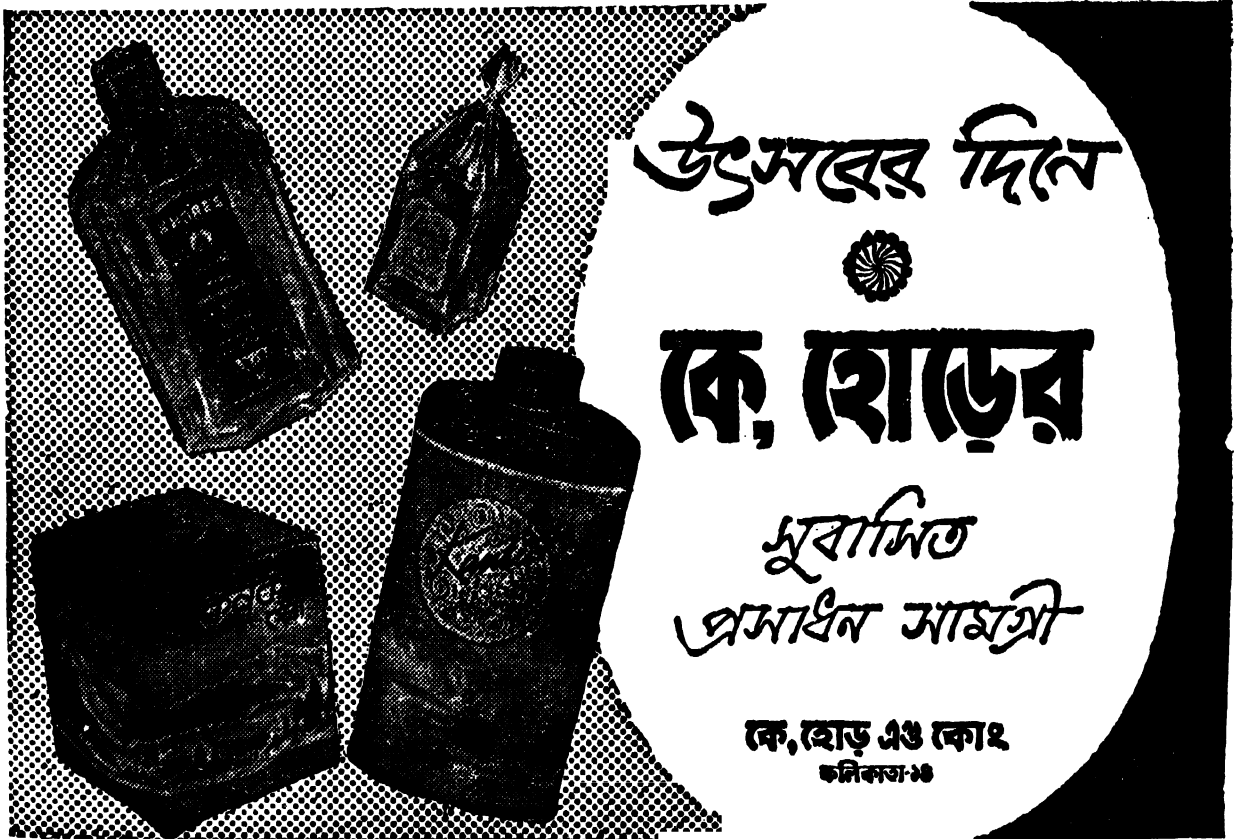
পাথরের চৌকির ওপর থেকে একখানি বই তুলে তিনি কন্যার হাতে দিলেন।

সুমিতা বইখানির পাতা উল্টে নামটি পড়লো, শ্রীমদ্ভাগবত!

অনুবাদ করেছেন, গোপীদাস মহারাজ। প্রথম পৃষ্ঠায় পিতার হস্তলিপি দু'ছত্র।

"জীবনে যদি কখনও আসে অন্ধকার,
এর মাঝে কোরো আলোর অনুসন্ধান।" [ক্রমশঃ

সুদানের পথে

লীলা মজুমদার এম-এ,

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।"

সেই দেশ হবে যে আফ্রিকা, যাকে কবিবর বলেছেন—

"রুদ্র সমুদ্রের বাহু প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা—
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।"

মনের কোথাও জাগেনি কোনও দিন। একে তো ঘরকুণো বাঙ্গালী মেয়ে—কবির মিঠা মিঠা বুলি পড়তেই শুধু ভালবাসি—বাস্তব জীবনে মেনে নিতে হবে তাই ভাবিওনি কোনও দিন সত্যি—কিন্তু আলোর কৃপণতা যেখানে বেশী সেখানেই বাহির হ'তে এনে দেখাতে হয় আলোর প্রয়োজনীয়তা—তাই সুদূর সুদান হ'তে অনুরোধ গেল ভারত সরকারের নিকট কয়েক জন ইঞ্জিনিয়ারের জন্ম নূতন স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশের ক্রমোন্নতির পথে সাহায্য কল্লে। ইংরাজদের বিদায় জানিয়ে আমন্ত্রণ করা হোল ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের তাদেরই স্থানে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক ইঞ্জিনিয়ার চাকুরের সঙ্গে বিয়ে হোয়েছিল আমার এবং তার পর হ'তে গতানুগতিক ভাবেই মফঃস্বল সহরের এক জায়গা হ'তে আরেক জায়গায় ঘুরে বেরাচ্ছিলুম। হঠাৎ এলো সরকারের আমন্ত্রণ-পত্র। তবে যাবার নয় দরখাস্ত পেশ করবার। সুদান! নামটিও তখন ভাল কোরে পরিচিত ছিল না। একে তো ম্যাট্রিকের পর ভূগোলের সাথে প্রায় সকল সম্পর্কই চুকে গিয়েছিল—তার উপরে একে আফ্রিকা, তায় আবার সুদান। মনেরও খুব বেশী দোষ নেই। যা হোক স্বামী তো দরখাস্ত কোরে দিলেন। ক'রে যে দিলেন ব্যস, তার পরে আর কোনও খবরাখবর নেই। কা কস্য পরিবেদনা—দিন চলে মাস এলো, মাসের পর মাসও চলে যাচ্ছে, এমনি ভাবেই এমনি সময়ে হঠাৎ এলো আবার ইণ্টারভিউর জন্মে ডাক। তাড়াহুড়ো কোরে চললুম কোলকাতাতে, সেখানে আসবে সুদান সরকারের প্রতিনিধিস্বরূপ ত্'জন সুদানী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।

এলুম কোলকাতাতে—আকস্মিক আগমনের কারণ শুনে সবার কাছ হ'তেই প্রায় এলো যথারীতি প্রচুর আপত্তি, এসব দেখে-শুনে আমিও গেলুম একদম ঘাবড়ে। ঘরকুণো ভাবটা কিছুটা হয়তো কমেছিল—কোলকাতার বাইরে থেকে এবং কিছুটা সুদূরের পিয়াসীর সংস্পর্শে এসে কিন্তু আবার সবার মাঝে এসে সবার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমার মনও তুলে দিল বিদ্রোহ, কিন্তু মনের বিদ্রোহ মনেই রইলো।

ইনটারভিউ সাঙ্গ কোরে তিনি যখন ফিরে এলেন, মনে হোল খুশী। একট ফোয়ারা সঙ্গে কোরে বয়ে এনেছেন অর্থাৎ সব-কিছুই প্রায় ঠিক শুধু কন্‌ট্রাক্ট সইটি করা বাকী। বাড়ীর আবহাওয়া হোয়ে গেলো থমথমে, কারুর অন্তরই সায় দিতে চাইছে না—অনেক কোরে একাই বোঝালেন সবাইকে—ইঞ্জিনিয়ার যে প্রয়োজন হোলে সুবক্তাও হোয়ে উঠতে পারেন, তার প্রমাণ পেলুম হাতে-নাতে। সবাই হোলেন কিছু কিছু রাজী অথবা রাজী হ'তে বাধ্য হোলেন জানি না—অবশেষে অনুমতি পাওয়া গেল সবাকার সুদূর সুদানের পথে পাড়ি দেবার।

দিন স্থির হোল ১১শে ডিসেম্বর ১৯৫৫—হোয়ে যাচ্ছে পৌষ মাস, আবার নূতন কোরে আপত্তি উঠলো বাড়ীতে—এটারও দেখলুম সুন্দর কোরেই ব্যবস্থা হোয়ে গেলো অর্থাৎ পিতৃমাতৃস্থানীয় গুরুজনদের সন্তোষ বিধানের জন্মে তিন দিন আগে হতে যাত্রা কোরে থাকা—আমার অবস্থা অনেকটা যেন 'বিপ্রদাসের' দ্বিজদাসের মতন কোনও মতামত নেবার বালাই নেই—ত্'তরফে ঠিক কোরে যা বললেন করবার জন্য তাই হোল আমার করণীয়, কিন্তু মন যেন কিছুতে মানছে না—উৎসাহও যে কারুর কাছ হ'তে পাইনি তা নয়—যখন পেয়েছি তখন কিছুটা হয়তো উৎসাহিতও হোয়েছি—কিন্তু আবার যে কে সেই—যত দিন এগুতে লাগলো মন যেন ততই পিছোতে সুরু কললো—ইউরোপ বা অমেরিকা হোলে কি হোত জানি না কিন্তু এ যে সুদান! নিগ্রোদের দেশ—যাদের কথা মনে হোলেই চোখের সামনে ভেসে উঠে ছোট্ট ছোট্ট কুঁকড়ে যাওয়া চুল অনাবৃত অসীম কালো দেহ, শুধু গাছের পাতার আবরণ একটুখানি পরিধানে—হাতে বর্শা, মাথায় পাখীর পালক গোঁজা, মুখে মোম্বাসা মোম্বাসা গানের সুর একটানে চালিয়ে নেচে নেচে চলে কিসের অভিযানে কে জানে! ও-সব দেশে মেয়ে আছে কি? আছে নিশ্চয়ই; তবে আমাদের চোখে সবই মনে হয় একই রকম—আবরণ কি ছেলে কি মেয়ে কারুর বিশেষ নেই। তাই হয়তো বৈষম্যটুকু মনে করতে সরমে বাধে। সভ্যদেশীয় কোনও মেয়ে কি নেই ও-সব দেশে! তারা কি পারে নিরাপদে পথ চলতে ওখানে?

উদ্ভট সব চিন্তা এসে জড়ো হচ্ছিল মনে। ভাবতেই পারছিলুম না, ওরাও এগিয়ে গেছে অনেকটাই সভ্যতার পথে। আলোর ছটা এসে গেছে ওদেরও দেহে মনে প্রাণে। তার জন্যই গভীর আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এসেছে ভারতের কাছে ক্রমবর্দ্ধমান সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাবার পথে সাহায্যের আশায়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত সব কিছু উপযোগী আভরণই এসে যেতে পারে ওদের দেশে; মন যেন কিছুতেই মানতে চাইছিল না। তাই দাদা যখন ভরসা দিয়ে বললেন, ইংরেজরা যেখানে বছরের পর বছর থেকেছে সেখানে, সকলেই নিরাপদে অন্ততঃ নিশ্চিন্তই থাকতে পারবে—ইংরেজদের প্রতি কত শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাস আমাদের! এরকম জোরালো কথা শুনে যেন মনটা কিছুটা ধাতস্থ হোল।

এলো অবশেষে স্মরণীয় ১১শে ডিসেম্বর। মাঝে মাঝে এমনি হয়, দিন যে কি কোরে চলে যেতে থাকে টের পাবারও অবসর থাকে না—আসছে আসছে কোরে সত্যি এসে গেলো যাবার দিনটি—ভোর হতেই সবার মন ভার হোয়েছিল—ত্'-এক পশলা বৃষ্টিও যে না হচ্ছিল তা নয়—কার উপরে অভিমান কোরে জানি না সবাইকে ছেড়ে কোন দূর দেশে পাড়ি দিচ্ছি মনে কোরে মনটা কেঁদে কেঁদে উঠছিল—বিকেল ৫টায় ছিল প্লেন ছাড়বার নির্দ্দিষ্ট সময়। তার ভেতরে হঠাৎ খবর এলো এয়ার ইণ্ডিয়ার অফিস হ'তে বিকেল ৫টার পরিবর্ত্তে প্লেন বেলা ২টার সময় দমদম বিমানঘাঁটি ছেড়ে চলে যাবে বম্বের উদ্দেশে—ওখানেই অপেক্ষা করছে ভারতীয় আন্তর্জাতিক বিমান আমাদের নিয়ে যাবার জন্মে। সুদানের পথে

আফ্রিকার প্রথম বন্দর কায়রোতে ঘণ্টাকয়েক সময় ছিল মাত্র বাকী। কোনও মতে নাওয়া-খাওয়া সেরে একদম রওনা হলুম সবাই মিলে দমদম বিমানঘাঁটী অভিমুখে—কি যে তখন মনের অবস্থা শুধু অন্তর্যামী জানতেন। গিয়ে দেখলুম, তখনও আছে কিছুটা সময় হাতে—কাষ্টমস্‌ পরীক্ষা হবে বম্বেতে—তবুও রক্ষে! আরও কিছুটা সময় তাহোলে থাকতে পারবো আত্মীয় পরিজনদের মাঝে বসে—চুপচাপ বসে আছি সবার সঙ্গে—হঠাৎ ঘোষিত হোল মাইকে, বম্বে-যাত্রীদের বিমান অভিমুখে যাত্রা করবার জন্ম—আরও দু'টি বাঙ্গালী পরিবার ও একজন ব্যাচেলর বাঙ্গালী ভদ্রলোকও ছিলেন সুদানের পথে যাত্রী—মনের অবস্থা আমাদের তিনটি মেয়ের একই রকম—মলিন মুখে সবার কাছ হ'তে বিদায় নিয়ে চললুম বিমান সন্নিকটে—মনে হচ্ছিল আমাকে যেন সবার কাছ হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোন সুদূর দেশে পৃথিবীর কোন অজানা প্রান্তে!

বম্বে যাবার পথে ঘণ্টাখানেকের জন্তে নামতে হোয়েছিল নাগপুরে—ইচ্ছে হচ্ছিল থেকে যাই ওখানে, পরে অন্য কোনও উপায়ে ফিরে যাবো কোলকাতার অভিমুখে কিন্তু কার্য্যতঃ করলুম না কিছুই, শুধু ধীরে ধীরে গিয়ে উঠলুম আবার স্বস্থানে—যেতে যেতে সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিণত হোল—জানালা দিয়ে যত বারই তাকাচ্ছি নীচে জমাট অন্ধকার ছাড়া কিছুই যেন আর নজরে পড়ছিল না। নদী নালা পর্ব্বত কত কি হয়তো পার হোয়ে যাচ্ছিলুম, দেখবার উপায় ছিল না কিছুই—শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম—কিছুক্ষণ বাদে একটি গুঞ্জন শব্দ শুনে আশে-পাশে তাকিয়ে দেখি, সহযাত্রীরা নীচের দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন—সবার দেখাদেখি আমিও ঝুঁকে পড়লুম নীচের দিকে—বা রে! এ যে আকাশকে নীচে দেখতে পাচ্ছি তার উজ্জ্বল তারকাবৃন্দ সহ কিন্তু তা তো আর হোতে পারে না—এ তবে কি! এই কি তবে সুশোভিতা আলোকমালায় সজ্জিতা বম্বে নগরী? স্বামী গভীর মনোযোগ সহকারে খবরের কাগজ পড়ছিলেন—ডেকে তাড়াতাড়ি দেখালুম, কোনও সৌন্দর্য্যই একা দেখে তৃপ্তি পাওয়া যায় না—উনিও খুবই চমৎকৃত হোলেন দেখে—যাদের প্লেনে যাতায়াত অভ্যেস হোয়ে গেছে তাদের চোখে এ সৌন্দর্য্য হয় তো কিছুই নয়—কিন্তু আকাশপথে বিচরণ আমার এই প্রথম—তাই এই সৌন্দর্য্যটুকু যেন আমার চোখে অভিনব হোয়ে দেখা দিল—আর মনে হচ্ছিল আসবার আগে স্বামীর কল্পনার জালে বোনা নিত্যি নূতন দেশের নূতন সৌন্দর্য্য সত্যিই বোধ হয় আমাকে চমৎকৃত কোরে দেবে—মুছিয়ে দেবে তৃপ্তির প্রলেপে আমার সকল বেদনা, পেছনে ফেলা আসা আত্মীয় পরিজনদের জন্তে—যা হোক, কয়েকটি ঘুরপাকের পর প্লেন এসে তো শান্ত হোল বম্বে বন্দরে—রাত তখন দশটা—এত রাতেও কি সরগরম—কি বিরাট হৈ চৈ—আমাদের ছিল তাড়া—ভাল কোরে দেখবারও উপায় নেই, দু' ঘণ্টার ভেতরে আবার রওনা হ'তে হবে কায়রো অভিমুখে আমাদের এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল সুপার কনষ্টেলেশানে।

যথারীতি কাষ্টমস্‌ সারা হোল, সঙ্গে ছিল শুধু এক বড় সুটকেশ ও ব্যাগ—আবশ্যকীয় সব কিছুই ছিল তাতে—বাকী আর সব কিছুই চালান কোরে দেওয়া হোয়েছিল জাহাজে পোর্টসুদান অভিমুখে। যা হোক, তার পরে সবার সঙ্গে ধীরে ধীরে চলতে লাগলুম ময়দানের দিকে, যেখানে বিরাটকায় প্লেন দাঁড়িয়ে আছে, তার বিপুল বপু নিয়ে—এগোবো কি, ওর দিকেই শুধু ঘুরে ঘুরে চোখ যাচ্ছিল যত এগোচ্ছি ততই যেন উঁচু ও বিরাট মনে হচ্ছিল। মানুষগুলোকে কত ছোটই না মনে হচ্ছিল—ওর সন্নিকটে যন্ত্র-বিশারদের দল যারা উঠেছিল ওর পিঠের ওপরে কলকব্জা সব পরীক্ষার জন্তে সবাই তখন ধীরে ধীরে নেমে আসছিল, সব কিছু আমাকে যেন আলাদিনের প্রদীপের দৈত্যের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল, ওর মুখের ভেতরে পুরে কত সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যেতে হবে আমাদের। সত্যিই তো নিয়ে যাবে, না, পথের মাঝে ওর মুখ হ'তে কোনও হাঙ্গর বা তিমি মাছের মুখে ফেলে দেবে কে জানে? যা হোক, গিয়ে তো আশ্রয় নিলুম ওর ভেতরে, ভেতরেও দেখছি এলাহী ব্যাপার, আলোয় আলোময় সব কিছুই, সুন্দর ও সুসজ্জিত, বসবার ও শোবার উপযোগী সুন্দর আরামদায়ক আসন, যাত্রীদের সব রকম সুখ সুবিধে দেখবার জন্তে আছে সুবেশা এয়ার হোষ্টেস্‌, সব-কিছুই অভিনব মনে হয় প্রথম দর্শনে। খাবার পাট আগের প্লেনেই সারা হোয়েছিল, ওখানে শুধু ঘুমোবার পালা, কিন্তু ঘুম কোথায় তখন! শেষবারের মতন ভারতের শেষ বন্দরকে প্রাণভরে দেখে নেবার জন্ম দু'চোখ খুলে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলুম বাইরের দিকে—হঠাৎ দেখলুম আমাদের সামনে জ্বলে উঠলো দুখানা সাঙ্কেতিক আলো 'ধূমপান নিষেধ' ও 'বেল্ট বাঁধবার' সঙ্কেত জানিয়ে অর্থাৎ প্লেন এখুনি ভূমি ছেড়ে শূন্যের পথে উড়বে, সত্যি তাহোলে চললুম ভারতভূমি ছেড়ে কত দিনের জন্তে কে জানে, মন যেন কিছুতেই সহজ ভাবে মানতে পারছিল না, তা বড্ড বেশী ভাবপ্রবণ বোধ হয় আমরা—বাঙ্গালী মেয়েরা তাই প্রতিপদেই পাই মন হ'তে বাধা, প্রতি পলে জাগে সংশয়—প্রতিমুহূর্ত্তে আসে চোখে জল নিজ পরিজনদের ছেড়ে যাবার আশঙ্কায়—ভিন্ন দেশীয় মেয়েরাও ছিল যাত্রী, তাদের কোনও ভাবান্তরই দেখা যাচ্ছিল না। আমাদের মতন অথচ প্লেন যেই শব্দ কোরে ছুটোছুটি শুরু কোরে দিল ওড়বার জন্তে, আমাদের মনও যেন তোলপাড় শুরু কোরে দিল নেমে পড়বার জন্ম কিন্তু এ পিঞ্জর ভেঙ্গে বেরোবার সাধ্য আর নেই, তখন শুধু এর চলার সাথে সমান তালে মনটাকে চালিয়ে যেতে হবে সম্মুখ পানে।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কখন জানি না। ঘুম ভেঙ্গে দেখি সমস্ত কামরাটি সুষুপ্তিতে মগন, নীথর নীরব। চারিধার শুধু প্লেন চলেছে হু হু শব্দ কোরে আরব সাগরের উপর দিয়ে। প্লেনের ইঞ্জিনের তলা হ'তে আগুনের ঝলক বেরোচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে আর নীচের দিকে তাকালে কিছুই দেখবার উপায় নেই, সমস্ত নীচটা মনে হচ্ছিল কুয়াশায় ঢাকা—সময় দেখবার জন্তে ঘড়ির দিকে তাকালুম—ও কি। ঘড়ি চলছে তো? সংশয় জেগে উঠলো মনে—তাড়াতাড়ি কানের কাছে ধরলুম—বা! টিক্‌ টিক্‌ শব্দ কোরে চলেছে তো সত্যি—কি ব্যাপার! আমার ঘড়িতে সাতটা হোয়ে গেলো—বাইরের দিকে তাকালুম আবার ভাল কোরে, কোথাও সূর্য্যিমামার একটুকুন রেশও দেখতে পাওয়া যায় কি না—কোথাও কিছু নেই শুধু কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন চারি ধার! হঠাৎ কানে এলো পাশের সারির বসবার আসন হ'তে কে যেন বলে উঠলেন—কি বৌদি! বড্ড ধাঁধায় পড়ে গেছেন, ঘড়ি আর প্রকৃতির চলায়

বৈষম্য নিয়ে, না? চমকে তাকিয়ে দেখি, আমাদের সহযাত্রী ব্যাচেলার ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক—ভারী মিশুকে, স্বীকার করতে হোল মনের দ্বন্দ্বকে—ভরসা যদি কোনও সুরাহা মিলে—মুস্কিল আসান হোল সত্যি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভূগোল একদম ভুলে বসে আছি সে খোঁচাটুকুনও হজম করতে খেয়াল হোল—তখন হোল যে আমরা চলেছি পশ্চিমের দিকে—পূব গগনকে আলোকিত কোরে তবেই সূর্য্যদেব দেখা দেবেন পশ্চিম-এর পাশে, তাই প্রকৃতির আবহাওয়ার সঙ্গে ভারতের সময়ের পাচ্ছিলুম না কোনও ঐক্য—দ্বন্দ্বের হোল অবসান, শান্ত হোল মন তখন।

ধীরে ধীরে সিটের গায়ে দেহ এলিয়ে ভাবতে লাগলুম কোলকাতার সকলকার কথা, সবাই কি করছে না করছে এখন—ওখানে নিশ্চয়ই সকলকার দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যধারা শুরু হোয়ে গেছে—যে ঘূর্ণি হাওয়া তুলেছিলাম কয়েকটা দিনের জন্য আত্মীয়-পরিজনদের কাছে, এখন তার অবসান হওয়ায় সবাই ধীরে ধীরে আবার ফিরে যাবেন নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মধারার ভেতরে। তবু নিকটতম আত্মীয়-আত্মীয়ারা হোতে পারবেন না সুস্থির—যত দিন না আসবে সুদান হ'তে আমাদের পৌঁছুবার খবর নিয়ে আসা জরুরী তার!

আমার ভাবনার স্রোতে ভেসে চলার ফাঁকে সহযাত্রীরা সকলেই যে স্বপ্নের দেশ হ'তে বাস্তব জগতে ফিরে এসেছিলেন টের পাইনি কিছুই—স্বামীর আহ্বানে চমকে উঠে দেখি, সত্যি সবাই যে প্রাতঃকৃত্য সারতে তৎপর হোয়ে উঠেছেন—আমার হয়নি কিছুই তখনও—ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম না তো? যা হোক চেষ্টা কোরে সবার ফাঁকে এক বার আমিও সেরে এলুম—আমার বাঙ্গালী সহযাত্রিনীরা খুবই ব্যস্ত দেখলুম শিশুদের ভদ্রস্থ কোরে তুলতে—প্রাতরাশ এসে আবার উপস্থিত হবে, তার আগেই প্রস্তুত হবার তোড়জোড় চলেছে—বাচ্চারা সারা ঘর জুড়ে ছুটোছুটি করছিল, ওদেরই বা দোষ কি! ঘরের বাঁধনে কতক্ষণ আর সুস্থির হোয়ে থাকা যায়—মাঝে মাঝে এয়ার হোষ্টেস্ মিষ্টি মিষ্টি কথাতে ভুলিয়ে মা'দের কাছে এনে দিচ্ছিল—বেশ ভাল লাগছিল শিশুদের কলকাকলীতে মুখরিত পরিবেশটি—স্বামী জানালার ধারে বসে প্রকৃতির নব নব সৌন্দর্য্য উপভোগ করছিলেন—হঠাৎ আমাকে বলে উঠলেন। 'দেখো, দেখো—কি সুন্দর! আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘাকে হার মানায়।' সচকিত হোয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে যে দৃশ্য আমি দেখলুম আমার জীবনে দ্বিতীয় বার সে দৃশ্য দেখবার সুযোগ হবে কি না জানি না—চারি ধারে কুয়াশার চিহ্নমাত্র নেই—সারা সকাল রোদে ঝলমল করছিল। দূরে দিগন্তের গায়ে চলে গেছে কত যে পাহাড়ের সারি, গণনা নেই তার!

'পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে, শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে, বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালী'—

পাহাড়ের চূড়া দেখবার উপায় নেই, সমস্ত চূড়া বরফাবৃত। তার উপরে সকালবেলাকার সূর্য্যের আলো পড়ে মনে হচ্ছিল যেন কত হীরা মুক্তা মাণিক্যের ছটা শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা পাহাড়ের চূড়াতে এসে আমাদের সকলকে চমৎকৃত করে দিচ্ছিল। কখনও বা মনে হচ্ছিল পর্ব্বতরাজ তার হীরকখচিত ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত মুকুট মাথায় দিয়ে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছেন দিগন্তের গায়।

ভাব যেখানে গভীর, ভাষা সেখানে মূক—যে সৌন্দর্য্য আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি, তার প্রকাশ করবার মতন ভাষা আমার নেই, যেটুকুও ছিল তাও যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ভাবের আত্মহারায়। কতক্ষণ যে এ সৌন্দর্য্য উপভোগ করেছি আমরা তার হিসেব নিকেশ রাখিনি কোনও, খেয়াল হোল যখন বিমান-চালকের কাছ হ'তে খবর এলো কায়রোতে আবহাওয়া খারাপের দরুণ আমাদের প্লেন গতি পরিবর্ত্তন কোরে যাচ্ছে বেরুটের অভিমুখে, প্লেন চলেছে আরবদেশের হাজার হাজার ফিট উপর দিয়ে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাবো আমরা বেরুট। বেরুট! সৌন্দর্য্যের তালিকাতে যে বেরুটের নাম শুনে এসেছিলাম এত দিন, সুন্দর দেশে যাচ্ছি তার জন্যেই কি পথে যেতে এত সৌন্দর্য্যের সমারোহ? সহরটি না জানি কত বিস্ময় মাখানো সৌন্দর্য্য নিয়ে দেখা দেবে আমাদের চোখে, ভাবতেও পারি না তা।

বেরুট সহরটি সৌন্দর্য্যমণ্ডিত পরিবেশেই যে অবস্থিত, নামবার আগেই পরিচয় পেলুম তার, একধারে তার সাগর অন্যধারে বিস্তীর্ণ পাহাড়ের সারি, মাঝখানে বেরুট বন্দর। প্লেন এসে দাঁড়ালে পর আমরা ধীরে ধীরে সবাই নেমে বিশ্রামাগারের দিকে চলতে লাগলুম, বিরাট আয়তন নিয়ে বিমানঘাঁটিটি অবস্থিত, শুধু বিরাটই নয়, সৌন্দর্য্যমণ্ডিতও বটে। চারি ধারে ফুলের সমারোহ। ফুলবাগানে গাছ আছে বোলে মনেই হয় না। শুধু মনে হয় থরে থরে যেন নানান্ রং-বেরংয়ের ফুল সাজানো। কালো ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে প্লেন দাঁড়াবার সমস্ত জায়গাটি। তার থেকে চলে গেছে তেমনি মসৃণ কালো পথ আমাদের বিশ্রামঘরের দিকে নিয়ে যাবার জন্য। শুধু ঘর বললে ভুল হবে, বিরাট একটি বাড়ী, দোতলা কি তেতলা বোঝবার উপায় নেই। পাহাড়ের বাড়ী কোথাও উঁচু কোথাও বা নিচু, শুধু আমরাই নই, আরো দু'টি প্লেনের যাত্রীও দেখলুম এসে রয়েছে ওখানে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীরা তাদের উজ্জ্বল গায়ের রং ও বেশভূষা দিয়ে পরিবেশটাকে যেন আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল কোরে তুলছিল। সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছিল বুঝি বা হলিউডের কোন এক বিলিতি ছবি দেখছি।

কায়রো পৌঁছুতে দুপুর হোয়ে যাবার সম্ভাবনা বোলেই কি না জানি না—যাত্রীরা সবাই দেখলুম নিজের নিজের পাসপোর্ট জমা দিয়ে রিফ্রেসমেণ্ট রুমের দিকে অগ্রসর হোল, আমরাও চললুম সেই সঙ্গে, তারই বা কি সুন্দর পরিবেশ, উপরতলায় চার ধার কাচ দিয়ে ঘেরা মস্ত বড় একটি হলঘরে রয়েছে সাজানো চেয়ার টেবিলের সারি। টেবিলের উপরে কাচের পাত্র পূর্ণ কোরে রয়েছে জলের পরিবর্ত্তে মোসাম্বির রস—ফলের চাইতে জলের দাম বেশী ওখানে—তাই তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে রয়েছে রসের পাত্র—কিন্তু আমরা হলুম সুজলা সুফলা বাংলার অধিবাসী—জল চাই আমাদের প্রতি পদে—বাধ্য হোয়ে তাই চাইতে হোল—খাওয়ার তাগিদ আমাদের বিশেষ কারুরই ছিল না—শুধু এটা ওটা নাড়াচাড়া কোরে কিছুক্ষণ কাচের মাধ্যমে বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করলুম বসে বসে—ভারী ভাল লাগছিল পরিবেশটি।

আমার এক সহযাত্রিনী প্রস্তাব করলেন, সহরটি দেখতে গেলে কেমন হয়? সানন্দে সবাই রাজী হলুম এ প্রস্তাবে—কিন্তু কতক্ষণ আমাদের থাকতে হবে এখানে—বাইরে যাবার অনুমতি হবে কি না, জানবার জন্যে যাওয়া হোল এয়ার ইণ্ডিয়ার কাউণ্টারে। দুঃখের

বিষয়, অনুমোদন হোল না ওদের তরফ হ'তে। প্লেন কখন ছেড়ে চলে যাবে স্থিরতা নেই তার কোনও, কায়রোর আবহাওয়া প্লেন চলবার উপযোগী হবার খবর এলেই আমাদের অভিযান সুরু হবে কায়রো অভিমুখে—কাজেই বিফল মনোরথ হোয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালুম সবাই—কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝক্ তকতক্ কচ্ছে! বন্দরটি যেদিকে তাকাই সেদিকই যেন অপরূপ হোয়ে দেখা দেয় আমাদের কাছে—অবাক হোয়ে দেখছিলাম তাই আর মনে হচ্ছিল গতকালও এমনি সময়ে প্রিয় পরিজনদের কত নিকটে ছিলাম আর আজ কত দূরে এক আন্তর্জাতিক পরিবেশের ভেতরে রয়েছি—এ রকম ঘটবে ভাবিওনি কোনও দিন। তাই মনে হয় সহস্র দিনের মাঝে এ দিনখানি রবে স্বতন্ত্র চিরন্তন।

কায়রো যাত্রা করলুম যখন, আমাদের ঘড়িতে ভারতের সময় অনুসারী দুপুর এসে গেছে—ধীরে ধীরে বেরুটকে বিদায় জানিয়ে আমরা গিয়ে বসলুম স্বস্থানে। প্লেন সশব্দে ভূমি ছেড়ে পাড়ি দিল সাগরের উপর দিয়ে আকাশপথে—দু'ঘণ্টার ভেতরেই কায়রো পৌঁছে যাবে—সাগরের ওপর দিয়েই যেতে হবে প্রায় সারাটা রাস্তা—ধীরে ধীরে সাগর হ'তে কত উঁচুতে আমরা উঠে গেছি—নীচের দিকে তাকালে ঢেউয়ের ঘাত-প্রতিঘাত আর দেখা যাচ্ছিল না—শুধু মনে হচ্ছিল নীচে—বহু নীচে সাদা ধবধবে বরফের টুকরো সারি সারি জমাট বেঁধে রয়েছে—অভিনিবেশ সহকারে তাকালে দেখা যাচ্ছিল ধীরে ধীরে সেগুলো আবার মিলিয়েও যাচ্ছিল—সাগরের কোনও প্রতাপই চোখে পড়ছিল না, আমাদের আলাউদ্দিনের প্রদীপের দৈত্যের ভয়াবহ শব্দ শুনে সাগরও যেন মনে হচ্ছিল শান্ত হোয়ে গেছে অনেক!

তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার নিজের চোখও যেন শান্ত হোয়ে আসছিল ধীরে ধীরে—ইচ্ছে হচ্ছিল কিছুক্ষণ সিটের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ দু'টো বুজে বিশ্রাম নিই—কিন্তু সৌন্দর্য্যপিয়াসী মন তা মেনে নিতে রাজী হোল না—যদি কোনও নূতন সৌন্দর্য্য হ'তে বঞ্চিত হোয়ে যাই আবার? অগত্যা সঙ্গে কোরে নিয়ে আসা একখানা বাংলা বই খুলে বসলুম। কিছুটা সময় বই এর প্রতি, কিছুটা সময় আবার বাইরের প্রতি দৃষ্টি রেখে কিছুক্ষণ চললো এই ভাবে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রথ দেখা ও কলা বেচা একসঙ্গে করা আর আমার পক্ষে সম্ভব হোল না—কখন হ'তে বইটি আমার মনের ও চোখের সমগ্র একাগ্রতা টেনে নিয়েছে ওর দিকে, টেরও পাইনি তা; সামনের সারি হতে যখন বিমানচালকের বিমানের গতি, উচ্চতা ও কায়রোতে পৌঁছুবার সময় ইত্যাদি নিয়ে বিবরণ এলো হাতে—খেয়াল হোল তখন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নাকি কায়রোতে পৌঁছে যাবো আমরা—তাড়াতাড়ি আবার নীচে তাকালুম কিন্তু তখন যাচ্ছিলুম আমরা মেঘের উপর দিয়ে, আশে-পাশে নীচে সমগ্র মেঘ আর মেঘ—উপর দিকে তাকিয়ে দেখি পরিষ্কার নীল আকাশে—তার নীচে এখানে ওখানে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই মেঘের ভেতর দিয়েই পথ কোরে নামবে আমাদের প্লেন—কায়রো যেন আপনাকে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে, কিছুতেই দেখা দেবে না বা নামতে দেবে না বিদেশীদের ওর বুকে—মেঘের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলুম দেখে ভয়ও হচ্ছিল আবার পুলক জাগছিল। মনে মনে হচ্ছিল যেন ফিরে গেছি আমাদের সেই পূর্ব্বেকার যুগে—পাড়ি দিয়েছি পুষ্পক রথে কোরে মেঘের রাজ্যেতে—শুধু দুঃখ—সে যুগের পুষ্পক রথে হোত না কোনও দুর্ঘটনা, এ যুগে সেটা আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। তাই মেঘের রাজ্য পার হোয়ে যতক্ষণ না পৌঁছুবো আমাদের এ যুগের মিশরের মাটিতে, ভয়ও কাটবে না মন হতে।

যা হোক, মানে মানে তো গিয়ে নামলুম কায়রোতে—আসবার আগে কত আলাপ আলোচনার কেন্দ্র ছিল এই কায়রো—কি দেখবো কি জানি না দেখবো। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি এই কায়রো নগরীতে—প্রথমতঃ এয়ার পোর্টটি দেখেই মনটা গেল দমে। একটি আন্তর্জাতিক বিমানঘাঁটি আরেকটু উন্নত ও সুশ্রী হওয়া অন্ততঃ উচিত ছিল মনে হয়, কিংবা বেরুটের স্মৃতিতে মনটা ভরপুর ছিল বোলেও বোধ হয় ওর পাশে আর কাউকে সে রকম পছন্দ হচ্ছিল না—কিন্তু আমার সঙ্গিনীদেরও দেখলুম তাই মত—মনের এই অবস্থায় কারুরই আর ভাল লাগছিল না বিমানঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে—বিমানঘাঁটিটি তখন আবার সংস্কার করা হচ্ছিল, তার জন্যেই যেন আরও গোলমেলে ও অসুন্দর লাগছিল সব কিছু আমাদের কাছে।

পাসপোর্ট, সহরে প্রবেশ করবার ও থাকবার অনুমতি-পত্র আদায় ইত্যাদির হাঙ্গামায় কেটে গেলো বেশ খানিকটা সময়। সব কিছু সেরে বাইরে বেরিয়ে দেখি, সুদান সরকারের তরফ হ'তে একজন সুদানী ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য—সুদানী যখন তখন তো নিশ্চয়ই নিগ্রো কিন্তু নিগ্রোদের যে ছবি মনে আঁকা ছিল এ তো সে রকম মোটেও নয়। রং অবিশ্যি খুবই কালো, চুলও সব কুঁকড়ে কুঁকড়ে রয়েছে কিন্তু আর সব কিছু তো আমাদেরই মতন। পোষাকেও দিব্যি বিলাতী ভাবাপন্ন, কথাবার্ত্তাতেও ভারী ভদ্র। কায়রো এয়ার-পোর্ট দেখে মনটি দমে গিয়েছিল যেমনি, ভদ্রলোকের সাথে পরিচিত হোয়ে সুদানীদের সম্বন্ধে যে ভয় ভাবনা ছিল মনে তা কেটে যাওয়ায় তেমনি আবার উৎসাহিত হোয়ে উঠলো। একটা দিন কায়রোতে থাকবার ও পরদিন সকালের প্লেনে খারটুমে যাত্রা করবার সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেন, এখন শুধু হোটেলের দিকে যাবার অপেক্ষা—বেশ খুশীর একটি ছোঁয়া লাগলো মনে। কায়রো সহরটি ঘুরে দেখবার অবকাশ হোল দেখে সবাই বেশ প্রফুল্ল মনেই চললুম বিমান কোম্পানীর গাড়ীতে কোরে হোটেল অভিমুখে।

কায়রোতে আমাদের যে হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করা হোয়েছিল, সেটা বিমানঘাঁটি হ'তে বেশ খানিকটা দূরে—শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল বোলে যাবার পথেই আমাদের শহরের বেশ খানিকটা দেখা হোয়ে গেলো—রাস্তাগুলো মস্ত চওড়া—মাঝখান দিয়ে চলে গেছে ট্রামের লাইন এঁকে বেঁকে—তার দু'ধারে মোটর চালাবার রাস্তা—ফুটপাতগুলো ভারী সুন্দর—সবুজ মখমলের মতন সবুজ ঘাসে বিছানো, তার মাঝে মাঝে আবার ফুলের কেয়ারী—ছোট ছোট নানা রংয়ের ফুল ফুটেছিল তাতে। যেতে যেতে পথে ফুলের সমাবেশ দেখতে পেলুম অনেক জায়গাতেই—পথিকের চোখে নয়নাভিরাম কোরে তুলবার ভারী সুন্দর প্রয়াস—মিশর শুধু সুন্দর নয় সুরুচি-সম্পন্নও বটে—বাড়ীগুলোও বা কি সুন্দর, তেমনি তার রংয়ের সমাবেশ,

তেমনি গঠন-নৈপুণ্য—পাথরের তৈরী বাড়ীগুলো মনে হোল সব—হবে নাই বা কেন। পিরামিডের দেশ এই কায়রো—ঐশ্বর্য্য ও শিল্পকলার কেন্দ্রভূমি—তাই এর শিল্পচাতুর্য্যে মনপ্রাণ মুগ্ধ হোয়ে যাবে বেশী কথা কি আর। বিমানঘাঁটিটিই শুধু দেখলুম এর ব্যতিক্রম, অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য। হোটেলে পৌঁছে কিন্তু আর তর সইছিল না—ভাবছিলুম শুধু যখন নির্দিষ্ট ঘরটিতে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম করবো, বিশেষত: আমার সহযাত্রিনীরা বাচ্চাদের সামলে নিয়ে চলতে বেশ কাহিল হোয়ে পড়েছিলেন—যখন ঘরে গেলুম সত্যি ভারী ভাল লাগলো মনে—ঘরটিও ছিল ভারী সুন্দর—আরাম উপভোগ করবার প্রয়োজনীয় সবকিছুই ছিল তাতে—কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সংলগ্ন স্নানের ঘরে খুব ভাল কোরে স্নানটা সেরে নিলুম আগে—ভারী আরাম ও তৃপ্তি লাগছিল মনে—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম স্বামী আবার প্রতীক্ষা কোরে বোসে আছেন জলের নির্ম্মল ধারায় শরীর ও মন শুচিস্নিগ্ধ কোরে তুলবার জন্যে—তারপরে যোপযুক্ত পোষাকে সজ্জিত হোয়ে নিলুম খাবার ঘরে খাবার জন্যে—উনিও দেখলুম বেশ তাড়াতাড়ির সহিত কোরে এলেন স্নান—নিশ্চয়ই তাহোলে খিদের তাগিদে। স্বামীর তৈরী হবার অবসরটুকুনে ফোন কোরে জেনে নিলুম সহযাত্রী যাত্রিনীরা সবাই প্রস্তুত হোয়েছেন কিনা—বাচ্চাদের ঘরেই খাওয়ানো সাঙ্গ কোরে সবাই চলছিলেন খাবার উদ্দেশ্যে—সহযাত্রী দেওরটির ঘর হ'তে কিন্তু কোনও সাড়াই পেলুম না, হয় তো খাবার ঘরেও গিয়েই অপেক্ষা করছে সকলকার জন্যে।

সত্যিই তাই—মস্ত বড় টেবিলের একটি আসন দখল কোরে খাবার ঘরের ম্যানেজারের সঙ্গে বেশ গল্প জমিয়ে তুলেছেন—আশেপাশের টেবিলগুলো প্রায় খালিই ছিল—আমরাই বোধ হয় সর্ব্বশেষ খাবার ঘরের অতিথি—মেনু এলো আমাদের কাছে অনুমোদনের জন্যে কিন্তু সারা তালিকা খুঁজেও পেলুম না আমাদের প্রিয় ভাত ও মাছের ঝোল—ইংলিশ হোটেল, তাই সবই প্রায় ইংলিশ খানা—ভাজা সেদ্ধ নয়তো কাঁচা—খেতে হবে পাউরুটি সহকারে—কি কি আনবার জন্যে বলেছিলাম এখন আর মনে নেই, শুধু মনে আছে আমাদের তিনটি বাঙ্গালী মেয়ের আধপেটা খেয়েই ফিরে আসতে হোয়েছিল ঘরে।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং—ঘুম-জড়ানো চোখে রিসিভার তুলে ধরতেই শুনতে পেলাম তাড়াতাড়ি তৈরী হোয়ে নেবার জন্যে জোর তাগাদা—ওরে বাব্বা! এরি মধ্যে চারটে বেজে গেলো! তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম—যেতে হবে পিরামিড দর্শনে, তাই তাড়াতাড়ি সব কিছু সেরে দ্বিতীয় বার ক্রিং ক্রিং করবার আগে রওনা হোলুম নীচের উদ্দেশ্যে। গিয়ে দেখি, আমাদের গ্রুপের ভেতরে সিনিয়ার ভদ্রলোক (মিত্তির সাহেব) ম্যানেজারকে মধ্যস্থ রেখে দু'খানা ট্যাক্সি ঠিক করেছেন, ম্যানেজারের সঙ্গে ট্যাক্সিচালকের কি কথা হোল জানি না—দু'খানা ট্যাক্সিই শেষে ঠিক হোল পিরামিড ও সমস্ত শহর ঘুরে দেখাবার জন্য। দুর্গা দুর্গা স্মরণ কোরে রওনা হলুম, একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে নিলুম—কে বুঝিয়ে দেবে সবকিছু দ্রষ্টব্যের ইতিবৃত্ত। আমাদের ড্রাইভারকে দিয়েও হয়তো হোতে পারতো সে কাজ কিন্তু আরবী ভাষা ওদের তখন যে ছিল আমাদের কাছে 'হিচির মিচি'র ছাড়া আর কিছু নয় কিন্তু এখনও কি খুব রপ্ত করতে পেরেছি? মালী বা চাকরের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তো বুঝতে পারি তা বা শুকনো খটখটে ভাষা!

যা হোক, গাড়ী দু'খানা তো এগুতে লাগলো ধীরে ধীরে, যাতে সব কিছুই বেশ ভাল কোরে দেখতে দেখতে যেতে পারি—সবচাইতে বাড়ীগুলোই যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী। নীল নদের ধার দিয়ে এ রাস্তা চলে গেছে পিরামিডের দিকে। নদীর ওপারে দেখা যাচ্ছিল নানান রকম নাম না জানা শস্যের ক্ষেত—নীল নদের কল্যাণে শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ কায়রো শহর ছোট ছোট গাছগুলোকে হেলিয়ে দুলিয়ে বেশ সুন্দর মিঠে মিঠে হাওয়া বইছিল। বিকেলটিতে ডিসেম্বর হোলে কি হবে, ভারী আরামদায়ক মনে হচ্ছিল হাওয়াটা। এক দিকে প্রকৃতির অনবদ্য অবদান অপর দিকে মানুষের তৈরী অপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্যের সমাবেশ—তারই ভেতর দিয়ে সবকিছু উপভোগ করতে করতে আমরা চলেছিলুম পৃথিবী বিখ্যাত পিরামিড দর্শনে

পিরামিড নদীর এপারে নয়, ওপারে। তাই সেতু পার হোয়ে যেতে হোল ওপারে। দূর হ'তেই দেখা যাচ্ছিল মিশরের প্রাচীন সভ্যতা ও ঐশ্বর্য্যের প্রতীক পিরামিডের সুউচ্চ শির—কি বিরাট তার আয়তন, যেমনি দৈর্ঘ্যে তেমনি প্রস্থে, মাথা উঁচু কোরে দেখতে দেখতে ব্যথা ধরে যায় যেন—দেখতেই যাকে পরিশ্রম হয় তৈরী হ'তে সেটা কত লক্ষ লোকের না জানি পরিশ্রম-সাপেক্ষ ছিল! কিন্তু কি এমন প্রয়োজনীয়তা ছিল এর? ফারাওদের খেয়াল চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছু কি? যার জন্যেই হোক, আজ বিশ্বের দরবারে প্রধান আশ্চর্য্য সমূহের ভিতরে মিশরের পিরামিড একটি অন্যতম আশ্চর্য্য—কত দূর দূরান্তর হ'তে দর্শকের দল ছুটে আসে শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে শুধু একটিবার দেখবার জন্য—ঐতিহাসিকদের কথা তো ছেড়েই দিলুম—দিনের পর দিন তারা কাটিয়ে দিতে পারে এই পিরামিডের গবেষণার পিছনে—ভিতরে নাকি দেখবার আছে এর অনেক কিছুই কিন্তু কি কারণে যেন সম্ভব হোল না আমাদের পক্ষে—মনে মনে কিন্তু আমি খুশীই হোয়েছিলাম—মোটেও ঔৎসুক্য ছিল না মনে, তার চাইতে মনে হচ্ছিল নীল নদের ধারে বসে কায়রোর দিকে তাকিয়ে থাকলে মনটা তৃপ্ত হোত বেশী—বিরাট পিরামিডের বিরাট সৌন্দর্য্য আমার মনে জাগাচ্ছিল শুধু এক শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়, আর কিছু নয়—সাধারণের চোখে হয়তো এর সৌন্দর্য্য ধরা পড়ে না, তাই এতদিনকার জল্পনা কল্পনার আধার পিরামিডের সৌন্দর্য্য জাগাতে পারেনি আমার মনে কোনও আনন্দ—শুধুই যেন ছিল শ্রদ্ধা ও বিস্ময়!

পিরামিডের কাছে বিদায় দিয়ে আমাদের চলা সুরু হোল এবার শহরের দিকে, তবে অন্য পথ দিয়ে যেতে যেতে একটি মস্ত বড় ফোয়ারা নিয়ে ঘেরানো একটি জায়গাতে—আমাদের গাড়ী দাঁড়ালো—ফোয়ারা তো নয়, যেন শুধুই লাল নীল নানান বর্ণের বাহারের ছটা—চারধারে এরকম নানান রকমের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হোতে থাকায় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল দূর হ'তে—আমরা সকলেই নেমে বেশ ভাল কোরে দেখলুম—গাড়ী হতে নেমে যেন কায়রোর আরেক অভিনব মূর্ত্তিও দেখতে পেলুম—বুলগেনিনের আগমনে কোলকাতা সহরের এক আলোকমালায় সজ্জিত বেশ দেখে এসেছিলাম—মনে ভাসছিল সে ছবি—এখানেও দেখছি তেমনি নানা রং-বেরংয়ের আলোর সাজে সজ্জিত বেশ—তবে কি কায়রোতেও সাজ সাজ রব সাড়া পড়ে গেছে তেমনি কোনও সম্মানিত অতিথির আগমন সম্ভাবনায়? পথপ্রদর্শক আমাদের সে ভুল ভেঙ্গে দিল—সমস্ত শহরটি প্রতি রাত্তেই এমনি আলোকমালায় সজ্জিত বেশ ধারণ করে, বিশেষ তার কারণ নেই

কোনও—তবে দূর হতে যে সব দর্শকের দল ছুটে আসে কায়রোর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করবার জন্য, তাদের চোখে নিজেকে আরও সুন্দর—আরো অভিনব কোরে তুলবার জন্যই হয়তো এই আলোর সমারোহে সমারূঢ় থাকে সুন্দরী কায়রো নগরী।

গাড়ীতে উঠে ঠিক হোল আর নামা হবে না, শুধু গাড়ীতে কোরে ঘুরে ঘুরে দেখা হবে—যথাসম্ভব! হোটেলে যে ফিরে যাবার প্রস্তাব হয়নি ভাগ্যি—কত রাস্তার উপর দিয়ে কত কি দেখতে দেখতে গেলুম। পথপ্রদর্শক সঙ্গে সঙ্গে বলে যাচ্ছিল সবাকার নাম ধাম পরিচয় কিন্তু আমার মন ছিল না মোটেও তাতে—যা সুন্দর, যা মধুর—যা দেখে মনপ্রাণ হবে তৃপ্ত তার দিকেই শুধু আমার দৃষ্টি—কি হবে তার পেছনের নাম গোত্র বংশপরিচয় জেনে—একটি শহর কত সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হোতে পারে তাই শুধু দেখছিলাম দু'নয়ন ভরে। কিন্তু একটি প্রশ্ন মাঝে মাঝে মনকে নাড়া দিয়ে উঠছিল, পারলুম না আর তাকে দাবিয়ে রাখতে—সকল শহরেই তো যেমনি থাকে নূতনের অস্তিত্ব তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পুরাতনের অবস্থিতিও কিছু না কিছু থেকে যায়—এতদিনকার পুরোনো শহর, নিশ্চয়ই আছে এরও ছোট ছোট ঘিঞ্জিগলি ও বস্তির সারি কিন্তু কোথাও আমাদের চোখে পড়লো না তো সে সব! গাড়ীতে ছিলেন সঙ্গে স্বামী ও এক মজুমদার ভদ্রলোক পরিবার নিয়ে—কথাটা শুনে হেসেই উঠলেন, যেন কত হাসির কথা এটা—এখানে নাকি কোনও কিছুই অসুন্দর যা চোখের পীড়াদায়ক হোয়ে থাকতে পারে না—নিত্যি নূতন সংস্করণ ও পরিবর্ত্তনের ফলে এদের যা মলিন ও অসুন্দর ছিল—তাই নাকি হোয়েছে এখন সৌন্দর্য্যে রূপান্তরিত। মন মানতে চাইলো না তা—হোতেই পারে না তা—নিশ্চয়ই পথপ্রদর্শক আমাদের কাছ হতে আড়াল কোরে রাখবার জন্য নিয়ে যাবার নির্দ্দেশ দেয়নি সে পথে আমাদের দেশের পথপ্রদর্শকও কি নিয়ে যেতো কোনও বিদেশী দর্শককে দেখাবার জন্য চিৎপুর বা বড়বাজারের কোনও রাস্তাতে? যা হোক, বেশী বাক্যব্যয় কোরে সময় নষ্ট করবার ইচ্ছে হোল না আর—চুপটি কোরে শুধুই দেখতে লাগলুম যা কিছু পড়ছে পথে যেতে যেতে।

হোটেলে যখন ফিরলুম, তখন খাবার সময় হোয়ে গেছে, অথচ তখনও চা খাওয়া হয় নি—খেয়ালই ছিল না একদম—ঠিক হোল চা খেয়ে, তার পর কিছুক্ষণ বাদে না হয় রাতের খাওয়া হবে। চা খেতে খেতে বেশ গল্প-গুজবও চললো খানিকটা, দু'জন সহযাত্রিনী চলে গেলেন ঘরে, বাচ্চাদের ব্যবস্থা করবার জন্যে। আমরা রাস্তার ধারের লবিতে বসে দেখতে লাগলুম রাস্তার লোক চলাচল ও যানবাহনের আনাগোনা—কতক্ষণ বসেছিলাম এমনি ভাবে, খেয়াল ছিল না। সঙ্গিনীদের পুনরাগমনে সচেতন হোয়ে উঠলুম, ওখান হ'তেই খাবারের উদ্দেশ্যে চললুম। এবারে দেখলুম, খাবার-ঘর নানা অতিথির আগমনে সরগরম—মিষ্টি মিষ্টি বাজনা বাজছে একটু দূরে, এক কোণ হ'তে নানান বর্ণের ফুলের তোড়া শোভা পাচ্ছে—সব টেবিলেতেই জোরালো আলোতে আলোকিত ঘরটি। সব কিছুর সমাবেশে ঘরখানা মায়াপুরী বোলে ভ্রম হচ্ছিল, যেন সব জায়গাতেই কি কায়রোর জাঁকজমক ও আলোর সমারোহ! যা হোক্, খাওয়া তো হোল একসঙ্গে, খাওয়ার চাইতে সত্যি বলতে কি পরিবেশেই আনন্দ পেলাম বেশী। কত রং-বেরংয়ের পোষাকে সজ্জিত হোয়ে কত সুন্দর ও সুন্দরীরা আসছে-যাচ্ছে, হাস্যে-লাস্যে ঘরখানাকে আমোদিত করে তুলছে—কেউ কেউ শুধু 'ড্রিঙ্ক' কোরেই চলে যাচ্ছে আবার বাইরে। 'ড্রিঙ্ক' করাটা ওদের কাছে যেমন আমাদের কাছে জল পান করা, শুধু আমাদের টেবিলটি ছাড়া আর সর্ব্বত্রই হচ্ছিল প্রচুর এর সরবরাহ। দেখতে বেশ লাগছিল, সব কিছু মিলে কিন্তু বেশীক্ষণ বসবার জো নেই, কাল সকালেই আবার রওনা হতে হবে সুদানের রাজধানী খারটুম অভিমুখে—তাই পরদিন ভোর ৫টাতে প্রাতরাশের ব্যবস্থার কথা বোলে আমরা যে যার ঘরে চললুম শুভরাত্রি জানিয়ে।

আধো আলো আধো ছায়ার ভেতর দিয়ে আমাদের গাড়ী চলেছে বিমানঘাঁটি অভিমুখে—পথে যেতে আরেকটি হোটেল হতে পেলুম ইস্কুলের ছাত্রী কয়েকটি, ভারী সুন্দর দেখতে ও সঙ্গে তাদের একজন মিস্ট্রেস চলেছে খারটুমে। ছুটি উপলক্ষে প্রিয়-পরিজনদের কাছে, মিস্ট্রেস অবিশ্যি সঙ্গে যাচ্ছিল শুধু এয়ার-পোর্ট অবধি ওদের যাত্রাপথে বিদায় জানাবার জন্য। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজিতে ভারী মিষ্টি কোরে আলাপ-আলোচনা করছিলেন, মেশবার জন্য দু' পক্ষই আগ্রহশীল কিন্তু মাঝখানে রয়েছে ভাষার ব্যবধান—ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই মনের ভাব আদান-প্রদানের।

এয়ার-পোর্টে যথাসময়ে পৌঁছুবার বেশ খানিকক্ষণ পরে আমাদের যাত্রা হোল সুরু খারটুম অভিমুখে—এবারে আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নয়, মরুভূমির সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে যেতে হবে। সে যে কি ভোগ মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছি তা তার জন্যই বোধ হয় রেখেছে সুদানের সীমারেখায় বিশ্রামের জন্য একটি বিমানঘাঁটি। ওয়াদ্দীহাল্‌ফা তার নাম—শুধুমাত্র একটি ঘর, আশেপাশে তার আর নেই কোনও জনবসতির চিহ্ন। জানি না, এ দেশে কেউ বাস করে কি না! আর করলেও কি তাদের উপজীবিকা। শুধু বালি আর বালি—চারি দিকে ধূ ধূ করছে মরুভূমি, কোনও দিন এখানে বৃষ্টি হয় না, এই নাকি এই জায়গাটির বিশেষত্ব। সহজেই তা হোলে বুঝতে পারা যায়, জায়গাটির মাহাত্ম্য। তাই সবুজের অভিযান নেই এর ধারে-কাছে কোথাও। সমস্ত দেহ-মন যেন আকুল হোয়ে উঠছিল একটুখানি ধরিত্রীর সবুজ শ্যামলিমা রূপ দেখবার জন্য, কিন্তু কোথায় পাবো তা?

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্। ওয়াদী হালফা পার হোয়ে যাবার কিছু পর হ'তেই স্মরণের জন্য এক মাধুর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তি—সাহারা প্রান্তরের কোনও প্রভাবই আর বিস্তার করতে পারেনি তখন সুদানের বুকে—উত্তর প্রান্তে যদি বা কিছু থেকে থাকে মধ্য বা দক্ষিণ প্রান্তে মোটেও নেই বলা চলে—নীল নদের আশীষবারি সুরু সেখানে—এক পাশে নীল নদকে রেখে আমাদের প্লেন চলছিল খারটুমের দিকে—নীল নদের আশে-পাশে সর্ব্বত্র সবুজের সমাবেশ—দেখে দেখে যেন আর চোখের তৃষ্ণা মেটে না—শ্যামল বাঙ্গলার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল আমাদের সে দৃশ্য—সমস্ত মনপ্রাণ যেন উন্মুখ হোয়ে উঠেছিল এ দৃশ্য দেখবার জন্য। এত শীগগির তো দূরের কথা, দেখতেই আর পাবো কিনা সে বিষয়েই যথেষ্ট আশঙ্কা জাগছিল মনে। ওয়াদী হালফাকে দেখে তখন আবার শঙ্কা জাগলো মনে। আমাদের গন্তব্যস্থল কেমন হবে আবার কে জানে! মরুভূমির দেশে তো দেখছি কিছুই ঠিক নেই। এই শুকনো খটখটে ধূ ধূ করছে বালির দেশ, আবার কিছু দূরেই

শান্ত স্নিগ্ধ সবুজ শ্যামল ভূমি! ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম এক গ্রীক ভদ্রলোককে (ব্যবসায় উপলক্ষে সুদানেই বসতি) আমাদের জায়গাটির নাম কোরে কেমন হোতে পারে তার আবহাওয়া ও পরিবেশ—উত্তর শুনে তো হতবাক্ আমি—সমগ্র সুদানের ভেতরে নাকি ওটি সব চাইতে মনোরম স্থান এবং সবুজের দেশ (Green land of Sudan) বলা হয় সুদানের।

বিকেল তিনটে নাগাদ আমরা গিয়ে পৌঁছলুম খারটুম বিমান-ঘাঁটিতে—সুদান সরকারের Chief Hydrologist ছিলেন একজন ভারতীয় Mr. Rajadaksha অবিশ্যি তিনি এখন আবার ফিরে গেছেন ভারতেই Mr Rajadaksha এবং সুদান সরকারের তরফ হ'তে আরেক জন সুদানী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন আমাদের রিসিভ করবার জন্যে। নেমেই একজন ভারতীয়কে দেখতে পেয়ে খুব ভাল লাগলো মনটা—উনিও এত দিন বাদে একসঙ্গে বেশ কয়েক জন ভারতীয়কে দেখতে পেয়ে ভারী খুশী, উভয়েই খুব সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন আমাদের। তারপর যথারীতি নিয়ম কানুনের বাধা-বিপত্তি উত্তীর্ণ হোয়ে রওনা হোলুম অবশেষে ওঁদেরই আনীত গাড়ী কোরে আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট হোটেল অভিমুখে।

খারটুমে নেমেই 'সুদানের পথে'র সমাপ্তির-রেখা টেনে দেওয়া উচিত ছিল বোধ হয় কিন্তু আমাদের প্রকৃত গন্তব্যস্থলে যাবার পূর্বে রাজধানীতে দু'টো দিনের অবস্থান কালের শুধু একটি ঘটনার উল্লেখ কোরেই আমার এ যাত্রাপথের কাহিনীর যবনিকা টেনে দেবো আমি।

পৌঁছবার পরের দিন সকালে স্বামী ও ব্যাচেলার ভদ্রলোক চক্রবর্তী (মাসখানেক হোল অবিশ্যি ব্যাচেলার নাম ঘুচে গেছে) বেরোলেম traveller's cheque ভাঙ্গাবার জন্যে ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যে—Mr. Rajadaksha অথবা Indian Embassyর সাহায্য ইচ্ছে হোলেই নিতে পারতেন কিন্তু সামান্য এ কারণে তাদের সাহায্য আর চাইলেম না, যা হোক ওদের সঙ্গে আমিও চললুম এই সুযোগে খারটুমও একটু বেশ ঘোরা হোয়ে যাবে মনে কোরে। রাস্তা-ঘাট একেবারেই অপরিচিত শুধু নয়, ব্যাঙ্ক সহরের কোন দিকে অবস্থিত তারও কোনও নির্দেশ জানা নেই আমাদের। ট্যাক্সি নেবারও ভরসা নেই, যদি কোনও কারণে ব্যাঙ্ক বন্ধ থেকে থাকে অথবা Cheque ভাঙ্গানো না যায় মুস্কিলে পড়তে হবে তাহোলে—হাতে নেই একটিও সুদানী মুদ্রা—যেতে হবে তাহোলে আবার সেই Embassy অথবা Mr. Rajadakshaর কাছে সাহায্য প্রত্যাশায়।

তিন জনে হাঁটতে সুরু করলুম—যেতে যেতে পথের ধারে একটি বেশ বড় রকমের দোকানের সামনে দেখলুম দু'জন ভদ্রলোক (গ্রীক বা ইজিপসিয়ান) কথা বলছেন দাঁড়িয়ে—National Bank of Egypt এর পথের নির্দেশটুকু একটু পাবার আশায় ওদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করা হোল—প্রথমে চাইলেন বোঝাতে কিন্তু তারপরে আমাদের না জানার ভাষা বুঝতে পেরে কি না জানি না নিজেই বললেন তাদের ভেতর একজন আমাদের পথ দেখিয়ে দেবার জন্য—পথ হ'তে একটি হেভি ট্যাক্সিও ডেকে নিলেন আমাদের কিছু বলবার অবসর না দিয়েই—গাড়ীতে যেতেও বেশ খানিকটা সময় লাগলো আমাদের ব্যাঙ্কে পৌঁছতে।

Bankএ দেখলুম ভদ্রলোক বেশ পরিচিত সকলকার সঙ্গেই—ব্যবসায় উপলক্ষে বহুদিন ধরে বসবাস এখানে, এটুকুন শুধু জেনেছিলাম ভদ্রলোকের সম্বন্ধে—ব্যাঙ্কের কাজও সুন্দর ভাবে সবকিছু সমাধান হোল ভদ্রলোকের সাহায্যে এবং বেশ অল্প সময়ের ভেতরেই—তারপর ব্যাঙ্ক হতে কোথায় আমরা যেতে চাই জানতে চাইলেন—আমাদের পরবর্তী যাবার জায়গা ছিল Indian liason Offices এর বাড়ীতে—কিন্তু ভদ্রলোকের অমূল্য সময় এ রকম কোরে নষ্ট করবার ইচ্ছে আমাদের ছিল না—তাই অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা নিজেরাই যেতে পারবো এবারে জানালুম—কিন্তু Liason Offices এর বাড়ীতেও এই প্রথম আমাদের যাওয়া জেনে নিয়ে হয়তো বুঝতে পারলেন সে পথও আমাদের একেবারেই অপরিচিত। কিন্তু টাকা ছিল তখন আমাদের সঙ্গে, তাই আমরা ভরসা পাচ্ছিলুম যেতে যথেষ্ট—আমাদের সকল আপত্তি হাসিমুখে মেনে নিয়ে আবার চললেন আমাদের নিয়ে লিয়াসন অফিসারের বাড়ী অভিমুখে—ভদ্রলোকের অযাচিত এই রকম সাহায্যে ও অমায়িক ব্যবহারে আমরা ভারী মোহিত হোয়ে গিয়েছিলাম—শুধু তাই নয়, গন্তব্যস্থানে পৌঁছে উনি নিজেই এবারে বিদায় চাইলেন এই বোলে, এ স্থানের ধারে কাছে ট্যাক্সি মোটেও মিলতে চায় না, তাই আমাদের প্রথম থেকে নিয়ে যাওয়া ও আসার গাড়ীটি কোরেই ফিরে যেতে চান উনি স্বস্থানে—কিন্তু তা কি কোরে হয় ট্যাক্সির সকল পাওনা যে আমাদেরই চুকিয়ে দেওয়া উচিত—ভদ্রলোক এ থেকেও নিরস্ত কোরে দিলেন আমার দু'জন সঙ্গীকে তার নীরব হাসি ও বিনীত আপত্তিতে, এ এমনি একটি ব্যাপার খুব বেশী জোরও করা চলে না এতে—বাধ্য হয়ে ক্ষান্ত হোলেন সঙ্গী দু'জন, ট্যাক্সির ভাড়াটা কিছুই নয় কিন্তু এ উপলক্ষ্যে একজন বিদেশী ভদ্রলোকের যে উদারতা ও মধুর ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হোলুম আমরা চিরকাল তা থেকে যাবে আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায়। কত ভাবনা চিন্তা ও কত সংশয় নিয়ে এসেছিলাম প্রবাসে—তাই ভদ্রলোককে নিয়ে যখন ট্যাক্সি দূর হ'তে দূরান্তরে মিলিয়ে যেতে লাগলো তখন শুধু কবিবরের কথাগুলো কানে বাজছিল, "আছে আছে প্রেম ধুলায় ধুলায়, আনন্দ আছে নিখিলে। মিথ্যায় ঘেরা ছোট কণাটিরে তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।" "প্রবাস কোথাও নহিরে, নহিরে জনমে জনমে মরণে। যাহা হই আমি তাই হয়ে রব সে গৌরবের চরণে।"

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে দিলওয়ারা মন্দিরে শ্বেত-প্রস্তরে খোদিত একটি স্তম্ভের আলোক-চিত্র মুদ্রিত হয়েছে। চিত্রটি শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় গৃহীত।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

ফেং চেং-শিয়াংএর সঙ্গে ওয়াংদের আলাপ খুব বেশী দিনের নয়।

বছর খানেক আগে একদিন সন্ধ্যেবেলা চিয়েং-চাং হঠাৎ এনে হাজির করেছিলো চেং-শিয়াংকে।

জেনী তখন রান্নাঘরে। মিনি সবে মাত্র ফিরে এসেছে লণ্ড্রির দোকান থেকে। বুড়ো ওয়াং একটি দীর্ঘ দিবানিদ্রা শেষ করে উঠেছে কিছুক্ষণ আগে।

ওয়াংদের পরিবার এমনি খুব সাদাসিধে। অবস্থা স্বচ্ছল হলেও নিজেদের চলাফেরা আদব-কায়দায় সাধারণ চীনা পরিবারের সমস্ত প্রথাই বজায় রেখেছে। সম্প্রতি ছেলে-মেয়েরা ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়া শিখলেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কোনো ফিরিঙ্গীয়ানা ঢোকেনি তাদের বাড়িতে।

কিন্তু বড়ো ছেলে চিয়েং-চাং বদলাতে সুরু করেছিলো সম্প্রতি। দেখা গেল, হলিউডের ছবি দেখতে দেখতে তার ইংরেজি কথাবার্তা একটু আমেরিকান ঢঙের হয়ে যাচ্ছে, তার চীনে কথার মধ্যে অনেক আমেরিকান বুকনি, গলায় জমকালো টাই, কিংবা গায়ে উগ্র রঙীন হাওয়াইআন শার্ট।

এ সব বর্বরদের দেশে বসবাস করার কোনো মানেই হয় না, সে বলতে সুরু করলো, "দেশ বলতে আমেরিকা। ওদের দেশে কী ফ্রীডম।"

"সেখানে গিয়ে থাকলেই পারো," জেনী একদিন হেসে বলেছিলো।

"সুযোগ পেলেই চলে যাবো," উত্তর দিয়েছিলো চিয়েন-চাং, "হয়তো সুযোগ পেয়েও যাবো শীগ গিরই।"

জেনী অবাক হয়েছিলো। সে বলেছিলো হাল্কা ভাবে এবং তাতে চিয়েং-চাং এতটা গুরুত্ব আরোপ করবে ভাবতে পারেনি। জিজ্ঞেস করেছিলো, "সত্যি সত্যি?"

চিয়েন-চাং-এর হাসি দেখে বুড়ো ওয়াংও একটু চিন্তিত হয়েছিলো। জিজ্ঞেস করেছিলো, "সুযোগ পাবে মানে? সুযোগের চেষ্টা করছো নাকি?"

ছেলে উত্তর দিলো, "চেষ্টা তো করছি বেশ কিছু দিন থেকে। এখন যোগাযোগ একটু হয়েছে। আমার এক বন্ধুর একজন আমেরিকান বন্ধু আছে। সে এখানে কনস্যুলেটে চাকরি করে। তার বাবার মস্তো বড়ো ফার্ম নিউ ইয়র্কে। সে তার বাবাকে লিখেছে, আমার একটা ব্যবস্থা যদি করতে পারে। ওর বাবার চিঠি পেলেই পাসপোর্টের জন্যে এপ্লাই করবো। ভিসা পেতে কোনো অসুবিধাই হবে না।"

বুড়ো ওয়াং কোনো উত্তর দেয়নি।

মিনি শুধু হেসে বলেছিলো, "ওখানে গিয়ে একটি হলিউডের ষ্টার বিয়ে করতে ভুলো না।"

"করবোই তো," বলেছিলো চিয়েং-চাং, "আমাদের এখানকার মেয়েদের চাইতে ওরা অনেক ভালো। তোমরা না জানো কথা বলতে, না জানো চলাফেরা করতে, না জানো মিশতে। আর ওদের মেয়েদের দেখ! কী সহজ ভাবে নেয় জীবনটাকে। তোমরা জানো রান্না করতে, ছেলেমেয়ের মা হতে। আর কিছু জানো না।"

"রান্না করতে, ছেলেমেয়ের মা হতে যে জানে," বুড়ো ওয়াং আস্তে আস্তে উত্তর দিয়েছিলো, "সে মেয়ে সবই জানে।"

সে কথার উত্তর না দিয়ে চিয়েন চাং বলেছিলো, "জীবনে কিছু করতে চাও তো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো, বাইরে চলে যাও, যে দেশ বড়ো হয়ে যাচ্ছে সেখানে যাও।"

"আমাদের দেশও তো বড়ো হচ্ছে, সেখানে গেলেই হয়," মিনি বলেছিলো।

চীনে তখন গৃহযুদ্ধ সবে মাত্র শেষ হয়েছে, কায়েম হয়েছে নতুন সাম্যবাদ।

চিয়েনচাং হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো, "বড়ো হচ্ছে! সেই ধারণা নিয়েই থাকো।"

জেনী, মিনি আর বুড়ো ওয়াং মর্মাহত হোলো, কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না।

শুধু ছোটো ভাই সুং-চাং বললো, "তোমরা যে যেখানে যাবে যাও, আমি কলকাতা ছেড়ে নড়ছি না। আমার এখানেই বেশ ভালো লাগে।"

জেনী মিনি একটু হাসলো, কারণ সুং-চাংএর সঙ্গে সম্প্রতি ভাব হয়েছে ওয়েলেসলির এবং ফিরিঙ্গী মেয়ের সঙ্গে। সুতরাং কলকাতা শহরকে তার ইদানীং স্বর্গ বলেই মনে হচ্ছে।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সব সময় লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন

খেলাধুলো করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকার—কিন্তু খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন ধূলোময়লার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কখনই থাকা যায় না। এই সব ধূলোময়লায় থাকে রোগের বীজাণু যার থেকে সবসময়ে আমাদের শরীরের নানারকম ক্ষতি হতে পারে। লাইফবয় সাবান এই ময়লা জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে এবং স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখে।

লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করলে আপনার ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে; আপনি আবার তাজা ঝরঝরে বোধ করবেন। **প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন—ময়লা জনিত বীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করুন।**

L. 265-X52 BG

চিয়েন-চাং বললো, "আমার বন্ধুকে একদিন এখানে নিয়ে আসবো। আলাপ করিয়ে দেবো সবার সঙ্গে।"

"সেই আমেরিকান?" বুড়ো ওয়াং জিজ্ঞেস করলো।

"না, এ আমাদেরই লোক। এর নাম ফেং চেং-শিয়াং।"

"ফেং? কোন ফেং? ট্যাংরার?"

"না, না, এখানকার লোক সে নয়। সে আগে থাকতো নানকিংএ। ব্যাঙ্ক অফ চায়নায় বড়ো চাকরি করতো। যুদ্ধের পর ও দেশ ছেড়ে ফরমোসায় চলে আসে। সেখান থেকে এখন কলকাতায় চলে এসেছে। এখানে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা করে।"

শুনে জেনী মিনি একটু গম্ভীর হোলো।

"ওদের অনেক পয়সা," চিয়েন-চাং বলে চললো, "ওর স্বর্গীয় বাবা এককালে ব্যাঙ্ক অফ চায়নার ডিরেক্টার ছিলো। ওরা ক্যাণ্টনের ফেং।"

"ক্যাণ্টনের ফেং!" বুড়ো ওয়াং আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো। দেশে না গেলেও, দেশের অনেক খবর সে রাখে। ক্যাণ্টনের ফেং-রা খুব অভিজাত বংশ।

"সে এখানে কি করতে এসেছে?" বুড়ো ওয়াং জিজ্ঞেস করলো।

"বললাম তো, ব্যবসা করতে এসেছে।"

"ব্যবসা ফরমোসায় বসে করলেই পারতো।"

"ওর ইচ্ছে হয়েছে, কলকাতায় এসেছে। তোমাদের অতো মাথাব্যথা কেন?" বিরক্ত হয়ে বললো চিয়েন-চাং।

"ওর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হোলো কি করে?"

"ওর অফিসে একটা কোটেশান চাইতে গিয়েছিলাম। সেখানে ভাব হোলো। সে আমায় লাঞ্চে ডাকলো। সেখানে বন্ধুত্ব হোলো। তারপর ওর বাড়িতেও গেছি। ওর একটি বোন আছে। নাম টিং-লিং। খুব শিক্ষিত, কালচারড্, একমপ্লিশড। সুন্দর দেখতে!

"ও, এই ব্যাপার?" জেনী আর মিনি হাসলো।

কিন্তু বুড়ো ওয়াং আরো গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, "চিয়েন, আমরা ওয়াং, খুব সাধারণ লোক। ওরা ফেং। ফেংদের সঙ্গে ওয়াংদের বন্ধুত্ব হয় না। আমি তো কোন দিনই শুনিনি, দেখিওনি।"

"বেশ তো, এবার দেখবে," চিয়েন-চাং উত্তর দিলো।

"আগে যা হয়নি, এখন কি তা হবে?"

"ওল্ড বয়, এটা ডিমক্রেসির যুগ, আর ফেং চেং-শিয়াং পাক্কা ডিমক্র্যাট। ডিমক্রেসি ওর রক্তে রক্তে এমন ভাবে মিশে গেছে যে কম্যুনিষ্টদের দেশে সে কিছুতেই থাকতে রাজী হোলো না। ও বলে, ও বছরখানেক পরে আমেরিকা চলে যাবে। ওর বোন টিং-লিং তো আমেরিকায় বড়ো হয়েছে। কিছুদিনের জন্ত এখানে এসেছে। আবার চলে যাবে!"

জেনী আর মিনি আবার মুখ টিপে হাসলো।

বুড়ো ওয়াং আস্তে আস্তে বললো, "দেখ চিয়েন, তোমার এসব কথাবার্তা আমার ভাল লাগছে না। আমরা এদেশে থেকেছি, বড়ো হয়েছি, এখানে ঘর করেছি, খুব দরকার না পড়লে ঘরের ছেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া আমি ভালো মনে করি না। দেশের অবস্থা এখন খুব গোলমেলে, তোমাকে সেখানেও যেতে বলছি না। তবে আমেরিকাও আমাদের নিজের দেশ নয়, তাই এখানে থাবার সংস্থান থাকলে এসব ছেড়ে সেখানে যাও, তাই আমি চাই না। যদি যেতে হয় সুং-চাং যাবে। তুমি বড়ো ছেলে। তুমি বাড়ীতে থাকবে। তোমাকে তোমার বোনেদের বিয়ে দিতে হবে। আমি বুড়ো হয়েছি। আমার দেখাশোনা করতে হবে। আর তোমাকে বিয়েও করতে হবে। ওয়াং বংশ টিকিয়ে রাখতে হবে। পূর্বপুরুষদের আত্মাদের পরিতুষ্ট রাখতে হবে"।—

"বিয়ে?" চিয়েন-চাং হেসে উঠলো, "এখন? অসম্ভব! আমার পছন্দ হবে এরকম মেয়ে এদেশে নেই। হ্যাঁ, একটা দুটো যে দেখা যায় না, তবে ওরা ঠিক এদেশের বাসিন্দা নয়"—

জেনী আর মিনি হেসে ফেললো।

বুড়ো ওয়াং গম্ভীর হয়ে বলে গেল, "দেখ, তুমি যদি টিং লিং-এর কথা ভেবে থাকো তো আমি বলবো তুমি একটি আহাম্মক। ফেং-এরা কোনো দিন ওয়াং-দের বিয়ে করে না। তার উপর টিং-লিং আমেরিকায় বড়ো হওয়া মেয়ে। তবে সে যদি সত্যি সত্যি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়, তা'হলে আমি বলবো সেটা ভালো কাজ হবে না। তা'তে তুমি অসুখী হবে, আমি অসুখী হবো। তোমার ভাই-বোনেরা অসুখী হবে।"

"কেন?" লাল হয়ে জিজ্ঞেস করলো চিয়েন-চাং।

বুড়ো ওয়াং উত্তর দিলো, "টিং-লিং তোমার বোনেদের মতো রান্না করতে পারবে না, ওদের মতো খাটতে পারবে না, কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। তার উপর শুনেছি, এসব বিদেশী বনে যাওয়া মেয়েরা বেশী ছেলে-মেয়ে হওয়া পছন্দ করে না। সেটা ওয়াং বংশের পক্ষে খুব বাঞ্চনীয় নয়। পূর্বপুরুষের আত্মারা তাতে অসন্তুষ্ট হবেন।"

চিয়েন চাং হাসতে লাগলো বুড়ো ওয়াং-এর কথা শুনে। বললো, "তোমরা তোমাদের পুরোনো ধারণা নিয়েই আছো। সময়টা যে বদলে যাচ্ছে, তোমাদের সে খেয়াল নেই?"

"সময়টা যে বদলে যাচ্ছে সে খেয়াল আমার খুবই আছে, কিন্তু কতগুলো জিনিস যে বদলায় না, চিরকাল যা চলে আসছে, ভবিষ্যতেও তাই চলতে থাকবে, সে খেয়াল নেই তোমার মতো অর্বাচীনের।"

"যেমন?" ভুরু কুঁচকালো চিয়েং-চাং।

"তুমি কি বলতে চাও," বুড়ো ওয়াং জিজ্ঞেস করলো, "সময় বদলে যাচ্ছে বলে মেয়েরা আর রান্না করবে না? তুমি কি বলতে চাও মেয়েরা আর ছেলে-মেয়ের মা হবে না?"

"বুড়োদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা," উত্তর দিলো চিয়েন-চাং, "আমাদের কথা তোমরা বুঝবে না, তোমাদের কথা আমরা বুঝবো না।"

বুড়ো ওয়াং আর কোনো কথা বললো না। আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল সেখান থেকে।

মিনি বললো, "কেন তর্ক করে বাবার মনে কষ্ট দাও? চুপ চাপ শুনে গেলেই পারো।"

"উনি যদি নিজে ইচ্ছে করেই কষ্ট পান, আমি কি করতে পারি বলো?"

জেনী জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা দাই-কো, একটা কথা বলবে?"

"কি কথা?"

"তুমি কি টিং-লিং-এর প্রেমে পড়েছো?"

"না, ঠিক তা' নয়," চিয়েন-চাং উত্তর দিলো, "আমরা এমনি বন্ধু, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।"

"বেশ তো। কিন্তু, তুমি যদি কোনো দিন ওকে বিয়ে করতে চাও, সে কি রাজী হবে ?"

চিয়েন-চাং একটু মাথা চুলকালো, তার পর বললো, "দেখ, ও যদি রাজী হয়ও বা, আমি রাজী হবো না। তার আগে আমার অনেক টাকা দরকার। আর সে টাকা এদেশে হবে না। তাই ঠিক করেছি আমেরিকা যাবো। ওরাও যাবে। আর আমেরিকা হোলো ডিমক্রেসি। আমার বাবা কি আর ওর বাবা কে, ওসব প্রশ্ন ওদেশে ওঠে না। আমার টাকা থাকলেই হোলো। তা হলেই আর বিয়ে করায় কোনো অসুবিধে হবে না।"

"ও," মিনি আস্তে আস্তে বললো, "ও, তাহলে তোমায় টাকার জন্যে বিয়ে করবে।"

"তোমাদের মন অত্যন্ত ছোটো," চিয়েন-চাং চটে গিয়ে উত্তর দিলো, "সে কথা কে বলেছে ? আমি কতকগুলো প্র্যাকটিক্যাল সুবিধে অসুবিধের কথা বললাম মাত্র।"

"থাক, থাক, আর চটাচটি করতে হবে না," জেনী মাঝখানে পড়ে বললো।

"ওদের কাউকে তো তোমরা চোখেও দেখনি," বললো চিয়েন-চাং, আগে ওদের নিয়ে আসি আমাদের বাড়ি, তারপর যা হোক একটা কিছু ধারণা করে নিও।"

"টিং-লিংকেও নিয়ে আসবে ?" মিনি জিজ্ঞেস করলো।

"না, টিং-লিংকে নয়। আগে চেং-শিয়াংকে নিয়ে আসি। একটু যাওয়া-আসা অন্তরঙ্গতা সুরু হোক। তারপর টিং-লিংও আসবে।"

"কবে আনবে ?"

"আনবো ইতিমধ্যে একদিন।"

"আগে থেকে বলে রেখো কিন্তু—।"

কিন্তু আগে থেকে কিছু বলে রাখলো না ওয়াং চিয়েন-চাং।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা এনে হাজির করলো ফেং চেং-শিয়াংকে,

মিনি তখন সবে কাজ থেকে ফিরেছে, হাত-মুখও ধোয়নি, মুখটা তার ঘামে চিক-চিক করছে।

জেনী রান্নাঘরে ব্যস্ত। তার কোমরে জড়ানো এপ্রনটি আধ-ময়লা।

বুড়ো ওয়াং জানলার ধারে বসে বাইরের পৃথিবীকে অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করছে।

এমন সময় চিয়েন-চাং এলো। সঙ্গে এলো চেং-শিয়াং।

প্রথম আলাপ করিয়ে দেওয়া হোলো বুড়ো ওয়াংএর সঙ্গে।

কিন্তু চীন দেশ ছেড়ে এসে কাণ্ড-তাণ্ড করতে ভুলে গেছে ফেং চেং-শিয়াং। সে একটু নড করে বললো, "গ্ল্যাড টু মীট ইউ।"

বুড়ো ওয়াং প্রশান্ত ভাবে উত্তর দিলো, তার অতিথিকে "তুমি এসেছো বলে আমিও খুব খুশী হয়েছি। ফেং-বংশের এক যোগ্য ব্যক্তির আগমনে ওয়াং পরিবারের এই ক্ষুদ্র গৃহখানি ধন্য হোলো। ওই চেয়ারখানি বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে। তুমি সেখানে বসে আমাকে কৃতার্থ করো।"

বিশুদ্ধ চৈনিক আপ্যায়নে ফেং চেং-শিয়াং একটু যেন অপ্রস্তুত হোলো। একটু 'বাও' করে চুপচাপ নির্দে'শিত চেয়ারটিতে বসে পড়লো।

"তোমার ভাই-বোনদের ডাকো," চিয়েন-চাংকে বললো বুড়ো ওয়াং, "ওরা এসে আমাদের সম্মানিত অতিথির পরিচর্যা করুক।"

বাপের অতিরিক্ত সৌজন্যে চিয়েন-চাংএর শরীর জ্বলে গেল। কিন্তু কোনো বিরক্তি প্রকাশ না করে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে জেনীকে ডেকে বললো, "জেনী, মিষ্টার ফেং এসেছেন—।"

জেনী তেমনিই বেরিয়ে এলো, এমন কি কোমরের এপ্রনখানিও না ছেড়েই। জেনীর পেছনে পেছনে এলো মিনি, তার সেই চিকচিকে মুখ নিয়ে।

অন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সুং-চাং। চিয়েন-চাং চেং-শিয়াংএর সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দিলো।

চেং-শিয়াং তার স্বভাবসুলভ পাশ্চাত্য সৌজন্য প্রকাশ করলো।

মিনির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো সে। শীর্ণ দেহের উপর কর্মক্লান্ত দিনান্তের ম্লান মুখখানি তার ভালো লাগলো না। সে চোখ ফিরিয়ে তাকালো জেনীর দিকে।

জেনীর দেহের গঠন খুব মজবুত, সুঠাম। উনুনের আঁচে লাল মুখখানি বেশ ঢলঢলে, ফরশা। তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখলো চেং-শিয়াং!

জেনী তাকিয়ে দেখলো চেং-শিয়াংএর চোখের দিকে। দেখলো—সেই চোখ, যে চোখ নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চীনের অভিজাত জমিদারেরা তাকিয়েছে কর্মচঞ্চল সুঠাম কৃষক-যুবতীর দিকে।

জেনী একটু হাসলো। ছুরির ধার মিশিয়ে দিলো সেই হাসিতে। শুধু জেনী বুঝলো আর চেং-শিয়াং বুঝলো। আর কেউ লক্ষ্য করলো না।

এক মুহূর্তের জন্যে লাল হয়ে উঠলো চেং-শিয়াংএর কান। সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে খুব সহজ ভাবে বললো, "চিয়েন-চাং আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব আনন্দিত হলাম। আশা করি আমরাও খুব বন্ধু হবো।"

"হ্যাঁ, আশা আমরাও করি," জেনীও উত্তর দিলো খুব সহজ ভাবে।

"এখন একটু চা খাওয়া যাক," বললো চিয়েন-চাং।

"হ্যাঁ, চা এখনই এসে যাবে," জেনী বললো।

"শুধু চা, আর কিছু নয়," বলে উঠলো চেং-শিয়াং, "আমার অন্য প্রস্তাব আছে।"

সবাই তাকালো তার দিকে।

"আজ চিয়েন-চাং আর তার ভাই-বোনেরা আমার অতিথি। আমরা আজ ডিনার খাবো বাইরে কোথাও।"

সেদিন থেকে ফেং চেং-শিয়াং-এর গতিবিধি সুরু হোলো ওয়াংদের বাড়িতে। সুং-চাং-এর সঙ্গেও খুব সখ্যতা হয়ে গেল। মিনিরও মনে হোলো লোকটা মন্দ নয়। শুধু জেনী পছন্দ করলো তার এই আসা-যাওয়া। তবে মুখে সে কিছুই বললো না। বরং খুবই ভদ্র ব্যবহার করতো চেং-শিয়াং-এর সঙ্গে।

কিছু দিন পর এক দিন টিং-লিংকেও নিয়ে এলো চেং-শিয়াং। প্রথমটা তার পোশাক-প্রসাধন ধরণ-ধারণ ভালো না লাগলেও

তার মিষ্টি ব্যবহারে বুড়ো ওয়াংও যেন গলতে সুরু করলো একটু একটু করে।

বললো, "যতোই আমেরিকায় থাকুক, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হোক, চীনা মেয়ে চীনা মেয়েই থাকবে। আমাদের ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি এত প্রাচীন যে, এদের এসব নতুন ভাবধারা উপর উপরই থেকে যায়, মনের গভীরে ঢুকতে পারে না।"

জেনী মিনি ভাবলো, টিং-লিং নাই বা হোলো আমাদের মতন, আমাদের দাই-কো যদি তাকে বিয়ে করে সুখী হয়, আমরা মানা করতে যাবো কেন? তা' ছাড়া দাই-কো আমেরিকা যখন যাবেই ঠিক করেছে, সেখানে গিয়ে আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করার চাইতে টিং-লিংকে বিয়ে করা অনেক ভালো। আর যাই হোক, ওয়াংদের রক্তে বিদেশী রক্তের ভেজাল থাকবে না।"

জেনী, মিনি আর টিং-লিং তেমনটা অন্তরঙ্গ হতে পারলো না অতো যাওয়া সত্ত্বেও, তবে একটা সহজ সদ্ভাব গড়ে উঠলো তাদের মধ্যে।

চেং-শিয়াংকেও দেখা গেল, খুব ভদ্র ব্যবহারই করছে জেনীর সঙ্গে। তার সেই অস্বাভাবিক কামনা-দহন চাউনি সে ওই প্রথম দিনই দিয়েছিলো,—তার পুনরাবৃত্তি আর কোনো দিনই হয় নি।

সুতরাং এরাও যেতে সুরু করলো টিং-লিং চেং-শিয়াংদের সাহেব-পাড়ার ফ্ল্যাটে। চেং-শিয়াং কয়েক বার পার্টি দিয়েছিলো তার বাড়িতে। সেখানে গিয়ে আরেক ধরণের দ্রুতলয় সমাজ-জীবনের পরিচয় লাভ করেছিলো জেনী আর মিনি। তা' ছাড়া দুই পরিবারের ভাই-বোনেরা মিলে মাঝে মাঝে বাইরে বেরোতো, এখানে ওখানে সেখানে।

একবার মিনি নিয়ে এসেছিলো আহ্-কিমকে, চিয়েন চাংএর আপত্তি সত্ত্বেও। কিন্তু চেং-শিয়াংকে দেখে আহ্-কিম গম্ভীর হয়ে গেল।

আহ্-কিমকে দেখে ভুরু কুঞ্চিত করলো চেং-শিয়াং।

"ও কে?" চেং-শিয়াং জিজ্ঞেস করলো চিয়েন-চাংকে।

"আমার বোন যেখানে চাকরি করে, সেই ফার্মের মালিক," বললো চিয়েন-চাং, তার পর একটু হেসে জুড়ে দিলো, "এবং ভাবী স্বামী।"

শুনে চুপ করে রইলো চেং-শিয়াং।

"এই লোকটি কে? আহ্-কিম জিজ্ঞেস করেছিলো মিনিকে।

"ওই যে টিং-লিং মেয়েটি, যাকে বিয়ে করবে আমাদের দাই-কো, তার বড়ো ভাই।"

শুনে আর কোনো কথা বললো না আহ্-কিম। তার পর সারাটা ক্ষণ আহ্-কিম আর চেং-শিয়াং কেউ কারো দিকে তাকালোও না, কথাও বললো না।

সবাই চলে যাওয়ার পর চিয়েন-চাং মিনিকে বললো, "আমি আগেই বলেছিলাম আহ্-কিমকে ডেকো না। ওকে চেং-শিয়াংএর ভালো লাগবে না। এখন দেখলে তো?"

"কেন? কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো সুং-চাং।

"সবাই জানে আহ্-কিম্ মাও-সে-তুর সমর্থক আর চেং-শিয়াং দেশ ছেড়ে ফরমোসায় চলে এসেছিলো। এরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না।

"এটা কলকাতা," উত্তর দিলো মিনি, "এবং বাড়িটা আমাদের।"

"যাই হোক, যেদিন এখানে ফেং-রা আসবে সেদিন আহ্-কিমকে ডেকো না।"

সেদিন থেকে মিনিও মেলামেশা বন্ধ করলো চেং-শিয়াংএর সঙ্গে। ও একা এলে আসতোই না ওর সামনে। শুধু টিং-লিং এলে, বেরিয়ে এসে একটু গল্প করতো তার সঙ্গে পারিবারিক সৌজন্য বজায় রাখবার জন্যে।

জেনীও ফেংদের সঙ্গে বেরোনো বন্ধ করেছিলো। তবে চেং-শিয়াং এলে এমনি বসে গল্প করতো, চা খাওয়াতো, ভাবতো, যাই হোক, টিং-লিংকে দাই কো বিয়ে করবে, সুতরাং এটুকু না করলে কি করে চলে! আহ্-কিমকে মিনি বিয়ে করবে, তাই সে চেং-শিয়াংকে না হয় এড়িয়ে চলে। ওদের রাজনীতি নিয়ে ওরা থাকুক। আমার কি? সবাই যে যার মতন সুখী হলেই আমি খুশি।"

চেং-শিয়াং সাধারণত চিয়েন-চাংএর সঙ্গে আসতো, কিংবা যে সময় চিয়েন-চাং বাড়ি থাকতো শুধু সে সময়ই আসতো।

একদিন এলো যখন চিয়েন-চাং বাড়ি নেই, সুং-চাও নেই, মিনিও ফেরেনি তার লণ্ডি থেকে, বুড়ো ওয়াঙ ভেতরে ঘুমাচ্ছে। জেনী একটু অবাক হোলো।

জেনীর বিস্ময় চেং-শিয়াং অনুধাবন করলো। বললো, "জেনী, আজ শুধু তোমার কাছে আসবো বলেই এ রকম সময় এসেছি।"

বললো, "জেনী, আজ শুধু তোমার কাছে আসবো বলেই এ রকম সময় এসেছি।"

"শুধু আমার কাছে? কেন?" জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"একটা কথা ছিলো তোমার সঙ্গে।"

"আমার সঙ্গে? কি কথা?"

চেং-শিয়াং তার সোনায় বাঁধানো দাঁতে একটুখানি হাসির ঝিলিক খেলিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "জেনী, আমায় বিয়ে করবে?" [ক্রমশঃ।

উত্তরণ

শ্রীসাধনা সরকার

গোধূলির ছায়াম্লান স্বপ্নভরা রাতে
সকরুণ মৃদুতানে গেয়েছি সে গান
বিরহের ধ্রুবক্ষণে শুনিবে সে সুর
আকাশের বুকে যদি পেতে দাও কান।
অকম্পিত নিশীথের শূন্য গৃহপানে
ধায় মোর ক্লান্তগতি, কলশব্দহীন
শিশিরের গুঞ্জরণে ছেয়ে আসে হায়
সত্তার অন্তিম গান—বেদনায় ক্ষীণ।
রাত্রির নদীজলে ভেসে যাক তবে
বিরহের প্রহরের আকাশ-প্রদীপ
বিস্মৃতির বনতলে নিঃশব্দ ভাবে
ঝরে যাক রজনীর গন্ধভরা নীপ।

সবাই জানেন —
বাজারে
ব্রুক বণ্ড
চায়েরই কাটতি
সব চেয়ে বেশী
লোকে রোজ
সাড়ে পাঁচ কোটিরও
বেশী কাপ
ব্রুক বণ্ড চা
খেয়ে থাকেন
চটপট সরবরাহ
করা হয় বলে
ব্রুক বণ্ড চা
একেবারে তাজা থাকে
Brooke Bond Tea
Brooke Bond
Leaf Tea
এই জন্যেই
অন্য যে কোন
মার্কা চায়ের চেয়ে
ব্রুক বণ্ড
চা
বেশী লোকে খান !
BB 139 TR
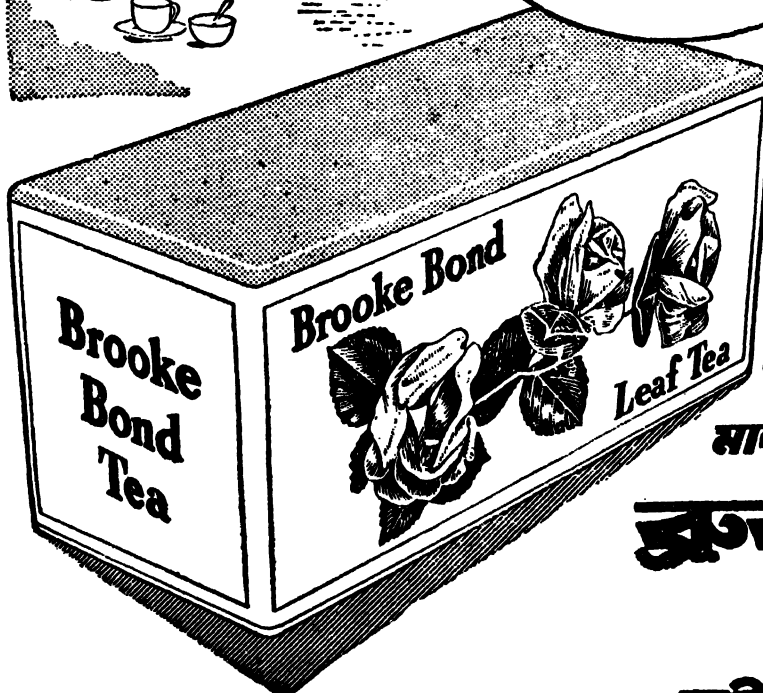
স্মলেখা দাশগুপ্তা

পরীক্ষা শেষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে না ফেলতে ফলাফলের যে দুর্ভাবনা আর অশান্তি ভোগ আরম্ভ হয়েছিলো, সে ভোগের শেষ হয়ে গেছে পাশের খবর পেয়ে। তার ওপর শুধু ভালো সম্বন্ধই নয়, স্থির হয়ে গেছে বিয়ের দিন—মৌরীর মন নির্জন মাঠের একক সর্ষে ফুলটির মতো খুশীর ঝিরঝিরে বাতাসে দুলছিলো।

বর্তমানে ও ওর বসবার জায়গা করেছে বাড়ীর চিলেকোঠায়—যেখানে বসে দু'দিন আগেও কেবল পিট টান করে পরীক্ষার পড়া তৈরী করেছে। আজ আর টান হয়ে এমন একটানা পড়বার দরকার নেই। তাই সে আনিয়ে নিয়েছে একটা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ার। এতে গা ঢেলে বসে ও গল্প উপন্যাস পড়ে—নয়তো তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। ভাবে কত কি—যার আরম্ভ আছে কিন্তু শেষ নেই। ছোট বোন মঞ্জু অবশ্যি ওর এই আয়াস ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে তাতে ধনুকটান মেরে বলে, ইংরেজী সাহিত্যের মোটা মোটা বই যোগাড় করেছে, দেখ না কত! পড়বে'তো নাই-ই আর পড়লেও বুঝবে ছাই। চলছে তো শুধু বসে বসে বিয়ের কথা ভাবা।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। একে বয়সটা স্বপ্ন দেখার। তার উপর বিয়ে—মনটা কখনও ওর স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসছে, কখন চাইছে গান গেয়ে উঠতে। সে দিন মৌরী ওর চিলেকোঠায় ইজিচেয়ারে বসে চোখ বুজে গানই গাইছিলো—

'দিনে দিনে কঠিন হলো কখন বুকের তল
ভেবেছিলেম ঝরবে না আর আমার চোখের জল,
হঠাৎ দেখা পথের মাঝে
কান্না তখন থামে না যে—'

—'এই দিদি, তুই এখন ও গান গাচ্ছিস যে?'

—'কেন কি হয়েছে তাতে?' ভ্রূ কুঁচকে ছোট বোনের দিকে তাকাল মৌরী।

—'বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর কেউ ও গান গায়? আর যদি গায় তো তার বিয়ে তক্ষুণি ভেঙ্গে যায়।'

—'গানটার অপরাধ?'

—'হঠাৎ দেখা পথের মাঝে কান্না তখন থামে না যে—' মা গো, কী ভীষণ গান! তোর বর এখন এ গান শুনলে বিয়ে ভেঙ্গে দেবে। পরে শুনলে সমস্ত জীবন তোর দিকে আড়নয়নে তাকিয়ে থাকবে—আর পথে তুই পরিচিত, অপরিচিত যার দিকে তক্ষুণি তাকাবি, তোর চোখে জল খুঁজবে। "কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশ-কুসুম চয়নে" এছাড়া কনের মুখে গান মানায়?'

মৌরী উঠে দাঁড়িয়ে বোনের লম্বা চুলে কষে এক টান দিয়ে বলল,—'বেশ তো ছিলাম আমরা ক'ভাই-বোন। শেষকালে তোর মত একটা অতি ফাজিল মেয়ে হবার কি প্রয়োজন ছিল?'

—'আমি তোমাদের প্রয়োজনে নয়, জন্মেছি বিশ্বের প্রয়োজনে। গার্গী, মৈত্রেয়ীর পর বন্ধ্যা ভারত এই প্রথম আবার একটি কন্যাসন্তান উপহার দিয়েছেন মাতা ধরিত্রীকে। কিন্তু সে কথা তো বলে বিশ্বাস করান যাবে না, করে দেখাতে হবে।'

'আচ্ছা ব্যাপারটা কি?' বৌদি এসে দাঁড়ালেন সামনে—'তুমি সেই থেকে ছাদে বসে আছ, পাত্তা নেই—মঞ্জুকে তোমায় ডাকতে পাঠালেন পিসিমা—তারও দেখা নেই। আজ সন্ধ্যায় বাসুর জন্যে মেয়ে দেখতে যেতে হবে না?'

'এমন একটা কথা ভুলে বসেছিলাম ক্ষমা নেই।' মৌরী ছুটল নীচে। এসে ঢুকল একেবারে ছোড়দা বাসুর ঘরে।—'এই ছোড়দা, হাঁচি, কাশি কমেছে তো? তোমার জন্যে মেয়ে দেখতে যাচ্ছি, দেখো বেরুবার মুখে আবার হ্যাঁচ্চো দিয়ে বসো না।'

বাসুদেব অল্প-জ্বরের সর্দি-কাশি নিয়ে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল। হাত দিয়ে নিজের পাশটা দেখিয়ে বললো—'শোন, বোস এখানে। কথা আছে।'

—'সময় নেই। খুব চটপট সার।' হাতে জড়িয়ে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে মৌরী গিয়ে বসল বাসুদেবের খাটের উপর। 'কি কথা, খুব ভালো করে দেখব এই তো?'

—'ঠিক উল্টো! একেবারেই মানা করছি যেতে।'

—'কেন?' আশ্চর্য্য হয়ে জানতে চাইলো মৌরী।

—'আচ্ছা', হাতের বইটা বন্ধ করে উঠে বসল বাসু—'এই যে তোরা এমন আয়োজন করে মাসী-পিসির সঙ্গে দল বেঁধে মেয়ে দেখতে গিয়ে বসিস, লজ্জা করে না তোদের? লেখাপড়া শিখেছিস, রুচিবোধের গর্ব্ব করিস, কিন্তু তোরা কি? নিজে তো বার চোদ্দ, নির্বিকার চিত্তে গিয়ে বসলি সভার মাঝে। আবার চলেছিস আরেক জনকে দেখতে!'

—'মিথ্যে কথা। কক্ষণো সভায়-টভায় বসিনি। আমি চা-খাবার সাজিয়ে ওঁদের ডেকেছি। সবাই এসে বসলে, সামনে উপস্থিত থেকে খাবার তদারক করেছি। কথা জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিয়েছি, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তা মহিলারা যা সদা-সর্বদা বাড়ী-ঘরে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় করে থাকেন। বিকার ঘটবে কেন?'

—'তুই জানতিস নে দেখতে এসেছে তোকে?'

—'এই কথা! ঐ সম্বন্ধ নামটাতে তোমার আপত্তি? না, আমার অবশ্যি তেমন কোন সংস্কার নেই।'

—'ঠাট্টা নয়, ও ভাবে পুতুলের মতো সাজিয়ে এনে দেখানোতে অসম্মান হয় মেয়েদের।'

—'বেশ', মৌরী যেন তর্ক করবার জন্য গুছিয়ে বসলো—'তবে মানুষের বিয়ে হবে কি করে?'

—'আসা-যাওয়ায়, আলাপে, পরিচয়ে।'

—'বাঁচা গেল। একেবারে দেখাদেখি-বর্জিত নয়। তবে এমন দু'-এক ঘণ্টার দেখায় তোমাদের হচ্ছে না। আরো সময় চাই। তা বেশ, হলো আসা-যাওয়া, হলো আলাপ-পরিচয়। তারপর?

—'তারপর ভালো লাগলে বিয়ে।'

—'না লাগলে ?'

—'হবে না।'

—'অর্থাৎ কেটে পড়বে ?'

মুখ-চোখের এমন ভঙ্গী করে কথাটা মৌরী বলল যে, বাসুদেব হেসে ফেলল। বললো—পরে কাটাকাটি হওয়ার চাইতে, আগে কেটে পড়া অনেক ভাল।

'তোমাদের মেলামেশার বিয়েতে পরে আর কাটাকাটি হয় না—নিশ্চয়তা দিতে পারো ?'

—'না, তা অবশ্যি পারিনে।'

—'পারলে এক্ষুণি হাতে হাত মিলাতাম। কিন্তু তা যখন নয়, তখন বেশী দেখার লাভটাকে—প্রয়োজনটাই বা কোথায়। তবু চলনে বলনে রূপে বুদ্ধিতে দিনের পর দিন ভালো লাগিয়ে তোমাদের আকর্ষণ করতে হবে? রক্ষে করো, তার চাইতে এই আমার ঢের ভালো।'

'এটা দুই পক্ষের কথাই হচ্ছে—ভালো লাগা-না-লাগাটা দুয়েরই।'

—'আমাদের চাকরি ব্যাপারটা কি একজনের মতে, আর একজনের গলায় দড়ি দিয়ে হয় না কি ?'

—'তোদের যে ভাবে দেখতে যায়, ছেলেদের কেউ সে ভাবে দেখতে গিয়ে বসে ?'

—'প্রয়োজন নেই। তোমাদের চেহারাটা নিতান্ত সাপ, ব্যাঙ জাতীয় না হলেই হলো। প্রয়োজন জ্ঞান গুণ আয়-ব্যয়ের হিসেব দেখা—সেটা তো সামনে বসিয়ে দেখবার জিনিষ নয়, খোঁজ-খবরের। সে খোঁজ-খবর নেওয়া হয় বৈ কি। বাছাই কি শুধু মেয়েই হয়? আমার বিশটা সম্বন্ধ কি বাবা এক নাক কুঁচকে ভেঙ্গে দেননি ?'

মঞ্জু এসে ঘরে ঢুকলো—'না দিদি—তোকে নিয়ে পারা গেল না। ছাদ থেকে টেনে নামালাম, আবার এখানে এসে তর্কে মেতেছিস? ছোট পিসিমা পর্য্যন্ত এসে গেছেন, আর আমরা এখনো তৈরীই হইনি। আজ বাবা রক্ষে রাখবেন না।'

মৌরী দৌড়োলো স্নানের ঘরে।

মেয়ে দেখে দিদির কানের কাছে মুখ নিয়ে মঞ্জু বললে—'ও বাবা, এ কি মানুষ না প্রতিমা রে দিদি ?'

মৌরী মাথা নাড়ল। 'যা বলেছিস। প্রতিমাই। কিন্তু মাটির নয়, প্রাণ আছে। এ মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে ঠিক করতে হবে ছোড়দার।'

বিপত্নীক ভ্রাতার গৃহে পিসিমাই কর্ত্রী। তিনি নাকে চশমা এঁটে খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখে সন্তুষ্ট চিত্তে মন্তব্য করলেন, 'হ্যাঁ, এ মেয়ে আমার বাসুর কাছে লক্ষ্মীর মতো মানাবে। ছোট পিসিমা তার মতামত সহজে বলে বসেন না। তিনি মনে করেন তাতেই গুরুত্ব বাড়ে।'

উদ্বিগ্ন মেয়ের মার মুখে দেখা দিল খুসীর কৃতার্থ হাসি। বললেন—আপনাদের পছন্দ হয়েছে, আমার মেয়ের ভাগ্য। সাহস ছিল না আপনাদের ঘরে কথা তুলি। কিন্তু কর্ত্তা বললেন, —'কিছু চায় না গো, চায় শুধু মাত্র একটি সুন্দরী মেয়ে। তা ভগবান সব দিকে বঞ্চিত করলেও মেয়ের রূপটুকু দিয়েছেন। তুমি চিঠি লিখে দাও মেয়ে দেখে যেতে। তারপর আমাদের বরাত।'

চঞ্চল মঞ্জু উঠে গিয়ে বসল মেয়েটির কাছ ঘেঁসে। চুপি চুপি বললো—'বড় ভালো লেগেছে ভাই তোমাকে। এক্ষুণি ইচ্ছে করছে বাড়ী নিয়ে যেতে। জান, চীন দেশে নাকি কনে পছন্দ হলেই শ্বশুরঘরে নিয়ে যাওয়ার রীতি। এ নিয়মটাই এখন আমার নিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে।' আবার তক্ষুণি মৌরীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে—'কিন্তু তোর বেলা নয়।'

বাড়ী ফিরে দু'বোন তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল উপরে। শাড়ী-কাপড়শুদ্ধ মেঝেতে বসে পড়ে বললো—'না ছোড়দা, পছন্দ হলো না।'

—'আছে তো লিষ্টিতে শ'খানেক। সব ক'টি বাড়ীর চা-মিষ্টি ধ্বংস না করে হবেও না।'

—'না গো ছোড়দা, এমন কষ্টে ক'রে কেন, সাধেও মিলবে না।'
সূর্য্য মুখী ফুলের মতো মাথা দোলাল মঞ্জু।

—'একেবারে এমন ভীষণ।'

—'হ্যাঁ, মাথা ঘুরে যাবে চেহারা দেখলে! আমাদের তো তাই গিয়েছিল।'

বাসু গম্ভীর ভাবে বললো—'মেয়েরা যখন অন্য কোন মেয়ের রূপের প্রশংসা করে তখন বুঝতে হবে, সে মেয়ে যে বলছে তার চাইতে অবশ্যই দেখতে খারাপ।'

মঞ্জু হাত জোড় করে কপালে ঠেকালো—'হে মা কালী, তাই যেন হয়। পাঁচ জোড়া পাঁঠা দেবো। একসঙ্গে এত রক্ত দেখে যদি ভয়ে কিংবা আনন্দাতিশয্যে মূর্চ্ছা যাও, চিন্তা নেই—ঘরে ডাক্তার জামাই আসছে। আর তোমার চিকিৎসা দিয়ে ব্যবসায় বউনি করতে পারলে, ঝনঝনে পসার তার আটকায় কে ?'

উঠে দাঁড়িয়ে মৌরী হেসে বলল—'যাই বাবাকে খবর বলে আসি গে।' সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জুও। দুবোনকে একসঙ্গে উঠে দাঁড়াতে দেখে বাসু বললো,—'তোরা কি জোড়া-বাঁধা? এক জনের সঙ্গে আর একজন উঠে দাঁড়ালি? বোস না।'

হাসিতে ফেটে পড়ল দু'বোন। 'কি শুনতে চাও বলো না? আচ্ছা দাঁড়াও আসছি আমরা বাবার কাছ থেকে হয়ে।'

পরের দিন। বেলা তখন দশটা। বৌদি এলো ব্যস্ত পায় খবর নিয়ে,—'শীগগির বসবার ঘরে যাও বাসু! তোমাদের বড়দা, বাবা কেউ বাড়ী নেই। একা ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি ছেলেটিকে।'

—'ছেলেটি? কে সে ছেলে?' জিজ্ঞাসা করল বাসু।

চোখ-মুখ ঘোরালেন বৌদি। 'কে, তা কি আমিই প্রথমে বুঝে উঠতে পারি। গা ধুতে যাবার আগে গেছি বসবার ঘরটা একটু গুছিয়ে রেখে আসতে। ও মা, দেখি কে যেন দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছে। জানতে চাইলাম, কা'কে চাই? এগিয়ে এসে বললো—'লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছি। আমার নাম সুদর্শন, কলকাতা আসতে হলো—বাবা বললেন একবার এখান হয়ে যেতে।'

লাফিয়ে উঠল মঞ্জু—'তোর ভাবী বর দিদি! বাবা এবার ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছে, হার্ট, লাংস মজবুদ কিনা দেখতে, মা গো—' হেসে লুটিয়ে পড়ল সে।

বাসু ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। আর মৌরী দাঁড়িয়ে রইল একটা বুক টিপ-টিপ নিয়ে।

বৌদি বললেন—'আজই লক্ষ্ণৌ চলে যাচ্ছে রাত্রের ট্রেণে। বলছে, বেশীক্ষণ বসতে পারবে না। তুমি চট করে তৈরী হয়ে নাও মৌরী! আমি যাচ্ছি পিসিমাকে খবরটা দিতে।' বৌদি চলে গেলেন।

গায়ে পাঞ্জাবী চাপাতে চাপাতে বাসু বললো—'আর কি, যাও। আবার সেজেগুজে দাঁড়াও গিয়ে সং হয়ে।'

—'আমাকে যেতে হবে কেন? আমায় দেখতে এসেছে, এমন কথা তো বলেনি!'

আকাশের দিকে তাকালো মঞ্জু—'দূর পাগল! তোকে দেখতে আসবে কেন? বাপ ছেলেকে আমাদের ঘরের আসবাব দেখতে পাঠিয়েছেন।'

—'আসবাবই তো তোরা। বিদ্রূপে ঠোঁট বাঁকালো বাসু। নিত্যদিন ঝাড়পোঁচ আর ঘসামাজার জৌলুস তুলে খরিদ্দারের চোখ ভোলাবার জন্ম বসে থাকছিস।'

—'এই ছোড়দা, কথা বাড়িও না বলছি। শেষে পালাবার পথ পাবে না।'

—'পালাবার পথ পাবো না!'

—'হ্যাঁ পাবে না। জবাব দেবার মতো কথা মিলবে না।'

—'এমনি সব ধারালো উত্তর রয়েছে। বেশ—রইল তোলা। দেখা যাবে কে কার হাতে বধ হয় আজ। আর দেরী করলে ভদ্রলোকটির আমাদের ভদ্রতাবোধ সম্বন্ধে প্রথম দিনই একটা সন্দেহ এসে যাবে। আমি নীচে যাচ্ছি। তোরা তৈরী হয়ে আয়।'

এগিয়ে এল মৌরী। 'দাঁড়াও ছোড়দা, আমি তোমার সঙ্গেই আসছি।'

—'এই ভাবে?'

—'হ্যাঁ।'

মঞ্জু বলে উঠলো—'কেন এ ভাবে যাবে না? এর ভেতর ও বুঝি বার দু'-তিনেক আয়নায় দেখে নেয়নি এই অগোছালো চেহারায় ওকে এখন যা সুন্দর লাগছে, প্রসাধন করলে তার সিকিও লাগবে না।'

—'তোকেও বেশ লাগছে। এ ভাবেই যাবি, না সাজতে হবে?'

—'তোর বর এসেছে, তুই সাজলি নে আমি সাজবো! তোর চাইতে চেহারাটা আমার ঢের ভালো—সে খেয়াল আছে? একটা সমস্যার সৃষ্টি হতে কতক্ষণ।'

—'ওর সঙ্গে পারবিনে মৌরী! চল শীগ্‌গির।' বাসু বোনদের নিয়ে ঢুকলো গিয়ে বসবার ঘরে।

সুদর্শন বসে বসে একটা বই-এর পাতা ওল্টাচ্ছিল। ওদের দেখে বই রেখে উঠে দাঁড়াল। বাসু নমস্কার জানিয়ে, একা বসিয়ে রাখবার জন্তে চাইল মাপ। তারপর ছবোনকে দিল পরিচয় করিয়ে। নমস্কার-বিনিময় করে আসন গ্রহণ করল সবাই। গল্প জমে উঠতে লাগল বাসুর সঙ্গে সুদর্শনের। মৌরী বসে রইল খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আর মঞ্জু বসে রইল একটা অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ করে। যে জিনিষে যত বেগ, তাকে আটকাবার জন্তে প্রয়োজন হয় তত বেশী ওজনের চাপ। মঞ্জুকে দেখেও মনে হচ্ছিল ভীষণ একটা হাসির বেগের মুখ চেপে রাখছে ও ঐ রকম অস্বাভাবিক ওজনের গাম্ভীর্য্য দিয়ে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—'আপনাদের ওখানে মাছের দর কত?'

—'মাছের দর!' আশ্চর্য্য হয়ে চোখ তুলে সুদর্শন প্রথমে মঞ্জুর দিকে, তারপর মৌরীর দিকে তাকালো।

শুধু সুদর্শনই নয়, বিস্ময়ে চোখ বড় করল বাসু, মৌরীও।

—'হ্যাঁ মাছের দর।' তেমনি গম্ভীর মুখ মঞ্জুর।

মেডিকেল কলেজে পড়া ছেলে সুদর্শন সে'ও হকচকিয়ে গেল। সবিনয়ে বললো—'মাছের দর বলতে পারবো না।'

—'কেন?' ভারী বিস্মিত মঞ্জু।

—'আমি বাজার করিনে।'

—'তবু?'

—'হঠাৎ চাকর চলে গেলে কি করেন?'

হেসে ফেলল বাসু। 'এ কি হচ্ছে মঞ্জু?'

—'বাঃ যতই লেখাপড়া করুক ঠেকা পক্ষের জন্তে মেয়েদের যেমন কিছু মেয়েলীকাজ জেনে রাখতেই হয়—ছেলেদেরও তেমনি কিছু জানা উচিত—নইলে সংসার অচল হয়ে ওঠার মতো বাহির অচল হয়ে ওঠে না।'

এবার হাসল সুদর্শন।—'তেমন দিনে হোটেলে যাব।'

পিসিমার ডাকে বেরিয়ে এসে বাঁচল মৌরী। বৌদির দিকে তাকিয়ে বলল—'কি দুর্দ্দান্ত মেয়ে রে বাবা!'

—'কেন কি করেছি আমি?'

—'আর কি কি করবার ইচ্ছে ছিল আপনার?'

—'যার জন্তে চুরি করি সেই বলে চোর।' ছোড়দাটা সামনে কথা বলে চলেছে যেন ভদ্রলোক ওকে দেখতে, ওর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। দিলাম কথার মোড় ঘুরিয়ে এদিকে তাকাবার ব্যবস্থা করে—আমারই দোষ হ'ল?'

—'না কিছু না।' জান বৌদি, জিজ্ঞাসা করে কি না "মাছের দর কত?"

গালে হাত দিলেন বৌদি।

—'তবে কি জিজ্ঞাসা করব? রবীন্দ্র সাহিত্য পড়েছেন? কবিতা কেমন লাগে? চিত্রতারকাদের কে আপনার প্রিয়? আচ্ছা তুমিই বল বৌদি, তার চাইতে বাজার দর প্রশ্নটা ভাল নয়?'

—'খুব ভালো! কিন্তু পাত্র দেখলে কেমন, তাই বল এবার।' হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন বৌদি।

—'অপূর্ব্ব! ভারী মিষ্টি দেখতে। ছোড়দার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কি মিষ্টি মিষ্টি হাসছিলেন। মাথার চুলগুলি যে বাতাসে উড়ছিল তাই বা কি মিষ্টি! তুই অমন করে তাকাচ্ছিস কেন দিদি? একদিন তুই তোর এক বন্ধুর বর দেখে এসে এক ডজন মিষ্টি বলেছিলি, আমি গুণে রেখেছি।'

—'ঐ যে পিসিমা বলেন, তোকে পুলিশ দিয়ে সামলাতে হবে, সত্যি তাই।'

'—কে জানে, পিসিমাতার বাণী না জানি আমার জীবনের ভবিষ্যৎ বাণী!' একটা টানা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মঞ্জু।

কিন্তু যে-ট্রেণে যাবার কথা ছিল সে ট্রেণে সুদর্শনকে যেতে দিলেন

মা মৌরীর বাবাই। বললেন—'এমন ছুটোছুটি করে যাবার দরকার কি? একদিন দেরি করলে কি খুব অসুবিধে হবে?'

—'তেমন নয়।'

—'তবে আর কি। আজ এখানেই থেকে যাও।'

সন্ধ্যারাতে বেশ একটা জমাট আসর বসেছিল। কে যে কখন এক এক করে উঠে গেছে—মৌরী লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ খেয়াল হলো, মঞ্জু উঠে দাঁড়িয়েছে। আর ও চলে যাওয়া মানে সুদর্শন আরও একেবারে একা পড়া। মঞ্জুর হাত চেপে ধরল মৌরী—'তুই আবার কোথায় চললি?'

—'রান্নাঘরে। নয়তো নিজের ঘরে। নয়তো তোর তেতলার চিলেকোঠায়।'

ধমক দিল মৌরী—'বোস বলছি।'

—'এক পেয়ালা চা সম্ভব হবে?' সুদর্শন মঞ্জুর দিকে চাইল।

—'ওয়েল ম্যানেজড। তা এ বাড়ীতে আপনার জন্য আজ অসম্ভব বলে কোন কথা নেই।'

মঞ্জু চলে গেল। সুদর্শন রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। যদি এমন ভারী কোচ না হয়ে বসবার স্থানটা হালকাজাতীয় কিছু হতো, তবে সে নিশ্চয়ই সেটা টেনে মৌরীর কাছে এগিয়ে আনত। একটু ঝুঁকে বসে বললো—'ভাবছি, বাবাকে গিয়ে মাথা ঠুকে একটা মস্ত প্রণাম করব।'

—'কেন?'

—'আনন্দে, কৃতজ্ঞতায়, তাঁর নির্ব্বাচনে মুগ্ধ হয়ে। কিন্তু আমাকে কি রকম লাগল জানতে চাইলেও আপনি তো নিশ্চয়ই মুখ খুলবেন না?'

চুপ করে রইল মৌরী।

—'কি, বলবেন না তো?'

—'এই সময়টুকুর ভেতর কি আর একজনকে চেনা যায়?'

—'এইটুকু সময়! ভোর দশটা থেকে আটটা—পরিচয়ের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল যে।'

তবু চুপ করে রইল মৌরী।

—'আরো সময় চাই। বেশ! বর্ত্তমানে যতটুকু গেছে, তাই বলুন না হয়?'

—'পোষাক ভালো, চেহারা মন্দ নয়, ড্রইংরুম আলাপে দখল আছে।'

হেসে ফেললো সুদর্শন।—'ড্রইংরুমের পাশের ঘরের সাক্ষাৎটার জন্যেই তবে আর সব জানা তোলা রইল।'

সুদর্শনের দৃষ্টি, তার কথা, গলার স্বর সব মিলিয়ে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে মৌরী। এবার ওঠা ভালো কিন্তু যেই মৌরী উঠে দাঁড়িয়ে বললো 'আসছি।' অমনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সুদর্শনও।

ওদের দুজনকে নিভৃত আলাপের সুযোগ দিতেই যে সবাই চলে গেলেন, এটা সুদর্শন ঠিকই বুঝেছিল। কিন্তু সুযোগটা সে কিছু নিয়ে ফেলল বেশীই। আচমকা কাছে টেনে আনল মৌরীকে। এত অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটা মৌরীর কাছে যে, প্রথমে কিছু বুঝে উঠতেই পারলো না সে। তারপর সুদর্শন যখন ওকে ছেড়ে দিয়ে ফের গিয়ে কোচে বসল, তখন হয় ও পাথর হয়ে গেছে, নয় গেছে মরে। নইলে ছাড়া পেয়েও ও অমন স্থির দৃষ্টিতে সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?

মৌরীর এ দৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় ছিল না সুদর্শনের। সে ভেবেছিল, ছাড়া পাওয়া মাত্র ছুটে পালাবে মৌরী লজ্জায়। এমন স্থির দৃষ্টিতে যে ওরই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, বা কোন মেয়ে তা থাকতে পারে—এ পর্য্যন্ত সুদর্শনের জীবনে সে অভিজ্ঞতা হয়নি। অবস্থাটা হয়ে দাঁড়ালো উল্টো অর্থাৎ ওরই ছুটে পালাবার মতো। একেবারে এতটুকু হয়ে গেল সে। হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে সময় প্রচুর হাতে পাবো, সেদিন আমি জিজ্ঞাসা করব কোথায় অপরাধ—আজ ক্ষমা চাইছি—'

চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলো মঞ্জু। —'একি! হাত জোড় করে কি প্রার্থনা করছেন!' সুদর্শনের হাতে চা দিয়ে মৌরীর দিকে তাকাতে গিয়ে মঞ্জু দেখল, এরই ভেতর কখন যেন সে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

ধীর পায় একটি একটি করে সিঁড়ি ভেঙ্গে তেতলার চিলেকোঠায় উঠে এসে ইজিচেয়ারটার উপর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল মৌরী। স্তব্ধ হয়ে রইল ওর শরীরের সমস্ত রক্তকণিকা। অন্য কোথাও এ অবস্থায় ওরা শরীরময় মাতাল-নৃত্য জুড়ে দেয়। কিন্তু যে শরীরে বাস করে, তাকে ওরা ভালো করেই চেনে। সেখানে মাতলামী করবে তেমন সাহস ওরা রাখে না।

কিন্তু সত্যি কি এতটা বিচলিত হবার মতো কারণ কিছু ঘটেছে?

কারণটা বাইরে খুঁজলে মিলবে না। অন্বেষণটা চালাতে হবে ভেতরের দিকে। মাটির সামান্য কম্পনেও বিশ্ব-সংসার কেঁপে ওঠে, কারণ নাড়াটা দেয় সে বিশ্বের মূল ভিত ধরে। সুদর্শনও নাড়াটা দিয়ে ফেলেছে মৌরীর চারিত্রিক কাঠামোর মূল ভিতে। একটা অতি উঁচু সুরে বাঁধা মন মৌরীর—প্রায় ক্ল্যাসিক মানের। সঙ্গীত-জগতের মতোই এমন মনেরও সমঝদার মেলা ভার। ওর সঙ্গে কারু বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না আর গড়ে উঠলেও ভাঙ্গতে সময় লাগে না। বয়সধর্মে ওদের কথা ওদের মতি যেদিকে গতি নেয়, মৌরী মুখ ফেরায় সে দিক থেকে। নতুন বিয়ে হয়ে আসা বান্ধবীদের নিয়ে কৌতূহলে কেউ মাত্রা ছাড়ালে মুখের প্রতিটি রেখায় প্রকাশ করে বসে, এমন বিরাগ যা আত্মমর্য্যাদায় আঘাত করে। মনে মনে অপমানিত বোধ করে ওরা। বন্ধ হয়ে যায় বন্ধুদের মনের দরজা। এই একটি দরজাই ওদের মনের আছে। সেটা বন্ধ হলে আর কোন পথ পায় না মৌরী ভেতরে ঢোকবার। মন খারাপ করে এসে ঘরে বসে। শুনতে পায় বন্ধুরা মন্তব্য করছে, অতি আনরোম্যান্টিক মেয়ে ও। শুনে হাসি পায় মৌরীর। একটি রোম্যান্টিক মন পাওয়া জগতে যত দুর্লভ তার ভেতর একটিও বোধ হয় ওদের নেই। তাই অপপ্রয়োগে এমন নিঃসঙ্কোচ।

এমন মেয়ের মন পাওয়া কঠিন—সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বাড়ীর সবাই। তাই আগে থেকেই ওর মনটা তৈরী করে রাখার কাজে লেগে গিয়েছিলেন তাঁরা। পাত্রের বিদ্যা-বুদ্ধি-ব্যক্তিত্ব-ঐশ্বর্য্যের বাণ এমন নিপুণতার সঙ্গে এক একটি করে নিক্ষেপ করে চলেছিলেন, যেন মৌরী মুখ ফেরাবার পথ না পায়। যখন ও-পক্ষ থেকে পছন্দ হবার খবর এলো, তখন সবাই মিলে এমন কাণ্ড জুড়ে

দিলেন, যেন অপ্রত্যাশিত নয়, অকল্পনীয় কিছু ঘটতে যাচ্ছে। স্বপ্ন দেখতে যা সাহস ছিল না তা চলেছে সত্য হতে।

ভয়ে ভয়ে এসে বোনকে জিজ্ঞাসা করেছিল মৌরী—'কি করি বল ত?'

নিজের দুচোখ বন্ধ করে দেখিয়ে দিল মঞ্জু—'একেবারে এমনি করে দুচোখ সেঁটে বন্ধ করে বসে থাক।'

—'চোখ বন্ধ করে বসে থাকব?'

—'হাঁ। আর খুলবি সেই শুভদৃষ্টির সময়ে। এর আগে নয়। সাহিত্যরথী মহারথীদের মানসপুত্রদের জন্ত বসে বসে মালা গাঁথছিস—মিলবে? তোর দ্বারা আপন স্বামী নির্বাচন জীবনেও হবে না। তোকে বিয়ে করতে হলে যাঁদের নির্বাচনে করতে হবে, তাঁরা যখন অমন চাঁদ পাওয়া ভাব করছেন, তখন তুই চোখ বুজে বসে থাক।'

তাই থাকবে ঠিক করেছিল মৌরী। ছিলও তাই। সুদর্শন না এলে ও চোখ খুলত সত্যি শুভদৃষ্টির সময়েই। তাই যখন বৌদি এসে বললেন সুদর্শন এসেছে, তখন ওর বুকটা যে এমন টিপ টিপ শুরু করেছিল তার কারণটাও এই—যদি ভালো না লাগে! যদি মন বেঁকে বসে! কি দেখে বেঁকবে, কেন বেঁকবে, সবার কাছে যা তুচ্ছ মনে হবে বা কিছুই মনে হবে না তেমনি কারণে ওর মন কেন এমন বিমুখ হয়ে উঠবে, যে শত চেষ্টা করেও আর মুখ ফেরাতে পারবে না। নিজেও বলার মতো কোন কারণ হয়ত বের করে উঠতে পারবে না—কিন্তু—তা হলে কি হলো। যা হবার তা হয়ে গেছে। সুদর্শনকে ওর ভালো লাগেনি। ওর সূক্ষ্ম রুচিবোধে ওর সূক্ষ্ম মাত্রাবোধে হয়ত সে এর ভেতর বহু বার আঘাত করে ফেলেছে। কিন্তু আলাপে পরিচয়ে যখন ভালো লাগল সুদর্শনকে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মৌরী। রূপে সে কন্দর্প নয়। কিন্তু তার চেহারায় যা আছে তা রূপের চাইতেও মূল্যবান। একটা স্থির আত্মবিশ্বাস। এমন চেহারার ডাক্তার দরজায় এসে দাঁড়ালেই রোগী মনের বল ফিরে পায়। ডাক্তারের আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন রোগীর মুখে গিয়ে পড়ে, তার বিশ্বাসও বাড়িয়ে তোলে। মৌরী দেখল, কথা বলতে সুদর্শন জানে কিন্তু তবু সে সংযত-বাক। এই বাক-সংযম তার প্রকৃতিগত না অভ্যাসকে স্বভাবে দাঁড় করিয়েছে আপন ব্যবসার অঙ্গ হিসাবে, ও অবশ্যি তা বুঝে উঠতে পারেনি—তা যাই হোক, একটা মানুষকে ভালো লাগার পক্ষে এটা ওর কাছে একটা মস্ত গুণ। তাই অসাধ্য সাধন হয়ে গিয়েছিল। মৌরীর ভালো লেগে গিয়েছিল সুদর্শনকে। যত বার ওর দিকে তাকিয়ে সুদর্শন কথা বলেছে বা হেসেছে এমন একটা অপরিচিত অনুভূতির স্রোত ওর শরীরের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে যে, মৌরী বিস্মিত না হয়ে পারেনি। কিন্তু সব কিছুর উপর নিজ হাতে যেন ছুরি চালিয়ে দিল সুদর্শন। পরিণতি লাভের জন্ত যে সম্পর্ক যতটুকু সময় চায়, যে ঘটনার জন্ত যতটুকু প্রস্তুতি কাল প্রয়োজন, সেটুকু দিতে অবসর না মানা—এ অশ্লীলতা।

দিনটা অসহ্য গরম। পরিমাপ যন্ত্রের পারদ ক'দিন ধরেই গিয়ে ঠেকেছে আট নয় ছাড়িয়ে। সন্ধ্যার দিকে যন্ত্রের পারদ নেমে এলেও গরমটা ধরে রাখে ইট, কাঠ, দেওয়াল। অন্য দিন বাতাস থাকে, আজ তা-ও নেই। একেবারে দমবন্ধ ভাব। দমবন্ধ হয়ে আসছিল মৌরীরও। যদিও কিছুক্ষণ আগে এর উল্টো মনোভাবটিই কাজ করছিল ওর মনে—কিন্তু এখন মনে হ'তে লাগল কোথাও কিছু ভালো লাগার মত নেই। আকাশটা অতি বেশী নীল। তারাগুলো অতি বেশী ঝলমলে। চাঁদটা যেমন কাছে, তেমনি বিশ্রী রকমের বড়। রং ব্যবহারে সংযম নেই কোথাও। অতি কাঁচা শিল্পীর হাতের কাজ।

গলির ওপরের আমগাছটা তার গুঁড়িটি মাত্র গলিতে রেখে সমস্ত শরীরটা নিয়ে এসে ঝুঁকে পড়েছে ওদের ছাদে। মঞ্জু বলে—'ও 'কারু নয়' হয়ে থাকতে চায় না। সেই গাছটা এখন ঝেঁপে উঠেছে বৈশাখী আমে। রং ধরা শুরু হ'লো বলে। সোজা হয়ে বসল মৌরী। আচ্ছা গাছগুলো যদি হঠাৎ হঠাৎ ভুঁইফোঁড় হয়ে বেরিয়ে এসে এক এক মাথা পাকাফল নিয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়াত? প্রকৃতি সুজলা, সুফলা হ'তেন ঠিকই কিন্তু তার শিল্পী নাম ঘুচত। পাতা খোলা, পাপড়ি মেলা, ফুল ফোটা, ফুলের ফল হয়ে ওঠা তার কাঁচা বর্ণে রং ধরা—এর একটা স্তরও সে জোর ক'রে এগুতে চায় না, এমন সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতি তার! ভালোবাসারও এমনি একটা ধাপে ধাপে পরিণতি আছে—সেও সময় চায় পাতা খোলার পাপড়ি মেলার। শিল্পিমনের অনুভূতিকাল ওতো সেটাই। শুধু ফলে লক্ষ্য তো লোভীর! কিন্তু তার জন্তও তো সময় দিতে হয়। উপভোগ করতে না জানলেও অপেক্ষা করতে জানতে হয়। মৌরীর মনে হয়, অনেকটা রম্য পথ সুদর্শন ওকে হেঁচড়ে নিয়ে এল। পথ, সব কিছুতেই এই পথটাই তো সবচেয়ে মূল্যবান। পথের সাধনায় এক টুক্রো নুড়ি ওঠে ভগবান হয়ে। নইলে ঘরে বসে যে পাথরের টুকরোটাকে মানুষ নুড়ি ব'লে ফেলে দেয়; চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে, মরুপ্রান্তরের আগুনে ঢালা পথে পা ফেলে, হিমালয়ের বরফ ঠেলে—অনাহারে অর্দ্ধাহারে কত দুঃখের পথ অতিক্রম ক'রে—সে নুড়িকেই বুকে চেপে ধরে, মানুষ ভগবান বলে। পথের সাধনায় আপন অন্তরটাই হয়ে ওঠে তখন তাদের পবিত্রবেদী। চোখ বুজলে সেখানেই তারা ভগবানকে দেখতে পায়। কি ভগবানের ক্ষেত্রে কি ভালোবাসার ক্ষেত্রে, এ প্রস্তুতিটাই কি পুণ্য নয়? এই প্রস্তুতিটাই কি প্রেম নয়?

শুধু এই নয়, এই ঘটনার ভেতর দিয়ে মৌরী যেন সুদর্শনের চরিত্রের অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখে নিল। একটি মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে তার ঠোঁট স্পর্শ করবার কাঁচা অবস্থা সে পার হয়ে এসেছে। অভ্যস্ত—এতে অতি অভ্যস্ত সুদর্শন। হাত দিয়ে চোখ ঢাকল মৌরী। তারাভরা আকাশটাকে যদি টেনে নামানো সম্ভব হ'তো, তবে বুঝি সেটা দিয়েই মুখ ঢাকত মৌরী।

[ক্রমশঃ।

সিরাজুল হক

তেলকালি-মাখা হাতে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বাড়ী ঢুকল অশোক। বেলা তখন প্রায় ছুটো। ছুঃসহ ক্ষুধা বারটার পর হতেই সুরু হয়; ক্ষুধা ঘড়ির কাঁটা ধরে চলতে পারে কিন্তু রুজি-রোজগারে নিয়মানুবর্ত্তিতা চলে কৈ? নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নান-আহার সব দিন হয় না। কোন দিন সাড়ে বার, কোন দিন একটা-দেড়টা, আবার কাজের চাপে আড়াইটা তিনটেও হয়ে যায় এক একদিন। আজ মেসিন ষ্টার্ট দেওয়া হয়েছিল সকাল ছ'টায়। গাড়ী গাড়ী ধান আমদানী; বেলা দেড়টা পর্যন্ত মেসিনটার গোঙানি ঘস্‌ঘসানি সমানে চলেছে। স্বাস্থ্যের দিকে তীক্ষ্ণ নজর পার্টনার মতিয়র রহমানের। মতিয়র পৌনে বারটার পর আর কিছুতেই মেসিন চালু রাখতে চায় না; এই নিয়ে অশোকের সঙ্গে প্রায়ই তার কথা-কাটাকাটি। মতিয়র বলে থাকে, টালবাহানা কেউ ঘুচোতে পারবে না রে! বাঙালীর এটি শেষ বিধিলিপি। ধান আমদানী হবেই, তাই বলে সময়ে নাওয়া-খাওয়া না করে অসময়ে স্বাস্থ্যটা মাটি করবি? ভিটামিনের ডেফিসিয়েন্সী শতকরা নব্বই জনের। দুধ মাছ দেশ থেকে একরকম উঠে গেল। ঘি-এ চর্ব্বি। সরষের তেলে শিয়াকুল কাঁটার নির্য্যাস। চা-এ চামড়ার গুঁড়ো। ভেজাল আর ভেজাল; ভেজাল ছাড়া খাবার নাই, পানীয় নাই। মানুষ বাঁচবে কি করে? পরমায়ু বাড়বে কিসে? অকালে দাঁত ভাঙছে। চুল পাকছে। পাড়ায় পাড়ায় যক্ষ্মা, হাঁপানি। তার উপর বাবা এই হাসকিন মেসিন নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি; ধুলোগুঁড়ো হরদম নাক দিয়ে পেটে ঢুকছে, ফুসফুসে আঘাত হানছে। উঁহু, স্বাস্থ্যের দিকে খুবই খেয়াল রাখতে হবে, নইলে সবই বিফল। কল চালাবে কে?

মতিয়র অতিশয়োক্তি করে নাই। গত বছর অশোক পুরো ছ'বছর ভুগেছে। চিকিৎসায় টাকাও কম খরচ হয়নি। কিন্তু তবুও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-কানুনগুলো সব সময় মেনে চলা যায় না। যে পেশা পাঁচ জনের সহানুভূতির উপর অনেকটা নির্ভর করে, যেটা একটা ব্যবসারই সামিল, সেখানে স্বাধীন কর্ম্মসূচী চলবে কি করে? অশোক এ কথাটা কিছুতেই পার্টনার মতিয়র রহমানকে বোঝাতে পারে না। আর একটি ব্যক্তিও ভয়ানক অবুঝ। সে হল রমা। রমার অসন্তোষ বা অনুযোগটা শাড়ী-স্নো-পাউডারের যথারীতি সরবরাহের নয়। স্বামীকে অভুক্ত রেখে সে মুখে আহার তুলতে পারে না অথচ অন্তঃসত্তা রমার গর্ভস্থ ভ্রূণ তাতে ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই অশোকের বাড়ী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই রমা প্রায় কেঁদে ফেলল। অশোক কয়েক সেকেণ্ড অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থেকে পরম প্রীতিভরে পত্নীর হাত ছ'খানা নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল—আজ থেকে তোমার কাছে আমি শপথ করছি রমা, আর কোনো দিন আমি এতো দেরী করব না। বারোটার আগেই আমি চালু মেসিনও বন্ধ করে এসে নেয়ে-খেয়ে যাব, কেমন?

রমা উদ্গত অশ্রু আঁচলে মুছে স্বামীর হাতধোওয়া জল, লাইফবয় সাবান ও গামছা আনতে সেখান হতে চলে গেল। রমার গমন-পথে তাকিয়ে পরিশ্রান্ত অশোকের আজ অনেক কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে পর পর। অনেক খোঁজ-খবর আর যাচাই করে বাবা যেদিন রমাকে ঘরের বউ করে নিয়ে এলেন, সেদিন বাবার সমবয়সীরা বলেছিলেন—ভায়া যে লক্ষ্মী সরস্বতী দুটোকেই ঘরে এনে তুললে হে! যেমন ছেলে, তেমনি বউ; এ একেবারে রাজযোটক।

সত্যই রমা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। সেদিনের সেই লক্ষ্মী সরস্বতীর আজ এ কি ছিরি! আজ কে বলবে এ সেই রমা? প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর জল থেকে তুলে আনা খড়ের কাঠামোর মত রমার রম্য দেহ থেকে সব কিছু শিল্পসম্ভার অন্তর্হিত হয়ে রিক্ততায় হাহাকার করছে। রমাকে দেখলে আজ আর চেনাই যায় না। অথচ কি-ই বা এমন বয়স! ক'টা বছরই বা বিয়ে হয়েছে! দশ বছর আগে অশোক এম, এর ছাত্র, রমা বি, এস সির। পূর্ব্বরাগ বা রোমান্সের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে তারা একদা পরিণয়-ঘাটে এসে লাগেনি। অশোক জমিদারপুত্র, কোলকাতায় পড়াশুনো করছিল। রমাও জমিদারকন্যা, কোলকাতার কলেজে পড়তে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার বাবা। অশোক রমা কেউ কাউকে চিনতো না। উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। ছেলেমেয়ের তত্ত্বতবাস করে উভয় অভিভাবক একই ট্রেনের একই বগির বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে দেশে ফিরছিলেন, চার ঘণ্টার জার্নির ভিতর ছ'জনের অভিভাবক আলাপনের মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি এমনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, চিরস্থায়ী রক্তের সম্পর্ক স্থাপন করতে পাত্রপাত্রী চোখে দেখার পূর্ব্বেই শুধু কানে শুনে এক রকম পাকা কথা দিয়ে দিয়েছিলেন।

বিয়ে হয়েছিল। অশোক এম, এ আর রমা বি, এস সি পাশ করে কলকাতার হোষ্টেল ছেড়ে এসে দেশের বাড়ীতে দাম্পত্য জীবন সুরু করল। জমিদারী ছিল, আর বেশ কয়েক হাজার টাকা, পাকা বাড়ী, নায়েব-গোমস্তা-প্যায়দা-পাইক- চাকর-চাকরাণী, সবার উপরে মাথার উপর বাবা। জীবনটা ছিল খুবই হালকা আর রঙীন, পাখা মেলে নীলাকাশে উড়ে চলবার মত।

ভূমিকম্প হল না বটে কিন্তু সব ভূমিসাৎ হয়ে গেল বৈ কি! যাচ্ছে, যাবে, যাবে না, এই করতে করতে এক দিন জমিদারী প্রথা

রহিত হয়ে গেল। সেই সঙ্গে নায়েব, গোমস্তা, প্যায়দা, পাইক আপনা আপনি বরখাস্ত হল। বাবা গতায়ু হলেন। সিন্দুক খুলে দেখা গেল, সেটা সব সময় চাবি দেওয়া থাকলেও ফাঁকা। অশোক ও রমার হাল্কা জীবন হঠাৎ দুর্ব্বহ হয়ে পড়ল। সেদিনের চক-মিলানো জমিদারবাড়ী, লতাপাতা সুশোভিত তোরণদ্বার, কাছারী-ঘর, নাটমন্দির সবই আছে কিন্তু তার প্রতি ইটে সমারোহের যে প্রতিধ্বনি তুলত, তা আজ গভীর বিষণ্নতায় মৌন, নিস্তব্ধ, অপাংক্তেয়। দূর-দূরান্তের মহাল থেকে প্রজারা আসত। কাছারী-ঘরের মেঝে প্রজাদের আভূমিনত প্রণিপাতের স্বাক্ষর আজও বহন করছে কিন্তু জমিদারী প্রথা রহিত হওয়ার পর প্রজাদের প্রণামাবনত মাথাগুলো যেন লৌহনির্ম্মিত কুতুব-মিনারের মত আকাশ ফুঁড়ে উন্নত শির হয়ে পড়ল। সেখান হতে জমিদার-বাড়ীটাকে আজ খুবই ক্ষুদ্র, খুবই করুণার স্থান বলে মনে হয়। এই ক্ষুদ্রতার মধ্যে রমা এক এক সময় হাঁপিয়ে উঠে, ভয়ও করে তার। রমা অনুযোগ করে—ওগো, তুমি তো বাইরে পাঁচটা লোকজন নিয়ে থাকো, আমি কি করে থাকি বল তো এই শূন্য পুরীতে? দুপুরবেলায় তেতলার ঘরে শুতে গিয়ে গা আমার ছমছম করে। না বাপু, এখানে আমি থাকতে পারব না; এ নির্জ্জন বাস তুলে দিয়ে অন্য কোথাও যাই চলো।

অশোক বলে—জনতাকে আমরা যুগ-যুগান্তর ধরে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম বলেই তো আজ নির্জ্জনে অপাংক্তেয় হয়ে থাকতে হচ্ছে রমা! অজ্ঞতা, মূর্খতা, অন্যায় ও শোষণের সুযোগ নিয়ে মানুষের শুধু সেলামই কুড়িয়েছি; তাই বলে কোলে ঠাঁই দিই নি তাদের। মানবদেহের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মস্তক আর ললাটদেশ আমাদের পদধূলিতে অপমানিত ও কলঙ্কিত হয়েছে রমা! নররূপী নারায়ণের সেই অপমান, তিনি কি ক্ষমা করবেন আমাদের? তাঁর রুদ্ররোষ থেকে নিস্তার পাবার জন্যেই তো আজ নির্জ্জনবাস করতে হবে এখানে। সে কথা ভুলে গেলে তো চলবে না আমাদের? তবে হ্যাঁ, তোমারই বা ভয় করার কি আছে? সেদিন চাঁদপুরের বোষ্টুমী ঠাকরুণের কাছ থেকে যে মাদুলিখানা নিলে, সেটাতে কোন কাজ হচ্ছে না বুঝি? ভূত-প্রেত, ডান-ডাকিনী তো তোমার দেহের ত্রিসীমানায় ভিড়বার কথা নয়, তবে বাড়ীটার চতুঃসীমা বন্ধ করতে হবে বৈ কি!

কথাটা শেষ করে অশোক নিজেই হেসে ফেলে। রমা কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে বলে—তোমার সব কথাতেই 'জোক'। আমি কি মিথ্যে বলছি? তুমি একদিন দুপুরবেলায় তেতলার ঘরে একা-একা শুয়ে দেখ না, ভয় করে কি না।

অশোক কণ্ঠস্বরে হঠাৎ গাঢ় প্রত্যয় এনে উত্তর দেয়—তুমি যা বলো তার এক রত্তিও মিথ্যে নয় রমা, সে বিশ্বাস তোমার উপর আমার আছে। কথা হল এই যে, ভূত-প্রেতগুলো বড়ই বাবু আর আরামপ্রিয়। পাকা বাড়ী ফাঁকা দেখলে আর কথা নেই। কোন সময় অলক্ষ্যে ঢুকে পড়ে জাঁকিয়ে বসে, দাপাদাপি করে দিন-দুপুরে। চর্ম্মচোখে দেখতে পেলে তো কথাই ছিল না। লাঠি-সোঁটা দিয়ে ঠেঙিয়ে দূর করা যেত; তা যখন সম্ভব নয়, তখন

বোষ্টুমী ঠাকরুণকে দিয়ে গোটা বাড়ীর চৌহদ্দিতে গাড়ী-চার মাদুলি পুঁতে দিলে কেমন হয়? তন্ত্রশক্তির মত আর শক্তি আছে? সব কুপোকাৎ হয়ে যাবে। তাই-ই করব রমা! এই শূন্য পুরীতে একা যখন আমাদের থাকতে হবে তখন নিরাপদ পন্থা হল বোষ্টুমী ঠাকরুণের তান্ত্রিক গুণসম্পন্ন মাদুলি ধারণ।

স্বামীর পরিহাস-উক্তিতে রমা মোটেই উৎসাহ বোধ করল না। বিস্মিত কণ্ঠে বলে—তুমি কি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস কর না?

করি। অশোক উত্তর দেয়—শ্রীমতী মনোরমা দেবী যদি সায়েন্সের ছাত্রী হয়ে ভূত-প্রেত বিশ্বাস করে, তা হলে তাতে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোক করা মোটেই শোভা পায় না। করি, খুব করি।

রমা আর তর্কে প্রবৃত্ত হয় না। স্বামীকে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ গা, যখন আমাদের জমিদারী ছিল, মহাল হতে প্রজারা আসত খাজনা দিতে, নজর দিতে, বাবাকে প্রণাম করতে; গমগম করত কাছারী-ঘর। নায়েব, গোমস্তা, পাইক, চাকর-চাকরাণী সবাই জমিদারী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেল এবাড়ী ছেড়ে। পুরোনো মনিব বলে কেউ তো থাকল না এক-আধ বছর এ বাড়ীতে?

আবার হাসালে রমা! অশোক প্রত্যুত্তর করে—নিমক খেলেই কি সকলের কাছ থেকে তার প্রতিদান পাওয়া যায় রমা? তা ছাড়া মৌচাকে মধু না থাকলে মৌমাছির গুঞ্জনধ্বনি তো শোনা যায় না! এ তো ন্যায়শাস্ত্র-সম্মত কথা।

রমা পূর্ব্বকথার সূত্র ধরে পুনরায় জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ গা, প্রজারা তোমায় চিনতে পারে তো? রাস্তা-ঘাটে হঠাৎ দেখা হলে প্রণাম করে, পায়ের ধুলো নেয়? এত দিন তাদের জমিদার ছিলে বলে সঙ্কোচ-সমীহ করে? 'বাবু' বলে সম্বোধন করতে ভুলে যায় না তো তারা?

কী সব প্রলাপ বকে যাচ্ছ রমা? অশোক রমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে—পরলোকগত প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রজারা চিনতে পারবে না, এ কি বলছ তুমি? খুবই পারে। জমিদার-বাড়ীর জাতকর্ম থেকে সুরু করে জমিদার-নন্দনদের জীবনের প্রতিটি ধাপ আর তার অনুষ্ঠানে অর্থ-উপচার যে প্রজাদের ঘর থেকে এসেছে তারা চিনবে না তো চিনবে কে? তাদের সেদিনের খোকন বাবুর অন্নপ্রাশনে যে অন্নমুষ্টি আমার কচি অধরোষ্ঠ স্পর্শ করেছিল, সে তো তাদেরই শ্রমজাত তণ্ডুলকণায় তৈরী রমা? সোনার থালায় সজ্জিত অন্নস্তূপের আড়ালে যাদের দান-হস্তের নীরব কল্যাণ কামনা ছিল, তারা কি ভুলতে পারে কখন? যে খোকন বাবুর উপনয়নে বিবাহের ভোজকাজে প্রজারাই হৃষ্টচিত্তে জুগিয়েছে পুকুরের মাছ, কলসী-ভরা দুধ, দই, ভাঁড়-ভর্ত্তি ঘি, গামলা-ছাপানো ছানাবড়া-রসগোল্লা, বস্তাবন্দী চিড়ে-মুড়ি, সরু চাল, সেই খোকন বাবুকে রাস্তাঘাটে দেখা হলে তারা পাশ কাটিয়ে চলে যাবে? রাজা-প্রজা সম্পর্কের চাইতে হৃদয়-রাজ্যের সম্পর্ক যে আরও বড় রমা! তুমি তো জান এম, এ পাশ করে বিয়ে হওয়ার পর বাবা যখন আমাকে জমিদারী দেখাশুনার কাজে তালিম দিতে লাগলেন, কাছারীতে বসে থাকতাম, প্রজারা মহাল থেকে এসে আভূমিনত হয়ে প্রণাম করত, পায়ের ধুলো নিতো; তাদের আনুগত্যনমিত মূর্ত্তি আজও আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। সেদিন নিজেকে চরম পূজনীয় ও অভিজাত বলে মনে করেছি। আজও অভ্যাস বশতঃ প্রজারা অতীতের জমিদার বলে প্রণাম করলে, পায়ের ধুলো নিতে এলে কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হয় রমা! মনে হয়, তারা পরিহাস করছে না তো? কী এমন সুকৃতি—সদাচার—সদনুষ্ঠান করেছি, যার জন্য আজও তারা ভক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে 'বাবু' বলে সম্বোধন করবে? বিদ্যামন্দির—হাসপাতাল—ধর্ম্মশালা···চতুষ্পাঠী—প্রজার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের অর্থেই এসব প্রতিষ্ঠান বাংলার জমিদাররা করেছেন রমা কিন্তু তবুও প্রজারা জমিদারের নামেই নান্দীপাঠ করে আসছে। যাদের অর্থে এই সব লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে তারা ভুলেও কোন দিন চিন্তা করে দেখেনি, এসবের প্রকৃত নির্ম্মাণকারী ও প্রতিষ্ঠাতা কে? অপরকে প্রবঞ্চনা করে এরা অমর হতে চায়নি; যুগ যুগ ধরে শুধু দান করে গেছে নীরবে অম্লান বদনে। এমন এরা আত্মবিস্মৃত মহীয়ান মানুষ! কিন্তু তবুও বাংলায় জমিদারকুল এত দিন কি কম নির্য্যাতন চালিয়েছে প্রজাদের উপর?

আমার বাবাও তাঁদেরই একজন ছিলেন। জমিদারের হৃদয়হীন শোষণ অত্যাচার অবিচারে প্রাণান্ত হয়ে যখনই তারা মুক্তির পথ খুঁজেছে তখনই তাদেরকে দমন করতে কত হীন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে জমিদাররা, যার অলিখিত ইতিহাস আজ সীমাহীন, ঘৃণাব্যঞ্জক। গুপ্ত ডাকাতদল গঠন, অবাধ্য প্রজা শায়েস্তা করতে লাঠিয়াল পোষণ, গোপনে রাত্রির অন্ধকারে প্রজার ঘরে অগ্নিসংযোগ, জাল হ্যাণ্ডনোট তৈরী; চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ, পরিশেষে ঋণের দায়ে প্রজাকে বাপ-দাদার ভিটেমাটি থেকে চিরতরে উৎখাত। অকাল বিধবার মর্য্যাদাহানি করতেও এরা পিছপা হয়নি সময় ও ক্ষেত্রবিশেষে। সেই সব দুষ্কর্ম ও পাপের বিষে বিষে বাংলার মাটি, বাংলার জল-বায়ু আকাশ-বাতাস সব বিষাক্ত নীল হয়ে গিয়েছিল। মানুষ-বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল শ্রীগৌরাঙ্গের দেশ। কিন্তু কী আশ্চর্য্যের বিষয় রমা, জমিদারী প্রথা রহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার প্রজাকুল সমস্ত গরল গলাধঃকরণ করে যেন নীলকণ্ঠ রূপ ধারণ করল! কোন বিচার তাদের দেখা গেল না; স্থির-শান্ত সৌম্যভাব। জমিদারের পূর্ব্বকৃত অপরাধ মুহূর্ত্তের মধ্যে স্মরণে এলে তারা মারমুখো হল না; প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে নিজের হাতে বিচারভার নিল না। শ্রীচৈতন্যের দেশে ক্ষমাই ধর্ম্ম-আদর্শ; প্রেমদান সেখানে শাশ্বত রমা! কাজেই তোমার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রজা প্রজাই আছে আজও। নাই জমিদার। জমিদারীহারার দল আজ প্রজার ঘাড়ে এক নতুন পোষ্যশ্রেণী। কতকটা ভিখারীও বৈ কি?

অশোকের সব কথাগুলো এতক্ষণ পর্য্যন্ত রমা সহিষ্ণুতা সহকারে শুনে যাচ্ছিল। প্রতিবাদ করে বলল—জমিদারী প্রথা বিলোপ হওয়ায় জমিদারশ্রেণী আজ ভিখারীর পর্য্যায়ে নেমে এসেছে। আমরাও কি তাই তবে?

—হ্যাঁ, রমা! অশোক বলে—আশ্চর্য্য হচ্ছ তুমি? ভিক্ষার সংজ্ঞা কি শুধু ঝোলা-মালা নিয়ে দ্বারে দ্বারে যাচ্ঞা করা!

মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করে, শ্রমদেবতাকে ফাঁকি দিয়ে অপরের অন্নে এত কাল যারা উদরপূর্ত্তি করে আসছিল, আজ তা' হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মরাকান্না সুরু করেছে। ক্ষতিপূরণ দাও, চাকরী দাও, জীবিকার উপায় খুঁজে পাচ্ছি না, কি খেয়ে বাঁচব, কি করে এত কালের মান-ইজ্জত বাঁচাব, এই ধরণের আরো কত আত্মমর্য্যাদা বিহীন আবেদন-নিবেদন। এ সব কি ভিক্ষারই সামিল নয় রমা? অক্ষমই অপরের করুণার উপর নির্ভরশীল হয়, সক্ষম তো হয় না?

—আমিও তো একজন জমিদার-ঘরের মেয়ে, বউ। রমা ব্যথা-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলে—আমাদের জীবনের আজকের এই গ্লানি কি মুছে ফেলা যায় না?

—যায়। অশোক যেন অবচেতন অবস্থায় "যায়" এই শব্দটি উচ্চারণ করে মনের গভীরে কি একটা বিষয় নিয়ে পর্য্যালোচনা করছিল। পুনরাবৃত্তি করে বলে—যায়। ঐ ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যেই যায়। কিন্তু সে ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে গ্লানি নাই, নাই হীনতাবোধ, মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করার প্রয়াস; আছে দেবত্ব, আছে পরমার্থ লাভ। আড়াই হাজার বছর পূর্ব্বে কপিলাবস্তুর রাজকুমার শাক্যসিংহ ধন ঐশ্বর্য্য শোষণ শাসন রাজসুখ সর্ব্ব অভিমান ত্যাগ করে মানব-জীবনকে গ্লানিমুক্ত করতে যে পথ নির্দ্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, সেই সাধনাই আজ আমাদেরকে গ্লানি ও পাপমুক্ত করতে পারে রমা! ত্যাগ ও সাম্যের সেই মহিমান্বিত উদার অনুভূতি যদি আজ আমাদের থাকত, আসমুদ্র হিমাচল যদি তার আড়াই হাজার বছরের পুরানো আত্মার বাণী কান পেতে নতুন করে শুনত আজ, তাহলে রাজা-প্রজা হৃৎ-হরণকারী সব সম্পর্কের তিক্ততা অনিশ্চয়তা হতাশা নিরাশার অবসান ঘটত রমা!

রমা স্বামীর সুসঙ্গত যুক্তি, নীতিবাক্য, উচ্চ পর্য্যায়ের আলোচনা নিজের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দিয়ে যাচাই করে আকুলকণ্ঠে বলে—ইচ্ছাময় ইচ্ছা করলে সবই করতে পারেন!

দুই

অশোক ও মতিয়র পরস্পর সহপাঠী। গ্রাম্য পাঠশালা থেকে বি, এ, পর্য্যন্ত। অশোক আরও দুটো বছর বেশী পড়ে এম, এ, ডিগ্রী নেয়। মতিয়র বি, এ, পাশ করে চাকুরীতে ঢুকে প্রবাসবাসী হয়। দু'জনের গ্রামের ব্যবধান মাত্র এক মাইল। একই রাস্তা দিয়ে বই বগলে হাইস্কুলে পড়তে যেত। একটি খেলার মাঠেই ছাত্রজীবনে ফুটবল নিয়ে ছুটোছুটি করেছে। পুজো পার্ব্বণে পরস্পর নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে সেটা অপরাধ বলে গণ্য হত। তা'ছাড়া আম জাম বনকুল বৈঁচি কতবেল প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী খৈরীবন থেকে সংগ্রহ করে স্কুল-ফিরতি পথে নুণ-লঙ্কা সহযোগে ভক্ষণ করা এক রকম মরশুমি বিলাস ছিল। অশোকের মা দু'জনের বন্ধুত্ব দেখে পুলকিত হয়ে বলতেন—আমার অশোক ও মতি যেন জগাই-মাধাই।

মতিয়র টিপ্পনী কেটে বলত—সে কি মাসীমা, আমি যে মুসলমানের ছেলে। অশোক জগাই হতে পারে, আমি কী করে মাধাই হতে পারি বলুন তো?

—কেন পারবি না? মাসীমা স্নেহসিক্ত হাসি হেসে সপ্রশংস দৃষ্টিতে বলতেন—তোর মা যদি আমার বোন হয় আর সেই সম্পর্কে আমি যদি তোর মাসীমা হলুম; তা হলে তুই মাধাই হ'স না বোকা? হিসেব করে ভাখ। এই বুঝি লেখাপড়া শিখছ তোমরা?

—লেখাপড়া বলতে মাসীমা কী বুঝতেন তা জানা যায় নাই, তবে মাসীমার মাধাই সর্ব্বশেষ বি, এ, পাশ করে দেশে সরকারী চাকরী করতে করতে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে পূর্ব্ববঙ্গের প্রান্তিক জেলা সুদূর চট্টগ্রামে 'অপসন' দিয়ে চলে যায়। কয়েক বছর সেখানে থাকার পর চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এল। স্কুল সাব-ইন্সপেক্টরের পোষ্ট, সামাজিক সম্মানও আছে, বেকারপ্লাবিত যুগের মন্দ চাকরী নয়, ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এলে কেন? কেউ জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয় মতিয়র—পরগাছা আলোকলতার মত আর কত দিন শূন্যে দোল খাওয়া যায় বলো? শত চেষ্টা করেও পরের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারলাম না। পরের রাষ্ট্রে চেয়ার-টেবিলে বসে কলম চালানোর চেয়ে নিজের জন্মভূমিতে ধান ভেনে খাওয়া লাখ গুণের ইজ্জত। তাই পালিয়ে এলাম চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে। ভাল করিনি বলছ?

প্রত্যুত্তর হয়—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

মতিয়র বলে—জন্মভূমির মহীয়সী রূপের কল্পনা এর চাইতে আর বেশী কী হতে পারে বল? সেই দেশের বাপ-পিতাম'র বাস্তুভিটে, শ্মশান-গোরস্থানের পুণ্যমাটির স্পর্শ থেকে যারা মানুষকে দেশান্তরে যেতে বাধ্য করে রাজনীতির দোহাই দিয়ে, তারা মানুষ নয়; জগতের কোন ভাষার অভিধানে এমন কোন শব্দ নাই যা দিয়ে তাদেরকে অভিহিত করি।

অশোক যে কথাটি বলে থাকে সেটাও মিথ্যা নয়—"Polities is the agitation of many for the gain of a few." অতীতের ষাট বছরের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহ্য থেকে কি এই কথাটাই প্রতিপন্ন হয় না মতি? তবে বৃথা খেদ করছিস কেন? কার উপর দোষারোপ করবি বল্?

মতিয়র বিস্মিত কণ্ঠে বলে—কোটি কোটি মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন, আহার-বিহার, শিক্ষা-সংস্কৃতি এক কথায় মানব-জীবনের সুস্থ ও সুন্দর বিকাশধারা যে নীতির সঙ্গে জড়িত, তা যদি সঙ্কীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ হয়, তাহলে মানব-জীবনের কী সার্থকতা থাকতে পারে অশোক?

অশোক এ বিষয়ে আর উপযুক্ত উত্তর না দিয়ে বলে—থাক্‌গে ও-সব কথা, ধান ভানতে শিবের গান। মেসিনটা ক'দিন থেকে একটু ডিস-অর্ডার চলছে। কাল ধান ভানা সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে কয়েকটা পার্টস খুলে দেখতে হবে কি হয়েছে কলটার।

বলতে গেলে পরিকল্পনাটা প্রধানতঃ মতিয়র রহমানেরই। বিদেশে চাকরী ছেড়ে চলে এসে মতিয়র এক রকম অথৈ জলে পড়ল। মাগগী-গণ্ডার দিন। মধ্যবিত্তের সংসার, আজ শত অভাব অভিযোগ, সমস্যায় কণ্টকিত; তদুপরি যোগ্যতানুসারে কর্ম্মসংস্থান নাই। বিস্তর সাধ্যসাধনা, তদ্বির তদারকের পর সরকারী বেসরকারী যা হোক একটা কিছু যোগাড় হলে তাকে বজায় রাখতে অনিচ্ছা সত্বেও হীনমন্যতার পরিচয় দিতে হয়। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর অশোকও ভয়ানক অসুবিধায় পড়ল; কিছু একটা না করলে দিন চলার দিন আর নাই। যুগটা স্পষ্ট পরিবর্ত্তনের যুগ; অশোক মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করল এই বাস্তবতাটুকু। অশোক এম-এ। মতিয়র বি-এ। উভয়েরই শৈক্ষিক যোগ্যতা উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি, বিশ্বরাজনীতি নিয়ে যারা মাথা ঘামায়, দু'-একটা সমস্যার সমাধানও বের করতে পারে অনায়াসে তারা। আজ নিজেদের ভরণপোষণ জীবিকানির্ব্বাহের উপায় নিয়ে গলদঘর্ম। স্কীম, ক্যাপিট্যাল, প্রফিট এণ্ড লস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বহু ডিসকাসন, গবেষণা হয় কিন্তু কোনটাই সাব্যস্ত হয় না। অশোক অভিমত প্রকাশ করে—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। ব্যবসা-বাণিজ্য এই ধর কাপড়, মণিহারী কিম্বা মুদিখানার দোকান খুললে কেমন হয়?

মতিয়র গররাজী। বলে—দারুণ ডিস-অনেষ্ট হতে হবে, নইলে মার্কেটে কমপিট করতে পারব না।

—আচ্ছা এ-সব বিজনেসে তোর যদি মত না হয় তা হলে কটেজ ইনডাষ্ট্রি এই ধর হোসিয়ারী, উইভিং, কারপেনটারি, স্মিথি।

—চলবে না। কণ্ঠস্বরে যেন রাজ্যের প্রত্যয় জমা করে মতিয়র বলে—পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা এসে বেহুঁস হয়ে হোসিয়ারী চালাচ্ছে।

—উইভিং?

—আগে ট্রেনিং নিতে হবে। মাকু ঠেলাঠেলির ব্যাপার। পেসেন্স চাই, নইলে সুতো ছিঁড়বে।

—কারপেনটারি?

—পাড়াগাঁয়ের লোক কে কটা চেয়ার-টেবিলে বসে? দুয়োর-জানলা লাঙল-জোয়াল স্থানীয় মিস্ত্রীতে যা তৈরী করে তাই-ই কেনবার খদ্দের থাকে না সব সময়।

—স্মিথি?

—নেহাই—লোহা—হাতুড়ি—হাপর—চারটেকেই একসঙ্গে সামলাতে হবে। মতিয়র বলে—উহুঁ ও-সব পারবি না। আগুনের তাতে তাতে ঝলসিয়ে যাবি।

—এটা নয়, ওটা হবে না, তবে কচু করবি? অশোক কতকটা বিরক্তি হয়ে মন্তব্যটা করে।

মতিয়র চিন্তামগ্ন।

অশোক খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে কতকটা আস্থার ভাব নিয়ে পুনরায় বলে—আচ্ছা, একটা এগ্রিকালচার ফার্ম করলে কেমন হয় বল দিকিন?

—এটা শ্রমিক অভ্যুত্থানের যুগ। মতিয়র বিজ্ঞোচিত মত প্রকাশ করে—চাষবাসের কাজ হল অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ। তা' ছাড়া নিজে কোদাল ফাউড়া লাঙল জমিতে না চালাতে পারলে শুধু দিনমজুরদের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে ফার্ম চলবে না।

—যা হোক, এ বিষয়ে একটা কনক্লুসানে আসা চাই তো? অশোক বলে—না শুধু রিসার্চ আর স্কীম। যা হয় একটা ঠিক কর ভাই!

ঠিক যেটা হল, সেটা একটা হাসকিন মেসিন কিনে ধানভানা। মেসিনটার আসল দাম ও খরচ খরচা নিয়ে পাঁচ হাজার টাকা পড়ল। প্রতি মণ ধানের ভানাই রেট মোটামাটি আট আনা ফেললে দশ হাজার মণ ধান ভানতে হবে মেশিনের দাম ও আনুষঙ্গিক খরচের টাকাটা তুলতে। তার পরে লাভালাভ। হিসাব কষে দেখতে গিয়ে অশোকের মাথা ঘুরে যায়। বলে—সর্ব্বনাশ, দশ—দশ হাজার মণ ধান ভানতে হবে রে? ক' বছর লাগবে তার ঠিক নাই!

আত্মবিশ্বাসের উপর মতিয়রের অগাধ শ্রদ্ধা। শঙ্কিত হবার কি আছে? মেসিনটা তো হাটের পণ্যদ্রব্য আলু কচু পটল নয় যে, সময়ে কাজে না লাগলে পচে-খসে যাবে। দু' বছরের জায়গায় না হয় তিন বছর লাগবে দশ হাজার মণ ধান ভানতে, তার পরে তো প্রফিট আছেই। প্রতি মণে আট আনা।

ভবিষ্যৎ লাভের অঙ্কটা বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে যায় মতিয়রের আশার আকাশে।

দেড় বছরের মধ্যে পাঁচ পাঁচ দফা মেসিন বিগড়ে যে লোকসান হল তার পরিমাণ প্রায় বার তের শো টাকা। বেশ চলছে মেসিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। মেকানিক এলো; তন্ন তন্ন করে দেখে কলকব্জা, বলল, ইনজেকটর বিকল। সেটা যদি মেরামত হল ত মাস দুই পর 'গভর্ণর'। 'গভর্ণর, যদি সারাই হয় তো ফ্যুয়েল পাম্প। ফ্যুয়েল পাম্প কেজো করে দু'চার মাস চলার পর হঠাৎ বিকল হয়ে পড়ে পিস্‌টন। অশোক বললে—মেসিনারী মাত্রই বিশ্রি। তাছাড়া জীবনটাই যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে যে দিন দিন। এমনি করে যন্ত্রদানবের পায়ে আমাদের সমস্ত উদ্ভাবনী শক্তি বিসর্জ্জন দিয়ে তার দাসানুদাসে পরিণত হবি? মনুষ্যেতর প্রাণীও আত্মশক্তি-সম্পন্ন বসুন্ধরাকে কেন্দ্র করে আকাশ-মাটি-জল ডানা মেলে, চলে ফিরে, সাঁতার কেটে চরে খুঁটে খায়। আর, আমরা মানুষ! হারিয়ে যেতে আমাদের সমগ্র সত্তা যন্ত্রদানবের কাছে। না—না—এ ভারতের ঐতিহ্যের পরিপন্থী মতি; এ পেশা আমাদের ছাড়তেই হবে।

মুগ্ধবিস্ময়ে অশোকের কথাগুলো মতিয়র শুনে যাচ্ছিল অশোকের মুখের পানে চেয়ে মতিয়রের মনে হল, হাজার হাজার বছর অতীতকালের গর্ভ হতে কে যেন একটি মানুষ এগিয়ে আসছে মাটির পৃথিবীর দিকে। সমস্যামুক্ত, শান্ত, সৌম্যমূর্ত্তি, হাতে তার ফসলের ফরমান। মতিয়র পরম শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে বলে—বেশ, তাই হল অশোক! কল আজ হতে চিরদিনের জন্য বন্ধ করলাম।

—হ্যাঁ, তাই করো ভাই! অশোক বলে—সব সমস্যার সমাধান করেছে যে মাটি সেই মাটিমায়ের কাছেই চলো ফিরে যাই মতি সেই অন্নপূর্ণা বসুন্ধরার বুকে।

—এগ্রিকালচার ফার্মের কথা বলছ?

—অশোক প্রশান্তকণ্ঠে উত্তর দেয়—হ্যাঁ। মাটি মা—জমি-লাঙল—ফসল।

ফ্যামিলি বাজেট

কি জন্যে যে ওর বাপ-মা ওর নাম দানী রেখেছিলেন, তা আমার কল্পনারও অগোচর ! যদি দানী নামের সঙ্গে দানের কোন নিকট-সম্বন্ধ থাকে, তাহলে নামটা সম্পূর্ণ অর্থশূন্য ছিলো। বন্ধুত্বের খাতিরেও যে পয়সা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত, সে যে কাউকে স্বেচ্ছায় এক পয়সা দান করবে, এটা অসম্ভব।

অফিসের মাধ্যাহ্নিক ছুটির সময় কত দিন ওকে চপ প্রভৃতি খাইয়েছি—ও অম্লানবদনে খেয়েওছে কিন্তু একদিনও তার প্রত্যুত্তরে আমাকে বা অন্য কাউকে দানী খাওয়ায় নি। তাই যখন সে একদিন পয়লা তারিখে ছুটির পর আমায় তার সঙ্গে করে যেতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালো তখন কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কৌতূহলই জয়ী হলো। হয়ত এই কৌতূহলের খেসারত হিসাবে সারা রাত লীলার নিঃশব্দ বাক্যবাণ আমায় সহ্য করতে হবে। কারণ তাকে নিয়ে আজ প্রথম শোতে সিনেমা যাবার কথা ছিলো।

"মিছামিছি বাস কম্পনীকে পয়সা না দিয়ে পাদযানের আশ্রয় নিয়ে গল্প করতে করতে যাওয়াই ভালো, কি বলো ?" দানী প্রস্তাব করলো। আমি মোটেই হাঁটতে পারি না কিন্তু আজ দানীর কোন কথাতেই না বললাম না। কিন্তু না বললেই ভাল হ'তো, কারণ, দানীর বাড়ী গেঁয়ো লোকের তথাকথিত "পোটাক পথ" মাত্র দূরে এবং যখন আমরা তার বাড়ী পৌঁছালাম তখন আর আমাতে আমি নেই। রাস্তায় দানী শুধু তার স্ত্রীর কথাই বলতে লাগলো, কাজেই বলা বাহুল্য, তার অর্দ্ধেক কথাও আমার কানে যায় নি। তবে যেটুকু গেল তাতে বুঝতে পারলাম যে, তার স্ত্রী রন্ধনে দ্রৌপদী, বিদ্যায় লীলাবতী এবং সরলতায় শিশু (অবশ্য দানীর মতে সরলতা মানে সাজসজ্জাবিমুখতা)। বিশ্বনিন্দুক দানীর মুখে প্রশংসা পাচ্ছে এ-হেন লোককে দেখবার ইচ্ছা আমার পথক্লান্তিকে অনেক পরিমাণে লঘু করে আনলো।

যখন দানীর ঘরে পৌঁছালাম, তখন ঘরে ঘরে সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বলে উঠেছে। কড়া নাড়তে দানীর স্ত্রী রাণী এসে দরজা খুলে দিলো। আমার মুখে শ্রান্তির চিহ্ন, দানী বোধ হয় মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হলো আর বললো "হেঁটে আসলে সান্ধ্যভ্রমণও হয় আর পয়সাও বাঁচে। আর তোমরা যারা খুব কম হাঁটো তাদের খিদেও পায়। রাণীর হাতের "শক্করপারা" খেলে তোমার মুখের রুচি ফিরে যাবে আর হাঁটাও নিরর্থক হয় নি মনে হবে।"

প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতা কাটতে বেশী সময় লাগলো না। কথাবার্ত্তায় রাণী বেশ চতুর বলেই মনে হোল ; তবে তার সরলতা অর্থাৎ সাজসজ্জাহীনতা কতকটা স্বেচ্ছায় এবং কতকটা দানীর প্ররোচনায়, সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমরা যখন কথাবার্ত্তায় মগ্ন তখন দানী ছোট ছোট কাগজের পুঁটলি করছিলো। তার স্ত্রীরও মুখের সঙ্গে হাত চলছিলো। প্রথমে আমি ওদিকে তত নজর দিইনি। মনে করেছিলাম অল্প খরচে সময় কাটানোর এ এক নূতন ফিকির হবে। কিন্তু যখন দানী প্রত্যেক পুঁটলীর মধ্যে কিছু কিছু পয়সা রাখতে লাগলো এবং কালী দিয়ে পুঁটলিগুলির উপরে কিছু লিখতে লাগলো তখন আমার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠলো। আমি দানীর দুর্বলতা জানতাম, লেকচার ঝাড়বার সুযোগ কখনও সে উপেক্ষা করতো না। তাই চুপ করেই রইলাম এই ভেবে যে, দানী আপনিই বলবে, কেন সে পুঁটলি বানাচ্ছে এবং তার উপযোগিতাই বা কি।

কিছুক্ষণ পরেই তার মুখ খুললো, "তুমি প্রায় আমার মতন মাইনে পাও এবং আমারই সঙ্গে চাকরীতে ঢুকেছো। যে রকম বাজে খরচ করো হাতে বোধ হয় কিছুই রাখতে পারো নি। অথচ দেখ আমি আর বছর পাঁচেকের মধ্যে একটা ছোট বাড়ী করবার মত পয়সা জমিয়ে ফেলবো। এখন অবশ্য মজায় আছো কিন্তু বুড়ো বয়সের জন্য বা অসময়ের জন্য সঞ্চয় না করলে পরে পস্তাবে।" গৌরচন্দ্রিকা সেরে দানী কিছুটা দম নিয়ে নিলো। বুঝলাম এবারে রহস্য প্রকাশ হবে। "আমাদের আয় যখন সীমাবদ্ধ তখন ব্যয়ের অঙ্ক যাতে মাত্রা ছেড়ে না যায় বরঞ্চ উল্টে কিছু টাকা প্রতি মাসে আমাদের হাতে উদ্বৃত্ত থাকে তাই আমি অনেক দিন ধরে একটা উপায় অবলম্বন করেছি। কাগজের পুঁটলী করে এক একটা পুঁটলীতে এক একটা দরকারী খরচ বাবদ টাকা রেখে দি এবং সাধ্যমত সেই টাকায় সেই খরচ চালাতে চেষ্টা করি। কোন খাতে বেশী খরচ হ'লে প্রায়ই অন্য কোন খাতের বাঁচা টাকার থেকে তা পূরণ হয়। যেমন ধর দাড়ি কামানোর পুঁটলীতে ১৲ টাকা, ঝির পুঁটলীতে ৩৲ টাকা রাখি। এই রকম ভাবে সমস্ত খরচের জন্য টাকা তুলে রেখেও আমার মাসে মাসে ৪০৲ টাকা বাঁচে।

রাণী অবশ্য ইতিমধ্যে উঠে গিয়েছিলো। খানিকক্ষণের মধ্যেই চা এবং "শক্করপারা" এল এবং খিদের জন্যেই হোক বা দানীর সাহচর্য্যের গুণেই হোক, বেশ রুচির সঙ্গেই সেগুলোর সদ্ব্যবহার করলাম। এই রকমে আরও কিছুক্ষণ কাটলো। তারপর আমি দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। আমার অবচেতন মনেও যে পয়সা জমাবার গুটি বাসা বাঁধছিলো তার প্রমাণ পেলাম ঘরে গিয়ে। লীলা মুখ গুমোট করে দরজা খুলে দিলো। সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে বললাম, "বিকালের জলখাবারের জন্য রসগোল্লা সিঙ্গাড়া প্রভৃতির দরকার কি ? আজ দানীর বাড়ীতে "শক্করপারা" যা খেলাম সিঙ্গাড়া তার কাছে কোথায় লাগে ! আসল কথা, খিদে পেলে যা খাও তাই মুখে অমৃত লাগে—আর ফাউ হিসাবে পয়সাও বাঁচে। আমি মনে করছি, রোজ অফিস থেকে হেঁটেই বাড়ী

ফিরবো আর জলখাবার সিনেমা প্রভৃতি বাজে খরচগুলো যথাসাধ্য কমিয়ে ফেলবো। এই করে দানীটা বেশ পয়সা জমিয়ে ফেলেছে, আমরাই বা পারবো না কেন?

লীলা তবুও চুপ করে রইলো এবং নিঃশব্দে আমার জলখাবার নিয়ে এলো। আমি শুধু চা'র কাপটা নিয়ে বললাম, "আর কিছু আমি খাব না, দানীর বাড়ীতে খেয়েছি।" তার পর আমিও বিভিন্ন কাগজের পুঁটলীতে বিভিন্ন খরচের পয়সা তুলে রাখলাম। দশ টাকা সিনেমা, হোটেল প্রভৃতির জন্তে আলাদা রাখলাম।

রাত-ভোর লীলা মুখ খুললো না, তবে সে কথা বলতে স্বভাবতই ভালবাসে; তাই সকালেই আমাদের মিটমাট হয়ে গেলো। অবশ্য একটু দুঃখের সঙ্গেই সে আমার পয়সা জমানোর নূতন ফিকিরে সহযোগিতা করতে সম্মত হলো। কারণ, সিনেমা দেখার সখ ওর বিলক্ষণ থাকার দরুণ সেই খাতে পয়সা অপর্য্যাপ্ত রাখা হয়েছে বলে ওর অভিযোগ।

দিন কতক বেশ চললো। অফিসে দানী ছাড়া আমি বড় একটা কারুর সঙ্গে মিশি না, কাজেই হোটেলের বাজে খরচ হয় না। দানীও আমায় বদলাতে পেরেছে দেখে খুব খুসী, একদিন গিয়ে দেখি, আমাদের পুরানো টাইপিষ্ট কেষ্ট ছুটিতে গেছে এবং সেই জায়গায় এসেছে একটা চটপটে কেতাদুরস্ত মেয়ে, নাম নলিনী, ক্রমশঃ আমাদের আলাপও হলো। দানী আমায় দূরে নিয়ে গিয়ে সতর্ক করে দিলো, যেন আমি নলিনীর সঙ্গে বেশী দহরম মহরম না করি।

দুপুরবেলায় চা খাবার ছুটির সময় অবনী নলিনীকে বললো, "চলুন চা খেয়ে আসি।"

"আপনিও চলুন না" নলিনী আমাকে অনুরোধ করলো। দিন কতক বন্ধ করার পর পুরানো অভ্যাসটা মাথা চাড়া দেওয়াতেই হোক, বা একজন মহিলার প্রথম অনুরোধ এড়াবার অক্ষমতাতেই হোক, আমিও ভিজে বেড়ালটির মত তাদের অনুসরণ করলাম। খাওয়াটা চা দিয়ে শুরু তোলো বটে, তবে আনুসঙ্গিক আরও অনেক কিছু এলো এবং শেষ পর্য্যন্ত বিলটা টাকা পাঁচেক অবধি গেলো।

ইচ্ছা করেই হোক বা আমার দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক, বিল শোধ করতে গিয়ে অবনীর মুখ চূণ হয়ে গেলো। "পার্স টা আনতে ভুলে গেছি" কাতর মুখে সে বললো। অগত্যা আমাকেই বিলটা শোধ করতে হ'লো। অবনী অবশ্য বললো বটে, তোমাকে পরে দিয়ে দেবো, কিন্তু আমি জানি, সে আর দেবে না বা দিলেও আমি নোব না।

আমি শুকনো মনে (বাইরে কাষ্ঠ-হাসি বজায় রেখে) আবার কাজে ফেরৎ গেলাম। এক হপ্তার মেহনত এক ঘণ্টায় গেলো, বাড়ী ফিরে ভাবলাম, স্ত্রীকে বঞ্চিত করে অপরকে (তা তিনি মহিলা-বন্ধুই হোন) হোটেলে বা সিনেমায় নিয়ে যাওয়া অনুচিত। পয়সা জমানো আমার দ্বারা হবে না। আমার প্রকৃতিই অন্যরূপ, তার চেয়ে খরচ করে দাম্পত্য-জীবন যাতে সুখে কাটাতে পারি, তার চেষ্টা করাই ভালো। লীলাকে বললাম, চল আজ "প্রকৃতিতে" একটা ভাল সিনেমা আছে দেখে আসি।"

এক সপ্তার মেঘ কেটে গিয়ে লীলার মুখে আবার রদ্দুর দেখা দিলো। *

অনুবাদিকা—অনুরাধা ভট্টাচার্য্য।

* "সুগন্ধা" দিওয়ালী-সংখ্যায় প্রকাশিত V. V. Bokil-এর একটি মারাঠী গল্পের ছায়াবলম্বনে।

তমসো মা জ্যোতির্গময়

তপতী মুখোপাধ্যায়

অন্তর-মাঝে চেতনারূপিণী সুপ্তিমগনা জননী মোর,
এত কশাঘাত মানব জীবনে তবু মোহ-ঘুম ভাঙ্গে না তোর।

বাহিরের যত মোহ উপচার অন্তর-মাঝে চক্র রচি,
জয়ের বাঁধনে সহস্রপাক বাঁধিয়া রেখেছে কেমনে বাঁচি?
সে উপকরণ নহে তো জননি আমাদেরই কোনও সৃষ্টিলীলা,
তোমারই সে কোন প্রিয় মুহূর্ত্ত মেলিয়াছে এই খেলার মেলা।
তুমিই দিয়াছ খেলিবার তরে নবীন খেলনা হাতেতে তুলি।
কঠোর পাঠেতে কেমনে আজিকে মন দিব মা গো তাহারে ভুলি?
একই হৃদয়ে কমল বজ্র বরাভয় আর খড়্গ সাথে,
এক হাতে তুমি বিলাও মাধুরী শাসন তোমার অন্য হাতে।

সে আসিলে ভরা কঠোর মিলন অসম্ভবা মা তোমাকে দেখি,
দুর্বল ভীরু কোমল হৃদয়ে কেমনে তাহারে জাগায়ে রাখি?
কঠিন কারার প্রাচীরবদ্ধা জননি, তুমি কি মুক্তি চাও?
ক্ষমতা তোমার আমাতে দানিয়া আপনি শক্তি মুক্তি লও।
হৃদয়ে আমার যত মালিন্য বেদনা আমাতে রক্তক্ষরা,
তোমার পায়েতে জবারূপে ফোটে নাও তুলে নাও দুঃখহরা।
অপূর্ণতারি অসম্পূর্ণ অর্ঘে তোমার কলুষ নাশি,
চিত্তে আমার আনীত শক্তি দীক্ষার টীকা দাও মা আসি।

তোমারই দীক্ষা লভি সে মন্ত্রে জাগাব তোমারে ও মনোরমা,
চিত্তের শ্রেয় সহস্রোপরি শিব সাথে হও পূর্ণতমা।
সে মিলন হ'তে জাগিবে অমৃত আনন্দরূপ রসের ধারা,
স্নাত হব মা গো তাহারই ধারায় মোর ধরা হবে মধুক্ষরা।

ছোটদের আসর
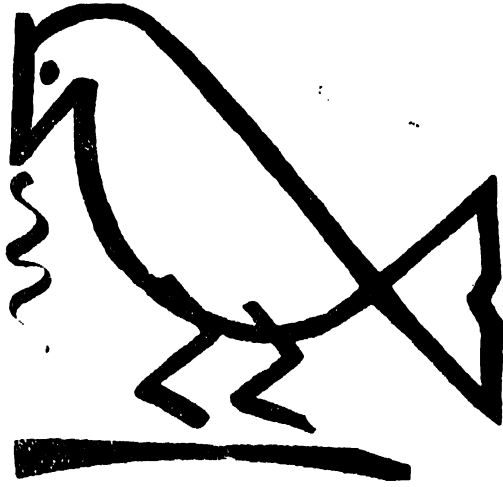
(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

স্কুলের স্নেহলতা দি' গল্প বলেছিলো—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন গরীবঘরের ছেলে। কষ্ট করে ঝড়ে-জলে-রোদ্দুরে হাঁটতে হাঁটতে পাঠশালায় পড়তে যেতেন। একদিন—তখন গরম কাল, ছেলে এলো ঘেমে নেয়ে বাড়ীতে। তার বইয়ের তাড়ার সঙ্গে কার একটা পেন্সিল এসেছে—লক্ষ্য হ'ল ছেলের মা'র। মা বললে ছেলেকে—কার পেন্সিল রে? ছেলের খেয়াল হল, বললে, আমার পাশে যে বসে, তার। ভুলে চ'লে এসেছে। কাল ফেরৎ দোব।

মা বললে, কাল নয়। আজই।

ছেলে বলে কাঁদো-কাঁদো হয়ে—তার বাড়ী যে অনেক দূর। এখন বড়ো ক্ষিধে পেয়েছে।

ছেলের ঠাকুমা বলে, আহা, বড়ো ক্ষিধে পেয়েছে ছেলেটার। আজ খেতে বসুক। কাল পাঠশালা যাবার সময় পেন্সিল সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে বৌমা!

ছেলের মা'র গলার স্বর গম্ভীর।

কাল ব'লে কোনো কাজ হয় না মা! যা করবার আজই করতে হবে। ছেলে আজই দিয়ে আসুক। এসে খাবে।

ছেলেকে যেতে হল। এখনকার ছেলে হ'লে বলত, তার দাদার সঙ্গে পথে দেখা হল, তার হাতে দিয়েছি। আরো কত কি কথা বানিয়ে বলতে পারত, না গিয়ে।

কিন্তু সে অন্য ছেলে ত নয়! গুরুদাস বাঁড়ুয্যে, যে গরীবের ছেলে থেকে হাইকোর্টের বড়ো উকীল থেকে বড়ো জজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হ'তে পেরেছিলো।

আর একজন ঈশ্বরচন্দ্র। রেঁধে-বেড়ে সকলকে খাইয়ে পড়তে যায়। আলোহীন ঘরে পড়া হয় না, বাইরে রকে ব'সে গ্যাসের আলোয় বই পড়ে। বাপের মোটে দশ টাকা মাইনে। সেই ছেলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হ'য়ে দশের একজন হলেন। মাকে পাঠায় ছেলে, শীতের গরম কাপড়। মা দেয় দান ক'রে।

আরো অনেকের যে শীতের কাপড় নেই, অন্য মা'ও নয়, বিদ্যাসাগরের মা, নিজের গরম কাপড় গায়ে দিয়ে আরাম করে কি ক'রে?

শেষ অবধি ছেলে বলে, যার যার দরকার—সকলের নাম দাও, তাদের হয়ে যাবার পর বাকি যেখানা থাকবে, সেইখানা তোমার।

গরীবের ছেলে বিদ্যাসাগর, গরীবের বন্ধু দয়ার সাগর হলো।

আর শুনেছিলাম আর একটি গরীব ছেলের কথা। সে ছেলেটি বিদেশী।

ছেলেটির সখ ছিল জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জীবনীখানা পড়ে। কিন্তু সে বইয়ের দাম অনেক। পয়সা কোথায় পাবে যে সেই বই কিনবে?

গ্রামের এক বড়োলোকের লাইব্রেরীতে সেই বই আছে শুনেছে। তাকে গিয়ে ধরলো বইখানা পড়তে দেবার জন্যে। পড়বার জন্যে পেলো বইখানা।

পড়ে সে মন দিয়ে। পড়ে পড়ে আশ মেটে না। কত মস্ত লোক জর্জ্জ ওয়াশিংটন, তার কথা বার বার পড়েও আবার পড়তে ইচ্ছে করে গোড়া থেকে।

ইতিমধ্যে একদিন ঝড় এলো, জল পড়লো। ছেলেটির ভাঙাঘরের চাল দিয়ে জল পড়ে দামী বইখানা শুধু ভিজে গেল না, নষ্ট হ'য়ে গেল।

তখন ছেলেটি সেই বড়োলোকের কাছে গিয়ে বললে—আপনার বইয়ের অনেক দাম। বইটা নষ্ট হয়ে গেছে, আমি যে আবার কিনে দিতে পারব, এমন পয়সা আমার নেই। আপনার জমির কাজে আমি খাটব, কোনো মজুরি না নিয়ে। যেদিন বইয়ের দাম উঠবে—সেদিন আমার ছুটি।

এমনি ক'রে খেটে খেটে সত্যি সত্যি সে বইয়ের দাম শোধ করলো।

আর সেই ছেলে—সেই গরীবের ছেলেটিই একদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হল—জর্জ্জ ওয়াশিংটন, যে প্রেসিডেন্ট। নাম তার অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন।

দেশে দেশে যুগে যুগে গরীবের ছেলেরাই অসাধ্য সাধন করেছে।

সোনার ঝিনুক মুখে দিয়ে যারা জন্মালো—তাদের মধ্যে থেকে যত লোক স্মরণীয় হয়েছে তার চেয়ে বেশী লোক

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

এসেছে সেই দল থেকে—আঁতুড়ঘরে যাদের ছেঁড়া কাঁথাও জোটেনি।

কিন্তু এইটাই মস্ত সান্ত্বনা নয়। 'দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী' ব'লেও একটা কথা সে শুনেছে। গরীব যে, তার গুণেরও আদর হয় না।

গরীব সে দেখেছে। পথের ভিখারীদের মধ্যে নয়, তারাও খেতে পায়। দেখেছে পুরীতে।

অঙ্কর মাষ্টারের বাড়ী। মাষ্টারের বৌ-এর শাড়ীটা এমন ছেঁড়া যে দরজার সামনে এসে দাঁড়ানো যায় না। পিঠটা সমস্ত দেখা যাচ্ছে। একটি ছেলে ঘরের মধ্যে একটানা কেঁদে যাচ্ছে। মা গো, ক্ষিদে পাচ্ছে।

সকাল থেকে মা নিজেও কিছু খায়নি, ছেলের মুখেও কিছু দিতে পারেনি। বাপ বেরিয়ে গেছে খাবারের চেষ্টায়। সে-ও ফেরেনি।

মীরার কাছে কতকগুলো কলা ছিল, কিনে নিয়ে যাচ্ছিলো। ৮।৯ বছরের ছেলে কি আগ্রহ ক'রে খেলো! ৮।৯ বছরের ছেলে ক্ষিধের জন্যে কাঁদে, কি করুণ সে দৃশ্য!

আর দেখেছিলো এক সাহেব-মেমকে। তারা ফিরিঙ্গী, রং যদিও সাহেবের মতন। স্বাধীনতার পর তাদের অবস্থা এমন খারাপ হল যে দিন চলে না।

সারা দিন কিছু না খেয়েও স্বামি-স্ত্রী বিকেলবেলা বাইরে চেয়ার টেনে দু'জনে মুখোমুখি বসত। সারা দিন তারা টাকার চেষ্টা করত। কোনো দিন জুটত, বেশীর ভাগ দিনই জুটত না।

কিন্তু বিকেলবেলা—পেটে কিছু না পড়লেও বাইরে চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসা এক দিনের জন্যেও বাদ যেত না।

মীরা এক দিন তাদের কিছু ঝিঙে দিয়ে এসেছিলো, তার বাচ্চা মেয়ের কাছে গল্প শুনেছিলো, সেই ঝিঙে-ভাতে ভাত তারা তিন জনে খুব তৃপ্তি ক'রে খেয়েছিলো।

তার পর তারা কোথায় চ'লে গেল! মেয়ের নাম বেবী। সে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। না খেতে পেয়ে তার চোখের কোল ব'সে গিয়ে কি বিশ্রী দেখতে হয়েছিলো!

সেই বেবী স্বাধীনতার পর কোথায় গেল, সে কথা মীরার জানতে ইচ্ছে করে।

অত দারিদ্র্যের মধ্যেও বেবীর মনে একটু জাঁক ছিল যে সে সাহেবের মেয়ে, স্বাধীন দেশের মেয়ে—মীরার মতন পরাধীন নয়। যদিও তার মা ছিল ভারতবর্ষের খৃষ্টান—ইংলণ্ডের মেয়ে নয়।

মীরারা যখন স্বাধীন হ'য়ে গেল, তখন বেবীর আর তার মায়ের মনের ভাব কেমন বদলালো তার জানতে ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক।

অমন দারিদ্র্য তারা পার হ'ল কি ক'রে, তাও জানার আগ্রহ জাগে।

কাঁথির পিসিমা ওর কথা ভাবছিলেন আর কেউ না ভাবুক।

উনি বললেন—চল, এই বেলা কাশী ঘুরে আসি। এখানে তো কেউ তোকে দেখছে না।

সত্যি, কেউ ওকে দেখছে না। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়ার ত্রুটি অবশ্য হচ্ছে না। স্কুলে আসা-যাওয়াও হয়। কিন্তু কারুর আর ওর কথা যেন মনে থাকে না। কিংবা মনে থাকে একটু বেশী ক'রেই। ও যেন এক সমস্যা হ'য়ে উঠেছে। কি করা যায়, মেয়েটাকে নিয়ে, কি করা যায়?

ড্যাডির মুখ গম্ভীর। সিগারেটের পর সিগারেট পুড়ছে। নানারকমের অ্যাসট্রে ছাইয়ে-ছাইয়ে ভরে উঠছে। কাচের আবরণের মধ্যে যে সোনালী চাকার সোনালী রথ ছুটেছে, তার মধ্যে ঘড়ি—চাকায় চাকায় টক্-টক্ ক'রে ঘুরে যাচ্ছে কাঁটা, বেজে যাচ্ছে, একটা-দুটো-তিনটে, ছুটির দিনের বেলা গড়িয়ে যায়—ড্যাডির ভাবনা কমে না।

কোণের ঘড়ি থেকে খাঁচার দরজা খুলে কোকিল বেরিয়ে এসে ডাক দেয়, কুহু, কুহু, কুহু, কুহু, চারটে বাজলো জানায়—খাঁচার দরজা বন্ধ হয়ে যায়, জার্মান ঘড়ির লম্বা পেণ্ডুলাম দুলতে থাকে, চা, চিনি, দুধের ট্রে নিয়ে বয় আসে—মামমি ড্যাডি মীরাকে নিয়ে চা খায়, কারুর মুখে কোনো কথা নেই।

হাসি নেই, ঠাট্টা নেই, কুশল-প্রশ্ন নেই। কত দিন পরে এ বাড়ীর বংশধর যদি আসে—মীরার আর কি দরকার?

শোবার ঘরে ড্যাডি বলে, থাক্ না, ও তার খেলার সাথী হ'য়ে থাকবে।

মাম্মি বলে—আয়ার কাজ করবে।

অনেকগুলো প্লেট পড়ার শব্দ হয় বাবুর্চিখানায়—ভাঙ্গলো বুঝি কতকগুলো ডিশ?

তাই মীরা যখন জানালো, কাঁথির পিসিমার সঙ্গে কাশী যাবে, কেউ প্রশ্নও করলো না, স্কুলের পড়ার কি হবে। ওরা দুজনেই যেন খুসি হল।

স'রে যাক্ দিন কতকের জন্যে সামনে থেকে মেয়েটা। কাঁথির পিসিমাই ত এখন বোঝা।

ছেলে আসছে সমস্ত বাড়ী দখল করতে। ঘর থেকে ঘরে সে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াবে।

সমাজের লোক দিনকতক জিগ্যেস করবে—কোথায় সেই মীরা, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যার ছিল, চেহারায়, অভিনয়ে, বুদ্ধিতে প্রতিভায়?

কোথায় সেই লাভ্‌লি মেয়েটি, মিষ্টি যার হাসি, মিষ্টি যার চোখ দুটি, মিষ্টি যার মুখখানা?

থার্ড ক্লাস গাড়ী। গরীব আর মধ্যবিত্তঘরের মেয়েরা চলেছে। বেনারস এক্সপ্রেস ছাড়বার সময় কামরায় কামরায় 'জয় বিশ্বনাথ' শোনা গেল।

যে বৌটি জামতাড়ায় যাচ্ছে, তার বাপ-মা-ভাই কাঁদতে কাঁদতে চ'লে গেল। স্বামীর সঙ্গে চলেছে হাওয়া বদলাতে। অনেক দিন অসুখে ভুগছে। স্বামী এখন অফিস থেকে টাকা ধার ক'রে স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছে চেঞ্জে। সেই গল্প সে বলতে বলতে চললো। স্বামীর কথা বলতে বলতে তার চোখে জল এলো। সামান্য মাইনে। দেনায় ডুবে আছে, তবু স্ত্রীকে বাঁচাতে চায়—এই কালো রোগা স্ত্রীকে। চন্দননগরে গাড়ী থামতে এসে জিগ্যেস ক'রে গেল—কষ্ট হচ্ছে না তো?

কোনো কষ্ট নেই। তুমি উঠে পড়ো। গাড়ী ছেড়ে দেবে। তোমায় অত খোঁজ নিতে হবে না। এঁরা আছেন।

আমরা আছি গো—মালা ঠক্‌ঠক্ করতে করতে এক বুড়ি বললে ওধার থেকে। আর [illegible]দেখব—বললে

তার ছেলে খেতে দেবে না। তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে কাশী যাও। মাসে পাঁচ টাকা পাঠাব। সেই ছেলেকে মানুষ করেছে পরের বাড়ীতে রাঁধুনীবৃত্তি ক'রে। ছেলের এখন দুশো টাকা মাইনে। মাকে আর দরকার নেই।

বৌমা গরীব হলেও বনেদী ঘরের মেয়ে। বলেছিলো—মায়ের জন্তে পৃথিবী দেখছ; সেই মাকে অপমান? সংসারে শান্তি থাকবে কি ক'রে? আমার ছেলেপুলে ভালো থাকবে কি ক'রে মায়ের চোখের জল পড়লে?

ছেলে বলেছিলো, এর নাম তুমি এম-এ পাশ? এখনো এত কুসংস্কার? মাকে তাড়িয়ে দিয়ে কত লোক সুখে আছে।

বৌমা বলেছিলো—আমি বিশ্বাস করি না।

তবু সে আটকাতে পারেনি। ছেলে মুখ্যু কি না। রাগ না চণ্ডাল তার।

গাড়ীতে কতকগুলি মেথরাণী উঠেছিলো। সকলের গা ঘেঁসে তারা বসতে চায়। বলে, আমরা কি পয়সা দিইনি? আমাদের কি বিনাটিকিস?

তারা থুতু ফেলছিলো। গাড়ী নোংরা করছিলো। আর বলছিলো—আমাদের যদি ঘেন্না করো—পুলিশ ডেকে দোব? নতুন আইন হয়েছে।

অন্ধকারে কখন বৌটি জামতাড়ায় নেমে গেছে, মেথরাণীরা নেমে গেছে কোন্ ষ্টেশনে—মীরা কিছু টের পায়নি। সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। মোগলসরাইয়ে গোলমালে সে জাগলো। ভোরবেলা মালবীয় ব্রীজে যখন গাড়ী উঠেছে—প্রথম দেখা গেল নীল গঙ্গার দক্ষিণ কূলে—আধখানা চাঁদের মতন অসংখ্য মন্দির-চূড়ার শহর—বেনারস। সবাই প্রণাম করে, ও-ও করে—বাড়ী-বাড়ী-বাড়ী—মন্দির-মন্দির-মন্দির—ঝকমক ঝকমক করছে—একটি আওয়াজ নেই—সকালবেলায় শান্ত আকাশের নীচে প্রথম সোনালী রোদে লক্ষ লক্ষ লোকে ভরা, লক্ষ লক্ষ বছরের পুরোনো মহাতীর্থ—বারাণসী। কত পুণ্য, কত পাপ, কত ধর্ম্ম, কত আরতি, কত স্মৃতি, কত কাহিনী ব্রীজ থেকে কতক্ষণ ধ'রে দেখা যাচ্ছে—কাশী-কাশী-কাশী।

তার পর সুরু হল সবুজ ফসলের ক্ষেত—যার কপি বেগুন কড়াইশুঁটি কোনো দিন ফুরোয় না। হারিয়ে গেল কাশী শহর, দূরে র'য়ে গেল পুণ্যতীর্থ। ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশন থেকে সিমেণ্ট বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে কপ, কপ, কপ, কপ, সাদা ঘোড়ার টাঙ্গা চ'ড়ে কত বাগান কত বাজার কত দোকান কত মহল্লা পার হ'য়ে গোধূলিয়া হয়ে দশাশ্বমেধ পৌঁছলো তারা—বাঙালীটোলার চারতলা বাড়ীর ওপরের ঘরে পাথরের জানলায় দাঁড়িয়ে এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা দেখে অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকতে হয়। ঘাটে ঘাটে মানুষ স্নান করছে, থালা ভরা ফুল নিয়ে পুজো দিতে যাচ্ছে, নৌকো চলেছে জলে, তীর্থযাত্রী চলেছে পথে—সংসার ছেড়ে কাশীতে কেন শান্তি পেতে আসে লোকে—কতকটা যেন বুঝতে পারে মীরা। স্নান ক'রে বিশ্বনাথের মন্দিরের পথে ওরা চললো।

মোড়ের ওপরেই থরে-থরে খাবার সাজানো রয়েছে—হিঙের কচুরি ভাজা হচ্ছে, সুগন্ধে চারিদিক ভরে গেছে—তার সঙ্গে ঢেঁড়শের তরকারী, সে নাকি অপূর্ব্ব! রয়েছে কাঁসার থালায়—চাপ চাপ সরওলা মালাই, কলকাতায় এ জিনিস কে চোখে দেখতে পায়? কিন্তু উপায় নেই। পুজোর আগে খাবার কথা মনে করাও পাপ। পাথর-বাঁধানো সরু গলি, দুপাশে পাথরের বাড়ী উঠে গেছে চারতলা পাঁচতলা—নীচে দু'পাশে দিনেরবেলায় ইলেকট্রিক আলোয় সাজানো দোকান। কাশীর কাঠের খেলনা, চক্‌চকে রঙে চোখে ধাঁধা লাগে, কাশীর গরদ, বেনারসী চেলি, চোলি সাচ্চা জরীর কাজ ঝিকমিক করে। কাশীর স্ফূর্ত্তি জর্দ্দা পান সুর্মা ধূপ সুগন্ধে পথ ভরে গেছে। কাশীর জার্মান সিলভার পেতলের দোকান ঝকমক ঝকমক করছে—সঙ্গে সঙ্গে নাম লিখে দিচ্ছে। 'কাশীর স্মৃতির' তলার মাটির পুতুলের দোকান, টিপের দোকান, দোকানের শেষ নেই, পথেরও শেষ নেই, যাত্রীরও শেষ নেই, সারা ভারতবর্ষের মেয়েপুরুষ যাত্রী, তার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গরু রাস্তা জুড়ে আসছে। মানুষজন ছিটকে ছিটকে পড়ছে, গরু চলে যাচ্ছে গম্ভীর হয়ে ঢুঁ মেরে, ধাক্কা মেরে, তারপর কেবলই ফুলের দোকান, রাশি রাশি ফুল, সাদা, লাল হলদে গোলাপী, ফুলের পাহাড় যেন, তারপর ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি ভারত-বিখ্যাত বিশ্বনাথ! ভারত-বিখ্যাত অন্নপূর্ণা! টাকার অবধি নেই, উৎসবের শেষ নেই, কাশী আসা সার্থক।

সন্ধ্যায় কাশীর ঘাটে ঘাটে বেদ উপনিষদ ব্যাখ্যা, সঙ্কীর্ত্তন, কথকতা রামায়ণ পাঠ—সে আবহাওয়াই যেন আলাদা—সে আবহাওয়া সারা হিন্দুস্থানে কোথাও নেই, ফিরে যায় মন কত শতাব্দী আগে।

কাশী মীরার সকল দুঃখ ভুলিয়ে দিলো। মায়ের মতন। বন্ধুর মতন।

পথে পথে একলা সে ঘুরে বেড়ায়। কাঁথির পিসিমা বলে দিয়েছিলেন, দশাশ্বমেধ গোধূলিয়ার কাছে কাছে থাকবে। গলি দিয়ে গলি দিয়ে কেদার হরিশ্চন্দ্র ঘাট পর্য্যন্ত যেতে পারো, গাড়ী-ঘোড়ার ভয় নেই, অন্য কোনো ভয় নেই।

কিন্তু ও চলে গেছলো মানমন্দিরের খোঁজে গঙ্গার ধার দিয়ে অন্য দিকে। সন্ধ্যে হয়ে গেছলো, পথ চিনতে পারেনি। কাশীর মধ্যে কাশীর গুণ্ডার হাতে প'ড়েছিলো। তাদের হাতে ছিলো চক্‌চকে ছোরা। তারা চেঁচাতে বারণ করেছিলো।

তবু ও চেঁচিয়েছিলো। ওর চীৎকার শুনে যে এলো তার চেহারা পাৎলা, রোগা। কিন্তু তাকে দেখেই গুণ্ডারা সেলাম ক'রে স'রে গেছলো।

আলাপ হয়েছিলো। তার নাম বাঘা। বাঙালীটোলার বাঙালী তরুণ বাঘাকে কাশীর সব লোক মানে, সর্দ্দার বলে স্বীকার করে।

তবে সঙ্গে থাকে রিভলভার। হাতবোমা সে অনায়াসে ছোঁড়ে। সাহসে অদ্বিতীয়। তবু একটা খুনের ব্যাপারে পুলিশ তাকে খুঁজছিলো ভুল ক'রেই। বাঘা নির্দ্দোষ হলেও ডুব দিয়েছিলো সাত দিন। বাঘাকে ধরবার জন্তে কী চেষ্টা চলছিলো। মীরা ভয়ে কাঁটা হয়েছিলো।

বাঘা তার জীবনে ছাপ দিয়েছে। বাঘাকে পুজো করা যায়। দুঃসাহসী ছেলে বাঘা!

বাঘা একদিন ধরা পড়লো। সেদিন মীরা কেঁদেছিলো। ক'দিনের পরিচয়ে কোনো মানুষের জন্তে এমন কান্না পায় সে জানত না।

কিন্তু বাঘা ছাড়া পেলো। বাঘার দলবল রোগীর সেবা, মণিকর্ণিকায় শব নিয়ে যাওয়া আর হারানোকে খুঁজে আনবার জন্তে সব সময় তৈরী।

অহল্যাবাঈ ঘাটে বিকেল নেমেছে কাশীর গঙ্গার নীল জলে সোনালী আবির ছড়িয়ে। ওপারে শূন্য বালুচর, জোয়ারের জনারের ক্ষেত সবুজ হয়ে আছে গোলাপী আকাশের নীচে। বাঘা বললো, মীরা, তুমি নাকি বড়লোকের ঘরে মানুষ হচ্ছিলে, এখন গরীব হ'য়ে যাবে ব'লে ভয় পাচ্ছ ?

কে বললে আপনাকে বাঘাদা' ?

পিসিমার মুখে শুনলুম কিন্তু তুমি খাঁচায় পাখী দেখেছ ?

কেন দেখব না ?

খাঁচার পাখী যখন খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে উড়ে যায়, সে কি কোনো ভাবনা ভাবে ? সে কি আর ফিরে আসে কাঁকনি দানা, হলদে ছাতু কিংবা ভিজে ছোলার লোভে ? নিরাপদ আশ্রয়ে ? ডাকলেও সে ফেরে না। সে গাছে গাছে ঝড়ে জলে কাটিয়ে দেয়—বনে বনে উড়ে বেড়ায়। তার ভাবনা কে ভাবে ? ভগবান ! সেই পাখীর মতন মন নিয়ে তুমি পৃথিবীর মাটিতে বেরিয়ে এসো, তোমার জায়গা ঠিক করাই আছে। শাস্ত্র যাঁরা লিখে গেছেন, তাঁরা বোকা ছিলেন না। তাঁরা কি তোমার-আমার মতন বুদ্ধু ?

নিশ্চয়ই না।

তাঁরা ভগবানের সম্বন্ধে সব জেনে তবে লিখেছেন। তোমার যদি দেখবার চোখ থাকে—তুমিও দেখতে পাবে, সমস্ত বিপদ সমস্ত অকল্যাণ থেকে মায়ের মতন কে আমাদের বাঁচাচ্ছেন প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে।

সূর্য্য ডুবে গেল। ঘাটে ঘাটে বিদ্যুৎ আলো জ্বলে উঠলো। জলে প্রদীপমালা ভাসলো। কত লোক স্নান করতে এলো সারা দিনের পর। জলে আলো কাঁপছে, ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, এমন সময়ে স্নান করলে শরীর ত নিশ্চয়ই স্নিগ্ধ হয়, রাত্রের ঘুমটা হয় চমৎকার।

বাঘা বললে, আমার গুরুদেবের কাছে গেলে অনেক প্রশ্নের জবাব পাবে। চলো কাল সকালে। সকালে নয়, খুব ভোরে।

তখনো কাশী শহর জাগেনি, ওরা নৌকোয় চড়লো। পাথরে বাঁধানো ঘাট একের পর আর। নামগুলো কি মনে থাকে ? মীর-ঘাট অহল্যাবাঈ, দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা, সিন্ধিয়া ঘাট, পঞ্চগঙ্গা, রামঘাট, গাইঘাট, গৌঘাট, রাজঘাট—তারপর ব্রীজের থামের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে বরুণাঘাট, যেখানে দাঁড়ালে ওদিকে অসিঘাট পর্য্যন্ত দেখা যায় অর্দ্ধচন্দ্রের মতন বারাণসীর গঙ্গার কূল ব'লে। বেণীমাধবের একটা ধ্বজা কলকাতার মনুমেন্টের মতন ঘোরানো সিঁড়ি আর বারান্দা নিয়ে জেগে আছে আকাশে মাথা তুলে। আরেকটা কবে প'ড়ে গেছে।

তিনতলার সমান সিঁড়ি ভাঙতে হয় বরুণাঘাটে। ওপরে আদিনাথের মন্দির দর্শন ক'রে ওরা বেরিয়ে এসে এক আশ্রম পেলে গঙ্গার তীরে।

তিনখানা কামরার একটি ছোট্ট বাড়ী, নানা ফুল-ফলের গাছ, লতাপাতায় ঢাকা। সেখানে এক ভদ্রলোক—সোনার চশমা চোখে, দাড়ি-গোঁফ কামানো শান্ত মূর্ত্তি—কাগজ পড়ছিলেন।

বাঘা বললে—গুরুদেব, আপনার কাছে মীরাকে নিয়ে এলুম। এর বিশ্বাস হচ্ছে না ভগবান আছেন।

গুরুদেব বললেন, নাই বা হল। তুমি জোর করে বিশ্বাস করাতে চাইছ কেন ?

বা রে, ভগবানে বিশ্বাস না করলে ও মনে জোর পাবে কেন ?

ভগবানে বিশ্বাস না করলেই মনে বেশী জোর পাওয়া যায়। আমি সৎপথে আছি, আমার কোনো ক্ষতি হবে না, হ'তে পারে না, কেন না আমি কারুর ক্ষতি করিনি, আমিই ভগবান—এই ধারণাটিই সব চেয়ে ভালো।

কথাটা মীরার খুব ভালো লাগলো।

গুরুদেব বললেন—তুমি পৃথিবীতে এসেছ একটি বিশেষ কাজে। সেইটি খুঁজে বার করো। প্রত্যেকেই এসেছে একটা বিশেষ কাজ নিয়ে। সকলে বুঝতে পারে না, সকলে পথ পায় না। যে পায়, তার নাম হয় নেতাজী, তার নাম এডিশন। যারা পায়, তাদের নাম হয় যীসাস, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, নিউটন, র‍্যাফেল, রোমাঁরোলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, মালবীয়, রকফেলার। যারা তোমার মুখের অন্ন, পরার কাপড়, রোগের ওষুধ তৈরী ক'রে দিচ্ছে, তারাও পথ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এঁদের সম্বন্ধে বলেছেন—ওরা কাজ করে। ওরা সার্থক।

বাড়ীর মধ্যে কয়েকটি ছেলে-মেয়ে হুল্লোড় তুলেছিলো। কত না ছড়া, কত না গান !—

> শোন্ রে খুকু
> শোন্ রে খোকা
> নাচ দেখাবে
> শূর্পণখা।
>
> কুম্ভকর্ণ
> দিচ্ছে ঘুম।
> ঘুম ভাঙাবার
> লাগ্‌লো ধুম।
>
> চিত্রকূটের পাহাড় যেতাম অমাবস্যার রাতে
> লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার থাকত সাথে সাথে।
>
> নেবু ফুল নেবু ফুল নেবু-নেবু গন্ধ।
> নেবু ফুল নেবু ফুল নও তুমি মন্দ।
>
> ছোট খোকা পড়ে অ—আ।
> শেখেনি সে কথা কওয়া ॥
>
> ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্
> রেল যাচ্ছে।
> ঝিরঝিরে নদী,
> গরু জল খাচ্ছে।

আওয়াজ শুনে ভেতরে ঢুকে দেখে মীরা, এক পাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সবুজ ঘাসে ঢাকা আঙিনায় নেচে হৈ হৈ করছে। তারা কাউকে ভয় করে না।

পৃথিবীতে এদের কেউ ছিল না। এদের আদর করবার কেউ নেই। এরা পেয়েছে এখানে পরম আশ্রয়।

বাঘাদা'র মুখে মীরা শুনলো—এখানে থেকে যারা বড়ো হ'য়ে গেছে, তারা কামার, কুমোর, ছুতোর, রাজমিস্ত্রী, টেলিফোন, ইলেক্‌ট্রিসিটি, কারখানা, স্কুল, মায় বইবাঁধানোর কাজে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

তারা কাজ করে।

যখন তারা কাজ করতে লাগলো তখন দেশের জজ, মেজিষ্ট্রেট, অধ্যাপক, কত লোকের দৃষ্টি পড়লো এদিকে। সাহায্য আসতে লাগলো চারি ধার থেকে।

শুধু বাঙালী নয়, সব প্রদেশের লোকের কাছ থেকে সাহায্য এলো। এখানকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেমন সব দেশের ছেলেমেয়ে আছে।

এখানে কিন্তু সকলকে বাংলা বলতে হয়, বাংলা পড়তে হয়, বাংলা শিখতে হয়—কারণ এ নিয়ে তো কোনো তর্ক নেই যে রবীন্দ্রনাথের বাংলা হিন্দুস্থানের সব চেয়ে অগ্রসর ভাষা। সব চেয়ে সুন্দর।

কোনো বাড়ীতে কোনো উৎসব হ'লে মেয়েরা নিজের হাতে খাবার এনে এখানকার সকলকে খাইয়ে যায়।

নেমে যায় নীচে প্রকাণ্ড কারখানায়—মানুষ গড়ার কারখানায়, যেখানে লেখা আছে—

অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব।
মাতৃহারা মা যদি না পায়,
তবে আজ কিসের উৎসব?

মীরা দেখলো—আর একটা ঘরে লেখা আছে সোনালী অক্ষরে—

আমাদের এ ধরণী বড়ো ভালো লাগে
ভালোবাসা যদি থাকে ঘরে।
কত শান্তি আসে, প্রাণে কী আনন্দ জাগে
ভালোবাসা যদি থাকে ঘরে।

গুরুদেব বললেন, এখানে তুমি আজ খেয়ে যাবে মীরা!

ভাগ্যিস পিসিমাকে বলে এসেছিলো বেলা হ'তে পারে, নইলে তিনি কী ভাবতে পারেন!

চলো একটু বেড়িয়ে আসি, বলে উনি মীরাকে নিয়ে বরুণার তীর ধ'রে চললেন। টলটলে নীল জল, এদিকটা অনেক ফাঁকা—মীরা বললো—বেশ ত জায়গাটা!

শিকরোল আরো ভালো লাগবে তোমার—সাহেবী প্যাটার্ণের বাংলোগুলি বাগানের মাঝখানে। অত দূর যেতে পারবে?

পারব।

ইতিমধ্যে ফট্ করে গেল মীরার স্যাণ্ডাল ছিঁড়ে। এক পাটি গেল। আরেক পাটি প'রে ত হাঁটা যায় না, দুটোই হাতে নিলো।

পথের ধারে গাছের তলায় একটি মুচি বসেছিলো। একটা কাঁসিতে যবের ছাতু আর ছোলার ছাতু মিশিয়ে বরুণা নদীর জল দিয়ে আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সে তার সকালের খাওয়া সেরে নিচ্ছে।

মীরা জুতোটা দেখাতে সে বললে—দুইয়ে পয়সা লেগা মাঈজী?

গুরুদেব বললেন—এক্কে পয়সা।

হায় সীয়ারাম! বলে সে হাসলো। মজবুত ক'রে সেলাই ক'রে দিলে।

খানিক দূর গিয়ে মীরা বললে, দেখুন গুরুদেব, আমার কাছে যদি পয়সা থাকত, ওকে আমি দু' আনা দিতুম।

আমিও তাই দোব। তোমার মন পরীক্ষা করবার জন্যে এমনি করলুম। বড়ো ঘরে মানুষ হ'লে এমনি বড়ো নজর হয়। মুচি কিন্তু নিতেই চায় না, ভয় পেয়ে যায়, এ কি ঠাট্টা তার সঙ্গে!

গুরুদেব জোর ক'রে দেন—লেও ভাইয়া ব'লে। তার পর বলেন—মুচির মতন এত উপকারী অথচ এত ভদ্র বন্ধু আমাদের আর নেই। সব দেশেই মুচিরা কত ভালো। এই জন্যে ওদের পয়সা দিয়ে যেমন তৃপ্তি পাওয়া যায় এমন আর কাউকে দিয়ে হয় না। তোমার পায়ের জুতো হাতে ক'রে ওরা সারিয়ে দেবে, ওদের ছাড়া তোমাদের চলবে না, তবু ওদের সঙ্গে তোমরা দর করবে, আর বলবে চামার। ডেনমার্কে এক মুচির ছেলে হল হান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডার্সন। লেখা-পড়া শিখলো না কিন্তু এত বড় শিশু-সাহিত্যিক হল যে সারা ইউরোপে তাকে নিয়ে মাতামাতি। আমাদের দেশে দেখো কোনো লেখা ভালো লেগেছে এ কথা ছেলেরাও জানায় না, তাদের অভিভাবকরাও না। বাংলাদেশের প্রথম শিশু মাসিক 'সখা' বার ক'রে যুবক প্রমদাচরণ সেন অভাবের মধ্যে রোগে ভুগে মারা গেলেন, যার নামে স্মৃতি-মন্দির হওয়া উচিত, তার নাম কেউ মনে করে না। আর হান্স অ্যাণ্ডার্সন যখন লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছলো, তখন হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের মিছিলে মনে হল বুঝি কোন দেশের রাজার শোভাযাত্রা চলেছে। শিশু-সাহিত্যের গঙ্গা-নদীকে যে ভগীরথ প্রমদাচরণ সেন বাংলার মাটিতে নিয়ে এলো—তার হল যক্ষ্মা। চিকিৎসা হল না।

আশ্রমের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ব'সে মীরা খেলো। দুষ্টু দুষ্টু বাচ্চারা খাবার সময় একটুও গোল করলো না।

দুপুরে সব মন দিয়ে পড়াশুনো করলো। বড়োরা হাতের কাজে গেল। বিকেলে ছুটোছুটি খেলা। সন্ধ্যেবেলা গল্প।

প্যাঁচা কেন লক্ষ্মীর বাহন, এত জীবজন্তু থাকতে? গোলাভরা ধান ইঁদুর নষ্ট করে, পেঁচা তাদের খায়। তাই পেঁচার মতন মুখ বলে ঘেন্না করলেও দুধের মতন সাদা লক্ষ্মীপেঁচা মা লক্ষ্মীর আদরের বাহন।

শ্রীরঙ্গমের মন্দির কোথায়? দাক্ষিণাত্যে কাবেরী নদীর তীরে। ৪১৮ বিঘা জমি, সাতটা পাঁচিল, প্রথম পাঁচিল ৩০০০ ফুট লম্বা ২৫০০ ফুট চওড়া। প্রবেশ-পথের ওপর যে পাথরের গোপুরম, তাই এখানকার তেরতলা বাড়ীর সমান উঁচু। মূর্ত্তি নারায়ণের—সমুদ্রের ওপর অনন্তনাগে শয্যা—দশ হাত লম্বা নীল পাথরের তৈরী, পায়ের কাছে লক্ষ্মী। এত বিরাট মন্দির তৈরী করতে ষাট বছর লেগেছিলো, সেই কারিগররাই বা কি রকম?

হাসির গল্পও হল—এক ব্রাহ্মণের তিন জামাই ছিল, দু'জন পণ্ডিত, ছোটটি মূর্খ। একদিন অনেক পণ্ডিত লোক বাড়ীতে এসেছে, তাই ছোট জামাইকে তার স্ত্রী খাটের তলায় লুকিয়ে রেখেছে, কি বলতে কি ব'লে ফেলবে। সংস্কৃতে কথাবার্তা হচ্ছিলো, অনেকক্ষণ ধ'রে ছোট জামাই শুনলো। অং বং চং শুনে মনে করলো বাংলা কথার সঙ্গে অনুস্বার যোগ করলেই সংস্কৃত হয়। তাই সে তেড়ে মেড়ে বেরিয়ে এসে বলে ফেললে—

অনুস্বারং দিলেং যদিং সমসকৃতং হয়,
তবে কেনং ছোটং জামাই খাটের তলাং রয়?

ছেলেমেয়েরা হেসে লুটিয়ে পড়লো।

অন্ধকার গঙ্গার বুকে নৌকো চলেছে। আকাশে অসংখ্য তারার

যেন আলপনা আঁকা রয়েছে অদৃশ্য যাদুকরের হাতে। কূলে কূলে অসংখ্য বাড়ীতে কাশী যেন আলোর দেওয়ালীর প্রদীপমালায় সাজানো। অদ্ভুত দৃশ্য !

সারা রাত ধ'রে এমনি চলতে ভালো লাগে। রেনিপার্কের সাজানো ড্রয়িং রুমের পুতুলজীবন থেকে মুক্তি পেয়ে এ যেন আকাশের পাখীর উড়ে যাওয়া।

মাঝিদের সঙ্গে বাঘাদা'ও দাঁড় টানছে। স্বেচ্ছায়, আনন্দে। তাদের সঙ্গে এমন হিন্দী ভাষা বলছে যে, কে বলবে ও বাঙ্গালী !

আশ্রম ওর ভালো লেগেছে। কিন্তু তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মীরার মনে হ'তে লাগলো—ভালো লেগেছে, এ কথা এদেশে মুখ ফুটে যেন বলতে নেই।

আমরা উপন্যাস পড়ি দিনের পর দিন। হয়ত আগ্রহ ক'রেই পড়ি। কিন্তু কক্ষণো জানাই না, ভালো লাগছে, আমাদের ভালো লাগছে।

ভালো লাগাবার জন্যে যিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করেন, তাঁকে অগ্রাহ্য ক'রেই আমরা আনন্দ পাই, যেমন ট্রামে চ'ড়ে অনেক দূর গিয়ে টিকিট ফাঁকি দিয়ে নেমে পড়াকে আমরা বাহাদুরী মনে করি।

তাই হান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডার্সন এ দেশে জন্মায় না। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র লেখককে আমরা প্রণাম করতে শিখি না। মীরা নিজের মনে বলে—আমাদের কি ক'রে ভালো হবে ?

[ক্রমশঃ

আমাদের মনের মানুষ

দেবদত্তা রায়

হাইকোর্ট।

বিশেষ জরুরী মামলার শুনানী চলেছে। বিচারাসনে গম্ভীরমুখে বসে আছেন বিচারপতি, তাঁর দৃষ্টি টেবিলের 'পরে কাগজে ন্যস্ত কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে, দুই কান তাঁর উদগ্র আগ্রহে উন্মুখ হয়ে আছে জেরার জবাব শুনবার জন্য। জুরীরা বসে আছেন চিন্তিত গম্ভীর মুখে, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে তাঁরাও তাকিয়ে আছেন সেই দিকে, আর মনের পাতায় তুলে নিচ্ছেন এদের কথাবার্তার নিখুঁত রেকর্ড।

বাদীপক্ষের জেরা···

জেরা করছেন একজন দৃঢ়দেহা ঋজুস্কন্ধ সম্ভ্রান্ত-দর্শন ভদ্রলোক। আদালতগৃহের সমস্ত লোক মধ্যে মধ্যে বিস্মিত নেত্রপাত করছেন তাঁর সুঠাম সৌম্য মুখমণ্ডলের পানে। তাঁর গম্ভীর মুখাভাসে, তীব্র ভাষণে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতের মধ্যে কি যেন একটা ছিল, লোককে যা অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করে আনত তাঁর দিকে। সেদিন সেই আদালতের উপস্থিত জনতারও মনে হচ্ছিল, এর মধ্যে একটা আশ্চর্য্য শক্তি আছে, তাঁর প্রতিটি কথায় প্রত্যেক ভঙ্গীতে ঝরে ঝরে পড়ছে সেই শক্তির আভিজাত্য।

এমন সময়ে আদালতের চাপরাশি এসে তাঁকে সেলাম করলে। জেরায় বাধা পেয়ে ফিরে তাকিয়ে ঈষৎ বিরক্তিভরে তিনি বললেন, "কী ?"

চাপরাশি সঙ্কুচিত ভাবে সসম্ভ্রমে একখানা টেলিগ্রাম তাঁর দিকে অগ্রসর করে দিলে।

টেলিগ্রামখানা পড়তে পড়তে তাঁর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু সে মাত্র এক পলকের জন্য।

পরমুহূর্তে টেলিগ্রামখানা মুড়ে পকেটে ফেলে তিনি আবার আরম্ভ করলেন জেরা, এবং নিজের প্রতিভা-প্রদীপ্ত বাগ্‌জাল বিস্তারের মধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে ফেললেন হারিয়ে।

আদালত শেষ হ'ল। সকলেই উঠবার উপক্রম করছে। বিচারকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন অভিজাতদর্শন ব্যক্তিটি।

বিচারক সন্তুষ্ট কণ্ঠে বললেন, "ভাল হয়েছে, চমৎকার হয়েছে আপনার জেরা। আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি, ওভাবে জেরা না করলে মামলাটার কিনারা করাই শক্ত হত। কাল তাহলে মিঃ—"

বাধা দিয়ে সেই স্বল্পভাষী ভদ্রলোক বললেন, "কাল আমি আসতে পারব না ইওর অনার, মামলাটা দুয়েক দিন মুলতবী রাখলে ভাল হয়।" বিচারকের হাতে তিনি তুলে দিলেন টেলিগ্রামখানা।

বিচারক স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

টেলিগ্রামে লেখা ছিল, "Your wife expined lest uight."

"আপনার স্ত্রী কাল রাত্রে মারা গেছেন।"

ইনি ছিলেন সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুসংবাদও যাঁকে কর্ত্তব্য কাজে এতটুকু বিচলিত করতে পারে না, অসীম ধৈর্য্যের আভিজাত্যসম্পন্ন ইনিই সেই আমার দেশের মনের মানুষ। এই অটল ধৈর্য্য ও বিপুল কর্ম্মনিষ্ঠার পতাকা উড়িয়ে তিনি গান্ধীজীর পাশে এসে ভারতের জাতীয়-সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তাকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করে এনেছেন। চিত্তভরে আজকে আমরা তাঁকে স্মরণ করি।

আজকের যুগে আমাদের যে চাই এমন অনেক অনেক সর্দ্দার প্যাটেল···কর্ত্তব্যে অবিচলিত, নিষ্ঠায় দৃঢ়।

ব্যক্তিগত অনুভূতির ঊর্দ্ধলোকচারী।

আজকের কিশোরদের মধ্যেই হয়ত লুকিয়ে আছে ভাবীযুগের সেই "লৌহমানব।" তাঁদের স্মরণ করেই বসুমতীর পাতায় তুলে ধরলুম তাঁর মহান্ আদর্শ।

প্রণাম প্যাটেল !!

সোনার পাখী

[বিদেশী রূপকথা]

শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস

এক রাজার একটা সুন্দর বাগান ছিল। আর সেই বাগানের আপেল গাছে আপেল ধরত—সোনার আপেল। ঐ আপেলগুলো পাকলে রোজই একবার করে গোনা হত। আপেল পাকার সময় হলেই বা রোজই একটা করে আপেল কমে যেত—এটাই হল আশ্চর্য্যের বিষয় ! রাজামশাই কিন্তু এ ব্যাপার শুনে রেগে আগুন হয়ে যেতেন। আপেল কমে যাবার কথা শুনেই যিনি মালীকে আদেশ দিলেন, যাতে সমস্ত রাত ধরে আপেল গাছ পাহারা দেওয়া হয়। মালী তার

জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই পাঠাল পাহারাদার হিসেবে। কিন্তু রাত প্রায় বারটা নাগাদ সে ঘুমিয়ে পড়ল গাছের নীচে। সকালবেলায় জেগে দেখে, গাছের আপেল একটা কমে গেছে। পরদিন মালী মেজ পুত্রকে পাঠাল পাহারা দেবার জন্যে। কিন্তু ঐ একই ব্যাপার—মধ্যরাত্রে সে-ও ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে আপেলগুলো গুণে দেখে সে, আজও একটা কমেছে। তার পর মালীর কনিষ্ঠ পুত্রের পালা। সে-ও প্রস্তুত হয়ে ছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের বেলায়ও ঐ একই ব্যাপার ঘটবে জেনে সে তাকে পাঠাতে রাজী হ'ল না। কিন্তু অবশেষে সে রাজী হ'ল। কনিষ্ঠ পুত্র প্রেরিত হল সোনার আপেল গাছটা পাহারা দেবার জন্যে। সমস্ত রাতের মধ্যে ওর এতটুকু ঘুম এল না। যখন বারটা হল, তখন সে বাতাসের মধ্যে একটা খস্ খস্ আওয়াজ শুনতে পেল। তার পর একটা সোনার পাখী উড়ে এল এবং পরে যখন সে ঠোঁট দিয়ে আপেলের গা'টায় কামড় দিয়েছে অমনি মালী-পুত্র ছুড়ল তীর। তীরটা পাখীটার কোন ক্ষতি করতে পারল না। কেবল মাত্র পাখীর লেজ থেকে একটা সোনার পালক খসে পড়ল এবং তারপরেই সে উড়ে চলল—আকাশের পানে। সকাল হতে মালী সোনার পালকটা নিয়ে গিয়ে হাজির হল রাজার কাছে। রাজা ডাকলেন সভাসদবর্গকে। সকলেই পালকটা দেখে বললেন—এটা রাজ্যের যে কোন অমূল্য সম্পদের চেয়েও মূল্যবান। রাজা বললেন—একটা পালক দিয়ে আমার কিছুই হবে না। গোটা পাখীটাই চাই।

সোনার পাখীটাকে খুব সহজেই পাওয়া যাবে—এই ভেবে মালীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বেরিয়ে পড়ল। কিছুদূর গিয়েই সে একটা ছোট বনের কাছে হাজির হল। এবং বনের পাশেই একটা খেঁকশিয়ালকে দেখতে পেল। তাই সে তক্ষুণি তার ধনুক উঁচু করে ধরল খেঁকশিয়ালটাকে মারবার জন্যে। ব্যাপার দেখে খেঁকশিয়াল বলল—তুমি আমাকে মের না। তোমাকে আমি সাহায্য করব। তুমি কি উদ্দেশ্যে বেরিয়েছ তা আমি জানি। সোনার পাখী চাই ত তোমার? আজ সন্ধ্যায় তুমি একটা গাঁয়ে পৌছবে। যখন তুমি ওখানে পৌছবে তখন দু'টো পান্থশালা মুখোমুখী দেখতে পাবে। ওর মধ্যের একটা খুব সুন্দর দেখতে। আরামপ্রদও বটে। ওটাতে তুমি ঢুকবে না। রাত কাটাবার জন্যে ওর বিপরীত দিকের নোংরা পান্থশালায় থাকবে, বুঝলে ত?

কিন্তু সে ভাবল—আচ্ছা ব্যাপার ত! এই বুনো খেঁকশিয়াল ব্যাটা কি করে জানল এ-সব? তাই এবার সে তীর ছুঁড়ল। কিন্তু ব্যর্থ হল। তীর ওর গায়ে লাগল না। বনের মধ্যে পালিয়ে গেল খেঁকশিয়াল। তারপর মালী-পুত্র হেঁটে চলল। খেঁকশিয়াল-কথিত গ্রামে সে পৌছুল এবং ওখানেই ওর সন্ধ্যে হ'ল। দু'টো পান্থশালাও সে দেখতে পেল। ওর মধ্যের একটাতে খুব নাচ, গান আর হল্লা হচ্ছে। এবং বিপরীত দিকেরটা নোংরা আর স্থির। কোন সাড়াশব্দ নেই ওর ভেতর থেকে। আমি নিশ্চয়ই খুব নির্বোধ প্রতিপন্ন হব—যদি ঐ নোংরা বাড়ীটাতে প্রবেশ করি, এই চমৎকার বাড়ীটা ছেড়ে। এই ভেবে সে ভাল পান্থশালাতেই প্রবেশ করল। ইচ্ছে মত পান-আহার সারল। তারপর পাখীর কথা, এমন কি বাড়ীর কথাও সে ভুলে গেল।

অনেক দিন পর জ্যেষ্ঠ পুত্রের কোন খবর না পাওয়ায় মেজ পুত্র প্রেরিত হল—সোনার পাখীর খোঁজে এবারও ঐ এক ব্যাপার ঘটল। খেঁকশিয়ালের সাক্ষাৎ এবং পরামর্শ সে পেল। কিন্তু যখন সে ঐ দুই পান্থশালার নিকটবর্তী হল, তখন জানালা দিয়ে দেখল যে, বড়দা ওর মধ্যে বেশ মজা করছে। বড়দাও ভেতর থেকে মেজ ভাইকে দেখে ডেকে নিয়ে গেল। খেঁকশিয়ালের কথা ভুলে গেল। ওর মধ্যে গিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে সে-ও বড়দার মত পাখী এবং বাড়ীর কথা ভুলে গেল।

তার পর আবার অনেক দিন কেটে গেল। মালীর কনিষ্ঠ পুত্র এবার সোনার পাখীটিকে খোঁজবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল। কিন্তু মালী পুত্রদের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল হওয়ায় অনেক দিন ধরে ওর কথায় কান দেয় নি। তা ছাড়া পথে অনেক বিপদ হতে পারে—যার জন্যে সে কনিষ্ঠ পুত্রকে ছাড়তে রাজী হয়নি। যাহা হোক, অবশেষে সে রাজী হল। বেরিয়ে পড়ল কনিষ্ঠ পুত্র। দু'দাদার মত বনের কাছে যেতেই ওর সাথেও খেঁকশিয়ালের দেখা হল। এবং সে-ও পরামর্শ দিল একে। দাদাদের মত সে খেঁকশিয়ালের প্রাণ নাশের কোন চেষ্টা করল না বরং খেঁকশিয়ালের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হল। খেঁকশিয়ালও সন্তুষ্ট হয়ে বলল—তুমি আমার লেজের ওপর বস। তা হলেই খুব দ্রুত যেতে পারবে। সে-ও বসল এবং খেঁকশিয়াল এত জোরে দৌড়ুতে লাগল যে বাতাসের মধ্যে শোঁ-শোঁ শব্দ হতে লাগল। এবং ওদের কানেও সে শব্দ বিঁধতে লাগল।

যখন তারা ঐ গ্রামে পৌছুল, তখন মালী-পুত্র পান্থশালা দু'টো দেখতে গেল। অন্য কোন দিকে দৃকপাত না করে সে নোংরা পান্থশালাটিতে ঢুকে পড়ল এবং রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দিল। সকাল-বেলায় আবার সে খেঁকশিয়ালের সাক্ষাৎ পেল। এবং সে আবার পরামর্শ দিল। বলল—তুমি সোজা চলে যাবে—যতক্ষণ না একটা দুর্গে পৌছাও। ওর সামনেই তুমি দেখবে সৈন্যরা ঘুমুচ্ছে আর নাকে গোঁ গোঁ শব্দ করছে। ও-সবে খেয়াল না করে সোজা দুর্গের মধ্যে চলে গেলে একটা ঘরে পৌছুবে—যেখানে সোনার পাখীটা রয়েছে—একটা কাঠের খাঁচার ভেতর। ওর পাশেই একটা সোনার খাঁচা রয়েছে। তুমি নোংরা কাঠের খাঁচা থেকে পাখীটা বের করে সোনার খাঁচায় রাখবার চেষ্টা করো না।

খেঁকশিয়াল লেজ সোজা করল এবং মালী-পুত্র ওর ওপর চড়ে বসল এবং শোঁ-শোঁ শব্দ করে চলল।

অবশেষে দুর্গের কাছে গিয়ে সে খেঁকশিয়ালের কথা মত সব দৃশ্য দেখতে পেল। সোজা চলে গিয়ে সে হাজির হল যেখানে খাঁচার ভেতর সোনার পাখীটা রয়েছে। তার নীচেই রয়েছে সোনার খাঁচাটা। আর ওর মধ্যেই রয়েছে আগের হারান সোনার আপেল তিনটে। যা পাখী আগে চুরি করে এনেছিল রাজার বাগান থেকে। তখন সে ভাবল—আচ্ছা, এই নোংরা খাঁচা থেকে যদি সে পাখীটাকে বের করে আনে, তাহলে খুব মজার ব্যাপার হতে পারে। তারপর সে নোংরা কাঠের খাঁচার দরজা খুলে পাখীটিকে সোনার খাঁচায় রাখল। কিন্তু পাখীটা এমন চীৎকার করে উঠল যে, সব সৈন্যরা জেগে গেল ঘুম থেকে। এবং ওরা মালী-পুত্রকে ধরে নিয়ে গেল—রাজার কাছে কয়েদী হিসেবে। পরদিন সকালে ওর বিচারের জন্যে সভা বসল। সকলেই বললেন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার কথা। তবে যদি সে সোনার ঘোড়া—যে বাতাসের মত দ্রুত

ছুটতে পারে, তাকে এনে দিতে পারে, তাহলে মৃত্যুদণ্ড ত হবেই না বরং সোনার পাখীটা এমনিতেই পাবে।

আবার মালী-পুত্র যাত্রা সুরু করল। সে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং খুব আশাহীনও হল। কিন্তু একটু পরেই খেঁকশিয়ালের সাথে দেখা।—আমার কথা না শুনে তোমার কি রকম অবস্থা হয়েছে দেখ। তবুও আমি বলব কি করে সোনার ঘোড়াটা তুমি পাবে। বলল খেঁকশিয়াল। সোজা গেলে তুমি একটা দুর্গ দেখতে পাবে। ওর মধ্যে সোজা চলে গেলে একটা আস্তাবল দেখবে—যেখানে সোনার ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পাশেই ঘোড়ার সহিস ঘুমিয়ে আছে এবং নাক ডাকাচ্ছে। আস্তে আস্তে চামড়ার জিনটা তুমি নেবে—সোনারটা নয়।

আবার সে খেঁকশিয়ালের লেজের উপর বসল এবং শোঁ-শোঁ বেগে চলল। ঠিকমত গিয়ে সে দেখল—সহিস সোনার জিনের ওপর হাত দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু যখন সে ঘোড়ার দিকে তাকাল তখন ভাবল—এ ঘোড়ার পক্ষে চামড়ার জিনটা খুব খারাপ দেখাবে। এবং খুব লজ্জার বিষয় হবে। এই ভেবে যখন সে সোনার জিনটা নিল তক্ষুণি—সহিস জেগে উঠে চীৎকার ছাড়ল—আর সমস্ত প্রহরীরা জেগে উঠল এবং ওকে কয়েদী হিসেবে ধরে নিয়ে গেল—রাজার কাছে বিচারের জন্য। রাজা বললেন—মৃত্যুদণ্ডই তোমাকে দেওয়া হবে—তবে তুমি যদি অমুক রাজ্যের সুন্দরী রাজকন্যাকে এনে দিতে পার, তাহলে সোনার ঘোড়া এবং সোনার পাখীটা তোমার নিজের সম্পদ হিসেবে দেওয়া হবে।

তখন সে আবার চলতে সুরু করল। এবং হঠাৎ খেঁকশিয়ালের সাথে দেখা হল। আমার কথা শোননি কেন? যদি তুমি শুনতে তাহলে পাখী এবং ঘোড়া উভয়ই পেতে। যাক্ তবুও আমি তোমাকে পরামর্শ দেব। তুমি সোজা চলে গেলে সন্ধ্যেবেলায় একটা দুর্গে পৌছুবে। ওর মধ্যে তুমি ঢুকে রাজকন্যার স্নানাগারের কাছে যাবে। রাত বারটার সময় রাজকন্যা স্নানাগারে যাবে। তখন তোমার সাথে ওর সাক্ষাৎ হবে। সাক্ষাৎ হতেই তুমি ওকে প্রণাম করবে। রাজকন্যা তোমার সাথে আসতে চাইবে। কিন্তু তার আগেই ওর পিতা-মাতার সাথে একবার সাক্ষাৎ করতে যাবে। তুমি ওকে যেতে দেবে না।—বলল খেঁকশিয়াল। অতঃপর মালী-পুত্র খেঁকশিয়ালের লেজের ওপর বসল এবং সন্ধ্যে নাগাদ দুর্গের কাছে পৌছুল। খেঁকশিয়ালের কথামত মালী-পুত্র রাজকন্যার স্নানাগারের কাছে দাঁড়িয়ে রইল এবং রাত বারটার সময় রাজকন্যার সাক্ষাৎ পেল। এবং প্রণাম ঠুকল। রাজকন্যাও ওর কথানুযায়ী ওর সাথে আসতে চাইল বটে, কিন্তু আসবার আগে পিতামাতার সাথে একবার সাক্ষাৎ করতে চাইল। কারণ, ওর কোন খোঁজ-খবর না পেলে পিতা-মাতা কেঁদে আকুল হবেন। মালী-পুত্র মোটেই রাজী হল না। কিন্তু রাজকন্যা কাঁদতে কাঁদতে ওর পায়ের ওপর পড়ল। রাজকন্যার ব্যাপার দেখে সে ওর পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ করতে অনুমতি দিল। কিন্তু যে মুহূর্তে রাজকন্যা ওর পিতার শয়নকক্ষে হাজির হল, তখনই সমস্ত প্রহরী জেগে উঠল এবং বন্দী করে রাখল।

অতঃপর সে রাজার সম্মুখে নীত হল। রাজা নিকটবর্তী একটা পাহাড় দেখিয়ে বললেন—তুমি আট দিন ধরে এটা খুঁড়ে সমতল ভূমিতে পরিণত করে ফেলতে পারলে রাজকন্যা পাবে এবং মৃত্যুদণ্ড হবে না।

পাহাড়টা সত্যিই খুব বড় ছিল। কি করে ও খুঁড়বে সবটা? সাত দিন ধরে খুঁড়ে দেখে পাহাড়ের খুব অল্পাংশটুকুও খুঁড়তে পারেনি সে। আর একদিন মাত্র বাকী। তাই সে মহা ভাবনার মধ্যে পড়ে গেল। সাত দিনের দিন খেঁকশিয়াল এসে হাজির। এসেই বলল—যাও তুমি অনেক পরিশ্রম করেছ। গিয়ে ঘুমোও। আমি সব কাজটা করে দিচ্ছি।

যখন সকালবেলায় মালী-পুত্র জেগে উঠল তখন দেখল যে, পাহাড়ের চিহ্নটা মাত্র নেই। তাই সে তাড়াতাড়ি রাজাকে গিয়ে খবর দিল।

রাজা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজকন্যাকে ওর হাতে দিলেন। খেঁকশিয়াল তখন বলল—আমরা এখন ঘোড়া পাখী সবই পাব। মালী-পুত্র বলল—কি করে পাব?

খেঁকশিয়াল বলল—তুমি যদি আমার কথা শোন তাহলে সব কাজ শীগগির সমাধা হয়ে যাবে। যখন তুমি রাজার কাছে যাবে তখন তোমায় জিজ্ঞেস করবেন—কই রাজকন্যা কোথায়? তুমি বলবে—এইখানেই। তখন তিনি খুবই আনন্দিত হবেন। আর সোনার ঘোড়াটা তোমায় দেবেন। তুমি ঘোড়ায় চড়ে বসবে। আর ঐ স্থান পরিত্যাগ করার আগে তুমি রাজাকে সম্ভাষণ জানাবে এবং অবশেষে রাজকন্যার সাথে করমর্দন করবে এবং করমর্দন করার সময়েই রাজকন্যার হাত ধরে ওকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে নিয়ে দেবে ছুট্। যত জোরে পারবে তত জোরে পালিয়ে আসবে।

খেঁকশিয়ালের কথা মত রাজকন্যাকে নিয়ে আসা হল ছিনিয়ে। আবার সে বলল—তুমি যখন পাখীর দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করবে, তখন আমি রাজকন্যাকে নিয়ে দুর্গের বাইরে থাকব। তুমি ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় রাজার সাথে কথা কইবে। যখন তিনি সোনার পাখীটা দেবেন—তখন তুমি ঘোড়ায় চড়াবস্থায় পাখীটাকে হাতে নিয়ে দেখবে খাঁটি সোনার কি না। তারপর রাজা একটু অন্যমনস্ক হলেই পালিয়ে আসবে ঘোড়া আর পাখী নিয়ে।

সব কাজ খেঁকশিয়ালের কথা মত সমাধা হয়ে গেল। পাখী নিয়ে রাজকন্যাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে আবার ওরা চলতে সুরু করল। খেঁকশিয়ালও চলল। একটু পরে খেঁকশিয়াল মালী-পুত্রের কাছে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করে বলল—তুমি দয়া করে আমার পা এবং মাথা কেটে ফেল।

মালী-পুত্র কি এতে রাজী হবে? যে ওকে এত সাহায্য করেছে তাকে কি করে হত্যা করবে? তাই সে গররাজি হল। খেঁকশিয়াল আবার পরামর্শ দিল। বলল—তুমি দুটো কাজ থেকে সর্বদা বিরত থাকবে। প্রথমতঃ, কাউকে ফাঁসী থেকে মুক্ত করতে যাবে না। দ্বিতীয়তঃ, কোন নদীর পাড়ে বিশ্রাম করতে বসবে না। তা হলেই বিপদ। আরও বলল—হে, যুবক! আমার এই কথা দুটো রক্ষে করতে তোমার কোন কষ্ট হবে না। তারপর সে বিদায় নিল।

তারপর মালী-পুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে সেই গ্রামের মধ্যে এসে পড়ল। যেখানে পান্থশালা দু'টো বিপরীতমুখী ছিল এবং তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা রয়ে গেছিল। ওখানে পৌছুতেই খুব গোলমাল

শোনা গেল। ভাল করে খোঁজ নিয়ে জানল যে—দুটো লোককে ফাঁসী দেওয়া হচ্ছে। নিকটে দেখে—সে ত একেবারে অবাক হয়ে গেল। কারণ ঐ লোক দুটো আর কেউ নয়—ওর সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়। যারা এর মধ্যে দস্যুতে পরিণত হয়েছিল। সে লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, ওদের বাঁচাবার কি কোন পথ নেই?—না যতক্ষণ না ওরা সব টাকা-পয়সা ফেরৎ দিচ্ছে ততক্ষণ ছেড়ে দেওয়া হবে না।

সে ওদের সব টাকা মিটিয়ে দিল এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়কে মুক্ত করল। এবং তারা সবাই একসাথে দেশে ফিরে চলল।

যে স্থানটিতে অর্থাৎ বনের পাশে ওদের সাথে খেঁকশিয়ালের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, তার পাশেই একটা নদী ছিল। ওখানে পৌঁছুতেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় বলে উঠল—নদীর ধারে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করে নেওয়া যাক এবং পান আহার সমাপ্ত করা হোক।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা খেঁকশিয়ালের কথা ভুলে গিয়ে বলল—হ্যাঁ, এখানেই বিশ্রাম করা হোক। এই বলে সে-ও নদীর ধারে গিয়ে বসল। সে যখন চুপচাপ বসে ছিল তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় পেছন দিক দিয়ে গিয়ে ওকে চ্যাংদোলা করে নদীর মধ্যে ফেলে দিল। তারপর ওরা দু'ভাই রাজকন্যা, ঘোড়া আর পাখী নিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে রাজাকে বলল—এই সমস্তই আমরা আমাদের নিজেদের শক্তি দ্বারা অর্জন করেছি।

খুব আনন্দের ধ্বনি পড়ে গেল সমস্ত রাজ্যে। কিন্তু ঘোড়া আহার বন্ধ করল। পাখী আর গান করল না এবং রাজকন্যা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ওদিকে ত ছোট ভাইকে ওরা নদীর ভেতরে ফেলে দিয়ে গেছে। ভাগ্যিস ওখানে বেশী জল ছিল না। কিন্তু ওর শরীরে ভীষণ আঘাত লেগেছিল। কয়েকটা হাড়ও ভেঙে গেছিল। নদীর তীরটা ভীষণ কর্দমাক্ত থাকায় সে বাঁচবার বা শুকনো জায়গায় ওঠবার কোন পথ পাচ্ছিল না। অতঃপর সেই খেঁকশিয়াল হাজির হল। এবং তার কথা না শোনার জন্যে খুব বকুনি দিল। কারণ তার কথা শুনলে ত বিপদ হত না। সে খেঁকশিয়ালের লেজ ধরল। আর একটা ভাল জায়গায় নিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলল।

তার পর খেঁকশিয়াল বলল—যদি তোমার ভাইরা তোমাকে ঐ রাজ্যে দেখতে পায় তাহলে হত্যা করবে। তাই খেঁকশিয়ালের পরামর্শ অনুযায়ী দরিদ্র বেশে সে তার রাজ্যের রাজার কাছে গিয়ে হাজির হল। রাজপ্রাসাদে ওকে প্রবেশ করতে দেখেই ঘোড়া আহার সুরু করল। পাখী সুমধুর স্বরে সংগীত শুরু করল। এবং ভাইদের চক্রান্তের কথা বলল। রাজাও—রাজকন্যাকে ওর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এবং ওদের দুজনকে খুব করে শাস্তি দিলেন। এবং রাজার মৃত্যুর পর সেই-ই রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হল।

অনেক দিন পরে মালীর কনিষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ নতুন রাজা যেখানে খেঁকশিয়ালের সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল—সেই বনের ধারে বেড়াতে গেল। পুরোন খেঁকশিয়ালের সাথে ওর আবার সাক্ষাৎ হল। সে আবার ওকে তার মাথা এবং পা কেটে ফেলতে বলল। অবশেষে নতুন রাজা ওর কথা মত মাথা ও পা কেটে ফেলল, আর মুহূর্তের মধ্যে সে খেঁকশিয়াল থেকে মানুষে পরিবর্তিত হল এবং ঐ রাজকন্যার ভ্রাতারূপে পরিগণিত হল। যাকে রাজকন্যা অনেক দিন আগে হারিয়েছিল।

ইয়োরোপী টিপ

যাদুকর এ, সি, সরকার

কুঙ্কুম-টিপ, কাজলের টিপ, চন্দন টিপও ভালো,
সিন্দুর টিপ কপালে গৃহিণী ঘর মোর করে আলো।
টিপ সহি দিয়ে বহু কাজ চলে, টিপ-টিপ পড়ে বৃষ্টি,
বাসর-ঘরেতে নতুন বধূর টিপ-টিপ করে দৃষ্টি।
টিপ-টিপ করে সন্ধ্যার তারা রজনীর অবসানে,
টিপ-টপ সাজে সেজে বড়বাবু হাওয়া খান ময়দানে।
নস্যির টিপ নাকে পড়ে দাদা, বুদ্ধির জট খোলে,
রেসের ঘোড়ার টিপ দিয়ে দিয়ে কারও বা পকেট ফোলে।
কিন্তু রে দাদা, ইয়োরোপী টিপ রুপী বাধা তার সাথে,
সাবধান হয়ে না চলো যদি বা ফল পাবে হাতে হাতে।
উঠিতে বসিতে ঘরে ও বাইরে সবখানে টিপ ভাই,
পার্কেতে গিয়ে বসবে একটু সেখানেও ছাড়া নাই।
বেঞ্চের পরে বসবামাত্র হাত বাড়াইবে মালী,
উপুড় হস্ত না করো যদি বা খেতে হবে গালাগালি।
সিনেমায় যাবে? বেশ ভালো কথা টিকিট নাও না কিনে,
গেট-কিপারকে টিপ দাও আগে তবে দেবে সিট চিনে।
ইণ্টারভ্যালে 'টয়লেটে' যাবে সেখানেও টিপ চাই,
স্যুট-টাই-পরা মেথর রয়েছে কেমনে এড়াবে ভাই?
ট্যাক্সিতে চেপে বেড়াবে সহরে, মিটারে উঠবে ভাড়া,
'সোফার সাহেব,' সে-ও টিপ চায় মিটারে পাওনা ছাড়া।
হোটেলেতে যাও সেখানেও টিপ টিপে ভরা এই দেশটা,
টিপ এড়ানোর টিপ কিছু দাও, দেখি করে শেষ চেষ্টা। *

* গত বছর ইয়োরোপ সফরকালে স্বনামধন্য যাদুকর এ, সি, সরকার স্বরচিত এই কবিতাটি আমার কাছে পাঠান। প্রকাশের জন্য কবিতাটিকে ফাইলে রেখে দেবার কয়েক দিন পরে খুলে দেখি সাদা কাগজ পড়ে আছে—লেখার চিহ্ন মাত্র নাই। ফেলে না দিয়ে কাগজটিকে ফাইলের মধ্যেই রেখে দিই। অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে ফাইল খুলে দেখলাম সাদা কাগজের বুকে লেখা ফুটে উঠেছে। পাছে এ লেখা আবার ম্যাজিকের মত উড়ে যায়, সেই ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা প্রেসে পাঠিয়ে দিলাম। কবিতাটিতে যাদুকর এ, সি, সরকারের সূক্ষ্ম রসজ্ঞান ও কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে।—সম্পাদক

"আগত যুগ, ভারতের ভার স্কন্ধে লইয়া বঙ্গজননী উঠিতেছেন।"

শ্রীঅরবিন্দ

ক'লকাতা মাঠে ফুটবল খেলা বেশ জমে উঠেছে এক রকম। তবে এবারের খেলায় তেমন বিশেষ কোন উন্নতি ফুটবল-মানের দেখা যায়নি। মহামেডান স্পোর্টিং, রাজস্থান এবং ইষ্টবেঙ্গল দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছে। গত বারের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান লীগ পাল্লার দৌড়ে বেশ পিছিয়ে পড়েছে।

ইতিমধ্যে প্রায় অনেক দলই প্রথমার্দ্ধের খেলা শেষ করে দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা খেলতে শুরু করে দিয়েছে। এবারের চ্যাম্পিয়ানসিপের পাল্লায় ত্রিদলীয় প্রতিযোগিতা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তবে লীগের ফিরতি খেলায় মোহনবাগান দল তাঁদের শক্তির পরিচয় দিতে চেষ্টা করছে। মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং দলের ফিরতি ম্যাচের খেলাটি ১—১ গোলে অমীমাংসিত হয়েছে। এ খেলায় মোহনবাগান দলের জয়লাভ করা সম্ভাবনাই অধিক ছিল।

মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের চ্যারিটি খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দল ১০ মিনিটের সময় একটি মাত্র গোল করে এবং ঐ গোলেই খেলাটির মীমাংসা হয়। প্রথম দশ মিনিট ইষ্টবেঙ্গল দল আধিপত্য বিস্তার করে থাকলেও মোহনবাগান দল আস্তে আস্তে খেলায় আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফরয়ার্ডদের ব্যর্থতার জন্ম গোল করা সম্ভব হয়নি।

রাজস্থান ও মহামেডান দলের খেলাটিতে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব পাওয়া যায়। রাজস্থান দল খেলা আরম্ভ হওয়ার দুই মিনিটের মধ্যে একটি গোল দেয়। আবার পরবর্ত্তী পাঁচ মিনিটের মধ্যে মহামেডান দল গোলটি পরিশোধ করে। এর পর দু'দলই আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চালালেও কোন দলই গোল করতে সমর্থ হয়নি।

লীগের নিচের দিকের দলগুলির মধ্যে হাওড়া ইউনিয়ন, বালী প্রতিভা প্রমুখ দলগুলি তাদের শক্তি অনুযায়ী আশানুরূপ খেলছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ষ্টেডিয়াম প্রসঙ্গে

ফুটবল মরশুমে কলকাতা দর্শককুলের দুরবস্থার চরম অবস্থা দেখলেই ষ্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। এ বিষয়ে নানা স্থানে নানা প্রসংগে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি বছরেই বিভিন্ন সংবাদপত্রে সাংবাদিকরা আলোচনা করেছেন। সাময়িক ভাবে ষ্টেডিয়ামের কথা উঠেই আবার সেটা চাপা পড়ে যায়।

সন্তোষের পরলোকগত মহারাজা সর্বপ্রথম কলকাতায় ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করেন। ইদানীং কালের বাণিজ্য ও শিক্ষামন্ত্রী ভূপতিভূষণ মজুমদার মহাশয়ও ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণকল্পে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু আজও তা পরিকল্পনার মধ্যেই রয়ে গেছে।

ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণের স্থান নির্বাচন একটি সমস্যা। কোন সময়ে ইডেন উদ্যানে ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড, এলেনবোরো কোর্স, ইডেন উদ্যানের কখনও ক্যালকাটা ফাইমস পুলিশ ক্লাবের মাঠ স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত পরিকল্পনা—পরিকল্পনাতেই রয়ে গেছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইডেন উদ্যানের ক্রিকেট মাঠ সমেত ন্যাশানাল ক্রিকেট ক্লাবের সম্পত্তি পুলিসী ব্যবস্থায় দখল করার পর ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণের কিঞ্চিৎ আশা দেখা দিলেও কতখানি কার্য্যকরী হবে, তা সঠিক ভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কলকাতায় ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। ইডেন উদ্যানে ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে, পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ডিমাণ্ড এ্যাক্সন কমিটির কনভেনর শ্রীবীরেন দের কাছে যে চিঠি দেন, তাতে অনেক আশার আলো দেখা দিয়েছে।

এখন প্রশ্ন। আমাদের ডাঃ রায় সত্যই কি এ বিষয়ে আগ্রহী? বিধান সভায় ইতিপূর্ব্বে ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে আলোচনা হয়নি। ডাঃ রায় প্রতিবারই বলেছেন যে, সরকার ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণের ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হ'ল না কেন? যতদূর মনে হয়, এ বিষয়ে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। কলকাতায় স্পোর্টস বিল পাশ হয়েছে। কিন্তু তার কাজ একটুও অগ্রসর হয়নি।

হঠাৎ ইডেন উদ্যান এ ভাবে দখল খানিকটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

ইডেন উদ্যান ঐতিহাসিক ক্রিকেট মাঠে কমোজিট ষ্টেডিয়াম করা হলে কিন্তু আপত্তি আছে। কমোজিট ষ্টেডিয়াম গঠিত হলে কি ফুটবল, কি ক্রিকেট কোনটির উপরই সুবিচার হবে না। ফুটবল মরশুমের পর ক্ষত মাঠকে ক্রিকেট খেলার উপযোগী করতে যে সময়ের প্রয়োজন তা মোটেই হাতে পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে বালুবিহীন ইডেন উদ্যানকে ক্রিকেট খেলার উপযোগী করতে প্রচুর সময় লাগবে।

ক্রিকেট মাঠে ফুটবল খেলা যায় কিন্তু ফুটবল মাঠে ক্রিকেট খেলা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

একশ' বছরের ঐতিহাসিক ক্রিকেট মাঠ বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ক্রিকেট মাঠকে ফুটবল মাঠে পরিণত করাও সঙ্গত মনে হয় না। ষ্টেডিয়াম না থাকলেও ক্রিকেট মাঠ হিসেবে ইডেন উদ্যানের যথেষ্ট সুনাম আছে। দেশ-বিদেশের গুণী ও কৃতী খেলোয়াড়রা এই মাঠে খেলে গেছেন। তাঁরা মাঠের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। বিশ্বের ক্রিকেট দরবারে ইডেন উদ্যানের যে আভিজাত্য, তাকে ক্ষুণ্ণ করার কোন রকম যৌক্তিকতা নেই।

* * * *

কলকাতার মাঠের অভাব নেই। ইডেন উদ্যানকে বাদ দিয়ে ... ঐতিহাসিক গাছে উঠবা। মোটের উপর ফুটবলের

তাই না কি

—রতন দাশগুপ্ত

ঝিলমে শিকারা

—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জলযান

—অর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

হিপোর হাঁ

—চঞ্চল মিত্র
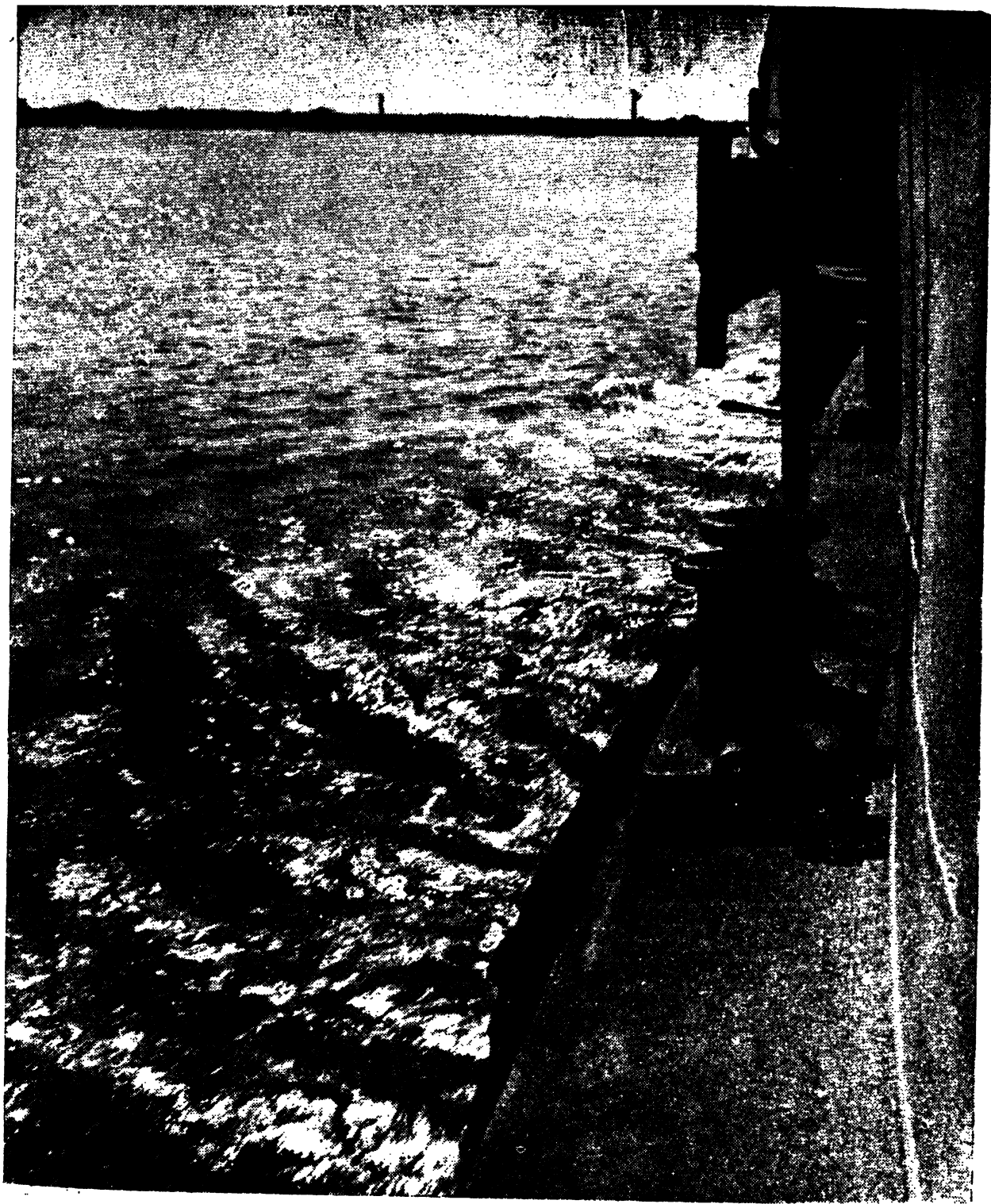
জন্ম কলকাতা মাঠে পৃথক ষ্টেডিয়াম চাই। এবং সে ষ্টেডিয়াম বেশ বড় আকারের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ক্রিকেট

বার্মিংহামের 'এজ্‌বাষ্টন' মাঠে ইংলণ্ড ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। সোনী রামধীনের মারাত্মক বোলিং এবং স্মিথ, ওরেল, ওয়ালকট ও সেবার্সের প্রশংসনীয় ব্যাটিং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের জয়লাভের পথকে সুগম করে দিলেও পিটার মে, কলিন কাউড্রের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং এবং লক এবং লেকারের বোলিং শেষ পর্য্যন্ত খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

ইংলণ্ড ১ম ইনিংস—১৮৬ (রিচার্ডসন ৪৭, মে ৩০, ট্রুম্যান নট আউট ২৯, ইনসোল ২০ রামধীন ৪৯ রাণে ৭ উইঃ গিলক্রিষ্ট ৭৪ রাণে ২ উইঃ)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস—৪৭৪ (স্মিথ ১৬১, ওয়ালকট ৯০, ওরেল ৮১, সি, সোবার্স ৫৩, আর কানহাই ৪২, ভার্ডাড ২৪, লেকার ১১৯ রাণে ৪ উইঃ ষ্ট্যাথাম ১১৪ রাণে ৩ উইঃ ট্রুম্যান ৯৯ রাণে ২ উইঃ)।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস—৫৮৩ (উইঃ ডিক্লেঃ) মে নট আউট ২৮৫, কাউড্রে ১৫৪, ক্লোজ ৪২, রিচার্ডসন ৩৭, ইভান্স ২৯, রামধীন ১৭৯ রাণে উইঃ।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—২য় ইনিংস—৭২ (৭ উইঃ) (ইভার্টন উইকস ৩৩; লক ৩১ রাণে ৩ উইঃ ট্রুম্যান ৭ রাণে ২ উইঃ লেকার ১৩ রাণে ২ উইঃ)।

[অমীমাংসিত]

লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৩৬ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করেছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের এ পরাজয় ফিল্ডস্‌ম্যানদের ব্যর্থতা ও তারই সংগে ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা বিশেষ করে চোখে পড়ে।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ২১৭ রাণে পিছিয়ে থেকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ব্যাটিং সুরু করে এবং দিনের শেষে ৪৫ রাণ সংগ্রহ করল। এভারটন ও সোবার্স ছাড়া কেউই প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা দেখাতে পারলেন না। ২৬১ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হওয়ায় এক ইনিংস ও ৩৬ রাণে পরাজিত হল।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস—১২৭ (আর কানহাই ৩৪, স্মিথ ২৫, বেলী ৪৪ রাণে ৭ উইঃ ট্রুম্যান ৩০ রাণে ২ উইঃ)।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস—৪২৪৪ (কাউড্রে ১৫২, ইভান্স, ৮২, রিচার্ডসন ৭৬, ট্রুম্যান নট আউট ৩৬, ক্লোজ ৩২, গিলক্রিষ্ট ১১৫ রাণে ৪ উইঃ ওরেল ১১৪ রাণে ২ উইঃ সেবার্স ২৮ রাণে ২ উইঃ)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—২য় ইনিংস—২৬১ (উইক্স ৯০, সেবার্স ৬৬ নাইরন আসগার আলী ২৭, ওয়ালকট ২১, বেলী ৫৪ রাণে ৪ উইঃ ষ্ট্যাথাম ৭১ রাণে ৩ উইঃ ট্রুম্যান ৭৩ রাণে ২ উইঃ)

[ইংলণ্ড ১ ইনিংস ৩৬ রাণে বিজয়ী]

টুকরো খবর

রেফারী পি, চক্রবর্ত্তী বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় একটি খেলা পরিচালনা করার আমন্ত্রণ পেয়েছেন। এ সংবাদ চক্রবর্ত্তীর নিজের পক্ষে ও কলিকাতা রেফারীজ এসোসিয়েসন তথা ভারতের পক্ষে গৌরবের কথা।

ভারত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় এখনও পর্য্যন্ত নির্লিপ্ত, তথাপি ভারতের কাছ থেকে খেলা পরিচালনার জন্ম সাহায্য চাওয়া ভারতীয় রেফারীর যোগ্যতার পরিচায়ক। বহিরাগত যত দলই কলকাতায় সফর করে গেছেন, তাঁরা খেলার পরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শ্রী চক্রবর্তীর এ সম্মানে প্রতিটি ভারতবাসী গৌরবান্বিত।

* * * *

ভারতের টেনিস পটীয়সী মিস রিতা জেভার একজন জার্মাণ পিয়ানো-বাদকের সংগে গত ১৮ই এপ্রিল বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হয়েছেন। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হলেও রিতা টেনিস খেলার সম্পর্ক ত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত করেছেন। ব্যাডেন ক্লাবের সভ্যা হিসাবে তিনি বিভিন্ন টেনিস খেলায় অংশ গ্রহণ করবেন। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায়, রিতার স্বামী রলফ হান্স মুলার একজন পিয়ানো-বাদক হলেও তাঁরও টেনিসে সুন্দর হাত আছে। দাম্পত্য জীবন সুখের হোক, এই কামনাই করি।

* * * *

ইংলণ্ডের কীর্তিমান ক্রিকেট খেলোয়াড় ডেনিস কমটন প্রথম শ্রেণীর খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ইংলণ্ডের ক্রীড়াক্ষেত্রে কমটন জনপ্রিয় খেলোয়াড়। একাধারে ফুটবল ও অপর দিকে ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে এতখানি গৌরব অর্জ্জন কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি!
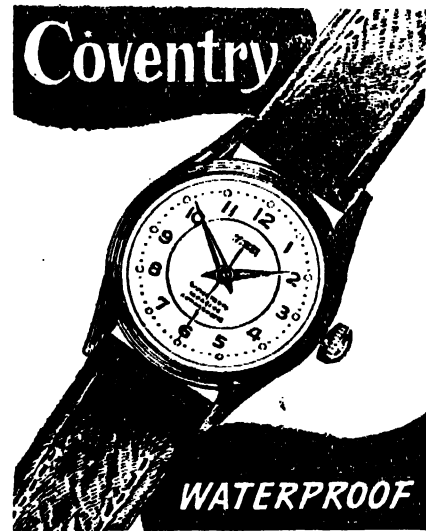
অধরের লিপষ্টিক
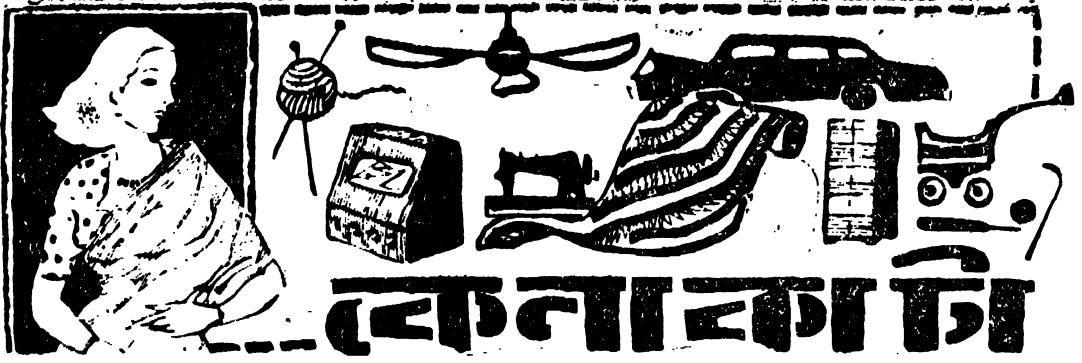
লিপষ্টিকের সুষ্ঠু প্রয়োগ আপনার সৌন্দর্য মহনীয় করে তুলবে, কিন্তু এর অপপ্রয়োগে তেমনি সৌন্দর্যের হানি হতে পারে। যদি আপনার স্বামী কিংবা পুরুষ-বন্ধু সাধারণ মানুষ হন, তাহলে তাঁদের কাছে লিপষ্টিক ব্যবহারের নিন্দা শুনতে শুনতে আপনার হয়তো মনে হবে, তাঁরা লিপষ্টিক আদৌ পছন্দ করেন না। কিন্তু তা সত্য নয়। সুন্দর এবং পরিষ্কার থাকলে যে কোন মানুষই উজ্জ্বল লাল অধর পছন্দ করেন। অনেক সময়ে দেখা যায়, ঠিক ঠোঁটের ওপর একটু লিপষ্টিক অত্যন্ত অযত্নের সংগে লাগানো আছে, আর কফি বা অন্য কিছু খেতে গিয়ে তাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। এমনি করে লিপষ্টিক ব্যবহারেই ওঁদের আপত্তি।

যদি লিপষ্টিক সুন্দর করে ব্যবহার করতে না পারেন এবং যদি এর রং স্থায়ী না হয়, তাহলে এর ব্যবহার নিরর্থক। কিন্তু তা করবেন কী করে? আমরা সেই বিষয়েই এখন আলোচনা করব।

লিপষ্টিকের সুষ্ঠু প্রয়োগের নিয়ম

অন্য সমস্ত প্রসাধনের কাজ সেরে লিপষ্টিক ব্যবহার করবেন। লিপষ্টিক ব্যবহার করবার আগে খুব সাবধানে মুখের সর্বত্র foundation make-up (এক প্রকার তরল প্রসাধন দ্রব্য। পাউডার, রুজ, লিপষ্টিক বা অন্য কোন প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহারের পূর্ব্বে এ বস্তু ব্যবহার করতে হয়) ব্যবহার করুন। বিশেষ করে ঠোঁটে লাগাবার উপর জোর দিন, যাতে ওখানকার শুক ভাঙ্গা ভাঙ্গা না দেখায়। তারপর দেখতে হবে আপনার অধর খুব শুষ্ক কি না। এর জন্য আপনি কমনীয় পাউডার ব্যবহার করতে পারেন।

এবার লিপষ্টিক ব্রাস দিয়ে লিপষ্টিকের ওপর ঘষুন এবং ওতে লিপষ্টিক ভরিয়ে নিন। ঠোঁটে দেবার সময় প্রয়োজন মত রং ভরে নেবেন ব্রাসে। সব সময় ব্রাস দিয়ে রং দেবেন। সোজাসুজি ষ্টিক থেকে এমন ভাবে নেবেন না যাতে ষ্টিকটা ভেঙ্গে যায়।

আপনার স্বাভাবিক অধর-রেখা ধরে উপরের ঠোঁটটি আগে রং করুন। প্রথমে একদিকের কাজ শেষ করুন এবং পরে অন্য দিক আরম্ভ করবেন, দেখবেন যাতে দুদিকেই সমান দেখায়। এবার নীচে আসুন এবং ঠোঁটের সীমারেখা ব্রাস দিয়ে অথবা একেবারে টিউব থেকে রং নিয়ে ভরিয়ে দিন। মুখের প্রান্ত ভাগ পর্য্যন্ত রং দেবেন। ফলে যখন হাসবেন, তখন সমগ্র অধর অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখাবে। প্রথম প্রথম যাঁরা লিপষ্টিক ব্যবহার করেন এবং এমন কি যাঁরা এ বিষয়ে পটু, তাঁরাও মাঝে মাঝে গোলমাল করে ফেলেন এবং অধরের ঠিক সীমারেখাটি নষ্ট করে ফেলেন। কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই। একেবারে সেঁটে যাবার আগে যে ধারটা একটু নষ্ট হয়েছে, সেখান থেকে অপ্রয়োজনীয় লিপষ্টিক উঠিয়ে ফেলুন এবং একটু গুঁড়ো পাউডার দিন। লিপষ্টিক দেবার পর দু'তিন মিনিট বসে থাকুন, যাতে রংটা বেশ বসে যায়; তার পর 'টিসু' কাগজ দিয়ে জায়গাটা বেশ করে মুছে ফেলুন।

যথার্থ অধররেখা

লিপষ্টিক দেবার পর নিজেকে খুব ভাল করে নিরীক্ষণ করুন। নিজে নিজে কথা বলুন, হাসুন, নিজের ঠোঁট দুটো দিয়ে একটা 'ও' তৈরী করুন। যদি আপনার মনে হয় কাজ এবং বিশ্রাম—সব সময়েই আপনাকে সুন্দর দেখাচ্ছে এবং দেহের অন্যান্য অংশের সাথে আপনার অধরের একটা সামঞ্জস্য আছে, তাহলে জানবেন, যে অধরচিত্র আপনি তৈরী করেছেন তা যথার্থ। কিন্তু ঠোঁট দুটো যদি খুব ছোট বা বড় দেখায়, কিংবা একটু ঝুলে পড়ে, তাহলে এর কতকগুলি প্রতিষেধক আছে।

যদি আপনার ঠোঁট আপনার মুখের তুলনায় খুব ছোট এবং সরু হয়, তাহলে আপনার স্বাভাবিক অধররেখার সমান্তরালে সমগ্র অধর-চিত্রটি বর্দ্ধিত করুন। যদি তা খুব বড় হয়, তাহলে foundation make up আর পাউডার দিয়ে স্বাভাবিক অধররেখা টানুন। এটা আগের মতই স্বাভাবিক রেখার সামান্তরালে থাকবে, কিন্তু একটু ভিতরের দিকে। যদি নিচের ঠোঁট একটু ঝুলে পড়ে, তাহলে অধর-চিত্র নিচের ঠোঁটের মাঝখান থেকে আরম্ভ করুন এবং ঝুলে পড়া লাইনগুলোর মাঝ দিয়ে একটি নতুন সোজা লাইন দু'দিকের সীমা পর্য্যন্ত নিয়ে যান।

আপনার লিপষ্টিক ব্রাস আর লিপষ্টিক একজন প্রসাধনশিল্পীর মত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করুন। আর ক্রমাগত অভ্যাসে আপনি সত্যিকার শিল্পীর মতই এর ব্যবহার করতে পারবেন।

—শ্রীসরোশ মোদি (লাকমে)

চলচ্চিত্রশিল্প ও বৃটেন

বিশেষ ধরণের সাহায্য ব্যবস্থা ছাড়া বৃটেনের ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রি বা বৃটিশ চলচ্চিত্র-শিল্পের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা স্বাভাবিক অবস্থায় কঠিন হতো। কতকগুলো ব্যবস্থা সম্পর্কে সেখানে বেশী রকম কড়াকড়ি হয়ে থাকে—এর মুখ্য লক্ষ্য বলতে কিছুটা মর্য্যাদা আর বাকীটা বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয়।

রপ্তানী-বাণিজ্য থেকে বৃটেনের এই শিল্পটিতে যে আয় হতে

পারে, তার মোট পরিমাণ হবে প্রায় ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু তার চেয়েও বেশী আয় হয়ত সম্ভব—আমদানীকৃত ফিল্ম বাবদ ডলার ব্যয় বাঁচিয়ে।

বৃটিশ ফিল্মশিল্পক্ষেত্রে সাহায্যের একটি সবচেয়ে বলিষ্ঠ পন্থা হচ্ছে 'কোটা' বা বরাদ্দ ব্যবস্থা। সেখানকার সিনেমা-ভবনগুলোতে দেশী ছবিগুলো কি পরিমাণ দেখাতে হবে—বেঁধে দেওয়া আছে সেইটি। আলোচ্য ব্যবস্থাটির লক্ষ্য কিন্তু অধিক সংখ্যায় বৃটিশ ফিল্ম তৈরীর জন্যে উৎসাহ দেওয়া নয়, পরন্তু আগে থেকে তৈরী ছবিগুলো যাতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রদর্শিত হ'তে পারে—তারই নিশ্চয়তা বিধান। ছবি নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ থেকে ছবির মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত সময় সাধারণতঃ প্রায় ১৮ মাস। এই ভিত্তিতে প্রতি বছরই নির্ম্মীয়মান বা নির্ম্মিত ছায়াছবিগুলোর বরাদ্দ নির্দ্ধারণ করে দেওয়া সম্ভবপর।

বৃটেনে ছায়াছবি সমূহের প্রদর্শন সম্পর্কে যাতে নিশ্চয়তা থাকে, এই উদ্দেশ্যে এক দিকে 'কোটা' বা বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু যেমন আছে, অপর দিকে নেশন্যাল ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন ফিল্মগুলোর নির্ম্মাণে সাহায্য করে চলেছেন। প্রতিটি ফিল্মই যে সাহায্য পাবে, এমন নির্দ্দিষ্ট কোন কথা নেই। সাধারণতঃ সে সকল ক্ষেত্রেই অর্থ সাহায্য করা হয়, যেখানে প্রযোজক বড় একটি ডিষ্ট্রিবিউটার ফার্ম্মের কাছ থেকে আগে ভাগেই ছবি ডিষ্ট্রিবিউশনের গ্যারাণ্টি আনতে পারেন। গ্যারাণ্টি দেওয়া থাকতে হ'বে এই মর্ম্মে—ছবি নির্ম্মাণ ব্যয়ের শতকরা ৭০ ভাগ ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী বহন করতে প্রস্তুত থাকবেন, যে [illegible] অবস্থায়। বাজার থেকে শেষ অবধি রাজস্ব যদি সেই পরিমাণে না উঠে এলো, তবে এই গ্যারাণ্টির মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। ব্যয়ের অবশিষ্টাংশের শতকরা ৩০ ভাগের জন্য প্রযোজক বা ছবিনির্ম্মাতা কোম্পানীই দায়ী থাকেন। অন্যথা একটা মোটা অংশ ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনকেই বহন করতে হয়।

এযাবৎ নেশন্যাল ফিল্ম কর্পোরেশন অবশ্যি তেমন ক'জন প্রযোজককেই অর্থ সাহায্য করতে পারতেন, বাইরের সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ যাঁদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। কিন্তু এক্ষণে নতুন আইন ব্যবস্থা হচ্ছে—যাতে করে এই ধরণের কড়াকড়ির বিলুপ্ত ঘটবে।

হিসাব অনুসন্ধান করে দেখা গেছে—১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত চার বছর কাল মধ্যে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন ১৫২টি বৃটিশ ফিল্ম বা ছায়াছবির নির্ম্মাণে অর্থ সাহায্য করেছেন। এই ১৫২টি ফিল্মের মধ্যে ৬২টি ক্ষেত্রেই মুনাফা অর্জ্জিত হয়েছে। উক্ত ছবিগুলো অবশ্যি একই সময়ে বৃটিশ ফিল্ম প্রোডাকসন ফাণ্ড থেকেও সাহায্য পায়। ফিল্ম কর্পোরেশন যে সাহায্য যোগান, বৃটিশ বাণিজ্য-বোর্ডের সরবরাহকৃত অগ্রিম অর্থই এইটির সূত্র। মোটের উপর বৃটেনে চলচ্চিত্র-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে, একে আরও বড় করবার লক্ষ্য থেকে সরকারী পর্য্যায়ে বহুবিধ চেষ্টা অবলম্বিত ও পন্থা অনুসৃত হয়ে আসছে সেই থেকেই।

এ দেশের তাঁতশিল্প

তাঁতশিল্প শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের অন্যতম প্রধান কুটীরশিল্প। আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তাঁতশিল্পের অবদান অস্বীকার করবার উপায় নেই। ইতিহাসেই দেখা যায়—অতীত ভারত বহু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করত, তাঁত-শিল্পজাত পণ্যের ব্যবসায় থেকে। ইংরেজ শাসনে পিষ্ট হয়ে এই শিল্প পিছিয়ে পড়েছিল বহুদূর—কিন্তু এক্ষণে দেশ অধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ায় এর পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলেছে এবং এইটি নিশ্চয়ই প্রত্যাশিত ছিল।

একটা জিনিস প্রথমেই লক্ষ্য করবার—আজিকার ভারতেও অন্যান্য যে কোন শিল্পের চেয়ে তাঁতশিল্পে নিযুক্ত শিল্পী ও কারিগরের সংখ্যা বেশী। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য-সচিব শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগোর মতে এই শিল্পের মারফতে দেশের ৩০ লক্ষাধিক ব্যক্তির কর্ম্মসংস্থান হচ্ছে। অপর একটি হিসাবে জানা যায়—সমগ্র ভারতে ২১ লক্ষ তাঁতে নিযুক্ত শিল্পী ও কারিগরের সংখ্যা হবে প্রায় ৮৭ লক্ষ। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই তাঁতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজারের কম হবে না এবং কর্ম্মীর সংখ্যাও হবে প্রায় ৪ লক্ষ। বাংলায় যে সকল তাঁত চালু—সেগুলো তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। উল্লিখিত ১ লক্ষ ৩০ হাজার তাঁতের মধ্যে ১ লক্ষ ১৫ হাজারই হচ্ছে ঠক্‌ঠকি তাঁত, অবশিষ্টগুলো অর্দ্ধস্বয়ংক্রিয় ও হস্তচালিত তাঁত।

সরকার থেকে দাবী করা হচ্ছে—তাঁতশিল্প দেশের বস্ত্র চাহিদার শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ মিটিয়ে থাকে। বস্ত্রকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বস্ত্র উৎপন্ন হয় ১৯৫৫ সালে ১৪৭ কোটি ৩০ লক্ষ গজ এবং ১৯৫৬ সালে ১৫৪ কোটি ১০ লক্ষ গজ। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৬ সালে তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ ১৫ কোটি গজের উপর এবং তার মূল্য প্রায় ১২ কোটি টাকা।

বিদেশী মুদ্রাও ভারত অর্জ্জন করে চলেছে এই শিল্প মারফত ক্রমেই বেশী পরিমাণে। ১৯৫৬ সালে ভারত থেকে রপ্তানীকৃত তাঁত বস্ত্রের পরিমাণ—৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৮৬ হাজার গজ। এতে ভারত ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার সমমূল্যের মুদ্রা অর্জ্জন করেছে। ১৯৫৬ সালে অর্জ্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল—৭ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, সিংহল, মালয়, সুদান প্রভৃতি দেশে ভারতীয় তাঁতবস্ত্র বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তন্মধ্যে সিংহলেই তাঁতবস্ত্র রপ্তানী হয় তুলনামূলক হারে সবচেয়ে বেশী। জার্ম্মাণী, অষ্ট্রেলিয়া, যুগোশ্লোভেকিয়া, পূর্ব্ব-আফ্রিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রেও ভারতীয় তাঁতজাত পণ্যের স্থায়ী বাজার পাওয়ার চেষ্টা চলেছে।

বর্ত্তমান যন্ত্রযুগে এই কুটীরশিল্পটি এখনও অবশ্যি সমস্যামুক্ত হয়নি। এর সর্ব্বাধিক প্রয়োজন হচ্ছে—পর্য্যাপ্ত সুতো সরবরাহ এবং সেই সঙ্গে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি। এদিকে জাতীয় সরকারের মনোযোগী দৃষ্টি পড়ে নি, সে কথা বলা চলে না। পরন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারী সাহায্য বরাদ্দ হয়েছে ৫৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এই শিল্পের উন্নয়নের দাবীতে পুনর্গঠিত পশ্চিমবঙ্গের জন্যও পরিকল্পনা কমিশন প্রায় ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। উক্ত অর্থের সদ্ব্যবহার যদি হয়, তবে এদেশে তাঁতশিল্পের দ্রুত অগ্রগতি না হয়ে পারে না।

নীলকণ্ঠ

তেইশ

B. N. G. S.—এই ইংরাজি আক্ষরে মুদ্রিত যে সাংকেতিক বাংলা বাক্য, তার পাঠ উদ্ধার করা শক্ত নয় অনেকের পক্ষেই। বিলাত না গিয়ে সাহেব। বিলাত ফেরত বাঙালীদের অনেকেরই মোসাহেবীর প্রবৃত্তি কেটে যায়। কেটে গিয়ে উদ্বোধন হয় স্বাধীন মনোবৃত্তির। বিলাত দেশটা যে মাটির, সোনা-রূপার নয়, এ বিশ্বাস দৃঢ় হতে ডি, এল, রায়ের হাসির গানই যথেষ্ট নয়; তার জন্ত বিলাতের মাটিতে একবার পা দিতেই হয়। বিলাত না গিয়ে সাহেব যারা, তারা বিলাতের মাটিতে পৌছতে না পারার কারণেই কিন্তু ভয়ঙ্কর। এদের সম্বন্ধেই গল্প আছে। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত গাল-গপপো। উনবিংশ শতাব্দীতে বিলাত গিয়ে এবং বিলাত না গিয়ে সাহেব, দু'দলই ছিল উগ্র মোসাহেব। ইংরাজি ধ্যান, ইংরাজি জ্ঞান এমন কি ইংরাজিতে অজ্ঞান হতে পারলেও তারা নিজেদের কৃতার্থ মনে করত। মদ না খেলে এবং গোমাংস ভক্ষণ না করলে তাদের ধারণা নয় শুধু; বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে ভালো ইংরাজি বলা অসম্ভব। এইরকম দুজন ইংরাজ হতে বদ্ধপরিকর বাঙালী হোটেলে গেছে গরুর মাংস খেয়ে সাহেব হ'তে। অনেক রাতে হোটেলে যাওয়ায় গোমাংস মেলেনি। মাংস নয় কেবলমাত্র, নাড়ি-ভুঁড়ি, হাড়, লেজ, শিং, কিসসু না মিলতে শেষ পর্যন্ত তারা খানিকটা গোবরের অর্ডার দিয়েছে। গোবরে শুধু পদ্মের নয়, গরুর এবং সেই কারণে ইংরাজির গন্ধ আছে যে!

এই বিলাত না গিয়ে সাহেবদের বদলে তাদের বংশধরেরা আজ টলিউডের ভেতরে না ঢুকে ফিলম উন্মাদ হয়েছে। তারাই ভয়াবহ। তারাই বিষাক্ত করেছে কলকাতার হাওয়া। এদের দেখতে পাবেন উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম কলকাতার তিন, চার পাঁচ রাস্তার মোড়ে সাজুভেলী, কফিহাউসে সিগারেটের আগুনে আলো করে বসে দশ দিক। মুখে দিগ্বিজয়ীর হাসি: ছবিদা আজ যেতে বললে তাঁর কাছে; জানিস। বিমল রায়ের ছবিতে লোক খুঁজছিল, এ শর্মাকে দেখবার পর লোক খোঁজার হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেয়ে গেছে। দেবকী বোস বললেন বোম্বাই না যেতে, কি করব তাই ভাবছি। যে বলল সে উঠে যেতে না যেতে তার জায়গা নিল যে সে মন্তব্য করল: গুল! সেরেফ গুল! আমি বলছি, ছবিদা ওকে দেখেই নি, দেখলে আমাকে অন্তত একবার জিজ্ঞেস করত। এদের মধ্যে কেউ কেউ এক আধবার ছবিতে ভীড়ের দৃশ্যে দাঁত বার করে হেসেছে। কেউ কথাও বলেছে এক-আধটা। আধা, তিনপোয়া মন্ত্রীদের মত এরা আধা, তিনপোয়া একটর। এরাই হচ্ছে সাজুভেলীতে-এই ফিলম পাগলদের হিরো।

মদের বদলে যাতে মদের মতই মজা সেই আমোদ, ginএর বদলে আজ সেই বস্তুরই নাম যাই হক তার আসল পরিচয়, সিনেমা। এরা সিনেমা ছাড়া দেখে না; সিনেমার কাগজ ছাড়া পড়ে না; ষ্টুডিওর আনাচ কানাচ ছাড়া ঘোরে না। এদের ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন, রূপালী পর্দা। ঘড়ি আংটি বেচে, কাবুলীর কাছে ধার করে। তিনটে ছটা নটায় রূপালী পর্দা এদের যেমনি করে টানে মদ যেমন করে মাতালকে, আফিং যেমন করে আফিংখোরকে। অভিনয় ক্ষমতার প্রয়োজন নেই, বিদ্যাবুদ্ধি অনাবশ্যক, শুধু একটা চান্স, একটা চান্সের অপেক্ষা শুধু। এদের মধ্যে সবাই যে অভিনয়-পাগল কেবল, তা নয়। কেউ কেউ অবার টেকনিশিয়ান হতে চায়। সিনেমার টেকনিশিয়ান। ক্যামেরাম্যান, সাউণ্ড রেকর্ডিষ্ট, ফিলম এডিটর, নাহলে নিদেনপক্ষে পরিচালকের সহকারী। এদের সংখ্যা অবশ্য কম। বেশির ভাগেরই স্বপ্ন; দুর্গাদাস, অশোককুমার, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল। এঁরা অবশ্য নিশীথ রাত্রির নীল স্বপ্ন। দিবাস্বপ্ন হচ্ছে অবশ্য সেই এক—উত্তমকুমার।

স্কুলের ছেলেপিলে যারা ম্যাটিনী শোতে স্কুল পালিয়ে কিউ দিচ্ছে প্রেক্ষাগৃহের সামনে, তারা টাকাটা পাচ্ছে কোথায়? তারা বই বিক্রী করে, স্কুলের মাইনে না দিয়ে জোগাচ্ছে এই টাকা। তাদের উসকানি দিচ্ছে ফিলমের কাগজ। মেয়েছেলের ছবি ছেপে, ফিল্মষ্টারের অলীক জীবনের আরব্যোপন্যাস রচনা করে অপটু হাতে ফিল্ম-পত্রিকাগুলি নিজেদের ভবিষ্যৎ গুছোবার অনেক আগেই নষ্ট করছে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা ভেবে ভেবে কূলকিনারা পাবে না উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে আসতে না আসতেই কি করে এতদূর ক্লীব হয়ে গেল। আগামী কালের সেই প্রশ্নের উত্তর মুদ্রিত রইল এখানে।

কিন্তু তীর এসেছে কি একদিক থেকে? না। তীর আসছে চতুর্দিক থেকে। যেদিক লক্ষ্য করবার কারণ পাওয়া যায়নি এখন তীর আসছে সেদিক থেকেই। স্কুল সেমিফাইন্যালের (স্কুল ফাইন্যালে এরা বসে বটে, কিন্তু ওঠে না আর, প্রতি বছরেই বসে একবার)। ছেলেরা জ্ঞানপাপী। তারা বোঝে তারা কি করছে। তাই তাদের জন্ত দুঃখ হলেও, দুঃখ করে লাভ নেই। কিন্তু নূতন হুজুগ এসেছে রূপালী পর্দায় বাচ্চা বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ছবি করার হুজুগ।

এর চেয়ে অন্যায়, এর চেয়ে ভয়াবহ আর কিছু ঘটা অসম্ভব। এর চেয়ে বড় ঘটনা, দুর্ঘটনা অকল্পের। রূপালী পর্দায় বাচ্চাদের আশ্চর্য অভিনয়কে টিকিট কেটে হাজারো হাততালিতে অভিনন্দিত করেই দর্শকদের কর্তব্য শেষ। কিন্তু রূপালী পর্দার অন্তরালে এই সব বাচ্চাদের জীবনে কি বিপ্লব ঘটে যায় এর ফলে আমরা কি কোনদিন তার খবর রাখি? রাখার প্রয়োজন মনে করি একবারও? না। করি না, কারণ তারা আমাদের কেউ নয়। কিন্তু করি না বলে যেন ভুলে না যাই যে আমরা যে ঘরে বাস করছি তা-ও তাদের ঘর। ঝাপটার ঢেউ সেখানে এসে পৌঁছুতেও দেরী নেই বেশি।

এই সব বাচ্চারা, কেউ স্কুলে পড়ে, কারুর হাতেখড়ি হয়েছে হয়ত কেবল মাত্র। এদের পর্দার ওপর অভিনয় কখনও কখনও এত দূর বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয়ে প্রদীপ্ত যে হতবাক হতে হয় আবালবৃদ্ধবনিতাকে। বালক অথবা বালিকা গুণী তাই বিশ্বজয় করে যখন তখন আমরা স্বতঃই হার মানি, বলি: একি গো বিস্ময়। কিন্তু বিস্ময় এর এক দিকে। অন্য দিক যে কত দূর বেদনার, ভয়ের, অথবা দুঃখের আমরা যদি জানতাম তাহলে শুধু তারিফ করেই ক্ষান্ত নিষ্ক্রান্ত হতাম কি না প্রেক্ষাগৃহ থেকে বলা শক্ত। আগেকার যুগের রূপালী পর্দাতেও বালক-বালিকার সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। তারাও অভিভূত করেছে অভিনয় পারঙ্গমতায়। কিন্তু সে ঘটনা কালেভদ্রে, নীল চাঁদে একবার, ইংরেজিতে যাকে বলে once in a blue moon, ঘটত। তা নিয়ে মাথা ব্যথা করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আজ কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট ছবিতেও কুশীলবদের তালিকায় অপ্রাপ্ত বয়স্কদের আবির্ভাব অপ্রচুর নয়। সেই হচ্ছে ভয়ের কথা; ভয়ঙ্কর কথা হচ্ছে সেই। হাতেখড়ি হবার আগেই যারা খড়ি মাখতে বাধ্য হয় মুখে তারা একদিন চূণ-কালি মাখতেও যে পেছপাও হবে না, সে এমন আর বেশি কথা কি?

এই সব বাচ্চাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করে দেখা যাক অতঃপর। এদের মধ্যে যে সব স্কুল-তারকা আছে তাদেরই বর্তমান সবচেয়ে দূষিত এবং ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। এরা প্লে করে অভিনন্দিত হবার পর যখন ক্লাসে এসে আর সব ছেলেদের ঈর্ষার পাত্র হয়, তখন ঈর্ষার কারণটা কিন্তু রাতারাতি মহৎ হয়ে দাঁড়ায় না। বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রমকে ঈর্ষা করা এক বস্তু আর সিনেমাষ্টারকে ঈর্ষা করা সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। অন্য সব দুগ্ধপোষ্যেরা তখনই পড়ার বই ফেলে ফিল্মের কাগজ মেলে ধরে। তখন থেকেই তাদের জীবনে আদর্শ হিসাবে মুদ্রিত হয়ে যায় বিদ্যাসাগরের নয়, পাহাড়ী সান্যালের মুখ। কি হবে পড়াশুনো করে? সেই ত' দাদা-বাবার মত কেরাণীগিরী করে সারা জীবন সংসারের বোঝা বয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মরা একদিন। তার চেয়ে পার্ট মুখস্থ করা কত 'রোমান্স'র, কত আশার, কত আরাধনার। তাদেরই একজনকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে তারা চেয়ে চেয়ে দেখে। তার মুখে গল্প শোনে টালিউডের। কিছু সত্য, কিছু বানানো। কিছু অলীক, কিছু অলৌকিক। ঘুম চলে যায় চোখ থেকে, দিবাস্বপ্ন দেখে জেগে জেগে। বার্ষিক পরীক্ষার বদলে বচ্ছর ভোর 'পরী'-কল্পনায় বিভোর বালক টিকিট না কেটে চড়ে বসে বোম্বাই অথবা মাদ্রাজ মেলে। ধরা পড়ে মাঝপথে খবর কাগজের হেডলাইন হয়; মাথা ঘুরে যায় আমাদের।

আর যে বাচ্চাটি রাতারাতি ফিল্মষ্টার হয়, তার? তার অবস্থা আরও দুঃসহ। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘর থেকে ষ্টুডিওর গাড়ীতে করে একদিন সে বেরোয়, ফিরে আসে দিগ্বিজয় করে। মুহূর্তে বিস্বাদ হয়ে যায় ঘরের ডালভাত। বাপমাকে মনে হয় শত্রু। পরিবেশকে জঘন্য। সিনেমাকে সত্য মনে করে, জীবনকে সিনেমা। তারপর টাকা পায় যেদিন সেদিন থেকেই ধরাকে সরা মনে করে। তাই টাকায় সংসার চলছে বোঝে যেদিন, সেদিন থেকেই সংসার অচল হয়। সবাই বোঝায় এখন এই টাকা, যত বড় হবে তত টাকাও বড় অঙ্কে। বাচ্চা দামড়া হওয়া মাত্রই বাতিল হয় টলিউড থেকে। শুধু টলিউড নয়, সংসার থেকেই বাতিল হয়ে বাকী জীবন ধরাকে সরা দেখার পরিবর্তে সরাইখানার সিঁড়িতে বসে দেশী সং সেজে গড়াগড়ি যায় আজীবন। তাদের খবর খবরকাগজে ছাপা হয় না।

এছাড়াও তীর আসছে আরও একদিক থেকে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে। এখন যাদের কথা বলছি, তারা বাচ্চা নয়, তারা বাচ্চার মা। মা-বোন-বউ-ঝি-এরাও সিনেমা বলতে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গল্পের ভাষায় যাকে বলে গিয়ে ignorant অর্থাৎ অজ্ঞান। সবচেয়ে মারাত্মক, সবচেয়ে সর্বনেশে, সব চেয়ে সর্বস্বান্তকর বিভ্রান্তি হল এই। ছেলেদের মন টিকছে না আর মেয়েদের। মায়েদেরও না। অভাবে যারা আসছে তাদের

কথা নয়; স্বভাবে আসছে যারা তাদের সংখ্যাও কম কিসে? বিদুষীরা বেরিয়ে পড়েছেন টলিউডে। স্বামী কর্মস্থলে, স্ত্রী রঙ্গস্থলে, ছেলেমেয়েরা বিরাট ফ্ল্যাট বাড়ীতে লিফট-ম্যানের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে মানুষ হচ্ছে। বিদুষীদের কথা বাদ দিই; সব দেশে, সব কালেই ফ্লবেয়ারের ম্যাডাম বোভারী আছে এবং থাকবে। ভয় তাদের নিয়ে নয়। ভয়, মধ্যবিত্ত ঘরের বউরাও মজেছে। রাধা মজেছিলেন কৃষ্ণের বাঁশী শুনে। এযুগের তরুণীরাও পাগল হয়েছে সিনেমার ডাক শুনে; পাবলিসিটির সিটি শুনে। ঘর রাখা যাবে না আর। ঘরে ঘরে অভাব আছে হাঁ-করে। যেখানে নেই সেখানেও হাঘোরে স্বভাব টানছে মধ্যবিত্ত ঘরের বউদের রূপালী পর্দায় নায়িকা সাজতে। পর্দানসীন ছিল মেয়েরা একদিন। একরকম ছিলো তারা। আজ তারা রূপালী পর্দানসীন হতে আরম্ভ করেছে। এখন আর এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

এর পরেও দিক আছে তীর এসে বেঁধার। এবার যাদের কথা বলছি তারা দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য। এরা, এই সব মেয়েরা টলিউডে জায়গা না পেয়ে এমেচর থিয়েটারে দশটা টাকার জন্য গিয়ে হাজির হচ্ছে যে কোনও দলের দরজায়। ঠকছে; তার পর ঠকাচ্ছে। ড্যালহউসী স্কোয়ার জুড়ে সন্ধ্যের পর, অথবা শনিবার অফিস ছুটির পর অফিসের ঘরে বসেই রিহার্সাল দিচ্ছে। এ রিহার্সাল থিয়েটারের নয়; অভিনয়ের নাম করে এ হচ্ছে বজ্জাতির মহড়া। থিয়েটারে রিহার্সাল দেওয়াটা বড় কথা নয়, কে কাকে নিয়ে বাড়ী পৌঁছে দেবে আনবে তাই নিয়েই নাটক। ড্যালহউসী স্কোয়ারের অফিস-পাড়ার মধ্যে সুরু হয়ে গেছে এই পোষ্ট অফিস লীলারঙ্গ। এখন সেখানে আটকে না থেকে পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ওর বীজাণু। মহড়া দেওয়া চলছেই সন্ধ্যে হতে না হতেই, কোথাও না কোথাও। দেখলে মনে হবে সংস্কৃতির অনুষ্ঠান আয়োজন করতে সারা দেশটাই বোধ হয় রাতারাতি জেগে উঠেছে। না। সংস্কৃতি চর্চা নয়; দুষ্কৃতির দুর্গোৎসব এগুলি। বিকৃতির দোলযাত্রা। সার্বজনীন Rogueদের ছোঁয়াচে রোগের জীবন্ত ডিপো একেকটি।

আগে যে সব অভিনয় পাগলদের কথা লিখেছি তাদের জন্যই কবির বক্তব্য: প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে! এ প্রেম প্রেমিকের নয়, প্রতারকের। তারা এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সাইনবোর্ড ঝোলায়। কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়: ছায়াছবিতে অভিনয়ের জন্য তরুণ-তরুণী চাই। বিজ্ঞাপনে রাঘব-বোয়াল ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে চুনো-পুঁটি। ভয়েস টেষ্ট, ক্যামেরা টেষ্ট ইত্যাদির নাম করে দফায় দফায় দফারফা হয় চুনোপুঁটিরা। তরুণরা পায় নাকের বদলে নরুণ! তরুণীদের যা যায় তার বদলে কিছু পেয়েই, কোন ক্ষতিপূরণেই, কোন কালে কোন মেয়েরই ক্ষত আর যাবার নয়। শুধু যাবার যারা তারা রাতারাতি সাইনবোর্ড পাল্টে চলে গেছে আবার নূতন ঠিকানায়। পড়ে থাকে তারাই যারা ঘরেও নহে, পারেও নহে। সেই, যে জন আছে মাঝখানে!

চব্বিশ

এ সব কথা যেতে দেওয়া যাক আপাততঃ। সমুদ্র মন্থনে শুধু গরল উদ্ধার করে লাভ নেই। বরং এই এক কথা, একঘেয়ে কথা শুনতে শুনতে অদ্য ও প্রত্যহ, বিরক্তির উদ্রেক হওয়া আশ্চর্যের নয়। তার বদলে এখন পরিবেশন করা যাক চানাচুর। এখন টাটকা আছে; এখনই করা যাক। চানাচুর অথবা ঘুঘনি দানা বাসি হলে আর কেউ খাবে'না। এখন এতক্ষণ যাদের কথা বলছি তারা সব কল্পনার রোগাক্রান্ত। যদিও টলিউড কল্পনার স্বর্গরাজ্য, তবু সেখানে কল্পনাতীত বাস্তব কাণ্ডও ঘটে বই কি কিছু কিছু। সেই রকম একটি বাস্তব চরিত্রের অবতারণা করা যাক অতঃপর। তার নাম দেওয়া যাক, কল্পনাতীত ভট্টাচার্য।

যার কথা বলছি সে সত্য সত্যই কল্পনাতীত এক অভিজ্ঞতা। টলিউডের কল্পরাজ্যেও এখনও তাকে অতিক্রম করতে পারে নি কেউ। যার কথা বলছি তার আসল নাম জানার জন্য কৌতূহলী হওয়ার এতটুকুও কারণ নেই। নিরর্থক। কারণ, উত্তমকুমার ছবি চালায়; উত্তমকুমারকে চালায় উত্তম-মধ্যম-অধম চিত্র-পরিচালকরা। যার কথা বলছি সেই কল্পনাতীত চালায় পরিচালকদের। পরিচালকদের, কাহিনীকারদের, প্রয়োজন হলে প্রেক্ষাগৃহের মালিককে। মায় পাবলিসিটি অফিসারকে নির্দেশ দেয় লিখুন! পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রশংসিত। পাবলিসিটি অফিসার যদি পণ্ডিতম্মন্য না লিখে, শুধু পণ্ডিত লেখে, তাহলে তাকে অকর্মণ্য মনে করে জবাব দেয়। পণ্ডিত শুনতে কত হালকা! আর পণ্ডিতম্মন্য? কত গভীর দ্যোতনা-ব্যঞ্জক বাক্য!

কল্পনাতীত: যদি টলিউডের লোক না

হয়ে ইনস্যুরেন্সের লোক হত কি কারখানার মালিক হত, তাহলে তাকে নিয়ে তৈরী হত খবরকাগজের সম্পাদকীয়। চেম্বার অফ কমার্সের বার্ষিক উৎসবে তার মুখ থেকে শুনে খুসী হত সবাই তার সেক্রেটারীর লেখা বক্তৃতা। হয়ত কালে মন্ত্রী হত সে। আবক্ষ মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচিত হত মৃত্যুর পূর্বেই। রাস্তার নাম হত তার নামে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারশিপ আকর্ষণীয় হত তার পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। ছায়াচিত্রের প্রযোজক হওয়ার ফলে এসব কিছুই জোটেনি কল্পনাতীতর কপালে। না জুটুক। সেখানে রাজটীকা পরিয়ে দিয়েছে তবু অর্থ আর সামর্থ্য। জীবনযুদ্ধে জয়যুক্ত হতে বাধা হয় নি তার। সেই বা কম কি!

কম সে নয়, কল্পনাতীতর অতীত যারা জানে, তারা জানে। কত দুস্তর পথ পেরিয়ে, কত কৌশল, ধৈর্য, বুদ্ধি এবং ভাগ্য ভরসা করে আজ সে সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে পৌঁছেচে, কল্পনাতীত রাজনৈতিক নেতা অথবা মার্চেণ্ট নয় বলেই তা বাইরের লোকের কাছে বদ্ধপুস্তক। আট টাকা মাইনের প্রোডাকশন বয় ছিল সে একদিন ষ্টুডিওতে। কাজ ছিল মেয়েদের গাড়ী করে আনা এবং বাড়ী পৌঁছে দেওয়া। মেয়ে মানে,—রক্তচক্ষুস করা কোনও উর্বশী নয়; নয় কোনও ভারত বিখ্যাত ফিলম্ ষ্টার। মেয়ে মানে ক্রাউডসিনে মুখ দেখান মাংসের স্তূপ, সন্ধ্যা হলে যারা গলির মোড়ে ল্যাম্পপোষ্টের তলায় দাঁড়ায়। মেয়ে নয়, স্ত্রীলোকের প্যারডি। নারীর জীবন্ত ব্যঙ্গচিত্র।

সেইখানে আরম্ভ। সেইখানে শেষ নয়। মেয়েছেলে তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে নি। কর্মের অসম্মান করতে পারে নি লাইনচ্যুত। এই লাইনেই বড় হবে, এই ছিল প্রতিজ্ঞা। নিঃসম্বল অবস্থা থেকে অর্থে সিদ্ধ হয়েছে কল্পনাতীত। সামর্থ্যে সিদ্ধার্থ। আজও সংগ্রামবিমুখ নয় সে। নারী, মদ অথবা আড্ডা কোনটাতেই আজও মজে নি দুলোমজার রাজ্য এই টলিউডে। পিছন ফিরে তাকালে মনে পড়বে সেদিনকার কথা। পূর্ণ থিয়েটার থেকে টেলিফোন করেছেন স্বর্গতঃ সুবিখ্যাত গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য। কল্পনাতীত টেলিফোন ধরে জিজ্ঞেস করেছে: কে কথা বলছেন। অজয় ভট্টাচার্য রেগে বলেছেন; আমি অজয় ভট্টাচার্য; আপনি কে?

—আজ্ঞে, আমি শুধু ভট্টাচার্য,—জবাব দিয়েছে কল্পনাতীত। কল্পনাতীতর এই উত্তরে নীরব হয়েছেন গীতিকার। পরে বলেছেন; লোকটা করে খাবে।

এই পরিহাসবোধ আজও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেনি কল্পনাতীতকে। একজন ক্যামেরাম্যানকে কল্পনাতীত অতি বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার করায়, বেশ নড়েচড়ে বসে, প্রতিনমস্কার করতে করতে জিজ্ঞেস করেছে: প্রভু! আমার প্রতি আবার এত সদয় কেন? করে খাচ্ছিলাম। এবারে বোধ হয় মারা পড়ব! কল্পনাতীত তক্ষুণি করেক্ট করে: ছিঃ! ছিঃ! কি যে বল? তোমরা টেকনিশিয়ানরা সাঙ্ঘাতিক চীজ! বাঁচাতে না পারো, ডোবাতে পার যে কোনও ছবি। টেকনিশিয়ান দেখলে আমি ডরাই। দূর থেকে নমস্কার করি। এমন কি কোনও গর্ভবতী গরু যদি নজরে পড়ে তাকেও প্রণাম করি সাষ্টাঙ্গে। ভগবতীজ্ঞানে নয়। যদি তার পেটের ভেতর কোনও টেকনিশিয়ান ভূমিষ্ঠ হবার অপেক্ষায় থেকে থাকে। কে জানে!

[ক্রমশঃ।

জারি গান

শ্রীজয়দেব রায়

জারি গান ও গাজীর গান, এক শ্রেণীর গোষ্ঠীসঙ্গীত। জারি সম্পূর্ণ ভাবে ইসলামী ধর্মসঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে, হিন্দু কবি ও গায়করা এ গানে অংশ গ্রহণ না করিলেও পল্লীবঙ্গের মুসলমান গৃহস্থদের সঙ্গে হিন্দু গৃহস্থরাও জারি গানের রসগ্রাহী শ্রোতা। হজরত ইমাম হোসেন ও হাসানের কারবালা ট্রাজেডিকে অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ এই শ্রেণীর গান রচিত হয়—

হানেফ বলে, আয় মোর কোলে জয়নাল বাছাধন ;
ওরে যে না পথে দিছিরে দুই ভাই জোড়ের ভাই এমাম হোছেন।
সেই না পথে যাবো রে আমি, করো আমায় গোর কাফন !
ভাই ভাই ব'লে ডাকছে হানেফ আর কি প্রাণের ভাই আছে।
যে বলের বল করলেম রে জয়নাল, সে বল ভেঙেছে ;
জহর গুলে আন রে জয়নাল জহর খেয়ে যাই মরে।

স্বভাবতঃ জারি গানের সুর অতি করুণ ; কাহিনী-সূত্র জানা না থাকলেও কেবল মাত্র সুরের আবেদনেই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠে। 'জারি'র অর্থই রোদন।'

মুন্সী মনসুর উদ্দীন বলিয়াছেন—

"জারি গান বাংলার মুসলমানদের চিরপ্রিয় করুণাত্মক গান। জারি গানের মত ব্যথার সুর অন্য কোন গানে ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এমন তীব্র ভাবে অন্য কোন পল্লীগানে যুদ্ধ করা হয় নাই।"

জারি গানের সুর বেশ গম্ভীর ; উদ্দীপনাময় ও ভাবাত্মক শব্দগুলিই সাধারণতঃ এই গানে ব্যবহৃত হয়—

খোদা খোদা আল্লার কিবা দোস্ত মোহম্মদ,
অজুদে মজুদে সাঁই, দমে কিয়ামত।
বিসমোল্লাতে বিস্ত হয় কিন্তু কারে দয়াময় ;
কোরাণ কয় নামাজ রোজা, বেহেস্ত যাবার রাস্তা সোজা,
হজরতে কয় নামাও বোঝা কর এবাদত।

জারি গানের গীতিরীতিটি কীর্তনেরই অনুসরণে রচিত। এই গানে রামায়ণ গানের ন্যায় একজন-মূলগায়েন পায়ে নূপুর পরিয়া ও হাতে চামর ব্যজন করিয়া গান ধরে, বাকী সকলে কতকটা মার্চের ভঙ্গীতে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধুয়া ধরিতে ধরিতে তাহাকে অনুসরণ করে।

জারি গানের সুরটি মুসলমান চাষী গৃহবাসীদের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত। কবির গান ও পাঁচালী গানের ন্যায় জারি গানের মধ্যেও কয়েকটি তুক ভাগ করা আছে—বন্দনা, মার্সিয়া বা কথা, প্রভাতী ও খেউড়।—

বন্দনা—পরথম আল্লার নাম সার করলাম বল মুখেতে।
আর না হইব মানব জনম এই জনম গেলে।
(আরে ভাই রে) পরথমে বন্দনা করি প্রভু নিরঞ্জন।
যাঁহার কোদ্রতে পয়দা এ তিন ভুবন।
তারপরে বন্দনা করি নবিজীর চরণ।
যাঁহার পিয়ারে পয়দা এ তিন ভুবন।
আমি সব শ্যাষে বন্দনা করি সভাজনের পাও।
যার দৌলতে আজ এখন ছাতু চিড়া পাও।
সভা কইর্যা বইছুন যত হিন্দু মুছলমান।
আপনাদের জনারে আমার অধমের ছালাম।

কথা—আরে ও ভাই রে হোছেন,
কারবালাতে তুমি যাইও না।
কারবালাতে বে-দীন আছে দীন তো মানে না।
ফাঁকি দ্যা কারবালায় নিয়া পানি দিবা না।

দোহার—মরি, হায় হায় হায়।

খেউড়—মূলগায়ক—আমার এই গানের যে করবেন হেলা।
কত শত দুঃখ পাইবেন শুতে যাবার বেলা।

দোহার—ওহো, ব্যাশ, ব্যাশ।

প্রভাতী—কি বি ত্রাহী পরিত্রাহি বাপ রে ও বাপ মলেম মলেম।
কি তামাসা সকল চাষা, ভেবেছিলো রাজা হলেম।
হাতে পলো, কাঁধে লাঠি, লোটে যত ঘটিবাটি।
মাংনা খারো, আল্লার জাতি, ভয়ে ভীরু অবাক হলেম।
দেশের যত হিন্দুর ভদ্র, তারা কি আর আছে ভদ্র।
আমাদের দেখামাত্র মজুর আর বাজার সেলাম।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়ে কোন মুসলমান জারি-গায়ক উপরিউক্ত গানটি রচনা করিয়াছিলেন। প্রভাতী পর্যায়ে এই শ্রেণীর সময়োপযোগী ও আনুষ্ঠানিক গান গাওয়া হয়। কিন্তু জারি গানের আসল অংশ হইল মার্সিয়া ও ধর্মযুদ্ধ। মহরমের করুণ কাহিনী, পয়গম্বরের জীবনী, ইসলাম ধর্ম স্থাপনে কাফেরদের সঙ্গে বিভিন্ন লড়াই প্রভৃতি অবলম্বনেই এই অঙ্গের জারি গানের রচনা।

অনেক জারি গানের মধ্যে যাত্রা গানের ন্যায় নাটকীয়তা ও সংলাপও রহিয়াছে। কাসেম ধর্মযুদ্ধে চলিতেছে, তাহার নব পরিণীতা পত্নী সাকিনা তাহাকে বিরত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

সাকিনা—বিয়ের কালে যুদ্ধে যেতে গো, কেন আকিঞ্চন।
হে, অনাথিনী ক'রে মোরে বিবাহ বাসরে,
কোন প্রাণে প্রাণনাথ চলেছ সমরে হে ॥

কাসেম—হো, মহাকর্তব্যের তরে ওরে সাকিনা।
চলেছি এ ঘোর সমরে কেঁদ না, কেঁদ না রে ॥

সাকিনা—যেও না, যেও না নাথ আমারে ছাড়িয়া।
(যদি) যুদ্ধে যেতে ছিল সাধ, কেন করিলে বিয়া হে···
হে, উদয় অস্তে একই সাথে কে দেখেছে কুথায়?
বিয়ায় ঘরে স্ত্রী রেখে স্বামী যুদ্ধে যায় হে ॥

কাসেম—রণে যদি না যাই পিয়া হাসরের দিনে।
ক্যামনে দেখাব মুখ বাবাজীর সামনে হে ॥

সাকিনা—যাও হে বীরেন্দ্র কাঁদে বাত্র মধ্যিখানে।
ডুবাও এজিদের নাম ছেঁড়া তরী জলে হে ॥

কাসেম—হয়তো আবার দেখা হবে হাসরের দিনে
বিরহ বিচ্ছেদ জ্বালায় নাই গো সেখানে হে ॥

সাকিনা—তুমি যেথা, দাসী তথা জেন গো নিশ্চয়।
আসমুদ্র সীমাময় ঘোষিবে ধরায় হে ॥

সাকিনার অনুনয়ে কাসেম আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে—"রণে ভঙ্গ দিলে প্রলয়ের দিনে আমি কি কৈফিয়ত দেবো?"

সাকিনা তখন কাসেমকে স-সমাদরে রণযাত্রায় সাজাইয়া দিল। এ যেন মহাভারতের উত্তরা-অভিমন্যু পালারই ইসলামী সংস্করণ। আরও করুণতর হইয়া উঠিয়াছে জারি গানে, যখন কাসেমের মৃত্যুতে সাকিনা আকুল স্বরে পতির রক্তাক্ত মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিয়া রোদন করিয়া গাহিতে থাকে—

হা রে ও আমার প্রাণনাথ, এস এস এস প্রাণ হৃদিবাসরে
কে রঙ্গিল সোনার তনুগো খোন খোরাবি আবিরে (হারে)।
ধর ধর গো পিয়া এসেছি প্রাণ পিত্তিমা
বুকে বিন্‌ছ্যা বিষের চিত দেখ নজরে
অঘোর ঘোরে ঘুম দিল লো (হা হা) সাকিনা লো
তোর ঘরে (হা রে)।

এস এস ওগো বর, ধন্য তোমার বাসর ঘর
আমিও লইব শয্যা তোমারি ধারে।
দাঁড়াও দাঁড়াও নাথ গো—(আমি) রক্তচেলি লই পরে ॥
এস তবে প্রেয়সী চল বাসরে বসি
রক্তজবার শয্যাপাতি গায় তিমিরে
নিবিড়ে ঘুমাব দোঁহে গো (উঠব) বাসিবিয়ার হাসরে ॥

বলা বাহুল্য, সাকিনার অংশও পুরুষেরাই গায়, তবে এই অংশটি করুণতর করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য সাধারণতঃ বালকদের কণ্ঠেই তাহা আরোপ করা হয়। বঙ্গবধূ বেহুলার আকুল ক্রন্দনই যেন সাকিনার কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে।

বগুড়া অঞ্চলে প্রচলিত জারি গানে বেহুলার উপাখ্যানও জড়িত আছে—

আমার গান শুনে প্রাণ বাঁচে না ভাই,
ও মোর ছাবেকদ্দিন কইছে তাই
কোথায় যায়ে গানের যোগাড় পাই।
আমার মনে বড় বাঞ্ছা ছিলো গায়ান গায়ে সাধ মিটাই।
(আরে) দুই হাতে দুই খঞ্জরী বাজাই ॥
আরে বয়াতি সংকথা কও,
বয়াতি কও বেউলার কথা,
কি হ'লো বয়াতি বলো চাঁদ সভায় ॥

জারি গানের গায়কদলের নাম 'বয়াতি'।

জারির কথকসুলভ গীতিরীতিটি বাঙলার সকল শ্রেণীর মুসলমান কবিদের মধ্যেই সবিশেষ প্রচলিত আছে। চব্বিশ পরগণা জেলায় এক অখ্যাত জারি কবিগায়ক মহম্মদ গোলাম আকবর রচিত নিম্নের গানটিতে চাষের গুণকীর্তন করিয়াছেন—

সোনার মাঠ সোনার হাট সোনার শস্য-প্রাণ।
এ সোনা উদ্ধারে কত গেছে সোনার প্রাণ ॥
আমরা গাঁয়ের চাষী দল আমরা দেশের বল।
নব যুগের বলরাম সব কাঁধে লব হল ॥
নব যুদ্ধ হবে ভাই রে এ বাঙলার মাঠে।
বাজে মোদের রণবাদ্য বাজে বাঙলার হাটে ॥

জারি গানের সুরে কোন বৈশিষ্ট্য নাই, এ গান কতকটা আবৃত্তি-প্রবণ, রাগরাগিণীর আশ্রয়ে এ গান গীতও হয় না।

গাজীর গান

গাজীর গানেরও মূল বিষয়বস্তু ইসলামী ধর্মপ্রচারকদের কাহিনী। ব্যাঘ্রদেবতা বড় গাজী খাঁ ও কুম্ভীরদেবতা কালু রায়ের কাহিনীও দক্ষিণ-বঙ্গের গাজীর গানের আসরে গাওয়া হয়।

দক্ষিণ রায় ও বড় গাজী খাঁর যুদ্ধের কাহিনীতে গাজীরই সর্বদা জয়লাভ হয়—

তখন, বিষম রাগে গাজীর মূর্তি হৈল ভয়ঙ্কর ;
যুদ্ধেতে চলিলা গাজী হামের দোসর ॥
তখন মারামারি কাটাকাটি (ঠ্যাকাইবা কে ?)
চইল হানাহানি ;
নরমুণ্ড মাছ হইল, রুধির হইল পানি !
(গাজী উপায় করবা কি ?)

কিন্তু যে সকল গান আসরের বাহিরে গাওয়া হয় সেগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের মুস্কিল আসান গানের ন্যায় গৃহস্থ সংসারের নানা কর্তব্য কর্মের ফিরিস্তি দেওয়া হয়। নিম্নের গাজী গানটি ইসলামী নীতি-কথার কীর্তন—

আল্লার হুকুম ভাই সাব দুনিয়া ভরি।
ওরে খোদার দোস্ত মহম্মদ করিল জারি ॥
বহুৎ বহুৎ পেগাম্বর দুনিয়াতে পয়দা হইল।
আল্লার কুদরতে মক্কায় মহম্মদ জন্মিল ॥
মহম্মদ মদিনা পরে বাদশা হয়েছিল।
বান্দার খয়রাফিরতে কোরাণ বানাইল ॥
কাল্লামল্লা পড় ভাই রে গোছল করিয়া।
জুম্মার নেমাজ পড় সকলে মিলিয়া ॥

গাজীর গানের এই চারণ সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের ঐতিহাসিক যতীন্দ্রমোহন রায় বলিয়াছেন—

"পূর্ববঙ্গে সর্বত্র এক সময়ে গাজীর গীতের প্রচলন ছিল। হিন্দু রাজাদিগের গুণগরিমা যেরূপ চারণ ও ভাটমুখে দিগন্তব্যাপ্ত হইত সুবর্ণ গ্রামের মুসলমান অধিপতি প্রভৃতিদিগের সেই রূপ গীতি আকারে গৃহে গৃহে শুনানোর রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল।"

মুস্কিল-আসানের গানের উপজীব্য সত্যপীরের কাহিনী। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রোতারা এই শ্রেণীর গান ভক্তিপ্রণত চিত্তে শুনিয়া থাকে—

মুস্কিল-আসান কর দয়াল সত্যপীর।
কলিকাতায় খিদিরপুরে সত্যপীরের থান।
হিন্দু মুসলমান মিলে সিন্নি করে দান ॥
হিন্দু ব'লে নারায়ণ, মোল্লা ব'লে পীর
জাতের বিচার নাই ক'রে খায় সিন্নী ক্ষীর ॥
কৃষ্ণ যে সবাইকে চেনে, কৃষ্ণকে চেনে কে ?
মরিয়া হইয়া তেনার নাম জপে যে ॥
যেই আশাটি ক'রে আপনি পীরকে দিচ্ছেন দান,
সেই আশাটি পূরণ করেন সত্যনারায়ণ ॥

আমার কথা (৩০)

প্রতাপনারায়ণ মিত্র

২৪ পরগণা জেলার মিত্র পাড়ার মিত্রবংশীয় স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ মিত্রের পুত্র সুখ্যাত সঙ্গীতবিদ প্রতাপনারায়ণ মিত্র ১৩১০ সালের আশ্বিন মাসে (১৯০৩ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। অন্নদাপ্রসাদ স্বর্গীয় মুরারিমোহন গুপ্তের শিষ্য ছিলেন, ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি প্রতাপনারায়ণের আকর্ষণ হয় পরিলক্ষিত। বাবার কাছে ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র বসুর কাছে সঙ্গীতে শিক্ষালাভ করেন। আঠারো বছর স্বর্গীয় দুর্লভ ভট্টাচার্যের কাছে মৃদঙ্গ শেখেন। এদিকে যথাসময়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী পূর্ত বিভাগে প্রবেশ করেন ও আগামী বছর সম্মানের সঙ্গে অবসর গ্রহণ করবেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, সেতার, তবলা, স্বরোদ প্রভৃতি বিষয়ে যাঁদের কাছে ইনি শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে যোগীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কে, জি, ঢেকনা, ছোট রামদাস মিশ্র, গৌরীশঙ্কর মিশ্র, বুন্দি মিশ্র, ধীরেন বসু, কালী পাল, মুস্তাক আলী খাঁ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত-সম্মিলনী থেকে পর পর দু'বছর (১৯৩৩-৩৪) প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন ও ১৯৩৪ খৃঃ নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতাতেও প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে আন্তঃ-মহাবিদ্যালয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়, নিখিল ভারত ডাক ও তার বিভাগীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ও নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অন্যতম

প্রতাপনারায়ণ মিত্র

বিচারক ছিলেন প্রতাপনারায়ণ, শেষেরটির কার্যকরী সমিতিরও ইনি একজন সভ্য ছিলেন কিছু কাল। আকাশবাণীর ইনি একজন শিল্পী ও বিচারক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্ধারণ সমিতিরও (সঙ্গীত বিভাগীয়) ইনি একজন সভ্য। বর্তমানে ইনি পশ্চিমবঙ্গের নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীত আকাদামীর একজন শিক্ষাদাতা। এ ছাড়া 'যদু ভট্ট,' 'পথের পাঁচালী,' 'অপরাজিত' প্রভৃতি ছায়াচিত্রেও ইনি মৃদঙ্গ বাজিয়েছেন নেপথ্য থেকে।

রেকর্ড-পরিচয়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

বর্তমান রেকর্ডের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বয়ং রাইচাঁদ বড়ালের পরিচালনায় "নীলাচলে মহাপ্রভু" চিত্রের গানগুলি গেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছবিখানি সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে।

কিন্তু তার আগে বলা দরকার, শ্রীমতী কণিকা দেবীর (বন্দ্যোপাধ্যায়) গাওয়া দু'খানি মীরার ভজন "সখিরি মেরি নিঁদ" এবং "গোবিন্দ কবহুঁ মিলে পিয়া"। কণিকা দেবীর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুরাগীদের কাছে তাঁর এই ভজন আরো ভালো লাগবে। রেকর্ড নম্বর—N 82122.

কুমারী পুরবী দত্তের গাওয়া "ওই গোধূলি বধূর সিঁথিতে" এবং "কে জাগে আজ শেষ প্রহরে" দু'খানি নতুন আধুনিক গান। —N 82749.

কলম্বিয়া

গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় দু'খানি চমৎকার আধুনিক গেয়েছেন—"রুম ঝুম ঝুম ঝুম" এবং "শাওন এল ওই।" দ্বিতীয় গানখানি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচনা।—GE 24844.

চিত্রগীতি

"নীলাচলে মহাপ্রভু" চিত্রের গান—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "জ্ঞান বিফল সাধু" এবং "জগন্নাথ জগদ্বন্ধু"—N 76056. শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে—"কি রূপ হেরিনু" এবং "মাধব বহুত মিনতি করি তোয়"—GE 30364 দীর্ঘকাল মনে রাখবার মত গান।

গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে—"শ্যাম অভিসারে" এবং "বন্ধু, আমি আজি কালি করি"—GE 30365 আর দুটি অবিস্মরণীয় গান।

যন্ত্রগীতি

বংশীধর রায় ও কার্তিকচন্দ্র ঘোষ "সি, আই, ডি" আর "চোরি চোরি" চিত্রের দুটি গানের সুর, বাঁশী ও কাষ্ঠতরঙ্গে বাজিয়েছেন চমৎকার!

মালতীর ঘুম

জসীম উদ্দীন

গহন রাত্রি ঘুমায় মালতী নিবিড় শান্তি ভরে,
শিথিল তাহার কবরী হইতে দু'-একটি চুল ওড়ে।
পাতায় পাতায় টুব টুব টুব নীহারের ফিসফিস,
সই সই সই কোন পাখী ডাকি' দোলায় নীরব দিশ।
রাতের ফুলের গন্ধে মাতাল উতল শীতল বায়,
বনের শাখায় আসে আর যায় মৃদুল নীরব পায়।
দূর বনপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শত জোনাকীর পরী,
কুটির তাহার প্রদক্ষিণ যে করে সারারাত ধরি।
গহন আঁধারে ঘুমায় মালতী আহা মরি মরি মরি,
মুখ-পদ্ম না নিশী-পদ্ম ও নিশীথী সরসী ভরি।
কেশের আঁধারে কর্ণ-কুসুমে দুলিছে ঝুমকো দুটি,
দু-বাহু বিজলী ঘুমায় এখন বসন মেঘেরে লুটি।
বক্ষের 'পরে দু'টি হাত মেলা, তাহাতে সোনার চুড়ি,
জ্বলিছে পূজার প্রদীপ যেন বা দেহ-মন্দির জুড়ি'।
মৃদু নিশ্বাসে দুলিছে দুইটি যুগল কমল বুকে,
যেন বা দুইটি স্বর্ণস্তম্ভ উঠিয়াছে দেবলোকে।
আকাশ মেলিয়া শত তারা আঁখি ধেয়াইছে ওই রূপ,
পাতায় পাতায় ফিস্-ফিস্-ফিস্ বহে'বায় চুপ চুপ।

বিবেকানন্দ স্তোত্রে

সুমণি মিত্র

১
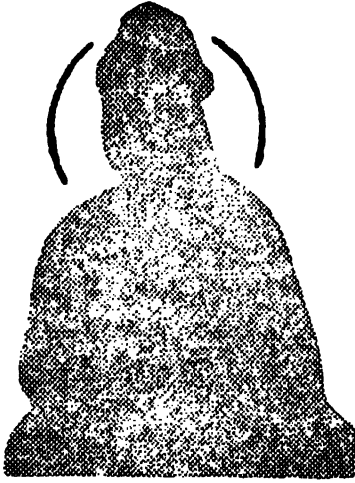
যখন বাংলাদেশ শাস্ত্র-বিমুখ,
হঠাৎ ঝড়ের মতো এসে
মৃত বেদ-আলোচনা
জাগ্রত কোরেছো এ-দেশে।
তাই বোলে তুমি
বেদের আবর্জনা করোনি গ্রহণ,
রাধাকান্ত ধারা অনুযায়ী
বিকৃত ব্যাখ্যাসহ
শাস্ত্রকে করোনি স্বীকার,
কিংবা আবার
ডিরোজীও-পন্থায়
বর্জন কোরোনিকো বেদ,
কল্যাণ-বুদ্ধিকে জাগ্রত কোরে
দূর করে দিয়ে গ্যাছো
বিশ্বাস ও যুক্তির ভেদ।
তুমিই আবার
শাস্ত্র ও সমাজকে এক বোলে মেনে
অভিনব ব্যাখ্যায়
শাস্ত্রকে কোরেছো প্রচার।
তুমিই প্রথম
শাস্ত্র ও যুক্তির
কোরে গ্যাছো রাখী-বন্ধন। ১

১। "I have often lamented that in our general researches into theological truth, we are subject to the conflict of so many obstacles.

কিন্তু যাই বলো,
তবু তুমি অভ্রান্ত নও;
নইলে কি হিন্দুনীতি অবহেলা কোরে
খৃষ্টানী ধর্ম-নীতি
বেমালুম কোলে তুলে নাও? ২

When we look to the traditions of ancient nations, we often find them at variance with each other. And when discouraged by this circumstance we appeal to reason as a surer guide, we soon find how incompetent it is alone to conduct us to the object of our pursuit. We often find that instead of facilitating our endevours or clearing up our perplexities, it only serves to generate an universal doubt incompatible with principles on which our comfort and happiness mainly depend. The best method perhaps is neither to give ourselves up exclusively to the guidance of the one or the other, but by a proper use of the lights furnished by both endeavour to improve our intellectual and mental faculties."

—*Raja Ram Mohan Roy*

২। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রামমোহন অদ্বৈতবাদ প্রচার কোরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু অদ্বৈতবাদে নীতিবাদের ভিত্তিটা সুদৃঢ় কোরে যেতে পারেননি। তিনি খৃষ্টান নীতিবাদকে শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে মিশ্রিত কোরে খৃষ্টান-ধর্মনীতির প্রাধান্য দিয়ে গ্যাছেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বোলে গ্যাছেন, খৃষ্টান-ধর্মের নীতিবাদ পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের নীতিবাদের চেয়ে নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতির পক্ষে বেশী উপযোগী।—

—"The Doctrines of Christ are more conducive to moral principles and better adopted for the use of national beings than any other which have come to my knowledge." আবার অন্যত্র বোলেছেন,—"The moral precepts of Jesus are something most extraordinary." আবার বোলেছেন,—"Genuine Christianity is more conducive to the moral, Social and Political Progress of a People than any other known creed." এই সব পড়ে-শুনে মনে হয়, রাজার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি পাশ্চাত্য-প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত কোরতে পারেন নি। তাছাড়া, তিনি খৃষ্টান-ধর্মের 'পাপবাদে' বিশ্বাস কোরতেন এবং খৃষ্টান-ধর্মের নীতি অনুযায়ী মানসিক প্রায়শ্চিত্তেরও প্রয়োজন বোধ কোরতেন। এই সব ক্ষেত্রে তিনি অদ্বৈত বেদান্তবাদী নন, কেন না বেদান্তে পাপবোধের কোনো স্থানই নেই।

ঋণং কৃত্বা...

এমন একদিন বোধহয় সত্যিই ছিল যখন লোকে ঘি খাবার জন্যে ধার করতেও পেছপাও হোতনা। মহাজনদের বিধান ছাড়াও তার অন্য কারণ ছিল। দুধ অমৃতের সমান আর সেই দুধ থেকে তৈরী ঘি, মাখন, ছানা, দই, ক্ষীর। সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে এইসব খাবার যে একেবারেই অপরিহার্য্য এ বিষয় কারো কোন দ্বিধা ছিলনা। আর সত্যিই দ্বিধা থাকবার কোন কথাও নয়। তখন সস্তাগণ্ডার দিন ছিল, ভাল টাটকা খাবার অপর্য্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যেত আর সাধারণ লোকে তা কিনতেও পারতো। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার কথা তখন উঠতোই না।

এখন দিনকাল বদলেছে। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ পরিবৃত হয়ে জমিদার মশাই বসে তামাক খেতে খেতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খোসগল্প করছেন আর তাসপাসা খেলছেন—এ এখন গল্পকথায় দাঁড়িয়েছে। তাঁর বংশধরদের এখন সকাল নটায় পড়ি কি মরি করে আপিসে কিম্বা নিজের ধান্দায় ছুটতে হয়।

সত্যিই আজকের এই ডামাডোল আর মাগ্গিগণ্ডার বাজারে সংসার করা, আয়ের মধ্যে চলা অতি দুরূহ কাজ। সবদিক সামলে, নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে চলা যে কত শক্ত কথা তা সকলেই জানেন। বাড়ীভাড়া, কাপড়চোপড়, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে আর বই-খাতার খরচেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, তাই অনেক সময়েই লোকে খাবার দাবারে খরচ কমিয়ে খরচ বাঁচাতে চায়। কিন্তু আজকাল আগেকার তুলনায় ঝামেলা বেড়েছে খাটাখাটুনি ও দুশ্চিন্তাও বেড়েছে। তাই ভেবে দেখুন যে খাবার দাবারে খরচ কমানো মানে কি? তার মানে হয় আধপেটা খেয়ে থাকা নয়তো নিকৃষ্ট বা ভেজাল জিনিষ খাওয়া। কিন্তু তাতে কি সত্যিই পয়সা বাঁচে? যে পয়সাটা বাঁচে তাতো ডাক্তারের পকেটে বা ওষুধ পত্তরেই খরচ হয়ে যায় অনেক সময়। সুতরাং পুষ্টিকর স্বাস্থ্যদায়ক জিনিষ খাওয়া যে একান্তই দরকার একথা বলে বোঝাবার দরকার নেই, বিশেষ করে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের, বাড়ীর কর্ত্তার, গিন্নীঠাকুরনের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। সুতরাং ঋণং কৃত্বা ছাড়া উপায় নেই এই কথা ভাবছেন তো? না, আছে; উপায় আছে। আর সে উপায় অবলম্বন করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে খুবই সোজা।

একটা সোজা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আপেল। আমরা সবাই জানি আপেল শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইংরেজীতে তো প্রবাদবাক্যই আছে যে রোজ একটা করে আপেল খাওয়া মানে ডাক্তারকে দূরে রাখা। কিন্তু আপেল সাধারণতঃ দুর্মূল্য, তাই কজনেই বা রোজ আপেল খেতে পারে বলুন? কিন্তু আপেলের চেয়ে অনেক কম দামে প্রায় সমান উপকারী ফল বা তরকারী খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়। যেমন ধরুন টোম্যাটো, যাকে আমরা বিলিতী বেগুন বলি, বা কলা—আপেলের চেয়ে অনেক কম দাম কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে ঘি। খাঁটি টাটকা গাওয়া ঘি ভাল জিনিষ, কিন্তু তা পাওয়া গেলেও বেশী দাম। তাই নিত্য ব্যবহারের জন্যে সব সময় গৃহস্থের পক্ষে খাঁটী ঘি কেনা হয়তো সম্ভব হয়না। সেখানে স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। ডালডায় খরচ কম আর ডালডা ঘি এর মতোই উপকারী। একথা জানেন কি যে ডালডা ও খাঁটী গাওয়া ঘিয়ে একই পরিমান ভিটামিন 'এ' আছে। ভিটামিন 'এ' শরীরের বাড়ের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দাঁত, চোখে ও গায়ের চামড়ার জন্যে অত্যন্ত উপকারী। ভিটামিন 'এ' স্বাস্থ্যের পক্ষে একটি অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। তাই এই স্বাস্থ্যদায়ক ভিটামিন 'এ' যুক্ত ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে এত ভাল। ডালডায় ভিটামিন 'ডি' ও দেওয়া হয়। ভিটামিন 'ডি' ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। ভিটামিন 'ডি' দাঁত ও হাড়কে সবল করে। শুধুমাত্র খাঁটী ভেষজ তেল থেকে ডালডা স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্ব্বদা শীলকরা টিনে খাঁটী ও তাজা পাবেন। এই সব কারনেই ডালডা আজ দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে আজই ডালডা কিনুন—কিনে পয়সা বাঁচান, শরীর ভাল রাখুন। মনে রাখবেন, ডালডা মার্কা বনস্পতি শুধুমাত্র খেজুরগাছ মার্কা টিনেই পাওয়া যায়, এই টিন দেখে কিনবেন।

HVM. 293A-X52 BG

পরের পোষাকী জামা
আমাদের জাতীয় জীবনে
সযত্নে পরাতে গেলে কেন ?
বেদান্তকে ভিত্তি কোরে
ধর্মমত গড়ো,
যত পারো পাদ্রীদের সাথে যুদ্ধ করো—
সে তো বাহাদুরী,
তাই বোলে তুমি
ভিন্ন জাতের ফুলে কেন
ছিন্ন জাতের মালা গাঁথো ?
বিজাতীয় শিক্ষার পাল্লায় পড়ে
আমাদের ভাষাটাকে কেন
হঠাৎ শিকেতে তুলে রাখো ?
পশ্চিমী শিক্ষার প্রণালীটা প্রচলন কোরে
দেশকে এগিয়ে গ্যাছো ঠিকই,
তবু এটা ভেবে দ্যাখো দিকি—
ইংরিজী ভাষাতেই নিতে হবে তাকে ?
হঠাৎ ছাড়তে হবে
চিরাভ্যস্ত ঐ স্বাভাবিক দিশী ভাষাটাকে ?

কাটলেট খেতে হবে বোলে
ছুরি-কাঁটা, ও-দুটো কি চা-ই-ই ?
খিদে কি মেটেনা তাতে
আমি যদি শুধু হাতে
বাবু হোয়ে বোসে সেটা খাই ?
বরং শীঘ্র মেটে তাতে,
সহজেই পেটে ঢুকে যায়।
ছুরি-কাঁটা চামচের
অভ্যেস না থাকাতে
পেটে যেতে দেরী হোয়ে যায়।

* * *

সব কিছু নেবো তো বটেই,
তবে সেটা হাতে তুলে
স্বাভাবিক, চিরকেলে
আমাদের দিশী কায়দায়। ৩

১১

তারপর তুমি
জ্ঞানের ভিত্তিটাতে
সবাইকে কেন টেনে আনো ?
কেন ফেলে দাও দেব-দেবী ?
মূর্তি-পুজোর প্রতি
তোমার এ বিদ্বেষ কেন ?

'Idol worship,—
Source of prejudice'ই শুধু ?
আর কিছু পেলে নাকো খুঁজে ?
ও কি শুধু '...Induces
The violation of
Every humane
And social feeling,—
And moral debasement
Of a race...?'
'Impure, absurd, puerile'ই শুধু ?
'Prejudice' ছাড়া
আর কিছু দ্যায়নি প্রতীক ?

কিন্তু স্বামিজীর বেদান্তবাদে খৃষ্টান-ধর্মের নীতিবাদ মাথা গলায় নি; বরং তিনি অদ্বৈতবাদের ওপরেই নীতিবাদের ভিত্তিটা সুদৃঢ় কোরে খৃষ্টান-নীতিবাদের ভিত্তিকে আক্রমণ কোরেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি রামমোহনের চেয়ে অনেক বেশি আত্মস্থ।

৩। স্বামী প্রজ্ঞানন্দের 'ভারতের সাধনা' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামিজীর গুরুভাই স্বামী সারদানন্দজী লিখেছেন,—"মহামনীষী রাজা রামমোহন রায়কে দীর্ঘ সুষুপ্তিমগ্ন ভারতে প্রথম জাগ্রত ব্যক্তি বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন—একথা অনেকাংশে সত্য হইলেও তিনিও যে আপনাকে ঐ পাশ্চাত্য মোহ হইতে সম্পূর্ণ দূরে রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। দেশে স্বাধীন চিন্তার স্রোত পুনঃ প্রবাহিত করিতে, পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী ও ইংরাজী ভাষার প্রবর্তনরূপ যে উপায় তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহাতে তাঁহার অসাধারণ ত্যাগস্বীকারাদির কথা সত্য হইলেও, উহা যে তাঁহার অন্তরে পাশ্চাত্যভাবপ্রাধান্যের পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমিত হয়। দিব্যপ্রতিভাসম্পন্ন স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছিলেন,—'রাজা রামমোহন ইংরাজীভাষার প্রাধান্য স্বীকারপূর্বক বিদ্যালয়সমূহে উহার প্রচলন করায় বিষম ভ্রমে নিপতিত হইয়াছিলেন, অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরের জন্য উহাতে দেশটাকে পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে; ঐরূপ না করিয়া, যদি তিনি সংস্কৃত ভাষার প্রচলন রাখিতেন এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানাদি বিদ্যা ও গ্রহণযোগ্য চিন্তাসমূহ ঐ ভাষায় অনুদিত করিয়া গ্রন্থাবলী প্রকাশ পূর্বক বিদ্যালয়সমূহে পঠন পাঠন করাইতেন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই দেশময় ঐ সকলের প্রচার সাধিত হইয়া সমগ্র জাতিটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইত।'

স্বামিজীর ঐ কথা তখন বুঝিতে না পারিলেও এখন বুঝা যায় যে, 'যে প্রণালী অবলম্বনে দেশের লোক নূতন ভাব ও সত্যগ্রহণে বহুকাল অভ্যস্ত হইয়াছিল, ইংরাজীভাষার প্রচলনে সেই প্রণালী এককালে দূরপরিহৃত হওয়ায় দেশের জনসাধারণের ঐ সকল ভাব ও সত্যগ্রহণে অনর্থক অনেক বিলম্ব হইয়াছে ও হইতেছে!...'পাশ্চাত্য মোহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া ভারতের জাতীয়তার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় ও প্রকাশ করিতে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম সমর্থ হইয়াছিলেন।"

তাই যদি ভেবে থাকো রাজা,
তুমিই কি কম 'প্রেজুডিস্‌ড' ?৪

১২

যদিও বোলেছো তুমি
নিম্ন আধারদের
প্রতীকের আছে প্রয়োজন,
তবু তুমি মন থেকে
প্রতীকোপাসনাটাকে
কোনোদিন করোনি গ্রহণ।
সবাইকে একমতে
এক বাঁধা-ধরা পথে
টেনে আনা সম্ভবপর ?
তোমার ধাতে যা শুভ
অপরের ধাতে সেটা
হয়তো অকল্যাণকর।
তুমি কি জানো না রাজা,
বিচিত্রতাই হোল
বিশ্বের প্রাণ-স্পন্দন ?
তবে তুমি শুনে রাখো
শঙ্কর অনুগামী
স্বামিজীর স্বস্তি-বাচন।

১৩

"...Different natures
Require different methods,
Your methods of coming to God
May not be my method,
Possibly
It might hurt me,
Such an idea as that
There is but one way for everybody
Is injurious,
Meaningless,
And entirely to be avoided.

Woe unto the world
When everyone
Is of the same religious opinion
And takes to the same path.
Then
All religions and all thoughts.
Will be destroyed.
Variety
Is the very soul of life
When it dies out entirely
Creation will die.

...How can they preach of love
Who cannot bear another man
To follow
A different path from their own ?
If that is love,
What is hatred ?"৫

১৪

ধর্ম-জীবনে যারা নিম্ন আধার
তাদের প্রতীক-পুজো কোরেছো স্বীকার। ৬

৪। রামমোহন গ্রীক ও রোমক মূর্তিপুজোর সঙ্গে হিন্দু মূর্তিপুজোর তুলনা কোরে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে,

"Idolatry practised by the Grceks and Romans was certainly just as impure, absurd and puerile as that of the present Hindus ; yet the former was by no means, so destructive of the comforts of life, or injurious to the texture of Society, as the latter."

—*A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas.*

মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভূমিকায় লিখেছেন,—

"Idol worship,—the source of prejudice and superstition and of total destruction of moral principles."

ঈশোপনিষদের ভূমিকায় লিখেছেন,—"Fatal system of Idolatry induces the violation of every humane and social feeling,—and moral debasement of a race who, I cannot help thinking, are capable of better things..."

তাই তিনি সদর্পে বোলেছেন,—"As Luther's design was to destroy Popery, the corruption of Christianity, by simply resuscitating genuine old Christianity as revealed in the New Testament, so his (Ram Mohan Roy's) mission was to destroy popular Pauranic Idolatry, the corruption of Hinduism, by resuscitating genuine old Hinduism as propounded in the ancient Vedas."

—*The Brhmo Samaj*, or *Theism in India by Keshab Ch. Sen.*

৫। "বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে বিভিন্ন সাধনপ্রণালীর প্রয়োজন। তুমি যে প্রণালীতে ঈশ্বর লাভ কোরবে, সেটা হয়তো আমার পক্ষে খাটবে না, হয়তো তাতে আমার ক্ষতিই হোতে পারে। সকলকে এক পথে যেতে হবে—এ কথার কোনো অর্থ নেই, বরং ক্ষতিকর ; সুতরাং এই মতবাদকে সর্ব প্রকারে এড়িয়ে যেতে হবে। যদি কখনো পৃথিবীর সমস্ত লোক একধর্মমতাবলম্বী হোয়ে একটা নির্দিষ্ট পথে চলে, তবে সেটা দুঃখের বিষয় বোলতে হবে। তাহোলে লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি এবং প্রকৃত ধর্মভাব একেবারে নষ্ট হোয়ে যাবে। ভেদই হোচ্ছে আমাদের জীবনযাত্রার মূল মন্ত্র। এই ভেদ যদি সম্পূর্ণ ভাবে চোলে যায়, তাহোলে সৃষ্টিই লোপ পাবে।

অন্য লোকে ভিন্ন পথ অনুসরণ কোরলে, যে তা' সহ্য কোরতে পারে না, সে আবার প্রেমের কথা বলে কি কোরে ! এই যদি প্রেম হয়, তবে বিদ্বেষ কা'কে বলে ?"

—*Lectures From Colombo to Almora.* (Page 33-34)

৬। রাজা রামমোহনের মতে "অজ্ঞানীর মনস্থিরের নিমিত্ত বাহ্যপূজাদি কল্পনা করা গিয়াছে।" পুরাণ সম্পর্কে তিনি বলেন,— "পুরাণাদি শাস্ত্র সর্বথা বেদান্তানুসারে অতীন্দ্রিয় আকারে রহিত

মূর্ত্তি-পুজোর প্রতি এই যে তোমার
কৃপণ অনুগ্রহ—এও অবিচার।
তুমি যে সত্য নও প্রমাণটা তারি,—
শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রতীক পূজারী।
এমন বুকের পাটা বলো আছে কার,
যে তাঁকে বোল্‌বে—তিনি তুচ্ছ আধার ?
মূর্ত্তিকে পুজো কোরে ত্যাখোনি যে ছাই,
তাই এত বুদ্ধির মিথ্যে বড়াই !
মূর্ত্তিকে ধোরে যদি ব্রহ্মেতে যেতে,
তাহোলে কি এ-কথাটা তুমি বোলে যেতে ?
তোমার এ-মতবাদে সত্যতা নেই,
স্বামিজীর প্রতিবাদ সেই কারণেই।—

*   *   *

"It has become
A trite saying,
That idolatry is wrong,
And every man
Swallows it
Without questioning.

I once thought so,
And to pay penalty of that
I had to learn my lesson
Sitting at the feet of a man
Who realised everything
Through idols ;
I allude
To Ramkrishna Paramahamsa." ৭

অতএব তোমার এই মতবাদটার
ঠাকুরই তো জীবন্ত প্রতিবাদ তার।

"If
Such Ramkrishna Paramahamsas
Are produced
Through idol-worship,
What will you have—
The reformers creed
Or
Any number of idols ?
I want an answer

Take
A thousand idols more
If you can produce
Ramkrishna Paramhamsas
Through idol-worship,

And
May God speed you !
Produce such noble natures
By any means you can.

Yet idolatry is condemned !
Why ?
Nobody knows.
Because
Some hundreds of years ago
Some man of Jewish blood
Happened to condemn it ?
That is,
He happened to condemn
Everybody else's idol
Except his own.
...If God
Comes in the form of a dove,
It is holy.
But
If he comes
In the form of a Cow
It is heathen superstition ;
Condemn it !
That is
How the world goes." ৮

তোমাদের মতবাদটায়
সত্যতা থাকলেও
স্বামিজীর তাই আফশোষ !

[ক্রমশঃ।

কহেন। পুরাণে অধিক এই যে, মন্দবুদ্ধি লোক অতীন্দ্রিয় নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া সম্যক্ প্রকারে পরমার্থ সাধন বিনা জন্মক্ষেপ করিবে কিংবা দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হইবে, অতএব নিরলম্বন হইতে ও দুষ্কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরকে মনুষ্যাদি আকারে ও যে যে চেষ্টা মনুষ্যাদির সর্বদা গ্রহ হয়, তদ্বিশিষ্ট করিয়া বর্ণন করিয়াছেন।" পুরাণের মূর্ত্তিপুজোকে রাজা অশাস্ত্রীয় বোলে বর্ণনা করেন নি বটে, কিন্তু তিনি পৌরাণিক যুগের বিকাশটাকে স্বীকার করেন নি ; তাই পুরাণ কথিত মূর্ত্তিপুজোকে নিম্ন অধিকারীর যোগ্য বোলে তার একটা সঙ্কীর্ণ স্থান নির্দেশ কোরে গ্যাছেন মাত্র।

৭। "আজকাল এটা চল্‌তি কথায় দাঁড়িয়েছে, আর সকলেই বিনা আপত্তিতে এটা স্বীকার কোরে থাকেন যে, পৌত্তলিকতা দোষ। আমিও এক সময়ে এ রকম ভাবতাম, আর তার শাস্তিস্বরূপ আমাকে এমন এক ব্যক্তির পদতলে বোসে শিক্ষালাভ কোরতে হোয়েছে, যিনি পুতুল-পুজো থেকেই সব কিছু পেয়েছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা বোল্‌ছি।" *—My Plan of Campaign.*

৮। "যদি পুতুল-পুজো কোরে এইরকম রামকৃষ্ণ পরমহংসদের অভ্যুদয় হয়, তবে তোমরা কি চাও ?—সংস্কারকদের ব্রাহ্মধর্ম, না পুতুল-পুজো ? আমি এর একটা জবাব চাই। যদি পুতুল-পুজোর দ্বারা এইরকম পরমহংসদের সৃষ্টি কোরতে পারো, তবে আরও হাজারটা পুতুলের পুজো করো। সিদ্ধিদাতা তোমাদের সিদ্ধি দিন। যে কোনো উপায়েই হোক এই রকম মহাত্মাদের সৃষ্টি করো দেখি। তবুও লোকে মূর্তি-পুজোকে গাল দেয়! কেন ? তা কেউই জানেনা। কারণ কয়েক হাজার বছর আগে জনৈক য়াহুদী বংশের একটি লোক মূর্তি-পুজোকে নিন্দে কোরেছিলেন বোলে ? অর্থাৎ তিনি নিজের পুতুল ছাড়া আর সকলের পুতুলকে নিন্দে কোরেছিলেন।...ঈশ্বর যদি একটা ঘুঘু পাখীর রূপ ধোরে আসেন, তাহোলে সেটি মহাপবিত্র, কিন্তু তিনি যদি গাভীর রূপ নিয়ে আসেন, তাহোলেই সেটা হিদেনদের কুসংস্কার! ওটা অধঃপাতে যাক! দুনিয়ার ভাবই এই।" *—My plan of Campaign.*

বাংলা সাহিত্যে নতুন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট সাহিত্য বিষয়ক নানা রকম পুরস্কারের ব্যবস্থা ক'রে আসছেন। বাংলা সাহিত্যের জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্ট 'রবীন্দ্র পুরস্কার'-এর আয়োজন করেছেন। দিল্লী থেকে বাংলা সাহিত্যের জন্য বিশেষ আকাদমী পুরস্কার আছে। এতদ্ব্যতীত দিল্লী থেকে সর্ব্বভারতীয় ভাষায় শিশু-সাহিত্যের জন্য কতকগুলি স্বতন্ত্র পুরস্কারও দেওয়া হয়ে থাকে। এই সকল পুরস্কার সাহিত্যসৃষ্টির পথে সাহিত্যিকদের যে যথেষ্ট উৎসাহিত করছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তবুও এই সকল সাহিত্য-পুরস্কার সমগ্র দেশের পক্ষে যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এর ন্যূনতা সহজেই নজরে পড়ে। একমাত্র আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যেই বিভিন্ন বিষয়ে সাহিত্যের জন্য ৪০টি বড় বড় প্রাইজ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত আছে আমেরিকার বিখ্যাত 'পুলিটজার' পুরস্কার। এই পুরস্কার প্রতি বৎসর সংবাদপত্র ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে ১৫টি ক'রে দেওয়া হয়ে থাকে।

কয়েক দিন পূর্ব্বে নববর্ষ উপলক্ষে দক্ষিণ-কলিকাতায় কলেজ ষ্ট্রীটের বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক মেসার্স এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্সের অন্যতম ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার একটি সাহিত্য আসরের ব্যবস্থা করেন। এটি এঁদের একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান। কলিকাতার প্রবীণ ও নবীন প্রায় সকল সাহিত্যিকরাই এই আসরে উপস্থিত ছিলেন। রাজশেখর বসু, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন ও নিবন্ধ পাঠ করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় এই সাহিত্য-পুরস্কারের কথা উত্থাপন করে বলেন যে, ফ্রান্সে সাহিত্যের জন্য ভূরি ভূরি পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বাংলা দেশে এইরূপ কোন ব্যবস্থার নিদর্শন দেখা যায় না। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় একজন অবাঙালী ব্যবসায়ী প্রদত্ত 'নরসিং দাস প্রাইজ' নামক একটি হাজার টাকার পুরস্কার প্রতি বৎসর বাংলা-সাহিত্যের লেখকদের দিয়ে থাকেন। দুঃখের বিষয়, এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাংলা দেশে নেই, যাঁরা বাংলা-সাহিত্যের জন্য অনুরূপ কোন পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন!

বাস্তবিক পক্ষে কথাগুলি যে কতদূর সত্য তা আজ আমরা সকলেই অনুভব করতে সক্ষম। সকল বিষয়েই যে আমাদের গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে তার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। ইতিপূর্ব্বে যে কতকগুলি আমেরিকার সাহিত্য-পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার একটিও গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত নয়—নোবেল প্রাইজের মধ্যেও তো সরকারের কোন দান নেই!

আনন্দের বিষয়, অন্নদাশঙ্করের এই আক্ষেপের পর, কলিকাতার দুইটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের মালিক, যাঁরা এই আসরেই উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা প্রতি বৎসর এক একজনে দু'হাজার টাকা ক'রে চার হাজার টাকার (শ্রেষ্ঠ গল্প-উপন্যাসের জন্য) চারটি সাহিত্য-পুরস্কার দেবেন ব'লে ঘোষণা করেন। দুইটি পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর' এবং অপর দুটি পুরস্কার দেন 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড'। এই চারটি পুরস্কার ব্যতীত আরও দুটি পুরস্কার উক্ত সভাস্থলেই ঘোষিত হয়। একটি পাঁচ শত টাকার পুরস্কার প্রতি বৎসর শিশু-পত্রিকা 'মৌচাক'-এর তরফ থেকে শিশু-সাহিত্যের জন্য; অপরটি মাসিক পত্রিকা 'উল্টরথ'-এর তরফ থেকে, প্রতি বৎসর পূজার সময় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য পাঁচ শত টাকা।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রারম্ভে এই পুরস্কার ঘোষণা বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় ঘটনা বলা যেতে পারে। আমরা আশা করি, এ থেকে আরও বহু সাহিত্য-পুরস্কারের উদ্ভব হবে এবং বহু প্রকাশক ও প্রতিষ্ঠান এ সম্বন্ধে অনুপ্রাণিত হবেন।

বর্ত্তমান বৎসরে যাঁরা এই পুরস্কারগুলি ঘোষণা করেছেন, তাঁদের যথাযথ ভাবে এই পুরস্কারগুলি বিতরণের একটি গুরু দায়িত্ব আছে। পুরস্কারগুলি কোন কোন বিষয়ে হবে, কারা এর বিচারক হবেন, কি ধরণের নিয়ম-কানুনের মধ্যে পুরস্কার বিতরিত হবে, ইত্যাদি নানা বিষয় সম্বন্ধে জানবার জন্য আমরাও যেমন উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি, তেমনি জনসাধারণেরও কৌতূহলের অবধি নেই। আশা করি, এ সম্বন্ধে একটি সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা শীঘ্রই আমরা অবগত হব।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

পুরনো বই

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাঙলা সাহিত্যের যে একটি বিশেষ আসন নির্দিষ্ট, এ কথা আজ নতুন করে বলবার নয়। বঙ্গ সাহিত্যের এই বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা নয়—আজকের দিনের তার আ-দিগন্ত খ্যাতির পিছনে আছে অনেক কালের সাধনার দীর্ঘ ইতিহাস। অতীতের অনেক সাহিত্য-পথযাত্রীর নিদারুণ পরিশ্রম। পূর্বাচার্যদের অকৃত্রিম সাধনা। বাঙা সাহিত্যের অতীত দিনের রূপ, তার সৃজন-কৌশল, তার গঠন-চাতুর্য যেমনই গৌরবময় তেমনই বৈশিষ্ট্যবান। তখনকার দিনের কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। আলোচনার সঙ্গেই সমভাবে স্থান পেয়েছে লেখকদের মূল রচনার দীর্ঘ উদ্ধৃতি। প্রতাপাদিত্য চরিত্র, কুলীনকুলসর্বস্ব, নববাবু বিলাস, হুতোম প্যাঁচার নকশা, গৌড়ীয় ব্যাকরণ, বোধেন্দু বিকাশ, তোতা ইতিহাস, বিদ্যাকল্পদ্রুম, নয়শো রূপেয়া প্রভৃতি গ্রন্থগুলি আবার নতুন করে স্থায়িত্ব লাভ করুক, এই কামনা। সমগ্র গ্রন্থটিতে শ্রীনিখিল সেনের পরিশ্রমের ছাপ পাওয়া যায়, আমরা তাঁর সাফল্য কামনা করি।—২ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা—১২ থেকে এ, মুখার্জী য্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। দাম চার টাকা মাত্র।

কর্মযোগ

উনিশশো পাঁচ সালের বাঙলা দেশের রক্তরাঙা দিনগুলিতে বাঙালীর জীবনধারায় যে মনীষীদের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল তাঁদেরই অন্যতম মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তকে স্মরণ করি শ্রদ্ধার সঙ্গে। অশ্বিনীকুমারের অনেকগুলি গ্রন্থের মধ্যে 'কর্মযোগ' গ্রন্থটিই তাঁর শেষ রচনার স্বাক্ষর বহনকারী। আধ্যাত্মিক রচনায় অশ্বিনীকুমারের লেখনী শক্তিগর্ভা। ঘাত-প্রতিঘাতে ভরা হাজারো ঘটনায় অতিবাহিত হয় আমাদের জীবন কিন্তু এই জৈব যাত্রার চরম উৎকর্ষতা মহামুক্তিতে। সেই মুক্তির চাবিকাটি নিহিত আছে নিষ্কাম কর্মযোগে। নিষ্কাম কর্মযোগ ছাড়া মুক্তির 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। গীতার আলোছায়ায় এই গ্রন্থ পুষ্ট। জোরালো ব্যাখ্যা দ্বারা অশ্বিনীকুমার তাঁর মতবাদগুলিকে সুদৃঢ় করেছেন। সংসারযাত্রার পরেই যে বিরাট জিজ্ঞাসা লুকিয়ে আছে সকলের মধ্যেই, তারই সমাধানের পথনির্দেশ পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। বসু সাহিত্য সংসদ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীঅমিয় বসু। দাম দু' টাকা মাত্র।

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ

বহু গুণীজ্ঞানী-জনসঙ্গলাভ-গুণাঢ্য রসিক পুরুষ অমল হোম রবীন্দ্রনাথেরও সান্নিধ্যলাভ করেছেন নানা ভাবে, নিবিড় ভাবে সঙ্গ করেছেন তাঁর সঙ্গে। সে কারণ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখার তিনি যথার্থ অধিকারী। এই গ্রন্থের মধ্যে রবীন্দ্র-চরিত্রের নানা দিক, কাহিনী, আলোচনা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। পরিচ্ছেদগুলির নাম থেকে পাঠকের এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। নামগুলি যথাক্রমে এইরূপ—পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, কেরাণী রবীন্দ্রনাথ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের চিঠি, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি চিঠি ও সাম্প্রতিক রবীন্দ্র-সমালোচনা প্রথম সংস্করণ স্বল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় পরিবর্দ্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। কবির কয়েকখানি মূল্যবান চিত্রও সংযোজিত হয়েছে এই সংস্করণে। ছাপা উচ্চাঙ্গের এবং সাজসজ্জা দেখে বিশ্বভারতীর প্রকাশিত গ্রন্থ ব'লে ভ্রম হয়। গ্রন্থখানি রবীন্দ্র ভক্তদের বহু নূতনত্বের আস্বাদ দানে সুখী করবে। প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ২৸০

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে মৈত্রেয়ী দেবী তাঁদের অন্যতমা। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কবিগুরুকে দেখলে দেখা যায় তিনি নানারূপেই প্রতীয়মান। এই গ্রন্থে কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে মূর্ত করে তুলেছেন মৈত্রেয়ী দেবী। চিরবিদায়ের কয়েক বছর আগে কবিগুরু মংপুতে করেছিলেন পদার্পণ। এই সময়েই লেখিকা রবীন্দ্রনাথকে আরও নিবিড়ভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। মংপুতে থাকাকালীন কবিগুরুর দৈনন্দিন আচার ব্যবহার-সংলাপ এই গ্রন্থের উপজীব্য। কবিসত্তার মধ্যে যে একটি শাশ্বত মানব-সত্তারও বিশেষ স্থান ছিল সেই রূপটিকেই ফুটিয়ে

তুলতে মৈত্রেয়ী দেবী তৎপর। সুখের বিষয়, এখানে তিনি সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছেন। প্রতিটি রবীন্দ্রানুরাগী তথা সাহিত্যপ্রিয় পাঠক-পাঠিকার কাছে এই গ্রন্থের যোগ্য সমাদর হোক। ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা—৩ থেকে প্রজ্ঞা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীসুকমল ঘোষ। দাম ছ' টাকা মাত্র।

SNAKE BITE

সর্পাঘাতের তীব্রতা সম্বন্ধে কাউকেই নতুন করে বোঝাবার কিছু নেই। অতীতের পৌরাণিক যুগ থেকে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক যুগ পর্যন্ত রীতিমত একটি আতঙ্কের আসন অধিকার করে আছে এই সর্প-দংশন। এই সর্প-দংশনের প্রতিকার কি ভাবে সম্ভব, তারই একটি সুবিস্তৃত আলোচনা পরিবেশিত হয়েছে উপরোক্ত গ্রন্থটিতে। সর্প-দংশন এবং তার চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি তথ্য গ্রন্থটির শোভাবর্ধন করেছে। বাঙলার ঘরে ঘরে এই গ্রন্থের যথোপযুক্ত সমাদর ঘটুক, এই কামনা করি। লেখক ও প্রকাশক—শ্রী পি, ব্যানার্জী, মিহিজাম, (বিহার)। দাম—পাঁচ টাকা।

স্বাধীনতার আবোল-তাবোল

দীর্ঘ দু'শো বছরের পরাধীনতা অতিক্রম করে ভারত লাভ করেছে স্বাধীনতার আস্বাদ। শত শত সন্তানের আত্মোৎসর্গ সফল হ'ল, লক্ষ লক্ষ মানবের পরাধীনতার বিরুদ্ধে অভিযান সার্থক হ'ল, বিধাতার দরবারে মানুষের অন্তরের আবেদনও হ'ল ফলবতী কিন্তু এই স্বাধীনতা তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দিল না। নিখুঁত হ'ল না তার রূপ, অনেক কিছু অভাব রয়ে গেল সেই রূপায়ণে। স্বাধীনতা আসার সঙ্গে আর যাদেরও আসার প্রয়োজন অথচ তারা এল না, সেই সম্বন্ধেই এখানে লেখকের আলোচনা। যাদের অভাবে স্বাধীনতা আজ নিজের মর্য্যাদা হারিয়েছে বহু পরিমাণে, সেই সংক্রান্ত আলোচনাই এ গ্রন্থের উপজীব্য। কোটি কোটি লোকের জীবন-মরণের প্রশ্ন যেখানে নিহিত সেখানে সেই সংক্রান্ত আলোচনাগুলো একটু গভীর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। স্বাধীনতাকে আবোল-তাবোল আখ্যাটা না দিলেই যেন ভালো হত। তবুও গ্রন্থটি যথেষ্ট মূল্য বহন করে এবং যে অভাব লেখককে বিচলিত করেছে, সেই অভাব আজ ঘরে ঘরেই বিদ্যমান। দেশের সত্যিকারের উন্নতিকল্পে লেখক যা আশা করেন তা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হোক, এই কামনাই করি। লেখক—সুনীলকুমার গুহ। পি ৫২১ রাজা বসন্ত রায় রোড, কলকাতা-২৯ থেকে লেখক নিজেই প্রকাশ করেছেন। দাম চার টাকা মাত্র।

বনভূমি

বাঙলা সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকার কাছে বিমল করের নাম আজ আর কারো অজানা নেই। জোরালো বক্তব্যের দ্বারা সৎসাহিত্য সৃষ্টি করে বিমল কর আজ নিজের আসন দৃঢ় করে নিয়েছেন। সুদূর মধ্য প্রদেশের একটি ছোট রেলওয়ে ষ্টেশনকে মুখ্যত কেন্দ্র করে বনভূমির পটভূমি রচিত। আগাগোড়া রচনাটি বিশুদ্ধ ভাষায় লেখা। সূর্যশঙ্কর-বনলতার চরিত্র সত্যিই প্রত্যেকটি পাঠকের মনে জাগায় করুণা। সমস্ত লাম্পট্য, দুরাচার ছাড়াও সূর্যশঙ্করের মধ্যে আছে একটি সূক্ষ্ম মানবতা, সেইটিই মূর্ত হয়ে ওঠে এক-এক সময়ে। হেমন্ত বাবুর চরিত্র অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন বিমল কর। এই চরিত্রটি সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার প্রতিমূর্তি। ১৭৭ এ আপার সার্কুলার রোডস্থ ত্রিবেণী প্রকাশন থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীকানাইলাল সরকার। দাম তিন টাকা।

সংকলিতা

অনেকগুলি নানা ধরণের কবিতার সঙ্কলন। বিভিন্ন বিদেশী কবির অনুবাদ-কবিতাও আছে কতকগুলি। গ্রন্থকার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন নানা মাসিক সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রিকাদির মধ্যে যে রস ছড়িয়ে এসেছেন, এই গ্রন্থখানির মধ্যে কাব্যরসপিপাসু পাঠক তা একত্রে পেয়ে খুশি হবেন। অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই কবির ছন্দমাধুর্য্য ভাববৈচিত্র্য ও অন্তর্দৃষ্টি লক্ষণীয়। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ উচ্চাঙ্গের এবং প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাও উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানির নামকরণ করেছেন, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ৪৲

সে মেয়ে ছিল তো সবই

হ্যালডর লাক্সনেস

সে মেয়ে ছিল তো সবই—যা তোমার ভালবাসা আর অন্বেষার,
যা কিছু পাওয়ার জন্যে ব্যাকুলতা, স্বপ্নদেখা তোমার মনের।
তুমি তাকে শুনিয়েছ ছন্দে গান তোমার সকল মনীষায়
শিখিয়েছ হে হৃদয়, সব কিছু শ্রদ্ধা-সম্মানের।

আমি যে পেয়েছি খুঁজে তোমার মনের মণিকোঠায় লুকানো
সত্যের এবং দূরদৃষ্টির কোরকগুলি ঠিক ;
এ পার্থিব জীবনের এবং জ্যোতির
যা কিছু সু-উচ্চতম—তাদেরই প্রতীক।

এবং তাদেরই নিয়ে আমরা দু'জনে বেঁচেছিলাম নিষ্পাপ
যে সত্যেরা—খণ্ড, ছিন্ন পৃথিবীকে বাঁধে সমবায়ে ;
ক্ষণজীবী আমোদের নাটকের থেকে
আনন্দের পবিত্র-মধুর প্রত্যবায়ে।

অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

রঙ্গপট

তাসের ঘর

বিশ্ববিধাতার গঠন-লীলার পরিপূর্ণতা মনুষ্য সৃষ্টিতে ও তাদের যথাযোগ্য স্থানে সংস্থাপনেই সেই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের বিকাশ। যাকে যেখানটিতে মানায় তাকে ঠিক সেইখানটিতেই তিনি বসিয়েছেন। কিন্তু মানুষের চিত্ত চিরদিনই অপূর্ণ। চাওয়ার নেশা তার ভাঙে না কোন দিন। সকল সময়েই সে ভাবে যে 'ওর জীবনযাত্রার মত আমারটি হলে ভাল হত'। ইচ্ছা তার পূর্ণ হয়—পরমুহূর্তেই সে বুঝতে পারে যে পরমপিতার উপর কলম চালানো মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। এই সত্যের ছায়া গ্রহণ করে অজয় ও বিনয় নামক দু'টি যুবককে কেন্দ্র করে রাসবিহারী লাল রচনা করেছেন 'তাসের ঘর'-এর কাহিনী। প্রথম জন বৈভব-বিমণ্ডিত, প্রচুর বিত্তবান, দ্বিতীয় জন রিক্ত, নিঃস্ব, মৃত্যু-অভিলাষী। একটি বড় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশে দেখা হয়ে গেল দু'জনে, দু'জনের মধ্যে বিনিময় হ'ল পারস্পরিক জীবনযাত্রার। এর প্রধান সহায়ক হ'ল উভয়ের মধ্যে আকৃতির অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য অর্থাৎ অজয় হয়ে গেল বিনয় ও বিনয় হয়ে গেল অজয়। তারপর নানা ঘটনার সমাবেশ হাস্যরস পরিবেশন। শেষে বিনয়ের দ্বারাই উভয়ের প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটন। অজয়কে ভালবাসত রেবা, কিন্তু অজয় তার ডাকে সাড়া দেয় নি, তাকে মন দিল বিনয়, সুষমার বেলাতেও তাই—সে চেয়েছিল বিনয়কে কিন্তু বিনয় তাকে চায় নি, তাকে চাইল অজয়। কথা হচ্ছে যে, প্রথমেই প্রশ্ন জাগে যে এই কাহিনী বাস্তবতার সমর্থন পায় কি না। বস্তুতঃ পক্ষে ঠিক হুবহু চেহারার মিল কি পাওয়া যায়, সৌসাদৃশ্য থাকে? একে দেখে অন্য বলে ভ্রমও হয় কিন্তু তাই বলে দিনের পর দিন একজন আরেকজন সেজে কাজ চালায় কি করে? তবে অজয় ও বিনয়ের পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব নিখুঁতভাবে ছবিতে ফুটে উঠেছে এবং কাহিনীর সাফল্যতা হয়েছে অনেকখানি সহায়ক। হেমন্তকুমারের কণ্ঠে গাওয়া প্রখ্যাত কবি বিমল ঘোষের লেখা "শূন্যে ডানা মেলে, পাখীরা উড়ে গেলে, নিঝুম চরাচরে তোমারে খুঁজে মরি।" গানটি একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অভিনয়ে দ্বৈত ভূমিকায় অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন উত্তমকুমার; এক সঙ্গে দু'টি বিভিন্ন ধরণের চরিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অথচ একটির মধ্যে আরেকটির ছাপ পড়ে নি। এইখানেই তাঁর সমধিক কৃতিত্ব। মিনুর করুণ-কাতর অসহায় চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়-নৈপুণ্যে। আদর্শের পায়ে নিবেদিত প্রকাশের কর্তব্যনিষ্ঠ অথচ কোমল রূপটি দর্শকমনে রেখাপাত করতে সমর্থ হয় রবীন মজুমদারের অভিনয় দক্ষতায়। দেবযানীর অভিব্যক্তিহীন অভিনয় ঠিক মুখস্থ করা তোতা পাখীর উক্তির মত। মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত এই ছবিটিতে সবিতা চট্টোপাধ্যায় যেন ভুল করে একটুখানি ভাল অভিনয় করে ফেলেছেন, তাঁর মত অভিনেত্রী যেটুকু ভাল অভিনয় করতে পারেন সেটুকুই আশার কথা। প্রার্থনা করি, তাঁর অভিনয়ের যেটুকু উন্নতির সূত্রপাত হ'ল তাসের ঘরে সেইটুকুই যেন ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বর্ধিত আকারে পরিণত হয়। জহর গঙ্গোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, তরুণকুমার, ডাঃ হরেন, মাঃ তিলক, চন্দ্রা দেবী, অপর্ণা দেবী, বাণী গঙ্গোপাধ্যায় স্ব স্ব ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন। এঁরা ছাড়া রূপায়ণে আছেন নবাগতা শেফালী নায়েক, স্বরূপ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শম্ভু চট্টোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, মণি শ্রীমানী, প্রেমতোষ রায় ও শ্যামপুকুর থানার ও, সি শ্রীঅনিল সরকার প্রভৃতি। তাসের ঘর ছবিটির মূল নাম ছিল 'বিনিময়'। নামটি বোধ হয় ঠিকই ছিল, কেন যে বদলানো হল বোঝা গেল না! ছবির একেবারে শেষের দিকটি কিন্তু পরিচালক সহজভাবে বোধগম্য করে উপস্থাপিত করতে পারেন নি। আর একটু সহজ করে ঐ জায়গাটি দেখালে ভালো হোত।

'পথে হ'ল দেরী' (প্রথম পূর্ণাঙ্গ গেভাকলারে তোলা বাঙলা ছবি) একটি দৃশ্যে ছবি বিশ্বাস ও সুচিত্রা সেন

নীলাচলে মহাপ্রভু

ছবির নামকরণেই বোঝা যায় যে, কাহিনীর পটভূমিকা বাঙলা নয়, দূর নীলাচল অর্থাৎ উৎকল এবং কাহিনীর নায়ক স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য। সোয়া চারশ' বছর আগের কথা। যেদিন বর্ণ বৈষম্যে নীলাচল জর্জর, ব্রাহ্মণত্বের আলোয় যেদিন ব্রাহ্মণেরা অন্ধ, অত্যাচারে পীড়নে শূদ্র নীচ অন্ত্যজদের প্রাণ অতিষ্ঠ, সেই সময়ে সমন্বয়ের বাণী বহন করে

বাঙলা থেকে নীলাচলে পদার্পণ করলেন নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্ত। তাঁর চরণপ্রান্তে সেদিন পরমানন্দে ঠাঁই পেল সর্বহারার দল। মহারাজা রণক্ষেত্রে, মহামন্ত্রী চক্রান্ত করে মহারাজকে নিহত করে শূন্য সিংহাসনে নিজে বসতে চান। জীবন্ত জগন্নাথকে দেখে তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করে ধন্য হল দেবদাসী, যিনি মহামন্ত্রী দ্বারা নিয়োজিতা হয়েছিলেন গৌরাঙ্গকে অন্য উপায়ে পরিতুষ্ট করে লোক সমক্ষে তাঁকে হেয় করতে। তাঁর ব্যর্থতা দেখে মহামন্ত্রী তাঁকে যখন চরম দণ্ড দিতে উপস্থিত, সেই সময়ে নাটকীয় ভাবে মহারাজার আবির্ভাব ও সকল দুর্যোগের সমাপ্তি। মহারাজাও চৈতন্তের প্রতি অবিশ্বাসী রইলেন, শেষে রথযাত্রার দিন মহারাজ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করলেন চৈতন্তের চরণে। এর পর মহাপ্রভুর স্বদেশে আগমন, মাতা-পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। পুনর্বার নীলাচলে গমন ও অসীমের মধ্যে বিলীয়মান হওন। ভক্ত দর্শকের চিত্ত এ ছবি অধিকার করবে সন্দেহ নেই। সমগ্র উৎকলবাসীর মহাপ্রভুকে বরণ করে নেওয়া বাঙালীর প্রাণে নতুন করে পথ চলার প্রেরণা জোগাবে। বিস্মৃত অতীতকে বর্তমানের বুকে জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা সকল সময়ে প্রশংসার যোগ্য। পরিচালনায় খুঁৎ চোখে পড়ে প্রথমাংশে জগন্নাথের মন্দিরে চৈতন্য অচৈতন্য হয়ে পড়ার আগের মুহূর্ত অবধি দেখা গেল মন্দিরের অভ্যন্তর একেবারে নির্জন অথচ তিনি পড়ার পরমুহূর্তেই যে গাদা-গাদা লোক বাধা দিতে এগিয়ে এল তারা কি দেওয়াল ভেদ করে এল? কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলুম কেউ মহার্ঘ অলঙ্কার পর্যন্ত দিয়েছেন, ভেবে দেখুন এ কি সম্ভব? কুষ্ঠরোগীকে যখন নীরোগ করলেন গৌরাঙ্গ, সেই সংবাদ সার্বভৌমের কাছে পৌছল না কেন? চৈতন্তের যে শোভাযাত্রায় সার্বভৌম পর্যন্ত অংশগ্রহণ করলেন সেই শোভাযাত্রায় মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ ভক্ত গোপীনাথ অনুপস্থিত কেন? মহারাজা প্রতাপরুদ্রের মাথার মুকুট অমন মুসলমান নবাবদের মত কেন? মহামন্ত্রী বিদ্যাধরের দাড়ি দেখে তাঁকে নীলাচলবাসীর পরিবর্তে শিখ বলে মনে হয়। অভিনয়ে অপূর্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন নবাগত নট অসীমকুমার। সমগ্র চিত্রখানির গৌরব বর্ধন করেছে তাঁর ভাবগম্ভীর শান্ত সংযত সুষ্ঠু অভিনয়। প্রথম আবির্ভাবেই দর্শকচিত্ত বিপুলভাবে নাড়া দিয়ে গেলেন অসীমকুমার। তাঁর ভবিষ্যতের কল্যাণ কামনা করি। যৎসামান্য আবির্ভাবে ঈশানকে জীবন্ত করে তুলেছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল, বীরেশ্বর সেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরেন ঘোষ, মলিনা দেবী, শিখা বাগ স্ব স্ব ভূমিকাগুলি সুষ্ঠু ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুমিত্রা দেবী ও দীপ্তি রায় দু'জনেই চরিত্র দুটির যথার্থ রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন, এঁদের অভিনয় পরিতৃপ্তি দেয়। ব্যর্থ হয়েছেন পদ্মা দেবী ও সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথমাক্ত অভিনয়ে মহারাণীর পরিবর্তে মনোহারিণী বলে মনে হয়, রাণীর ব্যক্তিত্ব এতটুকু তার মধ্যে নেই, রাজার অসংখ্য অনুগৃহীতারই একজন বলে তাঁকে মনে হয়। দ্বিতীয়ার অভিনয় সম্পূর্ণরূপে জড় ও আড়ষ্ট ও অভিব্যক্তিহীন। এখনও তাঁর রীতিমত সাধনার দরকার। কুচক্রীর রূপটি ধীরাজ ভট্টাচার্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না; তবে মাঝে মাঝে তাঁর সেই 'টেন-টেনে' কথা বলা দর্শকচিত্তে রীতিমত বিরক্তি উৎপাদন করে। এঁরা ছাড়া রূপায়ণে আছেন হরিমোহন বসু, কৃষ্ণধন মুখো, হরিধন মুখো, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টো, প্রীতি মজুমদার, বেচু সিংহ, সমীর মজুমদার, পারিজাত বসু, প্রেমতোষ রায়, শৈলেন মুখো, শ্রীমান্ তিলক, জ্ঞানদা কাকোতি, আরতি দাশ, সুরুচি সেনগুপ্তা ইত্যাদি।

সুরের পরশে

একটি থিয়েটারকে কেন্দ্র করে গল্প। স্বনামধন্য অভিনেতা পরেশ রায় মৃত্যুকালে তাঁর 'নাট্যশ্রী' থিয়েটারের ভার দিয়ে যান তাঁর মেয়ে মনীষাকে। ঘটনাচক্রে মনীষাকে মঞ্চে অবতীর্ণ হ'তে হয় ও পরে নাট্যকার কল্যাণ সেনের সঙ্গে নানা বিরোধের মধ্যে দিয়ে প্রেম গড়ে ওঠে শেষে সর্বস্ব ত্যাগ করে কল্যাণের জীবনে নিজেকে মিলিয়ে দেয়। এই হ'ল গল্প। একটি দুর্বল গল্প ও নিরেশ পরিচালনা ছবিটিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। তালকানার মত পরিচালনার বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কয়েকটি দেওয়া যাক। মন্ত্রশক্তির অভিনয়ে বাণীকে দিয়ে যে পরিচ্ছদ পরানো হয়েছে ও যে ভাবে নাচানো হয়েছে তাতে করে সন্দেহ হয় যে 'মন্ত্রশক্তি'র কাহিনীটি এঁদের জানা আছে কি না। 'সুরের পরশ' নাকটটির মঞ্চাভিনয়ের যতগুলি অংশ দেখানো হ'ল তা অস্বাভাবিক নয় কি? ছবিতে যত খুঁটিনাটি দৃশ্য দেখানো যায় মঞ্চে তা কিছুতেই যায় না—কবির দণ্ডাজ্ঞা থেকে মুক্তি পর্যন্ত খুব জোর তিনটি দৃশ্য দেখানো যেতে পারে, তার বেশী কিছুতেই নয়। সাধারণতঃ একটি থিয়েটার সাড়ে ন'টা নাগাদ ভাঙে, তার সাজসজ্জাদি খুলতে ও হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হ'তে আরও অন্ততঃ মিনিট পনেরো সময় যায়, ঐ খানেই পৌণে দশটা; এ ছবির নায়ক তখনও যে কি করে দশটার ট্রেণে বিদেশযাত্রার আশা রাখে সেইটেই ভাববার কথা। থিয়েটারটি দেখলুম 'প্রমীলা রাজ্য', অভিনীত নাটকটিতে পর্যন্ত।

প্রতিভা বসুর 'প.থ হ'ল দেরী'র একটি দৃশ্যে উত্তম, সুচিত্রা, প্রচার—সুধীরেন্দ্র সান্যাল

সব থেকে চোখে লাগে যে মৃত্যুপথযাত্রী পিতার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সেই সত্যের অপলাপন। যে সত্যকে বজায় রাখতে সহস্র বাধা সত্ত্বেও মনীষা নিজে অভিনেত্রী হ'ল, সেই মনীষা মুহূর্তের আবেগে সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে ভিন্ন জীবন গ্রহণ করে বসল এবং রীতিমত সে সরে গেল মঞ্চজগত থেকে। এমনও হতে পারত যে মনীষা সরে গেল বটে তবে সে মৃত পিতার থিয়েটারটিকে চালু রেখে গেল কিন্তু এ ধারণার মূর্ত প্রতিবাদ কাহিনীর বক্তব্যই। আমরা দেখতে পেয়েছি যে মনীষাই থিয়েটারের প্রাণ। সে চলে গেলেই থিয়েটার নিষ্প্রভ। মা সবই বুঝতে পারলেন অথচ মেয়ে কোথায় যাচ্ছে একবার প্রশ্ন পর্যন্ত করলেন না! তিনি কি একজন জ্যোতিষী যে সব কিছু গণনায় আগে থাকতে জেনেছিলেন? আদর্শবাদী সাহিত্যিককে এখানে যে ভাবে দেখানো হয়েছে ও যে সংলাপ তাঁকে দেওয়া হয়েছে এ জিনিষ প্রায় তেরো বছর আগের 'উদয়ের পথে'রই একরকম অনুকরণ বললে ভুল হয় না। অভিনয়াংশে উত্তমকুমার ভাল অভিনয়ই করেছেন, ছবির প্রায় মধ্যাংশে তাঁর আবির্ভাব আর ধরতে গেলে তাঁর আসার পর থেকেই যেন ছবিটি কিছুটা আকৃষ্ট করে দর্শক সাধারণকে। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখো, কালী বন্দ্যো, অনুপকুমার, জীবেন বসু, সত্য বন্দ্যো, সলিল দত্ত, শ্রীমান্ বাবুয়া, অপর্ণা দেবী, যমুনা সিংহ প্রত্যেকেরই অভিনয় যথাযথ চরিত্রানুযায়ীই হয়েছে; তবে মালা সিন্‌হা মনীষার রূপটি ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি, দর্শককে মোটেই আকৃষ্ট করে না তাঁর কৃত্রিমতাপূর্ণ অভিনয়। অবশ্য স্থানে স্থানে তাঁর অভিনয় অত্যন্ত সাবলীল হয়েছে স্বীকার করতেই হবে, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মনে হচ্ছে যে তিনি কায়দা-কসরতের দিকেই অধিকমাত্রায় যত্নশীলা। 'পুত্রবধূ'র মালা সিন্‌হার কাছে, আমরা এ জিনিষ আশা করি নি।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

চলাচল ও পঙ্কতপার মাধ্যমে দর্শক সাধারণ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও অসিত সেনের প্রতিভার পেয়েছে আস্বাদ। এঁদের আগামী অবদান 'জীবনতৃষ্ণা'। সঙ্গীত পরিচালনার ভার পেয়েছেন ডক্টর ভূপেন হাজারিকা। রূপায়ণে দেখা যাবে পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, উত্তমকুমার, সুনন্দা দেবী ও সুচিত্রা সেনকে।...

জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' বাঙলার বিদগ্ধমহলে একটি আদৃত গ্রন্থ। এটি পরিচালনা করছেন খ্যাতিমান পরিচালক তপন সিংহ। অভিনয়ে মালা সিন্‌হা সহ দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পিবর্গকে। ...তরুণ সাহিত্যিক অনিলবরণ ঘোষের 'বসন্তবাহার'কে চিত্ররূপ দিচ্ছেন অভিনেতা-পরিচালক বিকাশ রায়। সঙ্গীতে সমৃদ্ধ এই চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনার ভার পেয়েছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করবেন ভারতবরেণ্য ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ, আমীর খাঁ, হীরাবাঈ বরদেকার, কণ্ঠে মহারাজ, সাগিরুদ্দীন, শান্তাপ্রসাদ, মাণিক বর্মা, প্রসূন বন্দ্যো, মানবেন্দ্র মুখো, এ কানন, সন্ধ্যা মুখো, কণিকা বন্দ্যো প্রভৃতি। পর্দায় দেখা যাবে পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, বসন্ত চৌধুরী, দীপক মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, বিগত দিনের খ্যাতিমান অভিনেতা প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুনন্দা দেবী, অপর্ণা দেবী, নবাগতা শ্রীলা চট্টোপাধ্যায়, শুক্লা দাস, মায়া ভট্টাচার্য এবং রোশনকুমারী প্রমুখ শিল্পীদের।...মণি ঘোষ ও সুকবি অমল দত্তের পরিচালনায় চিত্রায়িত হচ্ছে কড়ি ও কোমল। ভূপেন হাজারিকার সঙ্গীত পরিচালনায় এই ছবিতে দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, রবীন মজুমদার, প্রবীরকুমার, জীবেন বসু, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপতি চৌধুরী, ভারতী দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীদের।...জনপ্রিয় তারকা উত্তমকুমার বর্তমানে প্রযোজক। তাঁর প্রথম প্রযোজিত ছবি 'হারানো সুর' যার কাহিনী রচনা ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন যথাক্রমে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ও হেমন্তকুমার। অজয় করের পরিচালনায় এই ছবিতে অবতীর্ণ হয়েছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, উত্তমকুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রা দেবী, সুচিত্রা সেন, কাজরী গুহ প্রভৃতি। প্রযোজনার ক্ষেত্রেও উত্তমকুমার সাফল্য লাভ করুন ও তাঁর দ্বারা চিত্রজগৎ আরও উপকৃত হোক, এই কামনাই করি।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

সৌন্দর্য্যময়ী অভিনেত্রী সুমিত্রা দেবী

শুধু বাংলা নয়, বাংলার বহির্জগতকেও একই সঙ্গে বিমুগ্ধ করেছেন সৌন্দর্য্যময়ী কুশলী অভিনেত্রী সুমিত্রা দেবী। একটি যুগ মাত্র অতিবাহিত হ'য়েছে তিনি চিত্রজগতে এসেছেন কিন্তু অভিনয়-প্রতিভা ও অভিনয়-দক্ষতার কী বিশিষ্ট ছাপই না রাখতে পারলেন এরই ভেতর! রক্ষণশীল পরিবারে তাঁর জন্ম—রক্ষণশীল পরিবেশেই তাঁর বাল্যজীবনের শিক্ষা ও দীক্ষা। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি এ লাইনে আসবেন এ বোধ হয় কল্পনার বিষয়ও ছিল না। কিন্তু শ্রীমতী সুমিত্রার বিদ্রোহী মন—চলিত সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা—এ ছিল বলেই এ লাইনে আসতে তিনি বাধা পেলেন না। আর এসে যখন পড়লেন তখন দেখা গেল তিনি প্রথম শ্রেণীর একজন সার্থক শিল্পী, বাংলার চলচ্চিত্র-জগত তাঁকে পেয়ে সত্যি লাভবান হ'য়েছে অনেকখানি।

শিল্পদের মতামত জানতে গিয়ে বহু শিল্পীর সংস্পর্শে এসেছি

এ যাবৎ, নোতুন নোতুন অভিজ্ঞতাও লাভ করেছি প্রচুর। শিল্প-চাতুর্য্য ও অভিনয়ে যাঁরা দর্শক সমাজের চিত্তবিনোদন করে থাকেন দিনের পর দিন, তাঁদের জীবন-বৈচিত্র্য, রূপালী পর্দার বাইরে যেখানে তাঁরা আমার আপনারই মত রক্তমাংসের মানুষ, সেই কাহিনী পাঠক-পাঠিকাদের সামনে উপস্থাপিত করে আসছি কত কাল থেকেই। এবারে বাংলার অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী সুমিত্রা দেবীর মতামত সংগ্রহ করে পরিবেশনের তাগিদ অনুভব করলুম প্রত্যক্ষ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে।

বালীগঞ্জের কেয়াতলা লেনের একটি প্রকাণ্ড ফ্লাট বাড়ী। শ্রীমতী কানন দেবী ও তাঁর স্বামী বন্ধুবর স্বনামধন্য পরিচালক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলুম আগে-ভাগেই সুমিত্রা দেবী এখানেই থাকেন। কলকাতার দারুণ গ্রীষ্মের একটি দিনে ঘর্মাক্ত কলেবরে হাজির হলুম সেখানে। চার তলায় ফ্লাটে যেখানে শ্রীমতী সুমিত্রা থাকেন, ঐ স্থানে তাঁর ড্রইংরুমে আমাকে নিয়ে বসান হ'লো। চমৎকার ঘরখানি—চারদিকেই দেখতে পেলুম শিল্পীমনের নানা নিদর্শন ছড়িয়ে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একখানি বৃহৎ আলেখ্য ঘরখানির শোভা বৃদ্ধি করেছে অনেকখানি, পরিবেশকেও করে তুলেছে বেশ স্নিগ্ধ শান্ত ও সমাহিত। ভাবলুম, আলোচনার ক্ষেত্র প্রশস্ত হ'য়ে আছে এইখানে আপনা থেকেই।

"১৯৪৪ সালে নিউ থিয়েটার্স-এর হিন্দি ছবি 'মেরি বহিন' এবং বাংলা ছবি 'সন্ধি'—এ দুখানি ছবিতে আমি প্রথম আত্মপ্রকাশ করি। তারপর এক বছরের মধ্যে বহু ছবিতে এবং বহু বিশিষ্ট ভূমিকায় আমার অভিনয় চলে আসছে। 'স্বামী' ছবিতে সৌদামিনী 'সাহেব বিবি গোলাম'এ পটেশ্বরী বৌ ঠাকুরাণী এবং 'আঁধারে আলো' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে আমি তৃপ্তি পেয়েছি তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী। এর বিশেষ কারণ জটিল চরিত্রে রূপদানেই সাধারণতঃ আমার আনন্দ। একটি দুটি হিন্দি ছবিরও নাম করবো আমি যেমন 'মশাল' ও 'ময়ূরপঙ্খে' (বোম্বাইয়ের ছবি) যেগুলোতে অভিনয় করতে যেয়ে আমার তৃপ্তি বা আনন্দ কম হয়নি। এক্ষেত্রে সেই একই কারণ—অভিনয়ের জন্য মনের মত কাহিনী ও চরিত্র খুঁজে পাওয়া। বলতে কি, যে চরিত্রের ভেতর সংঘাত রয়েছে অর্থাৎ বেদনা ও আনন্দ, আলো ও আঁধারের রয়েছে সংমিশ্রণ, বিশেষতঃ যাতে থাকবে একটা বিদ্রোহের মনোভাব, সেখানেই যেন আমি মানানসই, স্বাভাবিক ও সুন্দর। কাজেই সে চরিত্রগুলোতে অভিনয় করতে আমার মোটেই কষ্ট হয় না, পরন্তু মনে আনন্দ ও তৃপ্তি পাই আমি প্রচুর।"

ধীরে ধীরে বললেন আমায় শ্রীমতী সুমিত্রা দেবী এ কথাগুলো আলোচনার সূত্রপাতেই। এর পর আমি কয়েকটি প্রশ্ন রাখলুম তাঁর কাছে, আমি শুনছি, তিনি চললেন বলে।

একটি ছোট প্রশ্ন আমার—চলচ্চিত্র-জগতে আপনার যোগদানের কারণ কি?

—এ লাইনে কেন এলুম, সে কথা আজ আর বলে লাভ কি? তবে এটুকু বলতে পারি, চলচ্চিত্রে আমি যোগদান করবো, এ ধারণা আমার কোন দিনই ছিল না। ধরে নিন, নিছক ব্যক্তিগত কারণেই এ লাইনে এসে পড়েছি আমি। আমাদের Familyতে আমিই first এবং বোধ করি আমিই last. একটা কথা না বলে পারবো না, হয়তো বা এইটিই আমাকে এ লাইনে আসতে প্রেরণা জুগিয়ে থাকবে, ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের উপর একটা সহজাত টান ছিল আমার। মনে পড়ছে, পুজোর সময় আমাদের বাড়ীতে অভিনয় হ'তো প্রতি বারেই এবং সে অভিনয় আমার মনের উপর অলক্ষিতে কী প্রভাব বিস্তার করতো! সিনেমা-জগতে আসবার কথা তখন মনে উঠে নি বটে কিন্তু অভিনয়ের একটা নেশা আমাকে যেন ক্রমেই পেয়ে বসে। স্কুলে যখন পড়ছি তখনই অভিনয় করবার আমি সুযোগ পেলুম—এবং আর দুই-একবার সাহায্যের জন্যে অভিনয় করেছি অবশ্য, সে সকল অভিনয় শুধু মেয়েরাই করেছিল। Confidence ছিল মনে বরাবরই—অভিনয় করতে আমি পারবো, কখনই ব্যর্থ প্রমাণিত হবো না।

সামাজিক ও পারিবারিক প্রশ্নের কথা যদি তোলেন, তা হ'লে বলবো, শ্রীমতী সুমিত্রা বলতে থাকেন বেশ সহজ গলায়, ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর প্রথমটায় সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে প্রচণ্ড সংঘাত এসেছিল আমার। বাড়ীর দিক থেকেই আপত্তি ও বাধা দেখা দিয়েছিল অত্যন্ত বড় হ'য়ে কিন্তু আমার মনে কোন প্রশ্ন বা আপত্তি তখনও ছিল না, আজও নেই। সামাজিক ও পারিবারিক দিক থেকেও এখন সব ঠিক হয়ে গেছে, কোথাও আমি অনাদৃত নই।

—সাধারণতঃ আপনার দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী কি এবং বিশেষ hobbyই বা কি আছে? ধীর কণ্ঠে সুমিত্রা দেবী বলেন—বোম্বেতে যখন থাকি, ভোরবেলাই উঠে পড়ি ঘুম থেকে, তারপর চা খেয়ে স্নান করতে যাই—স্নান শেষে চলে হয় তো আমার

সুমিত্রা দেবী

নাচ শেখা। ষ্টুডিওতে যেদিন কাজ থাকলো সেদিন সেখানে চলে যাই, আর যেদিন স্যুটিং থাকলো না সেদিন প্রায় সারাদিনই বাড়ীর কাজ-কর্ম্ম দেখি। বিকেলের দিকে হয়তো বেড়াতে বেরিয়ে পড়লুম, ক্লাবে গেলুম খেলা-ধূলোও করলুম। রাত্রিতে বাড়ী ফিরে এসে কিছুক্ষণ চললো পড়াশুনো বা সংসারের কাজ-কর্ম্ম দেখা। হবি বলতে, গার্ডেনিং, ট্রাভেলিং, ষ্ট্যাম্প জমান, রকমারি coin সংগ্রহ—এ কয়টি আমার আছে এবং এগুলো করে আমি আনন্দ পাই। যখন খেলি, টেবিল টেনিস খেলতেই আমার ভাল লাগে। swiming করি outing এর দিকেও আমার ঝোঁক কম নয়। আর একটি হবি আমার ছবি তোলা, ছবি তুলতে সত্যি আমার ভাল লাগে।

শ্রীমতী সুমিত্রার বলা তখনও শেষ হয়নি, বললেন তিনি—পড়াশুনোর অভ্যাসটা এখনও রয়েছে কি না যদি বলতে হয়, বলবো—এটিও প্রায় আমার একটি হবি, কাজেই ছাড়তে পারিনি। এ অভ্যাসটি আজও। সাহিত্য ও Drama এ পেলেই আমি পড়ে থাকি। আধুনিক নামকরা সাহিত্যিক ও নাট্যকারদের রচনা মোটামুটি ভালই লাগে আমার। বর্ত্তমান সাহিত্যিকদের মধ্যে যাযাবর ও সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের লেখা আমার ভাল লাগে। সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলোর আমি একজন নিয়মিত পাঠিকা। 'মাসিক বসুমতী' আমার বেশ ভাল লাগে। এর প্রধান কারণ এর ভেতরে ভাল ভাল গল্প ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট রচনা থাকে যা পড়তে যেয়ে মনের আনন্দ হয়।

পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব মতামত কি?

সুমিত্রা দেবী উত্তর করলেন স্পষ্ট ভাষায়—পোষাক-পরিচ্ছদ simple হওয়াই ভাল, তবে সেটা artistic হতে হবে। সোজা কথায় সব কিছুর ভেতরই একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই। ড্রেস যতটা light colourএর উপর হবে, ততই বোধ করি ভাল।

এর পর চলচ্চিত্র শিল্প সংক্রান্ত বিশেষ আলোচনায় আমরা ফিরে এলুম। এবারে আমার প্রশ্ন—চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি গুণ না থাকলে নয়?

সর্ব্বপ্রথমেই বলতে হয়, চলচ্চিত্রে শিল্পী হিসেবে যোগ দিতে হলে আর্ট সম্বন্ধে sense অবিশ্যি চাই। proportion যাঁর ভেতর আছে, দক্ষশিল্পী তিনি হবেনই। বলা বাহুল্য, এ লাইনে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্ত একরূপ অপরিহার্য্যরূপেই চাই ভাল চেহারা, সুকণ্ঠ, অভিনয়-প্রতিভা এবং সেই সঙ্গে general instinct.

ভাল ছবির জন্তে কি চাই বা কি না হলেই নয়, জিজ্ঞেস করলে আমি না বলে পারবো না, শ্রীমতী সুমিত্রা জোর গলায় বলে চলেন, প্রথমেই চাই ভাল বই—অর্থাৎ ভাল গল্প বা কাহিনী। তার পরেই চাই treatment, ভাল টিম ওয়ার্ক ও নিখুঁত অভিনয়। সর্ব্বোপরি থাকতে হবে পর্য্যাপ্ত finance যাতে production কখনই hamper না করে। এ সবগুলোর দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে ছবি তৈরী করতে গেলে ছবি ভাল না হয়েই পারে না, এটুকু আমি বলবো।

থামতে যেয়েও সুমিত্রা দেবী দেখলুম থামলেন না। বললেন—আর একটি কথা আমি না বলে পারবো না, সে হ'লো শিল্পীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে। স্বাস্থ্য যে কোন মানুষের ক্ষেত্রেই পরম সম্পদ সন্দেহ নেই কিন্তু চলচ্চিত্রশিল্পীদের পক্ষে এটি আরও কিছু বেশী। স্বাস্থ্য যেখানে ভেঙ্গে গেল, শিল্পীর সেখানেই মৃত্যু। বলতে কি, শিল্পীদের বেলায় স্বাস্থ্য জিনিষটা খুবই urgent অথচ এটা দুঃখের যে, বাংলা দেশের মেয়েরা এদিকে ততটা ধ্যান দেন না।

চলচ্চিত্রে বাঙ্গালী—বিশেষ করে অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েদের যোগদান সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত মতামত কি?

শ্রীমতী সুমিত্রার কণ্ঠে দৃঢ় জবাব—শিক্ষিত অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েদের এ লাইনে আসতে বাধা কোথায়? আমি তো দেখিনে। অন্যান্য বৃত্তির মত এইটিও একটি গ্রহণযোগ্য বৃত্তি বলেই আমার বিশ্বাস। চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে উন্নীত করতে হলে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদেরই এ লাইনে চাই। বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের প্রসঙ্গেও ঐই একই কথা প্রযোজ্য। এ লাইনে এদের আরও অধিক সংখ্যায় আসা উচিত, এ কথাই আমি বলবো।

নিজের আয়ের প্রসঙ্গ তুলতে যেয়ে সুমিত্রা দেবী কোনরূপ জড়তা না রেখেই বললেন—১৯৪৪ সালে নিউ থিয়েটার্স এ যখন আমি যোগ দিই, তখন আমার মাসমাইনে ধার্য্য হয় আড়াইশো টাকা। অবশ্য এক মাস যেতে না যেতেই নিউ থিয়েটার্স-এর কর্ণধার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রী বি, এন সরকার সেটা বাড়িয়ে পাঁচশো টাকা করে দেন। শুধু তাই নয়, আমাকে বোনাসও দেওয়া হলো। এযাবৎ কোন ছবিতে বেশী পেয়েছি বা কোন ছবিতে কম—ঠিক খতিয়ে দেখি নি। তবে মনে হয়, বোম্বাইয়ের হিন্দি ছবি 'গুরু খুড়ু' এবং বাংলা ছবি "পথের দাবী"তেই সব চাইতে বেশী টাকা পেয়েছি। সব চাইতে কম টাকা হয় তো পেয়ে থাকবো বাংলা 'সন্ধি' ছবিতে—কম বলতে প্রায় ৩ হাজার টাকা।

এর পর আমি জানতে চাইলুম সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়? এ সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব ধারণা বা মতামত কি?

—চলচ্চিত্র একটি বিরাট শিল্প তো বটেই পরন্তু এ'টি একটি চমৎকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সমাজ-জীবনের উপর এ'র প্রভাব অপরিসীম। এর মাধ্যমে সমাজকে উন্নত করা চলে বহুদূর অবধি। আমি তো বলবো এটি একটি Powerful medium of teaching.

প্রশ্নোত্তরের পালা প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। এর ভেতর বুঝতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধে হলো না—শ্রীমতী সুমিত্রা চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। দেখলুম, সিনেমা-জগৎ সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তিনি এ ক'বছরের ভেতর—চিন্তা করবারও অধিকার রাখেন যথেষ্ট, কি করে এ শিল্পের উৎকর্ষ সাধন হবে, এ লাইনের উন্নতি হবে। একদিন যদি আমরা সুমিত্রা দেবীকে শিল্পীর পর্য্যায় অতিক্রম করে প্রযোজিকা হিসেবে দেখি, বা দেখতে পাই, তবে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হবো না। বরং এ আশাই রাখতে পারি পরিষ্কার যে, শিল্পী ও অভিনেত্রীরূপে তিনি যেমন স্বনামধন্যা, প্রযোজিকার নয়া ভূমিকাতেও তেমনি হ'তে পারবেন সার্থক। শ্রীমতী সুমিত্রা বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশন কর্তৃক বছরের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী নির্ব্বাচিত হয়েছেন কয়েক বারই, শ্রেষ্ঠা প্রযোজিকা-রূপেও আমরা তাঁকে দেখতে পাবো, এটি নিশ্চয়ই অতিরিক্ত চাওয়া নয়।
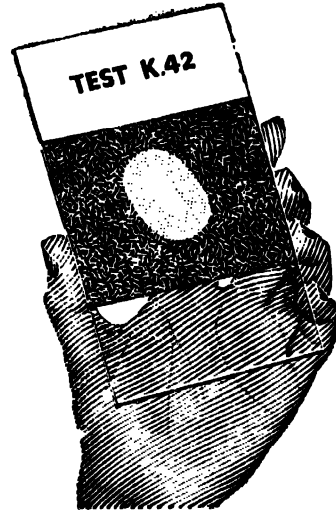
রাজায়-রাজায়

[৩৮৪ পৃষ্ঠার পর]

ম্যালেট ভালবাসা জানিয়েছিল নরম সুরে, চৌধুরাণীর দেহটাকে আন্তরিক চেয়েছিল। এ খাঁচার অধিকারী যদি নরদানব হয়!

আনন্দকুমারী ভবিষ্যৎ জানতে চায় না। রাবণের হাতে মৃত্যু অপেক্ষা রামের হাতে মরণ না কি অনেক সুখের, অনেক আনন্দের।

বজরার অধিকারীও দেখতে পেয়েছেন অপ্সরীনিন্দিতা মৎস্য-কন্যাকে। ছাদের ফরাসে লাল ভেলভেটের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে শুয়ে তিনি নিশ্চিন্তায় বসেছিলেন, বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলেন না।

একজন তাঁবেদার সেবায় রত ছিল। দেহ মর্দন করার কাজে। পদসেবার দাস একজন কাছে ছিল। তাকেই ফিসফিসিয়ে বললেন, —হয়তো ভাগ্যবিড়ম্বিতা, আশ্রয়প্রার্থিনী। কি প্রার্থনা জানায় শুনা চাই।

জগমোহন লেঠেলের বুকে সুপ্ত সিংহ জাগলো যেন। বজরার ছাদ থেকে নৌকার তীরে এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঝাঁপ দেওয়ার পূর্বমুহূর্তে বললে,—কুমারবাহাদুর, আপনার অনুমানই যথার্থ। দেখি কি বলে।

ভয়ে বুক দুরদুরিয়ে ওঠে। আনন্দকুমারী ক'বার শিউরে শিউরে উঠলো। ক'হাত পিছিয়ে দাঁড়ালো।

জগমোহন বললে—ঠাকরুণ, আপনি কে? এই ভয়ের স্থানে এমন অসময়ে?

অধর থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। ভিজে চোখে অশ্রুর আভাস দেখা যায়। আনন্দকুমারী সাবগুণ্ঠনে নতমুখী। নির্লজ্জতার আত্ম-প্রকাশ যেন না হয়। আনন্দ ভীতিকম্পিতকণ্ঠে বললে,—উদ্ধারপ্রার্থী আমি। আমাকে উদ্ধার করতে হবে। একজন ইংরেজ আমাকে—

—হাঁ! কৃত্রিম আঁতকে উঠলো জগমোহন। সহাস্যে। বললে—ঘর কোথায়? দেশ কোথায়? কি জাতের মেয়ে?

নতমাথা তোলে না চৌধুরাণী। গুণ্ঠনের আড়াল থেকে কথা বললে,—ঘর মান্দারণে। আমি একজন বণিককন্যা। পিতার নাম গোপীমোহন চৌধুরী।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে অট্টহাসি হাসলো জগমোহন। তীরের জঙ্গলে তার সজোর হাসির প্রতিধ্বনি ভাসলো। হাসতে হাসতে বললে—ঠাকরুণ, সিঁড়ি বেয়ে বজরায় ওঠ, তার পর দেখা যাবে। খানিক থেমে আবার বললে,—আমরাও ঐ মান্দারণে চ'লেছি।

জগমোহন সোৎসাহে আগে আগে চললে। তার ছায়া ভয়ে ভয়ে অনুসরণ করলো চৌধুরাণী। আশার আলো দেখলো যেন ভরাডুবির পর। তবুও এখনও ভয় ভয় করছে। বজরায় উঠতে পা চলছে না যেন। দেহ কাঁপছে থরথরিয়ে।

—কুমার বাহাদুর আছেন বজরায়। মানুষের মধ্যে দেবতা তিনি। জগমোহন সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বললো।

আনন্দকুমারী কথা বলে না আর। সে যা বলতে চায় তা যেন বলা হয়েছে। আত্মরক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছে, আর কিছু বক্তব্য নেই। সহসা চোখে পড়লো বজরার ঘরে স্তূপীকৃত অস্ত্রশস্ত্র। শেষ পর্য্যন্ত ডাকাতদলের হাতে স্বেচ্ছায় নিজে ধরা দিলো না কি চৌধুরাণী!

সিক্তবাস, ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীতের স্পর্শ লাগে। ভয়ের সঙ্কোচে পা দুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে। ভবিষ্যৎ কেউ জানতে পারে না, কে জানে এখনও কত বিপদ বরণ করতে হবে!

জগমোহন আবার কথা বলে খুশীর হাসি হাসতে হাসতে। বললে,—ঠাকরুণ, তোমার কোন' ভয় নাই। আমাদের কুমারবাহাদুর তোমাকে আশ্রয় দেবেন। এই বস্ত্রখান (বস্ত্র) নিয়ে তুমি ভিজে কাপড়টা ছেড়ে দাও। ভয় পাও কেন মিথ্যে মিথ্যে! ঘরের ভিতরে যাও, কেউ সেথায় নাই।

হলুদ রঙে ছোপানো একখানি নতুন কাপড় আনন্দকুমারীর হাতে দেয় জগমোহন। বজরার ঘরের দরজা দেখিয়ে দেয়।

কুমারবাহাদুর চোখের ইশারায় কাছে ডাকলেন জগমোহনকে। চুপি চুপি বললেন,—কাদের মেয়ে? কি বলতে চায়? অভিসন্ধি নাই তো কিছু?

এক ঝলক হেসে নেয় জগমোহন। হাসি চেপে বললে,—মান্দারণের এক বেণের মেয়ে। ইংরেজ ধ'রে নিয়ে কোথায় চলেছিল, মেয়েটা নৌকা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে এসেছে।

প্রশংসার হাসি হাসলেন কাশীশঙ্কর। বললে,—বেণের মেয়ের বুদ্ধির তারিফ করতে হয় তবে।

—হাঁ হুজুর! দেখে মনে হয় বেশ চালাকচতুর। জগমোহন হেসে হেসে বলে। বললে,—ধূর্ত ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়েছে যখন। মেয়েটি হুজুর যাকে বলে আপনার পরমাসুন্দরী।

কাশীশঙ্কর বললেন,—খেতে পরতে দাও এখন। মান্দারণে ফিরতে চায় না কি?

—হাঁ মান্দারণে ফিরতে চায়। জগমোহন ফিসফিস কথা বলে।

স্বর আরও নামালেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—বিন্ধ্যবাসিনীকে জানে না কি? জমিদার কৃষ্ণরামের নাম?

—শুধাই নাই হুজুর এ সব কথা। বলেন তো যাই গিয়ে বলি।

মাথা দোলালেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—না না এখন নয়। এই সকল কথা এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা সমীচীন হবে না। অহেতুক সন্দেহ করবে।

—তবে হুজুর আমি ঝোপ বুঝে কোপ মারবো। পরম আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললে জগমোহন। বললে,—খাইয়ে দাইয়ে তারপর আমি শুধাবো।

বজরার জানলা থেকে চৌধুরাণী দেখতে পায়, ম্যালেটের বজরা অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলেছে। আনন্দকুমারীর বুকের ওপর থেকে যেন এক গুরুভার পাথর স'রে যাচ্ছে।

হাতের কর গুণতে গুণতে কথা বলছিলেন কুমারবাহাদুর। হয়তো গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন। মন্ত্রজপের সঙ্গে সঙ্গে কথা বললেন, জপ থামালেন না।

—মা ঠাকরুণ!

বজরার দুয়োরে দেখা দেয় জগমোহন। একান্ত নিকটজনের মত ঘনিষ্ঠ স্বরে ডাকে। বলে,—মিঠাই খেয়ে জল খাও এখন।

—হ্যাঁ তাই দাও। ক্ষুধায় আমি কাতর। তোমাদের কত দয়া!

ক্ষীণকণ্ঠের কথা আসে ঘর থেকে। চৌধুরাণী ঘরের এক কোণে আত্মগোপন ক'রেছে। মুখ দেখানোর মত যেন মুখ নেই। কত পাপ করেছে! ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক দোষ হয়েছে তার। প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া আর রক্ষা নেই। নিজের দেহটার প্রতি কেমন যেন বিরাগ হয় তার। এই দেহ নিয়ে খেলা ক'রেছে ম্যালেট। ছোঁয়াছুঁয়ি করেছে মনের আনন্দে। গঙ্গায় ডুব দিয়েছে আনন্দকুমারী, মনটা তবু কেন পবিত্র হয় না কে জানে?

মিঠাই আর জলের পাত্র এগিয়ে দেয় জগমোহন। বলে,—খেয়ে-দেয়ে দু' দণ্ড জিরেন নাও। কুমারবাহাদুর যখন আশ্রয় দিয়েছেন তখন আর চিন্তা কি! ঘরের মেয়েকে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

—কুমারবাহাদুরকে আমার সহস্র প্রণাম জানাও। তিনিই আমার রক্ষাকর্তা।

চৌধুরাণীর কাঁপা কাঁপা স্বরে যেন প্রচ্ছন্ন ব্যথা। বুকভরা শ্বাস টেনে আবার বললে,—তোমাদের মান্দারণে যাওয়ার কারণ কি? সেখানে কোথায় যাওয়া হবে?

জগমোহন মনে মনে খুশী হয়। শব্দহীন হাসি হাসে। বলে,—সে-কথা ঠাকরুণ পরে ব'লবো, তুমি এখন মিষ্টিজল খেয়ে ঠাণ্ডা হও।

কেমন যেন দুঃখের হাসি হাসলো চৌধুরাণী। অতীত ঘটনার ছবি দেখতে পায় সে। কি দুর্বিবহ সেই মুহূর্তগুলি। ম্যালেটের দুঃসাহসের সমুচিত শাস্তি কে দেবে? ক্রোধের আতিশয্যে মধ্যে মধ্যে অধর দংশন করে আনন্দকুমারী।

নদীর তীরে চুল্লী জ্বলছে কয়েকটা। ভাতের হাঁড়ি চেপেছে মাঝিদের। কুমারবাহাদুরের রাতের আহার তৈরী হয়। মশালের আলো আর চুল্লীর আগুনে গঙ্গার তীরভূমির একাংশ আলোকিত হয়ে আছে।

—জগমোহন!

গম্ভীর কণ্ঠের ডাক আসে বজরার ছাদ থেকে। কাশীশঙ্করের কণ্ঠ যেন গুরু-গভীর।

আনন্দকুমারী কান পাতলো কথা শুনতে। বজরার অধিকারী কি বলেন কে জানে! ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়। কুমারবাহাদুরকে এখনও চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় নি। তিনি কেমন ধরণের মানুষ কে জানে!

—ডাকছেন কুমারবাহাদুর?

আহ্বান শুনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে জগমোহন। সাড়া দেয় বজরার পাটাতনে দাঁড়িয়ে।

কাশীশঙ্কর বললেন,—কাছে এসো, একটা গোপন কথা আছে।

চৌধুরাণী চমকে চমকে ওঠে। কুমারবাহাদুরের বক্তব্য কি, কেন ডাকাডাকি করছেন—ভয়ে বুক কাঁপতে থাকে যেন। অজানা আশঙ্কায় আনন্দকুমারী রুদ্ধশ্বাসে ব'সে থাকে। মিঠাই আর খাওয়া হয় না। মুখে ওঠে না। সজাগ কানে অপেক্ষা করতে হয়। কুমার কি আজ্ঞা করেন কে জানে?

জগমোহনকে কাছে পেয়ে কাশীশঙ্কর ফিসফিস কথা বললেন। বললেন,—পরস্ত্রীকে সঙ্গে ল'য়ে যাওয়া অন্যায় হবে না কি? লোকে যদি আমার চরিত্রে দোষ দেয়? কুকথা রটনা হবে না তো?

হো হো শব্দে হেসে উঠলো জগমোহন। বললে,—হুজুর, লোকে আড়ালে রাজা-বাদশাকেও গালমন্দ করে, কারণ থাক আর না থাক। লোকের কথার মূল্য কি?

—তবে বণিককন্যাকে ছাদে পাঠাও। আমি তার সহ ক'টা কথা কহি।

কাশীশঙ্করের মুখে অমূলক আশঙ্কা ফুটেছে। কথার সুর যেন রহস্যময়।

—সাবধানে কথা বলবেন হুজুর! পারেন তো আমাদের রাজকুমারীর খোঁজটা একবার জানবেন।

জগমোহন ফিসফিসিয়ে কথা বলে। বললে,—আমি তাকে পাঠাই।

—আর একটি কথা বলি। সর্দার-মাঝিকে শুধাও দেখি মান্দারণ আর কতদূর?

কুমারবাহাদুরের শেষের কথায় যেন ঈষৎ অধৈর্য্য প্রকাশ পায়। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকেন।

—হুজুর আমিই বলি, রাতভোর বজরা চালিয়ে সেই ভোর নাগাদ পৌঁছানো যায়।

—তোমার অনুমান ঠিক?

—হ্যাঁ হুজুর, বিশ্বাস করতে পারেন।

কথা বলতে বলতে জগমোহন বজরার ঘরে অদৃশ্য হয়। তার চলাফেরায় বজরা দুলছে দুলছে।

ঘরে তৈলদীপ জ্বলছে এক কোণে। চৌধুরাণী যেন রুদ্ধশ্বাসে ব'সে আছে। কুমারবাহাদুরের কণ্ঠস্বর শুনে ভয় ভয় করে। আনন্দকুমারী সভয়ে বললে,—তোমাদের কুমারবাহাদুর কি বিরক্ত হয়েছেন আমার জন্য?

জগমোহন সহাস্যে বললে,—কৈ না। হুজুর আপনাকে ডাকছেন। আলাপ করবেন।

ভীতিকম্পন আসে যেন। হাত আর পা অবশ হয়ে পড়ে। বক্ষ দুরু দুরু করে। মুখে কোন কথা আসে না। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে চৌধুরাণী।

—ভয় করছে না কি? বললে জগমোহন।

অল্প হাসি ফুটলো আনন্দকুমারীর মুখে। বললে,—না ঠিক ভয় নয়, তবে ভয়ও বটে। তোমাদের কুমারবাহাদুর মানুষ কেমন তাই শুনি?

—মাটির মানুষ। আকাশের দেবতার সঙ্গে কোন তফাৎ নাই তাঁর।

—গড় মান্দারণে চলেছেন কি কাজে?

—হুজুরের মুখেই শুনা যাবে। তাঁকে শুধাও কেন যা বলতে চাও।

—তা পারবো না। সাহস হয় না যে।

কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো চৌধুরাণী। হলুদ রঙে ছোপানো সুতির পাতলা বস্ত্র তার পরিধানে। আঁচল টানতে টানতে সিঁড়ি বেয়ে সলজ্জায় ছাদে ওঠে ধীরে ধীরে।

ফিরে দেখলেন না কুমারবাহাদুর। জ্যোৎস্নাধবল আকাশ দেখছেন তিনি। কাপড়ের খসখসানি শুনে বুঝলেন বেণের মেয়ে এসেছে। চৌধুরাণী ফরাসের এক পাশে ব'সলো সন্তর্পণে।

জগমোহন বললে,—হুজুর, তিনি এসেছেন।

কথায় কর্ণপাত করলেন না কাশীশঙ্কর। আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু ফিরিয়ে একবার দেখলেন মাত্র। বললেন, তোমার নাম কি?

—আমার নাম আনন্দকুমারী।

—পিতার নাম কি? তিনি কি করেন?

—গোপীমোহন চৌধুরী। বাণিজ্যকর্ম করেন।

আনন্দর পিতার নাম শুনে কুমারবাহাদুর খানিক স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। তারপর বললেন,—তাঁর নাম আমি শুনেছি। গোবিন্দপুরের ইংরেজের কুঠীতে তিনি মাল-মসলা সরবরাহ করেন। আমি কুঠীর নামের তালিকায় তাঁর নাম দেখেছি।

—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই দেখেছেন।

চৌধুরাণী এতক্ষণে সহজ সুরে কথা বলে। তবুও যেন তার হাবে ভাবে ভয়ার্ত্ততা। কণ্ঠ কম্পমান।

—তবে তোমার এই দুর্ভোগ কেন? কুমারবাহাদুর সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন।

চৌধুরাণী মাথা নত করে। বলে,—আমার দুর্ভাগ্য।

কাশীশঙ্কর বললেন,—মান্দারণে কত কালের বাস?

—শুনতে পাই তিন পুরুষের বসবাস আমাদের। বস্ত্রাঞ্চল পাকাতে পাকাতে কথা বলে আনন্দকুমারী।

হঠাৎ গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করলেন কুমারবাহাদুর। নিশ্চুপ ব'সে থাকলেন কতক্ষণ। কি এক গভীর চিন্তায় যেন মগ্ন হয়ে পড়লেন।

চৌধুরাণী আড় নয়নে দেখে একেকবার। কুমারবাহাদুরের অনিন্দ্য আকৃতি দেখতে দেখতে বিস্মিতা হয়। পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহ—যেমন বর্ণ তেমন গঠন। পুরাণে বর্ণিত রাজচিহ্ন যেন শরীরে।

একবার চারি চক্ষুর দৃষ্টি বিনিময় হয়। আবার চোখ নামিয়ে নেয় চৌধুরাণী। এক লক্ষ্যে দেখে নেয়, কুমারের মুখাবয়বে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যেন মূর্তিমান।

হঠাৎ আবার কথা বললেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—জমিদার কৃষ্ণরামের নাম কি জানা আছে? কৃষ্ণরামের গৃহ আছে মান্দারণে। যদিও কৃষ্ণরাম নিজে সপ্তগ্রামে বাস করেন।

—হাঁ আমি জানি। জমিদারপত্নী আমার বন্ধু। সম্প্রতি পরিচয় হয়েছে। তার নাম কি বিন্ধ্যবাসিনী?

সানন্দে বললেন কাশীশঙ্কর,—হাঁ, নামটা ঠিক। ঐ তার নাম।

—বিন্ধ্যবাসিনী মানুষটার তুলনা হয় না। এত কষ্টভোগ, তবু তার মুখ থেকে হাসি মিলায় না। আনন্দকুমারী চোখ তুলে কথা বলতে যেন সাহসী হয় না। বলে,—বন্দিনী হয়ে আছে সে। আপনি কৃষ্ণরামকে কি সূত্রে জানেন? শুনতে পাই কৃষ্ণরাম না কি অবিবেচক, অত্যাচারী।

নীরব হলেন কাশীশঙ্কর। মনে মনে প্রসন্ন হাসি হাসলেন। আকাশে চোখ তুলে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলেন কতক্ষণ। তারপর বললেন,—কৃষ্ণরাম আমার পরিচিত। মিথ্যা কথা শুন নাই। কৃষ্ণরাম একটা অমানুষ! ধীরকণ্ঠে কথা বলতে বলতে হঠাৎ স্বর সপ্তমে উঠলো। কুমারবাহাদুর ডাকলেন,—জগমোহন!

নদীর বুক থেকে তীরের জঙ্গলে এই ডাকের প্রতিধ্বনি ভাসলো।

জগমোহন আর সাড়া দেয় না, এসে হাজির হয় বজরা দুলিয়ে। বলে,—ডাকছেন হুজুর?

আরও কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকলেন কাশীশঙ্কর। কি যেন ভাবতে ভাবতে বললেন,—রাতের আহার প্রস্তুতের বিলম্ব কত জগমোহন?

—আর এক দণ্ড হুজুর। ভাত ফুটছে। মাংসটা আরও কিছুক্ষণ ফুটবে।

—সর্দ্দার-মাঝি!

উচ্চস্বরে ডাকলেন কুমারবাহাদুর। আবার প্রতিধ্বনি ভাসলো তীরের জঙ্গলে।

বজরার শেষ প্রান্তে বসেছিল সর্দ্দার। মাঝি আর মাল্লাদের দলপতি সে, তাই উচ্চাসনে বসে। সাড়া দেয়, বলে,—হাজির আছি।

—কোথায় তুমি? দেখতে পাই না কেন?

মুহূর্তের মধ্যে মাঝি-সর্দ্দার এসে উপস্থিত হয়। তিনটে সেলাম ঠুকে বলে,—কিছু বলবেন কুমারবাহাদুর?

কাশীশঙ্কর কি যেন নিক্ষেপ করলেন অন্তরিক্ষে। তৎক্ষণাৎ লুফে নেয় মাঝি-সর্দ্দার। একটি শালুর থলি। এক থলি টাকা। নবাবের ট্যাকশালে তৈরী।

—এখনই মান্দারণে যাত্রা করবো। তোমরা তৈয়ার হও।

কেমন যেন হুকুমের সুরে বললেন কুমারবাহাদুর। লাল ভেলভেটের তাকিয়া কোলে টেনে নিয়ে স্থির হয়ে বসলেন। জগমোহন কাছেই ছিল। তার উদ্দেশে বললেন,—চুল্লীতে টাটকা কাঠ দেও জগমোহন। মাংসটা যেন সুসিদ্ধ হয়।

গোবিন্দভোগ চালের ভাত আর কচি পাঁটার মাংস। আম আর ক্ষীর। বাতাসে এক মিশ্রিত সুগন্ধের ভার। ভাত, মাংস আর ক্ষীর চেপেছে উনুনে। মাটি খুঁড়ে চুল্লী বানানো হয়েছে।

কি এক গুপ্তমন্ত্রে যেন মাঝিরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সর্দ্দার-মাঝি কি এক মন্ত্র দেয় যেন তাদের কানে কানে আর দেখায় হাতের লাল শালুর থলি। মাঝিদের ব্যস্ততায় সাড়া পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। দোলনার মত দুলতে থাকে বজরা।

রাত্রি গভীর। গঙ্গার উত্তরপ্রান্তে চোখ মেলে মাঝি-সর্দ্দার। যতদূর দৃষ্টি যায় চোখে পড়ে সোনালী নদী—চক্রাকারে বেঁকে গেছে। নগদানগদি টাকার কাছে দূরত্ব কিছু নয়, কিছু নয়।

সর্দ্দার মাঝি বললে,—জগমোহন, তোমার হাঁড়ি কড়াই বজরায় তুলে নাও। বজরা ছাড়বে এখনই। নোঙর খোলা হবে এখনই।

বজরার ছাদে দুই জোড়া চোখ বিস্ময় আর আনন্দে প্রায় স্তব্ধ হয়ে আছে। আনন্দকুমারীর মুখখানি হঠাৎ যেন চোখে পড়ে। লাবণ্যে ঢল ঢল মুখশ্রী দেখতে দেখতে কুমারবাহাদুর যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছেন! দুই যুগল আঁখির দৃষ্টিমিলন আকাশের চাঁদ আর তারারা ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না।

[ক্রমশঃ

পুনর্ব্বাসন না প্রহসন ?

"কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় উদ্বাস্তুদের অত্যধিক ভীড় হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার এই সকল রাজ্যের শিবিরে বা আশ্রমে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নবাগত উদ্বাস্তুদের গ্রহণ করা হইবে না এবং আর কোনরূপ সাহায্য দেওয়া হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারত স্বাধীন হইবার পর হইতেই এই উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে। বহু অর্থব্যয় হইয়াছে, বহু উদ্বাস্তু প্রাণত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু আজও ইহার কোন সুষ্ঠু সমাধান হইল না। একজন উদ্বাস্তুরও যে সম্পূর্ণরূপে পুনর্ব্বাসন হইয়াছে, একথা বলা যাইতেছে না। আমাদের মনে হয়, এ-সমস্যার সমাধান নাই। এই সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারাই, যাঁহারা দেশ বিভাগে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কথায় বলে 'সস্তার তিন অবস্থা'। সস্তায় স্বাধীনতা লাভ করিতে গিয়া যে মূল্য দিতে হইতেছে তাহাতে নৈতিক এবং আর্থিক উভয় দিক দিয়াই ভারত আজ প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং বোধ হয় চিরদিনই খেসারত দিতে হইবে। এক এক সময় মনে হয়, জিন্নার দুই জাতিতত্ত্ব মানিয়া লইলেই ভাল হইত। তাহাতে বোধ হয় এতটা ক্ষতি হইত না। তবে সকল রকমেই যখন ভুল-ভ্রান্তি হইয়া গিয়াছে, তখন হাল ছাড়িলে চলিবে না। পুনর্ব্বাসন করিতেই হইবে। সেই সঙ্গে উদ্বাস্তুদের মানসিক অবস্থার দিকেও নজর দিতে হইবে। যে কোন পরিবেশে জোর করিয়া ঠেলিয়া দেওয়াকে পুনর্ব্বাসন বলে না।" —দৈনিক বসুমতী।

খেলাভাঙ্গার খেলা

"কলিকাতা ময়দানে ফুটবল খেলা উপলক্ষে যে লজ্জাজনক মারপিট ও গণ্ডগোল দেখা দেয়, তাহা শান্তিকামী সহরবাসী মাত্রকেই উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। অবিভক্ত বঙ্গে একদা এই শ্রেণীর ঘটনা ঘটিত। বহুদিন পরে আবার তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া শুধু অনভিপ্রেত নয়, ইহার পরিণামও আশঙ্কাজনক। কাজেই গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়েরই বিষয়টি সম্বন্ধে সময় থাকিতে সতর্ক হওয়া দরকার। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলেন মহামেডান স্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল, রাজস্থান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক নামাঙ্কিত ক্লাবের অস্তিত্ব থাকার ফলেই অনেক সময় অসুস্থ রেষারেষি ও পাল্লাপাল্লি দেখা দেয় এবং তাহা হইতেই শেষ পর্যন্ত অত্যুৎসাহীরা হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া বসে। সুতরাং এই শ্রেণীর নামকরণ বজায় রাখা ঠিক কি না গভর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, নাম পরিবর্তনের দ্বারা কিছু সুফল হইতে পারে, কিন্তু আসল পরিবর্তন দরকার মনোবৃত্তির। খেলা সুস্থ মানসিকতার জিনিষ—তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাহা যেখানে হিংসা, আক্রোশ ও মারপিটে পর্যবসিত হয়, সেখানে বুঝিতে হইবে পিছনে সেই সুস্থ মনোভাবটি নাই, যা খেলোয়াড়ী আদর্শরূপে সর্বদেশে স্বীকৃত। সেই মনোভাব কেবলমাত্র নামের অদলবদলেই রূপান্তরিত হইবে কি?" —যুগান্তর।

পুরুষ ও নারী—এক

"নারী শ্রমিক ও পুরুষ শ্রমিক একই হারে সমান বেতন পাইবে না কেন, এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় জনৈক মহিলা সদস্য অভিযোগ করিয়াছেন, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে শ্রমিকের যে বেতন নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, পুরুষ শ্রমিককে যে বেতন দেওয়া হয়, নারী শ্রমিককে সেই হারে বেতন দেওয়া হয় না। শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার উত্তরে বলেন যে, পুরুষ শ্রমিক অপেক্ষা নারী শ্রমিক কাজ কম করে। তার পর পুরুষ শ্রমিক ও নারী শ্রমিককে যে সমান হারে বেতন দিতে হইবে, এমন কথাও ভারতীয় সংবিধানে পরিষ্কার লেখা নেই। এইরূপ জবাব দিয়া মন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার বস্তুতঃ একটু বিপাকেই পড়িয়াছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তখন রহস্যচ্ছলে বলেন যে, নারী ও পুরুষকে বিভিন্ন হারে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা অন্ততঃ আমাদের আইন সভায় নাই। বিধান সভার সদস্য নারী ও পুরুষ সদস্যগণ সকলেই সমান হারে বেতন পাইয়া থাকেন। এখানে নারী ও পুরুষদের সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যেখানের বৈষম্যের কথা উল্লিখিত প্রশ্নে তোলা হইয়াছে, সেই বৈষম্য বস্তুতঃই আছে। সেখানে নারী ও পুরুষ শ্রমিক কেন সমান হারে বেতন পাইবে না? এই প্রশ্ন কিন্তু রহিয়াই গিয়াছে।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।
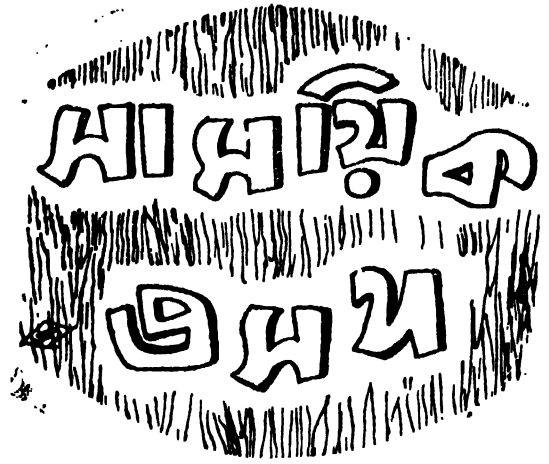
চরম নৃশংসতা

"ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিতেছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু আগমন সম্প্রতি হ্রাস পাইয়াছে। এর আসল কারণ নীচের সংবাদ হইতে বুঝা যাইবে। করিমগঞ্জের (কাছাড়) "যুগশক্তি" পত্রিকার ঢাকার প্রতিনিধি লিখিতেছেন—"ঢাকা, ১৫ই জুন। এক লক্ষ একষট্টি হাজার পরিবারের (প্রায় ৭ লক্ষ লোকের) বাস্তুত্যাগের আবেদনপত্র ঢাকাস্থ ভারতীয় ভিসা অফিসে দাখিল করা আছে। কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এখন আর মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দিতে চাহিতেছেন না। ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা আজ অসহায় বোধ করিতেছেন। ভারত সরকার ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটী হাই কমিশনারকে এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ যে, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করার ব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়ি করিতে হইবে। অনেক হিন্দু বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি বিক্রয় করিয়া ভারতীয় হাই কমিশন অফিসে আবেদনপত্র পাঠাইয়াও কোন সাড়া পাইতেছেন না। ফলে তাহারা আজ মৃত্যুপথের যাত্রী। পূর্ব্বের ন্যায় মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিলে প্রতি মাসে গড়ে ৩০,০০০ হাজার হিন্দু পাকিস্তান ত্যাগ করিত। হিন্দুদের জমিজমা জবরদখল, বর্ত্তমান জরিপের সময়ে হিন্দুর জমি মুসলমানের নামে রেকর্ড করা, হিন্দু

নারী অপহরণ, হিন্দুর বাড়ীতে ডাকাতি, হিন্দুর জমির ধান কাটিয়া নেওয়া, হিন্দুর মেয়েদের বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া নেওয়া প্রভৃতি কারণে হিন্দুগণ বাস্তত্যাগ করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িতেছেন। মাইনরিটি মিনিষ্টার শ্রীমনোরঞ্জন ধর এ বিষয়ে কিছুই করিতে পারিতেছেন না। হিন্দুরা মিঃ ধরকে আজ আর তাহাদের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করে না। ভারত সরকার ভারত বিভাগের পূর্ব্বকালীন প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া মাইগ্রেশন ব্যাপারে নানারূপ কড়াকড়ি করিয়া পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দুদের অসহায় অবস্থায় ফেলিয়াছেন। সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে যে হিন্দু পরিবার ভারতের কোনও স্থানে গিয়া বসবাস করিতে চাহেন, সেই অঞ্চলের লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান অথবা মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট হইতে সার্টিফিকেট এই মর্ম্মে নিতে হইতেছে যে, তিনি ভারতে গিয়া ভারত সরকারের "বোঝা" (Burden) হইবেন না। আর যাহারা ভারত সরকারের সাহায্যপ্রার্থী হইবেন বলিয়া আবেদনপত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা আদৌ মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পাইবে না। নেহরু গবর্ণমেণ্টের এই নৃশংসতার তুলনায় অন্ধকূপ ও জালিওয়ানাবাগের হত্যা নিতান্ত ছেলেখেলা মনে হইবে। ঐ দুই ঘটনা প্রবল উত্তেজনার মুখে ঘটিয়াছিল। কিন্তু এ যে লক্ষ লক্ষ অসহায় নরনারীর সুপরিকল্পিত জীবন্ত সমাধি।" —যুগবাণী (কলিকাতা)।

অবহেলিত সহর

"প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামের যে উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার সার্থক রূপায়ণে বাংলার গ্রামের যথেষ্ট সুসংস্কৃত অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু সহরগুলিতে সেরূপ উল্লেখযোগ্য উন্নতির কোনও চিহ্ন তো দেখা যায়ই না উপরন্তু আসানসোলের মত গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিল্পাঞ্চলীয় সহরটি ক্রমাগত জনবৃদ্ধির চাপে ও নিত্য নূতন ছোট বড় দোকান ও বাসগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধিতে অলিগলি হইতে সদর পর্য্যন্ত ঘিঞ্জি অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে। রাস্তাঘাট, কলের জল বাজার প্রভৃতি প্রত্যেকের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অপরিহার্য্য ব্যবস্থাগুলিকে এক একটি অব্যবস্থার দৃষ্টান্তস্থল বলা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত শিশুদের ও বড়দের জন্ত অত্যাবশ্যকীয় পার্ক পাঠাগার প্রভৃতির কোনও অস্তিত্ব নাই বলাই সমীচীন হইবে। আজকাল শিশুদের চতুর্থ শ্রেণী হইতে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য বিষয়ের পুস্তকে গৃহ নির্ম্মাণে স্থান নির্ব্বাচন হইতে গৃহের শয়ন ঘর, পাকশালা, পায়খানা প্রত্যেকটি ঘর কতটা দূরে কোনদিকে কতটা আলো-বাতাস যুক্ত হইবে, ও রুচিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু জানিতে ইচ্ছা হয়, পৌর প্রতিষ্ঠানের যাঁহারা গৃহ নির্ম্মাণের নক্সা অনুমোদন করেন তাঁহাদের এ বিষয়ে কোনও জ্ঞান বা কর্ত্তব্য আছে কি না? পূর্ব্বের পুরাতন বাড়ীগুলি তো যথেচ্ছ ভাবে উঠিয়াছে, তাহা লইয়া বলার কিছু নাই—কিন্তু এই কয়েক বৎসরের মধ্যেও এমন অনেক বাড়ী, বিরাট অট্টালিকা বা কুটুরী তৈয়ারী হইয়াছে, যাহা দেখিয়া মনে হয় যে সহরের সৌন্দর্য্য অথবা সেই গৃহবাসীদের স্বাস্থ্য কোনটির প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই এই সব প্ল্যান অনুমোদিত হইয়াছে।" —আসানসোল হিতৈষী।

রামরাজ্যের সুবিধা

"ভারত সরকার সম্প্রতি এক নির্দ্দেশ জারী করিয়া সর্ব্বস্তরে কয়লার দাম টন-প্রতি দেড় টাকা বাড়াইয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি কালের মধ্যে এই লইয়া তিন বার কয়লার মূল্য বৃদ্ধি করা হইল। ইতিপূর্ব্বে গত বৎসর জুলাই মাসে টন-প্রতি তিন টাকা হইতে সাড়ে তিন টাকা, ইহার পর ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে টন-প্রতি তিন আনা বাড়ান হয়। বর্ত্তমানের এই বৃদ্ধি তৃতীয়বারের বৃদ্ধি। সুতরাং ইহা বোঝার উপর শাকের আঁটি! আমাদের দেশে পণ্যমূল্য যে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা যেমন অস্বীকার করিবার উপায় নাই তেমনি ইহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে আজ সরকারী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও টলটলায়মান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ সরকার এমন সব ব্যবস্থা করিতেছেন, যাহাতে দেশের পুঁজিপতি ও শিল্পপতিরা আজ এইভাবেই দেশকে হাবুডুবু খাওয়াইতেছে!" —বীরভূম বার্ত্তা।

শোক-সংবাদ

চুণীবালা দেবী

গিরিশ-যুগের স্বনামধন্যা অভিনেত্রী চুণীবালা দেবী গত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ৮০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। সাধারণ রঙ্গালয় থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে ইনি অবসর গ্রহণ করেন। তার পর দীর্ঘকাল পর ১৯৫৪ খৃঃ 'পথের পাঁচালী'তে অভিনয়ের ভার গ্রহণ করেন ও অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেন। চলচ্চিত্রের প্রথম যুগেও ইনি বহু ছবিতে অংশ গ্রহণ করেন। 'পথের পাঁচালী'তে অভিনয় করে বিশের বহু দেশের প্রশংসা অর্জনে ইনি সমর্থা হন।

প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে অন্যতম উৎসর্গিত প্রাণ বিপ্লবী নেতা প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় গত ২০শে আষাঢ় ৬৪ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। বাল্যকাল থেকেই ইনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ও জীবনের একটি বিরাট অংশ কারাগারে অতিবাহিত করেন। ইনি ঢাকা থেকে এম, এল, সি, নির্বাচিত হন এবং ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন।

নলিনীকান্ত সেন

ফরিদপুরের প্রবীণতম উকীল ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রায়বাহাদুর নলিনীকান্ত সেন গত ২৩শে আষাঢ় ৮৭ বছর বয়সে লোকান্তর যাত্রা করেছেন। আইনে এঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত ছিল ও বহু জটিল মামলার সমস্যা সমাধানে নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দেন। ইনি ফরিদপুরে সরকারী উকীলও নিযুক্ত হন ও ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সরকারী কার্যভার থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এঁর পুত্রদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ডেপুটী ইন্সপেক্টার-জেনারেল ও য়্যাডিশনাল কমিশনার শ্রীপ্রণবকুমার সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেসিনে' শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

বিচিত্র ভ্রমণ প্রসঙ্গে

'মাসিক বসুমতী'র গত জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পালের 'বিচিত্র ভ্রমণ' শীর্ষক কৌতূহলোদ্দীপক ও সুখপাঠ্য রচনাটির জন্ত আপনারা ধন্তবাদার্হ। লেখক মহোদয় ২০১ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে যে ঘটনাটির কথা উল্লেখ করেছেন—তারই পরিপূরকস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের এ প্রসঙ্গে মতবাদ আমি উদ্ধারযোগ্য মনে করি। আলোচ্য ঘটনাটির সন আমার অজ্ঞাত, কিন্তু কবি ১৯২৪ সনে একটি রচনায় এই ব্যাপারটিকে স্মরণ করেছেন, কৌতূহলী পাঠকের জ্ঞাতার্থে সেটি উদ্ধৃত হ'ল: একটি কথা আমার ম'নে পড়ছে। তখন লোকমান্ত তিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো এক দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছিলেন আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। সে সময়ে নন্‌-কোঅপারেশন আরম্ভ হয়নি বটে কিন্তু পোলিটিকাল আন্দোলনের তুফান বইছে। আমি বললুম, রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপে যেতে পারব না। তিনি ব'লে পাঠালেন, আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি এ তাঁর অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের যে বাণী আমি প্রচার করতে পারি সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে সত্য কাজ—এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতের সত্য সেবা করতে পারি।—আমি জানতুম, জনসাধারণ তিলককে পোলিটিকাল নেতারূপেই বরণ করেছিল এবং সেই কাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এইজন্ত আমি তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারিনি। তার পরে বোম্বাই সহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, 'রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারবেন—এর চেয়ে বড়ো আর কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশাই করিনি।' আমি বুঝতে পারলুম, তিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন সে কাজের অধিকার তাঁর ছিল—সেই অধিকার মহৎ অধিকার। (পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি: ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৪: যাত্রী)। লেখকের মতে ১৯০৫-৬ সালে যে স্বদেশপ্রেমের বান এসেছিল ১৯১৬-১৭ সালে তা' অনেকখানি নেমে গেছে এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিলক প্রমুখের নতুন রাজনীতির সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেছে বলেই রবীন্দ্রনাথ এরকম কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চাননি—এই মত প্রকাশে ভুল বুঝবার অবকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজের 'স্বধর্ম' সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন—তার প্রমাণ অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি রাষ্ট্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে রয়েছে। হয়ত কখনো তাঁকে একতারা ফেলে দিয়ে ভেরি নিতে হয়েছে, ছুটতে হয়েছে খর মধ্যাহ্নের তাপে জয়-পরাজয়ের আবর্তনের মধ্য দিয়ে—কিন্তু, সে তার স্বভাব সংগত নয়, তাঁরই কথায়: 'ঝড়ের সময় ধ্রুবতারাকে দেখা যায় না ব'লে দিক্‌ভ্রম হয়। এক এক সময়ে বাহিরে কল্লোলে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে স্বধর্মের বাণী স্পষ্ট ক'রে শোনা যায় না।' কারণ 'ডিমক্রেসির যুগে... কর্তব্যের ভয়াবহতা' এবং 'প্রয়োজনের আসরের সরগরমের মধ্যে' 'ঢাকীর পক্ষে এ সময়টা সুসময়, কিন্তু বীণাকারের পক্ষে নয়।' আমার মনে হয়, লেখকের কথায় 'রবীন্দ্রনাথ এই টাকা গ্রহণ করলে ও তা দিয়ে ভারতের সাধনা বাহিরে নতুন করে প্রতিষ্ঠা পেলেও' তাঁর স্বভাবভ্রষ্টতার জন্ত রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেতাম না। এই পরিবেশে আজ তাৎকালিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে কবির ভূমিকায় নূতন মূল্যায়ন করাই সঙ্গত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, তিলকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, শ্রীঅমল হোম তার বিবরণ দিয়েছেন (দ্রঃ বলবন্ত গঙ্গাধর তিলক অমল হোম: বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩)। রবীন্দ্রনাথের 'জ্যোতিদাদা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিলকের গীতা-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করেন। পার্থ বসু। রামময় রোড। কলিকাতা—২৫
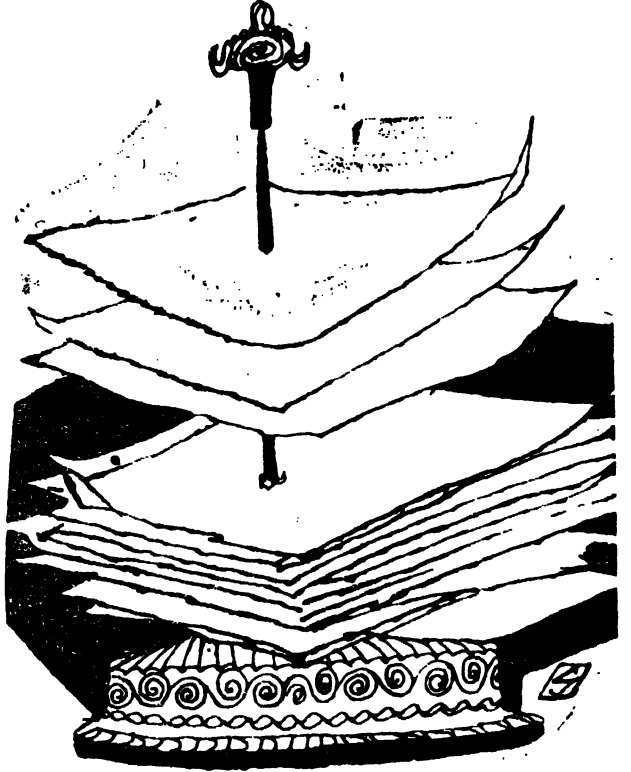
ওমরের জন্মকাল

দৈনিক বসুমতীর সাহিত্য সভায় প্রকাশিত সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের "নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম" নামে সুলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করে আনন্দ লাভ করলাম। আলি সাহেব এক জায়গায় লিখেছেন, ওমর খৈয়ামের জন্ম ও মৃত্যু-সন জানা যায় না। কিন্তু আমরা জানি ওমরের জন্ম ৪১০ হিজারাব্দে অর্থাৎ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে। ওমরের মৃত্যু-সনটি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতভেদ দেখা যায়। সাধারণ্যে তাঁর মৃত্যু-সাল ৫১৭ হিজারাব্দে (১১২৩-২৪ খৃঃ) এইরূপ প্রচারিত। কিন্তু পারস্য ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসকার অধ্যাপক ই, জি, ব্রাউন বলেন, ওমরের মৃত্যু ১১১৫-৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ ১১৩৫ খৃষ্টাব্দের অধিকতর নিকটবর্তী সময়ে ঘটে থাকবে। আর তিনি ওমরের তিন বন্ধুর যে গল্পটি বলেছিলেন তা নিছক গল্প—ইতিহাস নয়। এ বিষয়ে আমি তাঁকে ৺সুরেশচন্দ্র নন্দী লিখিত বঙ্গভাষায় একমাত্র ওমরের জীবনী "ওমর খৈয়াম" বইটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।—দীপঙ্কর নন্দী। কলিকাতা-৩৭

মুলাঁরুজ

সৈয়দ মুজতবা আলীর সমালোচনা পড়লাম। আমি 'মুলাঁ' লিখেছিলাম তিনি সংশোধন করেছেন 'মুলা' তাঁর মতে 'মুলাঁ'

লিখলে বাঙালী পাঠকরা পড়বেন—'রুলুঁ্যা।' প্রশ্ন তাহলে Roman আর Romain লিখতে হলে দুটোই কি একই রকম লিখতে হবে—'রমঁ্যা'? আর Romanকে 'রমঁা' লিখলে বাঙালী পাঠকরা 'র'কে 'রমা'-র 'র'-র মত উচ্চারণ করতে পারেন মুস্তবা আলী তা ভেবে দেখেছেন? 'রোমঁা' লিখতে কি আপত্তি? মুস্তবা আলীর theory অনুযায়ী Matinকে লিখতে হবে, 'মাত্যাঁ', Vilainকে 'ভিলাঁ', Parfumকে 'পারফাঁ', mainকে 'ম্যাঁ'। মুস্তবা আলী কি বলেন? তাই ত? তিনি বলছেন যে ফরাসীতে Romain এবং Roman দুইই আছে "এবং প্রকৃত পক্ষে একটা হবে রমঁ্যা এবং অন্যটা রমাঁ।" তাঁর উক্তি এবং যুক্তি পরিষ্কার নয়—anomolous, Henri সম্বন্ধে আমার যুক্তিকেই মেনে নিয়েছেন। Le সম্বন্ধে বলতে চাই আসল উচ্চারণ থেকে 'ল্য' অথবা 'ল্যে'র দূরত্ব মাপা সহজ কথা নয়। 'একার' ও 'র'-ফলার সমন্বয়ে কোন শব্দ মুস্তবা আলীর চোখে পড়েনি। কেন, 'জ্যেষ্ঠ, কথাটি বাঙ্গলা ভাষায় 'হরিজনের' মত? ফরাসীরা যে ইংরেজদের মত R উচ্চারণ করে না তা এখানে Kinder garten এর ভারতীয় শিশুরাও জনে। তাদের নামের R গুলো যখন ফরাসী শিক্ষকরা বিচিত্রভাবে উচ্চারণ করেন তখন তাঁরা বেশ কৌতুক বোধ করেন। ফরাসীরা যখন ইংরেজীতে কথাবার্তা বলেন তখন তাঁরা যে ফরাসী তা বোঝা যায় বিশেষ করে R এবং T'র উচ্চারণ শুনে। মুস্তবা আলী কি তা লক্ষ্য করেন নি? বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য কতগুলো বিশেষ গান, বিশেষ শব্দ ফরাসী শিক্ষকরা গোড়াতে শেখান যা articulation এর দিক দিয়ে চমৎকার। আসলে আলী সাহেব কখনও articulate করেন নি, করলে বাজে পরিহাস করতেন না। প্রথম যখন ফরাসী শিখি তখন আমাদের ফরাসী শিক্ষিকা বিশেষ করে R এবং U-এর উচ্চারণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। ফরাসীতে ও-দুটির উচ্চারণ সবচেয়ে শক্ত। শুধু দক্ষিণ ফ্রান্স কেন, ফ্রান্সের বিভিন্ন অংশের লোক এখানে আছেন; এমন কি প্যারিসেরও। সুইজারল্যাণ্ডেরও কিছু ফরাসী-ভাষাভাষী আছেন। তাঁদের উচ্চারণ বিভিন্ন ধরণের এবং কেউ কেউ R-কে বেশী Roll করে বলেন, আবার কেউ কম করে বলেন কিন্তু তাই বলে তাদের কেউই R-কে ইংরেজী R অথবা বাংলা 'র'-এর মত উচ্চারণ করেন না। এত বড় একটা Contrast মুস্তবা আলীর কানে ধরা পড়েনি—আশ্চর্য্যের বিষয়! শ্রীসুধীরকান্ত গুপ্ত (শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়)।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

বর্ত্তমান বৎসরের মূল্য পাঠাইলাম। দেরী হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত। বৈশাখ হইতে সকল সংখ্যা সত্বর পাঠাইবেন। শ্রীমতী ছায়া বসু। ফার্ণ রোড কলিকাতা।

আপনাকে অত্র M. O. যোগে ৭।০ মাসিক বসুমতীর ছ-মাসের সডাক চাঁদা বাবদ পাঠাইলাম। পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। বাসন্তী দেবী, Didwana.

The Monthly Basumati which please continue sending from the Baisak number—Mlv. B. U. Ahmed. Thaligram T. E. Assam.

মাসিক বসুমতীর দরুণ ছয় মাসের ৭। টাকা পাঠাইলাম। বৈশাখ সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠাইবেন, বাকী ছয় মাসের চাঁদা ভাদ্র মাসে পাঠাইয়া দিব।—শোভনা ঘোষ। 146, Gunjipara Jabbulpore, M. P.

অদ্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম আরও এক বৎসরের জন্য। প্রাপ্তি সংবাদ জানাইবেন।—নমিতা দে, ধুবড়ি ঘাট। কাছাড়।

জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আগামী ছয় মাসের মাসিক বসুমতীর ছ'মাসের সডাক মূল্য মোট ৭।০ পাঠাইতেছি। দয়া করিয়া ঐ সব সংখ্যার পত্রিকা নিচের ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী অণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। চণ্ডী ঘোষ রোড। কলিকাতা।

ষাণ্মাসিক চাঁদা বাবদ সডাক ৭।০ পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন।—শ্রীশান্তিসুধা মোদক। Goari Bazar, Nadia.

I am sending herewith Rs, 7'50 as half-yearly subscription for the "Monthly Basumati," Kindly send me "Monthly Basumati" 1364 B,S,—Nilima Bhan, Karol Bag, New Delhi.

১৩৬৪ সালের গ্রাহকমূল্য স্বরূপ ১৫৲ টাকা পাঠালাম। বৈশাখ হইতে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাবেন। Sm. Niharika Roy, Delhi.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম। এই বৎসর হইতে আমাকে পত্রিকার গ্রাহিকা করিয়া লইবেন।—রেণুকা মুখার্জ্জী। Pratapgunj, Baroda.

বার্ষিক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের মাসিক বসুমতী আমার ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রতিভা দেবী। 33 B Russa Road Cal—26.

আমি আপনাদের পুরানো গ্রাহক ছিলাম না, সেজন্য আমার কোনো গ্রাহক নম্বর নাই। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নূতন গ্রাহক সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া 'মাসিক বসুমতী' পাঠাইবেন। শ্রীমতী বাণী ভট্টাচার্য্য। Haw Baghs, Jabbulpur.

মাসিক বসুমতী পত্রিকা রেজেষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানোর বন্দোবস্ত করলে বাধিত হবো। রেজেষ্ট্রী খরচ সহ পত্রিকার ১ বৎসরের চাঁদা ২১৲ টাকা পাঠালাম।—শোভা মিত্র। Hill Colony, Dhanbad.

মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা তালিকাভুক্তা হ'তে ইচ্ছা করি। এই উদ্দেশ্যে ছ'মাসের অগ্রিম চাঁদা বাবদ ৭।০ পাঠালাম। দয়া ক'রে ফাল্গুন সংখ্যা থেকে আরম্ভ করে প্রতি মাসের বসুমতী আমার লিখিত ঠিকানাতে পাঠাবেন এবং আমার নাম গ্রাহিকা তালিকাভুক্ত করে নেবেন।—গায়ত্রী দেবী। C/o, S. K. Bhattacherjee. Acountant Patna Electric Supply Co. Ltd, Mangles Road, Patna.

দেওয়াল-চিত্র

—তাইকান ইয়োকোয়ামা অঙ্কিত
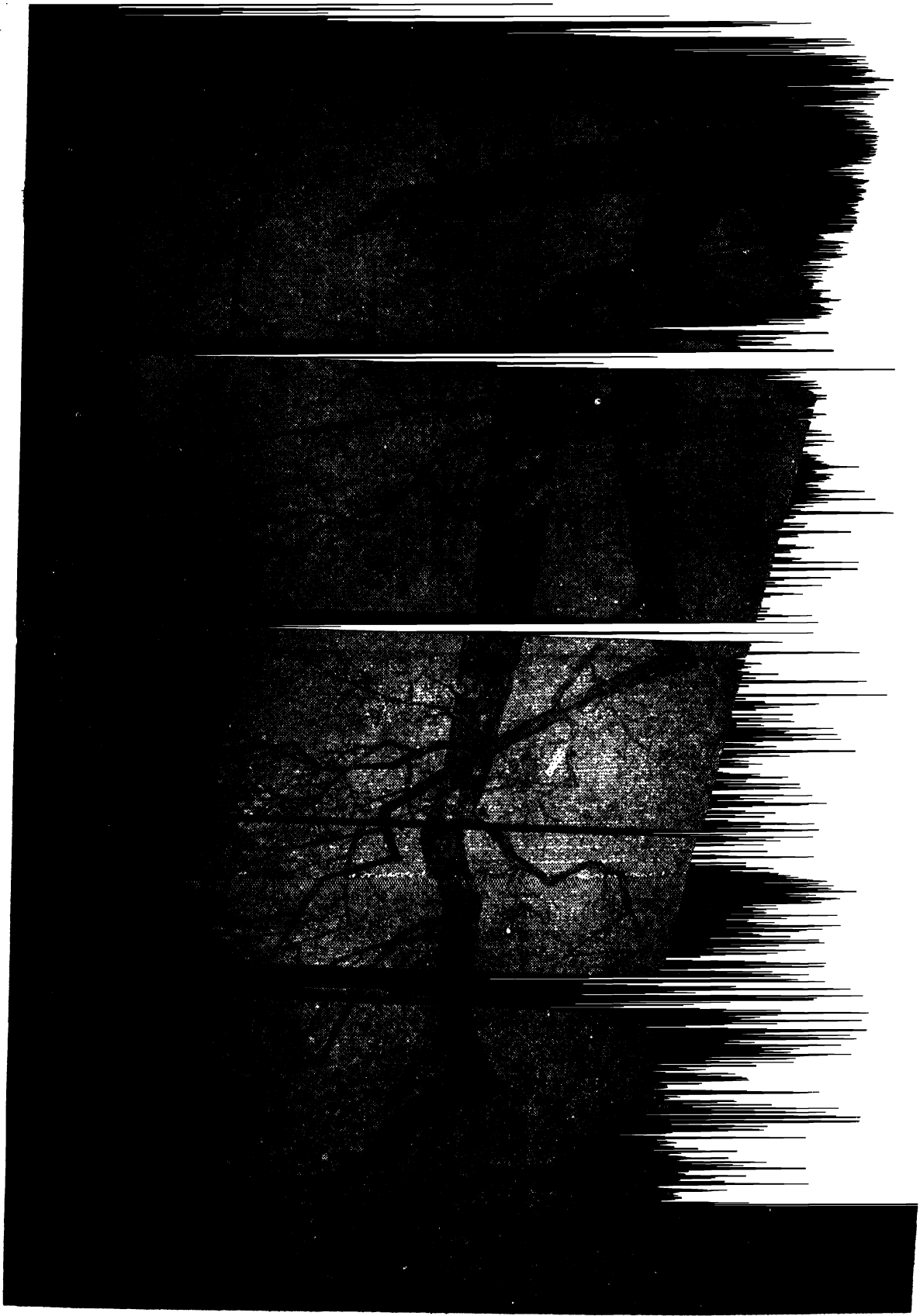
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

৩৬শ বর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৬৪] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

কথামৃত

মানব-সমাজ ক্রমান্বয়ে চারিটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য), এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেক রাষ্ট্রে দোষ-গুণ উভয়ই বর্ত্তমান। পুরোহিত শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সঙ্কীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁহাদের ও তাঁহাদের বংশধরগণের অধিকাররক্ষার জন্য চারি দিকে বেড়া দেওয়া থাকে—তাঁহারা ব্যতীত বিদ্যা শিখিবার কাহারও অধিকার নাই, বিদ্যাদানেরও কাহারও অধিকার নাই। এ যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ, বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করিতে হয় বলিয়া পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন।

ক্ষত্রিয়শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদারমনা নহেন। এ যুগে শিল্পের ও সামাজিক সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে।

তারপর বৈশ্যশাসন যুগ। এর ভিতরে ভিতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাহিরে প্রশান্তভাব—বড়ই ভয়াবহ! এ যুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় হইতেই সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়।

সর্বশেষে শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হইবে। এ যুগের সুবিধা হইবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হইবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়ত সভ্যতার অবনতি ঘটিবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়িবে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া যাইবে।

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারা যায়, যাহাতে ব্রাহ্মণ-যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকিবে অথচ এদের দোষগুলি থাকিবে না, তাহা হইলে তাহা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হইবে। কিন্তু এ কি সম্ভবপর? প্রত্যুত, প্রথম তিনটির পালা শেষ হইয়াছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসিবেই আসিবে—উহা কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই একমাত্র আশা। আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক মহামহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছেন।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

কোথায় চলেছি

নরেশ দাশগুপ্ত

ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার পর ভারতের ষ্টার্লিং ব্যালান্স ছিল সতেরো শ' কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের ঐ অর্থই বোধ হয় আমাদের মাথা খারাপ করিয়া দিল। ধনীর অর্বাচীন পুত্রের ন্যায় আকাশ-কুসুম গড়িতে লাগিলাম আমরা। দুই শত বৎসরের ঘাটতি বিশ বৎসরে পূরণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলাম। বিজ্ঞানের সাহায্যে ইউরোপ আমেরিকা দুই শত বৎসরে যাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাই আমরা বিশ বৎসরে সম্পন্ন করিবার জন্য পাগল হইলাম!

অর্থ পরের ঘরে, কল-কব্জা আমদানী করিতে হইবে পরদেশ হইতে।

ইহা সুবিদিত যে লগ্নী টাকা আদায় করিবার জন্য মহাজনকেই খাতকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। প্রাপ্য আছে বলিয়াই পাওয়া যায় না। নালিশ করিয়া ডিগ্রী করিলেও কিস্তি-বন্দীর ব্যবস্থা হইয়া থাকে। দুই কিস্তি দিয়া চার কিস্তি খেলাপ করা বিরল তো নহেই, বরং উহাই রীতি।

সুতরাং পরহস্তগত ধনের উপর নির্ভর করিতে হইলে আকাশেই সৌধ নির্মিত হয়, বাস্তব পৃথিবীতে ইমারত গঠন করা অসাধ্য না হইলেও অত্যন্ত দুঃসাধ্য।

অর্থ সমাগম হইলেও সময় মত যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইবে কি না তাহা কে বলিতে পারে? বিদেশীর উহা দিবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে কি না তাহাই বা নিশ্চিত করিয়া বলিবে কে? দিবার ইচ্ছা থাকিলেও নিজের এবং আত্মীয়-স্বজনের চাহিদা মিটাইয়া অপরকে দিবার মত কি পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহারই বা ঠিক কি? উদ্বৃত্ত থাকিলেই বা সহজে দিবে কেন?

কারখানায় যদি তাহাদের স্বার্থ না থাকে, তবে অপরকে মাল-মসলা সরবরাহ করিয়া স্বাবলম্বী অথবা অতিরিক্ত শক্তিশালী করিয়া কি তাহারা আপন পায়ে কুঠার মারিবে? খাল কাটিয়া আপন আঙ্গিনায় কুমীর ঢুকাইবার দুর্বুদ্ধি ইউরোপ আমেরিকার মত উন্নত দেশে কাহার আছে?

ভারতের ভূগর্ভস্থ রত্নের সন্ধান আমরা জানি, আর দুই শত বৎসর এখানে রাজত্ব করিয়া ইংরেজ জানে না, ইহা মনে করা বাতুলতা।

ভারতের মস্তিষ্কের যে অভাব নাই তাহার বহু প্রমাণ ইউরোপ আমেরিকা পাইয়াছে। ভারতের জনবলও তাহাদের অবিদিত নহে। শান্তিতে বাস করিয়া কল-কারখানা গড়িয়া তুলিতে পারিলে অদূর ভবিষ্যতে ভারত যে পশ্চিম এবং দূর-পশ্চিমকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে, সে সম্বন্ধে ধূর্ত বিদেশীর কোন সংশয় থাকিবার কথা নহে।

কিন্তু দূরদৃষ্টির অভাবে ক্ষমতা হস্তগত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম এবং অনতিবিলম্বে অগাধ সলিলে নিমজ্জিত হইলাম!

বিদেশী তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের চক্রান্তে পড়িয়া পঞ্চাশ কোটি টাকার পরিকল্পনার ব্যয় ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া দেড় শত কোটিতে পৌছিল, তথাপি পরিকল্পনা যে তিমিরে সেই তিমিরে!

সারের কারখানা তৈয়ারী হইল, সারও প্রস্তুত হইল কিন্তু উহা ক্রয় করিবার সামর্থ্য কৃষকের আজও হইল না!

নদীর বাঁধ হইল বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচের উদ্দেশ্যে। খালের জলের মূল্য দিবার অর্থ নাই এদেশের লোকের। কোথাও অনাবৃষ্টিতে ফসল জন্মিল না, কোথাও প্লাবনে দেশ ডুবাইয়া দিল!

বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইল। জনসাধারণ উহার দ্বারা উপকৃত হইল না, হইল কল-কারখানার মালিক; বেকার হইল কিছু মজুর, উদ্বাস্ত হইল কিছু গৃহস্থ। কোথায় বিদ্যুৎ-চালিত কুটিরশিল্প? পয়সা কোথায় যে কলের পাখার হাওয়া খাইয়া শ্রান্তি অপনয়ন করিবে পল্লীবাসী? কিংবা বিষাক্ত গ্যাস উৎপাদক কেরোসিনের হাত হইতে মুক্ত হইয়া বিজলী বাতির আলোর আনন্দ উপভোগ করিবে?

সতেরো শত কোটির ষ্টার্লিং ব্যালান্স এখন পাঁচ শত কোটিতে দাঁড়াইয়াছে, দিগন্ত এখনও বহু দূরে।

শাসকবর্গ আবেদন (!) করেন কোমরের কাপড় আরও আঁটিয়া পরিবার। কাপড় কোথায়, আঁটিয়া পরিবে? আট হাত কাপড়ে কি দুই কাজ চলে? কোমরে বাঁধিতে হইলে কি লজ্জা নিবারণ করা যায়?

নেতাদের লজ্জার বালাই না থাকিলেও জনসাধারণ এখনও ত্রৈলঙ্গ স্বামী হইতে পারে নাই।

কাণ্ডজ্ঞান বিসর্জন দিয়া দেশ বিভাগে রাজি হইয়া স্বাধীনতা ভিক্ষা পাইলাম, কুচক্রীর খেলা চলিতে থাকিল। শান্তি যেন চিরতরে ভারত-মহাসাগরে নিমজ্জিত হইল। বিবাদ কামনা করি না, তবুও আত্মরক্ষা করিতে প্রাণান্ত।

বিদেশ হইতে যুদ্ধের যে সামগ্রী আসিতেছে বিপদের সময় উহা কার্যকর হইবে কি না কে জানে! ইতিহাসে দেখা যায়, ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়িবার সময় রণজিৎ সিংহের বিলাতী বন্দুক ফুটিল না। বীর কেশরীকে পরাজয় বরণ করিতে হইল।

দু'-দু'টি মহাসমরের অনলের মাঝখানে থাকিয়া কি করিয়া ক্ষুদ্র সুইজারল্যাণ্ড নিরাপদে থাকিল তাহা কি আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি? কতখানি তাহার সামরিক শক্তি, তাহার সন্ধান কি লইয়া থাকি?

আমার সমরসম্ভার অপ্রতুল হইলে আবার আমি পরাধীন হইব, এই আশঙ্কায় চিন্তার স্বাধীনতা বিসর্জন দিলাম। চোখের উপর দেখিলাম, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বেলজিয়াম আক্রান্ত হইতেই বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া গেল; অতিদুর্বল সদ্যোজাত মিশরের উপর চড়াও করিতেই ইংলণ্ডের তৈলমসৃণ টাক ফাটাইয়া দিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিল সোবিয়েৎ নেতা। তথাপি ভরসা পাই না!

ভারতের মত এত বড় দেশে, ইহার অগণিত অধিবাসীকে শত্রু করিয়া কোন নির্বোধ আপনার চিরশত্রুকে সাহায্য করিবে? ভারতকে আক্রমণ করিয়া কোন অর্বাচীন আপনার ঘরে বিশ্বযুদ্ধ আহ্বান করিয়া নিজের সর্বনাশ করিবে? আস্ফালন অনেকেই করিয়া থাকে, কথা মত কাজ হয় ক'টা?

জাতির শক্তি তাহার গোলা-বারুদের উপর ততটা নির্ভর করে

না, যতটা করে তাহার জাতীয় সংহতির উপর। চল্লিশ কোটি অধ্যুষিত এই দেশকে আক্রমণ করিবে কোন মূর্খ তাহার আপন কবর খনন করিতে? যদি এই চল্লিশ কোটির মনের মিল থাকে। কিন্তু মনের কি সে মিল আছে?

১৯৪৭ সালে এই দেশবাসী নেহরুর হস্তে একটি শান্তিকামী সঙ্ঘবদ্ধ জাতি অর্পণ করিয়াছিল। দশ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্বেই রাজ্যে রাজ্যে বিবাদ-বিসংবাদ এইরূপ দাঁড়াইল যে, সূচ্যগ্র মেদিনীর জন্য একে অন্যের মস্তক ফাটাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিল না।

কুক্ষণে প্রদেশের নাম পরিবর্তন করিয়া রাজ্য রাখা হইয়াছিল! ইহারা যেন পৃথক পৃথক স্বাধীন রাজ্য!

কেন এমন হইল, কে চিন্তা করে? যাঁহাদের হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত তাঁহারা কী মনে করেন কে জানে!

সংবিধান রচনার সময় একটি ধারা নিবদ্ধ হইয়াছিল, যাহার বলে ইচ্ছা করিলে ভারতের অন্তর্ভুক্ত যে কোন রাজ্য পনেরো বৎসর পরে ইউনিয়ন হইতে পৃথক হইয়া যাইতে পারিত। সংবিধান গৃহীত হইবার সময় ঐ ধারাটি বর্জন করা হয়।

সোবিয়েৎ রাশিয়ার সংবিধান দৃষ্টেই ঐ ধারা লেখা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ঐ ধারাটি সোবিয়েৎ সংবিধান হইতে বর্জন করিবার চিন্তা আজও তাহাদের মনে উদিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, এবং এখন পর্যন্ত সোবিয়েতের কোন ইউনিট ঐ ক্ষমতার সুযোগ লইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

কোন আশঙ্কায় অথবা কোন উদ্দেশ্যে আমাদের গণপরিষদ ভারতের সংবিধান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই ঐ ধারাটি বর্জন করিলেন? ভবিষ্যতে উহার সুযোগ লইয়া কেহ বাহির হইয়া যাইবে সন্দেহ করিয়া কি? অথবা কোন প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের দুর্বল ক্ষুদ্র অঞ্চলকে এক্সপ্লয়েট করিবার দুরভিসন্ধি বশতঃ?

একত্র থাকিবার সুবিধা হৃদয়ঙ্গম করিলে পৃথক হইয়া যাইবার কি আশঙ্কা থাকিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা দুষ্কর। কিন্তু যদি একত্র থাকিয়া অসুবিধা, পক্ষপাতিত্ব, অবহেলা অথবা নির্যাতন ভোগ করিতে হয় তাহা হইলে পৃথক হইয়া যাইবার ইচ্ছা স্বভাবতঃই প্রবল হইয়া উঠে।

কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া, যতই সম্মানযোগ্য সে কাগজ হউক, কি ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন লোককে লইয়া ঘর করা যায়? নারায়ণ সাক্ষী করিয়া মন্ত্র পড়িয়া, এমন কি জাগ্রত দেবতা আইন আদালত সহায় করিয়াও ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামিস্ত্রীকে একত্র ঘর করান সম্ভব নহে। হাজার বাধা সত্ত্বেও একদিন তাহারা ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। ভারতের বর্তমান অবস্থা হইতে ঐরূপ আশঙ্কাই মনে জাগিয়া থাকে।

ইতিহাসের দোহাই পাড়িয়া বলা হয় যে, যখনই নিজেদের ভিতর বিবাদ করিয়া ভারত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তখনই সে পরাধীন হইয়াছে। ইহা সত্য।

পক্ষান্তরে ইহাও মিথ্যা নহে যে, যত বার ভারতকে সংহত করা হইয়াছে তত বারই সে অনতিবিলম্বে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৌর্য, পাঠান এবং মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস উল্লেখ করা যাইতে পারে।

যুগে যুগে কেন এইরূপ হইয়াছে? যত দিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শক্তি প্রবল রহিয়াছে মাত্র তত দিন পর্যন্তই ভারত সঙ্ঘবদ্ধ রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইলেই সুযোগ বুঝিয়া সকলে কেন্দ্রের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়াছে।

রাজচক্রবর্তীদের বেলায় যাহা সম্ভব হইয়াছে, নৃপতি বিহীন গণতন্ত্রে তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

গণতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি হইতে নির্বাচন করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করা হইয়া থাকে। এই মন্ত্রিমণ্ডলীর উপরই রাজ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্ত্রিমণ্ডলী সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতেই নির্বাচিত হয়। ইঁহারা মাত্র তত দিন পর্যন্ত ইঁহাদের দলের আনুগত্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, যত দিন তাঁহাদের নিজ নিজ প্রদেশের স্বার্থ গুরুতররূপে ক্ষুণ্ণ না হয়। কিন্তু যদি ক্রমাগত এই সকল অঞ্চল কেন্দ্রের সুবিচার হইতে বঞ্চিত হইতে থাকে, তাহা হইলে সেই অঞ্চলীয় মন্ত্রীর পক্ষে একাগ্রচিত্তে দলের তথা কেন্দ্রের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয় না। এই ভাবে দল দুর্বল হয়, এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলী তথা কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে।

কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইলে প্রদেশের সুবিধা মত সংবিধান পরিবর্তনের চেষ্টা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। উহাতে অকৃতকার্য্য হইলে সংবিধান-বিরোধী চেষ্টা যে হইবে না, তাহা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে।

ভারত আজ দুর্ভাগ্যক্রমে যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে যদি কোন রাজ্যের কোন প্রতিনিধি সংবিধান পরিবর্তন করিয়া রাজ্যকে ইউনিয়ন হইতে বাহির হইবার অধিকার দানের আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। এই মনোভাবের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীই দায়ী হইবেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রকাশ্যে অভিযোগ করিতে পারেন যে, বিশেষ বিশেষ রাজ্য কেন্দ্র হইতে সুবিচার পাইতেছে না, তাহা হইলে ঐ রাজ্যের অধিবাসীর মনে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, তাহা কি বুঝিতে কষ্ট হয়?

যেখানে সব দিক দিয়া নিজের অসুবিধা, এমন কি ক্ষতি স্বীকার করিয়া অপরের সঙ্গে ঘর করিতে হয়, সেখানে প্রণয় কত দিন থাকিতে পারে?

মানুষের বুদ্ধি ও দুর্বুদ্ধি উভয়ই দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। বেশী দিন আর তাহাকে বোকা বানাইয়া রাখা যাইবে না।

পৃথক হইলে কি বিপদ, তাহা বুঝাইতে গিয়া বলা হয় যে, প্রবল রাষ্ট্রের কাছে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতার কোনই মূল্য নাই। এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে বর্তমান কালে সারা পৃথিবী ছুটিয়া আসে তাহার সাহায্যের জন্য। যদিও দরদ অপেক্ষা শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যই প্রবল। যুদ্ধ যদি বাধে, তাহা হইলেও বর্তমান শতাব্দীর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে যে, শেষ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র আক্রান্ত রাজ্য স্বাধীনতা তো হারায়ই না, বরং আক্রমণকারী বৃহৎ শক্তি অপেক্ষা বহু কম সময়ের মধ্যে সে তাহার অবস্থার পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয়।

ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যুদ্ধের পর পদদলিত নিষ্পেষিত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তাহাদের পুরাতন স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছে এবং ধীরে ধীরে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে।

ভারতের অংশ সমূহের পক্ষে যে অনুরূপ হইবে, তাহা অনুমান করিবার কি কোন কারণ আছে? আর একটি যুক্তি দেখান হইয়া থাকে যে, পৃথক হইয়া গেলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় অনিবার্য।

কোন কোন অংশের পক্ষে এই প্রকার আশঙ্কা অমূলক না হইলেও সকল অংশের পক্ষে ইহা সত্য নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুই রাজ্যই কৃষি, বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ; লোকবলও ইহাদের যথেষ্ট আছে। অধিকন্তু ইহারা উভয়ই সমুদ্র-উপকূলবর্তী। পশ্চিমবঙ্গে একটি বৃহৎ বন্দর বর্তমান, আর একটির স্থানেরও অভাব নাই। উড়িষ্যার কোন বন্দর না থাকিলেও স্থানের অভাব নাই। সুতরাং কৃষি-শিল্প এবং বাণিজ্য লইয়া ইহাদের পক্ষে সমৃদ্ধিশালী হইবার কোন বাধা আছে বলিয়া সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায়?

এই সকল বিবেচনা করিয়া সময় থাকিতে সতর্ক হইবার আবশ্যকতা যে কত অধিক, তাহা কি বলিবার প্রয়োজন আছে?

একত্রে থাকিতে হইলে পরস্পরের সুবিধা অসুবিধার উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়। শুধু নিজের আঠার আনা দেখিলে চলিবে কেন?

ভারতের উন্নয়ন সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু বলা হইয়াছে। আরও কিছু না বলিলে ত্রুটি থাকিয়া যায় বলিয়া ঐ প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপন করিতে বাধ্য হইলাম।

উন্নতির চিন্তার সময় আমাদের চক্ষু এবং মন উভয়ই পশ্চিম গোলার্ধে নিবদ্ধ থাকে। দৃষ্টিশক্তি চিন্তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। ভুলিয়া যাই আমরা যে, আমাদের কৃষ্টি এবং আদর্শ স্বতন্ত্র এবং পৃথক।

প্রতীচী চায় আরও ভাল খাদ্য, আরও সুন্দর বেশভূষা, আরও চাকচিক্যময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা। প্রাচ্যের আদর্শ সাধারণ খাদ্য এবং সংযত বেশভূষা। পশ্চিম চায় ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে উড়িতে; পূর্ব চাহে ঘরে বসিয়া তাহার অন্তরের চিন্তার প্রসার, যে পর্যন্ত উহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া ব্রহ্মে বিলীন না হইয়া যায়।

পাশ্চাত্য আদর্শের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইতেছে দুর্লোভ, ঈর্ষা দ্বেষ, বিবাদ ও পরস্বাপহরণ এবং ব্যোমমার্গে দিগ্বিজয়ের অভিলাষে উল্কার মত অনিবার্য ধ্বংস, প্রাচ্যের আদর্শ মানুষকে পৌছাইয়া দেয় কল্যাণময়ের পরম শান্তিময় রাজ্যে।

কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া যে উন্নতির আশায় আমরা উন্মত্ত হইয়াছি, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পৃথিবীময় সংস্কৃতির দূত প্রেরণ করিয়া আমাদের সনাতন কালচারের যে গর্ব প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছি, সে গর্ব আর কত দিন করিতে পারিব?

বিজাতীয় কৃষ্টির আবর্জনা আনিয়া ঘর ভর্তি করিয়া, নিজের দেশের সুন্দর যাহা কিছু সব ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতেছি। কৃষককে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মিলের মজুর করিয়া বন্য পশুর পর্যায়ে ফেলিলাম, শান্তির সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালিলাম; সৃজনশীল শিল্পী হইল অনুকরণকারী টেকনিসিয়ান, দার্শনিক প্রস্তুত করিবে মারণাস্ত্র!

কথিত আছে যে, ফারাডে যখন ইলেক্ট্রিসিটি আবিষ্কার করিয়া মনের আনন্দে বিভোর, তখন কোন মন্ত্রী তাঁহাকে বারম্বার প্রশ্ন করিতে থাকেন উহার দ্বারা কি কাজ হইবে। উহার উত্তরে বিরক্তির সহিত ঐ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন, 'অন্তত পক্ষে উহার উপর তুমি ট্যাক্স বসাইতে পারিবে'।

বৈজ্ঞানিকের কথা মিথ্যা হয় নাই। সত্যই মানুষ একদিন উহার উপর ট্যাক্স বসাইল; কিন্তু সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন যে মনীষী তাঁহার অন্তরের আনন্দ কে বুঝিল?

সব জিনিষ অর্থের মাপকাঠি দিয়া মাপা যায় না। কৃষ্টি এমনই একটা জিনিষ, যাহা পৃথিবীর কোন মাপকাঠির নাগালের মধ্যে নহে।

ভারতের বৈশিষ্ট্যই তাহার কৃষ্টি; উহাই বোধ হয় তাহার দীর্ঘ জীবনের মূল কারণ। কত জাতি আসিল, কত গেল, ভারত প্রবহমান কাল ধরিয়া চলিতেছে। পশ্চিমের বিজ্ঞান আসিয়া ভারতের জ্ঞানকে নির্বাসিত করিলে কিসের জোরে ভারত বাঁচিবে? শুধু রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিয়া অথবা নটরাজের নৃত্য নাচিয়া কি তাহাকে রক্ষা করা যাইবে?

লোকটি যাহাকে হত্যা করিয়াছিল

(*Thomas Hardy* লিখিত 'The Man He Killed' কবিতার অনুবাদ)

যদি তার সাথে দেখা হতো কোন পুরান অতিথিশালাতে,
পিয়ালা পিয়ালা মদিরা উজাড় করিতাম বসে দু'জনাতে।
পদাতিক-রূপে মুখোমুখি দোঁহে দেখা হ'ল সমরাঙ্গনে,
দোঁহে দোঁহা প্রতি গুলী ছুঁড়ে দিনু, মারিনু তাহারে সেইখানে।
সমরাঙ্গনে বিপক্ষ দলে পাইনু তাহারে সমুখে—
সে মোর শত্রু জানি নিশ্চয়, তাই তো মারিনু তাহাকে।
হায়, মোর মন বুঝে না সঠিক শত্রু সে মোর কে বলে,
আমারই মতন হয়তো সে-জন না ভেবে ঢুকেছে সেনাদলে।

পেটের তাড়নে বিক্রী করেছে যাহা কিছু ছিল সম্বল;
আমারই মতন ছিল সে বেকার, তাই তো ঢুকেছে সেনাদল।
শান্তির কালে তার সাথে যদি মদের দোকানে দেখা হ'ত,
টাকা-কড়ি কিছু দিতাম তাহারে, করাতাম খানাপিনা কত।
যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হ'ল ব'লে তারেই মারিনু গুলীতে,
স্থান কাল-ভেদে একই মানুষের বিপরীত ভাব হিয়াতে।
যুদ্ধ বড়ই অদ্ভুত বটে, যুদ্ধ বড়ই ভয়ঙ্কর—
যুদ্ধ করেছে মানুষের প্রাণ নিষ্ঠুর, ক্রুর, ঘোরতর।

অনুবাদক—শ্রীতমালকৃষ্ণ নাথ।

বিপ্লবী ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৯৫৪ ইং অব্দের ৪ঠা জানুয়ারীর অমৃতবাজার পত্রিকায় জার্ম্মাণীর হামবুর্গে অবস্থিত ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের 'ইনভেষ্টমেণ্ট এডভাইজার টু জার্ম্মাণ ফাইনানশিয়ার' শ্রীশ্যামসুন্দরলাল গুপ্ত এক পত্র প্রকাশ করেন, তাহার শিরোনামা ছিল, 'এ্যাক্সেজ ফ্রম হামবুর্গ' তাহার মর্ম্ম ছিল, বিপ্লবী ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ১৯৫৩ ইং অব্দের ১৮ই ডিসেম্বর হামবুর্গের একটা হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তাঁহার দেহাবশেষ যেন মাতৃভূমির ধূলি-রাশির সঙ্গে মিশিয়া যায়।

ডক্টর দাশগুপ্ত যে শেষ জীবনে দারুণ অর্থাভাবে মর্ম্মন্তুদ অবস্থায় দিনাতিপাত করিয়াছিলেন, তাহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি প্রকাশ করেন।

আমরা যথাকালে এই বিপ্লবী-বীরের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হওয়ার সংবাদ পাই নাই। দারুণ অর্থাভাবের সংবাদও অবগত হই নাই, সুতরাং অকস্মাৎ উক্ত পত্র পাঠ করিয়া অবশাঙ্গ হইলাম। তিনি ছিলেন আমাদের সহকর্ম্মী, সহপাঠী, আমার স্বদেশবাসী এবং একই মত ও পথের পথিক। অর্থাভাবের সংবাদ পাইলে অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করা অসম্ভব হইত না। সুতরাং তাঁহার শোকে বক্ষ বিদীর্ণ হইল। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন স্বদেশী যুগে উদ্দাম কর্ম্মী, অগ্নিমন্ত্রের সাধক। পরে জার্ম্মাণীতে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্র ও যুবকগণের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং সর্ব্বকার্য্যের সহায়ক ছিলেন।

পরিচিতি!

ত্রিপুরা জেলার জিনোদপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ চা—কৃষি ও শিল্পবিদ্ মহেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্তের চতুর্থ পুত্র ছিলেন তিনি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণও কৃতী বিদ্যার্থী এবং তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার একটি ভাগিনেয়ী প্রখ্যাতা বিপ্লবী নারী-কর্ম্মী শ্রীসুনীতি চৌধুরী কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টিভেন্স হত্যার অপরাধে শ্রীমতী শান্তি ঘোষ সহ দীর্ঘকাল কারাকক্ষে আবদ্ধ ছিলেন। ১৮৮৮ অব্দের ১লা আগষ্ট জ্ঞানেন্দ্রের জন্ম হয়।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র স্বদেশী যুগের প্রারম্ভেই একজন বিপুল উৎসাহী দেশকর্ম্মিরূপে কুমিল্লা সহরে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি জিলা স্কুলে সর্ব্বজন-প্রশংসিত তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯০৬ অব্দের এপ্রিল মাসে বরিশাল কনফারেন্স ভঙ্গের পর বাগ্মিবর বিপিনচন্দ্র পাল যখন শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীউল্লাসকর দত্ত প্রমুখ একদল উগ্র দেশকর্ম্মিসহ স্বদেশী প্রচার ও জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে কুমিল্লায় গমন করেন, বিপিনচন্দ্র প্রত্যহ স্থানীয় দেশকর্ম্মিগণ সহ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তখন প্রত্যহ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রকে বিপিনচন্দ্রের দলের পুরোভাগে দেখা যাইত। তিন মাস পরে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রবর্ত্তিত প্রথম বৎসরের এণ্ট্রেন্স এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সমতুল্য পঞ্চম মান ও সপ্তম মান পরীক্ষা গৃহীত হয়। তিনি পঞ্চম মান পরীক্ষা দিয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া প্রথমতঃ বৌবাজারে 'দি এসোসিয়েসন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্সে' বিজ্ঞান শিক্ষায় ব্রতী হন। কিন্তু ছয় মাস পরই তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় পাইয়া—জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (পরে ডক্টর) সাগ্রহে তাঁহাকে কলেজ কোর্সে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। এখানেই তাঁহার দীক্ষা হইল বৈপ্লবিক মন্ত্রে,—গুরু গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ দে এম-এ, বি-এস-সি।

সোনার বাংলা

এক শুভ প্রভাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহরে আমরা আসিয়া দেখিলাম, বৃহদাকার সুরঞ্জিত প্রাচীরপত্রে সহর ঢাকিয়া গিয়াছে। পত্রটি ছিল এইরূপ :—

সোনার বাংলা!

৫০০০০ লোক মরিতে প্রস্তুত, তোমরাও প্রস্তুত হও!

ভিতরে উন্মাদনী ভাষায় ছিল ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার, এবং মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক হওয়ার আহ্বান।

আমরা স্কুল বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী প্রচারে বিব্রত, তখনও মুক্তি-সংগ্রামের কথা ভাবি নাই, প্রাচীরপত্র পাঠে হৃদয়ে উৎসাহ-অনল প্রদীপ্ত হইল।

কয়েক মাস পরে দাশগুপ্তের নিকট অবগত হইলাম, তিনি তাঁহার দুই জন সহকর্ম্মিসহ প্রাচীরপত্র একই রাত্রে চাঁদপুর, কুমিল্লা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহরের দেয়ালে দেয়ালে আঁটিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম সহকর্ম্মী নবীনচন্দ্র লোধও পরে আমাকে এই তথ্য জ্ঞাপন করেন। প্রাচীরপত্র ছিল কলিকাতার আত্মোন্নতি সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিপ্লব-মন্ত্রের প্রচার!

১৯০৬—৯ পর্য্যন্ত দাশগুপ্ত ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ এবং ত্রিপুরা জেলার সহর ও বড় বড় গ্রামে তাঁহার গুরু মহেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের নির্দ্দেশে বিপ্লব-মন্ত্রের প্রচার করেন, স্বয়ং অধ্যাপক মহোদয় আমাদের চুণ্টা, কালীকচ্ছ, বিদ্যাকুট, ইব্রাহিমপুর প্রভৃতি গ্রামেও গমন করেন। স্থানে স্থানে অত্যুৎসাহী কর্ম্মিগণের মধ্যে দু-একটি রিভলবারও বিতরণ করেন।

জার্ম্মাণী যাত্রা

১৯০৮ অব্দে মাণিকতলায় বোমার বাগান আবিষ্কৃত হয়, তৎপরই বিপ্লবী এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী যুবকগণের অন্তরে জাগিয়া উঠে বোমা প্রস্তুতের এবং প্রয়োগের বিধান আয়ত্ত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র উদ্দীপ্ত হইলেন জার্ম্মাণীতে যাইয়া রসায়নশাস্ত্রের অনুশীলন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতের বিদ্যা অর্জ্জন করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায়। তিনি 'দি এ্যাসোসিয়েশন ফর দি এ্যাড্‌ভান্সমেণ্ট অব সায়েণ্টিফিক এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এডুকেশন অব ইণ্ডিয়ান্‌স্'এর সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। ঘোষ মহাশয় তাঁহার লণ্ডন পর্য্যন্ত যাতায়াতের

পাথের দিতে প্রস্তুত হইলেন। তৎপরে বদান্যবর মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি দুই বৎসর পাওয়ার স্বীকৃতি পাইয়াই উৎসাহিত হইলেন এবং ধার-কর্জ্জ করিয়া ১৯০৯ অব্দের আগষ্ট মাসে "গোলকুণ্ডা" জাহাজে চাপিয়া লণ্ডন চলিয়া গেলেন।

বার্লিনে দাশগুপ্ত

বার্লিনে পৌছিয়া তিনি শীতের সেসনে ভর্ত্তি হইতে পারিলেন না। কারণ, জাতীয় বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট ভর্ত্তির পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইল না। এ বিষয়ে দৃঢ় ভাবে আন্দোলন করিয়া অবশেষে ১৯১০এর গ্রীষ্ম সেসনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন।

তাঁহারই আন্দোলনের ফলে জাতীয় বিদ্যালয় এবং সায়েন্স এসোসিয়েশনের সার্টিফিকেট জার্ম্মাণীর সর্ব্বপ্রকার বিশ্বালয়ে ভর্ত্তির পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইল।

আমি এবং ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (পরে ডক্টর এবং বিপণ কলেজের অধ্যক্ষ) ১৯১০এ বার্লিনে পৌছিয়া তাঁহার সাহায্য এবং সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলাম। সত্বরই লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার টেবিলের উপরে ম্যাডাম ভিকাজীকামা সম্পাদিত—"বন্দে মাতরম্", বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত—"তলোয়ার" শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম্মার "ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিষ্ট" এবং অন্যান্য বহুবিধ বৈপ্লবিক ইস্তাহার ও পুস্তকাদি রহিয়াছে। সত্বরই আমাদের নামেও শ্রীসাভারকর সংকলিত—"ভারত-স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস" এবং কিছু সংখ্যক পত্রিকাদি আসিল। আমরা উপলব্ধি করিলাম, প্যারিস বার্লিনে লোকচক্ষের আড়ালে এক যোগসূত্রে রহিয়াছে।

অস্ত্রসংগ্রহের বোঝা

দাশগুপ্ত এক দিন কথাচ্ছলে বলিলেন, তিনি কলিকাতায় শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দেবকে লিখিয়াছেন, জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাসৈনিকগণের ব্যবহৃত প্রায় নূতন রাইফেল সস্তা দরে বিদেশে চালান দেয়, তিনিও আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দিতে প্রস্তুত কিন্তু ডেলিভারী জার্ম্মাণীতেই নিতে হইবে। তার পর দেখাইলেন, একখানা পোষ্টকার্ডে মুদ্রিত রাইফেলের চিত্র।

প্রায় দুই মাস পরে আমার একজন জার্ম্মাণ সহপাঠী বন্ধু হ্বার আর্ণাস্ট মিটাগ আমার কক্ষে বসিয়া আমাকে জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষাদান এবং ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণকালে সহসা দাশগুপ্ত হইতে আনীত "ইণ্টার ন্যাশনেল হিষ্ট্রী অব দি রিভোলিউশনারী একটিভিটি" নামক গ্রন্থের প্রথম অংশ খুলিয়া দেখিলেন। সহসা উক্ত চিত্র দেখিয়া কাঁপিয়া উঠেন। তিনি বলেন ইহা ত তাঁহাদের মিলিটারী রাইফেল, তাহার চিত্র আমার নিকটে কেন? নানা ভাবে কথা বলিয়াও আমি তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে পুস্তকের ভিতরে যে এই চিত্র ছিল তাহা আমি জানিতাম না। কিন্তু তাহার মুখ কাল হইল—এবং সন্ধ্যাবেলায় পুলিশ আসিয়া এ বিষয়ে বহুবিধ প্রশ্ন করিলেন; পরদিন দাশগুপ্তকেও পুলিশ প্রশ্ন করে কিন্তু তাহা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই।

তিনি কলিকাতায় পত্র দিয়েছিলেন আত্মোন্নতি সমিতির উদ্যোগে ষ্ট্রাণ্ড রোডে একটা লোহা-লক্করের ও সিমেণ্টের দোকান খুলিতে। তিনি জার্ম্মাণী হইতে পাইপ পাঠাইবেন, তাহারই কতকগুলির মধ্যে থাকিবে রাইফেল, সিমেণ্টের পিপার মধ্যে বুলেট, পিস্তল এবং রিভলবার। ব্যবসা চলিবে লোকসান দিয়া। কলিকাতা হইতে উত্তর গেল—"ব্যবস্থা করিতেছি"।

হেগ আদালতে সাভারকরের বিচার

হেগ আদালতে শ্রীসাভারকরের ইতিহাসখ্যাত বিচারের জন্য প্যারিস ও বার্লিনে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তাহাতে দাশগুপ্তের কৃতিত্বও কম ছিল না। তিনি রাইখসটাগের কতিপয় সদস্য (সোসিয়েলিষ্ট এবং প্রগেসিভ পিপল্স পার্টির সভ্য) দ্বারা গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে আন্দোলন চালাইবার পরামর্শ দেন, অর্থ সংগ্রহেও তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইয়া আমরা গর্ব্ব অনুভব করি। যদিও উক্ত বিষয়ে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ডক্টর চক্রবর্ত্তী এবং আমার উৎসাহ অদম্য ছিল তথাপি তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য আমাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল। এ বিষয়ে ১৯৫২ ইং অব্দের ১২ই অক্টোবরের "যুগান্তর সাময়িকী"তে প্রকাশিত আমার সঙ্কলিত "হেগ আদালতে সাভারকর ব্যাপার" শীর্ষক প্রবন্ধে সকল তথ্য বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব

১৯১৩ অব্দের মার্চ্চ মাসে জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র "ফলিত রসায়নে" ডক্টরেট উপাধি লাভ করিলেন। তার পরই তাঁহার অধ্যাপক ডক্টর উল্ম্যান অনুরোধ-পত্র লইয়া সুইজারল্যাণ্ডের বাসেলে গেলেন এবং তথায় প্রসিদ্ধ 'রসে ব্রাণ্ড' ক্যামিকেল্স প্রস্তুতকারক "হৌফম্যান ল্যা রসে" কোম্পানীর 'উবারডিঙ্গেন' ফ্যাক্টরীতে গবেষক রাসায়নিক পদে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষণার পরই সুইজারল্যাণ্ড নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিল, সুতরাং জার্ম্মাণীতে অবস্থিত ফ্যাক্টরীতে বাসেল হইতে প্রত্যহ যাতায়াত করায় বিঘ্ন ঘটিল, কারণ উভয় দেশের মধ্যে রাইন নদীর উপরের সেতুপথ বন্ধ হইল, রেল-বাসও অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রহিল। এ জন্য তিনি ছুটি পাইলেন।

ভারত উদ্ধার উদ্যোগে সহযোগিতা

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র আগষ্ট মাসের ১৮ই তারিখে জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র দপ্তরে এক পত্র দিয়া ভারতে বিপ্লব বাধাইবার উদ্যোগ করার জন্য সাহায্য ও সহযোগিতা চাহিলেন কিন্তু উত্তর পাইলেন না। অপর একজন বিপ্লবী সি পদ্মনাভম পিলাই জুরিখে থাকিতেন, তিনি তথায় 'প্রো-ইণ্ডিয়েন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং "প্রো-ইণ্ডিয়েন" নামক মাসিক পত্রিকা জার্ম্মাণ ভাষায় প্রকাশ করিতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে জানিতাম, তাঁহার কার্য্যে প্রীত ছিলাম। তিনিও জ্ঞানেন্দ্রকে না জানাইয়া পররাষ্ট্র দপ্তরে এক পত্র লিখেন, কিন্তু উত্তর পান নাই।

৩রা সেপ্টেম্বর আমাদের অনুরোধে পররাষ্ট্র দপ্তর উক্ত দুই জনকেই আমরা বার্লিনে বিপ্লব সংঘটনের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এ সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া 'তাঁহাদের সহরে অবস্থিত জার্ম্মাণ কন্সাল হইতে অর্থ লইয়া বার্লিনে চলিয়া আসিতে পত্র দেন। জ্ঞানেন্দ্র অর্থ না লইয়া নিজ ব্যয়েই এবং পিলাই অর্থ লইয়া বার্লিনে আসিয়া উপস্থিত

হন। কিন্তু উভয়েই যদিও আমাদের বন্ধু ছিলেন, বার্লিনে পৌঁছিয়া পররাষ্ট্র দপ্তরের দরবার করিতে গেলেন, কেন পত্রের জবাব মিলিল না ইত্যাদি। পরে ব্যারন ওপেনহাইমের অনুরোধে আমাদের সঙ্গেই যোগদান করিলেন।

ডক্টর মুলার

দাশগুপ্ত ব্যারনকে অনুরোধ করেন, তাঁহার বন্ধু এবং আমার পরিচিত চীনভাষাবিদ ডক্টর মুলারকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনিয়া তাঁহাদের (পররাষ্ট্র দপ্তরের) এবং আমাদের দলের মধ্যে লিগেসন অফিসার ভাবে রক্ষা করার জন্য। এই সকল তথ্য ১৩৫৯ অব্দের পূজা সংখ্যা "বসুমতীতে" আমার লিখিত "বার্লিনে ভারত উদ্ধার উদ্যোগ" শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

মুলারের আগমন, তাঁহার বাটীতে আমাদের "ভারতবন্ধু জার্মাণ সমিতি"র কার্য্যালয় স্থাপন, স্পাণ্ডও বিস্ফোরক কারখানায় বিস্ফোরক প্রস্তুত শিক্ষা ইত্যাদি আমার বিভিন্ন প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

দাশগুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়াই তাঁহার সর্ব বিষয়ে কর্ম্মনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া ব্যারন ওপেনহাইম, ডক্টর মুলার প্রমুখ ব্যক্তিগণের এবং সমিতির প্রেসিডেন্ট—হামবুর্গ আমেরিকা ষ্টিমার লাইনের জেনারেল ম্যানেজার ভারতবন্ধু এবং ইংরাজ ফরাসীর ঘোরতর শত্রু স্যার আলবার্ট পলিনের প্রশংসাভাজন হইলেন।

হেলপোলাণ্ড যাত্রা

সিন্ধী পারসী ছাত্র বিপুল উৎসাহী এবং দুর্জ্জয় সাহসী দাদা বানজী কেরসাম্প এবং দাশগুপ্ত উভয়েই ছিলেন সর্ব্ব কার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়ার জন্য উৎকণ্ঠিত, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান দোষ ছিল—অত্যন্ত একজেদী এবং পরমত-অসহিষ্ণু, এ জন্য দলের সঙ্গে কার্য্য করার অনুপযোগী। কেরসাম্প হইতে দাশগুপ্ত অধিকতর জেদী ছিলেন, উভয়ে দাবী করিলেন তাঁহাদিগকে সামুদ্রিক মাইন প্রস্তুত শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। যদিও ৩রা সেপ্টেম্বর যে সব সর্ত্ত আমরা ব্যারন ওপেনহাইমের নিকট দিয়াছিলাম, ইহাও তন্মধ্যে একটি ছিল, তথাপি লেডী অফিসার স্যার ফন ফিসার যখন ইহা কয়েক মাস মধ্যে আয়ত্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া চেষ্টা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন, তখন আমরা এ বিষয়ে নীরব হই। সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ই তারিখ উক্ত দুই সহকর্ম্মী এজন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, নানা প্রকারে বুঝাইয়া নিরস্ত করা যখন অসম্ভব হইল তখন ব্যারন ওপেনহাইম, ডক্টর মুলার ও ফিসার পরদিনই তাঁহাদিগকে হেলপোলাণ্ড যাত্রা করিবার সুযোগ দিলেন।

ফ্রিড্রিখষ্ট্রাডক ষ্টেশনে প্রথম শ্রেণীর কামরায় তাঁহাদিগকে তুলিয়া দিবার কালে চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুকতাংকর এবং আমি বলিলাম, বৃথা যাইতেছেন। গাড়ী ছাড়িবার সময় দাশগুপ্ত সহাস্যে বলিলেন, "ভয় নেই, চার মাস মধ্যেই বঙ্গোপসাগরে ব্রিটিশ ও মিত্র শক্তির ষ্টিমার ডুবিয়ে দিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করবো।"

তৃতীয় দিনেই হেলপোলাণ্ড হইতে ফোনে কেরসাম্প চট্টোপাধ্যায়কে বলিলেন—"ভাল করে দেখে শুনে মনে হল, শীঘ্র শিক্ষা লাভ করা অসম্ভব। উচ্চ গণিত, পদার্থবিদ্যা এবং মেকানিক্সে সুপ্রচুর জ্ঞান না থাকলে মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং ফিরে যাবার অনুমতি চাই।" ব্যারণ আপিসে নির্দ্দেশ দিলেন হেলপোলাণ্ড ম্যারিন ট্যাকনিকেল ইনষ্টিটিউটে তাঁহাদিগকে ফিরিয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতে। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া হেলপোলাণ্ডের রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিলেন, তাহা সুবিস্তৃত, সুতরাং এস্থলে প্রকাশ করিতে বিরত রহিলাম।

সুইজারল্যাণ্ড যাত্রা

১৯১৪ অব্দের ১লা অক্টোবর দুই জন সহকর্ম্মী সহ আমি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করি, নবেম্বরের মধ্যভাগে আমার পল্লী নিবাসে বেয়ার্ণ হইতে লিখিত দাশগুপ্তের এক পত্রে অবগত হই, তিনি আমদানী-রপ্তানী ব্যবসায় হাত দিয়াছেন এবং জেনোয়া বন্দর হইতে মালপত্র প্রেরণ করার জন্য তথায় যাইতেছেন।

"আমদানী-রপ্তানী" অর্থ অস্ত্রশস্ত্র ভারত উপকূলে প্রেরণের চেষ্টা। ১৯১৬ অব্দে সুইজ গভর্ণমেন্টের শাসানী পাইয়া তাঁহাকে নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ড ত্যাগ করিতে হয়। তৎপর ঐ ব্যবসা চালাইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকুরীও করিবেন, এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি সুইডেনের ষ্টকহলম চলিয়া যান। তার পর বিশেষ কিছু অবগত হই নাই।

১৯১৯ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার (বার্লিন হইতে লিখিত এক পত্র) পাইয়া অবগত হইলাম, তিনি এবং ডক্টর মুলার এক সঙ্গে ডক্টর জে, সি, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং নামে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপরে তিনি হামবুর্গে যাইয়া একটি ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন এবং কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত ও রপ্তানী ব্যবসা আরম্ভ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে নেতাজীর সহযোগিতা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন বার্লিনে থাকিয়া চক্রশক্তির সহায়তায় ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করার উদ্যোগ করেন, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিলেন বলিয়া ১৯৪৫ অব্দেই সংবাদ পাইয়াছিলাম কিন্তু তার পর আর কোনো সংবাদ পাই নাই। বিদেশে বেঘোরে অর্থাভাবে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি হামবুর্গের একটি হাসপাতালে দেহত্যাগ করিলেন, তার পূর্ব্বে আমরা সংবাদ পাইলে প্রচুর না হউক কিছু কিছু অর্থ সাহায্য প্রেরণ করিয়া যদি আরও একটি বছর তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতাম, তবে ভারত স্বাধীন হইয়াছে ইহা জানিয়া তিনি পুলকিত হইতেন। ১৯০৫ হইতে ১৯৪৫ পর্য্যন্ত তিনি যে কল্পনা করিয়াছিলেন, যাহার জন্য শক্তি অর্থ এবং আয়ুক্ষয় করিয়াছিলেন তাহা সার্থক মনে করিতেন। ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সোনার বাংলা, তাঁহার গোমতী-তিতাস-মেঘনা-বিধৌত ত্রিপুরার বক্ষে জিনোদপুর গ্রামে যাইয়া জীবন ধন্য করিতে পারিতেন। সংগ্রাম, স্বদেশ এবং বাঙ্গালা জাতির কল্যাণের জন্য যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, বিভিন্ন পরিকল্পনা ছিল, তাহা আংশিক ভাবে পূর্ণ করিয়াও তিনি গাহিতে পারিতেন—

"সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে"।

পরিমল গোস্বামী

দ্বিতীয় পর্ব্ব

৪

ঋণশোধ নাটকের পশ্চাৎপট রূপে নন্দলাল বসু একখানা দৃশ্য এঁকেছিলেন। একটু দূর থেকে দেখলে মনে হবে সবুজের সমুদ্রে শাদা ফেনার ঢেউ। এই ছবিখানা আমাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছিল। শিল্পীর কাছ থেকেই একটুখানি ব্যাখ্যা পেয়ে হঠাৎ যেন আর্টের উদ্দেশ্য বিষয়ে আরও খানিকটা অস্পষ্টতার কুয়াসা আমার মন থেকে কেটে গেল। শরৎকালের আনন্দ আবেগের প্রকাশ এ ছাড়া আর কি হতে পারত ভেবেই পেলাম না। শরৎকালে মাঠে মাঠে সবুজের সমুদ্রে কাশফুলের ঢেউই তো এত দিন বাংলাদেশের প্রান্তরে প্রান্তরে দেখে এসেছি। একটি একটি পৃথক গাছ এঁকে তার রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশের যে শরৎ দৃশ্য মনকে নাড়া দেয় তা কোনো বিশেষ একটি জিনিস নয়। সে যেন শত কণ্ঠের ঐকতান। তা থেকে কোনো একটি সুরকে বেছে বের করতে গেলে সমগ্র রূপের উপর আঘাত হানা হয়। ইংরেজদের শিল্পশাস্ত্রেও Spoiling the forest with too many trees নামক একটি নিন্দাবাক্য প্রচলিত আছে। অর্থ কিছু ভিন্ন হলেও মূল কথাটি এক।

আচার্য নন্দলালের আঁকা এই একখানা মাত্র দৃশ্য আমার জীবনে একটি নতুন আবিষ্কার। কারণ বাংলার শরৎকালের ভাবরূপের প্রকাশ রবীন্দ্র কাব্যে স্যাচুরেশন পয়েন্টে উঠেছে বলা যেতে পারে। নন্দলালের ছবিতে দেখলাম তার অব্যবহিত দৃশ্যরূপ। মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহের বহু আয়োজন, বিশেষ মুহূর্তে যেমন একটি আগুনের রেখাময় ঝলকে প্রকাশিত হয়, এ ছবিটিও আমার মনে তেমনি শরৎ আকাশের একটি বিদ্যুৎ-রেখাময় প্রকাশ বলেই প্রতিভাত হয়েছিল।

ঋণশোধ পালা অভিনয় যে রাত্রে শেষ হল, সম্ভবত সেই রাত্রেই রওনা হয়েছিলাম শান্তিনিকেতন থেকে। আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রীনিতাইবিনোদ (নিত্যানন্দবিনোদ) গোস্বামী।

আর ফিরিনি সেখানে ছাত্ররূপে। স্বাস্থ্য এমন ভেঙে পড়েছিল যে মনে একটা হতাশার ভাব না এসে পারেনি। আমার সমস্ত উদ্যমের মুখে বার বার স্বাস্থ্য এসে বাধা দিয়েছে।

শান্তিনিকেতনে তখন খাওয়া ছিল আলুর তরকারী, ডাল ও দই বা দুধ। এরকম খেয়ে যেকোনো সুস্থ লোক সুস্থতর হয়, কিন্তু এই খাদ্যে স্বভাবত রুগ্ন আমি রুগ্নতর হয়ে পড়লাম। এমেটিন হাইড্রোক্লোর ইনজেকশন তখন খুব ডাক্তারজন-প্রিয় ছিল, কিন্তু 'তার সাধ্য কি ভাঙাকে জোড়া দেয় ? "ভাঙারে জোড়া দেবে সে কিসের মন্তরে ?"

বাড়িতে ফিরে উৎসাহহীন ভাবে বসে রইলাম। শান্তিনিকেতন থেকে বিদায়ের কালে ঋণশোধ পালা দেখে এসেছিলাম, কিন্তু শান্তিনিকেতনের ঋণশোধের পালা আর ফিরে এলো না আমার জীবনে।

শান্তিনিকেতনে আর ফেরা হবে না এ চিন্তা আমার কাছে বেদনাময় ছিল। মোহগ্রস্ত হয়েছিলাম বলা চলে। সম্ভবত গানের সুরে সুরে সমস্ত শান্তিনিকেতন পরিমণ্ডলের সঙ্গে আমি বাঁধা পড়েছিলাম। গান আমি গাই না। নীরব কবির মতোই আমি হয়তো নীরব গায়ক—অর্থাৎ কবিও নই, গায়কও নই, কিন্তু ও দুয়ের প্রভাব আমার জীবনে একটু বেশি।

রবীন্দ্র সঙ্গীত এমন ভাবে বাইরে কোথায়ও শুনিনি তার আগে। যেটুকু শুনেছি তা যৎসামান্য। বিদ্যাসাগর কলেজ হষ্টেলে তৎকালে প্রচলিত দু-চারটি গান দু'-এক জনের মুখে শুনেছি, তার অধিকাংশই প্রার্থনা সঙ্গীত। ফকিরচাদ মিত্র ষ্ট্রীটে বিমলকৃষ্ণ ঘোষ গাইত মাঝে মাঝে। তখনকার দিনের প্রচলিত গান অমল ধবল পালে লেগেছে, মহারাজ একি সাজে, আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার, আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ, তোমার অসীমে, তোমারি রাগিণী জীবন কুঞ্জে, মন্দিরে মম, মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি, শুধু তোমার বাণী নয় গো, প্রভৃতি গান চলত বেশি। আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি, আজি বারি ঝরে—প্রভৃতি প্রকৃতি সঙ্গীতও তখন চলতি ছিল।

মাঝে মাঝে এ সব গান শুনেছি শৌখিন গায়কের অপটু কণ্ঠে। পরবর্তী কালের বৈচিত্র্য এবং বহু মার্জিত কণ্ঠে গাওয়ার মোহবিস্তারী সৌন্দর্য তাতে ছিল না। এ স্বাদ প্রথম পেলাম শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায়।

এখান থেকে চলে আসবার সময় এই সঙ্গীতময় আবহাওয়ার যেটুকু রেশ বহন ক'রে নিয়ে এলাম তার ক্রিয়া তখন বুঝতে পারিনি।

কিন্তু পরে বোঝা গেল তা আমার সমস্ত সত্তায় ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যাঁরা সঙ্গীত মনে করেন না, তাঁদের সঙ্গে আমার বিরোধ নেই। রুচি বিষয়ে স্বাধীনতা থাকা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রকাব্য কাব্য নয়, এমন কথা অনেক ভদ্রলোক তো এক কালে বলতেন। তাঁরা অনেকে পণ্ডিত ছিলেন। এবং অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তিও বলতেন রবীন্দ্রনাথের ছন্দের কান নেই। এ নিয়ে অনেক কাল ধ'রেই বাগবিতণ্ডা চলেছিল এবং রবীন্দ্রছন্দের ব্যাখ্যায় আমার পিতাও যোগ দিয়েছিলেন (ভারতী ১৯০১, 'বঙ্গভাষা' ১৯০১)। আমি পরে এ সব লেখা পড়েছি। কিন্তু এতে প্রতিপক্ষের মত বদলায় নি।

যাঁরা কাব্য ভালবাসেন এবং সঙ্গীত ভালবাসেন তাঁদের কাব্য-সঙ্গীত ভাল না লাগবার হেতু নেই। বাংলাদেশে প্রচুর কাব্য-সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে এবং সে সব নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কথার যে কি কথার-অতীত-আবেদন, তা কেবল কথার যাদুকরই আমাদের হৃদয়ঙ্গম করাতে পারেন। যথাযথ কথা যথাযথ সুরের বাহনে আমাদের মর্মে এসে পৌঁছয় সহজে। এর এমনই ক্ষমতা যে এই সাহায্যে অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে অনায়াসে একটি যোগ ঘটে যায়, আমরা এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকের সঙ্গে সেই মুহূর্তে 'কমিউন' করতে থাকি। সঙ্গীতের এই 'কথা' সঙ্গীতের প্রধান কথা নয়। এ 'কথা' ভাবের সমার্থক। প্রকৃত সঙ্গীতে কথা বড় , ভাবটাই বড়। রবীন্দ্র সঙ্গীতেও কথা তার পৃথক অস্তিত্ব লুপ্ত ক'রে ভাবে পরিণত। কথা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও ভাবের গভীরতায় পৌঁছনো সম্ভব। শুধু সুর, বিশুদ্ধ যন্ত্র-সঙ্গীতের আবেদন, প্রোফাউণ্ড হতে পারে। যেমন দুজন প্রেমিকের মধ্যে গভীরতম ভাবের আদান প্রদান হতে পারে সম্পূর্ণ নীরব থেকে, শুধু হাতে হাত রেখে। কিন্তু প্রেম প্রকাশের এই নীরব রীতিই যদি একমাত্র রীতি হত তা হ'লে প্রেম বেশি দিন টিকত না সম্ভবত।

ভারতীয় অনেক রাগই প্রোফাউণ্ড। আশ্চর্য সৃষ্টি। সামান্য কথার আশ্রয়ে, অনেক সময় অর্থহীন কথার আশ্রয়ে, তা দাঁড়ায়। কাব্য কথা সেখানে অবান্তর।

রবীন্দ্র সঙ্গীত এ থেকে স্বতন্ত্র, যদিও সম্পূর্ণ নয়। এখানে কাব্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতা এত বেশি যে কাব্যকেই সুরের ভিতর দিয়ে অধিকতর প্রোফাউণ্ড করা হয়েছে। এতে বৈচিত্র্য আপনা থেকেই বেড়ে গেছে। কম্পোজার রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত সুরের আশ্রয়েই তাঁর গানের কথা গানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে মিশে গেছে। এর কোথাও তুলনা হয় না। অধিকাংশ ভারতীয় রাগের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে রবীন্দ্রসঙ্গীত তার অলঙ্কার-সর্বস্বতা-বর্জিত সরল সহজ আবেদন নিয়ে। সুরের অতি অলঙ্করণ এতে চলে না। সরলতাও যে আর্টের একটি বিশিষ্ট ধর্ম সেটি আধুনিকযুগে স্বীকার্য। এটি মানলে এবং বিশ্বাস করলে তবেই এদিকে আকর্ষণ বাড়তে পারে। অবশ্য তা শিক্ষাসাপেক্ষ। সুরের সঙ্গে সুরের মিশ্রণ মানা সহজ, কিন্তু সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের তৃতীয় আর একটি মিশ্রণকে, আর একটি সৃষ্টি ব'লে মানা, অতি-অলঙ্কার প্রিয়দের পক্ষে সম্ভবত কঠিন।

ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের পরিবেশে বাল্যকাল কেটেছে। তার মূল্য আমার কাছে কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের আবেদন আমার কাছে সম্পূর্ণ পৃথক। ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত যেমন যে-কোনো কণ্ঠে শুধু সঙ্গীত ব্যাকরণ ঠিক রেখে চললেই হ'ল, রবীন্দ্র-সঙ্গীত তা হয় না। এইখানে এর আর এক বৈশিষ্ট্য। যে সব রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার ভাল লাগে, উপযুক্ত কণ্ঠে গীত সে সবের ভিতর দিয়ে আমি অনেক গভীর বেদনায় গভীর সান্ত্বনা লাভ করেছি; কত দূর কত কাছে এসে পড়েছে; অসীমের মধ্যে আমার সকল সীমার বিলুপ্তি ঘটেছে. কোনো দিন যা পাওয়া সম্ভব মনে হয়নি, তা পেয়েছি; বেঁচে থাকার নতুন সার্থকতা লাভ করেছি, অনেক মানসিক মৃত্যুর পরে জন্মান্তর লাভ করেছি।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত বেশি ভালবাসি একান্তে শুনতে, আসরে নয়। সেজন্য শ্রীমতী কণিকা, শ্রীমতী সুচিত্রার উপর চাপ পড়েছে মাঝে মাঝে। কণিকার কণ্ঠে একদিন শুনলাম প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সঙ্গে, আমার ঘরে বসে। তিনি আমাদের বুড়ো দা। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি তাঁর দুর্বলতা আমার চেয়েও বেশি। তিনি সেদিন কণিকার কণ্ঠে 'রূপে তোমায় ভোলাব না' শুনে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। আর কেউ না থাকলে বুড়োদার সঙ্গে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কথা আলোচনা ক'রে অথবা তা থেকে কাব্যাংশ প'ড়ে এক একটি বেলা কাটিয়েছি।

কথায় কথায় ১৯৫৬ পর্যন্ত সরে যাওয়া গেল। ইতিমধ্যে ১৯২২ অনেক ঘটনা নিয়ে অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছে।

আমাদের দেশের বাড়িতে এই সময় এমন একটি লোকের আবির্ভাব ঘটে যাঁকে নিয়ে কয়েকটি দিন বেশ উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেল।

আমার এক আত্মীয়ার সঙ্গী হিসেবে কলকাতা থেকে নরেন নাগ নামক এক ব্যক্তি আসেন। আত্মীয়া যাবেন পদ্মা নদীর ওপারে পাবনা জেলার একটি গ্রামে। মাঝপথে আমাদের বাড়িতে দু'এক দিনের বিশ্রাম।

এই নরেন নাগের চেহারাটি খুব মার্জিত নয়। কেমন যেন একটি সাধারণ অশিক্ষিতের মতন চালচলন। পাতলা চেহারা, তামাটে রং, ঘাড়ের দিকে চুল চাঁছা, কপালে একগোছা চুল ঝুলে পড়েছে। মুখে পান এবং বিড়ি। যাই হোক, তাঁর সঙ্গে মৌখিক একটি কি দুটি কথা বলেই আমার কর্তব্য শেষ করেছি। বাড়ি থেকে একটুক্ষণ বেরিয়েছিলাম। দশটায় ফিরে এসে শুনি মেয়েদের মহলে হাত দেখা ও টোটকা ওষুধ ব্যবস্থা করা নিয়ে তিনি বড়ই ব্যস্ত। আমি শুনে বেশ একটু বিরক্ত বোধ করলাম।

নরেন নাগের গণৎকারি

কিন্তু বাইরের মেয়েদের মুখে ছড়িয়ে পড়ল যে গণৎকার এসেছেন, ওষুধও ব'লে দেন। গুজব শুনে প্রথম ছুটে এলো হরেন্দ্রকুমার রায়। তখন সে শান্তিনিকেতনের কাজ ছেড়ে এসেছে। অতি-সাধুতার জন্ম সে বিবেক বাঁচিয়ে কোথায়ও বেশি দিন কাজ করতে পারে না। যখন নিজেকে বাঁচাবার প্রয়োজন উগ্র হয়ে ওঠে তখনই কাজের সন্ধানে বেরোয়, এবং কাজ পেলে কিছুদিন পরেই ছেড়ে দেয়।

সে এসে নরেন নাগকে ধ'রে বসল কয়েকটি টোটকা ওষুধ লিখে দিতে হবে। কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসল সে। নরেন নাগ ওষুধ বলে যেতে লাগলেন। বললেন অজীর্ণের ওষুধ লিখুন। সেটি লেখা হলে সর্দিকাসির ওষুধ লিখুন—এই ভাবে চার পাঁচটি টোটকা লেখা হয়ে গেলে তিনি অসুখের নাম বাদ দিয়ে বললেন এইবার আপনার অসুখেরটি লিখুন ব'লে একটি টোটকার নাম বললেন এবং সেটি লেখা হ'লে বললেন, উপরে লিখুন অর্শ।

হরেন অর্শে ভুগছিল এবং নরেন ও হরেন পরস্পর সম্পূর্ণ অপরিচিত। অতএব আমি একটু ধাঁধায় প'ড়ে গেলাম।

হরেনই দ্রুত প্রচার করল কথাটা, এবং দ্রুত ভিড় বাড়তে লাগল আমাদের বাড়িতে। প্রফুল্লর পিতা যোগেন্দ্রকুমার এলেন। তাঁর পাশে ব'সে দেখলাম নরেন নাগ তাঁর মেরুদণ্ড বরাবর একবার হাত বুলিয়ে বললেন আপনার অসুখ সব লিখুন। যোগেন্দ্রকুমার নিজে ডাক্তার, লিখলেন সব। প্রত্যেকটি মিলে গেল। তিনি আমার চেয়েও সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু তিনিও যখন বিস্মিত হলেন, তখন আমি রীতিমতো ভাবতে শুরু করেছি। এর পর থেকে নরেন নাগ প্রত্যেকের হাত ধ'রে তার মনের কথা এবং যাবতীয় খবর বলতে লাগলেন। ক্রমে আমাদের বাড়ি প্রায় পীঠস্থান হয়ে উঠল।

নরেন নাগের একটি পদ্ধতি কিন্তু আমার কাছে খুব সন্দেহজনক মনে হল। সেটি তাঁর লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি। লিখিত প্রশ্ন ভাঁজ করা অবস্থায় প্রশ্নকারীর হাতের মুঠোয় থাকে, তারপর সেই ভাঁজকরা কাগজখণ্ড নরেন নাগ নিজে চেয়ে নিয়ে তাঁর হাতের মধ্যে রাখেন এবং দু' একটি প্রক্রিয়া করেন, তাতে কোন্ রহস্যজনক উপায়ে প্রশ্নগুলো তাঁর জানা হয়ে যায়। তার উত্তর দেওয়া শেষ হ'লে প্রশ্নকারীর মুঠোর মধ্যে কোনো টাটকা ফুলের টুকরো পাওয়া যায়। এই ফুলের টুকরো মাদুলিতে পুরে ব্যবহার করতে বলা হয়।

কিন্তু এটি যে একটি উচ্চাঙ্গের ম্যাজিক এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ রইল না। সবই ভোজবাজি। কিন্তু অন্যটির কোনো ভৌতিক ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পেলাম না। সেটি সত্যি আমার বুদ্ধির অতীত।

তিন মাইল দূর থেকে শশী মালাকর এলো। এসে ভিড় ঠেলে নরেন নাগের কাছে গিয়ে বলল, "বাবু আমার একটি কথা আছে।" নরেন নাগ বললেন "কি কথা বল।" শশী বলল কথাটা তার বৌ সম্পর্কে। "বৌকে ডাক।" শশী বলল, "বাবু বৌ তো আসেনি।" তখন নরেন নাগ বললেন, "তার ব্যবহারের কোনো জিনিস নিয়ে এসো, শাড়ী আনলেই হবে।"

শশী মালাকর চলে গেল।

ইতিমধ্যে লোকের পর লোক, অবিরাম ধারায় আসছে। দুপুরের খাওয়া শেষ হল তিনটেয়। খেয়ে উঠেও বিরাম নেই। শশী ফিরে এলো বিকেলে। বৌ-এর শাড়ী নিয়ে এসেছে। নরেন নাগ ভাঁজ করা শাড়ীখানা দু'হাতের মুঠোয় চেপে ধরেই বললেন, "তোমার বৌ পাগল।"

ঘটনাটা আমরা জানতাম না। শশী স্বীকার করল, দুর্দান্ত পাগল। তার পর নরেন নাগ পাগল সারার ব্যবস্থাপত্র দিলেন।

কাগজে লেখা প্রশ্নোত্তর চলছিল শুধুই সাক্ষর লোকের সঙ্গে, তাদের সংখ্যার চেয়ে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। সুতরাং হাত ধ'রে অথবা পিঠে হাত বুলিয়েই বলতে হচ্ছিল অধিকাংশ স্থলে। আমি আর সব ভুলে খুব মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলাম কোথায়ও কোনো ফাঁকি আছে কি না। কারো সম্পর্কে কিছু বলা, অতি সাধারণ ভাবে দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় হলে সে রকম গণনাবিদ্যার কোনো দামই নেই। কিন্তু নরেন নাগের এ পদ্ধতিতে কোথায়ও কোনো ত্রুটি খুঁজে পেলাম না। কারণ সবার ক্ষেত্রেই তাদের সব চেয়ে জরুরি কথাগুলোই তিনি বলতে লাগলেন। অনেকেই তা শুনে চমকে যাচ্ছিলেন।

নরেন নাগের চরিত্রের আর একটি দিক আছে। সর্বদা তাঁর সঙ্গে লেগে থেকে সেটি প্রথম দিনই আবিষ্কার করেছিলাম। সেটি হচ্ছে তাঁর ধাপ্পার দিক। অকারণ মিছে কথা বলা। গণৎকার রূপে একটি পয়সা নেওয়া গুরুর নিষেধ আছে, অথচ অন্য ভাবে ধাপ্পা দিয়ে দু আনা এক আনা নেওয়ার মধ্যে আমি কোনো ভুল দেখিনি। ভেবেছি, যে বিদ্যা তিনি জানেন, তাতে তিনি সহজে ধনী হতে পারতেন, কিন্তু তার বিকল্পে এই দু-চার আনার ধাপ্পা নিতান্তই অসঙ্গত।

চন্দনা নদীর পারে বোয়ালিয়া গ্রামের প্রাচীন সাহা পরিবারের ধারণা তাঁদের পূর্বপুরুষ অনেক টাকা মাটিতে পুঁতে রেখে গেছেন কিন্তু প্রকাণ্ড স্থান জুড়ে বাড়ি, তার কোন অংশে তা আছে তা তাঁরা জানেন না। এখন একমাত্র ভরসা নরেন নাগ। একদিন সন্ধ্যায় বেড়িয়ে এসে শুনি আমার মামা বাড়ির বড় একটি ঘরে তাঁরা সব এসে নরেন নাগের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। পরামর্শের বিষয়টিও তখনই শুনলাম।

গুণে বলে দেওয়ার ক্ষমতা যে নরেন নাগের অসাধারণ, এ বিষয়ে আমি প্রায় নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। অতএব কোথায় টাকা পোঁতা আছে সেটি বলা আর এমন কঠিন কি। অর্থাৎ আমার বিচার বুদ্ধির একটি অংশ ইতিমধ্যেই নরেন নাগের ক্ষমতার কাছে পরাজিত হয়েছে।

গুপ্তধনের সন্ধান দেওয়া হচ্ছে শুনেই আমার মনে হল বিনা শর্তে দেওয়া উচিত নয়। প্রাপ্ত টাকার একটি বিশেষ অংশ স্থানীয় স্কুলে দান করলে তবেই সন্ধান দেওয়া হবে, এ রকম একটা শর্ত ক'রে নেওয়া দরকার। কিন্তু এ কথাটা এখন তাঁকে বলি কি উপায়ে। ছুটে গেলাম মামা বাড়িতে। গিয়ে দেখি বিরাট আসর। তার মধ্যে কিছু বলা সম্ভব নয়। তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে বলাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হল। আমি চোখ মুখের ভাব এমন করলাম যেন কিছুই জানি না এখানে কি হচ্ছে, এমনি ভাবে নিতান্ত হাল্কা ভাবে নরেন নাগকে বললাম—"নরেন বাবু, সামান্য একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে একটু উঠবেন?"

নরেন নাগ বললেন—"এখন তো ওটা সম্ভব নয়, দেখছেন তো চেয়ে।" ব'লেই তিনি আমার ডান হাতখানা খপ ক'রে ধ'রে সেকেণ্ড তিনেক কাঁপাতে লাগলেন। তার পর হাত ছেড়ে দিয়ে পেন্সিলের সাহায্যে একটুকরো কাগজে গোপনে আমাকে লিখে জানালেন—"পরিমল বাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি শর্ত না ক'রে এঁদের আগেই কিছু বলব না।"

এই কথাটিই তাঁকে বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার হাতের ভিতর দিয়ে তা তাঁর মনে পৌঁছল কি ক'রে তা আমি জানি না।

একদিকে এই ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে—অন্যদিকের দু এক আনার দাপ্পা, ক্ষমার চোখেই দেখলাম।

আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা বলি। চন্দনা নদীর পারে মোহনপুর গ্রামের গোসেদের বাড়িতে নরেন নাগকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দুপুরে। এদিকে আমাদের বাড়ির জনতা ক্রমে হতাশ হয়ে পড়ছে, তাদের অধৈর্য বাড়ছে, ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে ফিরে আসার কথা, কিন্তু চার ঘণ্টা পার হয়ে গেল।

আমি অগত্যা নিজে গেলাম তাঁকে ধ'রে আনতে। গিয়ে এক রকম জোর ক'রে তাঁকে কেড়ে নিয়ে এলাম অন্দর মহল থেকে। বাইরে আসতেই এক মুসলমান যুবক হন্তদন্ত হয়ে নরেন নাগের গতিরোধ ক'রে দাঁড়াল, বলল, "বাবু আমার কথাটা একটু ব'লে যেতেই হবে।" নরেন নাগ বললেন এখন আর সময় নেই। আমিও তাই বললাম। তখন সে প্রায় কেঁদে ফেলল। নরেন নাগ তার হাতখানা চেপে ধ'রে একটু কাঁপিয়ে বললেন "ও! তোমার বৌ স'রে পড়েছে—এত নিয়ে?" ব'লে দুহাতে একটা পরিমাণ দেখালেন। যুবক বলল "হাঁ বাবু। এখন কি করি?"

নরেন নাগ বললেন "এনায়েৎ"—

যুবক বলল, "হাঁ বাবু, সে শালাও আসত।"

নরেন নাগ যুবককে আশ্বস্ত করলেন, "ভয় নেই, বৌ আবার ফিরে আসবে।"

কোনো দিক দিয়েই ভেবে পেলাম না এটি কি ক'রে সম্ভব। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেছি—বলেন না ঠিক কিছু। কামাখ্যায় শেখা বলেন। কিন্তু যেখানেই শেখা হোক, এ রকম ক্ষমতা মানুষের কি ক'রে লাভ হয় এ এক মস্ত রহস্য, আজও আমি এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না।

কলকাতায় তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল সম্ভবত এর তিন চার বছর পরে। কিরণকুমার ছিল আমার সঙ্গে সেদিন, এসপ্ল্যানেডে ট্রামে উঠতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা। তাঁর ঠিকানা নিলাম। কিরণ ও আমি একদিন গেলাম তাঁর কাছে, চিৎপুর রোডের কাছে কোনো ঠিকানায়। দেখা হল, কিরণের হাত ধ'রে তার বিষয়ে কিছু বলতে যেতেই গলা থেকে অনেকখানি রক্ত বমন করলেন মেঝের উপর। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল না। বললেন ওটি তাঁর সাধনার ফলে ঘটেছে। কি সাধনার ফলে জানি না। ঘরে দারিদ্র্যের চিহ্ন, অপরিচ্ছন্ন চারদিক। কিন্তু এ রক্ত কিসের রক্ত? পেটের না ফুসফুসের? —একটু ভীত ভাবে উঠে এলাম; নরেন নাগের সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

নরেন নাগের ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত হওয়াতে আমার একটা লাভ হয়েছিল। আগে যে সব জিনিস হয় না ধারণা ছিল, এবং তা জোরের সঙ্গে প্রকাশ করতাম, এর পর থেকে সে জোর কমে গেল। শুধু এ বিষয়ে নয়, সব বিষয়ে। আমি যা সত্য ব'লে জানি, তার বাইরে সত্য থাকতেও পারে এমনি একটা মনোভাব গড়ে উঠল ক্রমে। অর্থাৎ মনের এক গোঁড়ামি থেকে আর এক গোঁড়ামিতে যাওয়াই হচ্ছে মনের স্বভাব। এর মাঝামাঝি আরও একটি পথ আছে ব'লে ক্রমে বিশ্বাস হল—এবং সে পথই নিরাপদ এটিও বুঝলাম। তাই আজও এটা হয় না, বা ওটা অসম্ভব, এমন কথা বলতে আটকায়। বলি হতেও পারে, জানি না, তবে আমার নিজের এই বিশ্বাস, বা আমি নিজে এর বেশি ভাবতেও পারি না।

আমার অবিলম্বে আর কিছু কর্তব্য নেই, শুধু বাড়িতে বসে আছি এটি আমার কাছে অত্যন্ত অস্বস্তিকর বোধ হচ্ছিল। পড়াশোনার পথে চলব না মনে মনে স্থির করেছিলাম, কিন্তু তা না করলে ব্যবসা করা উচিত। সে সময় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ মনে মনে খুব বড় হয়ে উঠেছিল। চাকরি করব না, ব্যবসা করব। কিন্তু কিসের? সেইটি ঠিক হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত। মাসের পর মাস যায় বিষয় নির্বাচন হয় না।

বাবা ইতিপূর্বে আমার চলার পথে কখনো বাধা দেননি, এইবার তাঁর ইচ্ছাটা প্রকাশ করতে বাধ্য হলেন। তিনি বললেন কিছু না ভেবে আগে এম-এ ডিগ্রীটা নাও, তারপর যা হয় ভেবো।

পড়াশোনার বিরুদ্ধে মনটা প্রায় স্থির করেই ফেলেছি, এমন সময় এ প্রস্তাবটা হঠাৎ খারাপ লাগল। মনে মনে ডিগ্রীর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি খাড়া করেছি। আমার আদর্শ প্রফুল্লচন্দ্র, আমি বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার হতে দেব না এই পণ। তাই বললাম, এম-এ পাস ক'রে লাভ কি? আমি ব্যবসা করব। প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শের কথাটাও প্রকাশ করলাম। বাবা বললেন, প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং অনেকগুলো ডিগ্রীর অধিকারী, তাই ডিগ্রীর মোহ তাঁর নেই, তুমিও এম-এ পাস কর, তারপর যা হয় ক'রো, ডিগ্রীর বিরুদ্ধে তোমার যুক্তি তখন শোনা যাবে।

শান্তিনিকেতনে শরতের ছুটির গানের কবি রবীন্দ্রনাথ

প্রফুল্লচন্দ্র যে নিজে ভাল ভাল ডিগ্রীর অধিকারী হয়ে তবে ডিগ্রীর বিরুদ্ধে বাঙালী যুবকদের মন ভাঙাচ্ছেন এ সত্যটি হঠাৎ চমক লাগাল। এ রকম যুক্তি মনে আসেনি। এ পথে ভাবতে গিয়ে অনেক দূর চলে এলাম। যে ব্যক্তি ডিগ্রীধারী, ডিগ্রীর বিরুদ্ধে বলার অধিকার তাঁর থাকবে না তো কার থাকবে? যিনি মদ্যপান করেন, মদের বিরুদ্ধে তাঁর কথাই গ্রাহ্য, যিনি চা পান করেন, চা পান না বিষ পান বলার অধিকার তাঁরই। অতএব এম-এ ডিগ্রী খারাপ কি না, এম-এ পাস না ক'রে আমি বুঝব কি ক'রে। রাজি হয়ে গেলাম বাবার প্রস্তাবে। তা ভিন্ন বাবার ইচ্ছা এই প্রথম পালন করব ভেবে মন প্রসন্ন হল।

অর্থাৎ এম-এ ক্লাসেই আবার ভর্তি হব। ইংরেজী বই অধিকাংশই কেনা ছিল, অতএব ইংরেজীতে ভর্তি হওয়াই মোটামুটি ঠিক করলাম। কিন্তু নতুন ক'রেই যখন পড়তে হবে তখন নতুন কোনো বিষয়ে নিলে কেমন হয় এ প্রশ্নও জাগল মনে। নানা বিষয়ে আকর্ষণ অনুভব করি মনে মনে। যে জিনিস বাড়ি ব'সে নিজে নিজে পড়া অসুবিধাজনক, এ রকম একটি বিষয় পড়ার কথাও ভাবলাম। মনশ্চক্ষে প্রথম ভেসে উঠল অ্যানথ্রোপোলজি। বিষয়টি নতুন, এবং আমার কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক বোধ হল এবং দু'-তিন দিন নানা ভাবে চিন্তা ক'রে শেষ পর্যন্ত এই বিষয়টিই পড়ব ঠিক ক'রে ফেললাম। ইংরেজী যেটুকু পড়েছি তাতে ঘরে ব'সে বাকী বই নিশ্চয় পড়তে পারব কিন্তু কোনো বিজ্ঞানের সকল অঙ্গ নিজে নিজে পড়ার অসুবিধে। অতএব অ্যানথ্রোপোলজি।

টাকা নিয়ে চলে এলাম কলকাতায়, পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হব—সুদীর্ঘ আড়াই বছর পরে।

সব ঠিক, এমন সময় যাকে বলে 'ম্যান প্রপোজেস, গড ডিস্পোজেস'—মানুষ যা আয়োজন করে, ঈশ্বর তা ভেঙে দেন, তাই

এম্পায়ার থিয়েটারে বিসর্জন অভিনয়ে জয়সিংহ ও অপর্ণা

ঘটল। মালদহের ঈশ্বরলাল কুণ্ডু ছিল আমার পূর্ব সহপাঠী, তার সঙ্গে দেখা হতেই সে ধ'রে বসল, ভর্তি হয়ে টাকা ও সময় নষ্ট করার দরকার নেই। তিন মাস পরে পরীক্ষা, বি-এ পাসের পর তিন বছর হয়ে গেল, অতএব নন্-কলিজিয়েট হয়ে পরীক্ষা দেওয়ায় বাধা নেই।

ঈশ্বরলাল উকিল হওয়ার জন্য আইন পড়ছিল, তার ঐ সঙ্গে একটি এম-এ ডিগ্রীর দরকার ছিল। সেজন্য সে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম-এ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আমারও ডিগ্রী নেবারই প্রয়োজন ছিল কিন্তু তবু আমি এ প্রস্তাবে স্তম্ভিত হয়ে বললাম—সে একেবারে অসম্ভব, আমি অ্যানথ্রোপোলজির জন্য তৈরি হয়ে এসেছি। ঈশ্বরলাল বলল, সে খুব ভাল কথা, সেজন্য আগামী বছর ভর্তি হলেও চলবে, আগে বিনা খরচে বাংলায় পাস ক'রে নাও, বই সব আমার, একসঙ্গে পড়া যাবে।

ঈশ্বর স্যাটানের ভূমিকায় নেমে আমাকে ক্রমাগত বোঝাতে লাগল, তার নিজের একবেলার পড়া নষ্ট ক'রে। এবং শেষ পর্যন্ত ভজিয়ে ফেলল। মাত্র তিন মাস সময় এবং বাংলার সঙ্গে অতিরিক্ত তিনটি ভাষা নতুন ক'রে শিখতে হবে! কিন্তু এ বিষয়ে সে আমাকে কিছু ভাবতেই দিল না আর। সে থাকত বিদ্যাসাগর হস্টেলে সম্ভবতঃ তখন প্রিফেক্ট রূপে বাস করত, ঠিক মনে নেই। কিন্তু আমি কোথায় থাকব সে হল এক সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে কোনো পি-জি হস্টেলে থাকা চলত হয় তো, কিন্তু এ অবস্থায় কি করা যায়। বিদ্যাসাগর হস্টেলে ঈশ্বরলালের গেস্ট হয়ে থাকা তখন চলল না, সীট খালি ছিল না। দিনের বেলা হস্টেলে কাটানো যায়, কিন্তু রাত্রি বাস তখন স্থানাভাবে সম্ভব ছিল না।

তখন মনে পড়ল হরেন্দ্রকুমারের কথা। সে এতদিনে রবীন্দ্রনাথের কাজে এসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে সে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে থেকে তাঁর বাজারের কাজ করে। তার কাছে গিয়েছি দু-একবার, সে বলল এখানে যথেষ্ট জায়গা আছে তুমি থাকতে পার। রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করতেই তিনি সহজে সম্মতি দিলেন। ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের ঠিকানা—বিশ্ববিখ্যাত ঠিকানা। সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেই বাঁয়ের দিকের ঘর। বড় ইজি-চেয়ার ছিল একখানা সে ঘরে। সেইখানায় আমি ঘুমোতাম। খাটে থাকত হরেন্দ্রকুমার।

দিনের বেলা হস্টেলে গিয়ে পড়তাম, রাত্রে ফিরে শুধু ঘুমনো নয়, পড়তেও হ'ত কিছু, যতটা পারা যায়। ক্রমে পড়া ভাল লাগতে লাগল। পাঠ্য বইয়ের অনেকগুলির ইতিহাস মূল্য হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলাম। এত অল্প সময়ে তিনটি নতুন ভাষাসহ এতগুলো বই প'ড়ে আটটি পেপারে পরীক্ষা দিতে হবে, সেজন্য মনোযোগকে চাবুক মেরে, চোখের-পাশ-ঢাকা গাড়িটানা ঘোড়ার মতো narrow angle ক'রে নিলাম—মনের দৃষ্টি যাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হয়।

এই বাড়িতেই কিছুদিনের মধ্যে এম্পায়ারে অভিনীত বিসর্জন নাটকের রিহার্সাল শুরু হল। অভিনয় হয়েছিল অগস্টের (১৯২৩) কোনো তারিখে। রিহার্সাল চলত আমার মাথার উপরে কোনো ঘরে। দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে বিকেলে হস্টেলে যেতাম, সব দিন যাওয়া ঘটত না। রিহার্সালের আড়ম্বরের মধ্যেও মনোযোগ খুব বেশি বিক্ষিপ্ত হয়নি, কেননা ততদিনে পড়ায় সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছি। মাঝে মাঝে মানসিক ক্ষণ বিরামের

মুহূর্তে,—এবং যখন রিহার্সালের সম্মিলিত ধ্বনি আর শোনা যায় না,—তখন কবিকণ্ঠের একছত্র দুছত্র গানের সুর ভাঁজা প্রায় শুনতে পেতাম। এই ভাবে তিনি মনে আসা সুরের আভাসকে রূপায়িত করতেন এবং তার সঙ্গে কথা জুড়ে গান রচনা করতেন। এক একটা সুর গাইছেন, পছন্দ হচ্ছে না, আবার কিছু বদলিয়ে গাইছেন। এইভাবে চলত সর্বক্ষণ। মাঝে মাঝে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিতেন, তার আওয়াজও খুব জোর ছিল।

ক্রমে বিসর্জনের অভিনয় এবং আমার পরীক্ষা, দুই-ই আসন্ন হয়ে এলো। ভীষণ লোভ অভিনয় দেখব, অথচ তখন নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। দেখব না-ই ঠিক করলাম। মনকে যাকে বলে একেবারে বেঁধে ফেলা, তাই করলাম।

তারপর অভিনয়ের দিন এলো, বিকেলে সবাই এম্পায়ার থিয়েটারের উদ্দেশে বেরিয়ে যাচ্ছেন—সবই লক্ষ্য করছি। ঠিক এমনি সময় পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভূমিকম্পে টলতে লাগল। আবার প্রশ্ন জাগল দেখব কি দেখব না। না দেখলে মস্ত বড় একটা অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হব, দেখলে কম করেও দিন সাতেক লাগবে এর প্রভাব কাটাতে। নাটকখানি ভাল ভাবে পড়া ছিল, তাই জানতাম তার অভিনয়রূপ আমাকে কি ভাবে বিচলিত করবে। তাই ভয়।

কলকাতার থিয়েটার দেখছি প্রথম আসবার পর থেকেই। ১৯১২ কিংবা ১৩ থেকে। বাল্যকালে প্রথম বলিদান নাটক দেখেছি বেশ মনে আছে। দানীবাবু দুলালচাঁদ সেজেছিলেন। গিরিশ ঘোষের অভিনয় আমি দেখিনি। ছাত্রাবস্থায় কোনো অভিনয়ই বাদ যায়নি। নিয়মিত সিনেমা দেখেছি ১৯২২ থেকে।

বলা চলে, অভিনয় দেখার ঝোঁকটা একটু বেশি মাত্রাতেই ছিল। তাই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা আর হল না। সবাই চলে যাওয়ার পর কবি যখন গাড়িতে উঠে পড়েছেন তখন হঠাৎ মনে হল না দেখলে অনুতাপের আর অন্ত থাকবে না। দিশাহারা হয়ে কবিকেই অর্বাচীনের মতো জিজ্ঞাসা ক'রে বসলাম এখন টিকিট পাওয়া যাবে কি না। তিনি বললেন আমি তো ঠিক বলতে পারব না, তুমি চলে যাও থিয়েটারে, সেখানে গিয়ে, খোঁজ কর। আমি তখন বিভ্রান্ত। প্রতিজ্ঞা হঠাৎ ভেঙে যাওয়ার আনন্দের প্রথম ইন্‌সপিরেশনেই নির্বুদ্ধিতার প্রকাশ।

কালবিলম্ব না ক'রে ছুটে গেলাম এম্পায়ার থিয়েটারে এবং বিসর্জন দেখলাম। যা ভয় করেছিলাম তাই হল। এমন শ্রদ্ধা এবং তৃপ্তি নিয়ে অভিনয় আমি কমই দেখেছি। যা পাব আশা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি পেলাম। সবটা অভিনয় আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের জয়সিংহ আর দিনেন্দ্রনাথের রঘুপতি। তার উপর সাহানা দেবীর অতগুলি গান—এম-এ পাঠ্যপুস্তকগুলিকে লজ্জায় সঙ্কুচিত করল।

রাজসিংহ বেশী রবীন্দ্রনাথকে দেখে যৌবনের রবীন্দ্রনাথকে ..না করছিলাম। অপর্ণার সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের সময়ে জয়সিংহের উক্তি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির ভিতর দিয়ে তা দীর্ঘ মনে হয়নি। শেষ দৃশ্য রোমাঞ্চকর। বিচলিত হয়েছিলাম। সে বয়সে অনেক কিছুতেই বিচলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম।

নির্দিষ্ট কয়েক মাসের বিরামহীন পড়ায় এই একটি ছেদ পড়ল, এবং তা ছাড়াও এক বন্ধুর বিয়েতে দেশে যেতে হয়েছিল। ফলে পড়া আরম্ভ করতে হল আবার নতুন উদ্যমে। দিনে রাতে মোট প্রায় ১৬ ঘণ্টা।

এরই মধ্যে একটি পিতৃ আজ্ঞা পালন করতে হল। বাবা পারসিক ভাষা শেখার পর সাদির পন্দনামা ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন। তিনি পাণ্ডুলিপিখানা আমার কাছে পাঠিয়ে লিখেছিলেন, তাঁর কথা যেন 'রবিবাবু'কে স্মরণ করিয়ে দিই এবং তাঁর এই নতুন উদ্যমের কথা তাঁকে বলি।

একদিন সুযোগ পেলাম দেখা করার। দোতলায় তিনি তখন একা ছিলেন। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন বাবার সম্পর্কে। আগেই বলেছি বাবা পোতাজিয়া স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন—এবং পোতাজিয়া ছিল সাহজাদপুর থানায়। এই সাহজাদপুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা নতুন ক'রে বলবার দরকার নেই। এই অঞ্চলের ভূগোল সম্পর্কে তিনি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন। হুড়োসাগর নদীর অবস্থা এখন কেমন, বর্ষায় কেমন সব ডুবে যায়, এ সব বেশ কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করছিলেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তাঁর জীবনের অনেকখানি অংশ এই স্থানের সঙ্গে বাঁধা আছে, তাই এই কৌতূহল। আমার পিতার কথা বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন, এবং তিনি সে দিন তাঁকে শান্তিনিকেতনে ইংরেজী পড়াবার ভার দিতে চেয়েছিলেন সে প্রসঙ্গ আমি গত মাঘ মাসের কিস্তিতে উল্লেখ করেছি।

পন্দনামা বইয়ের বাংলায় কি নাম দেওয়া যায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি পাণ্ডুলিপির কয়েকখানা পাতা উল্টে-উল্টে দেখে নিলেন একটুখানি, এবং বললেন, একে নীতিপত্র বলতে পার। বই ছাপা হয়েছিল ১৯২৫ সালে। ঐ নামই রাখা হয়েছিল।

এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়ার ধরন সম্পর্কে কথা উঠল। কি কি বই পড়া হয় এবং কেমন ভাবে হয়, তাও তিনি একে একে জেনে নিলেন। তিনি একখানি বিশেষ বইয়ের কথা শুনে এমন বিচলিত হয়ে উঠলেন যে আমার নিজেকে সে সময় অত্যন্ত অপরাধী মনে হতে লাগল। তিনি দুবার জিজ্ঞাসা করলেন—এ বই এম-এ তে পড়ানো হয়?—মনে হল যেন বলতে বলতে মুখচোখ একটু লাল হয়ে উঠল, (ক্রোধে কিংবা লজ্জায়, জানি না) তবে তখনই সামলে নিলেন এবং আগের মতোই শান্তভাবে বলতে লাগলেন, স্কুলের পরীক্ষার সঙ্গে তোমাদের এম-এ পরীক্ষার কোনোই পার্থক্য নেই। নোট মুখস্থ ক'রে এম-এ পাস করা যায় শুনে অবাক হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একদিন অন্য এক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে একই রকম বিচলিত হতে দেখেছি মনে পড়ল। সেটি ১৯৩৭ সালে

দক্ষিণ থেকে দ্বিতীয় সারিতে ইণ্ডিয়ান ভার্নাকুলার পরীক্ষার্থীবৃন্দ

চন্দননগরে কবির হাউস বোটের মধ্যে। শ্রীঅমল হোম আর আমি সেখানে ছিলাম, অন্য কেউ তখনও এসে পৌঁছন নি। কোনো একটি বিশেষ রচনা সম্পর্কে তিনি সে সময় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। সাহিত্যিক শান্তিভঙ্গ হবে আশঙ্কায় কোনোটিরই নাম প্রকাশ করা গেল না।

অবশেষে এম-এ পরীক্ষা এসে পড়ল। কয়েকদিনের জন্য বিদ্যাসাগর হস্টেলে একটি সীট সংগ্রহ করা গেল। তাতে বেশ সুবিধে হল। হস্টেলে আসার সময়টুকু বেঁচে গেল।

আমাদের সময়ে বাংলা পরীক্ষার যে আটটি পেপার ছিল সেই আটটি পেপারের প্রত্যেকটিই ইংরেজীতে লেখা চলত খুশি মতো। বাংলাতে লিখতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। আমি সাতটি পেপার ইংরেজীতে লিখেছিলাম। বাংলায় পরীক্ষার্থী খুব বেশি ছিল না। সিনেট হলে প্রথম যিনি বসেছেন, আর সবাই তাঁর পর পর পিছনে। সম্ভবত ইণ্ডিয়ান ভার্নাকুলার সব এক সঙ্গে। আমাদের বাঁ পাশে ইংরেজী পরীক্ষার্থীরাও ঠিক ঐ ভাবে। একে বলা হয় single file বা Indian file। পরীক্ষা-গৃহে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে আমাদের পাশ দিয়ে কয়েক দিন যেতে দেখেছি।

আমাদের ফাইলের অগ্রভাগে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আমি—একজন বাদে সর্বশেষ। অর্থাৎ আমার পিছনে মাত্র একজন, কিন্তু আমার সম্মুখের সীটটি শূন্য, পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত। ফিসফাস চলেছিল মন্দ নয়, কিন্তু আমার কোনোই উপায় ছিল না, আমার সমুখস্থ আসন শূন্য। পিছনে যিনি ছিলেন তিনি নির্বিকার। বরঞ্চ তিনি কিছু অসুবিধের সৃষ্টি করেছিলেন অন্যভাবে। আমার বাঁ পাশের ইংরেজীর ছেলেরা কেউ কেউ চাপা গলায় আমার কাছে দু একটা শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছেন। কিন্তু সব চেয়ে অসুবিধে ঘটাতে লাগলেন আমার পিছনের পরীক্ষার্থী। তিনি মিনিট পনেরো লিখেই গুন্ গুন্ ক'রে সুর ভাঁজতে লাগলেন প্রত্যহ। তিন দিন সহ্য ক'রে চতুর্থ দিন তাঁকে বললাম, আপনি তো মশায় খুব ক্ষমতাবান পুরুষ, গান গাইতে গাইতে লিখতে পারেন।

তিনি বললেন, আমি তো লিখি না।

সে কেমন কথা?

বললেন, আমি ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষার্থী, কিন্তু আমার লেখবার কিছুই নেই।

কেন?

পড়াশোনা আদৌ করি নি, ক্লাসে একমাত্র পরীক্ষার্থী আমি। অধ্যাপকের অনুরোধে পরীক্ষা দিচ্ছি।

অতঃপর তিনি যা বললেন, তা তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক এবং তাঁর অধ্যাপকের পক্ষে করুণ। সে কথা প্রকাশ ক'রে বলবার নয়।

[ক্রমশঃ।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ

সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্যন্ত যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ, তথা হইতে এক অপূর্ববাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। জ্ঞান ভক্তি কর্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতি শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর, ততই যেন উহা গভীরতর হইতেছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থিমাংসে পর্যন্ত প্রাণসঞ্চার করিতেছে—নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে, আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে ইঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না, কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ
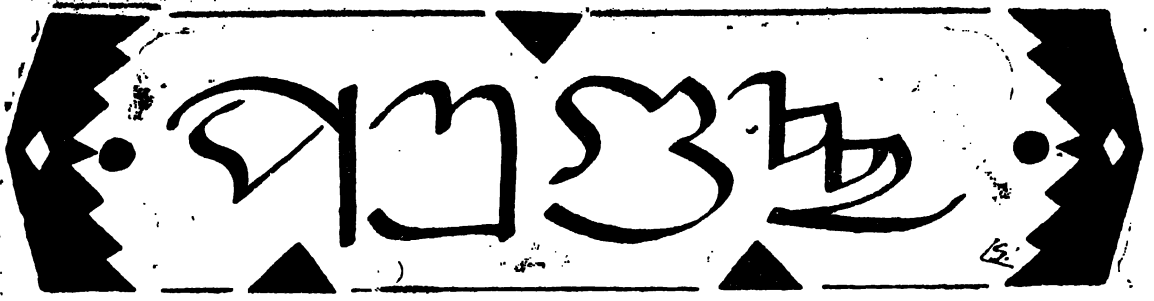
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

১৩

৩ জুলাই ১৯০১ ওঁ

বন্ধু

আমার কন্যার প্রতি তোমার আশীর্ব্বাদসহ সুন্দর উপহারখানি পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। তোমার হস্তাক্ষরসহ এই গ্রন্থখানি বেলা উপযুক্ত আদর করিয়া পড়িবে ও রাখিবে সন্দেহ নাই। আমার জামাতাটি মনের মত হইয়াছে। সাধারণ বাঙালির ছেলের মত নয়। ঋজুস্বভাব, বিনয়ী অথচ দৃঢ়চরিত্র, পড়াশুনা ও বুদ্ধিচর্চ্চায় অসামান্যতা আছে—আর একটি মহদ্‌গুণ এই দেখিলাম, বেলাকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। এইবার শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া গিয়া বেলাকে মজঃফরপুরে তাহার স্বামিগৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।

লোকেন বিলাতে গিয়া এমনি মাতিয়া আছে যে, আমাকে কিম্বা বেলাকে একটা ছত্র চিঠিও লিখিল না। তোমার সঙ্গে কি তাহার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া থাকে?

আমি সাহসে ভর করিয়া ইলেক্‌ট্রিশ্যান প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রাবণের বঙ্গদর্শনের জন্য তোমার নব আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। প্রথমে জগদানন্দকে লিখিতে দিয়াছিলাম—পছন্দ না হওয়াতে নিজেই লিখিলাম। ভুলচুক থাকার সম্ভাবনা আছে—দেখিয়া তুমি মনে মনে হাসিবে।

আষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে যেটুকু আভাস দিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় বৈজ্ঞানিক হিসাবে যথাযথ হয় নাই—তখন ইলেক্‌ট্রিশ্যান্ দেখিতে পাই নাই।

তুমি আরো কিছুকাল বিলাতে থাকিয়া যাইবার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছ খবর দিলে না কেন? আমি সেকথা জানিতে উৎসুক হইয়া আছি। অন্যান্য সভায় তোমার মত প্রচার কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাও জানিবার জন্য আমাদের মন উৎকণ্ঠিত। জর্ম্মানি ও আমেরিকায় যাইবার কোন প্রকার সুযোগ করিতে পারিবে না কি? তুমি যদি দীর্ঘকাল য়ুরোপে থাক তবে যেমন করিয়া হৌক একবার সেখানে গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। খুব বর্ষা পড়িয়াছে। তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১৪

২৫ জুলাই [১৯০১] ওঁ

বন্ধু,

তোমার কর্ম্ম কেন সম্পূর্ণ সফল না হইবে? বাধা যতই গুরুতর হউক তুমি যে-ভার গ্রহণ করিয়াছ তাহা সমাধা না করিয়া তোমার নিষ্কৃতি নাই; সেজন্য যে কোন প্রকার ত্যাগ-স্বীকার প্রয়োজন তাহা তোমাকে করিতে হইবে। এ কথা তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও অসঙ্কোচে বলিতে পারিতাম না। বলিতে পারিতাম না যে, দারিদ্র্য, অর্থ-সঙ্কট সাংসারিক অবনতি গ্রহণ কর। আমি নিজে হইলে হয়ত পারিতাম না—কিন্তু তোমাকে আমি নিজের চেয়ে বড় দেখি বলিয়াই তোমার কাছে দাবীর সীমা নাই। তুমি যাহা আবিষ্কার করিতেছ ও করিবে তাহাতে জগতের যে-শিক্ষা লাভ হইবে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে যে-দুঃখভার গ্রহণ করিবে তাহাতে তাহার চেয়ে কম শিক্ষা দিবে না। আমাদের মত বিষয়পরায়ণ সাবধানী, নিষ্ঠাবিহীন, ক্ষুদ্র লোকদের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত, এই শিক্ষা একান্তই আবশ্যক হইয়াছে।·····তুমি যদি ফার্লো না পাও তবে একবার এখানে আসিও। যথাসাধ্য ভাল বন্দোবস্ত করিয়া একেবারে যাত্রা করিয়া রণক্ষেত্রে বাহির হইবে। ইহা ছাড়া আর কি পরামর্শ দিতে পারি? একবার দেখা পাইলে বড় আনন্দিত হইব—না যদি পাই, তবু, তুমি তোমার কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছ এই খবর পাইলে আর কিছুই চাই না। তোমার উপরে আমার একান্ত নির্ভর আছে—বর্ত্তমান য়ুরোপ তোমাকে গ্রহণ করিল কি না তাহা লইয়া আমি অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইতেছি না—তুমি যাহা দেখিতে পাইয়াছ তাহা বৈজ্ঞানিক মায়া-মরীচিকা নহে তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র, দ্বিধামাত্র নাই। তোমার উদ্ভাবিত সত্য একদিন বৈজ্ঞানিক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবে—সেদিনের জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে পারিব।

ইতিমধ্যে তুমি একবার জার্ম্মাণি বা আমেরিকায় যাইতে পারিলে বেশ হইত। এবারে না হয় আর একবার চেষ্টা দেখিতে হইবে।

কন্যাকে ইতিমধ্যে স্বামিগৃহে রাখিয়া আসিলাম। পথের মধ্যে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া আরাম লাভ করিয়াছি। সেখানে একটা নির্জ্জন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি। দুই একজন ত্যাগ-স্বীকারী ব্রহ্মচারী অধ্যাপকের সন্ধানে ফিরিতেছি।

তোমার রবি

১৫

(অগষ্ট ১৯০১) ওঁ

বন্ধু,

আজ রমেশবাবুর চিঠি পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। তোমার প্রতি, সুতরাং স্বদেশের প্রতি, তাঁহার সহৃদয় অনুরাগে

আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। আমার সেই এক কথা। বিলাতে থাকিয়া তোমাকে স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম সমাধা করিতে হইবে। একবার কেবল দুই তিন মাসের জন্য দেশে ফিরিয়া এসো—তোমার সঙ্গে একবার সকল কথা পরিষ্কাররূপে আলোচনা করিয়া লইতে চাই।

তোমার স্পন্দন-রেখার খাতাখানি পাইয়া অনেকটা পরিষ্কার ধারণা হইল। বঙ্গদর্শনে এইগুলি খোদাইয়া ছাপাইবার ইচ্ছা আছে।

তোমার সঙ্গে শীঘ্র দেখা হইবার সম্ভাবনার কল্পনা করিয়া আগ্রহান্বিত হইয়া আছি। তোমার রবি

১৬

[অগষ্ট ১৯০১]

বন্ধু,

তোমার ছবি আজ পাইয়া বড় খুসী হইলাম। ভারি সুন্দর ছবি হইয়াছে—এ ছবি আমার লিখিবার ঘর বিভূষিত করিয়া থাকিবে। কিছু দিন পূর্ব্বে সাহিত্যে তোমার ছবি ছাপিবার জন্য সমাজপতি তোমার ফোটো চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। আমাদের শিলাইদহের গ্রুপ ছাড়া তোমার ছবি আমার কাছে ছিল না। সেটা তেমন ভাল না, কিন্তু অগত্যা সেইটেই সমাজপতিকে দিতে হইয়াছে। তোমার এ ছবিখানি চাহিলেও আমি দিতাম না—কারণ, চুরি করিতে অনেক ভদ্রলোক সঙ্কোচ বোধ করেন বটে, কিন্তু জিনিষ ধার লইয়া ফিরাইয়া না দেওয়াকে তাঁহারা অপহরণের নামান্তর বলিয়া জানেন না। তোমার প্রেরিত আশা ছবিখানিও ভাবে পূর্ণ। ভারতবর্ষীয় আশার সপ্ততন্ত্রী বীণার মধ্যে কোন্ তারটা অবশিষ্ট আছে? ধর্ম্ম, না, কর্ম্ম; ধ্যান, না, জ্ঞান; বিদ্যা, না, উদ্যম?

শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ-বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নামগন্ধ থাকিবে না—ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোন মতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। স্বার্থ-চেষ্টা এবং আড়ম্বর হইতে কোন মহৎ কার্য্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারও মুখরোচক হয় না। এতদিনকার ইংরেজি বিদ্যায় আমাদের কাহাকেও যথার্থ কর্ম্মযোগী করিতে পারিল না কেন? মহারাষ্ট্র দেশে ত তিলক ও পরঞ্জপে আছে, আমাদের এখানে সে-রকম ত্যাগী অথচ কর্ম্মী নাই কেন? ছেলেবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছে—দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্যে আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে। তুমি যদি ইতিমধ্যে একবার এখানে আসে তবে তোমাকে লইয়া আমার এই কাজটি পত্তন করিতে হইবে।

বিংশ শতাব্দীতে নৈবেদ্যের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে তোমাকে পাঠাই। নৈবেদ্যকে আমি আমার অন্যান্য বইয়ের মত দেখি না। লোকে যদি বলে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না বা ভাল হয় নাই তবে তাহাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করে না। নৈবেদ্য যাঁহাকে দিয়াছি তিনি যদি উহাকে সার্থক করেন তবে করিবেন—আমি উহা হইতে লোকস্তুতি বা লোকনিন্দার কোন দাবীই রাখি না।

সেদিন সরস্বতী নামক এক হিন্দি কাগজে দেখিলাম, আমার "মুক্তির উপায়" নামক ছোট গল্পটি তর্জ্জমা করিয়াছে। হিন্দিতে পড়িতে বেশ লাগিল—রস কিছুই নষ্ট হয় নাই।

একটা খবর তোমাদের দেওয়া হয় নাই। হঠাৎ আমার মধ্যমা কন্যা রেণুকার বিবাহ হইয়া গেছে। একটি ডাক্তার বলিল, বিবাহ করিব—আমি বলিলাম, কর। যেদিন কথা, তার তিন দিন পরেই বিবাহ সমাধা হইয়া গেল। এখন ছেলেটি তাহার অ্যালোপ্যাথি ডিগ্রীর উপর হোমিওপ্যাথিক চূড়া চড়াইবার জন্য অ্যামেরিকা রওনা হইতেছে। বেশী দিন সেখানে থাকিতে হইবে না। ছেলেটি ভাল, বিনয়ী, কৃতী।

ভয় নাই—তোমার বন্ধুটিকে তোমার প্রতীক্ষায় রাখিব। ফস্ করিয়া তাহাকে হস্তান্তর করিব না।

তোমার রবি

১৭

[সেপ্টেম্বর ১৯০১]

বন্ধু,

আজ মিস্ নোবলের চিঠিতে তোমার কথা পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি। আমরা এখন বোলপুরে শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছি। তুমি এখানে কখনো আস নাই। জায়গাটি বড় রমণীয়। আলোকে আকাশে বাতাসে আনন্দে শান্তিতে যেন পরিপূর্ণ। এখানকার আকাশে চলিবার-ফিরিবার সময় নিয়ত যেন একটি মঙ্গলের স্পর্শ অনুভব করি। এখানে জীবন বহন করা নিতান্তই সহজ ও সরল। কলিকাতার আবর্ত্তের মধ্যে আমার আর কিছুতেই ফিরিতে ইচ্ছা করে না। এখানে নিভৃতে, নির্জ্জনে, ধ্যানে ও প্রেমে নিজের জীবনকে ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এখানে একটি বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষ মাস হইতে খোলা হইবে। গুটিদশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্ম্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।

ত্রিপুরার মহারাজ কাল আমার কাছে একটি কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছেন। তোমার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আর দিন দশ-বারো পরে ত্রিপুরায় গিয়া মহারাজের সঙ্গে দেখা করিব। তোমার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাগুণে মহারাজ আমার হৃদয় দ্বিগুণ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রেণীর লোকের পক্ষে এরূপ বিনীত গুণগ্রাহিতা অত্যন্ত বিরল।

এখন ত তুমি প্রবাসেই থাকিয়া গেলে। দীর্ঘকাল তোমার বিচ্ছেদ বহন করিতে হইবে। বিলাতে যাইবার লোভ এখন আমার মনে নাই—কিন্তু একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিবার জন্য মন প্রায়ই ব্যগ্র হয়। তোমার সার্কুলার রোডের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি এবং নীচের তলায় মাছের ঝোলের আস্বাদন সর্ব্বদাই মনে পড়ে। এখন যদি ভারতবর্ষে থাকিতে তবে কিছু দিনের জন্যে তোমাকে শান্তিনিকেতনে রাখিয়া নিবিড় আনন্দ লাভ করিতাম। যদি কোন সুযোগ পাই একবার তুমি থাকিতে থাকিতে ইংলণ্ডে যাইবার চেষ্টা করিব। তোমার বন্ধুত্ব যে আমাকে এমন প্রবল ও গভীরভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা এক বৎসর পূর্ব্বে জানিতাম না। তোমার রবি

১৮

[অক্টোবর বা নভেম্বর] ১৯০১ আগরতলা

ওঁ কার্ত্তিক ১৩০৮

বন্ধু,

আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অতিথি হইয়া কয়েক দিন আছি। তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা ত জানই—সুতরাং তাঁহার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই বোধ হয় দুই-এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ করি তুমি বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে আপাতত উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। প্রাসাদ নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহু ব্যয়সাধ্য কার্য্যে সম্প্রতি মহারাজ জড়িত আছেন নতুবা তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারিতেন। তাঁহার এই উৎসাহে তিনি আমার হৃদয় আরো দৃঢ়তররূপে আকর্ষণ করিয়াছেন—স্বাভাবিক ঔদার্য্যের এমন উজ্জ্বল আদর্শ আমি আর দেখি নাই। তুমি অবসাদ হইতে নিজেকে রক্ষা কর। ফললাভ করিতে তোমার যতই বিলম্ব হউক আমাদের শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক প্রীতি সর্ব্বদাই ধৈর্য্য-সহকারে তোমার পার্শ্বচর হইয়া থাকিবে। তোমাকে আমরা লেশমাত্র তাড়া দিতেছি না; যাহাতে কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিবার জন্য তুমি যথোচিত বিলম্ব করিতে পার আমরা তাহারই সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি—আমাদের প্রতি সেই আস্থা তুমি দৃঢ় রাখিও। তোমার কাছে আমরা আরো কত দাবী করিব? তুমি যাহা করিয়াছ তাহার জন্যই যদি আমরা কৃতজ্ঞ না হইতে পারি তবে আমাদিগকে ধিক্। তুমি যাহা করিয়াছ আমরা তাহার উপযুক্ত প্রতিদান কিছুই দিতে পারি না। আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহা কতটুকু এবং তাহার মূল্যই বা কি? এইটুকু দিয়া তোমার উপরে দাবী চালাইতে পারি না। তোমাকে হৃদয়ের গভীর প্রীতি ছাড়া আর কিছুই দিই নাই জানিবে, সে প্রীতি ধৈর্য্য ধরিতে জানে এবং প্রীতি ছাড়া কিছুই ফিরিয়া চাহে না। মহারাজের সম্বন্ধে এটুকু নিশ্চয় জানিও তিনি তোমাকে ঋণী করিবার জন্য অর্থসাহায্য করেন নাই, তিনি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। যিনি তোমাকে প্রতিভা দান করিয়াছেন তিনিই তোমাকে উদ্যম ও আশা প্রেরণ করিয়া সেই প্রতিভাকে সার্থক করুন।

তোমার

১৯

রবি

[এপ্রিল ১৯০২]

ওঁ

বন্ধু,

তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই কিন্তু কত দিন যে তোমাকে লইয়া কাটাইয়াছি, হৃদয়ের অন্তরঙ্গ প্রদেশে তোমাকে অনুভব করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আজ তোমার জয় সংবাদ পাইয়া নবমেঘগর্জ্জনপুলকিত ময়ূরের মত আমায় হৃদয় নৃত্য করিতেছে। মাতাল মদের বোতলের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত যেমন পান করে তোমার চিঠির ভিতর হইতে আমি সমস্ত মত্ততাটুকু একেবারে উপুড় করিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। বহু বিলম্বে তোমার জয় হইলেও আমি হতাশ্বাস হইতাম না—তবু নগদ পাওনার প্রবল আনন্দ।

গত কাল প্যারিসে তোমার বলিবার কথা ছিল—নিশ্চয় সেখানে তোমার জয় হইয়াছে—তোমার সেই বক্তৃতাসভায় আমাদের হৃদয় উপস্থিত ছিল।

য়ুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিও—তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিও না। গারিবাল্ডি যেমন জয়ী হইয়া রণক্ষেত্র হইতে কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তেমনি তোমাকেও অভ্রভেদী জয়-তোরণের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের গভীর নির্জ্জনতার মধ্যে দারিদ্র্যের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইবে—তখন তোমাকে সকলে খুঁজিয়া লইবে, তুমি কাহাকেও খুঁজিবে না—তখন তোমার কাছে আসিতে ভারতবর্ষের কাছে সকলে মাথা নত করিবে—বিদেশী ছাত্রকে ডাকিবার জন্য বিদেশের প্ল্যানে প্রাসাদ রচনা করিলে চলিবে না—মাঠের মধ্যে কুটীরের মধ্যে মৃগচর্ম্মে যে বসিলে সেই তোমাকে পাইবে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আর কাহারো হাতে দেন নাই—তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন স্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কাষায় বসন পরিয়া তোমার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি আসিয়া বসিবে—সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ তোমার জয়শব্দ উচ্চারণ করিবার জন্য সেদিনকার পুণ্য সমীরণে এবং নির্ম্মল সূর্য্যালোকের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন। ভারতবর্ষের সমস্ত শূন্য প্রান্তর এবং উদার আকাশ তৃষিত বক্ষের ন্যায় ব্যাকুল প্রসারিত বাহুর ন্যায় সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আমরাও সেই দিনের জন্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের রাজা যে কেহ হউন, আমাদের আকাশ, আমাদের দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ কে কাড়িয়া লইবে? আমাদের স্নানের অবকাশ, আমাদের ধ্যানের অবকাশ, আমাদের দারিদ্র্যের অবকাশ হইতে আমাদিগকে কে বঞ্চিত করিতে পারিবে? আমাদের দেশে যে পরমা মুক্তির অচলপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে—তাহা স্তব্ধ, তাহা নির্ব্বাক্, তাহা দীন, তাহা দিগম্বর, তাহা শাশ্বত—তাহাকে বলীর বাহু ও ক্ষমতাশালীর স্পর্দ্ধা স্পর্শ করিতে পারে না—ইহাই চিত্তের মধ্যে স্থির নিশ্চয়রূপে জানিয়া শান্ত মনে সন্তোষের সহিত প্রসন্ন মুখে ইহারই বিরলভূষণ বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। বিদেশীর কটাক্ষে আর ভ্রূক্ষেপ করিব না—তাহার ধিক্কারে আর কর্ণপাত করিব না—তাহার কাছ হইতে যে বর্ব্বর রংচং বসনভূষণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম তাহা তপোবনের দ্বারে আবর্জ্জনার মত ফেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিব।

পত্রের মধ্যে আমাদের আশ্রমবৃক্ষ হইতে কালিদাসের শিরীষ পুষ্প তোমাকে পাঠাইলাম।

তোমার রবি

২০

[মে ১৯০২] ওঁ

বন্ধু,

ঈশ্বর তোমার ললাটে বিজয়-তিলক অঙ্কিত করিয়া তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন—তুমি কি আমাদের মত লোকের কাছ

হইতে বলের বা উৎসাহের অপেক্ষা রাখে ? সেখানে থাক এবং যেমন করিয়াই হউক, উল্লাসে হউক, বাধায় হউক, নৈরাশ্যে হউক, তুমি নিজেকেও ব্যর্থ করিতে পার না। যিনি ভিতরে থাকিয়া তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার সমস্ত জীবনকে সফলতার দিকে লইয়া গেছেন তাঁহার কর্ম্মকে হঠাৎ মাঝখানে নিরর্থক করিবে কে ? সীজারের নৌকা কখন ডুবে না। নিরাসক্ত ভারতবর্ষের অবিচলিত স্থৈর্য্য তোমাকে তোমার কর্ম্মের মধ্যে অনায়াসে রক্ষা করুক। কোন ক্ষুদ্র আকর্ষণ, কোন ইচ্ছার চাঞ্চল্য তোমাকে তোমার মহৎ ব্রত হইতে ভ্রষ্ট না করুক। ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে। তুমি এখানে আসিয়া তপস্বী হইয়া নিভৃতে তোমার শিষ্যদিগকে জ্ঞানের দুর্গম দুর্গের গোপন পথ সন্ধান করিতে শিখাইয়া দিবে, এই আমি আশা করিয়া আছি। পড়া মুখস্থ করানো, পাশ করানো তোমার কাজ নহে—যে-অগ্নি তুমি পাইয়াছ তাহা তুমি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না—তাহা ভারতবর্ষের হৃদয়াগারে স্থায়ী করিয়া যাইতে হইবে; বিদেশী আমাদিগকে জ্ঞানের অগ্নি যেটুকু দেয়, তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী ধোঁয়া দিয়া থাকে—তাহাতে যে কেবল আমাদের অন্ধকার বাড়ে তাহা নহে, আমাদের অন্ধতাও বাড়িয়া যায়—আমাদের দৃষ্টি পীড়িত হয়। তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি—আর কোন পথ ভারতবর্ষের পথ নহে—তপস্যার পথ, সাধনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিষ দান করিয়াছি, কিন্তু সে-কথা কাহারো মনে নাই—আর একবার আমাদিগকে গুরুর বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে—নহিলে মাথা তুলিবার আর কোনো উপায় নাই। ভারতবর্ষের প্রান্তরের বটচ্ছায়ায় সেই বেদী-অধিরোহণে তোমাকে সহায়তা করিতে হইবে। সৈন্যসামন্ত, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, বাণিজ্য, ব্যবসায়, কিছুই আমাকে বিচলিত করে না। আমি মাঠের মাঝখানে বসিয়া সেই প্রাচীন পবিত্র বেদীর স্বপ্ন দেখিতেছি। তাহা শূন্য রহিয়াছে, আমরা শিশুর মত তাহার মাটি ভাঙিয়া পুতুল গড়িয়া খেলা করিতেছি।

তোমার রবি

২১
২০ জুন ১৯০২

ঔ

৬ই আষাঢ় ১৩০৯
শান্তিনিকেতন
বোলপুর

বন্ধু

আষাঢ় আসিয়াছে—কিন্তু আষাঢ়ের সেই চিরন্তন নব ঘনঘটা এবার এখনো দেখা দিল না। আমরা সেই জন্য হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি। এখানে চারি দিকে অবারিত প্রান্তর—কোথাও দৃষ্টির কোন বাধা নাই—মেঘের লীলাস্থল এমন আর নাই—এইখানেই জয়দেব বিপুলচ্ছন্দে তমালবনে বর্ষা রাত্রির বর্ণনা লিখিয়াছিলেন। এখান হইতে জয়দেবের জন্মভূমি ছয় ক্রোশ—চণ্ডীদাসের জন্মভূমিও অধিক দূর নহে। এই জায়গায় ঘন বর্ষার সময় এক বার তোমাকে গ্রেফতার করিতে পারিলে চমৎকার হয়। এক এক সময় বিদ্যুতের মত আমার মনে হয় যে সব কাজকে আমরা অত্যন্ত বেশি মনে করি—বক্তৃতা করি, লিখি, হাঁসফাঁস করিয়া বেড়াই, দেশ উদ্ধার করিবার ফিকির করি—এ সমস্তই বাজে কাজ। জীবনটা ইহাতে কেবল খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। প্রেমই নিত্য, শান্তিই চিরন্তন। দুঃখ এই যে, মানুষকে ক্ষণিক ক্ষোভ সাময়িক অশান্তি কাটাইয়া এই নিত্য পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। এমনি করিতে করিতেই জীবনটা কাটিয়া যায়—তখন কোথায় তুমি কোথায় আমি! সম্পূর্ণতা কেবল মরীচিকার মত আগে আগে চলে তাহার পথের আর শেষ নাই! এমন করিয়া কে আমাদিগকে কেবলি টানিয়া চলিয়াছে ? এক একবার ইচ্ছা করে বিদ্রোহ করি—সব কাজকর্ম্ম ফেলিয়া মুখোমুখি করিয়া বসি—হৃদয়টাকে পূর্ণ করিয়া তুলি। কিন্তু পথের আহ্বান যখন আসে তখন লক্ষ্মীছাড়া আর বসিয়া থাকিতে পারে না—আবার দৌড় আবার দৌড়! একটা পাকের মধ্যে পড়িয়া গেছি। সমস্ত বিশ্বজগৎটা একটা পাক—কেবলি ঘুরিতেছে—ঘোরাই যেন তাহার পরিণাম—মানবলোকও একটা পাক—কেবলি ঘুরিয়া চলিতেছে, তাহার পরিণাম কোথায় ? এই জন্যই ভগবান বুদ্ধ ব্যাকুল হইয়া এই পাক হইতে কোন মতে বাহির হইবার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমস্ত মানুষ বাহির না হইলে একজনের বাহির হইবার জো নাই। জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া এই মানুষ-ঘূর্ণীতে ঘুরিয়া মরিতে হয়। তোমাদের বিজ্ঞানের মতে আকাশের এক জায়গায় পাক খাইয়া জগৎ অগণ্য গ্রহতারায় ঝলকিয়া উঠিয়াছে—কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ বলে না ? এই পাকের মধ্যে অগণ্য চক্র—নক্ষত্রচক্র, সৌরচক্র, গ্রহচক্র, জীবনচক্র—এই পাকের বাহিরেই স্থির শান্তি। প্রাণটা সেইখানকার জন্য দুই হাত বাড়ায়, কিন্তু ভীষণ জগতের টান তাহাকে আপনার অনন্ত ঘূর্ণায় বার বার টানিয়া লয়। প্রেমে যেন এই পাকের মধ্যেও একটুখানি স্থিতি ও পরিপূর্ণতার আভাস পাওয়া যায়। দুইটি হৃদয় মুখামুখি করিয়া বসিলে জগৎচক্রের ঘর্ঘরশব্দ কিছুক্ষণের জন্য যেন শোনা যায় না—তখন লাভক্ষতি সুখদুঃখ পাপপুণ্য জয়পরাজয়ের তোলাপাড়া কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া থাকা যায়। কিন্তু তোমার বিজ্ঞান দিগ্বিজয়যাত্রার সময় এই সকল কবির ক্রন্দন ঠিক নহে, এখন জয়ভেরীর বাদ্যই বাদ্য, এখন হৃদয়ের কথা হৃদয়ের মধ্যেই থাক।

তুমি জন্মণি আমেরিকায় তোমার জয়পতাকা নিখাত করিয়া আসিও। তাড়াতাড়ি করিয়ো না। আমি বোধ হয় দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিব—তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। এখন আমরা তোমাকে কাছে ডাকিব না। আগে তোমার কাজ সারিয়া আইস—তাহার পরে দীর্ঘ সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়া কেদারা টানিয়া বসা যাইবে।

আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে একটি জাপানী ছাত্র সংস্কৃত শিখিবার জন্য আসিয়াছে। ছেলেটি বড় ভাল। সে বেশ আমাদের আপনার লোক হইয়া আসিয়াছে। তোমার বন্ধু মীরা প্রত্যহ তাহাকে এক পেয়ালা ফুল দিয়া বশ করিয়া লইয়াছে। তাহার কাছ হইতে দুটো একটা করিয়া জাপানী কথাও শিখিয়া লইতেছে। ইহা যদি তোমার আশঙ্কার বিষয় বলিয়া মনে হয় তবে ইহার যথাবিহিত প্রতিকার করিও।*

তোমার রবি

* বিশ্বভারতীর সৌজন্যে।

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

যত বড় জাঁদরেল মানুষই হোন, সোবিয়েত দেশ থোড়াই কেয়ার করবে যতক্ষণ না কোন কর্মিক সংঘ পিছন থেকে আপনাকে ঠেলে দিচ্ছে। একলার খাতির নেই—এক গলায় অনেকের কথা বলুন, তবে শুনবে। যত রকম পেশা থাকতে পারে, সব পেশার লোক এক এক য়ুনিয়ন গড়ে বসে আছে। তারাই আসল। য়ুনিয়নগুলোকে হাত করে নিন, সারা সোবিয়েত দেশ তবে আপনার মুঠোর ভিতর।

য়ুনিয়ানের মস্ত বড় অফিসে চলেছি দুপুরের খানাপিনার পর। মস্কো শহরের সীমানা ঘেঁসে নতুন য়ুনিভার্সিটি-পাড়ায়, লেনিন পাহাড়ের দিকে। নামটা গোলমেলে—অল য়ুনিয়ানস সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব ট্রেড-য়ুনিয়ানস (All Unions' Central Council of Trade Unions)। উঠানে পা দিয়েই চোখের মণি গর্ত থেকে ঠিকরে বেরুবার জোগাড়। সশব্দে একজনে বলেও উঠলেন, ওরে বাবা, এই হল ট্রেড-য়ুনিয়ানের বাড়ি—রাষ্ট্রপতি-ভবন নয়? য়ুনিয়ন-অফিস বলতে আমরা বুঝি, নিচু-ছাত ঘুটঘুটে অন্ধকার ভাপসা গন্ধ-ওঠা ঘরের মধ্যে হাতল-ভাঙা খান দুই চেয়ার ও নড়বড়ে টেবিল। চেয়ার ও মেজের উপরে মানুষ কয়েকটি এবং দেয়াল ভতি আরশুলা। আর এখানে কী কাণ্ড!

চারতলায় উঠে গেলাম লিফটে। নানান বিভাগ—অগুন্তি ঘর। ঝকঝক তকতক করছে। আসবাবপত্র একেবারে হাল ফ্যাসানের—বসে বসে কাজ করার মধ্যে যতখানি সুখ নিতে পারা যায়। সকল ব্যবস্থা করে রেখেছে।

সোবিয়েত ট্রেড-য়ুনিয়ন জনসাধারণেরও সংস্থা। বেকার নেই, সক্ষম মানুষ মাত্রেই কাজ পেয়েছে—যে কেউ তাদের মেম্বার হতে পারে। কারখানায় কর্মিক, অফিসের কেরানি, কারিগরি ও উঁচু ক্লাসের ছাত্র—সবাই। জাতিধর্মের বাছবিচার নেই। ইস্কুলের মাস্টার, খনির শ্রমিক, বইয়ের লেখক, গাড়ির ড্রাইভার—সকলের আলাদা আলাদা য়ুনিয়ন, ইচ্ছে করলে যে কেউ মেম্বর হতে পারেন নিজ নিজ য়ুনিয়নের।

সমস্ত য়ুনিয়ন থেকে মেম্বার বাছাই করে নিয়ে আবার এক সংস্থা গড়ে, তার নাম সুপ্রীম ট্রেড-য়ুনিয়ন। ওদের ভিতরে ভোট নিয়ে হয় সেন্ট্রাল-কাউন্সিল। সকলের বেশি ক্ষমতা এই কাউন্সিলের—তাবৎ ট্রেড-য়ুনিয়ানের মধ্যে যোগাযোগ সাধন হল এদের বড় কাজ।

সরকারি ও আধা-সরকারি যাবতীয় ইলেকসনে ট্রেড-য়ুনিয়নগুলোর বিস্তর প্রভাব। অগুন্তি মেম্বার। কর্মিকদের ভাতডালের ব্যবস্থা করেই দায়খালাস নয়, কড়া নজর থাকে, কর্মিকরা যাতে ষোল আনা মানুষ হয়ে জীবন কাটায়—শুধুমাত্র কাজের যন্ত্র না হয়ে ওঠে। এই কাউন্সিলের ব্যবস্থায় সাড়ে ন' হাজার সংস্কৃতি-ভবন (Palace of Culture) চলছে। তা ছাড়া ছোটখাট ক্লাব—গুণতিতে দাঁড়াবে সাতানব্বুই হাজার। কর্মিক ও তার পরিবারের হরেক রকম খেলাধুলা পড়াশুনা ও স্ফূর্তিফার্তির ব্যবস্থা। ক্লাবে এসে তারা ছবি আঁকে, ফোটো তোলে, দরজির কাজ শেখে, তাস-দাবা খেলে, থিয়েটার করে, সিনেমা দেখে। গুণীজ্ঞানীরা এসে শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বক্তৃতা দিয়ে যান। প্রতি ক্লাবের সঙ্গেই শিশুকেন্দ্র—ছেলেপুলেদের শিক্ষা শরীর-চর্চা ও আমোদের ব্যবস্থা সেখানে। তেরো হাজার লাইব্রেরি চালায় কাউন্সিল। তাছাড়া সরকারি ও স্কুল-কলেজের লাইব্রেরি আলাদা তো আছেই। লড়াইয়ের সময় হিটলারের দল বিস্তর জায়গা দখল করে নিয়েছিল, অনেক লাইব্রেরি পুড়িয়ে দিয়েছে তখন।

লড়াইয়ে বাড়ি ভেঙে চুরমার করেছিল, এখন দেদার বাড়ি বানাচ্ছে মানুষের বসবাসের জন্য। যার যেমন দরকার, ঘরবাড়ি ঠিক করে দেওয়ার কাজও ট্রেড-য়ুনিয়নের। মাইনে-করা য়ুনিয়নের ডাক্তার—কর্মিকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুফতে তারা রোগী দেখে বেড়ায়। য়ুনিয়নের ইনস্পেক্টররা—পাকা লোক দেখে দেখে এই কাজে দেয়—কড়া চোখে তদারক করে বেড়ান, কর্মিকদের স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটছে কিনা কোথাও। প্রায় হাতে-মাথা-কাটার ক্ষমতা ওঁদের—দরকার হলে ফ্যাক্টরির কাজকর্ম থামিয়ে দিয়ে মামলা আনতে পারেন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। দোষত্রুটি সামলানোর জন্য এমন কি সরাসরি নিজ হাতে নিয়ে নিতেও পারেন। কর্মিকরা গোলমাল না করে, সেটাও দেখেন ওঁরা; গণ্ডগোল জমে ওঠবার আগেভাগে মিটমাটের ব্যবস্থা করেন য়ুনিয়ানের লোক ও কর্মকর্তাদের লোক এক জায়গায় এনে বসিয়ে। ওভারটাইম কাজ করবার নিয়ম নেই। কিন্তু জরুরি ব্যাপারে কখনো কখনো বিশেষ হুকুম। আসে তখনও ইনস্পেক্টর নজর রাখবেন, কর্মিকদের শরীর খারাপ না হয়ে পড়ে। পেন্সন পায় সকল কর্মিক—পুরুষের ষাট আর মেয়ের পঞ্চান্ন বয়স হলে। কয়লার খনিতে যারা কাজ করে তাদের পেন্সন অনেক আগে। পেন্সন পেলেই যে কাজ ছাড়বেন, তার কোন মানে নেই। স্বাস্থ্য ভাল থাকলে চাকরি চালিয়ে যথারীতি মাইনে নেবেন, আবার পেন্সনের টাকাও আসবে।

অক্ষমতার পেন্সন আছে। শরীর হঠাৎ অপটু হয়ে পড়লে পথে বসতে হবে না। সংসার-পোষণের দায়ঝক্কি থাকলে পুরো মাইনে পাবেন কাজকর্ম না করেও। অন্যথা মাইনের চার ভাগের তিন ভাগ। ভারী কাজ করতে পারছেন না কিন্তু হালকা কাজের শক্তি আছে এমন এমন অবস্থায় মাইনের অর্ধেক দেবে; বাকিটা আপনি খেটেখুটে রোজগার করুন। চাকরি পঁচিশ বছর পুরলে মাস্টারমশায়রা পেন্সন পাবে—শক্তি থাকলে চাকরিও চালিয়ে যাবেন পেন্সনের সঙ্গে। সন্তান-প্রসবের সময় মেয়ে-কর্মিকরা যাবতীয়

খরচখরচা পায়। এবং সাতাত্তর দিনের ছুটি। কোন কর্মিকের ধরুন শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে ; তার জন্য বলকারক দামি খাদ্য চাই। কিংবা একটা ছেলে ধরুন পড়াশুনোর কৃতিত্ব দেখিয়েছে, বৃত্তি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করতে হবে। য়ুনিয়ান আলাদা ফাণ্ড জমিয়ে রেখেছে এই সব বাড়তি ব্যবস্থার জন্য।

তেরো হাজার স্যানিটোরিয়াম ও বিশ্রামস্থান আছে ইউনিয়নগুলোর তাঁবে। পাহাড়ের উপরে সমুদ্রের কিনারে ভাল ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গায়। কর্মিকেরা সেখানে মুফতে থাকতে পায়। একমাস থাকবে—তার মধ্যে কারখানায় ছুটি মেলে আঠারো দিনের ; সোস্যাল ইনস্যুরেন্স ফাণ্ড থেকে বাকি বারো দিনের মাইনে দিয়ে দেয়। কর্মিদের স্বাস্থ্য ও আনন্দের জন্য নানারকম চেষ্টা—তার ফলে উৎপাদন বেড়ে সমৃদ্ধি উথলে উঠছে। জিনিষপত্রের দাম কমছে দিনকে দিন, আর কর্মিকের মাইনে বাড়ছে। কর্মিকের পরিবার খুব বড় হলে সেখানে বিশেষ ভাতা। ছেলেপুলের মধ্যে স্কুল-কলেজ ও য়ুনিভার্সিটির ছাত্র থাকলেও বেশি টাকা। জাতীয় আয়ের পুরোপুরি সত্তর ভাগ জনসাধারণের কাছে ফিরে আসবে, এই হল আর্থিক ব্যবস্থা ওদের।

য়ুনিয়নের চাঁদা মাইনের শতকরা এক ভাগ। ছাত্রের বৃত্তিরও অমনি শতকরা এক ভাগ দেয় ; বৃত্তি না পেলে পঞ্চাশ কোপেক। কর্মিকদের মধ্যে মেম্বার শতকরা নিরানব্বুই ; ছাত্রদের মধ্যে নব্বুই।

ধর্মঘটের কথা কখনো তো শুনিনে আপনাদের দেশে। কড়া আইন আছে নাকি ?

কার বিপক্ষে করবে বলুন ধর্মঘট ? মালিক বলে আলাদা কোন দল নেই নিজেরাই সব। ধর্মঘট নিজেদের বিরুদ্ধে ? সোবিয়েত দেশটাই হল এক সুবৃহৎ পরিবার। কত রকম সমস্যা ওঠে, তেমনি সমাধানও করে নেয় নিজেরা বুঝসমঝ করে। চাকরি যাওয়া খুব কঠিন এদেশে ; অতি-বড় অপরাধ করলে কালে ভদ্রে চাকরি যায়। শোষক না থাকায় তিক্ততার কারণ ঘটে না কোন সময়।

ছুটলাম ওখান থেকে শহরের ভিতর দিকে। আর দুটো-তিনটে দিন—এর মধ্যে যতদূর দেখে নেওয়া যায়। মস্তবড় প্রতিষ্ঠান—গর্কি ইনষ্টিট্যুট অব ওয়ার্লড লিটারেটারস। ডিরেক্টর হলেন আনিসিমভ, চীনে যাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সোবিয়েত-দলের নেতা হয়ে চীনে গিয়েছিলেন। সে কথা মনে আছে কি আর এত দিন পরে—দ্বিধা ভরে দোভাষিনীর মারফতে শুধালাম : মনে পড়ে আবছা রকমের কিছু ? গড়গড় করে একগাদা জবাব দিয়ে চললেন, দোভাষিনী ইংরেজি করে দিল : মনে পড়বে না কি, সাংহাইয়ে বক্তৃতার কমপিটিসন হল তোমার সঙ্গে। জিত তোমারই—হাততালির চোটে কানের পর্দা ছেঁড়ে তোমার বক্তৃতার পরে। আমি না-না করে উঠি : আজ্ঞে না, ডাহা মিথ্যে বলা হচ্ছে। তোমার বক্তৃতায় এমন হাততালি, আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে গিয়ে বৃষ্টির তোড়ে সৃষ্টিসংসার লণ্ডভণ্ড করে দিল। 'চীন দেখে এলাম' বইয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা আছে। পাকে-চক্রে আমিও তখন ভারতীয় দলের কর্তা হয়ে পড়েছি। কিন্তু আগেভাগে বানানো নিতান্তই কাগজে-লেখা বক্তৃতা—বাহাদুরি কারো নেই। না আমার, না অ্যানিসিমভের।

অ্যানিসিমভ তারপরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন : মনে নেই যে বলছ, দেখে যাও এদিকে এসে।—এসো।

অগুন্তি বইয়ের তাক। একটার সামনে দাঁড় করালেন। পিকিনে একগাদা বই দিয়েছিলাম। তার একটাও অন্য কোথাও দিয়েছেন বলে তো মনে হয় না। নিজের ইনষ্টিট্যুটে সাজিয়ে রেখেছেন। রেখেছেন কেমন জায়গায় ভাবতে পারেন ? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। বাংলার লেখক আমরা তাহলে মোটমাট দু-জন—রবীন্দ্রনাথ এবং এই অধম। আপনারা ছুয়-ছাই করেন, আর এত দূরে কী পশার জমিয়ে আছি ভাবুন একবার। যার হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরুন। ইতিমধ্যে অনেক দিন কেটেছে আরও অনেকে নিশ্চয় জুটে পড়েছেন সেখানে। বেশ দিব্যি ছিলাম নিরালায় কবিগুরুর পাদপ্রান্তে, এখন ভিড় জমে গেছে।

গর্কির নামে প্রতিষ্ঠিত—গর্কি-সম্পর্কীয় যত-কিছু এই এক জায়গায় এনে রাখছে। হরেক পাণ্ডুলিপি একটা ঘরে—জানালা নেই ভারী দরজা, দেয়াল ডবল পুরু। হাতের কাছে টুকরোটাকরা যে কাগজ পেয়েছেন তার উপরে গর্কি কলম চালিয়েছেন। আবার চওড়া মার্জিনে গোটা গোটা অক্ষরের পাণ্ডুলিপিও দেখছি। পরের পাণ্ডুলিপিও যত্ন করে দেখে কাটকুট করে দিতেন—এমনি শত শত রয়েছে। চিঠিপত্রের সংগ্রহ—চেকভকে লেখা চিঠি, চেকভ যে সব উত্তর দিয়েছেন ; বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার চিঠি, ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ইউরোপের এখান-ওখান থেকে শ্যামজী চিঠি দিতেন গর্কিকে।

গর্কির জিনিষপত্র শুধু নয়—সাহিত্যের গবেষণাগার। জাতবেজাত ভুলে দুনিয়ার তাবৎ সাহিত্য এই আখড়ায় জমায়েত হবে—গর্কির সেই মনোবাসনা। ইনষ্টিট্যুট অব ওয়ার্লড লিটারেটারস নামকরণটা গর্কিরই। বিশ্বভারতীর আদর্শ নির্বাচন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'যত্র ভবত্যেক নীড়ম্'—এখানেও সেই এক বস্তু। তিরিশ ভল্যুমে গর্কির যাবতীয় বই বেরুচ্ছে এই বছরের মধ্যেই। আর এক ভল্যুম হবে গর্কির চিঠি। তিন লাখ করে ছাপছে আপাতত।

ইংরেজি-সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়েছে বৃহৎ পাঁচ ভল্যুমে। ফরাসি ও জর্মন সাহিত্যের ইতিহাসও তৈরি হচ্ছে। সোবিয়েতে যতগুলো ভাষা চলিত, প্রতিটি ভাষা এ সাহিত্য নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, প্রতিটি সাহিত্যের ইতিহাস লিখছে। বেশি নজর অবশ্য রুশ-ভাষা সম্পর্কে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেশের পুরাণো রূপকথাও নিয়ে জোর গবেষণা চলেছে সম্প্রতি।

(২৭)

ক্রেমলিনে চলেছি। কত শত বার গেছি সামনে দিয়ে, আজকে ভিতরে যাব। রেড-স্কোয়ারের সামনে সদর গেট—ইতর লোক আমাদের ঐ পথে ঢুকতে মানা। বিস্তর কড়াকড়ি। ভিতরে ঢুকেও সর্বত্র চলাফেরা করতে দেবে না। লেনিন যেখানে থাকতেন, হাল আমলের কর্তারা থাকেন যেদিকটায়—দূর থেকে নজর তুলে যা দেখতে পান। অনেকটা পথ ঘুরে মস্কো-নদীর ধারে এসে পড়েছি। ক্রেমলিন নদীর উপরে, নদীর কিনারে ছোটখাট এক দুর্গ। তখন কেউ ভেবেছে, এত বিশাল হয়ে উঠবে কালক্রমে—এত খাতির, এমন নামডাক !

সাত পাহাড়ের উপরে মস্কো শহর। যে পাহাড় তার মধ্যে সকলের উঁচু, ক্রেমলিন সেখানে। শহর পত্তনের একেবারে গোড়ায় ক্রেমলিন তাকে ঘিরে দোকানপাট ব্যাপারবাণিজ্য ও লোকবসতিতে শহর ক্রমশ জমে উঠল। ছোট্ট এক দুর্গ—বারম্বার চেহারা পালটে আজকে অভিনব ও বিরাটকায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোবিয়েত-সরকারের মূল ঘাঁটি; যত কিছু শলাপরামর্শ বিচার-বিবেচনা এখানে বসে হয়। ভারি ভারি রাজনীতিক সভা এখানে—আমাদের পণ্ডিতজীকে নিয়েও হয়েছে। টানা উঁচু পাঁচিল বিস্তর ঘরবাড়ি মাথা তুলে আছে, ভিতরে আকাশ-ছোঁওয়া বড় বড় গির্জা, পাঁচিলের উপর থেকে লম্বা লম্বা চূড়া উঠে গেছে চূড়ায় লাল-তারা—এই হল ক্রেমলিন। মস্কো শহর, তাবৎ সোবিয়েত দেশ এবং নিখিল ভুবন দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে রহস্যময় ক্রেমলিনের দিকে। বিরাট স্থাপত্য—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এত বড় হয়েছে।

বড় বড় শিল্পীর মূল্যবান অজস্র ছবি—আর বহু বিচিত্র শিল্প-ভাণ্ডার, ঐতিহাসিক বস্তুর বিপুল সংগ্রহ। ক্রেমলিনের ভিতরে অরুজেনায়া প্যালাটা—এ দেশের প্রাচীনতম মিউজিয়াম। তাবৎ রুশশিল্পের, বিকাশ ও ক্রমোন্নতি এই একটা জায়গা থেকে মালুম হবে।—ধাতব ও কুটিরশিল্প, হাতের কাজ, কাঠের কাজ, সোনারূপোর কাজ বিশেষ করে।

ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের সঙ্গে শিল্পরীতির কত রদবদল হয়েছে, নিতান্ত উদাসীন লোকেরও নজরে না পড়ে উপায় নেই। এগারো শতক থেকে এই বিশ শতক—সাতশ' বছরের ধারাবহতা ছবির মতন দেখবেন। রাজা-রাজপুত্র রাজবধূ-রাজকন্যা সামন্ত-সেনানীদের যাবতীয় বিলাসভূষণ ও শিল্পসম্পত্তি সোবিয়েত আমলে এইখানে এনে জমা করেছে।

পিটার দ্য গ্রেটের তৈরি এই মিউজিয়াম। অস্ত্রাগার এক দিকে জার ও সেনানী-সামন্তর। ষোল কিলোগ্রাম ওজনের ভারী অস্ত্রও আছে। রকমারি শিরস্ত্রাণ। বক্ষোভূষণ মণিমুক্তাখচিত। বিচিত্র কারুকর্মের বন্দুক—ষোল শতকের। তলোয়ার—পিটার দ্য গ্রেট ভারতীয় তলোয়ার ও ছোরা ব্যবহার করতেন, সেগুলো। তলোয়ারের বিচিত্র খাপ। নানা রকম যুদ্ধের বাজনা সেকালকার। ঘোড়ার বর্ম, মানুষের বর্ম। পনের-ষোল শতকের বাসনকোশন। সোনার থালা। সোনা ও রূপার হরেক পাত্র, নাম বলতে পারব না। একটা পাত্রে সোনার ওজন পাঁচ সের হবে অন্তত। হাতির দাঁতের কৌটা। সোনা ও মণিমুক্তাখচিত কৌটা। ঘড়িই বা কত রকমের; কাঠের ঘড়ি—স্প্রিংটুকু মাত্র ধাতুর। আর এক ঘড়ি—আকারে বিশাল; মণিমাণিক্যে রৌদ্রের আভা বেরোয়; ঘণ্টা বাজলে ঈগল পাখি মুক্তা ফেলে দেয় মুখ থেকে; দরজা খুলে যায়; যে ক'টা বাজল, সেই অঙ্কর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। পিটার দ্য গ্রেটের মদ্যপাত্র, পোশাক। মণিমুক্তা-গাঁথা কত রকমের পোশাক—একটা পোশাকের ওজন প্রায় তিরিশ সের, এই গায়ে দিয়ে চলাফেরা করতেন। সোনার তৈরি মস্তবড় বাইবেল-কেস। বাইবেলের খাপ একটা-দুটো নয়, অনেক। রাজমুকুট, অভিষেকের জিনিষপত্র। হাতির দাঁতের সিংহাসন; মণিমুক্তা-বিজড়িত সিংহাসন। পিটারের বাপ রোমানভের সিংহাসন—চারটে হাতি, চতুর্দিকে, আর বিস্তর কারুকার্য। সিংহাসনটা তৈরি হয়েছিল ভারতে, পারস্যের বণিকেরা এনে উপহার দিলেন।

ঘোড়ার রাজকীয় সাজ, ঘোড়ার গায়ে দেবার পালকের কম্বল। সতের ও আঠার শতকের ঘোড়ায়-টানা গাড়ি—নানা জায়গা থেকে উপহার এসেছিল এসব। শীতে বরফের উপর দিয়ে নিয়ে যাবার শ্লেজগাড়ি। রাণী এলিজাবেথের শীতকালের গাড়ি—বাইশ ঘোড়ায় টানত, পিটার্সবার্গ থেকে মস্কো পৌছতে লাগত তিন দিন। দ্বিতীয় ক্যাথেরিনের গাড়ি, ফ্রান্সে তৈরি, দরাজ ভাবে স্প্রিং দেওয়ার দরুণ গাড়ি দুলতে দুলতে চলে।

সারা বেলাস্ত দেখে শেষ করতে পারি নে। কত আর টুকব? ক্লান্ত হয়ে এক সময়ে হাল ছেড়ে দিতে হয়।

বলেছি তো, ক্রেমলিনের ভিতরে খাসা খাসা গির্জা। খুদ জার-জারিনা তাঁদের ছেলেপুলে উজির-নাজির পুরুত-পাণ্ডা ধর্মকর্ম করতেন—অতএব অতিশয় বাহারের ক্যাথিড্রাল ক্রুশের যীশু ও মা মেরীর নামে। উসপেনস্কি ক্যাথিড্রালের ১৪৭৯ অব্দে পত্তন। বলগোভেশ্চে-নেস্কি ১৪৪৯ অব্দে এবং আর্ক এঞ্জেল ১৫০৯ অব্দে বানানো। এদের স্থাপত্য ও দেয়াল-ছবিগুলোয় একবার নজর বুলিয়ে তাজ্জব হয়ে আসুন। আর্ক এঞ্জেলের সতের শতকে আশ্চর্য ছবিগুলো অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, শিল্পীরা খেটেখুটে উদ্ধারকর্ম প্রায় শেষ করে এনেছেন।

তারপরে দেখুন ঢালাইয়ের কাজকর্ম। জারের কামান—কাঁসার কাছাকাছি একরকম মিশ্রধাতুতে তৈরি (১৫৩৮ অব্দ)। কারুকার্যে ভরা, বিরাট চেহারা, ওজনে চুয়াল্লিশ টন। পাঁচ মিটার চৌত্রিশ সেন্টিমিটার লম্বা। বড় বড় শেল পাঁচশ মিটার অবধি যেতে পারে। তাতারের আক্রমণ ঠেকাবার জন্য বানানো। কিন্তু শেষ অবধি এ কামান ব্যবহারের দরকার হয়নি।

পৃথিবীর সাত আশ্চর্যের একটা আগে দেখেছি চীনের মহাপ্রাচীর। আর একটা এই এখানে—দৈত্যাকার ঘণ্টা। সেড় হল ছয় মিটার বাট সেন্টিমিটার, ওজন দু-শ টন। দুনিয়ায় এর জুড়ি নেই। জারের ঘণ্টা—গ্রানাইট বেদীর উপর রেখেছে, উপরে জারের ছবি। রূপা-তামা ইত্যাদি নানান ধাতু মিশিয়ে তৈরি। কারিগরের নাম আইভান মোটোরিন ও তার ছেলে মিখাইল। ১৭৩৩-৩৫ অব্দে এখানে এই ক্রেমলিনের ভিতরে তৈরি। ঢালাই হয়ে গেলে ঘষামাজার জন্য ফ্রেমের উপর তোলা হল। সেখানে কাজকর্ম চলতে লাগল। ১৭৩৭ অব্দে মস্কোয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ঘণ্টা আগুনে বিষম গরম হল; কাঠের ফ্রেমও পুড়ে ছাই। ঘণ্টা পড়ল গিয়ে এক নালার মধ্যে—মস্কো-নদীর জলে ভরতি সেই নালা। গরমে-ঠাণ্ডায় ঘণ্টা ফেটে চৌচির। একটা টুকরো আলাদা হয়ে পড়ল, তার ওজন সাড়ে এগারো টন। পুরো একশ বছর ঐ নালায় পড়েছিল, ১৮৩৬ অব্দে তুলে নিয়ে পাথরের বেদি গেঁথে তার উপর রেখেছে। টুকরোটা পাশে।

আজকে আমার বক্তৃতা। বিকালবেলা, ভোকস অফিসে। সাংস্কৃতিক দলের হয়ে এসেছি—ঘোরাফেরা এবং খানাপিনা করে গেলেই হল না, ট্যাক্স দিয়ে যাও। সাংস্কৃতিক বচন শোনাও কিছু। তাতে ডরাই নাকি? গণতন্ত্রের যুগে সাহিত্যিক হয়ে আগড়ম-বাগড়ম

লিখলে শুধু চলে না, বলতেও হয় দেদার। ভেবেছিলাম, বলব, আধুনিক বাংলা উপন্যাস নিয়ে। গতিক বুঝে বিষয় পালটেছি—'গণজীবনে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব'।

কেন বলছি। বাংলা সাহিত্য নিয়ে আপনারা জাঁক করেন। জাঁক করবার বস্তুই বটে! বহু সাধনের জীবনসাধনায় মহাসাহিত্য গড়ে উঠেছে। খবর রাখেন, বাহিরের কেউ আপনাদের পোঁছে না? এই রাশিয়াতেই দেখলেন গল্প-সংকলনের ব্যাপারে। ভারত-পাকিস্তানের গল্প বাছাই হল, তার মধ্যে বাংলা ভাষার একটি গল্প নেই—বাঙালির আছে মাত্র একটি, ভবানী ভট্টাচার্যের। ওখানকার সাহিত্য-দিক্‌পালদেরই প্রশ্ন: ঠাকুরের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যও মরে গেছে নাকি? বুঝুন। মুশকিল হয়েছে, বাংলার কেউ ইংরেজিতে লেখেন না। লিখতেই বা যাবেন কেন? এমন স্বচ্ছ নমনীয় ভাষা আমাদের, মনের গূঢ় ভাবরঙ্গ ভাষায় এঁকে অবাধে প্রকাশ করতে পারি। ইচ্ছেও তাই। আর ওদিকে দেখুন, তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর লেখকেরাও শুধুমাত্র ইংরেজি লেখার গুণে আন্তর্জাতিক বাজারে কেষ্টবিষ্টু হয়ে বসেছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম। শুধু এই সোবিয়েত দেশের ব্যাপার নয়, তামাম ইউরোপে চক্কোর দিয়ে এসেছি—অন্য পরে কা কথা, শরৎচন্দ্রের নামটাও জানেন না ইয়া-ইয়া সাহিত্য-ধুরন্ধরেরা। দুনিয়া আজ ছোট্ট হয়ে একেবারে ঘরের উঠোনে এসে বসল—সেদিকে চোখ-কান বুঁজে থাকবেন কত দিন?

তা খোলাখুলিই বলি, বক্তৃতার এই যে নতুন বিষয়টা নিয়েছি, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ যেন চোখ-রাঙানি এর ভিতর। বাপু হে, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথা বলে থাক, দাওয়াত দিয়ে এনে যত্নআত্তি করছ সেই বাবদে—কিন্তু বাঙালি জাতের মন পাবে না বাংলা-সাহিত্যের অবহেলা করো যদি। বাঙালির বড় গর্ব তার সাহিত্য নিয়ে। প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে বাঙালি, পৃথিবীর কোন তল্লাটে যা কখনো ঘটেনি।

গণজীবনে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব—পূর্বাপর একটা ইতিহাস দাঁড় করানো কঠিন ব্যাপার, বিস্তর কাঠখড় পোড়ানো আবশ্যক। দূর বিদেশে ঘোরাঘুরির মধ্যে অবসর কোথায় তেমন? আর বক্তৃতার প্রয়োজনে ফরমাস মতো বইপত্র কে এনে দেবে জুটিয়ে? শ্রোতারাও সব সেরা মানুষ এখানকার। তবে সুবিধা আছে। জ্ঞানীগুণী তাঁরা যতই হোন, বাংলা সাহিত্যের কিছু জানেন না—নীরন্ধ্র অন্ধকার দৃষ্টির সামনে। অতএব শ্রীমুখে যা উচ্চারণ করব তাই তো বেদবাক্য ওঁদের কাছে। আপনাদের সামনে হলে—ওরে বাবা, কপালে ঘাম দেখা দিত, উঁ-আঁ করতাম বিশ বার—কাঠগড়ায় যেন খুনী আসামি। মস্কো শহরে কিসের পরোয়া? ভাগ্যক্রমে পাণ্ডিত্য দেখবার একটুকু মওকা এসে গেছে, আপনারা উচ্চবাচ্য করবেন না এই নিয়ে।

একেবারে গোড়া ধরে শুরু করা গেল—চর্যাপদ থেকে, বাংলা সাহিত্যের যা প্রথম নিদর্শন। সাধনার এক বিশেষ ধারা নিয়ে কবিতা—সে ধারা গণসমাজেই। গণমানুষের অগণ্য জীবনচিত্র—জাল ফেলে মাছ-ধরা, হরিণ-শিকার, ডোম-চণ্ডাল-শবরের ঘরবাড়ি, অনুরাগ-বিরাগ গীতিকাব্যের মধ্যে বিজলী-চমক দিচ্ছে।

তুর্ক-বিজয়ের কথা হল। রাজনৈতিক বিপর্যয় সন্দেহ নেই, কিন্তু যাঁরা শাসন করতেন, ক্ষমতা হারিয়ে তাঁরা সাধারণের মধ্যে নেমে এলেন। সংস্কৃত সাহিত্য এতাবৎ উঁচু শ্রেণীর একচেটিয়া ছিল, সেই সাহিত্য লৌকিক রূপ পেতে লাগল। রামায়ণ-ভাগবত-বাংলা সাহিত্য তার ফলে লাভবান হয়েছে। সমাজের মাথায় থেকে মহাভারত সর্ববোধ্য সহজ রূপ নিয়ে হাটে মাঠে বাটে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল; উন্নত সংস্কৃতির ফটক খুলে গেল গণমানুষের সামনে। তেমনি আবার বিস্তর লৌকিক ধর্ম ও লৌকিক আখ্যান মার্জিত সাহিত্যিক রূপ পেয়ে গেল বিভিন্ন মঙ্গল-কাব্যে। মানুষের কথায় ভরা এই কাব্যগুলো। দেবতারাও আছেন বটে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নিতান্ত ঘরোয়া সম্পর্ক তাঁদের। স্ত্রীর সঙ্গে কোন্দল, আধিপত্য-বিস্তারের জন্য ছলাকলা, পেটের দায়ে অতি সাধারণ বৃত্তি-গ্রহণ—মঙ্গল-কাব্যে মানুষ-দেবতায় ভেদ নেই।

দীন-চণ্ডীদাসের পদ আবৃত্তি করা গেল—'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' মানুষের উপর কেউ নেই, দেবতারাও নন—মানুষের মহিমা ঘোষণা করলেন বাংলার কবি। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ মাত্র নয়, বাংলার কবির মনের রঙে রাঙানো অনুপম সৃষ্টি। অনেক উপাখ্যান আছে, বাল্মীকির রামায়ণে যার নামগন্ধ নেই। অযোধ্যা আমাদের বাংলা দেশেরই কোন এক জনপদ—রাম-লক্ষ্মণ-সীতা যেন বাঙালি তরুণ ছেলেমেয়ে। জনজীবনে কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিশেষ প্রভাব। বাংলার কুমারী মেয়ে কামনা করছে, সীতার মতন সতী হই, রামের মতন পতি পাই, দশরথের মতন শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মতন দেবর পাই···

মওকা পেয়েছি, সহজে ছেড়ে দেব ওদের? বস্তুর বাগাড়ম্বর করে তো চৈতন্যযুগে পৌঁছানো গেল। নবীন গণতান্ত্রিকতার প্লাবন বাংলা সাহিত্যে। চিরকালের কবিরা অতীতকেই মনোরম করে আঁকেন, এঁরা কিন্তু পুরাণের বহুনিন্দিত পাপময় কলিযুগকে প্রণাম জানালেন—'প্রণমহ কলিযুগ সর্বযুগ সার।' সকল মানুষেরই অমেয় মূল্য স্বীকার করা হল—'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে'।

মাইকেল মধুসূদনের প্রায় সমস্ত বই লেনিন লাইব্রেরীতে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙালি কবিদের মধ্যে মাইকেলকে জানে এরা। বোধ করি শুধুমাত্র তাঁকেই। মাইকেল ধরে নবীন বাংলা সাহিত্যের কথা শুরু করলাম। বাংলা-সাহিত্য কালের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে, সেই জন্যে এই সাহিত্য জনমনে এমন জীবন্ত। তখনকার দিনের সামাজিক ইতিহাসে ফরাসি-বিপ্লবের অতুল প্রভাব—মাইকেলের সাহিত্য-কর্মেও তার প্রেরণা দেখতে পাচ্ছি। 'মেঘনাদবধে' কবি রামায়ণের কাহিনী কালের ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছেন—পুরানো নৈতিক মান একেবারে পালটে গেল। অনাচারী ঐশ্বর্যশালী রাবণ কবির কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' নায়িকারাও চিরকালের রীতিনীতি মেনে নিতে পারছে না—বিদ্রোহিনী তারা। কাব্যের বহিরঙ্গেও বিদ্রোহের ছাপ। পুরানো পদ্ধতির পয়ারগ্রন্থি ছেদন করে অমিত্রাক্ষর ছন্দে মাইকেল কাব্যলক্ষ্মীর শৃঙ্খল মোচন করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র। যুরোপীয় সংস্কৃতি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, বঙ্কিমের সাহিত্যে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা। ভারতের সাধনার পাদপীঠে যুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা—বঙ্কিম-সাহিত্যের এই

হল মর্মকথা। 'আনন্দমঠ' নামে উপন্যাসের একটা গান 'বন্দে মাতরম্'। বিপ্লবভূমি এই রাশিয়ায় হাজার হাজার তরুণ-তরুণী প্রাণ দিয়েছে মানুষের মুক্তি-সাধনায়। আমার ভারতবর্ষেও তেমনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্য। বিশেষ করে বাংলা দেশে। ফুলের মতো বাংলার ছেলেমেয়েরা কারাগারে দ্বীপান্তরের নির্বাসনে ফাঁসির মঞ্চে গুলির মুখে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করে মন্ত্রের মহিমা দান করলেন তাঁরা। 'বন্দে মাতরম্' সর্বভারতের জাতীয় মহাসঙ্গীত হয়ে উঠল।

বাংলার প্রথম কৃষক-অভ্যুত্থান নীল-বিদ্রোহে। শ্বেত শোষক দলের বিরুদ্ধে নিরন্ন চাষীরা রুখে দাঁড়াল। দীনবন্ধু এই নিয়ে নাটক লিখলেন—নীলদর্পণ। আন্দোলন বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হল এই নাটকে। নীলকরের অত্যাচার দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। শেষ অবধি ব্যবসা গুটিয়ে দেশে পালাতে হল নীলকরদের।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে দু-চার কথায় কি বলা যায়? তাঁর সৃষ্টি দেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আটক হয়ে থাকেনি, বিশ্বমানসের সঙ্গে তিনি জাতীর মানসের আত্মীয়তা সাধন করলেন। বিজ্ঞানের দয়ায় দূর বলে কিছু নেই আজ দুনিয়ায়। সব মানুষের মধ্যে চেনা-পরিচয়, রাজনীতি অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সম্পর্কে সকলের যোগাযোগ। এই বিশ্বজনীনতার এক বিচিত্র উপলব্ধি এনে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। দেশে দেশে পরিভ্রমণ করে তিনি ভারতের চিরন্তন সৌভ্রাত্র ও শান্তির বাণী প্রচার করলেন।

শরৎচন্দ্র ও নজরুল ইসলামের কথা বলে ইতি করা গেল। বক্তৃতা বড় হয়ে যাচ্ছে, তা ছাড়া আর এগুলে বিপদ আছে। বইটই কিছু নেই হাতের কাছে—ভ্রম বশে হয়তো বা ব্রহ্মা [illegible] কারো নাম বাদ পড়ে গেল, টের পেলে খেয়ে ফেলবেন তাঁরা আমায়। উপসংহারে এসে পড়েছি: বাংলা দেশ আজ খণ্ডিত, নানা সমস্যায় জর্জর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। তবু কিন্তু বঙ্গের উভয় খণ্ডেরই জনজীবনে বাংলা সাহিত্যের অতুল প্রভাব। বাঙালির কাছে অন্নের মতোই বাংলা সাহিত্যের আবশ্যক। বঙ্গভাষীর সংখ্যা ভারতের মধ্যে অনেক কম হয়ে গেছে কিন্তু বাংলা বইয়ের বিক্রি ভারতীয় কোন ভাষার চেয়ে কম নয়। কলম মাত্র উপজীবিকা অনেক লেখকের; পাঠকেরাই তাঁদের পোষণ করেন।

নিজের বুক ঠুকে বলি, দেখছেন এই অধীনকে। পাঠকেরাই খাওয়ান পরান। চেহারা দেখে কি মনে হয়—খুব খারাপ খাওয়ান না তাঁরা, কি বলেন?

হাসির তোড়ে ঘর ফেটে যায়। কিঞ্চিৎ গায়ে-গতরে আছি কি না, সেটা দেখিয়ে পাঠকদের মহিমা-কীর্তন হল। রোগা ডিগডিগে লেখকও আছেন—ঐ আসরে তাঁরা থাকলে মুশকিল হয়ে পড়ত।

পাকিস্তানের কথা উঠল। বাংলার তিন ভাগের দু'ভাগ পাকিস্তানে। রাজনৈতিক খড়গ মাটি আলাদা করে দিয়েছে, মানুষকে পারেনি। পূর্ব-পাকিস্তানের পুণ্যদিন একুশে ফেব্রুয়ারি। বাংলা ভাষার জন্য তরুণেরা প্রাণ দিলেন, রক্তের অক্ষরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁদের ভালবাসা লিখে গেলেন। দেশে দেশে স্বাধীনতা ও ধর্মের জন্য বহু জনে প্রাণ দান করেছেন। কিন্তু বাংলা চাই বলতে বলতে মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দেওয়া প্রথম এই পূর্ব-বাংলায় দেখা গেল। সকল বাঙালির তাঁরা প্রণম্য।

মোটামুটি এই হল বক্তব্য। সেই যে আমার ভাই—গ্রাতুক ডানিয়েলচুক—রুশে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিল। আপনারা হলে কত দূর-ছাই করতেন—ওরা কি বুঝল খোদায় মালুম—ফাঁকি দিয়ে কিছু তারিপ কুড়িয়ে নেওয়া গেল। আমার পরে হীরেন মুখুজ্জে মশায়—তিনিও বাংলা সাহিত্য নিয়ে বলবেন। তিনি ছিলেন না, অন্য কোন কাজে বেরিয়েছিলেন, বক্তৃতা শেষ হবার মুখে এসে পড়লেন। ছিলেন না ভাগ্যিস—পণ্ডিত মানুষ, অতুলন বক্তা, তাঁর সামনে কথাই সরত না মুখ দিয়ে। কামারের কাছে সূঁচ চুরি চলে না। কোন সভায় একদিন বলেছিলাম বাংলা সাহিত্য দুনিয়ার এক সেরা সাহিত্য। হীরেন্দ্রনাথ চুপি চুপি সমঝে দিলেন, দুনিয়া অবধি টানেন কেন, বড্ড বাড়াবাড়ি, গোটা ভারত ধরেই না হয় বলুন। আমি বলি, গতিক দেখছেন—দুনিয়ায় কেউ তো পোঁছে না আমাদের। সাহিত্যকে আকাশে তুলে দিয়ে চলে যাই—ওরা খানিকটা বাদসাদ দিয়ে নিচ্ছে, যত দিন যাবে নামতে নামতে আকাশ থেকে ক্রমশ ধরালোকে পৌঁছবে। এখনকার মতো পাতালের তলে আশা করি মুখ থুবড়ে পড়বে না আবার। হীরেন্দ্রনাথ আন্দাজে ধরেছেন, ফাঁপিয়েছি খুব আজকেও। শুরু করলেন তাই নিয়ে: আমার বন্ধু বোস মশায় ভালবাসার উচ্ছ্বাসে বাড়িয়ে বলেছেন হয়তো—তা হলেও বঙ্গ সাহিত্য···ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইংরেজিতে বললেন। সে বক্তৃতা টুকে আনি নি, টোকা অসম্ভব। অপরূপ বাচনভঙ্গি, খরস্রোতে ছুটে চলেছে। লেখায় তারকিছুই বোঝা যায় না—কানে শুনতে হয়, চোখের উপর দেখতে হয়। সেই অপরাহ্ণে দূর বিদেশের অজ্ঞাত পরিবেশে দুই বাঙালি আমরা প্রাণ ভরে বাংলা সাহিত্যের গুণগান করলাম। [ক্রমশঃ

"জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে অদৃশ্য, তবুও বহু শত আছে যা প্রত্যক্ষ, ইতিহাসে যা উজ্জ্বল। জীবনের এই সৃষ্টিকার্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে, তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে।"

—রবীন্দ্রনাথ

ডক্টর শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[মহামান্য বিচারাধিকরণের ভূতপূর্ব বিচারপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য]

আইনের ক্ষেত্রে গৌরবের সঙ্গে ফসল ফলিয়েও শিক্ষার উর্বর ভূমিতেও সমান গৌরবের সঙ্গে পড়েছে যাঁদের সুস্পষ্ট পদচিহ্ন সেই স্মরণীয় সন্তানদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ ভাবে মনে পড়ে যথা—স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাঃ রাধাবিনোদ পাল, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই ক'টি নামের সঙ্গে আর একজন কীর্তিমান পুরুষের নামও অনায়াসে যুক্ত করা যায়। আইনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভাবে সিদ্ধান্তদানে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রচেষ্টায় যিনি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণের অধিকারী—তাঁর নাম শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

বীরভূম জেলার কিরণহর গ্রামে শম্ভুনাথের জন্ম। স্বীয় মাতামহ স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সরকার (গঙ্গোপাধ্যায়) মহাশয়ের নামাঙ্কিত বিদ্যালয়ে করেন প্রথম পাঠগ্রহণ। এর পর আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে তাঁকে পাওয়া যায়, তারই মধ্যে একটির প্রধান শিক্ষক ছিলেন শম্ভুনাথেরই পিতৃদেব স্বর্গীয় বিন্দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। পালামৌ জেলা স্কুল থেকে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে এলেন মহাবিদ্যালয়ের পাঠের সঙ্গে পরিচিত হতে। প্রথমে পড়তে থাকেন ডাফ কলেজে (স্কটিশ চার্চেস কলেজ), তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজে। সেখান থেকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে পিয়োর ম্যাথামেটিকস্‌এ প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়ে এম-এ পরীক্ষায় হলেন সসম্মানে উত্তীর্ণ। তার পর শুরু হ'ল কর্ম-জীবনের। আমহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চলে একটি ছোট বিদ্যালয় ছিল সেদিন। সেই বিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষাদানের ভার পেলেন শম্ভুনাথ মাসিক পনেরো টাকা বেতনের বিনিময়ে। এই সঙ্গেই স্কটিশ চার্চেস কলেজে অঙ্কশাস্ত্রের বক্তার পদ গ্রহণ করেন তিন মাসের জন্যে, পরে আরও একটি বছর তাঁকে সেই পদে থাকতে হয়। এই সময়ে তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডক্টর ওয়াটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শম্ভুনাথ। অধ্যক্ষ তাঁকে সিনিয়ার প্রোফেসারের নিয়োগপত্র দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার পরেই এডিনবরা থেকে ঐ পদে নিযুক্ত হয়ে এক ভদ্রলোকের আগমন ঘটে। পদত্যাগপত্র পেশ করে শম্ভুনাথ চলে গেলেন বর্দ্ধমানে আইন-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে (এরই মধ্যে আইন পরীক্ষাতেও শম্ভুনাথ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন)। কিন্তু বর্দ্ধমান শম্ভুনাথকে ধরে রাখতে পারল না, সেখানকার পরিবেশ শম্ভুনাথের মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারল না। চলে এলেন কলকাতায়। হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করলেন, সেই সঙ্গেই মাসিক একশো পঁচিশ টাকা বেতনে রিপণ কলেজে গণিতশাস্ত্রের বক্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁকে ইংল্যাণ্ড যেতে হয় প্রিভি কাউন্সিলের সঙ্গে যুক্ত একটি মামলার ব্যাপারে। সেইখানে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ হন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলকাতা হাইকোর্টের একজন ব্যারিষ্টার বলে গণ্য হন। রিপণ কলেজও তাঁকে আইনের অধ্যাপকের নিয়োগপত্র দেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপকের দায়িত্ব ভার থেকে অব্যাহতি নেন শম্ভুনাথ। ব্যারিষ্টারীর চাপে তিনি বাধ্য হন অধ্যাপনা ছাড়তে, নয় তো অধ্যাপক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী। পশার চমৎকার জমতে থাকে। আইনজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি তাঁর ক্রমশঃই ছড়িয়ে পড়ছে দূর থেকে দূরান্তরে। এঁর জেরা করার অদ্ভুত ক্ষমতা আকৃষ্ট করেছিল বহু বিচারককে। সংখ্যাতীত আইনজ্ঞদের। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিচারাধিকরণের বিচারপতিরূপে একদা ঘোষিত হল শম্ভুনাথের নাম। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের গৌরবোজ্জ্বল কর্মমুখর আসনে অধিষ্ঠিত হলেন বিচারপতি শম্ভুনাথ। উপাচার্য হিসাবে নানা দিক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন করে গেছেন শম্ভুনাথ। তাঁর অবসর গ্রহণোপলক্ষে তাঁর প্রতি অপরিসীম অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন ডাঃ রাধাবিনোদ পাল ও স্বর্গীয় ডাঃ মেঘনাদ সাহা। এগারো জন উপাচার্যের অধীনে

শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাজ করে শম্ভুনাথ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ (ভূতপূর্ব পৌরপাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও বর্তমান অস্থায়ী উপাচার্য) বলেছেন যে শম্ভুনাথের কর্ম-সাফল্য কারোর থেকে কম নয় বরং বেশীই। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ইনি সম্মানজনক এল-এল-ডি উপাধি লাভ করেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। উপাচার্যের প্রাপ্য মাসিক আড়াই হাজার টাকা বেতনের একটি কপর্দকও শম্ভুনাথ গ্রহণ করেন নি, যত দিন তিনি এই পদে সমাসীন ছিলেন। শম্ভুনাথের নিজস্ব গ্রন্থাগার একটি ছিল। প্রায় লক্ষ টাকা মূল্যের। সেই সমগ্র গ্রন্থাগারটি তিনি উপহার দিয়েছেন ওয়েষ্ট বেঙ্গল লিগ্যাল এড সোসাইটিকে। ভারত সরকার থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তিন লক্ষ টাকা সাহায্য পেতেন। উপাচার্য শম্ভুনাথের প্রচেষ্টায় তার অঙ্ক তিন থেকে ষোলোয় পরিণত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগগুলির পরিবর্ধন ও উন্নতি-সাধনের প্রচেষ্টা তাঁর জনৈক পূর্বসূরীর দ্বারা সাধিত হয়েছিল কিন্তু সেই প্রচেষ্টার পরিপূর্ণ সফলতা দেখা গেল শম্ভুনাথ যখন উপাচার্যের আসনে সমাসীন। ঐ বিভাগগুলির বর্তমান রূপের জন্যে দায়ী শম্ভুনাথ।

ভারতবরেণ্য আইনবিদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ডক্টর রাধাবিনোদ পাল শম্ভুনাথের অবসর গ্রহণ প্রসঙ্গে তাঁর উদ্দেশে বলেছেন—"This retirement will indeed be a great loss to the cause of higher education in West Bengal. For the last few years he was our centre of hope, not because of his being the centre of power in the University, but because of his wisdom. It will indeed be doing an ill-service to the reputation of an eminent lawyer, a splendid judge and an erudite Vice-Chancellor if I make any attempt here to make an estimate of the breadth of Dr. Banerjee's intelligent outlook and practical wisdom. He was indeed a lawyer who had mastered the technical learning of the law without being mastered by it."

বিচারপতির আসন থেকে অবসর গ্রহণ করার পর শম্ভুনাথকে দেখা গেল ইনকাম্-ট্যাক্স ট্রাইব্যুনালের একজন সদস্যরূপে। সুপ্রিম কোর্টের ইস্তাহারে প্রাসঙ্গিক আইন সমূহ অচল ঘোষিত হওয়ায় এই ট্রাইব্যুনালের অস্তিত্বও শেষ হয়। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের কার্য নির্বাহক সমিতির সভাপতিরূপেও ইনি কয়েক বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমাজ কল্যাণ সমিতি ও বঙ্গীয় ক্রম-গঠনিক সংস্থারও একজন সভ্য। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যবিধান সভারও ইনি একজন মনোনীত সদস্য (এম-এল-সি)।

শম্ভুনাথের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা সুষমাময়ী দেবীর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। নিরহংকারিতা ও ধর্মানুশীলনের জন্যে ইনিও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থা হয়েছেন।

অসাধারণ মেধা ও প্রচুর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে জীবনের সিঁড়িটি তিনি ধাপে ধাপে উঠে এসে আজ পরিপূর্ণ সাফল্যের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছেন। মেধা ও পরিশ্রম তাঁকে দিয়েছে সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথ নির্দেশ। অধ্যবসায় ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে নিয়ে গেছে প্রগতির মধুময় পথে। মানবতায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ তাঁর অন্তর। গত বছর যখন স্বগ্রামে পদার্পণ করেন শম্ভুনাথ তখন তাঁর সম্বর্ধনা-সভায় আশে-পাশের গ্রাম মিলিয়ে প্রায় পনেরো হাজার লোকের উপস্থিতি ঘটেছিল সেখানে। শম্ভুনাথের সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের স্বীকৃতি তার মধ্যেই নিহিত নেই কি?

সমাজ-কল্যাণ সমিতির সভ্যরূপে গত বছরের অগাষ্ট মাসে ইনি বোম্বাই ও পুণার সমাজকল্যাণ কেন্দ্রগুলিতে বোবা, কালা, বিকলাঙ্গ, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত প্রমুখ অসহায় নরনারীর প্রতি পরিচর্যাগুলি পরিদর্শন করেন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই সম্পর্কে এক রিপোর্ট পেশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঙলার অনুন্নত এলাকাগুলিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে শম্ভুনাথকে এক রিপোর্ট পেশ করতে অনুরোধ করেছেন। এই রিপোর্ট প্রস্তুত হয়েছে এবং অল্পকালের মধ্যেই যথাস্থানে প্রেরিত হবে। ইনি প্রথমে একটি কৃষি, পশু-চিকিৎসা ও গার্হস্থ বিজ্ঞান বিষয়ক মহাবিদ্যালয়ের প্রবর্তন সমর্থন করেছেন, অবশ্য এর পরে আরও কয়েকটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

দরদী শম্ভুনাথের অপরিসীম দান দেশের ভবিষ্যৎ লক্ষ লক্ষ নাগরিকের উপকারে আসছে, তাঁর একক দানে গড়ে উঠছে অনেকের ভবিষ্যৎ, অনেকের আশাহত জীবনে ঔজ্জ্বল্যের ছোঁয়া লাগছে তাঁর অবদানে, তাই দিয়েই গড়ে উঠছে তাঁর জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার বিজয়তোরণ, খোদিত হচ্ছে সাফল্যের প্রস্তর, ফলক, আকাশকে আলিঙ্গন করছে সিদ্ধির গৌরব-মীনার।

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

[বিশিষ্ট সাংবাদিক ও ভারতীয় লোকসভার সদস্য]

বেদ, বিদ্যা ও বিনয়—এই তিন 'ব' দিয়ে যার সৃষ্টি সেও আর এক 'ব', তা হচ্ছে ব্রাহ্মণ। জগতের মঙ্গল তাঁদের কামনা, মানুষের কল্যাণ কামনাই তাঁদের ব্রত, বিশ্বমানবাত্মার হিতসাধনেই তাঁদের আনন্দ। বাঙলার এই পূজনীয় ব্রাহ্মণকুলের গৌরবাধার পরম নিষ্ঠাবান পণ্ডিত পরলোকগত কালীকিঙ্কর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের আদি নিবাস ফরিদপুর জেলায়। কালীকিঙ্করের যখন আঠারো বছর বয়েস সেই সময় তিনি কলকাতায় এসে বসতি সুরু করেন। রেলগাড়ী তখন ছিল না—পায়ে হেঁটেই কলকাতায় আসেন কালীকিঙ্কর তর্কসিদ্ধান্ত।

১৯০১ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতাতেই কালীকিঙ্করের পুত্র চপলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরাধিকার-সূত্রেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক, পিতার বিদ্যানুরক্তি পরিপূর্ণভাবে দেখা দিল পুত্রের মধ্যে। প্রথমে পাঠশালায় তারপর বৈয়াকরণ-কেশরী শিবনারায়ণ শিরোমণির টোলে, তারপর বাঙলার প্রথম বোর্ডিং স্কুল এরিয়ান ইনষ্টিটিউশানে (বর্তমানে সারদাচরণ এরিয়ান) পাঠগ্রহণ করে ১৯১৭ সালে উত্তীর্ণ হলেন প্রবেশিকা

পরীক্ষায়। টোলে শিক্ষাগ্রহণ কালে চপলাকান্ত মুখস্থ করে ফেলেন সমগ্র অমরকোষ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠকালীন চপলাকান্তের সম্যক পরিচয় হয়েছে কুমারসম্ভব ও উত্তররামচরিতের সঙ্গে। প্রবেশিকা পরীক্ষান্তেই আয়ত্তে এনেছেন বাল্মীকির রামায়ণকে। কলেজ-জীবনে পাণিনি সম্বন্ধে পাঠ নেন পণ্ডিত চন্দ্রিকাদত্ত মিশ্রের কাছে।

১৯২১ সাল। বি-এ পড়ছেন চপলাকান্ত। পরাধীনতার জ্বালা সূঁচের মতন বিঁধছে সারা দেশের গায়ে। সেদিন সেই জ্বালা নিবারণ করতে সব চেয়ে আগ্রহ নিয়ে এসেছিল দেশের তরুণ সম্প্রদায়। তারুণ্যের মূর্ত প্রতীক এ যুগের অভিমন্যু সুভাষচন্দ্র তখন জয় করেছেন দেশের চিত্ত, জাতীয় ভাগ্যাকাশে সেদিন পরিপূর্ণ দীপ্তিতে জ্বলছেন কবি-রবি রবীন্দ্রনাথ, অন্তরের পুঞ্জীভূত সৌন্দর্য্য দিয়ে ভারতমাতার মহিমময় রূপ-কল্পনায় বিভোর হয়ে আছেন সাহিত্যাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, পদগর্বী ইংরেজদের স্বভাবসুলভ অসৌজন্যতার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে তাদের বিব্রত করে চলেছেন পুরুষসিংহ আশুতোষ, পরম প্রাচুর্যের সীমিত বেড়াজাল ভেদ করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে নিখিল মানবের পাশে এসে দাঁড়ালেন যুগ-কর্ণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সাংবাদিকতায় ধারা-সৃষ্টি করেছেন প্রাতঃস্মরণীয় সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এই ১৯২১ সাল। স্বাধীনতা-যুদ্ধের একটি স্মরণীয় বৎসর, ঠিক এমনই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে আবির্ভাব হল এক ব্যক্তির। তাঁর নাম স্বর্গীয় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সাহিত্য ক্ষেত্রের এক জন যশস্বী পুরুষ স্বর্গত গান্ধীর আহ্বান থেকে চপলাকান্তও রাখতে পারলেন না নিজেকে দূরে সরিয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। পাঠ গ্রহণের হ'ল সাময়িক বিরতি। ১৯২২ সালে দেহরক্ষা করলেন পণ্ডিত কালীকিঙ্কর। এই সময় পূর্ববঙ্গের বহু জেলা পরিভ্রমণ করেন চপলাকান্ত। বাঙলাদেশের মাটিতে মাটিতে ছড়িয়ে আছে মোহনীয় মাধুর্য, বাঙলার আকাশ-বাতাস-জল-স্থল-ললনা প্রত্যেকের মধ্যেই পুঞ্জীভূত রয়েছে স্বর্গীয় সৌন্দর্য, বাঙলার প্রতিটি ধূলিকণায় মাখানো আছে পরম ভট্টারকদের পবিত্র পদরজ। বাঙলাদেশ দেখতে লাগলেন তারই উত্তরকালের এক যশ-মণ্ডিত পুত্র চপলাকান্ত।

১৯২৬ সালে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন চপলাকান্ত, এ দিকে সাংবাদিক জীবনেরও হয়েছে সূত্রপাত। ১৯২৫ সালে ফরোয়ার্ড পত্রিকায় শিক্ষানবীশ হিসেবে যোগ দিয়েছেন চপলাকান্ত। ১৯৩০ সালে আইন পরীক্ষায় ও ১৯৪১ সালে বাঙলায় এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন চপলাকান্ত। এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করলেন চপলাকান্ত। আইন ব্যবসায় শুরু করার প্রথমাবস্থাতেই তাতে ছেদ পড়লো। মালবজীর অধিনায়কত্বে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধ আন্দোলনে যোগ দিলেন চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। ১৯৩৮ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন চপলাকান্ত। সে সময় আনন্দবাজার সম্পাদন করতেন আদর্শ সাংবাদিক স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহোদয়। ১৯৪৪ সালে চপলাকান্তের নাম ঘোষিত হ'ল আনন্দবাজারের সম্পাদকরূপে। এ ছাড়া 'নিউ এরা' নামক একটি ইংরাজী সাপ্তাহিকও চপলাকান্ত সম্পাদনা করেছেন কিছু কাল।

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

সংস্কৃতভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ পূর্বাহ্ণেই বিবৃত করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার মূল যাঁরা—চপলাকান্ত তাঁদেরই অন্যতম, প্রভূত পরিশ্রম করে তিনি আনয়ন করেছেন তার বর্তমানের রূপ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের ও সিণ্ডিকেটের ইনি একজন সদস্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন তাঁর অক্ষয় কীর্তি এখানকার সাংবাদিকতার বিভাগটিকে একটি পৃথক ফ্যাকাল্টিতে পরিণত করার প্রচেষ্টা। এই সাধু প্রচেষ্টার পূর্ণরূপায়ণ নবগঠিত সিনেটের দ্বারা সম্ভব হবে। এই বিভাগটির প্রথম অবস্থা থেকেই চপলাকান্ত এর সঙ্গে যুক্ত।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারকল্পে পৃথিবীর বহু স্থান পরিভ্রমণ করেছেন চপলাকান্ত। জার্মাণী, ফ্রান্স, মিশর, গ্রেট ব্রিটেন, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী, ক্যানাডা ও এশিয়ার শ্যাম, কম্বোজ, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন চপলাকান্ত। গ্রন্থকার হিসাবেও তাঁর খ্যাতি সুপরিব্যাপ্ত। কংগ্রেস ইন এভলিউশান, কংগ্রেস সংগঠনে বাঙলার দান, ইংরাজীতে ব্যাডক্লিফ রোয়েদাদে বিচার, ভ্রমণ কাহিনী দক্ষিণ-ভারতে এবং কাব্যগ্রন্থ শেষ বসন্তে প্রমুখ গ্রন্থগুলির রচয়িতা তিনি। সুইজারল্যাণ্ডের ইণ্টারন্যাশনাল প্রেস ইনষ্টিটিউটের সঙ্গে ইনি যুক্ত, নয়াদিল্লীর নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক-সঙ্ঘ নিখিল ভারত বার্তাজীবী সঙ্ঘ, ভারতীয় সংস্কৃতি পরিষদ, বোম্বাইয়ের আন্তর্জাতিক সংস্কৃত পরিষদ পাটনার নিখিল ভারত দেবভাষা পরিষদ, কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতির কার্যনির্বাহক সমিতির ইনি একজন সভ্য, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের ইনি সম্পাদক। কলকাতার ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘের ইনি সভাপতি। কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত রবিবাসরের সঙ্গেও এঁর সংযোগ বিদ্যমান। বর্তমান বছরে ভারতীয় লোকসভায় সভ্যরূপে নির্বাচিত হয়েছেন চপলাকান্ত। পৃথিবীর নানাস্থানে ঘুরে চপলাকান্ত অনুভব করেছেন যে ভারতের সাংবাদিকতা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে বিদেশের দরবারে। আমরা ওদের থেকে ছোট তো নই-ই বরং বড়ই। আমি জিজ্ঞাসা করি, পেশা হিসাবে যারা সাংবাদিকতাকে গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে কি কি গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়, অভিজ্ঞ সাংবাদিক চপলাকান্ত জানান যে, দায়িত্ববোধ ও বিচারবুদ্ধিই এজগতের সর্বাপেক্ষা কাম্য বস্তু, তা যাদের আছে তাদের আগমনই এজগতের পক্ষে কল্যাণকর। স্বাধীন ভারতে সাংবাদিকতার যতটা উন্নতি হওয়া উচিত চপলাকান্তের অভিমতে তা মোটেই হয় নি।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলছে, কর্মব্যস্ত চপলাকান্তের সমীপে আগমন হতে থাকে দর্শনার্থীদের, আর স্বার্থপরের মত তাঁকে আটকে রাখা যায় না। নম্রতার প্রতিমূর্তি, মৃদুভাষী চপলাকান্তের কাছে বিদায় গ্রহণ করি। এসে দাঁড়াই প্রশস্ত রাজপথে, এক-পা, দু-পা

করে শুরু করি যাত্রা, সব কিছু পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে থাকি আমার গন্তব্য অভিমুখে।

শ্রীমনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব)

[স্বনামধন্য কবি ও সাহিত্য-শিল্পী]

জীবন সম্পর্কে নির্বিচার ঔদাসীন্যই শিল্পীকে বে-পরোয়া করে। ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের হেলাফেলার অন্ত থাকে না। প্রতিভার প্রদীপে তেল-সলতের প্রাচুর্য সত্বেও শিল্পীর চিরন্তন খেয়ালীপনায় নিজেকে নিঃশেষে শিখাহীন করে, বঞ্চিত হয় কাল ও সমাজ। শিল্পিজীবনে এইটিই বোধ হয় চরম ট্রাজেডী।

এই ট্রাজেডীর জলন্ত স্বাক্ষর যুবনাশ্বে।

আকস্মিক সাহিত্যের আকাশে তাঁর আবির্ভাব, বিদ্রোহের বাঁকা তলোয়ার হাতে। অথচ পরিচালনায় সংযমের দৃঢ়তা, আবার আকস্মিকতার ছড়াছড়ি তাঁর জীবনে।

বাংলা সাহিত্যে তখন প্রবল আলোড়ন। প্রখর রবিরশ্মির প্রভাবমুক্ত হবার সীমাহীন বাসনা নিয়ে একদল তরুণ সুকঠোর তপস্যায় রত। ধর্মে ও আচরণে পৃথক হয়েও স্বভাবে এক ছিলেন অনেকটা ইয়ং বেঙ্গলের উত্তরসূরী। যুবনাশ্ব এঁদের একজন।

যুবনাশ্ব সাহিত্যে ছদ্মনাম—আসল নাম মনীশ ঘটক। ১৯০২ খৃঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী পাবনা জেলার নতুন ভারেঙ্গা গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা সুরেশচন্দ্র ঘটক ছিলেন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। সরকারী কর্মব্যপদেশে তাঁকে ঘুরতে হয়েছে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায়। কৈশোর পিতার সঙ্গে সঙ্গেই কাটে। পদ্মা-যমুনা-মেঘনা-কর্ণফুলীর তীরে তীরে পড়েছে তাদের ছাউনি। খাল বিল নদী নালায় ভরা শ্যামল পূর্ববঙ্গ ও রুক্ষ শুষ্ক তাপদগ্ধ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই মনীশ বাবু ছেলেবেলা থেকে ঘুরে বেড়িয়েছেন—এর মধ্যে কোনটির প্রভাব তাঁর কবি প্রতিভার উন্মেষের কারণ ও সহায়ক সেটা বলা দুঃসাধ্য। কারণ তাঁর সামাজিক কাব্যজীবনের মূল সুর বিদ্রোহের বজ্রনাদ ভরা। যা কিছু অন্যায় অসত্য বা নিছক বঞ্চনা ও অশোভন দীনতা—তাঁর নির্মম বাঁকা তলোয়ারে সে সব রক্ষা পায়নি। অথচ অন্তে আছে এক অনির্বচনীয় প্রেমের সুর। যা বাস্তবকে সুন্দর করে, শোভন করে, মধুর করে। যা বিক্ষুব্ধ ক্লিষ্ট ও হতচেতন মনে জীবনের বলিষ্ঠ আশা আকাঙ্খার দ্যোতক। সুতরাং কল্পনায় তিনি বারি-ঝর-ঝর শ্রাবণ মেঘের অভিসারী—ব্যঞ্জনায় রৌদ্রদগ্ধ আকাশের মতো নির্মম। প্রগলভ ভাবালুতার প্রশ্রয় আদৌ তিনি দেননি। কল্পনা ও ব্যঞ্জনার এই বিপরীতমুখী সমন্বয় ঘটেছে তাঁর কাব্যে ও জীবনে।

১৯১৯ সালে চট্টগ্রাম থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কোলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এবং সেখান থেকে বি-এ পাশ করেন। এই সময় থেকেই তাঁর সাহিত্য-জীবন সুরু। সহাধ্যায়ী ৺বিজয় সেনগুপ্ত সহ ১৯২৩-২৪ সালে মনীশ বাবু কল্লোলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন। এবং যুবনাশ্ব ছদ্মনাম গ্রহণ করেন।

মুখ্যতঃ কবি হিসাবেই মনীশ বাবুর পরিচয়। যদিও তাঁর "ভুখা ভগবান" নামক ছোট গল্প তৎকালীন পাঠক সমাজের প্রভুত অভিনন্দন লাভ করেছিল এবং সিগনেট প্রেস সংকলিত Modern Bengali short stories এ তাঁর গল্প স্থান পেয়েছে। তবুও মনীশ বাবু নিজেকে কবি হিসেবে পরিচিত করতে চান। ১৯৩৫-৪০ পর্যন্ত প্রধানত তাঁর একটানা কাব্য পরিক্রমা। এই সময় 'বিশ্বভারতী' 'কবিতা' 'প্রবাসী' 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকার তিনি লেখকগোষ্ঠীর একজন।

৺অজিত চক্রবর্তী এবং বোম্বাই প্রবাসী ইকনমিক উইকলির সম্পাদক শ্রীশচীন চৌধুরীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ফলে তাঁরা মনীশ বাবুকে কাব্যচর্চায় প্রবুদ্ধ করেন। পরবর্তী কালে শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীসুধীন দত্তের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তাঁর কাব্যজীবনের বিকাশ সুরু হয়। ১৯৪০এ শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত নামচিত্রসহ তাঁর প্রথম কবিতার বই শিলালিপি প্রকাশিত হয়।

শিলালিপি প্রেমের কবিতায় সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা কাব্য পরিচয়' সিগনেটের 'বাংলা কবিতার সংকলন' বুদ্ধদেব বসুর 'আধুনিক বাংলা কবিতা' আবু সয়ীদ আইয়ুব সংকলিত পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা ইত্যাদি গ্রন্থে মনীশ বাবুর কবিতা স্থান পেয়েছে, ১৯৫৫এর মাসিক বসুমতীতে তাঁর কাব্য জীবনের অন্যতম দুটি কবিতা "বেয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতির তলায় বেয়াল্লিশ হাজার জানোয়ার" ও "ওদিকে আন্দামানে" প্রকাশিত হবার পর—কাব্যচর্চায় ছেদ পড়ে।

১৯২৭ খৃঃ আয়কর বিভাগে তাঁর কর্মজীবন সুরু। চাকুরি জীবনে তিনি ছিলেন নিরাসক্ত। স্বভাবের গভীরে সুপ্ত বিদ্রোহী সত্তা তাঁর কর্মজীবনকে ব্যক্তিত্বহীন নিরাপদ হতে দেয়নি।

পারিবারিক জীবনটিও তাঁর শিল্প ও সাহিত্যের পরিবেশে স্নিগ্ধ, দৈনন্দিন জীবনের ঘরে-বাইরে তার ছোঁওয়া সুস্পষ্ট—এ বিষয়ে বহু

শ্রীমনীশ ঘটক

ল,
নেমেছি
ন তো
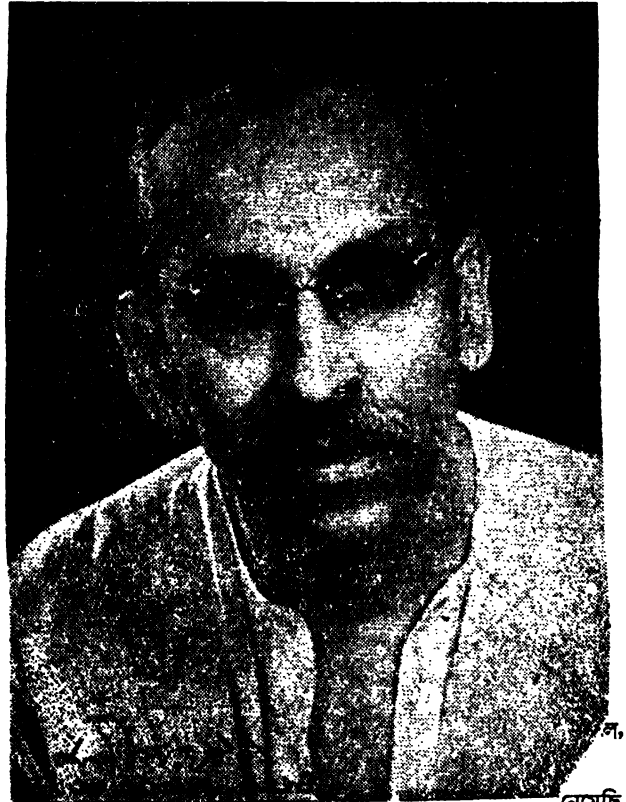
শিল্পীর চেয়ে তিনি ভাগ্যবান। সহধর্মিণী ধরিত্রীদেবী জয়শ্রীযুগের সুলেখিকা। জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য অধুনা বহু সাহিত্যের অন্যতমা লেখিকা। দ্বিতীয় কন্যা শাশ্বতী মিতুল ঘটক নামে Eve's weekly (বোম্বাই) কাগজের শিল্প নির্দেশিকা; সফল মঞ্চ ও চিত্রনাট্যের রচয়িতা বিজন ভট্টাচার্য তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা।

চাকুরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণান্তে মনীশ বাবু বর্ত্তমানে বহরমপুরের নিভৃত কুটিরে বসবাস করছেন। প্রবন্ধ-পাঠানুরাগ; অথচ লেখার বিষয়ে দারুণ ঔদাসীন্য। হয়তো প্রচণ্ড আত্মবিশ্লেষণই তাঁর নিয়মিত রচনার আসল প্রতিবন্ধক। এ প্রশ্ন দীর্ঘকায় সুপুরুষ মনীশ বাবুর ললাট মাঝে মাঝে রেখায়িত করে।

সাময়িক ব্রতচ্যুত যুবনাশ্বের সাহিত্যচর্চায় পূর্ণচ্ছেদ পড়েনি। কাব্যলক্ষ্মীর সুরঝংকার আজও তাঁকে আকুল করে তোলে। আবার বঙ্গ-সাহিত্যের রাজপথে ঘোড়সওয়ারের ভূমিকায় চাবুক হাতে তাকে দেখা যাবে—এই বহু প্রত্যাশিত আশ্বাসই তিনি দিয়েছেন,—আবার তিনি বলবেন :—

কশাও চাবুক কশাও ঘোড়সওয়ার
হাতে থাক খোলা ভাঙ্গা সে তলোয়ার।
বিজলী-ঝলক ঝলসাক ইস্পাতে।
পুড়ে ছিঁড়ে যাক কালোরাত সাথে সাথে।
সবল পেশী কি গাহিয়া ওঠে না গাথা।
আগুন জ্বলে না শুষ্ক আঁখির কোণে
কলিজার খুনে ফোয়ারার হাহাকার ?

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

[সমাজসেবী ও বেল্টিং-শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা]

১৮৮৯ সালে শ্রীলাহিড়ী হুগলী জিলার অন্যতম মহকুমা সহর শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ বৎসর বয়সে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্রীরামপুর কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠনের ব্যবস্থা না থাকায় তিনি বহরমপুরে আসিয়া স্থানীয় কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতে রসায়ন-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি, এস-সি পাশ করেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে এম, এস-সি ক্লাসে যোগদান করেন এবং ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় বিপ্লবী দলের নির্দ্দেশে ১৯১০ সালে তাঁহাকে স্ব... ...মেরিকা যাত্রা করিতে চপ... পথিমধ্যে জাপানে ব্যবসা... ...বিহারী বসু প্রমুখ প্রথমাব... ...র সহিত তিনি

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

কিছুকাল অতিবাহিত করেন। আমেরিকা মহাদেশে পৌঁছাইয়া তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম তীরবর্ত্তী অঞ্চলস্থ ভারতীয় বিপ্লবী-সংস্থা প্রসিদ্ধ "গদর পার্টি"র নেতাদের সহিত সংযোগ-স্থাপনা করেন এবং ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে ভর্ত্তি হন। ১৯১৩ সালে এম, এস-সি ডিগ্রী লাভ করিয়া যখন তিনি উক্ত শিক্ষা-নিকেতনে রসায়নশাস্ত্রে গবেষণামূলক কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তখন অর্থাৎ ১৯১৪ সালে ইউরোপে প্রথম মহাসমরের রুদ্রতাণ্ডব আরম্ভ হইয়া যায়। এই সুযোগে ভারতে বিদেশী শাসকদের চরম আঘাত হানিবার জন্য স্বদেশে ও বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবী দলের সদস্যরা প্রস্তুত হইতেছিলেন। সেই সময় ইউরোপীয় শাখার নির্দেশে জিতেন্দ্রনাথকে জার্ম্মাণী অভিমুখে যাত্রা করিতে হয়। বার্লিনে উপস্থিত হইয়া তিনি নিজেকে পশ্চিম-আফ্রিকাবাসী জার্ম্মাণ নাগরিকরূপে পরিচয় দেন এবং পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী "ধ্বংসাত্মক কার্য্যে বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার-বিধি ও প্রয়োগ-কৌশল" নিপুণতার সহিত আয়ত্ত করিতে থাকেন। কয়েক মাস পরে জার্ম্মাণ সরকারের সাহায্যে গোপনে আমেরিকা হইতে দুইখানি অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ জাহাজ ভারতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দলের নির্দ্দেশে শ্রীলাহিড়ী স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু ১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কুখ্যাত তিন আইনে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া ইংরাজ সরকার একটি জাহাজ জাভায় আটক করেন এবং অপরটি হইতে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বালেশ্বরের সন্নিকটে অস্ত্রশস্ত্র নামাইবার সময় বিপ্লবীদলের সহিত সরকার পক্ষের এক ঐতিহাসিক সংঘর্ষ হয়। উহাতে বিখ্যাত বিপ্লবী চিত্তপ্রিয় ঘটনাস্থলে নিহত হন, দলনেতা 'বাঘাযতীন' সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হন এবং মনোরঞ্জন ও নীরেন ধৃত হন। সুপ্রচেষ্টার এইরূপ বিপর্য্যয় এবং চার জন সহকর্ম্মীর এইরূপ পরিণতি কারাভ্যন্তরে অবস্থিত অসহায় জিতেন্দ্রনাথকে অতিশয় বিচলিত করিয়া তোলে। যুদ্ধ শেষে ১৯১৯ সালে শ্রীলাহিড়ী মুক্ত হইয়া আসেন। তৎপরে তিনি বিভিন্ন গঠনমূলক কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন এবং উহার মাধ্যমে বিদেশী শাসন ও শোষণ বন্ধের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। বিদেশী দ্রব্য বয়কট উপলক্ষ্যে তখন ভারতবর্ষে নব নব শিল্প প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছিল। অনুসন্ধিৎসু জিতেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে শিল্পায়নের অপরিহার্য্য অঙ্গ বেল্টিং এর প্রচুর চাহিদা বিদেশ হইতে আমদানীর মাধ্যমে মিটান হইয়া থাকে। ফলে, দরিদ্র দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা বাহিরে চলিয়া যায়। তজ্জন্য রাসায়নিক জিতেন্দ্রনাথ স্বচেষ্টায় শ্রীরামপুরে ভারতের প্রথম বেল্টিং শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া বিদেশী ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। উহা পরিচালনায় বহু বাধা বিপত্তি আসা সত্ত্বেও দৃঢ়চেতা জিতেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে বর্ত্তমানে উহা বাংলা তথা ভারতের নিজস্ব শিল্প বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এবং প্রায় দেড় হাজার পরিবার প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর "ভারত-ছাড়" আন্দোলনে জড়িত সর্ব্বভারতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হইলে জিতেন্দ্রনাথ উহার প্রতিবাদ করেন। ফলে তৎকালীন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে স্বগৃহে অন্তরীণ করিয়া রাখেন। ১৯৪৫ সালে মুক্ত হইয়া তিনি পুনরায় বিভিন্ন গঠনমূলক কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রীরামপুর কেন্দ্র হইতে বিধান সভায় এবং ১৯৫৭ সালে উহার লোকসভা কেন্দ্র হইতে এম, পি নির্ব্বাচিত হন।
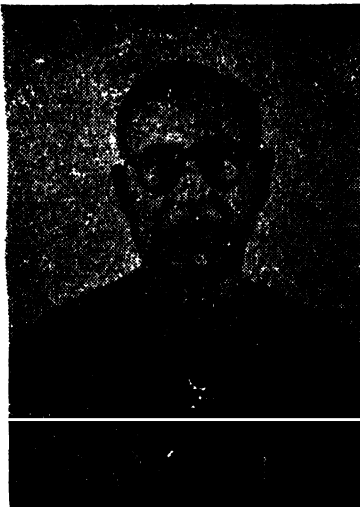
উদয়ভানু

উপলঘাতিনী গঙ্গার জলকল্লোলের একটা অস্ফুট শব্দ যেন কখন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তীরের জঙ্গলে অবিশ্রান্ত ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। পূর্ণ শুক্লতিথির জ্যোৎস্না-আলোয় জঙ্গলের দুর্ভেদ্য আঁধার ঘোচে না। অরণ্যচারী পশুর উজ্জ্বল চোখ সহসা আলোর ঝিলিক তুলে অদৃশ্য হয়ে যায়। খানিক আগে ঢেঁড়া পিঠেছে তীরের বাসিন্দারা; কাছাকাছি কোথায় হয়তো বাঘের ভয় দেখা দিয়েছে। ফেউ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁড়া পিটে পিটে গ্রামের মানুষকে সাবধানী নিশানা শোনানো হয়েছে। রাত্রি গভীর হওয়ায় ফেউয়ের ডাক থেমেছে এখন। বাঘ পালিয়েছে বনের মধ্যে।

বাঘ না বাঘিনী! কুমারবাহাদুরের সংযত মনটা মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে; চোখের রাশ আলগা হয় থেকে থেকে। প্রথম দেখায় যেন দেখতে পেয়েছেন কাশীশঙ্কর, এ মেয়ের মুখে যেন সম্রাজ্ঞীর লক্ষণ। এই ঘোর বিপদের রাতেও তার চোখে যেন ভয় বা আশঙ্কার চিহ্ন নেই।

—সর্দার, দেরী কত আর?

কথার সুরে হুমকি দিলেন কুমারবাহাদুর। সারা বজরার লোকজন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো সহসা। সবুর সহ্য হয় না কাশীশঙ্করের। মুখ থেকে কথা খ'সলে আর যেন স্থির থাকতে পারেন না। বজরার শম্বুক গতি, তীর থেকে মধ্যগঙ্গায় ভাসতে ভাসতে একটি প্রহর হয়তো উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। সুদক্ষ অশ্বারোহী কুমারবাহাদুর, বিদ্যুতের মত দ্রুততম বেগে ঘোড়া ছোটাতে পারেন। হঠাৎ যেন এক দৈবপ্রেরণায় তিনি চঞ্চল হয়েছেন অতিমাত্রায়, তাঁর পেশীবহুল দীর্ঘদেহে খুশীর জোয়ার নাচতে থাকে যেন। কি এক পণরক্ষার কাঠিন্য ফুটেছে সূক্ষ্ম চিবুকে। মাঝে মাঝেই চিবুক স্পর্শ করছেন। চিন্তায় আকুল চোখে রহস্যময় চাউনি ফুটে আছে।

বজরার কাঠের পাটাতনে খটাখট আঘাতের শব্দ ওঠে। হাল আর দাঁড় তোলাপাড়া করছে মাঝিরা। সর্দারও চেঁচিয়ে উঠলো। বললে,—দেরী নাই হুজুর!

হলুদ-ছোপানো কাপড়ে মানিয়েছে বটে আনন্দকুমারীকে। মাথায় সামান্য ঘোমটা দিয়ে কাপড়ের আঁচল এঁটেসেঁটে কোমরে জড়িয়েছে। ভিজে চুলের বোঝা এলিয়ে দিয়েছে পিঠে। ডুব-সাঁতারের কষ্টে এখনও যেন থেকে থেকে হাঁফিয়ে উঠছে।

পানের ডাবরটা ঠেলে এগিয়ে দিলেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—ইচ্ছা হয়তো দু'টা একটা পান—

কথা অসমাপ্ত থেকে যায়। আয়েসের হাসি হেসে দু'টি তাম্বুলমাখা পান মুখে দেয় চৌধুরাণী। বলে,—মহাশয়ের আসল পরিচয়টা শুনা হয় নাই এখনও।

মশালের আলোয় আর একবার দেখলেন কাশীশঙ্কর। চৌধুরাণীর মুখখানি দেখতে দেখতে বললেন,—আমি তেমন কেউ খ্যাতিমান নই। পরিচয়টা আপাতত গোপন থাক।

এক থলি টাকা পেয়েছে মাঝি-সর্দার। হাতে হাতে পেয়েছে শালুর থলি, ভারী ওজনের। রাতের আবেশে তন্দ্রা-নামা চোখে ঘুমের বদলে উৎফুল্লতা ফুটেছে। ঘুমন্ত মাঝিদের লাথি মেরে মেরে ঠেলে তুলছে। যারা ক্লান্তি আর ঘুমের ঘোরে উঠতে চায় না, তাদের চোখের সামনে লাল শালুর থলি ধরছে।

জগমোহন লেঠেল মুখ উঁচিয়ে বললে,—কুমারবাহাদুর, মাংসটা সিদ্ধ হ'তে আরও একটুক বিলম্ব হবে।

তিনটি চুল্লীতে ভাত, ক্ষীর আর মাংস চেপেছে। কাঠের আগুন জ্বলছে লেলিহান শিখা ছড়িয়ে। গন্ধে গন্ধে আশেপাশে শিয়ালের দল এসে জুটেছে। ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে গোঁফ চাটছে লোভে লোভে।

কাশীশঙ্কর বললেন,—একটা আটসেরী ছাগ সিদ্ধ হ'তে রাত্রি কাবার হবে না কি? চুল্লীতে টাটকা কাঠ দেও। ভাত আর দুধটা নেমেছে কি বলতে পারো?

—এখনই নামবে হুজুর! জগমোহন লেঠেলও কথা বলে ভয়ে ভয়ে। মালিককে দেখলে তার সকল শক্তি যেন উবে যায় দেহ থেকে। এত দাপট কোথায় অদৃশ্য হয়।

—যাও যাও, চুল্লীতে টাটকা কাঠ দেও। কথা বলতে বলতে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কুমারবাহাদুর। বজরার ছাদে পায়চারী করতে থাকেন। আনন্দকুমারীর উদ্দেশে বললেন,—তোমার পিতার সঙ্গে কোথায় দেখা হয় বলতে পারো?

কয়েক মুহূর্ত স্থির ব'সে থেকে চৌধুরাণী। সভয়ে মিহি কণ্ঠে বললে,—কি প্রয়োজন জানতে পারি কি?

আপন মনে হাসতে থাকেন কাশীশঙ্কর। তাঁর মনে কি এক ভাবের উদয় হয় যেন। পায়চারী থামিয়ে হাসি লুকিয়ে বললেন,—বিপদের ভয় নাই কিছু, প্রয়োজন আমার ব্যক্তিগত।

মুখের পাণ আর তাম্বুল বিস্বাদ লেগেছিল যেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কথাটি শুনে স্বস্তির শ্বাস ফেললো আনন্দকুমারী। বললে,—বাবামশাই সুতানুটি থেকে ফিরে আসেন তো দেখা হবে।

অল্প হাসির জের টেনে কাশীশঙ্কর বললেন,—ব্যবসায় নেমেছি আমি। চৌধুরীমশাই যদি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করেন তো আমাদের মত মানুষ ধন্য হয়ে যায়।

নম্রমিষ্ট হাসি হাসলো চৌধুরাণী। আনত চোখে বললে,—আপনারা রাজা বাদশাহ, আপনাদের কাছে বাবামশাই তো নেহাৎ নগণ্য।

কৌতূহলী হাসি চাপলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—তক্ত-সিংহাসন নাই তথাপি রাজা বাদশাহ!

আনন্দকুমারী বললে,—মহাশয় যদি পরিচয় গোপন করেন আমি আর কি বলতে পারি? বিন্ধ্যবাসিনী শুনেছি রাজার মেয়ে। আপনি তো রাজকন্যার সহোদর?

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মুখে তর্জ্জনী চেপে কাশীশঙ্কর বললেন,—চুপ! কাকপক্ষীও যেন টের না পায়। মান্দারণের বাসিন্দা আমার পরিচয় জ্ঞাত হ'লে কার্য্য উদ্ধার হবে না। কথা বলতে বলতে খানিক থেমে আমার বললেন,—চৌধুরীর মেয়ে, তোমাকে একটা কাজে নিযুক্ত করতে চাই।

যুক্তকর বুকে ঠেকিয়ে চৌধুরাণী বললে,—হুকুম করুন জাঁহাপনা। সামর্থ্যে যদি কুলায় আমি পেছপাও হবো না।

—না না, পরিহাস নয় আনন্দকুমারী! কথা বলতে বলতে আবার পায়চারী করতে থাকেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—তোমার দ্বারা কাজ উদ্ধার হয় তো রক্তপাত হয় না আর। তোমার উদ্দেশ্যটা এখন ব্যক্ত কর, তুমি কি স্বগৃহে যেতে চাও?

—না না জাঁহাপনা, গৃহে আর ঠাঁই হবে না আমার। চৌধুরাণীর মুখের হাসি মিলিয়ে যায় কথা বলতে বলতে। বলে,—আমার মা ঠাকরুণ আর কি আমার মুখ দেখবেন?

—তবে তোমার গন্তব্য কোথায় তাই বল'।

ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গে কাশীশঙ্কর শুধোলেন।

—মান্দারণেই ফিরবো আমি। তবে গৃহে আর ফিরবো না।

—কে আশ্রয় দেবে? সাগ্রহে বললেন কুমারবাহাদুর।

আনন্দকুমারী স্তব্ধ হয়ে যায়; মুখে কথা ফোটে না। আকাশের চাঁদের দিকে সলাজ চোখ তুললো। চন্দ্রকান্তকে মনে পড়লো। একবার তাঁর কাছে শেষ-আশ্রয় চাইতে দোষ কি? চৌধুরাণীর সুপ্ত মনে সহসা প্রতিহিংসার জ্বালা ধরে যেন। ঘোর বিপদের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়ে মৃত্যু আর সমাজের ভয়ে পালিয়েছেন চন্দ্রকান্ত। ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মত ফণা তুলে একবার তাঁকে দংশাবে না আনন্দকুমারী! কেমন যেন নেশাচ্ছন্নের মত চৌধুরাণী বললে,—দেখা যাক, কে আশ্রয় দেয়! মরি কি বাঁচি।

কাশীশঙ্কর বললেন,—আমি যে এখন তোমার সাহায্যপ্রার্থী। কার্য্য উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত কে তোমাকে মুক্তি দিবে?

ইদিক-সিদিক দেখলো চৌধুরাণী। স্তিমিতকণ্ঠে বললে,—যদি বলি একটা আশ্রয় না হয় মহাশয় আপনিই দেন? আমার দ্বারা কোন উপকার হয় তো আদেশ অবশ্যই পালন ক'রবো।

পায়চারী থামিয়ে কেমন যেন নিকটে এগিয়ে আসেন কাশীশঙ্কর। আনন্দকুমারীর কাছে এসে বললেন,—বিন্ধ্যবাসিনীকে চাই আমি। কৃষ্ণরামের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করতে চাই। বিন্ধ্যকে পাই তো তোমাকেও আশ্রয় দিতে পারি।

খিল খিল শব্দে হঠাৎ হেসে উঠলো আনন্দকুমারী। হাসতে হাসতে বললে,—আশ্বস্ত হলাম কুমারবাহাদুর! আশার আলো দেখতে পেলাম।

স্নেহের সুরে কাশীশঙ্কর বললেন,—বিন্ধ্য আর তুমি একত্রেই থাকতে পারো সুতানুটিতে, আপত্তি হবে না কারও। কিন্তু তুমি চৌধুরীর মেয়ে, তুমি কোন্ দুঃখে অন্যের ঘরে বাস করবে?

চৌধুরাণী হেসে হেসে বলে,—মান্দারণে ঠাঁই না পাই তো সুতানুটিতে যাবো আমি। আপনাদের চরণে থাকবো। যাই হোক, মনে হয় আপনি এখন খুবই বিচলিত। স্থির হোন আপনি, উদ্দেশ্য আপনার সফল হবেই। আমি সাহায্য করবো সাধ্যমত।

আসনে বসলেন কুমারবাহাদুর। পাণের ডাবর থেকে ক'টা পাণ তুলে মুখে দিলেন। বললেন,—এতক্ষণে আমি স্বস্তি বোধ করছি। মান্দারণের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই। অজ্ঞাত স্থান থেকে একজন বন্দীকে মুক্ত করা সহজ কর্ম্ম নয়।

—তাই বলি, আপনি এত ব্যস্ত হন কেন?

—আর ব্যস্ত হওয়ার কারণ নাই! তোমার সহায়তা পেয়েছি, আর কিছু চাই না আমি।

—আপনি আমাকে রক্ষা ক'রেছেন মৃত্যুর হাত থেকে। আমি কখনও ভুলতে পারি না উপকারীকে।—এই পৃথিবীতে কে কাকে রক্ষা করে?

বজরার ছাদের সিঁড়িতে জগমোহন দেখা দেয়। বলে,—হুজুর, বজরা জলে ভাসিয়ে দিক তবে?

কুমারবাহাদুর বললেন,—হাঁ। একটা কথা একশো দফায় বলতে পারি না আর।

এক-থলি টাকা পেয়েছে মাঝির দল। এই ঘোর নিশীথে নৈশ অভিযানে তাদের উৎসাহের অভাব হয় না। মাঝির দলকে গাঁজা খাইয়ে দিয়েছে জগমোহন লেঠেল। তামাকের কলকেয় গাঁজা ভ'রে ভ'রে খাইয়েছে।

বজরা জলে ভাসলো প্রচণ্ড ঠেলা খেয়ে। তীর থেকে গভীর জলে ভাসতেই চৌধুরাণী বললে,—কুমারবাহাদুর, একটা যদি প্রশ্ন করি, উত্তর দিবেন কি?

—আলবৎ দেবো। কথা বলতে বলতে একটি তাকিয়া টেনে নিয়ে ঠেস দিয়ে বসলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—আমার জীবনে গোপনায় কিছুই নাই।

সম্মতি পেয়ে ইদিক সিদিক দেখতে থাকে চৌধুরাণী। ফিস-ফিস কথা বললে,—মহাশয় কি বিবাহ ক'রেছেন?

হঠাৎ অট্টহাসি হাসলেন কাশীশঙ্কর। হাসতে হাসতে বললেন,—আজ নয়, বহুকাল পূর্ব্বেই এই গর্হিত কাজটা সমাধা করেছি। আমার একটি কন্যা আছে, তার নাম বনলতা, বনবালা, বন্যসুন্দরী।

মনে মনে আহত হ'লেও মুখে শুষ্ক হাসি ফোটায় আনন্দকুমারী। বলে,—বনলতার মা কোথায় আছেন এখন?

—সুতানুটিতেই আছেন। আমার পিত্রালয়ে।

—তাঁর নাম কি?

ইতস্তত বোধ করেন যেন কুমারবাহাদুর। খানিক থেমে বললেন,—তাঁর নাম মহাশ্বেতা। আমি নাম দিয়েছি রাতরাণী।

আঘাতটা বুকে লাগে যেন। চৌধুরাণী অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। অস্ফুটকণ্ঠে বললে,—তাঁর সিন্দুর অক্ষয় হোক। তিনি খুবই ভাগ্যবতী।

—ঈশ্বর জানেন। আমি ভাগ্যগণনা জানি না।

কেমন যেন আশাহতের মত একদৃষ্টে চেয়ে আছে আনন্দকুমারী। তার মনের সকল আনন্দ আর উৎসাহ যেন দপ ক'রে নিবে যায়।

ভাসমান মেঘের আড়ালে কখন লুকিয়েছে পূর্ণাকার চাঁদ। জ্যোৎস্নার আলো যেন ক্ষীণপ্রভ হয়ে আছে। কাশীশঙ্কর একবার লক্ষ্য করলেন আলো-আঁধারিতে। দেখলেন চৌধুরাণীর উজ্জ্বল চোখ দু'টিও যেন নিষ্প্রভ হ'তে থাকে। তার মুখের হাসির আভাস অদৃশ্য হয়।

বজরা গজেন্দ্রগমনে নদীর দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলেছে। জলে হালের আঘাতের ছপাছপ শব্দ ওঠে। একসঙ্গে অনেকগুলি হাল চ'লেছে।

চোখ নামালো চৌধুরাণী। কোমরে জড়ানো শাড়ীর বেষ্টন খুলে আঁচল টেনে পিঠে ফেললো। বললে,—বিন্ধ্যবাসিনী যদি ফিরতে না চায়?

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয় কাশীশঙ্করের। বললেন,—তবে তো রাজমাতার জীবন রক্ষা হওয়া অসম্ভব। আমিই বা তাঁকে মুখ দেখাবো কোন লজ্জায়?

কেমন যেন হতাশার হাসি হাসলো আনন্দকুমারী। বললে,—বিন্ধ্যবাসিনী নারী। নারীজাতি স্বামীর ঘর ত্যাগ করে না সহজে। তবে আশার কথা এই, বিন্ধ্যা স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আছে।

—আমরাও তাই জানি! কুমারবাহাদুর আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন। বললেন,—বিন্ধ্যাকে আমার সহ যেতেই হবে।

—আর আমাকে বানের জলে ভাসিয়ে দিয়ে যেতে হবে! ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বলে চৌধুরাণী।

—না, না, সে কি কথা! তোমারও একটা কিছু পাকাপাকি ব্যবস্থা হবে বৈ কি। কুমারবাহাদুর চোখ পাকিয়ে বললেন। বললেন,—তোমার মনোবাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।

—দেখা যাক কি হয়, ভেসে যাই না ডাঙ্গায় উঠি। কথার শেষে সহাস্যে উঠে পড়লো চৌধুরাণী। বললে—আমি ঘরে যাই, আপনি বিশ্রাম করুন কুমারবাহাদুর!

কাশীশঙ্কর দেখলেন, নবযৌবনা মেয়েটি ঠিক সাধারণ মেয়ের মত নয়। তার কথা আর হাবে-ভাবে ফুটে ওঠে এক ব্যক্তিত্ব—যা সচরাচর দেখা যায় না! তার রূপ-বৈচিত্র্য চক্ষুকে যেন প্রলুব্ধ করে! তার চালচলনে আভিজাত্য প্রকাশ পায়!

—আনন্দকুমারী! কুমারবাহাদুর ডাকলেন নাতিউচ্চকণ্ঠে। একটা কথা আছে। মুখে হাসি মাখিয়ে সিঁড়িতে দেখা দেয় চৌধুরাণী। সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গীতে বুক চিতিয়ে বলে,—কুমারবাহাদুর, আমি এসেছি।

—নিকটে আইস। কথাটি গোপন, সরবে ব্যক্ত করা যায় না। কথার শেষে চোখ-ইশারায় ডাক দেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—তুমি কি খুবই শ্রান্ত-ক্লান্ত?

বজরার ছাদে উঠে কুমারবাহাদুরের কাছাকাছি গিয়ে আবার ব'সলো আনন্দকুমারী। বললে,—আপনার অনুমান ঠিক। সত্যিই আমি ক্লান্ত। নিদ্রায় চোখ জড়িয়ে আসছে।

—রাত্রির আহারটা তবে সেরে নাও। কাশীশঙ্কর কথা বলতে বলতে আবার আসনপিঁড়িতে বসলেন তাকিয়া সরিয়ে দিয়ে। বললেন,—আহারান্তে নিদ্রাই সুখকর।

একটু হাসলো চৌধুরাণী। বললে,—আপনি অভুক্ত থাকবেন আর আমি রাক্ষসীর মত গোগ্রাসে গিলতে বসবো? তা হয় না কুমারবাহাদুর!

নৈকট্যের আবেগে বিমুগ্ধ হয়েছেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—তবে তুমি আর আমি একত্রে আহারে বসতে পারি। কিন্তু আরও খানিক সময় উত্তীর্ণ হোক। ক্ষুধার তত তীব্রতা বোধ করছি না ঠিক এখনই।

—কথাটি ব্যক্ত করুন। গোপন কথাটি কি, তাই শুনি।

কথা বলতে বলতে চৌধুরাণী একটি তাকিয়া টেনে নেয়। দেহটা ঈষৎ এলিয়ে দেয়।

কাশীশঙ্কর বললেন,—আমাদের শাস্ত্রে গান্ধর্ব বিবাহটা কি, তুমি কি জ্ঞাত আছো?

এ পাশে ও পাশে মাথা দুলিয়ে আনন্দকুমারী বললে,—আমি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নই কুমারবাহাদুর, মার্জ্জনা করবেন।

নিরাশ হ'লেন কাশীশঙ্কর। মৃদু গম্ভীর সুরে বললেন,—গান্ধর্ব্ব বিবাহে জাতবৈষম্য রক্ষা হয় না।

খিল-খিল শব্দে আবার হাসি ধরলো চৌধুরাণী। হাসতে হাসতে বললে,—আপনার এ চিন্তা কেন তাই প্রশ্ন করি।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকেন কাশীশঙ্কর। তার পর বলেন,—তোমার জন্য আনন্দকুমারী।

হাসি থামে না। চৌধুরাণীর হাসির শব্দ নদীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে। কেমন যেন ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হাসতে হাসতে বললে,—বিবাহে আর রুচি নেই কুমারবাহাদুর! পুরুষজাতির প্রতি আমার ঘৃণার শেষ নাই।

ঠিক এই ধরণের স্পষ্টোক্তি শোনায় অভ্যাস নেই কুমারবাহাদুরের। তিনি যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করলেন। কথার প্রত্যুত্তর দিতে পারলেন না।

আনন্দকুমারী আবার বললে,—আমার কথায় আপনি কি আহত হ'য়েছেন?

হাঁ না কিছুই বললেন না কাশীশঙ্কর। আকাশের দিকে চোখ মেলে ব'সে থাকলেন নিশ্চুপ।

চৌধুরাণী আবার সহাস্যে বললে,—কুমারবাহাদুর, প্রসঙ্গটা এখন চাপা থাক। চলুন আগে আহার শেষ করি। আমাদের খাওয়ার পাত্র সাজিয়েছে নীচের ঘরে।

কাশীশঙ্করের মুখের আকৃতির কোন বিকার দেখা যায় না। কেবল একটা গাম্ভীর্য্য প্রচ্ছন্ন হয়ে ফুটে আছে। তিনি শুধু বললেন,—তাই চল, আনন্দকুমারী।

বললেন কিন্তু ফরাস ত্যাগ ক'রে উঠলেন না কুমারবাহাদুর। তিনি সংযমের পক্ষপাতী। পদস্খলন কা'কে বলে তিনি জানেন না। কিন্তু আজ এই জ্যোৎস্নার রাতে কেমন যেন স্থির থাকতে পারলেন না কিছুতেই। মোহময়ী আনন্দকুমারীকে মুখ ফসকে ব'লে ফেললেন কথাগুলি। কাজটা কি গর্হিত হয়েছে, ভাবতে থাকলেন মনে মনে।

—কৈ, আসুন। কথা বলতে বলতে চৌধুরাণী একখানি হাত আগিয়ে ধ'রলো।

কাশীশঙ্কর সেই নরম হাত ধরলেন নিজের হাতে। ধ'রেই উঠলেন তিনি। আনন্দকুমারীর মুখপানে তাকিয়ে ঈষৎ হাসলেন যেন। খুশীর হাসি। রাত্রি তখন বেশ গভীরতর হয়েছে।

অথৈ জল থেকে দ্বীপে উঠেছে আনন্দকুমারী, তবুও তার ভয়ের কাঁপুনি ধরে থেকে থেকে। ম্যালেটকে যতবার মনে পড়ে আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়। ম্যালেট শিল্পী, বিদ্বান আর বৈজ্ঞানিক হ'লে কি হবে, তার অপহরণের স্পৃহা যেন ভয়াবহ। তার পৈশাচিক লালসা—ভাবতে ভাবতে আনন্দকুমারী কেমন যেন স্থির হয়ে যায়। সিঁড়ি-মধ্যপথে দাঁড়িয়ে পড়ে বিকল যন্ত্রের মত।

কাশীশঙ্কর বললেন,—শরীরগতিক কি ভাল নয় তোমার?

চৌধুরাণীর চোখের দৃষ্টিও থমকে থাকে। কুমারবাহাদুর দেখলেন মশালের আলোয়, আনন্দকুমারীর অনিন্দ্য মুখকান্তি যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। কি এক অত্যাচারের ক্লেশে যেন জর্জ্জরিত হয়েছে। কায়-ক্লেশের চিহ্ন স্পষ্ট হয়েছে মুখে।

আঁচলে মুখ মুছলো চৌধুরাণী। কাশীশঙ্করের চোখের বিস্ফারিত চাউনি বেশীক্ষণ যেন দেখা যায় না। চোখ নামিয়ে নেয় আনন্দকুমারী। ক্ষীণকণ্ঠে বলে,—কুমারবাহাদুর, আমার ভয় হচ্ছে যে!

হঠাৎ কোথা থেকে এক রাশ ভয় এসে আক্রমণ করে বণিক-কন্যাকে। ম্যালেটের সঙ্গে একত্রে দিন আর রাত্রি কাটিয়ে আজ নির্ভয়ের রাজ্যে এসে ত্রাসের হাত থেকে যেন রেহাই পায় না। অদৃশ্য ভয়ের করাল ছায়া দেখতে পায় যেন।

—আমি থাকতে ভয় পাওয়ার কারণ কি? কুমারবাহাদুর চুপি চুপি কথা বললেন, কথা যাতে অন্যের কানে না যায়।

—আমার কোন' দোষ নেই, ম্যালেট জোর করলে। আমাকে তার বজরায় তুললে! মুখে আঁচল চেপে কান্নার স্বরে হঠাৎ বললে চৌধুরাণী।

—তুমি চঞ্চল হও কেন এত! কে তোমার কাছে জবাবদিহি চায়? কাশীশঙ্কর বললেন হাসতে হাসতে। বললেন,—রাত্রি গভীর হয়েছে আনন্দকুমারী। ক্ষুধার জ্বালায় জঠর জ্বলছে।

—আহারে বসুন কুমারবাহাদুর। আমার তরে আপনি কষ্টভোগ করবেন কেন?

—আমাকে কি তুমি পশু ঠাওরাও? সহাস্যে শুধালেন কাশীশঙ্কর। আনন্দকুমারীর টোলখাওয়া চিবুক তুলে ধরলেন।

খানিক অপলক তাকিয়ে থাকে চৌধুরাণী। দুর্বোধ্য কথা শুনে অবুঝের মত যেমন তাকায় মানুষ, ঠিক সেই ধরণের অবাক চোখ যেন। সহসা দুই চোখ বন্ধ করলে সে। নতজানুতে ব'সে পড়লো কাশীশঙ্করের পদতলে। জলভরা চোখ তুলে বললে,—আপনি দেবতার চেয়ে বেশী আমার কাছে, আপনি যে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। মরণের হাত থেকে রক্ষা ক'রেছেন।

—রক্ষা করেন তিনি, মানুষ তো ছার! আবার কথা বলতে বলতে হাসলেন কাশীশঙ্কর। আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখিয়ে দিলেন, লুকিয়ে-থাকা রক্ষাকর্তাকে, ঈশ্বরকে। চৌধুরাণীর একখানি হাত ধরলেন সস্নেহে। বললেন,—আহারে বসতে চল'। অন্ন আর মাংস শীতল হ'লে বিস্বাদ লাগবে। আমিও ক্ষুধার্ত।

—ক্ষমা করবেন। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লো চৌধুরাণী। বললে,—চলুন আপনি; আমিও যাচ্ছি।

নীচের ঘরে এসে আবার বিস্মিত হয় সে। দু'খানি আসন প'ড়েছে পাশাপাশি। আহার্য্য সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন খানসমা রামপাখা ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। রঙীন লণ্ঠন জ্বলছে বজরার মধ্যে। ছাঁকা কাঁসার বাসনের সোনা-আভা ঠিকরোচ্ছে।

চৌধুরাণীর চোখের বিস্ময় দেখে হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন কুমারবাহাদুর। হাসতে হাসতে বললেন—আমার খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে আশ্চর্য্য হয়েছো তুমি! কথার শেষে আবার উচ্চতর কণ্ঠে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন,—একটা ছাগ আমি গোটাই খাই। অবাক হও কেন?

সত্যিই এক গামলা মাংস দেওয়া হয়েছে কাশীশঙ্করের আসনের সমুখে। থালায় যেন পর্বতপ্রমাণ ভাত, গোবিন্দভোগ চালের।

কুমারবাহাদুর আসনে বসলেন। গণ্ডূষের জল ঢাললেন হাতে। আনন্দকুমারীও সলজ্জায় বসলো পাশের আসনে। পাশের ঘরে চোখ পড়লো সহসা। চৌধুরাণী দেখলো কক্ষের দুই পাশে পৃথক দু'টি শয্যা রচিত হয়েছে। তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নেয় চৌধুরাণী। কাশীশঙ্কর দেখতে পান না কিছুই—তিনি তখন মুদিত চোখে গণ্ডূষের মন্ত্র বলছেন।

গঙ্গার বুক থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে আনন্দর কপালে যেন শত শত চুমা খেতে থাকে। [ক্রমশঃ।

"সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে—কোন সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশ-তত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তাহলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব—নব যুগের উদ্বোধন করে আমরা জয়যুক্ত হব।"

—রবীন্দ্রনাথ

[ছবি পাঠানোর সময় ছবির পেছনে নাম, ধাম ও
বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না]

জন্মদিনে

—ব্রজলাল চট্টোপাধ্যায়

ওয়ার্ড লেক (শিলং)

—উমাপদ চৌধুরী

মার্বল-রক

—ধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

জল-কল্লোল

—রণজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

মৃৎপাত্র —রথীন রায়

ওড়নার আড়ালে —কান্তি ভাই (সাংরি-লা)

ছবির কথা সাধারণের

শ্রীবিনায়কশঙ্কর সেন

"ও তোমাদের ছবি টবি বুঝিনে ভাই—"

এ অতি সাধারণ কথা, সাধারণ লোক অর্থাৎ যাঁরা কখনো ছবি আঁকেন না বা ছবি দেখেন না তাঁদের মুখ থেকে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। এই মতবাদের নিচের প্রচ্ছন্ন ভাবটি যেন ছবি দেখতে পারা—ছবি আঁকতে পারার মতই একটা বিশেষ প্রতিভার বস্তু, যা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এ কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। এ ঠিক যে, ছবি আঁকতে হলে এবং ভাল ছবি আঁকতে হলে বহু পরিশ্রম ও বহুদিনকার শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষানবিশীর প্রয়োজন ; কিন্তু ছবি দেখতে পারা অনেক সহজ—যার জন্য প্রয়োজন হয় কিছুটা বিদগ্ধ চিত্তবৃত্তি ও কিঞ্চিৎ রুচিবোধ। অবশ্য রুচির তারতম্যের উপরে বিচারের সূক্ষ্মতা নির্ভর করে এবং তা'ও সম্পূর্ণ আপেক্ষিক, তবে সাধারণ ভাবে যে কোন লোকই ছবি দেখতে শিখতে পারেন এবং ছবি দেখে যথেষ্ট আনন্দও সঞ্চয় করতে পারেন, যা থেকে কি না তিনি শুধু অন্ধ অজ্ঞানতা ও উদ্যমের অভাবজনিতই বঞ্চিত।

ছবি কি? শিল্পকলার একটি বিভাগ মাত্র। আমাদের শাস্ত্রে কলার-রাজ্যকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

১। চিত্র
২। ভাস্কর্য্য
৩। সঙ্গীত
৪। নৃত্য

যদিও শিল্পের আধুনিক সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক এবং মানুষের সব রকম বৃত্তিকেই শিল্প পর্য্যায়ে ফেলা হয়, যেমন মোটর গাড়ী চালানো একটা 'আর্ট', বই বাঁধানোও একটা 'আর্ট'—এক কথায় জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সবই 'আর্ট'। কথাটা কিন্তু খুব মিথ্যেও নয় এবং এতে হাসবারও কিছু নেই, তবে সে কথা বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ সাহিত্যের মত বিশুদ্ধ শিল্প বলতে আমরা ঐ চারটিই বুঝি। ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিজের ধারণা অবশ্য অভিনয়ও একটা আর্ট এবং নৃত্য ও সঙ্গীতকে আর্টের দলে নিতে হলে' তাকেও নিতে হয়। শাস্ত্রকাররা এত বুদ্ধিমান হয়ে অভিনয়কে কেন আর্টের পর্য্যায় থেকে বাদ দিলেন, কথাটা বুঝতে পারিনি।

যাই হোক, শিল্পকলার এই বিশেষ ভাগে কার কি গুণাগুণ বিচার করলে দেখা যায়, চিত্র হচ্ছে বর্ণ-শিল্প, একটি সমতল ক্ষেত্রের উপরে প্রলেপের সাহায্যে কোন বস্তু বা কোন দৃশ্যপটের সাদৃশ্য ফুটিয়ে তোলা—তাতে দুটি স্তর (Dimensions) আছে, তৃতীয়টি নেই।

ভাস্কর্য্য—আকার শিল্প, তাতে বর্ণের কারবার নেই কিন্তু আকৃতি আছে এবং তিনটি স্তরই এতে বর্ত্তমান। ভাস্কর্য্যে রং-এর ব্যবহার চলতে পারে বটে, তবে না হলেও ক্ষতি নেই এবং প্রায়ই ভাস্কর্য্য এই কারণে হয় এক রঙা।

সঙ্গীত—শব্দশিল্প, শব্দকে নানা তানে লয়ে, মীড়ে গমকে সাজিয়ে রস সৃষ্টি করা। সে শ্রুতিশিল্প, দৃশ্যশিল্প নয়।

নৃত্যে—গতিশিল্প, দেহকে নানা ভাবে আন্দোলিত করে ছন্দ সৃষ্টি করা। সঙ্গীতশিল্পও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সে দৃষ্টি ও শ্রুতিশিল্প দুইই।

অভিনয়—ভাবশিল্প, কথা ও অঙ্গ চালনা দ্বারা কোন ভাবকে ফুটিয়ে তোলা। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সঙ্গীত ও নৃত্য দুই-ই। সেও শ্রুতি ও দৃষ্টি শিল্প।

কোন সুদূর অতীতে মানব জীবনে শিল্প বা চিত্রশিল্পের আবির্ভাব হয়েছিল তার সঠিক হিসেব নেই। তবে এ ধারা যে দিকে দিকে দেশে দেশে মানুষের ভেতরে বিকাশলাভ করেছিল তার বহু নিদর্শনই সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে রয়ে গ্যাছে। আবার দেশে দেশে কালে কালে চিত্রের ধারাও বদলে যায় যা কি না ছবি দেখতে না আরম্ভ করা পর্য্যন্ত বোঝাই যায় না। একবার একটুকু চর্চ্চা করলেই দেখতে পাওয়া যায় যে, শুধু দেশে দেশে বা কালে কালেই এর বিভেদ হয় না, এমন কি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও এর বিভেদ হয়ে থাকে। সাইথিয়ান, ইজিপ্সিয়ান প্রভৃতি অনেক শিল্পধারাই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গ্যাছে। বর্ত্তমান কালে সারা পৃথিবী-ব্যাপী যে ধারা চলছে তাকে স্থূল ভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা চলতে পারে। যথা—

ইউরোপীয়ান স্কুল।
অ্যারাবিক ও পার্শীয়ান স্কুল।
ইণ্ডিয়ান স্কুল।
চায়নীজ স্কুল।

'স্কুল' কথাটার অর্থ হলো এক একটি ধারা। একবার ছবি দেখা আরম্ভ করলেই এদের ভেতরকার তফাৎ বেশ বুঝতে পারা যায়। এদের সবারই বিষয়বস্তু এক, সাধারণ প্রকৃতি, আকাশ, গাছপালা, মানুষ, পশু-পক্ষী, সাপ-মাছ, পোকা-মাকড়, সূর্য্যাস্ত-সূর্য্যোদয়, দিন-রাত্রি, বর্ষা-বসন্ত-শীত অর্থাৎ যা কিছুই প্রতিদিন দেখতে পাই আমাদের চোখের সামনে। দেব-দেবী, পরী-হুরী, ভূত-প্রেত, রাক্ষস-খোক্কসের কাল্পনিক ছবিও অবশ্য আছে। অথচ সারা পৃথিবীর অঙ্কন-রীতি বিভিন্ন। চীন দেশের ছবি দেখে চীনে মানুষের চোখ মুখ বা অঙ্গ সজ্জা দেখেই তা বুঝতে হয়না, ছবির আঙ্গিক দেখলেই তা বোঝা যায়।

পার্শীয়ান বা অ্যারাবিক ছবিও তাই। তাদের কাজ অতি সূক্ষ্ম এবং সে বিশেষ ধারা বুঝতে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের কোনই কষ্ট হয় না, কারণ ভারতবর্ষে ইংরেজ আসবার আগে সে ধারা অত্যন্ত চলেছিল। মুসলমান নরপতি এবং আরব ও পারস্যের জনসাধারণ সে ধারা নিয়ে এসেছিল ভারতবর্ষে।

ইউরোপীয়ান শিল্পধারাই বর্ত্তমানে পৃথিবীর দরবারে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষিত হয় এবং তারাই পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় অল্প বিস্তর প্রভাব বিস্তার করেছে। তা' বলে তাকে শ্রেষ্ঠতার আসন দেওয়া ভুল। শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতা বলে' কোন বস্তু নেই ও একটা দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র। তবে ইউরোপীয়ান শিল্পধারা যে একটা অত্যন্ত ব্যাপক স্থান অধিকার করেছে এবং পৃথিবীর সকল স্থানেই সকল লোকের ভেতরেই তার কিছু না কিছু চর্চ্চা হচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইউরোপীয়ান শিল্পের বিশেষ বিশেষত্ব এর বাস্তবতা যাকে বলে **Photographic approach.**

ভারতীয় চিত্রকলা বলতে অনেক ব্যাপক ধারা বোঝায়। ভারতবর্ষ বহু দিন ধরে বহু বিভিন্ন জাতির অধীনতা-পাশে বদ্ধ থাকায় ভারতীয় শিল্পধারার উপরে বিভিন্ন ধারার যত প্রভাবপাত হয়েছে, এমন বোধ করি আর কোন দেশেই হয়নি। উপরন্তু আমরা এ দেশের বাসিন্দা হওয়ায় এখানকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিল্পরীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভেদ সহজেই ধরতে পারি। যেমন দ্যাখা যায় রাজপুত বা কাংড়া স্কুলে। এই দুই স্কুলেরই উদ্ভব হয়েছিল ভারতবর্ষে মোগল ও পাঠান রাজত্বের সময়, তাই তাদের দুয়েরই ধারার উপরে মোগল এবং পাঠান চিত্রধারার প্রভাব অত্যন্ত বেশী রকম পড়েছে। ভারতীয় স্কুল বলতে সারা ভারতব্যাপী বিভিন্ন কালের বিভিন্ন স্কুল দেখতে পাওয়া যায়। সুদূর অতীতে ভারতবর্ষে ছিল এক শিল্পধারা যার নিদর্শন রয়ে গ্যাছে অজন্তা-এলোরায়। এই শিল্পধারারই প্রভাব রয়েছে সিংহলের সিগিরিয়া, অনুরাধাপুর, কাণ্ডী প্রভৃতি স্থানে। এঁরা পর্বত গায়ে পাথর কেটে গুহা বা গুম্ফা নির্ম্মাণ করে তার দেয়াল ও ছাত চিত্রণ করেন, কাগজ বা কাপড়ে আঁকা কোন চিত্রের নিদর্শন এঁরা রেখে যাননি।

ভারতের প্রদেশে প্রদেশে চিত্রশিল্পের বিশেষ এক একটি ধারা রয়েছে। বাঙলাদেশে আছে 'পট'। এই পটশিল্প বিকাশলাভ করেছিল মন্দিরের ধারে ধারে। এই পটের সৃষ্টিকর্ত্তারা ছিলেন শিল্পী পরিবার। বাসার সবাই আঁকতেন ছবি, অনেক সময় ছবিতে 'শ্রমভেদ' বা Division of labour ও অবলম্বন করা হতো। তা' এই রকম, বাড়ীতে হয়তো 'শেষ স্পর্শ' বা Finishing touch দিতো ওস্তাদ বাড়ীর কর্ত্তা যিনি বহু দিন ধরে বহু ছবি এঁকে উচ্চাঙ্গের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। তাঁর পক্ষে কাগজের প্রলেপ তৈরী করা বা এমন কি ছবির নক্সা বা ড্রইং করাও সময়ের অপব্যয়। তাই বাসার আর সবাই যার যেদিকে হাত তাই ঠিক করে দিত আর শেষে গৃহকর্ত্তা তাঁর শেষ ওস্তাদি লাগিয়ে দিতেন তাতে। তাঁদের সুবিধা ছিল এই যে, তাঁরা নিত্য নূতন ছবি আঁকতেন না। তাঁরা প্রায়ই আঁকতেন দেব-দেবীর ছবি, সেই জন্য বাঁধা ধরা নক্সা তাঁদের প্রস্তুতই থাকতো। মন্দিরের কাছের বাজারে বা মেলায় যে লোক সমাগম, হতো তারাই ছিল তাঁদের খরিদ্দার। রং এবং রেখা দুয়েরই কারবার ছিল তাতে। উড়িষ্যার ছবি বিকাশলাভ করে বেশী বইয়ের মলাটে এবং ভেতরকার চিত্রকে অবলম্বন করে। তার সঙ্গেও বাঙলার পটের বেশ সাদৃশ্য আছে।

দক্ষিণ ভারতের মাদুরার একটি ধারা বিকাশলাভ করে তা' একেবারেই দক্ষিণী। এদের অনেক নিদর্শন রয়েছে মন্দির-গাত্রের দেয়াল-চিত্রে। এই ধারাই ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্য ও মালাবারে প্রবেশ করে। তবে সেখানে গিয়ে মালাবারবাসীদের হাতে একটু ভিন্ন ধারা প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণে আর একটি যে বিশেষ ধারা বিকাশলাভ করেছিল, তাকে বলা হয় তাঞ্জোর স্কুল। এঁরা ছবিতে সোনা রূপোর পাত প্রবাল এমন কি হীরে মণিমুক্তো পর্য্যন্ত ব্যবহার করতেন। তা ছবির ভিতরে বিশেষ পদ্ধতিতে আটকে দেওয়া হতো। সে সব ছবি শৈলীতে না হলেও বস্তবাচ্যে হতো অত্যন্ত মূল্যবান।

এমনি ধারা হায়দ্রাবাদ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ, বিহার, গাড়োয়াল, সকলেরই একটা বিশেষ বিশেষ ধারা ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই এখনও রয়েছে। এমন কি, কোল, ভীল, সাঁওতাল, টোডা, পুল্লাইয়া, মুণ্ডা, ওঁরাও এদেরও ধারায় একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাৎ বেশ বুঝতে পারা যায়। বিশেষ শৈলী ছাড়াও বিষয়বস্তুর ভেতরেও নানা জিনিষ দ্যাখবার আছে যা ছবি দ্যাখা আরম্ভ না করা পর্য্যন্ত বোঝা যায় না। পূর্ব্বেকার দিনের ছবির বিশেষ বিষয় ছিল দেব-দেবী, পুরাণ-রামায়ণ, মহাভারতের ঘটনা নিয়ে ছবি। রাজা-রাজরার আলক্ষ্যে ও তাদের দরবার যুদ্ধ বা শীকার কাহিনী লিখেও ছবি আঁকা হতো। চাষাভুষো, দোকান পাট রাস্তা-ঘাটের ছবি প্রায় ছিলই না। প্রাকৃতির দৃশ্যের মধ্যে ছিল সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত, চন্দ্রালোকিত রাত্রি, বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ বর্ষা, পুষ্পভারাক্রান্ত বসন্ত, এরা বর্ষা ও বসন্তের বিপুল ও সুন্দর রূপ-সম্ভার শিল্পীর মনকে চিরদিনই আকর্ষণ করেছিল।

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়। আর ঐ হিমালয় চীনের দক্ষিণে। হিমালয়বাসী মানুষদের দেখে মনে হয় চীনজাতি হিমালয়কে যত বেশী সফর করেছে, ভারতবাসী তার কিছুই করেনি। নেপালী, ভুটানী, তিব্বতি এঁরা সবাই মঙ্গোলীয়ান জাত, চীনও তাই। তাই সর্ব্বদাই তাদের চেহারা ও কৃষ্টিতে মিল। সেই কারণেই ঐ সব দেশের শিল্পধারায়ও চীনের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। বর্ত্তমানে যদিও এরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং বুদ্ধের ছবিই ওদের দেশে বেশী মেলে তবু কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ, যম বা রাম-রাবণ, অর্জ্জুন, ভীম, দুর্যোধনের ছবিও এদের দেশে অনেক পাওয়া যায়। মণিপুরীরাও মঙ্গোলীয়ান জাতি এবং মণিপুরের শিল্পধারাও ওদেরই গা-ঘেঁষা।

এই হলো মোটামুটি ভাবে ভারতীয় শিল্পকলার বিবরণ—প্রদেশে প্রদেশে—অতীতে। বর্ত্তমানে কোন কোন জায়গায়, ধারার পরিবর্ত্তন হয়েছে বটে কিন্তু সব জায়গাতেই তা হয়নি। আবার কোথাও কোথাও নূতন ধারাও ঢুকেছে, পুরোনো ধারাও মরবার মত হয়ে বেঁচে আছে। ইংরেজ এদেশে আসবার পর এদেশের শিল্পের দরবারে একটা নূতন ধারা ঢোকে তা একেবারে বিলেতী। সেই সময় অনেক শিল্পীই সেই ধারা শিখতে থাকেন কেউ বা ব্যক্তিগত সাহেব গুরুর কাছে, কেউ বা সদ্য-প্রতিষ্ঠিত আর্ট-স্কুলে। সেই আমল থেকে বহু ভারতীয় শিল্পী বিলেতী ধারার চর্চ্চা করেছেন এবং এখনও করছেন। এঁদের অনেকের নামই প্রকৃত মেধা থাকলেও বিজ্ঞানের অভাবে জনসাধারণের মন থেকে মুছে গ্যাছে। তবুও অনেক শিল্পীই রয়েছেন কালের কাছে যাঁরা অমর আসন পেয়েছেন। দু' একজনের নাম করতে হলে বলতে হয় ত্রিবাঙ্কুরের রাজ-পরিবারের রাজা রবি বর্ম্মা, মহারাষ্ট্রের মিঃ এম. ভি, ধুরন্ধর, বোম্বের মাহাত্রে, বাংলা দেশে শিল্পাচার্য্য স্বর্গীয় যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী ইত্যাদি। গুরু অবনীন্দ্রনাথ 'বেঙ্গল স্কুল অব পেণ্টিং' প্রবর্ত্তন করবার আগে পাশ্চাত্য ধারায় অতি সুন্দর 'অয়েল পেণ্টিং' করতেন। আলেখ্য-চিত্রে তিনি ছিলেন অতি সুদক্ষ কারিগর। রাজা রবি বর্ম্মা ও অবনীন্দ্রনাথ সমসাময়িক কিন্তু সাধারণতঃ বিশেষ ভাবে বাঙলার লোকের ধারণা রবি বর্ম্মা অবনীন্দ্রনাথের পূর্ব্বতন। এ ধারণার কারণ রবি বর্ম্মা অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন। পরবর্ত্তী কালেও দেশের লোক অবনীন্দ্রনাথকে নূতন সৃষ্টি দিতে দেখেছে যখন রবি বর্ম্মার শুধু পুরোনো 'প্রিণ্ট' ছাড়া আর কিছুই

দখতে পায়নি। রবি বর্ম্মা একবার কলকাতা এসে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই দুই মনীষীর সাক্ষাৎকারের কোন বিবরণ কেউ লিপিবদ্ধ করে রাখেনি।

এঁদের পরবর্ত্তী কালে যাঁরা পাশ্চাত্য শিল্পপথ অবলম্বন করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা রবি বর্ম্মার সুযোগ্য ভ্রাতা রাজা রাজা বর্ম্মা, বোম্বাইয়ের মিঃ যোশী, পাঞ্জাবে মিঃ ঠাকুর সিং, বাঙলা দেশে স্বর্গীয় ভবানীচরণ লাহা, স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু প্রভৃতি। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, এদের কারুরই উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ এখনও দেশে তৈরী হয়নি।

অবনীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেন 'বেঙ্গল স্কুল'। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে তিনি পাশ্চাত্য শিল্পধারার অতি সুদক্ষ কারিগর ছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন কলকাতার আর্ট স্কুলের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ই, বি, হ্যাভেল। অধ্যক্ষ হ্যাভেল ভারতবর্ষ ঘুরে এখানকার যে শিল্প-সম্পদ দেখলেন, তাতে তাঁর চিন্তাধারা একেবারে ঘুরে গেল। তিনি পাশ্চাত্য ধারা বাদ দিয়েও প্রাচ্য রীতিতে ছাত্রদের ছবি আঁকাতে চাইলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম শিষ্য এবং সর্ব্বাধিক রসজ্ঞ শিষ্য। তাঁর অফুরন্ত আর অনবদ্য দান বিস্ময়কর। অবনীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে বাঙলা দেশে সত্বর মিউজিয়াম তৈরী হওয়া উচিত।

অবনীন্দ্রনাথ বেঙ্গল স্কুল তৈরী করে তাঁর পাশ্চাত্য পদ্ধতির জ্ঞান ও ভারতীয় পদ্ধতির প্রাণ ছবির ভেতরে ঢোকালেন আর তাতে সংযোজনা করলেন জাপানী ধুয়ে দেওয়া বা wash। তাঁর প্রথম যুগের যাঁরা ছাত্র, তাঁদের সকলের ছবিই যদিও এই পদ্ধতিতে আঁকা, তবু প্রত্যেকের ছবির ভেতরেই বিশেষ ব্যক্তিত্বটি একটু দেখলেই ধরা পড়ে। এঁদের দলে নাম করতে হলে বলতে হয় নন্দলাল, চাব্‌ভাই, উকিল, হালদার, ক্ষিতীন মজুমদার প্রভৃতি।

বাংলার পটের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই পটের পটভূমিকায় আর একটি নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেছেন শ্রীযুক্ত যামিনী রায়। এঁরও শিক্ষা আরম্ভ হয় পাশ্চাত্য ধারার কলকাতা সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ে। তার পর তিনি বেঙ্গল স্কুল অব পেণ্টিং দ্বারা প্রভাবান্বিত হন, এবং সেই ধরণে washএর ছবি আঁকা আরম্ভ করেন। সেই পদ্ধতিতে যখন তিনি সুন্দর শিল্প সৃষ্টি করছেন এমনি সময় হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন বহুদিন উপেক্ষিত বাংলার পট এবং পটুয়াদের, এবং সেই প্রাচীন পটকে তাঁর পাশ্চাত্য শিল্পের ও বেঙ্গল স্কুলের জ্ঞানের ভিত্তিতে ঢেলে আরম্ভ করলেন পরীক্ষা নিরীক্ষা। প্রথম প্রথম এঁকে অত্যন্ত বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছিল কিন্তু দেশবাসী তার মহতী প্রচেষ্টার মর্য্যাদা বুঝতে পেরে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিয়েছে এবং বর্ত্তমানে তিনি এই পট চিত্র নিয়েই রয়েছেন। যামিনীবাবুর পট ঠিক বাঙলার প্রাচীন পট নয়, তবু সেও পট এবং বাঙলার শিল্প-শাখার একটি বিশেষ দান।

আর একটি ধারার প্রবর্ত্তন করেন শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, তা' বিশেষ ভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণ। শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর কর্ম্মক্ষেত্র বাঙলার বাইরে হওয়াতে তাঁর ধারা বাংলার শিল্পরাজ্যে বেশী প্রভাবপাত করেনি।

বাংলার পটুয়াদের মধ্যে সামান্য কয়েক ঘর মাত্র বেঁচে আছে, কলকাতায় ও কলকাতার আশে পাশে। তেমনি সামান্য কয়েক ঘর মাত্র শিল্পী বেঁচে আছে তাঞ্জোর জেলায় যাঁরা এখনও তাঞ্জোর পেণ্টিং করেন। কিন্তু আনুকূল্য না থাকায় তাঁদের সৃষ্টিতে অতীতের সে জমক ও জৌলুষ নেই এবং বহুদিনের অনাদরে আঙ্গিকও অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। মাদুরায় একটি লোকও নেই। রাজপুতানা বা কাঙড়ার অবস্থাও তাই। তবে চারু শিল্পের ভারতীয় বিশেষ পদ্ধতিটি ঘা খেলেও ভারতবর্ষের কারুশিল্প প্রায়ই বেঁচে আছে যার ভেতরে ভারতীয় প্রাণধারার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

অবনীন্দ্রনাথের বেঙ্গল স্কুলও বর্ত্তমানে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আধুনিক শিল্পীদের ভেতরে বিশেষ কোন দল বা গোষ্ঠী নেই। তারা বহু দলে বিভক্ত, তবে মনে হয় বেশীর ভাগই ফরাসী 'ইমপ্রেশনিজম্' এবং আরও অনেক 'ইজম্'এরই পক্ষপাতী। তাঁরা সবাই বর্ত্তমানে নানা ধারা নিয়ে চলেছেন। সহসা লোকের চোখে এ পরিস্থিতিকে ভাঙ্গন বলে মনে হতে পারে কিন্তু এ যে নব যুগের গড়নেরই পূর্ব্বাভাস নয়, এ কথাও বলা কঠিন।

মোটের ওপর দ্যাখা গেল শিল্প-কলা কোন একটা বিশেষ ধারায় বা বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, যদিও গোড়াগড়ি সব দেশেই তার একটা চারিত্রিক বিশেষত্ব রয়েছে। সাধারণ ভাবে ভারতীয় শিল্পকলার ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার আভ্যন্তরীণ তফাৎ বিচার করতে গেলে বলতে হয় পাশ্চাত্য শিল্পকলা বাস্তবতামূলক বা 'রিয়ালিষ্টিক'। আরও সহজ করে বলতে হলে বলতে হয় পাশ্চাত্য শিল্পকলা সজ্জামূলক বা 'ডেকোরেটিভ'। প্রায়ই অদীক্ষিতের কাছ থেকে এই প্রশ্ন শোনা যায় যে, তোমাদের ছবির চোখ হাত পা ও-রকম লম্বা কেন, কোমর অত সরু বা কাঁধ অত মোটা কেন? তার উত্তরে বলতে হয় ওটা জোর বা 'একসেনচুয়েশন' (accentuation)। দৈনন্দিন জীবনে যখন আমরা কথাবার্ত্তা বলি তখন যদিও আমাদের সেই সময়কার মানসিক পরিস্থিতির উপরে তার প্রকাশ ভেদ হয় তবু সেটা ততটা লক্ষণীয় নয় যতটা যখন আমাদের সেই সংলাপই বলতে হয় রঙ্গমঞ্চে বা রূপালি পর্দ্দায় উঠে। একটা বিশেষ অবস্থাকে বিশেষ ভাবে বোঝান। ভারতীয় চিত্রকলা বা ভাস্কর্য্যও তাই। সেই শিল্পীরা—আমরা সহজ চোখে প্রকৃতিকে যা দেখি তার চাইতেও একটু এগিয়ে শরীরের বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরে জোর দিয়ে বা জোর কমিয়ে দিয়ে শিল্পীর মানসলোকের রূপ সৃষ্টি করেছেন বা করবার চেষ্টা করেছেন এবং সেই রীতিই ফুটিয়েছেন দৃশ্যপট ও আনুসঙ্গিক সমস্ত ব্যাপারেই। এ কথা—যতক্ষণ ছবি দ্যাখা আরম্ভ না করা যায়, ততক্ষণ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হয় না। তার পরেও একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা ছবি মাত্রই উৎকৃষ্ট নয় এবং পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে আঁকা ছবি মাত্রই নিকৃষ্ট নয়। অপর পক্ষে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে আঁকা ছবি মাত্রই উৎকৃষ্ট নয় এবং ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা ছবি মাত্রই নিকৃষ্ট নয়। রসের বিচারে পক্ষপাতিত্বের স্থান নেই। দু' পক্ষেরই ওস্তাদ এবং দু' পক্ষেরই হাতুড়ের দল আছে। তবে কোন্ পক্ষের কোন্‌টি উৎকৃষ্ট বা কোন্‌টি নিকৃষ্ট কাজ, তা বুঝতে অনেক সময় ও অনেক চর্চ্চার প্রয়োজন হয় এবং তা বোঝবার পরও অনেক ক্ষেত্রেই তা' সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ও দর্শকের ব্যক্তিগত রুচির ইসারা মাত্র। বহু দিনের পরিশ্রমে, বহু চর্চ্চায় জাগ্রত সেই রুচিবোধই ছবি দ্যাখার প্রধানতম আনন্দ ও এই সুদীর্ঘ সাধনার সত্যকার পুরস্কার।

রবীন্দ্রায়ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শুভ জন্মাব্দ ইং ১৮৬১ সাল বাঙলা দেশে, বাঙলা সাহিত্যে ও ঠাকুর-পরিবারে একটি স্মরণীয় বৎসর। এ বৎসর বাঙলা সাহিত্যে নবযুগের অবতারণাকে বাঙলার গুণিসম্প্রদায় প্রকাশ্য ভাবে বরণ করিয়া লন। জোড়াসাঁকোতে ঠাকুর-বাড়ির পার্শ্ববর্তী সিংহ-বাড়িতে বিদ্যোৎসাহিনী সভার উদ্যোগে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ বঙ্গভারতীর পূজারিবৃন্দ বঙ্গসাহিত্যে ভিক্টোরিয়ান যুগের অভ্যুদয়ের অগ্রদূত মাইকেল মধুসূদনকে বাঙলা কাব্যে নবধারা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রকরণ আনয়নের জন্য প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করেন।

বিরাট পুরুষ রবীন্দ্রনাথ কেন, যে কোনো জীবনীই ইতিহাস, সে কারণ কবিগুরুর জন্মের অব্যবহিত পূর্বের, জন্মের সমসাময়িক ও অব্যবহিত পরের সময়ে দেশে যাহা যাহা প্রধান ঘটনা ভাগ্যবিধাতার ইচ্ছায় ঘটিয়াছে, তাহাও কিছুটা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক এবং তাহার মধ্যে তদানীন্তন সমাজ বলিতে দেশের লোকের জীবন-যাত্রার ধারা, দেশের আইন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাও ধরিতে হইবে এবং সে কারণ দেশের প্রধান প্রধান ব্যাপারের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে যে যে বৎসর তন্মধ্যে ১৮৬১ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। প্রথমেই আইন সংক্রান্ত বিষয় কিছুটা হইল এই যে, ১৮৬১ সালে একতা সূত্র একটি ব্যাপারে দৃঢ়তর হয়। সরকার বিচারপ্রণালীর আমূল পরিবর্তন করেন। এতদিন বিচার কার্য দুই প্রকার স্বতন্ত্র প্রণালীতে নিষ্পন্ন হইতেছিল, সমগ্র ভারতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের কার্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ কর্মচারীর দ্বারা নিষ্পন্ন হইত এবং তাহার শেষ নিষ্পত্তির জন্য (আপিলে) কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল আদালতের ভাষা প্রথমে উর্দু পরে বাঙলা হইয়াছিল। এই দুই আদালতের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল হইত। মুসলমান আমল হইতে কোম্পানির আমল পর্যন্ত এদেশে যে সকল আইন প্রচলিত ছিল, বিচারকার্যে তাহাই গ্রহণ করা হইত। কেবল কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ—এই তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরের জন্য তিনটি সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার বিচারক বিলাত হইতে কেবল ব্যারিষ্টারেরাই নিযুক্ত হইয়া আসিতেন এবং তাঁহারা বিলাতি Equity এবং Common Law অনুসারে বিচারকার্য নিষ্পন্ন করিতেন। ১৮৬১ সালে স্থির হইল যে, ভারতবর্ষে এই দুই প্রকার বিচারালয় রহিত করিয়া একমাত্র হাই কোর্ট উচ্চতম আদালতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাতে একটি আদিম বিভাগ (Original jurisdiction) এবং একটি আপিল বিভাগ (Appellate jurisdiction) থাকিবে এবং তাহাতেই কলিকাতা প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি শহরে ও প্রদেশগুলির সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকার্য একই আইনের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইবে। হাই কোর্টে বিচারক পদে বিলাতি ব্যারিস্টার, সিভিলিয়ান এবং ভারতীয় ব্যবহারজীবী বিলাত হইতে নিয়োগপত্র পাইয়া নিযুক্ত হইবেন ও হাই কোর্টগুলি ভারত গভর্ণমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে। তদনুসারে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার লেটার্স পেটেন্টের দ্বারা কলিকাতা হাইকোর্ট ১৮৬১ সালে গঠিত হয় এবং রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, সদর দেওয়ানী আদালতের সরকারী উকিল, রমাপ্রসাদ রায় প্রথম ভারতীয় বিচারক মনোনীত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হাই কোর্টে যখন ১৮৬২ সালে কাজ আরম্ভ হইল তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। তাঁহার মৃত্যুর পরে কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের অন্যতম প্রধান উকিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত তাঁহার স্থানে কলিকাতা হাই কোর্টে প্রথম ভারতীয় বিচারক বা পিউনি জজ নিযুক্ত হইলেন। ইনি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ হইলেও বাঙলা দেশবাসী হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত সরস্বতীও বঙ্গ সাহিত্যে পরিচিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু ও পিতা শম্ভুনাথের ন্যায় প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ছিলেন।

পাঞ্জাব হইতে বাঙলা—উত্তর ভারতের জন্য একটি সর্বোচ্চ আদালত কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং গমনাগমনের সুযোগ বর্ধিত হওয়ায় কলিকাতায় সকল প্রদেশ হইতে অধিকতর সংখ্যক লোকের সমাগম হইতে লাগিল ও সকল প্রদেশবাসীর সহিত বাঙালীর হৃদ্যতা বৃদ্ধির সুযোগ হইল। একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিবারও বীজ বপন হইল এবং কালে ইহাতেই জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিল।

১৮৬১ সালে মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার পরের বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বদান্যতায় ব্যারিস্টারী পরীক্ষার জন্য তিনি বিলাত যান ও তিন বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা হাই কোর্টে ব্যারিস্টারি কার্য আরম্ভ করেন। এই ১৮৬১ সালে বাঙলার আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের উদ্‌গাতা ও বহু তথ্যবস্তুর আবিষ্কর্তা আচার্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রবিধি (Constitution) কী ভাবে হওয়া উচিত—তাহার খসড়া প্রস্তুত করিয়া দেশে ও বিদেশে মনীষীবৃন্দের নিকট যিনি যশস্বী ও বরণীয় হইয়াছিলেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতায় (পার্ক সার্কাসে) অধিবেশনের সভাপতি, এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার পরলোকগত

যেখানে গুনের বিচার
সেখানে সকলেই
পছন্দ করেন

পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুরও এই ১৮৬১ সালে কবির সহিত একই দিনে জন্ম। সুতরাং দেখা যায় একই বৎসরে ভারতের ভাগ্যবিধাতা কাব্যে, বিজ্ঞানে ও রাজনীতিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য তিনটি প্রতিভাশালী পুরুষের সৃষ্টি করেন। ভারতগগনে যুগপৎ 'Three stars of the first magnitude on the ascendant'-এর সমাবেশ। আমাদের ধর্মজগতে নবপ্রাণ সঞ্চারকল্পে কিছুকাল পূর্বে মহাসাধক পরম ভট্টারক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শুভাবির্ভাব হয়। ১৮৬১ সালেই (বাং ১২৬৮) ভাগ্যে দেখা ঘটিল তিনি লোকহিতার্থে বাঙলার পঞ্চবটী মূলে 'পরমহংসদেব' রূপে প্রকট হইয়াছেন। ক্রমে তাঁহার রশ্মিচ্ছটা সাগরপারের পশ্চিমাকাশ প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করিল।

এতক্ষণ শুধু ১৮৬১ সালের কথা বলিতেছিলাম। কবিগুরুর প্রাক্ জন্মকালে ও জন্মের অব্যবহিত পরের সময়ে দেশের পটভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ১৮৫৫ হইতে ১৮৬৫ পর্যন্ত এই দশ বৎসর একটা যুগসন্ধি বলিলে অন্যায় হয় না। নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বাঙলা দেশে, হিন্দু সমাজে এবং বাঙলা সাহিত্যে যে সকল পরিবর্তন আসিয়াছে, ঠাকুর-পরিবারের চিন্তাধারার ও জীবনযাত্রার উপরেও তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

১৮৬০ খৃঃ 'নীলকর বিষধর-দংশন-কাতর প্রজানিকর ক্ষেমংকরেণ কেনচিত পথিকের' হৃদয়ক্রন্দন সুকুমার সাহিত্যের মধ্য দিয়া ঢাকায় রামচন্দ্র ভৌমিকের দ্বারা প্রকাশিত হইল। রচয়িতার নাম না থাকিলেও নীলদর্পণখানির সাহিত্যিক মূল্য ব্যতীত আর একটা বিশেষ মূল্য আছে। নীলকরের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ইহা সহায়তা করিয়াছিল এবং সে হিসাবে ইহা ইংরাজি সাহিত্যে দাসপ্রথার বিরোধী আন্দোলনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'Uncle Tom's Cabin'-এর সহিত সর্বথা তুলনীয়। পরে প্রকাশ পায় ডাকবিভাগের পরিদর্শক, বঙ্কিমচন্দ্রের 'অভিন্ন সুহৃদ' সুকবি দীনবন্ধু মিত্র, যিনি পরে একজন সুদক্ষ নাট্যকার বলিয়া পরিচিত হন, এই পুস্তকের জনক। কিন্তু ইহার অনুবাদ করিয়া পাদরি লং সাহেব স্বজাতির বিরাগভাজন হন ও তাহার ফলস্বরূপ ইংরাজের উচ্চতম আদালত কর্তৃক ইংরাজ-সম্প্রদায়ের কুৎসা প্রচারের জন্য হাজার টাকা অর্থদণ্ডে ও এক মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মহাপ্রাণ কালীপ্রসন্ন সিংহ তদ্দণ্ডেই আদালতে ঐ টাকা দাখিল করিয়া দিয়া বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেন।

এই সময়েই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার মর্ড্যান্ট ওয়েলস্ বিচারাসন হইতে বাঙালী জাতির প্রতি যে সকল কটূক্তি প্রায়ই ব্যবহার করিতেন, বাঙালী তাহা নতমস্তকে সহ্য করিয়া লয় নাই। বিচারকের এই সকল কটূক্তির প্রতিবাদের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পরে মহর্ষি), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (পরে মহারাজা বাহাদুর সার), কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ কলিকাতার নেতৃবৃন্দ রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে অগ্রণী করিয়া শোভাবাজারের রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভা করেন। এই জনসভায় বাঙালীর সচেতন আত্মসম্মান বোধের প্রমাণ পাইয়া, আমরা হুতুমী ভাষায় বলি "নাটমন্দিরস্থ পাথরের গরুড়েরাও ডানা মেলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।" ফলে টেকচাঁদের পিসীর মুষ্টিযোগ "নারকেল মুড়ি ও ঠনঠনের নিমকির" প্রয়োগ না করিয়াও ওয়েলসের মুখরোগ সারিয়া গেল। "ওয়েলস ব্রেক হইলেন।" বস্তুত কালীপ্রসন্ন সিংহ এই নামে "বেওয়ারিশ লুচির ময়দা" বাঙলা ভাষায় ঘরোয়া কথাবার্তায় তদানীন্তন কলিকাতার সমাজের কতকগুলি নক্সা আঁকিয়া "এই এক নতুন" বলিয়া বাঙলার রসপিপাসুদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা যেমন অভূতপূর্ব তেমনই আজ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আছে।

বাঙালী এই সময়ে আর একটি ঘটনায় নিজেদের বৈশিষ্ট্য প্রচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। সিপাহী বিপ্লবের সময়ে কলিকাতার ইংরাজেরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া কলিকাতায় মার্শ্যাল ল প্রচারের জন্য বড়লাট ক্যানিং-এর নিকট বারবার জেদ করিতে লাগিল। কিন্তু লর্ড ক্যানিং, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর (পরে মহারাজা), রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের পরামর্শে ও তাঁহাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বে কিছুতেই মার্শাল ল প্রচারের সম্মতি দিলেন না। ইংরেজ সম্প্রদায় বিদ্রূপ করিয়া ক্যানিং-এর নাম দিলেন 'দয়ার অবতার' (Clemency Canning) এবং তাঁহার বিদায়কালে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে অসম্মত হইলেন। বাঙালী নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে ১৮৬২ সালে একটি সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থাও করিলেন।

ইতিমধ্যে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লেডী ক্যানিং-এর মৃত্যু হওয়ায় বাঙালী জাতির প্রতি তাঁহার সহৃদয়তা ও সহানুভূতির কথা চিরদিন জাগরূক রাখিবার জন্য বাঙালী তাহার দৈনন্দিন গৃহস্থালীর মধ্যে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত করিল। চিরপ্রচলিত ছানাবড়া পরিবর্তিত আকারে লেডী ক্যানিং নামে মিষ্টান্ন-সমাজে স্থান পাইল এবং পরে তাহাই লেডীকেনি নামে বাঙলার শহরে ও পল্লীগ্রামে সর্বত্র পরিচিত।

সিপাহী-বিপ্লবের পর কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়া ভারত রাণী ভিক্টোরিয়ার খাস রাজত্বের অংশীভূত হইল। বড়লাট তখন হইতে বড়লাট ও রাজপ্রতিনিধি হইয়া ভারতের সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাজধানী কলিকাতায় বসিয়া করিতে লাগিলেন। এই ঘটনায় এবং রেলপথের ও টেলিগ্রাফের বিস্তারে, কারণ ১৮৫৭ সালে মোটে আসানসোল পর্যন্ত রেলপথ হইয়াছিল, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রকৃষ্ট যোগ হওয়ায় দূরত্ব-ব্যবধান, বহু সময়ক্ষেপ এবং গমনাগমনের ঘোরতর বাধা অপসারিত হওয়ায় প্রদেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতাবোধের সঞ্চার হয়। তখন কলিকাতা হইতে হাওড়ায় নৌকায় পারাপার হইত। বহু বৎসর পরে ১৮৭৩ খৃঃ সার ব্রাডফোর্ড লেস্‌লি ভাসমান হাওড়া পোল প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যোগসাধন করেন। এই বৎসর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সাহায্যের জন্য কলিকাতার নেতৃবৃন্দ টাউন হলে সভা করিয়া অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সাহায্য দানে সফলকাম হইলেন।

এদিকে সে যুগে যেমন নানা ঘটনাস্রোতে পুরুষদের নানা উন্নতি হইতে লাগিল, দেশের মাতৃজাতিও যে অন্ধকার গহ্বরে নিশ্চেষ্ট ভাবে কালাতিপাত করিতেন তাহা নহে। মহর্ষির পিতামহ রামমণি ঠাকুরের সময় হইতে তাঁহাদের পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মহর্ষির মধ্যমা পিসী এবং লেখকের বৃদ্ধা প্রপিতামহী রাসবিলাসী দেবীর একখানি পুঁথি হইতে জানা যায় মহিলা শিক্ষিকারা বাড়ীর মেয়েদের স্তবাবলীর সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষা

দিতেন। আমার খুল্লপিতামহ গোকুলনাথ বলিতেন যে তাঁহার পিতামহী উক্ত রাসবিলাসী দেবীর মুখে শুনিয়াছিলেন যে, বিবাহের পর দুই তিন বৎসর মেয়েদের সংস্কৃত শিখিতে হইত। ১৮৫০ সালের ৬ই নভেম্বর অপরাহ্নে কলিকাতা শিমুলিয়া পল্লীতে একটি নারীশিক্ষা মন্দিরের ভিত্তি সমারোহের সহিত স্থাপন করা হয়। সম্ভ্রান্ত বাঙালীদের অনেকের উপস্থিতিতে একটি অশোক গাছের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নিকটে ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠানপূর্বক প্রোথিত করেন ও বাটন্ (Bethune) অশোক গাছের পাতা ছিঁড়িয়া ভূস্বামীর নিকট হইতে জমি ও ভিতের দখল লন। ভূমিখণ্ডটি দান করেন পাথুরিয়াঘাটার সূর্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তদানীন্তন আইন-সচীব মাননীয় জন ইলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বীটন (পূর্বোক্ত) বাঙলা ভাষায় স্ত্রী-বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই বিদ্যালয়ের নাম বীটন্ স্কুল ও পরে বীটন্ কলেজ হয় কিন্তু সেদিন বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছিল "হিন্দু ফিমেল স্কুল।" স্ত্রীশিক্ষার জন্য আগ্রহযুক্ত যে সকল তরুণদের চেষ্টায় যত্নে ও অর্থে ইহার উদ্ভব, তন্মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন অন্যতম। নারীশিক্ষার প্রতীকস্বরূপ অশোকতরু স্থাপন দক্ষিণারঞ্জনের সৌন্দর্য বোধ উদ্ভূত কল্পনা (AEsthetic consciousness). ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালংকার ইহার স্বপক্ষে ও উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। "সংবাদ ভাস্করের" সম্পাদক 'গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য' গৌরীশংকর তর্কবাগীশও ইহার বিশেষ পোষকতা করেন। মদনমোহন স্বীয় দুই কন্যাকে শিক্ষার্থে এখানে প্রেরণ করেন ও স্বয়ং শিক্ষকতার ভার অবৈতনিক ভাবে গ্রহণ করেন। এবং পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণ পরিচয়ের' পূর্বে মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থাবলী রচনার হেতু এই নবস্থাপিত বিদ্যালয়টি। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৫১ হইতে এই বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ। অভিজাত সম্প্রদায় মুসলিম প্রভাবে তখনো ঘোর পর্দানশীন্ ও ইহার বিরোধী ছিলেন।

ইহার বহু পূর্বেও কলিকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। অনেকগুলি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত ও বালিকাদের পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা হয়, যাহা স্কুল কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। স্যার এডওয়ার্ড রায়ান প্রভৃতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা ও কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক এই কমিটির সভ্য ছিলেন। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব ও পাথুরিয়াঘাটার উমানন্দন ঠাকুর বহু পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে এই সকল পাঠশালা পরিদর্শন ও মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা পরিচালনা করিতেন। উমানন্দের বাড়ির সামনে বালিকাদের ব্যায়াম ও ক্রীড়া করিবার একটি স্থান ছিল। সেকালে নারীশিক্ষায় উৎসাহ দান মানসে রাধাকান্ত "স্ত্রীশিক্ষা" নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন যদিচ তিনি সনাতনপন্থী দলের ছিলেন।

মহাত্মা বাটন্ বিদ্যালয়ে বালিকাদের যাতায়াতের জন্য কয়েকটি গাড়ী ও ঘোড়া দান করেন এবং তাঁহার চরম ইচ্ছাপত্রে বা উইলে তাঁহার অছিদের প্রতি নির্দেশ দিয়া যান :—

I give and devise all my interest in the lands, buildings and other property in Calcutta now intended to be used and occupied as a Female School to the E. I. Co. and their successors and assign FOR EVER with my request that they will endow the said institution as a Female School in perpetuity and honourably connect therewith the name of Babu Dakshina Ranjan Mukerjee in honourable testimony of his great exertion in the cause.

ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ের গাড়ীগুলির গাত্রে লেখা থাকিত কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষানীয়াতি যত্নতঃ।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা কন্যা ও কনিষ্ঠা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বাটন্ স্কুলে পাঠার্থে প্রেরণ করেন। তিনি তথাকার শিক্ষার সম্পূর্ণ পোষকতা করেন তথায় বাইবেল-ঘটিত শিক্ষার কোনো উৎপাত ছিল না বলিয়া।

নানাদিক দিয়া এইরূপে জাতির নবজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল। সাহিত্যক্ষেত্রেও তখন অনেকগুলি কবি ছিলেন যাঁহারা বঙ্গীয় ভাষাজননীকে নানা ভাবে সেবা করিতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। মাইকেল মধুসূদন তৎকালীন নবীন কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথকে সর্বোচ্চ আসন দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

If I am to doff my cap to any modern Bengali poet, it must be to the author of Swapnaprayan and to nobody else.

কিন্তু নবজাগ্রত জাতির সকল প্রকার আশা ও বেদনাকে জাতীয় ভাষায় উপযুক্তরূপে প্রকাশ করিতে পারেন, এমন এক জন শক্তিমান বাণীর বরপুত্রের অভাব দেশমাতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন ও প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। ভগবান সে প্রার্থনা পূরণের ব্যবস্থা করিলেন।

কালমোহিনী কল্প-বিধায়িনী পূর্ণেন্দুনিভাননার গৌরসুন্দর ললাটফলকে বঙ্গাব্দ ১২৬৮ সালটি (ইং ১৮৬১) শুভ্র শিশুসোম লেখাবৎ প্রতিভাত হইবে। তাহার অঙ্কে শোভমান নবজাত শিশুটির কর্ণযুগলে স্বয়ং ভারতী জননী যে আশীর্বাদী কুণ্ডল পরাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে প্রাচী ও প্রতীচী দিঙ্মণ্ডল সমকালে আলোকিত হইল। কলিকাতা মহানগরীর মুখমণ্ডল, তথাকার ঠাকুর বংশের মুখচ্ছবি, বঙ্গের সুধী সমাজের মুখারবিন্দ এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের—

"রাত্রিদিবা ঝরিছে লোচনবারি
মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত হে তোমারি—"

সেই পরাধীনতাপাশ বেষ্টিতা, অজ্ঞতার তামস বাষ্পাচ্ছাদিতা জননী ভারতের বদনকরঞ্জও যুগপৎ নবালোকে নবশ্রী ধারণ করিল। সেই নাতিবৃহৎ আগন্তুকের প্রাণধারণ লীলায়, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মূর্ত বিশ্বজননীর অপার করুণা ও আনন্দের আবির্ভাব বিশ্ববাসীর গোচরে আসিয়াছে। সেই নবজাতকের পরবর্তীকালের অমৃতবাণী দ্বারা আমরা অনুভূতি কথঞ্চিৎ প্রকাশ করি—

"একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল—"

এবং সেই ১২৬৮ সালটিও তাহার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত মানবকটি চিরদিন আমাদের ও ভাবী বংশধরদের স্মরণ পথের শরণী আলোকিত করিতে থাকিবে।

বাল্যারুণচ্ছটায় তাঁহার প্রকাশ বাল্য, কৈশোর, যুবসন্ধির মধ্য দিয়া শিক্ষা, দীক্ষায়, প্রতিভার ফলে কোরক রবীন্দ্রের উন্মেষ ও প্রস্ফুটিত দলবিকাশ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র, মহর্ষি ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় 'বড় বাড়ীর' 'ছোটবাবু' বিশ্ববরেণ্য ঋষি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ জন্ম ১২৬৮ সালের ২৫এ বৈশাখ সোমবার ৭ই মে ১৮৬১ মঙ্গলবার কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে, মীনরাশিতে কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম সাধারণত ৬ই মে সোমবার ধরা হয় কিন্তু তাঁহার জন্ম হয় রাত্রি তৃতীয় প্রহরে, সুতরাং ৭ই মে মঙ্গলবার হইবে। এই ১৮৬১ সালে দ্বারিকানাথের ঋণ শোধ করিয়া যে আয় হইল তদ্দ্বারা মহর্ষি সংসারযাত্রা নির্বাহের ব্যবস্থা করিলেন এবং যে উজ্জ্বল আভাষের ইঙ্গিত দেখা দিল তাহা বর্ষচক্রের আবর্তনে শশিকলার মতো দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল, পক্ষভেদে দর্শকের দৃষ্টিপথে কখনো অবলুপ্ত হয় নাই। প্রতিভা সংযোগে তাঁহার স্নিগ্ধ কিরণ বা দীপ্তির সমৃদ্ধি দৈববশে কবিজননীর অবলোকন করা ঘটে নাই বটে কিন্তু ক্ষয়হীন পূর্ণচন্দ্রোদয় কবিজনক যে জীবিতকালে দেখিয়া গিয়াছেন, ইহা পিতাপুত্রের এবং বঙ্গদেশের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

দ্বারকানাথের আমলের নানা অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানোদয়ের পূর্বেই দেবেন্দ্রপরিবারের জীবনযাত্রা ও চিন্তাপ্রণালী সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়াছে। মহর্ষি সকল দিকে ব্যয় সংকোচ করিয়া ভ্রমণ ও দুঃস্থদের সাহায্যের ব্যবস্থা ঠিক রাখিয়াছিলেন। যে জাঁকজমক আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা ও উৎসব-পরম্পরার সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথ বাল্যকালে পরিচিত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে তাহার সুযোগ ঘটে নাই। তিনি সম্পন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের ছেলের মতোই বর্ধিত ও আত্মোন্নতির পথে পরিচালিত হন ও তাহা সাধন করিবার অনুকূল পরিবেশ সৌভাগ্যক্রমে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বহুদিন পুস্তকের মধ্যে এবং নিজের অসামান্য সৃষ্টি-নৈপুণ্যের অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল।

বাড়ীর পাঠশালাতে পরিবারস্থ অন্যান্য বালকদের সহিত গুরুমহাশয়ের নিকট বালক রবির নিয়মিত লিখন-পঠনের সূত্রপাত হয়, তবে তাহার পূর্বেই অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের পূর্বেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়।

তখন ঠাকুরদের সকলের বাড়িতেই একটি করিয়া পাঠশালা থাকিত। বাড়ীর প্রতিবেশীদের সন্তানেরাও একত্রে সেই পাঠশালায় পড়িত। চার বৎসর হইলেই বালককে অগ্রজদের সহিত পাঠশালায় যাইতে হইত এবং সেখানে বসিয়া থাকা অভ্যাস করিতে হইত। গুরুমহাশয়েরা বলিতেন আগে "আসনশুদ্ধি" হউক, পরে লেখাপড়া হইবে। বালক গুরুমহাশয়দের অবাধ বেত্রচালনা দেখিয়া ও তর্জন গর্জন শুনিয়া গুরুর প্রতি ভয়ই অর্জন করিত কিন্তু অন্যান্য বালকদের পাঠ্যাবৃত্তি শুনিয়া মুখে মুখে কিছু কিছু শিখিত। পরে পঞ্চম বর্ষে বালকের হাতে খড়ি দিয়া তাহার রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইত। রবীন্দ্রনাথ আসন দুরস্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক কিছু শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। গুরুমহাশয়ের নাম ছিল মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিবাস বর্ধমান জেলা।

পাঠশালায় বিদ্যালাভ কতটা হইয়াছিল বলা কঠিন, তবে শৈশব কালেই তাঁহার সাহিত্য-রসাস্বাদন আরম্ভ হয়। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তখন পুরা 'দাস রাজত্ব'। (জীবনস্মৃতি দ্রঃ)। ছেলেদের দোষ-ত্রুটির জন্য চাকরদের ইঁট হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে ও অন্যান্য শাস্তিভোগ করিতে হইত। আর তাহারাও ছেলেদের নানাবিধ উপায়ে শাসন করিত ও যাহাতে কোনোরূপ অন্যায় আচরণ না করে তজ্জন্য কড়া নজর রাখিত। সেকালে বিস্তর বাঙালী ভৃত্য পাওয়া যাইত, পরে যাহাদের অধিকাংশ স্থান হিন্দুস্থানী ও উড়িয়াতে অধিকার করিয়াছে। কচিৎ বাঙালী খানসামা দেখা যায়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'ঈশ্বর' নামে যে তাঁহাদের চাকর ছিল, সে সন্ধ্যায় ছেলেদের হট্টগোল নিবারণের জন্য তাহাদিগকে লইয়া বসিয়া রামায়ণ ও মহাভারত শুনাইত। অন্যান্য চাকরেরাও সেখানে আসিয়া বসিত। কবি একটু বড় হইয়া নিজেই পড়িতেন, তাহারা শুনিত, তখন আর ঈশ্বরকে পড়িতে হইত না। পাঠশালার পাঠ্য কিন্তু অতি অল্পই ছিল, যাহাদের মধ্যে চাণক্যশ্লোক ও রামায়ণই প্রধান। ১২৭৩ সালেই রবীন্দ্রনাথ ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে প্রবেশ করিলেন কিন্তু বেশি দিন সেখানে থাকা হইল না। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে নর্মাল স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন, যেখানে তিনি ছাত্রবৃত্তির দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তখন এই বিদ্যালয়টি চিৎপুর রোডের উপর পাথুরেঘাটা স্ট্রীটের ঠিক সম্মুখে শ্যামলাল মল্লিকের বাড়িতে অবস্থিত ছিল।

কবির প্রাণে সহজাত অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় একটা সুর বহিয়া যাইত। প্রথম ভাগে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুরে প্রথম ঝংকার উঠিল। ঈশ্বর যখন রামায়ণ পড়িত তখন সেই সুর ঝংকৃত হইত। কিশোরী চাটুয্যের পাঁচালীর গানে সেই সুর বালকহৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিত। এই সুর যাঁহার প্রাণে জাগে, তাঁহার গায়ক ও কবি হওয়া আশ্চর্য নয় তবে গানটা সহজেই আসে, অনুশীলনও সাধনা সাপেক্ষ, কবি হওয়া ভাগ্যের কথা, কবিরা জন্মান, প্রস্তুত হন না। তখন বাড়িতে গানের হাওয়া চারিদিকেই বহিতেছিল। নাট্যাভিনয়ে গানের মহলায় গানের চর্চা চলিত। প্রসিদ্ধ গায়ক যদুভট্ট (যদুনাথ ভট্টাচার্য) তখন তাঁহাদের বাড়ির বেতনভোগী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। বাড়ীর সকলে গানের চর্চা করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের জন্য রামমোহনের নিযুক্ত গায়ক ভ্রাতৃযুগল কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর নাম তখন শহরে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুর গুণপনা সকলকেই আকৃষ্ট করিতেছিল। এমন কি, ১৮৭২ সালে যখন বাঙালীর সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ন্যাশান্যাল থিয়েটার বীডন স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনো বিষ্ণু রঙ্গমঞ্চের ভিতর হইতে গান গাহিতেন। তথায় প্রথম নাটক নীলদর্পণের অভিনয়কালে নটগুরু গিরিশচন্দ্র সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেন নাই। টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় এবং পেশাদারী নট জীবন তখনো তাঁহার মতবিরুদ্ধ ছিল এবং ব্যবসা হিসাবে ন্যাশান্যাল থিয়েটারের সাফল্যে তিনি সন্দিহান ছিলেন। তাই, ঐ অভিনয়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া একটি ব্যঙ্গ কবিতা মহাকবি গিরিশচন্দ্র রচনা করেন—

তাতে পূর্ণ অর্দ্ধ-ইন্দু কিরণ, সিঁদুর মাখা মোতির হার

* * * *

কিবা ধর্ম্মক্ষেত্রে স্থান,
অলক্ষ্যেতে "বিষ্ণু" করে গান,
অবিনাশী মুনিঋষি করছে বসে ধ্যান,
সবাই মিলে ডেকে বলে 'দীনবন্ধু' করো পার।

* * * *

মিলে যত চাষা করে আশা, নীলের গোড়ায় দিচ্ছে সার।

* * * *

স্থানমাহাত্ম্যে হাড়ি শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর' শীর্ষক পুস্তিকায় (অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যুতে, ১৯০৯) একস্থানে লিখিয়াছেন—"গানের শ্লেষ ছিল—স্থানমাহাত্ম্যে হাড়ি শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার।" এই অর্দ্ধ-ইন্দু প্রসিদ্ধ নট হাস্যরসিক অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি (মুখোপাধ্যায়), ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সহসম্পাদক ও নাট্যপরিচালক ছিলেন। বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ আগমনী ও বিজয়ার গান এবং ব্রহ্মসংগীত ব্যতীত কলাবতী মার্গ ও অন্যান্য গান গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈঠকখানায় একাধিকবার শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। বিষ্ণুচন্দ্রের পিতা কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। বিষ্ণু ১১ বৎসর বয়স হইতে ৭৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, বেতনের তিনচতুর্থাংশ কমিয়া যাওয়াতেও, ৬৭ বৎসর একাদিক্রমে ব্রাহ্মসমাজের গায়কের কার্য্য করিয়াছেন। ১৮৩০—১৮৯৭ একটি দিনও তিনি সমাজে অনুপস্থিত হন নাই। ১৯০১ সালে ৮২ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকে যখন ঐ সব আসরে প্রবেশাধিকার ছিল না, তখন দূরে থাকিয়া সকল গানের রসের আস্বাদনের সুযোগ ছিল। কাজেই গান গাওয়া তাঁহার সহজেই আয়ত্ত হইল। আর কবিতা রচনা করার সুযোগ একরূপ অনাহূতই আসিয়া জুটিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের খুল্লতাতভগ্নীর পুত্র জ্যোতিপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন কবির অপেক্ষা বয়সে বড়। ইঁহার পুত্র শিল্পী শ্রীমান যামিনীপ্রকাশ। কবির বয়স যখন ছয় সাত বৎসর তখন জ্যোতিপ্রকাশ বাঙলা শেষ করিয়া ইংরেজি পড়িতেন। তিনি একদিন হঠাৎ রবীন্দ্রনাথকে পদ্য লিখিবার প্রণালী শিখাইয়া দিলেন ও জোর করিয়া কয়েক ছত্র লিখাইয়াও লইলেন। রবীন্দ্রনাথ পয়ার বাঁধিতে শিখিলেন। তখন পদ্য লেখার চর্চা আরম্ভ হইল। কবি যখন নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্র তখন তাঁহার পদ্য রচনার কথা পণ্ডিতগণের অগোচর ছিল না। একদিন উক্ত স্কুলের শিক্ষক তৎকালীন প্রসিদ্ধ পাঠ্যপুস্তক "প্রাণী বৃত্তান্তের" লেখক সাতকড়ি দত্ত নিম্নের দুই ছত্র কবিতার পরে কী লেখা যাইতে পারে রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেন—

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

বালক-রবি মুহূর্ত্ত মাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

[ক্রমশঃ।

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

দশম সর্গ

বৎসগণ, তোমাদের সকলের বিশেষরূপে জেনে রাখা উচিত··· প্রতারকদের এই মায়া-কৃতি। কিন্তু দেখো, ভুলেও যেন সেগুলির সেবা ক'রে বোসো না। যাঁরা বিদ্বান তাঁরাই কেবলমাত্র কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে কামনা করেন···ধর্মানুগ কলা-কলাপ। ১

"ধর্মানুগ" কলাগুলি অন্যান্য কলাবিভাগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রধান। সেগুলি হচ্ছে :—

(১) সর্বভূতে দয়া,
(২) পরোপকার,
(৩) দান,
(৪) ক্ষমা,
(৫) অনসূয়া,
(৬) সত্য,
(৭) অলোভ,
ও (৮) প্রসন্নতা। ২

"অর্থানুগ" কলাগুলি হচ্ছে :—

(১) নিত্য উত্থান-শীলতা,
(২) নিয়ম-পরীপালন,
(৩) ক্রিয়া-জ্ঞান,
(৪) স্থান-ত্যাগ,
(৫) পটুতা,
(৬) অনুদ্বেগ,
ও (৭) স্ত্রীলোকদের উপর অবিশ্বাস। ৩

"কামানুগ" কলাগুলি হচ্ছে :—

(১) পোষাকের পারিপাট্য,
(২) সুকুমারতা,
(৩) চারুতা,
(৪) গুণোৎকর্ষ,
(৫) নানাবিধ শৃঙ্গারাদি লীলা,
ও (৬) প্রিয় বা প্রেয়সীর চিত্তজ্ঞান। ৪

"মোক্ষানুগ" কলাগুলি হচ্ছে :—

(১) বিবেক-রতি,
(২) প্রশান্তি,
(৩) তৃষ্ণাক্ষয়,
(৪) সন্তোষ,
(৫) সঙ্গ-ত্যাগ,
(৬) পরমাত্মায় নিজের জীবাত্মার বিলীয়মানতা,
ও (৭) পরম-প্রকাশ। ৫

এই হোলো ধর্মাদি চতুষ্টয় কলা' সর্ব্বসাকুল্যে বত্রিশটি হোলো এদের ক্রমবিভাগ। সংসারকে যাঁরা ফাঁকি দিতে চান, সেই বিদ্বানদিগের এগুলি বিদ্যা। ৬

পাঁচটি রয়েছে "সুখানুগ" কলা। যথা :—

(১) মাৎসর্য-ত্যাগ,
(২) প্রিয়বাদিত্ব,
(৩) সুধীরতা,
(৪) অক্রোধ,
ও (৫) বৈরাগ্য।

এই সুখানুগ কলাগুলি কিন্তু মানুষ ব্যবহার করে পরার্থে, স্বার্থে নয়। ৭

সাতটি রয়েছে "শীলানুগ"-কলা।

(১) সৎসঙ্গ,
(২) কামজয়,
(৩) শুচিতা,
(৪) গুরু-সেবা,
(৫) সদাচার,
(৬) নির্ম্মল প্রতিজ্ঞান,
ও (৭) যশোলিপ্সা। ৮

"প্রভাবানুগ" কলা সতেরটি, যথা :—

(১) তেজঃ,
(২) সত্ত্ব,
(৩) বুদ্ধি,
(৪) ব্যবসায়,
(৫) নীতি,
(৬) ইঙ্গিত-জ্ঞান,
(৭) প্রগলভতা,
(৮) সু-সহায়,

(৯) কৃতজ্ঞতা,
(১০) মন্ত্র-রক্ষণ,
(১১) ত্যাগ,
(১২) অনুরাগ,
(১৩) প্রতিপত্তি,
(১৪) মিত্রার্জন,
(১৫) অ-নৃশংসতা,
(১৬) সপ্রতিভতা,
ও (১৭) আশ্রিতজন-বাৎসল্য। ৯-১০

তিনটি রয়েছে "মানানুগ" কলা। এগুলি মনের জীবন। যথা :—

(১) মৌনতা,
(২) অ-চাপল্য,
ও (৩) অ-ভিক্ষা।

যাঁরা বিদগ্ধ তাঁদের উচিত...এই চতুঃষষ্টি কলাগুলিকে স্বগতঃ প্রয়োগ করা। ১১

আরও দশটি কলা রয়েছে, সেগুলিকে বলা হয়..."ভেষজ," অর্থাৎ যে রোগের যে ওষুধ। যথা—

(১) শক্তিমন্তের বিরুদ্ধাচরণ,
(২) বা শক্তিমন্তকে প্রণতি,
(৩) বলোদয় হলেই বৈরতাচরণ,
(৪) আর্ত্তের প্রতি ধর্মাচরণ,
(৫) দুঃখে ধৈর্য-ধারণ
(৬) সুখে উথলে না ওঠা,
(৭) ঐশ্বর্যের যেখানে ছড়াছড়ি সেখানে সংবিভাগ করণ,
(৮) সৎ-বিষয়ে সোহাগ,
(৯) মন্ত্র-সংশয় উপস্থিত হলে প্রজ্ঞার বিকীরণ,
ও (১০) নিন্দনীয় সমস্ত ব্যাপারেই পরাঙ্মুখতা। ১২-১৩

বৎসগণ, সর্বশেষ আমি তোমাদের শোনাব কতকগুলি সার-কথা। সর্ব্বলোকের এই সংসারে এই বাণীগুলি সার-তর। বৎসগণ,

(১) যত রকমের সত্য রয়েছে তার মধ্যে গুরু বাক্যটিকেই সার বলে জেনো।

(২) সমস্ত কার্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ম হচ্ছে গো-ব্রাহ্মণদেবতার পূজা।

(৩) অত্যুৎকট পাপগুলির মধ্যে লোভ শ্রেষ্ঠ।

(৪) যা কিছু উপতাপ জন্মায় তাদের মধ্যে 'ক্রোধ' শ্রেষ্ঠ।

(৫) গুণীদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান শ্রেষ্ঠ।

(৬) বিপুলবিত্তবিভবের চেয়ে যশস্বিতা বড়।

(৭) উৎকট দুঃখগুলির মধ্যে 'সেবা'ই সার দুঃখ।

(৮) যত রকমের নাগপাশ রয়েছে তাদের মধ্যে 'আশা' অতুলনীয়তম।

(৯) যতরকমের ধনরত্ন রয়েছে, তাদের মধ্যে দান-ধনই শ্রেষ্ঠ।

(১০) সেই প্রদেশগুলিকেই সুখের ব'লে জেনো, যেখানে নেই শত্রুরের উপদ্রব।

(১১) ভিক্ষার চেয়ে অধিক মানহানিকর আর কিছু নেই।

(১২) দারিদ্র্যের চেয়ে বড় অকল্যাণ...নেই।

(১৩) ধর্মই সংসার—পথিকের শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

(১৪) একমাত্র সত্য-ই পবিত্র করে তোলে সুখপথ।

(১৫) বিলাসাদি ব্যসন...শ্রেষ্ঠ রোগ।

(১৬) গৃহ সমৃদ্ধি নাশ করতে আলস্যই সেরা।

(১৭) যা কিছু শ্লাঘনীয়, তাদের মধ্যে নিঃস্পৃহতার স্থান সবার উপরে।

(১৮) মধুরেরও মধুর হচ্ছে প্রিয়বচন।

(১৯) নয়নে সব চেয়ে আঁধার ঘনায় দর্প।

(২০) সবার চেয়ে বড় উপহাসাস্পদ হয়েছেন 'দম্ভ'।

(২১) যত প্রকারের শুচিতা দেখেছ, তাদের মধ্যে অদ্রোহ-ই সব চেয়ে বিশুদ্ধ।

(২২) যতরকমের বরণীয় অনুষ্ঠান বা নিয়ম রয়েছে তাদের মধ্যে অচাপল্যই বরণীয়।

(২৩) অনেক কিছুই অপ্রিয় থাকতে পারে, কিন্তু পৈশুন্যের দোসর নেই।

(২৪) নৃশংস কর্মগুলির মধ্যে মানুষকে ভাতে-মারা (বৃত্তিচ্ছেদ) অদ্বিতীয়।

(২৫) পুণ্যরাশির মধ্যে কাকন্য শ্রেষ্ঠ।

(২৬) পুরুষত্বের চিহ্নগুলির মধ্যে কৃতজ্ঞতা শ্রেষ্ঠ।

(২৭) যত রকমের মোহানুগ প্রজ্ঞা রয়েছে, তাদের মধ্যে মায়া শ্রেষ্ঠ।

(২৮) যে কারণগুলি নরকে নিয়ে যায় মানুষকে, তাদের মধ্যে কৃতঘ্নতা প্রধানতম।

(২৯) ঠগ-চোরদের মধ্যে শ্রীমদন শ্রেষ্ঠ।

(৩০) জ্ঞাতি-ভেদের ব্যাপারে স্ত্রী-বাক্যই প্রবল।

(৩১) যে মানুষ ক্রুর সেই-ই আসল চাঁড়াল।

(৩২) কলিযুগে যে সব অবতার প্রকট হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক শ্রেষ্ঠ অবতার।

(৩৩) শাস্ত্রই অনবদ্য মণিপ্রদীপ।

(৩৪) উপদেশই অনবদ্য মঙ্গল স্নান।

(৩৫) ক্লেশের গণনায় বার্দ্ধক্যের স্থান সর্বাগে।

(৩৬) মৃত্যু-তুল্য যত রকমের দুঃখ-ভোগ রয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে চিররোগিত্ব।

(৩৭) বিষম বিষগুলির মধ্যে স্নেহ-ই শ্রেষ্ঠ বিষ।

(৩৮) কুষ্ঠ বিসর্পাদির অপেক্ষা বেশ্যার ভালবাসা সাংঘাতিক।

(৩৯) ভার্যাই গৃহের পরম ধন।

(৪০) পরলোকবন্ধুদের মধ্যে পুত্রই শ্রেষ্ঠ।

(৪১) সহস্র শল্যের চেয়ে শত্রু সাংঘাতিক।

(৪২) কুপুত্রই কুল-ধ্বংসের শ্রেষ্ঠ কারণ।

(৪৩) রমণীদের শ্রেষ্ঠ রহস্য হচ্ছে যৌবন।

(৪৪) মোহন বেশভূষার চেয়ে রূপ বড়।

(৪৫) সহস্র রাজ্য লাভের চেয়ে সন্তোষ বড়।

(৪৬) সম্রাটের সমস্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে সৎসঙ্গ সারতর।

(৪৭) শোষণকারীদের মধ্যে চিন্তার চেয়ে বড় কেউ নেই।

(৪৮) কোটরাগ্নির মত দাহন ছড়াতে বিরহ অদ্বিতীয়।

(৪৯) বিশ্বাস বা প্রণয়ের সার হচ্ছে মৈত্রী।

(৫০) যত রকমের মত্যার্থ ভোগ রয়েছে, তাদের মধ্যে নির্বন্ধনাই শ্রেষ্ঠ।

(৫১) যত রকমের ব্যাধি রয়েছে, সঙ্কোচ তাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

(৫২) কৌটিল্যের মত নির্জলা অন্ধকূপ আর নেই।

(৫৩) যত রকমের নির্মাল্যি রয়েছে, তাদের মধ্যে সরলতার স্থান আদিতে।

(৫৪) বিনয়ের তুল্যি রত্নমুকুট নেই।

(৫৫) দুর্ব্যসনগুলির রাজা হচ্ছেন দ্যূতক্রীড়া।

(৫৬) মরুভূমির পিশাচদের চেয়েও সাংঘাতিক হচ্ছে।

···স্ত্রীজিতত্ব। ১৪—২৭

(৫৭) ত্যাগই শ্রেষ্ঠ মণিবলয়।

(৫৮) শ্রুতিই উজ্জ্বলতম কর্ণভূষণ।

(৫৯) খল-মৈত্রীর চেয়ে চপলতর আর কিছু নেই।

(৬০) অনেক প্রয়াস বৃথা হয়ে যায়, কিন্তু দুর্জনের সেবা ব্যর্থ হবেই।

(৬১) মোক্ষসুখই শ্রেষ্ঠ উদ্যান।

(৬২) প্রিয়দর্শনই অমৃতবৃষ্টি করে।

(৬৩) শ্রেষ্ঠ লতা হচ্ছে ব্রহ্মরতি।

(৬৪) সজ্জনের বিবেকনাশ করতে হলে মূর্খসভা বসাও।

(৬৫) সফল যত মহাকৃত রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কুলীনেরাই শ্রেষ্ঠ।

(৬৬) সত্যযুগের অবতারদের চেয়েও সৌভাগ্যই জেনে রেখো কাম্য।

(৬৭) রাজদরবার সব চেয়ে স্থূল শঙ্কাস্থল।

(৬৮) স্বভাবকৌটিল্যে প্রথম স্থান অধিকার করে রমণীহৃদয়।

(৬৯) স্তুতির যোগ্য যা কিছু রয়েছে, তাদের মধ্যে ঔচিত্যই সব চেয়ে স্তবনীয়।

(৭০) চন্দনাদি অনুলেপনের চেয়ে গুণরাগ শ্রেষ্ঠ।

(৭১) শোকের জন্ম দিতে কন্যাই পটীয়সী।

(৭২) নির্বোধই অনুকম্পার শ্রেষ্ঠ পাত্র।

(৭৩) ধনদৌলতই আসল সৌভাগ্য।

(৭৪) কীর্তির মুখ্য মূল হচ্ছে জনপ্রীতি।

(৭৫) মন্ত্রের চেয়ে বড় তালবেতাল···নেই।

(৭৬) এক গজ আড়ের যে সব ধনকুবের রয়েছেন, তাঁদের শিকারই বেশী উপকারী।

(৭৭) স্বাস্থ্যকর যা কিছু হতে পারে, তাদের মধ্যে মানসিক শান্তিই শ্রেষ্ঠ।

(৭৮) বিভিন্ন তীর্থসেবার চেয়ে আত্মরতি মঙ্গলের।

(৭৯) নিষ্ফলাদের মধ্যে কৃপণ শ্রেষ্ঠ।

(৮০) সবচেয়ে বড় শ্মশান হচ্ছে···সংসারের আচার-বিবর্জিত মানুষ।

(৮১) ন্যায়-বুদ্ধিই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ রক্ষা।

(৮২) ইন্দ্রিয়-বিজেতাই শ্রেষ্ঠ প্রতাপী।

(৮৩) ঈর্ষ্যা-ই শ্রেষ্ঠ যক্ষ্মা।

(৮৪) অপযশের মত কুস্থানে-মরণ আর নেই।

(৮৫) মাতাই মাঙ্গল্য মহোত্তমা।

(৮৬) পুণ্যোৎসব উপদেশ ইত্যাদির চেয়ে পিতাই মহত্তর।

(৮৭) তীক্ষ্ণতর যত রকমের কাজ রয়েছে, তাদের মধ্যে খুন-খারাপিই শ্রেষ্ঠ।

(৮৮) শাণিত খড়্গের চেয়েও বিচ্ছেদ সাংঘাতিক।

(৮৯) প্রণামই উত্তম চোর···অহঙ্কারের বা ক্রোধের।

(৯০) যত রকমের কষ্ট-ভিক্ষা আছে, তাদের মধ্যে সৌহার্দের জোড়া নেই।

(৯১) পুষ্টিকরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে 'মান'।

(৯২) কীর্তিই সংসার বীরদের শ্রেষ্ঠ সার।

(৯৩) শ্রেষ্ঠ নীতি হচ্ছে 'প্রভুভক্তি'।

(৯৪) সৌখ্যের যত রকমের বীথি রয়েছে, তাদের মধ্যে যুদ্ধে নিধনই সৌখ্যের শ্রেষ্ঠ বীথি।

(৯৫) বিনয়ের মত কল্যাণ আর নেই।

(৯৬) অণিমাদি সর্ব্ব সিদ্ধির চেয়ে উৎসাহ বড় জিনিষ।

(৯৭) পরম প্রার্থিবগুলির মধ্যে পুণ্যই শ্রেষ্ঠ।

(৯৮) পরম প্রকাশ গুলির মধ্যে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।

(৯৯) সংসারে মানুষের কাছে অন্য-মানুষ নগণ্য। কীর্তিই ধন্য।

১৪—৩৮

আর বৎসগণ, জেনে রেখো, এই কলা-বিদ্যাগুলিকে আয়ত্ত করে যিনি কুশলী হয়ে ওঠেন, তিনিই অর্থের সৃষ্টি ও অর্জনতত্ত্বে বিজ্ঞানী হন, পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ হন।···সর্ববর্ণগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণের মত। ৩৯

নানান রকমের কলা রয়েছে। তারা শুভও আনে, অশুভও আনে। কিন্তু এই যে, একশটি সারগর্ভ বাক্য তোমাদের শোনালেন, জেনে রেখো, সেগুলিকে যিনি বিচারমূলে ব্যবহার করবেন, তিনিই দর্শন পাবেন লক্ষ্মীর। লক্ষ্মীদেবীর প্রয়োজন সর্ব্বকালেই প্রত্যক্ষ। ৪০

* * *

এই পর্যন্ত ব'লে শ্রীমূলদেব থামলেন। তারপরে আচার্য্যের যথা-কৃত্য অনুষ্ঠান ক'রে বিদায় দিলেন শিষ্যদের। ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন নিজের মন্দিরে।

তখন অস্ত গেছেন চাঁদ।

নক্ষত্রের ফুল ফুটে উঠেছে রাত্রির ওড়নায়। ৪১

এই 'কলা-বিলাস"—
নানান আসরের খেলা দেখায়;
অধরেতে মুচকি হাসির চাঁপা কোটায়;
এবং লোকজনকে উপদেশ দেয়;
যেন সে একটি প্রেমিক রতন।
যাঁর মধুর আলাপে রয়েছে বিচিত্র একটি আবেদন। ৪২

"ক্ষেমেন্দ্রের" প্রতিভা-সাগর থেকে উত্থিত হয়েছে এই কলা-বিলাস।

সেই বিলাস, হিমরশ্মি চন্দ্রদেবের মত, নিখিলের মনে নিত্য দান করুক আনন্দ···এই তাঁর প্রার্থনা। ৪৩

ইতি কলাবিলাসে সকল কলা নিরূপণং নাম দশমঃ সর্গঃ।

সমাপ্ত

শ্রীমতী আর্ভেরএর দিনপঞ্জী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তরু দত্ত

শেষ কথা

১৪ই ফেব্রুয়ারী মার্গরিতের ছেলে হয়। ওর মা বাড়ী ছিলেন না। জেনারেল তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন অসুস্থা এক পুরোনো বান্ধবীর বাড়ী, প্রায় মাইল দুয়েক দূরে। মার্গরিৎ জোর করেই ওর মাকে পাঠিয়েছিল, নয়ত ভদ্রমহিলা যেতে চাইছিলেন না। বিকেল চারটে নাগাদ যন্ত্রণা শুরু হয়। ওর স্বামী কি লিখছিল বৈঠকখানায়। পাশেই ও বসে বুনছিল। কয়েক মিনিট বাদে ও সোফায় শুয়ে পড়ল। স্বামী তাড়াতাড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে জানতে চাইল, "কি, কি হল?"

"কিছু না গো, বড় ক্লান্ত লাগছে।"

ও উঠে এসে বসল স্ত্রীর পাশে। দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেও ও তা ঢাকতে চেষ্টা করছিল। দুজনে হাত ধরাধরি করে বসে রইল নীরবে।

"লুই", শেষ পর্যন্ত ও বলল, "আমি ওপরে যাচ্ছি, শরীরটা কেমন যেন করছে।"

উঠে দাঁড়াল ও। ঘরটা যেন ওর চারিদিকে ঘুরতে লাগল। টপ করে ও বসে পড়ল।

"লুই, বড় দুর্বল লাগছে!"

ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে লুই একটা কোচে শুইয়ে দিল আস্তে আস্তে। "তুমি নড়ো না যেন, লক্ষ্মীটি, তোমার মাকে আমি ডাকতে যাচ্ছি, আর ডাক্তারকে খবর পাঠাচ্ছি।"

ও বেরিয়ে গিয়ে তেরেসকে পাঠিয়ে দিল। আনন্দে দিশেহারা হয়ে দাইটা ওর পোষাক পরিচ্ছদ খুলতে লাগল।

"আজই না তেরেস? বাছা আজ আসছে?"

"হ্যাঁ, খুকুদি।"

তেরেস ওকে ড্রেসিং গাউন দিতে গেলে ও হেসে বলল, "সব চেয়ে ভালটা দে তেরেস, এখুনি লোকজন আসবে।"

পৌনে এক ঘন্টা কেটে গেল, ব্যথা বেড়েই চলল। ওর চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল। ঝি গেল গরম জল আনতে। দুই হাতে মুখ ঢেকে ও জানালার ধারে বসেছিল; স্বামী এসে ঢুকল; ওর মুখ থেকে হাত সরিয়ে দেখল, ও কাঁদছে।

"বেচারা! এত কম বয়সে এই কষ্ট!" ওর কপালে চুমা দিয়ে ও বলে উঠল। তার পর জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা···যন্ত্রণা হচ্ছে খুব বেশী?"

ওকে আশ্বস্ত করবার জন্য হাসতে চেষ্টা করে মার্গরিৎ জবাব দিল, "না গো, সামান্য ব্যথা!" কিন্তু ও ক্রমশই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে দেখে মার্গরিৎ বলল, "এ ব্যথা সবই ভুলে যাব গো যখন কোল জোড়া ধন আসবে। এত বড় পুরস্কারের বদলে যন্ত্রণা সইতেই হবে!"

স্বামীর হাত ধরে গিয়ে ধীরে ধীরে ও শুয়ে পড়ল। ঢং ঢং করে ছটা বাজল। আরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল। লুই ছটফট করতে লাগল ডাক্তারের দেরী দেখে। ও উঠছে দেখে মার্গরিৎ জড়িয়ে ধরল ওকে যন্ত্রণার ঘোরে।

"যেও না লুই, একা বড় ভয় করছে, যেও না গো!"

"চুপ কর লক্ষ্মীটি, একটু শান্ত হতে চেষ্টা কর!"

হাঁটু গেড়ে ও বসে পড়ল বিছানার পাশে, স্ত্রীর মাথা কাঁধে রেখে। মার্গরিতের চাপা নিশ্বাস, অনর্গল অশ্রু—এসব দেখে বোঝা যাচ্ছিল কী যন্ত্রণা ওর হচ্ছে। সাতটা বাজল; সুদীর্ঘ এক নিশ্বাস ফেলেই ও অজ্ঞান হয়ে গেল: প্রসব হয়ে গেল। ঠিক সেই সময় বাড়ীর দরজায় এসে থামল একটা গাড়ী। ওর মা এলেন। ফেরার পথেই ওঁর কাছে খবর পৌঁছেছে। উনি ঘরে ঢুকতে কাপ্তেন উঠে দাঁড়াল, স্ত্রীর মাথা বালিশের ওপর রেখে ওঁর কাছে গিয়ে সংক্ষেপে বলল, "দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে ও অজ্ঞান হয়ে গেছে; ছেলে হয়েছে।"—তারপর বেরিয়ে গেল। ওর মার সঙ্গে সঙ্গে তেরেস এল; দশ মিনিট বাদে এলেন ডাক্তার; পাশের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে কাপ্তেন সব কথা খুলে বলল ওঁকে।

"ওর মা এখন ওর কাছে আছেন", ও বলল শেষে।

ঘরের দরজা খুলে গেল। মাদাম আর্ভের ডাকতে এলেন মঁসিয়্য শাঁতোকে, "আসুন ডাক্তার বাবু, খাসা নাদুস-নুদুস ছেলে হয়েছে!"

লুই আর ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন। তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে ও চোখ বুজে শুয়ে ছিল। ডাক্তার নাড়ী দেখলেন। আধ ঘণ্টা চেষ্টার পর ও চোখ খুলতেই প্রথম তার সঙ্গে চোখাচোখি হল। ওকে আশ্বস্ত করবার জন্য হাসল মার্গরিৎ। কপাল চুম্বন করে ওর স্বামী হাত রাখল ওর হাতে।

"বাচ্চাটা কেমন আছে গো?" চুপি চুপি মার্গরিৎ প্রশ্ন করল। মাদাম আর্ভের লুইয়ের হাতে ছেলে দিতেই লুই তাকে রাখল প্রসূতির বুকে। মার্গরিৎ বহুক্ষণ চেয়ে রইল তার দিকে; ওর মুখে ফুটে উঠল বিজয়িনীর হাসি। "ওগো, এই দেখ আমাদের সন্তান!" তারপর অপূর্ব হাসি হেসে বলল, "কি গো, ছেলে যে বাপের হামি চায়!"

লুই বসে মাকে আর ছেলেকে আদর করল।

"ভগবান আমার স্ত্রী-পুত্রের মঙ্গল করুন, তিনিই তাদের রক্ষা করুন সর্বদা!"

ডাক্তার ওর হাতে এক গ্লাস পানীয় দিয়ে বললেন, পোয়াতীকে সবটা খাইয়ে দিতে।

মার্গরিৎ উঠে বসতে চেষ্টা করল।

"না মা শুয়ে থাক, এখনো তুমি বড্ড দুর্বল, "হাঁ হাঁ" করে উঠলেন

ডাক্তার শাঁতো।—গ্লাস থেকে খানিকটা খেয়ে ও স্বামীকে বলল, "আর পারছি না।"

"কিন্তু এটুকু যে খেতেই হবে।"

অমনি মার্গরিৎ চুমুক দিয়ে খেয়ে নিল সবটা।

"যত পার খাওয়া-দাওয়া কর হে", ডাক্তার বললেন, "তা নয়ত নতুন মানুষটির খাওয়ার জোগাড় হবে কোথা থেকে? এমন গুণ্ডা ছেলে অল্পে শান্ত হবে না, একথা বলে রাখলাম।"

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন লুইয়ের সঙ্গে।

"কেমন দেখলেন?" লুই ব্যস্ত হয়ে উঠল।

উত্তরে ডাক্তার ছোট্ট একটা শীস দিলেন।

"বলুন মঁসিয়্য শাঁতো", লুই অধীর হয়ে জানতে চাইল। ডাক্তার ওর কাঁধে হাত রাখলেন।

"সবুর বন্ধু, ধৈর্য ধর। মার্গরিতের জন্ম থেকেই আমি ওকে দেখছি; ভেতরে ভেতরে ওর স্বাস্থ্য খুবই ভালো। এটা একটা আশার কথা। কিন্তু ওর বয়স সতেরো বছরও হয়েছে কি না সন্দেহ। এটা ভাল-মন্দ দুই-ই; ওর এখনও মা হবার বয়স হয় নি। কিন্তু ওর তারুণ্যের জোর আছে। এ-সময়ে অসুখ ও দৌর্বল্যের সাথে লড়াই জিতে ও বেরিয়ে আসতে পারবে মনে হয়। ওর স্বাস্থ্য কি এখনো আগের মতই অটুট আছে?"

"আমাদের বিয়ের আগে গত এপ্রিল মাসে ওর যে অসুখ হয়েছিল, তাতে ও অনেকটা রোগা ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আর মে মাসে আমাদের বিয়ে হয়।"

"হাঁ, হাঁ তখনো ও পুরোপুরি সেরে ওঠে নি!"

খানিকক্ষণ মঁসিয়্য শাঁতো আগুনের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু শীস দিলেন।

"আচ্ছা, বিয়ের পর আর অসুখ হয়নি, না?"

"উঁহু, দুবার খালি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।"

ডাক্তারের কালো প্রখর চোখ দুটি লুইয়ের বিষণ্ণ মুখে কিছু খুঁজছিল। "ঘাবড়াবার কিছু নেই হে, ওর বয়স অল্প, সেরে উঠবেই!" বলে তারপর স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন, "ভয় পেয়োনা বন্ধু, ঘাবড়াচ্ছ কেন? এ-বয়সে কোন বাবার কাছেই হার মানে না লোকে—এ আমার স্থির বিশ্বাস!"

ওঁরা ঘরে ঢুকলেন। মার্গরিৎ দরজার দিকে চেয়ে স্বামী আসছে দেখে হাসল। "কোথায় গিয়েছিলে গো? বস এখানে!"

বিছানাতেই একটু জায়গা করে দিল ও; লুই বসল।

"কি সুন্দর দেখতে হয়েছে ছেলেটা?" মার্গরিৎ বলল।

স্বামীর হাত নিয়ে বাচ্চাটার হাতের উপর রাখল মার্গরিৎ। "কি নরম না? তেমনি মোটা-সোটা। মা বলছিল দেখে ছ'মাসের ছেলে মনে হয়; ওর চোখ দুটি কিন্তু হুবহু তোমার মত হয়েছে: অমনি স্বচ্ছ, অমনি গভীর; কিন্তু ছেলে সহজে চোখ খোলেন না। ওর চুলগুলো কেমন বলত?"

"ঠিক তোমারই চুলের মত কুচকুচে কালো," উত্তর দিল লুই।

"হুঁ, আর সবই তোমার মত হয়েছে।"

"খালি আমার প্রশংসাই করবে নাকি গো?" দুষ্টু গলায় লুই জানতে চাইল।

"আমি এক বর্ণও মিথ্যা বলছি না গো; মাকে জিজ্ঞেসা কর না। আচ্ছা মা, ছেলেটা ঠিক লুইয়ের মত দেখতে হয়েছে না?"

"উঁহু, এখন বেশী কথা না বলাই ভাল, মঁসিয়্য শাঁতো বাধা দিলেন, "একটু ঘুমিয়ে নাও বাছা। বঁ সোয়ার!"

বাচ্চাটা হঠাৎ ককিয়ে উঠল, মার্গরিৎ ব্যস্ত হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকাল, "বোধ হয় খিদে পেয়েছে ডাক্তার বাবু!"

"বেশ ত, দুধ দাও।"

লজ্জায় গৌরবে লাল হয়ে উঠল মার্গরিৎ। "কিন্তু ঘন ঘন ওকে জাগিও না দুধ খাওয়াবার জন্য, তা হলে তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হবে।"

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। সব কটা বাতি নিভিয়ে দেওয়া হল। ছোট্ট একটা টেমি আর চিমনীর আলো ঘরে ছিল। ছেলেটার দিকে পরম আনন্দে মা তাকিয়ে রইল। অব্যক্ত এক সুখে ওর সমস্ত রক্ত ছলকে উঠল সারা গালে, যখন বাচ্চাটা মোটা ঠোঁট দুটি দিয়ে টিপে ধরল ওর স্তনাগ্র, ওর স্বামী পাশে বসে হাসছিল মিটি মিটি। বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়ল। দুধে-মাখা শাদা কচি মুখ থেকে মাতৃস্তন্য আলগা হয়ে পড়ল। এমন সময় জেনারেল মেয়ের কাছে এলেন।

"কি রে মার্গো, আজ সন্ধ্যা থেকে আমি তাহলে দাদামশাই হলাম?" বললেন উনি। লুই তাড়াতাড়ি উঠছে দেখে ওকে মানা করলেন উনি, "বস বাবাজী!" মেয়েকে চুমা দিলেন কপালে।

"ভগবান তোকে রক্ষা করবেন", বলতে বলতে ওঁর গলা ভারী হয়ে উঠল। তার পর বসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন লাগছে মা? বড় দুর্বল না?"

"সামান্য!" বলেই ঠোঁট ফুলিয়ে ও জিজ্ঞাসা করল, "কই বাবা, এক বারও তোমার নাতিকে দেখতে চাইলে না ত?"

"আমার নাতি!" জেনারেল এমন ভান করলেন, যেন আকাশ থেকে পড়ছেন, "উঃ এর মধ্যেই দাদামশাই হয়ে গেলাম! এমন জানলে শ্রীমানের সঙ্গে মার্গোর বিয়ে দিতাম না। ষাট বছরে পা দেবার ত এখনো কত দেরী! দেখতে দেখতে কত্তাদাদু হয়ে যাব এ ভাবে চললে!"

প্রাণ খুলে হাসতে লাগল মার্গরিৎ। সেই উচ্ছল হাসিতে সবারই বুক ভরে উঠল। মার্গরিৎ ওর স্বামীকে তিনটে বাতি জ্বালাতে বলল যাতে করে বাবা ভাল করে ছেলের মুখ দেখতে পান।

দাদামশাই বহুক্ষণ চেয়ে রইলেন নাতির দিকে। যৌবনের কথা তাঁর মনে পড়ল যখন প্রথম তিনি কোলে নিয়েছিলেন তাঁর খুকিকে চোখের সামনে ভেসে উঠল মশারী-খাটানো বিছানাটার ছবি! অ[illegible] স্নেহের সাথে উনি বাচ্চাটার কপালে চুমা দিলেন।

"আজ আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, তোর জন্মের কথা। কি[illegible] তোর মা এত দুর্বল ছিলেন না, অবশ্য ওঁর বয়সও এত অল্প ছিল ন[illegible] তখন।"

"কত ছিল বাবা?"

"পঁচিশ বছর।"

"তা হলে তো লুইয়ের চেয়েও বড় ছিলেন?"

"ওর কত হল? ১৮৪০ থেকে ১৮৬২? বাইশ বছর মাত্র! তার পর বললেন, "আজ তোর জন্মদিন ত খুকি?"

"তাই ত লুই, ভুলেই গেছিলাম।"

"তাতে কি, জন্মদিনে কি খাসা উপহারটা দিলি বলত?"—ওর মুখে হাসি ধরে না।

"হ্যাঁ, এর চেয়ে বড় উপহার জীবনে পাওয়া সম্ভব নয়" বলে লুই ওর ঘুমন্ত ছেলেকে আদর করল।

মার্গরিৎ স্বামীর হস্ত চুম্বন করল। তারপর খানিক বাদে প্রশ্ন করল, "লুই, ঠাকুমার কাছে তার করা হয়েছে?"

"ব্যস্ত হস না মা, আমি এখুনি তার করেই ফিরছি!" কাপ্তেন সাহেবের কি অন্য দিকে মন দেবার মত অবস্থা ছিল?—কিন্তু তোর এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। কাল কথাবার্তা হবে। শুভরাত্রি মা। ভালকরে ঘুমিয়ে নে!" বলে উনি চলে গেলেন।

পরদিন সকালে সবার আগে ও জেগে উঠল। লুই সারারাত ঘুমুতে পারেনি। শরীর খারাপের জন্য নয়, উদ্বেগে। বিছানার দিকে পেছন ফিরে ও দাঁড়িয়ে ছিল চিমনীটার সামনে। নিজেরই কল্পনার নেশায় ও বুঁদ হয়ে ছিল, এমন সময় কানে এল রমণীয় সেই ডাক, "লুই!"

ও ঘুরে দাঁড়াল। মার্গরিৎ ওর দিকে পূর্ণ আস্থাভরা ডাগর দু'টি চোখ মেলে চেয়ে ছিল। মাতৃত্বের দ্যুতি বিকীর্ণ হচ্ছিল ওর সারা মুখে। লুই এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল।

"লুই তুমি ঘুমাও নি?"

"না, আমার ঘুমের দরকার নেই গো!"

"কে বলল নেই? যদি এভাবে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন হও, মুস্কিলে পড়বে।"

"তাত হল, তুমি কেমন আছ?"

"ড্রাগনের মত সুস্থ গো, আর অত্যন্ত সুখী!"

স্বামীর হাত নিয়ে খেলতে খেলতে ওর চোখে পড়ল বিয়ের আংটিটা। ও হাসল, "যখন তোমায় ওটা পরিয়েছিলাম, তখন মনে যে কত দ্বন্দ্ব ছিল"!

"আর আজ?"

ও স্বামীর হাতের উপর নীরবে মাথা রাখল। "আজ আমি সবচেয়ে সুখী, প্রিয়!"

ওদের আদরে ছেলেটার ঘুম ভেঙে যেতেই সে কিছু খুঁজতে লাগল। লুই বুঝতে পেরে মশারী ফেলে দিল, খুলে দিল একটা জানলা। ফিরে এসে দেখল মার্গরিৎ ওকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

"ছোঁড়াটার খিদে পেয়েছে দারুণ!" হেসে জানাল মার্গরিৎ।

"খিদে ত না, একেবারে রাক্কসের মত গিলছে। ওর দাঁত থাকলে মাকেও খেয়ে ফেলত বোধ হয়", ঠাট্টা করল লুই।

ছেলেটা আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে বাপের দিকে তাকাল, যেন একটু হাসল।

"দেখছ লুই, এত গালমন্দ খেয়েও তোমার দিকে চেয়ে হাসছে, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই! ছেলের মত ছেলে!"

"মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশী দুধ খায় না গো?" লুই হেসে জিজ্ঞাসা করল।

"তা কি করে জানব? এই ত সবে একটা হল। না বাপু, ছেলেই ভাল।"
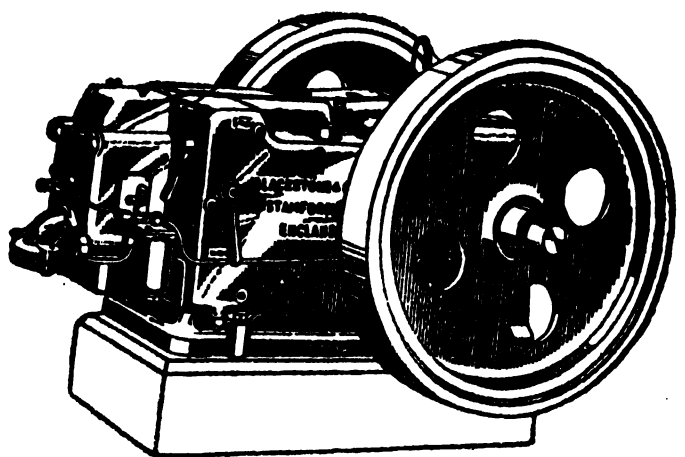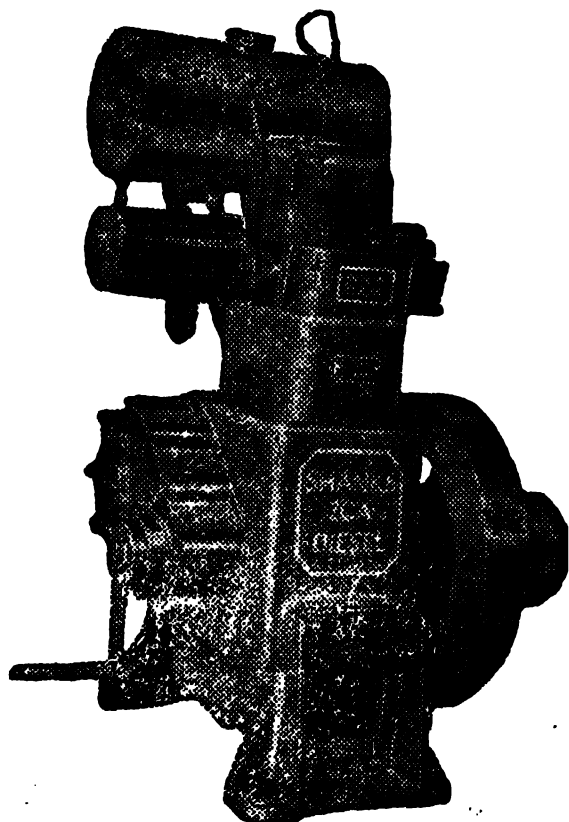
"আমারো সেই মত, কিন্তু আসছে বার, বছর খানেকের মধ্যেই জন্ম নেবে ছোট্ট একটি খুকি,—ঠিক তোমার মত দেখতে।"

"বছর খানেকের মধ্যে ?" ব্যথার ছাপ ফুটে উঠল ওর মুখে। অল্পক্ষণ পরে ও আত্মস্থ ভাবে বলল, "আমার স্বপ্নের কথা ?"

"তোমার স্বপ্ন ? পাগলি কোথাকার! স্বপ্নের কথা কেউ বিশ্বাস করে ?" বলে ওর গাল টিপে দিল।

মার্গরিং তবু বিষম ভাবে মাথা নাড়ল, "আমি বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু আমার এই স্বপ্ন যে অন্য রকম।"

"কিন্তু আর তো ভয়ের কিছু নেই। প্রসবের সময়টাই আশঙ্কাজনক। তুমি সগৌরবে পুরস্কার হাতে বেরিয়ে এসেছো সে-পরীক্ষা থেকে।" বলে ও ছেলের মাথায় হাত রাখল।

"তোমার কি মনে হয় সব বিপদ কেটে গেছে লুই ?" আশায় আনন্দে ওর চোখ জ্বলে উঠল।

"নিঃসন্দেহে, মার্গরিং।"

লুই-এর কথা ও পরম বিশ্বাসে মেনে নিল, বড় আশ্বস্ত হল।

"লুই বাইবেল থেকে কিছু পড়ে শোনাও না!" ও আবদারের সুরে বলল।

না ভেবে-চিন্তে বইটা খুলেই ও পড়তে শুরু করল যা প্রথম চোখে পড়ল। সেটি ১১৪ নম্বরের স্তোত্র :—

"—ভগবানকে আমি ভালবাসি ; তিনি আমার ক্ষীণকণ্ঠ শুনতে পাবেন।

—"তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন ; সারা জীবন ধরে প্রতিদিন তাঁকে আমি স্মরণ করব।

—"মৃত্যুর ব্যথা আমায় ঘিরে ধরেছে ; কবরের ভীতি আমায় আকুল করে তুলেছে।

—"অপরিসীম যন্ত্রণার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি আমি, ডেকেছি তোমায় হে ভগবান !

—"ভগবান আমার আত্মাকে মুক্তি দাও ; তুমি, তুমি ভগবান করুণাময়, সুবিচারক ; তুমি দয়াময়।

—"ভগবান সন্তানদের রক্ষা করেন ; বড় অবজ্ঞা সহ্য করেছি, তাই তিনিই আমায় উদ্ধার করেছেন।

—"হে আত্মা, স্বীয় শান্তিলোকে প্রবেশ কর, ভগবান তোমায় সব কিছু দান করেছেন।

—"তিনি মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেছেন আমার আত্মাকে, অশ্রু মুছে দিয়েছেন আমার নয়নের, সর্ব পতন থেকে আমায় বাঁচিয়েছেন।

—"এই মরলোকে আমি তাঁরই প্রীত্যার্থে বেঁচে থাকব।"

ওর পড়া শেষ হলে মার্গরিং আওড়াতে লাগল, "মৃত্যুর ব্যথা আমায় ঘিরে ধরেছে···ভগবানকে আমি স্মরণ করেছি। ভগবান, আমার আত্মাকে উদ্ধার কর।" তারপর ওর ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল ধীরে ধীরে, "চিরন্তন তাঁর সন্তানদের রক্ষা করেন ; তিনি আমাদের একেও দেখবেন, না গো ?"

"হ্যাঁ গো !"

সারাদিন ও বেশ হাসি-খুসী ছিল। ১৬ তারিখ সন্ধ্যা নাগাদ ও ঘুমিয়ে পড়ল। ডাক্তার এসে ও ঘুমুচ্ছে দেখে পরে আসবেন বলে চলে যাচ্ছিলেন ; হঠাৎ সেই সময় ও জেগে উঠে শঙ্কিত হয়ে তাকাতে লাগল।

"কি হল মা ?"

"ভয় !" ও বলল দারুণ বিচলিত ভাবে। ওর দুই চোখে অস্বাভাবিক একটা ছায়া।

"ভয় ?" ডাক্তার হেসে উঠলেন, "যা, যা! ভয় কিসের মা ?" ও স্বামীর কাঁধে হাত রাখল। "বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছি, না লুই ?"

"হ্যাঁ গো !"

"আবার সেই স্বপ্ন দেখেছি গো," অসম্ভব শঙ্কিত ওর চাউনি!

"হো, হো! স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছ বাছা ?" ডাক্তার বললেন "তোমার ছেলে যদি জানে তার মা এমন ভীতু, কি ভাববে বলত ? এই নাও, এটুকু খেয়ে নাও দেখি," বলে এক কাপ দুধ এগিয়ে দিলেন ওর মার হাত থেকে নিয়ে। এক চুমুকে ও সবটা খেয়ে নিল।

"এখন ভাল লাগছে না ?" বলে ডাক্তার উপদেশ দিলেন "এই সব খারাপ চিন্তাগুলো দূর করে দাও মা ; এ-দুর্বল অবস্থায় ভয় পাওয়া ঠিক নয় ; এমন যে কত দেখলাম—প্রথম মা হয়ে সব এই রকম নানা উদ্ভট চিন্তায় আকুল হয়ে ওঠে ; ভালো করে ঘুমাও মা-মণি, বঁ সোয়ার !"

লুই ওঁর সাথেই বেরিয়ে গেল, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডাক্তার মাথা নাড়লেন, "অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছে ; রাতে জ্বরটা বাড়বে ; এক দাগ ওষুধ দিও।"

"আর আশা নেই ডাক্তারবাবু ?" নীচু নীরস গলায় কাপ্তেন জানতে চাইল।

"উঁহু, সে-কথা বলছি না, হয়ত ভাল হয়ে যাবে, অসম্ভব কিছু নয় ; কিন্তু যা ভয় করছিলাম, ঠিক তাই হল : জ্বরটা !"

উনি নীচে গিয়েই দ্রুতপদে উঠে এলেন ; দেখলেন সিঁড়ির রেলিং-এ মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে লুই। অন্তরঙ্গের মত উনি ওর পিঠে হাত রাখলেন ; লুই চমকে উঠল ; ওঁকে দেখে বলল, "ওঃ আপনি।"

"আমি বলতে এলাম যে ও যেন বাচ্চাটাকে আর দুধ না খাওয়ায় ; একটি দুধ—মা পাঠাচ্ছি ; নয়ত বাচ্চাও অসুখে পড়বে। সবচেয়ে সতর্ক থাকতে হবে, ও যেন বিপদের বিন্দুমাত্র আভাস না পায়। তবে ও একদম ভেঙে পড়বে।"

তারপর লুইয়ের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, "আর মঁসিয়্য, এ-ভাবে মুষড়ে পড়ো না ; ভয়ের বিশেষ কিছুই দেখছি না। শতকরা, পাঁচটি মৃত্যুও হয় না এসব কেস-এ। জ্বরটা একটু মুস্কিলজনক বটে, কিন্তু কোন্ অসুখটা না শুনি ? আচ্ছা বাবা আসি ; বঁ সোয়ার।"

লুই প্রসূতির ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মা মেয়েতে কথা হচ্ছিল। ওর ম্লান কপোলে লেগেছে গাঢ় লালের ছোপ, আর চোখদুটো চকচক করছে ; দারুণ আবেগের সঙ্গে ও কথা বলছিল, নীচু গলায় অবশ্য, কারণ পাশেই ওর ঘুমন্ত শিশু। স্বামীকে আসতে দেখে ও তারদিকে ফিরে তাকাল।

"মার্গরিং !"

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ও ইশারা করল যে বাচ্চাটা ঘুমুচ্ছে। লুই হেসে ওর পাশে গিয়ে বসল।—

"ওগো, কথা একটু কম বললেই পারতে এ-সময়ে ; ক্লান্ত হয়ে পড়বে যে, শরীর খারাপ করবে।"

এমন সময় তেরেস এল ; দরজাটা ক্যাঁচ করে উঠতেই বাচ্চাটার ঘুম ভেঙে গেল।

"দেখলি তেরেস, তুই বাছার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলি!" একটু ধমকের সুরে ও বলল। তার পর বাচ্চাকে কোলে নিয়ে চপল হাসিতে মুখর হয়ে বলল, "বাবু আমার হয় ঘুমুবেন, নয় খাবেন; আলসে কোথাকার!"

ও ছেলেকে দুধ খাওয়াতে যাচ্ছিল, এমন সময় ধীরে ধীরে ওর তপ্ত হাতে হাত রাখল লুই।

"শুনছ, ওকে দুধ দিও না।"

সবিস্ময়ে চেয়ে মার্গরিৎ প্রশ্ন করল, "কেন?"

"তোমার অল্প জ্বর হয়েছে কি না, তাই জ্বরের ঘোরে ওকে যদি দুধ দাও, ওর শরীর খারাপ হবে। জ্বর ছাড়লেই আবার খেতে দিও, কেমন?"

শান্ত উৎফুল্ল কণ্ঠেই কথা কটি লুই বলল। কিন্তু ওর বুক ফেটে যেতে লাগল যখন দেখল কেমন ভাবে মার্গরিৎ করুণ দৃষ্টিতে একমনে শুনছে ওর কথা।

"বেচারা!" বলে সখেদে ও চোখ বন্ধ করল। পরে বাচ্চাকে আদর করতে গিয়ে দু' ফোঁটা জল তার মুখের ওপর পড়ল; তাড়াতাড়ি সেটা মুছে দিলেও ওর স্বামীর চোখ তা এড়ায় নি" সে সস্নেহে বালিকা-বধূর মাথায় হাত রাখল। খানিক বাদেই ও চোখ তুলে চাইল। এমন ভাব দেখাল যেন পরম শান্তিতে বিশ্রাম করছে।

"কিন্তু বাচ্চাটার খাবার কি হবে?"

"মঁসিয়্য শাঁতো এখুনি দাই পাঠাবেন বলে গেলেন।" লুই ও জুড়ে দিল, "দু-তিন দিনের ব্যাপার।"

সারা সন্ধ্যা জ্বরের ঘোরে কাটল; তবু মুখে টুঁ শব্দটি নেই। ও প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, ওর যন্ত্রণা দেখে স্বামী যেন উদ্বিগ্ন না হয়।

দাই এলে মার্গরিৎ তাকে ভাল করে দেখল। মার্গরিতের চেনা লোক, স্যার রিকার; বড় ভাল মানুষ। তিন ছেলের মা। মার্গরিৎ ওর হাতে টান দিল, "আচ্ছা তোমার দুধ ভাল ত বাছা, বলকারক বেশ, না?"

"আজ্ঞে, মাদাম, তুমি ত আমার বড় ছেলে দুটিকে দেখেছ—কেমন ষণ্ডা-গণ্ডা। ছোটটিও ওই ধরণের। বছর খানেক বয়স হল, লোকে দেখে ভাবে দুই বছরের ছেলে। জানত, এর আগে এ কাজ আমি করিনি; কিন্তু মা, ডাক্তার বাবু ওদিকে যখন গেলেন দুধ-মার খোঁজে, আর জানালেন যে তোমার ছেলের জন্য দরকার, আগুপিছু না ভেবেই আমি এগিয়ে গেনু: 'ডাক্তার বাবু আমার স্বাস্থ্য খুবই ভাল, গায়েও কম জোর ধরি না। আমায় নেবেন?' উনি তখুনি রাজী, 'হ্যাঁ, স্যার রিকার, তুমি বড় ভাল মানুষ,' উনি বললেন, কিন্তু আমি বাধা দিনু, 'মনে নেই ডাক্তারবাবু, উনিই ত একবার আমার গিওমকে রক্ষে করেছিলেন ও ডুবে যাচ্ছিল যখন?"

মার্গরিৎ চাষী বৌয়ের দিকে চেয়ে দেখল, ও ঝাড়নের খুটে চোখ মুছল।

"বাচ্চাটাকে দেখাবে মা?"

ওর হাতে ছেলে দেবার সময় হাজার রকম আবোল-তাবোল উপদেশ দিল মার্গরিৎ। ছেলেকে কি ভাবে যত্ন করতে হয় তার বিবরণ অনভিজ্ঞ বালিকার মুখে শুনে দাই ত হেসে বাঁচে না। মার্গরিৎ স্বামীর সঙ্গে বসে দেখছিল ওর বাচ্চার খাওয়া। বহুক্ষণ ধরে দাইয়ের বুকের দুধ খেয়ে ছেলেটা তার কোলেই ঘুমিয়ে পড়ল, মার্গরিতের চোখ জলে ভেসে গেল। ওর স্বামী ওর মুখ তুলে নিয়ে চুমা যখন দিলে, মার্গরিৎ তার হাত ধরে নিরাশার সুরে বলল, "দেখো, আমি যখন থাকব না, বাচ্চাটা আমায় একদম ভুলে যাবে!"

সারারাত ঘুমুতে পারল না ও, শেষে অনুরোধ করল ওর বাচ্চার বিছানা ওর বিছানার ধারে এনে রাখতে। লুই ভেবেছিল ও ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই একটা কৌচের ওপর শুয়ে একটু হাত-পা ছড়িয়ে নিচ্ছিল, আর এক ভাবে তাকিয়েছিল ওর স্ত্রীর দিকে। মার্গরিৎ তার ছেলের দিকে ঝুঁকে কি দেখছিল, লুইয়ের দীর্ঘশ্বাসে ও ফিরে তাকাতেই লুই প্রশ্ন করল।

"কি গো তুমি এখনও ঘুমও নি? করছ কি?"

"ছেলেটাকে দেখছি।"

"এখন ঘুমিয়ে নিলেই ভাল করতে, ছেলেকে দিনের বেলায় দেখতে!"

"কিন্তু তার আগেই যদি মরে যাই?" আত্মস্থ ভাবে মার্গরিৎ ফিস ফিস বলল।

"পাগলী কোথাকার," লুই এসে ওকে জড়িয়ে ধরল, "দিনরাত তুমি খালি মৃত্যু চিন্তাই করবে?"

"জান না তোমায় ছেড়ে যেতে কী কষ্টই হচ্ছে, নবাগত অতিথিকেও ছাড়তে বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু—"

"তবু কি? কে তোমায় যেতে দিচ্ছে? ভগবান? আমার হাত থেকে যমরাজ স্বয়ং এসেও তোমায় ছিনিয়ে নিতে পারবে না মার্গো!" দৃঢ়কণ্ঠে ও দাঁত চেপে বলল, কম্পিত ওষ্ঠ দিয়ে স্পর্শ করল মার্গরিতের ওষ্ঠ। শূন্য দৃষ্টিতে মার্গরিৎ হাসল।

"লুই, প্রিয়তম!" ওর কপালের চুলগুলি সরাতে সরাতে আবেশের সুরে মার্গরিৎ ডাকল।

লুই উঠে ওকে ঘুমের ওষুধ দিল।

জ্বর পুরোপুরি না ছাড়লেও ১৭ তারিখ সকালে ওকে অনেক সুস্থ লাগল। ডাক্তার যখন এলেন, ও তার স্বাভাবিক হাসিতে তাঁকে আপ্যায়িত করল। প্রথমেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আজ ছেলেকে দুধ খাওয়াতে পারবে কি না। ডাক্তার হাসলেন।

"তুমি মা বড় অধীর হয়ে উঠেছ দেখছি; আগে নাড়ী দেখি তার পর ছেলের কথা।—বাঃ যাদু বেশ বুঝেছেন ওর কথা হচ্ছে," বলে বাচ্চাটাকে উনি আদর করলেন। মার্গরিতের নাড়ী দেখে উনি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

"তোমার জ্বর এখনও ছাড়েনি মা; ছেলেকে এ অবস্থায় দুধ খাওয়ান ঠিক হবে না।" রোগিণীর ভাব পরিবর্তন দেখে উনি সান্ত্বনা দিলেন, "সেরে ওঠ মা, তারপর যত খুসী দুধ খাইও, কেমন?"

"তা আর আমার ভাগ্যে নেই ডাক্তারবাবু!" ওর মুখে অদ্ভুত করুণ হাসি খেলে গেল। শিশুর কপালে মুখ রেখে ও বলল, "ভগবান তোকে দেখবে বাপ, তোর বাবা থাকবে, কিন্তু মা থাকবে না রে, মা থাকবে না!"

ফিরে তাকাতেই যখন দেখল ওর স্বামী মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে সংযত করতে, তাড়াতাড়ি মার্গরিৎ জোর

করে হেসে বলল, "আমি বড় বাড়াবাড়ি করছি না গো ? একটুখানি জ্বর হয়েছে আর ধরে রেখেছি যে আমি মরতে বসেছি !" লুইয়ের কাঁধে ও হাত রাখল।

"নাও বাপু তুমিই ত এখনো কালো প্রজাপতির পেছনে পেছনে ছুটছ ; আমারগুলো কত সহজে তাড়িয়ে দিলাম দেখত ? কেন কষ্ট পাচ্ছ ? আমি মরব না লুই, মরতে চাই না। হল ত ? আচ্ছা, মঁসিয়্য শাঁতো, এত অল্প বয়সে, এমন খাসা স্বাস্থ্য থাকলে কেউ কখনো সামান্য জ্বরে মরতে পারে ?"

"মোটেই না, মোটেই না। তোমায় দেখে বড় আশ্বস্ত হলাম মা ; সব সময় প্রফুল্ল থাকতে চেষ্টা কর ; কালকেই তা হলে জ্বর ছেড়ে যাবে !"

আবার আসবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন। বিকাল চারটে নাগাদ জ্বর বাড়ল ; ওর বাবা এসে দেখলেন প্রলাপ শুরু হয়েছে।

"বাবা, বস এখানে !" সামনের চেয়ার দেখিয়ে ও বলল, "আমি সেরে উঠব, না বাবা ? আর একটু সেরে উঠলেই আমরা দক্ষিণ দেশে যাব, নীসে।"

তারপর স্বামীকে বলল, "সেই ছোট্ট বাড়ীটা আবার ভাড়া নেব, কেমন ? সেখানেই ত আমাদের নতুন অতিথির কথা প্রথম আলোচনা করি আমরা। আবার যাব ত নীসে ? বল না গো ?"

হঠাৎ দারুণ শঙ্কায় ও চেঁচিয়ে উঠল,

"কই ? ও কই ? আমার ছেলে আমায় ফিরিয়ে দাও !" বিছানায় ও উঠে বসল।

"এই ত তোমার ছেলে, তোমার পাশেই রয়েছে ; কেন মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছ ?" ওকে শুইয়ে দিয়ে লুই ছেলেকে রাখল ওর পাশেই।

"বাছার খিদে পেয়েছে গো", বলেই ও জামার বোতাম খুলতে গেল। লুই সন্তর্পণে বাধা দিল।

"মার্গো, ডাক্তার তোমায় মানা করে গেছেন না ওকে দুধ দিতে ?"

"কেন ?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করল মার্গরিৎ, কারণ জ্বরের ঘোরে ওর কিছুই মনে ছিল না।

"তোমার যে অসুখ করেছে।"

"অসুখ ?" ও চমকে উঠল।

"হাঁ, গো।"

"তেমন বাড়াবাড়ি নয়, না প্রিয় ? সেরে উঠব'খন। বলত লুই, শীগগির আমি সেরে উঠব, তাই না ?—কাল ?" ব্যথাভরা কণ্ঠে ও প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ"—দু'একটার বেশী কথা লুই বলতে পারছিল না। ইতিমধ্যে ডাক্তারকে ডেকে পাঠান হয়েছিল ; তিনি এলেন।

"ডাক্তারবাবু, আমি মরতে চাই না, আমি সেরে উঠব। লুইয়েরও তাই মত ; ও সত্যি কথাই বলে।"

মঁসিয়্য শাঁতো ওর নাড়ী দেখলেন।

"কেমন দেখছেন ? আমার জ্বর তেমন নেই, না ?"

"সামান্য আছে ; তোমার এখন ঘুমুতে চেষ্টা করা উচিত মা, একটা ঘুমের ওষুধ দেব।"

"তা হলেই ঘুম হবে ?"

"হাঁ মা।"

"সারারাত ?"

"নিশ্চয়ই !"

"আর সকালে উঠে দেখব সেরে গেছি, না ?"

"একদম সেরে উঠবে না, তবে দেখবে অনেক তাজা লাগছে শরীরটা।"

উনি প্রেসক্রিপশন লিখতে বসলেন ; ওষুধের দোকানে লোক গেল ; ও ওষুধ খেল ; তন্দ্রা এল ; ঘুমিয়ে পড়ল। ওর স্বামী আর মঁসিয়্য শাঁতো ওর পাশে বসে রইলেন। ওর বাবা আর মা'ও ছিলেন। দম নিতে ওর যেন কষ্ট হচ্ছে, গা পুড়ে যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লেও ও ছটফট করতে লাগল বিছানার ওপর। সবাই চুপ করে বসে রইলেন। খবরের কাগজ হাতে মঁসিয়্য শাঁতো বসেছিলেন, ঘন ঘন তির্যক দৃষ্টিতে রোগিণীর অবস্থা লক্ষ্য করছিলেন। ওর মা ছেলেটাকে দোল দিচ্ছিলেন, বাপ কাতর নয়নে চেয়ে ছিলেন প্রাণতুল্য কন্যার দিকে, তাঁর একমাত্র সন্তানের দিকে। ওর স্বামীর দিকে চেয়ে তিনি দেখলেন, তার মুখ অব্যক্ত যন্ত্রণায় কালো হয়ে উঠেছে। নতজানু হয়ে ও বসেছিল স্ত্রীর শয্যার পাশে, থেকে থেকে ক্লান্তিতে, অবসাদে মাথাটা নামিয়ে রাখছিল তার বালিশে। হাতের মুঠোয় ধরা ছোট্ট তপ্ত হাতটি ও থেকে থেকে চুমায় ভরে দিচ্ছিল, ঘুমিয়ে পড়ার আগে মার্গরিৎ স্বামীর হাতে ওই ভাবে হাত রেখেই শুয়েছিল। সকাল প্রায় ছটা নাগাদ, যখন পূবের আকাশ সাদা হয়ে এল, মার্গরিৎ চোখ খুলে উঠে বসল।

"লুই কই ? আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না ত ?" লুই যে ওকে ধরে বসেছিল, তা ও বুঝতে পারেনি।

লুই তাড়াতাড়ি সরে বসল।

"এই ত বন্ধু, কোথায় ছিলে ?" শিশুসুলভ হাসিতে ও ঝলমল করে উঠল। শীর্ণ দুটি হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল মার্গরিৎ। তার পর আবার শুয়ে পড়ল বিস্ফারিত নেত্রে।

"লুই, ছেলেটা কই ?"

বহুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে চেয়ে মার্গরিৎ তার মুখে চুমা দিল।

"বাছারে, ঘুমিয়ে আছিস ? যাবার বেলা ভেবেছিলাম তোর স্বচ্ছ চোখ দুটি দেখে যাব। যাক, ক্ষোভ নেই সেজন্যে। ওকে দোলনায় শুইয়ে দাও গো ! দেখ যেন জেগে না ওঠে।"

কাপুেন ছেলেকে দোলনায় রেখে এলে, তরুণ পিতার হাত দুটি চেপে ধরল মার্গরিৎ পরম সুখে।

"বন্ধু, বড় অন্ধকার, আর একটু কাছে এস, আরো কাছে, আরো !" দারুণ আবেগে জড়িয়ে ধরল ও স্বামীর হাত।

"উঃ, বড় ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত," ও বিড় বিড় করে বলল, "কি ঘুমটাই পাচ্ছে, প্রিয়, প্রিয়তম, এ ঘুমের আগে আমায় টেনে নাও, বুকে টেনে নাও।"

লুই ওকে বুকে টেনে নিল।

"ভগবান আমাদের মঙ্গল করুন।" মার্গরিৎ বলল।

ঘুমের আগে ছোট বেলা থেকেই এ প্রার্থনা ও করে এসেছে। ওর চোখ বন্ধ হয়ে গেল, ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেল, সেখান দিয়ে উড়ে গেল ওর সুনির্মল আত্মা ভগবানের বিশাল সত্তার পানে, আর মার্গরিৎ আচ্ছন্ন হয়ে রইল পৃথিবীর ঘুমে।

সমাপ্ত

অনুবাদ :—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুখের মুহূর্ত্তগুলি আসে আর যায়···নিবিড় করে ধরতে গিয়ে শুধু তার রেশটুকু নিয়েই শান্ত হোতে হয়।

আমারও যাবার মুহূর্ত্তটি ঘনিয়ে এলো এক অবাঞ্ছিত ঘটনায়। এক অকৃতজ্ঞ স্বল্পপরিচিতকে সাহায্যের বিনিময়ে পেলাম জুয়াচুরীর অপবাদ। বিতৃষ্ণায় ফ্লোরেন্স ছাড়তে বাধ্য হোলাম।

কিন্তু যাবার আগে টেরেসার কাছে না গিয়ে পারলাম না। আর বিদায় মুহূর্ত্তে আমাদের অশ্রুসজল নিবিড় আলিঙ্গন ওর স্বামী বেচারার চোখে যে সর্ষেফুল ফুটিয়েছিল, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি রোমে। আমার কাছে কার্ডিন্যাল পাসিয়োনের নামেও একটি পরিচয়-পত্র ছিলো। সেখানি নিয়ে আমি দেখা করতে গেলাম ওর সঙ্গে। তিনি আমার পরিচয় পেয়ে আমার নিজের মুখ থেকে আমার পলায়নের কাহিনী শুনতে চাইলেন।

—"কিন্তু সে যে বিরাট কাহিনী", সবিনয়ে জানালাম।

—"ভালোই তো, আমি শুনেছি তুমি বলতে কইতে বেশ ভালো পারো।"

—"কিন্তু তাহলে আমি বরং এই মেঝের উপর বসেই বলি।"

—"না, না, তা কি হয়? তোমার অমন দামী জামা-কাপড়!"

এক জন ভৃত্য একটি টুল এনে হাজির করলো। না আছে তার হাতল, না আছে ঠেসান দেবার জায়গা। প্রচণ্ড বিরক্তি আর অস্বস্তিতে জ্বলে উঠলাম। যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি আর দায়সারা গোছের করে গল্পটি বললাম পনেরো মিনিটের ভিতর।

—"তোমার বলার চেয়ে লেখার ভঙ্গী ভালো।"

—"আরাম করে না বসলে আমার কথা বলার জুত হয় না।"

—"কেন, এখানে তুমি আরাম পাচ্ছ না?"

—"না:, বিশেষ করে আপনার এই টুলটা।"

—"তুমি তোমার স্বাচ্ছন্দ্যটাই বুঝি পছন্দ করো?"

—"তা' করি।"

—"এই নাও প্রিন্স ইওজেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে আমার ভাষণ···এটা তোমাকে উপহার দিলাম। আশা করছি আমার লাতিনে কোন খুঁত পাবে না। হাঁ, কাল দশটার সময় মহানুভব পোপ তোমাকে দর্শন দেবেন।"

বিদায়ের ইঙ্গিত বুঝে উঠে এলাম।

আমি পোপকে আগে জানতাম যখন তিনি পাদুয়াতে সামান্য একজন বিশপ ছিলেন। ওঁর পবিত্র পাদুকার পবিত্রতম ক্রুশচিহ্নকে চুম্বন করতেই উনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করলেন। আর আমার সবিনয় নিবেদনের উত্তরে জানতে চাইলেন—রোমে উনি আমার জন্যে কী করতে পারেন।

—"এটুকু ব্যবস্থা করার চেষ্টা করুন, যাতে আমি নিরাপদে ভেনিসে ফিরে যেতে পারি।"

—"আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে রাজদূতের সঙ্গে আলোচনা করে তোমাকে তাঁর মত জানাবো।"

এরপর কিছুক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনায় দর্শনের সময় উত্তীর্ণ হোলে আমি বিদায় নিলাম।

কিছুদিন পরে রোম থেকে চলে যাবার সময় আর এক বার পোপের দর্শনপ্রার্থী হোলাম। উদ্দেশ্য আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কি না জানা। অবশ্য আমাকে উনি এমন সহৃদয়তায় অভ্যর্থনা করলেন যে আমি প্রায় অভিভূত। গদগদ চিত্তে জানালাম ভগবানের মূর্ত্ত প্রতীক—পৃথিবীতে উনি ছাড়া আর কে? যে কোনো খৃষ্টানের জীবনে সবচেয়ে বড় উৎসব ওঁর দর্শন—সবচেয়ে বড় কামনা ওঁর সঙ্গ।···গর্ব্বোজ্জ্বল মুখের স্মিত প্রসন্ন হাসিটুকু আমার চোখ এড়ায়নি। একটি ঘণ্টা ধরে আমার সঙ্গে ভেনিস, পাদুয়া আর প্যারিসের গল্প করতে লাগলেন। খুব আগ্রহ দেখলাম ওঁর ঐ সব জায়গা ঘুরে আসতে। সব আলাপ আলোচনার শেষে আবার আমার প্রার্থনাটির কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম···অতি বিনীত ভাবে। উত্তরে তিনি আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বললেন—"ঈশ্বরের কাছে নিবেদন কর বৎস। আমার প্রার্থনার চেয়ে তাঁর করুণার শক্তি অনেক বেশী।"

আর দু'টি দিন ছিলাম রোমে। তারপর কোন খেয়ালের বশে সোজা পাড়ি দিলাম ট্যুরিণে।

দশম পরিচ্ছেদ

কাউণ্ট এ, বি'র সঙ্গে পরিচয় হয় কাউণ্ট বোরোমিওর বাড়ীতে। আর প্রথম দর্শনেই ভদ্রলোক আমাকে কী যে পেয়ে বসলেন জানি না। প্রায় দুবেলাই একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া তো করতেনই, মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজনে টাকাও ধার নিতেন···অবশ্য একদিন মনের আবেগে আমার কাছে স্বীকার করে ফেললেন যে, আমি না থাকলে ওঁকে না খেয়ে মরতে হোতো। সম্প্রতি এমন অর্থাভাব চলেছে। উনি স্পেনে কাজ করতেন, বিয়েও করেছেন ওখানে। ওঁর সহধর্ম্মিণী?···ওঁর মতে একটি বিদ্যুল্লেখা···বয়স এই পঁচিশ কি ছাব্বিশ। ভদ্রলোক আমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন মিলানে ওঁর বাড়ীতে কিছুদিন থাকার জন্য। প্রত্যাখ্যান করাই উচিত ছিলো আমার, যখন জেনেছি পরিবারে সাচ্ছল্যের অভাব···কিন্তু

স্বভাবের ধর্ম—সে যাবে কোথায়? ঐ স্পেনীয় বিদ্যুল্লেখাটিকে একবার প্রত্যক্ষ করবে না ?··চিঠি পড়েছি যে··টুকরো টুকরো কথার ফুলকি চমক্ জাগায় মনে··ছবি এঁকেছি ইংরেজ মেয়ের বোধশক্তি, স্পেনের নিবিড় অনুভূতি আর ফ্রান্সের লাবণ্য আর মাধুর্য্যে গড়া সেই বিদ্যুল্লেখা।

বিন্তু হায় রে কপাল—যোগফল মিললো না বরাতে। দেখতে মন্দ না, নেহাৎ ছোটোখাটো গড়ন আর তেমনি গম্ভীর। আমাকে যাবার আগে চিঠিতে জানিয়েছিলেন দু'টুকরো তাফেতা কিনে নিয়ে যেতে। ওখানে পৌঁছে তাঁকে যখন জানালাম যে হুকুম তামিল হোয়েছে, তখন মাত্র একটা শুষ্ক ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, ওঁর পুরুত ঠাকুরকে বলবেন আমাকে দামটা দিয়ে দেবে। খেতে বসে কাউণ্ট এ, বি উচ্ছ্বসিত কিন্তু শ্রীমতীকে দেখলাম দারুণ গম্ভীর, মাঝে মাঝে আমাদের হাস্যকৌতুকের উত্তরে একটু মৃদুহাসির প্রত্যুত্তর। খাবারের থালা থেকে একটি বারও চোখ তুলতে দেখলাম না—অথচ প্রতিটি খাদ্যের অসংখ্য ত্রুটি ধরে অজস্র বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখলাম পুরুত ঠাকুরের উদ্দেশ্যে। অবশ্য এই ফাঁকে একটা কথা বলে রাখা ভালো—ইতালীতে প্রায় প্রতি বাড়ীতেই একটি ক'রে পুরুত ঠাকুরের খুবই চলন। গৃহস্থের কাছেই তাদের খাওয়া শোওয়া সব চলে, বদলে ঘরকন্নার হাজার খুঁটিনাটির দায়িত্বও তাদেরই ঘাড়ে। এ বাড়ীর পুরুত ঠাকুরটি কাছেই একটা গীর্জায় ভোরবেলা প্রার্থনা করাতে যান—ফিরে এসে সারাদিন সমস্ত সংসারটি চালাতে হয়, সেই সঙ্গে কর্ত্রীটিরও হাজারো ফরমাস।

খাবার পর কাউণ্ট আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘর অবধি এলেন—স্ত্রীর নীরস ব্যবহারে বিব্রত, লজ্জিতও বটে, তবে আশ্বাসও দিলেন পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে মাধুর্য্যের সন্ধান পাবো নিশ্চয়ই।

সে যাক্। আপাততঃ বাড়ীর সেরা ঘরটি পেয়ে মনটা খুসী। বাড়ীর আসল অবস্থা সত্যিই অভাবগ্রস্ত। বাসনপত্র মাটির, দাগলাগা টেবল-ঢাকা,—রাঁধুনী, ঝি, সবই একটি মেয়ে, পরিচ্ছদও জীর্ণ। আমার ফরাসী পরিচারক ক্লেয়ারমঁও তো তার শোবার আস্তানা দেখে ভেবেই আকুল—ছোট্টো, নোংরা, অন্ধকার খুপরী একটা।

ভোরবেলা বিছানা থেকে ওঠার আয়োজন করতে যাচ্ছি, এমন সময় পুরুত ঠাকুরের প্রবেশ। আমাকে অনুরোধ করলেন যে কর্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে আমি যেন বলি যে পুরুত ঠাকুরের কাছ থেকে আমি তিন শ' ফ্রাঙ্ক ঐ তাফেতার দাম হিসাবে পেয়েছি। আমার তো চক্ষু স্থির।

—"একজন পুরোহিত হোয়ে আপনি আমাকে মিথ্যা বলবার জন্যে অনুরোধ করেছেন? আশ্চর্য্য! নাঃ বলতে হলে সত্যি কথাই বলবো"—

"—আপনি তাহলে গিন্নীমাকে চেনেন না মশায়··আর এ বাড়ীর ধারাও কিছু জানেন না দেখছি। বেশ, আমি কর্ত্তার সঙ্গেই কথা বলবো তাহলে।"

পুরুত ঠাকুরের মত কাউণ্টকে দেখলাম শ্রীমতীর মেজাজের ভয়ে সদা শঙ্কিত। স্ত্রীর মিথ্যা দম্ভ বাঁচাবার জন্যে আমাদের মধ্যে দামটা ঠিক হয়ে গেছে বলতে রাজী হলেন।

ঘরে বসে কতকগুলো চিঠিপত্র লিখছি। দরজা ঠেলে ঢুকলেন স্বামি-স্ত্রী—তাঁদের একজন পারিবারিক বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করাতে। ভদ্রলোকের নাম মার্শিস ক্রলৎসি, প্রায় আমারই সমবয়সী। অভিবাদন জানিয়ে বললেন আমার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য এড়াতে চান না—তাছাড়া এই ঘরখানিতেই একমাত্র আগুন রাখার ব্যবস্থা, তার আরাম থেকে বঞ্চিতও হোতে চাননা। ক্লেয়ারমঁও ইতিমধ্যে আমার বাক্সটাক্স খুলে জামাকাপড় জিনিষপত্র সব বের করে ফেলেছিলো—চেয়ারগুলোও প্রায় সবকটাই স্তূপীকৃত। তারমধ্যে মার্শিস্ কাউণ্টেসকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ছোট্টো একটা পুতুলের মত নিজের হাঁটুর উপর বসিয়ে দিলেন। লক্ষ্য করলাম কাউণ্টেসের মুখ রাঙা হোয়ে উঠেছে—জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন।

—"যথেষ্ট বয়স তো হয়েছে··তবু শিখলেন না আমাদের মত মহিলাদের সঙ্গে মান রেখে কি করে চলতে হয়?"

—"ঠিক কথা কাউণ্টেস। মান্য করি বলেই তো আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে বসতে পারি নি"—

তার পর জামা-কাপড়ের স্তূপের দিকে চেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোনো মহিলাকে আশা করছি কি না?

—"নাঃ, তবে আশা আছে, মিলানে এমন একটির সন্ধান পাবো নিশ্চয়ই, যাকে এগুলি উপহার দিতে পারবো"—

সেদিন রাত্রে আহার্য্য থেকে সুরু করে আহার্য্য-পাত্রগুলি, মদ এমন কি টেবিল-ঢাকাগুলি অবধি এলো ওই ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে। খেতে বসেও লক্ষ্য করলাম, মার্শিস অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন কাউণ্টেসের রুক্ষ গাম্ভীর্য্যের ত্রুটি শোধরাবার জন্যে। খাবার পর সকলে মিলে গেলাম অপেরা দেখতে—সুখবর মিললো সেখানে টেরেসার দর্শন পেলাম। ঠিক করলাম শীগগিরই যাবো ওর সঙ্গে দেখা করতে।

ভোরবেলা ক্লেয়ারমঁও এসে খবর দিলে, একটি মেয়ে দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে। সম্মতি পেয়ে ঘরে এসে ঢুকলো দীর্ঘাঙ্গী সুশ্রী লাবণ্যময়ী একটি তরুণী, আবেদন জানালো আমার জামা-কাপড় কাচা আর সেলাই-ফোঁড়াই ইত্যাদি করার ভার নেবার জন্যে। ভারী ভালো লাগলো ওকে,—"কোথায় থাকো তুমি?"

—"এই বাড়ীরই নীচের তলায় আমার মা-বাবার সঙ্গে।"

—"তোমার নাম?"

—"জেনোবিয়া।"

—"বাঃ! রূপের মতো নামটিও মিষ্টি। তোমার করপল্লবে চুম্বন জানাতে পারি?"

—"না, তা' আর হয় না, এ করপল্লব আগেই অধিকৃত। এখানকার কার্ণিভালের শেষেই একজন দর্জ্জির সঙ্গে আমার পরিণয় স্থির।"

—"কেমন দেখতে তোমার ভাবী স্বামীটি? সুন্দর?··বেশ ভালো রোজগেরে তো?"

—"না, না, কোনোটাই নয়··শুধু নিজের একটি বাড়ী, হবে এই আশাতে বিয়ে করছি।"

—"খুব ভালো বলেছো। ভারী খুশী হলাম শুনে। আমার যে তাকে দেবার মতোও কিছু কাজ আছে—যাও, গিয়ে ধরে নিয়ে এসো।"

আমার সজ্জা সমাপন হোতে না হোতেই জেনোবিয়া তার হবু

বরকে ধরে নিয়ে এসে হাজির। ছোটখাটো মানুষটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যহীন।

—"এই যে, আপনিই এই মিষ্টি মেয়েটিকে বিয়ে করছেন ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ মশায় ! আর দিন দশেক পরেই বিয়েটা হবে।"

—"দিন দশেক, কেন ? কালই বা নয় কেন ?"

—"উঃ আপনার এত তাড়া ?"

—"নিশ্চয়ই, অন্ততঃ আপনার জায়গায় আমি তাই-ই করতাম। যাক, এই সিল্কটা দেখুন। কাল বল-নাচে যাবার জন্যে একটা 'ডোমিনো' করে দিতে হবে। তার জন্যে এই রইলো দশ সেকুইন—আপনার রসিদের টাকা হিসেবে।'···

লোকটা তো আহ্লাদে আটখানা হোয়ে চলে গেলো। একটু পরেই আমিও মিলানে টেরেসার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কেন জানি না টেরেসার প্রতি আমার একটা অতি কোমল মমতা ভরা ভালবাসা বরাবরই ছিলো···দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সেটা বরং না কমে বেড়েই চলেছিলো।

আনন্দে অধীর হোয়ে টেরেসা আমাকে স্বাগত জানালো। অপ্রত্যাশিত ভাবে আবার দেখা হওয়ার আনন্দে আবেগে ও ভালো করে কথাই বলতে পারছিল না। একটু প্রকৃতিস্থ হোয়ে প্রথমেই জানালো ও আর ওর স্বামীর সঙ্গে থাকে না। অসহ্য হোয়ে উঠেছে স্বামীর সঙ্গ। টেরেসা অবশ্য স্বামীকে অর্থ সাহায্য করে, তবে এক সর্ত্তে যে, তাকে রোমেই থাকতে হবে। সিজারো এসেছে ওর সঙ্গে মিলানে। টেরেসা কথা বলে যাচ্ছিল আর আমি মনে মনে বিশ্লেষণ করছিলাম আমার নিজের অনুভূতি। আজ আঠারো বছর ধরে টেরেসার প্রতি আমার ভালোবাসা কোথাও মলিন কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি ···কিন্তু আজ আমার মনের গঠন এমন হোয়ে দাঁড়িয়েছে যে একটির উদ্দেশ্যেই সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দিয়ে শূন্য হোতে আর পারে না। মনের বেদীতে একম্ অদ্বিতীয়মের পূজায় সে নারাজ।

সেদিন বাড়ী ফিরে খাবার টেবিলে দেখলাম কাউন্টেসের মেজাজটা বেশ খুশী খুশী···এমন কি আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতে রহস্য করে বললেন—

—"সারাটা দিন কাটলো কোথায় জানি না ভেবেছেন ? কিন্তু শ্রীমতীর যে একটি শ্রীমান আছেন, আপনার এত ঘন ঘন যাতায়াতে তিনি না সরে পড়েন।"

—"সরলেই সেই শূন্য জায়গা পূর্ণ করবো।"

—"আপনার উপহারে যারা বিগলিত হয়ে পড়ে, তাদের কাছেই শুধু আপনি দাসত্ব স্বীকার করেন।"

—"ঠিক বলেছেন, পারতপক্ষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করি না··· কারণ দেখেছি এই পন্থাটি অবলম্বন করলে আর কিছুতেই হতাশ হতে হবে না"—

"কিন্তু আপনার বান্ধবীটির মনের খবর জানেন বলে মনে হচ্ছে না তো···অত্যন্ত অর্থলোভী ছাড়া আর কেউ পারে গ্রেপ্পির সঙ্গিনী হতে ?"

নিঃশব্দে শুনে গেলাম। ইঙ্গিতেও প্রকাশ করলাম না যে আমার যথাসর্ব্বস্ব গ্রেপ্পির ব্যাঙ্কেই থাকে···প্রকাশ করলাম না আমার নিশ্চিন্ত সুখ যে টেরেসা শক্তিমানের হাতেই আশ্রয় পেয়েছে···

সেরাত্রে সকলে মিলে প্রথমে এক জুয়ার আড্ডায় পরে একটা অপেরা দেখতে গেলাম। সবশুদ্ধ দুশোর কিছু বেশী টাকা হেরেছিলাম আমি। বেচারী কাউন্টের আমার চেয়েও বেশী দুঃখ হোলো তাইতে। ওঁকে হায় হায় করতে দেখে মনে মনে হাসলাম··· ওঁর স্ত্রী যাকে ঘৃণা করেন সেই গ্রেপ্পির কাছেই আমার হাজার হাজার ফ্রাঙ্ক জমা আছে। আমার অর্থক্ষতির বহরে বিগলিত হৃদয়ে কাউন্টেস এসে জিজ্ঞাসা করলেন টাকার প্রয়োজনে আমি আমার দামী লোমের পোষাকটা বেচবো কি না। প্রায় হাজার সেকুইন দাম হবে ওটার উনি শুনেছেন।

—"ক্ষমা করবেন, ওটা ছাড়া অন্য কিছু বেচতে পারি, ওটি কিছুতেই বেচবো না।"

—"মার্শিস্ ত্রিল্যাৎসি ওটা উপহারের জন্য কিনতে চান।"

—"ওঁকে বলবেন আমায় মাপ করতে"—

আর কোনো কথা বললেন না, যদিও কিছু একটু বিচলিত দেখলাম ওঁকে। সেরাত্রে অপেরা থেকে ফেরার পথে টেরেসার সঙ্গে দেখা হোলো। জিজ্ঞাসা করলাম গ্রেপ্পির কথা সত্যি কি না। উত্তরে টেরেসা জানালে গ্রেপ্পির সঙ্গে ওর নিছক বন্ধুর সম্পর্ক। টেরেসা নিজে এখন রীতিমত ধনী, সে চায় সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে থাকতে। কারো আশ্রয়ে নয়। ভালো লাগলো ওর এই মনোভাব।

পরদিন রাত্রে কাউন্টেস আমার গাড়ীতেই থিয়েটারে যাবার অনুরোধ জানালেন। খুব খুশী হোয়ে রাজী হলাম। কিন্তু কে জানতো পরে এমন প্রহসন ঘটবে ? গাড়ী চলতেই ওঁর পাশে বসে ওঁকে জানালাম ঐ লোমের পোষাকটা আমি এখনি ওঁকে উপহার দিতে পারি বিনিময়ে শুধু একটু অনুগ্রহ বর্ষণ···

—"আমাকে অপমান করছেন ?" আগুনের ফুলকি ঝরতে লাগলো, "আশ্চর্য্য, আপনার মত লোকও ভদ্রঘরের মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানে না"—

—"কিন্তু মহাশয়া ভুল করছেন মুগ্ধতায়, প্রশংসায় অপমান কিছু নেই। বেশ, যদি বড্ড বাড়াবাড়িই করে থাকি ক্ষমা করুন। আর ঐ পোষাকটি পরে আমাকে একটু খুশী করুন।"

—"যদি আপনাকে ভালোবাসতাম তাহলে ক্ষমার প্রশ্ন উঠতো। আর আপনার স্থূল ব্যবহারে আমার কাছে আপনি ক্রমেই অপ্রীতিকর হোয়ে উঠছেন।"

—"আমার স্বভাবটা সবসময় মেজাজের উপর নির্ভর করে। খুব মোলায়েম ভাবে স্তুতি করতে দেখলেই আপনার ভালো লাগবে তো ?"

—"আপনার স্বভাব কিরকম তা' জানবার জন্যে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আপনাকে আমি গ্রাহ্যই করি না।"

—"এখানে আমাদের মিল আছে দেখছি। আমি আপনাকে কোনো দিনই গ্রাহ্য করিনি, করি না।"

—"তা' সত্ত্বেও আমার পিছনে হাজার সেকুইন খরচ করতে যাচ্ছিলেন ?" তীক্ষ্ণ শ্লেষের হাসি কাউন্টেসের।

—"ভালোবাসার খাতিরে নয়, আপনাকে নীচু করবার জন্যে, আপনার ঐ বিরাট আত্মম্ভরিতায় ঘা' দেবার জন্যে।"

কি উত্তর আসতো জানি না, কিন্তু বরাতক্রমে সেই মুহূর্ত্তেই গাড়ীটা থিয়েটারে এসে থামলো, আমি গেলাম জুয়ার আড্ডায় আর কাউন্টেস সোজা বক্সের দিকে। সে রাত্রে প্রচণ্ড হার

হোলো আমার। ফেরার পথে আবার কাউণ্টেসের সঙ্গে খিটিমিটি বাধলো—

—"আজ রাতে অনেক টাকা হেরেছেন শুনলাম···বেশ হোয়েছে, খুব খুশী হোয়েছি। মার্শিস হাজার সেকুইন দিতে রাজী আপনাকে ঐ পোষাকটার জন্যে। বেচতে পারেন এখনও, বরাত খুলে যাবে।"

—"আপনার বরাতও খুলে যেতে পারে তো। ওটা লাভ হবে কেমন—আপনার জন্যেই যে উনি কিনতে চেয়েছেন সেটা আমি জানি।"

—"হয়তো।"

—"না, অত সহজে আপনি ওটি পাচ্ছেন না। ওটা পাবার একমাত্র উপায় আমার কথায় রাজী হওয়া। না হলে আপনাদের টাকার জন্যে আমার থোড়াই কেয়ার।"

—"আপনার ঐ পোষাকের জন্যেও আমার ঘুম হচ্ছে না।"

এই রকম সুমধুর বাক্য বিনিময় করতে করতে আমরা বাড়ী পৌঁছলাম। কাউণ্ট আমার ঘরে এসে ঢুকলেন আমাকে একটু বোঝাতে। আমার জুয়ায় হেরে যাওয়াটাই ওঁর লাগে বেশী।

—"ত্রিলংসি আপনাকে হাজার সেকুইন দিতে রাজী। তাতেও তো আপনার খানিকটা আয় হবে।"

—"ঐ লোমের পোষাকটার জন্যে? ওটা তো আপনার স্ত্রীকে আমি বিনা পয়সায় দিতে রাজী। কিন্তু আমার কাছ থেকে উনি নেবেন না।"

—"অবাক কাণ্ড মশাই! অথচ বলতে কি পোষাকটার জন্যে ও ক্ষেপে উঠেছে। নিশ্চয়ই আপনি ওর আত্মসম্মানে ঘা' দিয়েছেন কোনো সময়। আমার উপদেশ নিন ওটা, ত্রিলংসিকে বেচে ফেলুন।"

—"ভেবে দেখবো, কাল আপনাকে সঠিক জানাবো।"

ভোরে উঠেই গ্রেপ্পির কাছে গেলাম। হাজার সেকুইন বার করে আনলাম ব্যাঙ্ক থেকে। আর গ্রেপ্পিকে জানালাম এ সম্বন্ধে কাউকে কিছু না জানাতে। বাড়ী ফিরে এসে দেখলাম কাউণ্ট আমার ঘরে আগুনের ধারটিতে বসে অপেক্ষা করছেন।

—"কি ব্যাপার বলুন তো মশাই? আমার স্ত্রী আপনার উপর ভয়ঙ্কর রেগে আছে অথচ কিছুতেই কারণটা খুলে বলছে না—"

—"কারণটা আর কিছুই নয়। ওই লোমের পোষাকটা আর কারো হাত থেকে ওঁকে আমি নিতে দেবোনা, আমার হাত থেকে ছাড়া। উনিও নেবেন না। কিন্তু এতে ভয়ঙ্কর রাগের কী আছে?"

—"হুঁঃ শ্রেফ বোকামি ছাড়া কিছু নয়। শুনুন আমার কথা, আপনার ধরণ দেখে মনে হয় টাকা আপনার হাতের ময়লা···এরকম মন হওয়া খুবই ভালো। তবে কি না ঐ টাকাটা পেলে আমি বড় খুশী হতাম। বন্ধুত্বের খাতিরে ওসব আত্মসম্মান ছাড়ুন মশাই··· মার্শিস এর কাছ থেকে হাজার সেকুইন নিয়ে আমাকে ধার দিয়ে ফেলুন"—

ওঁর কথায় প্রবল হাসির দমকে আমার বিষম খাবার যোগাড়। বেচারা কাউণ্ট অপ্রস্তুত হোয়ে লজ্জায় লাল হোয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে গেলেন। আমি ওঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললাম অবশ্য একটু জ্বালাভরা কণ্ঠেই।

—"বেচবো, কথা দিলাম ত্রিলংসিকেই বেচবো ওই পোষাকটা। কিন্তু টাকাটা আপনাকে ধার দেবোনা। ওটা দান করবো আপনার স্ত্রীকে। কিন্তু মনে রাখবেন তাঁকে সহজ নম্র শোভন হতে হবে—এই সর্ত্তে। বুঝতে পেরেছেন তো? এখন এই ভাবে ব্যবস্থা করতে পারেন"—

—"তাই দেখি"—বলে বেচারা কাউণ্ট বিদায় নিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যায় অপেরাতে ত্রিলংসির সঙ্গে দেখা করলাম।···সে বললে,—"শুনলাম আপনি নাকি ওই লোমের পোষাকটা আমাকে বিক্রি করতে রাজী হোয়েছেন। সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। আপনি যখনি বলবেন তখনি আপনাকে পনেরো হাজার ফ্রাঙ্ক পাঠিয়ে দেবো"—

—"কাল সকালেই আপনি লোক পাঠাতে পারেন পোষাকটা নিয়ে যাবার জন্যে।"

পরদিনই সকালেই ওর লোক এলো। এসে এত আলোচিত পোষাকটি নিয়ে গেল। দুপুরে উনি নিজেই এলেন আমাদের সঙ্গে একত্রে খাবার জন্যে। তার আগে প্রচুর সুখাদ্য আহার্য্য পাঠিয়েছিলেন। খাবার টেবিলে রীতিমত আড়ম্বর সহকারে বাক্সটি রেখে তার থেকে পোষাকটি বের করে গর্ব্বিত আনন্দে ওই দর্পিতা স্পেনীয় মহিলাটিকে উপহার দিলেন। আর তিনি ধন্যবাদে উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠলেন। আর ভদ্রলোক এমন ভাবে হাসতে লাগলেন যে, এসব ব্যাপারে তিনি অতি অভ্যস্ত। কিন্তু হঠাৎ বলে বসলেন যে কাউণ্টেস যদি সত্যিই বুদ্ধিমতী হ'ন তবে ঐ পোষাকটি আবার বিক্রী করে ফেলবেন—কারণ সবাই জানে যে অত দামী পোষাক কেনার মত আর্থিক সঙ্গতি ওঁদের নেই। কথাটা অত্যন্ত শ্রুতিকটু সন্দেহ নেই—তাই এবার ধন্যবাদের বদলে কটুকাটব্যের বর্ষণ সুরু হোলো। শেষে রাগের জ্বালায় কাউণ্টেস বললেন যে মার্শিস এত বড় বোকা যে এমন উপহার দিলে যা তিনি ব্যবহার করতে পারবেন না। এই ঝড়ের মধ্যেই একটি প্রতিবেশিনীর আগমন হোলো। ঘরে ঢুকেই টেবিলের উপর ছড়ানো বহুমূল্য পোষাকটির দিকে নজর পড়লো তাঁর—

—"ভারী চমৎকার তো। আমার কিনতে ইচ্ছে করছে।"

—"ওটা বিক্রী করে দেবার জন্যে কেনা হয়নি"—রুক্ষ উত্তর কাউণ্টেসের।

ব্যাপার সুবিধার নয় দেখে মহিলাটি তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তিনি বিদায় নিলেই আবার সেই চাপা আক্রোশের বিস্ফোরণ সুরু হোলো। কাউণ্টেসের সক্রোধ কুৎসিত বাক্যবাণের উত্তরে ত্রিলংসিও তীব্র, তীক্ষ্ণতম শ্লেষে তাঁকে বিঁধতে লাগলেন···কিন্তু ওঁর প্রত্যেকটি সুতীক্ষ্ণ শ্লেষভরা বাক্যবাণই আশ্চর্য্য ভদ্রয়ানার খাপে ঢাকা···শেষকালে বিপর্য্যস্ত ক্লান্ত অবস্থায় রণে ভঙ্গ দিয়ে কাউণ্টেস সোজা চলে গেলেন শয্যার আশ্রয়ে শয়ন কক্ষের অভিমুখে।

ত্রিলংসি আমার হাতে পনেরো হাজার ফ্রাঙ্ক গুঁজে দিয়ে উঠে চলে গেলেন। সবাই চলে গেলে কাউণ্ট আমাকে ধীরে ধীরে বললেন যে, যদি আমার হাতে সময় থাকে আমি যেন ওঁর স্ত্রীকে একটু সঙ্গ দিই কারণ ওঁরও হাতে কয়েকটা জরুরী কাজ রয়েছে।

—"দেখুন আমার পকেটে হাজার সেকুইন রয়েছে, যদি কাউণ্টেস একটুও বুঝদার হন তবে সব টাকাটা ওঁকে দিয়ে আসবো"—

উঠে ঘরে গিয়ে ত্রিলংসির দেওয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি রেখে ব্যাঙ্ক থেকে আনা নোটের তাড়াটি পকেটে পুরলাম। ছেলেমানুষি ছাড়া কি? দেখাতে চাইলাম কারো টাকাতেই আমি নির্ভর করি না, আমার নিজের যথেষ্ট আছে।

দেখলাম কাউন্টেস শয্যালীনা। তাঁর একপাশে বসে অত্যন্ত কোমল ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম শারীরিক সুস্থতা সম্বন্ধে, বাইরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সম্বন্ধে, দু'একটা মন্তব্যও করলাম।

—"আপনি বাইরে বেরোননি? ঘরোয়া পোষাক পরে রয়েছেন? চুলগুলোও আঁচড়ানো নেই?"

—"সম্ভব হলে আপনার সঙ্গেই সময় কাটাবো ভাবছি," আমার উত্তর।

"আপনার জুয়ার আড্ডা ছেড়ে আমার সঙ্গে সন্ধ্যাটা মাটি করবেন?"

—"আনন্দের সঙ্গে। ইতিমধ্যে অনেক টাকা হেরেছি তার উপর আজ মার্শিসএর কাছ থেকে যা পাওয়া গেল সেটাও আর খোয়াতে রাজী নই···আমার হাত থেকে তো আর নিলেন না···"

—"অত টাকা হাতছাড়া করা সহজ?"

—"হাতছাড়া নয়, আমি তো আপনাকেই দিতে চেয়েছিলাম। সে যাক, বড্ড ঠাণ্ডা আসছে, দরজাটা বন্ধ করে দেবো কি?"

—"নাঃ, আমার খোলাই ভালো লাগছে—খোলা থাক।"

—"তাহলে মাদাম, এখান থেকেই বিদায় নিতে হোলো। আমার ঘরের আগুনের ধারটি অনেক বেশী লোভনীয়।"

—"আপনি লোকটা খুবই খারাপ তবুও বসতে পারেন কিছুক্ষণ কারণ মন্দ লাগছে না সময়টা।"

কি জানি কেন মনটা কেমন অন্যমনস্ক আর বিস্বাদ হোয়ে গিয়েছিলো—পোষাকটা নিয়ে এত কচকচিতে আসার সময় ঘরে দেখে এসেছি···জেনোবিয়ার মিষ্টি হাসি ভরা সুন্দর মুখখানি ঝুঁকে পড়ে আমার জামা সেলাই করছে···তার সেই মুখখানি মনে পড়াতে? কি জানি কিছুতেই ঢাকতে পারিনি নিজের অস্বাচ্ছন্দ্য, সাড়া দিতে পারিনি সহজ শোভন ভাবে···কি জানি কতখানি আঘাত করলাম দর্পিতা রমণীর আত্মগর্বে···

আমার নীরস ব্যবহার ওঁকে কতখানি গভীরে ব্যথা দিয়েছে তা' শুধু মেয়েরাই বলতে পারবে···জানি না কোন দুর্গ্রহ আমাকে দিয়ে বলালে,—"আমার দোষ নেই মাদাম, আপনার সৌন্দর্য্য আমাকে একটুও আকর্ষণ করতে পারছে না···এই রইলো পনেরো হাজার ফ্রাঙ্ক আপনাকে সান্ত্বনা দিতে···আমি চললাম"—

টেবিলের উপর নোটগুলি রেখে সোজা বেরিয়ে এলাম। অন্যায়, অপ্রীতিকর সবই বুঝছিলাম কিন্তু কে যেন জোর করে অমন করালে আমাকে।

কিন্তু পরদিন খাবার টেবিলে কাউন্টেসের ব্যবহারে আমি অবাক্, অনুতপ্ত, লজ্জিত। যেমন মধুর, তেমনি ভদ্র তেমনি শোভন সংযত। বিবেকের দংশন-জ্বালা সহ্য করলাম···কেন রাত্রে অমন করে অপমান করেছি। যেমনি ওঁকে একা পেলাম তখনি অনুতপ্ত কণ্ঠে স্বীকার করলাম কাল রাত্রে অমন দুর্বৃত্তের মত ব্যবহারের জন্য ওঁর আমাকে ঘৃণা করা উচিত।

—"দুর্বৃত্ত আপনি? বরং উল্টোটাই আমি ভেবেছি, আমি তো আপনার কাছে রীতিমত কৃতজ্ঞ···ভাবতেই পারি না আপনার এ আত্মগঞ্জনা কেন?"

আমি ওঁর হাতখানি ধরে ধীরে ধীরে আমার ওষ্ঠের কাছে আনতেই হঠাৎ উনি ঝুঁকে পড়ে আমার গালের উপর চুমো খেলেন··· আমি তখন লজ্জায় রাঙা, অনুতাপে দিশাহারা···

সেরাত্রে অপেরাতে মুখোশ পরে 'বল' এর ব্যবস্থা ছিলো। আমি এমন ভাবে সেজেছিলাম যে, ভাবলাম কেউ আমাকে চিনতে পারবে না। আমার নস্যির কৌটা, ঘড়ি, এমন কি মণিব্যাগটাও বদলে ফেলেছিলাম। আর মণিব্যাগটাতে ছিলো প্রায় সাতশ' সেকুইন। জুয়ার আড্ডায় সর্বস্ব তো খোয়ালাম একঘণ্টার মধ্যেই। সবাই আশা করেছিলো এবার নিরস্ত হবো। কিন্তু আর এক পকেট থেকে আর একটা ব্যাগ বার করে আবার খেলতে সুরু করলাম—এবার বরাত খুললো, একেবারে দুহাজার আটশ' ছাপ্পান্ন সেকুইন জিতলাম।

সেদিন বাকী সময়টুকু নাচ, গান আর হুল্লোড়ের ভিতর দিয়ে কাটিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলাম কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে। কারণ তারপরই সবাই মিলে যেতে হবে জেনোবিয়ার বিবাহোৎসবে যোগ দিতে। আমাদের সঙ্গে ত্রিলংসিও গিয়েছিলেন। গ্রামের বাড়ীতে ওদের বিবাহের ভোজসভা আমরা সবাই গান গেয়ে আবৃত্তি করে মুখর করে তুললাম। প্রচুর আহার্য্যের আয়োজন, সবার অলক্ষ্যে ভোজসভার ব্যয়ভারটা আমিই বহন করেছিলাম। বহু গ্রাম্য-সুন্দরীর আবির্ভাব হোয়েছিলো, কিন্তু শ্রীময়ী বধূবেশিনী জেনোবিয়ার সঙ্গ আমি একমুহূর্ত্তও ছাড়িনি। উৎসব যখন চরমে তখন উৎসব-মত্ত অবস্থায় সবাই টেবিল ছেড়ে উঠে পার্শ্ববর্ত্তীর সঙ্গে আলিঙ্গন আদান প্রদান করতে লাগলো···আমি আড়চোখে দেখে নিলাম বরবেশী বিহ্বল দর্জ্জিটির চুম্বনে কাউন্টেসের মুখখানি বিরক্তি আর রাগে টক্‌টক্ করছে···

বিবাহের শেষে জেনোবিয়াকে আমার গাড়ীতেই তুলে নিলাম··· ওর সদ্য স্বামীর সাগ্রহ সম্মতিতে।

* * * *

পরদিন রাত্রে আবার গেলাম অপেরাতে। জুয়া খেলাতেই কাটতো সন্ধ্যাটা কিন্তু হঠাৎ দেখা হোয়ে গেলো সিজারোর সঙ্গে। আমার সিজারিনো? দুটি ঘণ্টা ওর সঙ্গে আলাপে কাটলো··· কি মন-ভরা সময়টুকু। ওর মনের সব কথা আমার কাছে উজাড় করে দিলে। বারবার অনুরোধ করলে আমি যেন ওর হোয়ে টেরেসার সঙ্গে আলোচনা করি। ব্যাপারটা কিছুই নয়···ওর সাধ নাবিক হবার, ওর নিশ্চিত ধারণা যে ওর মা যদি ওকে আপাততঃ প্রয়োজন মত টাকা দিয়ে সাহায্য করে ওর ভবিষ্যৎ ও নিজে গড়ে তুলবে। আমি কথা দিলাম টেরেসাকে রাজী করাবো। সেদিন রাত্রে ওর সঙ্গে একসঙ্গেই খেলাম। বাড়ী এসে সোজা বিছানায়। পরদিনও সারাদিন ঘর থেকে আর বেরোইনি। শুনলাম কাউন্ট গেছেন সান এঞ্জেলোতে। মাদাম একা আছেন। সাধারণ ভদ্রতাবোধেই রাত্রে খাবারের পর মাদামের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম, খাবার টেবিলে যোগ দিতে না পারার জন্য ক্ষমাও চাইলাম। কাউন্টেসের ব্যবহার আশ্চর্য্য সৌজন্যে ভরা। জানালেন ওঁর বাড়ীতে আমার কোনো লৌকিকতার প্রয়োজন নেই, যেমন খুশী তেমনি ভাবে থাকতে

পারি। কিন্তু আমার মনে হোলো ভিতরে ভিতরে কোনো প্যাঁচ খেলছেন। কারণ ওঁর মুখের কেমন এক মোহময় হাসির আভাস··· অমন হাসি শুধু সেই মেয়েরাই হাসতে পারে, যাদের মনে জ্বলছে প্রতিহিংসার অনির্বাণ শিখা। আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে আমার দিকে নস্যির কৌটোটা বাড়িয়ে দিলেন এক টিপ নেবার জন্যে। নিজেও নিলেন একটিপ।

—"কিন্তু মাদাম এটা কি বলুন তো? এ তো ঠিক নস্যি নয়?"

—"না, একরকম গুঁড়ো, মাথা ধরার পক্ষে অব্যর্থ। তবে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে নিলেই।"

আমি কি রকম অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলাম। জোর করে হেসে বললাম, "আমার মাথার রোগ নেই, তাছাড়া নাক দিয়ে রক্ত পড়াটা আমার একটুও ভালো লাগবে না।"

—"ভয় নেই বেশী রক্ত ঝরবে না।" তখনও সেই মোহময় হাসির টুকরো ঠোঁটের কোণায়—কিন্তু রক্ত ঝরবেই এটা ঠিক।"

বলতে না বলতেই দুজনে একসঙ্গে চার পাঁচবার হেঁচে ফেললাম—ত করে একফোঁটা রক্ত আমার নাক থেকে পড়লো আমার হাতের উপর। কাউন্টেস একটি রূপার বাটি নিয়ে টেবিলের উপর রাখলেন।

—"সরে আসুন কাছে, আমারও নাক থেকে রক্ত পড়ছে।" কাউন্টেস বললেন, দু'জনে কাছাকাছি এগিয়ে এসে বাটির উপর ঝুঁকে পড়লাম। দু'জনার নাক থেকেই বাটিটাতে রক্ত ঝরতে লাগলো। অবশ্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই থেমেও গেল। তখন অন্য আর একটা পাত্র আনিয়ে ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেললাম।

—"আমাদের রক্তের এই মিলন আমাদের দু'জনার মনে গভীর দরদ জাগাবে, হয়ত এমন নিবিড় বন্ধুত্বের বন্ধন সৃষ্টি করবে যার বিচ্ছেদ মৃত্যুর আগে নেই,"···কাউন্টেস ধীরে ধীরে বললেন।

আমি ওঁর কথায় বিশেষ মন দিইনি। আমি একটু গুঁড়ো চাইলাম কিন্তু উনি কিছুতেই দিতে রাজী হোলেন না আর নামটাও বললেন না কোনো মতে। শুধু বললেন ওঁর এক বন্ধু ওঁকে দিয়েছে। আমি তখনি বেরোলাম একজন ওষুধ-প্রণেতার খোঁজে। একজনকে খুঁজে পেলাম। গুঁড়োটার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ওটা কি হোতে পারে, কিন্তু কোনো সদুত্তর তো দূরের কথা আমার চেয়ে বেশী জানেন বলে মনে হোলো না। বাড়ী ফিরে ভারাক্রান্ত মনে বিছানায় গিয়ে শুলাম। নানা ভাবে চিন্তা করতে করতে মনে হোলো মাদাম স্পেনের মেয়ে—তার উপর যতই ভাল এখন দেখান, অন্তরে আমার প্রতি ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নেই···অতএব—

পরদিন ক্লেয়ারমঁও একসময় এসে জানালে যে একজন সন্ন্যাসী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—কিছু কথা বলতে চায়। আমি কিছু সাহায্য দিয়ে ভাগিয়ে দিতে বললাম। কিন্তু সন্ন্যাসী এক-পয়সাও সাহায্য চায় না, কেবল আমার সঙ্গে একা দেখা করতে চায়। গেলাম দেখা করতে। লোকটি বেশ বৃদ্ধ। ঈষৎ নীচু হোয়ে অভিবাদন জানিয়ে একটা নীচু টুল এগিয়ে দিলাম। কিন্তু সে ওসব গ্রাহ্যই না করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলতে লাগলো।

—"মশায়, আমি যা বলবো মন দিয়ে শুনবেন। আমার সাবধান করায় আপনি কান না দিলে, আপনার প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। আমার কথা সমস্তটা শোনা হোলে আমি যা বলবো ঠিক তাই করবেন। কিন্তু একটি প্রশ্নও আমাকে করবেন না—কারণ কোনো কথারই আমি উত্তর দেবোনা। আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে আমার এই নীরবতা বিশ্বস্ত ভাবে বিশ্বাসের মর্য্যাদা দেবার জন্যেই! আমার প্রতিজ্ঞায় আমার কথায় সন্দেহের অবকাশ নেই, কারণ আপনাকে খুঁজে বার করার মধ্যে আমার কোনো স্বার্থই নেই। আমি নিজেই বাধ্য হচ্ছি আপনাকে জানাতে। আমার স্থির বিশ্বাস যে আপনার জীবন-দেবতাই আমাকে দিয়ে আপনার মুক্তির উপায় দেখিয়ে দিচ্ছেন। ঈশ্বর আপনাকে ত্যাগ করেননি। এখন বলুন আমার কথায় আপনার মনে বিন্দুমাত্রও সাড়া জাগছে কি না, আমার সব কথা আপনি বিশ্বাস করে শুনবেন কি না।"

—"নিশ্চিত থাকুন মহানুভব, আপনার প্রতিটি কথাই আমি মন দিয়ে শ্রদ্ধাভরেই শুনবো। বলুন···আপনার কথা শুধু সাড়া জাগায়নি, সারা মন ছেয়ে এক অজানা আশঙ্কাও জাগিয়ে তুলেছে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আপনার উপদেশ মানবো—যদি অবশ্য আত্মসম্মানে 'ঘা' না লাগে, আর সাধারণ বুদ্ধির অগম্য না হয়"—

—"খুব ভালো। কিন্তু আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, এ ব্যাপারটার ফলাফল যাই হোক না কেন, আমাকে তার মধ্যে টানতে পারবেন না, আর আমার সম্বন্ধে কারো কাছে একটি কথাও উচ্চারণ করবেন না। আমাকে চেনেন তাও বলবেন না, চেনেন না তাও জানাবেন না। কেমন, রাজী?"

—"খুব। প্রতিজ্ঞা করছি কথা রাখবো। কিন্তু এবার সুরু করুন। কৌতূহল যে অসহ্য হোয়ে উঠছে"—

—"আজ দুপুরে আপনি একেবারে একা অমুক পার্কের সামনে অমুক রাস্তায় অমুক নম্বরের বাড়ীতে ঢুকবেন। তিন তলায় উঠে গিয়ে বাঁ দিকের দরজায় বোতাম টিপবেন। যে দরজা খুলতে আসবে তাকে বলবেন যে আপনি মাদাম—কে চান। আপনার তারপর বাড়ী ঢুকতে কোনো বাধাই হবেনা···মনে হয় আপনার নামও বোধহয় কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। যদিই জিজ্ঞাসা করে যাহোক বাজে একটা নাম বলবেন। যখন মাদাম—এর সঙ্গে দেখা হবে তখন খুব ভদ্র আর সংযতভাবে আলাপচারী করবেন—চেষ্টা করবেন তার বিশ্বাস অর্জ্জন করতে। মহিলাটি গরীব, তাকে দু'চারটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে কুণ্ঠিত হবেন না—তাতেই তাকে জয় করা সহজ হবে। তখন তাকে বলবেন যে, কাল রাতে একজন চাকর এসে একটি চিঠি আর একটি ছোটো বোতল যা দিয়ে গেছে—সেই বোতলটি না নিয়ে আপনি বাড়ী থেকে নড়বেন না। মহিলাটি রাজী না হওয়া অবধি ছাড়বেন না কিন্তু সাবধান বেশী গোলমাল চেঁচামেচি না হয়। তাকে ঘর থেকে বেরোতে কিম্বা কাউকে ডাকতে যেতে দেবেন না। দরকার হোলে বলবেন যদি বোতলটা আপনাকে দিয়ে দেয় তাহলে অপরপক্ষ যা টাকা দেবে তার দু'গুণ বেশী টাকা আপনি দেবেন। ভয় নেই, টাকার অঙ্ক এমন কিছু বেশী নয়···কিন্তু আপনার জীবনটা অনেক বেশী মূল্যবান। ব্যস্, আর কিছুই আমার বলবার নেই। এখন কথা দিন আমার কথা আপনি ঠিক ঠিক রাখবেন?"

—"বিশ্বাস করুন নিশ্চয়ই রাখবো। আমার জীবন-দেবতা সত্যিই আপনার মত মহানুভবকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন···সঙ্কট থেকে ত্রাণের উদ্দেশ্যে।"

—"তাই হোক, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন"—

সন্ন্যাসীর ওই অদ্ভুত আষাঢ়ে কাহিনীতে কিন্তু আমার একটুও হাসি পেল না। কেন জানিনা আমার মনের কোণে কোথাও একখানি ছোটো কুসংস্কারের মেঘ আছে, হাজার আলোর ঝড়েও তা' সরেনা···। তাছাড়া সন্ন্যাসীর চেহারাটাও বিশ্বাসযোগ্য, দেখলেই মনে হয় অত্যন্ত সাধুপ্রকৃতির।

ঠিকানা-লেখা কাগজটা নিলাম আর দুটো ছোটো পিস্তলও পকেটে ভরলাম। তারপর সেই রহস্য-কুঠির সন্ধানে যাত্রা করলাম। ক্লেয়ারমঁকেও সঙ্গে নিয়েছিলাম। কিছু দূরে ওকে অপেক্ষা করতে বলে আমি সোজা সেইখানে গেলাম।

এক অতি কুৎসিত-দর্শনা বৃদ্ধার সামনে শেষ পর্য্যন্ত হাজির হলাম। তার হাতে দুটি সেকুইন দিতেই সে খনখনে গলায় বলে উঠলো যে সে জানে আমি প্রেমে পড়েছি, জানে যে নিজের দোষেই আমি নিজে অসুখী আর আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতেও সে পারবে। এই ধরণের কথায় মনে হোলো এ নিশ্চয়ই যাদুকরী ডাইনী ধরণের স্ত্রীলোক। কিন্তু আমি যেই বললাম যে সেই ছোটো বোতোলটি না পেলে আমি এক পাও নড়বো না, তখন তার মুখখানা কী বীভৎস আর ভয়ঙ্কর হোয়ে উঠলো ধারণা করা যায় না। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ও ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে—তৎক্ষণাৎ আমি আমার পকেট-ছুরিটি বার করে ওর মাথার উপর তুলে ধরলাম। আর সেই অবস্থায়ই যেই বললাম অপরপক্ষের চেয়ে দুগুণ টাকা বেশী দেবো সঙ্গে সঙ্গে ওর সমস্ত বিক্ষোভ শান্ত হোয়ে গেল।

—"আমি ছয় সেকুইন হারালাম, কিন্তু আপনি যখন সব জানবেন খুশীমনেই ওর দুগুণ টাকা আমাকে দেবেন। কারণ এবার আমি আপনাকে চিনতে পারছি।"

—"কে আমি?"···

—"জিয়াকোমো ক্যাসানোভা দি ভেনেসিয়ান।"

তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে বারোটি সেকুইন বার করে টেবিলের উপর রাখলাম। দেখলাম খুশীতে বৃদ্ধার চোখে জল এসে গেছে।

—"আপনার জীবন হানি করতে চাইনি তবে প্রবল ভাবে প্রেমে পড়িয়ে প্রচণ্ড দুঃখ ভোগ করাতে চেয়েছিলাম।"

—"খুলে বলুন সব কথা।"

আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোটো ঘরে গিয়ে ঢুকলাম—বিচিত্র অদ্ভুত সব জিনিষে ঘরখানি ভরা—নানা আকারের নানা ধরণের শিশি বোতল, নানা রঙের পাথর, ধাতু, নখ—বিভিন্ন প্রাণীর, সাঁড়াশী, উনুন আর রাশীকৃত বীভৎস মূর্ত্তি।

—"এই আপনার বোতল।"

—"এতে কি রয়েছে?"

—"আপনার আর কাউণ্টেসের রক্ত একসঙ্গে মেশানো আছে। এই লেখাটা পড়ুন, বুঝতে পারবেন।"

এতক্ষণে বুঝলাম ব্যাপারখানা কি। আজ অবাক লাগে ভাবতে সেদিন সেই মুহূর্ত্তে কেন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠিনি। বরং তার বদলে ওই অতি শয়তানী স্পেনিয়ার্ডটার কথা মনে করে আমার চুলগুলো খাড়া হোয়ে উঠেছিলো···আর বিন্দু বিন্দু ঘামে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছিলো।

—"এই রক্ত দিয়ে আপনি কি করতেন?"

—"আপনার সর্ব্বাঙ্গে মাখাতাম। কেমন করে দেখবেন এই দেখুন।"

এই বলে একটা দু ফুট লম্বা বাক্স টেনে এনে টেবিলের উপর রাখলো। তার পর একটু রহস্যময় হাসি হাসতে হাসতে বাক্সের ডালাটি খুলে ধরলে। আমি ঝুঁকে পড়তেই দেখি আধ হাত লম্বা একটা মোমের তৈরী নগ্ন মূর্ত্তি উপুড় করে শোয়ানো··আর··আর এ কি! তার পিঠের উপর পরিষ্কার করে লেখা আমার নাম।

কিন্তু কি অপটু কাঁচা হাতে কুৎসিত অদ্ভুত-দর্শন হোয়েছে মূর্ত্তিটি! তবে আমার চেহারার আদলটা মোটামুটি এনেছে। কিন্তু কয়েকটি জায়গা এত সামঞ্জস্যহীন, বিকৃত ভাবে গড়া হোয়েছে যে ও বেঢপ সঙের মত মূর্ত্তিটা আমার ভাবতেই আমি হো হো করে চেঁচিয়ে হেসে উঠলাম—

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু।

দন্তক্ষয় নিবারণে
বিশেষ
প্রতিরোধক!•
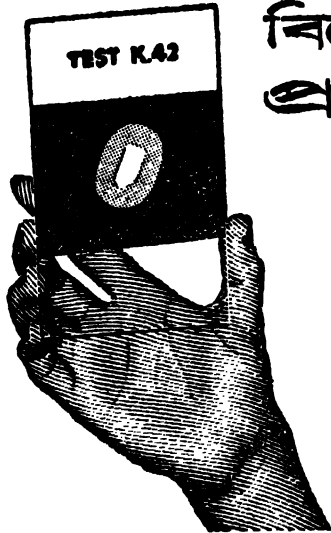
কলিনস সুপার-হোয়াইট টুথপেষ্ট

আপনার হাসির চমক অটুট রাখে

• গবেষণাগারে কে৪২ নম্বর পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কলিনস সুপার-হোয়াইট (সাদা অংশ) দন্তক্ষয়ী জীবাণু (কালো অংশ) প্রতিরোধের প্রাচীর (সাদার চারদিকে ধূসর আবরণ) গড়ে তোলে।

পেপারমিণ্ট-গন্ধী সুশীতল আস্বাদ!

লক্ষ্য করুন, ক্যাপটি
ব্যবহার কত সুবিধে।

জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কো: প্রাইভেট লি:
রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী

K. 4776 A

সিন্ধুপারে

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

তিন

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই বাঁ হাতি ঘরখানি—দেখে খুবই পছন্দ হল আমাদের। পাশাপাশি দু'খানি খাটে ধবধবে বিছানা—রঙীন সিল্কের লেপ দিয়ে ঢাকা। শোবার ঘরের উপযুক্ত প্রসাধন টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্রও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

চন্দ্রনাথ বলল, "তাহলে আমাদের জিনিষ নিয়ে আসি?"

মহিলাটি হেসে বললে, "বেশ ত। একটু রাত হয়েছে, আমার লোকজন এখন নেই, নইলে আমিই জিনিষ আনিয়ে দিতাম।"

একটু সন্ত্রস্ত ভাবে শুধালাম, "কত করে আমাদের দিতে হবে?"

মহিলাটি বলল, "দৈনিক ১২ শিলিং ৬ পেনি মাথা-পিছু—বেড ও ব্রেকফাষ্ট (অর্থাৎ রাত্রে থাকা ও সকালের চা-জলখাবার)।"

বুলা! শুনে বুকটা কেঁপে উঠল। আমি যখন বিলেতে আসি তখন তুমি ছেলেমানুষ ছিলে, তাই আমার আসার বিস্তারিত ব্যবস্থার কথা হয়ত তোমার ঠিক জানা নাই, কিংবা জানলেও মনে নাই। তোমার মনে আছে কি না জানি না—আমার বিলেত আসায় দাদার মত ছিল না। তার কারণ বাবার শরীর ভাল যাচ্ছিল না এবং ঠিক সে সময় টাকা-পয়সার দিক দিয়ে আমাদের অবস্থা যে খুব সচ্ছল ছিল, এমন কথা বলা যায় না। যদিও অত বড় জমিদারী আমাদের, তবুও তার আদায়পত্র ছিল মুকুন্দদাদার হাতে—তিনি নানান ছুঁতোয় টাকা পাঠাতে গোলমাল করছিলেন, দাদা কি বাবা দেশে গিয়ে কখনও জমিদারীর কিছু দেখেন নি।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বাবা ও দাদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে ঠিক হয়েছিল যে, মাসে মাসে ২৫০৲ টাকা করে আমাকে পাঠান হবে এবং আমি যেমন করেই হোক তার মধ্যে চালিয়ে নেব। আসার আগে কলকাতায় যে মাড়োয়ারী হাসপাতালে আমি কাজ করছিলাম, তাদের সঙ্গে লেখাপড়া হয়েছিল যে, আমি এ দেশ থেকে বছর দু'এর মধ্যে পাশ করে ফিরে গেলে, আমাকে বেশী মাইনের একটা ভাল চাকুরী ত' দেবেই, অধিকন্তু আমার আসা-যাওয়ার খরচাও তারা দেবে। কারণ যে সময় আমি আসি, তার বছর দুই পরে সেই হাসপাতালেই আমার উপরওয়ালা একটি বড় ডাক্তারের চাকুরী খালি হওয়ার কথা ছিল। বিলেত থেকে পাশ করে ফিরে না গেলে এমনি সে চাকুরী হওয়ার আমার কোনও আশা ছিল না। কেন না, সে সময় আমার চেয়ে আগে পাশ করা আরও দু'জন ডাক্তার সেই হাসপাতালেই কাজ করছিলেন। তাই সব দিক বিবেচনা করে বাবার কথাতেই দাদা শেষ পর্যন্ত মত দিয়ে দু' বছরের জন্য ঐ টাকাটা মাসে মাসে পাঠাতে রাজী হয়েছিলেন।

কিন্তু যদি সাড়ে বারো শিলিং করে রোজ দিতে হয় শুধু রাত্রে থাকা এবং সকালবেলার চা-জলখাবারের জন্য, তাহলে শেষ পর্য্যন্ত আমি দাঁড়াব কোথায়?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চন্দ্রনাথকে বললাম, "এদের দাবী বড় বেশী।"

চন্দ্রনাথ বলল, "আজ রাতটা ত থাকি। সকালে খুঁজলে এর চেয়ে সস্তার ঢের জায়গা পাওয়া যাবে।"

ট্যাক্সি থেকে জিনিষ-পত্র নিয়ে দু'জনে উপরে আমাদের ঘরটিতে রাখলাম। চন্দ্রনাথকে বললাম, "তুমি একটু গুছিয়ে নাও—আমি ঘুরে আসি।"

চন্দ্রনাথ বলল, "কোথায়?"

বললাম যাই ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে। সুরেশের সঙ্গে দেখা করে তাকে নিয়ে এসে আমাদের বাড়ীটা দেখিয়ে দি। কাল সকালবেলা তাকে না পেলে, একলা কোথায় সস্তায় ঘর খুঁজব?"

চন্দ্রনাথ বলল, "তোমার শরীরের ক্ষমতাকে বাহাদুরী দি'। এর পরেও আবার বেরুবে?"

শরীরের ক্ষমতার পিছনে যে আমার মনের একান্ত দুর্ব্বলতা রয়েছে সে কথা চন্দ্রনাথকে বোঝাবার চেষ্টা না করে ছুটলাম আবার সিঁড়ি দিয়ে। চন্দ্রনাথ দরজার কাছে এসে শুধাল, "কিছু খাবে না?"

তাই ত? খাওয়ার কথাটা ত একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম! হঠাৎ বুঝতে পারলাম—সত্যিই দারুণ খিদে পেয়েছে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই চন্দ্রনাথকে বললাম, "ফিরে আসি। তারপর যা হয় কিছু খাবো।"

চন্দ্রনাথ বলল "পাবে কোথায়? এ দেশে রাত্রে খাওয়ার সময় পার হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।"

ঘড়ির দিকে তাকালাম। প্রায় পৌনে আটটা বাজে। সাড়ে আটটায় ভিক্টোরিয়ায় ফোকষ্টোনের দ্বিতীয় ট্রেণ এসে পৌছবার কথা। চন্দ্রনাথকে "সে যা হয় হবে।" বলে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে বাইরে এসে ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। ট্যাক্সিকে আগেই দাঁড়াতে বলে গিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য, এতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘোরার দরুণ ট্যাক্সি ভাড়া জিনিষ নামাবার সময় চন্দ্রনাথই ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে দিয়ে গিয়েছিল।

* * * *

আধ ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে এসে হাজির হলাম। ট্যাক্সি বিদেয় করে দিয়ে ঠিক প্ল্যাটফর্মটি খুঁজে নিয়ে ঢুকে দেখি সুরেশ—প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করছে। রোগা লম্বা চেহারা—গায়ের রং অত্যন্ত কালো, তাই তাকে খুঁজে পেতে দেরি হল না; কাছে গিয়ে প্রায় সুরেশকে জড়িয়ে ধরলাম। সুরেশ আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেল—ট্রেণ ত' এখনও আসেনি।

বিস্তারিত সব সুরেশকে বললাম। বললাম, "চল আমাদের হোটেলে যাওয়া যাক"। সুরেশ বললে "চল"।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে সুরেশ বলল, "ট্যাক্সিতে যাবে না বাসে?"

মনে মনে আর পয়সা খরচ করে ট্যাক্সি চড়ার বাসনা আমার মোটেই ছিল না। কিন্তু বাসে যাওয়ার কথা সুরেশকে বলতে একটু লজ্জা হলো। এখান থেকে দূর ত কম নয়!

বললাম, "চলো। ট্যাক্সিতেই যাই।"

সুরেশ বলল, "সেই ভাল। সোজা বাস এখান থেকে আছে কি না জানি না। তাহলে আবার রাস্তায় পুলিশম্যানকে গিয়ে সব জিজ্ঞাসা করে নিতে হয়।"

দু'জনে ট্যাক্সি নিয়ে আবার রওয়ানা হলাম এবং আমার নির্দেশ মত খানিকক্ষণ পরে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল—২৭ নং বেডফোর্ড ষ্ট্রীটে।

কিন্তু এ কি! বাড়ীটা একটু অন্যরকম বলে মনে হচ্ছে না? সে বাড়ীর রংটা রাত্রে কাল ধরণের বলেই মনে হয়েছিল কিন্তু এ বাড়ীর রংটা যেন একটু বেশী লাগছে; বাইরের গড়ন অবশ্য একই ধরণের—সেই রেলিংঘেরা, কয়েক ধাপ সিঁড়ি ফুটপাথ থেকে উঠে গিয়েছে। ভাবলাম—আমার দেখার ভুল।

ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বিদেয় করে দিয়ে আমরা উঠে গিয়ে সদর দরজায় কড়া নাড়লাম। কিন্তু কৈ?—বাইরের সেই 'লিন্‌কল্‌ন হল হোটেল' লেখাটা ত নেই। এ কি সব ভৌতিক কাণ্ড!

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর একটি বৃদ্ধা মহিলা সদর দরজাটি ঈষৎ খুলে একটু বিরক্ত ভাবেই শুধাল, "কি চাই?"

জিজ্ঞাসা করলাম "এটা কি লিন্‌কল্‌ন হল হোটেল?" জোরে জোরে দুবার "না-না" বলে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে আমাদের মুখের সামনে দরজা দিল বন্ধ করে। ফ্যাল ফ্যাল করে সুরেশের মুখের দিকে তাকালাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুরেশ বলল, "তুমি নিশ্চয়ই ঠিকানা ভুল করেছ।"

বললাম "চন্দ্রনাথ বলল—বেডফোর্ড ষ্ট্রীট। আমি নিজে দেখলাম ২৭ নং।"

সুরেশ একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি করা যাবে?" সুরেশ বলল, "লিনকলন হল হোটেল বললে না?"

বললাম, "তাই ত মনে আছে।"

বলল, "চল, একজন পুলিশম্যানকে জিজ্ঞাসা করা যাক। এদেশের পুলিশম্যানরা আশ্চর্য্য! সব খবর রাখে।"

সত্যই আশ্চর্য্য এদেশের পুলিশ। এর পর কত বার কত সমস্যার অতি সহজ সমাধান মিলেছে এদের কাছে। সমস্ত লণ্ডন সহরটি যেন তাদের নখাগ্রে—কোথায় কোন রাস্তার কি ভাবে যেতে হবে, কোথায় গেলে কি পাওয়া যাবে, ঠিক পড়া মুখস্থ বলার মতন অতি সহজে বলে দেয় এবং বিশেষ আগ্রহ সহকারে। সাধারণতঃ ছ' ফুটের উপর লম্বা; কালো পোষাক পরা মাথায় কাল উঁচু টুপি—গম্ভীর ধীর পদক্ষেপে রাস্তায় মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যেন এদের জাগ্রত দৃষ্টির প্রভাবেই সমস্ত সহরটা চলেছে সুসঙ্গত শান্তির পথে।

চললাম দু'জনে ফুটপাথ ধরে। সুরেশ বলল, "চল কোনও একটা বড় রাস্তার মোড়ে গেলেই পুলিশ পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে পেয়ে যেতে পারি—নজর রেখো।"

আমার মুখে তখন আর কথা নাই—চলেছি দু'জনে। খানিকটা গিয়ে বড় কোনও রাস্তা নয়—একটা ছোট রাস্তার মোড়ের কাছে, অন্য দিকের ফুটপাথ দিয়ে ধীর পদক্ষেপে চলেছে এক জন পুলিশম্যান। সুরেশ তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে পুলিশম্যানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আমিও সঙ্গে গেলাম।

সুরেশ শুধাল, "ক্ষমা করবেন। লিনকলন হল হোটেলটি কোথায় বলতে পারেন?"

পুলিশম্যান বলল, "লিনকলন হল হোটেল? কি ঠিকানা?"

সুরেশ বলল "আমাদের জানা ছিল—২৭নং বেডফোর্ড ষ্ট্রীট। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি সেটা নয়।"

পুলিশম্যান বলল "নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। তাহলে হয় নিউ বেডফোর্ড ষ্ট্রীট, কিম্বা বেডফোর্ড প্লেস, কিম্বা আপার বেডফোর্ড প্লেস—এর কোথাও একটা হবে। এইগুলি সব আপনাদের খবর নিতে হয়।"

কোথা দিয়ে কি ভাবে এ সব রাস্তায় যেতে হয় সুরেশ বিস্তারিত সব জেনে নিতে লাগল। সে সব কথা আমার শুনবার ইচ্ছা সত্ত্বেও আমার কানে যেন কিছুই ঢুকল না।

হঠাৎ সুরেশের কথায় যেন চমক ভাঙ্গল। সুরেশ বলল, "চল ট্যাক্সি নেওয়া যাক।—বাসে এ সব জায়গায় যাওয়ার ঠিক সুবিধা হবে না। আর হাঁটবেই বা কত?"

যন্ত্রচালিতের মত বললাম, "চল।" আরও বেশ খানিকটা হেঁটে গিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। কোথায় গেলে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে এ সব খবরও সুরেশ পুলিশম্যানের কাছে নিয়েছিল।

আবার চলল ট্যাক্সি। কোথা দিয়ে কোথায় নিয়ে গেল—কিছুই খেয়াল করিনি তখন। সুরেশ একবার ট্যাক্সিতে জিজ্ঞাসা করেছিল—"যথেষ্ট টাকা কড়ি সঙ্গে আছে ত? আমার কাছে কিন্তু বিশেষ কিছু নাই।" উত্তর দিয়েছিলাম "কিছু আছে।" আন্দাজ আট পাউণ্ড অর্থাৎ শতখানেক টাকা তখন পকেটে ছিল বোধ হয়।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল—আর একটা বাড়ীর সামনে। আগেই বলেছি—সবই এক রকমের বাড়ী। ট্যাক্সির জানালা দিয়ে রংটা কালো ধরণেরই মনে হল। একটু যেন উৎসাহ হল মনে। সুরেশকে জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায় এলাম?"

সুরেশ বলল, "২৭ নং নিউ বেডফোর্ড ষ্ট্রীট।"

বললাম, "তুমি নেমে দেখ। আমি আর নামব না।"

সুরেশ "আচ্ছা" বলে ট্যাক্সি থেকে নেমে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে আমাকে বলল, "এখানেও নয়।"

"তা হলে?" শুধু এই কথাটি আমার মুখ দিয়ে কোনও রকমে যেন বেরুল।

সুরেশ শুধাল, "আচ্ছা—সেক্সপীয়ার হাট থেকে সেখানে গিয়েছিলে না? কতক্ষণ লেগেছিল যেতে—মনে আছে?"

বললাম, "বেশীক্ষণ নয়।"

সুরেশ বাইরে ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে কি সব কথাবার্ত্তা বললে। তার পর ট্যাক্সিতে এসে উঠে বসল। চলল ট্যাক্সি।

সুরেশ বলল, "বোধ হয় বেডফোর্ড প্লেস হবে। ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম। এ দেশের ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা সব রাস্তা চেনে এবং শুধু রাস্তার নাম ও নম্বরটা বলে দিলেই ঠিক গিয়ে দাঁড়ায়।"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সুরেশকে শুধলাম, "যদি না পাওয়া যায় ত কি হবে ?"

সুরেশ বলল, "অত ভাবছ কেন ? যদি না পাই রাসেল স্কোয়ারে আমার এক বন্ধু আছে—এক বোর্ডিং-হাউসে থাকে। তাদের ওখানে ঘরও খালি আছে—আমি খবর নিয়েছি। তবে জায়গাটা তত ভাল নয়—সেইখানে তোমাকে রাতের মত তুলে দিয়ে, কাল সকালে এসে যা হয় করা যাবে।"

শুধালাম, "তুমি থাক কোথায় ?"

বললে, "আর্লস কোর্টে—সে এখান থেকে অনেক দূর।"

শুধালাম, "সেখানে জায়গা নেই ?"

সুরেশ শুধু একটি কথায় জবাব দিল, "না।"

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল—২৭ নং বেডফোর্ড প্লেসে। কিন্তু এটাও লিনকলন হোটেল নয়।

সুরেশ বলল, "আর কত ট্যাক্সি-ভাড়া দেবে ? আপার বেডফোর্ড প্লেস এখান থেকে বেশী দূর নয়। চল হেঁটেই যাওয়া যাক।"

"চল।" বলে গাড়ী থেকে নেমে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বিদেয় করে দিলাম। সুরেশের প্রশ্নে সে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল—আপার বেডফোর্ড প্লেসটা কোন দিকে।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একবার মাথার উপরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম—অন্ধকারে কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ,—একটিও তারা দেখা গেল না। হায় রে ! কেন জানি না বুক ছাপিয়ে জল এল চোখে। কোনও রকমে সামলে নিলাম। হঠাৎ একটা হাওয়ায় সমস্ত শরীর উঠল কাঁটা দিয়ে কেঁপে—বুঝলাম কি অসম্ভব শীত !

সুরেশ বলল, "জোরে জোরে চল,—নৈলে ঠাণ্ডায় জমে যাব।"

কিন্তু দু'পা এগিয়েই বুঝতে পারলাম—আমার শরীর আর নিজেকে বইতে একেবারেই রাজী নয়। ফুটপাথে শুয়ে পড়তে পারলেও যেন আমি বাঁচি। মনের না শরীরের—কোনটার ক্লান্তি যে তখন বড় হয়ে উঠেছে সে বিচার করার শক্তিটুকুও নাই।

যাই হোক, তবুও চললাম। কিছুদূর গিয়ে রাস্তার পাশে একটি ছোট ভোজনাগার—ইংরাজীতে যাকে বলে 'কাফে' চোখে পড়ল। চারিদিকে শার্সি আঁটা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোতে ভিতরটা উদ্ভাসিত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অনেক ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা ভিতরে পান আহার করছিল।

সুরেশকে বললাম, "কিছু চা খেয়ে নিলে হত না ?"

সুরেশ শুধাল "তুমি ডিনার (সান্ধ্য ভোজন) খাওনি বুঝি ?"

বললাম "না।"

সুরেশ বলল, "চল, আগে বাড়ীটা দেখে নি, তারপর এসে না হয় কিছু খেয়ে নেবে।"

শুধালাম, "খোলা থাকবে ?"

সুরেশ বলল "এ কাফেগুলো প্রায় রাত ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে।"

চললাম—বেশ খানিকটা হাঁটলাম। ২৭ নং আপার বেডফোর্ড প্লেসের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ফুটপাথ থেকে সিঁড়ি দিয়ে ৩।৪ ধাপ উপরে উঠলাম। চমকে উঠলাম—সদর দরজার পাশে লেখা রয়েছে—লিনকলন হল হোটেল। বুলা ! অকূল সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে তলিয়ে যেতে যেতে হাত বাড়িয়ে পেলাম কূল।

সুরেশ শুধাল, "ল্যাচ-কী আন নি ?"

জিজ্ঞাসা করলাম, "সেটা আবার কি ?"

সুরেশ একটু হেসে বলল, "বাড়ির সদর দরজার চাবি। বাসা নিলেই সদর দরজার চাবি এরা একটা দেয়।"

বললাম, "না।"

সুরেশ কড়া নাড়ল। সেই মহিলাটি এসে দরজা খুলে দিল। একটু হেসে আমাকে বলল—"আপনি ল্যাচ-কী না নিয়ে বেরিয়েছিলেন—তাই আমি জেগে বসে আছি আপনার জন্য।"

সুরেশ বলল, "অসংখ্য ধন্যবাদ !"

উপরে উঠে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলাম। ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথের উপর মনে মনে যে একটু রাগ হয়েছিল—সেটা এতক্ষণ টের পাই নি। কেন সে 'আপার বেডফোর্ড প্লেস' না বলে শুধু বেডফোর্ড ষ্ট্রীট বলেছিল ? তাকে বেশ মিষ্টি করে দু-কথা শুনিয়ে দেব, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এই রকম একটা সঙ্কল্প করে নিলাম মনে।

উপরে উঠে নিজেদের ঘরে গিয়ে দেখি চন্দ্রনাথ একটা বিছানায় বেশ লেপ মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কাছে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম "চন্দ্রনাথ ! চন্দ্রনাথ ! ওঠ। সুরেশ এসেছে।"

চন্দ্রনাথ একবার আঃ, বলে বিছানার উপর খানিকটা উঠে বসে কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইল। তার পরই আবার শুয়ে পড়ল—অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে।

সুরেশ বলল, "থাক ডেকো না। ও এখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে।"

পাশেই আমার বিছানা পাতা—একটা বৈদ্যুতিক শক্তিতে যেন আমার শরীরটাকে টানছে সেই দিকে। সুরেশ ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগল। প্রসাধন-টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে সুরেশ বলল, "এই যে, তোমার জন্য চারখানা স্যাণ্ডউইচ এখানে ঢাকা দেওয়া আছে। জলও ঘরে আছে দেখছি।"

শুনে চন্দ্রনাথের উপর রাগ জল হয়ে কৃতজ্ঞতায় মন গেল ভরে।

সুরেশ বলল, "আমি একখানা খাই—কি বল ?"

বলতেই হল, "আচ্ছা !"

সুরেশ একখানা স্যাণ্ডউইচ বেশ উপভোগের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে লাগল। খেয়ে—জল খেয়ে বলল, "আমি এবার চলি—টিউবে আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।"

বললাম, "আচ্ছা—কাল সকালে এসো কিন্তু।"

সুরেশ বলল, "হ্যাঁ ! কিন্তু এগারটার আগে আসতে পারব না। ব্রেকফাষ্ট খেয়ে আসতে হবে ত !"

বললাম, "এগারোটা—অত দেরী করবে ?"

সুরেশ বলল, "তার আগে হয়ে উঠবে না, অনেক দূর যে এখান থেকে।"

সুরেশ চলে গেল। আমি তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি পর্য্যন্ত গেলাম। সুরেশ বলল, "তোমাকে আর নামতে হবে না।"

বললাম, "না ভাই ! আর পাচ্ছি না।"

ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে, কি আকর্ষণে জানি না, প্রথমেই চাইলাম বিছানার দিকে। কোনও রকমে পরিহিত কাপড়-চোপড় কতকটা খুলে ফেলে সটান শুয়ে পড়লাম বিছানায়—লেপের নীচে।

বিছানার পাশেই তারে ঝুলছে আলো নেবাবার কলটি। নিবিয়েও দিলাম।

শুয়ে মনে হল—তাই ত খাওয়া হল না। কিন্তু উঠি উঠি করেও উঠবার শক্তি পেলাম না। ভাবলাম—একটু জিরিয়ে নি। কিন্তু কখন যে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম—নিজেই জানি না।

চার

বুলা! ধৈর্য্য ধরো। লণ্ডনে আমার প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতা একটু বিস্তারিত করেই লিখলাম—পড়তে পড়তে ধৈর্য্য হারিয়ো না; কেন না তার একটু প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়। পরে প্রায় মাসাধিক কাল যে একটা অবসাদগ্রস্ত হতাশ মন নিয়ে আমি এই দূর বিদেশে কাটিয়েছি—ভাবলে এখনও ভয় পাই। এখন মনে হয়—প্রথম রাত্রে একটি অবশ মনের উপর ঐ রকম দিশেহারা ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের বেঁচে থাকার স্বাভাবিক আনন্দের পথটি আমি যেন কিছুদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আমি যখন চলে আসি, তুমি তখন ছেলেমানুষ। কাজেই আমার চরিত্রের বিশেষ কিছুই তোমার জানা নাই। শুধু জানতে—মেজদা আড্ডাবাজ লোক—বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েই বেশীর ভাগ সময় কাটান। কিন্তু আমার মনের পরিচয় কিছুই তুমি পাওনি। এক কথায় শুধু এইটুকু এখন বলে রাখি—সে যুগে আমার মনটা ছিল একটা হালকা রঙ্গিন বেলুনের মতন—যে দিক দিয়ে হাওয়া বইত সেই দিকেই মহা আনন্দে অনায়াসে ভেসে চলে যেত মনভরা আবেগ নিয়ে—এবং সামান্য একটু আঘাতেই ফেটে পড়ে যেত ধূলায়, আর যেন কোনও দিনই উঠবে না। হয়ত বলবে—এ ত অতি দুর্ব্বল মনের পরিচয় হল। হয়ত তাই। কিন্তু ঐ রকম মন দিয়েই যে তৈরী করেছেন আমাকে বিধাতা। সেটা ভুললে ত চলবে না।

* * * *

এইবার আমার কাহিনীটি সুরু করি। পরের দিন সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গল, তখন বেলা ৯টা বেজে গেছে। চন্দ্রনাথই আমাকে ডাকল, "বিকাশ, ওঠ। ওঠ। আর দেরী করলে, সকালের খাবার খেতে পাবে না। ব্রেকফাষ্ট তৈরী বলে দরজায় ধাক্কা দিয়ে গেছে। ওদের সকালের খাবারের জন্য একটা সময়ের নিয়ম আছে।"

চন্দ্রনাথও তখন বিছানায় শুয়ে—লেপে ঢাকা। আমি আপাদ-মস্তক লেপটিকে ভাল করে জড়িয়ে জড়িত কণ্ঠে শুধালাম।

"কটা পর্য্যন্ত এরা খাবার দেয়?"

চন্দ্রনাথ বলল, "যতদূর মনে পড়ে—বোধ হয় সাড়ে ন'টা বলেছিল। ন'টা দশ হলো।"

বললাম "তুমি ওঠ না আগে। একটাই ত' স্নানের ঘর।"

আমাদের ঘরের সঙ্গেই সংলগ্ন একটি স্নান ইত্যাদির ঘর ছিল।

চন্দ্রনাথ বলল—"আমার ত দেরী হবে না—তোমারই তৈরী হতে দেরী হয়। তুমিই আগে ওঠ।"

শুধু "না।" বলে পাশ ফিরে শুলাম।

চন্দ্রনাথ বলল, "না, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।"

একটু পরে শুয়ে শুয়ে খাটের শব্দে বুঝলাম—চন্দ্রনাথই আগে উঠল।

বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রনাথের প্রচণ্ড ধাক্কায় চমকে ঘুম ভাঙ্গল। বললে, "এই বার উঠে পড়। আর দেরী করো না। আমি স্নানের টবে গরম জল ভরে রেখে এসেছি—সটান গিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়, শীত কেটে যাবে।"

কোনও রকমে বিছানায় উঠে বসলাম। কিন্তু এ কি—কি প্রচণ্ড শীত! এ যেন ধারণারও অতীত। ঘরের চারিদিকের জানালার শার্সি আঁটা, গায়ে যথেষ্ট কাপড়-জামা আছে—কিন্তু তবুও বসেই যেন বরফ হয়ে জমে গেলাম। কোনও রকমে উপরের লেপটা টেনে গায়ে নিলাম জড়িয়ে। বললাম, "এত শীতে উঠব কি করে?"

চন্দ্রনাথ বলল, "জোর করে উঠে পড়, নৈলে হবে না।"

উঠি উঠি করে কিছুক্ষণ কাটল। কতকটা আন্দাজ করতে পারবে যদি বলি—আমাদের দেশের পৌষ মাসের দারুণ শীতের রাত্রে হিম ঠাণ্ডা জলে স্নান করবার জন্য নামতে হলে নামার ঠিক আগেই যে রকম মনের অবস্থা হয় কতকটা সেই রকম হয়েছিল আমার। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত, আজও স্পষ্ট মনে আছে, লেপটাকে জড়িয়ে নিয়ে স্নানের ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে, লেপটিকে মেঝেয় ফেলে দিয়ে কোনও রকমে স্নানের টবের গরম জলের মধ্যে ঢুকে যেন বাঁচলাম। চন্দ্রনাথ এক-টব গরম জল ভরে রেখে এসেছিল—যতটা গায়ে সয়।

আমাদের তৈরী হতে হতে প্রায় পৌনে দশটা হয়ে গেল। ঘর ছেড়ে দু'জনে নেমে এলাম নীচে। এক তলায় সিঁড়ির গোড়ায় একটি সাদা পোষাকপরা তরুণীর সঙ্গে দেখা হলো—সিঁড়ির কার্পেট পরিষ্কার করছে—বোধ হয় বাড়ীর ঝি। আমাদের দেখে একটু হেসে বললে, "সুপ্রভাত!"

চন্দ্রনাথ বলল, "সুপ্রভাত!" তার পর শুধাল, "ব্রেকফাষ্ট কোথায় খেতে পাওয়া যাবে বলতে পারেন?"

একটু হেসে মহিলাটি চন্দ্রনাথের দিকে তাকাল। বললে, "ব্রেকফাষ্ট ত আর খেতে পাওয়া যাবে না। ব্রেকফাষ্ট ত উঠে গেছে!"

জিজ্ঞাসা করলাম "তার মানে?"

মহিলাটি বললে "সাড়ে নটা পর্যন্ত যে ব্রেকফাষ্ট।"

চন্দ্রনাথ বললে, "তা হোক। আমরা সঠিক জানতাম না। গৃহকর্ত্রী কোথায়?"

বললে, "নীচে নেমে যান—সামনেই ব্রেকফাষ্ট খাওয়ার ঘর—সেইখানেই আছেন।"

নীচে মানে—এক তলারও নীচে। আগেই বলেছি—রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গিয়ে ওদের একতলার সদর দরজা। সাধারণতঃ অনেক বাড়ীতে রাস্তারও নীচে আর একতলা থাকে, যাকে ইংরাজীতে ওরা বেসমেণ্ট বলে। দোতলায় ওঠার সিঁড়িই ঘুরে নেমে গিয়েছে সেখানে। এই সব সেই দিনই প্রথম শিখলাম।

নীচে নেমে গিয়ে সামনেই খাওয়ার ঘর। দরজা ঠেলে ঢুকলাম। দেখলাম—এখানে ঠাণ্ডা অনেক কম।

বেশ বড় ঘর—ছোট ছোট অনেকগুলি টেবিল এবং তার পাশে দু'খানি কিংবা চারখানি চেয়ার চারি দিকে সাজান। প্রত্যেক টেবিলে ধবধবে সাদা চাদর পাতা ও একটি করে ফুলদানীতে ফুল দেওয়া রয়েছে। প্রত্যেক চেয়ারের সামনে টেবিলে ছুরী কাঁটা চামচ পরিপাটী করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এরই একটি টেবিলে এক কোণে গৃহকর্ত্রী ভদ্রমহিলা বসে খাচ্ছেন।

এবার আমিই প্রথম বললাম "সুপ্রভাত!"

ভদ্রমহিলা একটু হেসে 'সুপ্রভাত' জানাল আমাদের।

চন্দ্রনাথ শুধাল, "আমাদের জন্য কি ব্রেকফাষ্ট নেই?"

মহিলাটি বলল "আপনাদের অবশ্য দেরী হয়ে গেছে। কিন্তু আপনারা বোধ হয় সঠিক জানতেন না। তাই আপনাদের জন্য আমি কিছু খাবার রেখে দিয়েছি। বসুন।"

বললাম, "অনেক ধন্যবাদ!"

আমরা একটি টেবিলে বসলাম। একটু পরে সাদা পোষাকপরা একটা ঝি আমাদের টেবিলে দু'জনের মত চা, টোষ্ট, মাখন আধসিদ্ধ দু'টি ডিম, মারমালেড প্রভৃতি সাজিয়ে দিয়ে গেল।

* * * *

খাওয়ার পর আমরা একতলায় উঠে এলাম। একতলায় উঠে এসে বাঁ-হাতি একটি দরজা দিয়ে একটা বেশ বড় ঘরে ঢুকলাম—এটি বাড়ীর সাধারণ বসবার ঘর। ঘরে বেশ পুরু কার্পেট পাতা এবং ছোট-বড় অনেকগুলি গদিআঁটা কৌচ চারি দিকে সাজানো। মাঝখানে একটি নীচু গোল টেবিলের উপর দু'-তিনখানি খবরের কাগজ ও বিলেতি মাসিক বা সাপ্তাহিক কতকগুলি পত্রিকা ছড়ান রয়েছে। ঘরের এক পাশে দেওয়ালের গায়ে বাহার করে গাঁথা আগুন জ্বালাবার উনুন—গনগনে কয়লার আগুন জ্বলছে। এ ঘরটির সন্ধান খাওয়ার ঘরে গৃহকর্ত্রীই আমাদের দিয়েছিলেন। তখন বেলা প্রায় এগারটা বাজে—ঘরে অন্য কোনও লোক দেখলাম না। দু'জনে গিয়ে আগুনের ধারে দু'টি কৌচে বসলাম।

চন্দ্রনাথ বলল, "বসে কি হবে। চল বেরুই।"

বললাম, "চিনি না, শুনি না—যাব কোথায়?"

চন্দ্রনাথ বলল, "একটি থাকার পাকা ঘর ঠিক করতে হবে ত?"

বললাম, "সুরেশ আসুক।" ঘড়ির দিকে চেয়ে বললাম—"এখুনই এসে পড়বে।"

চন্দ্রনাথ বলল, "তাহলে তুমি সুরেশের জন্য অপেক্ষা কর আমি ঘুরে আসি।"

শুধালাম, "একলা? কোথায়?"

বললে, "মেজদার সেই বন্ধুর কাছে, মেজদার চিঠি আছে আমার সঙ্গে। তিনি কাছাকাছিই থাকেন। এর পরে গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। তিনি সাড়ে এগারটায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান।"

বললাম, "কোথায়?"

চন্দ্রনাথ বলল, "মার্চমণ্ট রোড—টেভিষ্টক স্কোয়ারের কাছে। বেশী দূর নয়। কাল রাত্রেই আমি গৃহকর্ত্রীর কাছে সব খবর নিয়েছি।"

শুধালাম, "একলা চিনে যেতে পারবে?"

বলল, "তা আর পারব না? পথে জিজ্ঞাসা করে নেব।" এই বলে চন্দ্রনাথ উঠে পড়ল।

শুধালাম, "তা আমি কি তোমার জন্য অপেক্ষা করব ?"

চন্দ্রনাথ বলল, "সুরেশ এলে তুমি বরং তার সঙ্গে বেরিয়ে দু-চার জায়গা দেখে এসো। আমিও দেখি। তার পর বিকেলে চা-এর সময় পরামর্শ করে যা হয় ঠিক করব।"

এই বলে চন্দ্রনাথ বেরিয়ে গেল। একলা ঘরে বসে—চাইলাম জানালার দিকে। উঃ—বাইরে কি কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলা অন্ধকার! হঠাৎ চমকে উঠলাম। এ কি! মনটা এত ভারি কেন ?—এতক্ষণ ঠিক যেন টের পাইনি—ক্রমেই যেন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। কাল রাত্রের সেই অকূলে কূল পাওয়ার অবলম্বনটি আজ আর নাই, কখন যেন হাত থেকে আবার গেছে খসে। তোমাদের মুখগুলি এক এক করে মনে করতে লাগলাম। মনে পড়ল সেই আমাদের দেশের শীতকালের সকাল বেলার পরিষ্কার সোনালী রোদটুকু। এ আমি কোথায় এলাম! সাত সমুদ্র তের নদীর পারে—অন্ধকার এই কারা-গহ্বরে—কি পাপের শাস্তিতে হল আমার নির্বাসন ? একটা খবরের কাগজ টেনে নিয়ে একটু অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম।

এমন সময় ঘরে একটি পূর্ব্বদেশীয় যুবক এসে ঢুকল। ছোট-খাট মানুষটি—গায়ের রং কালো—কিন্তু বেশ ফিটফাট, ইংরেজী পোষাক পরিধানে। মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম—মুখে একটি বেশ নম্র ভদ্রতার ছাপ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে "সুপ্রভাত! বড়ই খারাপ দিনটা আজ।" তার পর আগুনের যত কাছে সম্ভব একটি কৌচে বসে একটি পত্রিকা নিল টেনে।

খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গে দুটো কথা বলার ইচ্ছে হ'ল।

শুধালাম, "আপনি কোন দেশ থেকে আসছেন ?"

বলল, "ভারতবর্ষের সিংহল দেশ থেকে। আপনি ?"

বললাম "আমিও ভারতবর্ষের বাংলা দেশ থেকে আসছি।"

আর কোনও কথা বলল না। লোকটি কথাবার্ত্তা খুব কম বলে দেখছি। আমিই আবার কথা বললাম—"তা এই হোটেলেই থাকেন বুঝি ?"

বললে "আপাততঃ। কাছাকাছি দু'-তিনটে ঘর দেখেছি—দু'-এক দিনের মধ্যেই উঠে যাবো।"

শুধালাম, "কবে দেশ থেকে এসেছেন ?"

বললে "তা, প্রায় ছ' মাস হলো। এত দিন লণ্ডনের বাইরে একটি চমৎকার বাড়ীতে ছিলাম। কিন্তু আসা-যাওয়ায় অনেকটা করে সময় নষ্ট হয় বলে—এবার লণ্ডন সহরের ভিতরেই থাকব। কাজের অসুবিধা হয় অত দূরে থাকলে।" শুধালাম—"আপনি কি কোনও কাজ করেন, না লেখাপড়া করেন ?"

বললে "আমি ছাত্র। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি। আপনি ?"

এতক্ষণে একটা প্রশ্ন করাতে যেন বাঁচলাম। আমিই ত টেনে টেনে কথা চালাচ্ছিলাম এতক্ষণ।

বললাম, "আমি ডাক্তারী পড়তে দেশ থেকে সবে এসেছি।"

'ও!' বলে আবার চুপ করে গেল। কিন্তু আর একটি প্রশ্ন করার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলাম না। শুধালাম, "সস্তায় থাকার ভাল জায়গা আপনার সন্ধানে আছে ?"

লোকটি আমার মুখের দিকে তাকাল। শুধাল, "লণ্ডনের বাইরে কোনও সাবার্বে (সন্নিহিত বসবাসের পল্লী) থাকলে আপনার অসুবিধা হবে ?"

বললাম "না—সে ত খুব ভাল হয়।"

লণ্ডনের বাইরে—হয়ত ফাঁকায়—হয়ত সেখানে আকাশ গাছ-পালা দেখতে পাওয়া যাবে—মনটা একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল। এই বিরাট দৈত্যের গহ্বর থেকে হয়ত পাব একটু মুক্তি।

বললে "সুন্দর একটি জায়গা আছে এবং বেশ সস্তা। আমি সেইখানেই ছিলাম। চেয়ারিং ক্রশ-ষ্টেশন থেকে ট্রেনে যেতে হয়, আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার লাগে। এলটাম পার্ক জায়গাটির নাম। ১৪ নং গ্রীণহোম রোডে মিসেস ব্লেক বলে একটি ভদ্রমহিলা বাস করেন—তিনিই অতিথি রাখেন। মাত্র দু' গিনি করে সপ্তাহে—বেড ব্রেকফাষ্ট এবং সন্ধ্যেবেলায় সাপার (হালকা ধরণের সান্ধ্য ভোজন) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শান্তিপূর্ণ জায়গাটি।"

সুরেশ ঘরে ঢুকল। উঠে দাঁড়িয়ে সুরেশকে বললাম, "সুরেশ, চল। এখুনই যেতে হবে।"

সুরেশ শুধাল "কোথায় ?"

বললাম "এলটাম পার্কে। চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশন থেকে যেতে হয়। এই ভদ্রলোকটি সন্ধান দিলেন—থাকার খুব ভাল জায়গা আছে।"

সুরেশ ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ করে বিস্তারিত জেনে নিল। আমি ও সুরেশ রওয়ানা হলাম—এলটাম পার্ক অভিমুখে।

লিনকলন হল হোটেল থেকে বাসে চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনে এসে, ট্রেণ ধরে যখন এলটাম পার্ক ষ্টেশনে এসে পৌছলাম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা হবে। ষ্টেশনটি নীচুতে—খানিকটা উপরে উঠে গিয়ে এলটাম পার্ক পল্লী। আমি ও সুরেশ উপরে উঠে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালাম।

সত্যি চোখ জুড়িয়ে গেল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তার দু'ধারে ঠিক একই ধরণের ছোট ছোট দোতলা বাড়ীগুলি, সামনে একটি করে ছোট বাগান, বাগানের সামনে রাস্তার ধারে একটি করে লোহার ছোট গেট এবং একটি সরু রাস্তা সেই গেট থেকে বাড়ীর সদর দরজা পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে। সবই ঠিক কম-বেশী একই ধাঁচে তৈরী—যেন একই দিনে কোনও একজন কারিগর সমস্ত বাড়ীগুলি তৈরী করে রেখেছে।

দিনটা অবশ্য মেঘলা ছিল—কিন্তু এখানে সেই লণ্ডনের অন্ধকার কুয়াশা নাই। বাড়ীগুলির ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার ওধারে তরঙ্গায়িত মাঠের পর মাঠ—তার ঘন সবুজ রংটা সত্যিই আমার বুকের ওপর যেন একটা শীতল প্রলেপ লাগিয়ে দিল। আমি একদৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে রইলাম।

সুরেশ বলল, "ওহে চল, কোথাও মধ্যাহ্ন ভোজনটি সেরে নেওয়া যাক। বেলা সাড়ে বারোটা বেজে গেছে।"

সুরেশ বলল, "ঐ দূরে রাস্তার ও পাশে একটা কাফে আছে বলে মনে হচ্ছে। চল দেখা যাক।"

দু'জনে গেলাম সেই দিকে; সত্যিই কাফে। একতলার সামনের ঘরটায় খানকয়েক ছড়ান টেবিল রয়েছে, পাশে চেয়ার। পাঁচ-সাত জন ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা বিভিন্ন টেবিলে বসে খাচ্ছে। আমরাও একটা টেবিল দখল করলাম।

সুরেশই খাবার আনতে বলল। খেলাম—ল্যাম্ব চপ (অর্থাৎ সিদ্ধ করে ভাজা খানিকটা কচি ভেড়ার মাংস) সঙ্গে কিছু সিদ্ধ বাঁধাকপি ইত্যাদি তরি-তরকারী, দু' টুকরো করে রুটি ও মাখন

এবং পরে জ্যাম ইত্যাদি দিয়ে তৈরী খানিকটা পুডিং। এক কাপ করে চা-ও খেয়েছিলাম। মোটের উপর আমাদের খরচ হল আট শিলিং সাত পেনি; বলা বাহুল্য খরচটা আমিই দিয়েছিলাম— যখন টাকা নিতে এল, সুরেশ ছিল জানালা দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে বাইরের দিকে চেয়ে।

১৪নং গ্রীণ তোম রোডের সামনে এসে যখন দাঁড়ালাম, তখন ছ'টা বেজে গেছে। কাফে থেকে বেরিয়ে এক জন পুলিশম্যানকে সুরেশ রাস্তার খবর বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করে নিয়েছিল এবং পুলিশম্যানও অল্প কথায় বুঝিয়ে দিয়েছিল ঠিক। বলেছিল, "সোজা চলে যান বাঁয়ে দ্বিতীয় রাস্তা নেবেন এবং তার পর খানিকটা গিয়ে ডাইনের তৃতীয় রাস্তা হচ্ছে গ্রীণ তোম রোড।"

রাস্তার দু'ধারে ঠিক সেই একই ধাঁচের বাড়ী। অস্তোস না থাকলে হঠাৎ ঠিক বাড়ীটি চিনে বার করা কঠিন। আমরা নম্বর দেখে বাড়ীটা খুঁজে নিলাম।

সামনের সরু লোহার গেটটা খুলে, বাগানের রাস্তা বেয়ে আমরা সদর দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে দিলেন—একটি মহিলা। ইনিই মিসেস ব্লেক।

ভদ্রমহিলাকে দেখেই আমার ভাল লাগল। বয়স ঠিক আন্দাজ করা কঠিন, তবে মধ্যবয়সী—একমাথা চুল টেনে খোঁপা করে আঁচড়ান এবং একটি কালো জাল দিয়ে চুলগুলি ঢাকা। চোখে চশমা এবং চশমার আড়াল থেকে চোখ দু'টির একটি স্নিগ্ধ মৃদু হাসিতে মুখখানি সব সময়েই শুধু যে উদ্ভাসিত হয়ে আছে তাই নয়, মুখখানিতে একটা সহানুভূতি ভরা দাক্ষিণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মোটের উপর ছোটখাট মানুষটি—কিন্তু পরিণত গড়নের সামঞ্জস্য দৃষ্টি এড়ায় না। কথায়-বার্ত্তায় ধরণে-ধারণে সব সময়ই একটা উৎফুল্ল চঞ্চলতা যেন সারা অঙ্গ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে।

দরজাটি খুলে মৃদু হেসে বললেন, "সুপ্রভাত।"

সুরেশ বলল, "আপনার এখানে ঘর খালি আছে শুনেছি। আমার এই বন্ধুটি সবে ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন। এর থাকবার জায়গা হবে কি?"

মহিলাটি দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানালেন, "ভিতরে আসুন।"

ভিতরে গিয়ে দেখলাম—সেই একই ধরণের বাড়ী—সামনেই দোতলার সিঁড়ি উঠে গিয়েছে এবং ডাইনেরটি খাবার ঘর এবং বাঁয়েরটি বসবার ঘর। লণ্ডনের বাড়ীগুলির সঙ্গে তফাৎ এই যে, এ বাড়ীগুলি একটু ছোটখাট ধরণের এবং একতলারও নীচে, ওরা যাকে বেসমেণ্ট বলে তা এ-সব বাড়ীতে নাই।

দোতলার শোবার ঘর দেখাবার জন্য মহিলাটি আমাদের উপরে নিয়ে গেলেন। ঘরটা অবশ্য বিশেষ বড় নয়, তবে বেশ খটখটে এবং রাস্তার দিকে বেশ বড় একটা জানালা এবং খাট বিছানা প্রসাধন টেবিল প্রভৃতি আসবাবপত্রও ভাল। ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন না হলেও কাছেই স্নান ইত্যাদির ঘর। মহিলাটি বললেন যে, "এটি শোবার ঘর এবং নীচে খাবার ঘরটিই বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।"

তিনি আরও বললেন—"নীচের বসবার ঘরটি নিরিবিলি ব্যবহারে আপনার কোনও অসুবিধা হবে না। কেন না, আমার বাড়ীতে ত লোকজন বেশী নেই—মাত্র আর একটি জাপানী ভদ্রলোক থাকেন। তিনি ভোরে বেরিয়ে যান আর রাত্রে ফেরেন। তাঁর সঙ্গে আপনার প্রায় দেখাই হবে না।"

শুধালাম, "আমার আর একটি বন্ধু আছেন। তাঁর থাকবার কোনও ব্যবস্থা হতে পারে?"

মিসেস ব্লেক একটু ভেবে বললেন, "আপাতত নয়; তবে কিছু দিন পরে ব্যবস্থা করতে পারব বলে মনে হয়।"

খাবার এবং বসবার ঘরটি দেখবার জন্য নীচে নেমে এলাম। রাস্তার দিকে জানালা রয়েছে—ঘরটিও ভাল। একটি বড় টেবিলের চার পাশে লাল গদি-আঁটা চেয়ার এবং ঘরের কোণে একটি লাল গদির কৌচও রয়েছে। মেঝেয় বেশ লাল পুরু কার্পেট পাতা। কার্পেট অবশ্য এ-দেশীয় বাড়ীতে প্রায় সর্ব্বত্রই থাকে—এখানে আমার শোবার ঘরটিতেও ছিল।

সুরেশের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কি করব?"

সুরেশ বলল, "এক্ষুণিই ঠিক করে ফেল। সব দিক দিয়ে এমন সুবিধের জায়গা পাবে কোথায়?"

বললাম "কিন্তু চন্দ্রনাথ"—

বলল, "অত ভাবতে গেলে আর এ দেশে থাকা যায় না। এমন জায়গা ছেড়ে দিলে আর পাবে না। পরে না হয় চন্দ্রনাথ আসবে।"

আসলে কথাটা আমারও মনের কথা। সব দেখে শুনে আমার মন যেন জায়গাটিকে একেবারে আঁকড়ে ধরেছে, কিছুতে ছাড়তে রাজী নয়।

মুখে বললাম, "তাই হোক।"

মহিলাটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা সব ঠিক হলো।

শুধালেন, "কবে আসবেন?"

বললাম, "আজই। আমি এখুনিই গিয়ে জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিয়ে আসছি।"

মহিলাটি দেরাজের ভিতর থেকে একটি কাগজ বার করে বললেন, "সন্ধ্যের দিকে চেয়ারিং ক্রশ থেকে অনেকগুলি গাড়ী আছে। কখন আপনার আসার সুবিধে হবে?"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, "এই ধরুন ছ'টা আন্দাজ।"

মহিলাটি বললেন, "ভাল কথা। ছ'টায়ই একটা গাড়ী আছে এবং তার পরেই ছ'টা কুড়ি মিনিটে। এই দুটির একটায় এলেই ঠিক হবে। আমি ইতিমধ্যে আপনার ঘর গুছিয়ে রেখে দেব। রাত্রে এসে খাবার খাবেন ত?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

বললেন, "বেশ ভাল কথা।"

* * * *

লিনকলন হল হোটেলে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন প্রায় সাড়ে চারটা বাজে। সুরেশ চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশন থেকেই বিদেয় নিয়েছিল— কি কাজ আছে। কত নম্বর বাসে গিয়ে কোথায় নেমে লিনকলন হল হোটেলে যেতে হবে বিস্তারিত আমাকে বুঝিয়ে বলে দিয়ে গিয়েছিল।

বাসে আসতে আসতেই বুঝতে পেরেছিলাম, যদিও মনের মধ্যে বাড়ীটা ঠিক হওয়ার দরুণ একটা স্বস্তির হাওয়া বইছে কিন্তু একটা কাঁটা ফুটে আছে মনে। এই স্বস্তির হাওয়াতে কাঁটার ব্যথাটি থেকে থেকে খচখচ করে লাগতে লাগল—তাই ত। চন্দ্রনাথকে যে ঠকান হল, তাকে বাদ দিয়ে স্বার্থপরের মতন নিজের বাসাটি নিলাম ঠিক করে!

হোটেলে ঢুকে বাইরে বসবার ঘরটিতে গেলাম, চন্দ্রনাথ হয়ত ঐখানেই অপেক্ষা করছে। ছিলও তাই। চন্দ্রনাথকে দেখে নিজেকে একটু অপ্রস্তুত মনে হতে লাগল—যেন একটা অপরাধ করে ফেলেছি তার কাছে।

চন্দ্রনাথ শুধাল, "কি খবর? এত দেরী?" শুধালাম "তোমার খবর কি?"

চন্দ্রনাথ বলল, "আমি ত তোমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। আমি এইবার যাব।"

শুধালাম, "কোথায়?"

চন্দ্রনাথ বলল "বেশী দূর নয়—কাছাকাছি—টরিংটন স্কোয়ারে। আমার মেজদার বন্ধু একটি ঘর আমার জন্য আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন। কাজেই আমাকে যেতেই হল। আর ঘরটিও চমৎকার—বড় ঘর, সুন্দর আসবাব-পত্র—জানালা দিয়ে স্কোয়ার দেখা যাচ্ছে। বাড়ীওয়ালী ভদ্রমহিলাটি খুব ভাল। সস্তাও বেশ। বেড ও ব্রেকফাষ্ট সপ্তাহে তিন গিনি।

চন্দ্রনাথ এতগুলি কথা এক নিশ্বাসে বলে ফেললে খানিকটা যেন কৈফিয়তের মতন। একটা জোর স্বস্তির নিশ্বাসে আমার মনের কাঁটাটা গেল খসে। একটা কপট অভিমানের সুরে বললাম, "আর আমার কি দশা হবে?"

চন্দ্রনাথ বলল, "তুমিও চল আমার সঙ্গে। আমারই বাড়ীর কাছাকাছি দুটো ঘর আমি দেখে এসেছি তোমার জন্য। বেশ ভাল ঘর। একটু বেশী—সপ্তাহে সাড়ে তিন গিনি করে বেড ও ব্রেকফাষ্ট। লণ্ডন সহরের ভিতরে ঐ রকমই ভাড়ার মাপকাঠি। আমার বাড়ীর মহিলাটি মেজদা'র জানা-শোনা কি না—তাই বোধ হয় একটু সস্তায় দিয়েছেন।"

মুখে কপট গাম্ভীর্য্য মাখিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

চন্দ্রনাথ শুধাল, "তা, তুমি এতক্ষণ করলে কি?"

আর কপট গাম্ভীর্য্য রাখা চলল না। বললাম, "আমিও একটা ঘর ঠিক করে এসেছি।"

"ও!" বলে চন্দ্রনাথ হো-হো করে হেসে উঠল। তারও বুকে বোধ হয় বইল একটা স্বস্তির হাওয়া।

* * * *

লিনকলন হল হোটেলের দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে, আমার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে যখন সদর দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন সন্ধ্যে আর নয়, অন্ধকার রাত্রি—ঘড়িতে সময় সাড়ে পাঁচটা। সামনেই রাস্তায় ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার আমার কাছ থেকে জিনিষগুলি নিয়ে ট্যাক্সিতে সাজিয়ে রাখতে লাগল। চন্দ্রনাথ আগেই চলে গিয়েছে।

সদর সিঁড়ির উপরের ধাপে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলাম, সকালবেলার সেই সিংহলবাসী যুবকটি ফুটপাথ দিয়ে হোটেলের দিকে এগিয়ে আসছে—সঙ্গে একটি বিদেশী তরুণী। তরুণীটি যুবকটির সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হোটেল পর্য্যন্ত উঠে এলো না—ফুটপাথেই বাড়ীর রেলিং-এর পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল, অন্ধকারে নিজেকে একটু আড়াল করে। যুবকটি সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই আমার সঙ্গে দেখা।

তাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে বললাম যে, তারই নির্দ্দেশ মত বাড়ী ঠিক করেছি এবং বাড়ীটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

যুবকটি বলল, "ভালই থাকবেন। মহিলাটি খুবই যত্ন করেন। এখুনই যাচ্ছেন বুঝি?"

বললাম "হ্যাঁ।"

করমর্দ্দন করে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সে হোটেলের মধ্যে ঢুকে গেল—কিন্তু তরুণীটি সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে—বোধ হয় সিংহলবাসীর অপেক্ষায়। রাস্তার গ্যাসের আলো আমাদের সদর সিঁড়ির উপরে খানিকটা এসে পড়েছে কিন্তু তরুণীটি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে জায়গাটি অন্ধকার, তাই তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিমার মধ্যে তার অঙ্গলাবণ্যের মাধুর্য্য সহজেই পড়ল চোখে। হয়ত কিছুই আমার চোখে পড়ত না যদি না হঠাৎ আমি অনুভব করতাম যে তরুণীটি অন্ধকারের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে অসাধারণ উজ্জ্বল দু'টো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার চোখ-মুখ যেন বিদ্যুৎ-বাণে বিদ্ধ করছে। কখন যে সেই দৃষ্টিবাণ আমার নয়ন ভেদ করে অন্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল—টের পাইনি। কিন্তু ট্যাক্সি করে লণ্ডনের বুকের উপর দিয়ে যেতে যেতে আমার অন্ধকার বুকের মধ্যে সেই দু'টো চোখ, দু'টি প্রদীপশিখার মতন জ্বলতে লাগল অনেকক্ষণ!

[ক্রমশঃ।

পঞ্চতপা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১১

অন্ধকার শাল গাছের নিচে সাইকেল হাতে নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করে ভুতুবাবু দেখছে আর দরদর করে ঘামছে।

তারই দোকানের এক ঘরে টিম টিম করে আলো জ্বলছে একটা। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে খাটিয়ার ওপর বসে আছে লোকটা আর ক্রমাগত পাইপ টানছে। পাইপ নিবে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। দেশলাই জেলে পাইপ ধরাচ্ছে আবার। তার আভায় চকচকে মুখ লাল দেখাচ্ছে থেকে থেকে। ভুতু বাবুর চোখ জানে, সে লালিমা সুরাসিক্ত।

ভুতু বাবু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর দেখে চেয়ে চেয়ে। মনে হয় তারই দোকানে বাসা নিয়েছে এক মূর্তিমান বিভীষিকা। মড়াইয়ের বাতাসে গাছের পাতা মড়মড়িয়ে ওঠে। ভুতুবাবুর কানের ভিতর দিয়ে একটা অজ্ঞাত শঙ্কার স্রোত পা বেয়ে নামতে থাকে।

রাতের পর রাত কাটিয়েছে দোকানে, কখনো এমন হয়নি।

শলাই জ্বলে উঠল নিবন্ত পাইপের মুখে। তেলতেলে লাল মুখ ঢুলুঢুলু চোখসুদ্ধ দেখালো আবার। দোর গোড়ায় মেঝেতে দ্বিতীয় মূর্তি। অন্ধকারের মতই কালো আর থমথমে। ক্রমাগত মদ গিলছে সেও। ঘরের টিমটিমে আলোয় বাইরের দিকে বিরাট একটা ছায়া পড়েছে তার। সেই ছায়ার নড়াচড়া দেখে ভুতুবাবু বুঝতে পারে, থেকে থেকে বোতল উবুড় করে গলায় ঢালা হচ্ছে।

পর পর চারদিন···। ভুতু বাবু ভয়ে কাঠ। আরো এগারো দিন বাকি।

কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল এখনো যেন ঠাওর করতে পারছে না। কেন রাজি হল? টাকার লোভে। এক পাঁজা নোট যখন লোকটা নাড়তে লাগল তার চোখের সামনে, ভুতুবাবুর পায়ের নিচে মাটি দুলছিল। একেবারে গোল আর স্থির হয়ে গিয়েছিল তার গোল গোল দুই চোখ। নাকের ডগায় টাকার বাতাস লেগে গোটা শরীরটাই সিড়সিড় করে উঠেছিল। তবু টাকার লোভেই শুধু রাজি হয়নি। রাজি হয়েছে ভয়ে। অজ্ঞাত ভয়ে। কি করে যেন বুঝেছিল, রাজি না হলে তার দোকানের পাট বরাবরকার মত তুলতে হবে এখান থেকে। লোকটা তার নাকের ডগায় টাকা দুলিয়েছে মতামতের প্রত্যাশায় নয়। মুখ বন্ধ করার জন্য আর কৌতূহল দমন করার জন্য। টাকার দোলানিতে সেটা সম্ভব না হলে আরো উপায় আছে হাতে। সে উপায়টিও আড়ে আড়ে দেখেছে ভুতুবাবু, উপলব্ধি করেছে।

নোটের তাড়া দুলছিল রণবীর ঘোষের হাতে আর ড্যাবডেবে মড়া চোখে নির্নিমেষে চেয়েছিল হোপুন।

কেউ তারা ভয় দেখায়নি। তবু ভয় পেয়েছিল ভুতু বাবু। রণবীর ঘোষের হাতে টাকা আছে, টাকায় না হলে হোপুন আছে। একবার টাকার দিকে তাকাও। তারপরে হোপুনের দিকে। ওই ঠাণ্ডা মড়া চোখের সঙ্গে দ্বিতীয়বার আর চোখোচোখি করার সাধ হবে না। চেয়ে থাকো টাকার দিকে। নাকের ডগায় টাকার বাতাস মিষ্টি লাগবে। টাকা নাড়ার ফরফর শব্দটা মিষ্টি লাগবে কানে। বিহ্বল হাত বাড়িয়ে টাকা নাও তারপর। মড়া চোখের দিকে তাকিও না আর।

হাত বাড়িয়ে টাকাই নিয়েছে ভুতু বাবু।

কিন্তু ওই টাকাই অস্বস্তির কারণ, ভয়ের কারণ, বিভীষিকার কারণ। এত টাকা না পেলে অত ভাবত না ভুতু বাবু, অত ভয়ও পেত না। অত টাকা পেয়েছে বলেই গোলমেলে ঠেকছে সব কিছু। গোলমেলে ঠেকছে বলেই ভাবছে। আর যত ভাবছে তত ভয় বাড়ছে।

দু'দিনের মধ্যে সব কিছু যেন ওলট পালট হয়ে গেল ভুতু বাবুর চোখের সামনে। অথচ ব্যাপার সামান্য। গোড়ায় গোড়ায় তো টাকা নিয়ে দু'পাঁচজনের এক একটা দলকে এমন ঘর ছেড়ে দিয়েছে কতবার। বিদেশে বেঘোরে এসে পড়েছে। রাতে মাথা গোঁজার আস্তানা নেই। টাকা ফেলো, থাকো একরাত দু'রাত। ভুতু বাবু অন্য ঘরে সব পুরে তালাবন্ধ করে সাইকেল ঠেঙিয়ে চলে যাবে চৌদ্দ মাইল দূরে নিজের বাড়ি। ভাঙা কাচের আলমারি, তেলচিটে আসবাব পত্র বা ব্যবহার করা হাঁড়ি কড়াই চুরি করার জন্য অতটাকা দিয়ে দল বেঁধে রাত্রিবাস করতে আসবে না কেউ ভদ্রলোক সেজে। মুখ দেখে লোক চিনতে পারে ভুতু বাবু। তাছাড়া ছুটকো চুরির ভয়ও নেই কিছু। আদিবাসীরা আর যাই হোক, চুরি শেখেনি।

কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটাই অসম্ভব ত্রাস সঞ্চার করেছে ভুতু বাবুর মনে। পনের দিনের জন্য তার দ্বিতীয় ঘরটি দখল করেছে রণবীর ঘোষ। দিন নয়, শুধু রাতের জন্য। মড়াই ছেড়ে চলে যাচ্ছে বরাবরকার মত। দিনকতক থাকা দরকার এখনো। পার্টনারের সঙ্গে বনছে না বলেই এই ব্যবস্থা নাকি। পনের রাত্রির জন্য হলেও যে কোনদিন চলে যেতে পারে।

কিন্তু পনের রাত্রির জন্য অত টাকা কেন? এর পনের ভাগের এক ভাগ হলেও তো ভুতু বাবু রাজি হয়ে যেত। অত টাকা কেন আর অত থমথমে গোপনতা কেন? সেই গোপনতার সঙ্গী এই মড়া চোখো লোকটা কেন?

দোকানের শুরু থেকেই হোপুনকে চেনে ভুতু বাবু। তার আসুরিক কীর্তিকলাপ জানে। মনে মনে সমীহ করে। কিন্তু এরকম ভয় কখনো করেনি। কিছু দিন ধরেই লোকটার কথা ভাবছিল ভুতু বাবু। বিগত ক'টা দিনের মধ্যে ওর সঙ্গে নীরব যোগাযোগ ঘটেছে বার কতক।

নিরিবিলিতে ফস ফস করে আনকোরা নোট বার করেছে দু'টো তিনটে করে। মুখ ফুটে কখনো বলেনি বিশেষ কিছু। সামান্য

ইঙ্গিতে ভুতু বাবু বুঝে নিয়েছে। হাড়িয়া বা পচাই নয়, খাঁটি বিলিতি চাই। হাড়িয়া, পচাই তো ওদের ঘরে সর্বদাই মজুত থাকে। ওর মুখের দিকে চেয়েই ভুতু বাবু পরিষ্কার বুঝতে পারে, লেবেল আঁটা বিলিতির স্বাদ লোকটা ভালো করেই জেনেছে।

ভুতু বাবু কি এই ব্যবসা করে না কি ? মোটে না। বিশ মাইল দূরে শহরের দোকান সকলের জন্যেই খোলা। তুমি গেলে তুমিও নিয়ে আসতে পারো। কিন্তু তোমার যাওয়ার ফুরসত নেই বা সঙ্গতি নেই। আমি এনে দিই তোমার হয়ে। বোতলের দাম নিই আর পরিশ্রমের দাম নিই। ব্যস, বিবেকের কাছে পরিষ্কার ভুতু বাবু। যার দরকার, যেমন করে হোক আনবেই সে, ভুতু বাবু উপলক্ষ মাত্র।

কিন্তু তা বলে হোপুন ! হোপুনের জন্য ! ভুতু বাবু অবাক। অবশ্য এ অর্থের যোগানদার কে ভুতু বাবু অচিরে জেনেছে। কিন্তু জেনে বিস্ময় চতুর্গুণ বেড়েছে। তবু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি কিছু। জিজ্ঞাসা করবে কাকে। লোকটার বোবা চাল-চলনের ব্যতিক্রম নেই কিছুমাত্র। বরং আরো শান্ত আরো নিষ্প্রাণ মনে হয়েছে। কিছু জিজ্ঞাসা করলে এই জমাট কালো পাথর মূর্তি যে ভাবে মুখের দিকে চেয়ে থাকবে সে এক অস্বস্তি। ভুতু বাবু জিনিস এনে দিয়ে খালাস।

তার পর সরাসরি এই ঘর ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব, নাকের ডগায় রণবীর ঘোষের টাকা দোলানো এবং সেই সঙ্গে হোপুন ! ভুতু বাবু ভড়কে গেছে, ভাবনাচিন্তার অবকাশ বড় পায় নি।

দূরে শাল গাছের নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে ভুতু বাবুর। যেতে পারলে বাঁচে। কিন্তু পা যেন পাথর হয়ে গেছে। নড়তেও পারছে না।

সন্ধ্যে হতে না হতে মড়াইয়ের হট্টগোল থেমে যায়। কর্মচারীরা ওপরে উঠে যায়। আদিবাসীরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরের দিকে ছোটে হাড়িয়ার টানে। ভিনদিশি কুলীকামিনের আস্তানা এদিকে নয়। একটু রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুতু বাবুর দোকানের আশেপাশে জনমানবের চিহ্ন বড় থাকে না। রাত আটটা বাজতে না বাজতে দু'দশ ঘর বাঁধা খদ্দেরের রাতের খাবার উপরে চলে যায় শেষ বারের ট্রাকে। তার পরেই রাত্রির স্তব্ধতা। ধীরেসুস্থে তখন দোকান গোটাবার ব্যবস্থা করে ভুতু বাবু। আর ছোকরা কর্মচারী দুটোর সঙ্গে গল্পগুজব করে।

কিন্তু দু'দিন ধরে রাতের খাবার উপরে পাঠিয়েই ওদের বিদায় দিতে হচ্ছে। একটা ঘর তালাবন্ধ করে ফেলে দুরু দুরু প্রতীক্ষা। জিপে করে রণবীর ঘোষ আসে এক সময়। বাক্যব্যয় না করে সাইকেল নিয়ে প্রস্থান করে ভুতু বাবু। দূরে অন্ধকারে শাল গাছের নিচে এসে দাঁড়ায় তার পর। খাটিয়ায় বসে পাইপ ধরায় রণবীর ঘোষ। ক্রমাগত পাইপ টানে। পাইপ নিবে যায়। দেশলাই জ্বেলে ধরায় আবার। পিচ্ছিল লালিমায় চকচকিয়ে ওঠে গোটা মুখ !

সাইকেল-হাতে ভুতু বাবু দাঁড়িয়ে থাকে নিস্পন্দের মত। কতক্ষণ ঠিক নেই।

তার পরে, অনেক পরে শ্লথ গতিতে পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসে হোপুন। পুঞ্জীভূত খানিকটা নিটোল অন্ধকারের মত।

ভুতু বাবু জানে, অর্থ দিয়ে সহজে কেনা যায় না ওদের। কিন্তু মদের বশ প্রায় সকলেই।

সমস্ত রাত তা বলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না এভাবে। কতদূর যেতে হবে ঠিক নেই। গোলগাল দেহ সত্ত্বেও সাইকেল চেপে অনায়াসে চলে যাওয়া অভ্যেস আছে। কিন্তু ক'দিন ধরে শরীরটা যেন কাঠ। নড়তে-চড়তে সঙ্কট।

আরো এক রাত। একই ব্যাপার দেখল ভুতু বাবু।

সিমেন্ট ভেজাল সংক্রান্ত সমস্ত অঘটন জানে। প্রথমে ভাবল, সেই ব্যাপারেরই প্রতিশোধের চক্রান্ত কিছু। কিন্তু ভুতু বাবু নির্বোধ নয়। হঠাৎ মনে হল, তা নয়। একেবারেই নয় তা। আর কেউ না জানুক, ভুতু বাবু তো জানে ঘর দখলের কথা। জানে যখন, ওখানে মারাত্মক কিছু সংঘটনের সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া প্রতিশোধ নিতে হলে এভাবে ঘর দখলের দরকারই বা কি ?

তাহলে কি ? তাহলে কেন ?

ভুতু বাবুর গোল চোখে পলক পড়ে না প্রায়। দম বন্ধ করে ভাবতে থাকে।···তাহলে এমন কিছু, যার জন্য ঘর দরকার। এমনি নির্জনে, এমনি গোপনে। কোনো একজনের আসার প্রতীক্ষা। কেউ একজন আসবে।

···যেই হোক সে, পুরুষ মানুষ নয়।

একটা রোমাঞ্চকর উত্তেজনায় হঠাৎ যেন চাঙ্গা হয়ে উঠল ভুতু বাবু। সঙ্গে সঙ্গে এক উচ্ছল চপল মেয়ের মূর্তি ভেসে উঠল চোখের সামনে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের মেয়ে ঝরণা। ভারী ভাব দেখেছে এই লোকটার সঙ্গে। যখন তখন যেখানে সেখানে ঘোরে জিপে করে। মেয়েটাকে ভালো মনে হয়নি কোন দিন। তবু, খুশি ছিল মনে মনে। দোকানের খদ্দের বাড়িয়েছে অনেক। একবার এসে চা খেতে বসলে টানে টানে অনেক আসে।

কিন্তু তা বলে এই ব্যাপার ! খাপ্পা হয়ে উঠতে লাগল ভুতু বাবু। কিন্তু সেই সঙ্গে এক ধরনের নির্মম উষ্ণতাও উপলব্ধি করছে যেন। পরিবেশটা নিজের দোকান ঘর না হলে···

কিন্তু সহসা যেন বিদ্যুতের ঘায়ে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেল আবার। সমস্ত চেতনাসুদ্ধ বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে গেল এক নিমেষে। দেহের সব রক্ত জল।

···তাই যদি হবে, সঙ্গে এ হেন অনুচরটি কেন ? এই চক্রান্ত কেন ? মদে এই দুর্দম লোকটাকে বশীভূত করা কেন ?

দর দর করে ঘাম ঝরতে লাগল ভুতু বাবুর। সাইকেলটা পড়ে যাবার মত হল হাত থেকে। রণবীর ঘোষের চালচলন অনেক দিন লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করছে।···এবারে সব বুঝেছে ভুতু বাবু। সব জেনেছে। ঝরণা চ্যাটার্জী নয়। আর কেউ, যে স্বেচ্ছায় আসবে না। জোর করে আনা হবে। সেই জন্যেই এই চক্রান্ত। সেই জন্যেই হোপুন। সেই জন্যেই তাকে মদ গেলানো।

সাইকেল নিয়ে টলতে টলতে প্রস্থান করল ভুতু বাবু।

মনে মনে একধার থেকে জল্পনা কল্পনা করে চলেছে সান্ত্বনা। এক একবার এক একটা যুক্তির জাল বুনছে। কিন্তু খানিক বাদেই সেটা জোরালো লাগছে না তেমন। আবার ভাবছে। কোন অজুহাতই জুতসই লাগছে না খুব।

মাসির চিঠি এসেছে। মাসতুতো বোনের বিয়ে। অবিলম্বে তাকে যেতে হবে। বিয়ের প্রায় মাসখানেক দেরি এখনো। কিন্তু

মাসির জোর তাগিদ, ওর বাবা যেন পত্রপাঠ দুই একদিনের ছুটি নিয়ে ওকে রেখে আসে। সান্ত্বনা বেশ বুঝছে, একবার গিয়ে পড়লে দু'তিন মাসের ধাক্কা।

বেরোবার আগে অবনী বাবু চিঠি পড়ে গেছেন। ফিরে এসে যা হয় ভেবে ঠিক করবেন বলেছেন। সান্ত্বনা খুব জানে বাবাও রেখে আসতেই চাইবে। কারণ মড়াইয়ে এসে পর্যন্ত আর একবারও যায়নি। তাইতেই মাসি ক্ষুণ্ন মনে মনে।

সান্ত্বনা যাবে তো নিশ্চয়ই। এত দিনে সেই মাসতুত বোনের বিয়ে। আনন্দও কম নয়। মেয়ে দেখা নিয়ে সেই দু'দুবারের বিভ্রাট। বোনের বদলে ওকেই নিতে চেয়েছিল। রাগে আর সঙ্কোচে ওর সেই কেঁদে ফেলার উপক্রম! মনে পড়লে এখন কিন্তু খারাপ লাগে না খুব। বরং কেমন যেন খুশির আমেজ লাগে একটু।

সান্ত্বনার যেতে আপত্তি নেই। দু'চার দিনের জন্য গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে আসার আগ্রহই বরং ষোল আনা। কিন্তু ওই দু'চারদিনের জন্য। সময় সময়কালে বাবার সঙ্গে যাবে আর বাবার সঙ্গে ফিরে আসবে। কিন্তু মাসি দূরের কথা, বাবাও রাজি হবে না তাতে। ওই জন্যেই রাগ হয় বাবার ওপর। লিখে দিলেই হয়, সান্ত্বনা না থাকলে খাওয়া দাওয়ার অসুবিধে—আরো কত কি অসুবিধে। কিন্তু সে বেলায় ঠিক উল্টো বলবে। যেন ওর কোন দরকারই নেই। তা ছাড়া ও না থাকলে ছোকরা চাকরটার হাতে সুন্দরীর কি হাল হবে তাই বা কে জানে? আসলে মড়াই ছেড়ে যাওয়ার চিন্তাটাই যে প্রায় দুঃসহ, ভিতরে ভিতরে ওর সে অস্বস্তিও কম নয়।

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ। বিস্মিত হল সান্ত্বনা, এই ভরা দুপুরে আবার কে! কণ্ঠস্বর শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে।—মা-লক্ষ্মী আছেন না কি, আমি ভুতু।

তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দিল সান্ত্বনা। খুশি হয়ে বলল, কি ব্যাপার, আসুন, ভিতরে আসুন—এতকাল বাদে সুন্দরীর কথা মনে পড়ল বুঝি?

ভুতু বাবুর ঘামে-ভেজা ফোলা গাল অমায়িক হাসিতে টসটসে দেখালো। কাপড়ের খুঁটে ঘাম মুছতে মুছতে কাঠের চেয়ারে বসে বড় একটা দম নিল।—আসতে তো মন চায়, সময় পাই কোথা মা-লক্ষ্মী, আপনাদের আশীর্বাদে দোকান ছেড়ে নড়তেই পারিনে মোটে। তা ভালো আছেন তো?···ক'দিন দেখিনি, দোকানেও তেমন লোকজন নেই এখন, ভাবলাম এই ফাঁকে টুক করে মা-লক্ষ্মীকে দেখে আসি একবার।

দু'চোখ গোল করে মা-লক্ষ্মী দর্শনে মন দিল ভুতু বাবু। হাসি চেপে সান্ত্বনা পাশের ঘর থেকে একখানা হাতপাখা এনে তার হাতে দিয়ে অদূরে বসল।

ভুতু বাবুর হাতে পাখা নড়তে লাগল আর মুখে কথা ঝরতে লাগল। এলোমেলো কথা। রাজ্যের কথা। । গোরুর প্রসঙ্গ তুললই না মোটে। সান্ত্বনার মনে হল, শুধু দর্শনাভিলাষে আসেনি লোকটা, কিছু দর্শনতত্ত্বালোচনার বাসনাও উঠেছে। কথার তোড়ের মাঝখানে হঠাৎ থেমে যাচ্ছে এক একবার, দেখছে ওকে নিরীক্ষণ করে, আবার সচেতন হয়ে যে কোন একটা প্রসঙ্গ ধরে নতুন করে দর্শন পথ পাড়ি দিচ্ছে একটা। সান্ত্বনা মনে মনে অবাক হল একটু। শ্রোতা পেলে ভুতু বাবু বক্তা ভালো জানে। কিন্তু সে বক্তৃতায় সব সময়েই আত্মগত বা স্বার্থগত সুর থাকে একটা। কিন্তু আজ প্রায় দুর্বোধ্য লাগছে। সান্ত্বনা শুনছে মন দিয়ে, সেটা বোঝাবার জন্যেই মাঝে মাঝে মুখ টিপে হাসছে একটু আর সকৌতুকে চেয়ে আছে।

হাতপাখা হাঁটুর ওপর রেখে ভুতু বাবু অনর্গল বলে চলেছে। এবারের প্রসঙ্গ বোধ হয় আবহাওয়াগত।—বেজায় গরম পড়েছে, আবার এ সময়ে প্রচণ্ড জলও হয়ে গেল বার দুই। জল হয়ে গেল অথচ গরম কমল না। আকাশ সারাক্ষণ মেঘে থম থম, ওদিকে বাতাসের দেখা নেই। মড়াইয়ের সমস্ত বাতাস যেন পাহাড়ের ভিতরে গিয়ে সেঁধিয়েছে। মড়াইয়ে সবই উল্টোপাল্টা ব্যাপার এখন। কখন যে কি হবে কিছু ঠিক নেই। কিছু একটা হবেই এ বছরটা, আকাশের দিকে চাইলেই বোঝা যায় কিছু হবে। মা-লক্ষ্মীর কি মনে হয়, হবে না কিছু?

জবাব এড়িয়ে সান্ত্বনা হাসে তেমনি।

—মড়াইয়ের মানুষগুলোও কেমন যেন উল্টোপাল্টা রাস্তায় চলেছে এখন। মা-লক্ষ্মী কি সেটা লক্ষ্য করেছে? করে নি তো? কিন্তু ভুতু লক্ষ্য করেছে। ভুতু দোকান নিয়ে পড়ে থাকে সারাক্ষণ কিন্তু চোখ এড়ায় না কিছু। বাতাস শুঁকে হালচাল বলে দিতে পারে। না, মানুষগুলোও এখন সোজা রাস্তায় চলছে না ঠিক। সবাই নয়, কেউ কেউ। শরীরের কোথাও একটা ফুসকুড়ি হলে গোটা দেহে যন্ত্রণা। তেমনি কেউ কেউ সোজা পথে না চললে সমস্ত পথই ঘুলোতে কতক্ষণ! দুনিয়ায় ভালো পড়ে আছে, মন্দ পড়ে আছে। যার সঙ্গে যার যোগ, তেমনি হবে। ওই যোগটুকু না হলে ভালো মন্দ কোনোটারই কোন দাম নেই। তীর আর ধনুক আলাদা আলাদা পড়ে থাকলে তার পাশ দিয়ে হরিণ লাফিয়ে বেড়াবে—ও দু'টো একসঙ্গে হলে তবেই না কিছু ঘটতে পারে!

সান্ত্বনার হাঁপ ধরে যাচ্ছে প্রায়, আর উপমার বহরে বিস্ফারিত হয়ে উঠছে থেকে থেকে।

—ওই অতবড় মেঘটার গায়ে হাওয়া লাগছে না বলেই না গরমে সেদ্ধ! আবার তেমন হাওয়া লাগলে প্রলয় হতে কতক্ষণ? যেমন যোগ তেমনি। কথার ঝোঁকে ভুতু বাবুকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে প্রায়। —শুকনো মড়াইয়ে ভালো যোগাযোগ ঘটেছিল বলেই ভালো হতে চলেছে। অমনি ভালো যোগাযোগ হলেই নিশ্চিন্দি। কিন্তু না বলে? উল্টো হলে? তখন? তখন সমঝে চলা ছাড়া আর উপায় কি? উল্টো যোগাযোগ কি হচ্ছে না? খুব হচ্ছে। যার সঙ্গে যার মেলার কথা নয় তার সঙ্গে সে মিলছে। যার সঙ্গে যার মেশার কথা নয় তার সঙ্গে সে মিশছে। ওই যেমন ধরুন সাঁওতাল মাঝির ওই আধক্ষ্যাপা ছেলেটা আমাদের কণ্টাক্টর ঘোষবাবুর সঙ্গে এসে ভিড়েছে। ঘোষবাবুর পয়সায় মদ গেলে, তার জিপে করে ঘুরে বেড়ায় আর সকাল সন্ধ্যে গুজগুজ করে। আমি নিন্দে কারু কচ্ছি না, মা-লক্ষ্মী দু'জনে আলাদা আলাদা থাকলে নিন্দেরই বা কি আর ভয়ের বা কি! কিন্তু দু'জনে একসঙ্গে হয়েছে বলেই না মেয়েদের যত দুর্ভাবনা! সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির এখন তাদের বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে হলেই দশবার ভাবতে হবে। ঝড় এলে তার আর সময় অসময় কি, সব সময়ই সমঝে চলতে হয়। অবশ্য
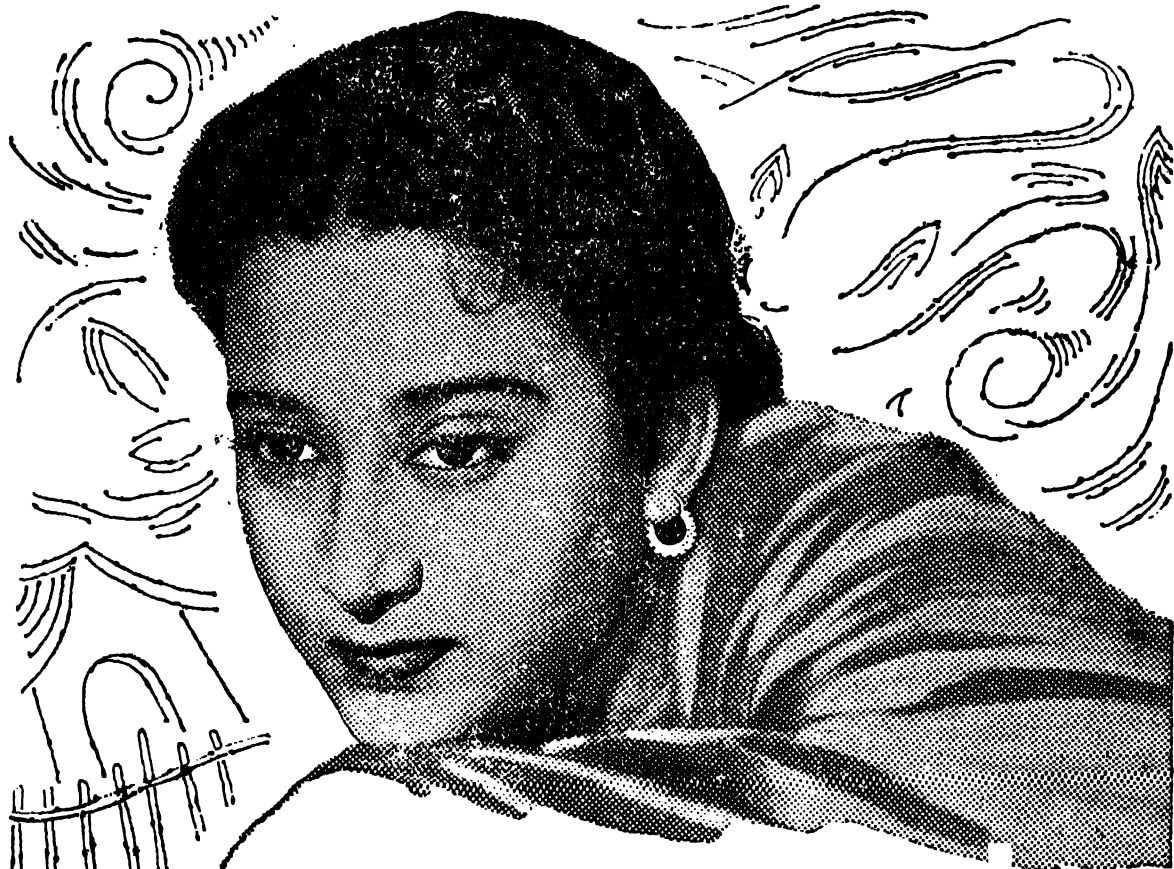
দশ পনের দিনের মধ্যেই ঘোষবাবু চলে যাচ্ছে মড়াই ছেড়ে। কিন্তু দশ পনের দিনই বা কি কম কথা! কখন কার বরাতে অভিশাপ লাগে ঠিক কি। পা বাড়িয়ে অভিশাপ কুড়োনোর থেকে ঘর-বন্দী হয়ে থাকাই ভালো। ভালো নয় মা-লক্ষ্মী? আপনিই বলুন—অভিশাপের ভয় কে না করে, অভিশাপের ভয়ে স্বয়ং অমন লক্ষ্মী ঠাকরুণকেই বলে সমুদ্দুরের গর্ভে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, হুঁ:···!

মস্ত একটা দম নিল ভুতু বাবু। জোরে জোরে হাতপাখা চালালো কিছুক্ষণ। ঘামে জবজবে হয়ে গেছে থলথলে মুখ।

কার অভিশাপে বা কোন অভিশাপের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে বন্দিনী দশা ঘটেছিল লক্ষ্মী ঠাকরুণের, ভুতু বাবু যেমন জানে, সান্ত্বনাও তেমনিই জানে প্রায়। কিন্তু সবটুকু শোনার সঙ্গে সঙ্গে নিস্পন্দ কাঠ একেবারে। কি বলতে চায় বা কি বলতে এসেছে আর অস্পষ্ট নয় একটুও। স্থান কাল ভুলে বিমূঢ় নেত্রে সান্ত্বনা চেয়ে রইল ভুতু বাবুর মুখের দিকে।

ভুতু বাবু হাসতে চেষ্টা করল এতক্ষণে।—যাক, অনেক গল্প করা গেল মা-লক্ষ্মী। মন খুলে দু'টো কথা বলি তার জো আছে, দোকানের ভাবনা ভেবেই অস্থির। তা'বলে গল্প করতে বসলে ভুতুর মনে মুখে আগল নেই, যা ভাববে তাই বলবে। চলি এবার মা-লক্ষ্মী, ওই ভূত ছুটো এতক্ষণে কি দিয়ে কি করছে ঠিক নেই—ভালো করে গেলাস না ধুয়েই হয়তো চা দিয়ে বসছে কাউকে···।

থপ থপ চরণে তর তর করে পাহাড় থেকে নেমে আসছে ভুতু বাবু। এবারের ঘাম ঝরাটা কায়িক পরিশ্রমের দরুণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা মুখে একটা প্রসন্নতার তৃপ্তি।

গোটা হৃৎপিণ্ডটাই হঠাৎ বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেছে সান্ত্বনার। লজ্জা নয়, ঘৃণা নয়। অনুভূতিশূন্যতা। সেটা গেল একসময়। ভুতু বাবুর কথাগুলো তলিয়ে দেখতে লাগল আবার। আরো স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করল। বরাবরই ভয় করতো হোপুনকে। কিন্তু সে ভয়ের মধ্যে আর যাই থাক, অবিশ্বাস ছিল না। দুর্বোধ্যতার বিস্ময় ছিল, সম্ভ্রমের শুচিতা ছিল। ওই কালো মূর্তিতে কালিমার আভাস-মাত্র দেখে নি কখনো। কিন্তু আজ এক মুহূর্তে সব বিশ্বাস, সব সম্ভ্রম এক নগ্ন পঙ্কিলতার স্পর্শে একেবারে বিকৃত হয়ে গেল বুঝি। জিপে রণবীর ঘোষের পাশে হোপুনের সেই নিশ্চল পাষাণ মূর্তি ভেসে উঠল চোখের সামনে। শুধু ভুতু বাবু কেন, সান্ত্বনাও দেখেছে। শিউরে উঠল হঠাৎ। মড়াইয়ের গহ্বরে বা সুন্দরীর অপরাহ্ণ রোমন্থনের পরিবেশে লোকটার সেই বিসদৃশ চাউনি, বিসদৃশ আচরণের মধ্যে আজ যেন বিভীষিকা দেখতে পেল।

কিন্তু সেদিনই আর এক ব্যাপার ঘটে গেল। সান্ত্বনা আরো বিহ্বল, আরো বিভ্রান্ত।

বিকেলে পাগল সর্দার এসে হাজির। চাঁদমণি নিখোঁজ হবার পরে এতদিনের মধ্যে এই প্রথম পদার্পণ। চিন্তা ভাবনা স্থগিত রেখে সান্ত্বনা এগিয়ে এলো। কিন্তু খুশির অভ্যর্থনায় মুখর হয়ে উঠতে পারল না আগের মত।

খানিক তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সর্দারই কুশল প্রশ্ন করল প্রথম, তু ভালো আছিস দিদিয়া?

—ভালো আছি সর্দার। তুমি ভালো তো? এসো ভিতরে এসো।

সর্দার দাওয়ায় এসে বসল। অদূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সান্ত্বনা। দেখছে। আরো শীর্ণ আরো শুকনো দেখাচ্ছে লোকটাকে। বার্ধক্যের সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে। কিন্তু সব থেকে আগে চোখে পড়ে একটা কর্কশ রুক্ষতা। কোটরাগত দুই চোখে খরখরে অসহিষ্ণুতা কেমন। চোখে চোখ রাখাও সহজ নয় খুব।

—উবাসির বাবু ঘরে নাই?

—এখনো ফেরেন নি। তুমি কাজ থেকে এলে?

সর্দার ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ কাজে যায়নি আজ। অন্য দিন বা অন্য সময় হলে সান্ত্বনা এই নিয়ে পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করত বা অনুযোগ করত। কিন্তু ভুতু বাবু ওকে বোবা করে দিয়ে গেছে একেবারে। চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল। মনে হল, পাগল সর্দার এতদিন বাদে হঠাৎ এমনি আসেনি, কিছু যেন বলবে বলবে করছে।

—তু ব'স দিদিয়া, দাঁড়িন থাকলি কেনে।

সান্ত্বনা দেয়াল ঘেঁষে বসল উবু হয়ে। দেয়ালে ঠেস দিল তারপর।

সর্দার আবার বলল, তুর সঙতে দু'টো কথা ছেল।

দু'টো ছেড়ে আস্তে ধীরে অনেক কথাই বলতে লাগল তারপর। অনেকটা নিজের মনে। সান্ত্বনা চুপ চাপ চেয়ে আছে! শুনছে। আর অবাক হচ্ছে। ভুতু বাবুর গোড়ার দিকের বক্তৃতার মত এও প্রায় দার্শনিক গোছের শোনাচ্ছে। তবে অত ঘুরিয়ে বা রেখে ঢেকে বলতে জানে না। যা বলে, মোটামুটি সোজা এবং স্পষ্ট।—কত যুগ বাদে মড়াইয়ে পুণ্যির যুগ এসেছে। সেই পুণ্যিতে শুকনো মড়াইয়ে জল হবে! কিন্তু সেই পুণ্যির সঙ্গে কিছু পাপও এসেছে। 'মুনিষের মূর্তিতে' পাপ এসেছে। পুণ্যিকে 'খুঁতো' করে দেবার মতলব আঁটছে। গোটা 'গেরামে' সে পাপের হল্কা লেগেছে, গোটা মড়াইয়ে সে পাপের 'ছেঁয়া' পড়েছে। কিন্তু ওরা 'ধম্ম' মানে 'শাস্তু' মানে! যত 'ভেৱণ' যত 'পেচণ্ড' হোক সে পাপ, তার 'পিতিবিধেন' হবেই, 'মিত্যু' হবেই। কিন্তু যতক্ষণ না তা হচ্ছে ততক্ষণ হুঁসিয়ার থাকা দরকার। খুব দরকার। নইলে 'অনপ্থ' হতে পারে, 'দুগগতি' হতে পারে। পাগল সর্দার সেই জন্যেই এসেছে, দিদিয়াকে সাবধান করতে এসেছে। হোপুন বলেছে। হোপুন কখনো বাজে কথা বলে না।—'তু আতবিরেতে একা কুথাও যাস না দিদিয়া, দিন দুকুরেও না। ও পাপ বড় সায়না, চি-লোকের দিকে তার লজর।' পাপ 'নেবারণ' হয়ে গেলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, আবার সকলে হেসে খেলে বেড়াবে। পাপের 'আশ্চয়' আর ক'দিন 'ভগমানের কোধে' সে ছাড়খার হবেই হবে।

অনুচ্চ একটানা বলে গেল পাগল সর্দার। ঠাণ্ডা একটা যান্ত্রিক রেশে খানিকক্ষণ যেন আচ্ছন্ন হয়ে রইল সান্ত্বনা। সচকিত হয়ে তাকালো তারপর। হোপুন বলেছে! হোপুন সাবধান করেছে! সান্ত্বনা ঠিক শুনল কি? ঠিক বুঝল কি? সে যে নিজের চোখে দেখেছে তার বিসদৃশ চাউনি, বিসদৃশ আচরণ! নিজের চোখে দেখেছে তাকে জিপে রণবীর ঘোষের পাশে! তাছাড়া ভুতু বাবুও দেখেছে। অনেক কিছুই দেখেছে। পরোক্ষে ওই লোকটার ত্রাসই ভুতু বাবু বিশেষ করে ছড়িয়ে রেখে গেছে সান্ত্বনার মনে।

কিন্তু বলতে গিয়েও বলা হল না কিছু। বিমূঢ় নেত্রে চেয়েই রইল শুধু। কেমন করে যেন উপলব্ধি করে নিল, ওই লোকটার সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহের আঁচে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে পাগল সর্দারের সমস্ত ভিতরটা। শোনামাত্র মরিয়া হয়ে ছুটবে ভুতু বাবুর কাছে, ছুটবে হোপুনের কাছে। হোপুন ছ'দু'বার প্রাণ দিয়েছে ওকে, ওর সহ্য হবে কি করে? মেয়ে হারিয়ে আবো নিবিড় করে পেয়েছে ওকে, কেমন করে হবে সহ্য?

কিন্তু হোপুনই বা সর্দারকে বলতে গেল কেন? সর্দারের মুখ দিয়ে দিদিয়াকে সাবধান করতে গেল কেন?

ছলনা? চাতুরী? ষড়যন্ত্র?

সান্ত্বনা বোবা। পাগল সর্দার উঠলে বাঁচে এখন। নিঃসঙ্গ হতে পারলে বাঁচে। হোপুনের প্রশ্নটা বড় নয় এখানে। বড় যেটা, তার লজ্জা আর ধিক্কার অপরিসীম।

কেন এসেছিল ভুতু বাবু?

ওকে সাবধান করতে।

কেন এসেছে পাগল সর্দার?

ওকে সাবধান করতে।

দু'জনের কেউই ওর কথা বলেনি বিশেষ করে। সাধারণ ভাবে বলেছে। সাধারণ ভয়ের কথাই বলেছে। সে ভয় মড়াইয়ের সব মেয়েরই। কিন্তু এরই মধ্যে বিশেষ ইঙ্গিতটুকু অপ্রচ্ছন্ন নয়। সান্ত্বনা বুঝতে পারে কাকে নিয়ে দুজনেরই ভয় এদের। অন্যথায় ভুতু বাবুর মত মানুষ দোকান ফেলে আসত না। পাগল সর্দারের বুকে আবার এক মেয়ে হারানোর ঝড় উঠত না।

চোখে চোখ পড়তেই নিজের অজ্ঞাতে হঠাৎ দু'চোখ যেন ছল করে উঠল সান্ত্বনার।

সর্দার চলে গেল।

সান্ত্বনা উঠল এক সময়। সমস্ত দেহে বিষাক্ত জ্বালা। অশুচি স্পর্শ। দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়াল চুপচাপ। দেয়ালের ওধারে আকাশ দেখা যাচ্ছে এক ফালি। আকাশ নয়, আকাশ ঢাকা ঘন মেঘ খানিকটা। হঠাৎ মনে হল, চাঁদমণির জীবনেই বীভৎস শকুনীর ছায়া পড়েনি শুধু। সমস্ত মড়াইয়ের ওপর পড়েছে। ওর ওপরেও। ঘন মেঘের তলা থেকে পড়ন্ত সূর্যের লাল আভা যেন ঠিকরে বেরুতে চাইছে খানিকটা জায়গা জুড়ে। দগদগে একটা ঘায়ের মত লাগছে দেখতে।

রাত্রিতে বাবার কাছে সরাসরি প্রস্তাব করল, কালই মাসির বাড়ি যাবে, তাকে রেখে আসতে হবে।

অবনী বাবু অবাক। মুখের দিকে চেয়ে একবারও মনে হল না বোনের বিয়ের আনন্দে যাবার জন্য মন নেচে উঠেছে। বললেন, বেশ তো যাবি'খন, এত তাড়া কিসের, বিয়ের তো এখনো ঢের দেরি।

—না বাবা, যাব ঠিক করেছি কালই যাব, তুমি রেখে এসো আমাকে। কতকাল যাইনে, মাসি কি ভাববে, মাসি কি ভাবছে ঠিক নেই, এর পর দেরি করলে কথা শুনতে হবে। ক'দিন আগে যাওয়াই ভালো।

মেয়ের এ ধরনের সুমতি বিস্ময়ের কারণ। মুখের দিকে চেয়ে বুঝে উঠলেন না ঠিক। কিন্তু এই একবেলার মধ্যে ওর মনে বিশেষ কিছু একটা পরিবর্তন ঘটেছে সুস্পষ্ট। কিছু একটা যাতনা যেন চেপে আছে। তবু জিজ্ঞাসাবাদ করতে ভরসা পেলেন না খুব। ওর যাওয়া নিয়ে তাঁরই বরং একটা দুর্ভাবনা ছিল। ভেবেছিলেন যেতে চাইবে না সহজে! গেলেও থাকতে চাইবে না সহজে। যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে যখন, মতিগতি বদলাবার আগে রাজি হওয়াই ভালো। তবু বললেন, আগে যাওয়া তো ভালই, কিন্তু কালই কি করে হয়, আপিস থেকে ছুটি নিতে হবে তো, পরশু যাস।

—না বাবা না, প্রায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল সান্ত্বনা, যাব তো কালই যাব নইলে যাবই না বলে দিলাম। ভারী তো একদিনের ছুটি, ও তুমি কাল সকালে গিয়ে ব্যবস্থা করে এসো।

ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলো। বাবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শক্ত হচ্ছিল। ভিতর থেকে একটা উদগত কান্না যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সকলের ওপর ক্ষোভ, সকলের ওপর অভিমান। যেতে চায় না তবু যেতে হবে বলে। কারো ওপর ভরসা করে এখানে থাকতে পারছে না বলে।

রাত্রির মধ্যেই গোছগাছ করল সব। নিজের নয়, যিনি থাকবেন এখানে তাঁর। ওর বাবার। বাক্স বিছানা জামা কাপড় মায় কুকার পর্যন্ত। নিজের ব্যবস্থায় অনভ্যস্ত নয় তার বাবা। থেকে থেকে তবু টন টন করে উঠছে সান্ত্বনার ভিতরটা। ভয়ে সব ফেলে ছড়িয়ে এভাবে তাকে এখান থেকে পালাতে হচ্ছে বলে।

পরদিন সকাল থেকেই মনে মনে একটা আশা পোষণ করছিল সান্ত্বনা। বাবার মুখে নরেন বাবু তাদের যাবার কথা শুনবে। শুনে একবার আসবে। সেই যে গেছে আর আসেনি। সাত আট দিন হয়ে গেল। লজ্জার সীমা পরিসীমা ছিল না এ ক'দিন। সেদিনের কথা যখনই মনে হয়েছে, লাল হয়ে উঠেছে। কি করে এর পরে ভদ্রলোককে মুখ দেখাবে ভেবে পায়নি। কিন্তু আজ ভাবছে অন্য কথা। আসুক। পারতে সান্ত্বনা কথাই বলবে না। ওকে যেতে হচ্ছে বলে ক্ষোভ আর অভিমান তার ওপরেই বেশি যেন। কথা বলবে না। কথার জবাব দেবে না। তবু আশা করছে। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ছে আরো এক জনকে। চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলিকে।

ছোকরা চাকরকে দশ বার করে সুন্দরীর সম্বন্ধে আর বাড়ির সম্বন্ধে সব ব্যবস্থা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। একটু এদিক ওদিক হলেই বাবার কাছ থেকে সে খবর পাবে সেকথাও বার বার করে সমঝে দিচ্ছিল। এমন সময় বাবা ফিরলেন।

সঙ্গে আর কেউ না।

এখান থেকে দশ বারো মাইল দূরে ষ্টেশান। সেখান থেকে ট্রেন। ষ্টেশান পর্যন্ত ট্রাকে যাবে। আপিসের ট্রাক নিয়েই এসেছেন অবনী বাবু।

ট্রাক মেন কোয়ার্টারে পড়তেই স্তব্ধতা বিসর্জন দিয়ে উৎসুক নেত্রে চার দিকে তাকালো সান্ত্বনা। নিচে নামছে ট্রাক। মুড়াই দেখা যায়। মড়াইয়ের কর্মস্রোত দেখা যায়। সেদিকে চেয়ে চেয়ে একটা কান্না যেন গুমরে উঠতে লাগল ভিতরে ভিতরে। ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলে ওঠে, ট্রাক থামাতে বলো বাবা, আমি যাব না!

নিশ্চল বসে রইল মূর্তির মত।

ওই ভুতু বাবুর দোকান। দেখা যাচ্ছে··গোলগাল লোকটা-

বসে আছে ক্যাশ বাক্স সামনে নিয়ে। সাগ্রহে সান্ত্বনা আবার তাকালো সেদিকে। ট্রাক থামিয়ে তার সঙ্গে অন্তত দেখা করবে একটি বার। দেখা করে বলবে, ভুতু বাবু, আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে। ভুতু বাবুর টাকার লোভ। ভুতু বাবুর দোকানে সব কিছুর দাম বেশি। কিন্তু সান্ত্বনার মনে হল, ভুতু বাবু ভারী আপন লোক তার। এই মুহূর্তে এত আপন বুঝি আর কেউ নয়। তার মা-লক্ষ্মী ডাকটা আর একবার শুনে গেলে হয় না।

ট্রাক ভুতু বাবুর দোকান ছাড়িয়ে গেল।

সান্ত্বনার মনে হল আর কিছুই থাকল না। নিজের অজ্ঞাতে চোখে জল এসেছে কখন টের পায়নি। বাবার কথায় সচকিত হল। অনেকক্ষণ ধরেই নিঃশব্দে লক্ষ্য করছিলেন তিনি।—কি হল বল দেখি? এভাবে যাত তাড়াতাড়ি কে তোকে আসতে বলেছিল?

সান্ত্বনা বাইরের দিকে ঘরে বসল প্রায়।

—না যাস তো বল, গাড়ি লোরাতে বলি।

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল, না—!

—এইটুকু তো পথ এখান থেকে, ভালো না লাগলে চলে আসতে কতক্ষণ! ক'টা দিন আর, বিয়েটা হয়ে গেলে যখনই লিখবি আমি গিয়ে নিয়ে আসব'খন—মন খারাপের কি আছে।

ভিজে চোখেও সান্ত্বনা বাবার দিকে ফিরে না চেয়ে পারলো না। ঠিক এই মুহূর্তে এই সান্ত্বনাটুকুই মস্ত সম্বল যেন।

সকালে দোকানে এসে ভুতু বাবুর চক্ষুস্থির। ঘরের দরজা হাঁ-করা খোলা। লোক নেই। সমস্ত ঘর জলে জলময়। জলে কাদায় সপসপ করছে মেঝে। জলের ড্রামের মুখ খোলা, ড্রাম প্রায় খালি। ত্রস্ত চোখে চারদিকে চেয়ে দেখে নিল ভুতু বাবু। আসবাব-পত্র তচনচ হয়ে আছে। কিন্তু যায়নি কিছু, সবই আছে। এমন কি খোলা দরজার গায় তালাচাবিও ঠিকঠাক ঝুলছে। কিন্তু ঘরের দুর্দশা দেখে রাগে দুঃখে ভুতু বাবুর চোখে জল আসার উপক্রম। নিশ্চয় ওই দু'জনের একজন মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে এমন যে অন্যজনকে ঘড়া ঘড়া জল ঢালতে হয়েছে মাথায়।

নিজের মনে সমানে গালাগাল দিয়ে চলল ভুতু বাবু। সাতপুরুষ উদ্ধার করতে লাগল দু'জনেরই। আর কক্ষণো ঘর ছাড়বে না, এই শেষ। মিয়াদ শেষ হতে এখনো সাত আটদিন বাকি। এই সাত আটদিনের টাকা সে ফেরত দেবে। ওই মরাচোখো ডাকাতটাকে বলতে পারবে না কিছু। বলা নিরাপদও নয়। কিন্তু রণবীর ঘোষকে বলবেই। বলবে আর টাকা ফেরত দেবে। দু'তিনটে দিন নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পেরেছিল ভুতু বাবু। সান্ত্বনার সঙ্গে দেখা করে আসার পর থেকেই আর চিন্তা ভাবনা ছিল না। গাছতলার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আর দেখেওনি মাতাল দুটো কি করছে না করছে। মনে মনে ভেবেছে, ওরকম মোটা টাকা পেলে পনের দিন ছেড়ে এখন আরো পনের দিনের জন্য ছেড়ে দিতে পারে ঘর। কারণ, আসল উদ্দেশ্যে ওদের ছাই দিয়ে এসেছে।

কিন্তু আবার? মিয়াদ বাড়ানো দূরের কথা, এই বাকি সাতদিনও দেবে না সে থাকতে। এরকম মাতালের পাল্লায় পড়লে সর্বস্বান্ত হতে কতক্ষণ!

ঘর-দোর সংস্কার হল। দৈনন্দিন দোকানপর্ব। সকাল গেল, দুপুর গড়ালো, বিকেল পেরুল। সন্ধ্যা। তারপর রাত্রি। উগ্রতা কমছে ভুতু বাবুর। কড়া কথা বলতে গেলে কি হতে কি হবে কে জানে। বরং বুঝিয়ে সুজিয়ে বলবে রণবীর ঘোষকে। আর যেন দোকান পাট খোলা রেখে দুজনেই চলে না যায় ওরকম। আর, ঘরের দুরবস্থা না করে। তবু যত রাত বাড়ছে তত অস্বস্তি বাড়ছে। ছোকরা চাকর দুটোকে আজ আর আগে ছাড়েনি। বুঝিয়ে বলতে গেলেও অনর্থ বাধবে কি না বিশ্বাস কি!

রাত বাড়ছে। মড়াই নিস্তব্ধ নিঝুম আবার। কিন্তু দুজনের একজনেরও দেখা নেই। না রণবীর ঘোষের, না গোপুনের। কি করবে ভুতু বাবু বুঝে উঠছে না। কখন চৌদ্দ মাইল সাইকেল ঠেঙিয়ে বাড়ি যাবে এরপর। চাকর দুটোকেই বা আর কতক্ষণ ধরে রাখবে। বসে বসে ঝিমুচ্ছে ওরা। ঝিমুনি আসছে ভুতু বাবুরও। সমস্ত দিনের পরিশ্রম আর ক্লান্তি।

হঠাৎ উঠে বসে দু'চোখ রগড়াতে লাগল ভুতু বাবু। বিস্ময়, বিভ্রম। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল চারদিকে। না ঠিকই দেখছে। সকাল হয়েছে। পাখি ডাকছে দূরে মুরগী ডাকছে কোথায়। চাকর দুটো মেঝেতে পড়েই ঘুমুচ্ছে অঘোরে।

কি কাণ্ড! খাটিয়া থেকে নেমে ভুতু বাবু গজগজ করতে লাগল আবার। চাকর দুজনকে ডেকে তুলল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে কেউ না আসার দরুন মনে মনে খুশি হবে কি হবে না ঠিক বুঝে উঠছে না।

সেদিন রাত্রিতেও এলো না কেউ। তার পরদিন শুনল, রণবীর ঘোষ পাততাড়ি গুটিয়েছে মড়াই থেকে। যে কোনদিন চলে যেতে পারে শুনেছিল। তবু যথার্থ গেছে জেনে ভুতু বাবু খুশিতে আটখানা। আর ঘর ছাড়তে হবে না, টাকাও ফেরত দিতে হবে না।

একদিন একদিন করে দেড়মাস কেটে গেল মাসির বাড়িতে।

যত খারাপ লাগবে ভেবেছিল সান্ত্বনা, প্রথম প্রথম তত খারাপ লাগেনি। এক আচমকা ত্রাসের বিভীষিকা থেকে ঢালা নিশ্চিন্ততার মধ্যে এসে দিনকতক বরং হাঁফ ফেলে বেঁচেছিল। তাছাড়া হঠাৎ সে এসে পড়ায় বিয়ে বাড়িও জমে উঠেছিল অনেক আগে থেকেই।

বিয়ে মেয়ের মাসতুতো বোনের মুখ খুলেছে আরো। এখন আর আভাসে ইঙ্গিতে ঠাট্টা নয়। সান্ত্বনাকে একলা পেয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছে, তোমার সেই নরেন বাবুর খবর কি সান্ত্বদি?

আগের মত সান্ত্বনা আর ভেতরে ভেতরে উত্যক্ত হয়নি এতটুকু। বরং হাসিঠাট্টার এদিকটাকে যেন মেনে নিয়েছে খুশি মনে। উল্টে টিপ্পনী কেটেছে, সে খোঁজে তোর দরকার কি, তুই বরং তোর গঙ্গারাম বাবুর খোঁজ খবরটা ভালো করে নেওয়া শেষ কর আগে।

ভাবী জামাইয়ের নাম শুনেছে গঙ্গাপদ।

তারপর বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে বাড়ি শান্ত হয়েছে আবার। মাসতুত বোন শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। দিন কাটছে একটা দুটো করে। এবারে যেন একটু একটু করে হাঁপিয়ে উঠছে সান্ত্বনা।

অবনী বাবু আগেও একদিন এসেছিলেন। বিয়ের দিনও এসেছেন। কিন্তু খুব বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করার অবকাশ তেমন পায়নি সান্ত্বনা। তবু এরই মধ্যে পাঁচবার করে সুন্দরীর খোঁজ

করেছে। বাপের সুবিধে অসুবিধের কথা জিজ্ঞাসা করেছে। পাগল সর্দার, ভুতু বাবু, এমন কি নিধুরামের প্রসঙ্গও তুলেছে। কিন্তু তারপর বোবা।

বাবার চিঠিপত্র পায়। মোটামুটি সংবাদও। কিন্তু তাতে মন ভরে না। মড়াইয়ের পাহাড় ধূসর মেঘের মত দেখা যায় এখান থেকেও। চেয়ে থাকে। মড়াই যেন ডাকছে তাকে। ক্রমাগত ডাকছে।

সুন্দরী কি করছে এখন? ভরা দুপুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঝিমুচ্ছে নিশ্চয়। ছোকরাটার হাতে ওর কি হাল হয়েছে কে জানে? বাবাকে ফাঁকি দিতে আর কি।···পাগল সর্দার কি জানে ও চলে এসেছে? আর ভুতু বাবু? নরেন বাবু জানেই।···কিন্তু কি ভাবছে? আর যদি ফিরে নাই যায় সান্ত্বনা ওখানে, তাহলে? তাহলে কি নিজেও উপলব্ধি করতে পারছে না? কিন্তু সংগোপনে চেষ্টা করছে অনুভব করতে।···আর সেই ভদ্রলোক?···চিফ ইঞ্জিনিয়ার? সে কি টের পেয়েছে ও ওখানে নেই? মড়াইয়ে সেই থেকে আর দেখা যায় নি ওকে, লক্ষ্য করেছে? করে থাকলেও বাবাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না নিশ্চয়ই। ইচ্ছে থাকলেও করবে না—চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দেমাকে বাধবে। ভারী তো···মানুষ খুব চিনেছে সান্ত্বনা।···তবে নরেন বাবুর কাছে জেনে থাকতে পারে বা নিধুর মুখেও শুনতে পারে। সচকিত হয়ে ভাবনার লাগাম থামিয়ে নিজেকেই চোখ রাঙায় এক এক সময়। কি লাভ এসব জেনে? হেসেও ফেলে আবার নিজের মনেই। লাভ-লোকসান আবার কি? জানতে ইচ্ছে করছে তো করছে, বাস—

অবনী বাবু আবার একদিন এলেন মেয়েকে দেখতে। বিয়ে-বাড়ি এখন একদম ফাঁকা। বাবাকে এবার অনেকটাই নিরিবিলিতে পেল সান্ত্বনা।

—সেই ভেজাল সিমেন্টের কি হল বাবা, সব মিটে গেছে?

জবাবে অবনী বাবু জানালেন, গোলযোগের সম্ভাবনা বরং বেড়েছে। কলকাতা থেকে বে-সরকারী কমিটি আসবে ড্যাম দেখতে। তারা ড্যাম দেখবে আর সেই সঙ্গে সিমেন্টের ব্যাপারও ফয়সলা করে যাবে। এই সব কিছুর তলায় তলায় ঘোষ-চাকলাদারের কারসাজি কিছু আছে বলেই অবনী বাবুর ধারণা। অবশ্য কবে পর্যন্ত আসবে কমিটি ঠিক নেই কিছু।

বাবার মুখের ওপর সান্ত্বনার দু' চোখ ঘুরে এলো এক চক্কর।—ওই কণ্ট্রাক্টররা এবারে খুব উঠে-পড়ে লেগেছে বুঝি?

—তা লাগবেই তো, যার যেখানে স্বার্থ। ওদের একজন এখানে আছে আর একজন তো সেই সব কাণ্ড করে কবেই গা ঢাকা দিয়েছে।

সান্ত্বনা অবাক। কাণ্ড করে! কই সে তো কিছুই জানে না! বাবার মুখের ওপর আর একপ্রস্থ বিচরণ করে স্থির হল দু' চোখ। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, দু'জনের কে আছে ওখানে?

—ঘোষের ওই পার্টনার···দ্বিজেন চাকলাদার।

সন্তর্পণে একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস মুক্তি পেয়ে বাঁচল যেন। শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল আবার, আর ওই লোকটা কি করে গেছে বলছিলে···?

একটু থমকে গেলেন অবনী বাবু। বিব্রত মুখে তাকালেন মেয়ের দিকে। খেয়াল হল সান্ত্বনা আগেই মাসির বাড়ি চলে এসেছিল বটে···জানার কথা নয়। দু' চার কথায় সমাচার যা বললেন শুনে কিছুক্ষণের জন্য সান্ত্বনার বাহ্যজ্ঞান লোপ পেল যেন। রণবীর ঘোষ মড়াই ছেড়ে গেছে সেও প্রায় মাস দেড়েক হল, সান্ত্বনা চলে আসার পরেই। ঠিক তার তিন দিন বাদে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের মেয়ে ঝরণা নিখোঁজ হয়েছে। আজ পর্যন্ত তার কোন খবর নেই। মড়াইয়ে এই নিয়ে মন্দ গণ্ডগোল হয়নি। কলকাতায়ও খোঁজখবর করা হয়েছে অনেক। দু'জনের কারোই পাত্তা মেলেনি। এমন কি দ্বিজেন চাকলাদারও রণবীর ঘোষের কোন হদিস দিতে পারেনি। হয়ত বা জেনেও ইচ্ছে করেই দেয়নি।

আত্মস্থ হওয়া মাত্র সান্ত্বনা চলে এলো বাবার সমুখ থেকে। যা শুনল দুঃখের কথা, লজ্জার কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে ওর ভিতরের একটা কালো ত্রাসও যেন অপগত। লোকটা বিদায় হয়েছে। আর হয়ত মড়াইয়ে আসবেও না। ঝরণার জন্য দুঃখ করবে? করা উচিত। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে না ও তার কি করবে? বরং হঠাৎ এক মুক্তির আনন্দ উপছে উঠছে। সেটা গোপন করার জন্যই বাবার কাছ থেকে চলে আসা। দেড় মাস মড়াই ছেড়ে এসেছে। দেড় মাস? দেড় বছর। দেড় যুগ।

পরদিন বাবার সঙ্গে মড়াইয়ে রওনা হল সে। মাসি অবাক, বাবা অবাক। প্রথম বারেও যেমন কেউ ধরে রাখতে পারেনি ওকে, এবারেও কারো নিষেধ বা অনুরোধে কান দিল না।

···মড়াই!

দূর থেকে চোখে পড়ামাত্র উচ্ছল আনন্দে ট্রাকের ধারে ঝুঁকে পড়ল প্রায়। ছেড়ে আসার সময় মনে হয়েছিল ভিতরটা বোবা শূন্যতায় ভরে উঠেছে। আজ তার উল্টো। এত আনন্দ ধরছে না। নির্নিমেষে দেখছে। এই দেড় মাসের পরিবর্তন যাচাই করে নিচ্ছে। এ সৃষ্টি সমারোহে দেড় মাস দেড় পলকের মতই। তার ওপর শুনেছিল, অসময়ে প্রায়ই বৃষ্টি হওয়ার দরুণও কাজ কর্মে ছেদ পড়েছে। তবু যাও হয়েছে তাই উপলব্ধি করার একাগ্রতায় উন্মুখ হয়ে উঠল যেন। পারলে আজই একবার মড়াইয়ে নামে। কিন্তু বাবা তাহলে দেবে'খন। ঘাড় ফিরিয়ে ঈষৎ কৌতুকে বাবাকে একবার দেখে নিল।

আপিস কোয়ার্টারস।

উৎসুক চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সান্ত্বনা। কিন্তু এই ভরা দুপুরে কে আর বাইরে বসে আছে? ওই দূরে কোণের ঘরটা একজনের। আর উঠোনের এদিকে আর একটা আর একজনের। ঘরে বসে কাজ করছে না মড়াইয়ে নেমেছে কে জানে। মনে মনে লজ্জা পেল একটু। ভিতরে ভিতরে ভাবছে কি না, সে যে এসেছে যদি ওই দুজনকে এক্ষুনি জানানো যেত।

ভুতু বাবুর দোকান।

—বাবা, ট্রাক থামাতে বলো একবারটি। এই, থামাও একটু! নিজেই বলে উঠল ড্রাইভারের উদ্দেশে। অবনী বাবু কিছু বলার বা বোঝার আগেই ট্রাক থামল এবং সান্ত্বনা নেমে পড়ল।

—তুমি ট্রাক নিয়ে বাড়ি চলে যাও বাবা, আমি আসচি একটু বাদেই।

অন্তর্ধান। অবনী বাবু দেখলেন, মড়াইয়ে প্রথম আসার আগে যা ছিল, রাতারাতি তার থেকেও যেন মেয়ের বয়েস কমে গেছে অনেক।

মা-লক্ষ্মী!

খালি গায়ে কাঠের ক্যাশ বাক্সের সামনে বসে ঝিমুচ্ছিলেন ভুতু বাবু। সহসা চোখের সামনে তার আবির্ভাবে বিস্ময় আর আনন্দে উদ্ভাসিত। দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল সান্ত্বনা।

—এসো মা-লক্ষ্মী, এসো। জিব কাটল, আসুন মা-লক্ষ্মী আসুন—বসুন—কবে এলেন?

সান্ত্বনা হাল্কা জবাব দিল, এখনো ভালো করে আসিনি, ট্রাক থেকে এখানে নেমে পড়েছি।

উঠে ভুতু বাবু একমাত্র টিনের চেয়ারটা ঝেড়েমুছে বসতে দিল। —ভুতুর ভাগ্য, বসুন মা-লক্ষ্মী ওরে এই ছোঁড়ারা, চা কর না ভালো করে, বেশ করে সাবানজলে গেলাস ধুয়ে নিস আগে।

হুকুম দিয়ে হৃষ্ট বদনে ক্যাশ বাক্সের সামনে সমাসীন হল আবার, আপনি ছিলেন না এতদিন গোটা মড়াই অন্ধকার।

সান্ত্বনা মুখ টিপে হাসছে তেমনি। কোনদিনই খারাপ লাগেনি, আজ তো কথাই নেই।

—বোনের বিয়ে হল?

মাথা নাড়ল।

মাসির বাড়ি এবং বোনের বিয়ের খবরাখবর নিতে লাগল ভুতু বাবু, সংক্ষেপে একটা ফিরিস্তি দিয়ে সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করল, তার পর এখানকার সব খবর বলুন।

পা গুটিয়ে আট সাঁট হয়ে বসল ভুতু বাবু।—খবর খুব ভালো মা-লক্ষ্মী, কিছু গণ্ডগোল নেই আর, খালি জল বিষ্টি একটু বেশি হচ্ছে এই যা। এদিক ওদিক চেয়ে কণ্ঠস্বর একেবারে সমে নামিয়ে আনল হঠাৎ, সেই যে সেই বলেছিলাম মা-লক্ষ্মী মনে আছে? আপদ বিদেয় হয়েছে একেবারে, আর আসতে হচ্ছে না বাছাধনকে··· যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন গা ঢাকা—তিন দিন বাদেই ওদিকে আর এক মেয়েও মড়াই থেকে একেবারে যেন উবে গেল—চ্যাটার্জী সাহেবের সেই মেয়েটা মা-লক্ষ্মী—সাট ছিল আগের থেকেই, বুঝলেন না?

সান্ত্বনা বুঝেছে আগেই। বুঝে চায়ের পেয়ালায় মনোনিবেশ করেছে।

তেমনি নিচু গলায় সোৎসাহে বলে গেলেন ভুতু বাবু, সে এক হৈ-হুলুস্থুলু ব্যাপার মা-লক্ষ্মী, ওই তো শরীর ভদ্র মহিলার, নড়তে চড়তে কষ্ট, তায় আবার সেজেগুজে থাকেন অষ্টপ্রহর—তা কোথায় গেল

সাজপোষাক কোথায় কি—দিনে সাত বার করে ওই দেহ নিয়ে ওপর নিচ করা—যাকে দেখেন তার কাছেই কি কান্না—কি কান্না—আমার মেয়েকে খুঁজে বার করে দাও তোমরা—তা খুঁজতে কি বাকি ছিল কোথাও, কোলকাতায় পর্যন্ত গোরু খোঁজা করা হয়েছে—ভদ্র মহিলার কথা ভাবলে রীতিমত কষ্ট হয় এখন।

মুখের দিকে চেয়ে কষ্টের কোন লক্ষণ দেখল না সান্ত্বনা। মহিলা, অর্থাৎ, ঝর্ণার মায়ের দুঃখ ওর মনেও যে রেখাপাত করল খুব, তাও নয়।

বাড়ি ফিরেই সুন্দরী-দর্শনে গোয়াল ঘরে ঢুকল সর্বাগ্রে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল আগে। অনেক দিনের অদর্শনের পর মা যেমন করে ছেলেকে দেখে। গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। মাথা নেড়ে সিং দুলিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল গোরুটা। সান্ত্বনার মনে হল, আনন্দ করছে আর সেই সঙ্গে অভিমানও জানাচ্ছে।

পরদিন কথায় কথায় বাবার মুখে শুনল, নরেন বাবু নেই এখানে, আপিসের কি কাজে কলকাতায় গেছে পাঁচ সাত দিনের জন্য। ভালো লাগল না। এ ক'দিনে ওর আসাটাই খানিকটা পুরানো হয়ে যাবে।

দুপুরে বাইরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে সান্ত্বনা মড়াইয়ের উদ্দেশে পা চালিয়ে দিল। এরই প্রতীক্ষায় ছিল। দিনটাও ভালো। মেঘলা, ছায়া ছায়া।

কাল লক্ষ্য করেনি। কিন্তু উপর থেকে আজ মড়াইয়ের দিকে চোখ পড়তেই অবাক। পরিবর্তন হয়েছে বই কি। মড়াইয়ের এক দিকের রূপ বদলে গেছে একেবারে। মাটির দেয়ালের ওদিকটা। সেই কোন তলায় পড়েছিল নোংরা দু'চার হাত আবর্জনা-গোলা জল। তাকালেও গা ঘিন ঘিন করত। সেই জল কি করে এরই মধ্যে ওই বিশাল উঁচু মাটির দেয়ালের প্রায় আধাআধি উঠে এসেছে। আর সেখান থেকে পিছনের দিকে যতদূর চোখ যায়, জল আর জল। বর্ষার লাল জল। গাঢ়-গৈরিক। থকথকে অপরিস্রুত, তবু অপরূপ। মেঘলা আকাশ, ধূসর পাহাড়, আর পারিপার্শ্বিক সবুজের সঙ্গে ঠিক যেমনটি মেলে।

চোখে পলক পড়ে না সান্ত্বনার। এতবড় সাময়িক মাটির দেয়াল তোলার অর্থ এখন বুঝছে।

মড়াই। সান্ত্বনা নেমে এলো। আগের মত তর তর করে নয়। জলে জলে পিছল হয়ে আছে। নিচে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাতাস, সেই মুক্তি আর সেই রোমাঞ্চ। গঠন-সমারোহের পরিবর্তন কিছু চোখে পড়ে না বটে, তবু তফাৎ কিছু উপলব্ধি করা যায়। কাজের তাড়া বেড়েছে, নিবিষ্টতা বেড়েছে, আবহাওয়ার একটা অলক্ষ্য তাগিদের ইঙ্গিত। সম্ভবত জলের দরুন। যতক্ষণ আকাশ সদয়, যতটা পারো এগিয়ে যাও। ভুরু কুঁচকে সান্ত্বনা আকাশের দিকে তাকালো একবার।···এখনই এই, ভরা বরষায় কি হবে কে জানে?

এ ছাড়াও তফাৎ কিছু দেখছে। হাজার লোক কর্মরত। ক'জনকে আর বিচ্ছিন্ন করে চেনে। কিন্তু ওর অনুপস্থিতি যেন সকলেই অনুভব করছিল। যেখান দিয়ে পাশ কাটালো সেখানেই মানুষগুলোর চোখে নীরব অভ্যর্থনার আভাস দেখল। খুশিতে আনন্দে ভরে ভরে উঠতে লাগল সান্ত্বনা। ওর যাওয়াও সার্থক, ফিরে আসাও সার্থক।

নিজের হাতে কাজ করে না পাগল সর্দার, কাজের তদারক করে। তাই করছিল। দূর থেকে সান্ত্বনাকে দেখে এগিয়ে আসতে লাগল। সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে পড়ল। কাছে আসতে সর্দারের ঘামে ভেজা কালো মুখ খুশিতে চকচকে হয়ে উঠল। দেখতে লাগল নিরীক্ষণ করে।

সান্ত্বনাও হাসছে। কি দেখছ সর্দার?

—তুকে।···তেমনি জবাব দিল সর্দার, তু চলে যেয়েছিলি কেনে দিদিয়া?

—বাঃ রে, বোনের বিয়ে, যাব না? বলল বটে, কিন্তু ওর খুশিভরা চোখের দিকে চেয়ে বিব্রত বোধ করতে লাগল। স্পষ্ট বলছে যেন, বোনের বিয়ে আর কতদিন ধরে হয় বাপু, তোর ডর লেগেছিল দিদিয়া। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কেমন ছিলে বলো সর্দার—।

·—ভালো ছেলাম। ভালো থাকার ছোটখাট একটা ফিরিস্তি দিল সর্দার। আজকাল আর কাজে কামাই করছে না। তবে জলের জন্য মাঝে মাঝে আপনি কামাই হয়ে যায়। নয়তো রোজ আসে। অনুযোগ করল, যাবার আগে দিদিয়ার ওকে বলে যাওয়া উচিত ছিল। তাহলে তার সুন্দরীর এত কষ্ট হত না। জানার পরে অবশ্য প্রায়ই গিয়ে সে সুন্দরীর দেখা শুনা করে এসেছে, ইত্যাদি—।

সান্ত্বনা বাবার মুখে শুনেছে সে কথা। কৃতজ্ঞ নেত্রে তাকালো তার দিকে। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলল সর্দার, হাল্কা প্রশ্ন করল, উবাসীর বাবু তুর বিয়া কবে দিবে?

দিনে দুপুরে এই পরিবেশে এমন বেখাপ্পা প্রশ্ন শুনলে কার না হাসি পায়। সান্ত্বনা হেসে উঠল খিলখিল করে। বলল, দিলে কি হবে? একেবারে তো চলে যাব এখান থেকে!

সর্দার মাথা নাড়ল, তা বটে। সত্যতাটুকু উপলব্ধি করল যেন। বিষণ্ণ ছায়া নামল মুখে। আর তক্ষুনি ভিতরের দগ্ধ মানুষটাকে যেন দেখতে পেল সান্ত্বনা। রিক্ততা দেখতে পেল। ওকে দেখে যত খুশি হোক, যত ভালো আছে বলুক, এক নিঃসীম বেদনার জরায় মানুষটাকে বরাবরকার মত আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেছে চাঁদমণি। পাগল সর্দার বরাবরকার মতই বুড়িয়ে গেছে।

সর্দারের দোসরটিকেও দূর থেকে লক্ষ্য করেছে সান্ত্বনা। সেদিন নয়, পরদিন। কোদাল দিয়ে পাহাড়ের গা-ঘেঁষা মস্ত একটা পাথরের তলা থেকে মাটি সরাচ্ছে। ওর আশে পাশে আরো অবশ্য কাজ করছে কেউ কেউ। তবু মনে হয়, চার পাশে একটা বিচ্ছিন্নতার গণ্ডি টেনে দিয়ে নির্মম একাগ্রতায় ওই অটল পাথরটার সঙ্গে যুঝতে নেমেছে। চোখে চোখ পড়তে সান্ত্বনা দ্রুত প্রস্থান করল সেখান থেকে। পিছন ফিরে তাকালো না একবারও।··· ভাবছে। ঝরণার নিখোঁজ হওয়ার ষড়যন্ত্রে সত্যিই কি এই লোকটাও জড়িত? বিশ্বাস হয় না যেন। বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু ফিরে তাকাবে আবার, এমন সাহসও নেই।

পা থেমে গেল।

অদূরে ওই প্রেসার-গেট সংলগ্ন ব্লকের দিকে এগোচ্ছে তিন চারটি লোক। একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। ওকে দেখেছে। সকলেই দেখেছে। এখানে এলে দেখা হবেই জানে।···

গত কালই আশা করেছিল। সংগোপন প্রত্যাশায় দু'চোখ সজাগ ছিল আজও।

দলছাড়া হয়ে ভদ্রলোক এদিকেই আসছে। বাকি ক'জন কাজের দিকে এগোচ্ছে। সান্ত্বনা না দেখার ভান করল প্রথম। কিন্তু সেও এক বিড়ম্বনা। দাঁড়িয়ে পায়ে করে আঁচড় কাটতে লাগল আধভেজা পাথুরে বালিতে, আর হাসতে লাগল সোজাসুজি তাকিয়ে। এই বরং সহজ।

কাছে এসে বাদল গাঙ্গুলি হাসিমুখে বলল, পরশু এসেছ শুনলাম ?

খবর রাখে। নিধুর মুখে শুনেছে বোধ হয়। নিধু কাল এসেছিল। খুশির লালিমায় সান্ত্বনা তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল শুধু।

—আজ এখানে আসতে আসতে ভাবছিলাম দেখা হবে, ঠিক ভেবেছিলাম দেখো।

সাধারণ হাল্কা কথা। কিন্তু তাইতেই লাল। এ রকম ভেবেছিল জানলে সান্ত্বনা আসতই না কক্ষনো। সে কথা আর বলে কি করে। চুপ করে থাকাও কাজের কথা নয়। বলল, ভেবেছিলাম এই দেড় মাসে কত কি না জানি হয়ে গেছে, এসে দেখি যেমন কে তেমনি, কিছুই হয়নি।

শাদা কথায়, কি-ই বা এমন কাজের লোক আপনারা !

বাদল গাঙ্গুলি প্রচ্ছন্ন কৌতুকে চুপ চাপ দেখল একটু।···ড্যামের ব্যাপারে ওর এই আগ্রহের কারণ কিছুটা জানে এখন। জলঝরা এক সন্ধ্যায় নরেন আর সে বসেছিল কোয়ার্টারে। সেদিন কেমন মনে পড়েছিল ওর কথা। পর পর অনেক দিন দেখেনি বলেই হয়ত। কথায় কথায় তখন শুনেছিল। আভাসে অনুমানে নরেন যতটুকু জানত।

ছদ্ম গাম্ভীর্যে প্রায় কৈফিয়ৎ দেবার মত করেই জবাব দিল, তুমি ছিলে না এখানে, যার যেমন খুশি ফাঁকি দিয়েছে।

হেসে ফেলল। এ প্রসন্নতা নিজের কাছেই প্রায় বিস্ময়ের কারণ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, সঙ্গী অফিসার ক'জন অনেকটা এগিয়ে গেছে। আর কিছু না বলে ফিরে চলল।

উৎফুল্ল চোখে সেদিকে চেয়ে সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। বাবার দুঃখ শুনেছিল, জল বৃষ্টির ব্যাঘাতে ভদ্রলোকের নাকি মেজাজ বিগড়ে আছে। তার ওপর বে-সরকারী কমিটি আসছে কাজ দেখতে আর সিমেন্টের ফয়সলা করতে, সে উদ্বেগও কম নয়। এই দেড়মাসে বেশ শুকনোই দেখাচ্ছিল ভদ্রলোককে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ওকে দেখে অন্য সকলের মত এরও চোখে মুখে সেই খুশির অভ্যর্থনা উপলব্ধি করেছে সান্ত্বনা।

বাড়ির উদ্দেশে পা চালিয়ে দিল। দেরি হয়ে গেছে। হোক গে।—তৃপ্ত, প্রসন্ন। এই কর্মপরিসরের প্রতি একাত্ম অনুভূতির আস্বাদন একটা। অপরিসীম মমতা। বেশ হত, এই মানুষদের মত সেও যদি কাজে লাগতে পারত কিছু। বেশ হত, পুরুষ মানুষ হলে। এ সময়ে ড্যামের ভালো মন্দ নিয়ে ভাবতে পারত, আলোচনা করতে পারতো চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গেও।

—ধেৎ ! সপ্রগলভ লজ্জায় সমস্ত মুখে যেন আবির লাগল এক প্রস্থ।

···পুরুষ মানুষ হলে কেউ আমলই দিত না ওকে।

দিন দুই গেছে আরো।

কোন কাজে মন বসছিল না সান্ত্বনার। সন্ধ্যা পার হতে চলল। খানিক আগে বাড়ি ফিরেছে আর ঘুরে ফিরে ঝরণার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের কথাটাই ভাবছে।

মেন কোয়ার্টারস্-এর এক পাথরের আড়ালে হাত পা ছড়িয়ে বসেছিলেন মিসেস চ্যাটার্জী। প্রসাধন পারিপাট্য নেই, শিথিল বেশবাস। ভারী মুখে বিষণ্ন কালছে ছাপ। উদাসীন বিষাদে এই দুনিয়ার প্রতিকূলতার কথাই ভাবছিলেন বোধ হয়। একেবারে সামনাসামনি পড়ে হকচকিয়ে গিয়েছিল সান্ত্বনা।

পালিয়ে আসত। কিন্তু মহিলার অপ্রসন্ন দুই চোখ যেন কাচপোকার মত আটকে ফেলল ওকে। মনে হল, ঠাণ্ডা ইশারায় ডাকছেন। পায়ে পায়ে কাছে আসতে আবার খানিক বিশ্লেষণ করে দেখলেন ওকে। পরে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন, এতদিন কোথায় ছিলে ?

বলল। সে যে ছিল না এখানে সেটা এঁরও অগোচর নয় জেনে অবাক।

আর একদফা উগ্র পর্যবেক্ষণ। ঠিক ওকে নয় যেন। ওর ভিতর দিয়ে এই বয়সের সকল মেয়ের ওপর বিরূপ ভ্রূকুটি একটা। কিন্তু কণ্ঠস্বর বদলে গেল হঠাৎ। মুখভাবও। গলা নামিয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যাবার আগে ঝরণার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল একদিনও ?

চট করে জবাব দিয়ে উঠতে পারেনি সান্ত্বনা। শেষ দেখা হয়েছিল ভুতু বাবুর হোটেলে। সান্ত্বনাকে দেখে এবং একটু পরেই রণবীর ঘোষকে দেখে ব্যঙ্গ কৌতুকে ঝলমলিয়ে উঠেছিল যে দিন। তার পর আর জানবে কি করে, সান্ত্বনা নিজেই পালিয়ে এসেছিল।

জবাব শুনে মিসেস চ্যাটার্জী বিস্মিত। তোমাদের বাড়ি গিয়েছিল? কবে? কেন? আমাকে বলেনি···

কান্নার মত শোনালো প্রায়। কিন্তু সামলে নিলেন। দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলার ক্ষোভে দ্বিগুণ বিরক্ত। মুখ ঘুরিয়ে রূঢ় মনযোগে ওপারের আকাশ-ঘেঁষা পাহাড় দেখতে লাগলেন তিনি।

সেই থেকে মনটা ভারী হয়ে আছে সান্ত্বনার। ভদ্রমহিলা যেমনই হোন, মেয়ের ভালো ছাড়া মন্দ তো কখনো চাননি বরং একটু বেশি ভালো চাইতেন বলেই অমন করতেন।

বাইরের ঘরে বাবার সঙ্গে আরো একজনের সাড়া পেয়ে খুশিতে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সান্ত্বনা! কিন্তু যত খুশি ততো লজ্জা। যত আনন্দ ততো সঙ্কোচ। হঠাৎ যেন অভিভূত হয়ে রইল দু'চার মুহূর্ত। দাওয়া ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল তাড়াতাড়ি।

বাবা ডাকলেন, কই রে সান্ত্বনা, নরেন এসেছে!

এসেছে তো জানে। কিন্তু যায় কি করে। সেই থেকে প্রতীক্ষাও করছে মনে মনে। কিন্তু সামনে গিয়ে দাঁড়ানো দায়।

নরেনই সহজ করে দিল ওর আসাটা। অবনী বাবুর সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে জানান দিল, দেড় মাসে মাসির কাছে রান্নাঘরের নতুন কি শিখে এলে হাতে কলমে পরীক্ষা চাই—একটু এদিক ওদিক হলেই গোল্লা!

আগের দিনের একটা সুর কানে লাগছে। এ ঘরে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল সান্ত্বনা। এতদিন পরে সাক্ষাতের আনন্দ থেকেও মানুষটাকে দেখে নেওয়ার কৌতূহল বেশি।

নরেনের দু'চোখ তার মুখের ওপর আটকে রইল দু'চার মুহূর্ত। তারপর হালকা অনুশাসনের সুরে জিজ্ঞাসা করল, যা বললাম কানে গেলো?

সান্ত্বনা জবাব দিল না। দেখছে তেমনি। হাসছেও।

অবনী বাবু মেয়ের দিক টেনে ঠাট্টা করলেন, কানে গেলেই বা করবে কি, এই দেড় মাসের মধ্যে দেড় দিনও কি ও মড়াই ছেড়ে ছিল ভাবো নাকি!

হাসি চেপে ভ্রূভঙ্গি করে বাবার দিকে তাকালো সান্ত্বনা। নরেন সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে দাবী প্রত্যাহার করে নিল যেন। বলল, তা বটে, এতবড় দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায়, গেলেও বা নিশ্চিন্তে থাকে কি করে।

আবারও দৃষ্টি বিনিময়। দেখাটাই শেষ হয়নি যেন সান্ত্বনার। মৃদু হাসি, সকৌতুক নিরীক্ষণ।

অবনী বাবু উঠে এলেন। আপিসের পোষাক বদলে হাতমুখ ধোবেন। নরেন সামনের দিকে ঝুঁকে এলো তৎক্ষণাৎ। গলা নামিয়ে বলল, এতদিন দেখা নেই দেখে ভাবলাম মাসি এবার হাতের মুঠোয় পেয়ে বোনঝিকেও একেবারে ঝুলিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বেন।

হাসি স্পষ্টতর হল। শাদা দাঁতের আভাসও দেখা গেল প্রায়। কিন্তু তবু কথা বলবেই না সান্ত্বনা।

নরেন সোজা হয়ে বসল। চোখে চোখ রাখল আবার। হালছাড়া গলায় বলে উঠল, কি ব্যাপার, চিড়িয়াখানার জীব ঠাওরালে নাকি আমাকে?

নিরীক্ষণের কৌতুকগঞ্জনা শেষ হল এতক্ষণে। সান্ত্বনা জোরেই হেসে উঠল।

[ক্রমশঃ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা নিরোধক ব্যবস্থা

'ফ্লু' বা ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এইটি ছড়িয়ে পড়তে পারে ব্যাপক ভাবে। সেজন্য বিশেষ রকম সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। চিকিৎসাবিদ্ বা চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞরা এই ব্যাধি নিরোধের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অনুসরণে পরামর্শ দিয়ে আসছেন, সেগুলো মোটামুটি এইরূপ:—(১) স্বাস্থ্য-রক্ষার সাধারণ নিয়মগুলো পালন ও কর্মক্ষম থাকা; (২) আলো-হাওয়াযুক্ত গৃহে কাজকর্ম ও শয়ন; (৩) সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি বদ্ধ জায়গার অনুষ্ঠান এবং সভা-সমিতি বর্জন; (৪) গায়ে অতিরিক্ত তাপ বা শৈত্য না লাগান; (৫) ট্রাম, বাস, ট্রেণ প্রভৃতিতে ভ্রমণ কালে অতিরিক্ত ভীড় এড়িয়ে চলা; (৬) লবণ জলে ঘন ঘন নাসিকা ধৌতকরণ; (৭) হাঁচি ও কাশির সময় নাকে ও মুখে রুমাল বা পরিষ্কার কাপড়ের টুক্‌রো ব্যবহার; (৮) অপরের তোয়ালে, গ্লাস বা প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার না করা; (৯) রোগ নিবারক বা প্রতিষেধক টীকা গ্রহণ; (১০) রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের হাসপাতালে প্রেরণ কিংবা গৃহে পৃথক্ স্থানে রাখার ব্যবস্থা; (১১) যথাসম্ভব শীঘ্র চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ এবং (১২) রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি জীবাণুমুক্ত করা এবং বাসনপত্রও নিয়মিত ভাবে শোধিতকরণ।
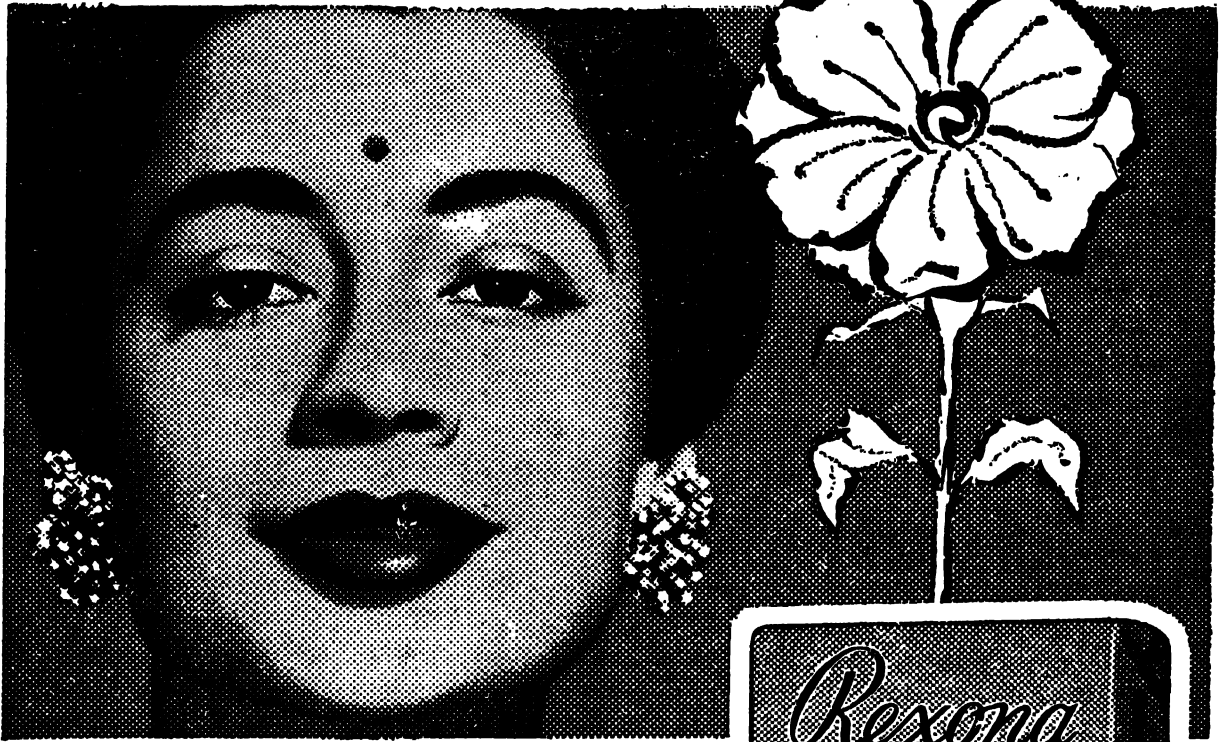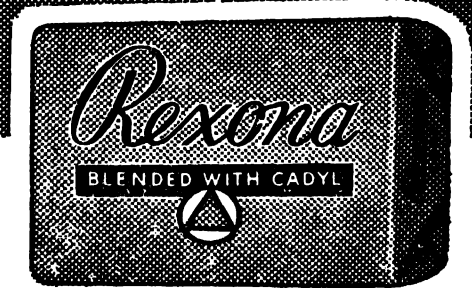
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

বালীগঞ্জের ট্রাম থেকে নেমে কেষ্ট দোতলা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায়। এই বাড়ীতেই সে এসেছিল দিন দশেক আগে ছেলে-চাপা-দেওয়া ফোর্ড গাড়ীর অনুসরণ করে। আজ তার রুক্ষ চুল, কালী-বসা চোখ, ময়লা কাপড় দেখে বাড়ীর কর্ত্তা সন্ত্রস্ত হ'ন, আপনার শালা ভাল আছে ?

কেষ্ট ম্লান হাসে। ভদ্রলোক উত্তর না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করেন, কি হয়েছে বলুন ?

—না, এখনও মারা যায় নি।

—তবে কি—

কথা শেষ করতে না দিয়ে কতকগুলো প্রেসক্রিপসন কেষ্ট পকেট থেকে বার করে দেয়। বলা বাহুল্য, এগুলি গৌরীর ভাইয়ের। ভদ্রলোক হাতে নিয়ে খুলেও দেখেন না, বলেন, এ আর আমি কি দেখব ? আপনি এত দিন আসেন নি কেন ? আমার স্ত্রী রোজই আপনার কথা জিজ্ঞেস করেন।

—মিছিমিছি এসে আর কি হবে, কিছুই তো বোঝা যায়নি। ডাক্তাররা বলছেন 'অপরেশন' করলে হয়ত বাঁচতে পারে। তাই—

—আমরা কি করতে পারি বলুন ?

—অন্ততঃ শ'খানেক টাকা এখুনি চাই।

—বসুন। এনে দিচ্ছি।

ভদ্রলোক ওপরে চলে গেলেন। একটু পরে শুধু টাকা নয়, সঙ্গে চাকরের হাতে সিঙ্গাড়া, মিষ্টির প্লেটে নিয়ে এলেন।—আমার স্ত্রী পাঠিয়ে দিলেন, খেয়ে নিন্।

কেষ্ট হাত জোড় করে বলে, মাফ করবেন, খাবার মত মনের অবস্থা আমার এখন নেই।

ভদ্রলোক জোর করেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, এখনও পর্য্যন্ত কিছু খাননি, যা পারেন—

কেষ্ট কথার উত্তর না দিয়ে একটা সন্দেশ জল দিয়ে গিলে ফেলে।

—কেমন থাকে একটু জানাবেন, বিশেষ চিন্তিত রইলাম।

কেষ্ট সম্মতি জানিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। কেষ্ট কোথাও এতটুকু সময় নষ্ট না করে সোজা টালীগঞ্জে চলে আসে। সমস্ত বস্তীটায় বিষাদের ছায়া পড়েছে। ছেলেটির অবস্থা খারাপ, কেষ্ট তা সকালেই দেখে গিয়েছিল, টাকার দরকার না থাকলে হয়ত সে এখান থেকে বার হ'ত না। ওদিকে গিয়েছিল বলেই যদি দরকার হয় ভেবে শ্যামলকে খবর পাঠায়, তার পর টাকার যোগাড় করে বস্তীতে ফিরেছে। গৌরীর ঘর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসে, ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে ছেলেটি মারা যায়নি, তবে আর বেশীক্ষণ নয়, হাঁপরের মত শ্বাস টানছে। এমনি ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা যমের সঙ্গে বোঝাপড়া চলল, তারপর সব শেষ।

গৌরীর বুকফাটা কান্না, অন্যদের লোকদেখানো চোখের জল, বয়ঃজ্যেষ্ঠদের অহেতুক ব্যস্ততা কেষ্টকে এতটুকু বিচলিত করে না। বস্তীরই একটি যুবককে ডেকে সে একান্তে পরামর্শ করে।

—ছেলেটির সৎকারের কি হবে ?

—জানি না, গৌরীকে জিজ্ঞেস করব ?

—কোন ব্যবস্থা কি হয়েছে ?

—কে করবে, ওদের তো কেউ নেই।

—যদি টাকা দিই, তুমি একটা খাটিয়া কিনে আনবে ?

—দিন্, কাছেই মড়াপোড়ানর খাট পাওয়া যায়, আমি এখনই নিয়ে আসছি।

যুবকটি চলে যায়। কেষ্ট জমিদার-বাড়ীর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়। বিরক্তিকর কান্না তার অসহ্য লাগে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল ছিল না, শ্যামলের ডাকে ফিরে তাকায়। মদনকে নিয়ে সে এসে হাজির হয়েছে। শ্যামল নিজে থেকেই বলে, ঠিকানা খুঁজে পেতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে কেষ্টদা', সেই কখন থেকে ঘুরছি।

—আমিও তাই ভাবছিলাম এতক্ষণ এলি না কেন।

—এই আমার বন্ধু, মদন—

কেষ্ট মদনের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার কথা শ্যামলের কাছে অনেক শুনেছি, আজ দু'জনে এসেছ ভালই হয়েছে।

মদন হেসে বলে, কত দিন থেকে আপনার কাছে আসব ভাবছি—

—জানি। কেষ্ট একটু থেমে বলে, এখন এক বার শ্মশানে যেতে হবে একটি ছেলেকে পোড়াতে।

শ্যামল কৌতূহল প্রকাশ করে, কে কেষ্টদা' ?

—এই বস্তীরই একটা ছেলে, একটু আগে মারা গেছে।

—তোমরা গিয়ে কয়েকটা জিনিষ কিনে আন, আমি বলে দিচ্ছি।

কেষ্ট বস্তীর ভেতর চলে যায়। মদন সেই দিকে তাকিয়ে বলল, কেষ্টদা' এত গম্ভীর লোক না কি ?

—সব রকম এ্যাকটিং ওর জানা আছে।

—কি ব্যাপার বল্ তো ?

—এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না।

দু'জনে ঘুরে ঘুরে এদিক-ওদিক দেখে। কেষ্ট এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নিয়ে ফিরে আসে।

—পণ্ডিত মশাই, আপনি এই ছেলে দু'টিকে একটু বুঝিয়ে দিন কি কি জিনিষ আনতে হবে।

পণ্ডিত মশাই বললেন, আমি বরং এদের সংগেই যাচ্ছি, যে কয়টি জিনিষ না আনলেই নয়, নিয়ে আসব।

—বস্তী থেকে বেরুতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব রকম ব্যবস্থাই কেষ্ট করেছিল, কিন্তু গৌরীর কাছ থেকে

তার ভাইয়ের মৃতদেহ নিয়ে আসতেই যা দেরী হ'ল। গৌরী ছোট মেয়ের মত হাউমাউ করে কাঁদছে, আমার যে আর কেউ রইল না গো, আমি আর একলা কিসের জন্যে বেঁচে থাকব?···কাঁদতে কাঁদতে সে অজ্ঞান হয়ে না পড়লে কেষ্টদের বেরুতে বোধ হয় আরও দেরী হয়ে যেত। সংজ্ঞাহীন গৌরীকে পণ্ডিত মশাইয়ের জিম্মায় রেখে কেষ্টরা খাট নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

কাঁধ দিচ্ছে মাত্র চার জন। সামনে কেষ্ট আর রাজেন, বস্তীর সেই যুবকটি। মদন আর শ্যামল পিছন দিকে। মদন আগে অনেক বার কাঁধ দিয়েছে, থেকে থেকে চেঁচায়, বল হরি, হরিবোল।

খানিক দূর গিয়ে শ্যামল কাঁধ বদলায়, নাঃ, হালকি আছে।

মদন উত্তর দেয়, সেই জন্যেই তো বেছে বেছে খাট নিয়েছি, যাতে না কাঁধে লাগে।

—আমি কিন্তু আগে শ্মশানে যাইনি।

—আমি অনেক বার গিয়েছি। এই তো সেদিন এক বুড়োকে নিমতলায় নিয়ে গেলাম, খুব ধুমধাম হ'ল। খৈ ছড়াচ্ছে, পয়সা ছড়াচ্ছে, ভিখারীদের খুব মজা।

মদন বলে, বাড়ী ফিরতে আজ অনেক রাত হয়ে যাবে।

—কেন? শ্যামল জিজ্ঞেস করে।

—শ্মশানে পৌঁছে খালি চুল্লী পাওয়া, কাঠের যোগাড়, অনেক সময় লাগবে।

কেষ্ট শুধু বললে, শ্মশানে পৌঁছে দিয়ে তোমরা বাড়ী চলে যেও, বাকী সব কাজ আমি করে নেব।

যদিও কেষ্ট বলেছিল শ্যামলদের চলে যেতে কিন্তু মৃতদেহে আগুন না ধরা অবধি তারা শ্মশানে ছিল। পাঁচ-ছটা চুল্লী জ্বলছে অন্ধকারের মধ্যে, সে-ও এক দৃশ্য!

শ্যামল এক সময় চুপি চুপি মদনকে বলে, কৈ আমার তো ভয় করছে না!

—ভয় করবে কেন?

—কি রকম যেন মনে হ'ত, শ্মশানে এলে ভয় করে।

—চল্, এইবার কেটে পড়ি।

শ্যামল এগিয়ে গিয়ে কেষ্টর কাছে এসে দাঁড়ায়, কেষ্টদা', আমরা এবার যাই?

কেষ্ট পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে শ্যামলকে দেয়, তোরা চলে যা, কাল কিম্বা পরশু আমার সংগে অনন্ত কেবিনে দেখা করিস, মদন তুমিও এস।

তারা চলে যায়। কেষ্ট আর রাজেন অনেকক্ষণ বসে থাকে। সব কাজ শেষ করে বস্তীতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। কেষ্ট রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাজেনকে অনুরোধ করে, আমি আর ভেতরে যাব না। দেখে এস তো আর কোন দরকার আছে কি না।

রাজেন চলে গেলে কেষ্ট সামনের চায়ের দোকান থেকে এক ভাঁড় চা কেনে। সারা দিনের অনিয়মের পর গরম চা খেতে গিয়ে কেমন যেন গা ঘুলিয়ে ওঠে। একটু পরেই রাজেন ফিরে এসে খবর দেয়, এখন আর কিছু দরকার নেই, গৌরীর কাছে বস্তীর অন্য মেয়েরা আছে। অনেকক্ষণ কেঁদে এখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

কেষ্ট সেখান থেকে হেঁটে এসে মোড়ের মাথায় বাস ধরে।

সারা রাত কেষ্ট ঘুমুতে পারে না। কি একটা অস্বোয়াস্তি বুক ভার করে রয়েছে। বার বার যে কথা মনে পড়ছে তা হোল গৌরীর নিঃসহায় কান্না। গৌরী একা, এই বিরাট পৃথিবীতে তার আপনার বলতে কেউ নেই। ঠিক এ ধরণের কোন চরিত্রের সংগে কেষ্টর পরিচয় ছিল না। হয়তো গল্পে পড়েছে কিম্বা কারো কাছে শুনেছে, কিন্তু নিজের জীবনে এ অভিজ্ঞতা তার বিচিত্র মনে হয়।

ঘরের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসছিল, ছাদে গিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়।

দূর আকাশে একটা তারা খসে পড়ে। সেই দিকে তাকিয়ে কেষ্টর আরেক কথা মনে হয়। তার নিজের বলতে কে আছে? এ বিরাট পৃথিবীতে সে-ও তো একা, আত্মীয়-স্বজন কারো কথাই আজ তার মনে পড়ে না। এই ছাদের নীচেই শুয়ে আছে দাদা, বৌদি, অথচ কতখানি ব্যবধান! শ্যামাও আজ-কাল ওপরে আসতে পারে না। জানলায়, দরজায় তার নিষেধের পর্দা টাঙ্গানো রয়েছে। এ চিন্তার শেষ কোথায়?

কেষ্টর হঠাৎ মনে হয় গৌরী তার চেয়ে সুখী। তার কেউ নেই বলে সে একা, কিন্তু কেষ্টর সবাই আছে, তবু সে একা। গৌরীর চেয়ে আরও বেশী একা।

কেন জানা নেই, এ চিন্তা তার মনে শান্তি এনে দিল, নিজেকে তার অনেক হাল্কা মনে হয়। ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে, সংগে সংগে গভীর ঘুম তার দেহ-মন আচ্ছন্ন করে ফেলে।

অনন্ত কেবিনে যে আসে আশু বাবু তাকেই জিজ্ঞেস করেন, কেষ্টর কোন খবর জান?

বেশীর ভাগ লোকই বলে, তারা কিছু জানে না। শ্যামল অবশ্য বলেছিল, কেষ্টদা'র সংগে শ্মশানে গিয়েছিলাম।

—কবে?

—এই তো ক'দিন আগে, একটা ছেলেকে পোড়াতে।

প্রভাত দূর থেকে মন্তব্য করে, কেষ্টকে আবার এ রোগে ধরল কেন?

আশু বাবু বলেন, তা কেন, দরকারের সময় ও তো বরাবরই কাঁধ দেয়।

—কি জানি, আমার ও-সব ভাল লাগে না। নিজের বাড়ীর লোককেই পুড়িয়ে অস্থির, তার ওপর পাড়ার লোক?

—সবাই এর মত তো আর সমান নয়?

প্রভাত আর তর্ক করার সময় পায় না। ছায়ামঞ্চের সম্পাদককে দেখে ব্যস্ত হয়ে তার সংগে আলোচনা সুরু করে, সত্যি বলছ পুলিশ গোলমাল করবে?

—তাই তো শুনছি, ও লেখাটা ছাপানো ঠিক হয়নি।

—তুমিই তো জোর করে বললে লিখতে।

—ভাবলাম বেশী বিক্রী হবে। হলও তাই, প্রায় পাঁচ শ' কপি বেশী কেটেছে। কিন্তু আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেলেছে!

—এমন কি অশ্লীল হল?

সম্পাদক ব্যাজার মুখে বলে, শ্লীল-অশ্লীলের কি আর বাঁধা মাপকাটি আছে, যখন যা খেয়াল চাপে—

—আগেও তো একবার নোটীশ পাঠিয়েছিল?

—সে প্রায় দু'বছর আগে। খেসারতও কম দিতে হয়নি, পাঁচশো টাকা।

—তারপর?

—কাগজের নাম পাল্টালাম, এখন আবার ধরেছে। সম্পাদক, প্রকাশক হওয়ার এই বিপদ। তোমাদের আর কি, লিখেই খালাস।

—কি করবে ঠিক করেছ?

—টাকা-কড়ি কিছুই নেই। যদি বলে, হয় জেলে যাও নয় জরিমানা এত টাকা, অগত্যা জেলেই যেতে হবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে প্রভাত জিজ্ঞেস করে, বৌদিকে বলেছেন?

—বলে লাভ নেই, ওর গায়ে যা কিছু গয়না ছিল সবই সেঁকরার দোকানে বাঁধা আছে।

সম্পাদককে খুবই বিমর্ষ দেখায়। আসন্ন বিপদের হাত থেকে বাঁচবার কোন পথই পায় না।

উৎসাহ দিয়ে প্রভাত বলে, ঘাবড়িয়ো না, দেখি আমি কি করতে পারি। শেষ পর্যন্ত কারুর কাছে না পাই, বেলারাণীকে এক বার বলে দেখব। আমাদের কাগজটা ও সত্যি ভালবাসে।

ইতিমধ্যে কেবিনে হৈ-চৈ করার লোকেরা এসে গেছে, সকলেই কেষ্টর সাকরেদ। বিশু চেঁচিয়ে বলে, কেষ্টদা' এই সময় ডুব মারলো? এদিকে রাঘব বোয়ালের কাছে উঠতে বসতে মুখ-খিঁচুনী খাচ্ছি।

ভোঁতন বলে, রাঘব বোয়ালের আর দোষ কি, ওর পয়সায় এত দিন নেচেছ কুঁদেছ, এখন ভোটের যা রেজাল্ট।

—সত্যি, কি হ'ল বল তো? যতদূর খবর বেরিয়েছে সবই অন্যরা জিতছে।

—কেষ্টদা' ওস্তাদ লোক, টাইম মাফিক কেটে পড়েছে।

—কি আশ্চর্য্য! বাড়ীতে গেলে পাওয়া যায় না, ভোরবেলা বেরিয়ে যায় আর অনেক রাতে ফেরে। বিশু মন্তব্য করে, কেষ্টদা'র জন্যে হা-পিত্যেশ করলে তো চলবে না, চল রাঘব বোয়ালকে যা হোক কিছু বলে আসি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলে সায় দেয়, চল, যা আছে বরাতে।

বিদ্যাভবনের কাছে এসে শ্যামল দেখে, ছেলেরা সব বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করছে, ভেতরে ঢুকছে না। মদন সামনের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আরেক জন ছেলের সংগে গল্প করছিল। শ্যামলকে দেখে উল্লসিত হয়ে বলে, তুই এসে পড়েছিস, খুব ভাল হয়েছে। আমি ভাবছিলাম তোরই কাছে যাব।

—ব্যাপার কি, স্কুল হবে না?

—ষ্ট্রাইক!

—কেন?

—কে জানে! সকালে এসেই শুনলাম ক্লাশে যেতে হবে না, ষ্ট্রাইক করতে হবে। ব্যস—

—আজ-কাল বেশ এমনি এমনি ছুটি পাওয়া যায়।

—চল আমরা কেটে পড়ি। এই যে চুণীলাল, এর বাড়ী যাব বলেছি, তুই চুণীলালকে চিনিস না? চুণীলাল মদনের পাশেই দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে তাকিয়ে বলে, স্কুলে দেখেছি।

—ফার্ষ্ট ক্লাশে পড়ে। লেখাপড়ায় বেশ ভাল, প্রত্যেক বছর পাশ করে। আমরা থার্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত একসংগে পড়তাম—কথা বলতে বলতে তারা তিন জনে এগুতে থাকে। চুণীলালের বাড়ী বেশী দূরে নয়, দুটো রাস্তা পেরিয়ে ডান দিকে মোড় নিতে হয়।

বেশ বড় বাড়ী, দুটো ঘর পেরিয়ে চুণীলালের পড়ার জায়গা। চুণীলাল বলে, এইটি আমার রাজত্ব, এখানে পড়ি, শুই, সব কিছু করি।

শ্যামল তারিফ করে, ক'টা ছেলে এমন নিজস্ব ঘর পায়, আমার তো দেখেই লোভ লাগছে। সকলে এক সংগে ছোট খাটটার ওপরই বসে পড়ে। মদন চুণীলালকে বলে, এই শ্যামলের কথাই আমি বলছিলাম। ওর হাতে অনেক সময় আছে, তোমাদের কি কাজের দরকার?

চুণীলাল শ্যামলের দিকে তাকায়, তাহলে তো খুব ভাল হয়। সারা দিন স্কুলে থেকে, তার পর পড়া করতে হয়, তাই বেশী সময় পাই না, যদি তোমার সুবিধে থাকে—

শ্যামল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কিসের সুবিধে?

—দেশের কাজ করার।

—দেশ!

—হ্যাঁ, চোখ বুজে বসে থাকলে তো আমাদের চলবে না, দেশের জন্যে ভাবতে হবে। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে—

শ্যামল থামিয়ে দেয়, কার অত্যাচার?

—সে কি আর এক দিনে বোঝান যায়? আমাদের অফিসে এস, দেবেনদা' সব বুঝিয়ে দেবেন।

—দেবেনদা' কে?

—আমাদের নেতা, এরকম লোক আমি দু'টি দেখিনি। খুব বড় পণ্ডিত, দেশের জন্যে জেলে গেছেন কত।

মদন এতক্ষণে কথা বলে, আমি আর শ্যামল তোমার সংগে এক দিন যাব।

—এক দিন কেন? আজই চল না।

শ্যামল হঠাৎ প্রশ্ন করে, তোমরা কি কাজ কর?

চুণীলাল বিজ্ঞের হাসি হাসে, সে কি এক রকম, হাজারটা কাজ আছে। এই যে ষ্ট্রাইক, সে তো আমাদেরই কাজ।

—তাই না কি?

—কোন স্কুল আজ হবে না। সকাল থেকে আমাদের দল চলে গেছে, তোমাকেও এ-সব কাজ করতে হবে।

—এতে আমি রাজী আছি।

—আমাদের দাবী যদি না মানা হয়, তাহলে এই দলে এমন একদল ছেলে আছে যারা নিমেষে কলকাতার সহর লণ্ডভণ্ড করে সব কিছু বন্ধ করে দিতে পারে।

মদন ও শ্যামল সবিস্ময়ে চুণীলালের কথা শোনে, তার বন্ধুদের আর দলের চমকপ্রদ কীর্ত্তিকলাপ।

ঐ ক'দিন যে কেষ্টকে কেউ খুঁজে পায়নি, বলা বাহুল্য, তার প্রধান কারণ গৌরী। সংসারে অভিজ্ঞ কেষ্ট ভাল করেই বুঝেছিল গৌরীর মন থেকে লজ্জা, ভয়, সংকোচ সরিয়ে দিতে না পারলে তাকে সহজ করে তোলা সম্ভব নয়। সেই জন্যেই রোজ কেষ্ট তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, কথার কৌশলে ফেলে-আসা দিনের কথা জেনে নিয়েছে এবং তারই ফাঁকে এই গোলমেলে দুনিয়ার সংগে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যে নিজের যুক্তিকে গৌরীর মনে বদ্ধমূল করার চে

করেছে। বার বার সে বলেছে, অত কাঁদলে চলে না, নিজেকে না দেখলে কে তোমায় দেখবে ?

গৌরী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, আর যে পারছি না।

—পারতে হবেই।

—আপনি ভাবতে পারছেন না, এই এক বছরের মধ্যে বাবা, মা, ভাই, বাড়ী-ঘর—

কেষ্ট নীচু গলায় বলে, জানি তুমি সব হারিয়েছ, কিন্তু বাঁচতে তো হবে।

গৌরী উদাস চোখে অন্য দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়, আর ইচ্ছে নেই।

—ও কথার কোন মানে হয় না।

—কার জন্যে বাঁচব ?

—নিজের জন্যে।

গৌরী উত্তর খুঁজে পায় না, নীরবে মাথা নাড়ে।

কেষ্ট ধমকে ওঠে, যদি মরতেই চাও তো চটপট মর, গঙ্গায় অনেক জল আছে।

একথা বলেই কেষ্ট চলে এসেছিল! কিন্তু আধ ঘণ্টা বাদে মাথা ঠাণ্ডা হলে সে বুঝতে পারে অন্যায় করেছে। গৌরীর সব আশা ভেঙ্গে গেছে, তার উপর অযথা এতখানি কঠোর হওয়া উচিত হয়নি। ফিরে এসে দেখে, গৌরী সেইখানেই বসে আছে। কেষ্টকে দেখে কাতর কণ্ঠে বলে, আমায় কিছু পয়সা দেবেন, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

কেষ্ট পকেট থেকে একটা টাকা বের করে দেয়।

—আপনি আমার জন্যে এত করলেন, জানি না—

—শোধ দিতে পারবে কি না ভাবছ ? হাতে পয়সা থাকলে যার দরকার তাকে দিই, ফেরৎ পাব বলে নয়।

—শরীরটা খারাপ লাগছে, এখন আমি আসি।

কেষ্ট গৌরীর দিকে তাকিয়ে বোঝে সত্যিই সে অসুস্থ। বলে, এতক্ষণ বাড়ী যাওনি কেন ?

—আপনাকে না বলে কি করে যাব, তা ছাড়া হাতে একটাও পয়সা ছিল না।

—তুমি ভেবেছিলে আমি ফিরে আসব।

গৌরী এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, চলতে চলতে বলে, হ্যাঁ।

—কেন ?

—তা জানি না।

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় কেষ্ট মনুমেণ্টের অদূরে গৌরীর সংগে বসে আলুকাবলী খাচ্ছিল। দিনের আলো নিবে গেছে, দূরে এসপ্ল্যানেড, বিজ্ঞাপনের ঝকমকে আলো, ট্রাম-বাস, কত রকম লোক। সেই দিকে তাকিয়ে থেকে কেষ্ট হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, এত বড় সহরে তোমার থাকার একটা জায়গা হবে না ?

গৌরী খুব আস্তে উত্তর দেয়, এত দিন তো হয়নি।

—তুমি চেষ্টা করনি।

—করেছি।

—কি ?

—ক'লকাতায় পৌঁছে আমি আর আমার ভাই ওই টালীগঞ্জের

বস্তীতে থাকার জায়গা পেলাম সে-ও শুধু পণ্ডিত মশাইয়ের জন্যে। বস্তীর সামনে যে পাকা দালান দেখেছেন, ওটা এক জমিদারের। উনি পণ্ডিত মশাইকে খুব শ্রদ্ধা করেন। ক'লকাতায় এলে পণ্ডিত মশাই ওদের বাড়ী উঠতেন। আমরা যখন নিঃস্ব অবস্থায় এখানে এলাম, উনি দয়া করে নিজের জমিতে এই বস্তীটি করে দেন। আমরা সাত-আট ঘর লোক থাকি সবাই এক গাঁয়ের। আগে ভাড়া নিতেন না, এখন—

কেষ্ট বাধা দিয়ে বলে, আমি তা শুনতে চাই না, তুমি নিজে কি চেষ্টা করেছ?

—তাই তো বলছি। থাকবার জায়গা পেলাম, কিন্তু হাতে এক পয়সাও নেই। ভাইটা এসেই অসুখে পড়ল, কি দুর্ভাবনা! কাজের জন্যে বাড়ী বাড়ী ঘুরেছি, কিছুই পাইনি।

—কেন?

—কে আমায় রাখবে? কি পারি আমি, না শিখেছি লেখাপড়া, না আছে ভারী কাজ করার শক্তি।

—সেলাইএর কাজ জান না?

—জানি। কাউকে করে দিলে খুসী হয়, কিন্তু পয়সা দেয় না।

—ঘরের কাজ?

—কে আমার জামিন হবে? উটকো লোক কেউ রাখতে চায় না।

—কোথাও কাজ পাওনি?

দু-এক জায়গায় পেয়েছি। যারা ভূতের মত খাটিয়ে নেয় আর মাসের শেষে ছুতো খুঁজে তাড়িয়ে দেয়, মাইনে দেয় না। তখন অত টাকার দরকার,—

গৌরী থেমে যায়। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, তার পর?

—ভিক্ষে সুরু করলাম, ভাইয়ের চিকিৎসা তাতে যা হয় হত। এমনই বরাত, হল একেবারে রাজরোগ। কেষ্ট কোন উত্তর দেয় না। গৌরী নিজের মনে বলে, ভিক্ষেই বা আজকাল ক'জন দেয়, আর দেবেই বা কত জনকে। এত ভিকিরি!

—তোমার মত ভিকিরিকে কেউ ভিক্ষে দেয় না—

গৌরী কেষ্টর মুখের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন?

—তুমি তো চোখ তুলে ভিক্ষে চাও না।

—মানে?

—যদি বাবুদের চোখে চোখ রেখে ভিক্ষে চাইতে, তারা দিত।

গৌরী বিস্মিত হয়, আপনি কি বলছেন?

—সত্যি কথা, এক বর্ণ বানিয়ে বলছি না। দয়া করে কেউ ভিক্ষে দেয় না, খুসী হয়ে দেয়।

—আপনি?

—আমার কথা ছেড়ে দাও, এক দিন জানতে পারবে। তবে যা বলছি শুনে রাখ। চোখ তুলে চললে এ সহরে থাকবার তুমি অনেক জায়গা পাবে, বেশ ভাল ভাবে থাকবার। নইলে না খেয়ে মরতে হবে।

গৌরী কি বলতে যায়, কেষ্ট থামিয়ে দিয়ে বলে, আর দেরী কোর না, বাড়ী যাও।

এ প্রসঙ্গের শেষ কিন্তু এখানেই হল না। পরদিনই সকালবেলা কেষ্টর সংগে দেখা হতেই গৌরী ঐ একই কথার অবতারণা করে।

—কাল আপনি যা বললেন আমি এখনও বুঝতে পারিনি।

—এখনও ভোলনি সে কথা? আস্তে আস্তে বুঝে ফেলবে।

—আপনি আমায় কি করতে বলেন?

কেষ্ট তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমি যা বলব তাই করবে?

—তা ছাড়া আর কি করব?

—আমার সংগে দোকানে চল, কয়েকটা জামা-কাপড় কিনে নাও।

—জামা-কাপড়?

—তোমার কাপড়-চোপড় বড় ময়লা, একসংগে ঘুরলে লোকে তাকায়।

—কিন্তু আপনার কাছ থেকে কি করে নেব, বস্তীর লোকেরা কি ভাববে?

—কি আবার ভাববে, সবাইকে বোল কেষ্টদা' দিয়েছে।

গৌরীর চোখ আনন্দে নেচে ওঠে, কেষ্টদা', সত্যি আপনাকে কেষ্টদা' বলে ডাকব?

—নয়ত কি কেষ্টা বলে ডাকবে ভেবেছিলে?

গৌরী লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে, ছি ছি, আপনি যে কি বলেন?

—চল, দোকানে যাওয়া যাক।

রাস্তায় চলতে চলতে রেফিউজিদের ফুটপাথের দোকান থেকে ওরা শাড়ী-ব্লাউজ কেনে। গৌরী প্রথমেই বলে'দিয়েছিল, দু'টি মিলের শাড়ী ছাড়া আর কিছু কিনবে না। কেষ্ট কথার অন্যথা করে নি, গৌরীর পছন্দমত নীল আর হলদে রংয়ের ছাপা শাড়ী কিনে দেয়।

—ব্লাউজ কিনবে না?

—আমার আছে।

—আর কি নেবে?

গৌরী একটু ইতস্ততঃ করে বলে, বরং একটা সায়া—

—নাও না।

দোকান থেকে বেরিয়ে কেষ্ট বলে, বিকেলে নিশ্চয় করে নীল শাড়ী পরে এস।

গৌরী সম্মতি জানিয়ে চলে যায়।

আজ প্রায় চার দিন বাদে দুপুরবেলা কেষ্ট অনন্ত কেবিনে এল। বিশেষ কোন লোক ছিল না, আশু বাবু চেয়ারে বসে ঢুলছিলেন। কেষ্টর গলা শুনে চমকে উঠে, চোখ কচলে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি বল তো? থাকো-থাকো আজ-কাল কোথায় উপে যাও পাত্তা পাওয়া যায় না!

সে কথার উত্তর না দিয়ে কেষ্ট আশু বাবুর কাছে একটা চেয়ারে বসে পড়ে, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, চটপট খাবার দিতে বলুন।

—কি আনবে?

—ডিম ভাজা, রুটি মাখন আর যদি চপ থাকে—পেট ভরে খাব।

আশু বাবু অর্ডার দিতে রান্নাঘরে চলে যান। ফিরে এসে কেষ্টর পিঠ চাপড়ে বলেন, সত্যিই আশ্চর্য্য লাগছে, এরকম হাসিখুসী ভাব তো তোমার অনেক দিন দেখি নি?

—কেন, আমি কি চিরকাল হা-হুতাশ করেই বেড়াব, বলিহারি বুদ্ধি!

—এ বুড়োকে ফাঁকি দিতে পারবে না, কি হয়েছে বল।

—আপনার কি মনে হয়?

আশু বাবু ভেবে নিয়ে বলেন, হয়তো কোথাও পাকা চাকরী পেয়েছো।

—ঠিক ধরেছেন। পাকা চাকরী, তবে মাইনে দেয় না। যাক্ গে, এদিকের খবর বলুন।

আশু বাবু এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলেন, এবার ব্যস্ত হয়ে বলেন, সর্ব্বনাশ হয়েছে, রাঘব বোয়াল কাৎ—

—সে তো জানি, হেরে গেছে। তাতে কি হোল?

—এর পরও জিজ্ঞেস করছ কি হ'ল? ভদ্রলোক রেগে আগুন, ছোঁড়াগুলোকে যা তা বলে গালমন্দ দিয়েছেন।

কেষ্টর মুখ থমথম করে, কি বলেছে?

—বিশেষ করে তোমার উপর রাগ, ওর টাকা নষ্ট করেছ, ওর নাম ডুবিয়েছ তোমরা—

—সে গাধাগুলো কিছু বলতে পারলো না!

—কি বলবে, জান তো তুমি ছাড়া ওরা এক পা চলতে পারে না।

কেষ্ট হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, খাবার রেখে দিতে বলুন, আমি রাঘব বোয়ালের সাথে দেখা করে আসি।

আশু বাবু ব্যস্ত হয়ে পড়েন, এত তাড়া কিসের? না খেয়ে যেও না।

কিন্তু কেষ্ট ততক্ষণে রাস্তায় নেমে পড়েছে, ও কত বড় শয়তান আমি দেখতে চাই।

রাঘব বোয়ালের বাড়ী যাবার পথে কেষ্টর সংগে ভোঁতনদের দেখা হয়ে গেল, তারা অনেকেই রকে বসে আড্ডা মারছিল। ভোঁতন বলে, কেষ্টদা', এত দিন কোথায় ছিলে, আমরা যে গরুখোঁজা করছি।

কেষ্ট সে কথার জবাব দেয় না, গম্ভীর গলায় বলে, আমার সংগে আয়।

—কোথায়?

—রাঘব বোয়ালের বাড়ী।

—ওরে বাপ্‌স্। সেদিন যা অপমান করেছে, আর ও-মুখো হচ্ছি না।

—এত ভয় কেন, আয় আমার সংগে।

ভোঁতন রেগে বলে, তুমিই আমাদের নাচিয়ে দিয়ে কেটে পড়লে, আর যত অপমান সইতে হ'ল—

—তোরা কি মানুষ, বেশ করে শুনিয়ে দিয়ে আসতে পারলি না?

আর কেউ আপত্তি করে না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেষ্টর সংগে যেতে হয়। আজ কিন্তু দারোয়ান গেট ছেড়ে দেয় না, বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করে, কিস্‌কা মাঙতা?

কেষ্ট খিঁচিয়ে ওঠে, কা'কে চাই জান না, রাঘব বোয়ালকে, তোমার বাবু।

দারোয়ান আর বাধা দেবার সাহস পায় না। কেষ্টর মেজাজ দেখে বাবুকে খবর দিতে চলে যায়।

কেষ্টরা এসে বসবার ঘরে জমা হয়। কেউ কারো সংগে কথা বলে না, আসন্ন ঝড়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের মত থমথম করছে। কেষ্টর চোখমুখ কালি, জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে।

রাঘব বোয়ালের চিৎকার শোনা যায়, কাহে ঘুসনে দিয়া।

দারোয়ান ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়, ও লোক বাৎ নেহি শুনা, জবরদস্তি—

তার পরেই সিঁড়িতে পট পট করে চটির আওয়াজ। পর্দ্দা সরিয়ে রাঘব বোয়াল দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢোকেন, কি চাই?

কেষ্ট দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, কৈফিয়ত!

রাঘব বোয়াল হতভম্ব হয়ে যান, কৈফিয়ত কিসের?

—এদের কাছে আপনি কি বলেছেন?

—কেন, ওরা বলেনি?

—আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। বুঝতে পারছি না ওরা বাড়িয়ে বলছে কি না।

রাঘব বোয়ালের আর ধৈর্য্য থাকে না, বলেন, ওরকম চড়া গলায় আমার সামনে কথা বোল না।

—কেন, আমি কি আপনার চাকর?

—শাট্—আপ্।

—ইউ শাট্—আপ্।

সমস্ত ঘর-শুদ্ধ সবাই শিউরে ওঠে। ভোঁতনরা ভয় পায়, তারা জানে রেগে গেলে কেষ্টর মাথার ঠিক থাকে না। তেমনি ভয় পায় রাঘব বোয়ালের বাড়ীর লোকেরা যারা এর মধ্যে এসে জড় হয়েছে ঘরে, বারান্দায়। তারা জানে, মুখের ওপর কথা রাঘব বোয়াল কোন দিন বরদাস্ত করতে পারে না। অসহ্য রাগে রাঘব বোয়ালের কান লাল হয়ে ওঠে, তোমাদের আমি পুলিশে দেব, শয়তান! টাকা চুরি করেছ?

—তাকে থামিয়ে কেষ্ট চিৎকার করে বলে, টাকা চুরি আমরা করিনি। তুমি করেছো, এত বড় বাড়ী, গাড়ী, সব লোক ঠকিয়ে। আমরা চোর হ'লে তুমি ডাকাত।

—কি! রাঘব বোয়ালের মুখ দিয়ে কথা বার হয় না।

তুমি প্রত্যেক দিন লোক ঠকাও, আমরা ঠকাব তোমাকে?

রাঘব বোয়ালের বড় ছেলে কেষ্টর কাছে এগিয়ে আসে, বাজে গোলমাল বাড়ীর ভেতর করবেন না, রোজ এসে যে টাকা নিয়ে গেছেন তার কি করেছেন জবাব দিন।

—ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করেছি। কে জান্‌ত আপনার বাবাকে? চার দিকে তার নাম ছড়িয়ে দিয়েছি, এতগুলো মিটিং ডেকেছি, নিজের চোখেই তো দেখেছেন।

—এত করলেন কিন্তু বাক্সে ভোট পড়ল না কেন?

—দেশের লোক আর গাধা নেই বলে। তারা মানুষ চিনতে শিখেছে। ভোট দিয়েছে এক জন প্রফেসারকে, সে এত বিজ্ঞাপনও দেয়নি, লোক ভোলাবার চেষ্টাও করেনি।

রাঘব বোয়াল আর চুপ থাকতে পারেন না, হাঁক দেন, দারোয়ান, রঘু পাঁড়ে—

—দারোয়ানদের বাবাও আমাদের কিছু করতে পারবে না। তবে কেন হেরেছেন, আসল কারণটা জেনে নিন, আমাদের দোষ নয়, নিজেরই দোষ। এত দিন ধরে যে সব নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করেছেন তারাই চাবুক মারলে এবার আপনাকে।

একথা বলেই কেষ্ট নিজের দলকে ডাক দেয়, চলে এস সবাই।

ভোঁতনরা এতক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সংকেত পেয়ে কেষ্টর সংগে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে। হতবাক রাঘব বোয়াল নিষ্ফল

আক্রোশে চেয়ারে বসে পড়েন। চাকর, দারোয়ানদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ছেলেকে বলেন, ওদের সব কাজে যেতে বল, আর ডাক্তারকে এক বার খবর দে।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে কেষ্ট দেখে গৌরী দাঁড়িয়ে আছে, পরনে তার সকালের কেনা সেই নীল শাড়ী।

—তুমি অনেকক্ষণ এসেছ?

—আধ ঘণ্টার ওপর।

—একটা কাজে আটকে পড়েছিলাম।

—তাতে কি হয়েছে, আমি বেশ এখানে দাঁড়িয়ে কত কি দেখছিলাম।

—নতুন শাড়ী পরে বেশ দেখাচ্ছে!

গৌরী চুপ করে থাকে।

—চল একটু বেড়িয়ে আসি।

কেষ্ট গৌরীকে নিয়ে হাঁটতে সুরু করে। সাহেবী পাড়ায় বড় বড় দোকানের সামনে, যেখানে আলোর মেলা, সেখান দিয়ে হাঁটতে দু'জনেরই ভাল লাগে। কত রকম জিনিস, রং-বেরং-এর মূল্যবান সামগ্রী। এক সময় কেষ্ট বলে, কত দামী দামী জিনিস দেখছ?

—বেশ সুন্দর!

—ঐ শাড়ীগুলোর দাম জান?

—কত?

—একশ' দেড়শ,' দুশ'।

—বা বা! কারা পরে?

—যাদের অনেক টাকা আছে।

গৌরী কেষ্টর দিকে তাকায়।

—তাই ত, অনেক দূর হেঁটে এসেছি। বাড়ীতে রান্না করেছ?

—না, গিয়ে করব।

—চল, বরং কোন দোকানে ঢুকে খেয়ে নেওয়া যাক।

মিষ্টির দোকানে ঢুকে ওরা কেবিনের মধ্যে গিয়ে বসে। গৌরী বলে, বা, কি সুন্দর জায়গা! এতটুকু ঘর, পাখা ঘুরছে, পাথরের টেবিল—

দোকানের ছোঁড়া চাকর এসে জিজ্ঞেস করে, কি আনব বাবু?

কেষ্টর যা মনে এল দু'-চার রকম খাবার বলে দেয়। গৌরীর মন অনেক দিন বাদে বেশ হাল্কা হয়ে যায়। দু'জনে নানা রকম গল্প করে। গৌরী জিজ্ঞেস করে, আপনার বাড়ীর কথা যে বলবেন বলেছিলেন?

কেষ্ট হাসে, হ্যাঁ, আমার একটা বাড়ী আছে—

—বলুন—

—ওই তো বললাম, এখনও ভাগ হয়নি। হ'লে আমার হবে নীচে একখানা ঘর, ওপরে একটা, এক ফালি ছাদ

—তা নয়, বাড়ীতে কে আছেন?

—কেউ নেই।

—সেদিন যে বলছিলেন খ্যামার কথা?

—ও আমার ভাইঝি।

—তবে কেউ নেই বললেন কেন?

—ওকে আর আমার কাছে আসতে দেয় না।

—কে?

—দাদা-বৌদি।

—দাদা-বৌদির কথা তো বলেন নি?

—ওদের ভাল লাগে না।

—কেন?

—বড় টাকা, আনা, পয়সার লোক। মনটা এতটুকু ছোট, কেষ্ট আঙুল দিয়ে পরিমাণ দেখায়। ইতিমধ্যে খাবার এসে পড়ায় এ প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়। দু'জনেরই বেশ খিদে পেয়েছিল, তাই ভাল করে খাবারের সদ্ব্যবহার করে। কচুরী, সিঙ্গাড়া, আরও দু'বার আনিয়ে নিতে হয়।

খাওয়া শেষ হলে দাম চুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

—তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল, জোরে বৃষ্টি নামার আগে ট্রামে করে তোমাকে পৌঁছে দিই।

গৌরী জোরে হাঁটতে থাকে। ট্রামে বেশী ভীড় ছিল না, সামনের দিকে খালি সিটে দু'জনে পাশাপাশি বসে। গৌরী বলে, আজও কিন্তু কাজের কথা হল না।

—সে নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।

—কত দিন আপনি এরকম টাকা দেবেন?

—যত দিন তোমার দরকার।

টালীগঞ্জের কাছে এসে ট্রাম থামে, বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে। দু'জনে নেমে দৌড়ে একটা গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়।

—উঃ, কি বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা!

—তোমার জামা-কাপড় যে একেবারে ভিজে গেছে!

—আপনি বুঝি শুকনো আছেন?

—আমার তো ভয় নেই, ভেজা অভ্যেস আছে। দেখ, তোমার আবার জ্বর না হয়।

—আমরা বাঙালদেশের লোক, জলেই মানুষ। ঐ যে ট্রাম আসছে, আপনি চলে যান।

—বেশ, তুমি তাহলে বাড়ীতে যাও।

কেষ্ট ট্রাম-ষ্টপেজে আসে। সেখানে রাজেনের সংগে দেখা, একেবারে ভিজে গেছেন যে কেষ্ট বাবু!

—হঠাৎ বৃষ্টি এল।

—গৌরী কোথায় গেল?

—বাড়ী গেছে।

প্রথম ট্রামটা এক রকম না থেমেই চলে যায়। অগত্যা কেষ্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজেনের সংগে আলাপ করে। রাজেন জিজ্ঞেস করে, আপনারা তো ভবানীপুরে মিষ্টির দোকানে গিয়েছিলেন, না?

—হ্যাঁ, তুমি ও-পাড়ায় ছিলে বুঝি?

—বাজারের কাছেই ছিলাম, দেখলাম আপনারা ঢুকলেন।

—তুমি এলে না কেন?

—কাজ ছিল। কিন্তু শাড়ী কিনতে আপনি ঠকে গেছেন।

—কেন?

—ও দোকানগুলোতে দামের ঠিক থাকে না। আরও আট আনা, দশ আনা কমে পাওয়া যেত।

দ্বিতীয় ট্রাম এসে পড়ে।

—আজ চলি ভাই, আর এক দিন আসব।

কেষ্ট ট্রামে উঠে পড়ে। [ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জরাসন্ধ

এক জনের সংসার, জিনিষপত্রের বাহুল্য নেই। যেটুকু ছিল, তাও দরাজ ভাবে বিলিয়ে ছড়িয়ে খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল। চোখে পড়বার মত রইল শুধু, একটা বড় আকারের প্যাকিং কেস। তার মধ্যে ভর্ত্তি বই। কিন্তু জিনিষ ছাঁটাই যতই সহজ হোক, মানুষ ছাঁটাই একটু কঠিন হয়ে দাঁড়াল। বনমালীকে দেশে যেতে হবে। কিন্তু মনিবকে একা ছেড়ে দেওয়া তার একেবারেই ইচ্ছা নয়। তাকে রাজী করাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেবতোষের পরিকল্পনা কিছু অদল-বদল করতে হল। নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়বার আগে কিছু দিন তার বিক্রমপুরের গ্রামের বাড়িতে কাটিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিতে হল। অনেক দিন মায়ের সঙ্গে দেখা নেই। কয়েক মাস আগে এখানে এক বার এসেছিলেন সুলোচনা দেবী। বাড়ি ফেলে বেশী দিন থাকা সম্ভব হয়নি। ছেলেকে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লেখেন, কিন্তু যাবার জন্যে কোনো দিন পীড়াপীড়ি করেন নি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'যেদিন ওর ইচ্ছা হবে আপনিই আসবে। ভালো আছে, এইটুকু জানলেই আমার হল।' সে খবরটা অবশ্য নিয়মিত জানিয়ে থাকে দেবতোষ। সংসারে তারও তো ঐ এক মা। শুধু বনমালীকে এড়ানো নয়, ক'টা দিন মায়ের কাছে গিয়ে থাকবার জন্যে তার নিজের গরজও কম ছিল না।

খালবিলের দেশ। ষ্টীমার-ষ্টেশন থেকে পঁচিশ মাইল নৌকা-পথ। সকালে রওনা দিয়ে বাড়ির ঘাটে পৌছতে বেলা প্রায় শেষ। সুলোচনা দেবী একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। উঠোনে ধান শুকোচ্ছিল, পা দিয়ে নেড়ে দিচ্ছিল রাধুর মা। দাদাবাবুকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে খবর দিতেই ধড়মড় করে উঠে পড়লেন। বেরিয়ে এসে বললেন, হ্যা রে, একটা খবর দিতেও পারিস নি? সারা দিন পেটে একদানা ভাত পড়েনি। ছুটো চাল ফুটিয়ে নামাতে যে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

দেবতোষ হাসতে হাসতে বললে, কেন, দুপুরবেলা যা রেঁধেছিলে, দু'জনে মিলে সব বুঝি চেঁছে-মুছে খেয়েছ? পাতে কিছু নেই?

—শোনো, ছেলের কথা! আমি কি জানি, তুই আসবি?

রাধুর মা বলল, বাড়িতে তো ভাত রয়েছে, মা! ডাল-তরকারী যা আছে, দাদাবাবুর হয়ে যাবে।

—সে তো যাবে। কিন্তু সেই ও বেলার শুকনো আলো চালের ভাত খেতে পারবে কেন? তুই যা, ছুটো চাল ধুয়ে আন।

—কিছু দরকার নেই মা, বাধা দিয়ে বলল দেবতোষ, যা আছে, তাই দাও। কত কাল তোমার 'দলা' খাইনি মনে করতে পার?

সুলোচনা হঠাৎ জবাব দিতে পারলেন না। ভাবলেন, কী বলে পাগল ছেলে! তাঁর মনে নেই? এই তো সেদিনের কথা, ইস্কুল থেকে ফিরে মায়ের পাতের ভাত-তরকারী না পেলে ছেলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বসত। শুধু পাতের হলেই চলবে না। মেখে ডেলা পাকিয়ে রাখতে হবে। শুকনো শুকনো করে মাখা সেই 'দলা'ই ছিল দেবতোষের কাছে অমৃত। শেষ কণাটি পর্য্যন্ত খুঁটে খুঁটে খেয়ে ফেলত। অথচ অন্যের হাতের অনেক বেশী উপাদেয় রান্না তার মুখে রুচত না।

খালের ঘাটে স্নান সেরে রান্নাঘরের বারান্দায় কাঁটাল কাঠের পিঁড়ির উপর এসে বসলো দেবতোষ। সেই আগের দিনের মত সুলোচনা ভাত মেখে মেখে তুলে দিলেন তার পাতের উপর। দেবতোষ পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে বললেন, আমি যে আসবো, তুমি নিশ্চয়ই জানতে, মা! যা যা ভালবাসি, সবই তো রেঁধেছ। মোচার ঘন্ট, থোড়ছেঁচকি, কুমড়োর ডগা দিয়ে মটর ডাল, কুলের অম্বল—কোনটাই বাদ পড়েনি।

সুলোচনার চোখ ছুটো ছলছল করে উঠল। নিশ্বাস ফেলে বললেন, আমি কী করে জানবো, বাবা? যিনি সব জানেন, এ তাঁরই কাজ। তিনিই হয়তো আমার হাত দিয়ে এই জিনিষ ক'টা রাঁধিয়ে রেখেছেন তোর জন্যে।

গ্রামের সঙ্গে দেবতোষের আশৈশব নাড়ির যোগ। কিন্তু এবার তার কোথায় যেন একটা বাঁধন শিথিল হয়ে গেছে। দু'দিন যেতে না যেতেই সেটা মা'র চোখেও ধরা পড়ল। দেখলেন, ছেলে তেমনি মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, এ-বাড়ি ও-বাড়ি খোঁজ-খবর নেয়, অসুখে বিসুখে ডাকতে এলে যায়, যা করবার করে। তবু বোঝা যায়, এ সব শুধু অভ্যাসের টান, এ সবের মধ্যে মন কোথাও নীড় বাঁধতে পারছে না, হয়তো আশ্রয় খুঁজে ফিরছে অন্য কোনোখানে।

হ্যাঁ রে, দেবু, বনমালী ভালো আছে তো? একদিন প্রশ্ন করলেন সুলোচনা।

হ্যাঁ, মা, তাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওখানে আর আমাকে ফিরতে হবে না। চার মাসের ছুটি নিয়েছি।

সুলোচনার মুখে হঠাৎ দুশ্চিন্তার ছায়া ফুটে উঠল। কিন্তু

ছেলেকে তা জানতে দিলেন না, অন্য কথা পাড়লেন, মহেশ কি ওখানেই আছে না বদলি হয়ে গেছে?

—ওখানেই আছেন।

—তার ছেলে ছু'টি?

—তারা তো ওখানে থাকে না! কোলকাতায় বোর্ডিং-এ থেকে পড়ে।

—ওখানে আর কার কাছে থাকবে? বলে নিশ্বাস ফেললেন সুলোচনা। আহা! ঐ রকম মানুষ, তার কপাল ছাখ।

সুলোচনা চলে যাচ্ছিলেন। দেবতোষ কী একটা বলতে গিয়ে ইতস্ততঃ করছেন দেখে ফিরে দাঁড়ালেন, কিছু বলবি?

—বলছিলাম, এবার একটু ঘুরে আসি।

—কোথায় যেতে চাস?

—প্রথম কিছু দিন কোলকাতা। তারপর, ভাবছি এক বার দক্ষিণ দিকে বেরোবো। তুমিও চলো না?

সুলোচনা কোনো দিন বাড়ি ছেড়ে নড়তে চান না। দেবতোষ ছু'-চার বার চেষ্টা করেছে তীর্থের নাম করে মাকে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে পড়তে। কিন্তু ওঁর মুখে ঐ এক কথা—'এই শ্বশুরের ভিটেই আমার সব চেয়ে বড় তীর্থ, বাবা! এখানে যদি চোখ বুজতে পারি, আর তোর হাতের একটু আগুন পাই, তাহলে আর কিছুই চাই না,' আজও সেই কথা বলেই দেবতোষের এই ঘুরে আসার প্রস্তাবে তিনি সম্মতি দিতে পারতেন। কিন্তু এই ক'দিন তার মুখের দিকে চেয়ে সহজেই বুঝতে পেরেছেন, তাঁর এই আত্মভোলা ছেলেটির উদার নির্লিপ্ত মনের কোণে এমন কোনো দাগ লেগেছে, যেখানে মায়ের হাতের একটুখানি স্পর্শ তার একান্ত প্রয়োজন। কে জানে, হয়তো সেই জন্যেই সে সকলের আগে মায়ের কাছেই ছুটে এসেছে। সুতরাং ছেলের জন্যে কিছু দিন অন্তত তাঁর শ্বশুরের ভিটার মায়া ত্যাগ করা দরকার।

কর্তাদের আমল থেকে কলকাতায় ওদের একটা এজমালি বাসা রয়ে গেছে। দেবতোষের জ্যাঠতুতো ভাই মহীতোষ সেখানে স্থায়িভাবে বাস করে। দোতলার এক পাশে খান তিনেক ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি নিয়ে একটা অংশ সুলোচনা নিজের জন্যে রেখে দিয়েছেন। আপাততঃ সেইখানে গিয়ে ওঠাই স্থির হল।

এই তো সে দিনের কথা। হেনা মনে মনে স্থির করেছিল, এ জেল তাকে ছাড়তে হবে। সে অনুরোধ জানাবার আগে জেলর সাহেবের কাছে কী বলবে, কতটুকু বলবে, তা-ও সে গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখছিল। কমলার প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিল, নিজের কাছ থেকে পালাতে চাই। তার পর অপ্রত্যাশিত ঘটনার স্রোত এমন জায়গায় তাকে নিয়ে এল, যেখানে আর পালাবার প্রয়োজন রইল না। যাকে উপলক্ষ করে সে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, তিনিই নিজেকে নিঃশব্দে সরিয়ে নিয়ে গেছেন, সমস্ত ভয়-ভাবনা-সমস্যার হাত থেকে তাকে চিরদিনের তরে মুক্তি দিয়ে গেছেন। কিন্তু এই মুক্তিই কি সে চেয়েছিল? শূন্যতা তো মুক্তি নয়? এ যেন 'প্রতিদিন তাকে একটু একটু করে গ্রাস করছে। এক দিন সে বন্ধন থেকে পালাতে চেয়েছিল, আজ এই নিরালম্ব রিক্ততা থেকে পালাতে চায়। আজকার প্রয়োজন যেন আরো বেশী। জেনানা ফাটকের এই ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে প্রতিটি ছোট-বড় পরিচিত বস্তু তাকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, তোমাকে যেতে হবে, এখানে তোমার জায়গা নেই। জেলর সাহেব তাকে স্নেহ করেন। কিন্তু তার অন্তরের এই অর্থহীন ব্যাকুলতা তিনি বুঝতে চাইলেও সে বোঝাবে কেমন করে? এই বিষ বুকে করে কোন্ মুখে, কোন্ লজ্জায় সে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? কী উত্তর দেবে যখন জানতে চাইবেন, কী তোমার কষ্ট? কিসের জন্যে তুমি চলে যেতে চাও?

এমনি যখন তার মনের অবস্থা, তখন এক দিন সকালবেলা সুশীলা এসে জানাল, জেলর সাহেব তোকে ডেকে পাঠিয়েছেন। হেনার হঠাৎ মনে হল, তিনি বোধ হয় অন্তর্যামী। তার মনের ডাক শুনতে পেয়েছেন। সুশীলা বলল, তৈরি থাকিস। চারটার সময়. উনি আফিসে এলেই নিয়ে যাবো।

পথে যেতে যেতে হেনার পা ছু'টো আড়ষ্ট হয়ে আসতে লাগল। বুকের ভিতরে দুরু-দুরু করছে কিসের যেন আশঙ্কা। কেন ডেকেছেন, আপনি কিছু জানেন মাসীমা? শুষ্ক মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করল সুশীলাকে।

সুশীলা হেসে ফেলল, ভয় নেই। ফাঁসি দেবেন না তোকে।

একটা কি ফাইল দেখছিলেন তালুকদার। ওদের সাড়া পেয়ে চোখ তুললেন। সুশীলা সেলাম করে বলল, আমি তাহলে যাই বাবা! খাটনিটা বুঝিয়ে দিয়ে এসে ওকে নিয়ে যাবো। জেলর বাবু মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। ছু'-তিন মিনিট পরে ফাইলটা

বন্ধ করে ফিতা বাঁধতে বাঁধতে বললেন, হ্যাঁ ; তোমাকে ডেকেছিলাম ; একটা কাজ করতে হবে।

হেনা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। তালুকদার বললেন, ভাবছিলাম, মেয়েদের কিছু উলের কাজ শেখালে কেমন হয় ? এই যেমন ধর— মোজা, গেঞ্জি, সোয়েটার, মাফলার এসব যদি বুনতে শেখে, জেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা করে খাবার সংস্থান হতে পারে।

হেনা ঘাড় নেড়ে জানাল, এ বিষয়ে সে একমত।

—শেখাবার ভারটা তোমাকে দিতে চাই।

—আমি পারবো কি ? বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিল হেনা।

—কেন পারবে না ? আমি তো তোমার হাতের কাজ দেখেছি।

হেনা মাথা নত করল। হাতের কাজের প্রমাণটা সুশীলা লুকিয়ে রাখতে চাইলেও জেলর সাহেবের কাছে গোপন নেই, এটুকু জানতে পেরে লজ্জিত হল। তালুকদার বললেন, জেলের সিপাইরা সরকারী খরচায় একটা করে জারসি পেয়ে থাকে। সেগুলো আমাদের কিনতে হয়। ওর কিছুটাও যদি তোমরা বুনে দিতে পার, অনেক পয়সা বাঁচে। ঐ দিয়েই বরং সুরু কর। গোড়ার দিকে একটু-আধটু খারাপ হলেও বিশেষ ক্ষতি নেই।

এ বিষয়ে একটা মোটামুটি আলোচনা হল। জারসি বুনতে কত উল লাগে, কত নম্বর কাঁটা চাই, কাজটা ভালমত শিখতে কতটা সময় লাগবে, মাসে কতগুলো করে তৈরী হবার সম্ভাবনা—এই সব এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপারে এই মেয়েটির জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সেটা প্রকাশ করবার দক্ষতা দেখে তালুকদার বিস্মিত হলেন। এই জাতীয় কাজে না লাগিয়ে ওকে দিয়ে যে শুধু ডাল ভাঙানো হয়েছে, সে কথা ভেবে মনে মনে লজ্জিত হলেন। শেষের দিকে বললেন, তুমি তাহলে তোমার ছাত্রীর দল ঠিক করে ফেল। একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, শিখবার আগ্রহ আছে, অন্ততঃ বছর খানেক থাকবে, এই ধরণের গুটি পাঁচ-ছয় মেয়ে হলেই কাজ সুরু করা চলবে। কী বল ?

হেনা কুণ্ঠিত স্বরে বলল, শেখাবার ভার আমি নিলাম, স্যর ! সাধ্যমত চেষ্টা করবো। কিন্তু লোক ঠিক করবার কাজটা আমাকে নিতে বলবেন না।

এ বিষয়ে ওর আপত্তিটা যে অযৌক্তিক নয়, বুঝতে পারলেন তালুকদার। বললেন, বেশ তাই হবে। ওটা আমি নিজেই এক সময়ে গিয়ে করে দিয়ে আসবো।

দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, সুশীলার আসতে বোধ হয় দেরি হবে। ততক্ষণে তুমি বরং ঐ বারান্দায় গিয়ে একটু বসো। বলে আবার একটা ফাইল টেনে নিলেন।

মিনিট দুই পরে তাকিয়ে দেখলেন, হেনা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখে মনে হল, কী যেন বলবার আছে, অথচ বলতে পারছে না। কিছু বলতে চাও ? কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন তালুকদার। হেনা চঞ্চল হয়ে উঠল। চোখে-মুখে দেখা দিল অস্বস্তির রেখা। দু'-একবার ইতস্ততঃ করে হঠাৎ বেরিয়ে এল, ব্যাকুল কণ্ঠ—আমি যে এখানে আর থাকতে পারছি না।

—কেন ? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন জেলর সাহেব।

—আপনি তো সবই জানেন। যে কারণে, যেমন করে ওঁকে চলে যেতে হল, তার পর আমি এখানে মুখ দেখাই কেমন করে ?

মহেশ বাবুর বিস্ময় কেটে গেল। যে ক'টি কথা শুনলেন, তারই ভিতরকার বেদনাটুকু অনুভব করে নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন জানালার বাইরে। হেনা যেন আপন মনে বলতে লাগল, এত দুঃখ দিলাম। সব বৃথা হল। এত করে যার হাত থেকে বাঁচাতে চাইলাম, সেই দুর্নাম আর অপমানই সার হল। আমারই জন্যে সকলের কাছে মাথা হেঁট করে চলে গেলেন !

—তুমি ভুল করছ হেনা, দৃঢ় গম্ভীর স্বরে বললেন তালুকদার। তাকে কারো কাছেই মাথা হেঁট করতে হয় নি। অপমান বা অমর্যাদা নিয়েও সে যায় নি। নিন্দুকের দুর্নাম তাকে স্পর্শ করে নি। যে যাই বলুক, আমার এই কথাটা তুমি নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পার।

হেনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই দৃঢ় কণ্ঠের মধ্যেই যেন সে খুঁজে পেল এক পরম আশ্বাস। তালুকদার জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখেই মৃদু-কোমল স্বরে বললেন, দুঃখ দেবার কথা বলছিলে। কিন্তু দুঃখ তো তুমি শুধু দাওনি, পেয়েছ তার অনেক বেশী। সে কথা আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি।

হেনার চোখের কোল দুটো হঠাৎ জলে ভরে গেল। কোনো কথাই বলতে পারল না। দু'টি জলধারা যখন গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে এল, তা-ও মুছবার চেষ্টা করল না। সেই অশ্রু-লাঞ্ছিত মুখখানার দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে তালুকদার আবার বললেন, তোমার সব কথা আমি জানি না। হয়তো এমন কিছু আছে তোমার জীবনে, যার জন্যে নিজের হাতে নিজেকে আঘাত দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কী সে কারণ, সে প্রশ্ন তুলবো না। একটা কথা শুধু বলতে চাই। স্বেচ্ছায় যে-পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এলে, সেদিকে আর ফিরে তাকিও না। তাতে শুধু কষ্টই পাবে আর কোনো ফল হবে না।

হেনা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। তালুকদার বললেন, আমার এই কথাগুলো হয়তো সাধু-সন্ন্যাসীর উপদেশ কিংবা পাদরি সাহেবের সার্মনের মত শোনাচ্ছে। তবু এর কোনোটাই মিথ্যা নয়। মেয়েমানুষ বলে জন্মেছ বলে শুধু ঐ সংসারের ডাকেই সাড়া দিতে হবে, আর তা না হলেই জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল, একথা যারা বলেন, তাঁরা মেয়েমানুষকে শুধু মেয়ে বলে দেখেন, মানুষ বলে দেখেন না। ঘরকন্নার বাইরেও যে বিশাল পৃথিবী পড়ে আছে, তার দাবীও কারো চেয়ে ছোট নয়। তার ডাক যদি শুনতে পাও, তাহলে যা পাওনি কিংবা পেয়েও নাওনি, তার জন্য এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না।

হেনার আয়ত উজ্জ্বল চোখের উপর থেকে যেন একটা আবরণ উঠে গেল। তৃপ্ত কণ্ঠে বলল, না, না। আমার আর কোনো ক্ষোভ নেই। কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। বড্ড ছটফট করছিল মনটা। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছিলাম। না, আমি আর কোথাও যেতে চাই না। এখানেই থাকবো। মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াতে পারবো আপনার পায়ের কাছটিতে, তার পর—বলে হঠাৎ থেমে গেল।

তালুকদার মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে বললেন, কী বলছিলে বল।

—বলছিলাম, এই জেলের মেয়াদ তো এক দিন শেষ হবে। সে কথা যখনই মনে পড়েছে, ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠেছে। কোথায় যাবো ? কোথাও গিয়ে দাঁড়াবো, এমন জায়গা তো আমার নেই।

আজ আর সে ভয় নেই। আপনার কাছে এসে মনে হল, জায়গা আছে। একটু আশ্রয়ের ভাবনা আমাকে ভাবতে হবে না।

আপনার অজ্ঞাতসারে চমকে উঠলেন জেলর সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলেন। হেনা লক্ষ্য করল, কিন্তু বুঝতে পারল না। বিস্ময়ে কুণ্ঠায় নির্বাক হয়ে রইল। অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুরে বললেন তালুকদার, তোমার ঐ 'আশ্রয়' কথাটা শুনে অনেক দিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। তোমারই মত আরেক জন —না; সে কথা এখন থাক। হ্যাঁ; তোমার কথা আমি ভেবে দেখছি। সেই প্রথম যেদিন তোমাকে দেখলাম, তুমি এলে আমার কাছে তোমার টিকেট নিয়ে, তখন থেকেই ভেবেছি। সেদিন কী বলেছিলাম, তোমার হয়তো মনে আছে।

—সে কথা একটি দিনের তরেও ভুলিনি, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল হেনা। আপনি বলেছিলেন, তোমার কথা যেমন শুনলাম, আমার একটা কথাও তেমনি তোমাকে শুনতে হবে।

—হ্যাঁ। আজও তার সবটুকু বলবার সময় আসেনি। শুধু জেনে রেখো, এখানকার কাজ শেষ হলেই তোমার ছুটি নেই। তোমাকে আমার দরকার হবে।

হেনা উল্লসিত হয়ে উঠল, আমি তার জন্যে তৈরি হয়ে আছি। কিন্তু···কুণ্ঠিত সুরে বলল, আমি পারবো কি?

—কেন পারবে না? নিজের ওপরে বিশ্বাস হারিও না। তাহলেই পারবে।

—আপনার দয়ায় সে বিশ্বাস হয়তো এক দিন ফিরে পাবো, দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল হেনা, কিন্তু ভয় হয়, যে-কাজ আপনি আমাকে দিতে চাইছেন, তার অধিকার বোধ হয় আমার নেই?

—কেন?

—তাহলে, আমার সব কথা আপনাকে শুনতে হবে।

—কী তোমার সব কথা?

—আমার জীবনের যত কিছু পাপ, যত কিছু অন্যায়, ছেলেবেলা থেকে যে দুঃখ দিয়েছি এবং পেয়েছি, যত বঞ্চনা সয়েছি, সব আমি আপনার পায়ের কাছে নাবিয়ে দেবো। তার পরও যদি মনে করেন, আমি অযোগ্য নই, আপনার দেওয়া কাজের অধিকার আজও হারিয়ে ফেলিনি, আপনার সব আদেশ আমি মাথায় পেতে নেবো।

—বেশ, তাই হবে। এক-রাশ দ্বিধা-সংশয়ের বেড়ি পায়ে বেঁধে কাজে নামা যায় না। মনের মধ্যে খটকা যখন দেখা দিয়েছে, সে জট খুলে ফেলাই ভালো। শুনবো তোমার সব কথা। ওই যে তোমার এসকর্ট এসে গেছে। সুবিধা মত আরেক দিন এসো।

সুশীলা ঘরে ঢুকল একেবারে হন্তদন্ত হয়ে। দীর্ঘ বিলম্বের জন্যে একগাদা কৈফিয়ত সুরু করতেই মাঝপথে বাধা পড়ল। জেলর সাহেব বললেন, চার-পাঁচ দিন পরে বিকেলের দিকে আর এক বার ওকে আনতে হবে। তার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে যেও।

আচ্ছা, হুজুর, সেলাম করে বলল জমাদারণী। কৈফিয়তের হাত থেকে এত শীঘ্র নিষ্কৃতি পাবে, একেবারেই আশা করেনি।

তালুকদার উঠে দাঁড়ালেন। হেনা এগিয়ে এসে গলায় আঁচল দিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল তাঁর পায়ের কাছে। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল সুশীলার সঙ্গে।

দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উনিও বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় বিরাট হাঁক-ডাক করে মহাবল সিং এসে হাজির। সঙ্গে জন দুই সিপাই আর এক দল কয়েদী। একটা জোয়ান লোককে দু-দিক থেকে ধরে টানতে-টানতে নিয়ে আসছে দু'জন মেট। গায়ের জামাটা ছিঁড়ে গেছে। চুল উসকো-খুসকো। চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে আগুন। জেলর সাহেব জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে জমাদারের দিকে চাইতেই সে বুক ঠুকে সেলাম জানিয়ে উচ্চকণ্ঠে অভিযোগ পেশ করল, কাম নেহি করতা হয়। ফিন্ মেটকো ভি গালি দিয়া।

লোকটাও উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল, আমাকে মেরেছে হুজুর! এই দেখুন···বলে পিছন ফিরে দাঁড়াল। পিঠের উপর, বাহুর পাশে চওড়া দাগ। কোথাও কোথাও কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়েছে।

—কে মেরেছে? প্রশ্ন করলেন জেলর।

—ঐ মেট, বলে একটা অগ্নিদৃষ্টি ছুঁড়ে মারল পাশের এক জন মেটের দিকে।

—মেরেছ ওকে? মেটকে জিজ্ঞাসা করলেন তালুকদার।

—কাজ করে না। তাই বলতে গিয়েছিলাম। মা-বোন তুলে গালাগাল দিয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করুন সিপাই বাবুকে।

—তার পর?

মেট নিরুত্তর। জেলর সাহেব প্রশ্ন করলেন, মেরেছ কি না জানতে চাইছি। মেট এক বার জমাদার এক বার সিপাইদের মুখের দিকে চেয়ে বিড়-বিড় করে বলল, একটা থাপ্পড় মেরেছি হুজুর।

সকলের অজ্ঞাতে জেলর সাহেবের ওষ্ঠের কোণে একটি সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল। সেই চিরন্তন "এক থাপ্পড়।" জেলের ডিসিপ্লিন রক্ষার প্রাথমিক ভার যাদের উপর সেই সব সর্দার-কয়েদীর নাম মেট। কেতাবী নামটা বেশ গাল-ভরা কনভিক্ট ওভারসিয়ার। তাদের পোষাকের প্রধান অঙ্গ একটি চামড়ার বেল্ট, তার সঙ্গে লাগানো পিতলের চাপরাশ। কারণে, অকারণে এই বস্তুটি তারা শাসন-দণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।

সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে প্রহারটা অস্বীকার করে না, তাচ্ছিল্য ভরে উত্তর দেয়, মেরেছি এক থাপ্পড়। যদি জানতে চান, দাগ হল কেমন করে, সদুত্তর পাওয়া বড়ই দুষ্কর।

রাউণ্ডে যাওয়া বন্ধ রেখে জেলর আবার তাঁর আসনে গিয়ে বসলেন। মহাবল সিং ঢুকল, তার বাদী, আসামী, সাক্ষী-সাবুদের দল-বল নিয়ে।

[ক্রমশঃ।

ব্যক্তিত্বে রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীঅজয়েন্দুনারায়ণ রায়

৩

রামেন্দ্রসুন্দর প্রস্তাব তুললেন—কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবার বয়স পঞ্চাশ হতে চলেছে, তাঁকে বাঙলার সাহিত্যসেবীদের পক্ষ হতে মানপত্র দেওয়া উচিত। আমি মনে করচি সাহিত্য পরিষৎ এতে অগ্রণী হবেন। এই শুনেই বাঙলার এক শ্রেণীর সাহিত্যিকরা রামেন্দ্র বাবুর উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁরা বললেন—রবীন্দ্রনাথ কী এমন করেচেন বাঙলার সাহিত্যের জন্য, যাতে তাঁকে সম্মান দিতে হবে? শুনেই বললেন রামেন্দ্র বাবু—যুগস্রষ্টাদেরকে এমনি অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। অনেক দিন আগে বুঝেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর—রবীন্দ্রনাথ এক জন হবেন বিশ্বের মধ্যে। সেই জন্য নিতান্ত বন্ধু হলেও বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অবদানের কথা। কারও কথায় কান না দিয়ে সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হতে সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা করালেন। বিরুদ্ধবাদীদেরকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাই লিখলাম—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মশায়কে রামেন্দ্রসুন্দর যে চিঠি দিয়েছিলেন—আপনার পত্র পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। রবীন্দ্র সংবর্দ্ধনার বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, তৎসহিত অভিনন্দন-পত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র রবীন্দ্র বাবুর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁহার বহু বৎসরের সাহিত্যসেবার উপলক্ষ করিয়া দীর্ঘায়ু কামনা করিয়াছে মাত্র। কোনরূপ রাজ্য অভিষেক করেন নাই, কোনরূপ পদবী দাবী করেন নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য লইয়া চিরকাল মতভেদ আছে ও থাকিবে। সে বিষয়ে পরিষদ কোন মত দিয়া ধৃষ্টতা দেখাইবে না, বা দেখান নাই। তবে তিনি বহু বৎসর সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরিমাণও কম নয়; সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কাজেই একটা উপলক্ষ পাইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা পরিষদের অন্যায় অপরাধ হইয়াছে বলা উচিত নহে।...

এই ধারা পত্রে মর্মে মর্মে দেশবাসীকে বোঝাইয়া দিলেন, কবিকে সম্মান দেওয়া অপরাধ হয় নাই। আরও লিখলেন—এই কাজে এমন কিছু টাকাও খরচ হয়নি পরিষদের পক্ষে। যার জন্য দেশের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। সাধারণের টাকা খরচ হইলেও অবশ্য আমাকে তাহার জবাবদিহি করিতে হইত। কিন্তু জানা উচিত, ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ কলিকাতায় আসিলে তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন পরিষদ। পরিষদের স্থাপনকর্ত্তা ৺রমেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতায় আসিলে তাঁহাকেও সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। বিদেশী সাহেব একবার পরিষদে আসিলেও তাঁহারও যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরের বহুযত্নের লাইব্রেরিটি যখন নিলামে চড়িয়া বাঙালীর দুই গালে চুণ-কালি মাখাইবার উপক্রম হইয়াছিল তখন পরিষদ মধ্যে পড়িয়া ওই লাইব্রেরিটি রক্ষা করিয়াছে। অতএব রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান দেখাইয়া পরিষদ কিছু অন্যায় করে নাই।

এই ভাবে অনেক চিঠি লিখে রামেন্দ্র বাবুকে বহু কশাঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। তবু তিনি বিশ্বকবিকে উপেক্ষা করতে পারেন নাই। বুঝেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ এক কালে বিশ্ববাসীর মধ্যে এক জন সেরা মানুষ হবেন। হলেনও তাই। পেলেন নোবেল প্রাইজ। তখন বিশ্বকবিকে দেশের লোক সম্মান দিতে গেলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, বলেছিলেন—আমি যদি আজ বিদেশ হতে নোবেল প্রাইজ না পেতাম, তাহলে ত আপনারা চিনতেই পারতেন না।

হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রামেন্দ্র বাবুর সহপাঠী। তাঁর বাড়ী ছিল বহুবাজারে। তিনি জ্যোতিষী বিদ্যায় একজন পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। অনেক টাকা খরচ করে বহু বই আনিয়াছিলেন কাশ্মীর দ্রাবিড় ইত্যাদি দেশ হতে। তাঁর বিদ্যার পরিচয় পেয়ে অনেক জজ, উকিল, মোক্তার, সাবজজ, ডাক্তার এসে বাড়ী ভর্ত্তি করে রাখতেন। গাড়ী, ঘোড়া, মটর দাঁড়িয়েই থাকতো।

সেই হরিমোহন বাবু প্রায়ই আসতেন রামেন্দ্র বাবুর বাসায় আলোচনা করতে। নানা আলোচনার পর রামেন্দ্র বাবু শুধু হাসতেন তাঁর কথা শুনে। নানারূপ জিজ্ঞাসা করলে শুধু বলতেন, আমি অনেক পড়ে এ শাস্ত্রকে বিশ্বাস করতে পারিনি। হয় তো এক দিন ঠিকই ছিল। মনে হয় মুসলমান যুগে লুপ্ত হয়ে গেছে সম্পূর্ণ শাস্ত্র। তুমি ভাল ভাবে আরও পড়ো, তখন বুঝতে পারবে। তুমি ত শুধু ব্যবসাদার নও যে পয়সা পেলে খুশী থাকবে? এই ভাবে কথা হতো বন্ধুর সাথে। ন'-দশ বছর পর এক দিন হরিমোহন বাবু এসে বললেন রামেন্দ্র বাবুকে, এতো দিন পরিশ্রম করে রামেন্দ্র, বুঝলাম তোমার কথাই ঠিক। কতক মিললেও বুঝলাম সম্পূর্ণ নয় শাস্ত্র।

তখন আরম্ভ করলেন রামেন্দ্র বাবু—তোমার আক্ষেপ করবার নাই। এটা ত একটা শাস্ত্র বটে। এক দিন এক জন মহাপুরুষ এসে নিশ্চয়ই একে সম্পূর্ণ করবেন। আমি ভেবেছিলাম, তুমিই বা সেই মহাপুরুষ। যে ভাবে আরম্ভ করেছিলে।

তখন হরিমোহন বাবু হেসে অস্থির। আমি কী ঋষি-মুনি? আমার এমন বিদ্যা নাই একটা শাস্ত্র উদ্ধার করি। তুমিই পারো রামেন্দ্র, যদি ইচ্ছা করো। রামেন্দ্র বাবু শুনে কেবল হাসতে লাগলেন।

রামেন্দ্র বাবু পুজোর ছুটিতে আর গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসতেনই। তখন যেন একটা শিক্ষিত লোকের মেলা বসে যেতো জেমো নূতন বাড়ীতে। ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, মাষ্টার, পণ্ডিতে বোঝাই থাকতো নূতন বাড়ী। কান্দীর ইস্কুলের মাষ্টার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় সে সময় উপস্থিত থাকতেন। তাঁকে রামেন্দ্র বাবু বললেন—তুমি লেখো ত দেবিন, আমি বলে যাই। তিনি লিখচেন এমন সময় রাম বাবু বললেন ছি দেবিন! ঘটিকা বানানে দীর্ঘ ঈকার দিলে। সেই একটা দিনের একটা কথা হতে শিক্ষা করে নিলেন দেবিন বাবু। সেই হতে গিলে খেতে লাগলেন বানান। এখনও তিনি বেঁচে আছেন। ওই অঞ্চলের মধ্যে এক জন বড় পণ্ডিত, বাংলা ভাষায়।

ইংরাজি মতে শিক্ষা দেখে রামেন্দ্র বাবু ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, কী শিক্ষা হয় আমাদের বুঝি না। একটা কী দুটো পাশ করে এলে ছেলে, তাকে তার মা কি বাবা জিজ্ঞাসা করলে—হা রে! পঁচিশ টাকা সোনার ভরি হলে আড়াই আনার সোনায় গহনা করে এলাম, কী দেবো বাবা বল? তখন শুনতে পাবো—ও সব আমাদের পড়া হয় না। কাউকে যদি জিজ্ঞেস করি আমার বাড়ীটা মেপে দে ত বাবা, সে বলবে আপনি অন্যের কাছে যান। হা রে, দুটো পাশ করে এলে কী শিখে এলি বল ত? নিরুত্তর।

আমার জানা ছিল, কেউ তখনকার দিনে ছাত্রবৃত্তি পাশ করে এ ধারা কথা বলতো না। সে সমাজের সব কাজ করবার মত শিক্ষা নিয়ে আসতো। এখন অর্থশ্রাদ্ধ ক'রে এসে এ কী শিক্ষা! এ সবের মূল হচ্ছে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করতেই সব মেধা বুদ্ধি শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কাজের কিছু হচ্ছে না।

তৎকালীন লাট সাহেব লর্ড রোনাল্ডসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি বিতরণের সময়ে স্পষ্ট বলেছিলেন—রামেন্দ্রসুন্দর প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রণালীর একটা সুন্দর চিত্র এঁকেছেন। সেই চিত্র দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন। সকলেরই সেই ভাব অবলম্বন করে চলা উচিত। শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্ম ও নিত্য কাজের মত বিদ্যা না থাকিলে সে শিক্ষা শিক্ষাই না।

জেমো কান্দীর বড় বাবু রামেন্দ্রসুন্দর এতো দিন কলকাতায় থেকে এলেন, একটু যদি কলকাতার টান থাকে কথায়! বেশভূষায় সেই পাড়াগাঁয়ের ভাব। কলকাতার বন্ধু-বান্ধব তাঁর বলতেন—হা রে রাম! এখনও তোর রাঢ়ের ভাষা ভাব গেল না! দুঃখিত হয়ে বলতেন—তা হলে ত আমার মৃত্যু সেই দিন। আমি ময়ূরপুচ্ছধারী হবো বলতে চাও? যখন ডাক দিয়েচেন দেশের বড় বাবু তখন শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই হাজির। তখন ইংরাজি উনিশ শ' পাঁচ কী ছয় সাল। দেখতে পেলে দেশের লোক আমাদের বড় বাবু শুধু পণ্ডিতই নন, তিনি আমাদের একজন স্বদেশী দেশহিতৈষীও। তিনি সকলকে ডেকে বললেন—তোমরা বিদেশী কাপড় আর পরবে না। বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করবে না। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করে বল আমাদের স্বদেশী জিনিষ যত খারাপই হোক, তাই আমরা ব্যবহার করবো।

এমন করেও ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে না বুঝে রামেন্দ্র বাবু তাঁর ছোট কন্যাকে দিয়ে পাড়া প্রতিবেশী সকল মেয়ে-ছেলেকে নিমন্ত্রণ করে আনলেন নিজের বাড়ীতে। তাঁরা সকলে এলে পাঠ করালেন—রামেন্দ্র বাবুর লেখা বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা। মুগ্ধ হয়ে শুনলেন সকল ছেলে-মেয়েতে। একটা উদ্দীপনা দেখা গেল সারা গ্রামে।

তখন সমস্ত গ্রামের অধিবাসীকে নিয়ে গেলেন কালী মাতার অঙ্গনে। সহস্র সহস্র গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলো—আজ থেকে আমরা বিলাতি কাপড় পরবো না। বিলাতি জিনিষ কিনবো না, আজ থেকে হিন্দু-মুসলমান আমরা ভাই ভাই। এক হয়ে মিলে মিশে থাকবো আমরা। আজও মনে পড়ে তিরিশে আশ্বিন কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজো নিয়ে ঐ দিন বাঙলার লক্ষ্মী বাংলা ছেড়েছিলেন। ঐ দিন আবার বাংলায় অচলা অর্চিতা হ'লেন। বাংলার হাট-মাঠ জুড়ে বসলেন।

রামেন্দ্র বাবুর কী যে আনন্দ বলার নয়। বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা যেন রামেন্দ্র বাবুর নিজের মনের কথা। সাধে জানকী বাবু ব'লেছিলেন—রামেন্দ্র বাবু ভারতকে ভালবাসতেন কতকটা ভারত ভারত বলিয়াই, কিন্তু আরও ভালবাসতেন ভারত তাঁহার নিজের বলিয়াই। ভারতের যা কিছু—তাহার আকাশ মৃত্তিকা তাহার উদাস প্রান্তর, তাহার হিমালয়, তাহার ভাগীরথী, তাহার কথা, তাহার কবি ও দার্শনিক সবেতেই গৌরব অনুভব ক'রতেন। তাঁর ভারত বাল্মীকি বুদ্ধির ভারত। যে কালের প্রভাবে নিমজ্জিত হ'লো, এই যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতেন। রামেন্দ্র বাবুর প্রকৃতি তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা সব দেশসেবার জন্য।

রামেন্দ্র বাবু নিজে সহস্র বার স্বীকার ক'রে গেছেন, তিনি অন্তরে অন্তরে স্বদেশী। এই বীজ বপন করে গেছেন তাঁর পিতা যখন তাঁর বয়স অষ্টম বর্ষ।

একখান মাত্র বই হ'তে রামেন্দ্র বাবু পরিচিত স্বদেশী হিসাবে। তিনি শুধু দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন দেশসেবক। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর মাতৃভাষাকে স্বীকার করাতে ইউনিভারসিটির পক্ষ হতে। শেষকালে দেখেও গিয়েছেন।

প্রাণপণ যুদ্ধ ক'রে গেছেন নিজের রিপণ কলেজকে হাতে তুলে না দেওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্টকে। এ জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার ক'রতে হয়নি রামেন্দ্র বাবুকে। কত বার বলে গেছেন রামেন্দ্র বাবু, বাহন হতেই হবে আমার বাংলা ভাষা। আমি না খেতে পেলেও কখন গবর্ণমেণ্টের চাকরী নেবো না। হাজার দু' হাজার টাকা দিলেও গবর্ণমেণ্টের গোলামী ক'রবো না।

৪

পেড্‌লার সাহেব রামেন্দ্রসুন্দরের প্রফেসার ও গুণগ্রাহী। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে ডাকিয়ে বললেন—তোমার একটা চাকরী স্থির ক'রেছি মহীশূরে, তুমি ওখানে যাও, নিশ্চয়ই তোমার উন্নতি হবে। গবর্ণমেণ্টের চাকরী বুঝচো না? একটু চিন্তা করে বললেন রামেন্দ্র বাবু—আপনাকে বাড়ী থেকে এসে পরামর্শ ক'রে উত্তর দেবো।

দু' তিন দিন পরে বাড়ী থেকে এসে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন রামেন্দ্রসুন্দর—আমার মায়ের মত পাওয়া গেল না। তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। বিরক্ত হয়ে সাহেব বললেন, তোমার মত হল না বল। তুমি কি দুগ্ধপোষ্য শিশু? মায়ের মত করাতে পারলে না! তবে কি না সার! আমার মত ছিলো না অতো দূর দেশে চাকরী করতে। চমকে উঠে বললেন সাহেব—দূর দেশ! জানো আমি সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এখানে চাকরী ক'রতে এসেছি। তুমি আমার চেয়ে কতো ছোট জানো? তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন—আমরা ঘরখেঁসা বাঙালী। আমরা বাংলা ছেড়ে কোথাও চাকরী করতে পারবো না। তখন হাসতে লাগলেন পেড্‌লার সাহেব।

হিন্দু ইউনিভারসিটি থেকে যখন মালব্যের ডাক এলো, তুমি এখানে চাকরী করবে এসো। হাজার টাকা মাহিনা দেবো, খাওয়া-থাকার কোন খরচা লাগবে না।

বাড়ীর সকলে এ খবর পেয়ে আহ্লাদে বাঁচেন না। চারশো টাকার মাহিনায় এক পয়সা বাঁচে না, তা ছাড়া বড় বাবুর মা বৃদ্ধা, তাঁর গঙ্গাস্নানও হবে, যদি শেষই সেখানে হয় তো কথাই নাই।

সকলে একত্রিত হয়ে স্থির করলেন রামেন্দ্রকে বলা যাক। সে মত করে কি না দেখা যাক। মা সভয়ে বলতে গিয়ে শুনতে পেলেন ছেলের কাছে—মা! তোমরা বল ত আমার আপত্তি নাই কিন্তু আমাকে একেবারে কাশীতে রেখে আসতে হবে। চাও ত আমাকে নিয়ে চল। এ কথা শুনে সকলেই নিরুত্তর।

কাশিমবাজারের মহারাজা রামেন্দ্র বাবুকে বললেন, আপনাকে আমার কৃষ্ণনাথ কলেজে কাজ নিতে হবে। কলকাতার চেয়ে মাইনে বেশী দেবো। তাও বাড়ীর কাছে হবে, আমাকে মত দিন।

অনেক ভেবে রামেন্দ্র বাবু বললেন, আমি কলকাতার সুধী সমাজ ছেড়ে সাহিত্য পরিষদ ত্যাগ করে কোথাও থাকতে পারবো না। আমাকে মাপ করুন মহারাজ!

বাড়ীর লোক বুঝলো রামের নাড়ী পোঁতা আছে কলকাতায়, সে কলকাতা ছেড়ে কোথাও থাকতে পারবে না। এমন সুবিধাও ছাড়লে রাম! একটু যদি বোঝে বাড়ীর এতো কাছে চাকরী!

১৯০৩ সালে কৃষ্ণকমল বাবু ছয় মাসের ছুটি নিলে, রামেন্দ্র বাবু রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ হলেন অস্থায়ী। তারপর কৃষ্ণকমল বাবু আর যোগ দিতে পারেন নি। কলেজে তখন স্থায়ী অধ্যক্ষ হলেন রামেন্দ্রসুন্দর। আইন এবং আর্ট পড়ান হ'তো রিপণ কলেজে। সকল বিভাগেরই অধ্যক্ষ হ'লেন রামেন্দ্রসুন্দর। তখন মাত্র নয়শো ছাত্র পড়ে কলেজে। রামেন্দ্রসুন্দর চিন্তা করে দেখলেন—একা আমার সকল বিভাগ দেখা সম্ভব হবে না। তখন তিনি জানকীনাথকে ল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন।

এই বিষয়েও কী কম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল রামেন্দ্রসুন্দরকে! তদানীন্তন ডিরেকটার পেড্‌লার সাহেব এলেন কলেজ পরিদর্শন করতে। তিনি ল্যাবোরেটরি ও লাইব্রেরী দেখে দুঃখ প্রকাশ করলেন এতো দৈন্য কলেজের!

তখন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী বললেন, রামেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে অনেক বিজ্ঞানের বই আছে, তাতে ছেলেরা অনেক সুবিধা পায়। শুনেই সাহেব বললেন রামেন্দ্র বাবু ত রিপণ কলেজ নয়। আমি অনুমতি দিতে পারি না বি-এস-সি খুলিবার।

তারপর ভাইস্‌চ্যানসালার হলেন স্যার আশুতোষ। তিনি দেখতে পাঠালেন রিপণ কলেজ, পি, কে সেনকে দিয়ে। দেখে এসে পরামর্শ আরম্ভ করলেন রামেন্দ্রসুন্দর, পি, কে, সেন, স্যার আশুতোষ ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী। স্যার আশুতোষ বলতে চান রামেন্দ্র, তোমরা ভুল ক'রো না। এখন গবর্ণমেন্ট নিজে ল কলেজ খুলতে চান। তোমরা কি গভর্ণমেন্টের সাথে লড়াই ক'রে পেরে উঠবে?

তখন রামেন্দ্র বাবু উত্তেজিত হ'য়ে বলে উঠলেন, এ জীবনই ত সংগ্রাম। দেখাই যাক না। আত্মহত্যা নীতি আমি পছন্দ করি না। শুনে সকলেই বুঝলেন। রামেন্দ্রসুন্দর সহজে ছাড়বেন না। তার পর সুরেন্দ্র বাবু ট্রাষ্টী গঠন ক'রলেন সার রাসবিহারী, লর্ড সিংহ, রাব বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে নিয়ে। সেক্রেটারী হ'লেন রামেন্দ্রসুন্দর।

তার পর থেকেই প্রবল ঝড় ব'য়ে গেল রামেন্দ্রসুন্দরের মাথার উপর দিয়ে। তাঁর ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, দুর্বার সাহসের জন্যই রক্ষা পেলো রিপণ কলেজ। রামেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞেস ক'রলেই ব'লতেন—এ ভগবানের দয়া। তাঁর ইচ্ছা না হ'লে এ কলেজ রক্ষা পেতো না।

প্রতিজ্ঞা ক'রলেন রামেন্দ্রসুন্দর—এ কলেজকে বি, এস-সি, পর্য্যায়ে তুলতেই হ'বে। আট-দশ বছর গবর্ণমেণ্টের সাথে লড়াই ক'রে বি, এস-সি পড়াবার অনুমতি পেলো গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে। এই সময় কী দুঃসহ যাতনা ভোগ ক'রেছিলেন ত্রিবেদী মশায়, বলার নয়।

এক দিন এক বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে ব'লেছিলেন—আমি এ কলেজকে এতো ভালবাসি, আমার নিজের মনে ক'রে। তা ছাড়া সুরেন্দ্র বাবু যুক্ত আছেন ব'লে আরও। তিনি যে একমাত্র প্রতীক স্বাধীনতা-যুদ্ধের।

কলেজের নিয়ম পঞ্চাশ মিনিট পড়াবার। জ্ঞান থাকতো না রামেন্দ্র বাবুর, পড়িয়েই চ'লেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কেও মনে পড়িয়ে দিলে ব'লতেন—এ আমার নিজের ছেলেদেরকে পড়াচ্ছি, সময় দেখে কী পড়ান সম্ভব?

আর একটা কথা, রামেন্দ্র বাবু ভালবাসতেন ছেলেদেরকে যেন বাড়ীর ছেলে। ছাত্ররা এসে ব'লতো রামেন্দ্র বাবুকে, সার আমরা খেলবো অমুক কলেজের সাথে। তখনই তিনি পরিহাস ক'রে তাদেরকে ব'লতেন—পারবি ত? হাঁ সার, আমরা নিশ্চয় ব'লছি পারবো। দেখিস যেন আমার মুখ হাসাস নে। পারি যদি কী দেবেন সার? আমি তোদেরকে খাওয়াব। আর যায় কোথা! ছাত্রদের দল হাসতে হাসতে চলে গেল। জয়লাভ ক'রে এলে রামেন্দ্র বাবুর কী খুসী। যেন তাঁর ছাত্ররা ভারত জয় ক'রে এসেছে। তখনই হুকুম পাঠিয়ে দিলেন স্ত্রী ইন্দুপ্রভা দেবীর কাছে—আজ এখনই একশ' জন ছাত্র আমাদের বাড়ীতে খাবে। ইন্দুপ্রভা দেবীও লেগে গেলেন আয়োজনে। ছাত্ররা প্রচুর আহার করে গেছে কত দিন। এ যেন রামেন্দ্র বাবুর নিত্যকর্ম্ম ছিল।

হোষ্টেলে ছাত্রদের বিবাদ হচ্ছে খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। সুপারিন্টেনডেণ্ট কিছুতেই মিটাতে পারেন না। রামেন্দ্র বাবু শুনে ভার দিলেন আর একজন ছাত্রদরদী প্রফেসারকে। তিনিও অক্ষম হলেন। তখন রামেন্দ্র বাবু নিজেই ভার নিলেন। সকল ছাত্রকে ডাকিয়ে বললেন—সত্বরই অগ্রহায়ণ আমি তোমাদের অভিযোগ শুনবো। এ ক'দিন তোমাদেরকে শান্ত ভাবে থাকতে হবে। আর একটা কথা—সেদিন আমি তোমাদের সাথে একসঙ্গে খাবো। কী যোগাড় করো দেখবো।

শুনেই ছাত্ররা আহ্লাদে বাঁচে না। অধ্যক্ষ আমাদের সাথে খাবেন! তাঁকে ভাল করে খাওয়াতে হবে। সে যোগাড়েই সকল বিভেদ ভুলে সকলে এক হয়ে খাটতে লাগলো।

ঠিক সময়ে রামেন্দ্র বাবু বললেন—ব্রাহ্মণ পেটুক মানুষ, তোমরা জানো ত? তারা এলে ছাঁদা নেয়—তখন হেসে ছাত্ররা বাধা দিয়ে বলল—আপনাকে আমরা জানি সার! আপনি কেমন ছাঁদা নেওয়া বামুন, তা-ও জানি।

তখন হেসে বললেন রামেন্দ্র বাবু—আমার সাথে দৌহিত্ররাও আসবে সব, হবে তো? ছাত্ররা খুসীর ধুমে বলে—দু'-তিনটে ছেলে আনবেন তার জন্যে এত বলচেন? দু'-তিন শো লোকের আয়োজন করেছি আমরা।

সন্ধ্যা আটটার পর রামেন্দ্র বাবু খেতে গিয়ে বসলেন—যে সব ছাত্রদেরকে ছোট জাতি বলে ঘৃণা করে ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা, তাঁদেরই পাশে দৌহিত্রদেরকেও বসালেন সেই সব ছাত্রদের পাশেই। অতো বড় ব্রাহ্মণকে ওই সব জাতির পাশে বসে খেতে দেখে ছাত্ররা বিস্মিত। যা নিয়ে এতো দিন এতো বিরোধ চলে এসেছে, একদিনের একটা ঘটনায় তার মূলোচ্ছেদ! খেতে খেতে তিনি কেবল বলেন গল্পচ্ছলে—জাতি সৃষ্টি করেছে আমাদের অজ্ঞানতা। আমাদের পরাধীন দেশে একটা কাজ চাই তো। তখন জ্যান্ত খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করাতো! এ-ও তাই। দেশ যখন স্বাধীন হতে থাকবে তখন এই জাতিভেদ সাপের খোসার মত আপনি ঝরে পড়বে। এ সব শিখবে তোমাদের মত লেখাপড়া ছাত্রদের কাছ হতেই সমাজ।

খাওয়া দাওয়ার পর সকল ছাত্র এক হয়ে ক্ষমা চাইল রামেন্দ্র বাবুর কাছে। বললো—আমরা ভুল করেছি সার! আপনি আমাদের জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়ে দিয়েচেন সার!

রিপণ কলেজের যখন ঘর তৈয়ারী হ'য়ে উঠে গেল নতুন বাড়ীতে, তখন অধ্যক্ষের জন্য একটা পৃথক ঘরের ব্যবস্থা হ'লো। তা'ছাড়া ইউনিভারসিটিরও এই মত।

তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন ভার হ'য়ে—আমাকে একঘরে করবেন কেন আপনারা? আপনাদের সাথে থাকলে কী অসুবিধা আমার? কেউ উত্তর দিতে পারেন না তখন।

আমি চাই একটা কলেজ ম্যাগাজিন বার করতে। তার জন্য ভার দিলেন প্রফেসারদের মধ্যে এক জনকে। এর নাম দিলেন রিপণ-কলেজ পত্রিকা। সকল প্রফেসারকেই উৎসাহ দিতেন লিখবার জন্য। কখনও নিজের ভাবে ভাবিত ক'রে নিরুৎসাহ করতেন না প্রফেসারদিগকে। স্বাধীন ভাবে সকলকে লিখবার সুযোগ দিতেন। এই সময়েই বের হয় ক্ষেত্র বাবুর "অভয়ের কথা।" এই বই পড়ে খুশী কতো রামেন্দ্র বাবুর। আরও উৎসাহ দেওয়াতে দু'-এক খান বই লিখে অমর হয়ে আছেন ক্ষেত্র বাবু।

রামেন্দ্র বাবু এলেই প্রফেসারদের মধ্যে উৎসাহের একটা বান ডেকে যেতো। ভাবতেন, এবার কিছু না কিছু শুনতে পাবো। তিনি এসেই আরম্ভ করতেন গ্রীক সভ্যতা থেকে সুরু করে সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের বিবরণ। কোন দিন বা বৈদিক যজ্ঞ, কোন দিন বৌদ্ধদর্শন। কখনও বা বৈষ্ণব দশ তত্ত্ব। একটা আনন্দ- হিল্লোল বইতো। যেন একটা বিরাট খনি মাটি থেকে তুলিয়ে নিতে পারলেই হয়, সোনা না হয় হীরে।

এই সময় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বলতেন—আমি রামেন্দ্র বাবুকে খুব বড় একজন পণ্ডিত বলে কেবল চিনতাম। তাঁর সাথে দেখাও হতো কোন সভা-সমিতিতে। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতাও শুনতাম। কিন্তু এমন ভাবে প্রাণ খুলে মেলবার সময় হয়নি। এখন দেখচি আমার আত্মীয়ের চেয়ে বড়। এখন আমি তাঁর ব্যবহারে অভিভূত।

দেখচি রামেন্দ্র বাবু দর্শন ও বিজ্ঞান ভালবাসেন বলিয়া সেই বই কেবল আনাইতেন না। নাটক নভেলও আনাইতেন সকলের মনোরঞ্জনের জন্য।

রামেন্দ্রসুন্দর অধ্যাপক-সঙ্ঘ স্থাপন করলেন রিপণ কলেজে। এর মধ্যে প্রাচীন নবীন বলে কোন প্রভেদ থাকলো না। তিনি এসে উৎসাহ দিতেন, আর বলাতেন ছাত্রদেরকে—স্বাধীন হবার শিক্ষা দিন। তারা যেন জগতের কাছে বলতে পারে আমরা পরাধীন নই।

তখন একটা হৈ-হৈ ব্যাপার সুভাষ বোসকে নিয়ে সারা বাংলায়। ওটেন সাহেবকে নিয়ে সকলেই প্রায় বলে—এটা ছাত্রদের খুবই অন্যায় শিক্ষকদের উপর। তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন—ও সব ছেলে যে মানবে না পরাধীনতা, ও শুনবে কেন অন্যায়! সইবে কেন বাঁধাধরা নিয়ম!

৫

এক সময় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বলেন—আমার মত ভট্টাচার্য্য বামুন ত নয় রামেন্দ্র? ও বাল্মীকির রাম, বেদের ইন্দ্র, কালির ভারতচন্দ্রের সুন্দর। ওর সঙ্গে আমার তুলনা? আমি তো ফলারে পেটো-ঝাড়া একজন বামুন। জ্ঞানে-বিদ্যায় ক'জন রামের মত আছে বল দেখি!

জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মুক্ত কণ্ঠে নিজের কথা বলে গেলেন। তার পর ভূয়সী প্রশংসা করলেন রামেন্দ্র বাবুর।

এক সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য পরিষদের উপর বিরক্ত হয়ে সাহিত্য পরিষদ ত্যাগ করলেন। তখন সকলেই ভাবলেন

অতো বড় পণ্ডিত একজন ত্যাগ করলেন সাহিত্য পরিষদকে! ব্যাপার কী! কোন সন্ধান জানতে না পেরে প্রশ্ন করলেন রামেন্দ্র বাবুকে। তিনি বললেন—বলবো কী ছাই! নূতন নূতন লোকের মত সহ্য করতে পারচেন না। সকলে একমত হয়ে সাড়া দেবে এ কেমন কথা। নিজের মতবাদ বিসর্জ্জন দেবে এ-ও কী হয়! তাহলে কী শাস্ত্রী মহাশয়কে আর পাবেন না সাহিত্য পরিষদ? তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন, এখন আমাকে বোঝাতে হবে।

কিছু দিন বিরাগ থাকার পর শাস্ত্রী মহাশয় একখানি প্রাচীন গ্রন্থ রমাকল্পদ্রুম রামেন্দ্র বাবুর হাতে দিয়ে বললেন—এটা সাহিত্য পরিষদকে দেবে।

তখন রামেন্দ্র বাবু প্রশ্ন করলেন, এতো ভালবাসেন যখন সাহিত্য পরিষদকে, তবে বিরাগ কেন?

—আমি লোকের কথা সইতে পারি না, তখন হেসে পণ্ডিতবরকে বললেন—কথা শুনতে হবে। এরা যে নতুন যুগের মানুষ। এ ধারা আলোচনা হওয়ার পর আবার তিনি যোগ দিলেন সাহিত্য পরিষদে।

প্রায় শাস্ত্রী মহাশয়কে ব'লতেন—আমরা কাজ করতে এসেছি করে যাবো। আমরা নামের পদের আকাঙ্ক্ষী নই। কোন দিনও কোন পদের জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষা ক'রবো না। সমস্ত জীবন সাহিত্য সাধনা ক'রে যাবো—তাই হয়। আমার মত লোককে ওরা সম্পাদকের ভার দিলো না, কা'কে আর দেবে বল ত? হেসে বলতেন—হয় তো আমার ও ভার বহন করবার শক্তি নাই ভেবেচেন।

তেজস্বী ব্রাহ্মণ তখন ব'লতেন—তাই বলে অন্যায়ের তোষামোদী করতে হবে? তাও হয় বহুজনের মতের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়। রামচন্দ্রকেও এই রকম ভাবে রঞ্জন করতে হ'য়েছিল প্রজাসাধারণকে।—তোমাকে পারবার উপায় নাই রাম! আমি ত রাম নই।

এর অনেক দিন আগের কথা। অক্ষয় সরকার তখন নবজীবনের সম্পাদক। তাঁর সাথে একটু পরিচয় ছিল রামেন্দ্র বাবুর। তখন রামেন্দ্র বাবুর পাঠ্যজীবন। একটু-আধটু লেখারও সখ ছিল। তিনি গিয়ে অনেক আলোচনা করতেন লেখার বিষয় নিয়ে। কেমন ভাবে লিখতে হয় তাও বলে দিতেন। এক রকম বলতে গেলে তিনিই গুরু রামেন্দ্রসুন্দরের। এ সব আলোচনা রামেন্দ্র বাবুর প্রথম কলেজ ঢুকেই।

বি, এ, পরীক্ষা দেওয়ার পর প্রথম মনে হলো এবার লিখতে হবে। এতো লজ্জা যে নাম দেবারও সাহস হয় না। লেখা পাঠিয়ে দিলেন নবজীবনে। ভয়ে ভয়ে থাকেন লেখা বের হয় কি না।

বের হলো বেনামীতে নয় স্বনামে। এই প্রথম হাতে-খড়ি বলতে হয়।

সরকার মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবগম্ভীর ভাষা যতদূর বদলে হয় বের করলেন। রামেন্দ্র বাবু ভেবে পান না—আমার নাম পেলেন কী ক'রে! তার পর মনে এলো একবার যাদের লেখা দেখেচেন তাদের নাম-ধাম ভুল হয় না।

তখন রামেন্দ্র বাবুকে পেয়ে বসেছিল কালীপ্রসন্ন বাবুর ভাব-গম্ভীর ভাষা। তিনিই বলেচেন নিজে—এই ভাব কাটতে আমার অনেক দিন লেগেছিল। ভাবতাম এ ভাষা ছাড়া ভাব প্রকাশ করা যায় না। অনেক চেষ্টার পর আমার জ্ঞান হলো, নিজের ভাষা না হলে সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায় না। সেই থেকে রামেন্দ্র বাবু কখন অনুকরণ করেন নি জীবনে। তখন বুঝলেন, কেন অক্ষয় বাবু কেটে কুটে ভাষা বদলে বের করতেন।

তার পর সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বার করলেন সাধনা। তখন রামেন্দ্র বাবু আকাশ-পাতাল নামে এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দিলেন। সেই প্রবন্ধ বের হওয়ার পর রামেন্দ্র বাবুর উৎসাহ হলো লিখবার। তখন কয়েকটা প্রবন্ধ লিখে দিলেন। সমস্ত কয়টাই বের হতে লাগলো সাধনায়।

তখন আর একটা মাসিক বের হলো জন্মভূমি, বঙ্গবাসী অফিস থেকে। ফটোগ্রাফ বলে এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তিনি দিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বের করলেন 'দাসী' বলে এক মাসিক পত্র। তিনি চেয়ে পাঠালেন প্রবন্ধ রামেন্দ্র বাবুকে। খুসী ধরে না রামেন্দ্র বাবুর—এখন আমাকে চাইতে লেগেছে গো। আমিও এক জন লেখক হলাম। পর পর কয়েকটিই পাঠিয়ে দিলেন 'দাসী'র সম্পাদক রামানন্দ বাবুর নিকট।

তারপর বের হলো এক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র সাহিত্য। এটা বের করলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। তিনি বলে রাখলেন—রামেন্দ্র বাবু! তোমার লেখা আর অন্য কাগজে দেওয়া হবে না, আজ থেকে তুমি আমার।

কী করেন রামেন্দ্র বাবু, যত সব লেখা দিতে হয় সমাজপতির কাগজ সাহিত্যকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উমেশচন্দ্র বটব্যাল, রজনীকান্ত গুপ্ত, আনি বেসাণ্ট, সামাজিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার, ধর্ম্মের প্রমাণ, ধর্ম্মের জয়, সত্য, আত্মার অবিনাশিতা, মাধ্যাকর্ষণ, অমঙ্গলের উৎপত্তি, মায়াপুরী, এই ধারা সর্ব্বজননন্দিত বহু প্রবন্ধ সাহিত্যের কলেবরে আত্মপ্রকাশ করেচে।

তখন রামেন্দ্র বাবুর খ্যাতি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েচে। তাঁর প্রবন্ধ পাবার জন্য সকল মাসিক পত্রিকার সম্পাদক উন্মুখ হয়ে আছেন। যদি কেউ কোন প্রবন্ধ রামেন্দ্র বাবুর কাছ থেকে নিয়েচেন, কী রাগ সমাজপতি মহাশয়ের! তিন চারটে প্রবন্ধ লিখে তবে রাগ ভাঙাতে হত রামেন্দ্র বাবুকে।

তের শো দশ সালে রামেন্দ্র বাবু 'জিজ্ঞাসা' নামে একখানা বই বের করলেন। তাতে কয়েকটা প্রবন্ধ আছে 'সুখ না দুঃখ', 'সত্য', 'জগতের অস্তিত্ব', 'আত্মার অবিনাশিতা', 'মাধ্যাকর্ষণ', 'এক না দুই', 'অমঙ্গলের উৎপত্তি', 'বর্ণতত্ত্ব', 'পঞ্চভূত', 'উত্তাপের অপচয়', 'ফলিত জ্যোতিষ', 'নিয়মের রাজত্ব', আরও দু'-চারটে প্রবন্ধ জুড়ে।

বই যখন রামেন্দ্র বাবুর হাতে পড়লো তখন খুশীর ধূমে আচ্ছন্ন হয়ে ভাবলেন—কোথায় আমার স্বর্গগত পিতা! যিনি আমার ভিতরে স্বাধীনতার বীজ বুনেছিলেন। একমাত্র তাঁরই আশীর্ব্বাদে আমি মরুভূমি অতিক্রম করে চলেচি। পিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুষ্কপ্রায়। কবে আমার পিপাসার নিবৃত্তি হবে দেব! চোখে জল পড়তে লাগলো। ইন্দুপ্রভা দেবী এসে বললেন—তোমার বই না কি ছাপিয়ে এনেচো? কৈ একখানা দাও না? তখনই একখানা বই হাতে নিয়ে দেখেন, স্বামীর চোখে জল। তুমি কাঁদচো কেন? দুঃখে নয় ভাবাবেশে। আনন্দের দিনে আমার বাবাকে মনে প'ড়লো। আচ্ছা তুমি এতো লিখচো বোঝা যায়

না কেন? রামেন্দ্র বাবু বললেন, বাঃ, আর কেও না বুঝুক তুমি ত বোঝো আমার বই।—বুঝি না ছাই। তুমি থাকো, বুঝিয়ে দাও তবে।—না-না; ভুল ব'লচো কত সময় তুমি ব'লো এই জায়গাটা কেমন লাগচে। সত্য ব'লচি কেমন যেন সে স্থানটা বুঝাতে পারিনি। ভুলই লিখেছিলাম। বাবা ইস্কুলে যেতে দিতে ভালবাসতেন না। তুমিও পড়ালে না, আমি আবার মানুষ! কা'কে বই পাঠাচ্ছো নাম লিখলে যে—ওঁর নাম জানবে না। রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা। আমারও ব'লতে পারো বড় দাদা।

সেই 'জিজ্ঞাসা' বইখানা পেয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ তাই এনে চঞ্চলা দেবী তাঁর কন্যা ও তাঁর মাকে শোনাতে লাগলেন।

"শান্তিনিকেতন, ১০ই অগ্রহায়ণ।

সাহিত্য পরিষদের ঝুটো রত্নাবলীর শির-স্থানীয় একমাত্র সাররত্ন বহুমানাস্পদ ত্রিবেদী মহাশয়!

আপনার পুস্তক পাইয়া পরম লাভ বলিয়া মনে করিলাম। 'জিজ্ঞাসার' প্রথম অধ্যায় পাঠ করিয়া যেরূপ আনন্দ রস অনুভব করিলাম, তাহাতে কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ের আরও কয়েকটা পাতা পাঠ করিলাম; ইচ্ছা এক দৌড়ে শেষ পৃষ্ঠার কূলে উপনীত হই। কোমর বাঁধিলাম পর্য্যন্ত। কিন্তু আর পারিয়া উঠি না, মনের খেদে পুস্তকখানি বন্ধ করিলাম। আমার পুস্তকখানি দু' দিনের উপাদেয় খোরাক হইবে। দ্রুত ভোজন করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিব না। যতখানি পড়িলাম অকৃত্রিম সত্য বলিয়া মনে হইল, সমস্তই মর্ম্মস্পর্শী। পাঠ সমাপ্ত হইলে আমার যাহা বলিবার কথা তাহা কোন মত ভাবে বলিবার চেষ্টা করিব।

আপনার গুণানুরক্ত
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র শুনেই স্ত্রী ইন্দুপ্রভা প্রশ্ন ক'রলেন—তোমার সাধের সাহিত্য পরিষদের লোকদেরকে ঝুটো বললেন কেন? তখন হেসে অস্থির রামেন্দ্রসুন্দর। বললেন, তোমার সমাজপতি হওয়া উচিত ছিল। তোমার মত সমালোচক ত দেখিনি মেয়েদের মধ্যে!—তা হবে না! অতো বড় লোক লিখলেন কেন বলতে হবে? তখনও হাসি ছাড়েনি রামেন্দ্র। আমাকে বাড়াবার জন্য, বুঝলে না?

রামেন্দ্র বাবুর 'জিজ্ঞাসা' পড়ে খুবই ভাল লেগেছিল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। কয়েক দিন পরই আর একখানি চিঠি লিখে অসুখের খবর নিয়ে চিঠি দিলেন।

তখন শুয়ে আছেন রামেন্দ্র বাবু বিছানায়। আর সকলেই আছেন বাড়ীর লোক। এমন সময় পিওন এসে চিঠি দিয়ে গেল। রামেন্দ্র বাবু বললেন তাঁর কন্যা চঞ্চলাকে, তোর মাকে এনে এই চিঠি খানা পড়।

"শান্তিনিকেতন, ১লা পৌষ,

প্রিয় ত্রিবেদী মশায়, 'জিজ্ঞাসার' আমি হদ্দ চার পাঁচ অধ্যায় পড়িয়াছি। আপনার গ্রন্থখানি জিনিষটা খুব ভাল—বিশেষতঃ আমার মত অকেজো লোকের পক্ষে। কিন্তু সকল পাঠকের পক্ষে তাহা আমি বলিতে পারি না। কারণ বিদ্যালয়ের অবোধ ছাত্ররা তাহা পড়িলে খুব সংসারের আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া তাহাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইবে। চন্দ্রের ওপিঠ কেউ চক্ষে দেখে নাই, অতএব চন্দ্রের ওপিঠের সহিত এপিঠের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা মনুষ্যের জ্ঞানাতীত। এ কথাটা আপনি খুব জোরের সহিত প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটি কথা আপনার প্রতি বক্তব্য আছে। আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আপনার নিকট ভাঙ্গিব, এখন না। কিন্তু আপনার শরীরটার আশু আরোগ্য প্রয়োজনীয়। তাহার পর অন্য কথা। আপনি ভাল আছেন শুনিলে আরও মনের কথা জানাইব।

আপনার গুণানুরক্ত
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

চঞ্চলা, এক বার তোর মাকে জিজ্ঞেস কর তো, কী অন্যায় দেখলেম কোথায়?

তখন ইন্দুপ্রভা দেবী ব'ললেন ঠিকই ত লিখেছেন। তবে আমাদের মত লোক তোমার লেখা প'ড়ে হাবুডুবু খাবে।

তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন—দেখ, তোর মা ঠিক ধরতে পারে কি না! আমি কোন লেখা তোর মাকে না দেখিয়ে কাগজে বের করি না।

চঞ্চলা, তোর বাবাকে বলে নভেল লেখাতে পারিস্ নে। তা হ'লে অনেক লোকে পড়তো। আর একটা কাজের মতো কাজও হ'তো।

তখন রামেন্দ্র বাবুর উচ্চ হাস্যের স্রোতে ঘর ভরে উঠলো।

[ক্রমশঃ।

যক্ষ্মা ব্যাধির নয়া প্রতিষেধক

মনুষ্যজীবনের পক্ষে যক্ষ্মা ব্যাধি মারাত্মক ব্যাধি। এই ব্যাধির প্রতিকারকল্পে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের প্রয়াস ও গবেষণার অন্ত নেই। সুফলও এর ভেতর পাওয়া গেছে প্রচুর, এইটি স্বীকার করতেই হবে অসঙ্কোচে। অন্ততঃ এককালে যে বলা হ'ত 'যার হয়েছে যক্ষ্মা, তার নেই রক্ষা', এ যুগে কথাটি হুবহু সত্য বলা চলে না। এ ব্যাধি নিরাময়ের জন্য এর ভেতর বহু ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্র বের হয়েছে এবং আরও বের করবার জন্যে অব্যাহত উদ্যম চলেছে বিশ্বের নানা যায়গায়, বিভিন্ন গবেষণাগারে।

যক্ষ্মা ব্যাধির প্রতিষেধক টীকা হিসাবে বি, সি, জি, আজ অনেক দেশেই চালু। সম্প্রতি বহু গবেষণান্তে আর একটি নতুন প্রতিষেধক ঔষধ বের করেছেন ডাবলিনের আইরিশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল। জন্তুর উপর এই ঔষধের কার্য্যকারিতা—যা পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট গবেষণাগারের ডিরেক্টর ডাঃ ভিনসেন্ট পার্বা সে সকল বিস্তারিত ঘোষণা করেছেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক ভাষণে। ঔষধটি ডাবলিন ড্রাগ (লেবোরেটরি লেবেল বি ৬৬৩) নামেই এখন পর্য্যন্ত পরিচিত। যক্ষ্মার আক্রমণ প্রতিরোধে মনুষ্য-শরীরে এর প্রয়োগ যদি ঠিক ভাবে হয়, তবে দ্রুত এবং নিশ্চিত সাড়া পাওয়া যাবে—আইরিশ আবিষ্কারক সংস্থাটি এ বিশ্বাস ও দাবী রাখেন।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

মঞ্জু উপরে উঠে এসে দিদিকে ও-ভাবে চোখে হাত-ঢাকা দিয়ে বসে থাকতে দেখে একটু পা-টেপা ভাবেই কাছে এগিয়ে এসে মৌরীর চোখের নীচে হাত ছোঁয়াল।

—এ কি হচ্ছে? মৌরী ঠেলে দিল মঞ্জুর হাতটা।

—অন্ধকারে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নি, তাই দেখছিলাম তুই কাঁদছিস কি না।

—কাঁদব কেন? ভুরু ঘোরালো মৌরী।

—কাঁদবি কেন? কারণটা আমি কি করে বলব? কেন যে এক এক সময় ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করে, তার কারণ মানুষ নিজেই বুঝে উঠতে পারে না; তা পরে বলবো। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

—তোর কি মনে হয়?

—আমার কি মনে হয়? আন্দাজ করতে বলছিস? ঠিক না হলে মাথার বাড়িটাড়ি মেরে বসবি না তো?

—না।

একটু ভাববার ভঙ্গি করে মঞ্জু। তার পর বলে—নামটা সুদর্শন, ভাবছি নামের প্রভাবটা হয়ত চরিত্রে কিছু আছে। তা মন্দ কি। প্রেমিক মানুষ, ভালো তো।

—প্রেমিকদের মেকির কারবারই চালাতে হয় বেশী। অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়াল মৌরী।

—দেখ দিদি, বাড়াবাড়ি করিস নে। যার সঙ্গে আজ বাদে কাল বিয়ে—

—হাঁ তার জন্যই। নইলে ভাবনাটা ছিল কি। এই পরিচয় তো শেষ হয়ে যেত আজই।

—বাঁচালি! এখন শেষ হয়ে যায় নি তাহলে! একটা স্বস্তির নিশ্বাস টানার ভাব করে বসে পড়ে মঞ্জু। মাথাটা চেয়ারে হেলিয়ে তাকায় আকাশের দিকে।

চাঁদটা তখন উঠে এসেছে একেবারে মাথার উপর কিন্তু আলোটা তার আর আগের মত স্পষ্ট নেই। হাওয়ায়-ওড়া পাতলা মেঘ ভেসে ভেসে এসে ঢেকে ফেলেছে তাকে। আর সে তারই এ-ফাঁক ও-ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেষ্টা করছে কেবল তার উজ্জ্বল রূপটা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতে। রূপ দেখার তৃষ্ণার চাইতে রূপের নিজেকে দেখাবার তৃষ্ণাটা যে একটুও কম প্রবল নয়, যেন তারই একটা দৃষ্টান্ত চলছে আকাশেও।

চেয়ারে মাথা রেখে মঞ্জুকে ও-ভাবে বসে থাকতে দেখে মৌরী বলে—হঠাৎ যেন তুই বড্ড ভাবনায় পড়ে গেলি মনে হচ্ছে?

—তোর কি উপায় হবে তাই ভাবছি।

—আমার উপায় ভাবছিস! হেসেই ফেলল মৌরী। আর হাসির সঙ্গে সঙ্গে মনের চাপা ভাবটাও যেন গেল অনেকটা ওর হালকা হয়ে। তা স্থির করতে পারলি কিছু?

—স্থির করা ব্যাপারটা কোন সময়ই তেমন কিছু কঠিন নয়। বিশেষ করে তোর বেলা তো নয়ই। কঠিন হলো যে স্থির করার নিয়ে পৌঁছোনোর পথ মেলা নিয়ে।

—অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে তার ধারণাটা এমন পরিষ্কার যে, উপায় খুঁজতে একটুও অন্ধকার হাতড়াতে হয়নি। ঠেকে গেছিস সেই উপায়ে গিয়ে উপস্থিত হওয়া নিয়ে। পথটা খুবই দুর্গম বুঝি?

—দুর্গম বলে কোন শব্দ নেই মঞ্জুরীর অভিধানে। পথই নেই। নির্ভয়ে সঙ্গে দেওয়া যায় এমনি পাত্রের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল কিন্তু কোন পথ নেই যে গিয়ে উপস্থিত হবো প্রস্তাবটা নিয়ে।

—কেন তোর আগেই অপর কেউ গিয়ে প্রস্তাবটা করে ফেলেছে? চোখ মিটমিট করল মৌরী।

—না। যিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছেন তিনিও তাঁর জন্য উপযুক্ত কন্যা বানিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই একটা তুচ্ছ কারণ তৈরী করে অবিবাহিতই রেখে দিয়েছেন।

এই বার সত্যিই কৌতূহল বোধ করে মৌরী।—নামটা বল তো? দেখি প্রস্তাবটা নিজেই গিয়ে করে উঠতে পারি কি না।

—বললাম যে, তার উপায় নেই।

—বেশ, উপায় না থাকে প্রস্তাবটা না হয় নাই-করা গেল। পরিচয়টা জানতে বাধা কি?

পরিচয় কি দেবে মঞ্জু! ও কি কোন বাস্তব লোকের কথা বলছে? মঞ্জু জানে, যোগাযোগ বইখানা দিদির কাছে ধর্মগ্রন্থ বিশেষ, বিপ্রদাস ওর কাছে আদর্শ পুরুষ, কুমু ওর মন খারাপের অষুধ। মনের তুফান থামাতে কুমু চোখ বুজে আবৃত্তি করত "প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্" মঞ্জু দেখেছে মৌরী মেলে ধরে বসে কুমুকে। বলে, যে শ্রদ্ধা দিয়ে কুমুকে তার সৃষ্টিকর্তা গড়েছেন আমাদের গড়বার সময় আমাদের সৃষ্টিকর্তাও নিশ্চয়ই তার কিছুটাও অন্তত দিয়ে গড়েছেন। আর বিপ্রদাস—মৌরীর কাছে নাকি ও নামটার সঙ্গে তিনটা ছবি জড়ানো। তার প্রথমটা হলো, দীর্ঘদেহ এক বলিষ্ঠ পুরুষ ঘোড়াটাকে নিজ মরজি মত চলতে দিয়ে ক্লান্ত দেহে বসে আছেন। বিষণ্ণ দৃষ্টি তাঁর দিগন্তে মেলা। মন ভারক্রান্ত প্রিয়তম বোনের ভবিষ্যৎ মঙ্গল অমঙ্গল চিন্তায়। আর তার দ্বিতীয়টা হলো, স্বামীর হাতে বোনের লাঞ্ছনায় স্থির থাকতে না পেরে অসুস্থ শরীর নিয়েও বিছানা ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। গায়ের সাদা মোটা চাদরটা লুটিয়ে পড়েছে তাঁর মাটিতে। বোনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন—'আয় কুমু আমার কাছে আয়।' আর তার তৃতীয় আইটেমের ছবিটা বলতে তো মৌরী দস্তুরমতো অভিভূত হয়েই পড়ে—স্বামীর ঘরে চলে যাচ্ছে কুমু। আর হয়ত দেখা হবে না। আর হয়ত ওকে এখানে আসতে দেবে না। বোনকে তার জীবনের সকল অমিলের সকল বেসুরের পরপারে পৌঁছে দিয়ে আসতে বসলেন, তখনও ভোর হয়নি। তখনও আলো

দেখুন! অর্দ্ধেকটী সানলাইট সাবানেই
এসব কাচা হয়েছে!
সানলাইটের ফেণার আধিক্যেই এর কারণ!
SUNLIGHT
SOAP
সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়জামা
সাদা ও উজ্জ্বল হয়।
S. 248-X52 BG
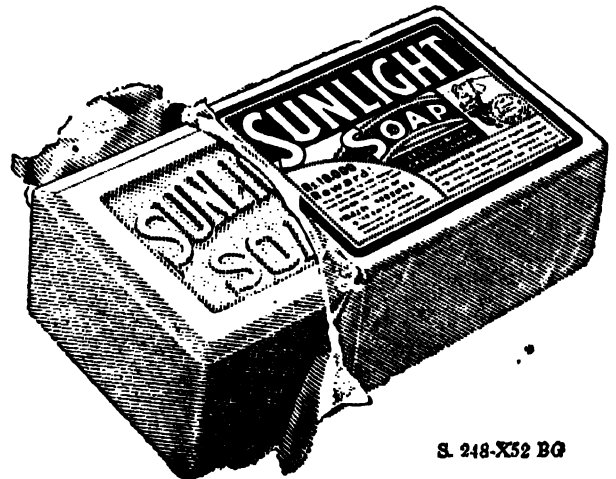
ফোটেনি, বোনের হাতে তুলে দিলেন একটি নিজে তুলে নিলেন একটি এসরাজ। বললেন 'আয় দু'জনে মিলে বাজাই।' দিদির চোখে-মুখে তখন একটা আলো খেলছে। যদিও মঞ্জুর কাছে বিপ্রদাসের রূপটা একমাত্র দাদা। এছাড়া আর কোন চেহারায় ও তাঁকে ভাবতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ এই মুহূর্তে কেন জানি তাঁকেই মনে পড়ে গেছে মঞ্জুর দিদির উপযুক্ত পাত্র হিসাবে। মৌরীর পাত্রের পরিচয় জানতে চাওয়ার জবাবে ধীরে ধীরে বলে—কুমুর দাদা।

বিস্ময়ে ভুরু ঘোরাল মৌরী—কুমুর দাদা—সে আবার কে?

—কুমুর দাদা, সে আবার কে? কুমু আর বিপ্রদাসের সঙ্গে তোকে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না কি?

—হা ভগবান! মানুষকে এ ভাবেও নিরাশ করতে হয়? ভেবেছিলাম নাম-ঠিকানাটা জেনে নিয়ে একেবারে গোলাপ-কুঁড়ির মালা হাতে গিয়ে দাঁড়াব সামনে। তার পরও ফিরিয়ে দিতে পারেন এমন পুরুষই হন তো তাঁরই মন জয় করব, এই হবে আমার সাধনা।

—দুঃখ ত এই। এমন পাত্র থেকেও নেই। বিজ্ঞানী আর ডাক্তার আজ-কাল কত পারে আবার যেমন কিছুই পারে না, জীবন দিতে পারে না—লেখকদেরও সেই এক অবস্থা। সৃষ্টি করতে পারে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তাই বলছি, মনের বিচরণ ক্ষেত্র মেঘলোক থেকে মর্তলোকে নাবিয়ে আনুন মহাশয়া। প্রথম প্রথম শক্ত ঠেকবে কিন্তু সেটাই সত্য। কেতাবী জগতে মন যেমনি সচল, দেহ তেমনি অচল। ও-জগতের নায়ক নিয়ে জীবন চলে না।

বৌদি মুখে অপ্রসন্নতা শরীরে রান্নাঘরের পেঁয়াজ-রসুন মাংস-মসলার এক সংমিশ্রিত গন্ধ নিয়ে এসে কাছে দাঁড়ালো।—তোমরা ভাই এখানে একটা কলিং-বেল-টেল গোছের কিছু লাগিয়ে নাও বাপু! খবর দিতে নিতে ডাকতে এত বার বার উপর-নীচ করতে আমি পারিনে।

সত্যি, সুদর্শন আসবার পর থেকে আজ বিশ্রাম একটুও মেলেনি অমিতার। হঠাৎ করে ওবেলা কিছুই করে ওঠা সম্ভব হয়নি। সেটা পুষিয়ে নেওয়া হচ্ছে রাতের আয়োজনে। নিয়ে আসা হয়েছে ছোট পিসিকে। ছোট পিসি নিয়ে এসেছেন তার রান্নার লোকটিকে, যে না কি তিনহাজারী পিসেমশাইয়ের পদস্থ অতিথিদের সদাই সামলাতে অভ্যস্ত। মুরগী-মটন-ডিম-বিস্কিট-পেস্তা-বাদাম-পেশোয়ারী চাল—আরও কত দেশী বিদেশী আয়োজন ঘরময় ছড়ানো। মাঝখানে ছোট পিসি এক শান্তিনিকেতনী মোড়ায় চেপে বসে তদারক করছেন। সাধ্য কি অমিতা সে ঘর থেকে বেরোয়। এটা হয়েছে তো ওটা করো। ওটা হয়েছে তো সেটা করো। বেচারীর অনভ্যস্ত কোমর সত্যি কটকট করছিল। চোখ ফেটে আসছিল জল। মঞ্জু ওকে হাত ধরে টেনে ওর চেয়ারটায় বসিয়ে দিলে। অমিতা বসে কিন্তু মুখে বলে—থাক, আমার আর বসে কাজ নেই। ছোট পিসির থমথমে মুখ আরো থম ধরে উঠবে। আর অপরকে বলব কি। তোমার দাদাটিই মানুষ! জুতো মচমচ করে রান্নাঘর থেকে আমায় ডেকে নিয়ে এলেন—আমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই। তোমরা দু'জন ছাদে, আমি রান্নাঘরে আর সুদর্শন বসবার ঘরে একা। যেন তোমাদের ছাদে থাকার, আমার রান্নাঘরে থাকার আর সুদর্শন বাবুর একা থাকার কারণ, আমার কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। তুমি এই কিছুক্ষণ আগেই না চা করে নিয়ে এলে? কি করে জানব আমি, তোমরা কখন ছাদে এসেছ?

—এই না জানাটাকেই দাদা অপরাধ মনে করেছেন। মঞ্জু বলে।

—রান্নাঘর থেকে পা দূরের কথা, মুখটা পর্যন্ত বার করে ঠাণ্ডা হতে ফুরসুত দিচ্ছে না। এদিকের খবর জানব কি করে?

—সেটা আবার দাদা জানেন না। তাই সব সময় সব ঘটনা জানবার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না, ম্যানেজ করতে জানতে হয়। তা জানবে না কেবল 'কি অন্যায়' বলে উঠবে রেগে। এসেছ তো নিশ্চয়ই এক পশলা ঝগড়া করে?

—এসেছিই তো।

—জানি।

—তুমি হলেও করতে।

—পাগল!

—করতে না? মিথ্যে মিথ্যে দোষ ঘাড়ে চাপিয়ে রাগ দেখালে চুপ করে থাকতে?

—আচ্ছা, সে যাক। কিন্তু দাদা যখন বললেন—'সুদর্শন একা কেন' তখন তুমি জবাব দিলে না কেন? 'তার এখন একটু একা থাকা দরকার তাই।'

স্বামীর সম্বন্ধে নালিশ ভুলে গেল অমিতা। কেন, তার একা থাকা দরকার কেন?

মৌরী রাগত ভাবে চোখ টিপল মঞ্জুকে। মঞ্জু তা দেখেও দেখল না।—ঠিক তোমার এই জিজ্ঞাসাটা এই ভাবে দাদাও করতেন। আর তখন তুমি আঁচল ঘুরিয়ে চলে আসতে আসতে বলতে, 'তা নিয়ে তোমার প্রয়োজন নেই।' দাদা তোমার কাণ্ডজ্ঞান অভাবের কথা ভুলে গিয়ে ভাবতেন, 'কি হলো।' আর সে অবসরে তুমি ভদ্রলোকদের খোঁজে পড়তে বেরিয়ে। এসে দেখতে, সত্যি তার একা থাকার প্রয়োজন আছে কি নেই। থাকে তো চলে গেলে। না থাকে তো বসতে কাছে। বাস হয়ে গেল। কিছু ম্যানেজ করতে জান না, কেবল ঝগড়া আর রাগারাগি, রাগারাগি আর ঝগড়া।

—ও সব মুখেই বলা যায়। ঘাড়ে পড়লে তখন দেখা যাবে। মৌরীর দিকে তাকিয়ে বলে—হোক না আগে, তার পর বুঝবে বিয়েতে কত মধু।

মৌরী বলে—জোড়ায় জোড়ায় তোমাদের দেখছি, স্বাদটা এর মিঠা না কষা, বোঝাটা কি নিজের জিভের জন্য তুলে রেখেছি?

মাথা দোলাল মঞ্জু।—এ বাপু তোমাদের পিঁপড়ের মধু খাওয়ার পরিণতি দিয়ে মধুর বাটিটাকে গালাগাল দেওয়া।

বিস্ময়ে চোখ বড় করে মৌরী।—ব্যাপারটা কি রে! ভূতের মুখে রামনামের মত কানে ঠেকছে যে। তুই না কি বিয়েই করবিনে! যদি এমন মধু ভরা, তবে বিয়েতে তোর এত বিরাগ কেন?

—বিরাগ? কি বলে! বিয়ে আমি করব না। তার কারণ, মধুর পাত্রটা জীবনে আমাদের না হলেও চলে কিন্তু যে নুণপাত্রটি জীবন ধারণের পক্ষে কেবল অপরিহার্যই নয়, যেটা সব স্বাদের মূল আর যার অভাবে আজ আমাদের জীবনের সব স্বাদ এমন বিস্বাদের পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে আমি বেরুবো সেই নুণপাত্রটির অন্বেষণে—কিন্তু তার দেরী আছে। বর্তমানে

আমি নীচে যাচ্ছি। তুমি নির্ভয়ে বিশ্রাম কর বৌদি! রান্নাঘর পরিচালন থেকে পরিবেশন সব ভার আমার। তরতর করে নামতে নামতে একেবারে সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দাদার সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া ভাবে মুখোমুখী অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়ল মঞ্জু। জয়দেব বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত নিজেই ওপরে উঠে আসছিল। —সুদর্শনকে একা বসিয়ে রেখে তোরা সবশুদ্ধ অমন ছাদে গিয়ে বসে আছিস কেন ?

—আমরা না থাকলেই বুঝি একা হলো ?

—আমরা বসে বসে গল্প করলে ভারি ভালো সময় কাটবে তার। নইলে বসতে কি ?

মঞ্জু জানে কথাটা সত্য নয়। এই সন্ধ্যার সময়টা ঘরে বসে থাকতে জয়দেবের বিষম আপত্তি। এটা তার তাস খেলবার সময়। তাসটাই নেশা, তাতে খেলাটা তিন তাসের, এ সময়টা তাকে কোন মতেই আটকে রাখা যায় না বাড়ীতে—গেলে আজ অন্ততঃ সে বাড়ী থাকতই। এতক্ষণে কবে সে চলে যেত। কিন্তু বাড়ীর প্রতি কর্তব্যটাকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে সব সময় চলা যায় না—অবশ্যি তাতেও আপত্তি ছিল না তার। আপত্তিটা বাড়ীর এবং তা এমন কম জোরালো নয় যে অনায়াসে অবহেলা করা চলে। সুদর্শনকে একা দেখে দু-একবার ঘরে ঢুকে দু-চারটা কথা বলেছে, বসেছে আবার উঠে এসেছে আবার গেছে। তার পর আমিতাকে উপরে ডেকে ত্যক্ততা প্রকাশ করেছে—তবু কারু দেখা নেই। এ ভাবে যেতেও পারছিল না বসতেও পারছিল না। এবার সে হাঁটা দিল। কিন্তু ক'পা গিয়েই ঘুরে এসে ডাকল মঞ্জুকে, এই মঞ্জু শোন। মঞ্জু এলে নীচু গলায় বলল—কুড়িটা টাকা দে না। কালকেই দিয়ে দেবো। ঐ যে সেদিন দিয়েছিলি ঠিক কথা মতো আজ সকালে তোকে দিয়ে দিয়েছি না ?

হাসল মঞ্জু। তা দিচ্ছি। কিন্তু সকালে নিয়ে সন্ধ্যায় আবার নেওয়াকে কি ঠিকমত দিয়ে দেওয়া বলে? টাকা এনে দিল মঞ্জু। আজ রাত করো না দাদা!

—না না। আজ তাড়াতাড়িই আসব। জয়দেব হাঁটা দিল।

মঞ্জু এসে অতি সাবধানে এবার উঁকি দিল বসবার ঘরে। দেখল সুদর্শন চোখের দু' কোণায় ভাঁজ ফেলে বসে সিগারেট টানছে। চোখের ভাঁজ চিন্তা করছে বলে, না হাতের সিগারেটের ধোঁয়ার জন্য বুঝল না মঞ্জু। ঢুকবে—একটু ভাবল ও। না আগে এক বার রান্নাঘরটা হয়ে আসতে হয়। বৌদিকে নির্ভাবনায় বসে থাকতে বলে এসেছে যে।

ঘরখানা যা সেজেছে পুঁই ডাঁটার চচ্চড়ি আর ইলশে-বেগুন ঝোল রান্নার ঘর তো নয়, যেন এটা বড় হোটেলের বাবুর্চিখানা। ছোট পিসির চাকর কানাইলাল ধবধবে পাজামা আর হাউই সার্ট পরে এমন মুখে হাত চালিয়ে যাচ্ছে যে, এমনি রান্নাঘরে এমন আয়োজনে অভ্যস্ত নয়। শুধু মনিবের খাতিরে কোন মতে কাজটা উতরে দিয়ে যাচ্ছে। আর ওদের রামু তার হাতে থালা প্লেট এগিয়ে দিচ্ছে না তো যেন সবিনয়ে বড় সাহেবের হাতে ফাইল পত্র তুলে দিচ্ছে। হেসে উঠল মঞ্জু। সবাই মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। ছোট পিসি কোলের উপর প্লেট নিয়ে পেস্তা-বাদাম বাছছিলেন। চোখের রিমলেস চশমাটা নাকের উপর ঠিক করে বসিয়ে মঞ্জুর দিকে চাইলেন। মুখে অসন্তুষ্টি—তোমরা দুজনে নাকি ছাদে গিয়ে বসে আছ ?

—অতিথির সামনে বসে কেবল কথা বললেই কি আপ্যায়ন বেশী ভালো করা হয়? একা থাকতে দিতে হয় তাকেও। এবার যাবো।

পেস্তাবাদামের খোসা ঝেড়ে ওঠে দাঁড়ালো ছোট পিসি।—ছেলে যে এমন এককথায় থাকল—আমার আশ্চর্য্যই লাগছে। তোমরা জান না আমি তো জানি, কত বড়ঘরের ছেলে আর কি ভাবে থেকে অভ্যস্ত সে। যদিও পিসিমার দিকে তাকিয়েই ছোট পিসি কথাগুলো বললেন তবু মঞ্জুর বুঝতে কষ্ট হলো না উদ্দেশ্যটা সেই। ছোটপিসির ধারণা ওরা দু'বোনে পাত্র অনুযায়ী যতটা খাতির যতটা সমীহ দেখানো উচিত তা দেখাচ্ছে না। ওদের ব্যবহারটা হচ্ছে সাধারণ।—ওঁদের লক্ষ্ণৌয়ের বাড়ীর যে এলাহি কাণ্ডকারখানার কথা শুনেছি ওঁর মুখে—ছিলেন তো গিয়ে কয় দিন। শুধু ওর জন্যই এ—থেমে গেলেন ছোট পিসি। বোধ হয় তারও বাজল। কারণ বহু বার বহু প্রকারে তিনি বুঝিয়েছেন সম্বন্ধ শুধু মাত্র তাদের জন্য।

হাঁ জানে মঞ্জুরা এ সম্বন্ধ পিসেমশাইয়ের খাতিরে। পিসেমশাই আর পাত্রের ব্যবসায়ী বাবার সঙ্গে কোথা দিয়ে যেন একটা স্বার্থের জট পাকিয়ে গেছে আর তারই ফল এটা। এ সম্বন্ধ হবার পর ছোট পিসির বুক চিরে একাধিক বার দীর্ঘশ্বাস পড়ে একটি মেয়ের জন্য। তবু একথা সত্য, এ বিয়ে তারই জন্য। মঞ্জু পিসিমার এই সাময়িক থেমে যাওয়ার ফাঁকে রওনা হলো। —আমি যাচ্ছি বসবার ঘরে। কিছু করবার হলে ডেকো। বৌদিকে আমি সুদর্শন বাবুর শোবার ঘরটা যে ঘরে হবে সেটা ঠিক করতে দিয়ে এসেছি।

ভালো কথা মনে পড়িয়ে দিল মঞ্জু। বাড়ী থেকে ডানলোপী তোষক বালিশ আনতে গাড়ী পাঠাতে হবে তো। বাসুদেব উঠে দাঁড়ালো। —আমি যাচ্ছি। তার উৎসাহের কারণ ভালো মিস্ত্রির খোঁজ, সে গাড়ীটা নিয়ে ঘুরতে পারবে। সমস্ত দিন আজ সে এই করছে। তার ধারণা, এ বিষয়ে তার জুড়ি নেই। বিদ্যাটা শেখাতে বললে বলে, এও মস্ত আর্ট। আর্ট যেমন বলে শেখানো যায় না—এও তেমনি। প্রতিভা থাকা চাই।

মঞ্জু এলো বসবার ঘরে। সুদর্শন ঠিক তেমনি ভাবে বসে সিগারেট টানছে। সামনের এসট্রেটা ছাই আর আদ্দেক-খাওয়া সিগারেটে ঠেসে গেছে। মঞ্জুকে দেখে সিগারেটের ছাইটা আঙুলের টোকায় ঝাড়তে ঝাড়তে বললো—আসুন।

বসল মঞ্জু। আঁচল দিয়ে মুখ মুছল। একটু অপেক্ষা করল। তার পর জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—মেঘ করেছে, ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে বেশ, কোথাও বোধ হয় বৃষ্টি হচ্ছে।

সুদর্শন তাকিয়ে রইল ওর দিকে। কিন্তু কথা বলল না কিছু।

মনে মনে মাথা নাড়ল মঞ্জু। তখন মৌরীর কাছে অপ্রস্তুত ভাবে হঠাৎ ক্ষমা চেয়ে ফেলতে গেলেও ব্যক্তিটি অমন সহজে হাত-জোড় করার নয়।

[ক্রমশঃ।

মানবেন্দ্র পাল

এক-ঝাড় রজনীগন্ধা কলেজ স্ট্রীট থেকে কিনে নিল রেখা।

এটা অবশ্য উপরি। হঠাৎ খেয়াল হল। ভাবল মন্দ না। আজ বিছানার কাছে নিঃশব্দে রজনীগন্ধা যখন আলো করে থাকবে তখন সেই আলোয় ওরা দু'জন অন্ধকার সিঁড়ি অতিক্রম করে ফিরে যাবে সুদূর অতীতে। আজকের রাতটা তো জেগে থাকবার রাত। আজ আর কিছুতেই ঘুমোতে দেবে না ওকে। ভালোই হয়েছে, কাল রবিবার। কাজেই শনিবারের একটা রাত জাগলে কিছুই হবে না।

আবার ট্রামে উঠল রেখা। ও অফিস থেকে ফেরবার আগেই সমস্ত গুছিয়ে ফেলতে হবে।

প্রতি বছর এই দিনটিতে জোর কমপিটিশান চলে। কেউ কম যায় না। তবে রেখা হারেনি। বরঞ্চ অবনীই হেরেছে দু-এক বার।

বাড়ি এসেই অবনীকুমার দেখে এক অদ্ভুত ব্যাপার! সমস্ত ঘরটা নিখুঁত ভাবে সাজানো। সাজানো অবশ্যই প্রত্যেক দিনই থাকে কিন্তু এ দিনটায় মনে হয় সারা দুপুর ধরে রেখা পরিশ্রম করছে। খাট আলমারী টেবিল চেয়ার এমন কি বুক-শেলফটা পর্যন্ত স্থান পরিবর্তন করেছে। বছরে এই একটি দিন রেখা এক বার করে সব সরিয়ে নড়িয়ে রাখে। এক বছরের একঘেয়েমিকে এমনি ভাবে এই বিশেষ দিনটিতে রেখা বদলে নেবার চেষ্টা করে।

ঘরে ঢুকেই অবনী সব বুঝতে পারে। অমনি লজ্জায় অপরাধে মাথা হেঁট হয়ে যায়।

অফিসের কাপড় তখনো ছাড়া হয়নি, এমন কি ফ্যানটা পর্যন্ত খুলে দেওয়া হয়নি, বিস্মিত বিমূঢ় অপরাধী অবনীকুমারকে ঠিক এই মুহূর্তে চকিত করে দিয়ে পর্দা সরিয়ে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় রেখা।

মুখের ওপর চক-চক করছে এক টুকরো হাসি। দু'চোখে অভিমান ভরা জল। কোনো রকমে একটা খাম বাড়িয়ে দিয়ে বলে—সার, আপকো একঠো চিঠি হায়।

এই বলে অবনীর হাতে কোনো রকমে খামটা গুঁজে দিয়ে রেখা দ্রুত পালিয়ে যায়।

খাম খোলবার আর দরকার হয় না। সেই মুহূর্তেই অবনীর সব মনে পড়ে। আবার এক বার বিবেকের দংশন বুকখানা জ্বালিয়ে দেয়। মনে মনে ভাবে ইস্! কী ভুল! এ মুখ নিয়ে রেখার কাছে দাঁড়াবে কী করে?

খামখানা ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়ে।

—আজ আমাদের বিয়ের দিন। তোমাকে প্রণাম জানাচ্ছি।

বিষয়বস্তু সেই একই। তবু রোমাঞ্চ আছে, তবু সামান্য এই দুটি লাইনের জন্যেই আজ অবনীকুমারের নিদারুণ পরাজয়।

বিয়ের অনেক পূর্বে থেকেই রেখার সঙ্গে অবনীর ঘনিষ্ঠতা ছিল। চিঠিপত্রও চলত নিয়মিত। তারপর ক্রমে ক্রমে ওরা ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। কিন্তু চিঠি লেখাটা বন্ধ করে নি। এটা রেখারই তাগিদ। ও বলে—চিঠি লেখার ভেতর একটা রোমান্স আছে। তাছাড়া যখন আমরা ছিলাম পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে—যখন কোনো ক্রমেই আমাদের নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না, তখন বিশ্বস্ত ভাবে কাজ করেছে এই পত্র-দূত। আজ দিন ফিরেছে বলে কি একে বাদ দেব?

সেই থেকে এমন কি বিয়ের পরও নিয়ম হল, অন্তত এই বিয়ের দিনটিতে ওরা পরস্পর পরস্পরকে এই একই বাড়ির ঠিকানায় চিঠি দেবে। একই দিনে একই পিওন একই বাড়িতে দুটি নীল খামে-ভরা চিঠি বিলি করে দিয়ে যাবে।

প্রথম প্রথম রেখাই মনে করিয়ে দিত। মুখে কিছু বলত না। ঘুম থেকে উঠেই একটি প্রণাম।

অবনীকুমার শশব্যস্ত হয়ে উঠত—আরে আরে, কী ব্যাপার!

—কী ব্যাপার মনে নেই?

বুদ্ধিমান অবনীকুমারের মনে পড়ে যেত। তাড়াতাড়ি বলতো ও তাই তো!

—আমায় চিঠি লিখেছ?

—চিঠি!

—তাও ভুলে গেছ? বেশ আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি না পাই তো, জন্মের মতো আড়ি।

অবনীকুমার আর বিছানায় শুয়ে থাকে না। তাড়াতাড়ি উঠে কোনো রকমে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে তখনই বেরিয়ে পড়ে পোষ্টাফিসের উদ্দেশে। ওখানেই একটা চিঠি লিখে পোষ্ট করে দেবে।

কিন্তু এর পর আর রেখা মনে করিয়ে দিত না। যত পুরনো হচ্ছিল ওরা, তত যেন অবনী কেমন ঢিলে হয়ে পড়ছিল। ঢিলে হয়ে পড়ছিল যরে; তেমন করে রেখার সঙ্গে গল্প করে না, তেমন করে কথায় কথায় বলে না—চলো বেড়িয়ে আসি। যেটুকু কথা হয়, তা শুধু অফিস নিয়েই। কেমন করে উন্নততর গ্রেডে যাবে, সেই চিন্তাতেই অবনী যেন বিভোর।

রেখার এটা ভালো লাগত না। তাই অভিমান বাড়ত দ্বিগুণ। ঠিক করলে, বিয়ের দিনের কথা আর মনে করিয়ে দেবে না।

দেয়ও না আর।

বেচারী অবনীকুমার প্রথম প্রথম কয়েক বার ভুলে গিয়ে লজ্জিত বেদনায় প্রতিজ্ঞা করলে মনে মনে, আর কখনো ভুল করবে না। সেই থেকে নতুন বছরের ক্যালেণ্ডার পেয়েই অবনীকুমার বিয়ের দিনটিকে চিহ্নিত করে রাখত।

এতে অবশ্য অবনীকুমারের আর ভুল হয়নি। ভুল হয়নি মানেই হার হয়নি। রেখা মনে মনে সুখী হত। কিন্তু স্বামীকে এই বিশেষ দিনটিতে চমকে দেবার জন্যে মনে মনে নানারকম ফন্দিও আঁটত। এবং প্রতিবারই ভাবত—আজ যদি ওর 'চিঠি' না আসে, যদি ভুলে গিয়ে থাকে, তাহলে—

কিন্তু অবনীকুমারের আর ভুল হয় না।

ট্রাম চলেছে। লেডিজ সাটটার এক পাশে রজনীগন্ধার ঝাড়টি সন্তর্পণে নিয়ে রেখা তাকিয়ে আছে ফুটপাথের দিকে। মনটা বড়ো প্রফুল্ল। অনেক দিনের অনেক কথা সব ভিড় করে আসে। কিন্তু

না, এখন থাক। সে সব কথা আলোচনা হবে আজ রাত্তিরে। সারা রাত ধরে।

ফুল কেনাটা হল এবার উপরি। এর আগে কোনো বছর ফুল কেনার কথাটা মনে হয়নি। ঘর-দোর গুছিয়েছে, পরিষ্কার করেছে, অবনীকুমারের মনের মতো খাবার তৈরি করে রেখেছে, একমাত্র কন্যা চিনুকে স্বামীর কোল থেকে বার বার নিজের কাছে টেনে নিয়ে অজস্র বার আদর করেছে। তারপর বিকেলের ডাকে দু'জনের চিঠি এলে, দু'জনেই অপরিসীম কৌতূহলে পড়ে ফেলেছে। কিন্তু ফুলের কথা মনে হয়নি কারও। অবনীকুমার শাড়ী কিনে এনেছে সেদিন, কিন্তু ফুল আনবার কথা মনে পড়েনি।

মনে পড়ল এবার রেখার। হঠাৎই মনে পড়ল। দশ বছর আগে একদিন এক ভীরু স্বরূপ যুবক তার কাছে ফুল নিয়ে এসেছিল। সেদিনটা রেখার বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কিন্তু সেই মানুষটার সঙ্গে আজকের মানুষটার তফাৎ যে অনেক!

সে আর ফুল নিয়ে এল না কোনো দিন।

বাড়ি এসে পৌঁছল যখন রেখা তখন পাঁচটা বাজছে। যদিও আজ শনিবার, তবু অবনীর ফিরতে সেই সাড়ে পাঁচটা। অফিস আর অফিস। অফিসের চেয়ে বড়ো যেন আর কিছু নেই।

ঘরে ঢুকতেই চিনু ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল মাকে।

—কী সুন্দর ফুল!

—তোর বাবা আসেনি?

চিনু বলে—না, বাবা আসেনি, তবে বাবার নামে একটা চিঠি এসেছে। বলে তখুনি চিনু ছুটে গিয়ে একটা নীল খাম এনে দিল।

রেখা দেখল এটা ওরই চিঠি। কিন্তু—

কিন্তু তার নামে তো চিঠি এল না! জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, আর কোনো চিঠি আসেনি?

চিনু যেন মায়ের দুঃখটা বুঝতে পারল। বিমর্ষ ভাবে মাথা নেড়ে বললে—না তো!

রেখার চোখ দুটো মুহূর্তে কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। যে আনন্দের দীপটি এতক্ষণ ধরে তার মনের গভীরে আলোময় করে রেখেছিল, এই মুহূর্তে কে যেন সেটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলে।

কিন্তু তাও মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই রেখার দুই চোখ চকচক করে উঠল। পাতলা ঠোঁটের ওপর দাঁতের কামড় বসিয়ে কী যেন ভাবল। তার পর গম্ভীর ভাবে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল, হয়তো এখুনি আজকের এত আয়োজন তছনছ করে ফেলবে, কুচিয়ে ফেলবে রজনীগন্ধার পাপড়ি।

কী জানি, রেখার যত বয়েস বাড়ছে তত যেন বাড়ছে অভিমান। একটুতেই যেন ভেঙে পড়ে—গলে যায়, কিছুতেই শুনতে চায় না অবনীর কোনো কথা। কেবলই মনে হয়, সে মানুষটা যেন আর নেই—সেই রোমান্টিক পুরুষটা যেন দূরে সরে যাচ্ছে—বহু দূরে।

কিন্তু অশান্তি সে দিন ঘটল না। অবনীকুমার এল একটু পরেই। হাসি-খুশি মুখ। তবু যেন কোথায় একটু অপ্রস্তুতের ভাব। হাতে একটা নতুন-কেনা কাপড়ের মোড়ক। ঘরে ঢুকেই চিনুকে কাছে টেনে নিয়ে একটু আদর করে জিগ্যেস করলে—তোর মা কোথায় রে?

চিনু নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। তার পর নিচু গলায় বললে—মায়ের মন খুব খারাপ।

অবনীকুমার চমকে উঠল। বললে—কেন?

—বোধ হয় মায়ের নামে চিঠি আসেনি অনেক দিন, তাই।

চিনু একটু থেমে আবার বললে—আজ একটু আগেই খবর নিচ্ছিল চিঠি আছে কি না—ওই যা—বলতে ভুলে গিয়েছি, তোমার নামে যে একটা চিঠি এসেছে।

এই বলে চিনু এক-ছুটে চিঠিখানা আনতে গেল। অবনীকুমার সেই সুযোগে জামার পকেট থেকে একটা মুখ-আঁটা ঠিকানা-লেখা খাম বের করে টেবিলে রেখে দিলে। যথানিয়মে রেখাকে চিঠি আজ সকালেই লিখে রেখেছিল কিন্তু পোষ্ট করতে ভুলে গিয়েছিল বেমালুম।

মনে মনে অবনীকুমার তাই কন্যাকে অজস্র ধন্যবাদ জানালে—ঠিক সময়ে চিঠির কথা তুলেছিল।

মিটমাট হয়ে গেল। মনোমালিন্যটা আর হল না। খাম দেখেই রেখার মনের গ্লানি দূর হয়ে গেল। লক্ষ্য করবার সময় পেল না, খামে পোষ্টাপিসের ষ্ট্যাম্প আছে কি না।

বেশ কেটে গেল সেদিনের সন্ধ্যাটা। স্বামি-স্ত্রী আর ঐ দশ বছরের কন্যা চিনু। হাসি-গল্প আর খাওয়া।

চিনু অবনীর গলা জড়িয়ে ধরে বললে—আজ আর সন্ধ্যের সময় তুমি বেরোতে পারবে না বাবা!

অবনীকুমার হাসল একটু। বললে—আচ্ছা, তাই হবে।

চিনু এবার মায়ের কোল ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো। বললে—মা, আমার জন্মদিন কবে?

—জন্মদিন! রেখা যেন চমকে উঠল।

চমকাবার মতো ব্যাপার তো কিছু নয়! অত্যন্ত সাধারণ একটি শিশুমনের জিজ্ঞাসা।

কিন্তু রেখার মনে হল, যদিও চিনুর এক বছর বয়েস থেকেই জন্মদিন নিয়মিত ভাবে উদ্‌যাপন করে আসা হচ্ছে তবু এই প্রথম চিনু নিজে জিগ্যেস করে জানতে চাইল, জন্মদিন কবে?

রেখা যেন কেমন থিতিয়ে গিয়েছিল। অবনীকুমারের লক্ষ্য এড়ায়নি। বললে,—কী হল এমন চুপ করে গেলে?

রেখা যেন কোন্ দূর জগৎ থেকে ফিরে এল। শুকনো গলায় বললে—চিনুর জন্মদিন—

অবনীকুমার তখন মেয়েকে ডাকল নিজের কাছে। বললে—এসো মা, আমি বলে দিচ্ছি।

চিনু মায়ের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে বাপের কোলে উঠে বসল।

অবনীকুমার ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে বললে—আজ হচ্ছে ইংরিজির কত তারিখ? কুড়ি না? বিশে জুলাই আমাদের বিয়ের দিন, আর তেইশে আগষ্ট হচ্ছে তোমার জন্মদিন। তা হলে বল দেখি আর ক'দিন বাকি রইল?

অবনীকুমার আদর করে মেয়ের গালে একটা চুমু দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু দেওয়া হল না। মুখ তুলে সামনে তাকাতে হল। রেখা ধীরে

ধীরে উঠে চলে যাচ্ছে।' অত সুন্দর মুখখানা এই মুহূর্তে যেন কেমন কালো হয়ে উঠেছে।

অবনীকুমার ভাবল একবার ডাকে, কিন্তু জানে, ডাকলে ত রেখা এখন আর আসবে না। ওর সেই পুরনো জায়গায় অনেক দিন পর আজ আবার নতুন করে আঘাত লেগেছে। এখন ওকে শুধু শুধু ডাকা মানেই চিনুর টনক নড়ানো। এখুনি হাজার রকম প্রশ্ন করে বসবে,—মায়ের কী হয়েছে বাবা? মা চলে গেল কেন? মাসের মুখটা অমন শুকনো কেন? বলো না?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিল অবনীকুমার। না, ডেকে দরকার নেই। রেখা একটু একলা থাকুক। আর চিনু—তার মনটাকেও প্রফুল্ল রাখা দরকার। ও এখন শিশু। ওর মনে যেন আঁচড়টি না পড়ে।

শ্রাবণের রাত্রি। বাইরে ঘন অন্ধকার। ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

এ একটা দুর্লভ রাত। চিনু বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে অকাতরে। এ পাশে অবনীকুমার আর রেখা। কারও মুখে কথা নেই। অবনীকুমারও তো প্রস্তুত ছিল তার জন্যে। কিন্তু—

কিন্তু কোথা দিয়ে যেন কী হয়ে গেল। কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে চিনু কী যেন বলে ফেলেছিল। কে জানত তার প্রতিক্রিয়া গড়াবে এত দূর।

অবনীকুমার কিন্তু জানে। জানে বলেই ও-ও আজ কথা বলছে না, ঘাঁটাচ্ছে না রেখাকে। একটু আদর করলেই যে রেখার মন ফিরে যাবে এমন তরল মন যে নয়। ও মনকে আয়ত্ত করা বড়ো কঠিন।

জানলা দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টির ছাট আসছিল। অবনী বললে একবার—জানলাটা বন্ধ করে দেব? রেখা উত্তর দিল না। মাথার কাছে অন্ধকারে সেই রজনীগন্ধার ঝাড়—যেন আলোর ফোয়ারা। সেই আলোর পথ দেখে দেখে কত সর্পিল সিঁড়ি অতিক্রম করে রেখা তখন পেছিয়ে চলেছে। চলেছে কোন সুদূর অতীতে।

বারো বছর আগের কথা। সে তো বড়ো কম দিন না! বারো বছর আগে এই অবনীকুমার ছিল সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। যৌবনের মাতাল রক্ত তখন ফুটছে সর্বাঙ্গে—চওড়া কপাল। দীর্ঘ সুঠাম দেহ—বুকভরা সাহস।

এক দিন রেখার সঙ্গে এক অলস দ্বিপ্রহরে লুডো খেলতে খেলতে চট করে নিজের পাকা ঘুঁটিটা রেখার ঘুঁটির সামনে এগিয়ে দিল।

রেখা একটু চমকে পুলকিত হয়ে গভীর আগ্রহে ছক্কাটা খোলের মধ্যে নাড়তে লাগল, যেন অবধারিত তিন পড়ে। তিন পড়লেই খাওয়া।

অবনীকুমার হেসে বললে—খুব সাহস আমার না?

ঠোঁট টিপে একটু হাসল রেখা। চাপা সুরে বললে,—সাহস নয় দুঃসাহস।

এই সামান্য একটি কথার কিন্তু তাৎপর্য ছিল গভীর। আগের দিন বিকেলেও অবনীকুমার এসেছিল রেখাদের বাড়ি। কলকাতার পরিবেশ। নিজেদের বাড়িতে লোকের অভাব নেই। তাছাড়া অন্য ভাড়াটেও রয়েছে। ঘরের সামনে দিয়েই সবাই যাতায়াত করে। তবু তারই মাঝে কেমন করে যে অবনীকুমার কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে রেখাকে টেনে নিয়েছিল, তা যেন কিছুতেই ভাবা যায় না।

উনিশ বছরের রেখা তখন থরথর করে কাঁপছিল।

—ছাড়ো ছাড়ো, কী সর্বনাশ!

রেখা ছাড়তে বললে বটে কিন্তু ততক্ষণে চোখ তার বুজে এসেছে।

অবনীকুমার ছাড়ল বটে, কিন্তু তখুনি না। রেখার পাণ্ডুবর্ণ ঠোঁট দু'টির ওপর আর একবার তৃষার্ত দৃষ্টি মেলে বললে, কেমন জব্দ?

ততক্ষণে রেখা সামলে নিয়েছে। এক বার ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে এল। না কেউ নেই।

আবার এসে ঢুকল ঘরে। অবনী তখন অন্যমনস্কের ভাণ করে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। রেখা এসে দাঁড়ালো পাশে।

—আমার খুব সাহস না? অবনী গভীর ভাবে তাকালো একবার।

রেখা বললে—সাহস নয় দুঃসাহস।

—কেন?

—কেন জিগ্যেস করছ? যদি ধরা পড়তাম তাহলে কী সর্বনাশ হত ভাবতে পার?

সর্বনাশের কথা কোনো পুরুষই ভেবে এগোয় না। যারা ভাবতে যায় তারা এগোতে পারে না। যারা এগোতে চায় তারা বুকের মধ্যে মশালের আগুন জ্বালিয়ে এগোয়—সে আগুনের তাপে মেয়েদের জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তারা সেই আগুনের শিখাটুকু নিজেদের বুকের গোপন গহ্বরে লুকিয়ে রেখে মত্ত আনন্দ পায়। সে মৃত্যুর মতো পুলক বুঝি আর কিছু নেই।

রেখা এমনি ভাবে দিনে দিনে তিলে তিলে মরছিল। মরছিল আর এক বিচিত্র আনন্দে তার সমস্ত হৃদয়টুকু ভরে উঠছিল।

কিন্তু এ সুখ চিরদিন রইল না। রেখার মা-বাবা ক্রমশঃ লক্ষ্য করলেন অবনীর ওপর রেখার একটা কেমন দুর্বোধ্য আকর্ষণ গড়ে উঠছে। এটা তাঁদের ভালো লাগল না। বিশেষ রেখার স্বচ্ছলতা। রেখা যে তাঁদের বড়ো আদরের, বড়ো গর্বের মেয়ে।

অবনীর ওপর ওঁদের কোনো মোহ ছিল না। ছেলেটি সুশ্রী শিক্ষিত লোভনীয় বটে—কিন্তু—ব্রাহ্মণ নয়। এমন কোনো দায় তাঁদের উপস্থিত হয়নি যার জন্যে রেখার মতো মেয়েকে এই পাত্রেরই হাতে তুলে দিতে হবে। এখনো সময় আছে অনেক—এবং রেখার সুন্দর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করবার মতো সম্ভাবনাও যথেষ্ট। সব ভেবে তাই অকস্মাৎ এক দিন অবনীকুমারের ওপর নোটিশ পড়ল। ও যেন আর এ বাড়ি না আসে কখনো।

এ কথা রেখা জানতে পারেনি প্রথমে। যখন জানল, তখন পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু নষ্ট করবার মতো সময় নেই। এখনো পাশের ঘরে ও বসে আছে একা। এতক্ষণ নিশ্চয়ই চলে যেত, কিন্তু যে বাড়িতে এত দিনের এত যাওয়া আসা সে বাড়ি থেকে চিরদিনের মতো চলে যাবার আগে একবার কি সে বাড়ির সেই মানুষটির সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

কোলকাতার নিউ মার্কেট, যাকে পুরোনো আমলের লোকেরা হগ সাহেবের বাজার বলেন, একটি অতি আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠান। কথায় বলে কোলকাতা সহরে পয়সা ফেললে মাঝরাতেও বাঘের দুধ পাওয়া যায়। নিউ মার্কেটের দোকান বাজার, আর হরেক রকমের মাল দেখে কথাটাকে একেবারে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দোকান পাট ছাড়াও নিউ মার্কেটে দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে, যথা নানারকম দোকানী ও খদ্দের ধরবার জন্য তাদের অভিনব উপায় অবলম্বন। শোনা যায় সাহেব, ও বিশেষ করে মেম সাহেব দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখলেই কোন কোন দোকানী নিজেকে একত্রে ইংরাজী ভাষাভাষী ও বিনয়ী দোকানদার প্রতিপন্ন করবার জন্য হাত নেড়ে বলেন "টেক তো টেক, নট টেক নট টেক, একবার তো সি" অর্থাৎ জিনিষ কিনুন বা না কিনুন, দোকানে এসে একবার দেখে তো যান! দোকানীর এই অভিনব আবেদনে বহু ঘোড়েল খদ্দেরও নাকি ঘায়েল হয়েছে বলে শোনা যায়। মাত্র এক মিনিটের জন্যে দোকানে গিয়ে শেষে ঘণ্টাখানেক পরে হরেক রকম মালপত্তর কিনে খদ্দেরকে বেরুতে দেখা গেছে।

আবার খদ্দেরও নানারকম। কেউ কেউ পুরনো ধরনের ও পুরনো প্যাটার্ণের জিনিষ পছন্দ করেন। আজকালকার বাজারে নিত্যই নতুন জিনিষ আবিষ্কার ও চালু হচ্ছে কিন্তু এঁরা সেই যে পুরনো জিনিষ আঁকড়ে বসে আছেন তো আছেনই তার আর কোন নড়চড় নেই। আর এক ধরণের খদ্দের আছেন যাঁরা নতুন ধরণের জিনিষ দেখলেই তা কিনে যাচাই করে দেখেন। যে কোন সমাজের পক্ষে এ ধরণের লোক বিশেষ দরকার কারণ এঁরা না থাকলে প্রগতি প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে এবং নতুনত্বের স্বাদ চলে যাবে। সব নতুন জিনিষই যে ভাল হতে হবে তা বলছি না। আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগে জিনিষ ভাল না হলে বাজারে তা টিঁকতেও পারে না কারণ খদ্দের বিজ্ঞাপন দেখে বা নতুন জিনিষ বলে একবার কিনে পরখ করেই বুঝবে এবং ভাল না হলে দ্বিতীয়বার আর কিনবে না। আজকের এই দ্রুত বৈজ্ঞানিক যুগে ভালো নতুন জিনিষ আমাদের সংসারে রোজই প্রায় আসছে এবং স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে। ধরুন পেনিসিলিন কদিনই বা বেরিয়েছে কিন্তু আজ ঘরে ঘরে ডাক্তারেরা ব্যবহার করছেন। ইংরিজীতে একে বলা হয় ওয়াণ্ডার ড্রাগ বা অত্যাশ্চর্য্য ওষুধ। বিশ বছর আগে কজনের ঘরে নাইলনের জামাকাপড়, প্ল্যাষ্টিকের জিনিষ ছিল? অথচ আজ এ সব জিনিষ কত হাজার হাজার পরিবারে স্থান পেয়েছে। তেমনি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বনস্পতি। বনস্পতি, বিশেষ করে ডালডা বনস্পতি আজ দেশের লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে তার প্রধান কারণ ডালডা বনস্পতি ভালো জিনিষ।

বনস্পতির গুণাগুণ সম্বন্ধে সরকারী গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ডালডা বনস্পতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো কিনা একথা অনেকেই প্রশ্ন করেন। এর উত্তর হচ্ছে ডালডা বনস্পতি ভালো না হলে আজ ঘরে ঘরে তার এতো আদর হোতনা। ঘি অতি উত্তম জিনিষ, কিন্তু আজকাল খাঁটী ঘি সাধারণ লোকে যে দামে কিনতে পারে, সে দামে সবসময় পাওয়া মুস্কিল। তাই রোজকার জন্য নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। জানেন কি ডালডার প্রতি আউন্সে ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়, যা ভাল ঘিয়ের সমান? ডালডা স্বাস্থ্যের জন্যে তাই এতো ভালো। ডালডা শুধুমাত্র খাঁটি ভেষজ তেল থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্বদাই শীল করা ডবল ঢাকনা'ওলা টিনে পাওয়া যায়। ডালডায় সব রান্নাই মুখরোচক হয়। নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি কিনুন—জানেন তো ডালডা শুধুমাত্র খেজুর গাছ মার্কা টিনে পাওয়া যায়—সর্বদা দেখে কিনবেন।

রেখা তা বুঝেছিল, তাই কোনো রকমে চোখের জল লুকিয়ে নিজের পড়ার বইগুলোর মধ্যে থেকে কী একটা বই টেনে নিল, ওই অল্পসময়টুকুর মধ্যেই এক টুকরো কাগজে কী যেন লিখল খস-খস করে। তারপর বেরিয়ে এল।

দ্রুত পায়ে এগোচ্ছিল ও পাশের বারান্দার দিকে—মা বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। ভুরু কুঁচকে বললেন—একটু রান্নাঘরে এসো না।

রেখা ফিরে দাঁড়ালো, চোখ ছ'টো লাল হয়ে উঠেছে। কান্না-জড়ানো স্বরে বললে—আসছি।

মা বিচলিত হলেন না। বললেন—ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?

এবার আর রেখা ফিরে দাঁড়ালো না বললে—ও ঘরে অবনীদা' রয়েছে, ওঁর একটা বই ফেরত দিয়ে আসছি।

ঝড়ের মতো ঘরে এসে ঢুকল রেখা। অবনীর চোখের দিকে তাকাবার মতো মনের জোর তার ছিল না। কোনো রকমে বইটা একটু খুলে চিঠিটা দেখিয়ে দিয়ে অবনীর হাতে সবশুদ্ধ সমর্পণ করে রেখা চলে গেল।

অবনী একবার ভাবল এখুনি সেও উঠে চলে যায়; কিন্তু দৃষ্টিকটু বলে বসে রইল। বসে রইল আরও আশায়—যদি রেখার মা আসেন। যদি লজ্জিত হয়ে বলেন—ওঁর কথায় তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা, তুমি যেমন আস, তেমনি এসো।

কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে গেল, তবু কেউ এল না। তখন অবনীর মনে আর একটা দুরাশা জেগে উঠল, ভাবল, রেখা হয়তো আর একবার আসবে।

নির্নিমেষ চোখে অবনী তাকিয়ে রইল। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক টুকরো আকাশ। এই অসময়ে কোথা থেকে বাতাস ঘরে এসে ঢুকল। দূরে শূন্য টিপাইয়ের ওপর ঢাকাটা সেই বাতাসে উড়তে লাগল।

সে মুহূর্তে অবনীর মনে হল, এত বড়ো শূন্যতা বুঝি জীবনে তার কখনো আসেনি।

* * * *

আজকের আকাশটাও তেমনি মেঘাচ্ছন্ন। তবে জুলাই মাস। মেঘটা আকস্মিক নয়।

অবনী এক বার পাশ ফিরে শুলো। না, রেখাও ঘুমোয় নি—কপালের ওপর হাতটা ফেলে রেখেছে। যেন তার মুখটা দেখতে না পায় কেউ।

দীর্ঘ বারো বছর আগে সেদিন বেলা বারোটায় সময় রেখাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই অবনী চিঠিখানা পড়লে। মাত্র দু-তিন লাইনের চিঠি—এমনি সর্বনাশ যে হবে তা আমি অনুমান করেছিলাম। যাক্‌ এর জন্তে দুঃখ করি না তোমার ঠিকানাটা আমার জানা আছে। আমি তোমায় প্রতি মঙ্গলবারে চিঠি লিখব। সে চিঠি তুমি ঠিক পাবে বুধবারে। আর তুমি লিখো শুক্রবারে যেন চিঠি পৌঁছয় ঠিক শনিবারে। আমি প্রতি শনিবার বিকেলে পিওনের জন্তে পথ চেয়ে থাকব।

তাই হল। প্রতি বুধবার আর শনিবার দুদিক থেকে দু'টি ব্যাকুল হৃদয়ের আন্তরিকতা নিঃশব্দে সবার অগোচরে দুই প্রতীক্ষা-কাতর প্রণয়ীর কাছে এসে পৌঁছতে লাগল।

চিঠির পর চিঠি জমতে লাগল। প্রতিটি চিঠি গুছিয়ে তুলে রাখে। তুলে রাখে ক্রিমক্র্যাকারের একটা শূন্য টিনে। সেটি আবার লুকনো থাকে তার গরম কাপড়ের ট্রাঙ্কের নীচে।

এমনি করে একটির পর একটি মাস কেটে গেল, কেটে গেল একটি বছর।

এখন আর শুধু চিঠি নয়—এখন নিত্য দেখা হওয়া। দেখা হওয়াতেও মন ভরে না, আরও নিবিড় হতে চায়। কত নির্জন বিকেলে ওরা গিয়ে বসেছে মাঠে। কত সন্ধ্যা ট্যাক্সীতে চড়ে বেড়িয়েছে নিরুদ্দেশের পথে।

তবু তৃষ্ণা মেটে না। অথবা প্রণয়ের স্বভাবই এই। প্রথমে একটুখানি হাতের স্পর্শ—আঙুলে আঙুলে ছোঁওয়া; প্রশ্রয় আর সুযোগ পেলে সেই স্পর্শকাতর মনটুকুই আবার সর্বগ্রাসী লোভে প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে। তখন তার দাবী মিটোনোও যত কঠিন—না মিটোনোও তত বিড়ম্বনা।

বিশেষ রেখা—সে যে আবার স্বাদ পেয়েছিল এক বার পুরুষের বুকের উত্তাপের।

এক দিন এই নিয়ে আলিপুর রোডের খালের ধারে বসে এদের মধ্যে বেশ এক পশলা ঝগড়া হয়ে গেল।

অবনীর লোভটা যেন একটু বেশি বেড়ে উঠছিল। কিছু দিন ধরে একটা অন্যায় জিদ অবনীকে যেন ছেলেমানুষের মতো পেয়ে বসেছে। বিকেলে দেখা হলেই অবনী বাঁকা চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বলবে—তা হলে এবার রাজি?

—কী? না জানার ভাণ করে রেখা যেন অন্যমনস্ক ভাবে জিগ্যেস করে।

—কী, জান না? অবনী হাসে।

রেখা লজ্জায় কথা বলে না। নিঃশব্দে মাথা নাড়ে।

—আচ্ছা বেশ, কাছে এসো কানে কানে বলি।

রেখা তাড়াতাড়ি সরে বসে,—কী যে করো এই খোলা জায়গায়! কেউ যখন দেখবে—

—দেবি, দুঃসাহস না থাকলে দুর্লভ জিনিস মেলে না।

—রেখা হেসে বলে—থাক আর দুঃসাহস দেখিয়ে কাজ নেই। এক বার দুঃসাহসের ফলটা তো দেখেছ? এবার পুলিশের হাতে যেতে হবে।

অবনী উত্তর দিল না, চুপ করে রইল।

রেখা একটা চিমটি কাটল। বললে—দুঃসাহসের ক্ষেত্রটা সব সময়েই লুডোর বোর্ড নয় জেনো।

অবনী বললে—তা জানি, কিন্তু আমার প্রাপ্যটা লুডোর বোর্ডের নীচে চাপা দিও না, দোহাই!

এবার রেখা অবনীকে মৃদু একটা ঠেলা দিলে। বললে,—কী বাজে বকছ। ছেলেমানুষ হচ্ছ দিন দিন?

অবনী হাসল আবার। বললে দেবি, পুরুষদের এই ছেলেমানুষীটির লোভেই তোমাদের মতো চরিত্রবতী মেয়েদেরও বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। হয় না কি?

কথা শেষ করে অবনী আস্তে করে রেখার পিঠের ওপর হাতটা রাখল। রেখা সে স্পর্শটুকু সরিয়ে দেয়নি।

সেই যে সরিয়ে দিল না, সেইটেই হল রেখার পরম সম্মতি। অবনী লাফিয়ে উঠল। তা হলে কালই?

—এত ব্যস্ত কেন, বিয়েটা হোক না। রেজিস্ট্রি করে বিয়ে, এর তো হাঙ্গামা নেই।

—তা নেই, বিয়ের পরের বউ আর বিয়ের আগের প্রিয়া এ দুটোর যে তফাত অনেক। আমি প্রিয়াকে পরিপূর্ণ ভাবে পেয়ে বধূকে বরণ করতে চাই রেখা!

রেখা 'না' বলতে পারেনি।

তার পর এল সেই দিনটি। ওর ঘরে সেদিন কেউ ছিল না। চাকরটাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছিল দুপুর বেলাতেই। সেদিন বেলা তিনটের সময় ও এল। রেখা এত কাঁপছিল যে মনে হচ্ছিল এখুনি বুঝি জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে যাবে।

অবনীর হাতটাও কাঁপছিল। সেটা বোঝা গেল যখন ও চাবি দিয়ে তালা খুলছিল।

তবু তালা খোলা হল। ঘরে ঢুকেই রেখা যেন থমকে গেল। এ কোথায় এল? ধবধব করছে বিছানার চাদর—দুটি বালিশ। মাথার কাছে টিপাইয়ের ওপর পেতলের কলসীতে রজনীগন্ধার ঝাড়।

পরস্পর একবার চোখোচোখী হল। রেখা অমনি মুখটা নামিয়ে নিল। এরই মধ্যে ওর মুখটা রাঙিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে অবনী ফ্যানটা খুলে দিল।

সে সন্ধ্যায় রেখা বাড়ি ফিরল সেই রজনীগন্ধার ঝাড়টি বুকে করে। মনটি তার আজ ভরে আছে কানায় কানায়।

মা জিগ্যেস করলে—ফুল কোথায় পেলি রে?

মেয়ে বললে—আমার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম, সে দিয়েছে।

* * * *

এই সেই রজনীগন্ধা। অন্ধকার রাতে এই ফুলেরই আলোয় পথ দেখে দেখে রেখা চলে গিয়েছিল অনেক দূর। এবার যেন চমক ভাঙল। বাইরে বৃষ্টি থেমেছে। পাশে শুয়ে রয়েছে সেই দুরন্ত অবনীকুমার।

ঘুমিয়ে পড়েছে কি? বোধ হয়, না।

শেষ পর্যন্ত রেখার মা-বাবাকেই এগিয়ে আসতে হল অবনীর জন্যে। রেখার বাবা হাত জোড় করে বললেন অবনীকে—দয়া করো।

এ প্রার্থনার দরকার ছিল না। তার আগেই ওরা বিয়ের দিন স্থির ক'রে ফেলেছিল। এবং যথাদিনেই রেখার বাবা যথানিয়মে মেয়েকে সম্প্রদান করলেন অবনীর হাতে।

সবই হল, কিন্তু হল সংক্ষেপে। অবনী বা রেখার তাতে কোনো আক্ষেপ ছিল না। তারা তখন পরিপূর্ণ।

বিয়ে হল এদের বিশে জুলাই, কিন্তু চিনু জন্মালো সেই বছরেই ডিসেম্বর মাসে। অর্থাৎ বিয়ের মোটে পাঁচ মাস পরে।

তা হোক, তবু এদের আনন্দের সীমা নেই। ফুটফুটে মেয়েটি। নিখুঁত গড়ন।

রেখা বলে—এ কার মতো হয়েছে বলো তো?

অবনী বলে—আমার মতো, তাতে আর সন্দেহ কি?

—ইস। উনি যেন এত সুন্দর! এ হয়েছে ঠিক আমার মতো, নয় রে চিনু?

এই বলে ঘুমন্ত শিশুর মুখে বারে বারে চুমু দেয়।

বিয়ের পর একটা দিনও অবনী শ্বশুরবাড়ি যায়নি। রেখাও না। তবু নাতনী হয়েছে খবর পেয়েই রেখার মা সেই রাত্রে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে চিঠি লিখলেন। সে চিঠির শেষ ক'টা লাইন এই—

—পোষ মাসে পোষলক্ষ্মী আমার ঘরে এসেছে। তাকে দেখবার জন্যে আমার মন ছটফট করছে। কিন্তু নিয়ে যাবে কে? উনি তো বাতে পঙ্গু। আমি কলকাতার পথঘাট ভালো চিনি না। তবু আমার পেটের মেয়ের মেয়ে, তাকে দেখবার জন্যে আমাকেই যেতে হবে।

এ চিঠি লিখলেন রেখার মা বারোই পোষ রাত্তিরে। অন্য অন্য চিঠির মতো রেখা এ চিঠিখানাও তুলে রাখলে যত্ন করে। তবে সেই ক্রিমক্র্যাকারের বাক্সে নয়।

অর্থাৎ সে চিঠিগুলো তার নিজস্ব। ভবিষ্যতে অনেক নির্জন মুহূর্তে অবনীর সে সব দিনের চিঠিগুলো পড়বে, কিন্তু পড়াতে পারবে না কাউকে। আর এ চিঠিখানা—এর মূল্য আলাদা। বড়ো হলে একদিন রেখাই তুলে দেবে চিনুর হাতে। বলবে—তোর জন্মদিনে এই হল প্রথম আশীর্বাদ তোর দিদিমার।

দিদিমা হয়তো তখন এ জগতের পাট চুকিয়ে চলে গিয়ে থাকবেন। চিনু সেদিন সেই চিঠি হাতে করে কি ক্ষণকালের জন্যেও তার দিদিমাকে মনে করবে না?

যাক্ সে কথা। মনে করবে কি করবে না, সে এখন বহুদূরের কথা। কিন্তু তার আগেই দেখা দিল আর এক গুরুতর সমস্যা। সে সমস্যার কথা রেখার মনে কোনো দিনই আসেনি। প্রথম মনে করালো ঐ অবনীকুমার।

চিনুর সে বার তিন বছর পূর্ণ হল। প্রতিবারের মতো এবারও স্বামি-স্ত্রীতেই মনের আনন্দে শিশুর জন্মোৎসব পালন করলে। কিন্তু সেই রাত্রেই অবনীকুমার হঠাৎ তুললে একটা সাংঘাতিক প্রস্তাব

প্রথমে অবনীকুমার কোনো কথাই বলে নি। কেমন গম্ভীর হয়ে ছিল। রেখা মৃদু ঠেলা দিয়ে বললে—কী হল? হঠাৎ এত গম্ভীর!

অবনী তবু চুপ।

রেখা আবার খোঁচালো—কী হল?

অবনী ধীরে ধীরে বললে—মেয়ে বড়ো হচ্ছে।

খিল-খিল করে হেসে উঠল রেখা—এ আর নতুন কথা কি? এখন থেকেই মেয়ের জন্যে পাত্র দেখো।

অবনী সে ঠাট্টা শুনল না। বললে—ওর জন্মদিনের তারিখটা বদলাতে হবে।

রেখা ঠিক বুঝতে পারল না। আশ্চর্য হওয়ার সুরে বললে—কেন?

—কেন বুঝতে পারছ না? মেয়ে যখন বড়ো হবে, তখন নিজের জন্মদিনের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় মরে যাবে না? তাছাড়া আমাদেরই কি কম লজ্জা? মেয়ে তখন কী চোখে দেখবে তার বাপ-মাকে? কী ভাববে, কল্পনা করতে পারো?

রেখা বোবা হয়ে গেল। এ দিকটা তো সে ভাবে নি!

অবনী বলছে তখন—মেয়েরা যতো বড়োই হোক মায়ের চেয়ে বড়ো আদর্শ তাদের জীবনে নেই। তুমি আমি মেয়ের সামনে সেদিন কী আদর্শ তুলে ধরব রেখা?

রেখা তখনো চুপ। এক সময়ে ফিস-ফিস করে উঠল—যেন আর কি তিন বছরের মেয়ের কানে না যায়। বললে—তবে উপায়?

উপায় এখনো আছে। চিনু বড়ো হবার আগেই নয় বদলে দিতে হবে আমাদের বিয়ের দিন, মিথ্যে করে বলতে হবে, আমাদের বিয়ে ঐ বছর জুলাই মাসে হয়নি, হয়েছে একটা বছর আগে।

রেখা শিউরে উঠল। বললে—না না, তা হয় না, বিয়ের দিন লুকনো যায় না। ও দিনকে আমি হারাতে পারব না।

—তা হলে চিনুর জন্ম-তারিখটা বদলে দিতে হয়। এখন থেকে আর সাতাশে ডিসেম্বর ওর জন্মদিন করা হবে না। করতে গেলে হিসেব মতো আরও ক'টা মাস পিছিয়ে দিতে হবে।

রেখা এবার উত্তর দিল না। শুধু অবনীর হাতখানা নিজের মুঠোয় তুলে নিয়ে বুকের কাছে টেনে আনল।

পরের বছর চিনুর জন্মদিন পালন করা ডিসেম্বরে হল না। ইচ্ছে করেই অবনীকুমার কঠোর হয়ে রইল—এক বারও রেখার কাছে তুলল না চিনুর কথা।

রেখাও কথা তোলে নি। মনে মনে সেও বুঝেছে, অবনীই ঠিক। ও বুদ্ধিমান পুরুষ—দূরদৃষ্টি আছে। আজ না হয় চিনু ছোটো—কিন্তু যেদিন সে বড়ো হবে—যেদিন নিজের জন্মদিনে নিজের বন্ধুদের ডেকে নিয়ে আসবার ইচ্ছে করবে, সেদিন? সেদিন মা-বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে তার কি লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাবে না?

তখন এক এক সময় রেখার কেমন রাগ হত অবনীর ওপর। মনে হত এ সমস্যার জন্যে তো ওই দায়ী। বিয়ে হওয়া তো পালিয়ে যাচ্ছিল না।

তবু নিরানন্দ এ বছরের এই সাতাশে ডিসেম্বরও রেখা চুপি চুপি লুকিয়ে লুকিয়ে চিনুর জন্যে কিনে দিলে একটা ফ্রক।

এমনি ভাবে চলল আরও ক'বছর। বেশ চলছিল। বছরে দু'দিন বড়ো আনন্দের। বিশে জুলাই আর—আর চিনুর নতুন জন্ম-তারিখ তেইশে আগষ্ট।

এ ছ'-সাত বছরে রেখার বেশ সয়ে গিয়েছিল। প্রতি বছর কেবল জন্মদিন উপলক্ষে চিনুর দু'বার পাওনা হত। এক বার হত সাড়ম্বরে। আর একবার হত অত্যন্ত গোপনে। সে পাওনা এক মেয়ে আর মা ছাড়া আর কেউ জানত না। তবু রক্ষে চিনু ছেলেমানুষ, সে কিছু জিগ্যেস করে না। সে পেয়েই খুশি।

কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল এই বার। আজ প্রায় দশ বছর বয়সের কাছাকাছি এসে মা-বাপের বিয়ের দিনের আনন্দ উল্লাসের মধ্যে সহসা প্রশ্ন করল—মা আমার জন্মদিন কবে?

আজ এই বীতনিদ্র রাত্রিশেষে রেখার সমস্ত বুকখানা যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ভাবল চেঁচিয়ে ওঠে,—হতভাগী মেয়ে, ও কথা আমায় জিগ্যেস করা কেন?

কিন্তু না, ভুল করে চিনু তাকে জিগেস করলেও অবনী ভুল করে নি। ওর জবাব অবনী নিজেই দিয়েছে।

ঠিক এর পর থেকে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন এসে গেল রেখার সংসারে।

দিন কাটতে লাগল। হাসি-খুশি গল্প বেড়ানো। কিন্তু সে বিশে জুলাই আর এল না। রেখা ইচ্ছে করে ভুলতে লাগল। ভুলতে লাগল তাদের অতীত ইতিহাস,—সত্যি ভোলা যায় না, তাই নির্মম পরিহাসে উপেক্ষা করতে লাগল তাদের বিয়ের দিনটিকে। কী দুর্মতি হয়েছিল সেদিন, পারে নি বিয়ের দিনটিকে বদল করতে, তার বদলে সচ্ছন্দে অস্বীকার করে গেল ডিসেম্বরের সাতাশ তারিখটিকে। আজ এই দীর্ঘদিন পরে মনে হয় রেখার, মা হয়ে কী করে পেরেছিল সেদিন এত বড়ো নির্মম হতে?

আজ তাই ঘৃণায় লজ্জায় সংকোচে রেখা ভুলতে বসল তার অতীতকে।

বিয়ের দিনটা ঠিক আসে, কিন্তু তেমন ভাবে রেখা আর অবনীকে প্রণাম করে না। পিওন ঠিক ঐ দিনেই হয়তো চিঠি দিয়ে যায়, কিন্তু সে চিঠির কোনোটিই আজ আর অবনী কিম্বা রেখার লেখা নয়। চুপচাপ—নিঝুম মনমরা বিবাহ-বাৎসরিক একটার পর একটা আসে আর চলে যায়।

অবনী সব বোঝে। কিন্তু একটি কথাও বলে না। শুধু মাঝে মাঝে জিগ্যেস করে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়া মেয়ে চিনু—আচ্ছা মা, আগে তোমাদের বিয়ের দিনে যেমন আনন্দ হত, এখন তেমন হয় না কেন?

রেখার মুখে এক টুকরো ম্লান হাসি ফুটে ওঠে। বলে,—মন বদলে যায় রে।

—কিন্তু দেখো, আমার জন্মদিনের বেলায় তোমাদের মন আবার এমনি ভাবে বদলে না যায়। এবার আমার কয়েক জন বন্ধুকে বলতেই হবে। মা—

রেখা যেন চমকে উঠল।

—তোমার কী হয়েছে বলো তো?

রেখা বলে—শরীরটা ভালো যাচ্ছে না রে। ভাবছি, তোর বিয়ে থা একটা দিয়ে যেতে পারলে বাঁচতাম।

চিনু মুখ লাল করে দ্রুত চলে যায় পড়ার ঘরে।

কিন্তু সমস্যা আরও আছে। আগষ্ট মাসের জন্মতারিখটার জন্যে সমস্যা নয়, সমস্যা সেই পুরনো ডিসেম্বরের সাতাশ তারিখটার জন্যে। রেখা আজও চুপি চুপি যে ঐ দিনটায় মেয়েকে কিছু দেয়। এখন আর ফ্রক নয়, এখন শাড়ী।

চিনু অবাক হয়ে যখন জিগ্যেস করে—তুমি প্রত্যেক বছর এই সময় একটা করে শাড়ী দাও কেন মা? তখন রেখা লজ্জায় সংকোচে

সংকোচে আর দাঁড়াতে পারে না। বিস্মিত চিনুকে অভিভূত করে দিয়ে রেখা যেন ছুটে পালিয়ে যায়।

অবশেষে অন্য বারের মতো এবারও তেইশে আগষ্ট এল। চিনু এখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছে। এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে পুরনো অনেকেই চলে গেল। রেখার মা মারা গেছেন, বাবা গেছেন তার আগেই। দিদিমার জন্যে চিনুর মনটা মাঝে মাঝে বড়ো খারাপ করে। কী জানি কেমন করে যেন বড্ড ভালোবেসে ফেলেছিল বৃদ্ধাকে। আজ তাই জন্মদিনের আনন্দ-উৎসবের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে মনে চিনু প্রণাম করল তার দিদিমাকে।

বাড়িতে আজ বেশ হৈ-চৈ। খুব ঘটা করে এবার অবনী মেয়ের জন্মোৎসব পালন করছে। বছরে তো আনন্দ করবার এই একটি মাত্র দিন। বাইরের লোক খাওয়াবার কথাটা অবশ্য রেখাই পেড়েছিল। ইচ্ছে ছিল, জন কতক কলেজের বন্ধুকে খাওয়াবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাড়ার কয়েক জনও বাদ পড়ল না।

যথাসময়ে মেয়েরা এসে পড়ল। চিনু স্নান করেছে কোন্ সকালে। কপালের ওপরে ছোট্ট সিঁদুরের ফোঁটাটিকে ঘিরে অসংখ্য চন্দনের বিন্দু।

বন্ধুরা এসে ঘিরে ফেলল। চিনু ওদের হাত ধরে নিয়ে গেল নিজের ঘরে।

কত গল্প, কত গান, কত হাসি, কত ঠাট্টা। কিন্তু চিনুর বেশিক্ষণ এ ধরণের হালকা আনন্দ ভালো লাগে না। এক সময়ে সে অন্য কথা পাড়ল। তার ছেলেবেলার কথা—মা-বাবার বিবাহ-বার্ষিকীর আবছা মধুর স্মৃতি, আর দিদিমার কথা।

দিদিমার কথা বলতে বলতে ওর চোখে জল আসত। কী ভালোই না বাসত তাকে! কিন্তু বেশি যেতে পারত না ওখানে। বাবা যেন পছন্দ করতেন না। কেন করতেন না কে জানে?

—আমার দিদিমার ফোটো দেখবি?

আগ্রহ না থাকলেও ভদ্রতার খাতিরে সম্মতি জানালো মেয়েরা।

চিনু বললে—দাঁড়া, মায়ের কাছ থেকে ট্রাঙ্কের চাবিটা আনি। একটি মাত্র ফোটো যা ক'রে এনেছিলাম। এখনো মামাতো ভাই-বোনেরা দেখলেই কেড়ে নিয়ে যেতে চায়। তাই লুকিয়ে রেখেছি মায়ের ট্রাঙ্কে। এই বলে উৎফুল্ল চঞ্চলতায় চিনু এক রকম ছুটতে ছুটতেই গেল রান্নাঘরে।—মা, তোমার ট্রাঙ্কের চাবিটা একবার দাও না?

বড্ড ব্যস্ত ছিল রেখা। কথা বলবার সময় পর্য্যন্ত নেই। কোনো রকমে আঁচল থেকে ঝনাৎ করে চাবিটা ফেলে দিল।

আস্তে আস্তে ট্রাঙ্কটা খুলল চিনু। সেকালের ভারী ট্রাঙ্ক। এই ট্রাঙ্কটা অনেক দিন অনেক বার অনেক নির্জন দ্বিপ্রহরে চিনু খুলেছে। খুলতেই কেমন একটা ধুলোর গন্ধ আসে। বহুকালের পুরনো স্মৃতিজড়ানো সেই ট্রাঙ্কের গহ্বরে অতি সন্তর্পণে চিনু একবার হাত দেয়, যেন কারা ঘুমিয়ে রয়েছে। আজও তেমনি করে ট্রাঙ্ক খুললে। কিন্তু মনটা অন্য দিনের মতো শান্ত ছিল না। ও-ঘরে বন্ধুরা বসে রয়েছে।

তাড়াতাড়ি পুরনো গরম জামাগুলো সরাতে লাগল। এক সময়ে বেরোল একটা বড়ো ক্রিমক্র্যাকারের বাক্স—ভালো করে সুতো দিয়ে বাঁধা। লুকিয়ে একটু হাসল চিনু। ওর ভেতরে কী আছে, চিনু তা জানে। লোভ সামলাতে পারে নি এক দিন। খুলে ফেলেছিল। দু'-একটা চিঠির প্রথম দু'-এক লাইন পড়েই কানের দু' পাশ লাল হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সেই যে টিন বন্ধ করেছিল আর খোলে নি।

দিদিমার ফোটোটা ছিল পাশেই। চিনু সেটা তুলে নিল। তুলে নিতে গিয়েই লক্ষ্য পড়ল ট্রাঙ্কের খোপে আরও কতকগুলো পুরনো চিঠি। এগুলো তো এর আগে লক্ষ্যে পড়ে নি।

পুরনো চিঠির একটা আকর্ষণ আছে চিনুর কাছে। একটা পোষ্টকার্ড তুলে নিল।

—এ যে দিদিমার লেখা!

পোষ্টকার্ডটা উল্টে সাল-তারিখগুলো দেখবার চেষ্টা করল; পুরনো চিঠি। কিন্তু চিঠিতে কোথাও সাল উল্লেখ নেই। শুধু তারিখটা আছে। বারোই পোষ।

এক নিশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে ফেলল চিনু। কিন্তু—কিন্তু ঠিক যেন বুঝতে পারল না।

কা'কে লেখা?

আবার ভালো করে ঠিকানাটা পড়ল।

না, মাকেই তো লেখা।

কিন্তু—

কিন্তু এ কোন মেয়ের কথা লিখেছিলেন দিদিমা?

আবার পড়ল—আবার পড়ল চিঠিখানা। মাথাটা কি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে? এ কোন্ মেয়ে?

চিঠির শেষটুকু পড়বার জন্যে চিনু চিঠিখানা একেবারে চোখের সামনে এনে ধরল।

না, লেখা তো পরিষ্কার, পড়তে কোনো অসুবিধে নেই?

—পৌষ মাসে পৌষ-লক্ষ্মী আমার ঘরে এসেছে। তাকে দেখবার জন্যে আমার মন ছটফট্ করছে। কিন্তু আমায় নিয়ে যাবে কে? উনি তো বাতে পঙ্গু। আমি কলকাতার পথ-ঘাট ভালো চিনি না। তবু আমার পেটের মেয়ের মেয়ে, তাকে দেখবার জন্যে আমাকেই যেতে হবে।

থরথর করে চিনুর হাতটা কেঁপে উঠল। মাথাটা যেন কেমন করছে।

সেই অবস্থাতেই ছুটে গেল মায়ের কাছে।

—মা!

সে কণ্ঠস্বরে ভীত-ত্রস্ত-চকিত হৃদয়ে রেখা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

কিছু জিগ্যেস করবার আগেই চিনু সেই চিঠিখানা মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কান্না-জড়ানো ব্যাকুল স্বরে বললে—আমার যে আরও একটা বোন ছিল, তার কথা তো আমায় কোনো দিন বলো নি?

বলতে বলতে চিনু ছুটে গিয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল।

রেখার পাতলা ঠোঁট দু'টো একবার কেঁপে উঠল।

কিন্তু না, সে আরও সাবধানী, আরও কঠোর। ঠোঁটের ওপর দাঁতের কামড় বসিয়ে সে কেবল নিজেকে সংযত রাখবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল।
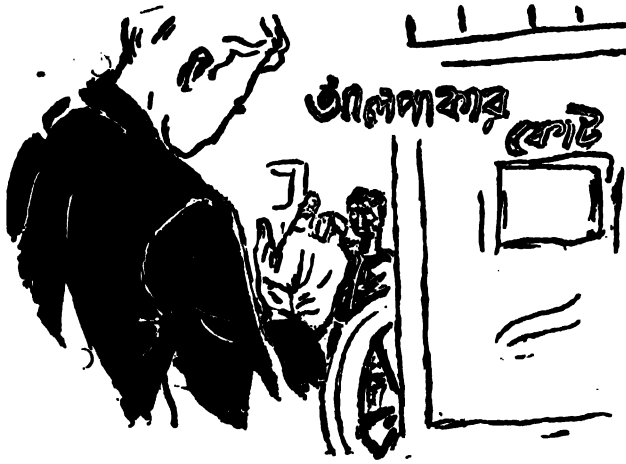
শ্রীঅবিনাশ সাহা

বোশেখ মাস। বাড়ীতে বিয়ের ধূম লেগেছে। হাট-বাজারের অন্ত নেই। বিরাট ফর্দ নিয়ে নকুলচন্দ্র ঢাকা ছোটে। হাতে সময় খুবই কম। আজই বাজার নিয়ে ফিরে আসা চাই।

বেলা এগারোটা। সূর্য যেন আগুন ছড়াচ্ছে। মাথার ওপর ধান রাখলে ফুটে খই হয়। নকুলচন্দ্রের ওষ্ঠাগত প্রাণ। একে থলথলে বিরাট দেহ—তার ওপর আবার ঘটি-ঘটি জল খাওয়া। ভুঁড়ি নয় তো, তেল-ভর্তি খুদে জালাই একটা পেটের ওপর ঝুলছে! সব চেয়ে বিপদে ফেলছে নকুলচন্দ্রকে কালো কুচকুচে লোমগুলো। অবিরত হুল ফোটাচ্ছে যেন গায়ে।

মেল ট্রেনে এসে নামে নকুলচন্দ্র। প্ল্যাটফরম লোকজনে গমগম করছে। কুলি, ফেরিওয়ালা, পানিওয়ালার দৌড়াদৌড়ির বিরাম নেই। সবচেয়ে ঘোড়াগাড়ির গাড়োয়ানরাই আছে ভাল। ওত পেতে এক একটি খেঁকশেয়ালই যেন শিকার ধরতে ব্যস্ত! যাত্রীদের কেউ একজন পাদানীতে পা বাড়িয়েছে কি ছুটে গিয়ে ছেঁকে ধরছে। অবশ্য যাত্রীরা তাতে কেউ বেজার হচ্ছে না। আদর আপ্যায়নে খুশীর হাসিই খেলে কারো কারো ঠোঁটের কোণে। কেউ ডাকে, আইয়েন বড় মিঞা। কেউ বা মাহারাজের বদলে মহারাজ সম্বোধন করেই আর একজনকে খুশী করতে চায়। আর একজন হয়তো জিজ্ঞেস করে, কোন হানে যাইবেন—দিগ্‌বাজার? উঠেন না বি, এ্যাক মিনিটে পৌচাইয়া দেই। রফটের চাকা (রবারের চাকা) মালুম বি পাইবেন না···

নকুলচন্দ্র কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে ব্যস্ত ভাবেই প্ল্যাটফরমে নামে। হাতে গোটা কয়েক রেশন ব্যাগ ও ছোট একটা এটাচি কেস। যাবে নবাবপুর হয়ে চকবাজার। জায়গায় জায়গায় নেমে হাট-বাজার করতে হবে। অবশ্য খালি হাত-পা থাকলে এক্ষুণি গাড়ি-ঘোড়ার দরকার ছিল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিরুপায়—ট্যাঁকের কড়ি গণ্ডা কতক গচ্চা দিতেই হবে। সব দিক ভেবে-চিন্তে একখানা গাড়ি নিতেই মনস্থির করে নকুলচন্দ্র। তবে শহরে ও নতুন নয়। ঢাকায় গাড়োয়ানদের বিলক্ষণ জানা আছে। মুখে ওরা যাই বলুক, স্বচক্ষে না দেখে কিছুতেই গাড়িতে উঠছে না।

গাড়োয়ান মাত্রেই কোন না কোন যাত্রীর পেছু নিয়েছে। কিন্তু নকুলচন্দ্রকে ছেঁকে ধরেছে একযোগে চার-পাঁচ জন। ওর আঙুল-ভর্তি সোনার আংটিগুলোই হয়তো সকলকে বেশী করে আকৃষ্ট করছে। হাতের বিছে কবচ-জোড়ার-জৌলুসও কম নয়। সূর্যকিরণে নবগ্রহের নয়টি রত্ন জ্বল-জ্বল করছে। অসহ্য গরমে মটকার পাঞ্জাবীটা অনেকক্ষণ গা থেকে খুলে কাঁধের ওপর ফেলেছে নকুলচন্দ্র। পুরোনো হলেও ওটার একটা আলাদা আভিজাত্য আছে। ওরা হয়তো সকলেই ওকে জমিদার আর নয়তো তালুকদার ঠাউরিয়েছে। তা যা ভাবে ভাবুক। ও কা'কেও কিছু বলবে না। বিদেশ-বিভুঁইয়ে একটু খাতির যত্ন পেলে ক্ষতি কি।···কারো কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে খুশীর আমেজেই সকলের সঙ্গে প্ল্যাটফরমের বাইরে চলে আসে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে সারবন্দী গাড়িগুলোকে। না, বরাত আজ ওসমান গাড়োয়ানেরই ভাল। নকুলচন্দ্র অন্য কারো কথায় কান না দিয়ে ওসমানকে ভাড়ার কথা জিজ্ঞেস করে।

ওসমান তো মহা খুশী। খোদা মেহেরবান। যাক, দু'দিন পরে আজ তাহলে এক জন খানদানী সোয়ারীই পাওয়া গেলো। ভাড়ার কথা তাই সোজাসুজি না বলে রেওয়াজ মতো বিনয়ে ফেটে পড়ে, আপনাগ চরণের ধূলা ঝাইড়া'বি খাই মাহারাজ, আপনাগ লগে আবার দর ভাও করণ লাগব নাকি? ওঠেন না, মোন যা চায় দিয়েন।

ওসমান বিনয়ে যতই গলে পড়ুক না নকুলচন্দ্র ওতে ভোলে না। সরাসরিই আবার বলে, না মা মিঞা, ওসব মোন চাওয়া-চাওয়ি কাম নাই। যা নিবা সোজা কও।

আরো বার কয়েক বিনয় প্রকাশের পর সোজা কথায় ভাড়া নগদ পাঁচ সিকে ঠিক হলেও ওসমানের আবদার শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়।—সাইদের সময় ওঠেন ত বি গাড়িতে! এক দিনের কাম নাকি! খুশী অইলে আর কিছু দিয়েন ঘোড়ারে খাইবার।

না না, আর কিছু পাইবা না। যাইবা ত তড়াতড়ি নও এলা, নকুলচন্দ্র দৃঢ় থেকেই বক্তব্য পেশ করে।

ঘোড়া জুড়তে জুড়তে ওসমান একটু অভিমান মিশ্রিত কণ্ঠেই জবাব দেয়, ইডা কে কইলেন মাহারাজ বাবু না? অন্যায় বি কিছু কইলে পায়ের থনে জোতা (জুতো) খুইলা মারেন না।

জবাবে নকুলচন্দ্র মুখে কিছু না বলে হাসতে হাসতেই গাড়িতে ওঠে। ওসমান ঘোড়ায় পিঠে চাবুক কষে নবাবপুরের পথ ধরে।

দেখতে দেখতে গাড়ি নবাবপুরে এসে পড়ে। বাঁ ফুটের মোড়ের ঐ সাদা বাড়িটাতেই মুলজী সিক্কার আপিস। ফর্দে এক নম্বর মোহিনী বিড়ি দু'বাণ্ডিল রয়েছে। আড়তদার অপেক্ষা খোদ আপিস থেকে নেওয়াই শ্রেয়ঃ। খাঁটি আর তাজা জিনিষ। নকুলচন্দ্র জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে যথাস্থানে গাড়ি বাঁধতে বলে।

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ওসমান লাগাম কষে দাঁড় করায় গাড়ি। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, শুভ কাজের বাজার করতে এসে গোড়াতেই ধোঁয়া কেনা চলে না। হিসেব মতো পাঁচ আনার সিদ্ধিই আগে কিনতে হয়। সিদ্ধিতে সিদ্ধি লাভ। না, কষ্ট যা'ই কেন হোক না, শাস্ত্রীয় বিধি অবহেলা করা চলবে না। সিদ্ধির দোকান অবশ্য গলির শেষ সীমান্তে। গাড়ি অতো ভেতরে যাবে না। গরমে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। তা হোক, তবু গাফিলতি করে অমঙ্গল ঘটানো চলবে না। কত আদরের পাচী। অতটুকু থেকে এত বড়টা হয়েছে। বলতে গেলে যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছে। না না, বিধি মতোই কাজ হোক। নকুলচন্দ্র গাড়ি থেকে নেমে সোজা সিদ্ধির খোঁজেই রওনা হয়। গরমে রাস্তায় পিচ গলে কাই হয়ে আছে।

পা পড়তেই সমস্ত শরীরটা ঝংকার দিয়ে ওঠে। হয়তো ফোসকাই ফুটবে পায়ের তলায়। কিন্তু কি আর করা যাবে? হাঁপাতে হাঁপাতে সিদ্ধি পাঁচ আনার কিনে কোন রকমে মুলজী সিক্কার আপিসে এসে ঢোকে। থপ করে বসে পড়ে হেলান দেওয়া বড় বেঞ্চটার ওপরে। ভাগ্যগুণে সেলস্‌ম্যানের নজরে পড়তেও দেরী হয় না। ভদ্রলোক প্রথমেই কোন কাজ কারবারের কথা না জিজ্ঞেস করে বিড়ি আর দেশলাই এগিয়ে দেয়। আদর আপ্যায়নে নকুলচন্দ্র আশাতীত খুশী হয়। ওর বোধ হয় একটা বিড়ির তেষ্টাই পেয়েছিল। কোঁচার খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে একটা বিড়ি ধরিয়েই খানিক দম নিতে থাকে।

সেলস্‌ম্যানও তার প্রাথমিক কর্তব্য শেষ করে অন্য দিকে মন দেয়। না, নকুলচন্দ্র এখন অনেকটা সুস্থ। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করাই এখন বিধেয়। হাতের পোড়া বিড়িটা যথাস্থানে নিক্ষেপ করে নিজের আর্জি পেশ করে।

সেলস্‌ম্যান মনোযোগ দিয়েই ওর কথাগুলো শোনে এবং কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ না করে বেশ ভদ্র ভাবেই জবাব দেয়, পাঁচ হাজারের কমে তো এখানে বিক্রি নেই বাবু সাহেব! আপনি এজেন্টের কাছ থেকে নেবেন।

নকুলচন্দ্রের উত্তপ্ত দেহ খানিকটা শীতল হয়ে এসেছিল, মুহূর্তে আবার গরম হয়ে ওঠে। বলে কি বেটা! পাঁচ হাজারের কমে বিক্রি নেই! হাটে বাজারে দোকানদার যে এক পয়সার বিড়িও উপযাচক হয়ে বেচে থাকে। গৃহস্থের পক্ষে এক সঙ্গে এক হাজার বিড়ি কেনা কি কম হলো! কোথাকার লাট বেলাট এসেছে বেটারা!···নকুলচন্দ্র কাছা ঝেড়ে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে পড়ে। কাজ নেই পয়সা দিয়ে জিনিষ কিনতে এসে লোকের পায়ে তেল মাখাবার। ট্যাঁকে কড়ি থাকলে বিড়ির অভাব হবে না।···তেতে-পুড়ে আপিসে ঢুকেছিল তেতেপুড়েই বেরিয়ে আসতে উদ্যত হয়।

সেলস্‌ম্যান ওর হাবভাব বুঝে কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু নকুলচন্দ্র সে সুযোগ দেয় না। মুখের উপরেই কড়া করে শুনিয়ে দেয়, কাম নাই মশয় আপনার চলাইনা কথা শুনবার। পয়সা থাকলে বিড়ি অনেক পামুনে।···রাগে গজ গজ করতে করতেই আপিস থেকে নেমে এসে গাড়ীতে উঠতে যায়।

ওসমান কোচবাক্সের ওপর বসে সবই লক্ষ্য করছিল। সহানুভূতির সঙ্গেই জিজ্ঞেস করে, কি অইল মাহারাজ, বিড়ি আনলেন না?

আহুম কোনহান থনে। হালারা (শালারা) যে মাথার কিরা দিয়া বইচে, পাঁচ হাজারের কম বেচব না! —সক্রোধেই উত্তর করে নকুলচন্দ্র।

মনে মনে হাসি পেলেও ওসমান সমতা রেখেই সান্ত্বনা দেয়, কিয়েরে বি গেচিলেন হালা ভাইটাগ (ভাটিয়া) কাচে! অগ বিড়ি অগ থনে কম দামেই পাইবেন নে চকে।

নকুলচন্দ্র বলে, হ, তাই নও। পাঁচ হাজারের কমে বেচব না হ্যা কতা হালারা সাইন বোর্ডে লেইকা থুইলেই ত পারে।

ওসমান ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালাতে চালাতে বলে, বুচচেন না ক্যান, মাইনষেরে পেরাসিনে করাই হালাগ কাম।

নকুলচন্দ্র আর কথা বাড়ায় না। একটা সীটে বসে আর একটা সীটের ওপর পা তুলে দিয়ে কিঞ্চিৎ আরাম করতে থাকে।

ওসমানের প্রাণেও বোধ হয় সহসা খুশীর হাওয়া লাগে। চড়া রোদেও প্রাণ খুলে গান ধরে, আমি বন ফুল গো···

নকুলচন্দ্রের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। শুভ কাজের সওদা করতে এসে প্রথমেই বাধা পেলো। শালা ভাটিয়ার কাছে না গেলেই ছিল ভাল। মনটা অবিরতই খুঁত-খুঁত করতে থাকে। গাড়ি বড় জোর হাত পঞ্চাশেক এগিয়েছে আবার দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে চেঁচাতে থাকে, আরে রাখ রাখ, ঐ বড় কাপড়ের দোকানটার সামনে লাগাও।

ওসমান গান থামিয়ে চলতি ঘোড়ার মুখে লাগাম কষে গাড়ির গতি রোধ করে। নকুলচন্দ্রের নির্দেশ মতো শাহী ষ্টোর্সের সামনে নিয়েই গাড়ি দাঁড় করায়।

নকুলচন্দ্র মাতা ঢাকেশ্বরীর উদ্দেশ্যে বার কয়েক কপালে হাত ঠুকে ধীরে সুস্থেই গাড়ি থেকে নামে। দোকানের সেলসম্যান মুহূর্তে ছুটে আসে গাড়ির কাছে। সবিনয়ে স্বাগত সম্ভাষণ জানায়। পান সিগারেট যোগে আপ্যায়নেও ত্রুটি হয় না।

নকুলচন্দ্র প্রথমে ভাবে সিগারেট খাবে না। কে জানে, এখানেও সওদা হবে কি না। জাঁকজমক তো এদের আরো বেশী। কি বলতে কি বলবে তার ঠিক কি!—একটা পান মুখে দিলেও সিগারেট ধরাতে দ্বিধা বোধ করে। কিন্তু না, এরা রীতিমতো ভদ্রলোক। চাইলে আধ গজ কাপড়ও এরা কেটে বিক্রি করতে রাজী। শালা ভাটিয়াদের মতো অতো ফুটুনি নেই। কথায় কথায় মনের খুশীতেই একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলে। উল্টিয়ে পাল্টিয়ে কাপড়ের জমি পরীক্ষা করে নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়েই একখানা বেনারসী শাড়ী পছন্দ করে। বড় পছন্দসই শাড়ী পাওয়া গেছে। এ রং পাঁচীকে মানাবে ভাল। কুটুমের কাছেও খাতির পাওয়া যাবে। খুশীতে গদগদ হয়েই শাড়ীর বাক্সটা বগলে ফেলে গাড়িতে এসে ওঠে নকুলচন্দ্র। আর একটা সিগারেট হাতে করে এনেছিল। গাড়ি ছাড়লে ধরিয়ে মৌজ করতে থাকে।

গাড়ি বাংলা বাজারের পথে চলেছে। হয়তো পঞ্চাশ গজও হবে না। নকুলচন্দ্র আবার চেঁচাতে শুরু করে।

ওসমান চলতি ঘোড়ার মুখে আবার লাগাম কষে মাঝ রাস্তাতেই গাড়ি দাঁড় করায়। বিরক্তির সঙ্গেই জিজ্ঞেস করে, কিছু ফালাইয়া আইলেন নাকি মাহারাজ?

আরে না মিঞা, কিছু ফালাইয়া আহি নাই। শাড়ীর ই রং চলব না। মনেই আছিল না শুভ কাজে আসমানী রং চলব না। তড়াতড়ি গাড়ি ঘোরাও, হাতের সিগারেট রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে অস্থির হয়ে ওঠে নকুলচন্দ্র।

মুখে চুমু খাওয়ার মতো আওয়াজ তুলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ি ঘোরাতে বাধ্য হয় ওসমান। ইচ্ছে করে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে দেয় গেঁয়ো ভূতটাকে। কিন্তু পারে না।

শাড়ীর রংটা এখনো ঠিক অপছন্দ নয় নকুলচন্দ্রের। কিন্তু হলে কি হবে; পাঁচীর মা যে মুখে ঝাঁটা মারবে। পই-পই করে বেচারা লাল শাড়ীর কথা বলে দিয়েছে। কেন যে এ রংটা তখন পছন্দ হলো! শালা ভাটিয়াই মেজাজটা বিগড়ে দিয়েছে।···গাড়ি ঘোরাতে কিঞ্চিৎ দেরী হচ্ছিল ওসমানের—নকুলচন্দ্র ফেটে পড়ে, আরে এই মিঞা, কদ্দিন গাড়ি চালাইচ? এতক্ষণ লাগে গাড়ি ঘুরাইতে?

কি যে কন্ মাহারাজ! ঘোড়ার বি তো আর কলের জান না যে বুতাম টিপুম আর ঘুরব। একটু সবুর করেন।—এই হালা ঘোড়ার পো, মাহারাজ বি রাগ করবার নৈচে হোনচ না (শুনছিস রে)। লাগামে টান দিয়ে কষে এক চাবুকের ঘা মারে।

দেখতে দেখতে গাড়ি আবার শাড়ী স্টোর্সের দরজায় এসে লাগে। সেলসম্যানও আবার এসে অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু নকুলচন্দ্র হাসতে পারে না। শুকনো মুখেই শাড়ীর বাক্সটা হাতে করে গাড়ি থেকে নামে। খানিক ইতস্তত করে সঙ্কোচের সঙ্গেই আবদার জানায়, এই শাড়ীটা দয়া কইরা একটু বদলাইয়া দেওয়ন লাগব।

সেলসম্যান নয়তো যেন রসের ভিয়েন। আহ্লাদে ডগমগ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা বিনয় প্রকাশ করে, আরে স্যার লেইগা এত দিক করবার নৈচেন ক্যান। আপনাগ দোকান, একবার ছাইড়া দশ বার বদলাইয়া নেন না।

উত্তর শুনে নকুলচন্দ্রের গোমড়া মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিনা দ্বিধায় আবার একটা সিগারেট ধরায়। হাসতে হাসতেই বলে, এই শাড়ীই, ইডার বদলে একটা লাল রঙের দ্যান।

ইস্, এই ত ঠেকাইচেন মাহারাজ। ইয়ার জুড়ি ত লাল রঙের বি অইব না। কিছু বাড়ন লাগব। তবে জমিন বিও জাদা সরম অইব। নকুলচন্দ্রের আবদারে সেলসম্যান উত্তর করে।

উত্তর শুনে নকুলচন্দ্র মাথায় হাত দিয়ে বসে। বলছে কি বেটা। পঞ্চাশ টাকাতেই ত চক্ষু ছানাবড়া। আবার আরো বাড়ন লাগব!···কিন্তু কি আর করা যায়, চাইলে তো আর দাম ফেরৎ পাওয়া যাবে না। অগত্যা দেখতেই হবে।···অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানায় নকুলচন্দ্র।

অরে, এক লম্বর বানারসীর বাক্সডা লইয়া আয়, নকুলচন্দ্রের সম্মতিতে খুশী হয়ে যোগানদারের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ে সেলসম্যান।

চোখের পলক পড়তে না পড়তে বাক্স এনে হাজির করে যোগানদার। সেলসম্যান বাক্সের ডালা খুলে উচ্ছ্বাস জানায় দ্যাখেন মাহারাজ, এক লম্বর বানারসী। পাকা রং সাচ্চা জরি।

গোটা বাক্সের মধ্যে মাত্র একখানাই লাল রঙের শাড়ী আছে। নকুলচন্দ্র শাড়ীখানা টেনে নিয়ে ভাঁজের মধ্যে হাত গলিয়ে জমি পরীক্ষা করতে থাকে।

সেলসম্যান সুযোগ বুঝে আবার উচ্ছ্বাস জানায়, ইয়ার আর জমিন পরখ করন লাগব না মাহারাজ। ইচ্ছা করলে জল বি বাইন্দা আনবার পারবেন। রং জরির জেল্লায় কয়নার (কনে) বি রোশনাই বাড়ব জামাই বি খুশী অইব। চক্ষু বুইজা লইয়া যান।

জামাই খুশী হবে কি না পরের কথা। কিন্তু নকুলচন্দ্র নিজেই খুশী হতে পারে না। বিচার করে দেখলে আগের শাড়ীখানাই ঢের ভাল। বেটা বাগে পেয়ে খারাপ জিনিষকেই ভাল বলে চালাতে চাচ্ছে। যত শালা চোটার কারবার· সেলসম্যানের উচ্ছ্বাসের কোন জবাব না দিয়ে মনে মনেই ইতস্তত করতে থাকে নকুলচন্দ্র।

সেলসম্যান অবস্থা বুঝে আবার উসকাতে থাকে, তামাম ঢাকা শহর ঘুরলে ইবকম শাড়ী মিলব না মাহারাজ! দেখছেন না, লাটের মদ্দে এই একটা বি খালি লাল শাড়ী।

কথা শুনে নকুলচন্দ্রের ইচ্ছে হয় পাল্টা মোটা কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু পারে না। দায় যখন ওর নিজের তখন মুখ বুজে সব শুনতেই হবে। মনের ভাব মনেই চাপা দিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গেই মন্তব্য করে, আগের শাড়ীখানাই আমার মনে ধরচে। ইখান—

মুখের কথা শেষ করতে পারে না নকুলচন্দ্র। সেলসম্যান দু'চোখ বিস্ফারিত করে প্রতিবাদ করে, আইজ্ঞা আপনে কন কি মাহারাজ। বৈদ্রে বৈদ্রে ঘইরা আপনার বি চক্ষের ঠিক নাই। ইডা অইল এক লম্বর আসল চিজ। এর লগে আপনে খুঁটা মালের জানপচান করবার চান?

নকুলচন্দ্র এবার ফুঁসে উঠতেই যাচ্ছিল, কোন রকমে আত্মসম্বরণ করে। সবিনয়েই শুধায়, আইচ্ছা কন, কত দেওয়ন লাগব?

না না, দামের কথা আর আপনেরে কেম্নে কই। চিজ বিই যখন আপনার পছন্দ হয় নাই, কৃত্রিম ক্ষোভের সঙ্গেই উত্তর করে সেলসম্যান। বলতে বলতে আবার একটা সিগারেট আর দেশলাইটা এগিয়ে দেয়!

. হাজার হলেও নকুলচন্দ্র লোভ সম্বরণ করতে পারে না।

সিগারেটটা ধরিয়ে আবার শুধোয়, সময় নাই, তড়াতড়ি কন কি দেওয়ন লাগব?

না না, আমি কিছু কইবার চাই না। ইনসাফ কইরা আপনেই বি যা হয় দ্যান।

আরে ধুত্তর, খালি খালি কতা বাড়ান। আপনার জিনিষ আপনে না কইলে নিবার পারুম নাকি?

আইচ্ছা বনীর (বৌনী) সময়ে দর ভাওয়ের কাম নাই। আর দউশগা (দশটা) টেকা দ্যান।

হাতের সিগারেটটায় জোরে একটা টান দিয়েছিল নকুলচন্দ্র, উত্তর শুনে মনে হয় মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। শালা কুট্টি বলে কি! কোথায় দশ টাকা কম হবে তা না আরো দশ টাকা বেশী। না, বাজার করতে আসাই আজ ভুল হয়েছে।···হাতের সিগারেট হাতেই থাকে, নকুলচন্দ্র আর নকুলচন্দ্রের ভেতরে নেই।

সেলসম্যান সমতা রেখেই যোগানদারের উদ্দেশ্যে বলে, এই, এইডা বাক্সের মদ্দে ভাল কইরা বাইন্দা দে।

নকুলচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারে না। তাড়াতাড়ি বাধা দেয়, না, এত দরে নিবার পারুম না। ঐ সমান সমান করেন।

আপনে কন কি! তাইলে কিছু দেওয়ন লাগব না। আগের টেকাও ফেরৎ লিয়া যান শাড়ী বি-ও অমনিই নিয়া যান।

মন্তব্য শুনে নকুলচন্দ্র মনে মনে ভাবে, সে ত তোমরা কতই দেবে চোটার দল। মুখেই কেবল লপ্‌চপানি।··প্রত্যুত্তরে বলে, অমনি নিমু কন কি। পাঁচ টেকা কম করেন।

বনীর সময় দরভাও করবেন না। দেবার হয় দশ টাকাই দ্যান নয়ত অমনিই লইয়া যান।

বেলা অনেক হয়ে গেছে। নকুলচন্দ্র বোঝে আর কথা বাড়ালে অনর্থক অপদস্থই হতে হবে। চোটারা একটা কানা কড়িও মাপ করবে না। তাই আর কথা না বাড়িয়ে দশ টাকার একখানা নোট ছুড়ে দিয়েই মন্তব্য করে, নেন্ আপনাগ মোন যা চায়।

সেলসম্যান বোধ হয় এবার বিবেকে ঘা খায়। হাসতে হাসতেই একটা টাকা ফেরৎ দিয়ে—মন্তব্য করে নেন্, কি আর করব। আপনে যখন অসন্তুষ্ট হন। কিনা (কেনা) দামে বি দিলাম।

নকুলচন্দ্র হুঁ হাঁ কিছু না বলে মুখ ভার করেই শাড়ীর বাক্সটা

হাতে করে গাড়িতে এসে ওঠে। মনে মনে গালাগালি দেয়, নে শালারা তগ ঘাটের কড়ি। আর কোন দিন যদি এ মুখো হই···

মুখ বুজেই নকুলচন্দ্র চলতে চায়, কিন্তু ওসমান ছাড়ে না। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়, কি অইল মাহারাজ, শাড়ী বি—বদলাইলেন ?

হ্যা, খোঁজে তোমার কি কাম মিঞা ? সেলসম্যানের সঙ্গে না পেরে ওসমানের ওপরেই ফেটে পড়ে নকুলচন্দ্র।

কিন্তু ওসমান দমে না। আপন ঢঙে পুনরায় ভেংচি কাটে, না, এমনেই জিগাই আর কি। আপনার মুখখান বি ত শুকাইয়া বলদের পাচার মতন দেখাইবার নৈচে—

এই মিঞা, মুখ সামলাইয়া কতা কইও, নকুলচন্দ্র তেড়ে ওঠে।

চটেন ক্যান মাহারাজ, বৈদ্রে কি মাথায় বি কিছু ঠিক আচে না কি ? কোনহানে যামু কন ?

নকুলচন্দ্র গলার স্বর গম্ভীর করে উত্তর করে, বাংলা বাজার লও।

গাড়ি ঘড়্‌ঘড়ের আওয়াজ তুলে বাংলা বাজারের দিকেই ছুটতে থাকে। ওসমান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসে আবার গান ধরে, আমি বন ফুল গো—

গাড়ির ভেতরে নকুলচন্দ্রের অবস্থা শোচনীয়। শাড়ীর বাক্সটা খুলে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। ইস শালা বদমাশ, গালে থাপ্পড় মেরে টাকাগুলো নেড়ে নিলে। পাঁচার মা এখন এ শাড়ী টান মেরে ফেলে না দিলে হয়—

গাড়ি বাংলা বাজারের সামানা প্রায় ছাড়িয়ে চলে। কিন্তু নকুলচন্দ্রের কোন সাড়া-শব্দ নেই। বেগতিক দেখে ওসমান সহসা ঘোড়ার মুখে লাগাম কসে শ্লেষের সঙ্গে প্রশ্ন করে, বাংলা বাজার বি ছাড়াই চললেন মাহারাজ, যাইবেন কোনহানে ?

ওসমানের তাড়ায় সহসা যেন সম্বিৎ ফিরে পায় নকুলচন্দ্র। তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, আরে রাখ রাখ মিঞা। আগে কইবার পারচি না। চন্দ্রা প্রেসে লও।

হ্যা ত বি ফাসাইয়া আইলাম মশয়, ওসমানের কণ্ঠে বিরক্তির সুর।

তার কি করুম ? ঐহানেই যাওয়ন লাগব।

হ, আপনে ত বি কইয়াই খালাস। আমার পেরাসিনিডা বাবা আছে ?

আরে নও নও মিঞা। কতা বাড়াইয় না, এতক্ষণ চইলা যাইবার পারতা।

ইস, হাওয়াই জাহাজে উঠচেন নাকি মাহারাজ ?

বেকায়দায় পড়ে নকুলচন্দ্র আর হুঁ হাঁ করে না।

ওসমান গজ-গজ করতে করতেই গাড়ি ঘোরাতে থাকে। যথারীতি চন্দ্রা প্রেসের ফটকে এনে দাঁড় করায়।

নকুলচন্দ্র আর বিন্দুমাত্র দেরী করে না। তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে একটা কাগজ বার করে প্রেসের ভেতরে ছোটে।

না, সব বেটাই দেখছি সমান। কত বার হু'টাকা দিয়ে প্রোগ্রাম ছাপিয়ে নিয়ে গেছি। আজ বেটা কিছুতেই তিন টাকার কমে রাজী নয়। তাও আবার ডাকে পাঠাবার খরচা আলাদা দিতে হবে। টাকার কুটি আর কা'কে বলে। সুযোগ পেলেই পকেট ফাঁক করবে। পাঁচীর কপালে যে কি আছে ভগবানই জানেন!

বিরক্ত হয়ে নকুলচন্দ্র তিন টাকাতেই রাজী হয়ে যায়। নগদ হু'টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে উঠে পড়ে।

ওসমান আবার গাড়ি হাঁকাতে হাঁকাতে নির্দেশ মতো বাবুর বাজারের পুলের মুখে এনে দাঁড় করায়। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। এখনো ঢের সওদা বাকী। ব্যস্তসমস্ত হয়েই নকুলচন্দ্র গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছিল, ওসমান বাধা দেয়। কোচবাক্স থেকে লাফ দিয়ে নেমে আবদার জোড়ে, ঘোড়ায় বি জল খাইব মাহারাজ, কিছু ছাড়েন।

নকুলচন্দ্রের মেজাজটা স্বভাবতঃই ভাল নেই। ওসমানের আবদারে ফুঁসে ওঠে, কিছু ছাড়ুম মানে ?

কইলাম ত মশয়, ঘোড়ায় বি জল খাইব, ওসমানের কণ্ঠেও কর্কশতা খান-খান হয়ে ঝরে পড়ে।

নকুলচন্দ্র কিছুটা সামলিয়ে নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে, কি জানি মিঞা, কোন দিন ত কিছু দেই নাই।

হ্যান নাই এহন বি হ্যান। ডর নাই, ভোগা দিয়া কিছু নিমু না। মাইনষেরে জিগাইলেই পাইবেন।

আরে চাই না মিঞা কেউরে জিগাইবার। এই নেও, বলতে বলতে রুমাল খুলে একটা আনি ওসমানের হাতে দিতে যায় নকুলচন্দ্র।

ওসমান চোখ কপালে তুলে ফুঁসে ওঠে, ভিক্ষা হ্যান নাকি মশয়। চাইর পয়সায় বি ত ঘোড়ার জিব্বাও ভিজব না।

না ভিজলে আমি কি করুম ? ইয়ার বেশী আমি কিছু দিবার পারুম না। তোমার লগে কিছু কতা আছিল নাকি ?

কতা আবার কি থাকব মশয়। জিগাস না মাইনষেরে। এই খলিল মিঞা, অদূরেই খলিল গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছিল, তার উদ্দেশ্যে চেঁচাতে থাকে ওসমান।

নকুলচন্দ্র ফাঁপরে পড়ে। না, সব দিক দিয়েই জ্বালাতন শুরু হয়েছে আজ। নিজের কপালে নিজেই করাঘাত করে ওসমানকে বাধা দেয়, এই মিঞা কাম নাই কেউরে ডাইকা, এই নেও, আবার রুমাল খুলে আর একটা আনি হাতে গুঁজে দিতে যায়।

ওসমান দাঁও বুঝে আবার কোপ মারে, কি তামসা করবার নৈচেন মশয়। আর না হ্যান এডুগা সুকি বি ত দিবেন (একটা সিকি)! ঘোড়ায় খাইব সঙ্গে বি হার মাহুত। আপনার আক্কেল কি ?

আক্কেল তুমি ভাল কইরাই দিলা মিঞা। আর আক্কেলের কতা মুখে আইন না। এই নেও, পিণ্ডি গিল গা, রাগের মাথায় আরো হু' আনা পয়সা বার করে দেয় নকুলচন্দ্র।

পয়সা চার আনা পেয়ে ওসমানের ঠোঁটে কিঞ্চিৎ হাসি দেখা দেয়। নকুলচন্দ্রের কড়া কথার কোন জবাব না দিয়ে সোজা পাশের একটা সরাইখানায় গিয়ে ঢোকে। যাবার সময় ঘোড়া দুটোর মুখে ছোলা ভিজানো আর ঘাসের টিন দুটো বেঁধে দিয়ে যায়।

ওসমান আর ঘোড়া হু'টো তবু এতক্ষণ পরে একটু হাঁপ ছাড়বার অবসর পায়। কিন্তু নকুলচন্দ্রের আজ ক্ষুধা-তৃষ্ণা বলে কিছুই নেই। বিকেল ছটার গাড়িতে ফিরতে না পারলে অনেক রাত হয়ে যাবে। সামনে কৃষ্ণপক্ষের ঘন অন্ধকার। রাস্তায় সাপ-খোপের ভয়ও কম নয়। তাড়াতাড়ি নেমে কেনাকাটায় মন দেয়। এক লহমায় পাঁচ সের ঢাকাই বলসাবান সোয়া সের, সুগন্ধি আনারপুরী তামাক,

এক কুড়ি কত্তে ও পাঁচ হাজার টিকে কিনে ফেলে। নির্দেশ মতো মুটেরা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ছাদে চাপিয়ে দেয়।

দেখে দেখে ওসমানের গায়ে জ্বালা ধরে। নতুন রং-পালিশ হয়েছে গাড়িখানায়। এই সমস্ত ছাইপাঁশ চাপিয়ে শেষটায় না দাগ ধরিয়ে দেয়। গেঁয়ো ভূত কোথাকার! ঘোড়ার গাড়ি না করে মোষের গাড়ি করলেই হতো।···কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না। এইমাত্র নগদ চার আনা পয়সা ফাউ বাগিয়েছে, একটু চক্ষু-লজ্জা তো আছে! নকুলচন্দ্রের কাণ্ড-কারখানা দেখে মুখ টিপে টিপে হাসতেই থাকে। গেঁয়োটা শেষটায় না তামাম ঢাকা শহরখানা ছাদের ওপর চাপিয়ে দেয়।···যা হোক, ভগবানকে ধন্যবাদ! মিনিট কুড়ি পঁচিশের ভেতরেই বাবুবাজারের পাট মিটে যায়। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে গাড়িতে এসে বসে। সুমুখের খালি সীটটার ওপর পা তুলে দিয়ে একটু আরাম করতে থাকে।

ওসমানও খানিকটা চাঙ্গা হয়ে—মনের আনন্দেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে। এবার চকবাজার। নকুলচন্দ্র আশ্বাস দিয়েছে, এখানেই বাজার শেষ।

দেখতে দেখতে গাড়ি এসে চকবাজারের ছোট কাটরার সামনে এসে লাগে। অবসন্ন দেহেও কিঞ্চিৎ বল সঞ্চার হয় নকুলচন্দ্রের। মনের খুশীতেই গিয়ে ঢোকে কাটরার ভেতরে। সারা দোকান খোঁজ খোঁজ। কিন্তু না, কোথাও নিজের গায়ের মাপে একটা আলপাকার কোট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দাম কম-বেশী যাই হোক—অন্যান্য সওদা এক রকম করে প্রায় সবই হয়ে গেছে। শুধু মিলছে না এই কোটটা। অথচ না হলে চলেই বা কি করে? পাঁচীর শ্বশুর তো শুনেছি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। সঙ্গে জনকয়েক সম্ভ্রান্ত বরযাত্রীই আসবে। নিজের বলতে তো একটাও ভাল জামা নেই। কোটটা হলে মানরক্ষা হতো। তা ছাড়া এই উপলক্ষে কেনা হলেই হল, নয়তো কবে আর আসছে শুধু একটা কোট কিনতে? এক দোকানদার না করে তো নকুলচন্দ্র আর এক দোকানে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সেখানে বিফল হয়ে আবার আর এক দোকানে, না, কেউ দিতে পারছে না ওর মনমতো কোট। সবাই বপু দেখে মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে। বেটাদের যেন ঠাট্টার পাত্র আমি। অর্ডার দিলে তো গাঁয়ের দর্জিকে দিয়েও করিয়ে নিতে পারি রে হতচ্ছাড়ার দল। তবে আর তোদের দোরগোড়ায় ধর্না দেবো কেন? সে সময় নেই বলেই না তোদের দোরে দোরে ঘুরছি। অতো চোখ-টেপাটেপি কিসের? এত বড় তো দোকান সাজিয়ে বসেছিস, লজ্জা করে না, একটা কোট বার করতে পারছিস নে? কেন, জীবনে কি আমার মতো বপু কারো দেখিসনি নাকি!···নকুলচন্দ্র ঘুরে ঘুরে অস্থির হয়ে ওঠে। সারা গা দিয়ে অঝোরে ঘাম ঝরছে। লোমগুলো ভিজে জবজবে। ভালুকের মতোই দেখাচ্ছে হয়তো। বেটারা তাই হয়তো অতো হাসছে। জামাটা গায়ে দিলে অবশ্য হয়। কিন্তু না, এখন আর সে উপায় নেই। হতচ্ছাড়ারা যা ভাবছে ভাবুক। ওদের দিকে না তাকালেই হলো। সারা কাটরা ঘুরে শেষটায় ব্যর্থ হয়েই গাড়ির দিকে ফিরে আসে নকুলচন্দ্র।

ওসমান কোচবাক্সের ওপর বসে একটা বিড়ি ফুঁকছিল, নকুলচন্দ্রকে দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে, খালি হাতে আইলেন মাহারাজ! কিছু আনলেন না!

নকুলচন্দ্র বিরক্তির সঙ্গেই জবাব দেয়, কি আমুম মিঞা! তোমগ তামাম কাটরা ঘুইরা একটা আলপাকার কোট পাইলাম না।

ওসমান ততোধিক বিস্ময়ের সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করে, আলপাকার কোট পাইলেন না! কার গায়ের?

কার গায়ের আবার নিজের লেইগাই চাইছিলাম।

আপনার লেইগা আলপাকার কোট? কন কি মাহারাজ! আপনার তামাম গায়ে না আলপাকার রইচে, চাউরগা (চারটে) বুতাম বি খালি লটকাইয়া লন না, বাহারের কোট অইবে নে।

ওসমানের রসিকতায় রেগে উঠতেই যাচ্ছিল নকুলচন্দ্র কিন্তু কি জানি কেন ফিক করে হেসে ফেলে। নিজের গায়ের দিকে তাকিয়ে শেষটায় মটকার পাঞ্জাবীটাই চড়িয়ে নেয়।

গাড়ি রেল-ষ্টেশনের পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে থাকে।

এরা আর ওরা

রমলা দেবী

ওদের সাথে তাল মিলিয়ে চলা
ওদের সুরে সুর মিলিয়ে বলা
ভালবাসার নিয়ম মেনে চলা
এদের আজও হল না।

ওদের কথা বুঝবে না ত এরা
এদের কথাও শুনবে নাক' ওরা
এক নিয়মে ওঠা বসা ঘোরা
এদের ওদের হল না।

চিরকালই চলল হানাহানি
থামল নাক' মিথ্যা কানাকানি
জীবন নিয়ে করে টানাটানি
ওদের সাথে এরা।

এরা, ওরা, মিলবে হায় কবে
পরস্পরে আপন করে লবে
কবে এদের বিবাদ মিটে যাবে
মিলবে এরা ওরা।

মৌলিকতায়, নির্ভরতায় ও আধুনিকতায়
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলি ১২
ফোন ৩৪-১৭৬১ • গ্রাম • ব্রিলিয়ান্টস
ব্রাঞ্চ : বালিগঞ্জ - ২০০/২/সি - রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা - ২৯ • ফোন : ৪৬-৪৪৬৬
ব্রাঞ্চ - জামসেদপুর ফোন : জামসেদপুর - ৮৫৮
শো রুমের পুরাতন ঠিকানা ১২৪, ১২৪/১ বহুবাজার স্ট্রীট·কলিকাতা-১২ কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে

ফরাসী বিপ্লবকালের একটি প্রেমের কাহিনী

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ-রায়

ফরাসী বিপ্লবের রক্তাক্ত স্রোতে দু'টি নিষ্কলঙ্ক রক্তের ধারা এসে মিশেছিল, দু'টি কুসুমকলি প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই ছিন্নদল হয়ে রক্তের সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল, তার কথা অনেকেই জানেন না। ঐতিহাসিকগণ একটির কথা বিশদ ভাবে বর্ণনা করলেও অপরটিকে উপেক্ষা করে গেছেন। কারণ সেইটিতে বিপ্লবের আগুন বিশেষ ছিল না—ছিল প্রেমাস্পদের জন্য আত্মবিসর্জন। সেই কাহিনীই এখানে বিবৃত করবো।

নর্মাণ্ডির মেরী এ্যান শার্লট কর্ডে ড আর্মণ্ডকে ফরাসী বিপ্লবের জোয়ান অব আর্ক বলা হয়। সাধারণ চাষীর ঘরে তাঁর জন্ম—যদিও পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে অনেকে রাজনীতিক, শাসক এবং যোদ্ধা ছিলেন।

শৈশবে শার্লট কনভেন্টে পড়াশুনা করেন। তার পর কাকীমার কাছে থাকা কালে ভল্টেয়ার প্লুটার্ক ও অনেকের লেখা পড়েন। তখনই তিনি দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার সময় তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। রাজনৈতিক মতবাদে তিনি ছিলেন 'গিরণ্ডিস্ট'—যাদের কাম্য ছিল শান্তি ও সাম্য। কিন্তু 'মাউন্টেন' দলের প্রাধান্যে সেই সময় প্যারিসে বিপুল রক্তের স্রোত বয়ে চলছিল।

ষোড়শ লুইয়ের পর (জানুয়ারী, ১৭৯৩ খৃঃ) তারা অসংখ্য লোকের গিলোটিন অর্থাৎ শিরশ্ছেদ করে। কায়েনে বসে শার্লট প্যারিসের সব খবরই পেতেন। সেই সময়ই মাউন্টেন দলের একজন প্রধান নেতা জীন পল ম্যারাটের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মে। তাকে হত্যা করে দেশকে বাঁচাতে হবে—এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি প্যারিসে আসেন।

ম্যারাটের দর্শনপ্রার্থী হয়ে তাকে লিখলেন—"আমি এইমাত্র কায়েন থেকে এলাম। জন্মস্থানের খবরের জন্য নিশ্চয়ই আপনি উৎসুক? এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করবো ও আপনাকে এমন অবস্থায় উপনীত করবো, যাতে দেশের প্রভূত উপকার হয়।"

কিন্তু সাক্ষাৎ মঞ্জুর হল না। শার্লট আবার লিখলেন, তা-ও ব্যর্থ হ'ল। তখন তিনি নিজেই এক দিন ম্যারাটের বাড়ীতে গেলেন। সেখানে দ্বাররক্ষীদের জানালেন যে, মাউন্টেন দলের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি ম্যারাটের আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসেছেন। কিন্তু তবুও রক্ষীরা তাকে ঢুকতে দিল না।

সেই সময় ম্যারাট উৎকট চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হয়ে কম্বল দিয়ে সমস্ত শরীর জড়িয়ে একটা টবে শুয়েছিলেন। গোলমাল শুনে তিনি শার্লটকে ভিতরে আসতে বললেন। বুকের কাছে ছোরা চেপে শার্লট ভিতরে ঢুকলেন।

শার্লট ম্যারাটকে বললেন, "কায়েনে ভয়ানক উত্তেজনা চলছে। গিরণ্ডিস্টরা কি যেন ষড়যন্ত্র করছে।"

ম্যারাট বললেন, "যেতে দাও ওদের, দু'-এক দিনের মধ্যেই সবগুলিকে গিলোটিন করছি।"

উত্তেজিত শার্লট কথা শেষ হওয়ার আগেই ম্যারাটের বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়েছেন। ম্যারাটের চীৎকারে পাশের ঘর থেকে দু'টি মেয়ে দৌড়ে এসে শার্লটকে ধরে ফেললো। শার্লট পালাবার প্রায় কোন চেষ্টাই করেন নি।

ট্রাইবুন্যালে বিচার আরম্ভ হ'ল……

—"তোমার কি বলবার আছে?"

—"শুধু এই যে, আমি সফল হয়েছি।"

—"কে তোমাকে দিয়ে এ কাজ করাল?"

—"আমার হৃদয়।"

—"ম্যারাট তোমার উপর কোন অন্যায় করেছিলেন?"

—"ও একটা পশু, ফ্রান্সকে ছারখার করে দিচ্ছিল।"

—"কিন্তু ওকে মেরে তুমি কার উপকার করলে?"

—"লক্ষ লক্ষ লোকের।"

—"কি ভেবেছ, দেশে আর ম্যারাট নেই?"

—"এর পরিণাম দেখে সবাই শিক্ষা পাবে।"

শার্লটের প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'ল।

* * * *

আদম লাক্স নামে একজন জার্ম্মাণ-ছাত্র প্যারিসে থেকে পড়তেন উৎসুক হয়ে এক দিন তিনি শার্লটের বিচার দেখতে গেলেন।

আসামীর কাঠগড়ায় শার্লট দাঁড়িয়ে। তার নরম সোনালী চুলে নর্ম্মান চাষীর একটি সাদা টুপি। বাদামী রংয়ের চোখ দু'টি বিষণ্ণ, শান্ত-গভীর চাউনি। সমস্ত অবয়বে স্বর্গীয় আত্মাহুতির ভাব।

মুগ্ধ আদম কোর্ট থেকে আবেশে টলতে টলতে বাড়ী ফিরলেন। তার সমস্ত মন-প্রাণ অর্পণ করেছেন শার্লটকে।

শুধু আর একটি বার তিনি শার্লটকে দেখেছিলেন।

১৭৯৩ খৃঃ ১৭ই জুলাই সন্ধ্যার একটু আগে শার্লটকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সারা দিন সমস্ত আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। কিন্তু যখন শার্লট গিলোটিনের কাছে এসে দাঁড়ালেন, তখন হঠাৎ মেঘের ফাঁক দিয়ে গোধূলির এক টুকরো বিষণ্ণ আলো এসে শার্লটের গায়ে পড়লো—অস্তগামী সূর্য্যের শেষ আলো বিদায়গামী মহান্ আত্মাটিকে বরণ করে নিতে। শার্লটের মহীয়সী মূর্ত্তি সেই স্বর্গীয় আভায় রঞ্জিত হয়ে ধীরে ধীরে এসে গিলোটিনে মাথা রাখলো।

ধারালো খড়্গটি পড়ার আগে আনমনে শার্লট বললেন, "আমার কর্ত্তব্যই প্রধান, আর সব কিছুই নয়।"

* * * *

আদম লাক্স বধ্যভূমি থেকে পাগলের মত বেরিয়ে এলেন। তার চোখে ভাসতে লাগল, সেই স্বর্গীয় আভায় মণ্ডিত শার্লটের মহীয়সী মূর্ত্তি—যাকে ভালবেসে তিনি ধন্য হয়েছেন। শার্লট তার প্রণয়ের কথা জেনেও যায় নি—এমন কি, আদম লাক্সকে তিনি কোন দিন দেখেনও নি, তাতে একটুকুও দুঃখ নেই আদমের। তিনি সেই দেবীকে ভালবেসেই ধন্য হয়েছেন। তার জন্য একটা মহৎ কিছু ত্যাগ করার অদম্য ইচ্ছায় অস্থির হয়ে উঠলেন আদম। তাঁর এমন কিছু নেই, যা সেই দেবীর কাছে নিবেদন করা যায়। হাঁ, আছে—তাঁর নিষ্কলঙ্ক জীবন। তাই তিনি দেবেন।

আদম লাক্স শার্লটের বিচারের নিন্দা করে একটি প্রচারপত্র লিখলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বন্দী করে রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা হ'ল। তাঁকে বলা হ'ল যে, ভুল স্বীকার করে যদি তিনি জার্ম্মাণীতে ফিরে চলে যান, তবে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

উদ্দীপ্ত স্বরে আদম উত্তর দিলেন—"যত দিন আমার প্রাণ থাকবে, তত দিন আমি এ অন্যায় বিচারের প্রতিবাদ করবো।" তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ল।

হাসিমুখে আদম লাক্স গিলোটিনে মাথা রাখলেন। শার্লটের রক্তচিহ্ন তখনও গিলোটিন থেকে মুছে যায় নি।

"দেবি আমার! একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।" শাণিত খড়্গ নেমে এল……

দু'টি রক্তের ধারা একসঙ্গে মিলে গেল। তাঁদের আত্মাও কি মিলে নি?

বিজ্ঞানবার্তা

পক্ষধর মিশ্র

আকাশ-জয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাশিয়ার কর্মতৎপরতার কাহিনী এতো দিন প্রচারিত হয়নি। আমরা শুধু জানতাম যে, রাশিয়া উচ্চাকাশের গবেষণায় পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রের চেয়েই পেছিয়ে পড়ে নেই, কিন্তু সঠিক ভাবে তারা যে কি পরীক্ষা করছে এবং সেই গবেষণামূলক পরীক্ষার ফলাফল যে কি, তার জ্ঞান থেকে বিশ্বজগৎ একেবারেই বঞ্চিত ছিল। প্রত্যেক দেশের বিজ্ঞানীরাই উপলব্ধি করতেন, রাশিয়া এই গবেষণায় নীরব দর্শকের ভূমিকা কিছুতেই নিতে পারে না। কারণ, মহাকাশে ক্ষমতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে কোন দেশের সৈন্য বিভাগের শক্তি বর্দ্ধনেরও একটা যোগাযোগ আছে। সমর-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সর্ব্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ নির্ম্মাণ করে যে-রাষ্ট্র ঐ উপগ্রহে সৈন্যস্থাপন এবং তৎসঙ্গে ক্ষেপণাস্ত্র প্রেরণের আয়োজন করতে পারবে, সেই এই বিশ্বে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী বলে পরিগণিত হবে। তাই মহাশূন্যের গবেষণায় সোভিয়েত রাষ্ট্র পেছিয়ে নেই,—আমেরিকার সঙ্গে সমান তালে প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। রাশিয়া কি করছে, তার কিছু সংবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, তাই আজ পাঠকদের পরিবেশন করবো। নিরপেক্ষ মহলের অনুমান, উচ্চাকাশের গবেষণায় আমেরিকা বা রাশিয়ার তুলনায় ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র অনেক পেছিয়ে আছে।

মাত্র কয়েক মাস আগে প্যারিসে কলেজ অফ এরোনটিক্স-এতে এক বিজ্ঞানী সম্মেলনে, সোভিয়েত বিজ্ঞানী দল রকেটের সহায়তায় তাঁদের উদ্ভাবিত নানা প্রকার যন্ত্রপাতির সাহায্যে উচ্চাকাশের বিষয়ে যে গবেষণা করেছেন, তার কিছু ফলাফল প্রকাশ করেন। এই সমস্ত গবেষণা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭০ মাইল উচ্চাকাশের বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য বিজ্ঞানী-মহলকে সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা উচ্চাকাশের ঐ অঞ্চলে রকেটের সাহায্যে কয়েকটি কুকুরকে প্রেরণ করেন। আকাশের ঐ মুক্ত পরিবেশে অবস্থান করার ফলে কুকুরগুলির দেহে ক্ষতিকারক কোন ফলাফলই পরিলক্ষিত হয়নি।

একটি বক্তৃতায় রাশিয়ার বিজ্ঞানী ডাঃ পোলোসকভ তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তু পর্য্যালোচনা করেন। উচ্চাকাশ পর্য্যবেক্ষণের যন্ত্রাদি ছোট ছোট মজবুত বাক্সের মধ্যে স্থাপন করে রকেটের সাহায্যে উচ্চাকাশে প্রেরণ করা হয়েছিল। রকেটটি তাদের মহাশূন্যে পরিত্যাগ করে; তার পর তারা প্যারাসুটের সাহায্যে নেমে আসে পৃথিবীর মাটিতে। মহাকাশে অবস্থানের স্বল্প সময়ের মধ্যেই স্বয়ংক্রিয় কার্য্য-ক্ষমতার মাধ্যমে ঐ যন্ত্র নানা প্রকার মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে নেয়। ঘটনাচক্রে প্যারাসুট যদি না খোলে, তাহলেও তথ্যাবলী সমেত যন্ত্রের ক্ষতিগ্রস্ত হবার কোনই আশঙ্কা নেই। যন্ত্রাদির আধার সমূহ এতোই মজবুত যে, বিনা প্যারাসুটে পৃথিবীর বুকে এসে ধাক্কা খেলেও তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না।

এক একটি রকেটের নাকের ডগায় লাগিয়ে একজোড়া করে বাক্স মহাকাশে পাঠান হয়েছিল। বাক্সগুলি লম্বায় প্রায় সাড়ে ৬ ফুট, চওড়ায় প্রায় ১৩ ইঞ্চি আর ওজনে ৬ মণেরও বেশী। প্রত্যেকটি বাক্স দু'টি করে কক্ষে বিভক্ত,—একটি কক্ষ বাতাস-নিবারক এবং চতুর্দ্দিকে বন্ধ এবং অপরটি মহাশূন্যের পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য উন্মুক্ত। বাতাস-নিরোধ কক্ষটিতে থাকে ব্যাটারী, ঘড়ি, ক্যামেরা এবং মোটর সমেত বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, তথ্যাবলী সংগ্রহের জন্য উন্মুক্ত কক্ষটিতে রাখা হয় থার্মোমিটার, ম্যানোমিটার, বাতাসের নমুনা সংগ্রহের জন্য কাচের আধার ইত্যাদি। কক্ষগুলি যুক্ত থাকে প্যারাসুটের সঙ্গে, উপযুক্ত সময়ে প্যারাসুট খুলে গিয়ে তাদের পৃথিবীতে অবতরণ করতে সহায়তা করে। রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে পৌঁছনোর পর যন্ত্রপাতি সমেত বাক্সগুলিকে মোটরের সহায়তায় রকেটের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ, রকেটের উপস্থিতি তথ্যাবলী সংগ্রহের ব্যাপারে যন্ত্রসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মহাকাশে বাতাসের গতিবেগ পরিমাপ করবার জন্য বিভিন্ন উচ্চতায় পর পর পাঁচটি ধোঁয়া-উৎপাদনকারী বোমা ফাটান হয়। ধোঁয়ার কণিকাগুলির ব্যাস এক মাইক্রনের অর্দ্ধেক এবং তাদের ব্যবহারের সমতা খুবই কম। কেবল ৫০ মাইলের উর্দ্ধে তারা খুব তাড়াতাড়ি নীচের দিকে নামতে থাকে। যাই হোক, দেখা গিয়েছে মহাকাশের ঐ উচ্চ অঞ্চলে অবস্থিত বাতাসের পরিমাণ কম হোলেও গতিবেগ বেশ বেশী। গরমকালে বাতাস পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে এবং শীতকালে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়।

মস্কোর সন্নিকটে অবস্থিত এরোমেডিক্যাল গবেষণা-কেন্দ্রের প্রধান ডাঃ পোকরোভস্কি তাঁর ভাষণে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৭০-৮০ মাইল উঁচুতে, মহাকাশের পরিবেশ জীবদেহের উপর কি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাই আলোচনা করেন। এই গবেষণার ফলে মানুষের আকাশ-জয়ের পরিকল্পনা ত্বরান্বিত হবে। ডাঃ পোকরোভস্কি জানান, রকেটে পরিভ্রমণের ফলে উচ্চাকাশের পরিবেশ জীবদেহের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকলাপের উপর বিঘ্নের সৃষ্টি করতে পারে, তাই এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান পরীক্ষামূলক ভাবে অর্জ্জন না করে, এবং সেই স্থানে দেহগত সর্ব্বপ্রকার জীবনক্রিয়ার নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে মহাকাশে যাবার চেষ্টা মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না। মানুষ পৃথিবীতে বসে বসে মহাকাশে মানবদেহের নিরাপত্তার যে সব ব্যবস্থা অবলম্বনের পরিকল্পনা করছে, তা সবই আনুমানিক।

রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা কুকুরের সহায়তায় তাঁদের এই গবেষণা পরিচালনা করেন। প্রথমে তাঁরা কয়েকটি কুকুরকে একেবারে বাতাস ও পরিবেশের সঙ্গে সংযোগশূন্য, বন্ধ টিউবের মধ্যে পুরে রকেটের সাহায্যে মহাকাশে প্রেরণ করেন। প্রত্যেকটি টিউবের মধ্যেই বাতাস পরিশোধক, উত্তাপ ও চাপ পরিমাপক যন্ত্রাদি এবং তৎসঙ্গে প্রাণীদের দেহের উত্তাপ, রক্তচাপ, নাড়ীর স্পন্দন, ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার তথ্যাবলী সংগ্রহেরও আয়োজন সম্পূর্ণ ছিল। দ্বিতীয় বারে কুকুরগুলিকে খোলা টিউবের মধ্যে করে

রকেটের সাহায্যে উচ্চাকাশে প্রেরণ করা হয়। এইবার তারা মহাশূন্যে ব্যবহার করবার জন্য বিশেষ ভাবে নির্মিত পোষাকের দ্বারা আবৃত ছিল। তাদের দেহের সঙ্গেই সংযুক্ত ছিল অক্সিজেন সিলিণ্ডার এবং বিভিন্ন তথ্যাবলী সংগ্রহের নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি। উভয় পরীক্ষাতেই নানা ভাবে কুকুরগুলিকে মহাশূন্যের বিভিন্ন উচ্চতায় এবং গতিবেগের মধ্যে পরীক্ষামূলক ভাবে ছেড়ে দিয়ে, পরিশেষে প্যারাসুটের সহায়তায় পৃথিবীপৃষ্ঠে নিয়ে আসা হয়। রুশীয় বিজ্ঞানীর মতে এই পরীক্ষার ফলাফল খুবই আশাপ্রদ, কুকুরদের অচেতন না করেও এই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে প্রয়োগ ক'রে দেখা গিয়েছে, তাদের উল্লেখযোগ্য কোনই ক্ষতি হয়নি। এই গবেষণার ফলে আশা করা যায়, মানুষ ৭০-৮০ মাইল উচ্চাকাশের পরিবেশে নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হতে পারবে। ডাঃ পোকরোসস্কি বক্তৃতার উপসংহারে আশা প্রকাশ করেন যে সমগ্র দেশের বিজ্ঞানীমণ্ডলের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার সমবেত প্রচেষ্টায় মানুষের শূন্যজয়ের স্বপ্ন একদিন না একদিন বাস্তব রূপ পরিগ্রহণ করবেই।

রাশিয়ার প্রতিনিধিদের উপস্থিতি এবং তাঁদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু, উপস্থিত বিজ্ঞানীবৃন্দের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহলের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু সম্মেলনে তাঁদের আলোচনায় বিদেশী বিজ্ঞানীর মধ্যে অনেকেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, তাঁদের অভিযোগ, রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার সমস্ত দিক বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে সমর্থ হননি। কি ধরণের রকেটে যন্ত্রপাতি এবং কুকুরকে মহাশূন্যে পাঠান হয়েছিল, সে সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই জানেন না। গত বছর কোপেনহেগেনের একটি সম্মেলনে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা এই বছর মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের চেষ্টার কথা উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু ডাঃ পোলোসকভের বক্তৃতায় বোঝা যায় না, তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি সমূহ ঐ কৃত্রিম উপগ্রহে স্থাপিত হবে কি না। যাই হোক রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের ব্যবহার অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল।

দুঃখের সেতু

(*Thomas Hood*-এর বিখ্যাত **"Bridge of Sighs"** কবিতার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ)

জীবনে যাহার শুধুই ক্লান্তি তেমনি অভাগী একটি আরো,
মরণের কোলে পেয়েছে শান্তি একটি কথাও শোনে নি কারো।
কোন্ সে বিধাতা গড়িয়াছিলেন এত সুন্দর কোমল ক'রে—
নাও তুলে নাও দেহখানি তার শুধু দেহখানি যতন ভরে।
সিক্ত বসন শবাচ্ছাদন ঝ'রে ঝ'রে পড়ে নদীর জল,
আয় তুলে নিই বুকে ক'রে তারে ঘৃণা ক'রে আর কি হবে বল?
শুধু নিন্দায় ছুঁলে না তাহারে যদি কিছু জ্ঞান বিবাদ কি দে,
তাই নিয়ে এস মানুষের মত দেখ এ জীবন-মরণ বিনে।
সে কে ছিল আর কি ছিল সে কথা সে বিচার আর আজিকে নয়,
শুধু চেয়ে দেখ একটি নারীর কি হয়েছে সারা জীবনময়।
অতীত দিনের কলঙ্ক তার সমাজ শাসন মানে নি বুঝি—
সে কথা হারায় নদীর ধারায় মরণ মাধুরী পেয়েছে খুঁজি।
বিশ্বমাতার একটি অংশ ধ্বংসের মাঝে পেয়েছে ছুটি,
থাক দোষ তার তবু শেষ বার মুছে দাও তার ওষ্ঠ দু'টি।
জলে-ধোয়া তার মাথা-ভরা চুল বাঁধন এলায়ে লুটায়ে পড়ে,
দাও তুলে দাও শুধু একবার সাজায়ে মনের মতন ক'রে।
তাকে ঘিরে শুধু অনুমান আর আলোচনা শুধু হল মুখর,
বারে বারে শুধু প্রশ্ন ঘনায় কোথা তার দেশ কোথায় ঘর।
মা তার কোথায় কে গো তার পিতা ভাই-বোন তার কেহ কি ছিল?
তারো চেয়ে বড় আপনার জন নারীর সে ধন কোথায় গেল?
দেখ সবে এসে যার যাই থাক এই ধরণীর মমতা নাই,
লক্ষ জনার নগর-দুয়ার শুধু একজন পেল না ঠাঁই।
ভুল সব ভুল অন্ধ আকুল ছিঁড়ে পড়ে গেছে বাঁধন যত,
পিতা-মাতা আর ভাই-বোন স্নেহ সে সব স্বপন হয়েছে গত।
ধ্রুবতারা সম প্রেমের সে শিখা লুটায়েছে তার ধূলির তলে,
শেষে গিয়াছেন বিধাতা তিনিও নীরব নয়ন অশ্রুজলে।

নির্জন তার অন্ধ-জীবন বন্ধ দুয়ার বিজন বাতি—
দাঁড়ায়েছে এসে তটিনীর তীরে কালো জলে যেথা হাজার বাতি।
শীতের হাওয়ায় কাঁপন জাগায় তবু তার মনে জাগে নি ভয়,
অন্ধ শীতল ওই কালো জল এমন আপন কেহ ত নয়।
পিছে ধেয়ে আসে কঠিন শাসন উন্মাদিনীর জীবন ভ'রে—
এখন তাহারে বাঁচাতে যে পারে সে শুধু মরণ এমনি ক'রে।
নীরব গহন হে মহামরণ রহস্য-কালো দু' বাহু ঘিরে,
নিয়ে যাও মোরে যেথা যতদূর শুধু এ ধরার সীমানা ছেড়ে।
এমনি করিয়া দু' বাহু বাড়ায়ে ঝাঁপ দিল নারী আকুলতায়,
তুহিন তটিনী কাঁপে থর-থর উঠে আর পড়ে চলে যেথায়।
তারি দুই কূলে ভেবে দেখ সবে কে আছ মানুষ দাঁড়াও এসে,
কবিও গাহন পান কোরো তাই যে-জলে মানুষ গিয়াছে ভেসে।
আর কথা নয় তুলে নাও তারে অতি সযতনে নারবে ধীরে,
বিধাতা যাহারে গড়িয়াছিলেন এত সুন্দর কোমল ক'রে।
মরণ-শীতল সোনার অঙ্গ যতনে তাহারে টানিয়া নাও,
মানুষের দেশ ছেড়ে চলে যায় তাহারে মানুষ সাজায়ে দাও।
জল-কাদা মাখা চোখ দু'টি তার মরে যেন তবু রয়েছে চেয়ে—
কিছু তার ছায়া দুঃসাহসের কিছু তার ভরা হতাশা দিয়ে,
কিছু তার কালো অন্ধ নিয়তি কিছু তার ভরা শূন্যতাতে,
সব মিলে ওই তীক্ষ্ণদৃষ্টি চেয়ে আছে দূর ভবিষ্যতে।
ধ্বংস তাহার দুঃখের ভারে লোক-নিন্দায় ছন্নছাড়া—
জীবন-জ্বালার মরুভূমি মাঝে হারায়েছে তার জীবনধারা।
বন্ধ কর গো অন্ধ নয়ন কি আর হবে গো এমন চেয়ে,
হাত দু'টি শুধু রাখ এক সাথে প্রার্থনা তার যাক সে গেয়ে।
এ জীবনে মোর যত ভুল-দোষ প্রতিটি বিন্দু আমারি সে যে,
শুধু এ জীবন গড়েছেন যিনি তাঁরি পদতলে চলিনু নিজে।

অনুবাদক—বীরেন্দ্রকুমার রায়।

বিবেকানন্দ স্তোত্রে

সুমণি মিত্র

১৫

পুতুল-পুজোর এই প্রসঙ্গে আজ
পরিব্রাজক স্বামিজীর
একটা ঘটনা যদি বোলি,
হয়তো হাসিল হবে কাজ।[১]

স্বামিজী তখন
পরিব্রাজক সন্ন্যাসী।
দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে কোরে
জলে-রোদ্দুরে
ভারতের নানাদেশ
ঘুরে ঘুরে শেষে
এসেছেন আলোয়ার দেশে।
আলোয়ার রাজ্যের দেওয়ান সায়েব
মেজর শ্রীরামচন্দ্র এই
তীক্ষ্মমেধা, দীপ্তদেহী
নিরাকাঙ্খ সাধুকে দেখেই
শ্রদ্ধায় অভিভূত হন,
তারপর বাক্যালাপ,
তারপর গৃহে আমন্ত্রণ।

স্বামিজীর দিব্য প্রতিভায়
বিমুগ্ধ হোয়ে,
বিপুল আশায়
দেওয়ান সায়েব
মনে এক নিষ্পাপ ফন্দী আঁটেন
দেওয়ান ভাবেন—
এই সাধুকে যদি তিনি
রাজ্যের রাজাকে ডাকেন,
স্বামিজীর সান্নিধ্যে
যদি তাঁকে টেনে আনা যায়,
ইংরিজীভাবাপন্ন মহারাজের
মনোভাব ঘুরে যাবে ঠিক্।

রাজকাজে উদাসীন
মহারাজ মঙ্গল সিং
সে-সময়ে বাইরে ছিলেন।
এমন সময়
দেওয়ানের কাছ থেকে
মহারাজ পত্র পেলেন,
লোভনীয় ছোটো এক লাইন-

"A great Sadhu
With a stupendous knowledge
of English
Is here."[২]
অর্থাৎ—'মহারাজ
আমার বাড়িতে আজ
পদধূলি দিন একবার।'

* *

দেওয়ানের চিঠি পেয়ে
মহারাজ আনন্দ পান,
কেন না রাজার
দারুণ শিক্ষাভিমান,
তার ওপর
বিলিতী মেজাজ।
রাজা তাড়াতাড়ি
স্বামিজীর সন্ধানে
পা বাড়ান দেওয়ানের বাড়ি।

তারপর স্বামিজীকে পেয়ে,
খৃষ্টানী নীতিবাদ
একরাশ পেটে পুরে খেয়ে
বিরুদ্ধ ভঙ্গীতে
মহারাজ বোললেন স্রেফ,—

১। ঘটনাটা The life of Swami Vivekananda (by his eastern and western disciples) থেকে নেওয়া।

২। "একজন সাধু এখানে এসেছেন। ইংরিজীতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য।"

"I have no faith
In idol-worship.
What is going
To be my fate ?"৩

* * *

প্রশ্নের সুর শুনে
স্বামিজীর এই মনে হয়,—
জ্ঞানার্জনের স্পৃহা
প্রশ্নের মূল-সুর নয়।
বোঝা গ্যালো বেশ,
এতে আছে সে-যুগের
মূর্তি-পুজোর প্রতি
ধার-করা ছাঁদি বিদ্বেষ।

যাই হোক,
স্বামিজী কি কম ?
স্বামিজী জানেন
কোন্ পথে কতো দূর
নিয়ে গেলে তাঁর
শিকারের ছুটে যাবে দম্।
—"সে কি কথা মহারাজ মঙ্গল সিং !"
স্বামিজী হাসেন,—
"Surely
You are joking !"৪

শিক্ষিত মহারাজ
তবু অবিচল,
কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে কথা বাড়ালেন,—
"No Swamiji,
Not at all !
You see,
I really cannot worship
Wood, earth, stone and metal
Like other people.
Does this mean
That I shall fare
Worse
In the life hereafter ?"৫

* * *

আলোয়ার রাজ্যের যতো অধিবাসী
আসলে কৃষ্ণ-ভক্ত সব,
মূর্তি-পুজোর বিশ্বাসী।
তারা ভাবে—আজ
স্বামিজীর দৌলতে
যদি মহারাজ
পুতুল-পুজোর প্রতি
শ্রদ্ধান্বিত হন্, তবে
আলোয়ার রাজ্যের
সকলেই গুর্মে খুশি হবে।

* * *

এমন সময়
স্বামিজী সটান্
একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটান্ !

ঘটনাটা এই,—
দেয়ালে একটা ফটো টাঙানো দেখেই
স্বামিজী চকিতে
বোললেন—ফটোখানা তাঁর হাতে দিতে!
ছবিটা রাজার,
তবুও প্রশ্ন তাঁর নাটকীয় ঠাটে,—
"আচ্ছা, বলো তো দেখি
এ-ছবিটা কার ?"

দেওয়ান জবাব দ্যান্,—
"আমাদেরই মহারাজজীর,
এ তাঁরই প্রতীক।"
হঠাৎ আদেশ আসে মেঘমন্দ্র রবে,—
"Spit upon it !"৬

স্বামিজীর কথা শুনে
সভাসদ ভয়ে স্তম্ভিত !
নিঃসম্বল সাধুটির
এত বড়ো দুঃসাহস কিসে,
রাজার সামনে বলে যাতে—
"থুতু ফ্যালো তাঁর ছবিটাতে !"

মনে মনে ভাবেন দেওয়ান—
আজ বুঝি স্বামিজীর
যায় গর্দান্ !

সন্ন্যাসী তবু বেপরোয়া,
রাজসভা শিহরিত কোরে
স্বামিজীর দারুণ তাগিদ,-

৩। "মূর্তি-পুজোতে আমার বিশ্বাস নেই, তা আমার দশাটা কি হবে ?"

৪। "আপনি নিশ্চয়ই রহস্য কোরছেন।"

৫। "না স্বামিজী, মোটেই তা নয়। দেখুন, বাস্তবিকই আমি অন্য লোকেদের মতো কাঠ, মাটি, পাথর বা ধাতুর পুজো কোরতে পারি না। এতে কি আমার পরজন্মে অধোগতি হবে ?"

৬। "এতে থুতু ফেলুন।"

"Any one of you
May spit upon it."৭

বিস্ময়ে হতবাক্‌ সব,
নিষ্প্রাণ ছবি যেন চিত্রশালার !
—"What is it
But a piece of paper ?"৮

এদিকে দেওয়ান
ভয়ে আর বিস্ময়ে
রাজার মুখের দিকে চান !
সন্ন্যাসী অতিথির
আজ বুঝি যায় গর্দান্‌ !
তবুও না-ছোড় বান্দা
স্বামিজীর জিদ্‌,—
"Spit upon it !
I say
Spit upon it !"৯

* * *

সকলে বজ্রাহত যেন !
মনে মনে ভাবে—
খাল কেটে কুমীরকে
স্বেচ্ছায় ডেকে আনা কেন !

তার পর রীতিমতো ঘেমে,
প্রকাণ্ড কক্ষের
দুঃসহ স্তব্ধতা ভেঙ্গে,
কোনোমতে ঢোক্‌ গিলে
দেওয়ান্‌জী বোললেন শুধু,—
"What ! Swamiji !
What are you asking me
to do ?
This is the likeness
Of our Maharaja !
How can I do such a thing ?"১০

৭। "আপনাদের মধ্যে যে কেউ হোক্‌ এসে এই ছবিটাতে থুতু ফেলুন।"

৮। (কেউই এগিয়ে এলো না দেখে স্বামিজী বোললেন) "এ কি ? এটা তো এক খণ্ড কাগজ মাত্র !"

৯। "ছবিটার ওপর থুতু ফেলুন, আমি বোল্‌ছি ফেলুন।"

১০। "স্বামিজী, আপনি এ কি আদেশ কোরছেন ? এটা হোচ্ছে আমাদের মহারাজজীর প্রতিকৃতি ! এর ওপর থুতু ফেলি কি কোরে ?"

শিকারীর কৌশলে
সমুদ্র-উপকূলে
এসে গ্যাছে বনের হরিণ!

সশব্দে ছুটে এলো বাণ,—
"ওকি কথা বলেন দেওয়ান ?
যতোই যা-হোক,
এটা তো একটা শুধু টুক্‌রো কাগজ,
ছবিটা তো সত্যিই মহারাজ নন ;
রক্ত-মাংস এতে আছে কি রাজার ?
আছে তাঁর প্রাণ-স্পন্দন ?
তবু কেন এত সঙ্কোচ ?
কেন একে এত সম্ভ্রম ?"

* * *

"Be it so,
But the Maharaja
Is not bodily present
In this photograph.
This is only
A piece of paper.
It does not contain
His bones and flesh and blood.
It does not speak or behave
Or move in any way
As does the Maharaja.
And yet
All of you
Refuse to spit upon it,—
Because..." ১১

এতক্ষণ পরে
দেওয়ান ও সকলের
প্রাণ এলো ধড়ে,
পরিচিত বন্ধুকে
ফিরে পেলো স্বামিজীর স্বরে ;
মুখ থেকে খসে পড়ে মেঘের মুখোশ।
"...Because
You see in this photo
The shadow of the Maharaja's form.

১১। "তা হোক্‌, তাই বোলে এই ফটোতে মহারাজজী তো আর সশরীরে উপস্থিত নেই। এটা তো এক টুকরো কাগজ মাত্র। এতে না আছে তাঁর অস্থি, না আছে তাঁর রক্তমাংস, না আছে তাঁর কথাবার্তা, না আছে তাঁর চাল-চলন। তা সত্ত্বেও এতে থুতু ফেলতে আপনারা নারাজ, কেননা..."

Indeed
In spitting upon it,
You feel
That you insult your master,
The prince himself."১২

*　　*　　*　　*

সমস্ত দেখে শুনে
রাজা তো অবাক্ !
প্রতীক-পুজোর
এমন সরস ব্যাখ্যা
শোনেননি আর।
সায়েবি শিক্ষাভিমান
ধীরে ধীরে খ'সে পড়ে তাঁর,
মুখে-চোখে ভাখা ভায়
বিশ্বাসের স্নিগ্ধ আমেজ।

*　　*　　*

এবার স্বামিজী
স্বয়ং রাজার দিকে ফিরে বোললেন,—
"See, your Highness,
Though
This is not you in one sense,
In another sense
It is you.
That was why
Your devoted servants
Were so perplexed
When I asked them
To spit upon it.
It has a shadow of you ;
It brings you
Into their minds.
One glance at it
Makes them
To see you in it !
Therefore
They look upon it
With as much respect
As they do upon your own person."১৩

১২। "কেননা, এই ফটোতে আপনারা মহারাজের সাদৃশ্য, ওঁর ছায়াটা দেখতে পাচ্ছেন। তাই সত্যিই এর ওপর থুতু ফেলার কথা ভাবতে গেলেই মনে হোচ্ছে—এতে আপনাদের প্রভু, স্বয়ং মহারাজকেই অসম্মান করা হবে।"

১৩। "দেখুন মহারাজ, এক হিসেবে এ-ছবিটা যদিও আপনি নন, আর এক হিসেবে দেখতে গেলে এ-ছবিটা আপনিই। সেইজন্যেই

প্রতীক-পূজোর
ঐ একই রহস্য,
ঐ একই সুর।

"Thus it is
With the devotees
Who worship stone
And metal images of Gods."১৪

* * *

এতক্ষণে মহারাজ
বুঝেছেন নিজের গলদ,
মন থেকে সরে গ্যাছে
সংশয়ের সিক্ত অবরোধ,
মনের গভীরে
আচমকা এসে গ্যাছে
বিশ্বাসের স্নেহোত্তপ্ত বোধ।

* * *

"It is because
An image
Brings to their minds
Their Ishta,
Or some special form
And attributes of the Divinity,
And helps them to concentrate,
That the devotees
Worship God in an image.
They do not worship the stone
Or the metal as such."১৫

"মহারাজ,
বহু দেশ কোরেছি ভ্রমণ,
কোথাও দেখিনি আমি
গৃহী বা শ্রমণ
পাথরের উপাসক কেউ,
কাউকে দেখিনি আমি
পূজো দিতে ধাতুর উদ্দেশে।"

"I have travelled to many places,
But nowhere have I found
A single Hindu
Worshipping an image,
Saying,
'O Stone! I worship Thee!
O Metal! Be merciful to me'!"১৬

"ফটোটা আপনি নন,
তবু এটা দেখে
আপনাকে মনে প'ড়ে যায়,
পাথর দেবতা নয়,
দেবতার স্মৃতিকে জাগায়।"

* * *

"Everyone is worshipping,
O Maharaja,
The same one God
Who is the Supreme Spirit,
The Soul of Pure Knowledge.
And God appears to all
Even
According to their understanding
And their representation of Him."১৭

* * *

শেষ হোলো স্বামিজীর কথা,
ঠিক্ যেন শেষ হোলো গান।
মনে হোলো যেন,
চেতনার আশে-পাশে
সুরের আবেশ রেখে
থেমে গ্যালো চার্চ-অর্গান্।

* * *

নব-জাত বিশ্বাসে রীতিমতো বিহ্বল হোয়ে,
বিশুদ্ধ শ্রদ্ধায় দুটো চোখ তরলিত কোরে,
নিজেকে ফুলের মতো নিবেদন কোরে তাঁর পায়
বোললেন মঙ্গল সিং,—

এতে থুতু ফেলতে বলায় আপনার অনুরক্ত কর্মচারীরা অতোখানি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ছবিটা আপনারই ছায়া, এটা দেখে আপনারই কথা তাঁদের মনে পড়ে যায়। একবার এ-ছবিখানা দেখলেই, এর মধ্যে আপনাকেই তাঁরা দেখ্‌তে পান। সেই কারণেই আপনাকে যেমন তাঁরা মান্য করেন, আপনার এ-ছবিটাকেও তাঁরা ঠিক্ সেইরকমই মান্য কোরে থাকেন।"

১৪। "ভক্তও পাথর বা ধাতুনির্মিত দেব-দেবীর মূর্তিকে এই চোখেই ছাখেন।"

১৫। "যেহেতু মূর্তি ভক্তকে তার ইষ্ট-দেবতার কথা স্মরণ কোরিয়ে ছায়, কিংবা ঈশ্বরের কোনো বিশেষ আকার বা গুণের কথা মনে কোরিয়ে ছায় এবং মনকে একাগ্র করবার সহায়তা করে, সেই জন্যেই তারা প্রতীকের মাধ্যমে ঈশ্বরের পূজো করে। তারা পাথর বা ধাতুর উপাসক নয়।"

১৬। "আমি বহুদেশ ভ্রমণ কোরেছি, কিন্তু কোথাও কোনো হিন্দুকে মূর্তি-পূজো কোরতে গিয়ে বোলতে শুনিনি,—'হে প্রস্তর, আমি তোমায় পূজো করি। হে ধাতু, তুমি আমার প্রতি সদয় হও!"

১৭। "মহারাজ, সকলেই সেই একই পরমাত্মার, বিশুদ্ধ জ্ঞানের আধার সেই পরব্রহ্মসত্তারই পূজো কোরে থাকে, এবং তিনিও ভক্তের ভাব এবং আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সকলকে দর্শন ছান্।"

"Heretofore
I did not understand its meaning !
You have opened my eyes !
But
Wha twill be my fate ?
Have mercy on me."১৮

অশ্রুসিক্ত আবেদন এটা,
ব্যাকুলিত প্রাণের বিলাপ !
এটা হোলো সত্যিই
মঙ্গল-বুদ্ধির
নতমুখী সলজ্জ ত্রাস !

* * *

কৃপার আবেগে স্নিগ্ধ চোয়ে
স্বামিজী এবার
মমতামথিত স্বরে
প্রার্থীর অন্তরে
প্রাপ্তির পিপাসা জাগান।—

"O prince,
None but God
Can be merciful to one,
And He is ever-merciful !
Pray to Him.
He will show His mercy
Unto you !"১৯

১৬

অবিশ্যি রাজা, ২০
তোমাকে কটাক্ষ কোরে এটা বলা নয়,
তোমার উদার দৃষ্টি
অতোখানি হয়নিকো ম্লান ;
—এটা আমি বোল্‌ছি তাঁদের,
তোমারই মতানুবর্তী
পরবর্তী ব্রাহ্ম-নেতা যাঁরা
পুতুল-পুজোর নামে
প্রচণ্ড বিভীষিকা খান্! ২১ [ক্রমশঃ।

১৮। "এতদিন আমি মূর্তি-পুজোর অর্থই বুঝতে পারিনি ! আজ আপনি আমার চোখ খুলে দিলেন ! কিন্তু আমার কি দশা হবে স্বামিজী ? আপনি আমায় কৃপা করুন।"

১৯। "মহারাজ, এক পরমাত্মা ছাড়া কেউ কাউকেই করুণা কোরতে পারে না, আর তিনি হোচ্ছেন সর্বদাই করুণাময় ! তাঁয় কাছে প্রার্থনা করুন, নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে কৃপা কোরবেন।"

২০। রাজা রামমোহন রায়।

২১। রাজা রামমোহনকে কেবলমাত্র মূর্তি-পুজোর বিরোধী বোললে, তাঁর উদারতা, বিশেষত্ব এবং গৌরবকে খর্ব করা হবে। মূর্তিপূজা-বিরোধী, একেশ্বরবাদী কিংবা বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী হওয়া সত্বেও তিনি প্রতীক-পুজোকে কোনোদিন অশাস্ত্রীয় বোলে নির্দেশ করেন নি। রাজা কিছুটা মূর্তি-পুজোর রহস্য বুঝতেন। তিনি এ-কথাও বোলেছেন,—"ঈশ্বরোদ্দেশে ঐ কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়।" তাই অধিকারীভেদে প্রতীক-পুজোর প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার কোরে গ্যাছেন। এ-ব্যাপারে তাঁর মনোভাব পরবর্তী ব্রাহ্ম-সংস্কারকদের চেয়ে অনেক বেশি উদার এবং সংস্কারমুক্ত।

মহর্ষি, রাজনারায়ণ, অক্ষয়কুমার বা বিদ্যাসাগর—সকলেই মূর্তিপুজোতে সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ কোরে গ্যাছেন ; অথচ কেউই মূর্তিপুজোর বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো যুক্তি দ্যাখাতে পারেন নি।

মহর্ষি প্রতীক-পুজোর বিরুদ্ধে নিছক্ প্রতিবাদই কোরে গ্যাছেন, রাজার মতো শাস্ত্র, যুক্তি বা লোকব্যবহারের দিক্ থেকে আলোচনা কোরে এ-বিষয়ে নোতুন কিছু বোলে যাননি। তাঁরই অনুগামী রাজনারায়ণ বাবুও মূর্তি-পুজোর বিরুদ্ধতা কোরেছেন বিশেষ কোনো যুক্তি না-দেখিয়েই।

প্রত্যক্ষবাদী অক্ষয়কুমার শ্রেণীভেদে মূর্তি-পুজোকে একপ্রকার নিম্নাধিকারীর ধর্ম বলে সঙ্কীর্ণমনে স্বীকার কোরলেও, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে এর অনুপযোগিতা প্রমাণ কোরে একে বর্জন কোরেছেন। বিদ্যাসাগর মশাইএরও ঐ একই যুক্তি—যা নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ তা কখনোই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হোতে পারে না, আর মূর্তি হোচ্ছে আকার-বিশিষ্ট এবং জড়। ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর আর মূর্তি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ; কাজেই ঈশ্বর মূর্তি হোতে পারেন না বা ঈশ্বরেরও মূর্তি হোতে পারে না।

বুদ্ধির এই সিদ্ধান্ত হয়তো আমাদেরও মেনে নিতে হোতো, যদি না পরবর্তীকালে সমন্বয়যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মূর্তির সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ কোরতেন, সাধনার দ্বারা প্রতিমাকে জাগ্রত না কোরতেন।

সংস্কার-যুগে একমাত্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই তাঁর ধর্ম-জীবনের শেষ স্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হোয়ে মূর্তি-পুজোর রূপক ব্যাখ্যা কোরে গ্যাছেন এবং তা ধর্ম-সাধনার অঙ্গীভূত বোলে স্বীকার কোরতেও পেছ্‌-পা হননি।

এই সব দিক্ থেকে বিচার কোরলে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, রামমোহন-পন্থীরা প্রচুর পরিমাণে রামমোহন থেকে বিপথগামী।

"Institutions do not make men, any more than organisations make life ; and even the ideal university....will be a superior piece of mechanism unless each student strives after the ideal of the scholar."
—*T. H. Huxley.*

নীলকণ্ঠ

পঁচিশ

টলিউড থেকে শুধু আক্ষেপ নিয়ে ফিরেছি, একথা লিখলে ভুল হবে। টলিউডে বিস্ময়ও আছে। বিস্ময়: মঞ্জরী দেবী। যে-কোনও উপন্যাসের চেয়ে অলৌকিক কিন্তু এতটুকু অলীক নয়। অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন মঞ্জরী, কিন্তু তাঁর নিজের জীবনে যে নাটক তার সঙ্গে কোনও তুলনা হয় না তাঁর অভিনীত কোনও ছবির কাহিনীরই। রাজপথ থেকে রাজতক্তে নয়; সে ইতিহাস পুনরাবৃত্তিতে হাস্যকর হয়ে গেছে। পাঁক থেকে পদ্মে; সমাজ পরিত্যক্ত জীবনের অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে আরেক দিন শুধু সমাজপতিদের নয়, সমস্ত সমাজের স্বীকৃতি আদায়ের মধ্যে ঘটনার উত্থান-পতন রোমাঞ্চকর। মেয়েমানুষ থেকে রমণীতে এই রূপান্তর আরব্যোপন্যাসের চেয়েও আশ্চর্য্য! গরীব থেকে শুধু বড়লোক মাত্র হয় নি মঞ্জরী; যে-সমাজ তার পিতাকে করেছে সমাজপতি অথচ তাকে করেছে সমাজচ্যুত, সে-সমাজকে ক্ষমা করে নি সে; মৌন অভিমান নয়; স্বীকৃতি আদায় করে করেছে মুখর প্রতিবাদ। সমাজের পরিচয়পত্রে যোগ করেছে নূতন বর্ণপরিচয়। টলিউডের নরকে অনেক অধঃপতিতা পতিতা হতে বাধ্য হয়েছে। তাদের চোখের জল টলিউডের মাটিতে পড়ে শুকিয়ে যায় নি; তার ভিতকে টলিয়েছে। সর্ব নিম্নস্তরের পতিতা হয়েছে সর্বোচ্চ স্তরের সঙ্গে পরিণীতা। মেয়েদের নিয়ে ছেলেখেলায় আমরা শুধু পুরুষের হাসিই দেখেছি; কোনও মেয়ের অট্টহাসি দেখি নি। মঞ্জরী এই সমাজের মুখের ওপর প্রচণ্ড ব্যঙ্গের সেই মুখর অট্টহাসি।

মঞ্জরীবালা কেমন করে মঞ্জরী দেবীতে উত্তীর্ণ হলো সেই—অভিজ্ঞতাই টলিউডের রঙ্গতীর্থে আমার একমাত্র লাভ। সেই জীবন-নাট্য এখানে উপন্যাসের মত সাজিয়ে দিলাম। জীবনের সত্যকে উপন্যাসের আঙ্গিকে জন্ম দিতে যেটুকু কল্পনার অঞ্জন মাখানো দরকার সেইটুকু দিয়েছি বলেই একে কাহিনী বলছি, না হলে একে সত্য ঘটনা বলেই আখ্যায়িত করতাম। কিন্তু নিখাদ সোনায় যেমন অলঙ্কার অসম্ভব, তেমনি নিছক সত্যকথনে রিপোর্ট হয়, সাহিত্য হয় না। তাই সত্যের ভিতের ওপর এ-হচ্ছে বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রিত ইমারত।

একটি কথা; এ-কাহিনী একজন চিত্রাভিনেত্রীর জীবনী মাত্র নয়; সেই জীবনকে উপলক্ষ্য করে এই লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করেছি আমি যে, পদ্ম দিয়েই মানুষ চিরকাল পুজো দেবে; পঙ্কের খবর নেবে না সে কোন দিন; কিন্তু যে লিখবে তার কাছে পদ্মের চেয়ে পঙ্কের দাম কম নয়; পঙ্কে জন্মায় বলেই পদ্ম,—পদ্ম। শুধু পদ্মের গন্ধে মানুষের মন উন্মনা হতে পারে কিন্তু সত্যকে পাবে না সে; শুধু পঙ্কের বর্ণনায় পুলিশের ডায়েরী হতে পারে, সাহিত্য অসম্ভব। পঙ্কে জন্মানোর বেদনার সঙ্গে পদ্ম হয়ে একদিন ফুটে ওঠার আশাই সাহিত্যের একমাত্র দাবী; পঙ্কজের সঙ্গে যেটুকু পঙ্ক জড়ানো, সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তব জীবনও ততটুকুই জড়ানো; তার বেশী নয়; তার কমও নয়।

ট্রাম ষ্টপেজে দাঁড়িয়ে মঞ্জরী আঁচলে-বাঁধা পয়সাগুলো গুণলে। কি হবে গিয়ে। একবার তার মনে হোল। কি হবে গিয়ে ফিরে যাই, সে ভাবলো। মনে মনে সে ঠিক বুঝতে পেরেছে, এ অসম্ভব, মাঝের থেকে এই দু'টো টাকাও আস্ত থাকবে না। আঁচলে হাত দিয়ে টাকা দুটো আরেক বার স্পর্শ করতেই আরো ভয় হল। দু'টো আস্ত রূপোর টাকা। গত সপ্তাহে দুলু বাবু দু'দিন পর পর তার ঘরে আসে নি। অনেক সাহস আর উপায়হীন হয়ে তবে সে খদ্দের জুটিয়েছিল। দু'টি কলেজ বাবু। তাদেরই একজন বোধ হয় কলেজের মাইনে থেকেই হবে, এই দু'টি টাকা দিয়ে যায়। দুলু বাবু জানলে?

এটা কি টালিগঞ্জের ট্রাম? মঞ্জরী এতক্ষণে পাশের লোকটিকে ভালো করে দেখলে। রুক্মিণীবালার দালালটার মত চেহারা, অবিকল কালো, নাদুস-নুদুস। গায়ে মলমলের পাঞ্জাবী, পায়ে কালো চটি, হাতে ওটা কি? রুক্মিণীবালার দালালের হাতে কখনো দেখে নি। হ্যাঁ টালিগঞ্জের গাড়ী। কোথায় যাবে? মঞ্জরী জবাব দিলে না; প্রথমে গাড়ীটায় উঠে পড়লো; ভাড়া বেশী, সে জানে; তবুও। লোকটার পেছন পেছন এসে উঠলো। মঞ্জরী আঁচ করলে, লোকটা চিনে ফেলেছে, সে কোথাকার। না হলে মেয়েছেলেকে নিশ্চয় আপনি করে ডাকত।

দুলু বাবু জানলে? আরেক বার ভাবতেই একটু ভয় পেলো মঞ্জরী। তারপর মনে মনেই বোধ হয় সাহস সঞ্চয় কোরবার জন্যেই হবে বললে: ও জানুক। ষাটটা টাকা দেবে; তাও আজ পাঁচ টাকা কাল দশ টাকা করে। এর দিকে তাকালে, ওর সঙ্গে কথা বললে অভিমান; দু'দিন অন্তর সন্দেহ। মঞ্জরী এবার স্পষ্ট করে বলে দেবে: সে পারবে না

ট্রাম আর যাবে না। খাঁচার মধ্যে ঢুকছে। মঞ্জরী নেমে পড়ল, আর সেই লোকটি। লোকটা এতক্ষণ লেডিজ সীটের পেছনেই বসেছিল। মঞ্জরী খেয়াল করে নি।

এখানে কোথায় যাবে ?

কোথায় যাবে। তা ছাই মঞ্জরীই কি ভালো করে জানে ? গোকুলের ওপর তার রাগ হোল ভীষণ। কত বার মঞ্জরী তাকে বলেছে ঠিকানাটা একটু কাগজে লিখে দিতে, না, ট্রাম যার পর আর যাবে না, সেইখানে নেমে যে কোন রিক্সওয়ালাকে বললেই হবে বায়োস্কোপের ছবি তোলা হয় যেখানে, সেখানে নিয়ে যেতে ; বাস !

আচ্ছা এখানে কোথায় বায়োস্কোপ ?

বুঝেছি, কিন্তু কোন ষ্টুডিওতে যাবে ? ওস্ত না রুবি ?

রু—রুবি !

এতক্ষণ বলনি কেন ? কার কাছে যাবে ?

রাখাল বাবু, রাখাল দত্ত গো ! 'গো' কথাটা মঞ্জরী এখানে লাগাতে চায় নি কিন্তু তবুও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওঃ, স্যারের কাছে ! একষ্ট্রার জন্যে ! তা, তার জন্য আর ওঁকে বিরক্ত করো কেন ?

গোকুল যে তাই বললে।

গোকুল কে ? ওঃ ! বুঝেছি, গোকুল ত' ষ্টুডিওর কুলি। আমার এসিষ্টেণ্ট ! চলো রাখাল বাবুর কাছে আমিই নিয়ে যাচ্ছি। গোকুলের নাম কোরবারই দরকার নেই সেখানে, বুঝেছ ?

মঞ্জরী চুপ করে রইল ; মনে মনে বলল, আমরা বেশ্যারা সকলের সব কথাই চট করে বুঝে নিই। শুধু নিজেদের মন নিজেরা বুঝিনে, কেন কে জানে !

একখানি রিক্স নিলে লোকটা। কাজ না হলেও ভাড়াটা বোধ হয় বাঁচলো ; মঞ্জরী একটুখানি খুসীই হল। পানের দোকানে থেকে শিস দিলে এক জন। এক জন চেঁচালে : কোথায় চললেন স্যার ? রিক্স থেকে নেমে মঞ্জরীই ভাড়া দিলে।

আজ তার শরীর খারাপ, শরীর ভালো না থাকলে কোনও পুরুষ মানুষই কোনও মেয়ে মানুষের জন্যেই একটি কড়ি বার করতেও রাজী নয়।

তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় সে জানে, এই হল দস্তুর।
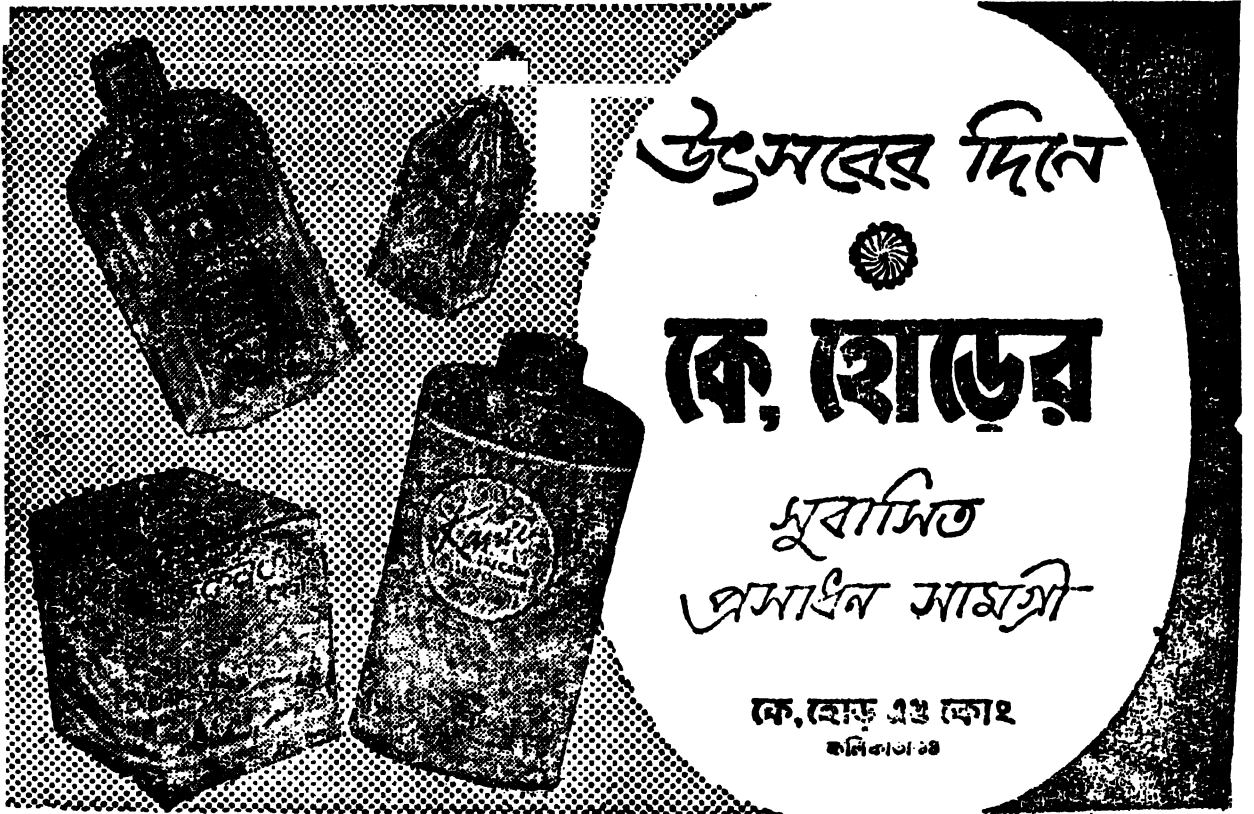
গেটের ওপর বৃত্তাকারে লেখা : রুবি ফিল্মস্‌ সাউণ্ড ষ্টুডিও। এক জন মিস্ত্রীই হবে হয়তো। বললে মঞ্জরীর সঙ্গের লোকটাকে : কি লাটুমাণিক, এতক্ষণে সময় হোল ? যাও, কর্তা ভেতরে রেগে ফায়ার ! চাকরী বোধ হয় আজ গেলো তোমার।

লে লে তুই চুপ কর। আমার চাকরী কে খায় রে ? লম্বা সরু এক ফালি রাস্তা পার হয়ে মঞ্জরী যে ঘরটায় এসে ঢুকলো, অত উঁচু, অত বড় আর অত নিস্তব্ধ ঘর সে আর আগে দেখেনি। আর কি গরম হ্যাঁ, দম বন্ধ হয়ে এলো প্রায় মঞ্জরীর।

ঘরে চার-পাঁচটি লোক। সবাই বোবা। কেউ কথা কয় না ; খদ্দের যাচানো নজরে মঞ্জরী এক ঝলক কটাক্ষ ঘুরিয়ে আনলো সকলের মুখের ওপর দিয়ে। বুঝতে পারলে এরা সবাই একজনের জন্যে অপেক্ষা করেছিলো কিন্তু সে মঞ্জরীর জন্যে নয়।

বহু দিন আগে একবার ব্যারাকপুর-এর এক বাগান-বাড়ীতে

গিয়েছিল, তার দিদির সঙ্গে। তখন তার বয়স বেশী নয়। ঠিক সেই বাগান-বাড়ীর মতই না ফিল্ম ষ্টুডিও। সহরের কাছেই, কিন্তু সহর থেকে যেন অনেক দূরে। পরিত্যক্ত প্রাসাদের মত মনে হয়। দু'-চারটি লোক, তাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। এটা যেন এক দিন কোন প্রাচীন রাজার রাজপুরী ছিলো। সৈন্য-সামন্ত সব বেরিয়ে পড়েছে, যুদ্ধ করতে আর ফিরে আসে নি। সেই সব ফেরারী ফৌজদের যাদের কোন দিন এরা দেখে নি, তাদেরই কল্পিত জীবনের আখ্যান নিয়ে মনগড়া রূপ দেওয়ার ছেলে-ভুলানো খেলা জমাবার চেষ্টায় অলস ক'টি লোক অলসতর কল্পনায় মশগুল। ফূর্তির ঠাণ্ডা আবহাওয়া কাজের আসরে। যা এদের প্রচেষ্টার মতই নিষ্প্রাণ। কলের পুতুল দম দিয়ে দিলে তবে চলে, না হলে অচল।

ঘরের মাথায় জমেছে ঝুল, ভূতের মত দেখায় অন্ধকার কোণে কোণে। সে ঝুল ঝেড়ে পরিষ্কার করবার দায় নেই কারুর; দায়িত্বও নেই। নোতুন যারা আসে এখানে, তাদেরই চোখে পড়ে শুধু। পুরোনোরা মেনে নিয়েছে এই জঞ্জালকে; যেমন মেনে নিয়েছে এই ঘরে তার আর লাইট আর ক্যামেরা আর মাইক, অভিনেতা আর অভিনেত্রী; বাইরের উঁচু আসনে পায়রাদের বক-বকম কখনও থামে কখনও থামে না, ভেতরে অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের সংলাপ বলে যাওয়ার মত কেউ কান দেয় না তাতে, থেমে গেলেই তবে সচেতন হয়, না হলে নয়।

কিন্তু আজ রবিবার তাই, না হলে মঞ্জরী এখনও জানে না এই নিষ্প্রাণ প্রাসাদে প্রাণ সঞ্চার হয় মুহূর্তে। লোকজন, কথাবার্তা হৈ-হৈ, যেন কি হচ্ছে, যেন কি হবে, এই এক সম্ভাবনায় কাঁপতে থাকে। এমন কি সে রকম স্যুটিং হলে এই ঘরে ঢুকে হঠাৎ মনে হয়, বাংলা দেশের কোন পাড়াগাঁয়ে ঢুকেছি; মাটির ঘর, মেঠো রাস্তা, গাঁয়ের লোক: চোখ দু'টো রগড়ে নিয়ে তবে আপনি বুঝবেন: স্যুটিং চলছে।

আজ রবিবার, তাই মনে হচ্ছে যেন কোনও বাড়ীতে বিয়ে শেষ হয়ে গেছে কাল। অলস মন্থর মুহূর্ত্ত বাসি ফুলের গন্ধে একটু বুঝি উন্মনা উদাসও করে।

মঞ্জরীর সম্বিত ফিরে এলো রাখাল বাবুর প্রশ্নে। বিনোদ তোমায় পাঠিয়েছে এখানে?

হ্যাঁ, মঞ্জরী ব্লাউজের ভেতর থেকে বার করে আনলে একখানা চিঠি।

রাখাল দত্ত এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ালেন চশমার জন্যে। পেলেন না। বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চন করলেন তিনি। চিঠিখানা খুলতেই খেয়াল হল চশমা তাঁর চোখেই আছে।

এর আগে প্লে করেছো সখ করে কখনো?

না।

ভালো ভালো সিনেমা দেখ তুমি?

না।

কোন স্যুটিং দেখেছ কোনও ছবির এর আগে?

না।

তোমার ছবি তোলা আছে একখানাও?

না।

ঠিক আছে। মন্তব্য করলেন পরিচালক। মঞ্জরী এবং ঘরের আর সব লোক বুঝে নিল ঠিক নেই।

তুমি ঐ মাঝখানটায় গিয়ে দাঁড়াও দেখি।

মঞ্জরী উঠে গেলো হতাশ ভঙ্গীতে। কিন্তু দাঁড়ালো ঠিক যেমন ভাবে বললেন রাখাল বাবু, ঠিক অবিকল সেই ভাবে। দাঁড়ানো অভ্যেস তার অনেক দিনের।

মুখটা তোলো, আরও একটু বাঁ দিকে, না, না ডান দিকে নয় বাঁ দিকে, ঐ তারাটার দিকে তাকাও; হ্যাঁ ঠিক আছে।

একটা ছোট আওয়াজ হতে মঞ্জরী মুখ ফেরালে।

নাও আরেকখানা ষ্টিল নাও হে। আরেক বার মুখ তোলো ত'!

তুমি বাংলা পড়তে পারো?

হ্যাঁ। মঞ্জরী এতক্ষণে একটা 'হ্যাঁ' বলতে পেরে অবাক হলো।

একজন লোক এসে তার হাতে একখানি লম্বা বড় কাগজ দিলে।

গোটা গোটা অক্ষরে লেখা পরিষ্কার। পড়তে কষ্ট হবে না; মঞ্জরী ভগবানকে ধন্যবাদ জানালে।

ওতে রুক্মিণী যে কথাগুলো লেছে সেই কথাগুলো শুধু তুমি বলবে। পুরুষের ডায়ালগ তোমার বলবার দরকার নেই।

মঞ্জরী পড়লে, এত দেরী হল কেন নাথ?

একটু থামলে তারপর। পুরুষের কথাগুলো তার বলবার নয় কিন্তু পড়ে দেখলে এর উত্তর সেই লোকটির বলবার কথা লেখা রয়েছে; তোমার কথা ভাবতে ভাবতেই দেরী হয়ে যায় রুক্মিণী!

কি মিথ্যে কথা! মঞ্জরী ভাবলে সে যুগে ব্যাটাছেলেগুলো বানিয়ে বানিয়ে মেয়ে মানুষের কাছে মিথ্যে বলে খুসী হত। তুলু বাবুও ত দেরী হলে মঞ্জরীকে আজও অমনি মিথ্যে বলে; কিন্তু এ কি, রুক্মিণী যেন বিশ্বাস করেছে সেই কথা। রুক্মিণী বলছে:

আমি সামান্যা নারী; রাজকাজে ব্যস্ত থেকেও তুমি আমায় ভোলো না নাথ?

মঞ্জরী কিন্তু জানে, তুলু বাবুর সব মিথ্যে। মঞ্জরীর ভালবাসার মতই মেকি। মঞ্জরী অবশ্য ভুলে গেলো যে তুলু বাবুর কথার জবাবে তাকেও অমনি মিথ্যে বলতে হতো। মঞ্জরী শুধু মনে মনে বললে, রুক্মিণী তুমি বোকা। ভীষণ বোকা।

মঞ্জরী এসে বসতেই দেখলে এক কাপ চা; কিন্তু পেয়ালায়। তেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু বাটি হলেই যেন ভালো হতো। চায়ের পুরো স্বাদটা সে পেত। প্লেটে ঢেলে ঢেলে মঞ্জরী চাটুকু খেলে ভয়ে ভয়ে।

কা'কে দিয়ে খবর দিলে তুমি পাবে?

গোকুল বাবু আমার জায়গা জানে।

গোকুল? বেশ দু'দিন তিন দিনের মধ্যেই তুমি খবর পাবে।

ঘর থেকে বেরোতেই রিক্সায় আসা সেই লোকটাকে দেখা যায়।

আমিই খবর দিয়ে আসব তোমায়; যেই পাব সেই তোমার ওখানে যাব; জায়গাটা কোথায়? রূপচাঁদ...

মঞ্জরীর এবারে রাগ হল। সে তাকাতেই লোকটা বললে: থাক থাক। গোকুলের কাছেই জেনে নেব।

ফ্লোরের মধ্যে সবাই একবাক্যে স্বীকার করলে: একাজ মঞ্জরীকে দিয়ে হবে না।

অসম্ভব, এ ত দাঁড়াতেই জানে না!

একে আবার বিনোদ বাবু জোটালে কোথা থেকে? একেবারে বাজারে মেয়েছেলে!

আরে, সোনার বালার সেই মেয়েটাই ত! ভীষণ কালো বলে

পেঁচি মঞ্জরী বলে ডাকি। একটা বোন আছে। আপন নয়, মাড়োয়ারী একটা বাবু রেখেছে সেটাকে।

নৃপেন গুঁই এর বাবা ; এই পেঁচি মঞ্জরীর।

নৃপেন গুঁই ? লরেটো স্যান্ডার্সের বড়বাবু।

হ্যাঁ। আমরা ঠাট্টা করতাম কার মেয়ে বলে ; নৃপেন আর মহাদেব চাটুজ্যে দু'জনেই যেত কি না সোনার বালার কাছে। তবে ও নৃপেনেরই মেয়ে, নৃপেনের মুখ বসানো একেবারে।

ছোটখাটো পার্ট হতে পারে।

রাখাল দত্ত একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ। একেই নেব। মেয়েটার কিছু নেই, সব করে নিতে হবে। শুধু camera face আছে অসম্ভব। গোকুল পরশু দিনই কাগজপত্তর নিয়ে সই করিয়ে নিয়ে আসবে। যারা দাঁড়িয়ে উঠেছিল তারা বসে পড়লো চেয়ারে।

ছবির দফা হয়ে গেল। সবাই বললে কিন্তু মনে মনে ; রাখাল দত্তের সামনে বলবার সাহসে কুলোয় না কারুর। শুধু একজন আপত্তি ছুঁড়ে মারলো সোজা।

কি পাবলিসিটি একে দেব ? প্রশ্ন করল মিঃ গাঙ্গুলী।

এত কাল যা সকলকে দিয়ে এসেছেন ; অভিজাত বংশের সম্ভ্রান্ত তরুণী।

এ ত' তরুণীই নয়, অভিজাতও কোন জন্মে নয়।

এত দিন পাবলিসিটি করবার পরেও একথা বলতে পারলেন আপনি ?

যাদের আমরা অভিজাত বলি, তরুণী বলে চালাই, তারা সবাই খাঁটি ? রাখাল বাবুর প্রশ্নের উত্তরে মিঃ গাঙ্গুলী বললেন : কিন্তু পিটুলিগোলাকে দুধ বলে চালাবার দিন গেলো বলে।

এবারেই তো আপনার বাহাদুরী দেখা যাবে। এবারে ষোল আনা খাওয়ান পাবলিককে, দুধের তেষ্টা তাতেই মিটবে।

তথাস্তু ! মিঃ গাঙ্গুলী ফিরে এলো তাঁর স্বধর্ম্মে। আমার ডিক্সনারী বলে, মালিকের যে ঘোড়া রেসে দৌড়াচ্ছে সে খোঁড়া হলেও তাকেই back করা salesman-এর কাজ।

তাই করুন, আর জেনে রাখুন, এ-ঘোড়া dark horse কিন্তু খোঁড়া নয়। সন্ধ্যে হয়ে যাবার পর মঞ্জরী ফিরে এলো তার ঘরে। খানিকটা হতাশা আর অনেক ক্লান্তি নিয়ে।

এসে দেখলে দুলু বাবু খাটে শুয়ে বই ওল্টাচ্ছে। দিন কাল তোমার ফিরে গেলো কিন্তু, কি বলো মঞ্জরী ? গরীবকে মনে রাখবে ত' ? দুলু বাবু ঢং বদলেছে।

কি বলছেন ? মঞ্জরীর হতাশ জিজ্ঞাসায় দুলু বাবু আঁচ করলে তেমন আশাজনক যেন কিছু ঘটেনি মঞ্জরীর ভাগ্যে, মনটা একটু খুসী হল। যাক। হয়ত আরোও কিছু দিন মঞ্জরী তারই থাকবে।

গোকুল বলছিল কি না তুমি ফিল্মে নামছ। ভালো ! ভালো ! ফিল্মষ্টার মঞ্জরী না কি অভিনেত্রী কুলরাণী, কোনটা তোমার ভালো লাগছে শুনতে রাণী ?

দিনের বেলাতেই দুলু বাবু চড়িয়ে এসেছে তা হলে।

হ্যাঁ ভালো কথা। ইনক্রিমেন্ট হয়েছে অফিসে। তোমাকেও কিছুটা অংশ দেব তার ; তোমাকে শুধু কথাতেই খুসী করে এসেছি ; এবারে কাজেও প্রমাণ পাবে তার।

আপনি বসুন একটু ; আমি আসছি।

কাপড় নিয়ে নেমে গেল নীচুতলায় মঞ্জরী। নীচের তলার ঘরের মেঝেয় রুক্মিণীর ছেলেটা শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। এই ছোঁড়া ওঠ। বলতে বলতে মঞ্জরী দেখলে হাতে একটা কাগজ গোঁজা। হাত থেকে সেটা খসিয়ে নিয়ে দেখলে ছাপা হ্যাণ্ডবিল।

ফেলে দিতে গিয়ে চোখ পড়ল 'পতিতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন'। ঘোষণাটা একটি আবেদন। পাড়ার লোকের কাছে। কয়েকটি পতিতার পাড়ার যুবকদের নৈতিক উন্নতির বাধাস্বরূপ এখানে ঘর নিয়ে আছে। সমাজের মঙ্গলের মুখ চেয়ে এদের উচ্ছেদ করা দরকার, তার জন্যেই পাড়ার সকলের পক্ষ থেকে মাতাব্বরদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে হ্যাণ্ডবিল মারফৎ।

কে কে সই করেছে দেখা যাক। মঞ্জরী স্বাক্ষরগুলির ওপর নজর নামিয়ে আনল। প্রথম নামটি পড়তেই তার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল স্বস্থান থেকে মুখের কাছে। বড় বড় টাইপে সুমুদ্রিত স্বাক্ষর দুলাল চাঁদ দত্ত।

চানের ঘরে ঢুকে চান করলে না মঞ্জরী।

গত পাঁচ বচ্ছর ধরে দুলু বাবুর বাঁধা সে। এক-আধবার লুকিয়ে অন্য খদ্দের মঞ্জরী বসিয়েছে বাধ্য হয়ে। সে জন্যেও দায়ী দুলু বাবুই। প্রয়োজনমত টাকাও তাকে দেয় নি দুলু বাবু। শুধু শরীর পাতই সার হয়েছে মঞ্জরীর। জাত তার জন্ম থেকেই গেছে কিন্তু পেট ভরেনি মাসের দশ দিন। আর সেই দুলু বাবু প্রতিদিন উচ্ছেদ কামনা করছে তার। কিন্তু মঞ্জরী যে এই পথে এসেছে এ কি তার নিজের ইচ্ছেয় ? ভালো লাগে তার দিনের পর দিন শরীর দিয়ে রোজগার করতে ? কেউ যদি তাকে বিয়ে করত সে কি কোন গেরস্থ বধূর চেয়ে কম ভালোবাসতো তার স্বামীকে। দুলু বাবু ত বিয়ে করেও চরিত্র ঠিক রাখতে পারে নি। কিন্তু কে তাকে বিয়ে করবে ? সে যে বেশ্যার মেয়ে, এর পর মঞ্জরীর কি কোনও জাত আছে ? কিন্তু তার বাবা কালও তো ভদ্রলোক সমাজের সকলের সঙ্গে সমান হয়ে মিশবেন। অথচ তার মেয়ের মেশবার উপায় নেই কোথাও। অন্নের জন্যে শরীর দেওয়া ছাড়া কোনও গত্যন্তর নেই। ছবির এই কাজটা সে পায় না ?

[ক্রমশঃ।

"শিক্ষক যেখানে বক্তা, ছাত্র শুধু শ্রোতা ; শিক্ষক যেখানে দাতা, ছাত্র শুধু গ্রহীতা,—সেখানে ছাত্রের স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ হইতে পারে না। সেখানে শিক্ষক ছাত্রের 'অন্ধের যষ্টি' ; শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত সে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। সে সর্ব্বদাই নিজেকে অক্ষম ও দুর্ব্বল মনে করে এবং আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

ছোটদের আসর
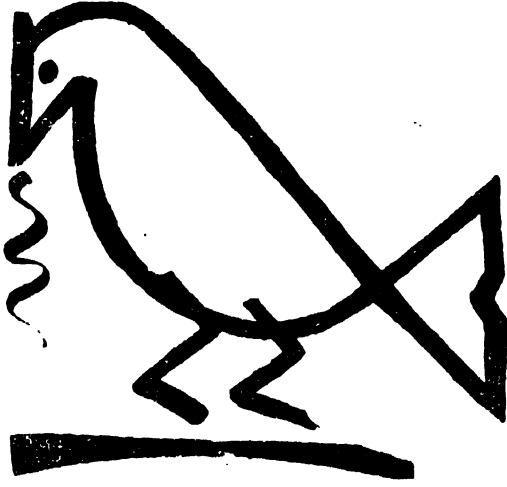
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। টাঙ্গাওয়ালা বলে 'বিশ্‌বিদ্যালে'। গোধূলিয়ার মোড়ে সারি-সারি টাঙ্গা দাঁড়িয়ে থাকে। ডাকে—আইয়ে বাবু আইয়ে। শেয়ারে লোক চড়ায়। কংক্রীটের রাস্তার ওপর দিয়ে কপ-কপ শব্দ করে ঘোড়া চলে, টমটমের মতন ঘণ্টা বাজে টাঙ্গাওয়ালার পায়ের চাপে। হাতের চাবুকের লাঠিটা চলন্ত চাকায় ঠেকিয়ে কটাকট শব্দ ক'রে সে বলে যায়।—বাঁচো ভাইয়া, বাঁচো শেঠ, বাঁচো সাইকেল—কপ-কপ কপাকপ, ঘোড়া চলে।

পার হয়ে যায় গণেশমহল্লা, রামাপুরা, সোনারপুরা, ভেলুপুরা, কেদার, হরিশ্চন্দ্র, শিবালয়, দুর্গাবাড়ী—রাণীভবানীর মন্দির। ওধার থেকে কামাচ্ছার রাস্তা এসে মেশে, সঙ্কটমোচনে মহাবীরের মন্দির ও মনোরম বাগান। পুরোন পানওলাটা চেঁচিয়ে ওঠে 'জয় সিয়ারাম' বছরের পর বছর নাকি যাকে পায় তাকে ডেকে—লঙ্কায় পাওয়া যায় পঞ্চক্রোশীর পথ, তীর্থযাত্রী কাশী, পরিক্রমা সারে এই পথে—সামনে জেগে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেরুয়া রঙের প্রধান ফটক, যেন ধ্যানগম্ভীর।

তার পর পিচঢালা রাস্তার দু'ধারে, কোথাও নিম, কোথাও বাবলা, কোথাও কৃষ্ণচূড়া, কোথাও পলাশ গাছের সারি—প্রাসাদের পর প্রাসাদ—মাথায় মাথায় মন্দিরচূড়া—বাণীনিকেতন, একটার পর একটা আয়ুর্বেদ কলেজ, আর্টস কলেজ, সায়ান্স কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিরাট লাইব্রেরী, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্টেল, খেলার মাঠ, সমস্ত গেরুয়া রঙের, যেন একটা আলাদা রাজ্য কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা, গঙ্গা থেকে কাছে, শহর থেকে দূরে।

প্রোফেসর্স কোয়ার্টার্স, ছোট ছোট বাগানওলা দোতলা বাড়ীগুলি পাশাপাশি ঝিক-ঝিক করছে, একটিতে বাঘার দাদা থাকে, ও উঠলো মীরাকে নিয়ে। অতিথি যেন এখানে প্রত্যাশিত। অপ্রত্যাশিত নয়। যখনি কেউ আসবে, গরম গরম হালুয়া, কিংবা লুচি আর আলু-পটোলের তরকারি, এ আর বলতে হয় না। দোতলার ঢাকা বারান্দা থেকে বিস্তীর্ণ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় মাইলের পর মাইল জুড়ে যেন স্বপ্ন সার্থক করেছে একটি লোকের—নাম যার মদনমোহন মালবী। রাজা-মহারাজা থেকে সাধারণ লোকের কাছ থেকে ভিক্ষার ঝুলি ভরে নিয়ে মালবীজী রচনা করেছেন সর্ব্বভারতীয় পরিকল্পনা! পাশাপাশি বাড়ী মিত্রবাবুর, ডোগর সিংএর, পান্সামবেকরের, যোশীজীর, মৈত্রমশায়ের। নাগবাবুর, শাস্ত্রজীর, ভাটনগরের, সুব্রহ্মণ্যমের। ছাত্রছাত্রীও সারা ভারতের। স্তবকে স্তবকে কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে রাস্তা যেন আলো ক'রে, আকাশে বকের পালকের মতন সাদা মেঘের স্তূপ, সাইকেল-রিক্স, মোটর, বাস, টাঙ্গা এক্কা দেখা যায়, সিনেমার ছবির মতন দূরে চলে যাচ্ছে—অধ্যয়ন অধ্যাপনা বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে, আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের।

তবু এর চেয়ে নালন্দা বড়ো ছিল। সেখানে থাকত দশ হাজার ছাত্র!

তবু এর চেয়ে আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সারা পৃথিবীর মনীষীর কাছে। কেন? কিসের জন্যে?

কারণ, সেখানকার শিক্ষার ধারা ইংরেজের অনুকরণে নয়, ঋষিদের অনুসরণে। সনাতন ভারতবর্ষের নিজস্ব পথে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবির পরিকল্পনায়। তাই পৃথিবীর দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সেখানে মাথা নীচু করে নতুন কিছু শিখতে আসে, শেখাতে নয়। সেখানে এণ্ড্রুজ পিয়ার্সনকে ভারতীয় হতে হয়।

এখানে হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক, সম্ভ্রান্ত আর শিক্ষিত, সবাই অধ্যাপক। এমন কোথায় পাওয়া যায়? মিত্রমশাইয়ের মেয়ে গুরুমুখ সিংএর পুত্রবধূকে বলছে—তুমরা স্বামী কেয়া করতে পারতা হ্যায়, পড়তে পারতা হ্যায় না চাকরী করতে পারতা হ্যায়? অর্থাৎ তোমার স্বামী কি করে? এখনো পড়ছে, না চাকরী করছে? গুরুমুখ সিংএর পুত্রবধূ এ হিন্দী বোঝে না। তবু বলে এই বাংলায় 'কালিজমে এখোন পড়ছে, নোকরী করতে পড়া খতম হোবে তোবে তো। কি কারোবার করে কুছু ঠিক আছে বেহেন?

সব বাড়ীর সামনে যেমন ফুলের বাগান, তেমনি রঙীন ফুলের মতন সাজসজ্জা সব। মাদ্রাজী মেয়েদের নাকে হীরে, কানে হীরে, কত দূর থেকে জ্বলজ্বল করে, গুজরাটীদের রঙীন শাড়ী, বাঙালী মেয়ের পার্শি শাড়ীর মতন কাপড় পরার ধরণ। সর্ব্বভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—এই ঘুরিয়ে কাপড় পরা। নকল করে ভাটিয়ারা, পাঞ্জাবীরা, ইউ-পির

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

মেয়েরা। বাঙালী মেয়েরা দক্ষিণী মেয়েদের মতন খোঁপায় মালা জড়ায়। এ যেন অন্য রাজ্য! এখানে মূর্খ কেউ নেই, এখানে প্রাদেশিকতা নেই। এখানে শুধু সহযোগিতা, এই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর্স কোয়ার্টার্সে।

রেলের থার্ড ক্লাস কামরায় এক বাঙালী ছোকরা চলেছিলো, পান খেয়ে জর্দা খেয়ে পীচ ফেলেছে জানলা লক্ষ্য ক'রে, হাওয়ায় সে পীচ উড়ে এসে পশ্চিমী ভদ্রলোকের রাজহাঁসের মতন সাদা খদ্দরের চাদরে লাগলো। ভদ্রলোক প্রতিবাদ করলো। বাঙালী যুবক, দেখলে, চলেছে তো থার্ড ক্লাসে, তার আবার এমন মেজাজ! না হয় আসাবধানে পানের ছোপ একটু লেগেই গেছে সাদা চাদরে! কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে? এমন করলে ফার্স্ট ক্লাসে যেতে হয়।

ছেলেটি প্রশ্ন করলে—উদ্ধত প্রশ্ন—কে তুমি লাটসাহেব?

জবাব হল—আমি কে জানলে তুমি চমকে যাবে—ভদ্রলোকের শান্ত উত্তর।

তবু ছেলেটি জেদ করে—আরে ভাইয়া বোলো না, কৌন হায় তুম? বাতাও না কেয়া নাম? কাঁহা কা নবাব খাপ্পা খাঁ?

নাম হমারা মদনমোহন মালবী।

তখন ক্ষমা চাওয়ার পালা। কুণ্ঠিত হওয়ার পালা। মদনমোহন মালবী ইংরেজ রাজত্বেই গভর্ণমেন্টের সন্ত্রাস। সারা দেশের সম্মান।

মালবীজী ঘুরে বেড়াতেন ছেলেদের মধ্যে—তোমরা ভালো হও, বড়ো হও বলে। তোমাদের জন্যে গঙ্গা থেকে কাছে শহর থেকে দূরে পাঠগৃহ ক'রে দিয়েছি, অধ্যয়ন নিয়ে থাকো। সংযম অভ্যাস করো।

কে শোনে কার কথা? সন্ধ্যে হতেই সারি সারি সাইকেল চললো শহরের দিকে—বিলাসের শহর কাশীর দিকে—হাজার হাজার সাইকেল, কে তাদের গতিরোধ করে?

সিনেমা দেখে, সরবৎ খেয়ে, নানা রকম আমোদ ক'রে, মারামারি ক'রে, ক্লান্ত যুবশক্তি ফিরলো হষ্টেলে—যার দরজা বন্ধ হ'য়ে গেছে।

ঢুকলো তারা পাঁচিল টপ্‌কে, ঢুকলো তারা জানলার গরাদে ভেঙে।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দরজা পাহারা দিতে এসে জলের কুঁজো ছোঁড়া দেখলে তার মাথার কাছ ঘেঁষে।

রাগ না ক'রে মালবীজী বোঝালেন—তোমরা আগামী কালের ভরসা। আমি আশা করব, এ রকম কাজ তোমরা আর করবে না।

গরমের ছুটি এসে গেল। হষ্টেলের ঘরে ঘরে পাখা চালিয়ে আলো জেলে রেখে ছেলেরা যে-যার দেশে চ'লে গেল—দু' মাস ধ'রে পাখা চলতে আর জ্বলতে লাগলো—পাখা-ফী আর লাইট-ফী দেয় না কি তারা? ছুটির সময়ে লোক না থাকুক, কারেণ্ট খরচ হোক।

গান্ধী এসে বললেন, এমন রাজপ্রাসাদের মতন জাহাজের মতন বিরাট হষ্টেল করার কি দরকার? এখানে থেকে পড়ে ছেলেরা কি তাদের খড়ের কুটীরে, খোলার চালের ঘরে, টিনের চালার মধ্যে ফিরে যেতে পারবে? ইংরেজের ইউনিভার্সিটির মতনই ত লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে এখানে? লাভ কি তাতে?

মালবীজী বলতেন, ইংরেজের যা কিছু ভালো তারা নিক্‌, সনাতন ভারতের যা কিছু ভালো, তাও গ্রহণ করুক্।

একজন বাঙালী প্রোফেসরকে ছেলেরা তাড়াতে চায়, পড়ানো ভালো হয় না ব'লে। ছেলেমেয়েরা মিছিল করতে লাগলো—চলবে না, চলবে না। বাঙালী ছেলেমেয়েরাও যোগ দিলো। বাঙালী অধ্যাপকদেরও সমর্থন ছিল।

অবাঙালী মালবীজী সেই বাঙালী প্রোফেসরকে ত্যাগ করতে রাজী হলেন না। তিনি প্রায়োপবেশন সুরু করলেন। চ'লে গেলেন বিন্ধ্যাচলে ডাকবাংলোয়—যে বিন্ধ্যাচল পাহাড়মালা আর্টস কলেজের ছাদে উঠলে দেখা যায়।

ছেলেদের শুভবুদ্ধি জাগলো না। বাঙালী প্রোফেসরকে চ'লে যেতে হল অবাঙালীকে চেয়ার ছেড়ে। মালবীজী হেরে গেলেন। হেরে গেলেও তাঁর প্রেম রেখে গেলেন এখানকার মাটিতে মাটিতে, যে মাটিতে এক দিন চারশো গ্রাম দাঁড়িয়েছিলো।

সেই সৌম্য শান্ত সুন্দর বৃদ্ধ মালবীজীর কত কথাই মীরা শুনলো। দেশের জন্যে, জাতির জন্যে, ধর্মের জন্যে, আত্মসম্মানের জন্যে, যিনি এত চিন্তা করেছেন, সেই মালবীজীর জীবনের কত কথাই মীরা শুনলো ক'দিন ধরে। কাশী প্রথম দেখা যায় যে-ব্রীজ থেকে, আজ তার নাম মালবীয় ব্রীজ।

গেরুয়া রঙের প্রাসাদগুলি ছক-কাটা জমির ওপর সুন্দর ভাবে সাজানো—প্রত্যেকটির মাথায় মন্দির—যেন কোনো বাণীতীর্থ, পথিক দেখলেই চিনতে পারে, যে পথিক পঞ্চক্রোশীর পথে চ'লে যায় ক্লান্তপদে, যে-পথিক গঙ্গার বুকে নৌকো ভাসিয়ে যায় চুণারের পথে, মির্জ্জাপুরের পথে, গাজিপুরের পথে।

ভোর হয়, সন্ধ্যা নামে, সারি সারি মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় পেতলের কলসে সূর্য্যরশ্মি ছড়িয়ে।

আবার সেই কথা উঠলো। এখানকার অবাঙালী প্রোফেসররা ব'ললেন—শান্তিনিকেতন আরো বড়ো, আরো মহান—ভারতের প্রাচীন সাহিত্য-শিল্প ও কাব্যধারার সঙ্গে পৃথিবীর মিলন নিত্য ঘটাচ্ছে বলে—তার আম্রকুঞ্জ, তার শালবীথি, তার খোয়াই, ধনের ঐশ্বর্য্যে নয়—ভাবের ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিত শান্তিনিকেতন বলে,—

হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে।

সেই শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন মীরা এখনো দেখে নি, কিন্তু শুনেছে—তার আহ্বান দেশে দেশে সাড়া জাগায়, সাগরের এপারে ওপারে।

বাঘা দেখে এসেছে। বললে, বাংলা দেশের এমন পরিচ্ছন্ন রূপ কোথাও দেখি নি, যেমন শান্তিনিকেতনে। প্রকৃতি এমন মিষ্টি কোথাও নয়, যেমন শান্তিনিকেতনে। আম্রকুঞ্জ, শালবীথি, সিংহসদন, কলাভবন, শ্যামলী, উত্তরায়ণ, খোয়াই, তিন-চার মাইল জায়গা জুড়ে মহাকবির কল্পনায় রূপ দেবার প্রচেষ্টা—যার চোখ আছে, সেই দেখে অবাক হবে।

কিন্তু দেখে নি কত লোক। দেখতে চায় না কত লোক। নিন্দে করে কত লোক! তারা এই বাংলা দেশেরই।

এক দিকে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজপ্রাসাদের মতন বৃহৎ অট্টালিকাগুলি, জাহাজের মতন হষ্টেলগুলি, আর এক দিকে বিশ্বভারতীর কাদামাটির কুটীরগুলি, আর কিছু কিছু সাধারণ বাড়ী কি ক'রে তুলনা হবে? মীরা ভেবেই পেলো না।

তবু এখানকার অজস্র আলোয় আলোকিত রাতগুলি, কৃষ্ণচূড়া

আর বাবলা গাছের মাথায় সোনালী আলোর সকালবেলাগুলি মীরার ভালোই লাগলো।

সোজা সোজা রাস্তা পড়ে আছে, যত ঘুর ইচ্ছে, তুমি ঘোরো। সুন্দর সুন্দর বাগান আছে এখানে ওখানে সেখানে।

কিন্তু ষাঁড়ও আছে। কাশী সহরেই অসংখ্য ষাঁড়, শিবের বাহন, তোমার গলা থেকে ফুলের মালা কামড়ে খেয়ে নিলেও তুমি কিছু বলতে পারবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে তাদের আরো অত্যাচার।

ষাঁড় যদি তোমায় তাড়া করে, তুমি একটা ইটও মারতে পাবে না। শুধু তোমায় ছুটতে হবে। ষাঁড়গুলো তেমনি পাজী, মানুষ—বিশেষতঃ মেয়েমানুষ দেখলেই তাড়া করবে। তুমি যদি কোনো গাছের পাশে লুকিয়ে পড়ো, সে চার ধার ঘুরে-ফিরে তোমায় খুঁজবে আর হাঁক পাড়বে গাঁক্ গাঁক্ গাঁক্।

তারা যার-তার ফসলের ক্ষেতে নেমে যত ইচ্ছে ফসল খাবে। কেউ কিছু বলতে পাবে না।

সুতরাং পথে বেরোলেই তোমায় লক্ষ্য করতে হবে কোন্ দিকে কোন্ ষাঁড়টা দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পেলেই তোমায় অন্য পথ ধরতে হবে। যারা গ্রাহ্য করে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ষাঁড় তাদের তাড়াও করে না। জ্ঞানপাপী ষাঁড়!

তবু এখানকার নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাত্রা মীরার ভালো লাগলো না। সকাল থেকে অধ্যাপকরা পড়াতে চ'লে যান আর্মি কলেজ, সায়ান্স কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আয়ুর্ব্বেদ কলেজ, কৃষি কলেজ। ছেলেমেয়েরা এক্কা টাঙ্গা বাসে স্কুলে চ'লে যায়। তখন মেয়েদের রাজত্ব। বাঙালী, বিহারী, গুজরাটী, সিন্ধী, মারাঠী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, অসমীয়া মেয়েদের আলাপ-পরিচয়, বেড়ানো। বিকেলে প্রোফেসররা ফিরলে সেজেগুজে মেয়েদের পথে পথে বেরিয়ে পড়া। দিগন্ত এখানে অবারিত, স্বাধীনতা এখানে প্রচুর, কিন্তু একঘেয়ে। বৈচিত্র্য নেই কোনো।

বৈচিত্র্যের মধ্যে পোষ্টমাষ্টারবাবু মারা গেল ক'দিনের সেপ্‌টিক্‌-জ্বরে। ছেলেপুলে ছিল না। দেশ থেকে ভাইরা এসে পড়লো, জীবনে যারা খোঁজ নেয়নি। বৌদিকে নিয়ে গেল দেশে, সঙ্গে তার পঞ্চাশ হাজার টাকা। খবর এলো কে খুন ক'রে রেখে গেছে পোষ্টমাষ্টারের স্ত্রীকে। সকলে বল্‌লো, আহা, তাই সে এখান থেকে যেতে চায় নি!

এ সব পুরোন খবর। আগের দিনের কথা! মীরা আজ চায় লড়াই। শান্ত জীবনযাত্রা নয়। এতে আনন্দ নেই। বাহাদুরী নেই। নিজের পরিবার প্রতিপালন করতে মানুষ পরের কথা ভাবছে না, এ যেন কেমন!

ছেলেকে মানুষ করছে, সে ছেলে বড়ো হ'য়ে বাপকে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে অন্য বাড়ীতে। সংসার চালানোর এই ত' সুখ! এই বয়সেই ও বুঝতে পেরেছে, জীবনের গতি ঠিক করে নিতে হবে ছোটবেলাতেই। কি ক'রে ঠিক ক'রে নিতে হবে? বুদ্ধিবলে। আজ সারা দেশে যে এত অসাধু, তার কারণ কি? অশিক্ষা আর কুশিক্ষা।

কোনোই শিক্ষা যে পেলো না, সে জানলো না, ভালো কি আর মন্দ কি। আর যে আসল শিক্ষা পেলো না, সে বাজে হয়ে গেল। বি-এ পাশ এম্-এ পাশ করেও মানুষ কেন মানুষকে ঠকাচ্ছে? ঠকাচ্ছে এইজন্যে যে তার শিক্ষা ঈশ্বরবিহীন শিক্ষা। ওপরওলা একজন আছেন যিনি পাপপুণ্যের বিচারে শাস্তি আর শান্তি দেন, তাঁর অস্তিত্ব এখনকার শিক্ষা স্বীকার করে না। স্বীকার না করলেও কাজ হয়ে যায়।

এ আলোচনা শুধু বুড়োদের জন্যে নয়, ছোটদের জন্যেও। তাই অহল্যাবাঈ ঘাটে ভাগবত-কথা শুনতে সে বসলো মন দিয়ে। কথক ঠাকুর বলছিলো, পৃথিবীর সকলেই সুখ চায়। বাড়ী, টাকা, জমিজমা, পোষাক-পরিচ্ছদ, গয়নাগাঁটি, আমোদ-প্রমোদ, সবই কিন্তু পাবার পর পুরোন হয়ে যায়। আর তাতে সুখ হয় না। তখন নতুন জিনিস খোঁজে।

যে সুখ কখনো ম্লান হয় না, সে সুখ পাওয়া যায় যিনি চির-আনন্দময়, তাঁকে পেলে। তাঁকে কি করে পাওয়া যায়? ভালো কাজের মধ্য দিয়ে। ভক্তিতে।

চঞ্চলা লক্ষ্মী তাঁর বুকে বাস করেন, তাই তাঁর নাম শ্রীনিবাস। শ্রীধর। সত্যভামা মনে করেছিলো তাঁকে পেয়েছে, তাই ওজন করা হল দাঁড়িপাল্লায় তুলে। রাশি রাশি অলঙ্কার, স্বর্ণমুদ্রা আর মূল্যবান বস্তু এক দিকে। আর এক দিকে শ্রীকৃষ্ণ। কিছুতেই সমান হয় না। শেষ পর্য্যন্ত একটি তুলসীপাতা চন্দন মাখিয়ে রাখা হল, শ্রীকৃষ্ণের পাল্লা হাল্কা হয়ে ওপরে উঠে গেল।

ঋষিরা কার কথা বলেছে? বেদে, উপনিষদে, পুরাণে কার কথা? বেদেরও আগে যে মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা ছিল, অনেক উঁচু, তা কাদের? অনার্য্যদের। অনার্য্যদের মধ্যে পড়ে কারা? বাঙালী, গুজরাটী, মারাঠী, মাদ্রাজী। আর্য্যদের আগেও তারা সভ্য ছিল। তাই এদের মধ্যে আহারে বিহারে এত মিল। পরে এলো আর্য্য। রাজপুত, শিখদের পূর্ব্বপুরুষ। তাম্রলিপ্ত আর রাজা শশাঙ্ক অনার্য্যযুগের সভ্যতায় উজ্জ্বল। তন্ত্র আর কালী আর শিব নিয়ে বাঙালী প্রথম উপাসনা সুরু করেছে।

তার পর পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে বাঙালীর স্নেহপ্রবণ মন নাড়ুগোপাল, গোপীজনের বংশীবদন আর রাধাকে নিজস্ব ক'রে নিয়েছে। কালীয়দমন কংসবধ পর্য্যন্ত তার। তার পর মথুরার রাজা যখন দ্বারকায় গেলেন—মীরার গিরিধারী—ভজনের মধ্য দিয়ে বাঙালী তাঁকে নিয়েছে, তীর্থযাত্রায় নিয়েছে, কিন্তু রাস ঝুলন দোলযাত্রার শিখিপাখা মাথায় মদনমোহনের মতন নেয়নি।

সেই ভগবানের দিকে মন চালিয়ে দিতে হবে গঙ্গার স্রোতের মতন। যা কখনো থামে না।

কথকঠাকুরের এ-সব কথা ছোটদের বোঝবার নয়। বায়না করতে লাগলো বাড়ী যাবার জন্যে। কাঁদতে লাগলো ক্ষিদে পেয়েছে বলে। মীরার বয়সী আরো কয়েকটি মেয়ে ছিলো। তারা শুনছিলো, বুঝুক না বুঝুক। বাঙালী মেয়ে ছোটবেলা থেকেই ধর্ম্মকথা শুনতে চায়। সিনেমার মতন এর আকর্ষণ না থাকুক, তবু এই সব কথা তাদের ভালো লাগে। ব্রতকথার মতন। এপারে ঘাটে ঘাটে আলো জ্বলে উঠেছে, ওপার ঘন অন্ধকার। নদীতে নৌকো চলেছে। ঘাটের ওপর ঘড়িতে সাতটা বাজছে। ওরা কথা শুনে যাচ্ছে। কথক বলে যাচ্ছে।

গঙ্গা সোজা সমুদ্রে যায়। যমুনা সোজা যায় না, সে গঙ্গায় এসে পড়ে যমুনার শাখানদীরা, যমুনার মারফৎ তাদের স্রোত পাঠায়। সেই সব পাহাড়ী নদীর বুকে পাহাড়ী ঝর্ণা ঝিরঝির ক'রে ঝরে পড়ে,

তারাও বলে, আমাদের জল সাগরে পৌঁছে দাও। উশ্রী নদী বরাকরে পড়েছে, বরাকর দামোদরে, দামোদর গঙ্গায়, গঙ্গা সকলের জল সমুদ্রে পৌঁছে দিচ্ছে।

ভগবানের দিকে মন এর-ওর-তার মারফৎ পাঠালে হবে না, তোমাকে সোজা যেতে হবে। নিয়মে বাঁধা তাঁর রাজ্য। বিশ্বাস রাখলে অলৌকিক ঘটনা ঘটে। বলেছেন যাঁরা, তাঁরা মহাপুরুষ। পরমহংসদেব মিথ্যে কথা বলার লোক নন, বুদ্ধদেব নন, শ্রীচৈতন্য নন, শ্রীঅরবিন্দ নন। গীতাঞ্জলির গানগুলি মিথ্যে নয়। বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, গান্ধী বাজে কথা বলতে আসেননি। রাজরাণী মীরা বৃথাই রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাননি।

বৃন্দাবনের সনাতন গোস্বামী সিদ্ধপুরুষ, তিনি পাথরের গোপাল পুজো করেন। সেই গোপাল একদিন ব'লে বসলেন পায়স খাব।

সনাতন বললেন, পায়স কি ক'রে দোব ঠাকুর? দুধ চাই, চিনি চাই, ভালো চাল চাই। মাধুকরী—মানে ভিক্ষে ক'রে এই কটা মোটা চাল পেয়েছি, তাই রেঁধে দিয়ে তোমায় ভোগ দিই। পায়সের বায়না আজ কোরো না। পায়স যদি খেতে চাও, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করো।

ভাত চড়াবার আগেই কোন ধনী সিধে পাঠিয়ে দিলে পরমান্নের উপকরণ। এটা কি নিতান্তই গল্প?

তিনিই তাঁর ব্যবস্থা ক'রে নেন। তুমি যখন বলো, দেবোত্তর ক'রে গেলুম, ঠাকুরের নিত্যসেবা হবে, সে দেবোত্তর থাকে না। ঠাকুর অভুক্ত থাকেন। মন্দির ভেঙে যায়। কত ভাঙা শিবমন্দির সারা দেশ জুড়ে।

কথক বলে, ঠাকুর কি বিগ্রহের মধ্যে? না। বিশ্বাসে। ভক্তিতে। দুর্গামূর্ত্তি ভাঙতে এলে মাথা ভেঙে দেবে, কিন্তু নিজে দেবে জলে বিসর্জন।

জগন্নাথের গোল গোল চোখে ঠুঁটো হাতে কি এমন রূপ ছিল যে চৈতন্যদেবের মতন মহাজ্ঞানী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন? তিনি যা দেখেছিলেন, সে চোখ কি আমাদের আছে? নীলাচল পার হ'য়ে নীল আকাশ পার হ'য়ে নীলসমুদ্র পার হ'য়ে কি মহাপ্রভুর জগন্নাথ গ্রহে গ্রহে ছড়িয়ে পড়েন নি? কথক ঠাকুরের প্রশ্ন।

রত্নবেদীর দেশের লোক মীরার চোখে জল। কাশী শহর জুড়ে মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা বাজতে থাকে। কথক ঠাকুর ব'লে চলে—আপনারা একটি দুটি পয়সা কেউ দেন, কেউ দেন না। একজন ডাক্তার, উকীল, ব্যারিষ্টার এর চেয়ে কম কথা খরচ করে অনেক বেশী রোজগার করে। তার জন্যে আমার দুঃখ নেই। ওপথে শান্তি নেই। এপথে আছে, সেই আমার সান্ত্বনা। ব্রাহ্মণ নির্লোভ হবে। ব্রাহ্মণ দশ দিনে অশৌচ পালন করে ব'লে আপনারা বলেন, নিজে সুবিধা দেখেছে, কিন্তু শাস্ত্রকাররা যে বিধান দিয়ে গেছেন সাধারণ লোকের পাপের প্রায়শ্চিত্তের চতুর্গুণ করতে হবে ব্রাহ্মণকে, সে বিষয়ে কথা বলেন না কেন? যাক্, আমার কাজ আমাকে করে যেতেই হবে। এতক্ষণ ধরে এই লোকটা যে বকবক করলো—এত চেঁচালো, তার ফলে সারা রাত হয়ত আমার ঘুমই হবে না, জেগে কাটাতে হবে তবু আসছে কাল বিকেল হলেই আবার আমায় শ্রীমদভাগবত নিয়ে এখানে এসে বসতে হবে। কিনে আনতে হবে নিজের পয়সায় ফুলের মালা গলায় পরবার জন্তে।

ইতিমধ্যে একজন ভাবের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে গেছলো। যতক্ষণ কথা চললো, ততক্ষণ তার ভাব আর হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি। যেই কথা থামলো অমনি সে উঠে বসলো। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে তার ধুতি সার্ট ছিঁড়ে গেছে, পকেটের পয়সা ছড়িয়ে পড়েছে। খুব জোয়ান লোকটা, কিন্তু ধর্ম্মের সূক্ষ্ম কথা শুনলে তার মনটা কেমন অবশ হয়ে যায়, কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে যায় ফিটের মতন। কিন্তু অন্য কোনো সময়ে এমন হয় না। মীরা অবাক হয়ে যায়।

কথক ঠাকুর উঠতে সকলে পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম করলো—মেয়েপুরুষ সকলে। কিন্তু কেউ পয়সা দিলো না। মীরার নেই তাই। থাকলে সে দশ টাকা দিয়ে বসত। এত গরীব, কিন্তু মুখে কি সুন্দর হাসি। কত শান্তি এঁর মনে, মীরা ভাবে।

কথক ঠাকুর ব'লে চলে—God-less educations. ঈশ্বর-বিহীন শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের দেশের ক্ষতি করছে। বাচ্চাদের শেখাতে হবে—

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে।
জীবনে তোমারে খুঁজিয়া ফিরেছি
রয়েছ জীবনে জীবনে।

তাদের শেখাতে হবে—

জীবে সেবা করে যেই জন,
সেই জন পুজিছে ঈশ্বর।

ঘুম থেকে উঠে তাদের গাইতে হবে—

বিমল প্রভাতে মিশি একো সাথে
বিশ্বনাথে করো প্রণাম।
উদিল কনক রবি রক্তিম রাগে,
বিহঙ্গ গাহে গান, আনন্দে জাগে,
তুমি মানব নব অনুরাগে
পবিত্র নাম তাঁর করো রে গান।

বাঘা—জেলখাটা বাঘা। দেশ যখন স্বাধীন হয়নি, তখন তাদের ক'ভাইয়ের কল্পনা ছিল, জননী জন্মভূমির শৃঙ্খলমোচন করতে হবে। এক চিন্তা, এক ধ্যান।

ইংরেজ চলে যাবার আগে সে জেলে ছিল। নিতান্ত কিশোর তখন।

ইংরেজ চ'লে যাবার পর দেখলে দেশের যুবকদের সামনে আর কোনো লক্ষ্য নেই। আর কোনো দায় নেই। বুকের রক্ত দেবার আর কোনো ব্রত নেই।

হিন্দি, বাংলা, ইংরেজী সিনেমা, নানা হোটেলে নানাম রকম খাওয়া, নানা ধরণের নানা দামের জুতো-জামা, চুলের কায়দা, চশমার বাহার, খেলার খবর, পয়সা ওড়ানো,—এই হল যুবকদের চর্চ্চা। মেয়েরাও বাদ গেল না। ইংরেজ চ'লে যাবার পর ইংরেজী শেখার আগ্রহ আর চেষ্টা ক'মে গেল, ইংরেজী পোষাক ইংরেজী কায়দার মান বাড়লো।

তরুণের সাহস, তরুণের শক্তি, তরুণের ত্যাগ, তরুণের বীরত্ব একেবারে মিলিয়ে গিয়ে রইলো শুধু ফাজলামি। তখন বাঘাদের দলের হাতে অনেক অস্ত্র, হাতবোমা থেকে রিভলবার পর্য্যন্ত। পড়তে লাগলো ইঞ্জিনীয়ারিং, করতে লাগলো ডাকাতি—বড় লোকের টাকা

কেড়ে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার জন্যে—যেমন রঘুনাথ বাবু ছিলো রঘুডাকাত।

বাঙালীটোলায় ও থাকে। কিন্তু দল ওদের মচ্ছোদরিতে—চৌক পার হ'য়ে বিশ্বেশ্বরগঞ্জ পার হ'য়ে রাজঘাটের পথে মচ্ছোদরিতে।

ও বলে জীবনের মহিমা হল লড়াইয়ের মধ্যে। বিনিময়ের মধ্যে আরাম-কেদারায় শুয়ে নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে নয়। মাথার ওপর জ্যৈষ্ঠের কড়া রোদ, আষাঢ়ের প্রবল বৃষ্টি ঝ'রে পড়ুক, ঝড় আসুক, তুফান উঠুক, ফিরব না, যখন যাত্রা হল সুরু।

অভাব না হ'লে যিনি অভাব পূরণ করেন, তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না। বিপদ না এলে যিনি বিপদমোচন, তাঁকে চেনা যায় না। দীন না হ'লে দীনবন্ধুকে বোঝা যায় না। হতভাগ্য যে, সে কখন্ অভাব হবে সেই দুর্ভাবনায় কখনো আরাম করতে পারলো না, ঈশ্বরে বিশ্বাস আনতে পারলো না, মানুষের খোসামোদ ক'রে, অসাধু পথ ধ'রে অন্যায় ক'রে শুধু টাকা রোজগারের প্রাণপাত চেষ্টা ক'রে পাপের বোঝা দুঃখের বোঝাই বাড়ালো, মা নয়, বাপ নয়, ভাই নয়, বন্ধু নয়, প্রতিবেশী নয়, আত্মীয় নয়, পর নয়—কারুর জন্যেই মাথা ঘামালো না—সে শুধু সুখ থেকে, আনন্দ থেকে, শান্তি থেকে, তৃপ্তি থেকে দূর থেকে দূরে যেতে লাগলো। সে যেদিন পৃথিবী থেকে সরে গেল, কারুর কোনো ক্ষতি হল না। কেউ তাকে মনে রাখলো না। এই রকম লোকই হাজার হাজার কোটি কোটি। তাদের মধ্যেও রঘুডাকাত মনে রাখবার মতন রঘুনাথ বাবু, দুঃখীর দুঃখে যার মন কাঁদত, অত্যাচারীর অহঙ্কার যে চূর্ণ করবার ক্ষমতা রাখত।

বাবার এই সব কথা মীরা শুধু শুনত না, গিলত। তার মনে হত, সত্যি, কত জজ ব্যারিষ্টার রাজ্যপাল ক্রোড়পতি ত এলো গেলো, কে বা তাদের গ্রাহ্য করলো? ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আশানন্দ ঢেঁকি—যিনি ঢেঁকি দিয়ে ডাকাত মেরেছেন ব'লে সম্মানের উপাধি পেয়েছিলেন ঢেঁকি, তাঁর কথা শুধু শান্তিপুর গুপ্তিপাড়া কেন, সারা বাংলার লোক আজো মনে করে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে। কবিরাজ বলেছেন আশানন্দকে আধপেটা খৈ খেতে, সকাল ন'টার মধ্যে—সর্দ্দিভাব হয়েছে যখন। বিকেল ৩টের সময়ে ঐ পথে যেতে কবিরাজের নজরে পড়লো, একজন খৈ ভেজে ভেজে দিচ্ছে, আশানন্দ দুধে ফেলে খাচ্ছেন। কবিরাজ বললেন, এ কি মশাই, সকাল ন'টায় যে খেতে বলে গেছি।

সকাল ন'টায় ত বসেছি। কিন্তু আধপেটা যে কিছুতেই হচ্ছে না!

বাবা বলে, জানো মীরা, সব জানতে হবে, পৃথিবীতে যা জানবার আছে। বিজ্ঞানের যত কথা, দর্শনের যত কথা। পাশ ক'রে পণ্ডিত হয় না, অজস্র বই প'ড়ে আর জ্ঞানে আর অভিজ্ঞতায় মানুষ বড়ো পণ্ডিত হয়। তার প্রমাণ শরৎচন্দ্র। তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ। প্রমাণ ক্রীতদাস ঈশপ, যার গল্প কথামালা। বঙ্কিমচন্দ্রের মতন বি-এ পাশ ত দেশভরা, কিন্তু বন্দে মাতরম্ কে বলতে পারলো? মাইকেলের মতন ব্যারিষ্টারের কি অভাব আছে? কিন্তু মেঘনাদবধ তারা শোনাতে পেরেছে? আমরা আদার ব্যাপারী। কিন্তু জাহাজের খবরেও আমাদের দরকার আছে। একটা জাহাজ তৈরী করতে কত ইস্পাত দরকার হয় জানো?

কত? মীরা বলে।

চার হাজার টন। সাতাশ মণে এক টন মনে রেখো। ঐ ইস্পাতে তিনশো মালগাড়ী হ'য়ে যায়। আট লক্ষ পেরেক গজাল আর খিল চাই। দোতলা বাড়ীর মতন উঁচু একটা জাহাজে পাঁচ ছ' মাইল লম্বা ইলেক্ট্রিক তার লাগে। মাল যা ধরে একটা জাহাজে, তা পাঁচশো মাল গাড়ীর মাল। যে কল চালায় জাহাজকে, তা রেলের ছ'টা ইঞ্জিনের সমান। যা তৈরী করতে হাজার হাজার শ্রমিক আর লক্ষ লক্ষ টাকা লাগে, যার নৌবিভাগের কর্ম্মচারী আমদানী করতে হয়, দুর্লভ স্বাস্থ্য আর কঠিন পরীক্ষার পর—তা ধ্বংস হয়ে যায় একটি টর্পেডোর ঘায়ে—আশ্চর্য্য মনে হয় না? সেই টর্পেডো আসে ডুবোজাহাজ থেকে। সেই ডুবোজাহাজে জলের তলায় কোথায় আছে যন্ত্রে ধরা পড়বে। মাথা ঘামিয়ে এত আবিষ্কার যখন ইংলণ্ড আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মাণী, রাশিয়া জাপান করেছে, তখন আমরা ভালো ইংরেজী বলতে শিখে বেশী মাইনের কাজ করাকেই জীবনের সার ব'লে বুঝেছি, আর এখনো তা ছাড়া কিছু ভাবতে পারছি না, তাই আমার ভারতবর্ষ আজো অনেক অনেক পশ্চাতে। আড়াই হাজার মাইল লম্বা ভারতের উপকূল। তেরো শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে আমরা যে জাহাজ ছেড়েছি সে রকম জাহাজ ইংরেজও তখন তৈরী করতে পারেনি। আজকের তরুণরা দলে দলে সমুদ্র রক্ষায় যাচ্ছে না। ক্লাবে আড্ডা মারছে।

মীরা বলে, কি করা যাবে বাবাদা'? পথ তো খোলা নেই!

পথ খোলা থাকে না। পথ ক'রে নিতে হয়। ঋষিদের আশ্রমে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা যেত জীবনকে তৈরী করবার জন্যে। সেইখান থেকে শিখত আয়ুর্ব্বেদ, লতাপাতার গুণাগুণ, মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ তৈরী। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা যেত ধনুর্বিদ্যা শস্ত্রবিদ্যা শিখতে গুরুর আশ্রমে। পথ তারা ক'রে নিয়েছিলো। সেদিন কাঠের জাহাজ তৈরী করে দেশে দেশে পাড়ি দিয়েছে, পাহাড়ে পাহাড়ে পথ করেছে, গুহায় গুহায় ছবি এঁকেছে, আকাশছোঁয়া মন্দির করেছে, সমুদ্র থেকে শাঁখ এনে তুলসীতলায় বাজিয়েছে, কাবুল থেকে জাফরাণ এনে পোলাও রেঁধে খেয়েছে।

আর আজ? বাস-ট্রামের পা-দানীতে কোনো রকমে একটা পা ঢুকিয়ে দিয়ে ঝুলতে ঝুলতে অফিস চলেছে। এক পা হাঁটতে পারে না। পাথেয় না দিয়ে পথ পার হবার বিদ্যেটা বেশ শিখেছে। তাই না?

কচুরিগলির কচুরি, ঠাঠেরিবাজারের বাসন, বিশ্বনাথের গলির মালাই, দশাশ্বমেধের গোল গোল ছাতা, সন্ধ্যার আরতি, মানুষের ভিড়—কাশী নিত্যনতুন। পাঁড়ে হাউলি, চুম্বি চৌকি, মদনপুরা—পাড়ার নামগুলিও নতুন নতুন। ভৃগুসংহিতার গণনা, কালভৈরবের ডোর, বীরেশ্বরের দোরধরা, সঙ্কটার পুজো—বৃদ্ধাদের এখানে কত কাজ। বাড়ী ছেড়ে কাশীতে চলে আসা মানে সংসারই ত্যাগ করা। মণিকর্ণিকায় শেষ কাজ হ'য়ে গেলে যেন নিশ্চিন্দি। কাশীবাস করতে এসেছে যে সব প্রবীণারা তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে মীরার ভারী ভালো লাগে। ওরা বিশ্বনাথের পায়ে চলে এসেছে। ওদের আর মায়া নেই।

••• এ মাসের প্রচ্ছদপট •••

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি শ্বেতপ্রস্তর-মূর্তির আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। মূর্তির নাম 'পুরুষ ও প্রকৃতি'। আলোকচিত্রটি কনক দত্ত গৃহীত।

সাজঘর

—বাসন্তী ঘোষ

শহীদ-স্মৃতি (পাটনা)

—অরুণ চক্রবর্তী

ব্যালান্স —দেবপ্রিয় দে

দারুণ অগ্নিবাণে —সুকমল ভট্টাচার্য
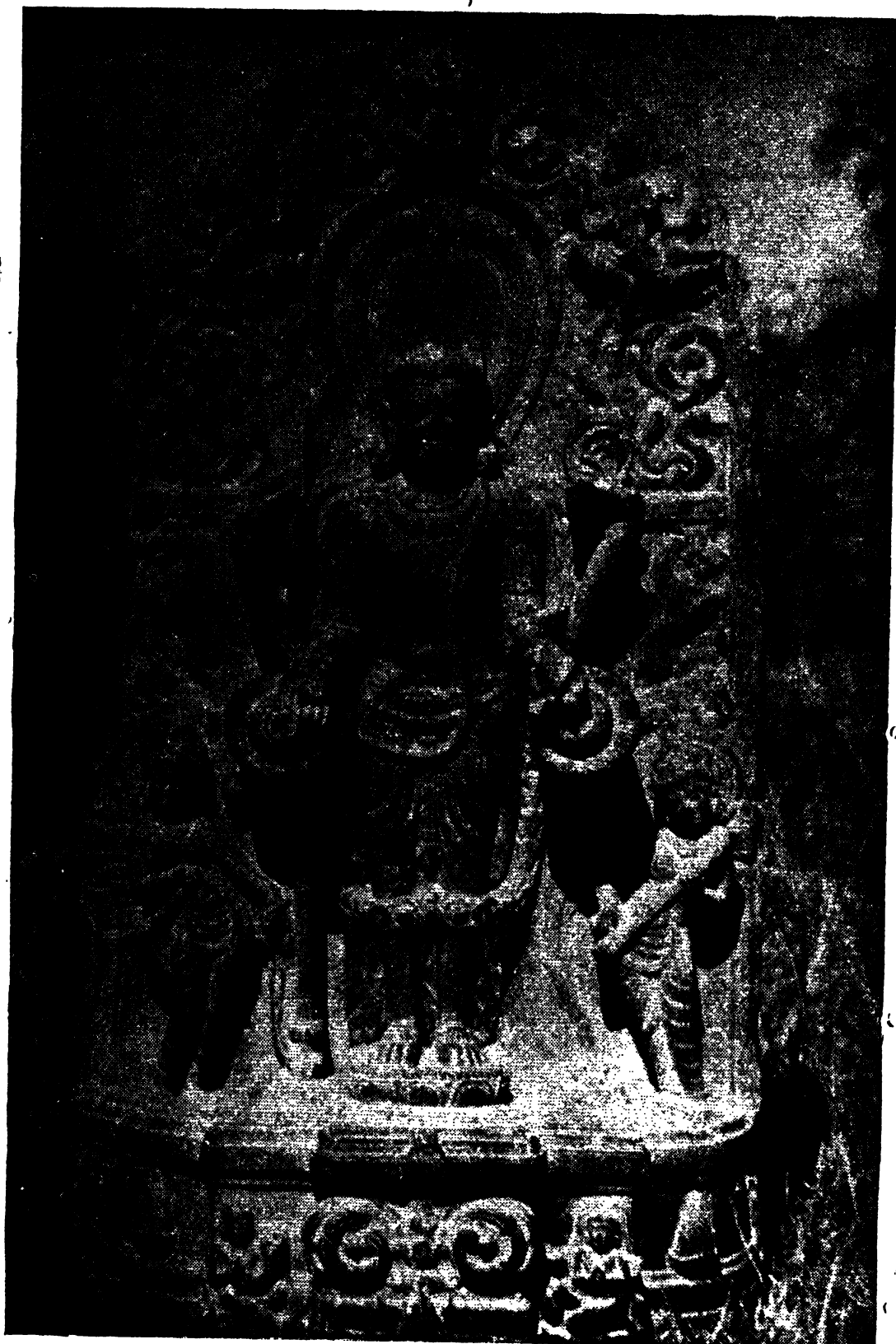
শ্রীবিষ্ণুমূর্তি (গৌড়, মালদহ) —মানব দত্ত

কাশীর ঘাট —ধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
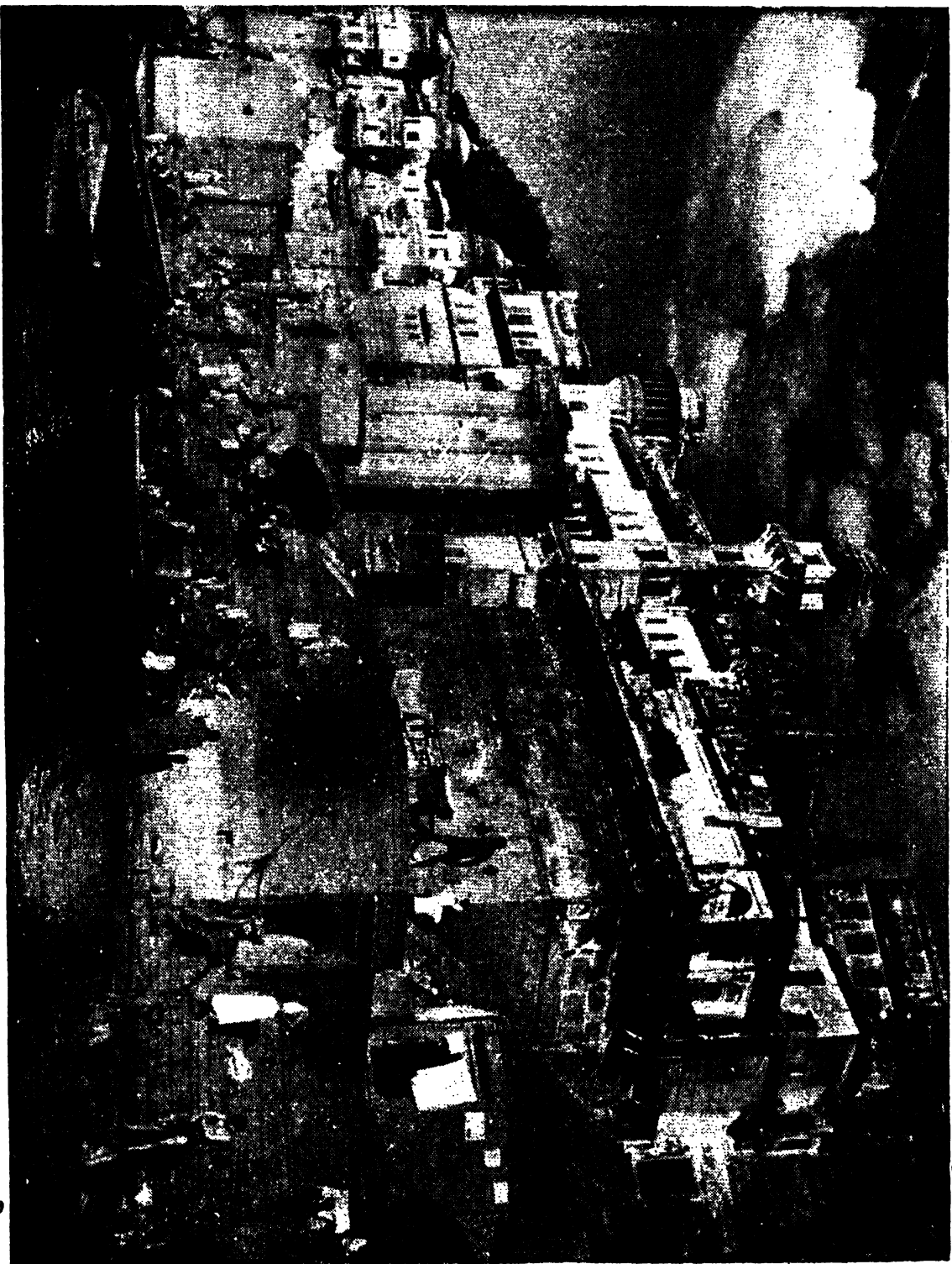
বাংলা দেশের, মহারাষ্ট্রের, মাদ্রাজের, গুজরাটের কোন দূর দূর গ্রাম থেকে বিধবারা কবে এখানে চ'লে এসেছে, কারুর টাকা আসে, কারুর আসে না, কারুর ছেলে পাঠায়, কারুর পাঠায় না, অন্নপূর্ণার রাজত্বে অভাব কারুরই হয় না। শিবের ত্রিশূলের ওপর যে বারাণসী, তা হাজার হাজার বছর ধ'রে পুণ্যলোভী মানুষের মনে শেষ শান্তি বিলিয়ে এসেছে।

কিন্তু মীরা এখানে থাকতে আসেনি। সমুদ্রকূলে তার জন্ম, সমুদ্রতীরে সে মানুষ, সমুদ্রের মতনই চঞ্চল। অনেক দিন এক জায়গায় থাকবার মেয়ে সে নয়।

কাঁথির পিসিমাকে বললে, দিদা, এবার কোথায় যাবেন ?

তুই কি ফিরে যাবি তাদের কাছে ? যারা আর তোকে চায় না, শুধু মুখ যুটে সে কথা বলতে পারছে না ?

আমার লরেটোর পড়া যে শেষ হয়নি। সেটা কি ওরা শেষ করতে দেবে না ? যদি ওরা আমায় চলে যেতেই বলে, তাহ'লে আমি বলব, আমার স্কুলের পড়াটা শেষ করতে দাও। মাঝপথে আমি যে অগাধ জলে প'ড়ে যাব। একথা আমার শুনবে না, এত নিষ্ঠুর কি ওরা হবে ?

পিসিমা বলেন, কি জানি বাবু! ওদের মন ওরাই জানে!

মীরা বলে, জানেন দিদা, আপনার সঙ্গে কাশীতে এসে বাঘাদা'কে দেখে আমার এই লাভ হল যে, গরীব হ'য়ে যাবার ভয় আর রইলো না, কথায় যে বলে, জীবনের রণক্ষেত্রে তার দেখা পেলাম। আমি এবার লড়াই করব। আমি ভয় আর করব না। ভয় মানেই পাপ, এখন বুঝেছি। [ক্রমশঃ।

জলকন্যা

হান্স ক্রিশ্চিয়ান হ্যাণ্ডারসন

বিশাল বড়ো সমুদ্রের মধ্যে অনেক, অনেক দূরে—জল যেখানে অপরাজিতার মতো নীল আর স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, যেখানটা এতোই গভীর যে, হাজারটি গেটের উঁচু গম্বুজ পর পর সাজালে তবে উপর থেকে একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকে,—সেখানে সাগর-রাজার দেশ।

তোমরা বুঝি ভেবেছিলে, জলের নিচে বালি ছাড়া কিছু নেই ? তা নয়, মোটেই তা নয়। অপরূপ সুন্দর সেখানকার গাছপালা, এতো হালকা তার ডালপালা যে, জল একটু কেঁপে উঠলো কি তারা নেচে উঠলো থিরথিরিয়ে—আচমকা দেখলে তাদের জীবন্তই মনে হয়। ডালের ফাঁক দিয়ে দিয়ে কতো রকমের ছোটো-বড়ো মাছ ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়—ঠিক যেমন আমাদের গাছে গাছে ওড়ে পাখির ঝাঁক।

জল যেখানে সবচেয়ে গভীর, সেখানে সাগর-রাজার প্রাসাদ। দেয়ালগুলো তার প্রবালের, উঁচু জানলাগুলো পান্না-বসানো, আর শঙ্খের কারুকরা ঢেউ খেলানো ছাদ, ঢেউয়ের দোলায় দোলায় এই খুলছে, এই বুজছে। কী যে সুন্দর লাগে দেখতে, প্রতিটি শঙ্খের বুকে ঝকমকে উজ্জ্বল একটি মুক্তো, তার যে কোনো একটি পেলে ওপরকার দেশের যে কোনো রাজা ধন্য হ'য়ে যায়!

সাগর-রাজার স্ত্রী মারা গেছেন অনেক দিন; তাঁর বুড়ি মা ঘরসংসার দেখেন। এই বুড়ির বুদ্ধিশুদ্ধি নেহাৎ মন্দ নয়, কিন্তু সাগর-সমাজে তাঁরাই যে সবচেয়ে বড়ো ঘর, এ নিয়ে বেজায় দেমাক তাঁর। তাঁর লেজে কি না বারোটা ঝিনুক বসানো, সেইটেই বড়ো ঘরের মার্কা—অন্যদের বড়ো জোর ছ'টা! এ ছাড়া তাঁর আর সবই ভালো, সবার মুখেই তাঁর সুখ্যাতি। রাজার ছয় মেয়ে, ছ'টি ফুটফুটে ছোটো রাজকন্যা; বুড়ি তাঁর নাতনীদের প্রাণের চেয়েও ভালোবাসেন। সবাই তারা সুন্দর, সবচেয়ে সুন্দর হ'লো একেবারে ছোটোটি। তার গায়ের রঙ গোলাপের পাপড়ির মতো নরম, সমুদ্রের মতোই নীল তার চোখ; অবশ্যি অন্য সব জলকন্যার মতো তারও পা নেই, পায়ের দিকটায় মাছের মতো লম্বা ল্যাজ—তা কী কোমল আর কতো উজ্জ্বল!

সমস্ত দিন মেয়েরা প্রাসাদের বড়ো বড়ো ঘরে খেলা করে; সেখানে চার দিকের দেয়ালে ফোটে নানা রঙের হরেক রকম সুন্দর ফুল। পান্নার জানালাগুলি একটু খুললো কি মাছেরা সাঁতরে এলো ঘরে, যেমন আমাদের জানলা দিয়ে চড়ুই পাখি উড়ে আসে। কিন্তু মাছেদের সাহস চড়ুইপাখির চেয়ে অনেক বেশি; তারা সোজা রাজকন্যার কাছে এসে গা ঘেঁষে খেলা করে, গায় তাদের হাত থেকে, আদর করলে আর যেতেই চায় না, গায়ের সঙ্গে লেগে ঘুরে বেড়ায়।

প্রাসাদের সুমুখে মস্ত বাগান ভ'রে গাছের সারি, কোনোটা আগুনের মতো লাল, কোনোটা মেঘের মতো গাঢ়-নীল; গাছের ফল সোনালি রঙে ঝলোমলো; জ্বলজ্বলে সূর্যের মতো উজ্জ্বল গাছের ফুল। আমাদের বাগান হয় মাটিতে; ওদের বাগান বালিতে, উজ্জ্বল নীল রঙের বালি, গন্ধক-জ্বলা আগুনের মতো নীল। সমস্তটার উপর অদ্ভুত সুন্দর একটা নীল রঙের ছোপ; সেখানে গেলে মনে হবে যেন অনেক উঁচুতে উঠে গেছি, আকাশ মাথার উপরে, আকাশ পায়ের নিচে—সমুদ্রের তলায় যে আছি তা মনেই হবে না। জল যখন শান্ত, তখন সূর্য তাকিয়ে থাকে যেন বেগুনি রঙের একটা প্রকাণ্ড ফুল; তার ভরা পেয়ালা থেকে পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন উপচে পড়ছে।

বাগানের একেক অংশ একেক রাজকন্যার দখলে; সেখানে তারা যার যা খুশি করে। এক জন তার বাগান সাজিয়েছে তিমির চেহারা ক'রে: আরেক জনেরটা ঠিক জলকন্যার মতো; কিন্তু সবচেয়ে ছোটো কন্যার যেটা সেটা একেবারে সূর্যের মতো গোল; আর সূর্যটা তার চোখে কি না লাল দেখাতো—সেই জন্যে তার ফুলগুলোও সব টকটকে লাল রঙের; এই মেয়েটি কিছুটা অদ্ভুত গোছের, ভারি চুপচাপ, একা ব'সে ব'সে কী যেন ভাবে। হয়তো এক দিন উপরে এক জাহাজ ডুবেছে: তাঁর নানারকম রঙচঙে সুন্দর জিনিস নিয়ে মেতেছে তার বোনেরা; কিন্তু শিশু-কোলে-করা শ্বেত পাথরের একটি বালকমূর্তি ছাড়া এই মেয়ে আর কিছু চায় না। মূর্তিটি নিয়ে সে তার বাগানে রাখলো; রোপণ করলে তার পাশে একটি লাল ফুলের গাছ। গাছটি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠলো, তার লম্বা ডাল নুয়ে পড়লো মাটির উপর—সেখানে চির-চঞ্চল বেগুনি রঙের ছায়ার যেন ডালে মূলে জড়াজড়ি।

এই জলকন্যা সবচেয়ে ভালোবাসতো মানুষদের কথা শুনতে, সমুদ্রের উপরে যাদের দেশ। ঠাকুমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সব গল্প শুনতো সে: জাহাজের আর মানুষের আর ডাঙার প্রাণীর যতো গল্প তিনি জানতেন সব। ওখানকার ফুলে নাকি গন্ধ আছে,

কী ভালো লাগতো তার এ-কথা শুনে. তাদের সমুদ্রের ফুলগুলো তো সব গন্ধহীন, ওখানকার বনের রঙ সবুজ, আর তার ডালপালায় মাছ যতো ছুটে ছুটে বেড়ায়, সব নানা রঙের, আর কী মিষ্টি গলায় গান করে তারা ! ঠাকুমার মনে অবশ্যি ছিলো পাখিদের কথা, কিন্তু বলবার সময় মাছই বলেছিলেন : নাতনীরা তো আর কখনো পাখি ছাখেনি, বললে কি কিছু বুঝতো তারা ?

গল্প শেষ ক'রে ঠাকুমা বলতেন : তোমাদের যখন পনেরো বছর বয়েস হবে তখন তোমরা উঠতে পারবে সমুদ্রের উপরে; পাহাড়ের ফাঁকে ব'সে চাঁদের আলোয়, দেখবে জাহাজ যাচ্ছে, বুঝবে কা'কে বলে শহর, আর কা'কে বলে মানুষ।

পরের বছর সবচেয়ে বড়োটির বয়েস পনেরো বছর হ'লো। অন্য সব বোনেরা—আহা বেচারীরা ! মেজোটি বড়োটির এক বছরের ছোটো, সেজোটি মেজোর ছোটো এক বছরের ; এমনি ক'রে-ক'রে সবচেয়ে ছোটোটির কপালে আরো পাঁচ-পাঁচ বছর ব'সে থাকা ! পাঁচ বছর পরে আসবে সেই শুভদিন, সে-ও উঠতে পারবে সমুদ্রের উপরে, দেখতে পারবে উপরকার পৃথিবীর সব কাণ্ড। যা-ই হোক, বড়োটির যখন যাবার সময় হ'লো, সে কথা দিলে, ফিরে এসে বোনেদের কাছে সব গল্প বলবে ; বুড়ো ঠাকুমা বিশেষ কিছু বলতেই পারেন না, আর তারা যে কতো জানতে চায় তার তো কোনো ইয়ত্তাই নেই !

কিন্তু ছেলেবয়েসের এই বাধা থেকে ছাড়া পাবার আগ্রহ সবচেয়ে ছোটোটির মতো আর কারুরই তেমন তীব্র ছিলো না। সবচেয়ে বেশি দেরি তারই—আর চুপচাপ একা ব'সে কী ভাবে সে ! কতো রাত খোলা-জানলা দিয়ে স্বচ্ছ নীল জলের দিকে সে তাকিয়ে থেকেছে, চার দিকে মাছেরা ছুটোছুটি ক'রে খেলা করছে ; দেখেছে সে সূর্য আর চাঁদ, ম্লান তারার আলো. উপরে কেমন দেখায়, তার চেয়ে হয়তো অনেকটা বড়ো, অনেকটা উজ্জ্বল। যদি হঠাৎ কালোছায়া পড়েছে—একটা তিমি বুঝি, না কি মানুষে বোঝাই একটা জাহাজ ভেসে চ'লে গেলো। সে-সব মানুষ স্বপ্নেও ভাবলে না যে তাদের অনেক, অনেক নিচে ছোটো এক জলকন্যা জাহাজের হালের দিকে ব্যাকুল আগ্রহে দিয়েছে লম্বা হাত দুটো বাড়িয়ে।

তার পর সেই দিন এলো, যার কথা বলছিলুম, বড়ো মেয়েটির বয়েস হ'লো পনেরো, উঠলো সে সমুদ্রের উপরে।

ওঃ, ফিরে এসে তার সে কী হাজার গল্প। সবচেয়ে ভালো লেগেছে তার চাঁদের আলোয় বালির উপর ব'সে মস্ত শহরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে, সেখানে তারার মতো ঝিকমিক কতো আলো আর কতো গান-বাজনা। দূর থেকে সে শুনেছে মানুষের আর গাড়ির আওয়াজ, দেখেছে গির্জের উঁচু গম্বুজ, শুনেছে ঘণ্টার শব্দ, আর, ওখানে যেতে পারবে না ব'লেই ও-সব জিনিষের জন্যে তার আরো বেশি মন-কেমন করছে।

এ-সব গল্প শুনতে শুনতে ছোটোটির নিশ্বাস পড়ে না। এর পর রাত্রে তার খোলা জানলায় যখন সে দাঁড়ায়, জলের ভিতর দিয়ে উপরে তাকিয়ে সে সেই বিরাট শব্দময় শহরের কথা ভাবতে ভাবতে এমন তন্ময় হয়ে যায় যে, তার মনে হয়, সে বুঝি গির্জের ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

পরের বছর দ্বিতীয় বোনটি পেলো ছাড়া। সে যখন ভেসে উঠলো সমুদ্রের উপর, সূর্য্য তখন অস্ত যায়-যায়, আর তা দেখে এতো ভালো লাগলো তার যে, সে ফিরে এসে বললে, জলের ওপরে যা-কিছু তার চোখে পড়েছে, এতো সুন্দর আর কিছুই নয়।

—সমস্ত আকাশ একেবারে সোনায় সোনা, সে ফিরে এসে বললে।—আর মেঘগুলো কী যে সুন্দর তা আমি ব'লে দেখাতে পারবো না—এই লাল, এই বেগুনি, এই কাজল-কালো, ভেসে মিলিয়ে গেলো আমার মাথার উপর দিয়ে। কিন্তু আরো তাড়াতাড়ি উড়ে এলো জলের উপর দিয়ে এক-ঝাঁক রূপোলি রাজহাঁস, ঠিক যেখানে সূর্য নেমে এসেছে। আমি তাকিয়ে রইলুম তাদের দিকে, সূর্য অস্ত গেলো ; সমুদ্রের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে আর মেঘের ধারে-ধারে যে গোলাপি আভা, তা-ও গেলো আস্তে-আস্তে মিলিয়ে।

তৃতীয় বোনের ওপরে যাবার সময় হ'লো। সব চেয়ে বেশি সাহস তারই, সে চললো এক নদীর স্রোত ধ'রে ধরে। নদীর দু-ধারে ছোটো-ছোটো সবুজ পাহাড় ; সেখানে গাছ-পালা, সেখানে আঙুর-ক্ষেত, ফাঁকে-ফাঁকে ঘর, বাড়ি, প্রাসাদ। সে শুনলো পাখির গান ; আর সূর্যের তাপে তার মুখ প্রায় পুড়ে যাবার মতো হ'লো, থেকে-থেকে তাই সে জলে ডুব দিয়ে নিলে। এক জায়গায় একদল ছেলেমেয়ে লাফালাফি ক'রে স্নান করছে ; তার খুব ইচ্ছে হ'লো ওদের সঙ্গে গিয়ে খেলে, কিন্তু ওরা তাকে দেখেই ছুটে পালালো বিষম ভয় পেয়ে, আর ছোটো কালো একটা জানোয়ার তাকে দেখে এমন ঘেউ-ঘেউ করতে লাগলো যে অগত্যা সে-ও ভয় পেয়ে ফিরে এলো সমুদ্রে। তবু সে ভুলতে পারে না সেই সবুজ বন, আর ঘন-নীল পাহাড় ; আর ফুটফুটে ছেলেমেয়েগুলোই বা কী, পাখনা নেই, তবু কেমন নির্ভয়ে নদীতে সাঁতরে বেড়ায় !

চতুর্থ বোনটির অতো সাহস হ'লো না, সে খোলা সমুদ্রেই রইলো, ফিরে এসে বললে, অতো সুন্দর আর কিছুই হ'তে পারে ... শাদা পাল-তোলা জাহাজ দূর দিয়ে ভেসে গেছে, এতো দূরে যে মনে হচ্ছে যেন একঝাঁক গাঙচিল ; জলে খেলা করছে ফূর্তিবাজ শুশুকের দল ; বিরাট তিমি এক নিশ্বাসে হাজারটা ফোয়ারা তুলে দিয়েছে আকাশে।

পরের বছর পঞ্চম বোনটির পনেরো বছর হ'লো। তার জন্মদিন পড়লো শীতকালে ; সমুদ্রের তখন সবুজ রঙ, প্রকাণ্ড সব বরফের পাহাড় জলে ভাসছে। সে বললে, সেগুলো মুক্তোর মতো শাদা দেখতে—অবশ্যি মানুষের দেশের গির্জেগুলোর চেয়ে ঢের বেশি বড়ো। এরই এক পাহাড়ের চুড়োয় ব'সে সে বাতাসে তার চুল দিলে খুলে, জাহাজগুলো তাড়াতাড়ি পাল তুলে দিয়ে যতো শীগগির পারলো ছুটে পালালো।

সন্ধ্যেবেলায় সমস্ত আকাশটা পালে-পালে ভ'রে গেলো ; বরফের বিরাট পাহাড়গুলো এই উঠছে, এই ডুবছে, নীল-লালচে একটা আভায় উঠছে ঝিকমিকিয়ে ; আর মেঘ ছিঁড়ে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো, গুমগুম ক'রে গড়িয়ে চললো বাজের আওয়াজ ; আর তক্ষুণি নামানো হ'লো সব জাহাজের পাল, সবাই সেখানে ভয়ে জড়োসড়ো ; শুধু রাজকন্যা চুপচাপ ব'সে শান্ত চোখে তাকিয়ে থাকলো বাঁকাচোরা বিদ্যুতের দিকে।

এরা সকলেই প্রথম বার উঠে নানা রকম নতুন সুন্দর জিনিস

দেখে গেলো মুগ্ধ হ'য়ে, কিন্তু সে-নতুনের মোহ শীগগিরই কেটে গেলো, কিছু দিনের মধ্যেই উপরের পৃথিবীর চাইতে নিজের বাড়িই তাদের ভালো লাগতে আরম্ভ করলো: আর কোথাও কি সব-কিছু এমন মনের মতো পাওয়া যায়?

প্রায়ই সন্ধ্যেবেলায় পাঁচ বোন হাতে হাত রেখে গভীর জল থেকে উঠে আসতো। অপরূপ তাদের কণ্ঠস্বর, অমন কোনো মানুষের হয় না। ঝড়ের আগে-আগে জাহাজের সামনে দিয়ে তারা যেতো সাঁতরে—গান গাইতো মধুর সুরে। সে গান যেন বলতো,—জলের নিচে আমাদের কী যে আনন্দ তা কি দেখবে না? ওগো নাবিক, ভয় ক'রো না; এসো, নিচে নেমে এসো আমাদের কাছে।

নাবিকেরা অবশ্য সে-কথা বুঝতে পারতো না; তারা ভাবতো, এ-শব্দ বুঝি শুধু জলের শিষ; এমনি ক'রে তারা সমুদ্রের লুকোনো ঐশ্বর্য্য ছড়িয়ে আসতো: কেন-না, জাহাজ ডুবলে সবাই তো মরবে, মার মৃত মানুষ ছাড়া সাগর-রাজের প্রাসাদে কেউ কখনো ঢোকেনি।

পাঁচ বোন যখন সন্ধ্যেবেলায় সাঁতরে বেড়াচ্ছে, ছোটোটি ব'সে থাকে তার বাবার প্রাসাদে, একা স্তব্ধ হ'য়ে মুখ উঁচু ক'রে তাকিয়ে। কাঁদতে ইচ্ছে করে তার, কিন্তু জলকন্যারা তো কাঁদতে পারে না! সেই জন্যে যখন তাদের মন-খারাপ হয়, মানুষের মেয়েদের চাইতে কতো বেশি যে কষ্ট পায় তারা, তার অন্ত নেই!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ভাবে,—কবে হবে আমার পনেরো বছর! আমি ঠিক জানি, উপরের পৃথিবী আর সেখানকার মানুষদের ভালো খুবই লাগবে আমার। শেষ পর্য্যন্ত এতো আশার সেই সময় এলো।

ঠাকু'মা বললেন, নে, এবার তোর পালা। আয়, তোকে তার বোনেদের মতো ক'রে সাজিয়ে দিই,—ব'লে তিনি তার চুলে জড়ালেন শাদা শাপলার মালা, আধখানা মুক্তো দিয়ে তৈরি তার এক-একটা পাপড়ি; তার পর আটটা বড়ো-বড়ো ঝিনুককে হুকুম করলেন তার ল্যাজের সঙ্গে লাগতে—তাতে বোঝা যাবে সে কতো বড়ো ঘরের মেয়ে।

বড়ো অসুবিধে লাগে এতে,—ছোটো রাজকন্যা আপত্তি করলে।

সুন্দর দেখাতে হ'লে এক-আধটু অসুবিধে গায়ে না মাখলে চলে না,—হেসে বললেন ঠাকু'মা।

এতো জাঁক-জমক কিন্তু রাজকন্যার মোটেই পছন্দ হ'লো না; যার ভারি মুকুটটা বদলে তার বাগানের লাল ফুল পরতে পারলে খুশি হ'তো, তাতে তাকে মানাতোও ঢের ভালো। কিন্তু সে সাহস পেলো না; ঠাকু'মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সমুদ্রের উপর ভেসে উঠলো সে, ফেনার মতো পাতলা।

যখন জলের উপর জীবনে প্রথম সে দেখা দিলে, সূর্য্য ঠিক অস্তে নেমে গেছে। মেঘেরা জ্বলছে লাল-সোনালি আলোয়, তারা ফুটেছে আকাশের পশ্চিমে, ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, আর সমুদ্রটা মস্ত একটা আয়নার মতো নিশ্চল প'ড়ে। তিনটে মাস্তুলওয়ালা এক জাহাজ ঠাণ্ডা জলের উপর চুপ ক'রে শুয়ে; একটি পাল শুধু তুলে দেওয়া, সেটাও কিন্তু নড়ছে না, হাওয়ার বেশি জোর নেই। নাবিকেরা সিঁড়িতে চুপচাপ ব'সে। ডেক থেকে আসছে গান-বাজনার শব্দ। তার পর অন্ধকার হ'লো, হঠাৎ একসঙ্গে হাজারটি আলো জ্ব'লে উঠলো জাহাজে, উড়লো অগুন্তি নিশেন।

ছোটো জলকন্যা কাপ্তেনের ঘরের কাছে গেলো সাঁতরে। জাহাজটা জলের দোলানির সঙ্গে-সঙ্গে আস্তে ওঠা-নামা করছে; এক বার সে উঁকি মেরে কাচের জানলা দিয়ে তাকালো। ভিতরে অনেক জমকালো পোশাক-পরা মানুষ; তাদের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর এক রাজপুত্র। খুব অল্প বয়েস তার, বড়ো জোর ষোল-সতেরো; বড়ো-বড়ো কালো তার চোখ। তারই জন্মদিনের উৎসব আজ। নাবিকেরা ডেকের উপর নাচছে, আর রাজপুত্র তাদের সামনে বেরিয়ে আসতেই একশো হাউই লাফিয়ে উঠলো আকাশে, রাত হ'য়ে গেলো দিন। জলকন্যা তাতে এতোই ভয় পেলে যে খানিকক্ষণ সে চুপ ক'রে রইলো জলে ডুবে।

আবার যখন সে তার ছোটো মাথাটি তুললো, তার মনে হ'লো যেন আকাশের সব তারা তার গায়ের উপর ঝ'রে পড়ছে। এমন অগ্নিবর্ষণ আর কখনো সে দেখে নি; সে কখনো শোনেও নি এমন আশ্চর্য্য ক্ষমতা মানুষের আছে! তাকে ঘিরে ঘুরছে যেন বড়ো-বড়ো সূর্য্য, হাওয়ায় সাঁতরে বেড়াচ্ছে জলজ্বলে মাছ, আর সমুদ্রের শান্ত জলে পড়ছে তার পরিষ্কার ছায়া। জাহাজে এতো আলো যে সব স্পষ্ট দেখা যায়। কী সুখী এই রাজপুত্র, কী সুখী! সে নাবিকদের অভিনন্দন গ্রহণ করলো, একটু হাসি-ঠাট্টা করলো তাদের সঙ্গে, এদিকে গানের মধুর সুরগুলো রাত্রির নীরবতায় গেলো মিলিয়ে।

রাত বাড়লো; কিন্তু এই জাহাজ আর এই সুন্দর রাজপুত্রকে ছেড়ে সে যেন কিছুতেই নড়তে পারছে না। ঢেউয়ের দোলা-লাগা কেবিনের ফুটো দিয়ে সে তাকিয়েই রইলো। নিচে জল ফেনিয়ে উঠেছে, জাহাজ বুঝি ছাড়লো। ঐ তো তুলে দিয়েছে পাল, উঁচু হ'য়ে উঠছে ঢেউ, হাতির শুঁড়ের মতো কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেলো, দূর থেকে শোনা গেলো বাজের আওয়াজ।

নাবিকেরা যেই দেখতে পেলে ঝড় আসছে, অমনি তারা আবার নামিয়ে দিলে পাল। ঝড়ের সমুদ্রে মস্ত জাহাজটা হাল্কা এতোটুকু নৌকোর মতো দুলছিলো; ঢেউগুলো অসম্ভব উঁচু হ'য়ে উঠে জাহাজের উপর দিয়ে গেলো গড়িয়ে—একবার সে নিচে ডুবে যায়, এক বার সে মাথা তুলে ওঠে।

এ-সব ব্যাপারে জলকন্যার অবশ্যি খুবই মজা লাগলো, কিন্তু নাবিকদের সবাই একেবারে ভয়ে জড়োসড়ো। জাহাজ গেলো ফেটে, মোটা মাস্তুলগুলো ঢেউয়ের দাপটে পড়লো নুয়ে, জোরে জল ঢুকতে লাগলো। জাহাজ একটুখানি এদিক-ওদিক দুললো, তার পর বড়ো মাস্তুলটা বাঁশের কঞ্চির মতো গেলো ভেঙে; জাহাজ উল্টিয়ে গিয়ে জলে ভ'রে উঠলো। জলকন্যা এতক্ষণে নাবিকদের বিপদ বুঝতে পারলে; কেন না, ভাঙা জাহাজের মোটা মোটা কাঠ ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে পাছে তার গায়েই লাগে, সেই জন্য তাকেও সাবধান হ'তে হ'লো।

কিন্তু ঠিক তখনি একেবারে ঝুলকালো অন্ধকার হ'য়ে এলো, চোখে আর কিছু দেখা যায় না। একটু পরেই ভয়ঙ্কর এক বিদ্যুতের চমকে সে সমস্তটা ভাঙা জাহাজ দেখতে পেলো। জাহাজ যেই তলিয়ে গেলো জলের নিচে, তার চোখ খুঁজলো রাজপুত্রকে। প্রথমটা সে খুশিই হ'লো: ভাবলে, এখন তো সে আমার বাড়িতেই আসবে। কিন্তু একটু পরেই তার মনে পড়লো যে, জলের নিচে তো মানুষ বাঁচে

না ; কাজে কাজেই রাজপুত্র যদি বা কখনো তার প্রাসাদে ঢোকে, ঢুকবে মৃত মানুষ হ'য়েই।

না-ন্‌-না, রাজপুত্র মরবে না, মরবে না। নিজের বিপদের কথা ভুলে ভাঙাচোরা টুক্‌রোর ভিতর দিয়ে সে সাঁতরে গেলো, শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলো রাজপুত্রকে। সে একেবারে তখন অবসন্ন হ'য়ে পড়ছে, অতি কষ্টে জলের উপর রেখেছে মাথা তুলে। হাত-পা ছেড়ে দিয়ে সে চোখ বুজেছিলো—নিশ্চয়ই ডুবে মরতো, যদি না ঠিক সেই মুহূর্তে জলকন্যা এসে তাকে বাঁচাতো। সে তাকে দু-হাতে জলের উপর তুলে ধরলো, স্রোতে ভেসে চললো দু'জনে।

সকালের দিকে থামলো ঝড়, ঠাণ্ডা হ'লো সমুদ্র, কিন্তু জাহাজটার কোনো চিহ্নই পাওয়া গেলো না। সমুদ্রের ভিতর থেকে সূর্য উঠলো আগুনের মত, তার আলোয় রাজপুত্রের গালের আভা ফিরে এলো যেন। কিন্তু চোখ তার তখনো বোজা। রাজকন্যা তার উঁচু কপালে চুমু খেলো, মুখ থেকে সরিয়ে দিলে ভিজে চুল। সে যেন তার বাগানের শ্বেতপাথরের মূর্তির মতোই দেখতে। সে আরেক বার চুমু খেয়ে মনে মনে প্রার্থনা করলে, রাজপুত্র যেন শীগ্‌গির ভালো হ'য়ে ওঠে।

তার পর তার চোখে পড়লো শুকনো ডাঙা, পাহাড়গুলো বরফে চিকমিকিয়ে উঠেছে। পাড়ের ধার দিয়ে দিয়ে চলেছে সবুজ বন আর বনে ঢোকবার মুখে একটা মঠ কি গির্জে—কী যে, ঠিক বোঝা গেলো না। ঢোকবার পথটির দু' ধারে সারি সারি খেজুর, পাশের বাগানে লেবু গাছের ভিড়। এখানে ছোটো একটি উপসাগর, জল গভীর হ'লেও শান্ত, পাহাড়ের শুকনো শক্ত বালি। এখানে ভেসে এসে লাগলো জলকন্যা মরো-মরো রাজপুত্রকে নিয়ে, মাথা উঁচু ক'রে তাকে শোয়ালো গরম বালুতে, সূর্যের দিকে ফেরালো তার মুখ।

গির্জেয় ঘণ্টা বাজলো ঢং-ঢং ক'রে, একদল মেয়ে বাগানে এলো বেড়াতে। জলকন্যা তাড়াতাড়ি স'রে গিয়ে কতকগুলো পাথরের পেছনে লুকোলো, ফেনায় ঢাকলো মাথা, তাতে তার ছোটো মুখটি আর কেউ দেখতেই পেলে না। কিন্তু আড়ালে থেকে সে চোখ রাখলো রাজপুত্রেরই উপর।

একটু পরেই এক জন মেয়ে এগিয়ে এলো। রাজপুত্রকে দেখে সে যেন ভয় পেয়েই গেলো, সে মনে করলে ও মরে গেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে ছুটে গিয়ে তার বোনদের ডেকে আনলে। জলকন্যা দেখলে, রাজপুত্র তাজা হ'য়ে উঠেছে, মেয়েরা সব তার মুখের উপর মুখ নিচু ক'রে হাসছে। কিন্তু রাজপুত্র চোখ মেলে অবশ্যি তাকে খুঁজলো না ; সে তো আর জানে না, কে তাকে বাঁচিয়েছে। আর তাকে যখন গির্জের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো, এতো মন-খারাপ লাগলো জলকন্যার যে, সে তক্ষুণি ঝুপ করে জলে ডুব দিয়ে ফিরে গেলো তার বাবার প্রাসাদে।

ফিরে এসে সে যেন আগের চেয়েও বেশি শান্ত, বেশি চুপচাপ হ'য়ে গেলো। বোনেরা জিজ্ঞেস করলে, সে ওপরের পৃথিবীতে কী-কী দেখে এলো, কোনো জবাব দিলে না সে।

যেখানে রাজপুত্রকে রেখে এসেছিলো, সেখানে কতো সন্ধ্যেয় সে গিয়ে উঠতো। সে দেখতো, পাহাড়ের বরফ গলছে, বাগানে পেকে উঠছে ফল ; কিন্তু রাজপুত্রকে কখনো দেখতো না, ম্লান মুখে ফিরে যেতো সমুদ্রের তলায়। বাগানে বসে রাজপুত্রের মতো দেখতে সেই পাথরের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকা হয়ে উঠলো তার একমাত্র আনন্দ। ফুলগুলোর জন্যে তার আর মমতা নেই ; বিপুল প্রচুরতায় বেড়ে উঠে তারা সিঁড়িগুলো ছেয়ে ফেললো, তাদের লম্বা লম্বা পাতাগুলো গাছের ডালে ডালে এমন করে জড়িয়ে ফেললে যে, সমস্ত বাগান যেন একটি কুঞ্জবন হ'য়ে গেলো।

তার পর সে তার মনের দুঃখ চেপে রাখতে পারলে না। গোপনে কথাটা বললে এক বোনকে, সে বললে অন্য বোনেদের, তারা বললে তাদের কোনো কোনো বন্ধুকে। তাদের মধ্যে এক জলকন্যা রাজপুত্রের কথা শুনেই বুঝতে পারলে : জাহাজের উৎসব সে দেখেছিলো নিজের চোখে ; রাজপুত্র কোন্ দেশের, কে সেখানকার রাজা, সব জানা ছিলো তার।

আয় বোন—ব'লে জলকন্যারা তাকে জড়িয়ে ধরলো। একসঙ্গে হাতে হাত ধ'রে তারা ভেসে উঠলো ঠিক সেই রাজপুত্রের প্রাসাদের সামনে। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনুবাদক—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট্ট মেয়ে বাণী

সলিল মিত্র

ছোট্ট মেয়ে কচি সোনা নাম রেখেছি বাণী,
খিলি খিলি হাসিটি তার মিষ্টি বড় জানি।
ফুলের বনে একলা মনে কতই খেলা করে,
সোহাগ ভ'রে লতা-পাতা জড়িয়ে বুকে ধরে।
কয় সে কথা চুপি চুপি ফুলের কানে কানে,
গোপনতার কি সেই কথা ঐ তো শুধু জানে।
রাশি রাশি মিষ্টি হাসি বাণীর চোখে-মুখে,
নয়ন ভ'রে দেখলে পরে জড়িয়ে ধরি বুকে !
চুপিসাড়ে বলি তারে 'বাণী-রাণী মোর—
সফলতায় ভ'রে উঠুক জীবনখানি তোর !'
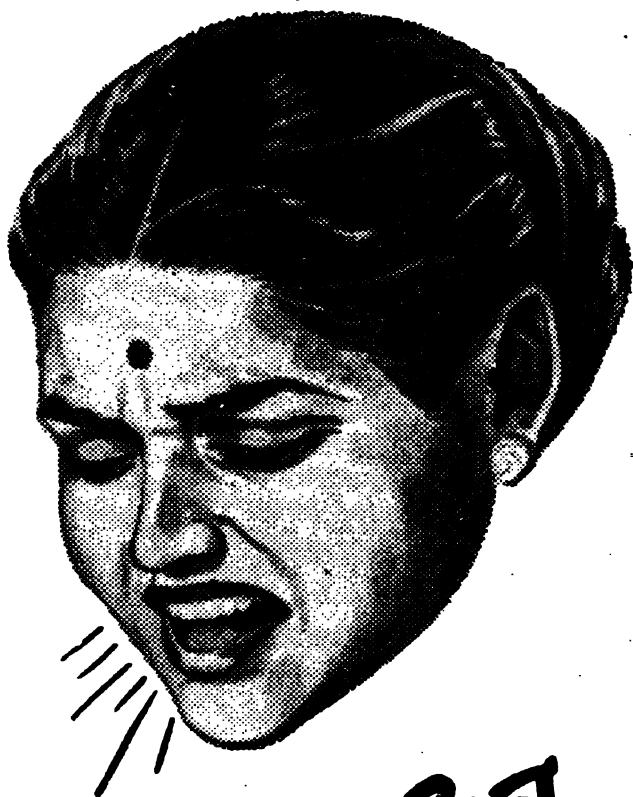
টেনিস

উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার ৭১তম অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। ৩৫টি দেশের বহু কীর্তিমান খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার খেলোয়াড়দের জয়জয়কার! এই দুই দেশের পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়রা পাঁচটি বিষয়ের বিজয়ী ও বিজিতের পুরস্কারগুলি লাভ করেছে। পুরুষদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার কীর্তিমান খেলোয়াড় লুই হোড। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় হোডের এটিই শেষ খেলা। কারণ, তিনি পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। উইম্বলডনে পেশাদার খেলোয়াড়দের স্থান নেই। লুই হোড পর পর দু'বছর উইম্বলডনে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করলেন। মহিলা বিভাগে বিজয়িনী হয়েছেন আমেরিকার নিগ্রো টেনিস-পটীয়সী মিস্‌ এ্যালথিয়া গিবসন।

সিঙ্গলস ফাইনাল (পুরুষদের)

লুই হোড (অস্ট্রেলিয়া) ৬-২, ৬-১ ও ৬-২ সেটে এ্যাসলে কুপারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

সিঙ্গলস ফাইনাল (মহিলাদের)

মিস এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ৬-৩ ও ৬-২ সেটে মিস ডার্লিন হার্ডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

ডাবলস ফ্যাইনাল (পুরুষদের)

গার্ডনার মুলর ও বাজপেটা (আমেরিকা) ৮-১০, ৬-৪, ৬-৪ ও ৬-৪ সেটে লুই হোড ও নীল ফ্রেজারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ডাবলস ফ্যাইনাল (মহিলাদের)

মিস এ্যালথিয়া গিবসন ও মিস ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) ৬-১ ও ৬-২ সেটে মিসেস থেলমা লং ও মিসেস মেরী হটনকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফ্যাইনাল

মার্ভিন রোজ (অস্ট্রেলিয়া) ও মিস ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) ৬-৪ ও ৭-৫ সেটে নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) ও এ্যালথিয়া গিবসনকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

ক্রিকেট

টেন্ট-ব্রিজ মাঠে ইংলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেষ্ট-ম্যাচ অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে।

পিটার মে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত করেন। শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড দল প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৬১৯ রাণ সংগ্রহ করে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ২৫৮ রাণ করেন।

৬১৯ রাণ পিছনে রেখে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ব্যাট করতে নামেন। কিন্তু খেলার মধ্যে বৃষ্টি নামায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের মনের ত্রাসের সৃষ্টি হল। শেষ পর্য্যন্ত ৩৭২ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হল 'ফলো অন' করতে বাধ্য হল। কিন্তু ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে উদীয়মান খেলোয়াড় কোলী-স্মিথ ও ডেনিস এ্যাটকিনসন দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে নিজ দলকে পরাজয়ের হাত হতে রক্ষা করেন। ৩৬৭ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৬১৯ (৬ উইঃ ডিক্লেঃ)—গ্রেভনি ২৫৮, রিচার্ডসন ১২৬, মে ১০৪, কলিন কাউড্রে ৫৫, ডেরিক রিচার্ডসন ৩৩, গডফ্রে ইভান্স ২৬, কোলী স্মিথ ৬১ রাণে ২ উইঃ।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—৩৭২ (ওরেল নট আউট ১২১, সেবার্স ৪৭, আর কানহাই ৪২, এভার্টন উইকস ৩৩, এফ, ট্রুম্যান ৬৩ রাণে ৫ উইঃ ও লেকার ১০১ রাণে ৩ উইঃ)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস—৩৬৭ (কোলী স্মিথ ১৬৮, গড্ডার্ড ৬১, এ্যাটকিনসন ৪৬, আর কানহাই ২৮, ষ্ট্যাথাম ১১৮ রাণে ৫ উইঃ ট্রুম্যান ৮০ রাণে ৪ উইঃ)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—৬৪ (১ উইঃ)।

[অমীমাংসিত]

লীডস মাঠে চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল এক ইনিংস ও ৫ রাণে পরাজিত হওয়ায় ইংলণ্ড দল রাবার জয়ের গৌরব অর্জন করল। 'লীডস' মাঠের চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচকে 'লো স্কোরিং' ম্যান বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কোন খেলোয়াড়ই সেঞ্চুরি লাভ করতে পারেন নি। তা ছাড়া পাঁচ দিনের টেষ্ট আড়াই দিনে সমাপ্ত হয়েছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—১৪২ (আর কানহাই ৪৭০, ওয়ালকট ৩৮, ফ্রাঙ্ক ওরেল ২৯, লোডার ৩৬ রাণে ৬ উইঃ লেকার ২৪ রাণে ২ উইঃ ও ট্রুম্যান ৩৩ রাণে ২ উইঃ)।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—২৭৯ (পিটার মে ৬৯, কাউড্রে ৬৮, শেফার্ড ৬৮, টম গ্রেভনি ২২, ওরেল ৬৯ রাণে ৭ উইঃ গিলক্রিষ্ট ৭১ রাণে ২ উইঃ)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস—১৩২ (ওয়ালকট ৩৫, সেবার্স ২৯, লোডার ৫০ রাণে ৩ উইঃ ট্রুম্যান ৪২ রাণে ২ উইঃ লক ৬ রাণে ১ উইঃ)।

[ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৫ রাণে বিজয়ী]

ফুটবল

কলকাতার ফুটবল মাঠের দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ঘটনা এমন নগ্নরূপে দেখা দিয়েছে এবং এই খেলার ব্যাপারে কত নিরীহ ব্যক্তি অকারণে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ায় নাগরিক জীবন দুর্বিবহ হয়ে উঠেছে। গত ১৫ই জুলাই মহামেডান ও হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবের পাণ্টা লীগের খেলায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। সামান্য ফুটবল

খেলাকে কেন্দ্র করে অবাধ মারামারি, ধর্ম্মতলা ও চৌরঙ্গী এলাকার দোকানপাট ও ট্রামবাস বন্ধ হওয়ায় সাধারণ নাগরিকের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। পুলিশের হস্তান্তরের ব্যাপারে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে যুগান্তরের মন্তব্যের উপর পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। "কলিকাতা ময়দানে ফুটবল খেলা উপলক্ষে যে লজ্জাজনক মারপিট ও গণ্ডগোল দেখা দেয়, তাহা শান্তিকামী সহরবাসী মাত্রকেই উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। অবিভক্ত বঙ্গে একদা এই শ্রেণীর ঘটনা ঘটিত। বহুদিন পরে আবার তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া শুধু অনভিপ্রেত নয়, ইহার পরিণামও আশঙ্কাজনক। কাজেই গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়েরই বিষয়টি সম্বন্ধে সময় থাকিতে সতর্ক হওয়া দরকার। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে অধ্যাপক নির্ম্মল ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন, মহামেডান স্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল, রাজস্থান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক নামাঙ্কিত ক্লাবের অস্তিত্ব থাকার ফলেই অনেক সময় অসুস্থ রেষারেষি ও পাল্লাপাল্লি দেখা দেয় এবং তাহা হইতেই শেষ পর্য্যন্ত অত্যুৎসাহীরা হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া বসে। সুতরাং এই শ্রেণীর নামকরণ বজায় রাখা ঠিক কি না গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, নাম পরিবর্ত্তনের দ্বারা কিছু সুফল হইতে পারে। কিন্তু আসল পরিবর্ত্তন দরকার মনোবৃত্তির। খেলা সুস্থ মানসিকতার জিনিষ···তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাহা যেখানে হিংসা, আক্রোশ ও মারপিটে পর্য্যবসিত হয়, সেখানেই বুঝিতে হবে পিছনে সেই সুস্থ মনোভাবটি নাই, যা খেলোয়াড়ী আদর্শরূপে সর্বদেশে স্বীকৃত। সেই মনোভাব কেবলমাত্র নামের অদলবদলেই রূপান্তরিত হবে কি?"

সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা লীগ খেলার আকর্ষণকে ক্ষুণ্ণ করলেও লীগ প্রায় সমাপ্তির মুখে।

কোন অঘটন না ঘটলে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করার কোনও বাধা ঘটবার সম্ভাবনা নেই। বর্তমানে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব মহামেডান অপেক্ষা তিন পয়েণ্ট বেশী নষ্ট করে একই অবস্থায় আছে।

পাকেচক্রে এবারে লীগ প্রতিযোগিতায় নামা বন্ধ আছে। এর ফলে প্রতি ডিভিসনে একটা করে দল বাড়ল। এর ফলে বহু খেলা বেড়ে গেল। একে তো নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলা শেষ হয় না, তার পর রেলিগেশান বন্ধ হওয়ায় যে সমস্যার উদ্ভব হোল আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষ কি সে কথাটা একটি বার ভেবেছিলেন?

বিস্মৃত দিনের কবিতা

বন্দে আলী মিয়া

নৈঋত মেঘের ঘটা—রন্ধ্রহীন গহন তিমির
একটি কামনা-বিহগ মোর মনে রচিতেছে নীড়—
নিশীথ রৌদ্রের দাহে পুড়ে গেল সুমেরু আকাশ
বসুধার বুকের মাঝারে গুমরায় ক্ষুধিত নিশ্বাস।

নাগিনীর বিষবাষ্পে নীল হলো মাধবী জীবন
আমার দিনের প্রান্তে চেয়ে আছে তৃষিত নয়ন;
তোমার মদির পাত্রে উচ্ছ্বসিত একটি আবেগ
শিহরায় ঘুমের মতন প্রেমহীন বিরস উদ্বেগ।

বাসকশয্যার পার্শ্বে পুষ্পলোভী মধুপের ভিড়
আমার ঘুমন্ত বুকে নাচে তাই অশান্ত রুধির;
বিস্মৃত দিনের গান ফুরাইয়া গেছে কবে হায়
তাহার পরশ আছে পরীদের দুইটি পাখায়।

দিনের ঈশান কোণে জ্বলিতেছে আঁখির প্রদীপ
উদয়তারারা হেথা ফেলে গেছে প্রভাতের টিপ।
প্রবাল দ্বীপের বুকে জেগে আছে রাতের বিলাস
আজি কি ফিরিবে পাখী ছিঁড়ি তার বন্ধন-পাশ?

সিন্ধু-শকুনি আজ খুঁজে ফেরে মানস সবিতা
হারায়ে গিয়েছে কোথা পুরাতন একটি কবিতা!
তাহার বেদনা বাজে প্রভাতের বিদগ্ধ তারায়
আমার ক্ষুধিত মন পিছু পানে ফিরে ফিরে চায়।

কাচ-শিল্পের অগ্রগতি

কাচ আর কাঞ্চনের মূল্যমান কখনই এক নয় সত্যি, কিন্তু তা হলেও আধুনিক জগতে কাচ একটি অপরিহার্য্য পণ্য এবং সেদিক থেকে এর মূল্যও অনস্বীকার্য্য। নেহাৎ ঠুনকো বা ভঙ্গুর জিনিস বলে কাচ আর অবজ্ঞাত নয়, মানুষের নানা প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে ঘরে ঘরে আজ চলেছে তার দুর্ব্বার অভিযান। এমনি হয়ে উঠেছে—কাচ তথা কাচ-নির্ম্মিত দ্রব্য-সামগ্রী না হলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যেন চলে না। কাচের শিশি, বোতল, টিউব, নল, সার্শি, আর্শি,—এ সব ত আছেই, কাচের গ্লাস, কাচের বাসন, কাচের চুড়ি, কাচের আলমারী—সর্ব্বত্রই কাচ। দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, ক্যামেরা থেকে আরম্ভ করে যুদ্ধাদির বিভিন্ন সরঞ্জামেও কাচ অপরিহার্য্য ভাবে চাই। এই যান্ত্রিক যুগে লৌহের চেয়ে কাচের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কম কিসে? এইটিকে 'কাচের যুগ' বলতেও নিশ্চয়ই আপত্তি থাকতে পারে না। কাচের জিনিস না হলে আজ যে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ অচল। দেখে স্বতঃই মনে হয়, এ যুগে কাচ কাঞ্চনের গৌরব বা সমকক্ষতা দাবী করবার মতোই সাহস সঞ্চয় করছে।

উনবিংশ শতাব্দীতেই বিশ্বে কাচকে কেন্দ্র করে একটি উন্নত ধরণের শিল্প গড়ে তুলবার সুপরিকল্পিত প্রয়াস আরম্ভ হয়। গত ৪০ বৎসরকাল মধ্যে এর যে অগ্রগতি হয়েছে, এক কথায় উহাকে 'বৈপ্লবিক' বলে আখ্যাত করা চলে। বস্তুতঃ আজ শুধু বহির্ভারতেই নয়, ভারতের অভ্যন্তরেও কাচ একটি প্রথম শ্রেণীর শিল্প হিসাবে গড়ে উঠছে। কোন অতীতে একটি ফিনিসীয় বণিক দল সিরিয়ার সমুদ্রোপকূলে রন্ধনকার্য্যকালে কাচ জিনিসটিকে আবিষ্কার করেন। আগুনের তাপে আলকালি নামক ক্ষার পদার্থের সঙ্গে বালুকা ও ছাই মিশ্রিত হয়ে সেদিন যখন এইটি সৃষ্টি হ'ল, তখন বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এমনি ভাবে কাচের আবির্ভাবের পর কাচ ও কাচ-শিল্পের উন্নতির প্রয়াস চলে যুগে যুগে এবং আজ সমগ্র বিশ্বে, এমন কি ভারতেও এর সাফল্যের স্বাক্ষর স্পষ্ট।

নিত্য ব্যবহারের উপযোগী কাচের জিনিস এবং চিকিৎসা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক কাচ দ্রব্য তৈরীর জন্যে এ দেশে বড় বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর জিনিসের উৎপাদন প্রণালী বিভিন্ন ধরণের এবং সকলই এখন সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-অনুমোদিত। এই শিল্পের উন্নতির জন্য শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে গবেষণাও চলেছে প্রচুর। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা মহানগরীতে জাতীয় সরকারের আনুকূল্যে ও পরিকল্পনানুযায়ী কাচশিল্প সংক্রান্ত একটি বিরাট গবেষণা-মন্দির স্থাপিত হয়েছে এবং এইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে ঠিক ৭ বছর পূর্ব্বে ১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসে। এই কয় বছরের ভেতরই আলোচ্য গবেষণা-সংস্থাটি (সেণ্ট্রাল গ্লাস এণ্ড সিরামিক ইনষ্টিটিউট) নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রভূত কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করেছেন।

এদেশে কাচশিল্পের প্রসার ও অগ্রগতির সূচনাকাল চিহ্নিত করতে হলে চলে যেতে হয় প্রথম মহাযুদ্ধের দিনগুলোতে। ১৯১৪ সালে প্রয়োজনের তাগিদে সারা ভারতে তিনটি বড় রকমের কারখানা স্থাপিত হয়। ক্রমেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নয়া-নয়া কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলে এবং জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হওয়া অবধি (১৯৪৭) এই সংখ্যা প্রায় এ[illegible]ত হয়ে দাঁড়ায়। কাচের এই কারখানাগুলোর পাশাপাশি কতকগুলো সংশ্লিষ্ট কারখানা বা পরস্পর নির্ভরশীল কারখানাও গড়ে উঠেছে। তন্মধ্যে স্বতন্ত্র চুড়ি তৈরীর কারখানাই হচ্ছে প্রায় ৯৫টি। বর্ত্তমানে ভারতে মোট গ্লাস ওয়ার্কস বা কাচের কারখানা দাঁড়িয়েছে ১৩০টির উপর—এর মধ্যে এক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই রয়েছে প্রায় ৩০টি কারখানা।

এ প্রসঙ্গে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার। উল্লিখিতরূপে কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাচ প্রস্তুত প্রণালীরও পরিবর্ত্তন হয়ে চলেছে দিন দিন। সাধারণতঃ কাচ একটি ভঙ্গুর পদার্থ কিন্তু এক্ষণে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে এইটি অভঙ্গুর এমন কি বস্ত্রের ন্যায় নমনীয় কাচের আবিষ্কারও সম্ভব হয়েছে। কাচ ও কাচশিল্পের বৈজ্ঞানিক উন্নতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কাচ প্রস্তুত প্রণালী পরিবর্ত্তনের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায়। পূর্ব্বে মুখের সাহায্যে হাওয়া দিয়ে কাচ গলানো হতো, আজ সেখানে হয়েছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির হাজিরা; পণ্ড ফার্ণেস-এর জায়গায় দেখা দিয়েছে 'ট্যাঙ্ক ফার্ণেস'। পক্ষান্তরে এই শিল্প উৎপাদনের ব্যাপারে সরাসরি আগুনের স্থলে বর্ত্তমানে সাহায্য নেওয়া হচ্ছে একেবারে গ্যাসের।

অভঙ্গুর কাচ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্প ও শিল্পজাত পণ্যেরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে আশ্চর্য্য রকম। অন্যান্য বহু মূল্যবান জিনিসের ন্যায় সেণ্ট্রিফুগাল পাম্প, কনডুইট পাইপ, বল বেয়ারিং গজ প্রভৃতিও আজ তৈরী হচ্ছে কাচেই। কাচশিল্প সংস্থার রিপোর্টে যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে—বিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন লোহা ও রবার, তেমনি আধুনিক শিল্পজাত পণ্যের ক্ষেত্রে কাচেরই জয়যাত্রা। বস্তুতঃ ভারতীয় কাচশিল্প কাচ ও কাচের রকমারী জিনিসের একটি মোটা চাহিদা এক্ষণে মিটিয়ে চলেছে। উৎপাদনের পরিমাণ থেকেও ভারতীয় কাচশিল্পের এই অগ্রগতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫০ সালে উৎপাদনের পরিমাণ যেখানে ছিল ৮৭ হাজার ১৮০ টন, সেখানে ১৯৫৫ সালেই উহা হয়ে দাঁড়ায়,

সোয়া লক্ষ টনের উপর। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে উক্ত পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে এবং এর মূল্যও ৪ কোটি টাকার বেশী ছাড়া কম নয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ১৯৬০-৬১ সালের শেষাশেষি মধ্যে উৎপাদনের লক্ষ্য হচ্ছে একেবারে দুই লক্ষ টন এবং সেভাবে নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও কারখানায় কারখানায় কাজও এগিয়ে চলেছে।

জীবিকার মান উন্নয়নের সঙ্গে কাচশিল্পের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, এইটি সহজেই অনুমেয়। এই উপমহাদেশে এ শিল্পটির এখনও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বিশেষ ভাবে এই কারণে যে, এর জন্য যে কাঁচা মাল প্রয়োজন, অর্থাৎ বালুকা, চুণ, চুণাপাথর ইত্যাদির সরবরাহ এখানে অপর্য্যাপ্তরূপে বিদ্যমান। কাচ ও কাচশিল্পের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনও এইটি স্বীকার না করে পারেননি। কমিশন স্পষ্টই মন্তব্য করেছেন—কাচজাত পণ্যের উপর বহু শিল্প নির্ভরশীল এবং এদিক থেকে জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোতে কাচশিল্পের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। কাচ ও কাচশিল্পের ক্ষেত্রে বাংলা তথা ভারত এখনও অবধি অবশ্য সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারেনি। এর জন্য সরকারী মনোযোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা আরও ব্যাপক আকারে প্রয়োজন। প্রাপ্ত একটি হিসাবে দেখা যায়—১৯৫৫-৫৬ সালে বিদেশ থেকে যে পরিমাণ কাচদ্রব্য আমদানী করা হয়, তার মূল্য প্রায় ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। এই সময় ভারত থেকে বিদেশে রপ্তানী হয়ে যায় মোটামুটি ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাচের জিনিস। সারা ভারতে এই শিল্পক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত কর্ম্মীর সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার; তন্মধ্যে প্রায় ৬ হাজার কর্ম্মীই কাজ করে চলেছে এই খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে। যত দিন যাবে, কাচ ও কাচশিল্প ততই প্রসার ও জনপ্রিয়তা লাভ করবে, এইটি আজ নিঃসংশয়ে বলা যায়।

হাঙ্গরের চামড়া থেকে শিল্প-সম্ভার

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে কত তুচ্ছ বা পরিত্যক্ত জিনিস বহুমূল্য শিল্প ও সম্পদে পরিণত হচ্ছে, বলবার নয়। সামুদ্রিক ভয়াবহ জীব হাঙ্গর—অতীত কালে মানুষের শত্রু হিসাবেই এইটি ছিল প্রধানতঃ গণ্য। বলতে কি, মানুষের কাছে এর তেমন কোন মূল্যই স্বীকৃত হয় নি সেদিনে। গবেষণা চলল বছরের পর বছর—যুগের পর যুগ। তার পর ধরা পড়ে গেলো এক দিন—গভীর সমুদ্রের এ বৃহদাকার মৎস্যটি মানুষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ যোগাতে পারে প্রচুর।

জলজ জীব হাঙ্গর স্থলের অধিবাসী মানুষের কাজে কি ভাবে লাগতে পারে? আধুনিক কালের একটি মস্ত আবিষ্কার—হাঙ্গরের গায়ে যে শিরীষ কাগজের মত অমসৃণ ত্বক্ বা ছাল থাকে সেইটি খুবই মূল্যবান। দেখা গেলো স্পষ্টই—এইটিকে ঠিক মত ট্যানিং বা শোধিত করে চমৎকার স্থায়িত্বসম্পন্ন চামড়া তৈরী করা যায় এবং সেই চামড়া থেকে গড়ে তোলা চলে নানা প্রয়োজনীয় শিল্প-সম্ভার। অবশ্য কাঠ ও অন্যান্য কয়েকটি জিনিস পালিশ বা মসৃণ করার কাজে হাঙ্গরের গাত্র-ত্বক্ ব্যবহৃত হচ্ছে বহু দিন কিন্তু যেদিন থেকে এইটি 'লেদার' বা শোধিত চামড়ার রূপ গ্রহণ করলো, সেদিন হাঙ্গর মানুষের পরম শত্রু হলেও শেষ অবধি শত্রু হিসাবে ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য হয়ে থাকলো না।

হাঙ্গরের ত্বক্ বা গাত্রাবরণ থেকে শোধিত চর্ম্ম তৈরীর কয়েকটি বড় বড় কারখানা গড়ে উঠেছে পশ্চিমী দেশগুলোতে। নিউজার্কের (আমেরিকা) একটি প্রকাণ্ড কারখানা থেকে (ওশেনলেদার কর্পোরেশন) গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের অসংখ্য শোধিত চামড়া তৈরী হয়েছে। যত দূর জানা যায়, হাঙ্গরের 'স্পিশীজ' বা প্রজাতি একটা দুটো মাত্র নয়—প্রায় দুই শতাধিক। এদের সব কয়টির ছাল থেকেই আবার শোধিত চামড়া হয় না। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, মাত্র ১০।১২টি 'স্পিশীজ' বা প্রজাতি চামড়া তৈরীর পক্ষে উপযোগী।

একটু আগেই বলা হ'ল—ভয়াবহ জীব হাঙ্গরের বিস্তর 'স্পিশীজ' বা প্রজাতি রয়েছে। তন্মধ্যে যে কয়টি বিশেষ ভাবে চামড়া তৈরীর কাজে আসে, সেগুলোর চলতি নাম—'টাইগার', 'লিওপার্ড', 'ডাস্কি', 'ব্রাউন', সার্ক,' 'সেণ্ডবার', 'ব্ল্যাক টিপ', 'ম্যাকারেল', 'হ্যাম্যার হেড', 'স-ফিশ', 'নার্স,' 'জাপানীস রে' ও মরোক্কো শার্ক।' হাঙ্গর ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নৌকায় রেখেই কিংবা ডকে এনে গাত্র-ত্বকটি ছাড়িয়ে ফেলা হয়। তার পর সমুদ্রের জলে ভাল রকম ধুয়ে এতে নুণ মিশিয়ে রেখে দিতে হয় অন্ততঃ চার কি পাঁচ দিন। পরিশেষে ছাল সব ভাঁজ ভাঁজ করে জাহাজ যোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন চর্ম্ম-শোধন কারখানায়।

বিশ্বের জলরাশিতে অবশ্য একই সংখ্যায় হাঙ্গর পাওয়া যায় না। বেশীর ভাগ হাঙ্গরের ত্বক আমদানী হয়ে থাকে সেমি-ট্রপিক্যাল সমুদ্র এলাকা থেকে। যেমন ম্যাক্সিকো উপসাগর, ম্যাক্সিকোর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল অঞ্চল, মধ্য আমেরিকা ও কারিবিয়ান সাগরের জলে বহু হাঙ্গর পাওয়া যায়। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের পাইন দ্বীপেও অসংখ্য হাঙ্গর ধরা পড়ে আসছে এ যাবং। ফ্লোরিডার জলরাশি হাঙ্গরে ভর্ত্তি এবং সেজন্য পূর্ব্বোক্ত ওশেন লেদার কর্পোরেশন সম্প্রতি ফ্লা-এর ষ্টুয়ার্টে একটি হাঙ্গর শিকার কেন্দ্র পর্য্যন্ত স্থাপন করেছেন। বিশেষ ধরণের জাল বা বর্শা দিয়ে হাঙ্গর ধরার প্রথা অনেক কালের। এছাড়াও আধুনিক যুগে কয়েকটি নয়া পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে হাঙ্গর শিকারের।

মানুষ আজ হাঙ্গরের দেহের প্রতিটি অংশ একটি না একটি কাজে লাগাচ্ছে বা লাগাবার চেষ্টা করছে। এদের 'লিভার' বা যকৃৎ-এ খাদ্যপ্রাণ 'ক' যথেষ্ট পরিমাণ আছে বলে ক্যামিকাল বা রাসায়নিক কোম্পানীগুলোর দিক থেকে এর চাহিদা খুবই বেশী। কতক শ্রেণীর হাঙ্গরের ডানায় চীনাদের একটি চমৎকার খাবার তৈরী হয়। হাঙ্গরের মাংসবহুল অংশটি অন্যান্য কয়েকটি জন্তুর এক প্রকার প্রধান খাদ্য। এই সামুদ্রিক জীবটির দেহ-কাঠামোতে আসলে কোন হাড় নেই। কাজেই গায়ের ছালটা ছাড়িয়ে নিলে বাকী অংশটি সহজেই একাকার হয়ে যায় এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাররূপেও ব্যবহৃত হয়। বাজারে হাঙ্গরের দাঁতের মূল্যও নিশ্চয়ই কম বলা চলে না। এ থেকে নানা ডিজাইনের মনোরম অলঙ্কার তৈরী হচ্ছে আজ-কাল। হাঙ্গরের চামড়ায় শিশুদের জন্যে ভাল ভাল পাদুকা হয় এবং বড়দের জুতোরও উপরিভাগটা তৈরী হয়ে থাকে। এ ছাড়াও এই চামড়া থেকে আজ বহু কাজের জিনিস নির্ম্মিত হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন শিল্প-কারখানায়। লগেজ, কোমরবন্ধ, পোর্টফালিও, পকেট-বই, সিগারেট-কেস, হাতঘড়ির ব্যাণ্ড ও রকমারী ক্রীড়াসামগ্রী থেকে আরম্ভ করে কত বিচিত্র শিল্পসম্ভারই না হাঙ্গরের মূল্যবান চামড়াজাত। বিজ্ঞানীদের দাবী—মানুষের কাছে এই জলজ প্রাণীটির অবদান নানা কারণে ব্যর্থ হবার নয় কখনই।
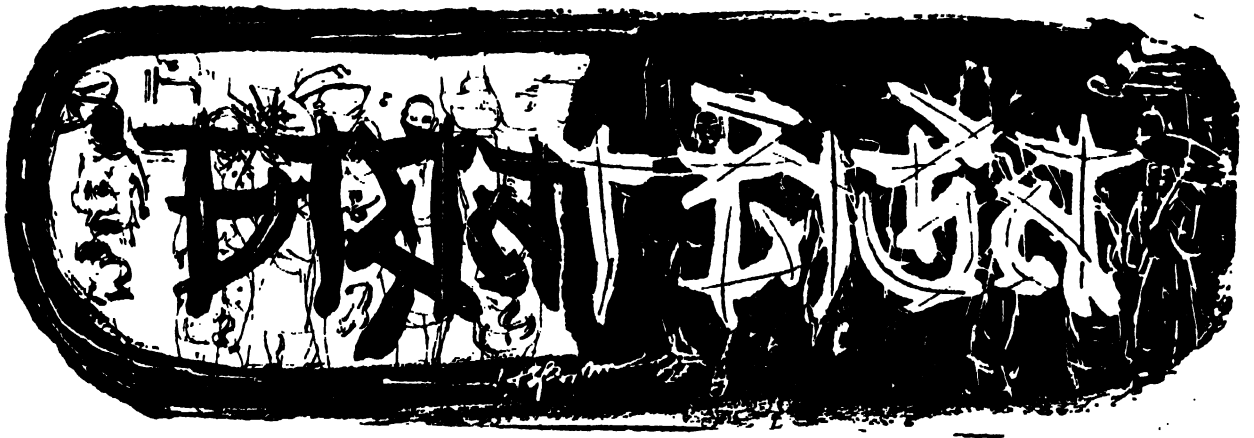
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

ফেং চেং শিয়াং যখন তার সোনায়-বাঁধানো দাঁতে একটুখানি হাসির ঝিলিক খেলিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "জেনী, আমায় বিয়ে করবে?" জেনী করবে না, কথাটি সোজাসুজি বলতে বলতেও বললো না।

জেনী ভাবলো, চেং শিয়াংকে যদি সে নিজে নাকচ করে দেয় তাহলে বড়ো ভাই চিয়েন চাং-এর সঙ্গে একটা কলহ অনিবার্য—কারণ প্রথমত চেং শিয়াং-এর কাছ থেকে কিছু অর্ডার পায় চিয়েন চাং, দ্বিতীয়ত চেং শিয়াং-এর বোন টিং লিং-এর সঙ্গে তার কিছু ভবিষ্যতের স্বপ্ন জড়িয়ে আছে। তাই নিজের থেকে কোনো কথা বলতে চাইলো না সে।

শুধু বললো, "চেং শিয়াং, আমরা পশ্চিম দেশের মেয়েদের মতো নই যে, নিজেদের বিয়ে নিজেরা ঠিক করবো। আমাদের পরিবার খুব রক্ষণশীল। তুমি বাবাকে জিজ্ঞেস করো। তিনি যা বলবেন তাই হবে।"

চেং শিয়াং যখন বুড়ো ওয়াঙ-এর কাছে গিয়ে বললে, বুড়ো ওয়াঙ-এর মনে তার তিরিশ বছর আগেকার চায়না টাউনের গুণ্ডা-সর্দারের প্রবৃত্তিগুলো হঠাৎ চেগে উঠলো। কিন্তু তিরিশ বছর আগেকার ওয়াঙ আর এই ওয়াঙ-এ অনেক তফাৎ! কাঠের চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে হাতের মালা ঘুরিয়ে চললো বুড়ো ওয়াঙ।

তারপর আস্তে আস্তে বললো, "চেং শিয়াং, ক্যান্টনের ফেং বংশের একজন যোগ্য সন্তানের কাছ থেকে এই প্রস্তাব পেয়ে ফুকিয়েনের ওয়াঙবংশ ধন্য ও সম্মানিত হোলো। ওয়াংবংশের মেয়ে ফেং বংশের ছেলের পায়ের নখের ধূলো হবার যোগ্যতাও নেই।

"আমি যদি যোগ্য মনে করি,—" বলে উঠলো অধৈর্য চেং শিয়াং।

"আমায় বলতে দাও," বুড়ো ওয়াং বাধা দিয়ে বললো, "আমি কি বলছিলাম জানো? আমি বলছিলাম ফেং বংশের লোকেরা খুব উদার। তাই তুমি জেনীকে দেখে করুণাপ্রবৃত্ত হয়ে এই প্রস্তাব করেছো। হয়তো পরে এই আকস্মিক করুণার জন্যে তোমার অনুশোচনা হতে পারে। সুতরাং বৃথা চঞ্চল না হয়ে তুমি ভালো করে ভেবে দেখ।"

"আমি ভালো করেই ভেবে দেখেছি," চেং শিয়াং উত্তর দিলো।

"এত তাড়াহুড়ো করবার কিছু নেই", বললো বুড়ো ওয়াঙ, তুমি জেনীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চাও, তখন আমায় এসে বোলো। আমি তখন জেনীর ভবিষ্যৎ সুখের জন্যে তার বাবা হিসেবে যা যা করা কর্তব্য মনে করবো, তাই করবো।"

"কিন্তু—"

"আমি যা বলেছি, এর বেশী কিছু এখন আর বলতে চাই না," বুড়ো ওয়াঙ শেষ করলো। "তবে তুমি আমার ছেলের বন্ধু। সুতরাং ছেলের বন্ধুর মতো এ বাড়ীতে যাওয়া-আসা করবে। ছেলের বন্ধুর মতোই সবার সঙ্গে মিশবে। সবার সঙ্গে দেখা হবে, কথাবার্তা হবে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন," বলে চক্ষু নিমীলিত করলো বুড়ো ওয়াঙ।

ফেং চেং শিয়াংকে উঠে পড়তে হোলো। আড়াল থেকে জেনী আর মিনি এদের কথাবার্তা সবই শুনতে পেয়েছিলো।

জেনী খুশি হয়েছিলো খুব। আর মিনি তো হেসে খুন। "ওল্ড ম্যান ভীষণ চালাক", মিনি হেসে বলেছিলো। জেনী হেসে মিনির হাতে চিমটি কাটলো।

মিনি হাসতে হাসতে বলতো, "এবার একদিন তোমার বাঙালী বয় ফ্রেণ্ডকে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।"

জেনী যেদিন দিলীপকে প্রথম এ বাড়িতে নিয়ে এলো সেদিন বাড়িতে বাইরের লোক কেউ ছিলো না। মিনি খুব খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি চায়ের ব্যবস্থা করতে লেগে গেল।

দিলীপের মুখে নির্ভুল ইংরেজি শুনে সুং-চাং খুব বিমুগ্ধ। তার উপর যখন শুনলো সে খুব ভালো ওয়ল্জজিটারবাগ জানে আর তখন তার উপর সুং-চাং-এর শ্রদ্ধার আর সীমা রইলো না।

বললো, "তুমি তো অন্য বাঙালী ছেলেদের মতো নও? তুমি কোন কোন জায়গায় যাও নাচের রাত্রিতে? তোমায় দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না!"

দিলীপ উত্তর দিলো, "আমি কিন্তু তোমায় দেখেছি। পরশু দিনও তুমি গোল্ডেন স্লিপারে ছিলে। আমার যতদূর মনে পড়ে তুমি রোজীর সঙ্গে নাচছিলে।"

"রোজীকে তুমি চেনো?" সুং-চাং জিজ্ঞেস করলো।

"রোজীকে ঠিক চিনি না, তবে রোজীর বড়ো বোন অলগাকে খুব ভালো করে চিনি।"

রোজীর দিদি অলগা তাকে চেনে, ব্যস, এর বেশী পরিচয় আর দরকার নেই।

কিন্তু চিয়েন চাং অতো সহজ ভাবে নিতে পারলো না দিলীপকে। খুব মামুলি সৌজন্যে সাধারণ দু'-চারটা কথাবার্তা ছাড়া বিশেষ কিছুই বলছিলো না সে। তা ছাড়া দিলীপকে দেখে এমন কিছু অর্থবান বলে তার মনে হোলো না এবং অর্থবান নয়, এরকম বিদেশীর উপর তার আগ্রহ খুবই কম।

সেই দু'-চারটা কথাবার্তার ফাঁকে সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কিসের ব্যবসা করো?"

"যা সামনে আসে, যার থেকে দুটো পয়সা হয়, তাই করি," দিলীপ উত্তর দিলো, "কোনো বিশেষ লাইন আমার নেই।"

"এখন কিসের ব্যবসা করছো?" জিজ্ঞেস করলো চিয়েন চাং।

"স্ক্র্যাপ।"

"স্ক্র্যাপ?" চিয়েন চাং ভ্রূকুঞ্চিত করলো, "স্ক্র্যাপ বেচবার চেষ্টা করছো বুঝি? বাজারে তো এখন ক্রেতা বেশী নেই!"

দিলীপ একটু হেসে উত্তর দিলো, "না, বেশী নেই। তবে তাদের মধ্যে আমি একজন। আমার হাতে একটি পার্টি আছে, ওরা চিনছে! আমার সন্ধানে যা ছিলো তা ওদের দিয়েছি। তবে তাতে কুলোয়নি। আমার আরো কিছু লাগবে।"

"তাই নাকি?" লাফিয়ে উঠলো চিয়েন-চাং। তার হাতে একটি পার্টি আছে যা স্ক্র্যাপ বেচবার চেষ্টা করছে। এমন সুযোগ নাক উঁচু করে অবহেলা করলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, সে ভাবলো।

মিনিট পোনেরোর মধ্যে সে খুব অন্তরঙ্গ ভাবে গল্প করতে লাগলো দিলীপের সঙ্গে। মিনিট পঁচিশের মধ্যে তাকে ফ্রিজেস্‌এ মদ্যপান করবার আমন্ত্রণ জানালো। তার পর দিন দিলীপের অফিসে গিয়ে দেখা করলো। ব্যবসার কথাবার্তা পাড়লো।

তিন দিনের মধ্যে লেন-দেন চুকে গেল। কিছু অর্থ রোজগার করলো চিয়েন-চাং। আর লক্ষ্য করলো যে বাজারে দিলীপের অসংখ্য যোগাযোগ। তবে যে পরিমাণ ধূর্ততা থাকলে এই যোগাযোগগুলো কাজে লাগানো যায়, দিলীপের সেটা নেই বলেই সে খুব বেশী কিছু করতে পারছে না।

এ লোককে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না, স্থির করলো চিয়েন চাং।

জেনীর ব্যাপার জেনী বুঝবে, চেং-শিয়াং বুঝবে, সে ভাবলো, আর যে হেতু চেং শিয়াং অত্যন্ত ধনবান লোক, তার উপর স্বজাতি, সুতরাং জেনী যে শেষ পর্যন্ত দিলীপের মোহ কাটিয়ে চেং-শিয়াংএর উপরই মনোনিবেশ করবে তাতে চিয়েন-চাংএর কোনো সন্দেহ রইলো না। যদি চেং-শিয়াং জেনীর মন জয় করতে না পারে, সে চেং-শিয়াংএর দোষ। চিয়েন চাং তাকে বাড়িতে নিয়ে জেনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে, ভাব করবার সুযোগ করে দিয়েছে, এর বেশী আর কী করতে পারে? জেনী যদি দিলীপকে বেশী পছন্দ করে, চিয়েন চাং তাতে বাধা দেওয়ার কে?

সুতরাং জেনীদের বাড়িতে দিলীপের নিয়মিত আসা-যাওয়া সুরু হোলো আর সেখানে আলাপ হোলো হাশিম সুলেমান, জয়প্রকাশ ত্রিবেদী, মা মিল চি, ম্যাবেল রবিনসন, হেনরি লরেন্স প্রভৃতি চিয়েন চাং জেনী মিনিদের অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে।

মাঝখানে কয়েক দিন জেনীদের বাড়িতে যায়নি চেং শিয়াং। এক দিন সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে যেতে দেখলো ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মিনি আর আহ কিম। ফুটপাথের পাশে সে গাড়ি থামালো, ইচ্ছে তার জেনীর খবর একবার মিনিকে জিজ্ঞেস করে।

কিন্তু মিনি কোনো কথা বললো না, শুধু একটু নড্ করে হেঁটে চলে গেল।

চেং শিয়াং লক্ষ্য করলো যে মিনি আর আহ কিম দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে একটা অর্থসূচক হাসি হাসলো। সেই হাসি চেং শিয়াংএর ভালো লাগলো না।

মিনি যে তাকে এড়িয়ে চলে সেটা সে যে লক্ষ্য করেনি তা নয়, তবে আগে এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি সে। তার লক্ষ্য জেনী। জেনীর বোন মিনি বাড়িতে তার সামনে বেরোলো কি বেরোলো না সেটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে তার মনে হয়নি কোনো দিন।

কিন্তু আহ্ কিম্‌এর সামনে মিনির এই তাচ্ছিল্য তার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিলো। সে জানে আহ্ কিম্ মাও-ৎসে-তুঙের সমর্থক, আহ্ কিম্ কলকাতার এক প্রগতিশীল চীনা যুবক সমিতির সেক্রেটারি, সেই সমিতির কার্যকলাপ বানচাল করে দেওয়ার জন্যে যাদের মারফতে জাতীয়তাবাদী অর্থবান চীনাদের টাকা খরচা করা হচ্ছে, ফেং চেং শিয়াং তাদেরই একজন।

সুতরাং আহ্ কিমের সামনে মিনির এই ব্যবহারে সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলো। দাঁতে দাঁত ঘষে সে ভাবলো, আচ্ছা, এর শোধ আমি নেবো। এমন শিক্ষা দেবো মিনিকে।

কয়েক দিন গাড়ি নিয়ে সে আহ্-কিমের লণ্ড্রির কিছু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলো। কিন্তু একা পাওয়া যায় না মিনিকে। সে প্রত্যেক দিনই বেরোয় আহ্-কিম্‌এর সঙ্গে। আহ্-কিম্ তাকে প্রায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে। দিন সাত আট পরে এক দিন দেখলো মিনি কাজের শেষে একাই বেরোচ্ছে।

খুব কাজের চাপ ছিলো সেদিন, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে মিনি দোকান থেকে বেরোলো—আর আহ-কিম বেরোনোর ফুরসতই পেলো না।

ক্লান্ত পদক্ষেপে বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের ফুটপাথ ধরে পথ চলছিলো মিনি ওয়াঙ। এমন সময় ফুটপাথের পাশে চেং শিয়াংএর গাড়ি এসে ব্রেক কষলো।

গাড়ির ভেতর থেকে চেং শিয়াং ডেকে বললো "গাড়ির ভেতর এসো। তোমাদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছি।"

সেদিন মিনি খুব ক্লান্ত। চেং শিয়াংকে যতোই অপছন্দ করুক সে, তাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার এই আমন্ত্রণ তার প্রত্যাখ্যান করবার ইচ্ছে হোলো না।

এটুকু পথ, মিনিট পাঁচেক লাগবে, কী আর ক্ষতি তাতে— মিনি ভাবলো।

একটু ভদ্রতার হাসি হেসে সে গাড়িতে চেং-শিয়াংএর পাশে এসে বসলো। চেং-শিয়াং গাড়ি হাঁকিয়ে দিলো এসপ্ল্যানেডের দিকে। মিনি একটু অবাক হয়ে চোখ তুলে চেং-শিয়াংএর দিকে তাকালো।

"লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের একটা দোকানে সামান্য একটা কাজ আছে," চেং-শিয়াং বললো, "সেটা চট করে সেরে নি। দু' মিনিট লাগবে।

তোমার সময় নষ্ট হবে না। হেঁটে যেতে তোমার যতক্ষণ লাগতো, তার আগে আমরা বাড়ি পৌঁছে যাবো।"

মিনি আস্তে আস্তে বললো, "লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে যাওয়ার ইচ্ছে আমার একটুও নেই। আমায় এখানে নামিয়ে দিলেই ভালো হয়।"

চেং শিয়াং হাসলো, বললো, "আমাকে ভয় কিসের মিনি! আমি তোমার ভাবী ভগিনীপতি। তোমায় লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে না নিয়ে যদি রেড রোডের এক পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কিছুক্ষণ বসে গল্প করি, তাতে কোনো দোষ হয় না, কেউ কিছু বলবেও না।"

শুনে মিনি চুপ করে রইলো। তার পর মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলো নিজের মনে।

সেই হাসি অবলোকন করে চেং শিয়াং পুলকিত হোলো। স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে তার নিজের জ্ঞান এবং যে-কোনো মেয়ে আকর্ষণ করবার মতো তার শক্তি ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তার আস্থা বেড়ে গেল।

খুব খুশি হয়ে বললো, "মিনি, তুমি একটি স্পোর্ট। তোমার দিদির চাইতে অনেক বেশী।"

এসপ্লানেডের মোড়ে লাল আলো। চেং শিয়াং গাড়ি থামালো। ডান দিক থেকে একটি ট্যাক্সি এসে তার সামনে আড় ভাবে দাঁড়ালো!

খুব বিরক্ত হয়ে সেদিকে তাকালো চেং শিয়াং। শিখ ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের উপর তার ভীষণ রাগ। কিন্তু গাড়ির আরোহীদের দিকে তাকাতে তার রাগ জল হয়ে গেল। দুটি পক্কবিম্বাধরা পাঞ্জাবী মেয়ে সেখানে বসে।

তার পর মনের খুশিতে মিনির দিকে ফিরে কি যেন একটা বলতে গিয়ে দেখে, সীট খালি। মিনি নেই। দরজা খোলা।

ওদিকে তাকিয়ে দেখে, রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথে উঠে হন-হন করে বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের দিকে ফিরে যাচ্ছে মিনি ওয়াঙ।

লাল আলো হলদে হোলো, তার পর সবুজ হোলো।

পেছন থেকে অন্য গাড়িগুলো অধৈর্য হয়ে হর্ণ দিচ্ছে।

নিরুপায় চেং শিয়াং তাড়াতাড়ি সামনের দিকে ঝুঁকে দরজাটা টেনে বন্ধ করে গাড়ি হাঁকিয়ে দিলো চৌরঙ্গির দিকে।

তার আরো রাগ হোলো মিনির উপর। ভাবলো, নাঃ, মিনিকে যতোটা ভালোমানুষ ভেবেছিলাম, ততোটা নয়।

তার পরদিন সে আবার গাড়ি নিয়ে গেল আহ-কিম্‌এর লণ্ড্রির সামনে। সেদিন মিনিকে পেলো না সে গিয়ে পৌঁছানোর আগেই মিনি চলে গেছে। তার পরদিন আবার গেল।

সেদিনও মিনিকে ধরা হোলো না। কারণ সে আর আহ-কিম্ একসঙ্গেই বেরোলো দোকান থেকে।

চেং শিয়াং সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার ছেলে নয়। সে আবার গেল পরদিন। সেদিন সুযোগ পেলো। দেখলো তিনি আহ-কিম-এর দোকান থেকে একলা বেরিয়ে আসছে।

মিনি খানিকটা এগিয়ে যেতেই চেং-শিয়াং গাড়িটা নিয়ে গিয়ে ফুটপাথের পাশে দাঁড় করালো। তারপর ডাকলো "মিনি!"

মিনি ওয়াঙ তার ডাকে সাড়া দেবে কিনা সে সম্বন্ধে একটু সন্দেহ ছিলো চেং শিয়াং-এর মনে।

কিন্তু অবাক হোলো যখন দেখলো, মিনি ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখে ঘুরে দাঁড়ালো, তারপর আস্তে আস্তে তার গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো।

চেং শিয়াং অবাক হোলো, খুশিও হোলো। বললো, "সেদিন তুমি আমা- না বলে গাড়ি থেকে নেমে গেলে মিনি! আমি খুব দুঃখিত হয়েছিলাম।"

মিনি কোনো উত্তর দিলো না।

"কোথায় যাচ্ছো? বাড়ি? এসো, গাড়ির ভেতর উঠে এসো। তোমায় পৌঁছে দিই।"

মিনির উত্তর এলো না। কিন্তু পেছন থেকে কাঁধের উপর টোকা পড়লো।

ফিরে তাকিয়ে চেং শিয়াং দেখে, আহ কিম্ এসে দাঁড়িয়েছে, গাড়ি অন্য পাশে।

আহ, কিম্ বললো, "বন্ধু, দিদির সঙ্গে বিয়ের কথা তুলবার পর বোনকে জোর করে গাড়িতে তুলে রেড রোডে হাওয়া খাওয়ার চেষ্টা করাটা খুব সমর্থনযোগ্য নয়, দিনের পর দিন তার অপেক্ষায় দোকানের কাছে গাড়ি এনে দাঁড় করালোও ভালো কথা নয়। তুমি বুদ্ধিমান লোক। আশা করি এ প্রচেষ্টা ছেড়ে দেবে। যদি ছেড়ে না দাও নানারকম অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটতে পারে। আমাকে তো চেনো। এবার যেতে পারো।"

চেং শিয়াং ভাবলো, গাড়ি থেকে নেমে একটা ঘুষি বসিয়ে দিই আহ, কিমের চোয়ালে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়লো কাছেই ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে আছে আরো চার-পাঁচজন চীনেম্যান। তাদের সে চেনে। আহ, কিমের দলের লোক তারা। তাদের ঘাঁটানো খুব নিরাপদ নয়।

চেং শিয়াং আর কোনো কথা না বলে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো। মিনি ওয়াঙ আহ, কিমের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আহ, কিম হাসলো মিনির দিকে তাকিয়ে।

চেং শিয়াং গাড়ি হাঁকিয়ে দিলো। খানিকটা গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলো আহ, কিম আর মিনি হাত ধরাধরি করে ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

মিনির উপর রাগ ভুলে গেল সে।

সমস্ত আক্রোশ এখন গিয়ে পড়লো আহ,-কিমের উপর। একটা রাজনৈতিক উষ্মা তার অনেক দিন থেকেই ছিলো। সেটা এখন ব্যক্তিগত জিঘাংসায় পরিণত হোলো। মনে মনে একটা সাংঘাতিক সংকল্প করলো সে।

তারপর বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের ট্রাফিকের ভিড়ে মিশে গেল।

এর পর জেনীদের বাড়ি যেতে বেশ খানিকটা নৈতিক সাহস সঞ্চয় করতে হোলো যেং চেং শিয়াংকে। ব্যাপারটা ওদের বাড়িতে জানাজানি হবে, সেই সম্ভাবনা তাকে বিচলিত করলো।

অনেক ভেবে-চিন্তে একদিন টিংলিংকে সঙ্গে নিয়েই ওয়াঙদের বাড়ি এসে উপস্থিত হোলো চেং শিয়াং। টিংলিংকে আনলো এই ভেবে যে, সে সঙ্গে থাকলে ওয়াঙেরা তার উপর যতো বিরক্তই হোক না, সেটা আরেক জন মহিলার সামনে প্রকাশ করবে না। তাছাড়া চিয়েন চাং রীতিমতো উল্লসিতই হবে।

ওয়াঙদের বাড়ি উপস্থিত হয়ে সুং চাং চিয়েন চাং-এর কাছে খুব সাদর অভ্যর্থনাই পেলো যেং চেং শিয়াং। ওরা বার বার জিজ্ঞেস করলো, এদ্দিন তার দেখা নেই কেন?

নানা কাজে ব্যস্ত ছিলো সে—জানালো চেং শিয়াং।

জেনী খুব স্বচ্ছতার সঙ্গে গল্প করতে লাগলো টিংলিংএর সঙ্গে।

চেং শিয়াং খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো মিনিও এসে যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। খুব সহজ ভাবে কথাবার্তা বলছে, এমন কি তার সঙ্গেও, যেন কোনো দিনই কিছু হয়নি।

একটু নিশ্চিন্ত হোলো চেং শিয়াং।

এমন সময় এসে উপস্থিত হোলো দিলীপ। আর সঙ্গে সঙ্গে চেং শিয়াং একটি ভাবান্তর লক্ষ্য করলো জেনীর মুখে, যেটা অনুধাবন করা তার মতো বহু অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়।

যথারীতি তার সঙ্গে আর টিংলিং-এর সঙ্গে দিলীপের আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

এমনি লোকটাকে চেং শিয়াংএর খারাপ লাগলো না, কিন্তু যতো বার মনে পড়লো দিলীপকে দেখা মাত্রই জেনীর চোখ-মুখ ঝলমলো হয়ে ওঠা, ততোবারই একটা সন্দেহের হুল বিঁধতে লাগলো তার মনে।

এক ফাঁকে চিয়েন চাংকে জিজ্ঞেস করলো, "লোকটা কে ?"

চিয়েন চাং খুব সতর্কতার সঙ্গে সহজ ভাবে উত্তর দিলো, "ক্যানিং ষ্ট্রীটে ব্যবসা করে।"

"তোমার বন্ধু ?"

"বন্ধু নয়, চেনা।"

"নিশ্চয়ই খুব ভালো রকম চেনা, তা নইলে বিদেশী লোক, তোমাদের বাড়িতে এত যাওয়া-আসা ?"

"খুব যাওয়া-আসা নেই," চিয়েন চাং উত্তর দিলো, "মাঝে মাঝে আসে, এই পর্যন্ত। এলে কি করবো, তাড়িয়ে তো দিতে পারি না। এটা ওদের দেশ। তবে হী ইজ নাইস ফেলো।"

চিয়েন চাংকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না চেং শিয়াং।

একটু পরে সুযোগ পেতে ওর ভাই সুং চাংকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "সুং চাং, এই দিলীপ লোকটা কে ?"

সুং চাং অতো সজাগ নয়, চিয়েন চাংএর মতো।

বললো, "দিলীপ ? সে জেনীর বন্ধু। চমৎকার লোক, খুব ভালো ওয়ল্জ জানে।"

"ওকে এখানে কে এনেছে ? চিয়েন চাং ?"

"না, চিয়েন চাং ওকে একটুও পছন্দ করে না," সুং চাং উত্তর দিলো, "ওকে জেনী এনেছে।"

ব্যস। ফেং চেং শিয়াং যা জানবার জেনে গেল।

"জেনী এনেছে ? জেনী ? জেনী তাহলে দিলীপের সঙ্গেই ভাব করছে।—এবার একটু একটু করে উত্তপ্ত হতে সুরু করলো চেং শিয়াং।—জেনী ? জেনী ওয়াঙ ? একটি চীনে মেয়ে ? তার সঙ্গে ভাব একজন বাঙালী ছেলের সঙ্গে ? কেন ? কলকাতার চীনে সমাজে ছেলে নেই ?"

কিন্তু বেশী ভাবপ্রবণ চেং শিয়াং নয়। অত্যন্ত পরিকল্পনাপ্রবণ তার মন। জেনীর ভাবনা ছেড়ে দিয়ে সে দিলীপের সম্বন্ধে ভাবতে সুরু করলো।—নিশ্চয়ই সে খুব বড়ো ঘর বা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে নয়, চেং শিয়াং ভাবলো, তাই যদি হোতো সে কোনো বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করে ফেলতো এদ্দিনে। চীনে মেয়ের উপর সে যখন আকৃষ্ট হতে পেরেছে তখন সে নিশ্চয়ই সে ধরণের বখাটে ফিরীঙ্গি-মন বাঙ্গালী ছেলে যারা এ্যাংলোইণ্ডিয়ান, চীনা, গোয়ানীজ এদের মধ্যে বন্ধু খুঁজে বেড়ায়। নাঃ, এর ব্যবস্থা করা খুব শক্ত হবে না, স্থির করলো চেং শিয়াং।

খুব হাসিমুখে আবার ওদের মধ্যে গিয়ে বসলো সে। মন খুলে নানানরকম গল্প ফাঁদলো সবার সঙ্গে, বিশেষ করে দিলীপের সঙ্গে। দিলীপের মুখ দেখে মনে হোলো তারও বেশ লাগছে চেং শিয়াংকে। টিং-লিংও খুব সহজ হয়ে গেল দিলীপের সঙ্গে। দিলীপ এমনি বেশ রসিক লোক! নানারকম চুটকি গল্প বলতে ওস্তাদ; তার মুখে নানারকম সব গল্প শুনে প্রচুর হাসলো সবাই, যতো না হাসবার, তার চাইতে বেশী হাসলো ফেং চেং শিয়াং আর তার বোন টিং-লিং।

কিছুক্ষণ পর টিং-লিং বললো, এবার তাকে যেতে হবে। ফেং চেং শিয়াং উঠে দাঁড়ালো। তারপর দিলীপকে বললো, "তুমিও যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে ? তোমায় তাহলে বাড়িতে নামিয়ে আসতে পারি।"

"না, ধন্যবাদ, আমি আরো কিছুক্ষণ আছি," দিলীপ উত্তর দিলো।

তখন ফেং চেং শিয়াং বললো, "কাল সন্ধ্যেবেলা কী করছো ? যদি কোনো কাজ না থাকে তো আমাদের বাড়ি এসো। একসঙ্গে বসে একটু ড্রিঙ্ক করা যাবে।"

দিলীপ সানন্দে রাজী হোলো। এ ধরণের আমন্ত্রণ সে কখনো প্রত্যাখ্যান করে না। কিন্তু বিষণ্ণ হোলো জেনীর মুখ। আর আতঙ্ক জাগলো চিয়েন চাংএর চোখে, যখন শুনলো টিং-লিং বলছে, "দিলীপ, আমি কিন্তু বসে থাকবো তোমার জন্যে।"

তার পরদিন দিলীপ গেল চেং-শিয়াংএর ফ্ল্যাটে।

গিয়ে দেখলো, চেং শিয়াং নেই। কি একটা কাজে যেন বাইরে গেছে। আসতে একটু দেরি হবে, দিলীপকে বসতে বলে গেছে।

বাড়িতে টিং-লিং একা, সে মিষ্টি হেসে দিলীপকে ভেতরে নিয়ে বসালো। [ক্রমশঃ

"The painter's mind must of necessity enter into nature's mind in order to act as an interpreter between nature and art, it must be able to expound the causes of the manifestations of her laws...." —*Leonardo Da Vinci.*

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

শ্রীশ্রীসারদা দেবী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমালতী গুহ-রায়

ঠাকুরের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা যিনি চালনা করবেন, ভবিষ্যৎ সন্তানদের যিনি প্রেরণা দেবেন, পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে তাঁকে তাঁরই সন্তানদের হাতে সঁপে দেবার যেন সুযোগ হয়েছিল ঐ দীর্ঘ রোগশয্যাটিতে শুয়ে। এই সুদীর্ঘ রোগশয্যাই তাঁকে সাহায্য করেছিল সারদা দেবীর প্রকৃত রূপটি ভক্তদের চোখে ফুটিয়ে তুলতে, তাঁর লুক্কায়িত জীবন থেকে সর্ব্বসমক্ষে তাঁকে টেনে আনতে। নতুবা নহবৎখানার বেড়ার আড়ালে ঐ অপরিসর ছোট্ট কুঠুরীখানাতে যে ভাবে তিনি আত্মগোপন করে থাকবার প্রয়াস পেতেন, ঠাকুরের দেহাবসানের পর তাঁর কথা কেউ জানতেও পারতো না।

আজকের সারাটি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম ও মন্দির, তার বীজটুকু নিহিত ছিল ঐ দীর্ঘ রোগভোগ জনিত ঠাকুরের কষ্টনিবারণে সমভাবে চেষ্টিত উন্মুখ ভক্ত সন্তান কয়েকটি এবং সারদা দেবীকে এই অবসরে এক নিবিড় শ্রদ্ধার নিগড়ে বেঁধে দেওয়ার মধ্যে।

আজ ভগবান পরমহংসদেব সশরীরে বর্ত্তমান নেই, এবং সারদা দেবীও তাঁর নশ্বর দেহে জীবিতা নেই। কিন্তু যে মহান শিক্ষা তাঁদের জীবনাদর্শে রয়ে গেছে, আজকের দিনে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন তারই ঘরে ঘরে প্রচার ও তারই আলোচনা। আমাদের পতনোন্মুখ জাতিকে রক্ষা করার অপর কোন অস্ত্র নেই।

সারদা দেবীর শিক্ষা ছিল 'মানুষ যখন অপরের ক্রটি দেখে তখনই সে নিজেকে কলুষিত করে ফেলে। অন্যের দোষ দেখে তার লাভ কি হয়? শুধু নিজেকেই ক্ষত-বিক্ষত করে শুধু সে নিজেই। অন্যের দোষ দেখতে দেখতে তাদের দোষ ছাড়া পরে আর কিছুই তার চোখে পড়তে চায় না।'

সত্যি সত্যিই এ বাণী, এ উপদেশ, সারদা দেবীর কেবলমাত্র মৌখিক ছিল না। অন্তর দিয়ে নিজেও তিনি তা পালন করতেন। তিনি নিজে অপরের দোষ বড় একটা দেখতে পেতেন না। দেবমন্দিরে প্রার্থনাকালে তিনি বলতেন, তাঁর চোখে যেন কারুর দোষ-ক্রটি না পড়ে। সত্য সত্যই তাঁর এ প্রার্থনা বিফলে যেতো না।

আজ সমস্ত ইয়োরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর অপর প্রান্তেও শ্রীশ্রীসারদা দেবীর পুণ্যস্মৃতির আয়োজন চলছে। তাঁর সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনাদর্শে যে দেবীশক্তির বিকাশ ঘটেছিল তা দেশের ও দশের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত উদ্দাম নরনারীকে স্নিগ্ধ মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রয়োজন এসেছে।

আমরা ভারতবাসীরা সেই মায়েরই সন্তান হয়ে দেশের যে পবিত্র আদর্শকে হারাতে বসেছি, তা কি তাঁর জীবনকাহিনী আলোচনা করলে আবার ফিরে পাবো না? ভারতীয়া নারী আজ পরানুকরণের ফলে পাশ্চাত্য উগ্র স্বাধীনতার মোহে তাদের বিলাস-ব্যসনের আকর্ষণে পথভ্রষ্ট হতে চলেছে, আপন গৃহ সংসারের শান্তির আশ্রয় যে ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি, তাকে ভুলতে বসেছে! ভারতের যা কিছু নিজস্ব সম্পদ তাকে অবহেলা করে শান্তিনাশক অনিত্য অসার বস্তুর পিছনে জ্বলন্ত আগুনের মুখে পতঙ্গের মতই দুর্ব্বার আকর্ষণে ছুটে চলেছে।

আমরা হয়তো ভাবতে পারি, পরম শ্রদ্ধেয়া সারদা দেবী অনন্যসাধারণ হয়েই জন্মেছিলেন। তাঁকে অনুকরণ বা অনুসরণ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তা ভেবে নিশ্চেষ্ট থাকলে আত্ম-প্রবঞ্চনাই হবে।

সারদা দেবীর জীবনের প্রারম্ভ থেকে অবসান পর্য্যন্ত আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই—তিনি সাধারণের চেয়েও সাধারণ ছিলেন। অতি সাধারণ ঘরে তাঁর জন্ম; সাধারণ ভাবে জীবনযাপন, সাধারণের সাথে মেলামেশা বা সঙ্গ। তাঁর অশন বসন ভূষণ সবই সাধারণ। অসাধারণত্বের কিছুই দেখা যায় না। কেবলমাত্র ত্যাগ সহিষ্ণুতা ক্ষমা সেবাপরায়ণতা এবং অপরিসীম স্নেহশীলতা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার দ্বারাই তিনি অসাধারণত্বে পৌঁছতে পেরেছিলেন।

কাজেই অসাধারণত্বের মোহ বর্জ্জন করে প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দিয়ে অন্তর-ঐশ্বর্য্যে ও চরিত্রমাধুর্য্যের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে ধনী-নির্ধনী ও ছোট-বড় ভেদাভেদ ভুলে শত গৌরবের মধ্যেও নিজেকে পরাধীন বোধ না করে শত দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজেকে দুঃখী বোধ না করে নির্লিপ্ত শান্ত ও তৃপ্ত ভাবে চলার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সাধারণত্ব থেকে অসাধারণত্বে পৌঁছাবার মূল তথ্য। আর মানবত্ব থেকে দেবত্বে আরোহণের পথ। সেই পথেরই নির্দ্দেশ আমরা পাই পরম-আরাধ্যা শ্রীশ্রীসারদা দেবীর মধ্যে। নতুবা তাঁর মধ্যে আমাদের মত কী-ই না সাধারণ ছিল?

আগেই বলা হ'ল, কত সাধারণ ঘরে মা'র জন্ম, কত সাধারণ কর্ম্মে তিনি অভ্যস্ত। যে কোন আনন্দে আনন্দ প্রকাশ, দুঃখে দুঃখবোধ; স্নেহে বিগলিতা ভাব, অন্যায়ে কঠোরতা, সবই তাঁর সাধারণের মত। অতি সাধারণের মতই স্বামিসন্দর্শনে তিনি ব্যাকুলিতা, স্বামিসেবায় পুলকিতা। আবার পালিতা কন্যা রাধুর প্রতি অনুরক্তি ও স্নেহ প্রকাশেও দেখতে পাই তিনি কত সাধারণ!

সারদা মায়ের আশৈশব জীবনযাপন এতই আমাদের সর্ব্বসাধারণের মত সাধারণ যে, তিনি যেন আমাদেরই সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে আছেন। তাঁকে আমরা বেদীতে বসিয়ে পরম

শ্রদ্ধার পাত্রী বলে পূজো করতেই শুধু চাই না, আমরা তাঁকে অন্তরের অন্তরতম রূপটিতেই যেন পাই। অন্তরতম ভাবে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করার সুযোগ পেয়েই আমরা বিচার করতে পারি, কিসে তিনি সব কিছুতেই আমাদের মত এত সাধারণ হয়েও দেবীপদবাচ্যা হয়ে এমন অসাধারণত্বে পৌঁছতে পেরেছিলেন ?

এই বিচারে প্রথমেই চোখে পড়ে, সাধারণের মত স্বামিসন্দর্শনে ব্যাকুলিতা হলেও সাধারণের মত স্বার্থসম্পর্কযুক্ত হয়ে স্বামীকে একান্ত নিজস্ব করে অধিকার করতে তিনি কখনো উন্মুখ ছিলেন না। স্বামী তাঁর প্রিয়তম ছিলেন বটে, তাঁর অন্তরের অন্তরতম ধ্যানের দেবতা পরম ইষ্টদেব ছিলেন। তাঁর সেবা, তাঁর যত্ন তাঁর সুখ-সুবিধার তত্ত্বাবধান, তাঁরই ধ্যান, তাঁরই চিন্তা, সারদা দেবীর জীবনে অনুক্ষণের সাথী ছিল। স্বামীর আদর্শে নিজেকে গড়ে তোলা, তাঁরই ভাবে ভাবিত হওয়া, তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। স্বামীকে সেবা করা, কাছে পেতে চাওয়া, স্ত্রীলোক হিসাবে তাঁর আন্তরিক কামনা হলেও সে অধিকারকে তিনি অনায়াসে অপরের হাতে তুলে দিয়ে হৃষ্টচিত্তে থাকতে পারতেন। এসব ক্ষেত্রেই তিনি সাধারণ থেকে অসাধারণত্বের এক ধাপে উঠতে পেরেছিলেন। সন্তোষই ছিল তাঁর 'অনুত্তমম্ সুখম্'। যা কিছু পাবার তাঁর আকাঙ্খা ছিল তার অভাবে কখনোই তাঁকে মনের প্রফুল্লতা হারাতে বা অপরকে দায়ী করতে শোনা যায়নি। স্বকৃত পুণ্যার্জ্জনে প্রাপ্তি এবং পুণ্যের অভাবে হারানো এই বিচারে তিনি তুষ্ট হ'তেন।

কন্যা, ভগিনী স্ত্রী ও মাতৃরূপে নারীর যে কয়টি মহিমময়ী রূপ আমরা জানি, অতি সাধারণ পরিবেশের মধ্য থেকে আপন ব্যক্তিগত চারিত্রিক মহিমায় ও অপরিসীম মনোবলে তিনি সে সব কয়টিতেই কি ভাবে অসাধারণ পরিচয় দিয়েছিলেন তা আমরা দেখেছি। সাধারণের মত বিন্দুমাত্র স্বার্থগন্ধও তাঁকে তাঁর কোন একটি রূপেই সাধারণ গণ্ডীতে আটকে রাখতে পারেনি। এই ছিল তাঁর অসাধারণত্বে পৌঁছবার মূল মন্ত্র।

সারদা দেবী ছিলেন ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি। তার সঙ্গে সহিষ্ণুতা ক্ষমা ও করুণা তাঁকে এক অপরূপ রূপ দিয়ে মানুষের মনে ভগবতীর আসনে স্থান দিয়েছিল। ভারতীয় নারীশক্তির আদর্শই তাঁর জীবনখাতার পাতায় পাতায় ভরা।

পৃথিবীতে তো অনেক সাম্রাজ্ঞীরাই রাজ্যশাসন করে স্মরণীয়া হয়ে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে অশিক্ষিতা লজ্জাশীলা অবগুণ্ঠনবতী দারিদ্র্যপিষ্টা পল্লীরমণী সারদা দেবীর তুলনা হয় না। সেই সব মহৎকুলশীলোদ্ভবা রাজ্ঞীরা সকলেই স্মরণীয়া সন্দেহ নাই কিন্তু

আমাদের মা সারদা দেবী শুধু স্মরণীয়াই ন'ন, তিনি সকলের স্মরণীয়া, বন্দনীয়া, বরণীয়া ও নমস্যা।
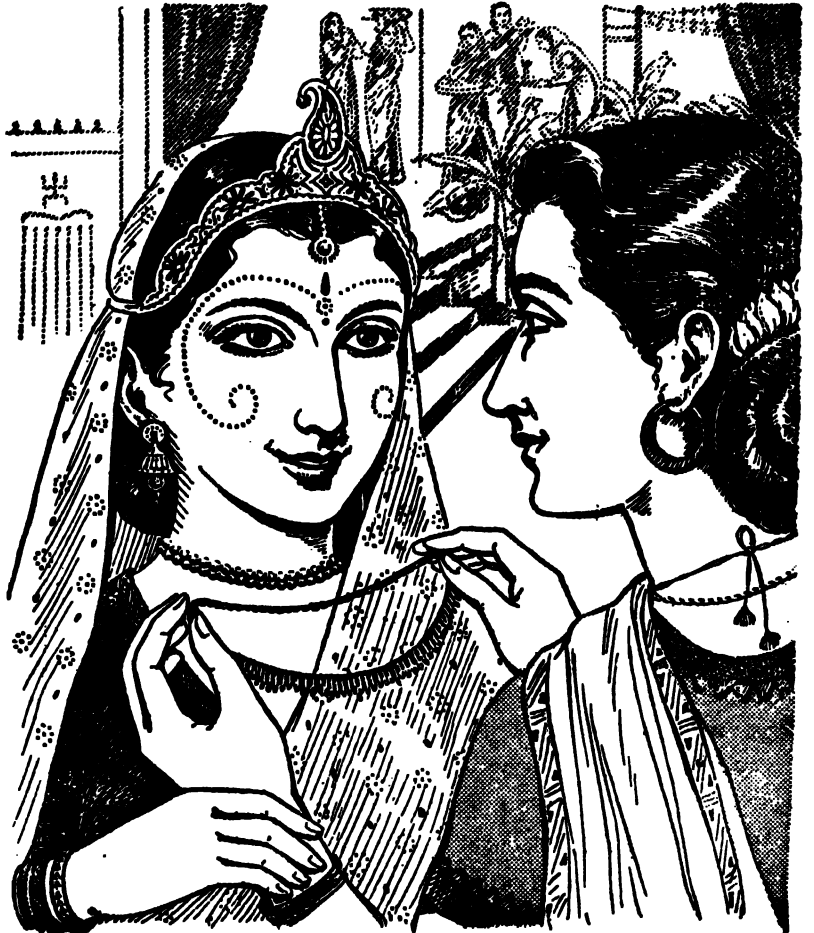
তাঁরা অভিজাতবংশে জন্মগ্রহণ করে, ঐশ্বর্য্যবিলাসে প্রতিপালিতা হয়ে, স্বর্ণসিংহাসনে আরোহণ করে, প্রজাবর্গ ঐশ্বর্য্যে প্রজাদের প্রতিপালন করে গৌরব অর্জ্জন করেছিলেন। কিন্তু সারদা দেবী সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করে দারিদ্র্যদুঃখে পিষ্টা হয়ে জীবনের অধিকাংশ সময় নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রেখেও একমাত্র উদার হৃদয় বিশ্বপ্রেম সেবাপরায়ণতা ও আত্মবিলোপের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অগণিত লোকের মর্ম্মসিংহাসনে অধিরোহণ করেছিলেন।

দারিদ্র্যপিষ্টা লজ্জাশীলা একটি পল্লীবালিকা, মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে যে সেবা ও আত্মদানের ব্রত নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে স্বামীর কাছে এসেছিলেন, উত্তরকালে দেবীরূপে সম্বর্দ্ধিত হয়েও সে সেবাব্রত থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হ'ননি। তাঁকে আমরা শেষজীবন পর্য্যন্ত অভিমানশূন্য আত্মোৎসর্গীকৃত সেবানিরতা জগজ্জননীর মত অপার্থিব স্নেহে প্রেমে ধনী নির্ধনী উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সমজ্ঞানে ব্যবহার করে যে সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী হতে দেখতে পাই, তা পৃথিবীর সকল রাজমহিষীর রাজসম্মানকেও ছাড়িয়ে যায়।

আপন অন্তরের ঐশ্বর্য্য সারদা দেবী কখনো প্রচার করেননি। বরং সঙ্কোচ ও দৈন্যের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হ'তেন। আগুন যেমন ছাইচাপা থাকে না, তেমনি তাঁর মহিমাও লুকিয়ে থাকেনি। আপনি ফুটে বর হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভক্তহৃদয় ছাড়িয়েও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

আধুনিক উগ্রস্বাধীনতার যুগে সারদা দেবীর পবিত্র জীবন কাহিনীর বহুল ও ব্যাপক প্রচার হ'লে আমরা ভারতীয়া নারী বুঝতে পারি যে, স্বাধীনতার যা প্রকৃত রূপ তা কোনকালেও কোন আবরণেই ঢাকা থাকেনি ও থাকতে পারে না। তথাকথিত চরম পর্দা'ন ও কুসংস্কারপূর্ণ গোঁড়ামীর যুগে অবগুণ্ঠনের আড়ালেও শ্রীশ্রীসারদা দেবীর যে স্বাধীন স্বতন্ত্র রূপখানি আমাদের চোখে পড়ে, সারা বিশ্বে তা অনুকরণীয় ও আকাঙ্ক্ষনীয়।

সারদা দেবীকে লড়াই করে এ ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হয়নি। অন্তরের ঐশ্বর্য্যের সাথে ধর্ম্মের মহান বন্ধনই তাঁকে দেশকালের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে এ স্বাধীন রূপখানি দিয়েছিল। এ স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা আজকের যুগের প্রগতি যুগের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা থেকে সম্পূর্ণই পৃথক। তাতে কোন উগ্রতার লেশমাত্র নাই, আত্মপ্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা নাই, সবল মত প্রকাশেরও কোন দাবী নাই। তাতে আছে শুধু সহজ সলজ্জ প্রাণবন্ত একটি গতি, ঐকান্তিক আত্মোৎসর্গীকৃত নিপুণ সেবা, পরম পবিত্র বিশ্ব-মাতৃস্নেহ এবং অপূর্ব্ব ত্যাগ, ক্ষমা ধৈর্য্য ও পরদোষাদর্শিতার একান্ত অভাব। সর্ব্বোপরি নিরহঙ্কার ও নিরভিমানযুক্ত একটি দীনভাব।

সারদা দেবী তাঁর অমর জীবন যাপন করে আগত অনাগত সকলের জন্য তাঁর সরল অনাড়ম্বর ও শিক্ষাতথ্যপূর্ণ জীবনযাপন কাহিনী ও অমর বাণী রেখে ২০শে জুলাই ১৯২০, বাংলা ৪ঠা শ্রাবণ ১৩২৭ সনের মঙ্গলবার তাঁর নশ্বরদেহ ত্যাগ করে ভগবান রামকৃষ্ণের সঙ্গে চির-মিলিতা হ'ন।

জনসাধারণের প্রতি তাঁর অন্তিম-বাণী ছিল 'যদি মনের শান্তি কাম্য হয়, অন্যের দোষাদর্শী হ'য়ো না। বরং নিজের দোষ দেখো। গোটা পৃথিবীকে আপন করতে শেখো। এখানে কেউ পর নয়। এই পৃথিবী তোমাদেরই একান্ত নিজের।'

তাঁর বাণী এমনই উদার ও বিশাল যে, এর আশ্রয়ে সকলেই সমভাবে শরণ নিতে পারে। এখানে নানা জাতি, নানা বর্ণ, নানা আচার নানা ধর্ম্ম বা নানা বিচারের কোন জায়গা নাই। খালি আছে সব কিছুকে মিলিয়ে এক মহামানবতা। এক স্বর্গীয় অফুরন্ত প্রেমসমুদ্র। যার অবগাহনে সদ্য মুক্তি সুনিশ্চিত। যার লক্ষ্য মোক্ষ। কর্ম্ম—সেবা। বন্ধন—ধর্ম।

শেষ

বর্ষণান্তে

রাণী দেবী

থেমে গেছে বর্ষণ গম্ভীর গর্জন,
থমথমে পল্লব সিক্ত।
স্তব্ধ স্বনন সন ক্লান্ত প্রভঞ্জন,
এলো অবগুণ্ঠনে নিশীথিনী নীপবনে,
চুরি করে নিখিলের গুঞ্জন।
মঞ্জীর চরণে মৃদু মৃদু গমনে,
এলো এঁকে আঁখিকোণে অঞ্জন।
হেসে ওঠে চন্দ্রমা লজ্জিত হ'লো অমা,
ত্রস্তে লুকালো যত কালিমা।
পুঞ্জিত কালো মেঘে অম্বর ছিল ঢেকে,
চকিতে খচিত হলো নীলিমা।
বিস্ময়ে দেখি চেয়ে বিশ্ব আলোয় ছেয়ে,
গলানো রূপোর যেন বন্যা।
ঝলমল তরুদল কিরণে সমুজ্জ্বল,
সজল যূথিকা হলো ধন্যা।

জাতিস্মর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

সুমিতার একঘেয়ে বাঁধাধরা জীবনের মাঝে হঠাৎ এলো বিচিত্র ভাবের ঝড়। অসীমের আবির্ভাব তার জীবনে যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি রোমাঞ্চকর।

চৈত্রের মধুর সন্ধ্যাকাল। নিজের ঘরে বসে সুমিতা তানপুরাতে সুর দিয়ে বসন্তবাগের আলাপ সুরু করেছে। সামনে তার সঙ্গীত-শিক্ষক ওস্তাদ আনোয়ার খাঁ উপবিষ্ট। করবীও উপস্থিত ছিলো সেখানে, সুমিতার গান শেষ হলে তারটা সুরু হবে।

কোনো খবর না দিয়েই অসীম প্রবেশ করলো ঘরে। সুমিতা হঠাৎ ওকে দেখে গান থামিয়ে দেয়, বসে থাকে মুখ নীচু করে…

শুধু তানপুরার বুকে জাগিয়ে রাখে সুরের মৃদু ঝঙ্কার। শ্বেত গোলাপের মত ওর দুটো গণ্ডে ছড়িয়ে পড়লো লজ্জারুণ আভা।

করবী উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বলে—কি সৌভাগ্য! আসুন, আসুন!···ও কি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

অসীম সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে একটি সিগারেট ধরায়। তার পর বলে, গান থামালে কেন সুমিতা? বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম তোমার গান, ভারি চমৎকার লাগছিলো, আমাকে দেখলে গান থেমে যাবে জানলে, বাইরেই থাকতাম।

তরুণ ওস্তাদ আনোয়ার, একটা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করে দেখলো এ বাড়ীর নতুন আগন্তুককে। তার পর ছাত্রীর দিকে চেয়ে বলে,—আজ-কাল গানে আপনার মোটেই মনোযোগ নেই সুমিতা দেবি! এ রকম গাফিলতি যদি আপনি করেন তো আমি কি করতে পারি? আপনার দিদিমাকে কৈফিয়ত তো আমাকেই দিতে হবে?

মৃদু হেসে সে কথার জবাব দেয় করবী,—ওর দোষ নেই ওস্তাদজী! মনটা একেই খারাপ ছিল, তার ওপর ওর বাবা চলে যাওয়াতে আরো বিমনা হয়ে গেছে। আরো দু-চার দিন যেতে দিন, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। নে মিতা, গানটা শেষ কর্।

আবার গান সুরু করলো সুমিতা। কিন্তু হারানো সুরকে কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারলো না। বারে বারে সুরের ছন্দপতন ঘটতে লাগলো।

বড় অস্বস্তি বোধ করছিলো সে। অসীমের শাণিত ছুরির মত চোখ দুটো দিয়ে তপ্ত আভা যেন ঠিক্‌রে পড়ছিলো ওর মুখের ওপর। কোনো রকমে সে গান শেষ করে তানপুরাটা নামিয়ে রাখলো। করবী সেটি তুলে নিয়ে গানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে বসলো।

অসীম সুমিতার দিকে চেয়ে বললো—তোমার চেহারা দেখছি ভারি খারাপ হয়ে গেছে মিতা, অসুখ-বিসুখ করেনি তো? তোমার বাবা তোমার তত্ত্বাবধানের ভার আমার ওপর দিয়ে গেছেন, সে কাজ তো এখন থেকে আমাদেরই করতে হবে।

সুমিতা মৃদু কণ্ঠে বলে—আমি ভালোই আছি।

অসীম উঠে দাঁড়িয়ে ওকে বলে—এসো না, তোমাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি মিতা! বেশ মেঘলা দিনটা আছে। বাইরের হাওয়া-বাতাস লাগলে শরীর-মন দুটোই তাজা হবে। দিন-রাত বাড়ীতে আবদ্ধ থাকলে ও-দুটো জড়ভাবাপন্ন হয়ে যায়।

চোখ তুলে চায় সুমিতা অসীমের দিকে। কি ছিলো ওর চোখ দুটোতে? বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রভাব! পুরুষত্বের আকর্ষণ?

অসীম আবার ডাকে—দেরী কোরো না মিতা, চলে এস।

সে ডাকে ছিলো আদেশের সুর। সে আদেশ লঙ্ঘন করবার শক্তি সুমিতার ছিল না। হ্যাঁ, মনে মনে সে-ও চাইছিলো, বাড়ীর অবাঞ্ছিত সঙ্গ ও আবহাওয়া থেকে কিছুটা সময় পালিয়ে থাকতে।

চট করে শাড়ীটা পাল্টে নাও মিতা!

কুণ্ঠিত পদে দু-চার পা অগ্রসর হয়ে থমকে দাঁড়ায় সুমিতা, নিজের শাড়ীর আঁচলটা ধরে নাড়া-চাড়া করে। শাড়ী পাল্টাবে? না থাক, দিদিমা গেছেন মার্কেটে; যদি ফিরে আসেন তাহলে? এতটা দুঃসাহস দেখানো তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

—কি হল? কাপড় ছাড়বে না? বেশ তো, কোনো প্রয়োজন নেই। বেশ চমৎকার আসমানী শাড়ী তো রয়েছে তোমার পরনে, এতেই মানিয়েছে তোমাকে বিউটিফুল। এসো, আর দেরী নয়। করবীর দিকে এক বার দৃষ্টিপাত করে অসীমের সঙ্গে বেরিয়ে যায় সুমিতা।

করবীর বিস্ফারিত দৃষ্টি ছিলো ওদের গতিপথ পানে। ব্যর্থতার গ্লানি বুকের ভেতর গুমরে উঠছিলো, পরাজয়ের হতাশা চোখে-মুখে!

সমস্ত রাগ নিক্ষেপ করলো মায়ের ওপর। সেই কোন দুপুরে যে বেরিয়েছেন, বাড়ী ফেরবার নামটিও নেই! তিনি সুমুখে থাকলে, মিতা ওকে কলা দেখিয়ে একলা অমন করে কি যেতে পারতো অসীমের সঙ্গে?

—আর মিতাই বা কি ধরণের বেহায়া মেয়ে? হলেই বা সুদামের কাকা! বয়সে তো এমন কিছু বড় নয়? একবার তু করে ডাকলেই কি ছুটে যেতে হয়? বোকা মেয়েটার কবে যে একটু বুদ্ধি-সুদ্ধি হবে!

কাটা ঘায়ে ওর আবার নুণ ছিটিয়ে দিলো ওস্তাদ আনোয়ার খাঁ।—আর মিথ্যে বসে থেকে লাভ কি করবী দেবি! গান আরম্ভ করুন। কিছু মনে করবেন না; বলছি যে সুমিতা দেবী হঠাৎ ওঁর সঙ্গে বাইরে গেলেন, ব্যাপারটা যেন ভালো ঠেকলো না আমার চোখে। মানে আপনাকেও তো সঙ্গে নেওয়া যেতো।

আহতা ফণিনীর মত ফোঁস করে উঠলো করবী।—আপনি আমাকে কি এতই অপদার্থ ভাবেন ওস্তাদজী? যে একবার তু করে ডাক দিলেই আমি ছুটে যেতাম ওদের সঙ্গে? নিজের ভালো-মন্দ বোঝবার মত যথেষ্ট বয়েস হয়েছে মিতার; সে বিষয়ে আর আমাদের মতামত প্রকাশ করা অবান্তর।

তানপুরায় মনোযোগ দেয় করবী। কিন্তু সেটাও যেন আজ বিগড়েছে। সুরটা যেন কেমন বেতালা। সব সমস্যার মীমাংসা করলেন মায়া দেবী। চট-পট চটির শব্দ তুলে, সওদা-করা এক বোঝা জিনিষ নিয়ে ঘরে ঢুকে, হাঁফাতে হাঁফাতে সোফায় বসে পড়লেন।

মাখন, জেলি, কেক, বিস্কুট, চকোলেট তার সঙ্গে স্নো, পাউডার, আরো কত কি, একটির পর একটি ব্যাগ থেকে বার করে টেবিলে সাজিয়ে রাখতে রাখতে বললেন—মিতা কোথায় রে রুবি? ডাক তো তাকে। আহা বাপ চলে গিয়ে মেয়েটা বড্ড মনমরা হয়ে গেছে।

ঠোঁট উল্টে জবাব দেয় করবী—সে একটু সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছে, অসীম বাবুর সঙ্গে।

—ও মা, সে কি কথা গো? দিদিমা বিস্ময়ে গালে হাত দেন।

—আর তুই তো বাছা মরা মানুষ নোস, ওকে একলা যেতে দিলি কেন তার সঙ্গে? নিজেও যেতে পারলি না? তোকে আর কত শেখাবো বাছা?

ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায় করবী। তিক্ত কণ্ঠে বলে, তোমরা সকলেই আমাকে কি ভেবেছো বল তো মা? আমার রূপ নেই বলে কি আত্মসম্মান বলেও কিছু নেই? অসীম বাবু মিতাকে ডাকলেন সঙ্গে যাবার জন্যে; আমার সঙ্গে একটা কথা বলারও প্রয়োজন বোধ করলেন না! আর আমি কি না যেচে যাবো তার সঙ্গে? কেন? কিসের জন্য এত হীনতা স্বীকার করবো, বলতে পারো?

তুমুল ঝড়ের পূর্ব্ব নিশানা দেখে উঠে দাঁড়ায় ওস্তাদ আনোয়ার। মায়া দেবীকে নমস্কার জানিয়ে ত্রস্ত পদে পালায় ঘর থেকে। শীকার হস্তচ্যুত হওয়াতে মায়া দেবীও ধৈর্য্য হারিয়েছিলেন, চিৎকার করে বললেন—কিসের জন্যে জানো না?—এত দিন ধরে বড়লোকের বাড়ীর পার্টিতে, জলসায় তোমাকে নিয়ে কত ঘোরাঘুরি করলাম; বাড়ীতে কত ছেলে ধরে নিয়ে এসে মুঠো-মুঠো পরের টাকা খরচা করে চায়ের মজলিশ বসালাম।

সুমিতার নাম করে এক গণ্ডা মাষ্টার রেখেছি নাচে, গানে, সব বিষয়ে তোকে এরিষ্টোক্রেট করে তোলবার জন্যে! সব কি আমার ভস্মে ঘি ঢালা হল? আজ পর্য্যন্ত তার ফল দেখা দূরে থাক্ একটা কুঁড়িরও নাম-গন্ধ নেই?

ছি! ছি! কি ঘেন্না! কি ঘেন্না! রাগে মুখমণ্ডল তাঁর রক্তিমবর্ণ! শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি অস্বাভাবিক, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর।

চেঁচামেচি শুনে অনিল কখন এসে দাঁড়িয়েছিলো ঘরে, নিঃশব্দে শুনছিলো মায়ের প্রলাপোক্তিগুলো। শান্তকণ্ঠে বলে সে,—আঃ এত চেঁচামেচি করছো কেন মা?

দোষটা কি রুবির? সে তো চেহারাটা পেয়েছে তোমারই মত! তাকে ঘষে-মেজে, নাচিয়ে গাইয়ে তো একটা অপরূপ কিছু করতে পারবে না। বড়দির ছিলো বাবার মত রূপ, সেজন্যে তাকে বড়লোকের বাড়ী বিয়ে দিতে বেগ পেতে হয়নি! সব মেয়েরই যে ঐরকম ঘরে বিয়ে হবে, এমন তো কোনো কথা নেই?

আমাকে বলো না—কত পাত্তর চাই তোমার? আমাদের মত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে অনেক পাওয়া যাবে। ও সব রাজা-উজির, জজ-ব্যারিষ্টার জুটবে না, ওর জন্যে আর মাথা ঘামিও না।

মায়া দেবীর ক্রোধবহ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়লো! কোমরে হাত দিয়ে, সপ্তমে কণ্ঠ চড়িয়ে বললেন—বটে! কত হাতি গেলো তল, এখন ফড়িং বলে আমার এক হাঁটু জল!

এই আজ থেকে আমি চুপ করলাম, দেখি তোমাদের ভাই-বোনের দৌড়টা। জামাইয়ের পয়সায় নবাবী আর কত দিন চলবে? এবারে আসছে তার আসল মালিক। নিজেরা চরে খুঁটে খেতে শেখো। আমি তো ঢের করলাম,—ঘটে কিছু বুদ্ধি ছিলো, বড় বড় ঘরের সঙ্গে মেলামেশা করবার মত ক্ষমতা আর শিক্ষা ছিল, তাই রাজ-হালে রাখতে পেরেছিলাম তোমাদের। বাপ তো রেখে গিয়েছিলো অষ্টরম্ভা। সম্বলের মধ্যে তো ঐ বাড়ীখানি। তা জামাইটাকে এত চেষ্টা করলাম বশে আনবার, সে কি আমার সুখের জন্যে? ঐ পোড়াকপালীটা যদি ঠিক মত আমার কথা মেনে চলতো, তবে সোমনাথ তো কোন ছার—স্বয়ং বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙিয়ে আমি ছাড়তুম। দু'চার দিন চেষ্টা করে উনি দিলেন রণে ভঙ্গ! তার পর কোথায় ক্লাব কোথায় লেক—যতো সব হাবাতে ঘরের ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে দিন-রাত হৈ-চৈ করে বেড়াতে লাগলেন! তা পারলি একটা রুই-কাতলা গোছের কিছু গাঁথতে? তাহলে বুঝতুম ক্ষ্যামতাটা।

জোড়হাত করে কান্নাভরা গলায় বলে করবী!—চুপ করো মা, ঢের বলেছো এবারে থামো! জামাই বাবুর পয়সায় রাজভোগ আর আমার দরকার নেই; নাচ-গানও আজ থেকে আমার শেষ হল! দোহাই তোমার মা! আর আমার জন্যে তুমি ভেবো না! আমার নিজের উপায় আমি নিজেই করতে পারবো। আরো জেনে রাখো,—তোমার ঐ রুই-কাৎলা ধরার পদ্ধতিটাকে আমি ঘৃণা করি। ও কাজ আমার দ্বারা হবে না,··হবে না··ঝড়ের মত ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো করবী!

অনিল বিস্ময়ভরা দু'চোখ মার দিকে মেলে দিয়ে বললো···আজ তুমি এ সব কি বলছো মা? বাবা কি রেখে গেছেন, কিসে দিন চলছে আমাদের, সে কথা কি কোন দিন জানতে দিয়েছো আমাদের? আর জামাই বাবুর বাড়ীতেই বা কেন আমাদের এনেছো? এত বিলাসিতা করবার শিক্ষা তো তোমার কাছেই পেয়েছি আমরা। আমাদের অবস্থামাফিক্ চাল-চলন কেন শেখাও নি আমাদের? কাক হয়ে ময়ূরপুচ্ছ ধারণের এ বিড়ম্বনা ভোগ কেন?

যাক্ যা হবার তা হয়ে গেছে। লেখাপড়া যখন শিখেছি পেট চালাবার উপায় একটা হবেই। রাগের মাথায় সত্যি কথাগুলো বলে ফেলে আজ উপকারই করলে আমাদের। চঞ্চল পদে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অনিল।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত শেষ হয়েছে। এবার ভস্ম আর তপ্তজল ক্ষরণের পালা।

সোফায় বসে নিজের হঠকারিতার জন্য নিজেকে বারংবার ধিক্কার দিলেন মায়া দেবী। অনুতাপ-ভস্মে ক্লেদাক্ত অন্তর। দু'চোখে নেমেছে তপ্ত অশ্রুধারা।

হায়! হঠাৎ এ কি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলেন তিনি? এমন ধৈর্য্যচ্যুতি এর আগে তো আর কখনও ঘটেনি তাঁর জীবনে?

কত বাধা-বিপত্তি, ঝড়-ঝাপটা তো বয়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে। অসীম ধৈর্য্য, অধ্যবসায় বলে বরাবর জীবনযুদ্ধে জয়মাল্যই তো এসেছে তাঁর ভাগ্যে?

তা-না হলে, বিলেতফেরৎ বড় ব্যারিষ্টারের শিক্ষিতা মেয়ে হয়ে একটা পশারহীন উকিলের সঙ্গে ঘর করা কি সাধারণ কথা? কত বুদ্ধি খাটিয়ে তবে বাইরের পালিশটা বজায় রাখতে হয়েছিলো—সেজন্যেই তো এক পয়সা জমানো সম্ভব হয়নি—বিলিতি কেতাদুরস্ত সমাজে তা না হলে আনাগোণা করা সম্ভব হোতো?···বাইরের জাঁকজমক দেখে তারা কখনও বুঝতে পেরেছে যে মানুষটার মাসের আয় সাত আট শোর বেশী নয়?

এর ওপর আবার কর্ত্তা গিয়ে তাও যখন বন্ধ হয়ে গেলো; তেতলার ফ্ল্যাট থেকে, বাড়ীখানা ভাড়া দিয়ে কি লজ্জায় ছিলেন ক'টা বছর। তবুতো তখন বড় মেয়ের গোপন সাহায্য ছিলো,—কিন্তু সেই অনামুখো বিধাতা পুরুষ যে তাঁর একটু সুখ দেখলেই বুক চড়চড়িয়ে মরেন, তা-নাহলে, কি-ই বা এমন হয়েছিলো তার? বছর বছর পাড়ার মেয়ে বৌগুলো বিয়োচ্ছে; সব তো ঠিক বজায় আছে? আবার এত ঐশ্বর্য্য এত যত্নের মধ্যে থেকেও বাছা আমার রেহাই পেলো না!

—চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠেন মায়া দেবী।

—এত কষ্টের পর,—জামাইয়ের বাড়ীতে এক'টা বছর যা হোক একটু স্বস্তিতে কেটেছে! ছেলেটাকে মানুষ করতে পেরেছেন,—কিন্তু ঐ অলুক্ষুণে মেয়েটা? কম মাথা খেলিয়ে পরিশ্রম করতে হচ্ছে ওর জন্যে? তার কিছু বুঝলো না? শুধু অবস্থা গোপন করার জন্যে দোষের ভাগী করে গেলো তাঁকে! নির্ব্বোধ,—আহাম্মক আর কা'কে বলে?

সন্ধ্যা সমাগমে, বিলাসচঞ্চল কলকাতা মহানগরী। অসীমের গাড়ী ছুটে চলেছে। চৌরঙ্গী, রেড রোড, ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে দু'চার পাক ঘোরাফেরা করবার পর সে বললো—এবারে কোথায় যাবে মিতা?

—আমি তো রাস্তা-ঘাট চিনি না,—চলুন যেখানে হয়, মৃদুস্বরে জবাব দেয় সুমিতা।

—ঠিক আছে—চলো আমার ক্লাবে যাই।

গাড়ীখানা যেন উড়ে চলেছে। সুমিতা শঙ্কিত চিত্তে জড়োসড়ো হয়ে বসবার চেষ্টা করে,—বারে বারে ওর গায়ে লাগছে অসীমের হাতের মৃদু ধাক্কা। [ক্রমশঃ।

রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু

ইন্দ্রাণী বসু

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে মহান রূপে দেখেছিলেন। মৃত্যুর মহিমা তিনি কত ভাবে তাঁর কাব্যের ভিতর যে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। জন্ম হলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জন্ম ও মৃত্যু একেবারে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। মৃত্যুর অস্তিত্ব না থাকলে পৃথিবী এত সুন্দর মনে হ'ত কি না সন্দেহ!

আমরা সাধারণ লোকে মৃত্যুভয়ে সর্ব্বদাই কাতর। কিন্তু গুরুদেব মরণকে উদ্দেশ্য করে কত কাব্যই যে রচনা করে গেছেন!

আমরা আমাদের প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোককাতর হয়ে ক্রন্দন করি। কিন্তু কবি বলেছেন,—

"নীরবে আকুল চোখে ফেলিতেছ বৃথা শোকে
নয়নাশ্রুপার।
ছিলে যারা রোষভরে বৃথা এত দিন পরে
করিছ মার্জনা।"

আমরা মৃত্যুর রূপ কল্পনা করার সময় তার ভয়াল ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির কথাই সর্ব্বাগ্রে ভাবি। কিন্তু কবিগুরুর 'মরণ' কবিতাটি থেকে তাঁর দেখা মৃত্যুর রূপ দেখি অন্য ভাবে।

"মরণ রে
তুঁহু মম শ্যামসমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্তকমল কর, রক্ত অধরপুট,
তাপবিমোচন করুণকোর তব
মৃত্যু অমৃত করে দান।"

গুরুদেব এখানে মেঘবরণ মৃত্যুর ভিতরেই তাপবিমোচনকারী, অমৃতদাতা মৃত্যুকে দেখেছেন।

মৃত্যুই যে শান্তি, এই কথা হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে কত দূর চিন্তাশক্তি, কত দূর মনের জোর থাকা প্রয়োজন তা' সহজেই অনুমেয়। আমরা কবির এই চিন্তাশক্তির পরিচয় পাই "মৃত্যুর পরে" এই কবিতাটিতে। এখানে কবি বলেছেন,—

"আজিকে হয়েছে শান্তি, জীবনের ভুলভ্রান্তি
সব গেছে চুকে।"

মৃত্যুর পরে আত্মা কোথায় যায়, এ প্রশ্ন আমাদের সকলের মনেই কখনও না কখনও জাগে। কিন্তু আমরা নিজেরা কখনও উত্তর দিয়ে নিজেদের সান্ত্বনা দিতে পারি না। কিন্তু কবির মনেও যখন এই প্রশ্ন জেগেছিলো তখন বলেছেন,—

"বৃথা তারে প্রশ্ন করি, বৃথা তার পায়ে ধরি
বৃথা মরি কেঁদে—
খুঁজে ফিরি অশ্রুজলে, কোন অঞ্চলের তলে
নিয়েছে সে বেঁধে।"

তারপরেই আবার নিজেই উত্তর খুঁজে পেয়েছেন,—

"পলকে বিচ্ছেদে হায় তখনি তো বুঝা যায়
সে যে অনন্তের।"

এই যে বোঝার ক্ষমতা এ কত দূর অন্তর্দৃষ্টি থাকলে তবে সম্ভব, এটা আমরা সকলে একটু তলিয়ে দেখলেই হৃদয়ঙ্গম করব।

কিন্তু এত জ্ঞানী ব্যক্তিও এক জায়গায় তাঁর ভীতির কথা বলে গেছেন। মৃত্যুকে এক সময় তিনিও ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু সে ভুল ভাঙতেও তাঁর সময় লাগে নি। তিনি বলেছিলেন,—

"মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।"

এই একই কবিতাতে আবার ভুল ভাঙ্গার কথা বলেছেন শেষে,—

"স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

সবশেষে আমার মত মরণভয়ে ভীত সকলকে তাঁর আশার বাণী শুনিয়ে শেষ করছি—

"চিত্ত-আসন দাও মেলে, নাই যদি দর্শন পেলে
আঁধারে মিলিবে তাঁর স্পর্শ—
মর্মে জাগায়ে দিবে প্রাণ।

আজ এই সন্ধ্যায়

অনুজা দেবী

আজ এই সন্ধ্যায়
আমরা দু'জনে হাতে হাত রাখি বসিলাম ঘাসের 'পরে,
দিগন্তের অসীম সীমায়
আমাদের কথাই সূক্ষ্মলিখনে লিখে দিল কে যেন
ইন্দ্রধনু ঝিলিক-হানা অক্ষরে।
আমার অনুভূতির নায়িকা বাতাসের শিহরণ নিয়ে
শুধু চেয়ে রইল
সেই দিগন্তের পানে।
বাঁধনের ভীতি নেই, চিরধৈর্যক্ষমাশীল প্রান্তর
ভরে উঠেছে গানে।

তবু তার অন্তর কেন কাঁপে:
কেন নিরাশার মন্ত্র জপে!
মনে হয় আকাশের বাণী
ভেপলা ওই কাচের রথে চড়ে
কিছু বলে যায় ওর কানে, যে কথা ও জানত না:
বড় কি পেয়েছ ব্যথা? হে সখি,
চাও কি সান্ত্বনা?

লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক

পাঠক-পাঠিকা হয়তো লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, আমাদের দেশের সংবাদপত্রে দেশের গুণীজনদের জন্মবার্ষিকী অপেক্ষা মৃত্যুবার্ষিকী পালনের সংবাদই অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ বাঙালী জাতি সম্মান দেখায় মৃতদের এবং জীবিতদের প্রতি কোন নজর দেয় না। এ কথাও সত্য যে, আমাদের মধ্যে কোন কোন বিখ্যাত ব্যক্তিকে বিদেশীরা সম্মানে ভূষিত না করা পর্যান্ত আমরা তাঁদের দিকে ফিরেও তাকায় নি, বরং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে তাঁদের নিম্ন পর্য্যায়ে নামাতে চেষ্টা ক'রেছি। প্রমাণস্বরূপ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করা যায়। নোবেল পুরস্কার লাভের পর বঙ্গদেশবাসীর দৃষ্টি পড়ে কবির প্রতি—যেজন্য তাঁর আক্ষেপের সীমা ছিল না। বর্ত্তমানেও বাঙালী জাতির এই মজ্জাগত অভ্যাসটির কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে, তেমন কথা আমরা বলতে চাই না। দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি দু'জন বিখ্যাত সাহিত্যিকের জন্মতিথি পালনের আমন্ত্রণপত্রে দেখলাম, আহ্বানকারীরা লেখকদের পুত্র-কন্যাগণ ছাড়া অন্য কেউ নয়। লেখকদের বংশধরদের নামের পরিবর্তে প্রকাশকদের নাম দেখতে পাওয়া গেলে আমরা দুঃখিত হ'তাম না। আরও সুখী হ'তাম, কোন সংশ্লিষ্ট নামের বদলে তৃতীয় জনদের নাম দেখলে। যাই হোক, দু'জন বিখ্যাত লেখকের পুত্র-কন্যারা তবু কর্ত্তব্য পালন করেছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য, প্রকাশকরা এমন ক্ষেত্রে কেন নীরব থাকেন? উক্ত দু'জন বিখ্যাত সাহিত্যিক ব্যতীত বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে আরও অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক আছেন—যাঁদের জন্মতিথি পালন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু, তাঁদের ওয়ারিশনগণ যে-কোন কারণে তিথিপালনে উদ্যোগী হ'তে পারেন না, সেই হেতু তাঁরা জীবিত অবস্থাতেই বিস্মৃত ও অনাদৃত থাকবেন—এই যুক্তি অর্থহীন। আমাদের দেশবাসীর স্কন্ধে দোষ চাপালেও কোন লাভ হবে না, আমরা জানি। 'বাঙালী আত্মভোলা জাতি' কথাটি তা হ'লে প্রবাদবাক্যে পরিণত হ'তে পায় না। কিন্তু প্রকাশকদের দায়িত্ব থাকবে না কেন? প্রকাশক দিনের পর দিন যাঁদের লেখাকে পণ্য করছেন এবং দু' পয়সা ঘরে তুলছেন, তাঁদের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি দান করুন—আমরা সবিনয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি। বিদেশের প্রকাশকরা অন্য দৃষ্টিকোণে দেখে লেখকদের। লেখকদের প্রচারের আর লেখকদের জীইয়ে রাখার চেষ্টা তাঁদের অনন্যসাধারণ। আমরা যে অক্লান্ত লেখকটিকে আমাদের ব্যবসা-বিপণির সদর দরজার শীর্ষে বসিয়ে থাকি সসম্মানে, তাঁর নাম শ্রীগণেশ। এমন প্রচেষ্টায় আমাদের ব্যবসাবুদ্ধি বা বাণিজ্য-লাভের লোভ প্রমাণিত হয়—ভক্তির নামগন্ধ থাকে কি না, সেটি প্রমাণ-সাপেক্ষ। গণেশ লিখে চলেছেন অবিরাম। প্রকাশকদের তাঁকে 'রয়্যালটি' দিতে হয় না একটি কপর্দকও। কিন্তু আসলে যাঁরা লিখছেন এবং প্রকাশকদের ব্যবসাকে চালু রেখেছেন, তাঁদের দাদন দিতে হয় কিছু কিছু। আমরা বলি, এই আর্থিক দেনা-পাওনার সম্পর্ক থাকলেও শুধু মাত্র টাকা দিয়েই প্রকাশকদের কর্ত্তব্য শেষ হয়ে যায় না। আধুনিক যুগের প্রকাশকদের কর্ত্তব্য এত সামান্য সীমায় আবদ্ধ নয়। বটতলার যুগের সঙ্গে কলেজ ষ্ট্রীটের 'কেতাবপট্টির' যুগ তুলনা করা চলে না। প্রকাশকরা যেমন মন থেকে চেয়ে থাকেন লেখকদের লেখার উত্তরোত্তর উন্নতি হোক, তেমনি লেখকরা যদি অন্তর থেকে কামনা করেন, প্রকাশকদের মনোবৃত্তির উন্নতিটা যেন অবনতির দিকে না নামে।

বিদেশের প্রকাশকদের কর্তব্য গাদার মড়ায় ভিন্ন ভিন্ন লেখকের বইয়ের বিজ্ঞাপন একসঙ্গে সাজিয়ে দিয়েই শেষ হয়ে যায় না। ওরা চায় লেখকরা বেঁচে থাকুক, এবং লেখকরা বাঁচলে তবেই লেখা বাঁচতে পারে। আমাদের দেশে যেমন লেখকের লেখাকে ক্যাপিটাল করা হয়, ওদেশে লেখকদের মূলধন হিসাবে ব্যবহার করে। লেখক মাত্র লিখেই খালাস পায়, অন্যান্য কাজকর্ম বা প্রচারের জন্য সাহায্য করবে প্রকাশকরা। আসল কথা, বিদেশী লেখকদের প্রচারের যা কায়দা-কানুন তা আমরা এখনও কল্পনা করতে পারবো না। অনেকে হয়তো অস্বীকার করবেন না, আমাদের দেশের কত শত প্রথম শ্রেণীর লেখক-লেখিকা কেবলমাত্র যথার্থ প্রচারের অভাবে অকাল-মৃত্যু বরণ করেছেন। অথচ ওদেশে পুরানো ও বিখ্যাত লেখকদের বই এখনও সমান হারে বিক্রী হচ্ছে প্রকাশকদের গুণপণায়। লেখকদের জন্মতিথি পালনের প্রসঙ্গে এত কথা লেখার কারণ, জন্ম-মৃত্যু-স্মৃতি-উৎসব পালনের রেওয়াজ প্রবর্ত্তিত হোক আর না হোক, প্রকাশকরা এখনও যদি ওয়াকিবহাল না হন, তবে লেখকদের শুধু মৃত্যুতিথিই তাঁদের প্রত্যেক দিনের অবশ্য পালনীয় কাজ হয়ে দাঁড়াতে বেশী দেরী হবে না।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

সপ্তপঞ্চ

আজকের দিনে পরিমল গোস্বামীর একটি নির্দিষ্ট আসন আছে সাহিত্যের দরবারে। সাহিত্যের এমন একটি দিক—যে দিকের একমাত্র দিকপাল বর্তমানে পরিমল গোস্বামী। তাঁর নানা স্থানে রচিত রচনাগুলি একত্রে সংকলিত করে প্রকাশিত হয়েছে সপ্তপঞ্চ।

নামকরণটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বসুমতীতে প্রকাশিত বহু রচনাও এই গ্রন্থের শোভাবৃদ্ধি করছে। পরিমল গোস্বামীর চিন্তাশক্তির প্রাবল্য, তাঁর পদচয়নের বৈশিষ্ট্য ও রসসৃষ্টির কুশলতা প্রত্যেক সাহিত্য-পাঠকের আদরের বস্তু। এই গ্রন্থটি বহুল ভাবে পাঠকগণ কর্তৃক সম্বর্ধিত হোক—এই আশাই আমরা রাখি। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীভানু রায়। দাম—তিন টাকা মাত্র।

আকাশ ও মৃত্তিকা

দীর্ঘ দিন ধরে উপন্যাসাদি রচনা করে বাঙলার সাহিত্য-ভাণ্ডারকে যাঁরা ভরিয়ে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে সরোজকুমার রায়চৌধুরীর নাম উল্লেখনীয়। উপন্যাসের মধ্যে ইনি বাঙলা দেশকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে সাধারণ বাঙালী জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় ঘটনাবহুল দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের ছাপ সুপরিস্ফুট। চারিত্রগুলিও বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সরোজকুমারের গ্রন্থগুলির মধ্যে এটিও একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ক্লাসিক প্রেস, ৩।১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীনারায়ণ সেনগুপ্ত। দাম—সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ

মানুষের জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের গান তো বাঙলার কোষাগারে সঞ্চিত এক অপূর্ব রত্ন-সম্ভার। বাঙালীর মানস মনের চেতনা জেগেছে রবীন্দ্রনাথের গানে। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি গানের রাজা। শুধু কথায় নয়, সুরের মধ্যেও তিনি এনেছেন এক অভিনব নতুনত্ব। রবীন্দ্রনাথের গানের সুর তাঁর নিজস্বতারই পরিচায়ক। সুরের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান এক মহার্ঘ রত্নরূপে বাঙালীর মনের মণিকুটিমে জমা হয়ে রইল। রবীন্দ্র-সুর নিয়ে এখানে আলোচনা করেছেন তাঁরই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বাঙলার এক বিদগ্ধ-সন্তান শ্রদ্ধেয় ডক্টর কালিদাস নাগ। শুধু তাই নয়, সুরের দরবারে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বও ইনি এখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা রসগ্রাহী মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে সন্দেহ নেই। গানের রাজা রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা অনেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরও চিত্তরঞ্জন করতে সমর্থ হবে বলে আশা রাখি। বুক-ব্যাঙ্ক, ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীসুধাংশু বক্সী। দাম আড়াই টাকা মাত্র।

কাজের কথা

জীবনের রঙ্গভূমিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ প্রয়োজনীয় বস্তু হতে পারে, তবে একমাত্র নয়। বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য ছাড়া মানুষকে মনুষ্য-সমাজের যোগ্য আসন দেওয়া যায় না, এ-ও যেমনই ঠিক তেমনই বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গে তাকে বিনয় সৌজন্যতা শিষ্টাচার প্রভৃতি আবশ্যকীয় গুণগুলিও আয়ত্তাধীনে আনতে হবে। মানুষকে বিনয়-গুণ, সৌজন্য-বোধও বড় হতে অনেকখানি সহায়তা করে, এ কথা যে কোন পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করবেন। এই সত্যের প্রচারবার্তা আলোচ্য গ্রন্থখানি। গ্রন্থখানি বহু বিদগ্ধজনের প্রশংসালাভে সমর্থ হয়েছে। কয়েকটি কাহিনী এর সঙ্গে সন্নিবেশিত করে গ্রন্থটিকে আরও উপভোগ্য করে তুলেছেন লেখক শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান যুগে বিশেষ করে উদীয়মানদের জীবনে এই গ্রন্থ আলোকপাত করুক। এই কামনাই করি। ন্যাশানাল হাউস, ১৬ শিবপুর রোড, হাওড়া থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীমতী উষা দাস। দাম আড়াই টাকা মাত্র।

পূর্বরাগের ইতিহাস

অল্পকালের মধ্যে যে ক'জন শক্তিমান লেখকের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দাশের নাম উল্লেখযোগ্য। রচনা-চাতুর্যে, পটভূমিকা-নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বে এটি একটি নাটক ছিল, নিউ এম্পায়ার মঞ্চেও এই নাটকের অভিনয় হয়ে গেছে। বর্তমানে সেই নাটকটিকে উপন্যাসাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। সহজ ভাবে বিষয়বস্তুর বিকাশের জন্যে এই গ্রন্থটি পাঠকের কাছে সমাদর লাভ করবে। সহেলি চরিত্রটি সৃষ্টি করে সুধীবৃন্দের প্রশংসা ভাজন হবেন রবীন্দ্রনাথ দাশ। ক্যালকাটা বুক ক্লাব প্রাইভেট লিঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বসু। দাম তিন টাকা মাত্র।

রক্তকমল

একশো বছর আগেকার স্বাধীনতা-সংগ্রামকে কেন্দ্র করে লেখা অনেকগুলি গল্পের সংকলন গ্রন্থরূপে দেখা দিয়েছে সুপরিচিত সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'রক্তকমল'। নামকরণেই বোধ হয় বোঝা যায়, গ্রন্থটির ভিতরের সম্ভার সম্বন্ধে। আজকের দিনে শতবর্ষ আগের সেই গৌরবময় অভিযান নতুন করে মানুষের মনে প্রেরণা যোগাবে। আশার কথা। মানুষের মনে আজকের দিনে ইতিহাস-চেতনা নতুনতর এক রূপ নিচ্ছে, বিশেষ করে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের আবেদন তো অবর্ণনীয়। সেই ইতিহাসকে কেন্দ্র করে সাহিত্যসৃষ্টি করে গজেন্দ্রকুমার ইতিহাসেরও যেমনই প্রচার ও প্রসার করেছেন, তেমনই গল্প সাহিত্যকেও করেছেন সমভাবে পুষ্ট। গজেন্দ্রকুমারের রচনা সম্বন্ধে নতুন করে বলবার কিছুই নেই, তবে তাঁর রচনার পটভূমিকা নির্বাচন সবিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। গজেন্দ্রকুমারের রচনায় স্থান কাল-পাত্রগুলির স্থানে স্থানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর রচনার কল্যাণে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি। প্রাপ্তিস্থান—এস. সি. সরকার য্যাণ্ড সনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম তিন টাকা মাত্র।

মাটকোঠা

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন একটি লগ্ন আসে, যার আহ্বানে চিরাচরিত গণ্ডী-টানা জীবনের পথ পরিবর্তন হয়। জীবনের ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনা হয় সেই একটিমাত্র ঘটনাকেই কেন্দ্র করে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন লেখক অভিনেতা প্রশান্ত চৌধুরী। 'শান্তি' চরিত্রটির মধ্যে এই উক্তি যেন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। শুকদেব চরিত্রটিও বিশেষত্বের দাবী রাখে। লেখকের রচনাভঙ্গী ভালো। নারীর মনের ঘাত-প্রতিঘাত যা শান্তির মধ্যে দিয়ে ফোটানোর প্রচেষ্টা হয়েছে সেই চেষ্টায় লেখক সফল হয়েছেন বলা যায়। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী। দাম তিন টাকা মাত্র।

চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত

শিপ্রা দত্ত

পল্লীর লোকসঙ্গীত, যা ছিল একদিন পল্লীর সম্পদ—পল্লীর গর্ব্ব, তা আজ লুপ্তপ্রায়। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞ পল্লীবাসীর সরল জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি এই লোকসঙ্গীত। যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় পল্লীবাসীর সরলতা, গভীর উদ্দীপনা ও অনুভূতি। দেশী ভাষায়, নিজস্ব ভঙ্গীতে পল্লীবাসীরা গেয়ে গেছে গান। কে, কবে, কোথায়, কোন সালে এই সব গীত রচনা করেছে তা আজ অজ্ঞাত। কিন্তু সেই শিল্পীর গানেই ঝঙ্কৃত হয়েছে সমস্ত পল্লীর মূর্চ্ছনা—তার ছন্দে ছন্দে ধ্বনিত হয়েছে পল্লীর বেদনা—তার সুরে অনুরণিত হয়েছে নিরাশার মধ্যে আশার সম্ভাবনা। বাস্তব জগতের কঠোর আঘাতের মধ্যেও সুন্দরের স্বপ্ন রচনা করে তারা এই গানের সুরে। ভাবের আবেগে সুরের ঝঙ্কারের মাধুরীতে ক্ষণেকের জন্য তারা ভুলে যায় তাদের দুঃখ-ভারাক্রান্ত জীবনের ক্লেশের ব্যথা। আশার রশ্মিরেখা উদ্ভাসিত হয় পল্লীবাসীদের মানসাকাশে। তাদের জীবন্মৃত হৃদয়ে আনন্দের শিহরণ জাগে। এই লোকসঙ্গীত তাদের অতীত গৌরব—বর্ত্তমানের আনন্দের উৎস—ভবিষ্যতের আলোর নিশানা। তাদের অজ্ঞ অন্তরের মূক রাগিণীর মূর্চ্ছনায় যে অন্তঃসলিলা ফল্গু বয়ে চলেছে—তা একান্ত ভাবে তাদের বস্তুতান্ত্রিক ও মানসিক উৎসাহের প্রয়োজনের দাবী মিটাবার জন্যই রচিত হয়েছে।

দেশের রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনে ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রক্রিয়ায় গ্রামের এই সাংস্কৃতিক গাথা—যা গ্রামবাসীর একান্ত নিজের সম্পদ—তা আজ আমরা হারাতে বসেছি। তাই আজ এই লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করতে অনেক গ্রামই বিচরণ করতে হয়। আগের মত গ্রামের এই আনন্দ-উৎস আর অনায়াসলভ্য নয়।

পূর্ব্ববাংলার চট্টগ্রামের চাষী ও মজুরদের কয়েকটা দুঃখ-দুর্দ্দশার গান সম্বন্ধে আজ লিখছি। একটি গানে গেয়েছে—

"আঁরা চাড়গাঁয়া চাষা,
হালচই রোয়া রুই, ইয়ান আঁরার পেশা
আঁরা গতজর কামই করি খাই,
কনু হালার দোয়ারত, ন যাই।
আঁরা চাড়গাঁইয়া চাষা,
হালচই, রোয়া রুই, ইগ্গান আঁরার পেশা।
আঁরার বড় বড় মানুষ হঅলে,
ঠ্যাঙ্গে লাথি মারে।
আঁরা চাড়গাঁইয়া চাষা।"

এই গানের মধ্য দিয়ে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, দুঃখী চাষার হৃদয়-বিদারক অভিমানের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

দিনমজুরদের দুঃখ-ভারাক্রান্ত জীবন মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠেছে আর একটি গানে,—

"দেশের খোষখোর, আর ফোষকোর যত আছে,
সব জীয়ন্তে মরা।
বেয়ানে ঘুমতুন উডি পরর কামত, যাই।
হারাদিন মজুরি করি, দিনর বেতন ন পাইলাম,
আজুয়া দিত, ন পারঙ্গম তোরে,
দশ টেক্যার নোটে নাইরে ভাঙ্গরা।
বাড়ীত, যাই ভাত কিদি খাইম ?
বেয়ানে খাই যে মরিচ ভত্তা,
বিয়ালে কি খাইয়ম ?
আবার ভাই, চইলের লাই যাতে,
বৌ যে শাড়ীর লাই করগে যে ইসারা।
কাওড়ের দোয়ানে গিই, হই গেলাম বেহোশ।
পিছদি আছিল গরাকাটা, আস্তে দিয়ে পোচ।
যখন পিচ মিক্যা ফিরি চাইলাম,
কয় যে চোয়ার মাইরঙ্গম তোরে ইত্যরা।
ঝাপটা মারি, বাড়াই ধরি কি কইলাম ভাই,
পইট্যা থানা গিই, উগ্যান মোওদ্দমা দিলামরে জোটাই।"

এই ভাবে সারা দিন পরিশ্রমের বিনিময়ে তাদের প্রতি যে অবিচার করা হয় ও দেশের সর্ব্বত্র যে অসাধুতা দেখা দিয়েছে—তাই এখানে ফুটে উঠেছে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার গরীব কৃষক ও মজুরদের কি ভাবে অন্নসংস্থান হ'তে বঞ্চিত করেছে—তারই মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শোনা যায় এই গানে—

"বারা বাঁধুনীর কওয়াল খাইয়ে হাটে ঘাটে জিঁও দিঁও,
ধানের কল হইয়ে।
ফারুৎ মধ্যে এক গোলা ধান খায়, তার বউএ সারাদিন
পাড়া বেড়াইত, যায়।

পাড়াত্তুন আসি বউএ হুরহুরাই চইল উন চড়াই দিয়ে,
কুলাৎ লই চইল ঝারিবার লাই, ছয়্যা তিজ্যা পটকাইত্তা মা'রগ্যো,
তুস কুরা গিয়ে ধাই।
কুলাৎ করি দিয়রে চইল, মাফিবার লাই কি রইয়ে।
গরম পানি লাইগ্যে চইলের গায়,
কিছু চইল ফেনের হংগে গিয়ে উৎরাইয়ে,
তলের গুণ তো পোড়া লাইগ্যে, মাঝের গুণ কচাল হইয়ে।
কবির কল্পনাতে মোহন বাঁশী কয়,
পাকিস্তানে বারা বাঁধুনীর বংশ থাইকত্য ন।
বউ এর ঝিয়ের সুখের লাই ভাণ্ডারীর দয়া হইয়ে।"

কালবাজারের এবং কলকারখানার প্রচলনে গরীব দুঃখী মজুরদের জীবনের শোচনীয় পরিণতি মূর্ত্ত হয়ে ফুটেছে এই গানে—

"দেশের হাইল চাইল কিছু দেখ্যনি ?
গরীবের করবল্যা মইদান ঠয়র পাইওনি।
দেশের মাজে বুড়াটুড়া যারা আফিন খায়,
মাজে মাজে মালদারগ্যা কয়,
মোটেও আফিন নাই।
আবার দশ টেঁয়া দি এক তোলা পাই।
এই বিচার কেও করেনি।
(গরীবে) গোলার ধান কলত্ ডলাই খায়।
বারাবান্দনী মরি যায়,
হিক্যা ফিরি কনে চায় ?
এক সের চইল আষ্ট আনা পইসা,
কোন দিন কিন্ননি (গরীবে) ?"

কালবাজারের স্ফীতি, দুর্ভিক্ষের শোচনীয় পরিণতি ও যুদ্ধের সূচনায় যে কণ্ট্রোলের প্রবর্ত্তন হয়েছিল—তার জন্য মানুষের যে চরম লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য ক'রতে হয়েছে—সেই দুঃখের কাহিনী গ্রথিত রয়েছে বাংলার সরল চাষাদের গানের ছন্দে—

"দারুণ বিধিরে আর কত দেখাবি জগতে,
কেও বস্তে সোণার খটত্, কেও পড়ি রয় কাদাতে।
ছেলে মেয়ের আদর গেল, দেখি মা'বর দুর্ভিক্ষে।
সাধু স্ফী চোর হইল কনটলও উপলক্ষে।
বড় কঠিন মানীর পক্ষে, কনটলের মাল আনিতে।
তেল কিনিতে বোতল ভাঙ্গে, চইল কিনিতে পকেট যায়,
ভাণ্ডারত্ চইল ন থাকক্, সাদা জামা থাইলে গায়,
বিরুদ্ধে বল্যে তারে, চইল দিয়ম ন থাইত।"

এক দিকে যেমন বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে কল কারখানার প্রবর্ত্তনায় চাষা মজুরদের চরম দুর্দ্দশা হয়েছে—তেমনি অনেক মজুরের অন্নসংস্থানও হয়েছে। সেই উপলক্ষে এই গান রচিত হয়েছে,—

"পেপার মিলের আজব কারখানা রে—চন্দরঘোনা,
রাঙ্গামাটীর এলেকাতে পাকিস্তানের গবরমেন্টে,
পাহাড় কাডি কিছু রায় না।
পাকিস্তানের দয়া হইল, কারখানা খুলি দিল।
গরীব লোকের অভাব রায় না,
লাখে লাখে লোক আসি,
কাজ পাইয়া হইল খুশী ;
স্ত্রীপুত্র আর ভাতে মরে না।
পেপার মিলের কারবার ভারী,
রাইঙ্গ জঙ্গেতে ইলেকট্রারী,
বাঁধ দিয়ে যে নদীর বিছখানায়।
দীজেন্দ্র আর জব্বর মল্লিক,
তারা বুঝে গরীরের দুখ।
ডেলি বেতন বাকী রাখে না।"

অভাব অনটনে দুঃখী চাষী নিজের সতীত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে সংসারের অভাব দূর করার চেষ্টা করছে, তার মর্ম্মান্তিক কাহিনী—

"আয়ার স্বোয়ামী গেলগই দ্বাশ ছাড়ি,
এই দুনিয়ার জ্বালা আঁই সইত ন পাড়ি।
জাউ খেচুরী পাইয়স রলি, নংগরখানাৎ যাই,
তারা হগগলে পাইল খেচুরী, আঁর তালাস নাই।
'এতক্ষণে কিল্যাই আইয়ম, তোর লাই নাই আর খেচরী।'
কণ্টল দাইডগ্যার ঘরৎ গেলাম কইরতাম তার খেচমত ;
দারুণী পেটের লাই বলি, ন চাইলাম ইজ্জত।
আঁর মনে ন লয় বুজ,
পোয়া উগ্যা মইরগ্যো, ঝি'র পোয়াউয়া ফুলি হইয়ে তুজ।
পেটের রোগৎ গেল গই যাদু, বুকত ছেল মারি ;
অনরে পাড়াইল্যা মা বইন, ইজ্জতে থাইক্য।
আতিক্যা বিপদে পইলে খোদারে ডাইক্য।"

রাষ্ট্রবিভাগের পর বহু চাষা মজুর এ দেশ ছেড়ে ইণ্ডিয়াতে গেছে। কিন্তু যেসব গরীব দুঃখীরা আজও পাকিস্তানে আছে,—সাথিহীন এ দেশে বাস করার কৈফিয়ত তারা দিচ্ছে—

"আঁর বাড়ীঘর কারে দিতাম ?
আঁরে ক্যান ভূতে পাইয়ে হিন্দুস্থান যাইতাম।
অ্যাডে আছে দুয়া ধেওন গাই,
উগ্যার দুধে খরচ চলে,
আর উগ্যার দুধ খাই।
লোকের কথা হুনি হিন্দুস্থান যাই,
হ্যাডে গেলে কি খাইতাম ?
অ্যাডে আছে, খেতে তরকারী,
ফইর ভরা মাছ আছে।
ভাই, সুখে খাইত পারি।
আটা, রুটী, ভাউ খেচুরী,
কিইল্যাই খাই জান হারাইতাম।
যারা হেন্দুস্থান গিইয়ে,
স্বরাজের আলোনদোলনে, জীগন হারাইয়ে।
লোকের কথার ভাব না বুঝি,
কিইল্যাই দুখের বারমাইস্যা গাইতাম।"

সর্বহারা চাষা মজুরদের উষর মরুজীবনে যে প্রেমের মন্দাকিনী ধারা বয়ে যায়—তারও ছিটেফোঁটা পাওয়া যায় তাদের সুরের মূর্চ্ছনায়। কোকিলের প্রথম কাকলীতে প্রেমিকার চঞ্চল মনের প্রতিচ্ছবি মূর্ত্ত হয়ে ফুটেছে এই গানে—

"এই বছর নতুন কুইলায় ডাক ছারে,
অমন পরাণ বিদরে ;
কু'ইলা কালা শব্দ ভালা নানান্ ভেচো জানে।
গাছের আগাত পাতার হেরত বইরা কুহরে
অই মোর পরাণ বিদরে।"

কোকিলের ডাক বিরহিণীকে কি ভাবে প্রভাবিত করে তারই একটি গান শুনুন— "কাউয়া কালা কু'ইলা বালা,
আঁখির পুত্তলি কালা,
আর ও কালা অঙ্গের নিশানা।
ওরে কালরূপে জগতজোরারে অ বঁধুয়া।
মনর শান্তি অইল না
তোর জ্বালায় আর পরাণ তো বাঁচে না।"

চাটগাঁর কোন মজুর অন্য দেশীয় যুবতীর মোহে পড়ে—প্রেমে পাগল হ'য়ে—সে স্বদেশ ছাড়তে বাধ্য হ'ল। সেই প্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েছে এই গানে—

"মনরে ধয্য মানে নারে দাদা,
দিলরে আঁর ধয্য মানে না।
চাটিয়া ছাড়াইল মোরে পরীজান সোনা
পরীজান রাস্তা দিয়া যায়।
ফির ফির শাড়ীর আঁচল বাতাসে উড়ায়।
তার চোখের বিজলী, মন করে দেবালা।
পরীজানের গামছা বর উম,
বুকত রাইয়লে বুক জুড়ায় চোখত আরে ঘুম।
তার ঠোঁডর কর্তা হুইনলে উঢে পরাণে মুরছ না।
পরীজানের মাথার কালাচুল।
য়্যান মেয়র পিছে হাজার পন্দীপ করে জুল্ জুল্।
তার চোখডাকে ইসারায়, হাতে করে মানা।
তার হাতত্ বাজু, পঅত জোরা মল,
তার বুকত্ দয়দের ঝরণা, মুঅত করে ছল।
ওতার মুখর কতা কনে চায় দাদা
দিল যদি যায় জানা।"

বিরহী প্রেমিক নিজেকে প্রিয়াহারা মজলুর সঙ্গে কল্পনা করেছে—

"তোঁয়ার প্রেমে দেবালী অইয়া,
ঘূড়ির আমি মজলু অইয়া।
তোঁয়ার নামে তসবী লই,
জুইপ্যম মালা নীরবে বই।
বিনা সুতায় গাঁইথ্যম মালা,
পরাই দিয়ম বন্ধুর গলায়।"

বর্ম্মাদেশ চট্টগ্রামবাসীদের একটি বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র। মজুরশ্রেণীর অনেক চট্টগ্রামবাসী সেখানে গিয়ে বর্ম্মা রমণীর প্রেমের জালে আবদ্ধ হ'য়ে নিজের স্ত্রীপুত্রের কথা বিস্মৃত হয়। কোন কুহকিনীর কুহকে তার স্বামী তাকে ভুলেছে—এই গানে বিরহিণী স্ত্রীর যেই করুণ কান্না ধ্বনিত হয়েছে—

"রঙ্গ্যা বন্ধু গেল ছাড়িয়ে
সদাদিলে মোর দাগ লাগাই।
এমন রসের কালে কার সোয়ামী ঘরত নাই ?
ছোডোকালে বিয়া দিলরে
মা বাপের চোখে ছাই,
আরে রঙ্গুম যাই ভুলি রলি
কন্ হতীনের ছল্লাপাই।"

বর্ম্মী রমণীদের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হওয়ায় চাটগাঁর বহু শ্রমিক মজুরদের সুখের নীড় ভেঙে গেছে। চট্টগ্রাম নদীপ্রধান দেশ। বিশেষ করে সমুদ্রের উপকণ্ঠে এই দেশটি অবস্থিত বলে এই দেশের মজুরশ্রেণী নাবিক হিসাবে সমস্ত ভারত ও পাকিস্তানে বিখ্যাত। চাটগাঁর নৌকার চালককে বা মাঝিকে "সাম্পানওয়ালা" বলে। নিশীথ কালে সাম্পানের মাঝির প্রিয়তমা তার প্রিয়তমের বিরহে গাইছে—

"অ ভাই, চাঁদমুখে মধুর হাঁসি।
দেবাল্যা বানাইলি সাম্পানের মাজি।
বাহার মারি যারগৈ সাম্পানরে।
ন মানে উজান ভাডি।
কুতুবদিয়ার পাছিমধারে সম্পানঅলার ঘর।
লাল বআটা তুলি দিয়ে সম্পানর উঅর।
অ ভাই চাঁদমুখে মধুর হাঁসি
দেবাইল্যা বানাইলি মোরে সম্পানার মাজি।"

কেবলমাত্র দুঃখ-দুর্দ্দশা বা প্রেমের গান নয়। নানা ব্রত ও সামাজিক গীত নানা পল্লীসঙ্গীতে শোনা যায়।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে চাষারা ক্ষেত চাষ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একবিন্দু মেঘও আকাশের বুকে নেই। দেবতা বিমুখ।

শুষ্ক ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে মেঘরাণীর কাছে চাষারা দল বেঁধে বৃষ্টি কামনা করছে—

"আয়রে মেঘরাণী মেঘ ধুই ধুই পেলা পানি।
কলাতলে গলা গলা—
কচুবন ডুবাই ফেলা।
হাল্যা তারা তের ভাই,
নল্ল ডুবাইত পানী নাই।
কালা মেঘ, ধলা মেঘ তারা সোদর ভাই।
অইন কোনাদি ঝর পেলাইদে, ভিজি অরত যাই।"

আবার অতিবৃষ্টি হ'লেও তার জন্য চাষীরা আবেদন জানায়। বসুমতীর স্নেহস্পর্শে ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলে। প্রতি আষাঢ়ের সাত তারিখে বসুন্ধরাকে ভোগ দেয় চাষারা। সমস্ত চাষীরা বসুন্ধরাকে ভোগ দেওয়ার পর গলবস্ত্রে সবার মঙ্গলার্থে এই গান গেয়ে থাকে—

"বর বর বর বসুমতীর বর
লটকাই লটকাই ধর।
পাড়াপড়শীর ভাগ্যে ধর।
অতিথ পথিকের ভাগ্যে ধর।
বসুমতীর বর।"

সমস্ত বিশ্ববাসীর হিতার্থে বর প্রার্থনা একমাত্র সরল, দরিদ্র চাষাদের পক্ষেই সম্ভব। যারা নিজেদের প্রতি বিন্দু রক্ত ক্ষরিত করে বিশ্ববাসীকে বাঁচিয়ে রাখছে—প্রতিদানে পাচ্ছে অবহেলা, অপমান ও অবিচার। ঢেঁকিতে চাল ভাঙ্গবার সময় তাদের একঘেয়ে কর্মের শ্রম লাঘব করবার জন্যও—তারা ঢেঁকি জীবনের একটি চমৎকার গান রচনা করেছে।

বিবাহানুষ্ঠান বাঙ্গালীজাতির বৈশিষ্ট্য। এই বিবাহকে উপলক্ষ্য করে, নূতন বৈবাহিকাকে উপলক্ষ্য করে, কনে সাজানোকে ও বর সাজানোকে উপলক্ষ্য করে বহু গীত আছে। এমন কি, বিবাহ উপলক্ষে যে সব স্ত্রীআচার আছে প্রতিটিকে উপলক্ষ্য করেই গান গাওয়া হয়। স্থান সঙ্কুলতা বশতঃ বিশদভাবে সেই সব গান আপনাদের কাছে পরিবেশন করা গেল না। তন্মধ্যে একটি গান মাত্র দিচ্ছি। কনেকে শ্বশুরবাড়ীতে বাজনা বাজিয়ে নেওয়া হচ্ছে তারই দৃশ্য—

"দয়াল্ল বড় মিঞার ঝি
জোরকারা বাজাইয়া যারগৈ
বারইপারা দিই।
বারইপারার মাঁইয়া পোয়া থিয়াই তঁঅসা চায়।
জোরকারার ধমকে ভইনউন চমকি আছাড় খায়।"

কেবলমাত্র আনন্দ-উৎসব নয়। জীবনখেলা সাঙ্গ হলে এ তরী যখন মৃত্যুর শমন পেয়ে পরপারে যাবার জন্য যাত্রা করে—তাকে উপলক্ষ্য করেও অনেক সুন্দর সুন্দর গান আছে।

"দিন ফুরাইল সইন্ধ্যা অইল
পথর সম্বল লইলা কি ?
গুবর মারা তেয়াগ গরি
ধজন পরিব তরাতরি।
ন গেলে তে বান্ধি নিব,
মোটা রছি গলাত দি।
পেয়াদা যারা আছে খারা,
সমন লই পিছদি।
দিন ফুরাইল সইন্ধ্যা অইল
পথর সম্বল লইলা কি ?"

মুসাফিরকে মহাযাত্রায় যেতে হ'বে। ষোল হাত ঘরে যার কুলায় নাই—তাকে সোয়া হাত কবরের মধ্যে বাস ক'রতে হবে—

"মুসাফির জঙ্গী তালাশ গর।
ডাক দিলে চলি যাবি কত কঅরের ভিতর।
ষোল হাত্যা বাশর ঘর ন কুলাইল জনমভর।
পাঁচ পাহাত্যা মাটীর ঘর,
যাইবি এগাশ্বর।
মুসাফির জঙ্গী তালাশ গর।"

এই সব শ্রমিকদের গানে এমন সব আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সুর ধ্বনিত হয়েছে—যা তাদের গভীর চিন্তাশীলতা ও মননশক্তির পরিচায়ক। পিতৃবিরহিণী অভাগী কন্যার হৃদয়বিদারক গান, ছেলেভুলানো ছড়া, হিন্দু মুসলীমের নানা ব্রত পার্ব্বণের গান, তাছাড়াও চাঁদ, ফুল, পাখী, বর্ষার ধারা প্রভৃতি ছোটখাট নানা বিষয়কে অবলম্বন করে পল্লীসঙ্গীত আছে। এই রকম বহু লোকসঙ্গীত এখনও পল্লীর নিভৃতে আনন্দের উৎসস্বরূপ রয়েছে। যদিও ব্যাকরণ, ছন্দ, ভাব ও ভাষার দিক দিয়ে এসব সঙ্গীতে অনেক ত্রুটি পাওয়া যায়। তবু এই সব গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে আমাদের দেশের নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, দুঃখী পরিজনের দৈনন্দিন জীবন কাহিনী। তাদের মানসাকাশে যে ভাবের উৎস জেগেছে—তাকেই সুরের মাধ্যমে রূপ দিয়েছে। এই ত্রুটিবহুল ছড়াগুলি চাটগাঁর শ্রমিক-সমাজের অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র। এই ছড়ার প্রতিবিম্ব দুঃস্থ শ্রমিক সমাজের যে মনোরাজ্যের পরিচয় আমরা পাই—তা হ'তে অনায়াসেই প্রতীয়মান হয় যে সুযোগ, সুবিধা পেলে এদের মধ্য হতেও গড়ে উঠত সর্ব্বহারাদের কবির দল। যে সব বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে কবিতা রচনা করে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছে—সেই প্রতিটি বিষয় প্রতিবিম্বিত হয়েছে চাটগাঁর চাষী-মজুরদের গানে। এত সাধারণ ভাষায়, স্বাভাবিক স্বরে—যে এত বড় বিষয়ে গান রচনা করা সম্ভব একমাত্র এরাই তা দেখালো, এটাই তাদের বৈশিষ্ট্য। পল্লীমায়ের মণিকোঠায় এই সব দুঃখীদের গানের মধ্যে এমনিতর কত মণিমাণিক্য লুকিয়ে আছে তা কে জানে? কিন্তু গভীরতা ও সরলতার ভিত্তিতে বিচার করে এই সব গান যে কোনও সাহিত্য-বাসরে একটু আশ্রয়ের আশা করতে পারে। চাটগাঁর পল্লীসঙ্গীতে হিন্দু মুসলীম উভয় সমাজের গান অনুরণিত হয়েছে। এক সমাজের প্রভাব যে অন্য সমাজে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে—তাও প্রকাশ পায় এই সব গানের মধ্য দিয়ে। কেবলমাত্র মজুরদলের দুঃখের কাহিনী নয়,—তাদের সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, প্রেম, বিরহ প্রকাশ পেয়েছে এই সব গানে। স্থানে স্থানে দেশীয় ভাষার সঙ্গে শুদ্ধ ভাষার সংমিশ্রণও দেখা যায় এই সব গানে। ভাষা ও ভাবের অসামঞ্জস্যতার দরুণ যদিও সাহিত্যের আসরে এই সব গানের স্থান নাই—তবু সহজ ও সরলতার দাবীতে সাহিত্যাকাশের কোন কোণে একটু স্থান হয়ত এরা পেতে পারে।

রেকর্ড-পরিচয়

'হিজ, মাষ্টার্স ভয়েস' ও 'কলম্বিয়া'য় প্রকাশিত রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82750—শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ প্রতিভাময়ী শিল্পীর কণ্ঠে দু'খানি কীর্তন "আজি গোকুল নগরে" ও "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে"—দরদী প্রকাশনায় সুন্দর।

N 82751—সুবীর সেনের গাওয়া দু'খানি আধুনিক গান "এতো সুর আর এতো গান" এবং "তোমার হাসি লুকিয়ে হাসে"—সংগীত-পিপাসুদের তৃপ্তি দেবে।

N 82752—কুমারী শ্রীলা সেন "দোলে দোলে রে চাঁদ" ও "তোমার কাছে তো কোন দিন আমি"—আধুনিক গান দু'খানি জনচিত্তজয়ী হবে।

N 87544—মাউথ অর্গানে 'পিয়ালা' ও 'বারিশ' চিত্রে দু'টি জনপ্রিয় সুর বাজিয়েছেন শিল্পী মিলন গুপ্ত।

কলম্বিয়া

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার শিল্পিগণ শ্রীযুত পঙ্কজ-কুমার মল্লিকের পরিচালনায় দু'খানি নাটিকা 'ধরার মেয়ে' GE 24845 হইতে GE 24847 এবং 'অনির্বাণ দীপ' GE 24848 হইতে GE 24850 রেকর্ডে প্রকাশ করেছেন। জনকল্যাণকর এই সেট দু'টি সকলেরই ভাল লাগবে।

GE 24857—পান্নালাল ভট্টাচার্য "তোমার মতন আমিও তো" ও "আশার খেলা এই জীবনে"—শিল্পীর দক্ষকণ্ঠে আধুনিক কালের দু'খানি আধুনিক গান।

GE 24858—কুমারী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় "মলয় আসিয়া ক'য়ে গেছে কানে" ও "সে কেন দেখা দিল রে"—নবাগতা শিল্পী ৺ডি, এল, রায়ের দু'খানি গানের অর্ঘ্য সাজিয়েছেন সার্থকরূপে।

GE 24859—কুমারী নির্মলা মিশ্র "ধূসর গোধূলি আকাশের" এবং "মনে আমার ফাগুন এলো"—দু'খানি আধুনিক গানে সংগীত-রসিকদের প্রীতি অর্জনে সক্ষম হবেন এই নবাগতা শিল্পী।

GE 30366—রেকর্ডে 'তাসের ঘর' বাণীচিত্রের দু'খানি গান "আমার গানে সুর ছিল" ও 'জ্বালিনু মিছে দীপ'—গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবীন মজুমদার।

GE 30367—'তাসের ঘর' চিত্রের অন্য দু'খানি গান "শূন্যে ডানা মেলে" ও "নীরবে যত কথা"—প্রথমখানি গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয়খানি গেয়েছেন কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন মজুমদার।

GE 30368—'সুরের পরশে' বাণীচিত্রের "আমার যে বীণা" ও "আমি নীল পরী"—গেয়েছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

এ ছাড়াও লোকরঞ্জন শাখার জনকল্যাণকর গানগুলি শ্রীযুত পঙ্কজ মল্লিক মহাশয়ের পরিচালনায় GE 24851 হইতে GE 24856 রেকর্ডে প্রচারিত হয়েছে। শচীন গুপ্ত, মৃণাল চক্রবর্তী, শ্যামল মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী উৎপলা সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সমরেশ রায়, সুরেন চক্রবর্তী, প্রীতি সেনগুপ্তা, পূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, কানাই মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিগণ এই রেকর্ডগুলিকে তাঁদের মধুর কণ্ঠে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন।

আমার কথা (৩১)

দুর্গা সেন

শুধু বাঙলা নয়, ভারতের বিভিন্ন ভাষার গানে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করে যে ক'জন বাঙালী সুনাম অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত সুরকার দুর্গা সেনের নাম অনায়াসে করা যায়। বাঙলা দেশের অতুলনীয় সঙ্গীত সম্পদের আস্বাদ এঁরা গ্রহণ তো করেছেনই, উপরন্তু বিভিন্ন ভারতীয় সঙ্গীতের রসও এঁরা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছেন।

আহীরিটোলার মথুরামোহন সেনের বংশে এঁর জন্ম হয় ১৯২০ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখে। বাবা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ সেন নিজে ছিলেন গায়ক ও কাশীমবাজার রাজবাটী প্রমুখ বহু উল্লেখযোগ্য স্থানে এঁর গায়কের খ্যাতি ছিল প্রচুর। দুর্গাদাসও বাল্যকালে বাবার কাছেই সঙ্গীতের পাঠ নেন। কুমার রাধাপ্রসাদ ইনষ্টিটিউশান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার পরই পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃদেবের তিরোধানে দুর্গাদাস দিশাহারা হয়ে পড়েন, স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও হয় যথেষ্ট ব্যাহত। গানের নেশা তখন প্রভাব বিস্তার করেছে পূর্ণমাত্রায়। কয়েকটি টিউশানী করতে থাকেন। এই সময় অনেক বাধা-বিপত্তির পর ইনি ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁর ছাত্র বরাহনগরবাসী স্বর্গীয় ভোলানাথ দের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শাহানশাহ, রেকর্ড কোম্পানী কলকাতায় শাখা সৃষ্টি করলে ইনি নিজের ছাত্রী শ্রীমতী বিভা সেন সহ একটি দ্বৈতকণ্ঠের গান রেকর্ড করেন। দুর্গাদাসের জীবনে এই প্রথম রেকর্ডিং। এই সময়ে প্রাথমিক পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সুরকার কমল দাশগুপ্তের অগ্রজ ৺বিমল দাশগুপ্ত। ব্রডকাষ্ট রেকর্ড কোম্পানী কলকাতায় শাখা খুললে, সেখানে প্রধান শিক্ষক হলেন বিমল দাশগুপ্ত, সেখানে তাঁর সহকারী হলেন দুর্গাদাস। এখানকার কর্মসচিব ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা একটি গানে সুরযোজনা করেন দুর্গাদাস। সেই প্রথম সুরকাররূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা। এর কিছুকাল পরেই বিমল দাশগুপ্তের মৃত্যু হয়।

ব্যয়-বাহুল্যের জন্য রেকর্ড কোম্পানী কলকাতার শাখা তুলে দিতে বাধ্য হলেন। এর পর সেনোলায় সঙ্গীত-শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে প্রবেশ করলেন। তার পর হিন্দুস্থানের সি, সি, সাহার ভ্রাতা হরেকৃষ্ণ সাহা 'মেলোডি' প্রতিষ্ঠা করলে, তার সঙ্গেও যোগস্থাপন করেন, মেলোডির রেকর্ডিং হোত হিন্দুস্থানেই। তার পর হিন্দুস্থানেই পুরোপুরি ভাবে যোগদান। এখানে কাজ করার সময় পরলোকগত সুর-সাধক অনুপম ঘটকের সংস্পর্শে আসেন ও এক নতুন জীবনের সোনার কাঠির স্পর্শ অনুভব করেন। পরলোকগত প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়ের বাড়ীর ষ্টুডিওতে তখন তেলেগু বিপ্রনারায়ণ ও হিন্দী টার্জন কী বেটী তোলা হচ্ছে। পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী ও রূপ. কে, শোরে। উভয় ছবিরই সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন অনুপম। তাঁর সহকারী হলেন দুর্গাদাস। তার পর চা সংক্রান্ত একটি প্রচারচিত্রে নিজে সঙ্গীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এই প্রচারচিত্রটির পরিচালক ছিলেন ভারতের এক স্মরণীয়

সন্তান শ্রদ্ধেয় মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র চলচ্চিত্র জগতের এক অবিচ্ছেদ্য পুরুষ শ্রীনিরঞ্জন পাল মহাশয়। এই জাতীয় পর পর চারখানি ছবির সঙ্গীতে সুরারোপ করেন দুর্গাদাস।

এঁর প্রথম সঙ্গীত পরিচালিত পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি 'আত্মা' (তেলেগু ভাষায় গৃহীত)। পরিচালনায় ছিলেন নিরঞ্জন পাল। পাল মহাশয় পরে এই ছবিখানির বাঙলা ভাষাতেও রূপ দেন, তাতেও সঙ্গীতের ভার পান দুর্গাদাস এবং বাঙালী দর্শকের কাছ থেকে পান প্রচুর অভিনন্দন। ছবিটির নাম ছিল 'শুকতারা' (১৯৪০ খৃঃ), এই ছবিতে এঁর সহকারী রূপে দেখা গিয়েছিল সুখ্যাত সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়কে। পাল মহাশয়ের পরবর্তী ছবি 'ব্রাহ্মণ-কন্যা'—সঙ্গীত পরিচালক দুর্গাদাসের সহকারিত্ব করেছিলেন সুরকার গোপেন মল্লিক। স্বর্গীয় সঙ্গীত-সাধক সুধীরলাল চক্রবর্তীও কণ্ঠদানের সুযোগ এই ছবিতেই সর্বপ্রথম পান। এর পর ভীষ্ম, ধাত্রীদেবতা, পোষ্যপুত্র, পথের সাথী, সন্ধ্যালী, ইন্দ্রনাথ, আঁধি, অসমাপ্ত ইত্যাদি চিত্রেও সুরকারের দায়িত্বভার এঁর উপরেও অর্পিত ছিল। 'স্বামীর ঘর' ছবিটিতে এঁর সহকারীরূপে কাজ করেছিলেন সুরজ্ঞ কালীপদ সেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে সুরকার হিসেবে দুর্গাদাস নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নেন। আকাশবাণী ও মঞ্চের সঙ্গেও এঁর নিবিড় যোগ। ১৯৪২ সালে 'নাট্য-ভারতী'তে (বর্তমানের গ্রেস সিনেমা) 'দুই পুরুষ' নাটকে সঙ্গীত পরিচালকরূপে যোগদান। নাট্য-ভারতীতে পথের ডাক, রঙমহলে নিষ্কৃতি, চাঁদবিবি, জীবন সংগ্রাম, মিনার্ভায় শ্রীমতী, কালো টাকা, পিতা-পুত্র, সারথি শ্রীকৃষ্ণ, দেবত্র, মহানায়ক শশাঙ্ক, ষ্টারে শকুন্তলা, জাতিচ্যুত, স্বর্ণমহল, রাজনর্তকী, শ্যামলী, পরিণীতা প্রভৃতি নাটকেও সুরের পরশ বুলিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে বহু জন-অভিনন্দিত ষ্টারে অভিনীত 'শ্রীকান্ত' নাটকটিতেও সুর দিয়েছেন দুর্গা সেন।

বিভিন্ন ভাষায় ইনি যত গান রেকর্ড করেছেন, তার সংখ্যা আজ অবধি প্রায় হাজারের কাছাকাছি হবে। বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানীতে সঙ্গীত-শিক্ষক থাকাকালীন যে সমস্ত খ্যাতিমান শিল্পীদের ইনি পাঠ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে—স্বর্গীয় কুন্দনলাল সায়গল, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সেনগুপ্ত, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, জগন্ময় মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও চৌধুরী, সমরেশ রায়, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, রবীন মজুমদার, অসিতবরণ, প্রদ্যোতনারায়ণ, অপরেশ লাহিড়ী, সত্য চৌধুরী, স্বর্গীয় সুধীরলাল চক্রবর্তী, গৌরীকেদার ভট্টাচার্য, তপনকুমার, অখিলবন্ধু, স্বর্গীয় মৃণালকান্তি ঘোষ, দিলীপ সরকার, ভবানীচরণ দাস, শচীন গুপ্ত, বেচু দত্ত, সুধীন চট্টোপাধ্যায় (আকাশবাণী), পান্নালাল ভট্টাচার্য, বিমলভূষণ, সি, এইচ, আত্মা, এন, এল, পুরী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, সুপ্রভা সরকার, সুপ্রীতি ঘোষ, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী মজুমদার, ভারতী বসু, বাঁশরী লাহিড়ী, সাবিত্রী ঘোষ, গায়ত্রী বসু, বেলা মুখোপাধ্যায়, মীরা চট্টোপাধ্যায়, রত্না গুপ্তা (পরিচালক হেমেন গুপ্তের স্ত্রী), কুসুম গোস্বামী, রাধারাণী দেবী, বাণী ঘোষাল, গৌরা মিত্র, রমা মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীতোপাসক দুর্গাদাস সেনের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল খেলাধূলায়, সাঁতার কাটায় তাঁর ভীষণ সখ। ভ্রমণের মধ্যেও তিনি পেয়ে থাকেন অপার আনন্দ।

দুর্গা সেন

র ঙ্গ প ট

লোকমান্য তিলক : প্রামাণ্য ছায়াচিত্র

লোকমান্য তিলকের জীবনী অবলম্বন করে ভারত সরকার একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে সারা ভারতকে তা উপহার দিয়েছেন। দীর্ঘ দিনের পরাধীনতার অবসানকল্পে ভারতের সন্তানদের অবদানের ইতিহাসে লোকমান্যের একটি বিরাট আসন সংরক্ষিত। লোকমান্যের নেতৃত্বে সেদিনকার ভারতবর্ষ পেয়েছিল একটি সত্যিকারের পথের নিশানা। সাংবাদিক তিলকের নির্ভীক লেখনী সেদিন গঠন করেছিল ভারতের জনমত। শুধু তাই নয়, প্রায় চল্লিশ বছর আগে ভারতের রাজনৈতিক গগনে ঐ পশ্চিম ভারতেই যে সন্তানের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁর আদর্শ ও নেতৃত্বের তুলনায় তিলকের নেতৃত্ব ও আদর্শ অনেক উঁচুদরের এবং সুফলপ্রসূ। তিলক ভারতে সত্যিকারের প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, ভারতের বুকে নির্জীবতা ও ক্লৈব্যের প্রলেপ বুলিয়ে দেওয়ার জন্যে কোন বিদেশী শক্তি তাঁকে নিযুক্ত করবার মত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করতে পারেনি। 'মহাত্মা'-আখ্যার উপযুক্ততম অধিকারী তিলকের উদ্দেশে আমরা প্রণাম নিবেদন করি।

আমাদের বর্তমান বক্তব্য এই চিত্রটির নির্মাতাদের প্রতি। তিলকের জীবনী উপহার দিয়ে তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। তবে একটা কথা উল্লেখ করি। ছবিতে যখন তিলকের জীবনীর সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলোও দেখানো হ'ল—জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডও দেখানো হ'ল—সেই সময় রবীন্দ্রনাথের নাইট-হুড ত্যাগ ভারতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ভারতের নব রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের অবদান এই অকৃতজ্ঞের দল এবং অকৃতজ্ঞ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ভারত সরকার অস্বীকার করলেও মহাকাল তা চিরদিনই স্বীকার করে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছাড়া ভারতের আর কোন প্রদেশে কবি-রবির জন্মদিন সরকারী ছুটির দিন বলে গণ্য করা হয় না অথচ রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'ভারততীর্থ' আখ্যা পেয়েছে সে কবিতার নাম বঙ্গতীর্থ হয়নি। তিলকের সমকালীন অনেক ঘটনাই দেখানো হয়েছে বা সে সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, অস্বীকার করব না—বাঙালী সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল ও শ্রীঅরবিন্দের প্রতিকৃতিও স্থানলাভ করেছে—জালিয়ানওয়ালাবাগও দেখানো হ'ল অথচ রবীন্দ্রনাথ নেই—আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই দেশবন্ধুও অনুপস্থিত। এ তাঁদের ইচ্ছাপূর্বক বাদ দেওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে? পরিশেষে নির্মাতাবৃন্দকে এইটুকুই বলি যে অকৃতজ্ঞতার আর নির্লজ্জতারও সীমা আছে একটা।

কাঁচামিঠে

বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার চিত্রজগতও সমানভাবেই পুষ্ট হয়েছে জ্যোতির্ময় রায়ের কল্যাণে। সুসাহিত্যিক জ্যোতির্ময় রায়ের লেখনীপ্রসূত উদয়ের পথে ও অল্পকাল আগে প্রদর্শিত তাঁরই লেখনীপ্রসূত ও পরিচালিত কাহিনী 'টাকা-আনা-পাই' চিত্রলোকে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। তাঁর বর্তমান অবদান 'কাঁচামিঠে'। দুটি তরুণ ও দুটি তরুণীকে মুখ্যত: কেন্দ্র করে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। একটি ঘর ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে এদের চরিত্রের ও কর্মধারার বিকাশ। এদের অল্পবয়সের হালকা দুষ্টুমীর, নরম মনের আদান-প্রদান, অপরিপক্ক চিত্তের ঘাত-প্রতিঘাত, ভাবধারা-বিনিময় গল্পের প্রধান উপজীব্য ও যথেষ্ট আনন্দ দিতে সক্ষম হয়। কাতুকুতু খেয়ে হাসতে হাসতে বাঙলাছবির দর্শকবৃন্দ যখন হাসির ছবি সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েন সেই সম্বন্ধে কাঁচামিঠের মত হাসির ছবি তাঁদের বিরক্তিকে পরিণত করবে তৃপ্তিতে। বদলে দেবে স্বাদ। ছবিটি হাসিরই ছবি অথচ কাতুকুতু দিয়ে হাসানোর প্রচেষ্টা এতে এতটুকু নেই—বরং স্বচ্ছতা ও সাবলীলতায় এ ভরপুর।

প্রধানাংশে দেখা দিয়েছেন রবীন মজুমদার, অনুপকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও তপতী ঘোষ। এঁরা চরিত্র-চতুষ্টয়ে যথাযোগ্য রূপদান করতে কৃতকার্য হয়েছেন। অনুপ-সাবিত্রীর বাবার ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, সাবিত্রীর প্রণয়াকাঙ্খীরূপে জীবেন বসু, ভৃত্য-বেশী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীনের পাণিপ্রার্থিনীরূপে বিনতা রায় ও ছবি বিশ্বাসের সহধর্মিণীর ভূমিকায় রেণুকা রায়ের অভিনয় অপরিসীম প্রশংসার দাবী রাখে। এ ছাড়া অভিনয়াংশে আছেন মিহির ভট্টাচার্য, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, শুক্লা দাস প্রভৃতি। সুহৃদ ঘোষের চিত্রগ্রহণ ও রাজেন সরকারের সঙ্গীত-পরিচালনাও ভাল লাগবে। সবার শেষে, জ্যোতির্ময় বাবুকে সর্বাঙ্গীন অভিনন্দন জানিয়ে এবং পূর্বাহ্নে তাঁর আগামী অবদানগুলির সাফল্য কামনা করে বলি কাঁচামিঠে ভাল ছবি হয়েছে একথাও যেমনই সত্যি, তেমনই কাঁচামিঠে যে টাকা-আনা-পাইএর ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারে নি একথাও অনস্বীকার্য।

মমতা

বাঙলা দেশের সমাজজীবনে সংমার আসনটি খুব নিরাপদ নয়। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিসেবে সে স্বামীর যেমনই মাথার ভূষণ হয় আবার সতীন-পোর সংমা হিসেবে অপরের চোখে তাকে মোটেই ভাল দেখায় না। অবশ্য এরও যে ব্যতিক্রম নেই এমন কথা বলা যায় না। বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখেছি, কোন এক সংমা তাঁর সতীনপোকে যে চোখে দেখতেন বোধ করি তাঁর সেই স্নেহ তাঁর নিজের সন্তানও পায় নি। শেষোক্ত-পর্য্যায়ের কোন এক সংমাকে কেন্দ্র করে 'মমতা'র কাহিনী রচিত। মমতা স্বামী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পেল তার চার মাসের মাতৃহারা সপত্নীকন্যাকে। কিছুকাল পরে দেখা গেল সে কালা ও বোবা, সকলে ধারণা করল সংমার বিষ-দৃষ্টিতে শিশুর এই পরিণতি। মমতার ব্যথা কিন্তু আর কেউ বুঝল না, সে চাইল স্কুলে দিয়ে রাধার মুখে 'মা' ফোটাতো স্বামী প্রতাপ

এবার বেঁকে বসল। তাঁর সম্মানবোধ তাকে টেনে রাখল, ফলে রাধাকে নিয়ে মমতার গৃহত্যাগ, তাকে স্কুলে ভর্তি করা, অশেষ যত্নে তার মুখে কথা ফোটানো, প্রতাপের আগমন, ভুল বোঝাবুঝি পরে রাধার মুখে 'মা' শুনে প্রতাপের অভিমান বিসর্জন ও মধুর মিলন। এই জাতীয় অভিনব বক্তব্যকে চলচ্চিত্রের রূপ দিয়ে তাকে সর্বজন সমক্ষে উপস্থাপিত করার প্রয়াস অভিনন্দন-যোগ্য সন্দেহ নেই। তবে কয়েকটি ভুলত্রুটি ছবিটির সাফল্যে অনেকখানি কুঠারাঘাত করেছে। বাঙালী-সমাজে স্ত্রীর মৃত্যুতেও সাধারণতঃ এক বছর কালাশৌচ পালন করা হয়, এখানে দেখলুম লক্ষ্মীর মৃত্যুর চার মাস পরেই প্রতাপ মমতাকে বিবাহ করছে, রাধা সত্যিই কালা কি না পরীক্ষা করার জন্যে প্রতাপ যখন চীৎকার করে 'রাধা-রাধা' করে ডেকে জিনিষ-পত্তর ভাঙতে আরম্ভ করল বাড়ীর আর কেউ সেখানে উপস্থিত হ'ল না। মাষ্টারের সমস্ত টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কর্তাদের উপযুক্ত উত্তর দেওয়া কল্পনায় ভাল মানায় সত্যি, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেটা কতটা সম্ভব—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ নেই কি? সুবীরের তার বাবাকে বিশেষ মনে পড়ে না—পরে শুনলুম সে পিতৃবিয়োগের পরই মাষ্টারী করতে শুরু করে। উপরিউক্ত উক্তিগুলি পরস্পর-বিরোধী নয় কি? যে ছেলে মাষ্টারী করতে পারে তার বাবাকে মনে রাখার মত সে সময়ে তার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। সুবীরের ঘরে যেখানে স্বর্গীয় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর মূর্তি বসানো আছে সেখানে কি কোন বঙ্গ সন্তানের মূর্তি বসানো যেত না? যে ঘটনার উল্লেখ করে সেই মূর্তি দেখানো হয়েছে সেই ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথের মূর্তি কি সেখানে খাপ খেত না? ভারতের রাজধানীসহ সমস্ত প্রদেশগুলিতে বাঙালী মনীষীরা কতটুকু সম্মান আজ পাচ্ছেন? বাঙালী বলে পরিচয় দিয়ে বাঙলার অসংখ্য যুগমানবদের উপেক্ষা করার মত অমার্জনীয় অপরাধ আর নেই। আর একটি ভয়ানক ভুল চোখে পড়ে—যেদিন প্রতাপ রাধাকে পরীক্ষা করছে সেদিনও দেখি, সে শিশু পরের দিনই জন্মতিথির আসরে তাকে দেখি যে একটি রাতেই তার বয়েস প্রায় বছর তিনেক বেড়ে গেছে। বাঃ আশ্চর্য!

অভিনয়ে সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন বেবী রাধা। মূক ও বধিরের অভিনয় করার সঙ্গেই সমস্তই চোখে মুখে রাধা যে একটি বিরাট শূন্যতা ফুটিয়ে তুলেছে তাতে

তার ভবিষ্যৎ শিল্পিজীবনের ঔজ্জ্বল্যেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর পরেই প্রশংসা পাবেন দীপক ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। পরস্পর বিরোধী দুটি চরিত্রের পাশাপাশি সংস্থাপন উভয়েরই প্রতিভা স্ফুরণের সহায়ক হয়ে উঠেছে। এঁদেরই সঙ্গেই মঞ্জু দের নামও উল্লেখনীয়। তিনিও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বোম্বাইয়ের বলরাজ সাহনী এই প্রথম বাঙলায় অভিনয় করলেন! অভিনয় তিনি ভালই করেছেন, তবে তাঁর অভিনয় মনে দাগ রাখতে সক্ষম হয় না। এ ছাড়া রূপায়ণে আছেন অমর মল্লিক, ডাঃ হরেন, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, ছবি ঘোষাল, তপতী ঘোষ, অপর্ণা দেবী, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, রেবা দেবী, আশা দেবী, মায়া ভট্টাচার্য, শান্তা দেবী প্রভৃতি। মমতার শেষ দৃশ্যটি প্রত্যেকটি দর্শককে অভিভূত করে তুলবে সন্দেহ নেই।

বসন্তবাহার

ছায়াছবির মধ্যে দিয়ে সাধারণের মধ্যে সঙ্গীতকে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়ে যে কটি ছবি এসেছে তাদের মধ্যে বিকাশ রায়ের প্রয়াস যেমনি মহৎ ও তেমনই সার্থক, এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ করছে বসন্তবাহার। সঙ্গীতের রস-আস্বাদনাভিলাষী দর্শক সাধারণকে পরম পরিতৃপ্তির খোরাক জুগিয়েছে বসন্তবাহার। সুর, তান, রাগের মোহনীয় ইন্দ্রজাল বিস্তার করে বিমুগ্ধ করে রাখে দর্শক সাধারণকে সঙ্গীতধর্মী এই চিত্রটি। গানের ছবি হিসাবে বসন্তবাহার অতুলনীয় ঠিকই তবে গান বাদ দিয়ে বসন্তবাহারের সমালোচনা করলে পূর্বোক্ত মতটি ঠিক পোষণ করা যায় না। কাহিনীকার অনিলবরণ ঘোষ বয়েসে তরুণ, তাঁর লেখায় স্নিগ্ধতা আছে, আছে আন্তরিকতা। তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্য-জীবনের আমরা সাফল্য কামনা করি। কাহিনীর প্রথমার্দ্ধ বেশ একরকম যায় তারপরই শুরু হয় মিনিটে মিনিটে অতি নাটকীয়তা। আবেগের প্রাবল্য নাট্যরস সৃষ্টির পক্ষে সহায়কও যেমনই আবার নাটকের গভীরতাকে হত্যা করে এই অতি আবেগ প্রবণতাই। শেষের দিকের ঘটনাগুলিকে খাপছাড়া বললেও অত্যুক্তি হয় না। তরুণ সঙ্গীতসাধক জয়ন্ত মুগ্ধ হয় মুন্নাবাঈয়ের গানে, সে তাঁর শিষ্যত্ব নেয় কিন্তু তাঁর কাছে পায় কথায় কথায় আঘাত, অবজ্ঞা ও অপমান। তাঁর মেয়ে লতার সঙ্গে জয়ন্তের হয় মন বিনিময়। মুন্না লতার বিয়ের ঠিক করে এক কুমারবাহাদুরের সঙ্গে। জয়ন্ত ফিরে আসে এদিকে লতাও কুমার বাহাদুরের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিয়ে ও নিজের পিতৃ পরিচয় পেয়ে সকলে মিলে চলে আসে নিজেদের দেশে। মুন্নারও জীবনের ধারা যায় বদলে। বাঈজী হয়ে যায় গৃহস্থ-গৃহিণী। এদিকে লতার স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ায় নিজের গায়েহলুদের মণ্ডপ ত্যাগ করে যায় জয়ন্ত, সঙ্গে সঙ্গে করে দেশত্যাগ, লতাকে সে খুঁজে বেড়ায়। নানা ঘটনার পরে মায়ের মৃত্যুর পর লতা যখন চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন সেই সময় ঘটনাচক্রে জয়ন্তের সঙ্গে লতার হয় পুনর্মিলন। নিজের বিয়ে ভেঙ্গে গৃহত্যাগ করল জয়ন্ত তারপর তার বাবার সম্বন্ধে পরিচালক নীরব। অর্থাৎ জয়ন্তের এই গৃহত্যাগ তার পরিবারে কি ফল প্রসব করল সে সম্বন্ধে কিছুই জানা গেল না। পিয়ারীলাল চরিত্রটি ভাল সন্দেহ নেই, তবে নতুনত্বের কোন ছাপ নেই কারণ এই। জাতীয় চরিত্র এর আগে আরও দু'-একজন স্বনামধন্য পূর্বসূরীদের লেখনীতে আবির্ভূত হয়েছে তবু পরিবেশের গুণে চরিত্রটি বড় ভাল লাগে। যে কুমার দু'দিন বাদে জামাই হতে যাচ্ছে মুন্নার তখনও তাকে 'আপনি-আজ্ঞে' করা ভাল লাগে কি? চিঠি লিখে জয়ন্ত চাকরকে দিচ্ছে—শুধু চিঠিটিই —তা খামে ঠিকানা লেখা বা তা জোড়া বা তাতে ডাকটিকিট লাগানো কি চাকরের দ্বারা হবে? ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মায়া ভট্টাচার্যের চরিত্র দুটি অনাবশ্যক সৃষ্টি মাত্র। ও চরিত্র দুটি কাঁচিছাঁটা করলে কোন ক্ষতি হোত বলে মনে হয় না।

অভিনয়ে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন বিকাশ রায়। ধরতে গেলে তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে ছবির গায়ে সত্যিকারের বসন্তের ছোঁয়া লাগল। বড় দরদ দিয়ে চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। তারপরই প্রশংসা পাবেন সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুন্নাবাইএর দম্ভ, আত্মগরিমা আবার লক্ষ্মীর অর্থদৈন্য, বাঙালী-সুলভ সহজ রূপটি সমান নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। অভিনন্দন-যোগ্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন অসাধারণ শক্তিসম্পন্না অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। নায়ক বসন্ত চৌধুরীর অভিনয় জড় না হলেও স্বাভাবিক নয়, স্বতঃস্ফূর্ত নয়, স্বচ্ছ নয় তবে স্থানে স্থানে তাঁর শক্তির আভাস পাওয়া যায়। প্রাণস্পর্শী অভিনয়ে দর্শককে মাতিয়ে তোলেন অপর্ণা দেবী। পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী ও শ্যাম লাহার অভিনয়ও প্রশংসনীয়, বহুদিন বাদে প্রতাপ মুখোপাধ্যায়কে দেখা গেল। কণ্ঠশিল্পীর কণ্ঠের সঙ্গে চমৎকার ভাবে ওষ্ঠ মিলিয়েছেন প্রতাপ মুখোপাধ্যায়। শ্রীলা চট্টোপাধ্যায় (ওরফে সুমালা চট্টোপাধ্যায়) এখনও স্বাভাবিকতাকে আয়ত্তে আনতে পারেন নি, তবে তাঁর সম্ভাবনা প্রশস্ত। এ ছাড়া রূপায়ণে আছেন—শ্রীপতি চৌধুরী, সৌরেন ঘোষ, প্রীতি মজুমদার, বেচু সিংহ, ভানু রায়, অনুশীলা, সীতা সেনগুপ্তা, শুক্লা দাস, নিভাননী দেবী, সন্ধ্যা দেবী, মায়া ভট্টাচার্য, আশা দেবী প্রভৃতি। এ ছবিতে ভারতের বহু বরেণ্য সুরসাধকের সমন্বয় ঘটেছে, সে কথা কারোরই অবিদিত নেই। প্রাণভরা অভিনন্দন জানাই জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষকে। প্রশংসার দাবী করতে পারেন চিত্রশিল্পী অনিল গুপ্ত। আবার বলি গানের ছবি হিসেবে বসন্তবাহার অতুলনীয় এবং এই ছবি উপহার দেওয়ার জন্যে বিকাশ রায় নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

সঙ্গীত-সাধক দিলীপকুমার সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-জগতেও একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষ। দিলীপকুমারের দরদভরা কণ্ঠ, তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বিভিন্ন ভাষায় তাঁর অনায়াস অধিকার বাঙলার গৌরবেরই বস্তু। চলচ্চিত্রে এবারে তাঁকে প্রথম দেখা যাবে সুধীরবন্ধু পরিচালিত 'মাথুর' চিত্রে। দিলীপকুমারের পরিচালনায় এই ছবিতে ধনঞ্জয়, সতীনাথ, গোবিন্দগোপাল, ধীরেন বসু, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ শোনা যাবে। পর্দায় দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, ইন্দ্রনাথ, ওঙ্কারনাথ, দেবযানী অনুভা গুপ্তা, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, শিখা বাগ, যূথিকা চক্রবর্তী প্রমুখ

ভিনয়-শিল্পীদের। *** ভারতের চলচ্চিত্রলোকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ...ক নীতীন বসু বর্তমানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'কে ...ির রূপ দিতে ব্যস্ত। হরিপ্রসন্ন দাশ সঙ্গীতের ভার পেয়েছেন। ...াগতা রীতা রায় সহ অভিনয়াংশে আছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায় বসন্ত ...ধুরী, অসিতবরণ, উৎপল দত্ত, মঞ্জু দে, ভারতী দেবী প্রভৃতি। ** মহাকবি মধুসূদনের ব্যঙ্গরসাশ্রয়ী রচনা 'বুড়ো শালিকের ...ড়ে রোঁ'কে চিত্রায়িত অবস্থায় শীঘ্রই দেখা যাবে, সেই ...ঙ্গ এই ছবিতে দেখা যাবে জীবেন বসু, সুনীল দাশগুপ্ত, ...সী লাহিড়ী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, ...লসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, আরতী ...স, অমিতা বসু, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতিদের। *** কমল ...ঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'ওগো শুনছো'র ভূমিকালিপিতে আছেন ...হর গঙ্গোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অজয়কুমার ...নু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, ডাঃ হরেন, ...দ্মা দেবী, মঞ্জু দে, শোভা সেন, জয়শ্রী সেন, মলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ...ক্লা দাস প্রমুখ শিল্পিগণ। ক্যামেরা ও সুরের ভার পেয়েছেন ...থাক্রমে অনিল গুপ্ত ও বাগচি। *** খ্যাতিমান কবি বিমল ...াসের 'মুখোস' কাহিনীটি চিত্রায়িত হচ্ছে মানু সেনের পরিচালনায়। ...র দিচ্ছেন তরুণ শিল্পী শ্যামল মিত্র। বিভূতি চক্রবর্তী ঘোরাচ্ছেন ...্যামেরার হাতল। চরিত্রগুলিতে রূপ দিচ্ছেন—ছবি বিশ্বাস, কানু ...ন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ...ঞ্জু দে, অপর্ণা দেবী ও নবাগতা বাসবী প্রমুখ শিল্পীরা। *** ...য়ঃকনিষ্ঠতম পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ছবি 'জন্মান্ত...' ...তে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, অসিতবরণ, ...র্মলকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, ...রুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, রেণুকা রায়, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালক-জীবনের আমরা সর্বাঙ্গীন ...মনা করি। ছবিটি প্রযোজনা করছেন শ্রীমতী রেখা দেবী মহাশয়া।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

হাস্যকৌতুক অভিনেতা শ্রীজহর রায়

হাস্যকৌতুক অভিনেতা হিসেবে শ্রীজহর রায় একটি বিশিষ্ট স্থান ...ধিকার করে আছেন আজকের দিনের বাংলা মঞ্চ ও চিত্রজগতে। ...সত্যি এক অদ্ভুত শিল্পী ইনি, যখন তখন হাসি ও আনন্দের উপাদান ...সৃষ্টিতে তাঁর এতটুকু বাধে না। এক কালের সিরিয়াস অভিনেতা কি ভাবে নিজেকে কমেডিয়ান করে তুললেন, সে অবিশ্যি জ্ঞানবার ...্যাপার। কিন্তু কমেডিয়ান জহর রায়কে আমরা যখন পেলুম—তখন বিস্মিত না হ'য়ে পারলুম না। অভিনয়-কলার একটা নোতুন ...দিক যেন খুলে গেল আমাদের সম্মুখে।

এরই মধ্যে এই স্বনামধন্য শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলো আমার ...তাঁরই বাসকক্ষে। সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা—তাঁর অভিমত জানা। আলোচনা আরম্ভ হলো, আমার এক একটি প্রশ্নের উপর চলল তাঁর উত্তর।

১৯৪৭ সালের 'পূর্ব্বরাগ' ছবিতে ঘটেশ্বরের ভূমিকায় আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ, বললেন শ্রীজহর রায় ধীরে ধীরে আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে।—"কোন ছবিতে এবং কোন ভূমিকায় অভিনয় করে আমি সবচেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি, বলা হয় তো একটু কঠিন। তবে তপন সিংহ পরিচালিত 'উপহার' ছবিতে ভোলার চরিত্রে অভিনয় করে আমার খুব ভাল লেগেছে এইটি না বলে পারবো না। এর একটা প্রধান কারণ ভোলা চরিত্রটিতে আমার মনের খোরাক খুঁজে পেয়েছিলাম। অন্য সব ছবিতে সাধারণতঃ মনের সঙ্গে মিলিয়ে এমনটি পাওয়া যায় না। ফলে অভিনয় করে আশানুরূপ তৃপ্তি সব সময় পাওয়া যায় না।"

চলচ্চিত্র জগতে যোগদানে প্রথম প্রেরণা পান আপনি কোথায় এবং এতে যোগদানের কারণ কি? ধীর কণ্ঠেই উত্তর করলেন শ্রীজহর—"অভিনয় করবার প্রেরণা পাই ছোটবেলাতেই এবং সে আমার বাবার কাছে। বাবা চলচ্চিত্রের নির্ব্বাক যুগে অভিনয় করতেন এবং রঙ্গমঞ্চেরও তিনি ছিলেন একজন কুশলী অভিনেতা। বাবার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে আমার মনে প্রবল ইচ্ছা জাগে আমিও অভিনেতা হ'বো, যোগ দেব চলচ্চিত্রে। এ লাইনে আসবার গোড়াকার কথা হিসেবে এইমাত্র বলতে পারি। এতে যোগদানে ব্যক্তিগত প্রশ্ন বা আপত্তি মনে আমার কখনই উঠেনি বা ছিল না। ছবিতে আত্মপ্রকাশের পরও সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে আমার কোনই পরিবর্ত্তন আসেনি, এটুকুও বলতে পারি।"

এর পর আমার প্রশ্ন থাকলো সাধারণতঃ আপনার দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী কি? এবং আপনার কোন বিশেষ হবি আছে কি না?

শ্রীরায় উত্তর করলেন—"দৈনন্দিন কর্ম্মসূচীর মধ্যে খুব একটা
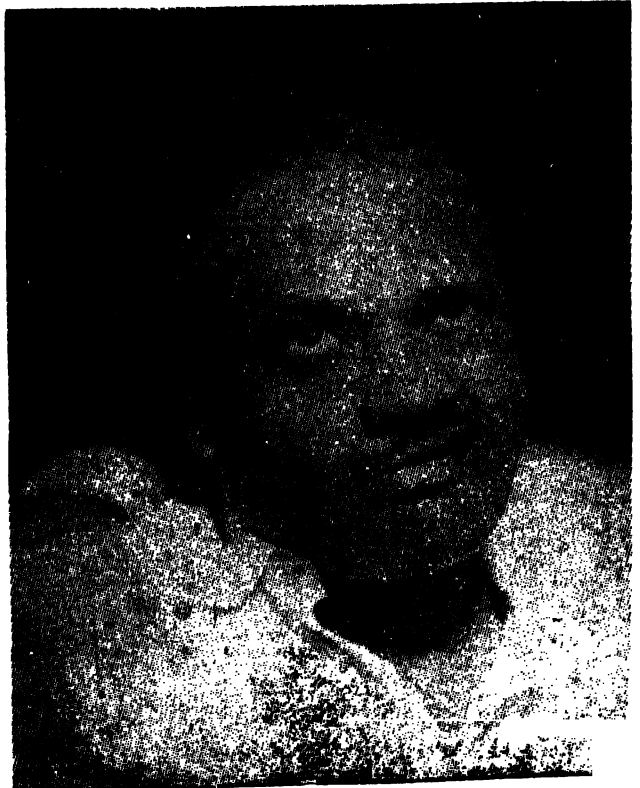
শ্রীজহর রায়

নোতুনত্ব নেই। স্যুটিং থাকলে সকাল ৯টার মধ্যে ষ্টুডিওতে বেরিয়ে যাই। স্যুটিং শেষে বাড়ী ফিরে বইপত্তর পড়ি। যেদিন স্যুটিং থাকলো না সে দিন আর কাজ কি? ঘরে বসে শুধু পড়াশুনো। ভাল ইংরেজী ছবির সন্ধান পেলে দেখতে যাই। থিয়েটারে যেদিন অভিনয় থাকে সেদিনগুলোতে স্যুটিং সেরেই সেখানে চলে যাই।"

হবি সম্বন্ধে কোনটাকে বলবো, শ্রীজহর বলে চলেন। "পুঁথি পুস্তক পড়তে আমার বেশ ভাল লাগে এবং এই নিয়ে আমি অনেক সময় কাটাই, এই মাত্র বললুন। humour ও satire নিয়ে যে সব বই deal করে, সেগুলো আমার কাছে খুবই প্রিয়। পত্রপত্রিকাও আমি পড়ে থাকি নিয়মিত। এর ভেতর নাম করতে পারি সাপ্তাহিক দেশ ও মাসিক বসুমতী। দৈনিক পত্রিকা প্রায় সবগুলিই আমি পড়ে থাকি। খেলার দিকেও আমার একটা ঝোঁক আছে। ফুটবল ও ক্রিকেট আমার খুব প্রিয় এবং স্কুল ও কলেজ জীবন থেকে এ আমি খেলে আসছি।"

—চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন?

শ্রীরায়ের কণ্ঠে স্পষ্ট উত্তর—"প্রথমেই চাই সুন্দর চেহারা। শিল্পীর চোখ-মুখ expressive হওয়া অত্যাবশ্যক। আর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে সুকণ্ঠ ও অনুপম বাচনভঙ্গী। টাইপ চরিত্রে অভিনয় অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এর জন্য পড়াশুনোও থাকা চাই প্রচুর। সহজ কথায় প্রতিষ্ঠাকামী শিল্পীকে জ্ঞান সঞ্চয় করতে হ'বে বহু বিচিত্র চরিত্র সম্পর্কে।" আমার পরবর্তী প্রশ্ন—ভাল ছবি তৈরী করতে হলে কি করা প্রয়োজন?

"—ভাল ছবির জন্য ভাল গল্প চাই, এইটি আমি প্রথমেই বলবো। বিশেষ ভাবে আরও চাই গল্পানুযায়ী চরিত্র নির্বাচন। সুদক্ষ পরিচালক হলে এ কাজটি কঠিন হবার নয়। নোতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও কালের চাহিদা অনুযায়ী গল্প নির্ব্বাচন করতে হ'বে। এ ব্যাপারে প্রযোজকদের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী দরকার হলে না পাল্টালে চলবে না। দেশ ও সমাজের চাহিদাও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ছবি নির্ম্মিত হওয়া সমীচিন। সবচেয়ে বড় কাজ যে ছবি হ'বে সেটি সকলের বোধগম্য হওয়া দরকার। এ জন্য যদি কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারের ও প্রয়োজন হয়, তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হ'বে। ছবির উৎকর্ষসাধন করতে হলে প্রযোজকদের উচিত হবে শক্তিশালী পরিচালকদের উৎসাহ দান।"

ষ্টার থিয়েটারে শ্রীকান্ত নাটকে জহর গাঙ্গুলী

—চলচ্চিত্রে শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েদের যোগদান সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

"—শিক্ষিত অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েরা যত বেশী এ লাইনে যোগদান করবেন, ততই এ শিল্পের নিশ্চিত উন্নতি, এটি সহজেই বলা যায়। যোগদান বলতে নিছক এ লাইনে আসাই নয়, সঙ্গে থাকতে হ'বে অব্যাহত সাধনা ও সজীব শিল্পিমন।"

আলোচনা ক্রমে অনেকটা এগিয়ে চললো। এবারে আমি জানতে চাইলুম শ্রীরায়ের কাছে—সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায় এবং এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার ধারণাই বা কি?

শ্রীরায় দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করলেন, "সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান বহু উঁচুতে। এর মাধ্যমে চলিত অবস্থা-ব্যবস্থার অনেক কিছু সংস্কার করা চলে। এজন্য satirical ছবি বিশেষ ভাবে গড়ে তোলা দরকার, অন্ততঃ আমার এই অভিমত। এই শিল্পের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ, তবে সরকারকে এজন্য কতকগুলো দায়িত্ব পালন করতে হ'বে। সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে চলচ্চিত্রের ক্রমোন্নতি না হয়ে পারে না। সুখের বিষয়, আজকাল ভাল ছবি তৈরী করবার একটা tendency এসেছে এবং সরকারও নিজ অর্থ-ব্যয়ে দু'-একটি ছবি করছেন।"

শেষ পর্য্যায়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনার প্রথম জীবন কি ভাবে কাটে এবং ভবিষ্যৎ জীবনই বা কি ভাবে কাটাতে চান?

অত্যন্ত সহজ গলায় উত্তর করলেন জহর রায়—"বরিশালে আমার জন্ম হলেও পাটনাতে কাটে আমার স্কুল ও কলেজ-জীবন। পড়াশুনো শেষ করে প্রথমে আমি ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশ করি। মনে মনে ছিল অভিনয়-জগতে যেমন করেই হোক আসবো। কিন্তু প্রথমেই সে সুযোগ মেলে নি। এ ভাবে কিছুকাল কাটাবার পর এক দিন চলে এলুম কলকাতায়, বাড়ীতে কাউকে না জানিয়েই। সে আমি ১৯৪৪ সালের কথা। তখন আমার দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল, এ লাইনে আসবই এবং প্রতিষ্ঠাও অর্জ্জন করবো। প্রথমে আমি serious অভিনয়ই করতুম কিন্তু যখন বুঝলুম যে, এ ভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে বিলম্ব হবে তখন comedian হিসেবেই অভিনয় আরম্ভ করি। এ লাইনে স্থায়ী আসন পাবার প্রথম পর্য্যায়ে যাঁরা আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের ভেতর রয়েছেন অভিনেতা ... চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক অর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জী ও বিমল রায় এবং ... পর্য্যায়ে তপন সিংহ। এঁদের উৎসাহ ও প্রেরণায় আমার শিল্পিজীবন গড়ে উঠেছে, এ কথা আমি অকুণ্ঠ ভাবে স্বীকার করি। এখন অবধি আমার জীবনের পরিচয় এইমাত্র। ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে নিশ্চয় করে এখনই কিছু বলা চলে না। তবে শিল্পী আমি, শিল্পী হিসেবেই আমি কাটাতে চাইব বাকী জীবনটা।"

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

চার জন সম্পর্কে

প্রীতিভাজনেষু

'মাসিক বসুমতীর' বিগত সংখ্যায় আমার জীবন-কথা সম্পর্কে যে সচিত্র বিবরণী বাহির হয়েছে, তার জন্য সম্পাদক হিসাবে আপনাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই জীবনকথার যিনি লেখক তাঁহাকে আমার প্রগাঢ় সাধুবাদ জানাবেন, লেখাটির ভিতর দরদ ও প্রীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'মাসিক বসুমতীর' সঙ্গে প্রথম তরুণ বয়স হইতে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং যোগসূত্র নানা দিক দিয়ে, সেই প্রীতির সম্পর্ক আরও গাঢ় হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লেখাটির ভিতর অনবধানতা বশতঃ কিছু ভুল (বোধ হয় ছাপার ভুল) আছে। পরবর্তী সংখ্যায় সংশোধন করিলে বাধিত হইব। যেমন যুগান্তর ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৯৪৭ নহে এবং ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ৬ মাসের পরেই আমার নাম সম্পাদক হিসাবে ঘোষিত হয়—১৯৪৮ সালে নহে। আনন্দবাজার পত্রিকায় ১০ বছরের মধ্যেই আমি সহকারী সম্পাদক (Asstt. Editor)পদ লাভ করিয়াছিলাম, ১২ বছরের মধ্যে নহে।

ভবিষ্যৎ reference'এর জন্য তারিখের দিক দিয়া এই ভুল সংশোধন বাঞ্ছনীয়। যদিও নিজের কথা উল্লেখ করা শিষ্টাচার-সম্মত নয়, তবু কৌতূহলী পাঠকদের জন্য আরও দুটি কথা লিখিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। যেমন বক্তা হিসাবে আমার জনপ্রিয়তা। এই কমিউনিষ্ট-অকমিউনিষ্ট দেশ সহ সারা পৃথিবী পরিক্রমা। আধুনিক বাঙ্গলার সম্পাদকদের মধ্যে আমিই প্রথম সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা দুনিয়ার বৃহত্তম অংশ পরিভ্রমণের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছি। বাঙ্গালা কাগজের একজন সম্পাদকের পক্ষে ওই সুযোগ লাভ সম্ভবতঃ উল্লেখযোগ্য। আপনি যাহা ভালো বিবেচনা করেন, করিবেন। পুনরায় আমার প্রীতি ও ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি। ইতি আপনাদের শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং প্রসঙ্গে প্রতিবাদ

আপনার সম্পাদনায় ১৩৬৪ সালের আষাঢ় মাসের "মাসিক বসুমতী"র যে সংখ্যাটি বাহির করেছেন তা'র ৩৭০ পাতায় শ্রীদেবব্রত ঘোষ মহাশয়ের লেখা প্রবন্ধ 'এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং' তার চতুর্থ লাইনে ঘোষ মহাশয় জানাচ্ছেন "বাড়ীটি ১৪১০ ফিট উঁচু ও ১০২ তলা।" অথচ সুকুমার সরকার বি-এ মহাশয় লিখিত ও মডার্ণ বুক এজেন্সী দ্বারা প্রকাশিত "বুক অব নলেজ" নামক বই-এ ৪৪ পাতায় দেখছি লেখক জানাচ্ছেন, "সর্ব্বসমেত এই বাড়ীতে ৭৫ তলা আছে এবং ইহার উচ্চতা ১০০০ ফুট," ইহার কোনটি ঠিক বলিয়া জানিব? আপনার মতামত পেলে সত্য বোঝা যাবে আশা করি। মডার্ণ বুক এজেন্সীকেও চিঠি দিলাম তাঁদের মতামতের জন্য। এই বইটি একটি পাঠ্যপুস্তক এটা আপনি নিশ্চয় জানেন, সেইজন্যই আমা'র আগ্রহ বেশী—ছাত্রকে কি ভুল পড়ানো হবে কলকাতা সহরে বাস কোরে? অধিক বাহুল্য। নমস্কার গ্রহণ করিবেন।—অনিল মুখার্জী

পত্রিকা-সমালোচনা

প্রবন্ধে, গল্পে, কবিতায়, ধর্মালোচনায় সমৃদ্ধ হয়ে মাসিক বসুমতী নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ একজন সাধারণ পাঠকের তরফ থেকে। জরাসন্ধের 'তামসী' ভালো লাগছে। লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করছে এই লেখাটি। 'লৌহকপাটে'র লেখক বাংলাসাহিত্যে পাকা হয়ে রইলেন. 'রাজায় রাজায়' অনেক দিন থেকে চললেও লেখাটির প্রতি আকর্ষণ সমানই আছে। সেটা বোধ হয় ভাষার গুণ ও চরিত্র চিত্রণে বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ বলেই। পরিমল গোস্বামীর 'স্মৃতিচিত্রণ' বেশ লাগছে। সুমণি মিত্রের জীবনী-কবিতা 'বিবেকানন্দ স্তোত্র' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যুগপ্রয়োজন ও উনবিংশ শতাব্দী শীর্ষক অংশটি Original। রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য —'তুমি নির্ঘাত John the Baptist' বা ঠাকুরের আবির্ভাব সম্বন্ধে "ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কেন বোললে না খুলে তুমি"···বিদগ্ধজনকে চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। শ্রীমালতী গুহ-রায়ের 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী'কে 'অঙ্গন-প্রাঙ্গণে' সীমাবদ্ধ না রেখে সাধারণ ভাবে পরিবেশিত হতে দিতে বাধা কি? —সৌরেন বসু। কলিকাতা—১৭

মাসিক বসুমতীর রুচিসম্মত প্রকাশের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। "রাজায়-রাজায়" লেখক উদয়ভানুকে তাঁর চমৎকার লেখার জন্য ধন্যবাদ। অন্ধ ও প্রত্যহর লেখক "নীলকণ্ঠ"কে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন। তিনি যে আদর্শের জন্য ইহা লিখিতেছেন তাহা নিশ্চয়ই সফল হইবে। মাসিক বসুমতীর অন্যান্য লেখাগুলোও বর্ত্তমানে সুন্দর হইতেছে, তাহার জন্যও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি লেখক সমেত আপনাকেও। আশীষকুমার ঘোষ, I. S. W. Colony বার্ণপুর আসানসোল।

কিনতে চাই

১৩৬৩ সালের চৈত্র সংখ্যা বসুমতী—শ্রীসিন্ধুমাধব বড়ুয়া। পোঃ শালকোচা, জেলা—গোয়ালপাড়া, আসাম।

১৩৬৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা বসুমতী—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ কেমা, সংখ্যটড়া, পোঃ শ্যামপুর, জেলা—বাঁকুড়া।

১৩৫৭ সালের শ্রাবণ, ১৩৫৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা অথবা ১৩৬২ সালের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যার বিনিময়ে ১৩৫৫ সালের কার্ত্তিক ও ১৩৫৩ সালের মাঘ সংখ্যা বসুমতী—শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় C/o বান্ধব পাঠাগার, পোঃ ও গ্রাম ধাত্রীগ্রাম, জেলা—বর্দ্ধমান।

বেচতে চাই

১৩৬১, ৬২ ও ৬৩ সালের সম্পূর্ণ মাসিক বসুমতী বাঁধান ও খোলা অবস্থায় আছে। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ১৲ টাকা। শ্রীজীবন চক্রবর্তী, চক্রবর্তী অপটিকাল কোম্পানী, ১০নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

১৩৫৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যা ও ১৩৬১ সালের চৈত্র সংখ্যা বেচতে চাই; ১৩৫৮ সালের মাঘ সংখ্যা বসুমতী আমার প্রয়োজন। ১৩৫৮ সালের ফাল্গুন কিংবা চৈত্র সংখ্যার বিনিময়ে ১৩৫৮ সালের মাঘ সংখ্যা দিতে পারি—শ্রীহিমাংশুরঞ্জন দে, পোঃ বালিসাই, জেলা—মেদিনীপুর।

১৩৩০ হইতে ১৩৩৩ সাল, ১৩৩৬-১৩৪১, ১৩৫১-১৩৫৫, ১৩৫৮-১৩৬০ সালের বসুমতী—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র; ১১সি নেপাল ভট্টাচার্য্য লেন, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

১৩৫৫ সালের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৬০ সালের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, পৌস, মাঘ ও ফাল্গুন একটি করে মাসিক বসুমতী আছে। প্রতি সংখ্যা ১।০ দেড় টাকা মূল্যে ডাক খরচ সমেত।—শ্রীমনুজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বোরহাট, গোলপুকুর জেলা—বর্দ্ধমান।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

মহাশয়, মাসিক বসুমতীর গ্রাহক মূল্য বাবদ আপনার ১৬।৭।৫৭ তারিখের পত্রমত ১৫৲ টাকা পাঠালাম। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন। শ্রীমতী মেনকাসুন্দরী দেবী—Lalpur, Behar.

বাংলা দেশের সব খবর জানার জন্য মাসিক বসুমতী নিয়মিত পড়তে চাই। এক বছরের জন্য গাহক করবেন।—Miss Mahasveta Dutt. Sholapur.

১৩৬৪ সালের আষাঢ় মাস হইতে মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Punnyarani Das. Assam.

I am remitting herewith my subscription for monthly Basumati for the period from Asar to Agrahayan. kindly ensure proper delivery of my copy. Thanking you.—Leela Ghose. Deputy Superintendent. C/o. Asstt. Collector, Centra. Execise, Jubalpur.

আমাদের মাসিক বসুমতীর আষাঢ় '৬৪ থেকে মাঘ '৬৪ পর্য্যন্ত চাঁদা ১০৲ পাঠালাম। শীগ্‌গির আষাঢ় সংখ্যা পাওয়ার আশায় সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রইলাম।—শ্রীমতী চাঁপারাণী মণ্ডল, মেদিনীপুর।

Sending Rupees fifteen only being the annual subscription of 'Masik Basumati' from Asarh number. Please instruct your despatch department to write the address properly—Sm. Anita Samanta. Hazaribagh.

আমার বার্ষিক মূল্য ১৫৲ টাকা M. O. করিয়া পাঠাইলাম। আষাঢ় সংখ্যা হইতে "মাসিক বসুমতী" পাঠাইবেন। নমস্কার গ্রহণ করিবেন।—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সেন। বল্লভপুর, বর্দ্ধমান।

মাসিক বসুমতী ছ' মাসের সডাক মূল্যস্বরূপ ৭।০ পাঠাইতেছি। আমার চাঁদা চৈত্র মাসে শেষ হইয়া গিয়াছে। যদি সম্ভব হয় ৩রা বৈশাখ হইতে বই পাঠাইবেন নতুবা আগামী মাস হইতে পাঠাইবেন। —মুক্তি মুখার্জ্জী। জব্বলপুর।

Herewith sending Rs. 7·50 in advance for half-yearly subscription of 'Masik Basumati', kindly acknowledge and arrange to send the magazine from this month onwards. Thanking you.—Sm. Sulekha Roy. Bombay.

মাসিক বসুমতী ॥
ভাদ্র, ১৩৬৪

(দেশী পট)

লক্ষ্মীশ্রী

- সতীতোষ বিশ্বাস অঙ্কিত

৩৬শ বর্ষ—ভাদ্র, ১৩৬৪] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

কথামৃত

আমি বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি সকলেই দুর্বলতা শিক্ষা দিতেছে, জন্মাবধিই আমি শুনিয়া আসিতেছি, আমি দুর্বল। এক্ষণে আমার পক্ষে আমার স্বকীয় অন্তর্নিহিত শক্তির জ্ঞান কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু যুক্তিবিচারের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, আমাকে কেবল আমার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে মাত্র, তাহা হইলেই সব হইয়া গেল।

যে কোন উপদেশ দুর্বলতা শিক্ষা দেয়, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি। নর-নারী বালক-বালিকা যখন দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইতেছে, আমি তাহাদিগকে এই এক প্রশ্ন করিয়া থাকি—তোমরা কি বল পাইতেছ? কারণ, আমি জানি, সত্যই একমাত্র বল প্রদান করে। আমি জানি, সত্যই একমাত্র প্রাণপ্রদ, সত্যের দিকে না গেলে কিছুতেই আমাদের বীর্যলাভ হইবে না, আর বীর না হইলেও সত্যে যাওয়া যাইবে না। এই জন্যই যে কোন মত, যে কোন শিক্ষাপ্রণালী মনকে ও মস্তিষ্ককে দুর্বল করিয়া ফেলে, মানুষকে কুসংস্কারাবিষ্ট করিয়া তোলে, যাহাতে মানুষ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ায়, যাহাতে সর্বদাই মানুষকে সকল প্রকার বিকৃত মস্তিষ্কপ্রসূত অসম্ভব, আজগুবি ও কুসংস্কারপূর্ণ বিষয়ের অন্বেষণ করায়, আমি সেই প্রণালীগুলিকে পছন্দ করি না। কারণ, মানুষের উপর তাহাদের প্রভাব বড় ভয়ানক, আর সেগুলিতে কিছুই উপকার হয় না, সেগুলি বৃথামাত্র।

শিক্ষার বিস্তার, জ্ঞানের উন্মেষ—এই সব না হইলে দেশের উন্নতি কি করিয়া হইবে?···সাধারণের ভিতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হইলে কিছু হইবার জো নাই।···পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্রগঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হইবে। ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করিতে হইবে। যাহাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাহাদের ঘরেই বড়লোক জন্মায়। মেয়েদের তোমরা এখন যেন কতকগুলি manufacturing machinc (উৎপাদন-যন্ত্র) করিয়া তুলিয়াছ। রাম, রাম! এই কি তোমাদের শিক্ষার ফল হইল? মেয়েদের আগে তুলিতে হইবে, mass-কে (আপামর সাধারণকে) জাগাইতে হইবে, তবে ত দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

এলবার্ট আইনষ্টাইন

ক্ষিতীশচন্দ্র সেন

শয্যায় শায়িত পাঁচ বছরের রুগ্ন ছেলের মন ভোলানোর জন্যে পিতা নাবিকের 'দিগ্‌দর্শন যন্ত্র নিয়ে এলেন। ছেলে প্রথমে অন্যমনস্ক ভাবে যন্ত্রটি নাড়াচাড়া করলো। তার পর যন্ত্রের কাঁটার কার্য-কলাপ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। কোন অদৃশ্য শক্তি একে আকৃষ্ট করছে? এই অনুসন্ধিৎসাই কি বালকের মনে ভবিষ্যতে জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী হবার প্রেরণা দিল?

এই বালকই বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানবিৎ এলবার্ট আইনষ্টাইন। ছেলে বয়সেই এর স্বভাব ছিল অন্য বালকের চেয়ে ভিন্ন রকমের। খেলা-ধূলায় তেমন মন দিল না। কল্পনাপ্রিয় লাজুক ছেলেটি একাই অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরে বেড়াতে এবং পাখী, ফুল ও নৈসর্গিক শোভা দেখতে ভালবাসতো।

জার্মেণীর দক্ষিণ প্রান্তে ব্যাভিরিয়া প্রদেশের উল্‌ম্ নগরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ আইনষ্টাইনের জন্ম হয়। আইনষ্টাইনের এক বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা উল্‌ম্ পরিত্যাগ করে মিউনিক সহরে এসে সপরিবারে বসবাস করেন। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত আইনষ্টাইনের এখানেই কাটে।

আইনষ্টাইনের অনুসন্ধিৎসু মন ছেলেবেলা থেকেই বয়োজ্যেষ্ঠদের নানারূপ প্রশ্ন করতো। এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ লক্ষ্যস্থল ছিল পিতৃব্য জ্যাকব। জ্যাকব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ব্যবসায়ের অংশীদার ছিলেন এবং এক পরিবারেই বাস করতেন। তিনিই ভ্রাতুষ্পুত্রের জীবন গঠনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। ছেলেটি ভৌতিক কাহিনী বা আজগুবী গল্পের চেয়ে অঙ্কের বই পড়তেই বেশী ভালবাসতো। তাই এই বিষয়ে অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে পড়ায় তেমন মন ছিল না।

আইনষ্টাইনের পিতা ছিলেন সাহিত্যপ্রিয়। দিনের কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলা তিনি পরিবারের সকলকে শীলার, গ্যেটে প্রভৃতি জার্মাণ গ্রন্থকারদের বই পড়ে শোনাতেন। মাতা ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়া। পিতা ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে কোন দিন অনুপস্থিত থাকলে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা সঙ্গীত-চর্চাতেই কাটতো। ছেলেবেলায় আইনষ্টাইনকে বেহালা শেখানো হয়। অবসর বিনোদনের জন্যে তিনি বেহালা বাজাতেন, তাতে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করতেন। এই ভাবে আইনষ্টাইন ছেলেবেলায় পরিবারের তিন ব্যক্তির নিকট তিন বিষয়ে উৎসাহিত হতে লাগলেন—পিতার নিকট সাহিত্যে, মাতার নিকট সঙ্গীতে এবং পিতৃব্যের নিকট গণিতে ও বিজ্ঞানে।

ছয় বছর বয়সে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। স্কুলে যাওয়াই ছিল ভয়াবহ ব্যাপার! সেকালের জার্ম্যাণ স্কুলের আইন-কানুন ছিল খুবই কড়া, সেনাদলের মত। শিক্ষকেরাও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না। স্কুলের পড়া মুখস্থ করতে হতো। জিজ্ঞাসিত হলে আউড়ে দিতে হতো, না হলে চুপচাপ বসে থাকবার নিয়ম ছিল। কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হলে বেত্রাঘাত চলতো। আইনষ্টাইনের ভাবপ্রবণ জিজ্ঞাসু-মন এরূপ আইনে কিছুতেই সায় দিল না। তিনি অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন। মনে হতো যেন স্কুলটা একটা গোলামখানা। ক্লাসের ছেলেদের 'মধ্যে তিনিই একমাত্র ইহুদী। তাছাড়া খেলাধূলা করতেন না বলে অন্য ছেলেদের প্রিয় ছিলেন না। কাজেই স্কুলে একাকী নিজের মনে সঙ্কুচিত হয়ে থাকতেন। স্কুলের পরে বাড়ী এসে স্নেহশীল পিতা-মাতার কাছে শান্তি পেতেন।

দশ বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ ক'রে তিনি মিউনিকের লুইৎপোল্ড জিমনেসিয়ামে ভর্তি হন। এই জিমনেসিয়াম-গুলি হাইস্কুলের অনুরূপ, সেখানে আট বছর প'ড়ে ডিপ্লোমা পেলে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যায়।

শান্ত, উদাসীন ছেলেটি স্কুলের শিক্ষকদের নিকট খুবই রহস্যময় হয়েছিলেন; এমন কি, তাঁরা এঁকে নিয়ে অনেক সময় বিব্রত হতেন। ইনি সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে কাঁচা ছিলেন। যে বিষয় তাঁর ভাল লাগতো না, সে বিষয় তাঁকে শেখানো মুস্কিল হতো। কিন্তু চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি গণিতশাস্ত্রে এত ব্যুৎপন্ন হয়েছিলেন যে, এ বিষয়ে শিক্ষকদেরও শিক্ষকতা করতে পারতেন। অঙ্ক বিষয়ে তিনি প্রশ্নবাণে শিক্ষকদের জর্জরিত করতেন। তাঁরা সব প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে হতবুদ্ধি হতেন। এ বিষয়ে একটি মজার ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে: একদিন স্কুলের ঘণ্টার পরে একটি শিক্ষক আইনষ্টাইনকে একান্তে ডেকে বললেন, "এলবার্ট, তুমি ক্লাশে আমাকে এত প্রশ্ন কর যে, আমি সব উত্তর দিতে পারি না। বোধ হয় কেউ পারবে না। এতে আমাকে অপদস্থ হতে হয়।"

"স্যর, আমি এ জন্যে দুঃখিত, কিন্তু আমি জানতে চাই"—

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, পৃথিবীর সবাই তোমার এ সব প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়। তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাকে আর অপদস্থ করো না। ক্লাশে আমাকে আর প্রশ্ন করো না।"

ঐ সময় জার্মেণীর সামরিক শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যুবকেরা সৈন্যদলে ভর্তি হওয়া গৌরবজনক মনে করতো। আইনষ্টাইনের সৈন্যদল সম্বন্ধে যথেষ্ট ভীতি ছিল। এমন কি, স্কুলের ছেলেরা যখন সৈন্য সেজে খেলা করতো, তিনি দূরে সরে থাকতেন। তাঁর মনে হতো, তাঁকে সৈন্যদলে যোগ দিতে হলে তিনি আর বাঁচবেন না। এই জন্যে তিনি পিতামাতাকে অনুরোধ করেন, জার্মেণী ছেড়ে অন্য দেশে যেয়ে বসবাস করবার জন্যে।

ইতিমধ্যে তাঁর পিতার ব্যবসা খারাপ চলছিল। পিতা ঠিক করলেন যে, ইটালির মিলান সহরে যেয়ে আবার নতুন করে কারবার সুরু করবেন। শুনে আইনষ্টাইন খুবই আনন্দিত হলেন। কিন্তু যখন শুনলেন যে, তাঁকে এই মিউনিক সহরে একাই থাকতে হবে স্কুলের পড়া শেষ করে ডিপ্লোমা নিয়ে যাবার জন্যে, তখন তিনি একেবারে দমে গেলেন। জীবনে এই প্রথম তাঁকে একা বোর্ডিং-এ থাকতে হলো। গৃহের সুখ-শান্তিও আর রইলো না। তিনি খুবই বিষণ্ণ হলেন। তারপর পালাবার এক মতলব করলেন।

ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে অসুখের অজুহাতে মিউনিক ত্যাগ করে মিলানে যেয়ে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হলেন।

মিলান সহরের রাস্তাঘাটে ঘুরে ছ'মাস নির্ঝঞ্ঝাটে কাটালো। কিন্তু এ ভাবে ত আর জীবন যাবে না! তাঁকে একটা কিছু করতেই হবে। বিশেষতঃ পিতার আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ার দরুণ তাঁর সাহায্যের উপর আর বিশেষ নির্ভর করা চলবে না। তাঁর বরাবরের ইচ্ছা, সারা জীবন পদার্থবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র নিয়েই কাটাবেন। কিন্তু মুস্কিল হলো, তিনি ডিপ্লোমা পাবার আগেই পালিয়ে এসেছেন। কাজেই সুইজারল্যাণ্ডে জুরিক নগরের সুইস ফেডারাল পলিটেকনিক স্কুলের দ্বারস্থ হলেন। কিন্তু ডিপ্লোমা না থাকার দরুণ ভর্তি হবার জন্যে পরীক্ষা দিতে হলো। সাহিত্যে, প্রাণিবিদ্যায় ও উদ্ভিদবিদ্যায় তিনি অকৃতকার্য হলেন। তখন তাঁকে উপদেশ দেওয়া হলো, আরাউ নগরের নিম্নস্কুল থেকে ঐ বিষয়গুলি আয়ত্ত করে আসতে!

আইনষ্টাইন আরাউতে নতুন জীবন পেলেন। এই পার্ব্বত্য দেশের নৈসর্গিক শোভা ছিল অপূর্ব। স্কুলের পরিবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ, ছেলেরাও মিত্রভাবাপন্ন। আরাউ স্কুলের অধ্যক্ষ, প্রফেসর উইনটেলার, ছেলেটির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর পড়াশুনায় অনেক সাহায্য করেন। অধ্যক্ষের বাড়ীতে কয়েকটি বিদেশী ছেলের খাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা ছিল। আইনষ্টাইনেরও ওখানেই থাকবার ব্যবস্থা হয়। অধ্যক্ষের পরিবারের সকলের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা হলো। পরে উইনটেলারের এক ছেলে আইনষ্টাইনের বোন মাজাকে বিয়ে করেন।

দশ মাসের মধ্যেই আরাউ স্কুলের পাঠ শেষ করে আইনষ্টাইন জুরিকের সুইস ফেডারাল পলিটেকনিক স্কুলে ভর্তি হলেন। এবার ভর্তি হবার সময় আর পরীক্ষা দিতে হলো না। এত দিনে আইনষ্টাইনের মনোবাসনা পূর্ণ হলো। বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করবার প্রবেশ-পথ এবার উন্মুক্ত। পলিটেকনিক স্কুলের নিকটে অবস্থিত জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ঐ সময়ে শিক্ষার কেন্দ্র। পৃথিবীর সব দেশের শিক্ষার্থী সেখানে বিদ্যার্জনের জন্যে সমবেত হতো। এ সময়ে অবস্থাসম্পন্ন এক আত্মীয়ের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেতেন। তাতেই কায়ক্লেশে দিন চলতো। নীচের ক্লাশের ছেলে পড়িয়েও কিছু রোজগার হতো। অবশেষে চার বছর পর, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পলিটেকনিক স্কুলের পড়া শেষ করে ডিপ্লোমা পেলেন।

আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যের উপর আর নির্ভর করা চলে না। এবার কাজকর্মের অনুসন্ধান চলতে লাগলো। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কোন চাকরি পাওয়া সম্ভব হলো না। ইতিমধ্যে ছেলে পড়িয়ে কিংবা অস্থায়ী কোন কাজ ক'রে সামান্য কিছু রোজগার হতে লাগলো। কিন্তু জীবনধারণের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। জীবনের এই দিনগুলিই সবচেয়ে দুঃখের। সামান্য পরিচ্ছদ, তাও আবার ছিন্ন। কখনও অর্দ্ধাহার, কখনও বা অনাহার।

অবশেষে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এক বন্ধুর সুপারিশে বার্ণ সহরের পেটেণ্ট অফিসে একটি স্থায়ী চাকরি জুটলো। যদিও মাইনে বেশী নয়, তা হলেও এতেই কোন রকমে খাওয়া-পরা চলে যেত। পূর্ব্বেই তিনি সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক হয়েছিলেন। এখানকার কাজ শিখে নিতে বেশী সময় লাগে নি। যে কাজ করতে অন্যের ছ'-সাত ঘণ্টা লাগতো, সে কাজ তিনি তিন ঘণ্টাতেই ক'রে দিতেন। এতে সুবিধা হলো এই যে, বাকি সময়টা তিনি তাঁর প্রিয় গণিতশাস্ত্রে মনোনিবেশ করতে পারতেন। অবশ্য এ কাজটা আড়ালেই করতে হতো। উর্দ্ধতন কর্মচারীর পায়ের শব্দ পেলে অঙ্কের খাতা টেবিলের দেরাজে লুকিয়ে রেখে অফিসের কাজের ভাণ করতে হতো। এই ভাবে তাঁর যুগান্তকারী আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে গবেষণা অগ্রসর হতে লাগলো, যা পরে সমস্ত পৃথিবীকে আলোড়িত ও স্তম্ভিত করেছিল এবং বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে নতুন রূপ দিয়েছিল।

এ চাকরিকে তিনি "মুচির কাজ" বলতেন। কারণ এ কাজ করা তাঁর পক্ষে ছিল সহজসাধ্য এবং আয়ও ছিল পরিমিত। কিন্তু এতে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। কারণ কাজের ফাঁকে তাঁর প্রিয় অঙ্কশাস্ত্রে নিযুক্ত থাকতে পারতেন। এর পর তাঁর জীবনে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা পর পর সংঘটিত হয়। পলিটেকনিক স্কুলের সহপাঠিনী মাইলেভা মারিৎস্কে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বিয়ে করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম ছেলে এলবার্টের জন্ম হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঐ বৎসর অর্থাৎ আইনষ্টাইনের ছাব্বিশ বছর বয়সে, আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পেটেণ্ট অফিসের কাজের ফাঁকে তিনি গণিতের এই জটিল গণনাসম্বন্ধীয় মতবাদটি নিয়ে তিন বছর যাবৎ ব্যাপৃত ছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি কখনও গবেষণাগারে নিজ হাতে পরীক্ষা করেন নি। অন্য বিজ্ঞানীদের গবেষণার খবর রাখতেন। সেই থেকে গণনা ক'রে এই সব তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি খুব অধ্যয়নশীল ছিলেন। বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক সব রকম বই-ই প্রচুর পড়তেন। তিনি এ সময়ে কঠোর পরিশ্রম করতেন।

তাঁর মতবাদ প্রচারিত হবার পর বৈজ্ঞানিক-সমাজে এ বিষয়ে আলোচনা সুরু হলো। তখনও তিনি অপরিচিত। সন্ধান নিয়ে জানা গেল যে, তিনি পেটেণ্ট অফিসের একজন সামান্য কেরাণী মাত্র, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন। এতে সবাই বিস্মিত হলেন। এর পর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে অধ্যাপক হবার জন্যে আহবান করা হয়। কিন্তু আইনষ্টাইন প্রথমে রাজী হন নি। এ চাকরিই ভাল, কারণ কাজের অবসরে অধ্যয়ন করবার অনেক সময়
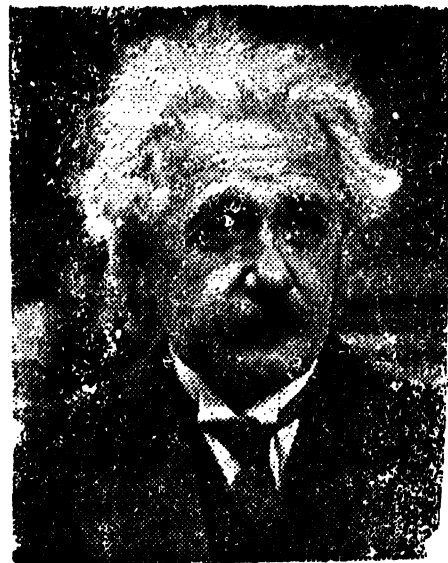
এলবার্ট আইনষ্টাইন

পাওয়া যায়। পরন্তু অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলে অধ্যাপনার জন্যে অনেক সময় অতিবাহিত করতে হবে। তাঁর নাম কেনার আকাঙ্ক্ষা কখনই ছিল না। শান্তিতে থেকে নিজের প্রিয় অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকতে পারলেই সুখী হবেন।

কিন্তু এখন আর পেটেণ্ট অফিসে কাজ করা চলে না। বৈজ্ঞানিক-সমাজে স্থান নেওয়া দরকার। অতঃপর জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের প্ররোচনায় তিনি বার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাময়িক ভাবে অধ্যাপনা করতে রাজী হলেন। অবশেষে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

আমন্ত্রিত হয়ে ইউরোপের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি বক্তৃতা করতে যেতেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রেগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক বেতনে নিযুক্ত হলেন। যে-সব ছেলে শিখতে ইচ্ছুক তাদের তিনি সাহায্য করতেন। অনেক সময় ক্লাশের পড়া রেখে দিয়ে নিজের গবেষণার বিষয় ছেলেদের নিকট ব্যাখ্যা করতেন। এক বছর পর আইনষ্টাইন তাঁর প্রাক্তন বিদ্যালয় সুইস ফেডারাল পলিটেকনিকে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে তিনি পাণ্ডিত্যের জন্যে বিখ্যাত হয়েছেন, কাজেই পুরনো বিদ্যালয়ে এসে খুব সম্মান পেলেন। বক্তৃতা দেবার সময় খুব ভিড় হতো; খুব কৌতুক মনে হতো যখন পক্ককেশ গর্বিত পুরানো শিক্ষকেরা তাঁর উচ্চপদ ও পাণ্ডিত্যের জন্যে খুব নীচু হয়ে তাঁকে সম্মান দেখাতেন।

এখনও তিনি আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। কিন্তু মুস্কিল হলো যে, শিক্ষকতা করবার দরুণ তাঁর নিজের কাজের ব্যাঘাত হতো। শীঘ্রই ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর এই বিঘ্ন দূর করলেন। জার্মাণীর বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ও ওয়ালটার নার্ণষ্ট, জুরিকে এসে আইনষ্টাইনকে অনুরোধ করলেন, বার্লিনের প্রুসিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সভ্য হয়ে কাইজার উইলহেল্‌ম্ ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষতা করবার জন্যে। এখানে তাঁকে কেবল গবেষণা করতে হবে, অধ্যাপনা করতে হবে না। ইচ্ছা হলে বক্তৃতা দিতে পারেন। কাজটি অতি সম্মানের, বেতনও অনেক বেশী। দুই বছর পলিটেকনিকে চাকরি করবার পর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বার্লিনের কাজে যোগদান করেন। তিনি একাই বার্লিনে গেলেন। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলো। দুই ছেলে তাদের মায়ের কাছেই রইলো।

বার্লিনে আইনষ্টাইনের অনেক আত্মীয়-স্বজন ছিলেন। তাঁরাই তাঁর থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। কিন্তু তিনি খেতেন অন্যত্র, এক পিতৃব্যের বাড়ীতে। পিতৃব্যের এক মেয়ে ছিল, নাম এল্‌সা! মেয়েটি বিধবা, তাঁর দুই কন্যা। মিউনিকে ছেলেবেলায় তিনি এল্‌সার সঙ্গে খেলা করেছেন। দু'জনের হৃদ্যতা ছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এল্‌সার সঙ্গে আইনষ্টাইনের বিয়ে হয়। মেয়ে দুটিও তাঁদের সঙ্গেই বাস করতো। আইনষ্টাইন মেয়ে দু'টিকে নিজের মেয়ের মত মনে করতেন। এল্‌সা স্বামীর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি হলেন একাধারে গৃহিণী, মাতা, রন্ধনকারিণী, সচিব ও রক্ষক। স্বামীর সব খাবার তিনি নিজে হাতেই রান্না করতেন। স্বামী পড়ার ঘরে ঢুকলে কাউকে কোন গোলমাল করতে দিতেন না। নেহাৎ কাজ না থাকলে কোন দর্শক দেখা করতে পারতো না। সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য হাতের কাছে গুছিয়ে দিতেন। বাইরে বার হবার সময় পকেটে টাকা দিয়ে বার বার মনে করিয়ে দিতেন। সব চেয়ে মজা হতো সাবান নিয়ে। স্নানের এবং দাড়ি কামানোর দুই রকম সাবান স্নানের ঘরে রাখলে পাছে অন্যমনস্ক বিখ্যাত গণিতজ্ঞ স্বামীর হিসাবে ভুল হয়, সেজন্যে এ রকম সাবানই রাখা হতো, যাতে দুই কাজই চলে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আইনষ্টাইনের বার্লিনে আগমনের কয়েক মাস পরেই, প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হলো। শান্তিপ্রিয় আইনষ্টাইন এতে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি মোটেই যুদ্ধের পক্ষপাতী নন। কিন্তু তিনি একাই বা কি করবেন? কাজেই তাঁর গবেষণায় আরও গভীর মনোনিবেশ করলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আপেক্ষিকতাবাদের দ্বিতীয় পর্যায় প্রকাশিত হলো। পৃথিবীর খুব কম লোকই তাঁর মতবাদ বুঝতে পারে। গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্ট জ্ঞান না থাকলে এ সব বোধগম্য হয় না। চরম অনুমান সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা যায় মাত্র। আপেক্ষিক-তত্ত্ব থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হচ্ছে:

· আলো সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই এর চেয়ে দ্রুত চলতে পারে না। আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে চলে। আলোর গতির কখনও কোন পরিবর্তন হয় না।

ঘড়ির গতি অনুসারে ঘড়ির কলের স্পন্দন নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি ঘড়িটি রকেটের ন্যায় একটি চলন্ত বাহনে রেখে দেওয়া যায়, তাহলে বাহনটি যত দ্রুত চলতে থাকবে ঘড়ির কলও তত আস্তে স্পন্দিত হবে। সাধারণ অবস্থায় এক ঘণ্টা বাজতে যে সময় লাগবে, ঘড়ির স্পন্দন আস্তে হওয়ার দরুণ এক ঘণ্টা বাজতে আরও বেশী সময় দরকার হবে। বাহনের ভিতরে স্থিত ঘড়ির সঙ্গে বাইরে সাধারণ অবস্থায় স্থিত কোন ঘড়ির সঙ্গে তুলনা করলে এ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। যদি ঘড়ির বেগ আলোর বেগের সমান হয়, তাহলে ঘড়ির কলের স্পন্দন থেমে যাবে।

পদার্থবিদ্যার প্রচলিত মতবাদ অনুসারে পদার্থ এবং শক্তি দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা। পরস্পরের কোন সাদৃশ্য নেই। শক্তির কোন ওজন বা ভর নেই। এক গ্লাস জল গরম করলে জলের উষ্ণতার ও তাপের পরিমাণের পরিবর্তন হবে। কিন্তু গ্লাসের মোট জলের ওজনের কোন তারতম্য হবে না। কিন্তু আপেক্ষিক-তত্ত্ব অনুসারে শক্তি এবং পদার্থ দুটি বিভিন্ন সত্তা নয়, পরন্তু মতাজাগতিক একই সত্তা এ দু'টি ভিন্নরূপে ব্যক্ত হয়। এই বিপ্লবাত্মক মতবাদ অনুসারে প্রমাণিত হলো যে, পদার্থ অপরিবর্তনীয়, পরন্তু ঘনীভূত শক্তি; অপর পক্ষে শক্তি হলো প্রবহমান পদার্থ। বস্তুকে শক্তিতে এবং শক্তিকে বস্তুতে পরিবর্তন করা সম্ভব। আপেক্ষিকতাবাদের গাণিতিক সূত্র অনুসারে এই পরিবর্তনের হার নির্ণয় করা যায়। সামান্য বস্তুতে প্রচুর শক্তি লুক্কায়িত রয়েছে। কাঠ, খড়, রবার, সোনা, লোহা প্রভৃতি যে কোন পদার্থের সম্পূর্ণ এক গ্রাম বস্তু ধ্বংস ক'রে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে আড়াই কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা শক্তির সমান হবে। তিন হাজার টন কয়লা পোড়ালে অনুরূপ শক্তি পাওয়া যায়। এক গ্লাস জল উত্তপ্ত করলে মোট জলের ওজনের এত সামান্য বৃদ্ধি পাবে যে, কোন সূক্ষ্ম-অনুভূতি-সম্পন্ন তুলাদণ্ডেও ওজন করা সম্ভব হবে না। এক হাজার টন জল সম্পূর্ণ বাষ্পীভূত করতে যে পরিমাণ তাপের দরকার, তার ওজন হবে মাত্র এক গ্র্যামের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ। এই সূত্র থেকেই পারমাণবিক শক্তিকে অ্যাটম বোমা তৈরীর কাজে নিয়োগ করবার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল।

বস্তুর ওজন ও আয়তন তার বেগের উপর নির্ভর করে। বস্তুর গতিবেগ যত বেশী হবে তার ওজনও তত বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু আয়তন তত কমে যাবে। বস্তু যদি আলোর বেগের অর্ধেক গতিতে চলে, তাহলে তার আয়তন শতাংশের প্রায় পনের ভাগ সঙ্কুচিত হবে। যন্ত্রের সাহায্যে ইলেকট্রন ও প্রোটনের গতি বৃদ্ধি ক'রে দেখা গেছে যে, যখন তাদের গতিবেগ প্রায় আলোর বেগের সমান হয় তখন তাদের ভর যথাক্রমে ৬০০ গুণ এবং শতাংশের ৩০ ভাগ বেশী হয়।

তারার আলো যখন সূর্যের ধার ঘেঁসে পৃথিবীতে আসে তখন আলোর রশ্মি সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের ফলে খানিকটা বেঁকে যায়, একেবারে সোজা আসে না। পূর্বে দুটি তারা যে অবস্থায় দেখা যেত, আলো বেঁকে গেলে তাদের অবস্থান সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হবে। মনে হবে, যেন তারা স্থান পরিবর্তন করেছে, হয়তো পরস্পরের আরও নিকটে এসেছে অথবা দূরে স'রে গেছে। কিন্তু মুস্কিল হলো যে, এরূপ তখনই সম্ভব হবে যখন সূর্য পৃথিবী এবং তারার মাঝখানে থাকবে, অর্থাৎ দিনের বেলায়। কিন্তু দিনের বেলায় প্রখর রোদে তারা দেখা যায় না। আইনষ্টাইন প্রস্তাব করলেন যে, সূর্যের পূর্ণ গ্রহণ হলে দিনের বেলায় তারা দেখা যাবে। আইনষ্টাইনের এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর যাথার্থ্য প্রমাণ করবার জন্যে পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীরা খুব ব্যগ্র হলেন। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় বিশেষ পরীক্ষা করবার জন্যে ইংল্যাণ্ডের রয়েল সোসাইটি দু'টি বৈজ্ঞানিক দল পাঠালেন, একটি ব্রেজিলে এবং আর একটি আফ্রিকাতে। তাঁরা শক্তিশালী ক্যামেরার সাহায্যে গ্রহণের সময় তারার অবস্থান সম্বন্ধে আলোকচিত্র গ্রহণ করলেন। পরে ঐ সকল চিত্র থেকে হিসাব করে দেখা গেল যে, আইনষ্টাইনের গণনা একেবারে নির্ভুল।

আইনষ্টাইনের সহকর্মীরা উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, এখন আপনার তত্ত্ব নির্ভুল প্রমাণ হওয়াতে আপনি নিশ্চয়ই খুব খুশী হয়েছেন। এই কথা শুনে তিনি মুখ থেকে তামাকের পাইপ সরিয়ে রেখে একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমার ত প্রমাণের কোন দরকার ছিল না। যাদের প্রমাণের দরকার ছিল তারাই পেল। এই ভাবে তিনি বিশ্ববিশ্রুত হলেন। খুব কম লোকই তাঁর তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতে পারলো। তাহলেও তাঁর খ্যাতি জনসাধারণে প্রচারিত হলো। এই নির্জনতাপ্রিয় লোকটি চার দিক থেকে উত্যক্ত হতে লাগলেন। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই বহু চিঠিপত্র পেতে লাগলেন; ফটোগ্রাফার, সাংবাদিক, হস্তলিপি-সংগ্রাহক প্রভৃতি বহু লোক তাঁকে বিরক্ত করতে লাগলো। হলিউড থেকে তাঁর চলচ্চিত্র নেওয়ার জন্যে প্রচুর টাকা দিতে চাইলো। এই সব দেখে-শুনে আইনষ্টাইন মন্তব্য করলেন, পৃথিবীর লোক উন্মত্ত হয়েছে।

যুদ্ধের প্রারম্ভে জার্মেণীর বিখ্যাত লেখক, চিত্রকর, বিজ্ঞানী, ডাক্তার প্রভৃতি বিরানব্বই জন বিদ্বান ব্যক্তি মিলে একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করলেন, জার্মেণী যুদ্ধ করছে আত্মরক্ষা করবার জন্যে। কাজেই জার্মেণী নির্দোষ। ঘোষণাপত্রটি আইনষ্টাইনের নিকট আনা হয়েছিল সই করবার জন্যে। কিন্তু ওই শান্তশিষ্ট ভদ্রলোকটি সই করতে অস্বীকার ক'রে বললেন, যুদ্ধ যখন আরম্ভই হয়েছে তখন কে দোষী এবং কে নির্দোষী, এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ না করে, পৃথিবীর সকল জাতি এক হয়ে শান্তির ব্যবস্থা করাই এখন যুক্তিযুক্ত। এরূপ উক্তি আইনষ্টাইনের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক হলো। নেহাৎ তিনি সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক বলে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা থেকে অব্যাহতি পেলেন। তাহলেও তাঁকে অনেক কটূক্তি সহ্য করতে হয়েছিল।

অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে পরিপাটী থাকবার অভ্যাস করানো যেত না। ঢিলা পায়জামা, পুরনো কোট এবং তামাকের পাইপই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। তিনি ছিলেন অতি সদাশয় ব্যক্তি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অন্যের উপকার করবার জন্যে অধিকতর সময় নিয়োগ করতেন এবং অন্যের দুঃখে সহানুভূতি দেখাতেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁকে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারের সমস্ত টাকাই তিনি প্রথমা স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন। প্রথমা স্ত্রী আইনষ্টাইনের কাছ থেকে নিয়মিত সাহায্য পেতেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি পৃথিবীর সব দেশেই ভ্রমণ করতে লাগলেন—ইংল্যাণ্ডে, দক্ষিণ-আমেরিকায়, জাপানে, প্যালেষ্টাইনে, স্পেনে ও যুক্তরাষ্ট্রে। কেবল বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা উপলক্ষেই যেতেন না, মানুষের সুখসমৃদ্ধি সম্বন্ধেও আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি রাজনীতিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক। আইনষ্টাইন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ভ্রমণে যান ১৯২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে, ইহুদীদের নেতা উইজম্যানের প্ররোচনায়। প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের জন্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমেরিকাবাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে। এখানে অনেক অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

ইতিমধ্যে অন্নাভাব প্রভৃতির জন্যে জার্মেণীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সঙ্গীন হচ্ছিল। দুর্বৃত্তদের অত্যাচার বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সময়ে হিটলার ব্রাউন সার্ট ষ্টর্মট্রুপার নামে দল গঠন করেন। পরে এই দলই নাৎসি নামে পরিচিত হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হাজার হাজার লোক এই দলে যোগদান করে। এদের কার্যকলাপ ছিল ভীতিপ্রদর্শক। ইহুদা-বিদ্বেষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। হিটলারের দল ছিল আইনষ্টাইনের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষী। তিনি অনেক ভীতিপ্রদর্শক চিঠিপত্র পেতেন, কিন্তু এ সব কিছুই গ্রাহ্য করতেন না। বিপদ ক্রমেই ঘনিয়ে এল। ডাঃ ওয়ালটার রথেনো যুদ্ধের সময় খাদ্য এবং যুদ্ধোপকরণ সৈন্যদলের নিকট পরিবহন সম্বন্ধে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি এই সময় জার্মেণীর পররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে এ কাজে নিয়োগ করাতে হিটলারের দল ক্ষিপ্ত হলো। কারণ তিনি ছিলেন ইহুদী। একদিন অফিসে যাবার সময় তাঁকে রাস্তার উপরে গুলী ক'রে হত্যা করা হয়। তিনি ছিলেন আইনষ্টাইনের বিশেষ বন্ধু। আইনষ্টাইন এ ব্যাপারে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্যে তাঁর স্ত্রী উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে বিদেশে গেলেই স্ত্রী নিশ্চিন্ত হতেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে লীগ অব নেশন্সের শাখা-কমিটি অব ইনটেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন, স্থাপিত হলে তাঁকে ঐ কমিটির সভ্য করা

হয়। শান্তি স্থাপনের জন্যে পৃথিবীর বিদ্বজ্জনদের একত্রিত করাই এই কমিটির উদ্দেশ্য। সভ্যদের মধ্যে ম্যাডাম ক্যুরী, রবার্ট মিলিকান ও লরেঞ্জ ছিলেন। এঁরা সবাই আইনষ্টাইনের বিশেষ বন্ধু।

যখন আইনষ্টাইন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা দিতে গেলেন, তখন জার্মেণীতে নাৎসি দল প্রবল-পরাক্রান্ত। আইনষ্টাইনের প্রতি নাৎসিদলের বিশেষ আক্রোশ। তিনি মনস্থ করলেন যে, জার্মেণীতে আর ফিরবেন না। বেলজিয়ামে যেয়ে বসবাস করবেন। বেলজিয়ামে যাবার পথে খবর পেলেন, তাঁর বার্লিনের বাড়ীঘর তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হয়েছে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধানে। তাঁর ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বেলজিয়ামে এসেই প্রুশিয়ান অ্যাকাডেমিতে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। জার্মেণীর এত কাছে বেলজিয়ামেও তিনি নিরাপদ নন। ইতিমধ্যে নাৎসিরা তাঁর মাথার জন্যে এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছে। শুনে তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে হেসে বললেন, তিনি জানতেন না তাঁর মাথার এত দাম। তাঁকে ইউরোপ পরিত্যাগ ক'রে যাবার জন্যে বার বার অনুরোধ করা হচ্ছিল। অবশেষে তিনি রাজী হলেন। প্রথমে লণ্ডনে, পরে যুক্তরাষ্ট্রে সতর্ক পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে অক্টোবরের মাঝামাঝি তিনি নিউইয়র্কে পৌঁছেন। নিউইয়র্ক থেকে সোজা প্রিন্সটনে চলে যান। সেখানে ইনষ্টিটিউট অব আডভান্সড ষ্টাডির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অতিবাহিত করেন।

তিনি ছিলেন মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহান্বিত এবং তাদের দুঃখকষ্টে সহানুভূতিসম্পন্ন। এই জ্ঞানতপস্বী তাঁর ভাবেই বিভোর হয়ে থাকতেন। যতটা সম্ভব অন্যের সংসর্গ এড়িয়ে চলতেন। সামাজিক রীতি-নীতিতে তিনি বিড়ম্বিত না হলেই খুশী হতেন। তিনি মান-সম্মান, টাকা-পয়সা, সাজ-পোশাক সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন। নিভৃতে লেখাপড়া করতে এবং অবসর সময়ে বেহালা বাজাতে পারলেই সবচেয়ে সুখী হতেন।

জার্মেণীর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে লাগলো। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে রাইনল্যাণ্ড এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মেণী অধিকার করলো। আইনষ্টাইন প্রথমে যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পরে বুঝলেন যে, ওই নৃশংসতা ও হত্যা নিবারণ করতে হলে বলপ্রয়োগ অনিবার্য। আর এ-ও জানতেন, যে দেশ যত বেশী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করবে সেই দেশই পরিণামে জয়ী হবে। তিনি ছিলেন পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। ইতিমধ্যে মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ামের বিভাজন দ্বারা প্রচুর শক্তির সন্ধান পাওয়া গেল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হবার এক মাস পূর্বে, তিনি বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে এক পত্রে জানালেন যে, ইউরেনিয়ামের বিভাজন দ্বারা প্রচণ্ড শক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই শক্তি হয়তো ভিন্নজাতীয় অতি শক্তিশালী বোমা তৈরী করতে নিয়োগ করা যেতে পারে। এরূপ সম্ভব হলে, এ জাতীয় একটি বোমার ধ্বংস করবার ক্ষমতা হবে বিস্তীর্ণ। অতএব এদেশের সরকারকে এ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এই সাবধান-বাণীর গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই কাজ আরম্ভ করলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন বিজ্ঞানীদের একত্রিত করলেন, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্যে। অবশ্য আইনষ্টাইন অ্যাটম বোমা তৈরীর ব্যাপারে কোনরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার নাগরিক হন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সটনের অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্য অবসর গ্রহণের পরও গবেষণা কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তখনও আপেক্ষিকতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা সম্পূর্ণ হয়নি। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে আপেক্ষিকতাবাদের তৃতীয় পর্যায় প্রচার করা হলো। তিন বছর পর এই পর্যায়ই সংশোধিত ক'রে প্রকাশিত হয়।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট হিরোসিমাতে প্রথম অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের পর তিনি অনুভব করলেন যে, এ ভাবে পারমাণবিক শক্তিকে অপব্যবহার করলে পৃথিবীতে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাঁর সভাপতিত্বে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি ইমার্জেন্সি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির উদ্দেশ্যই হলো জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, নতুন উদ্ভাবিত শক্তি খুবই প্রচণ্ড। একে ঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ না করলে বিপজ্জনক অবস্থা হবে। আইনষ্টাইন বিশেষ ক'রে বললেন, বিবদমান দেশসমূহ ভবিষ্যতে পরস্পরের প্রতি এই শক্তি প্রয়োগ করলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই মনুষ্যজাতির নিরাপত্তার জন্যে জনমত গঠন করতে হবে। পৃথিবীতে সব লোকেরই বাস করবার অধিকার আছে। পরস্পর হানাহানি না ক'রে যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি সহনশীল হয় এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি মানুষের উপকারে নিয়োগ করে, তাহলে ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল ও শান্তিপূর্ণ হতে পারে।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল এই মহামানবের দেহাবসান হয়। বর্তমান শতাব্দীতে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে মানুষের ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম পর্যন্ত, পরমাণুর অভ্যন্তর থেকে অসীম বিশ্ব পর্যন্ত একটি ভিন্ন রূপ মানুষের নিকট প্রতিভাত হয়েছে। মনুষ্যজাতির ইতিহাসে এত অল্প সময়ে এত দ্রুত পরিবর্তন আর কখনও সম্ভব হয়নি। কেবল প্রয়োজনের তাগিদেই নয়, মানুষের অনুসন্ধিৎসাই বিশ্বপ্রকৃতির দুর্বোধ্য রহস্যকে উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করছে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদই বিজ্ঞানীদের বিশ্বজগতের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বর্তমান মতবাদ উদ্ভাবিত করতে সাহায্য করেছে।

বুদ্ধিবৃত্তিই মানুষের শ্রেষ্ঠগুণ। গুহাবাসী মানুষ থেকে আরম্ভ ক'রে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষের সভ্যতার যে অগ্রগতি, তা সম্ভব হয়েছে মানুষের বুদ্ধিমত্তার জন্যেই। কিন্তু এই অগ্রগতি সমগ্র মনুষ্যজাতির মনীষার ফলে হয়নি। খুব কম লোকই উচ্চভাবসম্পন্ন। অতিপ্রতিভাশালী কয়েক জন মহাপুরুষই মনুষ্যজাতির চিন্তানায়ক। তাঁরাই যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে অনির্বচনীয় অব্যক্ত প্রকৃতির গভীর রহস্যের রূপায়ণ করেন এবং মানুষের ভাবধারাকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান।

ভূমিকম্প

শ্রীহৃষীকেশ রায়

সেদিন গ্রীসের ভূমিকম্পে ধনজনের যে অপরিমিত ক্ষতির বিবরণ সংবাদপত্রে ঘোষিত হ'ল, সে কি কোন দৈব দুর্ঘটনা বা আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়? পৃথিবী-পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে এই যে কম্পন মাঝে-মাঝে অনুভব করা যায়, এ কি কেবল বিধির বিধান বলেই আত্মতুষ্ট থাকতে হবে? ধরিত্রীর ধারক সহস্রফণা বাসুকী চঞ্চল হলে ভূমিকম্প হয়, কল্পনাবিলাসীর এ কল্পনা কি যুক্তিসহ? গ্রীসের প্রসিদ্ধ দার্শনিক এ্যারিষ্টটলের মতে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বায়ুপূর্ণ গহ্বরের বন্দী বায়ুর মুক্তি প্রচেষ্টাই ভূমিকম্পের কারণ। অনুসন্ধিৎসু মানুষ এই সকল যুক্তিহীন কাহিনীর পরিবর্তে চায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভূমিকম্পের কার্যকারণ নির্ণয় করতে, উদ্‌ঘাটন করতে চায় এর প্রকৃত রহস্য।

ভূ-পৃষ্ঠের বহিরাবরণের গভীরতা চল্লিশ মাইল। নানা জাতীয় শিলার সমন্বয়ে এই বহিঃত্বক গঠিত। রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু, তুষার প্রভৃতির নানা ক্রিয়ার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের এই শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ক্ষয়িত শিলার পললরূপে সঞ্চয়, ভূ-সংক্ষোভ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিপাত সতত সুশৃঙ্খলে ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধন করে। ভূমিকম্পও এইরূপ পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। আপাত দৃষ্টিতে ভূ-পৃষ্ঠ নিশ্চল বা নিস্পন্দ মনে হলেও সমুদ্র-তরংগের আঘাত, সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা, জলপ্রপাতের জলরাশির সবেগে নিম্নে পতন, যানবাহনের দ্রুত গমনাগমন, এমন কি বায়ুমণ্ডলে বায়ুচাপের পরিবর্তনেও ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে অবিরত যে মৃদু কম্পন অনুভূত হয়, তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও ভূ-কম্পলিপি যন্ত্রে ধরা পড়ে। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন কারণে বিস্তৃত স্থানব্যাপী ভূ-পৃষ্ঠের মৃদু বা তীব্র যে কম্পন তার উৎস ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে এবং তাকেই আমরা সাধারণতঃ ভূমিকম্প বলি। স্থলভাগের ন্যায় সমুদ্রগর্ভেও ভূমিকম্প বিরল নয়।

ধাতু-নির্মিত ঘণ্টার কোন স্থানে আঘাত করলে ঘণ্টার বহির্দেশে এক প্রকার তরংগায়িত স্পন্দন অনুভব করা যায়; জলে কোন ভারী জিনিস পড়লেও এইরূপ তরংগের সৃষ্টি হয়। ভূ-পৃষ্ঠের বহিরাবরণ স্থিতিস্থাপক বলে কোনরূপ আঘাতে সেখানেও কম্পন অনুভব করা যায়। পৃথিবীর অভ্যন্তর কোন কারণে আলোড়িত হলে স্থানবিশেষে কম্পন জনিত তরংগ ভূ-পৃষ্ঠে যে স্পন্দনের সৃষ্টি করে তাকেই ভূমিকম্প বলে। ধাতু বা জলে তরংগ সৃষ্টি হলে যেমন তার অণুগুলি স্থানচ্যুত হয় না, ভূমিকম্পের সময়েও সেইরূপ শিলার অণুগুলি সে নিয়মের ব্যতিক্রম করে না, তরংগের ব্যাপ্তিতে মাত্র কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের ক্রিয়াস্থল ভূ-পৃষ্ঠে, কিন্তু স্পন্দনের সূচনা হয় ভূগর্ভে, অনধিক ত্রিশ মাইল গভীরতার মধ্যে। কয়েক বৎসর পূর্বে ৪০ মাইল গভীর স্থানেও স্পন্দনের সূচনার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই উৎপত্তিস্থলকে বলে ভূকম্পনকেন্দ্র (Seismic focus) এবং ভূত্বকের বহির্দেশে অবস্থিত কেন্দ্রের ঠিক উপরিস্থিত স্থানকে 'উপকেন্দ্র (Epicentre) বলে। ভূকম্পন-কেন্দ্র, ভূপৃষ্ঠ থেকে তার গভীরতা এবং উপকেন্দ্র ভূকম্পলিপি যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ভূমিকম্পের প্রধান কারণ বলে মনে হলেও বস্তুতঃ দেখা যায়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত যত অধিক হয়, ভূমিকম্পের সম্ভাবনা এবং গুরুত্বও তত কমে যায়। আগ্নেয়গিরি-প্রধান স্থানসমূহে শিলাস্তরের অপটুত্ব নিবন্ধন সেই অঞ্চলে স্বভাবতঃ ভূমিকম্প বেশী হয়। এইরূপ ভূমিকম্পের প্রবলতাও দূরপ্রসারী হয় না ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপ ও সুমাত্রার মধ্যবর্তী ক্রাকাতোয়ার এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জাপানের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে কেবলমাত্র নিকটবর্তী স্থানে প্রবল ভূমিকম্প হয়েছিল; কিন্তু এইরূপ ভূমিকম্পের প্রবলতা সাধারণতঃ কমই হয়। এমন কি অনেক সময় কোন কম্পনই অনুভব করা যায় না। মার্টিনিক দ্বীপে মঁ পেলে (Mont Pelc'c) ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সক্রিয় হলে অতি সামান্য কম্পনই অনুভব করা গিয়েছিল। এরূপ বহু অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভূপৃষ্ঠে কোন স্পন্দনই অনুভূত হয় না। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কিলাউয়াতে প্রতিষ্ঠিত ভূকম্পলিপি যন্ত্রে সময় সময় মাসে কয়েক শত স্থানীয় কম্পন ধরা পড়লেও, আগ্নেয়গিরি সে-সময় নিষ্ক্রিয় থাকে; সেজন্য এরূপ ভূমিকম্পের সম্ভাব্য কারণ মনে হয়, ভূগর্ভে ম্যাগমা নামক গলিত ধাতু ও দ্রব গ্যাসীয় পদার্থে পরিপূর্ণ একপ্রকার শিলার সঞ্চরণ। ইহা ব্যতীত, আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হবার পূর্বে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প, বিবিধ বায়বীয় পদার্থ, গলিত লাভা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ চাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য যে চেষ্টা করে, তার ফলেও ভূত্বকের কিয়দংশ আন্দোলিত হয়; অবশ্য এক্ষেত্রেও তীব্রতা ও ব্যাপকতা কমই হয়। জাপানে এ বিষয়ে বহু গবেষণার পর স্থির হয়েছে যে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পের মধ্যে নিগূঢ় কোন সম্বন্ধ বর্তমান নাই।

ম্যাগমার সঞ্চরণ বা ভূগর্ভের চাপ থেকে বিভিন্ন পদার্থের মুক্তি-প্রচেষ্টা স্থানীয় ভূমিকম্পের কারণ হলেও, ভূমিকম্পের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ এখনও নিরূপিত হয় নাই। তবে বিভিন্ন কারণের মধ্যে ভূত্বকের ভাঁজ ও স্তরচ্যুতি, ভূসংক্ষোভ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্তরচ্যুতির দ্বারাই প্রধানতঃ তীব্র ও ব্যাপক ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিকগণ আরও লক্ষ্য করেছেন যে, শীতকালে এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে ভূমিকম্প বেশী হয়, অবশ্য এর কারণ এখনও অজ্ঞাত। আবার নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসর অন্তর যে স্থানবিশেষে প্রবল ভূমিকম্প হয় তাও দেখা গেছে; যেমন, জাপানে প্রবল ভূমিকম্প হয় তের বছর অন্তর। সেজন্য এক বা একাধিক কোন শক্তি ভূমিকম্পের মূলে কার্যকরী হয় তা' এখনও নির্ণয় করা যায় নাই।

অস্বাভাবিক ভাবে বিপর্যস্ত, কুঞ্চিত ও চ্যুতিযুক্ত পাললশিলা-স্তরের স্বাভাবিক অবস্থায় আসবার বহু বর্ষব্যাপী চেষ্টায় কোন স্তর ধ্বসে গেলেও প্রবল ভূমিকম্প হয়। সূর্যতাপ, বায়ু, বৃষ্টিপাত, তুষার, হিমবাহ প্রভৃতির দীর্ঘকালের ক্রিয়ার ফলে পাহাড়-পর্বতের উপরিভাগের শিলাস্তর ক্রমশঃ শিথিল হয়। এই অবস্থায় সেই স্তর ঢালের দিকে কাত হয়ে থাকলে অভিকর্ষ তাকে অবিরত নিম্নাভিমুখে আকর্ষণ করতে থাকে, ফলে স্তরটি একদিন হঠাৎ নিম্নগামী হ'লে তার পতনজনিত ধাক্কায় হয় ভূমিকম্প। এইরূপ ভূমিপাতের ফলে যেমন ভূমিকম্প হয়, তেমনি আবার ভূমিকম্প হলেও ভূমিপাত হতে দেখা যায়। ভূমিপাতের ফলে যে ভূমিকম্প হয়, পৃথিবীর বহিরাবরণ মাত্র তাতে স্পন্দিত হয় এবং তাও খুব

প্রবল ভাবে নয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে এর জন্য বিশেষ কোন চাঞ্চল্যই লক্ষিত হয় না। উত্তর-আমেরিকার রকি, ইউরোপের আল্পস, ভারতবর্ষের হিমালয় প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিপাত বিরল নয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর দার্জিলিং পাহাড়ে এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবে ভূমিপাতের জন্য সামান্য ভূমিকম্প অনুভূত হয়। বিরাট তুষারস্তূপের পতনেও এইরূপ ভূমিকম্প হয়ে থাকে।

পৃথিবীর উপরিভাগ শীতল মনে হলেও অভ্যন্তর খুবই উত্তপ্ত। তাপবিকিরণ করে পৃথিবী ধীরে ধীরে সংকুচিত হওয়ায় প্রবল চাপে কোথাও সমুদ্র এবং কোথাও পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। বৈজ্ঞানিক হোমস্ বলেন, ভূগর্ভে তেজস্ক্রিয় (Radio active) পদার্থ থাকায় পৃথিবীর শীতল হওয়া সম্ভব নয়; আভ্যন্তরীণ উত্তপ্ত পদার্থের পরিচলন-স্রোত দুর্বল ভূস্তরে আনুভূমিক (Longitudinal) চাপ দেওয়ায় ভাঁজবিশিষ্ট পর্বতের সৃষ্টি হয়। আবার বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে শিলাস্তর অবিরত ক্ষয় হয়ে ক্ষয়িত অংশ জলস্রোতে সমুদ্রগর্ভে নীত হয় এবং বহু বছর ধরে স্তরে স্তরে পাললিক শিলারূপে সেখানে সঞ্চিত হয়। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ কোন শক্তির ক্রিয়ায় সেগুলি ঊর্ধ্বগামী হয়ে পর্বতের সৃষ্টি করে। এমনি করেই পৃথিবীতে জল ও স্থলের একটা সাম্য অবস্থা রক্ষিত হয়ে আসছে।

হিমালয়ের গঠনপ্রণালী ও তার শিলাস্তরে সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ জীবাশ্মরূপে পেয়ে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, হিমালয়ের উপাদান যে পাললিকশিলা তা' একসময়ে সমুদ্রগর্ভেই ছিল। উত্তর-দক্ষিণে পার্শ্বচাপের ক্রিয়ায় সেই শিলাস্তর ভাঁজ হয়ে ঊর্ধ্বে উঠে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত বলে গণ্য হয়েছে। ইউরোপের আল্পস পর্বত হিমালয়ের মত পাললিকশিলায় গঠিত ভাঁজবিশিষ্ট পর্বত। পাললিক শিলাস্তরের এই যে ভাঁজ, এর তুলনা করা চলে, দু'পাশে চাপ দেওয়া বই, সতরঞ্চ বা কার্পেটে যে ভাঁজ পড়ে তার সংগে। এমনি ভাবে ভাঁজ খাওয়ার জন্যে স্তরগুলি ক্রমশঃ দুর্বল হয় আর ভগ্ন হয়ে স্থানচ্যুত হয়। ভূত্বকের কুঞ্চিত, বিপর্যস্ত ও চ্যুতি (Fault)-যুক্ত এই সকল স্তরের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়াসে চ্যুতির পার্শ্বস্থ ভূভাগ সরে গেলে ভূমিতে যে তীব্র ধাক্কা লাগে, তারই স্পন্দন চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে ভূপৃষ্ঠে আসে এবং প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হয়। অনেক সময় এইরূপ চ্যুতি ভূত্বকের এত গভীর প্রদেশে সংঘটিত হয় যে, তার স্পন্দন আমরা ভূপৃষ্ঠে আদৌ অনুভব করি না। চ্যুতির ফলে ভূমিকম্প হলেও, চ্যুতির চাক্ষুষ প্রমাণ এইজন্য অনেক সময় পাওয়া সম্ভব হয় না। চ্যুতির সহিত ভূমিকম্পের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ তার সাক্ষ্য দেয় আতঙ্ক সৃষ্টিকারী কয়েকটি ভূমিকম্প; তার মধ্যে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বেলুচিস্তানের, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আসামের এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কোয়েটার ভূমিকম্প প্রধান। কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশে যে ভূমিকম্প হয়, ভূতত্ত্ববিদগণ তার অন্য এক কারণও অনুমান করেন। তাঁরা বলেন, হিমালয়ের শিলাস্তর বৃষ্টিপাতের দ্বারা ক্ষয় পেয়ে সিন্ধু-গঙ্গার স্রোতে পলিরূপে বাহিত হয়ে সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত হয় এবং তাতে যে বিরাট চাপের সৃষ্টি হয়, তারই ক্রিয়াতে উক্ত স্থানে মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হয়। ইহা ব্যতীত তাঁরা আরও মনে করেন যে, ক্রমবর্ধনশীল হিমালয়ের গঠনকার্য এখনও অব্যাহত গতিতে চলছে, তাই হিমালয় ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে এখনও ভূমিকম্প হয়।

স্থলের ন্যায় সমুদ্রগর্ভেও ভূমিকম্প হয় এবং ইহা Tsunami নামে সর্বত্র পরিচিত। প্রশান্ত মহাসাগরগর্ভেই অধিকাংশ ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বলে দেখা গেছে। তবে আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝামাঝিও উত্তর-দক্ষিণে একটি ভূকম্পপ্রবণ স্থান আছে। সমুদ্রবক্ষে Tsunami-র ক্রিয়া তেমন তীব্র ভাবে অনুভূত না হলেও, উপকূলে এর ধ্বংসলীলা কল্পনাতীত! ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে, ১৭০৩ ও ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জাপানে Tsunami সৃষ্ট তরঙ্গে ভেসে গিয়ে হাজার হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে। সমুদ্রগর্ভে ভূমিকম্প হলে সমুদ্র-জলে যে তরংগের উৎপত্তি হয় তার উচ্চতা ৪০ ফুট, বিস্তার ১০০ থেকে ২০০ মাইল পর্যন্ত এবং গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০০ থেকে ৫০০ মাইল হয় অর্থাৎ এরূপ তরংগ প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে মাত্র বার ঘণ্টায়। অনেক তীব্র ভূমিকম্পের উৎপত্তি-স্থল সমুদ্রগর্ভে হওয়ার ফলে সমুদ্রগর্ভের শিলাস্তরে চ্যুতি দেখা গেছে।

বৃটিশ বৈজ্ঞানিক জন্ মিল্‌নে জাপানে পদার্থবিদ্যা অধ্যাপনার সময় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যে ভূকম্পলিপি যন্ত্রের আবিষ্কার করেন, তার এখন এত উন্নতি হয়েছে যে, তার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের অতি সামান্য কম্পন —যা আমরা অনুভব করতে পারি না, তাও লিপিবদ্ধ হয়। অবশ্য এর পরে আরও কয়েক প্রকার ভূকম্পলিপি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আরব সাগরে ঝড়ের ফলে ঢেউয়ের ধাক্কায় ভূপৃষ্ঠের যে স্পন্দন বহু দূরবর্তী বোম্বাই-এর কোলাবা মানমন্দিরের ভূকম্পলিপি যন্ত্রে ধরা পড়ে, তাতে সমুদ্রগামী জাহাজের অধ্যক্ষগণ পূর্বাহ্নেই সাবধান হতে পারেন। এ যন্ত্রের সাহায্যে ভূকম্প-তরংগের প্রকৃতি থেকে আমরা ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বা কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, কেন্দ্রের গভীরতা, পৃথিবীর অভ্যন্তরের অবস্থা এবং কম্পনের তীব্রতার সন্ধান পাই। কম্পনের তীব্রতা অনুসারে ক্ষীণ থেকে অতি তীব্র পর্যন্ত তার দশটি বিভিন্ন শ্রেণীনির্ণয় করা হয়েছে। এসব তথ্য জানবার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন মানমন্দিরে ভূকম্পলিপি যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। এত তথ্য জেনেও ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেবার মত শক্তি বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু আজও অর্জন করতে পারেন নি। কোন জাপানী প্রাণিতত্ত্ববিদ্ না কি লক্ষ্য করেছেন যে, সমুদ্রজাত এক প্রকার মাছ ভূমিকম্পের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠে। এ যদি সত্য হয়, তা' হলে পূর্বাহ্নে সাবধান হয়ে অনেক বিপদ থেকে ত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য মাছের উপর ভবিষ্যদ্বাণী করবার ভার দিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চেষ্ট নন। আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে পূর্বাভাস জানাবার মত অতি সূক্ষ্ম উপায় আবিষ্কৃত হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীতে বছরে যে ষাট হাজার ভূমিকম্প হয় তার মধ্যে প্রায় ২৫০টি বেশ বড়।

জলের ঢেউ-এর মত ভূমিকম্পের তরংগও কেন্দ্রের চারি দিকে প্রায় উপবৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে, বাধা পেলে জলের ঢেউ-এর মত এরা পথও পরিবর্তন করে। ভূমিকম্প-তরংগ তিন প্রকারের; মুখ্য (Primary) বা অনুদৈর্ঘ্য তরংগ (Longitudinal wave) সেকেণ্ডে ৫.৪ মাইল বেগে এবং গৌণ (Secondary) বা তির্যক তরংগ (Transverse wave) মুখ্যের প্রায় অর্ধেক (সেকেণ্ডে ৩ মাইল) বেগে পৃথিবীর অভ্যন্তর দিয়ে যায়, তৃতীয় একপ্রকার তরংগ (Surface wave) পৃথিবীর বহিরাবরণের উপর দিয়ে যায়। এই

সকল গতিবেগের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা ভূকম্পলিপি যন্ত্র ও ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের দূরত্ব নির্ণয় করা যায়, আর তীব্রতার দ্বারা উপকেন্দ্র স্থির করা হয়। অবশ্য ১৮০০ মাইল গভীরতা পর্যন্ত প্রাথমিক ও গৌণ তরংগ যত গভীর প্রদেশে প্রবেশ করে তাদের গতিবেগও তত বাড়ে। প্রথম দুই প্রকার তরংগের গতিবেগের পার্থক্য থাকায় উৎপত্তিস্থল থেকে উভয় তরংগ উপরে একই স্থানে আসতে সময়ের যে তারতম্য হয়, তা থেকে কেন্দ্রের অবস্থান জানা যায়। প্রাথমিক তরংগ কঠিন, তরল বা বায়বীয় যে কোনরূপ পদার্থের ভিতর দিয়ে এবং গৌণ তরংগ কেবল কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়েই যেতে পারে। কিন্তু ভূ-অভ্যন্তরে ১৮০০ মাইলের পর ২৩০০ মাইল লৌহ ও নিকেলের স্তর। তা হলে কি পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভূকেন্দ্রের চারদিকে উক্ত বিশাল স্থানটি তরল বা বায়বীয় পদার্থে পূর্ণ? কেহ কেহ বলেন, এত নীচে পৃথিবীর যে বিরাট চাপ (প্রতি বর্গইঞ্চিতে দু'লক্ষ মণ) পড়ে, তাতে কোন পদার্থ বায়বীয় তো নয়ই, এমন কি তরল আকারেও থাকতে পারে না; কঠিন যে নয় তা' গৌণ তরংগের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তবে ঐ স্থানের উপাদানের অবস্থা অর্ধ-তরল হওয়া অসম্ভব নয়। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ এই অঞ্চলের উপাদানের অবস্থা সম্বন্ধে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই।

পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে কখনও ভূমিকম্প হয় নাই; তবে ভূ-সংক্ষোভে চ্যুতিযুক্ত দুর্বল শিলাস্তরবিশিষ্ট স্থানেই ভূমিকম্প বেশী হয়। এ-সকল স্থানকে দুটি কটিবন্ধের আকারে কল্পনা করে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ তাদের নাম দিয়েছেন "প্রকম্পন কটিবন্ধ" (Seismic Belt), একটি কটিবন্ধ উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার পশ্চিম পার্শ্ব অর্থাৎ রকি ও এণ্ডিজের পার্বত্য অঞ্চল, এলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, জাপান ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়ে এবং অপরটি ভূমধ্যসাগর, আলপস পর্বত, ককেশাস পর্বত ও হিমালয় পর্বতের উপর দিয়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। কটিবন্ধ দুটির অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যে সমস্ত পর্বতের গঠন-কার্য এখনও শেষ হয় নি, তাদের নিকটবর্তী প্রদেশগুলি ভূমিকম্পপ্রবণ। ইউরোপের পশ্চিম উপকূলে কোন প্রকম্পন কটিবন্ধ না থাকার এই কারণ অনুমিত হয় যে, ওখানকার মহীসোপান (Continental shelf)* ধীরে ধীরে অনেক দূর পর্যন্ত ঢালু সমুদ্রে নেমে গেছে; আর উভয় আমেরিকার পশ্চিমে এবং এশিয়ার পূর্ব উপকূলের অধিকাংশ স্থানে মহীসোপান নাই বললেই চলে; বিশেষতঃ চিলে (chile) ও জাপানের অনতিদূরেই প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা এত অধিক, যে আটলান্টিক মহাসাগরের কোন স্থানই তত গভীর নয়। প্রথমোক্ত কটিবন্ধটি ও প্রশান্ত মহাসাগরের "আগ্নেয় মেখলা" (Fiery ring of the Pacific)-র অবস্থান তুলনা করলে দেখা যায় যে উভয়েই প্রায় একই স্থানের উপর দিয়ে বিস্তৃত এবং এতে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগার পরস্পর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়, উৎপত্তির কারণস্বরূপ উভয়েই ভূত্বকের দুর্বলতার সুযোগ নেয়।

সাধারণতঃ ধারণা করা হয়ে থাকে যে, ভূমিকম্পের ফলে ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত পদার্থের স্থানচ্যুতি হয়; আসলে কিন্তু তা' নয়। ভূত্বক স্বভাবতঃই খুব স্থিতিস্থাপক, এর ভিতর দিয়ে তরংগ প্রবাহিত হবার সময় তরংগের প্রবাহপথে অবস্থিত শিলার কণাগুলি অতি সামান্য ভাবে স্থানচ্যুত হলেও ইহার উপরিভাগের আলগা সকল পদার্থ দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। এমন কি, কখন কখন কয়েক ফুট দূরেও নিক্ষিপ্ত হয়। সামান্য পরীক্ষার দ্বারা এ ব্যাপারটি অনেকটা পরিষ্কার হয়; কাঠের একটি টেবিলের উপর পাথর রেখে যদি টেবিলের উপর জোরে আঘাত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, পাথরের টুকরাগুলিও সংগে সংগে স্থানচ্যুত হয়ে লাফিয়ে উঠছে কিন্তু টেবিলের কাঠের কণাগুলির কোনরূপ স্থান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে না। ঠিক এই ভাবেই ভূমিকম্পের সময় পৃথিবীর উপরিভাগের ঘর-বাড়ী, গাছপালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির স্বাভাবিক অবস্থার বহু পরিবর্তন সাধিত হয়। ভূমিকম্পের তরংগ শিলাস্তর অতিক্রম করবার সময় স্পন্দনের জন্য তার মধ্যে পর্যায়ক্রমে যে সংকোচন ও প্রসারণের উৎপত্তি হয়, তারই ফলে আভ্যন্তরীণ জলপ্রবাহের বহু ক্ষতি সাধিত হয়, কোন কোন প্রস্রবণের জলধারা স্তব্ধ হয় আবার কারোও বা জলধারার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, এমন কি অনেক সময় নূতন প্রস্রবণের সৃষ্টিও হয়; নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে নূতন প্রবাহপথে নদী প্রবাহিত হয়। ভূত্বকে ফাটল আর বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়ে তার থেকে বালিমিশ্রিত জল উৎক্ষিপ্ত হয়; বালির বাঁধ অতীতের ভূমিকম্পের সাক্ষ্য দেয়।

ভূমিকম্পের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও, এর ভয়াবহ ধ্বংসলীলা মানব-মনকে অভিভূত করে। ভূমিকম্পের ফলে কত সুসমৃদ্ধ জনপদ যে লুপ্ত হয়ে গেছে, কত লোকের অকালমৃত্যু হয়েছে তার সংখ্যা নাই। পূর্বলিখিত বিহারের ভূমিকম্প এবং ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে আসামের ভূমিকম্পকে একটা খণ্ডপ্রলয়ের সংগে তুলনা করা চলে। বিহারের ভূমিকম্পে বাংলা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত এর প্রকোপে বিপর্যস্ত হয়েছিল। ভূগর্ভ থেকে উৎক্ষিপ্ত জল, কাদা, বালি শস্যক্ষেত্র পূর্ণ করে তাকে অনুর্বর ক্ষেত্রে পরিণত করেছে; আর বহু নগর কম্পনের তীব্রতায় ধ্বংসস্তূপে রূপান্তরিত হয়েছে। সাধারণত ভূমিকম্পের কম্পন কয়েক সেকেণ্ড মাত্র অনুভূত হলেও, এক্ষেত্রে তা তিন চার মিনিট ছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর টোকিওর ভূমিকম্পে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের মৃত্যু হয় এবং টোকিও উপসাগরের তলদেশ ২০০ ফুট উচ্চে উঠে যায়; কিন্তু ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের ভূমিকম্পে কচ্ছ উপসাগরের উপকূল অনেকখানি নেমে যায়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আলাস্কার Yakutat Bay-র প্রসিদ্ধ ভূমিকম্পে উপকূলের অংশবিশেষ প্রায় ৫০ ফুট ঊর্ধ্বে উঠে এক নূতন জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। ভূমিকম্পের আঘাতে মাত্র ৩০ সেকেণ্ডে নিউজীল্যাণ্ডের নেপিয়ার সহর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে নিশ্চিহ্ন হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে আনাটোলিয়ার ভূমিকম্প প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের বহু পরিবর্তন সাধনকারী আসামের ভূমিকম্প এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে।

* মহীসোপান—মহাদেশের উপকূলভাগ কিছুদূর পর্যন্ত ঢালু ভাবে সমুদ্রে নামিয়া গিয়া পরে সোজা নামিয়াছে। এই ঢালু অংশকে মহীসোপান বলে। এখানকার জলের গভীরতা ৬০০ ফুটের অধিক হয় না।

ছেঁড়া জীবনের সূতা

(অপ্রকাশিত)

শিবনাথ শাস্ত্রী

ঠাকুর, ঠাকুর, দিন হল অবসান,
তোমা হাতে কবে দিব মোরে ?
এক গতি, এক মতি কবে হবে প্রাণ,
পড়িব না আর মোহঘোরে ?

ছিল শক্তি, ছিল কাজ, এবে গেল দুই,
রহিলাম তুমি আর আমি,
দিবা-অন্তে পদ-প্রান্তে আপনারে থুই,
ফেলিও না হে হৃদয়-স্বামী !

খাটিয়া খাটিয়া দিন শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহে
অপরাহ্নে যথা কৃষীজন,
হাত-পা ছড়ায়ে বসে আপনার গেহে
ভুলে যায় শ্রম-উপার্জ্জন ।

তেমনি তোমার পদে হাত-পা ছড়ায়ে
বসিবারে দিও দিবা শেষে,
নিরখি ও প্রেমমুখ পরাণ জুড়ায়ে,
ভুলে যাই জীবনের ক্লেশে ।

ছেঁড়া জীবনের সূতা এখন গুছাই
দ্বার দিয়ে বসি নিজ ঘরে,
ঘুচায়ে বাহির দৃষ্টি তোমা পানে চাই
সত্যরূপ দেখি গো অন্তরে ।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ক্রিয়ার ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে মরুসদৃশ ভূমি শস্যশ্যামলা হয়েছে, সমুদ্রে নূতন দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। ধ্বংসকারী এই যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, এর প্রকোপ থেকে ত্রাণ পাবার কি কোন উপায় নাই ? ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ক্যালিফোর্ণিয়ার লং বীচের (Long Beach) ভূমিকম্পে বহু সুরম্য অট্টালিকা নষ্ট হওয়ায় বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। অনেক পরীক্ষা করে তাঁরা দেখলেন, ইস্পাতের কাঠামো (Frame) আর কংক্রীট (Concrete) দিয়ে তৈরী বাড়ীর বিশেষ কোন ক্ষতিই ভূমিকম্প আর করতে পারে নি। ভূমিকম্পপ্রবণ জাপানে ঐ রীতিতে গৃহাদি নির্মাণ করে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। কলিকাতা এবং অন্যান্য নগরেও বর্তমানে গৃহাদি নির্মাণ কার্যে ইস্পাতের কাঠামো ও কংক্রীটের ব্যবহার প্রচুর ভাবে হচ্ছে। মনে হয়, এরূপ প্রণালীতে নির্মিত গৃহের আর কোন বিশেষ ক্ষতি ভূমিকম্প করতে পারবে না। ফলে অনেক ধন-জন নাশের আশংকা থেকে সম্পূর্ণ না হলেও বহুলাংশে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

পূর্ব-আলোচিত ভূমিকম্প জনিত তৃতীয় প্রকার তরংগের বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা স্থলভাগের শিলা অপেক্ষা সমুদ্রগর্ভের শিলার মধ্য দিয়ে দ্রুততর বেগে গমন করতে পারে। ক্যালিফোর্ণিয়ার এক ভূমিকম্পের উক্ত তৃতীয় প্রকার তরঙ্গ যে বেগে নিউইয়র্ক গেছল, তার চেয়ে অধিকতর বেগে জাপান এসেছিল। এই সিদ্ধান্ত এর থেকে করা যায় যে, স্থলভাগের অধিকাংশ শিলা গ্রানাইট ও সমুদ্রগর্ভ রচিত হয়েছে ব্যাসাল্ট শিলায় এবং আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের শিলার উপাদান এক নয়। মুখ্য ও গৌণ তরংগের গতিবেগ কেন্দ্র থেকে কৌণিক দূরত্বের অনুসারে বর্ধিত হয়ে থাকে।

কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠে তরংগের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের কৌণিক দূরত্ব	প্রতি সেকেণ্ডে গতিবেগ (মাইল)	
	মুখ্য তরংগ	গৌণ তরংগ
	৬'৮	৩'৭
৯০	৭'৯	

১৮০০ মাইলের অধিক গভীরতায় মুখ্য তরংগের এই ৮ মাইল গতিবেগ হঠাৎ ৫ মাইলে নামে এবং গৌণের গতিবেগ খুব মৃদু হয়ে আসে। আরো গভীরতর প্রদেশে মুখ্য তরংগ আলোকরশ্মির ধর্ম অনুসারে (Refracted) হয় ; ফলে ১০৪° কৌণিক দূরত্বের পর কোন স্পন্দনই অনুভব করা যায় না। ভূমিকম্প-তরংগের এই সকল আচরণ থেকে সিদ্ধান্ত করা গেছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে ৪৪০০ মাইল ব্যাসের যে স্তর তার অবস্থা ১৮০০ মাইল পুরু আবরণের অবস্থার সমান নয় এবং ঐ আবরণেরও ৭৫০ মাইল অবশিষ্টাংশের সমপর্যায়ে নাই। ভূমিকম্পের তরংগের দ্বারা এইরূপে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অনেক তথ্য জানা যায়।

পরিমল গোস্বামী

তৃতীয় পর্ব্ব

১

পরীক্ষার ফল ভালই হল এবং কেমন ক'রে হল তা আমি আজও জানি না। কোন প্রশ্ন কি ভাবে লিখলে এম-এ পরীক্ষক খুশি হবেন জানা ছিল না, বিষয়ের ক্ষেত্রে একেবারে নবাগত বললেই হয়। কোনো বিশেষ শ্রেণীতে পাস করার লোভও ছিল না, কিন্তু দৈবাৎ প্রথম শ্রেণীই পেয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা এবং শেষ পরীক্ষা দুইয়েতেই প্রথম শ্রেণী হল, আত্মতুষ্টির পক্ষে ঘটনাটা মন্দ নয়। আমাদের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জীবনেও তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম সম্মান পেয়ে গেছেন স্বদেশের কাছ থেকে।

যাই হোক আমার আবার সমস্যা দেখা দিল, পরবর্তী কর্তব্য কি? শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় ছেদ পড়ায় মনে দুঃখ ছিল। সেখানে তো আর ফেরা হল না, অথচ দেখি চিত্রাংকন শিক্ষার বাসনাটাই আবার একটু একটু ক'রে মাথা তুলছে।

পুনরায় কলকাতাতেই চলে এলাম।

এবং এসেই সোজা সরকারী আর্টস্কুলে গিয়ে অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের কাছে মনের বাসনা প্রকাশ করলাম। তিনি আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আমার বক্তব্য ছিল আধুনিক রীতিতে কিছু সুবিধে করতে পারব কি না, অর্থাৎ শেষ লক্ষ্য তেল। তিনি বললেন যে রীতিতে কাজ করেছ তা ছেড়ে এখনই অন্য রীতিতে যাওয়া সম্ভব হবে না, আগেরটি ভুলতে কিছু সময় লাগবে, অতএব প্রাচ্য পদ্ধতির জলেই লেগে থাক, তেলের আশা ছাড়। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ও সেই কথাই বললেন। অর্থাৎ অয়েল পেণ্টিং চলবে না।

অগত্যা তাই। আমার শিক্ষক হলেন হেড মাষ্টার ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মা। আমাকে পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে নেওয়া হল। ঈশ্বরীপ্রসাদ আমাকে অতিরিক্ত খাতির করতে আরম্ভ করলেন। আমার প্রতি সেই পক্ককেশ বৃদ্ধের স্নেহ আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি। তিনি প্রথমেই আমাকে সম্মানিত করলেন তাঁর ডানপাশে আমার জন্য একটি পৃথক আসনের ব্যবস্থা ক'রে। খুব কাছে বসালেন। তারপর আমাকে তাঁর হাতের কাজ দেখাতে লাগলেন। তিনি তখন বাইরের কোনো মহারাজার অর্ডারি একটি মিনিয়েচার পেণ্টিং করছিলেন আইভরির উপর। বললেন একমাত্র এতেই পয়সা, তোমাকে এ কাজ শিখিয়ে দেব। তারপর আমাকে মিউজিয়ামের আর্ট-গ্যালারিতে নিয়ে রাজপুত পেণ্টিং-এর পদ্ধতি বুঝিয়ে দিলেন মোটামুটিভাবে এবং একখানা ছবি দিয়ে বললেন এখানা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কপি কর। নিজ হাতে কপি করতে করতে তবে একটা পদ্ধতি আয়ত্ত হয়, বুঝতে সুবিধে হয়। কিছুদিন এ কাজ করতে হবে তোমাকে। সে ছবিখানার একটি কপি করেছিলাম, তাতে অন্যান্য রঙের সঙ্গে সোনা রঙও ছিল। কপিখানা এখনও অবিকৃত আছে।

স্কুল ছুটির পর প্রায় প্রতিদিন তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং হালুয়া খাওয়াতেন। তাঁর পুত্রের (রামেশ্বর বর্মা) অনেকগুলি পেণ্টিং তাঁর ঘরে টাঙানো ছিল, দেখালেন। তাঁর নিজের আঁকা ভারতীয় রাগ রাগিণীর কল্পিতরূপ কয়েকখানি ছিল। সে ছবিগুলো আমার ভাল লাগেনি।

ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্ম্মা তাঁর মিনিয়েচার পেণ্টিং দেখাচ্ছেন

এরপর মাসখানেক তাঁর নিতান্ত অনুগত হয়ে চলার পর তিনি আমাকে আরও বেশি খাতির করতে লাগলেন এবং এই সময় তিনি তাঁর সবচেয়ে গোপন কথাটি আমার কাছে প্রকাশ করলেন। এ কথা ছিল তাঁর মনে মনে। হয় তো কাউকে কখনও বলতে পারেননি, তাই আমাকে বলতে পেরে তিনি নিজের ঘাড় থেকে যেন একটা বড় বোঝা নামিয়ে ফেললেন।

তাঁর একান্ত ইচ্ছে আমি আর্টস্কুল ছেড়ে দিই। বললেন, "এখানে কিছুই হয় না। এখানে থেকে যারা পাস ক'রে বেরোয় তারা মাথা খুঁড়েও ত্রিশ টাকা বেতনের একটি চাকরি পায় না।" তারপর একটু চাপা গলায় একটু ব্যঙ্গমিশ্রিত সুরে অন্যান্য ছাত্রদের দিকে ইসারা ক'রে বললেন—"ঐ যে দেখছ ওদের, ওরা সবাই র‍্যাফেল হতে এসেছে এখানে। কি রকম র‍্যাফেল শুনবে? এক র‍্যাফেল গম ভাঙার কল খুলে ক'রে খাচ্ছে। আর এক র‍্যাফেল এক অফিসের কেরানি হয়েছে। এখানে পড়লে তুমি ঐ রকম র‍্যাফেল হবে। রাজি আছ?"

আমি হতাশ হয়ে পড়ি। ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, "আমার মতো যদি মিনিয়েচারের কাজ শেখ তা হলে এতে কিছু সুবিধে হতে পারে। যদি স্কুলে টিকে থাক তা হলে আমি শিখিয়ে দেব, কিন্তু তোমাকে বলি নাথাকতে, তুমি এ পথ ছাড়।"

ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রতিদিন আমাকে সঙ্গে ক'রে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং কানে এই মন্ত্র দিতেন। ক্রমে তাঁর কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করলাম, বুঝলাম তিনি সত্যি কথাই বলেছেন। কারণ সেই ১৯২৪ সালে শিল্পীর কোনো ভবিষ্যৎ ছিল না, তার প্রমাণও পেলাম চার পাঁচ বছর পরে এক বিজ্ঞাপনের সাহায্যে। ত্রিশ টাকা বেতনের একজন শিল্পীর দরকার হয়েছিল, আবেদনপত্র এসেছিল প্রচুর। সেও আবার ছবি আঁকার কাজ করতে নয়, ফোটোগ্রাফের এনলার্জমেণ্ট ফিনিশিং-এর কাজে। অনেক শিল্পীই তখন নিজের চেষ্টায় এই বিদ্যা শিখে নিয়েছিলেন অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য।

ঈশ্বরীপ্রসাদ আমার প্রকৃত হিতৈষীর কাজ করলেন।

আবার শহর থেকে গ্রামে। এখানে কাজ কিছুই নেই, তবু এ পরিবেশ নিতান্ত আপনার। রতনদিয়া গ্রামের পরিবেশ।

পদ্মার ভাঙনে যখন কালখালি ষ্টেশন রতনদিয়ার সীমানায় উঠে এলো তখন থেকে এ গ্রামের দাম বেড়ে যাচ্ছিল দ্রুত। জায়গাটি পাইকপাড়ার সিংহ জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং সম্ভবত ১৯১৭ সালে সাহেববেশী অরুণকুমার সিংহকে দেখেছিলাম রতনদিয়া কাছারীতে: ততদিনে রতনদিয়া গ্রামে প্রকাণ্ড বাজার বসে গেছে এবং বর্ষার চন্দনা বিদেশী বহু নৌকো ভরা বন্দরে পরিণত হয়েছে। এ বন্দরের স্থায়িত্ব বছরে প্রায় চার মাস, তার পর নদী শুকিয়ে যায়, তখন আর নৌকো চলে না।

বাজার ও বন্দর গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে। আগে এ অঞ্চলটি ছিল চাষের ক্ষেত আর ঝোপঝাড়ের অঞ্চল। শ্মশানও ছিল এই দিকে। ষ্টেশন থেকে চন্দনানদী পর্যন্ত শড়ক তৈরি হল বণিকদের জন্য। দূরত্ব সিকি মাইল মাত্র। গ্রামের সঙ্গে বাজারের যোগাযোগ হল আর একটি শড়কে। তার পাশে প্রকাণ্ড স্কুলঘর তৈরি হল, আর হল অতি সুন্দর একটি খেলার মাঠ। দৈনিক বাজারও আয়তনে খুব বেড়ে গেল। সব রকম মাছ, তরিতরকারী দুধ, বেলা আটটা থেকে একটা পর্যন্ত বিক্রির বিরাম নেই। কি শস্তা সব জিনিস, কি স্বাদু এবং টাটকা।

বাজার ও গ্রাম—মাঝখানে একটি পথ। এতবড় বাজার কিন্তু তাতে গ্রামের শান্তি কিছুমাত্র বিঘ্নিত হয় নি। বর্তমানের বিচারে এ গ্রামকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত বলা চলে। অথচ কারো মনে কোনো বিষয়েই কোনো আতঙ্ক নেই। গৃহসংলগ্ন জমিতে তরিতরকারী, ফলের গাছে ফল, আম কাঁঠাল ইত্যাদি—সবই অরক্ষিত, খোলা পড়ে আছে। আসবাবপত্র খোলা বৈঠকখানায় পড়ে আছে, কোনো দিন কিছু চুরি হয় না। সিঁদেল চোরের আবির্ভাব বছরে একবার হয় কি না সন্দেহ। মেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে নদীতে স্নান করতে যায়। কোনো দিন কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে এমন শোনা যায় নি।

রতনদিয়া গ্রামটি পূর্ব পরিকল্পিত একটি সুন্দর ছোট্ট উপনিবেশের মতো। এ গ্রামে যদিও সবাই হিন্দু, কিন্তু চারদিকের সমস্ত গ্রামে হিন্দু মুসলমানের মিশ্র বাস। সবাই যেন এক পরিবারভুক্ত। সাধারণ মুসলমানেরা সবাই প্রায় কৃষিজীবী। তারা দৈনিক বাজারে দুধ তরিতরকারী বিক্রি ক'রে নগদ পয়সা উপায় করে। তা দিয়ে মাছ কেনে। সবাই নিজ নিজ অদৃষ্ট মেনে নিয়ে তৃপ্ত। তারা ইংরেজ রাজত্বের খোঁজ রাখে না, তারা সবাই ঈশ্বরের রাজত্বে বাস করে। বড় বড় ব্যাপারে জীবন মরণ সমস্যায় তারা ঈশ্বরের বিচার মেনে চলে। কারো বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ নেই। তাদের মুখের দিকে চাইলে বহু কালের অভ্যস্ত একটি আত্মভোলা সরলতার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান যে সামাজিক ভাবে পৃথক, তা ভাল হোক মন্দ হোক, সবারই অভ্যাস হয়ে গেছে। এ নিয়ে কেউ কারো সীমানায় অনধিকার প্রবেশের কথা চিন্তা করে না।

এদের মাঝখানে বাস করার মতো তৃপ্তি আর নেই। গ্রাম্য জীবনের আর একটি বড় আরাম হচ্ছে এখানে ঘড়ি না হলেও চলে। এ পরিবেশ স্থায়ীভাবে ছাড়ব এ কল্পনা ভাল লাগেনি কখনো। এ ব্যাপারটি মনের সজ্ঞান পরিকল্পনাজাত নয়। খুব সম্ভব মনের দিক দিয়ে একটি বিরোধহীন পরিবেশ আমার পছন্দ বলেই।

স্থায়ীভাবে গ্রাম ছাড়া নয়, স্থায়ীভাবে গ্রামে থাকলে ক্ষতি কি, এই প্রশ্নটিই মনে বড় হয়ে দেখা দিল। সম্পূর্ণ গ্রাম্য জীবন। এখানে তখন মাসে দশ পনেরো টাকা একটি পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। অধিকাংশ পরিবার পাঁচ ছ টাকায় চলে।

আমার এম-এ ডিগ্রীর ভবিষ্যৎ মূল্য ডিগ্রী পাবার পরই ভুলে গিয়েছি। গ্রামে বসে ডিগ্রীর কথা মনে পড়ার হেতুও নেই কিছু। গ্রামের ঐশ্বর্য দ্রুত লোপ পাচ্ছে, কিন্তু তবু তার প্রতিটি ধূলি কণার সঙ্গে যে অঙ্গাঙ্গি পরিচয়, সে পরিচয় ভুলতে হবে এ কল্পনা বেদনা দায়ক কিন্তু ডিগ্রীর কথা ভুলে যেতে কিছু মাত্র দুঃখই বোধ হল না।

স্থির করলাম গ্রাম ছেড়ে কোথায়ও যাব না।

মাটির সঙ্গে সম্পর্ক আরও নিবিড় ক'রে তুললাম। বাড়ির সংলগ্ন জমিতে নানা গাছ লাগাতে লাগলাম, নানা জাতীয় আমের কলম এবং নতুন ধরনের নারকল গাছ কলকাতা থেকে রেল পার্সেলে আনিয়ে নিলাম। কোদাল এবং কুড়ুলের সঙ্গে পরিচয় বাড়ল। মাটি কোপানো এবং বড় বড় গাছ কাটাতেও পটুত্ব বাড়ল।

ইতিমধ্যে আমার মামাশ্বশুরের ভাগ্নে উপেন্দ্রনাথ বাগচী এসে প্রস্তাব করল রতনদিয়া বাজারে ডিসপেনসারি খুললে কেমন হয়। বড় ডাক্তারখানা ছিল না গ্রামে। বাজারে তখন এক মাত্র ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসাক, কুমারখালি থেকে এসেছেন সেখানে। উপেনের ডিসপেনসিং জানা ছিল, চিকিৎসা ব্যাপারেও তার জনপ্রিয়তা ছিল। আর আমার ওষুধ তৈরিতে ছিল তীব্র আকর্ষণ। বাল্যকাল থেকে নানা ওষুধ খেয়ে আসছি। প্রেসক্রিপশনের ওষুধ আমি বরাবর নিজেই তৈরি ক'রে নিতাম, অতএব নানা জাতীয় মেজার গ্লাস ও ব্যালান্স সহ আমার ব্যক্তিগত ডিসপেনসারিটি তখন প্রায় পনেরো ষোল বছরের প্রাচীন। বাল্যকাল থেকে এ কাজে আমার স্বোপার্জিত নৈপুণ্য। অতএব প্রস্তাবটি খুবই মনের মতো হল। উপেন নৌকো ক'রে তার বাড়ি থেকে অনেক ওষুধ এবং আলমারি নিয়ে এলো। বাজারে একখানা বড় ঘর ভাড়া নেওয়া হল মাসে পাঁচ টাকা। অতিরিক্ত মূল ধন লাগল মাত্র ছশ টাকা, সেটি আমি দিলাম।

বেশ উৎসাহ জাগল। 'ডিগনিটি অফ লেবার' কথাটিতে তখন মনে পুলক খেলে যেত। তদুপরি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতটি সর্বদা চোখের সামনে। দোকান বেশ জমে উঠল। পাইকেরি খুচরো সব রকম বিক্রি। প্রথম দিকে আমি নিজ হাতে ডিসপেন্সিংএর ভার নিলাম। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার প্রায় সকল ওষুধের মাত্রা আমার মুখস্থ হয়ে গেল। ওষুধের পার্সেল আসত রেলে। ষ্টেশন থেকে ডিসপেন্সারি পর্যন্ত পথের দৈর্ঘ্য হাঁটা-পথে প্রায় দশ মিনিট। একদিন একটি বাক্স আমি নিজে মাথায় ক'রে নিয়ে এলাম খুব গর্বের সঙ্গে। এর উদ্দেশ্য ছিল পাঁচজনকে দেখানো যে সাধারণ মজুর যা পারে আমিও তা পারি। শ্রমের সম্মান ওরাই একা পাবে কেন। আদর্শবাদের চূড়ান্ত!

বলা বাহুল্য, এতে নিন্দা রটে গেল। আমি এই নিন্দারই অপেক্ষা করছিলাম। মনের উৎসাহ আরও তীব্র হয়ে উঠল। সব দিকেই সংস্কার বর্জন করেছি যতটা সম্ভব। এটি তার মধ্যেকার একটি। নিন্দা রটল প্রায় সামাজিক ভাবে। সমাজের কিছু পরিচয় দেওয়া যাক।

পল্লীসমাজ অবশ্য সর্বত্রই এক। কয়েকজন আত্মচিহ্নিত নেতা সর্বত্রই আছেন এবং তাঁদের দাপট কম নয়। এতদিনে এঁরা আর নেই সম্ভবত। রতনদিয়া গ্রাম এ থেকে মুক্ত ছিল বরাবর। গ্রামটি অনেক দিক থেকেই ছিল আধুনিক। কিন্তু পল্লীসমাজ একটি মাত্র গ্রামে সীমাবদ্ধ থাকে না, আশে পাশের অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে এক একটি সমাজ এবং এ সমাজ ব্রাহ্মণ-প্রধান। শ্রাদ্ধ বা বিবাহ কাজে সঙ্গতি থাকলে সমাজসুদ্ধ নিমন্ত্রণ করাই রীতি। এই নিমন্ত্রণ কয়েক রকমের আছে। যথা (১) সমাজসুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে, (২) সমাজসুদ্ধ, কিন্তু শুধু পুরুষদের (৩) শুধু স্বগ্রামের স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে, অথবা (৪) স্বগ্রামের শুধু পুরুষদের। কোনো উপলক্ষে যখন সমাজসুদ্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয় তখন আড়ালে ব'সে সমাজপতি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে নিমন্ত্রণকারার কোনো একটা খুঁত বের করার চেষ্টা করেন, অবশ্য পূর্বে থেকেই যদি তাকে জব্দ করার উদ্দেশ্য থাকে। প্রয়োজন বোধে খুঁতের অভাব হয় না। তখন সবাই মিলে নিমন্ত্রণকারীর অজ্ঞাতসারে জোট পাকাতে থাকে এবং ভোজনের সময় উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যদি দেখা যায় নিমন্ত্রিতরা কেউ আসছেন না, তখন বোঝা যায় কিছু ঘটেছে।

এমনি হয়েছিল আমার বিবাহ সময়ে। আমার কাকা থাকতেন অন্যত্র, তাঁর বিবাহ হয়েছিল এমন পরিবারে যেখানে বিধবা বিবাহ বা ঐ জাতীয় কোনো গুরুতর কলঙ্ক ছিল। কাকা সপরিবারে এসেছিলেন বিবাহ উপলক্ষে। অতএব মহা সুযোগ। রতনদিয়ার লোকেদের কারো এ নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না, কিন্তু ভিন্ন গ্রামের সমাজপতি জোট পাকাতে লাগলেন। তিনি ভয় দেখিয়ে বহু নিমন্ত্রিতকে আটকে রাখলেন। বেলা গড়িয়ে যায় এবং তাঁদের আশা প্রায় ছেড়েই দেওয়া হয়েছে, এমন সময় দেখা গেল একে একে আসছেন সবাই। শেষ মুহূর্তের এই উদারতায় কৃতজ্ঞ না হয়ে পারা গেল না। পরে বোঝা গেল, এর মূলে 'উদরতা'। ভাল ভাল মিষ্টান্নের আয়োজনের কথাটা ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই জাতীয় বিরোধিতাকে কখনো ভয় করি নি আমি, এবং পাল্টা এঁদের বিদ্রূপ করায় তখন উৎসাহবোধ করেছি। একটি ঘটনা বলি। মুরগীর মাংস খাওয়া সে-যুগে নিন্দনীয় ছিল, বিশেষতঃ প্রকাশ্যে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে রান্নাঘরেই মুরগীর মাংস বরাবর রান্না হয়েছে, অবশ্য নিয়মিত মুরগীর মাংস খাওয়ার গরজ ছিল না কারোই। আমরা এ বিষয়ে সংস্কারমুক্ত ছিলাম। মাঝে মাঝে ডাক্তার কার্তিক বসাকের বাড়িতেও সবাই মিলে খাওয়া হত। এক দিন কথাটা খুব প্রচার হয়ে পড়ল এবং নদীর ওপারে অবস্থিত সমাজপতির কানেও পৌঁছল। তিনি এই উপলক্ষে আবার বৈঠক বসাতে লাগলেন, খবর এলো। এ কথা শোনামাত্র আমরা তাঁকে একখানা চিঠি লিখলাম। চিঠিখানা ছিল এই রকম :

মহাশয়, আমরা নিম্ন-স্বাক্ষরিত ব্রাহ্মণ সন্তানগণ গত রাত্রে ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসাকের বাড়িতে অতিশয় তৃপ্তি সহকারে তিনটি পুষ্ট মুরগীর মাংস ভক্ষণ করেছি। রান্না অতি উপাদেয় হয়েছিল।

এ চিঠির নিচে আমরা প্রায় দশ জন সই করেছিলাম। চিঠি যথাস্থানে পৌঁছেছিল, কিন্তু এর পর সব ঠাণ্ডা। সে আজ কত দিনের কথা—তেত্রিশ বছর হবে। তখন কিঞ্চিৎ দাম্ভিকতা ছিল, মনে কিছু উগ্রতা ছিল, তাই এখন যা অত্যন্ত করুণ মনে হয়, তারই বিরুদ্ধে উৎসাহের সঙ্গে লড়াই করেছি। আহত মস্তক সাপের মতোই তাকে মাটিতে পড়ে ধুঁকতে দেখেছি। কি বেদনাময় সে দৃশ্য! অনিবার্যকে রোধ করবার উপায় নেই, অথচ অনিবার্যকে গ্রহণ করবারও ক্ষমতা নেই। নির্বীর্য, কর্মবিমুখ, স্বয়ং যাবতীয় পাপ-কাজে লিপ্ত, সমাজপতিদের এই দুরবস্থা নিজ চোখে দেখেছি। দূর কালের পটে

গ্রামের সরলপ্রাণ চাষীরা

দেখলে বোঝা যায়, আমাদের নিষ্ঠুরতা প্রকাশের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। মৃতপ্রায়কে আঘাত করাটা বাড়াবাড়ি।

কিন্তু আরও একটি বড় জিনিস এতদিন লক্ষ্য করিনি। রতনদিয়া গ্রামে এতদিন আমাদের ছাত্রজীবনে বন্ধুদের মধ্যে যে স্তরের আলাপ আলোচনা মেলামেশা এবং ক্রিয়াকলাপ চলত, ইতিমধ্যে তার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের দলের সবাই প্রায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, বন্ধুরা সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনে দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। পরবর্তী ধাপের যারা অবশিষ্ট রইল তারা না পারল লেখাপড়া শিখতে, না পারল মার্জিত হতে। তারা রতনদিয়ার আভিজাত্যের ভাঙনের তলায় চাপা পড়ে গেল। তাদের সঙ্গে আমাদের ভেদ অতি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। শিক্ষাবর্জিত গ্রাম্য ছেলে তারা আমাদের বোঝে না, আমরাও তাদের বুঝি না। তারা উগ্র, এবং সম্পূর্ণ শালীনতাবর্জিত।

এইটি হৃদয়ঙ্গম ক'রে ভয় পেয়ে গেলাম। এদের মধ্যে থেকে কিছু করা বিপজ্জনক। যতই গ্রাম্য স্তব কল্পনা করি না কেন সেটি ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত মনের রোমাণ্টিক কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়—এই নিষ্ঠুর সত্যটি মনের মধ্যে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। সভয়ে আবার পল্লীদিগন্ত রেখার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করলাম।

এর পরেও ছ'সাত বছর নানা পরীক্ষার পথে চলেছি, অভিজ্ঞতাও লাভ হচ্ছে বিবিধ। লিখন বৃত্তিই যে শেষ পর্যন্ত অবলম্বন করতে হবে তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। পরবর্তী কয়েক বছরের অনেক কিছুই কোনটা আগে কোনটা পরে ঘটেছে তা এখন আর মনে করতে পারি না, কেননা এ সবের কোনোটিই জীবনের মোড় ঘোরায়নি।

এর মধ্যে বছরখানেক গভর্নমেণ্ট কমার্শ্যাল ইনসটিট্যুটে পড়েছি। কিছু একটা করা দরকার। চাকরি যদি করতেই হয় তবে স্টেনোগ্রাফি ভাল এমন উপদেশ দিয়েছিলেন অনেকে। সাধারণ ভাবেই খুব দ্রুত লেখার অভ্যাস ছিল আমার, কপিং পেন্সিলের সাহায্যে কলেজের অধ্যাপকের বক্তৃতা লিখেছি অনেক দিন। অতএব শর্টহ্যাণ্ডে সফল হব এমন বিশ্বাস ছিল। প্রিন্সিপ্যাল সেনের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি ছিলেন বাবার সহপাঠী এবং পরিচিত। তিনি আমার পরিচয় পেয়ে অভ্যর্থনার বদলে তিরস্কার আরম্ভ করলেন। বললেন বয়স পার ক'রে এ লাইনে এলে কেন? সরকারী চাকরির মনোনয়ন তো অনেকটা আমার হাতেই, সাত শ' আট শ' টাকা পর্যন্ত পাচ্ছে অনেকে। তোমার এখন সে পথ বন্ধ। এখন পাস করলে হয়তো কোনো মার্চাণ্ট অফিসে দুশো টাকার চাকরি করবে, কিন্তু কানে আসবে লাখ লাখ টাকার আলোচনা। ভাল লাগবে না সে কাজ।

দুঃখ হল খুবই। তবু ভর্তি হলাম। স্কুলটি ছিল বৌবাজার ষ্ট্রীটে। এক বছর পড়লাম সেখানে। দেবেন দত্ত ষ্টেনোগ্রাফি শেখাতেন পিটম্যান পদ্ধতিতে। প্রথম বছর শেষে পরীক্ষা দিলাম মিনিটে ৮০ শব্দ (অফিশিয়ালি), আসলে ১০০ শব্দ ডিকটেট করা হয়েছিল দেবেনবাবু নিজেই বলেছিলেন। টাইপরাইটারে ব'সে এর প্রত্যেকটি শব্দই নির্ভুলভাবে ট্রান্সক্রাইব করেছিলাম। ইংরেজী বা বাংলা বানান সম্পর্কে নিষ্ঠা ছিল একটু বেশি মাত্রায়, এবং আমাদের যুগের অনেকেরই এটি ছিল বিশেষত্ব। তাই পরীক্ষা ভালই হল। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা অধিকাংশই ছিল ম্যাট্রিকুলেট।

শর্টহ্যাণ্ড পড়ার সময় এই শব্দানুগ চিহ্নের সংক্ষিপ্ত লিখন পদ্ধতিটি খুব ভাল লেগেছিল। তখন মনে হত এটি আগে শেখা থাকলে সকল অধ্যাপকের বক্তৃতা আগাগোড়া লিখে নেওয়ার কত সুবিধে হত। তখন অধ্যাপকদের বক্তৃতা আগাগোড়া লিখে রাখবার মতোই ছিল।

পরীক্ষা দেবার পর আর স্কুলের সীমানায় যাইনি, শর্টহ্যাণ্ডের প্রতি এবং স্টেনোগ্রাফির চাকরির প্রতি মনে বিতৃষ্ণা জেগে উঠল। অনেকদিন পরে এক সহপাঠীর মুখে শুনেছিলাম পরীক্ষায় আমি প্রথম হয়েছিলাম এবং আমার জন্য কিছু প্রাইজও ছিল। কিন্তু ঐ স্কুলের সীমানায় পুনরায় যাওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

এই কয়েক বছরের মধ্যে কয়েকটি অদ্ভুত চরিত্রের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। ঘনিষ্ঠতা আগেই ছিল, কিন্তু এবারে গলায় গলায় ভাব হল। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল আইন অমান্য ক'রে চলার দিক দিয়ে আমাদের দুজনের চরিত্রে অনেকখানি মিল ছিল। দু'জনেই অনিয়মিত এবং এলোমেলো। বলাই এ বিষয়ে আমার চেয়ে কয়েক ডিগ্রী বেশি! এ সময়ে কয়েক মাস বা কয়েক বছর একই সঙ্গে কাটিয়েছি। একবার এক ঘরেও। বলাইয়ের নাওয়া খাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই নিয়মও নেই, হয়তো দশ পনেরো দিন পর এক দিন স্নান হল। চুলে চিরুনির স্পর্শ নেই, জুতোয় কালি নেই।

একবার পটুয়াটোলা লেনের এক মেসে ছিলাম। কেন ছিলাম তা আর এখন মনে নেই। সেখানে আমার পূর্বেকার সহপাঠী বন্ধু শিবচরণ মৈত্র থাকত। বলাইয়ের ভাই ভোলানাথ এখানে কিছুদিন ছিল মনে হয়। সেই সূত্রে বলাই এখানে আসত। শিবের জ্বর হয় একবার, জ্বরের পরে অন্ন পথ্য দরকার। বলাই সম্ভবত শিবকে ওষুধ দিয়েছিল, অতএব বলাইয়ের খেয়াল হল মেসের ভাত তো ভাল নয়, ভাল ভাত কারো বাড়ি থেকে ভিক্ষে ক'রে আনা যায় না? বলাই তৎক্ষণাৎ মেস থেকে একখানা থালা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল ভাত ভিক্ষের উদ্দেশ্যে।

বলাইয়ের কণ্ঠস্বর, চেহারা এবং ব্যক্তিত্ব ছিল দুর্বার। সব সময়েই তা ধারালো, তা সব বাধা কেটে এগিয়ে চলে এবং তা চমকপ্রদ রূপে চিত্তহারী। পনেরো মিনিটের মধ্যে বলাই প্রকাণ্ড একখানা থালায় শুধু ভাত নয়, অনেকগুলো বাটিতে সাজানো ঝোল ডাল ইত্যাদি নিয়ে এসে হাজির। সেই থালাখানার নিচে মেসের থালাখানা লজ্জায় মাথা ঢেকে আছে।

বলাই এক অপরিচিতের বাড়িতে ঢুকে সোজা গিয়ে বলল "এক বন্ধু আজ অন্ন পথ্য করবে, মেসের ভাত অখাদ্য, তাই ভাল ভাত ভিক্ষে করতে বেরিয়েছি, সম্ভব হলে এই থালায় কিছু ভাল ভাত দিন।" একেবারে সোজা কথার সোজা প্রস্তাব, প্রস্তাবে কোনো দ্বিধা নেই, কোনো দীনতা নেই। যাঁদের কাছে ভাত চাওয়া হল, সম্ভবত তাঁরা এই রকম চাওয়ার সরলতা এবং এর মধ্যকার নতুনত্ব দেখে এমন মুগ্ধ হলেন যে তাঁদের নিজেদের থালা-বাটিতে সব সাজিয়ে বলাইয়ের হাতে তুলে দিলেন, ঠিকানাও জিজ্ঞাসা করলেন না।

বলাই ছিল এমনি খেয়ালি ও ওরিজিন্যাল। কলকাতার মতো বন্ধ্যার বাড়িতে প্রবেশ ও ভাত ভিক্ষে পাওয়া যায় কিনা তার পরীক্ষা-বাসনা একমাত্র বলাইয়ের পক্ষেই সম্ভব। এবং শুধু এটি নয়,

আরও অনেক ঘটনা যার প্রত্যেকটি চমকপ্রদ, এবং একটা আর একটা থেকে স্বতন্ত্র।

ডাক্তারি ছাত্রদের কাছে কডলিভার তেল অন্তত তখন খুব প্রিয় ছিল। বলাইকে এই তেল কিছুকাল খেতে হয়েছিল নিউমোনিয়া আক্রমণ থেকে উঠে। বোতল ধরে মুখে ঢালত যতটা সম্ভব। সে সময় আমরা মির্জাপুর ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগ স্থলের ত্রিকোণাকার বাড়িতে থাকি। ওটির নাম ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিং। এখানে আরও ডাক্তারি ছাত্র থাকত, তার মধ্যে অমিয়কুমার সেন আমাদের অন্তরঙ্গ ছিল। এই অমিয় সেনকেও বলাইয়ের মতোই মাঝে মাঝে বোতল ধ'রে কডলিভার তেল মুখে ঢালতে দেখেছি। শেষে আমিও ঐরকম অভ্যাস করেছিলাম। কডলিভার তেলের বোতল দেখলেই এরা লোভ সামলাতে পারত না।

এই সময় অমিয় সেনের বিয়ে। ডাক্তারি ছাত্র, অতএব বলাইয়ের খেয়াল হল বিয়েতে সর্বোৎকৃষ্ট উপহার হবে এক বোতল কডলিভার তেল। কারণ এতে ফাঁকি নেই, সম্পূর্ণ সারবান এবং মৌলিকতায় আর সব উপহারকে হার মানাবে। তখন আমাদের কারো কাছেই উদ্বৃত্ত পয়সা বিশেষ কিছু থাকত না, খরচ সম্পর্কে আমরা সর্বদা বেহিসেবী। বলাই ঠিক করল উপহারের জন্য বেঙ্গল কেমিক্যালের কডলিভার তেল কিনবে এক বোতল, দাম কম, সম্ভবত দেড় টাকার নিচে। সেটি খাঁটি নওয়েজিয়ান তেল, এখানে বোতলে পোরা। ডি জংস্ কডলিভারও খুব চলত তখন, সেটি বিদেশী।

কেনার সময় আমি সঙ্গে ছিলাম। আমাদের বোর্ডিং হাউসের নিচে বি-বোসের দোকান। বলাই বেঙ্গল কেমিক্যালের তেল কিনল এক বোতল। সেখানে বাইরের এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন, তিনি হঠাৎ ব'লে বসলেন, "কিনছেন যদি, তা হ'লে আর দেশী কিনছেন কেন?" এ রকম ধারণা তখন অনেকেরই ছিল, বিদেশী নামের উপর অতি বিশ্বাস। কিন্তু বলাই একথা শুনে মুহূর্তে সেই ভদ্রলোকের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তখন তার মস্তিষ্কের তর্ক, এবং কৌতুক কেন্দ্র যুগপৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সে সামনের বেঞ্চের উপর একখানা পা তুলে দিয়ে সামনে একটু ঝুঁকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলতে লাগল, "আমার এই স্বাস্থ্য দেখছেন? ওজন বারো টন। কিন্তু আগে আমি ছিলাম কংকাল। শুধু বেঙ্গল কেমিক্যালের কডলিভার অয়েল খেয়ে এই স্বাস্থ্য হয়েছে আমার। অতএব আপনি যত ইচ্ছে চেঁচান, চেঁচিয়ে গলা দিয়ে রক্ত বার করুন, তবু আপনার কথা আমি মানতে রাজি নই।"

ভদ্রলোক মাথা নিচু ক'রে বোকার মতো ব'সে রইলেন।

সমস্তই খেয়ালের মাথায়, কোনোটিই পূর্ব-পরিকল্পিত নয়। যেমন, একদিন অমিয় সেনের বিয়ের পর মজাসৃষ্টির হঠাৎ একটি সুযোগ পাওয়া গেল। আমরা দুজনে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আবিষ্কার করি সদ্য বিবাহিত অমিয়কুমার তার স্ত্রীর কাছে একখানা চিঠি আরম্ভ ক'রে শেষ হবার আগেই কলেজে চলে গেছে। চিঠিখানা বলাই তার চিঠির প্যাড খুলে আবিষ্কার করল। আমি তখন সেই চিঠি নিয়ে বাকীটুকু লিখলাম। অমিয়কুমারের লেখা যেখানে শেষ হয়েছে তার পর থেকে এই ভাবে লিখলাম—

"সে যা হোক, আমি তোমাদের বাড়িতে যেতে চাই, কিন্তু যেচে যেতে বড় লজ্জা হয়। তোমরা যদি ওখান থেকে যেতে লেখ, তা হলেই যেতে পারি। লিখবে তো?—ইতি" তারপর এ চিঠি খামে বন্ধ ক'রে তার উপর অমিয়র স্ত্রীর নাম ও ঠিকানা লেখা হল। অমিয়র শ্বশুরবাড়ি ওখান থেকে হাঁটাপথে তিন মিনিটেরও কম পথ। মির্জাপুর ষ্ট্রীটের উপর।

আমি অন্যের হাতের লেখা সুন্দর নকল করতে পারতাম, যার লেখা সেও ধরতে পারত না অনেক সময়। যাই হোক, এ চিঠি পৌঁছে দেবার ভার নিল বলাই। সে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে, ফতুয়া গায়ে, খালি পায়ে, এবং চুলগুলো আরও অবিন্যস্ত ক'রে, অমিয়র শ্বশুরবাড়ি চলে গেল এবং কড়া নেড়ে গ্রাম্য উচ্চারণে গিয়ে বলল "অমিয় দাদাবাবু নতুন দিদিমণিকে এই চিঠিখানা পাঠিয়েছেন।"

ঘটনাটা ঘটেছিল সম্ভবত বেলা একটায়। তার পর আমরা বিকেলে বেরিয়ে যাই এবং এ চিঠির পরিণাম কি ঘটল তা জানবার জন্য সন্ধ্যার পরেই ফিরে আসি। এসে দেখি অমিয় গুম হয়ে ঘরে বসে আছে, আমাদের দেখামাত্র একখানা চিঠি আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল এই নাও তোমাদের চিঠির উত্তর।

অমিয়কুমার মিষ্টস্বভাবের মানুষ। কারো উপর চটতে দেখিনি কখনো, আমাদের উপরেও চটেছিল কি না ঠিক বোঝা গেল না।

ঘটনা অনেক দূর গড়িয়েছিল। নতুন জামাই চিঠি দিয়েছে, অতএব তাতে শ্বশুর বাড়ির সবারই অধিকার—চিঠির কথা সঙ্গে সঙ্গে প্রচার হয়ে গিয়েছিল। ফলে তার শ্বশুরবাড়ির সবাই একে একে অমিয়কে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন। অমিয়র শ্বশুরও এসে গেছেন একবার।

একটি নিষ্ঠুর কৌতুক সন্দেহ নেই। বলাই যে কি পরিমাণ খেয়ালি তার আরও দৃষ্টান্ত আছে। একদিন অমিয়র অনুপস্থিতিতে

ডিস্‌পেন্সিং ঘরে

তার টেবিলের ল্যাম্প থেকে চিমনিটা খুলে নিয়ে টেবিলের উপর ভেঙে রাখল। আমিও কিছু সহযোগিতা করলাম এ কাজে। আঙুলের সঙ্গে রুমাল জড়িয়ে ধুলো আর জলে মিশিয়ে ঝকঝকে বিছনার চাদরটির উপরে বিড়ালের পদচিহ্ন এঁকে দিলাম কয়েকটি। কাজটি খুব নিখুঁত হয়েছিল। অমিয় ফিরে এসে কোনো অদৃশ্য বিড়ালের উদ্দেশে অভিসম্পাত বর্ষণ করতে লাগল।

একদিন অপরাহ্নে হঠাৎ খেয়াল হল কলকাতার বাইরে কোথায়ও ঘুরে আসা যাক। বলাই আমি ও শিব মৈত্র অবিলম্বে চলে গেলাম শিয়ালদ স্টেশনে। পকেটে আমাদের উদ্‌বৃত্ত পয়সা কোনো সময়েই বেশি থাকত না, সেদিনও ছিল না। সবার সব পয়সা একত্র করে বলাইয়ের হাতে দিলাম। বলাই সে পয়সা বুকিং ক্লার্কের সম্মুখে ঠেলে দিয়ে বলল, "দাদা, তিনখানা রিটার্ণ টিকিট দিন।"

"কোথাকার?"

"তিতো বিরক্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি দাদা, যে-কোনো স্টেশনের দিন, আটকাবে না কিছু।"

বুকিং ক্লার্ক খুব কৌতুক অনুভব করলেন এ কথায়, এবং পয়সা হিসেব করে তিনখানা কাঁচরাপাড়ার রিটার্ণ টিকিট দিলেন।

ট্রেনের মধ্যে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল, তিনিও কাঁচরাপাড়া যাবেন। বলাই তাঁর সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে নিল, এবং তাঁকে দাদা বলতে আরম্ভ করল। বলাই ক্রমে প্রস্তাব করল তাঁর বাড়িতে গিয়ে বৌদির হাতের রান্না খেয়ে তবে অন্য কথা। ভদ্রলোক মহা বিপদে পড়লেন। তিনি যতই প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করেন বলাই ততই তাঁর সম্পর্কে এবং বৌদির সম্পর্কে আলাপ করতে থাকে। অবশেষে কাঁচরাপাড়া পৌঁছানর পরও যখন আমরা তাঁর সঙ্গে চলতে শুরু করলাম তখন তিনি যতরকম ভাবে সম্ভব আমাদের নিরুৎসাহ করতে লাগলেন। বললেন, "রাত্রি বেশি হলে ফেরবার আর গাড়ি পাবেন না, আপনাদের ভীষণ কষ্ট হবে, আপনারা সত্যিই আসবেন না, আমার বাড়ি এখান থেকে চার মাইল"—ইত্যাদি।

বলাই ভাত ভিক্ষে ক'রে নিয়ে এলো

আমরা শুধুই একটু 'মজা' করার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে মাইলখানেক গিয়েছিলাম।

ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডিংএ বলাই, আমি ও বলাইয়ের দূরসম্পর্কীয় এক ভাই (সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়) একটি ঘরে বাস করতাম। সে ঘরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধেশ্বর পড়ত মেডিক্যাল স্কুলে। পড়াশোনায় তার খুব নিষ্ঠা ছিল। বলাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল তার অপরিসীম। তার পড়ার সুবিধে হবে এই উদ্দেশ্যে বলাই মেডিক্যাল কলেজ থেকে মানুষের ব্রেন, ফুসফুস হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি কি ভাবে সংগ্রহ করে এনেছিল জানি না। সেগুলো পৃথক পৃথক মাটির হাঁড়িতে ফর্মালিনে ডোবানো থাকত, হাঁড়িগুলো থাকত তক্তাপোষের নিচে। তিনখানা তক্তাপোষের মাঝখানে বড় একটা সতরঞ্চি পাতা ছিল—এইখানে ব'সে ব্রেন বা ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ড কাটা হত এবং সিদ্ধেশ্বরকে এ সবের অ্যানাটমি বোঝানো হত। সেই সতরঞ্চির উপর একটি কুকার ছিল, তাতে প্রায়ই মাংস রান্না হত। একদিকে মানুষের ফুসফুস কাটা হচ্ছে অন্যদিকে পাঁটার মাংস রান্না হচ্ছে। সতরঞ্চির উপর মাসখানেকের ধুলো জমে আছে, কখনো তারই উপর শুয়ে পড়েছে বলাই। মানুষের সেই সব দেহাঙ্গ হাঁড়িতে ফর্মালিনে ডোবানো থাকত বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অংশ ডুবত না, তার ফলে সেই সব অংশ কিছুদিনের মধ্যেই পচে উঠে ঘর দুর্গন্ধে ভরে তুলত। কিন্তু সবাই নির্বিকার। তার মধ্যেই খাওয়া শোওয়া সবই স্বাভাবিক ভাবে চলছে।

আমারও অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন ধ'রে একটি ফুসফুস কাটা হচ্ছিল। ফুসফুসের ভিতরটা এই প্রথম দেখার সুযোগ পেলাম। ফুসফুসের খণ্ডিত অংশের গায়ে ছোট-বড় নানা রকম চেহারার কয়লার মতো কালো এক একটা অংশ, কেউ যেন সে-সব জায়গায় ভুষোর ছোপ লাগিয়ে দিয়েছে। ও-সব অংশের নাম শুনলাম কার্বনাইজড্ অংশ, অত্যধিক ধূমপানে বা ধোঁয়া নাকে টানার ফলে ফুসফুসে ঐ রকম এক একটা এলাকা কালো হয়ে যায়।

কাটাকাটির কাজ শেষ হবার পর আসল বিপদ। বলাই একদিন রাত দুটোয় উঠে কাটা ফুসফুস খবরের কাগজে জড়িয়ে গোপনে পথের রেফিউজ বিনের মধ্যে ফেলে এলো। বলল, যদি পুলিসে ধরে, তা হলে বিপদ। বলবে, নরহত্যা করেছ। প্রমাণ করতে হবে, করি নি। ততদিনে শাস্তির চূড়ান্ত।

থিয়েটার দেখা অনেক দিন থেকেই একটি বড় নেশা ছিল। বলাইও নিয়মিত দেখত। কিন্তু আমাদের হাতে উদ্‌বৃত্ত পয়সা কোনো সময়েই বেশি থাকত ব'লে মনে পড়ে না। মাসের শেষ দিকে কোনো বন্ধু এলে তাকে শোষণ ক'রে একেবারে গজভুক্ত কপিত্থবৎ ক'রে ছেড়ে দেওয়া হত। সাহেবগঞ্জ থেকে প্রবোধ এলে তার উপরেই আক্রমণটা বেশি হত। প্রবোধ ছিল অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, সে আমাদের জন্য খরচ ক'রে তৃপ্ত হত, এটি জানা ছিল ব'লেই আমাদের কোনো সঙ্কোচ হত না। তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম থিয়েটারে অথবা সিনেমায়। একটি পয়সা হাতে থাকতে তাকে ছাড়া হত না। সে যখন সাহেবগঞ্জে ফিরে যেত, তখনকার অবস্থা বলাইয়ের ভাষায়: প্রবোধদা'র পকেট আমরা একেবারে খালি ক'রে ফেলতাম, শেষে তাঁর যাবার সময় অন্য কোনো বন্ধুর কাছ থেকে পয়সা ধার ক'রে দিতাম, সে ধার প্রবোধদা'ই শোধ করতেন বলা বাহুল্য। প্রবোধদা'র যাবার সময়

খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ময়লা পোষাক ! দাড়ি কামানোর পয়সাও থাকত না।—বলাই এ গল্প তখন অনেককে শুনিয়েছে।

প্রবোধ ছিল অত্যন্ত কোমল হৃদয় এবং সেণ্টিমেণ্টাল। কোনো বিয়োগান্ত নাটক তার সঙ্গে দেখা প্রায় অসম্ভব ছিল। মনোমোহন থিয়েটারে 'প্রফুল্ল' অভিনয়ে প্রবোধ, বলাই ও আমি গিয়েছিলাম। প্রবোধ কিছুক্ষণের মধ্যেই এমন কাঁদতে আরম্ভ করল যে, তা ঠেকানো দুঃসাধ্য। সে উঠে যাবেই। কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়ে, এবং রওনা হয়, আমরা দু'দিক থেকে তার হাত ধ'রে জোর ক'রে বসিয়ে দিই। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। একটু পরেই আবার মর্মান্তিক দুঃখের দৃশ্য আরম্ভ হয়, আবার প্রবোধের সেখানে ব'সে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। জোর ক'রে চলে যেতে চায়। বলে পয়সাও খরচ করব এবং এত দুঃখ সহ্য করব, এ আমি পারব না। আবার তাকে ঠাণ্ডা করি, আবার সে কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়ে।

দানি বাবুর পরে প্রবোধকে কাঁদাতে লাগলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি তাঁর সীতা নাটকে। কিন্তু তত দিনে প্রবোধ থিয়েটারে ব'সে কান্নার মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করতে শিখেছে, কাঁদতে কাঁদতে উঠে যাবার চেষ্টা করেনি।

থিয়েটারে দুঃখের দৃশ্য দেখে কাঁদি কেন এবং পয়সা খরচ ক'রে কাঁদি কেন, এ প্রশ্নের ঠিক উত্তরটি আজও মেলেনি। আরিষ্টটল থেকে অদ্যাবধি এ চেষ্টা হয়ে আসছে, অনেক উত্তরই ভাল লাগে কিন্তু সম্পূর্ণ মনে হয় না। কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত যে ট্রাজেডি দেখতে আমরা পছন্দ করি—তা-সে *Katharsis* হোক বা না হোক, অথবা যে অর্থেই হোক। কিন্তু প্রবোধ যখন বলেছিল "পয়সাও খরচ করব এবং কাঁদবও, এ আমি পারব না"—তখন অন্তত সে মুহূর্তের জন্য আরিষ্টটল একটু দূরে সরে ছিলেন, এ দৃশ্যটি দেখতে পাননি।

বলাইয়ের খেয়ালের মৌলিকতা বলাইকে একটি অদ্ভুত চরিত্রে পরিণত করেছিল। আরও দু জন খেয়ালি ব্যক্তির সংশ্রবে এসে বলাইয়ের চরিত্র আরও খুলেছিল। সে দুজন ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শিবদাস বসুমল্লিক। প্রথম জন বলাইয়ের শিক্ষক, দ্বিতীয় জন তার সহপাঠী। খেয়াল বিষয়ে এ দু'জনকেই বলাইয়ের বড়দা বলা চলে। এঁদের কথা পরে বলব। ইতিমধ্যে আর একটি ছোট্ট ঘটনা বলি।

একদিন বলাইয়ের হঠাৎ খেয়াল হল কোনো একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সে পথে এসে দাঁড়াল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি পছন্দ মতো যুবককে ডেকে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রে ফেলল; দু'জনের মধ্যে চিঠিপত্র লেখা চলেছিল কিছুকাল। [ক্রমশঃ।

ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

বেদান্ত বলেন, জগৎটা একান্ত ভাবে মায়া। এই মায়ার ফাঁদে পড়িয়া জগৎকে সত্য বলিয়া মনে হয় এবং তাহারই জন্য মানুষের বন্ধন ও ত্রিবিধ দুঃখের নরক-যন্ত্রণা সহ্য করা। এই মায়িক জগতের মত ফিরিঙ্গির এই শাসনটাও একটা মায়া, একটা প্রকাণ্ড কাল্পনিকতা! ইহার পুলিশ-প্রহরী, কাজী-কারাগার, ইহার দ্বীপান্তর ফাঁসি! ইংরেজের পেয়াদা-পাইক, হাঁক-ডাক শাসনের শাসানিক যত হাঁক-ডাক, ফিরিঙ্গির লাট-বেলাট হইতে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব কিছুই ভ্রান্তি। যেদিন আমাদের আত্মানুভূতি হইবে, আমাদের স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারিব আর সেই আত্মানুভূতির স্বারাজ্যভূমি হইতে আমরা বলিব, ইংরেজ নাই—সেদিন ইংরেজ থাকিবে না! উষার রক্তিম রাগের স্পর্শে তমিস্রা রজনীর আঁধার যেমন নিমেষে লোপ পাইয়া যায়, ইংরেজের রাজ্য-সাম্রাজ্য, তাহার শিক্ষা-সভ্যতার বাড়াবাড়ি ও হুড়াহুড়ি নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে! ফিরিঙ্গির যা কিছু বাঁধন-ছাঁদনএর অস্তিত্ব কেবল আমাদের মূঢ়তায়, এ দেশী লোকের ভ্রান্তিতে। ফিরিঙ্গির প্রেমে আমরা মজিয়া আছি বলিয়া তাহাদের আটে-কাটে বাঁধিয়া রাখিয়া দিয়াছি। তাহাদের শিক্ষা চলিতেছে আমাদের প্রেমে, ঐ ম্লেচ্ছ শাসনকে আমরাই আমাদের অনুরাগ-আকর্ষণ দিয়া বর্ত্তাইয়া রাখিয়াছি। কিন্তু আর নয়, মুক্তির দিন আসিয়াছে। এই ফিরিঙ্গির প্রেমের ডোর ছিন্ন করিয়া স্বাদেশিকতার ভাগীরথী প্রবাহে অবগাহন করিয়া আমাদের একবার বেদান্ত মন্ত্রে বলিতে হইবে—ব্রহ্মৈবাহম্, আমরা ব্রহ্ম! আমরা ঋষিমুনির সন্তান! আমরা শ্রীকৃষ্ণের উত্তরাধিকার। আমাদের শোণিত সংশ্রবে রহিয়াছে প্রতাপ শিবাজীর শোণিত সম্পর্ক। আমাদের অধীন রাখে কে! আমরা মুক্ত স্বরাট!

'সন্ধ্যা', ১৩১৪ : রাজদ্রোহ মামলায় অভিযুক্ত।

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

বলসইতে এত পালা দেখলাম, মস্কো আর্ট থিয়েটারে একদিন যাওয়া তো উচিত। কিন্তু দেশে ফেরার জন্য পা বাড়িয়ে আছেন, প্রস্তাব কারো কানে ঢোকে না। শেষ পর্যন্ত মোটমাট পাঁচজন হলাম আমরা। আর দোভাষিণী ইরা—ইংরেজী করে বুঝিয়ে দেবার জন্য। পালা হল উষ্ণ হৃদি (warm heart) আমরা আসার আগে কালিদাসের নাটক হয়ে গেছে। সময় নেই যে রয়ে সয়ে কোন ভাল পালা দেখে যাব এখানে।

হলে ঢুকে রাগ হচ্ছে। আন্তন চেকভের মতো গুণী নিজে গড়ে তুললেন—জগৎজোড়া নাম—যে বস্তু এই? হালফিল আমাদের কলকাতার থিয়েটার যা দাঁড়াচ্ছে, ভাল বই খারাপ নয় এর চেয়ে। সিনসিনারি আহা-মরি কিছু নয়। বলসই থিয়েটার তো চোখ ধাঁধিয়ে মাথা খারাপ করে দিয়েছে। এখানে ভেবেছিলাম না জানি আরও কি দেখতে পাব! শুরুতেই মুসড়ে পড়েছি তাই।

প্রেমের গল্প। হাসি রহস্যও খুব। উনিশ শতকের পরিবেশ। এর মধ্যে একটা সিনে কিছু বাহাদুরি দেখলাম। জমিদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে নৌকো চড়ে কাছারি বাড়ি যাচ্ছেন। বাড়ির নিচে নদী। উঠলেন বাবু সতর্ক হয়ে, জুতোয় জলকাদা না লাগে। ছেড়ে দিল নৌকা, গান বাজনা ও ফুর্তিফার্তির ব্যাপার আছে, সেই সব শুরু হয়ে গেল। চলেছে, চলেছে—ঘর বাড়ি গির্জা মাঠ গাছপালা পার হয়ে চলেছে, অবশেষে কাছারি বাড়ির ঘাটে এসে লাগল। জমিদার সদলবলে নেমে পড়লেন। নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে হলসুদ্ধ আমরাও চলেছিলাম যেন। এখন কাছারি বাড়ি পৌঁছে সেখানকার কাজকর্ম দেখছি।

ব্যাপারটা বুঝলেন? নৌকো একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে, স্টেজের উপর দর্শকের দৃষ্টির উপর থেকে, তা ছাড়া যাবেই বা কোথা? পিছনের পর্দা ঘুরে যাচ্ছিল এ তাবৎ। পর্দায় আঁকা গির্জা ঘর বাড়ি গাছপালা প্রভৃতি। আলোর কারসাজি তার উপর। নৌকার ভিতর গান বাজনার সমারোহ এবং জীবন্ত অভিনয়—সমস্ত মিলিয়ে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায় দর্শকের। রেলগাড়িতে চড়ে হঠাৎ যেমন দেখেন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, গ্রামগুলো সামনের দিক থেকে পিছনমুখো চলছে, এখানেও সেই বস্তু দেখালে উল্টো রকম প্রত্যয় কেন না হবে!

অভিনয় যত এগোচ্ছে, মালুম হচ্ছে বলসইর সঙ্গে তফাৎ কোথায় এই থিয়েটারের। বলসইতে সিনসিনারি আলো সাজ পোশাকের বাহার—এক টিকিটে যুগপৎ অভিনয় ও ম্যাজিক দেখে নিচ্ছেন; এবং পালা-বিশেষে সার্কাসও। মস্কো আর্ট থিয়েটারে শুধু মাত্র একটি বস্তু—অভিনয়। আমাদের থিয়েটারে প্রম্‌ট করার রেওয়াজ—গানের এক একটা কলি যেমন দু-বার করে গায়, থিয়েটারেও ঠিক তাই। একবার উইংসের অন্তরাল থেকে প্রম্‌টার মশায়ের আবৃত্তি শুনছি; দ্বিতীয়বার স্টেজের বহির্দেশে অভিনেতার। তাবৎ ইউরোপ চষে বেড়িয়েছি বলতে পারেন—প্রায়ই তো পয়লা সারির সিটে বসে থিয়েটার দেখেছি—প্রম্‌ট শুনে শুনে বলার রেওয়াজ ওদের নেই। ঠোঁটের মুখস্থও নয়, নাট্যকারের লিখিত বস্তু অন্তরের ভিতর থেকে পুরোপুরি নিজ বস্তু হয়ে বেরিয়ে আসে। সাজ হবার এই হাল্কা নাটক, ভুবনময় হাঁক ডাক করবার কিছু নয়—কিন্তু প্রাণঢালা কী অভিনয়ই করছে প্রতি জন!

ইরা আমার ঠিক আগের সিটে। পাত্র-পাত্রী কে কী বলছে, অন্ধকারে কানের কাছে মৃদু গুঞ্জনে ইংরেজি ঝরে যাচ্ছে। বিরক্তি লাগে, চটে যাই। আঃ, থাম দিকি তুমি! নয়তো উঠে ওধারে গিয়ে বোসো ওদের যদি প্রয়োজন থাকে।

কথা বুঝছেন?

না। কিন্তু সমস্ত বুঝতে পারছি।

সত্যি কথা, অভিনয়ের মধ্যে যে কত সামান্য ব্যাপার আজকের আসরে বুঝতে পারছি। নায়িকা সেজেছে ঐ যে মেয়েটা, কুড়ি-বাইশ বছর বয়স কিন্তু মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি সর্বাঙ্গ দিয়ে ওর অভিনয়। চোখ বুঁজে আজও যেন অভিনয়ের ছবিটা দেখতে পাই। মনের গূঢ় লোকে যত রকম ভাবের আনাগোনা, মূঢ়তম দর্শকের কাছেও অবলীলাক্রমে সমস্ত যেন মেলে ধরছে। মস্কো আর্ট থিয়েটারের দেশজোড়া নাম এমনি হয়নি।

২৮

মস্কোয় জিনিষ কিনতে যাওয়া ঝকমারি। যা কিনবেন, কিউ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে যায়। অথচ দেশে আপনারা সব রয়েছেন, স্যুভেনির দুটো-একটা না নিয়ে এলে কেমন হয়? পুরো বেলা দাঁড়িয়ে জিনিস কিনবেন সত্যি সত্যি ঐ একটা কিম্বা দুটো—এক কিউ শেষ করে অন্য কিউয়ে গিয়ে দাঁড়াবেন, অধিক কি করে হবে বলুন। আমাদের বটুক-দা'র বুদ্ধি করলে হয়, বিলে মাছ ধরতে গেলাম। হোগলাবন ও জলকাদার ভিতর দাঁড়িয়ে ছিপ ফেলা। এক জায়গায় যা হবার হল, যাও তখন অন্যখানে। মস্কোরই এই সওদা করার ব্যাপার। বটুক-দা খানিকটা চেষ্টা চরিত্র করে শেষে দেখি ডাঙায় উঠে খেজুর গুঁড়ি ঠেশান দিয়ে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে বিড়ি ধরিয়েছেন। ও বটুক-দা, খালি খালুই ফিরিয়ে নিয়ে গেলে বাড়ির লোকে বলবে কি? বটুক-দা' জবাব দিলেন, খালি কেন হবে ভাই? হাট ঘুরে যাব, হাট থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে বলব ধরে এনেছি। বিরক্ত হয়ে আমরাও এক একবার ভাবছি তাই: দুত্তোর, কাবুলে গিয়ে কিম্বা একেবারে খাস দিল্লি থেকেই যা-হোক কিছু নিয়ে নিলে তো হয়। এত ঝামেলা করি কেন? কিন্তু বটুক-দা'র গল্পের উপসংহার মনে পড়ে যায়। হাটে পৌঁছুতে বড় দেরি হল, সব মাছ উঠে গেছে, এক ডালিতে ইলিশ আছে গোটা কয়েক। তাই সই—নির্ভীক বটুক-দা বাড়ি গিয়ে হয়তো বলেছিলেন, ইলিশ মাছই ধরেছেন

ছিপে। বটুক-দা'র বাড়ির ওঁরা অত্যন্ত ভাল মানুষ, এক কথায় মেনে নিয়ে বঁটি পেতে মাছ কুটতে বসে গেলেন। আপনারা যে তা নন। এমনই তো চোখ টেপাটেপি করেন, সোবিয়েতে ঘোরা চাট্টি কথা কিনা! লিলুয়া কি বিরাটির কারো বাড়ি, লুকিয়ে থেকে চুপি চুপি সোবিয়েতের বই কেঁদে নিয়েছে দেখগে। মস্কোর মার্কা-মারা জিনিষ ক্যাসমেমো সহ নয়ন সমুখে ধরে দিলেও কতবার আপনারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখবেন।

আমাদের এক টাকায় ওদের চুরাশি কোপেক। রুবলের (অর্থাৎ এক-শ কোপেক) দাম দাঁড়াল তবে এক টাকা তিন আনার মতো। এই রুবল যেন খোলামকুচি ওদের কাছে। মস্কোর ঐ ঠাণ্ডার মধ্যে ফুল ফোটে বড় কম। এন্তার কাগজের ফুল বানায় ফুল দেওয়া-নেওয়ার সুখ পাবার জন্য। সুখের ব্যাপারে শোকের ব্যাপারে কাগজের ফুলের ছয়লাপ। আসল গাছের গোলাপ প্রতিটির দাম হল তিন রুবল অর্থাৎ সাড়ে তিন টাকার উপর। কিনতেন? সাধারণ জুতো এক জোড়া দেড়-শ দু-শ রুবলের কম নয়। ওভারকোট হাজার দেড় হাজার। খাবার জিনিষ সস্তা সেই তুলনায়। আলুর সের বারো আনার মতো। রুটির পাউণ্ডও বারো আনা।

দর শুনে আমরা থ হয়ে যাই, আর ওরা কি কাণ্ড করছে কেনা-কাটার জন্য। ক্যামেরা গ্রামোফোন রেকর্ড, ঘড়ির দোকানে কিউ। এক মস্কো শহরেই দশ লক্ষ ঘড়ি কাবার হয়ে গেল এক সপ্তাহে। আরও যে যোগান দিয়ে উঠতে পারে না। গুম অর্থাৎ সর্ববস্তু বিপণিকে ঢুকেছি—রথের মেলার মতো মানুষ ঠেলে পারা যায় না। ছোট ছোট দোকানে ঢুকে দেখেছি—এমন কি বইয়ের দোকানেও যেখানে পাঠ্যপুস্তকের মরশুমটা বাদ দিয়ে লোক জন নাক ডেকে ঘুমায়। অবস্থার ইতর বিশেষ নেই কোনখানে। টাকা পকেটে থেকে যেন সব কামড়ায়, খরচ করে নিশ্চিন্ত হয়।

কেনই বা হবে না বলুন ভবিষ্যতের ভাবনা যখন নেই। ছেলে পুলে চাকরিবাকরি অসুখ বিসুখ, বুড়ো বয়সের ব্যবস্থা—সকল দায় সরকারের। সাধারণ মানুষ কাজ করবে, খাবে বেড়াবে, আমোদ স্ফূর্তি করবে—ব্যস। ফালতু টাকা কিসের দায়ে রাখতে যাবে? জিনিষ পত্রের দর বেশি, রোজগারও তেমনি অনেক বেশি। ইস্কুল-মাষ্টার মশায়ের কথাই ধরুন। চাকরিতে ঢোকেন আট শ রুবলে; বাইশ-শ রুবল অবধি মাইনে ওঠে। চার ঘণ্টার খাটনি—অন্যত্র ঠিকে পড়িয়ে (প্রাইভেট ট্যুইশানি নয়) উপরি রোজগার হয়। আরও আছে। এদেশে এবং মাষ্টার মশায়েরই শুধু আয়, স্ত্রী, রাঁধা বাড়া করেন ঘর সংসার দেখেন। এখানে স্ত্রীরও পৃথক আয় আছে। মেয়ে পুরুষ কাজ সকলেরই। শুধু মাত্র কমিকের বেলা নয়, সর্বক্ষেত্রেই। পারিবারিক আয় তা হলে কত বেড়ে গেল বিবেচনা করুন। এক পয়সা সঞ্চয় করবে না, দোকানে দোকানে তাই এমনি মচ্ছব।

খানা পিনা অন্তে আজকে আবার ইউনিয়ন অব রাইটার্সে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই একটি মাত্র ইউনিয়ন, যার সভ্য তাবৎ লেখকেরা। রাশিয়া বলে নয়—সোবিয়েতে যতগুলো গণতন্ত্র সর্বদেশের সকল লেখক। বিপুল প্রভাব অতএব। সাহিত্যকর্ম বলতে যা কিছু বোঝেন, সমস্ত ইউনিয়নের তাঁবে। শাখা আছে নানা শহরে। গণতন্ত্রগুলো দরকারে মাসিক নিজ দেশে আলাদা কনফারেন্স করে; তাদের কর্মকর্তাও আলাদা কিন্তু মাথার উপরে আছে ইউনিয়ন।

কাজকর্মের অবধি নেই। বিভিন্ন দপ্তরে সমস্ত ভাগ করা আছে। যতগুলা দপ্তর সোবিয়েত দেশে প্রতিটির জন্য আলাদা এক এক দপ্তর। পৃথিবীর সেরা ভাষা ও সাহিত্যগুলার সঙ্গে যোগাযোগে জন্য পৃথক দপ্তর আছে। গ্লাতুক ডানিয়েলচুকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, সে হল বৈদেশিক দপ্তরের লোক। খাটছে—অগুন্তি লোক একদল ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে আছে, চীনা সাহিত্য পরে একদল, ইংলণ্ড ফ্রান্স আমেরিকার ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চা করে আর একদল। আলোচনার বৈঠক বসে প্রায়ই। বিদেশ থেকে বিস্তর বই আসে; কর্মীরা পড়ে শুনে যে সব বইয়ের তারিপ করে, সেগুলোর অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা হয়। কোন কোন বই ছেপে বেরুবে, কোনটা বাতিল হবে ইউনিয়নই তার বিচারের মালিক।

বিদেশের লেখকদের দাওয়াত দিয়ে আনি ইউনিয়নের তরফ থেকে। আমাদের লেখকরাও বাহিরে যান। অতিথি পেলে বড্ড খুশি হই আমরা। শুধু যে বন্ধুরাই আসেন এমন নয়। অনেকে এসে তর্কাতর্কি গালিগালাজ করেন। শেষটা বুঝসমঝ হয়। পরস্পরের সাহিত্য আরও ভাল করে বোঝা যায় লেখকদের যাতায়াতে সাহিত্যের ঘর যাতে জাতির আত্মার দাবি পাই, মানুষে মানুষে সম্পর্ক নিবিড়তম হয়।

* * * *

ইউনিয়ানের বড়কর্তা কেউ হবেন, মুখপাত্র হয়ে যিনি সব বলছেন। বললেন, দেয়ালে পোষ্টার দেখছ ঐ? কংগ্রেস হচ্ছে—লেখকদের কংগ্রেস। অনেক বছর পরে হচ্ছে। ব্যবস্থা লেখক-সমিতির। বিপুল তোড়জোড় চলছে। আমাদের যত গণতন্ত্র, সব জায়গায় লেখকরা কনফারেন্স করছেন আসন্ন কংগ্রেস সম্পর্কে। সোবিয়েতের তাবৎ অঞ্চল থেকে লেখকরা আসবেন। বাইরের বড় বড় অনেক লেখককেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

ভারতের কাকে কাকে করলেন?

কিষাণ চন্দর তো আছেনই। আব্বাস এবং আরও কে কে যেন—

বাংলার কেউ নেই, নিশ্চিন্ত হলাম। বলি নিমন্ত্রণের লিষ্টি কিভাবে আপনারা ঠিক করেন বলুন দিকি।

সদুত্তর মেলে না, আমতা-আমতা করছেন: যাঁদের নাম সঙ্গে আছে, সোবিয়েতের মানুষ যাঁদের বই টই পড়ে তাঁদের কথা থেকে ঠিকঠাক করতে হয়।

সে জানি, গোণাগুণতি কয়েকটা নাম জানা আছে। নাম জানিয়ে রেখেছেন সেই মহাশয়েরা শুধুমাত্র লেখা নয়—শতধিক অন্য ক্রিয়া-কৌশলে। আত্মশ্রাদ্ধ যাবতীয় ব্যাপারে ঘুরে ফিরে ডাক আসে তাঁদের।

বাংলা সাহিত্য বলে এক বস্তু ছিল—সত্যি সত্যি কি বিশ্বাস করেন, ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে তা-ও লোপ হয়ে গেছে একেবারে?

কোন রকমই সে খবর আসে না, কি করা যাবে?

দোষ আমাদেরই, অন্যের উপর রাগ করে কি করব? রবীন্দ্রনাথের পর আর তো কেউ নজর মেলে বাইরের পানে তাকালাম না—পুবের শেষ প্রান্তে নানা সঙ্কট নিয়ে আছি পড়ে খণ্ডিত অবহেলিত একটি জাত। বিদেশের খাতির-আহ্বান এবং টাকাটা-সিকেটার যে সুযোগ আসে, ভারতের দ্বারপথ বম্বে এবং ভারতের রাজধানী দিল্লি অচিরে সমস্ত ভাগাভাগি করে নেন।

এই লেখক কংগ্রেসেরই ব্যাপার। ওঁরা একটা নাটক চেয়েছিলেন যাতে ভারতীয় জীবন-চিত্র আছে। নাটকটা রুশে তর্জমা করে

নিয়ে কংগ্রেসের গুনীজ্ঞানীদের মধ্যে অভিনয় করলেন। এমন-কি ব্যাপার—ভাগনে ছোঁড়া নাটকে হাত মক্স করছে,—খবরটা দিল্লি পৌঁছানোর ওয়াস্তা—সঙ্গে সঙ্গে নাটক চলে এলো। বাইরের কাকপক্ষী কেউ জানল না। হীরেন মুখুজ্জে মশায়ের মুখে শোনা, ওঁরা হকচকিয়ে যাচ্ছেন। আমরা চেয়েছিলাম ভারতীয় জীবনের সত্যিকার ছবি থাকবে যে নাটকে। এর ঘটনা স্থল মস্কো লণ্ডন কিম্বা প্যারি হলেও বেমানান হয় না। অথচ এসে গেছে ভারত থেকে। বাতিল করাও চলবে না। পোড়া বাংলা সাহিত্যে এই এই হাল আমলেও ভাল ভাল দেশি নাটক লেখা হয়েছে। কিন্তু হলে হবে কি—জোরদার মাতুল কোথায়, যথাসময়ে যথাস্থানে বস্তুটা যিনি গুঁজে দেবেন?

রুশ-সাহিত্য সম্বন্ধে যে কথা আজ অনেকের মনে ঘুরে ফিরে তাই উঠে পড়ে।

ইউনিয়ন এত সব ব্যবস্থা করলেন, লেখকদের এমন সচ্ছলতা—কিন্তু ভাল সাহিত্য হচ্ছে কই তেমন?

হচ্ছে বই কি! খবর রাখেন না তেমন আপনারা—

সে তো বটেই। ভিন্ন দেশের পুরোপুরি খবর রাখা সোজা নয়। আগেও তো এই ছিল। তবু সাহিত্য নিজের জোরে বিদেশের ঘরে ঘরে বিদেশির মনে মনে আপন করে নিত। তেমন সব দিকপাল সাহিত্যকার কোথায় আজকের দিনে?

ভদ্রলোক বললেন, দেশের উপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে, সেটা বিবেচনা করুন। বিপ্লবের পর থেকে চলছেই। ঘরের শত্রু বাইরের শত্রু। তারপরে মহাযুদ্ধ গেল যার ধকল ষোল আনা এখনো কাটানো যায়নি, দেখতে পাচ্ছেন! সাহিত্য হল শান্তির ফসল—ক'টা দিন আমরা শান্তিতে থাকতে পেলাম বলুন!

আর এক কারণ, লেখকের স্বাধীনতা নেই। ছাঁচে ফেলে সাহিত্য ফলাবার অভিলাষ।

চমকে ওঠেন তিনি: কে বলল?

আপনিই তো। কোন বই ছাপা হবে না হবে, এখান থেকে ঠিক করে দেন। কেউ অতএব এমন লিখবে না, কর্তাদের যা পছন্দসই নয়। যে কথাগুলো কর্তৃপক্ষ সকলকে শোনাতে চান, তারই সাহিত্য বানানো হচ্ছে। স্বাধীন সহজ সাহিত্য গড়ে উঠছে না।

ভদ্রলোক হেসে বলেন, এই দেখুন—মিছে বদনাম দিচ্ছেন। কর্তা কেন হতে যাব? আমরাও তো লেখক। ইউনিয়ন লেখকদেরই—সমস্ত লেখক মিলে মিশে গড়েছে। আর এই যদি নিয়ন্ত্রণ বলেন, এ জিনিষ সকল দেশেই আছে।

আমাদের নেই। আমরা সব-কিছু লিখতে পারি। দেশে ইচ্ছা মতো বই বের করি—কারো পছন্দ-অপছন্দর ধার ধারি নে।

কিন্তু অপছন্দ হলে ছাপা বই বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। পরিশ্রম অর্থব্যয় সমস্ত অকারণ। একই পদ্ধতির রকমফের। পাঠকের কাছে পৌঁছানো অনুচিত মনে হলে আমাদের ইউনিয়ন আগেভাগে বন্ধ করে, আপনাদের সরকার বন্ধ করে ছাপা হয়ে যাবার পর। কোনটা ভাল, বিবেচনা করে বলুন এইবার। ছাপানোর পরে, না ছাপানোর আগে?

ক'টা বই বা বাজেয়াপ্ত হয় ভারতে? কালে ভদ্রে কদাচিৎ। এখানেও ঠিক তাই। বাতিল পাণ্ডুলিপি নিতান্তই গোণাগুণতি। শুধু দুটো ব্যাপার আমরা লিখতে দিইনে—লড়াই বাধানো আর ধনতন্ত্রে ফিরে যাওয়া। বাকি সব কিছু লেখা চলে। সমাজ তন্ত্রের নিন্দা চলবে না, কিন্তু রাষ্ট্রের মাতব্বরদের বিরুদ্ধে স্বচ্ছন্দে লিখতে পারো।

বলতে লাগলেন, শত্রুরা রটায় আমরা নাকি সমালোচনা চাইনে। ডাহা মিথ্যা। সমালোচনা ছাড়া এগুনো যায় না, দোষ ত্রুটির শোধন হয় না—একটা শিশুও জানে। এমন কি পাঠকদেরও আমরা ডেকে আনি আচ্ছা রকম সমালোচনা যাতে হয়। পাঠকে লেখকে মিলে মিশে দোষগুণের বিচার করেন। লেখক ক্রমশ ত্রুটিশূন্য হয়ে ওঠেন পাঠকদের তাড়নায়। শুধুমাত্র পাঠকরাও কনফারেন্স করে বইয়ের সম্পর্কে মতামত দেন। প্রত্যেকটি লাইব্রেরি ক্লাব কর্মিকদের সংস্কৃতি-ভবন এমন কি ইস্কুল কলেজের ভিতরে পাঠক কনফারেন্সের ব্যবস্থা আছে। এই যে কংগ্রেস হবে, ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সবাই তাতে যোগ দেবেন। সারা অঞ্চলের লেখকরা দেখবেন পাবেন, যাদের জন্য লিখে যাবেন তাঁরা। নিরক্ষরতা নেই বলে বইয়ের বিষম চাহিদা। সাধারণ বই পনের-বিশ হাজার এবং গল্প উপন্যাস হলে এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ ছাপা হয় এডিসানে। এত মানুষকে প্রভাবিত করছে, লেখকের কি বিরাট দায়িত্ব বিবেচনা করুন। থামাল অতএব হতেই হবে। কিন্তু পাণ্ডুলিপির বিচার করি আমরা লেখকরাই, ধুরন্ধর রাজনীতিকরা এর ভিতরে নেই। আমাদের ভুল হলে, উপরে বোর্ড আছে, সেখানে পুনর্বিচার হতে পারে।

১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ সাত বছরে নতুন বই সাড়ে ন'-হাজার বেরিয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে বইয়ের প্রদর্শনী হবে—গত বিশ বছরের যাবতীয় বই দেখানো হবে সেখানে। সোবিয়েতের বই ভিন্ন দেশে যত বেরিয়েছে, তা-ও থাকবে। গর্কির 'মা' উনত্রিশটা ভাষায় তর্জমা হয়েছে একশ তিন রকমে। ভুবনপ্রিয় বই আরও অনেক আছে।

কাজ নেই। যথা ইচ্ছা ঘুরে বেড়ানো, দোকানে ঢুঁ মে[রে] সম্ভব হলে কিছু কেনাকাটা করা। ভোকস আজ রাত্রে বিদা[য়] ভোজ দিচ্ছেন।

বিস্তর জাঁদরেল ব্যক্তি এসে জমেছেন। আমাদের রাষ্ট্র[দূত] কে, পি, এস, মেননকেও ডেকেছে। এমন গতিক, মাঝে মা[ঝে] ভুল হয়ে যায় বিদেশ-বিভুঁয়ে আছি আমরা। ভোজের মধ্যে জায়গা বদলাবদলি হচ্ছে—এর পাশে গিয়ে বসলাম খানিক, চলে এলো আমার পাশে। আছি মাত্র কালকের দিনটা, ত[ার] পরে কে কোথায়? কথাবার্তা বেদনায় জড়িয়ে যাচ্ছে—আর দে[খা] হবে না হয় তো এ জীবনে! মানুষ বড় ভাল, মানুষে মানুষে তফ[াৎ] নেই—দূরের মানুষ কত সামান্য সময়ে একেবারে আপন হয়ে যায়।

মেনন বক্তৃতায় জমিয়ে তুলেছেন: এই ভারতীয়দের নেম[ন্তন্ন] শুনে লণ্ডনের এক কাগজে লিখল, রাশিয়া ভারতের সঙ্গে [প্রেম] জমাচ্ছে (**Russia is wooing India**)। আরে বাপু, [প্রেম] জমানো কি—মিলন তো হয়েই গেছে শান্তির মধ্যে (**They ha[ve] already been wedded in peace**)। কথা কেমন রসিয়ে ব[লেন] মেনন, যেখানে যান দিব্যি এক হাসিখুশির আবহাওয়া বানিয়ে তোলে[ন]।

বাঙালি ক'জনের কাল রাত্রে বিনয় রায়ের বাড়ি খাও[য়া]। আমাদের বরাদ্দ ভোজ—গুজরাটি ভায়াদের আগেই হয়ে গে[ছে]

গাঙগুলি থেকে সদ্য ধরে-আনা জীবিত মৎস্যের ঝোল খাওয়াবেন, বিনয় কথা দিয়েছেন। মস্কো শহরে শেষ খাওয়া—খানাপিনা সেরে এসে ঐ রাতেই প্লেন ধরব। ছিমছাম ছোট্ট ফ্ল্যাটে স্বামী-স্ত্রী বাচ্চা ছেলেটি নিয়ে দিব্যি আছেন। অজু বলে ডাকে ছেলেটিকে—এমন মিষ্টি ছেলে! লহমার মধ্যে ভাব জমে গেল। বিস্তর সম্পদ অজুর। মস্কো শহরে খেলনার একজিবিসন আছে কি না জানতে চান? একজিবিসনে কি দেখবেন, অজুর যা আছে আনতে বলুন না। বলতেও হবে না—বয়ে বয়ে নিজেই জেঠুদের সামনে জড় করছে। বাজারে যত রকম খেলনা পাওয়া যায় সমস্ত—ওর বাইরে একটাও নেই। বিনয় আর জয়া দেবী দু'জনেরই চাকরি, অহরহ কাজে ব্যস্ত। ছেলে কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুলে পড়ে—সেখানে থাকতে হয়। শনিবার বিকালে মা-বাপের কাছে আসে, সোমবার ভোরবেলা চলে যায়। বাংলা শেখে বাড়িতে, ইস্কুলে রাশিয়ান। আমাদের সামনে কিছুতে রাশিয়ান বলবে না অজু। সবাই আমরা এতদিনে পাঁচটা দশটা রুশ-কথা শিখেছি—সকলে মিলে একটা পুরো প্রশ্ন দাঁড় করানো গেল। আমাদের এত কষ্টের রাশিয়ান প্রশ্ন—দুষ্টু অজু তারও জবাব দিয়ে দিল বাংলায়।

এ ছেলের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়া চাট্টি কথা নয়। মোটরে উঠে হুঁশ হ'ল দেরি হয়ে গেছে বিষম। জোরে চালাও—বাঁধা ছাঁদা এখনো কিছু বাকি। সেই কাজ সারা করে হোটেল থেকে এক্ষুণি এরোড্রোম ছুটতে হবে। সহযাত্রীরা আমাদের না দেখে ইতিমধ্যেই বকাবকি লাগিয়েছেন হয়তো। দোষ দিইনে। মস্কো এরোড্রোম, বুঝতে পারছেন, বিশ মাইলের ধাক্কা শহর থেকে। প্লেন ছাড়বে ঠিক সাড়ে বারোটায়। জোরে চালাও গাড়ি, আরও জোরে—

রবি ভাদুড়ি তিন ঘণ্টার উপর হোটেলে বসে আছেন, চলে যাবার আগে একটুকু দেখা হয় যদি। দেশের মানুষ পেলে কী যে করেন ওঁরা সব! কথাবার্তার ফুরসৎ নেই—তিনিই লেগে পড়ে স্যুটকেসে মালপত্র ঠেসে টানাটানি করে সেগুলো বাইরে এনে ফেললেন। আরও কত জনের সঙ্গে ভাব জমিয়ে আছি, মন খুলে দুটো কথা বলতে পারলাম না যাবার বেলা। এরোড্রোম অবধি চলল জনকয়েক, প্লেনে রওনা করে দিয়ে ফিরে আসবে।

কী কাণ্ড! বারোটা বেজে গেছে, সাড়ে বারো হয়ে এলো—বসেই আছি, প্লেনের কর্তাদের সাড়া শব্দ নেই। পল ঘুরে এসে বলল, থাক বসে যেমন আছ: দেরি হবে। একটা বেজে গেল, ওরা বোধ হয় লেপ মুড়ি দিয়ে পড়েছে। দেখে এসো তো ভাই আর একবার!

পল আবার উঠল। অনেকক্ষণ দেরি করে এসে বলে, ওঠো—দুর্গা দুর্গা!

পল বলে, ওদিকে নয়—হোটেলে ফিরতে হবে। আবহাওয়া খারাপ, রাতে প্লেন ছাড়বে না।

রাত ঝিমঝিম করছে। দুর্ভোগটা ভাবুন একবার হাড়-কাঁপানো শীতে আবার এখন সেই বিশ মাইল। রাস্তায় কদাচিৎ একটা দুটো গাড়ি, দু'জন একজন মানুষ।

হোটেলে জোরালো আলোগুলো প্রায় সব নেভানো। করিডরে এখানে একটা ওখানে একটা—কায়ক্লেশে পথ খুঁজে চলা যায়। নিশুতি হয়ে গেছে। দোতলার অফিস ঘরে মেট্রন মেয়েটা দেখছি ফাইল ও খাতাপত্রের মধ্যে মগ্ন হয়ে বসে কাজ করছে!

এতগুলো জুতোর আওয়াজে চমকে মুখ তোলে। দেখে হেসে ফেলল: এ কি, তোমরা যে আবার?

সকালবেলা যাব। আবহাওয়া ভাল হলে খবর পাঠাবে।

মুশকিলে ফেললে। কি করি এখন বলো দিকি—

মুসকিল সামলাবার জন্য হাসিমুখেই ছুটোছুটি লাগিয়েছে। আমাদের বিছানাপত্রে তুলে দিয়েছে এর মধ্যে। সকালবেলা ঘরগুলো ভাল করে ধুয়ে বীজাণু মুক্ত করে নতুন বিছানা পাতবে নব আগন্তুকদের জন্য। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে কোথায় মানুষ জন, কোথায় কি, ডেকে তোল সকলকে—যেমন যেমন ছিল, ঠিক করে দিক।

ভোর বেলা উঠতে হবে—রাতের আর কতটুকুই বা আছে?—উদ্বেগে ঘুম হল না। সাড়ে ছটায় পোশাক পরে তৈরি। সাতটায় ঘর থেকে বেরিয়ে পাক দিয়ে এলাম এদিক-সেদিক। মানুষজন দেখি না, অন্ধকার থম থম করছে। আটটার সময় হৈ-হৈ পড়ল—খবর এসে গেছে, ব্রেক ফাষ্ট খেয়ে এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। প্লেন ছাড়ল এবারে সত্যি। বেলা দশটা—কিন্তু আকাশ অন্ধকার, কুয়াশায় ঢাকা এই তো দস্তুর এখানকার। কাল দুপুরবেলাটা উজ্জ্বল রোদ দেখেছিলাম এক ঝলক। আরও একটা দিন, মনে পড়ছে। এত দিন কাটিয়েছি মস্কোয়, তার মধ্যে মোটমাট এই দুই দিন।

২৯

যে-পথে এসেছিলাম, সেই পুরানো পথ ধরেই বাড়ি যাচ্ছি। দুপুরের খানা আশখাবাদে। রাতটা তাসখন্দে কাটাব। কাল দিনমানে সীমান্তের তেরমেস হয়ে কাবুল। ফিরছিও দুটো দল হয়ে। আমাদের নামিয়ে দিয়ে প্লেন পরের ক্ষেপে এসে পিছনের দল নেবে।

আশখাবাদে নামতে গিয়ে সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়াই। বৃষ্টি-বাদলা হয়ে গেছে খুব, কাঁচা গ্যাংওয়ে জল-কাদায় ভর্তি। ওর মধ্যে নামি কোথায়? ওরাও বলছে, বসুন—বসুন—। বাস এসে দাঁড়াল প্লেনের দরজার গায়ে—সিঁড়ি থেকে বাসের গহ্বরে। অফিস-বাড়ি আধ মাইলের উপর এই জায়গা থেকে। কাদা-জল ছিটাতে ছিটাতে বাস সেখানে পৌঁছে দিল। এবং খানাপিনা অন্তে ফিরিয়ে আনল প্লেনে।

এই শুধু নয়, মজা আছে আরও। যথারীতি দরজা এঁটে দিয়ে প্লেন তো ছাড়ল। দৌড়চ্ছে তীর বেগে—এমনি দৌড়তে দৌড়তে হুশ করে উঠে পড়বে তো আকাশে। কিন্তু খানিকটা গিয়ে আর এগোয় না। এমন তো হবার কথা নয়। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করি। দেখবার কি আছে—চতুর্দিকে কাদা-জল, আমাদের গাঁয়ের বিলের ধানক্ষেতে আষাঢ় মাসে চাষ দিয়ে যে রকমটা করে রাখে। ইঞ্জিন তার পরে হঠাৎ বন্ধ করে দিল। নিঃশব্দ। গতিক কিছু বুঝতে পারি নে—আমরা এ-ওর মুখের দিকে তাকাই। পাইলট খোপ থেকে বেরিয়ে এলো।

কি হল মশাই?

কাদায় চাকা বসে গেছে।

পাড়াগাঁয়ে গরুর গাড়ির চাকা এমনি বসে যায় কাদার মধ্যে। গাড়োয়ান ও চড়ন্দারেরা, এবং কখনো বা পাশের ভুঁইক্ষেতের চাষীদের ডেকে সকলে মিলে ঠেলাঠেলি করে তুলে দেয়। চাকা মারা বলে এই প্রণালীকে। কাজাকিস্তানে প্রান্তরের কাদায় নেমে, দেখুন না, আমাদেরও চাকা মারতে বলে।

দরজা খুলে পাইলট ও অন্য অফিসারেরা টপাটপ লাফিয়ে পড়ে অফিসঘরের দিকে গেল। তার পরে দেখি, বিস্তর লোক মিলে বড় বড় দুই লোহার পাত বয়ে আনছে। চাকার ঠিক সামনে কাদার উপরে সেই পাত দুটো পেতে দিল। পাইলটেরা উঠে এসে আবার স্টার্ট দিয়েছে। প্রপেলার ঘুরছে দুরন্ত বেগে, ঘোরতর আওয়াজ করছে। অবশেষে নড়ল প্লেন; কাদা থেকে চাকা বেরিয়ে লোহার উপরে উঠল। আর কি—বেশি কাদার জায়গাটা পার হয়ে এসে, ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে পড়ল। তবে তো বোঝা যাচ্ছে, হামেশাই এই কাণ্ড ঘটে তোমাদের এখানে। নয় তো প্রকাণ্ড লোহার পাত এরোড্রোমে এনে মজুত রেখেছে কি জন্য?

মস্কো থেকে তাসখন্দ বারো ঘণ্টার পথ। দুই জায়গায় সময়ের ফারাক তিন ঘণ্টা। একটা রাতে ঠিক হিসাব মতোই তাসখন্দে নেমেছি জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে, যেন দিনমান। দিগ্‌ব্যাপ্ত মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়া এমন পরিষ্কার জ্যোৎস্না কতদিন দেখিনি! অনেকবারের আসা যাওয়ায় জায়গাটা চেনা হয়ে গেছে, মাতব্বর যাঁরা অভ্যর্থনায় আসেন তাঁদের নাম অবধি বলতে পারি। আজকে এসেছেন জন চারেক মাত্র। বলছেন, এরোড্রোমের রেস্তোরায় ব্যবস্থা আছে ঝামেলা আগে চুকিয়ে নিন।

সে ভাল। শহরে পৌঁছে ডিনারে বসতে বসতে রাত পুইয়ে যেত। কিন্তু বাইরে এসে দেখি, গাড়ি একটাও নেই। মতলব কি গো? জামাইয়ের সেই গল্প। বিস্তর দিন শ্বশুরবাড়ি পড়ে থাকায় ধনঞ্জয়কে শেষটা পিটুনি খেয়ে সরতে হল। আমাদের সেই গতিক। ভরা পেটে এখন পায়ে হাঁটাবে নাকি অতদূরের শহর অবধি?

না, জায়গা এবার এখানেই—এরোড্রোমের একেবারে কাছে, রাস্তাটা পার হয়ে গিয়েই। অসমাপ্ত বাড়ি, রাস্তার পগার লাফিয়ে উঠানে পৌঁছুতে হয়। দালানে ঢালাও বিছানা করেছে, পাড়াগাঁয়ের বিয়েবাড়ি বরযাত্রীদের জন্য যেমন করে। যাকগে, একটা রাত্রি মোটে—ক-ঘণ্টাই বা আছে এই রাত্রির।

এখনো কিছু রুবল আছে ট্যাঁকে। সীমানা পার হয়ে গেলেই রুবলের নোটগুলো পাকিয়ে কান চুলকানো ছাড়া কি কাজে আসবে। অতএব প্রথম প্রাতঃকৃত্য, যে বস্তু চোখের সামনে পড়বে কিনে ফেলে ট্যাঁক খালি করা। দোকানের খোঁজে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় ঐ শহর অবধি গিয়েছি। গাড়ি নিয়ে ছুটেছে সেই অবধি। কী কাণ্ড, প্লেনে ঢুকতে হবে এখনই। শীতকাল এসে পড়েছে, হিন্দুকুশ বেলাবেলি পাড়ি দিতে হবে। তেরমেস রীতিরক্ষার মতো একটুখানি আমুদরিয়ায় এসেছি। বিদায় সোবিয়েত ভূমি! অন্ধকার পাতাল নয়, দিব্যধাম স্বর্গও নয়—আমার আপনার মতোই মানুষেরা হাসি অশ্রুর লক্ষকোটি সংসার করছে, বড্ড আপন করে পেয়েছি তাদের। বিদায়, বিদায়!

কাবুল। কাবুল হোটেলের নতুন ব্লক খুলে দিয়েছে, এবারে জায়গায় অসুবিধা হল না। গুপ্ত মুখুজ্জেরা আছেন বহাল তবিয়তে অতএব আড্ডা দিই, নিমন্ত্রণ খাই এবং আগ্মাসির জীপে ঘোরাঘুরি করি। পরের দিন দিল্লির প্লেন ছাড়বার দিন নয়। উত্তম, বাবুর বাসা দেখে আসা গেল। প্রশস্ত দুই চেনার গাছ সিংহদ্বারের মতন। উপরে উঠে যেতে হয়। ন্যাড়া পাহাড়ের নিচে সম্রাট বাবুরের কবরখানা—টালি ছাওয়া ছাত, সস্তা চুনকাম করা দেয়াল। অদূরে পুরানো কেল্লার চিহ্ন। শ্বেত পাথরে নতুন মসজিদ বানাচ্ছে পাশে।

তার পরের দিনও যাবে না প্লেন। আবহাওয়া খারাপ। উত্তম। নেতাজি কোথায় এসে লুকিয়ে ছিলেন, জায়গাটা তবে দেখে আসি। বাজার—ভারতীয়দের বিস্তর দোকানপাট। তারপরে এক ঘিঞ্জি পাড়ায় ঢুকেছি। গলির মাথায় সঙ্কীর্ণ এক বাড়ি দেখিয়ে দিল। রণচক্রের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতবর্ষের নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলবেন, ঐখানে থেকে তার আয়োজন হচ্ছিল।

তার পরের দিন লটবহর নিয়ে এরোড্রোমে হাজির হয়েছি। বলে, ফিরে চলে যান। সুলেমান রেঞ্জ পথ ছাড়ে নি এখনো। অতি উত্তম। ক্যামেরা ও ঘড়ি এখানে অনেক সস্তা ভারতের মতো কড়া ডিউটি নেই বলে। বাজার ঢুঁড়ে পছন্দ করা যাক। কিন্তু ঘরমুখো মন এখন—সহযাত্রী অনেকে হুঙ্কার ছাড়লেন সুলেমানের যতক্ষণ না ভাল খবর আসে—রইলাম এইখানে চেপে বসে। তা সে দিন হোক, মাস হোক, চাই কি বছর হোক পুরো। হোটেলে আর ফিরছিনে।

ঘণ্টা দুয়েক বিচার-বিবেচনার পর হুকুম এলো: ঢুকে পড় তাহলে প্লেনে।

উত্তম কথা। দেখা যাক সেই অবধি গিয়ে। না হয় ফিরে আসব। হোটেল আর যাচ্ছে কোথা?

ছোট্ট এক কৌটা আমাদের প্লেন। আকাশব্যাপ্ত সুলেমান অদৃশ্য মুঠোর ভিতর নিয়ে উপরে-নিচে ডাইনে-বামে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দেখছে, কোন সব চিজ রয়েছে এই কৌটার ভিতর। ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে তার পর? কৌতূহলের অবসানে মুচড়ে দুমড়ে ছুঁড়ে দেবে কোন তুষার শৃঙ্গে? আমাদের চিহ্ন মাত্র রইল না, এবং তৎসহ খাতা ভরতি এই যত আয়ুধ নিয়ে যাচ্ছি পাঠককুল বিমর্দনের জন্য।

কিন্তু কিছুই হয়নি, সে তো টের পাচ্ছেন। কিস্তি কিস্তি শর নিক্ষেপ করে নাজেহাল করেছি আপনাদের। সফাদর জং এরোড্রোমে উপর থেকে সভয়ে দেখছি—তুমুল হৈ-হল্লা, দাঙ্গা বেধেছে সম্ভবত কোন-কিছু ব্যাপার নিয়ে। দরজা খুলে মালুম হল, অভ্যর্থনার জন্য এসেছেন। ভাই ব্রাদার সব দল জুটিয়ে এসেছেন, নানান সমিতি থেকেও এসেছে। ওর মধ্যে আমার চেনা কেউ নেই বটে, কিন্তু সমিতিরা তো ছাড়বে না, তারা পাইকারি হারে মালা দেবে। বেঁটে মানুষ দলপতিকে নিয়ে ইতিমধ্যেই এমন ব্যস্ত—স্তূপীকৃত মালার থেকে নিচে জুতো সুদ্ধ এক জোড়া পা বেরিয়েছে, বোঝার ক্লান্তিতে পা দুটো গুটিগুটি এগুচ্ছে। সেনাপতি যেন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন—কাবুল থেকে মেরুসাগর অবধি বিজয় করে ফিরলেন। অথচ জানেন আপনারা, জুতোর তলায় ধুলো মাটিও লাগতে দেয় নি ওরা। কোন বাহাদুরির ফলে মাল্যদান, বুঝতে পারি না। এক মহিলা নামলেন; তিনি দিল্লিরই—রক্ষে নেই, তোড়া ও মালা উঁচিয়ে চতুর্দিক থেকে রে-রে করে ছুটেছে। টুক করে আমি লাইন ছেড়ে জনতার ভিতরে ঢুকে গেলাম—প্লেনে আসি নি, সম্বর্ধনার দলের যেন আমি। তার পরে ফাঁক বুঝে আরও কিছু পিছিয়ে কাস্টমসের আড়গড়ার মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

শেষ

শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু

[বাস্তবধর্মী চিত্রাঙ্কন-বিশারদ]

"আমার মনে হয় যে ছন্দানুগ কাব্য-সাহিত্য অপেক্ষা তাল-লয় মিশ্রিত সঙ্গীত-মূর্চ্ছনার সহিত রেখাঙ্কিত শিল্পকলার যেন গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে"—বর্ষণ-মুখর এক সন্ধ্যায় তাঁহার নিভৃত প্রকোষ্ঠে আমায় জানালেন ভারতের অন্যতম শক্তিমান চিত্রশিল্পী শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু।

ঢাকা জিলা বিক্রমপুর পরগণা নিবাসী শ্রীবসু ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ময়মনসিংহ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। মাতামহের সৌন্দর্য্যবোধ ও চিত্রকলানুরাগ এবং স্নেহময়ী জননীর উৎসাহ পাঠরত বালকের মনে রেখাঙ্কনে প্রেরণা দেয়। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ হইতে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের (অধুনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ইঞ্জিনিয়ারীং ক্লাসে ভর্ত্তি হন। এক বৎসর পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া তিনি ১৯১৩ সালে রণদাচরণ গুপ্তের জুবিলী আর্ট একাডেমীতে প্রবেশ করেন। শ্রীবসু মনে করেন যে তাঁহার পরলোকগতা মাতার অদৃশ্য আশীর্বাদের জন্যই বোধ হয় তাঁহার এই পরিবর্তন সাধিত হয়।

১৯১৬ সালে তিনি সরকারী আর্ট স্কুলে চলিয়া আসেন এবং শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বনামধন্য শিল্পী ৺যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন এবং ১৯১৮ সালে গ্রাজুয়েট পদবী প্রাপ্ত হন। এই সময় শ্রীহেমেন্দ্র মজুমদার, যোগেশ শীল, সতীশ সিংহ, যামিনী রায় প্রভৃতির সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। ছাত্রাবস্থায় তিনি আর্ট স্কুলে প্রথম একটি বার্ষিক-চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করেন এবং ১৯২১ সালে ৺ভবানীচরণ লাহা, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ও অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের সহায়তায় উহাকে তিনি "সোসাইটী অব ফাইন আর্টস" সর্ব্বভারতীয় চিত্র প্রদর্শনী-সঙ্ঘে রূপান্তরিত করেন। ১৯২৩ সালে শ্রী বসুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উক্ত সোসাইটীর সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন দিবসে বিদেশী দর্শকদের প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভারতীয় দর্শকদের নির্লিপ্ততা স্যার আশুতোষের মনকে অতিশয় ব্যথিত করে ও অতুলচন্দ্রের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেন।

শ্রী বসুর অঙ্কনে ও সংগঠনে সন্তুষ্ট হইয়া ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সর্বপ্রথম "গুরুপ্রসন্ন ঘোষ" বৃত্তি দেন এবং উহা দ্বারা তিনি লণ্ডন রয়েল একাডেমীতে দুই বৎসর (১৯২৪—২৬) শিক্ষালাভ করেন। অবসর সময়ে তিনি ইউরোপের প্রসিদ্ধ চিত্রশালা সমূহ পরিদর্শন করেন।

ভারতে ফিরিয়া অতুলচন্দ্র কলিকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে যোগদান করেন। কিন্তু ১৯৩০ সালে ভারত সরকারের সুপারিশ ক্রমে লণ্ডনে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড ও কুইন মেরীর প্রতিকৃতি অঙ্কনের জন্য প্রেরিত হন। পরবৎসর দেশে ফিরিয়া লুপ্ত ফাইন্ আর্টস সোসাইটি পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন এবং ১৯৩৩ সালে মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর প্রভৃতির সহায়তায় এ্যাকাডেমি অব ফাইন্ আর্টস-এর উদ্বোধন করেন। এই সময় তিনি নিজস্ব চিত্রশালায় অঙ্কনে রত থাকেন এবং "তিব্বতী মেয়ে" "সন্ন্যাসী" এবং ছোট ছোট প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রগুলি জনসমাদর লাভ করে। প্রতিকৃতি অঙ্কনে তাঁহার পারদর্শিতা বহুজন-স্বীকৃত। তন্মধ্যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের "বেঙ্গল টাইগার" নামে প্রতিকৃতি আজ সর্বজনবিদিত। কিছুকাল যাবৎ তিনি লোকসভা ও রাজ্য বিধান-সভার জন্য চিত্তরঞ্জন, সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাসচন্দ্র প্রভৃতির প্রতিকৃতি অঙ্কনে ব্যাপৃত আছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ময়ূরভঞ্জ মহারাজা ও মহিষাদল রাজার জন্য অনেকগুলি চিত্রাঙ্কন করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত "শতবার্ষিকী (১৮৫৭—১৯৫৭)" ও "ঝাঁসীর রাণী" ডাকটিকিট দ্বয়ের চিত্র তাঁহারই পরিকল্পিত।

আমার প্রশ্নের উত্তরে অতুলচন্দ্র বলেন যে, স্মৃতিভাণ্ডারের রূপসায়র হইতে চয়ন করিয়া যে অঙ্কন প্রধানতঃ তাহাই প্রাচ্য-দেশীয় পরোক্ষধর্মী চিত্রকলা এবং ইহার মধ্যে আসেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায় প্রভৃতি—আর সীমাবদ্ধ পরিধি, দৃষ্টস্থান, কাল ও নিত্য পরিবর্তনশীল প্রকৃতির মরমুহূর্ত্তগুলিকে অমর করিয়া রাখার জন্য যে রূপায়ণ উহাই মুখ্যতঃ পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষধর্মী চিত্রাঙ্কন। ইহার মধ্যে পড়েন সতীশ সিংহ, বসন্ত গাঙ্গুলী,

শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু

মাখন দত্তগুপ্ত, জয়নুল আবেদীন প্রভৃতি। তাঁহার গুরুজন, বন্ধুজন ও গুণিজন তাঁহাকে বস্তুতান্ত্রিক শিল্পী আখ্যা দিলেও একাগ্র সাধনায় তিনি উহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হন।

কথা প্রসঙ্গে তিনি শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরীর বহুমুখী কর্ম্মপ্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহযোগিতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। স্বাধীনতার দশম বার্ষিক উৎসবে সম্প্রতি (১৯৫৭) প্রাদেশিক কংগ্রেস অতুলচন্দ্রকে এক বিশেষ সভায় সম্বর্দ্ধনা করেন।

অধ্যাপক ডাঃ পুলিনবিহারী সরকার

[খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক]

রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণায় যে স্বল্প কয়েক জন বাঙ্গালী ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করে বিজ্ঞান-জগতে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন,—অধ্যাপক ডাঃ পুলিনবিহারী সরকার তাঁদের অন্যতম। বয়স প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করেছে—এখনও তিনি পরিপূর্ণ ভাবে কর্ম্মময় জীবন যাপন করছেন। বিজ্ঞান কলেজে যান,—দোতলার রসায়ন বিভাগের পাশের বারান্দায় প্রায়ই দেখতে পাবেন এই প্রধান অধ্যাপককে।—মুখে সর্ব্বদাই সিগারেট, ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করছেন বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান-জগতের কর্মধারার আর অনর্গল ধূমপান করছেন। অনেক দিন আগে তাঁর এই ধূমপান করা নিয়ে একটা বেশ মজার ঘটনা ঘটেছিল। অধ্যাপক সরকার, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র,—আচার্য্য রায় ধূমপান করা অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। অধ্যাপক সরকার তখন প্যারিস থেকে ফিরেছেন,—অত্যন্ত ধূমপান করেন, কি করে যেন কথাটা আচার্য্যদেবের কানে গিয়ে পৌঁছলো। আচার্য্যদেব তো বিশ্বাসই করেন না,—"নাঃ এ হতেই পারে না। পুলিন আমার ভারী ভালো ছেলে—সে সিগারেট খেতেই পারে না।" যাই হোক, কত দিন গুজব অবিশ্বাস করা যায়? একদিন দুপুরবেলা আচার্য্যদেব নিজেই হঠাৎ এলেন অধ্যাপক সরকারের ঘরে, দেখা যাক ছেলেটা করছে কি? এদিকে তখন ডক্টর সরকার সবেমাত্র একটা চুরুট ধরিয়ে মনের আনন্দে ধোঁয়া ছেড়েছেন,—হঠাৎ সামনে দেখেন আচার্য্যদেব। কোন রকমে চুরুট ফেলে, নিবিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে ওঠেন। আচার্য্যদেব তো রেগেই আগুন,—"ছেলেদের সাহেবীয়ানা শেখা হয়েছে। ধোঁয়াই যদি গিলতে চাও—বিড়ি খেতে পার না? দেশের পয়সা দেশে থাকে।" অধ্যাপক সরকার তখন পালাতে পারলে বাঁচেন।

পুলিনবিহারী সরকার

অধ্যাপক সরকার ১৮৯৫ সালের ২২শে নবেম্বর কোলকাতায় তাঁর দাদামশায়ের ঝামাপুকুর লেনের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি বাস সোনারপুরে—ঠাকুর্দা ছিলেন জমিদার। পিতা ৺বসন্তকুমার সরকার ছিলেন আইনব্যবসায়ী। আইনব্যবসা করতেন তমলুকে;—তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন, মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। কলেজে পড়বার সময় তাঁর বাবা স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন। মা—শ্রীমতী সরোজিনী দেবী এখনও তমলুকে বাস করছেন—বয়স তাঁর ৮২ বৎসর।

অধ্যাপক সরকার বাল্যশিক্ষা লাভ করেন তমলুক হ্যামিল্টন স্কুলে। ১৯০৯ সালে শেষ এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় পাশ করে পনের টাকা জলপানি লাভ করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন বোস, জ্ঞান মুখার্জ্জী আর জ্ঞান ঘোষ। জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জ্জী, মেঘনাদ সাহা আর ডাঃ সরকার এক মেসে এবং হিন্দু হোষ্টেলে একসঙ্গে বহুদিন বাস করেছিলেন। কিছুদিন ডাঃ সাহা আর ডাঃ সরকার এক ঘরে বাস করতেন। কলেজ-জীবনে অধ্যাপক সরকার ছিলেন একজন বড় স্পোর্টসম্যান। Y. M. C. A. এর স্পোর্টসে সেরা খেলোয়াড়ের সম্মানও তিনি একবার লাভ করেছিলেন। বিকেলবেলা ফুটবল খেলে, তারপর ব্যায়াম করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেই রাত্রে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন,—রাত্রে প্রায়ই খাওয়া আর তাঁর হতো না। বন্ধু-বান্ধবরাও কেউ ডাকতে যেত না—কারণ ঘুমের ঘোরে তিনি বড় হাত-পা ছুঁড়তেন, তাতে সকলেই বিরক্ত হতো।

অধ্যাপক সরকারের ভাষায়—"কেবল মেঘনাদই আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত। ডাকতে এসে সে কত দিনই কিল-ঘুঁসি খেয়েছে, তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। আবার মেঘনাদও আমায় কম জ্বালাতন করে নি। ও ঘুম থেকে উঠতো খুব ভোরে—তার পর চিৎকার করে এক ঘণ্টা জার্ম্মাণ ভাষা পড়তো। ওঃ, সে কি কষ্ট,—কিছুতেই আমি ঘুমোতে পারতাম না। রাগ করে মাঝে মাঝে উঠে জোর করে আলো নিবিয়ে দিতাম।" ১৯১৩ সালে বি, এস-সি, রসায়নশাস্ত্রে অনার্স সহ পাশ করে তিনি এম, এস-সি ক্লাসে যোগ দেন এবং ১৯১৬ সালে এম, এস-সি পাশ করেন। অসুস্থ থাকায় এক বছর তিনি পরীক্ষা দিতে পারেন নি। পাশ করার পরেই ১৯১৭ সালে তিনি শিক্ষক হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯১৭ থেকে ১৯৫৭ এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল তিনি অধ্যাপক হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন। ১৯২৫ সালে অধ্যাপক সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ গ্রহণ করে ফ্রান্স যাত্রা করেন। সেখানে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনঅরগ্যানিক কেমিষ্ট্রির গবেষণাগারে অধ্যাপক উরবাঁর অধীনে গবেষণা করে ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ফ্রান্সের ষ্টেট ডক্টরেট ডিগ্রীর অধিকারী,

—এর সম্মান খুবই বেশী। অধ্যাপক উরবাঁর গবেষণাগারে তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল গ্যাডোলিনিয়াম আর ইউরোপিয়াম এই দুই মৌলিকের শ্রেণীনির্ণয়। এই মৌলিক ধাতুদ্বয় খুবই দুষ্প্রাপ্য, —অধ্যাপক উরবাঁর গবেষণাগারে গ্যাডোলিনিয়াম মাত্র ৮ গ্রাম ছিল। এতো কম বস্তু নিয়ে কাজ করা খুবই কঠিন। অধ্যাপক সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই কাজ সম্পন্ন করেন এবং ৩০।৪০টি যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করার পর শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ গ্যাডোলিনিয়াম পুনরায় পরিশ্রুত করে বিশুদ্ধ মৌলিক ধাতুটি অধ্যাপক উরবাঁকে ফেরত দেন। অধ্যাপক উরবাঁ তাঁর এই কৃতিত্বের অত্যন্ত প্রশংসা করেন।

ফ্রান্স থেকে শিক্ষালাভ করে ফিরে এসে তিনি আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষ-অধ্যাপক এবং ১৯৫২ সালে রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। গবেষণামূলক শতাধিক প্রবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে অধ্যাপক সরকারের কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে।

অধ্যাপক সরকার বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতির আজীবন সদস্য ও ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ সায়ান্সের সভ্য। ১৯৩৯ সালে ইণ্ডিয়ান সায়ান্স কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতির আসনও তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত অমায়িক ও ছাত্রবৎসল। তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত,—ছুটীতে প্রায়ই সব কাজ ফেলে তিনি তমলুকে চলে যান, বৃদ্ধা মা'র কাছে কয়েক দিন কাটাবার জন্য। তমলুকেরও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত। এই সদানন্দময় বৈজ্ঞানিক দীর্ঘজীবন লাভ করে ভারতবর্ষের রসায়ন-বিজ্ঞানের শিক্ষাধারা ও গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধতর করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র

[খ্যাতিমান ব্যারিষ্টার ও প্রসিদ্ধ জনসেবক]

সুনিপুণ তর্ককুশলতা, সুতীক্ষ্ণ মেধা, স্থির যুক্তি সম্বল করে যে সকল ধুরন্ধর আইনবিদরা পথের প্রান্তভাগে পৌঁছে হাসিমুখে করমর্দন করেছেন খ্যাতির সঙ্গে, তাঁদের মধ্যে বিনা আয়াসেই আমরা নাম উল্লেখ করতে পারি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের। আইনে স্পৃহা তাঁর পৈত্রিক। পিতৃদেব স্বর্গীয় মণীন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন একজন য়্যাটর্ণী, তা ছাড়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার প্রধান কর্ম-সচিবের ও নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সমিতির একজন সভ্যের আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। ভারতের আইন-জগতের একজন বরণীয় সন্তান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য পরলোকগত ডাঃ স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর নাম কারোরই অজানা নয়। শঙ্করপ্রসাদ এঁর দৌহিত্র। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে শঙ্করপ্রসাদের জন্ম। প্রথমে সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ পরে হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯৩৪ সালে। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই-এস-সি করলেন পাশ (১৯৩৮) রিপণ (বর্তমানের সুরেন্দ্রনাথ) থেকে বি-এ। তারপর বিলাত যাত্রা। সেখানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ট্রিনিটি কলেজের ছাত্রশ্রেণীভুক্ত হলেন শঙ্করপ্রসাদ। ল-ট্রাইপস নিয়ে বি-এ পাশ করলেন। বিলেতের ছাত্রজীবন শঙ্করপ্রসাদের নানা কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। সেখানে নানা সৎকর্মে বাঙালীর তথা ভারতের মুখ তিনি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে এসেছেন। শুধু মাত্র গিয়ে তথাকথিত ভালো ছেলেদের মত গ্রন্থ অধ্যয়নের মধ্যেই তিনি নিজেকে সেখানে সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি, সেদিনকার নিজের তারুণ্য সর্বতোভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন উদ্যমের সঙ্গে। কেম্ব্রিজে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ছাত্র-কংগ্রেসে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করেন (১৯৪১), লণ্ডনের স্বরাজ হাউসের ও গ্রেট ব্রিটেনের ভারতীয় ছাত্রসংস্থার ইনি ছিলেন প্রধান কর্ম-নির্বাহক, ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির ছিলেন একজন সভ্য, কেম্ব্রিজের মজলিসের ইনি ছিলেন সভাপতি, গ্লাসগো (১৯৪২) ও নিউ-কাসল-অন-টাইন (১৯৪৩) এ অনুষ্ঠিত ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শঙ্করপ্রসাদ। নানাবিধ অপকর্ম করে বড়লাট পদ থেকে লর্ড লিনলিথগো অবসর গ্রহণ করে এখান থেকে ফিরে গেলে সেখানে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে ভারতীয় ছাত্ররা তাঁকে যে কৃষ্ণপতাকা প্রদর্শন করে, তাদের মধ্যে ইনিও ছিলেন অন্যতম। বার্মিংহামেও ভারত-সচিব কুখ্যাত এমারির অপকীর্তির জন্যে এঁদেরই প্রচেষ্টায় এক বিরাট প্রতিবাদ ঘোষিত হয়। বেয়াল্লিশের আন্দোলন সমর্থন মানসে শঙ্করপ্রসাদের কৃতিত্ব বিদ্যমান। বিশ্ববরেণ্য রাজনীতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ মেননের সঙ্গে ইণ্ডিয়া লীগে ইনি কাজ করে এসেছেন। লিঙ্কনস ইন থেকে ১৯৪৩ সালে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ভারতে ফিরে আসেন ১৯৪৪ সালে। ব্যারিস্টারী শুরু করেন ও কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে আই-এন-এ আন্দোলনে যে বিরাট ছাত্রদল গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র

ব্যারিস্টার শঙ্করপ্রসাদ। বঙ্গবাসী কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগেও ইনি অধ্যাপনা করেছেন।

বঙ্গবাসী কলেজের বাণিজ্য-শিক্ষার্থী সঙ্ঘের সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-কলেজ সঙ্ঘের সহ-সভাপতি এবং আইন-কলেজ পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের পদও এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। পরলোকগত বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতি থাকা কালে ইনি মধ্য কলকাতার জেলা কংগ্রেস কমিটিতে তাঁর সহকারিত্ব করেছেন। এ ছাড়া অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এঁর নাম যুক্ত। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় একজন সদস্যরূপে গণ্য হন। সাংস্কৃতিক দলের সভ্য হয়ে নয়াচীন পরিদর্শন করেন (১৯৫৪), পশ্চিমবঙ্গের বিচার, শাসন, ভূমি সংস্কার ও আইনবিভাগের মন্ত্রিত্ব ভার গ্রহণ করেন (জুন ১৯৫৬)। মন্ত্রী শঙ্করপ্রসাদের কর্মতৎপরতা, জনহিতকর প্রচেষ্টা, অনমনীয় কর্মোদ্যম, যেমনই প্রশংসার্হ, তেমনই গৌরবমণ্ডিত। একজন মন্ত্রী যে মানুষেরই প্রতিনিধি এই সত্যের মর্মোপলব্ধি করেছিলেন শঙ্করপ্রসাদ এবং তার মর্যাদা দিতেও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য বোধ করেন নি। মন্ত্রী থাকাকালীন সরকার পক্ষের যে গলদ তাঁর চোখে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ছদ্মবেশে নানা স্থানে ঘুরে দুর্নীতি দমনের প্রচেষ্টা তাঁকে বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় করে তোলে। কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য সরকার যখন বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন কংগ্রেসী শঙ্করপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়েছিলেন সেই প্রচেষ্টায়। রাজ্য পুনর্গঠনের প্রশ্নে, বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাবে, ট্রাম আন্দোলন ও শিক্ষক ধর্মঘটে, ভূমি সংস্কার আইনে যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা সর্বজনবিদিত। এই স্বার্থান্বেষী, দুশ্চরিত্র পুরো মন্ত্রী, তিন পোয়া মন্ত্রী ও আধসেরী মন্ত্রী দলে তিনিই ছিলেন একমাত্র জন, যিনি সত্যি দেশ ও দশের জন্যে ভেবেছিলেন কিছু, করেছিলেনও কিছু এবং করতে চেয়েওছিলেন আরও কিছু, তিনিই একমাত্র জন যাঁর নেতৃত্ব বাঙালী অনায়াসে মেনে নিতে পারত এবং তাতে সুফলই ফলত এ কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলা যায়। প্রার্থনা করি, তাঁর আরও কাজ সম্পূর্ণ করতে আবার একদিন তাঁর আবির্ভাব হবে তাঁর যথাযোগ্য স্থানে, তাঁর আসন আজ শূন্যই আছে, তিনিই আবার তা একদিন করবেন পূর্ণ।

ব্যক্তিগত জীবনে শঙ্করপ্রসাদ বিবাহ করেছেন ভারতের এক ধুরন্ধর আইনজ্ঞ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান য়্যাডভোকেট জেনারেল স্যার শ্রীসুধাংশুমোহন বসুর একমাত্র কন্যাকে। তিনি শ্রীমতী অলকা মিত্র।

আমার প্রশ্ন, আইনজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে গেলে কি কি বিশেষ গুণ থাকার প্রয়োজন—উত্তর দেন—পরীক্ষার জন্যে সব সময় প্রস্তুত হবে, একবার মক্কেলের কাছে আবার বিচারকের কাছে, এই পরীক্ষা দেওয়া দৈনন্দিন ব্যাপার। আর বিশেষ ভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ে দক্ষতা থাকা দরকার, যেমন সাহিত্যে, সঙ্গীতে, বিজ্ঞানে, যন্ত্র-বিজ্ঞানে, শিল্পে। কারণ ঐ জাতীয় বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে যদি মামলা উত্থাপিত হয় আর আপনি সে বিষয়ে যদি অনভিজ্ঞ হন তা হলে লড়বেনই বা কেমন করে আর জেরা করবেনই বা কি করে? জিজ্ঞাসা করি—পৃথিবীর আইনের দরবারে ভারতের স্থান কোথায়? আয়ত দৃষ্টি মেলে ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—সর্বোচ্চে, তারপর বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন—আর কেন তা জানেন—তার প্রধান কারণ বাঙলা দেশ ভারতের অন্তর্গত বলেই—হিমালয়কে অতিক্রম করে আজ অবধি যেমন কোন পাহাড় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে নি, তেমনই সারা বিশ্বে এমন কোন আইনশালা যে শ্রেষ্ঠতায় এ বিষয়ে কলকাতাকে অতিক্রম করে গেছে।

শ্রীরণদেব চৌধুরী

[সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন ব্যারিষ্টার]

পাবনা জেলার হরিপুরের চৌধুরীগোষ্ঠীর খ্যাতি বহুদূর-বিস্তৃত। এই বংশের দুর্গাদাস চৌধুরী স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। দুর্গাদাসের সন্তান-সৌভাগ্য অতুলনীয়! তাঁহার সাতটি পুত্র ও দুইটি কন্যা। ইঁহাদের সকলেই বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। দুর্গাদাসের প্রথম পুত্র স্বনামখ্যাত আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন নামকরা ব্যারিষ্টার; পরে তিনি হাইকোর্টের বিচারক নিযুক্ত হন। দুর্গাদাসের তৃতীয় পুত্র কুমুদনাথ চৌধুরী ছিলেন বিখ্যাত শিকারী। 'সবুজপত্র' এর সম্পাদক বিখ্যাত লেখক প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) ছিলেন দুর্গাদাসের চতুর্থ পুত্র। দুর্গাদাসের পঞ্চম পুত্র সুহৃদ চৌধুরী ছিলেন খ্যাতনামা আই, এস, এস অফিসার। কর্ণেল মন্মথনাথ চৌধুরী আই, এম, এস ছিলেন দুর্গাদাসের ষষ্ঠ পুত্র। মন্মথনাথ মাদ্রাজের প্রথম ভারতীয় সার্জেন জেনারেল হইয়াছিলেন। চলচ্চিত্রাভিনয়ে প্রখ্যাতনামা শিল্পী দেবিকারাণী ইঁহার কন্যা। দুর্গাদাসের সপ্তম পুত্র ব্যারিষ্টার অমিয়নাথ চৌধুরী 'এ, এন চৌধুরী' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি বিখ্যাত ভাওয়াল মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন। দুর্গাদাসের পুত্রদের মধ্যে একমাত্র ইনিই বর্ত্তমানে জীবিত আছেন। বাংলা মায়ের সুসন্তান হায়দ্রাবাদ-বিজেতা লেফটন্যান্ট চৌধুরী ইঁহার পুত্র। দুর্গাদাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রসন্নময়ী দেবী একজন নামকরা লেখিকা ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'সাধারণী' তে তিনি নিয়মিত ভাবে লিখিতেন। 'পূর্বকথা' নামক পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন। দুর্গাদাসের কনিষ্ঠা কন্যা মৃণালিনী দেবী পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতা।

দুর্গাদাসের দ্বিতীয় পুত্র যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (জে. চৌধুরী এই নামেই প্রসিদ্ধ) ছিলেন অনন্যসাধারণ। ইনি বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন। আইন বিষয়ক সাপ্তাহিক Calcutta Weekly Notes এর ইনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইনি শিল্পপ্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্, হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স, ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স প্রমুখ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অনেক যুবককে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় ইনি অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। দেশের কল্যাণ সাধনই ইঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বহু স্বদেশী মামলা ইনি বিনা পারিশ্রমিকে পরিচালনা করিয়াছিলেন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মামলায় ইনি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য বোম্বাই যান। ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে ইনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার মনোনীত সদস্য নিযুক্ত হন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক লবণশুল্ক প্রবর্তনের প্রতিবাদে ইনি সদস্যপদ পরিত্যাগ করেন। শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে বলিয়া ইনি

শিক্ষাপ্রসারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। National Council of Educationএর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের ইনি অন্যতম ছিলেন।

রাজনীতি ব্যাপারে স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহিত তরুণ যোগেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়। যোগেশচন্দ্রের কর্মশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সুরেন্দ্রনাথ যোগেশচন্দ্রকে আপন জন করিয়া লইবার জন্য আগ্রহ অনুভব করেন। ইহারই ফলে, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথের তৃতীয়া কন্যা সরসীবালা দেবীর সহিত যোগেশচন্দ্রের শুভ পরিণয় হয়। সরসীবালা দেবী বর্ত্তমানে জীবিত আছেন। যোগেশচন্দ্র ও সরসীবালার দুই পুত্র ও দুই কন্যা। ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়দেব চৌধুরী শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি বেরিলির Electric Supply Corporation-এর সমস্ত যন্ত্রপাতি স্থাপন ও অন্যান্য সমস্ত কাজ একাই করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ইনি অকালে পরলোকগমন করেন। ইঁহার একটি পুত্র আছে—তাঁহার নাম জনদেব। যোগেশচন্দ্র ও সরসীবালার দুই কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা অজিতা ছিলেন Union Public Service Commission-এর বর্ত্তমান সভা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী। ইঁহাদের কনিষ্ঠা কন্যা অমিতা আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী যোগেশচন্দ্র ও সরসীবালার দ্বিতীয় পুত্র রণদেব চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। আলিপুর হেষ্টিংস হাউসে অবস্থিত পাবলিক স্কুলে রণদেবের বিদ্যারম্ভ হয়। সেখান হইতে তিনি সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলে ভর্ত্তি হন। পরে হিন্দু স্কুল হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় কমপালসারি ও অ্যাডিশনাল ম্যাথামেটিক্স এবং মেকানিক্স এই তিনটি বিষয়ে তিনি শতকরা আশীর বেশী নম্বর পান। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে রণদেব ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আই, এস্, সি এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বি, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ব্যারিষ্টারি পড়িবার জন্য বিলাত গমন করিলেন। রণদেব ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে Grays Inn-এ যোগদান করেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে রণদেব কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন।

সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় রণদেব আইন ব্যবসায়ে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেন। Constitutional Law এবং Companies' Act-এ তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য সর্বজনবিদিত। এই দুইটি বিষয় লইয়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ হাইকোর্টে যে সমস্ত বড় বড় মামলা হয় সেই সব মামলায় বাদী বা প্রতিবাদী কোন না কোন পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ আসে। অক্লান্তকর্মী রণদেব এই সমস্ত মামলা পরিচালনা করিবার জন্য কলিকাতা হইতে সুপ্রীম কোর্ট, এলাহাবাদ হাইকোর্ট, ইষ্ট পাঞ্জাব হাইকোর্ট, পাটনা হাইকোর্ট, আসাম হাইকোর্ট, উড়িষ্যা হাইকোর্ট, জব্বলপুর হাইকোর্ট, বম্বে হাইকোর্টে ও অন্যান্য হাইকোর্টে গমন করেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে Pakistan Industrial & Finance Corporation-এর অনুরোধে Corporation-এর সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মিলিত সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত Limited Company পরিচালনা সম্বন্ধে আইনগত উপদেশ দিবার জন্য রণদেব করাচী গমন করেন।

বিহার সরকার Indian Copper Corporation-এর Kayanite-এর খনিগুলি দখল করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। ইহাতে পাটনা হাইকোর্টে যে মামলা হয় তাহাতে রণদেব Indian Copper Corporation-এর পক্ষ সমর্থন করেন। এই মামলায় বিহার সরকার হারিয়া যান। রণদেবের আইন বিষয়ক নৈপুণ্যের ফলে আসাম হাইকোর্ট Assam Revenue Tribunal যে ultra vires তাহা প্রমাণিত হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্ট এর ফুলবেঞ্চে রণদেব Evacuee Properties Actএর আইনগত অসঙ্গতি প্রদর্শন করেন। ব্যাঙ্কের মামলায় moratorium সম্বন্ধে নূতন পথের প্রদর্শন করেন রণদেব।

সুরেন্দ্রনাথের যোগ্য দৌহিত্র রণদেবের স্বদেশপ্রেম বিশেষ প্রশংসনীয়। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাংলার ভীষণ দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যদানের জন্য রণদেব অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান হইতে দলে দলে বাস্তুহারা আসিতে আরম্ভ করিলে এই সব বাস্তুহারাদের সাহায্য করিবার জন্য বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। এই সমিতির সহিত রণদেব সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই সমিতির অর্থসংগ্রহের জন্য তিনি বহু স্থানে গমন করিয়াছিলেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ ৺দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রী শ্রীমতী মীরা দেবীর সহিত রণদেবের বিবাহ হয়।

শিক্ষাবিস্তারে রণদেবের উৎসাহ অপরিসীম। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ইনি সুরেন্দ্রনাথ কলেজ কাউন্সিলের সভ্য হন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ইনি কলেজ কাউন্সিলের সেক্রেটারি এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। রণদেব বর্ত্তমানে Calcutta Weekly Notesএর সম্পাদক। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ইনি Supreme Court Appeals নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রকাশের সময় হইতেই এই পত্রিকাটির তিনি সম্পাদক। খেলাধূলায় রণদেব বিশেষ উৎসাহ অনুভব করেন। ছাত্রাবস্থায় ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলায় ইনি নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইনি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেণ্ট, মোহনবাগান ক্লাবের অন্যতম পুরাতন সদস্য।

শ্রীরণদেব চৌধুরী

উদয়ভানু

কিন্তু আজকের রাত জাগিয়ে রেখেছে রাজগৃহের প্রতিটি মহলকে।
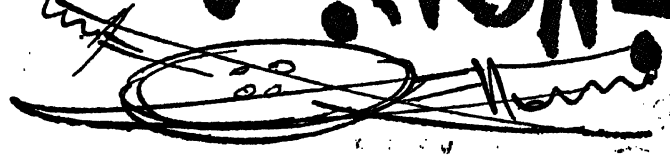
ফিসফিস গুঞ্জন, গোপন পদধ্বনি, চোরাহাসির চাপা শব্দ ভাসাভাসি করছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে এখনও। চাঁদোয়া থেকে ঝুলানো বেলোয়ারী লণ্ঠনের রঙীন আলোর আভা দেখা যায় অনেক দূর থেকে। ঘুম নেই কারও চোখে, জাগরণের পালা চলে তাই। কি একটি দুর্ঘটনার কথা বাতাসের ভারে ছড়িয়ে পড়েছে এক মহল থেকে অন্য মহলে। কৌতূহলের ব্যাকুল দৃষ্টি ফুটেছে সকলের চোখে। তবুও নাকি ঘটনা গোপন করতে সকলেই সচেষ্ট। রাজপুরীর বাইরে যেন কথা না ছড়ায়। পল্লীর আর সমাজের কেউ যেন না জানে। ঘুণাক্ষরেও টের না পায়।

রাজমাতা বিলাসবাসিনী প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়েছিলেন! তারপর ধীরে ধীরে অনেক ভাবাভাবির পর তিনি আত্মস্থ হন। মুখে হাসি মাখিয়ে বললেন,—ইচ্ছাবরী হ'তে সাধ হয়েছে পোড়ামুখীর! দেখা যাক রাজা শুনে কি বিচার করে।

অন্যান্য রাতে ম্লান-গম্ভীর মুখাকৃতিতে দেখতে পাওয়া যায় রাজরাণীদের। পথ চেয়ে প্রতীক্ষায় থাকেন যেন। সদরের রঙমহল থেকে রাজা অন্দরে ফিরে আসেন কি অবস্থায় কে জানে? আগেভাগে কিছুই বলা যায় না, রাজাবাহাদুর অর্দ্ধজ্ঞানে কি অজ্ঞানে ফিরবেন।

রাণীদের মুখেও আজ লুকানো হাসির ঝিলিক খেলে যেন। মুখে আঁচল চাপতে হয়, হাসি লুকাতে হয়। সকলের মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহী হয়েছেন বড়রাণী উমারাণী। চোর ধরা পড়েছে, কিন্তু উমারাণী চোরের অপরাধ অস্বীকার করতে চান।

অন্দরের দাসী আর পরিচারিকার দল চোর ধ'রেছে। অন্দরের পিছনে পুকুরধারে সচল ছায়ামূর্তি দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরবে চিৎকার করতে লেগে গিয়েছিল তারা। যুগল ছায়ামূর্তি পুকুরতীরে, গন্ধরাজ ফুলের গাছের আড়ালে।

পূর্ণিমার আর দেরী নেই। তাই চাঁদের আলোয় দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত আজ। আকাশে অগণিত তারা, কম্পমান শিখায় ধিকিধিকি জ্বলছে। সোনালী চুমকিখচা আকাশের চন্দ্রাতপ যেন। চাঁদের চতুর্দ্দিকে গোলাকার চন্দ্রমণ্ডল বিস্তৃত হয়ে আছে। তাই আজকের শুক্লারজনীতে লোকচক্ষু এড়াতে পারলো না চোরের দল। ধরা পড়লো দাসীদের চোখে। ভূত-প্রেতের আশঙ্কায় হৈ-হল্লা তুললো তারা। সত্যিকার মানুষ না ছায়ামূর্তি সঠিক ঠাওরাতে পারলো না যেন প্রথম দেখায়।

দাসীদের সভয় চিৎকারে যে যেখানে থাকে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। শেষ পর্য্যন্ত ধৃত দুই চোরকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সলাজে মুখ লুকায় দাসীরা। কারও মুখে আর কথা জোগায় না। কেউ কেউ বললে,—ও হরি, এ যে দেখছি আমাদের শিবানী আর শশিনাথ! ঘি আর আগুন এক হ'লে আর কি রক্ষে আছে!

শশিনাথ লজ্জায় মুখ নত করে। শুধু শিবানী যেন বেপরোয়া। ভয়ডরের বালাই নেই যেন। ধরা পড়েছে, তবুও বুক চিতিয়ে আছে নির্ভয়ে। মিটিমিটি হাসছে।

দাসীদের একজন বললে,—রাজবাড়ীতে কুলদেবী আছেন, ইষ্টমূর্ত্তি আছেন। এখানে এই অনাচার কি সহ্য হবে কারও! এই বেলেল্লাপণা!

শিবানী ছাড়া পেয়েছে, কিন্তু শশিনাথ মুক্তি পায় না। তাকে ঘিরে এক ব্যূহ রচিত হয় যেন দাসীদের। শশিনাথ আনত মুখে বসে থাকে পুকুরঘাটের এক পৈঠায়। সে যেন মূক আর বধির। রাজার কথাতেও রা কাড়ে না।

দাসীরা বলে,—রাজামশায় যা বিচার করবেন তাই হবে। আমরা এমনিতে ছাড়বো না।

শশিনাথের বুক দুরু দুরু করে। লজ্জায় মুখ দেখাতে পারে না। পুকুরে চাঁদের প্রতিবিম্বের দিকে চোখ রেখে নিশ্চুপ বসে থাকে।

সাজের ঘটা দেখে কে শিবানীর! লাল রঙের শাড়ীতে বেশ দেখায় তাকে, বিয়ের কনের মত। খোঁপায় ক'টা চাঁপাফুল দিয়েছে। আঁটসাঁট শাড়ীতে গাছ-কোমর বেঁধেছে। কপালে সিঁদুর-টিপ আর পায়ে আলতা রাঙিয়েছে। শশিনাথ বলেছিল তাকে লাল শাড়ী পরতে।

যদিও বিধি বাম হয়। লোক জানাজানিতে লজ্জার সীমা থাকে না। শশিনাথ যেন কাঁপতে থাকে ভয়ে ভয়ে।

কেবল উমারাণী ওদের পক্ষ নেন। দাসীদের প্রতি রুষ্ট হন। কোপ প্রকাশ করেন। তাদের ধমকানি দেন। বলেন,—শশিনাথকে ছেড়ে দাও তোমরা। আর যাই হোক, শশিনাথ চোর নয়।

দাসীরা বলে,—সেই আশাতেই রাত বেরাতে অন্দরের পুকুরধারে এসেছে। ভাঁড়ার থেকে কি চুরি ক'রতো কেউ বলতে পারে!

বড়রাণী ভর্ৎসনার সুরে বললেন,—ছি ছি, তোমাদের পাপের ভোগ আর কি। যার যেমন মনের বাসনা সে সেই রকম চিন্তা করে। শশিনাথ ভাঁড়ার লুঠতে আসবে কোন্ দুঃখে?

দাসীরা বললে,—তাইতো ভাব জমিয়েছে শিবানীর সঙ্গে। পাচার

করে শিবানী আর চুরি করে শশিনাথ। দেশে তার অভাবী সংসার। চুরি না করলে শশীর চলবে কোথা থেকে ?

সদরের রঙমহল থেকে কালীশঙ্কর যখন পাল্কীতে ফিরলেন তখন রাত্রি বেশ ঘন হয়েছে। গুলাব আতরের সুগন্ধি ভাসিয়ে আসেন রাজা। বৈশাখের তপ্ততা স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দিলেন যেন। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণের গাছে গাছে শাখা আর পাতা স্থির অকম্প হয়ে আছে। বাতাস আর চলছে না হঠাৎ। রাজার পাল্কী অন্দরে পৌঁছতেই রাজমাতার পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয় তাঁকে।

—বিলাসবাসিনী দেবী একবার সাক্ষাৎ চান রাজাবাহাদুর !

কথা শুনে কেমন যেন জড়কণ্ঠে বললেন,—কেন ? এ-হেন সময়ে ?

—বিশেষ প্রয়োজন আছে। তবে তিনি স্বয়ং আপনার মহলে আসতে পারেন, যদি হুকুম করেন তবেই।

—এবমস্তু। তাই হোক। আমি এখন পদচারণায় অক্ষম। মাতৃদেবী যেন ক্ষমা করেন।

কথার শেষে আবার চোখ বন্ধ করলেন রাজা। পাল্কীমধ্যে জরিদার তাকিয়ায় এলিয়ে পড়লেন। সোনায় পাতে মোড়া একটি খেলো হুঁকা ধরিয়ে দেয় খানসমা, রাজার হাতে। অম্বুরী তামাকের গন্ধে মিশে যায় গুলাবী আতরের সৌগন্ধ।

একজন অবলা নাকি আজ রাতের মত রঙমহলে এসেছিল। প্রতিবেশিনী একজন, গৃহস্থকন্যা। রাজার পেয়ারের খোসামুদেরা কোথা থেকে তাকে যে আনে, কেউ বলতে পারে না। যৌবনগর্বিতা দর হেঁকেছিল রাজার কাছে। ব'লেছিল,—হাতে হাতে টাকা না পাওয়া যায়তো কিসের আশে এসেছি ?

সহাস্যে কালীশঙ্কর ব'লেছিলেন,—কত টাকা ? এক লক্ষ না কি ?

গৃহস্থের মেয়ে সদম্ভে বলে—আমাদের কি দরাদরি মানায় ? যা দেবেন তাই হাত পেতে নেবো। তবে আগাম টাকাটা চাই। আমরা অভাবী, তাইতো এই কুপথে এসেছি।

কেমন যেন অবিশ্বাসের আভাস শোনা যায় তার কথায়। আত্মম্ভরী সুর যেন। তাই অসহ্য ঠেকে রাজাবাহাদুরের কাছে। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন,—অভাব যখন প্রকট তোমার, তখন হাতে ভিক্ষাপাত্র দেখি না কেন ?

—অভাবী, তাই পাত্র পর্য্যন্ত জোটে না। এই দুই হাতই আমাদের পাত্র। এইতো হাত পেতেছি রাজাজী !

কথার শেষে দুই হাত পাতলো সে ভিক্ষাপাত্রের মত। চোখে করুণদৃষ্টি ফুটালো।

হো হো শব্দে সহসা হাসলেন রাজাবাহাদুর। হাসতে হাসতে বললেন,—এই লও ভিক্ষা, যাও বিদেয় হও।

কথা বলতে বলতে এক মুঠো মোহর সশব্দে ছুঁড়ে দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন,—দেওয়ানজী এই শূয়ারের বাচ্চাকে ফটকের বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। খানিক থেমে বললেন,—পারেন তো এর দুই গালে দগ্ধলোহার দু'টা ছাপ দিয়ে দেন। দাগী থাক, লোকে চিনবে তবে।

—মার্জ্জনা করবেন রাজাজী ! ধৃষ্টতা ধরবেন না। অভাবের তাড়নায় স্বভাবটা নষ্ট হয়েছে। কাতর সুরের কথা ভাসে রঙমহলে।

কালীশঙ্কর আলবোলার শটকা মুখে তুলতে গিয়ে নামিয়ে নিয়ে বললেন,—অধিক কথার কোন প্রয়োজন দেখি না। বিদায় লও এখন। এই মুহূর্তেই।

মোসায়েবের দল ভেঙে পড়লো যেন। হতাশ চোখে চেয়ে থাকলো। ভেবেছিল দালালী পাবে রাজার কাছ থেকে। মাঠে মারা গেল তাদের প্রাপ্য অর্থ।

দেওয়ানজী এসে গর্ব্বিতার হাত ধ'রে টেনে তুলে নিয়ে যান। বলেন,—ছোটলোকের মেয়ে তুমি, তাই কথার আকটাক নাই। যা খুশী তাই বল'। টাকা আর মোহর আমাদের রাজার কাছে পাথরের মুড়ির সামিল।

—তা আমি জানি দেওয়ানজী !

—তবে যা পেরেছো কুড়িয়ে বাড়িয়ে নাও। বিলম্ব ক'র না। আমার সহ চল। তোমার ভাগ্য ভাল যে রাজা তোমাকে সহজে বিদায় দিয়েছেন। কথা বলতে বলতে দেওয়ানজী যেন ক্রোধে কাঁপছেন থেকে থেকে।

—আমার অঙ্গ স্পর্শ করবেন না দেওয়ানজী ! ছেড়ে দিন। আমার পা আছে, আমিই যাচ্ছি।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—দেওয়ানজী বুড়া হয়েছেন, তাই বোধ করি মনে ধ'রছে না তোমার। দেওয়ানজী !

—বলেন রাজাবাহাদুর।

—একটা জোয়ান পাইকের হাতে ওকে সঁপে দেন দেওয়ানজী ! সিংহের গর্জ্জন যেন রাজার ক্রুদ্ধকণ্ঠে ! হেলান দেহ তুলে বীরাসনে বস'লেন। বললেন,—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ! আমার মুসলমিন সিপাইরা কেউ বাহিরে আছে ?

—ক'জন আছে কাছেই। রঙমহলের দুয়োর আগলে আছে। দেওয়ানজী ভয়ের সুরে বলেন। কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত হকচকিয়ে ওঠেন।

দু'হাতে সজোর তালি ঠুকলেন কালীশঙ্কর। ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি হেসে ব'ললেন,—তবে তো ঠিক আছে।

মোসায়েবরা ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো। খেয়ালী রাজার কি ইচ্ছা হয় কে জানে ! হয়তো এখনই যা হয় একটা শাস্তি দিয়ে দেবেন। কিংবা গারদে পূরে রাখতে হুকুম দেবেন।

কালীশঙ্কর হেসে হেসে বিদ্রূপের সুরে বললেন,—ওকে দিয়ে দেওয়া হোক একটা সিপাইএর কাছে। ভোরের আলো ফুটলে ছেড়ে দেবে।

মোসায়েবরা বললে সমস্বরে,—ম'রে যাবে হুজুর !

—তাই যাক ! আবার ক্রূর হাসি হাসলেন রাজা বাহাদুর। বললেন,—ওকে অর্থ দিয়েছি, তবে আর বিনিময়টা বাদ যায় কেন ?

একজন মোসায়েব বললে,—মূর্খ নারী রাজাবাহাদুর, অপরাধ ধার্য্য করবেন না।

—মূর্খের জ্ঞান হোক। কালীশঙ্কর সহাস্যে বললেন,—দেওয়ানজী, ওকে ত্যাগ করেন, সিপাইদের একটাকে ডাকেন। অধিকক্ষণ আমি আর নাই রঙমহলে। অন্দরে যেতে চাই।

তথাস্তু।

কথার শেষে দেওয়ানজী বৃহৎ কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।

গর্ব্বিণী নারী ক্রোধে যেন ফুলছে থেকে থেকে। ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। কোমরে হাত। হিংস্র দেহভঙ্গিমা। হঠাৎ কথা বললে সে। ভুরু বাঁকিয়ে বললে,—চাই না আমার টাকা। আমাকে যেতে দিন।

হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন রাজা। তাঁর উর্দ্ধবপু হাসির তোড়ে নেচে নেচে উঠলো। শ্বেতপাথরের থালিতে সাজানো নীলাভ মিনাকাজের রূপার পানপাত্র। হাসতে হাসতে পিয়ালায় মদিরা ঢালতে থাকেন। টইটম্বুর পাত্র মুখে তুলে আর একবার রোষদৃষ্টিতে দেখলেন ঐ সাহসিনীকে। একজন মোসায়েব বলল,—রাজাবাহাদুর, আপনি সিংহের সমান, একটা মূষিক বৈ তো নয় ওটা! তবে আর কেন?

চুপ কর বেয়াদপ! তোদের তো ঘরে শাক-সজনা, বাহিরে যত বাবুয়ানা! কালীশঙ্কর ধমকে ধমকে বললেন। মুখে টলটল পাত্র তুললেন।

একজন তুর্কী সিপাই এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো। কটি থেকে ঝুলছে বাঁকা তরোয়াল।

পাত্র নামিয়ে রেশমী রুমালে মুখ মুছতে মুছতে কালীশঙ্কর বলেন,—দেওয়ানজী, টাকা আমি ফেরৎ ল'বো না। যা দিই তা আর ফেরৎ লই না আমি। মর্দ্দানী মেয়েটার কোন কথার ঠিক নাই। একবার চায়, আবার তৎক্ষণাৎ চায় না। বিপরীত কথা কয়।

দেওয়ানজী বললেন,—সত্যি রাজবাহাদুর, বড্ড যেন দেমাকী।

পানপাত্র শেষ করলেন কালীশঙ্কর। আবার মুখ মুছলেন রেশমী রুমালে। বললেন,—দেওয়ানজী, সিপাইকে বাৎলে দিন। ওদের বিদায় করেন। আমিও উঠি।

বাতাস নেই আজ। গুমোট গরমে রাজা ঘর্ম্মাক্ত হ'য়ে উঠেছেন। দু'পাশ থেকে বিচিত্রবর্ণের রামপাখা চলছে তবু।

থতমত খেয়ে যায় মোসায়েবের দল। একে অন্যের মুখপানে তাকায়।

রেশমী রুমালে গুলাবী আতর মাখানো। রঙমহলের জানালায় ভিজে খসখসের পর্দ্দা। কালীশঙ্কর আর কোন দিকে দৃক্‌পাত করলেন না। মহল থেকে বেরিয়ে পাল্কীতে উঠলেন।

মহেশনাথের কানেও কথা উঠলো। সেজের আলো জ্বালিয়ে পরম ভক্তিভরে রামায়ণ পাঠ করছিলেন তিনি, আপন কক্ষে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি সুর ও ছন্দে পড়ছিলেন। সেজের উজ্জ্বল আলোয় তবুও এক রাশ কালো, কিছুতেই যেন চোখে দেখা যায় না। নিরেট কাজলের মূর্ত্তি যেন মহেশনাথের—শুধু তাঁর চক্ষু আর বস্ত্রের শুভ্রবর্ণ চোখে পড়ে। কপালের মাঝে সিঁদুরের লাল টিপ্পা। শিখায় একটি জবাফুল।

শিবানী আর শশিনাথ অন্দরের পুকুরতীরে রাতের অন্ধকারে মনের কথা বলাবলি করতে এক হয়েছিল—দেখতে পেয়েছে দাসী আর পরিচারিকার দল।

মহেশনাথ বললেন আপন মনে,—দু'টাকেই বিতাড়িত করা হোক। শিবানীর মুখদর্শন করতে চাই না আমি। শশিনাথকে মনে ধরেছে তার, শশীর দোষ কি! আমাকে আর শুনাও কেন এই সকল কুকথা! আমার সহ্য হয় না, ক্রোধের জ্বালা ধরে। জ্ঞান থাকে না আর।

মন্থরার মত একজন দাসী অদৃশ্যে থেকে কথা বলে। ফিসফিসিয়ে বলে,—শিবানী কুল মজাতে চায়। লোকের কাছে মুখ দেখাবে সে কি ভরসায়?

মহেশনাথের মুখাকৃতি আরও যেন বীভৎস হয়ে যায়। মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটেছে। ক্রোধের আতিশয্যে বিকলাঙ্গ দেহ কাঁপছে থরথরিয়ে। খানিক নিস্তব্ধ থেকে মহেশনাথ বললেন,—তবে শশী যদি শিবানীর পাণিগ্রহণ করে, আমার কিছু বলার নাই। শিবানী তবু পাত্রস্থ হয়।

দাসী আড়ালে থেকে বললে,—শশিনাথ যদি তাতে একমত না হয়?

বিকট স্বরে হাসলেন মহেশনাথ। তাঁর ছায়া চঞ্চল হয় হাসির বেগে। ক্রূর হাসি হেসে বললেন,—শশিনাথের মৃত্যুভয় নাই! আমি তাকে রেহাই দেবো না। স্বহস্তে খুন করবো। শিবানীর সম্মুখেই।

দাসীর কথা নয়, অন্য এক নারীকণ্ঠ বাহির থেকে কথা বলে। মিহি-মিষ্ট কণ্ঠে। বলে,—শিবানীর দোষ নাই। আমরা শশিনাথের সঙ্গে শিবানীর বিবাহ দেবো।

রামায়ণ থেকে চোখ তুললেন মহেশনাথ। নরমস্বরে বললেন,—কে কথা বলে? বড়রাণী কি?

—হাঁ মহেশ ঠাকুরপো! আমিই সেই অভাগী।

—প্রণাম লও বড়রাণী! যা মন চায় তেমন ব্যবস্থা কর', আমি সম্মত আছি এ বিবাহে। শিবানীর পাত্র মেলা দুষ্কর।

—এই বিবাহে তুমি সম্মত আছো কি? উমারাণী মৃদুকণ্ঠে শুধালেন।

মহেশনাথ বললেন,—হাঁ সম্মত আছি, তবে অনাচারের প্রশ্রয় দিতে চাহি না। বিবাহ হয় হোক।

—তাই হবে।

মহেশনাথের মৌখিক সম্মতি শুনে উমারাণী যেন ছুটতে থাকলেন।

কেন কে জানে, মহেশনাথ অট্টহাসি ধরলেন হঠাৎ। হাসতে হাসতে স্বগত করলেন—নারী আর পুরুষের মিলন অনস্বীকার্য্য বড়রাণী! কেবল সাবধান হও, আমাদের মুখে যেন চূণ-কালি না পড়ে। কলঙ্ক রটনা যেন না হয়। রাজমাতা আর রাজাবাহাদুর যেমন বলবেন তেমন হবে।

উমারাণী ছুটে পালিয়েছেন। গেছেন বিলাসবাসিনীর মহলে।

রাজমাতা বললেন,—শশিনাথকে গ্রহণ করতে হবে শিবানীকে। নয়তো তার বিপদ হবে। রাজাকে ব'লবো উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে।

—আমারও এই এক কথা। বড়রাণী বললেন ইতি-উতি দেখে। বললেন,—এ সুযোগ হেলায় হারালে আর ফিরে আসবে না রাজমাতা! শিবানীর বিয়ে দেওয়া অসম্ভব হবে।

—আমিও তাই বলি। বিলাসবাসিনী বললেন দৃঢ়তার সঙ্গে। বললেন,—দেখি কালীশঙ্কর কি বলে।

সর্ব্বমঙ্গলা আর সর্ব্বজয়া দুয়োরে দেখা দেন। সর্ব্বমঙ্গলা বললেন,—রাজা তাঁর মহলে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করেন।

চুপি চুপি রাজমাতা বললেন,—নেশার ঘোর নাই তো মেজ আর ছোটরাণী? সাদা চোখে কথা বলবে তো?

সর্ব্বজয়া বললেন,—মনে তো হয় না। রাজা বেশ সহজ ভাবেই আছেন।

—তবে আর ভাবনা কেন? চল' তোমাদের সঙ্গে যাই। আমাকে তোমরা ধ'রে নে চল। কথা বলতে বলতে পালঙ ছেড়ে উঠলেন রাজমাতা।

খাস-কামরায় সোনার কেদারায় রাজা ব'সে আছেন।

উমারাণী তাঁর মাথায় গোলাপজল ছিটিয়ে দিলেন গোলাবপাশ থেকে। বললেন,—রাজমাতা আসছেন এখনই।

—কেন?

—শিবানী আর শশিনাথের কথা জানাতে আসছেন। তারা দু'জনে অন্দরের পুকুরতীরে একত্রে ধরা পড়েছে। দাসীরা দেখতে পেয়ে চোর-ডাকাত ব'লে ভুল করেছে। রাজবাড়ীতে জানতে আর বাকী নাই কারও।

উমারাণীর ক্ষীণকটি বাহুবেষ্টনে ধ'রলেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—তোমার অভিপ্রায়টা কি তাই শুনি?

খানিক স্তব্ধ থাকেন বড়রাণী। ভেবে ভেবে বললেন,—দু'জনের বিয়েতে আমার সায় আছে। আপনি সেই মত ব্যবস্থা করেন। তা যদি না হয় দু'টোকে বিদায় করেন রাজগৃহ হ'তে। যা ইচ্ছা হয় করুক ওরা। শিবানীকে পাত্রস্থ করলে লোকলজ্জা থেকে বাঁচা যায়।

—কাশীশঙ্করের জন্য অপেক্ষা করবে না? আগে সে আসুক।

রাজা কথা বলতে বলতে দু'খানা লবণ-ঠিকরি মুখে দিলেন। ক্ষুধা অনুভব করছেন তিনি। আকণ্ঠ মদ্যপানের পর ক্ষুধার্ত হয়েছেন যেন।

উমারাণী বললেন,—বিলম্ব হ'লে শশিনাথ হাতছাড়া হ'তে পারে। কিছু অর্থ দিয়ে দু'জনকে রাজগৃহ ত্যাগ করতে আদেশ দেন। বলেন, শশিনাথ তার পিত্রালয়ে ল'য়ে যাক শিবানীকে।

—পরে যদি মেয়েটাকে ত্যাগ করে শশিনাথ? সম্পর্ক যদি ছিন্ন হয়?

—শিবানীর দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

—তবে তোমার কথাই থাক্। শশী তাকে ল'য়ে যাক।

কালীশঙ্করের সম্মতি পেয়ে খুশীর হাসি হাসলেন বড়রাণী। বললেন,—ঐ রাজমাতা আসছেন ডুলীতে। আপনার বক্তব্য তাঁকে জানায়ে দেন তবে।

—কাশীশঙ্কর যদি কিছু মনে করেন? রাজাবাহাদুর আলবোলার নল মুখে তুলে বললেন জড়িতকণ্ঠে।

উমারাণী বললেন,—তাঁকে রাজী করানোর ভার আমার 'পরে দিন। আপনি অবিচলিত থাকেন, এই অনুরোধ।

কথার শেষে উমারাণী রাজার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আবার ছুটলেন যেন। নেশার মুখে বেশ সুস্বাদ লাগে যেন লবণ-ঠিকরি। আরও ক'খানা মুখে তুললেন কালীশঙ্কর।

গঙ্গার বুকে চাঁদের ছায়া—জলপ্রবাহে ঝিলিমিলি খেলে। তরল সোনা যেন গঙ্গার জল। কাশীশঙ্করের সুবৃহৎ বজরা মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। তীরভূমিতে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে এখানে সেখানে। হোমকুণ্ড জ্বলছে তান্ত্রিকদের। যেন চিতা জ্বলছে শ্মশানে!

আহার শেষে আবার বজরার ছাদে উঠলেন কাশীশঙ্কর। মুখশুদ্ধি চিবাতে চিবাতে। চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহার করেছেন কুমারবাহাদুর। মেজাজ খুশী হয়ে গেছে তৃপ্তিকর সুখাদ্যে। জ্যোৎস্নাধবল ফরাসে বসলেন তাকিয়া টেনে নিয়ে। বললেন,—খানসমা, আনন্দকুমারীকে বল' সে-ও ছাদে আসুক।

হঠাৎ যেন একখানি অনিন্দ্যসুন্দর মুখকান্তি ভাসলো কুমারের মানসপটে। রাত্তরাণীকে মনে পড়লো তাঁর। মহাশ্বেতাকে। সহধর্ম্মিণীর কথা ভাসলো যেন কর্ণকুহরে।

চৌধুরাণী এসে ব'সলো ফরাসের এক পাশে। বললে,—কুমারবাহাদুর, আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত না হয়।

আনমনা কাশীশঙ্কর বললেন—দেখো, চৌধুরীর মেয়ে, তুমি তো আমার সহোদরার বান্ধবী।

—হাঁ তাইতো। পান চিবানো স্থগিত রেখে আনন্দকুমারী ক্ষীণ হাসির সঙ্গে বললে।

—তবে তুমি তো আমারও ভগিনীতুল্যা।

—হাঁ তাইতো। আবার বললে আনন্দকুমারী। রাতের অনাবিল হাওয়ায় তার আলুলায়িত রুক্ষ কেশ উড়ছে। আঁচলও উড়ছে।

—তুমি কি নিদ্রায় কাতর হয়েছো?

—না না, আদপেই নয়। মান্দারণে যতক্ষণ না পৌঁছাই ততক্ষণ আমার নিদ্রা নাই চোখে।

—আমারও তদ্রূপ। তাই বলি, গল্পগুজবে রাত্রিটা অতিবাহিত করা যাক।

—বেশ কথা। আপনার যেমন অভিরুচি।

হেসে হেসে কথা বলে আনন্দকুমারী। আকাশে চোখ তোলে একবার। তার দীর্ঘ দুই চোখে আকাশের আর পূর্ণচাঁদের প্রতিচ্ছায়া খেলে।

—চুপি চুপি একটা কথা বলি তোমাকে। চৌধুরাণী, আমাকে ক্ষমা করবে?

—কেন কুমারবাহাদুর? এমন কথা বলেন কেন?

—আমি হয়তো অসংযত হয়েছিলাম তোমার প্রতি।

খিল-খিল শব্দে হেসে উঠলো আনন্দকুমারী। হাসতে হাসতে বললে,—কৈ? কখন? আমার তো মনে পড়ে না?

স্বস্তির শ্বাস ফেললেন কুমারবাহাদুর। আকাশের চাঁদসম রাত্তরাণীর মুখখানি যেন যখন তখন চোখে ভাসছে। চক্ষু মুদিত করলেই সেই মানসীকে দেখতে পাওয়া যায় যেন। তাঁর মধুমিষ্ট

কথা কানে ভাসে যেন। মহাশ্বেতা যেন কানে কানে কথা বলছেন কুমারের।

কুমারবাহাদুর বললেন,—মান্দারণের গল্প বল' তুমি। আমি শুনি।

মৃদু-মন্দ হাসলো চৌধুরাণী। বললে,—আপনি আগে সুতানুটির গল্প শোনান। তারপর আমি বলবো।

—বেশ কথা। কালীশঙ্কর বললেন ইদিক-সিদিক দেখতে দেখতে। বললেন,—সুতানুটিতে আমাদের তিন পুরুষের বসবাস।

রাত্রির হাওয়ার গতি অবাধ। শোঁ-শোঁ শব্দে বাতাস চলেছে। তীরের গাছ-গাছড়ার চাঞ্চল্যের একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে মধ্যগঙ্গায়। যেন শত শত লোক একসঙ্গে কথা বলছে!

মাঝিরা সোৎসাহে হাল টেনে চলেছে। তবুও বজরার গতি ধীর। চৌধুরাণী একবার লক্ষ্য করলো; আকাশের চাঁদ যেন তাদের সহযাত্রী। বজরার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ এগিয়ে চলেছে আকাশপথে। একজোড়া রাত্রিচর পাখী কর্কশ সুরে ডাকতে ডাকতে বজরার ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে যায় তীব্রগতিতে। গঙ্গার এক তীর থেকে অন্য তীরে চললো উড়তে উড়তে। চন্দ্রালোকে স্পষ্ট দেখা যায়—একজোড়া লক্ষ্মীপেঁচা।

অভ্যাসমত তাদের উদ্দেশে চৌধুরাণী একটা নমস্কার ঠুকলো। কালীশঙ্কর থামলেন না। সুতানুটির কাহিনী কি এক কথায় শেষ হয়? কুমারবাহাদুরের কথা একাগ্রচিত্তে শুনতে থাকে চৌধুরাণী। যদিও রাতের স্নিগ্ধশীতল বাতাসে তার ঘুম-ঘুম পায়। চক্ষু জড়িয়ে আসে। মনে মনে নিদ্রালস্য ত্যাগ করে আনন্দকুমারী। সাগ্রহে শোনে কুমারবাহাদুরের কথা। চোখে তন্দ্রার ঘোর উপেক্ষা করে সে।

[ক্রমশঃ।

অস্ফুট

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আসর-কোণে ঐ যে অলস বীণা,
ঐকতানে দিচ্ছে না কেউ ঘা
কেউ তোলে না সুর।
শুধু, নিজের বুকে স্তব্ধ আছে যা
তাইতেই ভরপুর।
যায় না বোঝা··বাজল কিছু কি না!

রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে তাই শুনি—
ভাবছে কি ও? ভুলেছে সব মন!
জাগে না ঢেউ, যন্ত্রণা আর দুঃখ-পীড়া যত
এই পৃথিবীর সকল প্রয়োজন
ছোঁয় না ওকে, পড়ে আছে অহল্যারই মত।
তবু··হাওয়ার তারে একটি করে গুণি—

দৈব'ধনের অশ্রুত ঝঙ্কার।
গাছের মাথা কাঁপছে পাখীর গানে।
সূক্ষ্ম মৃদু কম্প রণন কার!
ফুটল কি প্রেম অঘটনের টানে?

[ছবি পাঠানোর সময় ছবির পেছনে নাম, ঠিকানা
ও বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না]

মেঘ-মল্লার —তপন মল্লিক

গুণ-টানা

—গোবিন্দলাল দাস

বিদেশী পাখী (আলিপুর চিড়িয়াখানা) —মধুসূদন মুখোপাধ্যায়
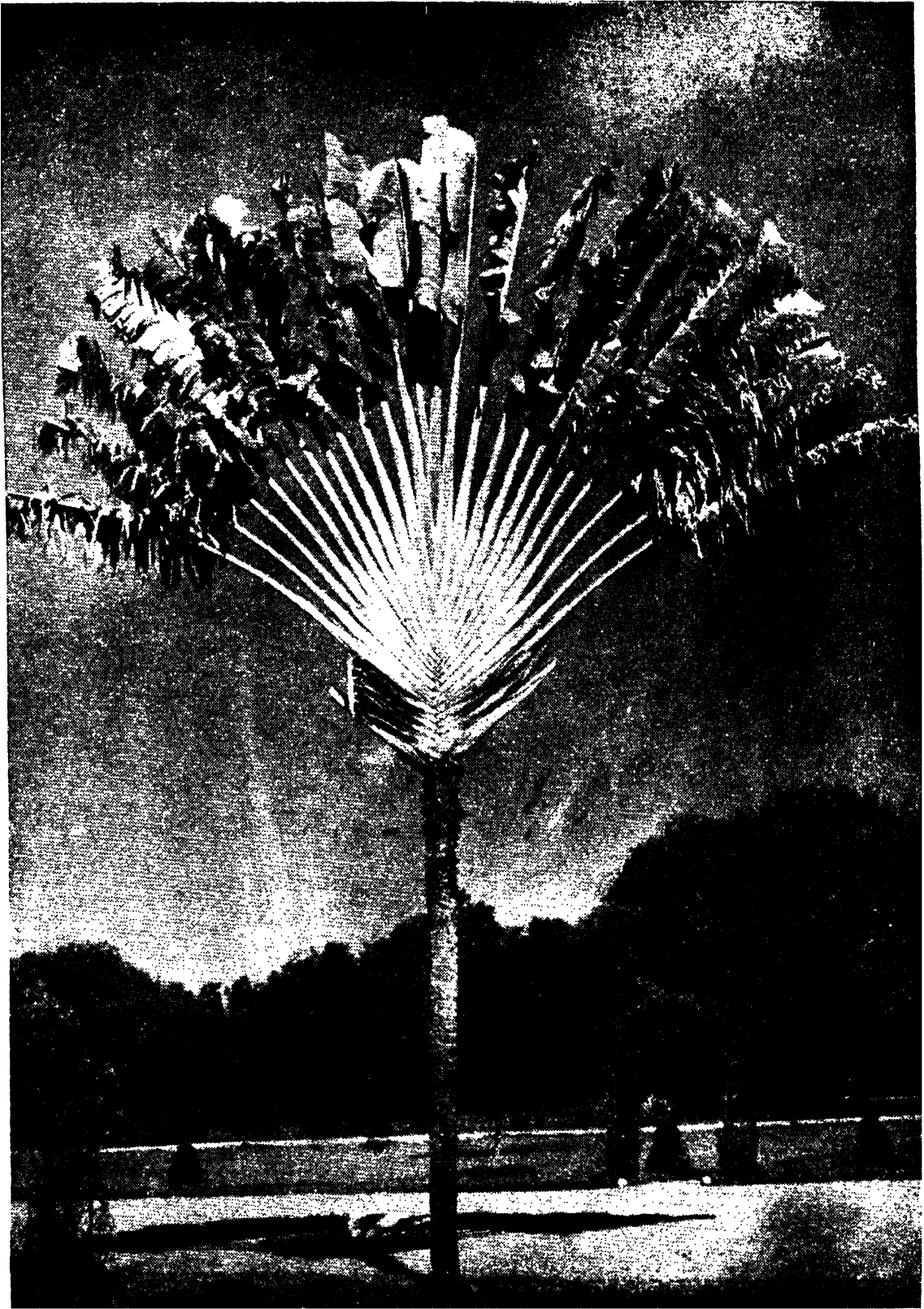
ট্রাভলার্স পাম —নিমাইচাঁদ শীল

পদ্মিনী

— রতন দাশগুপ্ত

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

২২

৩০ জুন ১৯০৩

ওঁ
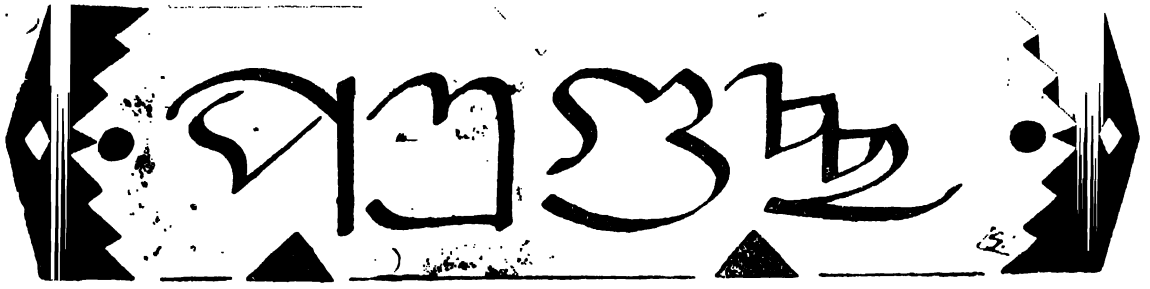
Thomson House
১৫ই আষাঢ়
১৩১০

বন্ধু,

রেণুকার সংশয়াপন্ন অবস্থার টেলিগ্রাফ পাইয়া আমাকে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে। তাহাকে জীবিত দেখিব এরূপ আশামাত্র ছিল না। ডাক্তাররা তাহাকে কেবলই Strychnine ব্রাণ্ডি প্রভৃতি খাওয়াইয়া কোন মতে কৃত্রিম জীবনে সজীব রাখিবার চেষ্টায় ছিল। আমি যেদিন আসিয়া পৌঁছিলাম সেদিন তাহারা রোগীর জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। আমি আসিয়াই সমস্ত Stimulants বন্ধ করিয়া দিয়া হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা করিতেছি। রক্ত ওঠা বন্ধ হইয়া গেছে—কাশি কম, জ্বর কম, পেটের অসুখ কম—বিকারের প্রলাপ বন্ধ হইয়া গেছে—বুকের ব্যথা নাই—বেশ সহজ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, অনেকটা সবল হইয়াছে—আশা করিতেছি এই ধাক্কাটা কাটিয়া গেল।

কিন্তু বিদ্যালয়ের জন্য আমার উদ্বেগের সীমা নাই। এখান হইতে তাহার সংকার সদ্গতি করিব এমন উপায়মাত্র নাই—সমস্তই অব্যবস্থার মুখে ফেলিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে—কবে যাইতে পারিব তাহার কোন ঠিকানা নাই। কি আর বলিব তুমি মোহিতবাবু ও রমণীকে লইয়া বিদ্যালয়কে দাঁড় করাইয়া দাও—ইহাকে তোমাদের জিনিষ বলিয়াই মনে করিও। আমি নিতান্ত একলা হওয়াতেই এত বিঘ্ন হইতেছে—তোমরা আমার সঙ্গে যোগ না দিলে আমার পক্ষে অসাধ্য হইতেছে। নূতন যে সকল অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দাও—ছেলেদের খাওয়া দাওয়া এবং চরিত্র পরিদর্শনের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দাও—অধ্যাপনের নিয়ম বাঁধিয়া দাও—নহিলে এই সময়ে মাঝপথে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলে আর শৃঙ্খলা স্থাপনা কঠিন হইবে—বিদ্যালয়ের বদনাম হইবে এবং বর্ত্তমান অরাজকতার অবস্থায় এমন সকল কুনীতি কুশিক্ষা কুদৃষ্টান্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে যে ভবিষ্যতে কেবল মাত্র অনুতাপ করিয়া তাহার সংশোধন হইতে পারিবে না। কুঞ্জবাবু সপরিবারে আছেন দিনরাত্রি ছেলেদের উপর দৃষ্টি রাখা তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর নহে—অনেক নূতন ছেলে আসিয়াছে তাহাদের চরিত্র ও আচরণ কিরূপ ঠিক জানি না—তাহারা বিদ্যালয়ে যদি কোন কলুষ আনয়ন করে তবে আক্ষেপের সীমা থাকিবে না। তুমি আর লেশমাত্র বিলম্ব করিও না। মোহিতবাবু বিদ্যালয়ের সমস্ত অবস্থা দেখিয়া জানিয়া আসিয়াছেন তাঁহাকে সত্বর ডাকাইয়া আমার এই চিঠি দেখাইয়া একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়ো। রেণুকাকে দিনরাত্রি সাবধানে সেবাশুশ্রূষা করিতে হইতেছে—চিঠি লিখিবার সময় অত্যন্ত অল্প—এইজন্য মোহিতবাবুকে চিঠি লিখিতে পারিলাম না। তুমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক উদ্বেগ জানাইলে তিনি কখনই উদাসীন থাকিবেন না—তাঁহাকে অনেক খাটাইয়াছি আরও অনেক খাটাইব। এ বিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ তোমাদের নিজের করিতে হইবে। যতক্ষণ লিখিতেছি ততক্ষণ আমার ঘুমানো উচিত ছিল কিন্তু বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অব্যবস্থায় আমাকে বিশ্রাম করিতে দিতেছে না। ছুটি কবে পাইব?

তোমার রবি

২৩

[অক্টোবর বা নভেম্বর ১৯০৫ ?]

ওঁ

বন্ধু,

আমি পলাতক। একদিন তুমি ছিলে কোণের মধ্যে, আমি ছিলাম জনতায়—আমি আজ কোণ খুঁজিতেছি, তুমি ভিড়ের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছ। যে-কাজ তোমার মুলতুবি ছিল সে তোমাকে সাধিয়া লইতে হইবে। আমার কাজ সারা হইয়াছে; তাই চোখ বুজিবার পূর্ব্বে বাতি নিবাইবার আয়োজন করিতেছি: এখন তুমি আমাকে ডাক দিলে চলিবে কেন? দেশের লোকের কাছ হইতে আমার মজুরি চুকাইয়া লইয়াছি—পুরা বেতন পাইলাম কি না সে হিসাব করিবারও ইচ্ছা নাই—এখন ছুটি লইয়া একটু বিশ্রাম করিব, এই জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। এই বিশ্রামের দাবী আমার অন্যায় নয়—এবং সেটা মঞ্জুর করিতে দেশের লোকের সিকি পয়সা খরচ নাই—সম্মান-সম্বর্দ্ধনার জন্য অনেক কাঠ-খড় দরকার হয়, এমন-কি অপমানও নেহাৎ বিনি খরচায় হয় না। কাল আবার বোলপুরে ফিরিতেছি। সেখানকার আকাশে এবং আলোয় কিছুমাত্র কৃপণতা নাই—ছেলেবেলা হইতে একান্ত মনে ঐ আকাশকে আলোকে ভালবাসিয়াছি—আমার স্বদেশের কাছ হইতে আর কিছু না পা[ই] ঐ জিনিষটি প্রাণ ভরিয়া পাইয়াছি—ক্ষুধা এখনো মেটে নাই।

বৌঠা'নকে নমস্কার দিবে।

তোমার রবি

২৪

[৮ জানুয়ারি ১৯০৮]

ওঁ

শিলাইদহ

বন্ধু

তোমার চিঠি পাইয়া বিশেষ সান্ত্বনা অনুভব করিয়াছি। আমাদের চারিদিকেই এত দুঃখ এত অভাব এত অভাব এত অপমান পড়িয়া আছে যে নিজের শোক লইয়া অভিভূত হইয়া এবং নিজেকেই বিশেষরূপ দুর্ভাগ্য কল্পনা করিয়া পড়িয়া থাকিতে আমার লজ্জা বোধ হয় আমি যখনই আমাদের দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দেখি তখনি আমাকে আমার নিজের দুঃখতাপ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনে। আমাদের অসহ্য দুর্দ্দশার মূর্ত্তি ঘরে ও বাহিরে আজকাল এমনি সুপরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছে যে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি লইয়া পড়িয়া থাকিবার সময় আমাদের আর নাই।

এবারকার কন্‌গ্রেসের বজ্রভঙ্গের কথা ত শুনিয়াছই—তাহার পর হইতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে দিনরাত্রি নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটা ঘায়ের উপর দুই দলে মিলিয়াই নুণের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত হইয়াছে। কেহ ভুলিবে না, কেহ ক্ষমা করিবে না—আত্মীয়কে পর করিয়া তুলিবার যতগুলি উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিবে। কিছুদিন হইতে গবর্মেণ্টের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে—এখন আর সিডিশনের সময় নাই—যেটুকু উত্তাপ এত দিন আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল তাহা নিজেদের ঘরে আগুন দিতেই নিযুক্ত হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া "বন্দে মাতরম্" কাগজে স্বাধীনতার অভয়মন্ত্রপূর্ণ কোনো উদার কথা আর পড়িতে পাই না, এখন কেবল অন্য পক্ষের সঙ্গে তাহার কলহ চলিতেছে। এখন দেশে দুই পক্ষ হইতে তিন পক্ষ দাঁড়াইয়াছে—চরমপন্থী, মধ্যমপন্থী এবং মুসলমান—চতুর্থ পক্ষটি গবর্মেণ্টের প্রাসাদ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া মুচকি হাসিতেছে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানেই বয়। আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না—মর্লিও নয় কিচেনারেরও নয়—আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিসাৎ করিতে পারিব।

শরৎ বহু দিনের পর তোমাদের ওখানে দিশি রান্না খাইয়া এবং বৌঠাকুরাণীর শাড়িপরা স্নিগ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া ভারি খুশি হইয়া বেলাকে চিঠি লিখিয়াছে।

কারখানা ঘরের কাজ চালাইবার উপযুক্ত Engine lathe প্রভৃতির কথা তোমার চিঠিতে পড়িয়া বিশেষ লোভ জন্মিতেছে। আমি যেমন করিয়া পারি বোলপুরে টেক্‌নিকাল বিভাগ খুলিব। ধর্ম্মপাল আমাকে গোটাকতক কল দিতে স্বীকার করিয়াছে। তাহার কতকগুলি কৃষি-ব্যাপারের যন্ত্র আছে, একটা কাপড় কাচিবার আমেরিকান কল আছে। সে বলে আমি যদি টেকনিকাল বিভাগ খুলি তাহা হইলে আমাকে সাহায্য জোগাড় করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার condition এই যে এই টেকনিকাল বিভাগের নাম রাখিতে হইবে Indo-American Industrial School। আমি তাহাকে লিখিয়াছি সাহায্যের পরিমাণ যদি যথেষ্ট এবং যদি যথার্থ কাজের হয় তাহা হইলে আমেরিকার ঋণ স্বীকার করিতে আপত্তি করিব না। আচ্ছা, তোমাকে যদি হাজারখানেক টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাই, তবে সুরেশকে দিয়া আমার Workshop এর মালমসলা কিনাইয়া পাঠাইয়া দিতে পারিবে কি? এ-সম্বন্ধে তোমার উত্তর পাইলে টাকা জোগাড়ের চেষ্টা দেখিব।

রথীর চিঠি প্রায়ই পাই। তাহারা সেখানে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে পড়াশোনা করিতেছে। বলা বাহুল্য, তুমি আমেরিকায় গেলে তাহাদের অত্যন্ত আনন্দ হইবে—নিশ্চয়ই তাহারা তোমাকে তাহাদের কলেজে টানিয়া লইয়া যাইবে। তোমার সঙ্গে আমিও জুটিতে পারিলে কত খুশি হইতাম। বৌঠাকরুণকে আমার কথাটা স্মরণ করাইয়া দিও—সমুদ্রের এপারের কালো বন্ধুদের ভাগে হৃদয়ের একটা অংশ রাখিয়া দেন যেন। ইতি ২৩শে পৌষ ১৩১৪।

তোমার রবি

২৫

[নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১২
বা জানুয়ারি ১৯১৩]

508 W. High Street
Urbana. Illinois U. S. A.

ওঁ

বন্ধু,

আমি অনেক দিন হইতে তোমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিলাম না বন্ধুত্বের কোন সূত্র কোথায় কেমন করিয়া কি পরিমাণে ছিন্ন হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল এ সম্বন্ধে আমি নিরবচ্ছিন্ন বেদনা অনুভব করিয়াছি। অবশেষে আমি এই কথাই ঠিক করিয়াছিলাম যে আমাদের মাঝখানে এই একটা মায়া, এই একটা ভুল বোঝার কুয়াশা দেখা দিয়াছে ইহার সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া লড়াই করিয়া কোনো ফল নাই কিছু দিন চুপ করিয়া থাকিলে পর ইহা আপনিই স্বপ্নের মত কাটিয়া যাইবে। তাই আমার মনে ছিল দীর্ঘকাল প্রবাসবাসের পর যখন ফিরিব তখন দেখিব মায়াবরণ মিলাইয়া গিয়াছে।

পশ্চিমে আমি সমাদর লাভ করিব, একথা মনে করিয়া আসি নাই—যখন অসুস্থ অবস্থায় শিলাইদহে বসন্ত যাপন করিতেছিলাম তখন গীতাঞ্জলি হইতে আমার ছোট ছোট গান ইংরেজি গদ্যে তর্জ্জমা করিয়াছিলাম, মুহূর্ত্তের জন্য মনে করি নাই সেগুলি কোনো কাজে লাগিবে—বিশেষত ইংরেজি ভাষায় আমার অধিকার সম্বন্ধে আমার মনে লেশমাত্র অহঙ্কার নাই। দৈবক্রমে সেগুলি কাজে লাগিয়াছে—তাহাতে আমার বিশেষ ভাবে এই আনন্দ যে যাহারা আমাকে ভালবাসে তাহারা গৌরব অনুভব করিবে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি সহসা এখানকার লোকের মনে একটা বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে—অনেকে বাংলা শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে হয়ত তাহার একটা শুভফল আছে। এদেশে আসিয়া আমি দুঃসাহসে ভর দিয়া ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে দুই একটা বক্তৃতা করিয়াছি, শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিল সেই উপলক্ষ্যে সম্প্রতি আমি এখানে আসিয়াছি। আমার বক্তৃতা এখানকার লোকের ভাল লাগিয়াছে, আরো আমন্ত্রণ পাইয়াছি। কিন্তু বক্তৃতা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার পক্ষে এতই ক্লান্তিকর যে, কি করিব ভাবিয়া

পাইতেছি না। আগামী এপ্রেল মাসে ইংলণ্ডে ফিরিবার কথা আছে। সেখানে ম্যাকমিলানরা আমার রচনা প্রকাশ করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। আমার অনেকগুলি কবিতা এবং কিছু কিছু নাটক তর্জ্জমা করিয়াছি—সেগুলি ছাপা হইলে সমাদৃত হইবে এমন আশা আছে। এমনি করিয়া এখানকার গোলমালের মধ্যে দিন কাটিতেছে—যতই আদর অভ্যর্থনা পাই না কেন—মনের ভিতরটাতে একটা ক্লান্তির ভার অনুভব করিতেছি—দেশে ফিরিয়া গিয়া সেখানকার অবারিত আকাশ অপর্য্যাপ্ত আলোক এবং অনবচ্ছিন্ন অবকাশের মধ্যে নিমগ্ন হইবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রায়ই একটা উদ্বেগ অনুভব করিতেছি। কিন্তু এখানে আমার কিছু কাজ আছে—সে কাজে ভঙ্গ দিয়া গেলে সেটা অন্যায় হইবে তাই এই আবর্ত্তের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আশা করিতেছি, দেশে ফিরিয়া গিয়া আরো উৎসাহ ও শক্তির সঙ্গে আমার কাজে লাগিতে পারিব।

তোমার
রবি

২৬
১৫ মে ১৯১৩

C/o Messrs. Thomas Cook & Son.
Ludgate Circus, London.
15 May. 1913

বন্ধু,

তোমার বন্ধু Mrs. Boole-এর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। তিনি তোমার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বয়স আশী পার হইয়া গিয়াছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহার বুদ্ধিশক্তির সজীবতা! তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। Miss MacLeod আমাকে তাঁহার ওখানে লইয়া গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তোমার কি এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে? যদি এখানে একসঙ্গে মিলিতে পারিতাম ত সুখের হইত। এদিকে আমার বোধ করি ফিরিবার সময় কাছে আসিতেছে; এখানকার সামাজিকতার ঘূর্ণির টানে পাক খাইয়া আমার শরীর মন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যালয়ের চিন্তাও আমাকে পাইয়া বসিয়াছে—আর অধিক দিন দূরে থাকা হয়ত ক্ষতিকর হইতে পারে।

ইহার মধ্যে একদিন এখানকার সভায় "চিত্রা"র ইংরেজি অনুবাদ পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। এখানকার শ্রোতাদের ভাল লাগিয়াছে। আইরিশ থিয়েটারে আমার "ডাকঘর" নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হইতেছে।

তবু এই খ্যাতি-প্রতিপত্তির ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে মন টিঁকিতেছে না। একটুখানি নিভৃতের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধ করিতেছি। হাতের কাজগুলা কোনোমতে শেষ করিতে পারিলেই দৌড় দিব।

গত বারে দেবেনের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছিলাম।

শুনিয়াছি, তোমার কাজ অগ্রসর হইতেছে এবং বাহিরের দিক হইতে তোমার বাধাবিঘ্ন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। ফিরিয়া গিয়া তাহার অনেকটা পরিচয় পাইব, এই প্রত্যাশা করিয়া রহিলাম।

তোমার রবি

২৭
[১৪ এপ্রিল ১৯১৪]

ওঁ

শান্তিনিকেতন
[১ বৈশাখ ১৩২১]

বন্ধু,

তুমি ত তোমার জয়যাত্রায় বেরিয়েছ—"শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু।" আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, তুমি জয়মাল্য বহন ক'রে নিয়ে এসে তোমার দেশকে অলঙ্কৃত করবে, তুমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে গেছ। আজ পয়লা বৈশাখ, আজকের নব বর্ষারম্ভের উৎসবে আমি এই প্রার্থনাই করচি—এতদিন ধ'রে যে সোনার ফসল তুমি ফলিয়ে তুলেচ মহাকালের তরণী বোঝাই ক'রে দেশে দেশান্তরে সেই ফসল প্রাণ বিস্তার ক'রে দিক।

যদি সম্ভব হয় এবার একবার আমার বন্ধু রোটেনষ্টাইনের সঙ্গে আলাপ ক'রে এসো। তিনি ত খুসি হবেন-ই, তুমিও হবে। আমি তাঁকে, তোমার কথা আগেই লিখে দিয়েছি। তুমিও তোমার পৌঁছা সংবাদ তাঁকে দিয়ো।

বৌঠাকুরাণীকে আমার নববর্ষের সম্ভাষণ জানিয়ো।

তোমার রবি

২৮
[সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর ১৯১৬]

ওঁ

বন্ধু,

তোমার চিঠি এখানে এসে পেলুম। জাপানে পেলে সুবিধা হ'ত, কেননা, সেখানে হাতে কতকটা সময় ছিল। কিন্তু এখানে এসে পৌঁছেই এমন প্রচণ্ড ঘূর্ণপাকের মধ্যে প'ড়ে গেছি যে, কিছুই ভাববার অবকাশ নেই—কেবলই আমাকে টানাটানি ছেঁড়াছেড়ি ক'রে ঠেলে নিয়ে চলেচে। এখানকার ঝোড়ো বাতাসে এক মুহূর্ত্ত স্থির হ'য়ে দাঁড়াবার জো নেই—বাড়িতে চিঠিপত্র লেখা পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দিতে হয়েছে। অন্তত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আমাকে এই ঘূর্ণির টানে সহর থেকে সহরে ঘরিয়ে নিয়ে বেড়াবে। যাই হোক, আমি কোনো জায়গায় একটুখানি স্থির হ'য়ে বসবার সময় পেলেই তোমার গান লেখবার সময় করব। তোমার বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাকৃতে পারতুম তা হ'লে আমার খুব আনন্দ হ'ত। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তা হ'লে তোমার এই বিজ্ঞান-যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে, এই কথা মনে রইল। এতদিন যা তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেচে। কিন্তু এ ত তোমার একলার সঙ্কল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে এর বিকাশ হ'তে চলল। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয়—তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী ক'রে দিয়ে যাবে—তার পর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চলতে থাকবে। কত বার আমরা নানা মিথ্যার সঙ্গে জড়িয়ে কত মিথ্যা জিনিষের সৃষ্টি করেচি—তার উপরে অজস্র টাকা বৃষ্টি ক'রেও তাদের বাঁচিয়ে তুলতে পারিনি। কেবলমাত্র অভিমান দিয়ে ত কোনো সত্য বস্তু আমরা সৃজন করতে পারিনে। কিন্তু এ যে তোমার চিরদিনের সত্য সাধনা—

এর মধ্যে যে আপনাকে দিয়েচে, আপনাকে পেয়েচে—তুমি যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত তোমার মন্ত্রকে তোমার অন্তরে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েচ, এইজন্যে বাইরে তাকে প্রকাশ করবার পূর্ণ অধিকার ঈশ্বর তোমাকে দিয়েচেন। সেই অধিকারের জোরে আজ তুমি একলা দাঁড়িয়ে তোমার মানসপদ্মের বিজ্ঞান-সরস্বতীকে দেশের হৃদয়-পদ্মের উপরে প্রতিষ্ঠিতা করচ। তোমার মন্ত্রের গুণে, তোমার তপস্যার বলে—দেবী সেই আসনে অচলা হবেন, এবং প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে তাঁর ভক্তদের নব নব বর দান করতে থাকবেন।

দেশে ফেরবার জন্যে মন ব্যাকুল হ'য়ে রয়েচে। এখানকার কাজ শেষ হ'তে কত দিন লাগবে জানিনে। কিন্তু এইরকম উর্দ্ধশ্বাসে লাটিমের মত ঘূরে বেড়াতে আর পারিনে।

তোমার রবি

২৯

[অক্টোবর ?, ১৯১৭]

ওঁ কলিকাতা

বন্ধু,

এতদিন শরীরটা অত্যন্ত টলমলে অবস্থায় ছিল—এখন ভাঙন ধরা সুরু হয়েছে। কানের উপরে এক পর্দ্দা প'ড়ে গেছে—ভাল ক'রে শুনতে পাচ্চিনে। তার উপরে শরীর এমন ক্লান্ত যে, প্রতিদিনের সামান্য কাজটুকু করাবার জন্যে তাকে ঠেলাঠেলি করতে হয়। ডাক্তার বলচে, একেবারে চুপচাপ ক'রে থাকতে। তাই এতদিন পরে চিঠি পড়বার ও চিঠি লেখবার জন্যে একজন সেক্রেটারী রাখতে হয়েছে—সর্ব্বদা নিজের কাছে কাছে এরকম একজন লোককে লাগিয়ে রাখতে আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে, কিন্তু আর উপায় নেই। এদিকে কনগ্রেসের সময় একটা কিছু বলবার জন্যে আমার উপরে অন্তরে বাহিরে তাগিদ এসেছে, কিন্তু কিছুকাল বিশ্রামের পর যদি ভাল থাকি ত চেষ্টা করব—এখনকার মত সুগভীর নিষ্কর্ম্মণ্যতার মধ্যে ডুব মারব। কোনো নূতন বায়গায় গেলে মনের বিক্ষিপ্ততা ঘটে, তাই শান্তিনিকেতনে যাওয়া ঠিক করচি—সেখানে বিদ্যালয়ের ছুটি—কেউ লোকজন নেই। বেলাকে ছেড়ে বেশী দূরে যাতায়াত চলবে না। কানটা আশা করি বিশ্রামের পরে আবার সতেজ হ'বে—না যদি হয় তা হ'লে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে নেপথ্যে স'রে পড়ব—

মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলেম না।

নিবেদিতার বইয়ের সেই ভূমিকা লেখবার মত মনের সচেষ্টতা নেই। তোমাদের লেক্চারের জন্যে করে তৈরী হ'ব তা বলতে পারিনে—বোধ হয় এখন থেকে কর্ত্তব্যকে সঙ্কীর্ণ ক'রে এনে জীবনের একটা সীমা নির্দ্ধারণ ক'রে নিতে হবে—এই সহজ কথাটা মনে রাখতে চেষ্টা করব—যা আমি পারি তার চেয়ে আমি বেশী পারিনে।

তোমার রবি।

৩০

১ জানুয়ারি ১৯১৯

ওঁ

বন্ধু,

বৌমার খুব কঠিন রকম নূ্যমোনিয়া হয়েছিল। অনেক দিন লড়াই ক'রে কাল থেকে ভাল বোধ হচ্চে। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বোধ হয় অনেক দিন লাগবে। হেমলতা এবং সুকেশী এখনো ভুগচেন। তার মধ্যে হেমলতা প্রায় সেরে উঠেচেন—কিন্তু সুকেশীর জন্যে ভাবনার কারণ আছে।

কিন্তু ছেলেদের মধ্যে একটিরও ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়নি। আমার বিশ্বাস, তার কারণ, আমি ওদের বরাবর পঞ্চতিক্ত পাঁচন খাইয়ে আসচি। ছেলেদের অনেকেই ছুটীর মধ্যে বাড়ীতে নিজেরা ভুগেছে এবং সংক্রামকের আড্ডা থেকে এবং কেউ কেউ মৃত্যু-শয্যা থেকে এসেচে। ভয় ছিল, তারা এখানে এসে রোগ ছড়াবে—কিন্তু একটুও সে লক্ষণ ঘটেনি এবং সাধারণ জ্বরও এ বছর অনেক কম। আমার এখানে প্রায় দুশো লোক, অথচ হাসপাতাল প্রায়ই শূন্য প'ড়ে আছে—এমন কখনও হয় না—তাই মনে ভাবচি এটা নিশ্চয়ই পাঁচজনের গুণে হয়েছে।

অজিতের অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে। তার গুণ ছিল—সে সম্পূর্ণ নির্ভীক ভাবে প্রবল পক্ষের বিরুদ্ধে এবং প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে নিজের মত প্রকাশ করতে পারত। ঠিক বর্ত্তমানে সে রকম আর কোন বাংলা লেখক আমার ত মনে পড়চে না।

আমি নিজে কোন স্পষ্ট ব্যামোয় পড়িনি—কেবল মাঝে মাঝে খুব একটা ক্লান্তি আমাকে চেপে ধরে—সেই পুনঃ পুনঃ ক্লান্তিটাই আমার ছুটির দরবার। আমার দ্বারা যতটা হতে পারে নানা রকমে তা করেচি, এখন অন্যদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দেবার সময় এসেচে। নূতন লোক এসে নূতন ভাষায় নূতন কালের জন্যে কথা ক'বে এইটেই হচ্চে আবশ্যক—নিজের পালাটাকে তার সময় অতিক্রম করিয়ে জোর ক'রে টেনে রাখাটাই ভুল। ইতি ১৭ পৌষ ১৩২৫।

তোমার রবি

৩১

২৪ নভেম্বর ১৯২১

ওঁ

বন্ধু,

তোমার "অব্যক্ত"র অনেক লেখাই আমার পূর্ব্ব-পরিচিত—এবং এগুলি পড়িয়া অনেক বারই ভাবিয়াছি যে, যদিও বিজ্ঞানবাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্যসরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত—কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে। ইতি ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮।* তোমার রবি।

* বিশ্বভারতীর সৌজন্যে।

"যার চোখ সুন্দরকে দেখতে পেলে না আজন্ম, তার চোখের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা ঘ'ষে ঘ'ষে ক্ষইয়ে ফেললেও ফল পাওয়া যায় না, আবার যে সুন্দরকে দেখতে পেলে সে অতি সহজেই দেখে নিতে পারলে সুন্দরকে, কোন গুরুর উপদেশ পরামর্শ এবং ডাক্তারি দরকার হ'ল না তার, বিনা অঞ্জনেই সে নয়নরঞ্জনকে চিনে নিলে।" —অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রায়ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহা অপেক্ষা এক বৎসরের বড় ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় বাড়িতে একই শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহাদের শিক্ষা পরিদর্শনের ভার কবির তৃতীয় অগ্রজ সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের উপর ছিল। হেমেন্দ্রনাথ ছেলেদের ভালো করিয়া মাতৃভাষা বাঙলা পড়াইয়া সংস্কৃত ও ইংরেজি আরম্ভ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এই বাঙলা শিক্ষায় কবির যে অশেষ উপকার হইয়াছিল তাহা বলিতেই হইবে। হেমেন্দ্রনাথ বালকদিগকে নানাবিধ শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রসিদ্ধ বাঙালী কুস্তিগীর অম্বু গুহের গুরু হীরা সিং পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিখিতে হইত। তাহার পরে বাঙলা সাহিত্য, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল অধ্যয়ন, তারপরে স্কুল। বাড়ী আসিয়াই চিত্র অংকন ও জিম্‌নাসটিক, সন্ধ্যার পরে সংস্কৃত ও ইংরেজি। রবিবারেও ছুটি ছিল না, ওস্তাদের নিকট (বিষ্ণু চক্রবর্তী প্রভৃতি) সংগীতচর্চা এবং বাড়ীর সংলগ্ন উদ্যান-মধ্যস্থিত পুষ্করিণীতে সন্তরণ শিক্ষাও অভ্যাস করিতে হইত। ইহা ছিল হিসাবের মধ্যে, হিসাবের বাহিরে ছিল, মাঝে মাঝে সীতানাথ তত্ত্বভূষণের নিকট প্রাকৃত-বিজ্ঞান শিক্ষা। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের যে 'কংকাল' আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়াছিল, সে কোন্ কংকাল জানি না ; তবে তারে গ্রথিত হইয়া একটা কংকাল তাঁহাদের বাড়ীর "পড়িবার ঘরের" দেওয়ালে আলম্বিত ছিল, তাহার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথকে অস্থিবিদ্যা শিখিতে হইত ও বহু দিন কবি জ্যোতিষশাস্ত্র ফলিত ও গণিত উভয়ই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথিতেও তিনি যথেষ্ট দখল অধিকার করিয়াছিলেন। তখন সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারে বাহির মহলে বালকদের জন্য স্বতন্ত্র একটি পড়িবার ঘর থাকিত, তাহাতে ঝোলানো ব্ল্যাকবোর্ড, মানচিত্র ও দুটি গ্লোব থাকিত (Terrestrial & Celestial) অর্থাৎ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মানচিত্রাংকিত। বাড়ীর লোকে ঐ ঘরকে "ইস্কুল ঘর" বলিত।

কবি যখন ছাত্রবৃত্তির দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তখন তাঁহার সহপাঠী বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ একদিন মহর্ষির কাছে একখানা বই চাহিতে গিয়া এমন সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহারা আর কিছুদিন নর্মাল স্কুলে পড়িতে থাকিলে হয়তো বা ক্রমে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা কহিবেন, এই আশংকাতেই মহর্ষি তাঁহাদের বাংলা শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলেন। সত্যপ্রসাদের সাধুভাষা প্রয়োগের কারণও ছিল। মহর্ষির সকল জিনিষ বেশ সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ হওয়াই অভিপ্রেত ছিল। আচরণ, বেশভূষা ও কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি পূর্বে উপদেশ দিতেন ও কার্যান্তে কিরূপ হইল তাহার বর্ণনা লইতেন, ব্যতিক্রমে বিরক্ত হইতেন। এই শিক্ষার ফলে তাঁহার জ্যেষ্ঠাত্মজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাষার এলোমেলো ব্যবহারে ও অযথা প্রয়োগে বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেন। হিমালয় ভ্রমণান্তে মহর্ষি দেবেন্দ্র যখন বাড়ী আসিতেন তখন বাড়ীময় একটা সাড়া পড়িয়া যাইত (শিল্পিগুরু ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' দ্রঃ)। সে সময় যেমন ধুতির সহিত দোবজা (চাদর) না থাকিলে পরিচ্ছদ ভদ্রোচিত হইত না, সেইরূপ ইজের ও পাঞ্জাবির উপর জোব্বা না থাকিলে, এবং বাহিরে যাইতে হইলে টুপি ও শুঁড়তোলা লপেটা জুতা পরিচ্ছদে অপরিহার্য ছিল যেমন একালে ট্রাউজারের সহিত বুক-খোলা কোট পরিলে কামিজ কলারের সহিত দিনে টাই ও অপরাহ্ণ হইতে বো পরা সভ্যতানুযায়ী অপরিহার্য। মহর্ষি-পরিবারের পুরুষেরা বাড়ীতে সাধারণত ধুতির বদলে ইজের পরিতেন কিন্তু ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ধুতি অবশ্যই পরিতে হইত ও এই নিয়ম সকল ঠাকুর বাড়ীতেই ছিল। মহর্ষির নিকট যাইবার সময় সকলেই মুখের পান ফেলিয়া যাইতেন। অন্দরে রবীন্দ্র-জননী মহর্ষির আহারের তত্ত্বাবধানের জন্য পাকশালায় যাইতেন। কাজেই সত্যপ্রসাদের মনে একটা দারুণ সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়াছিল, বই চাহিতে গিয়া ভাষাতে তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়িল।

এইবার রবীন্দ্রনাথের রীতিমতো ইংরাজি পড়া আরম্ভ হইল। প্রথমে তিনি 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি' নামক একটি ফিরিঙ্গীপ্রধান স্কুলে ভর্তি হইলেন। সেখানে ইংরাজি বা ল্যাটিন বিদ্যার সহিত স্কুল-পালানো বিদ্যা যথেষ্ট আয়ত্ত হইয়াছিল।

২৫এ মাঘ ১২৭৯ ইং ১৮৭৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথের উপনয়ন মহর্ষি-প্রবর্তিত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। মহর্ষি কেবলমাত্র সাবিত্রী-দীক্ষা পুত্রদের কর্ণে দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও তাহার অর্থ বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা দিয়াছিলেন। রামমোহনের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথেরও বাঙলা দেশে প্রচলিত সংস্কৃত উচ্চারণ বিকৃতবোধে মনঃপূত ছিল না। তিনি আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের সাহায্যে বিশুদ্ধ উচ্চারণ বেদ ও বেদান্ত পুত্রদের শিক্ষা দেন। ভট্টাচার্য বি-এ পাশ করিয়া ইংরাজিতে কৃতবিদ্য হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে ইংরাজিও পড়াইতেন। মহর্ষি বেদাঙ্গ ও অপরাবিদ্যা অর্জন পুত্রদের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পরাবিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। উপনয়নের পর হইতে রবীন্দ্রনাথ নিষ্ঠার সহিত নিত্য গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতেন। ইহাই তাঁহার ধর্মজীবনের ও সাধনার সূত্রপাত। তাঁহার তরুণ মনে পূর্ব-সুকৃতির ফলে শ্রদ্ধার বীজ সত্বরই অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং পিতার দৃষ্টান্তে ও বাক্যে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। এমন কি, অল্পবয়সে ভয় পাইলে অঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবীত জড়াইয়া গায়ত্রীমন্ত্রজপে সে ভয় দূর করিতেন। সাংসারিক দুঃখকষ্ট দুর্যোগে ইষ্টমন্ত্রে মনোনিবেশ পূর্বক সে-দুঃখ উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এই বিশ্বাস তাঁহার ভক্তিমান পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন।

এইবার একবার কবিকে মহর্ষির সঙ্গে ভ্রমণে বাহির হইতে হয়। ভ্রমণকালটা বেশ একটু লম্বা রকমের হইয়াছিল। ইতিপূর্বে একবার মাত্র কবি কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলেন। ডেঙ্গু জ্বরের ভয়ে তাঁহাদের কিছুদিন পানিহাটির এক বাগানবাড়িতে (ছাতুবাবুদের) আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এবার মহর্ষি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া প্রবাসে গিয়াছিলেন। প্রথমে কয়েক

দিন শান্তিনিকেতনে থাকিয়া তাহার পরে সাহেবগঞ্জ, দানাপুর প্রভৃতি স্থানে কয়েক দিন কাটাইয়া অমৃতসরে এক মাস থাকেন। সেখানে গুরুদ্বারা ও স্বর্ণমন্দির এবং জাতিভেদশূন্য শিখদের তথায় দিবারাত্রি আরতি, ভজনগান ও আরাধনা মহর্ষির মনে দৃঢ় রেখাপাত করে। সেইরূপ বঙ্গদেশে একটি স্থান বা আশ্রম স্থাপিত দেখিতে তিনি উৎসুক ছিলেন কিন্তু সম্যক কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তথা হইতে ড্যালহাউসি পাহাড়ে তাঁহারা বক্রোটাশিখরে পৌঁছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথকে কিছু ইংরেজি, কিছু সংস্কৃত সঙ্গে সঙ্গে কিছু গণিত আর জ্যোতিষ পড়িতে হইত। মহর্ষি স্বয়ং তাঁহাকে পড়াইতেন।

চার মাস বাদে শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মহর্ষির একখানা পত্র (হিমালয় বক্রোটাশিখর ১৪ই আষাঢ় ১৭৯০ শক) হইতে জানা যায় "রবীন্দ্রকে একটি জীবন্ত পত্রস্বরূপ তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি, তাহার প্রমুখাৎ এখানকার তাবৎ বৃত্তান্ত চুম্বকরূপে জানিতে পারিয়াছ।" এই জীবন্ত লিপিটি তাহার অনুচর কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়ের জিম্মায় কলিকাতায় ইতিপূর্বে আসিয়া পৌঁছায়। কলিকাতায় ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথকে আবার সেই বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতেই যাইতে হইল কিন্তু যে স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছে যে বন্ধন মানিতে চায় না। দীর্ঘকাল বন্ধন দশায় থাকিয়া পঙ্গু না হইলে পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গমকে ধরিয়া আনিয়া পুনরায় পিঞ্জরে ভরিয়া দিলে সে পলাইতেই চায়। রবীন্দ্রনাথ স্কুল হইতে নিয়মিত পলায়ন আরম্ভ করিলেন। অভিভাবকগণ সে কথা বুঝিয়া তাঁহাকে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট জেভিয়ারস্ কলেজিয়েট স্কুলে পাঠাইলেন।

১২৮১ সালের ২৫এ ফাল্গুন চৌদ্দ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয়। এই সময় তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন তাঁহার বৌঠাকুরাণী জ্যোতিরিন্দ্র-পত্নী কাদম্বিনী দেবী। ইনি কলিকাতার খ্যাতনামা সংগীতরসিক জগমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা ও শিক্ষার গুণে একজন বিদুষী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তৎকালীন যুগসাহিত্যপ্রবর্তক ও পরে রবীন্দ্রনাথের বৈবাহিক কবি-গুরু বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা ইঁহার প্রিয় থাকায় ইনি কবিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। ইঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত আসন পাইয়া বিহারীলাল "সাধের আসন" লেখেন। ইনি রবীন্দ্রনাথকে বিহারীলালের কবিতার আদর্শে কবিতা লিখিতে উৎসাহিত করিতেন। ইনি সাহিত্য ও সংগীতানুরাগী মাত্র ছিলেন না, স্বামীর উপদেশে অশ্বারোহণ বিদ্যায় নিপুণা হইয়াছিলেন। কলিকাতার ও চন্দননগরের রাজপথে বিচরণকালে এই অশ্বারূঢ় দম্পতি তাঁহাদের সহৃদয় সামাজিকতার গুণে বহু সম্ভ্রান্ত প্রাচীনপন্থীরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। নূতন স্কুলে যাইয়াও রবীন্দ্রনাথের আচরণের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হইল না। ব্যাপার বুঝিয়া কর্তৃপক্ষ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। এত দিনে রবীন্দ্রনাথের মনস্কামনা পূর্ণ হইল, তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলেন। এই সময়ে তাঁহার গৃহশিক্ষকেরা তাঁহার অন্যান্য বিষয়ে পড়াশুনা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অবশেষে কালিদাসের কুমারসম্ভব ও শেক্‌শপিয়ারের ম্যাক্‌বেথ প্রভৃতি তাঁহাকে পড়াইতেন ও তাঁহাকে অনুবাদ করিতে উৎসাহ দিতেন। ম্যাক্‌বেথের কবিকৃত অনুবাদ পরবর্তীকালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের স্কুলে পড়া এই পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ তখনকার এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষা দিলেন না। তখনকার ফোর্থ ক্লাসেই ইতি হইল। কিন্তু এ বয়সে তিনি অন্যপক্ষে কতটুকু লাভ করিয়াছিলেন দেখা যাক। সেই চৌদ্দ পনেরো বৎসর বয়সেই অতি সামান্য ইংরাজি, অল্প সংস্কৃত, অল্প জ্যোতিষ, সামান্য অস্থি ও স্বাস্থ্যবিদ্যা তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন যাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নয় কিন্তু মাতৃভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল।

তখন বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে অতি অল্পই তাঁহার অপঠিত ছিল। বৈষ্ণব কবিতা ও মহাজন পদাবলীর (রামপ্রসাদের রচনাবলী সমেত) প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চুঁচুড়া হইতে অক্ষয়চন্দ্র সরকার একটি সুন্দর সংস্করণ বাহির করেন। বালক রবীন্দ্রনাথ তাহা সাগ্রহে পাঠ করেন ও বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহের' পুরাতন কয়েক খণ্ড এবং প্রতি মাসে প্রকাশিত 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' 'অবোধবন্ধু,' 'বঙ্গদর্শন' কবির মনের আহার যোগাইত। ইহা ভিন্ন সেই সুর—যে সুর প্রাণে বাজিয়া বাজিয়া তাঁহাকে পরীক্ষার প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিল—সেই সুরই তাঁহাকে শিখাইল সংগীত, আর শিখাইল কবিতা রচনা।

গুণেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 'নব নাটকের' মহলা দিবার সময় বাড়ির বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রবীন্দ্রনাথ তন্ময় হইয়া তাহার সংগীত-লহরী আয়ত্ত করিতেন। বালক রবি সংগীত শিখিতেন পাঁচালী দলগঠনকামী পিতৃ-অনুচর কিশোরীর নিকট, পিতৃবন্ধু বৃদ্ধ শ্রীকণ্ঠ সিংহের নিকট, অগ্রজ জ্যোতি দাদার (নতুন দাদা) নিকট অনিয়মিত ভাবে ক্রীড়ার ছলে, আর বেতনভোগী ওস্তাদের নিকট। তাহার উপর বড় দাদা হারমোনিয়াম ও অর্গ্যান বাজাইতেন, জ্যোতি দাদা পিয়ানোও বাজান, কত লোক গান করে—ইহাতে নানা দিক হইতে সংগীতে সাফল্যলাভ অপরিহার্য। স্বভাবত সুকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথকে সকলেই গাহিতে বলিতেন, তিনিও তাহাতে অপ্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার গান শুনিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত। নয় দশ বৎসর বয়স হইতে বাড়ীর মাঘোৎসবে গায়কদের সহিত গানে যোগদান করিতেন। তখন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে মৌলা বকস্ প্রভৃতি বিখ্যাত ওস্তাদদের গতিবিধি ছিল। সিপাহী-বিপ্লবের পর লখনউএর নবাব ওয়াজেদ আলি শা সপরিবারে সপারিষদ ও চিড়িয়াখানাসহ কলিকাতার অপর পারে মেটিয়াবুরুজে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার আশ্রিত বড়ে মিঞা, ছোটে মিঞা প্রভৃতি সংগীতবিদগণ এবং চিকিৎসক হাকিমগণ কলিকাতার অভিজাত সমাজে বিশেষ সমাদরের সহিত আহূত হইতেন। মার্গসংগীতের মজলিশে প্রায় সকল বড়লোকের বৈঠকখানাই সরগরম ছিল।

রবীন্দ্রনাথের এক দিকে যেমন স্কুল-পালানো বিদ্যা অগ্রসর হইতেছিল, অন্য দিকে তেমনই সংগীতবিদ্যাবিদদের এড়াইয়া চলার সাধনার অনুশীলনও চলিতেছিল। বিখ্যাত সংগীতশিল্পী যদু ভট্টের ইচ্ছা ছিল যে সুকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথ যেন কানাড়া রাগিণীতে তাঁহার ঘর এবং নাম বজায় রাখেন। সেদিকে যদু ভট্টের সকল চেষ্টা কিরূপে তিনি এড়াইয়া চলিয়াছিলেন, সে কৌতুককর কবিকাহিনী আমরা কবির নিজের মুখে একাধিক বার শুনিয়াছি। আর কবিতা রচনা? কাগজে, শ্লেটে কবিতা রচনা

অবিরাম চলিতেছিল—যদিও তখন রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী কবিদিগের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, যদিও ছন্দবন্ধের কঠোর নিয়ম পদ্ধতি মনোমত ভাঙিয়া গড়িয়া লইতে বালক কবি তখনো পারেন নাই। ললিত পদবিন্যাস, রচনা-মাধুর্য ও ভাষার প্রগাঢ় দখল অবধান করিয়াও কেহই কিন্তু বালকের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া উচ্চাশা পোষণ করেন নাই। স্কুল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক সাধারণ মানদণ্ডে তাঁহার গৌরবভার অনেক কমিয়া গেল।

বড় দিদি সৌদামিনী দেবী হতাশা জানাইলেন—"রবির কিছুই হইল না" বলিয়া। কেহ কেহ অনুযোগ করিলেন, গুরুজনেরা তাঁহাকে তিরস্কার করা পর্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন। কেবল একজন তাঁহার আশা ছাড়িলেন না—তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

জোর করিয়া রবিকে কোনো কাজ করানো যায় না, ইহাই তাঁহার প্রকৃতি। যত দিন তাঁহাকে জোর জবরদস্তি করিয়া চালাইরা লইবার পন্থাগুলি অনুসৃত হইতেছিল, তত দিন তাঁহার মন ছিল বেড়া ভাঙার দিকে; এখন স্বাধীনতা পাইয়া তিনি সাহিত্যের মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যে অন্তঃপ্রেরণা তাঁহাকে কার্যে ব্রতী করিতে চাহিত, হৃদয় মন তাঁহাকে যে পন্থা অনুসরণ করিতে বলিত, যে সব বিষয় জানিবার জন্য, পড়িবার জন্য তাঁহার আকুল আগ্রহ জন্মিত, স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে সে-সবের সামান্যই সন্ধান থাকায়, তথায় উপস্থিতির বাধ্যতায় সে সবই নষ্ট করিয়া দিত। ফল হইত এদিক ওদিক দুদিকের কোনোটাই হইত না। এখন সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিল। এখন ইচ্ছামতো পঠন, ভ্রমণ সবই হইতে লাগিল; তবে মাষ্টার পণ্ডিত এখনো ছিল। এই সময়ে মেট্রোপলিট্যান ইন্সটিটিউশানের প্রাক্তন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্রজনাথ দে ও ঐ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান পণ্ডিত রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন।

রামসর্বস্ব পণ্ডিত মহাশয় সেকালের নিয়মানুযায়ী শকুন্তলা প্রভৃতি নির্দিষ্ট কাব্য পড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক উদ্ভট শ্লোক ও কৌতুকজনক অনেক সংস্কৃত শ্লোকও ছাত্রকে মুখে মুখে শিখাইতেন। সে পরিচয় কবি 'রাজা ও রাণী'তে দিয়াছেন। রাজা বিক্রমদেব ও দেবদত্তের কথোপকথনের মধ্যে দেবদত্ত প্রথমে সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক শুরু করিতেই রাজা বাধা দেওয়ায় দেবদত্ত রহস্য করিয়া বলিলেন—

অনুস্বর ধনুঃশর নহে, মহারাজ,
কেবল টঙ্কার মাত্র! হে বীর পুরুষ,
ভয় নাই! ভালো, আমি ভাষায় বলিব।

সংস্কৃতের ললিত বঙ্গানুবাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের অগ্রজেরা প্রসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথও অসাধারণ সৃষ্টিনৈপুণ্যের অধিকারী যেমন, অনুবাদেও ভ্রাতাদের ন্যায় তেমন অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। যাহার কিছু পরিচয় বিক্রমের ভয়স্থান মূল সংস্কৃত বাক্যটি নিম্নে দিলাম—

শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং
স্বারাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
স্বাঙ্কে স্থিতাপি রমণী পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ কুতো বশিত্বম্॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "নবরত্নমালা" গ্রন্থে সন্নিবেশিত কতকগুলি উদ্ভট শ্লোকের রচনা রবীন্দ্রনাথকৃত ছন্দে অনুবাদ দেখা যায়। সত্যেন্দ্রনাথের 'বাল্যকথা' হইতে জানা যায় যে, যখন 'নবনাটক' গণেন্দ্র ও গুণেন্দ্রের উদ্যোগে ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত হয় তখন বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার পণ্ডিতমণ্ডলীর নামসম্বলিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি নাট্যমঞ্চের শিরোভূষণ হইয়াছিল—

ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

রবীন্দ্রনাথ বহুদিন সংসারে নিঃসঙ্গ ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বুধেন্দ্রের শিশুকালে মৃত্যু হওয়ায় তিনিই জননীর ছোট ছেলে বলিয়া অত্যন্ত মাতৃস্নেহভাজন ছিলেন। মাত্র চৌদ্দ বছরের রবিকে রাখিয়া মায়ের লোকান্তর গমনে রবির লালন-পালনের ভার তাঁহার বড়দিদিকে লইতে হইয়াছিল। মাতৃবিয়োগের দরুণ সংসারের সহিত নিজের সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়া পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন যে, তিনি তখন সংসারে শেওলার মতো ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন। সুতরাং তিনি বহুর মধ্যে থাকিয়াও একা। এইরূপ নিঃসঙ্গ অবস্থাই তাঁহাকে অন্তর্মুখী করিয়াছিল। সঙ্গিহীন রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রকৃতির সহিত হৃদ্যতাস্থাপনে যত্নবান হইয়াছিলেন, তেমনি পুস্তককেই সঙ্গী করিয়া পাঠে অধ্যবসায়ী ছিলেন। এই সকল কারণই তাঁহাকে নিজের রচনার মধ্যে নিজেকে বিস্তার করিবার পথে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। কিন্তু কেবল পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনই একজন রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়, ইহা ভগবৎ-কৃপা ও অলৌকিক প্রতিভার অপেক্ষা রাখে। তাই কবি বলিয়াছেন যে "কবিত্ব ও ল্যাজ" ভিতরে না থাকিলে টানাটানি করিয়া তাহাদের বাহির করা যায় না।

কবিতা রচনা চলিতে লাগিল। হোক তাহারা মাত্র উচ্ছ্বাসের আবেগ, হোক তাহারা কল্পনার অপরিস্ফুট প্রতিকৃতি, হোক তাহারা কায়াহীন ছায়ামূর্তি, ভাবের বাহন ভাষার উপর কবির অধিকার স্বতঃই বর্ধিত হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের পারমার্থিক কবিতা শুনিয়া মহর্ষি হাসিয়াছিলেন। ভারতমাতা সম্বন্ধীয় কবিতায় 'নিকটের' সহিত 'শকটের' মিল গুণেন্দ্রনাথ কোনো ক্রমেই মঞ্জুর করিতে না পারিয়া হাসির ঝড়ে কোন্ অজানা পথে সে শকট উড়াইয়া দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতেও কবির রচনা সমান ভাবে চলিতেছিল ও তিনি ক্রমশঃ যে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন তাহার পরিমাণ যে কত তাহা কেহই জানিতে পারেন নাই—যতক্ষণ-না জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের প্রুফ সংশোধনের সময়ে (১৮৭৫ সাল) রবীন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইয়া জহরব্রত পালনের দৃশ্যে জ্যোতিরিন্দ্র-লিখিত গদ্য বক্তৃতার স্থলে একটি গীত সন্নিবেশ করিয়া দৃশ্যটির গাম্ভীর্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছিলেন। গীতটি রবীন্দ্রনাথের অতি অল্প বয়সেই ও অত্যল্প সময়ে রচিত—

জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।

ইহার পর রবিকে জ্যোদা (জ্যোতিদাদা) নিজের দলভুক্ত করিয়া লইলেন। অতঃপর জ্যোদা পিয়ানো বাজাইয়া নিত্যি নূতন ভাঙিয়া নানারকম গৎ প্রস্তুত করিতেন। সেই সময়ে তাঁহার বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনে দুই পার্শ্বে বসিয়া সেই সকল গতের সুরে গান বাঁধিতেন; ইহারই ফলে জ্যোতিরিন্দ্রের,

'মানময়ী' (পরে পুনর্বসন্ত নামে প্রকাশিত) গীতিনাট্যের সৃষ্টি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীও গতের সুরে কতকগুলি গান বাঁধিয়াছিলেন। ইঁহাদের এই গান রচনার পদ্ধতিটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাধারণত আগে গানের কথা রচিত হয়, পরে তাহাতে সুর সংযোগ হয়, ইঁহারা উল্টা দিকে আরম্ভ করিলেন। আগে গৎ বা সুর প্রস্তুত হইত, তারপর সেই সুরের উপযোগী ভাষা রচনা করিয়া গান রচিত হইত। শুনিয়াছি, ইহাই পশ্চিম-ভারতের অনুমোদিত প্রথা।

এইটাই ছিল ঠাকুরবাড়ীতে পরিবর্তনের যুগ। মহর্ষি নিজে স্বাদেশিকতায় অনুপ্রাণিত ছিলেন, কাজেই সকলেই সেই ভাবে ভাবান্বিত হইতেন। মহর্ষি মাতৃভাষারও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নশীল ছিলেন। একবার তাঁহার কোনো আত্মীয় তাঁহাকে ইংরাজিতে পত্র দেওয়ায় মহর্ষি সেই পত্রখানি অপঠিত অবস্থায় ফেরৎ দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—যে কোনো দেশের দুই জন লোক যখন এক জায়গায় জড়ো হয়, উপস্থিত থাকে, তখন তাহারা মাতৃভাষাতেই কথা কয়। স্বজাতীয়কে পত্র লিখিতে প্রত্যেক দেশবাসীই মাতৃভাষা ব্যবহার করে। বাঙালী আত্মীয় বাঙ্গালীকে চিঠি দিবে অবশ্যই বাঙলায় এবং তদানীন্তন পরানুকরণকারী অনেকেই যখন স্বীয় আত্মীয়কে ইংরাজিতে পত্র লিখিতেন, তখন সে সংবাদ পাইলে মহর্ষি দুঃখিত হইতেন। বেশভূষায়, সাহিত্যে, গানে, নাট্যে, চিত্রে, ধর্মে স্বাদেশিকতা ভিত্তি করিয়া সর্বপ্রকারে নানারূপ পরিবর্তন চলিতেছিল। 'ন্যাশন্যাল নবগোপাল' নামে খ্যাত নবগোপাল মিত্র রাজনারায়ণ বসুর পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করিবার নিমিত্ত যে 'চৈত্রমেলা' (পরে নাম হয় হিন্দু মেলা) স্থাপিত করিয়া স্বদেশী শিল্পে নূতন প্রাণ জাগাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, ঠাকুরবাড়ী সর্বতোভাবে তাঁহাকে সহায়তা করিতেছিল। সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের নামের সহিতই 'ন্যাশান্যাল' (জাতীয়) আখ্যা প্রদান করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'ন্যাশন্যাল নবগোপাল' বলিত। আর তিনি পাড়ায় পাড়ায় তরুণদের সংঘবদ্ধ করিয়া জিম্ন্যাসটিক চর্চার আখড়া করিয়াছিলেন ও সর্বদা বক্তৃতায় ব্যায়ামের উপযোগিতা ঘোষণা করিতেন। তাই তাঁহাকে Father of physical culture in Bengal বলিত। বাঙালার কর্তৃত্বে স্ত্রী-পুরুষ মিলিত বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের সাহায্যে তিনি সার্কাসের দল গঠন করেন, সেজন্য তাঁহাকে বাঙালী সার্কাসের প্রবর্তক বলা চলে। তিনি একটি অশ্বশালা রাখিয়া ঘোড়ায় চড়া শিখিবার 'রাইডিং স্কুল' করেন। সেখানে বিলাত যাত্রার পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অশ্বারোহণ অভ্যাস করেন। নবগোপাল পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির লাইসেন্স অফিসাররূপে বহু দিন কার্য করিয়াছিলেন।

এদিকে সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বোম্বাই হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সায়া, শেমিজ, জ্যাকেট প্রভৃতির সাহায্যে বঙ্গ মহিলার বেশভূষার মনোজ্ঞ পরিবর্তন আনয়ন করিতেছিলেন। আবার ওদিকে 'নবনাটকের' অভিনয়ে গুণেন্দ্রনাথ যে ভাবে অভিনেতাদের পোষাক পরাইয়া মঞ্চে অবতীর্ণ করান, সেই ভাবেই পোষাক পরিধানের রেওয়াজ বাঙলায় ক্রমে ক্রমে বাঙালী পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত হইয়া যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দৃশ্যকাব্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। এই রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তন যুগের মাঝখানে আসিয়া পড়ায় তাঁহার অনুভূতি ও শিক্ষা হইতেছিল নানা রকমে। এই সময়ে তাঁহার রচনা শ্রীকৃষ্ণদাস সম্পাদিত 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' এবং বিহারীলালের 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাঁহার গদ্য রচনা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভার সমালোচনা' ও জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রথম বাহির হইয়াছিল। জ্ঞানাঙ্কুরে যে বীণা বাজিয়াছিল তাহা আর বন্ধ হইল না, তাহা মধুরতর হইয়া ঝংকৃত। ইহার পরেই জ্যোতিরিন্দ্রের পরিকল্পনায় দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'ভারতী' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন ইহার লেখকদের এক জন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র ষোলো। ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘনাদবধ সমালোচনা' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ সমালোচকের সহিত একমত না হওয়ায় পাদটীকায় নানাবিধ মন্তব্য করেন। ইহাতেও রবীন্দ্রনাথের অব্যাহতি হয় নাই। যোগেন্দ্রনাথ চূড়ামণি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকায় (ভারতী ও মেঘনাদবধ) প্রতিবাদ ও আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। প্রথম বৎসরে শ্রাবণ ১২৮৪ হইতে ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের দুইটি প্রবন্ধ, বাইশটি কবিতা, ছয়টি সমালোচনা, প্রথম উপন্যাস 'করুণার' কিয়দংশ, 'ভিখারিণী' নামক বড় গল্প ও "কবিকাহিনী" কাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ঐ পত্রিকার "সম্পাদকীয় বৈঠক"-এ তাঁহার অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়। কবির পুস্তকাকারে মুদ্রিত প্রথম রচনা সম্বন্ধে কেহ বলেন 'কাল মৃগয়া' গীতিনাট্য, কেহ বলেন 'বনফুল' কাব্য উপন্যাস, কিন্তু কবি নিজে বলিতেন যে যখন তিনি আমেদাবাদে তাঁহার মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের নিকট ছিলেন, তখন তাঁহার বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রথম বৎসরের ভারতী হইতে "কবিকাহিনী" পুনর্মুদ্রিত করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ইহা ১২৮৫ সালের কথা। পুস্তকাকারে মুদ্রিত ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা। ইহার পূর্বে কবির "ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ" কবিতা চৈত্রমেলার প্রকাশ্য সভায় তাঁহার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত হয় এবং চৈত্রমেলার উপহাররূপে আর একটি লম্বা কবিতা তাঁহার নামে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়। কবির প্রথম উপন্যাস 'করুণা' কোনো দিন সম্পূর্ণ না হওয়ায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। দ্বিতীয় পুস্তক 'বনফুল' ১২৮৬ সালে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' (রাজসাহী) হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া তাঁহার অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণে জানে, সোমেন্দ্র বিকৃত-মস্তিষ্ক ছিলেন কিন্তু তিনি নিজেও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার একটি গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

ললিত আড়াঠেকা

দেখিতে তরঙ্গময় ভব পারাবার
তরঙ্গ সে কিছু নয় আতঙ্কই সার।
অসীমের ভাব যত হৃদয়ে আনিবে তত
ক্ষুদ্র তৃণটির মত দেখিবে সংসার।
কম ঝড় বয়ে যাবে হৃদয় অটল রবে
কি ভয় কি ভয় তবে?
অতিক্রমি দুঃখ-শোকে অনন্ত অনন্ত লোকে
নিরখিবে অনন্তের মহিমা অপার।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সাহিত্য ভাবধারার মধ্যে বর্ধিত হইয়া ও সর্বকনিষ্ঠ বলিয়া স্নেহাভিষিক্ত থাকায় তাঁহার সাহিত্য-জীবনের প্রথম উন্মেষ ও কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহার রচনাবলীকে এক প্রকার পারিবারিক সাহিত্য বলা চলিতে পারে। এই প্রতিভা বিকাশের দ্বিতীয় স্তর পরে দেখানো হইতেছে। [ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জরাসন্ধ

ক'দিন পরে সকালের ডাক দেখতে গিয়ে একটু আশ্চর্যই হলেন তালুকদার। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র তাঁর বড় একটা থাকে না। আজ একেবারে একসঙ্গে দু'খানা। একখানা লিখেছেন দেবতোষ—কোলকাতায় এসে আস্তানা নিয়েছি। ক'দিনের মধ্যেই দাক্ষিণাত্য অভিযান সুরু করবো, এই রকম সদিচ্ছা আছে। শুধু পুরী ওয়ালটেয়ার নয়, মাদ্রাজ, মহাবলীপুরম পক্ষিতীর্থম, চাই কি রামেশ্বরম পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারি, মা-ও হয়তো সঙ্গে যাবেন। অর্থাৎ দস্তুরমত তীর্থ পরিক্রমা। কবে ফিরবো, জানি না। মা আপনার কথা প্রায়ই বলেন··ইত্যাদি। দ্বিতীয় চিঠিখানা পড়ে চিন্তার ছায়া পড়ল মহেশের মুখে। খানিকক্ষণ কী ভাবলেন। তার পর প্যাড টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন।

দিন চারেক পরে সকালের দিকে ওদের বাসায় যখন পৌছলেন তালুকদার, দেবতোষ ঘরেই ছিলেন। বেরিয়ে এসে বললেন, ব্যাপারটা কি বলুন তো দাদা! পর পর দু'খানা চিঠি! তালুকদার বললেন, একখানায় ভরসা হল না। যদি হঠাৎ ফস্কে যায়? একটা জরুরী কাজে বেরোতে হবে তোমাকে নিয়ে। তোমার তীর্থযাত্রা হয়তো দু-চারদিন পেছিয়ে যেতে পারে।

দেবতোষ কিছু বলবার আগেই সুলোচনা এসে পড়লেন। এইমাত্র পুজার ঘর থেকে বেরিয়েছেন। শান্ত সমাহিত মুখখানার উপর একটি শুচিশুভ্র তন্ময়তা তখনো যেন লেগে রয়েছে। মহেশ উঠে গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন, বসো বাবা, আগে তোমার খাবারটা নিয়ে আসি। আমি সব গুছিয়ে রেখেছি। দেরি হবে না। তালুকদার বললেন, খাবারটা এখন থাক মা! ওটা বরং ফিরে এসে ধীরে-সুস্থে হবে। তার আগে, অনুমতি করেন তো আপনার এই ছেলেটিকে একটু খাটিয়ে নিয়ে আসি।

—সেজন্যে আবার অনুমতি কিসের বাবা? তুমি বড় ভাই; দরকার হলে ওর কান ধরে নিয়ে যাবে। আমাকে বলতে হবে কেন?

দেবতোষ গম্ভীর ভাবে বললেন, ধরতে হলে বাঁ কানটা ধরবেন, দাদা!

—কেন, ডানটা কি অপরাধ করল?

—ওটা মা আর নিতাই পণ্ডিত মশাই দু'জনে মিলে এত টেনেছেন যে আঠারো বছরেও তার ব্যথা মরেনি।

মিলিত হাসির শব্দে ঘর ভরে গেল।

বেরোবার মুখে সুলোচনা বললেন, তুমি কোথায় উঠেছ, মহেশ?

প্রশ্নটার তাৎপর্য বুঝতে পেরে তালুকদার বললেন, যেখানেই উঠি, দুপুরবেলা মায়ের প্রসাদ পেয়ে তবে যাবো। সেজন্যে ভাববেন না।

সুলোচনা খুসী হয়ে বললেন, কিন্তু ফিরতে যেন অনেক দেরি করে ফেলো না।

পথে আর বিশেষ কোনো কথা হল না। শিয়ালদ ষ্টেশনে রেলে চড়ে ওরা নামলেন এসে বেলঘরিয়ায়। সেখান থেকে রিক্স নিয়ে খানিক বাদে গলির মধ্যে একটা একতলা বাড়ির সামনে গিয়ে কড়া নাড়লেন। খুলে দিল একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের বিধবা মেয়ে। ওঁরা ভিতরে ঢুকতেই প্রণাম করে মহেশের পায়ের ধুলো নিল। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছে শাস্তি?

—জ্বরটা একভাবেই চলছে।

—চলো, দেখে আসি।

পাশেই একখানা ছোট ঘর। তক্তপোষের উপর একটি মেয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছে। বয়স বোধ হয় সাতাশ, আটাশ। রোগজীর্ণ শীর্ণ দেহ। মাথার কাছে বসে একটি অল্পবয়সী মেয়ে আস্তে আস্তে হাওয়া করছে। পায়ের দিকটায় একখানা টুলের উপর বসে একজন বর্ষীয়সী। মহেশ বাবুকে দেখে দু'জনেই উঠে দাঁড়াল এবং ছোট মেয়েটি এগিয়ে এসে প্রণাম করল। ডাক্তার রুগীর দিকে তাকিয়েছিলেন; মহেশ ইংরাজিতে বললেন, এই মেয়েটির চিকিৎসার ভার তোমাকে নিতে হবে, দেবতোষ! এই জন্যেই তোমাকে নিয়ে আসা। কই, উমা কোথায় গেল?

—এই যে, যাই, বলে এগিয়ে এল সেই বিধবা মেয়েটি।

তালুকদার বললেন, ইনি ডাক্তার। যা জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করেন, সব বুঝিয়ে দাও। এখন থেকে উনিই ওকে দেখবেন। তুমি তা হলে যা দেখবার দেখে নাও দেবতোষ! তার পর কথা হবে। আমি ওদিকে আছি।

রোগিণীকে মোটামুটি পরীক্ষা করবার পর ডাক্তারকে ভিতরের দিকের বারান্দায় মহেশ বাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। একটা মোড়ার উপর তিনি বসে আছেন, আর তাঁর সামনে দেয়ালের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সাত-আটটি নানা বয়সের মেয়ে। সকলের

পরনেই মোটা তাঁতের সাড়ি, আর তাঁতে-বোনা ছিটের তৈরি জামা। পাশে একটা খালি মোড়া পড়েছিল। তার উপর দেবতোষকে বসতে বলে মহেশ প্রশ্ন করলেন, কেমন দেখলে তোমার রুগী?

—টাইফয়েড বলেই মনে হচ্ছে। একটা শ্লাইড না নিয়ে ঠিক বলতে পারছিনে। আগে জানলে ও সব সরঞ্জাম নিয়েই বেরোনো যেত।

—আমার কি সে সব খেয়াল ছিল?

উমা বলল, আমাদের ডাক্তার বাবুকে খবর দিলে রক্ত নেবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন।

—তিনি এখনো রক্ত নেননি? একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো দেবতোষ।

—না। বলে গেছেন, অন্য ডাক্তার এসে রক্ত নিতে চাইলে, যা কিছু দরকার পাঠিয়ে দেবেন।

তালুকদার বললেন, তিনি হচ্ছেন হোমিও। তোমাদের এই সব রক্তারক্তির মধ্যে নেই।

—তিনিই বুঝি দেখছিলেন? জানতে চাইলেন দেবতোষ। তালুকদার বললেন, হ্যাঁ। তাঁর ওষুধে বিশেষ কাজ হল না দেখে ছেড়ে দিয়েছেন। সেই খবর পেয়েই তো তোমাকে নিয়ে এলাম।

হোমিও ডাক্তারকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হল। তালুকদার বললেন, ততক্ষণ চল, তোমাকে সবটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

বারান্দার কোলে উঠোন। তার ধার ঘেঁসে একখানা লম্বা ধরণের টিনের চালা। এক দিকে খান চারেক তাঁত আর তার সরঞ্জাম, আর এক দিকে দুটো সেলাই-এর কল। কোণের দিকে উল বোনার সরঞ্জাম। তাঁতগুলোতে টানা চড়ানো। তোয়ালে, গামছা বিছানার চাদর, আর একটাতে মনে হল সাড়ী। মেসিন দু'টোতে আটকে আছে আধ-সেলাই জামা। দেখে বোঝা যায় সব গুলোতেই কাজ চলছিল। যারা করছিল, এই মাত্র উঠে গেছে। পাঁচিলের ধারে একটা ছোট চালায় দুটো ঢেঁকি। একটাতে ধান ভানা হচ্ছে। তার সামনে গোবর-নিকানো আঙ্গিনায় বসে একটি বুড়ী ডালের বড়ি দিচ্ছে। চোখে ভালো দেখতে পায় না। একটি মেয়ে কানে কানে কী বলতেই আনন্দে কলরব করে উঠল, কৈ, কৈ, আমার বাবা কোথায়? আহা কত দিন দেখিনি। মেয়েটি আবার ফিস-ফিস করে কি বলল। বুড়ী খুসী হয়ে ঝুঁকে পড়ল আগের কাজে।

খিড়কির দরজা পার হয়ে ওঁরা পড়লেন গিয়ে বাগানে। কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা বিঘে তিনেক জমি। ছোট ছোট প্লট করে শাক-সবজির চাষ হচ্ছে। বেগুন কুমড়ো, লাউ-এর মাচা। একখানা ক্ষেতে দুটি মেয়ে পুঁই-এর চারা লাগাচ্ছে।

তালুকদার চলতে চলতে দু-একটা কথা বলছিলেন। দেবতোষ শুধু দেখছিলেন বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখ মেলে। বারান্দায় ফিরে এসে বসতেই উমা একখানা থালার উপর দু' গেলাস ডাবের জল নিয়ে ধরল ওঁদের সামনে।

তালুকদার বললেন, তোমাদের নতুন গাছের ডাব বুঝি?

—হ্যাঁ এই প্রথম পাড়া হল।

—কা'কে দিয়ে পাড়ালে?

উমা জবাব দিল না। দেবতোষ লক্ষ্য করলেন, সলজ্জ হাসিতে তার মুখখানা ভরে উঠেছে। বোঝা গেল, কাজটি সে নিজেই করেছে, কিংবা ওর মত কাউকে দিয়ে করিয়েছে। যে মেয়েটি রুগীর মাথায় হাওয়া করছিল বেরিয়ে এসে বলল, শান্তিদি' আপনাকে একবার ডাকছে, কাকাবাবু।

তালুকদার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, চল যাচ্ছি।

ওঁরা দুজনেই উঠে এলেন। কাছে এসে দাঁড়াতেই কম্পিত হাতখানা ধীরে ধীরে খাটের পাশ দিয়ে নামিয়ে দিল শান্তি। মহেশ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, থাক থাক। অসুখের মধ্যে কি প্রণাম করতে আছে? আমি এমনই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো।

শান্তি ক্ষীণ কণ্ঠে থেমে থেমে বলল, আমি আর বাঁচবো না, কাকাবাবু!

—পাগল! তাহলে এদের দেখবে কে? এই তো ডাক্তার বলছেন, ভয় পাবার মত কিছুই হয়নি। শুধু অতিরিক্ত খেটে আর অনিয়ম করে করে এই অসুখ ডেকে এনেছ।

শান্তি ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাল। অতি কষ্টে হাতখানা কপালে ঠেকিয়ে কী একটা বলতে গেল। দেবতোষ এগিয়ে এসে হাতটা ধরে ফেলে বললেন, থাক আর কথা বলবেন না। নিয়মিত ওষুধ পত্তর খেলে ক'দিনেই আপনি ভালো হয়ে যাবেন।

শান্তির চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে উঠল।

ফিরবার পথে পাশাপাশি বিস্ময় বসে দু'জনেই অনেকক্ষণ নিজের নিজের চিন্তায় ডুবে রইলেন। ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে প্রথম মৌন ভঙ্গ করলেন তালুকদার। বললেন, মেয়েটাকে টেনে তুলতে সময় লাগবে। কি বল?

—তাইতো মনে হচ্ছে।

—তাহলে? তোমার তীর্থ যে সিকেয় উঠল।

দেবতোষ হেসে উঠলেন।

—ও কি, হাসলে যে?

—হাসবার কথা যে, দাদা! এত দিন কোনো কাজেই তো আপনার লাগিনি। কখনো লাগতে পারি, সে আশাও কোনো কালে ছিল না। আজ যদি হঠাৎ সে সুযোগ এসে থাকে, তার চেয়ে তীর্থের নাম করে টো-টো করে ঘোরাটাই কি আমার বড় হল?

—শুধু তোমার কথা নয়, মার কথাও ভাবছি।

—মা তো যাচ্ছিলেন শুধু আমাকে আগলাবার জন্যে।

—কি রকম?

—কি জানি? ওঁর হঠাৎ মনে হল আমাকে এবার কাছে কাছে রাখা দরকার।

মহেশ ওঁর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ডাক্তার মৃদু হেসে বললেন, আমার যে একটা কাজ জুটে গেল, এতে বোধ হয় উনি খুশীই হবেন। আমাকে নিয়ে আজ-কাল ওঁর বেজায় ভাবনা বলে জোরে হেসে উঠলেন।

তালুকদার যোগ দিলেন না। চিন্তিত মুখে মাথা নেড়ে বললেন হুঁ।

রেলের কামরায় একদম ভিড় নেই। দু' জনে আবার গিয়ে বসলেন পাশাপাশি। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ক'দিন আছেন তো?

—কেন? আর থাকবার দরকারটা কি?

—আমার দিক থেকে কোনো দরকার নেই। পেশাণ্ট আমি একলাই সামলাতে পারবো। Blood reportটা যদি আজ সন্ধ্যার মধ্যে পাওয়া যায়, কাল সকালেই আবার যেতে হবে। আশ্রমের নাম-টাম তো দেখলাম না। বাড়িটা আবার চিনতে পারবো তো?

—আশ্রম কা'কে বলছ?

—তবে কী দেখে এলাম? হোম-টোম জাতীয় কিছু? ইংরেজিতে যাকে হোম বলে, 'আশ্রম' হল তারই বাংলা নাম।

—না হোমও নয়, আশ্রমও নয়! বলতে পার আশ্রয়। ওরা সব Ex-Convicts.

—Ex-Convicts! ডাক্তারের চোখ দু'টো বিস্ময়ে বিস্তৃত হল।

—হ্যাঁ। তোমার আমার মত ভদ্রঘরেই ওদের জন্ম। সেইখানেই মানুষ। তার পর একদিন ছিটকে এসে পড়ল জেলখানায়। কিন্তু জান তো, আমাদের দেশে যারা মেয়েমানুষ হয়ে জন্মায়, তারা যদি কোনো কারণে এক বার ঘরের বাইরে এসে পড়ে, সে আর ফিরে যেতে পারে না। বেরোবার রাস্তা আছে, ঢুকবার দরজা নেই। ওরাও তাই আর ঘরে ফিরতে পারেনি। যে গিয়েছিল সেও জায়গা পায়নি। এমনি আরো কত আছে! কে তার খোঁজ রাখে?

শেষের ক'টি কথায় কেমন একটা উদাস স্বর লেগে রইল। গাড়ীর বাইরে রৌদ্রদীপ্ত মাঠের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন তালুকদার। ডাক্তার একটু ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললেন, এদের কথা তো কোনো দিন বলেন নি, দাদা!

—তেমন কোনো উপলক্ষ হয়নি। আর, বলবার মত আছেই বা কী? তবে এবার যখন তোমাকে এর মধ্যে আসতে হল, তখন শুনবে বৈ কি? সব কথাই বলবো।

তালুকদার যে মেসটাতে উঠেছিলেন, দেবতোষ নিজে গিয়ে সেখান থেকে ওঁর বিছানা আর সুটকেসটা নিয়ে এলেন। কোনো আপত্তি শুনলেন না। দোতলার বারান্দায় একটি সস্ত পাটি-ভাঙা সতরঞ্চি বিছিয়ে রেখেছিলেন সুলোচনা। তার উপরে দু'টি ঝালর দেওয়া তাকিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জনে সেখানে আশ্রয় নিলেন। ডাক্তার হঠাৎ বলে উঠলেন, এঃ, মস্ত ভুল হয়ে গেছে দাদা! আপনার সিগারেট তো আনা হয়নি?

তালুকদার পকেটে হাত দিয়ে বললেন, তোমার ভরসা করে তো আসিনি, যে ভয় দেখাচ্ছ! আমার সম্বল আমার সাথেই থাকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ধোঁয়ার রস তো পেলে না, ভায়া! এ যে কী বস্তু, জানবে কেমন করে?···বলে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। ডাক্তার কী একটা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। তাঁর মনে হল সেই রিংগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে যেন তারই মধ্যে উনি নিবিষ্ট হয়ে গেছেন। এমনি করে কেটে গেল অনেকক্ষণ। তারপর গলাটা এক বার পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন তালুকদার, আজ থেকে তের বছর আগেকার কথা। নতুন প্রমোশন পেয়েছি—ডেপুটি থেকে পুরোপুরি জেলর। ছোটখাটো একটা জায়গায় থাকতে পারে, এই আশাই করেছিলাম। হঠাৎ দুম্ করে বদলি করে দিল একটা মস্ত বড় ফার্স্ট ক্লাস ডিষ্ট্রিক্ট জেলে, সেখানে ঝঞ্ঝাট লেগেই আছে। বড় দায়িত্ব পেলাম। সরকারের উপর কৃতজ্ঞ হবার কথা। কিন্তু আমার হল প্রাণান্ত। সারা দিনরাত খেটে কূল পাই না। যখন বাসায় ফিরি, দেহে সাড় নেই, মন থাকে খিচড়ে। ঘরে মীরা একা। তার সঙ্গে কোন দিন দু'একটা কথা হয়, কোনো দিন হয় না। ছেলে দুটো ছোট ছোট। তাদের সঙ্গে দেখাই হয় না। বাইরে স্বস্তি নেই, ঘরে শান্তি নেই। এমনি করে দিন যায়। এমন সময় এক দিন জেলে একটি নতুন কয়েদীর আমদানি হল। মেয়েমানুষ। কিন্তু গেটে এসে যখন দাঁড়াল, মনে হল এক ঝলক জ্বলন্ত আগুন। আগুনের অনেক রূপ। কখনো সে তুলসীতলার সন্ধ্যাদীপ, কখনো দেওয়ালির আলোকমালা, কখনো আবার সর্বগ্রাসী দাবানল। মেয়েমানুষের রূপটাও বোধ হয় অগ্নিধর্মী। কেউ মঙ্গল-প্রদীপ, কেউ আলেয়া কেউ বা প্রলয়ের মশাল। এই মেয়েটাকে বোধ হয় শেষের দলে ফেলা চলে। নাম কল্যাণী। কিন্তু ঘরে বাইরে অকল্যাণ ছাড়া আর কিছুই সে দিয়ে যায়নি। সে দোষ অবিশ্যি তার নয়। দোষ যদি কারো হয়ে থাকে, সে তার বিধাতার, যিনি সেই হতভাগীর সর্বাঙ্গে অসহ্য রূপের শিখা জ্বালিয়ে এমন ঘরে এমন পরিবেশে তাকে পাঠিয়ে দিলেন; যেখানে ঐটাই হল তার অভিশাপ। কে জানে এটা তাঁর খেয়াল না কৌতুক!

নিতান্ত পাড়াগাঁয়ে গরীবের ঘরে জন্ম। তার এক প্রতিবেশীর কাছে শুনেছি, বছর দশেক বয়স হতেই ওর বাপ-মা ওর ঘরের বাইরে যাওয়া বারণ করে দিলেন। তাকে দেখলেই নাকি পাড়ার ছেলে-বুড়োর মাথা ঘুরে যেত। তার পর সুরু হল বিয়ের চেষ্টা। ভালো ঘর জুটবে কী? যারাই দেখতে আসে ভয় পেয়ে যায় ঐ রূপ দেখে। পাড়ার গিন্নীরা বলাবলি করতেন, মেয়েমানুষের অত রূপ ভালো নয়। ওদের কপালে দুঃখ আছে। কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। এক জন ইংরেজ কবি পৃথিবী-শুদ্ধ সুন্দরী নারীদের সম্বন্ধে ঐ রকম একটা মন্তব্য করে গেছেন। যাক সে কথা। শেষ পর্যন্ত কল্যাণীর বর জুটল। অনেক দূরে ঐ রকম এক পাড়াগাঁয়ে। কনের বয়স পনেরো ষোলো। বর তিরিশ-বত্রিশ। গ্রামের হাটখোলায় একটা মুদি দোকান আগলায়, কোনো রকমে সংসার চলে।

বিয়ের পরে দেখা গেল, বর বেচারা দোকান ফেলে বাড়িতেই ঘুর-ঘুর করছে। অভিভাবকেরা প্রমাদ গণলেন। পাড়ার দু'-চারজন মুরুব্বি গোছের লোক পরামর্শ দিলেন, ছেলেকে বিদেশে পাঠাও চাকরি করতে। তাদের গায়ে আগুনের আঁচ লেগেছিল। মতকুমা সহরে চাকরিও একটা জুটিয়ে দিলেন তাদের মধ্যে কে এক জন। তার পর সুরু হল নানা রকম পতঙ্গের আনাগোনা। বৌ পুকুরে নাইতে গেলে সেখানে ছিপ ফেলবার হিড়িক পড়ে; মন্দিরে গেলে সেদিন গ্রামশুদ্ধ লোকের ভক্তি উথলে ওঠে। অন্ধকার রাতে ঘরের পেছনে পায়ের শব্দ পাওয়া যায়; বাসন মাজতে গেলে গায়ে এসে পড়ে উড়ো চিঠি। শ্বশুর-শাশুড়ী জানতে পারলেন, এবং সব কিছুর জন্যে বৌকেই দায়ী হতে হল। স্বামী বেচারা মাঝে মাঝে আসে। শোনে সবই। কিন্তু সে নিরুপায়। কোন এক মুরুব্বির কাছে পাড়তে গিয়েছিল কথাটা। ধমক খেয়ে চলে গেল চাকরিস্থলে।

এদিকে যত দিন যায়, বৌএর দিকে আর তাকানো যায় না। পেট ভরে ডাল-ভাতও জোটে না, তবু ফেঁপে-ফুলে উঠছে স্বাস্থ্যের জোয়ার। একটি শিশু যদি আসত ওর কোলে, হয়তো ওরই মধ্যে দেখা দিত একটুখানি ভাঁটার টান। কিন্তু তার কোনো

লক্ষণ নেই। পতঙ্গের দল বেড়েই চলেছে। তারই মধ্যে একটি একেবারে সোজাসুজি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে বসল। অর্থাৎ গভীর রাতে ঝাঁপের বেড়া কেটে ঢুকে পড়ল ওর শোবার ঘরে। গায়ে হাত দিতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠল না, চেঁচামিচি করে লোক জড়ো করবার চেষ্টাও করল না। বালিশের নিচে থাকত একটা ধারালো কাটারি। আস্তে আস্তে উঠে অন্ধকারে বসিয়ে দিল কোপ। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার আর একটা ভারী জিনিষ পড়ে যাবার শব্দ। এই টুকুই তার মনে আছে। তার পর কী হল সে জানে না। জানাবার মত অবস্থা যখন হল, চোখ খুলতেই দেখল বরোন্দার এক কোণে পড়ে আছে, জব জব করছে চুলের বোঝা, আর চারদিকে গিজগিজ করছে লোক। ধড়মড় করে উঠে বসতেই চোখে পড়ল উঠোনের এক কোণে পড়ে আছে একটা লাশ। কাঁধের আদ্ধেকটা নেমে গেছে, গলাটা ঝুলে পড়েছে এক পাশে, তবু চিনতে কষ্ট হল না। প্রবীণ ব্যক্তি, গ্রাম্য সম্পর্কে ভাসুর হন কল্যাণীর।

তার পর যা হয়ে থাকে। থানা, পুলিশ, উকিল মোক্তার, হাকিম, আদালত, শেষ পর্যন্ত আমার জেলখানা। দেবতোষ আপত্তি জানালেন কিন্তু এ কেস্-এ তো তার জেল হবার কথা নয়। সে যে মেয়ে; খুন যদি করে থাকে আত্মরক্ষার জন্যেই করেছে।

তালুকদার বললেন, তুমি তো বলছ আত্মরক্ষা, সাক্ষীরা তা বলল কই? গ্রামের সব মাতব্বর ব্যক্তিরা দল বেঁধে হলপ করে বলে এল, মেয়েটার চরিত্র খারাপ। নিয়মিত খদ্দের ছিল জন কতক; ভাসুর ছিলেন পথের কাঁটা, তাই তাদেরই একজনের সঙ্গে সড় করে বেচারাকে ডাকিয়ে এনে খুন করেছে। হাকিমও বোধ হয় আগুন দেখে ভড়কে গিয়েছিলেন। তাই ছেড়েও দিলেন না, ফাঁসি দ্বীপান্তরও দিলেন না। ৩২৬ ধারায় দু'বছর জেল দিয়ে শ্যাম আর কুল দুটোই বজায় রাখলেন।

জেলে আসবার পরদিন সে নিজে থেকেই ঢুকে গেল ঢেঁকিশালে। ভদ্রঘরের রূপসী তরুণী; সেলাই টেলাই গোছের একটা নরম কাজ দিতে চেয়েছিলাম। রাজী হল না। বলে বসল, ও সব করতে গেলে গতর থাকবে কেন? ফিরে গিয়ে আবার তো সেই ঢেঁকিই ধরতে হবে। কিন্তু জেল থেকে ফিরবার পর ঢেঁকি-ঘরটাও যে খালি পাওয়া যায় না, সে কথা তখনো জানতে পারেনি কল্যাণী।

যত দিন জেলে ছিল, খোঁজ-খবর কেউ নেয়নি। চিঠিও দেয়নি, দেখা করতেও আসেনি। যেদিন খালাস হল, খোরাকী, পথখরচ আর ক্লড মার্টিন ফাণ্ড থেকে সামান্য কিছু বখসিস দিয়ে একটি মেয়েছেলের সঙ্গে ওকে শ্বশুরবাড়িতেই পাঠিয়ে দিলাম। এসকর্ট ওকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে এল।

তার দিন তিনেক পর রাত এগারোটার সময় বাড়ি ফিরছি। দেখলাম সদর দরজার পাশে অন্ধকারে কে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম কে? মাথা তুলে বলল, আমি কল্যাণী।

—তুমি এখানে?

—কোথায় যাবো! ওরা ঘরে নিল না, মেরে-ধরে তাড়িয়ে দিল।

—বাপের বাড়ি গিয়েছিলে?

—গিয়েছিলাম। মা নেই; বাবা রাখতে চাইলেন না।

তার পর যা বলল, তার মানে, আশ্রয় দিতে রাজী ছিল অনেকেই, পীড়াপীড়িও করেছিল কেউ কেউ। কিন্তু সে যে কী আশ্রয় সেটা বুঝতে পেরে সেখানে আর দাঁড়ায়নি।

ওকে নীচে বসতে বলে উপরে গেলাম। মীরা ক'দিন থেকে জ্বরে ভুগছিল। সেই দিনই দুটো পথ্য পেয়েছে। ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল। আবার নেমে এলাম। চাকরটাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম হাঁড়িতে সামান্য কিছু ভাত-তরকারী পড়ে আছে। তাই বেড়ে দিতে বললাম। কল্যাণী যেন তৈরি হয়েই ছিল। বলবার অপেক্ষাও রাখল না। খাওয়ার ধরণ দেখে চাকরটারও বুঝতে অসুবিধা হল না যে অন্ততঃ দু'দিন কোথাও কিছু জোটেনি। তার পর চাকরকে সিপাইদের গারদে শুতে পাঠিয়ে, তারই ঘরে ওর শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে সদর বন্ধ করে উপরে উঠে গেলাম।

পরদিন সকালে উঠেই মীরাকে সব খুলে বললাম। সে খানিকটা চুপ করে থেকে শুধু বলল, আমাকে এক বার ডাকলেই পারতে।

বললাম, বড্ড ঘুমোচ্ছিলে, তাই আর ডাকাডাকি করিনি।

নিচে এসে দেখলাম কল্যাণী এরই মধ্যে স্নান সেরে এক রাশ ভিজে চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে মহা উৎসাহে কাজে লেগে গেছে, যেন এ বাড়িতে সে নতুন আসে নি; এটাই তার নিজের সংসার। আমাকে দেখে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল একটু দাঁড়ান, দাদা! অর্থাৎ সম্বন্ধও একটা পাতিয়ে ফেলেছে রাতারাতি। আমি ফিরে দাঁড়াতেই এগিয়ে এসে প্রণাম করল। বললাম, কী হল? হঠাৎ প্রণাম করছ যে? তেমনি মাটির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আপনি যে ক'টা টাকা দিয়েছিলেন, তাই দিয়ে একখানা কাপড় কিনেছি। নতুন কাপড় পরে গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়।

এবার নজরে পড়ল, তার পরনে একখানা লালপেড়ে নতুন সাড়ী। বললাম, তা তো বুঝলাম। কিন্তু এ-সব কী করছ তুমি?

—কী সব! বলে মুখ তুলে তাকাল।

রান্নাঘরের চেহারা একেবারে বদলে গিয়েছিল। সেই দিকটায় আঙুল দেখালাম। কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল, বাঃ, আমি থাকতে ও রাঁধবে কেন? ব্যাটাছেলে রান্নার কী জানে! "ব্যাটা-ছেলে," মানে আমার চাকরটি দেখলাম বেজায় খুসী। নিজের অধিকার সানন্দে ছেড়ে দিয়ে দিদিমণির ফাইফরমাজ খাটতেই ব্যস্ত।

কল্যাণী বলে উঠল, বৌদি কোথায়, দাদা? শুনলাম, তাঁর অসুখ। ওপরে যেতে পারি? আর কেউ নেই তো? চাকরকে দিয়েই ওকে উপরে পাঠিয়ে দিলাম! তার আগে ওর স্বামীর আর বাপের ঠিকানাটা জেনে নিলাম। ও হেসে বলল, ঠিকানা দিয়ে কী হবে? চিঠি লিখবেন তো? ওরা কেউ আসবে না।

দু'দিনও লাগল না। আমার সংসারের সব ভার চলে গেল কল্যাণীর হাতে। এমন অনায়াসে যে আমরা কেউ জানতে পারলাম না। ছেলে দুটোকে শিখিয়ে দিল, আমি তোমাদের পিসী। এক দিনের মধ্যে তারা ওর ন্যাওটা হয়ে গেল। তাদের খাওয়ানো পরানো, ইস্কুলে পাঠানো, মীরার সেবা-যত্ন ওষুধ-পথ্য, তার উপরে রান্নাবান্না—সারা দিন যেন চরকির মত ঘুরছে। এ বার উপর থেকে নিচে, আবার নিচে থেকে উপরে। দিনে-রাত

দুবেলাই আমার ফিরতে দেরি হয়। মীরাকে তার আগেই খাইয়ে দেয়। কোনো আপত্তি শোনে না। তার পর আমি এলে থালা সাজিয়ে ধরে দেয়, পাখা নিয়ে সামনে বসে। কোন জিনিষ ফেলে রাখবার উপায় নেই।

কিন্তু আগুন চাপা থাকে না। তাকে বেঁধেও রাখা যায় না। পতঙ্গ মহলে সাড়া পড়ে গেল। এবার পুরুষ নয়, এক ধরণের স্ত্রী-পতঙ্গ। যে সব শুভাকাঙ্খিনী প্রতিবেশিনীর দল নিতান্ত দুঃসময়েও কোনো দিন দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ান নি, তাঁরা এসে যখন তখন ভিড় করতে লাগলেন। আমার রুগ্না স্ত্রীর জন্যে তাদের দরদ উথলে উঠল। কত উপদেশ, কত শাস্ত্রবচন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উপলক্ষ্য ঐ একটি। একদিন বিকেলে আফিসে বেরোচ্ছি, মীরার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কানে এল, একজন বর্ষীয়সী মহিলা বিনিয়ে বিনিয়ে বলছেন, জান তো মা, ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলে প্রলয় ঘটতে কতক্ষণ! এখন শক্ত না হলে পরে আর কেঁদেও কূল পাবে না।

সব শুনলাম, সব দেখলাম. মীরার মুখে হাসি নেই, চোখে কিসের যেন ছায়া। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। ওষুধ, পথ্য যত্ন আত্তি, কোনো কাজে লাগছে না। এদিকে কল্যাণীর কথাই ঠিক হল। তার পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল কোনো দিক থেকেই কেউ উচ্চবাচ্য করল না। যে-সব রেসকু-হোম বা অবলা আশ্রম-টাশ্রমের খোঁজ-খবর সংগ্রহ করেছিলাম, বার বার লেখালেখি করেও কারও কাছ থেকে সাড়া পাওয়া গেল না। কল্যাণীর মামলা চলবার সময় একজন স্থানীয় সাপ্তাহিক কাগজের তরুণ সম্পাদক তার বীরত্বের প্রশংসা করে তিন-কলম জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার শরণ নিলাম। তিনি একবার ওকে দেখতে চাইলেন, সাংবাদিক পরিভাষায় যার নাম ইনটারভিউ। উদ্দেশ্য বোধ হয় যাচাই করা, কল্পনার বীরাঙ্গনার সঙ্গে বাস্তবের মিল কতখানি! কল্যাণীর সঙ্গে সম্পাদক মশায়ের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলাম। তার পর তিনি এত ঘন ঘন সাক্ষাৎ প্রার্থনা শুরু করলেন যে কল্যাণীকে আর তার সামনে বেরোতে রাজী করানো গেল না।

মীরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত ওর কোনো ব্যবস্থা হল কিনা। কিছু দিন থেকে প্রশ্নটা বড় ঘন ঘন আসতে লাগল। একদিন সবে আফিস থেকে ফিরে কাপড় ছাড়ছি। শুকনো মুখে এসে বলল, 'কল্যাণীর কিছু করতে পারলে? আফিসের কতগুলো ব্যাপারে মনটা তিক্ত হয়েছিল। কড়া জবাব বেরিয়ে গেল মুখ থেকে, দেখছই তো কোনো চেষ্টাই বাকী রাখছি না। একটা জায়গা টায়গা না পেলে ঘাড় ধরে রাস্তায় তো বের করে দেওয়া যায় না?

মীরা ক্লান্ত চোখ তুলে শুধু একবার তাকাল। তারপর নিঃশব্দে চলে গেল নিজের ঘরে।

এরই কয়েক দিন পরের ঘটনা। বরাবর নিয়ম ছিল আমার রাতের খাবারটা উপরে আমার শোবার ঘরে ঢাকা দেওয়া থাকত। বাড়ি ফিরবার পর, সুস্থ থাকলে মীরা এসে থালা-বাটিগুলো গুছিয়ে টুছিয়ে দিত, আর অসুস্থ থাকলে আমি নিজেই নিয়ে থুয়ে খেয়ে নিতাম। কল্যাণী এসে সব উল্টে দিল। অপেক্ষা করে থাকত, কখন আমি ফিরি। আর ঠিক তখনই ওর কড়ায় ঘি পড়ত এবং লুচি ছাড়ার শব্দ পেতাম। অন্য সব উপকরণ আগে থেকেই সাজিয়ে রাখত। আমার হাত-পা ধোওয়া শেষ হতে না হতেই দেখতাম থালা নিয়ে উপরে উঠে আসছে। অনেক দিন আপত্তি জানিয়ে বলেছি, খাবারটা এখানে রেখে দিয়ে তোমরা খেয়ে নিলেই পার। কষ্ট করে বসে থাকবার দরকার কি? লুচিগুলোও তো আগেই ভেজে রাখা চলে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিত, না, তা চলে না। থালাটা আসনের সামনে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলত, আপনি তো জানেন, এতে আমার কষ্ট হয় না। এক কথা আর কত বার বলবো?

নিষ্ফল জেনে ও নিয়ে আর কথা-কাটাকাটি করিনি। ঐ ব্যবস্থাই মেনে নিয়েছিলাম। সেদিনও নিঃশব্দে খেয়ে নিচ্ছিলাম। রাত এগারটা বেজে গেছে। কল্যাণী দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। উঠে মুখ ধুতে যাবো; চৌকাঠ পর্যন্ত যেতেই হঠাৎ বলে উঠল ধরা গলায়, আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন? আমি আপনার কী করেছি? থমকে দাঁড়ালাম। দীর্ঘায়ত ঘন-পল্লব দুটো কালো চোখের তারা একভাবে চেয়ে আছে আমার মুখের দিকে। কিছু একটা বলা দরকার। বলতেও যাচ্ছিলাম। কল্যাণী বসে পড়ে দু'হাতে আমার পা জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, আপনার পায়ে পড়ি আমাকে এক পাশে পড়ে থাকতে দিন। আপনাদের ছেড়ে, বারু নীরুকে ছেড়ে আমি কোথাও গিয়ে থাকতে পারবো না।

পা ছাড়তে চায় না। নীচু হয়ে বাঁ হাতে ওর কাঁধের পাশটা ধরে সরাবার চেষ্টা করে বললাম, এ-সব কী পাগলামি হচ্ছে! ওঠো, আজই তো আর যাচ্ছ না কোথাও।

হঠাৎ একেবারে কানের কাছে ফেটে পড়ল তীক্ষ্ণ স্বর—নীচে যাও কল্যাণী। চমকে উঠলাম। ওর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। কল্যাণীও তাড়াতাড়ি উঠে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল। অলন্ত চোখ মেলে সেদিকে একবার তাকিয়ে আমার দিকে ফিরে তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল মীরা, এই জন্যেই বুঝি কোথাও ওর জায়গা হয় না?

সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ তখনো মিলিয়ে যায়নি। চাপা ভর্ৎসনার সুরে বললাম, মীরা! মীরা ভ্রূক্ষেপও করল না। ঠিক সেই সুরেই আবার বলল, আর একটুখানি সবুর করতে পারলে না? আমি আর ক'দিন।'

ভীষণ উত্তেজনায় দুর্বল শরীর থরথর করে কাঁপছিল। মনে হল এখনই পড়ে যাবে। এগিয়ে ধরতে গেলাম। ছিটকে সরে গেল। তারপর কোনো রকমে টলতে টলতে ছুটে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

সে রাতটা আমার কাটল সবটাই প্রায় পায়চারী করে, কখনো বারান্দায় কখনো ছাদের উপর। ভোরের দিকে একটু গড়িয়ে নিয়ে যখন নিচে নামলাম, চাকর এসে খবর দিল, কল্যাণী নেই। বুকের ভিতর কেমন একটা ধাক্কা লাগল। তারপর নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এ ভালোই হল। এতদিন ধরে আমি যে সমস্যা মেটাতে পারিনি, সে নিজেই তার সমাধান করে দিয়ে গেছে। আফিসে বেরোচ্ছি; ঐ চাকরটাই একখানা ভাঁজকরা কাগজ নিয়ে এল। বলল, রান্নাঘরের তাকের উপর

পাওয়া গেছে। উপরে কাঁচা মেয়েলি হাতের পেন্‌সিলে লেখা—বৌদিদি! একবার ইচ্ছা হল, দেখি কী লিখে রেখে গেছে। কিন্তু হাতটা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেলাম। বললাম, তোর মার কাছে দিয়ে আয়। সে চিঠিতে কি ছিল, আজও আমি জানি না।

আফিসে যাবার পরেই কানে গেল দলে দলে সিপাইরা ওকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কে বললে খুঁজতে? তারও জবাব পেলাম হাবিলদারের কাছে, মাইজী কা হুকুম।

খোঁজ পাওয়া গেল পরদিন বিকাল বেলা। জেল থেকে খানিকটা দূরে কাদের একটা বাগান। তার ভিতর দিকে একটা এঁদো পুকুর। সেইখানে।

তুমি তো একটু-আধটু সাহিত্যচর্চা করে থাকো, ডাক্তার! আমি ভাই ও রসে বঞ্চিত। শুনেছি, তোমাদের কবিরা শত কণ্ঠে নাকি মৃত্যুর মহিমা কীর্তন করে গেছেন। মরণ বড় সুন্দর; শীতল কোল পেতে সে তাপিতকে আশ্রয় দেয়, এমনি সব ভালো ভালো কথা তাদের বইতে লেখা আছে। তারা কী দেখেছেন জানি না। কিন্তু মৃত্যু যে কত ভয়ঙ্কর, কত কুৎসিত সেদিন আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। বিশ্ব বিধাতার অনুপম সৃষ্টি এই যে নারীর রূপ মৃত্যুর স্পর্শে তার কি বীভৎস বিকৃতিই না ঘটতে পারে! তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। কতগুলো ডোম ধরাধরি করে কল্যাণীর দেহটা আমার বাড়ীর সামনে এনে নামাল। উপর থেকে মীরার চোখে পড়তে পারে সে খেয়াল হয়নি। হঠাৎ তার চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে দেখলাম যে সকাল হয়ে গেছে। ডাক্তার এল। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু কাঁপুনি দিয়ে এল জ্বর। মাঝে মাঝে ভীত রক্তাক্ত চোখ মেলে তাকায় আর চমকে চমকে ওঠে।

সেই সুরু। তার পর চলল একটানা ব্যর্থ চিকিৎসার পালা। ছোট বড় কত ডাক্তার দেখলেন। ওষুধের খালি শিশিতে ঘরের তাক বোঝাই হল। ফুঁড়ে ফুঁড়ে হাতে পায়ে আর জায়গা রইল না। তবু রোগ ধরা দিল না। তার পর এলেন এক কবিরাজ। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, বৈকালে ও সন্ধ্যায় চার রকম ওষুধ আর কটমট অনুপান চালালেন কিছু দিন। শেষ পর্যন্ত তিনিও হাল ছাড়লেন।

আমি বুঝেছিলাম, মীরাকে বাঁচাতে হলে সকলের আগে ঐ বাড়ি আর তার অভিশপ্ত পরিবেশ থেকে ওকে সরাতে হবে। কিন্তু বদলির জন্যে বার বার করুণ আবেদন জানিয়েও কর্তাদের মন ভেজাতে পারি নি। তার পর বহু চেষ্টায় পেলাম ছুটি। ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। শিমুলতলায় কয়েক মাস কাটিয়ে ছুটির শেষে জয়েন করলাম খুলনায়। নদীর পারে দোতলা বাড়ি। চওড়া খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে ঠিক সামনেই দেখা যেত বিশাল ভৈরব আর তার ওপারে সুপারি, নারকেল, আম, কাঁঠালের বাগানে-ঘেরা গ্রাম। সেখানেই পড়ে থাকত দিনের বেশীর ভাগ। একদিন বলল, ওগো, শোনো, এ জায়গাটা আমার বড্ড ভালো লেগেছে। এখানে আমাদের কিছু দিন রাখবে তো?

আমি পাশে বসে তার রক্তশূন্য শীর্ণ হাতখানা আমার হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম, রাখবো বৈ কি? অনেক দিন রাখবো। এবার তুমি চটপট ভালো হয়ে ওঠো দিকিন। মীরা একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। এ যে শুধু ছলনা, সেও জানত, আমিও জানতাম।

আর কিছু দিন যেতেই বারান্দায় যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। বিছানা থেকে তোলা বারণ। জানালার ধার ঘেঁসে খাট পাতা। তারই উপরে শুয়ে শুয়ে সারা দিন কাটে। যখনই সময় পাই, পাশে এসে বসি। সেদিনও শিয়রের কাছে বসে আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। রাত বোধ হয় দশটা। ছেলেরা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। মীরা শুয়ে আছে চোখ বুজে। একটা হাত শিথিল ভাবে পড়ে আছে আমার কোলের ওপর। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। তার পর আস্তে আস্তে চোখ খুলল। মিনিট কয়েক আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, আমার মাথাটা তুলে ধরে একটু বসিয়ে দাও না? আর শুয়ে থাকতে পারছি না। কোনো রকম নড়াচড়া ডাক্তারের নিষেধ। কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে না বলতে পারলাম না। পিঠের মাছে গোটাকয়েক বালিশ দিয়ে হালকা দেহটা একটুখানি উপরের দিকে তুলে দিলাম। আবার কিছুক্ষণ তেমনি তাকিয়ে থেকে বলল, একটা কাজ করবে? সিন্দুক খুলে আমার গয়নার বাক্সটা এনে দাও না? বাধা দিয়ে বললাম, একটু ঘুমোও দেখি। এত রাত্রে গয়না দিয়ে কী হবে?' মীরা চিরদিন ভারী শান্ত, ভারী অনুগত। শুধু মেনে নেওয়াই ছিল তার স্বভাব। অনেক দিন ভুগে ভুগে আজ-কাল তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ছিল। কথায় কথায় বিরক্ত হয়ে উঠত। বলল, আঃ, তোমার সঙ্গে আর বকতে পারি না। বলছি, নিয়ে এসো না বাক্সটা? আর আপত্তি না করে এনে দিলাম। ওর আঁচল থেকে চাবি নিয়ে ডালাটাও খুলে দিলাম ওর সামনে। অনেকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে রইল।

বড়লোকের মেয়ে। বিয়ের সময় অনেক টাকার গয়না দিয়েছিলেন ওর বাবা। ওর কাজ ছিল মাঝে মাঝে সেগুলো ভাঙ্গা আর নতুন করে গড়ানো। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। প্রাণ ধরে গায়ে তুলত না একখানাও। তাই নিয়ে একদিন কত অনুযোগ করেছি। হেসে বলত আমার বড্ড লজ্জা করে। কখনো বলত, কী হবে সঙ সেজে। আর কি সে বয়স আছে? একবার বড় রাগারাগি করেছিলাম এই নিয়ে। ও তখন নেহাৎ ছেলেমানুষ। কোন এক জমিদারের বাড়ি নেমন্তন্ন। আমাকেও যেতে হবে। হাতে একসেট সোনার চুড়ি আর গলায় একটা সাধারণ নেকলেস পরে বেরিয়ে এল। আমার মেজাজ গেল চড়ে। জিদ ধরলাম, জড়োয়া পরে না এলে আমি কিছুতেই যাবো না। এর পরে আর না পরে পারল না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অন্ধকারে হঠাৎ আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ফিস-ফিস করে বলল, আমার সব চেয়ে বড় অলঙ্কার সে আমার সঙ্গেই চলল, সেটা বোঝো না? আর গয়না দিয়ে কী হবে?' সেই রাতটা চোখের ওপর ভেসে উঠল। বললাম, এ সব তো চিরদিন বাক্সেই রয়ে গেল। আজ পরবে দুখানা? এসো না পরিয়ে দিই?

দূর—বলে আবার হাসল সেই সলজ্জ হাসি। তারপর বলল, ঐ নেকলেসটা আর ঐ বালাজোড়াটা দাও তো আমার হাতে। তাই দিলাম। একটু নাড়াচাড়া করে ও-দুটো আবার আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, আলাদা করে রাখো। আমার বীরু নীরুর যখন বৌ আসবে, আমি তো থাকবো না; এই দিয়ে তুমি তাদের মুখ দেখো।

তুমি তো জান, ডাক্তার, চিরদিনই আমি কাঠখোট্টা মানুষ। চোখের জলটল আমার আসে না। সেদিন কিন্তু দুটো চোখ আমার ঝাপসা হয়ে উঠল। বললাম, তুমি চলে যাবে, আর বৌরু নৌরুর বৌ দেখাবার জন্যে পড়ে থাকবো আমি একা? সে অভিশাপ আমাকে দিও না, মীরা! মীরা আর কিছু বলল না। দেখলাম, তারও দু'চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কোঁচার খুট দিয়ে মুছিয়ে দিলাম। একটু শান্ত হবার পর বলল, আর বাকী গয়নাগুলো আমি তোমাকে দিয়ে গেলাম।

চমকে উঠে তাকালাম ওর মুখের দিকে। এ কী বলছে মীরা! ও যখন থাকবে না, ওর ঐ গয়না দিয়ে আমি আর একজনকে সাজাতে বসবো? যাবার সময় এই আঘাতটাই কি রেখেছিল আমার জন্যে! আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মীরা বোধ হয় বুঝতে পারল আমার মনের কথা। হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়ে বলল, তুমি রাগ করছ! শোনোই না কি বলছি? তুমি যা ভাবছ, আমি তা কোনো দিন কল্পনাও করতে পারি না। ওগো, এতদিনেও কি তোমাকে চিনতে পারিনি?

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, না, না। আমি কিছুই ভাবছি না মীরা! বল, তুমি কী বলবে।

মীরা একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, এ গয়না তো তোমাকে এমনি এমনি দিচ্ছি না! এ রইল আমার জরিমানা। যে অপরাধ তোমার কাছে করেছি, এ শুধু তার একটুখানি দণ্ড।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এর কী উত্তর দেবো, বল? আমার চেয়ে কে বেশী জানে, এই যে আজ সে নিতান্ত অসময়ে মৃত্যুর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে, এর মূলে এমন কিছুই নেই, তোমাদের শাস্ত্রে যাকে বলে ব্যাধি। এর পেছনে আছে শুধু একটা রাত আর তাকে আশ্রয় করে একটি মেয়ের মরণাহত বীভৎস রূপ। আমার দু কৌটো সান্ত্বনা আর দুটো স্তোক বাক্য সেখানে কী করতে পারে! তবু বললাম, আমার কাছে তো তুমি কোনো অপরাধ করনি, মীরা! যদি কিছু করে থাকো, সে শুধু একটা ভুল। ঐ অবস্থায় সব মেয়েই তা করত। তার জন্যে তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিস নেই। মন থেকে সব দাগ তুমি মুছে ফেলে দাও।

অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এবার মাথাটা আমার কাঁধের উপর নামিয়ে দিয়ে বলল, ওগো, আমি জানতাম, যাবার আগে তোমার ক্ষমা আমি পাবোই। কিন্তু, তুমি ক্ষমা করেছ বলেই তো আমার অপরাধ মুছে না। তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথাটা রাখো। আমার শেষ সাধটুকু পূর্ণ করতে দাও। বললাম, বেশ দাও তোমার গয়না কিন্তু তুমিই যদি না রইলে, তোমার এই সোনার তাল দিয়ে আমি কি করবো? মীরা অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। দেহের সবটুকু ভার আমার উপর ছেড়ে দিয়ে সেই নিবিড় সান্নিধ্যটুকু যেন শেষবারের মত অনুভব করতে লাগল। আরো কিছুক্ষণ সেই ভাবে কাটিয়ে আশ্চর্য করুণ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলল, ঐ অভাগী মেয়েটা, যে শুধু শত্রুতাই করে গেল আমার সঙ্গে, ওর মত যারা বিনা দোষে জেলে আসে, তার পর বেরিয়ে গিয়ে সংসারে কোথাও ঠাঁই পায় না, পায় শুধু লাঞ্ছনা, এইগুলো দিয়ে তাদের একটা উপায় ক'রো। এক কৌটো আশ্রয়ের অভাবে আর কেউ যেন অমন করে প্রাণটা না দেয়। বলেই উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল আমার বুকের উপর। আমি বাধা দিলাম না। এই কান্নার তার প্রয়োজন ছিল। আরো কিছুক্ষণ পরে বুকের গুরুভার যখন একটু হালকা হয়েছে, আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে আবার তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে আমার হাতখানা চেপে ধরে কাতর সুরে বলল, বল, আমার কথা রাখবে?

ওর রুক্ষ চুলগুলো কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বললাম, রাখবো। এবার তুমি ঘুমোও।

মীরার রক্তহীন পাণ্ডুর মুখের উপর একটি পরম তৃপ্তির আভা ফুটে উঠল। অস্পষ্ট আলোতেও সেটা আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

মাসখানেকের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল!

[ক্রমশঃ।

ক্ষণ-লিখন

নিজন দে-চৌধুরী

সর্বদা শংকিত থাকি! কেবলি সংশয় জাগে, যদি
এই দিন-রাত্রি ভ'রে জীবনের মধুর ব্যঞ্জনা
দিয়ে সে কবিতা লিখি, মুহূর্তের আনন্দ-বেদনা
মূর্ত হয় যার ছন্দে—স্বপ্ন-সাধ-আশা-আকাংখার

স্বর্ণাক্ষরে সারাক্ষণ যে হৃদয়-ভাষ্য লিখি, তার
সকলি হারায় যদি? কোনো দিন আচমকা হাওয়ায়
যদি কোনো অসাবধানে দক্ষিণের জানলা দুটি খুলে
সব পাণ্ডুলিপি যদি অকস্মাৎ ছিঁড়ে-খুঁড়ে যায়?

যায় তো। রোজই তো যায়। এই মেঘ-বিস্তীর্ণ আকাশে
কত কাব্য লেখা হয়। বৈশাখের দীর্ণ হাকাকার
যে আনে, আবার সে-ই নম্র-হাতে অশান্ত কান্নার
শ্রাবণে অশ্রুর শ্লোক লিখে রাখে। রামধনু-রঙীন
সপ্তপদী মুছে ফের বেদনার বিচিত্র বিভাসে
আবার আকাশে আঁকে আনন্দের আশ্চর্য্য আশ্বিন।

ছোটদের আসর

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু
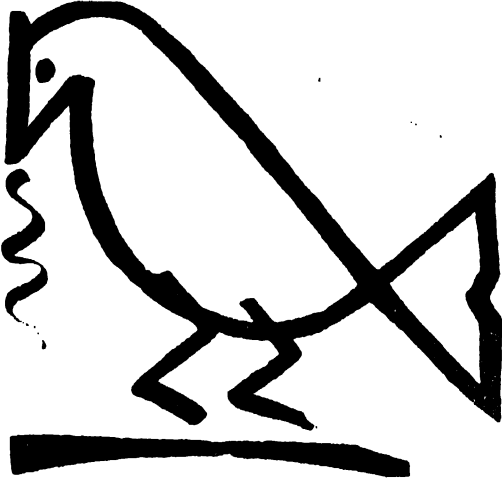
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বাবা ওর বৌদির কাছে নিয়ে গেল মীরাকে। সুরমা তার নাম। বাঙালীটোলারই এক বাড়ীর চার তলার ঘরে সুরমা থাকে। জানলার ধারে দাঁড়ালে নীচে—অনেক নীচে গঙ্গা দেখা যায়, গঙ্গাই ত রাস্তা থেকে তিন তলার সমান নীচে।

বাড়ীতে পাথরের দেওয়াল, পাথরের সিঁড়ি, এত পাথর কাশীতে এসেছিলো কোথা থেকে? কত কাল ধ'রে এত পাথর এমনি দাঁড়িয়ে আছে। কাশীতে না কি কখনো ভূমিকম্প হয় না। শিবের ত্রিশূলের ওপর কাশী। সেই ত্রিশূল এক বার ন'ড়ে উঠেছিলো কলিযুগের পাপে। ভূমিকম্প এক বার হয়েছিলো কাশীতে। কাশীতে যারা জীবন কাটিয়ে দিতে এসেছিলো, সেদিন তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিলো।

আর এক বার ভয় পেয়েছিলো। সুরমা গল্প করে,—বোসো ভাই, বলি সেদিনকার কথা। এলো বেরিবেরি, পা ফোলে আর হার্ট খারাপ হয়। মরতে লাগলো বাঙালীরা, যারা সর্ষের তেল খায়। হিন্দুস্থানীদের কিছু হল না। সেদিন যে সব বুড়ো-বুড়ি কাশীতেই প্রাণ দেবে ব'লে এসেছে—মণিকর্ণিকার ঘাটে ছাই হ'য়ে গিয়ে শিবলোকে যাবে ব'লে এখানে অপেক্ষা করছে, তারা দলে দলে পালালো।

প্রাণের মায়া এমনি জিনিস! যে প্রাণ দিতে এসেছে, সেই প্রাণ নিয়েই তারা কাশীর মতন তীর্থ ছেড়ে দেশের দিকে চলে গেল। শুধু তারাই রইলো, যারা বিশ্বাস করে—কাশীর গঙ্গার ধারে শেষ নিশ্বাসে শান্তি আছে। সেই মুচির মতন, যে বিশ্বাস করত, গঙ্গা স্নান করলে পাপ কেটে যায়। সে গল্প জানো ত?

মীরা বললে—জানি না বৌদি! বলুন না।

সকাল বেলায় চার তলার ঘরে মিঠে রোদে কার না গল্প শুনতে ভালো লাগে? বাঘাদা' চলে গেছে। মীরা একলাই যেতে পারবে। বৌদি এক হাতে লুচি বেলে নিয়ে কড়ায় দিতে দিতে গল্প বলতে লাগলো।

গঙ্গার ধারে এক কুষ্ঠরোগী, যাকে দেখছে তাকে বলছে—ওগো, তোমাদের মধ্যে কে নিষ্পাপ আছ, আমায় ছুঁয়ে দাও। দিলে আমি সেরে যাব।

কে দেবে? সকলেই ত জানে পাপী তারা। রোগী বললে, পাপ তো সব তোমাদের কেটে গেছে। আজ চূড়ামণি যোগে গঙ্গাস্নান ক'রে আসছ। আর কি পাপ আছে?

তাই বুঝি হয়? গঙ্গাস্নান করতে হয়, করতে এসেছে। রেলে ষ্টীমারে, নৌকোয় ভিড় ক'রে হুজুগে মেতে চূড়ামণি যোগে গঙ্গাস্নান করলো। করলো বলেই কি সব পাপ চলে গেল? অত বিশ্বাস কি আছে? সেই ভরসায় কুষ্ঠরোগীর গায়ে কি হাত দেওয়া যায়? কিন্তু মুচি শুনে বললে, তুমি ঠিক বলেছ! দাঁড়াও আমি গঙ্গাস্নান ক'রে এসে তোমার গায়ে হাত দিচ্ছি। ও মা, সে যেই এসে গায়ে হাত দিলো, রোগী একেবারে সেরে গেল। সে রোগী আর কেউ নন, স্বয়ং মহাদেব। মুচিকে এমন সব জিনিস দিলেন, যাতে তার মনে চিরশান্তি এলো। শান্তিই ত লোকে খোঁজে? টাকা বলো, কড়ি বলো, বাড়ী বলো, জমি বলো, ছেলে বলো, মেয়ে বলো, মান বলো, প্রতিপত্তি বলো—লোকে এই সব চায়, যাতে মনে শান্তি আসে। শান্তি যার আছে, তার কুঁড়েঘরে থেকেও সুখ। শান্তি যার নেই, তার অট্টালিকা থেকেও দুঃখ। সেদিন চম্পালাল ব'লে এক মাড়োয়ারী মারা গেল, যার কোটি কোটি টাকা। মারা যাবার সময়ে আমাদের ডাক্তার বাবুকে ব'লে গেল—টাকা যেন কারুর না থাকে, ছেলে-মেয়ে-জামাই সবাই চাইছে, সে যেন শীগ্‌গির মারা যায়। ভাইয়েরা চার দিক থেকে ছুটে এলো ঘটা ক'রে চিকিৎসা ক'রে জীবন শেষ ক'রে দিতে।

ইতিমধ্যে লুচি ভাজা হয়ে গেছে, ফুলো-ফুলো লুচির সঙ্গে আলুর ছেঁচ্‌কি দিয়ে থালা এগিয়ে দিলো সুরমা মীরার সামনে—খাও ভাই, ব'লে।

মীরা বলে, বৌদি, আমার জন্যে করছিলেন বুঝি? আমি বুঝতেও পারি নি। আমি তো এইমাত্র জল খেয়ে এলুম বাঘাদা'র বাড়ী।

জল খেয়ে এসেছো, এবার লুচি যোগ ক'রে জলযোগ করো।

আহা, জল মানে বুঝি জল? বৌদি কি বাংলা ভুলে গেলেন ইউ-পিতে থেকে?

সেই গোর? সুরমা হেসে বলে। কবে এসেছি বাংলা দেশ থেকে বৌ হয়ে কাশীতে। তোমার দাদা এখানে জ্যোতিষী ছিলেন—ভৃগু চর্চ্চা করতেন। গণেশ মহল্লায় মস্ত বাড়ী নিয়ে থাকতেন। হঠাৎ এক দিন বললেন আমার একটা বিষম ফাঁড়া আসছে, হয়তো

কাটবে না। তিন তলায় ঠাকুরঘরে মা কালীর পায়ের কাছে ভালো করে তেল দিয়ে একটি প্রদীপ জ্বেলে রেখে এসো। সলতেটা বড়ো করে দিয়ো। সারা দিন জ্বলা চাই। যদি নিবে যায়, আমাকে এসে বোলো। সারা দিন লক্ষ্য রেখো যেন তেল থাকে।

তার পর? মীরা বলে।

বারে বারে আমি যাই। দেখে আসি। দুপুর বেলা হঠাৎ উনি বললেন, আমার বুকটা কেমন করছে, একটু মালিস ক'রে দাও। তার্পিন তেল মালিশ করতে করতে কতক্ষণ কেটে গেল। উনি বলেন, এবার দেখে এসো। প্রদীপ বোধ হয় নিবে গেছে।

গিয়ে দেখি ভাই, প্রদীপ নিবে গেছে। তেল আছে, তবু নিবে গেছে। এসে দেখি উনি—

প্রতিমা চোখে আঁচল দেয়। মীরার চোখেও জল।

আপনি খুব অসুবিধায় পড়লেন?

অসুবিধা ব'লে? মুখ্যু আমাদের আর কি উপায় আছে বলো রাঁধুনীগিরি ছাড়া? ঐ বাড়ীরই এক অংশে এক ইস্কুল-ইনস্পেক্টর ভাড়া থাকতেন, তাঁর স্ত্রী আমাকে মেয়ের মতন টেনে নিলেন। রান্নার ভার দিলেন আর আমার দিন চ'লে যায় এমন মাইনের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। এখনো তাঁদের ওখানে কাজ করি। আজ তাঁরা বিন্ধ্যাচলে গেছেন, তাই আমাকে সকালবেলায় পেলে।

রাঁধুনীগিরি? বাংলাদেশের মূর্খ মেয়েদের এ ছাড়া আর কি কোনো উপায় নেই?

না ভাই, আর কোনো উপায় নেই। আমার মাসতুতো দাদা ছিলেন মস্ত যাদুকর। আশ্চর্য্য তাঁর খেলা। সেই দাদা যখন হঠাৎ মারা গেলেন, তখন আমার মাসীমা রাঁধুনী আর বৌদি বাসন মাজা ঝিয়ের কাজ নিলেন। বামুনের মেয়ে বলে কেউ কোনো দয়া দেখালো না। আহা, বৌদি তার বাপের কত আদরের মেয়ে ছিলো, তিন ছেলের পর এক মেয়ে—কোথায় কি হয়ে গেল সব!

মীরা বলে, দেশ স্বাধীন হ'য়ে গেছে। এখন তো অন্য রকম হবে!

কই হয় ভাই! স্বাধীনতার উৎসবে আলো জ্বলে, বাজী পোড়ে, তবু পয়সা অভাবে ছেলেরা স্কুল থেকে চ'লে আসতে বাধ্য হয়, চিকিৎসা অভাবে কত লোকে চিরুরুগ্ন হয়ে থাকে। কত লোক আজ কাজ না ক'রেও টাকা পায়। আর কত লোক কাজ চায়, কাজও পায় না, টাকাও পায় না। এ রকম সমস্যা যত দিন থাকবে, তত দিন স্বাধীনতার আলো-বাজী-মেলা-মিছিল সব বিশ্রী মনে হবে। এই কাশীতে এক দিন এমন দিন ছিলো, যখন আট আনার বাজার করলে একটা মুটে ডাকতে হত। মুটের ভাড়াও ছিল এক পয়সা। ঘর ভাড়া দিন এক পয়সা। ঝি দিন এক পয়সা। সেই দিন না ফিরলে আমরা স্বাধীনতার মানে বুঝতে পারব না।

খেয়ে উঠে মীরা হাত ধুয়ে এসে আবার বসলো। জানলার সরু সরু গবাদের কাছে দুটো বাঁদর উঁকি মারছিলো, ওদের অত্যাচারে চতুর্দ্দিকে শিক লাগাতে হয়েছে—মারা একটা বেলুন নিয়ে ছেড়ে গেল। ও দুটো ভেংচি কেটে নেমে গেল। আবার হৈ-চৈ, নীচের বারান্দা থেকে কার শাড়ী নিয়ে পালাচ্ছে।

মুখ বাড়িয়ে মীরা দেখে আহা রে, নতুন শাড়ী! ও মা! ও বাড়ীর ছাদে উঠে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো শাড়ীটা টুকরো টুকরো ক'রে।

গুলী করে মারতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু উপায় নেই, শ্রীরামের অনুচর সব। মহাবীরের শিষ্যসেবক।

মীরা বলে, বৌদি যাঁদের কাছে আছেন, তাঁরা কেমন?

তাঁরা ভারী মজার লোক। ইন্‌স্পেক্টর বাবু চিরদিন বেহারে কাজ ক'রে এসেছেন, ভাগলপুর মুঙ্গের, মোতিহারী, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর। কাশীতে এলেন রিটায়ার ক'রে স্ত্রীকে নিয়ে। ধর্ম্মকর্ম্ম ক'রে দিন কাটিয়ে দেবেন এই চিন্তা। সারা দিন মন্দিরে মন্দিরে গঙ্গার ধারে ধারে কাটিয়ে আসেন। বাড়ীতেও ধ্যান-ধারণা স্তব-পূজো নিয়ে থাকেন। ভারী আরামে দিন কাটে স্বামি-স্ত্রীর। তার পর সুরু হল যন্ত্রণা।

যন্ত্রণা?

হ্যাঁ যন্ত্রণা। স্বামীর খাওয়া হ'য়ে গেছে, স্ত্রী ভাতের থালাটি নিয়ে বসেছেন, এলো দু' গাড়ী লোক—পিসিমা আমরা এসেছি।

এসেছে তো কৃতার্থ করেছে। সেই ভাতের থালা ওদের এগিয়ে দিয়ে তিনি রান্নাঘরে ঢুকলেন। আমি ভাত নিয়ে চ'লে আসছিলুম, আমাকেও ঢুকতে হল ওঁর সঙ্গে। আবার উনুনে আগুন দেওয়া। আবার রান্না চড়ানো।

এ প্রায় প্রতি দিন।

মাসীমা এসেছি। মামাবাবু এসেছি। দাদু এসেছি। তাউই মশাই মাউইমা এসেছি।

একদল যায় তো আর এক দল আসে। হৈ-হৈ হাসির হুল্লোড় রাত বারোটা অবধি। পূজোপাঠ সব শিকেয় উঠলো। ভদ্রলোক যা পেন্সন পান সব খরচ হ'য়ে যায়, ধার হয়; তবু কাশীতে বাড়ী করে থাকার খেসারৎ দিতে হয়। যেখানে যত আত্মীয় আছে এই সুযোগে কাশীবাস ক'রে নিতে চায়।

শেষটা অতিষ্ঠ হয়ে উনি বাড়ী বদ্‌লালেন। গণেশমহল্লা থেকে চলে গেলেন কামাচ্ছায়। কাউকে ঠিকানা দিলেন না।

ক'দিন খুব আরামে কাটলো।

এক দিন দুপুরবেলা হঠাৎ—জ্যেঠামশাই, আপনি এখানে এসে উঠেছেন? উঃ কি কষ্ট যে হয়েছে আপনার বাড়ী খুঁজতে!

আচ্ছা মীরা, তুমিই বলো, কি রকম মনে হয়? ভালো মানুষ ওঁরা, কাউকে কিছু বলতে পারেন না, আমারই বলতে ইচ্ছে করে, কাশীতে কি হোটেল নেই? ধর্ম্মশালাও তো খোলা আছে। কালীবাড়ীতেও থাকা যায়। মরতে এখানে কেন?

চ'লে গেলেন বুলানালা, চ'লে গেলেন শিবালয়, গেলেন লঙ্কা—সেখান থেকে আবার ৺বিশ্বনাথ দূর হয় ব'লে এলেন পাঁড়েহাউলি কিন্তু অতিথিরা ওঁকে ছাড়লো না, ঠিক আবিষ্কার করলো আর দাঁত বার ক'রে বলতে লাগলো, বারে বারে বাড়ী বদলান কেন? এই তো আজ কর্ত্তা গিন্নী বিন্ধ্যাচলে গেছেন বাসে ক'রে—এক দল এসে দরজা গোড়ায় মাল পত্র রেখে ঠিক অপেক্ষা করছে, রাত্রে ফিরলেই দরজা খুলে ঢুকবে। শুধু কি ঢোকা? বলে, মাছ খাব, মাংস খাব, মামলেট খাব, যা ওঁর বাড়ীতে ঢোকে না।

মীরার হাসি পায়, কী অত্যাচার! সুরমাকে ওর ভালো লাগলো। কী সুন্দর মুখখানি সুরমার!

মীরার সঙ্গে ও রাস্তায় নেমে এলো। গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে। বলে, আমরা আগেকার লোক, গায়ে কিছু একটা না জড়িয়ে রাস্তায় বেরোতে পারি না। আর মাথায় কাপড় সব সময়ে থাকে। দেখো সব চলেছে খোঁপা দেখিয়ে ধ্যাং-ধ্যাং করে, কি রকম বেহায়া দেখায়!

মীরা বলে, আর ওরা ভাবে বৌদি, আপনারা জংলী।

সে তো চিঁড়িয়াখানায় বাঁদররা ভাবে মানুষগুলো কী অসভ্য।

এখন কে বাঁদর, কে মানুষ বিচার করবে কে বৌদি?

বড় রাস্তায় বড় বড় ঘড়া মাথায় নিয়ে গোয়ালারা ৺বিশ্বনাথের দুধ নিয়ে চলেছে ব্যোম ব্যোম শব্দ করে। লোকে পথ ছেড়ে দেয়। কী শক্তি ওদের গায়ে! এত ভারী ঘড়া কাঁধে করা কি চাট্টিখানি কথা? ৺বিশ্বনাথের স্নান হবে এই ঘড়া ঘড়া দুধ দিয়ে। চরণামৃত হিসাবে লোকে পাবে! মীরা মনে করে—এ কথা ভাবতে নেই, দেশের কত ছেলে এক ফোঁটা দুধ পাচ্ছে না, আর ৺বিশ্বনাথের পুজো হচ্ছে ঘড়া-ঘড়া খাঁটি দুধ দিয়ে! পাণ্ডাদের বলতে গেলে, তারা মারতে আসবে। তেমন ক'রে ভাবতে শেখেনি ব'লে—সোমনাথের মন্দির লুঠ হয় বারে বারে। কিন্তু ছোট ছেলেও জানে আসল সোমনাথের গায়ে হাত দেয়—এমন সাধ্য কোনো মানুষের নেই; মন্দির ভেঙে মসজিদ ভেঙে মানুষকে অপমান করা হয়, নিজেকে ছোট করা হয়, ভগবানের কিছুই করা যায় না। তাই বিশ্বনাথ-জগন্নাথ-সোমনাথরা মানুষের হাতেই আবার ফিরে আসেন। কালাপাহাড়রা, গজনীর মামুদরা ম'রে যায়। ভগবান হাসিমুখে জেগে থাকেন! যেমন রাজত্ব ফিরে আসে, ক্লাইভ্‌, উমিচাঁদ, মীরজাফররা চিরদিনের মতন ম'রে যায়—চিরদিন ধ'রে লোকের মুখে মুখে অভিশাপ পায়। কারুর বলবার সাহস থাকে না—আমি আমি মীরজাফর উমিচাঁদ জগৎ শেঠের বংশধর। রাজশক্তি একদিন স্পর্দ্ধা করে অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যা স্মৃতিস্তম্ভ তোলে, ময়দানে অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্যের অশ্বারোহী মূর্তি দাঁড় করায় তাদের, যারা ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ দমন করেছিলো—তাদের নামে রাস্তা পার্ক তৈরী করে, যারা তাদের শাস্তি দিয়েছে যারা নিজের দেশে স্বরাজ চেয়েছিলো। তার পর চাকা ঘুরে যায়। মূর্তি স্মৃতিস্তম্ভ নাম বিলুপ্ত হয়, যারা এক দিন দণ্ডিত হয়েছিলো, তারা পায় বীরের সম্মান।

বাঘার কাছে শুনে শুনে মীরা আজ-কাল এমনি ভাবনা ভাবতে শিখেছে। তবু দেখে, তারাই উন্নতি করে, জীবনে সুখী হয়,—অন্ততঃ বাইরে থেকে দেখলে যা মনে হয়—যারা দেশের কথা ভাবে না। যারা বলে না—

ও আমার দেশের মাটি তোমার
পায়েই ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর বিশ্বমায়ের
আঁচল পাতা।

বলে না,

যে তোমারে ছাড়ে ছাড়ুক,
আমি তোমায় ছাড়ব না মা!
তোমার চরণ করব স্মরণ
আর কারো ধার ধারব না মা!

মানের আশে দেশ বিদেশে
যে মরে সে মরুক ঘুরে
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা
ভুলতে সে যে পারব না মা!

সেদিন তুলসীদাসের সাধনক্ষেত্রে বাঘা বলছিলো দেশাত্মবোধের গান রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ভারতবর্ষে আর কেউ লেখেনি। হয় তো পৃথিবীতেও কেউ লেখেনি! তাঁর গান যত লোককে প্রেরণা যুগিয়েছে, এমন আর কারুর নয়। শুধু দেশপ্রেমের কথাই বা কেন? জীবনের পথে চলার কথা। এসো মীরা, আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে একটা গান শেখো—

যদি দুঃখে দহিতে হয়,
তবু মিথ্যা কর্ম্ম নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয়,
তবু মিথ্যা চিন্তা নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয়,
তবু মিথ্যা বাক্য নয়।
জয় জয় সত্যের জয়।

আবার বলো,

যদি দুঃখে দহিতে হয়,
তবু অশুভ কর্ম্ম নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয়,
তবু অশুভ চিন্তা নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয়,
তবু অশুভ বাক্য নয়।
জয় জয় মঙ্গলময়।

হাওয়ায় সে সুর অসিঘাট পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছিলো।

এমন সময়—

রঘুপতি রাঘব রাজারাম।
পতিত পাবন সিয়ারাম।

বলতে বলতে একদল লোক আসতে ওরা উঠলো।

কাঁথির পিসিমা বললেন, কেমন লাগছে মীরা এখানে?

খাঁচার পাখীর যেমন লাগে মুক্ত আকাশ দিদা। ঝর্ণার যে লাগে পাহাড়ের কোল। ছিলাম বাগানের ফোয়ারা, কল টিপে খো হ'ত, হয়েছি বনের ঝর্ণা, নিজের আনন্দে ব'য়ে চলেছি।

কিন্তু এরকম তো চলবে না। এক বার তো ফিরতে হবে যাদের কাছে ছিলি, তাদের মতামতটা তো জানা দরকার। তারা হয় খবরই নেয় না, সমানে তো খরচের টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছে জন্যে। সাত-আট মাস ধ'রে!

যেদিন টাকা পাঠানো বন্ধ করবে, সেদিন ভাবা যাবে। এখন আমি রামনগর চললুম বাঘাদা'র বাড়ীর সকলের সঙ্গে।

মীরা ভাবে কাশীতে এসেছিলেন শঙ্করাচার্য্য এসেছিলেন শ্রীচৈ এসেছিলেন বুদ্ধদেব। নতুন ধর্ম্ম যাঁরাই প্রচার করেছেন, তাঁদে কাশীতে আসতে হয়েছে। এই জন্যেই হয়তো কাশী হিন্দুর ভালো লাগে।

বাঘার বোন স্মৃতি কিন্তু একটা মজার কথা বললো নৌকায় যেতে। বিদ্যাসাগর মশাই কাশীতে এসে ৺বিশ্বনাথ ৺অন্ন

দেখেন নি। বলেছিলেন—আমার বাবা আর মা-ই তো বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণা। কী অসাধারণ মনের জোর দেখো! পারে কেউ?

বাঘার দাদু বললেন, এসেছিলেন নেপালের রাজা ত্রিভুবন রাণীদের নিয়ে। বিশ্বনাথের মন্দিরে সেদিন সকালে আর কেউ ঢুকতে পায়নি, ওরাই প্রাণ ভ'রে পুজো করেছিলো। কিন্তু জংবাহাদুর রাণার চর ছিলো পাহারা দিয়ে। যাতে রাজার সঙ্গে ইংরেজ সরকারের কথাবার্তা না হয়।

মীরা বলে, সে কি? রাণা ত মন্ত্রী। রাজার চেয়ে মন্ত্রী বড়ো! এ কোন্ দেশী কথা?

এক দিন নেপালে রাজার চেয়ে মন্ত্রীরাই বড়ো ছিল। রাজার প্রাসাদে প্রহরী থাকত পাহারা দেবার জন্যে, রাজা যাতে না পালিয়ে যেতে পারে। বাইরের কোনো লোক যেন রাজার সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পারে। এমনি কেটেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। আশী লক্ষ নেপালী প্রজাকে মূর্খ রেখে, রাজাকে নজরবন্দী করে, মন্ত্রীরা পুরুষানুক্রমে রাজকোষের বেশী ভাগ অর্থ লুটে-পুটে নিয়েছে। হিমালয়ের পাহাড়ের উঁচু চূড়ো ঘেরা নীচু উপত্যকায় কাঠমুণ্ডু শহর দিনের পর দিন এই অনাচার সহ্য করেছে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সায় দিয়েছে। তার পর—

তারপর?

রামনগরেরর রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের দিকে চেয়ে মীরা শেষটা শুনতে চাইলো।

তার পর ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হল—তখন এক জন ইংরেজ লেডি ডাক্তারকে রাজা ডেকে পাঠালো রাণীর চিকিৎসার জন্যে। তার মারফৎ খবর পাঠালো হিন্দুস্থান সরকারকে। তার পর এক দিন সদলবলে এখানে পালিয়ে এলো। রাণীদের সে দিন কী রাগ!

তারপর?

তার পর স্বাধীন নেপালের স্বাধীন নরপতি ত্রিভুবন ফিরে গেল নেপালে রাজশক্তি নিয়ে মন্ত্রীদের শক্তি হরণ ক'রে। জংবাহাদুরেরা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বাঙালী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যে নেপালে বুদ্ধের বাণী নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই নেপাল সমৃদ্ধ দেশ হ'য়ে উঠলো। একটা কথা জেনো মীরা, ইংরেজ সুবিধামত ইতিহাস বিকৃত করেছে, কিন্তু গ্রীকরা ভারতবর্ষের যে ইতিহাস লিখেছে, তাতে নিজেদের নীচতা, পরাজয়, কিছু গোপন করেনি—আর ভারতের মহত্ব উদারতা সমস্ত প্রকাশ ক'রেছে। পুরুর বীরত্ব, চন্দ্রগুপ্তের শৌর্য্য—গ্রীকরাই জানিয়ে গেছে, আর কেউ নয়। তারা না জানালে আমরা জানতেই পারতুম না। চন্দ্রগুপ্ত নাটকও সৃষ্টি হত না। ঐতিহাসিক হবে সকলের উর্দ্ধে। সিপাহীবিদ্রোহ নয়—বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহ প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ—এ কথা চাপা প'ড়ে গেছে ঐতিহাসিকের সঙ্কীর্ণতায়। অবশ্য, ইতিহাস লেখাও অতি কঠিন কাজ। এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করছিলেন। হাজার হাজার বছর আগে থেকে সুরু ক'রে। হঠাৎ তাঁর জানলার সামনে একটা দুর্ঘটনা ঘটলো, কি ক'রে ঘটলো তিনি নিজের চোখে সব দেখলেন। তার পর যে সব লোক দাঁড়িয়েছিলো, যারা প্রত্যক্ষদর্শী, অর্থাৎ নিজের চোখে সব দেখেছে, তারা এক একজন এক এক রকম কাহিনী বললো—কারুর সঙ্গে কারুর মিললো না। তখন ঐতিহাসিক ভাবলেন দিনের আলোর একটা ঘটনা নিজের চোখে পরিষ্কার দেখেও যখন ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ শোনা যায়, তখন হাজার হাজার বছর আগের ইতিহাস কত বিকৃত হয়ে গেছে সহজেই ভাবা যেতে পারে। অতএব থাক ইতিহাস রচনা।

রামনগরের ঘাটে ব্যাসকাশী দেখতে তখন অনেক যাত্রী এসে গেছে। ছায়াময় ব্যাসকাশী, সেখানে মরলে গাধা হয়, সেও ভালো লাগছে কলকাতার রেজিপার্কের বন্দিজীবনের চেয়ে। [ক্রমশঃ।

জলকন্যা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

হান্স ক্রিশ্চিয়ান হ্যাণ্ডারসন

ঝকমকে সোনালি পাথরের প্রাসাদ, শ্বেতপাথরের উঁচু সিঁড়ির ধাপ সোজা সমুদ্র থেকে উঠে গেছে। মাথায় সোনার গম্বুজ; বিরাট থামগুলোর ফাঁকে ফাঁকে শ্বেতপাথরের মূর্তিগুলো হঠাৎ দেখলে সত্যিকার মানুষ ব'লেই মনে হয়। উঁচু জানলাগুলো পরিষ্কার কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যায়, মখমলের পর্দা-ঝুলোনো বিশাল ঘর, দেয়ালে জমকালো ছবি। সাগর-রাজার মেয়েদের পক্ষে এমন অপরূপ দৃশ্য দেখা মস্ত একটা ফুর্তির ব্যাপার; সব চেয়ে বড়ো একটা ঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে তারা দেখলো, মাঝখানে এক ফোয়ারা খেলছে, তার জল উঠছে পিচকিরির মতো উপরের ঝকমকে গম্বুজ পর্যন্ত; ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঝিলকিয়ে প'ড়ে নাচছে জলে, চিকচিক করছে চার দিকের সুন্দর গাছপালা।

এখন জলকন্যা জানলো কোথায় থাকে তার প্রিয় রাজপুত্র। এখন থেকে প্রায় রোজ সন্ধ্যায় সে সেখানে যায়। সাহস ক'রে বাড়ির যতোটা কাছাকাছি সে যায়, অতোটা আর কোনো বোন যায় না। শ্বেতপাথরের বারান্দার তলা দিয়ে যে ছোটো খাল গেছে, এক দিন সে তা দিয়েও সাঁতরে গেলো খানিকটে। এখানে, উজ্জ্বল জ্যোছনার রাত্রে ব'সে ব'সে সে রাজপুত্রকে দেখে, রাজপুত্র তো তাকে দেখতে পায় না, সে জানে নিজে সে একা-একা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

কখনো রাজপুত্র বেড়াতে বেরোয় রঙ-করা শৌখিন নৌকোয়, উপরে ওড়ে নানা রঙের নিশান। জলকন্যা লুকিয়ে থাকে পাড়ের সবুজ বাঁশবনে, কান পেতে শোনে তার কথা; তার রূপোলি ঘোমটা মাঝে মাঝে হালকা হাওয়ায় উড়ে যায়, তার খশখশানি নৌকোর কেউ যদি শোনে তো মনে করে বুঝি একটা বুনো হাঁসের ডানা-ঝাপটানি কেঁপে গেলো।

কোনো-কোনো রাত্রে জেলেরা মশালের আলোয় মাছ ধরে; রাজপুত্রের কথাই বলাবলি করে তারা, কতো তার মহৎ কীর্তি। সে-সব কথা শুনতে-শুনতে জলকন্যার মন সুখে ভ'রে উঠে; ঢেউয়ের লড়াই ক'রে সেই-ই তো তাকে বাঁচিয়েছিলো, আর সে শুয়েছিলো তার হাতের উপর অবশ মাথা রেখে—কিন্তু সে তো তা জানে না, স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

শেষে সব মানুষই জলকন্যার প্রিয় হ'য়ে উঠতে লাগলো। আহা, সে যদি মানুষ হ'তো। কতো বড়ো মানুষের পৃথিবী, সমুদ্রের উপর দিয়ে জাহাজে ক'রে তারা উড়ে যায়, মেঘ-মাড়ানো পাহাড়ের চূড়োয় বেয়ে ওঠে; আর তাদের বন-জঙ্গল ধূ-ধূ কতো দূর চ'লে গেছে, অতো দূর জলকন্যার চোখ যায় না।

অনেক জিনিষের মানে সে বুঝতে চায়,' কিন্তু তার বোনেরা ভালো ক'রে জবাব দিতে পারে না। যেতে হোলো আবার তাকে বুড়ো ঠাকুমার কাছে—তিনি তো সমুদ্রের ওপরের দেশের অনেক খবর রাখেন।

যে সব দেশের মানুষ ডুবে মরে না, তারা কি চিরকাল বাঁচে? আমরা যারা সমুদ্রের তলায় থাকি—আমাদের মতো তারাও মরে না?

ঠাকুমা উত্তর দিলেন, মরে বৈ কি। আমাদের মতো মরতে হবে তাদেরও, তাদের জীবন আমাদের চাইতে অনেক ছোটো। আমরা বাঁচি তিনশো বছর, তার পর ম'রে সমুদ্রের ফেনা হ'য়ে ভেসে বেড়াই। অমর আত্মা নেই আমাদের, সেই পুনর্জন্ম। এক বার কেটে-ফেলা ঘাসের মতো আমরাও চিরকালের মতো যাই শুকিয়ে। কিন্তু মানুষের বেলায় শরীর ধূলো হ'য়ে গেলেও আত্মা বেঁচে থাকে; আমরা যেমন মানুষের বাড়ী-ঘর দেখবার জন্যে জল থেকে উঠি, তারা ওঠে ঊর্ধ্ব-আকাশের অজানা-অপরূপ রাজ্যের দিক, যাকে তারা বলে স্বর্গ,—আমরা তা দেখতে পারিনে।

আমাদের আত্মা নেই কেন? ছোট্টো জলকন্যা জিজ্ঞেস করলে,···আমি তো অনায়াসে তিনশো বছরের আয়ু ছেড়ে দিতে পারি, যদি একদিনের জন্যেও মানুষ হ'য়ে বাঁচতে পাই, যদি পাই স্বর্গের সেই বাড়ির খোঁজ।

ঠাকুমা বললেন, এ-সব কথা ভুলেও মনে আনিস নে। ঢের ভালো আছি আমরাই; কতো বেশি দিন বাঁচি, কতো সুখে থাকি।

একদিন তো মরতেই হবে; তারপর সমুদ্র আমাকে ফেনার মতো অবিশ্রান্ত আছড়াবে, চুরমার ক'রে ভেঙে উড়িয়ে দেবে হাওয়ায়, আর কখনো মাথা তুলে শুনবো না সমুদ্রের গান, কখনো দেখবো না সুন্দর ফুলগুলো, আর এই উজ্জ্বল সূর্য। আচ্ছা, ঠাকুমা, অমর আত্মা কি পাওয়া যায় না কিছুতেই;

পাগল! এ অবিশ্যি সত্যি কথা যে যদি কোনো মানুষ তোকে এতো ভালোবাসে যে তার বাবা-মা'র চেয়েও তুই প্রিয় হ'য়ে উঠিস, যদি সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোকেই চায়, আর বিয়ের মন্ত্র প'ড়ে শপথ ক'রে বলে যে চিরকাল তোকেই ভালোবাসবে সে; তা হ'লে অবশ্যি তার আত্মা উড়ে আসবে তোর মধ্যে, মানুষের সার্থকতা তুই জানবি। কিন্তু তা কি কখনো হ'তে পারে? আমাদের চোখে আমাদের শরীরের সবচেয়ে সুন্দর অংশ যেটা, সেই ল্যাজটাই তো তাদের চোখে পরম কুৎসিত, তারা ওটাকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। শরীরের সঙ্গে দু'টো বিদঘুটে খুঁটি না থাকলে নাকি ওদের চোখে সুন্দর দেখায় না—যাকে ওরা বলে পা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জলকন্যা নিজের শরীরের দিকে তাকালো: এমন সুন্দর, এমন নরম—কিন্তু ঐ তো একটা আঁশওয়ালা ল্যাজ।

ঠাকুমা বললেন, সুখী তো আমরাই। তিন শো বছর আমরা হেসে-খেলে, লাফিয়ে-সাঁতরে বেড়াবো—সেটা অনেক কাল—তার পর মরবো নিশ্চিন্ত হ'য়ে। আজ রাত্রে সভায় একটা নাচ আছে যে।

ঠাকুমা যে নাচের কথা বললেন, অমন জমকালো ব্যাপার পৃথিবীতে অবশ্যি কখনো দেখা যায়নি; সভার দেয়ালগুলো সব স্ফটিকের, যেমন পুরু তেমনি স্বচ্ছ; তাদের গায়ে সারে-সারে হাজার-হাজার শঙ্খ বসানো, কোনোটার গোলাপি রঙ, ঘাসের মতো সবুজ আবার কোনোটা; কিন্তু সবগুলোরই ভিতর থেকে তীব্র আলো বেরিয়ে আসছে, তাতে সমস্তটা ঘর আলোয় আলোময়। স্বচ্ছ দেওয়াল ছাড়িয়ে তাদের আলো জলেও অনেক দূর গিয়ে পড়েছে; তাতে ঝলমল ক'রে উঠছে লাখ-লাখ মাছের আঁশ—কোনোটা লাল, কোনোটা বেগুনি, কোনোটা সোনালি কি রুপোলি, একটা ছোটো, একটা-বা বড়ো।

সভার মাঝখান দিয়ে ব'য়ে চলেছে স্বচ্ছ উজ্জ্বল একটা স্রোত, তারই উপর নাচছে দলে-দলে জলপুরুষ আর জলকন্যা, তাদেরই নিজেদের অপরূপ কণ্ঠস্বরের তালে-তালে অমন মধুর নাচের ভঙ্গি পৃথিবীতে কখনো দেখা যায় নি। তারই মধ্যে ছোট্টো রাজকন্যাটির গলায় যেন সুরের ফোয়ারা, তেমন তো আর কারো নয়। হাততালি দিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানালে সবাই।

এতে সে খুশিই হ'লো। সমুদ্রে কি পৃথিবীতে তার চেয়ে অপরূপ স্বর কোনোখানেই নেই, এ সে ভালো ক'রেই জানে। একটু পরেই সে উপরকার পৃথিবীর কথা ভাবতে লাগলো; সুন্দর রাজপুত্রকে ভুলতে পারে না সে, তার যে অমর আত্মা নেই, এ-দুঃখ সামলাতে পারে না সে। পিতার প্রাসাদ থেকে সে পালিয়ে এলো; ভিতরে যখন ব'য়ে চলেছে উৎসবের স্রোত, তার ছোট্টো উপেক্ষিত বাগানে গিয়ে ব'সে রইলো সে চুপ ক'রে।

আচমকা সে শুনলে, শিঙার ফুঁয়ের শব্দ জলের উপর দিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে দূরে মিলিয়ে গেলো। মনে-মনে সে বললে, এই বুঝি সে বেরুলো শিকারে—যাকে আমি বাবা-মা'র চেয়েও বেশি ভালোবাসি, সব সময় ভাবি যার কথা, যার মধ্যে আমার জীবনের সব আনন্দ জ'মে রয়েছে। সব, সব বিপদ আমি নেবো—তাকে যদি পাই, আর পাই সেই সঙ্গে অমর আত্মা। আমার বোনেরা নাচুক রাজসভায়; আমি যাবো সেই ডাইনীর কাছেই—চিরকাল তাকে নিদারুণ ভয় ক'রেই এসেছি—কিন্তু এখন সে ছাড়া আমার তো উপায় নেই আর।

গেলো সে বাগান ছেড়ে; ফেনিয়ে-ওঠা যে-ঘূর্ণি ছাড়িয়ে ডাইনীর বাসা, গিয়ে দাঁড়ালো তার ধারে। এ-পথে সে আরো কখনো আসেনি। এ-পথে ফোটে না ফুল, মাড়াতে হয় না সাগর-ঘাস, সবুজ শ্যাওলা, পার হ'য়ে আসতে হ'লো ধু-ধু ধূসর বালুরাশি, তার ফেনিয়ে-ঘোরা ঘূর্ণিজল। রেলগাড়ীর চাকার মতো কোঁশ-কোঁশ ক'রে ঘুরছে সেখানকার জল··যা-কিছু কাছে পায়, টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যায় অতল পাতালে। এই ভীষণ জায়গা দিয়েই যেতে হ'লো তাকে ডাইনীর দেশে, যাবার আর পথ নেই যে। তারপর পেরোতে হ'লো একটা ডোবা, লিকলিকে পিছল কাদাগুলো টগবগ ক'রে ফুটছে, ডাইনী এটাকে নাকি বলে তার খেলার মাঠ। এর পরে একটা বনের মধ্যে তার বাসা—বাসাখানাও অদ্ভুত!

চার দিকে যতো গাছ আর ঝোপঝাড় সব ফণিমনসার জাত। যেন লক্ষমুণ্ড এককেটা সাপ ফণা উঁচু করে দাঁড়িয়ে: ডালগুলো ঠিক লম্বা লিকলিকে হাতের মতো, আঙুলগুলো জ্যান্ত পোকা; মূল থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতি অঙ্গ সমস্ত দিক নড়ছে, বাড়িয়ে দিচ্ছে নিজেকে। যা-কিছু তারা ধরে, এমন ক'রেই আঁকড়ে ধরে যে জন্মেও আর সে-সব ছাড়ানো যায় না।

এই ভীষণ বনের দিকে তাকিয়ে ছোটো জলকন্যা চুপ ক'রে একটু দাঁড়িয়ে রইলো। ভয়ে টিপটিপ করতে লাগলো তার বুক। নিশ্চয়ই সে তখুনি ফিরে যেতো, যদি না তার মনে পড়তে রাজপুত্রের কথা— আর অমরতা! কথাটা ভেবে তার সাহস বেশ বেড়ে গেলো। সে বেঁধে নিলে তার লম্বা চুল; যাতে ফণিমনসায় আটকে না যায়; বুকের উপর হাত দু'টি চেপে ধ'রে মাছের মতো দ্রুতবেগে জলের ভেতর দিয়ে শোঁ ক'রে চ'লে গেলো সে; পেরিয়ে এলো বিদঘুটে গাছগুলো, খামকাই তারা তার পিছনে ব্যগ্র হাত বাড়ালে।

এটা অবশ্যি সে লক্ষ্য না ক'রে পারলে না যে প্রত্যেকটি গাছের মুঠোর মধ্যে কিছু-না-কিছু আঁকড়ে ধরা, হাজার ছোট ছোট হাত লোহার বেড়ির মতো শক্ত হয়ে চেপে রয়েছে। সমুদ্রে ডুবে ম'রে কতো মানুষ এই পাতালে তলিয়ে গেছে; তাদের সাদা-সাদা কঙ্কাল এই ফণিমনসার মুঠোর মধ্যে থেকে বিকট দাঁত বার ক'রে হাসছে। তারা জড়িয়ে রয়েছে ডাঙার জন্তুদের কতো-কতো মুণ্ড, বুকের পাঁজর, আর আস্ত কঙ্কাল! নানা জিনিসের মধ্যে এক জলকন্যাও দেখা গেলো; তাকে তারা আঁকড়ে ধ'রে গলা টিপে মেরেছে। কী ভীষণ দৃশ্য বেচারা ছোটো রাজকন্যার চোখের সুমুখে!

যাই হোক, এই আতঙ্কের বনের ভিতর দিয়ে সে নির্বিঘ্নে তো পার হ'লো। তারপর পিছল কাদা-ভরা একটা জায়গা; মস্ত মোটা মোটা শামুকরা সেখানে গুড়গুড় ক'রে বেড়াচ্ছে, আর তারই মাঝখান ডাইনীর বাড়ি—যত দুর্ভাগা জাহাজ ডুবে মরেছে, তাদের হাড় দিয়ে তৈরী। এখানে ব'সে ডাইনী কুচ্ছিৎ একটা কোলাব্যাঙকে আদর করছিলো, আমরা যেমন পোষা পাখিকে আদর করি। বিকট মোটা মোটা শামুকগুলোকে সে পায়রা ব'লে ডাকে—তারা তার সারা গায়ে অনায়াসে হাত-পা ছড়িয়ে বেড়ায়।

ডাইনী বললে, কী চাও তুমি আমার কাছে তা আমি জানি। তুমি একটা আস্ত বোকা, কিন্তু তুমি যা চাও তা-ই হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভয়ানক বিপদে পড়বে তুমি—ওগো ফুটফুটে রাজকন্যে, এ-কথা তোমাকে আগেই ব'লে রাখছি। ল্যাজটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না—এই তো? চাও তুমি তার বদলে মানুষের মতো দু'টো ঠ্যাঙ—এই তো? তা-হ'লে রাজপুত্র তোমাকে ভালোবাসবেন, তুমি পাবে অমর আত্মা। তা-ই নয় কি? এ-কথা ব'লে ডাইনী এতো চেঁচিয়ে হেসে উঠলো যে তার পোষা শামুক ব্যাঙগুলো চমকে লাফিয়ে তার সারা গা থেকে ঝ'রে পড়লো।

ঠিক সময়েই তুমি এসেছো,—ডাইনী বলতে লাগলো। যদি সূর্যাস্তের পরে আসতে তা-হ'লে আর এক বছরের মধ্যেও তোমার জন্য কিছু করবার সাধ্যি আমার থাকতো না। তোমাকে দেব খানিকটে মন্ত্র-পড়া জল, তা নিয়ে তুমি সাঁতরে ডাঙায় যাবে, তীরে ব'সে সেটা খাবে। অমনি তোমার ল্যাজ খ'সে পড়বে, গজিয়ে উঠবে লম্বা দু'টো কাঠি, মানুষের আদরের পা। কিন্তু মনে রেখো—ভীষণ লাগবে, দারুণ কষ্ট পাবে; মনে হবে তোমার শরীরের ভেতর দিয়ে কেউ ধারালো একটা ছুরি চালিয়ে গেলো। এই রূপান্তরের পর যে-যে দেখবে তোমাকে, সে-ই ব'লে উঠবে তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী কন্যা। থাকবে তোমার ভঙ্গির লাবণ্য, এতো হালকা পা কোনো নর্তকীর নয়; কিন্তু প্রতি বার পা ফেলতে তোমার অসহ্য যন্ত্রণা হবে—হাঁটছো যেন খোলা তলোয়ারের ধারের উপর দিয়ে, রক্ত পড়বে স্রোতের মতো। পারবে তুমি এতো কষ্ট সহ্য করতে? যদি পারো, তাহলেই তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করি।

পারবো, পারবো, ক্ষীণস্বরে বললে রাজকন্যা। মনে পড়লো তার রাজপুত্রকে, এতো দুঃখে তাকেই তো পাবে সে—আর পাবে অমর আত্মা।

ডাইনি বলতে লাগলো,—ভেবে ছাখো—একবার মানুষ হয়েছো কি আর কোনো দিন জলকন্যা হ'তে পারবে না। পারবে না কখনো বোনেদের কাছে ফিরতে, যেতে পারবে না বাপের বাড়ি—আর যদি এমন হয় যে রাজপুত্র তোমাকে এমন একান্ত ভালোবাসলো না যে তোমার জন্যে সে বাবা-মা'কে ছাড়তেও প্রস্তুত হ'তে পারে, যদি তুমি তার সমস্ত ভাবনায় আর প্রার্থনায় জড়িয়ে যেতে না পারো, যদি না বিশপের মন্ত্রে তোমাদের বিয়ে হয়—তাহ'লে যে অমরতা তুমি চাও তা কখনো পাবে না, কখনো না। যে রাত্রে রাজপুত্র অন্য একজনকে বিয়ে করবে, সে রাত্রি ভোর হ'তেই তোমার মৃত্যু। দুঃখে তখন চুরমার হ'য়ে যাবে তোমার বুক, সমুদ্রের ফেনা হ'য়ে ভাসবে তুমি।

মুমূর্ষুর মতো ম্লানমুখে জলকন্যা বললে, তবু, তবু আমি সাহস করবো।

আরেকটা কথা। আমাকেও তোমার কিছু দিতে হবে তো— এতো কাণ্ড করা কি সহজ কথা! সমুদ্রের তলায় তোমাদের সকলের কণ্ঠই মধুর, তার মধ্যে সবচেয়ে মধুর তোমার কণ্ঠ। তাই দিয়ে রাজপুত্রকে মুগ্ধ করবে ভেবেছো তো? কিন্তু তোমার এই কণ্ঠস্বরই আমি চাই। তোমার মধ্যে সবচেয়ে যেটা ভালো জিনিস, তাই এই মন্ত্র পড়া জলের দাম; নিজের রক্ত মিশিয়ে সেটা তৈরি করবো আমি—খোলা তলোয়ারের মতো ধার হবে তো তার সেই জন্যেই।

জলকন্যা বললে, আমার কণ্ঠই যদি কেড়ে নিলে তো আমার আর রইলো কী? কী দিয়ে রাজপুত্রকে মুগ্ধ করবো।

রইলো তোমার অঙ্গের লাবণ্য, থাকলো তোমার ভঙ্গির শ্রী, তোমার কথা ভরা দৃষ্টি। এসব জিনিস মানুষের তরল চিত্তকে মুগ্ধ করা সহজই হবে। বেশ! সাহসে কুলোবে তো? জিভ বার করো—ওটা কেটে নিয়ে আমি নিজে রাখবো! মন্ত্র পড়া জলের এই দাম।

তবে তাই হোক। বললে জলকন্যা।

ডাইনী তখন ফুটন্ত কড়াইতে সেই বিষ তৈরি করতে লাগলো। আগে সে কড়াইটা ব্যাঙ-শামুক দিয়ে বেশ ভালো করে মুছে নিলে, বললে, বিশুদ্ধ ভাবে সব করতে হয়। তারপর তার বুকে একটু আঁচড় কাটলো, কালো-কালো রক্ত গড়িয়ে পড়লো কড়াই গলানো আলকাতরার মতো। সঙ্গে সঙ্গে অনেক মশলা ঢালা হ'লো। তারপর কড়াই থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধোঁয়া উঠতে লাগলো এমন বিকট বীভৎস মূর্তিতে যে দেখলে ভয়ে মূর্চ্ছা যেতে হয়। তার ভেতর থেকে আবার কঁকানি গোঙানির আওয়াজ আসছে—অনেকটা কুমীরের কান্নার মতো। অনেকক্ষণ পরে মন্ত্র-পড়া জল পরিষ্কার জলের মতোই টলটলে দেখা গেলো—তৈরি হয়েছে।

ডাইনী বললে জলকন্যাকে,—তবে, এই নাও। সঙ্গে সঙ্গে তার জিভটা টেনে কেটে ফেললো। বোবা হ'য়ে গেলো ছোট্টো

জলকন্যা—না পারে সে কথা বলতে, না পারে গাইতে। যাবার সময় ডাইনা ব'লে দিলে, 'যদি ফণিমনসারা তোমাকে ধরতে আসে, এই জলের একটুখানি ছিটিয়ে দিয়ো—তাদের ডানাগুলি হাজার টুকরো হ'য়ে ছিঁড়ে যাবে।

কিন্তু এ উপদেশের কোনোই দরকার ছিলো না। চকচকে শিশিটা তার হাতে তারার মতো ঝলমল করছে—তাই দেখেই ভয়ে ম'রে গেলো ফণিমনসারা। পার হ'য়ে এলো সে ভীষণ বন, পার হ'য়ে এলো ডোবা, ছাড়িয়ে এলো ফেনিয়ে ঘোরা চরকি-জল।

এইবার সে বাবার প্রাসাদের দিকে তাকালো। নিবে গেছে সভার আলো, সবাই ঘুমিয়েছে। ভিতরে সে কেমন ক'রে যাবে—গেলে তো কোনো কথাই বলতে পারবে না? শেষবারের মতো ছেড়ে যেতে হ'চ্ছে এই বাড়ি—কষ্টে তার বুক প্রায় গেলো ভেঙে। লুকিয়ে সে গেলো বাগানে, প্রতি বোনের কুঞ্জ থেকে একটি ক'রে ফুল নিলে ছিঁড়ে নিজেরই হাতে, চুমো খেলো অনেক বার; তারপর ঘন-নীল জলের ভিতর দিয়ে ভেসে উঠলো সে উপরের পৃথিবীতে।

তখনো সূর্য ওঠেনি। রাজপুত্রের প্রাসাদে পৌঁছিয়ে পরিচিত শাদা সিঁড়ি দিয়ে সে উঠে এলো। আকাশে তখনো চাঁদ জ্বলছে; ছোট্টো জলকন্যা শিশিতে ভরা মন্ত্র-পড়া জল ঢেলে দিলে গলায়। ধারালো ছুরির মতো সেটা যেন তার ভিতরটাকে ছিঁড়ে দিয়ে গেলো, মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল সে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙলো তার মূর্চ্ছা, সমস্ত শরীর অসহ্য যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে। যাক, পুড়ে যাক। তবু তো সে পেলো তার এতো আরাধনার ফল, দেখতে পেলো অপরূপ রাজপুত্রকে ঠিক তার সামনে, রাত্রির মতো কালো চোখ মেলে তারই দিকে তাকিয়ে থাকতে। লজ্জা পেয়ে নিজের চোখ সে নামিয়ে নিলে। এ কী! কোথায় তার মাছের মতো ল্যাজ? কোমল মসৃণ দু'টি পা নেমে এসেছে যে! কিন্তু কোনো আবরণ নেই তার: বৃথাই সে চেষ্টা করলে তার লম্বা ঘন চুল দিয়ে নিজেকে ঢাকতে।

রাজপুত্র জিজ্ঞেস করলে, সে কে, কী ক'রেই বা এখানে এলো! উত্তরে সে তার উজ্জ্বল-নীল চোখ দু'টো বড়ো ক'রে মেলে তাকালো, একটু হাসলো—হায়, সে তো কথা বলতে পারে না। রাজপুত্র তাকে হাতে ধ'রে প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেলো। ডাইনী ঠিকই বলেছিলো: তার এমন লাগলো যেন খোলা তলোয়ারের ধারের উপর দিয়ে হাঁটছে সে, কিন্তু সে-কষ্টটা অনায়াসেই সে সহ্য করলে, এগিয়ে গেলো সে দখিনী হাওয়ার মতো হালকা পায়ে; যে দেখলো তাকে সে-ই অবাক হ'লো তার লঘুলীলার লাবণ্য দেখে।

প্রাসাদে ঢুকলো সে, তার জন্য আনা হ'লো রেশমের আর মশলিনের বাহারে কাপড়; সেখানে যারা থাকে, তার মতো সুন্দর কেউ নয়—কিন্তু সে না পারে কথা বলতে, না পারে গান গাইতে। রাজা-রাণী আর রাজপুত্রের সামনে রোজ গান করে কয়েক জন দাসী, তাদের রেশমি কাপড়ে সোনালি বুটি তোলা; তাদের মধ্যে একজনের পরিষ্কার সুন্দর গলা শুনে রাজপুত্র খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠলেন। তাতে জলকন্যার মনে বড়ো কষ্ট হ'লো; সে তো জানে এর চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর ছিলো তার গান। সে ভাবতো, হায় রে, তার জন্যে যে আমি আমার অমন কণ্ঠস্বর চিরকালের মতো খুইয়ে বসেছি, তা তো সে জানেই না!

দাসীরা নাচতে শুরু করলো। তখন উঠলো আমাদের জলকন্যা; লীলায়িত শুভ্র দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়ে মৃদু ভঙ্গিতে যেন হাওয়ায় সে ভেসে বেড়াতে লাগলো। প্রতিটি ভঙ্গিতে ফুটে উঠলো তার অঙ্গের নিখুঁত লাবণ্যের ছন্দ; তার উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে যে-কথা ঝলমল করে উঠলো তা দাসীদের গানের চাইতে অনেক নিবিড় হ'য়ে মর্মে গিয়ে বাজলো।

সকলেই মুগ্ধ হ'লো, সবচেয়ে মুগ্ধ হলো রাজপুত্র। সে তাকে ডাকলে আমার কুড়িয়ে পাওয়া সোনা। বার-বার নাচলো সে, যদিও প্রতিটি পা ফেলতে অসহ্য যন্ত্রণা হ'লো তার। রাজপুত্র ব'লে দিলে সে সব সময় তার সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে; তারই পাশের ঘরে মখমলের বালিশে মশলিনের বিছনা পাতা হ'লো জলকন্যার।

রাজপুত্র তাকে পুরুষের পোশাক তৈরি করিয়ে দিলে; ঘোড়ায় চ'ড়ে সে যখন বেরোবে, এই কুড়িয়ে-পাওয়াও যাবে তার সঙ্গে। এক সঙ্গে কতো সুগন্ধি বনে তারা বেড়ালো, সবুজ ডালপালা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে গেলো কাঁধ, নতুন পাতার ঘনতার মধ্যে লুকোনো পাখিদের গানের জলশায় কী ফুর্তি! উঠলো জলকন্যা তার সঙ্গে খাড়া পাহাড়ে, নরম পা ফেটে রক্ত বেরুলো, অমনি অনুচরেরা ছুটে এলো হাঁ-হাঁ ক'রে। কিন্তু একটু মুচকি হেসে উঠলো রাজপুত্রের সঙ্গে আরো উঁচুতে; সেখানে দেখা যায় মেঘেরা পায়ের নিচে হেসে-খেলে গড়াগড়ি যাচ্ছে; ছুটছে এ-ওর পিছনে, যেন একঝাঁক পাখি দেশান্তরে চলেছে উড়ে।

রাত্রে, প্রাসাদের সবাই যখন ঘুমে বিভোর, জলকন্যা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে আস্তে নেমে এসে জলে পা ডুবিয়ে ব'সে থাকে। তখন তার মনে পড়ে জলের নিচে তার প্রিয়জনদের।

একদিন রাত্রে, তখন সে সিঁড়িতে ব'সে পা ধুচ্ছে, তার বোনেরা সাঁতরে এলো সেখানটায়, একসঙ্গে, হাতে হাত ধ'রে, গান গাইতে গাইতে। কী করুণ সে-গান! সে ডাকলে তাদের; বোনেরা তাকে দেখেই চিনতে পারলে; সে চ'লে আসায় তাদের বাড়িতে কতো দুঃখ সে-কথা তাকে না-ব'লে পারলে না। এর পর থেকে বোনেরা রোজ রাত্রেই আসে। একবার সঙ্গে ক'রে বুড়ো ঠাকুমাকেও নিয়ে এসেছিলো—অনেক দিন জলের উপরকার দেশটি দেখেননি তিনি। একদিন সাগর-রাজাও এলেন, মাথায় তাঁর সোনার মুকুট; কিন্তু এরা দু'জন ডাঙার খুব কাছে ভিড়তে সাহস পেলেন না, মেয়ের সঙ্গে তাই কোনো কথাই বলা হ'লো না।

এদিকে ছোট্টো জলকন্যাটি ক্রমেই রাজপুত্রের বেশি প্রিয় হ'য়ে উঠছে। কিন্তু তার কাছে সে কুড়িয়ে-পাওয়া সোনাই, তার বেশি কিছু নয় সে; ফুটফুটে মিষ্টি খুকুমণি—তাকে বিয়ে করবার কথা তার মাথায়ই এলো না কখনো। কিন্তু বিয়ে না করলে কী ক'রে পাবে সে অমর আত্মা? বিয়ে তাকে করতেই হবে—নয়তো ফেনা হ'য়ে যাবে সে, ছুটতে হবে তাকে চিরকাল, সমুদ্রের অশ্রান্ত ঢেউয়ের ধাক্কা স'য়ে-স'য়ে।

রাজপুত্র যখন তাকে বুকে নিয়ে আদর করেন, তার চোখ যেন জিজ্ঞেস করে, তুমি কি আর-সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসো না আমাকে?

রাজপুত্র বলেন, সবচেয়ে তোমাকেই তো ভালোবাসি—তোমার মতো ভালো আর কে? তুমিও তো আমাকে কম ভালোবাসো না?

একবার একটি মেয়েকে পলকে দেখেছিলেম, আর বোধ হয় কখনোই দেখবো না—তুমি অনেকটা তার মতোই। ছিলেম একবার এক জাহাজে, ডুবলো জাহাজ, ঢেউয়ের ঘা খেয়ে-খেয়ে ঠেকলেন গিয়ে তীরে এক গির্জের ধারে, সেখানে একদল মেয়ে পুজো-অর্চনা নিয়ে আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটোটি কুড়িয়ে পেলো আমাকে, প্রাণ বাঁচালো আমার। একবার শুধু তাকে আমি দেখেছিলাম, কিন্তু তার ছবি আমার স্মৃতিতে আঁকা হ'য়ে গেছে, তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারবো না। কিন্তু সে তো দেবতার সেবিকা, কী ক'রে পাবো তাকে? তুমি তার মতোই দেখতে, সেইজন্যই বুঝি এসেছো আমাকে সান্ত্বনা দিতে? আমাকে কখনো ছেড়ে যেয়ো না।

জলকন্যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলে, হায় রে, সে তো জানে না আমিই তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলুম! দুরন্ত ঢেউগুলোর উপর দিয়ে তাকে তুলে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলুম বনের মধ্যে সেই গির্জের ধারে; বসেছিলুম পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে—এক্ষুণি কেউ এসে পড়বে, এই আশায়। তারপর দেখলেন সেই সুন্দর মেয়েটিকে এগিয়ে আসতে—তাকেই সে ভালোবাসে আমার চেয়ে বেশি! সে আরেক বার দীর্ঘশ্বাস ফেললো, জলকন্যা তো কাঁদতে পারে না। সে-মেয়ে নাকি দেবতার সেবিকা, মন্দির ছেড়ে কখনো আসতে পারবে না, আর তো তাদের দেখা হবে না। আমি আছি সব সময় তার সঙ্গে-সঙ্গে, রোজ তাকে দেখি; আমি তাকে ভালোবাসবো, সমস্ত জীবনটা উৎসর্গ করবো তাকেই।

এদিকে রাজ-অমাত্যরা বলাবলি করে, প্রতিবেশী রাজার মেয়ের সঙ্গে আমাদের রাজপুত্রের তো বিয়ে। মস্ত জাহাজ সাজানো হ'চ্ছে সেই জন্যেই। সকলকে জানানো হয়েছে তিনি দেশভ্রমণে বেরোচ্ছেন, আসলে কিন্তু যাচ্ছেন রাজকন্যাকে আনতে, লোকজন সৈন্য-সামন্ত বিস্তর যাবে সঙ্গে। এ-সব কথা শুনে জলকন্যা মুচকি হাসে; রাজপুত্রের মনের আসল ভাবখানা তার চেয়ে ভালো কে জানে!

একদিন রাজপুত্র তাকে বললে, আমাকে তো যেতে হ'চ্ছে। সুন্দরী রাজকন্যাকে দেখতে যেতেই হবে আমাকে, আমার মা-বাবার ইচ্ছে তা-ই। কিন্তু সেই মেয়েকে বিয়ে ক'রে ঘরে আনতেই হবে—এমন কোনো জোর তাঁরা করবেন না। অবশ্যি আমার পক্ষে তাকে ভালোবাসাও অসম্ভব; গির্জের সেই মেয়ের মতো তুমি দেখতে ব'লে কি আর সে-ও তেমন হবে? যদি বিয়ে করতেই হবে, বরং তোমাকেই করবো—আমার কুড়িয়ে-পাওয়া সোনা, মুখে কথা নেই, চোখ-ভরা কথা। এই ব'লে সে তার চুলগুলো আঙুলে জড়িয়ে একটু আদর করলে; সঙ্গে-সঙ্গে জলকন্যার মন মানুষের সার্থকতা আর অমর আনন্দের মধুর স্বপ্নে দোলা দিয়ে উঠলো।

জমকালো জাহাজে চ'ড়ে প্রতিবেশী রাজার দেশে যেদিন যাত্রা, সেদিন রাজপুত্র বললে জলকন্যাকে, জাহাজে তার পাশে দাঁড়িয়ে, 'সোনা আমার, সমুদ্রে তোমার ভয় করে না তো?' তারপর বললে, 'ঝড়ে সমুদ্রে কেমন পাগল হ'য়ে উঠে। জলের নিচে থাকে কতো অদ্ভুত মাছ, কতো আশ্চর্য জিনিস যা ডুবুরিরা দেখে।'

জলকন্যা একটু হাসলো এ-সব কথা শুনে। সমুদ্রের তলায় কী আছে না আছে তা কি আর তার চেয়ে ভালো জানে পৃথিবীর কোনো মানুষ?

রাত্রে চাঁদ উঠেছে আকাশে, জাহাজের সবাই ঘুমিয়ে, সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সে ব'সে থাকলো। জাহাজ চলেছে সমুদ্রকে চিরে, জল উঠছে ফেনিয়ে। সেদিকে তাকাতেতাকাতে তার মনে হ'লো। সে যেন তার বাবার প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে তার ঠাকুমার রূপোলি মুকুট। তারপর দেখলো তার বোনেরা জল থেকে উঠে আসছে, ভারি ম্লান তাদের মুখ, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তার দিকে। সে হাসলো তাদের দিকে তাকিয়ে; সে যেমনটি চেয়েছিলো ঠিক তেমনটি সব ঘটছে, এই কথা তাদের বোঝাতে যাবে, এমন সময় সেখানে এসে পড়লো একজন খালাশি। তাকে দেখেই বোনেরা হঠাৎ এমন ডুব দিলে জলের মধ্যে যে, খালাশি ছোকরা মনে করলে জলের উপর সে শুধু ফেনাই দেখছিলো—আর কিছু নয়।

পরের দিন সকালে জাহাজ ঢুকলো রাজধানীর বন্দরে। বাজলো শঙ্খ, বাজলো জয়ঢাক, সেনা-সামন্ত মিছিল ক'রে গেলো শহরের ভিতর দিয়ে, উড়লো নিশেন, চললো ঝলসানো সঙিন উঁচিয়ে তুরুক সোয়ার। রোজই নতুন-নতুন আমোদ, নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া লেগেই আছে। কিন্তু রাজকন্যা তখন সেখানে নেই, তাকে পাঠানো হয়েছে দূরের দেশে লেখাপড়া শিখতে, রাজবংশের সবরকম গুণপনা সেখানে সে আয়ত্ত করছে। কিছুদিন পরে, সে ফিরলো দেশে।

এই আশ্চর্য রাজকন্যাকে দেখতে ছোটো জলকন্যা কিছু উৎসুকই ছিলো,—যখন দেখলো স্বীকার করতে বাধ্য হ'লো,—সুন্দরী বটে, এতো সুন্দর কোনো মেয়ে সে কখনো দেখেনি।

রাজকন্যার গায়ের চামড়া এমন শাদা আর নরম যে তার ভিতর দিয়ে নীল শিরাগুলো যেন স্পষ্ট ফুটে বেরিয়েছে; বাঁকা ভুরুর নিচে ঝকঝক করছে কালো একজোড়া চোখ।

এ যে সে-ই! রাজপুত্র ব'লে উঠলো তাকে দেখেই। এ-ই তো আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলো—মড়ার মতো যখন প'ড়েছিলুম সমুদ্রের ধারে! সলজ্জ বধূকে সে নিলে কাছে টেনে। তারপর কুড়িয়ে-পাওয়া বোবা জলকন্যাকে বললে, আজ আমার সুখের সীমা নেই। যা আমি আশা করতে সাহস পাইনি, তা-ই হয়েছে। আমার সুখে তুমিও কি আজ সুখী হবে না?—আশে-পাশের সকলের মধ্যে তুমিই তো আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো।

বোবা জলকন্যা দুঃখে একবার রাজপুত্রের হাত চেপে ধরলে। এখনই ভেঙে যাচ্ছে তার বুক; যদিও সেই বিয়ের রাত এখনো ভোর হয়নি, আসেনি তার মরণের দিন।

আবার গির্জের বাজলো ঘণ্টা, দূতেরা বেরুলো শহরের পথে-পথে আসন্ন বিবাহের ঘোষণা নিয়ে। বেদীতে জ্বললো রূপোর প্রদীপে সুগন্ধি আগুন, বিশপ সোনার ধূপতিতে ধুনো দিলে, বর-বধূ হাতে হাত রাখলো, উচ্চারিত হ'লো বিবাহের পবিত্র মন্ত্র।

ছোটো জলকন্যা পরেছে আজ রেশমের আর সোনার কাপড়, রাজকন্যার ওড়নার আঁচল ধ'রে পিছনে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু না দেখছিলো সে এই শুভ অনুষ্ঠান, না শুনছিলো গুরুগম্ভীর বিয়ের বাজনা। শুধু সে ভাবছিলো তার আসন্ন অবসানের কথা; তার মনে হ'লো পৃথিবী ও স্বর্গ দুই-ই সে হারালো!

সেই সন্ধ্যেতেই বর-বধূ জাহাজে গেলো ফিরে।

কামান, হাওয়ায় উড়লো পৎপৎ নিশেন, আর জাহাজের খোলা ছাদে সোনালি কাপড়ের অপরূপ শামিয়ানার তলায় কিংখাবের নরম জাজিম পাতা হ'লো,—বর-বধূ রাত্রে সেখানে শোবে। অনুকূল হাওয়া উঠলো; নীল জলের উপর দিয়ে জাহাজ হালকা ছন্দে চললো দুলে-দুলে।

অন্ধকার হবার সঙ্গে-সঙ্গেই রাশি-রাশি রঙিন আলো জ্ব'লে উঠলো, ছাদের উপর শুরু হ'লো নাচ। জীবনে প্রথম বার সমুদ্র থেকে মাথা তুলে যে-দৃশ্য সে দেখেছিলো জলকন্যার তা মনে প'ড়ে গেলো। এ দৃশ্যও তেমনি জমকালো—তাকেও যোগ দিতে হ'লো নাচে, জাহাজের তক্তার উপর পাখির মত হালকা পায়ে সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। মুগ্ধ হ'য়ে গেলো সবাই: এতো সুন্দর সে-ও কখনো নাচে নি। ভীষণ লাগলো তার ছোটো দু'টি পায়ে; কিন্তু সে-কষ্ট যেন তার আজ লাগলোই না—অনেক বেশি কষ্ট যে তার মনে?

আজকের পরে সে আর তাকে দেখবে না—যার জন্যে সে ছেড়ে এসেছে বাড়ি-ঘর, মা বাবা হারিয়েছে তার মধুর কণ্ঠস্বর, রোজ সয়েছে অসহ্য যন্ত্রণা—আর সেই মানুষটি এক ফোঁটা সন্দেহও করে না তার জন্যেই তো সে এতো সব করছে! আজই শেষ! এর পরে সে আর নিশ্বাসে সেই বাতাস টানবে না যে-বাতাসে তার প্রিয়তমের জীবন; আর দেখবে না ঘন-নীল সমুদ্র, তারায় ছাওয়া আকাশ। আসছে চিরন্তন রাত্রি—সেখানে আর কোনো ভাবনা নেই, কোনো স্বপ্ন নেই। জাহাজের উপর ব'য়ে চলেছে ফুর্তির স্রোত; সে-ও দুপুর রাত পর্য্যন্ত সকলের সঙ্গে হাসলো, নাচলো—মনের মধ্যে তার নিঃশেষ-হ'য়ে-যাওয়া মৃত্যুর ভাবনা। তারপর রাজপুত্র গেলো তার সুন্দরী বধূকে নিয়ে জমকালো শামিয়ানার নিচে বিশ্রাম করতে।

এখন সব চুপচাপ; হাল ধ'রে একা একজন মাল্লা দাঁড়িয়ে। জাহাজের সিঁড়িতে শাদা হাত দু'টি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পুবের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। কখন ভোর হবে? সূর্য্যের প্রথম আলোর রেখাই তো তার মৃত্যুর তলোয়ার। তার বোনেরা জল থেকে এলো উঠে, মৃত্যুর মতো ম্লান তাদের মুখ; এতো সুন্দর লম্বা চুল তাদের ছিলো, ঘাড়ের উপর দিয়ে ফুরফুর ক'রে উড়তো—এখন আর নেই।

কী হ'লো চুল?

'চুল দিয়েছি আমরা ডাইনীকে,'—তারা বললে। 'যাতে তোকে মরতে না হয়, যাতে সে তোর জন্যে কিছু করে। ডাইনী দিয়েছে এই ছুরিটা তোর জন্যে, এই নে। সূর্য্য উঠবার আগেই এই ছুরিটা তোকে রাজপুত্রের বুকে দিতে হবে বসিয়ে; যেই তার গরম রক্তের ফোঁটা তোর পায়ের উপর পড়বে, অমনি আবার তোর ল্যাজ হ'য়ে যাবে। আবার তুই হবি জলকন্যা, সমুদ্রের ফেনা হ'য়ে যাবার আগে বাঁচতে পারবি তিনশো বছর। শীগগির কর শীগগির! সূর্য্যোদয়ের আগে হয় সে মরবে, নয় মরবি তুই! বুড়ো ঠাকুমা আমাদের রোজই কাঁদে তোর জন্যে,—কাঁদতে-কাঁদতে চোখ তাঁর অন্ধ হ'য়ে গেছে, মাথার চুল সব প'ড়ে গেছে—যেমন গেছে আমাদের চুল ডাইনীর কাঁচিতে। মেরে ফ্যাল, মেরে ফ্যাল রাজপুত্রকে, তারপর আয় আমাদের কাছে। এক্ষুণি! এক্ষুণি! দেখছিসনে পুবের আকাশে গোলাপি আভা, সূর্য্য উঠলো ব'লে। সূর্য্য উঠলেই তো তোর শেষ, সব শেষ! এই ব'লে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা মিলিয়ে গেলো।

বর-বধূ যেখানে শুয়ে, ছোটো জলকন্যা তার সোনালি পর্দা সরিয়ে ঢুকলো; তাকিয়ে দেখলো রাজপুত্রকে, চুমু খেলো তার কপালে; তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো আলো প্রতি মুহূর্তেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। রাজপুত্র ঘুমের মধ্যে অস্ফুট স্বরে কী বললে—তার বধূর নাম; তার স্বপ্ন সে দেখছে, শুধু তারই—এদিকে জলকন্যার হাতে কাঁপছে সেই সর্বনেশে ছুরি!

হঠাৎ সে দূরে ফেলে দিলে মৃত্যুর সেই ধারালো জিহ্বা; জলন্ত লাল ঢেউগুলো লাফিয়ে উঠলো সব দিকে; ঢেউয়ের উপর দিয়ে নেচে চললো যেন এক পাগলি মেয়ে, মুকুট তার টাটকা রক্তে ছোপানো। তার প্রিয়তম রাজপুত্রের দিকে শেষবার যে-চোখ মেলে জলকন্যা তাকালো তা ক্রমেই স্থির, ঘোলাটে হ'য়ে এলো। তারপর সে জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো সমুদ্রে, ঠিক বুঝতে পারলে সে, তার শরীর আস্তে-আস্তে ফেনা হ'য়ে গ'লে যাচ্ছে।

জলের বিছানা থেকে উঠলো সূর্য্য। এমন কোমল উষ্ণ হ'য়ে আলোর পাপড়িগুলো পড়লো তার সারা গায়ে যে, জলকন্যা প্রায় বুঝতেই পারলে না যে সে মরেছে। এখনো সে দেখছে জ্যোতির্ময় সূর্য্যকে, তার মাথার উপর ভাসছে হাজার-হাজার স্বচ্ছ সুন্দর মূর্তি! এখনো তার চোখে ভেসে উঠছে জাহাজের পাল, রাঙানো উষার আলোর নাচ! মাথার উপরে সেই অশরীরী জীবদের কণ্ঠস্বরে ঝ'রে পড়ছে সুর—তা এমনি মধুর, এমনি কোমল যে মানুষের কানে সে-শব্দ ধরাই পড়ে না, যেমন ধরা পড়ে না মানুষের চোখে তাদের মূর্তি। তাকে ঘিরে তারা ঘুরে-ঘুরে উড়ে বেড়ালো,—যদিও পাখা তাদের নেই—নিজেদের লঘুতা ইচ্ছার বেগে তাদের ঠেলে উড়িয়ে নিয়ে যায়। শেষটায় জলকন্যা দেখলো যে তার শরীরও ওদের মতো হালকা হ'য়ে যাচ্ছে; মনে হ'লো কে যেন তাকে সমুদ্রের ফেনা থেকে আস্তে-আস্তে ঠেলে তুলছে উপরের দিকে। কোথায় আমি? যাচ্ছি কোথায়? সে জিজ্ঞেস করলে। তার কণ্ঠস্বর বেরুলো, শোনালো ঠিক ঐ আকাশকন্যাদের মতো। সে শব্দ অলৌকিক, শান্ত, স্নিগ্ধ! তার মধুর কোমলতা অন্তরের গহনতলে নিবিড় হ'য়ে ঝ'রে পড়লো।

আকাশ-কন্যাদের একজন বললে, তুমি যে আমাদের মধ্যে এসে পড়েছো! আজ হ'তে তুমিও যে আকাশ-কন্যা! জলকন্যার অমর আত্মা নেই; কোনো মানুষের ভালোবাসা পেলে তার আত্মা অমর হ'য়ে ওঠে! তার অনন্ত জীবন নির্ভর করে অপরের উপর। অমর আত্মা আকাশ-কন্যাদেরও নেই। আমরা তা অর্জন করি নিজেদের ভালো কাজের জোরে। আমরা উড়ে যাই গরম দেশে; যেখানে পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা বিষাক্ত হাওয়ার ঝাপটায় ধুঁকছে। আমাদের স্নিগ্ধ নিশ্বেসে হাওয়ার বিষ চ'লে যায়, তাদের প্রাণ বাঁচে। বাতাসের মধ্যে আমরা ছড়িয়ে যাই ঠাণ্ডা হাওয়া, তাকে সুরভিত ক'রে তুলি ফুলের মিষ্টি গন্ধে; এমনি ক'রে সমস্ত পৃথিবীতে বিলিয়ে যাই স্বাস্থ্য আর আনন্দ। তিনশো বছর ধ'রে এমনি সুকীর্তির জোরে আমরা অমরতা লাভ করি—মানুষের চিরন্তন সার্থকতার অংশীদার হই। আর তুমি ছোটো জলকন্যা—তুমি তোমার প্রাণপণ ক'রে রাজপুত্রকে বাঁচিয়েছো; হৃদয়ের প্রেরণায় মানুষের প্রেমের জন্য

এতো করেছো, এতো দুঃখ পেলে আমাদের মতো মানুষের সেবায়—এখন তুমি অপরূপ দেহ নিয়ে উঠে এসেছো পরিদের আকাশে; এখন তিনশো বছর ধ'রে সুকাজ করলে অমর আত্মা লাভ করতে পারবে।

ছোট্টো জলকন্যা স্বর্গের দিকে বাড়িয়ে দিলে তার আলোক-উজ্জ্বল দৃষ্টি, তার সরল কোমল দু'টি স্বচ্ছ দীপ্ত বাহু; তারপর জীবনে প্রথম বার জলে ভিজে উঠলো তার চোখ।

এদিকে জাহাজে সবাই উঠেছে জেগে, আবার শুরু হয়েছে উৎসব। সে দেখলো রাজপুত্র নববধূকে নিয়ে ব'সে আছে: তাকে খুঁজে না পেয়ে তাদের মন বড়ো খারাপ; ম্লান মুখে তারা তাকিয়ে আছে নিচু মুখে ঢেউয়ের ফেনার দিকে—যেন তারা জানে ঐ সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে ঝাঁপ দিয়েছে সে। অদৃশ্য হ'য়ে জলকন্যা রাজপুত্রের কপালে চুমু দিলে, হাসলে তার দিকে তাকিয়ে; তারপর আকাশ-কন্যাদের সঙ্গে উড়ে মিলিয়ে গেলো জাহাজের উপর দিয়ে ভেসে-যাওয়া গোলাপি মেঘের মধ্যে, তাদের সঙ্গে-সঙ্গে ভেসে গেলো দিগন্ত ছাড়িয়ে।

তিনশো বছর পরে আমরাও যাবো স্বর্গরাজ্যে,—সে বললে।

একজন কানে কানে বললে, আরো আগেও যেতে পারি। যে সব মানুষের বাড়িতে ছোটো ছেলেমেয়ে আছে, তাদের ভেতর অদৃশ্য হ'য়ে আমরা উড়ে যাই; আর যখনি আমরা দেখতে পাই একটি ভালো ছেলে, যে তার মা-বাবার সুখ, মুখ উজ্জ্বল করেছে, তাঁদের স্নেহের পুতুল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তখনি ঈশ্বর আমাদের এই প্রতীক্ষার সময়টা কাটিয়ে দেন। শিশুরা কেউ জানে না যে আমরা ঘরে-ঘরে উড়ে বেড়াচ্ছি; জানে না তাদের ভালো কাজে খুশি হ'য়ে আমরা একবার হাসলেই তিনশো বছর থেকে একটা বছর ক'মে যায়। কিন্তু যখনি আমরা দেখি বদমেজাজি দুষ্টু ছেলে, মনের দুঃখে আমরা কাঁদি, আর আমাদের প্রতি অশ্রুবিন্দু আমাদের প্রতীক্ষার সময় একদিন ক'রে বাড়িয়ে দেয়।

অনুবাদ: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাপ্ত

একটি চমকপ্রদ ম্যাজিক

যাদুকর এ, সি, সরকার

মস্ত এক বৈঠকখানা ঘরে সমবেত হয়েছেন দর্শকবৃন্দ। এখানেই দেখানো হবে ম্যাজিক। আরম্ভ হতে এখনও প্রায় আধ ঘণ্টা দেরী, তবুও এরই মধ্যে হলের অর্দ্ধেক ভরে গেছে দর্শকে। এদের মধ্যে আবার কচি-কাচার সংখ্যাই বেশী। কচি-কাচারাই যাদুর খেলা বেশী পছন্দ করে কি না, তাই। প্রদর্শনী আরম্ভ করার সময় যখন হ'ল তখন তো ঘরে তিলধারণের স্থানটুকুও নাই। হলের প্রায় বারো আনা অংশ ভরে গেছে কচি-কাচার দলে। তবুও টুঁ শব্দটি শোনা যাচ্ছে না—সবাই চুপচাপ। কথাটা শুনে বিশ্বাস হচ্ছে না তো? না হবারই তো কথা। বন্ধুদের সঙ্গে যখন তোমরা একত্র এক জায়গাতে থাকো, তখন তো তোমাদের কলরবে মুখর হয়ে ওঠে চারি দিক। চাই কি দু'-এক হাত ঝগড়া মারামারি হাতাহাতি হলেই বা কে আটকায়! যে ঘটনাটার কথা বলছি সেটা এ দেশের নয় বিলাতের। ওদের শৃঙ্খলাবোধ ও সৌজন্য আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের চেয়ে অনেক বলিষ্ঠ। নিয়মানুবর্ত্তিতা তাদের মজ্জাগত। যাক সে কথা। এখন যা বলছিলাম। যথাসময়ে খেলা দেখানো আরম্ভ করলাম। দু'-তিনটে খুব চমকপ্রদ খেলা দেখানোর পরে আরম্ভ করলাম একটি অপেক্ষাকৃত ছোট খেলা। দর্শকদের সামনে একটা টেবিলের উপরে আমি রাখলাম তিন রকমের তিনটি মুদ্রা—একটি হাফক্রাউন (আড়াই শিলিং) একটি দুই শিলিং ও একটি এক শিলিং। খেলাটার কথা সবাইকে বুঝিয়ে দিয়ে দু'জন দর্শককে পাহারাস্বরূপ সঙ্গে নিয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। আমার অনুপস্থিতি কালে এক জন দর্শক তার আসন ছেড়ে উঠে এসে তার পছন্দ মতন যে কোনও একটি মুদ্রা তুলে নিয়ে মুঠো করে ধরে রাখলো, আর মনে মনে একশ' বার ঐ মুদ্রাটির নাম করে মুঠো খুলে মুদ্রাটিকে আবার যথাস্থানে নামিয়ে রেখে আমাকে ডাকলো। আমি ঘরে ফিরে এলাম; চোখ বন্ধ করে প্রত্যেকটি মুদ্রা এক' এক বার হাতে তুলে নিয়ে পছন্দ-করা মুদ্রাটি সবাইকে যখন দেখালাম তখন তো সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

শোন এবার খেলাটার কৌশল। একটা মুদ্রাকে কিছুক্ষণ হাতের মুঠোর মধ্যে রাখলে শরীরের উত্তাপে তা বেশ গরম হয়ে যায়—এ তো তোমরা দেখেছই। শীতকালে বা শীতের দেশে এই প্রক্রিয়া হয় আরও ভাল। টেবিলের উপরে পড়ে-থাকা মুদ্রাতে আর কিছুক্ষণ মুঠো করে রাখা মুদ্রাতে যে তাপমাত্রার পার্থক্য এ অনুভব করেই চেনা যায় ঠিক মুদ্রাটি।
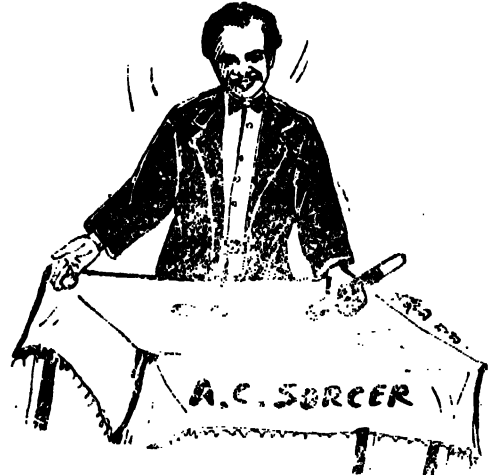
পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

যদিও প্রভাত সম্পাদককে ভরসা দিয়েছিল কিছু টাকা জোগাড় করে দেবে বলে, কিন্তু কোথাও তেমন সুবিধে করে উঠতে পারে না। তাই 'সবুজ ঘাসের' ট্রেড-শো দেখতে এসে বেলারাণীর সংগে দেখা হতেই সে ঐ কথার অবতারণা করে।

—আপনাকে একটা কথা বলার আছে।

বেলারাণী হেসে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার? আবার প্রশ্নোত্তর না কি?

—না, আমাদের পত্রিকা সম্বন্ধে।

—কি হয়েছে?

প্রভাত আমতা-আমতা করে, মানে একটু মুস্কিল হয়েছে, সম্পাদকের নামে ওয়ারেন্ট এসেছে। হয় জেল নয় ফাইন।

—হঠাৎ!

—হঠাৎ আর কি, একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, ওরা বলছে অশ্লীল।

বেলারাণী অবাক হয়, এমন লেখা ছাপালেন কেন?

—আমি তো আর ছাপাই নি, সব ঐ সম্পাদকের কাজ। একেবারে আকাট মুখ্যু ইংরিজি থেকে অনুবাদ করেছে—

—তাই তো ভাবনার কথা!

প্রভাত আস্তে আস্তে বলে, প্রায় পাঁচশো টাকার দরকার। জানেনই তো কাগজের অবস্থা, কোথা থেকে যে এত টাকা দেবে—

—পাঁচশো! সে তো অনেক টাকা! এক কাজ করুন, চাঁদা তুলুন। আমি দশ টাকা দেব অখন। প্রভাত আর এ বিষয়ে কথা বলার উৎসাহ পায় না। বেলারাণী নিজে থেকে জিজ্ঞেস করে।

—'সবুজ ঘাস' কেমন লাগল?

—তেমন সুবিধের হয়নি।

তখনও অনুষ্ঠান শেষ হয়নি। বেলারাণী বলে, চলুন, আমরা বরং বেরিয়ে পড়ি। ভীড় ভাঙ্গলে বড় দেরী হবে।

—চলুন।

বেলারাণী এগিয়ে গিয়ে এক ভদ্রলোককে ডেকে আনে। আলাপ করিয়ে দেয়, ইনি বিনোদ রায়, অভিনেতা, প্রযোজক, আরও অনেক কিছু। আর ইনি প্রভাত বাবু বই লেখেন।

কথা বলতে বলতে তারা নীচে নেমে আসে, কর্মকর্তাদের সংগে দু'-চারটে মুখের কথা হয়। বেলারাণী সকলকেই বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, বলে গাড়ীতে উঠে পড়ে। বিনোদের বড় গাড়ী, নিজে চালায়। সামনের সিটেই তিন জনে বসে পড়ে।

বাড়ী পৌঁছে বেলারাণী প্রভাতকে ছাড়ল না। বললে, আসুন, আমাদের সঙ্গে। কফি খেয়ে যাবেন।

তারা তিন জনে বসবার ঘরে এসে বসে। প্রভাত ভালো করে বিনোদের দিকে তাকিয়ে দেখে। সুশ্রী চেহারা, সিল্কের পাঞ্জাবী, দামী কোঁচান ধুতি। হাতে সিগারেটের টিন, চোখে রদ্দুরের-চশমা।

প্রভাত প্রশ্ন করে, আপনি কোন ছবিতে কাজ করছেন?

বিনোদ উত্তর দেয়, ছবিতে বেশী কাজ করি না, থিয়েটারে অভিনয় করি।

—কোন থিয়েটারে?

—এ্যামেচার।

—ও:।

—বেলার জন্যে এবার ফিল্ম লাইনে নামছি

—কোন বইতে?

—নিয়তির পরিহাস।

—কার লেখা?

বেলারাণী উত্তর দেয়, লেখকের নাম প্রভাত বাবু।

প্রভাত বিস্মিত হয়, তার মানে?

—আপনাকে আগেই বলেছিলাম, আমি প্রডাকসান করবো।

—হ্যাঁ, বলেছিলেন বটে।

—তারই প্রথম বই আপনাকে লিখতে হবে।

আনন্দে প্রভাতের চোখ-মুখ নেচে ওঠে, এতক্ষণ বলেননি একথা, নাম কে ঠিক করলে?

—আমি।

—চমৎকার নাম দিয়েছেন, পোষ্টার পড়লেই লোকের ভিড় হবে।

—খুব ভালো করে লিখতে হবে প্রভাত বাবু!

—কিন্তু প্লটটা তো এখনও বললেন না?

বেলারাণী মিষ্টি করে হাসে, পরে বলবো। এখন থেকে প্রায়ই আসতে হবে আপনাকে, সিনারিও লেখা তো সোজা কথা নয়।

—ও নিয়ে আপনি ভাববেন না, একেবারে ফার্স্ট ক্লাস করে দেবো। তা ছাড়া হাতে সময়ও অনেক, পত্রিকাই যখন উঠে গেল।

বিনোদ এতক্ষণ এদের কথা শুনছিল, কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বলে, বেলা, তোমার সংগে দরকারী কথাটা সেরে নিই।

বেলারাণী উত্তর দেয়, তাড়া কি, হবে এখন।

প্রভাত বোঝে, তারই জন্যে এরা কথা বলতে পারছে না। উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় চায়, আমায় মাপ করবেন, এবার চলি।

—এখনি উঠবেন?

—আজ চলি, কাল বরং আসবো, বলে প্রভাত নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বিনোদ উঠে গিয়ে বেলারাণীর সংগে এক সোফায় বসে।

—কই, এ ভদ্রলোকের কথা তো আগে বলনি?

—বেলারাণী অন্যমনস্ক ভাবে বলে, মনে ছিল না। দেখা হতে ভাবলাম একে দিয়ে লেখালেই হবে।

—টাকা নেবে তো?

—কত আর, শ'তিনেক টাকা।

যেখানে গুনের বিচার
সেখানে সকলেই
পছন্দ করেন

—মাব ?

—আমার কি। লোকটি ভাল, তবে বুদ্ধি কম। দেখলেই তো বুঝতে পারো—

—আশ্চর্য্য, সবাইকেই তুমি বোকা মনে কর ?

বেলারাণী [illegible] দিয়ে রাখে।

—কি দরকারী কথা বলছিলে

—আমায় কত টাকা দিতে হবে ?

—যা বলেছিলে—

—ঠিক তো, তার বেশী কিন্তু দিতে পারব না।

বেলারাণী হাসে, দিলেও নেবো না। যত কমে সম্ভব বই তুলতে হবে, দেখছো তো বাজার ?

—পরিচালক ঠিক করেছ ?

—প্রমোদ।

—প্রমোদ ? কি বলছো, ও যে একেবারে আনাড়ী।

—তাতে কি হয়েছে, বাড়ে সাত পোয়া পুরো নই ! চল্লিশ দিনের মামলা।

—একটু রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। [illegible] করে।

—মোটেই না। [illegible] বেলারাণীকে দেখতে, পরিচালককেও নয়, লেখককেও নয়।

বিনোদ কি বলতে যাচ্ছিল, বেলারাণী থামিয়ে দিয়ে বলে, ওপরে চল বিনোদ ! হয়ে গেল, আমি চান করে নিই।

বেলারাণীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রভাত হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে। নিজেকে তার খুব হাল্কা মনে হয়। এত দিন বাদে অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ সিনেমার গল্প লেখার সুযোগ পেয়ে বেলারাণীকে মনে মনে ধন্যবাদ জানায়। এই সুখবরটি অরুণাকে না জানিয়ে বাড়ী ফিরতে তার ইচ্ছে করে না। অরুণা প্রভাতের ছাত্রী, প্রাইভেটে তিন বার ম্যাট্রিক ফেল করে এ বছর পাশ করেছে। আগের দু' বছর অন্য মাষ্টার ছিল, বার বার ফেল করায় তাদের তাড়িয়ে প্রভাতকে আনা হয়। আশ্চর্য্য প্রভাতের কপাল, অরুণা পাশ করল। এমন কি, থার্ড ডিভিশানে নয়, সেকেণ্ড ডিভিশানে। অরুণার বাবা বলেছিলেন, আপনার বাহাদুরী আছে, অরুণা যে পাশ করবে আমি ভাবিনি, তাই ত বিয়ের সম্বন্ধ করছিলাম। প্রভাত অমায়িক হেসে উত্তর দিয়েছিল, মেয়ে আপনার খুব শার্প, ঠিক কোচিং পায়নি বলেই—তা তো বুঝতেই পারছি। যাই হোক, ও যত দিন পড়াশুনা করবে আপনাকে ভার নিতে হবে। বলা বাহুল্য, প্রভাত এ কথায় সম্মতি দিয়েছিল। অরুণা সকালে কলেজে পড়ে, বিকেলে প্রভাতের [illegible]

আজ প্রভাত যখন [illegible] তখন সাড়ে চারটা বাজে। [illegible]

[illegible]

[illegible] দেখে চোখ বড় বড় করে [illegible] ?

—বস, একটা খবর আছে।

—কিসের ?

—আমার গল্প সিনেমায় উঠবে।

—সত্যি, কোন গল্প ?

—নিয়তির পরিহাস।

অরুণা হাততালি দেয়, কি মজা, আমাদের পাশ দেবেন তো ? সবাই গিয়ে ছবি দেখে আসব। বাবা এমনিতে ছবি দেখে না, কিন্তু আপনার বই হলে নিশ্চয় যাবে। যাই, মাকে বলে আসি।

প্রভাত বাধা দেয়, আহা বোস না, সব কথা শোন।

অরুণা বসে পড়ে, তাই তো আপনার কথাই শুনছি না, এবার বলুন।

—আজই সকালে ঠিক হ'ল, প্রথমেই তোমাকে খবর দিতে এলাম।

অরুণা কপট রাগের ভাণ করে বলে, আমাকে দেবেন না তো কা'কে দেবেন শুনি ? আপনার সেই গেঁদীকে ?

—আহা, তার কথা আনছ কেন ?

—একশ' বার আনব। আমি বরাবর দেখেছি আমার সংগে কথা বলতে গেলেই আপনার গেঁদীর কথা মনে পড়ে, তার মত চালাক ছাত্রী আর পান নি। কিন্তু আচ্ছা, বিয়ের সময় আপনাকে একটা চিঠিও দিল না !

প্রভাত মনে মনে বিরক্ত হয়, কি কথা বলতে এলাম আর তুমি কি সুরু করলে বল ত ?

অরুণা প্রভাতের মুখটা দেখে নিয়ে বলে, রাগ করেছেন বুঝি ? আচ্ছা, আর একটি কথাও বলব না। এবার বলুন—

—তোমাকে বেলারাণীর কথা বলেছিলাম, ওরাই বই তুলছে। আমার লেখা উনি খুব ভালবাসেন কি না, তাই আমাকে দিয়েছেন—

অরুণা এতক্ষণ কোন কথাই শোনে নি, হঠাৎ প্রভাতকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করে, একটা কথা বলব ?

—কি কথা ?

—রাগ করবেন না ?

—বল না ?

—বেলারাণীর রংটা খুব ফর্সা ? ছবিতে যেমন দেখায় ?

—না, শ্যামবর্ণ।

—ওঁর বাঁ গালে একটা 'বিউটি স্পট' আছে না ?

প্রভাত আবার বিরক্ত হয়, আমি অত দেখি নি।

অরুণা হাসে, চোখে-মুখে তার দুষ্টুমী-ভরা, হ্যাঁ, দেখেন নি আবার। আমার কাছে অত সাধু সাজতে হবে না।

—কি মুস্কিল, যা বলি তাই নিয়েই ঝগড়া—

—ঝগড়া তো করি নি। আমাকে এক দিন বেলারাণীর কাছে নিয়ে চলুন না ?

—সেখানে কি করবে ?

—[illegible] করে আসব, কলেজের মেয়েরা সব অবাক হয়ে যাবে

[illegible]

অরুণা বিস্ময় প্রকাশ করে, আশ্চর্য্য লোক, এমনই বা কেন, [illegible] বা কেন ?

প্রভাত গজগজ করে, বললেই বা শুনছে কে ? আমি চললাম।

অরুণা ধমকে ওঠে, যান দেখি কেমন যেতে পারেন? বসুন ঐ চেয়ারে, আমি মিষ্টি জল নিয়ে আসছি।

—আমার দেরী হয়ে যাবে।

—হোক্ গে, কি এমন রাজকায্য পড়ে আছে শুনি? যতক্ষণ না আসছি, পত্রিকাটা পড়ুন।

অরুণা আদেশ জারী করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। প্রভাত ভালমানুষের মত বসে পত্রিকার পাতা ওল্টাতে থাকে।

চুণীলাল শ্যামলের সঙ্গে দেবেনদা'র আলাপ করিয়ে দেবার পর থেকে শ্যামল প্রায়ই দেবেনদা'র বাড়ী যায়। খিদিরপুরের এক প্রান্তে দু'খানা ঘর নিয়ে ওঁর বাসা। দেবেনদা'কে শ্যামলের অদ্ভুত লাগে। দেশের জন্যে উনি অনেক ত্যাগ করেছেন, সে সব কথা বলতে বলতে ওঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আবার কত সময় ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলেন। শ্যামল চুপটি করে শোনে। সেদিনও তিনি বলছিলেন, লেখাপড়া কর শ্যামল, ভাল করে লেখাপড়া কর। জ্ঞান না হলে কোন কাজ করা যায় না।

শ্যামল কোন কথা বলে না, জানে দেবেনদা' শুধু বলতেই ভালবাসেন।

—আমরা কলেজ ছেড়েছি অসহযোগ আন্দোলনের সময়, কিন্তু পড়া ছাড়িনি। জেলে কি বাইরে সব সময় এন্তার বই পড়েছি, দেশী, বিদেশী, যা পেয়েছি। এখনও কত কবিতা আমার মুখস্থ। একটু থেমে আবার বলেন, কিন্তু ভুল করেছি, সারা জীবন ধরেই ভুল করলাম। দেশের জন্যে সব ছেড়েছি, বাড়ী, ঘর সমাজ, কিন্তু কি লাভ হল?

শ্যামল আস্তে আস্তে বলে, কেন দেশ স্বাধীন হয়েছে, আপনাদের মত লোক না থাকলে—দেবেনদা' হাসেন, স্বাধীনতা তো কাগজে-কলমে। যাদের জন্যে প্রাণপণ করে খাটলাম তাদের কিছুই হল না! না পেল তারা খেতে, না শিখল তারা লেখাপড়া—

—হবে আস্তে আস্তে—

—আর হবে, বিশ্বাস হারিয়েছি। যে পার্টির জন্যে হাজার হাজার যুবক সেদিন প্রাণ দিয়েছে আজ সে পার্টির কি অবস্থা! এক জনও সত্যিকারের মানুষ সেখানে নেই। যারা কোন দিন দেশের কথা ভাবেনি, এতটুকু ত্যাগ করেনি, সে দিনকার সবচেয়ে বড় স্বার্থপর যারা তারাই টাকার জোরে আজ পার্টির হোমড়া-চোমড়া হয়ে বসেছে! আমাদের মত লোকের সেখানে আর স্থান নেই।

কথা বলতে বলতে দেবেনদা'র চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে, উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠেন, ভেঙ্গে যাবে, সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এত বড় মিথ্যে কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না। শ্যামল এসব কথার কিছুই বুঝতে পারে না। তবে এইটুকু সে জানে দেবেনদা' যা কিছু বলেন, তার পেছনে লুকোন আছে একটি আঘাত পাওয়া ব্যথিত অন্তর। [illegible] তাকিয়ে থেকে এক সময় বলে, দেবেনদা' [illegible]

—[illegible]

বাইরে থেকে কালীকে দেখে শ্যামলের মনে হয়েছিল লোকটা ভাল নয়, কিন্তু কাছে এসে আলাপ হতে তার মত বদলে যায়। উত্তর-কলকাতার এক অখ্যাত গলিতে তার আস্তানা। শুধু-গায়ে লুঙ্গী পরে বসে থাকে। মাথার চুল এত পাতলা যে কালো টাক পরিষ্কার দেখা যায়। নামের সঙ্গে চেহারার অবিকল মিল। পা দিয়ে জল গড়ালে কালীর মতই দেখায়। শ্যামল দরজায় কড়া নাড়তে কালী নিজে এসে দরজা খোলে, এস ভেতরে। দরজা বন্ধ করে শ্যামলকে ঘরের ভেতর নিয়ে যায়। ছোট্ট ঘর, আসবাব নেই বললেই চলে। মাদুরের ওপর বসে শ্যামলের হাতে হাত-পাখাটা ধরিয়ে দেয়, বড় গরম, একটু হাওয়া কর।

শ্যামল এ ধরণের আতিথ্যে বিস্মিত হলেও, কালীর কথামত তাকে বাতাস করে। কালী পালক দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিতে দিতে চোখ বুজেই জিজ্ঞেস করে, বয়স কত?

—ষোল।

—বাবা-মা কত দিন মারা গেছেন?

প্রশ্ন শুনে শ্যামল চমকে ওঠে। তবু উত্তর দেয়, মা মারা গেছেন ছোটবেলায়, বাবা আছেন।

—ভাই-বোন অনেকগুলি বুঝি?

—আমি একা।

কালী এক চোখ খুলে দেখে, এ লাইনে ক'দিন?

শ্যামল ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে, এই পার্টিতে?

—পার্টি-ফার্টি নয়, এখন কি করছ?

—কিছুই করি না।'

কালী দু'হাত দিয়ে মুখটা রগড়ায়, কি পারো?

শ্যামল আশ্চর্য হয়, কি রকম বলুন?

—পকেট মারতে পার?

শ্যামল স্তব্ধ হয়ে যায়, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, চেষ্টা করিনি।

—মিথ্যে কথা বলতে পারো?

শ্যামল এবার সহজ গলায় উত্তর দেয়, পারি।

কালী এবার দু'চোখ খুলে ভাল করে তাকায়, হঠাৎ শ্যামলের পিঠ চাপড়ে বলে, বাঃ, তুই ঠিক পারবি।

কালীর কাছে বাহবা পেয়ে সলজ্জ হাসিতে শ্যামলের মুখ ভরে ওঠে। কালী জিজ্ঞেস করে, বড় বড় বাড়ীর সামনে পেতলের নেম-প্লেট থাকে দেখেছিস?

—হ্যাঁ।

—কাল দুটো খুলে আনবি। আমার কাছে তালিম নিতে হলে প্রথমে নজরাণা দিতে হয়।

—কাল কখন আসব?

—এই সময়েই, শ্যামল চলে যাচ্ছিল, কালী ডেকে বলে, স্ক্রু-ড্রাইভার আছে?

—না।

—ঐ কোণ থেকে দুটো নিয়ে যা।

শ্যামল স্ক্রু নিয়ে কালীর বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে।

[illegible] নেই।

সারা শরীরে ব্যথা, জ্বর, শরীরে অনেকগুলো উপসর্গ এক সঙ্গে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সকলের চাইতে কষ্ট দরকারের সময় হাতের কাছে এক গ্লাস জল এগিয়ে দেবার লোক নেই বলে। তবু এরই মধ্যে

বাপ-মায়ের নিষেধ অগ্রাহ্য করে শ্যামা এসেছিল। ঘুম ভাঙ্গতে কেষ্ট দেখে, বার্লির গেলাশ নিয়ে শ্যামা বলছে, কাকু, এটা খেয়ে নাও।

কেষ্ট সে কথা না শুনে প্রশ্ন করে, ওপরে এসেছিস যে, বাবা বকবে না?

—বাবা নেই, অফিসে গেছেন।

—এখন ক'টা বাজে?

—দুটো বেজে গেছে। কষ্ট হচ্ছে কাকু?

কেষ্ট চিন্তিত মুখে বলে, ওপরে এসে ভাল করিস নি, তোর বাবা শুনলে বকবে, নীচে যা—

—তোমার যে জ্বর হয়েছে কাকু, ডাক্তার বাবুকে খবর পাঠাব?

—না, আর এক দিন শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে, তুই এখন যা।

শ্যামা কেষ্টর কথা মত বার্লির গেলাস রেখে নীচে চলে গেল বটে কিন্তু সুযোগ পেলেই ওপরে এসেছে, দরকারী জিনিষপত্র কাকার হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েছে।

এরই মধ্যে এক দিন বিপত্তির সৃষ্টি হল, শ্যামার ছোট ভাই দিদির ওপর রেগে বাবাকে বলে দিলে, বাবা, দিদি তোমার কথা শোনে না, খালি খালি ওপরে যায়।

বলরাম সবে আফিস থেকে ফিরছিল, কথা শুনেই মাথায় তার আগুন জ্বলে ওঠে, ডাক দিদিকে।

শ্যামা আসতেই বলরাম সজোরে কান মলে দেয়, বাঁদর মেয়ে, ওপরে কি করতে যাও?

শ্যামা থতমত খেয়ে যায়, চোখের জল সামলে ধরাগলায় বলে, কাকুর অসুখ করেছে—

বলরাম চীৎকার করে ওঠে, বেশ হয়েছে। ও মরুক, বাঁচুক, তোর তাতে কি? ওপরে যেতে বারণ করেছি ব্যস, আর কোন কথা শুনতে চাই না।

চেঁচামিচি শুনে শ্যামার মা ছুটে এসেছিলেন, আহা একটু বার্লি দিয়ে এসেছে তা অত মারধোর করার কি আছে?

—মেয়েকে অমন আস্কারা দিও না, বাপের অবাধ্য হওয়া—

শ্যামার মা স্বর পাল্টায়, আর তোকেও বলি মেয়ে, নিজের বাপকে তো চিনিস, গোলমাল করিস কেন?

—এর পর থেকে আমি সব কিছুর জন্যে তোমাকে দায়ী করব, কোন রকম ন্যাকামী আমি পছন্দ করি না।

বলরাম গজ-গজ করতে করতে কলতলায় চলে যায়।

—ঠিক এই সময় শ্যামল এসে দরজা ঠেলে। শ্যামার মা বললেন, খোকা, দেখ ত কে এল?

খোকন ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেয়, শ্যামার মা চেঁচিয়ে বলে, জিজ্ঞেস কর কা'কে চাইছেন।

খোকনের পুনরুক্তির আগেই শ্যামল উত্তর দেয়, কেষ্টদা' আছেন?

খোকন বলে, ওপরে।

শ্যামল দরজা পার হয়ে উঠোনে এসে দাঁড়ায়, শ্যামা বলে ফেলে, কাকুর যে জ্বর।

—এক বার বলুন আমি দেখা করতে চাই, আমার নাম শ্যামল।

সংগে সংগে কেষ্টর গলা শোনা যায়, ওপরে এস শ্যামল। আমি শুয়ে আছি।

শ্যামল ওপরে উঠে গিয়ে কেষ্টর বিছানার একধারে বসে পড়ে, কত দিন জ্বর হয়েছে কেষ্টদা'?

—ক'দিনই তো—

—আমরা তাই ভাবছি, আপনি আসছেন না কেন। এখন কত জ্বর?

—বেশী নয়, কাল-পরশু খুব বেড়েছিল। দুর্বল করে দিয়েছে বেশ,—কেষ্ট বালিসে ভর দিয়ে উঠে বসে, শ্যামল দ্যাখ তো বাইরে ছাদে বোধ হয় জল আছে, আর ঐ গামছাটা দাও, মুখটা ধুয়ে ফেলি।

মুখ ধুয়ে কেষ্ট অনেকটা সুস্থ বোধ করে। দুটো বিস্কুট আর বার্লি খেয়ে বলে, বেশ ভালো লাগছে এখন।

শ্যামল নিজের থেকেই বলে, টাকার দরকার আছে কেষ্টদা'?

—কেন?

—আপনার ভাগের অনেকগুলো টাকা আমার কাছে রয়েছে।

—দরকার হলে পরে নেব।

শ্যামল জিজ্ঞেস করে, জানেন প্রভাতদা'র বই ছবিতে উঠছে?

—প্রভাতের? আমাদের প্রভাত?

—হ্যাঁ।

—কি বই?

—নামটা ভুলে গেছি। খুব শক্ত নাম।

—ভাল কথা, প্রভাতের সংগে অনেক দিন দেখা হয়নি।

—বেলারাণী পার্ট করবে।

—তাই না কি?

—খুব ভীড় হবে, না কেষ্টদা'?

—ভাল বই হলে হবে নিশ্চয়।

কেষ্টর সংগে শ্যামলের অনেক কথা হয়, কিন্তু সে কালী বা দেবেনদা'র বিষয় কিছুই বলে না। কথার ফাঁকে এক সময় জিজ্ঞেস করে, আপনি কবে থেকে বেরুতে পারবেন মনে হচ্ছে?

—কাল কিংবা পরশু।

—আমি অনন্ত কেবিনে থাকব, যদি আপনাকে না পাই এখানে এসে খবর নেব।

—সেই ভাল, আশুদা'কে আমার কথা বোল।

—আশুদা'ই তো আমাকে পাঠালেন, আপনি না গেলে আশুদা'র মন খারাপ হয়ে যায়।

—আশুদা' বড় ভাল লোক।

—আমি তাহলে এখন আসি কেষ্টদা', শ্যামল নীচে নেমে যায়।

ক'দিন থেকেই মদন বড় একলা পড়ে গেছে। শ্যামল আজ-কাল আর আগের মত আসে না। স্কুল পালিয়ে পার্কে, কিম্বা আড্ডাসংঘের বৈঠকে যেমন শ্যামলের সংগে আগে দেখা হত, দৈনন্দিন কাজকর্মের খুঁটিনাটি আলোচনা হত, এখন আর তা সম্ভব হয় না। সব সময়ই ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে শ্যামল বলে, চলি ভাই, দেবেনদা'র কাছে যেতে হবে।

মদন কত সময় বিরক্ত হয়ে বলেছে, কি দেবেনদা' দেবেনদা' করিস, এ যে কেষ্টদা'র বাড়া হয়ে উঠল।

—এ অন্য ব্যাপার, না মিশলে বুঝবি না।

—আমি একলা একলা কি করব ?

—কি আবার করবি, ইস্কুল যাবি। বাড়ীর কাজ করবি, গলায় সোনার হার পরে বসে থাকবি।

—ক'দ্দিন ছবি দেখিনি, চল না একটা—

—বলছি তো সময় নেই, দেবেনদা' ছাড়া কালীর কাছে তালিম নিতে হবে।

—কালীকে নাম ধরে ডাকিস্ ?

- দাদা বললে চটে যায়।

—জাহান্নমে যা, আমার কি, পরে ভুগবি।

শ্যামল একথা গ্রাহ্য করে না। আড্ডাসংঘের অন্য কারো সঙ্গে মদনের তেমন বনে না। শ্যামলের পরে মাত্র এক জন যাকে সে ভালবাসে, সে মনুদা'। আজ বাড়ী থেকে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় মনুদা'র সংগে দেখা, দু'-তিন দিন না কামানোর ফলে মুখময় খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, পরনে ময়লা পাঞ্জাবী। মদনকে দেখে ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছ ?

—কোথাও যাইনি, এমনি।

—বস তোমার সঙ্গে একটু কথা বলি।

মদন বোঝে মনুদা' এতক্ষণ কথা বলার লোক খুঁজছিল, তাকে পেয়ে সত্যি খুসী হয়েছে, বলে, মনুদা' আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, শরীর খারাপ হয়নি তো ?

—শরীরের আর দোষ কি ভাই, কত আর সইবে !

—আপনি একটুতে বড় মুষড়ে পড়েন, কি এমন হয়েছে বলুন তো ?

—তুমি জান না মদন, নন্দিতার বাবা পরশু আমাদের বাড়ী গিয়েছিলেন। নন্দিতাকে লেখা আমার চিঠি দেখিয়ে শাসিয়ে এসেছেন, পুলিশে নালিশ করবেন বলে।

—সে কি, তার পর ?

—আমাকে বললেন, তুমি কেন এসব চিঠি দাও, আমার মেয়ে কখনও তোমায় লিখেছে ? আমি কিছু উত্তর দিইনি। পুলিশেও যদি দেয়। আমি কোন দিন বলব না যে নন্দিতাও চিঠি দেয়।

—কিন্তু উনি কি করে চিঠিটা পেলেন ?

—জানি না। কোন দিন জানতে চাইবোও না, যদি না নন্দিতা নিজে থেকে বলে।

ঠিক এই সময় নন্দিতা এসে তাদের বাড়ীর দোতলার ছোট্ট রেলিঙ ধরে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। মনুদা'র দিকে পেছন ফিরে মদনের সংগে কথা বলছিল, তাই মদন ইসারা করে।

মনুদা', ওই যে—

মনুদা' ফিরে তাকিয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে নন্দিতার দিকে চেয়ে থাকে। মদন মাথা হেঁট করে, মাঝে মাঝে, আড়চোখে মনুদা'র দিকে তাকায়, দেখে তার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, হঠাৎ মনুদা' তার পিঠ চাপড়ে বলে, চল মদন, তোমাকে কিছু খাওয়াই।

মদন বুঝতে না পেরে বারান্দাটার দিকে দেখে, নন্দিতা চলে গেছে। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার মনুদা' ?

—নন্দিতা আমায় সত্যিই ভালবাসে, তার কোন সন্দেহ নেই।

—কি করে বুঝলেন ?

মনুদা' কথার উত্তর না দিয়ে মদনের হাতটা ধরে এগিয়ে চলে।

কেষ্ট যদিও শ্যামলকে বলেছিল সুস্থ হয়েই অনন্ত কেবিনে আসবে, কিন্তু পরদিন বাড়ী থেকে প্রথম বেরিয়ে সোজা গেল টালীগঞ্জের বস্তিতে গৌরীর কাছে। একদিন বার বার তার গৌরীর কথা মনে পড়েছে, অসুখের মধ্যে এমন অসহায় অবস্থায় না পড়লে সে যেমন করে হোক একটা খবর পাঠাতো। ট্রাম-ষ্টেজ থেকে হেঁটে গৌরীদের বস্তি পর্য্যন্ত যেতে কেষ্টর বেশ কষ্ট হয়। দু' জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নেয়।

বস্তির মুখে একটা ছোট ছেলেকে দেখে জিজ্ঞেস করে, গৌরী আছে ?

—আছে বোধ হয়, বলে ছেলেটি চলে গেল। কেষ্ট অবাক হয়, আগেও ছেলেটিকে দেখেছে, কেষ্ট আসলে সে লাফাতে লাফাতে গিয়ে গৌরীকে ডেকে আনত। এক বৃদ্ধ দাওয়ার ওপর বসে হুঁকো টানছিলেন, কেষ্ট তাঁকেই জিজ্ঞেস করে, গৌরী আছে ?

বৃদ্ধ ব্যাজার মুখে উত্তর দেন, কি করে জানব, কলকাতার সহরে দেখছি সোমথ মেয়েরা ঘরে থাকে না।

এ ধরণের উত্তর কেষ্ট আশা করেনি, গৌরীর ভাইকে পোড়াতে যাওয়ার পর থেকে এ বস্তির সকলেই তাকে ভালবাসতো, এলেই দুটো কথা বলতো। আজ হঠাৎ যেন সব পাল্টে গেল। আর কোন কথা না বলে কেষ্ট সোজা গৌরীর ঘরের সামনে এসে হাজির হল। দরজা খোলা, গৌরী সেলাই করছিল, কেষ্টকে দেখে চমকে ওঠে, কেষ্টদা'—

—কি হয়েছে গৌরী, ওরকম করছ কেন ?

গৌরী কোন কথা বলতে পারে না, দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে।

—কি হয়েছে গৌরী, আজ সব কেমন অদ্ভুত লাগছে ! কেউ ভাল করে কথা বলছে না, তুমি কাঁদছ ? গৌরী নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, এত দিন আপনি কোথায় ছিলেন ?

—বাড়ীতে।

—ওঃ, গৌরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—কি ভাবছ ?

—ভাবিনি। তবে আজ এলেন কেন ?

—তাতে কোন দোষ হয়েছে ?

—আপনি বাড়ী যান। গৌরী উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

সেই দিকে তাকিয়ে থেকে কেষ্ট আস্তে আস্তে বলে, সেদিন রাত্রিতে বৃষ্টিতে ভিজে খুব জ্বর হয়েছিল, এত দিন বিছানায় পড়েছিলাম, বাড়ী থেকে এক পা বেরুতে পারিনি। আজ প্রথম বেরিয়েই তোমার খবর নিতে এসেছি। একটু থেমে বলে, এখনও বেশ দুর্ব্বল, পা কাঁপছে।

গৌরীর এতক্ষণে খেয়াল হয় এখনও সে কেষ্টকে বসতে বলেনি। উঠে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছে বলে, এইখানে বসুন।

কেষ্ট গৌরীর পরিত্যক্ত জায়গায় বসে পড়ে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজে থেকেই কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে, বল ?

—বলব, পরে।

—কখন ?

—এখানে নয়, সবাই কান পেতে আছে।

—কি বলছো ?

গৌরী চার দিক দেখে নিয়ে নীচু গলায় বলে, ঠিকই বলছি, আমাকে আপনাকে নিয়ে কথা উঠেছে ?

—হ্যাঁ, রাজেন লাগিয়েছে।

—রাজেন ? কেষ্ট স্তম্ভ হয়ে যায়, ঠিক বলছো ?

—সে অনেক কথা, জানেন না কি ভালো মেয়ে নই, আপনার সঙ্গে,—গৌরী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে, কেষ্ট স্থির গলায় প্রশ্ন করে, তুমিও কি চাও আমি চলে যাই ?

সে কথার সোজা উত্তর না দিয়ে গৌরী বলে, আমার যে আর কেউ নেই !

—দরকার হলে আমার সঙ্গে যাবে ?

গৌরী মুখ তুলে তাকায়, কোথায় ?

—জানি না, তবে চেষ্টা করব যাতে তুমি বাঁচতে পারো।

গৌরী চুপ করে থাকে।

—কি বল ?

—হঠাৎ কি বলা যায় ?

—আমি চললাম, তুমি ভেবে-চিন্তে জানিও।

কেষ্ট ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, গৌরী ডুকরে কেঁদে ওঠে, এরা আমাকে বাঁচতে দেবে না কেষ্টদা'। কেষ্ট সংযত কণ্ঠে উত্তর দেয়, তুমি শান্ত হয়ে ভাবো, যা ভালো বুঝবে, আমি সেই ব্যবস্থাই করে দেব।

আর কথা না বাড়িয়ে কেষ্ট ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মুখোমুখি রাজেনের সঙ্গে দেখা, এতক্ষণ সে বাইরে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল। রাজেন খেঁকিয়ে ওঠে, এতক্ষণ কি ফুসমন্তর দেওয়া হচ্ছিল ?

কেষ্টর কান লাল হয়ে যায়। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে হাসবার চেষ্টা করে, সবই তো শুনেছো।

—ছি ছি, ভদ্দরলোক ভেবেছিলাম, কেষ্টদা' বলে ডেকেছিলাম, শেষে কি না—

—কি ?

—একটা অসহায় মেয়েকে টাকার লোভ দেখিয়ে—

—বাজে বোক না, থাবড়ে মুখ লাল করে দেব।

রাজেন ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয়, চেঁচিয়ে ওঠে, কার কাছে মেজাজ গরম করছেন, আপনার মত কলকাত্তাই বাবু ঢের দেখেছি। পেটে এক, মুখে এক—

রাগে কেষ্ট কাঁপছিল। ঠাস করে রাজেনের গালে এক চড় মারে। আচমকা আঘাতে রাজেন প্রথমটা ভড়কে গিয়েছিল বটে কিন্তু পরক্ষণেই বাঘের মত কেষ্টর ওপর লাফিয়ে পড়ে। শরীর দুর্ব্বল না থাকলে কেষ্ট হয়ত কিছুক্ষণ যুঝতে পারত। কিন্তু বলিষ্ঠ রাজেন তাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে অমানুষিক প্রহার করতে থাকে। ইতিমধ্যে চারদিকে লোক জমা হয়ে গেছে, ভীড়ের মধ্যে থেকে কথা শোনা যায়, ছেড়ে দে রাজেন, মরে যাবে যে। কেউ বললে, নাক কেটে যে রক্ত পড়ছে, পুলিশ হাঙ্গামায় পড়বি নাকি ? সকলেই হৈ-হৈ করছে, গৌরী কোন কথা না বলে এক পাত্র জল নিয়ে সেখানে ছুটে আসে। রাজেন ততক্ষণে কেষ্টকে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। গৌরী বিনা ভূমিকায় কেষ্টর মাথার কাছে বসে জল দিয়ে তার মুখের রক্ত ধুয়ে দেয়। গৌরী ভয় পেয়েছিল, বোধ হয় কেষ্ট অজ্ঞান হয়ে গেছে, কিন্তু তার গর্জ্জানী শুনে একটু আশ্বস্ত হয়। কেষ্ট বিড়-বিড় করে বলে, শরীরটা দুর্ব্বল, তাই বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে, এর শোধ আমি নেব।

রাজেন চীৎকার করে ওঠে, কানে কানে কি বলা হচ্ছে ?

কেষ্টর বদলে গৌরীই উত্তর দেয়, রাজেনদা', তুমি ঘরে যাও। ভদ্রলোক অসুস্থ।

রাজেন জ্বলে ওঠে, ভদ্রলোক না চামার ! ওর হয়ে আর তোমায় দালালী করতে হবে না।

—কেন মিথ্যে কথা বাড়াচ্ছো, জানো তো সবই। উনি তো আমাদের কোন মন্দ করেন নি ?

—ভাল-মন্দ কি তোমার কাছে শিখতে হবে, না তোমার ঐ বাবুর কাছে ?

গৌরী এতক্ষণ পর্য্যন্ত সংযত ভাবে কথা বলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এবার তার ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, কথা বলতে শিখবে তো আমার কাছে এসো। যা তা বলতে তোমার মুখে বাধে না ?

—যা তা আবার কি ? যা সত্যি, তাই বলেছি। অত ঢলাঢলি কিসের ? রোজ একসঙ্গে বেড়াচ্ছো, শাড়ী কিনছো, জামা কিনছো, কত স্ফূর্ত্তি করছো, আমরা কচি খোকা—

অপমানে গৌরীর মুখ কালো হয়ে যায়। ছি, ছি, কি ঘেন্না, কি নোংরা মন তোমার ?

এবার অসহায় ভাবে সে অন্যদের দিকে ফিরে তাকায়, কিন্তু কারু কাছে এতটুকু সহানুভূতি পায় না। বৃদ্ধেরা বললেন, রাজেন তো অন্যায় বলে নি। তুমি আমাদের জ্ঞাতি-কন্যা, তোমার ভাল-মন্দ দেখা আমাদের কর্ত্তব্য।

বৃদ্ধারা বললেন, ড্যাং-ড্যাং করে নেচে বেড়াবেন, তার ওপর চোখা-চোখা বুলি কে সহ্য করবে ?

যুবকেরা বললে, রাজেন ঠিক করেছে, আরও দু' ঘা দিলে হতভাগা আর অন্য মেয়েদের ওপর নজর দিত না।

পণ্ডিত মশাই রায় দিলেন, জীবনে সংযমের দাম অনেক গৌরী, বয়স হলে বুঝতে পারবে।

চাপা কান্নায় গৌরীর দম বন্ধ হয়ে আসে, অসহায় ভাবে কেষ্টর দিকে তাকায়।

কেষ্ট তখন উঠে বসেছে। ক্লান্ত স্বরে গৌরীকে বলে, একটা গাড়ী ডেকে দেবে, বাড়ী যাব।

রাজেন খিঁচিয়ে ওঠে, নিজের পা নেই, যাও না। ও কি করবে—

গৌরী দৃঢ়স্বরে বলে, চলুন আমি আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব।

কেষ্টর কোন কথা বলার আগেই রাজেনের দল শাসিয়ে ওঠে, মনে রেখো, ওর সংগে গেলে আর এখানে ঢুকতে পাবে না।

কেষ্ট গৌরীর কাঁধে একটা হাত রেখে সকলকে শুনিয়ে বলে, চল গৌরী, এ নরকে তোমায় এক রাত্রিও ফেলে রেখে আমি শান্তি পাব না।

গৌরী যন্ত্রচালিতার মত কেষ্টর সঙ্গে বস্তি ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পেছনে রাজেনের দল তখনও শাসিয়ে যাচ্ছে।

দু'জনে ট্যাক্সীতে পাশাপাশি বসে, কেউ কথা বলে না। দু'জনের মনের মধ্যেই তোলপাড় করছে, গৌরী ভাবছে তার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা। অল্প ক'দিনের পরিচিত কেষ্টদা'র উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে সে আত্মীয়তার সব বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে চলে এসেছে। কে বলতে পারে এই নতুন পথের শেষ কোথায়? কেষ্টর চোখের সামনে ভাসছে সেই অপ্রীতিকর বস্তির ঘটনা, সমস্ত শরীর-মন তার আড়ষ্ট হয়ে গেছে। এত দুর্ব্বল যে কোন কিছু চিন্তা করারও শক্তি তার নেই। তাই ট্যাক্সী-ড্রাইভার যখন জিজ্ঞেস করলে, কোন দিকে যাবে, কেষ্ট শুধু বাড়ীর রাস্তাটা বলে দিয়ে চুপ করে রইল। সারা পথ সে গৌরীকে কোন প্রশ্ন করেনি, শুধু বাড়ীর মোড়ে এসে বলেছিল, এখানে নামো রিক্সা নিতে হবে।

গৌরী তার নির্দ্দেশ মত রিক্সায় চেপে বসে।

রিক্সা এসে বাড়ীর দরজায় থামলে কেষ্ট নেমে ঠেলা দিয়ে দেখে দরজা খোলা রয়েছে। ভেতরে কাছাকাছি কেউ ছিল না। কেষ্ট গৌরীকে নিয়ে লঘু পায়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সে প্রথম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। গৌরী আড়ষ্ট হয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল, কেষ্ট ক্লান্ত স্বরে বলে, আমি আর পারছি না গৌরী, একটু শুয়ে পড়ি।

কেষ্ট সত্যি সত্যি বিছানায় নেতিয়ে পড়ে। গৌরী এতক্ষণে তার অদ্ভুত পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে, সব ব্যাপারটাই তার কেমন যেন আশ্চর্য্য লাগে! মাত্র এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে জীবনের এ কি বিরাট পরিবর্তন! এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে কেষ্টর সংগে এক ঘরে রাত কাটাতে হবে তা সে কিছুক্ষণ আগেও কল্পনা করতে পারেনি। চুপ করে কেষ্টর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, দেখে যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, ঘরে কোন ওষুধ নেই? মৃদু স্বরে কেষ্ট উত্তর দেয়, দেখ তো ওই ছোট বাক্সটায় 'এনাসিন' আছে কি না—

গৌরী বাক্সটাই কেষ্টর কাছে নিয়ে আসে, দু'টো বড়ী সংগ্রহ করে কেষ্ট কোন রকমে গিলে ফেলে আবার শুয়ে পড়ে। অল্পক্ষণের মধ্যে নিশ্চিন্ত আরামে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

ক্ষিদে-তেষ্টায় কাতর গৌরী কেষ্টর মাথার কাছে বসে থাকে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে অবধি শ্যামা কেষ্টর খাবার ওপরে দিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করছিল। বাবা বেরিয়ে যেতেই আর সময় নষ্ট না করে থালা নিয়ে সোজা ওপরে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকে, কাকু, দরজা খোল, খাবার এনেছি।

কেষ্ট তখন ঘুমে অচেতন। গৌরী ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। শ্যামা বার বার দরজায় আঘাত করেও উত্তর না পেয়ে বিচলিত হয়। তার ভাবনা হয় কেষ্টর নিশ্চয় শরীর খুব বেশী খারাপ হয়েছে, তাই ছুটে গিয়ে ছাদের দিকের জানালার খড়খড়ি তুলে ভেতরে উঁকি মারে। গৌরী খড়খড়ি খোলার শব্দে চমকে উঠে দাঁড়ায়। কাকার ঘরে এই অপরিচিতা মেয়েটিকে দেখে শ্যামার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। কিন্তু কাকার মাথায় জলপটি দেখে তার স্থির বিশ্বাস হয় কেষ্ট বেহুঁস হয়ে পড়েছে। চিন্তিত মুখে শ্যামা নীচে নেমে আসে। মা জিজ্ঞেস করেন, কি রে খাবারের থালা ফিরিয়ে আনলি যে?

—কাকার খুব অসুখ,

—তাই নাকি, ডাক্তার ডাকতে বললে?

শ্যামা আস্তে আস্তে বলে, আমার সঙ্গে কথা হয়নি,

—তাহলে?

শ্যামা মার কাছে সব খুলে বলে, জিজ্ঞেস করে, এখন কি করি মা?

মার শঙ্কার চেয়ে কৌতূহল বেড়ে যায়, বলেন, চল্ আমিও দেখে আসি।

শ্যামার মা মেয়ের পিছু পিছু উপরে এসে খড়খড়ি তুলে দেখেন, কথা মিথ্যে নয়। সত্যিই কেষ্টর শিয়রে এক জন অপরিচিতা ভদ্রমহিলা বসে আছে, ঘরের দরজা বন্ধ।

কেষ্টর দাদা বাড়ী ফিরে স্ত্রীর কাছে এ খবর পেয়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, ছিঃ ছিঃ, ভদ্রলোকের বাড়ীতে এ সব কি?

—তোমার সবটাতে চেঁচামিচি করা চাই।

—তবে কি মুখ বুজে সব সহ্য করব?

—এ সব কেলেঙ্কারী ব্যাপার পাড়ায় জানাজানি হওয়াও তো ভাল নয়। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করো।—এর আমি হেস্তনেস্ত করে ছাড়বো। তোমায় বলে দিলাম, আর কোন কথা শুনছি না।

বলরাম রেগে উঠোনে পায়চারী করতে থাকে। শ্যামার মা বুঝিয়ে বলে, এখন শোবে চল, সকালে উঠে যা হয় কোর।

স্ত্রীর এ যুক্তি বলরামের অপছন্দ হয় না, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

গভীর রাতে কেষ্টর ঘুম ভাঙ্গে। শরীরে আর আগের মত যন্ত্রণা নেই, তবে খুব দুর্ব্বল। কোন রকমে উঠে ঘরের আলো জ্বালে। গৌরী মাটিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। দরজা খুলে ছাদে এসে দাঁড়ায়, খোলা হাওয়ায় শরীর ঠাণ্ডা করে দেয়।

হাজার রকম চিন্তা তাকে চেপে ধরে। গৌরীকে নিয়ে কি করবে সে? কোথায় যাবে, কোথায় রাখবে? কিছুই ভেবে পায় না। একমাত্র ভরসা সকাল বেলা আশুদা' কি প্রভাত যদি সাহায্য করে।

কেষ্টর হঠাৎ খেয়াল হয় তার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে, আবার ঘরে ফিরে আসে। গৌরী ঘুম ভেঙ্গে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। কেষ্টকে দেখে জিজ্ঞেস করে, আপনি কেমন আছেন?

—ভালো। তোমার ক্ষিদে পেয়েছে?

গৌরী উত্তর দেয় না, কেষ্ট ঘরের কোণ থেকে খানিকটা মিয়োনো বিস্কুট বার করে আনে, গৌরীর হাতে খানিকটা দিয়ে বলে, খাও।

গৌরী আস্তে আস্তে বলে, আপনি যখন ঘুমচ্ছিলেন, কে এসে দরজা ঠেলছিল—

—বোধ হয় শ্যামা।

—তার পর কারা খড়খড়ি খুলে দেখছিল, দু'বার।

কেষ্ট বোঝে দাদা-বৌদি নিশ্চয় খবর পেয়েছে। হঠাৎ বলে, গৌরী, ভোরে উঠেই আমরা বেরিয়ে যাব।

তখনও ভোরের আলো পরিষ্কার হয়ে ফোটেনি, কেষ্ট গৌরীকে নিয়ে নীচে নেমে সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। সমস্ত পাড়াটাই ঘুমে অচেতন। সদর রাস্তায় ভিস্তিরা জল দিচ্ছে। নিজেদের পাড়াটা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে মোড়ে এসে রিক্সা নিয়ে প্রভাতের বাড়ীর দিকেই যায়।

গলির মধ্যে দু'খানা ঘর নিয়ে প্রভাত থাকে। কেষ্ট অনেক ধাক্কাধাক্কি করার পর প্রভাত ব্যাজার মুখে দরজা খুলে দেয়।

কেষ্ট, তুই! এত দিন বাদে কেষ্টকে হঠাৎ এ ভাবে দেখে আশ্চর্য্য হয়, জিজ্ঞেস করে, এ সময়, ব্যাপার কি?

কেষ্ট কোন কথার জবাব না দিয়ে বলে, গৌরীকে এনেছি, ঘরে ডেকে নিয়ে আয়।

—গৌরী কে?

—সেই তো, সে পরে বলছি, তুই রিক্সা থেকে নামিয়ে ভেতরে নিয়ে আয়!

প্রভাত আর দ্বিরুক্তি না করে গৌরীকে আপ্যায়িত করে, আসুন, বাড়ীর দরজায় এসে রিক্সাতে বসে থাকবেন না কি?

গৌরী কথামত ভেতরে যায়। কেষ্ট রিক্সা ছেড়ে দিয়ে চট্ করে মোড়ের দোকান থেকে কচুরী-সিঙ্গাড়া,-মিষ্টি কিনে আনে।

প্রভাত রেগে বলে, এ কি, আমার বাড়ীতে এসে খাবার কিনে আনলি, তোর যত সব বাঁদরামী—

কেষ্ট সে কথায় কান না দিয়ে বলে, অনেক দরকারী কথা আছে, তোর পরামর্শ চাই!

—বল।

—একটু পরে, তুই আগে গৌরীর হাত-মুখ ধোবার ব্যবস্থা করে দে।

বাড়ীতে প্রভাত একা থাকে, তাই কোন রকমই অসুবিধে ছিল না। গৌরীকে কলঘর দেখিয়ে দিয়ে প্রভাত বাইরের ঘরে এসে কেষ্টকে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার বল তো?

—সে অনেক কথা, পুরো একটা উপন্যাস।

—বল তো শুনি?

কেষ্ট খুব সংক্ষেপে বলে যায়, গৌরীর সঙ্গে আলাপ থেকে সুরু করে কালকের সেই অপ্রীতিকর ঘটনার পর অপ্রত্যাশিত ভাবে তার সব ভার নেওয়া পর্য্যন্ত, সমস্ত কথা।

প্রভাত প্রশ্ন করে, এখন কি করবি ঠিক করেছিস?

—তাই তো ভাবছি।

—মেয়েটাকে বের করে আনলি কেন, ভালবাসিস?

—সেটা ভাববার সময় পেলাম কই, বোধ হয় রাগের মাথায়!

—বিয়ে করবি?

—যদি কোন উপায় না থাকে।

—এ ছাড়া আর উপায় কি? এত অল্প বয়েসের মেয়েকে কি সাধারণ কাজ দিতে কেউ রাজী হবে? আর কি করবেই বা। সমাজের মধ্যে বাঁচতে হলে বিয়ে করতে হবে।

কেষ্ট চিন্তিত মুখে বলে, তুই তো আমার অবস্থা জানিস, এখন কি করে বিয়ে করবো?

—এখন না হয়, দু'দিন পরে।

—তা পারি, বাড়ী ভাগ হয়ে গেলে। তাও মাস তিনেক তো বটেই, এ ক'টা দিন কি করি?

—ঘর নিয়ে কোথাও ওকে রাখ, তার পর যা হয়—

কেষ্ট বাধা দিয়ে বলে, ঘর পাওয়াও তো মুস্কিল, অনেক কথা উঠবে, এখনও তো বিয়ে হয়নি।

—সে জায়গা আমি ঠিক করে দিতে পারি, যদি তোমাদের আপত্তি না হয়।

—কোথায়?

—বেহালার কাছে, পিনাকীদের একটা ঘর খালি আছে।

—কোন পিনাকী?

—ফোটোগ্রাফার, আমাদের কাগজের কভারের ছবিগুলো তো সবই ওর তোলা—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছবিগুলো তো দেখি একই মেয়ের নানা রকম ভঙ্গী—

প্রভাত সায় দেয়, সেই মেয়েটার সঙ্গেই থাকে।

—ওর বউ?

—না, বিয়ে করায় ছেলে পিনাকী নয়।

—তবে?

—এই রকম হাফ-গেরস্ত থেকেই কাটিয়ে দেবে।

গৌরীকে প্রভাতের বাড়ীতেই অপেক্ষা করতে বলে কেষ্ট বাসা দেখতে বেরিয়ে পড়ে। সহরের এক প্রান্তে ছোট হলদে রংএর দোতলা বাড়ী। বাড়ীওয়ালা উপরে থাকে, নীচেটা ভাড়া দেয়। ঘর দেখে কেষ্ট সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে, খুসী হয়ে প্রভাতকে বলে, একলা থাকার ভয় নেই অথচ সব আলাদা ব্যবস্থা। এ বেশ ভালোই হ'ল। [ক্রমশঃ।

এক প্রত্যয়

সন্তোষ চক্রবর্ত্তী

স্বপ্নের শরীর থেকে ভয় আর বিচ্ছেদের ঘ্রাণ
বলে গেলো: 'যতই-না খুঁজে ফেরো সীমানার তীরে,
আকাঙ্ক্ষার ব্যগ্র স্বর, সন্ধ্যার বিষণ্ণতা ম্লান,
অধুনা পাবে না তাকে—পল্লবিনী সেই সংগিনীরে।'

তার নাম কৃষ্ণকলি এখনো স্মরণে আকুলিত,
এবার স্বগত উক্তি: তাহার আবেশ তুলে নিয়ে
স্মৃতির চেতনা-ভরা এই মন আশায় নিহিত—
পাঁচটি ঋতুর পর আবারো সে রঙ-তুলি দিয়ে।

হৃদয়ে বসন্ত এঁকে আসবেই: স্বপ্নের শরীর
ভয়ের বদলে গন্ধ এনে দেখে নিটোল মদির।
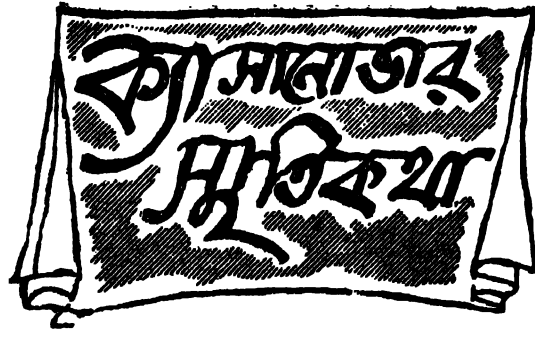
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

হাসছেন? বেশ বেশ, হাসুন যত খুসী, ডাইনী বিড়-বিড় করে বলতে লাগলো—কিন্তু ওই মোমের মূর্ত্তিটিকে যদি রক্তে ধুয়ে দিতাম তবে আপনার কি সর্ব্বনাশ হোতো দেখতেন। ও-সব মন্তর-তন্তর আমি ছাড়া এ তল্লাটে জানে আর কেউ? একটা মন্তর পড়ে যদি ওই মূর্ত্তিটাকে আবার আগুনে ফেলতাম, তাহলে তো সর্ব্বনাশের কিছু আর বাকী থাকতো না।

—হুম, কিন্তু আপাতত তো এটা আমার অধিকারে। এই রইলো আপনার বারো সেকুইন। এবার একটু আগুন জ্বালান, এই বিকট মূর্ত্তিটাকে পোড়াই—আর ওই বোতলের রক্তটা জানলা গলিয়ে রাস্তায় ফেলে দিই।

বৃদ্ধা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, মনে হোলো মূর্ত্তিটাকে গলিয়ে ফেলাতে। ও ভয় পেয়েছিল বিষম। ভেবেছিলো বুঝি ওগুলো আমি বাইরে নিয়ে যাবো ওর শয়তানীর প্রমাণস্বরূপ। এবারে আহ্লাদে আটখানা হোয়ে বলতে লাগলো, আমি হচ্ছি সাক্ষাৎ দেবদূত, আমার মত এমন সৎ এমন উদার দেখা যায় না—সঙ্গে সঙ্গে মিনতিও করলো, যাতে যা কিছু হোয়েছে কারো কাছে আমি না বলি। প্রতিজ্ঞা করলাম—না, কাউণ্টেসও জানবে না বিন্দু-বিসর্গও। তখন ডাইনীটা আরও বারো সেকুইন চেয়ে বসলো—কি ব্যাপার? না তাহলে মন্তরের জোরে ওই কাউণ্টেসকেই আমার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়াবে। আমি স্পষ্টই জানিয়ে দিলাম আমি তার জন্যে একটুও গ্রাহ্য করি না। সেই সঙ্গে একথাও বললাম, ভালোয় ভালোয় এইবেলা ওই জঘন্য ব্যবসা ছেড়ে দিতে, না হলে শীগ্‌গিরই ধনে-প্রাণে ডুবতে হবে।

এতগুলো টাকা গেলো বটে কিন্তু সন্ন্যাসীঠাকুরের কথা বর্ণে বর্ণে মানার জন্যে একটুও অনুতাপ করিনি। সন্ন্যাসীটির কেমন যেন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, আমার একটা অমঙ্গল ঘটবে বলে। খুব সম্ভব চাকর-বাকরের মধ্যে কেউ যে হয়ত ডাইনীর কাছে ওই রক্তটা দিতে গিয়েছিল তাকেই জেরা করে কিছু জেনেছিলেন। আমি কিন্তু ঠিক করেছিলাম কাউণ্টেসের ওই মতলব যে পুরোপুরি ফাঁস হয়ে গেছে আমার কাছে একথা কোন দিনই তাঁকে জানতে দেবো না। তাই আমার ব্যবহার আরও কোমল, নম্র আর বিনীত করে আনলাম। অবশ্য আমার সৌভাগ্য ডাইনীর মন্তরেই কাউণ্টেসের একেবারে অন্ধ বিশ্বাস ছিলো—কারণ তা' না হলে আমার উপর প্রতিশোধ নেবার জ্বালা মিটোতে আমাকে হত্যা করার জন্য গুণ্ডা ভাড়া করতেও পিছপাও হোতেন না বলেই আমার বিশ্বাস। আমি ইচ্ছে করেই এক দিন ওঁকে একটা চমৎকার সৌখীন উপহার দিয়ে ওঁর হাত দুটি চুম্বন করে বললাম,—আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, আমার উপর আপনি এত রেগে গেছেন যে আমাকে খুন করবার জন্যে গুণ্ডা ভাড়া করেছেন।

বলতে না বলতেই লক্ষ্য করলাম ওঁর মুখ টকটকে লাল হোয়ে উঠলো কিন্তু চট্ করে সামলে নিলেন নিজেকে। চলে আসবার সময় দেখলাম, বেশ ভারাক্রান্ত মনে বসে রয়েছেন। ভালো কি মন্দ করেছিলাম, জানি না কিন্তু তার পর থেকেই কাউণ্টেসের ব্যবহার একেবারে বদলে গেল। এক দিনের জন্যেও এতটুকু ত্রুটি আর ঘটতে দেখিনি কোথাও।

একাদশ পরিচ্ছেদ

এবার ইংল্যাণ্ডের পথে। কিন্তু ভারাক্রান্ত মন; মনের তটপ্রান্তে আছড়ে পড়ছে স্মৃতির ঢেউ, একের পর এক।

কি আশ্চর্য্য ভাবেই না মনের সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে আঘাত করে করে যায় হেনরিয়েটা। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে কি অভাবনীয়রূপে আসে ওর চকিত স্পর্শ! মনে পড়ে—

এক মঙ্গলবারের সকালে ক্লেয়ারমঁত এসে বলে, এক জন সাধু খুঁজছেন। আবার সাধু? ভাবতে না ভাবতেই আমার সবচেয়ে ছোটো ভাই সাধুর বেশে এসে হাজির। আমাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত আবেগে আমার দুটি হাত জড়িয়ে ধরলে। ওর উচ্ছ্বাসে বিরক্তই হলাম। কারণ চিরকালের বাউণ্ডুলে এই ভাইকে কোনো দিনই আমি দেখতে পারতাম না ওর উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত স্বভাবের জন্যে। তাছাড়া গত দশ বৎসর ধরে কোনো খোঁজই রাখিনি। ভালো করে চেয়ে দেখলাম ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড়, রুক্ষ শীর্ণ অপরিচ্ছন্ন চেহারা, ভিখারীরও অধম। জিজ্ঞাসা করলাম, আমার ঠিকানা পেলে কোথায়? জানালে, ম্যঁসিয়ে ব্রাগাদিনের কাছে।

—সে কি! তুমি তাঁকে আমার ভাই বলে পরিচয় দিয়েছো? শিউরে উঠলাম আমি।

—নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, আমি যেন তোমার জীবন্ত প্রতীক।

—তোমার মতো ওই আহম্মুক জড়ভরত চেহারাটাকে?

—তিনি তা' ভাবেননি। আমি যে তাঁর সঙ্গেই খেলাম।

—ওই পোসাকে? আমার মাথা হেঁট করিয়ে ছেড়েছো।

—তিনি আমাকে এখানে আসার ভাড়াটাও দিয়েছেন।

—হুম্। তাহলে সত্যিই ভিখিরী হোয়েছো। কিন্তু এখন আমার কাছে কি চাও শুনি? সোজাসুজি বলে রাখছি, আমার দ্বারা কিছু হবে না। যা বলবার, চলো তোমার সরাইখানাতেই গিয়েই

বলবে চলো, এখানে নয়। আর সাবধান, আমার চাকর-বাকরের কাছে আমার ভাই বলে পরিচয় দিও না।

এবার আমার ভাই জানালে সে একা নয়, সাধুগিরি করা সত্ত্বেও প্রেমে পড়ে একটি তরুণীকে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার পিতৃগৃহ থেকে তাকে ভুলিয়ে এনেছে—তাই ভেনিসে ফিরে যাবার সাহস নেই। এত দূর অধঃপতনও হোয়েছে তাহলে! মনে মনে ভাবলাম, তাহলেও একবার দেখেই আসা যাক ব্যাপারটা।

উজ্জ্বল শ্যামলা, দীর্ঘাঙ্গী, অত্যন্ত সপ্রতিভ অথচ অপরূপ শ্রীময়ী তরুণী। আমাকে দেখেই তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে প্রশ্ন করলে—আপনিই বুঝি এই মিথ্যাবাদীটার ভাই হ'ন? ওই জোচ্চোরটা যে আমার সর্বনাশ করেছে?

মেয়েটির বক্তব্য স্থির হোয়ে শুনলাম। আমার শ্রীমান্ ভ্রাতা মেয়েটিকে একটার পর একটা মিথ্যা সাজানো ভাঁওতা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে এখান থেকে সেখান করে। একটি পয়সা সম্বল নেই। আজ যদি আমার দেখা না পেতো তবে কাল থেকে মেয়েটিকে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করতে হোতো। দুঃখে, অপমানে, হতাশায়, বঞ্চনায় পাগল হোয়ে উঠেছে মেয়েটি। ওর যথাসর্বস্ব বিক্রী করে দিয়েছে আমার শ্রীমান ভ্রাতা। মেয়েটি কাতর অনুরোধ জানালে আমাকে, ওকে নিরাপদে ভেনিসে পৌঁছে দেবার একটা ব্যবস্থা করতে। আর আমার ভাইএর লিখিত অঙ্গীকার-পত্র—বিবাহের প্রতিশ্রুতি জানিয়ে। সেটা যেন আমি আগুনে পুড়িয়ে ফেলি। ওই জুয়াচোর বদমায়েশের সান্নিধ্য আর এক মুহূর্ত্তও সহ্য করতে চায় না মেয়েটি। আমার সামনে দুটি মুণ্ড—হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে দুই হাত জড়ো করে অপরাধীর নীরবতায় আমার ভাই নির্ভীক, তেজোদৃপ্ত স্পষ্ট—প্রকৃত ভেনিসের মেয়ের মুখ। ভালো লাগলো আমার। দায় আর দায়িত্ব বোঝার মত ভাবা রইলো না আর। ওকে নিরাপদে পিতৃগৃহের স্নেহনীড়ে পৌঁছে দেওয়া একটুও কঠিন নয় জানতাম, তাই সহজেই এবার বললাম, আমি তোমাকে কোনো বিশ্বাসী ভদ্রমহিলার সঙ্গে ভেনিসে পাঠানোর সব ভার নিলাম।

—মনে রেখো, মনে রেখো, তুমি কিন্তু শপথ করেছো আমার প্রতি চিরদিন বিশ্বস্ত থাকবে, বুঝেছো? মনে রেখো সেটা—বলতে বলতে যেই আমার ভাই ওর দিকে এগোলো সেই মুহূর্তেই ওই কোমল পেলব হাতের প্রচণ্ড কানমলা খেয়ে শ্রীমান কাঁদো-কাঁদো হোয়ে পিছিয়ে এলেন।

—বাঃ, তুমি তো দেখছি একটি ক্ষুদে বিচ্ছু, আমি বললাম মেয়েটিকে—আমার ভাইএর এত লাঞ্ছনা ভোগ তো তোমাকে ভালোবাসে বলই না?

—সেটা তো আমার অপরাধ নয়—তাছাড়া আমার কাছে কানমলা খাওয়াও এই প্রথম নয় ওর—

বাঃ রে মেয়ে!

—কিন্তু সাধুর গায়ে হাত তোলার জন্যে তোমাকে একঘরে করেছিলো মনে আছে?—ফোঁস করে উঠলো আমার ভাই।

—ভারী ব'য়েই গিয়েছিলো কিন্তু ফের বকবক করলেই আবার কানমলা খাবে।

—চুপ করো, চুপ করো, একটু শান্ত হও। তোমার জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও। চলো আমার সঙ্গে। তোমার যাবার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

এই বলে ভাইয়ের হাতে সবশুদ্ধ বিশটি সেকুইন দিয়ে ওকে চলে যেতে বললাম। হাতে টাকা পেয়েই শ্রীমান সন্তুষ্ট।

মেয়েটির নাম মার্কোলিনা। ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। আমার কাছে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, সুন্দর সজ্জা আর ভবিষ্যতের আশ্বাস পেয়ে ফোটা ফুলের মত সজীব হোয়ে উঠলো মার্কোলিনা। হাসিতে, কৌতুকে, ভঙ্গীতে, ইঙ্গিতে ওর সহজ মাধুরী উপচে উঠলো।

কয়েক দিন পর মার্কোলিনাকে নিয়েই আমি মার্সেলস-এ একটা বিবাহ উৎসবে যোগ দিতে গেলাম। উৎসব শেষে আমাদের যাত্রা সুরু হোলো। আমি ঠিক করেছিলাম, একটু সুবিধা পেলেই মার্কোলিনাকে ভেনিসে পাঠাবার ব্যবস্থা করবো। যাই হোক, আমাদের গাড়ী বেশ কিছুদূর এসেই বিগড়ে গেল। না সারিয়ে আর এগোবার উপায় নেই। পথের দু'ধারে কোনো বাড়ীও নেই। একটি মাত্র সুন্দর বাড়ী দেখা যাচ্ছিল, একটু দূরে মস্ত বাগানের মধ্যে। দুধারে উঁচু গাছের সারি দেওয়া লম্বা রাস্তা চলে গিয়েছে বাড়ীটার ফটক অবধি। কোনো উপায় না দেখে ক্লেয়ারমতকে পাঠালাম ওই বাড়ীটায়—কাছাকাছি কোনো মিস্ত্রী পাওয়া যাবে কি না এই সব জেনে আসতে।

একটু পরেই ও ফিরে এলো, সঙ্গে দু'জন পরিচারক। তারা আমাকে অভিবাদন করে অত্যন্ত নম্রভাবে জানালে যে, তাদের উপর আদেশ হোয়েছে, গাড়ীটা মেরামতের ব্যবস্থা করার আর আমাদের এই সময়টুকুর জন্যে ওই বাড়ীটিতে আতিথ্য নিতে অনুরোধ জানাবার। উপায়ান্তর ছিল না। জিনিষপত্র সবই আমার বিশ্বস্ত ক্লেয়ারমত-এর জিম্মায় রেখে মার্কোলিনাকে নিয়ে এগোলাম। বাড়ীর ফটকের কাছে আসতেই দু'জন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে, ওঁদের পিছনে তিন জন মহিলা। ভদ্রলোক দু'জন বার বার বলতে লাগলেন, মাদামের অর্থাৎ গৃহকর্ত্রীর অত্যন্ত আনন্দ হোয়েছে আমরা আতিথ্য স্বীকার করাতে। তা ছাড়া আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য উনি সর্ব্বদাই উৎসুক, আমরা যেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে বিশ্রাম করি। আমি বিনীত ভঙ্গীতে গৃহকর্ত্রীর উদ্দেশে অভিবাদন আর ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আশা করি বেশীক্ষণ ওদের উপর অত্যাচার করতে হবে না। গৃহকর্ত্রী লীলায়িত ভঙ্গীতে অভিবাদন করলেন। কিন্তু ওঁর মুখ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কারণ ওড়নাতে সমস্ত মুখটা এমন ভাবে ঢাকা ছিলো যে একটু অংশও দেখা গেল না। আমার পাশেই মার্কোলিনার লাবণ্যভরা মুখখানি পূর্ণ বিকশিত; মুখের চার পাশে অবাধ্য চুলগুলি সাপের ফণার মত ঢেউ তুলে উড়ছে, কোনো আবরণের বালাই নেই। ওঁদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, মার্কোলিনা আমার মেয়ে কি না? আমি বললাম ও আমার সম্পর্কিতা বোন, আমরা দু'জনাই ভেনিসের লোক। আমাদের কথার মাঝখানে একটা মস্ত স্প্যানিয়েল কুকুর তীরের মত ভিতর থেকে ছুটে এলো; মাদাম ওকে তাড়াতাড়ি ধরতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। যেই ওঁর সহচরী ওঁকে ধরে তুললে, উনি বললেন, ভালো করে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, ভীষণ ভাবে পা'টা মচকে গেছে। ওঁকে ধরে ওর ঘরে নিয়ে গেল, যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সহচরীটি ফিরে এসে খবর দিলে যে, ওঁর পা'টা

দেখতে দেখতে ফুলে উঠেছে, উনি বিছানায় শুয়ে আছেন আর সেখানেই আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন।

শয়নাগারে প্রবেশ করেও ওঁর মুখচন্দ্রিমা দর্শনের সৌভাগ্য হোলো না, তবু দুঃখিত ভাবে স্বীকার করলাম, ওঁর এই দুর্ঘটনার জন্যে আমিই দায়ী। পরিষ্কার স্বচ্ছন্দ ইতালীয় ভাষায় উনি জানালেন, আমাদের অতিথি হিসাবে পাওয়ার আনন্দের কাছে ওই ব্যথা নিতান্তই তুচ্ছ।

—মাদাম, আমার দেশের ভাষা এত চমৎকার বলেন আপনি? নিশ্চয়ই আপনি ভেনিসে ছিলেন?

—তা নয়। তবে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন ভেনিসেরই অধিবাসী।

এই সময় একজন পরিচারক এসে জানালো, বেশ কয়েক ঘণ্টা দেরী হবে গাড়ীটা মেরামত করতে। মাদাম অনুরোধ জানালেন, রাত্রিটাও তাহলে এখানেই কাটাতে। কৃতজ্ঞ ভাবেই সম্মতি জানালাম।

রাত্রে খাবার টেবিলে সারাক্ষণ অনর্গল ইতালীয় ভাষায় আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ওঁর মুখ দেখতে পেলাম না। আর পরিচয়? তা-ও সাহসের অভাবে খোলাখুলি জানা হোলো না।

নিদ্রার আয়োজনের সময় মার্কোলিনা জানালে, মাদামের কাছেই ও রাতে শোবে; এ দু'জনার সখীত্ব ওই অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ নিবিড় হোয়ে উঠেছে দেখলাম।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। প্রাতরাশের ব্যবস্থা গাড়ীতেই করবো ঠিক করলাম। বিদায় নেবার আগে গৃহকর্ত্রীর দর্শন চাইলাম—মিললো না। তখনও তাঁর সজ্জা ও প্রসাধন হয়নি, সে অবস্থায় উনি বাইরে আসতে লজ্জিতা। তবে তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে পাঠালেন আর পাঠালেন অনুরোধ—যখনই যাবো এ পথ দিয়ে, একা হোক, সবান্ধবে হোক, ওঁর কাছে যেন আতিথ্য স্বীকার করি। দেখা না হওয়াতে মনে মনে বিরক্ত হলাম বৈ কি! কিন্তু প্রকাশ্যে শিষ্টতার কোনো ত্রুটী ঘটেনি। সবার কাছে বিদায় নিয়ে আবার মার্কোলিনা আর আমার যাত্রা সুরু হোলো।

পথে মার্কোলিনাকে প্রশ্ন করলাম, কেমন দেখতে ওই মাদামকে? তরুণী না বৃদ্ধা? রূপসী না কুৎসিত?

—এক কথায় মনোহারিণী। কি অপরূপ সৌন্দর্য্য ওঁর, আপনাকে কি বলবো? বয়স তো তেত্রিশ বছর বললেন। হ্যাঁ দেখুন দেখুন, আমাকে ভালেবেসে কি দিয়েছেন—

বহুমূল্য হীরার আংটি দেখলাম ওঁর প্রসারিত আঙুলে। কিন্তু কেন আমার কাছে সারাক্ষণ ওড়নাতে মুখ ঢেকে রইলেন—এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ওঁকে দেখতে দিলেন না। তার কি কারণ, বার বার প্রশ্ন করেও মার্কোলিনার কাছে কোনো সদুত্তর পেলাম না। তার বদলে মঁসিয়ে কুয়েরিনি ভেনিসের যিনি রাজদূত তাঁর কাছে যে ওর মামা মাতিও বসে কাজ করে সেই সব অবান্তর প্রসঙ্গ তুলে আমার সঙ্গে ইংল্যাণ্ড যাবার বায়না জুড়ে দিলো। শুধু ওকে থামাবার জন্যেই ওর সব কথায় সায় দিয়ে গেলাম।

সূর্য্যাস্তের পর আমরা আভিনোঁতে পৌছলাম। ওখানে একটা সরাইখানাতে রাত কাটাবার ব্যবস্থা হোলো। দু'জনে ঘরে বসে
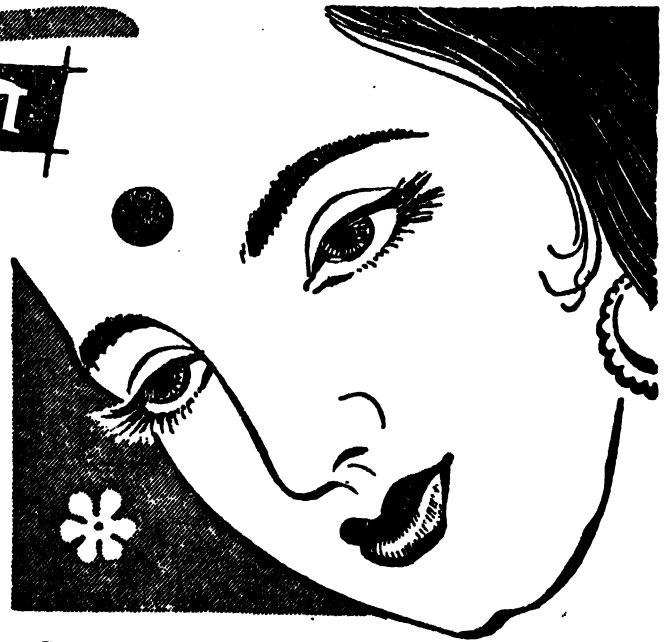
এমন সময় মার্কোলিনা হঠাৎ বললে,—আমরা তো আভিনোঁ-এতে পৌঁছে গেছি। যাক্ তাহলে মাদামের কাছে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা' পূরণ করবার সময় হোলো। হ্যাঁ, উনি এখানে না পৌঁছানো অবধি আপনাকে কিছু বলতে বারণ করে দিয়েছিলেন, এমন কি আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞাও করিয়ে নিয়েছিলেন।

—আরে সত্যি! বেশ মজার ব্যাপার তো? বলো বলো তারপর?···

—উনি আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। এতক্ষণ চিঠি আটকে রাখার জন্যে রাগ করলেন না তো আমার উপর?

—পাগল হোয়েছো? তুমি একজনের কথা রেখেছো, তা'তে আমি রাগ করবো? কিন্তু চিঠিটা কই, বার কর তাড়াতাড়ি—

—দাঁড়ান—এই বলে একতাড়া কাগজ বের করে ও বাছতে বসলো।

—ওঃ এটা আমার জন্মের সার্টিফিকেট।

—জানি তুমি ১৭৪৩ সালে জন্মেছ।

—আর একটা তো দেখছি আমার সততার সার্টিফিকেট।

—রাখো রাখো ওসব, পরে কাজে লাগবে। এখন আসল চিঠিটাই বার কর না?

—আশা করি হারাইনি।

—ঈশ্বর না করুন—কৌতূহলে আর অদম্য আগ্রহে আমার তখন আত্মহারা অবস্থা।

—এই যে পেয়েছি—আরে না তো! এতো আপনার ভায়ের লেখা ক'টি কবিতা।

—চুলোয় যাক কবিতা, পুড়িয়ে ফ্যালো ও সব আগুনে। আমার চিঠিটা কোথায় বার করো আগে।

—ওঃ ভগবান! এই—এই যে পেয়েছি!

ওর হাত থেকে খামটা একরকম ছিনিয়ে নিলাম। সাদা খাম, কোনো ঠিকানা নেই। খামটা ছিঁড়তে গিয়ে আমার আঙুলগুলো প্রবল উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলো। সীলটা ভেঙে ফেলতেই দেখলাম, নামের জায়গায় লেখা—

"আমার সারা জীবনের মহত্তম পুরুষকে।"

এ কি আমাকে উদ্দেশ করে লেখা? আশ্চর্য, আরও আশ্চর্য যে তখনও বাকী। সাদা পৃষ্ঠার একটি কোণে লেখা—

'হেনরিয়েটা'—আর একটি অক্ষরও নয়।

স্পষ্ট, স্বচ্ছ সেই চিরপরিচিত' লিখনভঙ্গী! আমারই হেনরিয়েটার—কোনো ভুল কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই তাতে। এর সেই অভিন্ন ইঙ্গিতময় বর্ণো-বিন্যাস—স্মৃতির পটে যে আজও জ্বলছে শেষ বিদায়ের দিনে সেই শেষ শেষ লিপি! একটিমাত্র কথা 'বিদায়'—সমস্ত না বলা কথাকে মূর্ত করে তুলেছিলো।

আমার হেনরিয়েটা! যার বিচ্ছেদ সুদীর্ঘ কালের প্রলেপে এতটুকু ম্লান হয়নি। দিনে দিনে আমার সমস্ত সত্তায় ও মিশে গিয়েছে গভীর থেকে গভীরতর অনুভূতিতে। ওকে পাওয়ার চেয়ে ওকে হারিয়েই ওকে নিবিড় করে পেয়েছিলাম।

কিন্তু হেনরিয়েটা, পারলে তুমি এত নিষ্ঠুর হতে? তুমি দেখেছিলে, তুমি চিনেছিলে তবু তুমি ধরা দিলে না? তাই বুঝি অবগুণ্ঠনের আড়ালে অপরিচিতা হোয়েই রইলে? কিন্তু পারলে তুমি হেনরিয়েটা? কেন ভয় পেয়েছিলে কি? দীর্ঘকালের যাত্রায় প্রথম যৌবনের লাবণ্য কিছু ম্লান হয়েছে বলে? ষোলো বছর আগে যে তরুণ তোমার মাধুর্য্য-সরোবরে ডুব দিয়েছিলো, তার সেই মুগ্ধ প্রেম আজও তো তেমনি আছে। তুমি সুখী হোয়েছো—শুধু কথাটি তোমার মুখে শোনার আনন্দ থেকে আমায় বঞ্চিত করলে—তুমি এত নিষ্ঠুর কেমন করে হোলে হেনরিয়েটা? আমাকে আজও ভালোবাসো কি না এ প্রশ্ন তোমায় আমি করতাম না—আমি জানি, আমি তোমার যোগ্য নই। মহিমময়ী, মাধুর্য্যময়ী প্রিয়া আমার কালই তোমার কাছে ফিরে যাবো আমি। তুমিই তো বলেছো তোমার দরজা আমার কাছে চিরদিন খোলা।

ওকে উদ্দেশ করে মনে মনে কত কথাই না বলছিলাম। কিন্তু সম্বিত ফিরে পেলাম মার্কোলিনার বিস্মিত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে। খেয়াল হোলো মন চাইলেই ওর কাছে যাবার, উপায় আমার নেই। কারণ, জানি আমি ও চায় না আমাদের দেখা হোক—ওর ইচ্ছার মূল্য আমাকে দিতেই হবে—সেইখানেই তো আমার প্রেম সার্থক। তবু সেই একই মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করলাম, মৃত্যুর আগে আর একটিমাত্র শুধু ওর দর্শন প্রার্থনা করবো।

মার্কোলিনা সভয়ে বলে উঠলো,—কি কাণ্ড বলুন তো মঁশিয়ে? আপনার চেহারা দেখে তো আমি রীতিমত ঘাবড়ে গেছি। একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হোয়ে গেছে মুখ—একটি কথাও বলছেন না—কাউন্টেস আপনাকে চিনতেন শুনলাম, কিন্তু ওঁর নাম শুনে আপনার যে এমন দশা হবে বুঝতে পারিনি।

—কে বললে তোমাকে আমরা বন্ধু ছিলাম?

—কাউন্টেসই বললেন। তাছাড়াও আমাকে বললেন, যদি জীবনে সুখী হতে চাও তবে ওঁর সঙ্গ কখনও ত্যাগ কোরো না। হায় রে, উনি কি আর জানেন যে আমাকে দেশে পাঠাবার সব ব্যবস্থাই আপনার করা হোয়ে গেছে? আমি কিন্তু তখনি সন্দেহ করেছিলাম আপনাদের দু'জনার মধ্যে বেশ নিবিড় প্রেমই ছিলো—আচ্ছা অনেক দিন হোলো কি?

—ষোলো, সতেরো বছর হবে।

—ওঃ তাহলে নিশ্চয়ই তখন খুবই কম বয়স ছিলো ওঁর—কিন্তু আজ ওঁর যে আশ্চর্য্য পাগল-করা রূপ এর চেয়ে সৌন্দর্য্য তখন নিশ্চয়ই ছিল না—

—মার্কোলিনা দোহাই তোমার—আর বোলো না—

—আপনাকে কাছে পেয়েও হারালাম—আমার কপালে এ সুখ জুটলো না।

—মার্কোলিনা, তুমি চিরসুখী হবে—তোমার সমবয়সী কেউ তোমার জীবনে নিশ্চয়ই আসবে, তার ভালোবাসা তোমাকে ঘিরে রাখবে চিরদিন।

কয়েক দিনের মধ্যেই মার্কোলিনার যাবার সুযোগ এলো। লণ্ডনের ভেনিশীয় রাজদূত মঁসিয়ে কুইরিনির সঙ্গে এক দিন থিয়েটারে সাক্ষাৎ হোলো। প্রথম পরিচয়ের পর এক দিন কুইরিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। আর তাঁর বাড়ীর ভোজসভায় তাঁর মার্কোলিনার মামার সঙ্গে ওর নাটকীয় পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎ।

মঁসিয়ে কুইরিনিই মার্কোলিনার পিতৃগৃহে পৌঁছানোর সব ভার নিলেন। তার মামাই তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, তাছাড়া মঁসিয়ে

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 542-X52 BG

কুইরিনি মাদাম ভেনারেন্দা নামে একটি বিশ্বস্তা মহিলাকে মার্কোলিনার সঙ্গিনী হিসাবে পাঠালেন।

যাক, আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু মার্কোলিনার বিচ্ছেদও আমাকে এমন তীব্র ভাবে কাতর করবে, বুঝতে পারিনি। ওকে বিদায় দিয়ে এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বহুক্ষণ কেঁদেছি। শেষে ক্লান্ত হোয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রায় পুরো একটি দিন ঘুমের শেষে দেখলাম, দেহে-মনে আবার সতেজ হোয়ে উঠেছি। আশা আর আনন্দে মনের স্ফূর্তিতে ইংলণ্ডে যাবার আয়োজন সুরু করলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইংল্যাণ্ড!

বিদেশী যেদিন প্রথম পা দেয় ইংল্যাণ্ডের মাটিতে, সেদিন প্রথমেই তাকে কাষ্টমসের পীড়াদায়ক অত্যাচারের কবলে পড়তে হয়। আরও হয় কর্ম্মচারীদের রূঢ় গর্বোদ্ধত আচরণে। ইংরেজ আইন মেনে চলবে কঠোর নিষ্ঠায়। তার জন্য কর্কশ, অমার্জিত, দাম্ভিক আচরণেও দ্বিধা করবে না, বিশেষ করে কর্ম্মচারীরা—ফরাসীরা জানে, কেমন কর্ত্তব্যের সঙ্গে মেশাতে হয় ভদ্রতা আর আন্তরিকতার সহজ সুর।

ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা দিয়ে আমার মনকে প্রথম আকৃষ্ট করে ওর পরিচ্ছন্নতা। সারা দেশটাই যেন সৌন্দর্য্যে, প্রাচুর্য্যে আর পরিচ্ছন্নতায় জ্বল-জ্বল করছে। আর সবচেয়ে বেশী ভালো লাগলো কাগজের নোট। এক টুকরো কাগজের বিনিময়ে সব পাওয়া যায়, সব দেওয়া হয়! লণ্ডন, ডোভার, ক্যাণ্টারবেরী।

প্রত্যেকটি শহরই আমাকে মুগ্ধ করলো। প্রথমে অবশ্য লণ্ডনেই স্থায়ী আস্তানা পাতলাম। কিন্তু নতুনের মোহ কাটবার পর থেকে কেমন বৈচিত্র্যহীন নিঃসঙ্গ কাটতে লাগলো দিনগুলি।

লর্ড পেমব্রোক আমাকে মন্ত্রণা দিয়েছিলেন 'ষ্টার ট্যাভার্ণ' হোটেলে খেতে—তাহলে নাকি আমি লণ্ডনের সেরা সুন্দরীদের দর্শন পাবো! কথামত গিয়েছিলাম, হোটেল-মালিকের সঙ্গে পরিচিত হোয়ে খুশীও হোয়েছিলাম। লর্ড পেমব্রোক-এর কথা জানাতে তিনি বললেন, ঠিক ওরকম ভাবে নয় তবে আমি যদি একত্রে আহারের জন্য একটি সঙ্গিনী খুঁজি—তাহলে শুধু মুখ ফুটে এক বার জানালেই চলবে। এই বলে তিনি ওয়েটার ডেকে বললেন, একটা মেয়ে ধরে আনতে—এমন ভাবে যেন বললেন যে, একটা শ্যাম্পেনের বোতল নিয়ে আয় তো। কিন্তু যেটি এলেন, তাঁকে দেখেই তো আমি মূর্চ্ছা যাবার জোগাড়। তাড়াতাড়ি একটা শিলিং দিয়ে বিদায় করলাম। কিন্তু হা হতোহস্মি! পর পর যে কয়টি নমুনা এলেন, তাঁদের প্রত্যেকের রূপেই আমি অস্থির। শেষ অবধি ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা—বললাম, আমি একাই খাচ্ছি, দয়া করে আর কষ্ট করবেন না।

সেদিন বাড়ী এসে ভাবী একটা অভিনব পন্থা মনে এলো। পরিচারিকাকে ডেকে বললাম, আমার বাড়ীর তিনতলাটা ভাড়া দেবো, তাহলে আর এমন নিঃসঙ্গ কাটাতে হবে না আর তার জন্যে ওর যা বাড়তি কাজ হবে, সে সবের দরুণ সপ্তাহে আধ-গিণি করে তাকে দেবো। পরদিনই ওকে দিয়ে জানলায় নোটিশ টাঙালাম :—

এই বাড়ীর তিনতলাটি আসবাবপত্র দ্বারা সজ্জিত অবস্থায় ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া অল্প—প্রার্থী তরুণী; একক এবং নির্ব্বঞ্ঝাট হওয়া চাই। ইংরাজী ও ফরাসী কথোপকথনেও অভ্যস্তা এবং কোনো দর্শনপ্রার্থীরই প্রবেশ নিষেধ।

বৃদ্ধা পরিচারিকাটির তো এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দেখে হাসতে হাসতে দম বন্ধ হবার যোগাড়। আমি বললাম,—হাসছো কেন বাছা? তুমি কি ভাবো, কেউ ঘর নিতে আসবে না?

—ঠিক তার উল্টো। সারা দিন-রাত কি ভীড় হয় দেখবেন। যাক্ সে, ফ্যানী ঠেকাতে পারবে।

—খুব বেশী হবে কি? ইংরেজী আর ফরাসী দুটো ভাষার কথা লিখেছি যে।

—আহা! অমন বিজ্ঞাপন পড়ার জন্যেই কত ভীড় হয় দেখুন।

সে কথা সত্যি। এক বার নোটিশটা না পড়ে কেউ যায় না। দ্বিতীয় দিন আমার নিগ্রো ভৃত্য জারবি আমাকে দেখালে দু'-দুটো খবরের কাগজে কি ভাবে আমার বিজ্ঞাপনটা ফলাও করেছে।

—ভদ্রলোকটির রুচিজ্ঞান আছে আর আমোদপ্রিয় তো বটেই। কারণ, উনি যে চান তাঁর শুধু তরুণী হলেই চলবে না, একলা হওয়াই চাই, আবার নির্ঝঞ্ঝাট! তাছাড়া তাঁর কাছে কোনো সাক্ষাৎকারীর প্রবেশ নিষেধ—অর্থাৎ ভদ্রলোক নিজেই তাঁকে সর্ব্বদা সঙ্গ দেবেন। তবে ভয়ের কথা, যদি তরুণীটি রাতে ঘুমোবার সময়েই শুধু বাড়ী ফেরেন? কিম্বা যদি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেরিয়ে যান বাড়ী থেকে? আর যদি সাক্ষাৎকারী হিসেবে বাড়ীওলারও প্রবেশ নিষেধ করেন!

একথা মানতেই হবে, ইংরেজী দৈনিকগুলিই দুনিয়ার সেরা পত্রিকা। যা কিছু ঘটে তা' নিয়ে মুক্তকণ্ঠে আলোচনা চলে পত্রিকা মারফৎ। যে দেশে লোকেরা স্বাধীন ভাবে বলতে আর স্বাধীন ভাবে লিখতে পারে সে দেশের মানুষই তো আসল সুখী।

যাই হোক, দশ দিন ধরে প্রায় শ'খানেক তরুণীকে প্রত্যাখ্যান করার পর এগারো দিনের দিন যখন খেতে বসেছি, এমন সময় একটি তরুণী এলো। সোজা আমার খাবার ঘরেই। বয়স মনে হোলো বিশ থেকে চব্বিশের ভিতর। দীঘল, তন্বী, সুঠাম দেহ—অত্যন্ত মার্জিত, বাহুল্যহীন রুচিপূর্ণ পরিচ্ছদ—শান্ত, গম্ভীর ঈষৎ গর্ব্বিত মুখশ্রী—আর ঘন মেঘের মত কালো চুল।

সুন্দর সংযত ভঙ্গীতে আমাকে অভিবাদন জানাতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমাকে অনুরোধ জানালে আমি যেন খাওয়া ছেড়ে না উঠি। ওর কণ্ঠস্বর আর বলার ভঙ্গীতে বোঝা গেল, বেশ বনেদী ঘরাণা ঘরের মেয়ে। আমার সঙ্গে কিছু খেতে অনুরোধ করায় এমন সহজ মধুর ভঙ্গীতে প্রত্যাখ্যান জানালে যে, আমি মুগ্ধ হোয়ে গেলাম। মেয়েটি এসেই ফরাসী ভাষায় কথা সুরু করেছিলো, পরে কথায় কথায় অতি সুন্দর আর নির্ভুল ভাবে ইতালীয় ভাষায় কথা বলতে লাগলো। মেয়েটি জানালো আমার সব রকম সর্ত্তেই ও রাজী। আমিও রাজী হোয়েছিলাম, ওকে দেখার আর কথা শোনার পর থেকেই।

—সমস্ত তিনতলাটা নেওয়া আমার পক্ষে বড্ড বেশী হয়ে পড়বে। যদিও আপনি সস্তা ভাড়ার কথাই বিজ্ঞাপনে দিয়েছেন, তবুও থাকার জন্য সপ্তাহে দু'শিলিংএর বেশী খরচ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—ঠিক আছে। ওই ভাড়াই আমিও ঠিক করেছিলাম। আপনি কিছু ভাববেন না। আমার পরিচারিকাই আপনার বাজার করা কাপড় ধোওয়া ইত্যাদি সব কিছু কাজ করে দেবে।

—অনেক ধন্যবাদ ! তাহলে খুব সুবিধা হবে আমার। আমার পরিচারিকাকে তাহলে জবাব দেবো। কারণ সে বড্ড পয়সা চুরি করে। আমার আয়ের পক্ষে সেটা বেশ মারাত্মক হোয়ে পড়ে। আমি বরং আপনার লোকটিকে সপ্তাহে ছ'পেনী করে দেবো। বলতে লজ্জা করে কিন্তু বেশী খরচ করার সাধ্য নেই আমার।

—কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না। আপনি যদি এক পেনী দেন তো আমার রাঁধুনীকেও রোজ এক পেনী দামের খাবার আপনাকে দিতে বলবো। রান্না নিয়ে আপনি বৃথা ভাববেন না। আর তাছাড়া রাঁধুনী যা আপনাকে দিয়ে যাবে, যত খাবারই হোক সবই নেবেন দ্বিধা না করে। কারণ আমার বলা আছে রোজ চার জনের মত রান্না করতে অথচ খেতে আমি একা। আপনি এক পেনী দিলে সেটাই ওর পুরোপুরি লাভ। কিছু মনে করবেন না আপনি এতে।

—কি আর বলবো, আপনার এ উদারতা আমি কখনো ভুলবো না।

সব ব্যবস্থা হোয়ে গেলো। মেয়েটি চলে গেলো জিনিষপত্র সব নিয়ে আসতে। এসেছিলো যখন তখন ওর মুখখানা ছিলো পাণ্ডুর ম্লান—যাবার সময় দেখলাম রক্তিম আভাসে উজ্জ্বল। ওর নাম কুমারী পলিন।

পরিচারিকার মারফৎ পলিনের সব খবরই কানে আসতো। শোবার ঘর ছাড়া বেশবাস পরিবর্ত্তনের জন্যে ছোটো একখানি ঘর বেছে নিয়েছে, চাকর-বাকরদের চেয়েও ছোটো ঘরখানা। এমনি পানীয় হিসাবে জল ছাড়া কিছুই খায় না। সকালে ছোট্টো একটুকরো রুটী শুধু আর দুপুরে স্যুপ, এর সঙ্গে আর একটিমাত্র ডিম সে যাই হোক না কেন।

এসব শুনে তখনি পরিচারিকাকে শিখিয়ে দিলাম পুরো প্রাতরাশ ওকে দিতে আর জানাতে, এ বাড়ীর নিয়মই সব ঘরে পুরো প্রাতরাশ পাঠানো—না হলে আমি ভীষণ দুঃখিত হবো। একখানি চিঠিও লিখেছিলাম ভালো একটা ঘর বেছে নেবার অনুরোধ জানিয়ে। আর সবশেষে ক্রেবামঁতকে পাঠালাম সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। প্রার্থনা মঞ্জুর হোলো। ঘরে গিয়ে দেখি বেশ কয়েকখানি বই টেবিলের উপর স্তূপীকৃত, তাছাড়া অন্য সব নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের টুকিটাকি—যা দেখলেই দারিদ্র্যের কথাই মনে হয়। আমি যেতেই পলিন এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালে।

—কি করে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো !

—আপনার সঙ্গ দিয়ে—অন্তত খাবার সময়টায়। একা খেতে গেলেই গোগ্রাসে গিলি, ফলে শরীরও ভেঙে পড়ে। যদি কিছু মনে না করেন আপনি আমার সঙ্গে খেতে এলে আমার পক্ষে খুবই ভালো হয়। অবশ্য তার জন্য আপনার বিন্দুমাত্রও অসুবিধা ভোগ করতে হবে না কোন দিক দিয়েই—

—তাই হবে, কিন্তু খুব যে মনোরম সঙ্গ পাবেন তা' মনে হয় না।

সেদিন আরও অনেক কথাই হোলো। কথায় কথায় জানলাম, পলিন ইংরেজ নয়, বাইরে থেকে এসেছে। অথচ ছোটো থেকেই ইংরেজী কথা বলতেই অভ্যস্ত। ক্রমেই ওর মধুর অথচ সংযত ব্যবহার ওর শান্ত-শ্রী আমার মনকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করছিলো বুঝতাম। আর ওর কথায়-বার্তায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হোয়েছিলো ও রীতিমত অভিজাত-বংশীয়া। এক দিন আরও ঘনিষ্ঠ প্রশ্নই করে বসলাম পলিনকে,—আপনি বিবাহিতা ?

—হ্যাঁ।

—মাতৃস্নেহের স্বাদ পেয়েছেন আপনি ?

—না। তবে অনুভব করতে পারি বৈ কি ?

—আপনার স্বামী ? তার সঙ্গে এ বিচ্ছেদ কেন ?

—তিনি অনেক দূরে থাকেন। বিচ্ছেদ নয়—কিন্তু দোহাই আপনার, আর প্রশ্ন করবেন না।

—একটা কথার অন্ততঃ জবাব দিন—এখান থেকে যখন চলে যাবেন—সে যাওয়া কি স্বামীর সঙ্গে মিলবার আশায় ?

—হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি ইংল্যাণ্ড ছেড়ে যাবার আগে আপনাকে ছেড়ে যাবো না। এই সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরা ছোটো দ্বীপটি ছেড়ে যাবো শুধু আরও সুখী হবার আশাতেই—আমার প্রিয়তমের সঙ্গ পেলে।

একটা প্রবল বেদনার অনুভূতিতে আমার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠলো—আর থাকতে না পেরে আবেগে বদ্ধকণ্ঠেই বলে উঠলাম, —আর আমি পড়ে থাকবো পিছনে—হতভাগ্যের মতো ! পলিন, পলিন আজ স্বীকার করছি আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, প্রকাশ করিনি শুধু তোমার অসন্তোষের ভয়ে।

—চুপ করুন, শান্ত হোন—আমার কোনো অধিকার নেই আপনার কথা শোনবার—আমার সাধ্যও নেই আপনাকে বাধা দেবার —আমার অনুরোধ শুধু রাখুন। তা না হলে কালই আমাকে চলে যেতে হবে এবাড়ী ছেড়ে ; সেটা যে আরও কষ্টদায়ক হোয়ে উঠবে।

—তোমার কথাই শিরোধার্য্য পলিন ! থাক্ ও প্রসঙ্গ—তোমার বইগুলি আমাকে দেখাবে ? তোমার ওই মহৎ সুকুমার মনের পিপাসা কি দিয়ে মেটাও, জানতে ইচ্ছে করে।

—নিশ্চয়ই দেখাবো। কিন্তু দেখলে হতাশ হবেন বলে রাখছি।

পলিন দেখালো ইংরাজীতে মিলটন, ইতালীয়তে আরিয়োস্তো, ফরাসীতেও কিছু সংখ্যক আর বাকী সব পর্ত্তুগীজে।

—তোমার এত চমৎকার সংগ্রহ ! কিন্তু বেশীর ভাগই পর্ত্তুগীজ ভাষায় কেন ?

—আমি পর্ত্তুগালের মেয়ে বলে।

—বল কি ! তুমি পর্ত্তুগীজ ? আমি ভেবেছিলাম, ইতালীয়—আশ্চর্য্য ! এই বয়সে পাঁচটা ভাষা দখল করেছো ? স্পেনীয় ভাষাও জানো নিশ্চয়ই ?

—জানি বৈ কি। পাশাপাশি থাকার দরুণ ওটা আপনা হোতেই শেখা হোয়ে যায়।

—পলিন, তোমার পরিচয় আমি সত্যিই জানতে চাই। হ্যাঁ, জানবার অধিকার আমি রাখি। আর তোমার বিশ্বাস রাখার অধিকারও আমি রাখি। তুমি আমায় জানাও পলিন, তোমার সত্য পরিচয়, তোমার জীবনের অতীত কাহিনী—

—জানি আমি। বলবো আপনাকে—সব কিছুই বলবো—পরিপূর্ণ বিশ্বাসেই বলবো—কিছু গোপন করবো না। আমি জানি, আপনি ভালোবাসেন আমাকে—আমার অনিষ্ট আপনার দ্বারা কখনই সম্ভব হবে না।

—এই সব পাণ্ডুলিপি কিসের ?

—আমারই জীবন-কাহিনী। আসুন আপনাকে পড়ে শোনাই সব।

* * * *

এক হতভাগ্য কাউণ্টের একমাত্র কন্যা আমি। ছোট্টো ছিলাম তখন—সেই সময় রাজাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রী দল ধরা পড়ে

তাদের সঙ্গেই অভিযুক্ত করে বাবারও প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। জানি না সত্যিই বাবা অপরাধী ছিলেন কি না—রাজসভায় কারো গোপন হিংসা আর বিদ্বেষের কবলে পড়ে প্রাণ দিলেন।

মা আমার আশ্রমে লেখাপড়া শিখেছিলেন। সেখানে এক জন মঠবাসিনী ছিলেন আমার নিজের মাসী। আমিও সেই আশ্রমেই ছিলাম, প্রায় আঠারো বছর বয়স অবধি। আমার যা কিছু শিক্ষা, সব সেখানেই। ইচ্ছা ছিলো, যত দিন না বিয়ে হয় তত দিন ওখানেই থাকবো আশ্রমের সুন্দর সংযত পরিবেশে—তা ছাড়া আমার মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনী মাসীকে আমি বড্ড ভালবাসতাম।

কিন্তু দাদামশায় নিয়ে এলেন আমাকে আঠারো বছর বয়সেই। বাবার সম্পত্তি রাজসরকার থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় নি। তার প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী তখন আমিই। এক দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া, মার্কুইস দ্য এস্-এর বাড়ীতে আমার থাকার ব্যবস্থা তোলো। তাঁর বাড়ীর অর্দ্ধেকটাই প্রায় আমার জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন—তা ছাড়া এক জন শিক্ষিতা অভিজাতবংশীয়া ধাত্রী রাখা হোয়েছিলো—ঝি, চাকর আর অন্যান্য বহু পরিজনই আমার পরিচর্য্যার জন্য ছিলো বটে কিন্তু আসল কর্ত্রী দেখলাম আমার ধাত্রীটি—যাই হোক, বরাতগুণে ওর স্বভাবটা ভালোই ছিলো।

কিন্তু আসল বিপদ সুরু তোলো বছর খানেক পরে। এক দিন দাদামশায় এসে জানালেন, এক কাউণ্ট আমাকে পুত্রবধূরূপে মনোনীত করতে চান—তাঁর উপযুক্ত পুত্র মাদ্রিদ থেকে সবে ফিরেছে—আর এই বিবাহ আমাদের সমস্ত অভিজাত সমাজে রীতিমত আনন্দের সাড়া জাগাবে—এমন কি, রাজা আর রাজ-পরিবারেরও সাগ্রহ সম্মতি আছে এতে।

—কিন্তু দাদামশায়, আমি তাঁদের সুখী করতে পারবো কি?

—খুব পারবি রে পাগ্‌লী! আর ও-বিষয়ে তোকে একদম মাথা ঘামাতে হবেই না।

—কিন্তু দাদামশাই—মাথা ঘামাতে হবে না বললে চলবে না; আগে আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হই।

—বিয়ের আগে এক বার আলাপ হবে বৈ কি। তবে তার জন্যে বিয়ের কিছু এদিক-ওদিক হবে না, সে সব আগেই যা ঠিক হবার হোয়ে গেছে।

আশ্চর্য্য! যাকে মন দিতে পারি নি, তার কাছে নিজেকে নিবেদন করতে হবে অন্ধের মতো? না, কখনই এ হোতে পারে না। সম্পূর্ণ অজানা, অপরিচিতের নাগপাশে নিজেকে এমন ব্যক্তিত্বহীন জড় পুতুলের মত জড়াতে দেবো না—দেবো না। ধাত্রীকে বললাম সব। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো যুক্তি দেবার সাহসও নেই ওর। তখন গেলাম আমার সন্ন্যাসিনী স্নেহময়ী মাসীর কাছে। সব শুনে উনিও বললেন, কাউণ্টকে আমার ভালো লাগা উচিত, তবে বিয়ে জিনিষটাই হোলো একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা—তা ছাড়াও ব্রেজিলের রাজকুমারীর প্রিয়পাত্র ওই কাউণ্ট—এ বিয়ের সম্বন্ধ উনিই করেছেন।

হতাশায় ভেঙে পড়ি নি। শেষ অবধি কি হয়, পরিচয়ের প্রথম অনুভূতি কেমন হয়, জানবার জন্য ধীর ভাবেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। পরিচয় ঘটতে দেরী হোলো না। বিরাট উৎসব-সমাবেশে পরস্পর পরিচিত হলাম। আমি নিঃশব্দে সারাক্ষণ শুধু লক্ষ্য করছিলাম কাউণ্টকে। গভীর মনোযোগে শুনছিলাম তার প্রতিটি কথা। কিন্তু প্রথমেই মনে হোয়েছিলো, এর কাছে আত্মনিবেদন কখনও করবো না—কখনও করতে পারবো না—কিছুতেই না। এই অতি প্রগলভ, পরচর্চ্চাকারী, আত্মম্ভরী নির্ব্বোধ লোকটিকে স্বামিত্বে বরণ করতে হবে? সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞানেরও অভাব যার, সর্ব্বসমক্ষে নিজের গুণগান করতে এতটুকু যার সঙ্কোচ হয় না, এমনি মূর্খ যে, হাল্কা রসিকতা আর কাল্পনিক বীরত্ব কাহিনীই যার একমাত্র বাগ্-সম্বল, তাকে কখনও শ্রদ্ধা করা যায়? তার সঙ্গ কখনও কি মুহূর্ত্তের জন্যেও কাম্য? তা ছাড়া চোখ দু'টিকেও নিরাশ করেছিল ওর কুৎসিত রূপ!

মনের এই তীব্র সমালোচনা মনেই ছিলো। বাইরে শান্ত, নম্র, সংযত ব্যবহারে কোথাও তার চিহ্ন ফুটে উঠতে দিইনি। কিন্তু আমার এই অতি সংযত, অতি ভদ্র ব্যবহারের ফলেই আশা করেছিলাম ওই অতি উচ্ছ্বসিত, অতি প্রগলভ কাউণ্ট আমাকে মনোনীতা করতে চাইবেন না।

হা হতোঽস্মি! দিন আষ্টেক যেতে না যেতেই দাদামশায় জানালেন, তাঁরা পিতা-পুত্রে আমাকে একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করবার অনুরোধ জানিয়েছেন—বিবাহের চুক্তিপত্রে সই করবার জন্যে। বিবাহের চুক্তিপত্রে না আমার মৃত্যুর পরোয়ানায়?

এই দুর্দ্দিনে আমার একমাত্র আশ্রয় মাসীর কাছ ছুটলাম। মাসী জানালেন উনিও দেখেছেন কাউণ্টকে—ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উনি ভাবতেও পারেন না। কিন্তু ওরা এমন ভয়ানক প্রকৃতির লোক যে, ছলে বলে কৌশলে সম্মতি আদায় করতে পিছপাও হবে না। মাসীর কথায় আমি একেবারে অকূল সমুদ্রে পড়লাম—আশ্চর্য্য! সেই মুহূর্ত্তেই বিদ্যুৎ চমকের মত একটা অদ্ভুত মতলব আমার মনের মধ্যে খেলে গেলো। তখনি বাড়ী চলে এলাম। এসেই কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলাম মার্কুইস দ্য পম্বালকে, যিনি আমার হতভাগ্য পিতাকে বন্দী করেন—যিনি আমার পিতার মৃত্যুর জন্যে দায়ী,—সেই কঠোর নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষটিকে। সমস্ত ঘটনা ওঁকে খুলে জানালাম—উপসংহারে লিখলাম আমার এমন সহায়হীনা অনাথা অবস্থার জন্য উনিই তো দায়ী। ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আজ আমার দায়িত্ব না নিলে—আমি আজ ওঁর আশ্রয়প্রার্থিনী—আমাকে ব্রেজিলের রাজকুমারীর রোষবহ্নি থেকে রক্ষা করুন আর মনোমত স্বামী নির্ব্বাচনে অধিকার দিন।

চরম উত্তেজনা আর ঝোঁকের মাথায় লিখে পাঠিয়েছিলাম—আমার ধারণা ছিল না লোকটির কঠোর হৃদয়ের আড়ালে কোথাও এতটুকু করুণার কোমলতা আছে। তবু আশার একটু ক্ষীণ শিখা জ্বলছিলো মনে, আমার ভাষা আর লিপির অভিনবত্বে কি একটু সাড়া জাগবে না? ন্যায় বিচারের দাবীতে পিতার জীবন নাশ করে কন্যার ন্যায্য দাবী কি প্রত্যাখ্যান করবেন?

দু'দিন পরে আশাতীত ভাবে এলো উত্তর। না, লিপির মারফৎ নয়। লোকের মারফৎ। তিনি বললেন, মার্কুইস তাঁকে গোপনে পাঠিয়েছেন আমাকে জানাতে যে—আমি যেন জানাই এই বিবাহে আমার মতামত স্থির করতে পারছি না, যতক্ষণ ব্রেজিলের রাজকুমারীর সম্মতির কোনো নির্ভুল বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাই। এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে উনি মনে করেন। আর বিশেষ কারণে কিছুই লিখে

জানানো সম্ভব নয় বলেই তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠিয়েছেন। আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই আগন্তুকটি চলে গেলেন। কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য্য শুধু আমার দৃষ্টি নয়, আমার সমস্ত মনের উপর গভীর রেখাপাত করে গেল। সদ্য মুক্তিলাভের আশায় আর আকস্মিক সুন্দরের আবির্ভাবে আমার মনের সে সময়ের অবস্থা বর্ণনার অতীত! কে জানতো সেই তীব্র মধুর অনুভবের কেন্দ্রে অপেক্ষা করছে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ?

এর পর থেকে আমি যখনই যেখানে গেছি, ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। খুবই আশ্চর্য্য! গীর্জ্জায় গেছি, থিয়েটারে গেছি। কোনো উদ্যানে উৎসবে গেছি, কি পরিচিতদের কোনো ভোজ-সভাতে, সেখানেই গেছি ওকে দেখেছি। আর যখনই গাড়ী থেকে নামতে বা উঠতে গেছি পেয়েছি ওর প্রসারিত হাতখানির নির্ভর। আকস্মিকতা কবে অভ্যাসে দাঁড়ালো—বিস্ময় করে সহজ হোয়ে উঠলো জানি না! কিন্তু টের পেলাম আর একটি জিনিস—ধরা পড়লাম আপন মনের কাছে। যদি কোনো দিন ওঁকে দেখতে না পেতাম, সমস্ত দর্শনীয় হোয়ে উঠতো বিস্বাদ—জীবন মনে হোতো অর্থহীন।

আমার জীবনের ধূমকেতু সেই কাউন্টের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হোতো, দাদানশাই কিম্বা তাঁর এই আত্মীয়টির বাড়ীতে কিন্তু আর একদিনও সেই পুরানো কথা উঠেনি।

এক দিন সকালবেলা শুনতে পেলাম, আমার পরিচারিকার ঘরে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের গলার আওয়াজ। কে এসেছে জানবার জন্যে গিয়ে দেখি, প্রচুর লেস নিয়ে একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে- আমাকে দেখেই অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে নমস্কার জানালে। লেসগুলোর দিকে এক বার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। এমন কিছু ভালো নয়। তরুণীটি জানালে, পরদিন অনেক ভালো জিনিস নিয়ে আসবে। ওর কথা শুনতে গিয়ে ওর দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলাম। কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আমার সমস্ত মন জুড়ে যে, তরুণের অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি ভাসছে, তার সঙ্গে এই তরুণীর! কি করে সম্ভব? আমার দৃষ্টিবিভ্রম? না তরুণীটি আরও দীর্ঘাঙ্গী তার চেয়ে—ভাবতে ভাবতে তরুণীটি কখন চলে গেল খেয়াল করিনি। পরিচারিকাকে প্রশ্ন করাতে ও বললে, আগে কখনো দেখেনি মেয়েটিকে।

পরদিন ঠিক সেই সময় ছোটো বেতের ঝুড়ি ভরে লেস নিয়ে সে হাজির। ওকে আমার নিজের ঘরে ডেকে আনলাম। তার পর কথা বলতে সুরু করলে ওকে আমার দিকে চাইতে বললাম—পূর্ণদৃষ্টিতে ও চাইলে আমার মুখের দিকে—কোনো সন্দেহ রইলো না আর। কিন্তু মনের প্রবল উত্তেজনায় একটি কথাও বলতে পারলাম না। তাছাড়া পরিচারিকাটির সামনে কোনো অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করা ঠিক নয়। ওকে বললাম আমার টাকার ছোটো থলিটা নিয়ে আসতে। সেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখনি ছদ্মবেশী লেসওয়ালী আমার পায়ের উপর এসে পড়লো!

—আমার ভাগ্য আপনার হাতে—আমি বুঝেছি আপনি ঠিক ধরতে পেরেছেন।

—হ্যাঁ, ঠিকই চিনেছি কিন্তু আমি ভাবছি আপনি কি পাগল?

—হ্যাঁ পাগলই হোয়েছি—শুধু ভালোবেসে—আমি আপনাকে—

—চুপ, উঠে পড়ুন, আমার পরিচারিকা এখনি এসে পড়বে।

—সে জানে—তাকে টাকা দিয়ে হাত করেছি।

—কি! এত দূর সাহস?

সে উঠে দাঁড়ালো। তখনি দেখলাম পরিচারিকাটি মুচকি হাসতে হাসতে টাকাগুলি গুণতে গুণতে ঘরে ঢুকছে। লেসগুলি জড়ো করে ঝুড়িতে তুলে একটু মাথা হেলিয়ে নমস্কার জানিয়ে ও নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

সেই মুহূর্ত্তে ওই দুর্বিনীতা পরিচারিকাকেও বার করে দেওয়াই আমার উচিত ছিলো। কিন্তু আমি ভাবলাম, কিছু না জানার ভাণ করে থাকাই শ্রেয়ঃ; তাতে অন্ততঃ মান বাঁচবে।

দিনের পর দিন চলে গেলো। পনেরোটি সুদীর্ঘ দিন। এক দিনও আর দেখিনি সেই তরুণ ছদ্মবেশীকে। নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পেলাম নিজের মনের চেহারা দেখে—সারা দিন-রাত আমার কাটছে শুধু স্বপ্ন দেখে। সারা মন—চিন্তা আমার ভরে গেছে এমন গভীর বিষণ্ণতায়? শুধু ওর নামটুকু জানবার জন্যে কি ব্যাকুলতা! পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করলেই পারতাম—কিন্তু ওর উপর কেমন বিতৃষ্ণা আর সঙ্কোচও এসে গিয়েছিলো।

তবু রইলো না ধৈর্য্যের বাঁধ—মন মানলো না সংযমের অনুশাসন। এক দিন প্রসাধন করতে করতে নিতান্তই যেন হেলাভরে জিজ্ঞাসা করলাম! সেই লেস্-ওয়ালী আর আসেনি?

পরিচারিকাটি ধূর্ত্তও কম নয়। আমার ছলনা ও ঠিকই ধরেছে। বললে, ছদ্মবেশ ধরা পড়ার ভয়েই আর আসতে সাহস করে না।

—ছদ্মবেশ আমি ধরে ফেলেছি। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি যে, তুমি এক জন পুরুষ জেনেও সমস্ত লুকিয়েছিলে আমার কাছে?

—আপনি অসন্তুষ্ট হবেন আমি ভাবিনি। আমি ওঁকে চিনতাম।

—কে উনি?

—কঁতে দ্য আল। আপনি নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন। কারণ, মাস চারেক আগে কি প্রয়োজনে উনি যে এসেছিলেন আপনার কাছে?

—তবে যখন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম লেস-ওয়ালীকে চেনো কি না, তখন কেন মিথ্যা বলেছিলে?

—ক্ষমা করুন। শুধু আপনি অপ্রস্তুত হবেন বলে। আমিও এই গোপন ব্যাপারে আছি জানলে আপনি রাগ করবেন বলে।

ওর এই স্বাভাবিক সত্য ব্যাখ্যাতে আমি খুসী হলাম। তাছাড়া আরও খুসী হলাম জেনে আমার কুমারী মনের প্রথম নৈবেদ্য তাহলে অপাত্রে নিবেদিত হয়নি। আমি শুনেছিলাম, তরুণ কঁতে দ্য আল—এর নাম বড় ক্ষেত্রে—বিখ্যাত অভিজাত পরিবারে। কিন্তু এখন সম্পদহীন। তবু মার্কুইস পমবালের মত প্রবল প্রতাপশালীর অধীনে পদস্থ কর্ম্মচারী সে—ভবিষ্যৎ উন্নতি তো সহজলভ্য তার। আর আমি তো আছি—ভাবতেই সমস্ত চিন্তাধারায় কেমন কেমন যেন সুখের আবেশ লাগলো। তার অভাব মেটাতে বিধাতা আমাকেই নির্দ্দিষ্ট করেছেন—ভাবতেও মধুর—মধুর কল্পনাতে আবার মুহূর্ত্তগুলি ভরে উঠলো আকাশ-কুসুম চয়নে—কিন্তু যাকে অমন করে বিদায় দিয়েছি—সে কি আর ফিরবে?

আমার গোপন কথাটি সে তো জানে না? সে কি আসবে?

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

ব্যক্তিত্বে রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীঅজয়েন্দুনারায়ণ রায়

৬

রামেন্দ্র বাবু নিজের প্রশংসা শুনলে মর্ম্মাহত হ'তেন। তখন সে প্রসঙ্গ পরিহার ক'রতে চেষ্টা ক'রতেন। ব'লতেন, স্তব-স্তুতি শুনাবার জন্য ত অনেক দেব-দেবী র'য়েচেন, এ-সব আমার কাছে কেন?

তখন তাঁদের জবাব ছিল, আপনিও ত' মানুষ নন সার! আপনি দেবতার চেয়ে কম কী?

দুঃখ ক'রে বলতেন—আমি মানুষ; আমি এক জন পরাধীন দেশের জীব।

পরের গুণকীর্ত্তনে তেমনি আবার তিনি ছিলেন পঞ্চমুখ। যখন রামেন্দ্রসুন্দরকে কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র হ'য়ে বিদ্যাসাগর উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব ক'রলেন, তখন তিনি বার বার নিষেধ ক'রে ব'লেছিলেন—এ উপাধি দেবেন না আমাকে, এ নেবার যোগ্যতা বাঙলা দেশে মাত্র এক জনেরই আছে। আমার মনে হয়, সারা ভারতের মধ্যে এক জনেরই অধিকার আছে বিদ্যাসাগর হবার।

আপনি নিজেকেই বা কম মনে ক'রচেন কেন? তাঁর হাজার গুণ থাকলেও তিনি কী আপনার মত বেদবিৎ?

শুনেই কানে আঙুল দিলেন। কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীকে ব'ললেন রামেন্দ্র বাবু—ও কথা শুনবো না আপনাদের। উনি যে ছিলেন স্বাধীনচেতা, আমাদের এই পরাধীন দেশে। যা' কেও কখনও ব'লতে সাহস করেননি, তাই তিনিই—একমাত্র তিনিই ব'লতে পারতেন মুখের উপর স্পষ্ট। তাতে গভর্ণমেণ্টের বড় বড় কর্ত্তারাই রাগ করুন, আর দেশের সমাজপতিরাই রাগ করুন। কা'রও খাতির রাখতেন না অন্যায়ের প্রতিবাদে স্পষ্ট কথা ব'লতে। কতো সময় দুঃখ ক'রতে শুনেচি সেই মহাপুরুষকে—এতো অশিক্ষিত দেশ আমাদের, এ দেশের জাতির ঘুম ভাঙাতে কত শতাব্দী যাবে কে জানে?

রামেন্দ্র বাবুকে কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর দান গ্রহণ ক'রতে হ'লো বটে, কিন্তু তিনি ব'লেছিলেন—এ দান আমি মাথা পেতে নিলাম, আর মাথার উপরেই রাখবো যত দিন বাঁচবো; দেশের লোকের সামনে বের ক'রবো না কোন দিন।

এক বার রামেন্দ্র বাবুর সঙ্গে সার গুরুদাস বাবুর তর্ক-বিতর্ক হ'লো কয়েকটা বিষয় নিয়ে সিনেটে। ব্যাপার অতি সামান্য; কিন্তু স্থিরবুদ্ধি গুরুদাস বাবু বড় ক'রে দেখলেন সে বিষয়কে। সব শুনে রামেন্দ্র বাবু কেবল হাসলেন।

পরের দিন রামেন্দ্র বাবু বই নিয়ে প'ড়চেন, বেলা তখন আটটা। চাকরে এসে খবর দিলো জজ সাহেবের গাড়ী এসেছে। তিনি ব'ললেন—নিয়ে এসোগে। যখনই দেখলেন জজ সাহেব আর কেও নন, গুরুদাস বাবু, তখন কী ক'রবেন ঠিক পান না। এত দূর ব্যস্ত হ'তে তাঁকে দেখা যায় না। গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিলেন। সার গুরুদাস বললেন—আমারই ভুল হ'য়েছিল রামেন্দ্র! পরে বুঝে দেখলাম: তোমারই কথা ঠিক। তুমি ক'তো বড় তখনই বুঝলাম, যখন কথার প্রতিবাদ না ক'রে কেবল হাসলে। আমাকে ডেকে পাঠালেন না কেন? কী প্রয়োজন ছিল আপনার আমার বাড়ী আসার?

গুরুদাস বাবু যাওয়ার পরই রামেন্দ্র বাবু গেলেন তাঁর বাড়ী। অতি বিনয় বচনে গুরুদাস বাবুকে বললেন—আমাকে চাবুক মারার কী প্রয়োজন ছিল সার! হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাইলেন রামেন্দ্র বাবু, তা ছাড়া পায়ের ধূলোও নিলেন। তখন নির্ব্বাক্ ব্রাহ্মণের মুখ থেকে বের হ'লো—তোমার জয় হোক রামেন্দ্র!

রামেন্দ্রসুন্দর গুণগ্রাহী ছিলেন। কোন গুণী লোকের অসময় উপস্থিত হলে তিনি চিন্তা করতেন—কেমন ভাবে তাঁর উপকার করা যায়। কায়েম মনসা বাচা যেমন ভাবেই হোক, তাঁর দিক থেকে কোন ত্রুটি হতো না।

শুনলেন রামেন্দ্র বাবু, দীনেশ সেন মহাশয় অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন নিজের বাড়ীতে। সংবাদ পেয়েই তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। বললেন নিজের স্ত্রী ও মাকে—তোমরা কিছু কিছু করে চাঁদা তুলিয়ে আমার হাতে দাও, আমি দেবো এক জন গুণীমানুষকে।

সকলেই একমত হয়ে টাকা তোলাতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, চঞ্চলার সঙ্গে কিছু নেবো না, সে ছেলেমানুষ। শুনেই রামেন্দ্রসুন্দর বললেন—কেন নেবে না? তার বিয়ে হয়েচে, একটা মেয়েও হয়েচে। মনে করবে তার মেয়ের একটা জামা কিনে দিলাম। প্রথম হতে শিক্ষা দাও অসময় হলে মানুষকে দিতে হয়। কেন তার হয়ে তুমিই দাও—বললেন স্ত্রী ইন্দুপ্রভা দেবী। হেসে বললেন—আমি পারি কিন্তু ওকে দিতে শেখাব। এখন থেকেই শিখুক।

দীনেশ বাবুর নিজের হাতের লেখা হতেই তুললাম—"কুমিল্লার রাণীর দীঘির পাড়ে একটা খোড়ো ঘরে—আমি রোগশয্যায় পড়ে বড় কষ্টে সময় যাপন করছিলাম। ডাক্তারগণ বলেছিলেন, আমি ভাল হব না। এই নিদারুণ চিত্র ভবিষ্যতের সম্মুখে দেখিয়া আমি ভীত ও কাতর ভাবে মৃত্যু কামনা করিতেছিলাম। শীতের প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া, সারা রাত্রি অনিদ্রা ও নৈরাশ্যের পরে এক দিন আমি মানসিক উৎকণ্ঠা দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলাম। এমন সময় ডাকপিওন আসিয়া এক সুদীর্ঘ পত্র আমার হাতে দিয়ে গেল, পত্রখানি রামেন্দ্র বাবুর। আমি তখনও তাঁহাকে দেখি নাই; কিন্তু এই অদৃষ্ট-ব্যক্তির আশ্বাসবাণী আমার নিকট যেন অদৃষ্টের আকাশ হইতে ঘনঘটা দূর করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য স্বর্গের জ্যোতি দেখা দিল। তার পর কলিকাতায় আসিলাম, তখন শয্যাপার্শ্বে আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রফুল্ল মুখখানি দেখিয়াছি। তিনি আমার সে সময় দুরবস্থা দেখিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছেন! প্রায় আসিয়া বলিতেন অমুক অতো টাকা দিয়াছেন। তাঁহারই জন্য শ্রীযুক্ত নাটোরের কুমারকে পাইলাম। লালগোলার রাজাবাহাদুরকে পাইলাম। কোন্ কোন্ সুধী ব্যক্তি আমার মাসিক

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

বৃত্তি করিয়া দিয়াছেন, এই সংবাদ পাইলাম। সুখের সময় তেমন ভাবে কখনও পাই নাই। কিন্তু দুঃখের দিনে তাঁহার গভীর স্নেহ আমি হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিয়াছি।"

তারাপ্রসন্ন গুপ্ত এক জন ছাত্র রামেন্দ্রসুন্দরের। তার অভাব জানতে পেরে তাকে নিজ বাড়ীতে রেখে পড়িয়েছিলেন। নিজের ভাই কিংবা ছেলেদের চেয়ে তাকে কম ভালবাসতেন না। শেষ জীবনে তারাপ্রসন্ন বাবুও কম উপকার করেন নি—এই পরিবারভুক্ত জনের।

রামেন্দ্রসুন্দর বসে রয়েচেন নিজের কামরায়, এমন সময় এক জন ছাত্র এসে হাজির! তার নাম জিজ্ঞাসা করায় বললেন—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কী চাও তুমি? আমি সার! আপনার কাছে দিনকতক দর্শন শাস্ত্র পড়তে চাই। খুব খুশী হয়ে বললেন রামেন্দ্র বাবু—এমন কথা কারও মুখে শুনিনি! আমি খুব আনন্দ সহকারে তোমাকে পড়াব। সেই দিন থেকেই যোগেশ বাবুকে বিদ্যাদান করতে লাগলেন। একে নিজের পড়া, কলেজে যাওয়া, তা ছাড়া সাহিত্য-পরিষদ ত আছেই। যোগেশ বাবু এলে তাঁর আহার-নিদ্রা থাকতো না। স্ত্রী ইন্দুপ্রভা দেবী বলতেন, তাঁর দেবর দুর্গাদাস বাবুকে—ঐ ছেলে ত তোমার দাদাকে না মেরে ছাড়বে না। কে শোনে সে কথা! এলেই তাঁকে পড়াবেন। কখন কখন হেসে বলতেন—ও ছেলে এলে আমারও আলোচনা হয়। তাই দুর্গাদাস বাবুকে নিষেধ করে বলে দিলেন—ওকে যেন কিছু বলা না হয়। ওর যত দিন ইচ্ছে পড়ে যাক।

কয়েক দিনই একটা ছোকরা এসে রামেন্দ্র বাবুর বাড়ীর পাশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। ইন্দুপ্রভা দেবী স্বামীকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে—ঐ দেখ, ঐ ছেলেটা আমার বাড়ীর পাশে কেবল ঘুরে ঘুরে আসে, তাকায় ঝিদের উপর। রামেন্দ্র বাবু একটু চেয়ে থেকে বললেন স্ত্রীকে—হয় তো আমাদেরকে বলতে পারে না, তাই ঝিদের দিকে চেয়ে থাকে। হ্যাঁ! তুমি কি না! ছুঁড়ি ঝি, তাদের দিকে চাইবে না?

একথা শুনেই ডাকলেন ছেলেটিকে। কী নাম তোমার? আমার নাম হুজুর—ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ। আমাদেরকে হুজুর হুজুর বলতে নাই। কী বলে ডাকবো তাহলে? কেন সার ব'লবে। এই দিকে ঘোরা-ফেরা করো, কী দরকার বলো? আমি সার একটু লেখাপড়া শিখেচি কিন্তু কোন কাজ জুটাতে পারচিনে। চাষের কাজও শিখিনি। এখন আমি অনাহারে আছি সার! একটা কাজের জন্যে সার আপনার কাছে ঘোরা-ফেরা ক'রচি। আপনি অতি মহৎ লোক বলে। এই পর্যন্ত বলে সেই ছোকরা কাঁদতে লাগলো রামেন্দ্র বাবুর পায়ের উপর প'ড়ে।

অতীব দুঃখে রামেন্দ্র বাবু বললেন স্ত্রীকে, দেখ গো দেশের অবস্থা। আমার কাছে এসেছে খাবার সংস্থানে? আমি এক জন শিক্ষক দরিদ্র মানুষ; আমার দ্বারা কী কাজ হবে?" তবুও পা ছাড়তে চায় না। তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন—তুমি পা ছাড়ো। তোমার একটা ব্যবস্থা ক'রবো। তুমি এখন খাওগে যাও বাড়ীর ভিতরে।

ইন্দুপ্রভা তখন মুস্কিলে প'ড়লেন। একে কেনা চাল, তাতে কলকাতার মত জায়গা—হা গা! দিনের পর দিন যে ছেলেটা খেয়েই চলেচে, একটা ব্যবস্থা কর। তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন স্ত্রীকে তুমি রাজার মেয়ে নও? একটা ছেলের খাওয়া দেখচো। আমাদের বাবার বাড়ীতে যে নিজের জমির চাল। কথা শেষ না হতেই স্বামী বললেন—এখানে যে আমার রক্ত জল করা চাল। এই চালই খাওয়াতে হবে।

এক দিন কিছু খরচ দিয়ে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে বললেন—তুমি আরও পড়গে। আর কিছু দিন পড়ার পর আবার তাঁকে এসে বললো, আমার একটা চাকরীর যোগাড় দেখে দিন সার! তখন রবীন্দ্রনাথকে লিখে শিলাইদহে একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দিলেন।

পূজোর ছুটিতে রামেন্দ্রসুন্দর বাড়ী গিয়েচেন। এমন সময় ধনা বাউরী এসে ধরলো, আমার ছেলেপুলে নাই হুজুর! কাপড়-চোপড় একেবারে নাই। পূজোর ক'দিন কেউ কাজ দেবে না। আমি খাওয়া অভাবে মরে যাবো হুজুর! এ স্বর তীরের মত বিঁধলো রামেন্দ্রসুন্দরের কানে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ধনা কাকা! দেখি কী করতে পারি।

তখনিই বের হলেন রামেন্দ্র বাবু ভিক্ষার ঝুলি হাতে। অজস্র কাপড় ও কয়েক মণ চাউল যোগাড় হ'লো। তখন তিনি বস্ত্র বিতরণ ফণ্ড ব'লে জেমোতে একটা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। এর কাজ ছিল পূজোর সময় কেউ যেন জেমো অঞ্চলে অনাহারে না থাকে। কেউ যেন কাপড় না পাওয়া হয়। যত গরীবই হোক না সে।

গরীব দুঃখী ও বয়সে বড় হলে একটা সম্বন্ধ ধরে ডাকতেন রামেন্দ্র বাবু। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, এ যে আমার মা-বাবার শিক্ষা।

বীরভূম জেলার মহম্মদ ইসমাইল ব'লে রামেন্দ্র বাবুর একজন ছাত্র। লণ্ডনে কিডস সহরে অর্থের অভাবে খুবই বিপন্ন হয়ে রামেন্দ্র বাবুকে একখানা চিঠি দিলেন। পত্র পেয়েই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। স্ত্রীর কাছ থেকে হাওলাত নিয়ে তিন শত টাকা পাঠালেন। সেই টাকা পেয়ে মহম্মদ ইসমাইল রামেন্দ্রসুন্দরকে যে পত্র দিয়েছিলেন, তার অনুলিপি দিলাম।

My Dear Gurudev !

With proper regards I acknowledge the receipt of kind aid of Rupees 300/- it has come to me in time of need. Had it been a week latter, I would have been in most disgraceful condition. I left unpaid, the cost of apparatus of other laboratory, expenses for the last session of the College closes next saturday altogether till the middle of September. It is needless to mention that I owe you life-long debt, you are good enough to say that I owe you no thanks, but it is beyond me to thank you sufficiently for the kindness shown to me. I shall then reverence you as my Guru of one who is like my own father. * * *

I remain Sir,
Your ever grateful pupil,
Sd/ M. Ismail.

কেও কোন কাজের জন্য রামেন্দ্র বাবুর কাছে এলেই হয়। তিনি সার্টিফিকেট দিয়েই আছেন। কেও যে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেই বলতেন—আমার দ্বারা যদি একটা লোকেরও উপকার হয়।

ঐ ধারা জ্ঞানী লোক রামেন্দ্রসুন্দর একটু যদি নিজের সম্বন্ধে হুঁস আছে! কেও না ডাকলে খাওয়া-নাওয়া নাই। কেও জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—কৈ! তোমরা ত কেও বলো নাই স্নানের জন্য? স্ত্রী ইন্দুপ্রভা বলতেন স্নেহের সুরে—কে অত বড় মানুষকে বলবে বার বার। তোমার কী প্রয়োজন থাকে না স্নান-আহারে? হেসে বলতেন—এটা যে তোমাদের নিত্যকর্ম্মের মত আমাকে নাওয়ান খাওয়ান। সেই জন্যে এ ভাবনাটা তোমাদের উপর ছেড়ে রেখেছি। আহা! না হয় তাই ছেড়ে দিলে। রাস্তা দেখে চল না কেন? আমরা কী তখনও তোমাকে ধরে নিয়ে যাবো? কত বার রাস্তায় পা মচকায় বল দেখি। কী হাসির কথা! সেদিন এক জন মহিলা তোমাকে ধরে আনলে, দেখেছো কী তাকে?

আনলেন বটে, আমি তাঁকে দেখিনি।—তুমি কী লক্ষ্মণ, কখন কোন মেয়েছেলের মুখ দেখো না। হাসতে লাগলেন রামেন্দ্র বাবু। স্ত্রী বললেন সেদিন পাশের বাড়ীর বন্ধুকে দেখাতে চাইলাম তুমি মুখ ফিরিয়ে বসলে। যখন তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দিলাম তোমার তখন চোখ বুজলে। দেখলে কী তোমার মহত্ব খোওয়া যেতো, না তোমার ছাত্ররা জানতে পারতো. ঠিক করে বলতে হবে! তখন রামেন্দ্র বাবুর হাসিতে ভরা মুখ, কথা নাই মুখে, এক দিন সকলে মিলে পরামর্শ করলো—আজ আমার মধ্যম দাদা এসেছেন ওঁকে শুদ্ধ নিয়ে থিয়েটারে যেতে হবে। দাদার কথা কিছুতেই ফেলতে পারবেন না। ভগিনীপতি পূর্ণেন্দুনারায়ণ প্রস্তাব করতে গিয়েই শুনলেন—তুমি ছেলেমানুষের মত কথা বলো না মধ্যম ঠাকুর! আমি যেতে পরবো না।—রাম বাবু! ওতেও অনেক জ্ঞানের কথা আছে, তোমাকে যেতে হবে. চল। আর কথা না বাড়িয়ে হাসতে লাগলেন রামেন্দ্র বাবু।—তোমার ঐ হাসিকে বড় ভয় করে রাম বাবু! তুমি না হেসে একটু অনুমতি দাও। তখনও সেই হাসি। তখন পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা স্ত্রী ঘরে এসে ঢুকলেন। জোরের সাথে বললেন, তোমার কেবল ভয় ছাত্ররা দেখবে বলে। ভয় করতে হবে না চল চল।

তখন মুখ খুললো রামেন্দ্র বাবুর, তুমি ঠিকই কথা বলেছো। ঐ ধারা ভয় আছে বলেই ত আমাদেরকে মানুষ হতে হয়।

যখন রামেন্দ্র বাবুর কন্যা মারা গেছে তখন তিনি সদর ঘরে ব'সে আকাশ-পাতাল কী ভাবছেন। ভাই দুর্গাদাস ঘুমিয়ে পড়েছেন, মুখ ঢাকা দিয়ে, তাঁরই পাশে। এমন সময় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী এসে উপস্থিত। তিনি বললেন, তুমি নাকি খুব কাতর হয়েছো কন্যার যাওয়াতে? মুখ না তুলতেই দু-চার ফোঁটা চোখের জল পড়লো রামেন্দ্র বাবুর। সে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী, শুয়ে রয়েছেন কে মুখ ঢাকা দিয়ে?

শুনেই বললেন, ও আমার ভাই দুর্গাদাস; না না ও আমার বাবা, আমার বন্ধু। আমাকে দেখতে না পেলে ও ভেবে আকুল হয়। এই যে আমার চোখের জল পড়লো, ও ভাই আমার জেগে থাকলে মুছিয়ে নিতো নিজের কাপড় দিয়ে। এই যে আমার কন্যা মরার ভাগ নিয়ে আমাকে কাঁদতে দেয় না! ও ভাই আমার অন্ধের যষ্টি, এই অপটু দেহকে বহন করে নিয়ে চলেছে।

সুরেন্দ্র বাবু থামিয়ে দিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। বুঝে গেলেন রামেন্দ্র বাবুর কী ধারা ভ্রাতৃপ্রেম!

রামেন্দ্র বাবুরা তিন ভাই। এক জন খুড়তুতো ভাই ছিলেন। কেও কোন দিন বুঝতে পারেনি নীলকমল বাবু রামেন্দ্র বাবুর নিজের সহোদর ভাই নন।

নতুন বাড়ীর পাশেই আছে ধর্মরাজতলা, সেখানে আনিয়েছেন নীলকমল বাবু শ্রীশ্রীসাধু-বাবাকে। তাঁর প্রধান আশ্রম মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণখণ্ড গ্রামে। এতো প্রবল তাঁর মাহাত্ম্য যে হাজার হাজার লোক তাঁর কাছে থাকতোই। নানা সদুপদেশ শুনতো। তাঁর এতো গুণ যে কয়েকটা জেলার লোক তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না।

তখন রামেন্দ্র বাবু বাড়ীতে আছেন। তাঁর কাছে সুধী সজ্জন আসার বিরাম নাই। তিনি তন্ময় হয়ে থাকেন নিজের অধ্যয়নে। কে বলবে তাঁকে নিজের তপস্যা ছেড়ে সাধু-মহাত্মার কাছে যেতে? ভাই নীলকমলের খুব ইচ্ছা—দাদা এক বার আসেন সাধু-বাবার কাছে। তা হলে আরও প্রকট হন জ্ঞানগম্ভীর সাধু-বাবা। নিজে সাহস ক'রে ব'লতে পারেন না। ধরলেন তাঁর বৌদিকে। ইন্দুপ্রভা দেবী বললেন—ভাই! তোমার দাদা ত' সাধুদেরকে দেখতে পারেন না, কী ব'লবো ভাই!

এক বার দেখা করতেই হবে বৌদি! আপনার পায়ে ধ'রে ব'লচি। কী আর করেন। বড়বাবুকে ধরলেন তাঁর স্ত্রী ইন্দুপ্রভা—হ্যাঁ গা শুনছো। সাধু-বাবা এসেছেন তোমাদের বাড়ীতে একরকম, তাঁর সাথে এখনও দেখা করোনি?

ওর জন্যে ত' আমার ভাই-ই রয়েছে। আবার আমি কেন? —তুমি গেলে ত' কোন অপরাধ হবে না। তুমিই যাও না একবার?

কেন—আমার ভাই কী তোমাকে ওকালতি দিয়েছে?

—যদি বলেই থাকে, এমন অন্যায় কি করেছে?

—আমি যেতে রাজি আছি। তুমি যদি কয়েকটা কথার জবাব দাও।

বল, আমি ঠিক বলবো।

আচ্ছা সাধু-বাবা হাত দেখেন নাকি?

না।

উনি মাদুলী দেন কি না?

না।

তবে আমি যেতে রাজি আছি; নীলকমলকে খবর দাও। নীলু বাবুর খুসী ধরে না সংবাদ পেয়ে। সাধু-বাবাকে ব'লে একটা সময় স্থির করা হলো। যথাসময়ে রামেন্দ্র বাবু এসে উপস্থিত হলেন। জেমো কান্দীর লোকে আসতে সেদিন বাকী ছিল না।

ধর্মতলার ঘরে ঢুকলে বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া কেও ঢুকতে পেলো না। রামেন্দ্র বাবু গিয়েই প্রণাম ক'রে প্রশ্ন ক'রলেন—বাবা! আপনি কী হাত দেখেন না?

ঈষৎ হেসে বললেন—দেখি বাবা! এ বিদ্যে আমি আয়ত্ত ক'রেছিলাম কি না।

—এ বিদ্যা কী আপনি সম্পূর্ণ আছে, বিশ্বাস করেন?

—শিখেছি মাত্র। ও-সব চর্চ্চা করি নাই।

—আপনি কি পয়সা নেন লোক এলে?

—আমি নিজে টাকা-পয়সা ছুঁই না। কেও ইচ্ছা করে দিলে ফিরিয়ে দিই না।

—কী করেন ?

—আশ্রম-খরচে ব্যয় হয়। সাধু-সজ্জনের সেবায় লেগে যায়।

—আপনি কি ওষুধ দেন বাবা ?

—কবিরাজী অনেক দিন শিখেছিলাম, যদি কাজে লাগে আপনাদের। সেই জন্য সেই মতে ব্যবস্থা দিয়া থাকি।

—এতে আপনার কী উপকার হয় ?

তখন হেসে বললেন সাধু-বাবা—আমি যে অন্ন গ্রহণ করছি আপনাদের। কিছু ত' সে-ঋণ শোধ করা চাই।

রামেন্দ্রসুন্দর খুসী হয়ে বললেন—আপনি অকপটে সব বললেন, সেই জন্য খুব আনন্দিত হলাম।

সাধুবাবা স্থির দৃষ্টি রেখে প্রশ্ন করলেন রামেন্দ্রসুন্দরকে—আপনি কী সাধু-মোহান্তর উপর তত সন্তুষ্ট নন ?

—কে বললে আপনাকে ?

—কেন, আপনার অনেক লেখা থেকে দেখতে পাই, আপনি বলেছেন যেন সাধুদেরকে পলাতক। নিজের ঝঞ্চাট না ব'য়ে এই ধারা আনন্দ করে।

হেসে রামেন্দ্র বাবু বললেন—বলেই যদি থাকি, ভুল করেচি কি ? কিন্তু আমি বলি না রামকৃষ্ণদেবদের সম্বন্ধে। তাঁদের এক শিষ্য ত' জগতের সামনে আমাদের ভারতকে তুলে ধরেছেন। এই আমি চাই, আপনাদের কাছ থেকে। ঘুমান ভারতকে জাগিয়ে তুলুন। ঘৃণ্য জাতিভেদ প্রথা সমাজ থেকে মুছে ফেলে দিন। তা হলেই আমার ভারত আবার জেগে উঠবে। কৈ ! তা তো দেখতে পাই না ! প্রতি যুগে যুগে দেখে আসচি, একজন মহাপুরুষ এসে সমাজের যে কয় জন মাথা তাঁদেরকে নির্জীব ক'রে চলে যাচ্ছেন। আপনারা নাকি বলেন—আপনাদের মধ্যে রাজনীতির গন্ধ নাই। সমাজ যে আপনাদের কাছে থেকেই শিখতে চান। এক দিন আসবে, সে দিনের আর বিলম্ব নাই, আপনাদের ভিতর হ'তে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে, তিনি আমার পরাধীন ভারতকে মুক্ত করবেন।

স্থির চোখে ব'সে ব'সে শুনলেন রামেন্দ্র বাবুর কথা। কথা উঠলেই বলতেন এমন তেজস্বী প্রাণ আমি এদেশে কাউকে দেখিনি। রামেন্দ্র বাবু একজন মহা তপস্বী।

বি, এ, পাশ করে এসেই রামেন্দ্রসুন্দর পিতামহের সব পুরাতন পুস্তক বার ক'রে পড়তে লাগলেন।

দু' মাস অধ্যয়ন ক'রে বুঝলেন, কী এতো দিন পড়লাম। আমাদের ঘরের বস্তু পড়ে থাকতে এতো দিন ঝুটো কাচের কারবার করেই জীবন শেষ ক'রতে চলেছি ! এই মনে হতেই একটা ধিক্কার এলো মনে। তখন থেকেই বেদের দিকে দৃষ্টি পড়লো। একটু বুঝে নেবেন বেদ, এমন পণ্ডিত নাই দেশে। তখন নিজ থেকে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলে মনের মত উত্তর পান না। নিজের মনের কাছে ডেকে ডেকে প্রশ্ন করেন—আমাকে শিখিয়ে দাও দেব ! তোমার দিকে চেয়ে আছি ; তোমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি দেব ! তুমি কৃপা করো।

হয়তো কোন পিতৃপুরুষ কৃপা করে থাকবেন। তিনি ভাল ভাবে বেদ জেনে তখন লিখতে আরম্ভ করলেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

একদিন জাপানের এক পণ্ডিত এসে ভারতের সকল পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেন—কার কাছে গেলে ভারতের আদি শিক্ষা আয়ত্ত করতে পারবো ? সকলেই একবাক্যে কলেন—সে পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর। তখন এলেন রামেন্দ্র বাবুর কাছে। এসেই অন্য পণ্ডিতদের বলার সাথে তাঁর সব মিলে গেল। দেখলেন এক জন জ্ঞানগম্ভীর সদাপ্রফুল্ল এক ঋষিকে।

কিমুরা সাহেব বললেন—আমি বেদবিদ্যা শিক্ষা করতে চাই।

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন—আমি নিজেই জানি না আপনাকে শেখাব কী ? কিছু দিন পর কিমুরা সাহেব এসে বসে রয়েচেন ; রামেন্দ্র বাবু প্রশ্ন করলেন—কী চাই সাহেব ? স্মিত হেসে কিমুরা সাহেব বললেন—কিছু না, আপনাকে দেখতে এসেছি। এখানকার লোকের মন খারাপ হ'লে হিমালয় যায় দেখতে, তাই আমার আসা।

আপনার কী অসুখ হয়েছিল ? কিছু দিন দেখিনি।

—না হ'লে আট-ন মাস আমার না আসা হয় ?

রামেন্দ্র বাবু বললেন—এবার আমি বেদ একটু একটু বুঝেচি, হয় তো আপনাকে বোঝাতে পারবো।

সেই আরম্ভ হ'লো বেদ পড়ান। শিষ্যের সাথে গুরুর আলোচনা। দিন নাই রাত্রি নাই, আলোচনার আর বিরাম নাই। কী মধুর আস্বাদন বলার নাই।

কিমুরা বলে গেছেন—আমি ভারতের ঋষির সন্ধান করেচি। সাহেব একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর গুরুকে—আপনার এত রাগ কেন পাশ্চাত্য বিদ্যার উপর ?

ভুল বুঝেচ তাহলে। বিদ্যার উপর আমার রাগ হতেই পারে না। তবে আমার দেশের শিক্ষা ওদের চেয়ে ঢের ভাল, এ বলাতে রাগ বুঝবেন না। আমার মত হাজার রামেন্দ্রসুন্দর হাজার হাজার বছর পরমায়ু নিয়ে এসে এ দেশের বিদ্যার কণা মাত্র শেষ করতে পারবে না। এ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। ভেবে পাই না, কী পণ্ডিত ছিলেন ঐ মুনি-ঋষিগণ !

মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। তখন চোখে জল রামেন্দ্র বাবুর। বললেন—ওরা বলুক না ! কেন, ওদের জ্ঞানের সীমা নাই। আমি মাথা পেতে শুনবো। কিন্তু তুলনা করে এটা মৃত বলে বর্ণনা করতে গেলে শুনবো না। [ক্রমশঃ।

"সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্ম্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাঙ্গলা দেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্ম্মের জয়ঢাক—এই সব জিনিষে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।" —প্রমথ চৌধুরী

ফ্লোরেন্‌টাইন্‌

মোপাসাঁ

মেয়েদের সম্পর্কে কথা হচ্ছিল; কারণ, ছেলেদের মধ্যে আলোচনার এ ছাড়া আর কি বিষয় থাকতে পারে? আমাদের মধ্যে এক জন বলল: দাঁড়াও, এ-সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ঘটনা আমার মনে পড়ছে। এই বলে সে তার কাহিনী সুরু করল:

এক এক সময় এক রকমের করুণ ক্লান্তি এসে দেহ-মনকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে। গতবছরে শীতের এক সন্ধ্যেবেলায় বাড়ীতে চুপচাপ বসে আছি,—ঐ রকমের একটা অবসন্নতা এসে আমায় চেপে ধরল। মনে হ'ল—এই নিষ্করুণ ক্লান্তির হাতে আত্মসমর্পণ করে এখানে বসে থাকলে, আমি হয়ত আত্মহত্যা করে বসব।

কোটটাকে গায়ে চাপিয়ে উদ্দেশ্যহীন অবস্থায় তাই বেরিয়ে পড়লাম। বুলভারে নেমে এসে হাঁটতে সুরু করলাম কাফেগুলোর পাশ দিয়ে। তখন বৃষ্টি সুরু হয়েছে; তেমন মুষলধারে অবশ্য নয় যে, পথচারীরা একেবারে হন্তদন্ত হয়ে আশেপাশে আশ্রয় নেবে। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি অবিশ্রান্ত ভাবে নেমে এসে জামা-কাপড়ের উপর চকচকে ফোঁটায় জমে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। ঐ ঝিরঝিরে ধারায় পোষাকের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যেন আর্দ্র হয়ে আসে। কাফেগুলোয় জনসমাগম তখন নেই বললেই হয়।

এ সময়ে কি করা যায়, ঠিক করতে পাচ্ছিলাম না। কয়েক ঘণ্টা কাটাবার মত একটা জায়গার খোঁজে কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে এলাম। এই প্রথম অবিষ্কার করলাম—সে-সন্ধ্যায় সময় কাটাবার মত কোন জায়গা সারা প্যারীতে নেই। শেষে ঠিক্ করলাম—রূপোপজীবিনীদের ভিড়ের জন্যে যে থিয়েটারটার নাম আছে, সময়টা ওখানে কাটিয়ে আসব।

অত বড় থিয়েটার-হলে দর্শক খুব অল্পই। চলন, বলন, চুলদাড়ির ছাঁট, টুপি, রঙ—এ সব দেখে ঐ সব দর্শকদের শ্রেণী নির্দ্ধারণ করতে বিশেষ কষ্ট হয় না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ প্রায় একটাও চোখে পড়ে না ওদের মধ্যে। আর, মেয়েগুলো জানাই ত, সেই একই রকমের—সাদাসিদে, ভেঙে-পড়া নুয়ে-আসা;—চলার ভঙ্গীটা দ্রুত আর কেন জানি না, একটা নিষ্ফল ঘৃণা ওদের চোখে-মুখে।

অবসন্ন মূর্তিগুলোকে দেখছিলাম,—মসৃণ, নাতিস্থূল। মোটা-সোটা শরীরের সংগে শীর্ণ চেহারাও চোখে পড়ে; ধর্মযাজকের ভাঁড়ামি সর্বাঙ্গে, পাগুলো লম্বা-লম্বা, বাঁকা। মনে হচ্ছিল,—চড়া দাম হেঁকে শেষ অবধি যা' সস্তায় ওরা বিকোয়, সেটুকুও পাওয়ার যোগ্য ওদের একটারও নয়।

হঠাৎ, ওদেরই মধ্যে একটু ভদ্রগোছের একটা ছোট্ট চেহারা চোখে পড়ল। মেয়েটির বয়স অল্প নয়, তবে চেহারাটা সতেজ, খাপছাড়া, উগ্র। তাকে থামিয়ে, কিছু চিন্তা না করেই পাশবভঙ্গীতে রাত্রের জন্য দর ঠিক করে ফেললাম। একা-একা ঘরে ফিরে আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না; তাই ঐ সস্তাদরের মেয়েটির সঙ্গই বেছে নিলাম।

মেয়েটিকে অনুসরণ ক'রে এগিয়ে চললাম। ওর আস্তানা ছিল মার্টারষ্ট্রপটের একটা মস্ত বড় বাড়ীতে। সিঁড়িতে গ্যাসের আলো তখন নিবে এসেছে। দিয়াশলাই-এর কাঠির আলোয় হোঁচট খেতে খেতে অস্বাচ্ছন্দ্য মনে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মেয়েটির অনুসরণ করছিলাম। সামনে থেকে তার পোষাকের খসখসানি কানে আসছিল।

পাঁচতলায় এসে মেয়েটি থামল। ভিতরের দরজাটা বন্ধ করে সে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কি কাল অবধি থাকতে চাও?

নিশ্চয়ই; সেই রকমই ত কথাবার্তা হয়েছিল।

না, কিছু মনে কর না, আমি এমনি জানতে চাইছিলাম। একটু দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি আসছি।

আমাকে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে রেখে মেয়েটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! দু'টো দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে এল। মনে হ'ল, কার সঙ্গে যেন সে কথা বলছে। আমি একটু বিস্মিত, বিচলিত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম—ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের তালে আছে না কি মেয়েটি? মুঠো আর পেশীগুলো আমার বেশ শক্তই ছিল। মনে মনে বললাম—দেখা যাক কি হয়।

কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করতে লাগলাম। একটা কিছু যেন খুব সতর্ক হয়ে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। তার পর, আর একটা দরজা খোলার শব্দ হল। মনে হ'ল, তখনও কিছু কথাবার্তা কানে আসছে; তবে গলার স্বরটা খুব নীচু।

মেয়েটি ফিরে এল; হাতে একটা জ্বলন্ত বাতি। আমাকে বলল—এবার তুমি ভিতরে আসতে পার।

আত্মীয়তার সুরে বেশ আত্মস্থ হয়েই সে কথাগুলো বলল। আমি ভিতরে ঢুকে পড়লাম। একটা খাবার ঘর পেরিয়ে ছোট একটা কামরায় পৌঁছলাম। খাবার ঘরটা দেখেই বোঝা যায়, ওখানে খাওয়া-দাওয়া কোন কালেই হয় না। যে ঘরে প্রবেশ করলাম, সেটা এ-রকম মেয়েদের সচরাচর যে-রকম ঘর হয়ে থাকে সেই গোত্রেরই। আসবাবপত্র আছে কিছু, পর্দাগুলো সব লাল; সিল্কের নরম তোষক পাতা—ওপরে সন্দেহজনক কতকগুলো লাল-লাল দাগ।

মেয়েটি আমায় সহজ হয়ে বসতে অনুরোধ করল।

সন্দেহের চোখে ঘরটাকে আমি পর্য্যবেক্ষণ করছিলাম। অবশ্য, সন্দিগ্ধ হবার মত কিছু চোখে পড়ছিল না। মেয়েটি খুব দ্রুত পোষাক খুলে ফেলল। আমি ওভারকোটটা খোলার আগেই দেখি, সে বিছানায় ঢুকে পড়েছে। তার পর সে হাসতে হাসতে বলল—

কি, তোমার আবার কি হল? এমন স্তম্ভিত হয়ে গেলে কেন? এস, দেরী কর না।

মেয়েটির দেখাদেখি ওর পাশে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মিনিট পাঁচেক পরেই কেমন একটা বোকামি মাথায় চাপল; মনে হ'ল—পোষাক প'রে এখুনি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় বাড়ীর সেই ভয়ঙ্কর অবসন্নতা আবার আমায় চেপে ধরল। নড়াচড়ার সব শক্তি যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি। নিদারুণ একটা বিরক্তি সত্ত্বেও ঐ পাঁচ জনের ব্যবহার করা বিছানার উপর চুপচাপ শুয়ে রইলাম। থিয়েটার-হলের আলোতে যে কামনার উদ্রেক হয়েছিল, সেটা যেন হঠাৎ আমার মধ্যে থেকে উবে গেল। দেখলাম, গায়ে-গায়ে শুয়ে আছি। আর পাঁচটারই মত একটা নীচুস্তরের মেয়ের সঙ্গে। তার উদাসীন অভ্যস্ত চুম্বনে অনুভব করলাম বিশ্রী বিস্বাদ।

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম: এখানে তুমি কত দিন হ'ল এসেছ?

এই পনেরই জানুয়ারীতে ছ'মাস হবে।

এর আগে তুমি কোথায় ছিলে?

রুজে ষ্ট্রীটে। কিন্তু দারওয়ানটা এমন পিছনে লাগল যে ওখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হ'লাম। এই বলে, তাকে নিয়ে রক্ষীটি কি কেলেঙ্কারী করেছিল, তার একটা মস্ত কাহিনী ফেঁদে বসল মেয়েটি।

হঠাৎ কাছেই কি যেন একটা নড়ছে শুনতে পেলাম। প্রথমে মনে হল, কে যেন নিঃশ্বাস ফেলল, তার 'পর আস্তে একটা শব্দ শুনলাম। কিন্তু পরিষ্কার কানে এল—কেউ যেন চেয়ার থেকে পড়ে গেল।

তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠে বসে মেয়েটিকে জোর গলায় জিজ্ঞাসা করলাম: ও কিসের শব্দ?

শান্ত, অবিচলিত গলায় মেয়েটি বলল—মিছেমিছি তুমি উদ্বিগ্ন হচ্ছ। শব্দটা আসছে আমার প্রতিবেশিনীর ঘর থেকে। দুটো ঘরের মধ্যিখানে ময়লা পিচ্‌বোর্ডের বাক্স দিয়ে পাতলা দেওয়াল তোলা হয়েছে। তাই ও-ঘরে শব্দ হ'লে মনে হয় যেন এ-ঘরেতেই কিছু একটা হয়েছে।

আলসেমিটা এমন জোর করে চেপে ধরল যে, বিছানার মধ্যে আবার ঢুকে পড়লাম। কথাবার্তা আবার সুরু হ'ল। এই মেয়েগুলোর সম্পর্কে স্বভাবতই একটু কৌতূহল হয়। কবে যে তারা প্রথম দুঃসাহস করেছিল এই পথে নেমে আসতে! হয়ত, ওদের প্রথম অপরাধের উপর থেকে পর্দাটাকে সরাতে পারলে অকলঙ্কের অস্পষ্ট চিহ্ন চোখে পড়তেও পারে। হয়ত, নিতান্ত সরলতায় বিগত দিনের লজ্জার ইতিহাস যখন ওরা দ্রুত বলে চলে, তখন ওদের মধ্যেও ভালবাসার মত কিছু চোখে পড়ে যেতেও পারে। এই কৌতূহলের বশেই মেয়েটিকে তার প্রথম প্রেমিকের কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

আমি জানতাম—সে মিথ্যে বলবে। তাতেই বা কি আসে যায়? সব মিথ্যেও কিছু মর্মস্পর্শী, সত্যি ঘটনাও ত' আবিষ্কার করতে পারি!

মেয়েটিকে বললাম—কই, বললে না তোমার প্রথম প্রেমিক কে ছিল?

লোকটি ছিল একজন দাঁড়িমাঝি।

তাই না কি? বল, তার পর কি হ'ল? তুমি তখন থাকতে কোথায়?

আর্জেন্তয়-এ।

সেখানে কি করতে?

একটা রেস্তোরাঁয় ঝি-গিরি করতাম।

ফ্রেস ওয়াটার সেলরস-এ; চেন না কি তুমি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি বই কি; সেই বোনাফাঁয়ের রেস্তোরাঁ ত?'

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ।

তা ঐ দাঁড়িমাঝিটা তার কাজ গোছাল কি করে?

ওর বিছানা পেতে দিচ্ছিলাম, এমন সময় আমার উপর জবরদস্তি করলে।

হঠাৎ আমার এক বন্ধুর জানা-শুনা এক ডাক্তারের কথা মনে পড়ল। ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে প্রাখর্য্য ছিল, আর মেজাজটা ছিল দার্শনিকের। কাজ করতেন একটা বড় হাসপাতালে। কুমারী মায়েদের, আর বারবনিতাদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে ছিল দৈনন্দিন। ভবঘুরে, পয়সাওয়ালা পুরুষগুলোর হাতে হতভাগ্য মেয়েগুলো কেমন করে কদর্য্য শিকার হয়ে ধরা পড়ত,—সে কাহিনী তিনি ভাল করেই জানতেন।

সব ক্ষেত্রেই দেখেছি, ডাক্তার বলতেন, সমগোত্রীয় পুরুষের হাতেই মেয়েদের বিপদ ঘটেছে। এ-সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা বড় কম নয়। নিরপরাধীকে দোষদুষ্ট করার অভিযোগে সব সময়ই ধনীদের অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে।

এটা কিন্তু সত্যি নয়। পুষ্প আহরণ করার প্রবৃত্তি ধনীদের আছে সন্দেহ নেই, তবে সে অনাঘ্রাত পুষ্প নয়।

আমার সঙ্গিনীর দিকে তাকালাম। হাসতে হাসতে বললাম—বুঝতেই পারছ, তোমার কাহিনী আমার সবই জানা। তুমি ভাঁড়াচ্ছ, দাঁড়িমাঝিটা মোটেই তোমার প্রথম প্রেমিক নয়।

না, না, আমি সত্যি বলছি, শপথ করে বলছি।

তোমার কথা সব মিথ্যে।

তুমি বিশ্বাস ক'রছ না; কিন্তু আমি শপথ করছি, আমি সত্যি বলছি।

না, তোমার মিথ্যে কথা রাখ; সত্যি ঘটনাটা কি আমায় বলবে?

মেয়েটি যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত, বিস্মিত হয়ে পড়ল। আমি আবার সুরু করলাম—শোন হে, আমি এক জন যাদুকর; সম্মোহন বিদ্যেটাও আমার জানা আছে। সত্যিটা লুকোবার চেষ্টা করলে, তোমায় এখুনি ঘুম পাড়িয়ে ফেলব; তার পর, আসল সত্যিটা সহজেই বেরিয়ে আসবে।

ও-জাতের মেয়েরা যেমন হয়ে থাকে,—মোটে ভীত, বিমূঢ় হয়ে পড়ল। তারপর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় বলল—তুমি কি করে সব বুঝতে পারলে?

উত্তরে বললাম—এবার তোমার সত্যি কথাটা সুরু কর।

আবার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইছ? সেটা তেমন কিছুই নয়। গাঁয়েতে সে বার কি একটা উৎসব ছিল। আলেকজাণ্ডার বলে এক খানসামা এসেছিল। এসেই লোকটা বাড়ীর মাথা হয়ে উঠল। বাড়ীর সবাইকে, এমন কি কর্ত্তাকর্ত্রীকে অবধি সে হুকুম

করতে সুরু করল; যেন একটা রাজা-টাজা গোছের কেউ হবে। লোকটার বিরাট, সুশ্রী চেহারা ছিল; আর, উনোনের কাছে তাকে পাওয়াই যেত না। সব-সময়ই তার চিৎকার শোনা যেত—কই হে, এদিকে কিছু মাখন, ডিম, একটু ভাল মদ্‌টদ্‌ দাও? যা' চাইবে সব তাকে চটপট দিতে হবে, তা' নইলে রাগ কি! এমন সমস্ত কথা শোনাবে যে লজ্জায় তুমি অধোবদন হয়ে যাবে।

দিনের কাজ শেষ হ'লে, দরজার সামনে বসে লোকটা পাইপ টানত। হাতে একগাদা থালাবাসন নিয়ে তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম দেখে সে বললে—ওহে সুন্দরি, চল না, লেকের ধারটা ঘুরে আসি; বলি, গ্রামটা এক বার আমায় ঘুরিয়ে দেখালে পারতে ত?—এই কথায় বোকার মত তার সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়লাম। আর লেকের ধার অবধি পৌঁছতে না পৌঁছতে আমি কিছু বোঝার আগেই সে আমাকে বশীভূত করে ফেলল। তার পর ন'টার গাড়ীতে লোকটা চলে গেল। সেই থেকে তাকে আর দেখিনি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার কাহিনী শেষ হ'ল নাকি?

থতমত খেয়ে মেয়েটি বলল—হ্যাঁ, আর একটা কথা,—ঐ লোকটাই ফ্লোরেন্‌টাইনের পিতা।

ফ্লোরেন্‌টাইন আবার কে?

ওটা আমার ছোট্ট ছেলের নাম।

ও, তা বেশ বেশ! তুমি নিশ্চয়ই দাঁড়িমাঝিটিকে বুঝিয়েছিলে যে সে-ই তোমার ছেলের পিতা?

হ্যাঁ, বুঝিয়েছিলাম।

টাকাকড়ি ছিল দাঁড়িমাঝিটার?

ছিল। আর, ফ্লোরেন্‌টাইনের ভরণ-পোষণের জন্য আমায় তিনশ' ফ্রাঙ্ক আয়ের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিল।

সব শুনে আমার বেশ মজা লাগছিল। তাকে বললাম—বেশ বলেছ, হে সুন্দরি; যতটা মনে হয় ততটা কামুক তোমরা ঠিক নও। তা, এখন ফ্লোরেন্‌টাইনের বয়স কত হ'ল?

বার বছর। এই বসন্তেই ওকে গির্জ্জেয় নিয়ে যাব।

তা মন্দ নয়। তাহ'লে, সেই থেকে তুমি তোমার বিবেকের সংগে বেসাতি করে আসছ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি বলল—এ ছাড়া আর কি করতে পারি?

হঠাৎ ঘরের এক পাশে জোরে কি একটা শব্দ হ'ল। বিছানা ছেড়ে এক লাফে আমি উঠে পড়লাম। শব্দ শুনে মনে হ'ল—কিছু যেন একটা পড়ে গিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে; দেওয়ালের উপর হাতড়ানির শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলাম। বাতিটাকে তখন আমি ধরে ফেলেছি। ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে আশে-পাশে তাকাতে লাগলাম। মেয়েটি উঠে পড়ে আমায় নিরস্ত করার চেষ্টা করে বলল—লক্ষীটি, শোন, ও কিছু নয়।

কিন্তু আমি তখন আবিষ্কার করে ফেলেছি, দেওয়ালের কোন্‌ দিক্‌ থেকে শব্দটা এসেছে। বিছানার মাথার দিকে একটা লুকোন দরজা। এক ঝট্‌কায় সোজা সেটাকে খুলে ফেললাম। চোখে পড়ল, হতভাগ্য একটা ছোট্ট ছেলের মূর্ত্তি। ছেলেটি তখন কাঁপছে; ভীতি-বিহ্বল চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। রুগ্ন, পাণ্ডুর একটা ছোট্ট চেহারা;—পাশেই খড়-বোঝাই একটা মস্ত চেয়ার; বোধ হয় ওর উপর থেকেই মাটিতে সে পড়ে গিয়েছিল।

আমায় দেখে মায়ের দিকে হাত দু'টি এগিয়ে দিয়ে ছেলেটি কাঁদতে সুরু করল:—সত্যি বলছি মা, আমি কোন দোষ করি নি। ঘুমুতে ঘুমুতে কখন আমি পড়ে গিয়েছি। আমায় বকবে না ত' তুমি? সত্যি বলছি মা, আমি ইচ্ছে করে কিছু করি নি।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—ও কি বলতে চাইছে?

মেয়েটি ভীত, বিব্রত হয়ে পড়ল। শেষে ভাঙ্গাগলায় বলল: কি আর বলব বল? ছেলেকে ইস্কুলে দেবার মত পয়সা রোজগার করতে পারি না। তবুও ত ওকে দেখা দরকার; আলাদা একটা ঘরভাড়া করব তাও পেরে উঠি না। যখন ঘরে কেউ না থাকে তখন ও আমার পাশেই ঘুমুতে পায়। আর, কেউ ঘণ্টা কয়েকের জন্যে এলে, ও ঐ খুপরির মধ্যে চুপচাপ ভালই থাকে। কি করে থাকে, অবশ্য, ও ভালই জানে। আর তোমার মত সারা রাত্রি কেউ থাকতে চাইলে, চেয়ারের উপর সারাক্ষণ ঘুমবার ফলে পেশীগুলো ওর শিথিল হয়ে পড়ে। এর জন্যে ওকেই বা দোষ দিই কি করে? আমার দেখতে ইচ্ছে করে—তোমাকে যদি সারা রাত্রি ঐরকম একটা চেয়ারে ঘুমতে দেওয়া হয়;—দেখতাম, তাহ'লে তোমার গলায় কেমন গান আসত!

মেয়েটি রেগে জ্বলে উঠে কাঁদতে লাগল।

শিশুটিও কাঁদল। হতভাগ্য ছেলেটির ভীত চেহারাটা দেখে মায়া হচ্ছিল। ঐ অন্ধ, আলোবাতাসহীন খুপরিতে ওর জীবন কাটে! শূন্য বিছানার যেটুকু উত্তাপ মুহূর্ত্তের জন্যে ওর কপালে মাঝে মাঝে জোটে, সেটুকুর জন্যেও সে কত লালায়িত!

আমার চোখেও বোধ হয় জল এসে গেল। বাড়ী ফিরে এসে নিজের বিছানায় আশ্রয় নিলাম।

অনুবাদিকা—কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য।

"আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণ-কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব্বদিগন্ত থেকেই।"

—রবীন্দ্রনাথ

কোলকাতার নিউ মার্কেট, যাকে পুরোনো আমলের লোকেরা হগ সাহেবের বাজার বলেন, একটি অতি আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠান। কথায় বলে কোলকাতা সহরে পয়সা ফেললে মাঝরাতেও বাঘের দুধ পাওয়া যায়। নিউ মার্কেটের দোকান বাজার, আর হরেক রকমের মাল দেখে কথাটাকে একেবারে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দোকান পাট ছাড়াও নিউ মার্কেটে দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে, যথা নানারকম দোকানী ও খদ্দের ধরবার জন্য তাদের অভিনব উপায় অবলম্বন। শোনা যায় সাহেব, ও বিশেষ করে মেম সাহেব দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখলেই কোন কোন দোকানী নিজেকে একত্রে ইংরাজী ভাষাভাষী ও বিনয়ী দোকানদার প্রতিপন্ন করবার জন্য হাত নেড়ে বলেন "টেক তো টেক, নট টেক নট টেক, একবার তো সি" অর্থাৎ জিনিষ কিনুন বা না কিনুন, দোকানে এসে একবার দেখে তো যান! দোকানীর এই অভিনব আবেদনে বহু ঘোড়েল খদ্দেরও নাকি ঘায়েল হয়েছে বলে শোনা যায়। মাত্র এক মিনিটের জন্যে দোকানে গিয়ে শেষে ঘণ্টাখানেক পরে হরেক রকম মালপত্তর কিনে খদ্দেরকে বেরুতে দেখা গেছে।

আবার খদ্দেরও নানারকম। কেউ কেউ পুরনো ধরনের ও পুরনো প্যাটার্ণের জিনিষ পছন্দ করেন। আজকালকার বাজারে নিত্যই নতুন জিনিষ আবিষ্কার ও চালু হচ্ছে কিন্তু এঁরা সেই যে পুরনো জিনিষ আঁকড়ে বসে আছেন তো আছেনই তার আর কোন নড়চড় নেই। আর এক ধরণের খদ্দের আছেন যাঁরা নতুন ধরণের জিনিষ দেখলেই তা কিনে যাচাই করে দেখেন। যে কোন সমাজের পক্ষে এ ধরণের লোক বিশেষ দরকার কারণ এঁরা না থাকলে প্রগতি প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে এবং নতুনত্বের স্বাদ চলে যাবে। সব নতুন জিনিষই যে ভাল হতে হবে তা বলছি না। আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগে জিনিষ ভাল না হলে বাজারে তা টিঁকতেও পারে না কারণ খদ্দের বিজ্ঞাপন দেখে বা নতুন জিনিষ বলে একবার কিনে পরখ করেই বুঝবে এবং ভাল না হলে দ্বিতীয়বার আর কিনবে না। আজকের এই দ্রুত বৈজ্ঞানিক যুগে ভালো নতুন জিনিষ আমাদের সংসারে রোজই প্রায় আসছে এবং স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে। ধরুন পেনিসিলিন কদিনই বা বেরিয়েছে কিন্তু আজ ঘরে ঘরে ডাক্তাররা ব্যবহার করছেন। ইংরিজীতে একে বলা হয় ওয়াণ্ডার ড্রাগ বা অত্যাশ্চর্য্য ওষুধ। বিশ বছর আগে কজনের ঘরে নাইলনের জামাকাপড়, প্ল্যাষ্টিকের জিনিষ ছিল? অথচ আজ এ সব জিনিষ কত হাজার হাজার পরিবারে স্থান পেয়েছে। তেমনি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বনস্পতি। বনস্পতি, বিশেষ করে ডালডা বনস্পতি আজ দেশের লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে তার প্রধান কারণ ডালডা বনস্পতি ভালো জিনিষ।

বনস্পতির গুণাগুণ সম্বন্ধে সরকারী গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ডালডা বনস্পতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো কিনা একথা অনেকেই প্রশ্ন করেন। এর উত্তর হচ্ছে ডালডা বনস্পতি ভালো না হলে আজ ঘরে ঘরে তার এতো আদর হোতনা। ঘি অতি উত্তম জিনিষ, কিন্তু আজকাল খাঁটী ঘি সাধারণ লোকে যে দামে কিনতে পারে, সে দামে সবসময় পাওয়া মুস্কিল। তাই রোজকার জন্য নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। জানেন কি ডালডার প্রতি আউন্সে ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়, যা ভাল ঘিয়ের সমান? ডালডা স্বাস্থ্যের জন্যে তাই এতো ভালো। ডালডা শুধুমাত্র খাঁটি ভেষজ তেল থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্বদাই শীল করা ডবল ঢাকনা'ওলা টিনে পাওয়া যায়। ডালডায় সব রান্নাই মুখরোচক হয়! নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি কিনুন—জানেন তো ডালডা শুধুমাত্র খেজুর গাছ মার্কা টিনে পাওয়া যায়—সর্বদা দেখে কিনবেন।

HVM. 299-X35 BG

আনাতোল্ ফ্রাঁস্

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর কথা। ওভ্যার্ণ-এর সিনেটারের (মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারী) একমাত্র তরুণ পুত্র আঁ্যাজুরিওস্যু স্কোলাস্তিকা নামে এক তরুণীকে বিয়ে করতে চাইল। সে-ও তারই মত সিনেটারের একমাত্র মেয়ে। তাদের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। বিয়ের উৎসবের পর আঁ্যাজুরিওস্যু তাকে বাড়ীতে নিয়ে এল এবং একই শয্যায় শুয়ে পড়ল ওরা। কিন্তু দুঃখে মেয়েটি দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে অঝোর ধারায় কাঁদতে সুরু করল।

—তোমার দুঃখের কারণ কি? বল আমায়, মিনতি করছি।

সে নীরব হয়ে থাকলে আঁ্যাজুরিওস্যু বললে—আমি ভগবানের পুত্র খৃষ্টের নামে তোমার কাছে মিনতি করছি, তোমার দুঃখের কাহিনী সব আমায় খুলে বল।

স্কোলস্তিকা মুখ ফিরিয়ে চাইল। যে গভীর দুঃখে আমার অন্তর পূর্ণ, সমস্ত জীবন ভরে চোখের জল ফেললেও তা দূর হবে না। আমি এই ক্ষীণ দেহ পবিত্র রাখতে এবং আমার কুমারীত্বকে খৃষ্টের কাছে নিবেদন করব বলে স্থির করেছিলাম। হায়! দুর্ভাগা আমার! তিনি আমায় এমনি ভাবে পরিত্যাগ করলেন যে আমি যা চেয়েছিলাম তা করতে পারলাম না। হায়! জীবনে কেন প্রভাত এসেছিল? স্বর্গের পতি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন নন্দন কানন আমায় উপহার দেবেন তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি মরণশীল মানুষের পত্নী হয়েছি! যে শিরে আজ শোভা পেত অম্লান গোলাপের মুকুট, সেখানে রয়েছে সাজান শুকিয়ে-যাওয়া গোলাপ!

হায়! জীবনের প্রথম দিনই কেন আমার শেষ দিন হল না? যদি এক ফোঁটা দুধ খাবার আগেই আমি মারা যেতাম তাহলে সুখী হতাম। স্নেহশীলা ধাত্রীরা আমার শবাধারটিকে কত চুম্বন করত। তুমি যখন তোমার হাত দু'টি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলে তখন আমি ভাবতে লাগলাম, পৃথিবীর মুক্তির জন্য ক্রুশবিদ্ধ হাত দু'টির কথা। বলা শেষ হয়ে গেলে সে অঝোর ধারায় কাঁদতে সুরু করল।

তরুণ যুবকটি তাকে ধীরে বলতে লাগল—স্কোলাস্তিকা, আমাদের বাপ-মা ওভ্যার্ণের লোকদের ভেতর ধনী এবং উন্নত। আমরা তাঁদের একমাত্র সন্তান। তাঁদের বংশ রক্ষা করতে এবং যাতে তাঁদের মৃত্যুর পর ধন-সম্পত্তি অপর কোন বাইরের লোক না পায় এই ভয়ে তাঁরা আমাদের মিলন চেয়েছিলেন।

স্কোলাস্তিকা জবাব দিল—পৃথিবী কিছুই নয়; ধন-সম্পত্তিও কিছু নয়। এমন কি জীবনও কিছুই নয়। বাঁচা অর্থই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা নয় কি? যারা চিরসুখে আলোয় করে অবগাহন এবং দেবদূতের মত ভগবানকে পাওয়ার আনন্দ যারা করে উপভোগ; বাঁচে শুধু তারাই।

এই সময়ে করুণায় আর্দ্র হয়ে আঁ্যাজুরিওস্যু বললে—আহা! কি মধুর নির্ম্মল বাণী। শাশ্বত জীবনের আলো আমার চোখে করছে ঝলমল।

স্কোলাস্তিকা, তুমি যদি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে চাও, আমি নির্ম্মল হয়ে থাকব তোমারই পাশে।

খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে চোখের জলের ভেতর হাসি ফুটিয়ে সে জবাব দিল—আঁ্যাজুরিওস্যু! মেয়েদের এই রকম কথা দেওয়া ছেলেদের পক্ষে শক্ত। কিন্তু তুমি যদি এমনি কর যাতে আমরা পৃথিবীর মলিনতাকে ছাড়িয়ে বাস করতে পারি, তাহলে আমার স্বামী এবং প্রভু যীশুখৃষ্ট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আমায় যে উপহার দেবেন তার একটি অংশ তোমায় দেব।

সে হাত দিয়ে ক্রুশ-চিহ্ন করে বলল—তোমার ইচ্ছাই আমি পালন করব। তারা পরস্পরের হাত ধরে শুয়ে পড়ল।

অতুলনীয় পবিত্রতা রক্ষা করে তারা একই শয্যায় শুতে লাগল। দশ বৎসর পরীক্ষার পর স্কোলাস্তিকা মারা গেল।

তখনকার দিনের প্রথা অনুযায়ী উৎসবের পোষাক পরিয়ে, মুখ অনাবৃত করে, স্তোত্র পাঠ করতে করতে তাকে গীর্জ্জায় নিয়ে আসা হল। সমস্ত লোক তাকে অনুসরণ করল।

স্কোলাস্তিকার কাছে নতজানু হয়ে আঁ্যাজুরিওস্যু এই বাণীটি উচ্চ কণ্ঠে বললে—প্রভু যীশু, তোমায় ধন্যবাদ জানাই! তোমার সম্পদকে পবিত্র রাখবার শক্তি তুমিই আমায় দিয়েছিলে।

এই কথায় মৃতা তার মৃত্যুশয্যা থেকে উঠল এবং একটু হেসে ধীরে ধীরে বলল—বন্ধু! যা তোমায় কেউ জিজ্ঞেস করেনি তা কেন বলছ? তার পরেই সে আবার চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়ল।

আঁ্যাজুরিওস্যুও শীগগিরই মৃত্যুকে অনুসরণ করল। "স্যাঁ-আলির" গীর্জ্জার ভেতর স্কোলাস্তিকার কাছেই তাকে সমাহিত করা হল। প্রথম রাত্রেই যে-দিন তাকে সমাহিত করা হল সে-দিনই নিষ্পাপ স্ত্রীর সমাধি থেকে একটি অদ্ভুত গোলাপ গাছ গজিয়ে উঠল। গাছটি তার পুষ্পিত শাখা দিয়ে সমাধি দুটোকে জড়িয়ে রইল। পরদিন সবাই দেখল তারা পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে গোলাপের শাখার দ্বারা। সুখী আঁ্যাজুরিওস্যু ও স্কোলাস্তিকার এই পবিত্র চিহ্ন জানতে পেরে ওভ্যার্ণের ধর্ম্মযাজকেরা সমাধি দু'টিকে 'বিশ্বস্ততা'র চিহ্ন বলে সম্মান দিল।

"স্যাঁ আলির" এবং "নোপোসিয়া" গীর্জ্জা কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার সত্ত্বেও এই দেশে কয়েক জন অখৃষ্টান পৌত্তলিক ছিল। তাদের ভেতর সিলভানু নামে একজন দেব-দেবীর ফোয়ারাগুলিকে ভক্তি করত। পুরোন ওক গাছের শাখায় ছবি টাঙ্গিয়ে রাখত এবং সূর্য এবং ফলপ্রদায়িনী দেবীদের প্রতীকস্বরূপ ছোট ছোট মাটির মূর্ত্তি তার আগুনের পাশে সাজিয়ে রেখেছিল। পাতার আড়ালে লুকিয়ে থেকে উদ্যানের দেবতা তার উদ্যান রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

বৃদ্ধ বয়সে সিলভানু কবিতা লিখত। সে গ্রাম্য এবং শোকের শক্ত ধরণের কবিতা লিখত। সে সুযোগ পেলে প্রাচীন চারণ-কবিদের শ্লোকগুলি সুকৌশলে নিজের কবিতার ভেতর ঢুকিয়ে দিত। জনতার সঙ্গে সে-ও খৃষ্টান দম্পতীর সমাধিস্থান দেখতে গেল। সমাধির ভেতর থেকে যে গোলাপ গাছ দু'টি উঠেছিল তাই দেখে সে

মুগ্ধ হল। সে ধার্ম্মিক ছিল বলে এই স্বর্গীয় চিহ্নটি বুঝতে পারল। এই ব্যাপারটি তার দেবতাদের নির্দ্দেশ বলে সে মনে করল এবং তার একটুও সন্দেহ রইল না যে প্রেমের দেবতা এরো-র ইচ্ছাতেই গোলাপ ফুটে উঠেছে।

বেচারী স্কোলাস্তিকা! সে নিজের মনে বলতে লাগল, এখন শুধু ছায়া মাত্র—হারানো সুখ এবং ভালোবাসার সময়ের জন্য অনুতাপ করছে। যে গোলাপ গাছ তার সমাধি থেকে উঠেছিল'তা যেন স্কোলাস্তিকার হয়ে আমাদের কাছে বলছে: যারা বেঁচে আছ তারা ভালোবাসো। সময় থাকতে জীবনের আনন্দকে উপভোগ করবার জন্য এই কাহিনী আমাদের শিক্ষা দেয়।

সরল পৌত্তলিক ব্যাপারটা এই রকম মনে করল। এই বিষয়ে সে একটা শোকের কবিতা লিখেছিল আমি তা 'তারাক্ক'র সাধারণ পাঠাগারে একাদশ শতাব্দীর বাইবেলের মলাটের ওপর হঠাৎ পেয়ে যাই। তালিকায় লেখা ছিল—মিসেল সাল-সঙ্কয়ন—এফ, এন ৭৪৩১, ১৭১ বি। পণ্ডিত লোকদের যে মূল্যবান পাতাটি এত দিন নজরে পড়েনি তাতে কম পক্ষে চুরাশীটি পংক্তি পরিষ্কার মেরোভিন্‌জিয়ান হরফে লেখা ছিল—তারিখটা সম্ভবত ছিল সপ্তম শতাব্দীর। কবিতাটির সুরু এই ভাবে—

এখন করিছ শোক, চাহিছ ফিরিয়া প্রত্যাখ্যান করেছিলে যা—এবং শেষ এই ভাবে—'শ্রদ্ধাঞ্জলির বিষাদময় গানের মোরা জাল বুনি।' পাঠোদ্ধার করার পরই সম্পূর্ণ কবিতাটি আমি নিশ্চয়ই প্রকাশ করব।

অনুবাদক—শ্রীসুবীরকান্ত গুপ্ত

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

একটি দোকানের মৎস্যাধার

পশ্চিমের রাঙা রোদ চোখ রাঙাচ্ছে পথচারীকে
খর গ্রীষ্মের পথ-ক্লান্তিকে।
চলতে-চলতে চমকে উঠলুম পাশের দোকানের দিকে তাকিয়ে—
চোখে ভেসে এল এক সমুদ্রের স্বপ্ন—দিবা-স্বপ্ন—
দু-হাত কাচের বাক্সে বন্দিনী লাবণ্যের সুনীল প্রতিমা!
(বিচিত্র কি বিচিত্র ওম্!
সমুদ্রকে বশ করেছে বসু-মিত্র এণ্ড কোং!)

দোকানের সামনে ঝুলছে পুরানো পর্দা
তার শত ছিদ্র দিয়ে গলে পড়ছে পড়ন্ত রৌদ্র—
দু-হাত কাচের আধারে মাছের গায়ে—
পুচ্ছকে হাল করে পাখনার দাঁড় বেয়ে
সানন্দে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে দু-হাত সমুদ্রে
লাল নুড়ির প্রবাল-গুহার মধ্য দিয়ে—
উঁচু আর নীচুতে এলো-মেলো পথে-পথে
ঘাসের আর রঙিন গাছের অলি-গলি বেয়ে—
চিকচিকিয়ে উঠছে যাদের গায়ের সোনা,
পাখনার লাল আর রাক্কুসে চোখের নীল!
(বিচিত্র কি বিচিত্র!
সমুদ্রকে বাঁধল শেষে বসু এবং মিত্র!)
গ্রীষ্মের প্রচণ্ড অপরাহ্নের রৌদ্রে
হঠাৎ পড়ল মেঘের ছায়া—
দূরে উত্তরে কলের চিমনির ধোঁয়ার সঙ্গে গা মিলিয়ে
উঠল কালো মেঘের ধোঁয়া—
লিকলিকিয়ে উঠল বিদ্যুতের আগুন।
সে আগুনের প্রচণ্ড তাপে আকাশখানা ফেটে গেল বজ্রের গর্জনে।

শন্‌শনে হাওয়া বয়ে গেল ছুরির মতন তীক্ষ্ণ
ছড়িয়ে গেল গড়িয়ে গেল উন্মাদের মতন
বিকট আবর্ত্তে—
তার পর নামল বৃষ্টি—শিলাবৃষ্টি।
বিদ্যুতের আগুনে পুড়ে যাওয়া আকাশের খণ্ড খণ্ড অস্থিকণা
সে প্রচণ্ড অতর্কিত ঝড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে
উঠলুম দোকানের সিঁড়িতে সেই পুরানো পর্দার পিছনে,
সেখানে দু-হাত সমুদ্রের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে
লাল-পুচ্ছের অগ্নিপাটের শাড়ী লুটিয়ে মৎস্য-কন্যারা—প্রবাল-দ্বীপে
ক্ষুদে ক্ষুদে তরুগুল্মের স্থির অন্তরালে—অবিচলিত!
(বিচিত্র কি বিচিত্র!
সমুদ্রকে করল যাদু বসু এবং মিত্র!)

ঝড় উঠবে না কোনো দিন—কোনো দিন দু'-হাতের ঐ সমুদ্রে
উদ্বেল হবে না তার তরঙ্গ মেঘের গর্জনে,
চাঁদ তারার দেশ থেকে নির্বাসিত ঐ সমুদ্রের আকাশে
জ্যোৎস্নার আলোর মতন মৃদু আর ভোরের আলোর মতন রাঙা!
সেই স্বপ্নময় আলোর তলে
ঘুরে বেড়াবে মাছেরা তাদের পাখনায় ভর দিয়ে
নিদ্রাহারা নিশীথের তরঙ্গিত চাঞ্চল্যে
রঙিন নুড়ির প্রবাল-গুহার অন্তরালে
ক্ষুদে লতা-পাতার অলিগলির পথে-পথে বাহার দিয়ে
আর জীবনের সকল বিক্ষোভের জ্বালায় ঝলসে যাওয়া
সহুরে মানুষের পুড়ে যাওয়া মন—
ঐ স্থির সমুদ্রের নীলাভ স্বপ্নের শৈত্যে—জুড়িয়ে যাবে
হঠাৎ এক আগুন-ঝরা গ্রীষ্মের ঝড়-ওঠা অপরাহ্নে।

(বিচিত্র কি বিচিত্র হায়!
বসু এবং মিত্র শেষে অগস্ত্যে হার মানিয়ে যায়!)

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পার্কের বেঞ্চিটায় বসবার মতলবে সুজিত এগিয়ে এলো। ক্লান্ত দুপুর। যাদের কাজ নেই তারা শুয়ে, বসে, গড়িয়ে সময় কাটাচ্ছে। সুজিতের কাজ নেই, কিন্তু 'গড়িয়ে বেড়াবার সময় কোথায় তার?

এত দুপুরেও সমস্ত বেঞ্চিতে মানুষ! কেউ হাঁ করে ঘুমুচ্ছে অকাতরে। কেউ বসে বসেই চোখ বুজে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছে। কেউ আধ-শোয়া অবস্থায় হেলান দিয়ে অতীতকে মনে মনে রোমন্থন করে চলেছে।

না, কোথাও বসার উপায় নেই! বিশ্রামের আশায় তার মত আরও এত লোক আসবে এই ছোট পার্কটায়, সুজিত ভাবতে পারেনি।

পার্কটার চার দিক ঘুরে অবশেষে ঈশান কোণের বেঞ্চিটায় চোখ পড়ল। আধখানা বেঞ্চি খালি। বাকি জায়গাটা এমন এক জনের দখলে যাকে এ সময় এখানে সে কল্পনা করতে পারেনি। এরও কি বিশ্রামের জায়গা মেলেনি কোথাও? তারই মত গৃহহীন, লক্ষ্মীছাড়ার দলের তো নয় সে।

যাক্, ভাববার প্রয়োজন নেই, এগিয়ে গেলো বেঞ্চির কাছে সুজিত। দূরে বিলিতি নাম-না-জানা গাছটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল সে। কাছে যেতেই উদাস দৃষ্টিতে এক বার তাকিয়ে দেখলো সুজিতকে। তার পর যেমন দূরে তাকিয়ে ছিলো তেমনিই দূরে তাকিয়ে রইলো।

এক বার একটু ইতস্তত করে বেঞ্চিটার এক কোণে বসে পড়ল সে। বসবার সময় আড়চোখে এক বার তাকালো বেঞ্চিটার শেষ প্রান্তে। না, কোন সাড়া নেই। এক জন পুরুষ যাকে সে কোন দিন দেখেওনি, সে পাশে বসলেও সাড়া নেই মেয়েটির। সুজিতকে সে বোধ হয় আমল দিতেই চায় না।

তা না দিক। সুজিত বসলো জুত কোরে। মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নড়ে-চড়ে বসলো। শব্দ করলো কাশির ছলে। হিল-ক্ষয়ে-যাওয়া চটিটাকে বেঞ্চিটার লোহার পায়ায় ঘষে শব্দ করলো।

—কিছু বলবেন? মেয়েটা সুজিতের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলো।

সুজিত হঠাৎ মেয়েটার প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেল। বুকটা একটু কেঁপে উঠল। এ রকম হবে, সে আশাও করেনি।

—ন্-নাতো! অতি কষ্টে জবাব দিলো। যেন গলা দিয়ে স্বর বার হতে চাইছে না। কে গলাটা টিপে ধরছে তার।

—তবে শব্দ করছিলেন এমনি? এবারে যেন মেয়েটি তার মুখোমুখি ঘুরে বসলো।

কোন রকমে ঢোঁক গিলে জবাব দিলো—হাঁ।

সুজিতের মুখের চেহারা দেখে মেয়েটি হেসে ফেললো। এবারে সুজিত আরও লজ্জায় পড়ল। মাথাটা হেঁট করে বসে বসে ঘামতে সুরু করল।

—দেখুন, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। এটাই যৌবনের ধর্ম। দু'জনে পাশাপাশি বসে আছি। দু'জনে গল্প করে নিজেদের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারি পরস্পরের সুমুখে। পারি কি না, আপনিই বলুন!

—সমস্যা! কথাটা বলে এতক্ষণে সুজিত মেয়েটির মুখের দিকে সহজ ভাবে চেয়ে দেখলো। সাধারণ আর দশটা মেয়ের মত যে সে নয়, ওটা তার কথাতে সে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে তার বুদ্ধির ও চিন্তার ছাপ কিছু বোঝা যায়নি তো! দু'টো জিজ্ঞাসু চোখে কোন শাণিত দীপ্তিও তো দেখা যায় না! বোকা-বোকা চাহনি বরং। মুখে ক্লান্তির কালিমা। যেন অনেক ঝড় ঝাপটা তার সরল কচি মুখটাকে বার বার আঘাত করে অকালে বুড়িয়ে দিতে চেয়েছে।

সুজিত চুপ করে থাকায় মেয়েটা আবার বললে—সমস্যা নেই আপনার জীবনে? সঙ্কোচের কি আছে বলুন? আলাপ-পরিচয় নেই এই তো? আলাপ-পরিচয় হতে কতক্ষণ লাগে বলুন?

সুজিত এর পরও বোকার মত তাকিয়েই রইলো। উপন্যাস সে অনেক পড়েছে। উপন্যাসের নায়িকাও প্রথম সাক্ষাতে এমন ভাবে কথা বলতে পারে না। অতি আধুনিক নায়িকাও নয়।—আমি তো দারুণ সমস্যায় পড়েছি। মেয়েটিই আবার কথা বললো।

এবারে সহজ হোয়ে এলো সুজিত। মেয়েটা প্রথম দিকটায় নাটকীয় ভাবে কথা সুরু করলেও এবারে ঘরোয়া কথাবার্তায় আসতে চায়। মন্দ কি! দেখা যাক কি তার সমস্যা।

মেয়েটার দিকে আবার তাকালো সুজিত। সমস্যার চিন্তায় কচি মুখখানা আরও করুণ হোয়ে উঠেছে তার।

ছোট ছেলের মত প্রশ্ন করলো সুজিত—কি সমস্যা?

মেয়েটা একটু সরে এলো তার দিকে। বললে, আমার নাম মল্লিকা। স্কুল ফাইন্যালে পাশ করার পর কলেজে পড়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু দাদা আর পড়াতে পারলেন না। তাই—

কথাটা শেষ না কোরেই ছেলেমানুষের মত আব্দারের সুরে বললে,—আপনারটা আগে বলুন। ব্যাটা ছেলেরটা আগে বলতে হয়।

কি বলবে সুজিত? তারই মত পাশ কার চাকরী খুঁজছে সে। সংসারে মা-ভাই-বোন আছে। বাবা নেই। পাঁচটা প্রাণী তারই গলগ্রহ। এক জন আত্মীয়ের বাসায় থাকে, খায় আর তার ছেলে-মেয়ে পড়ায়। ও কাহিনী তো মল্লিকার কাছে বলা যাবে না। সুরু করলেই বলবে ও তো জানি। ও সমস্যা তো চিরন্তন। আপাতত যে সমস্যা সেটাই সে জানতে চায়। ও সমস্যা তো একশো

জনের মধ্যে পঁচানববুই জনের। ও কি বলতে হয়! ও তো তার চোখ-মুখের উদ্বেগ ও কান্তির ছাপে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

সুজিতকে চুপ করে থাকতে দেখে মল্লিকা নড়ে-চড়ে বসল। বলল—কই বলুন?

—কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। আমতা আমতা করলো সুজিত।

—বলবার কিছুই নেই বোধ হয়? একটু হাসলো মেয়েটা।

—না, তা নয়। অনেক বলবার আছে কিন্তু কোনটা আগে আর কোনটা পরে বলব, তাই ভাবছি।

আগেরটা আগে বলবেন। তবে দোহাই, সেই একঘেয়ে প্যানপ্যানানি যেন না হয়। ভাইটার স্কুল থেকে নাম কাটা গিয়েছে, মাইনে বাকী আছে বলে; মায়ের অসুখ কিন্তু ডাক্তার দেখাতে পারছি না। বোনটার বয়স হয়েছে কিন্তু বিয়ে দিতে পারছি না! বাবার আফিমের নেশা, সরকার আফিমের কোটা কমিয়ে দিয়েছে।

সুজিত এবারে আরও মুস্কিলে পড়লো। কি বলবে? জানতে চাইলো সমস্যার কথা। কিন্তু তা শুনতে রাজী নয়। তবে? বলবে কি প্রেমের কাহিনী? আজ পর্য্যন্ত কোন মেয়েই তার প্রেমে পড়েনি, এমন কি চেয়েও দেখেনি তার দিকে। সেই প্রথম মেয়ে যে তার সুমুখে একা-একা এমন করে কথা বলছে এবং যার সম্বন্ধে কৌতূহল তার পুরোমাত্রায়।

সুজিত ভাবছে। মেয়েটাও নির্বাক্। মাথার ওপরের গাছটা থেকে ছুটো লাল ফুল ঝরে পড়লো তাদের মাঝখানে ফাঁকা বেঞ্চিটার ওপরে। ছু'জনেই চমকে তাকালো ফুল ছু'টির দিকে চেয়ে। তার পর মল্লিকা মুখ খুললো প্রথমে—কই বললেন না তো?

—আপনি বলুন, বেশ ভাল লাগবে। আমার ঠিক আসছে না।

মল্লিকা ছু'মিনিট ভেবে নিলো। তার পর পরিচিতার মত সুজিতের দিকে আরো সরে এসে সুরু করলো তার সমস্যার কথা। বললে—জানেন অভাব-অভিযোগ তো স্থায়ী সমস্যা, সে আপনি আমি আজই দূর করতে পারি না কিন্তু এই অভাবের মধ্যে যে অস্থায়ী শান্তি, ক্ষণেকের আনন্দ সেটা আমরা তো সৃষ্টি করতে পারি?

সুজিত এবারে বুঝতে না পেরে বোকার মত চেয়ে রইলো—এই ধরুন না, ছুজনে এখন তো খানিকটা পরিচিত পরস্পরের মধ্যে। কোথাও বেড়িয়ে আসি। নয়তো ছু'জনে একসঙ্গে একটু সিনেমা দেখি, নয়ত কোন রেষ্টুরেন্টে গিয়ে বসে চা খাই আর গল্প করি। সুজিত বললে—বেশ তো! এ সমস্যার সমাধান এমন কিছু কঠিন নয়। আমি ভাবছিলাম—

—ঘর-সংসারের কথা—কথা কেড়ে নিয়ে মল্লিকা উচ্ছল হোয়ে উঠলো। আপনার সংসারে কি ঘর পৃথক হয়েছে না কি?

এতখানি অন্তরঙ্গতা কি মেয়েদের স্বভাবজাত না মল্লিকার বিশেষ স্মার্টনেশের লক্ষণ? তবু মল্লিকার কথায় সুজিত একটু লাল হয়ে উঠলো। ঘাড় নেড়ে জানালো, না।

—তবে, এমন একটা সময় যখন আপনিও বেকার আর আমিও তাই। পার্কে আমরা কথা বলছি, কেউ শুনছে না, তবু মনে হচ্ছে অনেক মানুষ আশে-পাশে কান পেতে আছে! তাই না?

কি বলতে গেল সুজিত। মল্লিকা আর কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে ওকে একরকম টেনে তুললে। বললে—চলুন।

—কোথায় যাবেন, বেড়াতে?

—না।

—রেষ্টুরেন্টে?

—তাও না।

—তবে?

কথা বলেছে সুজিত কিন্তু বুকটা ছুরুছুরু করছে। ভয়ে বা লজ্জায় নয়। পকেটের অবস্থার কথা ভেবে। খরচটা হবে তারই। সে পুরুষ। আব্দার ধরেছেন ভদ্রমহিলা। ক্ষণেকের অতিথি যেন।

পার্কটার প্রায় তিন দিক ঘুরে অবশেষে তারা বার হবার পথ পেলো। মল্লিকাই এভাবে ঘোরালো। সহজ পথ চেনে না ওরা। পুরুষকে বশ করার অস্ত্র হাতে আছে, তাই তার সদ্ব্যবহার করতে জানে না।

সুজিত চলতে চলতে বুকপকেটটার ওপরে ছু'বার হাত বুলিয়ে নিলো। টিউশনির শেষ পুঁজি পাঁচ টাকার নোটটির অপমৃত্যুর কথা ভেবে ব্যথায় ভরে উঠলো মনটা। মনে হোলো চুনীর কথা। ছেঁড়া, তালি-দেওয়া প্যান্টটা পরে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে। সমবয়সী বন্ধুদের নতুন জামা-প্যান্ট পরতে দেখে হয়ত বাড়ী চলে এসেছে। কিন্তু কা'কেও খুঁজে পাচ্ছে না যার কাছে জানাবে তার একটা নতুন প্যান্টের আব্দার।

কি ভাবছেন বলুন তো? ভাবছেন মল্লিকা কেমন বেহায়া, নয়? কথাটা বলেই আড়চোখে একবার সুজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলে ওর মুখের ভাবটা।

সুজিত বললে না, না, এতে বেহায়া ভাববার কি আছে?

—নেই! চেনা নেই, পরিচয় নেই, তার সঙ্গে—কথাটা শেষ না কোরে খিল-খিল করে হেসে উঠলো। হাসি থামিয়ে বললে,—হয়ত কোন দিনই আর আমাদের দেখা হবে না। কখনও এই পার্কে যখন এই রকম ছুপুরের সময় আসবেন আর ঐ বেঞ্চিটায় বসবেন তখন মনে হবে এক প্রগলভা মেয়ের কথা, যার পাল্লার পড়ে—

মল্লিকার কথা কানে যায়নি সুজিতের। মন ওর চলে গিয়েছিল আমবাগানে ঘেরা গ্রামের পোড়ো ভাঙা বাড়ীটার ভেতরে; যেখানে একটা এই রকম প্রগলভা মেয়ে কোন দিন ঘরে বেড়ালে মানাবে কি না?

—আর ভাবতে হবে না, চলুন আজ সিনেমায় যাওয়া যাক! ভাল বই হচ্ছে সিনেমাটায়।

—সিনেমা? প্রশ্ন করেই থেমে গেল সুজিত। তাদের এই নাটকীয় অভিযানে সিনেমাই ভাল। হয়ত তাদের মতই নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যাবে।

—কেন সিনেমা আপনার ভাল লাগে না বুঝি? আবার আব্দারের সুর মল্লিকার গলায়। আর ঘনিষ্ঠ হবার প্রয়াস। চলতে চলতে কয়েক বারই সুজিতকে ছুঁয়ে গিয়েছে তার পেলব তনু। সেটা নেহাতই পাশাপাশি চলার বেগে। তার বেশী কিছু নয়।

সিনেমা-হলের সুমুখে এলো তারা। রঙীন প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াচ্ছে মল্লিকার দল। কেউ জোড়া বেঁধে, কেউ দল বেঁধে। তাদের চার পাশে পুরুষ-মৌমাছির মত এক-আধজন ভক্ত। চার দিকে বিলাতি সেন্টের উগ্র উন্মাদনা। পুরুষের চোখে মোহ সৃষ্টি করার মত আবহাওয়া। এখানে নেই বেকারের সমস্যা, ছেঁড়া শাড়ীটার

বদলে ভাল শাড়ী একটা কেনার তাগিদ, নেই রেশন আনার টাকা জোগাড়ের কথা। এ এক স্বপ্নের রাজ্য যেন! এখানে কেবল খুশী আনন্দ তন্ময়তার আবেশ।

এদিক-ওদিক এক বার তাকিয়ে দেখে নিলো সুজিত। না চেনা-মুখ চোখে পড়ে না। তাদের সমুখেই একজোড়া দম্পতি টিকিট কিনে হলে ঢুকলো। বেজায় ভীড়। টিকিট পাওয়া মুস্কিল। ওরা বোধ হয় বক্সের যাত্রী।

নোটটা পকেট থেকে বার করলে সুজিত। তার পর মল্লিকার দিকে চেয়ে বললে—টিকিট পাওয়া যাবে তো?

—তাই তো! এই লম্বা লাইন দিয়ে—মল্লিকাকেও চিন্তিত দেখা গেল। হঠাৎ খুশীতে উদ্ভাসিত মুখখানা কেমন যেন কালো হোয়ে এলো।

—দাঁড়াই তো লাইনে, সুজিত এগিয়ে গেল লাইনের দিকে।

—না, আমায় দিন, বলেই সম্মতির অপেক্ষা না কোরে সুজিতের হাত থেকে নোটখানা একরকম কেড়ে নিয়ে কৌশলের সঙ্গে পাঁচ সিকার দু'খানা টিকিট কেটে আনলো মল্লিকা।

—সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, কি বলুন? মল্লিকা একটু তৃপ্তির হাসি দিয়ে সুজিতের কথার জবাব দিলো।

এবারে সুজিত চারি দিকে চেয়ে দেখলো। জয়ের গর্বে বুক ভরে এলো। পাশে ক্ষণেকের চেনা বান্ধবী। যাকে সে জয় করেছে যাকে সে পাশে বসিয়ে আড়াই ঘণ্টা হলের মধ্যে কাটাতে পারবে। যার জন্ম সে একক মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বার বার আশ‌্পাশ থেকে চ্যাংড়ার দল তাদের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকবে।

পাশাপাশি বসলো তারা। সত্যি ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে না এক বারও পাঁচটা টাকার কথা। চুনীর কথা। স্বপ্নের রাজ্য। নায়ক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে চাকরী পেয়েছে। লটারীর টিকিটে টাকা পেয়েছে আর পেয়েছে নায়িকাকে তার অন্নলক্ষ্মী হিসাবে। বহু দিনের দেখা স্বপ্ন তাদের সফল হয়েছে!

চাঁদনী রাত, পাশাপাশি তারা বসে। দেহে দেহ লাগিয়ে, মনে মন। তারা ছুঁয়ে আছে পরস্পরকে। কেউ তাদের সরাতে পারবে না।

সিনেমার নায়ক-নায়িকার রোমান্স আজ সুজিতও অনুভব করছে। আবেশে কোন সময় মল্লিকা তার হাতের ওপর হাত রেখেছে। তার উষ্ণ নরম স্পর্শ তার দেহে শিহরণ জাগিয়েছে। জীবনে এত আনন্দ আছে, এ তো সুজিত জানতে পারেনি। তাদের এই অভিনয় তো সিনেমা থেকে কোন অংশে কম নয়? এর শেষ পরিণতি কি সিনেমার নায়ক-নায়িকার মত তাদের বেলায়ও হবে? শুধাবে না কি মল্লিকাকে কানে কানে?

—মল্লিকা!

কই মল্লিকা? এই তো ছিল পাশে। কোথায় গেল? বোধ হয় বাইরে গিয়েছে, আসবে এখনই।

সিনেমা ভেঙে গেল। তবু মল্লিকা এলো না। কোথায় গেল! বাইরে বেরিয়ে এসে তন্ন-তন্ন করে খুঁজলো মল্লিকাকে। মল্লিকা নেই। কিন্তু মল্লিকার কাছে যে তার পাঁচ টাকার নোটটার ফেরৎ টাকা রয়েছে।

মল্লিকাকে সেদিন সুজিত আর খুঁজে পায়নি। অনেক দিন পরে হঠাৎ মল্লিকাকে দেখতে পেলো সুজিত। তারই মত এক জনের হাত ধরে সিনেমা-হলের দিকে চলেছে।

—শুনছেন?

ওরা থামলো না।

সুজিত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো। একবারে মল্লিকার যে পাশটা খালি ছিলো, সেই দিকে।

—শুনছেন?

মল্লিকারা থেমে পড়লো। তাকালো সুজিতের দিকে।

—আমায় বলছেন? মল্লিকার মুখে কোন ভাবান্তর নেই। ভ্রূটাও একটু কুঁচকে গেল না!

—হাঁ।

—আপনাকে তো চিনি না!

—চেনেন না? অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে রইলো সুজিত।

—না।

—ভুল করেছেন। মল্লিকার সঙ্গীটি মন্তব্য করলো। তার পর সুজিতকে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হো-হো করে হেসে উঠলো। সঙ্গে মল্লিকাও হেসে উঠলো খিল-খিল কোরে। যেমন কোরে পার্কে তার পাশে বেড়াবার সময় হেসেছিল। অবিকল সেই হাসি।

সুজিত জোর কোরে যেন চেঁচিয়ে বলতে গেল, আমার সেই পাঁচ টাকার ফেরৎ আড়াইটা টাকা? চেঁচিয়ে বলতে গেল এখনও চুনীর প্যান্ট কিনে দিতে পারিনি। প্যান্টের টাকা যে আপনার কাছে।

ততক্ষণে ওরা কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকে আড়চোখে এক বার সুজিতকে দেখলো মল্লিকা। বোধ হয় বুঝতে পারলো সুজিতের অবস্থাটা। সুজিতের কথার জবাবে বলতেও চাইলো, চুনীর প্যান্ট সে টাকায় না এলেও, পানির ইতিহাসের নোটটা কেনা হোয়েছে তাতে। পানি যে অনেক দিন থেকে মল্লিকাকে বলেছিল, 'দিদি, ইতিহাসের নোটটা আনিস, ওর দাম ইতিহাসের থেকে অনেক কম'। পুষ্টির অভাবে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে-যাওয়া মেয়েটার করুণ মুখখানার দাম কি চুনীর চেয়ে কম?

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল অভয় ডাক্তারের। আবছা আঁধার! কালো মস্ত চেহারা লোকটির। মুখ ঠিক দেখা যাচ্ছে না, দুষমণের মতো চেহারা। পা টিপে এগিয়ে আসছে—এগিয়ে আসছে বিছানার দিকে। একটা কিছু কুমতলব রয়েছে, মনে মনে অভয় অনুভব করছে সেটা। বিছানার পাশে এসে লোকটি দাঁড়ালো, চেয়ে দেখলো অভয়ের দিকে। অভয়ের মনে হল এ মুখ তার চেনা, কত বার যেন দেখেছে। কিছুতেই মনে করতে পারলো না। ইচ্ছে হল ছুটে পালায়,—পারলো না, নড়বার শক্তিও যেন লোপ পেয়েছে। ভ্রূকুটি ফুটে উঠলো লোকটির মুখে, মস্ত বড় লোমশ হাত বাড়ালো সে—গেঁটে বড় বড় আঙুলগুলো সাঁড়াশির মতো এগিয়ে আসছে! বাধা দেবার শক্তি নেই, অসহায় চোখে আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো অভয়। গলার উপর এসে একটু থামলো আঙুলগুলো, তার পর গলা টিপে ধরলো। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, সমস্ত শক্তি একত্র করে আঙুল ছাড়াবার চেষ্টা করলো সে, ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসলো বিছানায়।

বিশ্রী স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলো অভয় ডাক্তার। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গেছে, শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে গলা। আলো জ্বালিয়ে বিছানার পাশে চেয়ারে ঢাকা-দেওয়া গ্লাসের জল ঢক-ঢক করে পান করে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো সে।

দরজা খুলে বাইরের দাওয়ায় বেঞ্চির ওপর এসে অভয় ডাক্তার বসলো। ভাদ্র মাস, জলে ভরে উঠেছে নদী-নালা। গত ক'দিন বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম, জল থই-থই করছে মাঠে, হাওরে, ধানক্ষেতে। সন্ধ্যা পর্যন্ত গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি ঝরে বৃষ্টি থেমেছে। ভিজা ঘাস, ভিজা মাটি, ভিজা পাতায় চিক-চিক করছে আলো—চাঁদের আলোও মনে হচ্ছে ভিজা। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলো অভয়, কৃষ্ণা চতুর্থীর চাঁদ উঠে এসেছে প্রায় মাথার ওপর, চাঁদের গা ঘেঁসে লালচে জ্যোতির্মণ্ডল, হালকা সাদা মেঘ দ্রুত ছুটে চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। • জ্যোৎস্নাই শুধু ভিজা নয়, চাঁদও যেন স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে ঐ ক'দিনের বৃষ্টির ছাট লেগে।

ছপ-ছপাৎ—কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলো অভয় ডাক্তার! বহু দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসছে জলে দাঁড় পড়ার শব্দ। ছপ-ছপাৎ—ডিঙি বেয়ে কেউ হয়তো যাচ্ছে। ছোট নালা চলে গেছে অভয় ডাক্তারের বাড়ীর পাশ দিয়ে পশ্চিমের হাওরে। বর্ষাকালে কিছু বুঝবার উপায় নেই, সব জলে ভরে ওঠে—একাকার হয়ে যায়, দুস্তর হয়ে ওঠে গ্রামের এক বাড়ী থেকে আরেক বাড়ীর ব্যবধান। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত চাঁদের আলোয় স্বপ্ন দেখছে! অভয় ডাক্তার শুনতে লাগলো জলে দাঁড় পড়ার শব্দ, মনে হতে লাগলো একটা তাল আছে এ শব্দের। ক্রমে শব্দ এগিয়ে আসছে, ডাক্তারের মনে হল—এগিয়ে আসছে তার বাড়ীর পাশের নালা ধরে। জলের ওপর দিয়ে ভেসে-আসা বহু দূরের শব্দ—নালা যেখানে জলের ভেতর নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে গেছে।

ছেলেবেলা থেকে একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তিভরা সত্তা বয়ে ফিরছে অভয় ডাক্তার। এক নাম-না-জানা অস্বস্তি, আতঙ্ক কিংবা আর কিছু। থেকে থেকে দেহ কাঁটা দিয়ে ওঠে, ঢিপ-ঢিপ করতে থাকে বুক, দেহের ওপর দিয়ে বয়ে যায় এক শীতল প্রবাহ। তার চলাফেরা আর দশ জনের মতো নয়, একথা সে অনুভব করে এসেছে চিরদিন। তাই এড়িয়ে চলেছে সে সবার সঙ্গ। একটা আশা-আর আশংকার মাঝখানে যেন তার মন নিত্য দুলছে। অনুভব করছে সে ভয়ঙ্কর এক আবির্ভাবের প্রত্যাশা প্রতিনিয়ত তার দেহে-মনে। সে যা জানে না জানতে হবে তাকে সে কথা।

অভয় ডাক্তার বহু দিন শহরে কাটিয়েছে। গ্রামে বাড়ী ছিল, সে বাড়ীর চিহ্নও নেই আজ। মূলবাড়ী আজ ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা—সাপ-শেয়ালের আস্তানা। এখানে থেকে আজ তিন বছর ডাক্তারী করছে অভয়, মূলবাড়ীর বাইরে ঘর করে আছে সে। একখানা ঘরেই এক পাশে ডাক্তারখানা—আলমারির পর আলমারি ভরা ঔষধপত্রে, অপর পাশে তার শয়ন ঘর—এপাশ-ওপাশ টানা বড় বারান্দা সামনের দিকে। ডাক্তারী পাশ করে অভয় ডাক্তার তার পূর্বপুরুষের গ্রামে ফিরে এসেছে। ভালো ছাত্র ছিল সে, বন্ধুরা ভেবেছিল চাকরি করবে,—গ্রামে তাকে ফিরে যেতে দেখে অবাক হয়েছে তারা। গ্রামের লোকও সেদিন অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছে, অভয় ডাক্তারের কথা ভুলে গেছে তারা বহু দিন। এ বাড়ীতেই অভয় বলে একটি ছেলে ছিল, সেই ছেলেই যে অভয় ডাক্তার, এ-কথায় বিশ্বাস হয় না তাদের।

ছপ-ছপাৎ—ক্রমেই এগিয়ে আসছে জলে দাঁড় পড়ার শব্দ। অভয় ডাক্তারের বাড়ীর দিকেই আসছে যেন! হয়তো অভয় ডাক্তারের কাছেই আসছে। চাঁদের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে সাদা হালকা মেঘ দ্রুত,—দাওয়ায় বসে অভয় ডাক্তার সেদিকে চেয়ে দেখছে।

শহরের বাইরে লোকের দিন কাটছে সুখে-দুঃখে, জীবনযাত্রা ঢিলে,—দিনের পর দিনগুলি আসছে যাচ্ছে, খেয়ালই নেই লোকের। একটি দিন আরেকটি দিনের অনুবৃত্তি! প্রভাত হয়,—কাজকর্মে গল্পেগুজবে, নাওয়া-খাওয়ার দিন কেটে যায়, সন্ধ্যা আসে—ক্রমে ক্রমে রাত্রি গভীর হতে থাকে, গ্রামের বুকে আঁধার নামে, নিস্তব্ধ হয়ে ওঠে চার দিক, ঘুমিয়ে পড়ে গ্রাম। ঝিল্লির ঝিঁঝিঁ রবে আঁধার কাঁপে, রাত্রিচর পাখীর পাখা-ঝটপটানি আর পেচকের কর্কশ আওয়াজে মাঝে মাঝে আঁধার চিড় খায়। আবার প্রভাত আসে—এমনি পুরুষের পর পুরুষের চলে জীবনযাত্রা, বৈচিত্র্যহীন—বৈষম্য নেই একের সঙ্গে অন্যের বিন্দু মাত্র। অভ্যস্ত জীবনপ্রবাহ,—ছেলে যুবক হয়, বৃদ্ধ হয়, তার পর আসে তার ছেলে—জীবন জীবনের অনুবৃত্তি। শত্রুতা, হিংসা-দ্বেষ, ঝগড়া-ঝাঁটি, মামলা-মোকদ্দমা,—সবই আছে, যেমন চিরদিন ছিল—বৈচিত্র্য নেই মোটেই। কচিৎ-

কখনো বৈচিত্র্য আসে সে জীবনধারায়, দু'-চার বছর মনে রাখে লোকে, তার পর ভুলে যায়। গতানুগতিক জীবনযাত্রা চলতে থাকে।

অভয় ডাক্তারের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হলেও দেখে মনে হয়, ত্রিশের কম হবে না। লাল গায়ের রঙ, একহারা চেহারা, ছোট মুখে কালো তীক্ষ্ণ চোখ দু'টি কোটর-প্রবিষ্ট, চোখ দু'টির দৃষ্টি যেন ভেতর থেকে ঠিক্‌রে পড়ছে। মুখের ভাব রূঢ় গম্ভীর, হাসি বা কৌতুক যেন এ মুখের জন্যে নয়। কচিৎ অদ্ভুত হাসি ভেসে ওঠে সে-মুখে, অসম্ভব করুণ দেখায় সে-হাসি, মুখভাব কাঠিন্যের, তাতে করে কোন বেশী কম হয় না—হাসি ভাবতে রীতিমতো বাধে। অভয় ডাক্তার কথা বড় একটা বলে না, মেশে না কারও সঙ্গে,—রোগ আর ঔষধ ছাড়া কারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার। রাস্তায় চলতে অবাক হয়ে লোকে তার দিকে চেয়ে দেখে, কথা বলতে সাহস করে না।

আলো-আঁধারে মেশা সবুজ পাতার ছায়ায় ঘুমিয়ে-পড়া গ্রামের উপর দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে অভয় ডাক্তার। স্বপ্নের কথা ভুলে গেছে সে। কানে ভেসে আসছে জলে দাঁড় পড়ার শব্দ,—ছপ-ছপাং—বহু দূর থেকে ভেসে আসছে তা'। আকাশ থেকে—ওই হাল্‌কা ছুটে-চলা সাদা মেঘের ওপার থেকে যেন ভেসে আসছে সে শব্দ! একটা গোপন অর্থ আছে এ শব্দের!

একটি বিশেষ দিনের কথা মনে পড়লো অভয় ডাক্তারের। এমনি বর্ষা ছিল সেদিন, জলে ভরে উঠেছিল নদা-নালা।

চৌদ্দ বছর আগে দেখা বাবার মুখ মনে পড়লো তার। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে একটা শীতল প্রবাহ অনুভব করলো সে, কাঁটা দিয়ে উঠলো গা—লোমগুলি সব খাড়া হয়ে উঠলো। কোথায় গিয়েছিলেন তিনি, ফিরতে রাত হয়েছে সে-দিন, কত রাত মনে নেই অভয়ের। ছুটে এসে তিনি বাড়ী ঢুকলেন, অভয়কে বললেন,—পালিয়ে যা অভয়, এক্ষুণি পালিয়ে যা—যা দাঁড়াস নে, এখানে ফিরে আসিস নে আর! ডাকাত—ডাকাত পড়েছে!

তার পর ঘরের কোণে তুলে-রাখা প্রকাণ্ড খাঁড়া হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। কি তার কথায় ছিল, অভয় জানে না, কিন্তু তক্ষুণি ছুটে পালাতে হবে, এ কথা বুঝেছিল সে—বুঝতে পেরেছিল, এক মুহূর্তও সেখানে তার থাকা চলবে না আর। তার পর কোন্‌ দিকে সে ছুটছে, সে খেয়াল আর তার ছিল না। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সে, বহু লোকের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে! ফিরে তাকালো—আগুন—আগুন লেগেছে বাড়ীতে। অভয় ফিরলো,—দাঁড়িয়ে ভেবে নিল একটু, তার বাবার নিষেধ। সে মানতে পারলো না, বাড়ীর দিকে ছুটে চললো আবার। ফিরে এসে দেখলো, বাড়ী-ঘর-দোর সব জ্বলে গেছে, হল্লা করছে গ্রামবাসীরা চার দিকে জড়ো হয়ে। ডাকাত পড়েছিল, বাড়ী ঘেরাও করে আগুন লাগিয়েছে। গ্রামের কেউ ভয়ে বেরোয় নি, ডাকাতেরা চলে গেছে অনেকক্ষণ। তার বাবাকে আর খুঁজে পায় নি অভয়। কিছু দিন ধরেই যেন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এ ডাকাতির কথা, ব্যবস্থা করেছিলেন সব কিছুর।

বারো বছর বয়সে সেই যে অভয় বেরিয়ে গিয়েছিল ফিরে আসে নি, সে আর অনেক দিন। এ ক'বছর বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে তাকে, অতিক্রম করতে হয়েছে বহু বাধা, এখানে অবান্তর সে-সব কথা। ডাক্তারী পাশ করে তিন বছর আগে সে ফিরে এসেছে আবার গ্রামে। গ্রামের লোক তার কথা ভুলে গিয়েছিল, অবাক হয়েছে তারা, আবার তাকে ফিরে আসতে দেখে! মনে মনে হাসলো অভয়,—কি বুঝবে তারা, কেন সে আবার ফিরে এসেছে। এ তিন বছর বসে আছে এখানে সে কিসের প্রতীক্ষায়?

মাকে স্বপ্নে যেন সে দেখেছে, বাস্তব নয় সেটা। ছেলেবেলার কথা মনে নেই তার। থাকবে কি করে—বয়স তার মাত্র পাঁচ-ছ' বছর তখন। মাকে মনে করতে পারে না সে, হাতড়ে ফিরে—কোন এক কালে তিনি ছিলেন এ কথা মনে পড়ে শুধু, কল্পনায় একটা আবছায়া মূর্তি ধরা পড়ে, কোন মতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে না সেটা। খুব ভয় পেয়েছিল সে এক দিন, তার পর আর মনে নেই। এ ভয়ের সঙ্গে তার মার স্মৃতির কি যোগ, বুঝে উঠতে পারে না অভয় ডাক্তার। তার মায়ের স্মৃতি যেন এই ভয়ের স্মৃতির সঙ্গে মিশে আছে। তার মাকেও এক দিন ডাকাতেরাই না কি মেরে ফেলেছিল। তার বাবাকে সে দেখেছে, গ্রামের কারো সঙ্গে বড় একটা মিশতেন না, কেমন একা থাকতে ভালোবাসতেন। গ্রামের উত্তর সীমায় অভয় ডাক্তারদের বাড়ী, তাকেও বাড়ী থেকে বড় একটা বেরোতে দিতেন না তিনি। তখন এর কারণ না বুঝলেও আজ সব বুঝতে পারছে অভয় ডাক্তার—যতই বয়স হয়েছে ততই বুঝতে পেরেছে। মা-বাবা দু'জনেই পর পর ডাকাতের হাতে মরেছেন। একটা কিছু কারণ, একটা কিছু অর্থ থাকবেই এর! টাকা তার বাবার ছিল কিন্তু তার নাগাল ডাকাতেরা পায় নি—সেটাই একমাত্র কারণ হতে পারে না এ ডাকাতির।

কান পেতে এবার শুনলো ডাক্তার, শব্দ যেন দূরে চলে যাচ্ছে। বাতাস উল্টো বইছে! না, এদিকেই আসছে শব্দ,—বাতাস ফিরতেই এবার স্পষ্ট শুনতে পেলো সে—ছপ-ছপাৎ—মেঘ সরে যেতেই তরল জ্যোৎস্নার প্লাবন নামলো পৃথিবীতে ও শূন্যে, সদ্যঃস্নাতা শুভ্র শাড়ী-পরা পৃথিবীর দিকে চেয়ে বসে রইলো ডাক্তার।

সকালের কথা মনে পড়লো অভয়ের,—সেও যেন স্বপ্ন, সত্য নয়। কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখ দুটো আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো তার। অনেক কিছুই আজ বুঝতে পারছে সে।

আজ সকালবেলা, নৌকো নিয়ে লোক এসেছিল মীরপুর থেকে—ভোম্বলের অসুখ, যেতে হবে। লোকের হাতে আগাম টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে ভোম্বল। ভোম্বল শেখ মুসলমান, অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। কোন কালেই ছ' মাসের বেশী জেলের বাইরে থাকে নি সে। লোকে ভয় করে তাকে, জেল থেকে বেরিয়ে এলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। জেলে তাকে যেতেই হবে আবার,—তার নিজের কাজের জন্যেও বটে, লোকের জন্যেও বটে। বাইরে তাকে থাকতে দিতে রাজী নয় কেউ। কখন যে তার শনি-দৃষ্টি কার ওপর পড়বে বলা শক্ত, সর্বনাশ তার করবেই সে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ঘরে আগুন দেওয়া,—এ যেন তার এক কৌতুক। দারোগা, পুলিশ সবাই তাকে চেনে, বাইরে এলে ছ' মাসের ভেতর জেলে তাকে পুরবেই তারা। অসংখ্য কৌতুককর গল্প রয়েছে এই ভোম্বল আর তার স্ত্রীকে নিয়ে—সবই অভয় ডাক্তার শুনেছে। লোকের হাতে চুরি-ডাকাতি করতে গিয়ে কত বার ধরা পড়েছে ভোম্বল, মেরে হাড় গুঁড়ো করে দিয়েছে তার, মরে গেছে ভেবে ফেলে দিয়েছে লোকে, ওরা চলে যেতেই দিব্যি সে বেঁচে উঠেছে আবার।

পুলিশের লোকেও মনে মনে ভয় করে এই দাম্ভিক অপরাধীটিকে। এক বার আদালতে এক দারোগা ঠাট্টা করেছিলেন, জেল হওয়ায় বলেছিলেন,—ইঁদুরটাকে এবার খাঁচায় পুরেছি। শুনে সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বল উত্তর দিয়েছিল,—ছ'মাস অপেক্ষা করুন দারোগা সায়েব, ইঁদুর খাঁচা থেকে বেরোলে সে ভোম্বল শেখ একথা ভুলে যাবে না। ছ'মাস পরে বেরিয়ে গিয়ে এক দিন একা পেয়ে দারোগার কান কেটে দিয়েছিল ভোম্বল। ভোম্বলকে অভয় ডাক্তার কেন, সকলেই চেনে। মাস তিনেক জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে, বয়স হয়েছে—এবার মক্কায় যাবে ঠিক করেছে সে। অবশ্য কেউ তার একথায় বিশ্বাস করেনি। গত পাঁচ বছর যখনই ভোম্বল বাইরে থেকেছে, ঔষধ নেবার ছুতো করে মাঝে মাঝে এসেছে সে অভয়ের ডাক্তারখানায়। ঠাট্টা করে বলেছে,—ভোম্বলকে তুমি চেনো না ডাক্তার, এক দিন তোমার এই ডাক্তারখানা তুলে নিয়ে পশ্চিমের হাওরের মাঝখানে রেখে আসবো,—কিংবা—শুনছি তুমি ভয় করো না ডাক্তার, ভোম্বলের হাতে যেদিন পড়বে সেদিন কি অবস্থা তোমার হবে ভাবছি। অসম্ভব শোনায় না ভোম্বলের মুখে কোন কথাই, মনে করলে সে কি যে করতে পারে না বলা শক্ত। ঔষধ নেওয়াই যে উদ্দেশ্য নয় সেটা বুঝলেও কেন সে আসে, ডাক্তার ভেবে পায়নি। কাঁচা-পাকা চুল-দাড়ি, এই কালো শক্তিশালী লোকটার দিকে চেয়ে হেসেছে অভয়, বলেছে,—রোগ হবে, ডাক্তারের হাতে পড়বে, আর সেদিন এই ডাক্তার একটি খোঁচায় কি কাণ্ড যে করে বসবে সে কথাটাও ভেবে দেখো! ভোম্বলকে ভয়ানক বা খুব খারাপ কোন দিনই মনে হয়নি তার।

আজ সকালে অভয় ডাক্তার ভোম্বলকে দেখতে মীরপুর গিয়েছিল। ভোম্বলের অসুখ, দাওয়ায় মাদুর পেতে শুয়ে আছে সে, চার দিক ঘিরে আছে তাঁর বউ ছেলে-মেয়ে। ডাক্তারকে দেখেই চোখ দু'টো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো তার। বউ-ছেলে-মেয়ের দিকে চেয়ে বললো,—তোরা চলে যা, ডাক্তারের সঙ্গে কথা আছে আমার। পাশে রাখা ছোট এক জলচৌকি দেখিয়ে অভয়কে বললো,—বসো ডাক্তার! উঠে গেল সবাই, সেখানে রইলো শুধু অভয় আর ভোম্বল।

ডাক্তার ভোম্বলের পাশে বসে বিছানা থেকে ভোম্বলের ডান হাত তুলে নিল। হেসে হাত ছাড়িয়ে নিল ভোম্বল,—এ রোগ আমার আর ছাড়বে না ডাক্তার! চিকিৎসার জন্যে তোমাকে ডাকিনি, কথা আছে।

অভয় অবাক হল, কি কথা থাকতে পারে তার সঙ্গে ভোম্বলের? বললো,—বলো?

ভোম্বল এবার আর হাসলো না, বললো,—আমি জানি এবার আমি বাঁচবো না। একটা আগ্রহ নিয়ে তাকালো সে ডাক্তারের দিকে—জানো ডাক্তার, এই ভোম্বল কারো ঋণ রাখেনি। একটা ঋণ থেকে গেল, সেটা শোধ করবার আর সময় হল না।

ভোম্বল তাকে কেন এসব বলছে বুঝতে পারলো না অভয়। জিজ্ঞাসা করলো, কার কাছে?

এ কথার কোন জবাব দিল না ভোম্বল, জিজ্ঞাসা করলো,—তোমার মা-বাবাকে মনে পড়ে?

—মার কথা ঠিক মনে নেই, বাবার কথা মনে আছে।

—ডাকাত তাদের খুন করেছে—না?

মাথা নেড়ে অভয় বললো,—হ্যাঁ।

—কে সে ডাকাত শুনবে?

অভয়ের মনে হল নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার। রুদ্ধ কণ্ঠে বললো,—বলো।

—পঞ্চাননপুরের কুঞ্জ বাবুকে চেনো?

—জমিদার?

—হ্যাঁ, তোমার মা-বাবাকে সে হত্যা করেছে!

—অসম্ভব! জোরে বলে উঠলো অভয়। কুঞ্জ বাবুকে চেনে সে। তার চোখের সামনে এক অমায়িক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ছবি ভেসে উঠলো। মাথা নেড়ে অভয় বললো,—এ হতে পারে না!

কঠিন হাসি ভেসে উঠলো ভোম্বলের মুখে,—অসম্ভব নয় ডাক্তার! তোমার মা-বাবাকেই ও শুধু খুন করেনি, খুন করেছে আমার ভাই ডালিম সর্দারকেও। ডালিম আমার বড় ভাই, সে সময় এত বড় জোয়ান ছিল না এ তল্লাটে। কুঞ্জ বাবুকে আজ তুমি যা দেখছো চিরদিন ও তা ছিল না, সেকালের জমিদারদের তুমি জানো না ডাক্তার! খারাপ কাজ আমি অনেক করেছি কিন্তু সব মিলিয়েও ওদের একটা কাজের সমান হবে না। আমাকে অবিশ্বাস করছো? কতকগুলো মিছে কথা বলবার জন্যে ভোম্বল তোমাকে নিয়ে আসেনি। ভোম্বল মিছে বলসে—কি তুমি ভোম্বলের করতে পারো শুনি?

মরতে বসেছে তবু কি দম্ভ লোকটার! অভয় বললো,—বলো।

—বাঁচবো না তাই বলছি। আমার একটা কথায়ও অবিশ্বাস করো না। সে সময় জমিদারের বহু খারাপ কাজে সাহায্য করেছে ডালিম সর্দার। যেদিন তোমার মা মারা যান তোমার বাবা বাড়ী ছিলেন না সেদিন। রাত্রে ডাকাত পড়েছিল, কুঞ্জ বাবু নাকি নিজে উপস্থিত ছিল সেখানে। তোমার মা আত্মহত্যা করেছিলেন কি না বলতে পারবো না, তার লাস পাওয়া গেছে পরদিন।

একটু থামলো ভোম্বল শেখ। রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনে যাচ্ছে অভয় ডাক্তার, মনে হচ্ছে এ এক উপকথা—সত্য নয়। ভোম্বল আবার বলে চললো,—আমি আমার খেয়াল নিয়ে থাকতাম, ভেতরের কথা সব বলতে পারবো না। যে কারণেই হোক, মুখ ভার করে ডালিম চলে এলো এক দিন। কুঞ্জ বাবু খুব অপমান করে থাকবে। বাড়ী এসে ডালিম বললো,—দেখে নেবো আমি এই জমিদারের বাচ্চাকে। বলা যতো সহজ এদের দেখে নেওয়া তত সহজ নয়। তোমার বাবা খুব তেজী লোক ছিলেন, খাতির করতো তাঁকে সবাই। ডালিম সেদিনই তার সঙ্গে দেখা করলো, পরামর্শ করলো তোমার বাবার সঙ্গে। টের পেয়ে কুঞ্জ বাবু তোমার বাবা আর ডালিম দু'জনকেই খুন করেছে।

ভোম্বল থামলো। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অভয়। ঝকমক করে উঠলো ভোম্বলের চোখ দু'টি। বললো,—আমি পারলাম না, তুমি এর প্রতিশোধ নিয়ো ডাক্তার!

অভয়ের লাল দেহ আরো লাল হয়ে উঠেছে, দৃষ্টি ঠিকরে পড়ছে ভেতর থেকে। বললো,—নেবো। ভেবো না, এর এমন প্রতিশোধ নেবো আমি—কথা শেষ না করে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরলো অভয়। সেখানে আর অপেক্ষা না করে উঠে চলে এলো সে।
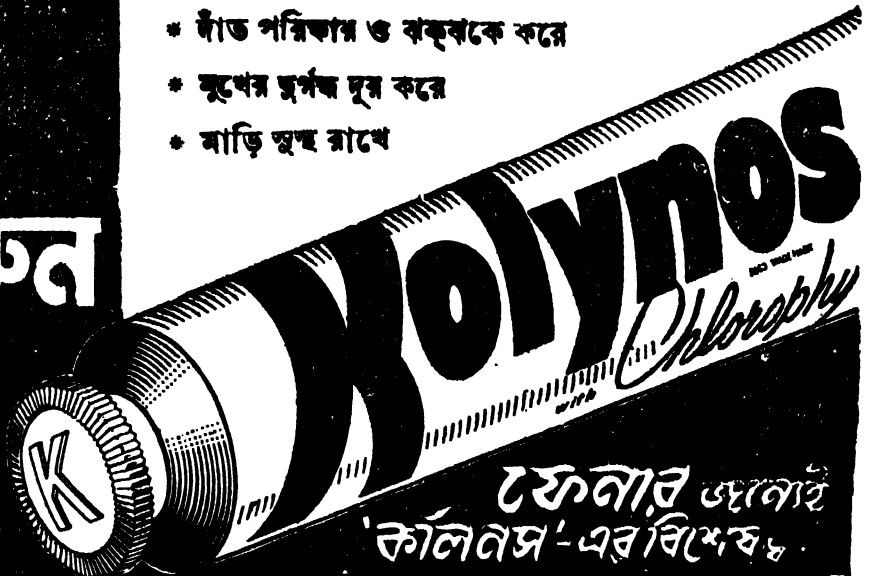
এত দিন যা বুঝতে পারেনি আজ তা সে বুঝতে পারছে।

'ছপ-ছপাং'—দাঁড়ের আওয়াজ হচ্ছে তার বাড়ীর পাশে, চোখ ফিরিয়ে সেদিকে চেয়ে দেখলো অভয় ডাক্তার।

ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে একটি লোক নামলো। মাঝি নামলো না, বড় নৌকা। কাদের নৌকা বুঝতে পারলো না অভয়। লোকটি নেমে তার বাড়ীর দিকেই আসছে। অভয় বুঝতে পারলো বাড়াবাড়ি অসুখ করেছে কারো, নইলে এতো রাত্রে তার কাছে লোক আসতো না।

লোকটি দাওয়ায় ডাক্তারকে বসে থাকতে দেখে অবাক হল। দাওয়ায় উঠে এলো সে, নমস্কার করে বললো,—পঞ্চাননপুরের জমিদারদের কর্মচারী আমি। কুঞ্জ বাবুর মেয়ের অসুখ, আপনাকে এক্ষুণি যেতে হবে। অভয়কে কুঞ্জ বাবুর চিঠি দিল সে।

অভয়ের মনে হল, এরি জন্যে যেন এতক্ষণ এখানে বসে সে অপেক্ষা করছিলো। মুখ তার কঠিন হয়ে উঠলো, জ্বলতে লাগলো চোখ দু'টো। দু'-এক কথায় কি হয়েছে জেনে নিল সে, বললো,—দাঁড়ান, এক্ষুণি আমি তৈরি হয়ে আসছি।

ঘরে গিয়ে অভয় দেখলো ঘড়িতে আড়াইটে বেজেছে। একটা হাত-ব্যাগে কতকগুলো ঔষধ পুরে নিল সে, একটা ঔষধ তৈরি করে নিল ইঞ্জেকসন দেবার জন্যে। তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কর্মচারীটিকে বললো,—চলুন।

পথে একটি কথাও বললো না অভয়। এতে আশ্চর্য্য হল না কেউ। সবাই জানে ডাক্তারের ধরণই এই। নৌকা চলেছে, ডাক্তার একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সামনের দিকে।

পঞ্চাননপুরে পৌছোতে পাঁচটা বেজে গেল। বাইরের ঘরেই কুঞ্জ বাবু বসে আছেন। তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে দেখলো অভয়। ডাক্তারকে তক্ষুণি ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন তিনি। বললেন, ফেরবার পথে এদিকে এসো ডাক্তার, কথা আছে।

মেয়েটি বিছানায় পড়ে আছে,—অচেতন নয়, ঝিমিয়ে-পড়া। জ্বরতপ্ত দেহ—রোগপাণ্ডুর মুখ। অভয় বুঝলো, বেশ কিছু দিন রোগে ভুগছে মেয়েটি। বয়স উনিশ-বিশের বেশী হবে বলে মনে হল না। মুখ শুকিয়ে উঠেছে—যেন একরাশ বাসী যুঁইফুল। ডাক্তারকে দেখে সরে দাঁড়ালো উৎকণ্ঠিত আত্মীয়া আর পরিচারিকার দল। একজন বিছানার পাশে এগিয়ে দিল একখানা চেয়ার। মেয়েটির মুখের দিকে আর তাকালো না অভয়। অত্যন্ত ধীরে সাবধানে পরীক্ষা করে দেখলো সে। হাতব্যাগ থেকে তার নাম ছাপানো কাগজ বের করে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলো,—নাম?

—রাজ্যেশ্বরী দেবী। কে এক জন উত্তর দিল।

—বয়স?

—বছর কুড়ি হবে।

সুন্দর পরিষ্কার অক্ষরে লিখে যেতে লাগলো অভয়। রোগের নাম, ঔষধের নাম সব পরিষ্কার করে লিখলো। একটা শিশিতে কয়েক দাগ ঔষধ দিল খাওয়াবার জন্যে। তৈরি করে নিয়ে আসা ঔষধ পুরলো ইঞ্জেকসনের নলিতে, তার পর সাবধানে রক্তবহা নাড়ী বের করে ইঞ্জেকসনের ছুঁচ বিঁধলো। যন্ত্রণাসূচক ক্ষীণ শব্দ করে আবার ঝিমিয়ে পড়লো মেয়েটি। এক অদ্ভুত রূঢ় হাসি ভেসে উঠলো ডাক্তারের মুখে। ইঞ্জেকসনের স্বচ্ছ নলির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সমস্ত ঔষধ ঠেলে দিল সে সেই নাড়ীর ভেতর। মেয়েটির দিকে আর তাকিয়ে দেখলো না সে, হাতব্যাগ তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে-ঘর থেকে।

বাইরের ঘরে গিয়ে কুঞ্জ বাবুর মুখোমুখি সে বসলো। কুঞ্জ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—কেমন দেখলেন?

ডাক্তার মাথা নেড়ে উত্তর দিল, যেন এক টুকরো কাঠ কথা বলছে,—ভালো নয়।

—কি রোগ?

—লিখে রেখে এসেছি।

—বাঁচবে?

—বলতে পারবো না। ইঞ্জেকসন একটা দিয়েছি, ঔষধও দিয়েছি। দরকার হলে বিকেল বেলা লোক পাঠাবেন।

একটু সময় চুপ করে রইলেন কুঞ্জ বাবু, চোখ-মুখ তাঁর করুণ হয়ে উঠলো। ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন,—এ আমার মেয়ের চেয়েও বেশী ডাক্তার, একে তুমি বাঁচাও। রমেশের ছেলে তুমি, রমেশ আমার বাল্যবন্ধু, তোমাকে বলছি,—আমার সর্বস্ব তোমাকে দেবো, একে বাঁচানো চাই।—ব্যগ্র দু'চোখ মেলে তিনি ডাক্তারের দিকে চেয়ে দেখলেন।

নির্বাক বসে আছে অভয়। দু'চোখ তার চিক-চিক করছে—ভাবাবেগের চিহ্নলেশহীন কঠিন মুখভাব আরো কঠিন হয়ে উঠেছে! স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে কুঞ্জ বাবুর দিকে।

অভয়ের সেই কঠিন মুখের ওপর চোখ রেখে কুঞ্জ বাবু বলে যেতে লাগলেন, তাঁরও মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে তখন। বললেন,—শোন ডাক্তার, নিঃসন্তান স্ত্রী মারা যাবার পর আমি আর বিয়ে করিনি: অথচ আশ্চর্য, রাজ্যেশ্বরী কি করে আমার মেয়ে হল, এ প্রশ্ন আজ পর্যন্ত কাউকে করতে দেখলাম না। ছ'মাসের রাজ্যেশ্বরীকে নিয়ে এসেছিলাম। এক দুর্যোগের রাতে ডাকাত পড়েছিল বাড়ীতে, বঁটি হাতে ছেলেমেয়েকে নিয়ে ছুটতে গিয়ে হোঁচট লেগে বঁটি বিঁধে যায়, মার বুক থেকে ছিটকে পড়ে ছ'মাসের শিশু মেয়ে। কুড়িয়ে এনে আজ বিশ বছর তাকে আমি মানুষ করেছি। শুধু তাই নয়, তার বাবা বুঝতে পেরেছিল মেয়ে বেঁচে আছে—তাকে হত্যা করেছি আমি।—মিনতিভরা কণ্ঠে কুঞ্জ বাবু এবার বললেন,—এ মেয়ে মারা গেলে আমি বাঁচবো না। একে বাঁচাতেই হবে ডাক্তার। তুমি একে বাঁচাও। মরে যাবো আমি, এ আমি সহ্য করতে পারবো না।

অভয় ডাক্তারের মুখভাবে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না, তেমনি নির্বাক বসে আছে সে। কালো চোখের গভীর দৃষ্টি কুঞ্জ বাবুকে বিঁধছে।

কুঞ্জ বাবু শেষ চেষ্টা করলেন,—একে বাঁচাতেই হবে। রমেশের মেয়ে এ, তোমার বোন।

চমকে উঠলো অভয় ডাক্তার। দেখতে দেখতে লাল মুখ তার সাদা হয়ে উঠলো। উঠে দাঁড়ালো সে, মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে বললো,—আগে জানলে হয়তো বাঁচাতে পারতাম, এ সর্বনাশ হতো না। সময় নেই—আমি যাই।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অভয় ডাক্তার। কি জানলে আর কতো আগে জানলে, সে কথা ঠিক বোঝা গেল না!

সেদিনই গ্রাম ছেড়ে চলে গেল অভয় ডাক্তার। সৈন্য বিভাগের বড় চাকরি পেয়েছে সে।

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই হার্মোনিয়াম!

মিতার মা হার্মোনিয়ামটা কিনেছিলো শখ করে—মেয়েকে গান শেখাবে বলে। জনশ্রুতি আছে—মিতার মা নিজেরই না কি গানবাজনার খুব শখ ছিলো প্রথম বয়েসে—তা সে শখ আর মেটাবার সুযোগ হয়নি। বিয়ে হয়েছিলো নেহাৎ অল্প বয়সে—তার পর শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণ করবার পর থেকে সে পাট চুকে যায় একেবারে। একে তো শ্বশুরবাড়ির সবাই ভীষণ গোঁড়া, তায় যে খাণ্ডার শাশুড়ীর পাল্লায় পড়তে হয়েছিলো, তাতে প্রাণের সবখানি গানের সুর চোখের জল হয়ে বেরোতো। সুতরাং—

তার পর শ্বশুর-শাশুড়ী মরবার পর কলকাতায় এসে যখন নিজের ঘর-সংসার পাতলো মিতার মা, তখন আর বয়েস নেই—মিতা-ই তখন চোদ্দ বছরেরটি। তবু তাতেও দমে না গিয়ে নিজে স্বামীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে একটা উৎকৃষ্ট হার্মোনিয়াম কিনে আনলো মেয়ের জন্যে। নিজের জীবনের অপূর্ণ সাধ মেয়ের মধ্যে দিয়ে যদি সার্থক করে তুলতে পারে।

মিতাকে গান শেখাবার জন্যে সপ্তাহে তিন দিন করে মাষ্টার আসতো—আর তিন ঘণ্টা ধরে শিল্পী হবার পবিত্রাহি প্রয়াসে পাশের বাড়িগুলির মাথা ধরিয়ে ছাড়তো মিতা। তবু তার মা অটল আশা অসীম ধৈর্য আর অধ্যবসায় নিয়ে সেই তিন ঘণ্টা ঠায় বসে থাকতো মেয়ের পাশে। মেয়ের চেয়ে মায়ের সাধনার একাগ্রতাই যেন বেশি। তবে শুধু মিতার মা-ই নয়, আরেক জন একাগ্র শ্রোতাও সমান অধ্যবসায়ের সঙ্গে মিতার পাশে বসে থাকতো সারাক্ষণ। সে আমাদের খুকু।

খুকুর বয়স তখন নয় কি দশ। দিব্যি শান্ত-শিষ্ট লক্ষ্মী মেয়েটি, ছোটবেলা থেকেই ওর গানের দিকে ভীষণ ঝোঁক—একেবারে ছোট্ট বয়েসে যখন আর সব বাচ্চারা চুষিকাঠি নিয়ে খেলা করে, তখনই কোথাও রেডিও রেকর্ড বাজলেই ও কান খাড়া করে চুপচাপ শুনতো। দেখে-শুনে ওর বাপ বলতেন—মেয়েটার গানের দিকে টান আছে, একটু বড়ো হলেই ওকে গানের স্কুলে ভর্তি করে দেবো। মা মুখঝামটা দিয়ে বলতেন—হ্যাঁ, রেখে দাও তোমার সোহাগের কথা! যার বাপ দেড়শো টাকার কেরাণী আর দেড় ডজন যার পুষ্যি—তার মেয়ে নাচগান যা শিখবে তা জানাই আছে—তা সে স্বয়ং উর্বশী এসে তোমার মেয়ে হয়ে জন্মালেও।

কথাটা সত্যিই। খুকুর বাবা সদাগরী আপিসের কেরাণী—বিদেশী মালিকের মুনাফার হিসেব কষে কষে চুল পাকিয়ে ফেললেন—কিন্তু তার দক্ষিণা বিশ বছরে দেড়শো টাকায় পৌঁছেচে। খুকু তাঁর তৃতীয় সন্তান—তার পরেও আছে আর চারটি। তার পর আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিগোষ্ঠী মিলিয়ে পরিবারের আয়তন দেড় ডজনই বটে প্রায়।

সুতরাং খুকুর যতই সহজাত সঙ্গীতপ্রীতি থাক্, তার বিকাশ আর পরিপোষণ যে কতটুকু হবে—তা খুকুর মার কথায় অক্ষরে অক্ষরে ফলতে সুরু করলো। খুকুর বয়স হলো গান শিখবার—এবং তা ছাড়িয়েও চললো ক্রমে—কিন্তু খুকুর বাপের আর টাকা জুটলো না মেয়েকে একটা যেমন-তেমন হার্মোনিয়াম কিনে দেবার—তা আবার তাকে গানের স্কুলে দেওয়া কি গানের মাষ্টার রাখা—সে তো দূরের কথা!

তাই খুকুর আমাদের গতি হলো ঐ পাশের বাড়িতে। যে তিন দিন মাষ্টার আসতো মিতাকে গান শেখাতে—খুকু নিয়মিত হাজিরা দিতো ঠিক। সে সময়ে কোনো কিছুতেই তাকে আর বাড়িতে কেউ ধরে রাখতে পারতো না—এমন কি, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবার লোভ দেখালেও কাজ হতো না। এই তিন ঘণ্টা ধরে ঠায় বসে ঐ প্রাণান্তকর চেঁচামেচি শুনতো কি করে ঐটুকু মেয়ে! তাই ভেবে অবাক হবার কথা। তার পর রুমালে মুখ মুছতে মুছতে মাষ্টার যখন বিদায় নিতো, তখন খুকু বাড়ি ফিরতো মুখ আঁধার করে।

একদিন রোব্‌বার দুপুরে খুকু পড়া করছিলো বাবার কাছে বসে। এক জায়গায় ছিলো Reba sings well—খুকুর পড়া সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেলো। বাবা চোখ বুজে শুয়েছিলেন, জিগ্যেস করলেন—কি হলো খুকু? খুকু বই বন্ধ করে রেখে বাবার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তার পর খানিকক্ষণ পরে আবদারের সুরে বললো—একটা কথা বলবো বাবা?

বাবা চোখ মেললেন—এতক্ষণ নিশ্চিন্তে মেয়ের সেবাটুকু উপভোগ করছিলেন। বললেন—কী, মা?

—মিতার মাষ্টারমশাই কী বলেছেন, জানো বাবা? বলেছেন, আমাকেও মিতার সঙ্গে সঙ্গে গান শেখাবেন—অমনি, পয়সা লাগবে না। মিতার মা-ও বলেছেন তাই—তুই এসে মিতার সঙ্গেই গান শিখবি। তোর বাবাকে বলিস একটা হার্মোনিয়াম কিনে দিতে বাড়ীতে অভ্যাস করার জন্যে—তা নইলে তো গান শেখা যায় না। আচ্ছা বাবা, একটা হার্মোনিয়ামের দাম কত? মিতার চেয়েও যদি ছোট্ট আর খারাপ হয়?

তার পর বাবার গলা জড়িয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো—জানো বাবা, আমি এক পয়সা এক পয়সা করে সাড়ে তিন টাকা জমিয়েছি আমার ফুটো বাক্সের মধ্যে—সেদিন গুণে দেখলাম! সে-সব টাকা তোমায় দিয়ে দেবো'খন বাবা! আর তার'বেশি যা লাগে তুমি দিয়ো'খন—তাহলে একটা হার্মোনিয়াম হবে না, বাবা? মিতারটার চেয়ে ছোট্ট হলেও হবে—তুমি দেখো।

খুকুর বাপ স্তব্ধনেত্রে খানিকক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখ ছলছলিয়ে এলো তাঁর। দু'হাত বাড়িয়ে আদরের মেয়েকে বুকে টেনে নিলেন। তার পর ভারী গলায় বললেন—হবে বৈ কি মা, খুব হবে! তোমার সাড়ে তিন টাকা দিতে হবে না,

হার্মোনিয়াম তোর আমিই কিনে দেব, একটু সবুর কর মা—পুজোর বোনাসটা যদি পুরো পাই, আর সব খরচ ফেলে তোর হার্মোনিয়াম আমি আগে কিনবো মা!

খুকু আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললো—পুজোর সময় দেবে বাবা? সেই ভালো। আমি আর এবার পুজোয় জামাকাপড় কিছুই চাইবো না বাবা, তুমি দেখো।

আমি খুকুর বেকার মামা। বি-এ, পাশ করে কলকাতায় এসে চাকরির চেষ্টা করছি বছর খানেক—দিদির আশ্রয়ে। বাড়ীতে এক বাবা ছাড়া আমার কাছেই কখনো সখনো খুকু তার মনের কথা খুলে বলে। ওর হার্মোনিয়ামের শখ আমারও অজানা নয়। ইচ্ছে করতো—একটা হার্মোনিয়াম কিনে দেবো ওকে—দিদির আশ্রয়ে আছি এত দিন। কিন্তু রোজগার বলতে তো একটা টিউশনি—পনেরো টাকার—তার থেকে দশ টাকা দিদির হাতেই তুলে দিই—মাসের শেষে আবার দিদির কাছেই হাত পাততে হয়—দু'-চার পয়সার জন্যে। একটা যেমন-তেমন হার্মোনিয়ামের দামও শ'খানেক টাকার কাছাকাছি। যদি কখনো চাকরি পাই—তখন ভাববার কথা। কিন্তু তখন কি আর ভাববার সময়ও থাকবে!

বাপে-মেয়েতে যে সময়ে ঐ কথা হচ্ছিলো—আমিও ঘরের কোণে উপস্থিত ছিলাম নিদ্রিতের ভাণ করে। সব শুনলাম। তার পর বাপ ঘুমিয়ে পড়লে মেয়ে যখন বইখাতা গুটিয়ে উঠে যাচ্ছিলো—আমায় জেগে থাকতে দেখে চুপচাপ আমার পাশে এসে বসলো। কিছুক্ষণ এটা-সেটা নাড়াচাড়া করে শেষে বিনা ভূমিকাতেই বলে ফেললো—আচ্ছা মামা, একটা হার্মোনিয়ামের দাম কত?

বুঝলাম, ও ছাড়া ওর মাথায় চিন্তাই নেই আর। হেসে বললাম—কত হবে আর! টাকা পাঁচ-সাত বোধ হয়—ঠিক জানি না। তবে সেগুলো বিশেষ ভালো নয়!

খুকু বাধা দিয়ে বললো—তা হোক্‌গে, বাজবে তো? তা হলেই হলো।

আমি দেখলাম—দাম বলে ফেলে বিপদ বাড়িয়েছি। হয়তো কোন দিন আমার পয়সার এক বোঝা নিয়ে এসে হাজির করবে চুপি-চুপি—এই নাও মামা, পাঁচ টাকা যোগাড় করেছি। এবার কিনে এনে দাও—তা হলেই তো গেছি।

সুতরাং তাড়াতাড়ি করে বললাম—কিছু ভেবো না খুকু! তোমার বাবা যখন পুজোর সময় কিনে দেবেন বলেছেন—তখন ভালো হার্মোনিয়াম আসবে বিলেত থেকে—মিতারটার চেয়েও ভালো।

খুকু আর কিছু না বলে গম্ভীর মুখে উঠে গেলো।

পুজো এলো, যথাসময়ে খুকুর বাবা বোনাসও পেলেন। কিন্তু তার অর্ধেকের বেশিই গেলো সহকর্মীদের কাছে সারা বছরের দেনা শোধ করতে। আর বাকি যা রইলো, তাতে একটা হার্মোনিয়াম যদিও বা হতো—কিন্তু খুকু বাদেও আরো তো ছেলেমেয়ে আত্মীয়-পরিজন রয়েছে—তাদের কথাও ভাবতে হয় তো পুজোর সময়! আর তা ছাড়া, কোনো এক অলস মধ্যাহ্নের তন্দ্রামগ্ন ক্ষণে ছোট্ট মেয়ের কাছে কী অঙ্গীকার করা হয়েছে—তা মনে রাখলে সদাগরী আপিসের কেরাণীর চলে না। অঙ্গীকার পূর্ণ করার উপায় নেই বলেই বেশি করে অঙ্গীকার ভুলতে হয়। সুতরাং খুকুর হার্মোনিয়াম আর হলো না।

খুকুও কিন্তু তা নিয়ে আর কোনো দিন একটা কথাও বলেনি কারো সঙ্গেই। বাপ-মাও এক দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তা দেখে। গরীবের ঘরে ও-সব শখ না থাকাই ভালো। শুধু আমি মাঝে মাঝে খুকুর চোখের দিকে যখন চেয়ে দেখেছি—ওর চোখের তারাটা অত্যধিক রকমের কালো মনে হতো—ওর বয়সের তুলনায়।

* * * *

মায়ের দয়া হয়ে সাত দিন রোগে ভুগে হঠাৎ মারা গেলো মিতা। শোক সামলে উঠে মিতার মা ঠিক করলেন—জায়গা বদলাবেন। জিনিষ-পত্র বাঁধাছাঁদা করে গাড়ীতে তুলে দিয়ে পাড়ার সবার বাড়ীতে দেখা করতে গেলেন। খুকুদের বাড়ীতে যখন এলেন—পিছনে চাকর একটা বাক্স মাথায় করে ঢুকলো।

হার্মোনিয়ামের মাধ্যমে মিতা তথা মিতার মার সঙ্গে খুকুর খুব হৃদ্যতা জমে গিয়েছিলো। মিতা হঠাৎ মারা যাওয়ায় খুকুও কম শোক পায়নি। তার উপর স্নেহপরায়ণা মিতার মা-ও চলে যাচ্ছেন আজ। তাই খুকু পাড়ার আর সব ছেলেমেয়েদের মতো মাল-বোঝাই গাড়ীর চার-পাশে ভীড় করে দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরের এক অন্ধকার কোণে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো।

মিতার মা এসে বললেন—চললাম দিদি! দুর্ভাগ্য নিয়েই এসেছিলাম, দুর্ভাগ্য বয়েই বিদায় নিচ্ছি। কিন্তু কৈ, খুকুকে দেখছি না যে? তাকে ডাকুন।

খুকু এলে তার হাত ধরে মিতার মা বললেন—মিতার হার্মোনিয়ামটি আমি খুকুকে দিয়ে যাচ্ছি দিদি! যোগ্য পাত্রেই পড়বে—মিতার আত্মা শান্তি পাবে। নিজের অপূর্ণ সাধ মেয়ের মধ্যে দিয়ে মেটাবো বলে কিনেছিলাম ওটা। তা সে স্বপ্ন সফল হলো না, মিতা চলে গেলো। অবিশ্যি বেঁচে থাকলেও স্বপ্ন আমার কতটুকু সার্থক হতো জানিনে। তাই আজ ওর হাতে তুলে দিলাম হার্মোনিয়ামটা। ওর স্বপ্ন যদি সার্থক হয় তবে আমার স্বপ্নও সার্থক হবে—এই আশা রইলো।

মিতার মার চোখে দু'ফোঁটা জল ঝিক্‌মকিয়ে উঠলো। খুকুর মা'রও। কেবল খুকু নিষ্পলক নেত্রে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো হার্মোনিয়ামটার দিকে।

হার্মোনিয়াম পেলো খুকু—কিন্তু গান শেখা আর হলো না।

বাব-মার দুঃখ ছিল মেয়ের একটা শখ মেটাতে পারছেন না বলে। সেটা যখন মিটেই গেছে ভাগ্যক্রমে, তখন অন্যগুলোর প্রতি আর চিন্তা কী! আর তা ছাড়া দিতে চাইলেই বা দেবার উপায় হচ্ছে কী করে! সুতরাং খুকুর গানের মাষ্টারও জুটলো না, গানের স্কুলে ভর্তিও আর হয়ে উঠলো না।

আর নিজে যে চেষ্টা করবে, তারই কি যো আছে একটু! বাড়িতে চারখানা যদি বা ঘর তো চার চারে ষোলো জন লোক—হার্মোনিয়াম বাজাতে বসবার এক তিল ফাঁক কোথাও কি মেলে! তার উপর ছোটো ভাই-বোন বড়ভাইদের হাত থেকে হার্মোনিয়ামটাকে সব সময় ডালা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়, যক্ষের ধনের মতো আগলে বেড়াতে হয়। তার জন্যে অত্যাচারও জোটে কম নয়, তবু সে নির্বিবাদে সহ্য করে সব-কিছু।

মাঝে মাঝে কোনো সন্ধ্যাবেলা—যখন ছেলেমেয়েরা খেলে ফেরেনি, বড়রা তখনো আপিসের পথে, মাসিপিসিরা পাড়া বেড়াতে গেছে—সেই ফাঁকে হয়তো হার্মোনিয়ামটাকে সন্তর্পণে বাক্স থেকে বার করে বাজাতে বসে খুকু। তাও কি নিশ্চিন্ত হবার যো আছে একটু? হয়তো মা সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দেন—ওই! মেয়ে গলা সাধতে বসেছেন! ওরে ও খুকু, ভাইটাকে একটু ধর না বাপু—এই এখুনি সব এসে পড়বে আপিস থেকে—এদিকে চা-জলখাবারও হলো না। আর একটু যে কাজে সাহায্য করবে—তা কেন—দিন-রাত ঐ নিয়েই আছে!—ধিঙ্গি মেয়ে হয়েছো কি করতে? মাকে সংসারের কাজে একটু সাহায্য করতেও শিখলে না? জন্মেছো গরীবের ঘরে—ওসব বিবিয়ানার সাধ কেন বাপু!

একটানা গজর গজর করে চলে মা। সেদিকে কান না দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে সঙ্গীত-সাধনা করবার মতন মনের অবস্থা তখন আর থাকে না। আর সত্যিই তো, মা একলা মানুষ, কত আর পারে! হার্মোনিয়ামটাকে বাক্সবন্দী করে আবার উঠতে হয় খুকুকে।

হার্মোনিয়াম হলো—কিন্তু খুকুর গান শেখা আর হলো না।

* * *

তার পর সাত আট বছর কেটে গেছে। খুকু এখন সতেরো বছরের তরুণী—কলেজে পড়ে। নিজে একটা টিউশনি করে পড়ার খরচ চালায়। খুকুর বাবার রিটায়ার করবার সময় এসে গেছে। আয় কিঞ্চিৎ বেড়েছে কিন্তু তার তুলনায় অনেক বেশি বেড়েছে সংসারের পরিধি আর জীবনযাত্রার ব্যয়-মাত্রা। দাদা একটা নামমাত্র চাকরি করে। আর মেজদা' আই, এ, ফেল করে চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

হার্মোনিয়ামটা বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে এখনো খাটের তলায় এক কোণে, খুকু মাঝে-মাঝে ধুলো ঝাড়বার অছিলায় বার করে দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ছলছলিয়ে ওঠে তার চোখ।

এমন সময়ে খুকুর ছোট ভাইটার অসুখ হলো—মারাত্মক রকম। ডাক্তার বললেন—প্যারাটাইফয়েড। সিরিয়াস টার্ণ নিয়েছে—ক্লোরোমাইসেটিন দিতে হবে ইমিজিয়েটলি—ফুল কোর্স। নইলে—

ওষুধটা তখন নতুন বেরিয়েছে—চারটে কোর্সের দাম আটষট্টি টাকা। বাবা শুনেই মাথায় হাত দিয়ে বসলেন—অতো টাকা এখন কোথায় পাবো—মাসের শেষ! ধারও যে কারো কাছে পাবো—সে আশা নেই। বন্ধু-বান্ধবরা সবাই কিছু না কিছু পারে—তার উপর এই দুর্মূল্যের বাজার, সবারই অবস্থা সমান। কি করি!

মা কেঁদে বললেন—আমার যা দু'-একগাছি চুড়ি ছিলো তা তো বহুকাল আগেই খেয়েছো—শাঁখা আর নোয়া ছাড়া তো অঙ্গে সোনার দানাও নেই! এখন বাছাকে আমার বাঁচাই কি করে?

আমি তখনো আছি ঐ পরিবারে। মাঝে একটা চাকরি করতাম, মাস দুই হলো আবার বেকার বসে আছি, ছাঁটাই করে দিয়েছে।

অফিস যাবার সময় খুকুর বাবা বললেন—দেখি, যদি পারি যোগাড় করতে—

খুকু সেদিন আর কলেজে গেলো না। বসে রইলো ভাইয়ের শিয়রে পাথরের মূর্তির মতন। সন্ধ্যে সাতটার সময় বাবা ফিরলেন শুকনো মুখে। নাঃ, কোথাও হলো না!

মা কেঁদে উঠলেন। ওগো, কী হবে তবে? ডাক্তার যে বলে গেছে আজকের মধ্যে ওষুধ দেয়া চাই—

খুকু চুপচাপ সরে গেলো সেখান থেকে। আধ ঘণ্টাখানেক পরে খুকু নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো রুগ্ন ভাইয়ের শিয়রের কাছে। মা বসে পাখা করছিলেন। এতক্ষণ স্তব্ধ চোখে পাখা নাড়ার দিকে চেয়ে থেকে তার পর ডান হাতটা বাড়িয়ে খুকু বললো মৃদু অকম্প্র স্বরে—এই নাও মা, টাকা, ওষুধ আনতে পাঠাও কাউকে—

মা চমকে উঠে ওর দিকে তাকালেন। তাঁর এক চোখে আলো, আরেক চোখে অন্ধকার বালসে উঠলো। খানিকক্ষণ স্তম্ভিত মুখে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তার পর ভয়ে ভয়ে অস্পষ্ট গলায় বললেন—টাকা! টাকা তুই কোথায় পেলি?

তার পর মৃদু অথচ অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলো খুকু—হার্মোনিয়ামটা বাঁধা দিয়ে এলাম সত্তর টাকায়। মিত্তিরদের মীরা একটা হার্মোনিয়াম কিনবো কিনবো করছিলো অনেক দিন থেকে—সেকেণ্ডহ্যাণ্ড, অল্প টাকার মধ্যে। তাকেই দিয়ে এলাম। মেয়েটার গানে দরদ আছে—যত্নে রাখবে জিনিসটা। কিন্তু তুমি আর দেরি কোরো না, ওষুধ আনতে পাঠাও ডাক্তার বাবুর কাছে।

খুকুর মার চোখ ছলছলিয়ে উঠলো। ধরাগলায় বললেন—হার্মোনিয়ামটা বাঁধা দিয়ে টাকা আনলি তুই? মিতার মার শেষ সাধের জিনিষ! ও কি আর কোনো দিন ছাড়াতে পারবি তুই? এই অভাবের সংসারে?

এতক্ষণ অতি কষ্টে নিজেকে চেপে রেখেছিলো খুকু। এবার আর পারলো না। তার মিশ-কালো দু'চোখ ছাপিয়ে ঝর-ঝর করে জল ঝরে পড়লো। কান্না-ভেজা কণ্ঠে বললো—না মা, কী দরকার আর ছাড়িয়ে! ও অভিশপ্ত হার্মোনিয়াম!

বারান্দায় বসে শুনছিলাম আমি সব কথা। খুকুর কথার উত্তরে আমি মনে মনে বললাম—না খুকু, ও হার্মোনিয়াম অভিশপ্ত নয়! অভিশপ্ত আমাদের জীবন—এই হতভাগ্য মধ্যবিত্তের জীবন। আর অভিশপ্ত—তাদের মানুষের মত বাঁচবার সাধ-আহ্লাদ! 'মানুষ' হয়ে উঠবার আশা-আকাঙ্ক্ষা!
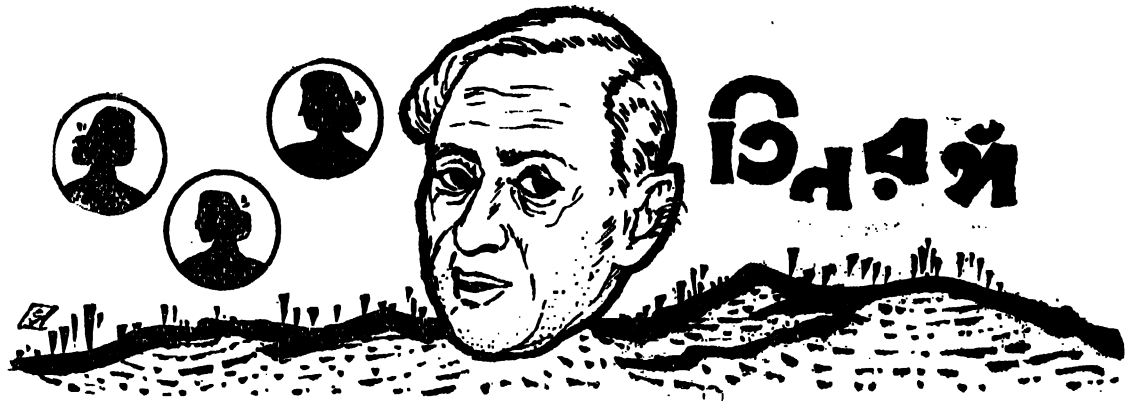
মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়

ডিসেম্বরের কড়া শীতের মধ্যে সুমথর ফিয়েট গাড়ীটা যখন ডায়না নদীর শুকনো খাত পেরিয়ে যাচ্ছিল তখন প্রায় সন্ধ্যে হব-হব। শীতের সন্ধ্যে পাঁচটা বাজতে না বাজতে এসে পড়ে। ধূলো উড়িয়ে চলেছে সুমথ। অনেকক্ষণ আমরা চুপ করে বসে আছি। বেশ হিমেল হাওয়া তীরের মত ঢুকছে ভেতরে। আমি ওভারকোটের কলারটা তুলে কানে ঢাকা দিয়ে বসলাম। মনে মনে নানা রকম এলোমেলো ভাবনা আসছে। সেটাতে মৌতাত জমানর জন্যে একটা সিগ্রেট ধরালাম। সুমথকেও একটা ধরিয়ে দিতে হল। এবার বেশ এক পাশে হেলে বসে জানলা দিয়ে হাতের কনুই বের করে দিয়ে হাতের চেটোটা গালের উপর রেখে মৌতাত করে বসেছি। হঠাৎ অনেকক্ষণ পর সুমথ কথা বলল, এই যে কাঁচা পথটা দেখছিস, বর্ষার সময় এটা থাকে না, এটা টেম্পরারি পথ। তোর ভাগ্যটা যদি ভাল থাকে, তবে ফেরার দিন হরিণ দেখতে পাবি।

তাই না কি? উৎসুক হয়ে বললাম, বোধ হয় জঙ্গল থেকে আসে ; এটা ত নদীর শুকনো খাত বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস, এটা ডায়না নদীর খাত, বর্ষার সময় কি যে চেহারা হয়, কল্পনা করা যায় না এখন। যে জঙ্গলটা আমরা পেরিয়ে এলাম মনে আছে ত'?

সুমথর শেষের কথার জবাবে বললাম, হ্যাঁ নিশ্চয়। ওখানে বুঝি বাঘ-টাঘ সব আছে?

বাঘ আছে, গণ্ডার আছে, হাতী আছে। ফেরার দিন রাতে ফিরব, চোখে পড়তে পারে ; তবে কি জানিস, আজ-কাল এত ট্রাফিক চলে যে, পেট্রোল ডিজেলের গন্ধ ওরা সহ্য করতে না পেরে রাস্তা থেকে অনেক দূরে থাকে।

এ সব রাস্তায় রাত-বিরেতে চলায় বেশ একটা থ্রিলিং আছে, আমি বললাম। সুমথ সে কথার স্বীকৃতি জানিয়েও আক্ষেপের সুরে বলল, তবে দশ-পনেরো বছর আগেও যে রকম ছিল আজ-কাল তার শতাংশের একাংশও নেই।

আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছি খুব মনোযোগ দিয়ে নয় অবিশ্যি, তবে মন্দ লাগছে না। এখান থেকে ভুটানের দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল, উত্তর দিকে যে নীল পাহাড়গুলোয় দৃষ্টি ঠেকে যাচ্ছে ঐখান থেকেই ভুটানের আরম্ভ। সুমথ বলে যাচ্ছে, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে ষ্টিয়ারিং-এ হাত রেখে। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে, ফিয়েটের হেড লাইট জ্বেলে দিয়ে আমরা লালমাটি বাগানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আর বেশি দূর নয় বোধ করি। ডায়না পার হয়ে এসেছি, আর একটা ছোট নদীর ব্রিজের উপর দিয়ে চলে এলাম। বহু দিন আগের তৈরী ব্রিজটা আজও ঠিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এ ব্রিজের আকারটা অনেকটা গাড়োয়াল ডিষ্ট্রিক্টের বহু পুরোনো ঝুলন্ত ব্রিজের ধরণের। দু' পাশে চা-বাগান। সমান করে ছাঁটা চা-গাছগুলো, মাঝখানে সোজা পিচের রাস্তা। বেশ লাগছে চলতে। মনটা অনেক দূরে চলে গিয়েছিল, হঠাৎ চমকে উঠলাম সুমথর কথায়।

কি রকম জ্যান্ত এ্যাডভেঞ্চার? সুমথ বলল, চল দেখাব। লেখক মানুষ তোরা, একটা গল্প ফেঁদে ফেল দিকিনি। আমার নামটা তার মধ্যে যে ভাবেই হোক স্থান পাবে আশা করি।

নিশ্চয়, নিশ্চয়! তা গল্পটা কি শুনি?

আরে সে এখন কি ; বুড়ো নিজের মুখেই বলবে শুনিস্।

আমি বললাম, কি, তোমার শিকারের গল্প না কি?

ইয়েস্, শিকার! তা শিকারই বলতে পারিস, আই ডু এ্যাডমিট, তবে আমার নয়। মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল সুমথ।

ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর কত দূর আছে তোমার বাগান? দিব্বি রাত হল।

সুমথ হাসল, কেন তোর ভয়-টয় করছে না কি?

আরে না না, ভয় কি। একেবারে নাবালক ঠাউরেছ! ছেলেবেলার কথা ভুলে গেলে?

দূর, এমনি বললাম, বলল সুমথ, বোধ হয় খাদ্যের প্রয়োজনটা বেশি অনুভব করছিস। আর অল্পক্ষণ কষ্ট কর, আমরা এসে গেলাম বলে। হ্যাঁ, কি বলছিলাম, সেই বুড়োর কথা—একটু থেমে আবার বলল সুমথ।

তুই হয়ত বিশ্বাসই করতে চাইবিনে কিন্তু ইট ইজ এ ট্রু ফ্যাক্ট।

খুব মালমশলাদার বুঝি? বললাম আমি।

একটা কথা সত্যি জানিস্ কানু, আমি নিজেকে দেখে আশ্চর্য হই, ও ব্যাটা বুড়োর ওপর কেন জানিনে রাগ করতে পারিনে। তুই লেখ। আমি হলফ করে বলতে পারি তুই রাগ করতে পারবি না, ওকে শয়তান বলে ভাগিয়ে দিতে পারবি না।

আমি একটু জোরেই বলল, কেন ভাগিয়ে দেব কেন? আগে শোনাই যাক ওর কথা।

তা ঠিক, তবে নিশ্চয় ইউ মাষ্ট ট্রাই, ইউ স্মড; লিখছিস তাহলে? ওর ভেতর দিয়ে চল্লিশ বছর আগেকার ডুয়ার্সের বাঙালীর ইতিহাস লেখা হবে। তার পর একটু থেমে হেসে সুরু করল সুমথ।

তাছাড়া বুড়োও খুব মজা পাবে। জানিস কানু, আমার বিশ্বাস, এই ধরণের লোকদের ফিলিংসটা কম, সত্যি পিটি হয়।

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে সুমথ যেন অনেক দূরে চলে গেল, কি রকম ঔদাসীন্যের আমেজ লাগছে ওর কথায়।

আমাকে আর ভাববার সময় না দিয়ে ক্যাঁচ করে লালমাটি ইন্‌স্পেকসন বাঙলোর সামনে আমাদের গাড়ী এসে থামল। আমি হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম—সাড়ে সাত।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। পুবমুখো বাড়ীটার দক্ষিণ পাশ দিয়ে একটা নদী চলে গিয়েছে। এখন জল নেই বললেই চলে, পাহাড়ী নদী বর্ষায় খরস্রোতা হয়। অসংখ্য নুড়ী পড়ে আছে, মাঝখান দিয়ে ঝির-ঝির করে বয়ে যাচ্ছে পায়ের পাতা-ডোবানো জলধারা। নামটা যেন কি বলেছিল সুমথ মনে পড়ছে না। ও হ্যাঁ! ভুমভুমা। চমৎকার ছোট্ট বাঙলোটি, রাস্তা থেকে খানিকটা উঁচু বলেই বেশি ভাল লাগে দেখতে। ছোট্ট টিলার ওপরে হলদে রঙের একতলা বাড়ী, চার পাশে রেলিং-ঘেরা বারান্দা। ঠিক তার নীচেই নানা রঙের মরশুমি ফুল। একটা গাছ উঠেছে পাকিয়ে পাকিয়ে বাঙলোর ছাদে। ভুমভুমার ওপারে আপার তণ্ডু ফরেষ্ট। নদীর ধারে প্রচুর বাঁশঝাড় রয়েছে। কোথায় যেন একটা পাখী ডাকছে, কুব্-কুব্ করে। ঠিক যেন নিম্নবঙ্গের গ্রামাঞ্চল।

নাঃ, এই ঠাণ্ডায় একটু গরম চা পেটে না পড়লে নয়। ছটা থেকে বসে আছি। সুমথর সাড়ে ছ'টার মধ্যে অফিস যাওয়ার কথা। কি ব্যাপার! উঠতে যাচ্ছিলাম, ভাগ্য ভাল, সে-ই এসে হাজির।

সুপ্রভাত! হেসে বললাম, একেবারে তৈরী মনে হচ্ছে?

নিশ্চয়। ছ'টা বেজে গিয়েছে, সে খেয়াল আছে? ওহ মনবাহাদুর, মনবাহাদুর!—হাঁক দিল সুমথ।

জী হুজুর! প্রিয়দর্শন পাহাড়ী কাঞ্ছা এসে উপস্থিত হল।

কুর্‌সি লাও একঠো, ওর সায়লা কো ভেজ দো।

হুকুম তামিল হতে দেরি হল না, চেয়ার এবং প্রাতরাশের জন্য টেবিল এনে সাজিয়ে দিল মনবাহাদুর।

নীল রঙের স্যুটে বেশ মানিয়েছে সুমথকে। শেভিং-এর পর সযত্ন নিভিয়ার প্রলেপে মুখখানা সাদা, চকচকে করে তুলেছে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে মিট-মিট করে হাসতেই ও ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলল।

দ্যাখ কানু, সাহেব-সুবোর কাছে যেতে হলে প্রেসটিজ অনুযায়ী একটু চাকচিক্য আনতেই হয়। তবু তোমার মত রাজা-বাদশাদারী শাল ইত্যাদি আমি গায়ে চড়াই নি যে, তুমি আমার সাজের বহর দেখে হাসছ।

আমাদের খাবার-দাবার এসে পড়ল। নাইস্! কাল রাতের মুরগীর মাংস, ওমলেট আর পাঁউরুটিতে কামড় দিয়ে আমরা প্রায় কাপ তিনেক চা খেয়ে ফেললাম। সিগ্রেট ধরিয়ে সুমথ ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল—না, আর বসা ঠিক নয়, ছ'টা পঁচিশ হয়েছে, এবার উঠি।

তুমি ক'টায় ফিরছ সুমথ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সিঁড়ির ধারে থমকে দাঁড়িয়ে বলল সে, এ্যাবাউট টেন।

অল রাইট! কিন্তু ছাটু ওল্ড-ফুলকে খবর দিতে ভুলো না।

আরে না, না, আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পর যাতে এসে পৌঁছায় তার ব্যবস্থা অফিসে গিয়েই করব।

ব্যস্ত পায়ে নেমে গেল সুমথ। ওর ভুবো রঙের ফিয়েট গাড়ী একটা শব্দ করে বাগানের ফ্যাক্টরীর দিকে এগিয়ে চলল।

আর আমি বসে বসে প্রচুর সিগ্রেটের ধোঁয়া উড়িয়ে পরশু কলেজ ষ্ট্রীট থেকে কেনা সমর সেনের বিজ্ঞানের ইতিহাস, প্রথম খণ্ডখানা নিয়ে বসলাম। শালখানা গলা থেকে নামিয়ে বুকের মাঝামাঝি রেখে ইজিচেয়ারের দুই হাতলে দু' পা তুলে দিয়ে বইখানায় মনোনিবেশের চেষ্টা করলাম।

খাওয়ার দরুণ হাতে যে তেল লেগেছিল, বেশ করে তোয়ালেতে ঘসে ঘসে তুলে সশব্দ উদ্গারে আমরা দু'জনেই ঘরখানাকে সচকিত করে তুলেছি। ধীর পায়ে আমরা অপেক্ষমান নেয়ারের খাটিয়ায় শুয়ে লেপ-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। চারি দিকে জানলা খোলা, দরজার কাছে এক চিলতে রোদ এসে পড়েছে। ওখানে কার যেন ছায়া পড়ল।

আরে এস এস প্রাণকেষ্ট, তোমার জন্যেই ত অপেক্ষা করে বসে আছি। এই যে ইনি সেই বাবু, সুমথ আমার দিকে ইঙ্গিত করল।

প্রাণকেষ্ট প্রসন্ন মুখে আমার দিকে তাকিয়ে হাত তুলে নমস্কার করল। বেশ পুরুষ্ট চেহারা, বয়স যাই হোক এখনো যে বেশ কিছুক্ষণ কর্মক্ষম থাকবে, বুঝতে সময় লাগে না। ও-আসরে আজ আমি সভাপতি, প্রতি-নমস্কার করে বললাম, বস, মোড়াটা এগিয়ে নিয়ে এস।

এতটা ঘনিষ্ঠতা বোধ হয় ও আশা করে নি আমার কাছে। বেশ একটু সঙ্কুচিত সলজ্জ ভাব দেখছি। কি ভাবে আরম্ভ করব বুঝে উঠতে পারছি নে। সমস্যা প্রাণকেষ্টই সমাধান করে দিল, বাবু আপনি না কি আমার নামে গল্প লিখবেন?

তোমার নামে গল্প? আমি কৌতুক করে বললাম, শুনেছি তোমার জীবনের ঘটনাগুলো একেবারে গল্পের মত। সেই সব পুরোনো দিনের কথা বল শুনি।

কিন্তু বাবু, গুছিয়ে ত' আমি বলতে পারব না?

বেশ ত যে ভাবে পার, বল। আচ্ছা প্রাণকেষ্ট, তুমি লালমাটি বাগানে কত দিন কাজ করছ?

তা বাবু চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর হবে।

তুমি ত' তাহলে অনেক পুরোনো লোক। তখনকার আর কেউ এখন কাজ করে না?

করে, তবে সে-ও আমার বছর দুয়েক পরে এসেছিল।

কে বল ত? সুমথ জিজ্ঞেস করল।

এখন যিনি বড়বাবু।

আই সি! বলল সুমথ। হ্যাঁ দেখো প্রাণকেষ্ট, তুমি বাপু এসব কথা বাদ দাও, যা শোনাবো বলে ঐ বাবুকে ধরে এনেছি, সেইটে শুনিয়ে দাও।

বুঝলেন বাবু! একটু কেসে আবার আরম্ভ করল প্রাণকেষ্ট, সবাই আমায় ঠাট্টা করে।

কিসের ঠাট্টা প্রাণকেষ্ট ? জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে বললাম।

এই বিয়ে-থার ব্যাপার নিয়ে। কেমন উদাসীন শুষ্ক-গলায় বলল কথাটা।

কেন ? প্রাণকেষ্ট কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল. বার তিনেক বিয়ে করেছি বলে।

সুমথ হেসে জিজ্ঞেস করল. তিন বার না চার বার ?

না বাবু বিয়ে তিন বারই. তবে—একথাটা শেষ না করেই প্রাণকেষ্ট নিজেকে সমর্থন করল। বলল, কি করব বাবু, বাচ্চা-কাচ্চাগুলিকে কে দ্যাখে ? নতুন পরিবার এই মাস কয়েক আগে ঘরে এসেছে।

বেশ বেশ, আমি আর সুমথ ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় করে জিজ্ঞেস করলাম, তা এটির বয়স কত হবে ?

একুশ-বাইশের বেশি হবে না।

আমি ত' ক্রমেই কৌতূহলী হয়ে উঠছি। চারটে নারীর সংস্পর্শে কেমন করে সে এসেছিল আর কেমন করেই বা একে একে তাদের মধ্যে তিন জন তার জীবন থেকে খসে পড়ল, এ কাহিনী যেমন যেমন বলেছিল আমি আপনাদের ঠিক সেই ভাবে তার কথাতেই বলবার চেষ্টা করব। জানিনে বিশ্বাস হবে কি না।

রোজ সন্ধ্যেবেলা বাঁশি বাজাতাম পুকুর পাড়ে এক পুরোনো বটগাছের তলায় বসে। সঙ্গীও ছিল দু-চার জন। এক দিন খুব ধমক খেলাম বাপের কাছে। বাপ বলল, কোন কাজকর্ম নেই নচ্ছার, বাঁশি বাজিয়ে গোপিনীদের মন ভোলাচ্ছ ? কুলাঙ্গার বেরোও—বেরোও বাড়ী থেকে।

আমিও সুযোগ বুঝে এক দিন মায়ের বাক্স ভেঙে দু' জোড়া অনন্ত নিয়ে সটকে পড়লাম বাড়ী থেকে, তারপর চাদর মুড়ি দিয়ে রাতারাতি একেবারে পটুয়াখালি। এখানে-ওখানে ঢুঁ মারতে মারতে বছর কয়েক পরে ভাগ্যক্রমে এসে পড়ি এই লালমাটিতে। বুঝতেই পারছেন বাবু, চা-বাগানে কাজ করার জন্যে তখন বিদ্যের দরকার হত না। শিলিগুড়িতে সায়েবগুলো ষণ্ডা-গুণ্ডা চেহারার লোক দেখলেই জিজ্ঞেস করত—এই বাবু, কাম করেগা ? আমিও চলে এলাম কাম করতে, গাঁয়ের ইস্কুলে চিঠি লেখার বিদ্যে অবশ্য আমার হয়েছিল। কত আর বয়েস তখন ? উনিশ কি কুড়ি হবে বোধ হয়।

তখন এত বাবুও ছিল না, আর এত সব বাড়ী ঘরও হয় নি। সায়েবের কুঠীর কাছে আমার এক আস্তানা জুটল। বেশ আছি, নিজের মনে সারা দিন পড়ে থাকি ফ্যাক্টরীতে। আস্তানায় যেটুকু থাকি রান্না-খাওয়া করতে কেটে যায়। নিজের মনে আছি, কোন ঝামেলা নেই। পাহাড় দেখিনি কখনো, খুব আমোদ লাগছে। সঙ্গী-সাথী জুটেছে দু'-একটা। বাঁশি এখানেও ছাড়িনি, রোজ আসর জমাই ডুমডুমার ধারে বসে। দেখতে দেখতে ডুমডুমায় কল এল। ডুয়ার্সের মারাত্মক সময় বর্ষাকাল এসে গেল। সারা দিন কখনো ঝিপ-ঝিপ, ঝুপ-ঝুপ, কখনো একেবারে গড়গড় করে বৃষ্টি পড়ে, থামবার নাম-গন্ধ নেই। বাগানে ঘুরবার উপায় নেই, জোঁকের উৎপাতে আর রক্তচোষা ডামডিমের ভয়ে। সায়েব উলিংডন ঘোড়া

নিয়ে ছুটে বেড়ায় অহরহ, কে জানে কোন দিকে নদীর পাড় ভাঙছে। বৈকালে জটলা হয় আপিসের বারান্দায়, আর দু'দিন, তার পরই নির্ঘাৎ জল ঢুকবে দক্ষিণ দিকের নতুন চায়াগাছের বাগানে। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল সেদিন, কেন মরতে এলাম এখানে? দু'বছরের মধ্যে বাড়ীর একটা খবর নিইনি, নিজের খবরও দিইনি, মা বেটী হয়ত কেঁদে কেঁদে অনর্থ করে তুলেছে। দেব একখান চিঠি।

আবার রাতে শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবি, না শালা, যা চুকিয়ে দিয়েছি যাক্। তা'ছাড়া চিঠি পোষ্ট করব কি করে? ডাকওয়ালা ত' এখন যেতে পারবে না! বর্ষা কাট্রক, তার পর দেখা যাবে। পাশের খাটিয়ায় ধনু সর্দার ঘুমুচ্ছে। ভাবতে ভাবতে আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল, কিসের যে গোঁ-গোঁ আওয়াজ হচ্ছে বুঝতে পারলাম না। ভয় হতে লাগল, তবে কি সিঁড়ির দরজাটা ভাল করে এঁটে দিইনি? ক্ষমতা হল না যে হারামজাদাকে ডাকি। দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকলাম।

ভোরের আলো ঘরে আসতেই মাথার কাছে খাড়া-করা বল্লমটা নিয়ে বাইরে এলাম, এসেই মনে হল, রাতে কেন অত ভয় করেছিল। বোধ হয় স্বপন দেখে থাকব। দাঁতন আর ঘটি নিয়ে উঠানে নেমে গেলাম। পেছনের কলাবাগানে দেখি এক-হাঁটু জল। কী ব্যাপার? খিড়কীর দুয়োরের নিচে ভুমচুমা এসে পড়েছে।

কুয়োর পাড়ে মুখ ধুয়ে, প্রতিদিনকার কাজ দু'বালতি জল নিয়ে পাকঘরে রাখলাম। খিড়কীর কাছে কতখানি জল মেপে দেখা দরকার, কি জানি আজ রাতে এখানে থাকা যাবে কি না!

খিড়কীর দরজা মানে টিনের দু'খানা পাল্লা তার তলায় শক্ত করে দুটো খেজুর গাছের গুঁড়ি ঠেক্‌না দেওয়া।

বলব কি বাবু, ভগবানের লীলা, জলে মাটি খেয়ে নিয়েছে, গুঁড়ির ফাঁকে মানুষ আটকে! কি করব ভেবে পেলাম না, ধনুর দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাচ্ছি। কে জানে প্রাণ আছে কি না: কোথা থেকে ভেসে এসেছে সতের-আঠার বছরের পাহাড়ী মেয়ে। ধরে তুলতে বুকের মধ্যে ধ্বক-ধ্বক করে উঠল। কি করব, ঘরে নিয়ে যাব, সেঁক-তাপ করব, ডাক্তারকে খবর দেব?

দুপুর নাগাদ জ্ঞান হল। হ্যাঁ বাবু, এ গল্প খুব ছোট। বে-হিসাবি মানুষ আমি, কোন কিছুই গুছিয়ে নিতে জানলাম না। খেয়ালের বশে কখন কি করি তার ঠিক নেই। কাঞ্চী আমার কাছে প্রায় দেড় বছর ছিল। কি গায়ের রং! তেমনি চেহারা। আপনারা ত' বাবু অনেক পাহাড়ী সহরে গিয়েছেন, নিশ্চয় দেখেছেন, কেমন ওদের হয় গায়ের রং।

কাঞ্চী হাতছাড়া হয়ে গেল আমার নিজেরই দোষে। বানে ভেসে এসেছিল আবার ভেসে গেল। ওরাও ঘরে থাকবার নয় বাবু! এখন আর দুঃখু হয় না! ঐ ডাক্তারই আমার কাল হল। পয়লা নম্বরের শয়তান ছোকরা, ওকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেল। আমি জানতাম না তা নয়, তবে ঠিক ধরতে পারিনি, এতটা করবে তাও বুঝিনি। চার মাস তখন তার গর্ভাবস্থা।

অবলীলাক্রমে বলে যাচ্ছে প্রাণকেষ্ট, যেন সে নিরাসক্ত ভাবে তার অতীতটাকে দেখছে, যেন এ তার নিজের নয়, আর কারো কথা- আমাদের শোনাচ্ছে।

সায়েবের অর্ডারি মদ আনতে গঞ্জে গিয়েছিলাম। তখনকার দিনে হাতীতে চড়ে যেতে হত। চার দিনের পথ। এর মধ্যেই যে ওরা ভেগে পড়বে এ আমার ধারণায় আসেনি। বেশ মনে আছে, ফিরে এলাম মঙ্গল বার দিন বৈকালে। শাড়ি এনেছিলাম দু'খানা নতুন বাগেরহাটি ডুরে, কাচের চুড়ি। সায়েবের কুঠিতে মাল পৌঁছে দিয়ে বেশ ডগমগ হয়ে আসছি বাড়ীতে, তখনো জানিনে ডাক্তার পালিয়েছে। ঘরে ঢুকে দেখি কেউ নেই, ভাবলাম, বুঝি বাইরে কোথাও গিয়েছে। কতক্ষণ হয়ে গেল কেউ ত আসে না। আমি ক্লান্ত শরীরে একবার পাকঘর, কুয়োতলা, কলাবাগান, খিড়কী সব ঘুরে এলাম। কাঞ্চী, কাঞ্চী, কত ডাকলাম। না, সাড়া নেই ত'!

প্রাণকেষ্ট এমন গলার স্বর করল, যেন এখনো খুঁজছে!

সন্ধ্যে হল, ধনু এল, রোজকার মত জল তুলে পাকঘরে নিয়ে গেল। কিন্তু আজ হঠাৎ ও নিজে চা করতে বসল কেন? এ দেড় বছরে ত' করেনি? আমার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠল। খাটিয়ায় শুয়ে শুয়েই ডাকলাম—ধনু! ধনু! তুই চা করছিস কেন, কাঞ্চী কোথায়?

চা খেতে খেতে সব শুনলাম। বিস্বাদ লাগল চা, গলার কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল যেন, পেটের মধ্যে কেমন একটা মোচড় দিয়ে উঠল। ধনুকে বললাম, আজ চাল-ডাল নিয়ে তুই লাইনে যা। অবাক হয়ে সে তাকাল আমার দিকে, কিছু শুধাল না।

মাথায় খুন চেপে গেল আমার। কি করব? এ-ঘর ও-ঘর খুঁজলাম, না, নিজের কোন জিনিষ রেখে যায়নি। কাচের চুড়িগুলো পটপট করে ভেঙে ছুড়ে ফেলে দিলাম। উনুনে ভাত চাপান ছিল, টান মেরে ডেকচিটা নামিয়ে নতুন কাপড় দু'খানা গুঁজে দিলাম গনগনে আগুনে। তাতেও মনের জ্বালা মিটল না, হাত-পা নিসপিস্ করতে লাগল।

পরে আক্ষেপ হয়েছে, ইস্! করকরে চারটে টাকার কাপড় না পোড়ালেই হত। সেই রাত্রেই মা-বাবাকে বেশি করে মনে পড়তে লাগল। ভুলেই গিয়েছিলাম দেশ-ঘরের কথা। চিঠি লিখলাম, আমি শীগগির যাচ্ছি।

আর দেরি নয়, পরদিনই সায়েবের কাছে ছুটি নিলাম দু'মাসের, বিয়ে করতে দেশে যাব বলে।

প্রথম বৌয়ের কথা শেষ করে খাঁকির জামার হাতায় চোখের কোণটা মুছল প্রাণকেষ্ট। হ্যাঁ, বৌ বই কি, এ ছাড়া আর কি বলতে পারি, না হয় নাই বা হল মন্ত্র পড়ে বিয়ে। তবে যে সুমথ বলল এদের ফিলিং একেবারেই নেই?

ষাট-বাষট্টি বছরের বৃদ্ধের এখনো কি মনে পড়ে উদ্দাম যৌবনের নিষ্ফল কামনার সেই কামিনীকে? আশ্চর্য!

আমি কিছুই জিজ্ঞেস করব না ভেবেছিলাম কিন্তু অজ্ঞাতসারেই প্রশ্ন করে বসলাম, আচ্ছা প্রাণকেষ্ট, আজও কি সেই কাঞ্চীকে তোমার স্মরণ আছে?

স্পষ্ট মনে আছে বাবু! এই নতুনটিকে নিয়ে তিনটি পরিবার ত' আমি বিয়ে করলাম, ছেলে-পিলেও আছে। আরও হবে কি না সে ভগবান জানেন! কিন্তু সেই দেড়টা বছর যে আমার কি ভাবে কেটেছিল তার কথা আজও যেন মনে করতে নেশা লাগে। আমার

অত সাধের বাঁশিটা সেদিনই ভেঙ্গে ঝুমঝুমার জলে ফেলে দিয়েছিলাম, আর কোন দিন বাঁশি বাজাইনি।

বেলা আড়াইটে প্রায় বাজে-বাজে, মনবাহাদুর তিন পেয়ালা চা এনে দিল। চায়ে চুমুক দিয়ে সুমথ বলল, এবার তোমার প্রথম বিয়ে-করা বৌয়ের কথা বল দিকি প্রাণকেষ্ট! তুমি যে দেখছি সেই কাঞ্চীর জন্যে বুড়ো বয়সে চোখের জল ফেললে? এ্যাঁ কি ব্যাপার!—বলে হা হা করে হেসে উঠল।

সুমথর ঠাট্টায় এবার সত্যি প্রাণকেষ্ট লজ্জিত হল, কি যে বলেন এজেন্ট বাবু, চোখের জল কোথায় ফেললাম? আমার দুই সতীন-লক্ষ্মী সগ্‌গে গিয়েছে তাদের জন্যই চোখের জল ফেলিনে, আর সে ত—

তারপর?

বহু দিন পরে বাড়ী পৌঁছলাম। কিন্তু তিষ্ঠুতে পারলাম না, মা মারা গিয়েছে আমি নিরুদ্দেশ হবার এক বছরের মধ্যে। বাপ দেশে নাই, বৃন্দাবনে। বাঁধন ছিঁড়ে গেল, সব বাঁধন ছিঁড়ে গেল দেশের। খুড়ো মশাই কর্তব্য সারলেন পাশের গ্রামের মুকুন্দ দাসের সেজ মেয়ে সুকুমারীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে। নগদ দু'শো টাকা আমি নিজেই খরচ করলাম।

প্রাণকেষ্ট নিশ্চিহ্নপ্রায় একখানা লালচে ফটোগ্রাফ বের করল, খবরের কাগজের মোড়ক খুলে। বোধ হয় পুরোনো ট্রাঙ্কের তলার দিকে ছিল। ছবিখানার উল্টো পিঠে জং ধরে গিয়েছে। নোলক-পরা এগারো বছরের বৌ সুকুমারী দেখতে বোধ হয় ভালই ছিল। ছবি দেখে প্রাণকেষ্টর হাতে ফিরিয়ে দিলাম।

বাবু, তখন আমার ডবকা বয়েস, মিথ্যে বলব না, রঙের নেশা ধরেছে। তখনকার দিনে টুকু-টুকু সব জনেরই চলত এখানে। গগন বাবুর প্রধান সাকরেদ হলাম আমি আর মন্মথ। ভাবি এক এক সময়, ন্যায়-অন্যায় বলে সংসারে দুটো জিনিস যদি থাকে আর পাপ করলে অন্যায় করলেই যদি তার ফল ভোগ করতে হয়, তা'হলে ত' আমাদের নিশ্চয় ভোগান্তি হোত। কই কি হল?

আমরা সায়েবের ভোগের আয়োজন বাড়িয়েছি, তার পুরস্কারও নেহাৎ কম পাইনি। তা'ছাড়া বিলাসের উপকরণ সায়েবের উচ্ছিষ্ট হলে পর ছিটে-ছাটা আমাদের ভাগে এসেছে, বঞ্চিত হইনি। যখন প্রথম বাগানে ঢুকি, মাইনে ছিল পঁচিশ টাকা, সায়েবের কৃপায় হল দেড়শ' টাকা। মন্মথ পেত পঁচাত্তর টাকা, হলো দু'শ টাকা। মন্মথ বিয়ে করল, গগন বাবু বিয়ে করল। এখন ত দিব্বি ভরা সংসার।

বলে চলে প্রাণকেষ্ট, গরম কালের সন্ধ্যা, বোধ হয় ত্রয়োদশী হবে, তাই সন্ধ্যের আকাশ অন্ধকার নয়। তারা ফুটেছে। বারটা বোধ হয় শনিবার হবে। কুলী-লাইনে খুব মাদল বাজছে, গগন বাবুর বাগানে বসে আছি তিন জনে, উনিই কথাটা পাড়লেন • একথা সেকথা হতে হতে।

আচ্ছা প্রাণকেষ্ট একটা কাজ করলে কেমন হয়? তুমি ত' এখানে অভিজ্ঞ লোক?

কি কাজ। খুব নীচু গলায় আলাপ হচ্ছিল আমাদের।

গগন বাবু বলল, সেদিন সায়েবের কথার ভাবে বুঝলাম কুলী
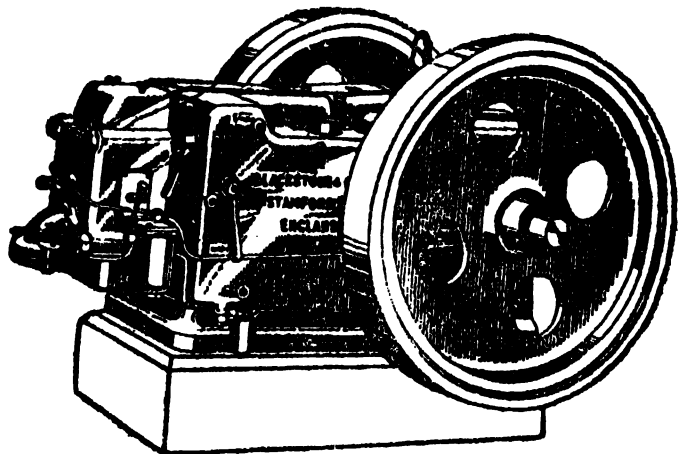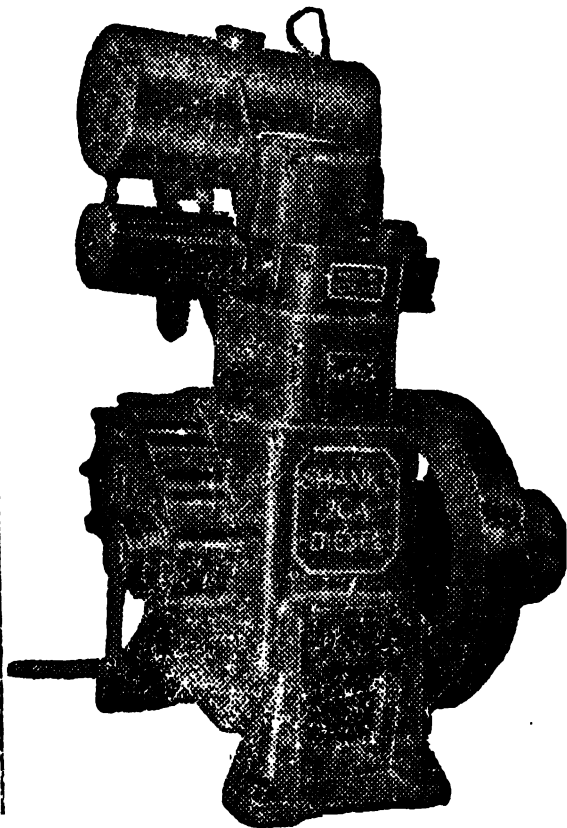
কামিনদের ওপর অরুচি ধরে গিয়েছে সায়েবের, যদি—ব্যবস্থা করতে পারি আমরা বুঝলে প্রাণকেষ্ট, আমাদের বরাত খুলতে দেরি হবে না।

আমরা তখন সায়েবের স্বাস্থ্য পান করছি তিন জনে। বুঝলেন কি না বাবু! ঝট করে মাথায় ঝিলিক খেলে গেল।

মন্মথ বলতে লাগল, আমাদের হাতে আপাতত কিছু নেই, ভরসা এক তোমার ওপর।

কুছ পরোয়া নেই। কিন্তু একেবারে নগদ কারবার চাই আমার। কথার খেলাপ না হয়।

ঠিক আছে, গগন বাবু, এবার যদি বিস্ক, তুমি নাও তবে তার ন্যায্যপ্রাপ্য তুমিই পাবে। কিন্তু আমরা যদি কুচবিহার বা জলপাইগুড়ি থেকে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে পারি, তাহলে বখরা হবে তিন জনের।

সেদিন এই পর্যন্ত। ভাবতে ভাবতে যে যার আস্তানায় চলে এলাম। গগন বাবু কথাবার্তা ঠিক করবে, কাল রবিবার, কি জানি ডাক পড়তেও পারে। মন্মথ আর গগন বাবুর তখন বিয়ে হয়নি। যাক্, মওকা যখন পাওয়া গিয়েছে, দাঁও মারতে ক্ষতি কি?

প্রথমটা খুব কান্নাকাটি করত সুকুমারী। প্রথম দিন কিছু বুঝতেই পারেনি, আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম কি না। এক রাতে মাত্র এক ঘণ্টার জন্যে যদি করকরে একশ' টাকার নোট পাওয়া যায়, তাহলে ঐ সামান্য সময়টুকু একলা বিছানায় কাটাতে আমার আপত্তি নেই।

হঠাৎ আত্মপ্রত্যয়ের ভাব নিয়ে প্রাণকেষ্ট বলে উঠল, বাবু, আপনারা ভাবছেন উঃ কি পিশাচ! বাবু, টাকাটা কি বড় নয় বলতে চান?

কি জবাব দেব, প্রয়োজনই বা কি প্রাণকেষ্টকে কিছু বলবার? ও যা বলছে বলুক। কি হবে ওকে বলে টাকা বড় কি, কি—

প্রাণকেষ্টর কথায় সচেতন হয়ে উঠলাম, বুঝলেন বাবু, এদিকে এলে মন-মেজাজ তখন অন্য রকম হত। আর হ্যাঁ, একথাও জোর করে বলব আমি, ডুয়ার্স অঞ্চলে যত বুড়োথুস্‌না দেখবেন, যে তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে আছে, সব ব্যাটা ঘুঘু। শুধু বাগান কেন বাবু, এখানকার ক্ষুদে সহরেও ঐ ব্যাপার। আপনি যতই বলুন ওর খুব নাম-ডাক, মান্য মানুষ, বড়লোক, সমাজের মুরুব্বি, বড় বড় ব্যবসা তার—আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত! আমি বিশ্বাস করিনে। বলুক দিকি তাদের কেউ, বলুক বুকে হাত দিয়ে, হ্যাঁ নিজের বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়েই সৎভাবে জীবন কাটিয়েছি, বিশ বছর আগে কোন দিন কোন অবস্থাতেই অন্যের সুন্দরী বৌয়ের ঘরে ধাক্কা মারিনি। লাথি মেরে কাঠের দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকিনি। তবে বুঝব হ্যাঁ বুকের পাটা, হ্যাঁ সাচ্চা তার স্বভাবচরিত্তির! —কথা বলতে বলতে প্রাণকেষ্ট রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল, গলার রগ ফুলে ফুলে উঠছে।

আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম, এক্ষুণি হয়ত এমন কারো নাম করে বসবে, যাকে আমরা জানি, চিনি—শ্রদ্ধা করে পাঁচ জনে। এ প্রসঙ্গ এখুনি বন্ধ করতে হয়।

সুমথ প্রায় ধমক দিয়ে উঠল, আরে ধেৎতেরি, অন্য লোকের কথায় কাজ কি? নিজের কীর্তি বল, তাহলেই যথেষ্ট।

হ্যাঁ বাবু তা ঠিক, অন্যের কথায় কাজ কি।—বলে একেবারে হাত জোড় করে ফেলল প্রাণকেষ্ট। তা দেখুন নতুন বাবু, আপনাদের কাছে এই প্রার্থনা, আমাকে পাষণ্ড বলে ভাববেন না। আমি ত' বলি, ভগবান, কৃতকর্মের ফল সবাই ভোগ করুক। আমিও বাদ যাব না, তা জানি।

আমি আর সুমথ সমস্বরে বললাম, থাক ও কথা বাদ দাও।

আমি পুরোনো কথার মোড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বৌ সকালে এসে তোমায় কিছুই বলল না?

না বাবু, কিছুই বলল না। তখন মনে বেশ সোয়াস্তি হল, এই ত' বাপু পোষ মেনেছ। এখন বুঝতে পারি কেন সে কিছু বলে নি। এতটুকু মেয়ে, তার মনে কি ঘেন্না! এর পরে আরও কয়েক বার তাকে যেতে হয়েছিল, শেষের বার আমি প্রায় শ' তিনেক টাকা পেয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আমরা কুচবিহার থেকে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেললাম। এই বাড়ীতেই তখন নাচ-ঘর ছিল, আমরা হয় ছ' মাস, নয় ত তিন মাসের কড়ারে নিয়ে আসতাম। শুধু সায়েব নয়, আমরা কেউই তার পেসাদ থেকে বঞ্চিত হই নি। নয় বছর উইলিংডনের আণ্ডারে কাজ করেই তার পর এল সেভিল। এক দিনকার ঘটনা বলি।

ঠাট্টা করে অনেক দিন বাদে একবার বললাম সুকুমারীকে, দেখবে না কি নতুন সায়েবকে?

দুপুর বেলা সে তখন মেয়েকে ভাত মেখে দিচ্ছিল দুধ দিয়ে। ইদানীং আর চুপ করে থাকত না, কথায় কথায় জোর উত্তর করত।

আমার ঐ কথায় খুব রেগে গেল, বলল, কেন বাবুদেরও ত বৌ আছে, তাদের রঙ কাল বলে বুঝি মান রক্ষে হবে না? আজও মেয়েমানুষ আনতে পার নি নাচঘরে? দুসপ্তা হয়ে গেল সায়েবকে উপোসী রেখেছ! চশমখোর কোথাকার! টাকাটাই সব হল? বলে আমার দিকে কি অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই সে তাকাল!

আবার সেই ভাবে বসে মেয়েকে খাওয়াতে লাগল। আমি আর ঘাঁটালাম না। সেদিন খেতে বসে কোন কথাবার্তা হল না; মনটা কেমন হল। বিকেলে মন্মথর সঙ্গে শিকারে বেরিয়ে গেলাম। লুকিয়ে-চুরিয়ে বুনো শুয়োরটা হরিণটা এখানে যাদের বন্দুক আছে তারা মারে। হয় বিট অফিসারকে নেমন্তন্ন করতে হয়, নয় ত' টাকা কামাই হলে বখরা দিতে হয়।

ফিরে এসে আর তাকে দেখতে পাইনি। নিজেই ধরাধরি করে বাক্স প্যাঁটরাগুলো কুয়োতলায় এনে রেখেছিল। মেয়েটাকে কম্বল দিয়ে ভালো করে জড়িয়ে এক পাশে শুইয়ে রেখেছিল, সব শুনলাম গগন বাবুর কাছে। যখন ফিরলাম এগারটার সময়, একটা বুনো শুয়োর মেরে নিয়ে দেখি গগন বাবু, ধনু বসে আছে আমগাছটার কাছে। খড়ের চাল, তার চিহ্নমাত্রও নেই। কাঠের ঘর পুড়তে বেশি মেহনত লাগেনি, তখনো গনগন করছে আগুন। এসময় ত' বাতাস থাকে না, শীতকাল, তাই রক্ষে আশে-পাশের বাড়ীতে আগুন ধরেনি। দেখে-শুনে মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করতে লাগল, শুধোতে চাইলাম সুকুমারীর কথা, মেয়ের কথা। গলায় স্বর ফুটল না। গগন বাবুর দিকে তাকাতেই তিনি আমার কাঁধে হাত

রেখে বললেন, মেয়ে আমার বাড়ীতে আছে, চল আজ ওখানেই থাকবে।

অনেক কষ্টে ফিস-ফিস করে শুধোলাম, আর?

আর? আর সব শেষ!

প্রাণকেষ্ট একনাগাড়ে তার দ্বিতীয় কাহিনী শেষ করে দম নিল। যেন সেই, সেই সময়ের মত এখনো স্বর ওর গলা থেকে বেরোতে চাইছে না। জোর করে গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, বাবু, আমার দোষ নেবেন না, যদি ধূমপানের কিছু পাই তাহলে একটু—

নিশ্চয়, নিশ্চয়! সুমথ বালিশের তলা থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরল প্রাণকেষ্টর সামনে, আমিও একটা নিলাম।

আশ্চর্য! এর পরেও কি করে ভাবে প্রাণকেষ্ট ভোগান্তি ওর হয়নি? চল বারান্দায় গিয়ে বসা যাক, আমি প্রস্তাব করলাম। দম বন্ধ করা কাহিনী শুনতে শুনতে আমাদেরও যেন দমবন্ধ হয়ে আসছিল।

আঃ খোলা হাওয়ায় এসে বাঁচলাম! প্রাণকেষ্টর কাহিনী ত' এখনো শেষ হল না, হয়ত অনেক বাকি। আমার বারান্দায় জাঁকিয়ে বসে বৈকালিক চা-পর্ব সমাপন করবার বাসনা ছিল কিন্তু সুমথর বিপরীত ইচ্ছা। সে বলল, চল চা খেয়ে একটু ইভনিং ওয়াক্ করে আসি, সারা দিন ঘরে বসে আছি।

তথাস্তু। তাহলে ধড়াচূড়া পরে নিতে হয়।

নিশ্চয়, বলল সুমথ, কিন্তু প্রাণকেষ্ট তুমি ত' গরমের কিছু আনোনি বাপু! সুমথর চোখ সব দিকে।

সঙ্গত হবে কি না চিন্তা না করেই আমি বললাম, চল সুমথ, বেড়াতে বেড়াতে প্রাণকেষ্টর বাড়ীর দিকেই যাওয়া যাক।

তা মন্দ নয়, বলল সুমথ, আমাদের সান্ধ্য-ভ্রমণও হবে আর প্রাণকেষ্টর গরম জামাও নেওয়া হবে।

আমি ভাবছিলাম, আজ প্রাণকেষ্ট রাত্রে খাওয়ার টেবিলে আমাদের গেষ্ট হোক।

এক্স্যাক্টলি সো! তোমাকে ভাবতে হবে না কানু, আমি ঠিক করেই রেখেছি।

ঠিক আছে। আমরা পথে বেরিয়ে পড়লাম। ফ্যাক্টরীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অনেক বাবুদের ঘর-বাড়ী দেখলাম, কুলকামিনী দু'-এক জনকেও চোখে পড়ল। যাক্ সে সব কথা।

দ্বিতীয় বিবাহ এবং নিরবচ্ছিন্ন অনেক দিন এই স্ত্রীর জীবিত অবস্থার ন'টি সন্তানের জন্ম ছাড়া প্রাণকেষ্টর এই সময়টায় কোন বৈচিত্র্য নেই। সাত মাস আগে নবমটির জন্মদান কালে দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

তার পরই যথারীতি নাবালকদের লালন-পালন করবার জন্য প্রাণকেষ্ট তৃতীয় বার দারপরিগ্রহ করেছে না কি বাধ্য হয়ে! কিন্তু এখানেই প্রাণকেষ্টর অজ্ঞাতসারে এমন একটি মারাত্মক অপরাধ হয়েছে যে সে না কি কিছুতেই মন থেকে খটকা দূর করতে পারছে না।

কি সেটা?

সত্যি বাবু, বললে পেত্যয় যাবে না, আমি আপনাদের পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি, এ লুকোচুরির মধ্যে আদপেই ছিলাম না। তবে হ্যাঁ বলতে পারেন মরতে তুমি আবার বিয়ে করলে কেন? কি করব বলুন, ঐ দুধের বাচ্চাদের দ্যাখে কে? বলবেন, কেন তোমার বড় বড় মেয়েরা আছে। তা আছে কিন্তু তাদের কি নিজের নিজের সংসার নাই?

আমরা অভয় দিয়ে বললাম, না বাপু, তুমি তিনটে কেন আরও বিয়ে কর। আমাদের বলবার কিছু নেই। কিন্তু তোমার মত মানুষের মনেও হঠাৎ অপরাধের ভয় কি করে ঢুকল, সেইটে আমাদের বল!

হ্যাঁ বাবু সেই কথাই ত' বলব, পরামর্শ দেন আমি কি করব। আমার বয়স হয়ে গিয়েছে, এ বয়সে কে আর মেয়ে দেয়? তাই ভেবেছিলাম দুঃস্থ বিধবা-টিধবা যদি পাই তাহলে—আমার ঘরে ভগবানের ইচ্ছায় দুটো ভাতের অভাব ত' নেই। তা ছাড়া মা-মরা কাচ্চাবাচ্চাগুলোকেও মানুষ করবে, আমারও দুটো ভাতজল করবে।

মনে মনেই বললাম হুঁ, তুমিও ভগবানের ইচ্ছে মান দেখি!

প্রাণকেষ্ট বলে চলে, তা কুলিখানার সর্দারকে বলেছিলাম কথাটা। সে আমার গেরামের লোক। আমাকে খবর দিল তার সন্ধানে মেয়ে আছে। তবে সে বিধবা নয়, তার স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছড়ি হয়ে গিয়েছে, মা-বাপের এমন সঙ্গতি নাই যে মেয়েকে পোষে। তা আমি বললাম, মা-বাপ এসে থাকলে আমার কোন আপত্তি নাই। হ্যাঁ বাবু বুঝলেন কি না, আগের পক্ষের সঙ্গে মেয়ের ছাড়াছাড়ি মানে একেবারে ডায়ামিটার হয়ে গিয়েছে।

ডায়ামিটার! সে কি?

সুমথ একেবারে হো-হো করে হেসে উঠল, এ্যাঁ প্রাণকেষ্ট একেবারে ডায়ামিটার? সেই মেয়েকে তুমি পছন্দ করলে?

—তাতে আর কি বাবু, আগের পক্ষের সঙ্গে যখন কোন সম্বন্ধই নাই। ও, বুঝলাম। ডায়ামিটার অর্থাৎ ডাইভোর্স।

প্রাণকেষ্ট সুমথর হাসির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। যাক্ গে, কি-ই বা লাভ হবে এই ভুলটুকু শুধরে দিয়ে। তাই আর কিছু বললাম না।

কথা পাকাপাকি হয়ে যায়নি তখনো, বলল প্রাণকেষ্ট, এই গত শ্রাবণ মাসে হঠাৎ এক দিন দুপুরবেলা আপিস থেকে ফিরে এসে দেখি, এক জন মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে বসে আছে বেলা ছ'টা থেকে। কি ব্যাপার? কারও আসার কথা ছিল না। সে মেয়েই আমাকে শুধোলো, আপনার জন্যেই কি কুলিখানার সর্দার মশাই পাত্রী খোঁজ করেছিলেন?

আমি ত' তাজ্জব বনে গেলাম, হ্যাঁ কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করতে চাইবেন না বাবু, সে মেয়ে নিজেই বলল 'আমায় আশ্রয় দিন, মা-বাবাকে বাঁচান দয়া করে।'

একেবারে আমার পায়ে হাত দিতে আসে। আমি ত' হাঁ-হাঁ করে উঠলাম। বললাম, বেশ থাক। সত্যি বলছি বাবু ও, ওর মা-বাবা সবাই যদি এমনি থাকতে চাইত আমি মানা করতাম না। সে নিজেই বলল, 'না এমনি থাকতে পারিনে, আপনি সত্যি করে আমায় বিয়ে করুন, মা-বাবাকে আসতে আজই চিঠি লিখে দেব, আমি অনেক কষ্ট করে এসেছি, দয়া করে একখানা পোষ্টকার্ড দিতে পারেন।'

আমি ততই অবাক হচ্ছি বাবু, এ মেয়ে তাহলে ত' লেখাপড়া জানা। আচ্ছা বাবু, আপনারা বলুন, সে ত আমার চেহারা, ঘর-বাড়ী বাচ্চাকাচ্চা সবই নিজের চোখে দেখল। তবে কেন এই বুড়োকে যেচে বিয়ে করবার জন্যে সাধাসাধি করল? আমার বিয়ে করাতেই

কি অন্যায় হল ? আর এই দুঃস্থ মেয়েটিকে ঘরে ঠাঁই না দিলেই কি ন্যায় হত ? আপনারা বিদ্বান মানুষ, বিচার করে বলুন।

আমি আর সুমথ জিজ্ঞেস করলাম—কেন এই নিয়ে কি গোলযোগ হয়েছে কিছু ?

প্রাণকেষ্ট উত্তর দিল, হাঁ বাবু হয়েছে, কিন্তু বিয়ে যখন করেই ফেলেছি, আর ত ফেলতে পারিনে ?

কথা বলতে বলতে আমরা অনেক দূর এসে পড়েছি।

প্রাণকেষ্ট বলল, ঐ যে বাড়ীটা দেখছেন বাইরে কলাঝাড়। ঐটে আমার বাড়ী। চলুন বাবু, গরীবের বাড়ীতে একটু চা খেয়ে আসবেন।

এই ত চা খেয়ে বেরোলাম, এখন আর নয় প্রাণকেষ্ট, আর এক দিন আসা যাবে। তুমি চট করে চাদর-টাদর একটা নিয়ে এস। আমরা এখানেই একটু পায়চারি করি—সুমথ বলল।

প্রাণকেষ্ট চলে গেল।

ধন্য তোমার প্রাণকেষ্ট, ভাই সুমথ ! আমার আশ্চর্য লাগছে। এত বিচিত্র রকমের ঘটনা তার জীবনে ঘটেছে ! কিন্তু সত্যি কি তুমি মনে কর ওর কালি নেই ?

আমার ত তাই মনে হয়। নইলে যে মেয়েগুলো ওর জীবন থেকে খসে পড়েছে তাদের জন্য ওর মনে কোন দাগ নেই কেন ?

কে বলল দাগ নেই সুমথ ! আমার ত মনে হয়—

কথা শেষ করতে দিল না, সুমথ থামিয়ে দিয়ে বলল, দ্যাট ইজ এনাফ, ঐ দেখ এসে পড়েছে। চল এবার ফেরা যাক।

প্রাণকেষ্ট অনুযোগ করতে লাগল, আপনারা গেলেন না ?

ঠিক আছে, এবার এলে যাব, বললাম আমি।

আর গিয়েছেন, এ সুযোগটা হারালাম। জানেন বাবু, নতুন বৌ আমায় খুব যত্ন-আত্তি করে।

বেশ ত, ভাল কথা। তবে এই যে কিছুক্ষণ আগে কি বলছিলে অপরাধ টপরাধ ?

হাঁ সে পাতকের কথা আর বলবেন না। চেহারা যদি দেখতেন তাহলেই বুঝতেন, এ আমাদের ঘরের মেয়ে নয়, ভদ্রলোকের ঘরের।

তা তুমি কি অভদ্র ?

না, তা বলছিনে, দোষ আরও গুরুতর। বলি শুনুন। আমি দুণাক্ষরেও এর বিন্দুবিসর্গ জানতাম না। মেয়ের মা-বাবা এল চিঠি পেয়ে। দিন স্থির হল।

সন্ধ্যের লগ্ন। সামান্যই আয়োজন। আমারই দু-চারজন চেনা-জানা লোক উপস্থিত আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বিয়ে ত হবে, বিয়ে পড়াবে কে ? পুরোহিত কোথায় ? মেয়ের বাপ বলল, সে সব ভাবতে হবে না। আমি মনে করলাম, ওদের সঙ্গে যে দু'জন লোক এসেছে, হবেও বা, তারা কেউ পড়াবে। ছাঁদনা তলায় বসেছি, ওর বাপই মন্ত্র পড়ে বিয়ে দেওয়াল। বাবু ওরা বামুন !

শেষের কথাটা বলতে বলতে বৃদ্ধ প্রাণকেষ্টর স্বরে আতঙ্কের আভাস ফুটে উঠল। বলল, বিয়ের আগে যদি জানতে পারতাম ! সকাল বেলায় বাগানের সকলে যখন কথাটা শুনলো আমায় ত গালমন্দ করতে লাগল। আমি আর কি করব বলুন ? বিয়ে যখন হয়েই গিয়েছে। কিন্তু বাবু, মহাপাতকের কাজ করেছি। আমি সাহা হয়ে বামুনের ঘরের মেয়েকে বিয়ে করলাম ! ছি, ছি !

অনুশোচনা সুরু হয়েছে বুড়োর।

তাতে আর কি হয়েছে, আজ-কাল ও-রকম কত হচ্ছে, অনেকেই জাত-ফাত মানে না। এত ভাববার কি আছে ? সান্ত্বনা দিয়ে বলল সুমথ।

না বাবু, আগে যা করেছি, করেছি। সে নিজের এক্তারের মধ্যে ছিল। কিন্তু—আমি ফস করে বলে ফেললাম—তবে বোধ হয় এত দিনে তোমার কৃতকর্মের ফল ভোগ হচ্ছে।

হঠাৎ কি রকম যেন রুষ্ট হয়ে উঠল প্রাণকেষ্ট। পরক্ষণেই আত্মগত ভাবে বলল, ঠিক বলেছেন বাবু, হয়ত তাই। কিন্তু আমি ত ইচ্ছে করে বা জোর করে এ মেয়েকে ঘরে আনিনি, সে আপনি এসেছে, তাতে আমার অন্যায়টা কি, বিচার করুন।

একটু থেমে আবার আস্তে আস্তে সহজ ভাবে বলল, বুঝলেন বাবু, মা মেয়েকে বলে তুই এ কি করলি ? জাত খোয়ালি বলে আমিও কি শেষ বয়েসে ওদের হাঁড়ি হেঁসেলে খাব ? কান্নাকাটি করে ; মা আলাদা রেঁধে খায়। মেয়ে কিন্তু আমায় খুব যত্ন-আত্তি করে।

কথা বলতে বলতে প্রাণকেষ্টর মুখখানা প্রসন্ন হয়ে উঠছে, এ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, যদিও অন্ধকারের দরুণ মুখখানা ভাল ভাবে দেখা যাচ্ছিল না। ওর এই প্রসন্নতা আমাদের দুজনকেই বিস্মিত করল।

ওর জীবনের বিচিত্র ঘটনার ভীড়ের কথাই মনে পড়ছিল আমার থেকে থেকে, লালমাটি ছেড়ে আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। আচ্ছা এখন কি করে সম্ভব বলতে পার সুমথ, জিজ্ঞেস করলাম আসার দিন গাড়ীতে উঠে, প্রথম জীবনে যে নিজের বৌকে সায়েবের বাড়ী স্বয়ং পৌঁছে দিয়েছে অম্লান বদনে টাকার লোভে, আজ সে উঁচু জাতের মেয়ে বিয়ে করে এমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে কেন ?

ওটা প্রেজুডিস ছাড়া কিছু নয়, বয়েস হয়েছে ত !

শুধুই কি তাই ? হবেও বা !

কৃষ্ণ

শ্রীপ্রজেশকুমার রায়

কৃষ্ণমেঘে তুমি কৃষ্ণ,
অন্ধকারে তুমি কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ তুমি মৃত্যুর রাত্রিতে,—
সবার অন্তে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ তুমি সবার আদিতে—
আদি-অন্ত-হারা সুর
বাজে কৃষ্ণ তোমার বাঁশীতে।

দেখুন! অর্দ্ধেকটী সানলাইট
সাবানেই এসব কাচা
হয়েছে!
অতিরিক্ত ফেণার দরুণই
এ সম্ভব হয়
SUNLIGHT
SOAP
Rs. 10,000 Reward!
LESS LABOUR
GREATER COMFORT
SUNLIGHT SOAP

পঞ্চতপা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১২

নরেন এবং সান্ত্বনা দুজনারই ভিতরে ভিতরে কিছু একটা আপস হয়ে গেছে যেন। চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে কথায় কথায় একদিন যে অস্বস্তির মুখোমুখি হয়েছিল, মনে মনে তার জন্ম দুজনেই কুণ্ঠিত তারা। সেটুকু মুছে ফেলার ব্যগ্রতাও তাই দুজনারই সমান। হাসিখুশি চপলতার মধ্যে পরস্পরের মনোরঞ্জনের সূক্ষ্ম আগ্রহটুকুর প্রকাশ নেই, অনুভূতি আছে।

সান্ত্বনা ভাবে, ভাগ্যে মাসির বাড়ি গিয়েছিল, নইলে কি লজ্জা, কি লজ্জা। ও লজ্জা বুঝি আর জীবনে কাটিয়ে ওঠা যেত না। মনে মনে সঙ্কুচিত নরেনই বেশি। কি না কি কথা একটা, তাই শুনে একেবারে দেউলের মত ওদের বাড়ি থেকে উঠে এসেছিল। নিজের সেই দৈন্য ওরও বিষম লজ্জার কারণ।

কিন্তু মাসির বাড়ি গিয়েছিল বলে আজ নরেনই মনে মনে খুশি বেশি। এই বাঞ্ছিত আপসের দরুনই নয় শুধু। দেড়মাসে মেয়েটা বদলেছে অনেক। নতুন সবুজের মত ফিরে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আবার। গোড়ায় যে মেয়ে মড়াইয়ে এসেছিল তেমনি। বরং তার থেকেও বেশি। মাঝখানে ওই উচ্ছল প্রাচুর্য নারীচেতনার কানায় কানায় বাঁধা পড়ে আসছিল। কাম্য তাইই। কিন্তু ওই থেকেই এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা এসেছিল। সংশয়ও।

কিন্তু সে অধ্যায় একেবারে মুছে গেছে এখন। চেতনার বাঁধ ভেঙেছে। নিজেকে আগলে রাখার কারিগরী ভুলেছে। দেড়মাসের শূন্যতা ভরাতে তিনগুণ উপচে উঠেছে। হাসে গল্প করে, হৈ-চৈ করে। রাগালে রাগে, চোখ রাঙালে ডবল চোখ রাঙায়। বেড়াতে বেরোয় দুজনে। পুরানো জায়গায় নতুনের ছোপ লাগে। শাল-মহুয়ার দিকে যায়, পাহাড়ের দুর্গম কোনো পাথরে ওঠার ভীরু চেষ্টায় হেসে আটখানা হয় নিজেই, একসঙ্গে চা খেতে আসে ভুতুবাবুর দোকানে। নরেন বাবু কত প্রশংসা করে ভুতুবাবুর, তার কাল্পনিক ফিরিস্তি দেয় গম্ভীর মুখে! লজ্জায় সুখে গলতে থাকে ভুতুবাবু। তাই দেখে হাসি চাপা দায় হয়ে ওঠে নরেনের।

সান্ত্বনার অগোচরে নরেন চেয়ে চেয়ে দেখে এক এক সময়। নতুন করে আবার কাঁচা বয়সের যাদু লেগেছে ওর মধ্যে। যা এই মড়াইয়ে আর এই মড়াইয়ের পাহাড়ী পরিবেশেই শুধু মানায়। বলেও ফেলে, ভাগ্যে জায়গাটা এরকম, অন্য কোথাও হলে টি-টি পড়ে যেত!

নিরীহ মুখে পাল্টা প্রশ্ন করে সান্ত্বনা, ধিঙ্গী মেয়ে বলত? জবাব না পেয়ে হেসে ওঠে।—আগে যা ছিলুম জানেন না, তড়তড়িয়ে গাছে উঠতাম বলে মায়ের হাতে কম কিল খেয়েছি!

চেষ্টা করলে এখনো পারো বোধ হয় গাছে উঠতে।

না, এখন আর পারিনে, মোটা ধুমসী হয়ে গেছি।

নিজের সম্বন্ধে অমন একটা বিশেষণ প্রয়োগের আনন্দেই আবার হেসে সারা। কতটা মোটা হয়েছে নরেন পরীক্ষাসূচক চোখে তাই যেন দেখে চেয়ে চেয়ে। তৃষ্ণার্ত একটা অনুভূতি হাসি চাপা দিতে হয় তাকেও।

নরেনের খুশি হওয়ার আরও একটু কারণ আছে। সম্প্রতি অবনী বাবুর মধ্যেও কিছু পরিবর্তনের আভাস পাচ্ছে সে। প্রথম থেকেই এই বাড়িতে তার অবারিত আনাগোনা। অবনী বাবু বাড়ি থাকুন আর নাই থাকুন, যখন খুশি এসেছে, যতক্ষণ খুশি থেকেছে। কিন্তু বিবেকের আঁচড় পড়তেই একটা দ্বন্দ্ব। ভদ্রলোক কিছু ভাবেন কি না, মনে মনে অসন্তুষ্ট হন কি না কে জানে! কিন্তু নরেনের মন থেকে এখন সে সংশয়ও গেছে। কোন কারণ নেই তবু গেছে। ওর এবারের এই আসা যাওয়া এবং মেয়ের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় ভদ্রলোকের একটুখানি সস্নেহ প্রশ্রয়ও আছে। কেমন করে নরেন যেন সেটুকু উপলব্ধি করেছে।

অনুকূল অবকাশ পেলে সান্ত্বনাকে ও নিজেই হয়ত বলত। উচ্ছলতার মুখে ওর বলাটা না হালকা হয়ে ভেসে যায়। সময় আসুক বলবে। সান্ত্বনা থামুক, শান্ত হোক একটু। তখন বলবে। সব অবরোধ ভাঙা তটিনীর সঙ্গে ওর তুলনা চলে এখন।

কিন্তু বেজায় রাগ হয় নরেনের এই অকাল বৃষ্টির ওপর। জলের দরুন ড্যামের কাজে বিঘ্ন হচ্ছে বলে চিন্তিত হয়ত হয়েছে, কিন্তু রাগ হয়নি কখনো। এ যেন এক গন্তাকারের অমিল। দিনকতক ছিল বেশ। আবার শুরু হয়েছে। সময় নেই অসময় নেই ঝমঝমিয়ে নামলেই হল। আপিসের পর বর্ষাতি নিয়ে অবশ্য হাজিরা দিতে পারে। দিচ্ছে না এমনও নয়। কিন্তু সান্ত্বনাই হয়ত চোখ বড় বড় করে বলে ওঠে, এই জলে কি কাণ্ড! কি কাণ্ডর সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে না উঠতে জলের ছিটে ফোঁটা কোথাও লাগল কি না অবনী বাবুর হাতে সেই পরীক্ষার সঙ্কোচ। তাছাড়া বেড়ানো বন্ধ। দিনকতক ওটাই মস্ত আকর্ষণ ছিল।

সকাল থেকেই সেদিন আকাশ নির্মেঘ। রোদ উঠেছে। কান্নাভেজা মুখে একপ্রস্থ হাসির মত। দুপুরে রোদ থাকল না বটে, কিন্তু শীতকালের পড়ন্ত আলোর মত ভারী একটা মিষ্টি ছায়া পড়ল সর্বত্র। যে আলো আর যে হাওয়া ঘরকুনো মনকেও বাইরে টেনে আনে।

আপিস ঘরের টেবিলে আঁকার সাজ সরঞ্জাম কাগজপত্র ছড়িয়ে রেখেই নরেন উঠে পড়ল শেষ পর্যন্ত। অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছে ভেতরটা। বিকেলে আবার শুরু হবে কি না এক পশলা কে জানে। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। আসলে ওই আকাশ, ওই বাতাসই আর এক নিভৃতের দিকে টানছে ওকে।

সরাসরি এসে ট্রাকে চাপল। মেন কোয়ার্টারস্‌এ উঠে ট্রাক ছেড়ে দিল। তার পর পা চালালো জেনারেল কোয়ার্টারস্‌এর দিকে।

বেশিদূর যেতে হল না। মুখোমুখি দেখা। সান্ত্বনা অবাক। কি ব্যাপার, এ সময়ে এদিকে কোথায় ?

সব ব্যাপারে ওর এই সহজ বিস্ময় নরেনের বাঞ্ছিত নয় খুব। ছদ্ম বিস্ময় হলে বরং খুশি হত। অত্যন্ত হালকা সুরেই জবাব দিল, এদিকে অবনী বাবু নামে এক ভদ্রলোক থাকেন, যাচ্ছিলাম তাঁর বাড়ি।···তা তুমি কি সুপারভিশানে বেরিয়েছ ?

জবাব না দিয়ে সান্ত্বনা তেমনি হালকা করেই পাল্টা প্রশ্ন করল আবার, অবনী বাবু নামে ভদ্রলোকের বাড়ি এখন যাচ্ছেন, আপিস নেই ?

—আছে। নরেন ঘটা করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল একটা। দিনটা দেখে ভাবলাম ভদ্রলোকের কন্যার হাতে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসি।

হেসে উঠল সান্ত্বনা। বলল, হাতের নাগালে ভুতুবাবুর দোকান ছাড়িয়ে এ পর্যন্ত আসছিলেন চা খেতে ?

যে অবকাশের প্রতীক্ষা মনে মনে, তারই একটা হাতছাড়া হয়ে গেল, নরেনও সেটুকু উপলব্ধি করল মনে মনে। আর কিছু না হোক, শুধু বলতে পারত, ভুতুবাবুর দোকানে ভুতুবাবু আছে, ওই ভদ্রলোকের কন্যাটি নেই বলেই এত পরিশ্রম আর পণ্ডশ্রম।

বলি বলি করেও বলা হল না। সান্ত্বনা তড়বড়িয়ে উঠল, আমি কিন্তু এখন আর ফিরছি না, পাঁচ দিন ঘরে বসে দম বন্ধ, সেই সকাল থেকে বেরুব বেরুব কচ্ছি—ভুতুবাবুর দোকানে চলুন আপনাকে চা খাওয়াচ্ছি।

চা আর না হলেও চলে। সানন্দ-প্রত্যাবর্তন এবং অবতরণ। সান্ত্বনারও খুশি ধরে না। বলল, চমৎকার দিন করেছে, না ? চলুন মড়াইয়ে নাবব, চট করে চা খেয়ে নেবেন, আমি ভুতুবাবুর পাল্লায় পড়ে গেলে ডাকবেন জোর করে। হেসে উঠল।

ভুতুবাবুর দোকানে ঢোকা হল না। চা-প্রার্থীর ভিড় সেখানে। এ আবহাওয়ায় চায়ের অজুহাতে অনেকেই বেরিয়ে এসেছে। ওরা ঢুকতে পারত। আপ্যায়ন করে ভুতুবাবু বসার ব্যবস্থাও করে দিত। কিন্তু অপিস টাইমে সসঙ্গিনী ওদের মধ্যে গিয়ে ঢোকা পদস্থ অফিসারের সাজে না। সান্ত্বনাও বোঝে, বলে, আপনার কপাল মন্দ আমি কি করব !

জবাব না দিয়ে মন্দ-কপালজনিত মুখখানি করে তুলতে চেষ্টা করে নরেন। লোক না থাকলেও এ সময় ভুতুবাবুর দোকানে গিয়ে ঢুকতে ভালো লাগত না। এগিয়ে চলল। মড়াইয়ে নামাটা আপিসের কাজের অন্তর্গত। নৈতিক না হোক বাহ্যিক কৈফিয়ৎ আছে।

মড়াইয়ের ধারে এসে সান্ত্বনা চ্যালেঞ্জ করল, নামুন, কে আগে নামতে পারে দেখি।

নরেন দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, দেখ মেয়ে, ভালো হবে না, জলে জলে যা হয়ে আছে, পড়লে তখন ?

সে সম্ভাবনা আছে। তবু ছাড়ার পাত্রী নয় সান্ত্বনা। ঠেস দিয়ে বলল, আচ্ছা ভীতু আপনি, হাত ধরে নামাবো ?

নরেন হাত বাড়িয়ে দিল, ধরো না।

সান্ত্বনার উৎফুল্ল দুই চোখ মুহূর্তের জন্য আটকে গেল তার মুখের ওপর। অননুভূত এক রোমাঞ্চকর স্পর্শের মত লাগল নরেনের। তৎক্ষণে দু'চার পা নেমে গেছে সান্ত্বনা। ফিরে দেখল আবার। বলল, তার থেকে হাত পা না ভেঙে আপনি বরং একটা আছাড় খান, লোকে দেখুক। নামবেন তো নামুন।

মড়াইয়ের সেই একটানা কর্মস্রোত। কিন্তু রোজই নতুন মনে হয় সান্ত্বনার। আজকের দিনটা আরো অদ্ভুত লাগছে। মড়াইয়ের গহ্বরে মেঘলা দিনের সর্বাঙ্গ জড়ানো ঠাণ্ডা বাতাসের ছড়াছড়ি। আর সান্ত্বনার মন তার থেকেও হালকা।

অনর্গল কথা বলছে। এখানে দাঁড়াচ্ছে, ওটা দেখছে, পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করছে। জবাব পেল কি পেল না খেয়াল নেই, প্রত্যাশাও নেই। মড়াইয়ে নেমেই পাগল সর্দারকে একবার খোঁজা অভ্যাস। কাছে দূরে দু চোখ ঘুরে এলো আজও। দেখতে পেল না। দূরে কোথাও আছে। আজ আর কারো কাছে যাওয়া নয় কারো কাছে দাঁড়ানো নয়। মড়াইয়ের বাতাসের মতই হালকা হয়ে শুধু ভেসে বেড়ানো।

খেয়াল হতে দেখল, চার্জিং মেসিন চলছে যেখানে সেদিকটায় এগোচ্ছে তারা। ও আর এখন রণবীর ঘোষের আওতা নয়। আর কোনো কণ্ট্রাক্টারের হাতে গেছে। অদূরে একদল কামিন ঝুড়ি মাথায় পাথর কুঁচি সরাচ্ছে। এরই মধ্যে এক নজর দেখে নিল সান্ত্বনা। পাঁচ মিশালি বয়সের মেয়ে সব। ওদের দিকে চেয়ে চাঁদমণির কথা মনে পড়ে যায় তবু। রণবীর ঘোষের পাশাপাশি ওকে দেখে অমনি দূরে দাঁড়িয়ে মেয়েটা সেদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

দু চোখে ভস্ম করছিল ওকে। আজ অন্তত এসব আর মনে করতে চায়নি সান্ত্বনা। কিন্তু চাঁদমণি ওর মনে দাগ কেটে আছে। না চাইলেও মনে পড়ে।

ছোট নিশ্বাস ফেলে এগিয়ে চলল। পাশের লোকটা কথাবার্তা বিশেষ বলছে না, সেদিকেও খেয়াল নেই খুব।

চার্জি মেসিন চলছে না এখন। লোকজনও বিশেষ নেই। কনভেয়ারের শেষ মাথায় অনেক উঁচুতে সেই ঘরের মত জায়গাটার দিকে চোখ গেল। ক্রেনে ওঠার সুযোগ না পেলে ওই মইয়ের মত খাড়া সিঁড়ি বেয়েই সেখানে উঠবেই একদিন ঠিক করেছিল।

সাগ্রহে বলল, ওখানে উঠি চলুন না ?

—কোথায় ?

—ওই যে উঁচু ঘরের মত, ওখানে।

নরেন বলল, ওখানে উঠতে গেলে পা হড়কে একেবারে বিশ্বরূপ দেখতে হবে।

যেন ছোট মেয়ের এক অসম্ভব আব্দার নাকচ করে দিল এক কথায়। ভুরু কুঁচকে সান্ত্বনা মাটি থেকে কতটা উঁচু হতে পারে এবং ওঠাটা একেবারেই অসম্ভব কি না তাই দেখতে লাগল।

ওদিকে নরেন দেখছে, মড়াই আজ ছোট বড় অনেক অফিসারকেই টেনেছে। অদূরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার এবং আরও দু'তিনজনের সঙ্গে চোখোচোখি হল। সান্ত্বনাকে বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও একটু, এরাও সব হাওয়া খেতে নামলেন কি না দেখে আসি।

সান্ত্বনাও এক নজর দেখে নিল তাঁদের। বিশেষ করে ঝরণার বাবাকে। কিন্তু এতদূর থেকে মানুষটাকে দেখা যায় এই পর্যন্ত। পায়ে পায়ে নরেন তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

দশ মিনিটও নয়। ফিরল আবার। তাঁরা আর একদিকে চলে গেলেন। কিন্তু এদিক ওদিক চেয়ে সান্ত্বনাকে দেখল না কোথাও। বিস্মিত নেত্রে চারদিকে তাকাতে লাগল সে। মেয়েটা গেল কোথায়!

টুপ করে কাছেই ছোট একটা পড়ল কি। চমকে উঠল নরেন। উপরের দিকে চেয়ে বিমূঢ়। কনভেয়ারের সেই মাথা থেকে সহাস্যে উঁকি দিচ্ছে সান্ত্বনা!

নরেন ভয়ে দিশেহারা। চিৎকার করে উঠল, ওখানে কি কচ্ছ ?

তেমনি চিৎকার করে জবাব পাঠালো সান্ত্বনা, বিশ্বরূপ দেখছি!

—শীগ্‌গির নেমে এসো! যথার্থ রেগে গেছে।

—শীগ্‌গির উঠে আসুন! বেপরোয়া জবাব।

—কি দস্যি মেয়েরে বাবা! তুমি নামবে কি না ?

—আপনি উঠবেন কি না ?

হতাশ হয়ে হাল ছাড়ল নরেন। কাঁধের কোটটা আছড়ে মাটিতে ফেলল সে। ভয়ে দুশ্চিন্তায় ঘেমে উঠেছে! কিন্তু চকিতে আরো একটা ভয়ের কথা মনে হল। এই খাড়া সিঁড়ি ধরে ওঠা যত সহজ নামা ততো নয়। ওটার থেকেও নামার সময় বিপদের সম্ভাবনা দ্বিগুণ। ওর কথা শুনে সান্ত্বনা যে নেমে আসতে চেষ্টা করেনি রক্ষা। তাড়াতাড়ি একজন কর্মচারীকে ডেকে নির্দেশ দিল ক্রেন-কেজ লাগানোর ব্যবস্থা করতে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল তারপর। ওপর থেকে সান্ত্বনা হাসতে লাগল প্রচুর।

এক্ষুনি নামতে হবে, তাড়াতাড়ি চারদিক দেখায় মন দিল সে। দু'চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। বিশ্বরূপ না হোক অপরূপ বটেই। এত উঁচু থেকে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি দেখাচ্ছে এতবড় সৃষ্টি। ওপরে আকাশ। নিচে বিজ্ঞান-পথে যুগ-যুগান্তের সাধনার বিচিত্ররূপ। সেই মহিমার সামনে হঠাৎ যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল সান্ত্বনা।

এত উঁচু থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু দেখার দিকে খুব মন ছিল না। নইলে দেখত, একটা মেয়ে কোথায় উঠেছে তাই চেয়ে চেয়ে দেখছে নিচের অনেকেই। আর মড়াইয়ের গহ্বরে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলিও। দেখছে না ঠিক, শাড়ির আভাসে বুঝতে পারছে শুধু দুঃসাহসিকা কে।

কোনরকমে ওপরে উঠে জিব বার করে হাঁপাতে লাগল নরেন। তাই দেখে আর একদফা হেসে উঠল সান্ত্বনা। নরেন ধমকে উঠল, থামো! আর হাসতে হবে না, এতটুকু ভয় ডর নেই তোমার ?

অন্য সময় হলে প্রত্যুত্তরে তেমনি করেই কিছু বলত। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার স্তব্ধতার ঘোর কাটেনি এখনো। নিচের দিকেই চোখ গেল আবার। বলল, এতবড় অভয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের এক ফোঁটা ভয়ের কথা ভাবতেও লজ্জা।

নরেন হাঁ করে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। সেটুকু উপলব্ধি করে সান্ত্বনা লজ্জা পেল যেন। বলল, দেখছেন কি ?

—দেখছি তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু!

হেসে উঠল সান্ত্বনা। দুষ্টই খাসা। চলুন।

ক্রেন-কেজ আসতে দেখে আবারও ছেলেমানুষের মতই খুশি হয়ে উঠল সে। ওতে করে নামবে, ভাবতেও রোমাঞ্চ। হাত ধরে নরেন কেজএ ওঠালো তাকে। ক্রেন ঘুরতে লাগল। যেন বাতাস সাঁতরে চলেছে তারা। সান্ত্বনার মনে হল শরীরের রক্ত সব সড়সড়িয়ে পা বেয়ে নামছে।

ছোট কেজ। ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে নরেন। হাতে হাত লাগছে। কাঁধে কাঁধ ঠেকে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে চপল আনন্দে এটা সেটা জিজ্ঞাসা করছে যখন, ওর নিশ্বাস এসে লাগছে গালে মুখে।

একটা সবল ইচ্ছাকে দ্বিগুণ বলে নরেন ভিতরে ভিতরে নিষ্পেষণ করে রাখল সারাক্ষণ।

কেজ ভূমি স্পর্শ করল।

বিফল আরো এক নিবিড় মুহূর্ত।

কেজ থেকে মাটিতে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে এক বিপরীত ধাক্কায় স্তব্ধ দুজনেই।

হঠাৎ দূরের একদিকে সামাল সামাল রব উঠল একটা। লোকজন যে যার কাজ ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সেই দিকে। চিৎকার, চেঁচামেচি, হট্টগোল। এত লোক ছড়িয়ে ছিল মড়াইয়ে, এমনিতে বোঝা যায় না। ওপর থেকেও তড়তড়িয়ে লোক নেমে আসছে।

সম্বিত ফিরতে নরেনও আর একটি কথাও না বলে প্রায় দৌড়েই চলল সেদিকে।

সান্ত্বনা সেখানেই দাঁড়িয়ে। মড়াইয়ের এই বিভ্রান্ত ব্যতিব্যস্ততা চেনে। এই কোলাহল জানে।

অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

সান্ত্বনা আড়ষ্ট। আর্ত আকুতি। কি হল? কার সর্বনাশ

হল ? কিন্তু এক পা নড়ার ক্ষমতা নেই। যতবার যত দুর্ঘটনার কথা শুনেছে, একই অবস্থা। চোখে দেখা দূরে থাক, নির্মম কিছু কানে এলেও ভিতরটা ঘুলিয়ে ওঠে থেকে থেকে। কিন্তু না দেখুক, নাজানা বা নাশোনা পর্যন্ত শান্তি নেই।

কি হল ? কে গেল ? ক'জন গেল ?

পিলপিল করে লোক জমছে এখনো। মড়াইয়ের ওদিকটা কালো মাথায় কালো হয়ে গেল। তবু লোক আসছে। হট্টগোল বাড়ছে।

দুর্ঘটনার বিবরণ জেনে আবার ফিরেও যাচ্ছে কেউ কেউ। পায়ে পায়ে এগলো সান্ত্বনা। জনা দুই লোক ওর সামনা সামনি আসতে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখের দিকে চেয়েই লোক দুটো বুঝল, জানতে চায় কি হয়েছে। তারা জানাল, পাথর চাপা পড়েছে একজন। পেল্লায় পাথর—সঙ্গে সঙ্গে শেষ।

সান্ত্বনার চোখে বোবা ত্রাস, বোবা প্রশ্ন। অর্থাৎ, কে ? আমি দেখেছি ? আমি চিনি ?

—হোপ্‌ন। নিজে থেকেই জানাল তারা, জলে জলে ধারের পাথর আল্‌গা হয়েছিল, বোকার মত তারই তলার মাটি কাটছিল লোকটা। সবাই বলছে, ইদানীং মাথা ঠিক ছিল না ওর—ওদের বুড়ো সর্দারটা কপাল ঠুকে রক্তারক্তি করছে একেবারে—

ভিড় সরিয়ে, মরণঘাতী পাথর নড়িয়ে, দলাপাকানো দেহটা সরিয়ে ফেলার পর এক ফাঁকে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে এসে ওই এক কথাই বলল কুলিবাবু।—নিজের দোষেই গেল স্যার লোকটা, ওই পাথরের নিচে বসেই তলাকার মাটি সরাচ্ছিল···।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে বাদল গাঙ্গুলি অন্যমনস্কের মত ভাবছিল কিছু। ভাবছিল সেই প্রথম দিনের কথা। বহু স্বজাতি পরিজনের সেই জিঘাংসু বিক্ষোভের জবাবে পাষাণ গাম্ভীর্যে এই একজনের সামনা-সামনি বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো। সেদিন মড়াই-ঘেরা গোটা পাহাড়টার মতই শক্ত নিটোল মনে হয়েছিল ওকে। আজকের এই শেষ দেখলে কে বলবে একখানিও হাড় ছিল ও দেহে।

ছোটো খাটো এমন দুর্ঘটনা মড়াইয়ে আরো অনেক ঘটেছে। কাজের তাড়ায় সে বিষণ্ণতা কাটিয়ে ওঠাও শক্ত হয়নি খুব। কিন্তু চারদিকে চেয়ে আজ বাদল গাঙ্গুলির কেমন মনে হল এই একটা অপঘাত অজস্রের উদ্যমকে যেন থেঁতলে দিয়ে গেল। বাদল গাঙ্গুলি নয়, চিফ ইঞ্জিনিয়ার সচেতন হয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ। কুলিবাবুকে আদেশ করল, দোষের কথা পরে হবে, জটলা বন্ধ করে ওদের সব কাজে যেতে বলুন, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, আর এক মিনিটও নয় !

কিন্তু শুনছে কে ? কাজ যারা করবে তারা ভ্রূক্ষেপও করল না। বস্ ক্ষুব্ধ হল। অসন্তুষ্ট হল ! জাতের অর্ধেক লোক মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে। যারা আছে, তারাও জায়গায় জায়গায় গোল হয়ে মূর্তির মত বসে। কুলিবাবুদের মৃদু অনুশাসনে কাউকে নড়ানো গেল না। উল্টে এই সময়ে এভাবে কাজের তাড়া দেওয়াটা প্রায় নির্মম মনে হল ওদের সকলের কাছে।

সান্ত্বনার কাছেও। অদূরে এসে দাঁড়িয়েছে কখন। আচ্ছন্নতার ঘোর কাটেনি। স্তব্ধ, বিবর্ণ। নিজের অগোচরে দু চোখ খুঁজছে কাকে। খুঁজছে পাগল সর্দারকে। তাকে দেখল না। দেখল এদের ! দেখল কলের মানুষ চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে। বেদনাবিহ্বল মুহূর্তে এ নিষ্প্রাণতা নির্দয় মনে হল শুধু।

চোখে চোখ পড়তে সোজা ফিরে চলল।

দুর্ঘটনার প্রসঙ্গে অবনী বাবু দুঃখ করলেন। নরেনও অনেক কথা বলল। কিন্তু সান্ত্বনার মুখে কথা নেই একটিও। পাগল সর্দারের কাছে যাবে ভেবেছিল। যায়নি। যেতে পারেনি। চাঁদমণির অঘটনের পরে গিয়েছিল। কিন্তু এবারে পারল না। শেষের দিকে সান্ত্বনার মন বিরূপ হয়ে উঠেছিল হোপ্‌নের ওপর। ওর বিসদৃশ আচরণ দেখে ভয় পেয়েছিল। আরো ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ভুতুবাবু। কিন্তু···

থমকে গেল। নিজের ভিতরটাই দেখতে চেষ্টা করল যেন। এই কি চেয়েছিল ? আর্ত আকুতিতে শিউরে উঠল প্রায়। না, এ সে চায়নি, কোনদিন চায়নি !

পাগল সর্দারের কাছে যেতে পারেনি। কিন্তু মড়াইয়ে এসেছে পরপর দুদিনই।

সর্দার আসেনি। ওর সঙ্গে আরো বিশ ত্রিশ জন আসেনি। কাজ শুরু হয়েছে আবার। সান্ত্বনার মনে হয়েছে, এই কালো মানুষদের কাজের মধ্যে যেন প্রাণ নেই আর। চিফ ইঞ্জিনিয়ার এসে তত্ত্বাবধান করে যাচ্ছে, কুলিবাবুরা তাগিদ দিচ্ছে। তাই ওঠা, তাই কাজে লাগা।

তৃতীয় দিন পাগল সর্দার এলো। বাকি সকলেও। ওর আসার সঙ্গে সঙ্গে দলের মধ্যে যেন নতুন করে শোকের ছায়া

নামল আবার। কাজে ছেদ পড়ে গেল। যারা কাজে লেগেছিল, কাজ ফেলে তারাও আস্তে আস্তে জড় হল এসে।

অদূরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখছে সান্ত্বনা। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অসন্তোষ দেখছে। কুলিবাবুদের তাড়া দেওয়া দেখছে। তারা বলছে, যারা কাজ করবে না তারা বাড়ি যাও, যখন কাজ করবে তখন এসো। এখানে এসে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার অর্থ কী?

সান্ত্বনার ইচ্ছে হল চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে গিয়ে বলে, যে লোকটা গেছে সে ওদের গাঁয়ের মাঝির ছেলে আর পাগল সর্দারের বুকের পাঁজর। ওদের এতবড় শোকে এটুকু ব্যতিক্রমে ড্যামের কাজের এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

কিন্তু ক্ষতি হোক না হোক তাগিদ দিয়ে ফল কিছু হল না। বরং ক্ষোভ বাড়ল ওদের। এক জায়গায় ভিড় না করে বিচ্ছিন্ন ভাবে কাছে দূরে যে যার দাঁড়িয়ে রইল বা বসে রইল চুপচাপ। দূরে একদিকে টহল দিচ্ছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার। সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আছেন, আরো কেউ কেউ আছে। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের চাপা অসহিষ্ণুতা তাঁদের উদ্বেগের কারণ।

পায়ে পায়ে পাগল সর্দারের দিকে এগলো সান্ত্বনা। এ দুদিনে তার ভিতরেও পরিবর্তন এসেছে একটা। উচ্ছলতার বদলে আবার সেই অন্তর্মুখি মনের গতি। স্থির, শান্ত, পরিণত।

সর্দার ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। পরে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল একেবারে। ওকে আর কখনো কাঁদতে দেখেনি সান্ত্বনা। মেয়ে হারিয়েও না। বোবা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল সান্ত্বনা।

খানিক বাদে শান্ত হল পাগল সর্দার। উবুড় হয়ে হাঁটুর ওপরের আধখানা কাপড়ে চোখের জল মুছে ফেলল। পরে একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হোপুন চলে গেল দিদিয়া—!

সান্ত্বনা বলতে পারল না কিছু। একটা সান্ত্বনার কথাও না। চুপচাপ তার পাশে বসল শুধু। কাছাকাছি যারা ছিল, দূরে সরে গেল আর একটু।

সর্দার আবার বলল, বাবুরা সকলে বলতে লেগেছে, হোপুন বোকা ছেল—পাথরের নিচে বসে মাটি কাটতে যেয়েছিল—কিন্তক হোপুন মরদ ছেল, কুছুতে তার ডর লাগত না!

—আমি জানি সর্দার। একটু থেমে প্রায় মুখোমুখি ঘুরে বসল সান্ত্বনা। কিন্তু তোমরা হাত পা গুটিয়ে বসে আছ কেন? কাজ করছ না কেন?

মুখ দেখেই বোঝা গেল, এই ব্যথার মুহূর্তে ওর মুখে এরকম কথা আশা করেনি সর্দার! মুহূর্তের জন্য তার চোখে যেন অবিশ্বাসের ছায়া নামল একটা। বলল, তু উদের মতন আমাদেরকে কাজের তাড়া দিস না দিদিয়া।

—না, ওদের মত দেব না। কিন্তু যে কাজ করতে করতে হোপুন মরে গেল সেই কাজটাই তোমরা বন্ধ করে বসে আছ?

দিদিয়ার এমন শান্ত কণ্ঠস্বর পাগল সর্দার আর শোনেনি কখনো। কিন্তু আজ তার এই ক্ষতর সঙ্গে খানিকটা খেদও মিশে আছে। জবাব দিল, তুরা ভদ্দজন আছিস দিদিয়া, আমাদিগের দুঃখ তুরা বোঝতে লাড়রি—এই ড্যাম হবে কিন্তক হোপুন আর ফিরবে না—উ চলে গেল—উ মরে গেল—আমাদিগের দুঃখ তুরা বোঝবি না দিদিয়া।

চুপচাপ অনেকক্ষণ। তারপর তেমনি আস্তে আস্তে সান্ত্বনা বলল আবার, দুঃখ না বুঝলে তোমার কাছে এলাম কি করে সর্দার।... এই তিন দিন তোমরা কাজ বন্ধ করেছ, এই তিনদিনই হোপুন মরে আছে—তোমরা কাজ শুরু করলেই সে বেঁচে উঠবে। এই ড্যাম হয়ে গেলে চিরকাল বাঁচবে হোপুন, কোনদিন মরবে না। গলা ধরে আসছিল সান্ত্বনার। একটা উদ্‌গত অনুভূতি চেপে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বলল হোপুনের আগে আরো অনেকে এখানে জীবন দিয়েছে...হয়ত আরো দেবে, কিন্তু কেউ তারা মরবে না সর্দার, যতকাল এখান দিয়ে জল যাবে ততকাল বাঁচবে তারা। কাজ করোগে যাও সর্দার।

পায় পায় ফিরে চলল সান্ত্বনা। কিন্তু পাগল সর্দার বিহ্বলের মত দেখছে ওকে। দুচোখ টান করে দেখছে। নিজের জরা সরিয়ে আর মর্মচ্ছেদী বেদনা সরিয়ে দেখছে। তার কালো মুখ চকচকে দেখাচ্ছে আবার। নিজের অগোচরেই উঠে দাঁড়াল। তাকালো চারিদিক।

—আই! হুঁই—কামি চালা কানা!

সমস্ত শক্তি উজাড় করা কণ্ঠস্বর। মড়াইয়ের খোলা বাতাস পর্যন্ত গমগমিয়ে উঠল যেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল কাছের লোক, দূরের লোক, নাজেহাল কুলিবাবুরা। সহকর্মী পরিবৃত বাদল গাঙ্গুলিও।

বিকেল। বাবা ফেরেনি এখনো। একটু বাদেই ফিরবে হয়ত। নরেন বাবুও আসতে পারে। কিন্তু ঘরে আর ভালো লাগছে না। বাইরেও লাগবে না জানে। একটা গুমোট ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছে সান্ত্বনা অনেকবার। ভাবতে চেষ্টা করেছে। এমন লাগছে কেন? হোপুন মরে গেল তাই? মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়। মনে সারাক্ষণই পড়ছে। কিন্তু দুর্ঘটনার বেদনাই নয়। আরো কিছু। আরো কি।

পিছনের দিকের নতুন পাহাড়ী রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে সান্ত্বনা। দাঁড়িয়ে পড়ল এক জায়গায়। ছ'সাত বছরের একটা পাহাড়ী ছেলে আপন মনে খেলছে বেশ। মস্ত একটা সুপুড়ির খোলে দড়ি বেঁধে সড়সড় করে টেনে নিয়ে আসছে। মানুষের অভাবে বড় বড় গোটাকতক ইঁট পাথর চাপিয়েছে খোলের মধ্যে।

হঠাৎ এই-ই ভালো গেল সান্ত্বনার। অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করল ওর সঙ্গে সঙ্গে। সহজ হওয়া বা সহজ কিছু করার তাড়না। সোৎসাহে এগিয়ে গিয়ে বলল, দাঁড়া, আমি টানছি তোকে।

নিজের হাতে ইঁট পাথর ফেলে দিয়ে বলল, নে, বোস্‌।

দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলল তারপর। ছেলেটা হাসতে লাগল হি হি করে। সান্ত্বনাও হাসছে।

বেশিক্ষণ নয়। অদূরের মানুষটিকে দেখেই হাসি মিলিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে সকৌতুকে দেখছে চেয়ে চেয়ে। কাছাকাছি হতে বলল, দৃশ্যটা ভালই লাগছে দেখতে।

সান্ত্বনা থমথমে গম্ভীর। একে দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেন পরিষ্কার হয়ে গেছে কেন বিগত ক'টা দিনের এই অস্থিরতা আর অসহিষ্ণুতা। হোপুনের ওই মর্মঘাতী মৃত্যুর স্তব্ধতাকে প্রায় অসম্মান করেছে এই

মানুষ—এই কলের মানুষ। ফস করে জবাব দিল, পরিশ্রম সার্থক হল তাহলে।

এগিয়ে চলল। মুহূর্তের জন্য থমকে গেল বাদল গাঙ্গুলি। সঙ্গ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি বললে?

—বললাম, আপনার ভালো লাগছে যখন, আমার এ পরিশ্রম করাটা সার্থক হল। পিছন ফিরে তাকিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল, এই ছোঁড়া, অত নড়িস কেন? বসে থাক না চুপ করে, দেব উল্টে ফেলে।

দেখল আড় চোখে। মানুষটা হাঁ করে চেয়ে আছে মুখের দিকে। কিন্তু আরো কিছু বলতে চায় সান্ত্বনা। আরো কিছু বলতে পেলে মন ঠাণ্ডা হয়। এমন কিছু যাতে লোকটার মনে হয় তাকে গ্রাহ্য করে না ও। ঝাঁঝের মাথায় আর কিছু হাতড়ে না পেয়ে তার কথাই টেনে আনল আবার। বলল, আপনার ভালো লাগলে আপনিও গিয়ে ওখানে বসতে পারেন, আমি স্বচ্ছন্দে টানতে পারি।

এইবার হয়েছে খানিকটা। দু'চার পা এগিয়ে গেল সান্ত্বনা।

নিজের অজ্ঞাতে যেন পা ফেলছে বাদল গাঙ্গুলি। বিস্ময়ে, কৌতুকে নির্বাক খানিকক্ষণ। আমি···ওখানে বসব?

কণ্ঠস্বর বদলে ফেলল সান্ত্বনা। গম্ভীর মুখে জবাব দিল, মুখ ফসকে বলে ফেলেছি, দয়া করে অপরাধ নেবেন না।

অর্থাৎ, আমার যা বলবার বলেছি, এবারে আপনি পথ দেখতে পারেন। কিন্তু পথ দেখার বদলে ওকেই দেখছে বাদল গাঙ্গুলি। নারী রোষের মহিমা দেখছে। বিব্রত মুখে হাসল একটু, কি ব্যাপার?

জবাব না দিয়ে সান্ত্বনা এগোতে লাগল। সুপুড়ির খোলে বাঁধা দড়িটা দু'হাতে পিছনে ধরা। সড়-সড় সড়-সড় শব্দ হচ্ছে। ছেলেটা বসে আছে ধ্যান গম্ভীর মুখে। ঢালু পথ, টানতে কষ্ট নেই। আর টানছে সে খেয়ালও নেই বোধ হয়। লোকটার মুখে হাসির আভাস দেগে উঠছে আবার।

একটু অপেক্ষা করে বাদল গাঙ্গুলি অন্য প্রসঙ্গ তুলল। থাক, তোমাকে একটা কথা বলব ভেবেছিলাম। সেদিন মড়াইয়ে ওই এলিভেটারের ওপরে গিয়ে উঠেছিলে কেন?

ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে পাণ্টা প্রশ্ন করল, অন্যায় হয়েছে?

—হয়েছে। বিপদ হতে পারত।

—কি বিপদ?

—ওখান থেকে পড়লে তোমার আর চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেত না।

এরকম সুযোগই চাইছিল সান্ত্বনা। প্রচ্ছন্ন শ্লেষে জবাব দিল তৎক্ষণাৎ, না গেলেই বা। ওর একটু পরেই তো পড়েছিল আর একজন, তারও আর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু

কার কতটুকু ক্ষতি হল তাতে? অন্তত, আপনার মনে কতটুকু দাগ পড়ল তার জন্যে?

বীতরাগের হেতু স্পষ্ট হল এতক্ষণে। মড়াইয়ে বিগত তিন দিনের ঘটনাবলী মনে পড়ল। বিশেষ করে আজ দুপুরের ব্যাপারটা। হাসতে লাগল অল্প অল্প।—এই ব্যাপার!···তোমাকে আজ ওই সর্দার লোকটার কাছে বসে থাকতে দেখেছিলাম বটে, কি যেন বলছিলে···কি বলছিলে?

—বলছিলাম, তোমার লোক মরেছে তাতে কি হয়েছে, তাকে তো সরিয়েই ফেলা হয়েছে চোখের সামনে থেকে—এমন বড় সাহেবের মেজাজ গরম হবার আগে তাড়াতাড়ি সব কাজে লাগোগে যাও।

যাই বলুক, সদলবলে সর্দার কাজে লেগেছে, নিজের চোখে দেখেছে। বাদল গাঙ্গুলি মৃদু মৃদু হাসছে তেমনি। ঘাড় ফিরিয়ে সকৌতুকে তাকালো দুই একবার, দেখল। পরে বলল, বুঝলাম।

রাস্তার ওপর আড়াআড়ি বড় একটা শুকনো গাছের ডাল পড়ে আছে। খেয়াল না করেই সান্ত্বনা পেরিয়ে গেল সেটা। বাদল গাঙ্গুলিও। দড়ি বাঁধা সুপুরির খোল আটকে যেতে ছেলেটা কাত হয়ে পড়ল। দু'জনেই ওরা ঘুরে দাঁড়াল। ছেলেটার হাতে লাগল বোধ হয় একটু, হাত ঘষতে ঘষতে সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল তার সারথির দিকে। সান্ত্বনা অপ্রস্তুতের একশেষ। কিন্তু ছেলেটাকে ধরার অবকাশ পেল না, তার আগেই ছুটে পালালো সে।

বাদল গাঙ্গুলির মজা লাগছে বেশ। নিঃশব্দ দৃষ্টি-বিনিময়। শুকনো ডালটা সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে দিল। দু' চার হাত টেনেই দড়িটা হাত থেকে ফেলে দিল সান্ত্বনা।

—দেখলে?

মুখ তুলে সান্ত্বনা তাকালো শুধু।

—ওই শুকনো ডালটা পথ আটকে ছিল।

—তাতে কী?

—বলছিলাম, এখন ওটা শুধু একটা বিঘ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে সান্ত্বনা বলে উঠল, তা বলে মানুষও তাই?

—মানুষের শোকটাকে যদি অমনি করে চোখের সামনে ফেলে রেখে দিই, তা হলে তাই।

সক্ষোভে প্রতিবাদ করল, লোকটা মাটি-কাটা কুলি মজুর বলেই ওরকম বলছেন, ভদ্রলোক হলে বলতেন না।

দু'চার পা চুপচাপ অগ্রসর হয়ে বাদল গাঙ্গুলি এবারে শান্তমুখে জবাব দিল, 'আমি নিজ হলেও বলতাম। ওই লোকটার মত আজ যদি আমিও অমনি থেমে যাই, একবারও চাইব না সকলে মিলে আমায় নিয়ে একটা শোকের দেয়াল গড়ে তুলুক।···গাছটা হাতে করে সরিয়ে দিলাম, কিন্তু শোকটাকে তো আর হাতে করে সরিয়ে ফেলা যায় না—যায় কাজে ডুবে থেকে। কিন্তু তোমার সর্দার সেটা বুঝবে কি করে বলো, বোঝে না বলেই এ সময় কাজের তাগিদটাকে এত নির্মম বলে মনে করে। হাসল একটু, কিন্তু তুমিও তো দেখছি তার দলেই।

ফিরে ফিরে দেখছিল সান্ত্বনা। মনের সেই গুমোট চাপ এবারে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। হালকা লাগছে, ভালো লাগছে, আর ফাঁক বুঝে এবারে রাজ্যের লজ্জা যেন চড়াও করছে ওকে।

একটু এগিয়েই রাস্তাটা মেন কোয়ার্টারসএর দিকে ঘুরে গেছে। দু'জনেই দাঁড়াল তারা। মুখ তুলে সান্ত্বনা হেসেই ফেলল। বলল, আমার মাথাও ওই সর্দারের থেকে বেশি উর্বর নয়।

নিজের কথাগুলো নিজের কাছেই ভালো লাগছিল বাদল গাঙ্গুলির। মেজাজ প্রসন্ন আরো। বলল, রাগটা একটু পড়েছে দেখছি, যা বলছিলাম শোনো তাহলে—এই এসব জায়গায় আর কখনো উঠবে না।

শেষের ছত্র অনুশাসনের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করল, সান্ত্বনা, উঠলে কি করবেন?

—ফের উঠলে এই ড্যামে আসাই বন্ধ করে দেব।

সান্ত্বনাও ছাড়ার পাত্রী নয়। বলল, এই ড্যাম করা ছেড়ে আপনাকে দিন রাত তাহলে আমাকেই পাহারা দিতে হচ্ছে।

বলেই অস্বস্তির একশেষ। ভদ্রলোকের হাসিভরা দুই চোখ যেন ওর মুখের ওপর আটকে আছে। সহজ কথার জবাবে হাল্কা কিছু বলার ঝোঁকেই বলা। অতশত ভেবে বলেনি। কিন্তু শুনেই মানুষটা দু'চোখে পাহারার কাজ শুরু করেছে প্রায়।

আসন্ন সন্ধ্যার নজিরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে বাঁচল। আকাশের দিকে একবার চেয়ে কোন কথা না বলে চপল পায়ে সোজা বাড়ির পথ ধরল সে।

যতক্ষণ দেখা গেল ওকে, বাদল গাঙ্গুলি দাঁড়িয়ে। তারপর গন্তব্যপথ ধরল সেও।

অনেকটা এগিয়ে সান্ত্বনা পিছন ফিরে তাকালো একবার। ধীরে সুস্থে এগোতে লাগল তারপর। কিন্তু খুব সচেতন মনে নয়।··· ভাবছে আর লজ্জা পাচ্ছে। নিজের ব্যবহারের কথা ভেবে লজ্জা পাচ্ছে। কিন্তু আরো বেশি লজ্জা পাচ্ছে আর কিছু ভেবে। হোপুনের অমন আকস্মিক মৃত্যু মনে দাগ কেটে বসার মতই। কিন্তু সেই মৃত্যুর বেদনা শুধু নয়, এর ওপর আর একটা অসহিষ্ণু ক্ষোভে এমন করে কাটালো কেন এ ক'দিন? কাটালো চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সেই যান্ত্রিক কর্তব্যপরায়ণতা বরদাস্ত করতে পারছিল না বলে, সেই নিষ্প্রাণ রূঢ়তা অসহ্য হয়েছিল বলে।

···চিফ ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে আর কেউ হলে এমন হত? সলাজ বিড়ম্বনায় ভ্রূকুটি করে উঠল মনে মনে, হতই তো! কিন্তু ভিতরে কেউ বলছে, হত না।

মেজাজ আজ অন্তত মোটেই প্রসন্ন থাকার কথা নয় চিফ ইঞ্জিনিয়ারের। ছিলও না। দুপুরে মড়াই থেকে উঠে আপিসে এসেই হেড আপিসের চিঠি পেয়েছে। এক্সপার্ট কমিটি আসার দিনক্ষণের নির্দেশ। মাঝে দিন পনের বাকি।

এক্সপার্ট কমিটি ড্যামের গঠন পরিদর্শন করবেন। আলাপ আলোচনা করবেন। মতামত জানাবেন।···আর, ঘোষ-চাকলাদারের সিমেন্ট সংক্রান্ত গোলযোগের ব্যাপারটারও নিষ্পত্তি করে যাবেন।

সরকারী কাজে এই পরিদর্শন নীতি জানা আছে। কিন্তু আন-অফিসিয়াল এক্সপার্ট কমিটির হাতে এই শেষের দায়িত্ব অর্পণ মনঃপূত নয়। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সততা এবং কর্তব্যপরায়ণতা ডিপার্টমেন্টেই ভালো জানে। বাইরের কারো জানার কথা নয়। আর, এজন্যে এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যস্থতা নিষ্প্রয়োজন।

যাই হোক, ও গোলযোগের মুখোমুখি দাঁড়ানো আছেই একদিন,

জানে। নরেনের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলেছিল, বিকেলে বাড়ি আসতে, পরামর্শ আছে ; কিন্তু একেবারে ভুলে গেছে।

সচরাচর হয় না এমন ভুল। নিজের কোয়ার্টারের দিকে পা চালিয়েও ঠিক মনে পড়েনি। আপন মনে হাসছে তখনো। রোমন্থন করছে কিছু। মিষ্টি কিছু। আগে এ রকম বিস্মৃতির আভাস মাত্রে চোখ রাঙিয়ে সচেতন করেছে নিজেকে। সেই নারী-বিদ্বেষী বিবরাশ্রয়ীদের শেকল খুলে দিয়েছে। অসহিষ্ণু রোষে মুহূর্তে সে প্রশ্রয়ের দূতকে ছিন্নভিন্ন করেছে তারা। কিন্তু এই এক মেয়ের কাছে ওরা হার মেনেছে। আলোর ঘায়ে হারমানা কীটের মত অগোচরে আশ্রয় নিয়েছে।···কবে চিফ ইঞ্জিনিয়ার নিজেও জানে না।

চলতে চলতে একটা অবাস্তব কথা ভাবছিল বাদল গাঙ্গুলি। পায় ছেলেমানুষের মতই ভাবছিল, এই মেয়েটাকে ওর মা দেখলে ভারী খুশি হত।

অকারণেই এইবার নরেনের কথা মনে হল কেমন। ওর সঙ্গে এই বাপ মেয়ের ঘনিষ্ঠতার কথা। এ সবে কৌতূহল প্রকাশ করেনি কখনো। তবু জানে।···কিন্তু এতদিনেও কোন সম্ভাবনার আভাস পর্যন্ত পেল না কেন ? ভুরু কুঁচকে ভাবতে ভাবতে চলল। বোধ হয় সেটা সম্ভব নয়। সামাজিকতার বাধা আছে হয়ত। এমন কিছু অতি-আধুনিক মানুষ নন অবনী রায়।

নরেনের কথা মনে হতে খেয়াল হল বিকেলে ওকে আসতে বলেছিল। এতক্ষণে এসে বসে আছে হয়ত। তাড়াতাড়ি পা চালালো।

নরেন অপেক্ষা করছিল ঠিকই। গোটা দুই সিগারেট শেষ করে কানকাঠি নিয়ে পড়েছে। প্রতীক্ষা ভালো লাগছে না খুব। এই সময়ে ঠিক এইখানে বসে থাকার কথা নয় তার।

বাদল গাঙ্গুলি ঘরে ঢুকে বলল, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তো ?

একটা চেয়ার টেনে বসল সামনে। হাসির আভাস। কানকাঠি কিছুটা দুর্গমে ঠেলে দিয়েছিল নরেন চৌধুরী। সেটা নিরাপদে ফিরিয়ে এনে তাকালো তার দিকে।—এত দেরি যে ?

—তোমার প্রিয় বান্ধবীর জন্যে। প্রসন্ন হাস্যে জবাব দিল, ভয়ানক রাগ আমার ওপর—তুমি বসে আছ ভুলেই গেছি !

চুপচাপ নরেন কান সুড়সুড়ির আমেজ উপভোগ করে নিল একটু।—রাগ কেন ?

—আমি একটি অত্যাচারী, পাষণ্ড, তাই। লোকের জন্য কোন মায়া মমতা নেই, কুলি মজুররা মরে গেলেও কাজ আদায় করে নিই—

নরেন অবাক।—বলল একথা ?

—প্রায়। উৎফুল্ল মুখে হেসে উঠল বাদল গাঙ্গুলি। মেয়েটি সত্যি ভালো হে, শেষে রাগ পড়তে লজ্জায় একাকার।

মুখ টিপে হাসছে নরেনও। তবে বাহ্যিক মনোযোগ কানকাঠির দিকেই বেশি। এরকম নির্মেঘ সজীবতা আগে আর কবে দেখেছে ? অনেক দেখেছে। কলকাতার নেশান বিলডার্স লিমিটেডএ দেখেছে। এর থেকে অনেক বেশি দেখেছে। তবে নেশান বিলডার্স ছেড়ে আসার পর আর দেখেনি। কানকাঠি পকেটে ফেলে সোজা হয়ে

বলল।—সান্ত্বনাকে তোমার কমপ্লিমেন্টটা জানিয়ে দেব'খন—আরো খুশি হবে আর আরো লজ্জা পাবে। যাক, এখন এদিকের খবর কি কি বলো।

বস্তুরাজ্যে ফিরে এলো বাদল গাঙ্গুলি। পকেট থেকে চিঠিটা বার করে সামনে রাখল। দিন পনেরর মধ্যেই আসছেন মহারথীরা··· কে কে আসছে লেখেনি।

—আসবে তো জানা কথাই।

—কি করা যায় ভাবছি।

—সিমেণ্ট কেস্‌এর ?

—হুঁ।

—এ ব্যাপারে তাদের মতলবটা কি না জানলে আগের থেকে তুমি ভেবে কি করবে ?

—মতলব কিছুটা বোঝা যাচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে নরেন বলল, গেলেও তোমার ভাবনার কিছু দেখিনে। ঘোষ-চাকলাদারের দুর্ভোগ যা হবার যথেষ্ট হয়েছে। মাসের পর মাস লোকসান খেয়েছে, অপদস্থ হয়েছে, ঘুষ দিতে এসে নাজেহাল হয়েছে, তারপর আসল দোষী যে সেও সরে গেছে এখান থেকে—এর পরেও ভাবা যখন স্বভাব তোমার, ভাবো বসে বসে, কি আর করবে।

পরামর্শের জন্য ডেকেছিল, কিন্তু এরকম নির্বিকার পরামর্শ বাদল গাঙ্গুলি আশা করেনি। তবু হেসেই ফেলল সেও। বলল, তোমার উপদেশ মনে রাখতে চেষ্টা করব।

এস্টিমেট কমিটি আসার প্রতিলিপি পেয়েছে ঘোষ-চাকলাদার ফার্মের দ্বিজেন চাকলাদারও। কারণ, এই পরিদর্শনের সঙ্গে সিমেণ্ট কেসও জড়িত।

খুশি এবং আশান্বিত হবার কথা।

কিন্তু কর্মজীবনে দ্বিজেন চাকলাদার এত অসহায় আর কখনো বোধ করে নি।

তিন মাস হতে চলল পাটনার নিরুদ্দেশ। রণবীর ঘোষের খবর বার্তা দ্বিজেন চাকলাদারও যথার্থই জানে না। এই তিন মাসে ক্রমাগত কলকাতা এবং মড়াইয়ে ছোটাছুটি করে কালঘাম ছুটেছে। মড়াইয়ের কাজ শেষ হলে রণবীর ঘোষের সঙ্গেও সম্পর্ক বরাবরকার মতই শেষ করে দেবে, জানা কথাই। অনেক হয়েছে, আর নয়। কিন্তু সদ্য বর্তমানে সামাল দেবে কি করে, ভেবে পাচ্ছে না।

নারী-ঘটিত ব্যাপারে তার দু' দশ দিন ডুব মেরে থাকাটা নতুন নয়। আগেও এ রকম করেছে অনেকবার। ওই সর্দারের মেয়েটাকে সরানোর পরেই তো নিখোঁজ হয়েছিল পনের দিন। কিন্তু তিন মাস অভাবনীয়···। বিশেষ করে এই সংকটের সময়। এখান থেকে সে যাবার আগেই হাবভাব দেখে বুঝেছিল, কিছু একটা মতলব আঁটছে। সে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের ওই মেয়েটার জন্য, সঠিক বোঝে নি। এর পর মড়াইয়ে আর আসা সম্ভব নয় তার পক্ষে ঠিকই। এমন কি কলকাতায়ও কিছু দিন তার গা-ঢাকা দিয়ে থাকারই কথা। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে তাকেও একটা খবর পর্যন্ত দেবে না, এমন দায়িত্বজ্ঞানশূন্যতা ভাবা যায় না। ওই মেয়েটাই উল্টে যাদু করল না কি শেষ পর্যন্ত !

রাগে আর দুশ্চিন্তায় জ্বলছে দ্বিজেন চাকলাদার। মনে মনে বুঝেছে হাতের টাকা নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত রণবীর ঘোষের আর টিকি দেখা যাবে না। চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ঘুষ দেবার জন্য আনা সেই তিরিশ হাজার টাকা তার হেপাজতেই ছিল। লোকটা অপচয় করত, কিন্তু টাকা-পয়সার গরমিল করত না কখনো। তাই এদিকটা ভাবে নি দ্বিজেন চাকলাদার। মাত্র তিরিশ হাজার নিয়ে সরে আজও পড়বে না। শেষ করে তবে আসবে।

কিন্তু দু' চার দিনের মধ্যেই ছোট মড়াইয়ে আর একটা খবর ছড়ালো।

আর কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে পড়ল দ্বিজেন চাকলাদারের।

খবরটা মহাসমারোহে রাষ্ট্র করলেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের গৃহিণী মিসেস চ্যাটার্জী। ঝরণার মা।

মায়ের ওপর মেয়ের রাগ পড়েছে এতদিনে। চিঠি লিখেছে।

কোথা থেকে ?

—আর বলো কেন কাণ্ড! যেখানে যাচ্ছেন আনন্দে আর গর্বে ডগমগিয়ে উঠছেন মহিলা।—একেবারে সেই বিলেত থেকে—লণ্ডন থেকে! বিয়ে? ও মা বিয়ে করেই তো গেছে! জামাই মস্ত বিদ্বান, এখানে অবশ্য চাকরীটা তেমন ভালো করত না, কলেজে প্রোফেসারি করত একটা। কিন্তু অত বিদ্বান ক'দিন আর ছাইচাপা থাকবে? যারা কদর বোঝে, তারাই ডেকে নিয়ে চাকরী দিয়েছে। শুধু তাই! মেয়েটা পর্যন্ত সেখানে কি একটা চাকরীতে লেগে গেছে। তাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা!

আনন্দে গর্বে মিসেস চ্যাটার্জী হেসে-কেঁদে সারা। চেনা মুখ মাত্রেই সবিস্তারে সুখবর জানিয়ে দিলেন। স্বামীর ওপর হুকুমজারী হল, আপিসসুদ্ধ লোক যেন অবিলম্বে জানতে পারে খবরটা। শুধু তাই কেন, বেশ ভালো করে একটা পার্টিও তো দিতে হবে সকলকে!

মনে মনে বিশ্বাস করল না শুধু দু'জন। ঝরণার বিলেত যাওয়াটা নয়, প্রোফেসরকে বিয়ে করাটা।

একজন ভুতুবাবু। অন্য জন দ্বিজেন চাকলাদার।

ভুতুবাবু হাসল মনে মনে। আর দ্বিজেন চাকলাদার ব্যবসা সংশ্লিষ্ট সব ক'টা ব্যাঙ্কে নোটিস দিল, একলার দস্তখতে রণবীর ঘোষ আর যেন এক পয়সাও না তুলতে পারে। অথবা, তার নির্দেশ ছাড়া কোথাও যেন তাকে টাকা না পাঠানো হয়। রণবীর ঘোষ শেষ কত টাকা তুলেছে না তুলেছে, তারও হিসেব চেয়ে পাঠালো সে। ···বিলেত যদি গিয়েই থাকে, তিরিশ হাজার টাকা দু'জনের পক্ষে বেশি দিন নয় খুব। ক্ষতি যা হয়েছে, হয়েছে—দ্বিজেন চাকলাদার এবারে ভালো হাতে শিক্ষা দেবে তাকে।

মড়াইয়ের আকাশে এমন ঘনঘটা এর আগে আর দেখে নি কেউ। ক'টা দিনের জন্য মাত্র বর্ষণে ছেদ পড়েছিল একটু। আকাশ আজ যেন এক অদ্ভুত কালোর ষড়যন্ত্রে মেতেছে।

মিসেস চ্যাটার্জী অর্থাৎ ঝরণার মায়ের সঙ্গে আজ আবার দেখা হয়েছিল সান্ত্বনার। ভিন্ন মূর্তি মহিলার। মেদবহুল দেহে অত

আনন্দোত্তেজনা যেন ধরে না। ওকে ধরে বেঁধে ঝাড়া একঘণ্টা মেয়ের সমাচার শুনিয়েছেন। এই মেয়েটার কাছেই নিজের মেয়ের সম্বন্ধে মস্ত দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন একদিন। এটা তারই জের সান্ত্বনা বোঝে।

আকাশের অবস্থা দেখিয়ে কোন রকমে ছাড়ান পেয়ে এসেছে। শুধু সান্ত্বনা নয়, ঘরমুখি হয়েছে সবাই। অল্প অল্প বাতাস বইছে। গুড়-গুড় মেঘ ডাকছে জলদগম্ভীর। মেঘের কালো সমস্ত দিনের আলো টেনে নিচ্ছে, শুষে নিচ্ছে যেন।

কিন্তু এরই মধ্যে ওই মহিলার কথা ভাবতে ভাবতেই বাড়ির দিকে চলেছে সান্ত্বনা। খবরটা রাষ্ট্র হওয়ার পরে ভুতুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওর। ভুতুবাবুর সবজান্তা হাসি ভালো লাগেনি সেদিন। আকারে প্রকারে যা বলেছে তাও না। গলা নিচু করে বলেছে, বিলেত যাওয়া আজকাল আর শক্ত কি মা-লক্ষ্মী—গেলেই হল। ···তবে কার সঙ্গে গেছেন সেটাই কথা। অমনি একবার গিয়েছিলাম ঘোষবাবুর পাটনার দ্বিজুবাবুর কাছে—ওই দ্বিজেন চাকলাদার মা-লক্ষ্মী। ভদ্রলোক স্নেহ করেন একটু আধটু···শুনলাম যা, তাতে তো ভুতুর চক্ষু স্থির!

চক্ষুদ্বয় খানিক স্থির করে সেটা দেখাল ভুতুবাবু। পরে খদ্দেরের সাড়া পেয়ে উপসংহার টেনে দিল চট করে।—তা গেছে যখন গেছেই, যার সঙ্গেই থাক্ ভালো থাকলেই ভালো, কি বলেন মা-লক্ষ্মী? আমাদের অতশত খোঁজে কাজ কি—

মহিলার সকল দোষ সকল অপ্রিয় আড়ম্বর মন থেকে মুছে গেছে সান্ত্বনার। আ-হা, যা ভাবছেন মহিলা, তাই যেন সত্যি হয়।···ওঁর এত আনন্দ এত আশা আবার যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়। ভুতুবাবুর কথা মিথ্যে হোক, মিথ্যে হোক, মিথ্যে হোক।

বাড়ি ফিরতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন অবনী বাবু। বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বকাবকি করলেন একপ্রস্থ।—এ ঝড় যদি এসে যেত কি হত! কাকপক্ষী বাইরে নেই, অথচ মেয়ের যদি হুঁস থাকত একটুও!

কিন্তু ঝড় এলো আরো ঘণ্টাখানেক বাদে। এই এক ঘণ্টা জানালার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা। দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মেঘের নিচে মেঘ এসে জমছে। তার নিচে আবার। মাঝে মাঝে শুধু সেই জলদ গুড় গুড় শব্দ একটা। ভয়াল ভয়ঙ্কর, বিরাটের রুদ্র সুন্দর মহিমা। ওই পাহাড়, ওই মাটি, ওই গাছপালা, ওই বাতাস—সব এক মহারুদ্রের বেদনাতুর প্রতীক্ষায় স্তব্ধ, সমাহিত।

সান্ত্বনাও।

ঝড় এলো। ঝড় নয়, প্রলয়। কল্পান্ত।

জানালা বন্ধ করে ঘরের দরজার একটুখানি খুলে বারান্দার ওদিকের দেয়াল ছাড়িয়ে সেই ক্ষমাহীন লীলার দিকে চেয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। ঝড়ের ঝাপটায় দরজা আঁকড়ে আছে, জলের কণা ছুঁচের মত বিঁধছে মুখে। হুঁস নেই সান্ত্বনার।

মড়াই বন্ধনের অন্তিম বিদ্রোহ? পাহাড় ভেঙে পড়বে? প্রকৃতি লণ্ডভণ্ড করে দেবে তার আপন সৃষ্টি?···প্রাণের পরে আজ যেন তার অন্ধ ঈর্ষা। তবু অপরূপ! সমস্ত আকাশে বুঝি অজস্র সিংহের মাতামাতি হানাহানি। তবু অপরূপ। আলুথালু হতাশ বনস্পতি পড়ছে মুখ থুবড়ে। তবু অপরূপ।

দরজা ধরে ঠক ঠক করে কাঁপছে সান্ত্বনা। ভয়ে নয়, ওই বিরাটের স্পর্শে। ওই অপরূপের স্পর্শে। স্রস্ত বসন, জলকণায় সর্বাঙ্গ ভিজে, খোলা চুল উড়ছে। দুনিয়া ঝলসানো বাজ পড়ল একটা কড় কড় করে। দরজা আঁকড়ে তবু দাঁড়িয়েই আছে তেমনি। নির্বাক, নিষ্পলক, বোবা। কিন্তু ওর ভিতরে বলছে কেউ। বলছে কিছু। আর কাঁপছে থর থর।—থামো, থামো, থামো! আর দেখিও না, আর দেখিও না! আর দেখতে পারিনে! আর সইতে পারিনে। ওই সর্বগ্রাসী বিরাটের মুখোমুখি আর দাঁড়াতে পারিনে! এবারে শান্ত হও। এবারে প্রসন্ন হও। এবারে সুন্দর হও। শান্তি, শান্তি, শান্তি, শান্তি, শান্তি, শান্তি···

দু'চোখ বুজে এলো সান্ত্বনার। নিস্পন্দ, বিহ্বল।

[ক্রমশঃ।

ভগ্নবীণ

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

ভেঙে গেছে বীণ ছিঁড়ে গেছে তার,
তবু এ বীণার ক্ষীণ ঝঙ্কার,
কেন তুলে হাহাকার?
কেন আঁখি-কোণে শুধু অকারণে,
অশ্রু-বাদল বিরহ ব্যথায়
ঝরে পড়ে বার বার?

সুখের স্বপন সোহাগ যতন
গেছে যদি, যাক্, আঁখি-বিমোহন,
হাসি-সাথে যাক্ মায়া,
প্রেম যদি যায় কিবা রহে হায়
পথের ধূলায়, বেদনা লুটায়,
কায়া বিনে মিছে ছায়া!

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

পাঁচ

১৪ নং গ্রীণহোম রোড—খাওয়া দাওয়া সেরে রাত্রে যখন গিয়ে নিজের বিছানাটিতে শুয়ে পড়লাম—সত্যই মনটা একটু হালকা বোধ হল। এ রকম হালকা মন অনেক দিন যেন পাইনি।

রাত্রে আহারের পরিমাণ খুব বেশী না হলেও বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছিলাম। রুটি মাখন, বড় একখানা মাছ-ভাজা এবং ধবধবে সাদা আলু-সিদ্ধ করে মোলায়েম মসৃণ ভাবে মাখান। সঙ্গে চা-ও ছিল। সবই বেশ সুখাদ্য।

খাওয়া দাওয়া সেরে মিসেস ব্লেকের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলাম—সেই খাবার ঘরেই। ঘরের এক পাশে দেওয়ালে আগুন জ্বালাবার জায়গায় একটি ইলেকট্রিক আগুন জ্বালার দরুণ শীতটা কতকটা সহনীয় হয়েছিল। মিসেস ব্লেকই এক রকম আমাকে শুতে উপরে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, "আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আপনি আজ সকাল সকাল শুয়ে পড়ুন—আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে।"

বললাম "সত্যই আমি ক্লান্ত।"

চুপচাপ নিরিবিলি বিশ্রামের জন্য মনটা তখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। মিসেস ব্লেকের "শুভরাত্রির" উত্তরে তাঁকে "শুভরাত্রি" জানিয়ে আমি উপরে উঠে গেলাম। গিয়ে কাপড় ছেড়ে সটান শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

বিছানায় শুয়ে পড়ার একটু পরেই নীচে থেকে টুং-টাং পিয়ানোর ধ্বনি কানে এসে বাজতে লাগল। মিসেস ব্লেকই কি পিয়ানো বাজাচ্ছেন? চুপচাপ নিরিবিলি রাত্রে এই বিদেশী পল্লীতে দূর থেকে ভেসে-আসা পিয়ানোর বিদেশী স্বরে মনটা যেন নিজেরই নাগালের বাইরে গেল চলে—একটি অচেনা দেশে!

* * * *

সকালবেলা ঘুম ভেঙ্গেই যেন চমকে উঠলাম—এ আমি কোথায়? অজানা, অচেনা, নির্ব্বান্ধব দেশে একটা অসহায় আকুল মনোভাবে মনটা যেন উঠল কেঁদে। সমস্ত রাত ঘুমের মধ্যে আমি যে তোমাদেরই নিয়ে ছিলাম—সেই আমার আলোভরা নীল আকাশের ঝকঝকে দেশ, সেই সুধার মায়া-ভরা মিষ্টি মুখখানির অপরিসীম দরদ।

উঠতে ত হবেই। কোনও রকমে ভারি মনটাকে টেনে নিয়ে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নীচে নেমে গেলাম। খাবার ঘরে ঢুকে দেখি—টেবিলের উপর এক পাশে একটি সাদা চাদর পেতে আমার জন্য ব্রেকফাষ্টের সরঞ্জাম সাজান রয়েছে। পিছনে রান্না-ঘরের দিক থেকে একটা গুনগুন্ বিদেশী গানের সুর কানে ভেসে এলো। মিসেস ব্লেকই গাইছেন বোধ হয়।

মিসেস ব্লেককে কি ভাবে ডেকে খাবার চাইব ভাবছি—এমন সময় মিসেস ব্লেকই এসে ঘরে ঢুকলেন। আগেই বলেছি—মিসেস ব্লেক খুব দ্রুত চালে-চলেন এবং সেই ভাবেই এসে ঢুকলেন ঘরে।

হেসে আমাকে সুপ্রভাত জানিয়ে শুধালেন—"ঘুম ভাল হয়েছিল ত? অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুলেন।"

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, ৯টা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। বললাম "হাঁ। আপনি খুব সকাল সকাল ওঠেন বুঝি?"

বললেন "হাঁ। আমি ভোর ৫টা বাজতে না বাজতে উঠে পড়ি। সংসারের অনেক কাজ করতে হয়ত। একটা ঝি অবশ্য আমার আছে। কিন্তু সে ঘণ্টা দুই এর জন্য এসে ঘর দোর পরিষ্কার করে দিয়ে চলে যায়। বাকি সব কাজই ত আমার।"

এই বলে হেসে আমার দিকে চেয়ে বললেন "বসুন। এখুনই আপনার ব্রেকফাষ্ট নিয়ে আসি।"

ঘর থেকে চলে গেলেন। হঠাৎ মনে হল এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুলে বোধ হয় ভদ্রমহিলার অসুবিধা হয়, তাই ঐ ভাবে কথাটির ইঙ্গিত দিলেন আমাকে।

ব্রেকফাষ্ট নিয়ে এসে সাজিয়ে দিলেন টেবিলে। বিশেষ কিছুই নয়। চা, দু'টুকরো রুটি ও মাখন এবং একটি সিদ্ধ ডিম। খেতে অবশ্য ভালই লাগল কিন্তু খাওয়াটা একটু কম-কম মনে হত লাগল।

আমি যখন ব্রেকফাষ্ট খাচ্ছি, মিসেস ব্লেক মাঝে মাঝে ঘরে যাতায়াত করছেন—এটা-ওটা-সেটা নানান কাজে। এক ফাঁকে বললাম, "মিসেস ব্লেক। আপনি এই শীতে অত ভোরে ওঠেন কি করে?"

খিল-খিল করে হেসে উঠলেন। বললেন "সবই অভ্যেস। বাধ্য হয়ে এ রকম অভ্যেস করতে হয়।"

শুধালাম, "আমি বেলা করে উঠেছি বলে আপনার বিশেষ অসুবিধা হল, না?"

বললেন "না। একদিনে আর কি এসে-যায়। কাল যে আপনি বড্ড ক্লান্ত ছিলেন। তবে সাধারণতঃ ৮॥ টা থেকে ৯টায় ব্রেকফাষ্ট খাওয়া শেষ হলেই আমার সুবিধা হয়।"

বললাম "কাল থেকে তাই হবে।"

বললেন "অনেক ধন্যবাদ!" ঘর থেকে আবার বেরিয়ে গেলেন।

ব্রেকফাষ্ট খেয়ে সহর অর্থাৎ লণ্ডন অভিমুখে রওয়ানা হলাম—আমার ডাক্তারী পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে।

যাওয়ার সময় মিসেস ব্লেক শুধালেন, "আপনি কখন ফিরে আসবেন? ৬ টার মধ্যে ফিরে আসবেন আশা করি। আমরা সাড়ে ছটায় সাপার খাই।"

বললাম, "তার অনেক আগেই ফিরে আসব। আমার কাজ শেষ হলে লণ্ডনে আমি আর এক মুহূর্ত্তও থাকব না।"

* * * *

লণ্ডনের কাজ-কর্ম্ম সেরে ফিরে আসতে আসতে আমার প্রায় পাঁচটা বাজল। লণ্ডনেই মধ্যাহ্নে সামান্য কিছু আহার এবং চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনের কাছাকাছি লায়ন্‌স কর্ণার হাউসে (চা ইত্যাদি জলযোগের দোকান) চা খেয়ে নিয়েছিলাম।

রাত্রে সাপার খেয়ে মিসেস ব্লেকের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম। কথায় কথায় মিসেস ব্লেকের পরিচয়ও কতকটা পাওয়া গেল।

মিসেস ব্লেকের স্বামী বেঁচে আছেন ; তিনি সুদূর মেসোপটেমিয়ায় সৈন্য বিভাগে কাজ করেন—ক্যাপটেন ব্লেক। ১৪ নং গ্রাণতোম রোড তাঁদের ৯৯ বছরের জন্য লীজ নেওয়া বাড়ী। ক্যাপটেন ব্লেক যা মাসোহারা পাঠান তাতে এই বাজারে মিসেস ব্লেকের চালান কঠিন। তাই তিনি দু'-একটি ভাড়াটে অতিথি বাড়ীতে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। তবে বেশী দিনের জন্য নয়। মিসেস ব্লেক আশা করেন যে, বছর খানেকের মধ্যেই তিনি তাঁর স্বামীর কাছে মেসোপটেমিয়ায় যেতে পারবেন ; এবং তখন এ বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে যাবেন চলে।

আমিও তোমাদের বিষয়ে অনেক গল্প করলাম। তোমাদের বিষয়ে কথা বলতে খুব ভাল লেগেছিল—আজও মনে আছে। তখন মিসেস ব্লেক তোমাদের ছবি দেখতে চাইলেন। উপরে শোবার ঘরে গিয়ে সুটকেশের ভিতর থেকে তোমাদের ছবিগুলি নিয়ে এসে মিসেস ব্লেককে দেখালাম। তিনি খুব আগ্রহ সহকারে সব ছবিগুলি দেখলেন—বিশেষ করে সুধার ছবি। বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, "কি মিষ্টি! কি মিষ্টি চেহারা।" তারপর একটু হেসে বললেন, "ছবিগুলি আজ আমার কাছে থাক। কাল সকালে আমি আপনার ঘরে সাজিয়ে দেবো। কেমন ?"

হেসে বললাম "বেশ ত।"

পরের দিন বিকেলে লণ্ডন থেকে ফিরে এসে দেখি, সত্যিই ছবিগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আমার শোবার ঘরে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছেন—দেওয়ালে আগুন জ্বালাবার উনুনটির উপর একটি তাক আছে সেইখানে। কেবল সুধার ছবিটি রেখেছেন—আমার প্রসাধন টেবিলের উপর। শুধু তাই নয়, সুধার ছবিটি আবার সাজিয়েছেন ফুল দিয়ে।

* * * *

মিসেস ব্লেকের বাড়ীতে দিন দশেক কাটল—ঐ একই ভাবে। সকালবেলা ব্রেকফাষ্ট খেয়ে আমি সহরে চলে যাই, বিকেলে ফিরি, সন্ধ্যাবেলা সাপার এক সঙ্গেই খাই এবং তারপর বেশ খানিকক্ষণ মিসেস ব্লেকের সঙ্গে গল্প করি কিংবা হয়ত খানিকটা বেড়িয়ে আসি।

যদিও রাত্রে বাইরে প্রচণ্ড শীত, তবুও মিসেস ব্লেকের প্ররোচনায়ই প্রথম বেড়াতে বেরিয়ে দেখলাম—বেশ ভালই লাগে। গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে গলায় মাফলার জড়িয়ে, মাথায় টুপি দিয়ে, হাতে দস্তানা পরে বাড়ী থেকে বেরিয়েই খানিকটা খুব জোরে হন্ হন্ করে হাঁটতে হয়। এবং তারপর শরীরটা একটু গরম হয়ে উঠলেই বাইরের ঠাণ্ডাটি মধুর লাগতে সুরু করে। অবশ্য যদি বাইরে বৃষ্টির উপদ্রব না থাকে। কেন না এদেশে প্রায়ই বৃষ্টি হয়, বিশেষতঃ শীতকালে।

এই দিন দশেকের মধ্যে মিসেস ব্লেক মাত্র দুই দিন আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু প্রথম দিনই বেড়াবার এমনই একটি সুন্দর জায়গার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন—যার কথা আমি জীবনে ভুলব না। এই জায়গাটির নামই এলটাম পার্ক, যার নামে এই পল্লীটির নামকরণ হয়েছে। এমন প্রাণজুড়ানো মনোরম স্থান আমি খুব কমই দেখেছি এবং স্থানটির স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমাদের বাড়ীর পিছন দিকে আর এক সারি একই ধরণের বাড়ী এবং তার সামনে একটি রাস্তা। সেই রাস্তার ওপাশেই এলটাম পার্ক—খোলা সবুজ মাঠ অনেক দূর পর্য্যন্ত চলে গিয়ে ঢেউ খেলিয়ে নেমে গেছে নীচে এবং সেই মাঠের উপর ছড়ান মাঝে মাঝে বড় বড় কয়েকটি গাছ—এইমাত্র। একটা অবশ্য নাতিপ্রশস্ত কালো পায়ে-চলা পথ সেই মাঠটিকে চারি দিকে ঘিরে আছে—সবুজ শাড়ীর কালো পাড়ের মতন এবং এই রাস্তাটির ধারে ধারে কিছুদূর অন্তর অন্তর একটি বেঞ্চি পাতা—পথিকদের বসে বিশ্রাম করার ঠাঁই। এই পার্কটির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, সাধারণত সহরের পার্ক বলতে আমরা যা বুঝি—এটা মোটেই তা নয়। ছোট-বড় ছাটাইকরা নানান রকম গাছের সারি দিয়ে সাজিয়ে, নানান রংএর ফুলের গয়না পরিয়ে এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যটুকু ক্ষুন্ন করার কোনও চেষ্টা ত হয়ইনি বরং স্থানটির স্বাভাবিক মাধুর্য্যটুকু যাতে সহজেই চোখে পড়ে, সেই দিকে যেন কর্ত্তৃপক্ষের নজর।

এই পার্কটির স্মৃতির সঙ্গে আমার সে যুগের মনের অনুভূতির

নিবিড় যোগ—তাই পার্কটির কথা এত করে বললাম। এলটাম পার্কে থাকার সময় আমি নিজে এখানে এসে প্রায়ই চুপচাপ একলা ঘুরে বেড়াতাম—বিশেষতঃ চাঁদের আলোতে। শীতকালের রাত্রে—লোকজন বেশী থাকত না। দু'-চার জোড়া তরুণ-তরুণী হয়ত আশে পাশে বেঞ্চিতে নিজেদের প্রেমের ভাবে বিভোর হয়ে থাকত বসে কিংবা হয়ত ধীর পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াত নিজেদের মৃদু কথাবার্ত্তার মধ্যেই তন্ময় হয়ে। অন্য কাউকে কেউ লক্ষ্যও করে না, অন্য কাউকে কেউ যেন চেয়েও দেখে না। তাই নিরিবিলি আপন মনে বেড়াতে কোনও দিন কোন বাধা পাইনি এখানে।

বুলা! আগেই বলেছি, একটা ভারি মন নিয়ে এ দেশের জীবন আমি সুরু করি। সেই প্রথমেই আমার মনের বেলুন যে চুপসে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, কিছুতেই তাকে এ দেশের হাওয়ায় ভরিয়ে হাল্কা করে আকাশে ভাসিয়ে তুলতে পাচ্ছিলাম না। এ দেশের হাওয়ায় যে নিজের মনের কোনও খোরাক পাইনি—মনটাকে ভরাই কি দিয়ে? সে যুগে আমার মনের সমস্ত খোরাক ছিল, সেই সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে, সেই নীল আকাশের দেশে তোমাদের ঘরে—একটা উপবাসী মনের মাটিতে এলিয়ে-পড়া ছাড়া উপায়ই বা কি?

তাই বোধ হয় ফুরসুৎ পেলেই ছুটে ছুটে আসতাম এলটাম পার্কে, একলা—যেন একটা নেশার ঝোঁকে। এই ঘন সবুজ ঘাসের উন্মুক্ত আবহাওয়ায় এ দেশটাকে ভুলে খানিকক্ষণ তোমাদের নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতাম—তোমাদের প্রত্যেকের বিষয় ছোট ছোট খুঁটিনাটি কত কথা যে মনে ভেসে ভেসে উঠত, আমার নিজের সে সব জানা ছিল বলে কখনও ভাবি নি। বেশ মনে আছে—কুয়াশাচ্ছন্ন চাঁদের আলোয় স্থানটিকে নিয়ে ক্রমে আমার মনে গড়ে উঠত একটা মায়া-রাজ্য—না এদেশের না ওদেশের; এবং সেই মায়ারাজ্যে আমি তন্ময় হয়ে ঘুরে বেড়াতাম তোমাদের সঙ্গে, যেন একটা অপূর্ব্ব নেশার পুলকে। হঠাৎ চমকে উঠতাম—হাতঘড়িতে চেয়ে দেখতাম ১১টা বেজে গেছে—নেশা যেত কেটে, ফলে দ্বিগুণ অবসাদ ভরা মন নিয়ে ধীর পদক্ষেপে ফিরে আসতাম—১৪ নং গ্রীণহোম রোডে।

* * * *

মিসেস ব্লেকের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল আরো একটা দিক দিয়ে। মিসেস ব্লেক বিশেষ সঙ্গীতানুরাগিণী ছিলেন এবং সন্ধ্যেবেলা খাওয়ার পর মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে নিতেন তাঁর গানবাজনা শোনাবার জন্য। মিসেস ব্লেকের মনোরঞ্জনের জন্য খানিকটা আমাকে থাকতেই হত, তারপর অভদ্রতা কাটিয়ে—একটু বেড়িয়ে আসি বলে—পালিয়ে যেতাম এলটাম পার্কে।

বাড়ীতে ঢুকেই ডাইনে খাবার ঘর—বাঁয়ের ঘরটি ছিল মিসেস ব্লেকের গান-বাজনার আসর। এইটিই মিসেস ব্লেকের বসবাস ঘর,—মেঝেয় মোটা কার্পেট পাতা, দামী আসবাবপত্রে সাজান এবং ঘরের কোণে একটি পিয়ানো। ইংরাজী সঙ্গীত সে যুগে আমি কিছুই বুঝতাম না, তবে পিয়ানোর উপর মিসেস ব্লেকের অঙ্গুলি সঞ্চালনের ভঙ্গীতে মনে হত পিয়ানো তিনি ভালই বাজান এবং যখন তিনি গান গাইতেন, গানের সুরটি মাঝে মাঝে কানে মিষ্টিই লাগত। ওঁর গানের দু'-একটি পদের সুর আজও আমার কানে বাজে। যখন তিনি টেনে টেনে গলা কাঁপিয়ে গাইতেন

"Spring is co-o-o-ming—"

কিংবা "long long rest
In your snow-white nest
—Kiss your mammy—" ইত্যাদি

তখন গলায় সুরের খেলায় মনে হত—ও দেশের মাপকাঠিতে বোধ হয় তিনি ভালই গা'ন! এই সঙ্গে বলে রাখি, ক্রমে তিনি আমাকে দুটি গানও শিখিয়েছিলেন।

যথা— "I passed by your window
In the cool of the night
Lilies were watching
So still and so white
Oh! I sang softly
no one was near
—Good night! God bless you
my dear." ইত্যাদি।

গান দুটি মোটামুটি শিখেই আমার মন আকুল হয়ে উঠেছিল তোমাদের জন্য—আজও মনে আছে—কবে দেশে গিয়ে তোমাদের এই গান শোনাব। বোধ হয় গান শেখার অনুপ্রেরণাও পেয়েছিলাম—তোমাদের শোনাব বলে। কিন্তু তোমাদের কোনও দিনই শোনান হল না।

* * * *

এই দিন দশেকের মধ্যে চন্দ্রনাথ এখানে বেড়াতে এসেছিল দু'দিন। প্রথম দিন বিকেলে আমার সঙ্গে এসে 'চা' খেয়ে গল্প করে ঘণ্টা দুই থেকে ফিরে গেল। এবং দ্বিতীয় দিন আমারই নেমন্তন্নে বিকেলে এসে, রাত্রের খাবার খেয়ে, এলটাম পার্কে বেড়িয়ে অনেক রাত্রে ফিরে গিয়েছিল এবং সেদিন মিসেস ব্লেকও বেড়াতে বেরিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে এবং এটুকুও আমার লক্ষ্য এড়ায় নি যে, চন্দ্রনাথকে মিসেস ব্লেকের বিশেষ ভাল লেগেছিল। চন্দ্রনাথেরও সবই খুব পছন্দ হয়ে গেল—স্থানটি, বাড়ীটি এবং মিসেস ব্লেককেও।

রাত্রে খেতে বসে মিসেস ব্লেককে বললাম, "আমার এই বন্ধুটির জন্য আপনাকে একটা ঘর দিতেই হবে, মিসেস ব্লেক!"

মিসেস ব্লেক তৎক্ষণাৎ সহাস্যে উত্তর দিলেন "নিশ্চয়ই দেবো। এ মাসটা যাক—(চন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে) ডিসেম্বর মাসের প্রথম থেকেই আপনি আসতে পারেন, যদি অবশ্য এ বাড়ী আপনার পছন্দ হয়।"

বললাম, ঘরের যদি আপনার অসুবিধা হয়, আমার ঘরে আর একটা ছোট খাট ধরে যাবে—আমরা দু'জনেই না হয় এক ঘরেই থাকব।"

চন্দ্রনাথ বলল "আমি রাজী আছি। আমারও এ বাড়ী খুব ভালই লেগেছে।" এ কথা অবশ্য চন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার আগেই হয়েছিল।

মিসেস ব্লেক বললেন "না না, তাহলে মিঃ বাগচীর (চন্দ্রনাথের) কষ্ট হবে। আমি আমার শোবার ঘরই ছেড়ে দেব।"

শুনে একটু অবাক হলাম—নিজে শোবার ঘর দেবেন ছেড়ে!

আগ্রহ ত কম নয়! মিসেস ব্লেকের শোবার ঘর দোতালায়, আমার ঠিক পাশেই বেশ বড় ঘর, এবং আমার ঘরের চেয়ে অনেক ভাল খাট-বিছানা প্রভৃতি আসবাবপত্রে সাজান। আমার ঘরে একটা কিন্তু মিসেস ব্লেকের শোবার ঘরে দুটো বড় বড় জানালা!

বললাম, "তা হলে আপনার ?"

বললেন, "আমার জন্য ভাববেন না। পিছনে একটা ছোট ঘর আছে—আমার থাকার পক্ষে যথেষ্ট হবে।"

চন্দ্রনাথ অনেক ধন্যবাদ দিয়ে কথা পাকা করে নিল। আমার সঙ্গে যে ব্যবস্থা, সব ঠিক সেই ব্যবস্থাই হলো—এমন কি দেনাও সপ্তাহে দু গিনি।

আরও একটু অবাক হলাম, যখন রাত দশটা পর্য্যন্ত এলটাম পার্কে বেড়িয়ে মিসেস ব্লেক আমাদের সঙ্গ না ছেড়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত এলেন—চন্দ্রনাথকে ট্রেনে তুলে দিতে। ওখান থেকে ষ্টেশনটির দূরত্ব নেহাৎ কম নয়—বোধ হয় প্রায় এক মাইল হবে।

রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে যেতে মিসেস ব্লেক বললেন—"চমৎকার আপনার এই বন্ধুটি! স্থির, ধীর—সুন্দর কথাবার্ত্তা।"

বললাম, "ওকে আপনার এত পছন্দ হয়েছে জেনে খুবই খুশী হয়েছি। ওই ত এ দেশে আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।"

বললেন, "এ রকম বন্ধু পাওয়াতে আপনি ভাগ্যবান।"

মাথায় বোধ হয় একটু দুষ্টু বুদ্ধি এলো। বললাম "হাঁ, বাইরের ভাগ্য কিছু কিছু আমার আছে অস্বীকার করি না। কিন্তু আসল ভাগ্যটি আমার নেই।"

একটু হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে শুধালেন "কি রকম ?"

বললাম, "এই ধরুন না, আপনার বাড়ীতে বাস করার সুবিধা পেয়েছি, আপনি আমাকে কত যত্ন করেন—সবই আমার ভাগ্য। কিন্তু আসলের বেলায় দেখি ফাঁকি।"

বললেন, "এখনও বুঝতে পারি নি।"

বললাম, "আপনার পছন্দসই মানুষটি হওয়ার ভাগ্য চন্দ্রনাথের দু'দিনেই হল—আমার এত দিন থেকেও হল না!"

হেসে বললেন "আপনি ভয়ানক হিংসুক প্রকৃতির লোক ত!'

বললাম, "হিংসার কারণ ঘটলেই লোকের হিংসা হয়।"

বললেন, "আপনি অবাক করলেন।"

বললাম, "কেন ?"

হেসে বললেন, "আপনার মনটি সাত সমুদ্র তের নদীর পারে একখানি মিষ্টি মুখের কাছে বাঁধা—এ দেশের কিছুই আপনার মনটিকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না—সেইটুকুই ত এতদিন লক্ষ্য করে এসেছি।"

বললাম, "তাই বলে এ দেশ সামান্য দানাপানি দিয়ে আমাকে অচ্ছুৎ করে রাখবে—সেটাই বা সইতে পারি কৈ ?"

খিল-খিল করে হেসে উঠলেন। বললেন, "আপনি ভয়ানক দুষ্টু।"

* * * *

মিসেস ব্লেকের বাড়ীতে দিন দশেক থাকার পর এমন একটি ঘটনা ঘটল, যাতে আমার অবসাদ ভরা ভারি মন একটা বিস্বাদে উঠল ভরে। সেই কথাই এইবার বলি। [ক্রমশঃ।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

পার্ক ষ্ট্রীটে কোনো একটি ক্লাবে,—অসীমের পাশের সোফায় আড়ষ্ট ভাবে বসেছিলো সুমিতা।

কত রকমারী ফ্যাসান-দুরস্ত ছেলে-মেয়ের ভিড় এখানে। এদের চলনে, বলনে নেই কোনো জড়তা। এদের ভেতর থেকে দু'-চারজন বিদগ্ধসমাজের কেষ্টবিষ্টুদের সঙ্গে সুমিতার আলাপ করিয়ে দিলো অসীম।

এর মধ্যে ছিলেন একজন বর্ষীয়সী মহিলা। উজ্জ্বল-শ্যাম গায়ের রং; আঁটসাঁট গড়ন, মুখখানি বেশ লাবণ্যে ঢলঢলো!

পরিধানে তাঁর দুধ-গরদের থান, শাদা সিল্কের ব্লাউস—হাতে বাছুরের চামড়ার শাদা ভ্যানিটিব্যাগ, পায়ে হাইহিল শাদা জুতো! চালচলন সবজান্তার ভাব সুস্পষ্ট।

—তিনি এসে পাশের সোফাটি দখল করে বসে জিজ্ঞাসা করলেন—অসীম, এ মেয়েটি কে? আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না?

—হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে জবাব দেয় অসীম। আমার দাদার বন্ধু সোমনাথ ত্রিবেদীর কন্যা সুমিতা ত্রিবেদী। হ্যাঁ, ওঁর ক্লাবে পদার্পণ, আজই প্রথম!

—সুমিতার দিকে ফিরে বলে—এস মিতা, তোমার আলাপ করিয়ে দিই মাসীমার সঙ্গে—ইনি বিখ্যাত আর্টিষ্ট স্বর্গীয় তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাচে, গানে, শিল্পকলায় অদ্ভুত দক্ষতা এঁর! এঁর অলকাপুরীতে অনেক ছেলে-মেয়ে নাচ-গান শিখে বিখ্যাত হয়েছে।

আচারলব্ধ শিক্ষাগুলো যাতে জনসমাজে প্রচারিত হয়, দেশ-বিদেশে এঁর ছাত্র-ছাত্রীরা আদর্শ শিল্পিরূপে পরিচিত হয়, সেজন্যে মাঝে মাঝে কমপিটিসন জলসার আয়োজনও করা হয় এঁর ব্যবস্থাপনায়।

মৃদু মৃদু হাসেন মাসীমা। সিঁদুর-রং ঠোঁট দু'টির ফাঁকে শাদা মার্বেলের মত চকচকে দাঁতের সারি চিকমিকিয়ে ওঠে! কৌতুক ভরে বলেন তিনি—আঃ, তুমি যে সেই আগেকার চারণদের মত আমার গুণগান সুরু করলে অসীম! নিজের উপলব্ধি দিয়েই সেটা ওকে বোঝবার সুযোগ দেওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত নয় কি? আজকালকার এই বিজ্ঞান-সর্ব্বস্ব যুগের মানুষ চায়, সব কাজের পেছনেই থাকবে একটা অকাট্য যুক্তি—তবেই হবে সেটা গ্রহণযোগ্য, তার থেকেই জন্মাবে বিশ্বাস, নির্ভরতা, বুঝেছো, না সে সব ও ক্রমেই বুঝতে শিখবে।

—আচ্ছা এখন তোমার কি কি শিক্ষা চলছে, শুনি তো মা?

সুমিতা জবাব দিতে পারে না। এত রকমারী মানুষের ভিড়ে সে এর আগে আর কখনও আসেনি, ওর যেন কেমন ভয়-ভয় করছিলো।

অসীম বোঝে ওর অবস্থাটা। জবাব সেই দেয়,—বাড়ীতেই শেখা সব ওর। আগে শুনেছি বেশ ভালো নাচতো, তবে এখন সে সব ছেড়ে দিয়েছে। গানের গলা চমৎকার, আর পিয়ানো, গীটার এই'আজ-কাল যেটা চলছে, সে সব শিক্ষাও চলছে ওর।

আঁকার ওপরও বেশ দখল আছে, ক্যালকাটা গার্লস কলেজে পড়ে, আসছে বছরে বি, এ, দেবে! তবে বাইরের সোসাইটিতে তেমন যাতায়াত, মেলামেশা নেই কি না, সেজন্য ঐ স্মার্টনেশের অভাবটা রয়ে গেছে।

মনোযোগ দিয়ে সব শুনে মিহি গলায় মন্তব্য প্রকাশ করেন মাসীমা। খুব ভালো কথা। অল্পবিস্তর সব শিক্ষাই আছে এর ভেতর; খালি একটু কালচারের পালিশ দিয়ে নিলে, চমৎকার হবে এ মেয়ে! তুমি আমার অলকাপুরীতে এসো মা, তোমাকে আমি—মানে আমি, তৈরী করবো। আই মাষ্ট মেক্ এ জেম্ অফ ইউ!

দিদিমাকে বোলবো আপনার কথা। শুষ্ককণ্ঠে জবাব দেয় সুমিতা।

মহাব্যস্ত ভাবে বলেন মাসীমা—নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! তাঁকে বলবে বৈ কি! তাঁর মত নেবে বৈ কি। আমি আজই তোমাকে আসতে বলছি না, তবে কি জানো? তোমার দিক দিয়েও ইচ্ছার প্রাবল্যটা থাকা চাই মা, তবেই ঠিক কালের সঙ্গে তাল রেখে চলবার যোগ্যতা অর্জ্জন করবে।

ঐ যে দেখছো, ফ্লোরে যে মেয়েটি এসে দাঁড়ালো, এখনি সুরু হবে ওর নাচ। ওটি আমারই হাতের তৈরি একটি জুয়েল; সিনেমায় এখন ওর কত নাম! ছবির পর্দ্দায় নিশ্চয়ই দেখেছো ওকে—মনে পড়ছে না? তোমাদের শুকতারা সেন গো!

—সিনেমা? বাংলা বই দিদিমা পছন্দ করেন না কি না, তাই দেখা হয় না আমার।

মিন-মিন করে সুমিতার কণ্ঠস্বর। ফ্যানের তলায় বসেও বিনবিনিয়ে ঘামতে থাকে সে। অবাক চোখে চেয়ে থাকে—অদূরে ফ্লোরের ওপর নৃত্যরতা লাস্যময়ী শুকতারার দিকে।

সে নিজেও নাচতে শিখেছিলো বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এ নাচের তুলনা হয় না। কিন্তু নাচের পোষাকটা বিশ্রী! এত লোকের ভিড়ে চোখ-ধাঁধানো ঝলমলে নিওন লাইটের মাঝে ভারি লজ্জা করে ওর। বিমুগ্ধ দর্শকদের উচ্ছ্বসিত সাধুবাদের মাঝে শুকতারার নাচ শেষ হল।

উঠে দাঁড়ালেন মাসীমা। সুমিতার হাতটা ধরে আকর্ষণ করে বললেন—এসো আমার সঙ্গে। অসীম, তুমিও এসো।

পাশের একটি নির্জন কক্ষে তিনি ওদের নিয়ে বসলেন। বয়রা ছুটলো তাঁর অর্ডার মত খাদ্যসম্ভার আনতে।

এক ঝলক মিষ্টি হাওয়ার মত, মূল্যবান প্রসাধনীর সুবাস ছড়িয়ে, নৃত্য-ভঙ্গিমায় ছুটে এলো শুকতারা সেন।

চটুল কণ্ঠস্বর তার জলতরঙ্গের মত বেজে উঠলো—হ্যালো, অসীম যে! ক্লাবে কি অরুচি ধরে গেলো?

আরে না, না। এই বৈষয়িক গণ্ডগোল নিয়ে কিছু দিন বড় ব্যস্ত ছিলাম কি না! সহাস্যে জবাব দেয় অসীম।

—আজ আমরা একটি নতুন মেয়েকে পেলাম, আমাদের অলকাপুরীর জন্য। এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলেই মনে হয় আমার। এর নাম সুমিতা ত্রিবেদী। আর এর পরিচয় তো তোমাকে একটু আগেই দিয়েছি সুমিতা। দু'জনের যোগাযোগ ঘটালেন মাসীমা! নমস্কার-বিনিময় শেষ করে—

সুমিতার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় শুকতারা, কৌতুক ভরে নজর বোলায় ওর সর্ব্বাঙ্গে। তারপর মিষ্টি হাসি রক্তপলাশের মত ঠোঁটে মাখিয়ে নিয়ে বলে—আপনি যে একটি জিনিয়স, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ আমি। কেন না, মাসীমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ, ধারণা তেমনি নির্ভুল! আপনার লোভনায় সঙ্গলাভের সৌভাগ্য মাঝে মাঝে হবে আশা করি। কি বলো অসীম?

এমন সুষ্ঠু ভাষায় আত্মপ্রশংসা শোনায় অনভ্যস্তা সুমিতা কি যে জবাব দেবে ওর কথার, হঠাৎ কিছু ভেবে পায় না। দ্রুততালে সুরু হয়েছে ওর বক্ষস্পন্দন। গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে উঠেছে। শুষ্ককণ্ঠে বলে সে, আমি—আমি অতি সাধারণ, এবারে কিন্তু আমি বাড়ী যাবো, দিদিমা হয়তো ভাবছেন!

উচ্ছ্বসিত হাসির ঝড় বয়ে গেলো ওর কথায়। মাসীমা ওর পিঠে মৃদু মৃদু চাপড় দিতে দিতে বলেন—আমি নিজে গিয়ে তোমাকে পৌঁছে দেব মিতা!

মাসীমার অর্ডার মত খাবারের প্লেট এলো। কাপ, ডিস, বোতল গ্লাস সবই এলো। ডিসে সাজানো মাটন্ চপ, স্যাণ্ডউইচ, পোটাটো-চিপস আর কেক্। তার সঙ্গে স্যালাড আর ফিস ফ্রাই!

—খেয়ে নাও মা! সুমিতাকে অনুরোধ করেন মাসীমা।

—শুধু একটু কেক দিন আমায়, এসব আমি খাবো না, শরীরটা ভালো লাগছে না।

ত্রিমূর্ত্তির সুমিষ্ট বাকাতাড়নায় শেষ পর্য্যন্ত সুমিতার আপত্তি টিকলো না! অতি কষ্টে গিলতে লাগলো খাবারগুলো,—যেমন করে রোগী ওষুধ গেলে ডাক্তারের তাড়নায়।

শুকতারা আর অসীমের হাতে ফেনিল তরল পানীয়-পূর্ণ কাচের গেলাস। খাদ্যের ফাঁকে ফাঁকে ওরা চুমুক দিচ্ছে ওতে। সুমিতা মাঝে মাঝে মুখ তুলে চায় ওদের দিকে—ভয় আর বিস্ময় ছ'টি চোখে ওর!

মাসীমা বোঝেন ওর মনের কথা। নিজের গ্লাসটি সরিয়ে রেখে, ছটি পাত্রে কফি ঢাললেন, একটি ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে অপরটি নিজে গ্রহণ করলেন।

নিজের মণিবন্ধে আঁটা ঘড়িটার পানে চেয়ে চমকে ওঠে সুমিতা। উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল ভাবে বলে—আমি আর এখানে থাকবো না, ওদিকে—

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে শুকতারা—দিদিমা ভাবছেন? তা মিতা দেবীর দিদিমার ভাবনাটা কিছু অমূলক নয়—অসীম! এত রাত হলো,—তার পর—তুমি সঙ্গে, ছিপিখোলা সোডার বোতলের মত, হাসির তরঙ্গ ছিটকে উঠলো শুকতারার কণ্ঠে!

মাসীমা মোলায়েম কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি ঢেলে দিয়ে বলেন—আহা, তোমরা ওর অবস্থাটা বুঝতে চাইছো না, বেচারী বড় ভালো মেয়ে।

ভালো মেয়েদের চাল-চলন এই রকমই হয় কি না। এখুনি আমরা সকলেই উঠবো মিতা, কফিটা খেয়ে নাও।

—দুরু-দুরু কম্পিত বক্ষে ওঁর আদেশ পালন করে সুমিতা।

মাসীমা সুমিতার সঙ্গে চললেন। শুকতারার পা ছুটো যেন টলছে—অসীম নিজের বাহুবন্ধনে নেয় ওর একখানি হাত,—বলে,—এসো,—তোমার গাড়ীতে যাবে? না আমি পৌঁছে দেব?

—নিজেকে মুক্ত করে নেয় শুকতারা!—আঁকাভুরু বাঁকিয়ে, মদিরোচ্ছল দৃষ্টিবাণ হেনে বললো,—থ্যাঙ্ক ইউ এ লট—আই উইল ম্যানেজ—গুড বাই! সুমিতা দেবি! আবার দেখা হবে আশা করি!

একটা ইংরিজি গানের কলি, গুন্-গুন্ করে ভাঁজতে ভাঁজতে, নাচের ভঙ্গিমায় পা ফেলে ফেলে—ওদের আগে আগে এগিয়ে গেলো শুকতারা সেন।

রাত্রি দশটা বেজে গেছে। মাসীমাকে ড্রইংরুমে বসিয়ে দিদিমাকে ডাকতে গেলো সুমিতা।

বাড়ীটার যেন কেমন থমথমে ভাব! লজ্জায় ভয়ে ওর সর্বাঙ্গ যেন কেঁপে উঠছে! নাঃ,—কাজটা ভালো হয়নি! দারুণ অনুশোচনায় ওর মনটা ভরে ওঠে!

—এদিক-ওদিক ঘুরে সে দিদিমার সন্ধান করে। কোথায় দিদিমা? সে এত রাত করে বাড়ী এলো, কই চিন্তাকুল হয়ে দিদিমা ছুটে এসে, এর কৈফিয়ৎ চাইলেন না তো? ছোট মাসী, মামা, কৈ! কারুর দেখা মিলছে না যে!

দিদিমার ঘরের পেছনের বারান্দায়, একটি ইজিচেয়ারে মুদিত নেত্রে অর্দ্ধশয়ান ভাবে পড়েছিলেন তিনি!

সুমিতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকবার পর সঙ্কোচ ভরে ডাক দেয়, দিদিমা! মিসেস বর্দ্ধণ এসেছেন আপনার সঙ্গে আলাপ করতে, আপনি একবার যাবেন কি?

উঠে বসলেন দিদিমা। তাঁর থমথমে অন্ধকার মুখখানি মিতার বক্ষস্পন্দনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো।

—বর্দ্ধণ! সে আবার কে? এত রাত্রে যেচে আলাপ করতে এলেন, ব্যাপার তো কিছু বুঝতে পারছি না? আচ্ছা যাও তুমি, আমি যাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন ও মৃদু প্রসাধন সেরে, ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়ে ড্রইংরুমে এলেন দিদিমা।

যুক্তকরে নমস্কার জানিয়ে, বিনীত কণ্ঠে বললেন,—কি সৌভাগ্য আমার! আপনি এসেছেন আমার সাথে আলাপ করতে? তা অসীম, তোমাকে পেয়েও বড় খুসি হলাম, না খেয়ে কিন্তু যাওয়া হবে না, ওরে অ রুবি, এদিকে আয়তো মা, দেখ এসে, কে এসেছেন!

মিসেস বর্দ্ধণ প্রতিনমস্কার জানিয়ে বলেন, আপনি বসুন দিদি, মোটেই ব্যস্ত হবেন না আমাদের জন্যে, এই মাত্র খেয়ে আসছি আমরা।

অসীম দিদিমার পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় ছুঁইয়ে বলে—অলকাপুরীর নাম নিশ্চয়ই আপনার অজানা নেই, তারই প্রতিষ্ঠাতা ও স্বনামধন্যা পরিচালিকা ইনি, মিসেস বর্দ্ধণ। ওঁর শিক্ষার পরিকল্পনা যেমন উন্নত, তেমনি সুরুচিপূর্ণ। আমার ইচ্ছা, সুমিতাকে ওঁর ছাত্রী করে দিই, অবশ্য আপনার আর মিতার যদি ইচ্ছা থাকে। ওঁর হাতে তৈরী প্রত্যেকটি মেয়ে, এক একটি জিনিয়স। মিতার ভেতরেও অনেক সদ্গুণ আছে, সেগুলো ওঁর সাহচর্য্যে পরিমার্জ্জিত হয়ে উঠবে।

—তুমি বড্ড বেশী বলে ফেলছো অসীম! আমি এমন কিছু অলৌকিক বিদ্যা জানি না, যে কয়লাকে হীরে করতে পারবো। তবে, যে প্রকৃত হীরে, তাকে কালচারের ভেতরে রেখে আরো দ্যুতিময় করাই আমার কাজ। মিতাকে অল্পক্ষণ দেখেই মনে হল ও একটি আসল রত্ন। ওকে পেলে, যোগ্যস্থানে শিক্ষা প্রয়োগ করার একটা সার্থক সৃষ্টির পরিতৃপ্তি; সেইটাই হবে আমার পরম আনন্দ লাভ।

—খুব ভালো প্রস্তাবই তো করেছেন আপনি, এতে আমার আপত্তির কি আছে? আর সুমিতার বাবাও অসীমের ওপর তার ভালো-মন্দর দায়িত্ব দিয়ে গেছেন শুনলাম, তখন তার মতামতেরও কিছুটা মূল্য আছে বৈ কি?

প্রসন্নভরা কণ্ঠে জবাব দেবার চেষ্টা করেন দিদিমা কিন্তু সে স্বরে বেজে ওঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

—তবে মনের গোপন বাসনা চুপি চুপি বলে,—

মন্দ কি! ঐ ক্লাবে তো রুবিকেও ভর্ত্তি করা যেতে পারে। এ্যারিষ্টোক্রেট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় বাইচান্স একটা কিছু ঘটে যেতেও তো পারে?

—আচ্ছা আজ আসি, রাত অনেক হলো, পরে আবার আসবো।

যুক্ত করে নমস্কার জানিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস বর্দ্ধণ। মোলায়েম হাসির সঙ্গে বললেন—একদিন আসুন না আমার অলকাপুরীতে, মনে হয় ভালো লাগবে আপনার।

—অবশ্যই যাবো, আপনি যখন নিজে এসেছেন আমার সঙ্গে আলাপ করতে। মেয়েদের উন্নতিমূলক শিক্ষার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে, নিশ্চয়ই অসীম বলেছে সে কথা আপনাকে?

অসীমের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিপাত করলেন দিদিমা, মিসেস বর্দ্ধণকে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে।

অসীমের রূপতৃষ্ণার্ত্ত চোখ দু'টি তখন সুমিতার রূপসুধা পান করছিলো, সেজন্যে দিদিমার অর্থপূর্ণ কথার জবাব মিললো না তার দিক থেকে—জবাব দিলেন মিসেস বর্দ্ধণ।

আপনার সুরুচির কথা আমাদের বিদগ্ধ সমাজে কারুর অজানা নেই দিদি! আপনাকে দেখবার, অনেক দিনের বাসনা আজ আমার পূর্ণ হল,—আচ্ছা—নমস্কার, আপনার বিশ্রামের হয় তো ব্যাঘাত করলাম!

আত্মপ্রশংসায় বিগলিতা দিদিমা, ভাবাবেগ সংবরণ করতে না পেরে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন মিসেস বর্দ্ধণকে। স্নেহোচ্ছল কণ্ঠে বললেন—ওকি কথা! কত ভাগ্যি আমার আপনার পায়ের ধূলো পড়লো আমার বাড়ীতে!

এর পর কত বার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাবো আপনার।

নিজে এগিয়ে গেলেন দিদিমা মিসেস বর্দ্ধণের গাড়ীর কাছে, তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে।

—সুমিতা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। ভাবে, যাক্ বাঁচা গেলো—দিদিমার রাগ পড়েছে তাহলে! কিন্তু ভুল ভাঙলো তার দিদিমার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে।

—এ-সব কি মিতা?—নিজেই যদি নিজের দায়িত্ব সব বুঝতে শিখেছ, তবে জামাইয়ের ভাত খেয়ে, তার বাড়ীতে থাকার আমার আর দরকার কি?—সব তো ঠিক করে এসেছো দেখছি! নেহাত সোমনাথ আমার ওপর তোমার ভার দিয়ে গেছে, তাই না বলে পারছি না, যখন অসীমের সঙ্গে বাইরে গেলে,—তখন রুবিকে তোমার সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিলো, সে তোমার সব কাজে সহায়তা করে, তোমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করে,—তোমারও কর্ত্তব্য তার সঙ্গে ঐ রকম প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করা—আজকের ব্যাপারে সে মনে যথেষ্ট আঘাত পেয়েছে!

সুমিতা দিদিমার মুখের পানে চেয়ে বিস্মিত ভাবে বলে—অসীম বাবু ছোটমাসীর যাবার কথা না বললে, আমি কি করে বলবো দিদিমা? গাড়ী তো আমার নয়!—আর এতে ছোটমাসীর ব্যথা পাবারই বা কি আছে?

সে যখন তার বান্ধবীদের সঙ্গে সিনেমায় যায়, বেড়াতে যায়, কৈ আমি তো যাই না, বা এতে কোন দুঃখ বোধও করি না!

—রীতিমত অবাক্ হয়ে যান দিদিমা, সুমিতার মুখে স্পষ্ট জবাব শুনে।

—একি হল? যে কথাই তিনি আজ বলতে যান, সব কথাতেই আজ সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় কেন? বোবারও যে বোল্ ফুটলো দেখছি! লাজুক, ভীতু, মুখচোরা মেয়েটা আজ মুখরা হয়ে উঠলো, কোন্ মন্ত্র বলে? নাঃ, কোথায় যে যেন কি ঘটছে! তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্যের ভিতের কোথায় যেন ফাটল ধরেছে! অদৃষ্টচক্রের পরিবর্ত্তনের ঘর্ঘর নিনাদ তিনি আজ যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন!

রোষক্ষিপ্ত পদক্ষেপে নিজের ঘরে প্রবেশ করে সশব্দে রুদ্ধ দরোজায় খিল তুলে দিলেন তিনি!

—সুমিতা বসে রইলো নিশ্চল ভাবে। নিজের উদ্ধত আচরণে, সে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলো, দিদিমার মুখের ওপর এমন স্পষ্ট ভাষায় জবাব দেওয়া কেমন করে সম্ভব হলো তার পক্ষে?

অন্যায়? না অন্যায় করেনি সে! চোখের সামনে তার,—ছোট মাসী, ছোট মামা, দিদিমা, সকলে মনের স্ফূর্ত্তি আমোদে দিন কাটাচ্ছে আর তাকে রেখে দেওয়া হয়েছে রুটিন-বাঁধা জীবনের ছকে! নিজেরা হরদম যাচ্ছেন, থিয়েটার-সিনেমা, ক্লাব আর পার্টিতে; তার ভাগ্যে কচিৎ ঘটে, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মত। বাড়ীতে সান্ধ্য আসর জমজমাট হয় ওঁদেরই জন্যে; আর ওকে তখন রেখে দেওয়া হয় মাষ্টারের তত্বাবধানে!

কেন? কেন? ওর অন্তর বলে কি কোনো পদার্থ নেই? আজ যে সে সভ্য সমাজে মিশতে পারে না, নেই তার স্বচ্ছন্দগতি, সাবলীল ভঙ্গিমা, যেমন আজ দেখেছে ক্লাবে অন্য মেয়েদের মধ্যে? সে কার জন্য? তার এই জড়তাপূর্ণ, যন্ত্রবৎ জীবনধারার জন্য দায়ী কে? কিসের জন্য সে হাসি-খুসি, চঞ্চল চপলতায় স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি? না কিছুমাত্র অন্যায় করেনি সে আজ!

ওদের জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, সে কারুর হাতের খেলার পুতুল নয়! তারও নিজস্ব সত্তা বলে কিছু আছে; আর আজ থেকে তার সদব্যবহারও সে করবে।

ক্ষিদে ছিলো না, ক্লান্ত পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে শয্যায় এলিয়ে দিলো অবসন্ন দেহখানি।

এতক্ষণে মনে উদয় হল দারুণ অভিমান। উদাসী পিতার হৃদয়হীনতা অন্তরে জাগালো সুতীব্র বিক্ষোভের আলোড়ন।

আজ তার নির্ভীক মানবীয় সত্তা, হঠাৎ যেন নিদ্রার জড়তা কাটিয়ে জেগে উঠেছে, পিতার নীরব উপেক্ষার বিচার করতে!

কেন তিনি কন্যার প্রতি এমন অবহেলা প্রদর্শন করলেন? তার প্রতি কি ছিলো না তাঁর কোনো দায়িত্ব? কোনো কর্ত্তব্য?

শুধু ব্যাঙ্কের টাকা আর বাড়ীই কি তার পাওনা? মাতৃহীনা কন্যার পক্ষে, পিতার স্নেহছায়ায় লাভের আশা, এমনই অবান্তর মনে হল তাঁর কাছে? যে তিনি তার নির্ব্বাসন-দণ্ড দিলেন একটা স্নেহহীন কঠোর, স্বার্থপূর্ণ পরিবেশের মাঝে? যার জন্য তার জীবনের একটা দিক, একটা মহাশূন্যতায় ভরে আছে? যার জন্যে আজ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ জীবনপথে, তার সঙ্কোচপূর্ণ পদক্ষেপ?

এক-রাশ জটিল প্রশ্ন ভিড় জমালো, ওর অভিমানাহত অন্তরে।

মনে পড়লো সুদামকে! হায়! দামাদা'! আজ তুমি যদি পাশে থাকতে—জ্বালাময় বিক্ষুব্ধ অন্তরটা আজ বার বার যে তোমাকেই চাইছে!

অসংখ্য সমস্যা-কণ্টকিত জীবনের পথে আমি যে বড় একা! বড় অসহায়, অন্ধকার, চারি ধারে আমার বড় অন্ধকার! [ক্রমশঃ।

ওমরের সম্বন্ধে দু'টি কথা

মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়

ওমরের রুবাইগুলি যেন বহুদূর থেকে ভেসে-আসা অস্ফুট সুরের মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি। যৌবনের এক মধুময় দিনে দেখলাম, অজস্র পুষ্প- সম্ভারে পূর্ণ ধরণীর বিচিত্র সজ্জা, পান করলাম যৌবনের রঙীন নেশার পরিপূর্ণ মদিরা, উচ্ছ্বসিত প্রাণের আবেগচঞ্চল ব্যাকুলতা ভরা স্বপ্নালু অলস দিন দেখতে দেখতে গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল। একটি জীবন যেন সদ্যফোটা একটি ফুল, ঝরে পড়ে বাদে, আবার

নতুন দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ফুটে উঠবে তার জায়গায়।

ওমরের কাছে এ-সব এক রাত্রের ঘটনা। জীবনের অস্তিত্ব তিনি একজন্মেই স্বীকার করেন, পরজন্মে নয়। সেই জন্মেই বলেছেন—

"জীবন-সুরা শূন্য হবার আগে
পাত্রখানি নাও ভরে নাও নিবিড় অনুরাগে।"

তিনি এই জীবনটাকে একটি প্রভাতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। * * *

"একটি প্রভাত আসে বিকশিত ফুলের মতন
মরা বাঁচা শুধু এক বেলা
খেয়ালীর সৃজনের খেলা।"

এই যে আসা-যাওয়া, দিন আর রাত্রির, আলো আর অন্ধকার, এর মধ্যেই বা কি আর শেষেই বা কি?

"খেলা শেষে দূরে চলে যায়
জানো কি কোথায়?"

এ প্রশ্ন তো তাঁর মনেও জেগেছিল?

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

"পথের শেষ কোথায়
কি আছে শেষে?"

গার্গীও যখন রাজা জনকের সভায় প্রশ্নোত্তর কালে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেছিলেন 'এর পর কি আছে?' যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিয়েছিলেন—'এর পর কি আছে জানতে চাইলে তোমার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হবে, আর জানতে চেও না।' ওমরও সেই প্রশ্ন করছেন—কিন্তু সমাধানের কোনও ইঙ্গিত দিয়ে যাননি।

জন্মান্তরের প্রতি তাঁর আস্থা নেই, এটা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"জীবনের অবসানে নাটকেরও হয়ে যায় শেষ।"

কিন্তু তারপরেই দেখি—

"আমাদেরও দু'দিন বাদে
নামতে হবে মাটির শেষে
কে জানে সই তার পরে ফের
এই আসরে আসবে কে সে!"

আমাদের আয়ু হিসেব করা দিনের মত! বাঁধা-ধরা নিয়মে মহাকাল যেন সদা-সর্বদা বয়ে যাচ্ছে। ফুল ফুটল একটি সুন্দর আলোভরা প্রভাতে, ঝরে পড়ল নিশীথে। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে যেটুকু আনন্দ করতে পারা সম্ভব, ওমর সেটুকুকেই নিঃশেষে উপভোগ করতে বসেছেন, কাল প্রভাত হবার পূর্বেই হয়ত আমাদের চলে যেতে হবে! তাই কালের ভাবনাগুলো তুলে রাখতে বলেছেন।

যাঁরা কালের ভাবনায় অস্থির, ইহকাল পরকাল কোনও কালেরই কাজ যাদের দ্বারা হবে না—অথচ অস্থিরতার অন্ত নেই যাদের, তাদের দু' নৌকোয় পা দেওয়া ভাবকে তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

"মূর্খ তোদের ঈপ্সিত ধন
কোথাও যে রে নাই।"

এটা একটা নিষ্ঠুর সত্য।

এক শ্রেণীর লোককে ওমর বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করে তুলেছেন তাঁর কাব্যে।

যাঁরা আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে পরিপূর্ণ পানপাত্রের কাছ থেকে দূরে থাকবেন তাঁরা ওমরের মতে—

"পূর্ণ করি দাও সখি পানপাত্র মোর,
অক্ষুণ্ণ হ'য়ে থাক স্বপনের ঘোর—"

* * * *

কিংবা—

"থাক সখি পড়ে থাক যত গৃহকাজ
এস এস ছুটে এস আজ
পানপাত্র ত্বরা ভরি নাও,
ফাগুন আগুন ফেলে দাও
শীতের কুহেলী আবরণ"।

* * *

বা—

"ওমর বলে আমার সাথে
বেরিয়ে এস আজকে রাতে
তত্ত্বকথার জটিলতা শাস্ত্রবচন ভুলে।"

* * *

"দাও পিয়ালা, প্রিয়া আমার
এই অধরে পূর্ণ ক'রে,
যাক অতীতের অনুতাপ আর
ভবিষ্যতের ভাবনা ম'রে।"

ইত্যাদি শুনলে তো রীতিমত রেগে যাবেন।—তাঁদের বহুকালকার অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন মনে এসব হাল্কা কথা, বা জীবনে একটু ছাতা দেওয়ার অপরাধে কঠোর আত্মশুদ্ধি ব্যবস্থা করেন, তাঁদের জন্যে তিনি বলেছেন— * *

"মুয়াজ্জীনের কণ্ঠ শোনো হাঁকে,
মূর্খ তোদের একুল ওকুল ডুবল ঘূর্ণীপাকে।"

ধর্মযাজকদের ব্যঙ্গ করে তিনি তৎকালীন সমাজের প্রতি বহু কটাক্ষ করে গেছেন। প্রচলিত ধর্মবিধিতে তাঁর অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা কি নিগূঢ় ভাবে ফুটে উঠেছিল—তা তাঁর রুবাইগুলি পড়লেই বোঝা যায়।

অথচ তিনি সত্যান্বেষী ছিলেন। আত্মজিজ্ঞাসু ছিলেন, শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানী।

তৎকালীন সমাজের ধর্মের কাঠামোর ভিতরের বস্তুকে তিনি অগ্রাহ্য করেন নি, করেছিলেন কাঠামোটাকে। বাহ্যিক আচার-সর্বস্ব মানুষের ভেতরের বস্তুকেই তিনি চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের যেমন সীমার মাঝে অসীম, ওমরের তেমনি সুরা এবং সাকী, এদের ভেতরেই তিনি সুফী সম্প্রদায়ের রহস্যময় সাধনপথের রূপ এবং অরূপের তত্ত্বে জীবন ভোর করেছেন। তিনি বলেছেন—

"পাঠাইয়াছিনু একদিন
আমার আত্মারে সেই পরিচয়হীন
সুদূর অদৃশ্য লোক যথা—
জানিবারে জীবনের ওপারের দু'-একটি কথা
দীর্ঘ দিন পরে মোর আত্মা এসে ফিরে
ডেকে বলে ধীরে
চেয়ে দেখ স্বামী
স্বর্গ ও নরক তব একাধারে আমি।"

ঈশ্বরের কাছে তিনি দয়া ভিক্ষা করেছেন করুণ ভাবে—

"পাপের মদিরা পানে মত্ত মোর দুরন্ত হৃদয়
শান্ত করে দাও তারে কৃপা দানে ওগো দয়াময়!

ক্ষমা ক'রো যদি আমি ক'রে থাকি কোনও অপরাধ
ওমর চাহে না কিছু—যাচে শুধু তোমার প্রসাদ।"

কিংবা— "ক্ষমা করো—দয়া করো দুর্ব্বলেরে দেব !
ভ্রান্ত জনে শাস্তি দেওয়া তোমার কি সাজে ?
তুমি যে দয়াল-দাতা, স্নেহপূর্ণ প্রাণ
অক্ষমের ব্যথা যে গো বুকে তব বাজে !"

এই মিনতিপূর্ণ করুণা-ভিক্ষার পরও কি অবিশ্বাসী বলা চলে ? তিনি ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলেছেন—

"সত্য একা বিশ্বব্যাপী সত্য ছাড়া নাই রে কিছু
সেই একেরে কেন্দ্র ক'রে বহুর প্রকাশ হচ্ছে পিছু।'

ঈশ্বর এক, কিন্তু বহুর মধ্যে তাঁর প্রকাশ, এ কথা তিনি স্বীকার করেছেন।

"ছোট বড় নানা রূপে দিকে দিকে যাঁহার বিকাশ
সবার মাঝারে থেকে তবু যিনি সদা অপ্রকাশ,
জরা-মৃত্যু যৌবনের বিশ্বজোড়া বিতর্কের মাঝে
এ তো সেই নির্ব্বিকার নিয়ত বিরাজে।"

ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিকল্প, তিনি কিছুই করেন না। অথচ তিনিই সত্য। তিনিই জ্ঞেয়—তিনিই জ্ঞাতা, একথা হিন্দুদর্শনও বলেছেন। এইখানে ওমরের সঙ্গে উপনিষদের বাণীর আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। ঈশ্বরের দেখা পেতে হলে তাঁর জন্তে সর্ব্বস্ব ছাড়তে হবে—তিনিও স্বীকার করেছেন—

"দেখা যদি পেতে চাও তাঁর
ছাড়ো এই অনিত্য সংসার
ছিন্ন করো জীবনের যত কিছু কঠিন বন্ধন !
জগতের শত পাকে বদ্ধ জীবগণ
পারে না দেখিতে তাঁরে
বৈরাগ্যের কঠোর কুঠারে
স্বজনের মায়া-মোহ পাশ
না যদি করিতে পার নাশ।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "তোমার প্রকাশ হোক
কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন
সূর্য্যের মতন"

ওমর বলছেন— "ওগো বিশ্বধারী
একমাত্র তুমি সেথা সত্য-পথচারী
খোলো খোলো তব সিংহ-দ্বার
দেখাইয়া দাও আজি
কোথা পাবো সুপথ আমার।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—
"উজাড় করে লও হে আমার সকল সম্বল,
শুধু ফিরে চাও হে চঞ্চল।"

কিংবা— "চির জনমের বেদনা
ওহে চির জীবনের সাধনা
তোমার আগুন উঠুক হে জ্বলে,
কৃপা করিও না দুর্ব্বল বলে
যত তাপ পাই সহিবারে চাই
পুড়ে ছাই হোক বাসনা।"

এই ধরণের কবিতার বা গানের সঙ্গে ওমরের একান্ত মিল আছে।

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে।"

গানটির সঙ্গে ওমরের—

"বধির এ কর্ণ হায়,
নাহি পায় পদশব্দ তবু !
আমাদেরই দৃষ্টি-পথে
জেগে আছো অপূর্ব্ব প্রভায়,
তবু এই অন্ধ আঁখি
রূপ তব দেখিতে না পায়।"

কবিতাটিতে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।

আনন্দের মধ্যেই যে ঈশ্বরের প্রকাশ, একথা তিনি সাকী এবং সুরার মধ্যে দিয়েই বহু ভাবে ব্যক্ত করেছেন। উপনিষদ বলছেন—আনন্দই ব্রহ্ম। সৎ-চিৎ-আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ। আনন্দই সত্য। এবং সত্যই আনন্দ—এ কথা তো বহু জ্ঞানীরাও বলে গেছেন।

ওমর বলছেন—

"ওগো সাকী, নিয়তির তরঙ্গ তাড়নে
জীবন-তরী যদি হয় কূলহারা,
না মেলে আশ্রয় যদি পথশ্রমে হ'লে মোরা সারা,
কিছু নাহি আসে-যায়, আমাদের করে
পানপাত্র পূর্ণ যদি থাকে।
সত্য রবে সাথে-সাথে নির্দ্দেশিতে
পথ জীবনের সকল বিপাকে।"

ওমরের কাব্যের বহু দিক আলোচনা করার মত বস্তু আছে। রূপ ও অরূপের যে তত্ত্বটি কিন্তু তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা বোধ হয় এই—

"ঢালিছে যে সুধা শাশ্বত সাকী
নিখিল পাত্র পরে
কোটি বুদ্বুদ উঠিছে ফুটিয়া
ফেনিল সে নির্ঝরে।
তোমার আমার মত কত শত
সেই স্রোতে সদা ভাসে
সাকীর পাত্র পূর্ণ সতত
কেউ যায়, কেউ আসে।"

You shall have joy, or you shall have power, said God ; you shall not have both.
—*Emerson.*

লাক্ষাশিল্প ও পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাক্ষার গুরুত্ব আজ অনেকখানি এবং এইটিকে কেন্দ্র করে মস্ত শিল্প গড়ে উঠছে এই রাজ্যে। ছারপোকার মত এক প্রকার কীট-নিঃসৃত লালাই হচ্ছে লাক্ষা। অপর দিকে লাক্ষা-কীটগুলোর প্রধান খাদ্য পলাশ, কুসুম প্রভৃতি গাছের রস। পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তরগুলোতে এ সকল গাছ প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে বলে লাক্ষার চাষ এখানে খুব সহজ। লাক্ষাশিল্পে এই রাজ্যের অগ্রগতির মূল কারণই এইটি বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

কিছু দিন আগে পর্য্যন্তও পশ্চিম-বাংলায় লাক্ষার বার্ষিক গড়পড়তা উৎপাদন ছিল ৪৫ হাজার মণ। কিন্তু এই উৎপাদনের হার এক্ষণে বেড়ে গেছে বিপুল পরিমাণে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বিহারের বিস্তর লাক্ষা উৎপাদক অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সেই থেকেই এই রাজ্যে এই ফসলের উৎপাদন দ্রুত বেড়ে গেছে। বলতে কি, যেখানে বার্ষিক উৎপাদন ছিল মাত্র ৪৫ হাজার মণ, সেটি হয়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার মণ এরই ভেতর। অপর দিকে পূর্ব্বে যে ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের লাক্ষা উৎপাদন ছিল ভারতের মোট উৎপাদনের ৪·০৮ শতাংশ, এক্ষণে সেইটি বৃদ্ধি পেয়ে ২২·২২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের লাক্ষা উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উৎপন্ন লাক্ষা পরিশোধনের জন্য ঝালদা, বলরামপুর, তুলিন, পুরুলিয়া ও আদ্রায় বহু কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এই কারখানাগুলো অবশ্য কুটীরশিল্পের ভিত্তিতে চালু—যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গালা উৎপাদনের জন্য কলকাতায় সংস্থাপিত হয়েছে দুইটি বড় কারখানা। ভারতে উৎপন্ন লাঠি-লাক্ষার এক-তৃতীয়াংশই এখানে পরিশোধন করে গালায় পরিণত করা হয়। সমগ্র দেশে লাক্ষা পরিশোধনের ৪ শত কারখানা (দেশী) আছে এবং তন্মধ্যে প্রায় ১৬০টি কারখানাই স্থাপিত এই পশ্চিম-বাংলায়। আলোচ্য কারখানাগুলোতে অসংখ্য শ্রমিক কর্ম্মনিযুক্ত রয়েছে, এবং অবিরাম সচেষ্ট রয়েছে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যে।

মানুষের প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্য-সামগ্রীতে লাক্ষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে লাক্ষার উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ হলেও এর ব্যবহার এখানে অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এই অঞ্চলে প্রধানতঃ খেলনা, চুড়ি, স্বর্ণালঙ্কার ও অলঙ্কার পালিসের কাজে লাক্ষা ব্যবহার করা হয়। লাক্ষার বেশী ব্যবহার চলে বার্নিশ, গ্রামোফোন রেকর্ড; কেন, সমগ্র ভারতে উৎপাদনের তুলনায় লাক্ষার ব্যবহার সামান্য। একটি সরকারী হিসাবে বলা হয়েছে—উৎপন্ন লাক্ষার মাত্র ৮ শতাংশ ভারতে ব্যবহৃত হয়। শতকরা অবশিষ্ট ৯২ ভাগ লাক্ষাই রপ্তানী হয়ে যায় বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, জাপান, রুশিয়া প্রভৃতি শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলোতে। এতে অবশ্য ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে প্রচুর। হিসাবে দেখা গেছে—ভারত থেকে বছরে যে লাক্ষা রপ্তানী হয়, তার গড়পড়তা মূল্য প্রায় ১০ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা।

ভারতে লাক্ষা উৎপাদনের মোট পরিমাণ হচ্ছে ১১,০০,০০০ মণ। তন্মধ্যে রাজ্য হিসেবে উৎপাদনের হার এইরূপ :—বিহার—৪,৫০,৫০০ মণ; মধ্যপ্রদেশ—২,৭৫,৫০০ মণ; পশ্চিমবঙ্গ—২,৪৫,০০০ মণ; উত্তর প্রদেশ—১১,০০০ মণ; বোম্বাই—৬৫,০০০; উড়িষ্যা—১৮,০০০ মণ; আসাম—১৮,০০০ মণ; পাঞ্জাব—২,৯০০ মণ এবং অন্যান্য রাজ্য ১৮,০০০ মণ। লাক্ষাশিল্পের সমধিক অগ্রগতির জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাক্ষার গুরুত্বের দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে ব্যবস্থা ও প্রস্তাবগুলো সম্যক কার্য্যকরী করবেন, এইটুকু দাবী নিশ্চয়ই রাখা যায়।

খাদ্য হিসেবে কাজুবাদাম

যত দূর দেখতে পাওয়া যায়, খাদ্য হিসেবে কাজুবাদামের ব্যবহার এদেশে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এখানকার ন্যায় বহির্দেশেও আজকের দিনে এর সমাদর যথেষ্ট এবং বিভিন্ন কেবিন, রেস্তোরাঁ, কফিহাউস প্রভৃতিতে আছে এ সরবরাহের ব্যবস্থা। শুধু একটি সুস্বাদু খাদ্য বলেই কাজুবাদামের উক্ত সমাদর নয়, পরন্তু এইটির জন্যে এর বিশেষ খাদ্যগুণই দায়ী। প্রকৃত প্রস্তাবে, বিশ্লেষণ মারফত কাজুবাদামের ভেতর মানুষ খুঁজে পেয়েছে পর্য্যাপ্ত খাদ্যপ্রাণ বা 'ভিটামিন'।

এই ফলটির গুণাগুণ নিয়ে খাদ্যবিজ্ঞানীদের গবেষণা অবশ্য চলে আসছে বহু দিন থেকেই। গবেষণায় খাদ্য হিসেবে এর মূল্য ও পুষ্টিকারিতা ধরা পড়েছে অনেকখানি। খাদ্যবিজ্ঞানী তথা খাদ্য-বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন—কাজুবাদামে শতকরা ২১ ভাগ রয়েছে প্রোটিন ও ২২ ভাগ শ্বেতসার পদার্থ এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ বলতে যেটি বুঝায়, সেটি আছে কমপক্ষে শতকরা ৪৭ ভাগ। এ ছাড়া এই শ্রেণীর বাদামের শাঁসে আয়রণ, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, নিকোটিনিক এসিড, রিবোফ্লাবিন—এ সকল পুষ্টিকর উপাদানগুলোও বিশেষ ভাবে বিদ্যমান।

কাজুবাদামের চাষ আজ-কাল ভারতের বহু জায়গায় হচ্ছে—তবে

এইটি বেশী পরিমাণে জন্মে থাকে উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলগুলোতেই। পশ্চিমবঙ্গেও এর চাষ চলেছে বটে কিন্তু চাহিদার তুলনায় উৎপাদন এখনও খুবই কম। মাদ্রাজ আর অন্ধ্র রাজ্যের উপকূলবর্ত্তী জেলাগুলোতে প্রচুর কাজুবাদাম জন্মায় এবং সেখান থেকে এইটি চালান হয়ে আসে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে। কাজুশাঁস তৈরীর ব্যবস্থার জন্যে দক্ষিণ-ভারতে গড়ে উঠেছে বেশ কতকগুলো কাজু-কারখানা।

বহু রকমারী মুখরোচক ও উপাদেয় খাদ্য আমরা পেয়ে আসছি এই কাজুবাদাম থেকে। এর শাঁস কি কাঁচা কি ভাজা—যে কোন রকমেই খাওয়া যায়, তবে সামান্য নুণ বা চিনি মিশিয়ে নিতে হয় এবং দরকার বোধে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো। নানাবিধ আমিষ, নিরামিষ ও মিষ্টি খাবার সুগন্ধ করার জন্যেও এই শাঁস ব্যবহার করা হয়। শাঁসটায় তেল দিয়ে ভাজলে অবশ্য ঘরে বেশী দিন রাখা চলে না। কাঁচা অবস্থায় এইটি সাধারণতঃ ভাল থাকে এক বছরেরও বেশী সময়। আমেরিকা প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রে খাবার চকোলেট তৈরীতে কাজুশাঁস ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কাজুবাদামের শাঁসবিহীন খোসাগুলো থেকেও কতকগুলো সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য হয়। বস্তুতঃ, কাজুশাঁসে যেখানে 'ক' ও 'খ' খাদ্যপ্রাণ রয়েছে সেক্ষেত্রে কাজুফল বা কাজুবাদামের শাঁসবিহীন খোসায় আছে যথেষ্ট পরিমিত 'গ' খাদ্যপ্রাণ। এইটিকে কত ভাবে কাজে লাগান যায়, সেজন্য এরই ভেতর বহু পরীক্ষা হয়েছে খাদ্য-গবেষণা-সংস্থাগুলোতে এবং পরীক্ষায় সুফলও পাওয়া গেছে প্রচুর। মোটের উপর খাদ্য হিসেবে, বিশেষ করে পুষ্টিকর খাদ্যরূপে কাজুবাদামের মূল্য ও গুরুত্ব এ যুগে আদৌ অস্বীকার করা চলে না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশে যদি এর চাষাবাদ আরও বৃদ্ধি করা যায়, তবে প্রভূত কাজেই আসবে এবং এই ব্যাপারে জাতীয় সরকারের সজাগ দৃষ্টি ও সক্রিয় সহযোগিতা বেশী রকম না থাকলে নয়।

চাকুরী থেকে অবসরের বয়ঃসীমা

চাকুরী বা কর্ম্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের বয়স সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা আছে প্রায় সকল দেশেই। কোথাও বা ৫৫ বছর; কোথাও ৬০ বছর, আবার কোথাও হয়ত ৬৫ বছর বয়সে এই প্রশ্নটি এসে দেখা দেয় চাকুরীজীবী, বিশেষ করে সরকারী চাকুরিয়াদের কাছে। স্বতঃই ধরে নেওয়া হয় যে, একটানা দীর্ঘ ২৫।৩০ বছর কাজ করার পর গড়পড়তা মানুষের কর্ম্মক্ষমতা এবং চিন্তাশক্তি অটুট থাকে না বা থাকতে পারে না। বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর গ্রহণের বয়স বেঁধে দিবার নিয়মটি এসে দাঁড়িয়েছে এই ধারণা বা বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই।

কিন্তু প্রশ্ন এখনও থাকছে—অবসর গ্রহণের উক্ত বয়ঃসীমা নির্দ্ধারণ অর্থাৎ বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের চলিত ব্যবস্থা একান্ত সমীচিন বা প্রয়োজনানুগ কি না? অন্য দেশে যেমনই হোক্, গ্রেট বৃটেনে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে, এই নিয়ে জোর গবেষণা চলেছে। গবেষণার ফাঁকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এরই ভেতর মন্তব্য করেছেন—বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর গ্রহণের বয়স নির্দ্ধারণের বর্ত্তমান নীতি বা রীতিটি অচল। তাঁরা দেখেছেন—৫৫ বা ৬০ বছর বয়সে যাঁরা বাধ্য হলেন কাজ থেকে অবসর নিতে, তখনও তাঁরা কাজ চালিয়ে যাবার মতো যথেষ্ট সক্রিয়, স্বাস্থ্য তাঁদের অটুট। তদুপরি দেখা গেছে—কর্ম্মজীবন থেকে অবসর নেবার পরই স্বাস্থ্য তাঁদের ভেঙ্গে পড়ে দ্রুত এবং বিনষ্ট হয়ে যায় ক্রমেই সকল পৌরুষ ও মনের স্ফূর্ত্তি। অবশ্য এ মন্তব্যটি তাঁরা করেছেন—গড়পড়তা সরকারী ও বেসরকারী চাকুরিয়া বা চাকুরীজীবীদের দিকে তাকিয়ে।

আলোচ্য সমস্যা নিয়ে আমেরিকার লাইফ এক্‌স্টেনশন সার্ভিস ফাউণ্ডেশন যে তদন্ত বা পর্য্যালোচনা চালিয়েছেন, সেটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার। সম্প্রতি ফাউণ্ডেশন ৩০টি প্রশ্ন সমন্বিত একটি প্রশ্নমালা ছড়িয়ে দেন ১৫ শত অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট। উত্তরদাতারা সকলেই মোটামুটি এই কথাটা বলতে চেয়েছেন—অধিক বয়সেও নিশ্চিন্ত স্বাস্থ্য ও মনের শান্তি বজায় রাখবার জন্যে অর্থটাই সবচেয়ে বড়। জীবন ধারণের উন্নততর ব্যবস্থা থাকলে ৫৫ বা ৬০ বছর, এমন কি ৬৫ বছর বয়সেও সাধারণ অবস্থায় শরীর ভেঙ্গে পড়ে না কিংবা সহসা কারণ হয় না কর্ম্মশক্তি বিলুপ্তির। তারপর অবসর জীবনে কি ভাবে সময় অতিবাহিত তথা সময়ের সদ্ব্যবহার করা যেতে পাবে, সেইটিও এ প্রসঙ্গে ভালরকম বিচার্য্য। বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমা নির্দ্ধারণ কালে এই জরুরী প্রশ্ন কয়টি সম্মুখে রাখলে সিদ্ধান্ত সঠিক হ'বে অনেকটা, এই দাবীটি রাখা চলে।
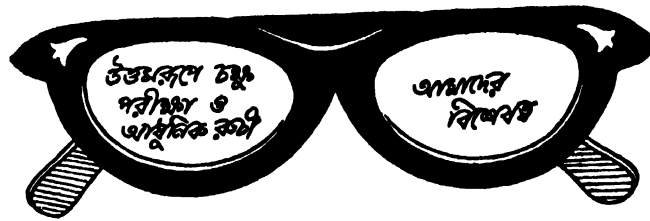
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

মৌরীর কাছে ওরকম হাতজোড় অবস্থায় মঞ্জু ওকে দেখে ফেললো বলে ততটা নয়, যতটা মৌরী ওভাবে ঘর ছেড়ে চলে গেলো বলে—প্রথমটায় কেমন যেন বোকাই বনে গিয়েছিল সুদর্শন। তবু সহজ ভাবটা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল সে। মুখে হাসি রেখেই চায়ের কাপটা নিয়েছিল হাত বাড়িয়ে। চায়ে চুমুক দিয়ে ভালোলাগার প্রশংসাসূচক শব্দ করেছিল 'বাঃ'! দাঁড়িয়ে-থাকা মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল—দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

এই ঘটনার পর যে পথটা খোলা ছিল সুদর্শনের কাছে, সেটা এই—এই সহজ ভাবটাই বজায় রাখা বা সম্ভব হলে এটার মাত্রাটা আরো একটু বাড়িয়ে দেওয়া। প্রথম ধাক্কায় করেছিলও সে সেটাই। কিন্তু মঞ্জুর মনে হলো, সুদর্শনের চরিত্রটাই রোল-করা কাগজের মতো; ঝোঁকটাই গোটানোর দিকে। মেলে ধরলেও সময় নেয় না গুটিয়ে যেতে।

অনুপায় মঞ্জু জানালার দিকে তাকিয়ে বসে রইলো মুখে এমন একটা হাসির ভাঁজ ফেলে যেন, কোন মজার দৃশ্য ওর দৃষ্টিটাকে বাইরের দিকে আটকে রেখেছে। সুদর্শনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করাটা শুধু ঘরের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর অপেক্ষা।

অবশ্যি মঞ্জু যে একেবারেই কিছু না দেখছিল বা না শুনছিল তা-ও নয়। রান্নার মিষ্টি গন্ধ গলিপথ পার হয়ে গিয়ে কৌতূহল জাগিয়ে তুলছিল প্রতিবেশীর। ওদের বাড়ী আজ কি ব্যাপার? ঘরে ঘরে বাতি জ্বলছে, নানা রান্নার গন্ধ আসছে। মৌরীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে? ছেলে এসেছে। কি করে ছেলে? মস্ত ডাক্তার! এখনই 'মস্ত' হলো কী করে? ডাক্তার আর উকিল চুলে পাক না ধরতে মস্ত হয় কখনো? তা ডাক্তারীতে মস্ত না হলেও অবস্থায় এখনই মস্ত বিরাট ধনী? এঁ্যা! তবে বুঝি ভালো? জিভটা সামলে ফেলতে হয় যার। তবে বুঝি আলাপ পরিচয়ের বিয়ে? নয়! ওর পিসেমশাইএর বন্ধুর ছেলে। এবার অনূঢ়া কন্যার দিকে তাকিয়ে মা কি ভাববেন কে জানে! হয়তো এমনি একটি আত্মীয়ের খোঁজ করবেন মনে মনে। হয়তো একটি নিঃশ্বাসও চাপাতে হবে। আছে, আছে কি আর না। কিন্তু কোন উপকার করবে তারা—সে আশায় বালি। হয়তো জানতে চাইবেন মা ছেলের বয়স। প্রায় সব জানার পর এবার 'এতো কে জানে' বিরক্তি প্রকাশ করবে মেয়ে। মৌরীর সৌভাগ্য সম্বন্ধে ধারণাটা অসমাপ্ত থেকে যাবে মা'র, ছেলের বয়সটা না জানতে পেরে।

বাড়ীটা কি এতো কাছে? কথা কি তারা চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে বলছিল? না। স্বভাবগুলো মঞ্জুর ভীষণ চেনা।

স্যাণ্ডেলের শব্দ তুলে লম্বা বারান্দা পার হয়ে নীচে নেমে গেল বাসুদেব। আওয়াজ পাওয়া গেল ছোটপিসির গাড়ী বেরিয়ে যাওয়ার। ভারি সুবিধে হয়ে গেছে ছোড়দা'টার। ছোটপিসি না বললে তার গাড়ী চাইবার সাহস কখনই তো তার হতো না কিন্তু এর সন্দেশ, তার দৈ, ওর রসকদমের জন্য ছুটোছুটি তাকে তো করতেই হতো! মঞ্জুর দৃষ্টিটাকে বাসুদেব স্যাণ্ডেলের শব্দ বাইরে থেকে টেনে এনেছিল বারান্দায়—এবার সেটাকে ঘরে এনে সুদর্শনের দিকে তাকালো সে।

নীরবে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে সুদর্শন হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা'র দিকে চোখ রেখে।

নাঃ! তার মুখে, ঠোঁটে তার দুই চোখের কোঁচকানো দৃষ্টিতে যে মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে, লজ্জা বা অপরাধীর মনোভাব বলে তার অর্থ কিছুতেই করা যায় না। উলটে আরো মনে হচ্ছে, একটা অস্বীকারের চেহারা না দেখানো পর্যন্ত তার আহত আত্মমর্য্যাদা যেন কিছুতেই শান্ত হতে পারছে না। মঞ্জু বুঝলো, কেউ কম যাবে না। যুদ্ধটা দু'পক্ষে করা হবে। হঠাৎ কেমন যেন একটা আনন্দ আর আত্মীয়তা বোধ করলো মঞ্জু সুদর্শনের প্রতি। মুখের উপর এসে-পড়া অগোছালো চুলগুলো হাত দিয়ে সরাতে সরাতে বললো—কথা খুঁজে পাচ্ছিনে। কিছু বলুন।

অতি মনোযোগের সঙ্গে হাতের অর্দ্ধেক শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা য়্যাসট্রের ভেতর ঠেসে ঠেসে নেবাতে লাগলো সুদর্শন। —আমিও পাচ্ছিনে।

—তবে?

নেবানো সিগারেটটা য়্যাসট্রের ভেতর ফেলে এবার সোজা হয়ে বসলো সুদর্শন।—শুনি, মেয়েদের নাকি কখনোও কথার অভাব হয় না।

—হাঁ, এবার অনেক কথা বলার মতো একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছেন বটে! বলতে পারি, বেচারী মেয়েরা কি করবে বলুন। চোখ রাঙ্গানো নেই, ভয় দেখানো নেই, হিসাব চাওয়া নেই—কলঙ্ক দেওয়া নেই—অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করছে তারা কেবল এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে। আয়ত্তেও এসে গেছে এ বিদ্যাটাই আরো বলতে পারি, বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, শক্তি অপক্ষয়ের এমন একটা পথ খুলে রেখেছিলেন বলেই; নইলে এতো দিতে যে আত্মশক্তি তারা সঞ্চয় করতো—কিন্তু না। এসব কথার উত্তর প্রত্যুত্তরের জন্য একটা জোরালো প্রতিপক্ষ থাকা চাই। ও, ছোড়দা না হলে আমার জমে না। বিষয়-বস্তু ভেদে মানুষভেদ আছে তো—আছে না? তার চাইতে বলুন এ সময়টা আপনি সাধারণত কি ভাবে কাটান বা কি ভাবে কাটলে আপনার ভালো লাগবে বলে মনে হয়? আমরা দেখি, আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যে তা সম্ভব কি না।

—এ সময়টা মানে সন্ধ্যের সময়টা?

—হাঁ।

—আমার সন্ধ্যার আনন্দের আয়োজন?

—সন্ধ্যার আনন্দ বলে কোন চিহ্নিত আনন্দ আছে না কি?

—বিষয়-বস্তু ভেদে মানুষভেদের মতো সময়ভেদে চিহ্নিত আনন্দও আছে বৈ কি।

আপনার সর্দি বিপজ্জনক হ'তে পারে !

গুরুতর রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে—এই উত্তম বিশেষ কার্য্যকরী মলমটি দিয়ে সর্দির যন্ত্রণা দূর করুন!

সর্দির জ্বালা যন্ত্রণা যখন এত সহজে দূর করা যায় তখন সর্দিতে কেন ভুগছেন ! শোবার সময় বুকে-পিঠে ও গলায় ভিকস্ ভেপোরাব মালিশ করুন…আর সর্দি যেখানে যন্ত্রণা দিচ্ছে, ঠিক সেখানেই আপনি বোধ করবেন বেশ আরাম। ভিকস্ ভেপোরাব ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার সর্দির জ্বালা যন্ত্রণা দূর করে…আর ঘুম থেকে উঠেই আপনি আবার আগের মতই সুস্থ বোধ করবেন। পরিবারের সকলের পক্ষে উপকারী।

ইহা দু'ভাবে সর্দি উপশম করে !

১

ইহা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে কাজ করে—

ভিকস ভেপোরাব থেকে যে [illegible] ঔষধের গন্ধ বেরোয় তা আপনি শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে গলায় ও নাকে সর্দির যন্ত্রণা দূর করতে পারেন।

২

ইহা ত্বকের ভিতর দিয়ে কাজ করে—

ভিকস ভেপোরাব লাগানো মাত্রই উহা ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে, আপনার বুকে। সর্দির ব্যথা দূর করে।

বুকে, পিঠে ও গলায় মালিশ করুন !

এখনই ভিকস ভেপোরাব ব্যবহার করুন ঃ

নূতন ছোট ট্রায়াল সাইজ টিন—মাত্র ৪০ নঃ পঃ ও তদুপরি ট্যাক্স।

327-B

দাম দেখা দিতে চাইলেও দামবার মেয়ে মঞ্জু নয়। বললো—বেশ তাই।

একটু সময় তাকিয়ে রইলো সুদর্শন মঞ্জুর দিকে। তারপর বললো—মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে।

—বিষয়?

বাজার-দর নয়।

—ও তো আপনি জানেনই না! কিন্তু মেয়েদের দর?

—বাজার-দরের মতো মেয়েদেরও কোন বাঁধা দর আছে, আমার জানা নাই।

বাঃ, তা থাকবে না কেন? দর অর্থে তো টাকা-পয়সার দরই বোঝায় না কেবল। মর্যাদাটাও দর। আর বেশীর দিকে না হোক, কমপক্ষের দিকে একটা মাত্রাও নিশ্চয়ই তার আছে—কিন্তু তা যখন আপনার জানা নেই, তখন যে যেমন আদায় করতে পারে—তাই না? আদায় করতে না জানলে তবে তো ঠকতে হবে দেখছি।

পাখার হাওয়া থেকে আড়াল করে আর একটা সিগারেট ধরালো সুদর্শন—জীবনভর মানুষ শিখতে শিখতে চলে। আমি না হয় এ বিদ্যেটা এখানেই শিখবো।

—যে শিক্ষাটা সব প্রথমে হওয়া উচিত, সেটা যে কেন শেষ জীবন পর্য্যন্তও ছেলেদের হয় না, বুঝিনে—বলেই হেসে ফেললো মঞ্জু। বললো—না এ ঠিক হচ্ছে না। এক সন্ধ্যার অতিথি আপনি। যদিও আক্রমণটা আপনার দিক থেকেই আসছে, তবুও হার স্বীকার করা উচিত আমারই। বলেছি তো, আজ এ বাড়ীতে আপনার জন্য অসম্ভব বলে কোন কথা নেই। দেখবেন আরো, অসম্ভব কিছু বললেই তা সম্ভব করে সবাই অসম্ভব খুশী হয়ে উঠবে। বলুন, কি ভালো লাগবে আপনার?

আকাশে যে আয়োজনটা অনেকক্ষণ ধরেই হচ্ছিল সেটা যেন শেষ হলো এতক্ষণে। ছাড়লো জোর ঠাণ্ডা বাতাস। উড়তে লাগলো জানলা-দরজার পরদা। রজনীগন্ধার থোপা থেকে ঝরে পড়লো মেঝেতে কিছু ভেজা ফুল। ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে নরম মিষ্টি গন্ধে ছোট ঘরটা উঠলো ভরে। সময় হলো এখন জোরালো বাতিটা নিবিয়ে সবুজ বাতিটা জ্বালিয়ে দেবার। কিন্তু তারপর ওর নিজের পক্ষে এখানে বসে থাকাটা যে হবে সাদা বাতিটার চাইতেও বেমানান! ডেকে আনবে না কি মৌরীকে?

ছুটে এসে রেডিওর চাবী ঘোরালো অমিতা। কি সুন্দর রবীন্দ্র-সঙ্গীত হচ্ছে। রেডিওটা খোলোনি কেন?

কেন যামিনী না যেতে জাগালে না,

বেলা হলো মরি লাজে—

মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে অমিতা খুশীতে হাসলো।

পরদার নীচ দিয়ে দেখা গেল আলো পড়ে চকচকিয়ে ওঠা চলমান দুটো পা আর শান্তিপুরী ধুতীর গিলে-করা কালো জরিপাড়। 'বার' থেকে ফিরলেন যতীন বাবু। প্রতিদিন আরো রাত হয়। আজ শুধু স্বাস্থ্য-রক্ষা করে এলেন। নইলে রাতে না হবে ক্ষিদে না হবে ঘুম। সুদর্শন চোখ তুলে বারান্দার দিকে তাকালো। মঞ্জু বলল—বাবা!

—ও!

কিন্তু যতীন বাবু এসে ঢুকলেন এ ঘরেই। চোখ দু'টো তার ঈষৎ লাল। মাথার চুল কিছুটা উসকো। কারণ, ঝড়ো বাতাসটা তিনি পথেই পেয়েছিলেন।

হাতের সিগারেটটা য্যাসট্রের ভেতর ফেলে উঠে দাঁড়ালো সুদর্শন। তাকে বসতে বলে নিজেও আসন গ্রহণ করলেন যতীন বাবু; আর মঞ্জু বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো ছাদে মৌরীর কাছে।

তখন বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেছে। মৌরী ওর ইজিচেয়ারটা চিলে-কোঠার ভেতর টেনে এনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শাড়ীর আঁচল দিয়ে বৃষ্টি মুচছে শরীর থেকে।

—শ্রীমতী এবার বুঝি চিলেকোঠায় বসে প্রকৃতির বৃষ্টিভেজা রূপ দেখবেন?

—আজ্ঞে হাঁ। তা আপনি কি করতে বলেন শ্রীমতীকে?

—খামকা ভালমানষী দেখাস নে দিদি! যেন আমি বললেই তুই আমার কথা রাখবি? আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি—মান-অপমান বোধটা কেবল তোরই আছে না আমারও থাকতে পারে?

—হয়েছে কি?

—এই ভদ্রলোকটি যে আজ এখানে বয়ে গেলেন, তা কি আমার জন্য?

—নিশ্চয়ই নয়।

—সন্ধ্যে থেকে ছাই আর আদ্দেক-খাওয়া সিগারেট দিয়ে ছাইদান ভরাট করতে করতে যে কথা এবং যার কথা উনি ভাবছেন, তার ভেতর কি আমি আছি?

—একেবারেই না।

—এ অবস্থায় আমার এঁকে সঙ্গ দেবার চেষ্টা করার কোন মানে হয় না, তাতে আমার মান থাকছে?

—একেবারেই না।

—এখন আমার কি করা উচিত?

—তাকে বসে বসে ভাবতে দিয়ে, উচিত নিজের কাজে চলে যাওয়া।

এবার হেসে গড়িয়ে পড়লো মঞ্জু।—এই দিদি, এরই ভেতর কি ভীষণ আপন ভাবতে শুরু করে দিয়েছিস তুই সুদর্শন বাবুকে?

বুঝে পেলো না মৌরী ওর কথার কি করে এ মানে হয়। বললো—এই মানে হয় আমার কথার?

—একমাত্র এই মানেটাই হয়।

চটে গেল মৌরী। বেশ হয়তো হয়। বিয়ে ভেঙ্গে ফেলা যখন যাচ্ছে না তখন আপন ভাবতে তো হবেই একদিন।

—তা তো হবেই। কিন্তু একদিন নয়, সেটা এখনই শুরু হয়ে গেছে—মা গো! হাসি থামিয়ে দম নিল মঞ্জু। চোখের জল মুছল আঁচল দিয়ে। তারপর বললো—তবে আর কেন ভদ্রলোকটিকে সবার কাছে অপদস্থ করছিস? এ তোর ঠিক হচ্ছে না। হচ্ছে কি? সবার মনে প্রশ্ন জাগছে না, সমস্ত দিন মেয়ে আমাদের অমন কথা বললো, কাছে রইলো। বিয়ের আগের আহ্লাদে বোকা-বোকা ভাবটা কেমন সুন্দর মুখের ওপর এসে যাচ্ছিল—হঠাৎ কি হলো! ছাদে গিয়ে মেয়ে অমন বসে রয়েছে কেন মুখ ঢেকে? তিনি যা করেছিলেন সবার চোখ বাঁচিয়েই তো করেছিলেন। জবাব দেবার যা তা তুইও সবার চোখ বাঁচিয়ে দে।

ভুরু দুটো কুঁচকে ছোট করে মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে রইলো মৌরী। মঞ্জু বললো—বল না ?

—সব তো তুই বলছিস। শেষটুকুও তুই-ই বল।

—আমি তোকে বলছি, সহজ ভাবে এসে নীচে বসতে এবং কথা বলতে। রাজী ?

একটু ভাবলো মৌরী। বেশ আসছি। তুই যা।

—আসবি ?

—আসবো।

—ঠিক ?

—হাঁ—হাঁ ঠিক।

নীচে নেমে এলো মঞ্জু। বাবা বসবার ঘরেই আছেন। কথা বলছেন সুদর্শনের সঙ্গে। কিছুক্ষণের জন্য সুদর্শনকে নিয়ে আর না ভাবলেও চলবে। নিজেদের ঘরে চলে এলো মঞ্জু। হাত দিয়ে পরখ করে দেখলো শাড়ীটা—না তেমন ভেজেনি। এক্ষুণি এটুকু শুকিয়ে যাবে বাতাসে। বাতি না জ্বেলে অন্ধকারের ভেতরই চেয়ারটা টেনে এনে বসল মঞ্জু জানালার কাছে। এটুকুই বাকী ছিল। সমস্ত দিন কথা বলতে পারে ও; বলেও তাই। কিন্তু দিনের ভেতর কিছুটা সময় ওর চাই—অন্তত যা না হলে দিনটায় খুঁত থেকে গেল বলে মনে হয় ওর, তা হলো চুপচাপ বসে কাটাবার মতো কিছুটা নির্জন অবসর। ভাবনার জগৎটাও বড় বিচিত্র ওর। তার চেহারাটা যেন পাঁচ বছরের শিশুর ঘাড়ে একটা ষাট বছরের বৃদ্ধের মাথা। মঞ্জু জানে, প্রকাশ্যে বার করলে ওর সঙ্গে মিলিয়ে ওর চিন্তা-জগতের এই রূপটা মানুষের কাছে বামন আকৃতি ঠেকবে এবং বামনকে মজা উপভোগ করার মতোই মুখ করে তারা তা উপভোগ করবে। তাই অপরের কৌতুক বন্ধ করতে সে নিজেই কৌতুক করে তাদের নিয়ে। কিন্তু যখন ও নিজে ভাবতে বসে—তখন সত্যি ভাবে—গভীর ভাবে ভাবতে চেষ্টা করে। বড় বড় বিষয়বস্তু তার। যে সব বিষয়বস্তুর শেষে একটা করে নীতি-শব্দ জোড়া থাকে কিন্তু নীতি যেখান থেকে দিনে দিনে সরে যাচ্ছে সহস্র যোজন দূরে।

ওলট-পালট হাওয়া বৃষ্টিটাকে নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে। দূরের নারিকেল গাছটা তেল-জল না জোটা পাগলা ছেলের মতো বাতাসের সঙ্গে সমান তালে মাথা ওলট-পালট করে স্নান করে মনের আনন্দে। রেডিওটায় বেজে চলে সেতার। দু'তিনটা ঘর পার হয়ে আসতে গিয়ে আর বৃষ্টি বাতাসের শব্দে চাপা পড়ে রেডিওর যান্ত্রিক শব্দটা হারিয়ে সে আলাপ এ-ঘর থেকে শোনায় যেন, বাদলা প্রকৃতির আপন নিভৃত আলাপের গুঞ্জনের মতো।

রান্না যোগান দেওয়ার কাজ শেষ করে ছোট পিসির অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে এসে এবার হাঁপ ছাড়ে অমিতাও। ব্লাউজ বডিজ ভিজে গেছে ঘামে। ভিজে গেছে পেটী-কোটটা কোমর পর্য্যন্ত। উঠে দাঁড়ানো মাত্র সে ঘাম কোঁটায় কোঁটায় নেমে আসছে উরু-কোমর বেয়ে। মুখটা দিয়ে বেরুচ্ছে যেন আগুনের শিষ। গরম মুখটাকে ঠাণ্ডা করলো অমিতা বৃষ্টির দিকে উঁচু করে তুলে ধরে বৃষ্টির ছাটে ভিজিয়ে। তার পর চলল ভিজে শাড়ী পায়ের পাতা থেকে টেনে তুলে ধরে স্নানের ঘরের উদ্দেশ্যে। এবার দরকার তার

একটি ভালো স্নানের। শরীর থেকে পেঁয়াজ-রসুন-কাঁচাডিমের যে গন্ধ বেরুচ্ছে—নাক সিঁটকালো অমিতা, এ গন্ধ দূর করতে একটি আস্ত সাবান শেষ হবে। আর শরীর থেকে তাড়ালেই হবে না কি? নাকে লেগে রয়েছে না গন্ধটা? সেটাও উপড়ে করতে হবে ঠিক শিশিখানেক। অমিতা এমনিতেই একটু প্রসাধনপ্রিয়, তাতে পশ্চিমবাংলার মেয়ে ও—প্রসাধনটা ওদের রক্তে। তিনটে বাজতে না বাজতে আলতা-সিঁদুর-কাজললতা নিয়ে বসে পড়ে তারা। কালো চিক্কণ করে তোলে চুল সুগন্ধি তেলে। খোঁপা বাঁধে নানা ছাঁদে। কাজল টানে, আলতা পরে, টিপ দেয়। পরে ডুরে-শাড়ী নয়তো নীলাম্বরী। তার পর পান খেয়ে ঠোঁট দুটি রাঙ্গা করে তুলে বৈকালিক প্রসাধন শেষে। অমিতার বাবার চালচলন সাহেবি-ঘেঁষা। তাই তার প্রসাধন সরঞ্জামে আলতা সিঁদুর কাজল-লতা বাদ পড়লো কিন্তু ড্রেসিং টেবিল তার ভরে উঠলো বিলিতি প্রসাধনে। এখনও মা বাক্সভর্তি করে সব কিনে কিনে পাঠান। কিন্তু পূর্ব-বাংলার মেয়ে মৌরী, মঞ্জু। ওদের মাথার খোঁপা সাড়ে ভাঙ্গে—পিঠে আছাড় খায়। তৈলহীন রুক্ষ চুলের গুচ্ছ আদ্ধেকই ওড়ে মুখের উপর। দুপুরের শাড়ী বদল হয়ে ওঠে না সন্ধ্যায়ও। অমিতা বলে—ছেলেরা তোমাদের দিকে ভুলেও তাকাবে না!

মঞ্জু বলে—ভুলেও তাকাবে না? কিন্তু তাকালে ভুলবে তো?

—না মুখ ফেরাবে।

—মুখ ফেরাবে। তবে তো অবহিত হতে হচ্ছে। দাঁড়াও কাল থেকেই উঠে-পড়ে লাগছি আমি। তোমার চূর্ণ হলুদ—

—চূর্ণ হলুদ! চোখ বড় করে অমিতা।

—ঐ যে, দুপুরে স্নানের সময় তুমি মাখ—এই নাম যেন কি—নাম যেন কি—মাথা চুলকোয় মঞ্জু—এই বৌদি সাহায্য করো না।

—বেসন-হলুদ।

—বেসন-হলুদ—কাল থেকে এ দুটো আমার চাই। ছেলেদের তাকানোটা আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ওদের দিয়ে কিছু করতে হলো—তা নিয়ে, কাজ আর তাকানো যাই হোক চেহারাটাই তুমি বলছো মুখ্য? তাই স্বীকার। পিসিমা বলেন, যে ঠাকুর যে ফুলে তুষ্ট।

আর মৌরী? মৌরী মুখ গম্ভীর করে তোলে। এসব কথা তুমি আমার কাছে বলো না বৌদি। আমার দুঃখ হয় মেয়েজাতটার জন্য।

অমিতা বুঝতে পারে না! ছেলেরা রূপ চায় আর তার জন্য মেয়েরা রূপচর্চ্চা করে, এতে দুঃখ হওয়ার, লজ্জা পাওয়ার কি আছে?

—ঠিক তো। মেয়েদের কেন, লজ্জা পাওয়ার থাকে তো আছে ছেলেদেরই, কি বলো?

তাই বা কেন থাকবে! অমিতা মঞ্জুর এ কথাও মানতে রাজী নয়। মঞ্জু হাসে। মৌরীর ঠোঁটের কোণে যে ভাঁজ পড়ে তা সামান্য অতি সামান্য, কিন্তু বাঁকা।

যতই গরমিল থাক, সঙ্গ কিছুটা মিলিয়ে আনেই। অমিতার শরীরযন্ত্রে ঢিলে ভাব এসে গিয়েছিল। স্নান শেষ করে ঘরে এসে নিঃশব্দে দরজার ছিটকানিটা বন্ধ করে দিল অমিতা। দশ মিনিট অন্তত—দশ-পনেরোটা মিনিট শুয়ে পিঠটা টান না করে ও কিছুতেই পারছে না। চটপট হাতে প্রসাধন শেষ করে, শাড়ী পালটে আলতো ভাবে শুয়ে পড়লো সে বিছানায়। আরামে বুজে এলো অমিতার দু'চোখের পাতা, আর সেই বোজা চোখের অন্ধকারে ছায়াছবির মতো ভেসে উঠলো খানিক আগে দেখা আয়নায় ওরই চেহারাটা। সুন্দরী ও। ওর রূপ দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল জয়দেব। সেদিন ওদের বিয়ে দু' পক্ষের অভিবাবকই খুশী মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। এর কারণ বিয়েটা কাকে করছে তা নিয়ে নয় জয়দেবের বয়সটাই ছিল না বিয়ে করার। একুশ হয়েছিল কি না তার সন্দেহ। আর ওদের তরফের আপত্তির কারণটা ছিল, ওরা বড় লোক। ওর বাবার লক্ষ্য ছিল হয় টাকা—নির্গুণ আর মূর্খের বাহন। নয়তো যোগ্যতা। কিন্তু এ দুটোর কোনটাই ছিল না জয়দেবের। সে তখন বি, এস-সি পড়ছিল ওর দাদার সঙ্গে। তবু দু' পক্ষের অভিভাবককেই তাদের বিমুখ মুখ ফেরাতে হলো। উদ্যোগ আয়োজন করে বিয়েও দিতে হলো। নতুন অতিথির জন্য মর্য্যাদার আসন প্রস্তুত করে রাখতেই যে হবে। সে আজ সাত-আট বছর আগের কথা। আজ ওদের দু'টি ছেলে-মেয়ে। থাক ওরা বাবা-মার কাছেই। ভালোই তো! ছোটদের দৌরাত্ম্য ওর পোষায় না। আর জয়দেবের যা রোজগার। এবার ওর চোখে ভেসে উঠলো সুদর্শনের চেহারা, তার ডিগ্রি, তার টাকা। পুরোনো কথা নতুন করে আজ মনে হওয়ার পেছনে কারণটাও অবশ্য এটাই দৌড়ের আগে পিছু হটার মতো। মৌরীর চাইতে ও অনেক বেশী সুন্দর, অনেক বেশী বড়লোকের মেয়ে। কিন্তু মৌরীর কাছে ওর চিরকালের জন্য হার হয়ে গেল। বিয়ে করে যে মেয়ে জিতে গেল, সে মেয়ের বাজী জেতা হয়ে গেল সমস্ত জীবনের জন্য। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো অমিতা। অদৃষ্ট! অদৃষ্টে থাকলে কত অসম্ভবের ভেতর পথ করেই না ভাগ্য এগিয়ে আসে, আর নইলে!

অদৃষ্ট! অদৃষ্টটাই সব। ঠিক এই কথাটাই বলছিল কানাইলালও রামুকে। রান্না হয়ে গেছে তার। তৈরী রান্না সাজিয়ে রেখেছে সে উনানের চার পাশে ঘিরে। চপ-কাটলেট-ফ্রাই রেখেছে ডিম-বিস্কিটে গড়িয়ে। ভেজে দেওয়া হবে গরম গরম। কাজ শেষ করে ছোট পিসির ছেড়ে-যাওয়া শান্তিনিকেতনী মোড়াটায় বসে উদাস ভাবে বৃষ্টি দেখছিল সে। তার হাতে একটা বিড়ি দিয়ে নিজে একটা নিয়ে বসে যে ওর সঙ্গে গল্প জমাবে তেমন সাহস রামুর ছিল না। তারা এক হয়েও কোথা দিয়ে যেন তার মনে হচ্ছিল এক নয়। কর্তার পদ-গৌরবের দাপট আগে পড়ে তাদের স্ত্রীদের মুখে আর তার পরই পড়ে তাদের ভৃত্যদের মুখে। ছোট পিসির পরই কানাইলালের মুখেও তা পড়েছিল। রামু সসম্ভ্রমে দূরে বসে সময় কাটাচ্ছিল মেঝেতে ঠুক-ঠুক করে চামচ বাজিয়ে। কৃতার্থ করে দিলো কানাইলাল তাকে একটু চা খাওয়াতে বলে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গিয়ে উনানে কেটলী চাপালো রামু। কিন্তু মুখ শুকিয়ে উঠলো। বৌদি বলেন, ওর চা নাকি যাচ্ছেতাই হয়। কানাই এতো এতো সব ভালো ভালো রান্না জানে আর ও চাটুকুও ভালো বানাতে জানে না! হে ভগবান, এ লজ্জা এ অপমান থেকে রক্ষা কোরো। নইলে আজকের মতো বেঁচে থাকবার ইচ্ছেটাই ওর উবে যাবে। ভালো চা বানাবার জন্য রামু প্রাণপণ চেষ্টায় লেগে গেলো। অমিতা যে ভাবে চা করে তার সব করলো সে। জল আবার ফুটতেই নামিয়ে ফেললো। চা ঢালবার আগে টি-পটটাকে উনানে ধরে গরম করলো। চামচ মেপে চা দিল। টিকোজী দিয়ে ঢেকে পাঁচ মিনিট সময় আন্দাজ

করলো বসে বসে। কাপ গরমজল দিয়ে ধুয়ে না নিলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। প্রতিদিন মনে করিয়ে দেয় বৌদি প্রতিদিন সে ভুলে যায়। আশ্চর্য্যরকম ভাবে কথাটা আজ মনে পড়ে গেল ঠিক সময়ে। বিলিতি দুধ ঢেলে চামচটা দিয়ে চা নাড়তে নাড়তে এবার রামুর মুখ উঠলো উজ্জ্বল হয়ে। চায়ের সোনালী রংটাই বলে দিচ্ছে ওর চা আচ্ছা হয়েছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে চানাচুর ভাজা চিবোতে আর কথা বলতে ইচ্ছে করবেই। এক আধটা কথা বলতে বলতে কথায় জমে উঠলো কানাইলাল। বলার মতো কথা কি ওর কিছু কম—সাহেবের খাওয়া পরার টাইম। চালচলনের কায়দা। মেমসাহেবের মেজাজ আর মর্জ্জি। মেমসাহেবের দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে তার রান্নার দক্ষতা, ভালো ভালো মাইনার ডাক আসা পর্য্যন্ত কত বিষয় কত কথা।

—ভালো ভালো মাইনা? তবু সে যায় না। কেন? জানতে না চেয়ে পারে না রামু।

কারণ আছে—বিশেষ কারণ আছে। বেশী টাকার কাজ ফেলে কি এমনি এমনি এখানে পড়ে রয়েছে? বড় লাভের জন্য ছোটখাট লাভ ছাড়তে হয়। ভাগ্যের সন্ধানে আছে সে। জানে কি রামু তার সাহেবের ক্ষমতার কথা?

কত তা' না জানলেও কিছু যে জানে, তা জানালো রামু।

সে কি জানে, সাহেব যাকে খুসী বিদেশ পাঠাতে পারে—ইংলেণ্ড জার্মাণী আমেরিকা? শুধু মাত্র সাহেবের মর্জ্জি নির্ভর? জানে না? তবে ওর কাছ থেকে জেনে রাখুক রামু বিদেশ পাঠাবার হর্ত্তা-কর্ত্তা হল তার সাহেব। তার দরজায় ধরণা না দিয়ে কারু পা বাড়াতে হয় না। কত কত ছেলেদের সে দেখছে এসে হাত কচলে দাঁড়িয়ে থাকতে—উপহার দিতে, ভেট দিতে। এমন কি—বিশ্বাস করবে কি রামু—বাজার করে দিতে, মেমসাহেবের ফরমাস খাটতে?

বেশ তো জানলো, বিশ্বাস করলো রামু কানাইলালের সাহেবকে খুসী না করে কারু বিদেশ যাওয়ার উপায় নাই। সে সুযোগের জন্য তার সাহেবের দরজায় ধরণা দিতেই হয়। কিন্তু তার সঙ্গে কানাইলালের ভাগ্য-অন্বেষণের সম্বন্ধ কি?

—আছে আছে। সেও সেই সুযোগের অপেক্ষাই দিন গুণছে আর বাবুর্চি জর্জ্জির কাছে ইত্যবসরে শিখে রাখছে ইংরেজীটা।

ততক্ষণে রামুর মুখের হাঁর ভেতর দিয়ে সাদা-সাদা দাঁত আর লাল টকটকে জিভটা দেখা যেতে শুরু করেছে।—বিদেশ! বিদেশ সম্বন্ধে রামু এটুকুই জানে, সেখানে একটা কিছু শিখতে যেতে হয়। কেউ যায় ডাক্তার হতে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার। আরো অনেক কিছু আছে নিশ্চয়ই—ও জানে না। কিন্তু কানাইলাল যাবে কি করতে?

ঢোলা পা-জামা-পরা পা ঝাঁকায় কানাইলাল।

কোন-কোন জিনিষটা শিখতে আর দেখতে বিদেশ না গেলে হয়? পত্রিকা পড়ে কি রামু? অক্ষর-পরিচয়হীন রামুর মুখ যে লাল হয়ে উঠলো, সে যে লজ্জায় মুখ নীচু করলো—সে সব লক্ষ্য করে না কানাইলাল।

তার ভেতরটাও তো চঞ্চলই। সে তো বুঝতে পারছে তার বিদেশে যাবার কথাটা রামুর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকছে। কিন্তু কেন? ঐ তো সেদিন সে শুনেছে সাহেবরা একদল সব যাচ্ছে এবার বিদেশের বাজার ঘুরে দেখে আসবার জন্য। তবে রান্না শিখতেই বা যাবার প্রয়োজন হবে না কেন? কানাইলালের পা'র ঝাঁকুনী আরো বেড়ে ওঠে। খানাপিনা যা হয়—তার রান্না, তার পরিবেশন, তার টেবিল চেয়ারে কাঁটা-চামচ—খাওয়া-বসা তার কোনটা দেশী? এ সব শিখতে হয় না। রপ্ত হতে হয় না বিদেশী রীতিতে। কত নির্ভুল শেখা সম্ভব এখানে বসে। কিন্তু ভুল হলে সাহেব যায় চটে। একদিন চটে গিয়ে মেমসাহেবকে বলছিলেন—দেও এটাকে বিলেত পাঠিয়ে। শিখে আসুক কি ভাবে ওদেশের 'ইয়েটরা' মনিবের যত্ন করে। মস্ত মস্ত লোক সব কেমন তাদের ওপর নির্ভর করে দেয় জীবন কাটিয়ে! নইলে ওকে দিয়ে পোষাবে না আমার। অভাবনীয় ভাবেই সুযোগটা এসে গিয়েছিল। বলেও ফেলতো সেদিনই কথাটা। কিন্তু বড্ড রেগে গিয়েছিলেন সাহেব—রাগের সময় কোন কথা বলতে নেই। একটু থামলো কানাইলাল। তারপর বললো—ওঁরা দেশের সেবা করেন, আমরা ওঁদের সেবা করি। ওঁরা দেশের সেবা করা শিখতে বিদেশ যান, আমরা যাবো ওঁদের সেবা করা শিখতে। ওঁরা বিদেশ থেকে না দেখে না শিখে আসলে দেশের কোন কাজ করতে পারেন না, বিদেশী কাজগুলো আমরা পারবো কি করে?

এতক্ষণে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়লো রামু।

বেশীক্ষণ শুয়ে থাকবার সাহস ছিল না অমিতার। কে জানে ছোটপিসি এখনও রান্না ঘরেই আছেন কি না! তাই যদি থেকে থাকেন তবে তিনি রান্নাঘরে আর ও ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে—না, এতো সাহস না দেখানোই ভালো। উঠে পড়েছিল ও। রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়তে হলো অমিতাকে। কান পেতে শুনলো কানাইলালের কথা। হাসি চেপে সোজা ছাদের দিকে যাচ্ছিল রাস্তার আলোয় দেখতে পেলো অন্ধকার ঘরে জানালার কাছে বসে আছে মঞ্জু। বৃষ্টিটা তখন প্রায় ধরে এসেছে। যেটুকু পড়ছে তাতে ঝাপটা ভাব নেই। পিসিমা ঝাঁটা দিয়ে বৃষ্টির জল সরাচ্ছেন বারান্দার। মঞ্জুদের ঘরে এসে ঢুকলো অমিতা। বাতি জ্বালিয়ে দিতে হঠাৎ আলোয় হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো মঞ্জু।

অমিতা জিজ্ঞাসা করলো—মাথায় চিন্তা আছে কি কিছু?

—আপাতত শূন্য।

—তোমার বাপ-দাদাদের যে কথা স্বপ্ন দেখতে সাহস নেই, তোমার ছোটপিসির বাড়ীর ভৃত্য তা ভাবে—এর ভেতর চিন্তা করবার মতো কিছু আছে বলে মনে হয়নি তোমার?

কানাইলালের বলা কিন্তু তখনও শেষ হয়নি। সে তখন বলছে, তার বিদেশের লক্ষ্য কি এ বাড়ীর কাজটাই ভেবেছে রামু। পাগল! তার লক্ষ্য দিল্লী। একবার ঘুরে আসতে পারলে দিল্লী তাকে ডাকবে না, কে বলতে পারে? কে বলতে পারে পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপানো লোভনীয় সব ডিনার টেবিলের পেছনে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে না?

যে রামু কাচের কাপ-ডিস ভেঙ্গে বৌদির কাছে ধমক খেতে খেতে হাসে; দিদিমণিদের বন্ধুদের কাছে চায়ের নামে গরমজল সেদ্ধ ধরে দিতে গিয়ে ট্রে শুদ্ধ ফেরত আনতে আনতে—'ভক্ত মন মেরী মাতার নন্দনে,' গেয়ে ওঠে—ফের ধমক খায়, ফের হাসে—সে রামুর মন আজ প্রথম ব্যর্থতার দুঃখে ছেয়ে গেল।

অমিতা যখন ভিজে বারান্দা শুকনো নেকড়া দিয়ে মুছে দেবার জন্ম রামুকে ডাক দিলো, ছাড়া-ছাড়া চেহারায় কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো রামু।

দৃষ্টি-বিনিময় হলো অমিতা আর মঞ্জুর। জিজ্ঞাসা করলো মঞ্জু—কাজটা এক্ষুণি ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হবে রামু? পিসেমশাই-এর মতো একজন সাহেবের খোঁজ আগে করে নিলে হতো না?

হতবাক হয়ে গেল রামু, দিদিমণি বুঝলো কি করে ওর মনের কথা!

—কি, অমন বোকার মতো চেয়ে রয়েছিস কেন? আগে একজন সাহেবের খোঁজ করে নিলে ভালো হতো না? তিন হাজারী না হোক, নিদেন দেড়-দুই।

রামুর কাছে তখন মঞ্জুর বোঝার বিস্ময়টাই বড় হয়ে উঠেছে—আপনি কি করে বুঝলে দিদিমণি?

—তোর মুখের লেখা পড়ে।

—মুখে আবার লেখা পড়ে নাকি! অবিশ্বাসের সঙ্গে হাতে দিয়ে মুখটা মুছলো রামু।

—পড়ে না? তুই আমাদের সঙ্গে যে ভাবে কথা বলিস, বলিস সে ভাবে ছোট পিসির সঙ্গে? ও বাড়ীর কেষ্টর গলা জড়িয়ে ধরে হি-হি করে হাসিস, করিস কখনো সে রকম কানাইলালের সঙ্গে?

—না তো!

—কেন করিস না?

বোকার মতো তাকিয়ে রইলো রামু, মঞ্জুর দিকে।

—ঐ মুখের লেখা পড়ে। তুইও জানিস সে-লেখা পড়তে। পত্রিকা পড়ার চাইতে এ লেখা পড়া অনেক শক্ত। কানাইলালের চাইতে তুই কিসে কম? হাঁ, তার মতো অবশ্যি তোর সাহেব নেই। তাতে হয়েছে কি—কানাইলালের সাহেব তো আমারই পিসেমশাই—তোর যাওয়া আটকাবে কে? কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি বোকা তবে?

বিশ্বাস যে রামু করলো তা নয়, কিন্তু মনের দুঃখ-দুঃখ ভাবটা কেটে গেল। বিশ্বাস—কানাইলালেরই যে শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া হবে তারই বা বিশ্বাস কি। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো রামু নেকড়া-হাতে, বারান্দা মুছতে।—'ভজ মন মেরী মাতার নন্দনে।'

—আবার। জিভ কাটলো রামু।

বসবার ঘরের উদ্দেশ্যে আসতে আসতে মঞ্জু বললো—বৌদি ভাবছি কি জানো, ভাবছি, কানাইলালের পরিকল্পনাটা দিল্লী পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়। হয়তো পরিকল্পনা কমিশনের মেম্বার টেম্বার হয়ে যেতে পারে।

বসবার ঘরে এসে দেখলো ওরা একটুও গল্পে জমেনি। প্রধান অতিথি যদি গল্পী না হয় তবে গল্প জমবেই বা কা'কে নিয়ে। বাসুদেব এ-ষ্টেশন থেকে ও-ষ্টেশন ঘুরিয়ে চলেছে রেডিওর চাবী। কখন শব্দ হচ্ছে ঘরর-ঘর, কখন বেজে উঠছে বর্মি কথা বা ইন্দোনেশিয়ার সংবাদ। যতীন বাবুর সঙ্গে কথা বলছে সুদর্শন সবিনয়ে আজ্ঞে হাঁ আর আজ্ঞে না দিয়ে। জয়দেবকে ঘরে না দেখে গম্ভীর হয়ে উঠলো অমিতার মুখ আর ওদের সঙ্গে মৌরীকে না দেখেই হয়তো ঠোঁটের কোণে যে চুল পরিমাণ ফাঁক ছিল সেটুকুও সেঁটে গেল সুদর্শনের।

বসে অমিতার কানের কাছে মুখ নিয়ে মঞ্জু বললো—যুদ্ধটা কড়া হবে ত'পক্ষে।

—যুদ্ধ! কোথায় কড়া যুদ্ধ হবে?

একটা নিঃশ্বাস টানলো মঞ্জু—কানে কানে কথার জবাবের নমুনা এই! রেগে উঠলো সে। কোথায় তা আমি কি করে বলবো। তবে হবে।

—যুদ্ধ, কখনোই আর যুদ্ধ হতে পারে না। রেডিও বন্ধ করে উঠে এলো বাসুদেব।

হেসে ফেললো মঞ্জু। না হবে তো না হবে। যুদ্ধ দিয়ে করবো কি আমি। না আছে একটা ঘোড়া না আছে একটা তলোয়ার। লক্ষ্মীবাঈ হওয়া তো ঘটছে না কপালে।

যতীন বাবুর জন্ম বহুক্ষণ ধরে সিগারেট খাওয়া বন্ধ রাখতে হয়েছিল সুদর্শনের। চেন স্মোকার যাকে বলে সুদর্শন তাই। কষ্ট হচ্ছিল তার। হঠাৎ খেয়াল হতেই যতীন বাবু উঠে গেছেন। সিগারেট ধরালো সুদর্শন। তার পর ওর নিজস্ব ভঙ্গিতে চোখ দুটো কুঁচকে ছোট করে তাকালো মঞ্জুর দিকে—ঘোড়া আর তলোয়ার পেলেই আপনি বুঝি যুদ্ধে নেবে যেতে পারেন?

—পারি। তবে একটা ঘোড়া আর একটা তলোয়ার দিয়ে তো আর অসংখ্যের সঙ্গে লড়তে পারবো না? একজন লড়লে প্রতিপক্ষও একজন হতে হবে। অসংখ্য দিতে পারেন তো লড়বো অসংখ্যের সঙ্গে।

—লক্ষ্মীবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ হয়েছিলেন ইংরেজের সঙ্গে লড়ে। আপনি লড়বেন কার সঙ্গে?

—লড়বো কার সঙ্গে! লড়বার জন্ম সময় সময় আমি যে দস্তুর মতো মানসিক যন্ত্রণা বোধ করি।

—আমি সরবরাহ করবো না হয় আপনাকে ঘোড়া আর তলোয়ার।

সুদর্শনের চোখে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না পরিহাস তাকিয়ে দেখবারও প্রয়োজন বোধ করে না মঞ্জু। বলে—উঁহু, আপনার সরবরাহ দিয়ে আমার সংগ্রাম চলবে না। ও তো ব্যবসায়ীর ব্যবসা—

—এই মঞ্জু, ছোট পিসি—অমিতা ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে মঞ্জুকে চুপ করবার ইশারা করে। সুদর্শন হাতের সিগারেট আবার য়্যাসট্রের ভেতর ফেলে। বাসুদেব উঠে বড় কৌচটা ছোট পিসিকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তিনি বসেন না। আহ্বান জানান খাবার টেবিলে আসবার।

খাবার সময় নেমে আসতেই হলো মৌরীকে। বাবা নিজে গিয়ে ডেকে নিয়ে এলেন তাকে। [ক্রমশঃ।

কাশির
মূলকারণ দূর
করুন

OF IMITATION
SIROLIN
'ROCHE'
for COUGHS COLDS
and all irritable and
inflamed conditions
of the Chest and
Respiratory Tract

বিবেকানন্দ স্তোত্রে

সুমণি মিত্র

১৭

বিপ্লবী ফ্রান্সের আদর্শে মন-প্রাণ ঢেলে,
মূর্তি-পুজোর ঘাড়ে কেন তুমি সব দোষ ফেলে
'পুরাণ' ও 'তন্ত্র'কে ধিক্কৃত কোরে গেলে রাজা ?
পুরাণের যুগটাকে তামসিক কেন বোলে গেলে ? ১

ফ্রান্সের মতবাদ ভারতের পক্ষে কি খাটে ?
এমনকি ইউরোপ কি ফল ফ'লেছে বলো তাতে ?
স্বাধীনতা-সাম্যের ধাপ্পাটা ধরা প'ড়ে গ্যাছে
উনিশ-শো-চোদ্দোর নৃশংস সংগ্রামটাতে !

বিগত যুগের প্রতি সে-যুগের আধুনিক ফ্রান্স
সংগ্রাম শেষ কোরে সে নিজেই হোয়েছে হতাশ !
সাম্যবাদের ভিত কোনোদিন হয়নিকো দৃঢ়,
স্বাধীনতা-মৈত্রীর স্বপ্নটা হোয়েছে বিনাশ !

যাই হোক, আমাদের পুরাণ ও তন্ত্রের যুগ
ভারতীয় জীবনের সাময়িক তুচ্ছ অসুখ।
কারুর অসুখ হোলে প্রথমে তো ডাকো ডাক্তার,
না কি চাও অগ্রিম শ্মশানের চিতায় উঠুক ?

অধঃপতিত ঐ পুরাণ ও তন্ত্রের দিন
স্বামিজীর দৃষ্টিতে একেবারে নয় প্রাণহীন।
ধর্ম-জীবনে তার পঙ্গুতা এসেছিলো ঠিকই,
তাই বোলে কোনোকালে হয়নি সে মৃত্যু-মলিন।

মূর্তি-পুজোর নামে জঞ্জাল জ'মেছিলো বোলে
মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলে অমূর্তে পাড়ি দেওয়া চলে ?
চিরাভ্যস্ত ঐ স্বভাবের ধারাটাকে ফের
সাগরের মুখ থেকে নিয়ে যাবে গিরিগুহাতলে ?

তোমার বুদ্ধি যাকে একেবারে দিলো বরবাদ,
সিদ্ধির গুহা থেকে ঐ শোনো তার প্রতিবাদ।
স্বামিজীও আজীবন জ্ঞান-যোগী হওয়া সত্ত্বেও
এ-ব্যাপারে তাঁর মত ঢের বেশি অপক্ষপাত।

* * * *

"Those reformers
Who preach against image-worship,
Or
What they denounce as idolatry,—
To them I say—
Brothers !...
A beautiful large edifice,
The glorious relic
Of a hoary antiquity
Has,
Out of neglect or disuse,
Fallen into a dilapidated condition ;
Accumulations of dirt and dust
May be lying
Everywhere within it ;
May be, some portions
Are tumbling down to the ground.

১। সংস্কার-যুগের প্রেরণাই হোচ্ছে ফরাসী-বিপ্লব। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের স্বাধীন চিন্তাবাদীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হোয়ে সংস্কার-যুগের প্রতিভাবান নেতারা আমাদের পৌরাণিক যুগের শাস্ত্র, লোকব্যবহার ও ধর্মসাধন পদ্ধতিকে নির্মমভাবে আক্রমণ কোরেছিলেন। রাজা রামমোহনই প্রথম যোদ্ধা। তিনি পৌরাণিক যুগের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে, জাতীয় অবনতির সমস্ত হেতুকে আরোপ কোরে এই পৌরাণিক যুগটাকে জাতীয় জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে এক ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হোয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, রামমোহনের মতো অতো বড়ো মনীষীও পুরাণধর্মের বিকাশের ধারাটাকে ধ'রতে পারেননি, বৌদ্ধ-যুগের অধঃপতনের পর পৌরাণিক ধর্মের সাধনাঙ্গে সাময়িক ভাবে যে আবর্জনা এসে জ'মেছিলো, তিনি তাই শুধু দেখেছিলেন ! অবিশ্যি, আমাদের এই পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে তাঁর এই অনুদার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই একটা ব্যতিক্রম।

তবু পরবর্তী ব্রাহ্মসংস্কারকদের মতো তিনি ইউরোপীয় সংস্কারকের দ্বারা অন্ধভাবে পরিচালিত হননি, তাঁদের মতো তিনি পৌরাণিক ধর্মকে একেবারে অধর্ম বোলে উড়িয়ে দ্যাননি। পুরাণকথিত ধর্মকে তিনি অধঃপতিত যুগের একটা নিম্নস্তরের ধর্ম বোলে স্বীকার কোরে গ্যাছেন। এ-ব্যাপারে তিনি পরবর্তী ব্রাহ্মনেতাদের চেয়ে কিছুটা উদার এবং আত্মস্থ।

What will you do to it ?
Will you take in hand
The necessary cleansing and repairs
And thus restore to the old,
Or
Will You pull the whole edifice
Down to the ground
And seek to build
Another in its place,
After a sordid modern plan
Whose permanence
Has yet to be established ?"২

১৮

চাইলেও পারবে না ; এমন কি বুদ্ধও, যাঁর
পুতুল-পুজোর প্রতি সবচেয়ে বেশি ধিক্কার,
মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তির পরেতে নিজেই
পুজোর পুতুল বোসেছেন সারা এশিয়ার !

পৃথিবীতে দুটো দল প্রতীকের উপাসক নন,
এক হোলো বুদ্ধেরা আর যারা পশুর অধম।
এ-দু'য়ের মাঝখানে আর যতো মাঝারির দল,
প্রতীকের প্রয়োজন সকলেরই আছে বেশি-কম।

সে-হিসেবে পুরাণেই আমাদের বেশি কল্যাণ।
এখানে 'সোঽহং' নয়, আমি দাস, তুমি ভগবান।
বাসনাবিবশ মনে বেদান্ত বেদনাদায়ক,
সহজ ভক্তি-পথে সবচেয়ে কম লোক্‌সান্।

এ পথেও একদিন 'তুমি-আমি' একাকার হবে,
'দাসোঽহং' মিশে যাবে 'সোঽহং'এর মহা বৈভবে।
তখন হয়তো আর পুরাণের প্রয়োজন নেই,
তার আগে পুরাণের সোপানটা পার হোতে হবে।

প্রাপ্তির শেষে গিয়ে তবুও কি তাকে ভুলে যাবো ?
ছাদে উঠে সিঁড়িটাকে ভুলে যেতে বাধ্‌বেনা ভাবো ?
পুরাণের 'দাসোঽহং' 'সোঽহং'এরই সোপান যখন,
জ্ঞানের চরমে উঠে ভক্তির মানে খুঁজে পাবো।

তখনি বুঝবো এই পৃথিবীতে আছে যতো ভাব,
কোনোটাই হেয় নয়, কম-বেশি সবেতেই লাভ ;
'জ্ঞান' বা 'ভক্তি-যোগ,' কেউ কারো বিরুদ্ধ নয়,
আত্ম-জ্ঞানের পথে সকলেই এক-একটা ধাপ।

তখনি সমন্বয়, তার আগে বৃথা কোলাহল !
মতুয়ার বুদ্ধিটা সিদ্ধির অভাবেরই ফল !
সিদ্ধ সাধকই শুধু এ-কথা বিশেষ কোরে বোঝে—
রাস্তাটা বড়ো নয়, একাগ্রতাটাই আসল।

১৯

তুমি কিংবা পরবর্তী ব্রাহ্ম-নেতা যারা
বুদ্ধিকে নিয়োজিত কোরে
অরূপের ভিত্তিতে
নোতুন ধর্মমত গোড়ে
ধর্ম-সমন্বয় চাও,
তারা এটা কেন ভুলে যাও
বুদ্ধি বা যুক্তিটা
ধর্মের শেষ কথা নয় ?
আত্মার অনুভূতিটাই ;
বিচিত্র বিশ্বের
ঐক্য-সত্তাটার
সাক্ষাৎ দর্শন চাই।
বুদ্ধির মন্ত্রণা নিয়ে
জ্ঞানকে ভিত্তি কোরে
মূর্তিকে ছেঁটে বাদ দিয়ে
হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান শাস্ত্রকে যদি
একেশ্বরের বাদে
জোর কোরে টেনে এনে কেউ
নোতুন ধর্মমত করেন হাজির,
সেটাও সমন্বয়,
তবে সেটা নিম্নশ্রেণীর।৩

২। "যে সব সংস্কারকেরা মূর্তি-পুজোর বিরুদ্ধে প্রচার কোরে থাকেন, অর্থাৎ পুতুল-পুজো বোলে যার নিন্দে কোরে থাকেন, তাঁদের আমি বোলি,—ভাই···সুন্দর বিরাট একটা বাড়ি, বহুকালের প্রাচীন একটা মহান্ স্মৃতিচিহ্ন অবহেলা এবং অব্যবহারের ফলে আজ পতনোন্মুখ। তুমি তাকে কি কোরতে চাও ? প্রয়োজন মতো পরিষ্কার এবং মেরামত কোরে তাকে তার পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনবে, না সমস্ত বাড়িটাকেই ভেঙ্গে ফেলে তার বদলে বাজে আধুনিক পরিকল্পনা অনুযায়ী আর একটা বাড়ি তৈরী কোরবে, যার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এখনো কেউ নিশ্চিত নয় ?"

—*The Religion we are born in* (*Colombo to Almora : Page* 408.)

৩। "He (Raja Rammohan Roy) spared no system of idolatry. He directed his able pen in exposing and denouncing in no measured terms the idolarous prejudices of Hinduism, Mahommedanism and Christianity. But at the same time he culled together passages from these scriptures inculcating Monotheism. Thus he proved a friend and foe to each of the three principal religious systems of the world. An unsparing and throughgoing iconoclast, he yet failed not to extract the simple and saving truth of monotheism from every creed, with a view to lead every religious sect with light of its own religion to abjure idolatry and acknowledge the

ওটা তোলো বুদ্ধির,
সাধনা বা সিদ্ধির নয়।

বুদ্ধির কৌশল
কেটে যায় বুদ্ধিরই বলে,
কিন্তু যা' পেলে তুমি
হৃদয়ের গিরি-গুহাতলে,
প্রাপ্তির চরমেতে
ঐক্যের অনুভূতি যেটা,
—সে হোলো মৃত্যুহীন,
সূর্যের মতো অনল্লাল।

আসল সমন্বয়ে
বুদ্ধির নিপীড়ন নেই,
একটা বিশেষ মতে বিশেষ পথেই
যুক্তির ধ্বজা তুলে
সবাইকে টেনে আনা নয়,
সাধনার জোরে
'এক'কে বিশেষভাবে অনুভব কোরে
অনেকের মাঝখানে
তাকে পেতে হয়।
এইভাবে সাধনার শেষে,
একদিন একেবারে
প্রাপ্তির চরমেতে এসে
ব্রহ্মের অনুভূতি পেলে,
এক আর অনেকের
মায়িক সীমাটা মুছে গেলে
তখন বুঝবে তুমি এই—
বহুরূপী ব্রহ্মের
অসত্য বোলে কিছু নেই।
তখনি তোমার
বিচিত্রতার প্রতি
বিদ্বেষ থাকবে না আর।

এই যে সমন্বয়
—এ হোলো বোধির,
বিচিত্র সাধনার চরমে গিয়েই
অখণ্ড ঐক্যের অনুভূতি এই।

তোমার সমন্বয়ে
বুদ্ধির কৌশল আছে,
সাধনালব্ধ এই
সাক্ষাৎ অনুভূতি নেই!
তাই জন্যেই
তোমাদের মতবাদটায়
বহুরূপী ব্রহ্মের
বিচিত্র ঝংকার নেই!

তাই জন্যেই
ব্রহ্মের মর্ত্যাগমন,
যুগের প্রান্তে এসে
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের
সাধনার এত আয়োজন।
স্বামিজী বলেন,—
"To proclaim
And make clear
The fundamental unity,
Underlying all religions,
Was the mission of my Master.
Other teachers
Have taught
Special religions
Which bear their names,
But
This great teacher of the nineteenth century
Made no claim for himself,
He left
Every religion undisturbed
Because
He had realised
That, in reality,
They are all
Part and parcel
Of the one Eternal Religion."

[ক্রমশঃ।

One Supreme. He went through the Hindu, Mahommedan and Christan scriptures with indefatigable perseverance, and set forth the unity of God from the teachings of these books, while he argued away with unsurpassed ingenuity and erudition all doctrines inculcating Polytheism."

—*The Brahmo Somaj*, or *Theism in India*. (*Indian Mirror, July* 1,1865) *by Keshab Ch. Sen.*

"আমার গুরুদেবের জীবনের উদ্দেশ্যই ছিলো, সমস্ত ধর্মের মূলে যে ঐক্য রয়েছে, তাকে ঘোষণা করা। অন্যান্য আচার্যেরা বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রচার কোরেছেন, সেগুলো তাঁদের নিজেদের নামে পরিচিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর এই মহান আচার্যদেব নিজের জন্য কোনো দাবী রাখেননি। তিনি কোনো ধর্মের ওপরেই হস্তক্ষেপ করেননি, কেননা, তিনি সাধনার দ্বারা উপলব্ধি কোরেছিলেন যে, সমস্ত ধর্মই এক সনাতন ধর্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ।"

—*My Master* (*page* 69)

ছাব্বিশ

ঠাণ্ডা জল ঢাললে গায়ে মঞ্জরী, তার সমস্ত ভাবনার গায়ে ঢেলে দিলে ঠাণ্ডা জল। ছবির কাজ সে পাবে না। এই দেহবেসাতিই তার নির্মম নিয়তি।

আজ আপনি যান, আমার শরীর বইছে না।

তাড়িয়ে দিচ্ছ এখন থেকেই। কিন্তু আজ একটু বেশী রাত অব্দি তোমার কাছে থাকব বলেই এসেছিলাম। কালই আমায় চলে যেতে হচ্ছে মধুপুর ; এক হপ্তাও থাকতে পারলাম না। কালই যেতে হবে।

আপনার পায়ে পড়ি দুলুবাবু ; আজ আপনি যান।

দুলুবাবু মঞ্জরীকে ভালো করে দেখলো। কি হলো। কি হতে পারে। শরীর খারাপ, ক্লান্তি, ওসব বাজে কথা। ওদের কখনও ক্লান্তি আসে না। তবুও দুলুবাবু বুঝলো, আজ এখানে থাকলে মেজাজই খারাপ হবে। আমোদ জমবে না। ভবানীপুরে বাণীর কাছে গেলে কেমন হয় ? দুলুবাবু উঠলো।

মধুপুর থেকে ফিরে এসে দেখব। আমার কলকাতার মৌতাত ভেঙ্গে গেছে।

দুলুবাবুর মদ খেলেই কাব্যি আসে আর গা গুলিয়ে ওঠে মঞ্জরীর। একটি কথাও বললে না সে।

নীচের চৌকাঠ পেরিয়ে গিয়ে ছেঁড়া কাগজগুলো তুলে নিলে দুলুবাবু, পতিতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন।

নিজের সই-এর ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠলো।

হতাশ হয়ে ওপর দিকে একবার তাকাল দুলুবাবু। তাকা লাগছিলো প্রায় বাড়ীউলীর সঙ্গে।

কি গো ভালো মানুষ ? আজ চললে যে এখনই ?

আর ভালো লাগে না ; ভাবছি এ সব ছেড়ে দেব। দুলুবাবু কথাগুলো নিজেকেই বললে কিন্তু জ্ঞানদা শুনতে পেল।

ভালো লাগে না কি গো ? মঞ্জরী ঝগড়া করেছে ?

ঝগড়া ? কই না ? শরীর খারাপ তার।

শরীর খারাপ ? ঠোঁট উলটে ভঙ্গী করলে সে। বেশ্যার আবার শরীর ভালো হয় কবে ? হন হন করে জ্ঞানদা চললো মঞ্জরীর ঘরের দিকে।

মঞ্জরীর ঘর বন্ধ।

তাই বলো। আশ্বস্ত হল জ্ঞানদা। অন্য খদ্দের লুকিয়ে রেখেছিল ঘরে। মঞ্জরীর পেটে পেটে এত ? হাসিতে বীভৎস দেখালো প্রৌঢ়া জ্ঞানদার বসন্ত-মুদ্রিত মুখ।

মার না খেয়ে কান্না মঞ্জরীর জীবনে এই প্রথম।

ফুলে ফুলে কাঁদলে মঞ্জরী, আর ভাবলে। এই সমাজের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিশোধ নেবার নেই। হাণ্ডবিল ছাপিয়ে নয়। আবেদন করে নয়, গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে সমাজের মধ্যে ঢুকে ; বিষ ছড়িয়ে। দূষিত দেহ দিয়ে জড়িয়ে। কলুষিত করে কদর্য কামনায়। কিন্তু তার জন্তে চাই টাকা। ছবির কাজটা হয় না ?

মঞ্জরীর ইতিহাস আর পাঁচজন বেশ্যার চেয়ে তখনও পর্য্যন্ত তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে অসাধারণ কিছু নয়। শুধু বেশ্যাদের মত সে অজ্ঞাতপিতার সন্তান নয়। তার বাবার নাম নৃপেন গুঁই। ক্যারেটা স্ট্যানডার্সের বড়বাবু। সন্ধ্যের পর ক্লাবে ব্রিজ খেলেন, রাত ন'টায় আসেন মঞ্জরীর মার কাছে। রাত বারোটায় বাড়ী ফিরে যান। কিন্তু একদিন অন্তর একদিন। যেদিন নৃপেন আসেন না, সেদিন আসেন মহাদেব চাটুজ্যে। নৃপেন আর মহাদেব দুই বন্ধু। একই নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করতে ঈর্ষা বোধ করেন না, এমন বন্ধুত্ব বোধ করি বিরল। নৃপেনকে মঞ্জরী বাবা বলেই ডাকে, মহাদেবকে সোনা-বাবা ! মাকে মঞ্জরী একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো ; তুমি বাবাকে বেশী ভালোবাস না, সোনা-বাবাকে ? সোনাবালা তার জবাব দেয় নি। বলেছিলো বেশ্যার কাউকে ভালোবাসতে নেই পেঁচি। ব্যবসা নষ্ট হয় তাতে। তুই কাউকে ভালোবাসতে যাসনে। আর পুরুষ মানুষের ভালোবাসা, মুসলমানের মুরগী পোষার চেয়েও মারাত্মক।

নীলকণ্ঠ

মঞ্জরীও কাউকে ভালোবাসে না। ভালোবাসে গান গাইতে শুধু, কিন্তু পারে না। গানের হাতেখড়ি তার সূর্য্যমুখী, ইন্দুমুখীর কাছে। তারা দুই বোন, দুই বাঈজী। কিছুদিন ট্যাঙ্গরায় তাদের বাড়ীর পাশে মঞ্জরী আর তার মা ছিলো। সেই সময় সা রে গা মা সেধেছিলো মঞ্জরী ; সে আর ক'দিন ? তার পরেই তারা উঠে যায় ভবানীপুরে। গান শেখা আর এগোয়নি। সোনাবালা মঞ্জরীকে বলেছিলো, দুঃখ করিস নি পেঁচি, যা শিখেছিস তাতেই চলবে। বাবুরা কি আর গান শুনতে আসবে ! যা হয় একটা কানের কাছে প্যাঁ-প্যাঁ করলেই হয়।

বাবুরা হয়ত খুসী হয় কিন্তু মঞ্জরী হয় না। পুরুষমানুষকে না হয় ভালোবাসতে নেই কিন্তু গান ভালোবাসলে দোষ কি ? গান কি পুরুষমানুষের চেয়েও খারাপ। না, খারাপ নয়। খারাপ যদি পৃথিবীতে কিছু থাকে সে হল কাউকে না ভালোবেসে দেহ

জাত-বেশ্যার মেয়ে হলেও মঞ্জরী মনে এই কথা কেমন করে তোলপাড় করে সারাদিন, সমস্ত রাত। এত দুর্ভাগ্য নিয়ে সে কেন জন্মালো ? কেন ? কেন ? কেন ?

দুপুরবেলায় মঞ্জরী গোছগাছ করে নিল সব।

সোনাবালা জিজ্ঞেস করলে : দুলুবাবু কবে আসবে রে মধুপুর থেকে ?

দুলুবাবু আর আসবে না। এলেও আমার কাছে আর নয়।

শোন্ ছুঁড়ির কথা একবার। আসবে না, যাবে কোথায় ?

মা ভয় কোরছে। নৃপেন গুঁই-র এবার পেনসনের সময়। সোনাবালার দুঃসময়। মঞ্জরীই একমাত্র ভরসা। তার পেটে যে এমন মেয়ে এলো কি ক'রে, সোনাবালা তাই অনেক সময় ভাবে। কিন্তু এখন কিছু বলে না ;

মঞ্জরীকে সে জানে। একবার বেঁকে বসলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। দিদির ওখানে যাচ্ছে, ক'দিন বাদেই ফিরবে। সেই সঙ্গে দুলুবাবুও, চলে যাবে যেমন করে হোক।

মঞ্জরী যখন দিদির বাড়ী গিয়ে উঠলো, তখন দুপুরবেলা। আপন দিদি নয়। মার পুষ্যি। কিন্তু মঞ্জরী ভালোবাসে মার চেয়েও বেশী।

মঞ্জরী দুপুরবেলায় আসবে ভাবেনি। ভারি খুসি হল বেলারাণী ; দুলুবাবু কোথা রে ?

থাকতে এলাম আমি ; জিজ্ঞেস করছিস দুলুবাবুর কথা ?

তুই তো এখন থাকবি ক'দিন ; দুলুবাবুকে ছেড়ে দিদির কথা মনে পড়ল তাই ভাবছি !

পরে ভেবো ; এখন এটা নাও দিখিনি।

সুটকেশ নিয়ে বেলারাণী উঠলো ওপরে শোবার ঘরে। দুপাশে দুখানা ঘর ছোট ছোট ; মাঝখানে বেলারাণীর থাবার ঘর। এইখানে রতনচাঁদ এসে রাত কাটিয়ে যায়। বেলারাণী একটু স্থুল, কিন্তু রং ফর্সা আর পুরুষমানুষ যা চায় সে তাই। কখনও আপত্তি ক'রে না ; কিছুতেই। শরীর খারাপের কথা জানায় না ; একবারও বলে না : আজ বাড়ী যাও লক্ষীটি। রতনচাঁদ ছাড়া তাকায় না কারুর দিকে। রতনচাঁদ ছাড়া আর কোনও মানুষ নেই তার। বয়স হয়েছে যা দেখায় তার চেয়ে কম বয়স।

মা কেমন আছে রে ?

সেই রকমই ঝগড়া করছে রাত দিন।

তাহলে তুইও সেই রকম আছিস পেঁচি ?

আমি কি রকম আছি তা ত দেখতেই পাচ্ছিস।

তুই আরো রোগা হয়ে গেছিস আর···

আর কি বল ?

আর এখনও তেমন ভুলো।

কি করে বুঝলি ?

বাইরে রিক্সা ঠং-ঠং করছে ; পয়সা দিসনি নিশ্চয় ?

ঐ রে সত্যিই ত' !

থাম থাম ; আমি দিয়ে দিচ্ছি। কত দেব রে ?

আগে আট আনা নিত ; রোগা হয়ে গেছি যখন বলছিস, তখন ছ' আনাই দে !

বারান্দা থেকে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে বেলারাণী বললে : এত হিসেবী ক'দ্দি করে থেকে ? দুলুবাবুর রস মরে এলো নাকি ?

না ; আমারই আর ভালো লাগে না দিদি !

ভালো লাগে না ? অবাক করলি পেঁচি ; এ আবার কার কবে ভালো লেগেছে ? অভ্যেস করে নিতে হয়।

এবার অভ্যেস বদল করব।

কি করবি ?

জানি না ; মঞ্জরী ভাবলে একবার সিনেমার কথাটা বলে ; তারপর কি মনে হল, চুপ করে গেল।

কিন্তু বেলারাণী চুপ করলো না। সেই বলল : থিয়েটারে নামবি ? ওসব খারাপ। শরীর একেবারে যাবে। পেট ভরবে না। টানা হ্যাঁচকায় যাবি কেন ? আমাকেও বলে, সিনেমা তুলবে, নামতে। আমি বলি, না ; ও আমাকে দিয়ে হবে না। হবে না, বলি বটে, কিন্তু হয়, জানি ; যারা করে, তাদের ত দেখেছি ; আমিও পারি। কিন্তু এই ত বেশ আছি ; কি হবে একজন ছেড়ে পাঁচ জনকে নিয়ে ?

তুমি সিনেমা দেখ দিদি ?

সে কি রে ? কালই ত' সন্ধ্যেয় গেছলাম স্বপ্ন-তরঙ্গ দেখতে। মেয়েটা বেশ করেছে। বড় দুঃখ হোল ; মরে গেল শেষে স্বামীর অত্যাচারে ; যাবি একদিন ?

হ্যাঁ ; চল কালই যাই দিদি !

কাল নয় রে ; শুক্রবার যাবো। কাল লক্ষ্মীপুজো আছে।

লক্ষ্মীপুজো করো নাকি। এতক্ষণে হাসলে মঞ্জরী। তাকিয়ে দেখল এক কোণে একটি লক্ষ্মীপ্রতিমা ছোট চারপায়ার ওপর। ফুল দিয়ে সাজানো। ধূপদানি শাঁখ ঘণ্টা ; ত্রুটি নেই কিছুতে।

এমনি করে একটু চোখ বন্ধ করে বসি। লক্ষ্মীর দয়াতেই ত' যা কিছু ; তাছাড়া পাপের বোঝা না কমুক, একটু কম চেপে বসবে।

তোমার স্বর্গবাস হবে, আর আমার ?

তুই ইন্দ্রলোকে থাকবি সুখে।

স্বর্গেও দুলুবাবুরা যাবেন তাহলে, মঞ্জরী অবাক হল। সেখানেও মেয়েছেলের জন্যে সুখ-সুবিধে সব। সেখানেও খুসী করতে হয় পুরুষদেবতাগুলোকে ; তা হলে মরেও শান্তি নেই।

কি অত আকাশ-পাতাল ভাবছিস রে পেঁচি ?

কিছু নয়। ঘুমবো একটু।

নে না ; গড়িয়ে নে একটু ; আমিও তো শোব।

বেলারাণী যখন ধাক্কাতে ধাক্কাতে মঞ্জরীকে তুললে ঘুম থেকে, তখন সামনের আর আশের পাশের বাড়ীতে দশ ওয়াট ইলেকট্রিক আলো পুড়ে গেছে। সন্ধ্যের বউনী হয়ে গেছে কাপড়ের দোকানে আর মনোহারী দোকানে। কুল্পী চাই বলে হেঁকে গেছে অন্তত বার চারেক। আর চান শেষ হয়ে চুল বাঁধা হয়ে গেছে নীলমণি দত্ত লেনের বসন্তসেনার।

ভর সন্ধ্যেয় মেয়েমানুষ এমন বেহুঁস ঘুমোয় নাকি রে পেঁচি ?

স্বপ্ন দেখছিলাম দিদি !

কি স্বপ্ন ?

দেখছিলুম সকাল হয়ে গেছে।

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়, তুই সকাল দেখলি ? স্বপ্ন তো আচ্ছা দেখিস তুই ?

চাকার আয়না —বৈদ্যনাথ হালদার

—কনক দত্ত

মুক্তির আস্বাদ

বন্দীর ব্যথা — মধুসূদন মুখোপাধ্যায়
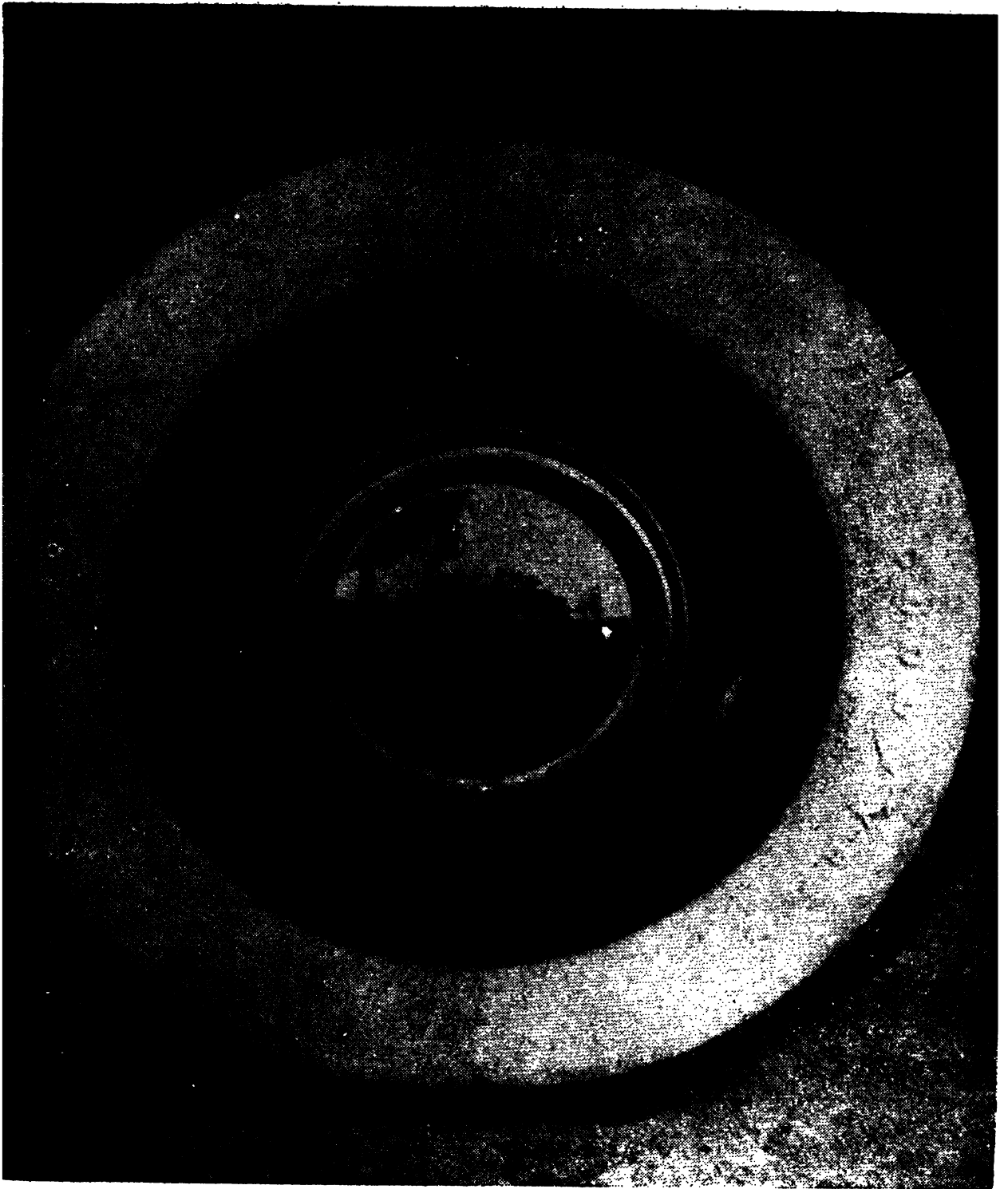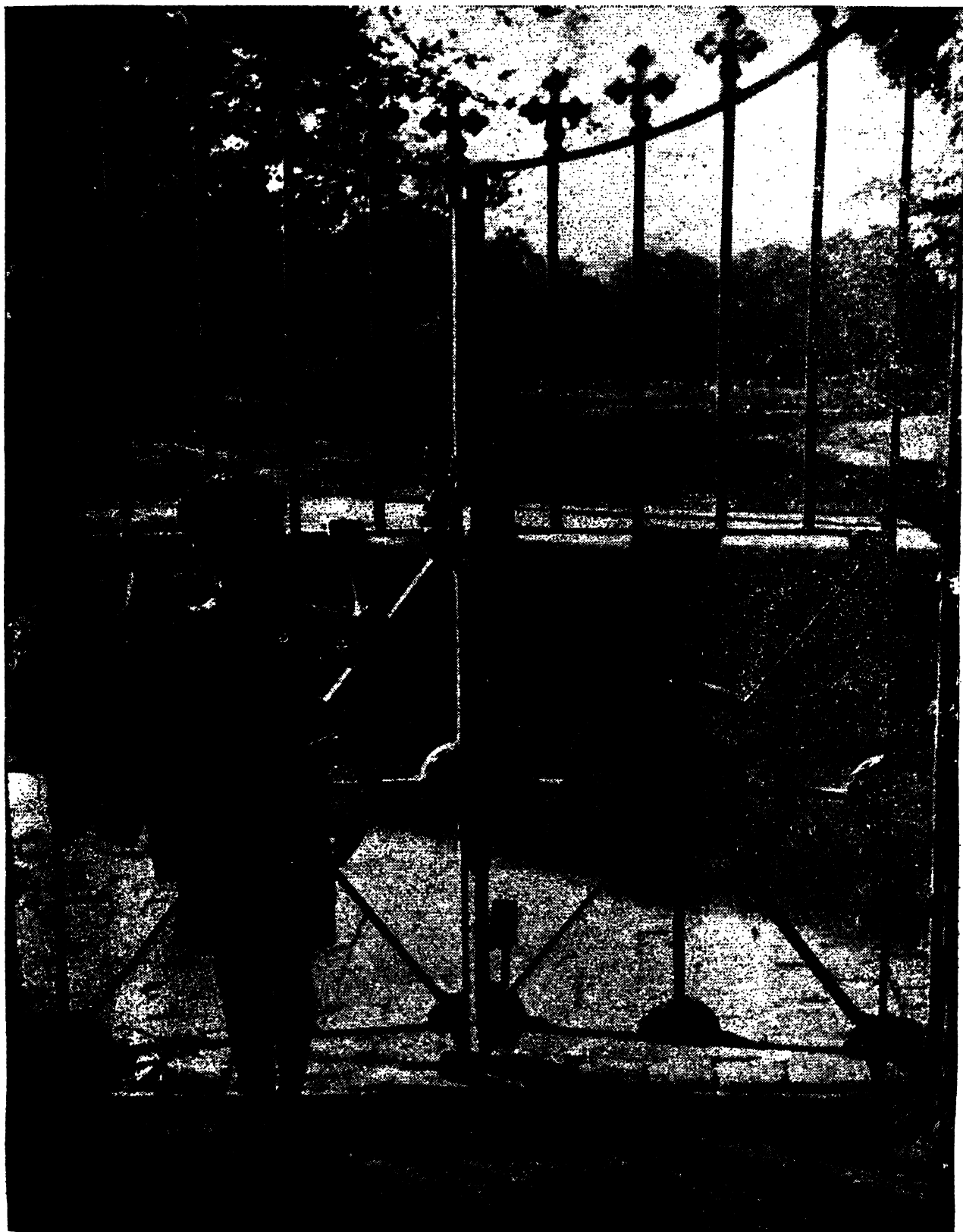
পায়রা ভোজন —রমেন বাগচী

না; সকাল এখনও সত্যিই হয় নি; মঞ্জরী হতাশ হল; সকাল হ'তে এখনও অনেক দেরী।

রাত আটটায় রতনচাঁদ এলো। জামার গলায় হীরের বোতাম লাগিয়ে রুমালে সেন্ট আর পাতলা গোঁফে আর কানের তলায় দামী আতর লাগিয়ে। মঞ্জরী অবাক হল। লোকটার পয়সা আছে কিন্তু দিদিও তো তেমন কিছু গুছিয়ে নিয়েছে বলে মনে হয় না! তারপর হিসেব করতে মনে পড়লো জাত ব্যবসাদার; মেয়েছেলের কাছে আসে কিন্তু যতক্ষণ থাকে ততটুকুর দাম দেয়। বিলোতে আসে না। বাপ-ঠাকুরদার মান রাখতেই আসে। মেয়েছেলে না রাখলে পয়সা রাখা যায় না।

—আমার বোন মঞ্জরী।

হ্যাঁ, হ্যাঁ! দেখেই বুঝে নিয়েছি। মুখের কাট হুবহু তোমারই রাণী।

মঞ্জরী মনে মনে হাসলো। বেলারাণী তার মার-পেটের বোন নয় কিন্তু বলতে হয়, শুনতেও হয়।

আজ কত টাকা ঠকালে?

রাম! রাম! রতনচাঁদ জিভ কাটলো; দু' পয়সা বেশী নেবো কিন্তু খদ্দেরকে ঠকাবো না।

মঞ্জরী মেপে মেপে দেখলে রতনচাঁদকে। যেমন করে রতনচাঁদ ওজন করে দেখে নেয়, সোনা আর হীরে। দেহের থেকেও কথাবার্ত্তায় স্থূল; মোক্ষ পাবার পথে চলেছে। অর্থই মোক্ষ। ঘি-দুধের শরীর আর নিশ্চিন্ত ঘুমের। শুধু চোখ দুটো বলে দিচ্ছে—আদর করতে করতেও বেহিসেবী হয় না রতনচাঁদ। মেয়েছেলের কাছে মিথ্যে কথা বলে, মিথ্যের মতই শোনায়। খদ্দেরকে সত্যি বলে না ভুলেও; কিন্তু সত্যির চেয়েও খাঁটি শোনায় সে-সব। চোখ দুটোই দু' ফালি ছুরি। ভেতর পর্যন্ত কেটে বসে, বাইরের ঘা শুকিয়ে যায় কিন্তু শুকোয় না ভেতরের জ্বালা। রূপকথার দিনে রাক্ষসের প্রাণ থাকতো পাখীর ছোট্ট বুকে। অজানা অরণ্যের বুনো ফলের ভেতর। জলের তলায় অতল পাতালে কুমীরের চোখের মণিতে। আর রতনচাঁদের হৃদয় বুঝি পড়ে আছে টাকার থলিতে। ফাট্‌কার দর ওঠা-নামায়। হীরা, পান্না, জহরতের ঠিক্‌রে-পড়া দ্যুতিতে। বেলারাণী পুজো করে কার্তিক। রতনচাঁদের উপাস্য গণেশ। কার্তিকের ময়ূর চলতে চলতে ক্লান্ত হয়। গণেশের মোটর গাড়ী পেট্রল ঢাললে চলে।

গান হোক একখানা। কিন্তু গানের আগে কাজের কথা হোক।

কাজের কথা বলতে গিয়ে থামলো রতনচাঁদ। একবার কটাক্ষ হানলো মঞ্জরীর দিকে।

ওর সামনে বলতে পারো। বেলারাণী মঞ্জরীকে উঠে যেতে দিলো না।

হাঁ রাণী, সে দেখেই বুঝে নিয়েছি। কাল বারোটায় লোক আসবে। এই হীরেটা রাখো। পকেট থেকে রতনচাঁদ বার করলে বাক্সটা।

বাক্সে হাত দিয়ে পরিষ্কার করলে রতনচাঁদ। তার পর বেলারাণীর হাতে দিলো। বেলারাণী উঠে গেলো সিন্দুক খুলতে।

কি বললে এটা দিয়ে দেব।

আমার লোক আসবে দুপুর বারোটায়; এসে বোলবে: রতন বাবু, চশমাটা ফেলে গেছেন; দাও দেখি।

মনে থাকবে তো?

এখনও অবিশ্বাস করো?

রাম! রাম! কি যে বলো রাণী! বিশ্বাস-অবিশ্বাস নেই, ঝুটো লোকের হাতে না যায় তাই।

এ কি ঝুটো মাল, যে ঝুটো লোকের হাতে যাবে!

মঞ্জরী বুঝলে, চোরাকারবারও আছে রতনচাঁদের। হয়ত সেইটেই পয়সার গোপন সুড়ঙ্গ। কিছু বললে না।

এবারে গান হোক একখানা।

আজ মঞ্জরী গাইবে। পেঁচি, গা তো একখানা। বহু দিন ধরে তোর গান শুনি নি। মঞ্জরী কিন্তু আপত্তি করল না। ধরলে তার একখানাই জানা গান।

'বনের পাখী উড়ে গেছে; মনের পাখী কাঁদে তাই!'

বহুৎ আচ্ছা!

বাইরের আকাশে কখন মেঘ জল হয়ে নামলো।

সে-রাত্তিরে রতনচাঁদ থেকে গেলো। এই বৃষ্টির মধ্যে বাড়ী যাওয়া অসম্ভব। গাড়ী ছিলো; কিন্তু গাড়ী ফেরৎ গেল।

আজ রাতে কাদের সঙ্গে যেন তোমার কথা ছিলো না?

সে আর হোত নাকি রাণী? বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে কিছু বাতচিৎ ছিলো। কিন্তু এতো বৃষ্টিতে বাঙ্গালী বাবুরা বাড়ী থেকে বেরোয় না!

বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে আবার কি কথা হবে? ঠকাচ্ছ বুঝি কাউকে?

শুনুন মঞ্জরী দেবি!

দেবি কথাটা কেটে বসে গেলো পেঁচি মঞ্জরীর মনে।

শুনুন একবার দিদির কথা! এতটুকু বিশ্বাস নেই আমাকে, ঠকাব কেন?

ফিল্ম বানাচ্ছি একখানা, তুমি ত আর হিরোইন হলে না রাণী?

আমি হিরোইন হলেও হিরো হবে অন্য লোক, সইতে পারবে ত?

হা হা হেসে উঠলো রতনচাঁদ, কি যে বলো রাণী!

অনেক রাত্তির পর্য্যন্ত ঘুম এলো না মঞ্জরীর।

নানা দিক দিয়ে মঞ্জরীর কয়েক বছর ব্যবসায় আজকের দিনটা একটু ব্যতিক্রম। দুলুবাবুর সঙ্গে সন্ধ্যে কাটেনি। কোন খদ্দেরের জন্যেও বাইরে দাঁড়াতে হয়নি। কোন খদ্দেরের কথা তার মনেই হয়নি আজ। এ এক অভিজ্ঞতা কিন্তু তার পরেই সে হিসেব করলো হাতে যা আছে তাতে এক মাস চলবে। সামনের মাসটা কোনও রকমে। ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল মঞ্জরী।

আজ তুমি কেমন যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছ?

বেলারাণীর কথায় চমকে উঠলো রতনচাঁদ, বলল, কেন?

তুমি নিজেই ভেবে দেখো।

বুঝতে না দিলেও বেলারাণী বুঝলো সবই। আর দোষ দিল বারে বারে নিজের কপালের, নিজেকে একেবারে উজাড় করে দিয়েই তার এ অবস্থা। একটুও হাতে না রেখে এতদিন ধরে সে শুধু দিয়েই এসেছে। অথচ সমস্ত সাধারণ মেয়েরাও জানে যে মেয়ের কাছে সহজেই পুরুষরা সব পায়, ন চাইতেই, যে সিন্দুক খুলে দেয় মনের আর দেহের, সেখানে বেশি দিন আকর্ষণ বাসা বাঁধে না। রাস্তার মেয়ে মানুষ প্রথম চাওনিতেই বুঝে নেয় কোন তাড়নায় ঘরের বউ ফেলে তার কাছে আসে মানুষ। তখন সে টানে কাঁচপোকাকে যেমন টানে

বেঙ্গল স্যাম্প। পাখীকে যেমন উড্ডীন শক্তি রহিত করে নিয়ে আসে সাপ নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে একটু একটু করে। আস্তে আস্তে। কিন্তু সাপের চেয়ে যে অনেক সাংঘাতিক সে জানে খেয়ে ফেললেই ফুরিয়ে গেল খেলা। সে আধমরা করে রেখে দেয় শীকারকে। বেলারাণীও যে এ তথ্য জানে না তা নয়, কিন্তু তার বাঁধা মানুষটির জন্যে ভারি দুঃখ হয়। রতনচাঁদের বউকে সে দেখেছে, বেলারাণী তার পাশে দাঁড়াতে পারে না; চেহারায় স্বাস্থ্যে, চমকিতেও এমনকি। তাই সে সব দিয়েছিল রতনচাঁদকে, বউয়ের কাছে যা পায়নি রতনচাঁদ বেলারাণী তা দিতে একবারও দ্বিধা করেনি, একটুও সময় নেয়নি; বোঝেনি স্বাভাবিক কামনার মৃত্যু আছে, বিকৃত কামনা সমুদ্রের মত অতল আর আকাশের মতই অসীমও সে বুঝি। শুধু পঙ্কিলতায় সে জঘন্যতম, পঙ্ককুণ্ডের চেয়েও দুঃসহ, উগ্রতম বিষবাষ্পের চেয়েও দুর্গন্ধ। তাই বিকৃত কামনার তাতে দিন-রাত যে দগ্ধ করে রাখতে পারে তার কাছেই মজা খোঁজে তারা। পরিহাস করতে চায় সহজ পথের অনায়াস আরাম। বেলারাণী রতনচাঁদকে এখনও হারায়নি কিন্তু হারাবে সে জানে, অন্য কোথাও একটুখানি হাতছানি দিলেই ভুলে যাবে রতনচাঁদ। তবুও বেলারাণী প্রথম দিনেও যেমন ধরা দিয়েছিলো আজও তেমনি। এতটুকু ঈর্ষ্যার কারণ হয়নি সে কোন দিন একটুকু ঈর্ষ্যা করেনি কোন দিন। রতনচাঁদ যা নিজে থেকে দিয়েছে তাই নিতে এতটুকু বেজার হয়নি। আভাসে আর উক্তিতে জানায়নি তার আরো চাই। পয়সা রেখেছে হিসেবীর মত; কিন্তু যৌবন বিলিয়ে দিয়েছে বেহিসেবীর রূপোপজীবিনীর মত। আর রতনচাঁদ এখন তার কাছে যত না আসে আরামের জন্যে তার চেয়েও বেশী আসে কারবারের খাতিরে। বাঁকাচোরা কারবারের কারবারি; বাড়ীর নীচের চোরা কুঠুরীর মত ব্যবহার করেছে বেলারাণীকে; রেখে দিয়ে গেছে কোকেন, আর হীরে, চালান করে দেবার আগে অনেক অনেক চোরাই মাল। বেলারাণীর ওপর নির্ভর করতে হয়েছে তাকে। নির্ভর করে ঠকতে হয়নি আজও। তাই বেলারাণীর ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে যাবার চেষ্টা করেনি রতনচাঁদ। কিন্তু বেলারাণীর বড় বড় ব্যবহার ভালো লাগে না রতনচাঁদের। এখানেও সেই খবরদারী। ভিজলে অসুখ করবে। বড্ড খাটছে রতনচাঁদ; এত ভালো নয়। বড্ড বেহিসেবী হয়ে পড়েছে নাকি রতনচাঁদ। রতনচাঁদ বিরক্ত হয়, কিন্তু হাসে। বেলারাণী ভাগ্যিস বিয়ে করবার মত মেয়ে নয়।

বিছানা ছেড়ে উঠলে মঞ্জরী।

কলঘরের দিকে এগুলো সে। খিল খুলে বাহিরে বেরুতেই মনে হলো সাঁ্যাং করে কে সরে গেলো। কে হতে পারে? দাঁত দিয়ে ঠোঁটের নীচেটা কামড়ে ধরলো। তারপর বাড়তি আঁচলটুকু দিয়ে সারা গা জড়িয়ে সে এগিয়ে চলল। চুপ, ফের কোঁস করে উঠলো রতনচাঁদ। তারপর একটা একশো টাকার নোট গুঁজে দিল মঞ্জরীর হাতে। হঠাৎ মঞ্জরী এক হাতে সুইচটা টিপে দিলে; আলো থেকে রতনচাঁদ একটু চোখ সরাতেই ধাক্কা দিলে মঞ্জরী আর মেদবহুল রতনচাঁদ কোণে বসানো মস্ত গোলটবের মধ্যে গিয়ে পড়লে। মঞ্জরী দরজা খুলতেই দেখলো বেলারাণী হাঁফাচ্ছে। কি হয়েছে? কি? বেলারাণীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শাড়ী ঠিক করতে করতে বললে কিছু হয়নি। এই একশো টাকার নোটটা উনি কলঘরে ফেলে গিয়ে নিতে এসেছিলেন। কলঘরে ছিলাম আমি, দরজা বন্ধ করতে ভুলে যাওয়ায় উনি বুঝতে না পেরে ঢুকে পড়েছিলেন। কথাগুলো শুনতে পেয়ে রতনচাঁদের মনে হলো সে বরফ-জলের মধ্যে বসে আছে; তবুও ঘাম হচ্ছে কেন? বেলারাণী যেতে দিলে মঞ্জরীকে আর বুঝলে সবই, তাই কিছুই বললে না। কপাল ভাঙ্গল আজ থেকেই।

পরের দিন সকালে সূর্য উঠে অনেকক্ষণ হামাগুড়ি দেওয়ার পর তবে মঞ্জরীর ঘুম ভাঙ্গলো। ঘুম ভাঙ্গামাত্র কাল রাত্তিরের বিশ্রী ঘটনাগুলো মনে পড়ে গেলো। পড়ে যাওয়ামাত্র সকালের চেহারাটা কালো হয়ে এলো তার চোখের ওপর। মঞ্জরীর এখন হঠাৎ বোধ হচ্ছে কাজটা ভালো হয়নি। বেশ্যার আবার লোক বেলোক কি? আর মঞ্জরী যদি রতন চায় সত্যি-ই জীবনে, তা হলে কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত রতনচাঁদের তাকে চাওয়াটাকেও মেনে নিতে হবে বৈ কি। কেন তার এ মতিভ্রম হলো? সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ছলুবাবুর ওপর। তার মেজাজই খারাপ করে দিয়ে গেছে ছলুবাবু। এক পয়সা দিয়ে যায়নি কিন্তু বেশ্যাবৃত্তির উপর ঘেন্না জমিয়ে দিয়ে গেছে। আজ রোজগারের পথ শুধু বন্ধ নয়। রোজগারের প্রবৃত্তির উধাও। কি করবে তবে মঞ্জরী? কি সে করতে পারে? এত অসহায় এর আগে মঞ্জরী আর কখনো এমন ভাবে বোধ করেনি।

চান-টান করে যাবার জন্যে মঞ্জরী তৈরী দেখেও বেলারাণী একটি কথাও কিন্তু বললে না। কিছুদিন থাকবে বলে কাল যখন মঞ্জরী এলো তার এখানে, বেলারাণী আজ সকালে কিন্তু আর সে ভেবে পেলো না যে সে তখন কেন এত খুসী হোয়েছিল। তার এতদিনের মৌচাকে তার নিজেরই একজন যে এমন ভাবে ঢিল মারবে, এ সে ভাবে নি। নিজের একজন। থুঃ। বলেই বেলারাণী মঞ্জরীকে ভাঙ্গা মৌচাকের বোলতার মত বিঁধতে না পেরে হতাশ ধিক্কার দিলে। সে থুতু তার নিজের গায়ে ফিরে এলেও; আবার দিলে; থুঃ? মন্দ মেয়েছেলে যখন ভালোমানুষী করতে যায় তখন যে সে শুধু ভালোমানুষের মন্দ করে তা নয়, তার নিজের মন্দ করে সবচেয়ে আগে। রাগ হওয়ার কথা বেলারাণীর যে জন্যে, রতনচাঁদের পাত্রী পরিবর্তনের কারণে, বেলারাণী কিন্তু অসুখী হয়নি তাতে; দু'-দিন মঞ্জরীর জন্যে রতনচাঁদ একটু ছুঁক ছুঁক করলেও সে জানত, রতনচাঁদ আবার তার দাঁড়ে এসেই বসত। কিন্তু নিজেও ভোলবে না, অন্যকেও বঞ্চিত করব, মঞ্জরীর মনোবৃত্তি বেলারাণীর ভালো লাগলো না। শেকল কেটে পাখী উড়িয়ে দিয়ে কার লাভ হল? কিন্তু যাবার সময় আর থাকতে পারলো না, মঞ্জরীকে জড়িয়ে ধরে বেলারাণী কাঁদলে, এ তুই কি করলি পেঁচি?

মঞ্জরী কিছু বললে না। চুপ করে এক সময়ে সে বেরিয়ে গেলো। নিজের ওই নোংরা জায়গায় ফিরে যেতে বিচ্ছিরি লাগছিলো মঞ্জরীর; বাড়ী এসে পৌঁছে তার আরও খারাপ লাগলো। দোতলায় নিজের ঘরে মার সঙ্গে কে যেন কথা বলছে। এ সময়ে আবার কে এলো কাছে। ছলুবাবু ফিরে এলো নাকি?

ও মা মঞ্জরী? ভগবান যা করেন, এই ভদ্দরলোক এসেছেন, তুই সেই কোথায় গিয়েছিলি কাজ করবার জন্যে, সেইখান থেকে; তোমার দিদির কাছে গেছে শুনে, এটা তোমার আমার হাতেই দিয়ে যাচ্ছিলেন। নাও। মঞ্জরী কাগজটা হাতে নিতেই উত্তেজনায় তার হৃদপিণ্ড তার ঠোঁটের কাছে লাফিয়ে উঠলো। ভগবান হয়ত তার

দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। সই করে দাও এখানে। লোকটির হাত থেকে কলম নিয়ে মঞ্জরী সই করলে গোটা গোটা অক্ষরে : মঞ্জরী দেবী! এ কি মঞ্জরী দেবী কার নাম? এবারে মঞ্জরী তার কুটিল হাসি হাসলে; মঞ্জরীবালা নামটা ভালো নয়; সিনেমায় আমি 'মঞ্জরী দেবী', এই নামই রাখব ঠিক করেছি। তুমিই এ কাজ পারবে মঞ্জরী। আগেই যখন নামের কথা ভেবেছ, তখন সিনেমাষ্টার হিসেবে তুমি নাম একদিন পাবেই। এই কথাগুলো মনে মনে বললেন ভদ্রলোক আর যে কথা উচ্চকণ্ঠে বললেন তার সারমর্ম; পরশু থেকে কাজ সুরু হচ্ছে। টাকা; নগদ টাকা সে পাবে; প্রথম মাসের মাইনে আগাম একশো পঁচাত্তর টাকা। আমাদের গাড়ী এসে তোমায় পরশু তুলে নিয়ে যাবে দশটায় তৈরী হয়ে থাকো। এই ক'টি কথা বলে অবশেষে নিষ্ক্রান্ত হন ভদ্রলোক; চান করার জন্যে পা বাড়ায় মঞ্জরী; তারপর কী মনে পড়তে থেমে যায়! মনে পড়ে, সন্ধ্যেয় রতনচাঁদের সাবধানবাণী বেলারাণীকে: হীরের আংটিটা যেন ঝুটো লোকের কাছে না যায় এবং বেলারাণীর আশ্বাস—একি ঝুটো মাল যে ঝুটো লোকের কাছে যাবে। এবং তারও আগে রতনচাঁদের নির্দেশ মনে পড়ে, মঞ্জরীর; ঠিক দুপুর বারোটায় আমার লোক এসে বলবে, কাল রাতে চশমা ফেলে গেছেন আমাদের ঘরে···ঠিক আছে; অস্ফুট আওয়াজ করে মঞ্জরী। তারপর যায় রুক্মিণীর ঘরে; অবিনাশকে ধরে গিয়ে।

অবিনাশ রুক্মিণীর দালাল কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বাসী, মাঝে মাঝে মঞ্জরীর কাজ করে। অবিনাশকে সব বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠিকানা বাতলিয়ে মঞ্জরী নিশ্চিন্তে চানের ঘরে ঢোকে। আরেক বার কুটিল হাসি আসে তার।

কাল রাতে বাবু যে চশমাটা ফেলে গেছেন?

দাঁড়াও, দাঁড়াও। বেলারাণী ভুলেই গেছলো কথাটা। ঘরে এসে ঢুকে দেখলো ঠিক বারোটা ঘড়িতে। হীর ধর আংটিটা আরেকবার দেখলে।

জ্বলজ্বলে পাথরটা যেন তার কপালের কালোকে ঠাট্টা করছে। একটা চশমার খাপের মধ্যে পুরে, চশমার খাপটাকে দিলে লোকটার হাতে, আর ভাবলে রতনচাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক কি এখানেই শেষ?

একটু বাদে বেলারাণী খেতে বসবে, আবার দরজায় কড়া নাড়লো কে! দরজা খুলে দিতেই বেলারাণী শুনলো কাল রাতে বাবু যে চশমাটা ফেলে গেছেন? লোকটি আবার বললে। এই মাত্র একজন এসে ঐ কথা বলে আংটিটা যে নিয়ে গেল।

আংটি?

আংটি মানে চশমা···চশমাটা নিয়ে গেল যে···

দাঁড়ান আপনি! বাবু বাইরে গাড়ীতে বসে আছেন, গিয়ে বলছি।

লোকটি ফেরৎ এলো। হাতে এক টুকরো কাগজ নিয়ে। তাতে লেখা, এতদিন কারবারের পর এ জোচ্চুরী তুমি না করলেই পারতে রাণী! রতনচাঁদ এই কথা লিখেচে। লিখতে পারলো তাকে। সমস্ত ভুলে বেলারাণী দৌড়ল দুপুরের রাজপথ দিয়ে। দেখলো রতনচাঁদের গাড়ী চলে গেছে অনেকদূর। শুধু ভিজে রাস্তার ওপর চাকার দাগ পড়েছে; মানুষের চামড়ার ওপর যেমন করে বসে যায় চাবুকের দাগ, ঠিক তেমনি। নিজের কপালে, গায়ে হাত বুলোল বেলারাণী, চাবুকের দাগ নেই কোথাও; কিন্তু তবুও জ্বালা করছে কেন? [ক্রমশঃ।

একটি আশ্চর্য মেয়েকে

দেবী রায়

জগতে মেয়ে অনেক তবু তোমার মত কেউ
পারে না দিতে শান্তি এই জীবনে কোনোখানে,
সুদূরপরাহত এ মনে ভালোবাসার ঢেউ
তোমাকে ছাড়া বিফল তাই বেঁচে থাকার মানে।
বেদনা এসে ছড়ায় শুধু গভীর অবসাদ,
এখানে দিন দীর্ঘতায় কেবলি ঝ'রে ঝ'রে
হৃদয় থেকে ফুরিয়ে দেয় ভালোবাসার স্বাদ,
গভীর ক্ষত সৃজন করে মনের অন্দরে।
সোনার চেয়ে অনেক দামী সোনার মত মনে
অন্ধকার ব্যাপ্ত এই হৃদয়-মরুভূমি
ফসলহীন হয়েছে শুধু বিফল আয়োজনে
কেটেছে দিন কেটেছে রাত এবং মৌসুমী
সুদূর থেকে সুদূরতরো হয়েছে তারপর
যা কিছু পড়ে রয়েছে তা সব ধুলো-বালির ঝড়।

বিজ্ঞানবার্ত্তা
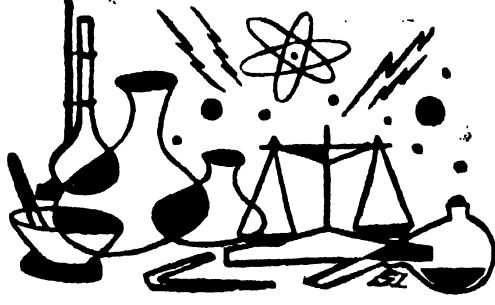
পক্ষধর মিশ্র

অটোমেশনের দিন এগিয়ে আসছে। মানুষের প্রয়োজন যাবে কমে : কলকারখানায় যন্ত্র নজর রাখবে যন্ত্রের উপর, কাজকর্ম, উৎপাদন সব কিছুই চলবে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে। ক্রমবর্দ্ধমান যন্ত্র-জগৎ-এর ক্ষমতার সীমানা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, সে মানুষের দৈনন্দিন কর্ম্মচর্চার উপর প্রভাব বিস্তার করতে সুরু করেছে। খবর পাওয়া গেল, সম্প্রতি সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মৃদু বিদ্যুৎ সঞ্চালনের সহায়তায় ঘুম পাড়াবার এক রকম যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। অনিদ্রায় ভুগছেন অথবা আপনার রক্তচাপ বৃদ্ধি হয়েছে, রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসে না—তখন এই যন্ত্র আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। এই যন্ত্রের উদ্ভাবক, সোভিয়েত ইনস্টিটিউট অফ এক্সপেরিমেণ্টাল সার্জিক্যাল এপারেটাস-এর বিজ্ঞানী মিঃ ইউরীহুদি জানিয়েছেন যে ঘুমপাড়ানী যন্ত্রটি ব্যবহার করা খুবই সোজা। একটা রবারের টুপী থাকে, সেটা পরিয়ে দেওয়া হয় মাথায়, টুপীটির সামনে চোখের পাতার কাছে এবং পিছন দিকে যথাক্রমে ইলেকট্রোড থাকে দুটি। ঐ ইলেকট্রোডের মধ্যে দিয়ে মৃদু বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত করে রোগীর মাথায় স্নিগ্ধ উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়। যন্ত্রের সহায়তায় কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর আবেশে রোগীর চোখে ঘুম আসে। কেবল ঘুম পাড়িয়েই ঘুম পাড়ানী যন্ত্রের কাজ শেষ হয় না, পাশেই লাগান থাকে একটা পরিমাপক যন্ত্র—আপনি ঘুমোবেন আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ যন্ত্রে আপনার সুপ্তির মগ্নতার পরিমাণ দেখা যাবে।

* * * *

সমাজের প্রতি বিজ্ঞানের দায়িত্ব প্রতিপালন করবার জন্য গড়ে উঠেছে একটি প্রতিষ্ঠান।—নাম তার সোসাইটী ফর সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি ইন সায়ান্সেস। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী থেকে আরম্ভ করে সাধারণ বিজ্ঞানকর্ম্মী, বিজ্ঞানানুরাগী সকলেই এর সভ্য হতে পারেন। এর প্রধান কার্যালয় আমেরিকায়—সভ্যরা ছড়িয়ে আছেন সমগ্র দুনিয়াতে। অধ্যাপক পাউলিং, অধ্যাপক কুলসন প্রভৃতি বহু বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী এই প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য। স্বয়ং মহামতি আইনষ্টাইনও এই প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির প্রয়োজনে মানুষের নিজস্ব প্রচেষ্টায় যে বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে, সে আজ মুষ্টিমেয় কতিপয় ক্ষমতালিপ্সুর প্ররোচনায় যাত্রা করেছে ধ্বংসের পথে। বিজ্ঞানের এই প্রলয়ঙ্কর রূপ প্রত্যক্ষ করে বিজ্ঞানীরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। সভ্যতাকে বাঁচাবার জন্য সমাজের প্রতি বিজ্ঞানের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা এবং সেই কর্ত্তব্য পালন করার প্রয়োজন খুবই বেশী। সোসাইটী ফর সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি ইন সায়ান্সেস এই মহান্ কর্ত্তব্য পালনে এগিয়ে এসেছেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁদের এই কল্যাণকৃৎ প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

এই সঙ্গে আর একটি আনন্দের সংবাদ পাঠকদের পরিবেশন করছি। খ্যাতনামা রসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় মহাশয় ১৯৫৭-১৯৫৮ সালের জন্য সোসাইটি ফর সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি ইন সায়ান্সেস-এর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক জন ইউব্যাঙ্ক-এর ব্যক্তিগত পত্রে জানতে পারা গেছে অধ্যাপক রায় নির্ব্বাচনে সর্ব্বাধিক সংখ্যক ভোট পেয়েছেন। তাঁর এই সাফল্যে আমরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

* * * *

সংবাদ পাওয়া গেল, অষ্ট্রেলিয়াতে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাসের এক প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে। 'ফ্লু'তে যাঁরা কাবু হয়েছেন আর যাঁরা এখনও তার চক্রপাকে মাঝে মাঝে নাজেহাল হচ্ছেন তাঁরা সকলেই মনে-প্রাণে এই প্রতিষেধকের প্রচার কামনা করবেন। অদ্ভুত এই রোগ ইনফ্লুয়েঞ্জা! বিচিত্র এর বীজাণু, এর অবস্থিতি সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক জগতেও, বিজ্ঞানের সর্ব্বক্ষমতা প্রয়োগ করে মানুষ একে আয়ত্তে আনতে পারেনি, তাই অষ্ট্রেলিয়ায় আবিষ্কৃত প্রতিষেধক ব্যবহারযোগ্য হলে মানব সমাজের যে প্রভূত উপকার হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রাচীন কালেও এই রোগ মানব সভ্যতাকে বহু বার বিব্রত করেছে। ফ্লোরেন্সবাসীরা একে ভয় করতো, বলতো এই মহামারীর সঙ্গে গ্রহ-উপগ্রহের যোগাযোগ আছে। যাই থাকুক না কেন, অন্যান্য রোগের মহামারীর সঙ্গে সাধ্যমতো যুদ্ধ মানুষ করতো কিন্তু এর কাছে সে ছিল একেবারে অসহায়। বিজ্ঞান-গর্ব্বিত মানুষের নজর এই রোগের প্রতিকারের প্রচেষ্টার প্রতি বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ হয়েছে মা[ত্র] কিছু দিন আগে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯১৮-১৯১৯ সালে যখ[ন] ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের মহামারী সমগ্র পৃথিবীর উপর তাণ্ডবলীলা চালি[য়ে] প্রায় দেড় কোটি লোকের মৃত্যুর কারণ হলো, তখনই চিকিৎসা-বিজ্ঞা[ন] হয়ে উঠলো তৎপর। মানুষের অন্যতম প্রধান এই শত্রুর বিনা[শে] সমগ্র বিশ্বে সুরু হলো গবেষণা, ১৯৩৩ সালে বিজ্ঞানীরা ইনফ্লুয়েঞ্জা[র] এক প্রকার ভাইরাস আবিষ্কার করলেন, এরা মুরগীর ডিমে তাড়াতা[ড়ি] বেড়ে ওঠে এবং সহজেই মানুষ বা অন্য প্রাণীকে আক্রমণ করতে পা[রে]। এর একটা প্রতিষেধকও বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন ; এই প্রতিষে[ধক] 'এ' শ্রেণীর ইনফ্লুয়েঞ্জার বিরুদ্ধে কিছু সময়ের জন্য কার্য্যকরী হ[লে]ও অন্য শ্রেণীর ইনফ্লুয়েঞ্জাতে কোন সাহায্যই করতে পারে না। এর [পর] ক্রমে ক্রমে 'বি' এবং 'সি' এই দুই শ্রেণীরও ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাই[রাস] আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৫৭ সালে যে ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে আমা[দের] পরিচয় তা সর্ব্বপ্রথম চীন এবং জাপানে সুরু হয়। এর প্রসা[রে] সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারলেন, এই রোগে ক্রমে ক্রমে স[মগ্র] বিশ্ব বিপন্ন হবে, তাই প্রতিকারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা সুরু করলে[ন]। রোগীদের গলা থেকে জীবাণু সংগ্রহ করে পাঠান হলো জেনেভা[য়] 'ওয়ারলড হেলথ অরগ্যানাইজেসনের' সদর কার্য্যালয়ে। ত[াঁরা] পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে এর প্রতিকার আবিষ্কার করবার [জন্য] পাঠিয়ে দিলেন। জাপান, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি স্থান থেকে ভাই[রাস] সংগৃহীত হয়ে বিমানযোগে তাঁদের কাছে নিয়মিত পাঠান হ[য়]

লাগলো। দেখা গেল, এই ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস 'এ' শ্রেণীর, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, 'এ' শ্রেণীর যে প্রতিষেধক ঔষধ পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা এই জীবাণুর উপরে কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারলো না। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, এর কারণ কি? কারণ কিছু দিন আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে—'এ' শ্রেণীর ভাইরাস কোন কোন সময় পরিবর্ত্তিত হয়ে অন্য এক বিশেষ ভাইরাসে পরিবর্ত্তিত হয়। পরিবর্ত্তিত ভাইরাস সমূহ খুবই স্থায়ী এবং তারা নিজেদের মতো অথবা আবার নতুন কোন ভাইরাসের সৃষ্টি ঘটায়। একটির ব্যবহারের সঙ্গে অপরটির ব্যবহারেব ও গুণাগুণের কোনই মিল নেই। বর্ত্তমান সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জার যে ভাইরাস আমাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে তা 'এ' শ্রেণীর পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত এক বিশেষ ধরণের অতিক্ষুদ্র বীজাণু।

এই রূপান্তরিত ভাইরাসের সৃষ্টির বিষয়েও বিজ্ঞানীরা যুক্তিজাল বিস্তার করছেন। এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি? অনেকের মতে তেজস্ক্রিয় রশ্মিসমূহই 'এ' শ্রেণীর ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাসের রূপান্তরের একমাত্র কারণ। নির্দ্দিষ্ট ভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়—তবে জগতে যে রকম ব্যাপক ভাবে পরমাণু সংক্রান্ত বিস্ফোরণের পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তার তেজস্ক্রিয়তায় পরিবর্ত্তিত এই ভাইরাসের আবির্ভাব মোটেই বিচিত্র নয়।

স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

পেনিসিলিনের আবিষ্কর্ত্তা বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং-এর জীবন কাহিনী আজ আপনাদের পরিবেশন করছি! পেনিসিলিনের আবিষ্কার বর্ত্তমান কালের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে—এই যুগ হলো অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ। টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক রোগ অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ সমূহের আবিষ্কারের ফলে বর্ত্তমান কালে অতি সহজেই নিরাময় করা যায়।

বিজ্ঞানী ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করে এই যুগের সূচনা করেছেন। ১৮৮১ সালের ৬ই আগষ্ট স্কটল্যাণ্ডের আয়ারসায়ারে তাঁর জন্ম হয়, লাউডন মুর স্কুল, কিলমারনক অ্যাকাডামি প্রভৃতি শিক্ষায়তনে বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি লণ্ডন পলিটেকনিকে ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন। প্রথম কর্ম্মজীবন তাঁর আরম্ভ হয় এক জাহাজ কোম্পানীতে। চার বছর এই কোম্পানীতে কাজ করার পর তিনি আবার ছাত্র হিসাবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্ট মেরী হসপিট্যাল মেডিক্যাল স্কুলে যোগদান করলেন। ১৯০৬ সালে ডাক্তারী পাশ করার পর ঐ হাসপাতালে বিজ্ঞানী স্যার এলম্রোথ রাইটের গবেষণাগারেই তাঁর গবেষক-জীবন সুরু হয়, বিখ্যাত এই বিজ্ঞানীর শিক্ষা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাই বিজ্ঞানকর্ম্মী ফ্লেমিংএর প্রারম্ভিক-গবেষক জীবনের প্রধান সহায় ছিল। ১৯২৯ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জীবাণু-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং জীবাণু-বিজ্ঞানের বহু শাখাতেই গবেষণা করেছেন,—এই সব বিষয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণার ফলাফল-সমন্বিত রচনার সংখ্যাও অনেক। তিনি জীবাণুনাশক লাইসোজাইমেরও আবিষ্কর্ত্তা। মানবদেহের রক্তের উপরেও তিনি অনেক গবেষণা করেছেন।

পেনিসিলিন আবিষ্কারই তাঁর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ। অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই পেনিসিলিনের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। ষ্টেফাইলোকক্কাস জীবাণুর বৃদ্ধি নিয়ে গবেষণা করার সময় হঠাৎ একদিন জীবাণু-সমন্বিত গবেষণা মাধ্যমের মধ্যে বাতাস থেকে সংক্রামিত হয়ে একটি সবুজ ছত্রাকের সৃষ্টি হয়। দেখা গেল, এই ছত্রাকের চারদিকের জীবাণু কি এক অজানা কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। বিজ্ঞানী অনুমান করলেন, জীবাণুর বিনাশের জন্য নিশ্চয়ই ঐ ছত্রাকই দায়ী। সুরু হলো গবেষণা, ছত্রাকটির নাম পেনিসিলিয়াম নোটেটান, আর এরই মধ্যে থেকে পাওয়া গেল জীবাণু-নাশক অত্যাশ্চর্য্য এক পদার্থ! এই পদার্থের নামকরণ হলো পেনিসিলিন।

পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ১৯৪৫ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিশ্ববিখ্যাত এই বিজ্ঞানী ১৯৫৫ সালের ১১ই মার্চ আকস্মিক ভাবে হৃদ্‌রোগে পরলোক গমন করেছেন।

সাহিত্যে দেহবাদ

বাংলা দেশে চিরকাল একদল সাহিত্যিক আমাদের সাহিত্যের তথাকথিত সমালোচকদের কাছে তিরস্কৃত হয়ে আসছেন। সাহিত্যের বাঁধাধরা রাস্তা অতি কষ্টে ত্যাগ ক'রে যাঁরা বহু বিপদের মধ্যে থেকেও পরীক্ষামূলক সাহিত্য সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হন, তাঁদের প্রতি ক্রোধের আর সীমা থাকে না সনাতনপন্থী এই সমালোচকদের। এ ক্ষেত্রে বলতে বাধা নেই বা স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, সাহিত্যের সনাতনপথে কোন ক্লেদ বা গ্লানি নেই। কিন্তু বর্তমান যুগের আলোচনাকারীদের সনাতন খোলসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় দুষ্ট মনোবৃত্তির পরিচয়। এঁরা দুনিয়ার হাল-হকিয়ৎ জানতে পরাঙ্মুখ, দেশ-বিদেশের আধুনিক সাহিত্যের কোন খোঁজ রাখেন না, চোখে বৈজ্ঞানিক-চশমা পরলেও দৃষ্টি এঁদের সীমাবদ্ধই থাকে—কেবল এক জাতক্রোধের বশে লেখনী ধারণ করেন এবং ভিত্তিহীন যুক্তি দেখিয়ে গালিবর্ষণ করতে থাকেন অপাঠ্য ভাষায়। সম্প্রতি জনৈক সাহিত্য-সমালোচক (!) আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে দেহবাদের ধুয়া তুলেছেন আবার। পৌরাণিক নারায়ণ-চক্র সাহায্যে সতীদেহ খণ্ড-বিখণ্ড করেন, আলোচ্য লেখকও (শুধু মাত্র নামের অজুহাতে?) লেখনী চালনা করেছেন আধুনিক সাহিত্যের সতীত্বহানির নজীর দেখিয়ে। সুদর্শনচক্র কার্যকরী হওয়ায় নানা তীর্থের সৃষ্টি হয়েছে আমাদের ভারতবর্ষে। মসীর অসিধারী হয়তো জানেন না, তাঁর অসিতে ধার পড়ে না কতকাল এবং হয়তো জানেন না লৌহযুগের অস্ত্র এ যুগে একেবারেই অচল। যাই হোক, সমালোচকের বক্তব্য: আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জন কয়েক সাহিত্যিক দেহবাদকে আশ্রয় ক'রে বড়ই অন্যায় করছেন। সাহিত্যের শ্লীলতাহানির রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়তে পড়তে তিনি নাকি আদিম অনুভূতিতে শিউরে শিউরে উঠছেন। শুধু মাত্র জন কয়েক লেখকের লেখার ছত্রে ছত্রে তিনি পর্ণগ্রাফির আস্বাদ পেয়ে তাঁদের নামের একটি 'ব্লাক লিষ্ট' পর্যন্ত পেশ ক'রে ফেলেছেন সাহিত্যের দরবারে। দেখা যাক, তালিকাভুক্ত লেখকরা এখন ভয় আর আশঙ্কায় লেখনী ত্যাগ করেন কি করেন না।

আমাদের দেশের শাস্ত্র আর পুরাণ, কাব্য আর মহাকাব্য, এমন কি ভাষাতত্ত্বের অভিধান মনোযোগের সঙ্গে সমালোচক পড়েছেন কি না আমাদের জানা নেই। না-জানি সমালোচকটি এই সকল মহাগ্রন্থ পড়লে হরিনামের নামাবলী ছেড়ে কোথায় পালাবেন! এখানে বিদেশী সাহিত্যের উপমা তুলছি না এইজন্য যে, দেশীতেই যাঁর এই দুরবস্থা হয়, এক ফোঁটা বিদেশী পান করলে হয়তো দাঁত-কপাটি লেগে যাবে তাঁর। 'মা কালী' মার্কা, 'মহাত্মাজী' মার্কা কিম্বা 'শনিঠাকুর'এর এক-আধ পাঁইটেই যিনি চোখে সর্ষে ফুল দেখেন, তাঁর সমুখে ফরাসী কুঁইয়া, স্কচ, হুইস্কি, রাশ্যান ভড্‌কা ধরা শুধু বিপজ্জনক নয়, অপ্রয়োজনীয়।

দেশ-বিদেশের বর্তমান সাহিত্য পর্যালোচনা করলে বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়, সাহিত্যের আঙিনা থেকে ন্যাকামি আর ভাঁড়ামি বিদায় গ্রহণ করছে। বৈজ্ঞানিক যেমন বিজ্ঞানের দূরবীণে পৃথিবী দেখছেন তেমনই আধুনিক কালের সাহিত্যিকরা বাস্তব দৃষ্টিতে দেখছেন সমাজ-সচেতন মানুষকে। ইদানীং কালের সাহিত্যিকরা বিশ্বাস করেন, সংসার-ধর্ম পালনের জন্য দেহকে যেমন বাতিল করা যায় না, তেমনই মানুষের কাহিনী লেখার মধ্যে মানবদেহকে বাদ দিয়ে শুধু 'গাথা' রচনা করা যায়, সাহিত্য রচিত হয় না। সনাতন কালের বাল্মীকি, বেদব্যাস, হোমার, দান্তে, সেক্সপীয়র, কালিদাস থেকে আধুনিক কালের রথী মহারথীরা দেহকে বাদ দিয়ে লিখতেন না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র অপ্রচ্ছন্ন ভাবে দেহ-তত্ত্ব শুনিয়েছেন। গান্ধীজী পর্যন্ত 'আত্মকথায়' আত্ম-দেহকে বাদ দিতে পারলেন না। কিন্তু একদা শুধু আমাদের 'কল্লোল'-যুগকে দেহাশ্রয়ী আখ্যা দেওয়া হয়। আবার সেই ধুয়া তুলেছেন আজকালের সমালোচক, আজকের সাহিত্যের বিরুদ্ধে। দেহবাদের পক্ষে যুক্তি দেখানো নিরর্থক আমরা জানি। সমালোচক 'ব্লাক লিষ্ট' পেশ করেছেন সাহিত্যের দরবারে, তালিকাভুক্ত লেখকরা নিশ্চয়ই আইনজ্ঞ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে তাঁদের পক্ষের 'কাউন্সেল' নিযুক্ত করবেন। মামলার ফলাফল নির্ভর করবে 'নির্মোক নৃত্যে'র রচয়িতা আমাদের সকল লিটারেরী কমিটির চূড়ামণি বিচারক রাজশেখর বসুর সুদক্ষ বিচার-বিবেচনায়। আদালতের বিচারকরা নিরপেক্ষ বিচার করেন, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে কোন লাভ হয় না তাঁদের কাছে—দেহবাদী সাহিত্যিকরা রাজশেখরের পুস্তক-প্রকাশকদের ধরাধরি করলে কিছু না হোক দীর্ঘ লিখিত সার্টিফিকেট লাভ করবেন অতি অবশ্য।

সমালোচকটির ব্যথা বা বেদনার কেন্দ্রস্থল যে-কোন পাঠকের কাছেই ধরা পড়ে। ব্লাক লিষ্টের লেখকদের বই বাজারে বেশ ভালই বিক্রী হচ্ছে—অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে স্পষ্টভাষায় স্বীকার ক'রে ফেলেছেন সমালোচক এবং বাঙলা দেশের পাঠক-পাঠিকা, সম্প্রদায়কে এজন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু সমালোচক হয় তো জানেন না, আজকালের পাঠক-পাঠিকা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সজাগ ও সচেতন। হরিনামের নামাবলী জড়ানো লেখকদের চেয়ে বাস্তববাদী

লেখকদের বইয়ের চাহিদা শুধু বাঙলা দেশে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অধিক। দেহবাদের ধুয়া তুলে কি কোন লেখার চাহিদা কমানো যাবে আর এযুগে? সমালোচক স্বীকার করবেন না, কিন্তু বর্তমান কালের লেখক এবং পাঠক-পাঠিকা বিশ্বাস করেন, দেহকে বাদ দিয়ে সত্যিকার সাহিত্য কেউ কখনও সৃষ্টি করতে পারে না। শুধু পোষাক-পরিচ্ছদ আর উচ্ছ্বাসের দিন বহুদিন আগেই শেষ হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন এই, সমালোচকের কিছু বই বাজারে কি প্রকাশিত হয়েছে? সেই বই কি যথেষ্ট বিক্রীত হচ্ছে না এবং পোকায় কাটছে? তাই যদি হয়, তবে তিনি দেহবাদের রাস্তায় চলতে পারেন। বাঙলার বিভ্রান্ত পাঠক-পাঠিকা তবেই গরম কেকের মত তাঁর রচনা গিলতে অচিরাৎ ব'সে যাবে।

যাই হোক, সমালোচকের যাতে বিন্দুমাত্র জ্ঞানগম্যি হয় শুধু মাত্র সেই কারণেই এ-স্থলে ডি. এইচ. লরেন্সের লেখার খানিকটা উদ্ধৃতি করছি। লরেন্স দেহতত্ত্ব সম্পর্কে বলেন :—

"Science has a mysterious hatred of beauty, because it doesn't fit in the cause-and-effect chain. And society has a mysterious hatred of sex, because it perpetually interferes with the nice money-making scheme of social man. So the hatreds made a combine, and sex and beauty are mere propagation appetite.

Now sex and beauty are one thing, like flame and fire. If you hate sex you hate beauty. If you love *living* beauty, you have a reverence for sex. Of course you can love old, dead beauty and hate sex. But to love living beauty you must have a reverence for sex.

Sex and beauty are inseparable, like life and consciousness. And the intelligence which goes with sex and beauty, and arises out of sex and beauty, is intuition. The great disaster of our civilization is the morbid hatred of sex."

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

রূপহলুদ

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্গতঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম চিরদিন লেখা থাকবে সোনার অক্ষরে। সম্পূর্ণ নিজস্বতা নিয়ে তিনি দেখা দিয়েছিলেন সাহিত্যাকাশে, সমগ্র আকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর লেখনীর রশ্মি। ভাবের ব্যঞ্জনায়, চিন্তাধারার অপরূপ প্রকাশভঙ্গিমায় বিভূতিভূষণের জোড়া পাওয়া দুষ্কর। 'পথের পাঁচালী'-স্রষ্টার বর্তমান গ্রন্থ রূপহলুদ কয়েকটি ছোট গল্পের সংকলন! গল্প-সাহিত্য আজ যে মহামূল্য রত্নসম্ভারে সজ্জিত তার বহুলাংশ সরবরাহ করে গেছেন বিভূতিভূষণ। এক সরল অনাড়ম্বর ঘটনার দর্পণে অতীত অবলুপ্ত ইতিহাসের সারিবদ্ধ ভাবে প্রতিবিম্ব-সৃষ্টির যাদুতে বিভূতিভূষণের দক্ষতা অনস্বীকার্য। বিরজা হোম ও তার বাধা, বুড়ো হাজরা কথা কয়, কাশী কবিরাজের গল্প, ছোটনাগপুরের জঙ্গলে আমার ডাক্তারি, বর্ণেলের বিড়ম্বনা প্রভৃতি গল্পগুলি গ্রন্থের সৌষ্ঠব বর্ধন করেছে। একটি মুখবন্ধ রচনা করেছেন বিভূতি-জায়া রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড) থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দাম—দু' টাকা মাত্র।

শ্রেয়সী

সুবোধ ঘোষ বাঙলার সাহিত্যাকাশে এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। বাঙলা সাহিত্যকে নানা দিক দিয়ে তিনি করেছেন পুষ্ট। জীবনের এক নতুন আস্বাদ তিনি সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে। 'শ্রেয়সী' তাঁর একটি উপন্যাস। এক প্রাচীন অভিজাত পরিবারকে কেন্দ্র করে এ কাহিনী। কমল বিশ্বাস অবাধ আভিজাত্যে তার যথারীতি পথেই চলতে থাকে। তৎপুত্র অতীনের যুগে হয় পথ-পরিবর্তন, তাদের আভিজাত্য, বংশগর্ব এক নতুনতর রূপ নিল। মোড় ঘুরল গরিমার। সেই পথে চলতে থাকল। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সুবোধ ঘোষ সমগ্র কাহিনীটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। অতীন চরিত্রটি আরও সম্যক প্রস্ফুটনে সাহায্য পেয়েছে কেতকী ও কাজরী চরিত্রের মাধ্যমে। এই দুটি নারীর পৃথক জীবনযাত্রার মধ্যেই বিকশিত হয় অতীনের চরিত্র। শ্রেয়সী পাঠক-পাঠিকার কাছে শ্রেয়ঃ হোক, এই কামনাই করি। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীমলয়েন্দ্রকুমার সেন। দাম পাঁচ টাকা।

দ্বীপপুঞ্জ

কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের খ্যাতি ছোট গল্পের মহলে অধিক মাত্রায় পরিব্যাপ্ত হলেও উপন্যাসের আসরেও তাঁর আসন অটল। দ্বীপপুঞ্জ উপন্যাসটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। হরিবংশ নামে এ আগে প্রকাশিত হয়েছিল, বর্তমানে এর অঙ্গসজ্জা বর্তমানোপযোগী করে তুলে ধরেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। চরিত্রচিত্রণে এঁর লেখনী প্রতিভার পরিচয়ই দিয়েছে। মানব-মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ভাব-বিনিময় ফুটে উঠেছে এঁর লেখায়। মুরলী, নবদ্বীপ, মনোরমা, মঙ্গলা প্রভৃতি চরিত্রগুলি প্রভূত ভাবে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। ত্রিবেণী প্রকাশন, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীকানাইলাল সরকার। দাম সাড়ে চার টাকা।

পসারিণী

তরুণদলের সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয় সমরেশ বসুর নাম একটি নিপুণ লেখনী নিয়ে আবির্ভাব হয়েছিল সমরেশ বসুর পসারিণী। কতকগুলি ছোট গল্পের সংকলন। গল্পগুলির মধ্যে সমরেশের দরদ ও অনুভূতির চিহ্ন বিদ্যমান। একটি আন্তরিকতার সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে। গল্পগুলি পাঠকমহলে সমাদর লাভ করুক। এম, সি, সরকার য়্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীসুপ্রিয় সরকার। দাম আড়াই টাকা।

রোমান হলিডে ও অন্যান্য গল্প

বিদেশী চলচ্চিত্র-কাহিনীগুলি বর্তমানে এক নতুন ধারার দিকে এগিয়ে চলেছে। এখন চিত্রনির্মাতারা গল্প-প্রধান কাহিনীগুলির দিকেই অধিকমাত্রায় মনোনিবেশ করেছেন। কয়েকটি খ্যাতিলব্ধ বিদেশী ছবির কাহিনী বাঙলায় অনুবাদ করেছেন ভবানী মুখোপাধ্যায়। এই রচনাগুলি ইতঃপূর্বে প্রথমে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। অনুবাদক হিসেবে ভবানী মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। অনুবাদের মাধ্যমে নানা দেশের সাহিত্যের সঙ্গে দেশবাসীকে পরিচিত করার প্রচেষ্টার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। এই গ্রন্থে রোম্যান হলিডে, ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি, স্কারামুস, নাইটস অফ দি রাউণ্ড টেবল, সাব্রিনা, বেয়ারফুট কনটেসা, পিকনিক প্রভৃতি ছায়াচিত্রের কাহিনীগুলি পরিবেশিত হয়েছে। সাহিত্যামোদী এবং চিত্রামোদী এই উভয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা এই গ্রন্থপাঠে পরিতৃপ্ত হবেন। এস, রায় য়্যাণ্ড কোং, ১৭৬ বিবেকানন্দ রোড থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীকমলরঞ্জন রায়। দাম আড়াই টাকা।

লিলির প্রেম

অনুবাদ-সাহিত্যে যাঁদের দখল পাঠক-সমাজে স্বীকৃত, তাঁদের মধ্যে শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাদুড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য। বহু প্রখ্যাত বিদেশী লেখকদের রচনা বাঙলায় অনুবাদ করে এঁরা যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। পূর্ব প্রুশিয়ার লেখক হেরম্যান সুডারম্যানের 'সঙ অফ সঙস্' উপন্যাসটির যে অনুবাদ এঁরা করেছেন লিলির প্রেম নামে সেই অনুবাদ-উপন্যাস জনসমাদর লাভে সমর্থ হবে আশা করা যায়। লিলি চরিত্রটি এঁরা নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই চরিত্রটি বড় দরদ দিয়ে ফোটানো হয়েছে। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীমলয়েন্দ্রকুমার সেন। দাম চার টাকা।

ধৃতরাষ্ট্র

বহু অভিনীত এই নাটকটির খ্যাতি এখন কারোরই অবিদিত নেই। সমাজে যে দুর্নীতির বিষবাষ্প ঢুকেছে এবং তার ফলে সমগ্র সমাজ আজ বিমিয়ে উঠেছে এবং সেই দুর্নীতি সুনীতির মুখোসেই নিজেকে আবৃত রেখে চালিয়ে যাচ্ছে তার খেলা, এই পটভূমিকায় নাটকটি রচিত। নাট্যকারের কৃতিত্বে ভরপুর। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি স্বচ্ছ ও প্রশংসনীয়। এই নাটক আজকের দিনে এক বিশেষ আবেদন বহন করে। লেখক—ধনঞ্জয় বৈরাগী। আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২ থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীরণজিৎ সেন। দাম—সুলভ সংস্করণ দু'টাকা ও শোভন সংস্করণ আড়াই টাকা।

অনুশীলা

রমাপতি বসুর সাহিত্যিক খ্যাতি আজকের নয়। প্রায় দু'যুগ ধরে বাঙলা সাহিত্যকে তিনি নানা ভাবে পুষ্ট করে আসছেন। তাঁর বর্তমান গ্রন্থ অনুশীলা। একটি নাচের ছাত্রী অনুশীলা। তার জীবনে পর পর এল সুবর্ণ, নবীনমাধব ও ইন্দ্রনীল—এই তিন জনের মধ্য দিয়ে অনুশীলার চারিত্রিক বিকাশ ও তার জীবনের গতিপথের ধারা প্রকাশ পায়। লেখকের মনোরম রচনাভঙ্গী ভাল লাগল। ঘটনাগুলি সুরূপায়িত এবং তিনটি পুরুষের তিনটি পৃথক রকমের চরিত্র গঠনেও লেখক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।—এস, ব্যানার্জী য়্যাণ্ড কোং, ৬ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম আড়াই টাকা মাত্র।

ঘেঁটুর গান

শ্রীজয়দেব রায়

ঘেঁটুর গান দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট গোষ্ঠী-সংগীত। ঘণ্টাকর্ণের অপভ্রংশ ঘেঁটু। গল্প আছে যে, ঘণ্টাকর্ণ নামে একজন অসুর শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিবে না বলিয়া কানে ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিত। ঘণ্টাকর্ণকে ব্যঙ্গ করার ছলে যুগ যুগ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত বাঙ্গালী তাহাকে লইয়া গানের মাধ্যমে উল্লাসে মাতে।

ফাল্গুন সংক্রান্তিতে ঘেঁটুর পূজা হয়। হাটের মাঝে 'কেলে হাঁড়ী' রাখিয়া সর্বজনসমক্ষে তাহা পদাঘাতে ভাঙ্গাই ঘেঁটুপূজা অর্থাৎ ভগবদ্-বিদ্বেষী ঘণ্টাকর্ণের দর্পচূর্ণ করাই এ পূজার মূল উদ্দেশ্য। তাহার পূর্বে সারা ফাল্গুন মাস ধরিয়া বালকদল সাজগোজ করিয়া প্রতি সন্ধ্যায় গৃহস্থদের ঘরে ঘরে গান গাহিয়া বেড়ায়। তাহাদের মধ্যে একজন সাজে ঘেঁটু, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অন্য সকলে নানা ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করে, সে-ও সাধ্যমত গান গাহিয়া সেগুলির জবাব দেয়।

কালের পরিবর্তন হইতেছে—সঙ্গীতের মধ্যেও সমাজ-চেতনার ঢেউ আসিয়াছে, ঘেঁটুগানের মারফতও দেশের সাম্প্রতিক দুঃখকষ্টের নানা ফিরিস্তি যুক্ত হইয়াছে। রাজনৈতিক চেতনার দিনে, এ গান জাতীয় আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া নবরূপে দেখা দিয়াছিল।

বালকদের মুখে জ্যাঠামি মনে হইলেও এসব গানে নানা উপদেশ, নানা ঘরোয়া নীতিকথা প্রভৃতিও স্থান পাইয়াছে। পল্লীবাসীদের বিশ্বাস—ঘেঁটুপূজা করিলে দাদ, খোস প্রভৃতি চর্মরোগ হয় না, তাই চর্মরোগী বালকরাই এ গানের পুরোভাগে অংশ গ্রহণ করে—

আজ আনন্দে ঘেঁটু লয়ে সঙ্গে
নাচিয়া নাচিয়া চল সবে যাই।
মনের আনন্দে দাও গো পূজা
এমন দিন ত আর হবে নাই॥
খোস চুলকুনা ঘেঁটু দিছিস গায়
সতী-নারীর বীর পতির পায়।
বামে দাঁড়ায়ে সতীনারী
পতি বিনা সতীর গতি নাই।

সংক্রান্তির দিনে ঘেঁটুরপূজার আয়োজনে ঘেঁটুর সখীরূপে কিশোরী-বেশী কিশোরদল চা'ল-ডা'ল, বাগানের ফুল, দূর্বাঘাস, হলুদ প্রভৃতি লইয়া নৈবেদ্য সাজায়। ঘেঁটুর পূজা মানেই কিন্তু ঘেঁটুর বিবাহ; তাহার জন্য সীতাপুরের বাসনা নামিকা এক পাত্রীকে মনোনীতা করা হয়, তাহার গায়ে-হলুদের আয়োজন হয়, জল সইবার ব্যবস্থা হয়—

ঘেঁটুর রাজার জন্যে কনে দেখতে যাই ক'জনা।
সীতাপুরে আছে মেয়ে, নামটি বাসনা॥
মেয়ের বয়সের নেই গাছ পাথর
আশীর কম হবে না।
হবে যেটি ঘেঁটুর কনে, কুলোয় শুয়ে দুধ খায় দু'বেলা॥

জল-সইতে গিয়াও সবাই ঘেঁটুর রূপগুণ লইয়া নানাপ্রকার ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাসাহাসি করিতে লাগিল—

সাধের মালা রইল গাঁথা বরণডালাতে
ঘেঁটুর রূপ দেখে আজ বিরূপ হলাম আমরা সবেতে॥
আ মরি, কি রূপের গঠন, (দেখে) গা'টা করছে কেমন,
গলা সরু, মাজা মোটা, টাক ধরেছে মাথাতে॥
কম হয়েছে চোখের জ্যোতি, জোল হয়েছে বুকের ছাতি
দাঁতগুলো সব নড়তেছে আর চুল নেই চোখের ভুরুতে॥

ক্রমে ক্রমে বাঙলার চিরপরিচিত তর্জার লড়াই সুরু হইল! একদল বালক ঠাট্টা করিয়া নানা প্রশ্ন করিলে ঘেঁটুও তাহার জবাবে গান গাহিয়া উত্তর দিতে লাগিল। হরিবিদ্বেষী অশুচি ঘেঁটুকে তাহারা জলশুদ্ধ করিয়া লইতে বলিল—

জল শুদ্ধ করিয়া লও, হাত পা তোমার ধোও।

ঘেঁটু পবিত্র হইবার জন্য হরিগুণ গান করিয়া বলিল—

ভাগ্যমানে কাটায় পুকুর চণ্ডালে কাটে মাটি॥
কুমোরের কলসী, কাঁসারির ঘটি।
জল শুদ্ধ, স্থল শুদ্ধ, শুদ্ধ মহামায়া
হরিনাম করিলে পরে শুদ্ধ হয় আপন কায়া॥
(বল হরি হরি, হরি হরি বল রে)

ঘেঁটুগান বাঙালীর সালতামামি গান। সারা বৎসরের নানা ঘটন-অঘটনের ফিরিস্তি-ফর্দ এ সকল গানে থাকে। সাধারণতঃ এ সকল গান পূর্ববঙ্গের মাগন গানের মতো বালকদলই সমবেত ভাবে গৃহস্থদের ঘরে ঘরে গাহিয়া ফিরে।

বীরভূম ও বর্ধমান জেলার সর্বত্র এবং চব্বিশ-পরগণা, হুগলী ও হাওড়া জেলার কোথাও কোথাও ঘেঁটুগানের বিশেষ চলন ছিল।

কোন এক সময়ে ঘরের মেয়েদের জলকষ্ট লাঘব করিবার জন্য

কোন কৃপণ গৃহস্থ কূপ খনন করিয়া দিয়াছিল, অকালপক্ক রসিক বালকদল সেই ঘটনা অবলম্বনে গান বাঁধিয়া গাহিল—

ঘেঁটু তাই ভাবি মনে।
আর তো সহ্য জলের কষ্ট যায় না গো কেনে।
গিন্নী বলেন, আর তো আমি জল খাব না পুকুরে।
কুলীতে তপ্ত বালি চলতে নারি দুপুরে॥
কর্তা বলেন, লখুরে।
যেখানে সস্তা পাবি আন গো ডেকে মজুরে।
পচা চাল ঘরে ছিল, সেগুলোর গতি হ'ল।
মিষ্টি জল উঠল তবু এঁটেল মাটির গহনে;
ঘেঁটু গো ভাবি তাই মনে॥

গানটির মধ্যে যে শ্লেষাত্মক পরিহাস রস আছে তাহা উপভোগ্য। এমন কি, রামায়ণের দেবচরিত্রগুলিও বালকদের কৌতুক হইতে বাদ পড়ে নাই। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণও নিশ্চয় বাল্যকালে একবার খোস-পাঁচড়ায় ভুগিয়াছিলেন, শেষ পর্যন্ত ঘেঁটুপূজা করিয়া তাঁহারা নিশ্চয় রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাহারা রাম-লক্ষ্মণের পুতুল সাজাইয়া পাল্কীতে চড়াইয়া গান গাহিতে বাহির হয়:—

সে বছরে খোস হয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের গায়।
হায় হায় হায়!
সে বছরে খোস হয়েছে লক্ষ্মণের গায়॥
কৌশল্যা সুমিত্রা রাণী এরা, কেঁদে কেঁদে পাগলিনী
দশরথ নৃপমণি ভূমিতে লোটায়।
হায় হায় হায়!

শেষে—

মন্ত্রী বলে—"শোন রাজা কর তুমি ঘেঁটুর পূজা।
আপদ বালাই দূরে যাবে যমযন্ত্রণা মম মন্ত্রণায়।"

কোন কোন ঘেঁটুগানে বেশ কবিত্বও আছে। অবশ্য এ কবিত্বও মামুলী ধরণের। এই শ্রেণীর গানই অকালপক্ক বালকদের নিকট হইতে সভ্যকবিদের ভব্য আসরে ঠাঁই পাইয়াছে। ঐরূপ একটি ঘেঁটুগানের নিদর্শন—

কি হেরিলেম অপরূপ যাইতে জলে।
ভুবনমোহন কালোরূপ দাঁড়ায়েছে ঐ কদমতলে॥
গলে মণিমুক্তা দোলে পদচিহ্ন বক্ষস্থলে
যমুনার দুই কূলে আলো কইরে,
মোহনচূড়া হেলেছে বামে রে, মন মোহিয়ে।
দাঁড়ায়েছে ঐ কদমতলে॥

ঘেঁটুগান রাখাল বালকদেরই গান—ফাল্গুন মাসে ঘেঁটুর পূজা, কিন্তু খোস-পাঁচড়া-দাদের দেবতা ঘেঁটুর বিজয়াভিযান চলে সারা বৎসর ধরিয়া; তাই গোঠের প্রান্তরে আর পুকুরের ঘাটে ঘেঁটুর জয়গানেরও বিরাম নাই—

ঐ ঢাবর বাজা, ঐ কাঁসর বাজা।
এলো এলো দ্বারে ঘেঁটু রাজা॥
ধামা বাজা তোরা কুলো বাজা।
এলো এলো দ্বারে ঘেঁটুরাজা॥

এই-ই ঘণ্টাকর্ণ, ওগো এই-ই ঘণ্টাকর্ণ
যেন ছেঁড়া ছাতা বর্ণ।
কাণের ঘণ্টা তোরা বাজা বাজা।
কানে ঘণ্টা বাঁধা আমাদের এই
ব্যাটা ঘেঁটুরাজা॥

কৃষাণী বালিকাদের কণ্ঠে ঘেঁটুর গান আর একটি ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। ফাল্গুন সংক্রান্তির দিন কৃষাণী গৃহস্থ ঘরের বালিকারা দল বাঁধিয়া চাপান ও উতোরের মধ্য দিয়া ঘেঁটুর গান গাহিয়া থাকে।

একদল গান গাহিয়া অনুরোধ জানাইল—

বেশ তো ভাই, বল না সই, সমিস্যা এই
তোমার কেমন তাই।
দিদিশাশুড়ী ভাঙবে তোমার হোক না সমিস্যা যেমন॥

অপর দল চাপান দিল—

বলি লো, বাঁশ গাছেতে ফলছে কাঁঠাল
ও তার বড় বড় কোয়া।

ঘেঁটুর দল জবাব দিল—

হাঁ, ভাই বল—এই ফাগুন মাসে,
কাঁঠাল ফলে বুঝি বাঁশের গাছে?

অপর দল আবার প্রশ্ন করিল—

বাঁশ গাছেতে ফলছে কাঁঠাল ও তার বড় বড় কোয়া।
মুড়ির সনে খেতে গেলেই ভাল, নয় সব ভোঁয়া।

কাঁচায় না খায়, ঝোলে ঝালে, পাকায় না খায় খুলে,
স্বর্গদ্বারে পৌঁছে যায় ও সে খেলে পায়ে দলে।

সবাই এক সঙ্গে—

ও দিদি খেলে পায়ে দলে।

বৌটুর দল এবার নিজেরাই সমস্যার সমাধান করিল

—ওগো দিদি, ও দিদির সই—
এর ভাঙানিটা হচ্ছে মই ;
বোঝো গো শুয়ে খেয়ো দই—
না বোঝো তো করবে হৈ-চৈ।

পূজার নতুন নতুন রেকর্ড

হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82753 (আধুনিক)—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, "আমার এ গানে" ও "তোমার প্রথম গান প্রথম তারার মতো।" N 82754 (আধুনিক)—শ্রীমতী উৎপলা সেন, "তোমার ভুবন হ'তে আমার এ নাম" ও "দোলা দিয়ে যায় কে দোলা দিয়ে যায়"। N 82755 (ধর্মমূলক)—শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, "রইল কথা তোমারি নাথ" ও "ওগো নিঠুর দরদী! এ কি খেলছো অনুখন।" N 82756 (আধুনিক)—মান্না দে, "এই ক্ষণটুকু কেন এতো ভাল লাগে" ও "আমি আজ আকাশের মতো একেলা।" N 82757 (আধুনিক) —তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "ঘুম-ঢুল ঢুল চাউনি চোখে" ও "ওগো আমার কোকিল-কালো মেয়ে।" N 82758 (আধুনিক)—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, "যে প্রেমের দেখা মেলে" ও "আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি।" N 82759 (পল্লীগীতি)—সনৎ সিংহ, "রথের মেলা রথের মেলা বসেছে" ও "ঐ ঘোর ঘোর লেগেছে ঘোর"। N 82760 (আধুনিক)—শ্যামল মিত্র, "এই পথে যায় চলে" ও "সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যা।" N 82761 (আধুনিক)—আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, "তারাদের চুমকি জ্বলে আকাশে" ও "আমি আল্পনা এঁকে যাই"। N 82762 (আধুনিক)—শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ, "গানে গানে আমি যে খুঁজি তোমায়" ও "এই ফুলের দেশে কোন্ ভ্রমর এসে।" N 82763 (কৌতুক নক্সা)—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী তপতী ঘোষ (ফিল্ম), "স্বামী চাই"—দুই খণ্ড। N 82764 (আধুনিক)—শ্রীমতী গীতা দত্ত (রায়), "ঝিরি ঝিরি চৈতালী বাতাসে" ও "কৃষ্ণচূড়া আগুন তুমি।"

কলম্বিয়া

GE 24860 (আধুনিক)—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, "ও বন্ধু, এই বকুলঝরা শ্রাবণ রাতে" ও "জীবনের নদীতটে ঢেউ ভেঙে পড়ে।" GE 24861 (আধুনিক ও পল্লীগীতি)—শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকর, "মনে রেখো, মনে রেখো" ও "রঙিলা বাঁশীতে কে ডাকে।" GE 24862 (আধুনিক)—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও ভূপেন হাজরিকা, "আঁকা বাঁকা এ পথের দু'পাশেই" ও "গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ মেঘ ঐ গরজায়।" GE 24863 (আধুনিক)—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, "প্রজাপতি মন আমার" ও "আজ কেন ও চোখে লাজ" GE 24864 ([illegible]) [illegible] "কোন [illegible] কারো নয় গো মা" ও (শ্যামা-সংগীত) "শ্যামা মা কি আমার কালো।" GE 24865 (আধুনিক)—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, "ওগো কৃষ্ণচূড়া, বলো আবার" ও "এ নহে যা চেয়েছি যুগ যুগ ধরে।" GE 24866 (আধুনিক)—কুমারী গায়ত্রী বসু, "মেঘ মেঘ মেঘ কত মেঘ করেছে আজ" ও "দূর বনপথে আলোতে ছায়াতে।" GE 24867 (আধুনিক)—শৈলেন মুখোপাধ্যায়, "তোমায় দেখেছি কত রূপে কত বার" ও "এ মন আমার যেন ভ্রমরের সুর হয়ে।" GE 24868 (আধুনিক)—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, "ফুল গো, তোমারে ছুঁয়ে ঝরাবো না ধূলিতে" ও "কুসুম যেমন ক'রে।" GE 24869 (আধুনিক) —শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, "দোলে দোলে ঐ দূর বিহঙ্গের পাগলা" ও "সোনার তরী নয় গো আমার।" GE 24870 (ধর্মমূলক)—কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, "প্রভাতে উঠিয়া মাতা যশোমতী" ও (কীর্তন) "বল না রে সখি, কহ না রে।"

চিত্র-গীতি

বসন্ত বাহার—বিকাশ রায় প্রোডাকশনস (প্রাইভেট) লিমিটেড, সংগীত পরিচালনা :—জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। N 76057—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য, "আঁধারে আমি তোমায়" ও "গগনে গগনে মত্ত।" N 76058—বিসমিল্লা ও সম্প্রদায় (শানাই), সুর :—বসন্ত বাহার, সুর :—ধুন। GE 30369—প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, "ললিতা গো বলে দে" ও "বাঁধো ঝুলনা"। GE 30370 —গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাঁধো ঝুলনা" ও "বারে বারে ছুটে যাই।" GE 30371—এ, টি, কানন মানিক বর্মা ও এ, টি, কানন, "নবীকে দরবার" ও "নবেলি কালী।" GE 25837—অমর সিং যস্পাল (ক্ল্যারিওনেট), সুর :—'আহা বদ্‌লা জমানা' ('মিস ইণ্ডিয়া') সুর :—চুপ হো যা ('বন্দী')।

আমার কথা (৩২)

শ্রীশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়

সাধনারই পরিপূর্ণতার রূপ সিদ্ধি। অকৃত্রিম উত্তম সঙ্গে করে নিয়ে আসে বিজয়ের আস্বাদ। জয়লক্ষ্মীর বরমাল্য তাঁদেরই জন্যে নির্ধারিত থাকে যাঁরা অনমনীয় আন্তরিকার সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকেন' সাধনার পথে। খ্যাতিমান স্বরোদবাদক শ্রীশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনে সফলতা এসেছে ফেলে-আসা শ্রমমণ্ডিত দিনগুলির কল্যাণে।

কলকাতার বড়বাজারের গঙ্গোপাধ্যায়-পরিবারের কথা বাঙলা দেশে কারোর অজানা নয়। এই পরিবার জন্ম দিয়েছে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী স্বর্গীয় যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে তৎপুত্র প্রথম ভারতীয় বৈমানিক শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে এবং বিখ্যাত কলারসিক স্যাটর্নী শ্রী ও, সি, (অর্ধেন্দ্রকুমার) গঙ্গোপাধ্যায়কে। এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হেয়ার স্কুলের প্রধানশিক্ষক স্বর্গীয় সুরথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অনুজ বাঙলার অন্যতম প্রাচীন তবলাবাদক স্বর্গীয় মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত তবলাবাদক শ্রীহীরেন্দ্রকুমার (হীরু) গঙ্গোপাধ্যায়। এঁর ছয় পুত্রের মধ্যে বিশিষ্ট তবলাবাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার (নাটু) গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীশ্যাম

গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। কলকাতায় ১৯১১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর আজকের দিনের প্রসিদ্ধ স্বরোদবাদক শ্রীশ্যামকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ। বাবা সেতার বাজাতেন চমৎকার। পাঁচ বছর বয়সে সেতারে বাবার কাছে নিলেন দীক্ষা। এদিকে ভর্তি হলেন নর্থ সাবার্বাণ স্কুলে—স্কুলের পড়ায় মন বসে না, সঙ্গীত দূর থেকে দেয় হাতছানি। প্রাণের পরতে পরতে ঝঙ্কার দেয় স্বরের মূর্ছনা। স্কুল থেকে পালাতে সুরু করলেন। তবে এ তথাকথিত স্কুলপালানো নয়। স্কুল পালিয়ে সিনেমার লাইন দেওয়াও নয়, স্কুল পালিয়ে বাড়ী এসে রেওয়াজ করা। স্কুলপালানো অধিকমাত্রায় যখন বেড়ে ওঠে সেই সময় নিজের চোখে-চোখে রাখবার উদ্দেশ্যে বাবা ভর্তি করে নিলেন হেয়ারে। সেখানে বাবার চোখে ধূলো দিতেও কসুর করলেন না। এই ভাবে ১৯২৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুদিন আই-এ পড়ার পর কলেজী পড়ায় ইতি ও সঙ্গীতের মধ্যে পুরোপুরি আত্মনিমগন।

বাবার কাছে প্রথম পাঠ নেওয়ার পর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর (১৯১৮)। ১৯২৪ সালে কেরামতুল্লার লোকান্তরের দিন পর্যন্ত তাঁর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন শ্যামকুমার। ইনি থাকতেন মেছুয়াবাজারের একটি বাড়ীতে। শ্যামবাজার থেকে প্রতি সন্ধ্যায় যন্ত্র নিয়ে সমস্ত জলঝড় উপেক্ষা করে পদব্রজে যাতায়াত করতে হত বালক শ্যামকুমারকে। রাত্রি দশটা অবধি ওস্তাদ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করে খেতে যেতেন, একবার [illegible] দেখতেন না শিক্ষার্থী বালকটির কথা, তার পর রাত আড়াইটে অবধি শেখাতেন, একটু ভুল হলেই অমানুষিক প্রহার। এই সময় শ্যামকুমার প্রভূত সাহায্য এবং উৎসাহ পেয়েছিলেন তাঁর মধ্যম অগ্রজ শ্রীঅমূল্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। ভ্রাতার উন্নতির জন্যে ইনি স্বেচ্ছায় নিজের প্রভূত স্বার্থ হাসিমুখে বিসর্জন দিয়েছেন। এবং প্রত্যহ ওস্তাদের বাড়ী তাঁকে নিয়ে যেতেন ও সমানে সেই রাত আড়াইটে অবধি বসে থেকে এঁকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে আসতেন। এরূপ স্নেহ এবং ত্যাগস্বীকার সত্যই দুর্লভ! কেরামতুল্লার মৃত্যুর পর তাঁরই শিষ্য স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ বসুকে গুরুপদে বরণ করে নিলেন শ্যামকুমার। মন তখন আকৃষ্ট হয়েছে স্বরোদের দিকে, সেতারে মন বসে না। অথচ গুরু তাতে রাজী হন না। একদিন ঘটনাচক্রে পরলোকগত নলিনীনাথ শেঠের বাড়ীতে এঁর হাতের ব্যাঞ্জো শুনে ধীরেন্দ্রনাথ সম্মত হলেন স্বরোদের পাঠ দিতে। ধীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর

শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়

পর শ্যামকুমার গুরু-প্রণাম জানালেন লোকবরেণ্য সুরসাধক আলাউদ্দীন খাঁকে। এঁর সঙ্গে পরিচিত হতে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন এঁর জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র হীরু বাবু এবং সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-পৃষ্ঠপোষক স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ সঙ্গীত-সম্মেলনে শ্যামকুমারের সাধারণ্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ। ১৯৩৭ সালের ৫ই এপ্রিল আকাশবাণীর তৎকালীন একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা শ্রী পি, সি, চৌধুরীর অনুরোধে বিনা পরীক্ষায় বেতারে স্বরোদ বাজান। আজ অবধি কোন ছায়াছবি-সঙ্গীতে ইনি অংশ গ্রহণ করেননি এবং ভবিষ্যতে ও জগতে কোনদিন যে যাবেন না, এ বিষয়েও তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে যাঁর সাধনার সূত্রপাত, আজ তাঁর জীবন ভরে গেছে সার্থকতার সুষমায়। সেই অনুকরণযোগ্য সাধনা অনুপ্রাণিত করুক তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের, এই কামনাই করি।

••• এ মাসের প্রচ্ছদপট •••

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে দুর্গামূর্তি গঠনের একটি চিত্র মুদ্রিত হয়েছে। এই মূর্তি ভাস্কর শ্রীরমেশ পাল কর্তৃক নির্মিত হয়।
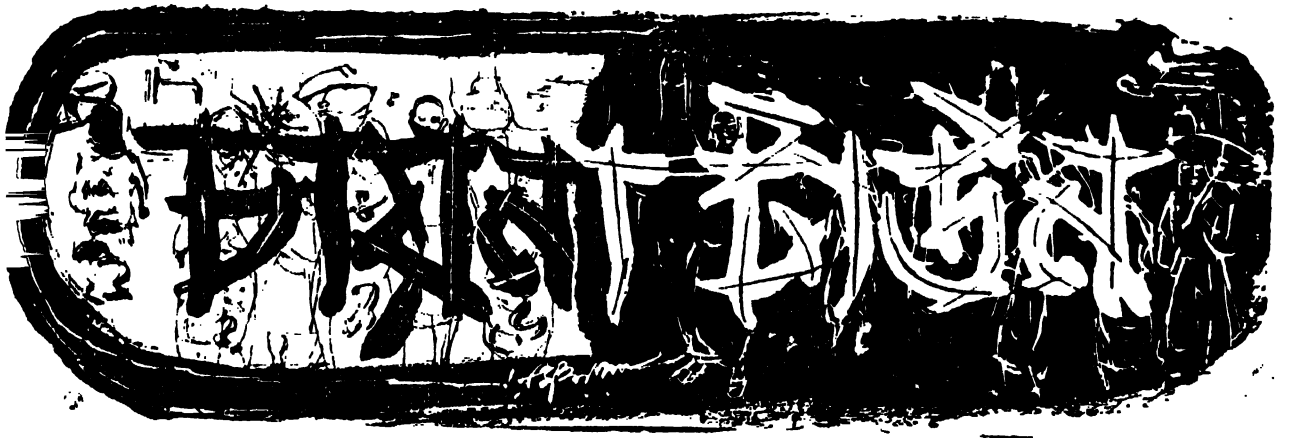
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

বাড়িতে টিং লিং একা। সে মিষ্টি হেসে দিলীপকে ভেতরে নিয়ে বসালো। জিজ্ঞেস করলো, "তোমায় কি দিতে রি? হুইস্কি সোডা না বীয়ার?"

"হুইস্কি. ধন্যবাদ!" দিলীপ বললো।

বেয়ারা এলো ট্রে-তে করে হুইস্কি আর সোডার বোতল নিয়ে। স্কির বোতলের মুখে সাইফন আঁটা। বেয়ারা একটি ছোটো বলে গেলাস রেখে এক পেগ হুইস্কি ঢেলে তাতে সোডা মিশিয়ে গা। একটি ছোট্ট গেলাসে করে একটুখানি ওয়াইন নিলো টিং-লিং।

অত্যন্ত জমকালো ভাবে সাজানো তাদের বসবার ঘর। দেয়ালে টি চীনে স্ক্রোল আর চিয়াং কাই শেকের একটি ছবি ছাড়া একত্বের কোনো ছাপ নেই। আসবাব পত্র একেবারে পাশ্চাত্য।

টিং লিং-ও পরে আছে একটি স্কার্ট। ওয়াইনের গেলাস তুলে বললো, "টু আওয়ার নিউলি মেড ফ্রেণ্ডশিপ।"

দিলীপও একটু হেসে তার গেলাসটি তুললো।

তার পর কিছুক্ষণ আবহাওয়া আলোচনা। বড্ড গরম এখন। মরটা দার্জিলিং শিলংই ভালো। বৃষ্টি নামলে ভালো হয়। তবে বৃষ্টি হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। রাস্তায় জল জমে—ইত্যাদি।

আবহাওয়ার আলোচনা শেষ হতে দিলীপ ঘড়িতে দেখলো আট কেটে গেছে।

"চেং শিয়াং কখন ফিরবে," সে জিজ্ঞেস করলো।

"বলে তো গেছে শীগ্‌গিরই ফিরবে," বললো টিং লিং, "তোমার য়ই খুব তাড়া নেই?"

"কিছু না। তবে চেং শিয়াং থাকলে আরো জমতো, ওকে র বেশ লাগে।"

"শুধু আমি থাকাতে একটুও জমছে না বলতে চাও?" বলে একটু সা টিং লিং।

"না, না, তা নয়" বলে দিলীপ একটু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করলো, ার সান্নিধ্যে আমি একলা থাকলে নিজেকে একটু বোকা-বোকা ব করি।"

টিং লিং স্থির দৃষ্টিতে একটুখানি তাকালো দিলীপের দিকে। পর বললো, "এটা নিশ্চয়ই জানো যে চেং শিয়াং তোমায় বানাবার জন্যেই আমার কাছে একলা ফেলে গেছে।"

দিলীপ অবাক হোলো। "মানে?" জিজ্ঞেস করলো সে। টিং লিং চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। অস্বোয়াস্তি অনুভব করলো দিলীপ। বললো, "আচ্ছা, মেট্রোর নতুন ছবিটা দেখেছো?"

টিং লিং হেসে ফেললো। বললো, "থাক, আর প্রসঙ্গ পাল্টাতে হবে না। তোমায় বলতে আপত্তি। তোমায় সেদিন দেখেই আমি চিনে নিয়েছি, তুমি বেশ সাদাসিধে। আচ্ছা, একটা কথা আমায় বলবে? তুমি জেনীকে ভালোবাসো?"

"এ কথা জিজ্ঞেস করছোই বা কেন? আর আমিও বা উত্তর দেবো কেন?" দিলীপ বললো।

"দেখ উত্তর না দিলেও যে আমি কিছু জানবো না তা তো নয়। সেদিন তোমাকে আর জেনীকে দেখে বুঝে নিয়েছি, আর তোমাদের সম্বন্ধে দু'চারটে কথা কানেও এসেছে। আমার তাতে কিছু আসে যায় না তবে আমায় যদি বন্ধুর মতো নাও আমি তোমার কিছু উপকার করতে পারি, আর কিছু উপকার আমিও আশা করি তোমার কাছ থেকে।"

"কি রকম?"

"আমি আর চিয়েন চাং দু'জনে দু'জনকে খুব ভালোবাসি, সে কথা নিশ্চয়ই জানো না।"

"চিয়েন চাং যে তোমার জন্যে পাগল, সে কথা জেনী আমায় বলেছে," দিলীপ উত্তর দিলো, "তবে তুমি যে চিয়েন চাংকে ভালোবাসো সেটা জানতাম না।"

"চিয়েন চাং-এর জন্যে আমি আরো অনেক বেশী পাগল," টিং লিং মৃদু গলায় বললো।

"চিয়েন চাং-এর জন্যে!"

সে কথার উত্তর দিলো না টিং লিং, আস্তে আস্তে বললো, "আমি চীনের মেয়ে। সুতরাং ভালোবাসতে পারি আর বিয়ে করতে পারি আমার দেশের ছেলেকেই। আমি কত দিন ধরে আশা করে ছিলাম এমন একটি ছেলের যে একেবারে দেশের মাটির মানুষ, আমার ভায়ের মতো বিদেশী ফুল নয়। হয়তো তেমন ছেলের খোঁজ পেতাম দেশে, কিন্তু সেখানে যাওয়ার উপায় নেই। আমার ভাই আমার সেখানে যাওয়ার পথ বন্ধ করে রেখেছে। এ দেশে এসে হঠাৎ পেয়ে গেলাম চিয়েন চাংকে।"

"কিন্তু চিয়েন চাং কি তোমাদের দেশের মাটির মানুষ?"

"ওর বাইরের চলন-বলন দেখে ওকে তুমি ভুল বুঝো না। ও একেবারে খাঁটি দেশের ছেলে। ওর যেটুকু বিদেশীয়ানা সেটা আসলে তার বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে পালানোর যে কামনা তার একটা প্রকাশ মাত্র। এই পরিবেশ তার ভালো লাগছে না। সে চীনে ফিরে যাবে না। সে আমেরিকা সম্বন্ধে নানা রকম গল্প শুনেছে, সেটা সোনার দেশ, সেটা সুখের দেশ, ইত্যাদি। সুতরাং স্থির করেছে সে সেখানেই যাবে। তাই তার এই সাহেবিয়ানা।"

"চীনে চলে গেলেই পারে," দিলীপ বললো।

"সেটা সম্ভব নয়।"

"কেন?"

টিং লিং এ প্রশ্নের উত্তর দিলো না। "কাউকে বোলো না, তোমায় বিশ্বাস করে বলছি," সে বলে গেল, "আমি খুব চেষ্টা করছি যদি দেশে ফিরে যাওয়া যায়। আর যদি তার ব্যবস্থা করে উঠতে পারি চিয়েন চাংকেও নিয়ে যাবো আমার সঙ্গে।"

"আমায় এসব কথা বলছো কেন?" দিলীপ আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

"চেং শিয়াং তোমায় এখানে কেন এনেছে জানো?" টিং লিং জিজ্ঞেস করলো।

"চেং শিয়াং-এর দুর্বলতা আছে জেনীর জন্যে। ভালোবাসা বলবো না, সে কাউকে ভালোবাসতে পারে না। কারো জন্যে তার দুর্বলতা এলে সে পাগল হয়ে যায় তার জন্যে, তারপর তাকে পেলে পরে তার সমস্ত মোহ কেটে যায়, ফিরেও তাকায় না তা' দিকে। কিন্তু তার জীবনে জেনী হচ্ছে প্রথম মেয়ে, যে তার দিকে ফিরেও তাকায় না। তার ধারণা, জেনী তার তোয়াক্কা করে না তোমার জন্যে। তাই তোমায় ভাব করিয়ে দিচ্ছে আমার সঙ্গে।"

দিলীপ অবাক হয়ে তাকালো টিং লিং-এর দিকে।

"এ সব তার কাছে নতুন নয়," টিং লিং বলে চললো, "তার নিজের কাজ গুছিয়ে নেওয়ার জন্যে আমার চেহারার সাহায্য সে অনেক নিয়েছে। চিয়েন চাংকেও সে আমার কাছে এনে আলাপ করিয়ে দেয় কোনো একটি বিশেষ মতলবে। কিন্তু আমিও যে চিয়েন চাংকে ভালোবাসলাম সেটা চেং শিয়াং জানে না। জানলে চিয়েন চাংএর ক্ষতি হবে। তাই আমি জানতে দিই নি, এমন কি চিয়েন চাংকেও নয়। আমি শুধু এই ভাণ করে বেড়াচ্ছি যে চিয়েন চাংকে আমি খেলিয়ে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা দিলীপ, কি দুর্ভোগ বলো তো? লোকে তো শুনি খেলিয়ে বেড়ানোর জন্যে ভালোবাসার ভাণ করে। কিন্তু আমায় করতে হচ্ছে ঠিক তার উল্টো।"

দিলীপ হাসলো।

"তোমায় আমার দরকার," টিং লিং বললো, "চিয়েন চাংএর ভালোর জন্যে—যাতে সে কোনো বিপদে না পড়ে—তাকে আমি মাঝে মাঝে দু'-একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই, যেটা আমার নিজের জানানো সম্ভব নয়। অথচ কাউকে পাচ্ছিলাম না যাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারি। আর তোমায় যখন চেং শিয়াং নিয়ে এসেছে, আর চাইছে যে কিছুদিন তোমার সঙ্গে আমার একটা যোগাযোগ থাক, তখন মনে হোলো ঠিক যে সুযোগ চাইছিলাম, সেটা পেয়ে গেলাম।"

"কী সুযোগ?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"দেখ, তোমায় বিশ্বাস করে বলছি," বললো টিং লিং, "আহ্‌কিম আর মিনির সঙ্গে আমার একটু যোগাযোগ হওয়া দরকার, সেটা তোমার মারফতেই হবে। চেং শিয়াং তোমায় আমার কাছে নিয়ে এসেছে তার একটা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে। সুতরাং তুমি যদি আমার কাছে আসো, আমি যদি তোমার সঙ্গে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াই কেউ কোনো রকম সন্দেহ করবে না।"

"জেনী করবে।"

"জেনীকে সব খুলে বলতে পারো। সে কাউকে বলবে না," টিং লিং উত্তর দিলো।

"চিয়েন চাং সন্দেহ করবে।"

"চিয়েন শুধু ভাববে যে তুমি আমার সম্বন্ধে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছো," টিং লিং হেসে বললো, "তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তাকে আমি ঠিক সামলে নেবো। উপস্থিত তোমায় একটি কাজ করতে হবে। করবে তো?"

"বলো।"

"আগামী মঙ্গলবার বিকেলবেলা তুমি চিয়েন চাংকে যেমন করেই হোক তোমার সঙ্গে সঙ্গে রাখবে। সিনেমায় হোক, রেস্তরাঁয় হোক, বার-এ হোক, যেখানেই হোক, ওকে আটকে রাখবে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত।"

"কেন?"

টিং লিং আস্তে আস্তে বললো, "সেদিন চেং শিয়াং-এরই একটা কাজে একজন লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা। আমি চাই না যে সে ও কাজে যায়।"

"কী কাজ?"

"সেটা তোমার জানবার দরকার নেই।"

"একটু যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটা," দিলীপ বললো।

টিং লিং উত্তর দেওয়ার আগেই দরজায় বেল বাজলো।

"চেং শিয়াং এসে গেছে," টিং লিং ব্যস্ত গলায় বললো, "এ নিয়ে আর কোনো কথা নয়। অন্য কথা বলা যাক। কী বলা যায়? হ্যাঁ, পার্ল বাকের বই পড়েছো?"

আবার বেল বাজলো দরজায়।

"আমি গিয়ে খুলে দিই," দিলীপ উঠতে গেল।

"না, না, বেয়ারা যাবে। বলো, পার্ল বাকের কি কি বই পড়েছো?"

"প্রায় সবই পড়েছি। গুড আর্থ, ড্রাগন সীড, মাদার, পিওনী।"—

দরজা খুলে দেওয়ার আওয়াজ এলো।

"গুড আর্থ সিনেমাটা দেখেছো?"

"হ্যাঁ, দু'-তিন বার দেখেছি।"

"পল মুনি অদ্ভুত অভিনয় করেছে, না? সেই পঙ্গপাল আসা দৃশ্যটি? কী সুন্দর"—

একজোড়া জুতো মশমশ করতে করতে ঘরে ঢুকলো।

"তুমি?" বললো টিং লিং।

দিলীপ ফিরে তাকিয়ে দেখলো।

টিং লিং-এর ভাই ফেং চেং শিয়াং নয়, এসেছে চিয়েন চাং।

"চেং শিয়াং কোথায়," সে জিজ্ঞেস করলো।

"সে তো বাড়ি নেই," উত্তর দিলো টিং লিং।

চিয়েন চাং-এর মুখটা অন্ধকার হোলো। সে একবার দিলীপের দিকে একবার টিং লিং-এর দিকে তাকালো।

"ওর ফিরতে দেরী হবে," টিং লিং গম্ভীর ভাবে বললো।

চিয়েন চাং কোনো উত্তর দিলো না।

"তুমি কাল সকালে এসো। চেং শিয়াংকে থাকতে বলবো," বললো টিং লিং।

"ভাবছি একটু অপেক্ষা করে যাবো," চিয়েন চাং বললো।

"অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই চিয়েন চাং," উত্তর দিলো টিং লিং, "চেং শিয়াং-এর ফিরতে অনেক দেরী হবে!"

চিয়েন চাং আবার দু'জনের দিকে পর পর তাকালো। তার পর বললো, "ও, আচ্ছা।"—বলে বেরিয়ে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে দিলো টিং লিং-এর বেয়ারা।

দিলীপ কোনো কথা না বলে বসে রইলো চুপ করে। সে ঘরের জানালা রাস্তার উপরেই।

টিং লিং ম্লান মুখে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে, যে পথ দিয়ে চলে গেল চিয়েন চাং। পথের বাঁকে সে অদৃশ্য হতে টিং লিং ফিরে এলো তার চেয়ারে, আস্তে আস্তে বললো, "বেচারা চিয়েন চাং! আমার উপর রাগ করে চলে গেল। আমি তাকে বসতেও বললাম না।" একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো টিং লিং।

"বললেই পারতে" দিলীপ বললো।

"না, চেং শিয়াং রাগ করতো। সে চায় তুমি এখানে কিছুক্ষণ একলা থাকো। কে জানে হয়তো চেং শিয়াংকেও সেই আসতে বলেছিলো, যাতে সে এসে তোমায় আর আমায় একলা দেখে।"

"কেন?"

"এও বোঝো না? খবরটা জেনীর কানে তুলে দেওয়ার জন্যে।"

"ও—।" দিলীপ এবার বুঝলো।

তারপর অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। অনেকক্ষণ চেং শিয়াং-এরও দেখা নেই।

একটি বাদুড় ঘরে ঢুকে দু'-তিন পাক খেয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল। সামনের বাড়ী থেকে পিয়ানোর সুর ভেসে এল। রাস্তা দিয়ে চানাচুরওয়ালা হেঁকে গেল।

টিং-লিং আস্তে আস্তে বললো, "চিয়েন চাং এর আজ রাত্তিরে ঘুম হবে না। এত চঞ্চল সে। একটুও বোঝে না!"

চুপ করে রইলো একটুখানি। তারপর আবার বলে গেল, "আমায় দেখে মনে হয় আমি কী সুখী। এরকম চেহারা এরকম স্বাচ্ছল্য, এরকম উন্নত জীবনযাত্রার মান। কেউ যদি জানতো!"

দিলীপ টিংলিং-এর কাছে তার ছেলেবেলার অনেক গল্প শুনেছিলো সেদিন।

টিংলিং-এর বাবা ছিলেন যুদ্ধের আগে ব্যাঙ্ক অফ চায়নার একজন ডিরেক্টার। খুব পুরোনো অভিজাত বংশ তাদের। চীন সম্রাটদের আমল থেকেই জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে তাদের পরিবারের যোগাযোগ।

টিং লিং-এর মা আমেরিকান। জাপান যখন চীন আক্রমণ করলো টিং-লিং তখন বেশ ছোটো, বছর নয়েক বয়েস। চেং শিয়াংও ছোটো। আর দু'জনেই আমেরিকান, মায়ের সঙ্গে সে বছর শীতকালে তাদের নানকিং ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাপ চিঠি লিখে জানালো যে এখন ফেরার দরকার নেই। পরে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

ওরা তখন নিউইয়র্কে। সেখানকার চায়না টাউনের চীনে সমাজের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। ওরা স্কুলে পড়ে, তাদের বন্ধুবান্ধব সব আমেরিকান। ওর মামার বাড়ির তরফের আত্মীয়স্বজন সব আমেরিকান। চীনে পরিবার দু'-চারটি যাদের সঙ্গে আনাগোনা, তারাও অভিজাত সমাজের—নিউইয়র্কের চীন কন্সাল জেনারেল, ইউনিভার্সিটির একজন চীনে অধ্যাপক, শাংহাই থেকে বেড়াতে আসা কয়েক জন চীনে কোটিপতি—এই সব। চীনা, জাপানী, ইংরেজ, আমেরিকান এ-সব পার্থক্য সে বুঝতো না তখন। যাদের সঙ্গে মিশতো তারা সবাই এতো ভালো যে কোন রকম পার্থক্য বুঝবার অবকাশ তখন হয়নি। পার্থক্য বুঝলো একদিন।

মায়ের সঙ্গে বেরিয়েছিলো একদিন। একটি দোকানের সামনে গাড়ি রেখে মা ঢুকলো দোকানে। টিং লিং গাড়িতে বসে রইলো।

এমন সময় দেখে একটি চীনে ছেলে পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এধারে এলো। হাতে তার কতকগুলো চীনা ফানুস। নিউইয়র্কের চায়না টাউনটা কাছেই। হয়তো তাদের দোকান সেখানে। এসব বাড়ির মেয়েরা তৈরি করে। হয়তো বাড়ি থেকে দোকানে মাল নিয়ে যাচ্ছে ছেলেটি। টিং লিংএর বড়ো ভালো লাগলো। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো সে।

এমন সময় রাস্তার উল্টো দিক থেকে আসছিলো দু'-তিনটি ছেলে। কাছাকাছি আসতে একজন চীনে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললো, "এই চিঙ্ক্-"

চীনে ছেলেটি দাঁড়িয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো, "আমায় বলছো?"

"হ্যাঁ, তোমায় বলছি। তুমি চিঙ্ক্—মারামারি করবে?"

ফানুসগুলো এক পাশে নামিয়ে রাখলো ছেলেটি। কিন্তু কিছু করবার আগেই তার মুখে একটি ঘুসি বসিয়ে দিলো সেই আমেরিকান ছেলে।

চীনে ছেলেটির ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এলো। কিন্তু সেও ছাড়বার ছেলে নয়। তবে যতো না দিলো সে, খেলো তার চেয়ে বেশী।

পথচারী কয়েক জন এসে তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিলো তাদের। আমেরিকান ছেলেগুলো চলে গেল তাদের পথে। চীনা ছেলেটি ঠোঁটে রুমাল চেপে ধরে ফানুসগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল অন্য দিকে। গাড়িতে বসে রুদ্ধ-নিশ্বাসে তাই দেখলো টিং লিং।

ওর মা ফিরে এলো। গাড়িতে ঢুকে গাড়ি চালিয়ে দিলো বাড়ির দিকে। টিং লিং তখনো চুপচাপ।

মা সেটি লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলো, "কি হোলো ডার্লিং?"

তখন টিং লিং আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "মামি, চিঙ্ক্ মানে কি?"

ওর মা একটু অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে, বললো, "এ কথা তুমি কোত্থেকে শিখলে?"

"একটু আগে একটি আমেরিকান ছেলেকে শুনলাম একটি চীনা ছেলেকে চিঙ্ক্ ডাকছে।"

"ও—! ওটা ভালো কথা নয়। কয়েক জন ষ্টুপিড লোক আছে, যারা চীন দেশের লোকদের চিঙ্ক্ বলে। তবে তুমি যাদের মুখে শুনেছো, ওরা নিশ্চয়ই ওই চীনে ছেলেটির স্কুলের বন্ধু।"

"আমি জানি না," টিং লিং বললো, "আমি শুধু দেখলাম যে, চীনে ছেলেটি চলে যাওয়ার সময় তার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে।"

"ও ডিয়ার, ডিয়ার", বললো চীনে মেয়ে টিং লিংএর আমেরিকান জননী, "ওরা কি এত সিলি যে, মারামারি করলো নিজেদের মধ্যে। ওই আমেরিকান ছেলেগুলো নিশ্চয়ই খুব ষ্টুপিড। ওরা যে কিছু মনে করে বলেছে তা নয়, যারা খারাপ ছেলে ওরা পথে-ঘাটে যার-তার সঙ্গে মারামারি করে বেড়ায়, আমেরিকান ছেলে দেখলে হয়তো তাকে আরো খারাপ গালাগাল দিয়ে তার সঙ্গে মারামারি করতো। এ নিয়ে তুমি অতো আপসেট হয়ো না ডার্লিং!"

টিং লিং কোনো উত্তর দিলো না।

ওর মা বলে গেল, "আমেরিকানরা চীনাদের কতো ভালোবাসে, জানো? আমাদের দেশে যুদ্ধ বেধেছে তার এখানকার লোকেরা আমাদের দেশের লোকেদের জন্যে কতো কি পাঠাচ্ছে,—কতো জামা-কাপড়, কতো খাবার, কতো টাকা। আমি যে সোয়েটার বুনছি দেখছো, সেটাও চাইনীজ রেডক্রসের জন্যে। কিছু দিনের মধ্যে একটা প্রসেশান বার করা হবে চাঁদা তোলার জন্যে, তুমি-আমি-আমরা সবাই যাবো। দেখবো, আমাদের দেশের কতো ছেলেমেয়ে আছে এই শহরে।"

টিং লিং চুপ করে শুনে গেল মায়ের কথাগুলো।

বাড়ি ফিরে টিং লিং এক সময় চেং শিয়াংকেও বলেছিলো পথের ঘটনার কথা।

চেং শিয়াং তখন সবে স্কুল থেকে বেস-বল খেলে ফিরেছে।

হাতের মাসল্ ফুলিয়ে অন্য হাত দিয়ে সেটি অনুভব করে সে বললো, "ওই চীনে ছেলেটি নিশ্চয়ই ভীতু। তাই ওরা ওর পেছনে লেগেছিলো। আমায় কেউ বলতে আসুক না, তখন দেখা যাবে! আর ওরা সব-আজে-বাজে ছেলে, ওদের পক্ষে এটা সম্ভব। আমাদের বন্ধুরা অন্যরকম। পীট, ষ্টীভ, আয়ান, এরা কোনোদিন ও রকম বলবে না।"

টিং-লিং আস্তে আস্তে বললো, "আমাদের দেশের একটি ছেলেকে যে ওরা রাস্তায় ধরে মারলো সেটা আমার ভালো লাগেনি।"

"ডোণ্ট বি সিলি," চেং শিয়াং উত্তর দিলো, "ওরা তো ওকে ধরে মারেনি, ওদের একজন আর এ মারামারি করেছে। ফেয়ার ফাইট। কিছু বলবার নেই।"

চেং শিয়াং এ কথা বলে চলে গিয়েছিলো হাত-মুখ ধুতে।

টিং লিং চুপচাপ বসেছিলো অন্ধকার বারান্দায়।

তার বার বার মনে হচ্ছিলো, এখানে চার দিকে আকাশচুম্বী বাড়িগুলো ঘিরে এত নিওন-সাইনের আলো, ওধারে ফিফ্‌থ্‌ এভিনিউতে দুরন্ত ট্রাফিক—আর এখন সাংহাইতে, ক্যাণ্টনে, ফু-চাওতে, আর এখানে সেখানে অন্যান্য শহরে গাঁয়ে বোমা ফেলছে জাপানীরা, আর তার মতো ছোটো ছোটো মেয়েরা মায়ের কোল ঘেঁসে কুঁকড়ে বসে আছে।

দিন তিন চার পরে একদিন দেখলো ওর মা খুব ব্যস্ত। সকাল থেকে এখানে সেখানে ফোন করছে। ব্রেকফাষ্ট খেয়ে টিং লিংকে বললো, সাজগোজ করে নাও। এখন বেরোতে হবে।

টিং লিং বললো, "মামি, একটা কথা বলবো ভাবছিলাম। চলো আমরা ড্যাডির কাছে ফিরে যাই।"

টিং লিং-এর মা একটু ম্লান হেসে ওর চুলে হাত বুলিয়ে বললো, "সে হয় না ডার্লিং। ড্যাডি এখন চুংকিং-এ আছে। সেখানে গেলে আমাদেরও অসুবিধে হবে, ওঁরও অসুবিধে হবে। ওখানে তো তোমার জন্যে স্কুল নেই। তোমার ড্যাডি লিখেছে আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে, তারপর যখন যুদ্ধ শেষ হবে তখন তোমার ড্যাডি এখানে বেড়াতে আসবে। এখান থেকে আমরা সুইজারল্যাণ্ডে যাবো, তারপর দেশে ফিরে যাবো। আর এখানে আমাদের কতো কাজ। দেশের জন্যে কতো টাকা তুলতে হবে। আমরা তো আজ সেখানেই যাচ্ছি।"

নিউইয়র্কের চীনে অঞ্চলে একটি চীনেদের স্কুল আছে। মায়ের সঙ্গে টিং লিং গেল সেখানে। চেং শিয়াংকেও বলা হয়েছিলো, কিন্তু সেদিন ওর এক বন্ধুর গাঁয়ের বাড়িতে পার্টি। সে গেল না।

সেই স্কুলে যেতে আরেকটি বড়ো-সড়ো মেয়ে তার হাত ধরে তাকে একটি ঘরে নিয়ে বসালো। সেখানে আরো অনেক মেয়ে—ছোটো বড়ো মাঝারি। সবাই বসে তারা আর রঙিন ক্রেপ কাগজ দিয়ে ফুল বানাচ্ছে।

"তুমি ফুল বানাতে জানো?" জিজ্ঞেস করলো বড়ো মেয়েটি।

"না," উত্তর দিলো টিং লিং।

"খুব সোজা। বোসো। আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।"

কয়েক বার দেখতেই শিখে নিলো টিং লিং। ফুল বানাতে বসে গেল সবার সঙ্গে।

ঘণ্টাখানেক পরে আরেক জন এসে সবাইকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। টিং লিং বিমুগ্ধ হয়ে দেখলো, এক দীর্ঘ প্রসেশান সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে।

এতো চীন দেশের লোক এই নিউইয়র্ক শহরে! টিং লিং অবাক হয়ে ভাবলো—এত ছেলে, এত মেয়ে তার বয়সী? কী সুন্দর, কী ফুটফুটে দেখতে। শোভাযাত্রীদের মাঝখানে মাঝখানে দীর্ঘ ব্যানার। তাতে নানা রকম শ্লোগান চীনা ভাষায় আর ইংরেজীতে লেখা। শোভাযাত্রার এক প্রান্তে বিউগেল বাজাচ্ছে একজন আর ড্রাম বাজাচ্ছে দু'তিন জন ছেলে।

আর টিং লিং-এর বয়েসী ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা নিয়েছে সাজিভরা কাগজের ফুল, নিউইয়র্কের পথচারীদের কাছে সেগুলো বিকোবে।

শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত দেশের জন্যে টাকা তুলবার জন্যে এই প্রসেশান, এত বড়ো শোভাযাত্রা নাকি বেরোয় নি অনেক দিন।

কাগজের রিপোর্টারেরা ঘোরাঘুরি করছে চারদিকে। ফ্ল্যাশ বালব ঝলসিয়ে ফোটো তুলছে প্রেস ফটোগ্রাফারেরা।

এক-সাজি কাগজের ফুল নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিলো টিং লিং-ও।

মামি কোথায়, মামি?—একবার ভাবল সে।

দেখলো তার আমেরিকান মা নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদের মধ্যে, আর প্রেস রিপোর্টারদের ডেকে ডেকে বুঝিয়ে দিচ্ছে ওটা-ওটা সেটা।

মায়ের জন্যে খুব গর্ব হোলো টিং লিং-এর, হোক না তার মা আমেরিকান, সে তো এখন লেং পরিবারের বৌ। আর শুধু তার মা কেন, নিউইয়র্কের অনেক চীনের অনেক আমেরিকান বৌ অসঙ্কোচে এসে যোগ দিয়েছে এই প্রসেশানে।

একবার শুধু চেং শিয়াং-এর কথা মনে পড়লো। বেচারা চেং শিয়াং—ভাবলো টিং লিং—সে জানে না সে কী মিস করলো।

নিউইয়র্কের জুলাই মাসের অমন গরম—একটুও অনুভব করলো না টিং লিং।

গান গাইছে সব ছেলেরা মেয়েরা। তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে শহরের জনবহুল রাজপথে কাগজের ফুল ফেরি করে বেড়ালো টিং লিং। এমন উত্তেজনা, এমন আনন্দ, তার জীবনে আর কোনোদিন আসেনি।

কেটে গেল আরো কয়েকটা বছর। জার্মানী যুদ্ধে নামলো, পরে নামলো আমেরিকাও। টিং লিং-দের দেশে ফেরা হোলো না কিছুতেই। মাঝখানে একবার কি একটা কাজে নিউইয়র্কে এসেছিলো টিং লিং-এর বাবা। তখন শুধু মাসখানেকের দেখা।

তারপর আরো দু'-তিন বছর, যুদ্ধ, খবরের কাগজে নিত্য নতুন হেড লাইন—আর নিউইয়র্কের ফ্যাশান-দুরন্ত অভিজাত সমাজের দুরন্ত জীবনযাত্রা। তারই মধ্যে বড়ো হয়ে উঠলো টিং লিং, দৈনন্দিন কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে, সবুজ শ্যামল চীনদেশের ঝাপসা স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

কেটে গেল আরো কয়েক মাস। ইউরোপে যুদ্ধ থেমে গেল, বিধ্বস্ত জার্মাণীতে প্রবেশ করলো ইংরেজ, মার্কিণ, ফরাসী আর রুশ সেনাবাহিনী।

নিউ ইয়র্ক সেদিন সন্ধ্যায় আলোয় আলোকময়। রাস্তায় ভিড়। হোটেলে রেস্তরাঁয় নাইট ক্লাবে উন্মত্ত নাচের আসর। চারদিকে খাকিতে সিল্কে শিফনে মেশামিশি।

তারই মধ্যে এক আমেরিকান বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে টিং লিং মাঝে মাঝে ভাবছিলো, কবে আমাদের দেশের যুদ্ধও থামবে।

তাও একদিন থামলো। এটম বোমা পড়লো হিরোশিমায়, নাগাসাকিতে, জাপান আত্মসমর্পণ করলো।

মাসখানেক পরে চুংকিং থেকে চিঠি এলো টিং লিং-এর বাবার, —আমি নানকিং যাচ্ছি। তোমরা সবাই সেখানে চলে এসো।

[ক্রমশঃ।

প্রয়াসী

ইংরেজ শাসনের যুগ !···

নৈশ আকাশের স্তব্ধতা প্রচণ্ড শব্দে ভেঙ্গে খান-খান হয়ে গেল। এত কোলাহল কেন? কিসের এত হট্টগোল?—ভারত জেগেছে। বঞ্চিত ভারত, লাঞ্ছিত ভারত, পদদলিত ভারত জেগেছে। যে ভারতবাসী একদিন ইংরেজের পাশবিক লোভ আর অমানুষিক নীচতার দংশনে জর্জরিত হয়ে পথের ধূলোয় লুটিয়ে পড়েছিল, তারাই আজ ধূলি-সজ্জা ছেড়েছে—চোখে জ্বলেছে রোষের বহ্নি, মনে জেগেছে বাঁধন ছিন্ন করার ঐকান্তিক স্পৃহা।

এলো বিপ্লব। ভাঙ্গিয়ে দিল ভারতের জড়তার ঘুমঘোর—হঠাৎ চোখ মেলে ভারতবাসী দেখলো জ্বলেছে অনল—সারা আকাশ লালে লাল হয়ে গেছে। ও কিসের আগুন? ও যে বিদ্রোহের আগুন! ও লাল রং কিসের? ও তো রং নয়—ও যে রক্ত—অত্যাচারিতের রক্ত, অত্যাচারীর রক্ত মিশে একাকার হয়ে গেল···রাঙিয়ে দিল কি ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিনের চলার পথ?

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ দমনেরও হিড়িক পড়ে যায়—চলে তল্লাসী, চলে নির্য্যাতন, ফাঁসীর দড়ি থাকে প্রস্তুত, রিভলভার থাকে ভরা। কাটে দিন···কাটে মাস···কাটে বছর। কত বিপ্লবী ধরা পড়ে, কিন্তু বিপ্লব তো মরে না! আরও ছড়িয়ে পড়ে গুপ্ত বিপ্লব—দিকে দিকে। নতুনদের আকর্ষণ করতে নব নব উদ্ভাবিত হয়—আর দরকার হয় জহুরীর চোখ রতন চিনে নিতে। কি এক অদম্য আকর্ষণ প্রতি ঘরের দুয়ার খোলায়, দূরত্বের ব্যবধান ঘোচায়, পরকে করে ভাই। এ তো চুম্বকের দিকে পেরেকের আকর্ষণ নয়, এ প্রভাতের সোনার আলোর প্রতি নবীন কিশলয়ের আকর্ষণ! যুগ যুগ ধরে যার ক্ষয় নেই, লয় নেই, তৃপ্তি নেই।

* * * *

শ্যামল ছায়ায় ঢাকা কত গ্রাম দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি, ছবির মতন। অস্তমিত সূর্য্যের আলোকে গৈরিক হয়ে গেছে সমস্ত আকাশ, বনানী, পুকুরের জল। পড়ন্ত বেলা—আস্তে আস্তে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠছে গ্রাম· দু'-একজন লোকও এবার দেখা যায় পথে। তাদের মধ্যে রঞ্জনও একজন—চলেছে সে—চোখে উৎসুক সন্ধানী দৃষ্টি। বাড়ীগুলো পেছনে পড়ে থাকে, ঘোষেদের পুকুরটার ধার দিয়ে আরও একটু এগিয়ে প্রত্যাশার আবেশে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—দাঁড়িয়ে পড়ে সে। একদল ছেলে ফুটবল খেলছে—বিদ্যুৎ বেগে ছুটছে—উত্তেজিত ভাব—পৃথিবীর আর সব কিছু লুপ্ত হয়ে গেছে তাদের কাছে। কয়েক জন ছেলে অচেনা—দূর গাঁয়ের নিশ্চয়—ম্যাচ খেলতে এসেছে। এই সুযোগ নিতেই তো স্কুল আর খেলার মাঠে হানা দেওয়া। এত চাঞ্চল্যের মধ্যে কিন্তু তাদের স্থিরভাবে লক্ষ্য করা শক্ত। তবু ধৈর্য্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকে রঞ্জন, বিরাট দায়িত্বের বোঝা তার কাঁধে—আজ নিজের রুচিতে আর দায়িত্বে কোন কিশোরকে দলে টেনে আনতে হবে—উজ্জ্বল সম্ভাবনার ইন্ধন যার মনে। যদি না পারে? যদি ব্যর্থ হয়? শ্রীমন্তদা' কি বলবেন?

খেলা জমে উঠেছে। দর্শক বেশী নেই। যারা আছে তারা সবাই মাঠের ওদিকে—গাছের ছায়ায়। একা রঞ্জন এদিকে। একটি ছেলে—বয়সটা অন্যদের তুলনায় কম—পাতলা পাতলা চেহারা ক্ষিপ্রগতিতে বল নিয়ে দৌড়োচ্ছে বিপক্ষের গোলের দিকে—অদ্ভুত কৌশলে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে—আরও কাছে—গোলপোষ্ট এবার তার নাগালের মধ্যে এসে গেল···উত্তেজনায় দর্শকরা চীৎকার করে উঠছে···এক মুহূর্ত্ত···হঠাৎ কি হল—পরক্ষণেই ছেলেটি ছিটকে এসে লুটিয়ে পড়ল রঞ্জনের একটু দূরে—খেলার মাঠের সীমানার বাইরে। রেফারী সিটি দিল—খেলা থামল—চীৎকার উঠল, 'ফাউল ফাউল'। তৎক্ষণে রঞ্জন ছেলেটার কাছে পৌঁছে গেছে। একবার তাকে দেখে নিয়ে হাত নেড়ে জানালো আর কাউকে আসতে হবে না—খেলা চলুক—ঠিক আছে। রঞ্জনকে দেখে নিশ্চিন্ত হল তারা—রেফারীর হুইশিল্ শোনা গেল—পেনাল্টি কিক্।···নেতিয়ে পড়েছে ছেলেটা—লেগেছে পায়ে—কিন্তু অনেকক্ষণ খেলার আর উত্তেজনার ক্লান্তিটাই বেশী প্রবল—লাল হয়ে উঠেছে কচি মুখখানা। পায়ের হাড়ে লেগেছে—মালিশ করে দিতে দিতে তাকিয়ে দেখলো রঞ্জন—একেবারে বাচ্ছা—রংটা উজ্জ্বল শ্যাম, একমাথা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া অবিন্যস্ত চুল।···একটু পরে লজ্জিত ভাবে উঠে বসল ছেলেটি—হাতের কনুইটা পড়ে গিয়ে কেটে গেছে—রক্তে-ধূলোয় মাখামাখি—ধোয়া দরকার। কুড়ি বছরের রঞ্জন ব্যায়াম-করা হাতে অনায়াসে তুলে নিল তাকে কোলে। প্রতিবাদ জানালো ছেলেটি—না না, নামিয়ে দিন, হেঁটেই যাব।

রঞ্জন তখন চলতে সুরু করেছে—সস্নেহে হেসে বলল—লজ্জা কি ভাই, দাদা হই যে আমি।

কেন এত স্নেহ? এ কি শুধুই ছোট ছেলের আঘাতের বেদনায়

সহানুভূতি? না কি বুদ্ধিদীপ্ত কালো চোখের মাঝে মিলেছে কোন্ সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত?···

ঘোষেদের পুকুরঘাটে এসে রঞ্জন তার রক্ত আর ধূলো ধুইয়ে দিল। তার পর পাশে এসে বসল। গাছপালায় ঢাকা নির্জ্জন জায়গাটা—এখনই অন্ধকার হয়ে আসছে।

—যন্ত্রণা কমলো? নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রঞ্জন।

—হুঁ, বেশী লাগে নি আমার—জবাব দেয় ছেলেটি।

—তুমি খুব সুন্দর খেলো তো! চমৎকার বল কাটাও।

সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে শিশুসুলভ গর্ব্বের সঙ্গে লজ্জা মিশিয়ে মাথা নিচু করে ছেলেটি। তার পর আক্ষেপের স্বরে বলে—আর একটু হলেই গোল হয়ে যেত। ইস্, রাজেনটা এমন চার্জ্জ করলে!

ফুলে-ওঠা পা'টার দিকে দু'জনেই তাকায়।

—তুমি আবার বাগে পেলে শোধ নেবে তো?—সকৌতুকে প্রশ্ন করে রঞ্জন।

—নাঃ, তা কেন? ও অন্যায় করলেই কি আমাকেও তাই করতে হবে? খেলায় প্রতিহিংসা কিসের? হেসে বলে—তা ছাড়া ওর সঙ্গে পারবও না আমি।

ওর কথার ধরণে খুসী হয় রঞ্জন। একটু পরে প্রশ্ন করে—তোমার নাম কি?

—অশেষ—অশেষ মুখোপাধ্যায়।

—কোন্ গ্রামে বাড়ী তোমার ভাই?

—এই গ্রামেই তো, একটু দূরেই বাড়ীটা।

—তাই নাকি? আশ্চর্য্য হয় রঞ্জন, কই তোমায় তো কোন দিন দেখিনি? আমার তো এই পাশের গাঁয়েই বাড়ী।

—এখানে আমি নতুন এসেছি যে,—বিশাল চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে তাকাল অশেষ—এটা আমার মামার বাড়ী! সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় আমার মামা।

—ও, তাই বল! সুখময় কাকার ভাগ্নে তুমি? বেড়াতে এসেছো? তোমাদের বাড়ী কোথায়?

ম্লান হাসল অশেষ।

—থাকতাম কলকাতায়, এখন এখানেই থাকি, মাসখানেক হল আছি—আমার মা-বাবা মারা গেলেন কি না। এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে যায় সে।

একটু অস্বস্তিতে পড়ে চুপ করে থাকে রঞ্জন।

অশেষই প্রশ্ন করে—আপনায় কি বলে ডাকব?

—আমায় রঞ্জনদা' বলে ডেকো। তুমি যাদের সঙ্গে খেলছিলে তারা সবাই আমায় চেনে। কোন ক্লাশে পড় তুমি?

—ক্লাশ নাইন।

ছেলেটাকে ভাল লেগেছে রঞ্জনের। সাধারণ কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে আসল কাজে অগ্রসর হবার পথটা ঠিক করে নিয়েছে সে। এবার সুরু করে দিল।

—জানো অশেষ, আমাদের একটা অভিনয়-সঙ্ঘ আছে। তুমি আসবে তাতে? তাহলে এবার অভিমন্যুর পাঠটা তোমায় দিই।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায় অশেষ।

—খুব রাজি, কিন্তু আমি অভিনয় করতে পারব কি না, না জেনেই যে পাঠ দেবেন বলছেন?

জেরা করার ধরণ দেখে হাসে রঞ্জন—বলে—আমরা দেখলেই বুঝতে পারি কে পারবে, না পারবে। আমাদের এক দাদা আছেন, তিনিই শেখান, তাঁকে চিনিয়ে দেব তোমায়।

মনে মনে বলে—অভিমন্যু হয়ে সপ্তরথীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে না-ই পারলে, ইংরেজ-রথীর সঙ্গে পারবে তো? তাহলেই হবে।

একটু পরে আবার বলে, আমাদের একটা লাইব্রেরীও আছে, বই পড়তে ভালোবাস তুমি?

—খুব, উৎসাহে চক-চক করে ওঠে অশেষের চোখ দুটো, খুব ভালোবাসি।

চুপ-চাপ যায়। রঞ্জন প্রশ্ন করে—তুমি তাহলে আমাদের কাছে আসছ? কবে আসবে বল?

—কালই যাব। রবিবার তো।

অবাক হয় রঞ্জন—অবশ্য এই আশাতেই তার এই শনিবারের ছেলেধরার অভিযান, তবু অশেষের আহত পা'টার দিকে না তাকিয়ে পারে না। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে হেসে ওঠে অশেষ।

—পায়ের কথা ভাবছেন বুঝি রঞ্জনদা'? ওতে কি? আমি না ছেলে। মা বলতেন ছেলেদের অত সহজে কাতর হতে নেই।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে—গ্রামের কোলাহল ক্রমেই আসছে কমে—রঞ্জন উঠে পড়ল।

—তাহলে ঐ কথাই রইল। কাল তুমি সন্ধ্যের আগে যেও, কেমন?

গ্রাম আর বাড়ীর পথ বলে দিল রঞ্জন—ওদের বাড়ীটা ছাড়িয়েই শ্রীমন্তদা'র বাড়ী—সেখানেই যেতে বলল। অশেষও উঠে দাঁড়ায়—অন্ধকারে দেখতে পায় না রঞ্জন, যন্ত্রণায় তার বিশাল চোখ দু'টো বেদনার্ত্ত হয়ে উঠেছে। বুঝতে দেয়ও না অশেষ—সোজা হয়েই দাঁড়ায়—বলে, তাই যাব।

রবিবার বিকেল। শ্রীমন্তদা'র ঘরে বসে কথা বলছিল রঞ্জন। আর সবাইয়ের মত সে-ও শ্রীমন্তদা'কে গুরুর মত শ্রদ্ধা করে। তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণে বহু ছেলে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে, রঞ্জনও তাদের একজন। তাঁর অঙ্গুলি হেলনে তারা প্রাণ দিতে পারে, শ্রীমন্তদা'র স্নেহও অপরিসীম। ক্রমেই রঞ্জন ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠছে—অশেষ যে তারই মূর্ত্তিমান পরীক্ষা। কেমন হবে অশেষ? যদি সে তার অযোগ্যতাই প্রমাণ করে? কাল অশেষকে যেন ঠিক বুঝতে পারেনি সে। বড় বেশী গম্ভীর, বয়সের তুলনায়—কিছুতেই অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না।

হঠাৎ ডাক শোনা যায়—রঞ্জনদা'!

লাফিয়ে ওঠে রঞ্জন—ঐ তো অশেষ,—এসেছে, এস অশেষ, এই যে আমি। অধীর আগ্রহে এগিয়ে যায় রঞ্জন আর একটু পরেই ঘরে ঢোকে, পেছনে অশেষ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অশেষকে দেখেন শ্রীমন্তদা'—সাদা হাফ প্যান্ট আর সার্ট পরা—রোগা—মাথায় এক মাথা রুক্ষ চুল, মুখটা একটু বেশী লাল। কালকের মত ধূলি-ধূসরিত নয়—সব মিলিয়ে একটি রূপবান কিশোর। মুহূর্ত্তের জন্য থমকে যান শ্রীমন্তদা'; এ কি! পলাশ ফুল নয় তো? ততক্ষণে ওরা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রঞ্জন বলে—অশেষ, ইনিই আমাদের সবার দাদা—শ্রীমন্তদা', আজ থেকে তোমারও দাদা।

পর মুহূর্ত্তে কচি নরম হাতে প্রণাম করে অশেষ—শ্রীমন্তদা' তেমনি করেই তাকিয়ে থাকেন অশেষের দিকে, বলেন—বস।

এ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রঞ্জনের সুপরিচিত—তার বুকটা টিপ্-টিপ করে। সামনে বসে পড়ে অশেষ—তার কিন্তু লেশমাত্র ভীত ভাব দেখা যায় না—নির্ভীক উজ্জ্বল চোখে স্পষ্ট করে তাকায় শ্রীমন্তদা'র দিকে—তাঁর চোখে চোখ রেখে। আর সেই কালো চোখের গভীর দৃষ্টির আগুনে শ্রীমন্তদা'র সব সন্দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। না পলাশ ফুল এ নয়। এ যে কেয়া। যেমন আছে সৌন্দর্য্য তেমনি আছে কাঁটার বেড়া! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সহজ হয়ে আলাপ সুরু করেন তিনি।

—তোমার কথা শুনলাম রঞ্জনের কাছে। তুমি অভিমন্যু হবে তো? পা কেমন আছে?

—পা মন্দ নয়, অভিমন্যু নিশ্চয় হব যদি আমায় যোগ্য বিবেচনা করেন।

—বেশ বেশ, তোমাকে বইও দেখাবে রঞ্জন। ওঃ, তোমার পা'টা যে ভীষণ ফুলেছে? কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে এসেছিল অশেষ, কেউ যাতে না দেখতে পায়। কিন্তু ফোলাটা আরও বেড়ে গেছে জোর করে পথ-চলার পরিশ্রমে। ধরা পড়ে লজ্জিত ভাবে হেসে বলে।

—হাঁ, একটু ফুলেছে—ঠিক হয়ে যাবে।

মুখটা আরও লাল দেখাচ্ছে, লজ্জায় না বেদনায় কে জানে? আসল কথায় এসে পড়েন শ্রীমন্তদা'। বোঝেন ও খাঁটি সোনা—একে এখনি কাজে লাগানো যায়—আগুনে পোড়াবার দরকার নেই।

—অশেষ, জান তো ইংরেজ আমাদের কি দুর্গতি করছে, আমাদের সোনার ভারত জ্বালিয়ে দিল, আর ভারে ভারে ধন যাচ্ছে বিদেশে। যারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে, যারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলছে—তাদের ওরা জেলে দিচ্ছে, দ্বীপান্তরে পাঠাচ্ছে, ফাঁসীকাঠে ঝোলাচ্ছে। তাদের অপরাধ—তারা নিজের দেশে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু বিপ্লবীকে সরিয়ে বিপ্লবের আগুন নেবানো যায় না ভাই! তাই দেখ, এত বিপদ এত উৎপীড়ন, সব তুচ্ছ করে দলে দলে এই বিপ্লবের আগুনে আত্মাহুতি দিতে এগিয়ে আসছে কত যুবক, কত কিশোর, কত বালক। শোনার মত কান যদি তোমার থাকে অশেষ, তবে তুমিও শুনতে পাবে—দেশমাতা আমাদের কাতর হয়ে ডাকছেন তাঁর শৃঙ্খল মোচন করতে। তুমি সাড়া দেবে অশেষ? দুঃখিনী মায়ের ডাকে? তোমার মা হারিয়ে গেছেন ঐ আকাশে, তাঁকে তুমি খুঁজে নাও দেশের মাটিতে। পারবে না ভাই?

হারানো মায়ের কথায় যে বেদনার ঝড় ছোট্ট বুকটায় উদ্বেল হয়ে ওঠে—বাইরে তা প্রকাশ পায় না। চোখের দৃষ্টিটা শুধু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—নিশ্চয় পারব শ্রীমন্তদা'। আমার চিরদিনের স্বপ্ন আমি বিপ্লবী হব। শপথ করছি আজ থেকে ভারতের শৃঙ্খল মোচনই হবে আমার ব্রত।

গভীর তৃপ্তি আর স্নেহে অশেষের মাথায় হাত দিতে গিয়ে কপালে হাত ঠেকে যায়—আর চমকে ওঠেন শ্রীমন্তদা'—একি গা যে পুড়ে যাচ্ছে, এত জ্বর নিয়ে এলে কেন ভাই আজকে?

হাসল অশেষ—তৃপ্তির হাসি—আমি যে রঞ্জনদা'কে কথা দিয়েছিলাম, দাদা আজ আসব। সারা দিনই শুয়েছিলাম—বিকেলেও জ্বর কমল না যে, তাই মাসীমাকে লুকিয়ে—আর বলতে পারে না। সহসা সব সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়—জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে। শ্রীমন্তদা' তাকে ধরে শুইয়ে দেন—অস্ফুট কণ্ঠে বলেন—সাবাস!

চলে পরিচর্য্যার পালা। ফুলের মত কচি মুখখানা ব্যাথায় ম্লান হয়ে গেছে। শ্রীমন্তদা' বলেন—জ্বরটা খুবই ছিল। তার ওপর এই জখম পায়ে এতখানি পথ চলে এসেছে, ক্লান্তিতে জ্বরটা বেড়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য? যতক্ষণ কথা বলেছি বুঝতে দেয়নি ওর কোন দৈহিক কষ্ট হচ্ছে! জ্বরের জন্যেই মুখটা অত লাল লাগছিল। অদ্ভুত রঞ্জন! দু'জনের চোখকে ফাঁকি দিল এই এক ফোঁটা ছেলের ধৈর্য্য! জহুরীর চোখ বটে তোর—রতন বার করেছিস।

অশেষের মাথায় হাওয়া করতে করতে অবাক চোখে তাকায় রঞ্জন—শ্রীমন্তদা'কে এত কথা বলতে সে কোন দিন শোনে নি। খুব চাপা লোক। বিস্ময়াধিক্যে নিজের সাফল্যটাও সে অনুভব করতে পারে না যেন।

কাটল কিছুদিন। ক্রমেই অশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। বৈপ্লবিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে অভিমন্যু বধের মহড়াও চলে। অশেষ খুব সুন্দর ভাবে লোকের গলার স্বর নকল করতে পারে—মেয়ে-পুরুষ নির্ব্বিশেষে। ছেলেবেলা এই গুণের সাহায্যে সে মামাতো বোন শান্তি ও বেণুকে বশ করে ফেলেছিল। এখানেও সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। এর পরের থিয়েটারটাতে ওকে স্ত্রী-ভূমিকায় নামানোর পরিকল্পনাও হতে লাগলো এখন থেকেই। কিন্তু অশেষের সব চেয়ে বড় গুণ, যে কাজে সে হাত দেয় সুষ্ঠুভাবে করে। তাই মামীমা যখন বলেন—ওরে, আমি দু'টো ডুব দিয়ে আসি, ততক্ষণ আচারগুলো একটু দেখিস বাবা, রদ্দুরে দিয়েছি।

তখনও যেমন অশেষ বইটি হাতে করে দাওয়ায় এসে বসে—মামীমা না আসা পর্য্যন্ত সুষ্ঠু ভাবে আচার পাহারা দেয়, তেমনি সুষ্ঠু ভাবে শেখে সে বিপ্লবের কাজ—আঁকায় হাত তার ভাল—ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুরেশদা' বাদলদা'র সঙ্গে গুপ্তকক্ষে ইস্তাহার আর পোষ্টার আঁকে—সহকর্মীরা শ্রান্ত হলেও ওর ক্লান্তি আসে না। আবার ঠিক তেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে সে অভিমন্যুর পাঠ করে—বীররস ফোটায়—যুদ্ধ করে সপ্তরথীর সঙ্গে। তাই প্রথম রাতের অভিনয়ে অভিমন্যুর জন্যে ধন্য ধন্য পড়ে গেল আর কলকাতার ছেলে অশেষ

মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখল বাংলা গ্রামের নতুন রূপ। বর্ষীয়সীদের চোখের জল আর শুকায় না, কমবয়সীরা বার বার খোঁজ করে—

—কে রে ছেলেটি? নতুন এসেছে গাঁয়ে? কোন্ গ্রামে বাড়ী?

আর বিজ্ঞেরা বলেন—বলিহারি, শ্রীমন্ত পাঠ শিখিয়েছে বটে!

অভিনয় শেষে সাজঘরে ভীড় জমে যায়—এগিয়ে আসেন কাকীমা, পিসিমারা—অবাক চোখে অশেষ দেখে শ্রীমন্তদা'র প্রতি এঁদের অসংখ্য স্নেহ-অভিযোগ। অশেষকে কাছে টেনে এনে কেউ বলেন—হ্যাঁরে শ্রীমন্ত, কি বলে এই দুধের ছেলেকে অভিমন্যু সাজালি রে হতভাগা! কেউ বলেন—স্বদেশী করলে কি এমনি পাষাণ হতে হয়?

শ্রীমন্তদা হাসেন—আর মনে মনে ভাবেন, দয়া মায়া থাকলে কি করে চলবে? অভিমন্যুর পাঠ তো শুধু অভিনয়, সত্যি যদি ওকে মরতে দিতে হয়, তাতেও তিনি কুণ্ঠিত হবেন না। মহড়া দেবার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি দেখতেন তিনি অশেষের মধ্যে? যখন ওর পাঠ না থাকতো তখনও তিনি লক্ষ্য করতেন ওর নিবিষ্ট মনে অভিনয়রতদের দেখার ভঙ্গী, একটা বিশিষ্ট ভঙ্গীতে দাঁড়ায় অশেষ—দেওয়ালে ঠেস দিয়ে একটা পা মুড়ে দেওয়ালে রেখে হাত দুটো পেছনে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—তেজী ঘোড়ার মত ঘাড়টা একটু বাঁকানো। ভাবতেন ঐ তেজী ঘোড়াটা সামান্য ইঙ্গিতে উল্কার বেগে ছুটতে পারবে কি না ঊষর মরুর পথে। কচি মুখের দিকে তাকাবার সময় কোথা বিপ্লবীর? দেশের প্রয়োজনে অশেষের মত হাজারটা ছেলেকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাবার আদেশ দিতেও কণ্ঠস্বর কম্পিত হবে না একটুও।

এ অশেষের এক নতুন অভিজ্ঞতা—এ কি অপরিসীম মাতৃস্নেহ, সীমাহীন মমতা। শুধু পাড়া-প্রতিবেশী নয়, আশ-পাশের গ্রাম থেকে নিমন্ত্রণ আসে—ভাল অভিনয়ের পুরস্কার আর কি, যত্ন করে খাওয়ানো। স্বল্পাহারী অশেষ খেতে না পারলে কত অনুযোগ—রোগা বলে কত সস্নেহ তিরস্কার। আর খাইয়ে শ্রীমন্তদা' পাশে বসে খেতে খেতে ক্ষ্যাপান তাকে।

—তোর কিচ্ছু হবে না, যা দেখছি। ঐ তালপাতার সেপাই হয়েই থাকবি। শুনে রঞ্জনদা'রা হাসে। বাড়ীতেও মামীমার বকুনি, মামাতো বোনেদের অনুযোগ—

—এ কি অনাছিষ্টি বাপু, লোকে নেমন্তন্ন করছে বলে ঘরের ছেলে বাড়ীতে কোন সময় দাঁতে কুটো কাটবে না! কি চেহারা হোচ্ছে দিন দিন!

মামা কোলকাতায় চাকরী করেন, তাই তাঁর বকুনিটা আর শুনতে হয় না। শুধু মামাতো বড় ভাই সুনীল তাকে কেমন একটা ঈর্ষার চোখে দেখেন—সুযোগ পেলেই বকতে শুরু করেন—তাতে স্নেহ নেই, আছে জ্বালা। আজকাল অশেষ আর গ্রাহ্য করে না, শুধু বড়দা'কে এড়িয়ে চলে।

তার পর একদিন সব আনন্দের ওপর যবনিকা টেনে দিয়ে শ্রীমন্তদা'কে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল রাজবন্দী হিসাবে। সেই বিদায়ের দিনে দশ-বারোটা গ্রামের লোক ভেঙ্গে পড়ল—সবার চোখে জল। শুধু তরুণ বিপ্লবী দলটির চোখে জ্বলে উঠল আগুন—প্রতিহিংসার আগুন।···তার পর চাঞ্চল্য একদিন জুড়োলো—কয়েক বছর কেটে গেল। এর মধ্যে কত ঘটনা ঘটল—কত বৈপ্লবিক ডাকাতি হয়ে গেল, কত ইংরেজ অত্যাচারী প্রাণ দিল, তাদের পোষা কত দেশী অফিসারের রক্ত ঝরল। তেমনি আবার গ্রেপ্তার হল কত বিপ্লবী, সাজানো হল কত ষড়যন্ত্র মামলা, জেলের ভেতর কত লাঠিচার্জ, কত গুলী ছোঁড়ার কাহিনী বাতাসে ভেসে এলো, আর বিপ্লবীদের মনের পাতায় রক্ত দিয়ে লেখা হয়ে গেল সেই অত্যাচারীদের নাম—তারা তাদের ধরাপৃষ্ঠ থেকে একে একে বিদায় দিতে লাগল। বিস্ময়ে ইংরেজের উদ্দেশ্যহীন নীল চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে—এ কি জাত! ফাঁসীর দড়ি গলায় পরেও যুবকের মুখের হাসি ম্লান হয় না, সহস্র চক্ষুর সম্মুখে কোন অত্যাচারী শাসককে সামনে থেকে গুলী করে পর মুহূর্ত্তে পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়ে ঢলে পড়ে কিশোর বালক—বিষের জ্বালায় বিকৃত হয় না মুখ, কচি মুখে লেগে থাকে তৃপ্তির স্নিগ্ধ হাসি! তাদের সে হাসি যেন শক্তিশালী শাসক-গোষ্ঠীর প্রতি ব্যঙ্গের ছুরিকাঘাত।

তারই মাঝে অশেষ নিজের নিষ্ঠায় পেয়েছে গুরুদায়িত্ব—শ্রীমন্তদা' নেই—সে-ই রঞ্জনের ডান হাত। দু'জনের মধ্যে সৌহার্দ্যও গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠেছে।···হঠাৎ পুলিশ এসে গ্রাম তোলপাড় করে অনেক বাড়ী সার্চ করে—কিছুই পায় না। কোথায় লুকোনো থাকতে পারে বাজেয়াপ্ত বিপ্লবাত্মক বই আর রিভালবার, বোমা আর ইস্তাহার—পুলিশী মগজে তা ঢোকে না।···এরই মধ্যে অশেষ স্কুল ছেড়েছে। প্রথম দশ জনের একজন হয়ে সসম্মানে ম্যাট্রিক পাশ করে ঢুকেছে কলেজে।

দীর্ঘ দিন পর যখন শ্রীমন্তদা' স্বগৃহে অন্তরীণ হয়ে বাড়ী ফিরলেন, তখন তাঁর প্রথম দিন দেখা তের বছরের অশেষের রোগা চেহারাটা নিত্য ব্যায়াম আর কুচকাওয়াজ-করা ষোল বছরের অশেষের পেশীর ভাঁজে ভাঁজে মিলিয়ে গেছে। পুরোদমে কাজ সুরু হোল পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে। আর অল্পদিন পরেই রঞ্জনরা অনেকে গ্রেপ্তার হয়ে গেল! অশেষ কিন্তু শ্রীমন্তদা'র সঙ্গে থাকে ছায়ার মতন—দু'তিন মাস পরে আই, এস, সি পরীক্ষা—বই ছোঁবার সময় নেই। দিনে নতুন ছেলে দলে আনতে শ্রীমন্তদা'কে সাহায্য করে—অভিনয়, খেলা আর বইএর লোভ দেখায়, তাকে যেমন করে একদিন রঞ্জন দেখিয়েছিল। পুলিশ নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে—শ্রীমন্তদা'কে রাতে বাড়ী থাকতে হবে—কিন্তু সারা রাত চলে গুপ্ত অভিযান—অশেষ থাকে পাশে—দেহরক্ষীর মত। সারা রাত নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে শ্রীমন্তদা' গ্রামে গ্রামে নেতাদের সঙ্গে দেখা করে বেড়ান—চলে আলোচনা, পরামর্শ উপদেশ—অন্ধকারেই কত ছেলে-মেয়েকে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা দেন।

একদিন ছুটিতে মামা এসেছেন বাড়ী—জানিয়ে দিল অশেষ—সে পরীক্ষা দিতে পারবে না। শুনে মামা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তার দিকে—হুঁকো হাতে ধরা, টানতে ভুলে গেছেন—শেষে বোঝালেন—সে কি কথা রে! চোদ্দ বছরে ষ্ট্যাণ্ড করে ম্যাট্রিক পাশ করলি, কত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তোর! পরীক্ষা দিবি না কি? কি এমন কাজ তোর?

তারপর রেগে গেলেন—কুলাঙ্গার ছেলে। বাপ-মার মুখে চুণকালি দিবি? ছি, ছি, জয়ার ছেলে হয়ে—তার কত ইচ্ছে ছিল তুই ডাক্তার হবি!

বড়দা' কত ব্যঙ্গ করলেন,—এখন সামলাও আদরের গোপালকে। কুসঙ্গে মিশে এই সব বুদ্ধি হচ্ছে! ভারি কাজের লোক!

অশেষ অচল অটল। তেমনি বুনো ঘোড়ার মত বিশিষ্ট ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইল।

রাতে শুয়ে ঘুম আসে না—জানলা দিয়ে এক টুকরো আকাশ চোখে পড়ে—একটা উজ্জ্বল তারা জ্বল-জ্বল করছে—অশেষের চোখ দু'টো জ্বালা করে, জলে ভরে যায়—সত্যিই কি সে অযোগ্য সন্তান? কানে বাজে মায়ের কথাগুলো—রোজ কাগজ পড়ে শোনাতে শোনাতে; বিপ্লবীদের গল্প বলতে বলতে বলতেন—মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচিস্ খোকা, পশুর মত বেঁচে কি লাভ? খোকা তুই বড় হয়ে বিপ্লবী হোস, দেশের লোক তোর নামে শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে। পারবি খোকা মৃত্যুভয় জয় করতে?

আজ কোথায় তার মা? ঐ কি? তারা হ'য়ে ফুটে আছেন? ব্যথায় কি ম্লান তাঁর চোখ? কৈ তা তো নয়! ঐ তো উজ্জ্বল চোখে হাসির আভাস—তৃপ্তির হাসি। ঐ তো আলোর পথ চেয়ে তাঁর আশীষ নেমে এলো! তার কোন সংশয় নেই, সঠিক পথই সে বেছে নিয়েছে—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজলো অশেষ, আর ঠিক তখনি জানলায় ধ্বনিত হ'ল শ্রীমন্তদা'র সঙ্কেত টক্-টক্। নিঃশব্দ পায়ে অশেষ বেরিয়ে এলো।

হন হন করে বাড়ী ফিরছিল অশেষ, তখনও রাত আছে। নদীর ধারে একটা নতুন বজরা দেখে থমকে দাঁড়ালো গাছের আড়ালে। কার বজরা? কোথা থেকে এলো? পুলিশের নয় তো? তল্লাসী করতে—এসেছে? সুকুমার ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীতে যে অনেক জিনিষ রয়েছে অশেষদের বাড়ীতেও—বলা তো যায় না। ছুটলো অশেষ। সুকুমারকে জাগিয়ে তুলে জানালো সব।

—চট্‌পট্ সব সরিয়ে ফেল সুকু, খুব সম্ভব সার্চ করতে এসেছে। আমিও যাই, আমাদের ঘরেও।

সুকুমার বলে—দূর, তোদের বাড়ী সার্চ করবে না—কোন বার তো করে না।

—না রে, এবার মনে হয় টের পেয়েছে, কতদিন আর চাপা থাকবে। সেদিন থানায় হাজরী দেবার দিন ছিল শ্রীমন্তদা'র, ফেরার পথে যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন দীনু খুড়ো দেখেছিল। তখনই শ্রীমন্তদা' বলেছিলেন এবার তুই গেলি অশেষ: ও বুড়ো এখনি ঠক্‌ঠক করে থানায় যাবে। ব্যাটা একটা স্পাই।···যাক্ তুই প্রস্তুত হ', দেখিস ভুল করে বিনুর মত বিপদে ফেলিস নি। ওর জন্যেই তো রঞ্জনদা'রা সব ধরা পড়ল।

বলেই ছুটলো সে। সব ঠিকঠাক করে শুয়ে পড়ল।···আর সত্যই সবার সুপ্তির জড়তা না কাটতেই সদল বলে দারোগা বাবু এসে হাজির হলেন।

—সুনীল বাবু, বাড়ীটা একটু দেখব।

শুনে শুধু মামীমা বা শান্তি আর বেণু নয়, বড়দা' পর্য্যন্ত হতবাক্। এ বাড়ীতে স্বদেশী কবে ঢুকলো! যাই হোক, কিছুই পাওয়া গেল না। শুধু বাজে কাগজের স্তূপ পড়তে পড়তে তেমেন দারোগার মাথা উঠল ধরে—অশেষের মুখে দুষ্টু হাসির ঝিলিক—গা জ্বলে গেল তাঁর। তাঁরা বেরিয়ে যেতেই বড়দা' রাগে ফেটে পড়লেন, মামীমা অনেক চোখের জল ফেললেন অশেষকে এই সর্বনাশা পথ ছাড়বার অনুরোধ জানিয়ে। অশেষ নির্ব্বিকার!—তারপর প্রায় প্রতি মাসেই দারোগা বাবুর আগমন হতে লাগল—ব্যাপারটা ক্রমেই গা সওয়া হয়ে দাঁড়াল—সবাই মেনে নিল।

[আগামীবারে সমাপ্য।

আকর্ষণ

অনুজা দেবী

আমাকে সচকিত করে
বিনিদ্র রজনী আমার সাথে মুখোমুখী হল,
বলল: শুকতারা আর কোনদিন
বিদায় নেবেনা,
সূর্য-প্রহরের প্রথম লগ্ন আর কোনদিন
প্রখর পরশ দেবেনা।

আমার সচকিতভাব কেটে গেল
মৃদু হেসে বলি: তবে তো তোমার অনেক কাজ।
শুনে মহারাত্রি হাসলো। ক্লান্ত তনুর আয়েস
ভাঙা আবিলতা এনে
কালো শাড়ির শ্লথ আঁচল বুকের ওপর
টেনে দিল। বলল:

তবে গূঢ় কথাটি বলি শোন,
এ পৃথিবীর পুনরভ্যুত্থান বিপ্লবের আস্বাদে
আর কোনদিন যাতে না জাগে,
তারি মহাব্রত নিয়েছি আমি,
ধ্বংসের মহড়া চলেছে
সৌরজগতে।

সুমিত্রা বলেন
ঠিক যাহা চেয়েছি
তাই আমি পেয়েছি
আজানুলম্বিত মম ঘন কেশরাশি,
কামদেব রাণী দেখে হাসে ঈর্ষাহাসি।
এমনি কেশের রাশি তুমিও পাইবে,
কে, এম, পির নারিকেল তৈল
যদি ব্যবহার করিবে।
জীবনের সুরু হ'তে জীবনের শেষ,
শুভ্র কভু হ'বেনাকো তব কৃষ্ণ কেশ।
কে.এম.পি
মার্কা
নারিকেল তৈল
KMP
COCOANUT OIL
গ্যারাণ্টি ১০০% খাঁটি
½ পাঃ ১ পাঃ ২ পাঃ ও ৫ পাঃ
'সিল' করা টিনে এখন সর্ব্বত্র
পাওয়া যায়।
ফোন
৩৪-৩৪১৪
প্রস্তুতকারক
পবিত্র হিন্দু অয়েল মিলস্
১নং, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭

ফুটবল

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব দীর্ঘ আট বছর পরে লীগ বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করায় ক্রীড়ামোদী মাত্রেই খুসী হয়েছেন। এবারের লীগে মহামেডান দল অন্যান্য দলগুলি অপেক্ষা অনেক উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রকাশ করে লীগ বিজয়ের সম্মান অর্জ্জন করেছে। এইবারের লীগ বিজয় মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করল। ইতিপূর্ব্বে একমাত্র ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব আট বার লীগ বিজয়ের সম্মান অর্জ্জন করেছিল। মহামেডান দল এবার নিয়ে ন'বার লীগ বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করল।

এবারের ক'লকাতা মাঠে লীগ খেলাগুলি শেষ হওয়ার পর দেখা গেছে, ক'লকাতার ফুটবল খেলার মান অনেক নিম্নমুখী। খেলোয়াড়দের মধ্যে সে নৈপুণ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

খেলোয়াড়দের এই ব্যর্থতার মূলগত কারণগুলি অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, তরুণ খেলোয়াড়দের সুযোগ সুবিধার অভাব। ক'লকাতার বড় বড় ক্লাবগুলি লীগ ও শীল্ড বিজয়ের জন্য বাইরে থেকে প্রতিবছরই খেলোয়াড় আমদানী করেন। শেষ পর্যন্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে ঠিক মত বোঝাপড়া না থাকায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ দক্ষতা দেখাতে চান। সেইজন্য খেলার মান ক্রমশঃ নিম্নমুখী।

খেলোয়াড়দের সুযোগ সুবিধা নিয়ে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করেছিলাম বলে মনে হচ্ছে। তবুও এই প্রসংগে দু'-চারটে কথা বিবেচনা করে দেখার যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে করি।

খেলোয়াড়রা যখন অকেজো হয়ে পড়েন সেই সময় তাঁদের জীবিকা নির্ব্বাহ করা একরকম দুঃসহ ব্যাপার হয়ে ওঠে। যে প্রতিষ্ঠানের জন্য যৌবনের অমূল্য সময়, শক্তি ও সামর্থ্য নিঃশেষ করে দিয়েছেন সেই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন শেষ হওয়ায় তাঁর দিকে দৃষ্টিদানের প্রয়োজন আছে বলে সেই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষরা মনে করেন না। শুধু সেই প্রতিষ্ঠান কেন—আই, এফ, এ কর্ত্তৃপক্ষের যে যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে, সে কথা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা চলে না।

প্রতি বছরই 'চ্যারিটি' খেলার ব্যবস্থা হয়। এতে আই, এফ, এ-র বাৎসরিক আয় কয়েক লক্ষ টাকা। কিন্তু এই সমস্ত টাকা ঠিক মত ব্যয় করা হয় না, তার প্রমাণ ১৯৫৬ সালের আই, এফ, এ-র বিভিন্ন খাতে আয়-ব্যয়ের হিসাবে। এই আয়-ব্যয়ের হিসাব হইতে মাত্র দু'একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

এক কথায় আই, এফ, এর হাতে মোট টাকা আসিয়াছে ৪,১৬৮১৬ ৵ ৬ পাই আর ব্যয় হইয়াছে ২,০০১১২ ৵ ৬ পাই।

টেলিফোনের জন্য ব্যয় হইয়াছে ২,৪৪২৷৹ আনা। 'মিনারেল ওয়াটারের' জন্য ব্যয় দেখান হইয়াছে ৩,০৭৭৸৹ আনা। এই প্রসংগে বলা যায়—যতদূর সম্ভব জানি, চ্যারিটি খেলার পর খেলোয়াড়রা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরিয়া জল পান করেন। কিন্তু আই, এফ, এ-র হিসাবে প্রতিটি চ্যারিটি খেলায় আনুমানিক দুই শত টাকার মত 'মিনারেল ওয়াটারের' জন্য খরচ হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল, এত রঙিন জল পান করিল কে?

তাছাড়া বকশিশ বাবদ খরচ হইয়াছে ১০৬১ টাকা। কিন্তু কাহাদের বকশিশ দেওয়া হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ নাই। জনসাধারণের টাকা খেলোয়াড়দের শ্রমে উপার্জ্জিত। তাই এ যথেচ্ছাচারের সম্বন্ধে সাধারণের বলার অধিকার আছে। এ বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি।

খেলোয়াড়দের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বলা যায়, আই, এফ, এ কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলেই চ্যারিটির টাকা হইতে কিছু টাকা স্বতন্ত্র ভাবে রাখিয়া দুঃস্থ খেলোয়াড়দের সাহায্য করিতে পারেন।

কলকাতা মাঠে আই, এফ, এ শীল্ডের খেলা শুরু হয়ে গেছে। আই-এফ এ শীল্ডের ইতিহাসটুকু বলেই এবারের মত ফুটবল খেলার আলোচনা শেষ করব। আগামীবারে আই, এফ, এ শীল্ডের খেলাগুলি বিস্তৃত আলোচনা করব। এই প্রসংগে বলা যায়, এবারে বহিরাগত দলগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী দল আছে। সেই সমস্ত দলগুলির মধ্যে কোন দল যদি শীল্ড বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করে তাহ'লে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কোন কারণ নাই।

আই, এফ, এ শীল্ড প্রতিযোগিতা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আই, এফ, এ শীল্ডের খেলা সুরু। ১৮৯২ খৃঃ শেষের দিকে ডালহৌসী ক্লাবের সম্পাদক এ, আর, ব্রডিন ও বি, আর, সি লীগুসে, ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ওয়াটসন, শোভাবাজার ক্লাবের এন, সর্ব্বাধিকারী একটি সভার স্থির করেন 'ট্রেডস কাপ' থেকে আরও বড় করে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন, যাতে স্থানীয় শক্তিশালী দলগুলি ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানের শ্রেষ্ঠ দলগুলি এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারে; তাহলে ভারতীয় ফুটবল খেলার মান অনেক উন্নত হবে। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে আর্থিক সাহায্য করলেন কুচবিহার ও পাতিয়ালার মহারাজা, স্যার এ, এ, আপকার ও ডালহৌসী ক্লাবের জনৈক সদস্য।

আই, এফ, এর প্রতিযোগিতার প্রথমবারের খেলা দুটি ভাগে ভাগ করে খেলান হ'ল। একটি বিভাগের খেলা লক্ষ্ণৌতে এবং অপর বিভাগের খেলা ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। সবসমেত ১৩টি দল এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। লক্ষ্ণৌ বিভাগে রয়্যাল আইরিশ রেজিমেণ্ট এবং ক'লকাতা বিভাগে ফিফথ ওয়েষ্টার্ণ ডিভিসন আর, এ, জয়লাভ করে ক'লকাতার ডালহৌসী মাঠে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই খেলায় রয়্যাল আইরিশ দল জয়লাভ করে সর্ব্বপ্রথম আই, এফ, এ শীল্ড জয়লাভ করে।

প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে মোহনবাগান দল ১৯১১ সালে শীল্ড বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করে।

* * * *

দ্বিতীয় ডিভিসনের লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে হাওড়ার ইণ্টারন্যাশানাল ক্লাব। সুতরাং আগামী বার থেকে ইণ্টারন্যাশানাল ক্লাবকে প্রথম ডিভিসনে খেলতে দেওয়া যাবে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, পর পর তিন বছর হাওড়ার তিনটি টিম দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে প্রথম ডিভিসনে খেলার যোগ্যতা অর্জ্জন করল। ১৯৫৫ সালে বালী প্রতিভা। ১৯৫৬ সালে হাওড়া ইউনিয়ন ও ১৯৫৭ সালে ইণ্টারন্যাশানাল ক্লাব।

প্যারালিম্পিক

কয়েক সপ্তাহ আগে ব্যাকিংহামশায়ারের ষ্টোক ম্যাণ্ডেভিলে আন্তর্জ্জাতিক প্যারালিম্পিকের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। ব্যারণ দ্য কুর্বাতিন আধুনিক অলিম্পিকের সৃষ্টি করে খেলাধূলার মাধ্যমে যে মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের বন্ধন এনে দিয়েছেন, তাঁরই মত অভিশপ্ত বিকলাঙ্গ মূক ও বধিরদের জন্য ফ্রান্সের আর এক মহাপ্রাণ ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হলেন মঃ রুবেন্স আলকেস। ষ্টোক ম্যাণ্ডেভিলের হাসপাতালের ক্রীড়াঙ্গনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের কয়েক শত প্রতিযোগী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বিজয়ীর তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছে আমেরিকা। তারপরই ষ্টোক ম্যাণ্ডেভিল হাসপাতালের স্থান।

* * * *

দ্য ভিলে এবার বিশ্ব পোলো প্রতিযোগিতায় এবার ভারত ৫-২ গোলে পরাজিত করেছে 'লেভারসিন' দলকে। 'লেভারসিন' দলে ফ্রান্স, স্পেন ও মেক্সিকোর খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা আছেন।

ভারতীয় পোলো দল যে বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দল, সে কথা কারো অজানা নেই। ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় দল বেসরকারী ভাবে কয়েকবার ইউরোপ সফর করে এসেছে এবং পোলো খেলায় উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে ভূয়সী প্রশংসা অর্জ্জন করেছে।

* * * *

সাঁতার

ইংলিস চ্যানেল অতিক্রমের আন্তর্জাতিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় মহিলা সাতারু গ্রেটা এণ্ডারসন প্রথম স্থান লাভ করেছেন। মহিলা সাঁতারুর পক্ষে ইতিপূর্ব্বে ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম করা সম্ভব হলেও আজ পর্য্যন্ত কোন মহিলার পক্ষে প্রথম স্থান অধিকার করা সম্ভব হয়নি। ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম করতে গ্রেটা এণ্ডারসনের সময় লেগেছে ১৩ ঘণ্টা ৫ মিনিট আর দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কেনথ রে ১৬ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে অতিক্রম করেছেন।

ভারতীয় সাঁতারু মিহির সেনের এবারের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেছে। মিহির সেন সাড়ে ১৪ ঘণ্টা জলে থেকে সম্ভাব্য স্থানে পৌছাতে পারলেন। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে আর একজন সাঁতারু হিমাদ্রি রায়। দেড় ঘণ্টা সাঁতার কাটার পর প্রচণ্ড শীতের জন্য জল থেকে উঠে পড়েন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের শতবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ-কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ 'যুব-জয়ন্তী' উৎসবে খেলাধূলার আয়োজন করেন। একটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে স্বর্গীয় রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জির নামাঙ্কিত শীল্ড উপহার দিয়েছেন। খেলাটিতে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ২-০ গোলে মোহনবাগান দলকে পরাজিত করে।

* * * *

স্বাধীনতা লাভের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানে ইতিপূর্ব্বে দুই একজন কীর্তিমান ক্রীড়াবিদকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়েছে। শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক এস, রায়কে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে একজন প্রকৃত গুণী ব্যক্তিরই সমাদর করেছেন।

কান্না-ভরা আকাশ

সৈয়দ হোসেন হালিম

আবার জমাট অন্ধকার।
আকাশ-মাটিতে জমানো বরফ।
ফিস্‌ফাস্ আকাশে-বাতাসে,
বর্ষণের আগে স্থির মৌন প্রস্তুতি—
বেদনায়-ভেঙে-পড়া শোকার্ত জননীর
কান্নার পূর্ব মুহূর্ত।
অন্ধকার কালো জলে কিরণ স্ফটিকে
অস্পষ্ট স্বচ্ছতা।

মেঘের ছাদের নীচে রোদ্দুর-শিশুর
হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটার নিষ্ফল প্রয়াস
কাকের দীঘল চোখে অদ্ভুত দৃঢ়তা—
সাগর লঙ্ঘনে দুঃসাহসিক নাবিকের কাঠিন্য।
চেনারের ডালে-ডালে দুরন্ত অস্থিরতা।
আকাশ-মাটিতে নীরব প্রস্তুতি—
বরফ গলার পূর্ব মুহূর্ত।
পানকৌড়ির কালো রঙে হলদের ছোঁয়া—

ডুবকাটা পাখীর রঙে দয়িতের নীরব সম্ভাষণ।
দেশলাই জ্বলার পূর্ব মুহূর্তে
বারুদের বোবা কান্না।
জিরো ডিগ্রিতে চার ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের
বরফ-গলানো হিট।
আকাশ-মাটিতে সজল স্নিগ্ধতা—
শোকার্ত জননীর কান্নার পর মুহূর্ত।

র ঙ্গ প ট

হারানো সুর

যদিচ কাহিনীর পটভূমিকার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। কেন না, বহুকাল আগে প্রদর্শিত রোনাল্ড কোলম্যান ও গ্রীয়ার গারসন অভিনীত র‍্যাণ্ডম হারভেস্ট এবং পঙ্কজ মল্লিক অভিনীত সাদাকালো (?) কেই বার বার মনে করিয়ে দেয় হারানো সুরের কাহিনীর মূলসূত্র, তবু ছবিটির চিত্রায়ণের দিকে যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন নির্মাতাবর্গ, সে প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসার্হ অর্থাৎ হারানো সুরের চিত্রমূল্য সুধী দর্শকের সমর্থনলাভ করবেই, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত। বিশেষজ্ঞদের কাছে জানা যায় যে, হঠাৎ বিশেষ রকমের দুর্ঘটনায় মানুষের মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়াশীল সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরাগুলি আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। যার ফলে আঘাতগ্রস্ত মানুষের মনে শুধু বর্তমান ও ভবিষ্যৎই আসন পায় এবং অতীত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে। ঠিক অনুরূপভাবেই আবার যদি সে আঘাত প্রাপ্ত হয় তখন সেই শিরা-উপশিরাগুলি আবার স্বস্থানে ফিরে আসে; রোগী তখন আবার অতীতকে মনে করতে পারে কিন্তু এই মধ্যবর্তী অংশ মুছে যায় চিরকালের জন্যে তার মন থেকে। এই পটভূমিকার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে হারানো সুরের কাহিনী। কাহিনীর প্রথমাংশ কাহিনীকারের কৃতিত্বে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। মানসিক চিকিৎসালয়ের কর্মপ্রণালী গ্রথিত করে কাহিনীটিকে মনোরম করে তোলা হয়েছে। চিত্রের গতিও বাধাহীন ভাবে প্রবাহিত। ছবিটির আর একটি প্রধান গুণ যে দুটি একটি অধ্যায় ছাড়া প্রায় সারা ছবিটিই পরিষ্কার অর্থাৎ কোন অংশ দুর্বোধ্য নয়। অর্থাৎ প্রশ্নমুক্ত, প্রত্যেকটি সংলাপ পর্যন্ত অতি সহজবোধ্য, চিত্রনাট্যকারের কৃতিত্বে ভরপুর। অবশ্য একেবারে দোষত্রুটি নেই বললেও ভুল হবে। যে অলোককে পুলিশে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই অলোককে প্রকাশ্যভাবে স্টেশনে নিয়ে এল রমা তার সাজসজ্জা পরিবর্তন না করিয়েই (পলাশপুরে এসে সে দিব্যি দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে সভ্য-ভব্য হয়ে উঠল), পুলিশ সম্বন্ধে রমা কি বেপরোয়া---তারপর দেখা গেল স্টেশনটি একটিমাত্র কাঠের পুতুল মার্কা পুলিশ ছাড়া একেবারে লোকশূন্য স্টেশন সম্বন্ধে এ রকম অদ্ভুত ধারণা পোষণ করা সুস্থ লোকের লক্ষণ বলে মনে হয় না। মোটরের ধাক্কা খেয়ে অলোক উল্টে পড়ল অথচ যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন দেখলুম সে সম্পূর্ণ অক্ষত। ওরকম ভাবে ধাক্কা খেয়ে যে গড়িয়ে পড়ল তার দেহ কি লোহা দিয়ে তৈরী যে একটু ছড়ে পর্যন্ত গেল না? মালা অলোকের ভাগ্নী, ওদেরই পরিবারভুক্তা অথচ তার মা-বাবার কোন সন্ধান নেই, এমন কি তারা মৃত হলেও তাদের সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নেই—প্রথম দিকে হাসপাতালে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে উপস্থিত শুভেন মুখোপাধ্যায় অভিনীত চরিত্রটি যদি মালার বাবার চরিত্র বলে ধরে নেওয়াও যায় তা হলে হাসপাতালে অলোককে গোড়া থেকেই দেখতে পাচ্ছি পাগলের বেশে কিন্তু কেন? দুর্ঘটনায় সে স্মৃতিশক্তিটুকুই হারিয়ে ফেলেছে তা ছাড়া আর তার সব ঠিকই আছে। এমন কি তার সংলাপের মধ্যেও পরিচালক উন্মাদসুলভ কোন সংলাপ জুড়ে দেন নি—চন্দ্রাবতীর সঙ্গে সে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলছে, অথচ তার রূপসজ্জা দেখে মনে হয় সে যেন একটি পাগল—একজন স্মৃতিভ্রষ্ট আর একজন উন্মাদে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান যেমন ভয়ানক মারাত্মক রকমের ভুল করেন তাঁরা যাঁরা নজরুল ইসলামের স্মৃতিশক্তির শূন্যতা এবং তদনুবর্তী জড়তা দেখে তাঁকে 'পাগল' বলে অভিহিত করেন। এখানেও অলোকের জড়তার জন্যে তাকে পাগল সাজিয়ে ঠিক সেই রকম ভুলই করা যায়।

অভিনয়াংশে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন সুচিত্রা সেন। বাংলা দেশ আজ সুচিত্রা সেনকে সত্যি গর্ব করতে পারে, সুচিত্রার অভিনয় বৈচিত্র্যপূর্ণ, একঘেয়েমী নেই, শুধু তাই নয় এই প্রেমিকা তরুণীরই যে রূপ তিনি একটি ছবিতে ফুটিয়ে তোলেন আর একটি ছবিতে ঐ প্রেমিকা তরুণীরই একটি ভিন্নতর রূপ ফুটিয়ে তোলেন এই জন্যেই তিনি আজ জন-গণ-মন-অধিকারিণী। উদাহরণস্বরূপ অগ্নিপরীক্ষা, শাপমোচন, সবার উপরে, সাগরিকা, শিল্পী, হারানো সুর প্রভৃতি ছবিগুলিতে তিনি এক চরিত্রেই অভিনয় করেছেন প্রেমিকা নায়িকার রূপ। কিন্তু সেই একটি রূপই তিনি উপরোক্ত প্রত্যেকটি ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিমায়। উত্তমকুমারও ভাল অভিনয় করেছেন, তবে সুচিত্রাকে তিনি এখানে অতিক্রম করতে পারেন নি। নবাগতা কাজরী গুহকে একটু সরস হতে হবে, হতে হবে আর একটু কোমল। পাহাড়ী সান্যাল, দীপক মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রা দেবী তাঁদের নামানুযায়ী অভিনয়ই করেছেন এবং দর্শক সাধারণকে আনন্দই দিয়েছেন। একটি কিম্ভূতকিমাকার ধরণের অভিনয় করেছেন উৎপল দত্ত, রোগীর সঙ্গে তাঁর দুর্ব্যবহার কাহিনীর দ্বারাই সমর্থিত কিন্তু রোগীর মায়ের সঙ্গে তিনি যে ভাবে সংলাপ বলেছেন তাতে করে তাঁর সম্বন্ধে আগেকার মত ধারণা আর পোষণ করা যায় না, খানিকটা লাফালাফি, নাচানাচি আর দানবীয় অভিব্যক্তির নাম কি অভিনয়? চরম অবিচার করা হয়েছে খ্যাতিমান শিল্পী শুভেন মুখোপাধ্যায়ের প্রতি, একবার মাত্র চন্দ্রাবতীর পিছনে তাঁকে দাঁড় করিয়ে শুধু একটিমাত্র বাক্য "চলুন"—তাঁর মুখে জুড়ে দিয়ে এক্সট্রাদের মুখ হাসানো হয়েছে। পুস্তিকাটিতে ভূমিকালিপির মধ্যে তাঁর নামটি অন্তর্ভুক্ত করা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয় নি। ছোট্ট ভূমিকায় চমৎকারভাবে সংযত অভিনয় করেছেন শিশির বটব্যাল, একটি দৃশ্যে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন ইরা চক্রবর্তী। সুন্দর অভিনয় করেছেন শ্রাবণী চৌধুরী,

'রমাদি, আমায় ক্ষমা কর'—সংলাপটি তিনি অপূর্বভাবে বলেছেন, এঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতায় ভরপুর। এঁরা ছাড়া অভিনয়াংশে আছেন পারিজাত বসু, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হরেন, ধীরাজ দাস, প্রীতি মজুমদার, খগেন পাঠক, মায়া রায়, লীনা দেবী প্রভৃতি। অজয় কর পরিচালিত এই ছবিটির চিত্রনাট্যকার সুরকার ও প্রচার-সচিব যথাক্রমে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও রমেন চৌধুরী।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

মহামুনি কশ্যপের পাঁচজন বংশধরের সমন্বয় ঘটেছে চন্দ্রনাথ ছবিটিতে। কাহিনীকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্রনাট্যকার—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক—কার্তিক চট্টোপাধ্যায় এবং নায়ক উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিচ্ছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, চন্দ্রা দেবী, পদ্মা দেবী, সুচিত্রা সেন, রেণুকা রায় ও রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি। * * পরশুরামের পরশপাথর গল্পটির পরিচালনা ও সুরযোজনার ভার গ্রহণ করেছেন বিশ্বের দরবারে বাঙলার গৌরববর্ধক পরিচালক ও সুরকার যথাক্রমে সত্যজিৎ রায় ও রবিশঙ্কর। রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শ্রীমতী রাণীবালা সহ তুলসী চক্রবর্তী, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, মণি শ্রীমানী এবং বাংলার এক অসাধারণ অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। * * দেবকীকুমারের পরিচালনায় চিত্রায়িত হচ্ছে সোনার কাঠি। অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন নীতীশ মুখোপাধ্যায়, আশীষকুমার, প্রশান্তকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, ভারতী দেবী, তপতী ঘোষ, প্রীতিধারা মুখোপাধ্যায়, গীতা সিং, শিখা বাগ, শ্রাবণী চৌধুরী, সীমা দত্ত প্রভৃতি। * * ছায়াসঙ্গিনীর পর বিদ্যাপতি ঘোষকে দেখা যাচ্ছে অদৃশ্য ইঙ্গিতের চিত্রকর-পরিচালকরূপে। সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের এই কাহিনীতে সুরারোপ করছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। রূপায়ণের দায়িত্বগ্রহণ করছেন ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, চিত্রিতা মণ্ডল ইত্যাদি···এর সংলাপ রচনা করেছেন সম্প্রতি পরলোকগত সাহিত্যিক পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। * * কিশোর কবি ছবিটিতে পরেশ মজুমদারের পরিচালনায় আপনারা দেখতে পাবেন পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, সাধন সরকার জহর রায়, শোভা সেন, দেবযানী, অপর্ণা দেবী ও নবাগতা মঞ্জুলিকাকে। বাঙলা দেশের এক ভাগ্যবিড়ম্বিত প্রতিভাধর কবির জীবনীই এর কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। * * বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'অভিশাপ' ছবিটিতে অভিনয় করেছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, মঞ্জু দে, শোভা সেন, প্রীতিধারা মুখোপাধ্যায় ও গীতশ্রী। * * শৈলেশ দের কাহিনী অবলম্বনে এবং অনুপ সরকারের পরিচালনায় গড়ে উঠছে বাগদত্তা ছবিটি। এতে অভিনয়াংশে আছেন ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, রবীন মজুমদার, প্রশান্তকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্য সান্যাল, পদ্মা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায় এবং তপতী ঘোষ প্রভৃতি স্বনামধন্য শিল্পিবর্গ।

আলো চাই

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

সারাদিন কর্মক্লান্ত দিনান্তের শেষে
দেহমন আহত অবশ,
তন্দ্রাতুর অসাড় নিস্তব্ধ ক্লান্ত দুই চোখে
শ্রাবণ-রাত্রির ঘনশীল বর্ষণে, ঘুম আসে।

দেহ এলাই নিস্তব্ধ আঁধার বক্ষে
স্নানাতুর আঁখি তার পর ফাঁকে ফাঁকে,
আমি দেখি যাত্রাপথে চেয়ে আছে সীমাহীন আঁখি
নব জনমের ইশারায় কে যেন আমায় ডাকে।

কখন তন্দ্রালু চোখে অন্ধকার সীমার বাহিরে
অনন্ত সৌন্দর্য্য মাঝে খুঁজে ফিরি একটুকু আলো,
অভ্রভেদী কণ্ঠস্বরে জবাব আসে আলো নাই আলো নাই
বন্ধ্যা পৃথিবীর বুকে আঁখির অশ্রুসিক্ত সার।

চমকে উঠি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে
কে যেন নোণা রক্তের থাবায়···
বহু ভুখা মানুষের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে
বন্য চোখে অট্টহাসি হাসে পাশব পীড়নে।

সশস্ত্র প্রহরী তাই দেখি তারা মোতায়েন রাখে
পথে পথে রক্তলোভী হিংস্র দস্যুরা ঘোরে,
দুর্ভিক্ষ উজাড় ঘরের আনাচে কানাচে
রক্তচক্ষু শিশুদের গলা টিপে ধরে।

তবুও অবাধ্য আমার জ্বলন্ত চোখ
বয়লারের আগুনে ঝলসে যাওয়ার কড়া মুখে,
এ ঝাঁঝালো রোদে পোড়া আঁখির কালো পেশীতে
কঠিন শপথ মেখে তন্দ্রাতুর চোখ ওঠে রুখে।

অনন্ত আলোর আকাশ তলে
যে আঁধার স্পর্শে করেছ তুমি মোরে স্বপ্নাতুর,
উন্মত্ত চলার পথে আজ জানাই প্রতিবাদ
হে ধরিত্রি! আগামী দিনের মাঝে একটু আলো চাই।

কাপড়ের কলের চক্র ও চক্রান্ত

"রাজ্যসভায় শ্রীপৃথ্বীরাজ কাপুর জিজ্ঞাসা করেন যে, মিলগুলিতে মজুত কাপড় ক্রয় করিয়া জনসাধারণের নিকট কম দামে বিক্রয় করিবার কথা গভর্ণমেণ্ট চিন্তা করিতেছেন কি না? কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ঐরূপ কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নাই এবং তিনি মনে করেন যে, গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিবেচনা করিবেন না। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রীর এই উত্তরে আমাদের বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই। জনসাধারণ কাপড় কিনিতে পারিল কি পারিল না তাহা লইয়া মাথা ঘামানো হয়ত তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যেও পড়ে না। কাপড়ের কলগুলিতে মজুত কাপড় জমিয়া উঠিতেছে। তাহা জমিয়া উঠুক, তাহাতে কি আসে-যায়? একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইয়াছেন যে, মজুত কাপড় খালাস করিবার জন্য তিনি উপযুক্ত সময় (appropriate time) পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। তিনি প্রশ্নটিকে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। কাপড়ের কলগুলিতে কাপড় জমিয়া উঠিতেছে। বেশী দামের জন্য লোকে প্রয়োজনীয় কাপড়ও কিনিতে পারিতেছেন না। এই সকল মজুত কাপড় খালাস করিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত সময় আর কি হইতে পারে? তিনি মনে করেন, বেশী দাম সত্ত্বেও লোকে কাপড় ক্রয় করে (people have gone in for cloth even when the prices are high)। এই উক্তির মধ্যে জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যায়। দাম বেশী হইলে যথেষ্ট পরিমাণে কাপড় ক্রয় করেন, এইরূপ লোক অবশ্যই আছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া পরেন, নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে বেশী দাম দিয়া কাপড় ক্রয় করেন না। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বৎসরে কয়খানা কাপড় পরেন, তাহা তিনি জানেন কি?"

—দৈনিক বসুমতী।

নিরামিষ ভোজন

"আগামী নভেম্বর মাসে বোম্বাই নগরে বিশ্ব নিরামিষাশী সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। লণ্ডনের আন্তর্জাতিক নিরামিষাশী সমিতি, বোম্বাই-এর জীবহিতৈষী লীগ, নিখিল ভারত পশুমঙ্গল সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নিরামিষাশী সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই নাকি সিংহল, জাপান, কানাডা, মালয়, তিব্বত, ইটালী, বৃটেন প্রভৃতি পঞ্চাশটি দেশ সম্মেলনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং সম্মেলনে প্রতিনিধির সংখ্যা খুব কম হইবে না। কিন্তু সম্মেলনের পক্ষ হইতে নিরামিষ ভোজনের স্বপক্ষে যে প্রচার কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। আমিষ ভোজনের ফলে মানুষের রক্ত-বিকৃতি ঘটে, রোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি ভোঁতা হইয়া যায় ইত্যাদি না হয় বুঝা গেল। কিন্তু আমিষ ভোজনের ফলে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং নিরামিষ ভোজন আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রী বজায় রাখিয়া যুদ্ধ নিবারণে সাহায্য করে, এই ধরণের কথার তাৎপর্য বুঝিয়া উঠা কঠিন। অবশ্য জীবপ্রীতি ও সাত্ত্বিকতার দিক হইতে নিরামিষ আহারের গুণপনা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। গান্ধীজী, বার্ণার্ড শ' প্রভৃতিও এই দলে। তবে জৈব-প্রোটিন আহার ভিন্ন মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সামর্থ্য পুষ্ট হয় না এবং নিম্ন রক্তচাপ ও করোনারী আক্রমণ ইত্যাদির ভয় থাকে, ইহাই বলেন অধিকাংশ বিজ্ঞ ব্যক্তি। সুতরাং প্রশ্নটি লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতদ্বৈধ আছে। হয়ত আলোচ্য সম্মেলনে সমস্যার একটা নির্ভরযোগ্য মীমাংসা হইয়া যাইবে।"

—যুগান্তর।

পাকিস্থানী নির্ব্বাচন

"পাক প্রধান মন্ত্রী শ্রীসুরাবর্দী বহু ঝামেলার মধ্যেও সময় করিয়া ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গ সফরে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ: তিনি পূর্ববঙ্গে গিয়া তাঁহার আওয়ামী লীগের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন, কৃষক প্রজাপার্টির কতককে লইয়া বা ভাগাইয়া 'কোয়ালিশন' গঠনের চেষ্টা করিবেন এবং এই শক্তি-বৃদ্ধির উপর ভরসা করিয়া আগামী ইলেকশনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবেন। আর চেষ্টা করিবেন—পূর্ববঙ্গের আওয়ামী লীগের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট (বর্তমানে জাতীয় আওয়ামী লীগের প্রেসিডেণ্ট) মৌলানা ভাসানীর জনপ্রিয়তা লাঘব করিতে—বলা চলে, মৌলানা ভাসানীর জনপ্রিয়তা খতম করিতে। মৌলানা ভাসানী নাকি মফঃস্বলের জনসাধারণের ইতিমধ্যেই চিত্ত হরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মৌলানা ভাসানী সত্যই শ্রীসুরাবর্দীর গতিপথে এক কণ্টকস্বরূপ। ঢাকার একটি সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, মৌলানা ভাসানীকে খতম করিবার ষড়যন্ত্রও আছে। তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার কথা বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিয়া অনেক চিঠিপত্রও নাকি ছাড়া হইয়াছে। মৌলানা ভাসানী এবং পশ্চিম পাকিস্থানের নেতৃবৃন্দ ঢাকার সম্মেলনে জাতীয় আওয়ামী লীগ নামে একটি দল গঠন করিয়াছেন। এই দলের আহূত সভা-শোভাযাত্রা শ্রীসুরাবর্দীর আওয়ামী লীগের সমর্থকগণ যেভাবে আক্রমণ করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে—বিশিষ্ট নেতাদের মাথা ফাটাইয়াছে এবং পরে পূর্ববঙ্গের কোন কোন সহরে উক্ত দলের সভা যেভাবে পণ্ড করা হইয়াছে, তাহা নিছক গুণ্ডামি ভিন্ন কিছু নহে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লীগের নেতৃবর্গ এই সকল রাজনৈতিক গুণ্ডামির নিন্দা করেন নাই। সুতরাং মৌলানা ভাসানীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের লোক চিন্তিত হইতেই পারেন। একমাত্র ভরসা—যদি শ্রীসুরাবর্দী তাঁহার দলের সমর্থকগণকে গুণ্ডামি ও মারামারি হইতে বিরত থাকিতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করেন। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধ দলের উপর এখনই

যেরূপ পুরাতন লীগমার্কা আক্রমণ চলিতেছে, তাহাতে আগামী নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও অবাধ হইবে, ইহা মনে করাই শক্ত। মৌলানা ভাসানীর ভরসাই তো অবাধ নির্বাচন!" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

নেতাজীর অসম্মান

"এক দিকে কলিকাতায় আউটরাম মূর্ত্তির জায়গায় নেতাজীর ছবি পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হইতেছে, হাজার হাজার লোক দাঁড়াইয়া তাহা নির্বিকার চিত্তে দর্শন করিতেছে, আর একদিকে চলিয়াছে তাঁহাকে লইয়া উদ্ভট কল্পনা ও গবেষণা। এক দিকে সংবাদপত্রেরা নেতাজী মূর্ত্তি সত্যাগ্রহের সংবাদ ব্লাকআউট করিতেছে, আর একদিকে কতকগুলি লোকের কল্পনা ফলাও করিয়া প্রকাশ করিতেছে। ফিজো এবং নেতাজী আলোচনার কাল্পনিক কাহিনী যাহারা প্রচার করিয়াছে, নেতাজীর সম্মান তাহারা রাখে নাই! নেতাজী ছিলেন অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা ছিল তাঁর ধ্যানের আদর্শ। ফিজো নাগাপাহাড় ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে, খণ্ডিত ভারতকে আরও খণ্ডিত করিতে ইচ্ছুক। নেতাজীর আদর্শে যাঁহাদের লেশমাত্র বিশ্বাস আছে তাঁহারা এই ব্যক্তির কাজে তাঁহার সমর্থন কল্পনাও করিতে পারেন না। থেবর বলিতেছেন,—নেতাজী নেপালে ঘাঁটি করিয়াছেন। নেপাল কি পৃথিবীর বাইরে মঙ্গলগ্রহে যে, তিনি সেখানে আসিয়া থাকিলে থেবর ছাড়া আর কেহ তাঁহার খবর পায় না? এই ব্যক্তি বলিয়াছিল, নেতাজীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। অথচ তাঁহার মৃত্যুরহস্য তদন্ত কমিটির সামনে সে উপস্থিত হয় নাই। ইহার কথার লেশমাত্র মূল্য নাই, নেতাজীর নামে কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করিয়া খবরের কাগজে নাম ছাপানোই ইহার উদ্দেশ্য। নেতাজী যদি জীবিত থাকেন এবং যদি কোন কারণে এখনও ভারতে আসা বাঞ্ছনীয় মনে না করেন, তবে তাহা লইয়া অলস গবেষণার কি প্রয়োজন? নেতাজীর বইগুলি তো কাহাকেও পড়িতে দেখি না? যে নপুংসকের দল নেতাজীর সম্মান রক্ষায় অগ্রসর হয় না, তাঁহার নাম উচ্চারণের অধিকার তাঁহাদের নাই। হেমন্ত বসু, অমর বসু এবং নেতাজীর নূতন ভক্ত প্রফুল্ল ঘোষ এবং জ্যোতি বসুকে থালায় করিয়া একটি শাড়ী ও দুই গাছি প্লাষ্টিকের চুড়ি বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার বাহিনী পাঠাইয়া দিলে উচিত কাজ হইবে।" —যুগবাণী (কলিকাতা)

নেহরুজীর আস্ফালন

"শ্রীনেহরু রাজ্যসভায় খুবই আস্ফালন করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গোয়াকে যদি সামরিক আঁতাতের বড় রকমের কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে সেই প্রচেষ্টা খুবই গুরুতর হইবে এবং ইহা ভারতের প্রতি অবন্ধুজনোচিত কার্য হইবে। ভারত কখনই তাহা বরদাস্ত করিবে না। কাশ্মীর সমস্যার উল্লেখ করিয়াও শ্রীনেহরু বলেন যে, কাশ্মীরে পাকিস্তান যে অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছেন, ভারত তাহার যথোচিত উত্তর দিবে। আমাদের বিশ্বাস, লোকসভা ও রাজ্যসভার দেশের বহু রাজনীতিবিদ্ ও বিদ্বানের সমাবেশ ঘটিয়াছে। তাঁহাদের সম্মুখে নেহরুজী এই ভাবে আস্ফালন করিবার স্পর্দ্ধা কি ভাবে রাখেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। নেহরুজী যখন বার বার ঘোষণা করিতেছেন যে, গোয়ায় সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের প্রচেষ্টা বা পাকিস্তান কর্ত্তৃক কাশ্মীর আক্রমণ ভারত সহ্য করিবে না, তখন ভারত কি করিবে তাহার প্রকৃত পাল্টা জবাব তাঁহারা নেহরুজীর কাছে চাহেন নাই কেন? বিরোধী দলের ২১৪ ব্যক্তি ছাড়া আর সকলে কি তবে জী হুজুরের দল? কাশ্মীর লইয়া পাকিস্তান যে অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে এইরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নহে যে, অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তান পশ্চিমী রাষ্ট্র জোটের সহায়তায় কাশ্মীর আক্রমণ করিবে। ভারতের বুকে যে হাজার হাজার পাকিস্তানী গুপ্তচরেরা অবলীলাক্রমে তাহাদের কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে সেই দিন তাহারাও আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিবে এবং ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে। আজ যে সমস্ত তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দ ভারত শাসনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন, সেই দিন তাঁহাদিগকেও যদি রঙ্গমঞ্চের অপর দৃশ্যে অবতরণ করিতে দেখি তাহা হইলে আমরা আদৌ বিস্মিত হইব না। পাকিস্তান সরকারও তাহা জানেন। একটি মাত্র ব্যক্তির খামখেয়ালীর জন্য দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে, ইহা দেশবাসী কোনদিনই বরদাস্ত করিবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।" —স্বস্তিকা (কলিকাতা)

জলাভাবে কৃষকের হাহাকার

"বর্ত্তমান জলাভাবে সর্ব্বত্র কৃষকের হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে ও কৃষিকার্য্যে গভীর হতাশ্বাস দেখা দিয়াছে। এ বৎসর অধিক বিলম্বে বৃষ্টি নামায় লোকে কৃষিকার্য্যে হাত দিয়াছিল। সামান্য কিছু কিছু জমি গভীরাঞ্চলগুলিতে আবাদ হইয়াছে বটে কিন্তু সাম্প্রতিক বৃষ্টির অভাবে প্রায় সর্ব্বত্র কৃষিকার্য্য ব্যাহত হইয়াছে। যে সমস্ত স্থানে আবাদ হইয়াছিল প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে তাহাও শুকাইয়া যাইতেছে। কৃষকেরা আকাশের দিকে তাকাইয়া দিন গুণিতেছে। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ ঘনাইয়া আসে বটে, কিন্তু শরৎকালের জলহারা মেঘের ন্যায় সবই নিষ্ফল হইতেছে ও আদৌ সুবৃষ্টি হইতেছে না। এ পর্য্যন্ত যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে পুষ্করিণীগুলির অর্দ্ধাংশও পরিপূর্ণ হয় নাই। আণবিক শক্তির তেজস্ক্রিয়া অথবা ধূমকেতু আদির প্রাদুর্ভাবের ফলে যে কারণেই হউক পৃথিবীর অনর্থ ঘনাইয়া আসিতেছে। একে ত' খাদ্যসঙ্কটে দেশ ম্রিয়মাণ তার উপর বিধির বিধানে এদেশবাসীর চরম দুর্গতি দেখা দিতেছে। ভগবানের কি ইচ্ছা কে জানে! আমাদের এতদঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা না থাকিলেও অবিলম্বে সমুদ্রের লোণা জল বা সম্ভব হইলে সুবর্ণরেখার জল কেনেলে প্রবেশ করাইলেও কতকটা উপকার হইতে পারে। কৃষিকার্য্যে জলাভাবে চারিদিকে যেরূপ দারুণ হাহাকার উঠিয়াছে তাহাতে এ বিষয়ে স্থানীয় পূর্ত্ত কর্তৃপক্ষের ত্বরান্বিত ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।" —নীহার (মেদিনীপুর)।

লাল ফিতার মাহাত্ম্য

"গত বৈশাখ মাসে ভাটপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত মাঝিগ্রাম মৌজায় এক ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২১টি বাড়ী ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সরকার হইতে পুড়ে-যাওয়া বাড়ীগুলির পুনর্নির্ম্মাণের জন্য এককালীন কিছু সাহায্য বা ঋণ দেওয়ার বন্দোবস্ত

আছে। তাই তাঁহারা ঋণের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত কোন ঋণ বা সাহায্য তাঁহারা পাইলেন না! এস, ডি, ও, অফিসে খোঁজ লইয়া জানা যায় যে, সেই দরখাস্তগুলি নাকি কমিশনারের কাছে পাঠানো হইয়াছে। ঋণ বা সাহায্য তাঁহারা কবে পাইবেন বা আদৌ পাইবেন কি না, সে বিষয়ে কোন স্থির নিশ্চয়তা নাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করিবার উদ্দেশ্যে Case no ও issuing date চান কিন্তু তাহাতে সংশ্লিষ্ট পেস্কার নাকি জানান যে ইহা জনসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় নহে; এই দুরন্ত বর্ষায় তাঁহারা বর্ত্তমানে অভাবনীয় দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়াছেন। বর্ত্তমানে সাহায্য পাইলে অতি অল্প খরচে তাঁহারা ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিতেন। নতুবা সম্পূর্ণ দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িলে চতুর্গুণ খরচ বেশী হইবে। লাল ফিতায় বাঁধা পড়িয়া এই সমস্ত দুঃস্থ ব্যক্তিবর্গ আর কত দিন দুঃসহজ্বালা সহ্য করিবেন! সরকার ইহা অনুধাবন করিবেন কি?"

—বার্তা (দিনাজপুর)।

দ্রব্যমূল্য

"মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, জেলায় ধান্য ও চাউল আছে এবং চালানও আসিয়াছে। তাহা যদি হয় তবে প্রতিদিন মূল্য বাড়িতেছে কেন? নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যও বাড়িয়া গিয়াছে। সরকার দ্রব্যাদি নিজে আয়ত্তে নিলে তাহা টিন ও সিমেন্টের পর্য্যায়ে আসিবে বলিয়া তাহারাও বোধ হয় আশঙ্কা করেন। সুতরাং ট্যাক্সের নাম শুনিয়াই হউক এবং চালান আসে নাই অজুহাতেই হউক—যে কোন অছিলায় মূল্য বাড়াইয়া দিলে বলিবার কেহ নাই। মানুষের ক্রয়শক্তি বাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং ভাবনার কিছু নাই। শুল্ক বাড়াইয়া দিলেও দ্রব্যমূল্য বাড়ে না। উপর তলার ধারণা যেখানে এই, সেখানে মানুষের প্রতিকারের সমস্ত পথ রুদ্ধ। সর্ব্বপ্রকার ট্যাক্স বসাইয়া ও তাহা আদায় করিবার অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়া দ্রব্যমূল্য কমান যায় না। ঘুষের পরিমাণ কত বাড়িয়াছে তাহার হিসাব প্রতিকারের আশা থাকিলে ব্যবসায়ী দিতে পারে কিন্তু তাহা দিলে সে মরিবে এবং ঘুষগ্রহীতাগণ নিশ্চিন্তে ও পরমানন্দে থাকিবে। অপচয়, ঘুষ, দুর্নীতি, পীড়ন প্রভৃতি বন্ধ করিতে পারিলে এ সকল সমস্যার সম্মুখীন হওয়া যায়। সে পথ বহু দূরে। তাহা করিতে গেলে সময়কালে চাঁদা বা সাহায্য করিবে কাহারা?"

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

সংস্কার?

"কংগ্রেসের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ কংগ্রেসকে শ্রদ্ধার আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা সাধু, সন্দেহ নাই। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব কংগ্রেসেরই উপর ন্যস্ত হইয়াছে। জনগণের সেবা করিবার সুযোগ যে প্রতিষ্ঠান লাভ করিয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠানে যদি সাচ্চা মানুষের অভাব হয়, আদর্শভ্রষ্টের ভীড় জমে, ক্ষমতালাভের উন্মাদনা দেখা দেয়, তাহা হইলে সেই প্রতিষ্ঠান যে গণ-সমর্থন হারাইবে, ইহা তো খুবই স্বাভাবিক। কংগ্রেস বলিতে পরাধীন ভারতে জনগণের প্রতিষ্ঠান বুঝাইত। এখন ইহা দল ছাড়া আর কিছুই নহে। একদা এই কংগ্রেসের পতাকাতলে দাঁড়াইয়া দেশবাসী যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিল, তখন দেশের মানুষ কংগ্রেসে আসিত। পুলিশের বেয়নেটের সম্মুখীন হইতে, নির্যাতন-লাঞ্ছনাকে হাসিমুখে বরণ করিতে এখনকার মত পারমিট সংগ্রহ বা এম, পি, ও এম, এল, এ, হইবার জন্য নয়। কংগ্রেস তখন ছিল ত্যাগ এবং জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক। আজ কংগ্রেস তাহার সেই মহান ঐতিহ্য হারাইয়াছে। আজ আদর্শবান বহু মানুষ কংগ্রেস হইতে সরিয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা কংগ্রেসে থাকিয়া এখনও আদর্শের পূজা করিতেছেন, তাঁহারা অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত। তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই অনাহার-অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতে হইতেছে। যাহারা আদর্শের ধার ধারে না, পরাধীন ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট বলিয়া যাহারা পরিচিত, তাহারাই আজ কংগ্রেস দখল করিতে চলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনে যাহারা কংগ্রেসের দুর্দিন দেখিয়া কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া অন্য দলের ছাপ লইয়া এম, এল, এ, বা এম, পি, হইবার আশায় নির্ব্বাচনে নামিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গত নির্ব্বাচনে রাতারাতি রাজনৈতিক গাউন পরিবর্ত্তন করিয়া বড় কংগ্রেসী সাজিয়াছিল। দেশবাসী তাহাদের এই অপরচ্যানির্জিম প্রশ্রয় দেয় নাই। ইহাদের মধ্যে অনেকেই গোহারান হারিয়া এখন যথারীতি আত্মসেবার ধর্ম্ম পালন করিয়া যাইতেছে। ইহারাই যে কংগ্রেসের কলঙ্ক, যাঁহারা কংগ্রেস সংস্কারের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা কি এখনও এই কঠোর সত্য উপলব্ধি করেন নাই?"

—সমাধান (হুগলী)।

আসামের বাঙালী ও বেকার সমস্যা

"আসাম রাজ্যের বেকার সমস্যার প্রতি ইদানীং রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আসাম রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাঙালী সমাজের মধ্যেই সর্বাধিক। উদ্বাস্তু বাঙালীদের মধ্যে বর্ত্তমানে এই সমস্যা অতি শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন বিভাগ উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনে সাহায্যকল্পে আসাম রাজ্যের স্থানে স্থানে বিভিন্ন শিল্পালয়ে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত অর্থ সকল ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের স্বার্থে ব্যয়িত হয় না বলিয়া অভিযোগ করা হইতেছে। অন্য দিকে আসাম সরকার এখনও সরকারী চাকুরিতে উদ্বাস্তুদের নিয়োগে বৈষম্যমূলক বিধান অনুসরণ করিতেছেন। এমন কি, আসামের স্থায়ী অধিবাসী বাঙালীদিগকেও সর্বত্র সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম হাইকোর্ট, ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজ, আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বহু সংখ্যক কর্মচারী কাজ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাদের মধ্যে বঙ্গভাষাভাষী প্রায় নাই বলিলেই চলে। আজ কাল আসাম অয়েল কোম্পানী এবং চা-বাগানসমূহেও বাঙালী নিয়োগে নানারূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইতেছে। আসামে স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী বাঙালীদের সংখ্যা যেখানে রাজ্যের মোট লোকসংখ্যার ন্যূনাধিক এক-তৃতীয়াংশ, সেখানে এইরূপ বৈষম্যমূলক আচরণের কোন যুক্তি থাকিতে পারে কি? আমরা এই বিষয়ে রাজ্য কর্ত্তৃপক্ষের সহৃদয় মনোযোগ আকর্ষণক্রমে আশু সুবিচার দাবী করিতেছি।" —যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

যুব-উৎসবে স্কাউট প্রতিনিধি

দমদম বিমান-ঘাঁটিতে আন্তর্জাতিক মস্কো-যুব-উৎসবে যোগদানকারী ভারতের একমাত্র স্কাউট প্রতিনিধি উত্তরপাড়ার শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মোহনবাগানের খ্যাতনামা শ্রীসমর বন্দ্যোপাধ্যায় (বদ্রু); যাত্রার প্রাক্কালে।

শরতের আগমনে

"শরৎ কালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এ দেশের এক বৈশিষ্ট্য। এই সময়ের মনোলোভা দৃশ্য—বন উপবন ও শস্যক্ষেত্র আদির শ্যামলিমা, সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোক, প্রকৃতির শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ দান করে এবং ফল ফুল, তরীতরকারী আদির প্রাচুর্য্যে লোকের মনে স্বভাবতঃই আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে। তাই বাংলার কবি সময়টাকে শ্রেষ্ঠ ঋতু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এ বৎসর বৃষ্টিকালে বৃষ্টির অভাবে কৃষিকার্য্য ব্যাহত হইয়াছে। তরীতরকারী আদিও পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইতে পারে নাই, এতদঞ্চলের গৃহ তৈয়ারীর একমাত্র অবলম্বন বাঁশগাছ বৃষ্টির অভাবে তাহাও জন্মিতে পারে নাই। কৃষিক্ষেত্রগুলি এখনও সম্পূর্ণরূপ শ্যামল রূপ ধারণ করিতে পারিল না। অধিকন্তু এখনও অনেকস্থলে কৃষিকার্য্য চলিয়াছে জানা যায়। এই অসময়ের চাষে কৃষকের সুফসল পাইবার আশা কি? কাজেই শরতের আগমন সুখের হইলেও কি করিয়া লোকের মনে আনন্দের উদ্রেক হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ আজ দেশের সর্ব্বত্র ভবিষ্যতের এক অশুভ ইঙ্গিত দেখা দিয়াছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি এ অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে ও খাদ্যমূল্য বৃদ্ধিতে লোকে অধিকতর ম্রিয়মাণ হইতেছে। তার উপর এ বৎসর প্রাকৃতিক বৈলক্ষণ্যে শরৎ ঋতুর প্রারম্ভেই একরূপ বৃষ্টি নামায় ভরা ভাদরের ভরা নদীতে একটু শরতের স্পন্দন দেখা দিয়াছে। মাঠ ভরা ধান, বুকভরা আনন্দ সবই যেন অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে ও এক দুর্দ্দিনের কাল মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে। এ অবস্থায় কয়জনেই বা শরতের আনন্দ উপভোগ করিবে?"

—নীহার (কাঁথি)।

দেশের অবস্থা ও কর্ত্তৃপক্ষ

"কিছু দিন ধরে কোলকাতার প্রভাবশালী দৈনিক কাগজ কয়েকটি পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের অভাব-অভিযোগের প্রকৃত চিত্র প্রকাশ করে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। মেদিনীপুর জেলার যে অবস্থার সংবাদ আমরা পাই সেটাও ভয়াবহ! তবে দুর্ভাগ্য আমাদের, সে সংবাদটা কোলকাতার কাগজ বহন করে আনছে না। ফলে অবস্থাটা আমরা জানলেও দেশের অনেকে জানেন নি এবং অনেকের মতন সরকারের উপর মহলও এ বিষয়ে অজ্ঞ। মেদিনীপুরের এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে আমাদের যে মহকুমা রয়েছে সেখানের অবস্থাটা ভয়াবহ বললে বোধ হয় ভুল হবে না। দরিদ্রতম দেশ—এই মহকুমা। কল নেই, কারখানা নেই, কোন কুটিরশিল্প নেই, শুষ্ক, রুক্ষ মাটির বুক থেকে যে ফসল কৃষকের ঘরে আসে, তাতে কৃষক-পরিবারের অন্নসংস্থান হয় না, কৃষকের ঘরের চালে খড় জোটে না, কৃষকের পালিত গরুর অবস্থাও পরিণতি হয়ে দাঁড়ায় শরৎচন্দ্রের "মহেশের" মতন। কেবল গরু নয়, তৃষ্ণা নিবারণের সামান্য জল সংগ্রহের জন্য অসংখ্য গ্রামের কুলবধূদের অভিযান করতে হয় ২।৩ মাইল দূরে। একটি সম্পদ ছিল জঙ্গল। যে সম্পদের সমস্ত রস নিঙড়ে নিত কাঠ-মহাজনের দল। কিন্তু শোষণের যন্ত্র হিসাবে যাদের ব্যবহার করা হতো সংখ্যা তাদের খুব কম নয়। জঙ্গলের কাঠ তারা কাটতো, ঘরের গরুর গাড়ী দিয়ে ষ্টেশনে চালান করতো, পাতা বনজ মূল, সংগ্রহ করে অনেকেই

নিজেদের অন্ন সংস্থান আর মহাজনের লক্ষীলাভের সহায়তা করতো। জঙ্গলের আয়তন গেছে কমে। যন্ত্রদানবের কল্যাণে, গরুর গাড়ী বিশেষ আর ব্যবহার হয় না, ছোট ছোট কৃষকের ঘরে অর্থাগমের প্রধান স্রোতটাই বন্ধ হয়ে গেছে।"

—নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

ভ্রমস্বীকার

এই সংখ্যার 'স্মৃতিচিত্রণ'র এক স্থানে 'বারো টন' ছাপা হয়েছে। এটি 'বারো টোন' পড়তে হবে।

'পত্রগুচ্ছ' বিভাগে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র সমূহ 'বিশ্বভারতী' থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ড থেকে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। এই সঙ্কলনে কবির লেখা আরও অনেক চিঠি আছে। পাঠক-পাঠিকা ইচ্ছা করলে উক্ত ষষ্ঠ খণ্ড পাঠ করতে পারেন। পত্র সমূহ প্রকাশের জন্য 'বিশ্বভারতী'র সৌজন্য স্বীকার করছি।

শোক-সংবাদ

গত শনিবার ১৪ই ভাদ্র ৮৩ বছর বয়সে হরিদ্বার যাওয়ার পথে ট্রেনের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন শ্রীশ্রীস্বামী বিশুদ্ধানন্দগিরি মহারাজ। সংসারাশ্রমে এঁর নাম ছিল হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল। পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের জীবনের প্রথম লগ্ন থেকেই যে মহান সন্তানের দল নিজেদের উৎসর্গিত করেছিলেন ইনি ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। আলীপুর বোমার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের মধ্যে ইনি ছিলেন অন্যতম। পরিণত বয়সে ইনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন ও জীবনে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'শিবম্' পত্রিকাটি বহুদিন তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

বিশুদ্ধানন্দের তিরোধানের কয়েক দিন পরেই বুধবার ১৮ই ভাদ্র বাঙলাদেশ আর একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিপ্লবীকে হারাল। তিনি অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (৭৮)। যৌবনের ঊষালগ্নে স্বদেশী আন্দোলনে তিনি আত্মাহুতি দেন এবং সুরেন্দ্রনাথ তৎসহ অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, হৃষীকেশ প্রমুখ বিপ্লব নায়কদের সঙ্গে পরিচিত হন। ইনি দীর্ঘদিন বন্দিজীবন যাপন করেছেন এবং দেশ-সেবার জন্যে নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করে গেছেন হাসিমুখে। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ইনি সক্রিয় ভাবে রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন ও বার্ধক্যবশতঃ সেই সময়ে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি কিছুকাল পৌরপ্রতিষ্ঠানের অ্যাসেসারের কর্মভার গ্রহণ করেন ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস-মনোনীত সদস্যরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক জ্যোতিষী ও সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী পুলিনবিহারী মিত্র গত ১৭ই শ্রাবণ তাঁহার ৬নং ঈশ্বর চক্রবর্তী লেনস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি দুই কন্যা, জামাতা, নাতি-নাতনী ও অগণিত
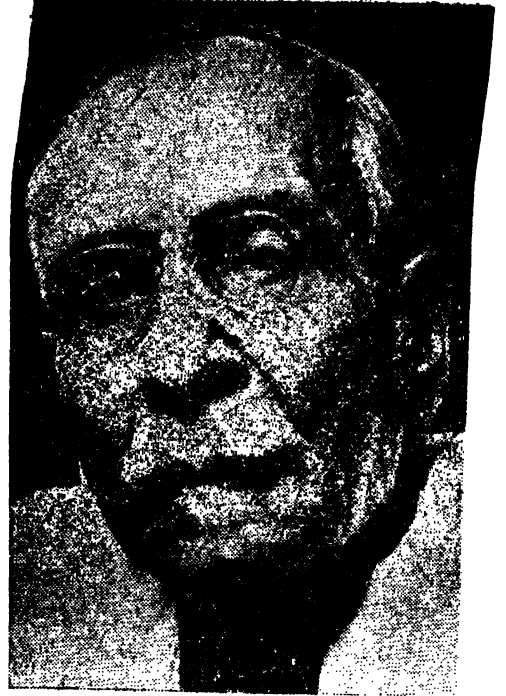
পুলিনবিহারী মিত্র

আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। পুলিনবিহারী স্বর্গত ক্ষেত্রমোহন মিত্রের পুত্র। বাল্যকালে স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি কিছুকাল চাকুরী-জীবনে প্রবেশ করেন এবং বাঙ্গালার বাহিরে অবস্থান করেন। এই সময় হইতেই তিনি জ্যোতিষবিদ্যা চর্চা আরম্ভ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি জ্যোতিষবিদ্যায় ও "ছায়া" বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। স্বর্গত মিত্র সাধুর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হয়। তিনি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন ভক্ত ছিলেন এবং রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) শিষ্য ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের তিনি ছিলেন একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত। তাঁহারই নির্দেশে তিনি রাখাল মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে পুলিন বাবু ছিলেন নিরহঙ্কার, সদালাপী, মিত্রবৎসল।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় ৭ই ভাদ্র শনিবার মাত্র ৪৯ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। কল্লোল-কালি-কলমের যুগে এঁর আবির্ভাব এবং শেষ দিন পর্য্যন্ত এঁর লেখনী সচল ছিল। কয়েকটি উপন্যাস এবং বহু ছোট গল্পে ইনি বাঙলা সাহিত্যকে পুষ্ট করে গেছেন। চলচ্চিত্র জগতেও কাহিনীকার এবং সংলাপকাররূপে ইনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কিছুকাল সহ-সম্পাদকরূপে দৈনিক বসুমতীকে সেবা করে গেছেন, অধুনা ইনি যুগান্তরের অন্যতম সহ-সম্পাদক ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাঠক-পাঠিকার চিঠি
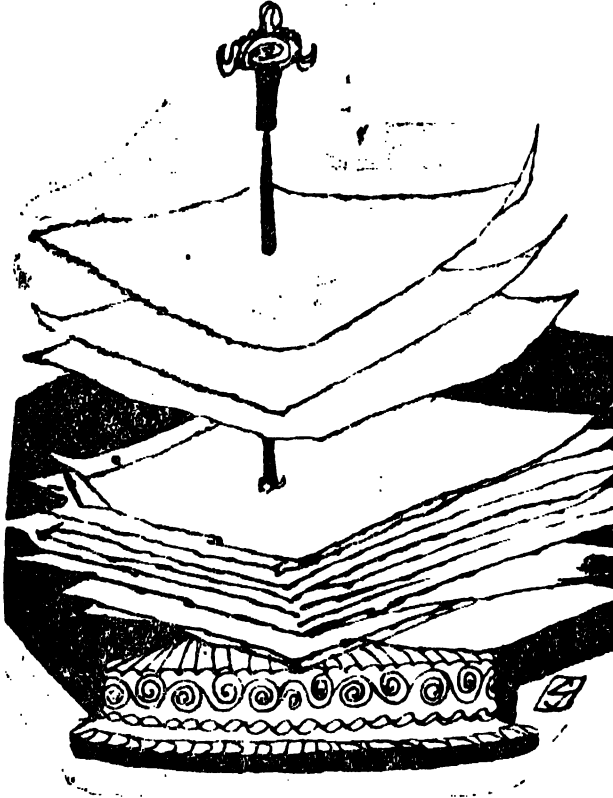
সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে

প্রিয় মহাশয়,

আমরা সম্প্রতি একটি Cinemaয় ছবি দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে দেখিলাম যে ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রস্তুত একটি ডকুমেণ্টারী ফিল্মে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস দেখান হইতেছে। এই ইতিহাস ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৫৭ সনের আন্দোলনকে নবজাগ্রত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম বা মধ্য যুগের ভারতবর্ষের আধিপত্য রক্ষার শেষ সংগ্রাম বলা হইবে কি না, ইহা এখনো ঐতিহাসিক বিতর্কের বিষয়। যাহা হউক, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলিলে তেমন কোনও আপত্তির কথা হইবে না, যেকালে ঝাঁসীর রাণী, নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, কুমার সিংহের ন্যায় মহাপ্রাণ তেজস্বী বীরগণ ইহার সহিত জড়িত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—এই ফিল্মে ১৯০৫ সনের বিপুল, বিরাট, অতুলনীয় স্বদেশী আন্দোলনের উল্লেখ পর্যন্ত করা হয় নাই। এই ফিল্মে স্বাধীনতা-মন্ত্রের উদ্গাতা বিরাট পুরুষ শ্রীঅরবিন্দের কোনও নাম নাই। এই ফিল্ম-প্রণেতাগণ কি মনে করেন যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের কোনও স্থান নাই? বাংলার বিপ্লব আন্দোলন এই ফিল্ম হইতে বাদ পড়িয়াছে। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল বা যতীন মুখার্জ্জীর ন্যায় বীর বিপ্লবী এবং বিপ্লব আন্দোলনের আরও অগণিত বীরের কাহারও কোনও উল্লেখ নাই। ফিল্ম প্রণেতৃগণ কি মনে করেন, ইহাদের কাহারও অবদান সিপাহী যুদ্ধের সৈনিকদের তুল্য নহে? চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ন্যায় চরম দুঃসাহসিক অভিযান এই ইতিহাসে স্থান পায় নাই, অথচ আমরা শুনিয়াছি, মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় অহিংস নেতাও ইহাদের কীর্ত্তিকলাপে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন; এই সকলের কারণ কি আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? স্বাধীনতা আন্দোলনের এই গৌরবময় ইতিহাসকে কেন ইচ্ছা পূর্ব্বক একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে? আর কারণ যাহাই হউক, ইহা কি সত্যনিষ্ঠা? ভারত গভর্ণমেণ্টের মূলমন্ত্র ঘোষণা করা হইয়াছে সত্যমেব জয়তে, কিন্তু আমরা এই ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠার কোনও নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না। এই জাতীয় ফিল্ম কাহারা তৈয়ারী করেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসকে যাঁহারা এইরূপ ইচ্ছা করিয়া বিকৃত করেন, আমরা তাঁহাদের সাধুবাদ করিতে অক্ষম। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্ব্বে শিবাজী উৎসব উপলক্ষে যে বিখ্যাত কবিতা লেখেন, তাহার মধ্যে আছে—"মরে না মরে না কভু সত্য যাহা, শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে, অপমানে না হয় অস্থির, আঘাতে না টলে।" আজ এই উপলক্ষে আমাদের ব্যথিত চিত্তে, এই কথাগুলিই বারংবার মনে হইতেছে। শ্রীদেবিদাস রায়। ঢাকুরিয়া। কলিকাতা—৩১।

পত্রিকা সমালোচনা

সবিনয় নিবেদন,

গত আষাঢ় সংখ্যা (১৩৬৪) মাসিক বসুমতীতে আমার লেখা "এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং" শীর্ষক প্রবন্ধটি সম্বন্ধে শ্রাবণ সংখ্যা (১৩৬৪) বসুমতীতে শ্রীঅনিল মুখার্জ্জীর প্রতিবাদ-পত্রটি পড়লাম। তিনি লিখেছেন—"ঘোষ মহাশয় জানাচ্ছেন বাড়ীটি ১৪১০ ফিট উঁচু ও ১০২ তলা। অথচ সুকুমার সরকার সরকার বি-এ মহাশয় লিখিত ও মডার্ণ বুক এজেন্সী দ্বারা প্রকাশিত বুক অফ নলেজ নামক বই-য়ে ৪৪ পাতায় দেখছি লেখক জানাচ্ছেন, সর্ব্বসমেত এই বাড়ীতে ৭৫ তলা আছে এবং ইহার উচ্চতা ১০০০ ফুট, ইহার কোনটি ঠিক বলিয়া জানিব?" আসলে বাড়ীটি ১৪৯০ ফিট উঁচু ও ১০২ তলা। যতদূর মনে হয়, আমার পাণ্ডুলিপিতেও তাই লেখা ছিল। ছাপার ভুলে ১৪১০ ফিট হয়েছে। এ বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। "মডার্ণ বুক এজেন্সী দ্বারা প্রকাশিত" শ্রীসুকুমার সরকার, বি-এ, মহাশয়ের "বুক অফ নলেজ" বইখানি আমি পড়িনি। সে কারণ বইখানিতে পরিবেশিত তথ্যগুলির সত্যতা সম্বন্ধেও কিছু লিখতে পারলাম না। তবে অনিল বাবুর অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে, আমি বিখ্যাত মার্কিণ বাস্তুকার Mr. Paul W. Kearney লিখিত "Atop the world's tallest structure" নামক প্রবন্ধ হ'তে এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং-এর যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি। মূল প্রবন্ধটি আমেরিকার "This Week" পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে প্রবন্ধটি "Reader's Digest" (Sept. 1952) পত্রিকায় আবার সংক্ষিপ্তাকারে ছাপা হয়। Mr. Kearney দীর্ঘদিন এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং-এর সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। কাজেই তাঁর তথ্যগুলি যে নির্ভুল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যাই হোক, অনিল বাবুর অনুসন্ধিৎসা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁকে আমি কলিকাতাস্থ মার্কিণ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান মিস জেন ফেয়ার ওয়েদার-এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে অনুরোধ করছি। তাহলে তিনি বাড়ীটি সম্বন্ধে আরো অনেক চমকপ্রদ তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। শ্রীদেবব্রত ঘোষ, চিত্তরঞ্জন, বর্দ্ধমান।

"বিবেকানন্দ স্তোত্র" প্রথম দিকে পড়িই নি; তার কারণ সে সময় বাইরে থেকে চেহারা দেখে মনে হয়েছিল, এ নিশ্চয় দুর্বল ছন্দে লেখা শিথিলচিত্ত কোন ভক্তের ভাবোচ্ছ্বাস। আপনার পত্রে কয়েকজন পাঠক-পাঠিকা প্রশংসা জানাতে লেখাটির প্রতি আকৃষ্ট হই এবং তারই পরিণাম এই পত্র। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কোন লেখা দেখলে উৎসাহভরে অগ্রসর হই, কিন্তু বড় দুঃখের প্রত্যাবর্তন ঘটে। কতকগুলি বুদ্ধিহীন ভাষাজ্ঞানহীন ভাবালুর লেখা পড়ে বিতৃষ্ণা এসে গেছে। মনে হয়েছে, বিবেকানন্দের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব এঁদের কাছে এমন ব্যর্থ হোল কি ভাবে? সূর্য্য তো সকল বস্তুকেই উত্তপ্ত করে—মধ্যাহ্নসূর্য্যের মত সেই প্রদীপ্ত বিবেকানন্দকে চোখের জলে মাখামাখি করে দেখা অবশ্য একজাতীয় শক্তির কাজ। শক্তি অপহারী সেই সব শক্তিমান লেখকে দেশ ছেয়ে গেছে; তারই মধ্যে শ্রীযুক্ত মিত্রের লেখায় বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখলুম। দেশে অপবুদ্ধিও আছে। নিজের সম্বন্ধে জীবদেহীর অতিরিক্ত ভাবতে নারাজ কিছু সুচতুর লোক ইদানীং বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা করছেন যদু-মধুর সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে। এঁরা থিয়োরীর গজকাঠি একটি পেয়েছেন পাশ্চাত্য গুরুর ত্যক্ত তত্ত্বের জঞ্জাল থেকে। তাই দিয়ে মাপছেন, আর বড়র ছোটত্ব খুঁজে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, এবং সত্যকথা শুঁতিয়ে জানানর অভিমান চরিতার্থ করছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ ঘরসংসার সামলে পরের জন্য পার্টটাইম ডিভোট করতে অভ্যস্ত মহাপুরুষ নন। তাঁকে বুঝতে যে আস্তিক্যবুদ্ধি ও শ্রদ্ধাশীলতার প্রয়োজন, তা শ্রীযুক্ত মিত্রের আছে। শ্রীযুক্ত মিত্রের দৃঢ়তার আমি প্রশংসা করি। তাঁর লেখ পড়ে বোঝা যায়, তিনি পুরোপুরি ভক্ত। কিন্তু ভক্তির কাঁদুনীকে তিনি ঘৃণা করেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে যিনি যথার্থ দেবতা মানেন, তাঁর পক্ষেই দেবতার মন্দির নির্মাণের প্রলোভনকে দমন করা সম্ভব। শ্রীযুক্ত মিত্র বিবেকানন্দের সমাধির উপর কথার তাজমহল নির্মাণ করেন নি। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে "বিবেকানন্দ স্তোত্র" যাঁরা প্রথমেই সংগ্রহ করবেন, আমি তাঁদের অন্যতম। কেবল ভাল লেখা বলে নয়, শ্রীযুক্ত মিত্র আমাদের একটি বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছেন বলে। জীবনী লেখার অনেক পদ্ধতি আছে, একটি হোল বাণীর মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখা। মিত্র মহাশয় এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করছেন। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি; বিবেকানন্দ বাণীর বরপুত্র নন, বিবেকানন্দের বাণীর চেয়ে বিবেকানন্দের জীবন অনেক বড়। কিন্তু উপলব্ধিবান পুরুষ বলে, বিবেকানন্দের বাণী চিন্তাসঙ্কলন মাত্র নয়—আত্মসাক্ষাৎকারের দিব্যচেতনা বহন করেছে তাঁর উক্তি। বিবেকানন্দই বিবেকানন্দকে উন্মুক্ত করে গেছেন। আর একজন বিবেকানন্দ না হওয়া পর্য্যন্ত গত বিবেকানন্দকে তাঁর বাণীর আলোকেই বুঝতে হবে। সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক নানা প্রয়োজনে তাঁর বাণীর বহুল ব্যবহার করা হয়েছে, তবু বিবেকানন্দ হিমাদ্রির গহন প্রবেশপথের দিশা ও দীপরূপে বিবেকানন্দের ছড়ানো বাণী-মণিখণ্ডগুলি ব্যবহার করা হয়নি এখনো উপযুক্ত রূপে। বিবেকানন্দ জীবনীর ব্যাপারে শ্রীযুক্ত সুমণি মিত্র এ বিষয়ে অগ্রণী জীবনীকার। অন্য কারণ বাদ দিলেও, স্বামীজীর সুগ্রথিত সটীক বাণী সঙ্কলনরূপে আমার কাছে বিবেকানন্দ-স্তোত্র মহামূল্যবান হয়ে থাকবে। সন্নিবেশের কৌশলে বিবেকানন্দকে কবিরূপে প্রতিভাত করেছেন শ্রীযুক্ত মিত্র। বীরবাণীর রচয়িতা বলে বিবেকানন্দকে কবি বলছি না,—তিনি যা কিছু বলেছেন সত্যের দিব্যালোক ও দিব্যগন্ধময় সে সকলই গদ্যভাষায় কথিত হয়ে কি আশ্চর্য্য আভ্যন্তর ছন্দকে অনায়াসে রক্ষা করেছে—শ্রীযুক্ত মিত্র সেগুলিকে কাব্যের বাহ্যাকার দেবার পূর্ব্বে সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব হয়নি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য আমার যা সামান্য পড়া আছে তার থেকে বুঝতে পেরেছি শ্রীযুক্ত মিত্র কি ভাবে তাকে মন্থন করেছেন। তাঁর পরিশ্রমের সৃষ্টি আমাদের কাছে আদরের সামগ্রী মাসিক বসুমতীর সম্পাদক মহাশয়কেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই লেখাটি প্রকাশের জন্য তো বটেই, ইতিপূর্ব্বে নিবেদিতার উচ্চাঙ্গের ফরাসী জীবনীর অনুবাদ প্রকাশের জন্যও বটে। জীবনী কোথা কি ভাবে সাহিত্য হয়, তার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে নারায়ণী দেবী অনুবাদ করা লিজেল রেমঁর নিবেদিতা। নারায়ণী দেবী শুধু অনুবাদ করেন নি, মরমী অনুভূতিকে প্রকাশ করার ব্যাপারে বাংলা ভাষা শক্তিকেও প্রমাণ করেছেন। আত্মার মহান সঙ্গীতময় কাহিনীরূপে নিবেদিতার অনুবাদ আমাদের ভাষায় স্থায়ী আসন পাবে। আমা এবং আমার বন্ধুজনের অনেক গূঢ় আনন্দের আশ্রয় ঐ অনুবাদ গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখব লিখব করেও কিছু লিখে ওঠা সম্ভব হয়নি আলস্যবশে এতে অপরাধ ঘটেছে, কারণ যে কোন সুন্দর সৃষ্টিকে সম্বর্দ্ধনা জানান পাঠকের পবিত্র দায়িত্ব। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, (বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক) ১ নস্করপাড়া লেন, কাসুন্দিয়া, হাওড়া।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Herewith I am sending Rs. 15/- to you for yearly subscription for Monthly Basumati—Kabita Ghosal. Nirmal Kutir Jamshedpur.

আশ্বিন মাস হইতে এক বৎসরের "মাসিক বসুমতী"র subscription পাঠাইলাম।—শ্রীমতী সাধনা গাঙ্গুলী। সাননগর, নিউ দিল্লী।

'মাসিক বসুমতী' এক বছরের মূল্য বাবদ ১৫৲ পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া শ্রাবণ সংখ্যা শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন।—বেলা বাগচী। এলাহাবাদ।

১৫৲ আগামী আরও এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ পাঠাইলাম। আশা করি যথাসময়ে বই পাঠাইতে থাকিবেন। Malati Rani Ganguly. গ্রা: M 51076, Bombay.

বার্ষিক মূল্য মাসিক বসুমতীর জন্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া শ্রাবণ সংখ্যা পাঠাইবেন। Sm. S. Banerjee গ্রা: M 51353 Bilaspur.

আপনাদের মাসিক বসুমতী পড়ে কত যে ভাল লাগলো তা আর কি লিখবো। তাই আমি অদ্য আবার ষাণ্মাসিক গ্রাহিকা হবার জন্য ৭ টাকা ৫০ নয়া পয়সা পাঠালুম। আমাকে আবার শ্রাবণ সংখ্যা থেকে বসুমতী পাঠিয়ে বাধিত করবেন। শ্রীপ্রতিভা দে। শিবসাগর, আসাম।

মাসিক বসুমতীর জন্য ছয় মাসের ৭৸০ টাকা চাঁদা পাঠাইলাম। আশ্বিন সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠাইবেন। Dolly Pachal. Kadamtalla, Howrah.

Rupees seven 50 n. p. are sent herewith as subscription for Monthly Basumati for the months from Baisak to Aswin for Bengali year 1364. Purnima Sarker. Jabulpur.

(পঞ্চশস্যে রচিত)

চু এন লাই

শিল্পী—রথীশচন্দ্র চক্রবর্তী

॥ মাসিক বসুমতী ॥
আশ্বিন, ১৩৬৪

মাসিক বসুমতী

[প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

৩৬শ বর্ষ—আশ্বিন, ১৩৬৪]

কথামৃত

আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি, সৃষ্টির ন্যায় জীবনও অনন্ত। শূন্য হইতে যে জীবনের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নহে—তাহা হইতেই পারে না।...তোমরা সকলেই ইহা পূর্ব হইতেই অবগত আছ যে, আমাদের প্রত্যেকেই অনন্ত অতীতের কর্মসমষ্টির ফলস্বরূপ। কবিগণের বর্ণনানুযায়ী শিশু প্রকৃতি হইতে সাক্ষাৎ প্রসূত হইয়া আসে না, তাহার স্কন্ধে অনন্ত অতীতকালের কর্মসমষ্টি রহিয়াছে। ভালই হউক মন্দই হউক, সে নিজ অতীত কর্মের ফলভোগ করিতে আসে। আমরা জানি, এই কারণেই জন্ম হয়। ইহা হইতেই বৈষম্যের উৎপত্তি, ইহাই কর্মবিধান ; আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অদৃষ্টের গঠনকর্তা।...যদি আমি অসুখী হই, তবে বুঝিতে হইবে আমিই আমাকে অসুখী করিয়াছি। ইহা হইতে ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে, আমি যদি ইচ্ছা করি তবে সুখীও হইতে পারি। যদি আমি অপবিত্র হই, তবে তাহাও আমার নিজকৃত ; তাহা হইতে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, আমি ইচ্ছা করিলে আবার পবিত্র হইতে পারি।

জীবাত্মা সকল অনাদি অনন্ত, তাহারা স্বরূপতঃ অবিনাশী।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক আত্মার সর্ববিধ শক্তি, পবিত্রতা, সর্বব্যাপিতা ও সর্বজ্ঞত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে।...প্রত্যেক মানবে, প্রত্যেক প্রাণীতে—সে যতই দুর্বল বা মন্দ হউক, সে বড়ই হউক, ছোটই হউক—সেই সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ আত্মা রহিয়াছেন। আত্মা হিসাবে কোন প্রভেদ নাই—প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে।...সংস্কৃত আত্মা ও ইংরেজী soul শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থবাচী। আমরা যাহাকে মন বলি, পাশ্চাত্যেরা তাহাকে soul বলেন। পাশ্চাত্য প্রদেশে আত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান কোন কালে ছিল না।...আত্মা মন ও স্থূলশরীর উভয় হইতেই পৃথক ; এই ধারণাটি মনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে রাখিতে হইবে। আর এই আত্মাই মন বা সূক্ষ্মশরীরকে সঙ্গে লইয়া এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। যে সময়ে উহা সর্বজ্ঞত্ব ও পূর্ণত্ব লাভ করে, তখনই উহার আর জন্মমৃত্যু হয় না—তখন উহা স্বাধীন হইয়া যায়—ইচ্ছা করিলে এই মন বা সূক্ষ্মশরীরকে রাখিতেও পারে অথবা উহাকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তকালের জন্য স্বাধীন ও মুক্ত হইয়া যাইতে পারে। স্বাধীনতাই আত্মার লক্ষ্য। ইহাই আমাদের ধর্মের বিশেষত্ব।

—স্বামী বিবেকানন্দ

তরু দত্তের জীবনী ও রচনা

ক্লারিস বাদের্

১৮৭৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী কলকাতা থেকে একটা চিঠি পাই—আমার প্রকাশকদের মারফৎ। এক ভারতীয় তরুণী আমার 'La femme dans l' Inde antique' "প্রাচীন ভারতে নারী" নামে বইটি অনুবাদ করবার অনুমতি চেয়ে এই চিঠি লেখেন। চিঠির সাথে ছিল একটা বই : সুন্দর ইংরেজী কাব্যে অনূদিত ফরাসী কবিতার সঙ্কলন : 'A Sheaf Gleaned in French Fields.'—একই সাথে পাওয়া এই বই ও চিঠির লেখিকার বয়স অতি অল্প, তা' সত্ত্বেও ইতিমধ্যে তিনি স্বদেশে ও ইংল্যাণ্ডে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। নাম তাঁর তরু দত্ত। কলকাতার এক খৃষ্টান-পরিবারের—মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও সুপণ্ডিত বাবু গোবিনচন্দ্র দত্তের মেয়ে ইনি।

ভারতবর্ষ থেকে পাওয়া এই চিঠিই তরু দত্ত ও আমার মধ্যে যোগাযোগের প্রথম সূত্র। সে সংযোগ নিয়তির বিধানে বড় তাড়াতাড়ি ছিন্ন হল—এই প্রতিভাশালিনীর অকাল মৃত্যুতে। তাঁর লেখা সেই চিঠিগুলি (যা' কলকাতা থেকে বাবু গোবিনচন্দ্র দত্ত পরে প্রকাশ করেন, 'এ শীফ গ্লীন্‌ড ইন্ ফ্রেঞ্চ ফীল্‌ডস'-এর পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে), তাঁর মৃত্যুর পর আমায় লেখা শোকাচ্ছন্ন পিতার চিঠিগুলি আর তরু দত্তের কবিতার বইয়ের নতুন সংস্করণে সংযোজিত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে যে তথ্য পেয়েছি, তার সাহায্যে আমার মনের পটে সত্যিকার অসামান্য এক ব্যক্তিত্বের যে কয়েকটি মাত্র রেখা ফুটে উঠেছে, সেই রেখা ক'টি আজ পুনরুদ্ধার করাই আমার উদ্দেশ্য।

১৮৫৬ সালের ৪ঠা মার্চ তরু দত্ত কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৯ সালে সপরিবারে তাঁর বাবা ইউরোপে আসেন ও চার বছর এখানে কাটান। তরু ও তাঁর দিদি অরু মাস কয়েক ফ্রান্সের একটি ছাত্রাবাসে থাকেন। তারপর ইংল্যাণ্ডে গিয়ে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কোর্স-এ তাঁরা বিশেষ উৎসাহের সাথে যোগ দেন।

তারপর গোবিন বাবু সপরিবারে যখন কলকাতায় ফিরে গেলেন, তখন তিনি তরুকে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা সংস্কৃতে দীক্ষা দেন। তাঁর কন্যার পাঠ-সহচররূপেই তাঁকে আমরা সর্বদা পাই। চমৎকার একটি পারিবারিক চিত্রে তিনি দেখিয়েছেন মাণিকতলা ষ্ট্রীটের পৈতৃক ভবনে কি ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা পড়াশুনোর মধ্যেই ডুবে থাকতেন

তরুর প্রসঙ্গে তাতে তিনি বলেছেন : "ও খুবই পড়তে পারত ; তেমনি তাড়াতাড়িও পড়ত ; কিন্তু পড়ার সময় কোনও দুর্বোধ্য অংশ বাদ দিয়ে যাওয়া ওর ধাতে সইত না। নানারকম অভিধান আর শব্দকোষ ঘেঁটে, শব্দের মানে উদ্ধার ক'রে খাতায় তখুনি লিখে রেখে, তবে শান্তি। ফলে কঠিন শব্দ বা বাক্যগুলির মানে এমন সহজে ওর মনে গেঁথে যেত যে যখনই আমাদের মধ্যে কোনও তর্ক উঠত সংস্কৃত, ফরাসী অথবা জার্মান কোনও প্রয়োগ বা বাক্যাংশ সম্বন্ধে, দশ বারে অন্তত আট বার ও-ই জয়ী হত। এক এক সময় আমার এমন জিদ চেপে যেত যে আমি বলতাম, 'বেশ ত বাজি রাখা যাক!' বাজির অঙ্ক ছিল সাধারণত এক টাকা। কিন্তু যখন কেতাব ঘেঁটে অর্থের সন্ধান মিলত, দেখা যেত ও-ই বাজি মাৎ করেছে। ও কিন্তু যখন হেরে যেত, বড় মজা লাগত তখন ওকে দেখতে। প্রথমেই প্রাণ খুলে খানিক হেসে নিত, তারপর আমার গালে পড়ত মৃদু টোকা, সেই সঙ্গে ওর প্রিয় কবি ব্যারেট ব্রাউনিং-এর হয়ত কয়েকটি লাইন, 'হায় প্রিয়তম, বয়সে তুমি যে বড়, জ্ঞানে তুমিই প্রবীণ, আর তুমি, তুমি যে পুরুষ!'—অথবা অন্য কোনও পরিহাস।"

পাণ্ডিত্যের কাছে সানন্দে মাথা নত করতে তরুর বাবা সদা প্রস্তুত ছিলেন, এমন কি, নিজের কন্যার কাছেও তার ব্যতিক্রম হত না। এই সব কথা তাঁর কাছ থেকে বার বার শুনে আমার চোখে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ওঠে তাঁর সন্তান-গৌরবে ধন্য পিতৃরূপ!

তরু দত্তের বাবা মেয়েকে ইউরোপীয় শিক্ষার সাথে সাথেই প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় শিক্ষিত করে তোলেন,—এখানেই আমরা দেখি ভারতের ওপর—মায় ব্রাহ্মণ ও ইসলাম ধর্মের ওপর—খৃষ্টান সভ্যতার প্রভাব কত সুন্দর। মঁসিয়্য গারস্যাঁ দ্য তাসি-র মতে, "ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান ও পার্সীরা নিজেদের খরচেই ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ইস্কুল খোলে, কেবল ছেলেদের নয়, মেয়েদের জন্যও। আজ অবধি এমন তাজ্জব কথা বড় শোনা যায় না!" *

তরুর কিন্তু ইতিহাসের দিকে তেমন টান ছিল না। একদিন লর্ড ল...(লিটন?) যখন কলকাতায় এঁদের বাড়ী বেড়াতে যান, তখন অরুর হাতে একটা উপন্যাস দেখে সেটা কেড়ে নিয়ে দুই বোনকে তিনি বলেন, "উপন্যাস বেশী পড়া ভাল নয়। ইতিহাস পড়া দরকার।"—তরু জবাব দেয়, "লর্ড ল...,উপন্যাসই আমাদের বেশী ভাল লাগে।"—"কেন?" এই প্রশ্নের জবাবে তরু সপ্রতিভ ভাবে হেসে বলে, "কারণ উপন্যাস হল সত্যি, আর ইতিহাস

* মঁসিয়্য গারস্যাঁ দ্য তাসি ভারতের নারীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রীমতী মেরী কার্পেন্টারকে তিনি প্রাণে-মনে শ্রদ্ধা করতেন ভারতের নারী প্রগতিতে কার্পেন্টারের অক্লান্ত চেষ্টার জন্য।

কল্পিত" ("Because novels are true, and histories are false.")। এই ভাবে পরিহাসের মাঝেই সে বুঝিয়ে দিল একটা গোটা জাতের—কাব্য-পরায়ণ হিন্দু জাতের—রুচির দৃষ্টিবিন্দু: ইতিহাস চাই না, চাই পুরাণ!

প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের প্রতি তরুর ছিল গভীর ভালবাসা। আমায় লেখা তার ফরাসী একটি চিঠিতে সে বলেছিল, "মাদমোয়াজেল, জানেন না, আমার স্বদেশের, আমার স্বদেশবাসীর প্রতি আপনার অনুরাগ (তার সাক্ষী আপনার বই, সাক্ষী আপনার চিঠি) কি ভাবে আমায় বিচলিত করে তোলে। আমি দৃপ্তকণ্ঠে বলতে পারি, আমাদের মহাকাব্যের যে কোনও নারী-চরিত্র প্রত্যেকের শ্রদ্ধার পাত্রী, প্রত্যেক হৃদয়ের অমূল্য সম্পদ। সীতার চেয়ে করুণ, তাঁর চেয়ে প্রেমময়ীর চরিত্র আমায় আর একটা দেখাতে পারেন? আমার ত বিশ্বাস হয় না। সন্ধ্যাবেলা যখন আমার মা আমাদের দেশের প্রচলিত গানগুলি গা'ন, আমার দু'-চোখ জলে ভেসে যায়। দ্বিতীয়বার বনবাসের সময় সীতার বিলাপ, একাকিনী যখন তিনি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দারুণ হতাশা আর ব্যথায় মুহ্যমান—এ-দৃশ্য এমনি হৃদয়-বিদারক যে চোখের জল না ফেলে তা' কখনও শোনা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।"—এই চিঠির সাথেই তরু সংস্কৃত থেকে দুটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ আমায় পাঠিয়েছিল। তাদের স্বল্প পরিসরে যে তেজের পরিচয় পেয়েছিলাম তা' অবিস্মরণীয়! বিষ্ণুপুরাণের দুটি কাহিনী: 'ধ্রুব', আর 'রাজর্ষি ও মৃগ'!

আজন্ম মায়ের মুখে প্রাচীন কাহিনী শুনে, বাবার কাছে সংস্কৃত পাঠের দীক্ষা পেয়ে তরু দত্তের কণ্ঠেও কি ধ্বনিত হবে শুধু তার দেশেরই বন্দনা? তার কাব্য-প্রতিভার বাহন হবে কি হিন্দুস্থানী? ভারতের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই কি তার বিষয়বস্তু হবে—যেখানে গহন অরণ্যে স্বীয় গরিমায় বিরাজিত অগণ্য বিটপী? সেকালের সংস্কৃত কবিদের মত সেও কি হরিণীর চঞ্চল গতিই অনুধাবন করবে একদৃষ্টে, দেখবে জড়োয়াখচিত মৌটুশকিদের লাস্য? বিশাল বনানীর বুকে, বিলম্বিত ন্যগ্রোধতলে শুনচে কি শুধু কোকিলের কুহু-মাধুর্য? নাগিনীর হিংস্র স্বনন? মৃগেন্দ্রের হুঙ্কার? বহু বর্ণের কমলশোভিত দীঘিতে সে কি শুধু কেলিমুগ্ধ বলাকার পানেই তাকিয়ে থাকবে? নিদাঘের সূর্যক্লিষ্ট পর্বতে পর্বতে ফেনময়ী তরঙ্গিণী তটিনীর চপল ময়ূখ কি সে বর্ণনা করবে, না কি বর্ণনা করবে উজ্জ্বল নীলকান্ত আলোকে স্নাত চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের হীরকচ্ছটা?

না! বাল্মীকি ও ব্যাস-উল্লিখিত দৃশ্যাবলী সামনে রেখে আমাদের এই ভারতীয় খৃষ্টান তরুণী ফিরে দাঁড়িয়েছে নিষ্প্রভ পাশ্চাত্যের পানে, যেখানে প্রাকৃতিক আকর্ষণ অনেক কম, কিন্তু মানুষের বহর অনেক বেশী। তাই, 'বিদেশী তরুণী'র প্রতি কবি শীলর-এর উক্তি একটু বদলে নিয়ে ওর কবিতার বইয়ের শেষে ও লিখেছিল, "যে-ফুল, যে-ফল আমি এনেছি, তা আর এক দেশের, আর এক সূর্যের আলোয়, আর এক লাস্যময়ী প্রকৃতির বুক থেকে চয়ন করা!"

> 'Ich bringe' Blumen mit und Früchte,
> Gereift anf einer andern Flur,
> In einen andern Sonnenlichte,
> In einer glücklichern Natur.

(শীলর-এর উক্তির প্রথমটা ছিল 'Sie brachte' Blumen...)

আমাদের ফরাসী কবিদের গানগুলি অনুবাদ করতে তরু ব[...] ভালবাসত; কিন্তু, ইতিপূর্বেই বলেছি, এই ভারতীয় তরুণীটি আকৃ[...] মগ্ন ছিল আমাদের সভ্যতায়, তাই সে এই গানগুলি হিন্দুস্থানীতে[...] অনুবাদ না করে করল ইংরেজীতে। ফলত, ম'সিয়্য গারস্যাঁ দ্য তাসির স্বনামধন্য লেখনী মাধ্যমে আমরা ভারতীয় মহিলা কবিদে[...] নামের যে তালিকা পাই, সে-তালিকা বৃদ্ধি না করে তরু অধিকা[...] করল তার আসন ইংল্যাণ্ডের কবিদের মাঝে।

কিন্তু আমাদের ক্লাসিকাল কবিদের কবিতা অনুবাদ করা এ[...] তরুণী কবির উদ্দেশ্য ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী কবিদে[...] ধারণা ছিল যে ভাব আবেগ প্রভৃতির উচ্চে স্থান দিতে হ[...] মননশীলতাকে। কবিতা বলতে তাঁরা বুঝতেন একখণ্ড স্বচ্ছ স্ফটিক যার সাহায্যে মানুষের চিন্তাধারা স্বচ্ছন্দে পড়া চলবে। কাজেই এ[...] শতাব্দীর ফরাসী লেখকরা এই তরুণী কবির চিত্ত হরণ করতে[...] পারেন নি। কারণ যে দেশ তাকে জন্ম দিয়েছে, সে-দেশে কবি[...] মানেই ভাব, কল্পনা, আবেগ, আর সেখানকার প্রকৃতির মত[...] তা প্রাচুর্য-মণ্ডিত। তরু সত্যিই যাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হ[...] তাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর কবিকুল। তাঁদের মধ্যেই সে খুঁজে পায় তার স্বদেশবাসীদের অভীষ্ট: হৃদয়ের প্রতিক্রিয়ার তী[...] নাটকীয় প্রকাশ, উপমার যথেচ্ছ ব্যবহার, বর্ণের বিপু[...] সমারোহ। ম'সিয়্য ভিক্তর হ্যুগোর প্রতি তরুর উচ্ছ্বাস দেখে তা[...] আশ্চর্য হই না। তার কবিতার বইয়ে প্রতিটি কবিতার তল[...] তারই দেওয়া মন্তব্যে তাই সে সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠেছে: "এক পাতাটাকায়, ছোট্ট কয়েকটি লাইনের পরিসরে ভিক্তর হ্যুগো সম্ব[...] মন্তব্য করা সত্যিই ধৃষ্টতা! পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে আ[...] তাঁর নাম। শেক্‌স্‌পীয়র, মিল্টন, বায়রণ, গোথে, শীলর প্রভৃতি[...] সাথে পাশাপাশি তাঁর আসন বহুদিন থেকেই প্রতিষ্ঠিত আ[...] কবিদের স্বর্গে।"

যদিও তরু দত্তের সক্রিয় কল্পনাশক্তি ভিক্তর হ্যুগো[...] লামার্তিনের চেয়ে অনেক উঁচুতে তুলে ধরেছিল, তবু তার আধ্যাত্মি[...] সত্তা দিয়ে সে স্বীকার করে নিয়েছিল 'মেদিতাসিয়' ও 'হার্মনী' কবির (লামার্তিনের) নৈতিক মহত্ব: "মেজাজে, কল্পনায়, উজ্জ্বলে[...] উচ্চভাবে, ষ্টাইলে—কবিত্ব বলতে যা' কিছু বোঝায়—একমা[...] পবিত্রতা ছাড়া—সব কিছুতেই তাঁকে ভিক্তর হ্যুগোর কাছে মা[...] নত করতে হবে। পবিত্রতায় তিনি অনন্য। তাঁর অ[...] স্বভাবতই আধ্যাত্মিক। সাধ্বী জননীর কোলে বসে যে-শিক্ষা তি[...] শৈশবে পেয়েছিলেন, তা' তিনি কখনও ভোলেন নি। জননী[...] তিনি তাই সহস্রবার স্মরণ করেছেন তাঁর লেখনীর সপ্রেম অর্চনায়।"

তারপর ম'সিয়্য লাপ্রাদ সম্বন্ধে তরু দত্ত লিখেছে, "লাপ্র[...] আর লামার্তিন হচ্ছেন বর্তমান ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁ[...] রচনাবলী গভীর, পবিত্র, আধ্যাত্মিক। দু-জনেই তাঁদের গর্ভধারি[...] কাছে এ-বিষয়ে ঋণী। কারণ উভয়ের জননীই ছিলেন ভক্তিম[...] প্রখর বুদ্ধিমতী আর আত্মত্যাগী (Women of prayer, larg[...] minded and self-denying)।"

লামার্তিন, ভিক্তর হুগো ও লাপ্রাদের সাথে সাথেই তরু দত্তের অনুবাদে ও মন্তব্যে আমরা পাই সমকালীন প্রায় প্রত্যেক পার্নাসির কবির উল্লেখ; বেরাঁজের, লত্রাঁ, মুসে, ভিইনী, শ্রীমতী জিরারদ্যাঁ, স্যাঁৎ-ব্যভ, ব্রিজো, পঁসার, গোতিয়ে, গুত্রাঁ, রবুল, বার্বিয়ে, ওজিয়ে, রাতিস্‌বন, লকঁৎ-দ্য-লীল, গ্রাম, মানুয়েল, কোপে, ল্যামোইন, প্রাদম, সুলারী প্রভৃতির।

তরু দত্ত কেবলমাত্র ফরাসী থেকে অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হয়নি। তার উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী লেখিকা হওয়া। যে কয়টি পাণ্ডুলিপি সে রেখে গিয়েছে, তার মধ্যেই একটি মূল ফরাসীতে রচিত উপন্যাস পাওয়া গেছে: 'শ্রীমতী আর্ভের-এর দিনপঞ্জী'—যা আমরা আজ প্রকাশ করছি আর যার সম্বন্ধে পরে আরো আলোচনা করব।

তরু দত্ত কেবল আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে ভালই বাসেনি, আমাদের জন্মভূমিকে সে ভালবেসেছিল নিবিড়ভাবে। ফ্রান্সের নিদারুণ দুর্যোগের ক্ষণে তার এই ভালবাসার পরিচয় আমরা পেয়েছি। তরু দত্তের বাবা কপি করে আমায় পাঠিয়েছেন অপ্রকাশিত কয়েকটি হাতে-লেখা-পাতা যার বুকে এশিয়ার এই দুহিতা, যখন পনেরো বছরও তার বয়স হয়নি, অমর করে রেখেছে আমাদের স্বদেশবাসীর দুর্ভাগ্যের কাহিনী এমনি করুণ ভাবে, যা দেখে কেউ বলবে না যে কোনও ফরাসী নারীর বুকের কথা তা নয়। তরু তখন লণ্ডনে ছিল। ওর বিদেশ-ভ্রমণের ডায়েরী থেকে—১৮৭১ সালের ২৯শে ও ৩০শে জানুয়ারীতে লেখা—একটু তুলে দিই এখানে:—

"২৯শে জানুয়ারী, ১৮৭১। লণ্ডন। ৯ সিডনী প্লেস, অনস্লো স্কোয়ার।—বহুকাল হল ডায়েরী লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম। শেষবার যখন এই ডায়েরী হাতে নিই, তারপর থেকে কত পরিবর্তনই না ঘটে গেছে ফ্রান্সে! হায় রে! ফ্রান্সে কতই না পরিবর্তন ঘটে গেল! কয়েক দিনের জন্য পারীতে যখন গিয়েছিলাম, কি রূপই তার দেখে এসেছিলাম। কি বাড়ী! কি রাস্তা! কি অপূর্ব সৈন্য-বাহিনী! আর আজ? সব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে! সব নগরীর রাণী যে ছিল, আজ তার এ কী দৈন্য! যুদ্ধ যখন বেধেছিল, সর্বান্তঃকরণে আমি ফরাসীদের পক্ষই নিয়েছিলাম—তাদের পরাজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকা সত্বেও। একদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন যুদ্ধ পুরোদমে চলেছে, উপর্যুপরি যখন ফ্রান্স পরাজিত হয়ে চলেছে, তখন ফরাসী সম্রাট সম্বন্ধে বাবা কি যেন মাকে বলছিলেন—কানে এল। তীরের বেগে নীচে গিয়ে শুনলাম, ফ্রান্স অধিকৃত।···তারপর আরো কত দুঃসংবাদ এল: পারীর বিপ্লব, সম্রাজ্ঞী ও যুবরাজের ইংল্যাণ্ডে পলায়ন, সম্রাটকে বন্দিরূপে উইলহেম্‌স্‌হোহের কাছে প্রেরণ, পারীতে জার্মাণ বর্বরতা, স্ট্রাসবুর্গে বোমা! বোমার মুখে কি দুর্দশা ওদের! বাড়ী-ঘর গুঁড়িয়ে গেল। চারিদিকে বহ্নি-লীলা!···

হায়! হাজার হাজার লোক বুকের রক্ত দিল তাদের দেশের জন্য, তবু সে দেশকে পড়তে হল শত্রু-কবলে! এরা কি এমনই পাপে মগ্ন ছিল যে, ভগবানকে এরা চায় নি—যার ফলে এই রোষ? না, এদের মাঝেই হাজার হাজার লোক ছিল, আজো আছে, ভগবানই যাদের সম্বল! ফ্রান্স, হায় ফ্রান্স, কি তোমার পতন! এই নিদারুণ অধঃপতনের পর, এই দৈন্যের শেষে, তুমি কি উঠে দাঁড়াবে না ভগবানের পানে, তাঁর প্রতি গভীর সত্তার অর্ঘ্য নিয়ে? আমি প্রার্থনা করি, শান্তি আসুক, থেমে যাক এই রক্তক্ষরণ।

৩০শে জানুয়ারী। সোমবার। যখন আমরা পোষাক বদলাচ্ছিলাম, প্রাতরাশের ঘণ্টা বাজল। নীচে গিয়ে আমাদের ইতালীয় চাকরের মুখে শুনলাম, পারীর পতনের সংবাদ।···'টাইম্‌স্' পত্রিকায় পড়লাম, "কাল জার্মাণরা দুর্গগুলি অধিকার করবে।" টেলিগ্রামে এই খবরই পাওয়া গেছে। এতক্ষণে বোধ হয় দুর্গ ওরা অবরোধ করে ফেলেছে। প্রত্যেক রেজিমেণ্টের অস্ত্র-শস্ত্র ওরা কেড়ে নেবে।···ফ্রান্স, হায় ফ্রান্স! আমার বুক থেকে আজ রক্ত ঝরে ঝরে পড়ছে।

ভারতীয় এক তরুণীর লেখা এই ক'টি পাতায় আমি খুঁজে পেলাম সেই সুতীব্র ব্যথা, সেই বুক-ফাটা কান্না, সেই প্রায়শ্চিত্তের মনোভাব, স্বদেশ-প্রেমের সেই স্বতঃস্ফূর্তি—যা এক দিন ঠিক ওই সময়েই আমায় বাধ্য করেছিল অখ্যাত এক ডায়েরীর পাতায় আত্ম-প্রকাশ করতে। সত্যিই, এশিয়ার এই তরুণীর বুকে যে হৃদ্‌পিণ্ড ছিল, তা আমাদেরই মত যে-কোনও ফরাসী রমণীর। সত্যিই আমাদের সেই দুর্গতির দিনে ঝরে ঝরে সেই হৃদয় থেকে আমাদেরই মত নীরবে রক্ত ঝরে পড়েছিল।

তরুর এই ডায়েরীতেই আমরা উল্লেখ পাই তার দিদি অরুর। মনোবৃত্তি ও রুচিতে দুই বোন ছিল অভিন্নাত্মা। দুই বোনই ঘর-কন্নার খুঁটিনাটির মধ্যেই গভীর অধ্যয়ন ও কাব্য-চর্চার অবকাশ কি ভাবে পেতে হয়, জানত। তরুর প্রতিভার পথ থেকে অরু নিজেকে সর্বদাই বিচ্ছিন্ন রাখত, যাতে ছোট বোনের বিকাশের কোনও অসুবিধা না হয়। আমার চোখের সামনে দুই বোনের একটি ফটো মেলা আছে, যার মাঝে দু'টি জীবনের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। অরু—সৌম্য, শান্ত, সংযত—বসে আছে; তারই পাশে, প্রেমে, নিবিড়তায় অরুকে যেন আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে আছে তরু—প্রাণোচ্ছল, অপূর্ব কেশদামমণ্ডিত, কাজল-চোখে আগুনের স্ফুরণ!

অরুরও বাসনা ছিল ফরাসী সাহিত্যের বেদীতে তার অঞ্জলি তর্পণ করবে। তার অনূদিত কবিতার মধ্যে 'The young captive'-ই অন্যতম। এই প্রশস্তি-কাব্য সে আশ্চর্য কৃতিত্বের সাথে অনুবাদ করেছিল। তার রচনা-শৈলী হয়ত কবি শেনিয়ে-র ফরাসী কবিতাকে ম্লান করে দিতে পারত। কবি Coigny-র মত সে-ও বুঝি বলেছিল,—

"এ-শুধু বসন্ত মোর; দেখে যাব নবান্ন-উৎসব;

*   *   *

উদ্যান-গরিমা-রূপে মোর কাণ্ড 'পরে
আজো শুধু হেরি নব অরুণাভা ঝরে,
অখণ্ড দিবস আমি দেখে যেতে চাই।

*   *   *

মরিতে চাহি না এই জীবন-প্রভাতে!"

১৮৭৬ সালে তরুর কবিতার বই প্রথম প্রকাশ কালে সে লিখেছিল, "এইখানে জানিয়ে রাখি যে A-স্বাক্ষরিত কবিতাগুলি অনুবাদিকার একমাত্র প্রিয় জ্যেষ্ঠা ভগিনী অরুর অনুবাদ। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে, ১৮৭৪ সালের ২৩শে জুলাই, সে যীশুর চরণতলে চির-বিশ্রাম লাভ করেছে।···সে যদি আজ বেঁচে থাকত তবে তার সাহায্যে বইটিকে সমৃদ্ধতর করে তোলা যেত।···ভাষায় বা লেখনীতে

প্রকাশযোগ্য যত কথা আছে তার মধ্যে সব চেয়ে করুণ হচ্ছে, 'হতে পারত' কথাটি।"

এ-কথা তরু যখন লেখে, তার আগেই সেই ব্যাধির লক্ষণ তার মধ্যে দেখা যায়, যে-রোগের কবলে প'ড়ে তার দিদিকে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়। ১৮৭৭ সালেই আমায় লেখা তার দ্বিতীয় পত্রে সে লিখেছিল, একটি বিশেষ ধরণের কাশি তাকে সর্বদা ভোগাচ্ছে। একদিন সে আমায় জানিয়েছিল, হয়ত পারী-তে সে আবার আসছে: তার বাবা ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে ওর চিকিৎসা করাতে চান। দু'টি সন্তান ইতিপূর্বেই হারানোর পর ওর বাবা তাঁদের শেষ সন্তানটিকে বৃথাই যমের নজর থেকে আড়াল করবার চেষ্টা করছিলেন। তরুর শরীর কিন্তু এমন ভেঙে পড়ল যে ইউরোপ যাত্রা স্থগিত রাখতে হল। ৩০শে জুলাই তরু আমায় কাঁপা হাতে লেখে; "মাদ্‌মোয়াজেল, দারুণ অসুখে ভুগলাম। বাবা-মার একান্ত প্রার্থনা ভগবান শুনেছেন, আমি ধীরে ধীরে সেরে উঠছি। শীঘ্রই আপনাকে বড় করে চিঠি লিখতে পারব আশা করি।"—সমস্ত বুকের রোগেই শেষ অবধি এমনি অলীক আশা রোগীকে ঘিরে রাখে।

আমায় সে আর চিঠি লিখতে পারে নি। তবে অনেক দিন আগে, এক বিষাদভরা মুহূর্ত্তে সে আমায় যে ফরাসী লাইনটি পাঠিয়েছিল, হয়ত সেই লাইনটিই সে বারে বারে আবৃত্তি করেছিল শেষ সময়ে।

"অচেনা বঁধু, প্রিয়তমা, বিদায়, মোরে বিদায় দাও!"

তরুকে কোন দিন দেখি নি, তবু ওকে ভালবেসেছি। ওর প্রতিটি চিঠিতেই ওর অন্তরের সরল মাধুর্যের, ওর স্পর্শকাতর মনের, ওর সদাশয়তার পরিচয় আমি পেতাম, যার ফলে ক্রমেই ও আমার নিকটতম আত্মীয়ার মত হয়ে উঠেছিল, আর যার ফলে, ইউরোপীয় খৃষ্টান সভ্যতায় বড় হয়ে ওঠা সত্ত্বেও, ওর স্বভাবে ভারতীয় নারীর মজ্জাগত ধর্ম আমার চোখে ফুটে ওঠে। তা'ছাড়া মাত্র বাইশ বছর বয়সে আমি যে-ভারতীয় নারীদের আদর্শে অনুপ্রেরিত হয়ে প্রথম বই লিখি, তাঁদেরই একজন বংশধরের হৃদয়ভরা ভালবাসা সাত সাগরের পারে থেকেও কি ক'রে আমি উপেক্ষা করি?

তরু দত্ত সেরে উঠছে জেনে ওকে আমি অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। ওর মাধ্যমে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম ওর মা ও বাবাকে। 'নৎর-দাম দে ভিক্তোয়ার' এর একটি প্রতিমূর্তি আমার ঘরে ছিল। তারই সামনে রাখা একটি তোড়া থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ওকে আমি একটা ফুল পাঠাই। ফুলটি 'অ্যামারান্থ'। লালচে পাঁপড়িগুলো এর কখনও শুকিয়ে যায় না। অমরতার প্রতীক। হায় রে! তরু দত্তের নামে এ উপহার যখন পাঠাই, তার বেশ কয়েক দিন আগেই সে ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে যায়! ওর বাবা-মার হাতে পড়বে আমার অভিনন্দন-পত্র, ওরই আরোগ্য-কামনায় লেখা!...

"গত ৩০শে আগষ্ট সন্ধ্যাবেলা ও আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে সেই লোকের পানে—যেখানে বিরহ আর ব্যথার নাম কেউ শোনে নি।" ওর বাবা আমায় লিখে পাঠালেন, "ভগবানের প্রতি ওর বিশ্বাস ছিল অসীম; এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নেমে এসেছিল ওর সত্তায়। একদিন ও ডাক্তারকে বলেছিল, 'দেখুন, শরীরের অসহ্য যন্ত্রণাই আমার চোখ দিয়ে জল টেনে আনে; তা' নয়ত অন্তর আমার আজ অপরিসীম শান্তিতে মগ্ন। জানি ভগবানই আমার সহায়।'—এমন শান্ত স্বভাবের মেয়ে আমি দেখি নি, আমার এই শেষ সন্তানটির মত। আমার স্ত্রী ও আমি আজ, জীবনের সায়াহ্নে, নিঃসঙ্গ পড়ে আছি শূন্য এই গৃহে যার প্রতিটি কোণ একদিন মুখরিত ছিল আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় তিন সন্তানের কলস্বরে। না, আমাদের ভগবান আছেন,—তিনিই সবার গতি, সব দুঃখে তিনিই সান্ত্বনা। সেদিন আগতপ্রায়, যেদিন আমরা সবাই আবার মিলিত হব পরমেশ্বরের চরণতলে চিরদিনের জন্য।

আমায় এই চিঠি লেখার কিছুকাল আগেই তিনি তাঁর কন্যা তরুর জীবনী লেখা শেষ করেন এই ভাবে, "কেন এই তিনটি তরুণ জীবন তাদের বিরাট আশাময় ভবিষ্যতের মায়া কাটিয়ে চলে গেল, আর আমি, পঙ্গুপ্রায়, পড়ে রইলাম এই শোচনীয় জীবন যাপন করতে? আমার মনে হয়, এ-সবই প্রস্তুতি—ওদের অনাগত জীবনের জন্য এ-সবের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এমন দিন আসবে যখন সব হেঁয়ালীই পরিষ্কার হয়ে যাবে আমার চোখে। জয় পরমপিতার জয়! তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক!"

এই স্থির বিশ্বাসের মাঝেই আমরা বুঝি তরু দত্তের জীবনে তার পিতার প্রভাব কত গভীর, আর তাই তাঁর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ চিত্ত স্বতঃই নত হয়।

তরু দত্তের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই **'Calcutta Review'** পত্রিকায় তার প্রিয় কবি **Gramont** থেকে অনূদিত তার আটটি সনেট প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ সনেটটি ঐশী করুণার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে রচিত। তরু দত্তের ব্যক্তিগত জীবনের শেষ কথা ক'টিই যেন এই সনেটে প্রকট হয়ে ওঠে। সর্বপ্রথম সনেটটির ভাবাবলম্বনে সনেটগুলির তলায় মন্তব্য করা হয়, ভগবানের ভালবাসা পৃথিবীর এই অস্ফুট প্রসূনটিকে যেন স্বর্গের দিব্য-পরিবেশে ফুটে উঠতে সাহায্য করে।

তরু দত্তের অকাল মৃত্যুতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-ক্ষতি হল, তারই প্রসঙ্গে রচিত শ্রদ্ধার্ঘ দেশ-বিদেশের যত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে পূর্বোক্ত পত্রিকাটি অন্যতম। **'Calcutta Review'**-এ লেখা হয়, "তরু দত্ত ইংরেজী লিখতে পারতেন উচ্চশিক্ষিতা ইংরেজ রমণীর মতই সুরুচিসম্পন্ন সুদক্ষ ভঙ্গীতে। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই কোমল, অন্তর্মুখী, করুণ-রসাত্মক, গভীর ধর্মভাবাপন্ন, নিষ্কলুষ উর্ধ্বায়িত কল্পনার আলোয় সমুজ্জ্বল,—যা বর্ত্তমান শতাব্দীর ইংরেজ কবিদের মাঝে তাঁর চিরস্থায়ী আসন পেতে রেখেছে!"

ভারত-অনুরাগী খ্যাতনামা ফরাসী পণ্ডিত, পারী-র এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি মঁসিয় গারস্যাঁ দ্য তাসি একটি জনসভায় এই ভাবে তরুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন, "গত ৩০শে আগষ্ট, মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তরু দত্ত কলকাতায় দেহরক্ষা করেছেন। তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা প্রতিভার অধিকারী; এই বয়সে তাঁর স্বদেশী ভাষা, পবিত্র সংস্কৃত ভাষাতেই তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল না কেবল, শুদ্ধ ভাবে তিনি ইংরেজী ও ফরাসী অনর্গল বলতে ও লিখতে পারতেন। এতে আমরা আশ্চর্য হই না, কারণ ইউরোপই ছিল শিক্ষার ক্ষেত্র। সব চেয়ে বড় কথা, যে বয়সে তরুণ-তরুণীরা ছাত্রাবাসের গণ্ডী কাটিয়ে উঠতে পারে না, সেই বয়সেই, আপন

প্রতিভাদীপ্ত অম্লান লেখনীনিঃসৃত ইংরেজী কবিতার সঙ্কলন তিনি প্রকাশ করেন। উত্তরকালে তিনি 'A Sheaf Gleaned in French Fields' নামে একটি বই প্রকাশ করেন, অপূর্ব ইংরেজী কবিতায় অনূদিত কয়েকটি ফরাসী কবিতার সঙ্কলন।...এই তরুণী নিজেকে যে খাঁটি ভারতীয় বলে আমার কাছে ব্যক্ত করেছিল, এ হচ্ছে পরমশ্রদ্ধাস্পদ, পরমপণ্ডিত, কলকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু গোবিনচন্দ্র দত্তের সর্বশেষ সন্তান। গোবিন বাবু ইতিপূর্বেই আর এক গুণবতী কন্যাকে হারিয়েছেন; এ-ও মাত্র কুড়ি বছর বয়সে যক্ষ্মাক্রান্ত হয়ে মারা যায়।"

ভারতের বড় লাট লর্ড লিটন-ই প্রথম এগিয়ে যান শোকসন্তপ্ত গোবিন বাবুকে সহানুভূতি জানাতে। ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যে ও রাজনীতিতে বংশানুক্রমে যাঁদের নাম বিখ্যাত হয়ে আছে, সেই পরিবারের সুযোগ্য সন্তান 'clytemnestre' গ্রন্থের লেখক লর্ড লিটন—নিজেও একজন উঁচুদরের কবি—অত বড় ভারতীয় প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের সুযোগ্য ব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ থাকতেও পারে যে বিশ্ববিশ্রুত 'Last Days of Pompei' গ্রন্থের Lady Lytton-Bulwer ছিলেন লর্ড লিটনের জননী। জননীর প্রভাব তাঁর চরিত্রের ওপর এমন গভীর রেখাপাত করে যে, কখনও নারীর মাঝে প্রতিভার সন্ধান পেলে সসম্মানে সে প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানানো ছিল লর্ড লিটনের বৈশিষ্ট্য। এঁরই কাকা লর্ড হেনরি লিটন ফ্রান্সে রাজদূত ও সাহিত্যিক-রূপে একাধারে জনপ্রিয় হন। ভারতের বড়লাট লর্ড লিটনকেই গোবিন বাবু তাই তাঁর কথ্যায় অপ্রকাশিত এই ফরাসী উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন। *

তরু দত্তের মৃত্যুর পর গোবিন বাবু তাঁর সন্তানদের সাথে পরলোকে পুনর্মিলিত হবার আশায় বুক বেঁধে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তাঁর প্রিয় কন্যার রচনাবলী প্রকাশ ও প্রচার করতে। তরুর জীবনী-সম্বলিত 'A Sheaf Gleaned in French Fields'-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশান্তে তিনি স্থির করেছেন, ফরাসীতে লেখা তরুর উপন্যাসটি ফ্রান্সেই প্রকাশ করবেন। আমি তাই 'শ্রীমতী আর্ভেরএর দিনপঞ্জী' ফ্রান্সে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছি।

তরু দত্তের পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে আমি আবেগে অধীর হয়ে পড়ি। লেখাটি আগাগোড়া তার বুড়ো বাবা বসে বসে কপি করে পাঠিয়েছেন: "লিখতে গেলে হাত আমার কাঁপে; ধীরে ধীরে তাই কপি করতে হয়েছে,"—গোবিন বাবু এই বিরাট কাজে হাত দেবার পর আমায় জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সুসম্বদ্ধ লেখার কোথাও বিন্দুমাত্র কেঁপে যাবার চিহ্ন পেলাম না। এই কঠোর অথচ দায়িত্বপূর্ণ কাজটি করবার সময় এক নতুন প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তা' সহজেই বোঝা যায়; আমায় তিনি লিখেছিলেন, "যতক্ষণ কপি করি, মনে হয়, আমি ওর সাথেই কথা বলছি।"

পরিবেশে ও প্রেরণায় 'শ্রীমতী আর্ভের-এর দিনপঞ্জী' যতই ফরাসী হোক না, যত বার পড়ি, আমার মনে পড়ে যায় আমাদের দেশের টবে-সাজানো বিদেশী ফুলের কথা: এ-দেশের জল-হাওয়া তাদের যতই সয়ে যাক, তবু গন্ধ থেকে যায় সুদূর এক ভিন্-দেশের মাটির। ভারতের প্রভাব তেমনি এই উপন্যাসে থেকে গিয়েছে। মার্গরিৎ আর্ভেরএর প্রেমাস্পদ নরহত্যা করে নিজেকে সমাজের চোখে ঘৃণিত করে তুললেও, মার্গরিতের মনোভাব তার প্রতি অপরিবর্তিত রয়ে গেল,—এর মধ্যে শুধু বাইবেলের শিক্ষাই মূর্ত হয়ে ওঠে নি। হিন্দু সমাজের সেই রীতির কথাও স্মরণে আসে। পতি ভাল হোক মন্দ হোক, সৎ হোক, দুশ্চরিত্র হোক—তবু সে দেবতা! নায়িকার স্বভাব-মাধুর্য ও নম্রতা, প্রত্যেক চরিত্রের ঋজুতা, কবিত্বময় উপমা—সব কিছুই আমাদের বারে বারে ভারতীয় জীবনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তবু অনেক ভারতীয় লেখকদের মাঝে শ্লাঘনীয় অথচ সহজলভ্য যা' নয়, তা' এই বইয়ে আমরা পাই: সূক্ষ্মতা ও সংযম। ইংরেজী জীবনের প্রভাবও এর মাঝে কিছু পাওয়া যায়: পারিবারিক বর্ণনা ও Home-এর নিবিড় আত্মীয়তা।

এই উপন্যাসে আমরা কাব্য থেকে নাটক, নাটক থেকে কাব্যে ঘুরে ফিরে আসি। অসাধারণ এর উদ্ভাবনা-শক্তি। ভারতীয় নারীদেরই মত স্বাভাবিক অথচ ফলপ্রসূ ভাষায় মার্গরিৎ আর্ভেরএর প্রতিটি ভাব-পরিবর্তন তরু সহজেই ফুটিয়ে তুলেছে—একাধারে তারুণ্যের নির্মল আনন্দ থেকে প্রেমের প্রচণ্ড আবেগ, অন্য দিকে সাধ্বী সতীর, নবীন জননীর সাংসারিক সুখ থেকে মৃত্যুর দারুণ বেদনা অবধি। মার্গরিতের দিনপঞ্জীর প্রথম কয়েকটা পাতায় আমরা পাই এক পঞ্চদশীকে কেন্দ্র-ক'রে অনবচ্ছিন্ন পারিবারিক স্নেহচ্ছায়া; তারপর দুর্ঘটনার রুদ্র আবর্তে, পূর্ণদীপ্তিতে জেগে-ওঠা নারীর আত্মচেতনা, অব্যক্ত ব্যথায় সে ফিরে দাঁড়ায় আশৈশব পরিচিত ক্রুশের পানে। ফ্রান্সের পল্লীবালার ধর্মভীরুতা সুন্দরভাবে এঁকেছে তরু দত্ত। মার্গরিৎ আর্ভের-এর চিত্তে ছেলেবেলার কনভেন্টের স্মৃতির কত মূল্য তা জানা যায় ভগিনী ভেরোনিকের মৃত্যুতে তার মনোভাব দেখে; আর তাঁর স্বর্গে অবস্থানের প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাসের মাঝে। পরিণয়ের মঙ্গল-সূত্রটিও তাই দেবমাতা মেরির চরণতলে উৎসর্গ ক'রে নিজেকে সে ক'রে তোলে তাঁর একান্ত আশ্রয়ের উপযুক্ত। পত্নী ও মাতারূপেও সে তাই ভোলে নি প্রেমাবতারের জননীকে।

বহু বার মার্গরিৎ আর্ভের-এর কাহিনী পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, এ-ও বুঝি ভারতীয় এক তরুণী আমাদের ফরাসী খৃষ্টান আওতায় বড় হয়ে উঠেছে। তরু দত্তের চিঠি-পত্র প'ড়ে তার চরিত্র যে-রূপ নিয়ে আমার কাছে ধরা দিয়েছে, সেই তরু দত্তের কণ্ঠই যেন থেকে থেকে শুনতে পেয়েছি মার্গরিতের কণ্ঠে। এই নায়িকার মধ্যেই বার বার খুঁজে পেয়েছি তরু দত্তের নিরাবরণ কমনীয় সত্তাকে, তার হৃদয়ের স্পর্শকাতর ভালবাসাকে, ভগবানের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাসকে। শ্রীমতী আর্ভের-এর পিতৃভবনই যেন তরু দত্তদের বাসগৃহ। পিতা-মাতা পরিবেষ্টিত মার্গরিৎকে দেখে মনে পড়ে যায় বাবা-মার স্নেহনীড়ে লালিত তরু দত্তের মুখ।

মৃত্যুর যে-ভাবনা ধীরে ধীরে মার্গরিৎ আর্ভের-এর দিনপঞ্জীতে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে তা' লক্ষণীয়। ষোড়শীর মনে প্রথমে জেগেছে বিস্ময়, মানুষ কি ক'রে নিজের মরণ-কামনা করতে পারে? উদ্দাম যৌবনের সমস্ত প্রাণশক্তি দিয়ে সে প্রতিবাদ জানিয়েছিল এই এই মৃত্যুর বিরুদ্ধে, "হায় ভগিনী ভেরোনিক! কতই বা তাঁর বয়স!

* তরু দত্তের যে কয়টি রচনাবলীর উল্লেখ এ যাবৎ করেছি, তা ছাড়াও তার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির মাঝে পাওয়া গেছে কিছু মৌলিক ইংরেজী কবিতা এবং একটি ইংরেজী উপন্যাসের আটটি পরিচ্ছেদ।

এই ত সবে ছাব্বিশ বছর পূর্ণ হয়েছে (মৃত্যু? এত কাছে? পরম পিতার স্নেহে, আনন্দে মুখর এই গৃহ ছেড়ে যাওয়া? ভগিনী ভেরোনিক পরম সুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন! কেন, আমি বুঝে উঠতে পারি না। জীবন কি শুধুই তিক্ততার একটানা অভিজ্ঞতা? মাধুর্য কি সেখানে নেই?…এ অবধি আমি ব্যথা কি কোন দিন জানতে পারি নি। এই জগৎ…কী সুন্দর!"

কিন্তু ওর ভুল ভাঙতে দেরী হয় না। জীবন তার স্বরূপ নিয়ে মার্গরিতের সামনে আত্মপ্রকাশ করে। মানসিক উদ্বেগের পরেই আসে শারীরিক যন্ত্রণা: তরু দত্ত যথার্থ বাস্তবিক জীবনের রস দিয়ে তা' ব্যক্ত করেছে। লেখিকার নিজের জীবনের ছায়া ও অসুখের অন্তিম অভিজ্ঞতা পুরোমাত্রায় উপন্যাসের শেষ অংশটিকে সমাচ্ছন্ন করে তুলেছে মৃত্যু-চিন্তায়। তবু মৃত্যুর সাথে চিরন্তনের ধ্যানই গ্রথিত হয়ে আছে। ভগিনী ভেরোনিকের অন্তিম-শয্যায় যে অমরতার আলো দেখা দিয়েছিল, সেই আলোতেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মার্গরিতের শেষ মুহূর্ত, সেই আলোই ভাস্বর হয়ে ওঠে তরু দত্তকে ঘিরে।

মার্গরিতের মাঝে আমরা যদি তরু দত্তের ভাবধারা, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও অকাল-মৃত্যুর সাদৃশ্য পেয়ে থাকি, সে সাদৃশ্য এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ। তরু দত্তের জীবনে আসেনি সেই ঝড়, যে ঝড় মার্গরিতের জীবন-কলিকে অকালেই বৃন্তচ্যুত করল। অল্প বয়সেই তরু দত্ত ইহলোক ত্যাগ করে। দাম্পত্যের ও মাতৃত্বের প্রেম-রসে সে ছিল বঞ্চিত। শুধু তার হৃদয়ের প্রশস্ততাই কল্পনায় তাকে এ ভাব উপলব্ধি করতে সাহায্যে করেছিল। তার মা আর বাবা একমাত্র রয়ে গেলেন এই পৃথিবীতে—তার সাথে পরলোকে মিলিত হবার পরম-লগ্নের অধীর প্রতীক্ষায়! যদিও তার জীবনের স্মৃতি সবচেয়ে বড় ক'রে আঁকা আছে তার বাবা-মার অন্তরেই, তবু তার সাহিত্যের খ্যাতি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আজ পৌঁছে গেছে। ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে এই যশস্বিনীর গৌরব নিয়ে ইতিমধ্যেই কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। আমি বলতে পারি, ফ্রান্সেও চিরদিন সবাই স্মরণ করবে এই তরুণী বিদেশিনীকে, ফ্রান্সের দীনতম মুহূর্তে আপন ভাবা ও হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যে নিজেকে ফরাসীদের সাথে অভিন্নাত্মা মনে করেছিল।

অনুবাদ: পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আলো আলো চোখে

জয়ন্তী সেন

মেঘ থেকে মেঘ-যেন সিঁড়ির ক' ধাপ
আকাশের নীল হ্রদে সেখানে আনত
আলো আলো মুখ কার ছায়া ঘন সোনালী আভায়
চেনা মনে হয় তাকে বিকেলের ঝিলিমিলি রঙে।
সবুজ টিয়ার টিপ গোধূলির সলাজ কপালে
ভীরু পায়ে ধাপে ধাপে নীল জলে ছায়ার কাঁপন
হলুদ আঁচল ওড়ে এলোমেলো পাড়ের জরিতে
ছুটি তারা ঝিকিমিকি—চোখ ভরা সাঁঝের কাজল।
দেখেছি কি তারে কভু জীবনের চেনা সরণীতে
দিনের প্রখর রোদে— তারাহীন রাতের প্রহরে?
দিনের রাতের ঋতু পালা করে আসে বার বার
ক্রমাগত প্রত্যহের ফুল-ফোটা সাঙ্গ করে করে;
পরিচিত সেই ক্ষণে জীবনের হরেক তাগিদে
পাথুরে জমির পরে পথ কেটে চলার প্রয়াসে
স্বপ্নেরা উধাও পাখী—মেঘে তার চিহ্ন পলাতক।
শুধু গোধূলির ক্ষণে শেষ আলো-কণাটির মত
ছায়া তার ভাসে মনে মেঘে মেঘে আকাশের নীলে
পলক স্ফুলিঙ্গ তরে ভালো লাগে ক্ষণিক আভাস
কবিতার ছুটি কলি ভুলে যাওয়া গানের চরণ
হঠাৎ স্মরণে পাওয়া মধুস্মৃতি অনেক কালের
সে যেন মধুরতর আলো আলো চোখে চেয়ে থাকে
দিনের ভাটির শেষে তারা-জ্বলা হাসিটুকু নিয়ে।

স্মৃতিচিত্রণ

পরিমল গোস্বামী

বলাইচাঁদ এ সময়ে (১১২৫-২৬) 'বনফুল' নামে মোটামুটি পাঠকমহলে পরিচিত হয়ে গেছে। কিন্তু তবু লেখাটা তখন তার নিতান্তই একটা শখের ব্যাপার ছিল, যেমন তখনকার দিনের অধিকাংশ লেখকের ছিল। লেখা যে জীবিকারূপে গ্রহণ করা যায় তা সাধারণ শৌখিন কোনো লেখকেরই তখন মনে আসেনি। পরবর্তী যুগে বনফুল বহু চরিত্র সৃষ্টি করেছে তার গল্প এবং উপন্যাসে—সবই প্রায় তার নিজের দেখা চরিত্র। দেখার চোখ তার এমনই সজাগ যে খুটিনাটি কোনো কিছুই সে চোখ এড়ায় না, এটি বনফুলের লেখার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তবু এর আরম্ভে বলাই নিজেই যে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হয়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে খেয়াল তার ছিল না। খেয়াল না থাকার কারণ বলাই আত্মসচেতন ছিল না। তার নিজের সম্পর্কে কে কি ভাববে বা বলবে তা সে তার অসাধারণ ঔদাসীন্যে অগ্রাহ্য ক'রে চলার এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত আমার চোখের সামনে মেলে ধ'রেছিল। একটা দুর্দান্ত প্রাণশক্তি সমস্ত অভ্যস্ত চিন্তাধারাকে দুঃসাহসিক ব্যঙ্গের সাহায্যে উল্টে দিত। এ বিষয়ে তার মতো দ্বিতীয় আর কাউকে দেখিনি! এ দিক দিয়ে সে তার গুরু ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের উপযুক্ত শিষ্য ছিল। পোষাক পরিচ্ছদ ছেঁড়া হোক, গ্রাহ্য নেই। মাটিতে বসে পড়ত যেখানে সেখানে। চুলে চিরুনি পড়ত না আদৌ। ধুলো পায়ে বিছানায় শুয়ে পড়ত। দাড়ি গজাচ্ছে মুখে, ভ্রূক্ষেপ নেই। একটা বৈপ্লবিক স্বাতন্ত্র্য।

একবার তার ৩নং মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে থাকতে এক কন্যার পিতা তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। বলাই সোজা ব'লে দিল, "না আমি এখন বিয়ে করব না।" ভদ্রলোক তবু একবার মেয়ে দেখতে অনুরোধ জানালেন। বলাই তার উত্তরে বলল, "বিয়ে করতে চাইলে কনের নাক ক ইঞ্চি বা চামড়া কেমন তা কখনো দেখব না, দেখি তো ব্লাড স্পিউটাম ইউরিন রিপোর্ট দেখব। বিয়েতে আমার ন্যূনতম শর্ত থাকবে এই যে প্রথমত সে একটি মেয়ে হবে, দ্বিতীয়ত ম্যাট্রিকুলেশন পাস হবে, এ ভিন্ন চামড়ার রঙে বা নাকমুখের মাপে আমার ইণ্টারেষ্ট নেই।"

ভদ্রলোক অতঃপর আর আসেননি।

বলাই চরিত্রের আরও একটা দিকের কথা বলা দরকার। ভাঙার দিকটা বলেছি, গড়ার দিকেও সমান উৎসাহ ছিল। তখনকার একটি ঘটনা মনে পড়ছে! এক জটাজুটধারী ব্যক্তিকে তখন ট্রামে বা পথে প্রায় দেখা যেত। জটা আজানুলম্বিত, দাড়ি নাভিস্পর্শী এবং পরনে গৈরিকবাস। চেহারাটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। বলাই একদিন লক্ষ্য করল তার চোখের নিচে, গালের যেটুকু স্থান দেখা যায় সেখানে কে যেন চড় মেরে আঙুলের চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছে, জায়গাটি লাল হয়ে উঠেছে।

বলাই তাঁকে একদিন পথে ধ'রে বলল, "আপনার মুখে যে ভয়ঙ্কর অসুখের চিহ্ন দেখা দিয়েছে—হয় তো কুষ্ঠ হবে, অবিলম্বে চিকিৎসা করা দরকার। চলুন আপনার বাড়িতে সব ব্যবস্থা করছি।"

গেল তাঁর বাড়িতে। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবেশ। গুরুগিরি ব্যবসা। বলাইয়ের প্রস্তাব শুনে প্রায় কেঁদে ফেলেন ভদ্রলোক; বলাই বলেছিল জটা দাড়ি সব কামিয়ে ফেলতে। কিন্তু তিনি বলেন তা হলে শিষ্যবাড়িতে আর মান থাকবে না, ব্যবসা মাটি হবে। বলাই বলল "ও সব ছাড়ুন, প্রাণে বাঁচতে চান তো জটা কেটে ফেলুন, দাড়ি-গোঁফ কামান।"

অবশেষে তিনি প্রাণভয়ে সব প্রস্তাবেই রাজি হলেন। বলাই একদিন তাঁর রক্ত দিয়ে গেল পরীক্ষা করতে। ভাসারমান রি-অ্যাকশান পজিটিভ। ইনজেকশন চলল এবং তাঁর অনেকটা উন্নতিও হল। চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করেছিল বলাই। পথের লোক ধ'রে বন্ধুত্ব করার কথা আগে বলেছি। সে বন্ধুর বাড়িতেও বলাই নিজে খরচ ক'রে মাঝে মাঝে চিকিৎসা করেছে।

ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কথা বলছিলাম। তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। এমন চরিত্র সহজে দেখা যায় না। আজকের দিনের পাঠক তাঁকে চেনেন না, কিন্তু বাংলা ভাষায় তিনি ছিলেন স্যাটায়ারের রাজা। তাঁর নরকের কীট, দশচক্র প্রভৃতি রচনা আলোড়ন জাগিয়েছিল পাঠকসমাজে। কার্টুন ছবি আঁকায় তিনি অসাধারণ পটু ছিলেন। তাঁর অনেক কার্টুন ছবি শনিবারের চিঠিতে বেরিয়েছে, পরে ভারতবর্ষেও দেখেছি। বিচিত্রায় তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা নামক তাঁর সচিত্র হারুর জীবনী যাঁরা পড়েছেন তাঁরা আজও তাঁর কবিতা রচনার ক্ষমতার কথাও মনে রেখেছেন নিশ্চয়।

তিনি কারো ব্যবহারের অপরিচ্ছন্নতা সহ্য করতে পারতেন না।

এ জন্য অনেকে তাঁকে ভয় করে চলত। বলাইয়ের মুখে তাঁর সম্পর্কে যে দু' একটি গল্প শুনেছি, তা থেকে তাঁর চরিত্রের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

একবার এক ভদ্রলোক কোনো রোগীর জন্য বিশেষ একটি ওয়ার্ডে বেড পাওয়া যাবে কি না জানতে এসেছিলেন বনবিহারী বাবুর কাছে। বনবিহারী বাবু বেশ ভদ্রভাবে তাঁকে বললেন, "এখন বেড খালি নেই, মাঝে মাঝে এসে খোঁজ ক'রে যাবেন।"

কথাটি স্বভাবতই ভদ্রলোকের মনের মতো হয়নি, অতএব তিনি পুনরায় অন্যত্র চেষ্টা করতে গেলেন। কিন্তু যাঁর কাছে গেলেন তিনিও পুনরায় ভদ্রলোককে বনবিহারী বাবুর কাছেই নিয়ে এলেন। বনবিহারী বাবু চকিতে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললেন, "বসুন।" খুব আদর ক'রে কাছে বসালেন। তার পর তাঁর হাতের কাজ সেরে দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রলোকের কানের কাছে মুখ নিয়ে আগে যেসব কথা বলেছিলেন সেই সব কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। বললেন, "এখন বেড খালি নেই, মাঝে মাঝে খোঁজ ক'রে যাবেন।" এক কানে ব'লে, ঐ কথাই আর এক কানে বললেন, এবং একবার এ কানে আর এক বার ও কানে বলতে লাগলেন। তারপর দু'চার জন ছাত্রকে ডেকে বললেন, আমি আর বলতে পারছি না, এবারে এক এক ক'রে তোমরা বলতে থাকো, ইনি কথা সহজে বুঝতে পারেন না, কিন্তু এঁকে বোঝাতেই হবে এখন বেড খালি নেই, মাঝে মাঝে খোঁজ নিতে হবে। তোমরা সে ভার নাও।"

ভদ্রলোক প্রথমে হঠাৎ ধারণাই করতে পারেন নি কি ব্যাপার, কারণ ঘটনাটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং অতর্কিত, কিন্তু যখনই বুঝলেন তখনই লজ্জায় অত্যন্ত বিপন্ন বোধ ক'রে দ্রুত পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন বনবিহারী বাবু আউটডোরের রোগী দেখছিলেন, এমন সময় উপস্থিত রোগীদের ভিড় ঠেলে এক ভদ্রলোক কোনো এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের পরিচয়পত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন বনবিহারী বাবুর কাছে, এবং সেই চিঠিখানি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, "আমাকে একটু আগে দেখে দিন দয়া ক'রে।"

বনবিহারী বাবু চিঠিখানা দেখেই ছাত্রদের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "ইনি ডাক্তার—এর চিঠি এনেছেন, তোমরা সবাই মিলে এঁকে নিয়ে নাচো, আমিও কাজ শেষ ক'রেই আসছি।"

আগে-আসা রোগীদের ঠেলে কারো চিঠির জোরে সুবিধে আদায় করতে আসা বনবিহারী বাবু সহ্য করতে পারেন নি। আর একটি ঘটনায় তাঁর ব্যঙ্গের আর একটি দিকের পরিচয় পাওয়া যাবে। সেদিন আমি সঙ্গে ছিলাম। বলাই ও আমি অনেক বার তাঁর বাড়িতেও গিয়েছি। গাড়িতে বেরোলে বনবিহারী বাবু মাণিকতলা স্ট্রীটের কাছাকাছি এসে গাড়ি থামিয়ে একটা হোটেল থেকে ফাউল কাটলেট আনিয়ে নিতেন, আমরা সবাই তার অংশ গ্রহণ করতাম। সেদিন আমরা তিন জনেই নেমে কাছের একটি সাময়িকপত্রের স্টলে দাঁড়িয়ে নতুন কাগজগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। এমন সময় বলাই একখানা ইংরেজী পত্রিকার একখানা পাতা খুলে বনবিহারী বাবুকে দেখিয়ে বলল, "এই দেখুন, এঁরা লিখেছেন, যে-থিয়েটারে বারবনিতারা অভিনয় করে, সে-থিয়েটার কারো দেখা উচিত নয়।"

বনবিহারী বাবু তৎক্ষণাৎ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন এবং বললেন, সত্যি কথা লিখেছে। থিয়েটারে অভিনয় করতে হলে অধিকাংশ সময় ওদের চিন্তা করতে হবে কি ক'রে ভাল আর্টিষ্ট হওয়া যায়, কি ক'রে অভিনয়ে নাম করা যায়, তদুপরি নিজ নিজ ভূমিকা মুখস্থ করতে এবং রিহার্সাল দিতে দিন-রাতের অনেকখানি অংশ ওদের নষ্ট হয়ে যাবে—সমাজের এত বড় ক্ষতি সহ্য করা উচিত নয়, কারণ যারা বারবনিতা, তাদের ধর্ম হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা সেক্স আলোচনা করা। থিয়েটার করতে গেলে সেই ধর্ম থেকে ওরা যে ভ্রষ্ট হবে, অতএব ওদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

আর একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র—শিবদাস বসুমল্লিক। তার চরিত্রও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমি এ রকম একটি চরিত্র কল্পনাই করতে পারি নি। তাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। দারিদ্র্যের সঙ্গে এমন হাসিমুখে লড়াই করতে আর আমি দ্বিতীয় কাউকে দেখি নি।

শিবদাস সামান্য স্থূলকায় ছিল। মুখখানা গোলগাল শার্টের উপর বুকখোলা কোট, ধুতি মালকোঁচা মেরে পরা, মুখে একটু বিষণ্ণতার ছাপ, হাসলে সে হাসি শিশুর মতো সরল এবং সুন্দর, হয় তো বা একটুখানি বিষণ্ণতার ছোঁয়াচ তাতে ছিল বলেই তা এমন সুন্দর। এমনি চরিত্র অথচ মধুর ব্যঙ্গপ্রিয় এবং দুষ্টুমি বুদ্ধিতে ভরা। প্রায় সব সময় সে সাইকেলে চড়ে বেড়াত। সে কারো কাছে সামান্য উপকার পেলে তার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করত। উপকারের সম্ভাবনাতেও পায়ের ধুলো মাথায় মাখা তার ছিল রীতি। এ বিষয়ে বয়স জাতি বা শ্রেণীভেদ তার কাছে ছিল না। ঝাড়ুদারের পায়ের ধুলো নিয়েছে সে অবলীলাক্রমে। কেউ হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছে, কেউ চমকে উঠেছে, কেউ সন্দেহ করেছে, কিন্তু প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে শিবদাস যখন সরল হাসিটি হেসে বলত, "আপনি আমার জ্যেষ্ঠ, আপনার পায়ের ধুলো আমাকে নিতেই হবে, জ্যেষ্ঠ কি না বলুন"—তখনই সন্দেহকারীর সকল সন্দেহ দূর হয়ে যেত, তখন সে পুনরায় তার পায়ের ধুলো নিত।

এক দিন এক বিয়ের প্রীতি উপহার ছেপে নিয়ে আসা হচ্ছিল চিৎপুর থেকে। বটতলায় কয়েকটি প্রেস আছে যেখানে অতি অল্প সময়ে ছোটখাটো জিনিস ছাপিয়ে আনা যেত। রবিবারেও কাজ হত সেখানে। এই রকম একটি জরুরি অবস্থায় সেখানে যাওয়া হয়েছিল। আমরা তিন জন গিয়েছিলাম সেখানে।

"এখন বেড খালি নেই, মাঝে মাঝে এসে খোঁজ ক'রে যাবেন।"

শিবদাস তার বাহনটিকে হাতে ঠেলে চলছিল। শুধু উপহারের প্যাকেটটা আমাদের কারো হাতে ছিল। এমন সময় বীডন ষ্ট্রীটে মিনার্ভা থিয়েটারের কাছাকাছি বিপরীত দিকের একটি বাড়ির সঙ্গে সাইকেলটি হেলান দিয়ে রেখে ভিতরের এক হারমোনিয়াম মেরামতের দোকানে ঢুকে গিয়ে বলল, "দাদা, এক খণ্ড দড়ি দেবেন? বড় বিপদে পড়েছি।" দোকানী এক খণ্ড দড়ি তার হাতে তুলে দিল। শিবদাস তৎক্ষণাৎ তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল। উঠে দেখে দোকানী লাফিয়ে শূন্যে উঠে পড়েছে—মুখে ধ্বনিত হচ্ছে "এ কি কাণ্ড, এ কি করেন মশায়।" শিবদাস গম্ভীর ভাবে বলল, "আপনি যে উপকার করলেন তা কজন করে বলুন? তা ভিন্ন আপনি আমার জ্যেষ্ঠ, পূজনীয়, আবার আপনার ধূলো দিন।"—শিবদাস গম্ভীর ভাবে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে উপহারের প্যাকেটটি সেই দড়ির সাহায্যে তার সাইকেলের কেরিয়ারের সঙ্গে বেঁধে নিল।

শিবদাস কোষ্ঠী বিচার শিখেছিল। প্রথম পরীক্ষার সময় সে আপন কোষ্ঠী বিচার ক'রে বুঝতে পারে সে সময় সকল গ্রহই তার প্রতিকূলে, অতএব পাস করা তার হবে না। এমনি অবস্থায় গুজব শুনতে পেল সে সব বিষয়ে পাস করেছে। শুনে মনটা তার খারাপ হয়ে গেল। তবে কি তার বিচারে ভুল হল? সে একে একে প্রত্যেক পরীক্ষকের কাছে যেতে লাগল সত্য যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে। যেখানে যায় শোনে পাস করেছে। শুধু একজন পরীক্ষক মার্ক বললেন না, এবং শুধু তাই নয় তিনি অত্যন্ত কড়া লোক ছিলেন—আইন না মেনে মার্ক জানতে আসাতে তিনি শিবদাসকে তাঁর বিষয়ে ফেল করিয়ে দিলেন।

শিবদাস ফেল করেছে জানতে পেরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল—কারণ গণনা মিলে গেছে।

সেটি সম্ভবত ১৯২৫ সাল। শিবদাসের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েতে আমরা উপস্থিত ছিলাম। বিয়ের কিছুদিন পরেই কোনো একটি ঘটনা নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তার কিছু মনান্তর ঘটে, এবং এই ব্যাপার নিয়ে কিছু চিঠি লেখালেখি চলে। একদিন শিবদাস আমাদের কাছে প্রস্তাব করল সে সবগুলো চিঠি পড়ে শোনাবে। সে যত চিঠি লিখেছিল তার নকল রেখেছিল।
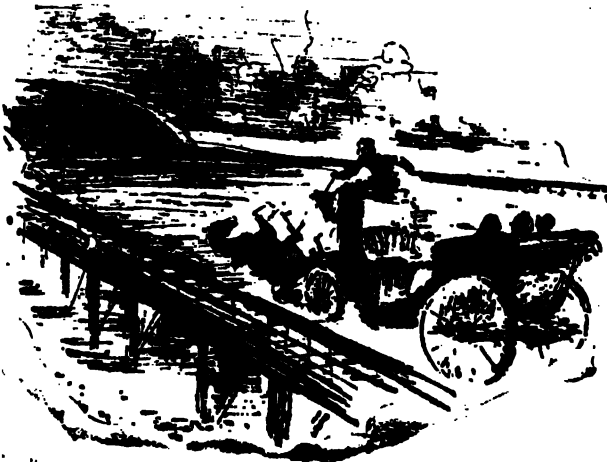
ঘোড়া আছাড় খেয়ে প'ড়ে গেল।

তাই ঠিক হল। অনেক চিঠি, কোথায় পড়া যায়? বলাই বলল, রাত্রে ময়দানে গিয়ে কোনো আলোর নিচে ব'সে পড়লে বেশ হয়। অগত্যা তাই ঠিক হল। আমরা সেখানে গেলাম রাত বারোটা আন্দাজ সময়ে। টীকা টিপ্পনিসহ সমস্ত চিঠি পড়া শেষ করতে মোট তিন ঘণ্টা লেগেছিল। সে প্রকাণ্ড এক ফাইল। শিবদাস সব বিষয়ে ছিল নিখুঁত।

রাত তিনটেয় কোথায় যাওয়া যায়? ঠিক হল একটা ফীটন ভাড়া ক'রে সকাল পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে বেড়াব। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া, শিশিরে ঘাস ভিজে উঠেছিল। শীত অনুভব হচ্ছিল বেশ। চা খাওয়া দরকার। আমরা তখন ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ধ'রে চলেছি। শিবদাস হাঁকল চালাও হাওড়া ষ্টেশন। চা খাওয়া দরকার, অতএব হাওড়া ষ্টেশন।

এই অতএবটা আমাদের ভ্রান্তি। হাওড়া ষ্টেশনের ষ্টল যে রাত্রিকালে বন্ধ হয়ে যায় সে খেয়াল কারোই ছিল না। ষ্টেশনের গাড়ি-বারান্দায় আমাদের ফীটন গিয়ে দাঁড়াল, আমরা নেমে ভিতরে গেলাম। সেখানে এক পুলিস কনষ্টেবল আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। শিবদাস বলল আমরা চা খেতে এসেছি। কনষ্টেবল আমাদের বুঝিয়ে বলল রাত্রে ষ্টল খোলা থাকে না, চা এখন পাওয়া যাবে না। শিবদাস তৎক্ষণাৎ তার ডান হাতখানা খপ করে ধ'রে হস্তরেখা বিচার করতে লাগল। কি বলেছিল মনে নেই, তবে তার ক'টি সন্তান তার সংখ্যা বলেছিল এবং তা মিলে গিয়েছিল। কনষ্টেবল মহা খুশি, সে বলল "দাঁড়ান চায়ের ব্যবস্থা করছি"—বলে কোথায় চলে গেল এবং মিনিট পনেরো পরে ফিরে এলো এক চাওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে। তিনটি মাটির ভাঁড়ে তিনজন সেই চা খেলাম, চায়ে দুধের বদলে ক্ষীর! উপাদেয় লেগেছিল।

এই প্রথম দেখলাম শিবদাস উপকারীর পায়ের ধুলো নিল না, খুব ভারিক্কে চালে গাড়িতে এসে উঠল। গাড়িতে উঠতে দেখি আর একটি কনষ্টেবল এগিয়ে এসে আমাদের খুব খাতির করতে লাগল। শিবদাস দুজনকেই কিছু বখশিস দিতে গেল, তারা বখশিস নিতে অস্বীকার করল। গাড়ি তখন ছেড়ে দিয়েছে। শিবদাস বলল "ঠিক করেছ না নিয়ে—এইটেই আমরা দেখতে এসেছিলাম।" কনষ্টেবলেরা তা শুনে আরও একবার সামরিক ভঙ্গিতে সালাম জানাল।

ফিরতে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। হাওড়া ব্রিজ তখন ভোরবেলা খুলে দেওয়া হত সপ্তাহে কয়েক দিন। আমরা ব্রিজ পার হওয়ার সময়েই খুলে দেওয়ার সময় হয়েছিল। গাড়ি সব থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ঘণ্টা বেজে গেছে। আমাদের কোচম্যান হঠাৎ গাড়ি খুব জোর ছুটিয়ে দিল ব্রিজ খুলতে খুলতেই যাতে পার হয়ে যেতে পারে, নইলে অন্তত ঘণ্টা দুই দেরি হবে। পার হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু পার হয়েই ঘোড়া আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। হৈ হৈ ব্যাপার। শিবদাস ভীষণ রেগে গেল কোচম্যানের উপর। আমরা দৈবাৎ বেঁচে গিয়েছিলাম, কারণ গাড়িটা সোজাই দাঁড়িয়ে ছিল। ঘোড়াকে তুলে দেবার পর গাড়ি আবার চলতে আরম্ভ করল।

সমস্ত রাত বাইরে থাকার ফলে আমি সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলাম এবং কয়েকদিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল সেজন্য।

শিবদাস কলেজে পড়ার খরচ চালাতো নিজে উপার্জন ক'রে। খুব পরিশ্রম করতে হত, সেজন্য পড়ায় যতটা মনোযোগ দেওয়া দরকার, তা দিতে পারত না। সেজন্য সে প্রথম এম-বি পরীক্ষাতে মেটেরিয়া মেডিকায় ফেল করেছিল। সম্ভবত ওষুধের মাত্রা মুখস্থ ছিল না। ছোট একখানি বই তার হাতে দেখেছি, তাতে ওষুধের মাত্রা ছাপা ছিল। সেই বই সে মন্ত্রের মতো মুখস্থ করবে ব'লে উঠে-পড়ে লাগল। ফেল ক'রে শিবদাস একবারই মাত্র খুশি হয়েছিল, কারণ তাতে ছিল তার কোষ্ঠীবিচারের নির্ভুলতার প্রশ্ন। এবারের ফেল করার জন্য সে তৈরি ছিল না। কিন্তু জেদ ছিল তার অত্যন্ত বেশি। সে ওষুধের মাত্রা এ থেকে জেড পর্যন্ত মুখস্থ করবেই, যাতে একটিও ভুল না হয়। অর্থাৎ প্রায় চার শ' সাড়ে চার শ' ওষুধের মাত্রা মুখস্থ করতে হবে।

ডোজের বইখানা সে সর্বদা পকেটে নিয়ে ঘুরত। কিন্তু একা একা মুখস্থ করা বড্ড একঘেয়ে লাগে। কোথায়ও ভুল হলে নিজে বই খুলে যাচাই করতে হয়, তা ভিন্ন ভুল হচ্ছে কি না তা চেক করা নিজে নিজে সম্ভব নয়। অতএব সে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে একটি কৌশল উদ্ভাবন করল। পথে চলতে চলতে শিবদাস হঠাৎ সাইকেল থামিয়ে কোনো পছন্দসই ভদ্রলোকের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়েই বলল, "দাদা, আমি মেডিক্যাল ছাত্র, পরীক্ষায় ডোজে ফেল ক'রেছি, আপনি এই বইখানা খুলে ধরুন, আমি মুখস্থ ব'লে যাই, ভুল হলে ব'লে দেবেন।" মুখে করুণ সরল হাসি। ভদ্রলোক চিন্তা করবারও অবসর পেলেন না যে, তিনি কি করছেন। কিন্তু তাঁর না ক'রে উপায় ছিল না। শিবদাসের বালকোচিত সরল অনুরোধ, অন্যায় কিছু নয়, কিন্তু অভূতপূর্ব। হয়তো ভদ্রলোক কিছু গর্বও বোধ করলেন।

ঘটনাটির মৌলিকতা লক্ষণীয়।

শিবদাসের মুখস্থ বলা আরম্ভ হয়ে গেল। কিছু পরেই ভদ্রলোক [illegible] "এবারে একটু ভুল হল।"

শিবদাস থমকে দাঁড়াল। তা হলে মুখস্থ ঠিক হয়নি। বইখানা ভদ্রলোকের হাত থেকে খপ ক'রে কেড়ে নিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, "হ'ল না দাদা, আমি একটি চাম লোদকু"—ব'লেই দ্রুত সাইকেল চালিয়ে দিল।

শিবদাসের নিজস্ব গড়া কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ ছিল। ওর মুখে উচ্চারিত হলে তার বেশ একটি অর্থ ফুটে উঠত। 'লদকালদকি' এই রকম একটি শব্দ, মানে ঢলাঢলি, খুব শোনা যেত তার মুখে। "চাম লোদকু" ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন অর্থ। কখনো নির্বোধ, কখনো কৃপণ, কখনো ধূর্ত।

চৌরঙ্গী প্লেসের মোড়ে এক প্রহরী পুলিসের পায়ের ধুলো নিয়ে খুব বিনীতভাবে এবং সসম্মানে জিজ্ঞাসা করল, "আপকা ইডিয়সি কনজেনিট্যাল হ্যায় কি অ্যাকোইয়ার্ড হ্যায়?" কিছুই বুঝতে না পেরে কনষ্টেবল গর্বের সঙ্গে বলল "কন্জেনিট্যাল হ্যায়।" শিবদাস বলল "ও! আপ একদম বরন্ (born) ইডিয়ট হ্যায়, তা হলে ঠিক আছে, আমি এই গলিতে একটি নিষিদ্ধ কাজ করব, আপনি একটু পাহারা দিন" বলে সাইকেলটি তার হাতে দিয়ে যথাকর্তব্য করতে গেল। কনষ্টেবলটি যে অন্যায় নিবারণের জন্য সেখানে ছিল, সেই অন্যায়টিই শিবদাস করল তাকে পাহারা রেখে, এ শুধু শিবদাসের পক্ষেই সম্ভব। তার লোক বশ করার বিদ্যা ছিল একেবারে অমোঘ।

এই চরিত্রের অনুকরণ হয় না। এ তার ব্যক্তিত্বের নিজস্ব রূপ আর পাঁচজনকে ছেড়ে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তার চেহারার সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গে এ সব উদ্ভট ব্যবহার এমন মানিয়ে গিয়েছিল যে এ সব বাদ দিয়ে তাকে ভাবাই যেত না। সব চেয়ে বড় কথা শিবদাসের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ প্রাণধর্ম ছিল, তেজও ছিল অসাধারণ। তার হাসিটি সব সময় বেদনামণ্ডিত মনে হত, সেজন্য সে একটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক চরিত্র ছিল।

দারিদ্র্য ছিল তার প্রথম ছাত্রজীবনে। কিন্তু তা সে দৃঢ়তার সঙ্গে জয় করেছিল এবং অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছিল। তার এম-বি পাস করার পর তার সঙ্গে আমার অনেকদিন দেখা হয়নি, কারণ আমি কিছুদিন কলকাতায় ছিলাম না। হঠাৎ কয়েক বছর পরে একদিন কর্পোরেশন ষ্ট্রীট ও গ্র্যাণ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে দেখা। ছোট গাড়ি একখানা আমার পাশ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

সে দিকে ফিরে চাইতে না চাইতে গাড়ির চালক শিবদাস খপ ক'রে আমার হাতখানা ধ'রে তার অভ্যস্ত সরল হাসিতে মুখখানা উদ্ভাসিত ক'রে ক্রমাগত বাংলায় এম-এ পরীক্ষার পাঠ্যের নাম ক'রে যেতে লাগল এবং বলল "এর মধ্যে তোমার কাছে কি কি বই আছে?"

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। ভুল শুনছি না তো? কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই সে তেমনি হেসে বলল, "বাংলায় এম-এ দিচ্ছি।"

খবরটি আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল শিবদাস-চরিত্রের সঙ্গে এর অসঙ্গতি নেই কিছু, একমাত্র তার পক্ষেই এম-বি পাস করার পর বাংলায় এম-এ পরীক্ষা দিতে উৎসাহী হওয়া সম্ভব। পরে শুনেছিলাম সে এম-এ পাস করেছিল। আরও পরে আরও একটি খবরে অত্যন্ত বেদনা বোধ করেছিলাম— শিবদাস মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। খবরটি যতদূর মনে পড়ে তার ভাইপোর কাছ থেকে শুনেছিলাম।

১৯২৬ সালে যেবারে বলাই এম-বি পরীক্ষা দেবে, সেই বছরেই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় সেখানে যেতে হল সরকারী আইনে। কারণ বলাই বিহার-প্রবাসী বাঙালী, অর্থাৎ বিহারী, অতএব

"আপনি এই বইখানা খুলে ধরুন, আমি মুখস্থ বলে যাই।"

বাংলায় পড়া চলবে না। সুতরাং সে কলকাতায় এম-বি হল না, বিহারের এম-বি বি-এস হল। এই সময় ইণ্টারন্যাশনাল বোর্ডিং-এর অন্যান্য ডাক্তারি ছাত্রও শেষ পরীক্ষা দিয়ে চলে গেলেন। অতঃপর এলেন এক দল এঞ্জিনিয়ার। আমাদের পুরাতন সহবাসী ছিলেন শ্রীরামপুরের বিভূতি মুখুজ্জে। তিনি খুব আমুদে প্রকৃতির, হৈ হল্লা ক'রে খুব জমিয়ে রাখতেন। তিনি ডাক্তারদের মরশুম থেকে সুরু ক'রে এঞ্জিনিয়ারদের মরশুম এবং তার পরবর্তী কালেও ছিলেন। আর একটি রহস্যপূর্ণ চরিত্রের লোক ছিলেন এখানে। তিনি জার্মানি ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি ঘুরে এসেছিলেন। কেন, তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য ছিল, কেননা তিনি ইংরেজী বা জার্মানি কিছুই ভাল জানতেন না। কিন্তু তাঁর খুব অধ্যবসায় ছিল। মাঝে মাঝে ভোরবেলা উঠে জার্মান বা ইংরেজী অভিধান খুলে নিয়ে চিঠি লিখতে বসতেন। একখানা চিঠি শেষ করতে দু'তিন দিন লাগত। ইংরেজ ও জার্মান মেয়েদের চিঠি দুইসব। প্রণয়পত্র সবই। দেখিয়েছিলেন দু' একখানা।

অতুলানন্দ চক্রবর্তী তখন ইণ্টারন্যাশনাল বোর্ডিং-এর বাসিন্দা। সে এই ভদ্রলোককে ঠাট্টা ক'রে বলত প্রণয়পত্র লেখা যে কারো কাছে এমন সিরিয়াস ব্যাপার হতে পারে তা তো জানতাম না, আমরা তো জানি ওটি একটি আমন্দের ব্যাপার। এই ভদ্রলোক আমাকে খুব পছন্দ করতেন, কেননা চিঠিলেখায় আমি তাঁকে অনেকবার সাহায্য করেছি। ইংরেজ মেয়ের চিঠিগুলো আমাকে দেখাতেন। তাতে তাঁর প্রণয়িনী লিখছে, "আর কত দিন অপেক্ষা করব, তুমি আমাকে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, আমি দিন গুনছি!"

ভদ্রলোক যে মেয়েটিকে ধাপ্পা দিয়েছেন তা বুঝতে দেরি হল না। ইনি, লণ্ডনের এক স্কুলের মেয়ে, নাম নেলি, তার সঙ্গে চিঠিতে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, সে মেয়েটি অনেকদিন আমাকে চিঠি লিখত পড়াশোনা আর ছবি আঁকার ব্যাপার নিয়ে। তার আঁকা জলরঙা একগুচ্ছ ভায়োলেটের ছবিটি খুব সুন্দর হয়েছিল, সে ছবির প্রশংসা করাতে কি খুশি!

একদিন এই ভদ্রলোকের সমস্ত গায়ে র‍্যাশ বেরোল। দারুণ ভয়ের ব্যাপার। তখন ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএ ডাক্তার কেউ ছিল না, আমি নিজে থেকে ডেকে আনলাম আর এক বন্ধুকে, তিনি ডাক্তারি ছাত্র। নাম সমরেশ ভট্টাচার্য, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের বিখ্যাত সার্জ্জন সুরেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্র। সমরেশকে বললাম, ভাই একটা ব্যবস্থা কর, সবাই সন্দেহ করছে স্মল পক্স হয়েছে। ভয় পাচ্ছে সবাই! সমরেশ একটুখানি দেখেই আমাকে বাইরে এসে গোপনে বলল স্মল নয় বিগ।

সমরেশ পরে এসে তাঁর রক্ত নিয়ে গেল, ভাসারমান রিঅ্যাকশন পজিটিভ। ওষুধের ব্যবস্থা হল, কিন্তু কেন যে রোগী ইনজেকশন ইত্যাদি বিনামূল্যে হওয়া সত্ত্বেও নিতে অস্বীকার করলেন জানি না। তবে জানা গেল ইতিমধ্যে তিনি কোনো এক দৈব ওষুধের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তারপর অনেকদিন তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। পরে শুনেছি কোনো এক সন্ন্যাসীর চেলা হয়ে তিনি গঞ্জিকা আকর্ষণে এবং সন্ন্যাসধর্মে অনেক দূর এগিয়েছেন, গায়ে ভস্ম মেখে থাকেন! তারও পরে শুনেছি তিনি আর বেঁচে নেই।

ইণ্টারন্যাশনাল বোর্ডিংএ থাকতেই আমি ছোট ছোট নক্সা লিখতে আরম্ভ করি। সে সব ছোটখাটো কাগজে ছাপা হত। বলাইও লিখত। আমাদের দুজনেরই তখন লেখার পরিমাণ ছিল কম। এবং তারও একটা বড় অংশ ছিল ফরমায়েসি বিয়ের উপহার লেখা। বলাইয়ের বিয়েতে আমি নানা নামে একখানা বইয়ের আকারে অনেকগুলো উপহার কবিতা ছাপিয়েছিলাম। নানা ছন্দে লেখা ছিল কবিতাগুলো। ১৯২৬ সালে বিচিত্রায় আমার একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়—নাম আর্টের অর্থ; এ প্রবন্ধের কথা আগে একবার বলা হয়েছে। এরই কাছাকাছি সময়ে কল্লোলের দিনেশরঞ্জন দাশের সঙ্গে পরিচয় হয়। কি ভাবে হয় তা আর মনে পড়ে না। তাঁর অনুরোধে কল্লোলে দুটি ব্যঙ্গ গল্প লিখেছিলাম। কাজি নজরুল ইসলাম 'নওরোজ' নামক একখানা কাগজ বের করেন, তিনিও আমার একটি ব্যঙ্গ রচনা ছেপেছিলেন। দীর্ঘ ইউরোপ প্রবাসখ্যাত গিরিজা মুখোপাধ্যায় তখন সেণ্টপলস্-এর ছাত্র, তিনি সেঁউতি নামক একখানা মাসিকপত্র বের করেছিলেন। সে কাগজে ব্যঙ্গ রচনা লিখেছিলাম, বলাইও লিখেছিল।

একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ব্যঙ্গ গল্প লিখি ১৯২৬ সালে। সেই আমার প্রথম বড় ব্যঙ্গ গল্প। কোনো বন্ধু সেটি প'ড়ে আমার কাছ থেকে নিয়ে যান মাসিক বসুমতীতে। বসুমতী (চৈত্র ১৩৩৩) সংখ্যায় সেটি ছাপা হয়েছিল, বসুমতী সিলভার জুবিলি সংখ্যায় সেটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তখনকার সকল ব্যঙ্গ লেখাতেই একটা অপরিপক্কতার ছাপ স্পষ্ট, এবং স্বভাবতই।

লেখা তখনকার দিনে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ আনন্দাৎ, উপার্জনেচ্ছায় কদাপি নয়। লেখা ছাপা হলেই একটা তৃপ্তি। কল্লোলে লিখলেও দিনেশরঞ্জন ভিন্ন কল্লোল-গোষ্ঠীর অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে অনেক পরে, সম্ভবত পাঁচ ছ' বছর পরে। দিনেশরঞ্জন দাশ ব্যক্তিটি বড়ই সহৃদয় এবং মনখোলা ছিলেন। আমার সঙ্গে [illegible] প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কিছুদিনের মধ্যেই এবং [illegible] তিনি আমার লেখা পছন্দ করতেন। ফোটোগ্রাফিতে তাঁর আকর্ষণ ছিল, এ বিষয়ে আমি তাঁকে সাহায্য করেছি অনেক পরে।

ইণ্টারন্যাশনাল বোর্ডিং-এ এই সময়ের মধ্যে আর একজন অধিবাসীর কথা মনে পড়ে। নাম ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি নৃতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত হয়েছেন পরে। এঞ্জিনিয়ার দলের মধ্যে কাশীর তারাচরণ গুইনের কথা আগে মনে পড়ে। তিনি তখন বি-ই পাস ক'রে রেলে চাকরি করতেন, শিয়ালদয়ের পথে তিনি ছিলেন ডেইলি প্যাসেঞ্জার। তিনি সাহেবী পোষাকে থাকলে কেউ তাঁর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে ইতস্তত করত। তাঁর দেহ দীর্ঘ, পেশীবিন্যাস স্যাণ্ডোর মতো। এ দুইয়ের যোগাযোগ বাঙালীর মধ্যে আমি আর দেখিনি। তারাচরণ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন এবং নিজে গাইতেন। ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএ এই উপলক্ষে মাঝে মাঝে গানের আসর বসত। গুণী গায়কেরা আসতেন।

তারাচরণ গুইন আমাকে স্বাস্থ্যচর্চায় দীক্ষা দিয়েছিলেন, আমার মতো ক্ষীণ দেহেও চড়তে চড়তে ক্রমে পঁচিশটি ডন এবং পঁচিশটি বৈঠকে উঠেছিলাম। আগে স্কুলজীবনে স্যাণ্ডোর চেষ্ট এক্সপ্যাণ্ডারের সাহায্যে মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যচর্চা করেছি। তার কোনো সময় স্থির ছিল না, এবং মাত্রাও সাধ্য সীমা ছাড়িয়ে যেত। তবে তারাচরণ

গুইনের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে পাকস্থলীর কিছু উপকার হয়েছিল, কারণ কিছুকাল ধ'রে জারক রসসমূহ যথা পরিমাণ নির্গত হয়েছিল তাদের নিজ নিজ গুপ্ত বাস থেকে। এই তারাচরণ পরে শুনেছিলাম রেওয়া রাজ্যের এঞ্জিনীয়ার হয়েছেন। কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও বিশেষ সখ্য হয়েছিল, পরে তাকে হুগলী জেলা এঞ্জিনীয়ার রূপে দেখেছি।

ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএর ম্যানেজার প্রথমে ছিলেন মাখনবাবু, পরে রবি রক্ষিত। ইনি মণিবাবু নামে পরিচিত। সাইকেলে দূর ভ্রমণ ক'রে খ্যাত হয়েছিলেন, সাঁতারেও বেশ নাম ছিল। তিনি আমাদের বন্ধুস্থানীয় হয়ে উঠেছিলেন। মাস ছয়েক আগে আ-কটিতটবিস্তারী দাড়ি চুল নিয়ে দেখা করেছিলেন, পরিচয় না দেওয়া পর্যন্ত চিনতে পারিনি। রবি রক্ষিতকে ইতিপূর্বে শেষ দেখেছিলাম ১৯৪৩ সালে এ-আর-পি কর্মীরূপে সাইকেলে ছুটতে। তার পরেই এই প্রায় সন্ন্যাসী বেশ।

চেনা-অচেনার ব্যাপার নিয়ে আরও দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গেই সেগুলো ব'লে রাখি।

যুদ্ধের মধ্যে ১৯৪৪-৪৫ এর কোনো এক সময় গ্রে ষ্ট্রিটে এক মিলিটারি অফিসারের পাশ কাটিয়ে যেতে তিনি খপ ক'রে আমার হাত ধ'রে হেসে বললেন, "চিনতে পারেন?" আমি বলি, "না"। তিনি ভীষণ বিস্মিত হয়ে বললেন, "সে কি কথা?—দেখুন ভাল ক'রে ভেবে।"

দু তিন মিনিট কেটে গেল কিছুই মনে পড়ল না। তখন তিনি একটু দমে যাওয়া সুরে বললেন শরৎদার কথা মনে নেই ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএর?

এবারে আমার বিস্মিত হবার পালা। ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএ কিছুকাল আগে আমরা একত্র কাটিয়েছি, এবং তা দুচার দিন মাত্র নয়। আমরা একসঙ্গে অতুলানন্দ, রবি রক্ষিত প্রভৃতি মিলে গ্রুপ ফোটো তুলিয়েছি। শরৎ সেন এম বি পাস ক'রে আয়ুর্বেদ এবং আইন পড়ছিলেন। তিনি সবারই শরৎদা ছিলেন, এই মানুষকে চিনতে পারিনি!

পরে ভেবে দেখেছি এর যুক্তিসঙ্গত কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত তাঁর চমৎকার দুপাটি দাঁতের একটিও মুখে ছিল না, তাঁর গৌরকান্তি কৃষ্ণ কান্তিতে পরিণত এবং পোষাক ষোল আনা মিলিটারি। তবু এ ঘটনাটি আমাকে খুব ভাবিয়েছিল এবং এই বিষয় নিয়েই ১৯৪৬ সালে "নতুন পরিচয়" নামক একটি গল্প লিখেছিলাম, সেটি ঐ বছরেই প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল। (পরে গল্পটি "মারকে লেঙ্গে" বইতে ও শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প সংকলনে স্থান পেয়েছে।)

আরও একটি মজার ঘটনা। বছর চারেক হয়ে গেল। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ট্রামে উঠেছি। পুরনো গদিহীন ট্রাম। উঠেই ভিতরে প্রবেশ ক'রে ডানদিকে চারজনের উপযুক্ত যে একটি তপ্ত আসন তারই বাঁ কোণে বসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক দীর্ঘ কেশ ও শ্মশ্রুগুম্ফধারী গৈরিক বসন সন্ন্যাসী উঠে আমার বাঁ পাশে বাইরে অবস্থিত যে আধখানা আসন তাইতে বসলেন। আমাদের দুজনের মাঝখানে ব্যবধান একটিমাত্র জানালা।

ট্রামের কোনো আসনই খালি ছিল না, দু-একজন যাত্রী দাঁড়িয়েও ছিলেন। এমন সময় বাঁ ধারের সেই জানালার পাশ থেকে সেই সন্ন্যাসীর মুখ আমার কানের কাছে ব'লে উঠল, "এই যে পরিমলবাবু।"

আমি সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম সেই অচেনা মুখের দিকে।

"আমাকে চিনতে পারছেন না?"

"না। ঠিক মনে হচ্ছে না তো।" লজ্জিতভাবে বলি। হয় তো তিনিও লজ্জিত হচ্ছেন।

তারপর হঠাৎ দুহাতে তাঁর সমস্ত দাড়ি চেপে আড়াল ক'রে মাথাটা যতটা সম্ভব জানালার ভিতর দিয়ে গলিয়ে বললেন, "দেখুন তো এবারে চিনতে পারেন কি না?"

ট্রামের যাত্রীরা আমার দিকে আমার উত্তরের অপেক্ষায় চেয়ে রয়েছেন। কিন্তু আমি সেই দাড়ি চেপে ধরা মুখও চিনতে না পেরে প্রায় ঘেমে উঠছি। সন্ন্যাসীও দাড়ি থেকে হাত সরান না, আমিও তাঁর মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারি না।

অবশেষে সন্ন্যাসী হতাশ হয়ে দাড়ি ছেড়ে দিয়ে বললেন, "আমি —এর দাদা, এবারে চিনতে পারছেন?

চকিতে মনে পড়ে গেল সব। চেনা উচিত ছিল এতক্ষণ। কিন্তু প্রথমেই চিনি না রূপ যে ভ্রান্তি ঘটেছিল তা আর গেল না সহজে। ট্রাম সুদ্ধ যাত্রীর কাছে আমি অপরাধী হয়ে রইলাম।

১৯৫৩ সালে আরও একজন পরিচিত পুলিসের লোককে সন্ন্যাসীবেশে দেখলাম যুগান্তর অফিসে। তবে এঁকে চিনতে কষ্ট হয়নি। অনিবার্য পরিবর্তনের পথে চলেছি আমরা। ব্যাপারটা ভুলে থাকি বলেই মাঝে মাঝে চমকে উঠতে হয়। আর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ মানুষেরই মনে যে বৈরাগ্য জাগতে থাকে, এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু দু-চার জন যে বাইরেও গৈরিকবাস পরেন এবং লম্বা চুল-দাড়ি রেখে বৈরাগ্য ঘোষণা করেন, সেটি নিতান্তই বাহুল্য ব'লে আমার মনে হয়।

১৯২৬-২৭এর মধ্যে রাজবাড়ির (ফরিদপুর) রাজা সূর্যকুমার রায়ের পুত্র সৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি রতনদিয়াতে তাঁর হেড মাষ্টার ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে—অথবা বন্ধু শৈলেন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আসতেন। বৎসরান্তে একবার ক'রে পুজোর মধ্যে তাঁদের প্রাসাদে গিয়ে হাজির হতাম। শৌখিন দলের থিয়েটার হত সেখানে। স্থানটি রাজবাড়ি ষ্টেশন থেকে দু' মাইল দূরে, লক্ষ্মীকোল নামক জায়গায়।

রাজা সূর্যকুমার ছিলেন বরিশালের জমিদার মতিলাল ঘোষ-দস্তিদারের ভগিনীপতি। তিনি সূর্যকুমার রায়ের এষ্টেটের এক্সিকিউটর ছিলেন। তাঁর এক পুত্র রাজবাড়িতে রাজা সূর্যকুমার ইনষ্টিটিউশনে পড়ত। সে যখন ম্যাট্রিকুলেশন পড়ে (১৯২৬) তখন তার সঙ্গে পরিচয় হয় সূর্যকুমারের বাড়িতে। ছেলেটির ছবি আঁকার বেশ হাত ছিল, দেখে

দু'হাতে দাড়ি চেপে ধ'রে বললেন, দেখুন তো, এবারে চিনতে পারেন কি না?

ভাল লেগেছিল। আমিই বলেছিলাম, একে যেন আর্ট স্কুলে দেওয়া হয়। ম্যাট্রিকুলেশন পাস ক'রে সে কলকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। তার পর সে গেল মাদ্রাসে দেবীপ্রসাদের ছাত্ররূপে। কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার এর নাম। শিল্পীরূপে আজ সে সম্মানিত।

জমিদার-সন্তান কালীকিঙ্কর খুব বিলাসিতার মধ্যে মানুষ হয়েছে স্কুলজীবনে। দু' মাইল দূরে স্কুলে যেত হাতীতে চড়ে, হাঁটা নিষেধ ছিল। এর মুখে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী সম্পর্কে একটিমাত্র কথা শুনেই আমি দেবীপ্রসাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কালীকিঙ্কর সরকারী আর্ট স্কুলের কোনো গণ্ডগোলে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল আরও অনেকের সঙ্গে; বেরিয়ে এসে সে ভিন্ন প্রদেশের দু' একটি আর্ট স্কুলে, সব কথা প্রকাশ ক'রে, আবেদন করেছিল ভর্তি হওয়ার জন্য। কিন্তু 'এক্সপেলড' শুনে কেউ রাজি হয়নি। রাজি হলেন একমাত্র দেবীপ্রসাদ। তিনি তখন কলকাতায় ছিলেন, কালীকিঙ্করকে ডেকে পাঠালেন। কালীকিঙ্কর তার কাজের নমুনা দেখাল, দেবীপ্রসাদ তা পছন্দ করলেন। তারপর বললেন, "তোমাকে নিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তুমি আমার কাজ দেখ, এবং বল, আমার কাজ তোমার পছন্দ হয় কি না। পছন্দ হলে তোমাকে ভর্তি হতে বলব।"

কালীকিঙ্কর এ কথায় স্তম্ভিত হয়েছিল, কোনো শিক্ষক যে ছাত্রকে এতখানি শ্রদ্ধা করতে পারেন তা তার জানা ছিল না। এ সংবাদ আমার কাছেও নতুন। আত্মক্ষমতায় নিঃসন্দেহ বিশ্বাস থাকলেই তবে এতখানি মানসিক ঔদার্য সম্ভব। কিন্তু এ তো অনেক কাল আগের কথা। চার পাঁচ বছর আগে দেবীপ্রসাদ আমাকে একখানা চিঠিতে প্রসঙ্গত যা লিখেছিলেন তার মর্ম এই যে "কালীকিঙ্কর ফাইনাল পরীক্ষা দিলে অবশ্যই ফার্স্ট হ'ত, কিন্তু পাস করলে স্কুল ছেড়ে যেতে হবে ভয়ে পরীক্ষাই দিল না সেবারে। একটি বছর অতিরিক্ত শিখল ব'সে ব'সে। ওর নিষ্ঠা দেখে ওকে মনে মনে গুরুর সম্মান দিয়েছি।"

এ যুগের কোনো শিক্ষকের মুখে এমন কথা দুর্লভ বৈ কি।

১৯২৫-২৬ থেকে আমি প্রায় প্রতি শনিবারে আজিমগঞ্জে যেতাম প্রবোধের কাছে। পরে বলাই যখন কিছুকাল আজিমগঞ্জের হাসপাতালে ডাক্তারের চাকরি নিল তখন আজিমগঞ্জের আকর্ষণ দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

কলকাতা থেকে একদিন জানা গেল জোড়াসাঁকোয় 'নটীর পূজা' অভিনয় হবে। এই অভিনয়টি প্রবোধকে বাদ দিয়ে দেখতে ইচ্ছে হল না, অথচ চিঠি দিয়ে জানানোরও সময় ছিল না, আমি সন্ধ্যাবেলা রওনা হয়ে রাত তিনটে আন্দাজ সময় গিয়ে পৌঁছলাম আজিমগঞ্জে। তারপর সেখান থেকে সকাল আটটায় রওনা হয়ে বিকেল সাড়ে চারটের কলকাতা এসে পৌঁছলাম। টিকিট বিক্রি হচ্ছিল চৌরঙ্গী রোডে অবস্থিত কার অ্যাণ্ড মহলানবিশের ফুটবল ও সঙ্গীতযন্ত্রের দোকানে। হাওড়া থেকে সোজা সেখানেই গেলাম আগে। গিয়ে দেখি টিকিট কেনায় খুব ভিড় নেই, তাতে খুবই উৎসাহিত হয়ে দোকানে প্রবেশ করেই দুখানা টিকিট কিনে নিয়ে চলে এলাম জোড়াসাঁকোয়। কিন্তু জোড়াসাঁকোর ভিড় দেখে অবাক! ভয় হল, সম্ভবত অনেক দেরি ক'রে ফেলেছি, অতএব দ্রুত পা চালিয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়েই অপ্রত্যাশিত বাধা।

টিকিট পরীক্ষক বললেন, "এ টিকিট চলবে না।"

"কেন?"

"এ তো আগামীকালের টিকিট, তারিখটা পড়ে দেখুন।"

পড়তে জানি না বলা সম্ভব নয়, কিন্তু দুঃখ হল আগে কেন পড়িনি। এবং আগামী কালের টিকিটই বা কিনলাম কেন? অথবা কার অ্যাণ্ড মহলানবিশই বা তা দিলেন কেন? আমরা তো বলিনি আগামী কালের টিকিট চাই।

টিকিট পরীক্ষক ব্যাপারটা অনুমান করলেন। তিনি বললেন "আজকের টিকিট অনেক আগ্রেই সব বিক্রি হয়ে গেছে, তাই বিকেলে যাঁরা টিকিট কিনতে গেছেন তাঁরা আগামী কালের টিকিটই কিনতে গেছেন এটি ধরে নেওয়া হয়েছে। কোনো নোটিস সেখানে অবশ্যই আপনাদের চোখের সামনে ছিল, আপনারা হয় তো দেখেননি। আপনারা যে আজকের টিকিট ভ্রমে কালকের টিকিট কিনছেন এটি হয় তো তাঁরা কল্পনাই করতে পারেননি, তাই এই বিভ্রাট।"

প্রবোধ ও আমি পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম। কাল সকালেই তার ফিরে যাওয়া জরুরি দরকার। মনে হচ্ছিল পায়ের নিচে যেন মাটি নেই। এত উৎসাহ এত পরিশ্রম সব বৃথা।

এমন সময় রথীন্দ্রনাথকে দেখে হঠাৎ মরীয়া হয়ে উঠে তাঁকে গিয়ে বললাম—এই ভুল হয়েছে—যেমন ক'রে হোক আজকেই আমাদের দেখার ব্যবস্থা ক'রে দিন। রথীন্দ্রনাথ কথাটি মাত্র না বলে আমাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে দোতলায় দাঁড়িয়ে দেখবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। যেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম, তিন বছর আগে তারই নিচের ঘরে বাস করেছি। অনেকেই দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, তাতে অসুবিধে হয়নি কিছু। হলেও তা মনে পড়েনি। [ক্রমশঃ।

When we come to the younger generation, however, we realize that 'cosmic consciousness' and 'love of humanity' have really been left out of their composition. They are like a lot of brightly-coloured bits of glass and they only feel just what they bump against, when they're shaken. They make an accidental pattern with otherpeople, and for the rest they know nothing and care nothing. *—D. H. Lawrence*

হারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লেখা বিভিন্ন সুধীবৃন্দের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[গত বছর (১৩৬৩) শারদীয়া সংখ্যায় এই পত্রগুচ্ছে ভারতের এক স্মরণীয় সন্তান, বাঙলার মুখোজ্জ্বলকারী পুরুষ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কবিবরকে লেখা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিখ্যাত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মোট প্রায় বিয়াল্লিশখানি অপ্রকাশিত পত্র মুদ্রিত হয়েছিল—দেশের শিক্ষার, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহারাজা যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং ঐ সকল জনহিতকর ব্যাপারে তিনি যে একজন অপরিহার্য্য পুরুষ ছিলেন, তারই পরিচায়ক ঐ চিঠিগুলি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল আমাদের রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদের এবং অভিজ্ঞ সমালোচকদের। এ বছরেও মহারাজাকে লেখা ঐ জাতীয় আরও কয়েকখানি অপ্রকাশিত চিঠি প্রকাশ করা হ'ল। একমাত্র প্রথম চিঠিটি এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অফ লিটারেচার-এর ফেলো) চিঠিটি ব্যতীত প্রত্যেকটি চিঠিই ইংরাজীতে লেখা। এই প্রসঙ্গে চিঠিগুলি প্রকাশ করতে অনুমতি দেওয়ার জন্য মহারাজার পৌত্র বর্ত্তমান মহারাজা পরম বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।—স]

রবীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্রের পত্র

'ভাণ্ডার'
৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
৩০ আশ্বিন ১৩১২

পরম পূজনীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু—

বন্দে মাতরম্

ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই, ভেদ নাই
এক দেশ, এক ভগবান
এক জাতি, এক মনপ্রাণ

বিনয়াবনত :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্যারীচাঁদ মিত্রের পত্র

২১শে মার্চ ১৮৮২

প্রিয় মহারাজা,

আপনার সহিত অদ্য প্রভাতে আমার আলাপের বিষয় আমাদের বিশেষ বন্ধু কর্ণেল অলকটকে (১) জানাইয়াছি। সমস্ত সমাচার শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। আপনার বৈঠকখানায় বাস করিবার জন্য আমন্ত্রণ পাওয়া তিনি বিশেষ সৌভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া মনে করেন। কর্ণেল অলকটের বিশেষ ইচ্ছা, যে কক্ষে তাঁহার অবস্থানের ব্যবস্থা হইবে, সেই কক্ষটি যেন সর্বতোভাবে প্রাচ্য ভাবধারায় সজ্জিত করা হয়। পরিপূর্ণ ভারতীয় জীবন যাপন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার ইচ্ছা ঐ কক্ষে যেন টেবিল-চেয়ারের পরিবর্তে তাকিয়া-ফরাসের আয়োজন হয়। সমগ্র কক্ষটিতে যেন একটি পরিষ্কার ভারতীয়ত্ব বিরাজ করে।

এক্ষণে, তাঁহার সহিত পত্রালাপ করিয়া দিনটি স্থির করিয়া লইলেই হয়।

আপনাদের
প্যারীচাঁদ মিত্র

রাজনারায়ণ বসুর পত্র

প্রিয়বরেষু, ২২ মার্চ

মহাশয়, আগামী কল্য সন্ধ্যায় আপনার গৃহে যে অভিনয়ের আয়োজন হইয়াছে, ঐ অভিনয় দর্শনের ইচ্ছা আমার পুত্র ও তাঁহার দুই জন সুহৃদ পোষণ করেন। সুতরাং অনুগ্রহপূর্বক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তিনখানি প্রবেশপত্র আমার ঠিকানায় পাঠাইবার আদেশ দিলে সুখী হইব।

আশা করি সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিতেছেন।

ইতি
আপনাদের
রাজনারায়ণ বসু

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পত্র

৮ মাণিকতলা
কলিকাতা
১লা জানুয়ারী ১৮৯১

প্রিয় যতীন্দ্র,

অদ্যকার নববর্ষের উজ্জ্বল প্রভাত তোমার সম্মানপ্রাপ্তির বারতা বহন করিয়া আনিল। তোমায় প্রাণভরা অভিনন্দন জানাই।

১। ভারতে প্রত্যক্ষ ঈশ্বরজ্ঞানবাদের আন্দোলনের (থিওসফিষ্ট মুভমেণ্ট) অগ্রদূত ! ভারতপ্রেমিক পুরুষ।

তবে, কথাটা বলিয়াই ফেলি, আমি আশা করিয়াছিলাম এ বৎসর তোমাকে 'ব্যারোনেটসি' (২) দেওয়া হইবে। যাহাই হউক, তাহা এ বৎসর হয় তো হইল না তবে প্রার্থনা করি যথাশীঘ্র আগামী কোন এক বৎসরে ঐ সম্মানে তুমি বিভূষিত হইবে।

সাক্ষাতে তোমাকে অভিনন্দন না জানাইয়া কেন যে পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম, সে বিষয়ও আশা করি তোমার অজানা নহে।

তোমাদেরই
রাজেন্দ্রলাল মিত্র

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পত্র

প্রিয়বরেষু, বুধবার

মহাশয়, জীবনী সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ তথ্য প্রেরিত হইল, আপনাকে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত, অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। আশা করি উহা গৃহীত হইবে।

আপনাদের
কেশবচন্দ্র সেন

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

মহাবালেশ্বর
মার্চ ২৭, ১৮৯৫

পরম পুজনীয় কাকামহাশয়,

আমি পুনরায় তথ্য সংগ্রহ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে রাজা রবি বর্মা কলিকাতাতেই গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে তিনি দার্জিলিঙ-এ স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় গমন করিয়াছেন। আমার অনুমান, আপনি ভ্রমণোপলক্ষে কলিকাতার বাহিরে ছিলেন বলিয়া প্রকৃত সংবাদ অবগত হন নাই। যাহাই হউক, আমি পুনরায় রাজাকে পত্রে নির্দেশ দিতেছি আপনার সহিত ভবিষ্যতে সংযোগ স্থাপন করিতে।

এখানে আমি কার্য্যোপলক্ষ্যেই আসিয়াছি এবং এখানকার কার্য্য সমাপ্ত হইলেই সাতারায় ফিরিয়া যাইব, সেখানেও বহু কার্য অসম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই স্থানটি অতীব মনোরম, দার্জিলিঙ বা সিমলার মত এই স্বাস্থ্যনিবাসটি অত শীতপ্রধান এবং উচ্চে অবস্থিত নহে। এখানে বাস করিলে প্রচুর আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে ভ্রমণ করিবার মত উপযুক্ত স্থানের অভাব নাই। অনেকে পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া এখানে স্বীয় স্বাস্থ্যোদ্ধার করেন। এখানে বাস করিলে পর্বতের ধ্যান-গম্ভীর অপরূপ শোভা প্রাণ মন বিশেষভাবে মাতাইয়া তোলে। প্রকৃতি অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া স্থানটিকে নয়নাভিরাম করিয়া তুলিয়াছে। প্রতাপগড়ের দুর্গটিও এর একটি কেন্দ্র হইতে নয়নগোচর হয়—ইহা সেই প্রতাপগড় যথায় মহাবীর শিবাজীর বাঘনখের আক্রমণে আফজাল খাঁকে বরণ করিতে হইয়াছিল আপন মৃত্যুকে। এখানকার জলবায়ুও স্বাস্থ্যের পক্ষে সবিশেষ অনুকূল। আশা করি আপনার বারাণসী-ভ্রমণও আনন্দদায়ক হইয়াছে। ইতি

আপনার স্নেহের
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের পত্র

পরম স্নেহাস্পদ রাজা যতীন্দ্র,

বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের গত শনিবারের অধিবেশনে ঠাকুর আইনের অধ্যাপনার জন্য শ্যামাচরণ সরকারকে বাতিল করিয়া ট্রেভলিয়ান মহাশয়ের নিয়োগ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে আশা করি সে সম্পর্কে রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে বিজ্ঞপ্তি পাইয়াছ।

তোমাকে আমার এ বিষয়ে পত্র লিখিবার হেতু যে আমি জানিতে চাই যে এ সম্পর্কে তুমি কিছু ভাবিয়াছ কি? কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই কি অবশেষে সফল হইবে? শ্যামাচরণ বাঙ্গালী, আমাদের স্বজাতি, তাহার পক্ষ অবলম্বন করা এবং তাহার অগ্রগমনে সর্বাঙ্গীনভাবে সাধ্যমত সাহায্য করাই আমি বিধেয় বলিয়া গণ্য করি। আমি এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই মানিয়া লইব না, কর্তৃপক্ষের কার্যের প্রতিবাদ করিব। তাঁহাদের পক্ষপাতপূর্ণ কার্যের সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন, ইহাও নিশ্চয়ই তুমি উপলব্ধি করিয়াছ। তাঁহাদের অবাস্তর কার্য আমি কিছুতেই সমর্থন করিব না, ইহার বিহিত করিবই এবং তজ্জন্য কোনপ্রকার বাধা-বিপত্তি আমি বিন্দুমাত্রও গ্রাহ্য করিব না। সত্যের জন্যে যুদ্ধ করিতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত, সেখানে আমার বিবেক আমার প্রধান সহায় হইবে এবং সেই যুদ্ধে ঐ বিবেকই আমায় পরিচালিত করিবে।

পত্রোত্তরে তোমার সুচিন্তিত মতামত জানাইয়া উদ্বিগ্নতা দূর করিও।

অশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী
রমানাথ ঠাকুর
৩০শে আগষ্ট ১৮৭৬

মহেন্দ্রলাল সরকারের পত্র

৫১ শাঁখারীটোলা,
কলিকাতা
২৪এ মে, '৮২

প্রিয়বরেষু,

মহারাজা, অদ্যকার প্রভাত সত্যই সর্বতোভাবে বরণীয়। আমাদের মধ্যে সে আপনার 'নাইটহুড অফ দি ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া' রূপী সম্মান প্রাপ্তির সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। আপনাকে সমগ্র অন্তরের সশ্রদ্ধ ও বিনত অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। অদ্যকার সুধীমণ্ডলীর মধ্যে আপনার স্থান অটুট, আপনার দেশসেবা ভবিষ্যতের সন্তানদের মধ্যে আদর্শস্বরূপ। দেশের অগ্রগতিতে এবং জাগরণে আপনার দান দেশবাসী চিরদিনই স্মরণ করিবে। দেশের ও জাতির বিকাশপথের আপনি এমন একজন অকৃত্রিম সহায়ক যাহার জন্য সমগ্র দেশ তথা দেশের প্রত্যেকটি সন্তান গর্ব অনুভব করিতে পারে।

শ্রদ্ধায় অবনত
মহেন্দ্রলাল সরকার

২। 'স্যার' উপাধি বংশানুক্রমিকভাবে ভোগ করার প্রথার অভিহিতি। কোন বাঙালী আজ অবধি ব্যারোনেটসি পান নি। চারজন বোম্বাইয়ের অধিবাসী এই ব্যারোনেটসি পেয়েছেন।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের পত্র

চট্টগ্রাম
২৫শে ফেব্রুয়ারী

পরম পূজনীয়েষু,

মহারাজা বাহাদুর, বহুদিন সাক্ষাতের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত ছিলাম, চট্টগ্রাম আগমনের ঠিক পূর্বেই মহারাজকুমারের নিকট শুনিলাম যে মহারাজা বাহাদুর বর্তমানে বারাণসীধামে। আপনার সহিত বর্তমানে আমার চাক্ষুষ সাক্ষাৎ প্রত্যহ না ঘটিলেও আমি অন্তরে প্রতি নিয়তই মহারাজের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করি। আমার হৃদয়াসনে মহারাজের যে কি বিশেষ স্থান সংরক্ষিত আছে তাহা বর্ণনা করিতে এ লেখনী অক্ষম জানিবেন।

স্নিগ্ধ-শান্ত নদীর মোহনীয় গতিধারা ও আমার অতি প্রিয় এই বনভূমির মধ্য দিয়া যেন বঙ্গ জননীকে নবরূপে দেখিতেছি। মা যেন আমার আরো কাছে ক্রমেই আসিতেছেন। আর কোন কর্মে মনে বসে না, কোথাও যাইতে প্রবৃত্তি হয় না শুধু মাত্র ইচ্ছা হয় বসিয়া বসিয়া এই দৃশ্য উপভোগ করি, মায়ের এই মহিমময়ী রূপ নয়ন ভরিয়া অবলোকন করি, নয়ন ধন্য হউক, হৃদয় পরিতৃপ্ত হউক, জীবন পূর্ণ হউক। ভক্তিনত প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
নবীনচন্দ্র সেন

সাহিত্যাচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের পত্র

১১ কাঁটাপুকুর লেন
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা
৩১শে জানুয়ারী ১৯০৭

মহামহিমান্বিতেষু,

অধীনের রচিত কয়েকটি সামান্য গ্রন্থ লইয়া মহামহিমান্বিত মাহারাজের দরবারে উপস্থিতি এবং এই নিবেদন যে মহারাজ এই গ্রন্থগুলি গ্রহণ করিয়া অধীনের আনন্দ বর্ধন করুন।

এই ভক্তি-অর্ঘ দান প্রসঙ্গে মহারাজার দরবারে নিবেদন যে বর্তমানে আধুনিক সাহিত্যকারগণ কর্তৃক তাঁহাদের কল্পনাপ্রসূত রচনা সমূহে যে পরিমাণ বিদেশী চরিত্রের ভাব অনুসরণ করিতেছেন—যাহার ফলে তাঁহাদের রচনায় পাশ্চাত্য প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে—ইহা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর এবং কুফলদায়ী। এই মনোবৃত্তিকে খণ্ডন করিতে হইলে পুনরায় আমাদের সনাতন ভারতের প্রাচীন সাহিত্যগুলির মন্থন বিশেষ প্রয়োজনীয়, আবার সেই সব মহান জীবনের প্রভাব আলোকের রশ্মিধারায় অবগাহন করিয়া তাঁহাদের আলোকে নিজেদের ভরাইয়া তুলিতে হইবে। সেই প্রাচীন ভাবধারাকেই নবরূপ দিয়া দেশ ও দশের মধ্যে প্রচার করিয়া ভবিষ্যতের সন্তানদের মানসক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই পথ ধরিলে আমার মনে হয় যে অত্যকার এই পাশ্চাত্য অনুকরণমোহ অতিক্রম করা সম্ভবপর হইবে এবং রুচি বদলাইয়া দিবে। দুঃখের বিষয় আমাদের প্রাচীন সাহিত্যগুলির প্রতি আমরা উদাসীন, আমাদের পূর্বপুরুষগণের কীর্তিরাজি আমাদের অভিভূত করে না। সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল বিরাট শক্তিসম্পন্ন বীরদের এবং মহিমান্বিতা পূজনীয়া বীরাঙ্গনাদের কীর্তি কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, বর্তমান যুগের কয়জন সন্তান সে সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবহিত আছেন? তাঁহাদের জীবনী কয়জন সন্তানের মধ্যে আলোকপাত করিয়া থাকে? ইহা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ব্যথার বস্তু।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ চিন্তা করিয়াই আমি এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছি, জানি না ঈশ্বরের কৃপায় কতদূর সফলকাম হইব। সংস্কৃত এবং প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কাহিনীসমূহকে এখনকার শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মনের মত করিয়া নবরূপে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি যাহাতে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য তথা প্রাচীনা মাতৃভূমির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পতিত হয়। এই 'রামায়ণী কথা' আমার দ্বাদশ বৎসরের পরিশ্রমের ফল। বাল্মীকির মূল রামায়ণটিকে আমাকে সমগ্রভাবে আয়ত্তে আনিতে হইয়াছে। ইংরাজীতে লিখিত পুস্তিকাটি 'বেহুলা' গল্পেরই বস্তু-সংক্ষেপ। উহা অবশ্য 'মডার্ণ রিভিউ' হইতে পুনর্মুদ্রিত করা হইয়াছে। ইয়োরোপীয়েরা এ দেশে আগমন করার বহু পূর্ব হইতে যে আমাদের দেশের সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল এবং সে যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে উৎকর্ষতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল ও সেই সভ্যতা ইয়োরোপীয় সভ্যতার অপেক্ষা বহুগুণ সমৃদ্ধ এই সত্যই অত্যকার তরুণ সম্প্রদায়ের নিকট উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। এবং এ ধারণাও আমি পোষণ করি যে তরুণ সম্প্রদায় তথা মহিলাদিগের মধ্যেও এই সত্য প্রচারে কোন অন্যায়েরই আশ্রয় আমি গ্রহণ করি নাই।

বর্তমান যুগে মহিমান্বিত মহারাজ যে একজন শীর্ষস্থানীয় পুরুষ এ সত্যের পুনরুক্তির কোন প্রয়োজন নাই। বিদ্যার ক্ষেত্রে, বদান্যতার ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে, মহারাজের সহিত তুলনীয় এমন কেহ এখন বর্তমান বলিয়া আমার মনে হয় না। যাঁহার নেতৃত্বে দেশ আজ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে, যাঁহার দাক্ষিণ্যে শত শত দরিদ্র বাঁচিবার সংস্থান পাইয়াছে, যাঁহার প্রেরণায় দেশে অনেক সৎসাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে বা হইতেছে তাঁহার কীর্তি কাহিনী ব্যক্ত করা আমার ক্ষমতা-বহির্ভূত। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত হইতে শুরু করিয়া আধুনিককালেরও বহু অসংখ্য লেখক মহারাজের উৎসাহে সৃষ্টির উৎস খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাহার তুলনা নাই। আজও এমন কোন লেখক নাই, তিনি যত শক্তিমানই হউন না কেন মহারাজের উৎসাহবাণী যিনি অপরিসীম সৌভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া গণ্য করেন না।

অবশেষে অধীনের নিবেদন, গ্রন্থগুলি কৃপাপূর্বক পাঠ করিয়া তাঁর মহামূল্য মতামতে অধীনের সাহিত্য সাধনাকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিবেন। ভক্তিনত প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আশা করি কুশলে আছেন। ইতি—

মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধানত
দীনেশচন্দ্র সেন

প্রেরিত গ্রন্থের তালিকা :—

(১) রামায়ণী কথা
(২) বেহুলা
(৩) ফুল্লরা
(৪) সতী
(৫) ইংরাজী বেহুলা
—এ মাইথ অব স্নেক-গডেস।

ভোলানাথ চন্দ্রের পত্র

২৬শে জানুয়ারী ১৮৬১

প্রিয়বর যতীন্দ্রবাবু,

আমার চারখানি পুস্তক আপনাকে এই প্রসঙ্গে পাঠাইবার সুযোগ গ্রহণ করিতেছি।

আমার এই রচনাপ্রকাশের ক্ষেত্রে ঠাকুর-পরিবারের নিকট হইতে যে অকৃত্রিম সাহায্য লাভ করিয়াছি, সে বিষয়ে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। আপনাদের পরিবারের এই অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পাইলে কি হইত বলা যায় না।

আমার লোকবরেণ্য খুল্লতাতের প্রয়াণের পর আপনি তাঁহার স্থানে সমাসীন। তাঁহার কীর্ত্তি সমগ্র দেশের গৌরববর্দ্ধক। আপনার নেতৃত্বের আজ বিশেষ প্রয়োজন, আপনার প্রতিভা প্রকাশের লগ্ন দ্বারদেশে আগত। সারা দেশ আজ আপনার দিকে চাহিয়া আছে। আপন নেতৃত্বে দেশ ও দশকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করুন ও আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করুন। ভারতের জাতীয় সংবাদপত্রের উন্নতিবিধান আজ অত্যাবশ্যক। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও আপনার অবদান গৌরবস্তম্ভ স্থাপন করুক। ভারতের সংবাদপত্র কর্মিগণের উপকারার্থে একটি তহবিল সৃষ্টি করিতে আপনাকে অনুরোধ করি। ভারতের প্রধানতঃ বঙ্গেরই সাংবাদিকতা সারা বিশ্বকে চমৎকৃত করিয়া, পুলকিত করিয়া, বিমুগ্ধ করিয়া যেদিন তুলিবে সেই দিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

হাণ্টার মহাশয় এখানকার প্রাচীন পরিবারগুলির ইতিহাস সংকলনে ব্যাপৃত, তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য লইয়া আপনার কাছে ঠাকুর পরিবার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ কয়েকখানি গ্রন্থ চাহিতেছি।

আশা করি সর্বাঙ্গীন কুশলে আছেন।

আপনারই
ভোলানাথ চন্দ্র

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধির পত্র

মিউনিসিপাল অফিস
হাওড়া
৭ই ডিসেম্বর ১৯০৩

শ্রীচরণকমলেষু,

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। কিরণবাবুর (৩) মৃত্যুসংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। ইহার পর আপনাকে কোন প্রকারে বিরক্ত করা অত্যন্ত মূঢ়তা বিবেচনা করি। কিন্তু বিশেষ কারণে আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া বিরক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। আশা করি স্বীয় স্নেহগুণে অপরাধ ক্ষমা করিবেন। কোন সময়ে আপনার সহিত সুস্থভাবে কথা কহিবার অবসর হইবে এই পত্রবাহকের হস্তে একটু লিখিয়া দিলে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব। ইতি—

সেবক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরীর পত্র

বার লাইব্রেরী
কলিকাতা
১২ই ডিসেম্বর ১৮৮৮

পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহারাজা বাহাদুর,

বড়লাট বাহাদুরের লিভিতে(৪) আমার পরিচায়করূপে আপনার গৌরবমণ্ডিত নামটি উল্লেখ করিবার গৌরব অর্জন করিতে পারি কি?

আগামী কল্য কর্মদিবস, তজ্জন্য বিশেষভাবে ব্যস্ত রহিয়াছি নতুবা নিজে গিয়া আপনাকে প্রণাম করিয়া আসিতাম। ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিয়া সুখী করিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের
আশুতোষ চৌধুরী

৫৩।৫৪ ধর্মতলা
কলিকাতা
২৫শে জুন ১৮৮৮

পরম শ্রদ্ধেয় মহারাজা বাহাদুর,

আমার ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর(৫) অনুকূলে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহাকে একখানি পরিচয়পত্র দান করার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করিতে পারি কি? সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম-এ এবং তাহার ছাত্রজীবন কৃতিত্বে পরিপূর্ণ। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে এদেশে আরও কত উন্নতিমূলক দৃষ্টি অবলম্বন করা যাইতে পারে, এই সম্পর্কে সে মহারাজার সহিত আলোচনা করিতে চাহে। গতানুগতিকভাবে সরকারী চাকুরীর চেষ্টা না করিয়া বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারের প্রতি তাহার এই আগ্রহ আশা করি আপনার প্রশংসা লাভে সমর্থ হইবে। এবং এই আশা করিয়াই আপনার দরবারে আমি উপস্থিত।

৩। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের মেজ মেয়ে স্বর্গীয়া বরেণ্যবন্দিনী দেবীর (বালিগঞ্জের ৩১।১ মনোহরপুকুর রোডস্থ বিখ্যাত কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় বনমালী মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী) ছোট ছেলে। স্বর্গীয় কিরণমালী মুখোপাধ্যায়। জন্ম—১৮৭২, মৃত্যু ১৯০৩। অসাধারণ শক্তিমান ব্যায়ামবীর। এঁর বীরত্বের কয়েকটি কাহিনী আজও পরিবারের মধ্যে আবেগ ও আদর্শের সঞ্চার করে। সঙ্গীতেও এঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। সে বিষয়ে ৺গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও সজ্জাদ মহম্মদের নিকট ইনি পাঠগ্রহণ করেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে উপেক্ষা ও আঘাতে এই হতভাগ্য যুবকের জীবননাট্যের পরিসমাপ্তি হয়। দৌহিত্রের মৃত্যুতে মহারাজা বিশেষ আহত হয়েছিলেন।

৪। তৎকালীন বড়লাটেরা মাঝে মাঝে এক মিলনসভা আহ্বান করে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হতেন। এখনকার সঙ্গে পার্থক্য এই যে, এই সভায় অভ্যাগতদের সঙ্গে বড়লাটের পরিচয় এ, ডি, সি করাতেন না, করাতেন কোন বিশিষ্ট অভ্যাগত। এই জাতীয় সম্মিলনীকেই লিভি বলা হতো।

৫। প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার এবং দেশবরেণ্য আইনসাংবাদিক। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জামাতা। সাহিত্যাচার্য প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজ। এঁদের গৌরবময় পরিবারের এক একটি খ্যাতিমান সন্তানের বিস্তৃত পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর জীবনীতে (চারজন) মাসিক বসুমতীতে কিছুটা দেওয়া আছে। যোগেশচন্দ্রের পুত্র কৃতী ব্যারিষ্টার শ্রীরণদেব চৌধুরী। ১৯৫১ সালে ৮১ বছর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন।

আমার বিশ্বাস, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা এ বিষয়ে যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন তাহার উপর আপনার মূল্যবান পরিচয়লিপি আমার অনুজকে সেই উপকার পাইতে যে কি পরিমাণে সাহায্য করিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আশা করি গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহ আপনার স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে নাই। প্রণাম জানিবেন। ইতি

আপনার স্নেহাধীন
আশুতোষ চৌধুরী

বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের পত্র

৩ য়্যালবার্ট রোড
২৭শে

প্রিয়বরেষু,

মহারাজা বাহাদুর, অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকায় মদীয় ভবনে একটি আপরাহ্ণিক চা-চক্রে মিলিত হইলে আনন্দিত হইব। এই আহ্বান আমার পূর্বাহ্ণেই করা উচিত ছিল, বিলম্বে আহ্বানের জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করিতেছি।

এবারের চা-চক্রে মহারাজা একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাইবেন, এই প্রীতিসম্মেলনে আমি আনুমানিক দ্বাদশ জনকে আহ্বান জানাইয়াছি, মহারাজা হয় তো সুখী হইবেন এই দ্বাদশ জনের মধ্যে সকলেই বাঙ্গালী, একজনও পশ্চিমা ইংরাজ নন।

আপনাদের
চন্দ্রমাধব ঘোষ

মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুরের পত্র

শোভাবাজার
২৪শে মে ১৮৮২

প্রিয়বরেষু,

স্যার যতীন্দ্রমোহন, তোমার ষ্টার অফ ইণ্ডিয়ার নাইটহুড প্রাপ্তিতে পরম আনন্দিত হইলাম। তোমার গৌরবে-সৌরভে সমগ্র বঙ্গ আমোদিত। তুমি আমার প্রাণভরা অভিনন্দন গ্রহণ কর। আজিকার বঙ্গদেশে তোমার মত বিচক্ষণ তীক্ষ্ণধী জননায়কের বিশেষ প্রয়োজন। প্রার্থনা করি, স্বীয় নেতৃত্বে দেশ ও জাতিকে ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির শীর্ষস্থানে পরিচালিত কর।

ভগবানের চরণে তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

তোমাদের
নরেন্দ্রকৃষ্ণ

মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পত্র

কাশিমবাজার রাজবাটী
৩১শে জানুয়ারী ১৮১৮

পরম ভক্তিভাজন মহারাজা বাহাদুর,

আপনার ৩০ তারিখের পত্রখানি পাইয়া যে কি পরিমাণ উল্লসিত হইলাম তাহা এই ক্ষুদ্র পত্রে বর্ণনা করা সাধ্যাতীত ব্যাপার।

আমার প্রতি মহারাজের সুগভীর করুণা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আমার উন্নতিকল্পে মহারাজা যাহা করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অদ্যকার সমাজে বা রাষ্ট্রক্ষেত্রে অধীনের যেটুকু আসন স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহার জন্যও মহারাজের স্নেহই দায়ী। আমার কিসে উন্নতি হয়, কি ভাবে আমি উপকৃত হই এ বিষয়ে মহারাজের পবিত্র অনাবিল স্নেহ চিরকালের জন্য এক মহামূল্য রত্ন হিসাবে আমার অন্তরে রক্ষিত হইবে।

আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর কর্তৃক আমার নিমন্ত্রণ গৃহীত হইয়াছে, ঐ উপলক্ষে এ গৃহে আপনার পদধূলি বিশেষভাবে আশা করি।

আশা করি সর্বাঙ্গীন কুশলে আছেন।

আপনাদের
মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বিচারপতি দ্বারকানাথ চক্রবর্তীর পত্র

ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশন
১৮ ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট
কলিকাতা
২৪শে আগষ্ট ১৮৮৫

প্রিয়বরেষু,

মহাশয়, কৃষ্ণদাস স্মৃতিরক্ষা তহবিলের হিসাবাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, অদ্যাপি তাহার ষোলো হাজার ছয় শত আটান্ন টাকা আয়ের অঙ্ক কিন্তু ঐ অঙ্কের মধ্যে মাত্র ছয় হাজার নয় শত তেরো টাকা এ যাবৎ আদায় হইয়াছে।

বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সহিত আমি আলোচনা করিয়াছি। একান্নবর্তী হিন্দু পরিবার প্রথা সম্পর্কে তাঁহার বক্তৃতাবলীর প্রুফ দিতে তিনি স্বীকৃত হইয়াছেন। বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও(৬) এ বিষয়ে তাঁহার যাহা ধারণা তাহা লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

আমার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। ইতি

মহাশয়ের চির-অনুগত
দ্বারকানাথ চক্রবর্তী

প্রিয়বরেষু,

মহাশয়, আগামী কল্য দিবা দুই ঘটিকা হইতে তিন ঘটিকা মধ্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। দেউলিয়া-বিল সম্পর্কে য়্যাসোসিয়েশানের পত্রটিও সঙ্গে লইব, কাজে লাগিতে পারে।

চিরানুগত
দ্বারকানাথ চক্রবর্তী

রাজকুমার সর্বাধিকারীর পত্র

১৮ ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট
আগষ্ট ২২, ১৮১৮

প্রিয়বরেষু,

মহাশয়, আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে বিষয়টি পার্লামেণ্টে উত্থিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে অন্তর্ভুক্ত কাগজটিতে বিস্তারিত বিবরণী পাইবেন। এই বিষয়ে ছোটলাট হয়তো আপনাকে শীঘ্রই জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন। তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে

৬। উত্তরকালের বঙ্গবরেণ্য পুরুষসিংহ পূজনীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত জানিয়া লইবেন। আমাদের বক্তব্যটি কিরূপ ভাবে সাজানো হইয়াছিল, সে সম্পর্কেও এই অন্তর্ভুক্ত কাগজটি আপনাকে আলোকপাত করিতে পারিবে।

আমাদের প্রত্যেকটি কার্যকলাপের প্রতি শত্রুপক্ষ তীক্ষ্ণ নজর রাখিতেছে, তাহারা সর্বতোভাবে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিতে চাহিতেছে, অতএব এবম্বিধ ক্ষেত্রে অতীব সতর্কতার সহিত আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। রাজকুমার সর্বাধিকারী

তাজহাটের রাজা গোবিন্দলাল রায়ের পত্র

১১ চৌরঙ্গী লেন

প্রিয়বরেষু, ২রা জানুয়ারী ১৮৮৮

মহারাজা, আপনার অভিনন্দন পত্র পাইয়া ধন্য হইলাম। যে সম্মান আমার উপর বর্ষিত হইয়াছে, আপনার অভিনন্দন তাহা অপেক্ষা কোন অংশ কম নয়।

বিশ্ববরেণ্য পরিবারের স্বনামধন্য পুরুষ আপনি আপনার ন্যায় তীক্ষ্ণধী নেতার অভিনন্দন পাওয়া ভাগ্যের কথা, ঐ পত্র আমার নিকট বিশেষ মূল্যবান বস্তু। আমার প্রতি আপনার অনুভূতির মর্যাদা রক্ষা যেন করিয়া যাইতে পারি। শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। ইতি—

আপনাদের
গোবিন্দলাল রায়

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র

বাগবাজার

শ্রদ্ধাস্পদেষু, ২৯শে অক্টোবর ১৮৯৪

মহারাজা বাহাদুর, আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী যদু বাবুর মাইকেলের জীবনীর নোটের কিয়দংশ আমি পুনর্বার লিখিয়া দিয়াছি এবং পরিষ্কার ভাবে তাহার একটি নকল করিয়াছি। নকলটি এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আপনি পড়িয়া দেখিবেন এবং যদি আরও কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনের প্রয়োজন অনুভব করেন তো করিবেন। যদু বাবুর কিঞ্চিৎ টীকা সহযোগে পরে উহা সরাসরি গৌরদাসকে পাঠাইয়া দিবেন। আপনি যদি অধিক অদল-বদল করেন, তাহা হইলে সমগ্র রচনাটিই আবার সম্পূর্ণ ভাবে পরিষ্কার করিয়া নকল করিতে হইবে এবং গৌরদাসকে পাঠানো হইবে। এ বিষয়ে গৌরদাস আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া আমার প্রাণ বাহির করিবার উপক্রম করিতেছে। যে জীবনী গৌর টাইপ করাইয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যে অর্থাৎ পরিশিষ্টে যদু বাবুর নোট যাইবে। সুতরাং যাহাতে অন্তই ঐ রচনা গৌরের হস্তগত হয়, কৃপাপূর্বক সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি। শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। ইতি—

চিরানুগত আপনাদের
কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
১৩ই ডিসেম্বর ১৮৮৮

পরম পূজনীয়েষু,

বড়লাটের লিভিতে আমার অনুজ অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং আমার স্বশ্রেয়দ্বয় বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় প্রদানের জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতে পারি কি? আপনার নাম যদি আমাদের পরিচয়-প্রদায়ক রূপে গণ্য হয় তাহা হইলে নিজেদের সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিব।

আপনার স্নেহাধীন
দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুমারী সত্যেন্দ্রবালা ঠাকুরের(৭) পত্র

৩ ম্যাথার্ষ্টান টেরেস
কুইন্স গেট
লণ্ডন
২১শে সেপ্টেম্বর

পরম পূজ্যপাদ কাকামহাশয়,

আপনার স্নেহলিপি এবং প্রেরিত ১৫০ পাউণ্ডের আশীর্বাদী আমার হস্তগত হইয়াছে। আপনার আশীর্বাদী ঐ ১৫০ পাউণ্ড শিরোধার্য করিয়া গ্রহণ করিলাম। আমার এই দুর্যোগের দিনে উহা পরিত্রাতার রূপ লইয়া আসিয়াছে, আগামী শীতে উহার সাহায্যেই হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিব।

কাকামহাশয়, সুখে-দুঃখে ঘেরা জীবনের অনেকগুলি বৎসর কাটিয়া গেল, আরও স্বল্পসংখ্যক কয়েকটি কাটিবে—সাক্ষাৎ কখনও ঘটিবে কি না জানি না তবে পত্রে যতটুকু জানা যায় ততটুকুর জন্যই উদ্গ্রীব হইয়া থাকি। কলিকাতাস্থ আমায় পরমপ্রিয় পরিজনদের আকৃতি কিরূপ, তাঁদের আকাঙ্ক্ষা বা অবসরবিনোদন কি, দৈনন্দিন কর্মসূচী কিরূপ, সেখানকার বাড়ীটি কিরূপ দেখিতে, সেখানকার নরনারীর জীবনধারা কিরূপ, এই সকল বিষয়ে জানিতে খুবই ইচ্ছা করে, মাঝে মাঝে পরমাত্মীয়দের সংস্পর্শ হইতে জন্মের মত দূরে সরিয়া থাকার বেদনা অশ্রুর উদ্রেক করে। আমার পিতৃদেবের সংগ্রহ হইতে আমার এক পিতৃস্বসার আলেখ্য দর্শন করিয়াছি। আমার প্রবল ইচ্ছা, আপনাদেরও প্রতিকৃতি আমার হস্তে আসে। অনুগ্রহপূর্বক আমার এই ইচ্ছাটুকু পূরণ করিয়া সুখী করিবেন। যতই দূরে থাকি, আমি কেমন করিয়া প্রকাশ করিব যে ভারতের পথ-ঘাট,

---

৭। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের খুল্লতাত ভারতবরেণ্য আইনবিদ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র প্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দ্বিতীয় পক্ষে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে কমলাকে বিবাহ করে ইংল্যাণ্ডে বসবাস করতে থাকেন, এ তথ্য সুবিদিত। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের এক ছেলে প্রসূনকুমার ও দুই মেয়ে সত্যেন্দ্রবালা ও নাগেন্দ্রবালা। তিন জনের মধ্যে সত্যেন্দ্রবালাই বেশীদিন জীবিতা ছিলেন। সত্যেন্দ্রবালা বিলেতেই লালিতা-পালিতা একবার মাত্র ভারতে এসেছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহারাজা প্রদ্যোতকুমারের অতিথি হয়ে, অবস্থান করেছিলেন বিশ্বখ্যাত ঠাকুর ক্যাসেলে (১৯০৯-১০)। এঁর চিঠির পত্রমূল্য যথেষ্ট। হতভাগিনীর ব্যথা বেদনা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে তাঁর পত্রে। বিদেশে বাস করেও স্বদেশের জন্যে ব্যাকুলতায়, সুনিবিড়-দেশপ্রেমে, পরিজনদের থেকে দূরে থাকার তীব্র দুঃখে চিঠিগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এঁর চিঠি যে কোন লোকের হৃদয়কে অভিভূত করে ফেলবে এ বিশ্বাস রাখি।

নদী-নালা, আকাশ-বাতাস সদাসর্বদাই আমায় আহ্বান করে। আমার পিতৃভূমি, আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষ, আমার পূর্বপুরুষগণের লীলাক্ষেত্র, আমার জনক-জননীর জন্মস্থান শত শত মনস্বীর পদরজ-ধন্য ভারতভূমিকে সুদূর ইংল্যাণ্ড হইতে প্রণাম নিবেদন করি।

আপনার এবং পরিবারস্থ সকলের কুশল সংবাদ দিয়া অনুগৃহীতা করিবেন ও আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করিয়া ধন্যা করিবেন। ইতি

আপনার স্নেহধন্যা
সত্যেন্দ্রবালা ঠাকুর
হোটেল বেলেভ্যু
মেণ্টন, ফ্রান্স
২৮শে মার্চ

পরম শ্রদ্ধাস্পদ কাকামহাশয়,

অদ্য প্রভাতে আপনার আশীর্বাদে এ স্থলে পৌছিয়াছি। গতকাল রাত্রে পারী ছাড়িয়াছি। রাত্রে ট্রেণে অত্যন্ত শীত অনুভব করিয়াছিলাম এবং তজ্জন্য কিঞ্চিৎ অসুবিধাও ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অন্ধকার আকাশের ঐ প্রভাতসূর্য গতরাত্রের সমস্ত অবসাদের অবসান ঘটাইল। সূর্যের মিষ্ট মধুর তাপরাশি শরীরে শক্তির সঞ্চার করিতেছে। আপনার সাহায্য না পাইলে এরূপভাবে স্বাস্থ্যোদ্ধার করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইত না। আমার মনে হয় এখানে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করিলে আমার স্বাস্থ্য বহুল পরিমাণে শ্রীসম্পন্না হইবে। আত্মীয়-বিবর্জিত জীবনের শেষাংশে আপনার করুণা, স্নেহ ও মমতা আমার নিকট এক মহার্ঘ রত্ন বিশেষ। ঈশ্বরের নিকট সর্বতোভাবেই আপনাদের মঙ্গল কামনা করিতে থাকি। আমার বিশেষ বান্ধবী মাননীয়া শ্রীমতী হেডম্যাণ্ড এখানে আছে।

আপনি এবারের গ্রীষ্মে কোথায় যাইতেছেন?

আশা করি কুশলে আছেন। আমার ভক্তিনত প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আমার ভ্রাতার সংবাদ জানিতে বড় ইচ্ছা হয়, তাহাকে আমার প্রীতিপূর্ণ আশীর্বাদ জানাইবেন, সুবিধামত সে যদি মাঝে মাঝে পত্র লেখে তো বড়ই আহ্লাদিতা হইব।

স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী
সত্যেন্দ্রবালা ঠাকুর

দাদাভাই নৌরজীর পত্র

লণ্ডন
১৪ই ফেব্রুয়ারী
১৮৫৯

প্রিয়বরেষু,

মহারাজা, যদিও একযোগে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন বর্তমানে কিছুকালের জন্য স্থগিত করা হইয়াছে এবং ভারতস্থ ও স্থানীয় ভারতীয় কর্তৃপক্ষগণ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অভিমত প্রদান করিয়াছেন তথাচ আমি বিন্দুমাত্র নিরাশ হই নাই। আমি লক্ষ্য করিতেছি যে ইঙ্গ-বঙ্গীয় সমাজের প্রতিনিধিগণ বাঙ্গালীগণকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখেন, শুধু তাহাই নয় তাহাদের কোন কিছুই স্বীকার করিয়া প্রাধান্য দিতে নারাজ। এ বিষয়ে কি কোন প্রতিবিধান সত্যিই অসম্ভব? দেশের স্বার্থের জন্য সংগ্রামের দিন সমাগত, প্রবল সংগ্রাম করিয়া দেশের হৃত স্বার্থ উদ্ধার করিতে হইবে। আমি যতক্ষণ এখানে আছি আমার সাধ্যমত সংগ্রাম আমি চালাইয়া যাইব। এখন আপনার ও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশানের সাহায্য পাইলে বড়ই উপকার হয়। ভারতের আজ জাগরণের দিন, অজ্ঞতা ও তামসিকতার বাষ্প দূরীভূত হইয়া জ্ঞানের ও প্রগতির (নৈতিক ও বাস্তবিক উভয়তঃই) আলোয় স্নাত হইয়াছে। তবে সংগ্রাম ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই, সহজ পথে, তাহার স্বার্থ উদ্ধার হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না অন্ততঃ এই স্থানে থাকিয়া আমি তো এই অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করিয়াছি। ভারতের সাহায্য আমি চাই, তবেই আমার সংগ্রাম সাফল্যভূষিত হইবে। ভারতে আজ যে শক্তির মিছিল চলিয়াছে দূর হইতে তাহা আমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। ভারতবাসীকে নিদ্রায় অভিভূত করিয়া রাখিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিই বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য। তাহাদের মনোমত বস্তুগুলি মুখের সামনে ধরিয়া দিয়া তাহাদের অভিভূত করিয়া তাহাদের ক্লীব করিয়া রাখিতে চায় এই বৃটিশ সরকার। আইরিশরা কেমন করিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাইল? তাহারা দলে দলে প্রতিনিধি এখানে প্রেরণ করিয়াছিল সংগ্রামেরই উদ্দেশ্যে, সে প্রচেষ্টা তো তাহাদের সফলই হইয়াছে বলা যায়। অতএব এইখানেই তো আমরা আইরিশ (এবং ইংরেজেরও) নিকট হইতে প্রভূত শিক্ষা পাইলাম। অধ্যবসায় ও অবিচলিত নিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয় আইরিশরা দিয়াছে। পণ করিতে প্রস্তুত আছি, যতদিন না জয়লাভ করিব, থামিব না, ভারতবর্ষ কি এখনও তাহার সন্তানদের প্রেরণ করিবে না?

দাদাভাই নৌরজী

পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বরের পত্র

গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়
১০ই মার্চ ১৯০৫

মহাশয়েষু,

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমন্ স্বামী গুজানন্দজীর নির্দেশে স্বতন্ত্র ডাকযোগে আপনাকে একখণ্ড মাসিক 'সঙ্গীত অমৃত পর্ব' প্রেরণ করিতেছি। আপনি কৃপাপূর্বক পাঠ করিবেন এবং অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় মহামূল্য মতামত দানে আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

আমাদের প্রচেষ্টায় মহারাজের প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতা অতীব শ্রদ্ধাসহকারে ভিক্ষা করি।

বিষ্ণু দিগম্বর
অধ্যক্ষ

নবাব বাহাদুর আবদুর লতিফের পত্র

১৬ তালতলা
৭ই জানুয়ারী ৯১

প্রিয়বরেষু,

মহারাজা বাহাদুর, আপনার 'মহারাজা' উপাধি বংশানুক্রমিক রূপে গণ্য হওয়ায় আমি যে কি পরিমাণে সুখানুভব করিতেছি তাহা সত্যই প্রকাশ করা যায় না। আপনার সম্মান সৌরভ সমগ্র দেশকে স্পর্শ করিয়াছে।

আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল সাক্ষাতে গিয়া আপনাকে শ্রদ্ধাভিনন্দন জানাইয়া আসিব কিন্তু অদ্যাপি শয্যার আশ্রয় ত্যাগ করিতে না

পারায় এই আনন্দোৎসবে যোগদান করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হইল না।

এই উপলক্ষে আপনি আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবন দান করুন, যশ ও শ্রী চিরকালের মত আপনার মধ্যে বিরাজ করুক, আপনার বিরাট জীবন আপনার ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আদর্শ সঞ্চার করুক ইহাই প্রার্থনা।

আপনাদের
আবদুর লতিফ

রাজা মাধোলালের পত্র

চৌখাম্বা
বারাণসী
১৩ই অক্টোবর ১৯০৫

ভক্তিভাজন মহারাজা-সাহেব,

এবারের শীতে আপনি বারাণসী আসিবেন না শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। এই সময় বারাণসী বড়ই স্বাস্থ্যকর জায়গা, একবার আসিলে আপনারও স্বাস্থ্য উদ্ধার হইত, আমাদেরও আনন্দবর্ধন হইত সেই সঙ্গে বারাণসীর শোভা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইত।

ভক্তিভাজন মহারাজ-সাহেব, এই প্রসঙ্গে নিবেদন করি, কংগ্রেসের প্রদর্শনীকার্যের দায়িত্বভার আমি গ্রহণ করিয়াছি—এ বিষয়ে আপনার সাহায্য পাইতে পারি কি? আপনার স্নেহধারা আমার প্রতি চিরকালই প্রবহমান, জীবনের নানা ক্ষেত্রে আপনার নিকট হইতে প্রভূত সাহায্য ও উপকার পাইয়াছি, সেই জোরেই আমার এই ভিক্ষা, স্নেহের দাবীও বলিতে পারেন। আমি ইহাও জানি, আপনি আমাকে যে সাহায্য করিবেন আর কাহারও নিকট সে সাহায্য আমি পাইব না। মাধোলাল

চৌখাম্বা
১লা নভেম্বর ১৯০৪

ভক্তিভাজন মহারাজা-সাহেব বাহাদুর,

বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট অধিবাসী বিখ্যাত শাস্ত্রী রাজারাম বোদাসের সুযোগ্য পুত্র মাধোরাও বোদাসের সহিত আপনার পরিচয় করাইয়া দিবার অনুমতি প্রদান করুন। ইনি নিজেও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বোম্বাই মহামান্য বিচারাধিকরণের এক ব্যবহারজীবী। আমাদের, হিন্দুদের সন-তারিখের ব্যাপারে যে মতদ্বৈধতা ও গোলযোগ বিদ্যমান, তাহার অবসানকল্পেই ইঁহার বর্তমান কলিকাতা গিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাতাভিলাষের উদ্দেশ্য। ইনি নিজেই মহারাজের নিকট স্বীয় উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করিবেন। এই সকল সৎকার্যে মহারাজের উৎসাহ অপরিসীম। মহারাজের বিদ্যোৎসাহিতার কথাও সুবিদিত। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, ঐ সংক্রান্ত যে সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি মহারাজের বিরাট গ্রন্থাগারে শোভা পাইতেছে—সেইগুলি ইঁহাকে অধ্যয়ন করিয়া গবেষণার কাজ চালাবার জন্য অনুমতি দিয়া আমাদের উভয়কেই কৃতার্থ করেন। মহারাজের এই অনুমতি রূপ আশীর্বাদ ইঁহার সাফল্যলাভের পথ প্রশস্ত করিবে, এই বিশ্বাসই আমি করি। আশা করি সর্বাঙ্গীন কুশলে আছেন। ভক্তি-অবনত প্রণাম গ্রহণ করিবেন। অনুগৃহীত

মাধোলাল

নেপালের প্রধানমন্ত্রী দেব শামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণার পত্র

থাপাথালি দরবার
নেপাল

পরম শ্রদ্ধেয় মহারাজা, ২৩শে মার্চ ১৯০১

আমার প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগে আনন্দপ্রকাশ করিয়া আপনি যে অভিনন্দন জানাইয়াছেন তাহার জন্য সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। যে বিরাট দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে তাহা সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে আপনার আশীর্বাণীই আমাকে সর্বদা প্রেরণা জোগাইবে।

আপনি ভারতবরেণ্য পুরুষ, আপনার আশীর্বাণী পাওয়া আমার স্বপ্নাতীত সৌভাগ্যের পরিচায়ক, চরণে নিবেদন এই আশীষ-ধারা হইতে কখনও বঞ্চিত না হই এবং সকল সময়েই যেন মূল্যবান উপদেশ পাইয়া থাকি—যাহা বিশেষরূপে আমার কাম্য।

আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আপনার অনুগৃহীত
দেবসামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা

শিক্ষাধিকর্তা স্যার য়্যালেক্স ক্রফ্‌টের পত্র

অফিস অফ দি ডিরেক্টার অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশান

প্রিয়বরেষু, ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭

মহারাজা, মহারাণীর জুবিলী উপলক্ষে পণ্ডিতদিগকেও উপাধি-দানের এক প্রস্তাব করিয়া পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন আমার সহিত এক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এখন পণ্ডিতদিগকে সম্মানোপাধি দেওয়া হইবে কি হইবে না কিংবা কিরূপ উপাধি তাঁহাদের দেওয়া বিধেয় এই বিষয়ে আপনি কি মতামত পোষণ করেন তাহা জানিবার জন্য আমরা বিশেষ উৎসুক। মিঃ এ, পি, ম্যাকডোনাল্ডের ইচ্ছাক্রমে এই উপলক্ষে একদিন (নির্দিষ্ট দিন পরে জানাইব) একটি অধিবেশনের আহ্বান করা হইবে, সেই অধিবেশনে যোগদানের জন্যে ম্যাকডোনাল্ড সাহেবকে এবং তৎসহ পণ্ডিত ন্যায়রত্নকে আপনাকে ও ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে আহ্বান করা হইবে।

আমার অনুরোধ সেই দিন আপনি আসিয়া আপনার সুচিন্তিত অভিমত প্রদানে আমাদের সহায়তা করুন। আপনাদের

এ, ক্রফট
(য়্যালেক্স ক্রফট)

মহারাজা স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরকে লেখা তিনখানি অপ্রকাশিত পত্র

[মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের চার মেয়ে ছিলেন কিন্তু একটিও ছেলে ছিলেন না, এই অপুত্রকতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে জননী মহারাজ-মাতা শিবসুন্দরী দেবীর ইচ্ছাক্রমে অনুজ সঙ্গীত-সম্রাট রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহনের ন'বছরের মেজ ছেলেকে যতীন্দ্রমোহন দত্তক গ্রহণ করেন। এই পুত্রই উত্তরকালের শিল্পপ্রাণ মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার। আলোকচিত্রায়ণে ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিলেতের রয়্যাল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির ইনি প্রথম ভারতীয় সদস্য (১৮৯৮)। কলকাতার শেরিফের আসনও এঁর দ্বারা হয়েছে অলঙ্কৃত। শিল্পের ও রুচির প্রতি অনুরাগের জন্য প্রদ্যোতকুমার চিরকালের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকেন। শিল্পই ছিল তাঁর প্রাণ।

এঁদের বিশ্ববিখ্যাত উত্তানবাটী 'এমারেল্ড বাওয়ার' বা 'মরকত-কুঞ্জ' নির্মাণ করেছিলেন এঁর পিতামহ পরম পণ্ডিত মহাত্মা হরকুমার ঠাকুর কিন্তু তা বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে প্রদ্যোতকুমারের কল্যাণেই। তাঁর শিল্পবোধের নিদর্শনবাহী এই মরকত-কুঞ্জ শোভায় সৌন্দর্যে নন্দনকাননকেও হার মানাত। কলকাতার য্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এরও প্রতিষ্ঠা ছিলেন তিনি। ১৯০২ খৃঃ সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে লণ্ডনে পিতার প্রতিনিধিত্ব করেন যুবক প্রদ্যোতকুমার; এই উপলক্ষে তাঁর মাসতুতো ভাই (এদিক দিয়ে ভাইপো) শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা আছে (বিলাতযাত্রা প্রশস্তি)। বিলেতে প্রদ্যোতকুমার দেখিয়ে এসেছিলেন যে অতিথিপরায়ণ আর বদান্য কা'কে বলে। এবং সেই ক্ষেত্রে সেখানকার অভিজাত সম্প্রদায়কে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে যুবরাজ দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পৌত্র তিনি। প্রদ্যোতকুমারের শিল্পবোধ ও শিল্পপূজার বিস্তারিত বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। নীচে তাঁকে লেখা তিনখানি চিঠি সন্নিবেশিত হ'ল। এ চিঠিগুলিও প্রকাশ করতে অনুমতি দিয়ে তাঁর পুত্র পূর্বোক্ত মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন কৃতজ্ঞতা পাশে আমাদের আরও জড়িয়ে ফেললেন।—স]

ডাঃ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা

প্রিয়বরেষু, ডিসেম্বর ৬, ১৯১১

মহারাজা বাহাদুর, রাজকীয় সম্বর্ধনা তহবিলে একশত টাকা দানকারী সদস্যরূপে বিশেষ প্রদর্শনীর দিন ষ্যাম্পি থিয়েটারে আমি প্রবেশাধিকার পাইব কি না এ সম্পর্কে এক ছত্র জানাইলে বিশেষ আনন্দিত হইব (অবশ্য যদি আপনার তরফে কোন অসুবিধা না হয়)।

আমার দেয় মুদ্রা আমি দিয়া দিয়াছি এবং প্রবেশাধিকারের জন্য একটি মামুলী আবেদনও করিয়াছি; তবে জানি না যে একশত টাকার সদস্যদের তথায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে কি না সেইজন্যই আপনাকে এই পত্র লেখা।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আমোদ-প্রমোদ উপসমিতির সভাপতিরূপে যে স্বর্ণ পদক পাইবার আমি অধিকারী তাঁহার জন্য মিঃ ডি, কে, কানিসন্‌কে লিখিব কি? অবশ্য যদি প্রবেশাধিকারই না পাই তো সুবর্ণপদক আমার কোন কাজেই আসিবে না।

বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনাদের

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পত্র

২৬ পটলডাঙ্গা, কলিকাতা

প্রিয় প্রদ্যোতকুমার, ৭ই ডিসেম্বর ১৯১১

বিশেষ প্রদর্শনীর উপসমিতির কার্যকরী সভার আমি একজন সভ্য। মহামহিম সম্রাট ও মহামহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞীর ভারতে আগমন উপলক্ষে এই বিশেষ প্রদর্শনী এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে আমাকে এবং আমার পুত্র পরিজনদের তুমি কি কি সুযোগ সুবিধা দান করিতে পার, জানাইয়া আনন্দবর্ধন করিও। তোমাদের

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের পত্র

ভবানীপুর

প্রিয়বরেষু, রবিবার, ৩রা মে ১৯১১

মহারাজা, চক্ষে ছানি পড়ার জন্য অন্য হস্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে। অপরাধ মার্জনা করিবেন। চিকিৎসকের উপদেশে যতদূর সম্ভব অধ্যয়ন ও লিখন বন্ধ রাখিতে হইতেছে।

আগামী মঙ্গলবার ৫ই তারিখে অপরাহ্ণ সোয়া পাঁচ ঘটিকায় অনুগ্রহ করিয়া এখানে একটি চা-চক্রে মিলিত হইলে সুখী হইব। আমি এ উপলক্ষে বিশেষ কাহাকেও বলি নাই, মাত্র দুই তিন-জনকে বলিয়াছি, বর্ধমানের মহারাজাকেও বলিয়াছি।

আপনার পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা শুনিবার জন্য আমি উৎসুক হইয়া আছি, সেখানে কি দেখিলেন, সেখানকার পরিস্থিতি কিরূপ, আজিকার যুগোপযোগী তাহাদের অগ্রগতি কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এই সকল তথ্য পরিবেশন করিয়া সুখী করিবেন।

আপনাদের

চন্দ্রমাধব ঘোষ

পত্র লেখা

শ্রীমতী বাসবী বসু

জানি আমি আমার চিঠি পৌঁছোবে না তোমার কাছে,
যদি বা পাও, তোমার চোখে বন্ধু, ইহার কি দাম আছে?
আমার সে যে মধ্যরাতের নীল গগনের উজল তারা,
বুকের মাঝের একটি কুসুম, ব্যথায় মলিন ধূলোয় ঝরা।
তোমার প্রাণে আবেশ জাগায় কোথায় তেমন গন্ধ গো,
তোমার মনে দোলন লাগায় কোথায় পাব সে ছন্দ!
নেই কো মাশুল নেই কো হদিস ঠিকানাটাও হয়নি জানা,
জানি আমি আমার চিঠি কোন কালেই পৌঁছোবে না।

অনেক দিনের অনেক কথা সাজিয়ে দিলাম চিঠির সাজে,
রইল ঢাকা, রইল চাপা লেফাপাটার বুকের মাঝে।
তবে আবার নক্সা কেটে কি কাজ আছে পত্র লেখায়
কে দেখেছে বুকের মাঝে আল্‌পনাটি রক্তরেখায়।
সুপ্ত রাতে তানপুরাতে যে গানখানি ঘুমিয়ে ছিল,
কোন্ রাগে যে প্রাণ-বাঁধা তার কোন্ জনে বা খবর নিল?
দীর্ঘ রাতের প্রহর আমার ঘরের প্রদীপ নিবু-নিবু,
মনের কথার জাল ছিঁড়ে যায় চিঠি আমার লিখছি তবু।

অনেক কথা বলার ছিল বিফল হল সে বাসনা—
জানি জানি আমার চিঠি তোমার হাতে পৌঁছোবে না।

মহারাণী সুচারু দেবী

(ব্রহ্মানন্দ-দুহিতা ও ময়ূরভঞ্জ-রাজমাতা)

শিল্পমন ও জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা যে বৈচিত্র্যময় মানব-জীবনে নিত্যসাথী তাহা তিরাশী বৎসর বয়স্কা মহারাণী সুচারু দেবীর সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয়ে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। কারণ, অসুস্থ দেহেও তাঁহার নিয়মিত চিত্রাঙ্কন এবং বিভিন্ন পুস্তক-পত্রিকা পাঠ দৈনন্দিন কর্ম্মধারার অনেকটা স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। এই স্বনামধন্যা পরহিতব্রতী, মাতৃতুল্যা মহিলার সরল ও সুমধুর ব্যবহার দর্শন-প্রার্থীর মনে এক গভীর রেখাপাত করে।

"নব-বিধান" প্রবর্ত্তক ভারতবরেণ্য মনীষী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের তৃতীয়া কন্যা ও চতুর্থ সন্তান সুচারু দেবী ১৮৭৪ সালে কলুটোলা স্ট্রীটস্থ দেওয়ান রামকমল সেনের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে গৃহে বিদ্যাভ্যাস করিয়া সাত বৎসর বয়সে তিনি Miss Spigetএর মিশনারী বিদ্যালয়ে (Church of Scotland) ভর্ত্তি হন। পরে তিনি Victoria Institutionএ যোগদান করিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষাদীক্ষায় বিষয়ে তিনি খুল্লতাত ৺কৃষ্ণবিহারী সেন ও উপাধ্যায় ৺গৌরগোবিন্দ রায়ের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। ১৮৮৪ সালে ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণের পর মাতা জগন্মোহিনী দেবী সন্তান পালনের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া আদর্শ জননীরূপে প্রতিভাত হন। পাঠ্যাবস্থায় সুচারু দেবী

মহারাণী সুচারু দেবী

তদানীন্তন মহিলাসঙ্ঘের (National Ladies' Association) একজন সক্রিয় সদস্যা থাকায় নানারূপ সমাজসেবার কর্ম্মে নিজেকে নিযুক্ত করেন। উহাই পরে All India Womens' Conference (A. I. W. C.) পরিণত হয় এবং মহারাণী বিভিন্ন সময়ে উহার সম্পাদিকা ও সভানেত্রীপদে বৃত হইয়াছিলেন। উহার করাচী অধিবেশনে তিনি প্রথম অলিখিত বক্তৃতা দেন। উহা ব্যতীত বর্ত্তমানে তিনি নিখিল বঙ্গ মহিলাসঙ্ঘ, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন, রামকৃষ্ণ মিশন একাডেমী অফ ফাইন আর্টস, বাহাই (ইরাণ] সম্প্রদায় সম্মেলন, রেডক্রশ, ভারত মহিলাশ্রম, ব্রাহ্মযুব-সঙ্ঘ প্রভৃতি নানা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত রহিয়াছেন। বারিপদার শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত "ব্রাহ্ম-মন্দির" মহারাণীর আনুকূল্যে নির্ম্মিত হয়।

১৯০৪ সালে দেশীয় রাজ্য ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও-র সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯১০ সালে তিনি মহারাজার সহিত ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তথায় তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী মহারাণী সুনীতি দেবীর স্বামী কুচবিহার মহারাজা পরলোক গমন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯১২ সালে ময়ূরভঞ্জ মহারাজা রামচন্দ্র দেহত্যাগ করায় তিনি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন।

১৯৩২ সালে তাঁহার কন্যা জয়ন্তী দেবীর সহিত নন্দগাঁও মহারাজার বিবাহ হয় এবং পুত্র ব্যারিষ্টার ধ্রুবেন্দ্র দ্বিতীয় মহাসমরের সময় (১৯৪২ সালে) কটকের সন্নিকটে যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকাকালীন বিমানদুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাই মহারাণী জানালেন "আদর্শ স্বামী ও প্রাণ-প্রতিম পুত্রকে হারিয়ে আমার বৈরাগ্যের জীবন চলছে এখন।" অবশ্য প্রথম হইতেই তিনি সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত রহিয়াছেন।

পূর্ব্বাঞ্চলে দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে নানারূপ জনহিতকর উন্নয়নমূলক কর্ম্মে যে ময়ূরভঞ্জ সর্ব্বাগ্রগণ্য রাজ্য হিসাবে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা মহারাণী সুচারু দেবীর আগ্রহে এবং ভূতপূর্ব্ব মহারাজা ৺পূর্ণচন্দ্রের উদ্যোগে ও বর্ত্তমানে মহারাজা প্রতাপচন্দ্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সম্ভবপর হয়। ডক্টর ৺পি, কে, সেন ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী উক্ত রাজ্যের দেওয়ান ও রাজনৈতিক পরামর্শ-দাতারূপে কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন।

বিগত শতাব্দীতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সার্কুলার রোডস্থিত "Lily Cottage" এ তদানীন্তন জ্ঞানী, গুণী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের একটি প্রধান মিলন-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। তজ্জন্য সুচারু দেবী মহর্ষি দেবেন্দ্র ঠাকুর, পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহামতি গোখেল, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতির

সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হন। এই সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় নমস্যদের সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করিলে মহারাণী আমায় জানালেন, "মহর্ষি আমার দাদার নামকরণ করেছিলেন করুণাচন্দ্র,—ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ও আমার পিতাঠাকুরকে হাত ধরাধরি করিয়া গৃহে নৃত্য করিতে দেখিয়াছি আর আমার ঠাকুরমাকে নিজ মায়ের মতন পরমহংসদেব মনে করিতেন,—মহামতি গোখেল মহারাজার মৃত্যুর পর সান্ত্বনা দিয়া আমায় বলেছিলেন যে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য যেন নিজেকে ব্যস্ত রাখি—স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ) আমাদের গৃহে 'নব বৃন্দাবন' অভিনয়ে 'ঋত্বিক' করেছিলেন আর সাত বৎসরের আমি ও আমার ছোট বোন উহাতে অংশ গ্রহণ করি,—বাগ্মী বিপিন পাল বলতেন যে অনেক কথা বলার আছে—তোমরা আমায় বলিয়ে নাও—মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সাক্ষাৎ-প্রার্থী আমাকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বললেন—Sword is hanging on me আর আমার হাতের ফুলগুলি তাঁহার বুকের উপর রাখিতে বলেন।" ইহা ছাড়া লেডি অবলা বসু, মিসেস পি, কে, রায়, সরলা দেবী, হেমলতা দেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, বাসন্তী দেবী, মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারকর ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি প্রভৃতির সহিত তাঁহার কর্ম্মজীবনে ঘনিষ্ঠতা হয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সহিত 'পণ-প্রথা' সম্বন্ধে একবার এক আলোচনা সভায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে মহাত্মা গান্ধীর কলিকাতায় অবস্থানকালীন পূর্ব্ব-পরিচিতা মহারাণী তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। ৺সরোজিনী নাইডু তাঁহাকে "মাসীমা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান রাজ্যপালিকা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার সম্বন্ধে নিয়মিত খোঁজখবর লইয়া থাকেন।

বাল্যকাল হইতে তাঁহার চিত্রাঙ্কনে অনুরাগ থাকায় ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালীন তিনি বহু চিত্রশিল্প সংগ্রহে ও অঙ্কন শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেন। তাঁহার অঙ্কিত তৈলচিত্রগুলি বিবিধ প্রদর্শনীতে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে তিনি "ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন বক্তৃতামালা"র জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এককালীন দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পরলোকগত পুত্রের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের জন্য পৃথক দশ হাজার টাকা তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত জীবনের বিভিন্ন সময়ে মহারাণী লিখিত প্রবন্ধ ও কবিতাসমূহ ১৩৫৭ সালে প্রকাশিত "প্রণতি" পুস্তকে গ্রথিত করা হইয়াছে। প্রথম জীবনে তিনি যে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন অদ্যাবধি তাহা পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান। তাঁহার গুপ্তদানে বহু পরিবার ও প্রতিষ্ঠান আজও উপকৃত হইতেছে। দুই শতাব্দীর সেতু-স্বরূপা এই মহীয়সী মহিলাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া আসিলাম।

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস

[হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি ও মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের প্রাক্তন য়্যাডমিনিষ্ট্রেটার]

অনিশ্চিত অন্বেষণ থেকে সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির সাফল্যময় পথের সেতু হ'ল ধৈর্য, নিষ্ঠা, উদ্যম। জীবনের উষালগ্নের আকাশ যাঁদের ভরে থাকে শ্রমের কালিমায় অপরাহ্নের আকাশ তাঁদের ভরে ওঠে শান্তির জ্যোতিতে। বাঙলাদেশের এই কর্মাগ্রয়ী সন্তানদের নামের তালিকায় শীর্ষস্থানেই দেখা দেবে শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাসের নাম। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণার বাসিন্দা পরলোকগত চন্দ্রশেখর দাসের কনিষ্ঠ পুত্র কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন অধিকর্তা (য়্যাডমিনিষ্ট্রেটার) বিখ্যাত আইনজ্ঞ শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ও বাল্যকালে দু'টি প্রচণ্ড আঘাত জীবনে পান, চার ও সাত বছর বয়েসে যথাক্রমে বাবা ও মা দু'জনকেই হারান। জীবনের ইতিহাস-রচনার বোধনবেলায় এই অপ্রত্যাশিত আঘাত তাঁকে সচেতন করে তুলল জীবনবোধের প্রতি। এই আঘাতের তোড়েই তাঁর জীবনের স্রোতধারা চিরদিন সার্থকতার উপকূলের উপর দিয়েই বয়ে গেছে। পাটনা থেকে চতুর্থ স্থান অধিকার করে স্কলারশিপ নিয়ে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন গোপেন্দ্রনাথ। কলকাতায় এসে যোগদান করলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। গণিতে এম, এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান করলেন অধিকার। এর পর অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করাকালীন সংস্পর্শে আসেন পুরুষ সিংহ পূজনীয় ডাঃ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের। আশুতোষ আইনের দিকে আকৃষ্ট করলেন গোপেন্দ্রনাথকে। গোপেন্দ্রনাথের জীবনে আশুতোষের প্রভাব অপরিসীম। অমলিন দীপ্তিতে আশুতোষ আজও বিরাজমান গোপেন্দ্রনাথের মনো মন্দিরে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষার প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের একজন আইন ব্যবসায়ীরূপে হলেন গণ্য। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে গ্রহণ করলেন আইন-কলেজের বক্তৃতাদানের দায়িত্বভার। আইনএ স্নাতকোত্তর রিসার্চ স্কলার ছিলেন গোপেন্দ্রনাথ। এফ, এ-তে স্কলারশিপ ছাড়াও ছাত্রজীবনের স্বীয় প্রতিভার পরিচায়করূপে লাভ করেছেন ঠাকুর আইন-পদক, পার্বতীচরণ রায় সুবর্ণপদক এবং বিশ্ববিদ্যালয় সুবর্ণ পদক। ১৯১৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত দীর্ঘ বত্রিশ বছর অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন বহু

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস

মামলা, যুক্তি, তর্ক ও জেরার প্রখরতায় নিজের আসন স্থায়ী করে নিয়েছেন কৃতী আইনবিদদের দরবারে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে গোপেন্দ্রনাথ কলকাতা বিচারাধিকরণের অন্যতম বিচারকের পদে নিযুক্ত হলেন। ১৯৫০ পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই পদে সমাসীন। অবসর গ্রহণের পরেই মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের য়্যাডমিনিষ্ট্রেটারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করে ভারত সরকারের আইন কমিশনের একজন সভ্য বলে হলেন পরিগণিত (১৯৫৫)। আইনে ইনি আর্টিক্‌লড ক্লার্ক ছিলেন ভারতবরেণ্য আইনজ্ঞ স্যার রাসবিহারী ঘোষের সুযোগ্য অনুজ ধুরন্ধর আইনজ্ঞ স্যার বিপিনবিহারী ঘোষের। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ইনি লণ্ডন, প্যারী, রোম, ভিয়েনা, ৎসুরিখ, নেপ্‌ল্‌স, ফ্লোরেন্স, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশসমূহ পরিভ্রমণ করেন। ফ্লোরেন্সের শিল্প সম্ভার এঁকে মুগ্ধ করেছে। ৎসুরিখে দেখেছেন বহু ভারতীয় সেখানকার ব্যবসায় জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ভারতীয় হিসেবে এই সমস্ত দেশগুলিতেই যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার পেয়েছেন এবং দেখেছেন যে ঐ দেশগুলিতে ভারতের প্রভাব অনতিক্রম্য। ব্যক্তিগত জীবনে বাঙলার এক প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষাবিদ হিন্দু স্কুলের স্তম্ভস্বরূপ স্বর্গীয় রসময় মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা মণিমালা মিত্রের পাণিগ্রহণ করেছেন। আজ সত্তরের পাদপ্রান্তে এসে ব্যবহারিক কর্মজগতের অন্তরালে এসেছেন গোপেন্দ্রনাথ। কিন্তু তাই বলে তাঁর এখনকার দিনগুলিও কর্মহীন নয়। সৎ গ্রন্থাদি পাঠ করে এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রমুখ বহু জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সমাজ সেবা করে দিন কাটছে গোপেন্দ্রনাথের। তাঁর সভাপতিত্বে এবং দানে বহু প্রতিষ্ঠান পুষ্ট হচ্ছে। নিয়োজিত হচ্ছে তারা সত্য ও সুন্দরের সাধনায় এগিয়ে যাচ্ছে তারা কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে।

অধ্যাপক ডাঃ সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[খ্যাতনামা গণিতবিজ্ঞানী]

খ্যাতনামা গণিতবিজ্ঞানী ডাঃ সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৯৩ সালের ২৭শে এপ্রিল ঢাকা জেলার মালপদিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়রা ছয় ভাই, ভাইদের মধ্যে তিনিই সকলের বড়। পরলোকগত অমর কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর সহোদর ভাই।

সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বাল্যশিক্ষা লাভ করেছিলেন দুমকা গভর্ণমেণ্ট স্কুলে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে স্কুলে তাঁর বরাবরই খুব সুনাম ছিল। ১৯০৮ সালে দুমকার ঐ স্কুল থেকেই সরকারী বৃত্তি লাভ করে তিনি সসম্মানে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজের শিক্ষা তাঁর আরম্ভ হয় ঢাকায়,—ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১০ সালে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় আই এস সি পাশ করেন। এই পরীক্ষাতেও তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে সরকারী বৃত্তি লাভ করেছিলেন, আই, এস, সি, পাশ করার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করলেন। ঐ কলেজ থেকেই ১৯১২ সালে গণিতবিজ্ঞানে অনার্স সহযোগে বি, এস, সি, এবং ১৯১৪ সালে গণিতবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর সহিত এম, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি হিন্দু কলেজ ফাউণ্ডেসন স্কলারসিপও লাভ করেছিলেন।

এম, এস, সি, পাশ করার পর তাঁর প্রকৃত গবেষক-জীবন সুরু হলো। ১৯১৫ সালে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারসিপ লাভ করলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালে নবনির্ম্মিত বিজ্ঞান কলেজের ফলিত গণিত বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। অধ্যাপনার সঙ্গে চললো গবেষণা, ক্রমেই গবেষক মহলে অধ্যপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খ্যাতি বৃদ্ধি লাভ করতে লাগলো। ১৯১৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ সায়ান্স উপাধি লাভ করলেন। ঐ বৎসরই অধ্যাপক ডাঃ গণেশপ্রসাদের স্থলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই গুরুদায়িত্ব লাভ করার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর।

ডাঃ সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষক জীবনে ডাঃ গণেশপ্রসাদ এবং সি, ভি, রমণের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। সংঘাতের ফলে সৃষ্ট তরঙ্গের বিষয়ে তাঁর কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই সময়ে পর পর ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ সালে। এই প্রসঙ্গেই তাঁর গবেষণার সুবিধার জন্য তিনি একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। যন্ত্রটির নাম দেন ব্যালিসটিক ফনোমিটার। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রথম জীবনের এই কাজ বিজ্ঞানীমহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। ১৯১৮ সালে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যেই তাঁর এবং তাঁর ছাত্রদলের গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়ে তাঁদের খ্যাতিকে যথেষ্ট বিস্তৃত করেছে।

১৯২২ সালে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্র থেকে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ডাক এলো। তিনি ভারত সরকারের আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করলেন। স্যার গিলবার্ট ওয়াকারের আমন্ত্রণ ক্রমেই ডাঃ বন্দ্যোপাধায় এই নতুন কর্ম্মস্থলে যোগদান করলেন। প্রথমেই তাঁকে কোলাবা এবং আলীবাগ মানমন্দিরের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। এই পদ গ্রহণের পরেই ১৯২৩ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি পদার্থ ও গণিত-বিজ্ঞান শাখার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। এই অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে তিনি ভারতীয় সমুদ্র সমূহে সাইক্লোনের সৃষ্টি, বৃদ্ধি, এবং ধ্বংস বিষয়ে আলোচনা করেন।

নতুন কর্ম্মক্ষেত্রে এসে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণা প্রধানতঃ ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান ও আবহাওয়া বিজ্ঞান বিষয়েই কেন্দ্রীভূত হলো। ভূমিকম্প বিষয়ক তাঁর মৌলিক গবেষণা পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট সম্মান লাভ করে। ভারতীয় সাগরসমূহের

আবহাওয়া মণ্ডলে গোলযোগের সঙ্গে সংযুক্ত পৃথিবীর মৃদুকম্পন বিষয়ে তাঁর একটি আলোচনা ১৯২৮ সালে ফিলজফিক্যাল ট্রানজাকসন অফ রয়েল সোসাইটীতে প্রকাশিত হয়। এর পরে ভূমণ্ডলের মৃদুকম্পন বিষয়ক তাঁর নিজস্ব মতবাদ তিনি গঠন করেন। ক্রমেই বহু ছাত্র ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নিকট গবেষণা করবার সৌভাগ্য লাভের জন্য, তাঁর কাছে সমবেত হতে থাকে। বোম্বাই সরকার এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁকে বোম্বায়ের রয়েল ইনসটিটিউটের অবৈতনিক অধ্যাপক পদ দিয়ে সম্মানিত করেন। এই সময়েই বহু ছাত্র তাঁর কাছে গবেষণা করে বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

১৯৩৩ সালে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারত সরকার ডাইরেক্টর জেনারেল অফ অবজারভেটারীস নিযুক্ত করেন। ১৯৩৪ সালে এই বিজ্ঞানী বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূপদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক এবং আবহাওয়া বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করবার জন্য ইউরোপ যাত্রা করেন। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করার পর তিনি পরে আবার ডাইরেক্টর জেনারেল অফ অবজারভেটারীস নিযুক্ত হন এবং ১৯৫০ সালে ঐ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানী যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গণিত-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত নামানোর জন্য তাঁর বিখ্যাত গবেষণা সুরু হয়। মেঘের মধ্যে বড় বড় বেলুনে করে জমাট কার্বন ডাইঅক্সাইড ও সিলভার আয়োডাইড বপন করে, ঠাণ্ডা জল ছড়িয়ে বৃষ্টিপাত ঘটানোর চেষ্টা তিনি করেছিলেন। এই প্রচেষ্টায় আংশিক সাফল্য লাভও হয়েছিল।

বর্ত্তমানে এই বিজ্ঞানী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় এমেরিটাস অধ্যাপক। লেখাপড়া নিয়েই কাটছে তাঁর শান্ত অবসর জীবন। শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশ তাঁর খুবই পছন্দ, তাই প্রায়ই মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে কিছু দিন কাটিয়ে আসেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা এখনও তিনি করছেন,—কয়েকটি বই রচনাতেও হাত দিয়েছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে এই সৌম্য, সহাস্যময়, সদালাপী বিজ্ঞানী ভূপদার্থ ও আবহাওয়া বিজ্ঞান বিষয়ে কয়েকটি ভালো বই লেখার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন।

সারা জীবনে বহু সম্মান এই বিজ্ঞানী পেয়েছেন। অসংখ্য বিদ্বদ্মণ্ডলীর তিনি সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন; তাঁর উপদেশ ও পরিচালনালাভে ধন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নাম-করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। তিনি ভারতীয় ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সেস-এর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। মনোগ্রাফ, পুস্তিকা মিলিয়ে এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর গবেষণা ও চিন্তামূলক প্রবন্ধের সংখ্যা শতাধিক।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মধুর ব্যবহার সহজেই সকলকে আকর্ষণ করে। সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল মনের জন্য সকলের কাছেই তিনি অতি প্রিয়। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর সখ হলো ছবি তোলা। নিজের হাতে নানা রকম যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করতে তিনি এখনও ভালোবাসেন। ভারতের শিক্ষা ও গবেষণাক্ষেত্রে এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর নেতৃত্বও মতামতের মূল্য ও প্রয়োজন খুবই বেশী। আমরা এই শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

ডক্টর হেমনাথ সান্ন্যাল

[ভারত-বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ও অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল]

নিখিল ভারতে বর্ত্তমানে যে স্বল্প-সংখ্যক বিখ্যাত আইনবিদদের নাম শ্রুত হয়, তন্মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ডক্টর হেমনাথ সান্ন্যাল অন্যতম। সাধারণ্যে তিনি "হেম সান্ন্যাল" বা এইচ, এন, সান্ন্যাল নামে সমধিক পরিচিত। সুদক্ষ তর্কজাল, সুতীক্ষ্ণ মেধা ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছেন।

১৯০২ সালে শ্রী সান্ন্যাল রংপুর জেলার নীলফামারী সহরে জন্মগ্রহণ করেন এঁর পঞ্চদশ বৎসর বয়সে দশম শ্রেণীতে পাঠকালে পিতা জানকীনাথ সান্ন্যাল পরলোকগমন করেন। পর বৎসর তিনি স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২২ সালে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররূপে অর্থনীতিতে অনার্স সহ গ্রাজুয়েট হন। উক্ত বৎসরেই উচ্চ-শিক্ষার্থে তিনি ইংল্যাণ্ড গমন করেন এবং ১৯২৫ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতি ও আইনে ট্রাইপস গ্রহণ করিয়া London School of Economicsএ গবেষণায় রত হন। ১৯২৭ সালে তথা হইতে Ph. D ডিগ্রী লাভ করিয়া Inner Templeএ আইন পড়িতে থাকেন। ১৯২৯ সালে ভারতে ফিরিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। প্রথম দিকে তাঁহাকে যথেষ্ট বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয় কিন্তু দৃঢ়চেতা হেমনাথ কয়েক বৎসরের মধ্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। সেই সময় কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবীরা তাঁহাকে সহকারী (জুনিয়ার) হিসাবে পাইতে সচেষ্ট হন। কিছুদিনের মধ্যে হেমনাথ কলিকাতা "বারের" তৎকালীন কায়েমী স্বার্থের মূলে আঘাত করিয়া জনপ্রিয় হন।

প্রথম বৎসরে হাইকোর্ট হইতে মাত্র একান্ন টাকা আয় হওয়ার

হেমনাথ সান্ন্যাল

বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে সরকারী শিক্ষাবিভাগে অধ্যাপনার বৃত্তি গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। কিন্তু ভগবৎ-বিশ্বাসী ও কর্ম্মনিষ্ঠ হেমনাথ অধিকতর আগ্রহে আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। জানি না শিক্ষাবিভাগ তাঁহার সহায়তায় কতটা উপকৃত হইত কিন্তু আইন-জগৎ যে একজন মুখোজ্জ্বলকারী বাঙ্গালী ব্যবহারজীবী হইতে বঞ্চিত হইত ইহা ধ্রুব সত্য। অগাধ বিত্ত অর্জ্জন করা সত্ত্বেও শ্রী সান্যাল কলিকাতা বারের প্রতিস্তরের ব্যক্তির সহিত মধুরালাপে রত থাকেন এবং তিনি বহুদিন হইতে উহার একজন "বেসরকারী নেতা" হিসাবে পরিচিত। সেখানে আজও তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি বহুবিখ্যাত মামলা পরিচালনা করিয়াছেন।

ছাত্রাবস্থায় শ্রীসান্যাল নানারূপ ক্রীড়ায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তজ্জন্য বর্ত্তমানে তিনি কয়েকটি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকিয়া বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ্‌দের সহায়তায় অল্পবয়স্ক বালকদের নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আইনের দিক্‌পাল হেমনাথের প্রতিটি দর্শনপ্রার্থীর সহিত মিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ আলাপ শুনিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহার পরিহাসপ্রিয়তা সর্ব্বজনবিদিত। আমার সহিত সাক্ষাতের সময় তিনি একটি "সন্ন্যাসীর কমণ্ডলু" দেখাইয়া বলেন যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথজীউর মন্দির হইতে নির্গমনকালে আকস্মিক ভাবে এক জটাজুটধারী সাধুপুরুষ তাঁহাকে উহা প্রদান করেন। উহা গ্রহণ করায় পরিবারবর্গের প্রচুর আপত্তি উঠে কিন্তু অটল থাকিয়া আজও উহা তিনি সযত্নে রক্ষা করিতেছেন।

শ্রীসান্যালের ক্ষুদ্র অথচ মনোরম বাসভবনে তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থাগারে নানা ধরণের পুস্তক দেখিয়া মনে হয় যে, জ্ঞান আহরণের ব্যাকুল আগ্রহে উহা গড়িয়া উঠিয়াছে। বহু অনুসন্ধিৎসু পাঠক উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কর্ম্মপ্রতিভা যে লুক্কায়িত থাকে না—উহা বর্ত্তমান মাসে নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের "অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল" রূপে হেমনাথের নিয়োগ মারফৎ প্রমাণিত হইয়াছে। কলিকাতা মহানগরী হইতে তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র সুদূর দিল্লী সহরে অপসারিত হওয়ায় শুধু যে ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষতি সাধিত হইবে, তাহাই নহে—আইনের একটি পরিপাট্য গ্রন্থশালার বিরাট অংশ শূন্য হইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যক্তিগত বা প্রদেশগত স্বার্থের উচ্চে জাতীয় সরকারের আহ্বানের স্থান হওয়া প্রয়োজন বলিয়া সকলে মনে করেন।

মানব-দরদী হেমনাথের এত জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও গত সাধারণ নির্ব্বাচনে তাঁহার পরাজয় দলের সাংগঠনিক ত্রুটীর জন্য সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

কলিকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট পত্রিকা তাঁহার কর্ম্মময় জীবনী-প্রকাশের জন্য আগ্রহান্বিত ও সচেষ্ট হন কিন্তু একজন বিশিষ্ট পুরাতন পাঠক হিসাবে তিনি সানন্দে উহা "মাসিক বসুমতী"তে প্রকাশার্থ উপহার দেন।

বিদায়ক্ষণে মনে হল যে কর্ম্মদীপ্ত, স্বনামধন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠ, সদানন্দ, অমায়িক ও যুবজনোচিত স্বাস্থ্যের অধিকারী এই মানুষটি আজ দূর-পথের যাত্রী ও আরও উচ্চতর গৌরব-শিখরে উঠিবেন। তাই স্মরণ করিলাম—শিবাস্তে পন্থানমস্তু।

ষ্টীমারে

অবনীকুমার নাগ

এখন অনেক রাত—একটা কি দুটো,
আমি ডেকের রেলিঙ্‌-এ হাতের ওপর
থুত্‌নি রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি।
ঝিরঝিরে বাতাস এসে আমার মাথায়
হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ; আবেশে আরামে আমার
চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে, আর—
পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের সুখ অনুভব করছি
দেহের প্রতিটি কণা দিয়ে।

আকাশের ওপরে আলোর মেয়ে কুমারীচাঁদ
মিট্ মিট্ করে তাকাচ্ছে আর হাসছে ;
তার উজ্জ্বল মুখ থেকে ছল্‌কে ছল্‌কে আলোটা এসে
মিষ্টি গানের মতো ষ্টীমারের ডেকে, নদীর বুকে,
আর আমার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে'
মনের-ইথারে কত না তরঙ্গ তুলছে।

ষ্টীমারটা যখন ছাড়লো তখন
হারেমের সহচরীর কায়দায়
তীর-বাদশাকে নদীর ঢেউ-হাত দিয়ে
'সেলাম' 'সেলাম' বলে ছলাৎ ছলাৎ করে'
আস্তে আস্তে পিছিয়ে এলো।
আমি ডেকে দাঁড়িয়ে তাই দেখলাম।
এখন আর ঢেউ নেই। বাঁধা পথে এখন
ষ্টীমার গন্তব্য স্থলে চলছে আপন-মনে।
বুকে তার কতো নিদ্রামগ্ন যাত্রী।

এখন ষ্টীমার চলছে আর
জলে চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ে'
কতটুকরো, কত খান খান হচ্ছে।
এই বুঝি ভালো ; হয়তো এই-ই বেশ।

তাই ভাবছি :
এমন রাতে আর ঘুমের-কেবিনে
আমি নাই-বা গেলাম।

রবীন্দ্রায়ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

যে রত্নগর্ভা মহীয়সী মহিলা কয়েকটি রত্নের জন্মদাত্রী তন্মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন রবীন্দ্রনাথ, সেই পরম শ্রদ্ধেয়া সারদাসুন্দরী দেবীকে নানা সাংসারিক ও আর্থিক সকল ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়া পতি-পার্শ্বচারিণী হইয়া চলিতে হইয়াছে। তেজস্বিনী শাশুড়ীর অবর্তমানে যাঁহাকে নিত্যনৈমিত্তিক কার্য ও উৎসব মুখরিত বৃহৎ সংসারের লোকলৌকিকতা, সামাজিকতা ও যাবতীয় ভার কর্ত্রীরূপে বহন করিতে হয় ও অনতিকাল পরেই দিক্‌পালসম শ্বশুরের তিরোভাবে নানা ঝটিকায় নানাবিধ উদ্বেগ সহিতে হয়, সেই পূজনীয়াকে বীরাঙ্গনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পরেও প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া স্বামীর প্রব্রজ্যা ও শৈলভ্রমণের মধ্যে অপূর্ব ধীরতার সহিত, কথঞ্চিৎ ভগ্নশরীর লইয়া এই মহিলাকে অতগুলি সন্তান-সন্ততির শিক্ষা ও পোষণ এবং তাঁহাদের বিবাহাদি ও শিশুপালন প্রভৃতি সকল কার্যেই কল্যাণ সাধনে নিরত থাকিতে হয়। যথাসাধ্য শান্তিতে ও প্রফুল্লতায় যে গৃহটিকে পূর্ণ রাখিয়াছিলেন ইহা তাঁহার কম কৃতিত্ব নয়। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও আধ্যাত্মিক বলও যথেষ্ট ছিল। দুটি ভাষা যেমন না জানিলে প্রত্যেক ভাষার প্রয়োগশক্তির বোধ জন্মায় না এবং সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না, তেমনি রবীন্দ্র-জননীর অর্জিত সংস্কার ও জ্ঞান শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টাকে পরিপুষ্ট করে। নারীর আদর্শে শুধু স্বামীর সুখ দুঃখের সঙ্গিনী হইলেই হয় না, সহকর্মিণী ও সহধর্মিণী হওয়া যে বাঞ্ছনীয় এ সংস্কার তাঁহার বাল্য হইতে শেষ দিন পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল ছিল বলিয়াই ভিতরের শান্তি ও বাহিরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

কবির বয়স যখন মাত্র চতুর্দশ বৎসর তখন এই মহীয়সী মহিলা কবিজননী ১২৮১ সালে পরলোকগমন করেন। বালক রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগের পর ও মায়ের শেষ অসুস্থতার জন্য তাহার কিছু পূর্ব হইতেই বালকের লালন-পালনে তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা সৌদামিনী দেবীর সহিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পত্নীরও সাহচর্য ছিল। তৎপরে কবির সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের পত্নী নীপময়ী দেবী সংসারের ভার গ্রহণ করেন ও তাঁহার বড়জা দ্বিজেন্দ্র-পত্নী সর্বসুন্দরী দেবীকে তিনি সাংসারিক কাজ কর্মে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেন। কবির মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমেদাবাদে বিচারকের পদে সমাসীন থাকায় সত্যেন্দ্র-পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী স্বামীর সহিত আমেদাবাদে থাকিতেন। মাতৃবিয়োগে কবির মনের অবস্থা কী হইয়াছিল তাহা তাঁহার স্বলিখিত রচনার পাঠক-পাঠিকারা জানেন।

কিছুকাল পরে কবি আমেদাবাদে তাঁহার মেজদাদার নিকট অবস্থানকালে তাঁহার ইংরাজি শিক্ষা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। তিনি ইংরাজি সাহিত্য পাঠ করিয়া তাহার ভাব অবলম্বনে বাঙলা রচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন যশের কিরীট মাথায় ধারণ করিয়া বাণীকুঞ্জে বিচরণ করিবেন, তখন অনেকেই তাহা বুঝিয়াছিলেন কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষের "কালের প্রস্তরপটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম" —এই গর্বিত বাণী সম্পূর্ণ ভাবে সার্থক করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে পরে বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন তাহা অদৃষ্ট দেবতা তখন নিজ পেটিকার মধ্যেই গুপ্ত রাখিয়াছিলেন, তাহা তখন স্বপ্নেও কেহ ভাবিতে পারে নাই। কাজেই রবীন্দ্রনাথ আত্মীয়দের মতে আর মানুষ হইলেন না যেহেতু অর্থকরী বিদ্যা তাঁহার আয়ত্ব হইল না ও এই চিন্তায় বিব্রত হইয়া আত্মীয় সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে ব্যারিষ্টার করিবার জন্য বিলাতে পাঠাইলেন। মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মেজদাদার সঙ্গে "পুণা" নামক জাহাজে বিলাত যাত্রা করেন। সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী তখন ছেলে মেয়ের সহিত ব্রাইটন অঞ্চলে বাস করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেইখানে আশ্রয় লইলেন ও সেখানকার পাবলিক স্কুলে অর্থাৎ এদেশীয় উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। সেখানকার অধ্যক্ষ প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন— What a splendid head you have. চোখ মুখের ভাবেই শিক্ষকের মনে আশার সঞ্চার কারণ বুদ্ধির পরীক্ষার তখনো কোনো সুযোগ ঘটে নাই। সে বিদ্যালয়ে থাকিয়া তাঁহার কিন্তু বিশেষ ফলপ্রসূ শিক্ষালাভ ঘটিল না। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার তারকনাথ পালিত (পরে ডাঃ স্যার) তাঁহাকে লণ্ডনে লইয়া আসিলেন। ল্যাটিন শিক্ষকের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ও বাড়ীতে তিন জন শিক্ষকের নিকট পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের ক্লাসে ছাত্র হইলেন। কলেজে তাঁহার গুরুদের মধ্যে ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ ইংরেজ সাহিত্যিকদের অন্যতম John ও Henry Morley ভ্রাতৃদ্বয়। John Morley পরবর্তীকালে Lord Morley হন। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক বার্কারের পরিবারে ও আচার্য স্কটের পরিবারে কিছুদিন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। সাহিত্য-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপীয় সংগীত শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা অর্জন মানসে বিলাতের তৎকালীন বিখ্যাত রাজনীতিক বক্তাদ্বয় ব্রাইট ও গ্ল্যাডষ্টোনের বক্তৃতা শুনিতে রবীন্দ্রনাথ বিলাতের পার্লামেন্টের হাউজ অব কমন্স সভার অধিবেশনগুলিতে নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকিতেন আর সাধারণ ও জাগতিক জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার ও চিত্রশালা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গ্রন্থপাঠাদিতে রত থাকা তাঁহার অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে ছিল। লণ্ডনে অবস্থানকালেই 'ভারতীতে' 'ভগ্ন তরী' নামক একটি কবিতা ও 'ইয়োরোপ-প্রবাসীর

পত্র, নামে কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হয়। যে পত্র-সাহিত্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের এতটা প্রসিদ্ধি, এই তাহার সূত্রপাত। ইয়োরোপ প্রবাসীর পত্রে তিনি বিলাত ও ইংরাজ জাতি সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করিতেন, সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ পাদটীকায় তাহার সমালোচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ আবার তাহার প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাঠাইতেন। এইরূপে বড়দাদার সহিত তাঁহার কিছুদিন উত্তর কাটাকাটি চলিয়াছিল।

লণ্ডনে তারকনাথ পালিতের পুত্র লোকেন্দ্রনাথ কবির সহাধ্যায়ী ছিলেন ও ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ভারতে ফেরেন। মহর্ষির আদেশে দেড় বৎসর পরে কবিকে দেশে ফিরিতে হয়। তাঁহার আর ব্যারিষ্টার হওয়া হইল না। বিলাত প্রবাসের ফলে কবি ইংরাজি ভাষা ও গান আয়ত্ব করিলেন। দেশে আসিয়া "বাল্মীকি প্রতিভা" ও "কাল মৃগয়া" রচিত ও অভিনীত হইল। কবি বলিয়াছেন এই রচনায় তিনি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে অনুসরণ করিয়াছেন—

"এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী ?"

"বিদ্বজ্জন সমাগমের" এক সম্মেলনীতে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকা অভিনয় করেন। তাহাতে প্রমাণিত হয় যে কবি একজন ভালো অভিনেতা। সে অভিনয়ের দর্শক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ যাঁহাদের নাম 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত বিদ্বজ্জন সমাগমের বিবরণীতে পাওয়া যায়। ডাঃ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিনয় দেখিয়া নূতন অভিনেতা কবিকে একটি গানে অভিনন্দিত করেন। কবির পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্ত্তিতে তাঁহার দেশবাসী কলিকাতা টাউন হলে যে প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া কবিকে অভিনন্দন প্রদান করেন, সেই সভায় স্যার গুরুদাস তাঁহার সেই বহুকাল পূর্বে রচিত গানটি পাঠ করিয়াছিলেন—

উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত আরবার।
উঠেছে নবীন "রবি", নব জগতের ছবি,
বাল্মীকির প্রতিভা যে দেখাইতে পুনর্বার।

* * * *

"মণিময়" "ধূলিরাশি" খোঁজো যাহা দিবানিশি,
ও ভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে চাবে না আর॥

ঠাকুরবাড়ীতে এই 'বাল্মীকি প্রতিভার' বহুবার অভিনয়ে অন্যান্য ভূমিকার নটদের পরিবর্তন হইলেও বাল্মীকি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও দস্যুসর্দার ছিলেন অক্ষয় মজুমদার একবার ছাড়া। সেবারে অক্ষয় বাবুর স্থলে অবতীর্ণ হন অবনীন্দ্রনাথ। বিদ্বজ্জন সমাগমের শেষ সম্মেলনীতে নাট্যমঞ্চে কবি সাধারণের সম্মুখে প্রথম দেখা দিলেও ইহাই তাঁহার প্রথম অভিনয় নয়। ইহার বহু পূর্বে বাড়িতে আত্মীয়দের সম্মুখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "মানময়ীতে" 'মদনের' ভূমিকা (১৮৭৬ ?), সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ইন্দ্র, ১৮৭৭ (?) সালে "বিবাহ উৎসব" গীতিনাট্যে একটি স্ত্রী-ভূমিকা ও "অলীকবাবু" প্রহসনে (১৮৭৭) নামভূমিকা অভিনয় করেন। তখন "অলীক বাবুর" নাম ছিল "এমন কর্ম আর করব না।"

ইহার পূর্বে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্র প্রমুখ Committee of Fiveএর উদ্যোগে যে "কৃষ্ণকুমারী" অভিনীত হয় তাহাতে কৃষ্ণকুমারীর মাতার ভূমিকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন। এই Committee of Five বা পঞ্চজনার সভার সদস্য ছিলেন—(১) গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, (৩) যদুকমল মুখোপাধ্যায়, (৪) অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী এবং (৫) কৃষ্ণবিহারী সেন। তাহার পর 'বড়দের দলের' উদ্যোগে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক' গণেন্দ্রনাথ প্রমুখের ব্যবস্থাপনায় অভিনীত হয়। "মানময়ী" "পুনর্বসন্ত" নামে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে জ্যোতিরিন্দ্রের তত্ত্বাবধানে পরে 'ভারত সংগীত সমাজে' অভিনীত হয় আর 'বিবাহ উৎসব' কোনো দিন মুদ্রিত হয় নাই। "অলীকবাবুর" বাড়ীর অভিনয়ে কবির সহযোগী অভিনেতা ছিলেন 'সত্যসিন্ধুর' ভূমিকায় বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ।

বিলাত হইতে ফিরিবার পরে বিশ বৎসর বয়সে 'ভগ্নহৃদয়' প্রকাশিত হয় কিন্তু গ্রন্থখানির আর দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নাই যদিও পরে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য করিয়াছেন—

চলেছে ভেসে কত না আশা তরী অনাদি স্রোত বেয়ে
কতকালের কুসুম উঠে ভরি' বরণ ডালি ছেয়ে।

এই পুস্তক প্রকাশের পর ছাত্রমহলে রবীন্দ্রনাথের নাম হইল "বাঙলার শেলি"। আকাশে বাতাসে তখন 'রবি বাবু'। কাব্যে আসিল নূতন ছন্দ। ক্রমে ১২৮৮ সালে "সন্ধ্যা সংগীত" প্রকাশিত হয়। গদ্যে তখন রবীন্দ্রনাথ 'ভারতীতে' "বিবিধ প্রসঙ্গ" ও "বৌঠাকুরাণীর হাট" লিখিতেছেন। এই সময়েই তাঁহার অননুকরণী সুরের লক্ষণ সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। ১২৯০ সালে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" ও "প্রভাত সংগীত" প্রকাশিত হইল।

নবছন্দে নবভাবে বঙ্গসাহিত্য ভরপুর হইয়া উঠিল। পিশুন-বুদ্ধি সমালোচকদল গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"এসব অস্পষ্ট, বোঝা যায় না এ চলবে না, এ কাব্য নয়—কাব্যি।" কাব্যের শব্দগুলা কিন্তু সবই বাঙলাভাষায়, দেখিলে বাঙলা অভিধানে সবই পাওয়া যাইতে পারিত।

প্রতিভাও উদ্বোধনের অপেক্ষা রাখে। বাড়িতে বড়দাদা নতুনদাদা জ্যোতিবাবু ছাড়াও কবিকে প্রথম বয়সে উদ্বোধিত করেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী।

বঙ্গসাহিত্যের আর এক নব-জাগরণের প্রভাত-আলোকে যে কলকণ্ঠ বিহঙ্গকুলের কাকলিতে ভারতীকুঞ্জ মুখরিত হইয়াছিল তাহার অগ্রণী ছিলেন "সারদা-মঙ্গলের" কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া যে নবীন-যাত্রীরা সাহিত্যক্ষেত্রে যাত্রারম্ভ করিয়া ছিলেন সেই দলে রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন, 'এষা' কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং বিহারীলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্র। এই অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী, আন্দুলনিবাসী, এম, এ, এবং বি, এল হইয়া এটর্ণি হন কিন্তু বাস্তব জগতে আদালতের কচকচানি অপেক্ষা কল্পলোকে কাব্যরচনা ও চিত্রশিল্প ইঁহাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

অক্ষয় ভাই,

বনের পাখী বনে এসে
গান গায় প্রাণ ঢেলে

তাহার কি কর্ম থাকা আদালত পিঞ্জরে
বসন্তের সহকার
মুক্তবায়ু প্রাণ যার
অবরুদ্ধ কারাগারে সে কি কভু মুঞ্জরে ?
তোমার কি সাজে সখা আদালত-পিঞ্জরে ?

ইংরাজি কাব্য ও সাহিত্যে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বঙ্গসাহিত্য সরস্বতীর সেবায়ও তাঁহার লেখনী রসবিকাশে সফলতা লাভ করিয়াছিল। ইঁহাকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

অতএব নমো নম
অধম অক্ষমে ক্ষম
ভঙ্গ আমি দিনু ছন্দরণে
মগধে কলিঙ্গে গৌড়ে
কল্পনার ঘোড়দৌড়ে
কে বলো পারিবে তোমা সনে।

যখন রবীন্দ্রনাথ 'ভারতীতে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" লিখিলেন তখন ঐ পত্রিকাতেই অক্ষয়চন্দ্র নির্ঝরিণীর প্রাণের ব্যথা লিখিলেন—

*   *   *

কে জানিত ভাগ্যে ছিল হেন অভিশাপ,
হ'ল সার অশ্রুঢালা, নিরাশ, মরম জ্বালা
দিবানিশি কুলু কুলু আকুল বিলাপ।

*   *   *

অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাহিত্য-সহচর। প্রথম বয়সে কবি ইঁহার সহিত কাব্যশাস্ত্র আলোচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের ভাষায় কাব্য লিখিতে মনস্থ করিয়া "ভানুসিংহের পদাবলী" রচনা করিলেন। এই 'ভানুসিংহ' লইয়া একটি কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই সময়ে অধ্যাপক নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জার্মাণীতে ছিলেন। সেখানে তিনি ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সহিত এদেশের কবিদের তুলনা করিয়া একটি নিবন্ধ লেখেন। এই নিবন্ধে 'ভানুসিংহকে' প্রাচীন পদকর্তা বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন ও এই নিবন্ধ লিখিয়া তিনি 'ডক্টর' উপাধি পান।

'ভানু' যে 'রবির' নামান্তর মাত্র তাহা তখনো প্রকাশ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের কৌতুক রচনা "ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী" তখনো "নবজীবনে" প্রচারিত হয় নাই।

কবি যখন "বঙ্গভাষার লেখক-এ" অনুরুদ্ধ হইয়া কাব্যজীবনের ক্রমবিকাশ লেখেন তখন লেখেন তিনি যন্ত্র মাত্র, যন্ত্রী তাঁহার মধ্য হইতে বহু বিচিত্র সুর বাহির করিতেছেন। এই ভাবে সারা জীবন কবির সাধনা।

বিলাত হইতে ফিরিবার পর সাহিত্যসমালোচক কবি প্রিয়নাথ সেনের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য ঘটে। ইয়োরোপের বিখ্যাত গ্রন্থকারদের রচনাবলী প্রিয়নাথের অধীত ছিল। ইনিই প্রথম কবিকে ইয়োরোপীয় সাহিত্যাধ্যয়নে উদ্বুদ্ধ করেন। পরে বিশ্ব-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল তাহার আরম্ভ এইখানে। সেই সুদূর অতীত হইতে কবি বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে চিরদিনই সজাগ ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় নব প্রকাশিত কোনো গ্রন্থই তাঁহার অনধীত নাই শুধু বাংলা বা ইংরেজি সাহিত্যক্ষেত্রে নয়—শিক্ষাক্ষেত্রের নানা বিভাগে। এইখানে আর একটি জীবন-বন্ধুর প্রভাবের কথা স্মরণীয়। সে বন্ধু বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। আচার্য জগদীশের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অল্প-বয়সে হয় এবং সেই হইতেই উভয়েই অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই কবি ও বৈজ্ঞানিকের মিলনে উভয়েই পরস্পরের জ্ঞানশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই বিজ্ঞানাচার্যের সাহচর্যের ফলেই হয়তো কবি প্রাকৃতিক আনন্দের মধ্যেও বাস্তবের বেদনাকে বিস্মৃত হন না এবং তাহা কবির বহু রচনায় প্রকাশ। এমন কি তাঁহার প্রিয় ঋতু বরষার আনন্দের মধ্যেও তিনি যে পথবাসী গৃহহারার কথা বলিতে ভুলেন নাই তাহাও একদিন কবিকে জগৎপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন। আর উদ্ভিদের রাজ্যে প্রাণের সাড়া জীবরাজ্যের মতো কি না তাহার সন্ধানে স্যর জগদীশচন্দ্র যে একনিষ্ঠ সাধনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেও কবির উৎসাহ যে কতদূর কার্যকরী হইয়াছিল তাহা তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন।

'সন্ধ্যা সংগীত' ও 'প্রভাত সংগীতের' মাঝখানে কবিকে আর একবার বিলাত যাত্রা করিতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, লোকচরিত্রাভিজ্ঞতা, ঘটনাসমাবেশের পারিপাট্য ও সমস্যা বিশ্লেষণের শক্তির পরিচয় তাঁহার প্রতি রচনাতেই পাওয়া যায়। তাঁহার বাগ্মিতাও অসাধারণ। কণ্ঠস্বরের নানা বৈচিত্র্য যাহা তাঁহার ৭০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছিল তাহা আমাদের দেশে অতি অল্প বাগ্মীরই আছে। প্রবন্ধ পাঠের সময় কবির স্বর মাধুর্য না হারাইয়াও যে গাম্ভীর্যপূর্ণ গভীর নাদে পরিণত হইতে পারিত তাহা যাঁহারা শুনেন নাই তাঁহারা অনুমান করিতেও পারিবেন না। সে সময়ে তাঁহার সেই মৃদু কণ্ঠস্বর এমন গম্ভীর ও ব্যাপক হইয়া উঠিত যে কলিকাতা টাউন হলের মতো স্থানেও বক্তার কথাগুলি হলের অপর প্রান্ত হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইত। পৃথিবীর সকল দেশ হইতেই বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি সাদর আহ্বান পাইয়াছেন এবং সকল দেশেই তাঁহার অসামান্য শক্তি বাগ্মী বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ যদি ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতেন তাহা হইলে তিনি হয়তো ব্যবহারজীবীরূপে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া ক্রোড়পতি হইতে পারিতেন কিন্তু ভাগ্যবিধাতা ডাঃ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতিকে লইয়া যে খেলা খেলিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে লইয়াও সেই খেলাই খেলিলেন ; মাদ্রাজ হইতে তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিলেন।

মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কবি কাব্যালোচনায় ও রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। যে সকল পত্র পত্রিকার একটু নাম হইয়াছিল তাহারাই রবীন্দ্রনাথের রচনা বক্ষে ধারণ করিতে যত্নবান ছিল। কবি তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত এক স্থানেই থাকিতেন, চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানে, কলিকাতায় সদর স্ট্রীটে, দার্জিলিঙে, সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রের সহচর ছিলেন। কিছুদিন এইরূপে কাটাইয়া কবি বোম্বাই অঞ্চলে কারোয়ায় সত্যেন্দ্রনাথের নিকট চলিয়া গেলেন। এইখানে "প্রকৃতির প্রতিশোধ" লিখিত হয়। "সন্ধ্যা সংগীতে", "প্রভাত সংগীতে" আনন্দের জন্য, সৌন্দর্যের জন্য একটা চঞ্চল আবেগময় আকুল আকাঙ্ক্ষারই প্রমাণ মেলে। "প্রকৃতির প্রতিশোধে" সসীম অসীমের দ্বন্দ্ব, সসীমও তুচ্ছ নয়—অসীমও পূর্ণ নয়—উভয়ের মিলনেই পূর্ণানন্দ। তাঁহার সকল রচনার উদ্দেশ্য বা নির্দেশ বোধ হয় তাহাই। "প্রকৃতির

প্রতিশোধের" পর "ছবি ও গান" (১২৯০) ও "কড়ি ও কোমল" (১২৯২) প্রকাশিত হইল। কড়ি ও কোমল প্রকাশের পর "কাব্যি" সমালোচকদল অন্তর্হিত হইলেন। কেবল 'রাহু'তে কাব্য হইতে মধু সঞ্চয়ে বঞ্চিত হইয়া মক্ষিকার মতো দু'চারিটা ব্রণ খুঁজিয়া বাহির করিয়া—

উড়িসনে রে পায়রা কবি, খোপের ভিতর থাক্ ঢাকা।
তোর বক্‌বকামি কোঁসকোঁসানি তাও কবিত্বের ভাব মাখা
তাও ছাপালি গ্রন্থ হ'ল নগদ মূল্য এক টাকা।

বলিয়া গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিলেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ রচনায় সিদ্ধহস্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক সমালোচনায় চিরদিন নিরুত্তর থাকিতেন। কেবল জীবনে একবার মাত্র 'দামু ও চামু' ইহার ব্যতিক্রম ও পরে তাহাও তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে পরিত্যক্ত।

এই সময়েই (১২৯৬ বঙ্গাব্দ) কবির 'রাজা ও রাণী' নাটক প্রকাশিত ও কলিকাতায় বির্জিতলায় (বীর-জি তলায় ?) অর্থাৎ ধর্মতলা ষ্ট্রীট ও সারকিউলার রোডের সংযোগস্থলে সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে অভিনীত হয়। কুমারসেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন সত্যেন্দ্র-জামাতা —বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল, সংস্কৃত ও ফরাসীভাষায় কৃতবিদ্য, "বীরবল" ছদ্মনামে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত স্বনামধন্য প্রমথ চৌধুরী।

পর বৎসরে "বিসর্জন" রচিত হয়। পরবর্তী গ্রন্থ "মানসী" যখন প্রকাশিত হয় তখন কবির জীবনে ভাবুকতার আতিশয্য চলিতেছে। কোনো স্থানে নিজের আদর্শের অনুরূপ একটি কবিকুঞ্জ নির্মাণ করিয়া তিনি নিভৃতে দিন যাপন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে গাজিপুরে কিছুদিন ছিলেন এবং সেখানে একটি বাড়ীও ক্রয় করেন। "মানসীর" অধিকাংশ কবিতা ও 'গোলাপছড়ি' গল্প গাজিপুরে লিখিত। গাজিপুর হইতে কবি ফিরিয়া আসিলেন, কবিকুঞ্জ আর হইল না। সে বাড়িখানি তাঁহার ভাগিনেয় অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়কে দান করেন। কলিকাতা হইতে গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড ধরিয়া গো-শকটে পেশোয়ার পর্যন্ত দীর্ঘকাল ভ্রমণে বাহির হইবার সংকল্প কবি করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা হইল না। পিতৃ আদেশে জমিদারী দেখিতে যাইতে হইয়াছিল।

"বালক" জন্মিল "ছবি ও গান" ও "কড়ি ও কোমলের" মাঝখানে ও কবি "মুকুট" নাটক ও "রাজর্ষি" উপন্যাস, "হেঁয়ালী নাট্য," "ভ্রমণ বৃত্তান্ত" ও কিছু প্রবন্ধ তাহাতে লেখেন। এই সময়ে কবি যে শিশু সাহিত্যের অবতারণা করিলেন তাহা অপূর্ব অভাবনীয়, সম্পূর্ণ নূতন। তাহারই পরিণতি আমরা 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' এবং 'সে'-তে দেখিতে পাই। রাজর্ষির আখ্যান ভাগ লইয়া পরে নাটক রচিত হয় ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের ভাণ্ডার বৃদ্ধিকল্পে প্রথম অভিনীত হয়। ছেলে মেয়েদের জন্যই 'বালক' পত্রিকার বোধ হয় সৃষ্টি কিন্তু "বালক" নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিল না। "ভারতীর" অংকে ঢলিয়া পড়িল। "ভারতী ও বালক" কিছুকাল একত্র দেখা গেল। অল্পদিন পরে বালকটির দুর্দশা হইল, সে আহার স্বল্পতায় মৃত্যুরাজ্যে চলিয়া গেল। মৃতবৎসা "ভারতী" "সাধনায়" মনোনিবেশ করিলেন।

১২৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথের লেখনীর উপর বহুলভাবে নির্ভর করিয়া তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রেরা বলেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকদের কর্মশক্তি লইয়া সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক হইয়া 'সাধনা'র প্রকাশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ত্রিশ। তিনি 'সাধনায়' গদ্য পদ্যের জুড়ি হাঁকাইয়া দিলেন। 'সাধনার' সময়ে তাঁহার রচনা নানাপ্রকারে বিচিত্র। সাময়িক ইংরাজি পত্রিকা হইতে সার সংকলন, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, রাজনৈতিক আলোচনা, সমাজতত্ত্ব, গ্রন্থ সমালোচনা, মাসে মাসে কাব্য ও ছোট গল্প প্রভৃতি বিবিধ রচনা "সাধনায়" প্রকাশিত হইত। একই বৈঠকে নানারূপ বিভিন্ন বিষয় লিখিয়া কেহ যে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতেছেন ইহা বোধ হয় ইয়োরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রেও বড় দেখা যায় না। ইহা ভিন্ন সাপ্তাহিক "হিতবাদী" প্রকাশের সহিতও তাঁহার এই সময়ে সম্বন্ধ ঘটে। শুধু লেখা নয়, তিনি "হিতবাদীর" একজন ডিরেক্টারও ছিলেন। "সাধনাতেই" কবির উপদেশে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ "স্বপ্নপ্রয়াণের" চিত্রাংকনে প্রবৃত্ত হন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা স্বাধীন বিকাশে পথের সন্ধান পাইল। যে ছোট গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথ বাঙলাসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী, তাহারও আরম্ভ "হিতবাদীতে" ও "সাধনায়"। গল্প রচনায় কবির আনন্দ তাঁহার এক পত্রে প্রকাশ—

"গল্প লেখায় কৃতকার্য হ'লে পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়।···গল্প লেখার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব, তারা আমার দিন-রাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভ'রে রেখে দেবে। আমার একলা মনের সঙ্গী হবে। বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের বিরহ দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের উপর বেড়িয়ে বেড়াবে।"

এই সময়ে কবি সাধনার স্তরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, এ সময়ের কথা তাঁহার অপর একখানি পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"নৌকায় থাকিতাম। সঙ্গে যে লোক ছিল সে প্রত্যহ প্রত্যূষে এক বাটি ডাল সিদ্ধ করিয়া আমার টেবিলের উপর ঢাকা দিয়া রাখিয়া যাইত। আমি সেই ডালটুকু খাইয়া লিখিতে বসিতাম; সমস্ত দিন লিখিতাম। কোনোরূপ চিত্তবিক্ষেপ হইত না, অপরাহ্ণ পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটার সময় খানকতক লুচি খাইতাম, তাহার পর বাহিরে 'ইজি' চেয়ারে শয়ন করিতাম; নৌকা নদীর উপর অশ্রান্ত-ভাবে চলিতে থাকিত। এক sittingএ পঞ্চভূতের ডায়েরি, গল্প, কবিতা অনর্গল লিখিয়া যাইতাম। ক্লান্তি বোধ করিতাম না।"

"পঞ্চভূতের ডায়রির" আরম্ভ শুভায় ভবতি কিন্তু শেষরক্ষা হয় নাই কারণ—

শেষ দেখা কি ভালো ?
তেল ফুরিয়ে যাবার আগে
নিভিয়ে যাব আলো।

[ক্রমশঃ।

[ছবি পাঠানোর সময় ছবির পেছনে নাম, ঠিকানা ও বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না]

ভোরের ভৈরবী

—রতন দাশগুপ্ত

মহারাণীর স্মৃতি

—অরুণ মুখোপাধ্যায়

যন্ত্রতন্ত্র —মোহন চক্রবর্তী

ঘুমন্ত শিশু —শ্রীমতী শেফালী চট্টোপাধ্যায়

খুশীর বুদ্‌বুদ্‌ —রতন দাশগুপ্ত

নাচ-গান-বাজনা —রামকিঙ্কর সিংহ
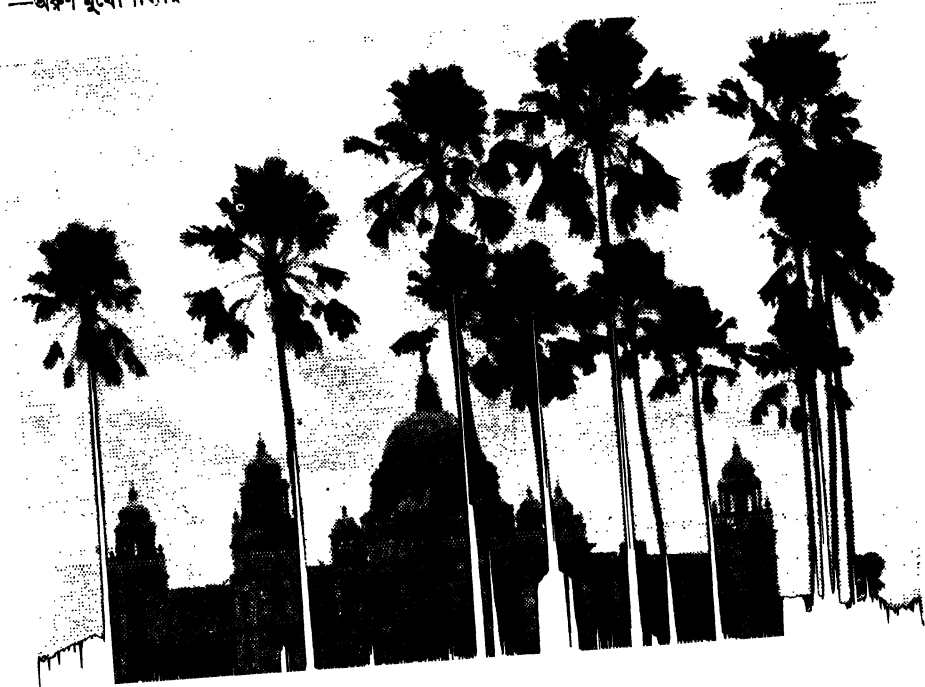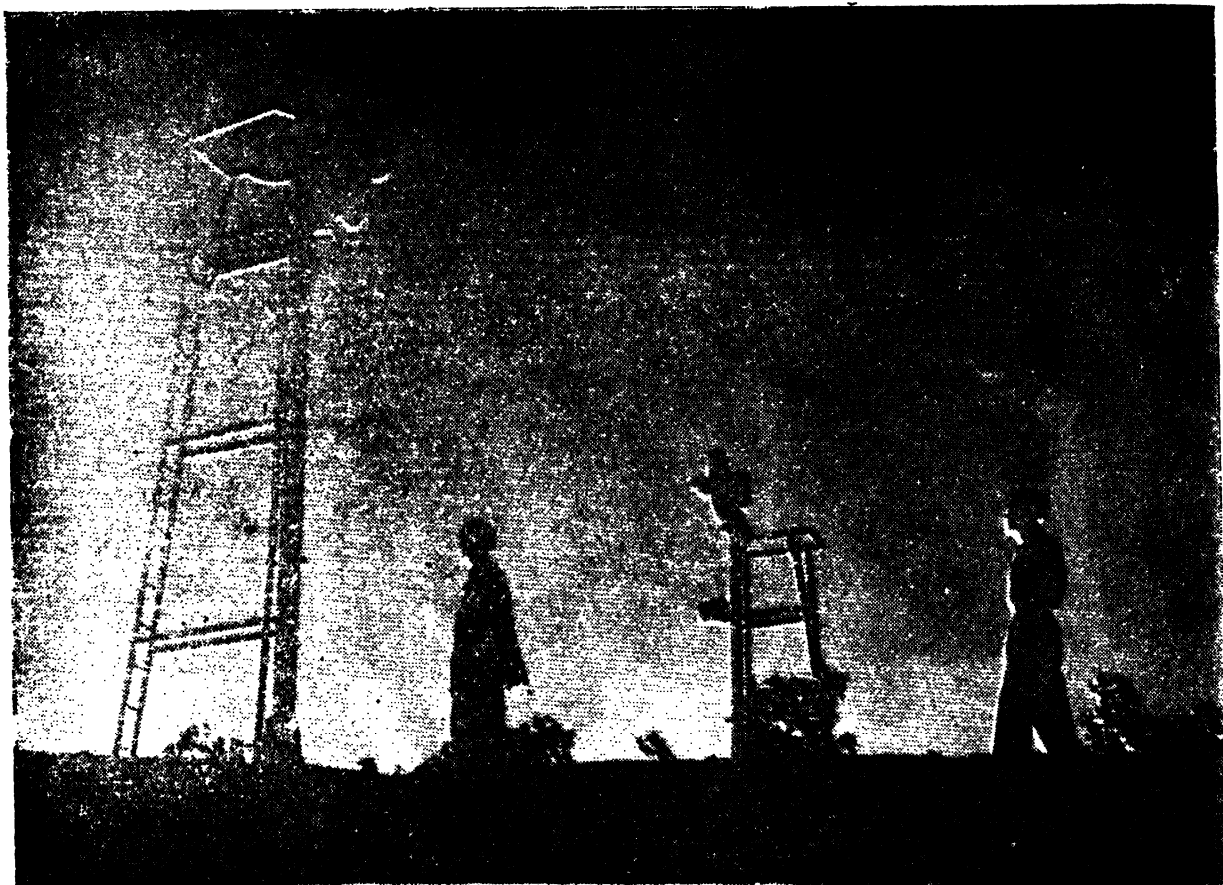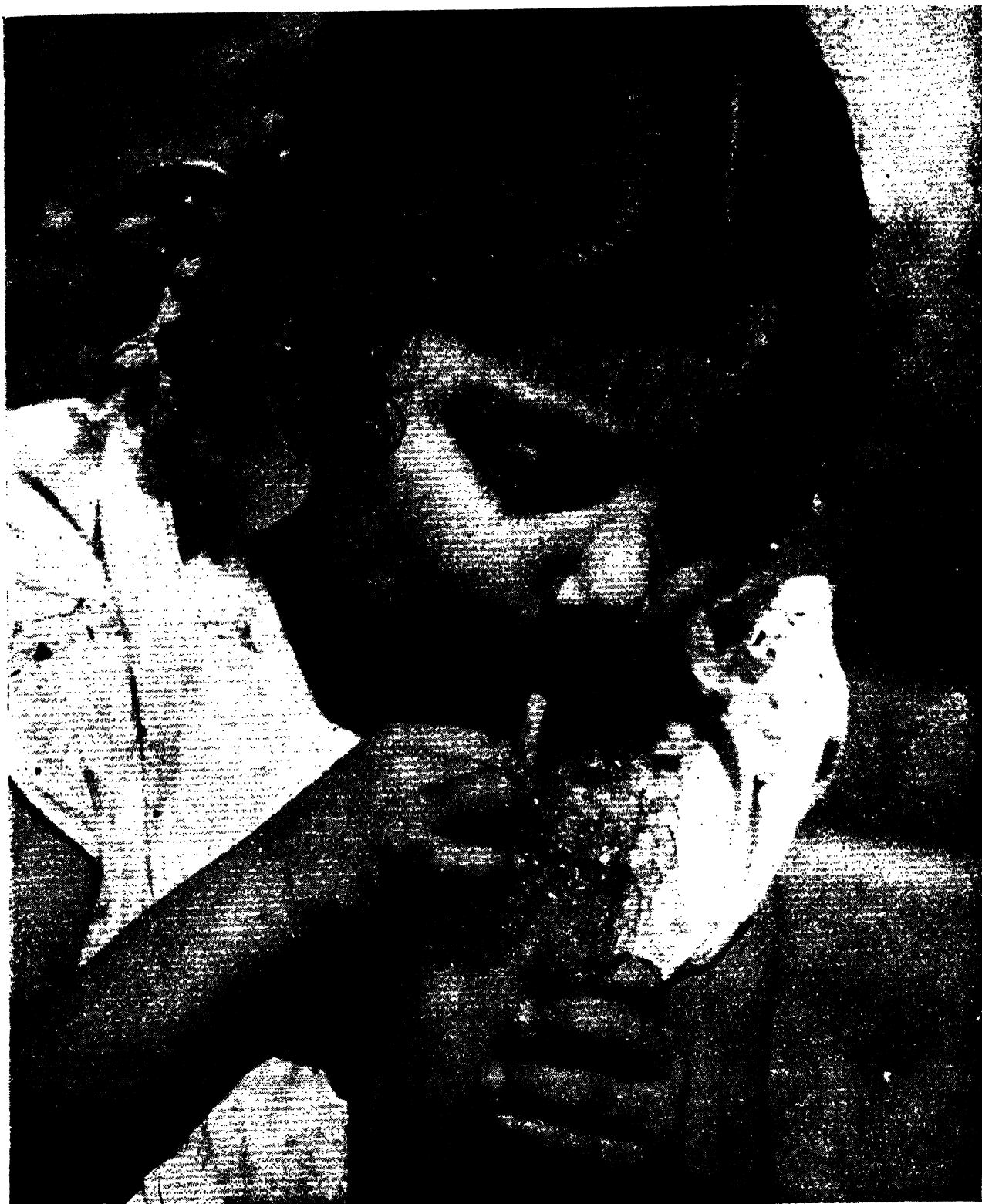
ও ম র খৈ য়া ম

(অপ্রকাশিত)

কাজী নজরুল ইসলাম

মুগ্ধ করো নিখিল-হৃদয় প্রেম-নিবেদন কৌশলে,
হৃদয়-জয়ী হে বীর, উড়াও নিশান প্রিয়ার অঞ্চলে।
এক হৃদয়ের সমান নহে লক্ষ মসসিদ আর 'কা'বা',
কি হবে তোর তীর্থে 'কা'বা'র, শান্তি পাবি হৃদয়-তলে।

লয়ে শরাব পাত্র হাতে পিই যবে তা মস্ত হ'য়ে,
জ্ঞান-হারা হই সেই পুলকের তীব্র-ঘোর বেদন স'য়ে।
কি যেন এক মন্ত্র-বলে যায় ঘ'টে কি অলৌকিক,
প্রোজ্জ্বল মেরে জ্ঞান প'লে যায় ঝর্ণা-সম গান ব'য়ে।

এক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের এই দুনিয়া রে ভাই, মদ চালাও!
কাল্‌কে তুমি দেখবে না আর আজ যে জীবন
দেখতে পাও।
খামখেয়ালীর সৃষ্টি এ ভাই কালের হাতে লুঠের মাল,
তুমি তোমার আপনাকে এই মদের নামে লুঠিয়ে দাও।

মদের নেশার গোলাম আমি, সদাই থাকি নুইয়ে শির,
জীবন আমি পণ রাখি ভাই প্রসাদ পেতে তার হাসির।
শরাব-ভরা কুঁজোর টুঁটি জাপটে সাকী হস্তে তার
পাত্রে ঢালে নিঠুর হাতে নিঙড়ে তাহার লাল রুধির।

আড্ডা আমার এই সে গুহা, মদ চোলাই-এর এই দোকান,
বাঁধা রেখে আত্মা-হৃদয় করি হেলায় শরাব পান।
আরাম-সুখের কাঙাল নহি, ভয় করি না দুর্দশায়,
এই ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুতের উর্ধ্বে ফিরি মুক্ত-প্রাণ।

মীন-কুমারী হংসীরে কয়, 'শুকাবে এই বিল যখন
তোমার-আমার কি হবে ভাই তাই ভেবে মোর
ব্যাকুল মন।'
মরালী কয়, 'কাবাব যদি হই দুজনাই তুই-আমি,
ভাসলে এ বিল মদের স্রোতে মোদের কি তায়
লাভ তখন?'

বিধর্মীদের ধর্মপথে আসতে লাগে এক নিমেষ,
সন্দেহেরই বিপথ-ফেরৎ বিবেক জাগে—এক নিমেষ।
দুর্লভ এই নিমেষটুকু ভোগ করে নাও প্রাণভরে,
এই ক্ষণিকের আয়েশ দিয়ে জীবন ভাসে এক নিমেষ।

জল্লাদিনী ভাগ্যলক্ষ্মী, ওর্ফে ওগো গ্রহের ফের!
স্বভাব দোষে চিরটাকাল নিষ্ঠুরতার টানছ জের।
বক্ষ তোমার বিদারিয়া দেখতে যদি এই ধরা
খুঁজে পেতো ঐ বুকে তার হারা-মণি-মাণিক ঢের।

আমার ক্ষণিক জীবন হেথায় যায় চলে ঐ ত্রস্ত পায়
খরস্রোতা স্রোতস্বতী কিংবা মরু-ঝঞ্ঝা প্রায়।
তারির মাঝে এই দুদিনের খোঁজ রাখি না—ভাবনা নাই,
যে গত কা'ল গত, আর যে আগামী কাল আসতে চায়।

শুনছি আমার তনুর তীরে যৌবনেরই মদির স্তব,
পান করে যাই মদিরা তাই শুনছি প্রাণে বেণুর রব।
তিক্ত স্বাদের তরে সুরার ক'রো না কেউ তিরস্কার,
ত্যক্ত মানব-জীবন সাথে মানায় ভালো তিক্তাসব।

হায় রে হৃদয়, ব্যথায় যে তোর ঝরছে নিতুই রক্তধার
অন্ত যে নেই তোর এ ভাগ্য-বিপর্যয়ের, যন্ত্রণার।
মায়ায় ভুলে এই সে কায়ায় আসলি কেন রে অবোধ,
আখেরে যে ছেড়ে যেতে হবেই এ আশ্রয় আবার!

আজ আছে তোর হাতের কাছে
আগামী কা'ল হাতের বা'র,
কালের কথা হিসাব ক'রে বাড়াসনে তুই দুঃখ আর।
স্বর্গ করা ক্ষণিক জীবন—করিসনে তার অপব্যয়,
বিশ্বাস কি—নিঃশ্বাসভর জীবন যে কা'ল পাবি ধার!

পণ্ডশ্রম করিসনে তুই হাতড়ে ফিরে সকল দোর,
সৌভাগ্যের সাথে বরণ করে নে দুর্ভাগ্য তোর।
এই জীবনের জুয়াখেলায় হবেই হবে খেলতে ভাই
আসমানি হাত হ'তে যেমন পড়বে ঘুঁটি ভাগ্যে তোর।

এই কুঁজো—যা আমার মতন ভোগ করেছে প্রেম দাহন,
সুন্দরীদের মাথায় থাকি, পেলো খোঁপার পরশন।
এই সোরাহির পার্শ্বদেশে এই যে হাতল দেখতে পাও,
পেলো কতই তন্বঙ্গীর ক্ষীণ কাঁকালের আলিঙ্গন!

তুমি আমি জন্মিনিকো—যখন শুধু বিরামহীন
নিশীথিনীর গলা ধ'রে ফিরত হেথায় উজলদিন;
বন্ধু, ধীরে চরণ ফেলো! কাজল আঁখি সুন্দরীর
আঁখির তারা আছে হেথায় হয়ত ধূলির অঙ্ক-লীন।

প্রথম থেকেই আছে লেখা অদৃষ্টে তোর যা হবার,
তাঁর সে কলম দিয়ে—যিনি দুঃখে সুখে নির্বিকার।
স্রেফ বোকামী, কান্নাকাটি লড়তে যাওয়া তার সাথে,
বিধির লিখন ললাট-লিপি টলবে না যা জন্মে আর!

ভালো করেই জানি আমি, আছে এক রহস্য-লোক,
যায় না বলা সকলকে তা ভালোই হোক কি মন্দ হোক।
আমার কথা ধোঁয়ায় ভরা, ভাঙতে তবু পারব না
থাকি সে কোন গোপনলোকে দেখতে যাহা
পায় না চোখ।

চলবে না কো মেকি টাকার কারবার আর, মোল্লাজি।
মোদের আবাস সাফ ক'রে নেয় শেয়ান ঝাড়ুর কারসাজি
বেরিয়ে ভাঁটিখানার থেকে বলল হেঁকে বৃদ্ধ পীর—
'অনন্ত ঘুম ঘুমাবি কা'ল পান করে নে মদ আজি।'

সবকে পারি ফাঁকি দিতে মনকে পারি ঠারতে চোখ,
খোদার উপর খোদকারিতে ব্যর্থ হয় এ মিছে স্তোক।
তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে জাল বুনিলাম চাতুর্যের
মুহূর্তে তা দিল ছিঁড়ে হিংস্র নিয়তির সে নোখ।

এই যে রঙীন পেয়ালাগুলি নিজ হাতে গড়ল সে
ফেলবে ভেঙে খেয়াল-খুশীর লীলায় এদের বিনদোষ?
এতগুলি সুষ্ঠু শোভন চটুল আঁখি চন্দ্রমুখ
প্রীতির ভরে সৃষ্টি ক'রে ক'রবে ধ্বংস ক্রোধ-বশে?

পেয়ালাগুলি তুলে ধরো চৈত্রী লালা ফুলের প্রায়
ফুরসুৎ তোর থাকলে, নিয়ে ব'স লালা-রুখ্ দিলপ্রিয়ায়।
মউজ করে শরাব পিও, গ্রহের ফেরে হয়ত ভাই
উল্টে দেবে পেয়ালা সুখের হঠাৎ-আসা ঝঞ্ঝাবায়।

খৈয়াম! তুই কাঁদিস কেন পাপের ভয়ে অযথা?
দুঃখ করে কেঁদে কি তোর ভরবে প্রাণের শূন্যতা?
জীবনে যে করল না পাপ নাই দাবী তার তাঁর দয়ায়
পাপীর তরেই দয়ার সৃষ্টি, আনন্দ কর্ ভোল্ ব্যথা!

ঘেরা-টোপের পর্দা-ঘেরা দৃষ্টি-সীমা মোদের ভাই,
বাইরে ইহার দেখতে গেলে শূন্য শুধু দেখতে পাই।
এই পৃথিবীর আঁধার বুকে মোদের সবার শেষ আবাস—
বলতে গেলে ফুরোয় না আর বিষাদ-করুণ সেই কথাই।

মসজিদ মন্দির গির্জায় ইহুদ-খানায় মাদ্রাসায়
রাত্রি-দিবস নরক-ভীতি স্বর্গ-সুখের লোভ দেখায়।
ভেদ জানে আর খোঁজ রাখে ভাই খোদার যারা রহস্যের
ভোলে না এই খোশ-গল্পের ঘুম-পাড়ানো কল্পনায়।

এই ধরাতে দেখছ যা তার সকল-কিছু সব মায়া,
এই তুমি বলছ যা সব, শুনছ কলবর—মায়া।
তিনভাগ জল একভাগ থল এই পৃথিবীর, এ-ও মায়া,
গোপন প্রকাশ সত্য-মিথ্যা এসব অবাস্তব মায়া।

'ঘুমিয়ে কেন জীবন কাটাস?' কইল ঋষি স্বপ্নে মোর,
'আনন্দগুল প্রস্ফুটিত করতে পারে ঘুম কি তোর?
ঘুম মৃত্যুর যমজ-ভ্রাতা তার সাথে ভাব করিসনে,
ঘুম দিতে ঢের পাবি সময় কবরে তোর জনম-ভোর।'

হৃদয় যদি জীবনে হয় জীবনের রহস্যজয়ী,
খোদা কি তা জানতে পারে মৃত্যুতে সে অবশ্যই।
কিন্তু তুমি থেকেই যদি শূন্য ঠেকে সব কিছুই,
তুই যখন রইবে না কা'ল জানবে কি আর শূন্য বই?

আকাশ যেদিন দীর্ণ হবে, আসবে যেদিন ভীম প্রলয়,
অন্ধকারে বিলীন হবে গ্রহ তারা জ্যোতির্ময়,
প্রভুর আমার দামন ধরে বলব কেঁদে, 'হে নিঠুর,
নিরপরাধ মোদের কেন জন্মে আবার মরতে হয়?'

[ক্রমশঃ।
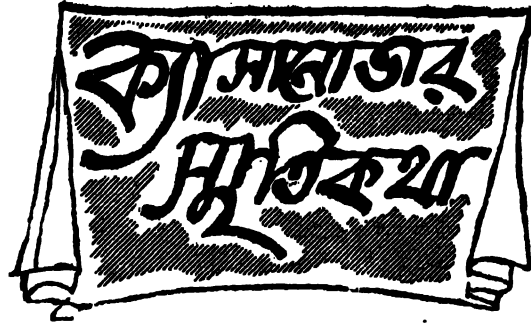
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে তখন এমনি দুলছে মন !

ধরা পড়ে গেছি আপন মনের কাছে—হৃদয়ের দাবীর দুর্নিবার আকর্ষণে ভেসে গেছে সব যুক্তি-তর্ক আর বিচার-বিবেচনার ছোটো ছোটো আড়াল। বিস্মিত পুলকে স্তব্ধ হোয়ে শুধু অনুভব—মনের কানায় কানায় ভরা জোয়ারের প্রবল উচ্ছ্বাস—

সে কি আসবে ?

এমনি সময়ে একদিন আমার পরিচারিকা ঘরে এসে ঢুকলো, চোখে-মুখে খুশী উপচে পড়ছে,—"মাদাম, সেই লেস-ওয়ালী আবার এসেছে—তাকে নিয়ে আসবো এখানে ?"

—"তুই কি পাগল হলি ?" প্রচণ্ড বিস্ময়ে আমি চমকে উঠি।

—"বেশ, তবে বিদায় করে দিয়ে আসি ?"

—"না না, এখানেই নিয়ে এসো, আমি নিজে কথা বলবো ওর সঙ্গে।"

কঠিন হবো, তিরস্কার করবো, অনেক প্রতিজ্ঞাই তো ছিলো—কিন্তু চোখের সামনে ওকে দেখে কোথায় ভেসে গেলো সব—দ্বিধাহীন সঙ্কোচহীন স্পষ্ট ভাষায় শুধু জানালাম আমার ভালোবাসা—নিবেদন করলাম আমার প্রেম—ওকে ঘিরেই যা' মঞ্জরিত হোয়ে উঠেছে। আর এ-ও জানালাম—বৃথাই এ ভালোবাসা, আমাদের মিলন—সুদূর-পরাহত—শুধু স্বপ্নলোকেই সম্ভব—কোনো আশাই নেই। ও জানালে সম্প্রতি মার্কুইস ওকে একটি বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়ে ইংল্যাণ্ডে পাঠাচ্ছেন—কিন্তু যাবার সময় আমাকে পাবার প্রতিশ্রুতি যদি পাথেয়রূপে না পায় তবে সে ব্যর্থতা সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুও ভালো। আমাকে ছাড়া ওর জীবনের কোনো অর্থ, কোনো মূল্যই ওর কাছে নেই। আমাকে অনুরোধ জানালে যেন আমি ওর এখানে আসায় সম্মতি জানাই। আমি তো সম্মতই।

মাত্র বাইশ বছর বয়েস ওর। আমার চেয়ে মাথায় বুঝি একটু ছোটোই হবে। ছিপছিপে একহারা চেহারা—অপরূপ লাবণ্যভরা—গলার স্বর আরও মিষ্টি—সবে দাড়ির আভাস দেখা দিয়েছে। লেস-ওয়ালীর ছদ্মবেশ তাই নিখুঁতই হোতো।

তিনটি মাস কাটলো। সপ্তাহে তিন চার দিন করে না এসে ও পারতো না। বেশীর ভাগ সময়েই আমার পরিচারিকাটি তার অসীম কৌতূহল নিয়ে চার পাশে ঘুরঘুর করতো। কিন্তু সে না থাকলেও আমার স্থির বিশ্বাস যে, নিবিড় বিহ্বল মুহূর্তেও ওর আমার প্রতি সম্মান আর সংযমের বিন্দুমাত্রও অভাব হোতো না।

—এমনি শান্ত ভদ্র প্রকৃতি ওর। আর এই মার্জিত রুচি আর সংযমই আমার ভালোবাসাকে নিবিড়তর করে তুলছিলো।

বিপদের মুহূর্তটিও আকস্মিক ভাবেই এসে পড়লো। দু'জনের কেউই এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একদিন সকালে ও এলো—দু'চোখ ভরা জল। আদেশ এসেছে যাত্রা করার—লণ্ডন অভিমুখে ম'সিয়ে দ্য সাঁ'এর কাছে পত্রবাহকরূপে। এমন কি ফেরোলে ইতিমধ্যেই একটি ছোটো ষ্টীমার অপেক্ষা করছে ওর জন্যে যতশীঘ্র সম্ভব লণ্ডন পৌছবার তাগিদে। দেখলাম, হতাশার তীব্র বেদনায় ওর শুধু কণ্ঠই রুদ্ধ হয়নি, স্থিরভাবে চিন্তা করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। ওকে আশা দিতে গিয়ে আমি একটা মতলব ঠিক করে ফেললাম। জানি না, কোথা থেকে মনের এত জোর এত সাহস পেয়েছিলাম যে বলে বসলাম আমি ওর সঙ্গেই যাবো ওর পরিচারকের ছদ্মবেশে। কিন্তু তাইতে ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে—শেষ অবধি দু'জনে মিলে ঠিক করলাম যে আমি ওর ছদ্মবেশ নেবো আর ও যাবে আমার সহধর্মিণীর ছদ্মবেশে।

আর ইংল্যাণ্ডে পৌছেই আমরা বিয়ে করি, যদি তাহলে এই পালিয়ে আসার কলঙ্ক মুছে যাবে। ওকে বোঝানোর আর সাহস যোগানোর জন্যে যুক্তি কিছু কম ছিল না আমার—একটি মেয়ের সম্মতি না থাকলে তাকে নিয়ে কেউ পালাতে পারে না। অতএব ও দোষী কোথায় ? তাছাড়া আমার সম্পত্তির অধিকারী হোতে যাচ্ছে তাঁরই প্রিয়পাত্র—এতে মার্কুইস আমাকে শাস্তি তো দেবেনই না বরং খুশী হবেন। আর তত দিন আমার বহুমূল্য গহনা, হীরে জহরৎ তো আছেই।

দিন এসে গেলো। আমি আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে অসুস্থতার ভাণ করে পড়ে রইলাম। তারপর ছোট্টো একটি ব্যাগে বিশেষ দরকারী কয়েকটি জিনিষ আর গহনার বাক্সটি ভরে পুরুষের ছদ্মবেশ পরে বাড়ীর পিছনে চাকরদের সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে গেলাম। আশ্চর্য্য, কেউ আমাকে চিনতে পারলো না ! এমন কি বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসার সময় বেয়ারাটাও চিনলো না ! যাক্ নিশ্চিন্ত। কিছু দূরেই অপেক্ষা করছিলো ও। দু'জনে মিলে জাহাজে গিয়ে উঠলাম—স্বামি-স্ত্রী পরিচয়ে। বিনা বাধায় কেটে গেলো যাত্রা করার মুহূর্তটিও। মধ্যরাতের আগে ক্যাপ্টেনেরও দেখা মেলেনি। তিনি সদলে এসে আমাকে জানালেন, তাঁর উপর আদেশ আছে যেন আমার প্রতি যত্নের কোনো ত্রুটি না হয়। আমি কঁতে দ্য আস-কে পরিচয় করালাম আমার স্ত্রী হিসাবে। ক্যাপ্টেন ওকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানালেন।

দিন কাটতে লাগলো স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক গতিতে। চোদ্দ দিনের দিন আমাদের জাহাজ নোঙর ফেললো প্লিমাউথে। সেখান

থেকে ক্যাপ্টেনের কাছে কয়েকটা চিঠি এলো। দেখলাম, একটা চিঠি খুব মন দিয়ে পড়ে আমাকে এক পাশে ডেকে আনলেন। তারপর সঙ্কোচের সঙ্গে জানালেন, ওঁর উপর হুকুম এসেছে মার্কুইসের কাছ থেকে যে একজন তরুণী পর্তুগীজ মহিলা এই জাহাজে আছেন; তাঁকে যেন কোথাও নামতে না দেওয়া হয়। আর তিনি নিজে তাকে নিয়ে সোজা লিসবনে চলে আসেন যেন—এই হুকুমের অন্যথায় তাঁর প্রাণদণ্ডও দিতে দ্বিধা করবেন না। ক্যাপ্টেন সাহেব আরও সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, এই জাহাজে একমাত্র আমার স্ত্রী ছাড়া অপর কোনো মহিলাও তো নেই—অতএব ও যে সত্যিই আমারই স্ত্রী, তার প্রমাণ আমাকে দেখাতে হবে। তা' না হলে আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

—"উনি তো আমারই স্ত্রী", খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বললাম। "কিন্তু প্রমাণ করবার মত কোনো কাগজপত্রই তো আমাদের সঙ্গে নেই!"

—"দুঃখিত, অত্যন্ত দুঃখিত। ওঁকে তাহলে আমার সঙ্গে লিসবনেই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যতদূর সম্ভব সম্মানের সঙ্গেই ওঁকে নিয়ে যাওয়া হবে। এটাও মার্কুইসের আদেশ।"

—"কিন্তু ক্যাপ্টেন, স্ত্রী তো স্বামীরই সহগামিনী?"

—"মানছি, একশো বার মানছি কিন্তু হুকুম যে মানতেই হবে। আপনিও লিসবনে ফিরে যেতে পারেন। চাই কি আমাদের আগেই সেখানে পৌঁছতে পারেন।"

—"তবে আপনাদের সঙ্গেই যাই না কেন?"

—"সেটা যে হবার নয়। আমার উপর কড়া হুকুম আছে আপনাকে এখানে নামিয়ে দেবার। কিন্তু আমিও ভাবছি, এটা কেমন হোলো যে আপনাকে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে দেবার কথায় মার্কুইস একবারও আপনার স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেন নি? যাই হোক, মার্কুইস যে ভদ্রমহিলাটির খোঁজ করছেন তিনি যদি আপনার স্ত্রী না হ'ন, তবে তাঁকে লণ্ডনে আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।"

—"আচ্ছা, ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নিতে পারবো কি?"

—"নিশ্চয়ই, তবে আমার সামনে।"

কেবিনে গিয়ে কাউণ্ট 'প্রিয়তমা পত্নী' সম্বোধন করে সব ঘটনা বললাম—ভয় ছিলো পাছে ও উত্তেজিত হয়ে সব ফাঁস করে দেয়—কিন্তু ও ধীরভাবে সব শুনে জানালে, আমাদের হুকুম না মানা ছাড়া আর গতি নেই—তবে আশা আছে শীগ্‌গিরই আবার আমরা মিলবো। ক্যাপ্টেনের সামনে কোনো কথাই বলা গেল না, তবু জানিয়ে দিলাম, লণ্ডনে পৌঁছেই আমি মঠবাসিনী সেই সন্ন্যাসিনীকে চিঠি দেবো—আর ও যেন পৌঁছেই সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা করে। এদিকে আমার গহনার বাক্স দামী হীরা, জহরৎশুদ্ধ ওর কাছেই রয়ে গেলো। চাইতে পারলাম না পাছে ক্যাপ্টেনের সন্দেহ হয় যে ওকে রীতিমত ধনিকন্যা দেখে আমি ঠকিয়েছি।

ভাগ্যের পায়ে নিজেদের সঁপে দিলাম। যাবার আগে চোখের জলে পরস্পরকে অভিষিক্ত করে আলিঙ্গন করলাম। ক্যাপ্টেনের চোখও শুষ্ক ছিল না।

ওকে নিয়ে যাবার পর আমাকে নামতে হোলো একটি মাত্র ব্যাগ সঙ্গে করে—তাইতে শুধু পুরুষের পোষাক, বই, কাগজ-পত্র, একটি তলোয়ার আর একজোড়া পিস্তল। কাসটমস-এর হাঙ্গামা চুকিয়ে একটা সরাইখানায় এসে ঢুকলাম। মালিকের কাছে জানা গেল লণ্ডনে একটা দল যাচ্ছে, আমি সহজেই সেই দলে ভিড়ে পড়তে পারি। খরচ শুধু একটি ঘোড়ার দাম। মালিকই সেই দলটার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভালোই লাগলো তাঁদের। যাত্রা স্বরু করলাম। কিন্তু পুঁজি তো নিঃশেষ—তাই দু'এক দিন পরেই আরও সস্তার একটি আশ্রয়ে উঠলাম। বেশ পরিচ্ছন্ন সুন্দর তিনতলা একটি বাড়ীর একটি ঘর নিলাম। বাড়ীওয়ালী শুধু ভদ্র নয় মনটিও ভারী নরম। সহজেই বিশ্বাস করতে পারলাম ওঁকে। অনুরোধ জানালাম আমাকেও মেয়েদের পোষাক কিছু কিনে এনে দিতে—কারণ আর পুরুষের ছদ্মবেশে বাইরে বেরোবার সাহস বা ইচ্ছা দুটোই ছিল না—সম্বল তখন মাত্র পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা—সামনে অন্ধকার ভবিষ্যৎ। দুদিনের মধ্যেই নিজেকে পেলাম—কঠিন ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সম্বলহীনা একটি তরুণী—যার জানা হোয়ে গেছে সোজা পথে চলতে গেলে ভয় করলে চলবে না।

দশ শিলিং সপ্তাহের ভাড়া। তাও বেশী দিন চালানো সম্ভব হোলো না। তাছাড়া আমার প্রতি লোকেদের বিশেষ করে যুবকদের কৌতূহল একটু বাড়াবাড়ি রকম উগ্র হোতে লাগলো। শেষ অবধি হাতের আংটিটা বাড়ীর পাশেই এক বৃদ্ধকে বেচে দিলাম—দেড়শ' গিনি পাওয়া গেল। বাড়ীওয়ালীও আমার অবস্থা বুঝে আরও সস্তার একখানা ঘর খোঁজ করছিল! বাইরে খেতে যাবার সঙ্গতি ছিল না বলে একটি পরিচারিকাও জোটাতে হোয়েছিলো—আর সেটাই সবচেয়ে বিরক্তিকর—ভাবতাম, দুনিয়াশুদ্ধ সবাই বুঝি যড় করে আমাকে ঠকাতে চায়। আসলে একটু-আধটু চুরি লোকজন করেই থাকে কিন্তু যার কাছে দৈনিক এক শিলিং-এর বেশী খরচ করা সম্ভব নয়, তার কাছে ওই একটু চুরিও অনেকখানি গায়ে লাগে। বেশী কিছু খাওয়া ছেড়ে দিলাম। শুধু রুটী আর জল। দিনে দিনে শরীরও হোতে লাগলো শীর্ণ থেকে শীর্ণতর। এমনি সময়ে একদিন আপনার ওই অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়লো—চোখে পড়লো বিভিন্ন পত্রিকায় আপনার প্রতি কটাক্ষ। স্বভাব যাবে কোথায়? কৌতূহল দমন করা সহজ হোলো না—তারপর তো সবই জানা আপনার—হাঁ, ইতিমধ্যে একটা ঘটনা বলা হয়নি। আমি ইংল্যাণ্ডে পৌঁছবার দিন তিনেক পরই আমার সন্ন্যাসিনী মাসীকে একটি চিঠি লিখি সব ঘটনা জানিয়ে—আর তার সঙ্গে সকাতর মিনতি জানাই, যাকে মনে মনে স্বামী বলে বরণ করেছি তাকে রক্ষা করতে, তাকে আশ্রয় দিতে। আরও জানালাম, যত দিন না আমাদের দু'জনার মিলনের পথে সব বাধা সরে যায় তত দিন লিসবনে ফিরবো না। চিঠিটা প্যারিস দিয়ে মাদ্রিদে পাঠালাম—স্থলপথে এটাই সবচেয়ে সোজা রাস্তা। দীর্ঘ তিনটি মাস পরে মাসীর চিঠি পেলাম। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন মহিলাটির পৌঁছানো খবর মার্কুইসকে দিলে তিনি সোজা আদেশ দেন, তার একটা চিঠি সমেত মহিলাটিকে সন্ন্যাসিনী মাসীর আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে। চিঠিটায় মাসীকে লিখে জানিয়েছেন যে তাঁর বোনঝিকে পাঠানো হোলো, এবার মাসী যেন তাকে ঘরে চাবি-বন্ধ করে রেখে দেন। সৌভাগ্যক্রমে আমার চিঠিটা মাসী আগেই পেয়েছেন। তিনি ওকে নিরাপদেই একেবারে ঘরে বন্ধ

ক'রে রাখলেন যাতে কেউ কিছু টের না পায়। এদিকে মার্কুইসকে চিঠি দিলেন, যাকে পাঠানো হোয়েছে সে তাঁর বোনঝি নয়, তারই ছদ্মবেশে একটি তরুণ। এখন মার্কুইস তরুণটিকে এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করলেই ভালো—কারণ আশ্রমে পুরুষদের বসবাস নিষিদ্ধ।

ইতিমধ্যে কাউন্টের সঙ্গেও মাসী দেখা করেছেন ও মাসীর পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়েছে আর আমাদের দু'জনারই জন্যই ভিক্ষা চেয়েছে ওর স্নেহের আশ্রয়ের—আমার সমস্ত হীরা জহরৎ গহনাগুলিও মাসীর হাতে তুলে দিয়েছে। মাসী ওর সততায় আর সুন্দর ব্যবহারে খুব খুসী।

এদিকে মার্কুইস চিঠি পড়ে নিজেই চলে এলেন মাসীর কাছে। মাসী তাঁকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন যে, আশ্রমের সুনাম আর পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখতে হলে এখনি একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার, আর সব ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ গোপন থাকা দরকার। কারণ তাঁর নিজের মান-সম্ভ্রমও এর উপর নির্ভর করছে। কাউন্ট যে মাসীকে সব গহনাগুলি ফিরিয়ে দিয়েছে তাও জানিয়ে দিলেন। মার্কুইস সব ঘটনাটাই গোপনে রাখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেন—তবে উনি যে একটুও রাগ করেন নি তার প্রমাণ মাসীকে সহাস্য পরিহাসে ওর জিজ্ঞাসা—এমন একটি অপরূপ সুন্দর কান্তি তরুণকে যে তার সঙ্গদান করতে পাঠিয়েছিলেন তার জন্যে মাসী নিশ্চয়ই মার্কুইসকে ক্ষমা করবেন। যাই হোক, কাউন্টকে সঙ্গে নিয়ে তখনি তিনি চলে গেলেন। তারপর থেকে চিঠি লেখার দিন অবধি মাসী ওদের আর কোনো খবরই পাননি। ওদিকে সারা লিসবন জুড়ে উল্টোটাই রটেছে যে কাউন্ট লণ্ডনে আর মার্কুইস আমার প্রতি কোনো দুর্ব্বলতার জন্যেই আমাকে লুকিয়ে রেখেছেন! এটাও ঠিক, মার্কুইস আমার সব খবরাখবর রাখার জন্য চর নিযুক্ত করেছেন। আর মাসীর কথা মত আমিও তাঁকে লিখেছি যে আমি এখনি লিসবনে ফিরতে রাজী, যদি উনি কথা দেন যে সাধারণ সমক্ষে সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত ভাবে কাউন্টের সঙ্গে আমার পরিণয় হবে। তা না হলে ইংল্যাণ্ডেই আমি সারাজীবন কাটাব—এখানে আর যাই হোক, মুক্ত স্বাধীন জীবনযাত্রায় পদে পদে আইনের বাধা আসবে না।

এখন আমি মার্কুইসের উত্তরের অপেক্ষা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মার্কুইস আমার সর্ত্তে রাজী হবেন আর খুশী হয়েই আমার সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবেন। বাবার মৃত্যুর খানিকটা ক্ষতিপূরণ হবে।

* * * *

—"কি ভাবছো?"

—"কিছু না।"

—"মোটেই কিছু না নয়—ভাবছো যে আমার প্রেমে তুমি মরতে পারো, তাই না? কিন্তু দিন দিন যে ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছো—রাত কাটাচ্ছো নিদ্রাহীন চোখ মেলে, এ কি দেখিনি আমি? নাঃ, যদি সত্যিই আমাকে খুশী দেখতে চাও তবে বেরিয়ে এসো ঘোড়ায় চড়ে··দিন-রাত এই নির্জ্জন অলস মুহূর্ত্তগুলোকে কোন মতে পার করে দিলেই কি স্বাস্থ্য থাকে?"

—"পলিন, প্রিয়তমা—তোমার কোনো কথাই তো আমি না রেখে পারি না—কিন্তু ফিরে এসে?"

—"দেখবে আমি কৃতজ্ঞ—দেখবে তোমার আহারে রুচি—রাতের ঘুম—"

—"ব্যস্ ব্যস্—এক্ষুণি ঘোড়া সাজাতে বলছি।"

শুভ্র কোমল হাতখানিতে চুম্বনের মৃদু স্পর্শ দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কিংসটনের রাস্তায়। আমাদের দু'জনার পরিচয় আজ নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত—কিন্তু আমার পিপাসিত মনের তৃষ্ণা যে শুধু বন্ধুত্বে তৃপ্ত হতে চায় না—ক্ষুব্ধ, লুব্ধ আকাঙ্খার জ্বালা আমার রাতের ঘুম আমার দিনের আনন্দ সব কিছু হরণ করেছে। অথচ পলিন দিনে দিনে ভরে উঠছে অপরূপ মাধুর্য্যে—কোন অফুরাণ লাবণ্যের সুধা-স্রোতে—চিন্তায় বিভোর—ভ্রূক্ষেপ ছিল না আশে-পাশে—হঠাৎ কিসের ধাক্কায়? ঘোড়াটা তীব্রবেগে মুখ থুবড়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে আমিও একেবারে শূন্যে লাফিয়ে উঠে সজোরে ভূমিশয্যা গ্রহণ করলাম। ওঠবার ক্ষমতা রইলো না যন্ত্রণায়—সৌভাগ্যক্রমে দেখি, কিংসটনের ডিউকের প্রাসাদের সামনেই পড়েছি। ডিউকের লোকজনের সাহায্যে বাড়ী এলাম গাড়ীতে শুয়ে। বাড়ী এসে বিছানায় শুয়েই ডাক্তারকে খবর দিলাম।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করলেন—বেশী রকম মচকে গেছে। হাড়-ভাঙ্গার সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা অমূলক। অবশ্য এ-ও জানালেন, হাড় ভাঙ্গলে মন্দ হতো না, তাঁর কৃতিত্ব ফলাবার সুযোগ ঘটত।

এতক্ষণ পলিনের সঙ্গে দেখা না হওয়াতে আশ্চর্য্য লাগছিলো। শুনলাম ও বাড়ী নেই, কোথায় বেরিয়েছে। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে এসে হাজির—গভীর উত্তেজনায় সমস্ত মুখখানি রক্তরাঙা—দুটি চোখে অনুতপ্ত বেদনার ছায়া—

আমার পাশে বসে পড়ে বললে—"শুধু আমার জন্যেই তোমার এই দশা, আমার জেদের ফলেই তোমাকে হাড়ভাঙ্গার নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে—"

বলতে বলতে ওর দুটি চোখ ছাপিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগলো—অনুশোচনা আর সমবেদনা? না আরও কিছু?··দেখলাম, ওর মুখখানি মৃতের মত বিবর্ণ, মূর্চ্ছাহতের মত আমার পাশে ঢলে পড়ছিলো—তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেললাম।

—"করুণাময়ী, শোনো শোনো, অত অধীর হোয়ো না, ভাঙ্গেনি, শুধু মচকানোর ব্যথা"—

—"সর্ব্বরক্ষা! উঃ ঝি-চাকরগুলো কি মিথ্যাই না বলতে পারে? আমাকে কি ভয়ই না পাইয়ে দিয়েছিলো! দেখো দেখো, এখনও আমার বুকের ভিতরটা কেমন কাঁপছে!"

—"পারছি—বুঝতে পারছি—আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়েই পারছি, এই আকস্মিক দুর্ঘটনা আমার সারা মন যে ভরিয়ে দিলে!"

তৃষিত ব্যাকুল দুটি অধর দিয়ে ওর রক্তিম কোমল স্ফুরিত দুটি অধর স্পর্শ করতেই অনুভব করলাম প্রতিদান, এ যে কী প্রাপ্তি, এ যে কী পরম প্রাপ্তি, আমার সমস্ত অণু-পরমাণু ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো নিবিড় পুলকে।

হাসছে পলিন।

—"হাসছো যে? কেন হাসছো বলতেই হবে।"

—"প্রেমের এই চকিত ছলনায়, যা সব সময় জয়ী হয়। জানো, আমি সেই বুড়োটার কাছে গিয়েছিলাম আমার আংটিটা ফিরিয়ে

আনতে। ওটা তোমাকে দেবো, আমার ওই ছোট্ট চিহ্নটি সারাজীবন তোমার কাছে থাকবে”—

—“পলিন—পলিন, আমার মনটাকে তুমি কি ভাবো বলো তো? শোনো, ‘সোনার চেয়ে সোনামুখের ঢের বেশী দাম বুঝবে সে’—চাই না তোমার তুচ্ছ জহরৎ—তোমার প্রেম ঢের বেশী দামী।”

—“আচ্ছা গো আচ্ছা! আর যদি দুটোই পাও? শোনো, এখন থেকে আমার যত দিন না ডাক আসে তত দিন আমরা দু'জনে থাকবো মধুচন্দ্র-উৎসবমত্ত দম্পতির মত, কেমন? শোনো, তুমি নড়বে না এই বিছানা থেকে—আমাদের খাবার এইখানেই দেবে। জানো, এই ক'দিন পাশাপাশি থেকে গোপন প্রেমের দ্বন্দ্বে আমিও ক্লান্ত হোয়ে উঠেছিলাম। আমি আজ ভোরে মনে মনে ভেবেছিলাম ভেঙে দেবো এই ছলনার লুকোচুরি, নিবেদন করবো আপনাকে তোমার ব্যগ্র-ব্যাকুল বাহুবন্ধনে। যতক্ষণ না সেই ‘কাল’ পত্র আসে আমাদের বিচ্ছেদের সূচনা জানিয়ে ততক্ষণ আমি থাকবো তোমার পাশে—”

—“সেই পত্রবাহক রাস্তায় চোর-ডাকাতের হাতেও পড়তে পারে!”

—“অত সৌভাগ্য আমাদের বরাতে নেই প্রিয়তম!” চুপ করে চেয়ে থাকি পলিনের মুখের দিকে।

পর্তুগালের সেরা সুন্দরী—কোন বনেদী, সম্ভ্রান্ত, অভিজাত পরিবারের শেষ প্রতীক—আজ প্রেমের মাধুর্য্যে অঞ্জলি পূর্ণ করে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—ক'টি মুহূর্ত্ত ভরে দিতে রঙে-রসে, ছন্দে-সুরে—তার পর মিলিয়ে যাবে এই চকিত বিদ্যুল্লেখা মনের প্রান্ত ভরে দিয়ে ঘন কালো মেঘে—

নিঃশব্দ বেদনায় মন ভরে উঠে।

এই বাড়ীটা ছাড়বো না ঠিক করে ফেললাম। অন্ততঃ যত দিন পলিন এখানে আছে। ও সহজে বাড়ী থেকে বেরোতো না, এক রবিবার উপাসনায় যাওয়া ছাড়া। ওর মনটা ছিলো ভারী ধর্ম্মপ্রবণ কিন্তু স্বাধীন চিন্তাও ও কোরতো।

আমি সোজা হুকুম দিয়েছিলাম আমার সঙ্গে কেউ যেন দেখা করতে না আসে—আমার বাড়ীতে কেউ যেন না ঢোকে। এমন কি ডাক্তার অবধি নয়। সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি, আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আমাকে দেখতে আসার বা খোঁজ-খবর নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি চেয়েছিলাম আমাদের দু'জনার এই ক্ষণ-স্বর্গে একটিও বিচ্ছেদের মুহূর্ত্ত যেন না আসে।

মার্ডিনেলীকে লিখেছিলাম, লণ্ডনের সেরা ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি শিল্পীকে পাঠাবার জন্যে! একজন ইহুদী শিল্পীকে ও পাঠিয়েছিলো। দুটি ভারী চমৎকার প্রতিকৃতি শিল্পীকে পাঠাবার জন্যে। একজন ইহুদী শিল্পীকে ও পাঠিয়েছিলো। দুটি ভারী চমৎকার প্রতিকৃতি শিল্পী এঁকেছিলো। অদ্ভুত সাদৃশ্য এনেছিলো—একেবারে নিখুঁত বলা চলে। আমার প্রতিকৃতিটি একটি আংটির উপর বাঁধিয়ে পলিনকে উপহার দিলাম। এই একটি মাত্র উপহার পলিন আমার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলো। দিনের পর দিন চলে গেলো।

প্রতিটি দিন ভরে দিয়ে নব নব সুধারসে—প্রতিটি দিন আমি পেতাম আমার প্রিয়াকে নতুন রূপে—নতুন রহস্যে। আমাদের সারা দিন-রাত যেন একটি বীণার ঝঙ্কার—পলিন এক এক দিন অস্ফুট গুঞ্জনে জানাতো—‘কি জানি লিসবন থেকে হয়তো ডাক কোনো দিনই আসবে না—কোনো দিনই এসে পৌঁছবে না সেই চিঠি।’ স্বপ্নে স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভবিষ্যতের কল্পনা নিয়ে জাল বুনতাম দুজনে বসে। কাউন্টের কথা পলিনের শুধু স্মৃতিতেই ছিলো—মন থেকে বুঝি নির্ব্বাসন হয়েছিল তার! তাই ও বলতো, শুধু সুন্দর মুখের প্রভাবেই নারীর মন এমন মুগ্ধ কি করে হয় ও বুঝতে পারে না—কখনো বলতো,—“আমার মনে এই বাইরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হোয়ে যে মিলন তাইতে প্রায়ই সুখ আসে না —ক্ষণস্থায়ী আনন্দের পর নেশাভাঙার জ্বালা থাকে শুধু”—

কিন্তু অবশেষে এলো সেই একদা-বাঞ্ছিত পত্রখানি। নিবিড় কালো বিচ্ছেদের রেখা আমাদের মাঝখানে টেনে দিয়ে। এমন ভাবে লেখা চিঠিখানি যে ফিরে যাবার সম্বন্ধে কোনো সংশয় কোনো প্রতিবন্ধকতাই টিকতে পারে না। দু'খানি চিঠি—একটি মাসীর কাছ থেকে আর একটি মার্কুইসের। মার্কুইস জানিয়েছেন, যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে যেতে জলপথে বা স্থলপথে। আর সেখানে পৌঁছালে তাকে তার সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে—আর তাদের সম্পূর্ণ আইনসম্মত, লোকাচার সম্মত বিবাহ উৎসবের অনুষ্ঠানে কোনো ত্রুটিই ঘটবে না। মার্কুইস তাকে প্রকৃত ডাচেসের মর্য্যাদায় আর স্বচ্ছন্দে ভ্রমণের জন্যে দু'হাজার পাউণ্ড ষ্টার্লিং পাঠিয়েছেন। কিন্তু পলিনের বনিয়াদী মন মার্কুইসের এই টাকা পাঠানোতে কিছু ক্ষুব্ধ আর বিরক্ত দেখলাম, ‘উনি কি ভাবেন আমি অর্থকষ্টে পড়েছি?’

পলিন ধনী—পলিন উদার। যখন সত্যিই অর্থাভাবে ছিলো, তখনও ওর আংটিটা আমাকে উপহার দেওয়া থেকেই বোঝা যায়। ওর ভরণ-পোষণের সব ভার আমার উপর দিতে ও সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত ছিলো তাই। যদিও ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো আমি ওকে কোনো দিনই ঠকাবো না।

বিদায়ের মুহূর্ত্তটি যখন স্থির হোয়ে যায় তখন কি করুণ-মন্থর শ্রান্ত দিনগুলি কাটে! নিবিড় করে কাছে পেয়ে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দেবার ব্যথায় সমস্ত মন ভারাক্রান্ত। দু'জনে বসে থাকি মুখোমুখি, সব বলা যেন শেষ হোয়ে গেছে; কিছু চাওয়া কিছু পাওয়া যেন বাকী নেই। খেতে বসে দুজনেই আনমনে উঠে আসি, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শয্যার আশ্রয়ে দু'জনারই কাটে বিনিদ্র রজনী

যাবার দিন এলো। আমি ডোভার অবধি ওর সঙ্গে গেলাম। ১২ই আগষ্ট ও যাত্রা করলো। সঙ্গে দিলাম আমার বিশ্বাসী ক্রেয়ারমঁতকে। মাদ্রিদ অবধি পৌঁছে দিতে পলিনকে। যাবার আগে ওর শেষ কথা—

‘একটি মিনতি রেখো। আমি না ডাকলে কখনো লিসবনে এসো না। না—কোনো কারণ দেখানোর প্রয়োজন আছে কি? তুমি বুঝবে আমার মনকে অশান্ত, বিক্ষুব্ধ করে তুলো না। অসুখী চঞ্চল মনে সব কিছু করা যায় কিন্তু তুমি তো আমাকে ভালোবাসো তুমি কি চাইবে আমার মান, সম্ভ্রম, ন্যায়নিষ্ঠা সব ভাসিয়ে দেবার একমাত্র কারণ হোতে? আমি কি স্থির করেছি জানো? দিনরাত মনকে বোঝাবো আমার স্বামী ছিলে তুমি, দুজনার মিলিত দিন কেটে গেছে, আজ আমি বিধবা, আমি লিসবন যাচ্ছি দ্বিতীয় বার বিবাহের জন্যে।’

* * * *

কোথায়—কোথায় যেন একটা ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে এই দু'টি বিচ্ছেদে—আমার জীবনের দু'টি মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদে। যা আমার সমস্ত সত্তাকে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দিয়ে গেছে, যার গভীর ক্ষত সারা জীবনের অশ্রুসিঞ্চনেও মিলিয়ে যায়নি।

একটি পনেরো বছর আগে হেনরিয়েটার বিদায়ের দিন আর একটি আজ। আশ্চর্য্য! এই দুটি নারীর চরিত্রে কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! শুধু শিক্ষার সাধনা একজনকে আরও বিকশিত হাস্যোচ্ছলা, আরও সুরুচিসম্পন্না আরও সংস্কারমুক্ত করে তুলেছে অপরার চেয়ে। পলিনের ছিল আভিজাত্যের গর্ব্ব, ও আরও গম্ভীর, আরও ধর্ম্মপ্রবণা কিন্তু হেনরিয়েটার চেয়ে বেশী আবেগময়ী। এই দু'টি নারীই আমার জীবন ভরে দিয়েছে সুধা-রস-ধারায়!

কালের প্রলেপে মিলিয়ে গেছে দু'জনেই, যেমন সব কিছু মিলিয়ে যায়। কিন্তু বিস্মৃতির আবরণও তো মাঝে মাঝে সরে যায়, তখন দেখি হেনরিয়েটার হাসিভরা মধুর মুখখানিই উজ্জ্বলতর হোয়ে ফুটে উঠেছে মনের পটে। কেন তা' আজ বুঝি। যেদিন হেনরিয়েটাকে পেয়েছিলাম সেদিন ছিলাম বাইশ বছরের তরুণ, ছিলো স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্ন রচনার বয়স। আর পলিন এসেছিলো সাঁইত্রিশ বছরের অভিজ্ঞ, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন একটি মনের কাছে, আজ বেশ বুঝতে পারি বয়সের ছাপ কেমন করে মনের মধ্যে বিচারের দাঁড়িপাল্লা ঝুলিয়ে তার অকারণ পুলকের গতিরোধ করে।

ফিরে এলাম লণ্ডনে। সমস্ত রাত্রি গভীর অবসাদে কাটলো। ভোরবেলা আমার ছোকরা চাকর জারবি ঘরে ঢুকলো গরম চকোলেটের গ্লাস হাতে করে।

—"আপনার পরিচারিকা জানতে চায় সেই বিজ্ঞাপনটা আবার ঝুলিয়ে দিতে হবে কি না"—

—"শয়তানী! ও কথা বললে আমি ওকে খুন করে ফেলবো।"

—"রাগ করবেন না, ও আপনার ভারী অনুগত। আপনাকে অমন কাতর ভাবে মুষড়ে পড়তে দেখেই ও জিজ্ঞাসা করছিলো।"

—"দূর হও! আর বলে রাখছি এ সম্বন্ধে কথা বলা তো দূরে, মনেও স্থান দেবে না তোমরা"—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বার্লিন।

লণ্ডন থেকে বার্লিনে চলে এলাম। ক'টা দিনের মাঝে কিছু ঘটনা কিছু বৈচিত্র্য ছিলো বৈ কি। কিন্তু সে কথা থাক। বার্লিনে প্রথম দিন পৌঁছেই দেখা করলাম লর্ড মার্শালের সঙ্গে—ভাইয়ের মৃত্যুর পর উনিই এখন লর্ড কেইস। ওঁকে শেষ দেখেছিলাম লণ্ডনে—স্কটল্যাণ্ড থেকে ফিরছিলেন—সেখানে ওর সম্পত্তি পুনরধিকারের জন্যে গিয়েছিলেন। অবশ্য সেটাও সম্ভব হোয়েছিলো রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের জন্যেই।

এই স্মৃতিকথা লেখার সময় উনি বার্লিনে প্রচুর আয়াসে আরামে রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের পরম প্রিয়পাত্র হোয়ে দিন কাটাচ্ছেন। যদিও রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন না। কারণ সে সময় ওর বয়স আশীর উপর। কিন্তু ওর সরল মধুর প্রকৃতির এতটুকু পরিবর্ত্তন হয়নি। উনি সাদরে আমাকে আহ্বান জানালেন—কিছুদিন বার্লিনেই থাকার জন্য অনুরোধও জানালেন। আমি বললাম, স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারি যদি রাজ-অনুগ্রহে একটি মনোমত কাজ পাই। কিন্তু আমার হোয়ে রাজার কাজে সুপারিশের জন্য অনুরোধ করাতে উনি বললেন, তাইতে ভালোর চেয়ে খারাপই বেশী হবে।

—"রাজার ধারণা যে কোনো লোকের চেয়ে মানুষ চেনার ক্ষমতা তাঁর অনেক বেশী। নিজেই তিনি যাচাই করে নিতে ভালোবাসেন। কখনও কখনও যার মধ্যে কেউ কিছুই দেখতে পায় না, তার মধ্যেও অনেক প্রতিভার আবিষ্কার করেন, কখনও ঠিক তার উল্টোটাই ঘটে"—

উনি আমাকে সোজাসুজি রাজার কাছে চিঠি লিখতে বললেন,—"অবশ্য যখন লিখবে তখন আমার সঙ্গে যে তোমার পরিচয় আছে সে কথারও উল্লেখ করতে পারো। তাহলেই রাজা আমাকে তোমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন—আর বলতে হোলে আমি যে তোমার সম্বন্ধে ভালো ভালো কথাই বলবো, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো"—

—"কিন্তু, মহাশয়, আমি লিখবো সোজা রাজার কাছে—আমার কোনো পরিচয়ই তো তাঁর জানা নেই? আমি তো ভাবতেই পারছি না লেখার কথা?"

—"কিন্তু তুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাও—কেমন না?"

—"নিশ্চয়ই।"

—"তাই-ই যথেষ্ট, তোমার চিঠিতে ওই ইচ্ছাটাই প্রকাশ করলেই হবে।"

—"রাজা উত্তর দেবেন?"

—"কোনো সন্দেহ নেই তাইতে। কারণ সবার চিঠির উনি উত্তর দেন। উনি জানিয়ে দেবেন কখন কোথায় তোমার সঙ্গে ওর দেখা করার সুবিধা হবে। আমার কথা শুনে চলো—আর যা কিছু হবে আমাকে জানিও"—

ওর কথা মতই সাদাসিধা ভাষায় সশ্রদ্ধভাবে একটি চিঠি লিখে পাঠালাম। মাত্র একদিন বাদেই ফ্রেডারিকের সই করা উত্তর এলো—আমার চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে আর জানিয়ে বেলা চারটার সময় সাঁসুচি স্কোয়ারে রাজার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হোতে পারে।

আমার আনন্দ তখন কল্পনাতীত। উৎসাহের চোটে নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগেই গিয়ে হাজির। খুব সাদামাটা একটা কালো রংয়ের পোষাক পরে। ভিতরে ঢুকে কাউকেই দেখতে পেলাম না। একজন প্রহরী, শান্ত্রী অবধি না। ছোটো একটা সিঁড়ি দেখে সোজা উঠে গেলাম, সামনেই খোলা দরজা—ঢুকে পড়ে দেখি চিত্রশালা। একজন লোক এগিয়ে এসে আমাকে সংগ্রহগুলি দেখাবেন কি না, জানতে চাইলেন।

—"আমি এখানে শিল্প-সংগ্রহ দেখতে আসিনি। এসেছি রাজার দর্শনার্থী হয়ে—তিনি যে জানিয়েছিলেন বাগানেই থাকবেন"—

—"ঠিক এই মুহূর্ত্তে তো তিনি কন্সার্ট-এ বাঁশী বাজচ্ছেন। আহারের পর এই-ই তাঁর অবসর বিনোদনের রীতি। রোজই তাই করেন। আচ্ছা, কোনো সময় ঠিক করে দিয়েছিলেন কি?"

—"হ্যাঁ, চারটার সময়—হয়তো ভুলে গেছেন তাহলে।"

—"তিনি কখনোই ভোলেন না। ঘড়ির কাঁটা ধরে ওঁর কাজ—আপনি বরং বাগানেই অপেক্ষা করুন"—

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো না—দেখলাম উনি আসছেন। সঙ্গে সেক্রেটারী আর একটা চমৎকার স্পানিয়েল কুকুর। যেই আমাকে দেখতে পেলেন অমনি আমার নাম ধরে ডাকলেন মাথার বিশ্রী পুরানো টুপীটা খুলে নিয়ে। কি জলদগম্ভীর স্বর! ঠিক এমনটিই আমি চেয়েছিলাম।

নিঃশব্দে চেয়ে রইলাম।

—"কি! কথা বলতে পারেন না আপনি? আপনিই না আমাকে লিখেছিলেন?"

—"হ্যাঁ, কিন্তু কিছুই মনে করতে পারছি না, কি বলবো? আমি ভাবতে পারিনি রাজার—আমার সমস্ত অনুভূতি এমন করে আচ্ছন্ন করে দেবে। আমি ভবিষ্যতে বরং প্রস্তুত হোয়েই আসবো। লর্ড মার্শালের আমাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিলো—"

—"ওহো, উনি আপনাকে চেনেন নাকি? আসুন বেড়াতে বেড়াতে কথা হবে। কি বলতে চেয়েছিলেন আমাকে? আচ্ছা এই বাগানটা কেমন লাগছে বলুন তো?"

ওঁর বাগানের সম্বন্ধে মতামত জানতে চাইলেন। বলা উচিত ছিলো এ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আমার নেই। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই অজ্ঞতা প্রকাশ! যা' থাকে বরাতে বলে সোজা বললাম—"চমৎকার!"

—"কিন্তু ভার্সাই-এর বাগান এর চেয়ে অনেক সুন্দর!"

—"তা' ঠিক কিন্তু সেটা শুধু অজস্র ফোয়ারার জন্যে।"

—"সত্যিই তাই; কিন্তু এখানেও আমার ত্রুটি নেই কিছু। জলই নেই এখানে—তিনশ' হাজার ক্রাউন খরচ করেছি কিছুই হয়নি।"

—"তিনশ'—হাজার ক্রাউন! যদি এত খরচ করা হোয়ে থাকে তবে জল তো প্রচুর পরিমাণে ওঠার কথা"—

—"ওহো! আপনি দেখছি জলের কারিগরীতে বিশেষজ্ঞ!"

বলা উচিত কি ভুল দেখছেন? অসন্তুষ্ট করা তো মোটেই সমীচিন নয়। তাই চুপচাপ মাথা হেঁট করে রইলাম—যে অর্থে হ্যাঁ, না, দুই-ই বোঝায়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এবার উনি প্রসঙ্গটা চেপে গেলেন। তারপর বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, ভেনিসের নৌশক্তি আর সৈন্যসংখ্যা কত? ধাতস্থ হোলাম আমি।

—"বিশটি যুদ্ধজাহাজ আর বহুসংখ্যক নৌকা।"

—"আর স্থলপথে?"

—"সত্তর হাজার সৈন্য। সবাই রাষ্ট্রের প্রজা। সেদিক থেকে হিসাব করতে গেলে গ্রাম-পিছু একজন লোক"—

—"না আপনার উক্তি ভ্রান্ত। মনে হয় আষাঢ়ে গল্পে আমাকে ভোলাতে চান। তার চেয়ে আপনাদের করপ্রথা সম্বন্ধে বলুন।"

রাজা-রাজড়ার সঙ্গে এভাবে কথোপকথন আমার এই প্রথম। ওঁর বলার ধরণ হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়া, এসব দেখে নিজেকে মনে হচ্ছিল যেন আমি কোনো ইতালীয় নাটকে অভিনয় করছি—যেখানে একটা কথা ভুল হোয়ে গেলেই দর্শকদের নিষ্ঠুর টিটকারী সুরু হবে। যাই হোক, আমি বললাম, করপ্রথার পুঁথিগত জ্ঞানের সঙ্গেই আমি পরিচিত।

—"তাই-ই আমি চাই।"

—"তিন রকম কর আছে। একটি ধ্বংসাত্মক, একটি দুর্ভাগ্যক্রমে অতি প্রয়োজনীয় আর একটি নিঃসংশয়ে ভালো। প্রথমটি রাজকর দ্বিতীয়টি যুদ্ধকর, তৃতীয়টি জনপ্রিয় কর।"

—"বেশ, বেশ কিন্তু রাজকরকে ধ্বংসাত্মক বলার অর্থ কি?"

—"প্রজার তহবিল শূন্য করেই তো রাজার কোষাগার পূর্ণ হয়। তাছাড়া এতে মুদ্রা চালু থাকতে না পারায় ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হোয়ে রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে।"

—"তবু যুদ্ধকরকে তো প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করছেন?"

—"দুর্ভাগ্যক্রমে প্রয়োজনীয়—কারণ যুদ্ধ যে সর্বনাশা আত্মরক্ষার প্রস্তুতি তো রাখতেই হবে—আর তৃতীয় করটির জনপ্রিয়তার কারণ, সেটি জনকল্যাণেই ব্যয়িত হয়, প্রয়োজনীয় জলসেচ, প্রণালী খনন, বিজ্ঞানচর্চা, শিল্পচর্চা প্রভৃতি বিভিন্ন হিতকর কাজে"—

—"হ্যাঁ এ কথাগুলি ঠিকই। আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই কাল্‌সাবিগিকে চেনেন?"

—"নিশ্চয়ই! আমরা একসঙ্গেই তো 'জেনোস' লটারী প্রতিষ্ঠা করি—প্রায় সাত বছর আগে প্যারিসেতে—"

—"কি জানি আপনাদের ঐ 'জেনোস্' লটারীটা আমার একটুও ভালো লাগেনি। মনে হয় স্রেফ জুয়া ছাড়া কিছু নয়। জিতবার স্থির নিশ্চয়তা জানলেও আমি কখনও ওতে যোগ দিতাম না।"

—"ঠিকই বলেছেন। কারণ, জনসাধারণ কখনোই লটারীর পিছনে ছুটতো না যদি না তার আড়ালে ওই ভুয়া নিরাপত্তার লোভটি থাকতো।"

হঠাৎ কথা পালটিয়ে রাজা আমার দিকে চেয়ে বললেন,—"আচ্ছা, আপনি যে অত্যন্ত সুপুরুষ, সেকথা আপনি জানেন?"

—"এ-ও কি সম্ভব যে এতক্ষণ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার পর আপনি আমার মধ্যে সব গুণ ছেড়ে শুধু ওই তুচ্ছ রূপটুকুই দেখলেন, যেটা শুধু আপনার দেহরক্ষী নির্ব্বাচনেই প্রয়োজন!"

হেসে ফেললেন রাজা—পরক্ষণেই বললেন,—"লর্ড কেইথ তো চেনেন আপনাকে। আমি তাঁর সঙ্গে আপনার বিষয়ে কথা বলবো।"

টুপীটা মাথা থেকে খুলে নিলেন—বুঝলাম বিদায়ের ইঙ্গিত। সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলাম।

তিন-চার দিন পরে লর্ড মার্শাল আমাকে ডেকে পাঠিয়ে জানালেন, রাজা খুব খুশী আমার সঙ্গে সেদিনের পরিচয়ে, আর আমার জন্যে কাজের চেষ্টাও করবেন, বলেছেন। খুব উৎসুক হোয়ে রইলাম, কোন কাজের জন্য ডাক আসে⋯কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নাই।

এই স্মৃতিকথা লেখার সময়তেই রাজা ফ্রেডারিকের বোন ডাচেস অব্ ব্রান্সউইক সকন্যা এসেছিলেন রাজার কাছে। পরের বছরই প্রুশিয়ার যুবরাজ ওঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ওঁদের আগমন উপলক্ষে রাজা একটি ইতালীয় অপেরা অনুষ্ঠানের আদেশ দেন। সেখানে সেই উৎসবে রাজাকে আবার দেখলাম—কালো পোষাক, প্রতিটি সেলাইএর উপর সোনার কাজ, কালো সিল্কের মোজা—সব জড়িয়ে কেমন একটা হাস্যকর মূর্ত্তি—যেন অভিনয়ের ঠাকুর্দা—প্রতাপশালী সম্রাট নয়। এক বগলে লম্বা টুপী আর এক হাতে বোনের হাতটি ধরে উৎসব-গৃহে প্রবেশ করলেন। প্রত্যেকেই নির্ব্বাক

হোয়ে চেয়ে রইলো ওঁর দিকে—এক বৃদ্ধরা ভিন্ন রাজাকে ইউনিফর্ম ছাড়া অন্য কিছু কখনও পরতে দেখেছে কি না স্মরণেও আনতে পারে না।

রাজার প্রাসাদ দেখেছি—তাই দেখেছি সেখানে অন্যান্য বিরাট সুসজ্জিত কক্ষগুলির সঙ্গে রাজার নিজস্ব শয়নকক্ষটির কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! ছোট্টো একটি ঘর—একধারে পর্দ্দার আড়াল দেওয়া অতি সাধারণ ছোটো একটি বিছানা। কোনো পাদুকা, কোনো রাত্রিবাস কিছুই নাই, একটি পুরানো রাত্রে পরার টুপী ছাড়া। শীতের সময় ওই টুপীটির উপরই তিনি ওঁর বাইরের টুপীটি পরেন। ঘরের একধারে একটি সোফা, তার সামনে একটি টেবিল—কাগজ কলম আর দোয়াতদানীতে স্তূপীকৃত, আধপোড়া অবস্থায় খাতাও কয়েকটি দেখলাম। ওই ঘরখানির পরিচারক জানালে—ওই কাগজপত্র আর খাতাগুলিতে গত যুদ্ধের ইতিহাস লেখা আছে। আকস্মিক ভাবে কয়েকটি খাতা পুড়ে যায়। সম্প্রতি রাজা আর লিখছেন না—তার পরে বোধ হয় অসমাপ্ত লেখাটা আবার ধরেছিলেন। কারণ, তাঁর মৃত্যুর ঠিক পরেই ওটি প্রকাশিত হয়।

পাঁচ-ছয় সপ্তাহ কেটে যাবার পর লর্ড কেইথ জানালেন যে, রাজা আমাকে একটি অফিসারের পদে নিযুক্ত করেছেন—সেটি হোলো পমিরেনিয়ান ক্যাডেটদের দলপতি বা শিক্ষক—সম্প্রতি এই ক্যাডেট দলটি খোলা হোয়েছে। সংখ্যায় মাত্র পনেরো জন ক্যাডেট—দলপতি পাঁচ জন, প্রত্যেকের অধীনে তিন জন ক্যাডেট। আর পারিশ্রমিক ছ'শো ক্রাউন—আহার, ক্যাডেটদের সঙ্গে একই টেবিলে। আর কাজটা? ক্যাডেটদের সঙ্গে সর্ব্বত্রই থাকা; এমন কি রাজসভাতেও অবশ্য তখন ফিতাটিতে বাঁধা ইউনিফর্ম পরতে হবে। আমাকে এখনি মনস্থির করে ফেলতে বলা হোয়েছে কাজটা নেওয়া সম্বন্ধে। কারণ বাকী চার জন দলপতি অথবা শিক্ষক নিযুক্ত করা হোয়ে গেছে। আমি লর্ড কেইথকে জানালাম, পরদিন নিশ্চয়ই আমি মতামত জানাবো, আজকের দিনটা চিন্তা করে নিয়ে।

কি অসীম প্রচেষ্টায় প্রবল হাস্য দমন করে বাড়ী ফিরে এলাম, সে আমিই জানি। কিন্তু আরও বেশী অবাক হোলাম শুনে এই পনেরো জন পমিরেনিয়ার রীতিমত ধনী আর অভিজাত বংশীয়। তিনটি বিরাট হলঘর আসবাবপত্র শূন্য এবং কয়েকটি ছোটো ছোটো সাদা চূণকাম করা শোবার ঘর—শয্যা আর শয্যাধার দুই-ই শোচনীয়! একটা কাঠের টেবিল আর দুটি চেয়ার, ব্যস! ক্যাডেটরা জোর বারো-তেরো বছর বয়সের হবে। টাইট পোষাক, রুক্ষ চুল ছোটো করে ছাঁটা, বিশ্রী বোকা-বোকা ভাব আর যন্ত্রের মত ভঙ্গী। তাদের শিক্ষকদের তো প্রথমে ভৃত্যশ্রেণীতেই ফেলেছিলাম—পরিচয় পাবার আগে।

পরদিন সোজা লর্ড কেইথের কাছে গিয়ে সবিস্তারে সব জানালাম—আর সবিনয় নিবেদন করলাম আমার অক্ষমতা। লর্ড কেইথ হাসলেন, শুনে আর স্বীকারও করলেন এ কাজ না নেওয়াই ঠিক। তবে বার্লিন ছেড়ে যাবার আগে রাজাকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে যাওয়া উচিত, সে উপদেশও দিলেন। উপদেশ মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে হোলো। ফিরে এসে যাত্রার আয়োজন সুরু করলাম। মন তখন স্থিরই করেছি রাশিয়া যাবার জন্যে। ম্যঁসিয়ে দ্য ত্রাগাদাকে চিঠি দিলাম পিটাসবুর্গের ব্যাঙ্কে জানাতে—যাতে আমাকে প্রতি মাসে খরচ চালাবার মত অর্থ দেওয়া হয়। একটি ভৃত্যও জুটে গিয়েছিলো নাম ল্যাম্বার্ট। খাবার আগে আবার গেলাম রাজসকাশে—অত্যন্ত পরিচিতের মতই এগিয়ে এলেন রাজা, প্রশ্ন করলেন পিটাসবুর্গ যাত্রা করছি কবে?

—"পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই—যদি অনুমতি করেন"—

—"বেশ বেশ...মঙ্গল হোক—কিন্তু সেখানে কি করবেন কিছু ঠিক করেছেন? তাছাড়া ওখানের রাণীর কাছে কোনো পরিচয়-পত্র সঙ্গে নিয়েছেন?"

—"কিছু না, শুধু এক জন ব্যাঙ্কারের কাছে একটি পরিচিতি-পত্র আছে আমার।"

—"ওটাই আসল দরকার। আচ্ছা ফেরার পথে যদি এখান হোয়ে যান তবে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, রাশিয়ার খবর শুনবো। বিদায়!"

—"বিদায়!"

দুই শত ডুকাট সঙ্গে নিয়ে বার্লিন থেকে রওনা হোলাম।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

দৃষ্টিহীন

(John Milton এর On His Blindness)

হায় কেন এই অকালে আঁধার নেমে
এলো নয়নের মাঝে, বাণীহারা ভাষা,
প্রতিভার হোলো অপমৃত্যু, এ জনমে
যা ছিল মোর দেবাশীষ। তবুও তো আশা
জেগে রহে বুকে কহিতে কাহিনী আপন
কবিতার গানে, ভয়ে মরি পাছে মোর

অক্ষমতা জ্ঞানে দেবতা বিরূপ হন;
প্রশ্ন করি, "সেবা যদি চাও হে ঈশ্বর,
দৃষ্টি তবে কেন নিলে হরে?" হেনকালে
শুনি, ধৈর্য্যের আশ্বাস বাণী, "যে রাজার
আদেশ পরে নিখিল বিশ্ব ছুটে বলে,
তুচ্ছ সেবা তাঁর কাছে ক্ষুদ্র মানবের।

যে সহে নীরবে তাঁর আঘাত বেদনা
শ্রেষ্ঠ তারি পূজা সার্থক তার সাধনা।"

—অনুবাদ: তপতী চক্রবর্ত্তী

পঞ্চতপা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৩

শোকের বাড়ী থেকে শবদেহ অপসারণের পরেও যেমন মৃত্যুর চিহ্ন ছড়িয়ে থাকে, ঝড়ের পরে গোটা মড়াইয়ের সেই অবস্থা। সমস্ত প্রাকৃতিক স্থাবরতার একেবারে গোড়ায় নাড়া পড়েছে যেন। পাথরে আর গাছপালায় মড়াই ছেয়ে গেছে। রাস্তার অবস্থাও তাই। এতদিনে ও-পারের কুলি-বসতির পাকা ব্যবস্থা সত্ত্বেও যে ক'টা তাঁবু ছিল, মাটি নিয়েছে। তবে লোকক্ষয়ের খবর কিছু কানে আসেনি। সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে উঠে থাকবে। সাময়িক অবরোধের ও-ধারে মড়াইয়ের লাল জলে গৃহস্থঘরের আটচালা ভাসছে অনেকগুলো। আর গাছের ভাঙা ডাল। মড়াইয়ের গৈরিক-যৌবনে যেন কলঙ্ক লেগেছে।

সম্পূর্ণ দিন কেটে গেল রাস্তা পরিষ্কার করে, মড়াইয়ের গহ্বর থেকে পাথর আর গাছপালা সরিয়ে মোটামুটি কাজের ব্যবস্থায় ফিরে আসতে। তার পরের দিন বিধাতা যেন কৃপণ হাতে আলোও পাঠালো একটু, মিষ্টি রোদ চিকচিকিয়ে উঠল। সকাল থেকে কাজের তাড়া লাগল মড়াইয়ে।

তারপরই অপ্রত্যাশিত আলোড়ন আবার একটা। দূর থেকে, ওই দূর থেকে খবরটা কানাকানি হয়ে এদিকে পাগল সর্দারের কাছ পর্যন্ত পৌঁছুতে সময় লাগল না খুব। কোদাল শাবল গাঁইতি ফেলে পায়ে পায়ে লোক চলল সেদিকে। ওই দূরে, যেদিকে পাহাড় ঘেঁষে মড়াই বেঁকে গেছে সম্পূর্ণ। যেদিকে আকাশে শকুনি উড়ছে অনেকগুলো সেদিকে। কৌতূহল আর চাপা উত্তেজনা। ক্রমশ বাড়তে লাগল সেটা। কাজ শুরু হবার আগেই কাজে ছেদ পড়ল আবার।

আর উত্তেজনায় একেবারে বসে পড়েছে পাগল সর্দার। স্বজাতীয়দের অনেকে দৌড়ে এসেছে ওর কাছে। নিজেদের ভাষায় বলাবলি করেছে কি। তারপর আবার ছুটেছে।

আনন্দে গড়াগড়ি করতে ইচ্ছে যাচ্ছে পাগল সর্দারের। ঠিকমত চেনা যাচ্ছে না বলে খটকা লাগছে ওদের মনে? কিন্তু না দেখেও এতটুকু সংশয় নেই পাগল সর্দারের। সে নিঃসন্দেহে বলে দিতে পারে লোকটা কে। বলে দিতে পারে ঝড়ে পাথর নড়ে কার বিকৃত শব মড়াইয়ে গড়িয়েছে। শব নয় ঠিক, শব হলে সকলে চিনতে পারত। কঙ্কালে পরিণত হয়েছে প্রায়। কিন্তু পাগল সর্দার ঠিক বুঝেছে। না দেখেও চিনেছে। তোরাও চিনবি। হাতে হীরের আঙটি নেই দুটো? পোষাক-আসাকের চিহ্ন নেই? নীল চশমা? পাহাড়ে উঠে খোঁজ করগে যা, যেখান থেকে গড়িয়েছে ওটা সেই জায়গাটা খুঁজে বার করগে যা—ঠিক মিলবে কিছু, তোরাও চিনবি ঠিক।

এসব খবর বাতাসে ছড়ায়। কর্মকর্তারাও সবাই গুরুগম্ভীর মুখে চলেছে সেদিকে। এমন কি দোকান ফেলে আজ ভুতুবাবুও নেমে এসেছে। থেকে থেকে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে ভুতুবাবুর। গোল চোখ স্থির হয়ে আসছে এক একবার। সেই এক সকালে কেন জলে থৈ থৈ করছিল সমস্ত ঘর, এখন আর সেটা বুঝতে না চাইলেও বুঝতে পারছে। যত পারছে ততো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

পাগল সর্দার দেখছে সকলকে। যারাই যাচ্ছে ওদিকে, চেয়ে চেয়ে দেখছে তাদের। দেখগে যাও, বেশ ভালো করে দেখে নাওগে যাও। দেখছে আর তার কালো মুখে গলগলিয়ে হাসি উপছে উঠছে।

সান্ত্বনাকে দেখে আনন্দে একেবারে যেন অধীর হয়ে উঠল সে। —দিদিয়া! আঁই রে দিদিয়া! উদিন তুকে বলি নাই হোপুন মরদ ছেল? আখুন দেখে লে রে দিদিয়া, আখুন দেখে লে!

স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলেনি। যেটুকু ছড়িয়েছে আভাসে ইঙ্গিতে। সান্ত্বনার কানে গেছে, কিন্তু মাথায় ঠিকমত ঢোকেনি যেন। এখনো ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল সর্দারের মুখের দিকে। কিন্তু আজ এই প্রথম এত হাসি এত আনন্দের মধ্যেও সর্দারের মূর্তিটা কেমন যেন কুৎসিত ঠেকল ওর চোখে।

পারলে ধেই ধেই করে নাচত সর্দার। অনর্গল কত কথা বলল, কত কি বলল ঠিক নেই। সবই হোপুনের প্রশস্তি! ও একটু থামলেই সান্ত্বনা বাড়ি ফিরবে ভাবছিল।

কিন্তু এরই মধ্যে আবার একটা বিশেষ উত্তেজনা দেখা গেল লোকজনের ছুটাছুটি আনাগোণায়।

আবার এক চমকপ্রদ চাঞ্চল্য। আবার এক হাড়-কাঁপানো খবর।

লোকজন পাহাড়ে উঠেছিল মৃতের চিহ্ন খুঁজতে। বেশি খুঁজতে হয়নি। পেয়েছে। সেই সঙ্গে আর একটা ভয়াবহ আবিষ্কারে স্তব্ধ সকলে।

আর একটা কঙ্কাল। এটা সম্পূর্ণই কঙ্কাল।

কিন্তু পুরুষের নয়। নারীর। রূপোর গয়না আটকে আছে কিছু, পাশেও পড়ে আছে দু'-চারখানা।

কখন, কেমন করে বাড়ি ফিরেছে সান্ত্বনা খেয়াল নেই। কেমন করেই বা সর্দারকেও নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে এত পথ হেঁটে, জানে না। সর্দার এক সময়ে হাত ধরে টেনেছিল মনে আছে। সর্দার যন্ত্র-চালিতের মত উঠে এসেছিল তাও মনে আছে। তারপর কখন বাড়ি এসেছে হুঁস নেই।

ভিতরের দাওয়ায় বসে আছে সর্দার। সান্ত্বনা ঘরে। অবনীবাবু ক্রমাগত ঘর-বার করছেন। এ অবস্থায় এভাবে দুজনকে রেখে বেরুতেও পারছেন না। মুখে কেউ সোরগোল না করলেও ওই দুটো কঙ্কালের একটিকে মনে মনে সনাক্ত করেছে সবাই। পুরুষকে। কিন্তু দ্বিতীয়টিই সকলের বিভ্রান্তির কারণ। সঠিক বুঝে ওঠেনি

কেউ। অবনীবাবুও না। কিন্তু এদের দুজনকে দেখে অনুমান করেছেন। বুঝেছেন।

সান্ত্বনার ইচ্ছে হচ্ছিল দেয়ালে মাথা ঠুকে সচেতন করে নিজেকে। তার যে এখন অনেক ভেবে দেখার আছে, অনেক কিছু বুঝতে বাকি। রোদ উঠলে যেমন কুয়াশা মিলায়, তেমনি সোজাসুজি একবার নিজের ভিতরে তাকাতে পারলেই কিছু একটা প্রহেলিকার যেন অবসান ঘটতে পারে। কিন্তু তাকাতেও পারছে না, ভাবতেও পারছে না। একটা বোবা নিষ্ক্রিয়তা একেবারে গ্রাস করেছে ওকে।

···এই জন্যেই আসবে বলেও আর আসেনি চাঁদমণি। সেই রাত্রিতেই হয়ত ধরা পড়েছে। মরণ শানাচ্ছিল যে মানুষটা তার হাতেই ধরা পড়েছে। সে দৃশ্য ভাবতে গিয়ে অব্যক্ত ব্যথায় একলা ঘরে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল সান্ত্বনা। চাঁদমণির সেই পা-ছোঁয়া স্পর্শ সর্বাঙ্গে সিড়সিড়িয়ে উঠল।···হয়ত কাঁচপোকার মত টেনে নিয়ে গেছে, বলির পশুর মত···। সান্ত্বনার মনে হল, ওর বুকের হাড়গুলো যেন মটমট করে ভাঙছে কে। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু যাবে কোথায়? দাওয়ায় পাগল সর্দার। আস্তে আস্তে বসে পড়ল আবার।

···তারপর ফাঁদ পেতেছে হোপুন। সেই প্রলোভনের ফাঁদে রণবীর ঘোষকে আটকেছে। পিচ্ছিল প্রলোভনের ফাঁদ উপলক্ষ্য সান্ত্বনা। সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে আবার। ওই জন্যেই জিপে সেই লোকটার পাশে দেখা গেছে তাকে। ওই জন্যেই মড়াইয়ে আর সেই গোরু-চরা পাহাড়ের নির্জনে হোপুন অমন করে চেয়ে চেয়ে দেখত ওকে। ওই ফাঁদ দেখেই ভুতুবাবু ওকে সতর্ক করে দিতে এসেছিল। আর পাগল সর্দার ওকে সতর্ক করতে এসেছিল তো হোপুনেরই ইঙ্গিতে···।

ভিতরে ভিতরে সবক'টা উপলব্ধির তার যেন একসঙ্গে সজাগ করে তুলতে চাইল সান্ত্বনা। ব্যাকুল আকুতি।···ওই পাষাণ-মূর্তি লোকটার নির্মম নৃশংসতাই বড়, না আর কিছু বড়?

চমকে উঠল একেবারে। ঘরের চৌকাঠে পাগল সর্দার দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি-বিনিময় হতে বলল, আথুন যাইরে দিদিয়া···

সান্ত্বনা অবাক। যেন দুটো গল্পগুজব করতে এসেছিল, সুখ-দুঃখের কথা কইতে এসেছিল—বেলা পড়ে আসছে দেখে এখন চলল। সান্ত্বনা মাথা নেড়েছিল কি না নিজেই জানে না।

বাইরে এসে মেন কোয়াটারস-এর রাস্তা ধরল পাগল সর্দার। কলের পুতুলের মত এগিয়ে চলল সে। মেন কোয়ার্টারস-এর ভিতর দিয়ে, গেষ্ট হাউসের পাশ দিয়ে একেবারে পাহাড়ের ধারে এসে দাঁড়াল। পায়ের নিচে মড়াই। বাঁয়ে শুকনো খটখটে। যেদিকে ড্যাম বাঁধা হচ্ছে। ডাইনে মাটির সেই সাময়িক প্রতিরোধ।

অন্যমনস্কের মত হাঁটতে হাঁটতে ছাড়িয়ে গেল সেটা। আরো বেশ খানিকটা এগিয়ে থামল একজায়গায়। এখানেও পায়ের নিচে অতলান্ত মড়াই। কিন্তু এখানে মড়াইভরা জল। লাল জল। লাল যৌবন। উচ্ছল, কলকল। একাগ্র মনোযোগে পাহাড়ঘেঁষা ওপারের দিকে দেখতে লাগল পাগল সর্দার।

···কোন্ জায়গাটা হবে? তখন তো মড়াইয়ে জল ছিল না একফোঁটা। আর কত বছরের কত কালের কথা সেটা।

কিন্তু কোন্খানটায় হবে?

কোন্খানটায় আজও ঘুমিয়ে আছে চাঁদমণির মা ফুলমণি?

ওই খানটায়?···নাকি ওই খানটায়?

জলের নিচে ঠাওর করা শক্ত। জলের নিচে পাথর, তার নিচে মাটি, তার নিচে···

মস্ত শিকারী ছিল পাগল সর্দার। এমন শিকারী হয় না নাকি। কিন্তু শিকার করা ছেড়ে দিল কেন? সকলের বিস্ময়।

ছাড়বে নাই বা কেন। বড় শিকারের পরে ছোট শিকারে হাত ওঠে না মন ওঠে? শেষ যে শিকার করেছে পাগল সর্দার···বাঘ ভালুকও তুচ্ছ। তার পর শিকার ছাড়বে না তো কি!

পাহাড়ীরা ছিল ওদের জাতশত্রু। পাহাড়ের ডগায় থাকত। ফাঁক পেলে এসে লুঠতরাজ করে যেত। ওদেরই কাউকে মনে ধরেছিল ফুলমণির! এদেরই কারো সঙ্গে 'ছাতই' হয়ে চলে গিয়েছিল! সর্দার তো বনে জঙ্গলে শিকার নিয়ে থাকত বছরের বেশির ভাগ সময়। সে শিকার জলো ঠেকল এর পর। শিকারীরা ধৈর্যের পাহাড় না কি। মিথ্যে নয় বোধ হয়। প্রায় এক বছর ধৈর্য ধরে ছিল পাগল সর্দার, নিবিড় প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে ছিল। শিকার আসবে জানত। বনের হরিণ ঝোপে ঝাড়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে কতক্ষণ? তার স্বভাবই তাকে টেনে আনে। ফুলমণিই বা পাহাড়ে পাহাড়ে নেচে বেড়ানো ভুলে থাকবে ক'দিন? তার স্বভাবও তাকে টেনে আনবে।

এনেছিল।

বছরের বড় শিকারের উৎসবে বেরিয়েছিল সাঁওতালরা। পাঁচ দিনের দেশময় শিকারোৎসব। ছেলে বুড়ো ঝেঁটিয়ে বেরোয় 'ডুবু-ডুবু নাগরা পিটিয়ে, 'শরং শরং' বাঁশি ফুঁকে আর 'তুতু' তুতু' শাকোয়া বাজিয়ে। কাছে দূরে কে আর না টের পায় ওদের এই শিকার অভিযান। পাঁচ দিন আর কোনো মরদ পুরুষের টিকি দেখা যাবে না দেশে গাঁয়ে।

কিন্তু পাগল সর্দার যায়নি।

···সেও বড় শিকারেরই প্রতীক্ষা করছিল।

সুয্যি-ডোবা আবছা আলোয় শিকার সেদিন নিঃশঙ্কে এসে দাঁড়িয়েছিল ওই ছোট খাড়া পাহাড়টার ডগায়।

এত মন দিয়ে আর কখনো তীর ছোঁড়েনি বোধ হয় পাগল সর্দার।

বাণবিদ্ধ পাখি যেমন উল্টে পাল্টে শূন্য থেকে নেমে আসে মাটির দিকে, ওর শিকারও তেমনি লপটে ঝপটে নেমে আসছিল নিচের দিকে। সবটা আসেনি, কাছেই একটা পাথরে আটকে গিয়েছিল। ক্ষিপ্রচরণে সর্দার গিয়ে তুলে নিয়েছিল তাকে। শিকার একবার মাত্র চোখ মেলে দেখেছিল তার নির্মম শিকারীকে, তারপর পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজেছিল। অতি যত্নে, অতি সঙ্গোপনে বুকে করে শিকার নিয়ে নেমে এসেছিল সর্দার। তারপর···

তারপর, ওই জলের নিচে পাথর, তার নিচে মাটি, আর তার নিচে···

নরেনকে দেখা মাত্র সান্ত্বনা ভিতরের গুমোট অসহিষ্ণুতা কাটিয়ে ওঠার পথ পেল যেন। এক পলক দেখে নিয়ে আলতো প্রশ্ন করল, কবে এলেন?

নরেন অবাক। কবে এলাম কি রকম ?

নির্লিপ্ত মুখে সান্ত্বনা আবার তাকালো তার দিকে। আপনি কি এখানেই ছিলেন নাকি এ ক'দিন ?

জবাব না দিয়ে নরেন হাসতে চেষ্টা করল একটু। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আরো অবাক সে। এ ঠিক ঠাট্টাও নয়, অনুযোগও নয়। নিরুত্তাপ অভিমানের ঝাঁজ একটু।

বাদল গাঙ্গুলির বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই সন্ধ্যার নরেন এসেছিল। আশা করেছিল, চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা সান্ত্বনা তুলবে। কিন্তু সান্ত্বনা তার ধার দিয়েও যায়নি। পরদিনও না। অথচ হোপুনের দুর্ঘটনার পরের সে থমথমে মুখভাব আর ছিল না। বরং খুশিতে উপছে উঠতে দেখেছিল অনেকবার। বাদল গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা যোগাযোগের প্রসঙ্গ সান্ত্বনা আগেও সন্তর্পণে পরিহার করেছে। অথচ ভিতরের একটা চাপা আনন্দ চাপতে পারেনি। তাছাড়া আরো অনেক কিছু উপলব্ধির কারণ ঘটেছে অনেকবার।···বিশেষ করে মাসির বাড়ি যাওয়ার আগে সেই বিকেলে নরেনের হালকা ইঙ্গিতে অপ্রতিভ লালিমায় ধড়মড়িয়ে উঠে রান্নাঘরে পালানো।

এবারেও সান্ত্বনা বলেনি কিছু, বাদল গাঙ্গুলি বলেছে। বলেছে, সান্ত্বনার সে কি রাগ তার ওপর। আর রাগ পড়তে লজ্জায় একাকার নাকি। বাদল গাঙ্গুলির বলার মধ্যেও চিরাচরিত নিস্পৃহতার অভাবটুকু নরেন লক্ষ্য করেছিল বই কি। মনে হয়েছিল, সেই রাগ আর লজ্জা চিফ ইঞ্জিনিয়ারের মরু-রুক্ষ জীবনে ঠাণ্ডা প্রলেপের কাজ করেছে।

তারপর গত চার পাঁচদিন আর আসেনি নরেন। ঝড়, জল —মড়াইয়ে বিপর্যয়ও কম ঘটেনি ক'টা দিনের মধ্যে। আজই শুধু জল হয়নি সকাল থেকে। তবু আসবে ভাবেনি। কিন্তু বিকেল হতে পায়ে পায়ে চলে এসেছে কেমন।

আগে হলে এটুকু অভিমানই দখিন বাতাসের স্পর্শ বলে মনে হত। কিন্তু এ প্রশ্রয়ের যাতনা বিষম। এবারে নরেন সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। পাচ্ছে। দাওয়ার ওপর মোড়ায় বসে পড়ে বলল, এ ক'দিন ঘুমিয়ে কাটালে নাকি, আকাশের অবস্থা দেখোনি ?

দু'-চার মুহূর্ত অপেক্ষা করে সান্ত্বনা আকাশের অবস্থাটা তার মুখ থেকেই আঁচ করে নিতে চেষ্টা করল যেন। তারপর ঘরে চলে এলো। আধময়লা শাড়ীটা বদলে নিল। আয়নায় মাথা আঁচড়ে নিল একটু।

নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে চায় সান্ত্বনা। নিঃশেষে ছাড়িয়ে যেতে চায়। ওই ঝড়টা যেন ওরই বুকের উপর এক অনড় বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেল। কি বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে ওর ভিতরে ভিতরে। ঘটে যাচ্ছে। দুঃসহ লাগে। ও ভুলতে চায় ওই ঝড়ের কথা। চাঁদমণির কথা, হোপুনের কথা, পাগল সর্দারের কথা···। ওই মানুষদের জীবনের ব্যর্থতা ওকে বুঝি গ্রাস করতে আসছে।

নিজেকে ভুলতে চায়। মাসির বাড়ি থেকে ঘুরে আসার পর জীবনে যে নতুন জোয়ার এসেছিল, সেই জোয়ারেই আবার ভাসতে চায় সান্ত্বনা। বেরিয়ে আসতে চায় এই স্তব্ধতার আবরণ ভেঙে। চেষ্টাও করছে। চেষ্টা করছে সহজ হতে, সুস্থ হতে।

নরেনের কথাও ওর সত্যিই মনে হয়েছে এ ক'দিন। মনে হয়েছে, ওই লোকটাই পারে এই অসহ্য গুমোট খান্ খান্ করে ভেঙে দিতে। বিকেলে জল-বৃষ্টি সত্ত্বেও প্রতীক্ষা করেছে।

ফিরে এসে বলল, চলুন আর বসতে হবে না, যে বিদঘুটে ছিরি আকাশের, এক্ষুনি হয়ত আবার ঝমঝম শুরু হবে।

একটু দেখে নিয়ে নরেন বলল, বেরোলে পরে যদি শুরু হয় ?

হয় হবে, আপনাকে আর সে গবেষণা করতে হবে না, চলুন।

বেরিয়ে সেই পিছন দিকের পাহাড়ী রাস্তা ধরল সান্ত্বনা।

—এদিকে কোথায় ?

—যমের বাড়ি। ফিরে তাকালো, ভয় করছে ?

ওর দিকে চেয়েই নরেনের আজ হঠাৎ কেমন মনে হল, যে অবকাশের প্রতীক্ষা করছিল এতদিন, আজ সেটা আসবে। যে কথাটা বলি বলি করেও বলা হয়নি এতদিন, সেটা আজ বলা হবে। এ সংশয়ের থেকে সে অনেক ভালো। জবাব দিল, না তুমি সঙ্গে থাকলে আর ভয় কি।

ভালো লাগছে সান্ত্বনার। ভালো না লাগিয়ে ছাড়বে না। সেই জোয়ার জীবনে ফিরে যাবে সঙ্কল্পবদ্ধ। সান্ত্বনা হেসে উঠল। ওই হাসি দিয়ে গোটা পাহাড়ের ওপর থেকে কালো মেঘের কালো ছায়াটা পর্যন্ত দূর করে দেবে যেন। বলল, ভয় না তো কি, এ ক'দিন আসেননি কেন ? কি যাচ্ছেতাই সব ব্যাপার হল একটার পর একটা, দুটো কথা বলারও লোক পাইনে।

—খবর দাওনি কেন ? নরেন নিস্পৃহ।

—এতদিন কোন্ খবরটা দিতে হয়েছে মশাই আপনাকে ?

—জল-বৃষ্টি মাথায় করে যাই বলে তুমিই তো কতদিন কত খোঁচা দিয়েছ।

সান্ত্বনা বলতে যাচ্ছিল, খোঁচা খেয়েও তো আসতেন। বলল না। এবারের এই না আসার হেতুও কেমন করে যেন উপলব্ধি করেছে। সান্ত্বনা আপস করতে চায়। কিন্তু সোজা রাস্তায় নয়। নিজেকে সজাগ করে। বলল, খোঁচা না ছাই, আসলে আপনি আজকাল আর আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।

নরেনের ভিতরে প্রশ্রয়ের সাড়া জাগছে আবার একটা। সংশয়ের পর্দাটা যেন পাতলা হয়ে আসছে। পাশাপাশি চলার একটা স্পর্শ লাগছে কোথায়। তবু এই সেই প্রতীক্ষিত অবকাশ কি না বুঝে উঠল না। জবাব না দিয়ে হাসতে লাগল সেও।

—থাক, আর হাসতে হবে না, যে ভাবে হাঁটছেন এখানেই সন্ধ্যে।

—এটা কি হাঁটার মত রাস্তা, ঠোক্কর খেতে খেতে প্রাণ গেল।

সান্ত্বনা হেসে ফেলল, এখনো ঠোক্কর খাওয়া অভ্যেস হয়নি ? কিন্তু জবাব শোনার আগে চট করে সামলে নিল।—সত্যি যা হয়েছে রাস্তাঘাটের অবস্থা, এক ঝড়ে সব কাত।

পাথরের ওপর পা ফেলে ফেলে নরেন চলেছে। মন বলছে, সময় আসেনি, আসবে। অবকাশ আসেনি, আসবে। আজই আসবে। ধমনীতে একটা উষ্ণ স্রোত বইছে ওর। জোর করেই চেষ্টা করল সহজ হতে। বলল, শুধু ঝড় কেন, এই বৃষ্টিটাও কম ভয়ের নাকি! কোথায় কোথায় বন্যা হয়েছে খবর এসেছে— এরকম হলে তো হয়েছে আর কি। আপিসে, সারাক্ষণ এই কথা আর এই ভাবনা।

সান্ত্বনা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে তাকালো। এতক্ষণের চেষ্টায় মড়াইয়ের উপর থেকে যে অবাঞ্ছিত ছায়াটা সরিয়ে রেখেছিল সেটা যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল আবার। আর সেই পাষাণ-ভারও। বলে উঠল, চিফ-ইঞ্জিনিয়ারের মুখোমুখি বসে গালে হাত দিয়ে তাই ভাবুন গে, আমার সঙ্গে আসতে হবে না, যান্।

হন্ হন্ করে দু'-চার পা' এগিয়ে গেল সে। নরেন প্রথমে অবাক, পরে খুশি। কাছে এসে বলল, তোমার সঙ্গে এলে কি আলোচনা করতে হবে শুনি ?

—কোন আলোচনা নয়। শুধু বড় বড় পা ফেলতে হবে আর হাসতে হবে। হাসার নমুনা ওর মুখেই ঝরল প্রথম।

নরেনের আপত্তি নেই। চলার গতি বাড়ল। দিনের আলো ঘন কালো হয়ে আসছে আরো। কোন দিকে বা কোন পথে চলেছে কারোই হুঁস নেই। কথা অনর্গল সান্ত্বনাই বলছে। আবোল তাবোল কথা। হাসছেও খুব। নরেনেরও হাসার ভূমিকা। কিন্তু কেমন যেন লাগছে। ওকে দেখে আজ হঠাৎ ঝরনার কথা মনে পড়েছে। কোথায় যেন মিল। থেকে থেকে অন্তর্দ্বন্দ্ব একটা। ওই নারীচাপল্য আর প্রশ্রয় ঠিক তার উদ্দেশ্যে নয়, সে উপলক্ষ্য মাত্র। ঝরনাও বাইরে থেকে কত জনকে অমন প্রশ্রয় দিয়েছিল। হাসার ভূমিকা নরেনের, কিন্তু হাসি তেমন আসছে না।

সান্ত্বনা থমকে দাঁড়াল এক জায়গায়। সামনেই বাঁকের মুখে সেই বিশাল পাথরের আড়াল। তার ওপাশে বড় গাছ ভেঙে পড়ে আছে একটা। একান্ত নির্জনে এই আড়ালের ওধারে একদিন দেখেছিল দুজনকে। চাঁদমণি আর হোপুনকে। সর্বাঙ্গ সিড় সিড় করে উঠল কেমন।···অমোঘ আকর্ষণ একটা।

আড়াল পেরিয়ে সেই ঢালু পাথর। যেখানে ওরা বসেছিল। বসে আর ছিল কোথায়। চাঁদমণি শুয়েই ছিল প্রায়। আর ওর মুখের ওপর, বুকের ওপর ঝুঁকেছিল হোপুন। অনেকদিনের একটা বিস্মৃতিবিলগ্ন অস্বস্তি ভিতর থেকে যেন নড়ে চড়ে উঠছে আবার। যেমন উঠেছিল এখানে চাঁদমণি আর হোপুনকে দেখে। যেমন উঠেছিল প্রথম সন্ধ্যায় বাদনা উৎসব থেকে ফেরার পর রাতের বিনিদ্র শয্যায়। পাথরটা যেন ইশারায় ডাকছে ওকে। নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে না পারার যাতনা বুঝি ওখানে গিয়ে বসলে কমবে একটু। অজ্ঞাত অনড় বোঝাটা হালকা হবে।

পাশের লোকটা যে নির্নিমেষে লক্ষ্য করছে তাকে সে খেয়ালও ছিল না বোধ হয়। লজ্জা পেল, হেসেও উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে থমকেও গেল একটু। চাঁদমণির উচ্ছল হাসির মত লাগল যেন নিজের হাসিটা। লাগুক, ও আর পরোয়া করে না। বলল, দেখবেন কি, আর হাঁটে না, চলুন ওই পাথরটার গিয়ে বসি একটু।

চপল পায়ে গিয়ে পাথরটার উপর বসে পড়ল ধুপ করে। চুপচাপ নারীমুখের বর্ণছটা দেখছিল নরেন। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেও। প্রায় মোহগ্রস্তের মত। বসল পাশে।

চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে সান্ত্বনা তাকালো একবার। এত কাছে ঘেঁষে বসার মত ছোট নয় পাথরটা। বসেছে তো বসেছে, সান্ত্বনা বেপরোয়া। বলল, কি হল এমন চুপচাপ যে? জায়গাটা বেশ না ?

উৎফুল্ল মুখে চারদিকে তাকিয়ে জায়গাটা বেশ তাই যেন উপলব্ধি করতে লাগল সে। কিন্তু মনে পড়ছে অন্য কথা। প্রথম সন্ধ্যায় সাঁওতালদের বাদনা উৎসব থেকে ফেরার পথে এর থেকে আরো বড় পাথরে বসেও সেটা বড় মনে হয়নি খুব। আর ওকে নীরব দেখে এই ভদ্রলোকই সেদিন বলেছিলেন, অমন চুপচাপ কেন।

অস্বস্তি আজও। কিন্তু সেদিনের মত অত ভীরু অস্বস্তি নয়। নেশার মত। ভদ্রলোক চেয়ে আছে নিষ্পলক, উপলব্ধি করেই সান্ত্বনা অন্য দিকে ঘাড় ফেরালো আরো। পড়ো গাছটার দিকে চেয়ে অস্ফুট কণ্ঠে হেসে উঠল, বেচারী গাছটার অবস্থা দেখুন একবার।

তারপর সর্বাঙ্গে শিহরণ একটা।

এক হাত ওর পিঠে, অন্য হাত দিয়ে তার মুখখানি সম্পূর্ণ নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল নরেন।

চোখে চোখে, চোখের তারায় তারায় বিনিময়।

বিদ্যুতস্পর্শের মত।

নিমেষে নেশার ঘোর কেটে গেল যেন সান্ত্বনার। চপলতার চিহ্ন মুছে যেতে লাগল। শুকনো খরখরে লাগছে জিবের ডগা, ঠোঁট। সামলে নিয়ে জোর করে হাসতে চেষ্টা করল একটু। নড়েচড়ে সরে বসতে গেল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা সবল আকর্ষণে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার বুকের ওপর। মুহূর্তের অবকাশ পেল না। দুই ঠোঁট বিদীর্ণ হতে লাগল থেকে থেকে; ঘন, উষ্ণ, নির্মম। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল অধরের বাধা। দাঁতে লাগছে, জিবে লাগছে।

বাধা দেবে ভাবছে। প্রাণপণ চেষ্টা করতে চাইছে বাধা দিতে। কিন্তু সর্বাঙ্গ অবশ। ওর হাড়গোড় সুদ্ধ মটমট করে ভাঙবে নাকি মানুষটা! নিবিড় যাতনা। জানুতে, কটিদেশে, স্তনভারে। দেহ-দেহলীতে ভাঙনের তাণ্ডব। আর পারছে না সান্ত্বনা। বাধা দিতে পারছে না। স্পর্শ-বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে।··· ঘুমের মত লাগছে। শিথিল হয়ে আসছে সব কিছু। সান্ত্বনা হাল ছেড়ে দিল। এলিয়ে পড়ল। সেই যাতনার মধ্যেও কতকালের, কত যুগের একটা জমাট-বাধা শিতল অবরোধ বুঝি বাষ্প হয়ে নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অন্তিম বিস্মৃতির মুহূর্তে আবার এক ঝাঁকুনি খেয়ে সচেতন হল যেন। পাথরচ্যুত হয়ে নরেন মাটিতে এসে পড়ল। সান্ত্বনা বসে পড়ল। সান্ত্বনা উঠে বসল। দাঁড়াল। পা কাঁপছে থরথর। বুকের ভিতরে যেন হাতুড়ী পিটছে ঠক ঠক করে। বাতাস নেই। বিস্রস্ত বেশবাস ঠিক করে নিল। বিস্ফারিত দুই চোখ নরেনের মুখের ওপর। লজ্জা নয়, ভয় নয়, ঘৃণা নয়। রাজ্যের বিস্ময় আর বিভ্রম।

চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। ফিরে চলল। পিছনে ফিরে তাকালো না একবারও। তবু উপলব্ধি করল মানুষটা আসছে পিছনে পিছনে! পাঁচ সাত মিনিটের পথ আর। কিন্তু আর ফুরোয় না যেন।

শোনো—

পা থেমে গেল। থামতে চায়নি তবু নরেন কাছে এসে দাঁড়াল। ধীর, স্থির। বলল, তোমার বাবার সঙ্গে আমি দুই একদিনের মধ্যেই দেখা করব।

দুই চোখে এক ঝলক আগুন ছড়িয়ে হন হন করে এগিয়ে চলল সান্ত্বনা।

নরেন দাঁড়িয়ে রইল।

সোজা নিজের ঘরে এসে একেবারে শয্যা নিল সান্ত্বনা। বাবা বাড়ি নেই। কিন্তু আসবে তো। কি করে মুখ দেখাবে সান্ত্বনা। সামনে গিয়ে দাঁড়াবে কেমন করে। রাগে আগুন হয়ে উঠতে চাইছে মানুষটার ওপর। পারছে না বলেই রাগ বাড়ছে, যাতনা বাড়ছে, অস্বস্তি বাড়ছে। উঠে মুখ হাতে জল দিতে গিয়ে একেবারে স্নান করে এলো। কিন্তু গা জুড়োয় না তবু। সেই স্পর্শ-বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে না।

বাবা ফিরেছে টের পেল এক সময়। কিন্তু তিনি খেয়াল করলেন না কিছু। যতটা সম্ভব আড়ালে আড়ালে কাটিয়ে রাতের মত নিশ্চিন্ত হল সান্ত্বনা। আজ আর চোখে পাতায় এক করতে পারবে না জানা কথাই। না পারুক। অনেক বিচার বিশ্লেষণ বাকি। মানুষটার অমন দুঃসাহসের দরুন নিজেকে উত্তেজিত করে তোলাই বাকি। কিন্তু একা ঘরে ঠোঁটের জ্বলুনি উপলব্ধি করছে আবার। বিস্মৃতির সেই নির্মম স্পর্শগুলো গ্রাস করতে আসছে আবার। আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। হঠাৎ কান খাড়া করে নিজের বুকের স্পন্দন শুনতে লাগল যেন সান্ত্বনা। কিছু একটা পরিবর্তন উপলব্ধি করতে লাগল। দেহের অন্তস্তলে সেই ভাঙনের সমারোহ মনে পড়তে লাগল।···যত ভাবছিল তত যেন ভরেও উঠছিল।

বাবার ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সান্ত্বনা। দু চোখ রগড়ে নিয়ে দেখল, দিব্বি বেলা। সাত্বনা অবাক। কখন ঘুমালো! এমন বিচ্ছিরি ঘুম শিগ্‌গীর ঘুমিয়েছে বলেও মনে পড়ে না।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে-ফিরে সেই এক কথাই ভাবছে। বিগত দিনের কথা। ওই একটা দিনের সঙ্গে সঙ্গে ওর জীবনের একটা অধ্যায় যেন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু খারাপ লাগছে না, বরং হাল্কা লাগছে অনেক।

বিস্মৃতির মুহূর্তে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল। না উঠলে···?

অস্ফুট শব্দ নির্গত হল একটা মুখ দিয়ে। উনুন থেকে তেলের কড়া নামিয়ে ফেলল তাড়াতাড়ি। ফুটন্ত তেলের ছিটায় হাতের কব্জিতে ফোস্কা পড়ে গেছে। দেখল। বিদ্বেষের জ্বলন্ত ছিটায় অমনি করে দাহ করতে চাইল একজনকে। ভাবতে চেষ্টা করল, ওর অন্তস্তলের এক সংগোপন আশা দস্যুর মত উপড়ে ফেলতে চেয়েছে লোকটা। ওর জীবনে আর এক বাঞ্ছিতজনের পদসঞ্চার নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছে। আর একজনের প্রাপ্য ভাণ্ডারের দিকে হাত বাড়িয়েছে নির্লজ্জের মত।

কিন্তু তবু চোখের সামনে চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে বড় করে তোলার চেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে থেকে থেকে। সেই নির্লজ্জ মানুষটাই তাকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে বার বার। আর সান্ত্বনা রাগ করতে পারছে না বলেই অবাক হচ্ছে। ভালো লাগছে বলেই জ্বলে উঠতে চাইছে। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না বলেই অস্বস্তি। নিজের অন্তস্তলে দৃষ্টি চালাল সন্তর্পণে।

ওর প্রশ্রয়ে আমন্ত্রণ ছিল? আহ্বান ছিল? সরোষে বলে উঠতে চাইল, না, কক্ষনো না!

কিন্তু সমর্থন আসছে না। উল্টে যেন ব্যঙ্গ করছে কেউ, না কি! এতকালের যে জমাটবাঁধা অবরোধ হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে এখনো, সে তবে কি? আর তার প্রতি মোহ আছে কোনো? মায়া আছে কিছু?

এত বড় এক বিপর্যয়ের উপলক্ষ যে মানুষ, জীবনে আর তাকে মুখও দেখাবে না বোধ হয়। কিন্তু বাবার কাছে আসবে বলেছিল লোকটা। তিন-চার দিন কেটে গেল। আসে নি। সান্ত্বনার জ্বলন্ত চোখে সেদিন এ প্রস্তাবের জবাব লেখা ছিল বলেই আসে নি বোধ হয়। ঠিক আশাও করছে না। আসুক, না আসুক বয়ে গেল। কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে কি একটা অসহিষ্ণুতা চাড়িয়ে উঠছে যেন। উষ্ণতা বাড়ছে। রাগতে পারছিল না, কিন্তু এখন কারণে-অকারণে মেজাজ চড়ছে।

ওর এ ক'দিনের হাবভাব অবনীবাবুর লক্ষ্য করার কথা। কিন্তু সম্প্রতি চাকরীর ব্যস্ততায় বিড়ম্বিত তিনি। তিনি কেন, সকলেই। এক্সপার্ট কমিটি এসে গেল বলে। এদিকে আকাশ আর বৃষ্টির যা অবস্থা, বাইরের তত্ত্বাবধান ছেড়ে কমিটির সব পরিদর্শন আপিসের ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যেই শেষ হবে বোধ হয়। অতএব হিসেব-নিকেশ জল্পনা-কল্পনার নথিপত্র সব রেডি রাখো, গোছগাছ করো, আপিস সাজাও। এ ছাড়াও উপরওলাদের হাবভাব চালচলনে এই কমিটিকে কেন্দ্র করে কেমন একটা শঙ্কার ছায়া নেমেছে। কমিটি এলে প্রতিকূল কিছু ঘটতে পারে যেন। কি, সে আভাস স্পষ্ট নয় কারো কাছে।

অবনীবাবু এই নিয়েই ব্যস্ত ক'টা দিন। সান্ত্বনার সঙ্গে যত কথা হয়েছে, তার বেশির ভাগই এই কথা। সান্ত্বনা শুনেছে কি শোনেনি, তাও খেয়াল করেন নি। তবু সেদিন কি মনে হল তাঁর। বললেন, নরেন আসেনি এর মধ্যে? আপিসেও দেখিনে বড় একটা···

জবাবে যথাসম্ভব নিস্পৃহ মুখে সান্ত্বনা ঠোঁট ওল্টালো শুধু। অর্থাৎ কে জানে, খবর রাখিনে।

একটু খট্‌কা লাগল বোধ হয়। অবনীবাবু খেয়াল করে মেয়ের দিকে তাকালেন এবার। হেসেই বললেন, কি রে, আবার ঝগড়াঝাটি করেছিস বুঝি?

ভ্রূভঙ্গি করে হাসতে হল সান্ত্বনাকেও। দিব্বি পারে এসব এখন। পাল্টা অনুযোগে আসল জবাব এড়িয়ে গেল। বলল, তুমি তো দিন-রাত কচি মেয়ের মত ঝগড়া করতেই দেখো আমাকে।

সেদিনই নিজের উদ্যোগে নরেনের সঙ্গে দেখা করলেন অবনীবাবু। ভড়কে গিয়েছিলেন প্রথম। এমন ধীর শান্ত ওকে আর দেখেননি কখনো। কিন্তু দুই এক কথার পরেই শুনলেন যা, তাতে পারিবারিক প্রসঙ্গ বিস্মৃত হলেন। ভাবলেন, ওর মুখের এই অবস্থা যখন, রীতিমত দুশ্চিন্তার কারণ যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নরেন চৌধুরী এক্সপার্ট কমিটির প্রসঙ্গ তুলে নিজেকে আড়াল করেছে।

বাড়ি ফিরেই সান্ত্বনাকে বললেন সব। বললেন, এক্সপার্ট কমিটি যে আসছে তার চেয়ারম্যান হলেন বিপুল বাড়রী নামে এক ভদ্রলোক। মস্ত ইঞ্জিনিয়ার, মস্ত এক ফার্ম-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। বাদল গাঙ্গুলি সেখানেই চাকরী করত আগে, এর সঙ্গেই একটা ভয়ানক গোলযোগের ফলে চাকরী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল তাকে।

এত না বললেও চলত, শুধু নাম শুনলেই চিনত সান্ত্বনা। বুঝতও। এ ক'দিন বাবার দুশ্চিন্তা দেখেও দেখেনি, বা তার কোনো কথা শুনেও শোনেনি। কিন্তু আজকের খবরটা শোনা মাত্র নড়ে চড়ে সজাগ হয়ে উঠল। নিজের ভাবনা চিন্তা তলিয়ে গেল সব। আরো কিছু শোনার আশায় জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইল শুধু।

অবনীবাবু বলে গেলেন, এই জন্তেই ক'দিন ধরে এরকম অবস্থা দেখছি অপিসের। নরেন বলল, মতের এতটুকু নড়চড় হলে এখান থেকেও সোজা চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বসতে পারে বাদল গাঙ্গুলি! এমন অদ্ভুত কথা তো আমি শুনিনি কখনো।

এতটা বরদাস্ত হল না সান্ত্বনার। ঝাঁঝিয়ে উঠল প্রায়, নরেনবাবুর সবেতেই বাড়াবাড়ি, আমি বলে রাখছি কিচ্ছু হবে না—এত সহজে যদি সব ভেস্তে যেত, দুনিয়ায় তাহলে আর বড় কাজ কিছু হত না।

উত্তেজনায় নিজের ঘরে চলে এলো। কিন্তু উতলা সেও কম হয়নি। যা বলে এলো বাবাকে, সেটা তার মনের কথা, আশার কথা। কিন্তু শুধু এরই ওপর ভরসা করে সত্যি নিশ্চিন্ত থাকা সহজ নয়! নরেনবাবু যা বলেছে, বাবা সেটাকে অদ্ভুত ভেবে অবাক হতে পারেন, কিন্তু সেরকম কিছু ঘটা যে অসম্ভব নয় সে শুধু সান্ত্বনাই জানে। যে নাম শুনল, তাঁর সঙ্গে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কণা মাত্র আপসেরও কোন সম্ভাবনা নেই। ছটফটানি বেড়েই চলল। ইচ্ছে হল, এক্ষুনি নরেনবাবুকে ডেকে পাঠায় একবার। কিন্তু সেও কোনদিন সম্ভব নয় তার।

আর কোনদিকে মন দেবার মত মনের অবস্থা থাকলে নরেনের পরিবর্তন চোখে পড়ত বাদল গাঙ্গুলির। হেড অপিস থেকে এক্সপার্ট কমিটির নামগুলো আসার পর কথাবার্তা দু'চারটে শুধু তার সঙ্গেই বলেছে, একটু আধটু পরামর্শও করেছে। কিন্তু মুখের দিকে ভালো করে তাকায়নি বোধ হয়।

বাদল গাঙ্গুলির ভিতরে ভিতরে বিষম এক মর্যাদার লড়াই চলেছে স্বাক্ষণ।···এরকম হতে পারে একবারও ভাবেনি। কিন্তু ভাবেনি কেন সেটাই আশ্চর্য। বেসরকারী বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিশিষ্ট কমিটিতে বিপুল বাড়রীর আমন্ত্রণ নতুন কিছু নয়। নেশান বিল্ডার্স-এ থাকতে এরকম অনেক কমিটিতে তাঁকে যোগ দিতে দেখেছে।

ভিতরে যাই হোক, বাইরে শান্ত মুখেই প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। অভ্যর্থনার ভার পড়ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের ওপর। গেষ্ট হাউসে থাকবেন তাঁরা। মিটিংয়ের ব্যবস্থাও সেখানকার বড় হল-এ হতে পারে। যেমন ইচ্ছে তাঁদের।

যথা দিনে তাঁরা এলেন। বিকেলে নিজের কোয়ার্টারস-এ এসেই বাদল গাঙ্গুলি খবর পেল। অঝোরে জল পড়ছে তখন। এই প্রথম বোধ করি জলের ওপর খুশি হল সে। নরেনকে আগেই বলে রেখেছে, ড্যাম পরিদর্শন করানোর ভার তার। একটা গাড়িও মজুত আছে তাঁদের জন্য। কিন্তু আজ আর কেউ বাইরে বেরুবেন না বোধ হয়।

বসে আছে চুপচাপ। ভিতরে শুকিয়ে আসা ক্ষতর মুখে নতুন জ্বালা একটা। ঘোষ-চাকলাদার ফার্মের ওপর আর রাগ নেই একটুও। যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছে। তা ছাড়া অপকর্মের আসল নায়ক যে তার পরিণতি তো স্বচক্ষে দেখেছে। মৃতের পরে অভিযোগ বড় থাকে না কারো। তারও নেই। যদিও রণবীর ঘোষের মৃত্যু বিধিবদ্ধ সমর্থন পায়নি এখনো। অনেকটাই চাপাচাপির মধ্যে আছে, তাবলে মড়াইয়ে জানতে বাকি নেই কারো। কিন্তু বোঝাপড়া এখন আর ঘোষ-চাকলাদার ফার্মের সঙ্গে নয়। বোঝাপড়া এক্সপার্ট কমিটির সঙ্গে···বিপুল বাড়রীর সঙ্গে। একবার তার বিচার করেছিলেন ভদ্রলোক। আবারও তাই করতে এসেছেন বোধ হয়। কমিটির আর পাঁচজনও হয়ত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সায় দেবেন। কিন্তু এবারে আর সে বিচারের কোন আভাসও বরদাস্ত করবে না।

পরদিনও সকাল থেকেই মাঝে মাঝে জল হচ্ছে, মাঝে মাঝে থামছে। এরই মধ্যেই সদলে ড্যাম পরিদর্শনে বেরুলেন কমিটি। দেখার আনন্দেই তাঁরা দেখলেন সবকিছু। কখনো সকৌতুকে জানতে চাইলেন এটা সেটা, কখনো বা সপ্রশংস উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করলেন। নরেনের সঙ্গে বারকতক দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে বিপুল বাড়রীর। সপ্রতিভ বিনয়ে নরেন ড্যাম সংক্রান্ত আলোচনাও করেছে একটু আধটু। কিন্তু পূর্ব পরিচয়ের আভাসও ব্যক্ত হয়নি।

বিকেলের দিকে যথানির্দিষ্ট মিটিং বসল গেষ্ট হাউস-এ।

বাদল গাঙ্গুলি এলো।

নরেন চৌধুরী এমন কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারও এই যেন যথার্থ ইঞ্জিনিয়ারের মূর্তিতে দেখল তাকে। সচেতন। মৃদুগম্ভীর। ···প্রায় দাম্ভিক।

বিপুল বাড়রী বাদে বাকি সকলেই সকলরবে আপ্যায়ন করলেন। নরেন পর্যন্ত আশা করেছিল, অনুপস্থিতির দরুণ সৌজন্যসূচক কিছু একটা বলবে। কিন্তু চিফ ইঞ্জিনিয়ার তার ধার দিয়েও গেল না। হেসে পাল্টা অভিবাদন জ্ঞাপন করল সকলের উদ্দেশে। তারপর তাকালো চেয়ারম্যান বিপুল বাড়রীর দিকে।

এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন বিপুল বাড়রী। কংগ্র্যাচ্যুলেশানস!

দুই এক মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময়। হাত মিলাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। থ্যাঙ্ক ইউ।

চেয়ার টেনে বসল তারপর। সদস্যদের কোনরকম অসুবিধে হচ্ছে কি না খোঁজ নিল। অতি বর্ষার প্রসঙ্গ উঠল। ড্যাম কনষ্ট্রাকশন সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জিজ্ঞাসা করল।

সকলেই প্রশংসা করলেন আর একদফা। বিপুল বাড়রী চুপচাপ পাইপ টানতে লাগলেন। বিশেষ ফাইলপত্র সব হাতের কাছে এনে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সে সবের ধার দিয়েও গেলেন না কেউ। মুখে মুখে আলোচনা চলল, কি হচ্ছে, কি হবে, আরো কি হতে পারে।

সবশেষে ঘোষ-চাকলাদারের সিমেণ্ট প্রসংগ। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিল বাদল গাঙ্গুলি। সংক্ষেপে ঘটনা ব্যক্ত করে জানালো, ওই ফার্মকে ডিসমিস করতে হবে।

কথা উঠল এই নিয়ে। কিন্তু যেরকম ভেবেছিল সেরকম নয়। ঘরোয়া আলোচনার মত। সদস্যদের কেউ কেউ বললেন, এতবড় কাজে এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ কি। এতদিনে ওই ফার্মের ক্ষতি যথেষ্টই হয়েছে। এতবড় ফার্ম, এর আগে আর যখন কোনো অভিযোগ নেই, একেবারে বরখাস্ত না করে এবারের মত ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে, এতে কর্মকর্তাদেরও কিছুটা গলদ আছে যখন। কত

মালের সঙ্গে কতটা সিমেণ্ট মেশানো হচ্ছে ষ্টাফের সেটা সব সময় দেখে নেওয়ার কথা।

কথাগুলো কতটা নীতিগত এবং কতটা স্বার্থগত বুঝে উঠল না বাদল গাঙ্গুলি। হাসিমুখেই পাল্টা জবাব দিল, ষ্টাফ কাজই করেছে, কাউকে অবিশ্বাস করেনি এটাই তাদের গলদ। কিন্তু তাবলে অবিশ্বাসের কাজ যিনি করেছেন তাঁকে বরদাস্ত করবেন কি করে?

প্রতিবাদ কেউ করলেন না। কিন্তু মীমাংসাও এখানেই শেষ হল না। যাঁরা এসেছেন, কেউ তাঁদের মধ্যে ওই ফার্মের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, গলাজলে দাঁড়িয়ে বললেও বাদল গাঙ্গুলি সেটা বিশ্বাস করে না। নরেনের ধারণা, তদারকে এসে সব কথায় একেবারে মুখ বুজে সায় দিয়ে চলে যাওয়া রীতি নয় বলেই কমিটি এই প্রসঙ্গ নিয়ে পড়েছে। তা ছাড়া, মুখে যত সৌজন্য প্রকাশই করুক চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নিস্পৃহ আপ্যায়নে মনে মনে সকলের পক্ষে তুষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকটা যেন নিজের মধ্যেই আলোচনা চলতে লাগল। একজন বললেন, ফার্মের আসল কর্মকর্তা যিনি, তিনি নাকি বহুদিন ধরে নিখোঁজ, দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনান্ত ঘটেছে বলেও শোনা যাচ্ছে। অতএব এর পরে আর টানা-হেঁচড়া করে লাভ কি। তাছাড়া, হয়ত বা কর্মচারীরাই করেছে এই কাণ্ড, ভদ্রলোকেরা হয়ত কিছুই জানেন না।

অনেকেই অনুমোদন করলেন। একেবারে জাবিকায় হাত না দিয়ে কড়া ওয়ার্নিং-এ ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলাই সাব্যস্ত করলেন তাঁরা।

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের মুখভাব বদলাতে লাগল। নরেন চৌধুরী এবং অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার দু'জনেরই বেশ অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। বিপুল বাড়রীর দিকে তাকালো বাদল গাঙ্গুলি। সেই থেকে পাইপ টানছেন আর নির্বাক শ্রোতার মত শুনছেন। তাঁর চোখে-মুখে চাপা হাসির আভাস দেখল যেন বাদল গাঙ্গুলি। শান্ত মুখে সব ক'জন সদস্যকেই দেখল একবার। পরে স্পষ্ট করে বলল, কিন্তু আমি তাতে রাজি নই।

হালকা আলোচনায় অস্বস্তিকর ছেদ পড়ল একটা। কিন্তু এসেছেন যাঁরা, পদমর্যাদায় সচেতন তাঁরাও কম নন। হেসেই একজন বললেন, এই সামান্য ব্যাপারটা আপনি এত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন মিঃ গাঙ্গুলি, একটু আধটু ভুল ত্রুটি তো লোকে ক্ষমাও করে!

প্রায় টিপ্পনীর মত শোনাল। জবাব দিল, ব্যাপার সামান্য হলে আমি এত সিরিয়াসলি নিতাম না, আশা করি কমিটি সে আস্থা আমার ওপর রাখবেন। ভুল ত্রুটি আর চুরি দুটো এক জিনিস নয়। কিন্তু আমার অভিযোগ ওইটুকু চুরির বিরুদ্ধেও নয়। আমার অভিযোগ, যে মনোবৃত্তি আপনাদের ওই ড্যামের চল্লিশ ফুট চওড়া দেয়ালকে স্বচ্ছন্দে ঝাঁঝরা করে দিতে পারে তার বিরুদ্ধে। আমার মতে ঘোষ-চাকলাদার ফার্মকে ডিসমিস করতে হবে।

সকলেই চুপচাপ। বস্তুতঃ সরকারী আমন্ত্রণে গতানুগতিক পর্যবেক্ষণে আসা, তিক্ততা সৃষ্টি করতে কেউ বড় চান না। কিন্তু বিতর্ক উঠলে বা প্রতিকূলতার আভাস পেলে এ রীতি সব সময় খাটে না। নিজেদের অস্তিত্ব তখন একটু আধটু জাহির করেই থাকেন তাঁরা। সেই রকমই করলেন একজন। হালকা হেসেই বললেন, ধরুন, আমাদের মতামত যদি অন্যরকম হয়?

—তা হলে আমি ধরে নেব, আপনারা আর কারো ডিসমিস্যাল অ্যাপ্রুভ করে যাচ্ছেন।

এরকম একটা জবাব প্রত্যাশা করেননি কেউ। নরেন ঘেমে উঠতে লাগল। অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার কোনো অছিলায় সরে পড়া যায় কি না ভাবতে লাগলেন। গুরুগম্ভীর পরিস্থিতি। তিলের থেকে তাল হল যেন। একজন প্রবীণ সদস্য বলেই ফেললেন, দিস্ ইজ ট্যু মাচ!

ঠুক ঠুক শব্দ হল। টেবিলে আস্তে আস্তে পাইপ ঠুকছেন চেয়ারম্যান বিপুল বাড়রী। অনেকটা আপন মনেই যেন। কিন্তু মুখ দেখলে মনে হয়, কোথায় যেন রসের আমেজ লেগেছে। ধীরে সুস্থে বললেন, ওয়েল জেন্টলমেন, আমার মনে হয় এই ব্যাপারে এবারে আমার কিছু বলা উচিত।

থামলেন আবার। সকলেরই চোখ গেল তাঁর দিকে। বাদল গাঙ্গুলি অন্যদিকে ঘাড় ফেরাল।

—ব্যাপারটা হয়ত বা কিছুই নয়, আবার হয়ত বা অনেক কিছুই। কিন্তু আসল কথা, এই ড্যামের সমস্ত দায়িত্ব যাঁর ওপর তিনি এই ফার্মকে বিশ্বাস করেন না, আর সেই অনাস্থা নিয়ে কাজও করতে চান না।···চান না যখন, তখন আমরাই বা বাইরে থেকে এসে এ নিয়ে জোরজবস্তি করি কেন? উই হ্যাভ সো মেনি গুড কণ্ট্র্যাক্টরস—সো মেনি ইনডিড! কাজেই আমার মতে কাজ যিনি করছেন তাঁর ওপরেই এই ফয়েসলার ভার ছেড়ে দিয়ে আমরা এ আলোচনা থেকে বিরত হই—আফটার অল, তোয়েন দি চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইজ ডুইং সাচ এ ম্যাগনিফিসেণ্ট জব!

পকেট থেকে দেশলাই বার করে নিবিষ্ট চিত্তে আবার পাইপ ধরাতে লাগলেন তিনি। কেউ আর প্রতিবাদ করলেন না কিছু। বাদল গাঙ্গুলি চেয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে।

খবরটা শোনা মাত্র খুশিতে একেবারে উছলে উঠল সান্ত্বনা। ওরই এক মস্ত দুর্ভাবনার আসান যেন। বড় সমস্যা এলে ছোট অনেক সমস্যা যেমন তলিয়ে যায়, একদিন তেমনি নিজের কোন কথা ভাবার অবকাশ পায়নি। কেবল মনে হয়েছে, কি হবে, কি জানি হবে। ড্যাম পরিদর্শনে যাঁরা আসছেন তাঁদের মধ্যে একটা নাম অষ্টপ্রহর উতলা করেছে তাকে। তাই প্রথম খবরটা শুনেই আনন্দে আটখানা। বলে উঠল, আমি বলিনি বাবা, এত সহজে গোলমাল কিছু হলেই হল! তোমরা তো ভেবে সারা!

অবনীবাবু যেমন যেমন শুনে এসেছেন বলতে লাগলেন। অর্থাৎ, কি হল না হল। সান্ত্বনা উত্তেজিত, রোমাঞ্চিত। বাবা আবার বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারও মনে হল, ঘরে বসে থাকার কোনো অর্থ হয় না। দুদিন আগেও ভেবেছে, বাইরে বেরুনো এ জীবনের মতই ঘুচে গেল। কিন্তু এখন আর সে রকম মনে হল না এক বারও। সপ্রগলভ বিস্মৃতির আনন্দে উন্মুখ হয়ে উঠতে লাগল বারবার।··· সরাসরি বাড়ি গিয়ে হানা দিলে কেমন হয়? অবাক হবে, আকাশ থেকে পড়বে।···কিন্তু খুশি হবে। পুরুষমানুষকে আর চিনতে

বড় বাকি নেই সান্ত্বনার। এক ভাত টিপলে হাঁড়ির ভাত চেনা যায়। পুরুষ সন্নিধান জনিত সঙ্কোচ ভয় ওর গেছে।

তবু যাবে কি যাবে না ঠিক করতেই কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল। টিপ টিপ জল পড়ছে আবার। ক্রুদ্ধ নেত্রে সান্ত্বনা আকাশ দেখতে লাগল বার বার। আর ভিতরে ভিতরে অধীর হয়ে উঠতে লাগল। শেষে জল একটু ধরতেই দরজায় শেকল তুলে দিয়ে সোজা সামনের দিকে পা বাড়ালো।

···ওর ভয় সঙ্কোচ গেছে, তবু একজনের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায় পথে, বিড়ম্বনার একশেষ হবে।···নরেনবাবু। পা থেমে এলো সান্ত্বনার। হ্যাঁ, হবে। অসহিষ্ণু চরণে অস্বস্তি মুছে ফেলতে এগিয়ে চলল আবার। দেখা হলে নিজেই মুখ তুলে তাকাতে পারবে না, ওর কি!

অন্যমনস্কের মত নিজের কোয়ার্টারের দিকে চলেছে বাদল গাঙ্গুলি। আর চিন্তা নেই, উত্তেজনা নেই। তবু ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত। কিছু ভাবছে না, ভাবতে চাইছে না। কিন্তু অন্তস্তলে কলকোলাহল চলছে একটা। নিঃসঙ্গ অবকাশে সেটা আরো মুখর হয়ে উঠবে।··· এর থেকে বিপুল বাড়রী ওর বিরুদ্ধাচরণ করলে খুশি হত বোধ হয়। ভদ্রলোক হার মেনে ওর উদ্যমের শিখা অনেকটা নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন।

ঘরের ভিতরটা আবছা অন্ধকার। আলনায় কোটটা ফেলে সুইচ টিপতেই বিস্ময়ে স্তব্ধ একেবারে। আরাম কেদারায় সমস্ত নারীদেহ ঢেলে দিয়ে নিঃশঙ্ক কৌতুকে চেয়ে আছে ওরই দিকে। আর হাসছে মৃদু মৃদু···।

নীলা।

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সচেতন হল বাদল গাঙ্গুলি। সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ কেটে গেল। সহজ হল। এই মুহূর্তে অন্তত নির্মমভাবে সহজ হতে হবে চকিতে উপলব্ধি করে নিল সেটুকু।

নীলা বলল, বিষম অবাক হয়ে গেলে যে?

টাইটা খুলে বাদল গাঙ্গুলি সামনে এসে দাঁড়াল। জবাব দিল না। চোখে চোখ রাখল। তার চোখেও হাসির আভাস এখন।

নীলা হেসে জিজ্ঞাসা করল, চিনতে পারছো তো?

বিছানার একধারে বসল। নিধুকে হাঁক দিয়ে বলল, চা কর। পরে তাকালো তার দিকে। বলল, কই আর পারলাম। তারপর, তুমি কি মনে করে?

যেন দেখা সাক্ষাৎ হয় প্রায়ই। মনে কোন দাগও নেই ছাপও নেই। অন্তত, আগ্রহ কিছু নেই। নীলা জবাব দিল, এলাম বাবার সঙ্গে। টেবিলের ওপর নিজের ফোটোর দিকে চেয়ে তেমনি হাসতে লাগল অল্প অল্প।—কেমন আছ?

নীলা এসেছে জানলে ফোটোটা ওখানে থাকত না নিশ্চয়ই। বাদল গাঙ্গুলির ইচ্ছে হচ্ছিল, ওর সামনেই ওই ফোটো আছড়ে ভাঙে। বলে, এই পরিণতির অপেক্ষাতেই এটা ছিল এখানে। ক্ষুদ্র জবাব দিল, ভালো।

—এখানে এসে কি সব গোলযোগের কথা শুনছিলাম, মিটে গেছে?

—হ্যাঁ, তোমার বাবা দয়া করে মিটিয়ে দিলেন।

তরল কণ্ঠে হেসে উঠল আবার নীলা। যে রকম হাসত। হেসে যেমন করে সমস্ত পরিবেশ নিজের দখলে নিয়ে আসত। সকৌতুকে চেয়ে চেয়ে দেখল আবার একটু। বলল, অর্থাৎ, তবু তোমার রাগ কোনদিন পড়বে না, এই তো?

—তোমাদের ওপর আমার কোন রাগ নেই তো।

নীলা হাসল না এবার, আবার একটু চেয়ে দেখল শুধু। পরে বলল, না থাকারই কথা, আজ যে এভাবে এসেছি সেটাই মস্ত গর্ব আমার···তবে বাবা খুব অনুতপ্ত।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে উষ্ণ হয়ে উঠছে বাদল গাঙ্গুলি। কিন্তু সেটা প্রকাশ হয়ে গেলেই পরাজয়। ঠাণ্ডা জবাব দিল, মরা মানুষ অনুতাপ শোনে না।

থমকে গিয়েও আবারও হেসে উঠল নীলা। বলল, এতবড় একটা জ্যান্ত জিনিস গড়ে তুলছ, মরা মানুষ কি!

—চিফ ইঞ্জিনিয়ার গড়ে তুলছে।

নিধু চা দিয়ে গেল। কিন্তু দিয়ে আর যাবে কোথায়? আগেও দরজার আড়ালেই ছিল, আবারো সেখানে এসে দাঁড়াবে বলেই তাড়াতাড়ি রান্নাঘর বন্ধ করতে গেল। ওর মুখের দিকে কেউ তাকালে স্পষ্ট দেখত, এই মেয়েটার পুনরাগমন সে একটুও পছন্দ করেনি। ফিরে আসতে গিয়েই দু'পা যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল নিধুর। বাইরে, আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একজন···।

দিদিমণি!

সহসা একটা ঘা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে সান্ত্বনা। বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঘরে আরাম কেদারায় অর্ধশয়ান হাস্যমুখি নারীমূর্তিটি দেখেছে। দেখে চিনেছে। নিস্পন্দ কাঠ হয়ে অন্ধকার দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেছে তারপর।

ঘরের মধ্যে নীলা হাসছে তখন। বলছে,···আমি কবে যাব না যাব সে খোঁজে তোমার দরকার কি, আমি যদি আর না-ই যাই, তাহলে?

জবাব শুনল, তাহলে আমার কাজের কিছুটা ক্ষতি হতে পারে এই পর্যন্ত।

তরল হাসি।—তা হলেই বা, তোমার থেকে তোমার কাজটাকে কবে আর বড় করে দেখেছি আমি!

অদূরে নিধুর ওপর চোখ পড়ল সান্ত্বনার। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, জীবনে এত বড় দৈন্য আর আসেনি কখনো। যেমন এসেছিল, চকিতে আবার প্রস্থান করল তেমনি।

দ্রুত আত্মবিস্মৃত।

মেন কোয়ার্টারস ছাড়িয়ে এসে থামল। একটা পাথরের উপর বসল। বসে রইল নিশ্চল মূর্তির মত। অনেকদিন বাদে নরেনবাবুর সেই কথাগুলো যেন কানে বাজতে লাগল আবার।—ওর জীবন থেকে নীলা সরে গেছে ভালই হয়েছে।···ওই মেয়ে আজও পারে ওর জীবনের সব কিছু ওলটপালট করে দিতে, এই কাজ, এই নিষ্ঠা সব কিছু তচনচ করে ফেলতে।

কঠোর গাম্ভীর্যে থমথম করতে লাগল সান্ত্বনার সমস্ত মুখ।

কতক্ষণ বসেছিল ঠিক নেই। চমকে উঠল একেবারে। নিধু সামনে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি কৈফিয়ৎ দিল, নীলা দিদিমণিকে গেস্টো হ'উস-এ পৌঁছে দিয়ে ভাবলাম এদিক দিয়ে একটু ঘুরে যাই··· তুমি অন্ধকারে একলাটি বসে কেন দিদিমণি?

সান্ত্বনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। তার পর উঠে দাঁড়াল। এমনি বসেছিলাম, এগিয়ে দেবে চলো। দু'চার পা' গিয়েই শান্তমুখে জিজ্ঞাসা করল, আমি গিয়েছিলাম বাবুকে বলেছ নাকি ?

নিধু অম্লানবদনে ঘাড় নাড়ল, বলেনি।

কিন্তু বলেছে। পৌঁছে দেবার জন্য নীলা দিদিমণির সঙ্গে কোয়ার্টারস-এর বাইরে এসেই চট করে আবার ফিরে গিয়ে বাবুকে জানিয়ে এসেছে, ওভারসিয়ার দিদিমণি এসেছিল, এসেই চলে গেছে। বাবুর মুখভাব অবলোকন করার অবকাশ অবশ্য পায়নি। তক্ষুনি চলে আসতে হয়েছে। কিন্তু আর একজনের সম্বন্ধে বাবুকে সচেতন করার কর্তব্যটা কিছুটা সেন না করে পারেনি নিধুরাম। নীলা দিদিমণিকে পৌঁছে দিয়ে তারপর জেনারেল কোয়ার্টারস-এর দিকেই দ্রুত পা চালিয়েছিল সে। এখানে এমন দেখা হয়ে যাবে ভাবেনি।

গড় গড় করে বাবুর গুণকীর্তন করতে লাগল নিধু। সারাক্ষণ নীলা দিদিমণির সঙ্গে একটুও ভালো 'ব্যাভার' করেনি তার বাবু। সব কথার কড়া কড়া জবাব দিয়েছে। কাল সকালে ড্যাম দেখাতে হবে বলেছিল নীলা দিদিমণি, কিন্তু বাবু 'পষ্ট' জবাব দিয়েছে, তাঁর সময় নেই, অন্য লোক সঙ্গে দেবে দেখাবার জন্য। নীলা দিদিমণি বলেছে, ক'দিন ছুটী নিয়ে কলকাতায় আসতে। বাবু বলেছে সময় নেই। নীলা দিদিমণি তর্ক করতে ছাড়েনি, বলেছে সরকারী কাজ কারো জন্য আটকে থাকে না। ওর বাবু সে কথার জবাব পর্য্যন্ত দেয়নি, ইত্যাদি—।

কিন্তু এত বলার পরেও মুখের দিকে চেয়ে নিধুর মনে হল, সুপারিশ ঠিক জায়গা মত পৌঁছুল না। যতই বলুক, ওর ভিতরেও নাড়াচাড়া পড়েছে একটা। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে এবার আস্তে আস্তে নিজের দুশ্চিন্তা প্রায় স্বীকারই করল যেন, বাবু তার যত কড়া 'ব্যাভারই' করুক, দিনকতক এরকম দেখা সাক্ষাৎ হলে আবার সব ভুলে যাবে, বড় জবরদস্তি মেয়ে এই নীলা দিদিমণি···।

ঘাড় ফিরিয়ে এবার কার দিকে তাকালো সান্ত্বনা। এতক্ষণ শুনছিল চুপচাপ। সন্তর্পণ আগ্রহে শুনছিল। কিন্তু শোনার কিছু নেই আর। তাছাড়া এর পরে চুপ করে থাকাও বিসদৃশ। প্রায় রুক্ষকণ্ঠেই বলে উঠল, কি বকছ বকর বকর করে, আর আসতে হবে না, এবারে বাড়ি যাও।

নিধু দাঁড়িয়ে পড়ল।

সান্ত্বনা এগিয়ে চলল হন হন করে।

মস্ত এক দুর্ভাবনা নিয়ে বসে আছেন অবনীবাবু। কোথায় কোথায় বন্যা হচ্ছে, কোন্ কোন্ জায়গা ভেসে গেল, কোথায় কি রকম ক্ষতি হয়েছে,—একটু আগে সেই বৃত্তান্ত শুনে এসেছেন অবনীবাবু। এই বন্যার ভাবগতিক ভাল নয় মোটেই, মেয়ের কাছে সেই দুর্ভাবনার ফিরিস্তি দিতে লাগলেন তিনি।

কোন উদ্বেগ প্রকাশ করল না সান্ত্বনা, বা একটি কথাও বলল না। মুখের দিকে চুপচাপ চেয়ে রইল।

এক বর্ণও কানে ঢোকেনি তার।

রাত্রি। ঘরের আলো নিবানো। জানালার গরাদ ধরে মূর্তির মত সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে। বাইরে অন্ধকার। আকাশে তারা নেই একটাও। দূরের এক কোণে অন্ধকার ফুঁড়ে বিদ্যুৎ চিকচিকিয়ে উঠছে এক একবার।

ইচ্ছে করেই নিজের মধ্যে তলিয়ে গেছে সান্ত্বনা। যে স্মৃতি সভয়ে পরিহার করেছে বরাবর, নিজেকে দগ্ধ করে তাই নিংড়ে নিয়ে আসছে চোখের সামনে।

···ওর মায়ের সেই স্মৃতি।

···শেষের দিকে পুরোপুরি মাথা খারাপ হয়েছিল মায়ের। মাটির আগুন অষ্টপ্রহর ধিকি ধিকি বুকে জ্বলেছে। বোবা ব্যথার সান্ত্বনা সেই ঝলসানো মূর্তি চেয়ে চেয়ে দেখেছে। মা নয়, একখানা জ্বলন্ত কঙ্কাল। কাছে যেতে ভয় হত, ছুঁতে ভয় হত। শেষ বুকফাটা তৃষ্ণায়ও এক ফোঁটা জল দিতে পারেনি মুখে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, বলেছে, জল তুই কোথা পেলি ?

···জল নেই কোথাও, জল পেলি কোথায় তুই ?

···জল নেই, জল নেই, ও জ্বলন্ত আগুন !

···গলানো আগুন ঢালতে এসেছিস তুই আমার মুখে, অ্যাঁ ? দূর হ'! দূর হ' আমার সমুখ থেকে ! দূর হ'!

···সেই তৃষ্ণার্ত স্মৃতির ওপর শান্তির সমাধি উঠছিল। মায়াবিনী এসেছে তার নিবিষ্টতায় ভাঙন ধরাতে।

দিগন্তে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ ঝলসে উঠেছে।

[আগামী বারে শেষ।

সিন্ধুপারে

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

ছয়

চন্দ্রনাথ বেরিয়ে যাওয়ার দিন দুই পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা খাওয়ার টেবিলে মিসেস ব্লেক বললেন—"কাল একজন অতিথি আসছেন আমার বাড়ীতে। দিন তিন চার থাকবেন।"

বললাম, "কে অতিথি ?"

মিসেস ব্লেক মৃদু হেসে বললেন, "আপনার ধ্যানস্থ মনের ধ্যান ভেঙ্গে যদি একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখেন—ভালই লাগবে।"

বললাম, "ধ্যান ভাঙ্গা না ভাঙ্গা নির্ভর করে ধ্যান ভাঙ্গানো শক্তির উপরে। তাঁর যদি সে শক্তি থাকে, ধ্যান নিশ্চয়ই ভাঙ্গবে।"

বললেন, "তার সে শক্তি আছে বলেই ত আমার বিশ্বাস। অবশ্য অনেক দিন তাকে দেখিনি।"

শুধালাম, "মানুষটি কে ?"

বললেন, "আমার ছোট খুড়তুতো বোন—নাম ভিভিয়েন মিস কার্টারিজ।"

বললাম, "ও—মিস্ ?"

একটু হেসে বললেন, "কেন—হতাশ হলেন নাকি ?"

বললাম, "আমার আর হতাশ হওয়া না হওয়ার কি আছে ?"

বললেন, "তা বটে। তবে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাবেন। এ রকম প্রাণবন্ত মেয়ে খুব কমই দেখেছি।"

শুধালাম, "এমনি বেড়াতে আসছেন বুঝি ?"

বললেন, "না। লণ্ডনে একটা কাজের জন্য দেখা করতে আসছে। ব্রিষ্টলে মেয়েটি কাজ করে—লণ্ডনে একটা ভাল চাকুরীর যোগাযোগ হয়েছে। তাই আসছে।"

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে যেতে লাগলেন, "আমারই বাপের বাড়ী—লিড্‌নীর কাছে উলষ্টন্ গ্রামে, মেয়েটি সেই গ্রামেই মানুষ হয়েছে—একেবারে পাড়াগেঁয়ে ছিল। তবে চার পাঁচ বছর দেখা-শোনা নেই—এখন হয়ত অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। ব্রিষ্টলের মত সহরে ত আছে অনেক দিন।"

শুধালাম, "হঠাৎ চিঠি পেলেন বুঝি ?"

বললেন, "চিঠিপত্র ওর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে চলে। আমি অনেক বার ওকে লিখেছি—আমার এখানে বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য। এত দিন হয়ে ওঠেনি। কাজে দু'-চার দিন ছুটী পেলে গ্রামে মা'র কাছেই যায়—মা এখনও বেঁচে কি না।"

শুধালাম, "বাপ বেঁচে নেই ?"

বললেন, "না। আমার কাকা অনেক দিন মারা গেছেন। একটি বড় ভাই অবশ্য আছে, সেই গ্রামের জমিজমা ইত্যাদি দেখাশুনো করে। মেয়েটিকে আমি বড় ভালবাসি। প্রথম জীবনেই মেয়েটি একটি নিদারুণ আঘাত পেয়েছিল।"

শুধালাম, "কি রকম ?"

বললেন, "তখন ওর বয়েস কত হবে—সতেরো আঠারো। গ্রামের একটি ছেলেকে ও ভীষণ ভালবেসেছিল। ছেলেটিও ছিল চমৎকার! দু'জনের বিবাহ ঠিক হয়ে গেল। এমন সময় এলো যুদ্ধ। ছেলেটি যুদ্ধে গেল, আর ফিরল না।"

কেন জানি না, মনে মনে মেয়েটির বর্ত্তমান বয়সের একটা আন্দাজ করে নেওয়ার কৌতূহল হল।

শুধালাম, "সে আজ কত দিন হবে ?"

বললেন, "বছর সাত-আট হবে।"

খাওয়া-দাওয়ার পর মিসেস ব্লেকের গান-বাজনা শুনে একটু সকাল সকালই শুতে গেলাম—বাইরে সমানে বৃষ্টি হচ্ছিল। বিছানায় শুয়ে সহজেই বুঝতে পারলাম—মেয়েটিকে দেখার সত্যই একটা কৌতূহল জেগেছে মনে।

পরের দিন সকালবেলা ঘুম ভেঙ্গে দেখি, মনটা যদিও অন্য দিনের মতনই ভারি, তবুও ভারটা আজ যেন কতকটা সহনীয় বলে মনে হচ্ছে—যেন কিসের একটা নতুন আগ্রহে। কিসের আগ্রহ, ভেবে বুঝতে কতকটা যেন সময় লাগল।

* * * *

সহর থেকে এল্‌টাম পার্কে যখন ফিরে এলাম তখন ঘড়িতে চারটে বাজে—বিকেল আর নয়, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। শীতকালে এ দেশে চারটে বাজতে না বাজতেই সন্ধ্যা হয় সুরু।

এল্‌টাম পার্কের বাড়ীর কাছাকাছি এসে হঠাৎ মনে পড়ল—আজ বাড়ীতে একটি নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ হবে। মেয়েটির কথা সকালবেলা অবশ্য মনে হয়েছিল, কিন্তু সমস্ত দিন একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। সকালবেলা, মেয়েটির চেহারা ধরণ-ধারণ, সবই মিসেস ব্লেকের কথার ভিত্তিতে, মনে মনে কল্পনার একটি ছবিতে যে গড়ে ওঠেনি—এমনও নয়। জীবনে একটা আঘাত পেয়েছে—অতএব বিষণ্ণ শান্ত দুটো বড় বড় চোখ, স্থির ধীর সমাহিত ধরণ-ধারণ। মিসেস ব্লেক বলেছিলেন—প্রাণবন্ত। অতএব একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি সারা অঙ্গ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে। একহারা গড়নের পরিপাটী সামঞ্জস্য যে মিসেস ব্লেকের কোন কথার ভিত্তিতে মনে জেগেছিল—বলতে পারি না।

বাড়ীর দরজা খুলে বাড়ীতে ঢুকেই দেখি—মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে, দোতলা থেকে একতলায়। তখন সন্ধ্যা হয়েছে, তাই আলো জ্বলছে ঘরে। সিঁড়ির উপরে টাঙ্গানো একটা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোতে মেয়েটিকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম—কল্পনায় যে ছবি গড়ে উঠেছিল, একেবারেই তা নয়। একহারা মোটেই নয়—বেশ হৃষ্টপুষ্ট লম্বা গড়ন এবং বড় একখানা মুখে দুটো অতিরিক্ত বড় বড় চোখ, শান্ত বিষণ্ণ ত নয়ই বরং একটা অনাবিল উজ্জ্বল চঞ্চলতায় ভরা। পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা বিশেষতঃ মুখে রং

মাথার বাহার—তাও যেন একটু অতিরিক্ত বলে মনে হল, মনকে আনন্দ দিল না বরং একটু পীড়াই দিল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই একগাল হেসে বললেন—"আপনি ত মিষ্টার চৌধুরী ? শুভসন্ধ্যা !"

বললাম, "হ্যাঁ—শুভসন্ধ্যা ! আপনি ত' মিস্ কার্টারিজ ?" হেসে মাথা নাড়িয়ে বললে, "না।"

একটু অবাক হলাম। তবে ইনি কে ? মিস কার্টারিজের সঙ্গে বোধ হয় আর কেউ এসেছেন ?

ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমার গায়ের ওভার-কোটটি খুলতে আমাকে সাহায্য করে। ওভার-কোটটি আমার হাত থেকে নিয়ে ঝুলিয়ে রাখল আলনায়। তারপর আমার সামনে দাঁড়িয়ে মাথাটি ঈষৎ হেলিয়ে মুখে একটা দুষ্টু হাসি মাখিয়ে বললে, "আমি ভিভিয়েন। কেউ মিস কার্টারিজ বললে ভয়ানক রেগে যাই।"

হেসে বললাম, "ও !"

বললে, "কথাটা মনে থাকে যেন।"

খাওয়ার টেবিলে বসে মেয়েটির অনর্গল কথায় প্রায় যেন হাঁপিয়ে উঠলাম। এত কথা বলে যে, আর কাউকে কথা বলার সুযোগই দেয় না। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে সে না জানে কি ? এইটেই বিশেষ করে আমাকে বোঝাবার জন্য যেন উঠে-পড়ে লাগল। অমন সুন্দর দেশ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নাই—চিরবসন্তের দেশ—না শীত না গরম ; ভারতবর্ষের লোকদের আপনা থেকেই একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে—তারা মানুষের মুখের দিকে চেয়েই তাদের ভবিষ্যৎ সহজেই বুঝতে পারে। ভারতবর্ষের মেয়েদের নাচ গান, বিশেষতঃ তাদের রং-বেরংএর শাড়ী—আহা কি সুন্দর ! ভারতের খাবার বিশেষ করে কারি—আহা যেন অমৃত, জীবনে এত সুখাদ্য সে কখনও খায় নি ; সে একবার যাবেই ভারতবর্ষে—ইত্যাদি কথায় আমাকে অভিভূত করে ফেলার কি প্রচেষ্টা !

মিসেস ব্লেক এক ফাঁকে একটু হেসে বললেন—"অদ্ভুত ভারতবর্ষের মেয়েদের মুখ বড় মিষ্টি হয়। মিসেস চৌধুরীর ছবি দেখেই সেটা আমি বুঝতে পেরেছি।"

মেয়েটি যেন একটু অবাক হয়ে বললেন—"মিসেস চৌধুরী ! আপনার বিবাহ হয়েছে না কি ?"

একটু দৃঢ়স্বরে বললাম "হ্যাঁ।"

মেয়েটি চুপ করে গেল—বড় জোর মিনিট পাঁচ এর জন্য।

শুধালাম—"আপনি ভারতের বিষয় এত খবর পেলেন কি করে ?"

বললে—"আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব সে দেশ ঘুরে এসেছে, তাদের কাছে শুনেছি। বইও পড়েছি অনেক। ভারতের বিষয়ে আমার একটা স্বাভাবিক কৌতূহলও আছে।"

বললাম—"শুনে খুসী হ'লাম।"

একবার আমার মুখের দিকে কেমন এক রকম করে একটু পরেই তাকিয়ে—যেন মস্ত একটা সত্য ধরে ফেলেছে—এই রকম একটা চাপা হাসিতে চোখ দুটো আরও উজ্জ্বল করে শুধাল—"আপনি নিশ্চয়ই গুপ্ত রাজকুমার।"

অবাক হয়ে শুধালাম "তার মানে ?"

বিজ্ঞের মত বলল—"আমি জানি, ভারতবর্ষে অনেক বড় বড় রাজা-মহারাজা আছে—কোটি কোটি টাকা তাদের আয়। তাদের ছেলেরা অনেক সময় সত্য গোপন করে এ দেশে বেড়াতে আসে, এ দেশের শিক্ষা-দীক্ষা ভাল করে বুঝে নেওয়ার জন্য। আপনি নিশ্চয়ই তার একজন ?"

"হেসে শুধালাম—"কি করে বুঝলেন ?"

বললে—"তাদের শুনেছি খুব অল্প বয়সে বিবাহ হয়। আপনার যখন এত অল্প বয়সেই বিবাহ হয়েছে—"

বললাম, "তখন আমি নিশ্চয়ই রাজকুমার—এই ত ?"

বললে, "তা ছাড়া আপনার চেহারা ধরণ-ধারণের মধ্যেও কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে।"

"হেসে বললাম—"যাক্, আপনার বিশ্বাস ভাঙ্গাতে চাই না।"

খাওয়া শেষ হয়েছে। মিসেস ব্লেক মুখে শুধু একটা চাপা হাসি মাখিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বললাম—"আপনি একটা অন্যায় করে ফেললেন।"

শুধাল—"কি রকম ?"

বললাম—"আমার এত বড় গোপন সত্যটি মিসেস ব্লেকের সামনে দিলেন প্রকাশ করে—"

বললে—"ও ক্লারা। তা ক্লারা কাউকে কিছু বলবে না। ও বড় চাপা মেয়ে।"

* * * *

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মিসেস ব্লেকের বসবার ঘরে গান-বাজনার আসর বসল। মিসেস ব্লেক একটা সুর বাজাবার পরই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভিভিয়েন খুব ভাল গান গায়। সে খবরটি আপনি এখনও জানেন না মিঃ চৌধুরী !"

বললাম—"বেশ ত। শুনি ওঁর একখানা গান ?"

তৎক্ষণাৎ মিস কার্টারিজ পিয়ানোর ধারে গিয়ে দাঁড়াল এবং তার গান হল সুরু। অত্যধিক উচ্চকণ্ঠে গলা কাঁপিয়ে সমস্ত গা দুলিয়ে গান গাইতে সুরু করল—অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হল, ঘর থেকে পালিয়ে যাই। গানটা শেষ হলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

মিসেস ব্লেক বললেন—"কি রকম লাগল ? গলা অদ্ভুত না ?"

বললাম—"সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।"

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—"আপনারা যদি আমাকে ক্ষমা করেন—আমি একটু বেড়িয়ে আসি।"

তৎক্ষণাৎ মিস কার্টারিজ বলল, "হ্যাঁ, খুব ভাল কথা। আমিও মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসি। সমস্ত দিন বাড়ী বসে বসে প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছি।"

সত্যিই মহা বিপদে পড়লাম। এই মহিলাটিকে নিয়ে এলটাম পার্কে বেড়াতে যাওয়ার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু করিই বা কি। মিসেস ব্লেককে বললাম, "আপনিও চলুন।"

গম্ভীর ভাবে বললেন, "না। একটা সুর আজ আমাকে পিয়ানোয় ভাল করে আয়ত্ত করতেই হবে।"

সাধারণতঃ এ রকম গম্ভীর ভাবে কথা মিসেস ব্লেক বলেন না। কি হল ? কিছু কি অপরাধ করে ফেলেছি ?"

* * *

রাস্তায় বেরিয়ে দু'-চার পা যেতেই মিস কার্টারিজ বললে, "ক্ল্যারা একটু রেগে গেছে।"

শুধালাম—"কেন বলুন ত? কিছু কি অন্যায় হলো?"

হেসে বললে—"অন্যায়টা আপনার নয়, আমার কিংবা হয়ত দু'জনারই।"

শুধালাম—"কেন? কি হল?"

হেসে হেসে বলতে লাগল—"যদিও ওর বয়স খুব বেশী নয় কিন্তু ও ভয়ানক সেকেলে। আধুনিক মেয়েদের মনোভাব চাল-চলন ও যেন বুঝতেই চায় না। ভুলে যায় জগৎটা ক্রমেই অনেক এগিয়ে যাচ্ছে।"

শুধালাম—"কি রকম?"

বলল—"এই রাত্রে এক'জন বিবাহিত যুবকের সঙ্গে আমার একলা বেড়াতে বেরুনটা ওর ঠিক পছন্দসই হল না।"

শুধালাম—"তা হলে এলেন কেন?"

বলল—"আমার বয়েই গেল। ওর পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে জীবনে আমাকে চলতে হবে না কি?"

ক্রমে দু'জনে এসে পড়লাম এলটাম পার্কে। অন্যমনস্ক ভাবেই হেঁটে চলে এলাম—ভেবে পথ ঠিক করে আসিনি। এতক্ষণ মেয়েটি ফুটপাথের উপর দিয়ে আমার প্রায় গা ঘেঁষে চলছিল। এলটাম পার্কে ঢুকতেই হঠাৎ আমার ডান হাতটি টেনে নিয়ে নিজের বাঁ হাতের বগলের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে ধরল। হেসে বলল—"এ রকম ভাবে না চললে লোকে ভাববে কি? ভাববে—হয়ত আমাদের ঝগড়া হয়েছে।"

বললাম—"ভাবলেই বা কি এসে-যায়?"

বললে—"সে আমি সইতে পারব না।"

কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে চলতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ডান হাতখানা টেনে সরিয়ে নেওয়ার যে ইচ্ছে হয়নি এমন নয়—কেন না, ও ভাবে চলতে একটু অস্বস্তি অনুভব করছিলাম মনে। কিন্তু ঐ কাজটুকুর মধ্যে যে রূঢ় ব্যবহার করার শক্তির প্রয়োজন, সত্য কথা বলতে গেলে তা আমার ছিল না। তাই ঐ ভাবেই চলতে হল। চলতে চলতে মেয়েটির অঙ্গের ভরা যৌবনের ঢেউ যে আমার অঙ্গ একেবারেই স্পর্শ করেনি—এমন কথা বলতে পারি না।

চলতে চলতে মেয়েটি শুধাল—"আচ্ছা, একাধিক বিয়েও আপনাদের দেশে চলে। তাই আপনাদের মতন গুপ্ত রাজকুমাররা প্রায়ই ত এদেশে এসে আবার একটা বিয়ে করেন—না?"

গম্ভীর ভাবে বললাম—"তা তাদের কথা আমি কি করে বলব?"

একটু যেন বেশী গা ঘেঁষে মাথাটা ঈষৎ আমার মাথার দিকে হেলিয়ে বললে—"আপনি কি দুষ্টু! আপনার ঐ মিষ্টি মুখখানির মধ্যে এত দুষ্টুমি লুকিয়ে রাখেন কি করে?"

* * * *

বেশীক্ষণ বেড়াইনি। ঠাণ্ডা লাগার ছুতো দিয়ে শীঘ্রই ফিরে এলাম। ফিরে এসে দু'-চারটি কথা বলে দু'জনকেই শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেলাম শোবার ঘরে।

বিছানায় শুয়ে পড়ার পর সুধার মিষ্টি মুখখানি আজ যেন বিশেষ করে আমায় পেয়ে বসল—মনটা বড়ই আকুল হল সুধার জন্য।

* * * *

পরের দিন সকালে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে আর মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলো না। মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করাতে মিসেস ব্রেক গম্ভীর ভাবেই বললেন—"তিনি বিছানায় শুয়ে আরাম করছেন—এখনও ওঠেননি।"

সহরে গিয়ে নিজের কাজকর্ম্ম সেরে সোজা বাড়ী না ফিরে চলে গেলাম চন্দ্রনাথের বাড়ীতে তার সঙ্গে খানিকটা গল্প করবার জন্য। বিশেষ করে এই মেয়েটির গল্প তাকে বলবার প্রবল আগ্রহ হয়েছিল মনে।

চন্দ্রনাথ সমস্ত কথা শুনে ত হেসেই অস্থির। তারপর বললে—"দেখো হে গুপ্ত রাজকুমার! এ মেয়েটিকে যেন রাণী বানিয়ো না।"

বললাম—"রাণী বানাব! ওকে দেখলেই ত আমার পালাতে ইচ্ছে করে।"

চন্দ্রনাথ বলল—"ওটাও ভাল লক্ষণ নয়। বেশী বিরাগ অনুরাগেরই সূচনা।"

তারপর বলল—"যাই হোক, ওকে কিন্তু তুমি বেশী আমল দিয়ো না।"

বললাম—"আমি আমল দিই না কি! এমন গায়ে-পড়া মেয়েও আমি আমার জীবনে দেখিনি।"

বললে—"জীবনে ক'টা মেয়েই বা দেখেছ? এ দেশে অনেক রকমের মেয়ে দেখতে হবে। তোমাকে ত আমি চিনি—তাই বলি একটু বুঝে চলো।"

নানান কথাবার্ত্তায় প্রায় ঘণ্টা দুই চন্দ্রনাথের কাছে কেটে গেল। বাড়ী ফিরে এলাম তখন রাত্রি ছ'টা! বাড়ীতে ঢুকেই প্রথমেই দেখা হলো মেয়েটির সঙ্গে। প্রায় ছুটে এসে আমার হাতখানা ধরে হেসে বলল—"আপনি ত ভীষণ লোক!"

শুধালাম—"কেন কি হ'ল?"

বললে—"মানুষকে এত ভাবাতেও পারেন! শুনেছি—সাধারণতঃ আপনি চারটের মধ্যেই ফিরে আসেন, আর আজ ছ'টা বেজে গেল।"

গম্ভীর ভাবে বললাম—"কাজ ছিল।"

সাপার টেবিলে আবার সুরু হল মেয়েটির সেই অনর্গল কথা। আজ অবশ্য বেশীর ভাগ কথাই—থিয়েটার, থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রী এবং বিশেষ করে যার বিষয় আমি কিছুই জানি না, অপেরার গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে আলোচনা। এই আলোচনা প্রসঙ্গে অপেরা গায়িকাদের অনুকরণে কোনও কোনও গানের দু'-একটি পদ মেয়েটি খেতে খেতেই হুঁ হুঁ করে গেয়েও উঠল। সব সময় সব বিষয়ে সব কথায় নিজেকে জাহির করে লোককে মুগ্ধ করার কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এই মেয়েটির চরিত্রে— সেটা সত্যিই লক্ষ্য করার জিনিষ।

সহসা মেয়েটি প্রস্তাব করে বসল—"কালকের দিনটাও ত আমি আছি। চলুন মিঃ চৌধুরী! কাল একটা থিয়েটার দেখে আসা যাক। উইনডহ্যাম থিয়াটারে সার জিরাল্ডি ডুমরিয়ার-এর বই আছে।

"প্রাউড্‌স ফল"—শুনেছি খুব ভাল।"

আমি হঠাৎ কি উত্তর দেব, ঠিক করতে না পেরে মিসেস ব্রেকের মুখের দিকে তাকালাম।

মিসেস ব্রেক বললেন, "কাল আমার যাওয়াও সম্ভব নয়।"

মেয়েটি তবুও নাছোড়বান্দা, বললে—"আপনি আমাকে নিয়ে চলুন মিঃ চৌধুরী!"

বললাম, "আমারও ত কাল যাওয়া মুস্কিল।"

মেয়েটি বলল, "বেশ আমি একলাই যাবো। লণ্ডনের ভাল একটা থিয়েটার না দেখে আমি ফিরছি না।"

নানান কথা চলল। কথায় কথায় কি প্রসঙ্গে মনে নাই, মেয়েটি বলল, "আমি ভারতীয় সিল্ক ভয়ানক ভালবাসি। ভারতীয় সিল্কের তুল্য কাপড় ত জগতে দ্বিতীয় নাই। আমার ভারতীয় সিল্কের অনেক পোষাক আছে—এখন ত পরা চলে না। গ্রীষ্মকালে পরি।"

ক্রমে খাওয়া শেষ হল। মিসেস ব্রেক খাওয়ার জিনিষ-পত্র গুছিয়ে, তুলে রাখার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মেয়েটি মুখে একটু চাপা হাসি মাখিয়ে বলল, "ভারতীয় সিল্কের খুব ভাল নাইট ড্রেস (রাত্রে পরে শোবার পোষাক) আছে আমার, আপনাকে দেখাবো। নিশ্চয়ই খুশী হবেন।"

মিসেস ব্রেক ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "গান-বাজনার আসর আজ বসবে, না আপনারা বেড়াতে যাবেন?"

মহা উৎসাহে তৎক্ষণাৎ বললাম, "নিশ্চয়ই গান-বাজনা শুনব। আজ আর বেড়াতে ইচ্ছে করছে না।"

বলে যেন বাঁচলাম। থিয়েটারে যাওয়ার অনুরোধ উপেক্ষা করেছি, যদি একটু বেড়িয়ে আসার অনুরোধ আসে—উপেক্ষা করার শক্তি হয়ত পাব না।

* * * *

পরের দিন সকালবেলা মেয়েটির সঙ্গে দেখা হল—মিনিট পাঁচ-এর জন্য। আমি যখন তৈরী হয়ে ব্রেকফাষ্ট খাওয়ার জন্য নীচে নেমে এলাম, দেখি মেয়েটি বেরুবার জন্য তৈরী হয়ে সদর দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। হেসে বললে, "সুপ্রভাত! আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ সিঁড়িতে আপনার পায়ের শব্দ শুনে দাঁড়ালাম।"

বললাম, "ধন্যবাদ! আজ এত সকাল সকাল বেরুচ্ছেন?"

বললে, "হ্যাঁ—আজ অনেক কাজ। কাল সকালেই ত চলে যাবো। এখুনই বেরুতে হবে, ইতিমধ্যেই আমার দেরী হয়ে গেছে। চলি—কেমন?"

এই বলে দরজার কাছ থেকে হাত নেড়ে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে জানাতে চোখে-মুখে কি রকম যেন একটা দুষ্টু হাসি মাখিয়ে বললে, "আজ সন্ধ্যাবেলা সাপারে আমি থাকব না। রাত্রে যেন নিশ্চয়ই দেখা হয়।"

এবং কথাগুলি বলেই দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই মিসেস ব্রেক খাবার ঘরে ঢুকলেন ব্রেকফাষ্ট নিয়ে।

সুপ্রভাত জানিয়ে বললাম, "মিস কার্টারিজ আজ সন্ধ্যেবেলা সাপারে থাকবেন না বলে গেলেন।"

মিসেস ব্রেক বললেন, "না। উনি আজ সমস্ত দিন লণ্ডনে কাটিয়ে থিয়েটার দেখে রাত্রে বাড়ী ফিরবেন।"

বললাম, "একলাই সত্যি শেষ পর্য্যন্ত থিয়েটারে গেলেন?"

একটু যেন বিরক্তি-মাখানো সুরে বললেন, "ওর আবার একলা! লোক জুটিয়ে নিতে ওর আর কতক্ষণ?"

* * * *

ঘড়িতে চেয়ে দেখলাম, রাত বারোটা বাজতে দশ মিনিট। মিসেস ব্রেককে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে শোবার ঘরে এসে লেপের নীচে শুয়ে শুয়ে এতক্ষণ একখানা বই পড়ছিলাম। ভাবলাম, এইবার আলো নিবিয়ে চোখ বুজে তোমাদের কথা একটু ভাবি। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ব।

হঠাৎ দরজায় খুট্ খুট্ করে কে যেন বাইরে থেকে অতি সন্তর্পণে আওয়াজ করল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঈষৎ খুলে মুখ বাড়ালো, মিস কার্টারিজ। একগাল হেসে চাপা গলায় শুধাল, "আসতে পারি?"

এ দেশের নীতি অনুসারে পুরুষদের শোবার ঘরে পুরুষ থাকলে মেয়েদের ঢোকা অত্যন্ত অন্যায়, বিশেষতঃ পুরুষদের পরিধানে যদি পুরোদস্তুর পোষাক পরা না থাকে। আমার পরিধানে তখন শুয়ে পড়ার পোষাক, তাই উত্তরে আসতে বলিই বা কি করে? কিন্তু মেয়েটি আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সটান ঘরে ঢুকে এসে যতটা নিঃশব্দে সম্ভব দরজাটি ভিতর থেকে দিল বন্ধ করে। এগিয়ে এলো খাটের কাছে, অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম, পরিধানে প্রায় কোনও বস্ত্রই নাই, কেবল একটা পাৎলা সিল্কের পোষাক—তোমরা যাকে সেমিজ বল তাই; অর্থাৎ মেয়েদের শোবার পোষাক। এই পাৎলা সেমিজের ভিতর দিয়ে সর্ব্বাঙ্গের সাদা ধবধবে রং বৈদ্যুতিক আলোতে যেন ঠিকরে বেরুচ্ছিল।

সর্ব্বাঙ্গ দুলিয়ে বললে, "আপনাকে বলেছিলাম ভারতীয় সিল্কের নাইট ড্রেস আপনাকে দেখাব। এই দেখুন। গায়ে পরে যে কি আরাম!"

বললাম, "ভাল।"

বললে, "হাত দিয়ে দেখুন, কি মোলায়েম।"

মেয়েটির এই স্পষ্ট বেহায়াপণায় আমার শরীর-মন ক্রমেই যেন সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। কোনও রকমে হাত বাড়িয়ে পোষাকটির একটি কোণ একটু স্পর্শ করে বললাম "হ্যাঁ।"

মেয়েটি বলল, "উঃ, কি শীত, আমি যেন জমে যাচ্ছি। আজ এক বন্ধুর সঙ্গে ডিনারে অন্তত চার গ্লাস শ্যাম্পেন্ খেয়েছি—ভেবেছিলাম ঠাণ্ডা লাগবে না—কিন্তু তা ত নয়।"

এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম—কথা সত্যিই একটু জড়ান। বুলা! আশ্চর্য্য হয়ো না। এ দেশের মেয়েরা প্রায় সকলেই কম-বেশী মদ খায়—তাতে কোনও দোষ নেই এ দেশের নীতিতে।

হঠাৎ মিসেস ব্রেকের কথা মনে পড়ল। ছিঃ ছিঃ—তিনি এই অবস্থায় মেয়েটির আমার ঘরে আসার খবর টের পেলে কি মনে করবেন! আমাকে নির্দ্দোষী কখনই ভাববেন না।

শুধালাম, "মিসেস ব্রেক কি শুয়ে পড়েছেন?"

কথায় একটু চাপা রকমের খিল-খিল হাসি মাখিয়ে বলল, "উঃ, ক্ল্যারাকে আপনি এত ভয় করেন? ভয় নেই গো ভয় নেই—অত কাঁচা মেয়ে আমি নই। ক্ল্যারার ঘরের দরজা অনেকক্ষণ বন্ধ হয়েছে।"

চুপ করে শুয়ে রইলাম কিছু না বলে। হঠাৎ যেন আর দাঁড়াতে পাচ্ছে না—এই ভাবে বিছানার উপর বসে পড়ল। একটু যেন আব্দারের সুরে বলল, "আমি যে শীতে মরে যাচ্ছি।"

সহসা চোখের সামনে ভেসে উঠল—বিদায়ের সময় সুধার সেই সলজ্জ কাতর চাহনিটি।

গম্ভীর ভাবে বললাম, "মিস্ কার্টারিজ! আপনি শুতে যান। এ রকম ঠাণ্ডা লাগলে আপনার অসুখ করবে।"

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল—কোনও কথা না বলে।

আবার বললাম, "শুতে যান—আর দেরী করবেন না মিস কার্টারিজ।"

হঠাৎ যেন বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। "কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর লোক আপনি?"

এই কথাগুলি বলতে বলতে সশব্দে দরজা বন্ধ করে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কথাগুলির মধ্যে একটা জড়ান ভাব ছিল—সেটা নেশার না কান্নার, ঠিক বুঝতে পারিনি।

* * * *

মেয়েটির সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। পরের দিন সকালে ব্রেকফাষ্টে নেমে মিসেস ব্রেকের কাছে শুনলাম—মেয়েটি আগেই বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

শুধালাম, "এত সকালে গেলেন?"

বললেন, "নইলে ব্রিষ্টলে পৌঁছতে ওর দেরী হয়ে যাবে।"

পরে নিজের মনেই যেন বললেন, "বাঁচা গেল। ওর যে এত পরিবর্ত্তন হয়েছে জানতাম না।" কথাগুলির মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ঘৃণার ভাব প্রকাশ হল।

আশ্চর্য্য! মিসেস ব্রেকের মুখে কথাগুলি শুনে কেন জানি না, মেয়েটির প্রতি কেমন যেন একটা করুণা এলো মনে। মনে পড়ল সেই প্রথম দিন দেখা হতেই ছুটে এসে আমার ওভারকোট খুলে নেওয়ার কথা। বেচারী! সকলকে মুগ্ধ করার একটা প্রাণপণ চেষ্টা করে আবার সকলের বিরাগ ভাজন হয়ে গেল।

[ক্রমশঃ

"মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে—
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির
আঘাতে না টলে।"

—রবীন্দ্রনাথ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

শ্যামল কালীর কথা মত পরদিনই পেতলের নেমপ্লেট এনে দিয়েছিলো বলে সহজেই কালীর সাকরেদ হয়ে যেতে পেরেছে। প্রায়ই শ্যামলের পিঠ চাপড়ে কালী বলে, এ লাইনে খুব হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করবি। তাহলে আর কোন ভয় নেই।

কালীর আড্ডায় অনেকের সঙ্গে শ্যামলের আলাপ হয়েছে, তারা সবাই কালীকে ওস্তাদ বলে ডাকে। যেতে-আসতে পায়ের ধূলো নেয়, দেখাদেখি শ্যামলও শিখে ফেলেছে। আজ সে খোলাখুলি কালীকে জিজ্ঞেস করে, ওস্তাদ, আমায় কিছু কাজ দেবে না?

কালী খেতে বসেছিল, এক গ্রাস ভাত মুখে পুরে পাল্টা প্রশ্ন করে, কি করবি?

—সে তুমি ঠিক করে দাও। আমি কি বলবো?

—প্রথমে একটা হাল্কা কাজ কর।

—কি রকম?

—একজন ছোঁড়া নিতাইএর কাছে ক'জন লোক চেয়েছে, তাদের এক্জামিন বন্ধ করে দিতে হবে।

শ্যামল বিস্মিত হয়, কি করে?

—হাল্লা করতে হবে, আর কি। নিতাই-এর সঙ্গে যাবি, ওরা বলে দেবে।

—এর জন্যে?

কালী হেসে ওঠে, টাকা মিলবে বৈ কি। মুফৎ-এর কাজ কালী করে না।

হৈ-চৈ করে স্কুল বন্ধ করার অভিজ্ঞতা শ্যামলের যথেষ্ট আছে কিন্তু ঠিক এ ধরণের টাকা নিয়ে অন্যদের পরীক্ষা করাটা তার কাছে নতুন। আগের দিন প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছিল, সেই অজুহাতে কয়েক জন সারা বছর ফাঁকি-দেওয়া ছেলে, কালীর দলকে ডেকে এনেছে পরীক্ষা লণ্ডভণ্ড করে দেবার জন্যে।

যে স্কুলের সামনে তারা জড়ো হল, অল্পক্ষণ বাদেই সেখানকার একজন খবর দিয়ে গেল, আপনারা তৈরী থাকবেন। একটু বাদেই কয়েক জন চেঁচামিচি করে বেরিয়ে আসবে, ওদের সঙ্গে আপনারা মিলে যাবেন। ভিতরে ঢুকে খাতা পত্তর—

আর কিছু বলতে হল না। নির্দ্ধারিত সময়ে ছেলেরা বেরিয়ে আসতেই শ্যামলরা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে গগনভেদী চীৎকার আর শ্লোগান, ছাত্রসংঘ এক হও, আমাদের দাবী মানতে হবে। যারা হলের ভিতর পরীক্ষা দিচ্ছিল, যাতে তাদের অসুবিধে না হয় তাই কর্তৃপক্ষ হলের দরজা বন্ধ করার আদেশ দিলেন। তাইতেই ঠেলাঠেলি, মারামারির সূত্রপাত। জোর করে ভাড়া করা ছাত্ররা ভিতরে ঢুকে যায়, দরোয়ানদের ঘুষি মারে, গার্ডেরা বাধা দিতে এলে তাঁদেরও জামা ছিঁড়ে দেয়, কাগজপত্র কুটিকুটি করে। শ্যামলেরও মাথায় কেমন যেন নেশা চেপে যায়, সামনে যে ছেলেটি প্রাণপণ খাতা বাঁচাবার চেষ্টা করছিল তকে বলে, উঠে পড়ুন, আর কেন?

ছেলেটি করুণ গলায় বলে, কেন, আমরা পরীক্ষা দেব।

—খুব যে ফার্ষ্ট বয় এসেছেন, এতগুলো ছেলে পারলো আর তুমি উঠতে পারছো না? শ্যামল এক দোয়াত কালী ছেলেটার গায়ে ঢেলে দেয়। পাশের একটি ছেলে বাধা দিতে এলে শ্যামল তার চোখ থেকে চশমা কেড়ে নিয়ে হলের আরেক কোণে ছুড়ে ফেলে দেয়। মিনিট দশেকের মধ্যে সব কিছু বিশৃখল হয়ে যায়। আবার 'শ্লোগান' দিতে দিতে বিজয়ী ছেলেরা জয়োল্লাসে হল ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যের পর শ্যামল কালীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। কালী একগাল হেসে বলে, নিতাই-এর কাছে সব শুনেছি, ব্যস, আমার এক্জামিনে তুই পাশ হয়ে গেছিস।

শ্যামল কালীর পায়ের ধূলো নেয়, ওস্তাদ, যা বলবে আমি ঠিক করে দেব।

কালী একটা দশ টাকার নোট বার করে শ্যামলকে দিয়ে বলে, এই নে। নিতাই ছাড়া আজ সবাই তোদের দলে নতুন ছেলে ছিল, কিন্তু কেউ কম যায় না, খুব হাল্লা করে এসেছে।

কালীর কাছ থেকে বেরিয়ে শ্যামল পকেট থেকে কলম আর ঘড়ি বার করে। আজকের গোলমালের মধ্যে তিনটে কলম আর দুটো ঘড়ি হাত সাফাই করেছে। সে কথা কালীর কাছেও সে চেপে গেছে। বাড়ী ফিরে নিজের বাক্সের মধ্যে সেগুলো রেখে দেয়।

রাত্রে খাবার সময় কথা উঠলো, আজকের গোলমালের বিষয়, মামা নেশার ঝোঁকে বললেন, পরীক্ষা কেউ চায় না। আমি তো বলি, কেন মিথো লেখাপড়া করা—

মামার শালা বটু বাবু খনখনে গলায় আপত্তি করেন, তোমার যেমন কথা। ছেলেগুলো যে ক্রমশঃ বাঁদর হচ্ছে। ইস্কুল থেকেই গুণ্ডামী শিখলে বড় হয়ে কি হবে বলতে পারো?

মামা একথার জবাব না দিয়ে শ্যামলকে জিজ্ঞেস করেন, তোরাও পরীক্ষার সময় এরকম গোমলাল করবি নাকি?

শ্যামল তাচ্ছিল্য ভরে উত্তর দেয়, ও, যারা লেখাপড়া করে না তারাই গোলমাল পাকায়।

—তোমার মত ভাল ছেলেরা নয়, বলে বটু বাবু তির্য্যক দৃষ্টিতে শ্যামলের দিকে তাকান।

এই ভদ্রলোকটিকে শ্যামল দু' চক্ষে দেখতে পারে না। রোগা, হাড়গিলে চেহারা। সব বিষয়ে নাক গলানো অভ্যেস। দশ দিনের জন্যে এ বাড়ীতে থাকতে এসে দু'মাসের ওপর রয়ে গেছেন, একই ঘরে থাকেন বলে শ্যামলের অস্বস্তির শেষ নেই।

বটু বাবু আবার বলেন, বই নিয়ে কখনও বসতে তো দেখলাম না!

মামা বাধা দেন, আহা, ও বাড়ীতে আর থাকে কতক্ষণ! ইস্কুল করে, কোচিং ক্লাশে যায়—

—তাই বলে বাড়ীতে পড়বে না? আমরাও তো কিছু খারাপ ছাত্র ছিলাম না, কোন না কোন সময় বাড়ীতে বই নিয়ে বসতে হয়েছে।

শ্যামলের বিরক্তি ধরে যায়, ইচ্ছে করে বটু বাবুর মুখে একটা সজোরে ঘুষি লাগায়। তবু কোন কথা না বলে খাওয়া শেষ করে নিঃশব্দে উঠে পড়ে।

বটু বাবু শ্যামলের খাওয়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি তোমায় বলছি জগৎ, ছেলেটার মতি-গতি ভাল নয়।

—তোমার সবাইকেই সন্দেহ।

—পরে বুঝবে। গরীবের কথা বাসি হলে সত্যি হয়।

—ওর বাবাকে চেন না বটু, খুব 'অনেষ্ট' লোক।

—কাউকে চিনতে আমার বাকী নেই। আজ নয়, একদিন সব বলব। তোমার ছেলেদের মুখ চেয়েও আমার বলা উচিত।

জগৎ বাবু আর কথা বাড়াতে চান না, চল হে রাত হ'ল। হাত ধুয়ে ফেলি।

বাধ্য হয়ে বটু বাবু জগৎ বাবুর অনুসরণ করেন।

প্রভাতকে আজকাল বেলারাণীর বাড়ী প্রায়ই যেতে হয়। কারণ এখনও গল্পটা পুরো লেখা হয়নি। বেলারাণী রোজই বিষয়বস্তু বদলায়। তার প্রযোজিত প্রথম ছবিতে নায়িকারূপে সে যাতে সব রকম অভিনয়-প্রতিভা দেখাবার সুযোগ পায় তেমন হওয়া চাই। প্রভাত ফরমাস মতো খানিকটা করে লিখে নিয়ে যায়। বেলারাণী শুনে বলে, হয়েছে, তবে বড্ড ফরমাস মত লেখা মনে হচ্ছে।

—বলুন তো একটু অন্য রকম করে দি।

—না না, অন্য রকম করতে হবে না। আর প্রাণ আনতে হবে।

—কোথায়?

—ধরুন যেখানে নায়ক পাগল হয়ে গেল, নায়িকার চরিত্রে আরও 'প্যাথোজ,' চাই।

—কি রকম ডায়ালগ চান বলুন?

বেলারাণী হেসে ফেলে, সে আমি কি জানি। খুব করুন, মানে দর্শকের চোখে জল এনে দিতে হবে।

অনেক দিন বেলারাণী কাজে বেরিয়ে যায় প্রভাতকে বসিয়ে রেখে, আপনি বসে লিখুন, আমি এখুনি আসছি। হয়তো কোন দিন বেলারাণী সত্যিই তাড়াতাড়ি ফিরে আসে, হয়ত কোন দিন আসে না। প্রভাত বসে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে চলে যায়। তবে বেলারাণী না থাকলেও যার সঙ্গে প্রায়ই প্রভাতের দেখা হয় সে হোল বিনোদ। নিজের গরজে সে কথা বিশেষ বলে না, তবে প্রভাত প্রশ্ন করলে সে উত্তর দেয়।

আজ প্রভাত বিনোদকে জিজ্ঞেস করে, বিনোদ বাবু, গল্পটা কি দাঁড়াবে বলুন তো? বেলারাণী রোজই তো বদলে দিচ্ছেন।

বিনোদ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলে, বেলা ঐ রকমই। নিজেই বদলে যাচ্ছে তো গল্প।

—ওঁর সঙ্গে আপনার অনেক দিনের আলাপ?

—হুঁ, যখন ও থিয়েটারে নাচতো, তখন থেকে।

—উনি খুব তাড়াতাড়ি নাম করেছেন।

বিনোদ সোফায় গা এলিয়ে দেয়, বলতে গেলে পাঁচ সাত বছরের মধ্যে। তা কম উন্নতি নয়, থিয়েটারের গ্রুপ নাচিয়ে থেকে একেবারে চিত্রতারকা।

—ওঁর সত্যিকারের বয়স কত?

—ভগবান জানেন!

—আপনি জানেন নিশ্চয়?

বিনোদ হাসে, ও জেনে কি লাভ?

বিনোদ উসখুস করতে থাকে, সোফার ওপরই এপাশ ওপাশ ফেরে। নিজের মনেই বিড়-বিড় করে বলে, বেলা যে কোথায় গেল আমায় বসিয়ে রেখে!

—এখুনি আসবেন বোধ হয়।

—আমি আর পারছি না। চলি। বিনোদ উঠে দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে আসে, আপনি আর একলা বসে থেকে কি করবেন, আমার সঙ্গে আসুন।

—কোথায়?

—কোন একটা বারে যাই, চলুন।

বিনোদ গাড়ী করে প্রভাতকে নিয়ে যায় সাহেবপাড়ায় দ্বিতীয় শ্রেণীর চীনে রেস্তোরাঁয়। এখানে খাবার আর পানীয়, দুই-ই পাওয়া যায়। এ ধরণের রেস্তোরাঁয় প্রভাত যে আগে আসেনি তা নয়, তবে খুব স্বচ্ছন্দ অনুভব করে না।

বিনোদ জিজ্ঞেস করে, কি পান করবেন?

—আমি করি না।

—করে দেখুন না, একেবারে বিষ নয়।

—তাহলে হাল্কা কিছু দিন।

বিনোদ দুটো হুইস্কির অর্ডার দেয়। পান করতে হলে ভাল জিনিষটাই করুন।

দু'পেগের বেশী খেতে প্রভাতের সাহস হয় না, তাইতেই মাথা ঝিম-ঝিম করে। বিনোদ কিন্তু পাঁচটা পর্য্যন্ত সোডা দিয়ে চালিয়ে গেল, তারপর জল মেশানো আরও দুটো। মাস পেটে পড়তেই নেশা জমে ওঠে। বিনোদের মন খুলে গেছে, বেলারাণীর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন, ওর জন্যে কত টাকা নষ্ট করেছি জানেন? হাজার, হাজার। ওকে পেলাম না। আলেয়ার পেছনে ছোটাই সার—

প্রভাতের কৌতূহল হয়, এখনও তো ওর কাছেই আসেন।

—উপায় নেই, কি করবো।

—বেলারাণীকে আপনি ভালবাসেন?

—ভালো আমি কাউকে বাসিনি, নিজেকেও না। এ লাইনে কত দিন আছি জানেন?

কত দিন?

দশ বছর। বাবা মারা যাবার পর থেকে। বাড়ী পেলাম, গাড়ী পেলাম, নগদ টাকা পেলাম। আর কি চাই?

—আপনার মা?

—অনেক আগে মারা গেছেন। দুটো বোন ছিল, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে।

—তার পর ?

বিনোদ হাসতে গিয়ে নেশার ঝোঁকে কেঁদে ফেলে, তার পর আর কি, এই যা দেখছেন, মাতাল।

—আপনার মাথার ওপর আর কেউ ছিল না ?

—আছেন জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাই-মা। তাঁদেরও সম্পত্তি আমিই পাব।

—বলেন কি ?

বিনোদ হো-হো করে হাসে, আশ্চর্য্য হচ্ছেন ! কেন, ভগবানের স্বভাবই এই তেলামাথায় তেল ঢালা। যার টাকা আছে তার টাকা হয়, খাবার লোক নেই। যার দরকার নেই, তারই গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে হয়—

প্রভাত বাধা দিয়ে বলে, আপনার বাবা কি অনেক টাকা রেখে গিয়েছিলেন ?

—তা কম নয়। নিজে রোজগার করেছেন, আমার দু'-দাদুর সম্পত্তি পেয়েছিলেন, সে-ও অনেক—

—বিয়ে করেননি কেন ?

বিনোদ কি যেন ভেবে নিয়ে বলে, করেছিলাম।

—তিনি ?

—নেই।

—মারা গেছেন ? কি স্থার—

বিনোদ এ কথার উত্তর দেয় না। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরায়, বেলারাণী যে ফিলম্ তুলছে তার অর্দ্ধেক টাকা আমার।

—আপনি তো মনই দেন না এ ব্যাপারে।

—ও নষ্ট হবে, আমি ঠিক করে রেখেছি।

—তবে এতে নামলেন কেন ?

বিনোদ হাসে, বেলার জন্যে।

প্রভাত বিস্মিত হয়, আপনি সত্যি আশ্চর্য্য লোক !

—আশ্চর্য্য লোক কিছু নয় প্রভাত বাবু, স্রেফ জ্ঞানপাপী। একটু থেমে বলে, আপনি তো লেখক, আমারও লেখার ইচ্ছে আছে—

—আপনি লিখেন নাকি ?

—লিখি না, তবে লিখবো। একখানা বই।

—কি বিষয় ?

বিনোদ আবার হাসে, সে এখন বলব না, তবে দেখবেন, দেবদাসের চাইতেও ভাল বই হবে।

—আপনার বুঝি দেবদাস খুব ভাল লাগে ?

—দেবদাস আমার বাইবেল। একটু থেমে প্রভাতকে প্রশ্ন করে, আপনি ভগবান বিশ্বাস করেন ?

—নিশ্চয়।

—প্রার্থনা করেন ?

—করি।

—তাহলে আমার জন্যে একটি প্রার্থনা করবেন ?

—কি ?

—যেন আমার 'থাইসিস্' হয়।

প্রভাত দেখে, বিনোদের চোখের কোণে জল চক্-চক্ করছে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে বিনোদ প্রভাতকে বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

প্রায় এক সপ্তাহ বাদে কেষ্ট অনন্ত কেবিনে এলে, আশুদা' জড়িয়ে ধরে বললেন, আর তোমাকে ছাড়া হচ্ছে না। আশুদা'র দোকানের কথা বুঝি আজ-কাল মনে থাকে না ?

কেষ্ট হেসে উত্তর দেয়, সব চেয়ে বেশী মনে থাকে আশুদা', কিন্তু সময় যে পাই না।

—কি এমন রাজকার্য্য করছ শুনি ?

—সে অনেক ব্যাপার। চলুন আপনার সঙ্গে পরামর্শ করি।

দু'জনে একান্তে বসে চা খেতে খেতে যে আলোচনা করল, তা হোল কেষ্টর বাড়ী ভাগ করা নিয়ে। বলরামের উকীল কেষ্টর সঙ্গে দেখা করে তার দাদার মনোভাব জানিয়ে গেছে। অগত্যা কেষ্টকেও তৎপর হতে হয়। আশুদা'কে বলে, আমায় একজন উকীল ঠিক করে দিন, যে সব বুঝে নিতে পারবে।

আশুদা' বললেন, সে আর এমন কি। আমার বড় শালার ছেলে বেশ ভাল উকীল, বল তো তাকেই ঠিক করে দি।

—আপনি যা ভাল বুঝবেন। সব দায়িত্ব আপনার।

—এত দিনে তাহলে বাড়ী ভাগ সত্যি সত্যি হচ্ছে।

—তা ছাড়া উপায় কি ?

—আমি বলি কেষ্ট, একলা তুমি থাকতে পারবে না।

—দোকলা পাব কোথায় ?

—বিয়ে কর।

—কা'কে ?

—কা'কে, তা আমি কি করে বলব ? যাকে তোমার পছন্দ।

—পছন্দ এখনও কাউকে করি নি।

আশুদা' গলা নামিয়ে বললেন, কেন, গৌরী ?

কেষ্ট আড়চোখে আশুদা'র মুখটা দেখে নেয়, তার কথা আপনি কি করে জানলেন ?

আশুদা' একগাল হেসে উত্তর দেন, আমি সব খবরই রাখি ভায়া !

কেষ্টর ইচ্ছে ছিল, এ বিষয়ে আশুদা'র সঙ্গে আর একটু কথা বলে কিন্তু প্রভাত এসে পড়ায় সে এ প্রসঙ্গ পাল্টাতে বাধ্য হয়। প্রভাত কেষ্টর মাথায় চাটি মেরে বলে, তুই কি হয়েছিস বল্ তো ? তারপর একটা খবর পর্য্যন্ত দিলি না !

—খবর থাকলে তো ?

—'রিয়েলী' তুই একটা যা-তা—

আশুদা' ইত্যবসরে উঠে পড়েন খদ্দেরদের তদারক করতে।

প্রভাত নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করে, জায়গাটা কি রকম লাগছে ?

—ভালই, কোন গোলমাল নেই।

—যা হোক, সংসারী হয়ে পড়লি তো ?

—যেটুকু না হলে নয়।

—পিনাকীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে ?

—হয়েছে, সে রকম কিছু নয়।

—চিনুর সঙ্গে ?

—কে ?

—পিনাকীর—

—ও হ্যাঁ, গৌরীর সঙ্গে হয়েছে।

—মেয়েটা সত্যি ভাল। ওই হতভাগাটার পাল্লায় পড়ে এতটুকু শান্তি পেল না। তার পর, কি করবি ঠিক করলি ?
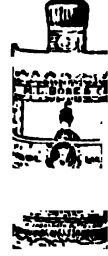
স্নানের সময়
মনে
রাখবেন
একশ' বছরের
ঐতিহ্য,
বিশুদ্ধতা এবং
অপরিবর্ত্তিত
গুণগুলির জন্য
আজও সমাদৃত
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
এম. এল. বসু য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

—কিসের কি ?

—গৌরীর ?

—দাদা তো বাড়ী ভাগের ব্যবস্থা করছে। আমিও আশুদা'কে উকীল ঠিক করতে বলেছি, ঝামেলা চুকলেই—

—হ্যাঁ, বেশী দেরী করিস না।

একমুখ পান খেয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে শ্যামল আসে, আশুদা'র সামনে দাঁড়িয়ে বলে, শীগ্‌গিরি ডিম রুটি দিতে বলুন, তাড়া আছে।

—তোমার কেষ্টদা' এসেছে যে—

—কই ? শ্যামল পেছন ফিরে কেষ্টর দিকে তাকায়। হেসে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, আচ্ছা লোক আপনি কেষ্টদা', একটা কথারও ঠিক রাখেন না।

—বড্ড ঝামেলার মধ্যে ছিলাম।

—আমাকে একটা খবর দিলেও তো পারতেন। আর প্রভাতদা'ও হয়েছেন আপনার জুড়ী, সেদিন বললেন যে ষ্টুডিও দেখাতে নিয়ে যাবেন, তার কি হ'ল ?

প্রভাত উত্তর দেয়, এখনও পুরো কাজ সুরু হয়নি, হলে বলব'খন।

—আপনি আর বলেছেন !

—মাস খানেক বাদে খবর নিও।

প্রভাত উঠে গেলে কেষ্ট শ্যামলকে জিজ্ঞেস করে, তোমার কাছে আমার কত টাকা আছে ?

—প্রায় তিরিশ টাকা।

—আজকে দিতে পারবে ?

—সঙ্গে তো বেশী নেই, পাঁচ টাকা আছে।

—তাই দাও, বাকীটা আশুদা'র কাছে রেখে যেও। আমি নিয়ে নেব।

শ্যামল সম্মতি জানিয়ে পাঁচটা টাকা কেষ্টর হাতে দেয়। কেষ্ট আবার জিজ্ঞেস করে, সিনেমার টিকিট কিছু বিক্রী করলে না কি ?

—না, সময় পাইনি।

—আজ-কাল কি করছ ?

—অনেক ব্যাপার আছে, পরে বলব।

বলেই খাওয়া শেষ করে শ্যামল উঠে পড়ে। কেষ্ট বসে বসে সিগারেট ধরায়।

নতুন বাসায় এসে গৌরীর ভাল লাগে। এখানকার বিলিব্যবস্থা, পরিষ্কার ঘর, রান্নার সরঞ্জাম, যা কেষ্ট কিনে এনেছে, সবই তার মনের মত। মাঝে মাঝে যদিও বস্তীর কথা ভেবে অস্বস্তি বোধ করে কিন্তু পরক্ষণেই কেষ্টর উদারতা ও মহত্ব সে কথা ভুলিয়ে দেয়। রাত্রে কেষ্ট কোনদিনই এখানে থাকে না, নিজের বাড়ী ফিরে যায়। প্রয়োজন মত সকালে কি দুপুরে আসে। কেষ্ট না খেলে গৌরী খেতে চায় না বলে দুবেলাই তাকে গৌরীর কাছে খেতে হয়।

গৌরী বলে, বাড়ীতে কে আপনার খাবার নিয়ে বসে আছে ?

—কেউ নেই।

—তবে ?

—আমারও তো কাজ-কর্ম আছে, সময়ের ঠিক থাকে না। দেরী হলে পাছে তুমি না খাও, এই ভয়ে অনেক সময় কাজ ফেলে আসতে হয়।

—এলেনই বা। গৌরী মুখ নীচু করে বলে, একলা আমি কিছুতেই খাব না—

অগত্যা কেষ্টকে সময় করে রোজই আসতে হয়। এ আসার মধ্যে কর্তব্যবোধের চেয়ে আনন্দ ছিল অনেক বেশী। তাই সব কিছু ফেলে রেখে ঠিক সময়ে এসে গৌরীর দরজায় ধাক্কা দিত।

এখানে আসার পর যার সঙ্গে গৌরীর খুব আলাপ হয়েছে সে হোল চিন্ময়ী, সবাই ডাকে চিনু বলে। মেয়েটির রঙ ময়লা, কিন্তু মুখশ্রী ভাল। একটু বেশী গায়ে-পড়া। নিজে থেকেই এসে গৌরীর সঙ্গে আলাপ করে, আপনারা বুঝি আজ এলেন ?

—হ্যাঁ।

—আপনার নাম ?

—গৌরী।

—আমার নাম চিনু, সামনের ঘরে থাকি।

গৌরী মাদুর পেতে বসতে দেয়, বসুন।

চিনু বসে পড়ে, আমাকে আর অত খাতির করতে হবে না। একবার বসলে আর উঠতেই চাইব না। নিজের রসিকতায় হেসে ওঠে মেয়েটি। চারদিক তাকিয়ে বলে, এঘরে আমাদের এক বন্ধুরা ছিল, কিছু দিন আগে চলে গেছে।

গৌরী বিশেষ কৌতূহল দেখায় না, তাই বুঝি ?

চিনু বলে যায়, কি বরাত মেয়েটার, এক মাস ছিল এখানে অতীন বাবুর সঙ্গে। বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল, তাই তো চলে গেছে।

—বিয়ের পর চলে গেলেন কেন ? এ ত বেশ ভাল ঘর।

চিনু হাসে, বিয়ে হলে এখানে আর থাকবে কেন ভাই ?

—কেন ?

গৌরীর প্রশ্নে চিনু বিস্মিত হয়, বিয়ে করে এখানে কেউ থাকে না কি ?

—আপনারা ?

—আমাদের মত যাদের মাথার সিঁদুরই সর্ব্বস্ব, তারাই থাকে।

চিনুর কোন কথাটাই গৌরীর কাছে পরিষ্কার হয় না। ঠিক এই সময় পিনাকী অন্য ঘর থেকে ডাক দেওয়ায় চিনু উঠে পড়ে, যাই ভাই উনি এসেছেন, একমিনিট দেরী হলেই রসাতল করবেন।

এর পর ক'দিনের মধ্যেই চিনুর সঙ্গে গৌরীর বেশ আলাপ হয়ে যায়। আপনি তুমির দূরত্ব কাটিয়ে তারা 'তুই তুই' করতে সুরু করে। চিনু বলে, যাই বলিস, তোর কেষ্টদা' লোক ভাল, মুখ খারাপ তো করে না। আমার কর্তাটির কাছে একদিন তুই থাকতে পারিস তো কি বলেছি !

—খুব বকেন বুঝি ?

—কি না করেন, তবু মুখ বুঁজে পড়ে থাকতে হয়। কি আর উপায় বল ?

গৌরী রান্না করছিল। চিনু জিজ্ঞেস করে, মাছের ঝাল করছিস বুঝি ?

—হ্যাঁ, কেষ্টদা' খুব ভালবাসেন।

—হ্যাঁ রে, তোর কেষ্টদা' কি করেন ? সারা দুপুরই তো তোর কাছে দেখি।

গৌরী অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দেয়, জানি না তো !

—এ আবার কি ন্যাকা কথা, যার সঙ্গে আছিস, সে কি করে জানিস না ?

—ওঁদের অবস্থা বেশ ভাল, দোতলা বাড়ী আছে।

—উনিই বলেছেন বুঝি, তুই জানলি কি করে ?

—আমি ওঁদের বাড়ীতে একদিন ছিলাম যে।

—তাই নাকি, তোকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন ? একটু থেমে বলে, না, তোর কেষ্টদা' সত্যিই ভাল লোক।

গৌরী কাজ করতে করতেই উত্তর দেয়, আমি তো বলি দেবতা।

কত দিন কত সময় এ ভাবে দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়। কেষ্টর প্রতি গৌরীর এই গভীর বিশ্বাস চিনুকে মুগ্ধ করে। অপর পক্ষে চিনুর বিবিধ প্রশ্ন গৌরীকে কৌতূহলী করে তোলে। তাই কেষ্টকে খেতে বসিয়ে একদিন সে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি কাজ করেন ?

এ প্রশ্নে কেষ্ট বিস্মিত হয়। বলে, এ কথা কেন জানতে চাইছ গৌরী ?

—অনেকে জিজ্ঞেস করে, আমি কিছুই বলতে পারি না।

কেষ্ট হাসে, ও এই কথা, আচ্ছা পরে বলব'খন।

গৌরীর অকারণ জিদ চেপে যায়, না, আজই বলুন।

—আজ থাক গৌরী, বলছি তো।

বলুন না ?

অগত্যা কেষ্ট বলতে বাধ্য হয়, ব্যবসা করি।

সেদিন মিথ্যে কথা বলে কেষ্ট গৌরীকে শান্ত করেছিল বটে কিন্তু মনে মনে সে এই ভেবে শঙ্কিত হয় যে, একবার যখন গৌরীর মনে কৌতূহলের বীজ উপ্ত হয়েছে তখন সব কিছু না জানা অবধি তা কিছুতেই শান্ত হবে না। তাই প্রথম সুযোগ পেয়েই গৌরীকে সে বোঝাতে চেয়েছিল, গৌরী, তোমায় অনেকগুলো কথা বলার আছে যা এখনও বলা হয়নি।

—কি বলুন ?

—মানে, জানি না তুমি কি ভাবে নেবে।

গৌরী চুপ করে থেকে কেষ্টকে কথা বলার সুযোগ দেয়।

—আমি ছোটবেলা থেকেই অনেক রকম ভাবি, আজও। দেখ, মানুষ মাত্রেই বুদ্ধি দিয়ে কাজ হাসিল করে। এত রকম যে জিনিষপত্র ব্যবহার করছ সবই মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে তৈরী করেছে। বুদ্ধি যার নেই সে বাঁচতে পারে না। রাস্তায় যত বড় বড় বাড়ী দেখ, গাড়ী দেখ, এ সব কাদের ? যাদের খুব বুদ্ধি ! যারা বোকা লোকদের ঠকিয়ে টাকা রোজগার করে, তাদের।

গৌরী অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, সে কি বলছেন, লোককে ঠকালে তো তার শাস্তি হবে ?

—হয় না, সেইটেই তো সব চেয়ে মজার ব্যাপার। যার যত টাকা তার তত খাতির। যখন একবার টাকা হয়ে যায় তখন কেউ ভাবে না, কি করে এত টাকা হল। সব চোর !

—চোর !

কেষ্ট ম্লান হাসে, জানি গৌরী, এভাবে ভাবতে গিয়ে তোমার খারাপ লাগবে কিন্তু এ সব সত্যি কথা। গয়লারা দুধে জল মেশায় বলে তোমরা বক, কিন্তু ভেজাল ছাড়া কোন জিনিস কি বাজারে পাও ?

—যেটা খারাপ, কিনব না। দেখে কিনব।

—কি করে দেখে নেবে ? বন্ধ টিনের মধ্যে ভেজাল মাল, ধরবার কি উপায় আছে ? যারা ঠকায়, যারা চোর, তাদেরই টাকা, তাদেরই খাতির।

গৌরী নীচু গলায় বলে, তাহলে আমাদের টাকা চাই না।

—বাঁচবে কি করে ?

—ভগবান বাঁচাবেন !

—সে হলে খুব ভাল হত। কিন্তু তোমার ভগবান একেবারে কালা আর কানা। কিছু দেখতে শুনতে পায় না।

গৌরী শিউরে ওঠে, ছি, ছি, অমন করে বলবেন না।

কেষ্ট এবার রেগে যায়, ভগবান বাঁচালো তোমার ভাইকে, তোমাকে ?

—ভাই-এর মারা যাবার ছিল তাই গেছে। কিন্তু আমাকে তো তিনি বাঁচিয়েছেন,, আপনাকে পেলাম কি করে ?

এর পর আর কথা চলে না। কেষ্ট চুপ করে যায়, কিন্তু মনে শান্তি পায় না। গৌরীকে বোঝাতে না পারলে দু'জনের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাবে। গৌরীও বোঝে, কেষ্ট ঠিক আগের মত সহজ হতে পারছে না। সব সময় কি যেন চিন্তা করে।

একদিন আগের মত বেড়াতে বেরিয়ে গড়ের মাঠে বসে, গৌরী ঐ কথাই জিজ্ঞেস করে, আপনার কি হয়েছে কেষ্টদা' ?

—কিছু না তো ?

—কি ভাবছেন এতো ?

—ও কিছু না।

—আমাকে বলবেন না ? গৌরীর অভিমান হয়।

কেষ্ট হেসে উত্তর দেয়, রেগে গেলে কেন, বলে লাভ নেই জেনেই বলছি না।

—কি ?

—ভাবছি, তোমার মত যদি সব জিনিষে বিশ্বাস রাখতে পারতাম। যেমন তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো, আমাকে বিশ্বাস করো, সবাইকে বিশ্বাস কর।

—আপনি কাউকে বিশ্বাস করেন না ?

—না।

—আমাকে ?

কেষ্টকে আবার হার মানতে হয়, তোমার কথা আলাদা।

এইটুকুতেই গৌরী খুসী হয়, আর কাউকে বিশ্বাস করেন না ?

কেষ্ট গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দেয়, কেন এমন হয়েছে জানো ? ছোটবেলা থেকে কেউ আমায় বিশ্বাস করতো না। আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মা মারা গেলেন। আমার নাম হল অপয়া ছেলে। বড় হতে লাগলাম, কারুর ভালবাসা পেলাম না। একলা মানুষ হতে লাগলাম। ভাবতাম খুব বেশী। লেখাপড়াতেও সুবিধে করতে পারলাম না, আর কেউ তা নিয়ে মাথাও ঘামায়নি।

গৌরী গলায় দরদ দিয়ে বলে, আপনার বাবা, তিনি ভালবাসতেন না ?

—বোধ হয় না। একটা এ্যাক্সিডেন্টে বাবার পা ভেঙ্গে যাওয়ায় কাজ ছেড়ে দিতে হয়, সেও নাকি আমার দোষ, আমি অপয়া।

—তারপর ?

—দাদা আমার চেয়ে অনেক বড়, চাকরি করতো বাবার আফিসে। সেই সংসার চালাতে লাগলো। কিন্তু আমি দাদাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতাম না।

—কেন ?

—ভীষণ বদরাগী লোক। একটু ভুলচুক হলেই আমাকে মারতো। কেউ বাঁচাতে আসতো না। কেষ্ট একদৃষ্টে দূরে তাকিয়ে থেকে বলে যায়, আত্মীয়-স্বজন যারা আসতো, দাদার কাছেই আসত। আমি যে বাড়ীতে আছি কেউ একবারও ভাবতো না। মামার বাড়ী থেকে লোক এসে দাদাকে নিয়ে যেত, আমি থাকতাম একা। বাবা শেষের দিকে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন, আমাকেই দেখাশোনা করতে হ'ত।

গৌরী কেষ্টকে থামিয়ে দেয়, চলুন, রাত হ'ল।

কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়, চল।

চলতে চলতে কেষ্ট আবার ম্লান হেসে বলে, বাবা যদি হঠাৎ মারা না যেতেন, বাড়ীর অংশ আমি পেতাম না। উইল করলে সবই দাদাকে দিয়ে যেতেন।

—বৌদি আপনার হয়ে কিছু বলতেন না ?

—আমার হয়ে বলবে ? আমাকে বোধ হয় বাড়ীর চাকরের চেয়ে বেশী উঁচুতে কিছু ভাবতো না। স্বার্থপর, তবে ওরও দোষ নেই, যেমন সবাই করছে। অথচ আশ্চর্য হচ্ছে, ওদের মেয়েটা আমাকে ছাড়া এক মিনিট থাকতে পারত না। বাপ-মার কাছে কত বকুনী খেয়েছে, মার খেয়েছে, তবু আমার কাছে ছুটে পালিয়ে আসে। এখন শুনছি দাদা আমার ওপর রেগে আমায় বিয়ের ঠিক করেছেন এক দোজবরের সঙ্গে।

গৌরী চমকে ওঠে, সে কি, ওইটুকু মেয়ে !

—কে বুঝবে সে কথা। এক স্কুলমাষ্টার। দুটো ছেলে রেখে বউ মারা গেছে, তাদের জন্যেই আমাকে বিয়ে করছে।

আজ এই প্রথম কেষ্ট গৌরীর সঙ্গে নিজের জীবনের কথা খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করে। গৌরীর সমস্ত সহানুভূতি কেষ্টর জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে, সে চায় কেষ্টর মন থেকে এতদিনের পুঞ্জীভূত বেদনার ভার লাঘব করে দিতে।

তাই পরদিন চিনুর ঘরে গিয়ে সে বলেছিল, সত্যি চিনু, কেষ্টদা'র তুলনা হয় না।

—কেন, আবার কি হল ?

—ছোটবেলা থেকে যে কি কষ্ট পেয়েছেন, শুনলে তুই অবাক হয়ে যাবি।

চিনুকে কথা বলার সময় না দিয়ে গৌরী গত কাল কেষ্টর মুখে যা যা শুনেছিল, বর্ণনা করে যায়। কথা শুনতে শুনতে চিনুর চোখে জল ভরে আসে। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে বলে, তুই কখনও ওনার মনে কষ্ট দিস না। গৌরী লজ্জা পেয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। চিনুর ঘরে সে বেশী আসেনি, চতুর্দ্দিকে ছড়ানো ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। চিনু বলে, ছবি দেখবি, বোস্ না।

বড় ছোট নানা আকৃতির ছবি চিনু গৌরীর সামনে সাজিয়ে দেয়। কত রকম দৃশ্য, কত মেয়ের ছবি।

গৌরী প্রশ্ন করে, এসব কাদের ছবি ?

—যাদের মুখ ছবিতে ভাল ওঠে।

—কি হয় ?

—বিক্রী।

—কোথায় ?

—পত্রিকায়, কাগজের বিজ্ঞাপনে। মলাটে ছাপায়, কখনও ভেতরে। এই দেখ না—

চিনু কতকগুলো পুরোন পত্রিকা বার করে আনে। গৌরী দেখে সব পত্রিকাগুলোর মলাটে চিনুর ছবি। অনেক রকম ভঙ্গীতে। গৌরী অবাক হয়, এ যে সব তোর ছবি রে ?

—আগে আমার ছবিই বেশী তুলত।

চিনুর কথায় গৌরীর কেমন খট্‌কা লাগে। জিজ্ঞেস করে, আজকাল তোলে না ?

—কম।

—কেন ?

—আমার চেয়ে অনেক সুন্দরীরা ছবি তুলতে ছুটে আসে বলে।

—তোর খারাপ লাগে না ?

চিনু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, না।

ঠিক বুঝতে না পেরে গৌরী চিনুর দিকে তাকায়। চিনু মুখ নীচু করে বলে, আর ছবির মোহ নেই।

—কিসের মোহ আছে শুনি ?

—জীবনের।

—মানে ?

—ঘর, সংসার। কিছুই হ'ল না।

বিস্মিতা গৌরী প্রশ্ন করে, এ তো বেশ ভাল ঘর, নিজের বাড়ী না হলে বুঝি মন ওঠে না ?

—তা বলিনি রে গৌরী, ছেলেপিলে না হলে, সমাজ না থাকলে মেয়েদের জীবনে কোন সুখ নেই।

—ছেলেপিলের কথা জানি না কিন্তু সমাজ চাই না আমি। বিশ্রী লোক তারা।

চিনু ম্লান হাসে, এখন তাই ভাবছিস, পরে বুঝবি। যদি নিজের ভাল চাস্ কেষ্টদা'কে বুঝিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল, নইলে আমার দশা হবে।

—কেন, তোর বিয়ে হয়নি ?

—পুরুষদের তুই চিনিস না। বের করে আনবার সময় বিয়ে করব, হ্যান করব, ত্যান করব, নানারকম বলে। পরে সব ভুলে যায়।

গৌরী অবাক হয়ে চিনুর সীঁথির সিঁদুরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—সিঁদুর দেখছিস ? ও আমাদের পরতে হয়। মিথ্যে বউ সেজে বসে না থাকলে বাইরেও বেরুন যায় না। চিনু আর কথা বলতে পারে না, চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে। গৌরীও সে কান্নায় যোগ দেয়। সে চিনুকে জড়িয়ে ধরে মৃদুস্বরে বলে, আমি জানতাম না কিন্তু, তাই একথা তুলে তোকে কষ্ট দিলাম।

চিনু ধরাগলায় বলে, আমি বলছি গৌরী, বিয়ে করে ফেল। তোর কেষ্টদা' ভাল লোক, বোধ হয় রাজি হবে। নইলে পরে সারাজীবন জ্বলে-পুড়ে মরবি।

সারা দিন গৌরী এই কথা নিয়ে ভেবেছে। কেষ্টর কাছে

এ প্রসঙ্গ পাড়তে গিয়ে ও লজ্জায় পারেনি। কথায় কথায় বলে, চিনু মেয়েটা খুব ভাল।

কেষ্ট শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছিল। জিজ্ঞেস করে, কে চিনু, ঐ পিনাকীর বউ ?

হ্যাঁ। পরে নীচু গলায় বলে, জানেন কেষ্টদা', ওদের বিয়ে হয়নি।

—জানি।

—কি করে জানলেন ?

—যাদের বিয়ে হয়নি, তারাই এ বাড়ীতে থাকে।

—চিনু তো বিয়ে করতে চায়, ঐ ভদ্রলোকই তো রাজী হচ্ছেন না।

—পরে দুঃখ পাবে।

—সত্যি কেষ্টদা', চিনু চায় ছেলেপিলে, ঘরসংসার।

—সব মেয়েই তাই চায়।

গৌরী সহজ গলায় হেসে বলে, কই, আমি তো চাইনি ?

—চাইবে।

—কবে ?

—আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু।

—তখন কি হবে ?

—বিয়ে।

গৌরী লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। কেষ্ট বলে, বিয়ের জন্যেই তো তৈরী হচ্ছি গৌরী ! ভেবেছিলাম দু'-এক মাসের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বাড়ী ভাগ করা, আলাদা থাকার বিলিব্যবস্থা করা, কিন্তু দেখছি আরও কিছু দিন সময় লাগবে।

গৌরী চুপ করে থাকে, একটু পরে বলে, আমার জন্যে আপনার অনেক কষ্ট হল, না কেষ্টদা' ?

কেষ্ট হাসে, খুব কথা বলতে শিখেছ বে, কে মাষ্টার, চিনু নাকি ?

গৌরী হেসে উঠে দাঁড়ায়, চিনু আপনার খুব ভক্ত।

—অন্ধ ভক্ত, সে তো আমায় দেখেনি।

—ওকে ডেকে আনব, বেচারী সব সময় একলা থাকে।

—হবে'খন।

গৌরী আবদার ধরে, না, ডেকে আনি, দেখুন না, খুব ভাল মেয়ে।

কেষ্টর ভাল লাগে গৌরীর এই ছেলেমানুষী। হেসে সম্মতি জানায়।

গৌরী ছুটে গিয়ে চিনুকে ধরে আনে। চিনু সবেমাত্র পা ধুয়ে কাপড় ছাড়ছিল। গৌরী কোন ওজর-আপত্তি না শুনে টানতে টানতে তাকে কেষ্টর সামনে হাজির করে বলে, এই যে কেষ্টদা', চিনু।

চিনু গৌরীকে কপট রাগের সঙ্গে বলে, তোর জ্বালায় এখানে থাকা যাবে না দেখছি। এরকম টানাটানি করলে মানুষ বাঁচে !

—বাঃ, কেষ্টদা'র সঙ্গে আলাপ করবি না ?

কেষ্ট হেসে বলে, তোমার কেষ্টদা' এমন একটা কেউ-কেটা নয় যে সবাইকে এসে আলাপ করতে হবে।

গৌরী ততক্ষণে চিনুকে জোর করে মাদুরে বসিয়ে দিয়েছে। চিনু আবহাওয়াকে পরিচিত করে নেওয়ার জন্যে কেষ্টকে প্রশ্ন করে, আপনার সঙ্গে প্রভাত বাবুর খুব আলাপ আছে, না ?

—হ্যাঁ, ও আমার অনেক দিনের বন্ধু।

—আপনি ওঁর লেখা খুব পড়েন বুঝি ?

—একটাও পড়িনি। বই পড়া আমার অভ্যেস নেই।

—উনি কিন্তু আপনার কথা খুব বলেন।

—আমিও ওর কথা খুব বলি।

গৌরী বাধা দিয়ে বলে, কই না তো ! আপনি তো প্রভাত বাবুর কথা আমার তেমন কিছু বলেন নি ?

—বলার সময় হয়নি।

ধীরে ধীরে এদের গল্পের আসর জমে ওঠে। কেষ্ট দোকান থেকে গরম তেলেভাজা কিনে আনে, চিনু ঘর থেকে মুড়ি আর আচার নিয়ে আসে। সন্ধ্যেবেলাটা তিন জনেরই খুব আনন্দে কেটে যায়।

শ্যামলের বাড়ীতে থাকতে আর এক মিনিট ভাল লাগে না, বটু বাবুর জ্বালায় সে অস্থির। ভদ্রলোক সারাক্ষণ বক্ বক্ করেন। বিশেষ করে শ্যামলকে ঠুকতে পারলে, তিনি বোধ হয় অপরিসীম আনন্দ পান। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই শ্যামলকে তুলে দেন, এই শ্যামল, ওঠ্। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

শ্যামল সাড়া দিতে চায় না। গায়ের কাপড়টা আরও জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু বটু বাবু হার মানার পাত্র নয়। রীতিমত চেঁচাতে সুরু করেন, ছোট ছেলে, এত ঘুম কেন, আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। সকাল সকাল উঠে মুখ-হাত-পা ধুয়ে কোথায় পড়তে বসবে, তা নয়, বেলা ন'টা পর্য্যন্ত ঘুম। জ্বালাতন বাবা, তেমনি জগৎটা, একটা কথাও যদি ছেলেটাকে বলে !

এর মধ্যে ঘুমোনো অসম্ভব। বিরক্ত হয়ে শ্যামল উঠে মুখ ধুতে চলে যায়।

এ তো রোজই লেগে আছে। তাছাড়া দেখা হলেই পড়ার কথা।

—কি পড়ছিস দেখাস না কেন ? এককালে আমি ভাল ছাত্র ছিলাম।

শ্যামল মৃদু স্বরে উত্তর দেয়, আপনি কেন কষ্ট করবেন, কোচিং ক্লাশে আমি সব পড়ে নিই।

—আহা বেশী পড়লে তো দোষ নেই, ভালই হবে।

আবার কোন দিন অন্য দিক দিয়ে ঠোকেন, মাথায় অত বড় বড় চুল কেন, খোঁপা বাঁধবি নাকি ?

বাইরের লোকের সামনে, সকলে হেসে ওঠে। শ্যামল উত্তর দেয়, চুল কাটার সময় পাইনি।

—বাড়ীশুদ্ধ সবাই চুল কাটছে আর তোমার সময় হয় না? হরো নাপিতকে ডাকলেই তো হয়—

—আমি নাপিতের কাছে কাটি না।

—তাই তো, চুলের বাহার নষ্ট হয়ে যাবে, কি বল্? শ্যামল বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তার পর এই তো সেদিন রাধা, ওর চেয়ে ন'বছরের ছোট মামাত বোনটা বলছিল, শ্যামলদা, তুমি সিগারেট খাও?

—কে বললে?

—মামা বলছিল।

—বটু মামা, কা'কে বলছিল?

—বাবাকে। তোমার জামা-কাপড়ে সিগারেটের গন্ধ, পকেটে দেশলাই থাকে।

রাগে শ্যামল দাঁতে দাঁত ঘষে, বটু বাবু যে রোজ তার জামা কাপড় ঘেঁটে দেখেন এবিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। সেদিনই রাধার হাতে অনেকগুলো লজেন্স দিয়ে বলে, রাধা খুব ভালো মেয়ে। বটু মামা আমার নামে কি কি বলে, আমায় সব বলে দিস। তোকে আরও লজেন্স দেব।

আজ সকালে আর এক ব্যাপার নিয়ে বটু বাবুর সঙ্গে তার খটাখটি লাগলো। নাওয়া খাওয়া সেরে হাতে বই নিয়ে শ্যামল অন্য দিনের চেয়ে সকাল সকালই বার হচ্ছিল। বটু বাবু ডাকলেন, এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছিস?

—স্কুলে।

—এখনও তো সাড়ে ন'টা বাজেনি।

—একটু দরকার আছে।

—কোথায়?

শ্যামলের আর ধৈর্য্য থাকে না। ফস করে বলে ফেলে, সে খোঁজে আপনার দরকার কি?

বটু বাবু জবাব শুনে রেগে অস্থির, কি, আমার কথাটার উত্তর দেবে না। এমন লাটসাহেব তুমি?

—তা অত বাজে বকছেন কেন, কি দরকার তাই বলুন না?

বটু বাবু চীৎকার সুরু করে দেন, এ বাড়ীতে আমি আর এক মিনিট থাকবো না। যে বাড়ীর ছেলেরা গুরুজনদের সম্মান রেখে কথা বলতে জানে না, সেখানে আমি—

রান্নাঘর থেকে পিসীমা, ওপর থেকে জগৎ বাবু সকলেই ছুটে আসেন। জগৎ বাবু যদিও বোঝেন বটু বাবু অনেক বাড়িয়ে বলছেন তবু বলতে হল, শ্যামল, বড়দের সঙ্গে কখনও অমন ভাবে কথা বলবে না। মাপ চাও। শ্যামলের আত্মসম্মানে লাগে। সত্যিই তো ওর কোন দোষ নেই। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যে তাকে সর্ব্বক্ষণ বিরক্ত করে তার কাছে মাপ চাইতে হবে কেন? চোখ ফেটে তার জল বেরিয়ে আসে। জগৎ বাবু আর পিসীমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, আমি তোমাদের কাছে একশো বার মাপ চাইছি যদি কিছু অন্যায় করে থাকি, কিন্তু বটুমামার কাছে নয়।

এই বলেই সে বাড়ী থেকে হন হন করে বেরিয়ে গেল, একবারও পেছন দিকে না ফিরে।

বটু বাবু ফোড়ন কাটেন, দেখলে ছেলের মেজাজ, তোমাদের গ্রাহ্য করে, ভাবো?

জগৎ বাবু শ্যালককে বোঝাতে চেষ্টা করেন, ছোট ছেলে, ওর কথা কি অত মনে করলে চলে? তুমি বরং আমার কাছেই শোও, বটু বাবু মাথা নাড়েন, না ঐ ঘরেই থাকবো! ও যে কত বড় শয়তান, তা প্রমাণ করে তবে আমার শান্তি।

সকালবেলাই এই অপ্রীতিকর ঘটনায় শ্যামলের মন ভারী হয়ে ওঠে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে অন্য দিনের মত বিভাভবনের কাছাকাছি এক জানাশোনা মনোহারীর দোকানে বইগুলো রেখে দেয়, আবার বাড়ী ফেরার পথে নিয়ে যাবে বলে। আজ তার দেবেনদা'র কাছে যেতে আর ইচ্ছে করে না। অনেক দিন বাদে মদনের কথা মনে পড়ে যায়।

বাড়ীতে মদন ছিল না। সেখান থেকে বেরিয়ে শ্যামল আড্ডা-সংঘের পাথরের ওপর চুপচাপ বসে পড়ে। কাজের দিন, স্কুল-কলেজ আর অফিস যাবার তাড়ায় সবাই ব্যস্ত, তাই আড্ডাসংঘের আসর একেবারে ফাঁকা। মদনের বন্ধু বিপিন সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। শ্যামলকে দেখে জিজ্ঞেস করে, মদনকে খুজছ?

—হ্যাঁ।

—মনুদা'র বাড়ীতে আছে।

—তুমি তো ওদিকে যাচ্ছ, ওকে ডেকে দাও না।

খানিক বাদে মদন এল। শ্যামলের কাছে বসে প্রশ্ন করে, হঠাৎ কি মনে করে?

—এমনি।

—এমনি তো আর তুই আমার কাছে আসিস না?

—বাড়ীতে আর ভাল লাগছে না।

—কি হয়েছে?

—ঝগড়া-ঝাটি। বটু হতভাগা! ও শালা আর যাবে না।

—বটুমামা! তা তোর পেছনে লেগেছে কেন?

কে জানে! মামা, পিসীমা আমায় ভালবাসে। ও সহ্য করতে পারে না। শ্যামল মদনকে অনেকগুলো ঘটনা বলে সম্প্রতি বটু বাবুর সঙ্গে যা ঘটেছে সব। শুনে মদন বলে, বটু মামা কিন্তু তোকে মুস্কিলে ফেলতে পারে।

—আমিও ছেড়ে কথা কইব না, ওর ওস্তাদী বার করব।

—কি করবি?

—সে দেখিস—

শ্যামল যদিও দম্ভ করে বললে বটু বাবুর ওপর প্রতিশোধ নেবে, মনে মনে সে এখনও কিছু ঠিক করতে পারেনি। তবু মদনের সঙ্গে আলাপ করে তার মন অনেক হাল্কা হয়। কথায় কথায় মনুদা'র কথা ওঠে। মদন বলে, মনুদা'র জন্যে সত্যিই কষ্ট হয়। খালি দুঃখের গান করছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

—নন্দিতা কি বলে?

—সে আর বলবে কি করে, দেখাশোনা সব বন্ধ। দেখ না, বাড়ী জানলা সব বন্ধ, বেরুবারও হুকুম নেই।

—তা হলে?

—তা হলে আর কি। শুধু স্কুলে যায় আর আসে, মনুদা'র সে সময় অফিস। চিঠিপত্রও লিখতে পারে না। মনুদা' আজ-কাল আড্ডাসংঘেও আসে না।

—ট্র্যাজিডি।

—তুই একটা কাজ করবি ?

—কি ?

—মন্নুদা'র একটা চিঠি নন্দিতাকে দিতে পারবি ?

—এ আর এমন কি ! সুযোগ থাকলে নিশ্চয়ই।

—নন্দিতা যখন ইস্কুলে যায়। ঠিক সোয়া দশটার সময় ও বাড়ী থেকে বেরোয়। সঙ্গে কিন্তু লোক থাকে।

—দেখি কি করতে পারি। চিঠিটা দে, আজই দিয়ে দিই। আবার কবে আসব—

মদন শ্যামলকে টেনে তোলে, চল মন্নুদা'র কাছে, বেচারী খুব খুসী হবে।

পথে যেতে যেতে শ্যামল বলে, মন্নুদা'কে বলে আমার টাকা দিস কিন্তু।

—নিশ্চয়ই।

—তুই কিন্তু মেয়েটাকে ভাল করে দেখিয়ে দিবি। আমি ঠিক চিনি না।

মন্নুদা' কথা শুনে গলে পড়েন, এ যদি পার শ্যামল, আমি তোমার কেনা চাকর হয়ে থাকব। শ্যামল ও মদন যুগপৎ বলে ওঠে, ছি ছি, ও কি বলছেন মন্নুদা' !

মন্নুদার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে শ্যামল আর মদন হাজির হল নন্দিতার স্কুলের সামনে। শ্যামল বলে এই স্কুল নাকি, এখানে তো আমি প্রায়ই আসি।

—মেয়েদের ইস্কুলে ?

—দূর গাধা। স্কুলের সামনেই বইএর দোকান দেখছিস ? নতুন পুরোন দু'রকম বই-ই বিক্রী করে, আমার খদ্দের।

—ওখানে কি করবি ?

—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

—মানে ?

—পোষ্ট অফিস। দোকানের ওই ছোকরাটার সঙ্গে আমার খুব ভাব আছে। মন্নুদা'র চিঠিগুলো রেখে যাব, নন্দিতা নিয়ে যাবে। উত্তর হয় তাকে ছাড়বে নয় এখানে দিয়ে যাবে। ওকে কিছু পয়সা দিলেই হবে।

মদন উৎসাহিত হয়, বেশ বুদ্ধি করেছিস্। ব্যবস্থা করে ফেল, নন্দিতার স্কুলে আসার সময় হল।

দোকানের মালিকের বয়স কম। শ্যামল বলে, মনে রাখবেন স্যার, নাম নন্দিতা।

ভদ্রলোক হাসেন, এসব মিষ্টি নাম কি আর ভোলা যায় ?

—একটা বইয়ের ভেতর করে দেবেন। অন্য কারুর হাতে যেন না পড়ে, তাহলেই কাণ্ড বাধবে।

—সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন, এরকম অনেক করেছি।

টেবিলের ওপর কয়েকখানা দোকানের নামলেখা রুটিন পড়ে ছিল। শ্যামল দু'খানা নিয়ে নেয়। চিঠি-পিছু আট আনা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করে শ্যামল বেরিয়ে আসে। মদন জিজ্ঞেস করে, হাতে ওগুলো কি রে ?

—রুটিনের কাগজ, ঐ দোকানের বিজ্ঞাপন।

—কি করবি ?

—বিলি করবো। তোর কাছে পেন্সিল আছে ?

মদন কলম বার করে দেয়। রুটিনের জন্যে লাইনকাটা কাগজে যেখানটায় দোকানের নাম লেখা আছে তার কাছে তীর চিহ্ন দিয়ে শ্যামল লেখে, এখানে মন্নুদা'র চিঠি আছে, আপনার নাম বললেই দিয়ে দেবে।

মদন ঠেলা মারে, ঐ যে নন্দিতা আসছে।

চারটি মেয়ে একসঙ্গে আসছিল। সঙ্গের লোকটি বোধ হয় মোড় পর্য্যন্ত এসে চলে গেছে। শ্যামল জিজ্ঞেস করে, কোনটা ?

—একেবারে ডান দিকে, ঐ যে চুল খোলা, গোলাপী শাড়ী পরা—

—ঠিক আছে, দাঁড়া আমি আসছি।

মদন ফুটপাথে উঠে দাঁড়ায়। শ্যামল সোজা মেয়েদের দিকে এগিয়ে যায়।

—রুটিন পেপার, ফ্রী রুটিন পেপার, বলে শ্যামল একরকম জোর করেই তাদের হাতে কাগজ ধরিয়ে দেয়।

মেয়েরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে, বাবা, বাবা। এদের জ্বালায় অস্থির।

শ্যামল আসল কাগজটি নন্দিতার দিকে এগিয়ে লেখা কথাগুলোর দিকে আঙুল রেখে বলে, এই যে—

নন্দিতা দাঁড়িয়ে লেখাটা পড়ে, সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে শ্যামলের দিকে তাকিয়ে নীরবে ধন্যবাদ জানায়। অন্য মেয়ে তিনটি এগিয়ে গিয়েছিল। তারা পেছন ফিরে তাকাতেই নন্দিতা রুটিনটা খাতার তলায় নিয়ে দ্রুত-পায়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

মেয়েরা চলে গেলে শ্যামল মদনের কাছে ফিরে মুরুব্বি চালে বলে, কাজ হাসিল।

—সত্যি ! লেখাটা ও পড়েছে ?

শ্যামল হাসে, চোখে চোখে যে কথা হয়ে গেল।

শ্যামলের অনুমান যে মিথ্যে নয় তা তখনই বোঝা গেল। মদন বলে, ঐ দেখ, নন্দিতা দোকানে ঢুকছে।

—চালাক আছে, অন্য মেয়েদের স্কুলে ছেড়ে এসেছে।

নন্দিতা দোকান থেকে চলে যেতেই শ্যামল গিয়ে হাজির হয়। দোকানদার বলে, চিঠিটা নিয়ে গেছে।

—দেখলাম, এসে কি বললে ?

—কি আর বলবে, উঃ আঃ করতে লাগল, আমি নাম জিজ্ঞেস করলাম।

—বই-এর মধ্যে করে দিয়েছেন তো ?

—নিশ্চয়, মেঘদূতের কাব্য।

শ্যামল হেসে ফেলে, আপনি সত্যিই কবি।

ভদ্রলোক অমায়িক হাসেন, ব্যবসাদারও। বই-এর দাম তিন টাকাও ঐ সঙ্গে দিয়ে দেবেন।

শ্যামল আর মদন মন্নুদা'র সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। মন্নুদা' আনন্দে বিগলিত হয়ে আর সেদিন অফিস গেলেন না। তিন জনে সিনেমা আর রেষ্টুরেন্টে আমোদে কাটাল।

[ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জরাসন্ধ

কিছু কেনাকাটা এবং দু'-চার জায়গায় দেখাশোনার দরকার ছিল। সে দিনটা তাতেই গেল। পরদিন ডাক্তার ধরে নিয়ে গেলেন বেলঘরিয়ায়। পথে যেতে যেতে বললেন তালুকদার, আজ তো তুমি একাই আসতে পারতে। আমার দরকার পড়ল কিসে?

ডাক্তার বললেন, বাঃ, আপনাকে নিয়ে আবার ভালো করে সবটা দেখতে হবে না? আজ যে চোখ দিয়ে দেখবো, কাল তো তা ছিল না

রক্ত পরীক্ষায় ধরা পড়েছে শান্তির টাইফয়েড। তার জন্যে যা কিছু করা দরকার, সে সব সেরে নিয়ে মহেশের সঙ্গে চারদিকটা আবার ঘুরে ঘুরে দেখলেন দেবতোষ। এক সময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বৌদির গয়নাই কি আপনার একমাত্র সম্বল?

তালুকদার বললেন, গোড়াতে তাই ছিল। বারো হাজার টাকা পেয়েছিলাম গয়না বিক্রী করে। তারপর আরো কিছু কিছু জুড়েছে হয়েছে।

—এবং এখনো হচ্ছে।

—না, এখন আর বড় একটা পেরে উঠি না। ছেলে দু'টোর বোর্ডিং-খরচা। তাছাড়া—বলেই থেমে গেলেন।

দেবতোষ বললেন, তাছাড়া যে আরো দু'-চারটি পোষ্যি আপনার আছে, তার কিছু কিছু খবর আমিও রাখি।

তালুকদার সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বললেন, এখন তো এদের আর পুঁজির দরকার নেই। নিজেদের খরচ কুলিয়ে বরং কিছু কিছু জমাতেও পারে। তিনটি মেয়ে আর একখানা তাঁত নিয়ে সুরু করেছিলাম। আজ বারোটি মেয়ে কাজ করছে। ওয়ার্কসপটাও তাই বাড়াতে হয়েছে।

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, বৌদির কি কোনো ছবি আছে?

—না, কোনো দিন ফটোগ্রাফারের সামনে নিতে পারিনি। ঐ এক কথা—আমার বড্ড লজ্জা করে।

সামনের দিকে দীর্ঘ দৃষ্টি মেলে, যেন কোন এক দুর্নিরীক্ষ্য বস্তু লক্ষ্য করে বললেন তালুকদার। কে জানে এটাও হয়তো বিধাতার অভিপ্রায়। তা না হলে মীরা শুধু ছবি হয়েই থাকত আমার কাছে; এমন করে এখানকার সব কিছুর মধ্যে তাকে পেতাম না।

সেই বুড়ী আজও বড়ি দিচ্ছিল। ঘুরতে ঘুরতে সেখানটায় গিয়ে তালুকদার বললেন, কেমন আছ, পিসী!

বুড়ী একগাল হেসে বলে উঠল, এসেছ বাবা? কাল ওদের কাছে শুনলাম তুমি চলে গেছ। ভাবলাম, আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাবে?

—কাল আর সময় হলো না। আজ আবার এলাম।

—বেশ করেছ, বাবা! তোমার দয়াতেই আমরা এতগুলো মেয়েমানুষ দিব্যি খেয়ে-পরে সুখে আছি। তা না হলে—

—আমার জন্যে বড়ি রেখেছ তো?

—রেখেছি বৈ কি, বাবা! উমার কাছে আলাদা ঠোঙায় করে রাখা আছে। মনে করে নিও, কিন্তু।

—নিশ্চয়ই নেবো। সেবার যেগুলো দিয়েছিলে, দুটো চারটে করে এক মাস বসে খেলাম।

বুড়ীর শীর্ণ মুখখানা খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ষ্টেশনের পথে তালুকদার বললেন, যা দেখছি, এই টাইফয়েডের ধাক্কা সামলাতেই তোমার ছুটি ফুরিয়ে যাবে। ডাক্তার অন্যমনস্ক হয়ে কী ভাবছিলেন। হঠাৎ যেন তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। বললেন, কী বলছেন? ছুটি? আশীর্বাদ করুন দাদা, ছুটি আমার অক্ষয় হোক।

—তার মানে?

—তার মানে, গোলামি আর করতে চাই না। ভাবছি, এরই কোনো একটা গলির মধ্যে একখানা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে বসে পড়বো।

—ও দুর্মতি ছাড়। আজকাল পাড়ায় পাড়ায় এম-বি'র ছড়াছড়ি। তোমার মত ক্যাম্বেল-ওয়ালাকে পুছবে কে?

নিজেকে দেখিয়ে বললেন, এরকম বিনি পয়সার মক্কেল দিয়ে তো পেট চলবে না।

—খুব চলবে, দাদা! দুটো তো মোটে পেট। তার খাঁই আর কতটুকু?

তালুকদার গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোমার মনের কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি, দেবতোষ! মেয়েগুলোকে দেখবার চাগাবার কেউ নেই। ঐ প্রাক্তিই যা হোক করে চালিয়ে নিয়েছে এত দিন। কাজকর্ম দেখাশুনা করা, তারও

ভার ছিল ওরই ওপর। ও ঘরে থেকে পড়েছে, এখানকার অবস্থা প্রায় অচল। আমি যে এসে মাঝে মাঝে দেখবো, তাও সম্ভব নয়। কাজেই তোমাকে পাওয়া আর হাতে স্বর্গ পাওয়া একই কথা। কিন্তু তাই বলে তোমার মত একটি ছেলে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করে এমনি একটা তুচ্ছ কাজ নিয়ে পড়ে থাকবে, তাও আমি হতে দেবো না, ভাই! ও-সব পাগলামো করো না।

দেবতোষ হেসে ফেললেন, কিছু মনে করবেন না দাদা! আপনার কথা শুনে আমাদের অ্যানাটমির প্রফেসর ডাক্তার ঘোষের প্রথম লেকচারটা মনে পড়ল। আপনার এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কথাটা তিনিও সেদিন অন্ততঃ বার পাঁচেক আউড়েছিলেন। কিন্তু একটা অত্যন্ত সোজা কথা তিনি হয়তো জানতেন না, আপনি জেনেও চেপে যাচ্ছেন। সেটা হচ্ছে এই, যা কিছু উজ্জ্বল, তাই সুন্দর নয়। তার চাকচিক্যে চোখ ভুলতে পারে, মন ভোলে না।

তালুকদার সাহেবের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার বললেন দেবতোষ, আপনি কী ভাবছেন, আমি জানি। টাকাটা যে ভয়ানক কাম্য বস্তু, সেটা অস্বীকার করি না। তবে এ-ও জানি, ওটাই সব নয়। দু'-একজন ভাগ্যবান ব্যক্তির খবর আমি রাখি, ডাক্তার হিসেবে যে Career তারা গড়ে তুলেছিলেন, সেটা সত্যিই উজ্জ্বল। সারা জীবন ধরে নেশার ঝোঁকে তারা শুধু ব্যাঙ্কের খাতায় মোটা মোটা অঙ্কের ডান দিকে শূন্যের পর শূন্য যোগ করে গেছেন। তারপর শেষ বয়সে যখন মনের পাতায় চোখ ফেরালেন, দেখা গেল বাঁ দিকের অঙ্কটা মুছে গেছে, পড়ে আছে শুধু ঐ শূন্যগুলো। কিন্তু আমার শুধু শূন্য দিয়ে চলবে না, দাদা! এমন কিছু চাই যাতে মন ভরে।

তালুকদার এখনো কোনো সাড়া দিলেন না দেখে একটু আশ্বাসের সুরে বললেন দেবতোষ, আপনার ভয় নেই। এই মুহূর্তেই কিছু স্থির করে ফেলিনি। তবে হঠাৎ একদিন যদি শুনতে পান, বন্ধুরা আফশোস করে বলছে, মুখ্যু ডাক্তার এমন সাধের চাকরিটা রাখতে পারলো না, শুনে যেন চমকে উঠবেন না।

ডাক্তারের কথা শেষ হলে নিশ্বাস ফেলে বললেন তালুকদার, তোমার কপালে দুঃখ আছে, তা বুঝতে পারছি। তবে আপাতত সে কথা ভাবছি না। ভাবছি, জেল-মহলে এত দিন মহেশ তালুকদারের নাম ছিল, 'মেয়েধরা'। অনেক সুনাম কুড়িয়েছি। এবার বোধ হয় 'ছেলেধরা', বলেও কীর্তি রেখে যাবো।

ডাক্তার হো-হো করে হেসে উঠলেন।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে দেবতোষকে একটা কী কাজের ভার দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন সুলোচনা। তারপর আহ্নিক সেরে বারান্দায় এসে বসলেন মহেশের সামনে। কোনো রকম ভূমিকা না করেই বললেন, আমার দেবুর একটি বৌ এনে দাও, বাবা! তুমি ছাড়া এ কাজ আমার আর কাউকে দিয়ে হবে না।

—বেশ তো মা, আমি খোঁজে রইলাম। এ আর এমন শক্ত কী।

—জানো, মহেশ, এতদিন ওর বিয়ে নিয়ে আমি একেবারেই মাথা ঘামাইনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, একজন চাই যে ওর ভার নেবে, ওকে বুঝবে, সব সময়ে পাশে এসে দাঁড়াবে। মাকে দিয়ে সে কাজ চলে না। তা ছাড়া আমি আর ক'দিন?

—সে কথা বললে কিন্তু ঝগড়া করবো, মা! ছেলের বিয়ে দিন। মনের মত একটি বৌ নিয়ে অনেক দিন ঘর করুন। দু'-চারটি নাতি-নাতনীর মুখ দেখুন। তবে তো আপনার ছুটি।

সুলোচনা হাসলেন, অতোখানি আমি চাই না বাবা! দেবু আমার স্থির হয়ে বসেছে, এখানে ওখানে ভেসে বেড়াচ্ছে না, এইটুকু দেখে যেতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত।

সুলোচনা উঠে যাচ্ছিলেন। মহেশ বললেন, কিন্তু কী রকম মেয়ে আপনার পছন্দ, তা তো বললেন না, মা!

—শোনো কথা! কী রকম আবার। ওর মন যাকে চায়, যাকে পেলে ও সুখী হবে, তাকেই আমার পছন্দ। সে যে মেয়েই হোক, আমার কাছে তার একমাত্র পরিচয় সে আমার দেবতোষের বৌ। এর বেশী আমার আর কিছু জানবার নেই, বাবা!

ডাক্তারের সঙ্গে মায়ের মুখের আদল অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বললেন তালুকদার, এত দিন দেবতোষকে দেখে আশ্চর্য লাগত। অত বড় একটা দরাজ মন। যত দেখেছি, ততই মুগ্ধ হয়েছি। আজ আর হই না। দেখলাম, ওটা ও মাতৃগর্ভ থেকেই নিয়ে এসেছে।

সুলোচনা লজ্জা পেয়ে যেন শুনতে পাননি, এমনি ভাবে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেলেন।

পরদিন সকালের দিকে ট্রেণ। চা'এর আগেই জামা-কাপড়টা সুটকেসে ভরে নিচ্ছিলেন তালুকদার। একটা লালচে গোছের কাগজ হাতে করে দেবতোষ ঘরে ঢুকলেন। আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে মহেশ বললেন, টেলিগ্রাম এল বুঝি?

—এল নয়; যাবে।

—যাবে!

—হ্যাঁ; এখন না পাঠালে ঠিক সময়ে পৌঁছবে কেন? ছুটি তো আপনার আজকেই শেষ।

মহেশ কাপড় গোছানো বন্ধ করে বললেন, তোমার মতলবটা কি বল তো ডাক্তার? কাল তো একটা বাজে অজুহাত তুলে যাওয়া বন্ধ করল। আজকে আবার কোন্ ছল নিয়ে এসেছ?

—দুর্বৃত্তের ছলের অভাব নেই, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই বলে গেছেন। কিন্তু দাদা, আজকের ব্যাপারে আমি শুধু আজ্ঞাবহ। বিশ্বাস না হয়, যাঁর আজ্ঞা তাঁকেই ডেকে নিয়ে আসছি।

—থাক; তোমাকে আর কষ্ট করে ডাকতে হবে না। আমিই যাচ্ছি। মার সঙ্গে বোঝাপড়ার দরকার হলে আমি নিজেই করে নিতে পারবো।

ওঁকে আর যেতে হল না। তার আগে সুলোচনাই এসে পড়লেন। ডালাখোলা সুটকেসটার দিকে চেয়ে দেবতোষকে বললেন, তুই বলিসনি বুঝি?

—বললাম তো। মানছেন কৈ? ওঁর নাকি ভয়ানক দরকার, না গেলেই নয়।

মহেশ ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সুরে বললেন, ডাক্তাররা জ্যান্ত মানুষকে মরা বলে সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে, সবাই জানে। কিন্তু চোখের উপর রাতকে দিন বানিয়ে দেয়, সেটুকু জানতে বাকী ছিল!

সুলোচনা হাসিমুখে বললেন, ঠিক বলেছ, বাবা! ঐ জন্যে ওর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু তোমার কোনো কাজের ক্ষতি হবে না তো?

—কিছু না। আর যদি হয়ও, সে ক্ষতির চেয়ে লাভটাই কি বেশী নয়? আর একটা দিন মায়ের কাছে থাকতে পেলাম।

সুলোচনার মুখখানা মাতৃগৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, কতটুকুই বা থাকতে পার মায়ের কাছে। এসে অবধি ছুটোছুটির তো আর বিরাম নেই। এখনি আবার আমার সঙ্গে বেরোতে হবে।

—কোথায় যাবেন, মা?

সুলোচনার মুখের উপর একটুখানি করুণ ছায়ার স্পর্শ লাগল। মুহূর্তকাল নতমুখে থেকে বললেন, কাল অনেক রাত পর্যন্ত দেবুর কাছে সবই শুনলাম। তখন থেকেই ভেবে রেখেছি, তোমার সঙ্গে গিয়ে একবার ওদের দেখে আসবো।

—আপনি যাবেন ওদের কাছে! বিস্ময়ে আনন্দে যেন চেঁচিয়ে উঠলেন তালুকদার।

—কেন যাবো না বাবা? আমার মীরা মা বেঁচে থাকলে সেই তো সব করত। সে নেই বলে, তার এই কাজটুকু যাতে কোনো দিকেই অসম্পূর্ণ থেকে না যায়, আজ আমাদের সবাইকে তাই দেখতে হবে।

মহেশ দাঁড়িয়ে রইলেন অভিভূতের মত। সুলোচনার মৃদুকণ্ঠ আবার শোনা গেল, দেবুকে তাই বলছিলাম, তুমি যা করছ, তার তুলনা হয় না। ঐ আশ্রয়টুকু না পেলে ওরা ভেসে যেত, কিংবা এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াত, যার কথা মনে হলেও গা শিউরে ওঠে। কিন্তু তোমরা পুরুষ মানুষ। যতই দাও, মেয়েদের সব অভাব মেটাতে পার না। খানিকটা থেকে যায়, যা তোমাদের হাতের বাইরে। সেটা তো তুমি নিজের চোখেই দেখেছ বাবা! আমরা যে রাক্ষসের জাত। আমাদের ক্ষিদে কিছুতেই মিটতে চায় না।

মহেশের চোখের ওপর জেগে উঠল অনেক বছর আগেকার একটি রাত। তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে আছে একটি মেয়ে। কানে এল তার ব্যাকুল কান্না। হঠাৎ চমকে উঠলেন সুলোচনার কণ্ঠস্বরে। উনি বলে চলেছেন, আমার তো করবার কিছু নেই; সে শক্তিও নেই। তবু আমাকে দেখে যদি ওদের মনে এইটুকু বিশ্বাস জাগে যে ওটা শুধু ইস্কুল নয়, আশ্রয় নয়, ভাত-কাপড় আর একটু মাথা গুঁজবার জায়গা—এই দিয়েই তোমরা ওদের ধন্য করনি, আরো কিছু আছে ঐ ঘর ক'খানির মধ্যে, যাতে মেয়েমানুষের মন ভরে, যা ওরা দু' হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে পারে, সেই জন্যেই আমার যাওয়া। যদি না বুঝে থাকে, সেই কথাটাই আমি ওদের বুঝিয়ে দেবো। এইটুকু ছাড়া আমার আর কী করবার আছে?

মহেশ বললেন, মা, আজ বুঝতে পারছি, আপনার কাছে আমার অপরাধের অন্ত নেই।

সুলোচনা হেসে বললেন, শোনো ছেলের কথা! কী অপরাধ করলে তুমি?

—ওদের কোনো কথাই আপনাকে বলি নি। হয়তো আজও কিছু না জানিয়েই চলে যেতাম। দেবতোষ আমাকে সে-লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছে।

—তাতে কোনো অপরাধ হয়নি, বাবা! এ কি বলে বেড়াবার জিনিষ?

—কেন যে বলি নি, আমার সব কথা শুনলে হয়তো বুঝতে পারবেন। একথা আমার মনে হয়েছিল, দেবতোষকে তাই বলছিলাম সেদিন, এই মেয়েগুলোর যে অভাব, সে শুধু অন্ন-বস্ত্রের নয়, শুধু আশ্রয়ের নয়। যে-ঘর ওরা একদিন ছেড়ে এসেছিল, তার পর আর ফিরে পায় নি, গিয়ে দেখেছে দোর বন্ধ, সুখে, দুঃখে, ভক্তি, ভালবাসায় ভরা সেই ঘরের আস্বাদটুকু যদি ওদের দিতে না পারলাম, তাহলে তো কিছুই হল না! সেই কথা মনে করেই লোক-লস্কর, ইট-কাঠ জড়ো করে আশ্রম বা হোম্ না বানিয়ে, ছোট একটা গৃহস্থ-পল্লীর মধ্যে ঐ বাড়িটুকুতে এনে ওদের তুলেছিলাম। মনে মনে এই আশা ছিল, আপনার জনের কাছে জায়গা না পেলেও পরের কাছে, প্রতিবেশীর কাছে মানুষের যে স্বাভাবিক পাওনা, সেটুকু থেকে ওরা বঞ্চিত হবে না। কিন্তু মা, সে আশা আমার সফল হয় নি।

সুলোচনা বললেন, আশাটা তোমার অতিরিক্ত ছিল বলেই সফল হয়নি, বাবা!

—কিন্তু তখনো আমি হাল ছেড়ে দিই নি। আমার দু'-একটি আত্মীয়া—নাম বললে, আপনি না চিনলেও দেবতোষ চিনবে—আমরা যাকে বলি, সমাজ-কল্যাণ বা সেবাব্রত সেখানে তাদের প্রতিষ্ঠা আছে। অনাথ-আতুর নিয়ে তারা বড় বড় প্রতিষ্ঠান চালিয়ে থাকেন। তাদের দু'-একজনকে ধরে আমার ঐ বেলঘরিয়ার গলিতে নিয়ে এলাম। মেয়েদের ডেকে এনে বসিয়ে দিলাম ওঁদের পায়ের কাছে। ওঁরা অনেক তত্ত্বকথা শোনালেন। পাপী-তাপী বিপথগামী মানুষের উদ্ধারের জন্যে যে-সব বড় বড় কথা বলে গেছেন মহাপুরুষেরা, তারই কতকগুলো আওড়ে গেলেন। যখন চলে গেলেন, মেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, তারা শিখলো হয়তো অনেক কিছু, কিন্তু পেল না কিছুই। তার পরেও তাঁরা এসেছেন। মেয়েরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, ভক্তি, শ্রদ্ধা, অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি না হয়। তারা যে ওদের বিশিষ্ট অতিথি, ওদের আশ্রয়দাতার পরম শ্রদ্ধাভাজন আত্মীয়া।

সুলোচনা জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা কি এখনো আসেন?

—না, মা! দু'-চার বার এসেই এ-সব ছোটখাট ব্যাপারে নজর দেবার মত উৎসাহ তাঁদের চলে গেল। আমিও বেঁচে গেলাম।

দেবতোষ বললেন, আপনি ভুল করেছেন, দাদা! লেগে পড়ে থাকলে ওঁদের হাত দিয়ে একটা মোটা রকম ডোনেশন-কোনেশন আদায় করতে পারতেন। আর কিছু না হোক, গোটা কয়েক ঢেঁকি আর কুলো বাড়ানো যেত, দুটো পয়সা আসত। যাক সে সব বকেয়া কথা। আপাততঃ সব চেয়ে দরকারী কথা হল, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।

—অ্যাঁ, তাই নাকি! ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সুলোচনা, যাই, তোমাদের চা নিয়ে আসি। ইস্, এত বেলা হয়ে গেছে!

—কিচ্ছু বেলা হয়নি মা! চায়ের জন্যেও আমাদের কোনো তাড়া নেই।

—উঁহুঁ, ওটা একবচনই রাখুন, দাদা, মাথা নেড়ে বললেন দেবতোষ। আটটার সময় চায়ের তাড়া নেই, এতখানি অপবাদ আমাকে অন্ততঃ দেবেন না।

মহেশও রীতিমত তেড়ে উঠলেন, ভাগ ডাক্তার, বেশী বাঁচিও না,

হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেবো। বনমালীর রাজ্যে যখন ছিলে, কি রকম আটটার সময় চা জুটত, আমার তো আর জানতে বাকী নেই ভায়া!

সুলোচনা বললেন, বল কী বাবা, এ দিকে তো দেখি বনমালী বলতে অজ্ঞান!

—তা হলে কি হবে? মাসের মধ্যে অন্ততঃ দশ দিন বনমালীর ভাঁড়ারে মা ভবানীর রাজত্ব। সকাল আটটায় কেটলিতে জল ফুটছে; হঠাৎ দেখা গেল চা নেই। ছুটল আমার নিধিরামের কাছে। চায়ের সমস্যা মিটল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার এল ছুটতে ছুটতে। কী ব্যাপার? দুধ নেই। নাঃ এইখানেই শেষ নয়। মাঝে মাঝে তিন দফাও ছুটতে হয়। চা করতে হলে চিনিও তো চাই। বলে হেসে উঠলেন। সুলোচনা ব্যথিত সুরে বললেন, তবু ঐ হতভাগাটাকে কিছুতেই তাড়াবে না।

দেবতোষ বললেন, ওঁর কথা তুমি বিশ্বাস কর, মা? সব বাড়িয়ে বলছেন।

—বাড়িয়ে বলছি! আমার সব নোট করা আছে হিসেবের খাতায়। দয়া করে বিলটা এখনো পাঠাইনি।

—বিলের কথা যখন তুললেন দাদা, তাহলে বলতে হয়, ওটা এ তরফ থেকেও যেতে পারে, এবং তাতে বোধ হয় আমারই লাভ।

—কী রকম?

—আজ্ঞে, বনমালী যদি নিধিরামের কাছে দশ বার গিয়ে থাকে, নিধিরাম বনমালীর শরণ নিয়েছে অন্ততঃ সত্তর বার। চা'টা চিনিটা তো আছেই, মাঝে মাঝে ডাল চড়িয়ে দেখা গেল নুণ নেই।

—নুণ নেই?

—আজ্ঞে হাঁ, নুণ নেই।

দু'জনের মিলিত হাসির শব্দে ঘর ভরে উঠল। সুলোচনাও মৃদু হেসে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন চায়ের জোগাড়ে।

চা'পর্ব শেষ হবার পর সুলোচনা বেলঘরিয়া যাবার উদ্যোগ করতে যাচ্ছেন, এমন সময় মহেশ কুণ্ঠিত সুরে বললেন, মায়ের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।

সুলোচনা ফিরে দাঁড়ালেন।

মহেশ বললেন, বলছিলাম আমি আজ থাকি। আপনি দেবতোষকে নিয়ে যান।

—কেন! সবিস্ময়ে বলে উঠলেন সুলোচনা।

একটু ইতস্ততঃ করে বললেন তালুকদার, আমাকে সঙ্গে দেখে ওরা যদি আপনাকেও আমার সেই বড় বড় আত্মীয়দের দলে ফেলে, সেটা তো আমি কিছুতেই সইতে পারবো না। অথচ তার জন্তে ওদের দোষ দেবারও কিছু নেই। তাই বলছিলাম, আপনি নিজেই যান। আমি থাকি।

কথাগুলো সহজ সুরেই বললেন তালুকদার। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত বেদনাটুকু সুলোচনার অন্তর স্পর্শ করল। উত্তরে একটি কথাও বললেন না। শুধু তাঁর স্নিগ্ধ চোখ দু'টি অপরূপ কারুণ্যে ভরে উঠল।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই একটা সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে তিনি তেমনি নিঃশব্দে দেবতোষের সঙ্গে রিক্সায় গিয়ে উঠলেন।

যারা জেল খাটে তাদেরও ছুটি আছে, সপ্তাহান্তে একদিন। কিন্তু যারা জেলের জন্তে খাটে, তাদের ও বালাই নেই। পালপার্বণে তাদের ভারী প্রোগ্রাম, রবিবারে বিশেষ রুটিন। নিতান্ত দায়ে পড়ে দু'-চার দিন যদি বাইরে যাবার প্রয়োজন হয়, মুলতুবি কাজগুলো বসে থাকে ওৎ পেতে, ফিরে এলেই চেপে বসে। বেশ কিছুদিন আর ঘাড় তুলবার অবসর দেয় না।

জেলার সাহেব ফিরে আসবার পর সুশীলা একটু ফুরসত খুঁজছিল তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্তে। কিন্তু দু'বেলায় তার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য করেছে, হয় তিনি ডুবে আছেন কাগজপত্রের স্তূপের মধ্যে, নয় তো তাকে ঘিরে রয়েছে ডেপুটি বা কেরাণীবাবুদের দল। দিন পাঁচ ছয় পর বিকাল বেলা ডিউটিতে যাবার পথে হঠাৎ একটু ফাঁক দেখে ঢুকে পড়ল একদিন। তালুকদার মুখ তুলতেই বলল, হেনা একটু আসতে চায়, বাবা! ক'দিন ধরেই বলছিল, যা ভিড়, আমি আনতে সাহস করিনি।

মহেশের মনে পড়ল, শেষ যেদিন তার সঙ্গে দেখা, হেনাকে কথা দিয়েছিলেন, একদিন তার সব কাহিনী শুনবেন। তার জন্তে সময় হয়তো আছে, কিন্তু মনের একটা প্রস্তুতি দরকার। সুশীলাকে বললেন, আজ তো হয় না। ওকে একটু সময় দিতে হবে। তুমি বরং—বলে ডায়রি খুললেন তারিখটা নির্দিষ্ট করে দেবার জন্তে। সুশীলা বলল, ও বলছিল, ওর যা কথা পাঁচ মিনিটেই হয়ে যাবে।

মহেশ ডায়রি বন্ধ করে বললেন, ও, তাহলে এখনই নিয়ে এসো।

হেনা এসে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তালুকদার বললেন, তোমার সেদিনের কথা আমার মনে আছে। তার জন্তে আরেক দিন ডাকবো। তা ছাড়া আর কিছু বলবে?

হেনা মাথা নেড়ে মৃদুকণ্ঠে উত্তর করল, না, আর কিছু নয়। সেই জন্তেই এসেছি। ভেবে দেখলাম, ওটা আমার বলা হবে না। তালুকদার জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। বলতে যাচ্ছিলেন, বেশ তো নাই বা বললে। কিন্তু তার আগেই বলে উঠল হেনা, আপনার কাছে বসে নিজের মুখে স্বচ্ছন্দে বলে যাবো, তেমন কথা তো আমার নয়। এ এমন কথা, যা বলতে গেলে বোধ হয় সব মেয়েমানুষেরই জিভ আটকে যাবে। তবু, না বলেও আমার উপায় নেই। তাই এত অপরাধের পর আর একটা অপরাধ করে বসলাম। বলে আঁচলের আড়াল থেকে একটা বাঁধানো খাতা বের করে এগিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখল। তারপর আবার পেছনে সরে গিয়ে বলল, মুখ ফুটে যা বলতে পারিনি, অথচ যা না বলেও আমার স্বস্তি নেই।

লজ্জার মাথা খেয়ে সেই কথাই আমাকে বলতে হয়েছে এই খাতার পাতায়; প্রতি মুহূর্তে সে যে কী কঠিন পরীক্ষা, সে শুধু আমিই জানি। কী করবো? এ ছাড়া যে আমার আর কোনো পথ ছিল না।

খাতাখানা তুলে নিয়ে প্রথম পাতাটা খুলতেই জেলার সাহেবের দু'টি চোখে ফুটে উঠল বিস্ময়ভরা প্রসন্ন দৃষ্টি। মানুষের হস্তাক্ষরের সঙ্গে মুক্তার তুলনা এত দিন কবিজনোচিত কল্পনা বলেই তাঁর ধারণা ছিল। আজ মনে হল, কথাটার মধ্যে অত্যুক্তি যদি বা থাকে, তা সামান্তই। হেনার কথার কোনো জবাব না দিয়ে তিনি

পাতাগুলো উলটে যেতে লাগলেন। হেনা কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনি কি দেখছেন, আমি জানি।

—কী বল তো?

—খাতাটা ঠিক পথ দিয়ে আমার হাতে আসেনি। ওতে আপনার আফিসের ছাপ নেই।

—তাই নাকি! হুঁ, তাই তো দেখছি। কিন্তু গেল কী করে?

—তার জন্মে যা কিছু অপরাধ সব আমার। যে শাস্তি দেবেন, খুসী মনে মাথা পেতে নেবো।

—কিন্তু শাস্তিটা তো তোমার একার পাওনা নয়? আর একজনকে পাচ্ছি কোথায়?

"আরেক জন"এর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে হেনার সমস্ত মুখখানায় হঠাৎ একরাশ আবির ছড়িয়ে গেল। সেইটুকু লুকোবার জন্মে সে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল। একথা আর বলা হল না, আপনার অনুমান মিথ্যা। খাতা আমি তাঁর কাছ থেকে পাইনি।

জেলর সাহেব হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তুমি খুব ভালো আল্‌পনা দিতে পার, না?

—আল্‌পনা! সবিস্ময়ে চোখ তুলে তাকাল হেনা।

—হ্যাঁ।

—না তো? আল্‌পনা আমি কোনো দিন দিইনি।

—তা হবে। খাতাটা খুলে সকলের আগে ঐ কথাটাই আমার মনে হয়েছিল।

হেনা নিঃশব্দে চোখ নামিয়ে নিল। তার সুন্দর লেখার সুখ্যাতি সে আগেও অনেক শুনেছে। কিন্তু এমন সুন্দর করে তা কেউ বলেনি। একটি লাজনম্র আনন্দের স্নিগ্ধ আলোয় তার আনত মুখখানা দীপ্ত হয়ে উঠল।

সেদিন জেলর সাহেবের সান্ধ্য আফিস সন্ধ্যার আগেই বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সংক্ষেপে সেরে নিয়ে খাতাখানা হাতে করে বসলেন গিয়ে দক্ষিণের বারান্দায়। প্রথম দৃষ্টিতে যে আল্‌পনার কথা তাঁর মনে হয়েছিল, সেটা এর লিপি-সজ্জার সৌষ্ঠব। কিন্তু অক্ষরের ফ্রেম পার হয়ে যতই ভিতরে ঢুকলেন তালুকদার, দেখতে পেলেন, এই খাতাটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে যে শঙ্কা, বেদনা, লজ্জা, লাঞ্ছনার বিচিত্র আলেখ্য, সে-ও এক ভাগ্যবিড়ম্বিতা বঞ্চিতা নারীর নিভৃত মনের আল্‌পনা। শেষ পাতাটি যখন শেষ হল, যেমন তেমন করে বলা এই অগোছালো ইতস্ততঃ ছড়ানো কাহিনীগুলো তিনি মনের মধ্যে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। কত কথা সে বলতে গিয়েও বলতে পারেনি। বারে বারে তার ছিঁড়েছে, হারিয়ে গেছে খেই। সেই না-বলা কথার ফাঁকটুকু তিনি ভরে দিলেন নিজের ভাবায়, মমতার স্পর্শ দিয়ে জুড়ে দিলেম তার ছিন্নসূত্র। এমনি করে যে-হেনাকে তিনি দেখেননি, বিভিন্ন পটভূমিকার উপর গড়ে-ওঠা তারই একটি অখণ্ড রূপ তাঁর চোখের সুমুখে ভেসে উঠল।

* * * *

দুর্দান্ত খেয়ালী নদী আড়িয়ালখাঁ। তার উত্তর পারে খানিকটা জায়গা জুড়িয়ে অনেকগুলো বড় বড় টিনের ঘর। পাশ দিয়ে চলে গেছে ধূলোর রাস্তা। নগর নয়, সহর নয়, আশে-পাশের লোকেরা বলে গঞ্জ। নামটা কিন্তু ভয়ানক জমকালো—বাহাদুর নগর। হয়তো কোনো কালে কাছে-ধারে কোথাও সত্যিকার নগর বসিয়ে রাজত্ব করতেন কোনো রাজা কিংবা নবাব বাহাদুর। তার পর একদিন লেলিহান রসনা বিস্তার করে ছুটে এল আড়িয়ালখাঁ। একে একে গ্রাস করল তার সকল কীর্তি। যাবার সময় উপরে রেখে গেল খানিকটা উচ্ছিষ্ট—যাকে বলে চর। তারই উপরে গড়ে উঠেছে এই গঞ্জ। দূর-দূরান্তর থেকে পাল তুলে ছুটে আসে বড় বড় সওদাগরী নৌকা, বয়ে আনে কত রকমের পণ্য—তেল, গুড়, লবণ, তামাক, নারকেলের দড়ি, তার সঙ্গে বর্ত্তমান সভ্যতার নানা চটকদার বিদেশী বিলাস। ফিরবার পথে নিয়ে যায় এ দেশের সব চেয়ে বড় সম্পদ ধান, পাট, সর্ষে, কলাই। এই বাহাদুর নগরের একটা জীর্ণ ভাঙ্গা ঘাটের পাশে, হাট বাজারের কোলাহল থেকে দূরে ঝুরিনামা বটের ছায়ায় হেনা এসে বসত তার দাদার সঙ্গে। গঞ্জের পেছনে, নদী থেকে খানিকটা দূরে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে ছিল একসার টিনের বাড়ি—থানা, তার পাশে ডাকঘর, ডাক্তারখানা, আর একটু তফাতে রেজিষ্ট্রেশন আফিস। ওদের বাবা ছিলেন ঐ ডাকঘরের ব্রাঞ্চ পোষ্টমাষ্টার, সদাশিব মিত্র। বিপত্নীক বৃদ্ধ। সংসারে দুটি মাত্র তাঁর আসক্তি—একটা পুরানো আমলের গড়গড়া, আর এক সেট

বৈষ্ণব-সাহিত্য। আপিসের সঙ্গেই বাসা। খানদুয়েক থাকবার ঘর। উপরে টিন, মাটির মেঝে, ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া। বড় ঘরটার মাঝখানে পার্টিশান। তার এক দিকে থাকতেন তিনি আর এক দিকে হেনা। ছোট ঘরটাতে থাকত তার দাদা। আপিসের কাজটুকু শেষ হলেই তিনি তাঁর শোবার ঘরের বারান্দায় গিয়ে বসতেন। বাঁ হাতে নল, আর ডান হাতে কখনো বিদ্যাপতি, কখনো চণ্ডীদাস, কখনো বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত। একাধারে সরকারী পিয়ন এবং বেসরকারী বাহন শম্ভু এসে মাঝে মাঝে কলকে পালটে দিত।

মা যখন মারা যান, হেনার বয়স হবে সাত। দাদা তার বার-তের বছরের বড়। বি-এ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরেছে। তার পর পাশের খবর বেরোল। কিন্তু সনতের আর বেরোনো হল না। জড়িয়ে পড়ল ঐ বোনটিকে নিয়ে। সংসারে স্ত্রীলোক নেই। ওকে খাওয়ানো পরানো, আগলে রাখা, ভুলিয়ে রাখা, সব সনতের হাতে। বেশ খানিকটা বড় হবার আগে পর্য্যন্ত দাদাই তার চুল বেঁধে দিত। বড় হয়ে যখন নিজে বাঁধতে শিখেছে, তখনো ফিতে কাঁটা নিয়ে মাঝে মাঝে তার ঘরে গিয়ে হাজির হত, চুলটা বেঁধে দাও না দাদা! সনত হয়তো তখন পড়াশুনা করছে। তেড়ে উঠে বলতো, পালা। তার পর কোন কোন দিন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যেত। বোনকে কাছে ডেকে তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলত, হ্যাঁরে, মার কথা তোর মনে পড়ে?

হেনার চোখ দু'টো ছলছল করে উঠত, মায়ের কথা মনে পড়ে যায়, দাদার হাতের নিবিড় স্পর্শে। মনে মনে বলত, কেমন করে পড়বে? তুমি ছাড়া আর কোনো মাকে তো আমি জানি না?

মেয়েদের একটা মাইনর ইস্কুল ছিল ওদের বাড়ির কাছেই। বইখাতা নিয়ে হেনা সেখানে পড়তে যেত। ভালো ছাত্রী বলে তার নাম ছিল। হেড মিস্ট্রেস সুরমা দি খাতির করতেন, স্নেহও করতেন। মাঝে মাঝে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে আলাদা করে পড়াতেন। কিন্তু হেনার আসল স্কুল ছিল তার দাদার ঘর। কত বই ছিল সনতের। বেশীর ভাগ প্রবন্ধ, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, মহাপুরুষ এবং মনীষীদের উপদেশ। একটু যখন বড় হয়েছে, মাঝে মাঝে এটা-ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করত। ভারী ভালো লাগত শ্রীম কথিত কথামৃত, স্বামিজীর বীরবাণী, ভগিনী নিবেদিতার অপূর্ব জীবনকথা। কী সব সমিতির সভ্য ছিল তার দাদা। কোথায় কলেরায় গ্রাম উজাড় হয়ে গেল, কোথায় বন্যায় তিন হাজার লোকের আশ্রয় নেই, কোথায় হঠাৎ আগুন লেগে পুড়ে গেছে একটা গোটা বাজার, খবর পেলেই দাদা আর তার দু'চারটি বন্ধু ওষুধ পত্তর চাল কম্বল ঘাড়ে করে ছুটত। এমন দিন গেছে যখন হয়তো একনাগাড়ে দশ বারো দিন সনত বাড়ি আসেনি। ভারী ভাবনা হত হেনার। কিন্তু বাবা একটি বারও জানতে চাইতেন না তার কী হল। খোঁজ খবর নেবার কথা বলতে গেলে নিঃশ্বাস ফেলে বলতেন, কিছু দরকার নেই, মা! যখন তার সময় হবে, আপনিই আসবে।

মাঝে মাঝে সনতের কোনো কাজ থাকত না। তখন হেনাকে ডেকে নিয়ে পড়াত, কত গল্প বলত দেশবিদেশের। কোনো কোনো দিন বিকালবেলা সঙ্গে করে নিয়ে যেত সেই ভাঙ্গা ঘাটে। আড়িয়ালখাঁর বুকের উপর নানা আকারের নৌকার ভিড়। ওপারে গাছপালায় ঘেরা গ্রামের ছবি। হেনা মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকত। একদিন ওদের সামনে দিয়ে দু'ধারে ঢেউ তুলে চলে যাচ্ছিল একখানা সুদৃশ্য ষ্টীম লঞ্চ্। বোধ হয় কোনো পাটের সাহেবের বাহন। হেনা হাত তুলে বলল, ত্তাখ দাদা, কী সুন্দর ষ্টীমারখানা!

সনত কী ভাবছিল। গম্ভীর ভাবে বলল, হ্যাঁ, ওটা হল সামনের সিন্। ওর উল্টো দিকটা তেমনি কুশ্রী।

হেনা বুঝতে না পেরে দু'টি জিজ্ঞাসু চোখ তুলে ধরল দাদার মুখের উপর। সনত বলল, আমাদের বারোয়ারী তলায় দুর্গা-প্রতিমা দেখেছিস তো? কী চমৎকার দেখতে! পেছনে গিয়ে একদিন উঁকি মেরে দেখিস।

—কী সেখানে? প্রশ্ন করল হেনা।

—একগাদা দড়ি-দড়া, নোংরা বাখারি আর ছেঁড়া চট। ওগুলো না হলে প্রতিমা তৈরি হয় না।

—বাঃ, তা হবে কেমন করে?

—ঠিক তেমনি। ঐ যে ষ্টীমারটা দেখে তোর চোখ ঝলসে গেল, ওর একটা উল্টো পিঠ আছে। সেখানে রয়েছে আমাদের কয়েক লক্ষ নোংরা ভাঙ্গা ঘর আর ছেঁড়া কাঁথা। তার ওপর মুখ থুবড়ে খাবি খাচ্ছে একপাল কঙ্কাল। তাদের রক্ত আর মাংস দিয়ে তৈরি হয়েছে ঐ ময়ূরপঙ্খী।

এ কথার কী উত্তর দেবে হেনা! এসব যখন বলত, দাদার মুখে ফুটে উঠত কেমন একটা অদ্ভুত হাসি! সে হাসি দেখলে ভয়-ভয় করে, বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

কোনো কোনো দিন বাড়ি ফেরার পথে গঞ্জের ঐ সারি সারি টিনের শেডগুলো দেখিয়ে বলত সনত, আমার মাঝে মাঝে কী ইচ্ছা করে জানিস হেনা? ঐ টিনগুলো সব আগুন লাগিয়ে ছাই করে দিই।

হেনা চমকে উঠত। তারপর আশ্চর্য করুণ কণ্ঠে বলত সনত, ঐ আপদ যেদিন আসেনি, কী শান্তিই না ছিল আমাদের খোড়ো ঘরে। রোগ নেই, অভাব নেই, দেশ জুড়ে ঝলমল করছে আনন্দ। এই ঢেউ টিনের ঢেউ লেগে সব ভেসে গেল। হেনার ইচ্ছা হত জিজ্ঞাসা করে, কী করে গেল। কিন্তু দাদার মুখের দিকে চেয়ে বলতে পারত না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে সনতই আবার তুলত সে কথা।

কিসে গেল জানিস? ঐ পাট। সাহেবরা আর তাদের দিশী চেলারা বলে বেড়ায় পাট নাকি বাংলার সম্পদ। সম্পদই বটে! ওরই লোভে রাতারাতি ক্ষেপে উঠল মানুষগুলো। যেখানে যত ছিল ক্ষেত-খামার, ভিটে, ডাঙ্গা, সব ভেঙ্গে চষে জঙ্গের মত ছড়িয়ে গেল পাটের বীজ। পাটের বীজ নয়, সর্বনাশের বীজ। দেশের খাদ্য গেল, স্বাস্থ্য গেল, তার জায়গায় এল গোছা-গোছা করকরে নতুন নোট্। তাই দিয়ে কিনল বিলাতী ঢেউটিন, জার্ম্মাণী আলোয়ান, জাপানী ছাতা আর দিশী কুইনাইনের বড়ি। নোটের বাণ্ডিল আর কদ্দিন? ঐ টিনেও আজ টান ধরেছে। গাছতলা ছাড়া আর গতি নেই। তাই বা কোথায়? গাছ তো গেছে সেই প্রথম চোটে।

বলতে বলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সনত। পাশের একটা আগাছা জঙ্গলের দিকে আঙুল তুলে বলল, তুই দেখিসনি, হেনা! এইখানে ছিল একটা মস্ত বড় কলমের বাগান। ছেলেবেলায়

কত দিন আম কুড়োতে এসেছি। কী মিষ্টি আম! আর তেমনি জাম হত ঐ কোণের দিকে একটা গাছে। গোটা অঞ্চলের ছেলে-বুড়ো খেয়ে ছড়িয়ে শেষ করতে পারত না। তারপর একবার গরমের ছুটিতে বাড়ি এসে দেখি, সব ম্যাজিকের মত উড়ে গেছে। তার জায়গায় লম্বা লম্বা পাট। ঐ যে এঁদো পুকুরটা দেখছিস, ডালিমের রসের মত জল ছিল। পাট পচিয়ে পচিয়ে ওর ঐ দশা। এই তো সেদিনের কথা। আজ পাটও নেই : পড়ে আছে শুধু আশসেওড়া আর শিয়ালকাঁটার বন।

এতক্ষণে প্রশ্ন করল হেনা, আর পাট বুনছে না কেন?

—দর নেই যে। কিন্তু এদিকে ধান-চালের বাজার আগুন।

—এবার তাহলে চালের দাম কমবে, না দাদা? খুসী হয়ে বলল হেনা। ঐ বস্তুটির চড়া দর যে একটা সাংসারিক দুশ্চিন্তার কারণ, সেটা বুঝবার বয়স তার অনেক আগেই হয়েছিল। সনত সায় দিল না, তেমনি চিন্তিত মুখেই বলল, তা আর হয় না। এ বড় মজার জিনিষ। একবার চড়ে বসলে আর টেনে নামানো যায় না।

—কেন?

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলত সনত, বড় হ; লেখাপড়া শেখ। তারপর নিজেই বুঝতে পারবি।

দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল হেনা। ইস্কুলে যায় আসে। সঙ্গী, সাথী বলতে ঐ দাদা আর তার লাইব্রেরী। সমবয়সী মেয়েরা খেলাধূলা ছুটোছুটি করে। ও থাকে এক পাশে। ওদের সঙ্গে কোথায় যেন ওর মস্ত বড় অমিল। মনের মধ্যে কিসের যেন অস্থিরতা। চারদিকের অভাব, দৈন্য, রোগ শোক। এর কি কোনো শেষ নেই? আছে বৈ কি? একদিন নিশ্চয়ই আসবে, যখন মানুষের কোনো দুঃখ থাকবে না। কবে কেমন করে আসবে সেদিন, এই তার চিন্তা। মেয়েরা তাকে এড়িয়ে চলে। আড়ালে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। সেদিকে ওর খেয়াল নেই। মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারের স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। নিতান্ত ছোটটি নয়। সে কথা তাকে কেউ মনে করিয়ে দেয়নি। নিজের সম্বন্ধে এখনো যেন তার ঘুম ভাঙেনি। নিজের দেহ এবং দেহ-সজ্জার দিকেও চোখ পড়েনি। এমনি সময়ে একদিন ছুটির পরে তার ডাক পড়ল হেড মিস্ট্রেস স্বর্ণদি'র ঘরে। দু'-একটা মামুলি কুশল প্রশ্নের পর তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সাড়ি নেই, হেনা?

—হ্যাঁ; আছে তো। এবার পুজোয় একটা সুন্দর সাড়ি দিয়েছেন বাবা।

—বাবাকে বলো, আরো সাড়ি কিনে দিতে। কাল থেকে আর ফ্রক পরে এসো না, কেমন?

—কেন? বলেই অকস্মাৎ কিসের লজ্জায় হেনার সমস্ত দেহটা আড়ষ্ট হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে খুলে গেল তার দৃষ্টির আবরণ। এ যেন নিজেকে নিজের আবিষ্কার। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় কেন যে লোকগুলো তার দিকে তাকিয়ে থাকে, কেন যে বন্ধুরা গা টেপাটিপি করে নিজেদের মধ্যে, আর তাকে দেখলেই চুপ করে যায়, সব যেন অন্ধকারে হঠাৎ জ্বলে-ওঠা বিদ্যুৎ-শিখার মত তার চেতনার মধ্যে চমক খেলে গেল।

প্রথম সাড়ি পরে দাদার ঘরে গিয়ে প্রণাম করতেই কৃত্রিম বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল সনত, আরে, হেনা! আমি ভাবছিলাম এ আবার কোন্ ভদ্রমহিলা এলেন আমাদের বাড়ি?

—যাও, বলে মাথা নীচু করে দাঁড়াল হেনা। কুয়াসা-মুক্ত অরুণাভাসের মত তার মুখে সেই লজ্জার স্পর্শটুকু সনতের চোখেও নতুন লাগল। সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, হঠাৎ আজ পেন্নামের ঘটা কেন?

—বাঃ, ঘটা আবার কিসের? নতুন কাপড় পরলাম, তাই।

—ও-ও, আমি মনে করেছিলাম, এটা বুঝি নোটিশ।

—কিসের নোটিশ! ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করল হেনা।

—নোটিশ, মানে, তোমাদের বাড়ী আর পোষাচ্ছে না, চললাম এবার নিজের ঘরে।

—তুমি ভারী অসভ্য হয়েছ দাদা! বলেই পালিয়ে গেল নিজের ঘরে।

এই যে নবজন্মের আস্বাদ এল হেনার মনে, খাতার পাতায় তার একটুখানি আভাস দিয়েই সে চলে গেছে অন্য কথায়। তালুকদার সাহেবের মানস চক্ষে সেই ছবিটি স্পষ্টতর হয়ে উঠল। তিনি তো জানেন, এ হচ্ছে সেই চিররহস্যময় বয়ঃসন্ধি, যখন নিজেকে দেখে নিজেরই বিস্ময় লাগে। মনে হয়, যেন ঘুমিয়েছিলাম, রাতারাতি জেগে উঠে দেখি, আরেক দেশে এসে পড়েছি। যা কিছু দেখছি, তাই রঙীন, তাই স্বপ্নময়। প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন হঠাৎ অবাক হয়ে দেখে, তাদের সেই ক্ষীণাঙ্গী চঞ্চল, কিশোরী মেয়েটি কোথায় হারিয়ে গেল। তার জায়গায় যে এল তার প্রতি অঙ্গে দেখা দিয়েছে জোয়ারের জাগরণ। শুধু তনুরেখায় নয়, পূর্ণতার নবরূপ এসেছে তার গতিতে, তার চলার ছন্দে, তার কণ্ঠে তার হাব-ভাব লীলায়। যেখানে সেখানে সে ঝড়ের মত এসে পড়ে না। যখন তখন শোনা যায় না তার উচ্ছল হাসির কলধ্বনি। চোখের দিকে তাকালে চকিত লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেয়। একলা বসে ভাবে, কিন্তু ভেবে পায় না কী করবে তার নতুন-পাওয়া নিজেকে নিয়ে, কোথায় রাখবে তার এই হঠাৎ ভরে ওঠা লাবণ্যের সম্ভার। নির্জন ঘরের জানালা দিয়ে স্বপ্নময় দৃষ্টি পাঠিয়ে দেয় দূরে-দূরান্তরে! কী দেখে সে জানে না। কথায় কথায় সে আনমনা। কারো ডাক শুনলে চমকে ওঠে। অকারণে বুক ছাপিয়ে ওঠে উদ্বেল আনন্দে। কখনো বুক ভেঙে আসে অব্যক্ত বেদনায়। কেমন করে জানবে সে, কখন কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে বিদায় নিয়ে গেল তার কৈশোর, হৃদয়ের কানে কানে এসে গেল যৌবনের লিপি!

দেহমনের এই রূপান্তর বিশ্ব প্রকৃতির দান। সব মেয়ের জীবনেই আসে। হেনারও এসেছিল। কিন্তু এই নিতান্ত সহজ বস্তুটি যদি কোনো বিশেষ রূপ নিয়ে থাকে তালুকদারের চোখে, তার কারণ, এই মেয়েটির জীবনে এটা শুধু আবির্ভাব মাত্র। এল, কিন্তু প্রত্যাশিত পরিণতির পথ দিয়ে তাকে সার্থকতায় নিয়ে গেল না!

[ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

প্রয়াসী

রমেনের নেতৃত্বে একটা ডাকাতি করেছিল অশেষ। শ্রীমন্তদা'র অধীনে আরও গোটা দুই ডাকাতি করার পর তার স্বপ্ন সফল হল। তাকে নেতা করে শ্রীমন্তদা' পাঠালেন খাজনার গাড়ী লুঠ করতে। প্ল্যান হবে তার নিজস্ব, নিজেরই পছন্দে সে সুকুমার আর রমেনকে সঙ্গী হিসাবে নিল। এ বিরাট দায়িত্বের অর্থ সে জানে—যদি কো ভুল হয়, যদি কোন গোপন তথ্য পুলিশের কাছে ফাঁস হয়ে যায়, তাহলে শ্রীমন্তদা' নিজের হাতে তাকে শাস্তি দেবেন—সে শাস্তি মৃত্যু-দণ্ড পর্য্যন্ত হতে পারে—কোন স্নেহের দুর্বলতা তাঁকে তাঁর কর্ত্তব্য হতে বিচলিত করতে পারবে না। আশ-পাশের পনেরো-কুড়িটা গ্রামের গভর্ণমেন্টের খাজনা তুলে নিয়ে যাবে ঘোড়ার গাড়ীতে। একটুখানি পথ, তারপর ট্রেনে তুলে দেবে। দায়িত্ব নিয়ে যাবেন দেশী রেভিনিউ অফিসার তারক সোম—সাংঘাতিক লোক একটি! সব টাকা কালেক্ট করে নিজের গ্রামের বাড়ীতে রেখেছেন, সেখান থেকেই রওনা হবেন, সঙ্গে থাকবে দু'জন চৌকীদার আর কোচম্যান রহিম। তারক বাবুদের বাড়ীটা অশেষদের গ্রামের প্রায় আট-দশটা গ্রাম ছাড়িয়ে।

কি উপলক্ষ্যে তারক বাবুর বাড়ীতে একটু খাওয়া-দাওয়া ছিল—বেরোতে বেশ রাত হয়ে গেল। অবশ্য ভোরের মেলে যাবেন, অনেক সময় আছে—অসুবিধে কিছু নেই। আর পথও সামান্য—তাই স্বদেশীদের ভয়টাও নেই। বর্ষাকাল আকাশ ভরা ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, অল্প বৃষ্টি পড়ছে, বেশ অন্ধকার। অনেক খবর সংগ্রহ করেছে অশেষ। তারই দু'টির ওপর তার প্ল্যান গড়ে উঠল। এক—তারক সোমের সাত মেয়ের পর এক ছেলে—ভীষণ আদুরে। আর রহিমের একটি মাত্র মেয়ে মমতাজ—বুড়ো বাপের কলিজা।

সদর রাস্তাটা চলে গেছে ষ্টেশনে। ঘোড়ার গাড়ীতে পাঁচ মিনিটের পথ, রাস্তা মাটির রাস্তা—বর্ষায় বেশ জখম হয়েছিল, অশেষ, সুকুমার আর রমেন সন্ধ্যা হতে গা ঢাকা দিয়ে তারা গোড়ার দিকে ঝপাঝপ কোদাল চালিয়ে গোটা চারেক বিরাট গর্ত্ত করে দিল—কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টির জলে পূর্ণ হয়ে গেল। কোদালগুলো রমেন দৌড়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখে এল। তারপর তারা দাঁড়িয়ে রইল—সুকুমার আর রমেনের পরনে লুঙ্গী, মুখে দাড়ী, খালি গা, কোমরে ভোজালি—যদি প্রয়োজন হয়। এক সময় শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। অন্ধকারে ঠাওর করে দেখল ওরা এগিয়ে আসছে, গাড়ীটার দরজাগুলো বন্ধ, কোচবাক্সে রহিম আর একজন চৌকীদার আর পেছনে একজন। প্রথম গর্তটা পার হতে গিয়ে যে বিরাট ঝাঁকানি লাগল তাতেই ভেতর থেকে তারক বাবু চীৎকার করে উঠলেন।

"কি করছিস রে ব্যাটারা? মেরে ফেলবি নাকি?"

এরাও ভয় পেয়ে গেছে—তায় সামনের জলভরা আরও ক'টা গর্ত্ত দেখে আর এগুতে সাহস করলো না। রহিম চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"রাস্তা যে বড়ই জখম হইছে কর্ত্তা, ঘোড়া যাতি লারব, বনের পথে চলি? কি কন?"

—"তাই চল, একটু ঘুর হবে, সময়ও আছে।"

এই চাইছিল অশেষরা—একটু সময় না পেলে কি কাজ হয়?

বনের পথে ধীরে ধীরে চলল গাড়ী, অশেষরাও একটু তফাতে থেকে অনুসরণ করতে লাগল। বেশ একটু যখন এগিয়েছে লোকালয় ছাড়িয়ে; হঠাৎ অশেষ ছুটতে লাগল, একটু পরেই চীৎকার—

—"ও, চাচা, গাড়ী থামাও গো, ও চাচা, বাবুর বাড়ী বড় বিপদ, ও চাচা শুনছো।"

বিস্মিত রহিম গাড়ী থামাল—তারক বাবু দরজা ফাঁক করে মুখ বাড়ালেন। অশেষ তখন এসে পৌঁছেছে, হাঁফাচ্ছে—মাথায় গায়ে চাদর জড়ানো, মুখ প্রায় দেখা যায় না, সেই পুরোনো ক্ষমতাটাকে কাজে লাগিয়েছে সে—গলার স্বরটা বদলে ফেলেছে।

তারক বাবু প্রশ্ন করলেন—"কি হয়েছে?"

অশেষ দু' চোখ কপালে তুলে ফেললো—

—"তুমি তো তারক বাবু, তোমার ছেলের কলেরা হয়েছে যে গো, ধাত ছেড়ে গেছে; তবু বাবা 'বাবা' করে হেদুচ্ছে। দেখবে তো শীগ্‌গির এস।"—

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুলে উঠল—প্রশান্তর কলেরা—হতে পারে, দু-একটা হচ্ছেও—তাঁকে খুঁজছে প্রশান্ত। তারক বাবু চঞ্চল হয়ে ওঠেন—তবু প্রশ্ন করেন—"তুই কে, কি করে জানলি?"

অশেষ তড়বড় করে—"আমার বাড়ী তো সেই বর্দ্ধমানে, আমার বাবার দোকান আছে যে এই গেরামে, আমি এসেছিনু তার কাছে। তোমার বাড়ীর যে লোক খবর দিতে এসছেল, সে তো বমি করে পথের ধারে মাটি নেছে—আমি ঘুমুচ্ছি—ডেকে তুলে তোমায় খবর দিতে পাঠাল। যাবে তো চল শীগ্‌গির, পায়ে হেঁটেই যাওয়া ভাল, যা রাস্তা হয়েছে গাড়ীর থেকে পা চলবে তাড়াতাড়ি।"

খুব সত্যি কথা, এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করেন তারক বাবু—চৌকীদাররা, রহিম সবাই বিশ্বাসী, একবার প্রশান্তকে—ডাক্তারের ব্যবস্থা—"ওরে তোরা একটু অপেক্ষা কর, আমি এক্ষুণি আসছি।" তারক বাবু হনহন করে এগোল, অশেষও সঙ্গে যায়, তারপর খানিকটা গিয়ে—"ও মা গো, পায়ে যে কাঁটা ফুটলো" বলে বসে পড়ে। আবার বলে—

"তুমি দাঁড়িওনি বাবু, চলে যাও, আমি পরে যাব।" তারক বাবু অদৃশ্য হন। গাছের আড়াল দিয়ে সুকুমার আর রমেন ততক্ষণে গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু পরেই সবাইকে চমকে দিয়ে একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

"ও বাপজান, তুমি কুথা গেলে গো! আমি যে তোমার লগে আইস্যা আঁধারে কিছু দেখতে নারি গো!"

রহিম উঠে পড়ে—"আমার বেটীর গলা না! এই যে বেটী আমি, কাঁদিস না।" বলেই চৌকীদারদের হতভম্ব করে দিয়ে লাফিয়ে

চলে যায়। কি করে যে মেয়ে এখানে আসবে এ প্রশ্নও মনে আসে না তার পিতৃস্নেহের আধিক্যে। আর সেই মুহূর্তে লাফিয়ে পড়ে দু'জন—পলকে বলিষ্ঠ হাতে ম্যালেরিয়া-জর্জরিত চৌকীদার দুটোকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে মুখে কাপড় গুঁজে দেয়, বুকে চেপে বসে ভোজালির কোণ ছোঁয়ায় বুকে। ওদিকে স্নেহ-অন্ধ পিতার ডাক শোনা যায় দূরে "কোথা গেলি গো বেটী মমতাজ।"—বেটী তখন অশেষ হয়ে গাড়ীর ভেতর—তুলে নিল সিলকরা বাক্সটা—ছুটতে লাগল বন দিয়ে—একটু দূরে গিয়ে হুইসিল দিল—সঙ্গে সঙ্গে চৌকীদারদের ছেড়ে লুঙ্গি তুলে অন্য দুজনও লাফ দিয়ে পালাল। একটু পরে ব্যাপারটা বুঝে বৃথাই চৌকীদাররা ছুটোছুটি করতে লাগল এদিক-ওদিক। রহিম যখন বুঝল মমতাজ সেখানে নেই, তখন বৃথাই সে নিশির ডাক ভেবে নিদারুণ ভয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগল। আর তারক বাবু নিস্তব্ধ ঘুমন্ত বাড়ীর দোর ঠেঙ্গিয়ে সবাইকে ডেকে তুলে যখন বুঝলেন সব মিথ্যে, তখন বৃথাই দৌড়োলেন গজরাতে গজরাতে—"দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা হতভাগাকে।"

হতভাগারা তখন ভোল পাল্টে ভদ্রলোক সেজে সাইকেল চালিয়েছে জোর কদমে। শ্রীমন্তদা'র কাছে সিল ভেঙ্গে টাকা হবে গোণা, কাঠের বাক্সটা উনুনের রসদ যোগাবে। কাল-পরশুর মধ্যে আশ-পাশের দশ-বিশটা গ্রামের বাছা-বাছা বাড়ী তোলপাড় করবে পুলিশ কিন্তু কোন নিশানা পাবে না। কৈফিয়ৎ দিতে দিতে তারক বাবুর হবে প্রাণান্ত, চাকরী নিয়ে পড়বে টানাটানি—ভালই হল, এক ঢিলে দুই পাখী বাজিমাৎ।

আরও একটা বছর কাটলো। কত গোপন বৈঠক হয়, কত ছেলের ওপর কাজের ভার দেন শ্রীমন্তদা', মৃত্যুর সঙ্গে কোলাকুলি করে তারা—কখনও ফেরে, কখনও ফেরে না। লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অশেষ, কিন্তু বিপ্লবী দলের ছেলে, বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না। শেষে এক দিন এল বহু প্রতীক্ষিত দিন—কলকাতার দারুণ অত্যাচারী এক সাহেব, শিকার করতে যাচ্ছেন খবর পাওয়া গেল—আনন্দ করতে। অনেক বিপ্লবী তাঁর অত্যাচারে মৃত্যু বরণ করেছে, এবার তাই তাঁর পালা। ভার পড়ল অশেষের ওপর, নির্দেশ পাওয়া গেল ধরা কোন মতেই দেবে না। যদি পালাবার সুবিধে না থাকে, ব্যস্ত হবে না, পকেটে রইল পটাশিয়াম সায়নাইড—হাতে রইল রিভলবার। সহকর্মী চলল গোপাল।

সেই বনে এসে তারা কাঠুরের বেশে আস্তানা গাড়ল। দিন দুই গেল, সব কিছু দেখে-শুনে পথঘাট চিনে নিল ওরা। চিনে নিল লালমুখো সাহেবটাকে—যা ওদের লক্ষ্য। তৃতীয় দিন দুপুরে একটা সুযোগ পাওয়া গেল। সাহেবের একটা বয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছিল আপনি-আজ্ঞে করে, খাতির দেখিয়ে। তারই কাছে জানা গেল, সাহেবের শরীর খারাপ—শিকারে যাবেন না, অন্যরা যাবে। এত বড় সুযোগ আর আসবে না। অশেষরা তৈরী হয়ে রওনা হল—তখন দুপুরবেলা। পোষাক তাদের ছেঁড়া-খোঁড়া, হাল্কা ছদ্মবেশ। তাঁবুর দক্ষিণে কিছুটা দূরে একটা পুকুর-পাড়ে এসে দাঁড়াল ওরা। গোপাল ইট-পাথর চটে বেঁধে একটা পুঁটুলী করে রাখল। তার পর দুই বন্ধু আলিঙ্গনে বদ্ধ হল। অশেষ হেসে বলল—"চললুম গোপাল, যদি আর না ফিরি তো এবার

এমনি হেলাভরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন দেয় বিপ্লবী। তাকে হারিয়ে শুধু গ্রামের ফুটবল টিমের ক্ষতি হবে, আর কিছু না। তার পর দৃঢ় পদক্ষেপে সে এগিয়ে গেল। গোপালের চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে—অশেষহীন খেলার মাঠ, অশেষহীন অভিনয় কল্পনা করা যায় না।—অশেষ তখন পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়েছে।

তাঁবুর এলাকায় এসে পড়ল অশেষ—অদ্ভুত ভাল সুযোগ—সাহেব বাইরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বই পড়ছেন, সামনে টেবিলে হুইস্কির বোতল, গেলাস। আর কেউ নেই—চাকরদের তাঁবু থেকে অল্প কোলাহল ভেসে আসছে। সাহেবের কোমরে রিভলবার থাকতে পারে—থাক, ওটুকু ঝুঁকি না নিলে চলবে কেন? অশেষ সামনে এসে দাঁড়াল—পকেট থেকে রিভলবারটা তখন হাতে নিয়েছে—আরও কাছে এগিয়ে গেল; আর মাত্র চার পাঁচ হাতের ব্যবধান—সাহেবের হাতের বইএর ওপর তার ছায়া পড়েছে—চমকে চোখ তুলে তাকালেন সাহেব—আর পরমুহূর্তে ট্রিগার টিপল অশেষ—এক··দুই··তিন··কিছুই করা হল না সাহেবের—চেয়ার থেকে ঢলে পড়লেন··সামনের টেবিলটাও সেই ধাক্কায় ওল্টাল—হুইস্কিতে আর রক্তে মিশে গেল। এক নিমেষে চারদিক দেখে নিল অশেষ—রিভলবারের আওয়াজে চাকরদের কোলাহল থেমেছে—এখনি বেরিয়ে ওরা সব বুঝতে পারবে—তার আগেই—বাঁ হাতে পটাশিয়াম সায়নাইডটা ধরে দক্ষিণের পুকুরটার পথে অদৃশ্য হল অশেষ। একটু পরেই পেছনে শুনলো বহু পায়ের শব্দ—আর কোলাহল—অশেষ গতিবেগ বাড়ালো —গোপাল গুলীর আওয়াজ হতেই বোঝাটা হাতে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল—অশেষ কাছাকাছি আসতেই প্রাণপণ বলে সেটা পুকুরে ছুঁড়ে ফেলল—তারপর আঁকাবাঁকা বনের পথে অদৃশ্য হল দুজনে। দূর থেকে শুনলো পদশব্দ আর শোনা যায় না—কোলাহল আসছে পুকুরঘাট থেকে—সার্থক প্রচেষ্টা—ভ্রান্ত হয়েছে অনুসরণকারীর দল—ইটের বোঝা ফেলার শব্দে ভেবেছে আততায়ী পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর ভাবনা নেই—ওরা যখন ভুল বুঝতে পারবে, তখন এরা এ তল্লাট ছেড়ে গেছে—ভোল ফেলেছে পাল্টে।

এর পরেই কিন্তু গ্রামে ফেরা হবে না—সাহেবের মৃত্যুর আগে অনুপস্থিতি আর মৃত্যুর পরই উপস্থিতি—সন্দেহ হবে পুলিশের। দুই বন্ধু মাস কয়েক ভাল মানুষের মত দেশ ভ্রমণ করে বেড়ালো। শ্রীমন্তদা'দের সঙ্গে সব সংশ্রব ছিন্ন—পাছে সন্দেহ হয়। শেষে একদিন ফিরলো। শুনলো শ্রীমন্তদা' কলকাতায়—আজ ফিরবেন। আরও খবর—মাসখানেক আগে জেল থেকে খবর আসে—হঠাৎ রঞ্জনের গ্যালাপিন টাইপের টি, বি, হয়েছে—রঞ্জনের বাড়ীর লোক, শ্রীমন্তদা' চেষ্টার ত্রুটি করেন নি—কিন্তু কিছু হোল না—ক'দিন হল সে চলে গেছে চিরতরে—শেষ ক'দিন সে বার বার অশেষকে দেখতে চেয়েছিল। বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল অশেষ। তারপর বাড়ী ফিরে এলো। শ্রীমন্তদা' ফিরবেন জেনেও সন্ধ্যায় সে ছুটলো না—শুয়ে পড়ল। সহসা বিপ্লবীর কাঠিন্যের আবরণ ভেদ করে সারাশরীরটা তার কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠলো—বালিশে মুখ ঢেকে অশেষ কাঁদতে লাগল—যেমন করে একদিন কেঁদেছিল শৈশবে—মা মারা

দেখতে চেয়েছিলে তুমি···দেখা হল না একটি বারও !—শ্রীমন্তদা' তার পাশে বসে মাথায় হাত দিয়ে ডাকলেন,—"অশেষ !"

চমকে উঠলেও কান্না থামাতে পারল না অশেষ—শ্রীমন্তদা'রই কোলে মুখ লুকোলো সে—কান্নার বেগটা গেল বেড়ে। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে শ্রীমন্তদা' বললেন—"কাঁদিসনি অশেষ, রঞ্জন চলে গেল, তার অসমাপ্ত কাজ যে তোকেই সমাপ্ত করতে হবে ভাই! আর রঞ্জন-দেহটাই গেছে—ও বেঁচে থাকবে চিরকাল—ভারতের শহীদ মানুষ বলে কত সম্মান করবে পুজো করবে। এই তো আমাদের পুরস্কার রে।"

আরও বছর খানেকের মধ্যে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল—অসংখ্য হত্যা আর ডাকাতি—পুলিশ দিশেহারা হ'য়ে যাকে পেল তাকেই জেলে পুরে ফেলল। তার মধ্যে শ্রীমন্তদা'রাও সবাই গেলেন—শুধু অশেষ ও আরও কয়েক জন বাইরে রইল। সব কাজের ভার অশেষ নিজের কাঁধে তুলে নিল এবার। বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ তার একেবারে উবে গেল। উল্কার বেগে সে বাংলা ও বিহারের গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ছুটোছুটি করে শ্রীমন্তদা'র অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। বছর দুয়েকের মধ্যে সে অসংখ্য দল গড়ে তুলল—বিপ্লবের বহ্নি এতটুকু নিবতে দিল না। পুলিশ এবার তার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল—আই, বি, পুলিশের ধ্যানে জ্ঞানে একটি মাত্র নাম—অশেষ মুখোপাধ্যায়—ধরো যেখান থেকে পার—যেমন করে পার। পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে অশেষ—আজ শুনলো পুলিশ—অশেষ মুখোপাধ্যায় অমুক গ্রামে এসেছে, সাজ সাজ রব পড়ে গেল আই, বি, অফিসার দলবল নিয়ে ভুঁড়ির ওপর বেল্ট আঁটতে হাঁসফাঁস করতে করতে ছুটে এলেন, কোথায় কে? অশেষ হয়তো তখন মাঝি সেজে নৌকো ভাসিয়েছে অথবা সাহেব সেজে পাটনার ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় হেলান দিয়ে বসে ওলটাচ্ছে ইংরেজী নভেলের পাতা। পুলিশের ইনট্যালিজেন্ট ব্রাঞ্চকে বুদ্ধির খেলায় নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল সে।

এর মধ্যে অশেষ খবর পেলো বিয়ে হয়ে গেছে শান্তির, বেণুর, সুনীলেরও। কোনটাতেই সে থাকেনি। মামীমা কত দুঃখ করেন। কত ছেলেকে বলেন—"ওরে একবার তাকে আসতে বলিস।" তাদের সঙ্গে দেখা হলে কখনও অশেষ শুনতে পায়, কখনও পায় না। শুনতে পেলেও যাবার উপায় নেই—ক্ষুদ্র গৃহের অর্গল সে ভেঙেছে—সারা দেশে তার ঘর, স্নেহনীড়ের বাঁধন তো তার জন্য নয়। একদিন খবর এলো মামা মারা গেছেন। মুহূর্ত্তের জন্য মামীমার জন্য মনটা দুলে ওঠে—আবার কাজের চাপে ভুলে যায়। তারপর একদিন শুনলো মামীমার খুব অসুখ। বিপ্লবীর ধৈর্য্য বাঁধ ভাঙে—ক্ষুদ্র গৃহকোণ হাতছানি দেয়। রাতের অন্ধকারে গাঢাকা দিয়ে দু'বছর পরে বাড়ী ফিরল অশেষ। খিড়কীর পথে বাড়ী ঢুকে, মামীমার ঘরের দাওয়ার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল সে। বোধ হয় সবাই ঘুমোচ্ছে। দাওয়ায় সুনীল বসেছিল, প্রশ্ন করল, "কে?"

বড়দা! প্রমাদ গুণলো অশেষ। তবু বলল "বড়দা! আমি, অশেষ।"

অশেষকে বিমূঢ় করে দিয়ে সুনীল সস্নেহে বলল—"অশেষ! আয় ভাই, মা তোকে দেখবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন। আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?"

বড়দার পেছন পেছন অশেষ তন্দ্রাচ্ছন্ন মামীমার শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়াল, ডাকল—"মামীমা!"

চমকে চোখ মেলে অশেষকে দেখে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেললেন মামীমা—"অশেষ! তুই! এত দিনে মনে পড়ল বাবা! কি চেহারা হয়েছে রে! ও সুনীল, বৌমাকে বল ওর জন্যে খাবার আনতে।"

অশেষ বলল—"আমার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না মামীমা, তোমার অসুখ শুনে দেখতে এলাম। কিন্তু আমি এসেছি কেউ যেন না টের পায়—পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে আমায়।"

কথাটা কিন্তু চাপা রইল না। গ্রামের সবাই দলে দলে দেখা করতে আসতে লাগল—গ্রামের ছেলে এত দিনে বাড়ী ফিরেছে—তাম কি না এসে পারে?

তার ফলে পরদিনই এক আই, বি, অফিসার দলবল নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন—ঝানু লোক, নাম শুনেছে অশেষ। সামনা-সামনি দেখা হয়ে গেল। মুহূর্তে জেলে যাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হল অশেষ। তারপর হেসে আহ্বান জানালো—"এই যে আসুন মিঃ সেন, সত্যি এত দিন আপনাদের হয়রাণ করার জন্য দুঃখিত আমি। আপনাদের অনেকের প্রমোশন বোধ হয় বন্ধ করে রেখেছি তাই না? চলুন, আর দেরী কেন? রাজঅতিথি হবার জন্যে প্রস্তুত আমি। দেরী হলে আবার যদি পালাই, আপনার গ্রেড বাড়বার স্বপ্নটি এবারও ভাঙবে কি শেষে?"—

নির্বিকার ভাবে কথাগুলো হজম করলেন মিঃ সেন, ভাবলেন একবার পুরি আমার ডেরায়, তারপর বাছাধনকে দেখাচ্ছি···অশেষের আগমন সংবাদের মতই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল গ্রেপ্তারের সংবাদটাও। সারা গ্রাম ভেঙ্গে পড়ল তাদের বাড়ীতে। অসুস্থা মামীমা আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন—"কেন এলি অশেষ, কেন এলি তুই আমায় দেখতে?"

তাঁকে চাপা গলায় সান্ত্বনা দিল অশেষ—"কেঁদ না মামীমা, ছিঃ, পুলিশের কাছে দুর্বলতা প্রকাশ কি তোমার সাজে?" তারপর হেসে উঠল—"এই বা কেমন আবদার বাপু, রাজার বাড়ী রাজভোগ খেতে দেবে না একবারও!"···দিগন্তব্যাপী হাহাকারের মধ্য দিয়ে বলিষ্ঠ পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলল অশেষ—সশস্ত্র পুলিশবেষ্টনীর মাঝে। সুরু হল জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

শুধু সেনের ডেরায় নয়, অনেক আই, বি-পুঙ্গবের সঙ্গেই মোলাকাৎ হল। মিষ্টি কথা—'বাবা' 'বাছা'—অর্থের প্রলোভন—কিছুতেই যখন অশেষ কোথায় তাদের দলের রিভালবার আর ইস্তাহার লুকোনো থাকে এই 'তুচ্ছ' কথাটা বলে দিল না, তখন শাস্তিস্বরূপ সম্মুখ সমরে আহ্বান জানালেন তাঁরা—অবশ্য একতরফা—পরখ করে দেখলেন কত শক্ত হতে পারে কুড়ি বছরের ভেতো বাঙ্গালীর হাড়—কত তার সহ্য-শক্তি। পরীক্ষা দিলও অশেষ—শক্তি ও চৈতন্যের শেষ বিন্দুটি ক্ষয় না হওয়া অবধি স্থির হয়ে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল বিভিন্ন রকম অত্যাচারের সামনে, তারপর একসময় সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ল। খাঁটি ইস্পাত—ভেঙ্গে গেল—তবু মচকালো না। এর পর রাজবন্দী হয়ে অনেক জেলে ঘোরা হল—কোথাও কিন্তু শ্রীমন্তদা'র সঙ্গে দেখা হল না। কোথাও শোনে এক মাস আগে তিনি বদলী হয়ে গেছেন, কোথাও শোনে মাত্র দুদিন আগে। প্রথম দু'-চারদিন খারাপ লাগল—বাইরের কর্মচঞ্চল জীবন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে—কিছুতেই মন বসে না। তারপর এই পরিবেশেই সে অভ্যস্ত হয়ে গেল—এখানকার খেলা, প্যারেড, অভিনয়, হাতে-লেখা পত্রিকা—সবেতেই সে অগ্রণী হয়ে এগিয়ে গেল। পরিবর্তে পেল অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, অফুরন্ত ভালোবাসা, স্নেহ, প্রীতি ও মমতা। কাটতে লাগল দিন। একদিন বড়দার চিঠিতে জানলো মামীমা আর নেই। আজ আর কান্না পেল না অশেষের—ক্ষোভের হাসি হাসল সে—যাক্, সবাই তাকে মুক্তি দিয়ে গেল একে একে—কোন বন্ধন আর তার রইল না পৃথিবীতে। আই, বি, পুলিশ নতুন চাল চালতে অনেক বন্দীকে মুক্তি দিল—স্বগৃহে অন্তরীণ করে। অশেষেরও 'একদিন ছাড়পত্র মিলল—তিন বছর পরে।

গ্রামে পা দিয়েই শুনলো শ্রীমন্তদা' বাড়ীতে আছেন। তখনি ছুটলো সে। ঘরে ঢুকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল—শ্রীমন্তদা'র বিশাল দেহটা মিলিয়ে গেছে বিছানার সঙ্গে। আগের মতই নির্মল হেসে আহ্বান জানালেন শ্রীমন্তদা'—"আয় অশেষ, আমি জানতাম তুই ছাড়া পেলেই ছুটে আসবি, আয়, কত দিন দেখিনি রে তোকে!"

নিঃশব্দে প্রণাম করে পাশে এসে বসল অশেষ। ক্রমে ক্রমে শুনল বিনা সর্ত্তে শ্রীমন্তদা'কে মুক্তি দিয়েছে গভর্ণমেন্ট—শুধু একটি নিত্যসঙ্গী দিয়েছে—দুরারোগ্য রোগ ক্যানসার। অশেষের স্নানাহার বন্ধ হল। শ্রীমন্তদা'কে বাঁচাতেই হবে যে। তার ওপর আছে বিপ্লবের কাজ—এতদিনের অনুপস্থিতির ত্রুটি পূরণ করতে হবে। এক মাসেই পুলিশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল—কিন্তু কোন ছুতো পায় না যে গ্রেপ্তার করবে অশেষকে। অদ্ভুত কৌশলে অশেষ পুলিশের সব সর্ত্ত মেনে চলার ভাণ করতে লাগল। শত চেষ্টাতেও কিন্তু শ্রীমন্তদা'কে ধরে রাখা গেল না—মাস তিনেক পর মহাপ্রয়াণ করলেন তিনি। আর তার পরদিনই একটা ষড়যন্ত্র মামলায় অশেষের নাম ঢুকিয়ে তাকে হাজতে পুরে পুলিশ আক্রোশ মেটালো। মামলাও একতরফা—কিছুই হল না—অনেক বিপ্লবী বন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য কয়েদে ঢুকলো অশেষ। এবার আর রাজবন্দী নয়—তাই খাওয়া-শোওয়ার উপকরণের বাহুল্য নেই—শয্যা ছিন্ন, দুর্গন্ধ কম্বল, পরিধেয় ছোট প্যান্ট আর কোর্ত্তা, আহার্য্য ক্ষুদ সেদ্ধ, পুঁইডাঁটার ঘ্যাট, কাজ—ডাল ভাঙ্গা, হাপর টানা। জীবনের সে অধ্যায়ও একদিন শেষ হল—বাইরে এসে দাঁড়াল অশেষ—কিন্তু মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার আগেই আবার গ্রেপ্তার—বেধেছে মহাসমর—নিরাপত্তা বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

এমনি করে বিভিন্ন রকম বন্ধনদশার মধ্যে কখন যে কেটে গেল জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় ন'-দশটা বছর—টেরও পেল না অশেষ। কত রকম পরিস্থিতি, কত রকম পরিবেশ, কখনও প্রাচীরঘেরা প্রাঙ্গণে অবাধ বিচরণ, কখনও স্বগৃহে আবার কখনও অন্য কোন গ্রামে অন্তরীণ, আবার কখনও বা মোটা লোহার গরাদেয় ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে

কয়েদী। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ শুধু খবরের কাগজ মারফৎ। কি পরিবর্ত্তন এলো দেশে তার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতাই রইল না তার। তারপর একদিন রণকোলাহল স্তিমিত হয়ে এলো —ভারতের আকাশে-বাতাসে বাজলো স্বাধীনতার ভৈরবী সুর—তারই মাঝে একদিন জেলের লৌহকপাট উন্মুক্ত হল—অশেষ এসে দাঁড়াল বাইরে—মুক্ত আকাশতলে। একবার পিছন ফিরে তাকাল —বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার এতদিনের পরিচিত ছোট্ট জগৎ—কারাগার আর সামনে অনন্ত অপরিচয়ের সমুদ্র—কালের হাওয়ায় পাল্টেছে সব কিছু—যে উদ্দাম চঞ্চল যুগের সঙ্গে ছিল তার আশৈশবের মিতালি এ যুগের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য নেই।···অগণিত মানুষ চলেছে স্রোতের মত আপন আপন কাজে—তাদের কেউ চেনে না অশেষকে—বিপ্লবীদের "বুলেটকে।" কানে বাজল মায়ের কণ্ঠস্বর—"দেশের লোক তোর নামে শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে।"

সে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল শ্রীমন্তদা'র গম্ভীর স্বরে—"ভারতের শহীদ মানুষ বলে কত সম্মান করবে, পূজো করবে। এই তো আমাদের পুরস্কার রে!"

—মায়ের পক্ষে এ ভুল করা হয়তো স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু শ্রীমন্তদা'? তিনি কত দূরভবিষ্যৎ দেখে জাল পাততেন, তিনি কি করে এ-ভুল করলেন? সম্মান?—হঠাৎ হাসি পেল অশেষের। কে চেনে তাদের? ক'জন জানে শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তীর নাম? রঞ্জন মিত্রের নাম ক'জন শুনেছে? ক'জন খবর রাখে রঞ্জনের অসমসাহসিকতার, তীক্ষ্ণবুদ্ধির?—চব্বিশ বছর বয়সে যার জীবন শেষ হয়ে গেল! ক'জন মনে রেখেছে শীর্ণ শ্রীমন্তদা'র রোগপাণ্ডুর মুখখানা?

জনস্রোতে গা ভাসাল অশেষ।

তারপর? আরও কি জিজ্ঞাসা আছে? পাঠক, তোমার সহস্র কাজের ভীড় থেকে একবার চোখ তুলে জানতে কি তুমি চাইবে কোথায় গেল সেই অশেষ? উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ দলিত মথিত করে যে গেয়েছিল স্বাধীনতার গান উদাত্ত কণ্ঠে? সে কি শুধু স্রোতের টানে ভেসে গেল, নাকি পেল কোথাও তীর, আশ্রয়, শান্তিময় গেহ? শুধু অশেষ কেন? তার মত কত অগ্রজ ছেলে 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করেছিল—তাদের ক'জনকে আজ তোমার মনে আছে?

* * * *

অর্দ্ধসমাপ্ত ছবিটার পাশে পেনসিলটা রেখে চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসলেন জনৈক পোষ্টার আর বিজ্ঞাপন আর্টিষ্ট—ক্লান্ত দৃষ্টিতে সামনের খোলা ছোট্ট জানলাটা দিয়ে তাকালেন বাইরে। চৈত্র মাস—বিকেল হ'য়ে আসছে। মাথার ওপর করগেটের চালটা অসম্ভব তেতে আছে—উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ছোট্ট অন্ধকার ঘরখানা। বাইরেও দৃষ্টি প্রসারিত করা শক্ত—বড় বাড়ী, উঁচু চিমনী, কালো সর্পিল ধোঁয়া—প্রতি পদেই দৃষ্টি যেন হোঁচট খায়। তবু এর ফাঁক দিয়ে, ওর পাশ দিয়ে, তার মাথা দিয়ে কোন রকমে অগ্রসর হতে পারলে চোখে পড়ে এক টুকরো আকাশ—ওঃ! ডুবন্ত সূর্য্যের আলোয় লালে লাল হয়ে গেছে একেবারে। আজকের এই লাল আকাশ মনে পড়িয়ে দেয় আর এক যুগের কথা। সে যুগেও এমনি লাল হয়ে উঠেছিল আকাশ—রক্তঝরা লাল। কিন্তু হঠাৎ এ পরিবেশে আসার সার্থকতা কি? একটু সময় করে নিয়ে অশেষকে খুঁজতে বেরিয়েছি কি আমরা? কিন্তু কোথায় অশেষ? কোথায় বাঘা যতীন—মাষ্টারদা'র উত্তর পুরুষ—বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী? ঐ অর্দ্ধসমাপ্ত ছবিটার দিকে তাকালে এক কোণে দেখা যাবে বটে ছোট্ট করে সই করা আছে—অশেষ মুখোপাধ্যায়। তবে কি কিশোর অশেষ যে হাতে অসংখ্য বৈপ্লবিক ইস্তাহার আঁকত, সেই হাতেই প্রৌঢ় অশেষ আঁকছেন সিনেমা, ওষুধ আর ফুডের বিজ্ঞাপন—অন্নজলের সংস্থান করতে? কিন্তু নামের মিলই কি সব? চেহারায় কি কোন সাদৃশ্য আছে? বিপ্লবী অশেষের বলিষ্ঠ হাতের পেশীগুলোর লেশমাত্রও কি অবশিষ্ট আছে, বিজ্ঞাপন আর্টিষ্ট অশেষের শিরাবহুল হাতের ফাঁকে? কিশোর অশেষের একমাথা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া কালো চুলের এক গাছাও কি মিলবে না এই অকালবৃদ্ধ মানুষটার অল্প ক'গাছা পাকা চুলের মাঝে? তবে? তবু সহস্র গরমিলের মধ্যে একটা মিল চোখে পড়ে—ঐ যে রক্তাভ আকাশের পানে নিবদ্ধ দু'টি চোখ—ওরা যে সেই কিশোর অশেষের চোখ—তেমনি বিশাল, গভীর—তেমনি স্বপ্নালু! যদিও স্বপ্নটা ভেঙ্গে গেছে অনেক দিন! শুধু ঔজ্জ্বল্য এসেছে কমে—পড়েছে একটা ক্লান্ত আলস্যের আবরণ।

শেষ

ভালবাসার গোপন কথা

(Blake-এর 'Love's Secret' কবিতার অনুবাদ)

ভালবাসা নীরব মধুর নেইক' তাহার কোনই ভাষা,
বাতাস যেমন বয় নীরবে তেমনি তাহার যাওয়া-আসা।
নিজের প্রকাশ নিজেই করে কথা দিয়ে বলাই মিছে,
কথার ভিড়ে হারায় সে যে কথাহারার ধায় সে পিছে।
হৃদয় আমার উজাড় করে ভালবাসার কথা যত,
বলেছিলাম প্রিয়ায় আমার বারে বারে মনের মত।

প্রিয়া আমার কাঁপল বারেক কিসের ভয়ে সেই ত জানে,
শুধু জানি রইল না সে চলল কোথায় আপন টানে।
হঠাৎ দেখি পথিক সে এক এল বিজন পথটি বেয়ে,
যেমন আসে বিজন বাতাস নীরব মধুর পরশ ছেয়ে।
কোন কথাই বলে নি সে ভালবাসা চাওয়া-পাওয়ার,
তবু তাহার নীরব ছোঁয়ায় চলল ভেসে প্রিয়া আমার।

অনুবাদ: বীরেন্দ্রকুমার রায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

মৌরী নিজেই ভাবছিল, এবার না নামলেই নয়। যে সঙ্কোচটুকু বাধা হয়েছিল, সেটুকু কাটিয়ে ওঠা সহজ হতো মঞ্জু বা অমিতা সঙ্গে থাকলেই। তবু উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। এমনি সময় এলেন বাবা।

বাবার কাছে মেয়ের এ অনুপস্থিতি কিছুমাত্র বিস্ময়ের ছিল না। মেয়ের স্বভাব তিনি জানেন। নতুন পরিচয় যে সে সহজ করে না, করলেও সে পরিচয় যে তার নতুনের গণ্ডী ছাড়িয়ে এগোতে চায় না; আর না এগোনো পর্য্যন্ত দেখা পাওয়া যে তার কঠিন—এ তিনি ভালো রকমই জানেন। কিন্তু কন্যার এই স্বভাবের প্রশ্রয় যতীন বাবু আজ দিলেন না। ডাকটা দিলেন এসে তিনি আদেশের সুরে। অবশ্যি একেবারে নিখাদ নয়। সঙ্গে কিছুটা অনুনয়ের রেশও দিলেন মিশিয়ে—যেটাতে কাজ হয়। না যদি আসে কি করতে পারবেন, কি করতে পারবেন মেয়ে যদি তার আদেশ মান্য না করে? কিছুই না। যদিও বাপ-মার অবস্থাটা প্রায় সর্বত্রই কতকটা এই রকম, তবু যতীন বাবুর ক্ষেত্রটা কিছু আলাদা। পিতার প্রাপ্য অনেক পাওনা তিনি হারিয়েছেন নিজ দোষে।

আজও মৌরী বাবাকে দেখে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলো। যদি আর একটু আগে ও নেবে যেতো, তবে বাবার এ আসাটা তো ওকে দেখতে হতো না। কিন্তু এর ভেতর কি দোষের আছে কিছু?

আছে। কেউ এলে তো ওকে ডাকা ছেড়েই দিয়েছেন বাবা। আজ কেন এলেন—কেন না এসে পারলেন না?

ওর আজকের অনুপস্থিতি আর রোজের অনুপস্থিতিটা কি এক?

এক নয়, এক নয়। জানে মৌরী রোজের সঙ্গে আজ মিলানো চলে না। পাঁচ জনের ভেতর একজন সে, গিয়ে যদি না বসে, কিছুই যায়-আসে না। যদি বা যায়, মূল্য তার ধরার ভেতর নয়। কিন্তু আজ যে ওর উপস্থিতিটাই অতিথি আপ্যায়নের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, ওই যে আজ অতিথিকে খুসী করার প্রধান উপকরণ। আর ঠিক এই জন্য—এই জন্যই বাবাকে দেখে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলো মৌরী—যদি আর একটু আগে ও নেবে যেতো।

এ ছাড়াও কারণ আছে। মেয়েকে ভালো পাত্রে বিয়ে দেবার ইচ্ছে বাপ-মায়ের স্বাভাবিক ইচ্ছে। কিন্তু বাবার দু' চোখের ভেতর যে আলো মৌরী এই অন্ধকারের মধ্যেও চকচক করে উঠতে দেখতে পাচ্ছে—তা কেবল খুসীর আলো নয়, আনন্দের আলো নয়; ও জানে প্রচণ্ড লোভ মিশে আছে তার ভেতর। মেয়ের ক'টা বাড়ী ক'টা গাড়ী হলো, সে আঁচলের চাবি ডান দিক বা বাঁ দিক করে কত টাকা নাড়াচাড়া করবে, বাবার দৃষ্টি সে সব ছাড়িয়ে চলে গেছে রাজ্যের রাজকোষের দিকে। যে ঘরে মেয়েকে তিনি বিয়ে দিচ্ছেন সেখান থেকে রাজভাণ্ডার দূরের পথ নয়—অপেক্ষা ওর রওনা হবার। তার পর? তার পর তো শুধু চল্লিশ দ্যুয়ের মন্ত্রটি শিখে নেওয়া আর গাধার পিঠে গিনি মোহর তোলা—লুঠের টাকা লুঠে আনা। এমন কি ধরা পড়লেও মার্জিনাকে ছুটতে হবে না মুচির খোঁজে—ঘাড়-গর্দান সব ঠিক যায়গায় তো থাকবেই, হয়তো মিলে যাবে শিরোপাও।

কিন্তু তাঁকে সংশোধন করার শক্তি তো ওর নেই! নীরবে মৌরী নেবে এলো নীচে। ঢুকলো গিয়ে খাবার ঘরে। ওর দিকে তাকিয়ে অমিতা মুখ টিপে একটু হাসলো। মঞ্জু জানালো, স্বাগতম্। দুজনেই ভীষণ ব্যস্ত। এক্ষুণি সবাই এসে পড়লো বলে। একজন গ্লাসে গ্লাসে জল ঢালে বরফের টুকরো ফেলে আর একজন চটপট হাতে টেবিলে সাজায় ডিস-প্লেট।

অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো মৌরী। নিজেদের নিত্যদিনের খাবার ঘরটা যেন নিজেই চিনে উঠতে পারছে না সে। কালো জঙ-ধরা শিকের জানালায় ঝুলছে সাদা লেশের পরদা। দিনের বেলা হলে যার চেহারাটা দেখতে হতো বস্তীর মেয়ের গায়ে মূল্যবান পোষাক ঝোলার মতো। কিন্তু রাতের অন্ধকারে দেখাচ্ছে শুধু পরদাগুলোই। মাসের সওদারাখা বার্ণিস-ওঠা দেরাজটা ঢাকা হয়েছে জালি-নেটে। তার ওপর রয়েছে ফুলদানীতে নানা রংএর মরশুমী ফুল। ফলদানীতে ফল নানা দেশী বিদেশী। টেবিলে মূল্যবান বিলিতি ডিনার সেট আর কাচগ্লাসের গ্লাস। এক কথায়, লেসে-নেটে ফুলে-ফলে বিলিতি ডিনার সেটে কাচগ্লাসের গায়ে ঠিকরানো হাজার পাওয়ারের আলোতে ঝলমলে ঘরটার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হলো, ও যেন উপন্যাস বর্ণিত উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের কোন ডাইনিং রুমে এসে দাঁড়িয়েছে।

—তোর জন্য আর কি করতে পারি আমরা?

ঘরের মূল্যবান যা কিছু সব ছোট পিসির বাড়ীথেকে আনা। যা নেই, তা দেখানোর লজ্জায় মুখ কালো হয়ে উঠতে চায় মৌরীর। বলে—আর দরকার নেই। এমনিতেই অনেক বেশী করে ফেলেছিস।

—তবে এবার আমাদের ছুটি। পরিবেশনের ভার তোর—এ্যাঁ? সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সমর্থন জানালো অমিতাও—হাঁ ভাই তাই—কেমন?

সুদর্শনকে নিয়ে ঢুকলো এসে সবাই খাবার ঘরে। বিস্ময়ে দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল মৌরী, সরে গিয়ে দাঁড়ালো সে জানালার কাছে। আর ও নিজে না তাকিয়েও বুঝলো চেয়ার টেনে বসবার সময় বেশ স্পষ্ট ভাবেই ওর দিকে একবার তাকালো সুদর্শন।

মাছ-মাংসের ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে পিসিমা দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছে। ছোট পিসি গিয়ে দাঁড়ালেন সুদর্শনের পাশে গম্ভীর ভারিক্কী চালে। কোমরে শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে পোলাউ আর ফ্রাই-ডিস হাতে এসে দাঁড়ালো অমিতা, মঞ্জু। সাহায্য করতে লাগলো কানাইলাল। রান্নুর মনের ভার কমে গিয়েছিল। সে

বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে লাগলো সুদর্শনকে। অভ্যাগত অধম না উত্তম, তা কষবার কষ্টিপাথর হলো রামুর বাড়ীর ব্যবহারটা। বিশেষ করে বাড়ীর কর্তার মুখের চেহারা। যতীন বাবুর দিকে একবার তাকালেই ও বুঝতে পারে অতিথি ধনী না নির্ধনী। বাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত না অতিবাঞ্ছিত। দুপুরের আয়োজনে ও তেমন ধরে উঠতে পারেনি, এখন মাথা নাড়ছিল মনে মনে—দিদিমণির বর মস্ত কেউ। রোমাঞ্চ হয় রামুর, যদি কানাইলালের সাহেবের চাইতেও বড় কেউ হয়!

খাওয়া চলতে থাকে, কখনো এ-কথা সে-কথা, কখনো অমিতা মঞ্জুর কিছুই না নেওয়ার অনুযোগ, বাবা পিসিমাদের আরো একটু নেওয়ার পীড়াপীড়ি, বাসুদেবের তার নিজের ডিসটার প্রতি সুদর্শনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিমাণ দেখিয়ে তাকে উৎসাহিত করবার ভেতর দিয়ে। অমিতার অত হাসি কথার ভেতর দিয়েও মাঝে মাঝেই ধরা পড়ে যায় ওর মনের মেঘ। জয়দেব আজও ঠিক সময় এলো না—এক টেবিলে খেতে বসলো না। সমস্ত দিনের পরিমিতি বোধ ও এখনকার অটল গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মৌরী সামঞ্জস্য করে উঠতে পারে না সুদর্শনের মাঝখানকার ব্যবহারটা। সবার মাথার উপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দিয়ে জানালায় হেলে দাঁড়িয়ে থাকে সে। পরদাগুলো কখনো মৃদু বাতাসে দোলে, কখনো জোর বাতাসে ওড়ে। কিছু ঝির-ঝিরে বৃষ্টি মাথায়-মুখে এসে পড়ে যায় আরাম লাগিয়ে।

—এই দিদি! ধর ধর শীগ্‌গির। গেল হাতটা পুড়ে।

চমকে উঠে এগিয়ে এলো মৌরী আর ওর হাতে থালাটা তুলে দিয়ে পাখীর ডানা ঝাড়ার মতো ঝাড়তে লাগলো মঞ্জু ওর হাতটা—গেছে, একেবারেই পুড়ে গেছে হাতটা।

অমিতা হেসে উঠলো খিল-খিল করে। ওটা তো বরফ-ঠাণ্ডা মিষ্টির থালা।

কোমরে জড়ানো আঁচল খুলে মুখে হাওয়া দেয় মঞ্জু আর ওর দিকে একবার তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজেকে সহজ করে ফেলে মৌরী। বাবা মিষ্টি নেবেন না জানে, তবু প্রথমে গিয়ে দাঁড়ালো সে যতীন বাবুরই কাছে। সস্নেহ দৃষ্টিতে বাবা কন্যার দিকে তাকালেন—আমি কি মিষ্টি খাই মা!

মিষ্টি তিনি খান কিন্তু রাতের বেলা নয়। মিষ্টি দেখলে তার ফরাসী-প্রিয়া নাক কুঞ্চিত করে।

খাওয়া হয়ে গেলে আর যে কিছুতেই টেবিলে বসে থাকতে পারেন না, সে-কথাটা জানিয়ে অনুমতি নিয়ে উঠে পড়লেন যতীন বাবু। আর সুদর্শনের কাছে এসে মৌরী দাঁড়াতেই প্লেটের উপর হাত ঢাকা দিল সুদর্শন।

এগিয়ে এলো অমিতা—এ কি, মিষ্টি নেবেন না?

—আমি মিষ্টি খাইনে।

—তা হয় না। আমাদের মেয়ে প্রথম মিষ্টিহাতে এগিয়ে এসেছে ও ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।

নীরবে হাতটা ডিসের উপর থেকে সরিয়ে নিল সুদর্শন।

অমিতার বাধা দূর করতেই হয়ত পিসিমারা চলে গেলেন ঘর ছেড়ে। যদিও পিছু হটে গিয়েছিল মৌরী, তবু এগিয়ে এসে সুদর্শনের প্লেটে মিষ্টি দিতে হলো তাকে।

একটা দিলে কেন মৌ! নিজে তুলে এনে মিষ্টি দিলো অমিতা সুদর্শনকে। বললো—আর বেজোর চলবে না। একটা তুলে নিয়ে ডিসটা ঠেলে সরিয়ে রাখতে দেখে অভিমান ভরে বললো—খেলেন না তো?

—পারছি নে।

—আমি যে আরো কত পারি—কিন্তু লজ্জা করছে। মাথা চুলকায় বাসু।

চটছিল মৌরী অমিতার উপর। বাসুদেবকে দেওয়া হলে থালা রেখে চলে গেলো সে। ওর বিরক্তি বুঝতে বাকী রইলো না অমিতা মঞ্জুর। হাসলো ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে।

সুদর্শনের হাতে তোয়ালে তুলে দিচ্ছিল অমিতা—হন্তদন্ত ভাবে ঘরে এসে ঢুকলো জয়দেব। ফরসা জামা-কাপড় তার ছিটে বৃষ্টিতে ভেজা। কালো ঘন চুল আরো চকচকে দেখাচ্ছে জলে ভিজে ওঠায়। রুমাল দিয়ে ঘাড়-মাথা-মুখ মুছতে মুছতে মাপ চাইলো সুদর্শনের কাছে। মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বললো—ঠিক সময়ে এসেছি—তোদের খাওয়া হয়নি তো? যা ক্ষিদে পেয়েছে!

ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে থাকা অমিতার মুখ দেখলে কে বলবে এতক্ষণ সে এতো হেসেছে, এতো কথা বলেছে।

অমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো সুদর্শন। বললো—ক'টার সময় বাড়ী ফিরলে স্ত্রীদের মুখের হাসি মিলায় না?

হেসে উঠলো জয়দেব। গম্ভীর মুখে জবাব দিলো অমিতা—স্ত্রীদের মুখের হাসিটা মূল্যবান মনে হলে অপরের কাছ থেকে সেটা জেনে নিতে হবে না। আর তা না হলে শত শিখিয়েও লাভ নেই। চলুন। সুদর্শনকে অনুসরণ করতে বলার ভঙ্গিতে ডেকে বেরিয়ে গেল অমিতা।

দ্বিতীয় বার টেবিল তৈরী হলো। অমিতা আজ অনেক খেটেছে। তাকে বসিয়ে, ছোট পিসিকে ডেকে, মৌরীকে আপ্যায়নের ভঙ্গিতে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে, কানাইলালকে হাতে হাতে সাহায্য করে, পিসিমাকে খাইয়ে ছোট পিসির রওনা হবার সময় টিফিন কেরীয়ার ভর্ত্তি মিষ্টি বাড়ীর জন্য গাড়ীতে তুলে দিয়ে—এমন কি আবার বৃষ্টি নামলে যে ঠাণ্ডাটা পড়বে তাতে একটা চাদর গোছের কিছু দরকার হবে, ফের গিয়ে সেটা সুদর্শনের বিছানায় রেখে এসে মঞ্জু একেবারে তাক লাগিয়ে দিল সবার। অমিতা গলা জড়িয়ে ধরলো মঞ্জুর। অনেক ধন্যবাদ ভাই তোমাকে।

ওরা দু'জন যখন শোবার ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হলো তখন রাত একটা বেজে গেছে।

ঘরে ঢুকে চেয়ারে পত্রিকাপাঠরত জয়দেবের দিকে ফিরিয়ে তাকালো না অমিতা। যদিও ও জানে এ রাতে পত্রিকার পাতায় চোখ পেতে বসে থাকাটা ওরই পথ চেয়ে বসে থাকা। ঘরে এসে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলে সব অপরাধ ক্ষমা করলেও এ অপরাধটা ক্ষমা করে না অমিতা—অন্তত সে রাতটা বৃথা করে দেয়ই সে। আজ রাত অনেক হয়ে গেছে। আজও জয়দেব বসে থাকবে এতটা আশা করেনি সে। যে জন্য বসেছিল জয়দেব তা হলো অমিতা অর্থাৎ খুশী হলো।

সোজা আলনার কাছে চলে গিয়ে শাড়ী পালটে শরীরে পাউডার

চালে অমিতা—এক দিন জয়দেবের সঙ্গে রাগারাগি হওয়াতে মৌরীদের ঘরে চলে গিয়েছিল সে। মঞ্জু বলেছিল ক'দিন?

অনেক দিন। দেখবো আমার প্রয়োজন হয় কিনা।

কথাটা শুনে মুহূর্তের জন্য মৌরী বই-নিবিষ্ট দৃষ্টি তুলে ওর দিকে তাকিয়ে আবার বই-এ মন দিয়েছিল। সে দৃষ্টির অর্থ না বুঝতে পারার মতো বোকা অমিতা নয়। কলেজে-পড়া মেয়ে সে-ও। কিন্তু মৌরীর অনেক কথা অনেক ভাবই গায়ে মাখে না সে। প্রয়োজনের কথা বলেছ তো হয়েছে কি। জগৎটাই তো প্রয়োজনের পেছনে ছুটে চলেছে। শস্য বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে, গাছ আলোর দিকে বাহু মেলে দেয়, বীজ মাটি খোঁজে—প্রয়োজন বলে। চন্দ্র-সূর্য্য ফুল-ফল-জল; মানুষের প্রতিটি সম্পর্ক—জড় আর জীবজগতের যত চাওয়া কোনটা অপ্রয়োজনের? শুয়ে পড়লো সে। সে শোওয়া অপূর্ব। ও জানে উপাধানের উপর কি ভাবে খোলা হাতটা রাখলে, খোঁপাটা কতটা এলিয়ে দিলে, পা'র দিকের শাড়ী কতটা তোলা থাকলে, ফরসা ঘাড়-পিঠ বাহুর কতটা লালশাড়ীর ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেলে আকর্ষণের শক্তি জোরালো হয়। ও জানে, কি ভাবে সৌন্দর্য্য দিয়ে পুরুষকে মুগ্ধ করতে হয় আর সে জানা প্রয়োগ করতে সঙ্কোচ বোধ করে না একটুও। যুদ্ধ-বিগ্রহ হিংসা-দ্বেষ পুরুষ রূপবতীর জন্য যত করেছে, গুণবতীর আকর্ষণে কি কেউ তাদের তা করতে শুনেছে কোন দিন? ইতিহাসের পাতায় তো দূরের কথা, আজও পুরুষের হাতের সৃষ্টি সাহিত্যের পাতায় কই অমিতা তো রূপযৌবনের পায়ে মাথা কোটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না? গুণের কথা যে তারা এক-আধটু না লেখে তা অবশ্যি নয়—সে শুধু নিজেদের মান রক্ষার জন্য। পড়ে আর দেখে ও স্থিরনিশ্চয় হয়েছে যত দম্ভের কথাই বলুক, মেয়েদের গুণগত অনুৎকর্ষতার প্রতি যত বিদ্রূপবাণই বর্ষণ করুক—রূপের চাইতে বড় পুরুষের কাছে কিছু নেই। এর চাইতে খাতির তারা আর কিছুকে করে না। এ ছাড়া তারা আর কিছু চায় না। থাকলেও পীড়া অনুভব করে,—পীড়ন করে। মৌরীর এ কথাটা সে বিনা আপত্তিতে স্বীকার করে, খনার জিহ্বা কাটা যাবার ভেতর ঐতিহাসিক সত্য না থাক আছে পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক সত্য। আর তাদের চাওয়া দিয়ে তৈরী বলেই মেয়েরা গুণের ঘরে জ্ঞানের ঘরে আজও এমন দেউলে। সমস্ত দিনের অস্বীকারের পর এখন যে স্বীকৃতি স্বামীর কাছে সে পায়, সমস্ত দিনের অপমানের পর যে মান তার এখন মিলবে, সমস্ত দিনের পরাজয়ের পর যে জয় তার এখন তা কিসের? গুণ কি নেই ওর?

অলস ভাবে পাশ ফিরল অমিতা। শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে নিল পাখার হাওয়া। ঘুমিয়ে পড়া অমিতার কোন দায় নেই তা ঠিক করে দেবার। শঙ্কি কানে এলো জয়দেবের হাতের কাগজ ভাঁজ হবার—এখন যদি রিমঝিম বৃষ্টিটা আবার নামতো।

শোবার জন্য তৈরী হচ্ছিল মৌরীও। এ ব্যাপারটায় বিলাসী সে। একটি শিল্ক অন্তর্বাস আর একটি শিল্ক শাড়ী—দীর্ঘ দিনের অভ্যাস ওর। অবস্থার অভ্যাস নয় বরং অবস্থা অতিরিক্ত অভ্যাসই তবু হয়ে গেছে। সমস্ত দিনের দশ বিশ গজ কাপড়ের বোঝা নামিয়ে খালি শরীরে শুধু মাত্র কয়েক মুঠো নরম সিল্ক জড়িয়ে শোয়া—এ বেঁকি আরাম! কাপড় বদলে সেই আরাম উপভোগ করতে করতে বিছানার উপর বসে চুল বাঁধছিল সে, মঞ্জুকে ঢুকতে দেখে বললো—হলো রাজকার্য্য পরিদর্শন?

হাত দুটো পেছনের দিকে নিয়ে হাতের তালুর উপর শরীরের ভার রেখে খাটে বসলো মঞ্জু। বললো—পিসিমা বলেন, হিমালয়ের উপর ঋষি তপস্বীরা সব যোগাসনে বসে তপস্যা করছেন আর মাঝে মাঝে বলে উঠছেন 'স্বস্তি-স্বস্তি।' আমরা ভালো মন্দ যে কথাটাই বলি যদি তাঁদের সেই স্বস্তিবাক্য তার উপর এসে পড়ে, তবে তা ফলে যায়। ধর যদি তোর এই আমার রাজকার্য্য পরিদর্শনে বেরুবার কথাটার উপর ঋষিদের সেই 'স্বস্তি' পড়ে গিয়ে থাকে?

—তবে তুই রাজা হবি।

—হঠাৎ হঠাৎ তোরা যে আমার জীবনের কি ভবিষ্যৎ সত্যগুলো বলে ফেলিস, নিজেরাও জানিসনে। কিন্তু রাজা তো আর আজ-কাল হওয়া যায় না—মন্ত্রী।

বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বুজে শব্দ করলো মৌরী, হুঁ।

—আচ্ছা; রাজ্য থাকলে, প্রজা থাকবে, মন্ত্রী থাকবে, থাকবে সেনা আর সেনাপতি—সবই যদি থাকবে তো রাজা বেচারীরা দোষ করেছিল কি?

—হুঁ।

—অকর্ম সুকর্ম যাই হতো, হতো তো মন্ত্রীদেরই পরামর্শে।

—হুঁ।

—বুঝলি দিদি, এ মন্ত্রীদের চাণক্য বুদ্ধির চাল—রাজত্ব দখল করবার কৌশল। রাজাদের তাড়িয়ে রাজত্ব আর সিংহাসন দখল করেছে ওরা।

—দোহাই তোর মঞ্জু! মাথা ধরেছে এ্যাসপ্রো খেয়েছি।

—নে বাপু ঘুমো। উঠে বসে একমাথা জট চুলের ভেতর গায়ের জোরে চিরুণী চালাতে চালাতে গুন্ গুন্ করে উঠল মঞ্জু—

'সকলি তোমারি ইচ্ছা
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা
লোকে বলে করি আমি'—

—তুই কি পাগল হলি? রাত দুটোর সময় 'সকলি তোমারি ইচ্ছা' গাইতে বসলি।

—তাইতো। বৃষ্টি থেমে গেছে। তোর বিছানায় এক চাদর চাঁদের আলো, বাতাসে হাস্নুহানার মিষ্টি গন্ধ—নির্বাচনটা ঠিক হয়নি। 'মন, বলে চিনি চিনি' এটা গাইবো?

—মঞ্জু, সত্যি বলছি ভীষণ মাথা ধরেছে। অনুনয় করলো মৌরী।

কিন্তু বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসতে চাইলো না মঞ্জুর। এ-পাশ ও-পাশ করলো অনেকক্ষণ। তারপর কেমন যেন একটা বুকচাপা অস্বস্তি ভাব একেবারে ছটফটিয়ে তুললো ওকে। চেষ্টা করলো সহ্য করতে অনেকক্ষণ কিন্তু পারলো না। ঘুমিয়ে পড়েছিল মৌরী। মঞ্জুর ডাকে ঘুমভাঙ্গা লাল চোখ মেলে উঠে বসলো মৌরী বিছানার উপর। বললো—কি রে?

—বড্ড খারাপ লাগছে শরীরটা।

দেখ ! অৰ্দ্ধেকটী সানলাইট
সাবানেই এসব কাচা
হয়েছে!
অতিরিক্ত ফেণার দরুণই
এ সম্ভব হয়
SUNLIGHT
SOAP
Rs. 10,000
Reward!
SUNLIGHT
SOAP
সানলাইট
সাবান
জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে

উৎকণ্ঠিত ভাবে উঠে বাতি জেলে গিয়ে দাঁড়ালো মৌরী মঞ্জুর কাছে—কেন কি হয়েছে?

—ভালো লাগছে না।

মৌরী দেখলো, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে মঞ্জুর। মুখটায় ঢেলে দেওয়া হয়েছে যেন একরাশ কালী। ঠোঁট দুটো একেবারে সাদা। তাড়াতাড়ি জল এনে মঞ্জুর মুখে মাথায় জলের হাত বুলোতে লাগলো মৌরী। বললো—এতো কাজ করা অভ্যাস আছে নাকি যে সহ্য হবে! বাড়াবাড়ি করতে গেলে এমনি হয়।

হাত দুটো বুকের ওপর রেখে চোখ বুজে পড়ে থাকে মঞ্জু। মৌরী ঠাণ্ডা ভেজা হাতটা ওর চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে চালিয়ে বুলোয়। বলে ইস্, আগুন বেরুচ্ছে মাথা থেকে। বেশ কতটা সময় এভাবে কাটিয়ে তারপর জিজ্ঞাসা করে মৌরী, ভালো লাগছে একটু?

—একটুও না।

আরো কিছুক্ষণ কাটলো এই ভাবে। পড়ে রইলো মঞ্জু চোখ বুজে। শরীরের ভেতর শত্রুপক্ষে মিত্রপক্ষে যে যুদ্ধটা চলছে যেন তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে, সময় দিচ্ছে শান্তি স্থাপনের! তারপর যেন সেও অংশ গ্রহণ করলো সংগ্রামে। ছুটে গিয়ে বেসিনের ওপর মুখটা বাড়িয়ে ধরলো—তারপর কি পেট-নিংড়ানো বমি! কলের মুখটা চেপে ধরে ঝক্কি সামলায় মঞ্জু আর মৌরী হাত বুলোয় ওর পিঠে। এমনি হলো আরো ঘন ঘন তিন-চার বার। ভীত কণ্ঠে বললো মঞ্জু—কলেরা-টলেরা মতো কিছু নয়তো রে?

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগলো মৌরীর। এতক্ষণ সে ভেবেছে, দিনের অসহ্য গরম, ঝাল তেল মশল্লার গরম রান্না, অভ্যাস অতিরিক্ত কাজ—সব মিলে এটা হয়েছে। এবার ভয়ে সর্বশরীর মোচড় দিয়ে কি যেন একটা গলা পর্য্যন্ত উঠে এলো মৌরীরও। সত্যি যদি তাই হয়। কোথায় ডাক্তার, কোথায় ওষুধ! রাতের নির্জন পথটা ভেসে উঠলো চোখের উপর—কোথায় ট্যাক্সি! একটা ফোন তাও পর্য্যন্ত নেই কোন চেনা বাড়ীতে। দোকানপাট সব বন্ধ—বন্ধ পোষ্ট অফিসের পাবলিক ফোন। আকাশ প্রান্তর টানা বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মুহূর্তে ঝলকে গেলো কথাগুলো মৌরীকে কাঁপিয়ে। মুখে বললো—যাঃ। কিন্তু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল টেবিলটার কাছে সময় দেখতে। অসুখে-বিসুখে মানুষে আগে তো ভোরটাকেই ডাকে। কিন্তু ডাকলেই তো আর সে আসে না—এখনও ভোর হবার বাকী আছে। মঞ্জুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললো মৌরী—দূর পাগল; ওতে কি শুধু বমি হয়? ভাবিসনে। আমি এক্ষুণি আসছি।

বারান্দা দিয়ে হাঁটা দিল মৌরী। এখানে ওখানে জমে আছে বৃষ্টির জল। চাঁদের আলো পড়ে সে জল কোথাও চকচক করছে, কোথাও ধরে আছে সে জল পুরো চাঁদটাকে। টবের ফুল গাছের ছায়াগুলোকে বারান্দার মেঝের উপর দেখাচ্ছে নিপুণ শিল্পীর হাতের আঁকা ছবির মতো। জল চাঁদ আলো ছবি—উৎকণ্ঠিত পদক্ষেপে সব মাড়িয়ে চললো মৌরী।

ছোড়দার দরজা খোলা কেন? নিশ্চয়ই ভুলে গেছে বন্ধ করতে! ভালোই হলো—বাসুদেবের ঘরে গিয়ে ঢুকলো মৌরী। ছোড়দাকেই আগে তোলা যাক। কিন্তু দরজার সামনেই পড়লো হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে। খোলা দরজায় কাছে চেয়ারে বসে আছে সুদর্শন। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট!

উঠে দাঁড়ালো সুদর্শনও। আশ্চর্য্য কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে কি ব্যাপার? তারপর ওর হতভম্ব ভাব দেখে তুললো ভ্রূ কুঁ করে। বললো—আমি যে এখানে, সেটা জানেন বলেই [illegible] করছি।

জানে কিন্তু ভুলে গিয়েছিল—উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে একেবা ভুলে গিয়েছিল মৌরী—সুদর্শন, সুদর্শন ডাক্তার, সে এখ সে ছোড়দার ঘরে! তাকে ডাকতে ট্যাক্সি দরকার হবে ফোন লাগবে না। আনন্দে ও যে আবোল তাবোল কথা [illegible] বললো না সে ও অতি সংযত বলে। শুধু একটা হাত দিয়ে [illegible] একটা হাত চেপে ধরলো। বললো—একটু ভাঙ্গা গলায়ই বললো মঞ্জু হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বমি করেছে বার পাঁচ [illegible] তাই ডাকতে এসেছিলাম ছোড়দাকে।

—ছোড়দাকে! সে কি ডাক্তার? হাতের সিগারেটটা বাই ছুড়ে ফেলে দিয়ে পাঞ্জাবী গায়ে চাপালো সুদর্শন! তারপর জাম হাত দুটোকে ঠেলে উপর দিকে তুলে দিতে দিতে বললো—চলুন।

সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে এবার সহজ স্বরে বললো মৌরী ছোড়দাকে—

বাধা দিলো সুদর্শন। বললো—ডাকবেন ছোড়দাকে কি দরকার। প্রয়োজন না হলে কেন খামকা বাড়ীশুদ্ধ লোক ব্যস্ত করে তুলবেন। আগে দেখিই না আমি। কিন্তু মৌর থমকানো ভাব লক্ষ্য করে পড়লো দাঁড়িয়ে। চাঁদের আলো ভেতর দিয়ে একটা স্থির দৃষ্টি ফেললো মৌরীর মুখের উপর। তারপ হাসলো একটু। বললো আচ্ছা দাঁড়াচ্ছি। আপনি আপন ছোড়দা বড়দা যাকে হয় ডেকে নিয়ে আসুন গিয়ে।

লাল হয়ে উঠলো মৌরীর মুখ। 'আসুন' বলে পা চালা সে নিজেদের ঘরের দিকে।

ঘরে ঢুকে একটু সময় মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়ি রইলো সুদর্শন। তারপর বসে হাত বাড়িয়ে নিজের হাতে টে নিল মঞ্জুর হাতটা। একবার তাকিয়ে একটু হেসে চোখ বন্ধ কর মঞ্জু।

সুদর্শন রোগী দেখে। শিয়রে দাঁড়িয়ে মৌরী সুদর্শনের দে দেখে। কখনো তাকায় তার হাতের দিকে, কখনো তাকায় মু দিকে। লক্ষ্য করে সুদর্শনের মুখের চেহারা। সেখানে কে চিন্তার ছায়া পড়ে কি না।

সুদর্শন নাড়ী দেখলো! লম্বা লম্বা আঙুলে শাড়ী কাপড় উপর দিয়েই টিপে দেখলো পেটটা। বুক দেখার যন্ত্র নেই—হাত মঞ্জুর বাঁ দিককার বুকে রেখে হাতের চাপে পরখ করতে লাগ হৃদ্‌স্পন্দনের মাত্রা। মঞ্জুর নিঃশ্বাস ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বল লাগলো সুদর্শনের হাতের মূল্যবান হীরেটা। মৌরী ওর নিজে বুকের ধক্ ধক্ শব্দটা যেন কানে শুনতে পেতে লাগলো। [illegible] ফেরালো সে মঞ্জুর বুকের ওপর রাখা সুদর্শনের দীর্ঘ বলিষ্ঠ হাতট উপর থেকে। আর এতক্ষণে ওর হাত-পা অবশ করে দিয়ে [illegible] পড়লো, শুধু মাত্র শাড়ীর আঁচল ওর গায় জড়ানো। মঞ্জুর আচম তাকে যে ভাবে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়েছিল—তাই আছে

ধক্‌ধকানো বুকটার উপর আড়াআড়ি ভাবে হাত চাপা দিল মৌরী।

দেখা শেষ করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে সুদর্শন জানালো—কিছুই নেই ভয় পাওয়ার। ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, ওষুধ দিচ্ছি। বেরিয়ে গেল সে।

মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আগে একটা জামা গায়ে চাপালো মৌরী। তারপর নিরুদ্বেগ মন নিয়ে গিয়ে বসলো মঞ্জুর শিয়রে। 'ওষুধ দিচ্ছি' বলে যে ভাবে বেরিয়ে গেল সুদর্শন ও বুঝলো ওষুধ তার কাছেই আছে।

ফিরে এসে নিজে হাতে ওষুধ খাওয়ালো মঞ্জুকে সুদর্শন। কপাল ঘাড় কানের পাশ জল দিয়ে দিল বেশ করে ধুইয়ে। ভিজে-যাওয়া বালিশটা বদল করে দিল মৌরীর খাট থেকে বালিশ তুলে নিয়ে। চোখ তুলে খুঁজে দেখলো ঘরের সুইসবোর্ডটা কোথায়। পাখার স্পীডটা দিলো বাড়িয়ে। তারপর আবার চেয়ার টেনে মঞ্জুর হাতের নাড়ীতে তিন আঙুলের টিপ রেখে বসলো।

ঠায় দাঁড়িয়ে মৌরী। কিন্তু সুদর্শন না চাইলো তার কাছে কোন সাহায্য না কইলো তার সঙ্গে কোন কথা, না তাকালো একবার তার দিকে। মিনিট দু'-তিন পর উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আর দরকার হবে না। এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বে। বলেই চলে যাচ্ছিল হঠাৎ দরজার মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো—কাল সকালে চলে যাবো। আপনি নিশ্চয়ই তখন আসবেন না। বিদায় সম্ভাষণটা এখানেই জানিয়ে যাচ্ছি, নমস্কার!

আবার নিজেকে ভালো লাগিয়ে গেলো সুদর্শন। আর ভালো লাগিয়ে দিয়ে যাওয়াটা দিয়ে যাওয়ার চাইতেও বেশী নিয়ে যাওয়া। ওর মনটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল সুদর্শন একেবারে তার ঘর পর্য্যন্ত। আর তার বেতের চেয়ার টেনে বসা, তার সিগারেট ধরানো তার চোখ ছোট করে ধোঁয়া ছেড়ে চলার সঙ্গী হয়ে যে মৌরী আছে এ কথা জানতে পারলে সুদর্শনের পক্ষে শান্ত ভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে চলা হয়তো সম্ভব হতো না।

শেষ রাতের আবছা অন্ধকারের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হয়ে গেল মৌরী। রোগা চোখ দুষ্টুমিতে ভরে মঞ্জু তাকিয়ে আছে ওরই দিকে। ঘুমোস নি?

—ডাক্তার 'ঘুমিয়ে পড়েছে' না 'ঘুমিয়ে পড়বে' কোনটা বলে গেলেন?

ঘুমের ওষুধ দিয়েছে সুদর্শন। পড়বে বলে গেলেও পড়াটা ঠেকিয়ে রাখতে পারছিল না মঞ্জু। হাত পা আসছিল অবশ হয়ে। চোখের পাতা দুটো হয়ে উঠছিল শীশের মতো ভারী। তবু ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল না ওর। সেরে উঠে ভারি ভালো লাগছিল। ভালো লাগছিল শেষ রাতের হাওয়া আর ফুলের ভেসে আসা গন্ধ। ভালো লাগছিল, শাড়ীর কচি-কলাপাতা রংটার মতো ভালো লাগার নরম হয়ে আসা মৌরীর মুখটা। ও জোর করে চোখ খুলে রাখছিল, কথা বলছিল। বললো আহা, অসুখটা যদি আমার না হয়ে তোর হতো। ডাক্তার রোগী দেখে কি আনন্দটাই না পেতেন?

—আচ্ছা তোর জন্যই না এই মাত্র ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলাম!

—তা আমি কি করবো অসুখ সেরে গেলে? স্বপ্নে হাসার মতো হাসলো মঞ্জু আবার অসুখ করবো—কিন্তু আর পারলো না, চোখের পাতা দুটো যেন নিজ থেকেই এক হয়ে গেল ওর। বাতি নিবিয়ে দিল মৌরী।

পরের দিন। সুদর্শনের ট্যাক্সি ছেড়ে দিতেই সামনে দাঁড়ানো রামুকে প্রচণ্ড ভাবে ধমকে উঠলেন যতীন বাবু—উল্লুক, দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি?

কড়কড়ে একটা দশ টাকার নোট বকশিশ দিয়ে গেছে ওকে সুদর্শন। চালে চলনে মেজাজে কানাইলালের সাহেবের চাইতে বড় দরের মনে হচ্ছিল রামুর সুদর্শনকে। এ বাড়ীরই তো জামাই কানাইলালের সাহেব। একটা আস্তো টাকা কোন দিন ওর ভাগ্যে বকশিশ মেলেনি। হাউই সার্ট আর ঢিলে পাজামা পরিয়ে মনে মনে প্রায় নিজেকে দিদিমণির সঙ্গে লক্ষ্ণৌ রওনা করিয়ে দিয়েছে আর সেই খুসীই মুখে ফুটে উঠেছে—চমকে উঠলো রামু অযথা দুর্ব্যবহারে। কাঁদো-কাঁদো মুখে চলে গেল সে ভেতরে।

বুঝলো সবাই—জয়দেব বাসুদেব অমিতা। তারাও চলে গেল একে একে। যতীন বাবু পায়চারী করতে লাগলেন এদিক ওদিক। রাতে ডাকতে গিয়ে মেয়ের মুখের যে চেহারা দেখেছিলেন লজ্জার মাথা খেয়ে আর তাকে ডাকতে যেতে পারেননি তিনি। কিন্তু এতো-গুলো লোকের ভেতর এ বুদ্ধিটা কারু হলো না!

হয়েছিল। সবার হয়েছিল। পিসিমা পারেন নাই যে কারণে যতীন বাবু পারেন নাই। আর সবাই এসেছিল ফিরে।

ওষুধের ঘুম। অচৈতন্য হয়ে ঘুমোচ্ছিল মঞ্জু। জেগে উঠে যখন শুনলো, রেগে বললো—বাড়াবাড়ির একটা মাত্রা আছে।

—সে মাত্রা সবাই ছাড়াচ্ছে বলেই আমি ভারসাম্য রক্ষা করছি।

—দোহাই দিদি থাম। মা তোকে কি মাত্রাটানাটাই হাতে-খড়ির সময় শিখিয়েছিলেন।

—হাঁ, মাত্রাবোধটাই সৌন্দর্যবোধের প্রথম এবং প্রধান অঙ্গ।

আর কি বলতে পারে ও? ও কি বলতে পারে, চুলের ভেতর হাত চালাতে চালাতে শেষ রাতের অস্পষ্ট আলোয় এক আকাশতারা পেছনে রেখে সুদর্শন যে বিদায় সম্ভাষণ ওকে জানিয়ে গেছে সে ছবিটার উপর দিনের চড়া ছবি ও চাপাতে চায় না। যে সুরটুকু কাল রাতে বাঁধা হয়েছে চায় না তাতে হাত ছোঁয়াতে—যদি ছিঁড়ে যায়।　　[ক্রমশঃ।

কর্ম্মযোগ কি?

"সর্ব্বভূতে হরির সেবা—জীব-জন্তুর মধ্যেও হরির সেবা যদি কেউ করে, আর যদি সে মান চায় না, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গ চায় না, যাদের সেবা করছে তাদের কাছ থেকে উলটে কোনও উপকার চায় না, এরূপ ভাবে যদি সেবা করে, তাহলে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম, অনাসক্ত কর্ম্ম করা হয়। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করলে তার নিজের কল্যাণ হয়। এরই নাম কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগও ঈশ্বর লাভের একটি পথ।"　　—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

বিবেকানন্দ স্তোত্রে

সুমণি মিত্র

২০

আচ্ছা বলতো রাজা—
ধর্ম-জীবনে
প্রতীক-পূজারী কারা নন্?

* * *

"Superstition
Is a great enemy of man,
But
Bigotry is worse.

Why does a Christian
Go to church ?
Why is the Cross holy ?
Why is the face
Turned towards the sky
In prayer ?
Why are there
So many images
In the Catholic Church ?
Why are there
So many images
In the minds of the Protestants
When they pray ?

My brethren,
We can no more
Think about anything
Without a mental image,
Than we can live
Without breathing."১

২১

ঈশ্বর নিরাকার মুখে বললেও
আমরা সবাই
ধর্ম-জীবনটাতে
প্রতীকের সাহায্য চাই।
'হিন্দু হিদেন' যেটা সজ্ঞানে করে
মূর্খেরা করে না-জেনেই !
খৃষ্টান্, মুস্লিম, ইহুদী বা বৌদ্ধই হোক্,
ইরাণী বা পারসীক্,
সকলেই প্রতীকোপাসক।

ইহুদীর মন্দিরে থাকে কেন 'আর্ক' ?
এক জোড়া ডানাওলা দেবদূত আর
'ঈশ্বরাদেশ' কেন রক্ষিত তাতে ?
খৃষ্টান কেন তাতে বাইবেল রাখে ?
ক্যাথলিক-পন্থী বা গ্রীক্-খৃষ্টান,
যীশুর মূর্তিটাকে
সযত্নে কেন আঁকড়ান্ ?
প্রোটেষ্ট্যাণ্টও কেন
'সর্বব্যাপী'টিকে
ব্যক্তিবিশেষরূপে চান্ ?
কেন চার্চ 'সেক্রেড্' ?
বাইবেল কেন পুজো খান্'
আজও কেন এশিয়ায়
পাঁচ হাত মাটি খুঁড়ে
সোনার বুদ্ধদেব পান্?

পার্সী বা ইরাণীরা
আগুনের পুজো করে কেন ?
মুসলমানই বা কেন
নামাজের সময়েতে
তীর্থ 'কাবা'র দিকে চান্ ?
'কাবা'র ও-মসজিদে
'কৃষ্ণপাথরে' কেন

১। "কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু তার চেয়েও সাজ্বাতিক শত্রু হোচ্ছে—সঙ্কীর্ণতা। আচ্ছা, যদি ঈশ্বর সর্বব্যাপীই হন, তা'হলে খৃষ্টান চার্চে যান কেন ? কেন তাঁরা 'ক্রুশ'কে এত পবিত্র মনে করেন ? প্রার্থনার সময় কি জন্যে তাঁরা আকাশের দিকে তাকান ? ক্যাথলিক্দের ধর্মমন্দিরে এত মূর্তি স্থান পেলো কেন ? প্রার্থনা কালে প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের মনে এত ভাবময়ী মূর্তির আবির্ভাব হয় কেন ? তাই, বিনা নিঃশ্বাসে যেমন আমাদের জীবন ধারণ করা অসম্ভব, সেই রকম মূর্তিবিশেষের সাহায্য বিনা আমাদের পক্ষে কোনো কিছু চিন্তা করাটাই সম্ভব নয়।"
—The Chicago Addresses. (page 14).

মুসলমানেরা চুমু খান ?
'জিম্‌জিম্' থেকে কেন
এক ঘটি জল তুলে
পাপ থেকে নিষ্কৃতি চান ?
শ্রদ্ধায় নত হোয়ে
ফকীরের কবরেতে
কেন তবে প্রদীপ জ্বালান ?

* * *

অতএব মূর্খ 'brethren',
"It is vain
To preach
Against the use of symbols
And
Why should we
Preach against them ?—
We are all born idolaters,
And idolatry is good,
Because
It is in the nature of man."২

* * *

তাই দেখি আজ,
আধুনিক ইউরোপী
উগ্র প্রোটেষ্ট্যাণ্ট, যাঁরা
প্রতীকের বিরুদ্ধে
সর্বদা দাগেন কামান,
ধর্ম-জীবনে তাঁরা
'অগাস্ত্‌' ও 'কোম্‌তে'র
সাক্ষাৎ চ্যালা বোনে যান্ !
স্বধর্ম-বিচ্যুত
'অজ্ঞেয়বাদী' তাঁরা,
সর্বদা 'এথিক্' আওড়ান্ !

২২

তাই বোলে বোল্‌ছিনা—যতোদিন পারো
মূর্তির ছায়াতলে ক'ষে ঘুম মারো,
প'ড়ে থাকো প্রতীকের অচলায়তনে,
'চরৈবেতি'র ঐ মন্ত্রটা ছাড়ো।

"It is very good
To be born in a church,
But it is very bad
To die in a church.

It is very good
To be born
Within the limits
Of some certain forms
That help
The little plant of spirituality,
But
If a man dies
Within the bounds
Of these forms,
It shows
That he has not grown,
That
There has been
No development
Of the soul."৩

২৩

দুটো দল প্রতীকের উপাসক নন্,
পরমহংস আর যারা নরাধম।
এ-দুয়ের মাঝখানে আর সকলের
প্রতীকের প্রয়োজন আছে বেশি-কম।
পরমহংস,—তিনি প্রতীকের পার।
ছাদে উঠে প্রয়োজন নেই সিঁড়িটার।
ছাদে যে চায় না যেতে চায় না সে সিঁড়ি,
মূর্তি চায় না তাই মূর্খ, গোঁয়ার।

"Two sorts of persons
Never require any image—
The human animal
Who never thinks of any religion,
And the perfected being
Who has passed
Through these stages.

Between these two points
All of us require
Some sort of ideal,
Outside and inside."৪

২। "প্রতীকের বিরুদ্ধে প্রচার করা বৃথা আর কেনই বা তা' কোরবো ? আমরা সবাই আজন্ম মূর্তিপূজারী, আর মূর্তি-পূজো কল্যাণকর, কেন না এটা মানুষের স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে।"
—Bhakti or Devotion. (Complete works, vol II, page 39)

৩। "চার্চে জন্মানো ভালো কিন্তু সেখানে মরাটা অত্যন্ত খারাপ। কোনো বিশেষ বিশেষ মূর্তি—যারা আধ্যাত্মিকতার চারা-গাছটাকে জীবন ধারণে সাহায্য করে—তাদের মধ্যে জন্ম নেওয়া ভালো, কিন্তু তাদের বন্ধনের মধ্যে যদি মৃত্যু হয়, তা'হোলে বুঝতে হবে সে বাড়েনি, তার আত্মার কোনো উন্নতিই হয়নি।"
—Realisation and its methods (page 83)

৪। "দু'থাকের লোকেরা কখনোই প্রতিমা-পুজো করেনা—এক হোচ্ছে নরাধম, যারা ধর্ম সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন, আর হোচ্ছেন বিশুদ্ধাত্মা—এই সব অবস্থাগুলোকে যাঁরা পেরিয়ে এসেছেন। এই দুটো থাকের মাঝখানে আমরা যারা আছি, তাদের সকলেরই কোনো না কোনো আদর্শ চাই, তা সে বাইরেই হোক আর মনেই হোক।"
—Addresses on Bhakti-Yoga. (Complete works, vol IV, page 45)

২৪

পরমহংস আর পাষণ্ড ছাড়া
প্রতীকের শত্রুতা কোরে থাকে যারা,
তাদের দেখতে হবে করুণার চোখে ;
মূর্খ, বাচাল আর অসত্য তারা।

যতদিন স্বক্ষেতে যাচ্ছেনা মন,
জড়ের ওপরে টান রয়েছে যখন,
অপরের সাহায্য চাই যতোদিন,
ততোদিন প্রতীকের আছে প্রয়োজন।

যতোই বলোনা কেন—'তিনি নিরাকার,'
'সর্বব্যাপী' আর 'অসীম-অপার',
ওটা হোলো বড়োদের গালাগালি শুনে
ছেলেরা যেমন বলে—'পাজী-নচ্ছার।'

মানেই বোঝেনা তার, তবু বলা চাই ;
ইচ্ছেটা—রাতারাতি ঢ্যাঙ্গা হোয়ে যাই।
ধর্ম কি বাক্যির বাটি-চচ্চড়ি ?
অনুভূতিহীন ছুটো শুক্‌নো কথাই ?

বুদ্ধির বোল্-চাল কলেজেই কাটে,
বিকোয়না আধ্যাত্মিকতার হাটে।
বিত্তেতে হোতে পারো 'মাউন্ট এভারেষ্ট',
হয়তো বামন তুমি নিজেকে জানাতে।

'বিধাতা সর্বব্যাপী' বলাটাই সার,
ব্যাপ্তির কতোটুকু ধারণা তোমার ?
যতোই বলোনা মুখে তবলার বোল,
সে-বোল হাতেতে আনা দুরূহ ব্যাপার!

আচ্ছা, ভাবোতো দেখি অসীমের কথা ;
এখনি পরখ করো অসীম মূঢ়তা।
অসীম বোল্‌তে তুমি বোঝোনা কিছুই,
কিংবা যা বোঝো সেটা তার উল্টোটা!

অসীম বোল্‌তে তুমি ভাবো খুব জোর
সুনীল আকাশ আর সবুজ সাগর।
আকাশ ও সমুদ্র—ছুটোই প্রতীক,
তবে ওরা ঢোকে কেন মনের ভেতর ?

তাও তাকে তোমার ঐ দৃষ্টিসীমায়
সীমায়িত কোরে নিয়ে তবে তাখা যায়।
বোধাতীত অসীমকে ভাব্‌তে গেলেই
অসীম সসীম হন্ বোধের সীমায়।

একসেরা-ঘটিতে কি বেশি দুধ ধরে ?
ছ'সের ধরাতে গেলে পাঁচসের পড়ে!
মন বা বুদ্ধি বলো, একসেরা-ঘটি ;
[illegible]

অতএব অসীমকে জেনে বা না-জেনে
সীমায়িত করো তাকে বুদ্ধির 'ফ্রেমে'।
বুদ্ধিটা কোনোদিনই অনন্ত নয়,
কিছুটা ছুটেই ব্যাটা মরে ঘেমেঘেমে!

যাই হোক, এখানে সে-প্রসঙ্গ থাক্,
কেন ওরা আসে মনে তাই ভাবা যাক্।
অসীমের প্রসঙ্গে কেন আসে ঐ
আকাশ ও সাগরের জোড়া ফটোগ্রাফ্ ?

প্রতীকের মাধ্যমে কেন তাকে চাও ?
সাগরের সাহায্য কেন নিতে যাও ?
ও-ছুটোকে মন থেকে বাদ দিলে কেন
থাকেনাকো অসীমের কোনো চিন্তাও ?

মনেতে বিশেষ কোনো ভাব আসে যেই,
অমনি প্রতীক আসে সেই নিমেষেই।
কিংবা প্রতীক দেখে মনে প'ড়ে যায়
একটা বিশেষ ভাব, ভাবি সেইটেই।

পুরীতে বেড়াতে গিয়ে সমুদ্র দেখে
অসীমের চিন্তাটা ওঠে মন থেকে,
কিংবা অনন্তের প্রসঙ্গ হোলে
সমুদ্র ছুটে আসে সেই পুরী থেকে।

অতএব কেউ যদি নিজেদের ভাবে
প্রতীকের মাধ্যমে অসীমকে ভাবে,
'কাবার পাথরে' আর 'ক্রুশে'তেই হোক্,
সসীমেই অসীমের গন্ধটা পাবে।

'নিরাকার ব্রহ্মে'র মোক্তার তাই
অসীমকে চান যাঁরা প্রতীক ছাড়াই,
এখন প্রশ্ন এই—তাঁরা কাকে চান ?
ব্রহ্মকে সত্যি, না প্রতিষ্ঠাটাই ?

বোলুন সত্যি কোরে তাঁরা কাকে চান ?
সত্যকে সত্যি, না নিজেদের নাম ?
প্রথমের প্রার্থীরা মুখরতাহীন,
দ্বিতীয়ের প্রার্থীই তর্ক বাধান।

হিন্দুতো বোলছেনা প্রতীকটা শ্রেয়,
প্রতীকের মাধ্যমে 'ব্রহ্ম'কে চেয়ো।
প্রতীকের উপাসনা বোলে কিছু নেই,
'ব্রহ্ম'ই উপাস্য, 'ব্রহ্ম'ই ধ্যেয়। ৫

৫। 'প্রতীকোপাসনা'র অর্থ কি? প্রতীক শব্দের অর্থ হোচ্ছে—বাইরের দিকে যাওয়া, আর প্রতীকোপাসনার অর্থ—ব্রহ্মের পরিবর্তে এমন এক বস্তুর উপাসনা, যা একাংশে কিংবা অনেকাংশে 'ব্রহ্মে'র খুব সন্নিহিত, কিন্তু ব্রহ্ম নয়। ভগবান রামানুজ তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে বোলেছেন—"অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যাঽনুসন্ধানম।" অর্থাৎ, "ব্রহ্ম নয়, এমন বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি কোরে ব্রহ্মের অনুসন্ধানকেই

সবই তো ব্রহ্ম, তবু সেই সত্তাকে
সবেতে স্থাপার আগে স্থাপে একটাতে।
প্রতীক পুজোর মানে আর কিছু নয়,
ব্রহ্ম-দৃষ্টি দিয়ে স্থাপা একটাকে।

এ-ভাবে ব্রহ্মবোধ জেগে যাবে যেই,
তখন আর প্রতীকের প্রয়োজন নেই।
ব্রহ্ম-দৃষ্টি দিয়ে দেখবে তখন
ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সব কিছুতেই।

দ্বিতীয়রহিত সেই মহাসত্তায়
কেউ যদি কোনোদিন এক হোয়ে যায়,
তখন পুজোর কথা ওঠেনাকো আর।
কে কাকে চাইবে বলো, কে থাকে যে চায়?

পুজাদিতে অন্ততঃ দু'জন তো চাই?
একা হোলে ওঠেনাকো পুজো কথাটাই।
তোমার ও ব্রহ্মের ভেদ মুছে গেলে,
ধ্যাতা-ধ্যেয় এক হোলে, তুমি তো একাই।

প্রতীকোপাসনা বলে।" (ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৫ম সূত্রের রামানুজভাষ্য।) ভগবান শঙ্করাচার্য বোল্‌ছেন—"মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেতি। তথা আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ। স যো নামব্রহ্মেত্যুপাস্তে ইত্যেবমাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সংশয়ঃ।" অর্থাৎ "মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা কোরবে, এটা আধ্যাত্মিক, আকাশ ব্রহ্ম—এটা আধিদৈবিক। (মন আধ্যাত্মিক ও আকাশ বাহ্য প্রতীক—এই উভয়কেই ব্রহ্মের বিনিময়ে উপাসনা কোরতে হবে।) এইরূপ, আদিত্যই ব্রহ্ম, এই আদেশ। 'যিনি নামকে ব্রহ্ম মনে করেন'—সেই সব স্থলে প্রতীকোপাসনা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়।"—(ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৪র্থ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য।)

প্রতীকোপাসনার ফলটা কে দ্যান? প্রতীক, না ব্রহ্ম? শঙ্করাচার্য বোলছেন—"আদিত্যাদ্যুপাসনেঽপি ব্রহ্মৈব দাস্যতি। ঈদৃশং চাত্রং ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং প্রতীকেষু তদ্‌দৃষ্ট্যধ্যারোপণং প্রতিমাদিষু ইব বিষ্ণ্বাদীনাম্।" অর্থাৎ "আদিত্যাদির উপাসনার ফল ব্রহ্মই দ্যান্,, কারণ তিনি সকলের অধ্যক্ষ। যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু আদি দৃষ্টি আরোপ কোরতে হয়, সেইরকম প্রতীকেও ব্রহ্মদৃষ্টি আরোপ কোরতে হয়, সুতরাং এখানে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হোচ্ছে বুঝ্‌তে হবে।"—(ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৫ম সূত্রের শাঙ্করভাষ্য।)

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রতীকোপাসনা প্রসঙ্গে বোলছেন,—
"One thing, therefore, has to be carefully borne in mind. If, as it may happen in some cases, the highly philosophic ideal, the supreme Brahman, is dragged down by Pratika-worship to the level of the Pratika. and the Pratika itself is taken to be the Atman of the worshipper, or his Antaryamin, the worshipper gets entirely misled, as no Pratika can really be the Atman of the worshipper. But where Brahman Himself is the object of worship, and the Pratika stands only as a substitute or a suggestion there of, that is to say, where, through the Pratika the Omnipresent Brahman is worshipped—the pratika itself being idealised into the cause of all, the Brahman—the worship is positively beneficial; nay, it is absolutely necessary for all mankind, until they have all got beyond the primary or preparatory state of the mind in regard to worsoip."
—Worship of substitutes and images. (Bhakti-Yoga, page 55)

২৫

এ হেন ব্রহ্মবোধ হোয়ে থাকে যার,
সেই শুধু পৃথিবীতে প্রতীকের পার।
নিজের ও ব্রহ্মের সীমা মুছে দিয়ে
ব্রহ্মরুদ্রতেজে তোলে হুংকার।

তখনি সে গর্জায়—খাবো কার পাতে,
আমি ছাড়া আর কিছু নাই যদি থাকে?
প্রতীক বা প্রতিমার এইটুকু দাম,
আমাতে জাগিয়ে স্থায় এই 'আমি'টাকে।

যা কিছু শক্তি—সে তো নয় প্রতিমার,
অনন্ত শক্তির আমিই আধার।
শক্তিটা থাকেনাকো 'পান্‌চিং ব্যাগে',
যতোই মারুক্ ঘঁষি তাতে 'বক্‌সার'।

প্রতীক প্রতিমা বলো, তারা সকলে
আত্মিক ব্যায়ামের 'পান্‌চিং থলে'।
খৃষ্ট, বুদ্ধদেব—সকলেই তাই,
তাঁরা যে মহান্—সে তো আমি বোলি বোলে।

* * *

"Christs and Buddhas
Are
Simply occasions
Upon which
To objectify
Our own inner powers.
We really
Answer our own prayers."৬

* * *

অতএব বলে যারা গোঁড়া খৃষ্টান—
খৃষ্টই পৃথিবীকে কোরেছেন ত্রাণ,
তারা আর যাইহোক, মহাত্মা নয়,
মানুষের শক্তিকে করে অপমান।

* * *

"It is blasphemy
To think

৬। "খৃষ্ট ও বুদ্ধেরা শুধু বাইরের অবলম্বন। আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোকে ঐ সব অবলম্বনে আমরা আরোপ কোরে থাকি মাত্র। আসলে আমরাই আমাদের প্রার্থনার জবাব দিই।"
—Inspired Talks (page 167).

That
If Jesus had never been born,
Humanity
Would not have been saved.
It is horrible
To thus forget
The divinity in human nature,
A divinity
That must come out."৭

তখনি সে গর্জায়—চাইবোটা কাকে,
আমি ছাড়া আর কিছু নাই যদি থাকে ?
খৃষ্ট বুদ্ধ বলো—একজোড়া ঢেউ
'আমি' রূপ উত্তাল সমুদ্রটাতে।

* * *

"Never forget
The glory of human nature.
We are the greatest God
That ever was
Or ever will be.
Christs and Buddhas
Are but waves
On the boundless ocean
Which I am."৮

* * *

বুদ্ধ বা খৃষ্টের এইটুকু দাম,
তাঁদের কেন্দ্র কোরে হই পালোয়ান।
আমার ভেতরে যদি শক্তি না-থাকে,
বুদ্ধের সাধ্য কি আমায় জাগান্।

২৬

তাও যদি হয়, তবে সেটা কিছু কম ?
প্রতীক-পুজোটা তাই নয়কো অধম।
সুপ্ত ব্রহ্মটাকে জাগাতে গেলেই
সকলেরই প্রতীকের আছে প্রয়োজন।

তাই যিনি ব্রহ্মেতে হোয়েছেন লীন,
প্রতীকেরও প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অসীম।
এম্-এ-পাশ-মাষ্টার 'ইন্‌ফ্যাণ্ট্ ক্লাসে'
বলেন না—A-B-C-D মূল্যহীন।

তাই তিনি এ-কথাও বোলে যান এসে—
প্রতীক-পুজোও ঐ একই উদ্দেশে,
সকলেই একদিন ব্রহ্মকে পাবে,
কেউ আগে, কেউ পরে, কেউ সব-শেষে।

"The range of idols
Is
From wood and stone
To Jesus and Buddha,
But
We must have idols.'৯

ব্রহ্ম-বিশুদ্ধতা এসে গ্যাছে যার,
আর কি সে অন্যকে করে ধিক্কার ?
বাচ্চারা সাধু ভাবে জোচ্চোরদেরও,
জোচ্চুরি-বৃত্তি যে মনে নেই তার।

চরম ব্রহ্মজ্ঞানে মন্দটা নেই,
মন্দটা বড়ো জোর কম্ ভালোতেই।
আলোর অভাব নয় ঘনান্ধকার,
তফাৎটা কম্ আলো বেশি আলোতেই।

* * *

"This is
One of the great points
To be remembered,
That
Those who worship God
Through ceremonials
And forms
However crude
We may think them,
Are not in error.
It is the journey
From truth to truth,
From lower truth
To higher truth.

Darkness is less light ;
Evil is less good ;
Impurity is less purity." ১০ [ক্রমশঃ।

৭। "যীশু যদি না জন্মাতেন, তবে মানুষজাতটার উদ্ধারই হোতোনা—এরকম মনে করা দারুণ নাস্তিকতা। মানুষের স্বভাবে যে দেবত্ব অন্তর্নিহিত রয়েছে, তাকে এভাবে ভুলে যাওয়াটা অতি মারাত্মক কথা। ঐ দেবত্ব কোনো না কোনো সময়ে প্রকাশিত হবেই হবে "—Inspired Talks (page 167).

৮। "মানুষের স্বভাবে যে মহত্ব রয়েছে—তাকে কখনো ভুলোনা। ভূত বা ভবিষ্যতে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর কেউ হন্‌নি, কখনো হবেনও না। আমিই সেই অনন্ত সমুদ্র—খৃষ্ট ও বুদ্ধেরা তারই তরঙ্গ মাত্র !" —Inspired Talks (page 167).

৯। "কাঠ পাথরের পুজো থেকে সুরু কোরে যীশু-বুদ্ধের পুজো পর্য্যন্ত সবই প্রতিমা-পুজো, কিন্তু মূর্তিকে আমাদের আঁকড়াতেই হবে।"

—Inspired Talks (page 72).

১০। "এটা বিশেষ কোরে মনে রাখতে হবে—যারা নানারকম ক্রিয়াকাণ্ড কোরে ভগবানের পুজো করে, আমরা তাদের যতোই অনুপযোগী মনে কোরি না কেন, তারা আসলে ভ্রান্ত নয়। কারণ, মানুষ নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে আরোহণ কোরে থাকে। অন্ধকার বলতে বোঝায় কম আলো, মন্দ বোল্‌তে—কম ভালো ; অপবিত্রতা বোলতে—অল্প পবিত্রতা।"

—Practical Vedanta. (page 45)

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

রাধা-চরিত্রের বিবর্ত্তন

শ্রীমতী শঙ্করী বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈষ্ণব কবিতার প্রধান উপজীব্য শ্রীরাধা—শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক এবং অপরূপ প্রেমকাহিনী এবং তাঁদের যুগ্মজীবনের বিচিত্র লীলা। সমুদ্রগামী নদীর তুষারসমাচ্ছন্ন উৎসমুখ হতে তার চরম পরিণতি মহাসমুদ্রে আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত যেমন উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন, এই তিনটি ধারা দেখা যায়, ঠিক অনুরূপ ভাবে বৈষ্ণব কবিতার নায়িকা শ্রীরাধাচরিত্রেও নায়ক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম দর্শন হতে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়া পর্য্যন্ত তিনটি ক্রম দেখা যায়। শ্রীরাধার চরিত্রে মুগ্ধা, মধ্যা এবং প্রগলভা—এই তিনটি ধারার ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয়েছে যথাক্রমে পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মান, মিলন, আক্ষেপানুরাগ, প্রেমবৈচিত্ত্য, মাথুর এবং ভাবসম্মিলন বিষয়ক পদগুলির মধ্য দিয়ে।

কৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ রাধার অন্তরে প্রলয় বয়ে এনেছে। এর পর থেকে রাধার চিত্র এক স্থানেই স্থির হয়ে নেই। তাঁর চিত্ত গতিশীল—অন্তরের অস্থিরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রথম প্রথম রাধা কেবলমাত্র কৃষ্ণের দর্শনেই নিজেকে পরম সুখী মনে করতেন কিন্তু তাতেও সে মনের ফাঁক ভরে ওঠে না—মন আরও নিবিড় আরও গভীর ভাবে পেতে চায় তার প্রিয়জনকে। প্রণয়ের ধর্মই হয়ত এই। তাই কেবল অঙ্গের পরশেই রাধার অন্তরের দাবী মেটে না—তাঁর তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয় হাহাকার করে বলে—দাও, আরো দাও। সেইজন্য অবশেষে দেখা যায়, রাধা তাঁর সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে, সমাজ-সংসারের বাধা অতিক্রম করে এই "আরো কিছু"র সন্ধানে অভিসার যাত্রায় পদক্ষেপ করেছেন।

যে পূর্ব্বরাগ কৃষ্ণের নামরূপ শ্রবণেই রাধার মনে সঞ্চারিত হয়েছে তা ক্রমশঃ সাক্ষাৎ বা চিত্র দর্শনের মধ্য দিয়ে গভীরতা লাভ করেছে। রাধার গৃহকর্ম্মে মন নেই—এখন তিনি :

> ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার তিলে তিলে আইসে যায়
> মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন কদম্ব কাননে চায়।

রাধার জীবনে কৃষ্ণের অপরিহার্য্যতা যে কত গভীর, তা শুনতে পাই তাঁর একটি উক্তিতে :

> হাথক দরপণ মাথক ফুল।
> নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।
> হৃদয় ক মৃগমদ গীমক হার।
> দেহক সরবস গেহক সার।
> পাখীক পাখ মীনক পানি।
> জীবক জীবন হাম ঐছে জানি।

কিন্তু এত নিবিড় নৈকট্য অনুভব করেও কৃষ্ণের বিরাট রহস্যের তত্ত্ব রাধা বুঝতে পারেন না। তাঁর পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে না পেরে রাধার অন্তরে মাঝে মাঝে এক চাঞ্চল্য জেগে ওঠে। এখন তাঁর অন্তর অল্পে সুখী নয়, কারণ তিনি জানেন—ভূমৈব সুখম্। মিলনের আকাঙ্ক্ষা যত তীব্র হয়ে উঠছে, দেহজ কামনা ততই লুপ্ত হয়ে দেহাতীত বাসনার অরূপলোকে রাধার মন যাত্রা করেছে। তাই তাঁর সাধনা দেহকে অবলম্বন করে দেহাতীত, ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে ইন্দ্রিয়াতীত।

রাধা জানেন যে যত দিন তাঁর মধ্যে অহংবোধ জাগ্রত থাকবে, তত দিন কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পূর্ণ মিলনের সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি একদিন আপন যৌবনধর্ম্ম, সমাজ সংসার, বংশমর্য্যাদা সবই পরিত্যাগ করে অভিসারে যাত্রা করলেন। আকাশে মেঘের ঘনঘোর ঘটা, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক আর বজ্রপাত—কর্দমাক্ত, কণ্টকাকীর্ণ অতি দীর্ঘ পথ—কিছুই তাঁকে বাধা দিতে পারল না। তাঁর পার্থিব কামনা-বাসনার সীমা মুছে গিয়ে দেখা দিয়েছে আত্মার বিশুদ্ধিকরণ—তাই পথের কোন কষ্টেই তিনি কাতরা নন। কারণ তিনি যে ইতিপূর্ব্বেই ঘরের কোণে বসে সাধনা করেছেন :

> কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
> মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি
> গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
> চলতহি অঙ্গুলি চাপি—

যাতে তাঁর এই অভিসার সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। রাধার এই অভিসার লোকোত্তরতার স্পর্শ লাভ করেছে। এর কারণস্বরূপ কবিগুরুর ভাষায় বলা যায় :

> তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে, আনন্দের নব নব পর্য্যায়।
> পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে
> নিত্য পুষ্প নিত্য চন্দ্রালোকে।
> নিত্যই সে একা। সে-ই একান্ত বিরহী
> সে অভিসারিকা তারই জয়।
> আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।
> সেও ত নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ।
> সে যে বাজায় বাঁশী। প্রতীক্ষার বাঁশী
> সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে
> বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
> পদে পদে মিলেছে একতানে।
> তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে
> সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে।

কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার প্রত্যহ সাক্ষাৎ হোতে লাগল—রাধা আকণ্ঠ ভরে সেই বিষামৃত পান করতে লাগলেন। কৃষ্ণের প্রেম নিত্যনূতন

রূপে আস্বাদান করলেন কিন্তু পিপাসার নিবৃত্তি হোল না। তাই রাধা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন :

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝন কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

কিন্তু রাধার প্রেম-অভিযানের এখানেই শেষ নয়, বরং আরম্ভ। কারণ, "অহেরিব'গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবো কুটিলা ভবেৎ।" এই প্রেম ভক্তির জানা রঙ্গ, বিচিত্র বিভঙ্গ। তাই কৃষ্ণ যখন রাধার কুঞ্জে না এসে অপর কুঞ্জে যান, তখন দেখি রাধার অভিমানিনী রূপ। অনুতপ্ত কৃষ্ণ এসে রাধার পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করেছেন কিন্তু রাধা তাঁর তীব্র অভিমান বশতঃ তিরস্কার'করে কৃষ্ণকে বিদায় দিয়েছেন অথচ পরমুহূর্ত্তেই তিনি কৃষ্ণবিরহে কাতরা। তিনি জানেন যে কৃষ্ণ বহুবল্লভ কিন্তু তবুও তাঁর হৃদয় মানে না, তিনি একাই কৃষ্ণের সান্নিধ্যকে নিবিড় করে উপভোগ করতে চান। মিলনের মধ্যেও রাধা বিরহের সুর শুনতে পান। কৃষ্ণকে হারাবার ভয়ে তাঁর অন্তর এক অজানা ব্যথায় ভরে থাকে। কৃষ্ণের দেখা না পেলে রাধার কাছে ক্ষণমাত্রকে যুগ বলে মনে হয়, আবার মিলনের পর সন্দেহ হয় : যা পেলাম তা কি সত্য ? যে প্রেমের জন্য অসাধ্য সাধন তিনি করেছেন, আজ পর্য্যন্ত তার স্বরূপ ত' তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন না অথচ এই প্রেমেরই দারুণ স্রোতোবেগে রাধা তাঁর ব্যক্তিত্বের তটভূমি থেকে স্খলিত হয়ে অসহায় শৈবালের মত মহাসমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর এই যাত্রা সীমা থেকে অসীমের প্রতিই যাত্রা। এর মধ্যে স্থিতি নেই, বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। কৃষ্ণকে পেয়েও না পাওয়ার বেদনা যে কত গভীর! রাধার কাতর উক্তির মধ্য দিয়ে তারই অভিব্যক্তি দেখা যায় :

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

রাধাচরিত্রের পরিবর্ত্তমান ধারাটি লক্ষণীয়। কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রাধার আত্মবোধ ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। তাঁর হৃদয়ে আজ কৃষ্ণের আরতি। কৃষ্ণের অধিষ্ঠান এবং কৃষ্ণের সঙ্গে নিবিড় একাত্মবোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছে! তাই রাধা বলেন :

বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।

এত দিন দুঃখের তরঙ্গাঘাতে তাঁর চিত্ত আন্দোলিত হয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। নানা দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অবশেষে তিনি উপলব্ধি করলেন যে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিই চরম প্রাপ্তি। তিনি বলেন :

শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়।

এখানে রাধা প্রগলভা—মুগ্ধা নন। জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। তাই দেখা যায়, রাধার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। তাঁর সমস্ত দ্বন্দ্ব-দ্বন্দ্ব চাওয়া-পাওয়া দূরীভূত হয়ে গিয়েছে। নানা অশান্তির পর শান্তির সমুদ্রে অবগাহন করে শান্ত রাধা বলেন :

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান।

আজ রাধা-কৃষ্ণকে "সো বহুবল্লভ কাম" জেনেও দুঃখ করেন না—তাঁর সাধনা দ্বৈত সাধনা থেকে অদ্বৈত সাধনায় উপনীত হতে চলেছে। পূর্ব্বে মিলনের মধ্যেও বিরহের যে আভাস তিনি পেয়েছিলেন, তা সত্যতা লাভ করল সেদিন, যেদিন অক্রুর এসে কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গেলেন। কৃষ্ণ বিনা রাধার জীবন-জগৎ শূন্যতায় ভরে উঠল। তাঁর অন্তর কৃষ্ণের বিরহে হাহাকার করে উঠল :

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি।

তাঁর পূর্ব্বের চাপা ক্রন্দন আজ এক মহাক্রন্দনে পরিণত হোয়েছে। যে কৃষ্ণকে লাভ করে রাধার একদিন মানের অবধি ছিল না, তৃপ্তির সীমা ছিল না, সেই কৃষ্ণকে হারিয়ে তাঁর বেদনা অসীম শূন্যতায় পর্য্যবসিত হোয়েছে। বর্ষার বারিপাতের সঙ্গে রাধার মন তাই গেয়ে চলেছে :

এ সখি হামার দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

কৃষ্ণ হয়ত আবার এক দিন ফিরে আসবেন কিন্তু রাধার তাতে কি লাভ? কারণ যাদ :

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঁয়ায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে।

বিরহের দশ দশা রাধার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠল—কিন্তু এই জ্বালা তাঁকে বেশী দিন সইতে হোল না—কৃষ্ণ অবশেষে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। এবার তাঁদের যে মিলন ঘটল, তা হর-গৌরীর মিলন অপেক্ষাও নিবিড় এবং গভীর। কৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শুনে রাধা বললেন :

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে।
বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।

কারণ তিনি জানেন যে সাধকের দেহই মঙ্গল আচারের স্থান—"The humanbody is the highest temple of God." এখন কোকিলের কূজন, ভ্রমরের মধুর গুঞ্জন, মৃদুমন্দ মলয় বা চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণে তাঁর অন্তর বিরহানলে জ্বলে ওঠে না—তিনি আনন্দে অধীর হয়ে বলেন :

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা।

কৃষ্ণের সঙ্গে এই মহামিলন—ভাবসম্মিলনে রাধার আর বিচ্ছেদের

আশঙ্কা নেই। তাঁর এই আত্মনিবেদন আর কিছুই নয়—"সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা" এই সংসার ক্ষণস্থায়ী এবং অসার জেনে রাধা তাই চিরস্থায়ী শাশ্বত কৃষ্ণের পদপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করেছেন—এমন কি, নিজের দেহের উপর সমস্ত দাবী ত্যাগ করে তিনি কৃষ্ণের উদ্দেশে প্রার্থনা করছেন :

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পলুঁ
দয়া করি ছোড়বি মোয়।

সর্ব্বশেষ স্তরে এসে রাধার উপলব্ধি হোয়েছে—সোঽহং নয়—তত্ত্বমসি—কৃষ্ণই সেই পরমপুরুষ। এখানেই তাঁর দ্বৈত সাধনা অদ্বৈত সাধনার সর্ব্ব শেষ সোপানে গিয়ে উপনীত হয়েছে।

রাধার পরিব্রাজনা সুরু হয়েছে পথে পথে। মান আক্ষেপ মিলন বিরহের নিত্যলীলার মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্র ক্রমেই বিকশিত হোয়ে উঠেছে। তাঁর মুগ্ধা, মধ্যা এবং প্রগল্‌ভা রূপের মধ্যেও কত চিত্র—কৃষ্ণের রূপদর্শনে ও গুণশ্রবণে হৃদয়ের যে আকস্মিকতার উদ্বোধন, নিখিল রসামৃতের আনন্দসমুদ্রে তাঁর ধ্যানশীলতা—এই ভাবেই সমগ্র বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে নানা চিত্র-বিচিত্রের মাধ্যমে রাধার চরিত্র উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে।

অসীম হতে বিচ্ছিন্ন রাধার অসীমের প্রতি যে সীমাহীন পিপাসা রয়েছে, তার একমাত্র নিবৃত্তি অসীমেই। পার্ব্বত্য নদী যখন তার নামরূপ হারিয়ে মহাসমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন নদী আর নদী থাকে না, সমুদ্রে পরিণত হয়। নদীর সমস্ত সত্তার মিশ্রণ ঘটে সমুদ্রের বিরাট সত্তার মধ্যে। এই মিশ্রণে দ্বিত্ব নেই—আছে একত্ব। রাধা এবং কৃষ্ণের মিলন—সীমা এবং অসীমেরই মিলন। কারণ কৃষ্ণ যে অসীম এবং অনন্তেরই প্রতীক। রাধা কেবল তাঁর চলার মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্তি খুঁজে পাননি—তিনি আপন সত্তাকে যেদিন কৃষ্ণের মহাসত্তায় বিলুপ্ত করে দিতে পারলেন, সেদিনই এল তাঁর সুখ, তাঁর শান্তি, তাঁর তৃপ্তি। এই প্রসঙ্গে মরমীয়া সাধকের যে উক্তি কত গভীর এবং ব্যাপক, তার পরিচয় নতুন করে পাওয়া গেল :—

"In this highest stage the soul is united to God without means, it sinks into the vast darkness of the God head.

কাল আসছে

[একটি জনপ্রিয় ইংরাজী সঙ্গীতের অনুবাদ]

শমিতা গুপ্ত

ওগো মোর প্রিয় দিন হবে অবসান
'কালকের' নেই দেরী ;
নতুন তপন আনিবে রোদন ধারা
আভাস জাগিছে তারি।
ও রাঙা অধরে হাসি নাহি দেখা দেবে,
ও কালো নয়নে নাহি ঝলকিবে আশা,
আমি যে জেনেছি ওগো মম প্রিয়তম
মোর রহিবে না, কাল তব ভালোবাসা।

দিন হল শেষ 'কালকের' হল শুরু
সামনের দিন সকাল রয়েছে অজানা
তোমার স্পর্শ সহজেই মোরে বলে
ভালোবাসা তব শুধুই মিথ্যা ছলনা।
চিরদিন শুধু তোমারেই ভালোবাসিব
যত দিন তারা আকাশেতে দেবে আলো
প্রতিদিন শুধু এই আশা লয়ে থাকিব
একদিন তুমি সত্যি বাসিবে ভালো।

তুচ্ছ

দীপালী বিশ্বাস

ক্লান্ত বিকালের ঠাণ্ডা হয়ে আসা উত্তাপ কেমন যেন লুটিয়ে পড়েছে খোলা জানালার কাচের সার্সির গায়ে, ঘরের সিমেন্ট-ওঠা মেজেতে, এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা বিছানার চাদরে আর পুরানো বৃষ্টিভেজা দেয়ালটার কোণে—যেখানে ক'দিনের অবিরাম বর্ষণে ভাঙ্গা ছাদ দিয়ে জল পড়ে পড়ে ধুয়ে গিয়েছে ময়লাগুলো। বৃষ্টির জন্য ঘরের মাঝখানে টেনে-আনা খাটখানার ওপর অলস মৌনতায় বসে আছি আমি। নিবিষ্ট হয়ে দেখছি আমার মনটাকে। ব্যাকুল বিদ্রোহে সে বেরিয়ে গেল স্ব-ইচ্ছায় আর তারই আকুলতা যেন আমি দেখছি। দেখছি আর ভাবছি।

কত কাজ—অনেক হিসাব-নিকাশ লিখতে হবে, অনেক রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে, আবার অনেক কড়া হিসাব-নিকাশ একটু কালির আঁচড়ের অপেক্ষায় জমে আছে। অফিসের সঙ্গেই আমার ঘর—অফিসকে তাই দিতে হয়েছে অনেক সুন্দর মুহূর্ত্ত। সারাদিনের অনেক চিন্তা, সন্ধ্যারাতের অনেক প্রসন্নতা হারিয়ে যায় অতর্কিতে কাজের প্রয়োজনে। মেনে নিতে হয় সে কোলাহল। কিন্তু সহসা এক একটা দিন আসে, যেদিন অকারণ ব্যথায় ভরে ওঠে সারা অন্তর—সেদিন আর মেনে নেওয়ার দিন নয় এমনই করে আকুল মনকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকা শুধু।

আজ তাই হয়েছে। ওই তো দেখছি আমি আমারই মনটাকে—কেমন করে বারে বারেই অসহায় আর্ত্তনাদে উড়ে পড়ছে ওখানটায়। যেখানে আমগাছটার কাঁপচে সবুজ পাতার ওপর দিয়ে জানলার মধ্য দিয়ে ঘরের মাঝখানটায় থমকে দাঁড়ান রোদ্দুরটা একটু হঠাৎ বৈরাগ্যের রঙ্গে চিক্‌চিক্ করছে। তার ওপাশে পড়ে রয়েছে আমারই এক জোড়া খড়ম, বারে বারে যেন কেঁদে ফিরছে সেই কাঠের নিষ্প্রাণ রূপের কাছে। আর আমি দেখছি, দেখছি আর ভাবছি।

ভাবছি ? কই না ! ভাবছি না তো ? ভাবতে চাই কিন্তু পারছি না। কেন, কেন, কেন ?

কীসের শব্দ দরজায় ? কে ? কে যেন দাঁড়িয়ে দরজার ওপাশে—গলাটাকে সহজ করে জিজ্ঞাসা করি, কে ? দরজাটা ঠেলে খুলে দিয়ে দাঁড়াল একটি মেয়ে। এসেছে প্রয়োজনের কথা নিয়ে। অন্যমনস্ক ভাবে কী যেন বললাম। বলতে বলতে, শুনতে শুনতে এমনই অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে যে মেশিনের মতন উত্তর দিয়ে যাই। নিজের অজ্ঞাতসারেই বলি অনেক কাজের কথা। কথা সেরে চলে গেল মেয়েটি। কিন্তু মনটা আজ ঘুরে-ফিরে কেবলি ওই একটুখানি ঝিকিমিকির চার পাশে কেঁদে ফিরছে।

এখন বেলা কত? সাড়ে চারটা হবে বোধ হয়। হাতঘড়িটার দিকে তাকাতে ইচ্ছা করছে না। সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন অবশ হয়ে গিয়েছে। অফিস থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্য ঘরে এসেছিলাম আর তাতেই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। এ দুর্ঘটনার কথা কাগজে উঠবে না, পাঠকে পড়বে না—কেউ একটু সময় করে বলবে না—"আহা রে"। আমার অন্তর শুধু জানল, বিধাতার সৌন্দর্য্যলোকে অসংখ্যের মধ্যে আজ একটি দীপ্তি নিবে গেল বড় অসহায়, করুণ ভাবে।

"আসব?" একটা প্রশ্ন ভেসে এল। "এসো"—ভাল করে চোখ মেলে তাকাতেও যেন চাই না ঠিক এই মুহূর্ত্তে। তবু ফিরে দেখলাম একরাশ কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে ওই কাজের মানুষ। তাগিদের ওপর তাগিদ দিতে থাকে সে। প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন। না, এখনই তাকে দেখে দিতে হবে ওগুলো—হ্যাঁ এখনই, আজই, এই ক্ষণেই। অভ্যাসে হাতটা বাড়াই। কলমের আঁচড়ে নামের একটা মিছিল এলোমেলো হয়ে বয়ে চলতে লাগল। সে পালা শেষ হোল। হায় রে শুধু ভুলের দায়িত্ব নিয়ে নিজেকে চব্বিশ ঘণ্টার একটা প্রয়োজনচক্রে বেঁধে দিয়েছি—সেই অবিরাম একটানা চক্রে ঘুরে চলেছি আমি।

সেই ছককাটা একঘেয়ে দিনের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা অপরিচিত মুহূর্ত্ত এসে সব তোলপাড় করে দিল। আহা রে—ওই তো, কতটুকুই বা প্রাণ, কিন্তু কী ব্যাকুল তৃষ্ণা ছিল তার বাঁচার।

মনটা গুনগুন্ করে ফিরছে। কেবলই সেই সারাদিনের অকারণে বাড়ানো কাজের কথায় ভরে উঠছে। নিত্যদিনের মতন আজও ভোরে কুঁজোটা থেকে জল নিতে যেয়ে হঠাৎই চোখ পড়েছিল ওটার ওপর। কোথা থেকে এল কি জানি! দেয়ালের ঘোলা রংয়ের ওপর বসে একটা প্রজাপতি। গিরিমাটির লালচে আভা আর তারই হালকা গভীর রঙের মিশ্রণে সুন্দর পাখা দুটি অদ্ভুত সুন্দর। ভোরবেলার প্রসন্ন আলোয় স্নিগ্ধ এক সৌন্দর্য্যের ছবি। রূপসৃষ্টির নিপুণতার এক অম্লান উদাহরণ। কী জানি কি খেয়াল হোল—একটু ধরতে ইচ্ছা কোরল। দক্ষিণের বারান্দার পাম গাছগুলির ফাঁক দিয়ে আসা বাতাসের দোলায় কাঁপন ধরেছিল তার মেলে দেওয়া হালকা পাখায়। আনন্দের একটু স্পর্শ, আশ্চর্য্য সুন্দরের একটু আমেজের লোভ ভোরবেলার শান্ত মনটাকে পেয়ে বসেছিল। তাই হাত বাড়িয়েছিলাম।

উঃ, ভাবতেই কেমন জানি অবাক লাগে! মনটা ভাবছে, ওই
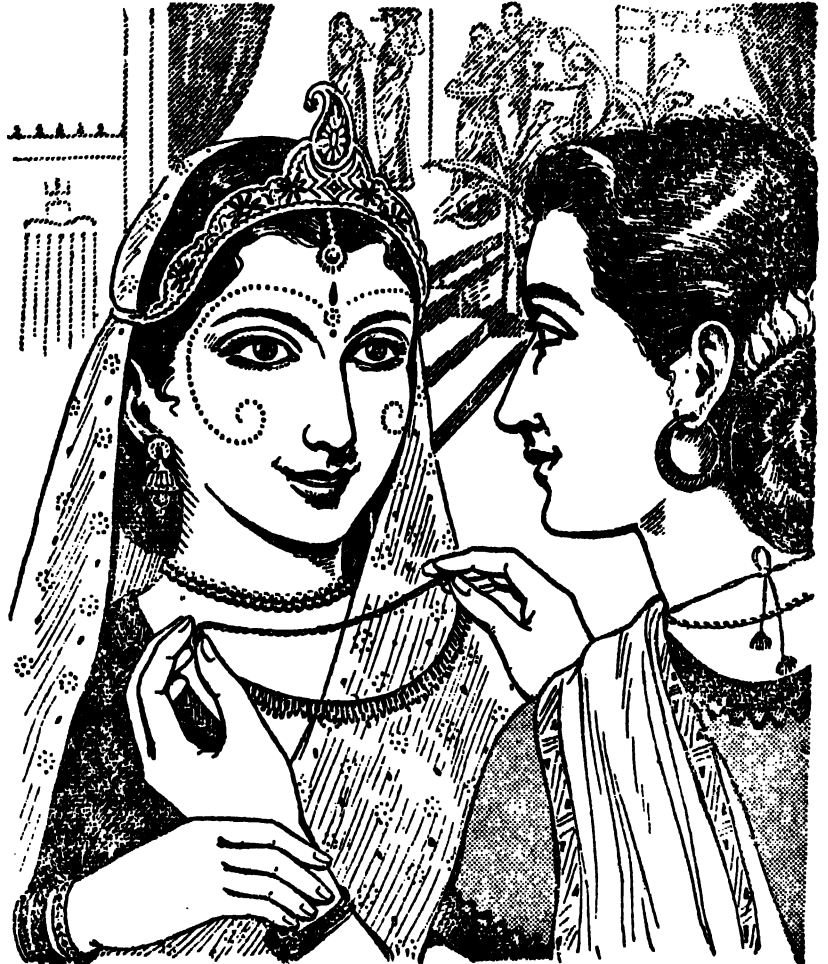
তো দেখছি আমি ও কাঁদছে, টপ টপ করে—জল নয় তার ব্যথার বৈরাগী রং ঝরে পড়ছে মাটির সঙ্গে লেপটে-যাওয়া ডানা দুটির ওপরে। তখন কি জানতাম, এমন করে যাকে বাঁচিয়ে তুলতে চাই-ই, এমনি করেই এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে তাকে নিষ্ঠুর ভাবে বিলুপ্ত করে দেব? এ কি নিয়তির পরিহাস! ও যেন সারাদিন অপেক্ষা করেছে এই পরিহাসটুকুকে আরও মর্মান্তিক করার জন্য।

কি বলছিলাম যেন? হাত বাড়িয়েছিলাম, নয়? স্পর্শ একটু করতেই ছটফট্ করে উঠে ওটা নেতিয়ে পড়লো কেমন যেন। আলতো করে ধরে জলের কুঁজোটার কাছে ছেড়ে দিতেই উড়ে যেয়ে বসলো সেটার গায়ে। আর আশ্চর্য্য! সৌন্দর্য্যের যেন হাট বসলো। কুঁজোটার রাঙ্গামাটি রঙের সঙ্গে তার দুই-রাঙ্গা গেরুয়া মাটির ঝিকিমিকি যেন সৃষ্টি তারের এক সুষম ঝঙ্কার তুলল। এ জগতের সঙ্গে কই আমার তো কোন সম্পর্ক নেই? আমি তো হিসাব-জগতের মানুষ। খাতাপত্রের কাল কালি আর মাঝে মাঝে মোটা মোটা লাল লাইন দেখাই আমার অভ্যাস—সেই রঙ্গই আমার বুদ্ধি অভ্যস্ত, কিন্তু এই মুগ্ধতার মায়ায় আজ আমার বোধ যেন একটা ধাক্কা খেল। অনেকক্ষণ, হ্যাঁ অনেকক্ষণ সেই স্নিগ্ধতা আমি প্রাণ মন ভরে পান করেছিলাম। যতক্ষণ না বেলা উঠেছে, ঘরের কাজ করে যে মেয়েটি সে এসে না ডেকেছে ততক্ষণ আজ আমার মনটার শূন্য হয়ে আসা পাত্র মেলে ধরেছিলাম ওই আনন্দ পানে। সচেতন হয়ে উঠে সাবধান করেছিলাম মেয়েটিকে, ওটা যেন না নাড়াচাড়া হয়, থাক ওখানে।

তার পর ব্যস্ত ছিলাম অন্য দিনের মতই নানা কাজে। কিন্তু যখনই অবসর পেয়েছি একটু দাঁড়িয়ে দেখেছি সে দৃশ্য, যত দেখেছি তত মুগ্ধ হয়েছি। দুঃখ হয় ভাবলে, ওই তো মনটা ছটফট্ করছে বেদনায়, ভাবছে আমি যদি শিল্পী হতাম। রঙ্গে রেখায় ধরে রাখতাম সেই ছবিটি—যা চেতন মনের স্তর থেকে বিদায় নেবে একদিন।

কিন্তু হায় রে নিয়তি! বিকালে হঠাৎ খুব জরুরি তাগিদে দ্রুত পদে এসেই চাবিটা নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম অফিসে, হঠাৎ সেই এক ফালি রোদের শীর্ণ দেহের ওপর কী যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। ভাল করে দেখেই চমকে গেলাম। খড়মের তলায় নিঃশব্দে শেষ হয়ে গেল সৌন্দর্য্যের একটা শিশির-বিন্দু। একটু শব্দ না, একটু প্রতিবাদ না। নিঃশব্দ, মহান্, শান্তি।

উঃ, আর ভাবতে পারছি না। ওই তো একেবারে মিশে গিয়েছে সিমেন্টের কর্কশ মেঝেতে। মনে হচ্ছে, কে যেন ওখানে, ওই মেঝেতে এঁকে রেখেছে একটা রঙের ছবি-প্রজাপতি। একটু বিকৃত হয়নি, একটু ম্লান হয়নি, একটুও পরিবর্ত্তন হয়নি।

কাঠের সিঁড়িতে শুনতে পাচ্ছি পায়ের শব্দ। ক্রমেই জোরে আসছে শব্দটা। বোধ হয় পাঁচটা বেজে গিয়েছে, তাই কর্মীরা চলেছে নিজের জায়গায়।

কিন্তু আমার মন? সে তো ওই কেবলই অসহায়ের মতন তার সেই ছবি-টেকটার চার পাশে গুনগুনিয়ে ফিরছে। ভাবছে—পরম আদরে যাকে ধরে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম, সে এমনই করে কৌতুক করে চলে গেল কেন?

অহংটা বড় মুখড়ে পড়লো আজ। অহংকার করেছিলাম ওই ক্ষুদ্র প্রাণটিকে ধরে রাখায়, লোভ হয়েছিল রয়ে সয়ে, ঘুরে ফিরে সে দৃশ্য দেখার। তাই বোধ হয় এমনই করে শিক্ষা হোল। কোন সান্ত্বনাই যেন খুঁজে পাচ্ছি না এই অনিচ্ছাকৃত নিষ্ঠুর দুষ্কৃতির। মিঠে আলোর ঝিরঝিরে বাতাসে ভোরের বেলা যে সুরের তার বেঁধেছিলাম তা এমনই করে ব্যথার মীড় টেনে ছিঁড়ে গেল কেন?

হায় রে নিয়তি! আমিই শেষ করে মুছে দিলাম সেই করুণ সুন্দরকে, যাকে প্রাণপণে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম তাকেই বিসর্জ্জন দিলাম ব্যথার সমুদ্রে।

কিন্তু এও তো সেই অহংকারের কথা। আমি কে? কী বা আমার ক্ষমতা? মনে পড়লো সেই ইচ্ছা-সমর্পণের বাণী—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

মনটা কখন চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। গুনগুনানি বন্ধ করে স্থির স্তব্ধ হয়েছে। হঠাৎ সচেতন হয়ে দেখল আবছা হয়ে এসেছে জায়গাটা। রোদের সোনাটুকু কখন মুছে গিয়েছে আর সেই ছবিও আবছা অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসেছে। বাইরে বারান্দার থামে থামে শোনা যাচ্ছে পায়রার ডানা ঝটপট, ফিরে এসেছে ওরা ওদের নীড়ে, নিশ্চিন্ত আরামের পক্ষচ্ছায়ে। জানলার বাইরে আকাশের মেঘলা নীল রং আর সেই আমগাছটার ঘন কালো আভাস ধীরে ধীরে এক অপরূপের রাজদরবারের দুয়ার উন্মুক্ত করছে।

হারিয়ে যাবে কি সংসারের শত সহস্র লক্ষ প্রয়োজনের পাকে ফেরা জীবনের মাঝখানে আজকের এই পাওয়া আনন্দটুকু আর তা হারানোর বেদনা? হয়তো বা ভুলেই যাব! ভুলে যাব? না, তা হয় না—

> "অন্য মনে চলি পথে
> ভুলিনে কি ফুল, ভুলিনে কি তারা?
> তবুও তাহারা
> প্রাণের নিঃশ্বাসবায়ু করে সুমধুর
> ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর।"

জীবনের দুস্তর বন্ধুর চলার পথে ওই মনটা যখনই কাঙাল হয়ে উঠবে তখনই আজকের দিনটি যে অমৃতসঞ্চয় রেখে গেল তাই দেবে আবার নূতন আলো, নূতন আশা, নব উদ্দীপনা। এই তুচ্ছ একটি মুহূর্ত্ত বিবৃত হয়ে রইলো আমার জীবনে, অন্তরের অন্তরতম লোকের মণিকোঠায়।

সারাদিনের শত কাজ পড়ে রয়েছে। মনটাকে ফিরিয়ে এনে উঠে পড়ি এবার। সন্ধ্যাশাঁখের শব্দ মিলিয়ে গেল, রেশটুকুও গেল প্রায়। ক্লান্ত দেহ আর ফিরে পাওয়া শ্রান্ত আবিষ্ট মন নিয়ে উঠলাম—আর নয়।

তবুও ঘরের বাইরে পা দিয়ে আবার তাকালাম সেই অলিখিত দুর্ঘটনার দিকে—না, কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। না দেখা যাক, তবুও এ ক্ষণিকার স্মৃতিতে রইলো তার রঙ্গীন স্বপ্ন। সে আছে, সে রইলো, সে থাকবে।

জাতিস্মর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

দিদিমার ডাকে চমকে ওঠে সুমিতা। কত বেলা হয়েছে! সোনালী রোদের ঝিলমিল ওর বুকের পালকের মত শাদা বিছানার চাদরে।—যেন ওর দিকে চেয়ে কৌতুকভরে হাসছে বাসন্তী প্রভাত।

—তোমার গীটারের মাষ্টার অনেকক্ষণ এসেছেন মিতা, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।

দিদিমার মুখের পানে একবার সলজ্জ দৃষ্টিপাত করে; বলে সুমিতা,—এই যে, এখুনি আসছি দিদিমা!

কাল রাতের ঝড়ের বিন্দুমাত্রও চিহ্ন দেখতে পায় না সে মুখমণ্ডলে!

মাষ্টার মশাইয়ের নির্দ্দেশমত গীটারের বুকে সুরের খেলা জাগায় সুমিতা, কিন্তু সে আজ বড় অন্যমনা।

মাত্র এক দিনের ব্যবধানে! কিন্তু মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট ভূকম্পন ওর মনের সকল বৃত্তিগুলোকে ধরে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়ে গেছে! সে আজ নিজের সম্বন্ধে যেন বড় বেশী সচেতন হয়ে উঠেছে।

ছোটমাসী কই? সে তো এলো না আজ গীটার শিখতে?

কানে এলো দিদিমার কণ্ঠস্বর···অ, রুবি, রুবি! মাষ্টার মশাই কতক্ষণ বসে থাকবেন?···—বেয়ারা, বেয়ারা,···আরে দিদিমণি কাঁহা?—কি? বাহার গিয়া?—এবারে তাঁর কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়লো, —বলি এই সাত সকালে কোথায় চরতে গেছেন তিনি? কিছু বলে গেছেন কি? ওঃ! আমি যে একটা মানুষ বাড়ীতে আছি, সেকথা বুঝি আজকাল আর কারুর মনে থাকে না? বাড়ীতে দেখছি স্বেচ্ছাচারিতার ঝড় বইতে সুরু করেছে!

অনিল চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়িয়ে বললো, —কি হয়েছে মা? এত চেঁচাচ্ছো কেন?

—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! বলি দল বেঁধে সব আমার পেছনে লেগেছো কেন, বলতে পারো?

—তোমার ছোট ভগিনী এই সাত সকালে গেলেন কোথায়?—কোন্ সম্পত্তি রোজগার করতে?

—সম্পত্তি রোজগার করা অত সহজ ব্যাপার নয় মা!—তবে, কাল রুবি একটা গানের টিউসানীর কথা বলছিলো,—আমার মনে হয়···হয়তো সেখানেই গেছে।

—এতও কপালে ছিলো? আমার পেটের মেয়ে করবে টিউসানী?—কেন আমি কি ভিকিরি? ওর বাপ কি কিছু রেখে যান নি? যে ওকে পেটের ভাত জোটাতে হবে টিউসানী করে?

দিদিমার কণ্ঠস্বরে কান্নার পূর্ব্বাভাস।

সুমিতা গীটার থামিয়ে বলে,—আজ এই পর্য্যন্ত থাক্ মাষ্টার মশাই!

সে উঠে আসে বাইরের বারান্দায়!

অনিল সহাস্যে বলছে তখন—অত রাগ করছো কেন মা? তুমিই তো কাল বললে; বাবা তেমন কিছু রেখে যাননি! কাজ করলে আজকালকার দিনে মোটেই মান খরচা হয় না। যার যেমন বিদ্যে, সেইটুকু কাজে লাগিয়ে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করলে পরিণামে একটা সুফল লাভ অবশ্যই হয়, আমিও তো ক'জায়গায় চাকরির দরখাস্ত করেছি, দেখো না, খুব শীগগির একটা যোগাড় হয়ে যাবে। পরের পয়সায় বড়মানুষী করার চেয়ে, নিজের উপার্জ্জনের নুণ-ভাতের সম্মান অনেক বেশী মা!

এবারে মায়া দেবীর চোখে জল আসে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন তিনি—কাল রাগের মাথায় কখন কি যে বলেছি, সেইটেই সত্যি হল তোমাদের কাছে? আর এত কাল তোমাদের সুখের জন্যে যে রক্ত-মাংস জল করলাম, সে সব এতই মিথ্যে হয়ে গেছে যে কোনো কিছু করার আগে আমার একটা মতামত নেবারও প্রয়োজন মনে কর না তোমরা?

বেশ ভালো কথা—আমিও দেখে নেব, তোমাদের দৌড় কতখানি! অতই সোজা যদি হতো উপার্জ্জনের পথটা, তাহলে দেশে বেকার বলে আর কোনো পদার্থ থাকতো না; সবাই রাতারাতি কাজের মানুষ হয়ে উঠতো!

ভুল বুঝো না মা! কাল রাগের মাথায় সব কথা বলে আমাদের ভালোই করেছো, চোখ খুলে দিয়েছো মা! আমি বলছি দেখো, এর ফল ভালোই হবে।

আর শোনার ধৈর্য্য ছিলো না মায়ের; পদশব্দে মেদিনী কম্পিত করে, নিজের ঘরে চলে গেলেন তিনি। ম্লানমুখে বলে সুমিতা, তোমরা সবাই মিলে কি আরম্ভ করেছো ছোটমামা? থাক, এ নিয়ে তোকে আর মাথা ঘামাতে হবে না মিতু! তার চেয়ে ভালো খবর দিতে পারি, আগে কি খাওয়াবি বল?

—কি খাবে তাই বলো? ডিমের চাউ চাউ, মোগলাই পরোটা? কমলার পুডিং? রসগোল্লার মালাই; কাশ্মীরী ঘুগনী, লাহোরী বালুসাই, পাঞ্জাবী পায়েস। বলো আরো কিছু?

আর নয়, আর নয়, বাব্বা, খেতেই চেয়েছি, তা বলে ফাঁসি তো যাচ্ছি না!

এই যে, নে। লণ্ডন থেকে চিঠি এসেছে তোর। একখানি সুদৃশ্য নীলাভ খাম সুমিতার হাতে দিলো অনিল।

চিঠিখানা নিতে গিয়ে ছোটমামার মুখের দিকে সলজ্জ দৃষ্টিপাত করে মিতা। দেখতে পায়, ওর চোখে, ঠোঁটের ফাঁকে, চাপা হাসি খেলছে! নিটোল কপোল দুটি ওর পাকা টোমাটোর মত হঠাৎ রক্তিমবর্ণ হয়ে ওঠে, কানের পাশে ঘাড়ের ওপর, মৃদু জ্বালা অনুভব করে।

এর নাম কি পুলক শিহরণ? ভেবে পায় না।

নিজের ঘরে, দুরু-দুরু বক্ষে প্রবেশ করে সুমিতা! সোফার ওপর বসলো পাখাটা জোরে চালিয়ে দিয়ে। খামখানি দেখলো বার বার। ওর পুলক ভারে অবনত চোখ দুটি থেকে যেন পবিত্র প্রেমের স্নিগ্ধ ধারা ঝরে পড়ছিলো খামখানির ওপর।

সুদাম! ওর দামীদা'! তার চিঠি! গত রাত্রেই তো তার সারা মন-প্রাণ চাইছিলো সুদামকে, ওর আর্তস্বর কি সেই সুদূর সাগরপারে পৌঁছেছিলো? শুনতে পেয়েছিলো সে? তাই পাঠিয়েছে। তার স্নেহসিক্ত অন্তর্বাণী?

সন্তর্পণে চিঠিখানি খাম থেকে বার করে পড়তে থাকে সুমিতা!

"কি করছো এখন মিতা? সর্বক্ষণ অবাধ্য মনটা ছুটে চলেছে তোমার পানে! কিছুতেই যে তাকে পাঠ্যবিষয়ে নিযুক্ত করতে পারছি না! শুনতে পাচ্ছি তোমার গীটারের সুরমূর্চ্ছনা! তোমার গানের সুর যেন ছড়ানো এখানকার আকাশে-বাতাসে!

অচেনা পরিজন আর অজানা পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে বোধ হয় বেশ কিছু দিন সময় লাগবে।

মন খারাপ করে থেকো না লক্ষ্মীটি! দিদিমা, মাসী, মামা, তুমি নিজে,—সব ভালো তো? তোমার খরগোস আর পাখীগুলো? নিরাপদে আছে তো?

শরীর আমার ভালোই আছে, আমার জন্যে তুমি কিছুমাত্র ভেবো না!

টেলিগ্রামে পৌঁছোনো খবর, কাকা নিশ্চয়ই জানিয়েছেন তোমাদের? তারপর নিজেকে একটু স্থিতি করে নিয়ে, তোমাকে আর মাকে চিঠি লিখতে বসেছি। বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা। কত—কত বার লুকিয়ে চোখের জল আঁচলে মুছছো মিতা? না রাণী, মনকে স্থির করো, মাত্র তিনটে বছরের ব্যবধান, তার পর সারা জীবন থাকবো তোমার পাশে—আর একটা দিনও কোথাও যাবো না তোমাকে ছেড়ে।

খুব তাড়াতাড়ি জবাব চাই কিন্তু। তোমার হাতের স্পর্শ-লাগা কয়েকটি ছত্র, সে যে এই সুদূর সাগর-পারে, আত্মপরিজনহীন দেশে, আমার একমাত্র সান্ত্বনা। তাই তার জন্যে চলবে আমার আকুল প্রতীক্ষা। আমার অন্তহীন স্নেহ-অনুরাগ পাঠালেম মিতু।

ইতি—দামীদা"

—কি রে মিতা, এখনো বসে আছিস, কলেজ নেই তোর? কার চিঠি রে? হুড়মুড়িয়ে ঘরে প্রবেশ করে করবী। মুখে-চোখে ক্লান্তির ছাপ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

—সুদাম, মা-নে—দামীদা'র চিঠি। কেমন জড়িয়ে যায় সুমিতার ঠোঁটের ভাষা। আবিরের ছোপ লাগে গালে।

—ওঃ, তাই বুঝি! তাই তোকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে, খুশীর আলোয় ঝলমল করছে মুখখানা।

—আঃ, একটু আস্তে! দিদিমা শুনতে পাবেন যে! তার পর করবীর গলাটা এক হাতে জড়িয়ে ধরে বলে সুমিতা—আমার ওপর রাগ করেছো ছোট মাসী? কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমাকে ফেলে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিলো না। তবে অসীম বাবু-র

ওকে বাধা দিয়ে বলে করবী—দূর পাগলী, রাগ করবো কেন? আমি কি তোর বডিগার্ড নাকি যে যখন যেখানে যাবি, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও দৌড়োতে হবে? খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে করবী, সুমিতাও যোগ দেয় ওর হাসিতে।

—বলি এসবের মানে কি, জানতে চাই আমি। দিদিমার গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে ওরা দু'জন। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত, থমথমে অন্ধকার মুখে ওদের সামনে আবির্ভূতা হলেন মায়া দেবী।

—কি জানতে চাইছো মা? আমার টিউসানীর কথা? আগে কিছু ঠিক ছিলো না, তাই বলিনি। আজই সকালে পেলাম চাকরীটা কি না। শ্রীদুর্গা মিলের প্রোপ্রাইটার ধনপতি ক্ষেত্রীর মেয়েকে বাংলা গান শেখাতে হবে। গীটারও শিখবে। কাল কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আজ গিয়েছিলাম সেখানে। এসেছে আরো অনেকে, তবে আমার বরাতেই লেগে গেলো চাকরীটা। মাইনে ভালোই, এখন একশো করে দেবে, পরে যোগ্যতা বুঝে বাড়াবে।

—বাঃ, চমৎকার! বাঙালী ছেড়ে এবার ভুঁড়িওলা মাড়োয়ারীর দরজায় ধর্ণা দাওগে, লজ্জা হলো না ও-কথা আমায় শোনাতে? সমাজে আর মুখ দেখাবার পথ রাখলে না আমার! এতও ছিলো এ পোড়া বরাতে! চোখে আঁচল চাপা দেন মায়া দেবী।

—ভুল করছো মা! মুখ লুকিয়ে রাখবার মত কোনো ব্যাপার ঘটেনি এতে। শিক্ষাদান করার কাজে, লজ্জার চেয়ে গৌরবের মাত্রাই বেশী, এই আমার ধারণা। আর ঝোড়ো পাতার মত এলোমেলো জীবন যাপন করার মাঝেই বা আছে কোন সার্থকতা? তবু কাজের মধ্যে থাকলে জীবনের একটা পথনির্দেশ পাওয়া যায়। কথা বলতে বলতে এগিয়ে যায় করবী মায়ের দিকে। দু' হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলে—তুমি খুব ভালো মনে আমায় সম্মতি দাও মা গো! তা না হলে আমার কিছুই হবে না। তোমায় দুঃখ দিতে আমি পারবো না, তবে একটা বাসনা জেগেছিলো মনে, সুযোগও মিললো কিন্তু তোমার মত না পেলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।

—না, বাধা আমি আর কাউকে দেবো না। সকলকারই ভালো-মন্দ বোঝবার বয়েস হয়েছে, যে যার পথ বেছে নেবার শক্তিরও অভাব নেই, তখন আমি কেন মাঝপথে বাধার সৃষ্টি করি? করবীর হাত ছাড়িয়ে অবসন্ন পদক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করলেন তিনি।

খোলা চিঠিখানি হাতে নিয়ে নিশ্চল ভাবে বসেছিলো সুমিতা। মনে এলোমেলো প্রশ্ন। ছোট মাসী চাকরী করবে? কেন? রাতারাতি সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেছে। কেমন সব এলোমেলো। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করে সে, তুমি হঠাৎ চাকরী করতে গেলে কেন ছোট মাসী? আর দিদিমাও যেন আজ বড় বেশী উত্তেজিত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। আমার মনে হয়, এমন কোনো ত্রুটি আমার দিক থেকে ঘটেছে, যার জন্যে এই সব গোলমালের সৃষ্টি হচ্ছে। আমার বড্ড খারাপ লাগছে ছোট মাসী; তুমি আমাকে খুলে বলো কারণটা।

—আরে না, না, একেবারে কিচ্ছুটি ঘটেনি। জীবনটা বড় একঘেয়ে লাগছিলো, হয় দিনরাত বাড়ীতে বসে থাকা, নয় বাইরে হৈ-হুল্লোড় করা, লেখাপড়ার তো বালাই নেই। কত দিন আর ভালো লাগে এ-সব? তাই একটা নতুন জীবনের স্বাদ গ্রহণ করবার চেষ্টায় আছি, এই হলো ব্যাপার। আর মার কথা? যত দিন না তাঁর এই রূপসী বিদুষী কনিষ্ঠা কুমারীর জন্যে কোনো এক রাজপুত্র প্রণয়মাল্য নিয়ে না আসবেন, ঠিক তত দিন ওঁর মেজাজও অমনি হাই টেম্পার হয়ে থাকবে। তাই তো বলি, আমাকে হুকুম দাও না, তোমার গোবর-গণেশ ছোট জামাইকে তার গর্ত্ত থেকে চুলের ঝুঁটি ধরে, ধুতরোর মালা গলায় দিয়ে এক্ষুণি এনে পিঁড়েয় দাঁড় করিয়ে

দিচ্ছে ; দেখি ওঁর পেল্লাদি কন্তের মালা বদল হয় কি না। দুজনেই হেসে উঠলো। যাক বাজে কথা। হ্যাঁ রে, সুদাম কি লিখেছে? ভালো আছে তো? শুধোয় করবী।

—পড়েই দেখো না, সলজ্জ হাসি হেসে সুদামের চিঠিটা করবীর হাতে ফেলে দিয়ে ছুটে পালায় সুমিতা।

ধনপতি ক্ষেত্রির বাড়ীতে যায় করবী গান শেখাতে। সুমিতা যায় অলকাপুরীতে নৃত্য-গীতের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে। আর অনিল যায় ধনপতি ক্ষেত্রির ষ্টুডিওতে। ক্ষেত্রির নতুন বই বসন্তসেনাতে নায়কের পাট পেয়েছে সে, নায়িকা শুকতারা। একেবারে প্রথমেই নায়কের ভূমিকাটি অবশ্য অলকাপুরীর মাসীমার সুপারিশে পেয়েছে অনিল।

—ওর ইটালিয়ান টাইপের মুখাকৃতি আর চটপটে চলন, বলন, অল্প সময়ের মধ্যেই মাসীমার অন্তরকে জয় করে নিতে সমর্থ হয়েছিলো।

মাসীমার সুনজরে পড়লে সে ছেলেমেয়ের উন্নতির পথ, কুসুমাস্তীর্ণ এ রকম একটা জনরব আছে। শুকতারা, আরো কয়েকটি অভিজাত ঘরের ছেলেমেয়ে এর জলন্ত প্রমাণ। অনিলের বেলায়ও সে প্রবাদ বাক্যটি নিষ্ফল হয়নি। মাস তিনেক ধরে সুমিতারও শিক্ষার পরিমার্জ্জনা চলেছে মাসীমার হাতে।

—নাচের গঠন আছে তোমার, শিক্ষাও কিছু আছে, তবে বড্ড সেকেলে ধরণ। ভাব-ব্যঞ্জনাহীন। নাচের তালের সঙ্গে চাই অর্থময় ইঙ্গিত। পায়ের ছন্দে করমুদ্রায় ফুটিয়ে তুলতে হবে অন্তরের আবেদন। তবেই সেই নাচ হবে উচ্চস্তরের আর্ট।

অলকাপুরীর সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষে সুমিতাকে পাশে বসিয়ে উপদেশ দিচ্ছিলেন মাসীমা। নিবিষ্টচিত্তে মূল্যবান শিক্ষাগুলো গ্রহণ করেছিলো সুমিতা।

ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে বিচিত্র আলপনা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রাকেটে নানা রংএর দেশী-বিলাতি পুষ্পগুচ্ছ। অপরূপ নৃত্যভঙ্গিমার ফটো তার মাঝে মাঝে। আরো অনেক শিক্ষার্থীর ভিড় সে কক্ষে। নাচের মহড়া সুরু হলো অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে।

শুকতারার বসন্তসেনার বিশেষ নৃত্যকলা প্রথমে আরম্ভ হলো। বসন্তসেনার সঙ্গে নাচের অংশ গ্রহণ করলো, সখীবেশধারী আরো পনেরোটি মেয়ে! চোখধাঁধানো নিওন লাইটের তলায়, হাল্কা রং-এর নাইলনের সূক্ষ্ম শাড়ী, জরির কাঁচুলি, পাতলা ওড়না, আর ফুলের অঙ্গাভরণে সজ্জিতা বসন্তসেনা আর তার সখীদের নৃত্যের ছন্দে ছন্দে প্রবাহিত হলো বিচিত্র লাস্যতরঙ্গ।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে ওদের পানে চেয়েছিলো সুস্মিতা! আড়চোখে তার মুগ্ধ দৃষ্টিপাত লক্ষ্য করে, গর্ব্বের হাসি হাসছিলেন মাসীমা।

চুপি চুপি বললেন ওকে—এদের চেয়েও অপূর্ব্ব করে গড়ে তুলবো তোমায় মিতা! গানের গলাটিও তোমার ভারি মিষ্টি, তবে উচ্চারণ চাই আরেকটু বিশুদ্ধ, আর ছোট ছোট গিটকিরীগুলো আরেকটু স্পষ্ট আর সুরেলা হওয়া চাই।

খুব শীগগির তৈরী হতে হবে তোমায়। খানিক আগে তোমার সঙ্গে যাঁর পরিচয় করিয়ে দিলাম? ঐ যে, বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরেছে অনিরুদ্ধ বসু? ওর বাড়ীতে হবে একটা বড় রকমের পার্টি!

অভিজাত সমাজের গণ্যমান্য পুরুষ আর মহিলারা আসবেন সেখানে। সেদিন ওখানে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার ভার মিসেস বাসু আমার ওপরেই দিয়েছেন কি না, তোমার নাচ হবে সেদিনের প্রোগ্রামের প্রধান আকর্ষণ।

কেমন যেন রোমাঞ্চ লাগে মাসীমার কথায়, সুস্মিতার অন্তরে! পাষাণের বুকে যেন লাগে প্রাণের দোলা। সলজ্জ হাসি ফুটে ওঠে ওর গোলাপ পাপড়ির মতো ওষ্ঠপ্রান্তে। খঞ্জন পাখীর মত সুন্দর চোখ দু'টি পুলকাবেশে নত হয়ে আসে!

লোলুপ দৃষ্টি দ্বারা সে সৌন্দর্য্যসুধা লেহন করছিলো অসীম হালদার। মায়া দেবী মাঝে দু'-চার দিন এসেছেন সুস্মিতার সঙ্গে, তবে প্রত্যহ আসা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। অতবড় সংসারটার সব দায়িত্ব তো একা তাঁকেই বহন করতে হয়। সেজন্যে অসীমকেই রোজ সন্ধ্যায় সুস্মিতার সঙ্গে আসতে হয়। আজ কয়েকটি বিশেষ ধরণের নৃত্যের মহড়া হবে শুনে এসেছেন তিনি। মাননীয় ও মাননীয়া অতিথিদের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করে, গল্প জমিয়েছেন মিসেস বাসুর সঙ্গে। মন কিন্তু তাঁর সুস্থ ছিলো না। অনুশোচনার কাঁটাগুলো যন্ত্রণা দিচ্ছে মাঝে মাঝে। মেয়েদের উন্নত শিক্ষালাভের কি চমৎকার জায়গা! দুর্ভাগা মেয়েটা এসব ছেড়ে গেলো কি না গানের মাষ্টারী করতে? যদি আসতো এখানে হলপ করে বলতে পারেন তিনি, সুপাত্র একটি নিশ্চয়ই যোগাড় হতো এখানে।

আহা, কি সব চাঁদের টুকরোর মত ছেলের দল ঘোরাফেরা করছে এখানে! ওদের হালচাল দেখলে যে কেউ মালুম করতে পারবে যে এরা সব পাঁচ, দশ হাজারী মাসিক আয় করণেওলা ঘরের ছেলে।

কি দুর্ম্মতিই না হয়েছিলো সেদিন তাঁর; মেয়েকে করলেন অযথা তিরস্কার। সেই কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করা ছাড়া উপায় কি এখন?

যাক, ছেলেটা তবু একটা হিরোর পার্টই পেয়েছে! উন্নতিও করবে জানা কথা!

মানসচক্ষে তিনি দেখতে লাগলেন, সুসজ্জিত হালফ্যাসানের একখানি বাড়ী, অসীমের মত প্রকাণ্ড একখানা সাদা বুইক গাড়ী! ব্যাঙ্কে কয়েক লক্ষ টাকা! ব্যস, এর বেশী আর কিছু চান না তিনি।

কত লোক আসছে তাঁর বাড়ীতে, ছেলের দর্শনপ্রার্থী হয়ে, কিন্তু দেখা তারা পায় না, অত সহজে কি আর দেখা মেলে? সময় কোথা তার? বড় বড় ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে চলেছে কনট্রাক্ট! দিন-রাত এ ষ্টুডিও থেকে ও ষ্টুডিওতে ছুটোছুটি! নাওয়া খাওয়ার সময় পায় না বাছা। তার পর নিজের ষ্টুডিও, নিজের কোম্পানী অসম্ভব নয়। ব্যথার ক্ষতটার ওপর সান্ত্বনার প্রলেপ দেন মায়া দেবী।

চঞ্চল পায়ে এগিয়ে চলেছে সময়ের মুহূর্ত্তগুলো। কেটে গেছে আরো কয়েকটি মাস।

সুস্মিতার সমস্ত সত্তাগুলো ভেঙে-চুরে, নতুন ছাঁচে ঢেলে গঠন করতে লেগেছেন অলকাপুরীর মাসীমা।

সে আর আগেকার ভীরু, লাজনম্রা, স্বল্পভাষিণী সুস্মিতা নয়;—তার অন্তরে যেন শতাব্দীর নিদ্রার জড়তা কাটিয়ে জেগে উঠেছে এক প্রাণচঞ্চলা নারী!

শুক্লা একাদশীর অসম্পূর্ণ চন্দ্রকলা আজ হাস্যে, লাস্যে, চঞ্চলতায়, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রে বিকাশিতা হয়েছে!

সুদাম ছিলো জীবনে তার ধীর, স্থির, পঙ্কিল, কামনাহীন, শ্বেতকমলস্বরূপ! দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত পবিত্র নির্ম্মাল্যস্বরূপ! তার নিষ্কলুষ সঙ্গ মনে আনে আধ্যাত্মিক ভাবের সূক্ষ্ম অনুভূতি—দিব্য পরশ!

জাগে না নারীর চঞ্চলতা! সোনার কাঠির স্পর্শে নারীর কামনাময় ইন্দ্রিয়গুলোকে সে যেন করে দেয় নিদ্রাতুর! শুধু জাগিয়ে রাখে এক অতি মানবীয় সত্তাকে, শুদ্ধ প্রেমের হোমানল-শিখাকে!

অসীম ঠিক তার বিপরীত! সে যেন একটি দুরন্ত ঝড়; দাবানল! যেন জ্বলন্ত বিসুবিয়সের প্রতীক! সুস্মিতার মনে ছড়িয়ে দিয়েছে তপ্তলাভা! সৃষ্টি করেছে প্রবল সংঘাত। দুরন্ত ঝাঁকুনি দিয়ে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে তার স্বপ্নসৌধখানি।

তার দানবীয় ব্যক্তিত্বের দুর্নিবার আকর্ষণে সুস্মিতার জীবনে জেগে উঠেছে এক শাশ্বত কামনাময়ী নারী! সে শুধু কল্পনার সৌন্দর্য্য পানে আর তৃপ্ত হয় না, সে এখন পরিপূর্ণ বাস্তববাদী! জগৎকে দেখবার, উপভোগ করবার জন্য লাভ করেছে সে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী!

গুন্-গুন্ করে গানের কলি একটি ভাঁজতে ভাঁজতে সুস্মিতা টেনে নিয়ে বসলো তার চিঠির কাগজের সুদৃশ্য প্যাডখানি। সুদামের তৃতীয় চিঠিখানি এসেছে, দিন সাতেক হয়ে গেলো, ক'দিন নাচের রিহার্সালে বড় ব্যস্ত থাকায় জবাব লেখার সময় পায়নি!

আজ আর না লিখলেই নয়! আজ আর কোনো কাজ নয়, শুধু-শুধু সুদামের উদ্দেশে ছড়িয়ে দেবে তার নতুন ভাবপূর্ণ অন্তরের আবেগভরা পুলকগীতি! পরম অনুরাগ ভরে লিখতে সুরু করলো সে।

'—দামীদা'!

এবারের চিঠিতে পাঠাচ্ছি কত নতুন খবর! যখন তোমার অনুপস্থিতির বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল মনটা,—সেই সময়ে। পেলাম মনের অবসন্নতা দূর করবার একটি চমৎকার উপায়।

অলকাপুরীর নাম তুমি শুনেছো কি না জানি না, সেখানে নিয়মিত নাচগানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছি!

এবারে কিন্তু পরীক্ষাটা আর দেওয়া হ'ল না,—কি জানি কেন পড়ায় মোটে মন বসে না! রাগ করছো না তো?

মাঝে মাঝে মনটা যে কত উতলা হয় তোমার জন্তে, সে যন্ত্রণা তো লিখে জানাবার নয় !

কত দিন যে দেখিনি তোমায়, শুনিনি তোমার কবিতা, আশ্চর্য্য লাগে,—এত দিন তোমাকে ছেড়ে এখনও কেমন করে আমি বেঁচে আছি, দামীদা' !"

বাইরের বারান্দায় মস্-মস্ জুতোর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো অসীমের অধৈর্য্য কণ্ঠস্বর।

—মিতা ! প্রস্তুত আছো তো ? সময় কিন্তু বেশী নেই।

অর্দ্ধসমাপ্ত চিটিখানি প্যাডের ভেতর লুকিয়ে ফেলে মিতা।

—এ কি এখোনো বসে আছো ? ছটায় যে মিসেস বাসুর বাড়ীতে পার্টি ! তোমার জন্তে অপেক্ষা করছেন মাসীমা ! ভুলে গেছো নাকি সব ? মোটে দুটো দিন দেখা হয়নি, এতেই এত ভুল, না জানি দু'মাস দেখা না হলে তুমি কি করবে ? হয়তো চিন্‌তেই পারবে না !

আজ সারা দিন সুদামের কথাই ভেবেছে সে। তার চিন্তা সত্যই ওকে ভুলিয়ে দিয়েছিলো অন্যান্য প্রয়োজনীয়। অপ্রোয়জনীয় সব ব্যাপারকে ! সে যে সঙ্কল্প করেছিলো আজকের মনোরম সন্ধ্যাটি সুদামের ধ্যানে ভরিয়ে দেবে—

—শরীরটা কেমন ভালো ঠেক্‌ছে না, আজকের প্রোগ্রামে আমাকে বাদ দেওয়া যায় না ? মৃদুস্বরে বলে মিতা।

—কি আশ্চর্য্য ! তাই আবার হয় না কি ? তুমি যে এখন অলকাপুরীর সেরা মেয়ে গো ! আজকের প্রোগ্রামের লাইফ যে তুমি ! শরীর খারাপ ? ও-সব কিছু না—নাও ওঠো, ওঠো,—

—ওর দুই হাত চেপে ধরে অসীম, নিজের লোহার সাঁড়াশীর মত কঠিন দুই হাতে। তারপর এক ঝাঁকুনি দিয়ে ওকে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় মেঝের ওপর।

কেমন শির-শির করে সুমিতার সর্বাঙ্গ। ঝিম্ ঝিম্ করে মাথাটা। সম্মোহিত রোগীর মত, ভীতিপূর্ণ বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে অসীমের শাণিত ছুরির ফলার মত চক্‌চকে চোখের পানে।

—হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! উল্লাসের হাসিতে সারা দেহটি কাঁপিয়ে বললো অসীম।—কি দেখছো অমন করে ? যাও, তৈরী হয়ে নাও শীগগির ! তখনও দু'টি মনের প্রবল দ্বন্দ্ব চলছে সুমিতার অন্তরে ! সভ্যতার পালিশ করা, সামাজিক মন ওকে ডেকে নিয়ে চললো পাশের ঘরে বেশ পরিবর্ত্তন করবার জন্তে।

—আর অন্তরের গভীর অতলে অবচেতন মনটা যেন হায়, হায়, করে উঠলো, কোন অজানা আশঙ্কার আবছায়া দর্শন কোরে। একটা নিগূঢ় বেদনার নিষ্পেষণে গুমরে কেঁদে উঠ্‌লো সে !

খানিক বাদেই বেশ পরিবর্ত্তন করে ফিরে এলো সুমিতা।

—ওয়াণ্ডার ফুল ! ! ! কি অপরূপ মানিয়েছে তোমায় লাল শাড়ীতে। এবার গলায় আর হাতে পরো কিছু লাল আভরণ।

নত দৃষ্টিতে একটু চিন্তা করে বললো সুমিতা—চুণির গহনার সেট্‌টা আমার দিদিমার সিন্দুকে আছে, তিনি এখন বাড়ী নেই, তবে লাল জেড পাথরের গয়না আছে, ওতে যদি চলে।

—আলবৎ চলবে ! বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান মনোমুগ্ধকর রূপ তোমার—এর ওপর অতি সামান্য আভরণও অসামান্য হয়ে উঠবে।

আজ আর সুমিতা লাল হয়ে ওঠে না, ক'মাস ধরে অবিরাম রূপের স্তুতিবাদ শুনেছে সে, ওটা এখন সয়ে গেছে।

ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে লাল জেড পাথরের অতি প্রিয় গহনার সেট্‌টি বার করে পরলো সে।

মধুর স্মৃতির মৃদু শিহরণ এক ঝলক পুবালী বাতাসের মত ছোঁয়া দিয়ে গেলো ওর সর্বাঙ্গে। বছর দুয়েক আগে ঐ জলজলে লাল পাথরের গহনার সেট্‌টি, দার্জ্জিলিং থেকে এনে ওকে উপহার দিয়েছিলো সুদাম।

—অলকাপুরীতে যখন ওরা পৌছোলো, তখন ছ'টা বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি।

—অধৈর্য্যভাবে ছুটে এসে গাড়ীতে উঠে পড়েন মাসীমা।

ইস, এত লেট্ তোমাদের ? সেখানে ষ্টেজ সাজানো এখনো বাকি, শিল্পীরা কে এলো না এলো, আরো কত প্রয়োজন থাকতে পারে, সব গেলো এলোমেলো হয়ে। টাইমের ছকে পা ফেলে চলবার অভ্যাস করো তোমরা, তা না হলে আন্তর্জাতিক বিদগ্ধ সমাজে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলতে অসুবিধা ভোগ করবে।

[ক্রমশঃ।
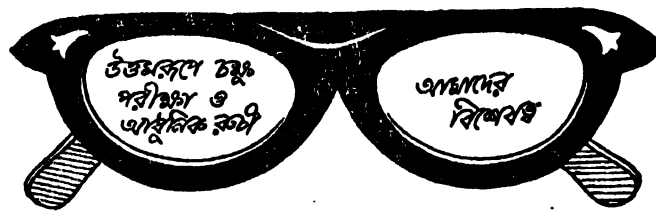
বিজ্ঞানবার্তা

পক্ষধর মিশ্র

আবর্জ্জনার মূল্য বিষয়ে অনেক আলোচনাই আপনারা শুনেছেন। একজনের কাছে যা আবর্জ্জনা—আর একজনের কাছে হয়তো তা নয়। আজকে যাকে আবর্জ্জনা গণ্য করে আমরা ফেলে দিচ্ছি, আগামী কাল তা থেকেই মানবসভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক কোন বস্তু আবিষ্কার হতে পারে। যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানেই তাদের বস্তু সমূহের উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু অনাবশ্যক বস্তু আবর্জ্জনাস্বরূপ জমে যায়, এদের অপসারণ অথবা উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকেই যথেষ্ট চিন্তা করতে হয়। সহরের মধ্যে একে ফেলে দেওয়া যায় না, তাহলে নাগরিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হতে পারে আর সহরের বাইরে পাঠানও এক বিরাট সমস্যা! পরমাণু শক্তি ব্যবহারের যুগে এই সমস্যা আরো প্রকট হয়ে উঠবে; তাই বিজ্ঞানী মহল খুবই চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। পরমাণু চুল্লী ব্যবহারের পর যে তেজস্ক্রিয় আবর্জ্জনা পাওয়া যাবে তাকে কি করে অপসারণ করা যাবে? এই আবর্জ্জনা সহরের মধ্যে রাখাও নিরাপদ নয় আবার সহরের বাইরে ফেলাও বিপজ্জনক। এই আবর্জ্জনা থেকে সর্ব্বদাই মারাত্মক রশ্মিসমূহ নির্গত হবে, যা জীব অথবা উদ্ভিদদেহের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। এই আবর্জ্জনা নিয়ে মানুষ করবে কি?—পৃথিবীর কোন অঞ্চলেই একে পরিত্যাগ করা নিরাপদ নয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা নানা পরামর্শ দিচ্ছেন। কেউ বলছেন, একে কংক্রিটের এক বিরাট বাক্সের মধ্যে পুরে, চারদিক বন্ধ করে সমুদ্রের গভীরতম অঞ্চলে ফেলে দেওয়া হোক, কোন কোন বিজ্ঞানী বলছেন, না এতে খুব সুবিধা হবে না,—দুর্ঘটনায় যদি কোন রকমে বাক্স একবার ভেসে যায় তাহলে সমুদ্র তেজস্ক্রিয় রশ্মির দ্বারা বিপন্ন হবে। তাহলে করা হবে কি? এই সব বিজ্ঞানীরা পরামর্শ দিচ্ছেন, তেজস্ক্রিয় আবর্জ্জনা সমূহকে রকেটে করে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। একবার যদি এদের পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া যায় তাহলে পৃথিবী এর দায়মুক্ত হতে পারে। এরা মহাশূন্যে যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়াক, পৃথিবীর মানুষকে বিরক্ত না করলেই হোল।

বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার জন ককক্রফট্ এই বিষয়ে অন্য ভাবে চিন্তা করছেন। তাঁর চিন্তা, অন্যান্য বহু আবর্জ্জনার মতো পরমাণু চুল্লীর এই আবর্জ্জনাকেই বা কাজে লাগান যাবে না কেন? শিল্পবিজ্ঞান ক্ষেত্রে এই আবর্জ্জনাকে উপযুক্ত কাজে লাগান গেলে মানব-সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হবে। বিজ্ঞানী ককক্রফট্, রেডিওলজির ব্রিটিশ কনফারেন্সে এই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন।

গত ১৯৫১ সাল থেকেই আমেরিকার ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানীরা পরমাণু চুল্লীর তেজস্ক্রিয় আবর্জ্জনা সমূহকে কাজে লাগাবার জন্য গবেষণা করছেন, ককক্রফটের বক্তৃতায় এই শ্রেণীর গবেষণার গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বিজ্ঞানী ককক্রফট্ জানান, এই তেজস্ক্রিয় আবর্জ্জনার ব্যবহারে প্লাষ্টিক শিল্পে এক বিরাট পরিবর্ত্তন আসবে; প্লাষ্টিক সমূহের মধ্যে পলিইথিলিনের চাহিদা পৃথিবীতে খুবই বেশী, এর দাম যাবে অনেক কমে। তেজস্ক্রিয় আবর্জ্জনা থেকে যে গামারশ্মি নির্গত হয় তার সহায়তায় ইথিলিনকে দলবদ্ধ করে অতি সহজেই পলিইথিলিন উৎপাদন করা সম্ভব। স্যার জন ককক্রফট্ হিসাব করে দেখান যে, ইথিলিন থেকে প্রায় এক টন পলিইথিলিন প্রস্তুত করার জন্য মাত্র ১০০ কুরী তেজস্ক্রিয়তার প্রয়োজন হয়। আগামী ৮ বছরে কেবলমাত্র গ্রেট ব্রিটেনেই প্রায় ২ টন তেজস্ক্রিয় আবর্জ্জনা জড় হবে; ২ টন তেজস্ক্রিয় আবর্জ্জনা কোটি কোটি কুরী সরবরাহ করতে সক্ষম, তাহলে চিন্তা করে দেখুন, এই শক্তি প্লাষ্টিক উৎপাদন শিল্পে কি বিরাট পরিবর্ত্তন আনতে পারবে!

* * * *

কেবলমাত্র প্লাষ্টিক শিল্পেই নয়, বহু ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, তেজস্ক্রিয় রশ্মিসমূহের উপস্থিতি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম। অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর এই রশ্মিসমূহের বিশেষ প্রভাব আছে। বিদ্যুৎশক্তি ও আলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তন আনতে পারে, তাই এর থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানের দু'টি প্রশাখা। একটি ইলেকট্রোকেমিষ্ট্রি এবং অন্যটি ফটোকেমিষ্ট্রি। আজকের দিনে তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব পরিলক্ষিত এবং তার ব্যবহারিক দিক উন্মুক্ত হওয়ায়, বিজ্ঞানের আর একটি নতুন প্রশাখার সৃষ্টি হয়েছে,—তার নাম রেডিওকেমিষ্ট্রি। এই বিভাগে নিত্য ঘটছে নতুন আবিষ্কার। বিজ্ঞানের এই বিভাগের সহায়তায়ই শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই পরমাণু চুল্লীর ভিতর বাতাস থেকে সার প্রস্তুত করা হবে। বাতাসকে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে পরমাণু চুল্লী 'এ্যাটমিক পাইলের' মধ্যে, বিচ্ছুরিত তেজস্ক্রিয় রশ্মি থেকে প্রাপ্ত অপর্য্যাপ্ত শক্তি,—রাসায়নিক শক্তিতে পরিবর্তিত হয়ে বাতাসের নাইট্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের ঘটাবে মিলন। পাওয়া যাবে নাইট্রিক অক্সাইড, এর থেকেই প্রস্তুত করা হবে বিভিন্ন নাইট্রেট। এই 'নাইট্রেট সারে'র তেজস্ক্রিয়তা খুবই কম, নিরাপদে জমিতে ব্যবহার করা চলে।

* * * *

যাই হোক, আবার পরমাণু চুল্লীর আবর্জ্জনার ব্যবহারের কথায় ফিরে আসা যাক। কেবলমাত্র শিল্পক্ষেত্রে নয়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহারের চেষ্টা সুরু হয়েছে। সম্প্রতি ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা ক্যান্সারের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় রশ্মির উৎস হিসাবে পরমাণু চুল্লীর আবর্জ্জনা ব্যবহার করে সুফল পেয়েছেন। কাম্বারল্যাণ্ডের উইণ্ডস্কেল ওয়ার্কাস ব্যবহৃত পরমাণু চুল্লীর আবর্জ্জনা, লণ্ডনের রয়েল মার্সডেন হাসপাতালের চিকিৎসকেরা একটি বিশেষ ধরণের যন্ত্রে স্থাপন করে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করছেন। অনেক চিকিৎসা- বিজ্ঞানীই আশা করেন, অদূর ভবিষ্যতে এই তেজস্ক্রিয় আবর্জ্জনার সহায়তায় মানুষ খুব সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে।

* * * *

পক্ষধর মিশ্রকে আবার কলম থামাতে হলো। বিজ্ঞান বার্ত্তা লেখার সময়েই কাগজওয়ালা দিয়ে গেল সকালবেলার খবর কাগজ। প্রথম পাতায় বড় বড় হেড লাইন—সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব কল্পনা করা যায় না। এই সাফল্য বিজ্ঞান সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে এক অতুলনীয় মর্য্যাদার অধিকারী। মানুষের বহু যুগের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার সার্থক রূপ। জানতাম, এই বৎসরই আমেরিকা এবং রাশিয়া মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের চেষ্টা করবে—কিন্তু তার সাফল্য সম্বন্ধে কেহই নিঃসন্দেহ ছিলেন না। আমেরিকার বিজ্ঞানী মহলের প্রচেষ্টার কিছু সংবাদ আমরা পাচ্ছিলাম, কিন্তু রাশিয়া ছিলো একেবারেই নীরব। নীরব বিজ্ঞানীমহলই সর্ব্বপ্রথম মহাশূন্য জয়ের দ্বারে আঘাত করলেন। বিস্তারিত সংবাদ পরবর্ত্তী সংখ্যায় আলোচনা করবো, এবার কেবল সফল বিজ্ঞানী দলকে বিজ্ঞান সভ্যতার ইতিহাসে তাঁদের অভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তি স্থাপনের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কার্ল ফ্রেডারিক গাউস

সর্ব্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিজ্ঞানী জোহান কার্ল ফ্রেডারিক গাউস ১৭৭৭ সালের ৩০শে এপ্রিল ব্রানসউইকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন অত্যন্ত দরিদ্র শ্রমজীবী—সংসারের আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তিনি অত্যন্ত কম বয়সেই গাউসকে রোজকারের জন্য কোন কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গাউসের মা ছিলেন একেবারে অন্য প্রকৃতির মহিলা—তাঁর আশা, গাউস লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। প্রকৃতপক্ষে মা'র চেষ্টায়ই মাত্র সাত বছর বয়সে ছোট্ট গাউস স্কুলে যোগদান করবার সুযোগ পান।

দশ বছর বয়সের সময় গাউস অঙ্কের ক্লাসে উঠলেন। অঙ্কের প্রথম দিনেই তিনি মাষ্টার মশাইকে একটি অঙ্ক কষার মাধ্যমে চমৎকৃত করেছিলেন। ঘটনাটা তাহলে বলি শুনুন, মাষ্টার মশাই এসে বোর্ডে একটা বিরাট এরিথমেটিক্যাল প্রোগ্রেসনের অঙ্ক দিয়ে জাঁকিয়ে চেয়ারে এসে বসলেন। মতলব আর কি, ছেলেরা চেষ্টা করুক আর তার মধ্যে আমি একটু জিরিয়ে নিই। বিরাট ঐ অঙ্কের পাল্লায় পড়ে ছেলেদের তো মাথা খারাপ হবার অবস্থা। হঠাৎ গাউস উঠে এসে শ্লেটটা মাষ্টার মশায়ের টেবিলে রেখে তাঁকে বিরক্ত করলো! ব্যাপার কি?—মাষ্টার মশাই শ্লেট দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন!—শ্লেটের উপর কেবল অঙ্কের উত্তরটা লেখা রয়েছে। শক্ত অঙ্কটা একেবারে মনে মনেই করেছে গাউস—কোন কিছুরই সাহায্য না নিয়ে! মাষ্টার মশাই বুঝলেন, এ ছেলে সহজ ছেলে নয়; এর মধ্যে বিরাট প্রতিভা লুকিয়ে আছে। নিজের পয়সায় গাউসকে তিনি অঙ্কের বই আর খাতা কিনে দিলেন, প্রাথমিক গণিতের সীমানা পার হতে গাউসের বেশী দিন লাগলো না। স্কুলের সমস্ত শিক্ষকেরাই গাউসের শিক্ষালাভ করার এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। স্কুলের শিক্ষক বারটেলসের গণিতের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল—তিনি এবার গাউসের সঙ্গে একত্রে গণিতচর্চ্চা করতে আরম্ভ করলেন। গণিত-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় গাউসের অসামান্য ক্ষমতার কথা ব্রানসউইকের ডিউকের কানে উঠলো, তিনি জ্ঞানী আর গুণী ব্যক্তিদের প্রতিভার একজন মস্তবড়ো পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রতিভাশালী বালক গাউসের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা শুনে তিনি নিজে তার শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করতে রাজী হলেন। মায়ের অনুপ্রেরণা সম্বল করে, ডিউকের শুভেচ্ছা ও কৃপায় গাউসের শিক্ষার্থী জীবন এগিয়ে চললো। ১৭৯২ সালে ম্যাট্রিকুলেসন পাশ করে তিনি ভর্ত্তি হলেন কলেজে, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সময় তিনি উচ্চ পাটীগণিত বিষয়ে মৌলিক গবেষণা সুরু করেন। ১৭৯৯ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে হেমস্টেট বিদ্যালয় থেকে তিনি গণিতবিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি লাভ করলেন।" মাত্র ২৪ বছর বয়সেই "Disquisitiones Arithmetical (Arithmetical Researches) নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করে বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ ভাবে পরিচিত হলেন। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো তাঁর খ্যাতি—অনেক সমালোচকের মতে এই পুস্তকখানিই তাঁর গবেষক জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

ব্রানসউইকের ডিউক কার্ল উইলহেম ফার্ডিনাণ্ড এই বিজ্ঞানীর আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করবার জন্য একটি ভাতার ব্যবস্থা করে দিলেন। গাউস এবার অ্যাষ্ট্রোনমি, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিজম প্রভৃতি বিষয়ের গবেষণায় মনোযোগ দিলেন, তখন জনৈক বিজ্ঞানী গ্রহাণুপুঞ্জের একটি ক্ষুদ্র অংশ আবিষ্কার করে তাকে নাম দিয়েছেন 'সিরাস'। আবিষ্কর্ত্তার মতে 'সিরাস' আর একটি গ্রহ। কিন্তু আবিষ্কারের পরেই সিরাস গেল হারিয়ে, তার কক্ষপথ নির্ণয় করতে না পারলে 'সিরাস'কে আর পাওয়া যাবে না, কেবলমাত্র হিসাব করে এর কক্ষপথ নির্ণয় করা অতি কঠিন কাজ। গাউস একে সম্ভব করলেন, অজস্র হিসাব-নিকাস করে আবিষ্কার করলেন 'সিরাসের' কক্ষপথ। অবশেষে সিরাসকে গাউস-নির্দ্দিষ্ট পথে পাওয়া গেল। বিজ্ঞানী গাউসের অবদান গণিত-বিজ্ঞানের সর্ব্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে—গুণমুগ্ধ বিজ্ঞানীমহলে তাঁকে প্রিন্স অফ ম্যাথামেটিকস আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

নেপোলিয়ন যখন জার্ম্মাণী আক্রমণ করেন, তখন গাউস ছিলেন গৌটিনজেন অবজারভেটরীর পরিচালক। গাউস রাজরোষে পড়লেন এবং তাকে ২০০০ ফ্রাঙ্ক জরিমানা করা হলো। ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাপলাসের কৃপায় তিনি এই বিপদ থেকে রক্ষা পান।

গাউস ১৯০৫ সালে এক সহপাঠিনীকে বিবাহ করেন, প্রথম পত্নীর পরলোক গমনের পর শিশু-সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁকে আবার বিবাহ করতে হয়। সাহিত্য ও ভাষার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, অনেকগুলি ভাষা তিনি জানতেন, এমন কি এক সময় সংস্কৃতও আয়ত্ত করতে চেষ্টা সুরু করেছিলেন। প্রিন্স অফ ম্যাথামেটিকস গাউস, জীবনে কতো যে সম্মান লাভ করেছিলেন তার শেষ নেই—সমগ্র দুনিয়ার গণিত-বিজ্ঞানীমহল তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করে গিয়েছিল। গণিত-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁকে আর্কিমিডিস এবং নিউটনের সঙ্গে এক আসন দেওয়া হয়। ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী পরলোক গমন করেন।

আই. এফ. এ শীল্ডের খেলা এখনও শেষ হয়নি। এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে শেষ পর্য্যন্ত শীল্ডের খেলা শেষ হবে কি না সে বিষয়ে বেশ সন্দেহ আছে।

এবারের শীল্ডের ফ্যাইনালে এক দিকে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব উঠেছে এবং অপর দিকে মহামেডান স্পোর্টিং ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব সেমিফাইনালে উঠে বসে আছে।

ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডান দলের খেলার নির্দ্দিষ্ট দিন ধার্য্য হওয়া সত্ত্বেও খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি—তারও নানান কারণ আছে। এক দিকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করে তোলার জন্য সংগ্রাম—আর সেইজন্য কলকাতার পুলিশ কমিশনার পুলিশ দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন না এবং বিনা পুলিশে কোন গুরুত্বপূর্ণ খেলা সম্ভব হবে না বলেই খেলা বন্ধ আছে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়, আবার কলকাতা মাঠে খেলার মাঝে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে আরম্ভ হয়েছে। এবারের শীল্ডের কোয়ার্টার ফ্যাইনাল খেলায় মহামেডান স্পোর্টিং ও জর্জ্জটেলিগ্রাফ দলের খেলায়। কিন্তু এ অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য দর্শক বা সমর্থকরা একটুও দায়ী নন। প্রথম এবং প্রধানরূপে দায়ী করা যায় রেফারীকে এবং তারপর কয়েক জন খেলোয়াড়কে।

ইতিপূর্ব্বে কলকাতা মাঠের ফুটবল নিয়ে নানান রকম উচ্ছৃঙ্খল ঘটনা ঘটে গেছে। দিনের আলোয় ক্লাবের তাঁবু তছনছ, পুলিশের সম্মুখে রেফারীকে প্রহার, সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন দেখে পুলিশকে কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি চালাতে হয়েছে। কিন্তু গত ১৪ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা সমস্ত ঘটনাকে ম্লান করে দিয়ে কলঙ্কমলিন ঘটনায় কলঙ্কের মোটা কালির রেখা টেনে দিয়েছে।

সেদিনের খেলার মাত্র মিনিট দু'-তিন বাকি এমন সময় খেলোয়াড়দের মধ্যে হাতাহাতি সংগ্রাম। মহামেডান দলের একজন খেলোয়াড় টেলিগ্রাফ দলের একজন খেলোয়াড়ের উপর অহেতুক আক্রমণ করেন, অপর দিকে অপর একজন টেলিগ্রাফ দলের খেলোয়াড় মহামেডান দলের খেলোয়াড়ের ব্যবহারের পাল্টা জবাব দেন। শেষ পর্য্যন্ত দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এ সময়ে রেফারী নিশ্চুপ হয়েছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যিনি সাধারণ ফাউল করার জন্যে খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁর মত রেফারী এ সময়ে প্রথমে নিশ্চুপ হয়েছিলেন! তারপর হাতাহাতি থেকে লাথালাথি পর্য্যন্ত পৌঁছবার সময় তিনি পুলিশ ডাকেন। ইতিপূর্ব্বে মহামেডান ও হাওড়া ইউনিয়ন দলের খেলায় মহামেডান দলের একজন খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করেন অথচ রেফারী কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি। অবশ্য এ ব্যাপারে আই. এফ. এ কর্ত্তৃপক্ষ দোষী খেলোয়াড়কে দুদিনের জন্য 'সাসপেণ্ড' করেছিলেন। রেফারীর নানান ভুলের জন্য এ বছরের অনেক খেলাতেই অনেক গোলযোগ হয়েছে। খেলোয়াড়দের অখেলোয়াড়ী মনোভাবের জন্য আই. এফ. এ তথা সেই খেলোয়াড় যে ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত সেখান থেকে যেমন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, তেমনি রেফারীর ভুল খেলা পরিচালনার জন্য আই. এফ. এ. কর্ত্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, ইতিপূর্ব্বে এমন অনেক ঘটনা ঘটে গেছে যার বিরুদ্ধে খুব গুরুতর শাস্তি অবলম্বন করা উচিত ছিল কিন্তু আই. এফ. এ কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতাই বলুন আর পক্ষপাতিত্বই বলুন, যার জন্যে তেমন কোন শাস্তি অবলম্বন করেন নি।

জর্জ টেলিগ্রাফ ও মহামেডান দলের খেলার দোষ-ত্রুটি নিয়ে জর্জ টেলিগ্রাফ দলের সম্পাদকের কাছ থেকে আই. এফ. এ কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিবাদপত্র গ্রহণ করেন নি। কারণ, আধ ঘণ্টা সময় অতিক্রম হয়ে গেছে বলে আইনের দোহাই দেওয়া হয়েছে। আধ ঘণ্টা সময় অতিক্রম হওয়ার জন্যে টেলিগ্রাফ দলের সম্পাদক যে কারণ দেখিয়েছিলেন, তা আই. এফ. এ কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপূত হয় নি। অথচ চারিটি ম্যাচের খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত সময় খেলানোর কোন নজির ইতিপূর্ব্বে চোখে পড়েনি। অথচ অতিরিক্ত সময় খেলার জন্যে টেলিগ্রাফ দলের যথেষ্ট আপত্তি ছিল। এখন প্রশ্ন হল, সুবিধা বুঝে আইনের দোহাই পাড়া আর কত দিন চলবে? আইন প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত মনে করি।

যত দিন পর্য্যন্ত কায়েমী স্বার্থের অবসান না ঘটবে, তত দিন পর্য্যন্ত বাংলার খেলাধুলার কোন রকম উন্নতি আশা করা যায় না। অথচ দেশে 'স্পোর্টস বিল' পাশ হয়েছে কিন্তু তা এখনও কেন কার্য্যকরী হচ্ছে না, তার কোন সঠিক কারণ এখনও পর্য্যন্ত জানা যায়নি।

একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির ৩৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এবারে রবীন্দ্রনাথের 'ঋতুরঙ্গ' নৃত্য-নাটিকাটি অভিনয় করেছেন, ও প্রতি বছরেই এঁরা প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এরূপ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এবারে 'ঋতুরঙ্গ' দর্শকদের অধিক আনন্দ দিলেও সাঁতারের যে সমস্ত কৌশল বেহুলা, কালিয়াদমনে যে নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছিল, এবারে কিন্তু ঠিক ততটা পায়নি। তবে ঋতুরঙ্গের ষড়ঋতুর বর্ণনা, প্রকৃতির বিচিত্রলীলা বাংলার শ্রেষ্ঠ কথক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মুখ থেকে ও রবীন্দ্র-সংগীতের মাধ্যমে যে কাব্যময় রূপটি ফুটে উঠেছিল, তা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। এঁদের এই মহৎ প্রচেষ্টাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

* * * *

সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রসেবীদের ফুটবল প্রতিযোগিতায় 'প্রফুল্ল সরকার কাপের' ফাইন্যাল খেলায় 'জনসেবক' পত্রিকা 'স্বাধীনতা'কে ১—০ গোলে পরাজিত করেছে।

* * * *

'গুডউইল মিশনে' আমেরিকায় তিন জন টেনিস খেলোয়াড় এসেছিলেন। কার্বলিন কাপের প্রথায় বাংলা দলের সংগে এবং

পরের দিন ইনভিটেসন খেলা খেলেন। তাঁদের খেলায় নৈপুণ্য আছে, মারের চটক আছে কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁরা ঠিক 'গুডউইল মিশনে' খেলার উপযুক্ত বলে মনে হয় না। তাঁরা যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যে ক্রীড়ামোদী মাত্রই দুঃখিত। তাঁরা শিষ্টাচার মেনে চলেন নি।

* * * *

সাঁতার

আজাদ হিন্দ, বাগে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েশনের তিন দিনব্যাপী সাঁতার প্রতিযোগিতায় তিনটি বিষয়ে নতুন ভারতীয় রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া আরও সাত জন সাঁতারু বাংলার পুরানো রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন।

নতুন ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী ২০০ মিটার বুক-সাঁতারে পঞ্চদশবর্ষীয় স্কুলছাত্র -বেণু তালুকদার ২ মিঃ ৫৩·৪ সেঃ অতিক্রম করেছেন। ইতিপূর্বে সার্ভিস দলের সাঁতারু সামসের খাঁর রেকর্ড ছিল ৩মি ০·৪ সেঃ। মেয়েদের ১০০ মিটার চিৎ-সাঁতারে বোম্বাইয়ের ডলি নাজিরকে পরাজিত করেছেন সন্ধ্যা চন্দ্র। সময় ১মিঃ ৩৩·৪ সেঃ। বুক-সাঁতারে ডলি নাজির তার পুরানো রেকর্ড ১মিঃ ৩৭·৬ সেঃ পরিবর্তে ১মিঃ ৩৭ সেঃ অতিক্রম করেছেন। পি, কে, ঠক্করের ডাইভিং যেমন দর্শকদের আনন্দ দান করেন তেমনি ৮ বছরের বালক শ্রীকান্তি দত্ত সুন্দর ডাইভিং দেখিয়ে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছে। শ্রীমান কান্তি ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েসনের সভ্য।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

রক্তচক্ষু "STOP"

লালবাজার ষ্ট্রীট ও ড্যালহাউসি ইষ্ট—
ঠিক মোড়েই এক কানা দৈত্য
তার এক চোখ রাঙিয়ে বলল—"থামো"।
অমনি থেমে গেল ট্রাম তার বুকের ঘড়ঘড়ানি তুলে,
হিস হিস করে গর্জাতে লাগল ধাড়ী আর বাচ্চা বাস,
নীরবে ঝিমিয়ে পড়া রোগীর মতন প্রাইভেট কারগুলি
স্থির হ'য়ে গেল।
তাদের বুকে-ঘাড়ে-কোলে ছিল যে মানুষের জনতা
তারাও স্থির হ'য়ে গেল পরম নিরুৎসুক হ'য়ে—
দুলল না তাদের কানের দুল আর মাকড়ি,
ফাইল ফিতে আর পাগড়ি
স্কার্ট আর শাড়ী, ধুতি আর পাজামা—
কেউ বার করল বই—কেউ বা চিঠি
যেন অনন্তকাল ধরে ঐ রক্তচক্ষু 'Stop'
তার চোখ রাঙিয়ে বলবে থামো।

আহা—যদি সত্যিই বলতে পারতো—"থামো,
চিরকাল এমন ভাবে ব'লো না
এমনি উর্দ্ধশ্বাসে জীবনকে পিষে ফাইলের চাপে,
এমন করে চোখের দ্যুতি নিবিয়ে দিয়ো না
বৈদ্যুতিক বাতির কড়া আলোর তলে
চ'লো না এমন ক'রে বৃত্তির চাপে প্রবৃত্তিকে মেরে।"
কিন্তু ও তা বলবে না—ঐ একচোখো দৈত্য
মাথায় ওর লোহার টুপি—
ও কি ক'রে দেখবে উপরের নীলাকাশকে
কি ক'রে দেখবে পিছন ফিরে লালদীঘির জলে সূর্যাস্তের সোনাকে,
কি ক'রেই বা শুনবে অন্ধকারে—কৃষ্ণপক্ষে—
ঘড়ি-ঘরের নিশীথ রাত্রের শাসন
মস্ত লাল চাঁদের চোখ-রাঙানো—"থামো"।

ছোটদের আসর
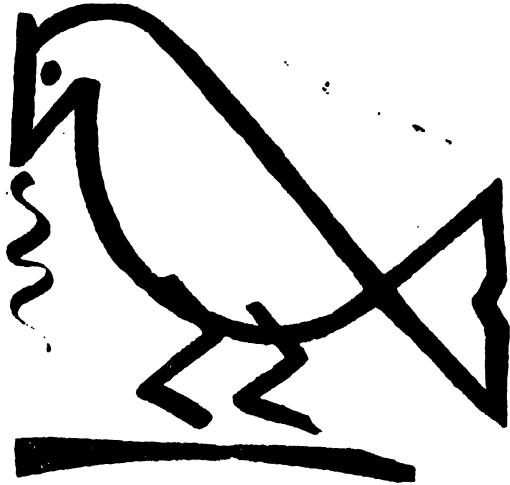
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ব্যাসকাশীতে দুর্গার মন্দির। অপূর্ব্ব তার শিল্প দেয়ালে দেয়ালে, দরজায় অলিন্দে গবাক্ষে। মনোরম উদ্যান ফলের গাছে ফুলের গাছে আলো-ছায়ায়। সেখানে এক সন্ন্যাসী। পাঞ্জাবি-পরা শান্তিপুরে ধুতি-পরা সন্ন্যাসী। বললেন, জানো—কেবলি জানো। পৃথিবীতে জানবার জিনিষের অন্ত নেই।

মীরা তো জানতেই চায়। ব'সে গেল তাঁর সামনে।

জানো গ্যালিলিও প্রথম আবিষ্কার করেন সূর্য্যের চারি পাশে পৃথিবী আর অন্য গ্রহরা ঘুরছে। পণ্ডিতরা পুরোহিতরা প্রতিবাদ করলো। এমন অশাস্ত্রীয় মিথ্যে কথা বলতে আছে নাকি! রোমের বিচারসভায় গ্যালিলিওকে স্বীকার করতে হল পৃথিবী ঘুরছে না। যেমন একজন ভূগোল শিক্ষক বলেছিলো—পৃথিবী ঘোরে না। ঘুরলে তোরা আমার ঘাড়ে পড়তিস্, আমি তোদের ঘাড়ে পড়তুম। স্কুল ইন্স্পেক্টর বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলো। বললে—পৃথিবী ঘোরে না? এ সব কি শেখাচ্ছেন? পৃথিবী ঘোরে না?

মাষ্টার বললে, ঘোরে। দশ টাকায় ঘোরে না। মাইনে মাসে দশ টাকা, তাতে পৃথিবী ঘোরানোর কথা শেখানো যায় না। দশ টাকায় চূণকামের ইংরিজি **whitewash** হয় না **limewash** হয়।

তার মাইনে বাড়লো।

গ্যালিলিও পিসা শহরে একটা ঝোলানো বাতির দোলানি লক্ষ্য করছিলেন। নিজের নাড়ী টিপে তার গতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলেন এদিকে যতক্ষণ থাকে, ওদিকে ততক্ষণ থাকে। ডাইনে যতটা ওঠে, বাঁয়ে ততটা ওঠে। এই থেকে আবিষ্কার হল ঘড়ির পেণ্ডুলাম। সময়কে বাঁধা হল। গ্যালিলিও যখন মারা গেলেন তখন আর একটি বৈজ্ঞানিকের জন্ম হল, আপেল পড়া দেখে যিনি ভাবতে বসেছিলেন, আপেল আকাশে উড়লো না, পাশে গেল না, মাটিতে পড়লো কেন? বেরোল—মাধ্যাকর্ষণ। সেই নিউটন এত অন্যমনস্ক ছিলেন, যে এক ভদ্রলোককে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোর কথা ভুলেই গেলেন। সে লোকটা অপেক্ষা করে করে রেগে নিজের খাওয়াতো খেলেই, নিউটনের ডিশও শেষ করলো। নিউটন খাবার ঘরে এসে বললেন, আমি ভেবেছিলুম এখনো খাইনি। ডিশ দেখে মনে পড়লো আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

কী মজার লোক! মীরা বলে।

আরো জানো—ফ্রান্সিস বেকন খুব উঁচু ধরণের লেখক ছিলেন। তাঁর পদমর্য্যাদা এত বেশী ছিলো যে, তিনি নাটক লিখতেন নিজের নামে নয়—কারণ সে যুগে নাটক লেখাটা হালকা ধরণের কাজ ব'লে লোকে মনে করত। লোকে বলে, সেই সব নাটক সেক্সপীয়ারের নামে চ'লে গেছে। যে কোনো দিনই লেখাপড়া শিখলো না, থিয়েটারের ঘোড়ার সহিস হয়ে কাটালো, সেই সেক্সপীয়ার কখনো এমন পণ্ডিতী ভাষা শিখতে পারে?

আরো জানো ফ্যারাডে ইলেক্‌ট্রিক লাইট আবিষ্কার করলেন, তাঁর সহকর্ম্মী হাম্‌ফ্রি ডেভি কয়লাখনির আলো বার করে হলেন 'স্যর'। আর ইটালীর গ্যালভানি যে তার বার করলেন তার নাম গালভানাইজড।

আরো জানো—পৃথিবীর সব চেয়ে বিখ্যাত ছবি হচ্ছে মোনা লিসা। এঁকেছেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। একটি রূপসী মেয়ের মুখে চাপা হাসি। সে রকমটি আজো অবধি কেউ ফোটাতে পারলো না। যে মেয়েটি এই ছবির মডেল হয়েছিলো—সে একজন অফিসারের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। অনেকক্ষণ থাকতে হত বলে একদল লোক তাকে বাজনা শোনাতো, তবে ছবি আঁকা হত, যে ছবি অমর।

শুধু জেনেই যাও, কত কি ভাববার। সেই সব কথা আবার অন্যদের জানাও। জ্ঞান বাড়ুক।

আচ্ছা, লোকে আপনাকে ঠাকুর বলে কেন? আপনি ত মরণশীল মানুষ? মীরা প্রশ্ন করে।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

ব'লে তাদের তৃপ্তি হয়, তাই বলে। যেমন খোকাকে খোকন বলে মায়ের আনন্দ। আমাকে রাক্ষস বললেও আমি চটব না, যেমন খোকাকে ভূত বললেও সে চটে না। মনটা রাখতে হবে দুনিয়ার খোকনের মতন।

দিনে একবার তুমি স্থির হয়ে কোথাও বসবে। একবার তাঁকে ডাকবে যাঁকে তুমি ভগবান মনে করো—তিনি কৃষ্ণই হোন, রামকৃষ্ণই হোন। মনে বল পাবে। যদি কোনো পয়সা বাঁচাতে পারো, একটা বাক্সয় রাখবে। কোনোদিন

তাঁরই কাজে কিংবা কোনো দুঃখীর কাজে লাগবে। এর নাম ইষ্টবৃত্তি। এ বৃত্তিতে তোমার মঙ্গল হবে।

রামনগরের রাজার বাড়ী সাধারণকে দেখতে দেওয়া হয়। কেন হয়? হয় এইজন্যে যে বাড়ী দেখতেও লোকে এ পারে আসবে। নৌকোওলা কিছু পাবে, এ দিকের জিনিসপত্র বিক্রি হবে, ঠাকুরদেবতা পয়সা পাবে, নইলে এ ব্যাসকাশীতে লোকে আসবে কেন? বরোদার রাজপ্রাসাদও খোলা হয় সাধারণের কাছে। নইলে কি দুঃখে লোকে বরোদার মতন জায়গায় নাববে? সব কাজেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে। বিনা উদ্দেশ্যে ভগবানও কিছু করেন না। তিনিও তাঁর দৃষ্টিকে বুদ্ধিময় মঙ্গলময় দেখতে চান। যদি শিশুর মতন তাঁর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারো, তাহ'লে তুমি যা চাও তাই পাবে।

সে তো ভাবতেই পারি না।

সন্ন্যাসী হাসলেন। বললেন, খালি তোমার জানবার চেষ্টা করতে হবে, পৃথিবীতে এত জিনিস জানবার আছে, এক জীবনে জেনে শেষ করা যায় না।

আপনি তো কত জানেন!

জান্‌তে জান্‌তে জানোয়ার হ'য়ে গেছি।

সন্ন্যাসী ব'লে চলেন—খালি পড়ে যাও, যেখানে যা পড়বার পাবে ছাড়বে না। হঠাৎ তোমার চোখে কোনো প্রবন্ধ বা ভ্রমণকাহিনী বা উপন্যাস এমন পড়ে যাবে যা শেষ ক'রে তোমার মনে হবে, এটা যদি না পড়তে পেতে, তোমার জীবন বৃথা হ'য়ে যেত। পাবে অনেক জ্ঞান, অশেষ উৎসাহ, অনেক সান্ত্বনা, অনেক প্রেরণা। বিশেষ ক'রে বড়ো বড়ো লোকের কাহিনী পড়লে অনেক শিক্ষা পাবে। যেমন ধরো—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। বিলেত গিয়ে তিনি ব্যারিষ্টার হ'য়েছিলেন ব'লে পৈত্রিক বাড়ী তাঁকে ছাড়তে হয়েছিলো। সাহেবপাড়ায় তিনি বাসা নিয়েছিলেন। আর হয়েছিলেন মস্ত বড়ো ব্যারিষ্টার। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি তিনি। তখন তিনি উমেশচন্দ্র নন, ডব্লিউ সি ব্যানার্জী কিন্তু মায়ের কাছে উমেশ। রোজ মাণিকতলা ষ্ট্রীটে জুড়িগাড়ী চ'ড়ে তিনি আসতেন, তখন মোটর আসেনি এদেশে। সেই গাড়ী দূরে রেখে পায়ে হেঁটে নিজের বাড়ীর দরজায় এসে ডাকতেন 'মা'। মা সদরে এসে দাঁড়ালে তিনি প্রণাম করতেন। মা বলেন, তোর গাড়ী র'য়েছে, পায়ে হেঁটে আসিস কেন বাবা? ছেলে বলে, তোমার সামনে আসব গাড়ী হাঁকিয়ে চাল দেখিয়ে? ঘাড়ে তো আমার একটাই মাথা! অত সাহস হবে কি ক'রে? সেই রাস্তার নাম এখন তাঁর নামে। কিন্তু ক'জন মনে রাখে সেই কৃতী মাতৃভক্ত ছেলের কথা? ক'জন মানতে চায়?

মীরার শুনে শুনে ক্লান্তি আসে না। আরো শুনতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সঙ্গের লোকেরা তাড়া দেয়। তাদের সকলের এসব কথা শোনার আগ্রহ নেই। বাজে কথা ব'লেই মনে করে সব। তারা ভাবে, জেনে কি হবে? জেনে কিছু লাভ আছে?

সুরমা সেদিন যাচ্ছিলো এক বড়োলোকের বাড়ীতে সেলাই শেখাতে। মীরা এসে পড়লো। ওকেও সঙ্গে নিলো। চৌখাম্বার চৌধুরীদের বাড়ী। কি প্রকাণ্ড বাড়ী! কি সাহেবী কায়দা! কে যেন এ বাড়ীতে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট আছে। এদের বাড়ীর বৌ কিন্তু মেমসাহেব নয়, ননদরা মেমসাহেব। তারা ইংরেজীতে আর হিন্দীতে কথা বলে। বাংলা বলে না। ভুরে কাপড়পরা বৌটি ব্লাউস বডির 'কাট্‌' শিখতে লাগলো। আর এদিক ওদিক চেয়ে নিজের দুঃখের কথা বলতে লাগলো। বাড়ীর বড়ো ছেলের বৌ ও, কিন্তু ওর অসুখ হলেও কেউ দেখে না। রাত্রে রুটি আর বেগুনভাজা খায়। তাই কত দিন ওর ননদরা খেয়ে বসে থাকে। ওকে উপোস করে থাকতে হয়। মীরা ভাবে এর নাম বড়োলোক! এর নাম এত টাকা! বাড়ীর প্রথম বৌ যেখানে এত কষ্ট পাচ্ছে সেখানে শাশুড়ী ননদ মেমসাহেবী করে বেড়ায় কি করে? মানুষ এতোই অমানুষ হয়?

ননদরা এলো। তাদের কথা কি মিষ্টি! মীরাকে জড়িয়ে ধরে বললে—ই কৌন্‌ হৈ? কিৎনা লাভলি। মুখটা ভারী মিষ্টি তো! কি খানা দিতে পারি তোমার বোলো।

কিছু খাব না মীরা বলে।

কেনো? সাহেববাড়ীর খানা বলে ভয় হোচ্ছে?

মীরার ইচ্ছে হল বলে, এর চেয়ে বড়ো সাহেববাড়ী আমি দেখে এসেছি। সে কলকাতার সাহেববাড়ী, এ তো হাজার হলেও কাশীর সাহেববাড়ী, যেখানে সাহেবিয়ানা বেমানান। ভালো হোটেল নেই, ভালো ক্লাব নেই।—মুখে কিন্তু কিছু বলে না। গেঁয়ো মেয়ে সেজেই চুপ করে বসে থাকে।

চৌখাম্বার এই প্রকাণ্ড বাড়ী, তার চারধারে প্রকাণ্ড বাগান, এখানে কাশী শহরের আরতির ঘণ্টাধ্বনি আসে কিন্তু ধূপধুনার গন্ধ আসে না। এত বড়ো তীর্থে এ প্রাসাদ যেন বেমানান! স্বাধীন ভারতে এ লোকগুলো যেমন বেমানান!

বাবা সেদিন এক নতুন কথা বললো—আমরা দু'শো বছরের পরাধীন নই, পরাধীন অনেক আগে থেকে। হিন্দুরাজারা যদি এক হয়ে থাকতে পারত, তাহলে হিন্দুস্থান তাদেরই থাকত, যারা এখানকার আদিম অধিবাসী। কবি বলেছেন—

সে ভাব থাকিত যদি, পার হ'য়ে সিন্ধুনদী
আসিতে কি পারিত যবন?

তুর্কী, মোগল, পাঠান বাইরের লোক। এদেশে যতদিন তারা রাজত্ব করেছে, তাদেরই দেওয়া—যাদের নাম মুসলমানরাই দিয়েছিলো 'হিন্দু,' তারা প্রজাই ছিল। সিরাজুদ্দৌলার আমল পর্য্যন্ত প্রজাই ছিল, রাজা নয়। সুতরাং সিরাজুদ্দৌলার রাজত্ব যাওয়ার নাম বাংলার স্বাধীনতা যাওয়া নয়। বাঙালী ঐতিহাসিক বাঙালী নাট্যকাররা কি করে এমন বাজে কথা লিখতে পারলো ভেবে অবাক হতে হয়! শিখরা, রাজপুতরা, মারাঠীরা, বাঙালীরা বিদ্রোহ করেছে কাদের বিরুদ্ধে? গুরুগোবিন্দ সিং, বাজীরাও, প্রতাপাদিত্য যে পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্যে লড়াই করেছিলেন,' তাকে অস্বীকার করব কি করে? আমাদের মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়ে গেছে—ইংরেজ মার্শম্যান, ইংরেজ কেরী। ইংরেজের আমলেই উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী পৃথিবী-বিখ্যাত লোকদের জন্ম হয়েছে, যা কোনো শতাব্দীতে হয়নি। মুসলমান আমলে তো নয়ই। ইংরেজ আমাদের শিখিয়ে গেছে কথার দাম, ব্যবসায়ে সাধুতা, পরধর্মকে শ্রদ্ধা, মেয়েদের সম্মান। ইংরেজ দেখিয়ে গেছে নিজের দেশের পোষাক কি ক'রে ব্যবহার করতে হয়, কি ক'রে

স্বতন্ত্র থাকতে হয়, কি ভাবে জীবন ভোগ করতে হয়। ইংরেজের গুণ আমরা কিছুই নিলাম না, শুধু গালাগালিই দিলাম। বিবেকানন্দ বার বার বলে গেছেন—ইংরেজের ভালোটা নে। ওদের কাছে অনেক শেখবার আছে। এক একজন ইংরেজ প্রায় দেবতাদের কাছাকাছি।

তোমার ভক্তির আতিশয্য যে দেখছি বাঘা দা'!

ভক্তি হবে না? আমার কাকা হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার কলেট সাহেবের গল্প করেন। বিয়ে থা করেন নি। নিঃশব্দে দান করেন। কে কোথায় গরীব কেরাণী আছে, চুপি চুপি এসে দাঁড়ালেই হ'ল! কুড়ি পঞ্চাশ একশো। কাকা একবার কি মামলায় দেরী হ'তে কলেট সাহেবকে কড়া চিঠি লিখেছিলেন। তারপর একদিন নিজের দরকারে কাছে যেতে কলেট সাহেব সব ভুলে গিয়ে কাকার উপকার করলেন। পারবে কোন বাঙালী এ কাজ করতে? ধারণায় আনতে পারবে? ইংরেজ আমলে কলেট সাহেব 'জয়হিন্দ' শুনে কৃত্রিম রাগ দেখাতেন। নিজেই যাবার সময়ে বলে গেলেন 'জয়হিন্দ'। কত লোক যে তাঁর কাছে উপকৃত হয়েছিলো বলবার নয়। কিন্তু চলে যাবার সময়ে তারাই দেখা অবধি করলো না! তিনি মনে করতেন, সমস্ত অফিসে তাঁর ছেলেরা কাজ করছে। কেউ কণ্ডাক্টরের সঙ্গে মারামারি ক'রে ট্রাম ডিপোয় আটকে আছে, খবর পেয়ে তিনি নিজের মোটরে গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন। অথচ সামান্য একজন কেরাণী সে। এর নাম ইংরেজ। একজন সাধারণ ইংরেজের সমান সাধারণ ভারতবাসী নয়—অসাধারণ যাঁরা, তাঁরাই। ইংরেজের সাহস, ইংরেজের সততা—নেতাজীর, শ্রীঅরবিন্দের, তিলকের, দাদাভাই নৌরজীর। মহামানব বিদ্যাসাগরের, বিবেকানন্দের, রবীন্দ্রনাথের। সাধারণ কোনো লোকের মধ্যে ইংরেজের গুণ দেখতে পাবে না। ইংরেজ এত বড়ো।

সেই ইংরেজ দেশের ছেলেদের জেলে দিয়েছে, ফাঁসীকাঠে লট্‌কেছে।

তা পেরেছে এ দেশী গোয়েন্দা এ দেশী পুলিশের জন্যে। তারা যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করত, ধরতে পারত কোনো সাহেব তাদের কোনো দিন? এ দেশী গোয়েন্দা, এ দেশী পুলিশ শুধু নেতাজীর যাওয়ার সময়ে জেনেও চুপ ক'রেছিলো, তাই ইংরেজ পারলো না তাঁর পথ আট্‌কাতে। ইংরেজ রাজত্বে দেশী পুলিশ সেই প্রথম ভালো কাজ করেছে। কতকটা বিবেকের তাড়নায়, কতকটা প্রাণের ভয়ে। সেদিনকার সি আই ডি-রা স্বাধীনতা দেরী ক'রে দিয়েছিলো। নেতাজী যাদের বলতেন, ইংরেজের কুকুর।

দেশ তো স্বাধীন হয়ে গেছে বাঘা দা, এখন তোমার কি কাজ?

আমরা হলাম বাংলা মায়ের দামাল ছেলে। কবিতায় যাদের বলা হয়—দুর্দ্দম দুর্ব্বার। কবি বলেছেন—

দুর্ব্বলেরে রক্ষা করো,
দুর্জ্জনেরে হানো—
আমরা সেই দলের।

আমরা শিক্ষায় সম্পূর্ণ হব, সাহসে অটুট থাকব। আমাদের কাজ বিধাতার হাতে। কখন কোথায় আমাদের দরকার হয়, কে জানে? বৌদ্ধ আর বৈষ্ণবদের শান্তির মন্ত্রের সঙ্কীর্ত্তনের মূল্য আছে—দেশ যখন শান্ত। অশান্তি যখন আসবে তখন কালীমন্ত্র—অস্ত্র নিয়ে দাঁড়াতে হবে। তখন শিবাজীর ভাগোয়া ঝাণ্ডা—গৈরিক পতাকা—হর হর মহাদেও। রাজপুতের আজ কি কোনো সাড়া পাওয়া যায়, হলদীঘাটের যুদ্ধ মেবার পাহাড়ের যুদ্ধ যারা করেছিল। কাশ্মীর, যোধপুর, বিকানীর থেকে যারা কারবার করতে আসে, হাওড়ার পোলের এপার থেকে কলকাতার তিন ভাগ আকাশ-ছোঁয়া বাড়ীতে ছেয়ে ফেললে—তারা মাড়োয়ারী। রাজপুতানার রাজপুত কই? রাজস্থানের কাহিনী যে ইংরেজ টড লিখে গেল, সে-সব কি কারবারেই চাপা পড়বে? পাঞ্জাবীদের মধ্যে শেষ লালা লজপত রায়। তার পর কারা? হয় ট্যাক্সিওলা নয় বড় চাকুরে দামোদর ভ্যালিতে কারখানায়। সাহস বীরত্ব মারামারি জাগিয়ে রেখেছে বাঙালী। আমি উত্তর-পশ্চিমের সেই বাঙালী, এখানে লাঠি না চালালে থাকা যায় না। কালই বেহারী গয়লা আর মুসলমান তাঁতীদের সঙ্গে দু' মুখো ঝগড়া করতে হয়েছে লাঠি চালিয়ে, এখানকার জনকতক বাঙালীর। আমাদেরই জিত হয়েছে। কারণ আমরা এই কথা বার বার আওড়াই—

আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।
তরীখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে,
তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধরব না।

ওরা এসব কবির বাণী জানে না। ওরা শোনেনি—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়,
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব্ব তুঃখ ভয়।

আমাদের মতন পদে পদে আর কেউ বলতে পারে না—তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ মঙ্গলময় স্বামী!

বাঘার দিকে চেয়ে চেয়ে মীরার শ্রদ্ধা জাগে। এই রোগা ছিপছিপে চেহারা, মনে হয় এক চড়ে কাৎ হয়ে যাবে, কিন্তু কী সাহস মনে?

আর কী লাঠি চালানোর কৌশল! দেখেছে সে—বিদ্যুতের মতন লাঠি চলে ওর হাতে।

আর ছুরি একটা আছে, বোতাম টিপে দিলে পেটের মধ্যে সোজা চলে যায় এদিক থেকে ওদিক। ঐ ছুরিতে নাকি কত বদমাইস লোক খুন হয়েছে।

নীচে থাকেন মহারাজ। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে আড়াইমণি মুগুর ভাঁজেন। তিনি বললেন—মীরাবাঈ, আপ্‌ হিন্দী কেঁও নেহি বোল্‌তী হ্যায়?

বাঘা জবাব দিলে, হিন্দী কি আবার একটা ভাষা?

মহারাজ বলেন, সে কি বাবুজী, সুরদাস, তুলসীদাস, মীরাবাঈ কবীরের ভাষা, ভাষা নয়?

এইটে আপনার ভুল ধারণা মহারাজ! সুরদাসের গান ব্রজমণ্ড ভাষায়, মীরাবাঈয়ের রাজস্থানীতে, তুলসীদাসের কোশলী অবোধীতে, আর কশাইয়ের ছেলে কবীরের গান খিচুড়ি ভাষায়—দিল্লীর চলতি ভাষা, ব্রজবুলি আর অবোধী মিশিয়ে। কোনটাকে হিন্দী বলা যায় না। হিন্দীর এতে গৌরব করবার কিছু নেই হিন্দীতে খাড়িবোলী চলে, তা দেড়শো বছরের বেশী পুরোন নয়

হিন্দী শিখতে হলে, আগে লিঙ্গভেদ তুলে দিতে হবে। রাস্তা হল পুংলিঙ্গ, সড়ক হল স্ত্রীলিঙ্গ, কাগজ পুংলিঙ্গ, কিতাব স্ত্রীলিঙ্গ, পুলিশ, দাড়ি, গোঁফ স্ত্রীলিঙ্গ। অদ্ভুত! আসল হিন্দী আসল বাংলার মতন—বাংলা দেশকা সুন্দর ভাষা শ্রবণ কর্‌নেমে হৃদয় পুলকিত হোতা হ্যায়। শান্তিনিকেতনকা আম্রকুঞ্জমে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকা সভাধিবেশন স্মরণীয় হো রহা!

মহারাজ হাসতে থাকেন।

এতই জানবার আছে পৃথিবীতে! মীরার মনে হয়।

সেদিন ওরা এলাহাবাদ গেল, ভোরে মোটরে চড়ে। কাশীর বিখ্যাত ল্যাংড়া আমের বাগান, সবুজ দৃশ্যে চোখ ভ'রে যায়। বাবা বললে, সবুজের দিকে নীলের দিকে যতই চেয়ে থাকবে—চোখ ভালো থাকবে।

মনে পড়লো মীরার নীল সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার বুঝি তাই অত ভালো লাগত।

আর প্রভাতের প্রথম কিরণ আলট্রাভায়োলেটে ভর্ত্তি, শরীরের পক্ষে উপকারী। সকালের সোনালী রোদ নির্মেঘ নীল আকাশে ভেসে যাওয়া সাদা মেঘ—যেখানে বাস থামছে সেখানে বনে বনে পাখীর ডাক, চওড়া গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড পীচ ঢালা চক্‌চকে—কী সুন্দর লাগে সব ভুলে শুধু চেয়ে থাকতে!

লাল সাদা অনেকগুলো ঝকঝকে ব্রীজ পার হ'য়ে এলাহাবাদ শহর ছাড়িয়ে গিয়ে প্রয়াগ ঘাট—নৌকায় ক'রে অনেকটা গিয়ে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম—নীল জল সাদা জল মিশ খাচ্ছে না, দুটো নদীর মাঝখান অথচ ডুব-জল নেই—চারিধারে ধূ ধূ করছে চড়া মাঘমেলা-কুম্ভমেলা বসে, পুরানো দুর্গ অক্ষয় বট, হু হু হাওয়া।

পুণ্য হয় না ব'লে স্বাস্থ্যের উপকার হয় বললে কে আসত এখানে? এই মাইলের পর মাইল বিস্তৃত নদী আর নদীর চরে, আসত কি হাজার হাজার যাত্রী? এমন অপূর্ব্ব দৃশ্যের মহিমা যে বোঝে, সেও আসত না। জানত না।

কোন প্রাচীন কাল থেকে দেশের মুনি-ঋষিরা মানুষকে কৌশলে ভালো ভালো জায়গায় টেনে আরবার ফন্দী করেছেন।

আর সাধারণ মানুষ বাড়ীভাগ জমিভাগ নিয়ে দলাদলি মারামারি করেছে এই ভেবে যে চিরদিন তারা থাকবে। কোথায় চ'লে গেছে সব, কার জমি কে ভোগ করছে, কার বাড়ী কবে ভেঙে গেছে, কিন্তু মানুষের হিংসাকুটিল হাসি আর চক্রান্ত বংশপরম্পরায় ভেসে এসেছে, শান্তি নেই, কোথাও শান্তি নেই।

দেশ থেকে দেশে এই ছুটে বেড়ানোর মধ্যে ভগবানের যে ইঙ্গিত, ছোটো মেয়েটির তাই ধরবার চেষ্টা দেখে সৃষ্টির দেবতা হয়ত মিটি মিটি হাসেন। একদিন ঝড়ের রাত্রে সমুদ্রের তীরে যাকে তিনি পৃথিবীতে এনেছেন তার ভবিষ্যৎ ভেবে।

তাই অন্নকূট উৎসবে ওর উৎসাহের সীমা নেই। ভিড়? হোকগে ভিড়। ও যাবেই। স্বেচ্ছাসেবকরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, পাণ্ডারা ঘেমে উঠছে, মেয়ে-পুরুষ কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, এই সিঁড়িতে ওঠো, আবার নীচে নামো—ডাইনে যাও, বাঁয়ে ফেরো, বিশ্বনাথের রাজবেশ কী সুন্দর চোখ দুটি! অন্নপূর্ণার মিঠাইয়ের মন্দির থরে থরে সাজানো, দোতলায় জালের মধ্যে সোনার বিরাট মূর্ত্তি, অন্ন দিচ্ছেন মা।

নারদ এটি ঘটিয়েছিলো। হিমালয়কে বললে, তুমি কাশীতে এসেছো মেয়েকে দেখতে? তোমার মেয়ের জাত নেই। শ্মশানের শিবকে বিয়ে করেছে ব'লে কেউ তার হাতে খাবে না। তুমি লুকিয়ে থাকো। মা এসে দেখলেন মণিকর্ণিকার ঘাটে তাঁর বাবা। বাড়ীতে যাবে না? না মা তোর তো জাত নেই। কেউ তোর হাতে খায় না শুনেছি।

এই কথা? মহাদেবকে বললেন—স্বর্গের দেবতাদের নেমন্তন্ন করো, আমি ভাত খাওয়াব। নেমন্তন্ন করে কে তেত্রিশকোটি দেবতাকে? নারদ পারে তার ঢেঁকির এরোপ্লেনে চ'ড়ে। কথায় বলে 'নারদের নেমন্তন্ন।' ত্রিভুবন এসে হাজির। সবাই তৃপ্তি ক'রে অন্ন নিলে, শেষটা নারদও ব'সে গেল।

হিমালয় বেরিয়ে এসে বললে, তবে না কি আমার মেয়ের জাত নেই?

অন্নকূট, অন্নের পাহাড়, হ'য়ে গেছে অন্নকোট মুখে মুখে। সারা ভারতবর্ষ এসে হাজির বারাণসীতে। ভিড় দেখে দেবতারা স'রে পড়েছেন।

টেলিগ্রাম এলো কলকাতা থেকে—এবার তোমায় আসতে হ'বে, নইলে টাকা পাঠানো বন্ধ হবে।

মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিলো খাঁচার পাখী। আবার গিয়ে রেনিপার্কে বন্দী হবে?

যেতে হবে সেই অশ্রদ্ধা অবজ্ঞার মধ্যে? অন্নপূর্ণার কাশীতে নিত্য উৎসব ফেলে রেখে মেকী সভ্যতার কলকাতায়? যেখানে মানুষ প্রাণ খুলে সত্যি কথা বলে না? সেখানকার লোকেরা ভাবে—

কাল হল কলি।
কলির মতন চলি।

বাবা বললে, যেতে যখন লিখেছে, তখন যেতে হবে। হাল-চাল দেখে এসো ওখানকার। নইলে তোমার পথ আমি ঠিক ক'রে রেখেছি।

পড়ে থাকবে মালবীয়া ব্রীজের নীচে উত্তরবাহিনী গঙ্গা, ঘাটের পর ঘাট, মন্দিরের পর মন্দির, মালবীজীর বিশ্ববিত্তালয়, টাঙ্গা আর এক্কার ঠুনঠুন, ফেরীওয়ালিনীদের মিষ্টি কথা—ফুল, ফল, ধূপ, চন্দন হর হর ব্যোম ব্যোম?

মীরা ভাবে, আমরা বলতে পারি না, লেখকরা কেমন গুছিয়ে মনের কথা টেনে আনেন তাঁদের কলমের মুখে—পশ্চিমের আকাশ সোনায় সোনায় ভরা, তার নীচে মন্দিরময় বেণারস, বিকেলের মিলিয়ে আসা আলোয় মিলিয়ে যাচ্ছে, নীল গঙ্গা রূপোর মতন দেখায়, ট্রেণের কামরায় আলো জ্বলে—চোখের আড়ালে চ'লে যায় কাশী, আসে মোগলসরাইয়ের মঠে, আসে অন্ধকার, আবার আলো—ষ্টেশন—কাশীর খেলনা নিয়ে ফেরিওলারা প্ল্যাটফর্ম্ম ভ'রে—মন কেমন করে—ভীষণ মন কেমন করে। কোনো জায়গার জন্তে যে মানুষের মন কেমন করে, কে তা জানত? কাঁথির পিসিমা বলেন—করে।

কাশীর মাটির পুতুলগুলো তিনি ব্রীজ থেকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে এসেছেন। কাশীর মাটি নিয়ে যেতে নেই, সোনা চুরি করা হয়।

[ক্রমশঃ।

ডাকঘরের ইতিবৃত্ত

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

আজ তোমরা দূরের বন্ধুর সঙ্গে অনায়াসে আলাপ করতে পারো চিঠিপত্রের সাহায্যে, কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন এই সহজ কাজটি ছিল পরম দুঃসাধ্য। আদিম যুগে—মানুষ যখন চিঠিপত্র লিখতে শেখেনি, তখন অপরকে কোন সংবাদ দিতে হলে এমন কোন বস্তু পাঠাতে হত যার সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত হতে পারে। বহু শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পরও এই প্রতীক (symbols) ব্যবহারের রীতি মানুষ ছাড়তে পারেনি। কিন্তু সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সে ঐ প্রতীক খোদাই করতে শিখলে পাথর, কাঠ ও হাড়ের উপর। আরও কিছুকাল গত হলে সে রঙের সাহায্যে ঐ প্রতীক আঁকতে শুরু করলে পশুর চামড়া, গাছের ছাল ও পাতার উপর। এ থেকে সৃষ্টি হল চিত্রলিখনের—বিভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে মানুষের মনের বিভিন্ন কামনা ও অনুভূতি অভিব্যক্ত হতে লাগল।

পত্রলিখনের পদ্ধতি যদিও আবিষ্কৃত হয় খৃষ্টের জন্মের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে, তবু একথা ঠিকই যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে পত্র প্রেরণের কোন সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা কল্পিত হয়নি। পত্র প্রেরণের প্রয়োজন হলে ভৃত্যের সাহায্য নেওয়া হত আর যাদের ভৃত্যের অভাব তাদের পক্ষে বন্ধুবান্ধবের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারসীকরাই সর্ব্বপ্রথম ডাকের প্রবর্ত্তন করে। পত্র লেখা হত মাটি, পাথর বা কোন ধাতুর উপর, আর ঐ পত্র পাঠানো হত অশ্বারোহী কর্ম্মচারীর সাহায্যে। এর জন্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি ছিল আর প্রত্যেক ঘাঁটিতেই অশ্বারোহী থাকত মোতায়েন।

ঐতিহাসিকরা বলেন, ব্যাবিলনেও ঐ ধরণের ডাকের ব্যবস্থা ছিল খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮০ অব্দে। কিন্তু উভয় দেশেই ডাক ব্যবহৃত হত কেবলমাত্র সরকারী কাজে। এর পর অনেক কাল ডাক-ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। তবে যে সব অঞ্চলে ঘোড়ার পিঠে যাতায়াত করা অসম্ভব সেখানে ঘোড়ার পরিবর্ত্তে উটের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। ডাক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে রোমান সম্রাটদের আমলে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে যোগাযোগ দৃঢ় করার জন্য রাজ-কর্ম্মচারীরা ডাকের উৎকর্ষ সাধনে মনোযোগী হন। পার্চমেণ্ট বা প্যাপিরাসে-লেখা চিঠিপত্র সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বার্ত্তাবাহক পায়রা, ঘোড়া ও জাহাজের সাহায্যে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ডাকের এই সুবিধা ছিল জনসাধারণের অনধিগম্য, তাদের তখনও নির্ভর করতে হত ক্রীতদাস বা দূরের যাত্রী পর্য্যটকের উপর।

এর পর ডাকের উন্নতির চেষ্টা করেন ফ্রান্সের সম্রাট শার্লমেন। রোমান সম্রাটদের মত তিনিও ঘোড়সওয়ার নিযুক্ত করেন ডাক বহনের জন্য।

মধ্যযুগে ইয়োরোপের নানা দেশে ডাকের প্রচলন হয় বটে, কিন্তু ফ্রান্স ছাড়া আর কোন দেশেই জনসাধারণ ঐ ডাক ব্যবহার করতে পারত না। ফ্রান্সে ডাক সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু ডাকে চিঠি পাঠানো ছিল এত ব্যয়সাধ্য যে অধিকাংশ লোকই ঐ ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারত না।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়োরোপের প্রায় সকল দেশেই ডাকের প্রবর্ত্তন হয় আর ঐ সময় জনসাধারণও ডাক ব্যবহারের সুযোগ পায়। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান শহরের মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হয় এবং ডাকঘরও প্রতিষ্ঠিত হয় নানান্ স্থানে। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফ্রান্সে চিঠি রেজিষ্টারী করার রীতি প্রচলিত হয় এবং ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে এক আন্তঃনাগরিক ডাকের প্রতিষ্ঠা হয় প্যারিসে। শহরের প্রধান প্রধান স্থানে ডাকবাক্স রাখার ব্যবস্থা হয় এবং ডাকটিকিটও প্রচলিত হয়।

ডাক ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে যখন লণ্ডনে পেনি পোষ্টের প্রচলন হয়। শোনা যায়, অল্প মাশুলে চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা হওয়ায় লোকের চিঠি লেখার আগ্রহ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, সমগ্র ইংলণ্ডের ডাকঘরগুলিতে যত কর্ম্মচারী ছিল তার চাইতেও বেশী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করতে হয় কেবলমাত্র লণ্ডনের ডাকঘরে। ডাকের এই জনপ্রিয়তার ফলে কিছুকাল পরেই ডাকের কর্ত্তৃত্ব গভর্ণমেণ্টের অধীনে চলে যায়।

কিন্তু ডাকের সুব্যবস্থা হলেও সপ্তদশ শতাব্দীতে ডাকের গতি ছিল অতি মন্থর, ঘণ্টায় চার মাইলের বেশী তার যাবার শক্তি ছিল না। কাজেই ডাকের গতি বৃদ্ধি করার জন্য শেষটা অশ্বারোহী বার্ত্তাবাহক নিযুক্ত হয় আর ঐ ব্যবস্থার ফলে ডাকের সমাদর উত্তরোত্তর বাড়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ষ্টেজকোচের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে ডাকের গতি অনেকটা বাড়ল বটে, কিন্তু ডাকবিভাগের কর্ত্তারা পুরানো পদ্ধতি ত্যাগ করে এই নতুন ব্যবস্থার সুযোগ নিতে আগ্রহ দেখালেন না। পূর্ব্বের মত তাঁরা হরকরার সাহায্যেই চিঠি পাঠাতে লাগলেন। ফলে জনসাধারণ আইন অমান্য করে ষ্টেজকোচে চিঠি পাঠাতে লাগল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ডাক পাঠাবার জন্য ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র নিয়মিত কোচ সার্ভিসের ব্যবস্থা হল আর ঐ বৎসরই ইয়োরোপের অন্যান্য দেশও ইংলণ্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুস্তক ও সংবাদপত্রের প্রসার বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার বিস্তার ঘটে, ফলে জনসাধারণের লেখার আকাঙ্ক্ষা ও শক্তিও বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন ষ্টীমার ও রেলপথের প্রবর্ত্তন হয় তখন ডাকের ব্যবহার আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি পায়।

ইয়োরোপে যখন ডাক বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তখন আমেরিকাতেও ডাক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন শুরু হয়। আমেরিকায় ডাকের প্রথম প্রচলন হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। প্রথম ঔপনিবেশিকের দল এখানে আসার পর কিছুকাল পর্য্যন্ত মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। একই উপনিবেশের অন্তর্বর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামে চিঠিপত্র পাঠাবার জন্য বেতনভোগী হরকরা ছিল, কিন্তু দূরবর্ত্তী স্থানে চিঠি পাঠাতে হলে বণিক বা পর্য্যটকদের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ইংলণ্ডে চিঠি পাঠাতে হলে জাহাজের কাপ্তেনের হাতে চিঠি জিম্মা করে দিতে হত।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের গভর্ণর লাভলেস উপনিবেশগুলিতে ডাক ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হন। নিউইয়র্ক ও বোষ্টনের মধ্যে মাসে একবার যাতে চিঠি বিলি হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করেন। কিছুকাল পরে ফিলাডেলফিয়ায় একটি

আপিস খোলা হয় দেশী ও বিদেশী ডাক পরিচালিত করার জন্য। ঐ সময় ডাক পাঠানো হয় হরকরার সাহায্যে আর ঐ সব হরকরার বেশীর ভাগই ছিল রেড ইণ্ডিয়ান।

ডাকের ইতিহাসে আমেরিকায় এক নবযুগের সূত্রপাত হয় ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে যখন টমাস নীল্ উত্তর আমেরিকায় মেল সার্ভিস স্থাপনের অনুমতি পান। বিভিন্ন উপনিবেশের ডাকের জন্য দেয় চাঁদার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হল। নীল এবং ইংলণ্ডের ডাক-বিভাগের কর্ত্তারা অ্যাণ্ড্রু হ্যামিলটন নামে এক ভদ্রলোককে আমেরিকার পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদে বহাল করলেন। অধিকাংশ উপনিবেশের জন্যই সাপ্তাহিক ডাকের ব্যবস্থা হল আর ডাক পৌছতে যাতে বিলম্ব না হয় তার জন্য অশ্বারোহী ডাকবাহক নিযুক্ত হল। ডাকের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ডাক-পরিচালনার স্বত্ব ইংলণ্ড কিনে নিলে।

তখন আমেরিকায় ডাকবাহকের কাজ ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। রাস্তা-ঘাট যা ছিল শীতকালে তা বরফে ও বৃষ্টিতে দুর্গম হয়ে উঠত। পথে দস্যুর ভয় ছিল। সেতু ছিল কম, বেশীর ভাগ নদীই সাঁতরে পার হতে হত। কাজেই চিঠিপত্র পৌছতে সময় লাগত খুব বেশী, কখনও বা চিঠিপত্র পথেই নষ্ট হয়ে যেত।

ঐ সমস্ত অসুবিধার জন্য ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কণ্টিনেণ্টাল কংগ্রেস নিজস্ব একটি ডাক-বিভাগ স্থাপনের সঙ্কল্প করলেন আর ফলমাউথ থেকে সাভান্না পর্য্যন্ত অনেকগুলি ডাকঘর তৈরী হল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকার ডাক বহনের কাজে সকল রকমের যানই নিয়োজিত হল। ক্যানো, ষ্টেজকোচ, ষ্টীমবোট, রেলগাড়ী—যেখানে যেটার সুবিধা সেইটারই ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হল। তবে এতেও জনসাধারণের অসুবিধা একেবারে দূর হল না। ইয়োরোপের অনুকরণে আমেরিকাতেও তখন চিঠির পাতা গুণতি করে মাশুল ধার্য্য হত, ওজন যাই হোক না কেন। আর মাশুলও ছিল খুব বেশী। স্বল্পবিত্তের সামর্থ্যের বাইরে। ত্রিশ মাইল ব্যাসের মধ্যে চিঠি পাঠাতে হলে মাশুল দিতে হত দশ সেণ্ট। অনেক আন্দোলনের ফলে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট এক আইন জারি করে মাশুলের হার কমিয়ে দিলেন।

আমাদের দেশে ডাকের প্রচলন হয় বহুকাল পূর্ব্বে। হিন্দু রাজাদের আমলে বেতনভোগী বার্ত্তাবাহক ছিল। কপোতের সাহায্যে কখনও কখনও দূরবর্ত্তী অঞ্চলে পত্রাদি পাঠানো হত। সম্রাট অশোক রাজ্যশাসনের সুবিধার জন্য ডাকের উন্নতির সাধন করেছিলেন বলে শোনা যায়। মুসলমান আমলে সম্রাট শের শাহের সময় ডাকের সংস্কার হয়। শের শাহও ঘোড়ার ডাকের প্রবর্ত্তন করেছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। তবে ইংরেজ আমলেই ডাক যে এদেশে জনপ্রিয় হয়েছে একথা নিঃসন্দেহ। লর্ড ডালহৌসির সময় ডাকবিভাগের আমূল সংস্কার হয়। ডাকটিকিটের প্রচলন হওয়ায় জনসাধারণ অল্প ব্যয়ে সংবাদ প্রেরণের সুযোগ লাভ করে। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে আজ যে ডাকের কত সুবিধা হয়েছে তা বলা নিষ্প্রয়োজন। তোমরা জানো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল পরে এদেশে বিমান ডাকেরও প্রবর্ত্তন হয়েছে। প্রতি সপ্তাহেই এদেশ থেকে বিমানে ডাক যাচ্ছে দেশ-বিদেশে। ইদানীং এদেশের বিভিন্ন শহরের মধ্যেও বিমানে ডাক বিলির ব্যবস্থা হয়েছে। এখন আর বোম্বাইএর চিঠির জন্য দীর্ঘ তিন দিন অপেক্ষা করতে হয় না, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চিঠি হাতে এসে পৌছয়।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস

কিছু দিন আগের কথা বলছি। ইংরেজ রাজত্ব তখন আমাদের দেশে পুরোদমে চলছে। দেশ শাসনের নামে ওরা যেমন শোষণ করছিল, তেমনি আমাদের দেশের অনেক জমিদারও প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করছিলেন।

খুলনা জেলায় অন্যতম জমিদার রায়সাহেব কালী বাবুও এমনি একজন ছিলেন। সামান্য একটু মনোমালিন্যের জন্য তাঁর স্ত্রীকে পর্য্যন্ত খুন করে ফেললেন তিনি। তার কিছুদিন পর নিষ্ঠুর ভাবে তাঁর সাত জন পড়শী প্রজাকে গুলীবিদ্ধ ক'রে হত্যা করলেন। 'একতাই বল' এই ভেবে গ্রামের সবাই মিলে আদালতে মামলা দায়ের করলেন কালী বাবুর বিরুদ্ধে। বছর ছয়েক মামলা চলার পর আদালত রায় দিল। শোনা গেল কালী বাবুর ফাঁসির হুকুম হয়েছে। কালী বাবুর বাবা তখন জীবিত। পুত্রের ফাঁসি হবে শুনে মহাচিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু সে চিন্তা মাত্র দু'-তিন দিন স্থায়ী হল। কালী বাবুর বাবা হাজার দশেক টাকা নিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। গেলেন এক খ্যাতিমান ব্যারিষ্টারের কাছে। তাঁর পরামর্শানুযায়ী কালী বাবুর বাবা আপীল করলেন। অতঃপর ব্যারিষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে চুক্তি করলেন তিনি। চুক্তিতে ঠিক হ'ল কালী বাবুর প্রাণদণ্ড রদ করতে পারলে কালী বাবুর সমপরিমাণ ওজনের রৌপ্যমুদ্রা ব্যারিষ্টার মশাইকে দেওয়া হবে। আর তা' না পারলে ব্যারিষ্টার মশাই এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করবেন না।

শেষ বারে কোর্ট যখন রায় দিল, তখন দেখা গেল, কালী বাবু মোটেই দোষী নন। এক টাকা জরিমানাও দিতে হল না তাঁকে। কালী বাবুর বাবা ব্যারিষ্টার মশাইয়ের কৃতিত্বের জন্যে পূর্ব্ব-চুক্তি অনুযায়ী কালী বাবুর সমপরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে দিলেন। কিন্তু অন্যায় ভাবে কালী বাবুকে বাঁচান হয়েছে। এইজন্য ব্যারিষ্টার মশাই প্রাপ্য সমস্ত অর্থ স্থানীয় হাসপাতালে দান করে দিলেন। কে জানো এই সাধু ও দানশীল ব্যারিষ্টার? ইনি হচ্ছেন আমাদের পূজনীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। আমরা চিরকাল পরম শ্রদ্ধার সংগে তাঁকে স্মরণ করে চলব। তাঁর স্পর্শ হবে আমাদের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

বুদ্ধগয়া

শ্রীবলাইকৃষ্ণ সরকার

বিগত বছরে অর্থাৎ ১৩৫৩ সালে ভগবান বুদ্ধের ২৫০০ তম মহাপরিনির্ব্বাণ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। বছরের গোড়া থেকেই এ উৎসব সুরু হয়েছিল আর তার উদ্‌যাপন হলো বছর শেষ হওয়ার সংগে সংগে। এই বিশেষ বছরে তাই বুদ্ধস্মরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ক'জন ঠিক করলাম বুদ্ধগয়া দর্শনে যাব। হিন্দু ও

বৌদ্ধদের অন্যতম তীর্থ এই বুদ্ধগয়া। আমরা তখন হাজারীবাগ রোডএ সাময়িক আস্তানা নিয়েছি। সেখান থেকেই একদিন সকালে খাওয়া দাওয়া সেরে রওনা হওয়া গেল গয়া প্যাসেঞ্জারে হাজারীবাগ রোড থেকে গয়া বেশীদূর নয়। ২ ঘণ্টা, ২॥ ঘণ্টার পথ আমরা চার জন বন্ধু মিলে বেশ আরামেই দেখতে দেখতে চললাম রাস্তায় যেতে যেতে তিনটি টানেল ও ধানুয়ার জঙ্গল পড়লো দুধারে নিবিড় বন, মাঝখান দিয়ে ট্রেণ যাচ্ছে। বেশ লাগছিল আরও অনেকগুলো ষ্টেশন যেগুলো অভ্রখনির জন্যে বিখ্যাত—পার হয়ে আমরা যখন গয়া পৌছলাম তখন বেলা প্রায় দুটো। ষ্টেশন থেকে নেমেই আমরা গেলাম বাসষ্টাণ্ডে। কিন্তু বাস পাওয়া গেল না, শুনলাম বাস ছেড়ে চলে গিয়েছে। সুতরাং একটা টাঙ্গাওয়ালার সংগে রফা হোল। সে তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে বুদ্ধগয়া ঘুরিয়ে আনবে। কারণ হাতে সময় খুব কম। টাঙ্গায় ওঠামাত্রই টাঙ্গাওয়ালা ঘোড়ায় চাবুক লাগাল। ঘোড়ার হাড়জিরজিরে চেহারা হলে কি হবে! ছুটতে লাগল একেবারে রেসের ঘোড়ার মত। টাঙ্গাওয়ালাও ছিল বেশ আমুদে লোক। রাস্তায় যেতে যেতে নানান গল্প করতে লাগলো। গয়া থেকে বুদ্ধগয়া। সুন্দর পিচঢালা পথ। ফল্গু নদীর ধারে ধারে প্রায় ৭ মাইল। ইতিহাস-বিশ্রুত ফল্গু নদী। এরই তীরে ভগবান বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ হয়েছিল। এরই তীরে গয়ায় বিষ্ণুমন্দিরে হিন্দুরা পিতৃতর্পণ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে। আমাদের বাঁ দিক দিয়ে বয়ে চলেছে ফল্গু নদী। ডান দিকে ক্ষেত-খামার আর মাঠ। রাস্তার দুপাশে গাছের সারি। আমরা তারই ছায়ায় ছায়ায় চলেছি। বেলা প্রায় চারটার সময় আমরা বোধগয়া অর্থাৎ বুদ্ধগয়ায় পৌছলাম। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল মন্দিরের বিরাট চূড়া। ওপরের দিকটা ক্রমশঃ ছুঁচলো হয়ে গিয়েছে। এই সময় সরকারের তরফ থেকে মন্দিরের সংস্কার ও মেরামতের কাজ হচ্ছিল।

টাঙ্গা থেকে নেমে আমাদের খানিকটা উঁচু জায়গায় উঠতে হোল। তারপর বাঁদিকে বাঁকতেই দেখা গেল বুদ্ধদেবের বিশাল মন্দির। একটা বড় পুষ্করিণীর মত নীচু জায়গায় মন্দিরটির অবস্থিতি। এক পাশের সিঁড়ি দিয়ে আমরা নীচে নামলাম। জায়গাটিতে সুন্দরভাবে বাগান করা ও চমৎকার সাজান। আমরা এগিয়ে চললাম। ডানদিকেই বিরাট কারুকার্য্যমণ্ডিত মন্দির মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জুতো খুলে মন্দিরের মধ্যে ঢুকতে হয়। মন্দিরের মূল অভ্যন্তরে উঁচু পাথরের বেদীর ওপর ভগবান বুদ্ধের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। যোগাসনে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট। মূর্ত্তির রং অনেকটা কাঁচা সোনার মত। এই বুদ্ধমূর্ত্তি বহুবার অপসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শোনা যায়, পূর্ব্বে আরো যে সব বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল—সে সবই সুবর্ণনির্ম্মিত ছিল। বুদ্ধদেবের সেই মহিমামণ্ডিত মূর্ত্তি দর্শন ও প্রণাম করে আমরা বাইরে এলাম। বহির্দ্বারের কাছে একটি টেবিলে মতামত লেখার খাতা রয়েছে। আমরা সেই খাতার পাতায় লিখলাম—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"

এর পর ওপরে অর্থাৎ দ্বিতলে উঠলাম। দ্বিতলের চাতালের চার কোণে মধ্যচূড়ার অনুকরণে চারটি ক্ষুদ্রাকার মন্দির রয়েছে। নানান ভাস্কর্য্যে ভরা। প্রত্যেকটি চূড়ায় এবং মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে গায়ে ঘণ্টার আকৃতির মধ্যে যে কত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি রয়েছে যে তার হিসেব নেই। মাঝখানের চূড়াটি প্রায় ১৮০ ফিট উঁচু। মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণ পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৩০ ফিট আর উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৬ ফিট বিস্তৃত।

মন্দিরের পশ্চিম দিকে পরম পবিত্র অশ্বত্থ গাছ বোধিদ্রুম। এই বোধিবৃক্ষের তলেই গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বিশ্বের মানব-কল্যাণের জন্যে সত্য উপলব্ধি এই তরুমূলেই হয়েছিল। উত্তরকালে ভগবান বুদ্ধ এই প্রেরণাতেই সত্য, অহিংসা, সংযমের কথা প্রচার করে গেছেন। মানুষকে দুঃখ-কষ্ট, ব্যাধি-মৃত্যুর হাত থেকে মহানির্ব্বাণের সন্ধান দিয়ে গেছেন। এই বৃক্ষটি যদিও সেই আদি-বৃক্ষ নয়—তার বংশধর। তবু আমরা তার কয়েকটি পবিত্র পত্র অতি সযত্নে সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম।

মূল মন্দিরের পূর্ব্বদিকে প্রাঙ্গণের মধ্যেই তারাদেবী ও পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্তি আছে। আমরা সে সব দর্শন করে মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে গেলাম। সেখানে একটি পুষ্করিণী আছে। এর নাম মুচকুন্দ হ্রদ। গল্প আছে যে, এই হ্রদের কাছে বসে এক সময় বুদ্ধদেব যখন ধ্যান করছেন—তখন প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হয়। সেই সময় নাগরাজ মুচকুন্দ ঠিক বাসুকির মত বুদ্ধদেবের দেহে নিজ ফণা বিস্তার করে প্রভুকে আচ্ছাদিত করে রাখে ও ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে বুদ্ধদেবকে রক্ষা করে।

বুদ্ধদেবের মন্দির পরিক্রম করে আমরা রাস্তায় বের হয়ে এলাম। পাশেই তিব্বতীয় বৌদ্ধ মঠ, চৈনিক বিহার ও বিড়লার মন্দির প্রভৃতি আমরা এসবও ঘুরে দেখলাম। ক্রমশঃ বেলা পড়ে আসছে। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মি পড়েছে বুদ্ধমন্দিরের চূড়ায়। আমরা এবার ফিরে যাবো। যতই দূরে যাই পিছন ফিরে বার বার দেখি—বুদ্ধদেবের পুণ্যমন্দির তার শীর্ষ উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে মুক্তির বাণী বিঘোষিত করতে বিরাজ করছে করুণাঘন শান্ত সৌম্যকে অন্তরে ধারণ করে। আমরা সে দিনের শেষ বেলায় আবার স্মরণ করলাম অমৃত মন্ত্র—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।'

হাই জাম্প

হ্যান্স ক্রিশ্চান অ্যাণ্ডারসন

তিন বন্ধু। মাছি, ফড়িং আর ব্যাঙ। খুব ভাব তিন জনে।

তিন জনে নিজেদের ভেতর বললে—"এসো না ভাই, আমরা একটা হাই জাম্পের প্রতিযোগিতা করি। দেখা যাক্ কে বেশী লাফাতে পারে।"

সবাই বললে—"তা বেশ! তা বেশ!"

সারা দুনিয়াতে খবর চলে গেল মাছি, ফড়িং আর ব্যাঙ হাই জাম্প দেবে। তোমরা সবাই এসো—দেখো। এমন সুযোগ কেউ হারিও না।

সমস্ত কিছু তোড়জোড় করতে করতে এলো সত্যিকারের লাফানোর দিন।

দেশের রাজা এসেছেন প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করতে—প্রাইজ দিতে।

হৈ-হৈ-রৈ-রৈ ব্যাপার!

সভাপতির ভাষণে তিনি বললেন শ্রোতাদের—"সব চেয়ে উঁচুতে যে লাফাতে পারবে তার সঙ্গে আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেবো।"

এই কথা না শুনে মাছি, ফড়িং আর ব্যাঙ তো আনন্দে গদগদ। আনন্দে ভেসে যাবার জোগাড়। রাজা তাঁর বক্তৃতা শেষ করে সিংহাসনে বসলেন।

প্রথমে মাছি এলো। রাজা ও দর্শকদের নমস্কার করলো। করবেই তো—ও যে খানদানি। মাছির বেশ নরম স্বভাব। মাছির ভেতর কোন চপলতা নেই।

মাছির পর এলো ফড়িং। ফড়িং তো ফড়িং-ই। নামও যেমন কাজও তেমন। ট্যাং-ট্যাং করতে করতে এলো। নমস্কারও করলো না। যাই হোক, ফড়িং পরেছিল ভারী সুন্দর সবুজ রংয়ের পোষাক। সুন্দর মানিয়েছিল কিন্তু তাকে। সবুজ রংটা ফড়িং খু—ব ভালবাসে। তা ছাড়া ও রংটা ওদের "ফ্যামিলি কলার"।

এবারে এলো ব্যাঙ মশায়। থপ্ থপ্ করে সভার মাঝে এলো। মুখে কথা নেই। শুধু ড্যাব-ড্যাব করে এদিকে দেখছে, ওদিকে দেখছে।

রাজা মশায় বললেন—"প্রতিযোগীরা সবাই উপস্থিত। আর বাজে কাজে সময় নষ্ট না করে প্রতিযোগিতা সুরু করে দেওয়া যাক্।"

রাজা মশায়ের কথা মতো হাই জাম্প সুরু হোল।

প্রথমে লাফালো মাছি। মাছি এতো উঁচুতে লাফালে যে কেউ তাকে দেখতেই পেলে না যে সে কত উঁচুতে উঠেছে। হাওয়ার সঙ্গে মাছি মিশে গেছে। অতএব মাছি বাতিল হয়ে গেল।

এবারে এলো ফড়িংয়ের পালা। ফড়িং লাফালে। লাফালে তো লাফালে একেবারে রাজার মুখের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। রাজা তো রেগেই আগুন। লোক-লস্করবা ফড়িংকে এই মারে তো এই মারে। রাজা মশায় এগিয়ে এসে তো ফড়িংকে লোক লস্করদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। ফড়িং কাঁদতে কাঁদতে সভা থেকে বেরিয়ে গেল। কপাল ভাল যে প্রাণে মরেনি।

যাক্। এবারে এলেন ব্যাঙ মশায়! ব্যাঙ মশায় এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। মুখে রা সরে না। ব্যাঙ মশায় তো একেই দেখতে কেমন বোকা-বোকা। তারপর এই সব ব্যাপার দেখে আরো কেমন যেন বেশী বোকা হয়ে গেছে। ও মনে মনে বললে—"দরকার নেই বাবা লাফিয়ে। লাফাতে গিয়ে কি বাপের দেওয়া প্রাণটা হারাবো? থাক্ বাবা, ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যাওয়া যাক্। যত সব সুখে থাকতে ভূতে কিলোন ব্যাপার।"

রাজার কুকুর ব্যাঙের হাবভাব দেখে বললে—"আমার মনে হয়, ব্যাঙ কেমন যেন একটু ভড়কে গেছে, তা'ছাড়া ওর শরীরটা তেমন বিশেষ ভাল নয় বোধ হয়—।" বলেই দু'বার হাঁচলে।

কুকুরের এই কথা না শুনে ব্যাঙ তো রেগেই আগুন! "কি, আমার অপমান? দাঁড়াও দেখাচ্ছি"—বলেই ব্যাঙ মশায় দিলেন পাশ থেকে লাফ। লাফ দিয়ে তো ব্যাঙ মশায় পড়লো রাজকুমারীর কোলের ওপর। রাজকুমারী বসেছিল রাজার পাশের সিংহাসনে।

ব্যাঙ মশায়কে মেয়ের কোলে না দেখে রাজামশায় বললেন—"পৃথিবীতে আমার মেয়ের থেকে কোন উঁচু জিনিষ বা বস্তু নেই। তাই যে আমার মেয়ের মাথা পর্য্যন্ত লাফাতে পেরেছে সেই এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে বলে আমি মনে করি। বুদ্ধিমান ছাড়া এই জিনিষ কেউ জানে না। তাই আমি ব্যাঙের বুদ্ধির প্রশংসা করছি। ব্যাঙ সত্যিই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ।"

রাজা শেষকালে নিজের কথা মতো ব্যাঙের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

মাছি বললে ফড়িংকে—"দেখ্ ভাই, আমি সবচেয়ে উঁচুতে উঠেও প্রথম হতে পারলাম না। সবই কপাল ভাই, সবই কপাল। আমি পাতলা আর ছিপছিপে বলে কেউ দেখতেই পেলে না যে, আমি কত উঁচুতে উঠেছি। জগতে আজকাল নির্বুদ্ধিতারই জয়। বোকাদেরই রাজত্ব।"

এই দুঃখের জ্বালায় মাছি পররাষ্ট্র বিভাগে চাকরী নিয়ে বিদেশে চলে গেল। পরে শোনা গেল যে মাছিকে বিদেশীরা মেরে ফেলেছে।

ফড়িংও তাই ভাবছে—"কি অদ্ভুত এই জগত!" আর মনে মনে মাছির কথাগুলোই আওড়াতে লাগলো—"হ্যাঁ এই পৃথিবীতে গোবর গণেশদেরই জয়-জয়কার! এই পৃথিবীটা নির্বুদ্ধি মাংসপিণ্ডদের জন্যে।" তারপর সে গাইতে লাগলো তার বিখ্যাত বেদনা-বিধুর গান—কিটির—কিট্—কিটির—কিট্।

ফড়িংয়ের কাছ থেকেই আমরা জানতে পেরেছি এই মহাসত্যকে। কিন্তু আমার ছোট বন্ধুরা জেনে রাখো, ছাপার অক্ষরে যদিও পড়ছো এই মহাসত্যকে, তবুও ভেবো না যে সব সময়ই এই ব্যাপার সত্যি।

অনুবাদক—দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

চীনের অন্তর্বিপ্লব শেষ হবার পর যখন নতুন সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হোলো টিং লিং-এর তখন উনিশ বছর বয়েস, ফেং চেং শিয়াংএর চব্বিশ। তদ্দিনে ওদের মা বাবা দুজনেই মারা গেছেন। চেং শিয়াং একটা বড়ো চাকরি করতো কুওমিনটাং সরকারে।

নানকিং-এর নাম বদলে হোলো পিকিং। চিয়াং সরকারের বিশ্বস্ত যারা সবাই চলে এলো ফরমোসায়। সেই সঙ্গে গেল চেং শিয়াং আর টিং লিং। টিং লিং থেকে যেতে চেয়েছিলো। চেং শিয়াং রাজী হয়নি।

কিন্তু ফরমোসায় এসে চেং শিয়াং বেশী দিন চাকরি করেনি! সেখান থেকে সায়গন হয়ে ব্যাংককে এসে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা সুরু করলো। সেখানেও থাকলো না বেশী দিন। ব্যাংকক থেকে সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুন, তারপর এখন কলকাতায়।

"এ ভাবে আর ভালো লাগে না," টিং লিং বললো দিলীপকে, "আমার কাজ শুধু দাদার সংসার গুছিয়ে রাখা আর দাদার সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক যাদের তাদের কারো কারো সঙ্গে একটা সামাজিকতার যোগাযোগ বজায় রাখা।"

"কাউকে বিয়ে করে নিজের একটা সংসার পাতলেই পারতে," দিলীপ বললো।

"চেং শিয়াং সেটা চায় না।"

"চিয়েন চাং'এর সঙ্গে তোমার যে মাখামাখি, সেটা যদি জানতে পারে?"

"চিয়েন চাং-এর ক্ষতি হবে তাতে। আমায় অবশ্যি কিছু বলবে না।"

মঙ্গলবার সকাল থেকেই কি রকম একটু অস্বোয়াস্তি বোধ করছিলো দিলীপ। কি একটা যেন কাজের ভার আছে তার উপর। অথচ মনে পড়ছে না কিছুতেই।

বিকেলবেলা হঠাৎ মনে পড়লো।

টিং লিং তাকে বলেছিলো চিয়েন চাংকে যে করেই হোক মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা তার সঙ্গে সঙ্গে রাখতে। চেং শিয়াং-এর সঙ্গে কোথায় যেন যাবার কথা আছে তার—সেটা যেন সম্ভব হতে দেওয়া না হয়

দিলীপ তক্ষুণি চলে এলো ওয়াংদের বাড়ি।

ঘরে ঢুকতেই জেনীর সঙ্গে দেখা। মুখ তার শুকনো।

"চিয়েন চাং কোথায়," দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"কি ব্যাপার বলো তো," জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"কেন?"

"ঘণ্টাখানেক আগে একবার আহ-কিম এসে খোঁজ করলো চিয়েন চাং কোথায়। কিছুক্ষণ আগে এসে খোঁজ করলো চেং শিয়াং। এখন তুমি। সবাই হঠাৎ তার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছো কেন?"

"আমি এমনি খোঁজ করছিলাম," দিলীপ সহজ হবার চেষ্টা করে বললো। "ওর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি। তাই ভাবলাম, আজ সন্ধ্যেবেলা ওর সঙ্গে একটু আড্ডা দেবো। সে কোথায়?"

জেনী একটু চুপ করে রইলো। তার পর জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, ব্যাপারটা কি বলো তো?"

"কিসের ব্যাপার?"

"চিয়েন চাং সেদিন রাত্তিরে বাড়ি ফিরে এসে টিং লিংএর খুব নিন্দে করলো। বললো, মেয়েটি নাকি ভালো নয়। ওর অনেক ব্যাপার সে জানতে পেরেছে। ওর সঙ্গে নাকি ভাব অনেকেরই, তবে কারো সঙ্গে খুব বেশী দিন নয়। ওর কথা শুনে মনে হোলো, টিং লিং-এর কোনো ব্যবহারে সে মনে আঘাত পেয়েছে। ও টিং লিংকে তো ভালোবাসতো খুব।"

দিলীপ একটু অবাক হোলো। তার পর হাসলো খুব। হেসে বললো, "আচ্ছা পাগল! কি ব্যাপার জানো? সেদিন চেং শিয়াং আমাকে ওদের বাড়ি যেতে বলেছিলো মনে আছে তো? গিয়ে দেখি, চেং শিয়াং নেই, আমায় বসতে বলে গেছে, বাড়িতে শুধু টিং লিং একা। টিং লিংএর সঙ্গে বসে যখন গল্প করছি, এমন সময় চিয়েন চাং এসে উপস্থিত। সে-ও বোধ হয় আমাদের সঙ্গে বসে গল্প করতে চেয়েছিলো কিছুক্ষণ। কিন্তু টিং লিং তাকে বসতে বললো না। তাকে চলে আসতে হোলো। তাই বোধ হয় রাগ করেছে তার উপর।"

"তুমি ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে গল্প করেছো, না?" জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"[illegible]"
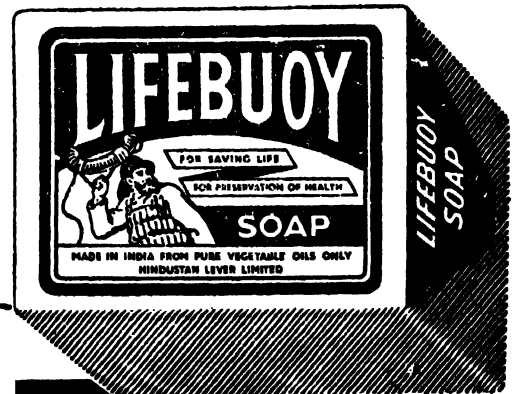
"এ রকম একটা কিছু আমি আঁচ করেছিলাম। কারণ, চিয়েন চাং আমার কাছে খানিকক্ষণ তোমার নিন্দেও করেছিলো। সে বলছিলো, তুমিও নাকি লোক ভালো নও আর এটা-ওটা-সেটা।"

দিলীপ হাসলো।

ম্লান হাসি হাসলো জেনীও। বললো, "তোমায় তো আমি চিনি দিলীপ! এ-সব যে ফেং চেং শিয়াং-এর ফন্দি, সে আমি খানিকটা বুঝতে পারছি।"

দিলীপ জেনীর হাত ধরলো, বললো, "জেনী!"

"কি?"

"তুমি আমার বিশ্বাস করো?"

"বিশ্বাস না করলে কি এত কথা বলতাম?" জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"টিং লিং সেদিন আমায় কি বলেছিলো, জানতে চাও?"

"না।"

"তবু শোনো। জানলে তুমিও খুশি হবে, চিয়েন চাং-ও খুশি হবে। তবে এখন কাউকে কিছু বোলো না। টিং লিং বলছিলো সে চিয়েন চাং-কেই বিয়ে করবে, কিন্তু এখন সে কথা কাউকে জানতে দিতে চায় না। কারণ ফেং চেং শিয়াং শুনলে ভীষণ রাগ করবে, এমন কি, সে চিয়েন চাং-এর ক্ষতিও করবার চেষ্টা করতে পারে।"

জেনী একটু অবাক হোলো। বললো, "এত কথা তো জানতাম না! চেং শিয়াং-এর সঙ্গে দাদার যে মাখামাখি, তাতে দাদার ক্ষতি হতে পারে সে আমরাও বুঝতে পারছিলাম, আহ-কিমও সেদিন বলছিলো। তবে টিং লিং যে দাদাকে এত ভালোবাসে সে কথা তো জানতে পারিনি কোনো দিন?"

"আজ চিয়েন চাং-এর কোথায় যেন যাওয়ার কথা আছে ফেং চেং শিয়াং-এর সঙ্গে। টিং লিং আমায় পাঠিয়েছে, আমি যেন তার আগেই চিয়েন চাংকে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসি, যাতে চেং শিয়াং এসে চিয়েন চাংকে না পায়।"

জেনী একটু অবাক হয়ে তাকালো দিলীপের দিকে। বললো, "ও, সে জন্যেই চেং শিয়াং এসে দাদার খোঁজ করছিলো?"

"চিয়েন চাং কোথায়?"

জেনী একটু চুপ করে থেকে বললো, "দাদা একটু কলকাতার বাইরে গেছে। বলেছে এখন কাউকে কিছু না বলতে।"

"কলকাতার বাইরে গেছে?" দিলীপ অবাক হোলো, কবে গেছে?"

"কাল সকাল বেলা।"

"কোথায় গেছে?"

"তা তো বলে যায় নি। শুধু একটি স্যুটকেস আর হোল্ডঅল নিয়ে গেছে।"

"কবে ফিরবে?"

"তা তো বলে যায় নি? মনে হোলো কয়েক দিন দেরী হবে। তা নইলে গরম স্যুট সবগুলো নিয়ে যেতো না।"

দিলীপ চুপ করে বসে রইলো। ভেবে পেলো না কি করবে —এখানে বসে জেনীর সঙ্গে গল্প করবে, না জেনীকে নিয়ে বেরোবে, কিংবা একবার দেখা করে আসবে টিং লিং-এর সঙ্গে।

জেনী চা করে দিলো। বাইরে বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো আস্তে আস্তে। বাইরে একটি গাড়ি এসে থামলো। একটু পরে ঘরে এসে ঢুকলো ফেং চেং শিয়াং।

দিলীপ আর জেনীকে একসঙ্গে একলা ঘরে দেখে তার মুখে যে রকম ভাব ফুটে উঠবে বলে এরা আশা করছিলো, সে রকম কিছু দেখা গেল না চেং শিয়াং-এর মুখে।

তাকে দেখে মনে হোলো সে যেন খুব ক্লান্ত, খুব উৎকণ্ঠিত। সে জিজ্ঞেস করলো, "চিয়েন চাং কোথায়?"

"বেরিয়েছে," জেনী বললো।

"কখন ফিরবে?"

"কিছু বলে যায়নি তো?"

"কোথায় গেছে জানো?"

"না, জানি না।"

চেং শিয়াং ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবলো।

"এক কাপ চা নেবে," জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"না। আমার বসবার সময় নেই," চেং শিয়াং উত্তর দিলো, "চিয়েন চাং যদি দু'টার মধ্যে ফেরে তো বোলো আমি তার জন্যে অপেক্ষা করবো, সে যেন এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। কোথায় দেখা করতে হবে সে জানে।"

"আর যদি দু'টার মধ্যে না ফেরে?"

"তা' হলে—তা'হলে—," ভুরু কুঁচকে চেং শিয়াং একটু ভাবলো, ভেবে বললো, "তা'হলে আজ আর আমার সঙ্গে দেখা করে দরকার নেই। আমিই এসে ওর সঙ্গে দেখা করবো কাল কিংবা পরশু।"

চেং শিয়াং চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ দু'জনেই। তারপর দিলীপ হঠাৎ বললো, "জেনী, ভাবছি আর বেশী দিন অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না।"

জেনী বুঝতে পারলো না। চোখ তুলে তাকালো দিলীপের দিকে।

দিলীপ বলে গেল, "সামনে হপ্তায় যদি দিন ঠিক করতে চাই তোমার বাবা কি আপত্তি করবেন?"

"কিসের দিন?" জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"বিয়ের দিন। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের অফিসে গিয়ে ব্যবস্থা করে আসতে হবে তো।"

জেনী তার চেয়ার থেকে উঠে এসে দিলীপের চেয়ারের হাতলের উপর বসলো। বসে দিলীপের কাঁধে হাত রেখে বললো, "দিলীপ, তুমি সত্যিই এত সিরিয়াস?"

"সিরিয়াস না তো কি ছেলেখেলা?"

"দিলীপ, ভালো করে ভেবে দেখ—আমায় বিয়ে না করে হয়তো তোমাদের নিজের জাতের মেয়ে বিয়ে করলে অনেক সুখী হবে তুমি।"

"না জেনী, তোমায় ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না, আর কাউকে বিয়ে করবোও না। অবশ্যি তুমি যদি না চাও!"

"না, না, দিলীপ, ও কথা বোলো না, তুমি তো জানো, আমিও তোমায় ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবো না।"

"তা হলে সামনের হপ্তায় গিয়ে বিয়েটা সেরে আসি।"

জেনী আস্তে আস্তে বললো, "বেশ, তুমি যদি চাও তো তাই

হবে।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো, "দিলীপ, আমার ভয় করছে।"

"কেন ?" দিলীপ হেসে জিজ্ঞেস করলো।

"না, হাসি নয়। চেং শিয়াংকে তুমি চেনো না।"

"তার সঙ্গে কি সম্পর্ক ?"

"সে আমায় বিয়ে করতে চায়, জানো তো ?"

"কি হয়েছে তাতে ?"

"সে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করে ?"

দিলীপ হাসতে সুরু করলো ! বললো, "আমার কি ক্ষতি করবে সে ?"

জেনী আর কিছু বললো না।

দিলীপ ঘড়ি দেখলো। তার পর উঠে পড়লো।

"কোথায় যাচ্ছো ?" জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"একবার টিং লিং-এর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"কেন ?"

"তাকে একবার জানিয়ে দেওয়া দরকার যে চিয়েন চাং কলকাতায় নেই। সুতরাং সে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারে।"

টিং লিং বাইরের ঘরে বসেছিলো চুপচাপ। দিলীপকে দেখে কোন কথা বললো না। হাত দিয়ে শুধু চেয়ার দেখিয়ে দিলো। দিলীপ চেয়ার টেনে বসতে জামার ভিতর থেকে একটি চিঠি বার করে দিলো দিলীপের হাতে।

"কার চিঠি ?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"পড়ে দেখ।"

চিঠি ইংরেজিতে লেখা। দিলীপ দেখলো, চিঠির নিচে চিয়েন চাং'-এর সই।

ডিয়ার টিং লিং—সে লিখেছে—তুমি যখন এ চিঠি পাবে, আমি ততক্ষণে বম্বে পৌঁছে গেছি। আমি সেদিন রাত্রে তোমায় একথাই জানাতে গিয়েছিলাম যে আমার পাসপোর্ট আর ভিসা হয়ে গেছে। একটা চাকরীর ব্যবস্থাও হয়ে গেছে নিউইয়র্কে। টাকাকড়ি যা যোগাড় করবার দরকার ছিলো, তা-ও হয়ে গেছে। আমি জানাতে গিয়েছিলাম তুমি কি আমার সঙ্গে আসবে—না কি আমি আগে চলে যাবো, তুমি পরে আসবে। তোমার বাড়ি গিয়ে তোমার কাছ থেকে যা ব্যবহার পেলাম তাতে মনে হোলো জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন আর নেই। সেদিন একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হোলো সে ব্যাংকক থেকে এসেছে, তোমাদের চেনে, তার কাছ থেকে তোমার কথা অনেক শুনলাম। তাই ভাবলাম তোমার কাছ থেকে কিছু আশা না করাই ভালো। তুমি তোমার মতো সুখে থাকো। আমি আমার নতুন জীবন সুরু করি বিদেশে গিয়ে। বম্বে থেকে প্লেন ধরে আমেরিকায় যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।—চিয়েন চাং।

দিলীপ চোখ তুলে দেখলো টিং লিং'এর চোখ জলে ভাসছে !

যেই ডাকে চিঠি এসেছিলো টিং লিং এর কাছে সেই ডাকে বুড়ো ওয়াঙের কাছেও চিয়েন চাং-এর চিঠি এসেছিলো।

বুড়ো ওয়াং প্রথমে মনে মনে একবার চিঠিটা পড়ে নিলো। জেনী, মিনি আর সুং চাং একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। চিঠি পড়ে ওয়াং দু-তিন মিনিট চোখ বুজে চুপ করে বসে রইলো। তার পর ছেলে-মেয়েদের কাছে ডেকে খুব নিচু গলায় চিয়েন চাং-এর চিঠি পড়ে শোনালো।

মিনি চুপ করে রইলো নির্বিকার ভাবে। জেনীর চোখ জলে ভরে উঠলো। একটু খুশি-খুশি দেখালো সুং চাংকে।

"জীবনের এই ধারা," ওয়াং বললো, "ছেলে-মেয়েরা ছড়িয়ে পড়বে দেশ-বিদেশে, নতুন করে নতুন পরিবারের গোড়া পত্তন করবে। ওয়াংদের খুঁজে পাবে হ্যাংকাও, ফুকিয়েনে, হংকংএ। ওয়াংদের পাবে ব্যাংকক, সাইগন, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুরে, খুঁজে পাবে জাকার্তায় রেঙ্গুনে। এ ভাবে ছড়াতে ছড়াতে আমরা এসেছি কলকাতায়। এবার একজন চললো আমেরিকায়। সে সুখী হোক, দেশী বা বিদেশী যাকে খুশি বিয়ে করে ওয়াংদের বংশ বিস্তার করুক। ওয়াং পূর্ব-পুরুষদের আত্মার কল্যাণ হোক।"

একটু চুপ করে রইলো ওয়াং। তার পর বললো, "যে যেখানে খুশি থাক, আমি একটুও দুঃখিত হবো না। আমি শুধু চাই যে আমার ছেলেমেয়েদের অন্তত একজন ফুকিয়েনে ফিরে যাক।"

আবার চক্ষু নিমীলিত করলো বুড়ো ওয়াং। জেনী, মিনি, সুং চাং আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বাইরে এসে সুং চাং বললো, "চিয়েন চাং আমেরিকা যাচ্ছে, ভালোই হোলো। আমিও থাকবো না। রোজী বলছে তার ইণ্ডিয়া ভালো লাগে না, সে তার হোম ইংল্যাণ্ডে চলে যাবে। আমিও চলে যাবো তার সঙ্গে।"

মিনি গম্ভীর ভাবে বললো, "রোজী তো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। ওর হোম ইণ্ডিয়া। সে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে কি করবে?"

"না, ওর হোম ইংল্যাণ্ডে, ওর পূর্বপুরুষ সেখান থেকে এদেশে এসেছে, ওদেশে ওর অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে।"

মিনি বললো, "আমি কিন্তু ফুকিয়েনে চলে যাবো। আহ-কিমও যাবে। আমাদের মধ্যে তাই কথা হয়ে আছে।"

"সবাই যার যেখানে খুশি যাবে," জেনী চোখের জল মুছে বললো, "কিন্তু চিয়েন চাং যদি তোমাদের মতো এত খুশি মনে যেতে পারতো, আমার দুঃখ করার কিছু থাকতো না। সে কিন্তু অনেক দুঃখ নিয়ে এদেশ ছেড়ে গেল।"

মিনি আর সুং চাং চুপ করে রইলো।

জেনী আস্তে আস্তে বলে গেল, "যে যেখানে খুশি যাও, আমি কিন্তু কলকাতা ছেড়ে এক পা-ও নড়ছি না। এদেশে শেষ পর্যন্ত আমি আছি আর বুড়ো ওয়াং আছে।"

•

দিলীপ একদিন জেনীকে বলেছিলো, "তোমার বোন মিনি যদি আহ-কিমকে বিয়ে করে চীনে ফিরে যায়, ওদের সঙ্গে তোমার বাবাকেও পাঠিয়ে দিতে পারো।"

"কেন?"

"সুং চাংও এখানে থাকবে না, তুমি আর আমি মিলে যে সংসার পাতবো সেটা চায়না টাউনে নিশ্চয়ই নয়—বুড়ো ওয়াং-এর কি এখানে একা-একা ভালো লাগবে?"

শুনে জেনী একটু ম্লান হেসেছিলো, বলেছিলো, "বাবা কলকাতা ছেড়ে নড়বে না।"

"কেন?"

"সে অনেক কথা। ফেং-হুং-মিং এর নাম শুনেছো?"

"ফেং হুং মিং? হ্যাঁ আহ-তং একদিন বলেছিলো কিছু কিছু। এককালে তো সে ছিলো চায়না টাউনের রাজা—।"

"হ্যাঁ। সে-ই প্রথম বাবাকে কলকাতায় নিয়ে আসে। সে আঠারোশো ছিয়ানব্বুই সালের কথা।"

বুড়ো ওয়াং জন্মেছিলো ফুকিয়েনে, তাদের পৈত্রিক খামার-বাড়িতে। সে সময় তাদের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল, কিন্তু সে একটু বড়ো হতে না হতেই বাপ মারা গেল, খুড়োরা জমাজমি যা ছিলো হাত করে বাড়ি থেকে বার করে দিলো ওয়াংকে।

ফেং-হুং-মিং যখন ওয়াংকে প্রথম দেখলো তখন তার বয়েস কুড়ি কি একুশ। হ্যাংকাওর কুখ্যাত পাড়ায় গুণ্ডামি করে বেড়ায়।

ফেং-হুং-মিং-এর মাথার উপর তখনো চীন সরকার পুরস্কার ঘোষণা করে নি। দক্ষিণ-চীন-সমুদ্রের বন্দরে বন্দরে সে তখনো স্বচ্ছন্দ ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। তার জাঙ্ক আছে কয়েকটি, সমুদ্রে ডাকাতি করে বেড়ায়। খবরটা সরকারী ভাবে কারো জানা নেই, এমনি জানে সবাই। তাই ভয় করে, সমীহ করে ফেং-হুং-মিংকে। সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, কলকাতার চায়না টাউনগুলোতে তার অপ্রতিহত প্রতাপ, বিশেষ করে কলকাতায়।

হ্যাংকাও-এর এক জুয়ার আড্ডায় ওয়াং ফেং-হুং-মিং-এর এক অনুচরকে ধরে ঠ্যাঙালো। অন্য লোকদের হাতে হয়তো তক্ষুণি ছুরি খেতো ওয়াং, কিন্তু সেদিন ফেং-হুং-মিং স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলো বলে সে বেঁচে গেল। সেই বাঁচিয়ে দিলো তাকে, কারণ একটু অবাক হয়েছিলো সে। ফেং-হুং-মিং-এর অনুচরকে ধরে ঠ্যাঙায় হ্যাংকাওএ এমন সাহস কার? তাকে ডেকে দু'চার কথা জিজ্ঞেস করতেই জানলো সে ফুকিয়েনের ওয়াং।

ফেং-হুং-মিং চিনতো অন্য এক ওয়াংকে।

জিজ্ঞেস করলো, "অমুক ওয়াং তোমার কে হয়?"

"আমার বাবা।"

"তোমার বাবা?" অবাক হোলো ফেং-হুং-মিং। তার মানে সুং-লি তোমার মা?"

"হ্যাঁ।"

"আরে এতক্ষণ বলো নি কেন? তুমি জানো সুং-লি'র বোন তাই-লি আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী?"

"হ্যাঁ—!"

"তবে চুপ করে আছো কেন? তুমি আমার নিকট-আত্মীয়।"

"আমার আরো নিকট-আত্মীয় আমার কাকারা," ওয়াং উত্তর দিলো, "ওদের কাছ থেকে যা ব্যবহার পেয়েছি, তার পর থেকে আমি আত্মীয় দেখলে ভয় পাই।"

ফেং-হুং-মিং তাকিয়ে দেখলো ওয়াং-এর দিকে। তারপর হো হো করে হেসে ফেললো।

বললো, "দেখ বৎস, হাতের সব আঙুল সমান নয়, উইলো গাছের সব পাতা সমান নয়, তেমনি সব মানুষ সমান নয়। আমি যে তোমার সত্যিকারের হিতৈষী আত্মীয় সেটা বুঝবার সুযোগ দিতে রাজী আছি তোমায়। তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে?

···ওয়াং ফেং-হুং-মিং'এর সঙ্গে কলকাতায় চলে এলো। সেটা আঠারো শো ছিয়ানব্বুই সাল, তার বয়েস তখন কুড়ি।

সেই অল্প বয়েসেই সে ফেং-হুং-মিং-এর ডান হাত হয়ে উঠলো।

আপিং কোকেনের চোরা ব্যবসা, ডাকাতি গুণ্ডামি রাহাজানি, এমন কোনো কুকাজ নেই যা ওয়াং করতো না!

এই পর্যন্ত বলে জেনী থামলো। তাকালো দিলীপের মুখের দিকে। তারপর বললো, "দিলীপ, এই আমার বাবার আসল পরিচয়।"

দিলীপ জেনীর মুখের দিকে তাকিয়ে খুব সহজ হাসি হাসলো।

"এসব অনেক দিন আগেকার কথা," জেনী বলে গেল, "অনেকেরই মনে নেই, আমরাও আর কাউকে বলি না। কিন্তু আমার মনে হোলো তোমায় বলা দরকার। তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও, সুতরাং আমরা কি, সে কথা তোমার ভালো ভাবেই জেনে নেওয়া দরকার। একথা শুনে তুমি যদি তোমার মত পাল্টে ফেল, আমি একটুও দুঃখিত হবো না।"

দিলীপ হাসলো। বললো, "জেনী, পঞ্চাশ বছর আগে তোমার বাবা কি ছিলেন, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি জানি বুড়ো ওয়াংকে, সে খুব ভালো লোক। আমি জানি দুষ্টু মেয়ে জেনীকে, সে-ও খুব ভালো।"

জেনীর ছোটো ছোটো চোখ দুটো জলে ভরে এলো, মাথা নিচু করলো সে।

"তারপর?" জিজ্ঞেস করলো দিলীপ।

"আমাদের সম্বন্ধে আরো কিছু জানতে চাও বুঝি?"

"না, না, সে ভাবে আমি কিছু জানতে চাই না," দিলীপ বললো, "আমার গল্প শুনতে ভালো লাগে। বিশেষ করে এ ধরণের রোমাঞ্চকর গল্প। তোমার বাবা কলকাতায় এসে ফেং-হুং-মিং'এর ডান হাত হয়ে উঠলেন। তারপর?"

ফেং-হুং-মিং-কে যদি বলা হয় চায়না টাউনের রাজা, বিবি আমেলিয়ার মেয়ে রেবেকা বিবিকে বলা যেতো চায়না টাউনের রাণী। রূপের জৌলুস তার বিবি আমেলিয়ার মতোই। তার খ্যাতি কলকাতার নানাজাতের অভিজাত মধুকরদের মধ্যে বিস্তৃত। বিবি আমেলিয়া লেনে রেবেকা বিবির বৈঠকখানায় পায়ের ধুলো দিতো না, এমন রাজা, মহারাজা, নবাব, জমিদার পাওয়া যেতো না সে-সময়।

সে-সময় আশেপাশে অনেক বাড়ি ছিলো তার নিজেরই, তাতে থাকতো শুধু নানা রকম মেয়ে, যাদের খুঁজে-পেতে নিয়ে আসতো, [illegible] নিয়ে আসতো ফেং-হুং-মিং'এর দল, নিয়ে আসতো বাংলার বাইরে থেকে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন বন্দর থেকে। আর এসবকে কেন্দ্র করেই রেবেকা বিবি আর ফেং-হুং-মিং'এর নানা রকম অসামাজিক, অনৈতিক, বেআইনী ব্যবসা। কিন্তু কেউ তাদের কিছু বলতে সাহস করতো না। ইংরেজের আইন, ইংরেজের পুলিশ ঢুকতো না এ অঞ্চলে। এরাই ছিলো এ অঞ্চলের আইন। আর রেবেকা বিবির পৃষ্ঠপোষক ছিলো অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ। পরে বক্সার যুদ্ধের সময় ফেং-হুং-মিং ইংরেজদের সাহায্য করেছিলো বলে তাকেও ঘাঁটাতো না ইংরেজ সরকার।

এদের মধ্যে এসে ওয়াং বেশ ভালোই ছিলো। অভাব নেই, দুর্ভাবনা নেই। এ অঞ্চলের এক জুতো ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করে সে সংসারও পেতেছিলো।

উনিশ শো চব্বিশে তার ছেলে চিয়েন চাং'এর জন্ম হোলো।

তার পরের বছরে ওয়াং-এর জীবনের একটি নতুন পরিচ্ছেদ সুরু হোলো।

ওয়াং ফেং-হুং-মিং'এর সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলো আঠারো শো ছিয়ানব্বুই সালে। তার বছর দু'য়েক পরে ফেং-হুং-মিং'এর ঔরসে রেবেকা-বিবির একটি মেয়ে হোলো।

মেয়েটিকে চোখের সামনেই বড়ো হতে দেখেছে ওয়াং। মেয়েটির বারো বছর বয়েস হতে না হতে রেবেকা-বিবি তাকে লক্ষ্ণৌ পাঠিয়ে দিলো নিজের এক আত্মীয়র কাছে।

ওয়াং শুনলো যে রেবেকা-বিবি মেয়েকে এ রকম পরিবেশের মধ্যে রাখতে চায় না। তাই তাকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে সে পড়া-শুনো করবে, গান-বাজনা শিখবে—বিশেষ করে গানে তার ভীষণ ঝোঁক।

রেবেকা-বিবি প্রায়ই লক্ষ্ণৌ গিয়ে মেয়ের কাছে কিছুদিন কাটিয়ে আসতো। আর মাঝে মাঝে যেতো ফেং-হুং-মিং।

তারপর মেয়েটিকে ওয়াং অনেক দিন দেখেনি। কি তার নাম তাও জানতো না।

ফেং-হুং-মিং উনিশ শো বিশ সালে একবার কুয়ালালামপুর কি একটা কাজের উপলক্ষে গিয়েছিল, সেখান থেকে আর ফিরলো না। একদিন সকালবেলা তার লাশ পাওয়া গিয়েছিলো এক কুখ্যাত অঞ্চলের রাস্তার ধারে। কারা তাকে গুলী করে মেরে ফেলে রেখেছিলো।

তারপর রেবেকা-বিবিও আর কলকাতায় থাকে নি। সে চলে গেল লক্ষ্ণৌ মেয়ের কাছে। এখানকার যা কিছু দেখাশোনা করবার সবই করতো ওয়াং।

বছর পাঁচেক পরে, চিয়েন চাং-এর যখন আট ন'মাস বয়েস রেবেকা-বিবি কলকাতায় ফিরে এলো। তখন তার বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।

সঙ্গে নিয়ে এসেছে মেয়েকেও। সেই বারো বছরের মেয়ের তখন ছাব্বিশ-সাতাশ বয়েস। আগুনের মতো রূপ। আর অদ্ভুত গানের গলা। নামও নিয়েছে নতুন ধাঁচের—জুলেখা বাঈ।

রেবেকা-বিবি ওয়াংকে ডাকিয়ে এনে বললো, "এবার তোমায় একে দেখাশোনা করতে হবে।"

[ক্রমশঃ।

নীলকণ্ঠ

সাতাশ

প্রথম দিন শ্যুটিং থেকে ফিরে মঞ্জরী মনে মনে হিসেব করলে। টাকার নয় ; কাজের ! আসল ফিল্মে অভিনয়ের চেয়ে, যা তাকে ভালো করতে হবে, তা হল ডিরেক্টর আর প্রোডিউসরের সঙ্গে প্রেমের অভিনয়। সেটা মঞ্জরী পারবে।

বড় পরিচালকের ধক্কা দিতে হবে এখন থেকেই। প্রথম শ্যুটিং এর দিনে তার চেয়ে প্রয়োজনীয় আলাপ হয়েছে ; সবচেয়ে প্রয়োজনীয় লোকের সঙ্গে ; শ্রীকৃষ্ণ দত্ত। শ্রীকৃষ্ণ দত্ত তার ফিগারের প্রশংসা করে বলেছেন তালিম দেওয়া দরকার। তালিম দেবার জন্যে মঞ্জরী একদিন তাকে আসতে বলেছে। আরেকটি কাজ আছে পরশু। প্রথমদিন প্রোডিউসার আসতে পারে নি। পরশুদিন আসবে। তার সঙ্গে গাড়ীতে বেরুবে মঞ্জরী চা খেতে।

সেই পরশু এলো আজ এই মাত্র। অন্ধকার হয়ে এসেছে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট। আধ অন্ধকার। লম্বা লম্বা ছায়া ফেলে, যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে তবুও দুঃসময় নয় আজ ; ভাগ্যের মই বেয়ে জীবনে সাফল্যের চুড়োয় উঠবার প্রথম ধাপে আজ পা দেবে মঞ্জরী। তার প্রথম পা এগিয়ে দেবে। আজ মঞ্জরীর সুসময়।

রাখালবাবুর গাড়ী এলো বলে। প্রোডিউসার বসে থাকবে ধর্মতলার একটা ফ্লাটে তার জন্যে ; প্রোডিউসারকে মেজাজে রাখতে পারলে একশো পঁচাত্তর টাকা মাইনেয় চালিয়ে নিতে আটকাবে না একটুও।

চাবি দিয়ে আলমারী খুলে বিলিতি পাউডারের একটি মাত্র সযত্নে রক্ষিত কৌটোটা বার করা মাত্রই গাড়ীর হর্ণ এলো কানে। দুই হাতে চালিয়ে সেরে নিলে অর্ধসমাপ্ত প্রসাধন, তারপর গাড়ীতে রাখাল দত্তের পাশে এসে উঠল মঞ্জরী। রাখাল দত্ত যেতে যেতে শুধু বললেন, এই তোমার চান্স মঞ্জরী। গাড়ী এসে যেখানে থামলো সেটা একটি বিরাট বাড়ী। তারই দোতলায় একটা ঘরে মঞ্জরীকে বসিয়ে রাখালবাবু ভেতরে গেলেন।

এই আমাদের নোতুন হিরোইন মঞ্জরী। পর্দা ঠেলে রাখাল দত্ত যাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে মঞ্জরী যতটা থমকালো, এই মুহূর্তে এখানে বাজ পড়লেও সে হতবিহ্বল হত না অত বেশি। কিন্তু যাকে দেখে মড়ার মত সাদা হয়ে গেল মঞ্জরীর মুখ মুহূর্তের জন্যে, সে কিন্তু একটুও বিচলিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

মিষ্টি হেসে প্রোডিউসার রতনচাঁদ শুধু বললে : নমস্কার মঞ্জরী দেবী !

প্রথম যে কথা মঞ্জরীর মনে হলো তা আর কিছু নয় শুধু এই : রতনচাঁদকে চৌবাচ্চায় ফেলে দেওয়ার শোধ এবার সে নেবে। কিন্তু রতনচাঁদ ভদ্রলোক। রতনচাঁদ ব্যবসাদার। সে ওসব কিছুই করলে না। শুধু বললে : তারপর দিদির কি খবর ? কেঁপে উঠলো মঞ্জরী দেবী মনে মনে ; মুখে বললে, ভালো নয়। কেনো ? রতনচাঁদ তাহলে অবাক হতে জানে। কেন, তাও জানেন না। মঞ্জরীর আস্তে আস্তে সাহস বাড়ছে। ওঃ ওসব বাত ছেড়ে দাও মঞ্জরী, ও তোমার দিদি ভুলেই গেছে। আবার হামিও ভুলে যাবো। নাও চা খাও দেখি এখন। চা দিয়ে গেল বেয়ারা। এদিকে এসে বোস না। চা খেতে খেতে শুনলো মঞ্জরী। কিন্তু মঞ্জরী গেলো না ; বরং রতনচাঁদ এসে বোসলো। বসেই বাড়ীর কথা শুধাতে লাগলো ; কোথায় থাকে মঞ্জরী, কে কে আছে তার। কটা ঘর নিয়ে থাকে সে, প্রথমে একটু অবাকই হয়েছিল বটে মঞ্জরী, তারপরই বুঝলে। রতনচাঁদ আরেকটা চোরাকুঠুরি খুঁজছে ; মালপত্তর সরিয়ে রাখবার জন্যে। মঞ্জরী হাসলো। চোর জানে না সে গাঁটকাটার জিম্মায় জিনিষ রাখতে চাইছে। রতনচাঁদ হাসলে। গাঁটকাটা ধরতে পারেনি যে চোরের নজর সব সময় বোঁচকার দিকেই। আংটিটা যে মঞ্জরী ছাড়া আর কেউ সরাতে পারে না, বেলারাণীকে জোচ্চোর বললেও, রতনচাঁদ জানে তা। চোর কে, রতনচাঁদ বেলারাণীর কথা মোটরে শুনেই বুঝেছে ; কিন্তু তখনও মাথায় বড্ড গরম আর শরীর ছিলো সেই পরিমাণ ঠাণ্ডা। ভাবনাকে কাজে গড়িয়ে নিতে একটু দেরী করেছিলো মাড়বার তনয় আর গাঁটকাটা এসেছিলো ঠিক তখনই। বহুৎ আচ্ছা বলেছিলো রতনচাঁদ নেপথ্যের নায়িকাকে ; যেমন করে নাকি বলে ওঠে গান বিলাসী শ্রোতার বাণ্ডিল ওস্তাদ যখন তানের খেলা দেখায়। যেমন করে মঞ্জরী শক দিয়েছিলো বড় রতনচাঁদকে। 'খেলোয়াড় আছে', মনে মনে সেলাম করেছিলো রতনচাঁদ, কুর্নিশ করেছিলো অনেকবার। তবে ওস্তাদেরও ওস্তাদ আছে, ঠাকুরেরও ঠাকুর। সুদে আসলে তুলে নেবে দাম, মান খোয়াবার খেসারৎ শুদ্ধ। কিন্তু এক্ষুনি নয়। আগে মুরগীটা একটু মোটা হোক তার পর একদিন জুৎ মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটা যাবে মনের আরামে, হাতের সুখে।

রতনচাঁদ বাড়ী নামিয়ে দিয়ে গেল যখন তখন মঞ্জরীর বাড়ীর দরজায়, একটি কি দুটি মেয়ে তখনও, হতাশ পথিক সে যে আমি বলবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। ওপরের ঘরে মঞ্জরীকে জড়িয়ে ধরে বললে বেলারাণী : রাগ করেছিস। মঞ্জরী বললে না। রতনচাঁদের কি

খবর? মঞ্জরী এ প্রশ্ন কেন যে করলে, সে তা জানে না। রাগ পড়লেই আবার আসবে; রতনচাঁদ আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে না। দিদি তাহলে এখনও নিশ্চিন্তি আছে। মঞ্জরী আর কিছু বললে না; কিন্তু বেলারাণী জিজ্ঞেস করলে কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

গিয়েছিলাম কাজে, রাস্তায় দেখা তুলু বাবুর সঙ্গে, দেরী করে দিলে। মঞ্জরী মিথ্যে কথা বলে, না ভেবেই। দুজনেই চুপ করে গেল হঠাৎ। মঞ্জরীর মা এসে বললেন, কি তোরা চুপচাপ বসে কেন, খা।

মঞ্জরীর কানে সে কথা গেল না। সে ভাবলে দিদিটা কিন্তু বোকা। বেলারাণীর কানে কোন কোন কথা গেল না। সে ভাবতে লাগল: মঞ্জরীটা কি মিছে কথা বলে আজকাল। তুলু বাবু আজ দিন কয়েক হোল বেলারাণীর কাছে যেতে আরম্ভ করেছে; বেলারাণীকে তুলু বাবু কালই বলেছে: না মঞ্জরীর মুখ সে এ জীবনে আর দেখবে না।

আটাশ

প্রথম ছবি বাজারে বেরুলো, সে-ছবি তেমন জুতের হলো না; কিন্তু সবাই একবাক্যে স্বীকার কোরল মঞ্জরী বলে এই নতুন মেয়েটার হবে। সেদিন যারা হালকা ভাবে বলেছিলো কথাটা তারা আজ সবাই আঙুল কামড়াচ্ছে; হলো ত' বটেই; তবে এতদূর হলো যে সেদিন যারা পিঠ চাপড়িয়েছিলো আজ তারা সবাই মঞ্জরীর কৃপাপ্রার্থী; এতটা নিশ্চয়ই তারা চায় নি। এতটা হবে জানলে তারা কিছুই চাইতো না; চাইতো আরম্ভেই মঞ্জরীকে দাবিয়ে দিতে; প্রথম দৃশ্যে হতো যবনিকা পতন!

প্রথম ছবি মুক্তি পাবার পর মঞ্জরী প্রশংসা পেলো বটে; কিন্তু কাজ পেলো না। কাগজে তার ছবি ছাপা হলো বটে; কিন্তু নতুন কোনও কণ্ট্রাক্ট সই হলো না; প্রশংসায় মন ভরে: মানুষের পেট ভরে না। মঞ্জরী শঙ্কিত হলো। ইতিমধ্যে সে উঠে এসেছে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পাড়ায়; মা আছে পুরানো বাড়ীতে। শুধু ছবির ওপর ভরসা করে এসেছে বললে মঞ্জরী মিথ্যে বলবে; কিন্তু শুধু লোকের ওপর নির্ভর করেও মঞ্জরী আর বসে নেই। সে লোক সাজ্ঘাতিক বড়লোক হলেও; ছবি তার চাই-ই। মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে গরু-ছাগল-মোষ মারা বাঘের যা হয়, সমাজের সর্ব ঘৃণ্য স্তরের মেয়েমানুষ যখন ছবির নায়িকা হয় তখন তারও হয় তাই। বহু লোকের ডাক আসে তার জীবনে; এক লোকের কাছে আর বাঁধা থাকতে চায় না সে; আর এ-ডাক শুধু উপভোগের স্থূল আহ্বান নয়; এর পেছনে আছে মেয়েমানুষের দেহের অতীত, শিল্পীর অস্তিত্বের প্রতি অভিনন্দনের স্পর্শ। ছবিতে নামবার পরই মঞ্জরীর মনে হয়েছে, হয়ত দেহ-বেসাতিই তার নির্মম নিয়তি নয়!

এরই মধ্যে প্রথম ছবির নায়ক এসেছে দুপুর বেলায় তার নতুন বাড়ীতে। এমন সময় দরজায় টুক্-টুক্ করে আওয়াজ করেছে কে? এমন সময়ে কে হতে পারে? ধড়াস করে উঠেছে মঞ্জরীর বুক। দরজা খুলে যাকে দেখেছে তাকে দেখে অনেকক্ষণ কথা সরে নি মঞ্জরীর·
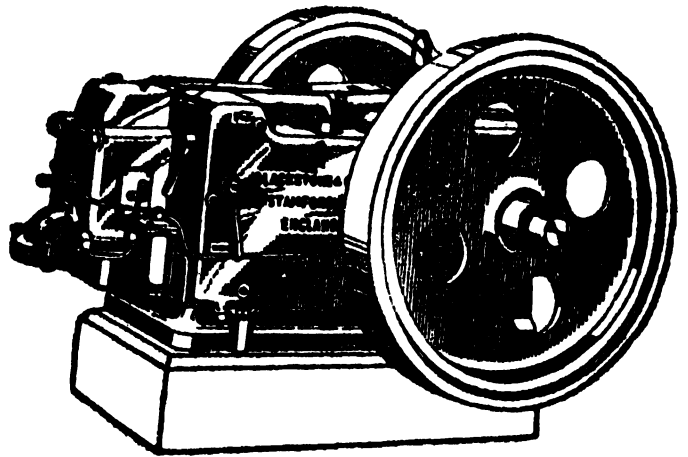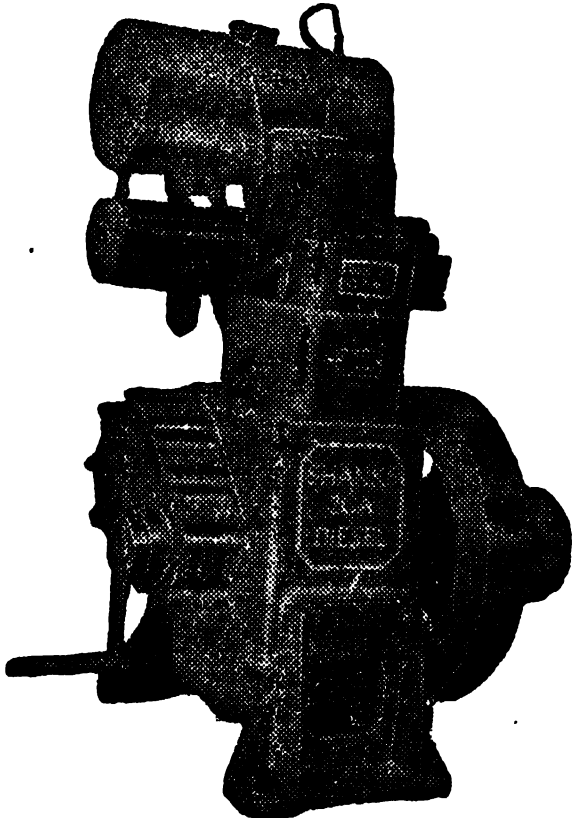
মুখে। তাই দরজায় দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ দত্ত, যার একটা কথায় crowd scene-এর মেয়ে হ'তে পারে লক্ষ-লক্ষ টাকার ছবির নায়িকা। মঞ্জরী চুপ করে গেলেও ভেতরে সে বসেছিলো, তার প্রথম ছবির নায়ক সে কিন্তু চুপ করে থাকে নি; চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেছে শ্রীকৃষ্ণ দত্তকে? 'স্যর' না কি?

ঘাবড়েছেন শ্রীকৃষ্ণ দত্ত; লজ্জায় পড়েছেন। কিন্তু মুহূর্তকাল মাত্র। অভিনেতা চরিয়ে তিনি এতকাল চলেছেন; অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করবার জন্যে তাঁর চেয়ে তৈরী কে? ভিতরে ঢুকে, নাকে রুমাল চাপা দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছেন; অন্য কিছু ভাববেন না; এ মেয়েটি বড় দুঃখী, আমার দেখে মনে হয়েছিলো, এর হবে। তাই, একটু তালিম-টালিম দিয়ে দিলে যদি উন্নতি করতে পারে, তারই জন্যে আসা।

উঠে পড়েছিলো ছবির নায়ক; যাবার আগে বলেছিলো: তাই দিন স্যর, তালিমই দিন, আমি এখন চলি।

'স্যর' শুধু তালিমই দিলেন না; 'স্যর' ভদ্রলোক; কাজও দিলেন। মস্ত বড়ো কাজ। উপনায়িকার। কিন্তু 'স্যর'-এর আশীর্বাদ পেলে নায়িকার চেয়ে উপনায়িকারই বাজি মারবার আসা বেশী; মঞ্জরী স্বপ্ন দেখতে লাগলো।

শ্রীকৃষ্ণ দত্তর ছবির নাম কালিদাস। মঞ্জরী তাতে যে ভূমিকাটি পেলো সে হচ্ছে কালিদাসের inspiration অনসূয়া। মঞ্জরীর অভিনেত্রী জীবনের সর্বোত্তম সুযোগ। সেই সুযোগ প্রায় নিজে থেকে পায়ে হেঁটে এল মঞ্জরীর দরজায়। এবং এল আশ্চর্য দ্রুত। সবাই অবাক হল। ঈর্ষান্বিত হল মঞ্জরীর সৌভাগ্যে। কিন্তু কেউ প্রশ্ন করল না। এর আগেও বহুবার আনকোরা মেয়েকে প্রথম নিয়ে একটি ছবিতেই রাতারাতি তাকে ষ্টার বানিয়ে তোলার পরিচয় দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। এই প্রথম নয়। মাটি থেকে মাত্র পাঁচটি আঙুলের সাহায্যে যেমন মূর্তি গড়ে তোলে কেষ্টনগরের পুতুল-শিল্পীরা। দেখে অবাক হতে হয়। ধরতে সময় নেয় অনেকক্ষণ, এ মাটির মূর্তি না প্রাণের পুত্তলী:

কিন্তু মঞ্জরী মাটি নয়; মেয়েমানুষ। যেমন তেমন মাটি থেকেই তেমন তেমন শিল্পী বানিয়ে তোলে মূর্তি। তাদের হাতে পুতুল থেকে জন্ম নেয় প্রতিমা। কিন্তু মানুষকে শিল্পী করতে শুধু স্রষ্টারই সব দায়িত্ব যে, যার ভেতর থেকে নবজন্ম হবে শিল্পের তারও তাগিদ থাকা চাই সৃষ্টির। এবং সৃষ্টির এই বেদনা যে নিজের বুকে বয়ে বয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে পায় সুবিপুল আনন্দ সেই শিল্পী। এই বেদনার সঙ্গে কোনও যন্ত্রণারই তুলনা অসম্ভব। রুদ্ররুক্ষ দারিদ্র্য অথবা অগ্নিবর্ষ ক্ষুধা এ দুয়েরই নিদারুণ যন্ত্রণা। সৃষ্টির বেদনা? সে দুর্বহ। খুবই। এ পৃথিবীতে একমাত্র মাতৃত্বের মহিমময় বেদনার সঙ্গেই তার যা কিছু মিল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মাতৃহৃদয়ের যে হাহাকার সেই হচ্ছে শিল্পীর ক্রন্দন। সৃষ্টি হচ্ছে শিল্পীর সন্তান। এবং সন্তান জন্মের পর প্রতিবারই প্রতিজ্ঞা,—আর নয়। এ যন্ত্রণা, এই বেদনা, এই হাহাকার, এই কান্না মেনে নেওয়া,—আর নয়। আর প্রতিবারই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গেই প্রতিজ্ঞার—পূর্তি। শিল্পীরও তাই। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় মুক্তি। কিন্তু মুক্তি নয়। আবার নবতর সৃষ্টির জন্য প্রস্তুতি মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণর দত্তর কাছে গিয়ে মঞ্জরীর সত্যি সত্যি নবজন্ম হল। আরেক পৃথিবীতে পৌঁছল মঞ্জরী। অভিনয়ের নূতন অর্থ সেখানে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে, ফল হয়ে দেখা দেয়। সে পৃথিবীতে পদার্পণের আগে পর্যন্ত মঞ্জরীর মনে অভিনয় সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা ছিল, কলের পুতুলের মত কেবলমাত্র পুঁথির কথা প্রাণহীন আউড়ে যাওয়া। সে জানত এতেই বুঝি হয়। মাত্র এইটুকুই তার কাছে সবাই চায়। এবং তাই শক্ত মনে হয় নি অভিনেত্রী জীবন, অসম্ভব মনে হয় নি ফিল্মে প্লে করা। সেই স্বপ্নের ভূমি পায়ের তলা থেকে সরে গেল শ্রীকৃষ্ণ দত্তর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। দাঁড়ানো মাত্র শ্রীকৃষ্ণ দত্ত হাসলেন। মঞ্জরীকে সেই হাসিই বলে দিল যে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে পর্যন্ত এখনও শেখেনি সে।

হাসলেন, কিন্তু ভ্রূকুঞ্চন করলেন না শ্রীকৃষ্ণ। বরং মঞ্জরী যে অভিনয় সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ, এতে বরং খুসীই হলেন। দড়কচড়া মেরে যাওয়ার চেয়ে কাঁচাই ভালো। নরম মাটিকেই গড়ে পিটে নেওয়া যায়। শক্ত মাটি ভেঙ্গে তাকে আবার নরম করে নিয়ে গড়ায় মেহনত অনেক বেশী। মজুরী পোষায় না। মঞ্জরীকে শ্রীকৃষ্ণ দত্ত মন্ত্র দিলেন। অভিনয়ের ইষ্টমন্ত্র।

সেই ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে নবজন্ম হল মঞ্জরীর। শ্রীকৃষ্ণ দত্ত বললেন, অভিনয়শিল্পী ব্যক্তিগত জীবনে কি, মহীয়সী মহিলা অথবা কলঙ্কিনী কুলটা সে প্রশ্ন মানুষের, জীবনদেবতার নয়। এমন কি শিল্পী পুরুষ না মহিলা, এ জিজ্ঞাসাও অবান্তর। শিল্পীর কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, সেক্স নেই। সে শিল্পী,—এই তার একমাত্র পরিচয়। শিল্পী হিসেবে সে সার্থক কি না তাই হচ্ছে তার চরম বিচার। মানুষ হিসাবে সে কি তা নিয়ে যার মাথা ব্যথা তার নাম সমাজ, শিল্প নয়।

মঞ্জরীর ভয় ছিল সে অশিক্ষিত। তাকে অভয় দিলেন শ্রীকৃষ্ণ দত্ত। বললেন, লেখাপড়া করে লোকে পণ্ডিত হয়, স্রষ্টা হয় না। পণ্ডিত হবার জন্য চাই প্রতিজ্ঞা। স্রষ্টা হবার জন্য প্রতিভা। প্রতিজ্ঞা করতে হয়। প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে হয়। যারা সৃষ্টি করবার জন্য জন্মায় তারা সৃষ্টি করেই খালাস। সেই সৃষ্টির অঙ্গে অর্থের আভরণ পরানোর জন্যই প্রয়োজন হয় পণ্ডিতের। সৃষ্টির জন্য শিল্পী, ব্যাখ্যার জন্য পণ্ডিত। এক জনের প্রেরণা রস, আরেকজনের বিচার। অভিনয় কেমন করে করতে হয় সে সম্বন্ধে যে বই লেখে সে সব জানে শুধু অভিনয় করতে জানে না। যে অভিনয় করে সে কেমন করে অভিনয় করে তা হয়ত জানে না কিন্তু অভিনয় সেই করে।

শ্রীকৃষ্ণ দত্ত আরও বলেছিলেন। বলেছিলেন মঞ্জরী যখন অভিনয় করছে না ষ্টুডিওর ফ্লোরে তখনও সে অভিনয় করছে। জাগরণে এবং নিদ্রায়, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে যে অভিনয় করছে না সে নয় অভিনেত্রী। অভিনয় শুধু ধারণার নয়, ধ্যানের বস্তু। অর্জুনের চোখ থেকে যেমন সব সরে গিয়ে জেগেছিল শুধু পাখীর চোখটুকু তীর ছোঁড়ার মুহূর্তে তেমনি অভিনেত্রীকে শুধু জগত বিস্মৃত হলেই চলবে না, তাকে আত্মবিস্মৃতও হতে হবে।

আত্মবিস্মৃতই হলো মঞ্জরী। অতীতবিস্মৃত হল সে। মুছে গেল ভবিষ্যৎ। বর্তমান বিস্মৃত হল, অস্তিত্ববিহীন। সত্তা বিসর্জিত। শুধু জেগে রইল অভিনীত চরিত্রের রূপকল্প। চলে গেল কালিদাসের কালে। উজ্জয়িনীর দ্বারপ্রান্তে উজ্জীবিত হল মঞ্জরী। সে যে পতিতা, সে যে পেটের দায়ে অভিনয় করতে এসেছে তা ভুলে যেতে তার না হল ভয়, না হল দেরী। শুধু তাই নয়। খ্যাতি, অর্থ, নিশ্চিন্ততা, নির্ভরতা কিছুরই কথা রইল না তার মনে। মনে রইল না সে মঞ্জরী। মনে হল না শুধু, প্রত্যয় হল সে অনসূয়া। পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবির প্রেরণা। মঞ্জরী নয়। কালিদাসের সে কবিতা। গানের, আলোর, আনন্দের প্রস্ফুটিত মঞ্জরী! ধন্য হল। কৃতকৃতার্থ হল। সার্থক হল।

[ক্রমশঃ।

একটি গ্রীসীয় পাত্রের প্রশস্তি

জন কীটস্

[John Keats-এর Ode on a Grecian Urn কবিতার অনুবাদ]

আজো তুমি নিরুদ্বেগ বিশ্রামের বধূ—অচুম্বিতা,
 স্তব্ধতা ও বিলম্বিত সময়ের পালিত সন্তান,
জানো গ্রাম্য জীবনের ইতিবৃত্ত, পুষ্পিত কথার, শুচিস্মিতা,
 ব্যাখ্যা করো, আমাদের কবিতার চেয়ে যার মিষ্টতর মান :
তোমার আকৃতি ঘিরে পত্রলেখা এ কাহিনী কার!
 দেবতার, অথবা কি মানুষের, কিংবা উভয়ের,
সুন্দরী টেম্পীতে কিংবা আর্কেডীয় উপত্যকায়?
 এ কোন মানুষ এরা অথবা দেবতা? কুমারীরা অনিচ্ছুক? আর
কী উদ্দাম পশ্চাৎধাবন? কী প্রচেষ্টা এ-পলায়নের?
 কেমন বাঁশি ও একতারা বাজে? কী তীব্রতা আনন্দ-বন্যায়?

শ্রুত সঙ্গীতের লয় মধুর, কিন্তু যা শ্রুত নয়
 আরো সুমধুর : তবে কোমল বাঁশিরা বেজে যাও;
কানের তৃপ্তিতে নয়, অনুভবে আরো প্রেমময়
 শব্দহীন গান গেয়ে আত্মাকে জাগাও
তরুতলে সুন্দর যুবক, ছেড়ে দিতে পারো না তুমি তো
 তোমার সঙ্গীত, ওই গাছেরাও নগ্ন হবে না তো কোনো দিন;
কখনো পাবে না তুমি চুম্বনের সুযোগ তো সাহসী প্রণয়ী,
 যদিও জয়ের কাছাকাছি—তবু, হয়ো না দুঃখিত;
বিবর্ণ হবে না সে তো, যদিও তোমার ভাগ্য রয়ে যাবে দীন,
 তুমি চিরকাল প্রেম দিয়ে যাবে, আর সেও রবে রূপময়ী।

আহা সুখী, সুখী সেই শাখারাও! যাদের পাতারা
 ঝরে না, এবং যারা কোনো দিন বসন্তকে দেয় না বিদায়;
আর সুখী সঙ্গত-নায়ক ক্লান্তিহারা,
 চিরদিন বাঁশি যার নূতন-নূতন গান গায়;
আরো সুখী সে প্রেমিক! আরো কী সুখের প্রেম তার!
 যা চির সতেজ উষ্ণ চির ভুঞ্জনের,
অনন্ত আগ্রহ নিয়ে যা রবে অম্লান;
 বহুঊর্ধ্বে মানুষের সেই কামনার—
যা আনে সুতীব্র দুঃখ তৃপ্তি-ক্লান্তি ঢের,
 উত্তপ্ত ললাট আর বিশুষ্ক রসনা—অবদান।

বলি উপহার দিতে কারা এরা আসে?
 পল্লব-আবৃত কোন বেদীতে হে তুমি পুরোধার,
নিয়ে চলো গো-বৎসারে, সে কান্না তুলেছে নীলাকাশে,
 রেশম-মসৃণ দেহপার্শ্ব মাল্যে বিভূষিত তার?
কোন ক্ষুদ্র নগর—নদীর তীরে অথবা কি সাগর কিনারে,
 অথবা পর্বতশীর্ষে নির্মিত শান্তির দুর্গ নিয়ে,
আজ এই জনতার থেকে রিক্ত এমন পবিত্র এই ভোরে?
আর ক্ষুদ্র হে শহর, তোমার সরণিগুলি রবে একেবারে
 নিস্তব্ধ, এবং কেউ বলবে না ঘরে ফিরে গিয়ে
কেন তুমি জনহীন, বাঁধা কোন নিয়মের ডোরে।

গ্রীসীয় গঠন! আহা সুন্দর আকৃতি! সুচিত্রণ
 মর্মরের মানব-মানবী সুসজ্জিত,
আরণ্য শাখায়, আর পায়ের তলায় গুল্ম বন;
 স্তব্ধ তুমি করো ভ্রান্ত আমাদের—আকুল চিন্তায় নিমজ্জিত
অনাদি অনন্তকাল যেমন বিভ্রান্ত করে; শান্ত গ্রাম্যকথা!
 পুরাতন যুগ এই-বংশ ধ্বংস করে দিলে কভু
তখনো থাকবে তুমি অংশীদার আরেক দুঃখিত জনতার।
মানুষের বন্ধু হয়ে, যাদের বলবে তুমি তবু
 "সৌন্দর্যই সত্য, আর সত্যই সৌন্দর্য"—নিশ্চয়তা
এ সবই যা জানো এ পৃথিবীতে, এবং যা তোমার জানার।

অনুবাদ—গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য

মিসেস ডায়ার্স জাতে হাঙ্গেরীয়ান কিন্তু আমেরিকান নাগরিকত্ব লাভ করে এখন আবার বাস করতে এসেছে এডিনবরায়। শিল্পী—ছবি আঁকে ভালই। এডিনবরায় প্রথম যখন যাই তখনই আলাপ হয় নেলসেন মনুমেণ্টের নীচে। একটু আলো পেতেই ক্যামেরা খুলে ছবি তুলছিলাম—ক্যামেরার মধ্য দিয়ে চোখে পড়ে তার দেহবল্লরী। মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে কি যেন আঁকছে। আমি কৌতূহলের বশে এগিয়ে যাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য—ভারী সুন্দর। তুলির টানে ধরা পড়েছে। পেছন ফিরে তাকায় ডায়ার্স। নিজে থেকেই আলাপ সুরু করে হাসতে হাসতে। বোধ হয় বিদেশিনী, তাই সঙ্কোচের বালাই নেই।

শুনেছি, যাযাবর জীবন নিয়েই পথ চলেছে মিসেস ডায়ার্স। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউই বিশেষ নেই। থাকার মধ্যে আছে প্রচুর অর্থ আর শিল্পী হবার অদম্য ক্ষুধা। বিয়ে হয়েছিল ফিলেডেলফিয়ায়, কিন্তু হনিমুন থেকেই পালিয়ে আসে মিঃ ডায়ার্সের কুৎসিত আকাঙ্ক্ষার ভয় এড়াতে। সুদীর্ঘ দশ বছর চলে গেছে। পত্রালাপ পর্য্যন্ত নেই—বিবাহ বিচ্ছেদও হয়নি। মিঃ ডায়ার্স যে অনুন্নত জীবনের মধ্য দিয়ে পাথেয় সংগ্রহ করে চলেছে—সে খবরও অজানা নেই। কিন্তু সৌন্দর্য্য-সন্ধানী চোখ তার আকাশের দিকেই দৃষ্টি ফিরিয়ে আছে—নীরব ভাব বিনিময়ের শেষে তার ভিত্তিতে ভালবাসার সোপান গড়ার আশায়।

বাড়ীর জানালা দিয়ে উঁচু কিং আর্থার সীটটা চোখে পড়ে। ঘরের মধ্যে ছবির পর ছবি—অচেতনকে চেতনা দেবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

মিসেস ডায়ার্স প্রশ্ন করে—তুমি কি সব কিছু মনে করতে পার?

তাকিয়েছিলাম তারই আঁকা এক ছবির দিকে। অর্থ দুর্বোধ্য।
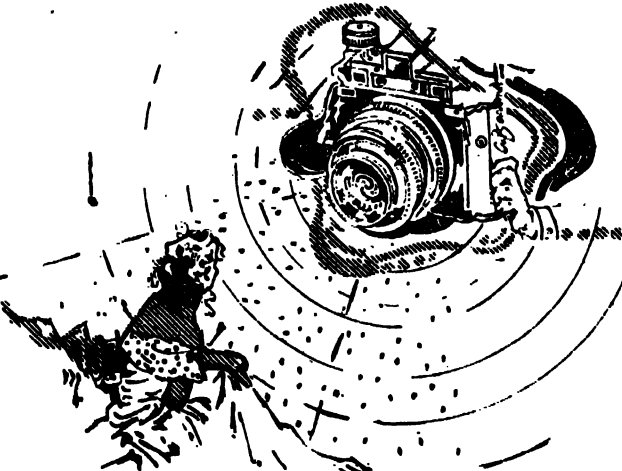
এক নগ্নমূর্ত্তির ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে এক টুকরো মেঘ—বিরা আকার ধারণ করার প্রয়াস। দূরে এক ছোট্ট পাখী উড়ে চলে যাচ্ছে দিগন্তের দিকে। পায়ের কাছে দুই কুকুরে এক টুকরো হাড় নি খেলা করছে।

প্রশ্ন শুনে ঘাড় ফেরাই। উত্তর দিই—পারি যেটা মনে রাখতে চাই।

—আর ভুলে যাওয়ার ব্যাপার?

—ঠিক তাই যেটা ভুলে যেতে চাই সেটাই ভুলে যাই।

—মানুষের বেলাতেও।

—সেটা তো আরও সহজ।

—ঠিক বলেছ। কিন্তু সেই সহজ ব্যাপারটাকে এত বছরে আয়ত্ত করে উঠতে পারলাম না। অনেক সময় ইচ্ছে হয়েছে দো জানালা বন্ধ করে অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসে থাকব। না থাকবে কোন শব্দ—না কোন কোলাহল। দেখব তার মধ্যে কি সৌন্দর্য আছে।

কথার মোড় ফিরিয়ে দিই অন্য কথায়।

—এখানে কত দিন আছ?

—তারিখ নিয়ে চলার অভ্যাস নেই তবে মোটামুটি এক বছর।

—যে আশা নিয়ে এসেছিলে তা নিশ্চয়ই মিটেছে?

—তোমার কি মনে হয়।

—আমার মনে হয় এডিনবরা তোমায় নিরাশ করেনি।

—এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়। এমন কি জেনারেল পোষ্টাফিসের সামনে নির্লজ্জ মাংসলোলুপ মানুষ আর সেই সঙ্গে মেয়েদের ব্যবসার দরাদরীর দৃশ্যও নয়। জান আমি ভালবাসি—বিচ্ছিন্ন জীবন আঁকাবাঁকা কাঁটা ভরা পথ, লাল মেঘ, শীতের ঝড়।

পুরান দিনের এক ঘটনার কথা বলে।

নিউঅর্লিন্সে থাকার সময় ঘটে।

সমুদ্রের ধারে ছবি আঁকতে আঁকতে রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। তবু ওঠার ইচ্ছা ছিল না। স্বল্পালোকেই তুলি বুকে নিয়ে শুয়েছিল বালির ওপর। পরনে ছিল স্বচ্ছ এক সাধারণ পোষাক—শুধু সভ্যতার আইনকে ফাঁকী দেওয়ার জন্য।

পাশে একজন এসে দাঁড়ায়—

সিগারেটের আগুন শেষ হয়ে গিয়েছিল—তাই খোঁজ করছিল কাঠির।

দিয়াশলাই তুলে দেয় তার হাতে···

হাত চেপে ধরে—আগন্তুকের হাতের চাপে কিসের যেন মাদকতা।

এ যে সেই চিরন্তন ইঙ্গিত।

মিসেস ডায়ার্স হাসতে হাসতে বলে—থাক আর পশুত্বটা শক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে না। আনন্দ তাতে বড় একক হয়ে পড়ে।

লোকটার চলার পথে থমক এনে দেয় কথার চাবুক।

—আনন্দের ভাগী আমাকেও করে নাও।

এ রকম অভ্যর্থনা লোকটার জীবনে কোন দিনই আসেনি— সাহস তাই নিবে এসেছিল এর পর। চারিদিকে আর কেউ নেই— সাড়াশব্দও মেলে না। ডায়ার্স অগ্রসর হয়—অথচ তখন কুমারী···

সেই কঠিন বালুর বুকেই শোণিতপাত হয়—

ধন্যবাদ দেয় চুম্বনের ছোঁয়ায়…

নারী বলে—ধন্যবাদ তো আমারই দেওয়া উচিত। বিনা আমন্ত্রণেই এই সুখী করার জন্য।

সঙ্গে করে বাড়ী পৌঁছে দিতে চায়।

উত্তর আসে—না, মনের আনন্দ এখনও এ জায়গাটাকে ঘিরে আছে। এর মধ্যে এখান থেকে যাবার ইচ্ছা নেই।

চলে যায় সে—যাবার আগে হাতে গুঁজে দিতে চায় অপমানের চিহ্ন, ডলারের কাগজ।

গ্রহণ করে না। শুধু বলে—যদি মনে রাখতে চাও তবু খোঁজ রেখ। মাতৃত্ব পালন করার সময় আমার নেই। তখন দিও তোমারই আনা প্রাণকে।

কাহিনীর শেষে মিসেস ডায়ার্স উঠে টেবিলের ধারে যায়।

বলে—সাধারণ লোকের ধারণা, জীবনে সুখ শান্তি পাওয়া ভাগ্যের কথা। আমি তা বিশ্বাস করি না। এটা অবশ্য সত্য যে সুখ জিনিষটা ঠুনকো কাচের খেলনার মত, যেটা নিয়ে খেলা করে পুরুষ-নারী জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে। দু'জনের দৃষ্টি যদি একই দিকে না থাকে বা দুজনের আকর্ষণ যদি সমান না হয় তবে সেটা কোন অসতর্ক মুহূর্তে নীচে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। তাই বলে ভাগ্যের ওপর হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে সুখ আর আসবেই না কোন দিন। অন্যায় অনাচার যাই বলুক অন্যেরা, সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকলে পথ চলতে হবে ঠিক মাতালের মত। মাতাল হবার আনন্দই যে একেবারে আলাদা। এত উগ্র ভাবে পরিস্ফুট হয় সব কিছু সে অনেক সময় অনুভব করার শক্তি পর্য্যন্ত যায় হারিয়ে। স্বল্প সুখ মনকে তৃপ্ত তো করেই না বরং কুণ্ঠা বাড়ায়! আনন্দ রোজকার ব্যবহৃত জিনিস নয়—আস্বাদনে এর তীব্রতা না থাকলে এই ব্যবধানকে বাঁচিয়ে রাখবে কে? আর সেজন্যই ভাগ্য অতৃপ্তিকে চাপা দিতে পারে না।

মিসেস ডায়ার্স-এর অনেক শিল্পই প্রকাশিত হয় পত্রিকা ও কাগজে। বেশ সুনামও আছে শিল্প-জগতে। তার গুণগ্রাহী দলের অভাব নেই। তারা বাধা মানে না—ভীড় করে প্রায়ই তার বাড়ীতে, যদিও তার দেখা পাওয়া ভার। অনেকেই আসে শিল্পীর সৌন্দর্য্য দেখতে তার বেশভূষার অসংলগ্ন ব্যবহারের ফাঁক দিয়ে আর অনেক আসে শিল্পীর সত্যকার মর্য্যাদা দিতে। ভিন্ন পথ হলেও ড্রইংরুমে জায়গা দেওয়া যায় না। মাত্র দু-একজন নীচের তলা থেকে তার অঙ্কনশালায় প্রবেশের অনুমতি পায়। বাড়ীতে দেখা শোনার জন্য আছে ডিক্—রোজ রাত্রে চলে যায় খাওয়া দাওয়ার পর।

সেদিনেও চলে গেল যথাসময়ে। আমরা গিয়ে বসি আগুনের ধারে। রেডিও অতি মৃদুস্বরে গানের সুর শুনিয়ে চলে।

আমি প্রশ্ন করি—শিল্প সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

—শিল্প আমার মতে খামখেয়াল মাত্র। সমাজে এর কি দান সেটা তোমরাই জান বেশি—শিল্পী বহুক্ষেত্রেই সমাজের কথা ভেবে কিছু সৃষ্টি করে না। নগ্ন এক মেয়ের বিশেষ ভঙ্গীমা শিল্প হতে পারে কিন্তু সমাজের কথা ভাবলে কখনই সে শিল্প সৃষ্ট হত না। সমাজের নিয়মমাফিক চলাফেরা করা তার স্বভাব নয়। শিল্পী মাত্রেই অনাচারী গোপনে গোপনে—কথাটা তোমাদের কিন্তু অসত্য নয় কিন্তু কেন জান? শিল্প শিল্পীর জীবনের একটা বড় অংশ অধিকার করে থাকে, স্বপ্ন দেখে সে শিল্পেরই নানান বর্ণ দিয়ে। যখন সে শিল্পের গণ্ডী ছেড়ে বাইরে আসে, তা সে যত সামান্য সময়ের জন্যও হোক না, সে চায় সব পিপাসা মেটাতে। অথচ সাধারণ আনন্দ আর তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। আনন্দও তাই বহু ক্ষেত্রেই বিকৃত অথবা অসাধারণ হয়ে পড়ে। আনন্দের সময়টুকু সে কখনই সমাজের মধ্যে ব্যয় করতে চায় না।

নীচের দরজা থেকে কলিং বেলের আওয়াজ আমাদের টেনে আনে বাস্তবতার মাঝে। মিসেস ডায়ার্স চলে যায়। আমি চোখ বন্ধ করে তার কথার অর্থ বোঝার চেষ্টা করি।

মনে হয় কত যুগ পার হয়ে যায়—তবু তার দেখা নেই।

ওঠার কথা ভাবছি, কানে ভেসে আসে চীৎকার—

—আমি আজ থাকবই থাকব।

পরক্ষণেই মিসেস ডায়ার্স-এর অনুরোধ—তোমায় কোন দিন তো ফেরাইনি, তবে আজ আমার কথা রাখবে না কেন?

—আমি এখানে আসি তোমার কথা রাখব বলে নয়।

—তবু।

—তুমি যাবে, না, তোমায় জোর করে নিয়ে যেতে হবে।

অস্থির ভাবে উঠে পড়ি। এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি—আবার শুনতে পাই মিসেস ডায়ার্স এর কণ্ঠস্বর—তোমার সঙ্গে জোর করে আমি পারব না আর তুমি কোন কিছু বুঝবেও না। একটু অপেক্ষা কর আমি আসছি।

ঝড়ের বেগে আসে আমার কাছে।

হাত ধরে বলে—তুমি আমার সম্বন্ধে কি ভাবছ জানি না কিন্তু অন্ততঃ ঘণ্টাখানেকের জন্ম আমায় ক্ষমা কর। আমি এসে তোমায় সব কিছু বলব। এটুকু দয়া আমায় কর।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার চলে যায়।

আমি কয়েকটা বই টেনে নিয়ে সময় কাটাবার চেষ্টা করি। কোন এক বই থেকে একটা কাগজ মাটীতে পড়ে যায়। কৌতূহল বশে পড়ে ফেলি—

"প্রিয় মিসেস ডায়ার্স,

তোমার কথামত খোঁজ নিয়ে জানতে পারি মিসেস ম্যাকমীলন যক্ষায় ভুগছে কিন্তু তাহলেও তোমার ভয় নেই। আমি ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করেছি এবং ডাক্তারের উপদেশ মত চললে বাচ্চার দেহে ঐ বীজ সংক্রামিত হবার কোন কারণই থাকবে না। তার ওপর ম্যাকমীলন পরিবারে তোমার মেয়ে যে ভালভাবেই মানুষ হবে সে আশ্বাসও আমি দিতে পারি। যাই হোক এ বিষয়ে তোমার মতামত শোনার অপেক্ষায় রইলাম।"

আমেরিকা থেকে চিঠিটা এসেছে গত মাসে, হয় তো এর উত্তরও এত দিনে চলে গেছে যথাস্থানে।

মিসেস ডায়ার্স-এর জীবনের আর একটা দিক ধীরে ধীরে প্রকাশ হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে এল রাতের অতিথির আগমনোদ্দেশ্য। শিল্পীর শিল্প-জীবন ভুলে তার অন্যরূপ দেখার চেষ্টা করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইচ্ছা করেই বইটা খুলে রেখে দিই পাশে আর তার ওপর চাপা দিই চিঠিটা।

ঘুমাবার ভাণ করলেও শেষে ঘুমিয়েই পড়ি।

কয়লা ভাঙ্গার শব্দে ঘুম ভাঙ্গে—মিসেস ডায়ার্স হাঁটু গেড়ে বসে আগুন ঠিক করছিল।

আমি পা টেনে নিয়ে বসতেই বলে তোমায় ঠাণ্ডায় রাখার জন্ম ভয়ানক লজ্জিত। কিন্তু নিজেও তো কয়েকটা টুকরো কয়লা দিতে পারতে।

বলি আমার তেমন শীত করছে না।

—সত্যি হবেও বা। আমি এই মাত্র স্নান করলাম বলেই হয়তো আমার এত শীত বোধ হচ্ছে।

বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করি, এত রাতে স্নান করলে!

দেখি পাশ থেকে বই ও চিঠিটা অন্তর্হিত হয়েছে।

মিসেস ডায়ার্স বলে চল শোবে চল। আমার আর ঘুমাবার ইচ্ছা নেই। যতক্ষণ পারি তোমার সঙ্গে গল্প করা যাবে।

ঘুমাবার ইচ্ছা আমারও ঠিক ছিল না। তাই শোবার ঘরেই সুরু করে মিসেস ডায়ার্স তার কাহিনী।

স্বামীকে ত্যাগ করে চলে আসলেও আদিম ক্ষুধার ডাক ভুলতে পারিনি। যতই শিল্প নিয়ে সাধনা করি দেহের তন্ত্রীতে সময় সময় শিহরণ আসে আর তখন শিল্প দিয়ে মনকে ভুলিয়ে রাখা সম্ভব নয়। প্রয়োজন হয় নরনারীর সাময়িক আনন্দ প্রচেষ্টা।

সৌন্দর্য্য আছে কিন্তু সম্মান হারিয়ে পথে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না বা ক্লাবে খোঁজ করতে চাই না। মডেলদের ব্যবহার করতাম তাই নিজের খেয়াল মেটাতে। আপত্তি তো উঠতোই না বরং শিল্পীর মনোরঞ্জনে তারা নিজেকে ধন্য মনে করত। বিপদ হতো অনেক সময়েই। কয়েক বার যাতায়াতের পর কেউ কেউ আসত দাবী নিয়ে আমার প্রয়োজনেরও বাইরে। না চাইলেও তাদের সন্তোষ বিধানে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হত—ভয়ে, কিংবা লোকলজ্জার হাত এড়াতে। এই দাবীর হাত এড়ানোর জন্য বহুবারই আমায় স্থান পরিবর্ত্তন করতে হয়েছে, এমনকি অর্থ দিয়ে পূরণের চেষ্টাও কম করিনি।

প্রশ্ন করি এভাবে জীবনটাকে হেয় না করে আবার বিয়ে করছ না কেন?

—বহু বার ভেবেছি সে কথা কিন্তু আটকে গেছি সন্তানের কথা ভেবে। মাতৃত্ব চাইনি কোন দিনই আর মায়ের স্নেহটা সবটাই গেছে শিল্পের দিকে। আর গোপন করার কিছু নেই—তুমি চিঠিটা পড়েছ। এই মিলনের বিষময় ফল আমি রোধ করব কি ভাবে। তাই আশ্রমে ওদের পালন করা ভিন্ন উপায় থাকে না। মিসেস নাম থাকার ফলে হাসপাতালে স্থান পেতে অসুবিধা হয় না কেবল ভাবনা হয় যখন সময় আসে সেই শিশুর শিক্ষার। অনেকেই আশ্রম থেকে ঐসব শিশুদের পোষ্য হিসাবে নেয় কিন্তু দায়িত্ব এড়ানোর জন্য সেখানে আমার সন্তানকে ছেড়ে দিতে পারি না। প্রথমবারে আমার এক শিক্ষা হয়। চমৎকার ফুটফুটে ছেলে—আমারি এক চেনা বান্ধবী তাকে নেওয়ার জন্য আমায় অনুরোধ করে। রাজী হলাম সহজেই। অথচ একবছরের মধ্যেই ছেলেটি মারা যায়। ডাক্তারী রিপোর্টে জানলাম সহজ মৃত্যু নয় সেটা। নিজের দুর্ব্বলতা না থাকলে সেই ধনীদের বিরুদ্ধেই কেস করতাম।

তারপর থেকে স্থির করেছি, না জেনে শুনে আর কখনই কাউকে দেব না।

বিয়ের মধ্য দিয়ে কোন সন্তান হলে এইভাবে তাকে বিলিয়ে দেওয়ায় আইনের দিক দিয়ে অনেক বিপদ আছে। তার ওপর ঐ যে বললাম চিরন্তন এ কামনা আমার নেই অথচ স্বামিত্বের দাবীর কাছে মনের বিরুদ্ধেও আমায় অনেক কিছু মেনে নিতে হবে।

এসব কথা জানার পর আমায় ঘৃণা করবে জানি—দেশে ফিরে যাবে দুঃস্বপ্নের মত স্মৃতি নিয়ে। তোমরা আইন বাঁচিয়ে চল, আইনের ভয়ে কিংবা আইন রচার আদর্শে। তোমরা আমাদের সৃষ্টিকে সম্মান দিলেও—শিল্পীর সমাদর কর না সব সময়। আমরা অবশ্য সেজন্য ক্ষোভ করি না তবে এইটুকু প্রার্থনা—যদি ভুলে না যাও তবে মনে রেখ, সমাজের বাইরে থাকতে চাই বলেই সমাজের রীতি-নীতি আমাদের বেঁধে রাখতে পারে না।

কথার উত্তর না দিয়ে শুয়ে থাকি। অন্ধকারে দেখতে পাই না তার মুখ। আগ্নেয়গিরির গহ্বরের মধ্যকার লাভার মধ্যে—জ্বালাময়ী ক্ষুধারূপী গলিত ধাতুর সঙ্গেও অমূল্য সম্পদ থাকে বিচারের মন থাকা চাই।

মিসেস ডায়ার্স-এর কথা বন্ধ হয় না।

—সত্যিই এডিনবরা এবার ছাড়তে হবে। দুঃখ হয় আলেকের জন্য। ওর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে ওকে আমিই নিয়ে আসি মডেলের কাছে। অথচ আমারই আকর্ষণে ধরা দিল আলেক

তিন সঙ্গী

—আর্য্য বসু
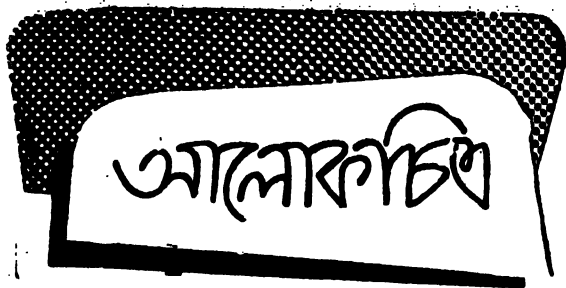
দলমাদল (বিষ্ণুপুর)

—অনুশীলা দেবী

লেক (উদয়পুর)

—মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দভীরু —বীথি সরকার
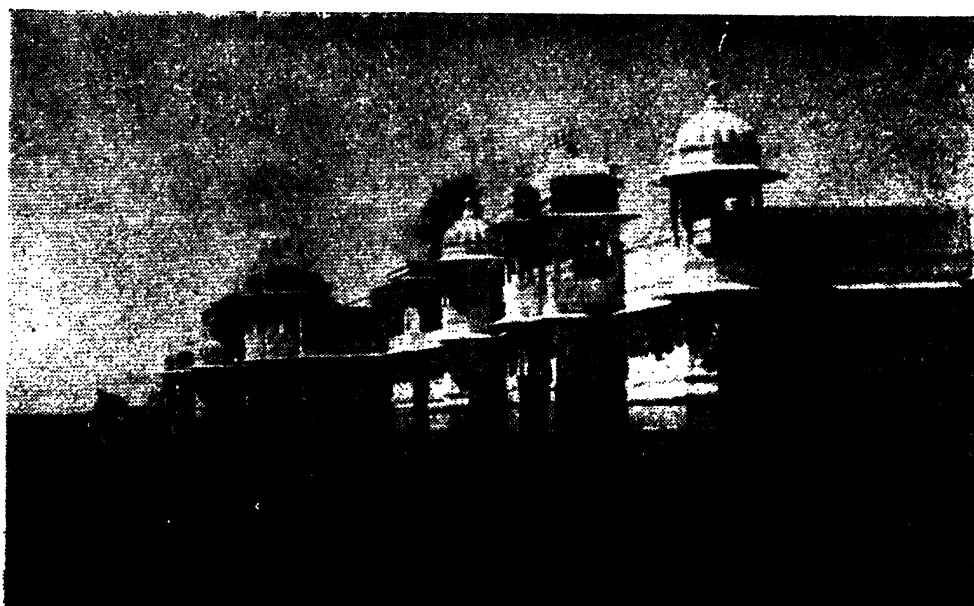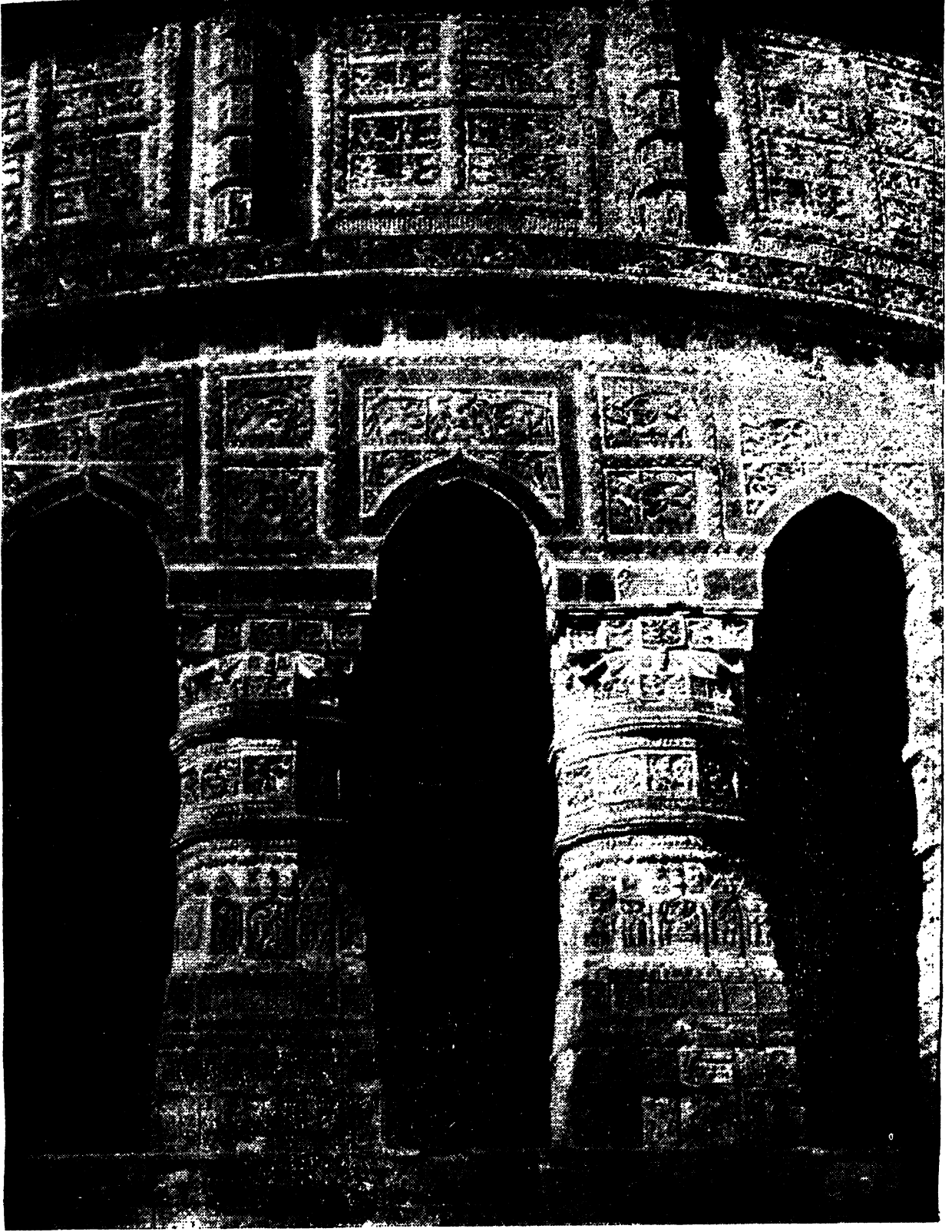
জোড় বাংলা (বিষ্ণুপুর) —তুলসীদাস সিংহ
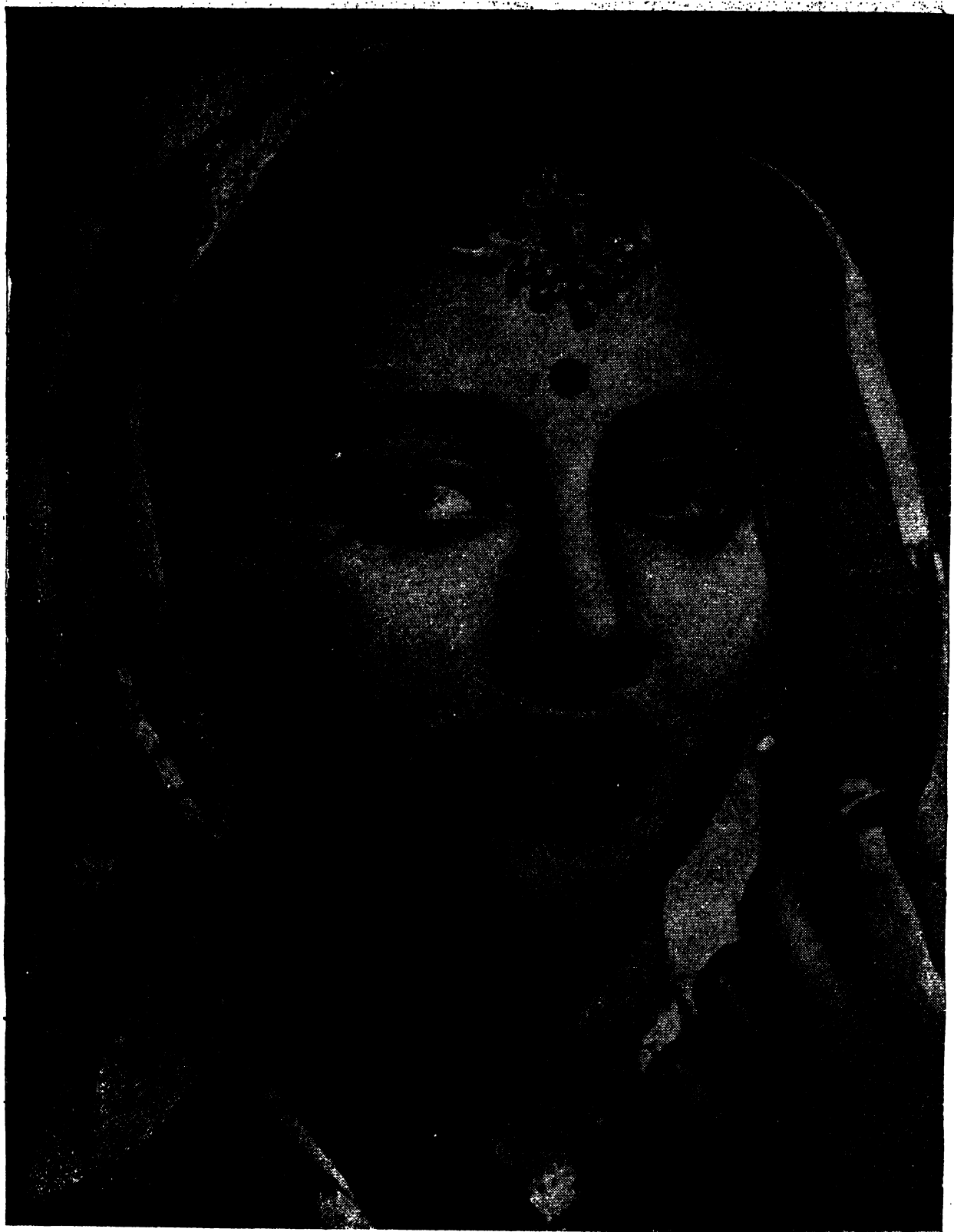
অবগুণ্ঠিতা —কান্তি ভাই

থাকতে না পেরে একদিন তার মনের কথাও বলে। বিয়ে করতে প্রস্তুত আছে তাও স্বীকার করে। অথচ কত ছোট, বয়েসে এমন কি মনের দিক থেকেও। শেষে একদিন স্বার্থের জন্য তাকে নিয়ে আসি বাড়ীতে। আস্বাদ পায় প্রথম। চঞ্চল হয়ে ওঠে অথচ আমার প্রয়োজন গেছে মিটে। তার আবেদন প্রতি বারেই অগ্রাহ্য হতে দেখে ভুল পথ ধরে। দেখি তাকে অন্য জায়গায় অন্য ভাবে। ফেরাবার মত প্রলোভন আমার নেই। এখন হয়ে পড়েছে অমানুষ। নারীত্ব ওর কাছে খেলনা। প্রেমের মর্য্যাদার কথা ভুলে গেছে একেবারেই। আজও এসেছিল ও উন্মত্ততা নিয়ে। সেখানে নীতিকথায় শান্ত হবে না জেনেই তাড়াতে পারিনি। অথচ নিবেদনের পর কি প্রশান্ত উদার মূর্ত্তি! এখন যদি দেখ ভাবতেই পারবে না কয়েক ঘণ্টা আগে সে অমন ভাবে মনুষ্যত্ব ভুলে পশুর মত কামময় হয়ে উঠেছিল।

বাধা দিই—তোমার বিছানায় শুয়ে রইল আলেক আর তুমি এখানে।

—তুমি ভাবছ কি ভাববে ঘুম ভেঙ্গে আমায় দেখতে না পেলে। দৈহিক সম্পর্ক শুধু যেখানে সেখানে ওসব ভাবনা আসবে কি করে। ভয় নেই, ঘুম ভাঙ্গলে আপনা থেকেই আলেক চলে যাবে বাইরে। তা সে যত রাত্রেই হোক না কেন। পড়ে থাকবে কাগজে লেখা দুটো কথা—ধন্যবাদ প্রিয়।

—একটা কথার সত্যি জবাব দেবে।

—জানা থাকলে নিশ্চয়ই দেব।

—কখনও কাউকে ভালবেসেছ?

—হ্যাঁ, আমার শিল্পকে।

—মানুষের মধ্যে?

—ঠিক জানা নেই, তবে আলেকের জন্য কিছুটা চিন্তা করি। বড় দুর্ব্বল চিত্ত, কাউকে অবলম্বন না পেলে পথ চলার ক্ষমতা নেই ওর।

—ওটা ভালবাসা নয়, সহানুভূতি। ভালবাসা থাকলে তার অবিশ্বাসের কোন কাজ করতে পারতে না তুমি।

—তাই যদি বল তবে স্বীকার করব মানুষকে ভালবাসিনি কোন দিনই।

—শেষ জীবনের অবলম্বন কি হবে?

—কেন শিল্প।

—পারবে শেষ জীবন পর্য্যন্ত তুলি ধরতে?

—শিল্প সৃষ্টি করার শক্তি শেষ হলেই কি শিল্পীর মরণ হয়? শিল্পজগত থেকে সে বিদায় নিতে পারে কিন্তু তবু তার দান করার কিছু আছে সাধনার ঐশ্বর্য্য দিয়ে। অবশ্য সে বাঁচার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তবু মরণে আমার বড় ভয় যতক্ষণ না সে মরণ আসে সৌন্দর্য্যময়ী হয়ে। অপেক্ষা করে থাকব সেই দিনের জন্য।

সারা রাত ধরেই হয়তো মিসেস ডায়ার্স কথা বলে গেছে। আমি শুনতে পাইনি সব। কথা শেষ হবার অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছি।

ভাদুর গান
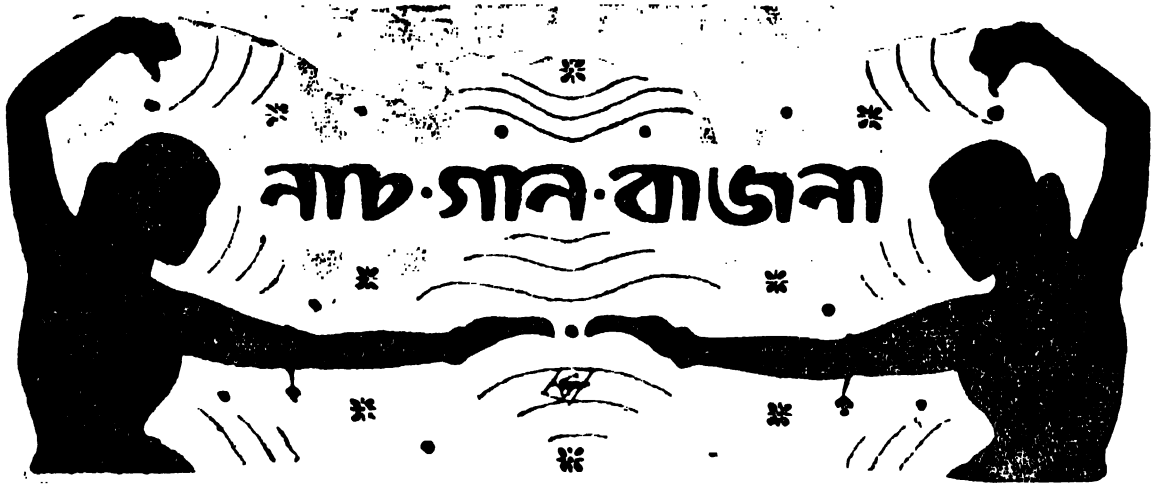
শ্রীসুন্দরগোপাল ঘোষ

ভাদুর গান আর ঘেঁটুর গান পশ্চিম-বাংলায় বহু প্রচলিত লোক-সঙ্গীত। এই দুই প্রকার গানকেই লোকসঙ্গীতে একটি স্তরেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু ভাদুর গান যেন একান্তই বীরভূমি জনপদের নিজস্ব। পূর্ব্ববাংলার জারিগান—শারিগানের মত এই ভাদুর গানেরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণতঃ ভাদ্র মাসের প্রথম হ'তে সুরু ক'রে সারা ভাদ্র মাসই এ গান চ'লে থাকে। "ভাদু মা"-এর পূজাকে উপলক্ষ ক'রে এ অঞ্চলের বাগ্দী-হাড়ী-ডোম প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ভাদু মায়ের পুতুলাকৃতি প্রতিমাকে সঙ্গে নিয়ে লোকেদের দরজায় দরজায় এ গান ক'রে থাকে! সঙ্গে নর্ত্তকীবেশী একজন পুরুষ থাকে। সে যখন নাচে তখনই বিশেষ বিশেষ সুরে এই ভাদুগান পাওয়া হয়।

এই ভাদুমা কে বা কোথা হ'তে এই 'ভাদু মা'র পূজার প্রচলন হ'ল এ নিয়ে গবেষণার অন্ত নাই। বিখ্যাত গ্রন্থ "Hasting's Encyclopaedia of Religion & Ethics"এর "Bagdi" শীর্ষক প্রবন্ধে আছে :—

"They also parade the Effigy of a female saint named Bhadu who is said to have been daughter of the Raja of Puchet and who died a virgin for the good of the people. Her worship consists of songs and wild dances in which men and women and children take part.—(vide Vol 11 p p 328.)

উদ্ধৃত বিবরণ থেকে আমরা পাই ভাদু Puchet-এর রাজার কন্যা; যিনি লোকের মঙ্গলের জন্য আজীবন কুমারী ছিলেন। এর সঙ্গে ভাদুই সম্পর্কীয় প্রচলিত গল্পেরও কিছু মিল আছে। প্রচলিত গল্পে আছে—মানভূমের রাজার একমাত্র কন্যা ভাদুমণি। কিন্তু রাজার মনে সুখ নাই। কন্যা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। বিয়ে করতে চায় না। এই ভাবে কুমারী অবস্থাতেই অকালে তার মৃত্যু হয়। রাজা কন্যাশোকে পাগল হ'য়ে যান। পরে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে কন্যার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য অধীনস্থ নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে ভাদুর পূজার প্রচলন করেন।

প্রচলিত ভাদুগানেও এই মানভূমের রাজার উল্লেখ আছে। গানের মধ্যে আছে :—

"এল ভাদু কোথা হ'তে, কে পারে ভাই সন্ধান দিতে।
শুনেছিলাম মানভূমেতে রাজবাড়ীতে জন্ম হয়।"

আরও একটা গানে আছে :—

"ভাদু আমার রাজার মেয়ে, পণ ছিল যে করবে না বিয়ে,"
ইত্যাদি।

এইটাই ভাদুর উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রচলিত মতবাদ। আরও একটা কারণে এই মতবাদটি পুষ্ট হ'য়েছে। মানভূমের আদিবাসী "ওঁরাও"দের মধ্যে ভাদুপূজার অনুরূপ এক উৎসব দেখা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, বীরভূমির এই লোকগীতির উৎস সন্ধানে বাংলার প্রত্যন্তপ্রদেশ সুদূর মানভূম পর্য্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন নাই।

বীরভূম এবং বীরভূমের সীমান্তবর্ত্তী বর্দ্ধমানের অংশবিশেষেই ভাদুগান সমধিক প্রচলিত। সুতরাং পশ্চিমবাংলার এই অঞ্চলেই ভাদুর গানের উৎপত্তি অসম্ভব নয়। পশ্চিমবাংলায় শ্রাবণ মাসের মধ্যেই ধান্যরোপণাদির সমাপ্তি ঘটে। ভাদ্র মাসে বাগদী-হাড়ী প্রভৃতি শ্রেণীর কৃষি-শ্রমিকদের প্রচুর অবসর। বর্ষার ক্লান্তি অপনোদন-প্রয়াসী এই কৃষি-শ্রমিকেরাই ভাদুপূজা তথা ভাদুগানের সৃষ্টি ও প্রচলন ক'রেছে "ভাদু মা" বৈদিক বা পৌরাণিক দেবতা শ্রেণীতে পড়ে না। এমন কি, মঙ্গলকাব্যের যুগেও ভাদুর কোন ধারণা ছিল ব'লে মনে হয় না। যদিও ভাদুগানকে কোন কোন অঞ্চলে ভাদু-মঙ্গল ব'লে উল্লেখ করা হয়। ভাদ্র মাসকে চলতি কথায় বলে "ভাদুর" মাস। এই "ভাদর" মাসে এই উৎসব হয় বলেই একে বলা হয় ভাদর গান বা ভাদুর গান। সারা ভাদ্র মাস গান ও উৎসবের শেষে সংক্রান্তির দিন যথারীতি অধিবাসের পর বিসর্জ্জন হয়। এই বিসর্জ্জন উৎসবের আবার বৈশিষ্ট্য আছে। একসঙ্গে অনেকগুলি ভাদুর গানের দল একস্থানে মিলিত হয়। তাদের মধ্যে সেখানে কবিগান, তর্জ্জার মত গানের পাল্লা চলে। উপস্থিত শ্রোতা সাধারণ উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টের বিচার করে।

ওঁরাওদের মধ্যে অনুরূপ উৎসবের প্রচলন দেখিয়াই ভাদুগান মানভূমের সৃষ্টি ব'লে মনে করবার কারণ নাই। ওঁরাওরাও বাগদী-হাড়ীদের মত অনগ্রসর নিম্ন শ্রেণীর জাতি। কাজেই বাংলার এই ভাদু উৎসবের দ্বারা তাদের প্রভাবিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় বিশেষ ক'রে যখন এতে আদিরসাত্মক অশ্লীলতার গন্ধ আছে।

প্রচলিত প্রবাদগল্প থেকেই ভাদুগানের কবিরা গান লিখেছেন এবং Hastings সাহেব সেই সমস্ত প্রবাদ ও গান থেকেই তাঁর প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহ ক'রে থাকবেন। যাই হোক, ভাদুগানের মৌলিকতা নিয়ে বর্তমান রচনার কলেবর বৃদ্ধি অবাঞ্ছনীয়।

বাংলার লোকসঙ্গীতের এই শীর্ণধারাটি কিন্তু আজও প্রবহমান। প্রত্যেক বছরেই কিছু কিছু নতুন গান পূর্ব্বের গানের ধারাকে পুষ্ট করে। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাদুগানের বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন হয়। পূর্ব্বে বাগদী-হাড়ী প্রভৃতি শ্রেণী নানাবিষয়ে অনগ্রসর ছিল, তখন ভাদুগানও একটি বিশেষ ভঙ্গীতে রচিত ও গীত হত। বৈচিত্রহীনভাবে একই গান বছরের পর বছর একই সুরে চ'লে আসত। যেমন :—

(১) চল্ ভাদু চল্, ম্যাগে এল জল,
জামাকাপড় ভিজে গাল···।"

(২) "আমার ভাদু, সোনার যাদু, হাতে সোনার গহনা।"

(৩) "ভাদু যাবে কলকা-আ-তা-আ।" ইত্যাদি।

কিন্তু স্বাধীনোত্তর যুগে নিম্নশ্রেণীর সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে ভাদুগানেরও পরিবর্তন এসেছে। এই যুগের ভাদুগানের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে তাদের পরিচয়ের কথা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে এইরূপ কয়েকটি ভাদুর গান আলোচনা করা হচ্ছে।

'৪৭ সালে স্বাধীনতার সঙ্গে বাংলামায়ের অঙ্গচ্ছেদ ঘটল। এটা ভাদুর গানের শিল্পিসমাজ ঠিকমত গ্রহণ করতে পারল না। এই দুঃখ-খেদের কথা ফুটে উঠল তাদের ভাদুগানে :—

"দুখের কথা বলব কারে ওগো ভাদুমা।
সোনার বাংলা ভাগ করিল কোন হতভাগা।
মুসলমানরা পাকিস্তানে, তাড়াল ভাই ভগিনীগণে,
বাস্তহারা কেঁদে সারা, দুঃখের নাই মা সীমা।

এই বাস্তহারাদের দুঃখে ভাদুগানের কবিরা বিচলিত হ'য়েছিল। নিজের বাস্তভিটা থেকে উৎখাত হ'য়ে লক্ষ-লক্ষ বাস্তহারা ভাই যখন অসহায় নিরাশ্রয় ভাবে কলকাতার পথে পথে, হাওড়া শিয়ালদ'র প্লাটফরমে এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত ছুটে বেড়াচ্ছিল তখন তাদের প্রতি কার না করুণা জেগেছিল? তাদের বেদনার সুর ভাদুরগানেও ছত্রে ছত্রে উৎসরিত হ'য়েছে :—

"(ভাদুমা) বাংলাদেশের কাঙাল ছেলে
রয় কত উপবাসে।
পরনেতে নাইক টেনা
মরে কত আপশোষে
পেট ভরে সব পায় না খেতে
বাস করে এই বাংলাদেশে
(মা) তাদের বিনাদোষে মারতে আসে
প্রবল প্রতাপ পুলিসে

আরও আছে :—

"কত কত অগণিত বাস্তহারার দল।
খালিপেটে পথে পথে ফেলছে চোখের জল।"

সরকারী পুনর্বাসন নীতিরও কঠোর সমালোচনা পাওয়া যায়। বেত্তিয়া—আন্দামান—দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা তাদের কথায় বাস্তহারাদের পরিহাসের সুপরিকল্পিত প্রহসন। সরকারের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ভাদুমা-এর শরণ নিয়ে বলা হ'য়েছে :—

"ভাদু তুমি মন্ত্রী হ'য়ে কর পুনর্বাসন।"
এখনকার মন্ত্রীদের মত
তাদের ক'র না নির্বাসন।

এর পরেই এল স্বাধীনতার দ্বিতীয় অভিশাপ "লেভি" বা "কর্ডন" প্রথা। পল্লী অঞ্চলে জনমন বিক্ষুব্ধ হ'ল। আর সেই বিক্ষোভ এসে সাড়া দিল ভাদুর গানে :—

"আয় মা ভাদু, আয় মা ঘরে হেরে তোরে প্রাণ জুড়াই।
যা ছিল ধান দেশের সরকার
"লেভি"তে সব করলে উজাড়
কি খেয়ে যে বছর যাবে, মনে হ'ল ভাবনা তাই।

দেশের লোকের যখন এই অবস্থা তখনই কলকাতার ট্রাম কোম্পানী ভাড়া বাড়াল। সে কথা পল্লীর লোকদেরও অবিদিত রইল না। কলকাতার "এক পয়সা-আন্দোলন" এ সহানুভূতি দেখিয়ে ভাদু গানের সুরেও এই অহেতুক মুনাফার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'ল :—

"কলকাতাতে ট্রামের ভাড়া,
বাড়িয়ে দিলে ভরারা।
লাগিয়ে লেঠা, লাঠিপেটা,
কতই যে খুন ঘটল হায়।"

বাংলা মায়ের বাঘা ছেলে শ্যামাপ্রসাদের রহস্যজনক অপ্রত্যাশিত মৃত্যু স্বাধীনোত্তর বাংলার এক বিশেষ ঘটনা। সারা ভারত যখন শ্যামাপ্রসাদের শোকে মুহ্যমান, বাংলার নিম্ন শ্রেণীর এই শিল্পীদের বুকেও তখন এ বেদনা বেজেছিল নিদারুণ ভাবে। তাদের কাছেও এটা ছিল অপ্রত্যাশিত :—

"কে সাধিল ভাদু সাধে বাদ্
সাধ ক'রে কাশ্মীর ঘুরে
এল না শ্যামাপ্রসাদ।

* * * *

বল ভাদু কেমন ক'রে
মায়ের প্রাণে ধৈর্য্য ধরে···॥

গোয়া-অভিযান আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিদেশী-কবলিত গোয়া প্রভৃতিকে ভারতভুক্তির আন্দোলনে তখন ভারতের আকাশ-বাতাস চঞ্চল। দেশমান্য নেতাদের নেতৃত্বে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকের দল গোয়া প্রবেশ করছে। বাংলার ঘরের ছেলে "ঢাকুদা" (ত্রিদিব চৌধুরী, এম, পি,) তখন গোয়া প্রবেশ করতে কৃতসঙ্কল্প। সে কথা পল্লীবাসাদের কানে কানে প্রচারিত হ'ল। মনে মনে শুভপ্রচেষ্টা অভিনন্দিত হ'ল। ভাদুগানের কথাশিল্পী লিখলেন :—

"গোয়া চল্, গোয়া চল্,
চল ভাদু গোয়া।
জাতীয় পতাকা হাতে
চল ভাদু গোয়া।

তুমি যদি না যাবে মা।
ভারতের মান রবে না।
হ'য়ে ভারত ললনা (ভাদু)
যাবে কি মান খোওয়া।
চল ভাদু গোয়া।"

আঞ্চলিক দুঃখ-দুর্দ্দশার কথাও ভাদুর গানে ফুটে ওঠে। সেচ-পরিকল্পনায় মানুষের সুখসুবিধার সঙ্গে দুঃখও এসেছে। নতুন পরিকল্পনার অসৎ বিভাগীয়-কর্মচারীদের কর্মশৈথিল্যে লোকের নানা দুঃখ ঘটেছে। সময়মত জল না দেওয়া, অর্থের বিনিময়ে কৃপাদানে পক্ষপাতিত্ব এবং সময়ে অতিরিক্ত জল সরবরাহের দোষে শত শত লোকের ঘর বাড়ী মাঠ ফসল ভেসে গিয়েছে। অসৎ এই কর্মচারীদের দোষে সরকার পল্লার জনগণের কাছে অপ্রিয় হ'তে চলেছে। এই সব উল্লেখ সাম্প্রতিক ভাদুগানে দেখা যায় :—

"কে ক্যানল আনলে ভাদু দেশে গো ?
ও মা মেসানজোরের জলের তোড়ে
ঘর-বাড়ী যায় ভেসে গো।
খাল কেটে কুমীর আনা
য্যাদ্দিন মা ছিল জানা
এ যে খাল কেটে মা কি এনেছে
দেখে যাও মা এসে গো।
যার আছে ভাদু টাকা কড়ি
সেই জল পায় তাড়াতাড়ি
"ওভারসিয়র বাবু" নীচু ছেড়ে
উঁচু দিয়ে, জল দেয় মা হেসে গো।
ট্যাসকো দিয়ে ক্যানেল বাবুর
ধমক খাই মা ঠেসে গো,
তবু সময়মত ক্ষেতে দিতে
আমরা জল পাই না শেষে গো।
কে ক্যানল আনলে ভাদু দেশে গো।"

জারিগান সারিগান ও অন্যান্য পল্লীগীতির মত ভাদুর গানেও রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব এসে পড়েছে। ভাদুমণি যেন কৃষ্ণবিরহিণী রাধা। কৃষ্ণপ্রেমমূলক অনেক ভাদুগান প্রচলিত আছে। বাহুল্য ভয়ে কয়েকটির অংশবিশেষ উল্লেখ করছি :—

(১) "সোহাগিনী ভাদুমণি, শ্যামগরবের গরবিণী,
প্রেমতরঙ্গের তরঙ্গিণী চিন্তামণি রে।
ছিল ভাদু বিন্দাবনে, গোপনে নিকুঞ্জ বনে,
মনে প'ড়ল এত দিনে তাই এল ফিরে।"

(২) "ভাদু আমার রাজনন্দিনী, কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী।

(৩) " (ও সে) ভুলায় রূপে কালোসোনা
অজানা তার কিছু নয়॥"

(৪) "তুমি যে প্রেমতরঙ্গিণী,
কৃষ্ণভাবের ভাবিনী, ওগো ভাদুমণি॥"

এই সমস্ত নানা দিক আলোচনা করলে বাংলার পল্লীসংস্কৃতির সঙ্গে ভাদুগানের নিবিড় যোগটি ধরা পড়ে। নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রচলিত ব'লে ভাদুগানের কথাতে কিছুটা অশ্লীলতা দোষ থাকে, অপটু হাতের লেখা ব'লে স্থানে স্থানে ছন্দপতন ঘটে। কিন্তু বিশেষ সুরে গাইবার সময় সে ছন্দপতন কানে বাজে না। ভাদুগানের কবিরা প্রাচীন যুগের চারণদের মত গানের মধ্যে দিয়ে অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে দেশ সম্বন্ধে সজাগ ক'রে দেয়। এদিক দিয়ে তাদের দান কম নয়। '৪২ এর আন্দোলনের সময় রচিত কয়েকটি গানের উল্লেখ না ক'রলে বোধ হয় প্রবন্ধের অঙ্গহানি ঘটবে। দেশনেতাগণ তখন বিদেশী শাসকের কারারুদ্ধ। তখন ভাদুর গান বা'র হ'ল :—

"হায় কি নতুন শাসন এল ভারতে।
বিনাদোষে হায় পুলিসে আসে গুলী চালাতে॥
কারাগারে বন্দীরা সব হায় কি কষ্টে কাটে দিন ;
অনশনে দিনে দিনে হয় যে তাদের তনু ক্ষীণ।

* * *

কারাগারে বন্দীর প্রাণে দাও হে ভাদু শান্তিবারি
কংসবংশ ধ্বংস কর প্রকাশ হও স্বরূপেতে॥"

সুখের কথা, লোকসঙ্গীতের এই ধারাটি সভ্যতার চোরাবালিতে আজও হারিয়ে যায় নাই। বছর বছর ভাদুর আগমন ঘটছে, সারা ভাদ্রমাস পূজা পাওয়ার পর আবার বছরের মত তার বিসর্জন হচ্ছে। যাওয়ার সময় পল্লীকবি ভাদুমণিকে বার বার ব'লে দিচ্ছে :—

"এসো ভাদু বছর বছর সোনার বাংলাদেশে।
ক'রো আবার রসভঙ্গ কে ছাড়তে চায় তোমার সঙ্গ
এবার বিদেয় দিতে সবার মিরে নয়নজলে ভাসে॥"

আমার কথা (৩৩)

শ্রীপ্যারীকৃষ্ণ পাল

ভারতমাতার মহিমান্বিতা রূপ বহুলাংশে প্রতিভাত হয়েছে সঙ্গীতের মাধ্যমে, আবার ভারতীয় সঙ্গীতও নানাভাবে পুষ্ট হয়েছে তার লোকসঙ্গীতের কল্যাণে। আজকের দিনের নগর-সঙ্গীতের তুলনায় এর অবদান ও ঐতিহ্য আরও বিরাট। কবে যে এর জন্ম হয়েছিল তার তারিখ খুঁজে বার করতে ইতিহাস আজও অপারগ। ভারতের সেই সুবর্ণমণ্ডিত দিনগুলিতে এদের প্রভাব ছিল অনতিক্রম্য। নরনারীর জীবনে মাখানো ছিল সেদিন সঙ্গীতের একটি মধুর প্রলেপ।

সেই স্বর্ণযুগেই বাঙলার কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের লেখনী থেকে উদ্ভূত হয়েছিল চণ্ডীমঙ্গল। প্রত্যেক বাঙালীর পরমারাধ্য গ্রন্থ। সেদিনকার সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করল সঙ্গীতজ্ঞদের কল্যাণে। তাঁর চণ্ডীমঙ্গল-এর কাহিনী বাঙলার ঘরে ঘরে পরিচিত হ'ল "চণ্ডীর গান" নামে। এর গায়কদের মধ্যে আজকের দিনে একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষ শ্রীপ্যারীকৃষ্ণ পাল।

বর্ধমানের রাণীগঞ্জবাজার অঞ্চলের স্বর্গীয় রাজনারায়ণ পালের পৌত্র ও স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পালের পুত্র শ্রীপ্যারীকৃষ্ণ পাল ১২৯৪ সালের শ্রাবণ মাসে (১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করলেন। জন্মেছেনই সঙ্গীতের আবেষ্টনীর মধ্যে। ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছেন পিতৃ-পিতামহের মধ্যে সঙ্গীতের চর্চা। ছকে-বাঁধা বিদ্যালয়ের শিক্ষা ধরে রাখতে পারল না প্যারীকৃষ্ণকে ; কাজ চালানোর মত বিদ্যা আয়ত্তে আনলেন প্যারীকৃষ্ণ। তার পরেই সঙ্গীতে করলেন পুরোপুরি ভাবে আত্মনিয়োগ। সেই জীবন আজও অব্যাহত। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন, বাহুল্যের বালাই নেই, নেই আত্ম-নিনাদের প্রচেষ্টা। খাঁটি বাঙলা দেশের জীবনধারা। প্রথমে বাবার সম্প্রদায়ে গান গেয়ে এসেছেন, বর্তমানে নিজেই সেই সম্প্রদায়ের প্রধানের পদে সমাসীন। শ্রীরামপুরের ক্ষেত্রমোহন সাহার মেলা ছাড়া কলকাতায় পূজ্যপাদ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, বটকৃষ্ণ পাল, চকদীঘির ললিতমোহন সিংহরায় প্রভৃতি আরও অনেকের গৃহেই গান শুনিয়েছেন প্যারীকৃষ্ণ। তা ছাড়া বর্তমানে প্রত্যেকটি দেবীপক্ষের প্রথম নটি দিন প্রত্যহ অপরাহ্নে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের প্রাসাদে (১২ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলকাতা—৬) তাঁর পৌত্র মহারাজা প্রদ্যোৎকুমারের পৃষ্ঠপোষকতায়—সসম্প্রদায় প্যারীকৃষ্ণ গান শুনিয়ে থাকেন।

চণ্ডীর গান প্রসঙ্গে প্যারীকৃষ্ণের কাছে যা জানা গেল, মোটামুটি তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র চণ্ডীমঙ্গল গীত হতে প্রায় এক মাস সময় লাগে। চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথির সমগ্রাংশ মুকুন্দরামের রচনা, তবে গানের সময় বিভিন্ন গায়ক নিজেদের সুবিধে অনুযায়ী বিভিন্ন সংলাপ যোগ করে নিয়েছেন—এই সংলাপগুলি মুকুন্দরামের নয়। চণ্ডীমঙ্গল তিন ভাগে বিভক্ত যথা—(১) দেবখণ্ড, (২) ব্যাধখণ্ড, (৩) বণিকখণ্ড। প্রথম খণ্ডে সতী ও তাঁর দেহত্যাগের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে চিত্রিত আছে, শ্রীমন্ত সদাগরের কাহিনী।

সপ্তত্যোত্তীর্ণ প্যারীকৃষ্ণকে বলি—তোমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বল, আজন্ম যার মধ্যে ডুবে রইলে আজ একাত্তরে পা দিয়ে সে সম্বন্ধে কি অভিজ্ঞতা তুমি সঞ্চয় করলে ?—"খুব খারাপ বাবু, খুব খারাপ—কি আর বলব, আপনারা সবই তো দেখছেন—এ সব গানের এখন আর কদর নেই বাবু, এখন আর কদর নেই—আমাদের ছেলেবেলায় কি দিনই সব দেখেছি বাবু, এই সব বাড়ীতে তখন কি সমারোহের সঙ্গে গান গেয়ে গেছি। আমরা তো এখন বোঝা হয়ে বেঁচে আছি।"

ভাবতে অবাক লাগে যে, একটি মানুষের জীবনে কি পরিবর্তন, অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে কি আকাশ-পাতাল ওলোট-পালোট! ঠিকই বলেছেন প্যারীকৃষ্ণ—নতুন যুগের নতুন ঢেউ আসছে দুর্বার বেগে—বিগত যুগের থিতিয়ে পড়া জলস্রোতের কোন আবেদনই তাকে টলাতে পারবে না। কিন্তু তবু—তবু যা পুরোনো যা প্রাচীন তা কখনই আজকের দিনে আর অবলুপ্ত হতে পারে না—তা বেঁচে থাকবে সংস্কৃতির ইতিহাসের জোরে। লোকের মুখে হয়তো আর শোনা যাবে না কিন্তু মনের দেওয়ালে কান পাতলে নিশ্চয় শোনা যাবে তার ভিতরে ধ্বনিত হচ্ছে সেই "ফুল্লরা বললেন…।"
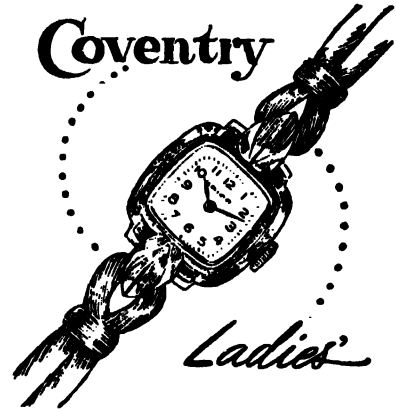
পারিবারিক বাজেটের প্রশ্ন

'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' বলে যেমন একটি কথা আছে, তেমনি 'আয় বুঝে ব্যয় কর'—এইটিও একটি মস্ত দাবী। প্রথমতঃ সমাজ ব্যবস্থার কারণেই আমাদের জীবনযাত্রা অনিশ্চিত এবং অনিশ্চিত বলেই বাজেটের অর্থাৎ হিসাব করে দিন চলার প্রশ্নটি উঠে। এর বিপক্ষেও যে কঠিন যুক্তি দেখান হয় না, এমন নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে বাজেট বা আয়ব্যয়কের ধার ধারেন না, এখনও সমাজে এমন লোক বা পরিবারের সংখ্যাই বেশী।

বিলেতে কিন্তু পারিবারিক বাজেট প্রসঙ্গটি নিয়ে রীতিমত গবেষণা চলেছে চিন্তাশীল মহলে। সম্প্রতি এ সম্পর্কে এমন কি জনমত আহ্বান করা হয়েছিল সংবাদপত্র মারফত। তাতে দেখা গেছে—প্রতি দশটি পরিবারের মধ্যে ছয়টি পরিবারেই আগে থেকে আয়ানুযায়ী ব্যয়ের কোন বাজেট থাকে না কিংবা সাধারণ ভাবে জমা-খরচটা পর্য্যন্ত রাখবার ব্যবস্থা নেই। দশটির ভেতর মাত্র তিনটি পরিবার বাজেট করে জীবনযাত্রার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন এবং অবশিষ্ট একটি পরিবার চেষ্টা করেও বাজেট রেখে চলতে পারেন না।

এখন প্রশ্ন—উপরের তিনটি শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌টি ঠিক অর্থাৎ আদর্শ পরিবারের সংজ্ঞা দাবী করতে পারে কারা? পারিবারিক বাজেট রাখা কি আদৌ ভাল, না এই ব্যবস্থা বা পদ্ধতিতে স্নায়ুর উপরই শুধু চাপ পড়ে এবং সময়ই অপচয় হয়? পক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল বলিষ্ঠ যুক্তির অবতারণা করা হয়ে থাকে, সেগুলো একে একে এই ভাবে বলা যায়।

পারিবারিক বাজেটের পক্ষে প্রথম যুক্তি—এতে অযথা বা প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয়ের হাত থেকে বাঁচা যায় এবং মানুষকে ইহা করে তোলে মিতব্যয়ী। সর্ব্বাবস্থায় দায় বা ঋণমুক্ত থাকবার জন্যও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এইটি একটি প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। একে ভুল প্রমাণিত করার চেষ্টায় অপর পক্ষ যুক্তি দেখান—পারিবারিক বাজেট করে চললেই আশানুরূপ মিতব্যয়ী হওয়া যায় না। পরন্তু আয় বুঝে যারা ব্যয় করতে অভ্যস্ত নয়, খরচের বাজেট করা তাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। আর যারা আয় অনুপাতে ব্যয় করতে বদ্ধপরিকর, বাজেট বরাদ্দ না করেও তাদের চলে। আসলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে যে জিনিসটি চাই, সে হচ্ছে ইচ্ছা-শক্তি, সংযম ও সাধারণ জ্ঞান (কমনসেন্স)।

বাজেট রেখে চলার সমর্থনে দ্বিতীয় যুক্তি—এই ব্যবস্থায় বড়রকম নজরে থাকে এবং তার জন্য আবশ্যক প্রস্তুতিরও সুযোগ হয়। আরও সোজা ভাষায় বলা চলে, অতিরিক্ত ব্যয়ের টাকাটা আলাদা করে রাখা যায় এতে আগে থেকেই এবং পরে প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে হঠাৎ কোন দুশ্চিন্তা বা অসুবিধায় পড়তে হয় না। এইখানেও বিরুদ্ধবাদীরা যুক্তিস্বরূপ বলবেন—বাস্তবিকতা-সর্ব্বস্ব বর্ত্তমানকে অস্বীকার করে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে নিয়েই বাজেটের যতকিছু কারিগরী। অথচ কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ জরুরী অবস্থা সত্যি এসে গেলে বাজেটের অঙ্ক ধরে কোন কাজ হয় না, পরন্তু অন্ততঃ তখনকার মত বাজেট নিরর্থক বলেই গণ্য হয়।

স্বপক্ষে তৃতীয় যুক্তি—সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত ভাবে বাজেট তৈরী হলে আর্থিক বিরোধ, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা হ্রাস পায় কিংবা আদৌ থাকে না। নিজের অবস্থা-ব্যবস্থা সম্পর্কে নিজে সব সময় সম্যক্ সচেতন থাকা যায়, সুতরাং চলবার জন্য অত্যধিক মাথা ঘামাবার প্রশ্ন এতে প্রায় থাকে না। প্রতিপক্ষের কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ যুক্তি শোনা যাবে—বাজেট করে চলতে গেলেই বরং উদ্বেগ ও অশান্তি সারাক্ষণ মন জুড়ে থাকে, হিসাবের খুঁটিনাটির বাইরে যেয়ে স্বস্তির সুযোগ এতটুকু যেন উহাতে নেই। এমন কি, এই অবাঞ্ছিত রীতি অনুসরণের ফলে পরিবারের লোকজনদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয় এবং মনের অমিলও দেখা দেয়। কারণ খরচের ব্যাপারে প্রত্যেকেরই হাত-পা থাকে কঠিনভাবে বাঁধা।

চতুর্থ যুক্তি যা বাজেটের সমর্থনে উপস্থিত করা হয়—এই রীতি বা ব্যবস্থায় দুটো উপায়ে অযথা অর্থব্যয় নিরোধ হতে পারে। প্রথমতঃ, এতে অর্জিত অর্থের কোথায় অপচয় হচ্ছে, সেইটি ধরবার সুযোগ হয় এবং তখন সেই ছিদ্রপথ রুদ্ধও করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, আগে থেকে নির্দ্দিষ্ট খাতে অর্থ-বরাদ্দ থাকায় ইচ্ছার তাগিদে হঠাৎ কিছু ক্রয় করতে যাওয়া কঠিন হয়। এই যুক্তি যারা মানতে চায় না, তাদের বক্তব্য—বাজেট রাখতে যেয়ে সখ করেও ইচ্ছা মাত্র কোন পণ্য বা আসবাব ক্রয়ের সুযোগ থাকে না। পক্ষান্তরে উহাতে সব সময়ই একটা পরিকল্পনা করে কেনা-কাটার দাবী থাকে এবং ধরা-বাঁধা সূত্রের ভেতর থেকে নিরানন্দ ভাবে দিনাতিপাত করতে হয়। অথচ আগে না ভেবে যখন তখন একটা কিছু খরচ করার মধ্যেই তৃপ্তি ও আনন্দ সবচেয়ে বেশী।

পারিবারিক বাজেটের পক্ষে পঞ্চম যুক্তি—বাজেট করে চলবার অভ্যাস করলে উপভোগের জন্য কোন্ কোন্ জিনিস সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সেইটি আপনি বাছাই হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এই পন্থায় চাহিদা মেটাবার জন্য পূর্ব্ব থেকেই অর্থ আলাদা করে

ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় প্রধানতঃ এর মারফতই। বিপক্ষদলের কণ্ঠে অমনি যুক্তি উঠে—প্রয়োজনের বাইরে ক্রয় করার ফলেই যে সব সময় আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়, এ কথা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে পর্য্যাপ্ত অর্থ না থাকার দরুণই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গোলযোগের উদ্ভব হয়ে থাকে। অধিকাংশ লোকই যে কষ্ট পায়, সে টাকা পয়সা নেই বলেই, পারিবারিক বাজেটের ন্যায় কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ না করার দরুণই নয়।

বাজেট ব্যবস্থার অনুকূলে ষষ্ঠ যুক্তি যেটি প্রদর্শন করা হয় —এই পদ্ধতি অনুসরণে তরুণদের পক্ষে টাকা-পয়সার সঠিক মূল্য উপলব্ধির সুবিধা হয়—এই নিয়ে সহসা ছিনিমিনি খেলতে সাহস হয় না। ব্যয়ের খাত নিয়ন্ত্রণের জন্য এইটি সংসার জীবনের অন্ততঃ প্রথম ধাপে অবশ্য চাই। আর্থিক সমস্যাগুলোকে কোন না কোন ভাবে মিটাবার রাস্তা এই থেকে পাওয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তে জীবনপথে এগিয়ে যাওয়া চলে। প্রতিপক্ষের পরিষ্কার যুক্তি—বাধ্যতামূলক বাজেটে টাকা-পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ বন্ধ হলেও তরুণ মনে এর প্রতিক্রিয়া অন্য ভাবে না হয়ে পারে না। জীবনারম্ভেই তাদের দৃষ্টি ও লক্ষ্য এতে অনিবার্য্যরূপে সীমিত হয়ে পড়ে এবং চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য উত্তম ও অধ্যবসায় বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে যায়।

স্বপক্ষে আরও একটি (সপ্তম) দৃঢ় যুক্তি দেখান হয়—পারিবারিক বাজেট বা আয়-ব্যয়ক রাখলে নিজের সম্বল কখন কি আছে না আছে কিংবা ব্যক্তি, সংসার স পরিবারের দায়-দেনা সত্যি কত, এইটি স্পষ্টভাবে বুঝবার ও জানবার অবকাশ মিলে। সেক্ষেত্রে অর্থ নাশ চালিত হওয়ার কারণ থাকে না, বরং অর্থের উপর নিজেরই স্বাভাবিক কর্তৃত্ব এসে যায় পুরোমাত্রায়। এর বিপক্ষেও সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি হাজির করা হয়ে থাকে—আলোচ্য ব্যবস্থায় পাতার পর পাতা হিসাবের অঙ্কে ভর্ত্তি করা হয় বটে কিন্তু আসলে দৈনন্দিন ব্যয় যা হ'বার হয়েই যায়, বাজেটের উপর নির্ভর করে সচরাচর এ চলে না। আর হিসাবের প্রশ্নটাকেই যদি বড় করে দেখবার প্রয়োজন হয়, তা হলে খরচের মুহূর্ত্তেই অনায়াসে সেইটি করা যায়।

পারিবারিক বাজেটের পক্ষে-বিপক্ষে এইটি রাখার প্রয়োজন —অপ্রয়োজন সম্পর্কে আরও নানা যুক্তিরই অবতারণা করা যেতে পারে। কিন্তু এই থেকে কোন একটি স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান কিংবা এক কথায় সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়া স্বভাবতঃই কঠিন। এইটুকু মাত্র আবারও বলা চলে—বর্ত্তমান সমাজ-কাঠামোতে আয় যেখানে সীমাবদ্ধ এবং ব্যয়খাতের যেখানে শেষ নেই, সেখানে হিসেবী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি? বাজেটই বলা হোক্ কি জমা-খরচই বলা হোক্—একটা কিছু নথি রেখে চললে সাধারণ পরিবারের পক্ষে মঙ্গলেরই সম্ভাবনা।

ভারতে গোলমরিচের উৎপাদন

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গোলমরিচ প্রধানতঃ একটি মশলা হিসাবেই গণ্য, কিন্তু সাধারণতঃ মশলার যেমন উপকারিতা বলতে কিছু নেই, গোলমরিচটা ঠিক সে পর্য্যায়ে পড়ে না। দ্রব্যগুণের বিচারে গোলমরিচের একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট রয়েছে এবং কতকগুলো ক্ষেত্রে এইটি সত্যি উপকারী। সেজন্য দেশীয় ঔষধাদির প্রকরণে এর ব্যবহার দেখা যায় এবং অন্য সব মশলার তুলনায় এটা দামীও বটে।

গোলমরিচের উৎপাদনের দিক থেকে আজিকার ভারত কিন্তু মোটেই পিছিয়ে নয়। পরন্তু এই পণ্য উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান এখন দ্বিতীয়। বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী গোলমরিচ উৎপন্ন হয় ইন্দোনেশিয়ায়, সম্প্রতি ভারতের গোলমরিচ ফলন সম্পর্কে একটি সরকারী হিসাব পাওয়া গেছে। তাতে দেখা যায়, বিগত বর্ষে অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সালে এখানে উৎপন্ন গোলমরিচের পরিমাণ হচ্ছে ৩২ হাজার টন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরেও (১৯৫৫-৫৬ সাল) প্রায় একই পরিমাণ গোলমরিচ উৎপাদিত হয়। তিন বছর আগে ১৯৫৪-৫৫ সালে উৎপাদনের হার অপেক্ষাকৃত কম ছিল। প্রদত্ত সরকারী হিসাবেই জানা যায়—উক্ত আর্থিক বৎসরে সমগ্র ভারতে মোট ফলন হয়েছিল ২৬ হাজার টন। অপর দিকে ভারতের মধ্যে সর্ব্বাধিক গোলমরিচ উৎপন্ন হয় কেরল রাজ্যে।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা চলে—ভারতে যে পরিমাণ গোলমরিচ হয়ে থাকে, তার সবটাই এখানে ব্যবহৃত হয় না। দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে মোট ব্যয় হয় ৮ হাজার টন গোলমরিচ। বাকী যেটা থেকে যায়, তা প্রতি বছরই বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। এই খাতেও ভারত সরকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করে থাকেন অনেক। বিগত বর্ষে (১৯৫৬-৫৭ সাল) এখান থেকে মোট ১৪৮৪০ টন গোলমরিচ রপ্তানী করা হয়েছে। সরকারী হিসাব থেকে এ-ও জানা যায়—১৯৫৫-৫৬ সাল এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে রপ্তানীকৃত ভারতীয় এই পণ্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩,৯২৭ ও ১৪,৭৭৮ টন।

ভারত থেকে সাধারণতঃ গোলমরিচ রপ্তানী হয়ে যায় চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, পূর্ব্ব-জার্ম্মাণী, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই কয়টি দেশে ১১ হাজার টন গোলমরিচ প্রেরিত হয়েছে এবং মূল্য বাবদ পাওয়া গেছে ৩০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া নিয়েছে ৫১৭ টন এবং পোল্যাণ্ড ২১৫ টন। বছর কয়েক হ'ল সোভিয়েট ইউনিয়নও ভারত থেকে গোলমরিচ আমদানী সুরু করেছে। সেখানে ১৯৫৫-৫৬ সালে এই পণ্যটি প্রেরিত হয়েছে ৩,৯৫০ টন। ১৯৫৬-৫৭ সাল অর্থাৎ বিগত বর্ষেও রুশিয়াতে রপ্তানী হয়ে গেছে প্রচুর গোলমরিচ।

ভারতে গোলমরিচ উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে আরও বেশীরকম। বেসরকারী প্রচেষ্টা ছাড়াও সরকারী দৃষ্টি এই দিকে দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ৩৬ হাজার টন গোলমরিচ ফলনের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারী ও সরকারী উদ্যম পাশাপাশি চললে এই লক্ষ্য পূরণ হবে, এইটুকু অনায়াসে বলতে পারা যায়।

নোট মুদ্রণে বৃটেন

কারেন্সী বা ব্যাঙ্ক নোট মুদ্রণ ব্যাপারে বৃটিশ অবদান কখনই অস্বীকার করা চলে না। বিশ্বের বহু স্বাধীন দেশে আজও বৃটেন থেকে রকমারী নোট ছাপা হয়ে যায়। যুদ্ধোত্তরকালে বৃটিশ মুখাপেক্ষী কতকগুলো রাষ্ট্র অবশ্য নিজস্ব তত্ত্বাবধানেই নোট তৈরী করেছে, কিন্তু তাতেও নোট মুদ্রণে বৃটেন যে মান ও দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে, সেটি কেউ প্রায় অতিক্রম করতে পারেনি।

নোট ছাপিয়ে দেবার জন্য তিনটি বৃহৎ বৃটিশ মুদ্রণ-সংস্থা (সিকিউরিটি প্রিণ্টার্স) বিশ্বের নানা দেশ থেকে অর্ডার গ্রহণ করে থাকেন। এই মুদ্রাসংস্থাগুলোর নাম যথাক্রমে—ব্রাডবেরী উইলকিনসন, ওয়াটারলো এণ্ড সন্স এবং দ্য-লা-রিউ। গত বৎসর প্রথমোক্ত ফার্ম্মটি (ব্রাডবেরী উইলকিনসন) একমাত্র পারস্যের নেশন্যাল ব্যাঙ্কের নিকট থেকেই ৪ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের নোট মুদ্রণের অর্ডার পেয়েছিল। যতদূর জানা যায়, এই মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের তৈরী কারেন্সী নোট আজ চালু রয়েছে প্রায় ২৫টি দেশে। বলতে কি, প্রতি বছরই এর নিউ ম্যালডাল কারখানায় লক্ষ লক্ষ ব্যাঙ্ক নোট যত্নসহকারে মুদ্রিত হয় এবং সেখান থেকে ঐগুলো অর্ডার অনুযায়ী এক একটি দেশে রপ্তানী হয়ে যায়।

বৃটিশ ফার্ম্মসমূহে বিভিন্ন ধাপে নানা বিশেষজ্ঞের হাত ছুঁয়ে অর্ডারী নোট সকল তৈরী হয়। কোথাও হয়ত জল ছাপের কাজ হল, কোথাও হল ডিজাইন অনুসারে রঙের কাজ, আবার কোথাও বা হল নোটের উপরকার লেখাগুলোর কারিগরী। শেষ অবধি ষ্টীল প্লেট তৈরী করে উভয় দিকে মুদ্রণ সম্পন্ন হলে নোটের উপর ক্রমিক নম্বর দেবার পালা আসে। মাঝে আরও একটি কাজ হয়ে যায় এবং সেটি হচ্ছে নোট প্রচারের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির অবিকল স্বাক্ষর মুদ্রণ। নির্দ্দিষ্ট কাগজের লম্বা শীটে অসংখ্য নোট একটি সঙ্গে ছাপা হয় এবং সবশেষে কাজ হল সেগুলো ঠিক ভাবে কাটা ও নোটের বিভিন্ন মূল্যমান অনুযায়ী তাড়া বেঁধে নেওয়া। এর পর এক একটি প্যাকেট শীলমোহর করে যে ব্যাঙ্কের অর্ডারী নোট, সেখানে যথানিয়মে পাঠিয়ে দেওয়া।

সূচনা থেকে পূর্ণাঙ্গ নোট তৈরী হয়ে বার হওয়ার মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রতি স্তরেই চলে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ। কোথাও সত্যি কোন ভুল-ত্রুটি বা মুদ্রণ-বিভ্রাট হয়ে পড়লো কি না, এইটি তন্ন তন্ন করে না দেখলেই নয়। ব্রাডবেরী উইলকিনসন নামীয় ফার্ম্মটিতে এই পরীক্ষা কার্য্যেই নিযুক্ত আছে বহু তরুণী সমেত প্রায় এক সহস্র কর্ম্মী। সুবৃহৎ নোট মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানটি থেকে শুধু কারেন্সী নোট বা ব্যাঙ্ক নোটই নয়, ডাকটিকিট, চেক, বণ্ড, শেয়ার সার্টিফিকেট, রাজস্ব টিকিট, পাসপোর্ট, মোটর লাইসেন্স প্রভৃতিও মুদ্রিত হয়ে অহরহ বাইরে রপ্তানী হয়ে যাচ্ছে। বৃটেনবাসীরা সেজন্যই গর্ব্বসহকারে এই দাবীটি করতে ছাড়ে না—'আমরা অর্থ তৈরী করে দিই, আর খরচ করে বিশ্ববাসী।'

মীনাকুমারী তাঁর ত্বকের যত্ন নেন
লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে "এটি এত সম্পূর্ণ রকম শুভ্র এবং বিশুদ্ধ!" তিনি বলেন
বিয়োগান্ত করুণ ছবির বিখ্যাত অভিনেত্রী মীনাকুমারী আজ ভারতে সর্বাধিক জনপ্রিয় চিত্র তারকাদের অন্যতম। তিনি কিন্তু শুধু কুশলী অভিনেত্রীই নন, তাঁর চেহারাও অত্যন্ত সুন্দর—শুটিংয়ের সময় গরম আর্কল্যাম্পের তাতেও তাঁর ত্বক থাকে মসৃন ও লাবণ্যময়! অবশ্য লাবণ্যের যত্ন নেওয়ার একটি গোপন উপায় তাঁর জানা আছে। "আমি সর্বদা বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি। এটি একটি অপূর্ব মোলায়েম, সুগন্ধী সাবান।" নিজে পরীক্ষা করে দেখুন। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে আপনার ত্বক কত সতেজ, কত সুন্দর হয়ে উঠছে!
কমাল আমরোহীর 'পাকীজা' চিত্রের তারকা।
LUX
TOILET SOAP
লাক্স টয়লেট সাবান
চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান
L.T.S. 644-X62 BG

সর্ব্বভারত লেখক-সম্মেলনের সম্ভাবনা

সংবাদপত্রে অনেকেই হয়তো লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, সম্প্রতি এক সর্ব্বভারতীয় লেখক সম্মেলনের উদ্যোগ ও আয়োজন চলেছে। আমাদের দেশবাসীর মধ্যে সাহিত্য-রসপিপাসুদের কাছে এই আয়োজনের উদ্দেশ্য আনন্দদায়ক সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এখনও ভাষার লড়াই চলেছে। এমন কি এই দ্বন্দ্ব রক্তারক্তি ও খুনোখুনির পর্য্যায়ে নেমেছে। তদুপরি দিল্লী-সরকারের নেক-নজরের অন্ধ পক্ষপাতিত্বে এক প্রদেশ অন্য প্রদেশের প্রতি হিংসা প্রকাশ করছে। কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের সৃষ্টি হিন্দী-অভিযানের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যেজন্য বিভিন্ন প্রদেশবাসীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির আত্মবিকাশের পথ অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। আমাদের মাতৃভাষা আমাদের ভুলে যেতে হবে—কেন না হিন্দী নাকি কম্পালসারি, ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই। যদিও হালে শ্রীনেহরুও অযথা—হিন্দী-আন্দোলনের জন্য বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ আকৃতি যখন এই, তখন ভারতীয় সাহিত্যিক সম্মেলনের প্রাক-ঘোষণায় আমরা উল্লসিত হবো, অধিক কথা কি? যাই হোক পাঠক-পাঠিকা স্মরণ রাখবেন, আমাদের দেশে 'সম্মেলন' শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, আমাদের জনগণের সঙ্গে যে-যে বিষয়ের কোন যোগাযোগ নেই, সেই-সেই গুরু-গম্ভীর ও দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের সম্মেলন হওয়াই যেন এক প্রচলিত রীতি।

কিছুকাল আগেও শীতের মরশুমে কলকাতায় নানাবিধ 'সিরিয়াস' সম্মেলনের পাকাপাকি বন্দোবস্ত ছিল। ধর্ম্মচক্রের মহামণ্ডল, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আমীরী জলসা, প্রগতিপন্থীদের সৌখীন সমাবেশ, ক্লাব ও অফিস কর্ম্মচারী ইউনিয়নের বার্ষিক রঙ্গাভিনয়, প্রভৃতি অনুষ্ঠান যদিও সম্মেলনের নামেই চলে যায়। শোনা যায়, কোন কোন সম্মেলন আবার 'ক্লোজড্ ডোর' অর্থে রুদ্ধদ্বারকক্ষে হয় নাকি এই কলকাতায়।

তবুও আমরা আশা পোষণ করবো সর্ব্বভারতীয় লেখক সম্মেলন সার্থক হোক। কেন না, আমাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ-বিবাদের কারণে হয়তো আমরা ভুলে গেছি, ভারতীয় সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পীদের মধ্যে সেযুগে যেন এক অবিচ্ছিন্ন ঐক্য ও মৈত্রী ছিল—বর্ত্তমানে বেটি আমরা পুরোপুরি হারিয়েছি। দেশের আর বিদেশের দল-বেদলের এতটা 'ডিরেক্ট' প্রভাব তখন দেশের মসীজীবীদের প্রতি বর্তায়নি। আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীমাত্রকেই পুতুল প্রতিভা আর বিকশিত হবে না। কিন্তু আমরা হয়তো মানতে চাইবো না, মহান আদর্শের পিছনে ধাওয়া করতে গিয়ে আসল সৃষ্টিকার্য্য ব্যাহত হচ্ছে অনেকের। রাজনীতির সঙ্গে তালে তাল রাখতে রাখতে সুর বেতালা হয়ে পড়ে—আমাদের কানেই যা শুধু বাজে না। এখানে উল্লেখ করলে অন্যায় হবে না, রাজনীতির রাজরোগে ভুগে ভুগে বহু শিল্পী ও সাহিত্যিক অকালমৃত্যু বরণ করেছেন দেশে-বিদেশে।

আমাদের সাহিত্যেও রাজনীতিপ্রিয়তা আছে। নীলদর্পণ, পথের দাবী সৃষ্টি হয়েছিল সত্যিকার দেশাত্মবোধের তাগিদে। কিন্তু আমরা যদি বিদেশ থেকে এই দেশাত্মবোধকে আমদানী করতে চাই এবং তাকে পণ্য ক'রে ব্যবসা ফেঁদে বসতে চাই, জাতীয়তাবাদী পাঠকগোষ্ঠী মেনে নেবেন কি? তদুপরি রাজনীতির উৎকর্ষের ফলস্বরূপ পরস্পরের মধ্যে বিভাগ আর বিরোধের প্রাচীর-রচনা তো অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। সর্ব্বোপরি লাভ বলা যায়, সরকারী কৃপাদৃষ্টি, যদি লাভ করা যায়। বৃত্তি, পুরস্কার, স্বর্ণপদক আর উপাধিভূষণের নিশ্চিত ব্যবস্থা জানবেন। সাহিত্যিক শিল্পী আর বৈজ্ঞানিকদের এখন তাই লাভ কিছু নেই, প্রলোভন নানাপ্রকার। সুতরাং আমাদের দেশের যখন এই অবস্থা বা দুরবস্থা, তখন একটি সর্ব্বভারতীয় লেখক-সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি প্রচারে সত্যিই বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন এই—আন্তঃপ্রাদেশিক সাহিত্যক্ষেত্রে ক'জন সাহিত্যিক আছেন—যাঁরা জয়ধ্বজা ধ'রে সম্মেলনে হাজিরা দেবেন! আমাদের সকল প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে কতকগুলি ভাষা সাহিত্যসৃষ্টিযোগ্য তাও বিবেচ্য। সংস্কৃতভাষার সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র আছে এক মাত্র বাঙলা ভাষার। একারণেই বাঙলা সাহিত্যে আজ নয়, অনেক আগেই বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে ভাষার মাহাত্ম্যে। তাই আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী ভাষা যাঁর এখনও বৈয়াকরণিক পদ্ধতিতে রচিত করতে পারলেন না তাঁরা সাহিত্যের দরবারে প্রতিনিধিত্ব করবেন কোন্ লজ্জায়?

তবুও আমরা বলি, শতেক বাধা, হাজার দলাদলি আর নির্ম্ম পক্ষপাতিত্বের মধ্যে একটি সর্ব্বভারতীয় লেখক সম্মেলন হোক এ কলকাতার বুকে। আমাদের সেই আগের দিনের প্রীতির শুভসম্পর্কে আবার আমরা স্মরণ করি সকল দলাদলির ঊর্দ্ধে থেকে। ভারতবর্ষে প্রদেশে প্রদেশে অশান্তির জাল যদি ছিন্ন হয় পরস্পরের ভাব-বিনিময়ে এর চেয়ে আনন্দের আর কি থাকতে পারে! এই সম্মেলনে

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

সাহিত্য পাঠের ভূমিকা

শুধু অধ্যাপনার ক্ষেত্রেই নয় সাহিত্য সৃষ্টি, প্রবন্ধ রচনা, সমালোচনার ক্ষেত্রেও সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রতিভা সর্বজনবিদিত। উপরোক্ত গ্রন্থটি তাঁর আলোচনা ও সমালোচনার প্রতিভার ছাপ বহন করছে। সাহিত্য জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং শুধু তাই নয়, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, নীতি প্রভৃতির সঙ্গেও সাহিত্যের যোগ অবিচ্ছেদ্য এবং সেই জন্যেই সকল কালের সাহিত্যের মধ্যে স্বভাবতঃই যে এদের ছাপও পড়তে বাধ্য এই ভিত্তিতে সুবোধচন্দ্রের আলোচনা রূপলাভ করেছে। সুবোধচন্দ্রের মূল্যবান সমালোচনা পাঠ করে আগ্রহান্বিত ও রসগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দ লাভ করবেন। বিশ্বভারতী, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। দাম আট আনা মাত্র।

সোবিয়েতের দেশে দেশে

বাঙলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী রচনার একটি বিশেষ স্থান আছে। আমাদের দেশে বিস্তর পর্যটক আজ নেই, কিন্তু দেশী ও বিদেশী সংস্কৃতি মিশনের কৃপায় ইদানীং অনেক গুণীজনই বিদেশগামী হচ্ছেন এবং ফিরে এসেই সবিস্তার ফতোয়া জারী করছেন। নিজ নিজ দৃষ্টিতে বিদেশকে বর্ণনা করছেন, কিছু বা পক্ষপাতিত্বে। কিন্তু সত্যিকার সাহিত্যিকের লেখা ভ্রমণবৃত্তান্ত অধুনা এক প্রকার দুর্লভ বলা চলে। অলেখকের রোজনামচা আর সুলেখকের বর্ণনাবিন্যাসে বহুবিধ পার্থক্য। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও নাট্যকার মনোজ বসুর লেখায় শেষোক্ত গুণপণা সুপ্রচুর! তাঁর রচিত 'সোবিয়েতের দেশে দেশে'র সঙ্গে বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার অপরিচয় নেই। এই বৃত্তান্ত সম্প্রতি সুন্দর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এই রচনা প্রকাশার্থে যখন নির্ব্বাচন ক'রেছি তখন অধিক প্রশংসা অবশ্যই করতে পারি। কিন্তু বিশেষতঃ মনোজ বসুর রচনা আমরা পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিয়েছি বিবিধ কারণে। তিনি সুসাহিত্যিক। তাঁর রচনা আন্তরিকতায় ভরপুর। ছলনা কাকে বলে তিনি জানেন না। আবার কৃতজ্ঞতায় কিংকর্ত্তব্য হারিয়ে অতি-প্রশংসায় মুখরও হন না। অধিকন্তু তাঁর বাচনভঙ্গীর সরলতায় ও লেখার মুন্সিয়ানায় ভ্রমণ-কাহিনীকে সত্যিকার সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত করতে পারেন। মনোজ বসুর লেখা পাঠে যেন দেশ দেখার দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায়। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রার্থনা করি। অসংখ্য আলোকচিত্র বইটির অন্যতম আকর্ষণ। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলিকাতা-১২। মূল্য ছয় টাকা।

বাঙলা সাহিত্যে নাটকের ধারা

বাঙলা সাহিত্যের দরবারে একটি বিশেষ আসন অধিকার করে আছে নাটক। কাব্য, প্রবন্ধ, ছোট গল্পের মত দীর্ঘকাল ধরে নাটকও বাঙলা সাহিত্যকে পুষ্ট করে আসছে যথেষ্ট পরিমাণে। বহু খ্যাতনামা নাট্যকার মহাকবির সম্মান পর্যন্ত পেয়ে গেছেন জাতির কাছে। বহু সুপ্রাচীন পৌরাণিক গ্রন্থে অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থটিতে বাঙলা নাটকের তথা যাত্রার গোড়ার যুগ থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হয়েছে নাট্যোৎসাহী এবং নাট্যানুরাগী মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে পরিতৃপ্তি ও জ্ঞান দুইই লাভ করবেন। এই জাতীয় সৎ এবং জ্ঞানপ্রসূ গ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্যে লেখক ধন্যবাদের দাবী করতে পারেন। দীর্ঘ গ্রন্থটিতে লেখকের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। একটি আটত্রিশ পাতার দীর্ঘতম সমালোচনা লিখেছেন ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল। মহাজাতি প্রকাশক, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীমহীতোষ বসু। দাম আট টাকা মাত্র।

তারা তিন জন

বাঙলা দেশের সুখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র সেনের নাম কারো অজানা নয়। তাঁর "শতাব্দী" অনেকেরই চিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর কয়েকটি ছোট ছোট গল্পের সংকলন। বালক ও কিশোরদের উপযোগী মোট বারোটি গল্প। গল্পগুলি নিজস্বতায় সমুজ্জ্বল। রমেশচন্দ্রের দরদ ও অনুভূতিতে কয়েকটি গল্প জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিতু হাকিম, বিন্দি, আফিসের কাপড়, সাদা ঘোড়া, রাজার জন্মদিন, তারা তিন জন প্রমুখ গল্পগুলি পাঠক-চিত্ত আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস রাখা যায়। প্রফুল্ল-কুমুদ লাইব্রেরী, ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন এস, চক্রবর্তী। দাম দু'টাকা মাত্র।

রাত্রি

সাহিত্যিক আশু চট্টোপাধ্যায়ের খ্যাতি একদিন পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছিল। বর্তমানে তাঁর এই উপন্যাসটি প্রকাশ লাভ করেছে। মুখ্য চরিত্র হৈমন্তী। দু'টি বিপরীত জীবনধারার সম্মুখীন সে। স্বামী সমীরণ রাজনৈতিক কর্মী। ধূমকেতুর মত তাদের সংসারে আবির্ভূত হয় পুরন্দর, অনেক কিছুই সে চায়, আবার দেবদূতের মত সেই সংসারেই এসে পড়ে অঞ্জন। এই চরিত্রগুলি সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হয়েছে লেখকের প্রতিভায়। প্রতিটি চরিত্রের ভিতরকার কথা নিঙড়ে বের করেছেন লেখক। ভিন্নধর্মী চরিত্রগুলির সম্মেলনে কাহিনীর গতি মনোরম হয়ে উঠেছে। শ্রীকালী পাবলিশিং হাউস, ৬৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীঅরবিন্দ সিংহরায়। দাম চার টাকা আট আনা মাত্র।

রাজনীতি

রাধানাথ সিংহ লেখার জগতে নবাগত হলেও তাঁর রচনার উৎকর্ষতা এবং গভীরতা যথেষ্ট পরিমাণে প্রশংসার দাবী করতে পারে। বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নমূলক এবং চিন্তাগর্ভ ছোট ছোট কয়েকটি প্রবন্ধ ও রম্যরচনা স্থান পেয়েছে উপরোক্ত গ্রন্থটিতে। সমাজে, মানুষের জীবনে যে বহুবিধ উত্থান পতন সূচিত হয় তা যে এমনই হয় না তার পিছনেও থাকে একটি পটভূমিকা, এই পটভূমিকাতেই রচনাগুলি রচিত। ছাব্বিশটি রচনার মধ্যে কয়েকটি রচনা বিশেষ ভাবে প্রমাণ করে যে রচয়িতার চিন্তাধারা অসার নয়। ৫ ধর্মতলা রোড, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীমতী চিত্রা সিংহ। দাম দু' টাকা মাত্র।

হঠযোগ প্রণালী

মানুষের স্বাস্থ্য যোগাসন দ্বারা কি ভাবে গড়ে তোলা যায় সে বিষয় আলোচনা আজ রীতিমত ব্যাপকতা লাভ করেছে। এ দেশে কেন বিদেশের বহু সাহিত্যিকই আজ এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছেন। হঠযোগের চর্চা ভারতে নতুন নয়, বহু প্রাচীন গ্রন্থ তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। স্বাস্থ্য গঠনের প্রধান সহায়ক এই বিদ্যা সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত ব্যক্তি অনেকেই আছেন তাঁদের কৌতূহল নিবারণে এই গ্রন্থ সক্ষম হবে। হঠযোগ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন এই গ্রন্থের মুখ্য আকর্ষণ। কয়েকটি চিত্রও এর শোভাবর্ধন করেছে। এই সংগ্রন্থের আমরা বহুল প্রচার কামনা করি। লেখক কালীমোহন দেবশর্মা। তারাচাঁদ দাস য়্যাণ্ড সন্স, ৮২ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীবিশ্বনাথ দাস। দাম তিন টাকা আট আনা মাত্র।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি সুগ্রন্থ (কিশোরদের উপযোগী) আমাদের হস্তগত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলি লেখনীর প্রখরতায়, প্রাঞ্জল বর্ণনাগুণে, সহজভাবে মূল বক্তব্য প্রস্ফুটিত করার জন্যে পাঠকচিত্ত জয়ে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। গ্রন্থগুলি—(১) প্রফুল্লরঞ্জন বসু-রায়ের ইউরোপের গান্ধী ডাঃ য়্যালবার্ট শুইটজার (প্রকাশিকা শ্রীমতী গায়ত্রী বসু, শৈবলিনী কুটীর, সন্তোষপুর, কলকাতা—৩২, দাম ১'৫০ ন, প,) (২) ঋষি দাসের ছোটদের ভিক্টর হিউগো (প্রকাশক অরুণকান্তি পাল, নবভারতী, ৬ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, দাম এক টাকা চার আনা) এবং (৩) কৃষ্ণময় ভট্টাচার্যের কিশোর (প্রকাশক কুড়রাম ভট্টাচার্য ও লেখক, রামকৃষ্ণ প্রকাশনী, ৩৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, দাম দেড় টাকা মাত্র)

এই প্রসঙ্গে দুটি শিশুসাহিত্য গ্রন্থের নামোল্লেখ করি। এদের মূল উদ্ভব বিদেশে। এই দুইখানি গ্রন্থও রচনা কুশলতায় সমুজ্জ্বল। শিশুমনে এরা সহজেই প্রভাব বিস্তার করবে হৃদয়গ্রাহী ভাব বর্ণনার কল্যাণে। এই গ্রন্থ দুটি—(১) বিজনবনের নিরালা ঘরে। রচনা—লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডার, অনুবাদ—হিমাংশুকুমার ঘোষ। প্রকাশক যতীন্দ্রনাথ দাস, পরিচয় পাবলিশার্স, ১৭৫-এ পার্ক ষ্ট্রীট দাম—এক টাকা আট আনা মাত্র এবং (২) রুশদেশের উপকথা। রচনা—আলেক্সেই তলস্তয় অনুবাদ—লীনা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী, ৬৪-এ ধর্মতলা ষ্ট্রীট। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

য়্যান্টিবায়োটিক

(বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ)

সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা বহুদিন ধরেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাহিত্যের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা ও বিজ্ঞানের মধ্যে সাহিত্যের প্রসার এঁদের মূল্য লক্ষ্য। এই সমন্বয়কারদের মধ্যে বর্তমানে বিজ্ঞান-সাহিত্যকার বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ অনায়াসে করা যায়। নানা প্রকার ব্যাধি প্রাণিদেহ যখন বিপর্যস্ত করে তুলছিল সেই সময় বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ দেখা দিয়েছিল য়্যান্টিবায়োটিক। স্বভাবতঃই সেই সম্পর্কে মানব সাধারণের আগ্রহ জাগবে। এই গ্রন্থে সেই সকল আগ্রহ প্রশমিত হবে। এতে য়্যান্টোবায়োটিকের আবিষ্কার তার উৎস, তার প্রক্রিয়া, তার ইতিহাস সমূহ সুনিপুণভাবে বর্ণনা করে গেছেন বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর শক্তিশালী রচনা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যুগপৎ সমন্বয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকার কল্যাণসাধন করবে বলে আশা করা যায়। বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা—৭ থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন দাম আট আনা মাত্র।

সিগারেট

মৈত্রেয়ী দত্ত-চৌধুরী

শুধু দাহ নিয়ে বুকে,
শুধু নিয়ে আগুনের প্রচণ্ড প্রদাহ,
তৃষিতের মুখে লাল আগুনে রেখায় তুমি জ্বলো;
জ্বালাময়ী কোন ভাষা বলো,
পুঞ্জীভূত ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়।
তোমার ভেতরে শুধু দাহ,
তবু এনে দাও প্রাণে
অতৃপ্ত নেশার প্রবাহ !
জীবনের স্বপ্নসম ছুটে-চলা প্রদীপ্ত নেশায়,
সমস্ত চেতনা ঘিরে নামে এক রঙ্গীন আবেশ,
তবু তার কতটুকু আয়ু ?
কতটুকু তৃষ্ণার রেশ ?
'এসট্রে'র বুকে তার মুহূর্ত্ত প্রয়াণের তাই
শুরু ভস্মশেষ।

আদর্শ পথ্য,
পানীয় ও খাদ্য
LILY
BRAND
BARLEY
TRADE MARK
FOR INFANTS & INVALIDS
LILY BARLEY MILLS/LTD
MURARIPUKAR ROAD
ULTADANGA : CALCUTTA
লিলি
বার্লি
সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ
ও
স্বাস্থ্যপ্রদ

জন্মদিনে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দ্বি-ত্রিংশ বৎসর আজ পূর্ণ জন্মদিনে।
সখা-সখী-গুণী-ভক্ত শুভার্থী সকলে
জানায় সাদর সম্ভাষণ হাসিমুখে:
"ফিরিয়া ফিরিয়া যেন আসে এই দিন
বর্ষে বর্ষে ল'য়ে তাঁর শুভ আশীর্বাদ।"

জন্মদিন আসে ফিরে স্নেহের উৎসবে,
আনন্দের সম্বোধনে বন্ধু-বান্ধবীর,
দাক্ষিণ্যের দানে তব হে দাতা বরদ,
আরো যেন সৌন্দর্য-গভীর ছন্দে—আরো
স্নিগ্ধতায় কমনীয়, প্রত্যয়ে নির্মল—
প্রাণের বন্ধুর পথ করিয়া মসৃণ—
তোমারি আশীষে। বর্ষ পরে বর্ষ যায়
ঋতুচক্রে—দিনে দিনে আনি' নব নব
আশ্চর্য উপলব্ধির অফুর সম্ভার
কভু সুখে, দুঃখে কভু। দিনে দিনে পাই
সঙ্গ তব নিত্যসাথী!—কখনো আঁধারে
আশাভঙ্গ বেদনায়, কখনো আলোকে
সুগন্ধ মঞ্জুল চেতনার মঞ্জরণে।
কখনো নিরাশা পথে নামে নব আশা,
কখনো উচ্ছল লগ্নে ঘনায় বাদল,
প্রতি ছন্দে তবু তব অলক্ষ্য করুণা
প্রাণের প্রত্যন্ত তটে আসে ঢেউ তুলে।

জীবনে আমরা চিনি প্রাপ্তির দক্ষিণা
জন্ম-উত্তমর্ণ মন প্রতি অনুভবে
দিনান্তে গণনা করে লাভ-ক্ষতি তার।
কৃপণ কুসীদজীবী প্রতি পাতে ফেলে
অঙ্ক—কোথা কি পেয়েছে দিন-আবর্তনে
কোন্ মূল্য বিনিময়ে। দেখেও দেখে না
আমাদের অন্ধ নেত্র—শ্রেষ্ঠ দান তব
আসে অচিহ্নিত পথে। জীবন-দেবতা!
নহে মর্ত্য স্বভাব তো স্বভাব তোমার।
তোমার দানের সুর ছন্দ-ইন্দ্রজালে
উষরে পল্লব-দোল দুলায় পলকে,
জাগায় পাষাণ-ভাঙা নির্ঝর নিমেষে,
কাঁটায় কুসুমবাণী, নিশীথে অরুণা,
নিরুৎসাহ-বাঁধ দেয় ভাসায়ে সহসা
অনির্দেশ্য উচ্ছ্বাসের আনন্দ-প্লাবনে,
পরাভব-ভালে আঁকি' নব জয়টীকা,
ক্ষতিবুকে অক্ষতির উদ্ভাসি' আভাস!

এক হাতে হানি' নথ আঘাত তোমার
অন্য হাতে দাও বর আশার অতীত!
শৈশবেই মাতৃহারা করি' এসেছিলে
পিতারূপে—একাধারে জনক-জননী,
তর্কসাথী, উপদেষ্টা, শাসক, বান্ধব।
যৌবনে সংসার সুখ হ'তে ছিন্ন করি'
সুদূর প্রবাসে এলে ধরি' গুরুরূপ,
পিতারও অধিক স্নেহে করিয়া লালন
দিলে অভিনব জন্ম—দীক্ষা ইষ্টনামে:
সংশয়ে দেখায়ে পথ, পরম দিশারি,
তিমিরান্ধ নয়ন করিলে উন্মীলন
গাহি ঘুম-জাগানিয়া অলোক সঙ্গীত।
সহসা আরাধ্য গুরু—তিরোধানে যবে
নিরাশার অশ্রুধারে পুছিলাম: "কোথা
আশা তার গুরু যার নাই আর?" এলে
দিতে দীপ্ততর দিশা দেবদূতীরূপে:
(অপরূপ লীলা!) শিষ্যা হ'য়ে দিলে দেখা,
দিন পরে দিন দিলে "পরম প্রসাদ"
সমাধির মাধ্যমে তাহার! তরী যবে
ভাঙা হাল, ছেঁড়া পাল মজ্জমান—হ'ল
দুরন্ত ঝটিকা মন্ত্রশান্ত বরে তব:
শান্তির বন্দর দিশা মিলিল অকূলে!
শিষ্যারূপে চেয়েছিল যে শরণ—নিজ
কাণ্ডারীর রূপ যেন তোমার ইঙ্গিতে!
অন্তহীন সেবা-ভক্তি অবদানে তার
শিখাল ভক্তির মর্ম, চাহি' উপদেশ
বিনম্র প্রণামে—দিল দীক্ষা দীনতার।
একান্ত নিষ্ঠায় তার, গুরুরূপে যেন,
দেখাল সে—নিষ্ঠা বিনা পরমপ্রাপ্তির
মিলে না মিলে না দিশা। দিনে দিনে নাথ,
নব নব ইন্দ্রজাল উদ্ভাসিয়া তার
সমাধি-মাধ্যমে তুমি গাহিলে: "কৃপাল
প্রতি কৃপার্থীরে করুণায় রহে ঘেরি,
নিত্য নব পরীক্ষায় প্রাণের মনের
সুপ্ত-শক্তি-উদ্বোধন তরে দেয় তারে
দুঃখ শোক তাপ।" যাহা ছিল এতদিন

জনশ্রুতি—চাক্ষুষের অধ্যায়ে রাঙিল
নব অনুভব রঙে—স্বপ্নের অতীত
ভরসার বাণী হ'য়ে শ্রুতিলব্ধ তার
মন্ত্রমান গীতিগুচ্ছে! "অঘটন-যুগ
গত চিরতরে"—নহে সত্য এ রটনা,
এ কথা করিলে তুমি ঘোষণা আপনি,
জাগালে প্রত্যয় নব অপার লীলায়
তোমার হে কারুণিক, গাহিয়া তোমার
বৃন্দাবন—মুরলীর মূর্ছনায় যেন :
"যে চায় অন্তরে দিশা পরম শরণে,
প্রতি বাধা হ'বে তার সহায় জীবনে,
অভিশাপ হবে বর, আঘাত জাগাবে
অন্তর্জ্যোতি, মরুপথ হাসিবে কুসুমে।"

কুতর্কবিলাস মাঝে ভুলি যে আমরা
এ-বাণী তোমার তাই বুঝি মেঘছায়
প্রত্যয়ের নীলাকাশে ক্ষণে ক্ষণে? বুঝি
তাই আসে অতর্কিতে ঘাত-প্রতিঘাত,
মিলন মন্দিরে নামে বিরহের ছায়া,
শঙ্খধ্বনি মাঝে শঙ্কা দেয় হানা, কাটে
নৃত্যে তাল, গতি ক্ষুণ্ণ হয় বাধা বাঁধে,
মদির মুহূর্তে আসে শোণিত-সংঘাত,
অবেলায় নামে সন্ধ্যা, বিজয়ে বিভ্রম!
কেন ভুল হয় বার বার—দেখিয়াও
দেখি না তো, শুনিয়াও চাই না শুনিতে!
মন সাধে বাদ যবে প্রাণ দিতে চায়,
কেন যে—জানি না আজো! কতটুকু জানি
জীবন-নাট্যের তব শেষাঙ্কের বাণী
হে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মহানাট্যকার!

আমি শুধু জানি বন্ধু, যা আমি পেয়েছি
পথের পাথেয়রূপে কৃপায় তোমার :
পেয়েছি প্রত্যয় তুমি আছ এ জগতে,
জেনেছি—আমার গানে তুমিই চাহিছ
ঝংকারিতে আপনার অসীম আকুতি।
জল আছে তাই জাগে জলের পিপাসা ;
অমৃত তৃষ্ণারে তাই করেছি বরণ
লভিতে অমৃত-উৎস, সরল নির্ভরে
বিন্দু করে আবাহন সিন্ধুরে হৃদয়ে।

জানি তাই—তুমি আছ ঘেরিয়া আমারে
বুকের নিঃশ্বাস রূপে প্রাণের মণ্ডলে,
সঙ্গীতে সুরের রূপে শ্রুতির পুলকে,
চরণ ঠমকরূপে পথের চলায়,
আলোছায়া-রূপে জীবনের তীর্থপথে।
করুণা প্রতিমা তব অন্তর মন্দিরে
ছড়ায় কিরণ তার আনন্দ-প্লাবনে।
তারি সে আলোকে দেখি—তুমি আছ প্রতি
সখাসখী সম্ভাষণে স্বদেশে বিদেশে।
তোমারি দৃষ্টির বরদানে হেরি নাথ
অম্লান চাহনি তব প্রতি পরিচিত
নয়নের স্নেহালোকে। যেথা যত গান
ওঠে বেজে—আনে বহি' তোমারি ঝংকার
অন্তরাল হ'তে যারে ঝরাও অঝোরে
হে চিরপ্রণয় উৎস! প্রাণের স্পন্দনে,
শক্তির গৌরবে বিরহের বেদনায়,
মিলনের রাসনৃত্যে, হাসির উল্লাসে,
অশ্রুর ব্যথাহরণে! অশ্রান্ত চিন্তায়—
প্রতি স্ফুরণেই হেরি তোমারি বিকাশ,
প্রতি কণ্ঠে তব গান জাগে, প্রতি বুকে
তুমিই বুনিছ স্বপ্ন পুষ্পিতে জাগরে
প্রেমের কমলরূপে।

যত দিন যায়
ক্ষয় ক্ষতি ভুলি বন্ধু, তোমারি বাঁশির
বৃন্দাবন-মুখী ডাকে। শুনেছে তোমার
সে আহ্বান একবার যে পথিক সে কি
পারে আর দিতে সাড়া উচ্ছলি সোনার
হরিণের মায়ানৃত্যে? সে যে নাথ, তার
জেনেছে জীবনে : প্রতি দুঃখ ব্যথা মাঝে
করুণার বাঁশি তব বাজে হৃদয়ের
মধুবনে ; জানে সে সে—তারি মধুরিমা
প্রিয়জন কলকণ্ঠে হয় অনূদিত।
তুমি করো অলক্ষ্যে যে-সম্ভাষণ, তারি
ঝংকার তাহারা তোলে—কভু ব্যথামাঝে
ঝরায়ে সান্ত্বনা, কভু আনন্দ-উৎসবে
শ্রদ্ধা-স্নেহ-প্রীতি সুরে মধু মূর্ছনায়।
তুমি রাজো প্রতি নর্মে কর্মে—এ সত্যেরে
সে যে জানে, তাই দেখে আবির্ভাব তব ;
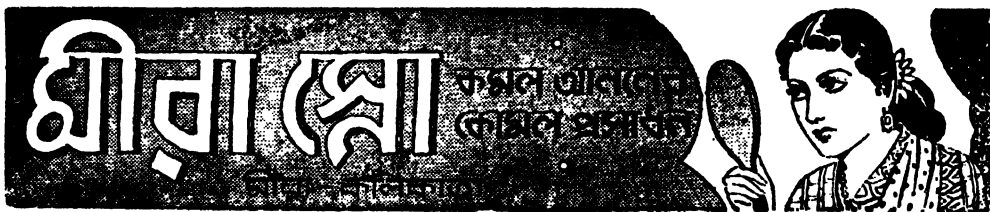
কভু শ্রীমণ্ডিনী উষা কপোল-সিন্দূরে
সলজ্জ আভায়, কভু বসন্ত পঞ্চমী
প্রভাতী হোলি খেলায়, প্রাণের রসোচ্ছ্বাসে,
কভু মধ্যাহ্নের দীপ্যমান অভ্যুত্থানে,
কভু সন্ধ্যা মরণের নিষণ্ণ চিতায়,
কভু লক্ষ নক্ষত্রের আরতি-লগনে
দৃষ্টি যবে পরিপূর্ণ স্বর্ণমৌন মাঝে
লভে এক অনির্বচনীয় ধ্যানদিশা
কৃতাঞ্জলিবন্দনায়।
আজ জন্মদিনে
এ-প্রার্থনা শ্রীচরণে : চেতনা আমার
তরুসম যেন অনন্তের প্রেমে তব
নীলাম্বর পানে মেলে প্রতি শাখা তার,
জাগরে স্বপনে সুখে দুঃখে, নিবেদিয়া
প্রতি বিকশন সম্ভাবনা—যারা রাজে
আফোটা কুঁড়ির রূপে, আধজাগা আলো
শিহরণরূপে, আধ-পাওয়া অন্তর্লীন
সুগন্ধ-সঙ্কেত-রূপে : যা কিছু আমার
আপন বলিয়া জানি—পারি বন্ধু যেন
সঁপিতে চরণে তব সম্পূর্ণ প্রণামে,
যত ভাষাহীন কৃতজ্ঞতা রাজে মনে
লভি তব বরাভয়—করুণার দান
পূর্ণিমা বিকাশ তার জীবন-সন্ধ্যায়
পারি যেন সাধিতে তোমার অভিষেকে
প্রশ্নহীন সর্তহীন সর্বনিবেদনে।
তাহলে লক্ষ্যের মুখে চলিব বল্লভ,
কাঁটাবনে অন্ধকারে হেরিয়া ফণীর
মণির আলোকে পথ—সর্ববাধা দলি'।
প্রসাদে তোমার নিত্য হে মহানুভব!
যে-অনল্প-অভীপ্সার প্রথম প্রদীপ
জ্বেলেছিলে তব স্নিগ্ধ আশিস শিখায়
আমার শৈশব প্রাণাধারে যেন তার
কৃতজ্ঞ আরতি পারি রাখিতে জ্বালায়ে
আমার প্রতিটি দীপে : যেন পারি নাথ
আমার প্রতিটি আশাভঙ্গ বেদনারে
দহিয়া রূপান্তরিতে সমবেদনায়
তাপ যত করি' আলো পারি সঞ্চারিতে
শত্রুমিত্র উদাসীন সবার মঙ্গলে—
আনন্দে নিরভিমান, গৌরবে গভীর।
আজ জন্মদিনে বন্ধু জাগে এ প্রার্থনা
উচ্ছল অন্তরে : আমি দাস, তুমি প্রভু
এ কথা স্মরণে যেন থাকে নিত্য-যত
ভক্তির প্রণাম পাই—যেন মনে রাখি
সে অর্ঘে আমার নাই লেশ অধিকার :
অন্তর মন্দিরে অভিমান পুরোহিত
কোনো ছলে যেন নাথ, না করে হরণ
দেবোদ্দিষ্ট উপচার। যত বিঘ্ন-বাধা
আসে তীর্থ-পথে দিনে দিনে—করে যেন
লক্ষ্য-স্পৃহা গাঢ়তর—নির্মল নিটোল
প্রণতির অঙ্গীকারে অকুণ্ঠ অম্লান
অহৈতুকী প্রেমোচ্ছল আত্মসমর্পণে।

পুণা, ২২শে জানুয়ারী, ১৯৫৭

ছুটির গান

অনুজা দেবী

প্রান্তরে মন ছুটেছে আজ প্রান্তরে
গান জেগেছে, জেগেছে গান অন্তরে
ব্যথার বকুল কী বলেছে তাই ভেবে
বল্ না হৃদয় আজকে তোমায় কী দেবে।

গান জেগেছে, জেগেছে গান অন্তরে
সূর্যমুখী হাওয়ার দোলায় বুক ভাঙে
প্রান্তরে মন ছুটেছে আজ প্রান্তরে
সরমপ্রিয় কোন্ সে বধূর মুখ রাঙে।

প্রান্তরে মন ছুটেছে আজ প্রান্তরে
আমার হৃদয় কোন্ সুরে আজ আশ্বাসে
গান জেগেছে, জেগেছে গান অন্তরে
কার পরশে জাগবো সে কোন্ বিশ্বাসে।

কাশির
মূলকারণ দূর
করুন

OF IMITATION
SIROLIN
'ROCHE'
for COUGHS COLDS
and all irritable and
inflamed conditions
of the Chest and
Respiratory Tract

র ঙ্গ প ট

অভয়ের বিয়ে

খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রযোজনাতেই দ্বিতীয়বার দেখা দিল অভয়ের বিয়ে। এক জ্যাঠামশাইয়ের এক ভ্যাবা মার্কা ভাইপো অভয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম-এস-সি পাশ করে কিন্তু মানুষ হয় না, জ্যাঠামশাইয়ের অতিরিক্ত সাবধানতায় সে শুধু বই-খাতাই চিনেছে, বহির্জগত সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর সে-ই যখন সংসারের মালিক হল তখন তো তুরীয় অবস্থা। জ্যাঠামশাই তাঁর পেহ্লাদ মার্কা ভাইপোর জন্যে বন্ধুকন্যা মায়াকে পাত্রী নির্বাচিতা করে গেলেন। মায়া শিক্ষিতা, আলোকপ্রাপ্তা—তার সংস্পর্শে এসে অভয়কে রীতিমত বিব্রত ও

শরৎচন্দ্রের "চন্দ্রনাথ"এর একটি দৃশ্যে মলিনা দেবী ও সুচিত্রা সেন

লজ্জিত হতে হয়—মায়ার পাণিপ্রার্থী অজয়। এই চক্রের মধ্যে দিয়ে মায়া ও তার পিসতুতো বোন সরমার কল্যাণে জড়তা ঘোচে অভয়ের ও পরে অভয়ের সঙ্গেই মায়ার বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হয়। —ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত শুধু গ্রন্থকারই নন, একজন অভিজ্ঞ আইনবিদও, (অর্থাৎ যুক্তি নিয়ে যাঁদের অহোরাত্র কারবার) তাঁর হাত দিয়ে এরকম যুক্তিহীন অন্তঃসারশূন্য এবং অদ্ভুত কাহিনী কি করে বেরোল তা বোঝাই যায় না। অভয়কে হাস্যাস্পদ করতে গিয়ে লেখক নিজেকেই যে আগাগোড়া হাস্যাস্পদ করে গেছেন এটা কি তিনি বুঝতে পারেন নি! জ্যাঠামশাইয়ের আদরে অভয় লোকের সঙ্গে মেশে না তাঁর চোখে-চোখেই থাকে—বেশ তো, বাস্তবজগতে এর বহু উদাহরণ আছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে ছেলেরা লাজুক হয় ও-রকম বাঁদর হয় না, ঘরকুনো হয় ঠিকই কিন্তু ওই রকম উল্লুক হয় কি? তার হাজার গণ্ডা স্যুট-পরা বন্ধুকে সে দেখছে আর নিজে ওই রকম সঙের মত স্যুট পরে হনুমান সাজছে—এ কি বিশ্বাসযোগ্য? অভয় নিজেও যথেষ্ট ধনী, তার বাড়ী প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ—কান্তিবাবুর বাড়ীর প্রাচুর্য দেখে ভড়কানো তার পক্ষে শোভা পায় না। বেবী ট্যাক্সির কি তখন প্রচলন ছিল? লক্ষ্ণৌতে যে সব পথের ছবি তোলা হয়েছে—রাস্তাগুলি ফাঁকা কেন? উত্তর প্রদেশের রাজধানীর রাজপথে লোক চলাচল নেই। মায়া ও সরমা তো দেখছি বাড়ীর মধ্যেও বেশ দামী জর্জেটের সাড়ী পরেই ঘুরে বেড়ায়। আর একটি অদ্ভুত জিনিষ চোখে পড়ল অভয়ের বাড়ী। বাইরে থেকে মনে হয় এ যেন একটি হানাবাড়ী—ভাড়া, জীর্ণ অথচ ভিতরে চাকচিক্যের বন্যাধারা—ঝকঝকে, তকতকে, সাজানো, গোছানো এ কি ডিটেকটিভ গল্প না কি? কান্তিবাবুর মত একজন বিচক্ষণ লোক অজয় বলল বলেই যথাসর্বস্ব বন্ধক দিয়ে বসলেন? কিন্তু সরমার চরিত্রটি আদর্শ বলে ধরে নিতে পারে, সরমার ত্যাগ সংযম শ্রদ্ধার বস্তু।

অভিনয়ে উত্তমকুমার যে পরিমাণ ছেলেমানুষী করেছেন তার জন্যে তাঁকে আমরা বিন্দুমাত্র দায়ী করব না,—চরিত্রটি যেভাবে বর্ণিত আছে তিনি সেই রূপটি সেই ভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন শুধু—একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব যে তাঁর এখনকার অভিনয়-প্রতিভা শুধু বাঙলাদেশ কেন সারা ভারতের গর্বের বস্তু। বিকাশ রায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও সুন্দর হয়েছে। প্রণতি ঘোষের অভিনয় সংযত এবং সাবলীল। ছবি বিশ্বাস জহর গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ এবং শোভা সেন শক্তির পরিচয়ই দিয়েছেন। অন্যান্যাংশে আছেন—প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হরেন, তুলসী চক্র, প্রীতি মজুমদার, ধীরাজ দাস, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুকুমার দাশগুপ্ত, আলোক-চিত্রে বিশু চক্রবর্তী এবং সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়।

ওগো শুনছ

উপরোক্ত ছবিটি সম্বন্ধে কোন কিছু বলার আগে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধা জানাই এর কাহিনীকার সম্প্রতি পরলোকগত সাহিত্যিক সাংবাদিক পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে—যাঁর কাহিনী অবলম্বন করে এম, কে, জি'র এই বর্তমান প্রচেষ্টা রূপলাভ করল—তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে এম, কে, জি কর্তৃপক্ষ ছবির আরম্ভে একটি প্লেট জুড়ে

দিয়েও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারলেন না—মনুষ্যত্ববোধের চমৎকার উদাহরণ! আপিসের বড়বাবু মনোহর স্ত্রী ললিতাকে নিয়ে বেশ সুখী, অপিসে মহিলা-সহকর্মী মানসীকে সে বোনের চোখে দেখে—তাকে পৌঁছে দেয় নিজের বাড়ীতে—ললিতার কানে কথাটা ওঠে অন্যরকম ভাবে। অশান্তির সূত্রপাত ললিতাও ওই অপিসে ঢোকে একটি পদে সমাসীনা হয়ে। তারপর নানারকম হাস্যকর ঘটনার মধ্যে দিয়ে পুনর্মিলন এবং মানসীর সঙ্গে শুভমিলন ঘটে অপিসের মালিক বোস মশায়ের শ্যালকের। এই শ্যালকটিকে দেখতে পাচ্ছি ভগিনীপতির অপিসে সে একরকম বেপরোয়া হয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিস দিচ্ছে, টেবিলে শুয়ে পড়ছে, গানের সুর ভাঁজছে, ভগিনীপতিরই হোক আর বাবারই হোক, কোন অপিসের মধ্যে এ জিনিষ কখনো সম্ভব? নিমন্ত্রিত অতিথিদের সরবতের মধ্যে সিদ্ধি খাওয়ানোয় কৌতুক থাকতে পারে কিন্তু ভদ্রতা বা শালীনতা থাকে না তবে—হয় না কি—তা বলছি না—হয় নিশ্চয়ই হয়—হয় কোথায়—হয় একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধুমহলে কিন্তু যেখানে ব্যাপক নিমন্ত্রণ সেখানে বিশেষ করে কোন শিক্ষিত সমাজে এ জিনিষ অসম্ভব। যে চিঠি নিয়ে ললিতা লঙ্কাকাণ্ড বাধালে সেটাই বা কি করে হয়? ললিতার মত মেয়ে সে তার স্বামীর হাতের লেখা চেনে না—একবার সে খতিয়ে দেখবে না যে কার হাতের লেখা দেখে সে ঐ লঙ্কাকাণ্ড বাধাচ্ছে? সবার শেষে মনোহর-ললিতা স্বামি-স্ত্রী বলেই যখন বোস মশায়ের সামনে পরিচিত হয়ে গেল তখনও শ্রীমতী বসু সন্দেহের চোখেই স্বামীকে দেখে এসেছেন—এটা না হলেই ভালো হোত। তখনও ঐ সন্দেহের চোখে দেখে আসায় একটু রসহানি ঘটে না কি? অভিনয়াংশে প্রায় সব শিল্পীই সুনিপুণ ভাবে স্ব স্ব চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন। এতে জহর গাঙ্গুলী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অতনুকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, নবদ্বীপ হালদার, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ হরেন, মঞ্জু দে, শোভা সেন, পদ্মা দেবী জয়শ্রী সেন, বাণী গাঙ্গুলী, সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিকা ঘোষ, ছবি রায়, শুক্লা দাস, ইরা চক্রবর্তী প্রভৃতি শিল্পীরা অভিনয় [illegible]

গঙ্গোপাধ্যায়; সঙ্গীত ও ক্যামেরার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে অনিল বাগচী ও গুপ্ত।

আমি বড় হব

বেশ কিছুকাল বাদে চলচ্চিত্র জগতে দেখা দিলেন শৈলজানন্দ। বাঙলার সাহিত্য ক্ষেত্রে শৈলজানন্দের অবদানের বিরাটত্ব সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই—চিত্রজগতও নানাভাবে একদিন পুষ্ট হয়েছে তাঁর কল্যাণে। শৈলজানন্দই বোধ করি প্রথমজন যিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাঙলাদেশের আভ্যন্তরীণ রূপকে ফুটিয়ে তোলেন সর্বসাধারণের সামনে। বাঙলা দেশের ভিতর বাড়ীর খবরাখবর বোধ হয় তাঁর আগের আর কোন পরিচালকের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। এ ছাড়া বিচিত্র চরিত্র-সৃষ্টিতে এবং

[illegible]

অভিনব সংলাপ যোজনায় তাঁর কুশলতা সর্বজনবিদিত। তাঁর পরিচালিত বর্তমান ছবিটির কাহিনী রচনায় তাঁর আবেগাশ্রয়ী মনই ধরা পড়েছে। "আমি বড় হব"র ভিত্তি-প্রস্তরই খোদিত হয়েছে আবেগ ও আদর্শকে কেন্দ্র করে। দয়াময় সু-উপার্জনে অক্ষম, কখনো মেয়ের বিয়ে, কখনো ছেলের পৈতে এই জাতীয় ভাঁওতা দিয়ে সে উপার্জন করে—তার বড় ছেলে দেবনাথ বিধবা শ্যালিকার কাছে থেকে সত্যিকারের মানুষের মতই মানুষ হচ্ছে, দয়াময় তাকে কেড়ে নিতে চায়—শ্যালিকা ঐ বাপের কাছে কিছুতেই তাকে দিতে চায় না। ছেলে রাণীগঞ্জে এক ব্যবসায়ীর বাড়ীতে থেকে পরীক্ষা দেয়—সেখানে সে যথেষ্ট অবাক হয়ে ওঠে তারপর ঘাত প্রতিঘাতপূর্ণ নানা ঘটনার পর দেবনাথের সঙ্গে ব্যবসায়ী-কন্যা অমলার শুভ-মিলন এবং সকলের সঙ্গে সকলেরই আনন্দময় মিলন ও মধুময় পরিসমাপ্তি। ছবিটিতে দেখলুম পথের প্রাধান্যই বেশী, অনেক কিছু ঘটনা পথেই ঘটেছে কিন্তু আশ্চর্য লাগল পথগুলিকে ফাঁকা ফাঁকা দেখে, পশ্চাৎপটগুলি যে কৃত্রিম তা সহজে ধরা যায়। একটা কথা বলব যে ছবিটি সর্বজন-উপভোগ ঠিকই এবং দর্শক সাধারণকে আনন্দও দেয় যথেষ্ট কিন্তু তবু বলব যে ছবিটি এখনকার দিনের উপযোগী নয়, এ ছবি যুগসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় অন্ততঃ পনেরো বছর পিছিয়ে আছে।

অভিনয়ে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন যশস্বী অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষ অভিনেতাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই আসন সংগ্রহ করে নিয়েছেন কালী বন্দ্যো—দয়াময়ের চরিত্র তাঁকে সেই আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করল। অপূর্ব সংবেদনশীল অভিনয়ে দর্শকমন আকৃষ্ট করে তোলেন শোভা সেন। জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় পরম হৃদয়গ্রাহী এবং মনকে নাড়া দিয়ে যায়। বিজু এবং হাসিকে আমরা প্রশংসাই করব এবং সেই সঙ্গে দু'জনকেই বলব নিজেদের অভিনয় প্রতিভা আরও উন্নততর করে তুলতে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, গৌর শী, বীরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সরযূবালা দেবী, অর্পণা দেবী, বহুকাল পরে শেফালিকা দেবী নৈপুণ্যের পরিচয়ই দিয়েছেন। এ ছাড়া অভিনয়াংশে আছেন জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ছবি মুখোপাধ্যায়, গোকুল মুখোপাধ্যায়, মনি শ্রীমানী, শ্যামল, বাবুয়া প্রভৃতি। ছবির পুস্তিকাটি যিনি সম্পাদনা করেছেন তাঁর উদ্দেশে বলি যে বইটিতে অনেক শিল্পীরই নামোল্লেখ নেই। যেমন বীরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শেখর চট্টোপাধ্যায়, গোকুল মুখোপাধ্যায়, ছবি মুখোপাধ্যায়—এ অনবধানতা ক্ষমা করা যায় না, সমগ্র বইটিতে শিল্পীর নামটাই বা পড়ে গেল, এ কি? ভবিষ্যতে এ বিষয়ে এঁদের সজাগ থাকতে অনুরোধ করি।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

১৩৬২ সালের বসুমতীর পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছি[ল] প্রবোধ সান্যালের উপন্যাস। নাম যার 'পুষ্পধনু'। পুষ্পধনু বর্তমা[নে] সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় চিত্রায়িত হচ্ছে। এতে রূপ দিচ্ছে[ন] উত্তমকুমার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, ভানু বন্দ্যোপাধ্যা[য়] অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ এবং নবাগতা মিস বারবা[রা] প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রাজেন সরকার। * * পৌরাণিক ছবি পরিচালনায় ফণী বর্মার খ্যাতি সুবিদিত। বর্তমা[নে] ইনি "দাতা কর্ণ" নামক একটি পৌরাণিক ছবির পরিচালনকা[র্যে] ব্যাপৃত। ধীরেন দের ক্যামেরায় ধরা পড়বেন কমল মিত্র, নীতি[শ] মুখোপাধ্যায়, মোহন ঘোষাল, অসীমকুমার, অরুণপ্রকাশ, মি[হি]র ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যা[য়] বুবি মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ তিলক, মলিনা দেবী, দীপ্তি রায়, তপ[তী] ঘোষ, অপর্ণা দেবী ও নবাগতা অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃ[তি] শিল্পিবর্গ। * * * 'বিভ্রান্ত' ছবিটি পরিচালনা করছেন [..] মুখোপাধ্যায়। এর চরিত্রগুলি ফুটে উঠছে পাহাড়ী সান্যাল, ক[..] বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অসিতবরণ, আশীষকুমার, সাবি[ত্রী] চট্টোপাধ্যায় এবং তপতী ঘোষের অভিনয়ে। * * * দিল[ীপ] মুখোপাধ্যায় পরিচালনা করেছেন 'জন্মতিথি' ছবিখানি। এই ছবি[র] আলোকচিত্রীর দায়িত্বভার সম্পন্ন করেছেন ধীরেন দে। এতে দে[খা] যাবে জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, বসন্ত চৌধুরী, অনুপকু[মার] প্রেমাংশু বসু, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, [..] লাহা, শ্রীমান্ বিভু, শ্রীমান্ বাবুয়া, মলিনা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্য[ায়] বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, মণিকা ঘোষ, রাজলক্ষ্মী নিভাননীকে। একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে বিপিন গুপ্তকে। * * * খগেন রায়ের রচিত ও পরিচালিত 'দ্বিচক্র' ছবিটিতে অভি[নয়] করছেন পাহাড়ী সান্যাল, রবীন মজুমদার, বীরেন চট্টোপাধ্য[ায়] অতনুকুমার, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত বসু, রেণুকা [..] এবং কাজরী গুহ ও আরো অনেকে।

এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে ভুবনেশ্বর মন্দিরের শ্রীশ্রীগণেশ-মূর্তির আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। আলোকচিত্র শ্রীপরিতোষ সেন কর্তৃক গৃহীত।

রাজায় রাজায়

উদয়ভানু

রাম-মশালের জোরালো আলোয় বজরার ছাদ উদ্ভাসিত হয়ে আছে। চলন্ত বজরা, দ্রুতগতিতে উত্তরপথে এগিয়ে চলেছে। মশালের চতুর্দ্দিকে পতঙ্গ উড়ছে, মৃত্যুর সম্ভাবনায়। শুক্লারজনী, অল্প অল্প মেঘের মাঝে মধ্যমণির মত চন্দ্রসভা বসেছে যেন। বৃহৎ গোলাকার চন্দ্রমণ্ডল সৌরাকাশে। অগণিত নক্ষত্র, কোনটি স্থির, কোনটি দপ দপ জ্বলছে ধুকধুকির মত, থরথর কাঁপনে। গঙ্গার অন্য তীরে, অনেক দূরের আকাশ থেকে হঠাৎ একটি তারা খ'সে পড়লো প্রায় বিদ্যুৎ-গতিতে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে তীব্রগতি উল্কাপাত দেখে মনে মনে গন্ধপুষ্পের নাম বলে আনন্দকুমারী। কেমন যেন শঙ্কাকুল চাউনি ফুটেছে চৌধুরাণীর চোখে। মনে মনে বলতে থাকে,—জাতী, চম্পক, সেঁউতী, মাধবী, কেতকী, পারুল, বকুল—

কাশীশঙ্করের দৃষ্টি গঙ্গার এক তীরে প্রসারিত। তিনি যেন সবিশেষ চিন্তামগ্ন। চক্ষু উন্মুক্ত, কিন্তু যেন দৃষ্টিশক্তিহীন। তীরে ঘন বনাঞ্চল, দিনমানেও আঁধার দেখায়। মনে হয় যেন অন্ধকারের প্রাচীর, সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে শত্রুর পথ আগলে। কুমারবাহাদুর হয়তো ভবিষ্যতের ভাবনায় ডুবে আছেন। রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী কি তবে চিরজন্মের মত স্বামিগৃহ ত্যাগ করবে! অসহায়ের মত একা-একা দিন কাটাবে! শয্যায় একাকিনী হবে!

—কুমারবাহাদুর, গড়মান্দারণে এখন রক্তারক্তি চলেছে, তা কি জানেন?

বস্ত্রাঞ্চলে আঙুল জড়াতে জড়াতে হঠাৎ যেন কথা বললে আনন্দকুমারী। একবার লজ্জাভরা চোখ তুলে তাকালো ভীত দৃষ্টিতে। বললে,—মান্দারণে খুনোখুনি চলেছে।

ধীরে ধীরে আসনপিঁড়িতে বসলেন কাশীশঙ্কর। সোনালী জরিদার তাকিয়া তুলে নিলেন কোলে। কপালে কয়েকটি ক্ষণপ্রকাশ রেখা ফুটলো তাঁর। কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন,—হাঁ চৌধুরাণী, আমার তা অজ্ঞাত নয়। আমি জানি। খানিক থেমে আবার বললেন,—সমগ্র বঙ্গদেশেই এই রক্তপাত চলেছে। ব্রাহ্মণবর্গ বৌদ্ধতন্ত্রকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। বুদ্ধের নাম লুপ্ত করতে চায়।

ঈষৎ হাসলো আনন্দকুমারী। ম্লান হাসির সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে বললে,—কেবল ব্রাহ্মণ নয়, হিন্দুমাত্রেই বুদ্ধের নামে ক্ষিপ্ত হয়। শ্রমণ দেখলেই অস্ত্র ধরে।

বাঁকানো ললাটরেখা সরল হয় না। কাশীশঙ্কর বললেন,—মান্দারণে বৌদ্ধ জনসংখ্যা কত?

—আমার সঠিক জানা নাই কুমারবাহাদুর! তবে বেশ কিছু [illegible]। [illegible] আছে। আঁচল আঙুলে জড়ায় আর কথা বলে আনন্দকুমারী। চোখের পলক তোলে না। আঁখি-তারা যেন নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ।

কাশীশঙ্কর মৃদু হাসলেন। বললেন,—ত্যাগ আর ভোগের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আর কি!

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো আনন্দকুমারী। বললে,—তবে আমার কোন ভয়ের কারণ নাই।

কৌতূহলের সঙ্গে কুমারবাহাদুর বললেন,—কেন? তুমি কি হিন্দুও নয়, বৌদ্ধও নয়?

অপ্রতিভ সুরে চৌধুরাণী বলে,—না না, পরিহাস করবেন না। বুকভরা শ্বাস নেয় সে। কয়েক মুহূর্ত থেমে থাকে। তারপর বলে,—আমার পিতাকে দুই দলেই মানে। তিনি নাকি পক্ষপাতশূন্য। দুই মতেরই পূজা করেন।

বজরার গতি উত্তরোত্তর যেন বেগময় হয়। হাল টানার জলজ ধ্বনি আরও যেন ঘন ঘন শোনা যায়। দড়ির বাঁধন আর হালকাঠের ঘষাঘষিতে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ ভাসে গঙ্গার বুকে।

কাশীশঙ্কর দু'দিকের তীর দেখতে থাকেন চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে। কালো আকাশে বিরল তারার মত তামস-তীরের এখানে-সেখানে ছাড়া ছাড়া অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। তপস্যার হোমানল জ্বলছে। তাই, হয়তো মাঝে মাঝে বাতাসে ঘৃতাহুতির গন্ধ ভাসছে। দগ্ধ চন্দন কাঠের তীব্র সৌরভ আসছে। মঙ্গলফলের আশায় পূজাযজ্ঞ চলেছে। সাধক আর সাধিকারা সিদ্ধিলাভ করছে।

—চৌধুরীমশায় বিচক্ষণ মানুষ, তাই তাঁর পরমতসহিষ্ণুতা আছে। কাশীশঙ্কর বললেন তীর থেকে চোখ ফিরিয়ে। বললেন,—যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্যং বিধীয়তে।

আনন্দকুমারী বললে,—ভিক্ষু আর শ্রমণরা দলে দলে বাঙলা ত্যাগ করছে। পুঁথি পাচার করছে তিব্বতে না কোথায়।

—মান্দারণে আমি অপরিচিত। কুমারবাহাদুর বললেন চাপা সুরে। বললেন,—আমার প্রতি যদি কোপ পড়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকদের? কেন না আমরা ঘোর শাক্ত। শক্তিতন্ত্রের পূজা করি, উপবীত ধারণ করেছি।

আনন্দকুমারী আনত দৃষ্টি তুললো। সগর্ব্বে ও সহাস্যে বললে,—এই চৌধুরাণী আপনার সহচরী থাকতে বৌদ্ধতান্ত্রিকরা ততটা সাহসী হবে না।

খানিক ভাবালু চোখে তাকিয়ে থাকেন কাশীশঙ্কর। ধীরে ধীরে বললেন,—আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে কি বৌদ্ধরা?

তাচ্ছিল্যের মৃদু হাসি হাসলো আনন্দকুমারী। হাসির জের টেনে বললে,—না না। কদাপি নয়। খড়্গ আর তরবারি তাদের সম্বল।

—তবে আমি ভীত নই। কাশীশঙ্কর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন। বললেন,—আমার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। আমি একাই শত্রুক আক্রমণকারীকে পর্য্যস্ত করতে পারি।

প্রতিকূল প্রবাহে বজরার গতি মধ্যে মধ্যে ব্যাহত হয়। মাঝির দল যেন হিমসিম খায় হাল টেনে টেনে, তবুও থামে না। লক্ষ্যে না পৌঁছে তারা যেন ক্ষান্ত হবে না।

মনের সঙ্গোপনে আতঙ্ক জাগে থেকে থেকে। আনন্দকুমারী শিউরে শিউরে ওঠে। ম্যালেটকে মনে পড়ে যখন তখন। কি দুর্দ্দান্ত দুঃসাহস তার! তার উদ্দেশ্য অসৎ, ম্যালেট নারীমাংসলোভী। চৌধুরাণী এক অবাঞ্ছিতের ইচ্ছা-অনলে নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে চায় না। এখন মনে পড়লে লজ্জায় অধোবদন হয় আনন্দকুমারী। ভয়ার্ত চোখে চেয়ে থাকে। ম্যালেটকে এখন কাছে পাওয়া যায় তো চৌধুরাণী সমুচিত শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু কোথায় ম্যালেট! সে এখন নাগালের বাইরে চলে গেছে।

পবিত্র গঙ্গাধারায় আস্নাতা, তবুও যেন মনের কলুষ-কালি ধৌত হয় না। আনন্দকুমারী এক সুপ্ত জ্বালায় জ্বলতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে। মনে মনে ভাবে, এই দেহ দগ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আর দোষমুক্ত হবে না।

—তুমি কোথায় যাবে চৌধুরাণী? সাগ্রহে শুধোলেন কুমার-বাহাদুর। বললেন,—তুমি কি স্বগৃহে যেতে চাও? সেখানে কি আশ্রয় মিলবে?

—ঈশ্বর জানেন কুমারবাহাদুর! হতাশ সুরে বললে চৌধুরাণী। বললে,—আমার অপরাধ কি তাই বলেন। আমি তো তখন নিরুপায়। ম্যালেটকে প্রতিরোধ করি, সে সামর্থ্য কোথায়।

—আমি বুঝি অনুমানে, তোমার অবস্থাটা কল্পনা করতে পারি! হেসে হেসে কাশীশঙ্কর বললেন। বললেন,—তোমার পিতামাতা কি তোমার জন্য তাঁদের সংস্কার ত্যাগ করতে পারবেন।

—জানি না কুমারবাহাদুর। তবে আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আমি চৌধুরী-গৃহের কৃপাপ্রার্থী নই। চৌধুরাণী দীপ্তকণ্ঠে কথা বলে যেন। বলে,—মান্দারণে আমার এক পরিচিত ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি নিশ্চয়ই দয়া করবেন। তাঁর চরণে ঠাঁই দেবেন।

—কে সেই ভাগ্যবান? কাশীশঙ্কর বললেন জিজ্ঞাসু সুরে। বললেন,—তিনি অবশ্যই একজন সজ্জন! উদার মনোবৃত্তির মানুষ।

—হাঁ সজ্জন, তবে জানি না বর্ত্তমানে কি তাঁর অভিলাষ। তাঁর মতের পরিবর্ত্তন হবে কি না তাও জানি না।

কি যেন বলতে চাইছেন কুমারবাহাদুর, অথচ মুখ ফুটে বলতে পারছেন না। ইতস্ততঃ বোধ করছেন হয়তো। তবুও বললেন,—চৌধুরাণী, তুমি যদি আমাদের সহ সুতানুটিতে যাও, ক্ষতি কি! বিন্ধ্য আর তুমি একত্রে থাকতে পারো দুই সহোদরার মত।

—আপনার প্রস্তাব খুবই সুখকর। এ জন্য কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই। আনন্দকুমারী কেমন যেন কাতর সুরে বললে। বললে,—তবে অন্যের সংসারে গলগ্রহ হ'তে চাই না আমি। আমার জন্য অশান্তির আগুন জ্বলবে না কি! আপনাদের পুরনারীরা আমাকে কি চক্ষে দেখবেন কে জানে!

কাশীশঙ্কর মিহিকণ্ঠে বললেন,—তোমার ঈপ্সিত জন যদি তোমাকে গ্রহণ না করেন?

ম্লানহাসির অস্ফুট আভাস দেখা দেয় আনন্দকুমারীর মুখে। হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। বললে,—তবে আর উপায় কি! মান্দারণে আমাকে ভিক্ষাবৃত্তিতে থাকতে হবে। ভিখারিণীকে সকলেই কৃপা করবে।

মুখে কথা যোগায় না কুমারবাহাদুরের। তিনি নিশ্চুপ ব'সে থাকেন। গভীর চিন্তায় মগ্ন যেন তিনি। বজরার আলো-উজ্জ্বল ছাদে এক নৈঃশব্দ বিরাজ করে। চৌধুরাণী আনত চোখে আঁচলের পাক দেয় আঙুলে। পাক দেয় আর খুলে ফেলে। তার চোখে ঘুমের আবেশ ফুটেছে। ক্লান্তি আর বিনিদ্রার জড়তা!

পূর্ণিমা আসন্ন, তাই রাত্রির আকাশে গ্রহাণুপুঞ্জের ছড়াছড়ি। দূরদিগন্তে সোনালী ছায়াপথ সৃষ্টি হয়েছে। কাশীশঙ্কর উর্দ্ধচোখে দেখেন, নীরব সাক্ষীর মত সংখ্যাতীত আকাশ-তারা, মিটি-মিটি দেখছে যেন। আর হাসছে কেঁপে কেঁপে। মধ্যরাতের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে উড়ু উড়ু। আনন্দকুমারীর কপালে রুক্ষকুন্তল থেকে থেকে চঞ্চল হয় নির্মল হাওয়ায়।

সর্দার-মাঝির হঠাৎ কথায় চৌধুরাণী যেন একবার চমকে উঠলো। আনত চোখ তুললো।

মাঝি হঠাৎ সরবে বললে,—রাজামশায়, বজরা গঙ্গা ছেড়ে আমোদর নদীতে যাবে ভোরের আগেই।

প্রসন্ন হাসি হাসলেন কুমারবাহাদুর। সহাস্যে বললেন,—সর্দ্দারজী, তুমিই এখন আমাদের রক্ষাকর্তা। সমুচিত পুরস্কার দেবো তোমাকে।

মাঝি বললে,—দু'দণ্ড ঘুমিয়ে লেন রাজামশায়। রাত ফুরুতে বিলম্ব আছে এখনও।

কাশীশঙ্কর বললেন,—আমার চক্ষু থেকে নিদ্রা দেবী পলায়ন করেছেন। নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না যে। বিন্ধ্যবাসিনীকে দেখতে না পাওয়া পর্য্যন্ত স্থির হ'তে পারি না।

সলাজ চাউনি তুললো আনন্দকুমারী। আঁচল ত্যাগ ক'রে বললে চুপি চুপি,—বিন্ধ্যর জন্য বৃথা চিন্তিত হবেন না, আমি যতক্ষণ আছি। আমার সাহায্যে বিন্ধ্যকে পাওয়া যাবে জানবেন।

বুকে যেন বল পান কাশীশঙ্কর। মনে সাহস। বললেন,—তবে দু'দণ্ড নিদ্রা ভোগ করা যাক। খানিক থেমে আবার বললেন,—আনন্দকুমারী, তুমি তোমার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় যাও, আমি ছাদেই থাকি। প্রহরী হই তোমার।

—আপনি যেমন বলেন তাই হোক।

কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো চৌধুরাণী। কেমন যেন বিদগ্ধ-চোখে কুমারবাহাদুরকে দেখলো কয়েক মুহূর্ত। বললে,—আপনি তবে বিশ্রাম করেন, আমি নীচে যাই।

—হাঁ হাঁ, বিশ্রামের প্রয়োজন আমাদের উভয়ের। কাশীশঙ্কর সানন্দে বললেন। বললেন,—নির্ভয়ে নিদ্রা যেও তুমি, দ্বিধা নাই কিছু।

—প্রণাম কুমারবাহাদুর! মৌখিক প্রণতি জানিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বজরার পাটাতনে নামতে থাকে আনন্দকুমারী। একবার চোখ ফিরিয়ে দেখে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ ক'রলো সে। কাশীশঙ্করের চোখে স্বপ্নের জড়িমা ছড়িয়ে দিয়ে গেল যেন।

জড়পুতুলের মত চুপচাপ ব'সে থাকেন কুমারবাহাদুর। আনন্দ সমুখে নাই, খেয়াল হয় না যেন। তাঁর মনে হয়, চৌধুরাণী এখনও যেন পূর্ব্ববৎ ব'সে আছে নতদৃষ্টিতে। অদৃশ্য হয়েছে সে, চোখের আড়ালে গেছে—তবুও যেন চোখে ভাসছে তার দেহ-অবয়ব। কর্ণকুহরে ভাসছে তার মধুমিষ্ট কথার সুর। মদিরার নেশার মত কুমারের চোখে যেন রূপের নেশা ধরে।

রাত্রি সার্দ্ধ-দ্বিপ্রহর। নদীর দুই তীরে ঝিল্লী ডাকছে অবিরাম। এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে দৃষ্টি যায় চৌধুরাণীর। বিস্মিত স্থিরনেত্রে কক্ষমধ্যস্থিত দীপালোকের প্রতিচ্ছায়া ফুটে ওঠে। সেই কক্ষে রাশি রাশি অস্ত্র। তীর, তরবারি, খড়্গ, ভল্ল, বর্শা, বর্ম্ম, ঢাল আর শৃঙ্খল। কয়েকটি ধনুক কক্ষের এক কোণে সজ্জিত।

অস্ত্রের আড়ৎ যেন। ক্ষীণ দীপালোকে চাকচিক্য খেলে লৌহসারে। আপন ধারে হাসছে তারা।

দেহ টলটলায়মান। বজরার বেগ দ্রুত। আনন্দকুমারী আর ক্ষণমাত্র দাঁড়াতে পারে না, শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে। শয্যার পাশে রূপার জলপাত্র। পানের ডিবা। গন্ধসার। চৌধুরাণী তার শরীরে যেন ব্যথা অনুভব করে, অনভ্যাস জল-সাঁতারের অঙ্গ-সঞ্চালনে। কক্ষে সে একা, পুরুষ-চোখের চাউনি নেই এখানে। লজ্জা নেই। ঝড়-ঝঞ্ঝার শেষে শান্ত-প্রকৃতির মত সে এখন। ম্যালেট যেন ঝড় বইয়ে দিয়ে গেছে। অশান্তির তুফান। চৌধুরাণীর ভবিষ্যৎকে বিপন্ন ক'রেছে সে। মান্দারণে ফিরে মুখ দেখাবে সে কি লজ্জায়! কোথায় ঠাঁই হয় কে জানে, ঘরে না পথে!

তপ্ত অশ্রুর দু'টি ধারা নামলো আনন্দর আঁখিপ্রান্ত থেকে। অতি দুঃখে যেন চোখ ফেটে জল ঝরলো সহসা। কিন্তু, এক বিধাতা জানেন, চিলের মত ছোঁ মেরে ম্যালেটই তাকে হরণ ক'রেছিল। সে নিরুপায়, অসহায়ের মত আত্মদান ক'রেছে। হয়তো বা মৃত্যুভয়ে।

বজরা দুলে দুলে উঠলো কার যেন পদাঘাতে। কে হয়তো চলাফেরা করছে যেন একদিকের পাটাতনে। কুমারবাহাদুরকে একা পেয়ে জগমোহন লেঠেল ছাদে উঠেছে।

নিশীথ-নদীর জল থেকে চোখ ফিরালেন কালীশঙ্কর। বললেন,—কে?

—আপনার দাস কুমারবাহাদুর। জগমোহন একটু যেন চাপা সুরে সাড়া দেয়।

—কিছু বক্তব্য আছে? কালীশঙ্কর কিঞ্চিৎ ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

—হাঁ, কথা আছে হুজুর! জগমোহন ব'সে পড়লো ফরাসের এক কিনারায়। কুমারের একখানি পা টেনে নেয়। বলে,—পদসেবা করি কুমারবাহাদুর।

অনিচ্ছার সঙ্গে যেন কালীশঙ্কর বলেন,—চলাফেরা নাই, শরীর-যন্ত্র বিকল হ'তে চায়। গ্রন্থিসমূহে কেমন যেন বেদনা অনুভব করি।

দুই সবল হাতের পেশনে কুমারের পদসেবা করতে থাকে জগমোহন। পা টিপে দেয় সযত্নে। হাত চালায় আর কথা বলে,—হুজুর, আমাদের মেয়ে উদ্ধার না হওয়া তক চৌধুরীর মেয়েকে যেন ছেড়ে না দেন। এই মেয়েটা সবই জানে। স্থিরবুদ্ধিশালিনী। সেও আমাকে এক প্রকার কথা দিয়েছে, বিন্ধ্যকে রক্ষা করবে বিপদ থেকে।

—কথা দিয়েছে মেয়েটা? আরেক বার শুধায় জগমোহন, সহাস্যে।

কুমারবাহাদুর বললেন,—হাঁ, কথা দিয়েছে। তবে চৌধুরীকন্যাও বিপদগ্রস্তা। সে-ও যাতে রক্ষা পায় তজ্জন্য আমিও সচেষ্ট হবো।

—সমাজপতিদের অমান্য করা যাবে কি! জগমোহন সন্দেহের সুরে বলে। হাত চালায় আর কথা বলে। বললে,—চৌধুরীর মেয়েকে ঘরে যদি না নেয়!

—দেখা যাক। কালীশঙ্কর কথার মধ্যপথে যেন থামলেন। তারপর কি ভেবে আবার বললেন মৃদুহাসির সঙ্গে,—আনন্দকুমারীর মনের মানুষ আছে মান্দারণে, কথায় কথায় জেনেছি আমি! শুনেছি সেটা একটা টুলো পণ্ডিত। জাতে ব্রাহ্মণ।

—তবে আর চিন্তা নাই আমার। জগমোহন চিন্তিত হয়ে থাকে যেন। বলে,—আমি ঠাওরেছি মেয়েটাকে হয়তো আপনিই—

—ছি ছি! তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লুপ্ত হয়েছে না কি? কুমারবাহাদুর ঈষৎ চোখ পাকিয়ে বললেন। বললেন,—আমি বিবাহিত, যোগ্যপত্নী আছে আমার সংসারে। অন্য নারীতে আসক্ত হওয়ার কোন কারণ নাই আমার। এমন কথা শোনামাত্র আমার গৃহিণী মহাশ্বেতা হয়তো দেহত্যাগ করবেন।

—তা বটে। তা বটে। জগমোহন বললে ফিসফিস কথা। বললে,—তবে হুজুর, মেয়েটার চোখে আমি লোভ দেখতে পেয়েছি। আমরা জেতে ছোট হ'তে পারি, চোখের দৃষ্টিতো হুজুর ছোট নয়। আপনার প্রতি চৌধুরীর মেয়ের—

মৃদুমন্দ হাসলেন কালীশঙ্কর। বললেন,—চুপ! চুপ! বাতাসে কথা ভাসে। কি কথা কার কাণে যায় কে বলতে পারে।

ফিসফিসিয়ে বললে জগমোহন, পদসেবায় ক্ষণেক বিরত হয়ে বললে,—সত্য বলুন কুমারবাহাদুর, আমার অনুমান মিথ্যা কি না?

আবার হাসলেন কুমারবাহাদুর। অস্ফুট, অল্প হাসি। বললেন,—চৌধুরীকন্যাকে আমিও পরীক্ষা করেছি, তার মন জেনেছি। মেয়েটার প্রকৃতি সরল, স্বভাব কিঞ্চিৎ চঞ্চল।

জগমোহন কথা বলতে ইতস্ততঃ করে। বলে,—হুজুর, আপনি কি চৌধুরীর মেয়েকে আপনার চরণে ঠাঁই দেবেন?

এপাশে ওপাশে মাথা দুলিয়ে কালীশঙ্কর বললেন,—না, না। তোমার ধারণা ঠিক নয়। আনন্দকুমারী আমাদের সহ মান্দারণে যাবে। তৎপর আমাদের করণীয় কিছু নাই। তার ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে।

স্বস্তির শ্বাস ফেললো জগমোহন। চিন্তামুক্তির প্রসন্নতা ফুটলো মুখে। তার শরীরের সমস্ত পেশীসমূহ যেন জেগে উঠতে থাকে; বক্ষ বিস্তারিত হয় ক্ষণে ক্ষণে। আর কোন কথা বলে না, পদসেবার কাজে লাগে হৃষ্টচিত্তে।

কুমারবাহাদুরের চোখে নিদ্রার আবেশ। আর যেন জেগে ব'সে থাকতে পারেন না। তাঁর বিশাল চোখ দু'টি মুদিত হয় ধীরে ধীরে। তন্দ্রাজড়িত কুমারের মুখে কথা শোনা যায় মিহি সুরে কালীশঙ্কর বললেন,—যদি নিদ্রামগ্ন হই, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমাকে

—যেমন হুকুম হবে হুজুর। জগমোহন সোৎসাহে কুমারের দেহ মর্দ্দন করতে করতে বললে।

ঘুম-জড়ানো সুরে কাশীশঙ্কর বললেন,—তোমার দৈহিক শক্তি দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে না কি! ঠিক মনে হয় আমার দেহে যেন হাত বুলাও তুমি। দলাই মলাই করবে কোথায়, তা নয়।

পরাজয়ের হাসি হাসলো জগমোহন। বললে,—সে কি কথা হুজুর! আমার দেহে যত শক্তি আছে সেই জোরেই তো সেবা করছি।

কাশীশঙ্কর বললেন,—তবুও আমার বোধ হয় না কেন? বোঝাই যায় না।

—মার্জ্জনা করেন কুমারবাহাদুর, আমার আর শক্তি নাই। জগমোহন সলজ্জায় বললে। বললে,—আপনার দেহ লোহার তুল্য হুজুর!

হয়তো নিদ্রায় ডুবে গেছেন কাশীশঙ্কর। তবুও হেসে হেসে কথা বললেন ঘুম-জড়ানো সুরে। বললেন,—শরীরচর্চা ত্যাগ করি নাই আমি। সপ্তাহে ক'টা দিন এখনও মল্লভূমিতে যাই। ক'টা পালোয়ানের সহ লড়ালড়ি করতে হয়।

—আমি তা জানি কুমারবাহাদুর। জগমোহন পরাস্ত ভঙ্গীতে বললে,—আপনার দেহের গঠন দেখলেই ধরা যায়।

লেঠেল জগমোহনের কথা কানে যায় কি না যায়। কাশীশঙ্করের নাসিকা গর্জ্জাতে থাকে সহসা। তিনি গভীর নিদ্রায় ডুবে যান ক্ষণিকের মধ্যে।

নীচের কক্ষে একজনের চোখে কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। সে আনন্দকুমারী। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে চৌধুরাণী তবুও জেগে থাকে। জ্যোৎস্না-ধবল আকাশে চোখ তুলে চেয়ে থাকে। বজরার জানলা উন্মুক্ত। দাঁড়ী-মাঝিদের হাল টানার শব্দটা যেন প্রকট হয়ে কানে বাজে। দড়ি আর বাঁশের সংঘর্ষের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ।

আনন্দকুমারী বিপন্মুক্ত, তবুও মাঝে মাঝে তার বক্ষ দুরু দুরু করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিমশীতল হয়। সমাজের ভয়, সমাজপতিদের রোষদৃষ্টি আর শাস্তি-শাসন, আত্মজনদের কটূক্তি—চৌধুরাণীর চোখের চাউনি স্থির হয়ে থাকে আকাশে। আশঙ্কার ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলে যেন বক্ষমাঝে। ভয় ভয় করে —যদি সমাজ স্থান না দেয়। অগ্নি-পরীক্ষায় যাচিয়ে নিক সমাজ, সেই ভাল হয়। চৌধুরাণী রাজী আছে। আপত্তি জানাবে না কখনও।

চন্দ্রকান্ত ব্রাহ্মণের প্রতি মনে মনে বিরক্ত হয় আনন্দকুমারী। তাঁর প্রতি কি এক জাতক্রোধে প্রতিহিংসা গ্রহণের স্পৃহা জাগে যেন মনে।

বজরার গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দকুমারীর বক্ষস্পন্দনও যেন দ্রুততর হ'তে থাকে। দুশ্চিন্তা নিদ্রাকে গ্রাস করে। কণ্টকহীন শয্যা, তবু ঘুম নেই চোখে। দৈহিক ক্লান্তিতে শুধু নিশ্চুপ সে। জ্বররোগের পর যেমন দেহ ঝিমিয়ে থাকে।

মাঝি আর মাল্লাদের ছেঁড়া ছেঁড়া কথা, জলে হালচালনার ছপাছপ শব্দ, দুই তীরভূমিতে ঝিল্লীর ডাকাডাকি—গভীর রাত্রির জ্যোৎস্নালোকিত রূপ দেখেও ভীতা হয় যেন আনন্দকুমারী।

নাসিকা গর্জ্জনের ক্ষণকাল পরেই জগমোহন কুমারবাহাদুরের পদসেবায় বিরত হয়। পাছে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হয় সেজন্য পা টিপে টিপে ছাদ থেকে নীচে নামলো সে। কৌতূহলের বশে একবার সন্ধানী-চোখে দেখলো বজরার কক্ষমধ্যে। স্তিমিত দীপালোকে দেখলো যে, শুভ্র শয্যায় কে যেন রাশি রাশি শ্বেতপুষ্প ঢেলেছে। শয্যায় শয়ানা চৌধুরাণী যেন এক স্থির-শোভা। দেখতে দেখতে জগমোহনের মত কঠিন মানুষও চোখ ফিরাতে পারে না। জ্ঞানশূন্য বিমুগ্ধের মত স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে।

আনন্দকুমারী নিদ্রা যায়নি। নিমীলিত চক্ষে গাঢ় চিন্তায় কি যেন ভাবছে। গভীর রাত্রির মত তার চিন্তারাশিও মস্তিষ্কে ঘনীভূত হ'তে থাকে। বিনিদ্রায় ও মুদিত চক্ষে নিজের অবস্থা চিন্তা করে হয়তো। বুকে হয়তো তার আগুন জ্বলছে। ভয় আর ভাবনায় সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে আছে।

সিঁড়ির ধাপে ব'সে পড়লো জগমোহন। ঘুমে তার চক্ষু আর মুক্ত থাকতে চায় না। তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে জঙ্গলাকীর্ণ বিরল বসতির গড়-মান্দারণ। দু' কূল প্লাবিত খরস্রোতা আমোদর নদীর তীরে বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গতোরণ দণ্ডায়মান। দুর্গের পাদমূল নদীর গর্ভে নিমজ্জিত। কিন্তু দুর্গ না কি জনশূন্য—পশু আর পক্ষীর আবাসে পরিণত। দুর্গ-প্রাচীরে বট আর অশথের চারা, বন্য আগাছার আস্তরণ। দুর্গতোরণ ভগ্ন হওয়ায় দুর্গের রূপ যেন আরও ভীতিপ্রদ দেখায়। পরিত্যক্ত বাস্তুগৃহসমূহে শৃগাল আর কুকুরের আস্তানা।

কিন্তু মান্দারণ-বাসিনী বিন্ধ্যবাসিনী যেন ভয়লেশহীন।

যে-দেশে মনুষ্যের বাস দিনে দিনে লুপ্ত হ'তে চলেছে, সেখানে রাজকুমারী পরম নিশ্চিন্তায় কালাতিপাত করেছেন। তিনি যেন হিংস্র পশুকে পরোয়া করেন না, সর্প-বিষকে ভয় করেন না, দুর্বৃত্ত দস্যুদানবকেও মানেন না।

তিনিও জাগরূক। তাঁরও চোখে ঘুমের চিহ্ন নেই। জাজ্বল্যমান বাতির আলো তাঁর দুই পাশে। সম্মুখেও একটি বাতি জ্বলছে।

ঘুম নামে না চোখে; তাই রাজকন্যা লিখনকার্য্যে ব্যাপৃতা। তাঁর হাতে লেখনী। একাগ্রচিত্তে বিন্ধ্যবাসিনী শাস্ত্রপুঁথি নকল করছেন পাতার পর পাতা। শুভ্র তুলট কাগজ ক্ষণমধ্যে কৃষ্ণকালির আখরে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

জ্বলন্ত বাতির আশপাশে কীটপতঙ্গের জটলা। অগ্নিদগ্ধ হ'তে চায় উড়ন্ত কীট। আগুনের দাহিকায় আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে চায়।

—রাজকুমারী!

নিঃশব্দ রাত্রির মৌনতা সহসা ভঙ্গ হয়। কিন্তু রাজকন্যার একাগ্র মনোনিবেশ টুটলো না। বিন্ধ্যবাসিনী পূর্ব্ববৎ লিখনকার্য্যেই রত থাকেন।

আহ্বানকারী পুনরায় ধীরকণ্ঠে ডাকলো,—রাজকন্যা! রাজকুমারী!

এই গহন রাতে এই ভগ্নপুরীতে কোন প্রেতাত্মা ব্যতীত কে আর কথা বলবে! তাও পুরুষকণ্ঠের সন্ত্রস্ত আহ্বান।

বিন্ধ্যবাসিনী ধারণা করেন হয়তো পাঠানপ্রহরী প্রহরার কাজে ক্লান্ত হয়ে অন্দরে এসেছে, কিছু বক্তব্য আছে তার। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের কর্ণেন্দ্রিয়কে অবিশ্বাস করেন। পাঠানের কণ্ঠস্বর কি এতই শ্রুতিমধুর! পাঠানের কথার সুর কর্কশ, কণ্ঠ যেন গর্দ্দভনিন্দিত।

রাজকন্যা তিলমাত্র বিচলিত হন না। লেখনীও থামে না। যদিও মনে মনে আশঙ্কিত হতে থাকেন। পরিচারিকা অন্য ঘরে ঘোর নিদ্রামগ্না।

আবার ডাক শোনা যায়।—রাজকন্যা!

—কে? বিস্ফারিত চোখের প্রসারিত দৃষ্টি ফিরিয়ে বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—কে তুমি? পরিচয় না জানা পর্য্যন্ত সাড়া দিতে পারি না।

কক্ষের বাহিরে অদৃশ্য কে যেন, কথা বলছে অপরিচিত সুরে। আবার তার কথা শোনা যায়। সে বলে,—রাজকুমারী, আমি চন্দ্রকান্ত।

চন্দ্রকান্ত! অস্ফুটে এই নামটি সবিস্ময়ে উচ্চারণ করেন বিন্ধ্যবাসিনী। মস্যাপাত্রে লেখনী স্থাপিত ক'রে পরিধেয় বস্ত্র বিন্যস্ত করেন ঊর্দ্ধদেহে। কেমন যেন সলজ্জায় আসন ত্যাগ করলেন। মাথায় গুণ্ঠন টেনে উঠে দাঁড়ালেন। মৃদুকণ্ঠে বললেন—আপনি এই অসময়ে কেন আবার কষ্ট করলেন? কোন বিপদের আশঙ্কা আছে কি?

—হাঁ, তা আছে বৈ কি। চন্দ্রকান্ত অন্ধকারেই থাকেন, কথা বলেন। আত্ম-প্রকাশ করেন না। আলোর আভায়! বললেন,—শুনলাম, বাঙলার নবাবের সমীপে একজন দূতকে পাঠিয়েছেন। চন্দ্রকান্ত হয়তো পথশ্রমে শ্রান্ত। খানিক থেমে আবার বললেন,—তাঁর কন্যাহরণের ষড়যন্ত্রে আপনার ও আমার নামও যুক্ত করেছেন।

—আমার দুর্ভাগ্য আর কি!

অবিন্যস্ত বস্ত্র ঠিকঠাক করতে করতে কথা বললেন রাজকুমারী, বিষণ্ণ কণ্ঠে। বললেন,—আমার অপরাধ কি তাই শুনি?

—তা আমার অজ্ঞাত। চন্দ্রকান্ত ধীরে ধীরে বললেন। অন্ধকারে থেকেই বললেন,—মিথ্যা অভিযোগ লিখানো হয়েছে কোতোয়ালে। নগররক্ষক শুনা যায় হিন্দুবিদ্বেষী, তজ্জন্যই ভয়। বর্ত্তমানে নগররক্ষকের কার্য্যে একজন মুগলকে নিযুক্ত করেছেন বঙ্গের নবাব।

—আমি তো নিরূপায়। বললেন রাজকুমারী, কাঁপা-কাঁপা সুরে। বললেন,—যাই হোক, এখন রক্ষা পাওয়ার কি উপায় তাই বলুন। আত্মহত্যায় কি রেহাই পাওয়া যাবে?

চন্দ্রকান্ত আর কথা বলেন না। দর-দালানে দাঁড়িয়ে থাকেন অপরাধীর মত।

রাজকুমারী বললেন,—আপনি কক্ষে প্রবেশ করুন। আমার অনুরোধ, দ্বিধার কিছু নাই।

—বিনা অনুমতিতে কক্ষ-প্রবেশে সাহসী হই না। চন্দ্রকান্ত ক্লান্ত সুরে বললেন। কথার শেষে দ্বারে দেখা দিলেন। রাজকন্যা আড়নয়নে দেখলেন, ব্রাহ্মণ সত্যই পথশ্রান্ত। ভয়ের আবেগ তার মুখাবয়বে। চোখে চিন্তাকুল চাউনি।

গুণ্ঠন ঈষৎ টেনে কথা বলেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—যা সত্য তা কি মিথ্যা হয়? ভিত্তিহীন অভিযোগের মূল্য কি?

—নগররক্ষক সজ্জন নয়। যে-কোন অছিলায় আমাদের ব্যতিব্যস্ত করতে পারে। বিপদে ঠেলতে পারে। তাই যত আশঙ্কা আমার। কথা বলতে বলতে চন্দ্রকান্তর শ্বাস রুদ্ধ হয় যেন।

যৌবন টলমল করছে। সৌন্দর্য্য প্রভাপ্রাচুর্য্যে প্রদীপ্ত মূর্তি রাজকন্যার। যদিও অবহেলা ও অনাসক্তিতে বিন্ধ্যবাসিনীর রূপ বর্তমানে কিঞ্চিৎ ম্লান। চূর্ণ অলকগুচ্ছে আবৃত রাজকন্যার মুখখানি চন্দ্রকান্তর নজরে পড়ে না। কি যেন লজ্জায় বিন্ধ্যবাসিনী অলকগুচ্ছ বক্ষ'পরে নামিয়ে দিলেন।

—আমার মৃত্যুই মঙ্গলের। স্বগতঃ করলেন রাজকুমারী, সকাতরে।—বৃথা বিড়ম্বনা আর সহ্য হয় না। অকারণ দোষারোপ আমার প্রতি কেন?

—কিংকর্তব্য রাজকন্যা? চন্দ্রকান্ত মৃদুকণ্ঠে শুধোলেন। আমি বলি এই গ্রাম ত্যাগ করাই উচিত।

—বিচারবোধ নাই আর আমার। মৃত্যু ছাড়া গতি দেখি না। কথা বলতে বলতে বিন্ধ্যবাসিনী আঁখিপ্রান্ত আঁচলে মুছলেন! বললেন,—সপ্তগ্রামে এই সকল ভিত্তিহীন সংবাদ যায় তো আপদের অন্ত থাকবে না। তিনি আর রক্ষা রাখবেন না।

চোখাচোখি হ'তেই ইশারায় ডাকলেন চন্দ্রকান্ত। মুখে যেন তার অনুরোধের ভঙ্গিমা। তাঁর আহ্বান-ইঙ্গিতে সাড়া দেওয়া

ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হলেন। রাজকন্যার মুখে-চোখে যেন সম্মোহিতার ভাবাবেগ।

চন্দ্রকান্ত দুঃখের হাসি হাসলেন যেন। রাজকুমারী কাছে আসতেই সন্ত্রাসে ইদিক-সিদিক দেখলেন যেন। তারপর বিন্ধ্যবাসিনীর একখানি নধর-নরম হাত নিজ করে ধারণ করলেন। ফিস-ফিস বললেন—আমার সহ আইস। কথায় কথায় পরিচারিকা যদি জাগ্রত হয়!

—কোথায় যাবো? আবেশ-আকুল কণ্ঠে বললেন রাজকন্যা। বললেন,—মরণের পথে কি?

ক্ষীণ হাসির সঙ্গে চন্দ্রকান্ত বললেন,—না। এখানে বাতির আলো, পার্শ্বকক্ষ অন্ধকার।

কথা বলতে বলতে ব্রাহ্মণ সেই আঁধার ঘরে প্রবেশ করলেন। রাজকুমারীও বন্দিনীর মত তাঁকে অনুসরণ করলেন। ব্রাহ্মণ আবার বললেন,—উষার আলো ফুটুক, তারপর যা হয় একটা স্থির করা যাবে।

বিন্ধ্যবাসিনীর আত্মজ্ঞান যেন লোপ পেয়েছে। মুখের কথা হারিয়েছেন। চন্দ্রকান্তর করচাপে তাঁর হাত পিষ্ট হতে থাকে।

রুদ্ধশ্বাসে ও ভয়ে ভয়ে রাজকন্যা বললেন,—আমি ভীতা হই, পরিচারিকা যদি সহসা জেগে ওঠে।

চন্দ্রকান্তর আকর্ষণ যেন চাঁদের মতই। তিনি রাজকন্যার অন্য হাতও নিজ হস্তে ধারণ করলেন। চুপি চুপি বললেন,—আমার দুঃসাহস মার্জ্জনীয়। শত বিপদেও কেন যে আমার মানস চক্ষু প্রবোধ মানে না কি জানি! অসংযম আজ আমার মনকে অধিকার করেছে।

রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী যেন নীরব নিস্পন্দ। দুরু দুরু বক্ষ, ঘন ঘন শ্বাসপতন হয় সশব্দে। জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারে একবার ইচ্ছা হয়, এই কক্ষ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, এই মুহূর্তে। পদচারণায় সচেষ্ট হন রাজকুমারী, কিন্তু তাঁর গতি বাধা পায়। দিব্যজ্ঞান লুপ্ত হলেও অনুভবে বোঝেন, তিনি যেন কার বাহুপাশে আবদ্ধ।

বৈশাখী-রাতের এলোমেলো মত্ত-বাতাস চলেছে বাইরে, শনশনিয়ে। রাত্রির নিস্তব্ধতায় আমোদরের প্রবাহধ্বনি ভেসে আসছে। শুক্লাতিথির চন্দ্রাকর্ষণে নদী যেন আজ উর্দ্ধগামী। চাঁদের দিকে মাথা তুলছে জলকল্লোল। প্রগল্ভার খিল-খিল হাসির মত জলের ধারা সশব্দে এগিয়ে চলেছে।

মুক্তির আশায় বিন্ধ্যবাসিনী আরেকবার যেন উন্মুখ হয়ে ওঠেন। কিন্তু বাহুবন্ধন কত যে কঠোর! বৃথা চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজকন্যা। অনুমানে বুঝলেন, মুক্তি নেই। পুরুষের কাছে নারীর মুক্তি কোথায়? [ক্রমশঃ।

গৃহবিচ্ছেদ ও সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট

"গৃহবিচ্ছেদ যে নিতান্ত নৈসর্গিক তাহা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়াও সহজ কর্ম্ম নহে। সমুদায় পরিবার প্রায় সদ্গুণসম্পন্ন হয় না; পরিবারের মধ্যে কেহ বা ভাল, কেহ বা মন্দ। ভাল-মন্দে সুন্দর রূপ মিল হয় না; মন্দে মন্দে কখনই মিল হয় না। কখনও কখনও গুণবানদিগেরও পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। যেহেতু, গুণ নানা প্রকার, কেহ বা এক গুণের সাতিশয় পক্ষপাতী হইয়া অন্য গুণের যৎপরোনাস্তি দ্বেষ করে, কেহ বা অন্যবিদ্বিষ্ট গুণের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠে। তখন তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য থাকিবার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, যে সকল পিতা-মাতা সম্মান ও সমাদরের উপযুক্ত, তাঁহাদিগের পুরস্কারও হইয়া থাকে। যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া ন্যায়ানুগত পথে চলিতে পারেন, তাঁহাকে কেহ কখনও ঘৃণা বা অনাদর করে না।"

"সংসারাশ্রমে অনেক প্রকার দুঃখ ও কষ্ট আছে। কতকগুলি লোক ভৃত্যের অধীন। ভৃত্যের উপর বিশ্বাস করিয়া সকল কার্য্যের ভার দেন, ভৃত্য যাহা করে তাহাই হয়। কতকগুলি লোককে ধনবান জ্ঞাতি-কুটুম্বের ইচ্ছামাত্রের উপর নির্ভর করিয়া কালক্ষেপ করিতে হয়। তাঁহারা সেই জ্ঞাতি-কুটুম্বকে সন্তুষ্ট করিতেও পারেন না, রুষ্ট ও বিরক্ত করিতেও তাঁহাদিগের সাহস হয় না। এমন অনেক স্বামী আছেন তাঁহারা কেবল হুকুম খাটাইতে চাহেন, এমন অনেক পত্নী আছেন তাঁহারা স্বামীর একটি কথাও গ্রাহ্য করেন না। এই ভূমণ্ডলে অনায়াসেই লোকের মন্দ করা যায়, কিন্তু ভাল করা সহজ কর্ম্ম নয়। একজনের সুবুদ্ধিতে ও সদ্গুণে অনেকে সুখী হইতে পারে না, কিন্তু একজনের মূর্খতাদোষে ও পাপে অনেকেই অসুখী ও বিষম দুরবস্থাপন্ন হইয়া উঠে।"—তারাশঙ্কর তর্করত্ন অনূদিত জনসন প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "রাসেলাস" গ্রন্থ হইতে। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ২৫এ ভাদ্র, সংবৎ ১৯১৪।

স্পেনসার সুব্রত দত্ত

যা কখনও কোরব না, পণ করেছিলাম, তাই ক'রতে হোল। বিয়ে নয়—চাকরী। আমাদের দেশের আইবুড়ো ছেলেরা পণ করে বিয়ে কোরব না। কিন্তু লণ্ডনে এসে পণ করে বসলাম যে চাকরী কোরব না। কিন্তু চাকরী করতে হোল। নতুন আর কি? পণ করি সকলে। পণ ভাঙিও সকলে।

ভারত সরকারের ষ্টার্লিং তহবিলে ঘাটতি। বিলেতে টাকা আনাতে যথেষ্ট হাঙ্গামা দেখা দিল। ভাবলাম—ভালই হোল। দেশের টাকা তো অনেক খরচ করলাম। এবারে কিছু উপার্জন করি।

ব্যারিষ্টারী পড়ছিলাম—মানে 'বার' করছিলাম। টাইপটা জানা ছিল। কাজ পেলাম অতি সহজেই। এত সহজে কিন্তু এদেশে সকলের কাজ জোটে না।

বিলিতি অফিস। এর আগে কিছু ইংরেজের সংগে আলাপ হয়েছিল। কিন্তু তা ত দানা বাঁধেনি। ভাবলাম হয়তো নতুন কিছু অভিজ্ঞতা হবে। কিন্তু এক মাস কাজ হবার পরেও কোন অভিজ্ঞতাই হোল না। আলাপ হোল না বিশেষ। ইংরেজ জাত বড় 'কোল্ড'।

'সামার' এসে গেল—বহু প্রত্যাশিত 'সামার'। এরা যেমন ক্রিসমাসের জন্য দিন গোণে, তেমনি দিন গোণে 'সামার-হলিডের' জন্য। দু' সপ্তাহ লম্বা ছুটি। এরা তখন সকলে বেরিয়ে পড়বে। আর কোথাও না যাক লণ্ডনের কাছাকাছি, আইল অফ ওয়াইট যাবেই, যেমন কোলকাতার লোকেরা পুজোর ছুটিতে মধুপুর বেড়াতে যায়। যে ব্লকে কাজ করতাম, সেই ব্লকেই অন্য এক ঘরে সামার হলিডের জন্য লোকাভাব হওয়ায় আমার কাজ বদল হোল। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে।

লেসলি থারগুডের সংগে এখানেই আলাপ। আমাদের ঘরটা বেশ বড়। ছ'টা বড় বড় টেবল পাতা। আর সেই ঘরেরই এক কোণে পার্টিসান দেওয়া ছোট্ট জায়গায় সুইচ-বোর্ড। লেসলি টেলিফোন অপারেটর। ঘরের আর এক প্রান্তে টাইপরাইটার নিয়ে কাজ করে যাই। অন্য লোকের আলোচনা মাঝে মাঝে শুনি। মাঝে মাঝে শুনি না। ওরা কাজ করে। কাজের ফাঁকে কখনও গল্প করে, হাসিঠাট্টা করে। আমি তাতে যোগ দিই না, লেসলিও দেয় না। এইখানেই আমাদের দু'জনের মিল।

এ ঘরে আমার প্রথম দিনই—লাঞ্চের একটু আগে আমার মনিব ডাকলো, বললাম, কী ব্যাপার?

তোমাকে লাঞ্চ আওয়ারে এক ঘণ্টা সুইচবোর্ডে বসতে হবে—যখন মিঃ থারগুড থাকবে না।

কিন্তু আমি যে টেলিফোনের কিছু বুঝি না, ভয়ে ভয়ে বললাম।

ও খুব সোজা ব্যাপার। তোমাকে মিঃ থারগুড বুঝিয়ে দেবে—আর এ কাজ তোমারই, এ ঘরে যে টাইপিষ্ট থাকে এটা তার কাজ।

কোনও মতামত প্রকাশ করলাম না। কারণ লাভ নেই তাতে। কাজের প্রসংগে থারগুডের সংগে আলাপ হোল। এবং প্রথম আলাপে অবাক হলাম—ওর কথা শুনে। মৌখিক আলাপের পরই লেসলি বললে—তোমার উচ্চারণ শুনে বোঝা যায় তুমি বিদেশী। কন্টিনেন্টের কোথায় তোমার বাড়ী? নিজের গায়ের রং-এর দিকে তাকালাম। ভাবলাম রসিকতা করছে না তো? এ আবার কেমন রসিকতা? কিন্তু হঠাৎ কোণের দিকে নজর পড়লো। সাদা লাঠি। এ দেশের অন্ধ বা যারা প্রায় অন্ধ—তারা ব্যবহার করে। ঐ সাদা লাঠিই তাদের চিনিয়ে দেয়। বুঝলাম—লেসলি প্রায় অন্ধ, ওর প্রশ্নের উত্তরে বললাম—আমি পুব দেশের লোক—ভারতীয়।

লেসলি আর কিছু প্রশ্ন কোরল না। আমাকে কাজ বুঝোতে লাগলো। কিছুই বুঝলাম না। এবং সেটা আমার দোষে নয়। ওর দোষে। ভাল করে কাজ বুঝোতেই পারলো না। একটু পরেই সাদা-লাঠি হাতে নিয়ে ম্যাক পরে বেরিয়ে গেল। আমি বসলাম সুইচবোর্ডে। কিছুক্ষণের মধ্যে সারা ব্লকের লোক ভেঙে পড়লো আমাদের ঘরে।

হৈ-চৈ—সকলেরই এক কথা। টেলিফোন বিভ্রাট। কে দশ মিনিট লাইন চেয়ে পাচ্ছে না—কে মিনিষ্ট্রী অফ হেলথের সংগে জরুরী আলোচনা করছিল—দু'বার তার লাইন কাটা গেছে এই সব। সামনের চেয়ারে বসে থাকা ইহুদী মেয়ে মিস ফ্রিডেনবার্গ উঠে বললে—মিঃ বোস নতুন লোক। আজই প্রথম।—সকলে হাসতে হাসতে চলে গেল। আমি বসে ঘামতে লাগলাম। একটু পরেই লেসলি আসাতে আমি গেলাম লাঞ্চ খেতে।

দুই

লেসলির চেহারায় কোন স্বকীয়তা নেই। বয়সও অনুমান করা যায় না। ওর সংগে আলাপ করার আগ্রহ মোটেই ছিল না। কিন্তু আলাপ হয়ে গেল। আমার 'অফিসিয়াল আওয়ার' পাকা চাকুরেদের চেয়ে সপ্তাহে এক ঘণ্টা বেশী। আমার কাজ পাকা নয়—এ জন্য সোম থেকে বৃহস্পতি প্রতিদিন পনের মিনিট বেশী থাকতে হয়। লেসলিও থাকে এই সময়ে। টেলিফোন অপারেটরের এক ঘণ্টা বেশী।

দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে একদিন পাঁচটার সময় আমার বেয়োয়ার
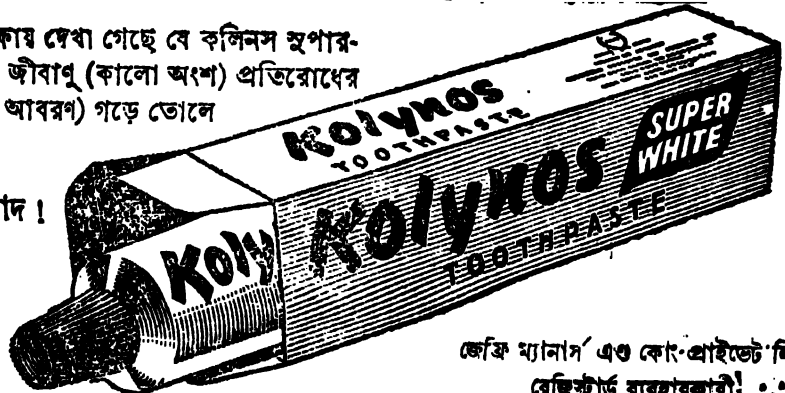
প্রয়োজন হোল। ছুটি আমার সওয়া পাঁচে। ভাবলাম লাঞ্চ আওয়ারের পরে 'বসের' অনুমতি নিয়ে রাখবো। কিন্তু কপাল দোষে লাঞ্চ আওয়ারের পরে 'বস' আর ঘরে এলো না। পাঁচটা বাজার সংগে সংগেই ঘরের আর সকলে বেরিয়ে যায়। সামার-টাইম। ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে অফিসের বাবুরা যতদূর সম্ভব সূর্যের আলো পায়। এরা এক মুহূর্ত ঘরে থাকে না। চক্ষের নিমিষে নগর মথুরা। আমিও প্রায় এদের সংগে সংগেই 'চীয়ারিও' বলে বেরিয়ে এলাম। তার পরদিন সকালে লেসলি আসার সংগে সংগেই আমাকে বললে—ভাল হয়েছে, তুমি মিঃ কার্ণার আসার আগে এসেছ।

কেন, 'বস' কি কোনও কিছু রেখে গেছে? বললাম।

তুমি গতকাল বেরোবার সংগে সংগেই মিঃ কার্ণার ঘরে এসে তোমার খোঁজ করে। আমি বলেছি তোমার বাড়ীতে একজন অসুস্থ। এই 'কল' পেয়ে তুমি চলে গেছ। আজ সেটা ম্যানেজ কোর।

তোমাকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি—মিঃ থারগুড, কৃতজ্ঞতার সংগে বললাম। 'দ্যাটস্ অল্ রাইট, দ্যাটস্ অল্‌রাইট' লেসলি দু বার বললে।

কাজ ছিলো না সেদিন খুব বেশী। আস্তে আস্তে টাইপ করছিলাম। কিন্তু ভাবছিলাম অন্য কথা। লেসলির কথা। ঘরের পশ্চিম কোণে কাচের পার্টিসান করা ওর বসার জায়গা। কাচের মধ্যে দিয়ে ওকে দেখা যায়। সোনালী চুল সাধারণের তুলনায় একটু বড়ই। অবিন্যস্ত। কলারটা আধময়লা। স্যুটটাও অতি সাধারণ। কিন্তু ভাবলাম—না লেসলি অতি সাধারণ ইংরেজ নয়। দরদ আছে ওর। নয়তো কি দরকার ছিল ওর আমার জন্য মিথ্যে বলার? আমার ভারতীয় প্রবৃত্তি আমাকে ওর প্রতি কৃতজ্ঞ করালে।

এর পর প্রতিদিনই পাঁচটার সময় যখন আর সকলে চলে যেত তখন আমি উঠে আসতাম—আমার জায়গা ছেড়ে, লেসলির পার্টিশান দেওয়া জায়গার পাশে একটা ছোট্ট আয়না ঝুলোন আছে। কেশ-বিন্যাস করার সময়ে ওর সংগে আলাপ করতাম। ওর কবে চোখ খারাপ হয়েছে—এটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কি না এই সব। লেসলিও আমাকে প্রশ্ন করতো। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মামুলী প্রশ্ন। পনের মিনিট মাত্র আমাদের সময়! কি আর বেশী আলোচনা হবে? তাছাড়া—সব দিন সময়ও হোত না। আজ হয়তো আমি ব্যস্ত, বলে লেসলি।

ইংরেজদের সম্বন্ধে একটা কথা শুনেছিলাম—'ইফ ইউ ক্যান ব্রেক দি আইস ইট ইজ অল্ রাইট' আমার ঘরে যে আলোচনার 'গ্রুপ' ছিল আমার অজ্ঞাতসারেই সে বরফ গলে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে আমি এদের একজন হয়ে গেলাম। কাজের অবসরে যে টুকিটাকি আলোচনা হোত আমি তাতে যোগ দিতাম। কিন্তু লেসলি এই সমাজ ছাড়া হয়ে রইলো। মাঝে মাঝে দেখতাম—কখন যে ওর জায়গা ছেড়ে গেছে জানি না। সুইচবোর্ডের কাঁটাগুলো বারে বারে আঘাত করে করে ঘরের লোকদের সচেতন করতো। আমাদের মধ্যে কেউ তখন উঠে আসতো সুইচবোর্ডে—আর লেসলি সম্বন্ধে মন্তব্য হোত।

অবাক কাণ্ড, ও যে কখন ঘর ছেড়ে গেছে কেউ জানি না।

ওর পা—মানুষের পা নয়। হাঁটে ঠিক বেড়ালের মত নিঃশব্দে, এদের মন্তব্য শুনতাম, আবার এক এক দিন আমি সায়ও দিতাম।

গ্রীষ্ম শেষ হয়ে আসছে। আমার চাকরীর মেয়াদও ফুরিয়ে আসছে। একদিন হঠাৎ অফিসে 'ইসাবেলে'র সংগে দেখা হয়ে গেল। ইসাবেল আমার বন্ধু হিমাদ্রিশেখরের স্প্যানিস বান্ধবী। তবে লণ্ডনে অনেক বছর ধরে থেকে প্রায় ইংরেজই হয়ে গেছে।

তুমি এখানে? আমি প্রশ্ন করলাম।

আমিও তোমাকে একই প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম—ইসাবেল বললে। অবশ্য লেসলি আমাদের ব'লেছিল যে ওদের ঘরে একজন ভারতীয় এসেছে। আমি কিন্তু তখন জানতাম না যে সে হচ্ছ তুমি।

তুমি বুঝি এখানে কাজ কর, জিজ্ঞেস করলাম।

হ্যাঁ আমি নর্থ ব্লকে টাইপ পুলে কাজ করি। লেসলি আমাদের কাছে প্রায় আসে। আচ্ছা চলি—

ইসাবেল চলে গেল। সেদিন বিকেলে আমি লেসলিকে ইসাবেলদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ আমি ওদের ঘরে যাই মিঃ বোস! লেসলি বললে। আমি বড় নিঃসঙ্গ। আমার কথা কেউই ভাবে না। এমন কি এই ঘরেই যা আলোচনা হয়—আমি তার বাইরে পড়ে থাকি।

লজ্জিত হলাম। সত্যিই তো—এই ঘরে আমাদের আলোচনায় কোনও দিনই লেসলিকে দেখিনি যোগ দিতে। আমরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তবু ব্যাপারটা সহজ করার জন্য বললাম—ঘরে কি-ই বা আলোচনা হয় বলো। কে আর তাতে বিশেষ যোগ দেয়। আর তাছাড়া তোমার কাজ জনসাধারণের সংগে। জনসাধারণকে তুমি অফিস সম্বন্ধে প্রথম খবর দাও। তোমার এই বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ সব সময়ে ব্যস্ত থাকা কাজ নিয়ে কিছু আলোচনায় যোগ দেওয়ায় সম্ভব নয়।

জানি মিঃ বোস, আমি বাইরের লোকের সংগে 'ফার্স্ট লিঙ্ক'। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন আমার এত নিঃসংগ তা তোমরা বুঝবে না। তোমাদের সংগে দুটো কথা বলায় আমার কি আনন্দ—তা তোমরা জানতেও চাও না। আমার চোখ খারাপ—সিনেমা দেখা চলে না। থিয়েটারে ভাল সীটে বসার আমার সামর্থ নেই, ইচ্ছে মত খাবার উপায়ও নেই আমার—ডায়াবেটিস রুগী আমি। তার ওপরে আমাকে সাধ্যাতিরিক্ত সঞ্চয় করতে হয়—আমার কথা না বলাই ভালো।

লেসলি এর বেশী সেদিন আমাকে কিছু বলেনি। কিন্তু আমি আমার আচরণে লজ্জিত হলাম। এই লোকটা আমার সম্বন্ধে ভেবে একদিন—মনিবের কাছে মিথ্যে বলেছে। অথচ এর কথা আমি কোন দিন ভেবে দেখিনি। ভাববার চেষ্টাও করিনি। আজ ওর কথা ভাবলাম। আমাদের ঘরে থেকে ঘর-ছাড়া লেসলি হয়তো কিছু পরিবর্তনের জন্য ইসাবেলদের টাইপ-পুলে যায়। সেখানে হয়তো সহানুভূতিসম্পন্ন ওরা কোনও প্রশ্ন করে। আমি নিজেও তো ওকে অফিসের পরে কোনও কফি-কর্ণারে একদিন ডাকতে পারতাম। কিন্তু আমিও ডাকিনি। আজ আর ডাকা চলে না। বড় দেরী হয়ে গেছে।

এর পরের দিন বেলা সাড়ে এগারোটার সময় দেখলাম লেসলি নিঃশব্দে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বুঝলাম, ও ইসাবেলদের টাইপ পুলে যাচ্ছে। হঠাৎ ওর অনুপস্থিতি আবিষ্কার করলে মিস ক্রিডেনবার্গ। কাণ্ডবিনিন্দিত কণ্ঠে চীৎকার শুনলাম—'দি ক্যাট ইজ আউট এগেন' ঘাড় ফিরিয়ে মিঃ কার্ণার দেখলো। 'মাইচোরস' মন্তব্য

হোল। থারগুডকে নিয়ে আর চলে না। গত সপ্তাহে দু' দিন কামাই করেছে—তারপর হরদম ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া এদের চাকরীতে রাখা দায়। কেন যে এদের রেখেছে জানি না—

মিস ফ্রিডেনবার্গও মন্তব্য করলে—জানি না বাপু। ও যেন সর্বদাই ঝিমিয়ে আছে। কথা বলবে একঘেয়ে সুরে, আমার 'কাজিন' তো জন্মান্ধ! সে অনেক হাসি-খুসী। 'লাইফ'কে 'এনজয়' করাও একটা 'আর্ট'।

মিঃ জনসন বললে—আমি জানি ও কোথায় যায়। নর্থব্রুকের টাইপিষ্ট মেয়েদের সংগে গল্প করতে—এই ফাঁকি দিয়েই ইংরেজ জাতটা ডুবতে বসেছে—

লেসলি এর মধ্যে ফিরে এসেছিল। মিঃ কার্ণার তাকে বললে যে তার জানান না দিয়ে কোথাও যাওয়া উচিত নয়। সুইচবোর্ডে যদি কল আসে—আর বাইরের লোক যদি সাড়া না পায় তাহলে অফিসের বদনাম। লেসলি কোনও কথা না বলে চেয়ারে বসলো।

আজ আমি এদের হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে ভাবলাম। কিন্তু এও ভাবলাম যে, এদের মতামত অযৌক্তিক কি না। লেসলি সম্বন্ধে এরা সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারে—কিন্তু লেসলির নিয়মিত অনুপস্থিতি এদের কাজের অসুবিধা করায়। লেসলি যদি কোনও দিন না আসে তাহলে এদেরই একজনকে সুইচবোর্ডে বসতে হবে—আর সে কাজ খুব উপভোগ্য নয়। হয়তো দু'-একদিন এ কাজ করা চলে। কিন্তু তার বেশী নয়। হৃদয় দিয়ে বিচার করলে এ সবের প্রশ্ন আসে না। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে এ প্রশ্ন আসবেই। ইংরেজ জাত হৃদয় বোঝে—বান্ধবীর—প্রিয়ার—বধূর। আর কারুর নয়। সবচেয়ে বড় কথা হোল এ দেশ যৌবনের জন্য—স্বাস্থ্যের জন্য—উপভোগের জন্য—। যারা পিছিয়ে আছে তাদের জন্য এরা দাঁড়াবে না—তাদের জন্য নিজেদের বঞ্চিত করবে না। তাদের কথা ব্যষ্টি ভাববে না—ভাববে সমষ্টি ষ্টেট। লেসলির জন্য যদি এরা নিয়মিত অসুবিধে নিতে না চায় তাহলে এদের দোষ দেওয়া চলে না।

ছুটি হোয়ে গেল। আমরা দু'জনে রইলাম। আর সকলে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিয়েছে। আজ লেসলি আমার টেবলে এলো।—শুনলে এদের কথা। আমি কি ইসকুলের ছেলে যে যখন বাইরে যাব হাত তুলে অনুমতি চাইবো!

ঠিক সেইরকম দাঁড়ালো নাকি?

হ্যাঁ ব্যাপারটা ঠিক সেই রকমই দাঁড়ালো। কিন্তু কিছুই বলার নেই।

তিন হপ্তাহ বাদে আমার হলিডে। তখন বিশ্রাম পাব পনের দিনের মতো। কিন্তু জানো—এই কয়েক বছর আগেও আমি হলিডের জন্য এতটা ব্যস্ত হতাম না। তখন অফিসে অনেক আনন্দে ছিলাম। এই ঘরে তখন কার্ণার থাকতো না—থাকতো 'রিডন'। কাজের মাঝে যে গল্প হয়—আমিও যোগ দিতাম তখন। আমার তো বিশেষ বন্ধু-বান্ধব নেই, তাই অফিসের এই আলোচনার যথেষ্ট আনন্দ পেতাম।

তোমার বাড়ীতে কি কেউ নেই যে তোমার সংগে দু' দণ্ড কথা বলে?

না মিঃ বোস, আমার মত লোকের সংগে দু' দণ্ড বসে গল্প করবে এমন লোক আমার বাড়ীতে নেই। আমি একলা মানুষ ভায়েরা সব আলাদা থাকে। মা নেই অনেক দিন। বাবা পঞ্চান্ন বছর বয়সে আবার বিয়ে ক'রেছে। আমার খোঁজও রাখে না। আমিও রাখি না। কখন রাখার সময় বলো? দেখছো তো কি তাড়াতাড়ি দিন কাটে এদেশে! তবে আমার খোঁজ নেয় আমার এক বোন। তার খুব ইচ্ছে যে আমি তার সংসারে থাকি কর্ণওয়ালে। কিন্তু তার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি তার সংসারে কেন বোঝা হই?

ঠিক কথা। আমরা যতক্ষণ কর্মক্ষম ততদিনই কাজ করা উচিত। তোমার মতের সংগে আমি একমত—বললাম।

পাঁচটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে। হাত-মুখ ধোবার জন্য উঠলাম। ক্লিক ক্লিক করে সুইচবোর্ডের কাঁটাটা আঘাত করতে সুরু করলে অসময়ে। থারগুড সেদিকে রওনা হোল টেবল ছেড়ে। এই কুড়ি মিনিট কোন কলই আসেনি। প্রথম কল হলো অসময়ে—পাঁচটা কুড়িতে। শুনলাম ও বলছে, মে ফেয়ার নট নট—

তিন

সমস্যাটা তাহলে বড় হয়ে দাঁড়ালো—আমার মনে হয় অফিসের এদিকে নজর দেওয়া উচিত। কত দিন আর এমনি করে চালাই। পার্সলেন ডিপার্টমেন্টকে একটা কিছু করতেই হবে—মিঃ কার্ণার বললে।

সুইচবোর্ড আর সুইচবোর্ড—জনসন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

সুইচবোর্ড মিস ফ্রিডেনবার্গ বসে। সে প্রশ্ন করলো—থারগুড এখন কেমন আছে। জ্ঞান আছে কি?

আমি কি হসপিটালে এ খবর নেব?

না খবর নিয়ে কি হবে? 'হেমারেজ' যার ইচ্ছে তার সম্বন্ধে কেন ঘন ঘন খবর নেওয়া—

চুপ করে বসে শুনছি। দু'দিন আগে লেসলি অফিস থেকেই ছুটি নিয়ে হাসপাতালে যায় 'চেক আপের' জন্য। প্রত্যেক দু'মাস অন্তর ও চেক-আপ করাতো, এবারে সময় হয়নি। কিন্তু শরীর ভাল না থাকার দরুণ আগে থেকেই ছুটি নিয়ে চলে গেল। এ বিষয়ে এ দেশ বড় ভাল। মন্তব্য না ক'রেই ছুটি দেবে। লেসলি হাসপাতাল থেকে চেক-আপ করতে গিয়ে আর ফেরেনি। ব্রেন-হেমরেজ হচ্ছিল।

আমার ঠাকুমা কিন্তু ব্রেন হেমরেজের পরে অনেক দিন বেঁচে ছিল। শুধু এক অংগ পড়ে যায় মিস ফ্রিডেনবার্গ সুইচবোর্ড থেকে হঠাৎ বললে।

আমার শাশুড়ীরও কিন্তু তাই, মিঃ জনসন বললে আমার বউ সব সময়ে একসাইটেড, তাকে যত বলি কে শোনে কার কথা। কে জানে একটা কিছু না হয়।

সেদিন চুপচাপ কেটে গেল। বিশেষ আলোচনা হলো না। এর পরের দিন আমার টেবলের সামনে মিঃ কার্ণার যখন একটা কপি ম্যাটার দিচ্ছিলো তখন মিস ফ্রিডেনবার্গ খবর দিলো। আগের দিন সন্ধ্যা সাতটায় লেসলি মারা গেছে। পাশের টেবলে জনসন আর ফ্রেড ওদের হলিডে প্ল্যান ক'রছিল। মন্তব্য করলে—'পুওর ওল্ড থারগুড'—

দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে গেলাম। ঘরের সকলের মুখের দিকে

তাকালাম। ভাব-বৈলক্ষণ্য নেই। শুধু মিস ফ্রিডেনবার্গের মুখে কালো ছায়া পড়েছে দেখলাম। ভাবলাম—আমরা আমরা—তোমরা তোমরাই।

লেসলির মৃত্যুর পরে দু'দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে আর কোনও আলোচনা হয়নি। আবার আলোচনা শুনলাম। ফিউন্যারালের।

তাহলে কর্ণওয়ালেই 'ফিউন্যারাল' হবে?—হ্যাঁ কর্ণওয়ালেই হবে সাত দিন পরে।

সাত দিন পরে? ওকে রাখবে কোথায় এই গরমে? 'রেষ্ট চেম্বারে' সাত দিন মলম টলম মাখিয়ে রাখা হবে। তারপর ওকে কর্ণওয়ালে ওর বোনের কাছে পাঠান হবে। সেখানেই ফিউন্যারাল—

কফিনের জন্য তো মালার ব্যবস্থা করতে হবে—হ্যাঁ সে আর বলতে।

আলোচনা স্থগিত হওয়ায় জানতে পারলাম না মালার কি ব্যবস্থা হচ্ছে। বিকেলের দিকে সুইচবোর্ডে বসেছিলাম কিছুক্ষণ। সামনে পিন আপ করা বিভিন্ন ছবি—পার্টিশানে লাগান। হলিডে মেকাররা বিভিন্ন জায়গা থেকে লেসলিকে ছবি পাঠিয়েছে। যত্ন ক'রে ও তা পার্টিশানে লাগিয়ে রেখেছে। ম্যাড্রিদের সেই সিনিওরিটার নৃত্যপরায়ণা ছবি নতুন করে আবার দেখলাম। রং তার চটে গেছে। অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে এসেছে সিনিওরিটার ঠোঁটের লাল রং, চোখের মেদুর ভাবা! থারগুডের খুব প্রিয় ছবি আমাকে একাধিক বার প্রশ্ন করেছে সে এর সম্বন্ধে।

মিঃ বোস আমরা 'থারগুডের' একটা 'ফিউন্যারালে' মালা পাঠাব। তুমি কি কিছু 'কন্ট্রিবিউট' করবে? কার্ণার বললে।

ফিরে এলাম অন্য জগতে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বলে কার্ণারের হাত থেকে কাগজটা নিলাম—এবং টাকার অঙ্ক বসিয়ে নাম সই করে দিলাম। তারপর জ্যাকেটের পকেট থেকে হাফ ক্রাউন বের করলাম। প্রায় দু' টাকা।

না না না। অত দিতে হবে না। আমরা সকলে এক শিলিং দেড় শিলিং করে দিয়েছি।

কিন্তু আমি যে কাগজে লিখে নামসই করে ফেলেছি—বললাম। দেখ মিঃ বোস তিন পাউণ্ডে একটা মোটামুটি ভাল মালা হয়ে যায়। আর আমরা হিসেব করে দেখেছি যে এই এক শিলিং এই তিন পাউণ্ড উঠে আসে। কেন মিছিমিছি তুমি বেশী পয়সা দেবে। আড়াই শিলিং কেটে এক শিলিং বসিয়ে দাও। এই নাও তোমার চেঞ্জ।

দেড় শিলিং ফেরৎ পেলাম। কিন্তু আমি আজও ভেবে উঠিনি যে এরা কি হৃদয়হীন না বাস্তবধর্মী! আমাদের সমাজে আমরা এমন অবস্থায় কখনও পয়সার হিসেব করি না। সবচেয়ে বড় কথা যে আমি তখন লেসলির জায়গায় ব'সে। তার কফিনের মালার জন্য পয়সা দিচ্ছি আর আমার মনিব জীবিতের হিতার্থে মৃতের অংক বসাচ্ছে।

দিন সকলেরই কাটে। একজন যে আমাদের ঘর থেকে চিরদিনের মত চলে গেছে—ক'দিনের মধ্যে আমরা তা ভুলে গেলাম। পার্সনেল ডিপার্টমেণ্ট থেকে এবারে এক তরুণীকে পাঠিয়েছে—সুইচবোর্ডে। এলী—তার নাম। বড়ই চটুলা—সদালাপী। আমাদের ঘরের আবহাওয়া যেন বদলে গেল। পশ্চিম দিকের কাচের পার্টিসানে রং-বেরঙের মেলা বসলো—যেখানে আগে দেখা যেত শুধু 'গ্রে'। সাদা লাঠির বদলে এলো জাপানী রঙীন হাত পাখা। এলী তা কতরকম করে ঘুরিয়ে হাওয়া খাবে! জায়গা ছেড়ে এলী এর ওর টেবলে আসে। হেসে কথা বলে। আমরা সকলে খুসী। আমার সম্বন্ধেও দেখলাম ওর বেশ আগ্রহ। ভাবলাম মেয়েটাকে ইণ্ডিয়ান রেস্তোর্যাঁয় নিয়ে গেলে কেমন হয়। অথবা কোনও ভারতীয় ছবি দেখাতে—'স্ক্যালা'তে। বৈজয়ন্তীমালার 'নাগিন' আসছে সামনের বুধবারে। ওকে আগে থেকে নেমন্তন্ন করে রাখি।

সেদিন বুধবার। আজ এলী আমার সংগে সিনেমায় যাবে। মনটা বড় খুসী। বিকেল চারটের সময় মিঃ কার্ণার কয়েকটা ম্যাটার দিয়ে বললেন—এগুলো জরুরী, আজই হওয়া চাই।

টাইপ করতে করতে একটা চিঠিতে এসে থেমে গেলাম। মিঃ কার্ণারের লেখা চিঠি—মিসেস সিম্পসনকে। লেসলির বোন মিসেস সিম্পসন। চিঠির ভাবার্থ এই—প্রিয় মিসেস সিম্পসন—তোমার ভাই মিঃ থারগুডের মৃত্যুতে আমি এবং আমার সহকর্মীরা অত্যন্ত মর্মাহত। মিঃ থারগুড তার দৈহিক অসুস্থতা সত্ত্বেও যে সদা হাস্যময় মুখে আমাদের সংগে প্রতিদিন কাজ করেছে তা আমরা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করছি। তার শেষ কাজের সময় উপস্থিত না থাকার জন্য দুঃখিত। আমাদের মন তার সংগেই থাকবে। তার আত্মার সদ্‌গতি হোক। ইতি—

চিঠি টাইপ করতে গিয়ে ব'সে রইলাম। আঙুল যেন নড়তে চাইলো না। ভাবলাম লেসলি থারগুড ব'লে একজন এই ঘরে ছিলো আমাদেরই একজন হয়ে। আজ সে ইতিহাস হয়ে গেছে।

তোমার চিঠি এখনো শেষ হলো না। কি ভাবছ অমন আকাশ পানে তাকিয়ে—দেখলাম এলী এসে দাঁড়িয়েছে। আজ না আমাদের সিনেমায় যাবার দিন। তুমি নিশ্চয়ই ভুলে গেছ—তোমরা ভারতীয়রা বড় ভাবুক—কি এত ভাবতে পারো?

ঘড়ির কাঁটা পৌণে পাঁচটার ঘরে। বললাম—কে বললে ভুলে গেছি। আমি এই দিনটার জন্য চেয়ে ব'সেছিলাম। এটাই শেষ চিঠি এলী। ভাবলাম আমিও কি সাহেব হয়ে গেছি? তারপর টাইপরাইটারে দ্রুত আঙুল বুলিয়ে গেলাম "Dear Mrs. Simpson—"

পল্লীবাস

যে সব অবস্থায় পল্লীবাস এমন ক্লেশকর করিয়া তুলিয়াছে তাহা দূর হইলেই পল্লীবাস আবার সুখকর হইতে পারে। পল্লীর জঙ্গল যদি সাফ হয়, জলকষ্ট যদি সারে, নালানর্দমাগুলি পরিষ্কার হইয়া বর্ষার জল যদি নামিয়া যায়, ম্যালেরিয়া দূর হয়, ঝগড়া-ঝাটি কমিয়া সামাজিক সৌহৃদ্য যদি বাড়ে, তবেই পল্লীবাস আবার সুখকর হইতে পারে।

—মালঞ্চ (মাসিক) আশ্বিন, ১৩২২।

গৃহ-সমস্যা

"কলিকাতায় গৃহ-সমস্যা যে কত জটিল হইয়া উঠিয়াছে, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ২৪টি ফ্লাটের জন্য দরখাস্তের ফর্ম্ম সংগ্রহের ভীড় হইতেই তাহা সহজে উপলব্ধি করা চলে। ২৪টি মাত্র ফ্লাট ভাড়া দেওয়া হইবে। কিন্তু দরখাস্তের ফর্ম্ম সংগ্রহের জন্য গত ২১শে ও ২৪শে অক্টোবর সি আই টি অফিসের সম্মুখে কয়েক হাজার নরনারী লাইন দিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে সারা রাতও নাকি লাইনে দাঁড়াইয়া ছিলেন দরখাস্তের ফর্ম্ম পাইবার আশায়। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের উদ্যোগে ইদানীং কিছু কিছু বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এখনও তাহা নিতান্তই অল্প। শ্রমিকদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে সরকারী তরফ হইতে এ-পর্য্যন্ত যতটুকু উদ্যোগ দেখা গিয়াছে, স্বল্প আয়বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত সমাজের জন্য গৃহনির্ম্মাণে এখনও তাহা দেখা যায় নাই। গৃহ-সমস্যা আজও জটিল থাকিবার ইহাই অন্যতম কারণ।" —দৈনিক বসুমতী

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্বেচ্ছাচার

"স্কুলগুলি খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ হইতে স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ যে সার্কুলারটি পাইবেন তাহাতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে:—"১৯৫৮ সালে স্কুলের সেসান এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে আরম্ভ হইবে। সুতরাং এ বৎসরের বার্ষিক পরীক্ষা ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে লইলেই চলিবে। মার্চের শেষে পরীক্ষার ফল বাহির হইবে।" অক্টোবরের শেষে সার্কুলার পাইয়া স্কুলের পরিচালকগণ কিরূপে উল্লিখিত ব্যবস্থা কার্যে প্রবর্তন করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। এতদিনের প্রচলিত রীতি অনুসারে নবেম্বরের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষাসমূহ সমাপ্ত হইয়া যায়, বড়দিনের ছুটির পূর্বেই ফল ঘোষণা করিয়া ক্লাশ প্রমোশন দেওয়া হয়। পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র ছাপাইতে হয়। পূজার ছুটির মধ্যেই এই কাজগুলি শেষ করিয়া রাখা হয় এবং স্কুল খুলিবার কয়েক দিন পরেই পরীক্ষা আরম্ভ করা হয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ এতদিন যখন এ বিষয়ে স্কুলসমূহের নিকট কোন নির্দেশ দেন নাই, তখন স্কুলসমূহ নিশ্চয়ই প্রচলিত ব্যবস্থানুযায়ী যথারীতি প্রস্তুত হইয়াছে। এখন সহসা এই নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইলে সকল স্কুল বা অনেক স্কুলই বিপদে পড়িয়া যাইবেন বলিয়া আমাদের আশঙ্কা। তাহা ছাড়া ছাত্রগণের দিক হইতেও একটা বিশেষ বিবেচ্য দিক আছে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পুরোনো এক বৎসরের পড়া তাহাদের শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের মার্চ মাস পর্যন্ত বসাইয়া রাখিলে আরও তিন মাসেরও বেশী সময় তাহাদিগকে পুরাতনের বোঝা বহিয়া চলিতে হইবে! ইহাতে ছাত্র, শিক্ষক, পরিচালক, অভিভাবক সকলেই অসুবিধা ভোগ করিবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ যে পরিবর্তন ঘটাইতে চাহিতেছেন, সে পরিবর্তন ঘটাইতে হইলে অন্ততঃ এক বৎসর পূর্বে তাহার নোটিশ দেওয়া উচিত ছিল।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

ভারত সরকারের ভিক্ষাবৃত্তি

"যেরূপ অবস্থার মধ্যে ভারত সরকার এবং শিল্পপতিগণ কর্জ সংগ্রহের জন্য অভিযান সুরু করিয়াছিলেন, তাহাতে এরূপ পরিণতি অনিবার্য। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, এই ধরণের আর্থিক লেনদেন নির্ভর করে ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একটা সন্তোষজনক ধারণার উপর। ঋণ গ্রহণকারী নির্দিষ্ট কিস্তি মত টাকা শোধ দিতে পারিবে কি না, কিম্বা মূলধন নিরাপদ থাকিবে কি না, সে সম্পর্কে উত্তমর্ণের মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-সঙ্কোচের উদ্রেক হইলে তাহারা পিছাইয়া যায়। ব্যক্তিগতভাবে কেহ ঋণপ্রার্থী হইলে মহাজন যে রকম সতর্কতা অবলম্বন করেন, কোন জাতি ঋণপ্রার্থী হইলেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না। এই সহজ, সত্য কথাটা স্মরণ থাকিলে বিদেশ হইতে কর্জ ও মূলধন সংগ্রহের চেষ্টার নৈরাশ্যের কারণটা বুঝিতে পারা যাইবে। অর্থের অভাবে ভারতের বৈষয়িক অবস্থা বাস্তবিকই যদি টলায়মান হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিদেশীরা কর্জ দিবে কি ভরসায়? তাহারা তো দয়া ধর্ম করিতে বসে নাই! ঋণ গ্রহণকারীর যোগ্যতা নির্ভর করে বৈষয়িক ভিত্তি দৃঢ় করিয়া তুলিবার উপর। এই ব্যাপারে ক্রমাগত গাফিলতীর দ্বারা ভারত সরকারই পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা বাজার দর নিয়ন্ত্রণ ও আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় জাতি গঠনের কাজে লগ্নীর জন্য বাধ্যবাধকতা বলবৎ করিলে বৈষয়িক ভিত্তি দৃঢ় হইয়া উঠিত। আর ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা সম্পর্কে বিদেশী লগ্নীকারীদের মনে আস্থাও তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু ক্রমাগত অবহেলা দ্বারা সরকার সে সুযোগ নষ্ট করিয়াছেন। এখনও তাঁহাদের পক্ষে নীতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন আছে সত্য। কিন্তু উহা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নির্ভর করে বৈষয়িক বনিয়াদ সুদৃঢ় করিয়া তুলিবার এবং দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদ ও সঞ্চয় সদ্ব্যবহারের উপর। এই উদ্দেশ্যে জাতির সর্বশক্তি নিয়োগ না করিলে মাত্র কাঁদুনি গাহিয়া কিম্বা প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়া বিদেশীদিগের সহযোগিতা লাভ করা অসম্ভব।" —যুগান্তর।

পি, ডব্লিউ ডি'র কৃপা

"সংবাদ পাওয়া যায় যে, পি, ডব্লিউ, ডি নাকি স্থানীয় কণ্ট্রাক্টারগণকে কাজ দিতে খুব আগ্রহশীল নহেন। পি, ডব্লিউ, ডি'র কাজ টেণ্ডার আহ্বান দ্বারা বণ্টন করা হয়। নিম্ন মূল্যের টেণ্ডার গ্রহণ করারই রীতি। সংবাদে প্রকাশ, ক্ষেত্র বিশেষে নিম্ন-মূল্যের টেণ্ডারও নাকি অগ্রাহ্য করা হয়। টেণ্ডার গ্রহণ বিষয়ে ভালমন্দ বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। রাজ্যের আর্থিক

বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। স্থানীয় কণ্ট্রাক্টারদের মধ্যে অনেকে উদ্বাস্তুও আছেন। স্থানীয় লোকের কর্মসংস্থান করিয়া দেওয়াও সরকারের কর্ত্তব্যের মধ্যে রহিয়াছে। ত্রিপুরায় সড়ক নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটিতেছে। ইহার জন্য কণ্ট্রাক্টারদের দায়ী করা চলে না। সরকারের গলদ দূর না করিয়া কেবল স্থানীয় কণ্ট্রাক্টার উচ্ছেদ দ্বারা পি. ডব্লিউ. ডি'র কাজ অগ্রসর হইতে পারে না।" —সেবক (আগরতলা)

আমরা ভারতবাসীরা

"স্বাধীনতা লাভের সময় ইংরাজের নিকট হইতে যে টাকা পাইয়াছিলাম তা প্রায় নিঃশেষ করিয়াছি এই দশ বৎসরে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় হাত দিয়া। আচ্ছা, যে পরিকল্পনায় অধিকাংশ টাকা 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়' উড়িয়া যাইতেছে। হাতে কলমে তাহা ধরা পড়িয়াও এই খেয়াল ছাড়ার মত সুবুদ্ধি কি আমাদের হইবে না? যখন দেশে অসাধু লোকের সংখ্যাই অগণিত তখন টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলা কি ঠিক? আজ অর্থমন্ত্রী মহাশয় দেশ-বিদেশে ছুটিয়াছেন "ঋণং দেহি ঋণং দেহি" বুলি লইয়া। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারক শ্রীপতঞ্জলি শাস্ত্রী এখন ঋণ করিয়া নাস্তানাবুদ না হইয়া এ কার্য্য রদবদল করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কে শোনে তা!"

—জঙ্গীপুর সংবাদ।

দোকান-শ্রমিকদের দুর্দ্দশা

"এত দিন আমাদের জাতীয় সরকার লীগ আমলের একটি পক্ষপাতদুষ্ট আইনের ডুগডুগী বাজাইয়া বাহবা নিয়াছিলেন। কারণ ছিল দোকানীরা ঘৃণা লজ্জা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থাকিত। কোনক্রমে যদি আদালতে হাজির করা হইত তখনই নানা ঝঞ্ঝাট এড়াইবার জন্য বিচারকের নিকট 'কসুর' মানিয়া লইত। কিন্তু সম্প্রতি কতিপয় আইনজীবীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া দোকানীরা দল বাঁধিয়া ও চাঁদা তুলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনকারী আইন এবং নিয়মাবলীর ছিদ্র অন্বেষণে ও সওয়াল-জবাবের মারপ্যাঁচ পদে পদে সরকারপক্ষকে পরাস্ত ও হেনস্তা করিয়া কিস্তিমাৎ করিতেছে। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই সকল ত্রুটি সংশোধনের জন্য বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোন ফল আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কবে যে হইবে উহার হদিসও পাওয়া সম্ভব হইতেছে না। বলিতে চাই নিয়মাবলীর মধ্যে সাপ্তাহিক নোটিশে এক নির্দ্দেশ আছে যে, সাপ্তাহিক বন্ধ সম্পর্কে ইচ্ছা করিলে তিন মাস অন্তর বদল করা চলিবে। অথচ এইরূপ সাপ্তাহিক বন্ধের নোটিশ হাজার হাজার দোকানে তিন মাস পর পুনরায় বদল করিয়া লওয়া হয় নাই। বন্ধ সম্পর্কে অভিযোগ আদালতে উপস্থিত হইলে—আসামী পক্ষের উকীল নানা অবান্তর কথার সৃষ্টি করিয়া বলেন—"আমার মক্কেলের নোটিশ তিন মাস অতীত হইয়াছে। অতএব এই অভিযোগ টিকিতে পারে না, কিন্তু তিন মাস পর কোন নোটিশ বদল না করার বিষয়ে কোন অভিযোগ আদালতে পেশ করা হয় নাই এবং নিয়মাবলীতে এমন কোন ধারা সন্নিবেশিত করা হয় নাই যাহার দ্বারা নোটিশ পরিবর্ত্তন না করিলে তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হইবে। প্রিভিলেজ লিভ ও সিক লিভ সম্পর্কে আইনে যে নির্দ্দেশ আছে ঐ সম্পর্কে নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন না হওয়ায় ও খাতাপত্র দেখার ব্যবস্থা না থাকায় শ্রমিকেরা তাহাদের স্বাধ্য পাওনা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে। এইভাবে দোকান আইনের আরও যে সকল ত্রুটি বিদ্যমান এই সকল বিষয়ে সরকারের বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ ভাবে অবগত আছেন। কিন্তু কি কারণে বা কোন পক্ষের ইচ্ছাকৃত দীর্ঘসূত্রতায় আইনটি এইভাবে জড়ভরত হইয়া পড়িয়া আছে এবং ইহার ভবিষ্যৎ পরিণতি কি ঘটিবে তাহা জানিতে না পারিয়া দোকান শ্রমিকেরা হতাশ হইয়া পড়িতেছে।"

—দোকান শ্রমিক (কলিকাতা)।

সরকারী গাড়ী কাহার সম্পত্তি?

"সাময়িক জৌলুষ আর অগণিত মানুষের ভিড়ে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে প্রতিমা দেখতে বেরিয়েছি। মাথার উপরে চন্দ্রালোকিত রাত্রি, পায়ের নীচে বালুরঘাটের ধূলিধূসরাকীর্ণ রাস্তা; সংকীর্ণ রাস্তাগুলি মানুষের প্রবাহে উপচে পড়ছে। ঠেলাঠেলি কোরে এগোতে হচ্ছে, সহসা পেছন থেকে বেজে-উঠা মোটরের তীব্র হর্ণের আওয়াজে চমকে উঠে জমে-ওঠা ভিড় রাস্তার দু'ধারে সরে গিয়ে ভিড়কে আরো নিবিড় কোরে তুললে; মাঝখান দিয়ে ব্যস্তভাবে একটি গাড়ী বেরিয়ে এগিয়ে চললো। কৌতূহলী পথিক লক্ষ্য কোরে দেখলো গাড়ীটির নম্বর W G O 54. মনের ভেতরে স্বাভাবিক গুঞ্জন উঠলো; গাড়ীটি কার? খোঁজ নিলে জানবেন উল্লিখিত গাড়ীটি সরকারী টাকায় সরকারী কাজের জন্য ক্রীত। ব্যবহৃত হচ্ছে প্রতিমাদর্শনের জন্য। দেখছেন কারা? কোন বিশেষ ব্যক্তির পরিবার পরিজন। কে যেন প্রশ্ন করলো তেল জোগাচ্ছে কে? ভিড়ের মধ্য থেকে একটি মন্তব্য বাতাসে মিশে গেল—ভূতে। আমি অবশ্য এ মন্তব্যে বিশ্বাস রাখিনি! একটু সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে চললে দেখতে পেতেন; কোন পূজোমণ্ডপের সামনে আরোহী-আরোহিণীদের ফেরার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে যে গাড়ী, তার নম্বর W G O 45 পাশ দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে যেটা বেরিয়ে গেল তার নম্বর W B D 9455 অথবা দেখতে না চাইলেও চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো যেটা; তার নম্বর W B D 6927. এ দেখে আপনি যে কোন মন্তব্য করতে পারেন। কিন্তু মূল প্রশ্ন হোল; সত্যই কি গাড়ীগুলি ব্যবহৃত হোয়েছিল? যদি হয়ে থাকে তবে তা কি লগ্‌ বুকে Entry করা হয়েছিল?"

—বার্ত্তা (বালুরঘাট)

সমবায়, কৃষক ও ধানের দাম

"ধান চালের দাম কমিয়াছে। আউস এবং আশ্বিনা-ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। মণকরা প্রায় তিন টাকা ধানের দাম কমিয়াছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র জনসাধারণ একটু শান্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। জনসাধারণ পরিকল্পনার প্রচারের ধোঁকাবাজী অপেক্ষা সামান্য মোটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থাটা ভাল বোঝে। কিন্তু সরকার ভাত-কাপড়ের বাজারে আগুন লাগাইয়া দিয়া পরিকল্পনার দোহাই দিয়া সমস্ত চাপা দিতে চান। ধানের দাম কমা শুভ লক্ষণ। ধান চালের দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে কাপড় তেল নুণ ইত্যাদির দাম কমিলে সাধারণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য সাধারণের জীবনযাত্রা দুর্বিবহ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু স্থির ভাবে দেখিতে গেলে ধান চালের এই মূল্য হ্রাসে আনন্দের চেয়ে আতঙ্কিত বেশী হইতে হয়। ফসল সামান্যই উঠিয়াছে। দুঃস্থ চাষীর দল সামান্য ফসলের মোটা

অংশ বিক্রয় করিয়া দীর্ঘকালের অভাব মিটাইতে চাহিতেছে। বর্তমান মূল্য হ্রাস যদি বাজারের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী কমে তবে আনন্দের কথা। ধান-চালের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় অন্য জিনিষ পত্রের দাম কমিতে বাধা। কিন্তু আতঙ্কিত হইতেছি এইজন্য যে কাপড়, নুণ, তেল, তামাক, খোল ইত্যাদি চাষীদের অতিআবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির দাম কমিবার কোন লক্ষণ নাই, কোন আয়োজন নাই, কোন ব্যবস্থা নাই, এমন কি সরকারী কর্ণধারদের কোন প্রতিশ্রুতি (মিথ্যা হইলেও) নাই।" —নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)

পার্টির অভ্যন্তরে চরম জবরদস্তি

"ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির হুগলী জেলা কমিটির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীশিশির গাঙ্গুলীকে পার্টি হইতে বহিষ্কার করার সংবাদ জানা গিয়াছে। বেঙ্গল টিং ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উঁহার সম্পাদকরূপে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীকে ফুলের তোড়া ও শ্রমিকদের দাবীর সনদ প্রদান এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির বাহিরের কোন ব্যক্তির নিকট জনৈক বিশিষ্ট পার্টি সভ্যের তহবিল তছরূপের চাঞ্চল্যকর কাহিনী প্রকাশ শ্রীগাঙ্গুলীকে পার্টি হইতে বহিষ্কারের অন্যতম কারণ, এরূপ জানা গিয়াছে। শ্রীগাঙ্গুলীকে বহিষ্কার করার প্রতিবাদে কম্যুনিষ্ট পার্টির মহেশ লোক্যাল কমিটির বিশিষ্ট কয়েকজন সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা পার্টির প্রাদেশিক কমিটির নিকট এক খোলা চিঠিতে উক্ত পদত্যাগের সংবাদ জানাইয়াছেন এবং উহা প্রকাশের জন্য সংবাদপত্র সমূহে পাঠাইয়াছেন। পার্টি নেতৃত্বের জঘন্য ও অগণতান্ত্রিক কার্য-কলাপের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা আর একবার কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিল। যদিও কম্যুনিষ্ট পার্টিতে কথায় কথায় কিরূপ ষ্টীম রোলার চলে তাহা কাহারও অজানা নয়।" —বর্দ্ধমান।

দাঁওমারা পরিকল্পনা

"জলের চোরা কারবারের চরমতম নিদর্শন মাইথন বাঁধে জল আটক। এই জল আটকের ফলে বিস্তীর্ণ ক্যানেল এলাকায় জল দেওয়া যাইতেছে না। একটিমাত্র ক্ষেত্রে একটি দাঁড় কাটাইবার আবেদনে একজন সরকারী কর্ম্মচারী কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়ের প্রতিশ্রুতির মত ইহা নিষ্ফল না হইলে হয়। ফসলবৃদ্ধি, কমিউনিটি প্রোজেক্ট, ন্যাশন্যাল এক্সটেনশান সার্ভিস কত কি—পর পর কংগ্রেসী 'দাঁওমারা' পরিকল্পনার অন্ত নাই। বরগুলে ও গুস্করায় নগরী পরিকল্পনায় কত অপব্যয় হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচের ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। বাংলা দেশে গড়ে ৫৫´ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। দেশে তৈরী সামান্য পাম্পে যাহা হয়, কোটি কোটি টাকার বিদেশে তৈরী যন্ত্রপাতি আনিয়া সে কাজ হইতেছে না। বিদেশী ডলার ও বিলাতী মুদ্রা এই ভাবে অপব্যয় করিয়া—আজ সামান্য পাম্প পর্য্যন্ত চাষীকে দেওয়া যায় না। এমন কি সরকারী দপ্তরে ও মন্ত্রীদের মহলে সামান্যতম উদ্বেগ পর্য্যন্ত নাই। দেশের বিরাট সম্ভাবনাকে এই ভাবে নিষ্পিষ্ট নিহত করা প্রকারান্তরে দেশদ্রোহ। সঙ্গে সঙ্গে চীনের সংবাদ পড়ুন।—দেড় লক্ষ সরকারী কর্ম্মচারীকে মাঠে নামানো হইয়াছে। দেশের প্রতি এরূপ মমতা, এরূপ একান্ত মনোভাবের সামান্যটুকুও কি এ দেশের শাসন ব্যবস্থায় পাওয়া যাইবে না?" —নূতন পত্রিকা (বর্দ্ধমান)

কংগ্রেসের তামাসা

"কথায় বলে 'খাচ্ছিস তাঁতী তাঁত বুনে, কাল করলে এঁড়ে গোরু কিনে।' নেহেরু সরকারের পরিকল্পনাগুলিই হয়েছে কাল। এর দ্বারা জনসাধারণের অবস্থা উন্নত হওয়া তো দূরে থাকুক, তাদের জীবন ক্রমশই দুর্বিবহ হোয়ে উঠছে। পরিকল্পনার খরচ তোলার জন্য পরিকল্পনার নামে সরকার কেবলই ট্যাক্সের পর ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে চলেছেন। তার ওপর এই পরিকল্পনাগুলির জন্যই ঘটছে মুদ্রাস্ফীতি। তার ফলেই আজ এমন অগ্নিমূল্য হোয়ে উঠেছে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছিল এর দ্বারা ভারত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। পেট ভরে খেতে পাবার আশায় হাড়ভাঙা খেটে না খেয়ে জনসাধারণ ট্যাক্স যুগিয়েছে। সে টাকা জলে গেছে। 'অধিক শস্য উৎপাদন কর' বোলে শ্লোগান দিয়ে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তবু খাদ্যাভাব দূর হয়নি, এখনও বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলেছেন 'ভাত কম খাও, না হোলে ডায়াবেটিস হবে।' ভেতো বাঙ্গালী, তার চোদ্দপুরুষ ভাত খেয়ে এলো, ডায়াবেটিস হোল না। আর আজ ডাঃ রায় নতুন থিওরি খাড়া করছেন। দেখা যাচ্ছে ১ম পরিকল্পনা ব্যর্থই হয়েছে। ২য় পরিকল্পনার ঘোষিত লক্ষ্য ভারতকে শিল্পে উন্নত করা ও তার মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করা। তার জন্য আবার ট্যাক্স বসানো হোল। কিন্তু এক পা না এগোতে এখন শোনা যাচ্ছে কর্তারা বলছেন 'উঁহু, বেকার সমস্যার সমাধান হওয়া দূরের কথা, আরও বহু লক্ষ লোক বেকার হোয়ে পড়বে।' অবস্থার উন্নতির কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। শুধু বেঁচে থাকাই যেন আজ সাধারণ মানুষের পক্ষে অভিশাপ হোয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ প্ল্যান নয়, প্ল্যানের নামে তামাসা।" —সাধারণতন্ত্রী (শিবপুর)

খোলাখুলি কালোবাজার

"সংশোধনী সেটেলমেন্টে আপত্তির রায় বা স্বত্বাদির নকল লওয়া জেলা সদর হইতে মহকুমার বিভিন্ন সার্কেল অফিসে আসায় জনসাধারণের কতকটা সুবিধা হইয়াছে সত্য কিন্তু ঐরূপ দরখাস্তের ফরম পাওয়া মুস্কিল হইয়াছে। অথচ ঐ ফরমে ৵৹ দুই আনার কোর্টফি ষ্ট্যাম্প দিয়া দরখাস্ত না করিলে সে দরখাস্ত অচল হয়। প্রকাশ উহা সরকারের ৫৫৭০ নং বিক্রয়যোগ্য ফরম, অন্য কেহ ছাপাইয়া দিতে পারে না। কিন্তু উহা কোথা হইতে যে সরবরাহ হয় তাহাও কেহ সঠিক বলে না। ফলে যে সব ভেণ্ডার উহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, তাহারা যথেচ্ছ লাভ করিতেছে। যেমন এই তমলুকে ঐরূপ ফরম একটি।৹ চারি আনা মহিষাদলে।৵৹ আনা এবং পাঁশকুড়ায় নাকি ।৵৹ দশ আনার কমে পাওয়া যায় না। সরকার যে নকলের দরখাস্ত লইতে মোট ৵৹ দুই আনা ফি ধার্য্য করিয়াছেন তাহার ফরমে এই চোরা-কারবার নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নহে, তবে কেন বা কাহার দোষে এইরূপ অঘটন ঘটিতেছে তাহা কে দেখিবে?" —প্রদীপ (তমলুক)

রাষ্ট্রভাষা-সমস্যা

"সংবিধান রচনার সময় সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির উল্লাসে কোন্‌ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত, সে দিকটি ভাল ভাবে আলোচনা না করিয়াই তাড়াতাড়ি হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়াটা যে কত বড় ভুল হইয়াছে, দীর্ঘ দশ বৎসর পরে তাহা স্পষ্ট ধরা

পড়িয়া গিয়াছে। ভাষা কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইবার পরই দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই চৈতন্যোদয় হইয়াছে—কি সর্ব্বনাশ! হিন্দী চালু করিবার অত্যুৎসাহে ইহারা করিতে চলিল কি? ভারতের শ্লাঘা সংস্কৃতি সংহতি—সব কিছুরই যে মূলোচ্ছেদ করিয়া হিন্দীওয়ালারা দেশের বহু কষ্টার্জ্জিত স্বাধীনতা বিপন্ন করিয়া তুলিতে তৎপর। বিপদটা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ভাষা কমিশনের ইনিও অন্যতম সদস্য ছিলেন, কিন্তু ভারতের কল্যাণ বুদ্ধিই তাঁহাকে সব শিয়ালের এক রা করিতে দেয় নাই। তিনি দেশপ্রাণতায় প্রবুদ্ধ হইয়াই হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের ফানুস ফাঁসাইয়া দিয়া দেশবাসীকে সজাগ সতর্ক হইবার জন্য আকুল আহ্বান জানাইয়া দিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলেন।" —পল্লীবাসী (কালনা)।

শোক-সংবাদ

আমরা বেদনার সহিত জানাইতেছি যে, গত ৫ই অক্টোবর ৺পুরীধামে উত্তরপাড়ার তারকনাথ মুখোপাধ্যায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি মহালয়ার দিন ৺পুরীধামে বায়ু পরিবর্ত্তনান্তে গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬০ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ইং ১৮৯৮, ৫ই বৈশাখ, ১৩০৫ সালে উত্তরপাড়া রাজবাটীতে, উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সি,এস,আই, এম,এ, বি,এল মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺কুমার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বিপ্লবীযুগের মিছরী বাবু) এঁর দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে ৺তারকনাথ জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৪ বৎসর বয়সে মাতৃহীন ও ১৪ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া ৺তারকনাথ তাঁহার ভারত-বিখ্যাত পিতামহ রাজা প্যারীমোহনের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হইয়া এম,এস,সি অধ্যয়নকালেই তৎকালীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে বিপুল ভোটাধিক্যে সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ঐ অল্প বয়সেই ৺তারকনাথ তাঁর পিতামহের আনুকূল্যে ৺স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ মনীষীগণের দিনের পর দিন সান্নিধ্যলাভে ধন্য হন, এবং অচিরেই তৎকালীন বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তৎকালে যে অল্প কয়জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ধনীর সন্তান বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে ভাস্বর থাকিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরামপুরের ৺কুমার তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, কাশীমবাজারের মহারাজা ৺শ্রীশচন্দ্র নন্দী, নাড়াজোলের ৺কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁন, সহিরপুরের কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়-এর নাম স্মরণ করা যাইতে পারে এবং উত্তরপাড়ার ৺তারকনাথ উক্ত দলের আরেক জন ছিলেন। পরে হুগলী জিলাবোর্ডের প্রায় ৩০ বৎসর সহ-সভাপতি ও সভাপতি বাংলার দুই বার মন্ত্রীরূপে এবং জীবনের আরও বহুক্ষেত্রে ৺তারকনাথ জাতিকে সেবা করিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়া হুগলী জিলা তথা বাংলার একজন নেতৃস্থানীয় ভূম্যধিকারী ও রাজনীতিবিদরূপে খ্যাতিমান হন। ময়মনসিংহের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা শশীকান্তের আমন্ত্রণে ময়মনসিংহ জিলা জমিদার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ৺তারকনাথ। স্বরাজ্য দল গঠনের সময় দেশবন্ধু ও নেতাজীর সান্নিধ্যধন্য ৺তারকনাথ বহুবিধ ক্ষেত্রে দেশের সেবা
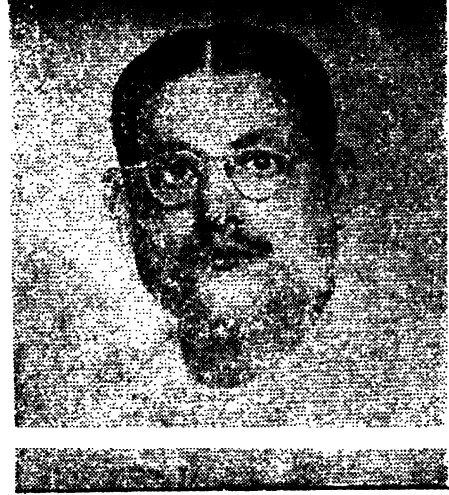
তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

করিয়া থাকেন এবং উত্তরপাড়ার 'রাজেন্দ্র-ভবন' তৎকালীন বাংলার সকল মনীষী ও রাজনীতিবিদগণের আগমনস্থল হইয়া উঠে। হুগলী জিলা বন্যা, দুর্ভিক্ষাদি ত্রাণকার্যে ৺তারকনাথের অবদান হুগলী জিলাবাসী আজও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়া থাকে। দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র-স্মৃতি-রক্ষা-সমিতির সভাপতির পদে বহুদিন অধিষ্ঠিত থাকেন ৺তারকনাথ। তাঁহার তিন কন্যা শ্রীমতী অমিয়া, অসীমা ও অণিমা দেবী; পত্নী ও তিন ভ্রাতা শ্রীলোকনাথ, শ্রীঅমরনাথ ও শ্রীচন্দ্রনাথ বর্ত্তমান। ৺তারকনাথ সি,আই,ই ও এম,বি,ই উপাধি ভূষিত ছিলেন ও ভট্টপল্লী পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক 'শাস্ত্র-বিশারদ' উপাধি প্রাপ্ত হন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাই।

বিগত যুগের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা বসন্তকুমার লাহিড়ী এম,এ, ব্যারিষ্টার য়্যাট ল' গত ২১শে আশ্বিন তাঁর অশীতিতম জন্মদিনের দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। স্বদেশী যুগে জাতীয় শিল্প প্রসারে তাঁর বিরাট অবদান ছিল। অধুনালুপ্ত বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক ও বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ইনি ম্যানেজিং ডিরেক্টার ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক পদেও ইনি কিছুকাল সমাসীন ছিলেন। ব্যবসায় জগতেও একদিন এঁর বিশেষ প্রভাব বর্ত্তমান ছিল।

যশোহর নিবাসী বিখ্যাত সাহিত্যসেবী অবলাকান্ত মজুমদার গত ১৭শে আশ্বিন ৬৬ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। নাট্যকাররূপেও ইনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যশোহরের সুধীসমাজে এঁর একটি বিশেষ আসন সংরক্ষিত ছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব গিরিশ-অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষায় গ্রন্থপ্রকাশক সমিতির সম্পাদক সুসাহিত্যিক অমরেন্দ্রনাথ রায় ৬৭ বছর বয়সে গত মহাষ্টমীর দিন ১৫ই আশ্বিন পরলোকগমন করেছেন। সমালোচকরূপেও এঁর খ্যাতি ছিল। ইনি কয়েকটি গ্রন্থের গ্রন্থকার ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাসিক বসুমতীর প্রচার-আধিক্য

Editor-in-Chief, Thank you for printing our letter offering "used" magazines to your readers. The response was overwhelming and far beyond our capacity to supply at this moment. However, please assure your readers, for us, that while it may take a little time, every person who wrote for the magazines, will ultimately receive them. Please accept our thanks for your co-operation. Sincerely, H. P. Box 329, Ansonia Station, New York, 23, N. Y. U.S.A.

পত্রিকা সমালোচনা

বন্ধুবরেষু, আমার সম্বোধন দেখে হয়তো বেশ বিস্মিত হচ্ছেন। ভাবছেন, যার সঙ্গে কোন দিনের পরিচয় নেই, সে কি সাহসে বন্ধুত্বের দাবী করতে পারে! আপনার অনুমান সত্যি হ'লেও আপনি হয়তো জানেন না, আপনার পত্রিকার সঙ্গে আমার গত সাত বছরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, মাসিক বসুমতী আমার দিন-রাত্রির সঙ্গী। আপনাদের পত্রিকা মারফৎ আমি যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই। তাই নিবিড় বন্ধনের আবেগে বন্ধুত্বের দাবী ক'রে থাকি তো অন্যায় এমন কিছু নিশ্চয়ই হবে না। কাগজের সম্পাদক হিসাবে আপনি আমার এবং আমাদের সংসারের সকলের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনার সাহিত্য-লেখার সঙ্গে আমরা যথেষ্ট পরিচিত। আপনার প্রত্যেকটি বই সংগ্রহ করেছি, এমন কি অভিধান 'রঙ্গালা' এবং 'কলকাতার পথঘাট'। বিশেষতঃ এই দু'টি বই বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য যোগান। এ বছরের শারদীয়া যুগান্তরে আপনার অদ্ভুত একটি ছোটগল্প পড়লাম—'আশার আলো'। বাঙলা সাহিত্যে ঠিক এই ধরণের টেকনিকের গল্প আমি ইতিপূর্বে কখনও পড়িনি। আশা করি, অন্যান্য সাহিত্যিকদের এই গল্প অনুপ্রেরণা যোগাবে। মানব সমাজের এক সঙ্কটজনক সমস্যাকে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন, যদিও দুঃসাহসের পরিচয়ই যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গেছে। আমাদের দেশের প্রত্যেকটি মেয়ের 'আশার আলো' পড়া উচিত, অন্ততঃ আমার তাই ধারণা।

আপনার পত্রিকার প্রসঙ্গ আলোচনা করছি। মাসিক বসুমতী সময়ে পাওয়া না গেলে আমি যেন দিশাহারা হই। কাগজটি হাতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রথম অবশ্যপাঠ্য—পত্রিকার শেষের সাময়িক প্রসঙ্গ। এই বিভাগটিতে আমি দূরবাসিনী বঙ্গ-ললনা বাঙলা দেশের হাল আমলের একটি সামগ্রিক রূপ চোখের সম্মুখে দেখতে পাই। বিভিন্ন পত্রিকা থেকে আপনাদের নির্বাচন ও উদ্ধৃতি যথোপযুক্ততায় পরিবেশিত হয়। আশা করি, আমার মত আরও অনেকেই দূরে থেকেও বাঙলা দেশের ছবি দেখার আনন্দ পেয়ে থাকেন। তারপরেই আমি পত্রিকার আদি অন্ত তন্ন তন্ন খুঁজতে থাকি—ক'জন মহিলা লিখেছেন এবং কি কি লিখেছেন। আপনি হয়তো অস্বীকার করবেন না, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান কত বেশী। এখন যে ক'জন খ্যাতির শিখরে বসে আছেন, তাঁদের সংখ্যা অতি নগণ্য। তাঁদের লেখাও উন্নতির দিকে না এগিয়ে বরং অবনতির দিকে এগিয়ে যেতে দেখছি। এর কারণ আমার অনুমান, যথার্থ শিক্ষার অভাব কিম্বা উচ্চশিক্ষার বালাই না থাকা। বিদেশী লেখিকাদের জ্ঞানের পরিধি আমাদের মত সীমাবদ্ধ নয়। অভিজ্ঞতা এবং উৎকর্ষতা কোন দিকেই দোষ খুঁজে পাওয়া

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

যায় না। বদ্ধঘরের চার দেওয়ালে থেকে লিখতে হয়। ক'জন খ্যাতিমানাদের লেখা প'ড়ে শেষ পর্যন্ত হাস্য সম্বরণ করা যায় না।

মাসিক বসুমতীতে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, সত্যিই বেশ কয়েক জন লেখিকা উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচনা করেছেন। জানি না, কলকাতার পাঠক-পাঠিকা তাঁদের লেখা প'ড়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন কি না। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী, মালতী গুহ-রায়ের লেখা। আগেও আমরা একজন লেখিকার 'নিবেদিতা' পড়বার সৌভাগ্য লাভ করেছি—অনুবাদিকা নারায়ণী দেবী। এই দুই লেখিকার জন্য আমি দস্তুরমত গর্ববোধ করি এবং এঁদের প্রচারের জন্য যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই পড়তে বলি। (সঙ্গোপনে জানিয়ে রাখি, নারায়ণী আর মালতী দেবী এই বাবদে আমাকে কি 'কমিশন' দিচ্ছেন?) কবি উমা দেবীর 'রাজধানীর পথে পথে' কবিতাকে লিরিকের পর্যায়ে ফেলা যায় নিশ্চয়ই। কলকাতা সহরের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি এঁকে চলেছেন কবি—যা দেখছেন তাঁর চোখে। উমা দেবীর দৃষ্টির বিস্তার অসীম, তাঁর ভাষা-মাধুরী সুধায় পরিপূর্ণ। অঙ্গন ও প্রাঙ্গণে আপনারা প্রতি মাসেই বহু মহিলার লেখা ছেপে থাকেন—যেজন্য আমাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভের সুযোগ-উন্মুক্ত। এই বিভাগে প্রত্যেকটি লেখাই যে সুখপাঠ্য হয় তা নয়, তবে গুণপণার পরিচয় যথেষ্ট থাকে। বর্তমানে ধারাবাহিক প্রকাশিত 'ক্যাসানোভার স্মৃতিকথা', একজন মহিলা অনুবাদ করছেন বাঙলা ভাষায় কল্পনাতীত নয় কি? এই বিশেষ 'আত্ম-জীবনী' পৃথিবীর সাহিত্যে বিখ্যাত ভিন্ন ভিন্ন কারণে। শান্তা বসু দক্ষতা ও সংযমের সঙ্গে ক্যাসানোভাকে বাঙলার পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে যেন চাক্ষুষ পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। অনুবাদিকার অন্য একটি

লেখা আমরা কিছুকাল আগে বসুমতীতেই পড়েছি। বিখ্যাত রুশীয় লেখিকা ভেরা প্যাশেভার কি একটি বই, নাম আমার সঠিক মনে পড়ছে না। 'ক্যাসানোভা'র অনুবাদে বাঙলা সাহিত্য লাভবান হবে। আবার অনেকদিন পরে 'মিত্রা'র লেখিকা সুলেখা দাশগুপ্তার 'বর্ণালী' উপহার পেয়েছি। বর্ণালী শুরুতেই আমাদের দৃষ্টি ও মনকে আকৃষ্ট করেছে। এই লেখিকার লিখনভঙ্গী বেশ উন্নত। বারি দেবীর গল্প আমরা কয়েকটি পড়েছি। 'বাতিঘর' কিঞ্চিৎ পুরানো ষ্টাইলে লিখিত, কিন্তু ঘটনাবিন্যাস ও গল্পাংশ প্রশংসার যোগ্য। আরও কয়েক জনের লেখা উল্লেখ করা যায়, চিঠির আকার তাতে আর রক্ষা হয় না। জয়ন্তী সেন কবিতা বেশ ভালই লিখছেন। তাঁর লেখা ক'মাস দেখছি না কেন? জয়ন্তী সেনের কবিতার ভাবা ও ছন্দ বেশ হৃদয়গ্রাহী। সবশেষে আমার নিবেদন, মহিলা লেখিকাদের আরও সন্ধান দিক বসুমতী। শোনা যায় সাহিত্যের পাঠিকাই নাকি সংখ্যায় অধিকতর, কিন্তু লেখিকাদের প্রাদুর্ভাব কম কেন? নমস্কার ইতি—কৃষ্ণা সান্যাল। বিজয় নগর, নই দেউলী।

চার জন

আমরা মাসিক বসুমতীতে বিখ্যাত বাঙালীদের জীবনকথা পড়ে খুব আনন্দ পাই। আপনি আমাদের যুবকদের সামনে এই সব মহৎ লোকদের জীবনী প্রকাশ করে খুব মহৎ কাজ করছেন। তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। এই সম্পর্কে আমাদের খৃষ্টীয় সমাজের দুই জন ব্যক্তির কথা আপনাকে জানাচ্ছি, আপনি যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে তাঁদের বিষয় প্রকাশ করতে কৃতার্থ অনুভব করব। (১) আচার্য্য সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, তিনি ১৯১১ সালে মোহনবাগানের খেলোয়াড় ছিলেন। বিষ্ণুপুর শিক্ষাসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। আজীবন সমাজ সেবা করেছেন, বাঙালার কৃতী সন্তান, খৃষ্টীয়ান সমাজের উত্তর ভারত যুক্ত মণ্ডলীর অবৈতনিক প্রধান আচার্য্য। তাঁর বয়স ৭৩ এখন, তবুও সারা উত্তর ভারতে পরিভ্রমণ করেন এই কার্য্য উপলক্ষে। শিক্ষাব্রতী হিসাবে তাঁর অবদান অপরিমেয়। (২) দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা পরে জানাব আপনাকে। ইনি শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস। ইতি—সতীশ নন্দ। Y. M. C. A., College St. Cal—12.

[আপনি এই দুই কৃতী ব্যক্তির জীবনী 'চারজন'এর জন্য লিখে পাঠিয়ে দিন।—স]

আপনার সুপ্রসিদ্ধ মাসিকে "বাঙালী পরিচিতি (চারজন)" নিয়মিত পাঠ করি। কিন্তু রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্রের উল্লেখ উহার মধ্যে কেন নাই বুঝিতে পারিলাম না। ইনি ১৯১৫ সালে ইংরাজী সাহিত্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া এম, এ পাশ করেন। ইঁহার সহপাঠীদের মধ্যে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান উপাচার্য্য শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত ও প্রাক্তন উপাচার্য্য ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে আছেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী, বিচারপতি শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীপাঁচকড়ি সরকার, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার, শিক্ষাবিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ডক্টর সনৎকুমার বসু ইত্যাদি।—শ্রীরমারাণী সরকার। ব্যারাকপুর।

[আপনি এই কৃতী ব্যক্তির জীবনী লিখে দিন, অনুরোধ।—স]

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Sending herewith subscription for one year. Dr. F. Chrestien. P. O. Barharwa. Santal Pargana.

আশ্বিন ১৩৬৪ সংখ্যা হইতে এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইলাম। —সবিতা চক্রবর্ত্তী। c/o P. K. Chakrabarti, I.A.S. Belvedere Estate. Cal-27.

Please put my name as one of your subscribers. Sending Rs. 24/- for one year. —Mrs. Shyamali Guhathakurata. 41. Farleigh Ave. se-19. Singapure.

মাসিক বসুমতীর এক বছরের মূল্য বাবদ পনেরো টাকা পাঠাইলাম। পত্রিকা নিয়মিত পাঠাবেন।—শ্রীমতী তিলোত্তমা দাস-মহাপাত্র। Jamirapalgarh. Midnapur.

ছয় মাসের পত্রিকার মূল্যের দরুণ সাড়ে সাত টাকা পাঠাচ্ছি। —কল্পনা বসু। Manivilla. Nougonj. Assam.

বার্ষিক চাঁদা পনেরো টাকা পাঠালাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাবেন। —দীপ্তি দত্ত-রায়। C, 85. Vinay Nagar. New Delhi.

I am sending subs. for M. Basumati as usual. —Gouri Biswas. Gauhati.

Being subs. for one year, please acknowledge. —Mrs. L. P. Devi Barwah. Borhat Tea Estate. N. E. Rly. Upper Assam.

পত্রিকার মূল্য বাবদ টাকা পাঠাইতেছি। প্রাপ্তি জানাইবেন। —মিস অণিমা রায়। হাজারিবাগ। বিহার।

Sending my annual subs. for one year. —Aparajita Ghose. Berhampur Main Rd. Mursidabad. West Bengal.

Sending Rs. 15/- being the yearly subs. for M. Basumati. —R. N. Sikdar. Carron Tea Estate.

Annual subs. for M. Basumati. Kindly acknowledge. —Hd. Master, D. N. High school. Konjahgarh. Orissa.

মাসিক বসুমতীর বাকী চাঁদা ৭৷৹ পাঠাইলাম। বাৎসরিক চাঁদা পুরা জমা হইল। R.K. Ghosh. Jabulpur.

গ্রাহক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইতেছি। দয়া করিয়া পূর্ব্ববৎ আপনার পত্রিকা পাইলে বাধিত হইব।—স্নেহলতা সেন, রাসবিহারী এভিন্যু। কলিকাতা।

Sending Rs. 7·50 for the subscription of your Monthly Basumati for six months.—Kanika Dutta, Kalahandi, Orissa.

আষাঢ় সংখ্যা থেকে মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হইতে চাই। চাঁদা বাবদ ৭৷৹ টাকা পাঠালাম। দয়া করে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন। —Bani Chakravorty, Sabarmati, Ahmedabad.

১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন। গ্রাহিকা ক'রে সুখী কোরবেন।—অরুণা চক্রবর্ত্তী, গৌহাটি, আসাম।

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা ১৫৲ টাকা এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আশ্বিন হইতে আমাকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া নিয়মিত 'মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—Niharika Choudhury, Rajasthan.

আমার নমস্কার গ্রহণ কোরবেন। ১৩৬৩ সালের ফাল্গুন সংখ্যা থেকে বসুমতী পাঠাবেন দয়া কোরে। ছ' মাসের চাঁদা পাঠালাম।—Sabita Devi, Azamgarh.